॥ স্কেচ ॥

শিল্পী:

শ্রীগোপাল ঘোষ

তোমার সম্ভাষণ শোনবার জন্য তাঁরা তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

—গোবিন্দ, আমি তাঁদের কি বলব?

—পুরুষজাতি ভার্যার মুখে নিজের স্তুতি শুনলে যেমন পরিতৃপ্ত হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। কৃষ্ণা, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের কাছে গিয়ে তাঁদের স্তুতি কর।

—হা কৃষ্ণ, আমি তাঁদের গঞ্জনাই দিয়েছি, এই দগ্ধ মুখে স্তুতি আসবে কেন? কি বলব তুমিই শিখিয়ে দাও।

—সখী কৃষ্ণা, বাগ্‌দেবী তোমার রসনায় অধিষ্ঠান করবেন, তুমি আজ সর্বসমক্ষে অসংকোচে তাঁদের সংবর্ধনা কর। এখন আমার সঙ্গে পতিসন্দর্শনে চল। সেবন্তী, মাল্য প্রস্তুত হয়েছে?

সেবন্তী একটা ঝুড়ি দেখিয়ে বললে, এই যে। অন্য ফুল পাওয়া গেল না, শুধু কদম ফুলের মালা।

কৃষ্ণ বললেন, ওতেই হবে।

ম্যাদি দ্বিজগণে বেষ্টিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অশ্বত্থ-তরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মন্ত্রজপ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণ সহিত দ্রৌপদীকে আসতে দেখে সকলে উত্থান করলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, পাঞ্চালী, তোমার মৌন ভঙ্গ কর।

পাঞ্চালী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।—দেবসম্ভব পঞ্চ আর্যপুত্র, পতিমহিমায় অভিভূত হয়ে আমি সম্ভাষণ করছি, যা মনে আসছে তাই বলছি, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর। পিতৃভবনে স্বয়ংবরসভায় ধনঞ্জয়কে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, ইনি লক্ষ্যভেদ করলে আনন্দে বিবশ হয়েছিলাম, এঁকেই পতিরূপে পাব ভেবে নিজেকে শত্ধন্য জ্ঞান করেছিলাম। কিন্তু বিধাতা আর গুরুজনরা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেন নি, পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই আমার বিবা দিলেন। অন্তর্যামী সাক্ষী, কিছুকাল পরেই আমার সব ক্ষোভ দূর হল, পঞ্চপতি আমার অন্তরে একীভূত হয়ে গেলেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেমন পৃথক পৃথক এবং একযো অন্তঃকরণ রঞ্জিত করে সেইরূপ পঞ্চপতি স্বতন্ত্র ও মিলি ভাবে আমার হৃদয় উদ্‌ভাসিত করেছেন।

পাণ্ডবাগ্রজ, ইন্দ্রপ্রস্থে যখন পট্টমহিষী ছিলাম ত বসন ভূষণে ও প্রসাধনে আমি প্রচুর অর্থব্যয় করেছি, প্রিয়জনে মুক্তহস্তে দান করেছি। যখন যা চেয়েছি তুমি তখনই দিয়েছ, প্রশ্ন কর নি, অপব্যয়ের জন্য অনুযোগ কর নি। দা দাসীদের আমি শাসন করেছি, তোমার প্রিয় পরিচারক আমার কঠোরতার জন্য তোমার কাছে অভিযোগ করেছে, কি তুমি কর্ণপাত কর নি, পাছে পাণ্ডবমহিষীর মর্যাদা ক্ষ হয়। তুমি শান্তিপ্রিয় ক্ষমাশীল ধর্মভীরু, তোমার ধর্মাধর্ম বিচারপদ্ধতি না বুঝে আমি বহু ভর্ৎসনা করেছি, তথাপি এ অপ্রিয়বাদিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নি। অজাতশত্রু মহাম ধর্মরাজ, তোমার মহত্ত্ব বোঝবার শক্তি ক জনের আছে?

মধ্যম পাণ্ডব, তুমি জরাসন্ধবিজয়ী মহাবল, দুঃসা কর্মই তোমার যোগ্য, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ক তোমাকে নিযুক্ত করেছি, আমার প্রতি প্রীতিবশে তুমি যেন হয়ে সে সকল সম্পাদন করেছ। তুমি ভোজনবিলাসী, রন্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। ইন্দ্রপ্রস্থে বহুসংখ্যক নিপুণ সূপ তোমার তৃপ্তিবিধান করত, কিন্তু এই অরণ্যাবাসে আমি সামান্য ভোজ্য এক পাকে রন্ধন করে তোমাকে দিয়ে থা তাতেই তুমি তুষ্ট হও, কখনও অনুযোগ কর না যে বি বা অতিলবণ বা ঊনলবণ হয়েছে। নরশার্দূল, তোমা সকলের চেষ্টায় রাজ্যোদ্ধার হবে, কিন্তু আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ একমাত্র তুমিই নিতে পারবে। দুর্যোধন দুঃশাসনকে তাদের অন্তিম দশায় মনে করিয়ে দি পাণ্ডবমহিষীকে নির্যাতন করে কেউ নিস্তার পায় না।

তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ নও

ভ্রাতারা যুদ্ধকালে তোমারই নেতৃত্ব মেনে থাকেন। তুমি দেবপ্রিয় সর্বগুণাকর, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, দেবসেনাপতি স্কন্দতুল্য রূপবান, নৃত্যগীতাদি কলায় পটু, হৃষীকেশ কৃষ্ণ তোমার অভিন্নহৃদয় সখা। যখন সুভদ্রাকে বিবাহ করে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরীতে এনেছিলে তখন আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সত্য বলছি, এখন আমার কোনও দুঃখ নেই। যে নারী পঞ্চপতির ভার্যা সে কোন্ অধিকারে সপত্নীকে ঈর্ষা করবে? সুভদ্রা আমার প্রিয়তমা ভগিনী, দ্বারকায় তার কাছে আমার পঞ্চপুত্রকে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। পরন্তপ মহারথ, কুরুপাণ্ডব-সমরে তুমিই পাণ্ডব সেনাপতি হবে, বাসুদেবের সহায়তায় বিপক্ষের সকল বীরকেই তুমি পরাস্ত করবে। কুরুপিতামহ ভীষ্ম আমার মহাগুরু, তোমাদের আচার্য দ্রোণ আমার নমস্য, কিন্তু দ্যূতসভায় তাঁরা রাজকুলবধূকে রক্ষা করেন নি, বীরের কর্তব্য পালন করেন নি, কাপুরুষবৎ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। সব্যসাচী, সম্মুখ সমরে মর্মভেদী শরাঘাতে তাঁদের সেই কর্তব্যচ্যুতি স্মরণ করিয়ে দিও।

চতুর্থ পাণ্ডব, তুমি সুকুমারদর্শন বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি বিচিত্র পরিচ্ছদ এবং বহু রত্নালংকার ধারণ করতে, কিন্তু এখানে আমাকে অল্পভূষণা দেখে তুমিও নিরাভরণ হয়েছ, গন্ধমাল্যাদি বর্জন করেছ। তোমার সমবেদনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তুমি দশার্ণ ত্রিগর্ত পঞ্চনদ প্রভৃতি বহু দেশ জয় করেছিলে। আগামী সমরেও তুমি জয়লাভ করে যশস্বী হবে।

কনিষ্ঠ পাণ্ডব, তুমি আমার পতি ও দেবর, প্রেম ও স্নেহের পাত্র, বিশেষভাবে স্নেহেরই পাত্র। বনযাত্রাকালে আর্যা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্চালী, আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, সে যেন এই বিপদে অবসন্ন না হয়। নির্ভীক অরিন্দম, তুমি অবসন্ন হও নি, যুদ্ধের জন্য অধীর হয়ে আছ। পূর্বে তুমি মাহিষ্মতীরাজ দুর্মতি নীলকে এবং কালমুখ নামক নররাক্ষসগণকে পরাস্ত করেছিলে। দুরাত্মা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধেও তুমি নিশ্চয় বিজয়ী হবে।

হে দেবপ্রতিম মহাপ্রাণ পঞ্চপতি, দেববন্দনাকালে দেবতার দোষকীর্তন কেউ করে না, তোমাদের দোষের কথাও এখন আমার মনে নেই। আজ আমার জন্য তোমরা জীবন দিতে উদ্যত হয়েছিলে, দাসত্ব বরণ করেছিলে। কোন্ নারী আমার তুল্য পতিপ্রিয়া? পতিনির্বাসিতা সীতা নয়, পতিপরিত্যক্তা দময়ন্তীও নয়। তোমরা অপর পত্নীদের পিত্রালয়ে রেখে কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর যাপন করতে এসেছ, এক দুই বা তিন অখণ্ড পত্নীর পরিবর্তে আমার পঞ্চমাংশেই তুষ্ট আছ। কোন্ স্ত্রী আমার ন্যায় গৌরবিণী? কোন্ পতি তোমাদের ন্যায় সংযমী? বহুবর্ষপূর্বে পিতৃগৃহে বিবাহমণ্ডপে একই দিনে তোমাদের কণ্ঠে একে একে মাল্য দিয়েছিলাম, আজ এই অরণ্যভূমিতে মুক্তাকাশতলে একই ক্ষণে পুনর্বার দিচ্ছি। মহানুভাব পঞ্চপতি, প্রসন্ন হও, স্নিগ্ধনয়নে আমাকে দেখ।

পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে মালা দিলেন, সেবন্তী শঙ্খধ্বনি করলে, বিপ্রগণ সাধু সাধু বললেন, কৃষ্ণ আনন্দে করতালি দিলেন। তার পর দ্রৌপদীর মস্তকে করপল্লব রেখে যুধিষ্ঠির বললেন, পাঞ্চালী, তোমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায় দেখছি, এখন স্বগৃহে বিশ্রাম করবে চল।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে অর্জুন বললেন, মাধব, জটাজুটধারী ঋষিটিকে পেলে কোথায়? তাঁর অভিনয় উত্তম হয়েছে, কিন্তু হাস্যদমনের জন্য তিনি বিকট মুখভঙ্গী করছিলেন। ভাগ্যক্রমে ধর্মরাজ পাঞ্চালী ও আর সকলে তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম বললেন, ওহে কৃষ্ণ, একবার এদিকে এস তো। পাঞ্চালী বোধ হয় আর কখনও আমাদের গঞ্জনা দেবেন না, কি বল?

কৃষ্ণ বললেন, মাঝে মাঝে দেবেন বই কি, ওঁর বাক্শক্তির তো কিছুমাত্র হানি হয় নি।

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশে সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ কোনও কালে পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু সংস্কৃতের পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক অনেক দূরে। বৈদিক ভাষা বলিতে বোঝায় প্রধানতঃ ঋগ্বেদের ভাষা। ঋগ্বেদের মধ্যেও পরবর্তী যুগে রচিত অনেক অংশ আছে; কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া দিলে তাই হইতেছে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। অন্যান্য বৈদিক সংহিতার বা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা কাল হিসাবে অর্বাচীন ও ব্যাকরণ হিসাবে বিভিন্ন। অর্থাৎ এই রচনাগুলির ভাষা অনেক পরিমাণে বৈদিকত্ব বিসর্জন দিয়া পরবর্তী কালের সংস্কৃতের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বৈদিক ও সংস্কৃত মূলতঃ অভিন্ন হইলেও, একটি আর একটির বহু পূর্ববর্তী এবং তাহাদের মধ্যে কিছু মৌলিক ও অনেক কালপরিণামগত পার্থক্য রহিয়াছে।

কিন্তু স্থানগত পার্থক্যও রহিয়াছে। কারণ, সংস্কৃত যুগের ত কথাই নাই, পরবর্তী বৈদিক যুগেই আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র পঞ্চনদের তীর হইতে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীতে এবং ক্রমশঃ কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেখিতে পাই, প্রাচ্য প্রদেশের বৈদিক উপভাষা প্রাচীনতর বৈদিক ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহার আদিম রূপে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে, উত্তর প্রদেশে (অর্থাৎ পঞ্চনদে) ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলা হয়, তাই ভাষা শিক্ষা করিতে উত্তর প্রদেশেই যাওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার তেমনি প্রাচীন ঋগ্বেদীয় ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল, 'র' এই বর্ণের প্রাচুর্য। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক ভাষা, যাহা প্রাচ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই র-কার স্থানে ল-কার বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—ঋগ্বেদের 'রম্বতে', 'শ্রীর', 'রোচন' প্রভৃতি অর্বাচীন বৈদিকে হইয়াছে 'লম্বতে', 'শ্লীল', 'লোচন' ইত্যাদি। এই ল-কারের আবির্ভাব প্রাচ্যদেশের বিশেষত্ব বলিয়া বৈয়াকরণ পতঞ্জলিও লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা জানি, আরও পরবর্তী সময়ে প্রাচ্যদেশের মাগধী প্রাকৃতে এই ল-কারের প্রাধান্য ছিল। মাগধী প্রাকৃত হইতে বাংলা ভাষাতেও ইহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; যেমন সংস্কৃত প্রাচীর হইতে বাংলা পাঁচিল; হরিদ্রা হইতে হলুদ; সংস্কৃত—দীর্ঘ—প্রা দীহর—বাং দীঘল ইত্যাদি।

কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যসংস্কৃতি ও বৈদিক ভাষা মগধ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিলেও, সে সময়ে বাংলাদেশ বা বাংলা ভাষার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই বৈদিকের সঙ্গে বাংলার কোন সাক্ষাৎ সংযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষা একদিকে সংস্কৃত, অন্যদিকে প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইল। এই প্রাকৃত ভাষার প্রাচ্য রূপ হইতেই বাংলা ভাষার কালক্রমাগত উৎপত্তি। কিন্তু বাংলা ভাষার আদিযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল অনেক পরে, আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল এবং অপভ্রংশের মধ্য দিয়া ভারতের আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলি ক্রমশঃ তাহাদের স্থান দখল করিয়াছিল।

কিন্তু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে সাক্ষাৎভাবে উদ্ভূত হইলেও, বিদ্বৎসমাজে ও সাহিত্যে চিরকাল প্রচলিত ছিল বলিয়া বাংলা ভাষা কোন দিন সংস্কৃতের প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃতে পরিবর্তিত হইলেও, ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষার কাঠামোটি মোটামুটি বজায় ছিল। কিন্তু যখন সংস্কৃত রূপ ছাড়িয়া মধ্যস্তরে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিল, তখন ভাষার কাঠামো অনেকটা ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করিল—প্রধানতঃ উচ্চারণপদ্ধতিতে, শব্দ ও ধাতুরূপে এবং পদপ্রয়োগে। প্রাকৃতের এই পরিবর্তিত কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাতেও প্রবর্তিত হইল। তাই বাংলা সংস্কৃত হইতে পৃথক ও বিশিষ্ট রূপ লাভ করিল। যেমন, প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় সংস্কৃতের দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে এবং বহুবচনের বিভক্তিও নামমাত্র অবশিষ্ট; সাতটি কারকের মধ্যে কর্তা বা প্রধান কারক এবং তির্যক বা অপ্রধান কারক এই দুইটি মাত্র কারকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; চতুর্থী ও ক্লীবলিঙ্গ লুপ্তপ্রায়; স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার সীমাবদ্ধ; সংস্কৃত শব্দরূপের বিভক্তি-বৈচিত্র্য বাংলায় বর্তিয়াছে যৎসামান্য; ধাতুরূপের প্রাচুর্য একেবারেই নাই—ত্রিবিধ অতীত, দ্বিবিধ ভবিষ্যৎ অথবা দ্বিবিধ লিঙ্গের প্রয়োগ নাই; ধারকরা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া সন্ধির ব্যবহার নাই বলিলেও চলে; উচ্চারণে মাগধী প্রাকৃত হইতে বাংলায় প্রায় সর্বত্র শ-কারের প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি লক্ষণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কেবল গঠন উচ্চারণ বা ব্যাকরণ হিসাবে পরিবর্তিত হইলেও, নিছক শব্দসম্পদে সংস্কৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে বাংলা যুগে যুগে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলায় একশ্রেণীর শব্দ আছে, যাহা আদি-আর্য বা সংস্কৃত হইতে মধ্য-আর্য প্রাকৃতের ভিতর দিয়া ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করিয়া বাংলা রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন—সং কৃষ্ণ—প্রা কণ্হ—অপ কাণ—বাং কানু বা কানাই; সং কার্য—প্রা কজ্জ—বাং কাজ; সং অষ্ট—প্রা অট্‌ঠ—বাং আট ইত্যাদি। এই শব্দগুলিকে বলা হয় তদ্ভব, অর্থাৎ 'তৎ' (মূলস্থানীয় ভাষা) হইতে 'ভব' (ঐতিহাসিকক্রমে উদ্ভূত)। বাংলার আসল মৌলিক শব্দ হইতেছে এইগুলি, যাহা আদি ভাষা হইতে কালের বিবর্তনে ও স্বাভাবিক পরিণতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু ইহা ছাড়া এবং অন্য ভাষা হইতে আগন্তুক শব্দ ছাড়া, বাংলায় আর একশ্রেণীর [illegible] আছে যেগুলি সংস্কৃত হইতে সা[illegible] গৃহীত, প্রাকৃতের মধ্য দিয়া [illegible] যেমন—কৃষ্ণ, কার্য, অষ্ট এই [illegible] শব্দগুলিও কানু-কানাই, [illegible] তদ্ভব শব্দগুলির সঙ্গে ব্যব[illegible]

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃত হইতে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত এই শব্দগুলিকে বলা হয় তৎসম অথবা তৎ বা সংস্কৃতের সম বা অভিন্ন। বাংলায় তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রায় শতকরা প'য়তাল্লিশ। ইহা ছাড়া, সংস্কৃত হইতে ধারকরা আর এক শ্রেণীর শব্দ বাংলায় আছে, যাহাকে বলা হয় অর্ধতৎসম। এগুলি এককালে সংস্কৃত হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনর্বার গৃহীত হইয়া তৎকালীন ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এগুলির রূপ তদ্ভব হইতে অন্যভাবে কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন—একদিকে সং হইতে তদ্ভব কানু বা কানাই, তেমনি অন্যদিকে আবার সং কৃষ্ণ পুনগৃহীত হইয়া মধ্য বাংলা কিষণ বা কষণ ও আধুনিক বাংলা কেষ্টো বা কেষ্টা ইত্যাদি দুই বা ততোধিকরূপে প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ, তৎসম রাত্রি, তদ্ভব রাত বা রাইত, অর্ধতৎসম রাত্তির; তৎসম বৈদ্য, তদ্ভব বেজ, অর্ধতৎসম বদ্দি ইত্যাদি। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার বাংলা কথ্য ভাষায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এগুলি পুনর্গৃহীত সংস্কৃত শব্দের সাক্ষাৎ রূপান্তর মাত্র; প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আগত ও ঐতিহাসিক ক্রমে পরিবর্তিত তদ্ভব শব্দের সঙ্গে এইখানেই ইহাদের পার্থক্য।

অপর ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে যে সব শব্দ বাংলায় আসিয়াছে, সেগুলি আগন্তুক শব্দ. যদিও এখন বাংলা ভাষায় ইহার অধিকাংশই কায়েমীভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহারা আসিয়াছে প্রধানতঃ ফারসী ('আন্দাজ', 'খবর', 'খুব'), আরবী (কেতাব, জিলা, আয়েশ), তুর্কী (উজবুক, কাবু, উর্দু), পর্তুগীজ (আনারস, জানালা, গামলা) ও ইংরেজী (টেবিল, চেয়ার, আস্তাবল) প্রভৃতি ভাষা হইতে ঠিক অবিকলভাবে নয়, বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতির অনুযায়ী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে। এখন ইহাদের বিদেশী শব্দ বলিয়া অনেক সময় চেনা যায় না। ইহা ছাড়া, এক শ্রেণীর শব্দ আছে যাহাকে বলা হয় দেশী। ইহাদের অনেকগুলি বাংলার আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতে বাংলায় বেমালুম অনুবর্তিত হইয়াছে; আবার অনেকগুলির ব্যুৎপত্তিও জানা নাই। যেমন—ঝোল, ঢেউ, ডাঙ্গা, ঢোল ইত্যাদি। বাংলায় দেশী ও বিদেশী শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না।

তথাপি বাংলার আসল ও মৌলিক শব্দ হইতেছে তদ্ভব। সেই সঙ্গে রহিয়াছে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের প্রাচুর্য, যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যুগে যুগে বাংলা ভাষার পুষ্টি ও বিকাশের দিক্ হইতে সংস্কৃত ভাষা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেকটা লেখকবিশেষের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে, কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি এই প্রবণতা বাংলা ভাষার আদিকাল হইতেই দেখা যায়। বাংলার পক্ষে এই প্রবণতা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, এবং ইহার মূলে ছিল সংস্কৃতের বহুযুগসঞ্চিত শব্দসম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষা। কারণ, প্রাকৃতধর্মী হইলেও বাংলা সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কবিহীন নয়, বরং ইহার স্বজাতি ও সগোত্র। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ হইতে বাংলা কথ্য ভাষার না হউক, সাহিত্যিক ভাষার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল সংস্কৃতের শব্দপ্রাচুর্য। পণ্ডিতী বা সংস্কৃতঘেঁষা লেখার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যের সাধারণ প্রচলিত শিষ্ট বা তথাকথিত সাধুভাষার ইহাই হইতেছে ক্রমবিবর্তিত রূপ।

কিন্তু সংস্কৃতবহুল বলিয়া বাংলা সাধুভাষাকে অসাধু অপবাদ দিবার বা আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, বাংলা ভাষার এই দ্বিবিধ রূপ, যাহা দুই হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আকস্মিক নয়, তাহা ইহার স্বাভাবিক বিকাশ-ধর্মের বিবর্তনে সম্ভব হইয়াছে। বাংলার প্রাকৃত-প্রকৃতি বজায় রাখিয়া সংস্কৃতের সমৃদ্ধতর ভঙ্গি ও বিশালতর বৈভব ইহাকে যে সৌন্দর্য ও শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহাই ইহার যুগ্মমিলনের ক্রমবিকাশলব্ধ অমূল্য মূর্তি। সংস্কৃতের শ্রী, শক্তি সম্পদ আহরণ করিয়া বাংলা ভাষা যে উত্তরোত্তর বর্ধনশীল ও সর্বতোমুখী হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা সর্বাঙ্গীন সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত ভঙ্গির নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সম্ভব হইত না। কারণ, অপেক্ষাকৃত শিথিল ও দুর্বল প্রাকৃত বাংলার প্রয়োজন ছিল আভিজাত্যের সংযম ও সংহতি, সুষমা ও সামর্থ্য। শুধু শব্দাড়ম্বর, বৈদগ্ধ্য বা অলঙ্কৃতির জন্য, ইহার দীপ্ত ও পরিচ্ছন্ন মূর্তির জন্য, মেরুদণ্ডের জন্য, শব্দার্থের নিটোল পরিপূর্ণতা ও রসসংবাদী ধ্বনিসৌষ্ঠবের জন্য প্রয়োজন ছিল—এবং আজও রহিয়াছে—সহজ ও উপযোগী সংস্কৃত প্রভাবের আশ্রয়।

বৈদেহী

দোতলার বারান্দার সবটাই রঙীন কার্পেটে ঢাকা, আর সিঁড়িটার ধাপে ধাপে চকচকে তারের নেট থাপে থাপে বসানো। এই প্রকান্ড বাড়িটার বুকের ভেতর কোথাও কোন আঁচড় লাগতে পারে না।

সিঁড়িটা উপরে উঠে এসে ঠিক যেখানে বারান্দার সঙ্গে মিলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিকাশ আর মল্লিকা। পাশাপাশি নয়, মুখোমুখিও নয়, শুধু দু'জনের কাছাকাছি দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একজনের মুখ এদিকে আর আর-একজনের মুখ ওদিকে। কেমন এলোমেলো আর ছন্দছাড়া এই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা, আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী। যেন হঠাৎ ঝড়ের একটা ধাক্কা লেগে জোড়া ফুলদান উল্টে পড়ে গিয়েছে আর মিল হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বিকাশ আর মল্লিকা হ'লো স্বামী আর স্ত্রী, হয় পাশাপাশি নয় মুখোমুখি ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে। এত রাত্রে, সিঁড়িমুখের কাছে বারান্দার ওপর এত দীপ্ত বিদ্যুতের আলোকের নীচে এভাবে এত গম্ভীর হ'য়ে দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা একটু বিসদৃশ বৈকি।

সুবোধ ঘোষ
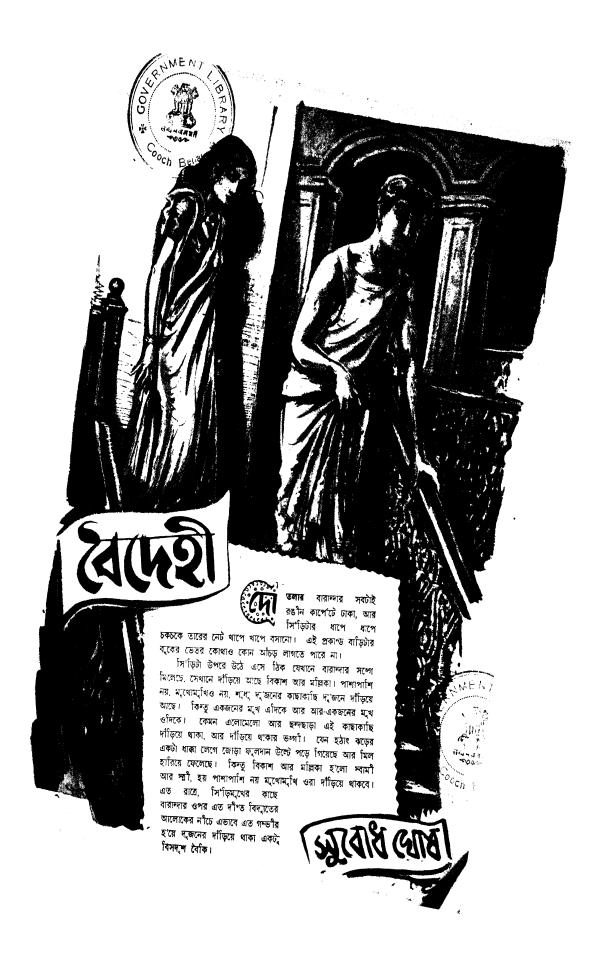
প্রথম কথা বলে মল্লিকা—কোথায় যাচ্ছ?

বিকাশ উত্তর দেয়—নীচে।

কিন্তু নীচে চলে যেতে পারেনি বিকাশ। এখনো শান্ত ও গম্ভীরভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

মল্লিকা হলো এক অতি সাধারণ মোক্তারের মেয়ে, আর বিকাশ হলো অতি বড় এক জমিদারের ছেলে। মল্লিকার রোগা রোগা দুটো হাতে চুড়ি ঢল্ ঢল্ করে। আর বিকাশের কাঁধের পেশীর চাপে গেঞ্জি ছিঁড়ে যায়। এ-হেন দুর্বল মল্লিকা এ-হেন প্রবল বিকাশকে বাধা দেবে কেমন ক'রে? বাধা হবার মতো একটা বস্তুই যে নয় মল্লিকা!

রাজনগরের সেই বিখ্যাত কুলীন, সেই মিত্র বংশের ছেলে শ্রীবিকাশচন্দ্র মিত্র, মস্ত বড় কুলপঞ্জীতে যে বংশের নানা গৌরব ও কীর্তির কথা পয়ার ছন্দে লেখা আছে। সম্পদেই বা কি কম? আছে দেশের জমিদারী, আছে কলকাতায় দশটা বাড়ি, আছে নানা কোম্পানীর শেয়ার। আজ তিন বছর হলো যে বইখানি লিখেছে বিকাশ, তার সুনাম কলকাতা ছাড়িয়ে এখন মহীশুরে বোম্বাই ও দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। হিন্দু কোড বিলের অনেক ভুল ধরে দিয়েছে বিকাশ। প্রমাণ ক'রেছে বিকাশ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটা ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই বিল রচনা করা হয়েছে।

আর ওদিকে দিনাজপুরের এক সাধারণ মোক্তারবাড়ির মেয়ে মল্লিকা। টাকা-পয়সায় বড় না হোক্, হাসিখুসিতে আর মায়া-মমতায় বেশ বড়ই তো সেই মোক্তার বাড়ি। সবচেয়ে বড় ছিল মল্লিকার মায়ের মনের আশা। বলতেন—একটি মাত্র মেয়ে আমার, বড় ঘর না পেলে বিয়েই দেব না মেয়ের।

প্রতিদিন ঠিক সকাল আটটার সময় নিজের হাতেই সর আর কাঁচা হলুদ খুব মিহি ক'রে বেটে নিয়ে মেয়েকে কাছে ডাকেন মল্লিকার মা। পড়া ছেড়ে উঠে আসে মল্লিকা। মেয়েকে প্রায় কোলের উপর বসিয়ে নিয়ে সোনা-রংয়ের সরবাটা মাখাতে থাকেন। দৃশ্যটা এক একদিন চোখে পড়ে যায় মল্লিকার বড়দা'র। বড়দা হেসে ফেলেন—এই ধিঙ্গিটাকে নিয়ে তুমি এসব কি করছো মা?

হ্যাঁ, ধিঙ্গি তো বটেই। গত মাঘে একুশে পা দিয়েছে মল্লিকা। আর, গতকাল কলেজ থেকে হাসিমুখ নিয়ে ফিরেছে, আই-এ টেস্ট পরীক্ষায় মোটামুটি ভালভাবেই পাশ করেছে মল্লিকা। এখন শুধু বড় পরীক্ষাটা রয়েছে সামনে, আর মাত্র তিনটি মাস পরেই।

মনে মনে অবশ্য আক্ষেপ করেন মল্লিকার মা, কি যে একটা অপদার্থ শরীর করেছে মেয়েটা, গায়ে আর শাঁস ধরে না। মুখটাই শুধু দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠছে। সত্যিই তো, যদি কোন গরীবের সংসারে, একটা খাটুনির ঘরে গিয়ে পড়ে মেয়েটা, কি হবে ওর উপায়? কদিন বেঁচে থাকতে পারবে?

সোনা-রঙের সরবাটা নিঃশেষ হয়ে যায়। স্নান সেরে নিয়ে বারান্দায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন চুল আঁচড়ায় মল্লিকা, তখন বেতের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বারান্দার প্রান্তে দেখা যায় পাকাচুলে ভরা মাথা নিয়ে প্রবীণ এক ভদ্রলোকের মূর্তি। উঠোনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন ভদ্রলোক—কি লো বৈদেহী, ঘরে আছিস্, না কলেজে চলে গিয়েছিস্?

মল্লিকা সাড়া দেয়—আমি ঘরেই আছি বৈদান্তিক।

ভদ্রলোক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এসে মল্লিকার কাছে দাঁড়ান। তার পরেই শুকনো গাল কাঁপিয়ে, আর দুই চোখের ভুরু নাচিয়ে হাসতে থাকেন।—ঘরের বার হবি কবে?

মল্লিকা—যেদিন বের করে দেবেন সেদিন।

ইনি হলেন এই বাড়ির রাম জামাইবাবু, রামকুমার রায়, মল্লিকার সেই জেঠতুতো দিদির স্বামী, যিনি বয়সে মল্লিকার মায়ের চেয়েও দু'বছরের বড়। তামাকের কারবার করেন রাম জামাইবাবু, থাকেন অন্য এক পাড়ায়, আর মাঝে-মাঝে আসেন এই বাড়িতে। খোঁজ ক'রে যান, মল্লিকার বিয়ের জন্য কোন সম্বন্ধের খোঁজ খবর হচ্ছে কিনা।

ঠাট্টা করেই মল্লিকার রোগা দেহটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না রাম জামাইবাবু। দেহ নেই মল্লিকার, তাই মেয়েটা একটা বৈদেহী।

মল্লিকা'ও রেহাই দেয়নি রাম জামাইবাবুকে। দাঁত নেই রাম জামাইবাবুর, বয়স ষাটের ওপর। দন্তহীন রাম জামাইবাবু তাই একটা বৈদান্তিক।

রাম জামাইবাবু বলেন—আমি বলি শোন বৈদেহী, ঘরের বার হয়ে তোর দরকার নেই।

মল্লিকা—আমিও তো তাই বলি।

রামজামাইবাবু—বিয়ে না ক'রে শুধু প্রেম ক'রে যা।

মল্লিকা—কেমন ক'রে?

রামজামাইবাবু—চিঠি লিখে, শুধু চিঠি।

মল্লিকা—তাহ'লে একটা মানুষ ঠিক ক'রে দিন।

রামজামাইবাবু—কেন?

মল্লিকা—নইলে, চিঠি লিখবো কার কাছে?

রামজামাইবাবু—আপাতত আমার কাছেই যদি.........।

রাম জামাইবাবুর কথা আর শেষ হয় না। বাইরের ঘর থেকে যেন মুখর একটা আলোচনা আস্তে আস্তে এই দিকে এগিয়ে আসছে। দরজার দিকে উৎসুক চক্ষে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। রাম জামাইবাবু হাসেন।

বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ালেন মল্লিকার বাবা, আর তাঁর বন্ধু রাজনগরের জমিদার বিখ্যাত বঙ্গচন্দ্র মিত্তির।

মল্লিকার বাবা বলেন—ঐ আমার মেয়ে, আমার এক মাত্র মেয়ে।

বঙ্গচন্দ্র মিত্তির বলেন—সুন্দর মেয়ে। বাস্, আর কোন কথার দরকার নেই।

বাইরের ঘরের দিকেই ফিরে চলে গেলেন মল্লিকার বাবা আর তাঁর জমিদার বন্ধু। এঘর আর ওঘর থেকে ছুটে আসেন মল্লিকার মা, বড়দা আর বৌদি, যেন কতগুলি ব্যস্ত ও বিস্মিত কৌতূহল। বৌদি প্রশ্ন করেন—ব্যাপার কি জামাইবাবু?

আহ্লাদে আটখানা হয়ে, আর হো হো ক'রে হেসে উত্তর দেন রাম জামাইবাবু। —রাজনগরের বঙ্গচন্দ্র মিত্তির, যিনি আজ তোমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, তিনি হলেন মল্লিকার আসন্ন শ্বশুর। কোন দাবী-দাওয়া নেই। বন্ধুর উপকার করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন বঙ্গ মিত্তির।

বনেদী বংশ, বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, বড় রোজগেরে, দেখতে ভাল, এ'কেই তো বলে নিখুঁত মানুষ। মল্লিকার মত মেয়ের জন্য এমন পাত্র কি স্বপ্নেও আশা করতে পেরেছিল এই মোক্তারবাড়ি?

সবই তো সত্য কথা। মল্লিকার মায়ের আশা পূর্ণ হয়েছে। তবে আজ আবার এমন ক'রে এত রাত্রে আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন বিকাশ আর মল্লিকা? স্বামী আর স্ত্রীর চোখে ঘুম নেই কেন?

মল্লিকা প্রশ্ন করে—ঘুম আসছে না, তাই কি বাইরে যাচ্ছ?

বিকাশ—লোকে কি ঘুমোবার জন্য বাইরে যায়?

মল্লিকা—নিশ্চয়ই না।

বিকাশ—তবে কেন বাজে কথা বলছো?

মল্লিকা—আমার কথাগুলি বাজে, না আমিই বাজে হয়ে গিয়েছি?

বিকাশ—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

মল্লিকা—বুঝে দেখেছি। কিন্তু তুমিও কি বুঝতে পার?

বিকাশ—আমি আবার কি বুঝবো?

মল্লিকা—এই সময় এভাবে তোমার বাইরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

বিকাশ—কি বলতে চাইছো তুমি, স্পষ্ট করে বলো।

উত্তর দেয় না মল্লিকা। আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারেনি মল্লিকা, জীবনে কোনদিন বলতে পারবেও কি না সন্দেহ, কি চেয়ে এসেছে তার মন। স্পষ্ট করে বলে ফেললে যে সেই চাওয়ারও কোন অর্থ হয়

না। সে জিনিস চাওয়া যায় না, চাইলেই ভিক্ষে-করার মত বিশ্রী হয়ে যায় সেই চাওয়া। চায়ওনি পায়ওনি মল্লিকা। বুকের ভেতর এই যে একটা বন্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণা থেকে থেকে শিউরে উঠছে, এটারও বয়স যে তিন বছর। সেই উৎসবের রাত্রিতেই, সেই বাসরঘরের হাসি আর হৈ-হৈ-এর মধ্যেই মল্লিকার বুকের ভেতর যেন কাঁটা বিঁধলো হঠাৎ।

এক শিশি সেন্ট বিকাশের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন বৌদি—ধরুন ভাই।

বিকাশ—কেন?

বৌদি—মল্লিকার গায়ে ছিটিয়ে দিন।

বিকাশ—কেন?

বৌদি—দেখছেন না, কেমন জবুথবু হয়ে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। ওর লজ্জা ভাল করে ভিজিয়ে আর ঠাণ্ডা করে দিন তো।

আঁচল টেনে নিয়ে আরও জড়োসড়ো হয়ে, মাথাটা আরও নীচু ক'রে নামিয়ে দিয়ে, মুখটা আরও বেশি ক'রে লুকিয়ে ফেলে মল্লিকা। এই মুহূর্তে এক অজানা ও অচেনা মানুষের হাত থেকে জীবনে এই প্রথম তার এই উৎসবের সাজে জড়ানো দেহের উপর ঝরে পড়বে সুরভির বৃষ্টি। যেন একটা বিস্ময়ের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে মল্লিকার মন।

সেন্টের শিশি নামিয়ে রেখে দিয়ে বিকাশ বলে—থাক্, এসব ঝঞ্ঝাট করে লাভ নেই, শুধু সময় নষ্ট।

অপ্রস্তুত হলেন বৌদি। তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বর মস্ত বিদ্বান আর মস্ত বড়লোক, সুতরাং একটু খেয়ালী আর একটু গম্ভীর আর একটু কেমন-কেমন তো হবেই। এত বেশি ঠাট্টা-তামাসা করা উচিত হয়নি। হয়তো এ-বাড়ির মানুষগুলিকে একটু ছ্যাবলাই মনে করছেন আর মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন বিকাশবাবু।—আমরা চলি ভাই। চলে যান বৌদি।

বাসর ঘরের দরজার উপর কান পেতে-ছিলেন বৌদি, জানালার যত ফাঁক আর ফাটলের ওপর চোখও পেতেছিলেন। কিন্তু, কিছুই লাভ হলো না বৌদির, আর একটু আশ্চর্যও হলেন। মনে হলো, বাসর ঘর যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, নিভে গিয়েছে বড় বাতিটা, বোধ হয় শুধু টিম টিম করছে মাটির প্রদীপটা। কিংবা সেটাও কোনকিছুর আড়ালে পড়ে গিয়েছে, নইলে ঘরের ভেতরটা [illegible] অন্ধকারে ভরা মনে হবে কেন?

[illegible]বৌদির কানেও ব্যথা ধরে গেল। কিছুই [illegible]তে পেলেন না, একটা কথার ফিসফিসও [illegible] একটা চাপা হাসির মৃদু শব্দও না।

[illegible] সকালবেলা মল্লিকাকে একা পেয়েই এক-গাল হেসে এক হাত নিলেন বৌদি—লোভানি লোভী মেয়ে কোথাকার!

মল্লিকা—কি হলো?

বৌদি—এক মুহূর্ত দেরী সইতে পারলে না, আমরা বেরিয়ে আসতে না আসতেই বাতি নিভিয়ে দিলে!

মুখ ভার ক'রে আর যেন দুটো আহত চোখ নিয়ে বৌদির দিকে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। এইবার বৌদিও একটু বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন—কি হলো? মুখভার কেন?

মল্লিকা বলে—কিছু না।

তারপর কয়েকটা দিন রাজনগরের বাড়ি, সেখানেও বড় একটা উৎসব সহ্য করতে হলো মল্লিকাকে। রাজনগর থেকে দিনাজপুরের বাড়িতে মল্লিকা ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র বৌদি তেমনি উৎসাহের আবেশে প্রশ্ন করে বসলেন—কেমন হলো ফুলশয্যা?

মল্লিকা—শয্যা হলো, ফুল হলো না।

বৌদি—তার মানে? ফুল ছিল না?

মল্লিকা—ছিল, কিন্তু কেউ একজন সেই ফুল ঠেলে সরিয়ে দিল, আর দেখতে পেলাম না।

বৌদি—কেন?

মল্লিকা—অন্ধকারে দেখবো কি ক'রে?

এই অন্ধকারের সংবাদ শুনেও কিন্তু বৌদির মুখে কোন অন্ধকার দেখা দিল না। মুখ টিপে হাসলেন, তারপরেই বললেন—ভালই তো।

মল্লিকা—কি?

বৌদি—জমেছে ভাল, তোমার ভাগ্যি ভাল, এবার কোল জুড়ে একটা আসবে ভাল।

রাজনগর থেকে আসবার পর দিনাজপুরের জীবনের কয়েকটা দিন বুকের ভেতর বন্ধ যন্ত্রণাটা একটু কম কষ্ট দিয়েছিল মল্লিকাকে। যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু যেন ঘুমিয়েছিল। প্রতিদিন আসেন বৈদান্তিক রাম জামাইবাবু, হাসি-তামাসার তুফান জাগে ঘরে। সন্ধ্যেবেলা বারান্দার উপরে শতরঞ্জি বিছিয়ে বেহালা হাতে নিয়ে বসেন মল্লিকার বাবা। ডাক দেন—আয় মল্লি, এস বৌমা। আমার বাজনার সঙ্গে তোমরা একটা কোরাস গাও।

মল্লিকা হেসে ফেলে—তা হয় না।

বিস্মিত হন বাবা—কেন?

মল্লিকা—আমাদের গানের সঙ্গে তুমি বেহালা বাজাও।

বাবা খুশি হয়ে বলেন—তাই হোক্।

দিনাজপুরের বাড়ির সন্ধ্যাটা গানের সুরে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

উঠোনের দু' পাশে চাঁপার বন হ'য়ে রয়েছে। দুপুরে ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে ব'সে এই চাঁপাবনের দিকে তাকিয়ে থাকতেও বেশ লাগে। তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। পচার মা এসে ডাক দেয়—তোমার চিঠি বুঝি, দেখতো খুকু। চিঠি হাতে নেয় মল্লিকা। হ্যাঁ, মল্লিকারই চিঠি আলিপুর থেকে।

বৌদি চিঠি কাড়বার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। বৌদির উপদ্রবে শেষে বাধ্য হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর বসে চিঠি খোলে মল্লিকা। সুরু হলো, বুকের সেই যন্ত্রণাটা।

দু'লাইনে লেখা ইংরেজীতে টাইপ-করা একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য হলো, পরশুদিন পেঁছিবো দিনাজপুর। প্রস্তুত থেক, সেদিনই রওনা হবো কলকাতা। চিঠির শেষে নামটা অবশ্য বিকাশেরই নিজের হাতের লেখা। শুধু ছোট্ট একটি স্বাক্ষরিত বি মিত্র।

দু'দিন পরেই দিনাজপুরের বাড়িতে এল বিকাশ। নিখুঁত আর খাসা জামাই দেখবার জন্য আর একবার আত্মীয়-স্বজনের ভীড়ে চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠেছিল দিনাজপুরের বাড়ি।

সারা দিনটা মা'র গা ঘেঁষে চুপ করে ব'সে থাকে মল্লিকা। হ্যাঁ, এবার সত্যিই ভয় পেয়েছে মল্লিকা। জ্ঞানী গুণী ধনী ও কাজে-ব্যস্ত মস্ত এক লোক এসেছেন। একটি ইস্পাতের মানুষ।

কিন্তু আর ভয় করবারও সময় ছিল না। সোনা-রঙের সর-বাটা দিয়ে এতদিন ধরে রঙীন-করা আর নরম-করা একটা প্রাণ, গান হাসি ও তামাসার আদরে পোষা একটা জীবন ইস্পাতের মানুষের সঙ্গেই চলে গেল, আর এসে ঠাঁই নিল আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যে বাড়ির বারান্দায় রঙীন কার্পেট আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে চকচকে তারের নেট।

পয়সার মানুষ, মস্ত লোক, তাঁকে তো সারাদিনই কারবারের কাগজপত্র নিয়ে আর মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠবার কোন অবলম্বন খুঁজে পায় না মল্লিকা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক একদিন হেসেই ফেলে মল্লিকা। স্কুলে পড়বার সময়েই খোঁপা কম্পিটিশনে প্রথম হ'য়ে প্রাইজ পেয়েছিল মল্লিকা। ত্রিশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের খোঁপা তৈরীর আর্ট অনেক চেষ্টা ক'রে শিখেছিল মল্লিকা। কিন্তু সে আর্ট বোধ হয় এরই মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছে মল্লিকার বুকের এই বন্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণার মধ্যে।

আলিপুরের এই বাড়িতে এসে প্রথম রাতটা যদি বাগানের ঝাউগুলির গায়ে অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আর মৃদু বাতাসের খেলা

দেখে দেখেই কাটিয়ে দিতে পারতো মল্লিকা, তবে হয় তো মল্লিকার স্মৃতির মধ্যে একটু জ্যোৎস্না মিশে থাকতো। আজ তাহলে মনে করতে পারতো মল্লিকা, স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এসে এই বাড়ির অন্ততঃ প্রথম রাতটা তাকে নিশ্চিন্ত হয়ে দু'চোখ মেলে একটা স্বপ্ন দেখবার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগও পায়নি মল্লিকা। বরং একটা শব্দ শুনে প্রথম রাত্রিতেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল মল্লিকা। এবং তার পরে যেন মৃদু বাতাস আর জ্যোৎস্না মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে একটা অন্ধকার চেপে বসলো মল্লিকার বুকের ওপর।

রাত্রি ঠিক দশটার সময় বারান্দার ঐদিকে বিকাশের ঘরে কলিং বেল বেজে উঠলো ঝন্ ঝন্ ক'রে। আর বারান্দার এই দিকের ঘরের জানালার কাছে বসে সেই শব্দ শুনে চমকে উঠলো মল্লিকা। ঝাউবাগানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে মল্লিকা। বুঝতে পারে না, এসময় এত ব্যস্তভাবে বেল বাজিয়ে কা'কে ডাকছে বিকাশ।

বারান্দার কার্পেটের ওপর দিয়ে একটা চটি-ঘসা শব্দ ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ মল্লিকার ঘরে ঢুকে বিকাশ একটু আশ্চর্য হয়েই বলে—ডাকছি, তবু শুনতে পাচ্ছ না যে?

মল্লিকা—আমাকে ডাকছিলে?

বিকাশ—তা ছাড়া আর কা'কে ডাকবো?

দুচোখ বন্ধ করতে গিয়েই মাথা হেঁট করে মল্লিকা।—শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

মল্লিকার বন্ধ চোখের পাতার ওপরে সেই মুহূর্তে যেন ঝলক দিয়ে একরাশ অন্ধকার এসে ধাক্কা দেয়। আহত পাখির মৃত্যু-স্বরের মত টিক্ করে ছোট্ট একটি শব্দ করেছে আলোর সুইচ, আর মরে গিয়েছে সব আলোক। একটা মূক ও বধির পেশী-দর্পিত উল্লাস মল্লিকার শ্বাস রোধ ক'রে রাখে কিছুক্ষণ। তারপরেই চলে যায়।

আবার যখন জানালার কাছে এসে বাগানের ঝাউগুলির মাথার দিকে তাকায় মল্লিকা, তখন মনে হয় জলে ভিজে গিয়েছে ঝাউয়ের মাথায় জ্যোৎস্নার প্রলেপ। চোখের জল মুছে নিয়ে আর একবার ভাল করে তাকায় মল্লিকা। তারপর চুপ করে বসে থাকে।

একদিনই বেজেছিল কলিং বেল, তারপর আর নয়। ঝন্ ঝন্ করে বেল বাজানো আর অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকা, নিতান্তই একটা বৃথা সময় নষ্ট করার ব্যাপার, বিত্তবান ও রোজগেরে ও কাজে-ব্যস্ত মানুষের কাছে যে সময়ের দাম অনেক। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে মল্লিকা আর শুনতেই পাবে না বিকাশের এই রাত দশটার আহ্বান। তাই নিজেই উঠে আসে বিকাশ।

বারান্দার কার্পেটের ওপর দিয়ে এক জোড়া পায়ের চটি-ঘসা চলার শব্দ, যেন অদ্ভুত এক শব্দের সরীসৃপ হিস হিস করে ছুটে আসে মল্লিকার ঘরের দরজার দিকে। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। মল্লিকার রোগা দেহটা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। চোখ বন্ধ, তবু সুন্দর মুখটা যেন ফোটা-ফুলের মত জাগা-জাগা শোভায় ঢলঢল, যেন আলো-মাখা হয়ে পড়ে রয়েছে তন্দ্রায় অভিভূত একটা রঙীন সাধ। কিন্তু ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে না বিকাশ। ঘরের আলোটাও যেন একটা বাধা, কারণ যত রঙ আর ঢঙ, যত রেখা লেখা আর ছায়া, যত কাজল আর টিপ, বিনা প্রয়োজনের যত জিনিস চোখের ওপর তুলে ধরে। তাই সেই মুহূর্তে নিভে যায় ঘরের আলো। মল্লিকার ঘুমন্ত দেহের সব স্পন্দন যেন দুঃসহ এক পাষাণভারের পেষণে চূর্ণ হতে থাকে। আলিপুরের বাড়ির রাত্রির জীবন এই নিয়মেই চলে, কোন ব্যতিক্রম হয় না।

—'শরীর কেমন আছে, সব খবর লিখবে, লজ্জা করো না।' আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির হয়ে বৌদির চিঠিটা যেদিন এল, সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিছানার ওপর পড়ে রইল মল্লিকা। বৌদি শুধু অনুমান করেছেন, কিন্তু মল্লিকা যে অনুভব করেই ফেলেছে, তার এই রোগা শরীরের পাঁজরের আড়ালে যেন ধুকধুক করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর একটা শরীরের কুঁড়ি। ভয় পায় মল্লিকা, কিন্তু অদ্ভুত এই ভয়, কিছুক্ষণের জন্য বুকের ভেতর সেই বন্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণাটাকে সরিয়ে দিয়ে মল্লিকার মনে অস্পষ্ট একটা মায়া ছড়াতে থাকে এই ভয়। যেন আলিপুরের প্রতি রাত্রির অন্ধকারের আঘাতে অপমানিত এই শরীরের স্নায়ু ও শিরার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে একটা মিষ্টি কান্না ও অস্ফুট কলরবের স্রোত। এও যে জীবনে এক নতুন যন্ত্রণার আবির্ভাব, কিন্তু কি আশ্চর্য, এই যাতনাটাকে সহ্য করতে ভালই লাগে মল্লিকার।

হাসপাতালে যাবার দিনে বিকাশের মুখের দিকে অপলক চক্ষে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। বিকাশ বলে—ব্যবস্থা তো সব ঠিকই আছে। এবার চলে যাও।

মল্লিকা—চলে তো যাচ্ছিই, কিন্তু ফিরে আসতে পারবো তো?

বিকাশ হাসে—তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল। যাও, আর দেরি করো না।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা। ইস্পাতের মানুষের চোখ কি সত্যিই দেখতে পাচ্ছে না আর বুঝতে পারছে না? মল্লিকার এই কপালের জন্য মায়া না হয় না-ই হলো, ঐ বিত্তবানেরই দেহের প্রবল রক্তমাংসের তৃপ্তির ফুল হয়ে আসবে যে শিশু, তার মুখ কল্পনা করেও কি এই ভদ্রলোকের স্তব্ধ ঠোঁট দুটো চঞ্চল হয় না এই কপালের সামান্য একটু ছোঁয়া নেবার জন্য?

কোন কথা না বলে, অপলক চোখ নিয়েই চলে গেল মল্লিকা, আর একেবারে গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবার পর রুমাল তুলে চোখ চেপে রইল। সঙ্গিনী নার্স বলে—কোন ভয় নেই দিদি! মন খারাপ করবেন না।

মন আছে, তাই মন খারাপ হয়েছে, আর তাইতো জীবনটা এত অশান্ত। কিন্তু যার মনই নেই সে যে কি ভয়ঙ্কর শান্ত, সেটা আজ এই এত রাত্রে আলিপুরের বাড়ির এই সিঁড়িমুখের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মল্লিকা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মন নামে কোন ঝঞ্ঝাট নেই এই ভদ্রলোকের জীবনে?

মুখে হাসি টেনে, আর চোখের দৃষ্টি একটু স্নিগ্ধ করে নিয়ে প্রশ্ন করে মল্লিকা। —মন ভাল লাগছে না, তাই কি বাইরে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে?

বিকাশ—না মন ভাল আছে, আমার মন সব সময়েই ভাল থাকে।

মল্লিকা—তবে কেন বাইরে যেতে চাইছো?

বিকাশ—জেরা করো না আমাকে। তোমার এসব কথার উত্তর দেবার ইচ্ছে আমার নেই, আর সময়ও নেই।

চুপ করে মল্লিকা। এখানে দাঁড়িয়ে বাগানের ঝাউয়ের কালো কালো মাথাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। মন আছে বিকাশের, কিন্তু সে-মন সব সময়ই ভাল থাকে। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। এই বাড়িটারই মত, মোজেইকে মসৃণ আর কংক্রিটের কঠিন একটা মন, যার ওপর কোন আঁচড় লাগতে পারে না। তা না হলে চোখে পড়তো অতি বিত্তবান এই ভদ্রলোকের, কেন এক সন্ধ্যায় বিকাশের ঘর থেকে চলে আসবার সময় দরজার কপাটে ঠুকে গেল মল্লিকার মাথাটা।

সেদিন ছিল মল্লিকার আর বিকাশের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দিন। বোধ-হয় এই শুভদিনের হৃদয়টাকেই একবার পরীক্ষা করে দেখবার সখ হয়েছিল মল্লিকার।

সন্ধ্যে হ'তেই সেন্টের ছোট একটা নীল রঙের শিশি হাতে নিয়ে বিকাশের ঘরে ঢোকে মল্লিকা।

বিকাশ—এ কি? এই অসময়ে কেন?

মল্লিকা হাসে—আজ সতরই বৈশাখ।

বিকাশ—আজ তিরিশে এপ্রিল।

মল্লিকা হাসে—আমি ইংরিজী তারিখ মানি না।

বিকাশ—বেশ তো, কিন্তু বাংলা তারিখের কথাই বা বলছো কেন?

মল্লিকা—আজ আমাদের বিয়ের একটা বছর পূর্ণ হ'লো। গত সতরই বৈশাখে...।

বিকাশও হাসে—হ্যাঁ, সে একটা দিন গেছে বটে! তিনদিন কোর্ট আর অফিস কামাই ক'রে অনেকগুলি মিটিং ছেড়ে দিয়ে......।

চমকে ওঠে মল্লিকা, বুকের ভেতর আবার সেই বন্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণাটা চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়। তবু শান্তভাবেই পালঙ্কের এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকে মল্লিকা। সেন্টের ছোট নীল শিশি আঁচলের আড়াল থেকে বের ক'রে বিছানার ওপর রাখে।

বিকাশ বলে—ওটা কি?

মল্লিকা—চিনতে পারছো না?

বিকাশ—একটা সেন্টের শিশি মনে হচ্ছে।

মল্লিকা—আগে কখনো দেখনি?

বিকাশ—মনে তো পড়ছে না।

মল্লিকা—সেই সতরই বৈশাখে দিনাজপুরে, একটা বাসরঘরে...।

আশ্চর্য হয় বিকাশ—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তোমার বৌদি উপদ্রব করছিলেন একটা সেন্টের শিশি নিয়ে।

মল্লিকা—হ্যাঁ। সেই শিশি এটা।

বিকাশ—কি আশ্চর্য!

হাতের কাছে খবরের কাগজ টেনে নেয় বিকাশ। আর, কয়েকটি মুহূর্ত শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে মল্লিকা। তারপরেই ঘরের টেবিলের এক কোণে শিশিটা রেখে দিয়ে প্রায় একটা দৌড় দিয়েই চলে যায়। তার এই বেনারসীর আঁচলের সুরভিপিপাসা জীবনে পূর্ণ হবে না• কোন দিন। চলতে গিয়ে শাড়ির লুটানো আঁচলে পা বেধে যায়, আর মাথাটা কপাটে লেগে খট্ ক'রে বেজে ওঠে, যেন তার জীবনেরই একটা ধিক্কারের আঘাত।

টেবিলের উপরেই পড়ে রইল নীলরঙের ছোট একটি শিশি। থাকুক্, চাকর রামযতন যদি টেবিলের ধুলো পরিষ্কার না করে, তবে বোধ হয় ধুলোয় চাপা পড়ে মরে যাবে শিশিটা। বিকাশের চোখের ওপরে থাকলেও এই শিশি কোনদিন তার চোখে পড়বে না।

নিজের ঘরের ভেতরে পা দিয়েই শান্ত হ'য়ে দাঁড়ায় মল্লিকা। কারণ, শান্ত না হ'য়ে উপায় নেই। তার পায়ের শব্দ যেন দুপ্ দাপ্ ক'রে বেজে না ওঠে এই ঘরের ভেতর। কারণ, আজকাল এই ঘরের ভেতরেও একটা মানুষ থাকে। দেড় মাস বয়সের একটি মানুষ, সারাক্ষণ ঘুমোয় আর ঘুম ভাঙলেই কাঁদে। বরং এই ছোট্ট প্রাণটার ছোট ছোট নিঃশ্বাসগুলির কাছে বুক রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে, আর শান্তিও পায় মল্লিকা। শুয়ে পড়ে মল্লিকা।

ভেজা গোলাপের দুটো পাপড়ির মত ক্ষুদ্র দুটি ঠোঁট অদ্ভুত এক তৃষ্ণার টানে মল্লিকার বুকের ভেতরে লুকানো এক গহ্বর থেকে ঝর্ণা টেনে আনছে, যেন মল্লিকাকেই ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে একটা সান্ত্বনার ধারা। ঘুমিয়ে পড়ে মল্লিকা।

কিন্তু কতক্ষণ? বারান্দার কার্পেটের উপর দিয়ে আনাগোনা করে এক জোড়া চটি-পরা পায়ের শব্দ। দশটা বেজে গিয়েছে নিশ্চয়। ঘুম ভেঙে যায় মল্লিকার। আর বুঝতে পারে, উপায় নেই, উঠে যেতেই হবে। না উঠে যাওয়া পর্যন্ত থামবে না ঐ শব্দ। আজকাল মল্লিকার ঘরের ভেতরে একটি শিশু; আর ঘরের কাছে ছোট ঘরে ঝি আর ধাই ঘুমোয়। তাই বিকাশের ঘরেই যেতে হয় মল্লিকাকে।

এইভাবেই তো আরও দুটি বছর এক মূক, বধির ও অন্ধ আহ্বানকে তৃপ্ত করতে করতেই কেটে গেল মল্লিকার জীবন। আজ এসে একবার স্বচক্ষে দেখে বুঝে যান ঠাট্টার ওস্তাদ রাম জামাইবাবু, দেহ আছে কিনা বৈদেহীর। আর একবার হাসপাতালের কেবিনের আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর একটি এসেছে মল্লিকার বুকের পাশে। বড়টির বয়স দু' বছর, ছোটটির ছয় মাস।

এরই মধ্যে রাজনগর হ'তে এক দুর্ভাগ্যের সংবাদ এসেছে, আর রাজনগরের ব্যথাহত জমিদারবাড়িকে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করার অদ্ভুত এক দায় নিতে হয়েছে মোক্তারের মেয়ে রোগা-পটকা এই মল্লিকাকেই।

মারা গিয়েছেন শাশুড়ী ঠাকরুণ, এক বছর বয়সের একটি ছেলে রেখে। মায়ের কোলের মত একটা কোল না পেলে বাঁচবে না এই ছেলে, তাই শ্বশুর ঠাকুর স্বয়ং আলিপুরে এসে মল্লিকার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন শিশুটিকে।

দু' বছর বয়সের বড়টাও ঝি-এর কাছে শোবে না, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে হাত বাড়িয়ে যদি মল্লিকার গলাটা ধরতে না পায়, তবে আর রক্ষা নেই। আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ি সেই দু' বছর বয়সের গলার চীৎকারেই কাঁপতে থাকে। তাই বড়টাকে মাথার কাছে শোয়াতে হয়, আর এক বছরের দেবরটি আর ছয় মাসের ছোটটাকে রাখতে হয় ডাইনে আর বাঁয়ে। রাত্রির প্রহরে প্রহরে এক একটি ক্ষুব্ধ তৃষ্ণার্ত দাবীর চীৎকার জাগে, কখনো বা একই সঙ্গে।

ঝি'ও ব্যাপার দেখে এক এক সময় মেজাজ রাখতে পারে না,—তিনটে কাঁচাখেগো দেবতা যেন, চেটেপুটে শেষ ক'রে দিলে মায়ের শরীর।

ধাই বলে—ধন্যি তুমি বৌদি, এতও সহ্য করতে পার!

কিন্তু এত ক'রেও কি তৃপ্ত হ'লো আর শান্ত হ'লো আলিপুরের এই বাড়ির আত্মা? হয়নি নিশ্চয়।

খস্ খস্, হিস্ হিস্, চটি-ঘসা শব্দের সরীসৃপ ছটফট করে ঘুরতে থাকে বারান্দার কার্পেটের ওপর। মল্লিকার ঘরের দরজার সামনে এসে এক একবার থামে, আবার চলে যায়। কখনো অল্প রাতে, কখনো মাঝ রাতে আর কখনো বা শেষ রাতে। কখনো বা ঘুমের মধ্যেই এই শব্দের নখর বিদ্ধ ক'রে দেয় মল্লিকার স্বপ্ন, ঘুম ভেঙে যায় ভয়ে। কখনো যেন স্বপ্নেরই কষ্টে ঘুম ভেঙে যায় মল্লিকার, আর শুনতে পায় শব্দ। রেহাই দেবে না, বাঁচতে দেবে না মন্দা শ্বাপদের নিঃশ্বাসের মত ঐ শব্দ। মল্লিকাকে শেষ পর্যন্ত পাগল না ক'রে ছাড়বে না ঐ শব্দ।

একদিন শব্দ শুনেও বিছানার উপর শক্ত হয়ে বসে রইল মল্লিকা। দপ্ দপ্ করে মাথার ভেতরটা। কি ভয়ানক নির্মম একটা পৌরুষের ছায়া ঘুরছে বারান্দার অন্ধকারে! মনে পড়ে মল্লিকার, একদিনের জন্য ভুলেও বাচ্চাগুলির গালে একটা চুমোও দেয়নি বিকাশ, ঐ অতিশিক্ষিত এক ভদ্রলোক বাপ। ভয় হয় মল্লিকার, ঐ আনন্দহীন শব্দকে ঘেন্না আর ভয় করতে করতে একদিন তারই বুকের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর ঘেন্না ধরিয়ে দেবে তারই জীবনের এত যত্ন উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা দিয়ে ঘুমপাড়ানো এই বাচ্চাগুলির ওপর। না, আর নয়।

বিছানা থেকে উঠে দরজা খোলে মল্লিকা। দরজা পার হয়ে বারান্দার ওপর এসে দাঁড়ায়। বারান্দার দেয়াল হাতড়ে সুইচ টেপে মল্লিকা। আলোর ঝলক চমকে উঠতেই বিরক্ত হয়ে তাকায় বিকাশ।—এ কি?

মল্লিকা—আলোর ওপর এত রাগ কেন?

যেন আচমকা এক আঘাতে অপ্রস্তুত হয়ে বিকাশই প্রশ্ন করে—এর মানে?

মল্লিকা—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

বিকাশ—আর তুমি?

মল্লিকা—আমি যাব না।

বিকাশ—কি বললে?

মল্লিকা—আর পারবো না, তুমি দয়া ক'রে আমাকে আর কখনো শুধু বিশ্রী কতগুলি কষ্ট দেবার জন্য ডেক না।

বিকাশ—বিশ্রী কষ্ট?

মল্লিকা—হ্যাঁ, একটুও ভাল লাগে

বিকাশ—শরীরে সয় না?

মল্লিকা—শরীরেও সয় না, মনেও সয় না।

মস্ত বড়লোক আর মস্ত বিদ্বানের সম্মানের মাথায় যেন হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত পড়েছে। বিকাশের চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে। —ঘেন্না করে বুঝি?

উত্তর দেয় না মল্লিকা।

বিকাশ—এতদিন ধ'রে ঘেন্নাই ক'রে এসেছ নিশ্চয়।

মাথা হেঁট ক'রে রঙীন কার্পেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা। কোন উত্তর দেয় না।

বিকাশ—তাহ'লে তুমি আর এখানে থেকে কি করবে?

মল্লিকা—তুমিই বলো, কি করবো আমি?

বিকাশ—আমি বলি, তুমি দিনাজপুরে চলে যাও।

দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে মল্লিকার চোখ—যাব।

বিকাশ—আর তোমার বাচ্চাগুলি?

মল্লিকা—তোমার বাচ্চাগুলি তোমার বাড়ির ঝি আর ধাইয়ের কাছে থাকবে।

বিকাশ—তাই ভাল।

চলে যায় বিকাশ, আর মল্লিকা ফিরে এসে তার ঘরে ঢোকে ও দরজা বন্ধ করে' দেয়।

তিনটে শিশুকণ্ঠের চীৎকার জাগে, মুখর, বিব্রত ও অস্থির হয়ে ওঠে আলিপুরের বাড়ির রাত্রির বাতাস। ঝি উঠে আসে, ধাই উঠে আসে। বিছানার ওপর আল্‌গা হয়ে ব'সে চুপ ক'রে শুধু শুনতে থাকে মল্লিকা। যেন তার এই শরীরটাকে ছিঁড়ে খাবার একটা কারখানা জেগে উঠে চীৎকার করছে। শক্ত হয়ে আর নিজেকে যেন পাথর ক'রে নিয়ে ব'সে থাকে মল্লিকা। বুঝতে পারে, এতদিনে বিষ ধরেছে তার বুকের বাতাসে। নিজেরই ওপর একটা নিষ্ঠুর ঘেন্না দপ্ দপ্ ক'রে মাথার ভেতরে। তার পরেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মল্লিকা।

মল্লিকাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাতে ব'লে দিনাজপুরে টেলিগ্রাম করেছিল বিকাশ, আর লোক আসতেও দেরী হয়নি। পরদিনই সকালে চলে এলেন বৃদ্ধ রামজামাইবাবু আর ঝি পচার মা। সেই পচার মা, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যাকে নিজের মা ব'লেই জানতো আর ডাকতো মল্লিকা।

মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পচার মা। মল্লিকা বলে—চুপ।

বুঝতে পারে পচার মা, এটা দিনাজপুরের মোক্তারবাড়ির মত যা-তা একটা বাড়ি নয়। এখানে মন খুলে কান্নাটান্নার স্বাধীনতা নেই। মস্ত বাড়ি, মস্ত বড়লোকের বাড়ি।

চোখের ভুরু নাচিয়ে হাসতে গিয়ে রামজামাইবাবুরও মুখের হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল। —ব্যাপার কি রে বৈদেহী। কোন রকম ঝগড়া-টগড়ার ব্যাপার হয়নি তো?

মল্লিকা বলে—ভগবান জানেন।

চুপ করে রইলেন রামজামাইবাবু। আজ রাত্রিটা পার করে দিতে পারলেই হলো। এই কয়েক ঘণ্টা গম্ভীর হয়ে থাকলে ক্ষতি কি? আর থাকতেই তো হবে। বিকাশ বড় গম্ভীর। গম্ভীর মানুষের গম্ভীর বাড়ি।

রাত্রিটাও দেখা দেয় গম্ভীর হয়ে। ছেলে-গুলিও সন্ধ্যা থেকে বড় শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। আর, রাত দশটা হতেই যেন একটা নীরবতার গুমোট এসে চেপে বসলো রাত্রির বুকের ওপর। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, সাড়াশব্দহীন ও মূর্চ্ছিত আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ি।

এই তো শেষ রাত্রি। মল্লিকার তিন বছরের জীবনের সহ্য-করা সব আর্তনাদ এই বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দিয়ে সুখী হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে রাত্রিটা। বারান্দার অন্ধকারে রঙীন কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে, বুকের ভেতর বন্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রটাকে শান্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারে মল্লিকা, সত্যিই শক্তি ফুরিয়ে এসেছে তার। ইস্পাতের মানুষ ক্রুদ্ধ হয়েছে, সেই ক্রুদ্ধ মনে ক্ষমা জাগিয়ে তোলবার মত শক্তি নেই আর এই দেহে, আর এই মনে।

হঠাৎ চমকে ওঠে মল্লিকা। একটা নতুন ধরণের শব্দ। টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং শব্দ বাজছে বিকাশের ঘরে রাত্রির এই স্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে বিকাশের ঘরের দরজার পর্দার কাছে দাঁড়ায় মল্লিকা। কোথা থেকে এক আহ্বান এসেছে, তারই জবাব দিচ্ছে বিকাশ। নিঃশব্দে, নিঃস্পন্দ দেহ নিয়ে আর নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে থাকে মল্লিকা। থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে পা দুটো। মল্লিকার এই দেহটাকেই তুচ্ছ ক'রে অপমান এইবার একেবারে চরম করে দেবার জন্যে কোথায় এক অন্ধকার খুঁজে বের করেছেন মল্লিকারই স্বামী।

তাই, আর কোন কারণ নেই, এত রাত্রে এই সিঁড়িমুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা। বাধা দেবার জন্য নয়, শুধু নিজের চক্ষে একবার দেখে যাবার জন্য, একজন ইস্পাতের মানুষ কেমন করে স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে চলে যায়।

অনেকক্ষণ তো হলো, কিন্তু একটু আশ্চর্যও না হয়ে পারে না মল্লিকা, এখনো কেন দাঁড়িয়ে আছে ইস্পাতের মানুষ? পথ খোলা থাকতেও কেন চলে যেতে পারছে না?

হ্যাঁ, দেখলে মনে হয়, যেন বারান্দার রঙীন কার্পেটে বিকাশের পা দুটো বেঁধে গিয়েছে। কোন বাধা নেই, আর সেটাই যেন একটা ভয়ানক বাধা।

জীবনে এতক্ষণ ধরে কোনদিন এত রাগ, ঘৃণা ও সন্দেহ মত্ত হয়ে ওঠেনি বিকাশের মনে। যে-মন একেবারে নিরেট ও শান্ত, যে-মন সর্বদাই ভাল থাকে, বিকাশের সেই মনেই যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মল্লিকার একটা কথা। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ি যার, সেই বিকাশ মিত্রের স্পর্শ একটুও ভাল লাগে না বিকাশ মিত্রের স্ত্রী মল্লিকার। অতি সাধারণ মোক্তারের মেয়ে, রোগা জিরজিরে মল্লিকার মুখের একটা কথা যেন মৃত্যুর বিষ ঢেলে দিয়েছে বিকাশ মিত্রের জীবনেরই সব অহংকারের উপর। তাই যন্ত্রণা জেগেছে বিকাশের ইস্পাতে আবৃত শান্ত ও সুখী মনের কোণে কোণে, জীবনে এই প্রথম। তাই ইচ্ছে করে, ঐ দুঃসাহসী মেয়ের মনের ঘৃণাকে পাল্টা ঘৃণা দিয়ে একেবারে চূর্ণ করে দিতে।

বিকাশ বলে—তোমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। যদি বুঝতাম যে, ক্ষমা চাইতে এসেছ, তবে না হয়......।

মল্লিকা—ক্ষমা?

বিকাশ—হ্যাঁ।

মল্লিকা—তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, এটা কি আর এমন কঠিন কাজ?

শান্ত হয় বিকাশের কণ্ঠস্বর—তবে চলো আমার ঘরে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে মল্লিকার কণ্ঠস্বর—ছিঃ।

গম্ভীর হয় বিকাশ—এর মানে?

মল্লিকা—কেন যাব তোমার ঘরে? টেলিফোনে তোমার একটা নেমন্তন্ন এসেছে ব'লে ভয় পেয়ে?

শিউরে ওঠে বিকাশ। জীবনে এই প্রথম, ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো বিকাশের শান্ত ও কঠিন অহংকারের ইস্পাত। বিকাশের চোখ আর মন যেন সব উত্তাপ হারিয়ে একটা শীতার্ত বাতাসের আঘাতে কাঁপছে। বিকাশের জীবনই কোন দিন প্রস্তুত ছিল না, ধারণাতেও ছিল না যে, এই রকম এক একটা যন্ত্রণা ও ভয় পৃথিবীতে আছে, আর এই-ভাবে জ্বলে উঠতে আর শিউরে উঠতে পারে তার নিজেরই মন।

মল্লিকা—কি হলো তোমার?

বিকাশ—কিছু না।

মল্লিকা—তুমি মন খারাপ করছো কেন, আমার একটা সামান্য কথায়?

যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে মল্লিকা। অদ্ভুত, বোঝা যায় না মল্লিকা নামে এই নারীর মনের

স্কেচ—

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

রহস্য। একটু বিস্মিত হয়েই মল্লিকার মুখের দিকে তাকায় বিকাশ।

এতক্ষণ ধরে, এই তিনবছরের মধ্যে মল্লিকার মুখের দিকে কোনদিন তাকায়নি বিকাশ। এতক্ষণ ধরে নয়, এমন ক'রেও নয়। আজ সিঁড়িমুখের কাছে দীপ্ত আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বিকাশ বোধ হয় জীবনে এই প্রথম ভাল করে আর অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেল আলো-মাখা একটা সুন্দর মুখ। বড় বড় চোখের পাতা আর নরম দুটো ঠোঁট হঠাৎ কাঁপে আর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কপালের সিঁদুর-টিপ থেকে গুঁড়ো ঝরে পড়েছে গালের ওপর।

বোধ হয় ইস্পাতের বুকে বিস্ময় জেগেছে। বুঝতে পারে না বিকাশ, বাধাই যদি না দিতে চায় মল্লিকা, তবে কেন এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে বৃথা? বাধা দেবে না, বাধা দেবার জন্য একটুও আগ্রহ নেই মল্লিকার। কঠিন একটা মনের উপর শুধু ফুটে রয়েছে সুন্দর একটা মুখ। সে-রাত্রে হঠাৎ ঘেন্না করেই বিকাশকে বাধা দিয়েছিল মল্লিকা, আর আজ এ-রাত্রে বিকাশকে একটা সামান্য বাধা দিতেও ঘেন্না বোধ করছে মল্লিকা।

বেদনার আভাস বাজে বিকাশের গলার স্বরে। —যদি আমাকে বাধা না দেবার জন্যই এসে থাক, তবে......।

মল্লিকা—বাধা দিতে আসিনি, শুধু বলতে এসেছি, এভাবে যেতে নেই।

বিকাশ—কিভাবে যেতে নেই?

মল্লিকা—যেভাবে যাচ্ছ।

বিকাশ বিব্রতভাবে তাকায়। হেসে ফেলে মল্লিকা। —একটু সেজে যেতে হয়।

কথাগুলি একটা অর্থহীন বাজে ঠাট্টার মতই, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হয় বিকাশ, কথা বলতে গিয়ে যেন ছলছল করে উঠেছে মল্লিকার গলার স্বর।

মল্লিকা—একটু সাজিয়ে নিতেও হয়।

চমকে ওঠে বিকাশ, যেন তার মনের কঠিন ইস্পাত ঝন্ করে বেজে উঠেছে মল্লিকার এই অদ্ভুত একটা কথার প্রতিধ্বনির আঘাতে।

বাগানের ঝাউগুলির মাথার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে মল্লিকার চোখ। আর যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠছে মল্লিকা—মুখের দিকে তাকাতে হয়, একটু হাসতে হয়, আর আলো নেভাতে হয় না।

যেন একটা সেতারের তার মধুর প্রলাপ বাজিয়ে রাত্রির নীরবতার গুমোট ভেঙে দিচ্ছে। আর শুনতে গিয়ে বিকাশের অতি-শিক্ষিত মনের ভেতরে ভেঙে যাচ্ছে তিন বছরের একটা বধিরতার গুমোট।

সত্যিই প্রলাপ। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির দেয়ালের বাধা ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় যেন চলে গিয়েছে মল্লিকার চোখের দৃষ্টি। যেন তিন বছরের বনবাসের দুঃখে আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ছে কতগুলি রঙীন তৃষ্ণা। বলতে বলতে ছটফট করে ওঠে মল্লিকা। —গানের সুর একটু শুনতে হয়, চাঁপাবনের দিকে একটু তাকাতে হয়, নইলে বাঁচবে কি করে মানুষ?

বিকাশ ডাকে—মল্লিকা।

প্রায় চীৎকারই করে ওঠে মল্লিকা—ফুল-শয্যার ফুল ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় না।

টপ্ করে' মল্লিকার দু'চোখের দুই কোণ থেকে ঝরে পড়ে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা। ছুটে চলে যায় মল্লিকা।

কোথায় গেল মল্লিকা? আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ির নিস্তব্ধতার মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে মল্লিকা, খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয় বিকাশ।

এই তো মল্লিকার ঘর। ঘরের মধ্যে বিছানার ওপর তিনটি ঘুমন্ত শিশু। তিনটি ফুল বাঁচিয়ে আর সাজিয়ে রেখেছে মল্লিকা তার রোগা শরীরেরই সুধা দিয়ে।

আয়না-টেবিলের দেরাজ ধরে টান দেয় বিকাশ। সাজানো রয়েছে কতগুলি রুমালের থাক। রুমালের ওপর রঙীন সুতোর লেখা বলছে—'তোমার জন্মদিনে'।

আয়নার কাছে একটি হাতির দাঁতের কৌটা। কৌটর ঢাকনি খুলে দেখতে পায় বিকাশ, সিঁদুরের ভেতর ডুবানো রয়েছে একটি ইংরাজীতে টাইপ-করা চিঠি। দেখা মাত্র যেন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগে চোখে, বিকাশের মনের ভেতরে দুটো পাথুরে চোখে। তুচ্ছ একটা চিঠিকে যে কোহিনুর করে পুষে রেখেছে মল্লিকা!

যেন কান্না-ধোওয়া শিশুর মনের মতই একেবারে অসহায় আর দুর্বল হয়ে যায় বিকাশের মন। বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে মল্লিকার এই লুকিয়ে-রাখা উপহার, রঙীন খেলনা যেমন বুকে চেপে ধরে তৃপ্ত হয় লোভী শিশু।

এ ঘরে না, ও ঘরে না, প্রকাণ্ড এই বাড়ির সব শূন্য ঘরই শূন্য হয়ে রয়েছে, মল্লিকা কোথাও নেই।

হতাশ হবার আগে, কি মনে করে আর একবার আর একটি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিকাশ। অনুমান করতে ভুল হয়নি বিকাশের। ঘরের ভেজানো দরজায় কান রেখে শুনতে থাকে বিকাশ। মনে হয়, দুটি ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ বাজছে। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে তাকায় বিকাশ। স্তব্ধ হয়ে, আর অদ্ভুত এক মায়াবেদনায় অভিভূত চক্ষু নিয়ে দেখতে থাকে বিকাশ, বুড়ি পচার মা'র কোল ঘেঁসে গুটিশুটি হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মল্লিকা। চব্বিশ বছর বয়সের মল্লিকা নয়, যেন এইটুকু এক শিশু। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির দংশন আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছে মল্লিকা অন্য এক জগতে, এক কোমল জঠর-স্নেহের কাছে, আর নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বারান্দার রঙীন কার্পেটের ওপর ছটফট করে আনাগোনা করে বিকাশ। দুটো অশান্ত পায়ের চলার শব্দ বেদনার্ত নিঃশ্বাসের শব্দের মত বারান্দার আলোকের বুক বিচলিত করে এদিক থেকে ওদিকে যায় আর আসে।

ঘরের দরজার কাছে একবার থামে বিকাশ; যেন লুব্ধ অথচ মুগ্ধ এক দস্যুর ছায়া। তারপর আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করে না বিকাশ। এগিয়ে যেয়ে দুটি ব্যস্ত, ব্যগ্র ও বিহ্বল হাতে মল্লিকার ঘুমন্ত শরীরটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে চলে আসে।

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকায় মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে ও অপমানে আহত দুটি চক্ষু জ্বলে ওঠে ঘৃণায়, যেন এক ধর্ষক দস্যুরই লোভ মল্লিকার জীবন কলুষিত করার জন্য আঁকড়ে ধরেছে তার দেহ। কিন্তু চীৎকার করতে গিয়েই থেমে যায় মল্লিকা। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে বিকাশের মুখের দিকে। একেবারে নতুন হয়ে গিয়েছে সেই মুখ, কি সুন্দর মুখ! মুখ টিপে হাসছে বিকাশ, কিন্তু জল টলমল করছে দুই চোখে।

বিকাশের ঘরের আলোটা যেন আপনা থেকেই প্রখর হয়ে ওঠে এই গভীর ও নিস্তব্ধ রাতের একটা নতুন বাতাস পেয়ে। বিছানার ওপর শুয়ে থাকে মল্লিকা। একটা শাল মল্লিকার গায়ের ওপর টেনে দিয়ে বিকাশ বলে—তুমি ঘুমোও মল্লিকা।

—আর তুমি?

বিকাশ হাসে—আমি আজ বসে থাকবো তোমার মাথার কাছে, আমাকে ঘুমোতে বলো না।

সত্যি সত্যিই বিছানার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসে পড়ে বিকাশ।

ঘুম নয়, যেন জীবন জুড়িয়ে দিয়ে একটা তৃপ্তি নেমে আসছে মল্লিকার চোখের ওপর। আর তারই আবেশের ভারে মন্থর হয়ে মুদে আসছে চোখের পাতা।

হঠাৎ শিউরে ওঠে মল্লিকার তন্দ্রা, ঝির-ঝির করে যেন একটা স্নিগ্ধ সুগন্ধের বিন্দু বিন্দু চুমো ঝরে পড়েছে মল্লিকার গায়ে, মুখে, মাথায় আর বালিশে ও বিছানায়। আর কপালের ওপর দুটি ওষ্ঠের তপ্ত, সিক্ত ও শিহরিত স্পর্শ।

চোখ মেলে তাকায় মল্লিকা। প্রথমে বিকাশের মুখের দিকে, তারপর বিকাশের হাতের ছোট্ট একটি নীল রঙের শিশির দিকে।

মল্লিকা বলে—এ কি করলে তুমি?

বিকাশ উত্তর দেয়। —তুমি ঘুমোও।

বিকাশের একটা হাত শক্ত করে ধ'রে মল্লিকা বলে—না।

আজ নিস্তব্ধ রাত্রির বিহ্বল মুহূর্ত-গুলিকে যেন এই বিছানার উপরেই ফুলের মতন ছড়িয়ে দিতে চায় মল্লিকা। বিকাশের হাত ছাড়ে না মল্লিকা। নতুন এক তারার আলো জ্বল্ জ্বল্ করছে মল্লিকা চোখে।

বিকাশের গলার স্বর যেন একটু বিব্রত হয়। —আমার কথা ভেবে তুমি কোন চিন্তা করো না মল্লিকা। তুমি ঘুমোও।

মল্লিকা—না।

বিকাশ—একটি নয়, তিনটিতে মিলে তোমার কোল কাড়াকাড়ি করছে, তার ওপর যদি আবার......না মল্লিকা, তোমার শরীরের জন্যও তো একটু ভাবতে হয়।

মল্লিকা—না। আজ আর কোন ভয় ভাবতে চাই না।

আলো জ্বলছে প্রখর হয়ে। আর মল্লিকা ভাবে, তার জীবনের বাসরঘর এতদিনে আলোয় ভরে গেল। আজ এখানে বৌদি নেই, থাকলে আজ দরজার ফাঁকে উঁকি দিলে দেখতে পেতেন বৌদি, মল্লিকা সত্যিই একটা লেলানি ও লোভী মেয়ে।

সকাল বেলা মল্লিকাকে চা তৈরি করতে দেখেই খটকা লাগে বৈদান্তিক রাম-জামাইবাবুর মনে।—মতলব কি রে বৈদেহী?

মল্লিকা হাসে।—এখন বসে বসে চা খান তো।

রাম জামাইবাবু—চা খাব কি রে, রওনা হতে হবে না?

উত্তর না দিয়ে মল্লিকা শুধু হাসতে থাকে। আর রাম জামাইবাবু হো-হো করে হেসে তাঁর এতক্ষণের গাম্ভীর্য চূর্ণ করে দেন। মন থেকে একটা দুশ্চিন্তার ভার মুক্ত হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দে দুই চোখের ভুরু নাচিয়ে রাম জামাইবাবু বলেন—তাই বল, কপোত-কপোতীর ঝগড়া? মান-অভিমান? ...যাক্, ভালই হলো, কিন্তু আমি তো আর দেরি করতে পারবো না। এখনই রওনা হতে হবে।

মল্লিকা—এখনই কেন?

রাম জামাইবাবু—কাল আমার মামলার তারিখ আছে, আদালতে হাজির হতে হবে।

চা খেয়ে, চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে মনের আনন্দে লাঠি ঠুকলেন রাম জামাইবাবু। —আমি চলি বৈদেহী। হ্যাঁ, একবার তোর ইয়ের সঙ্গেও দেখা করে যাওয়া উচিত।

বিকাশের ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দিলেন রাম জামাইবাবু—চললুম ভাই বিকাশ।

চমকে ওঠে বিকাশ, এলোমেলো হয়ে যায় মনের চিন্তাগুলি। শুকনো মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে, আর মনের বেদনা চাপতে গিয়ে গলার স্বরটাও কেমন হয়ে যায়।—তাহ'লে মল্লিকাও যাচ্ছে?

লাঠি ঠুকে হো-হো করে হেসে রাম-জামাইবাবু বলেন—তুমিও যে দেখছি একটা আস্ত রামচন্দোর হে!

আলিপুরের প্রকাণ্ড ও গম্ভীর বাড়িটাকে হো হো ক'রে হাসিয়ে দিয়েই চলে গেলেন রাম জামাইবাবু।

কোর্ট থেকে ফিরে নৃত্যলাল হাঁক পাড়ছেন, ও মা! সুহাসিনী রোজ দুপুরে দুপুরে অন্নদা খুড়িকে মহাভারত পড়ে শোনান। আজও হচ্ছিল। এবং তার পরে যেমন হয়ে থাকে—মহাভারত গড়াচ্ছে মেজের উপর, চোখ বুজে নিঃসাড় দুজনে। উঁহু, অন্নদার সাড় আছে—চোখ বুজলেই তাঁর আবার নাক ডাকে।

নৃত্যলাল গজর-গজর করেন, বুড়ো মানুষটা আধপোড়া হয়ে আসছে, সে হুঁশ কারো নেই। বেশ, কাউকে চাচ্ছি নে—কোথায় আমার মা-জননী?

সুহাসিনী ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কি বলছ? ঘুমুচ্ছে বোধ হয় বউমা। কি দরকার, আমায় বলো—

নৃত্যলাল আরও রেগে যান। চিরটা কাল তুমি খেটে মরবে তো এদেশ সেদেশ খুঁজে বউ নিয়ে এলাম কেন ঘরে?

ছেলেমানুষকে তাই বলে বুঝি সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে? ফিক করে হেসে উঠে বললেন, রাতে তেমন ঘুম-টুম হয় না বোধ হয়।

সে-ও তোমার দোষ। পরের মেয়ে এসেছে—দেখা উচিত তার সুবিধে-অসুবিধে। আজ থেকে সন্ধ্যে হলেই তাকে ঘুমুতে হবে। না ঘুমুলে শুনবই না। কিন্তু দিনে ঘুমানো অত্যন্ত বদ, শরীর মেদের ঢিবি হয়ে দাঁড়ায়—

সুহাসিনী হেসে বলেন, তর মানে তাস খেলতে হবে তো তোমার সঙ্গে?

নিজের ঘরে গেলেন নৃত্যলাল। সেখান থেকে চিৎকার করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, এমন মা দেখিনি বাপু! ছেলেটা রোদে তেতে-পুড়ে এলো, তিনি বেহুঁশ হয়ে আছেন। আমার সেকালের সেই মা বেঁচে থাকলে ছুটে এসে পড়তেন এতক্ষণ। এখনকার মাগুলো পাষাণ!

আর মাঝের কোঠায় অলকা ছটফট করছে। কিন্তু প্রতুলের হাত ছাড়াবে কেমন করে?

না, থাকো শুয়ে যেমন আছ। হবে না। আড়াই পহরে এখন মা-জননী! কাজকর্মে তো মন নেই—মক্কেল ভাগিয়ে কোর্ট পালাতে শুরু করেছেন।

অলকা বলে, ছেলে যেমনধারা কলেজ পালায়—

আঃ—প্রতুল তার মুখে হাত দিয়ে কথা ঠেকায়। —দিব্যি বেশ ঘুমিয়ে রয়েছ, ঘুমন্ত মানুষ বকবক করে নাকি?

মুখখানা টেনে নিল একেবারে বুকের উপর। আলুল চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে। গায়ের জোরে পারা যায় পুরুষের সঙ্গে? অতএব ঘুমিয়েই আছে অলকা—শ্বশুরের কাকুতিতে সাড়া দেবার জো নেই।

শ্বশুরটিও নাছোড়বান্দা। সাজ-পোশাক ছেড়ে একেবারে দরজায় এসেছেন।

উঠে আয় মা। বিকেল হয়ে গেছে—এখনো ঘুম? তোর শাশুড়ি ডাকছে। কি অবাধ্য বউ রে, শাশুড়ির কথা শোনে না! কালকের দুটো ফোঁটা ধরা আছে, আর তিনটে হলেই পাঞ্জা। পারবে ওরা আমাদের মা-পোয়ের সঙ্গে?

ঘা দিচ্ছেন দরজায়। জোরে—আরও জোরে। নিতান্তই মারা না গেলে এর পরে পড়ে থাকবার কথা নয়। অলকা জড়িত কণ্ঠে বলে, এসে গেছেন বাবা? আমিও ভাবছি, খেলার আধাআধি হয়ে আছে—তাস দিতে লাগুন বাবা, আমি যাচ্ছি—

নৃত্যলাল নড়লেন না। কাঁচা কাজের মানুষ তিনি নন। ছেলেমানুষ, তায় ঘুম ধরেছে। অন্নদা খুড়ি আর সুহাসিনী ওদিকে যে তাস পাতিয়ে বসেছেন—সে দায়িত্ববোধ থাকে এই বয়সে? ছেড়ে গেলে আবার হয়তো বিছানায় গড়িয়ে পড়বে।

তাগাদা দেন, কি হল রে? আমি দাঁড়িয়ে আছি—

সব চেয়ে বড় মুশকিল, খিল খোলা মাত্রেই নৃত্যলাল ঢুকে পড়েন যদি ঘরে—যে ব্যস্তবাগীশ লোক, কিছু বিচিত্র নয়। তা বুদ্ধি রাখে অলকা। পাখির মতো ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে ওদিক থেকে শিকল দিয়ে দিল। খেলার তাড়া রয়েছে, আর সন্দেহেরও কোন কারণ ঘটেনি—শিকল খুলে ঘরে ঢুকতে যাবেন কেন? হাওয়ায় দরজা খুলে গিয়ে আসামী যে আচমকা নজরে এসে যাবে, সে ভয়ও রইল না।

অনেকক্ষণ কেটেছে। খেলা জমেছে, ও'দের হাসিহল্লায় মালুম হচ্ছে। ঘরের ভিতরে প্রতুল একা-একা করে কি? শীতের দিনে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকা—সেটা মন্দ নয়। কিন্তু পাঁচটা বাজে, কলেজ থেকে ফিরবার সময় হয়ে গেছে। খেলায় যত মত্ত থাকুন, ছেলে কখন বাড়ি ফিরল—সেদিকে বাপের খরদৃষ্টি। দেরির জন্য বিশ গণ্ডা জেরায় পড়তে হবে। পাকা উকিলের জেরা—বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে রচনা করতে।

রাগে হাত কামড়াবে—না কি করবে এখন? সোহাগী বউ হয়েছেন—শিকল আটকে রেখে হৈ-চৈ করে দিব্যি তাস পেটানো হচ্ছে, চা-কচুরিও দেদার চলছে, নইলে ফুর্তির অমন জোয়ার বইত না। এদিকে নিরম্বু এক প্রাণী ছটফট করে মরে খাঁচার ইঁদুরের মতো। এই হল একালের পতিভক্তি! ছেলেরা এই কারণে বিয়ে করতে চায় না। প্রতুলও করত না—কিছুতেই না—যদি না পরম বন্ধু অমলচন্দ্র বোন গছাবার জন্য অমন উঠে পড়ে লাগত। আর বাবারও কি হল—মেয়েটা ঠিক জাদু জানে—এক নজর দেখেই তাকে ঘরে আনবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। সে সময়টা কত খাতির প্রতুলের—আকাশের চাঁদ চাইলেও বোধ হয় আঁকুশি দিয়ে পেড়ে দিতেন। ব্যাজিতে বাজনায় পাটনা শহরটা সরগরম করে বউ তো বাড়ির উঠোনে নামাল—ব্যস, কাজ ফুরনোর সঙ্গে সঙ্গে বাপের আবার পুরনো মূর্তি। সংসারের কেউ এখন প্রতুলকে গ্রাহ্য করে না—বাড়ির বউটা পর্যন্ত করে না।

চেঁচামেচি বন্ধ, খেলার শেষ তবে এতক্ষণে! তাই—প্রদীপ হাতে অন্নদা আসছেন। বাড়িময় বিদ্যুতের আলো—তবু তেলের প্রদীপ জেললে ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দেখানো চাই তাঁর। ঝনাৎ করে শিকল খুলে এঘরেও ঢুকলেন। ঘোর হয়েছে, চোখেও একটু কম দেখেন—ঘরে পা দিয়েই হাউমাউ চিৎকার—

আমি দিদিমা, আমি—আমি—

কে কার কথা শোনে! ভর সন্ধ্যায় ভূত দেখেছেন। কিম্বা চোর। হাতের প্রদীপ পড়ে গেছে। তড়াক করে একেবারে বারাণ্ডার উপর—সেখান থেকে উঠানে। তবু রক্ষা, নৃত্যলাল বৈঠকখানায় চলে গেছেন। সুহাসিনী ছুটে এলেন।

কি হল খুড়ি মা?

ছেলের দিকে নজর পড়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুই কখন এলি কলেজ থেকে?

এসেছি—

কখন?

তা দুটো-আড়াইটে হবে সেই সময়। দু'জন প্রফেসার আসে নি, সকাল-সকাল ছুটি দিয়ে দিল।

সুহাসিনী বলেন, দুটোয় তো দেখলাম পড়ে আছিস বিছানায়। বউমা বলল, দেরিতে আজ কলেজ। তা হলে গেলি কোন সময়, আর ফিরলিই বা কখন?

প্রতুল আমতা আমতা করে বলে, তবে বোধ হয় যাওয়াই হয়নি মা। তাই—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সুহাসিনী গম্ভীর হলেন।

কাল বললি, মাথা টিপটিপ করছে। আজ ঘুমিয়ে পড়লি। উনি যদি টের পান—

টের যাতে না পান, তাই করো। মা গো, শুধু আজকের দিনটা। কাল থেকে দেখো। ঠিক দশটায় যাবো, পাঁচটায় আসবো—এক মিনিট এদিক-ওদিক নয়। তুমি মা ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নিও।

অন্নদা সামলে নিয়েছেন। দন্তহীন মাড়িতে হাসি। বললেন, শিকল দিয়ে রেখেছে কেনরে নাতবউ? বিয়ের বছর না যেতে এই? বিস্তর ভোগান্তি তোমার কপালে দাদাভাই।

সহাসিনী খুব বিরক্ত হয়েছেন প্রতুলের উপর। কিন্তু কাণ্ড-কারখানা দেখে গম্ভীর মুখ রাখা দায়। সরে গেলেন তাড়াতাড়ি। পরের বাড়ির মেয়েটা আসার পর এ বাড়িতে কারো মুখ কালো করবার জো নেই।

খেতে খেতে নৃত্যলাল মুখ তুলে তাকালেন।

এগজামিন কবে?

অবহেলার ভাবে প্রতুল বলে, দেরি আছে—

নেই দেরি—মাস দেড়েক মোটে। অ্যানাটমির প্রফেসার ঘোষের কাছে খবর নিলাম। তুই তো দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিস, খাওয়ার পরেই অমনি ঘরে ঢুকিস—

সেখানে গিয়ে পড়ি—

হ্যাঁ, শুয়ে পড়িস একেবারে। আজ থেকে এগারোটার সিকি মিনিট আগে শুতে গিয়েছিস তো টের পেয়ে যাবি। পরের মে এসেছে—তার সামনে গালমন্দ করব ভেবেছিলাম। তা-ই কি হতে দিবি তু হতভাগা?

প্রতুল আড়চোখে মায়ের দিকে চায়, বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দিলেন নাকি আজকের ব্যাপার?

নৃত্যলাল হুঙ্কার দিলেন, হাত চালিয়ে খেয়ে নে। খেয়েদেয়ে বসতে হবে আবার—

নৃত্যলালও বসেন মক্কেলের কাগজপত্র নিয়ে। তাঁর বৈঠকখানা পড়ার ঘরের পাশেই। সশব্দে পড়ছে প্রতুল। এগজামিনের পড়াই বটে—শব্দ ধাপে ধাপে তুমুল হয়ে উঠল। ছেলে যেন বাপের উপর শোধ নিচ্ছে। নৃত্যলালের কাজের ভণ্ডুল হয়ে যায়—একবারের জিনিস পাঁচবার দেখেও মাথায় ঢোকে না। ছেলের মঙ্গলের জন্য অথচ মানা করাও চলে না। কুলাতে না পেরে উঠে পড়লেন শেষটা।

এগারোটা—হায়, কতদূরে সে এখন? কাঁটা যেন গরুর গাড়ি হয়ে চলছে। যা গতিক—রাত ভোর হয়ে যাবে এগারোটা বাজতে।

বাপ উঠে গেছেন—জোরদার পড়ার তত আবশ্যক নেই। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠে জানান দেওয়া, মনোযোগী ছাত্র চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। দরজার বাইরে এসে ক্ষণে ক্ষণে এদিক-ওদিক তাকায়। শীতের রাত্রি—এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি হয়ে উঠেছে। বাবার তো সারাদিন কোর্টে ছুটোছুটি—তাঁরও এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

পায়ে পায়ে ভিতরে এসে গলা খাঁকারি দিল। তারপর মৃদু কণ্ঠে সাড়া নেয়, কে আছ ইদিকে? ও মা!

অন্নদা বলেন, এতক্ষণ ছিল তের মা। এই মাত্তোর উঠে ঘরে চলে গেল।

জল তেষ্টা পেয়েছে দিদিমা—

জোয়ান-যুবারা উঠতে পারে না—বুড়োমানুষ দিদিমা তরতর করে নিজেই গিয়ে কলসি থেকে জল গড়াচ্ছেন।

এত শীতে তেষ্টা পেল?

পায় অমনি! এগজামিনের পড়া হব এর নাম। কিন্তু তুমি কেন কষ্ট করে উঠতে গেলে দিদিমা? আরও তো ছিল!

আবার কে? নাতবউ ঘুমিয়ে আছে—

প্রতুল চটে উঠল, তাই দেখ আজকালকা আক্কেল-বিবেচনা। তুমি শীতের মধ্যে উ কাজ করবে, আর লেপ মুড়ি দিয়ে কা হয়ে থাকবে বাবার এক আহ্লাদি পুতুল

অন্নদা বলেন, ওর কি দোষ? ও কি করব বলো! শ্বশুরের তাড়া খেয়ে ঘুমুতে হয় নিজে আজ দাঁড়িয়ে থেকে শুইয়ে দিয়েছে নতুন এসেছে—ধমকধামক শুনে ভয় পে যায়।

প্রতুল বলে, কি অন্যায় দেখ বাবার! সন্ধ্যে রাতে শুইয়ে রেখে শরীর একেবারে শেষ করে দেবেন। তিরিক্কি মেজাজ—কথা বলতে যাবে কে মুখের উপর?

এবার অন্নদা হেসে ফেললেন।

তুমি তো আছো দাদাভাই—বাকি রাত জাগিয়ে রেখে শরীর আবার ভাল করে দিও।

জলের গেলাস নামিয়ে রেখে নিশ্বাস ফেলে প্রতুল ফিরল। ঘুমানো হচ্ছে—তা আবার দিদিমার বিছানায়। নিজেদের ঘরে একলা শুতে ভয় করে। কি কাপুরুষ যে মেয়েজাতটা! জগতের কোন কাজে আসবে না!......

দাঁড়িয়ে পড়ল। বচসা হচ্ছে বাবা ও মায়ের মধ্যে। এ কিছু নতুন নয়, পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের হয়ে থাকে। কিন্তু হচ্ছে যেন তাদেরই কথা! কান খাড়া করল—হ্যাঁ, তাই বটে! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল জানলা ঘেঁষে।

তোমার ঐ তাড়াহুড়োয় পড়ার আরও ক্ষতি হচ্ছে। উসখুস করে বেড়ায়, মন খুলে দুটো কথা কইতে পারে না বেচারিরা।

নৃত্যলাল উদারভাবে বলেন, তিনটে বছর হলে এখানকার ডিগ্রিটা হয়ে যায়। বিলেত গিয়ে ধরো আরও তিন-চারটে বছর। ফিরে এসে দেদার কথাবার্তা বলুক—কে মানা করতে যাচ্ছে?

বিবেচনা উত্তম বটে! একুনে বছর সাতেক দাঁড়াল। সাত বছর পরে—মন থাকবে তখন অসার ঐহিক কথাবার্তায় নয়—নিরঙ্কুশ মুখোমুখি হয়ে দিব্যি মহাভারত-পাঠ এবং হরিমহিমা শ্রবণ করা যাবে। কেউ তাতে মানা করতে আসবে না।

মা রাগ করে বলেন, বিয়ে না দিলেই হত!

মা তুমি এমন ভালো! বাবা উপস্থিত না থাকলে প্রতুল ছুটে এক্ষুণি মায়ের পদধূলি নিয়ে আসত।

বিয়ে দিতে গেলে কেন তবে ছেলের?

বিয়ে বুঝি ওর জন্যে? মেয়ে নেই বলে দুঃখ করতে গিন্নি, সে মেয়ে হেঁটে এসে ঘর আলো করল। আমি মা-জননী পেলাম। সংসার পেয়েছে অন্নপূর্ণা—ক'মাসে একেবারে শ্রী-ছাঁদ ফিরে গেছে, দেখছ না?

চমৎকার! সবারই বখরা হয়ে গেল—আর সে যে সারাদিন উপোস করে বাসরের মেয়েগুলোর অশেষ লাঞ্ছনা সয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো, তার বেলায় ফক্কিকার! তার কেউ নয় অলকা।

হেন অবিচারে মেজাজ ঠিক থাকে না। ঘড়িটা সামনে মেলে দেয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে সে গুম হয়ে রইল। তারপর ঘণ্টা-মিনিটগুলো কায়ক্লেশে পার করে দিয়ে দুম-দুম পা ফেলে ঘরে ঢুকে ধপাস করে বিছানায় পড়ল।

সে-লোকের পাত্তা নেই এখানে। দিদিমার কাছেই রাতটুকু কাটানো হবে মনে হচ্ছে। বেশ—চাইনে কাউকে। উঠে আলো নিভিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল।

ক্ষণপরে অন্ধকারে—কি-সমস্ত মাখে কিনা ওরা—মাদকতাময় মৃদু সৌরভ...... চুড়ির ঝিনিমিনি......তারপরে গায়ের উপরে এলিয়ে পড়ে পদ্মফুলের মতো কোমল দু-খানা হাতে প্রতুলের গালদুটো চেপে ধরে যেন জোর করে কথার জবাব আদায় করছে. ঘুমুলে?

প্রতুল ক্ষেপে ওঠে, ঘুমুব না—তবে কি সারা রাত্তির জেগে ধ্যান করব? ক'টা বেজেছে?

এগারটা—

গরগর করতে করতে উঠে প্রতুল সুইস টিপল। টেবিল থেকে হাতঘড়িটা অলকার সামনে ধরে।

ক'টা?

ঐ তো বললাম—

সাত মিনিট হয়েছে এগারোটা বেজে গিয়ে। সাত-সাতটা মিনিট—কে দেয় আমাকে? লোকে অমন দু-দশ মিনিট হাতে নিয়ে আসে! বিশ বছর অবধি নির্ঝঞ্ঝাটে এত ঘুম ঘুমিয়ে এলে, তবু সাধ আর মিটল না! ঘড়ি দেখে দেখে আমি ওদিকে লবেজান—তা কার যায় আসে?

অলকা মুখ ভার করে বলে, আর তোমার ঘড়ি দেখতে হবে না। চলে যাচ্ছি—পাটনায় পাঠিয়ে দেবেন আমায়।

চকিতে তাকাল তার দিকে প্রতুল। বকুনি খাওয়ার শোধ নিচ্ছে না তো এইসব সাংঘাতিক কথা বানিয়ে বলে? ও মেয়ে সব পারে। দৃষ্টির সামনে অলকা থতমত খেয়ে যায়। কষ্টও হয় বোধকরি। বলে, হ্যাঁ—হয়েছিল সেই কথা। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। মা বলছিলেন বাবাকে সেই তাস খেলার সময়।

মা তুমি এমন? মমতাময়ী সকলের মা—আর প্রতুলের বেলা এ কোন পাষাণী মা হয়ে বসেছেন!

অলকা বলে, কথা ঠিকই। রাতদিন আমরা

লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে—গুরুজনদের ফাঁকি দেয়ার তালে থাকি, ওতে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। মা তাই বলতে যাচ্ছিলেন, বউমা দিনকয়েক না হয় পাটনায় ঘুরে আসুক। তা বাবা মোটে কানেই নিলেন না—না-না করে উঠলেন।

প্রতুল প্রীত হয়ে বলে, বাবা আমার বড় ভালো!

আমি চলে গেলে যে বাড়ি অন্ধকার!

দেমাকের হাসি চিকচিক করে উঠল অলকার চোখে মুখে। বলে, কদর বুঝলে না তো মশাই, কথায় কথায় তাই বকুনি দাও।

প্রতুল গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। তারপর বলে, ঠিক বলেছেন—যাওয়াই উচিত তোমার। কষ্ট করে বিয়ে করে আনলাম—

এখন তুমি সকলের সব হলে, আমার ছিঁটে-ফোঁটাও নও। হোক অন্ধকার—একা আমি কেন, বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে অন্ধ হোন।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, কি ভুলই করেছি! নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে যে বিয়ে করে, সে হল আস্ত গাধা। তিনটে বছর পরে ডাক্তারিটা পাশ করে—ধরো—কাজ নিয়ে গেলাম মফস্বলের এক ছোট্ট হাসপাতালে। নিরিবিলি একটুকু বাসা, সামনে ফুলবাগিচা—

অলকা বলে, ফলের বাগানও থাকবে। আম-জাম পেয়ারা-লিচু আমাদের পাটনার বাগান দেখনি তুমি—বাগানের ফল না হলে খেয়ে সুখ!

প্রতুলের আপত্তি নেই।

বাগানে বেশ ছায়া-ছায়াও হয়। রাত্তিরবেলা টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না ডালপাতার ফাঁক দিয়ে ফুলবাগিচায় এসে পড়ে। ওর উপর বাতাস হলে তো কথাই নেই। আমার তো মনে হয়, ঢালা জ্যোৎস্নার চেয়ে কুচি-কুচি কাঁপা-কাঁপা জ্যোৎস্না অনেক ভালো। কি বলো?

অলকা উৎসাহিত হয়ে বলে, আর নদী চাই। পাটনার ছাত থেকে গঙ্গা দেখা যায়। অত বড় নয় কিন্তু। সরু ছিমছাম শ্যামলা মতন নদী। নদী না থাকলে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

প্রতুল আশ্চর্য হয়ে বলে, বাঃ রে—তুমি কোথায় সে জায়গায়?

অলকা অভিমান করে বলে, আমায় বাদ দিয়ে তোমার বাসা? আমি এখানে পড়ে থাকব বুঝি? বেশ!

প্রতুল বলে, ডাক্তার হলাম, চাকরি নিয়ে তারপর তো গেলাম নতুন বাসায়! সে অন্তত আরো তিন বছর পরের কথা—তদ্দিন পড়ে থাকবে বুঝি তুমি? যা ছুটোছুটি লাগিয়ে-ছিল চড়কডাঙ্গার চৌধুরিরা! নতুন বাসায় উঠে খোঁজখবর নিয়ে হয়তো দেখতাম চৌধুরি-বাড়ির ছোটবউ অলকা দেবী দুই সন্তানের জননী—ট্যাঁ-ভ্যাঁ করছে ডাইনে বাঁয়ে, সব্যসাচীরূপে দু-হাতে সমান বেগে কিল-চড় ঝাড়ছেন—

অলকা রাগ করে ওঠে, যাও—

মোটে দিশে করতে দিল না! এই বুঝি হাত-ছাড়া হয়ে যায়! টোপর পরে ছাদনাতলায় দাঁড়িয়েও একমাত্র ভাবনা, চৌধুরিদের আগে মন্তোরগুলো তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে পারলে হয়—

অলকা হেসে বলে, যে চর তুমি লাগিয়ে দিলে—রাতদিন সে তক্কে তক্কে থাকত। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করবার জো ছিল চৌধুরিদের?

প্রতুল গদ গদ হয়ে বলে, অমলের কাছে আমি জীবন ভোর ঋণী হয়ে আছি। সে যেমন ভাল লোক, তার বোনটাও সেই রকম হত যদি!

অমলও পড়ে বোর্ডিং-এ থেকে। দু-দিন পরে সে এসে উপস্থিত। কর্তা-গিন্নীর মধ্যে তখনো গোলমাল চলছে—সাব্যস্ত হয়নি অলকাকে নিয়ে যাবার জন্য পাটনায় লেখা হবে কিনা।

বৈঠকখানায় ঠাসা মক্কেল। নৃত্যলাল কাজ করছিলেন।

এসো বাবা। বেহাই-বেয়ানের চিঠিপত্র পেয়েছ—আছেন সকলে ভাল?

শুষ্ক মুখে অমল বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। হার্ট দুর্বল, উপর নীচে করতে বুক ধড়ফড় করে। চেঞ্জে চলে যাচ্ছেন শিগগির। আমাকে লিখেছেন, অলকাকে নিয়ে যেতে। বেশি নয়—আট-দশ দিন থাকবে মাত্র। আমিই আবার পৌঁছে দিয়ে যাবো। অসুখবিসুখে মন দুর্বল হয়ে পড়ে কিনা—তা ছাড়া বাইরে চলে যাচ্ছেন। অনেক করে তাই লিখেছেন, ক'টা দিনের জন্য একটু চোখের দেখা দেখে যাওয়া—এই আর কি!

নৃত্যলাল গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন। বললেন, আচ্ছা—ভিতরে যাও তুমি। হাতের কাজটা সেরে যাচ্ছি। গিয়ে শুনব।

বেশি দেরি হল না। মক্কেলদের বসিয়ে রেখে চলে এলেন। অমল ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। সুহাসিনী এক কথায় রাজি। সত্যিই তো, মা মেয়েকে দেখতে চেয়েছেন—এতে আপত্তি করা যায় কোন মুখে?

নৃত্যলাল তখন শেষ ভরসাস্থল অলকাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোর মতামতটা শুনি। যাবি?

অলকা ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ—

অমল বলে, যদি অনুমতি করেন—এই এগারটার ট্রেনেই। মোটেই এখন কলেজ কামাই করবার জো নেই। শনিবার আছে অজ, সরস্বতীপুজোও পড়ে গেছে সেই সঙ্গে, পৌঁছে দিয়ে কালই আবার ফিরে আসব।

নৃত্যলাল বলেন, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে হবে কেন বাবা? মেয়েছেলের যাওয়া—দু'ঘণ্টার মধ্যে গোছগাছ হয় কখনো? শনিবার হলে সুবিধে হয়—বেশ তো, সাত দিন পরেও আবার শনিবার আসছে।

সুহাসিনী রাগ করে ওঠেন।

তোমার যেমন কথা! মায়ের অসুখ—মুখ শুকিয়ে বাছার আমার এতটুকু হয়ে গেছে। যাচ্ছে ক'দিনের জন্যই বা! একপাজা জিনিসপত্র নেবে কি করতে? তোমরা ভাইবোন চান করে যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে নাও দিকি—জিনিসপত্র আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।

যাবার সময় অলকা বলে, তাসখেলা যেন বন্ধ না হয় বাবা—ও বাড়ির রেখাকে ডেকে নেবেন, চারজন হয়ে যাবে।

নৃত্যলাল বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, রেখা আবার খেলতে জানে নাকি?

ভালো খেলে—আমার চেয়ে অনেক ভালো। সাত-আটটা দিন তো বাবা, কোন রকমে কাটিয়ে নেবেন।

আমি বাইরের কারো সঙ্গে খেলিনে—

শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে অলকা ট্যাক্সিতে উঠল। প্রতুলও যাচ্ছে, হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

শ্যামবাজার অঞ্চলে একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি এসে থামল। প্রতুল বলে, নামো—

অলকা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

এ কোথায়?

সেই যে কথা হয়েছিল, মনে নেই? নিরালা একটুকু বাসা—

অমল, দেখা গেল, হি-হি করে হাসছে। অলকা জিজ্ঞাসা করে, হল কি মেজ-দা? পাটনায় যাওয়া হবে না?

অমল বলে, কি দরকার? মা দিব্যি আছেন। চেঞ্জে যাবার কথা আছে বটে—সে এখন নয়, বোশেখ মাসে। তার এখনো তিন-চার মাস বাকি। ধরে নে, পাটনায় এসে উঠলি। দিন আষ্টেক পরে আবার তোর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

অলকা বলে, কি সর্বনাশ! ডাহা মিথ্যেকথা বলে নিয়ে এসেছ?

অমল বলে, ইচ্ছে করে কি বলেছি—ঐ দুরাচার মিথ্যুক বানিয়েছে আমায়। বাসা করে দিনকতক একা-একা থাকবে—হোটেলে রুম ভাড়া করে তারপর আমার কাছে গিয়ে পড়ল। সেই ইস্কুল থেকে একসঙ্গে পড়ছি—কোনদিন ওর হাত এড়াতে পারিনি, আজকেও পারলাম না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ঢুকে পড়েছে। অমল বলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়—ভিতরে চলে আয়। কার আবার নজরে পড়ে যাবে—তোরা এখন হুলি ফেরারি আসামীর সামিল।

তেতলার একপ্রান্তে দুই সিটের কুঠুরি। ঘরে ঢুকে অলকা ঘাড় কাত করে দেখে নিল তার নতুন সংসার। স্যুটকেশটা সরিয়ে কোণের দিকে রাখল, তোষক-চাদর পেতে ফেলল খাটের উপর। প্রতুল হাত-পা মেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, আঃ কি সুন্দর বাসা আমাদের!

অলকাও পাশে এসে বসেছে। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আমি নদী চেয়েছিলাম—ঘরের ভিতর থেকে নদী দেখা যাবে। কোথায়?

খোলা জানলায় সদর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। প্রতুল বলে, ঐটাই ভেবে নাও নদী।

অফিসের বেলায় জোয়ার আসে, দুপুরবেলা ভাটা।

অবস্থা গতিকে তাই ভাবতে হয়। বড় বড় কয়েকটা গাছও আছে ফুটপাথের উপর। আম-কাঁঠাল-পেয়ারা-লিচু নয়,—নিম আর দেবদারু।

প্রতুল বলে, ফল না হোক—ছায়া দিচ্ছে তো বটে! কি বলো?

অলকা ঘাড় নাড়ে। এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ফুলের বাগান? ন্যাড়া বাসায় থেকে সুখ নেই। বাগান না হলে হবে না। না—কিছুতে হবে না। তার চেয়ে গাড়ি ফেল হয়েছে বলে বাড়ি ফিরে তাসখেলা ভাল।

মুশকিলে পড়ে এবার প্রতুল। এদিক-ওদিক তাকায়। খানিকটা নিরুপায়ভাবে বলে, বাগানটা হচ্ছে না—তাই তো, ফুল বাগানের কি করা যায়!

গভীর স্নেহে অলকার মুখখানা বুকের উপর নিয়ে এলো। বলে, বাগান না হোক, শতদল পদ্মফুল আছে একটি। আমার এই এক ফুলেই পুরো বাগান হার মেনে যায়।

আর কি বলবে এবার অলকা? কেঁদে না ফেলে এত আনন্দে! কোথায় ছিলে এদ্দিন লুকিয়ে সমুদ্রের মতো অকূল ভালবাসা নিয়ে? কলেজে পড়বার সময় অলকা হাসত ঠাকুরমার সেকেলে কথাবার্তায়—স্ত্রী নাকি জন্মজন্মান্তর ধরে একই মানুষকে স্বামী পেয়ে আসছে। আজকে মনে হচ্ছে, এমন খাঁটি সত্যি জীবনে কমই শুনেছে। যুক্তি-বিচারে নয়, মনের কানায় কানায় বুঝতে পারছে।

বন্ধ দরজায় টোকা। ধড়মড় করে অলকা উঠে বসে, আঁচল তুলে মাথার উপর দেয়। নিরালা বাসা হল তবে আর কোথায়, একটু-খানি শোওয়া-বসার জো নেই—মানুষের উৎপাতে। মানুষগুলো যেন মুকিয়ে থাকে।

হোটেলের চাকর ডাকছে, বাবু—

বাবুটির উঠবার গতিক নেই, ডাক শুনে তিনি আরো চোখ বুজে পড়লেন। অলকা দরজা খুলে দিয়ে বলে, কি রে?

খেতে যাবার জন্য ডাক এসেছে। আর সমস্ত লোকের হয়ে গেছে—এরাই শুধু বাকি। কামরা অবধি তাই চলে এসেছে।

অলকা বলে, খেয়ে এসেছি আমরা। এ বেলা খাবো না।

প্রতুল তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল। না হে, এককথায় জবাব দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তুই বাপু একজনের মতো খাবার দিয়ে যা—তাই বাঁটোয়ারা করে নেওয়া যাবে।

আর অমল ঐ যে ফেরারি আসামী বলে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা আনাগোনা করছে অলকার মনের মধ্যে। বলল, এখন বলে নয়—দু'বেলাই ঘরে খাবার দিয়ে যাবি। ডাইনিং-রুমে গিয়ে খেতে পারব না।

ঘরে খাবার দেবার নিয়ম নেই দিদিমণি, এক যদি বেশি রকমের অসুখ-বিসুখ হয়—

হেসে উঠে প্রতুল বলে, অসুখই তো রে—অতি সাংঘাতিক অসুখ। ওর আমার দু-জনেরই। দেখছিস নে, নড়ে বসবার তাকত নেই! তোর একটু কষ্ট—তা ঘাবড়াস নে, তার ব্যবস্থাও হবে।

ঠিক হল তাই। অলকার আবার এক চিন্তা, অসুখ হলে তো সাবু-বার্লি দেয়। তাই যদি নিয়ে আসে এক বাটি?

প্রতুল বলে, ক'টা অসুখের খবর রাখো যাদু? আমরা তাবৎ অসুখের নাম-ধাম কুলশীলের ফিরিস্তি মুখস্থ করি। এমন অসুখও আছে, খাওয়া দুনো তেদুনো বাড়িয়ে দিতে হয়। এই যে আমাদের—এ-ও অসুখ একরকমের, ফার্মাকোপিয়ায় যদিও দাওয়াই বাতলে দেয় নি—

পরম আলস্যে আবার গড়িয়ে পড়ে।

দিন ক'টা ভালই যাবে পাটনায় তোমার এই বাপের বাড়িতে। আমার কিছু টানা-পোড়েন আছে অবিশ্যি—দিনে দুবার রাত্রে দু-বার আসা-যাওয়া। কিন্তু তুমি একেবারে রাজরাজেশ্বরী—দিনরাত গদিয়ান হয়ে থাকবে। সিঁড়িতে পা ঠেকাতে হবে না কোন বাবদে।

যেতে কি মন চায়? কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দেওয়া—গাড়ি অবশ্য প্রায়ই দেরি করে ছাড়ে আজকাল—তবু মোটের উপর একটা হিসাব আছে।

ঘড়ি দেখে প্রতুল বলে, যাই এবারে—কেমন? রাত্তিরে আসছি—একটু নিশুতি হয়ে গেলে তার পর—এই ধরো দশটা সাড়ে-দশটা। শেষ রাতে আবার গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে বাড়ির সকলের উঠবার আগে। দিন-মানেও এই রকম। মাঝের সময়টুকু কেবল তোমায় একা-একা থাকতে হবে।

অলকা আৎকে ওঠে, ওরে বাবা!

এমন কাপুরুষ! হোটেলে মানুষ গিজ-গিজ করছে।—আর অমলও তো আসবে মাঝে মাঝে—

তাড়া খেয়ে অলকা আর কিছু বলে না। তা বলে ভয় ঘোচে নি—মুখ শুকনো করে রয়েছে।

দরজা বন্ধ করে থেকো বরঞ্চ, বই-টই পোড়ো। রাতে আসবার সময় দু-একটা বই হাতে করে আসবো।

অলকা জানলায় বাইরের দিকে চেয়ে। দু-হাতে জোর করে তার মুখখানা একেবারে সামনাসামনি এনে কাতর হয়ে প্রতুল বলে, হাসো। মাঝের এই পাঁচ-ছ' ঘণ্টা আমাকেও তো একলা কাটাতে হবে—হাসিমুখ না দেখে গেলে থাকব কেমন করে?

বেরুচ্ছে প্রতুল। ফটকের কাছে ভারী গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, ছুটেছেন যে মশায়! ডাক্তারের কাছে বুঝি?

প্রতুল অবাক হয়ে তাকাল।

তিনি পরিচয় দিচ্ছেন, আপনার পাশের ঘরে আছি। পাকিস্তান থেকে এসেছি—সৃষ্টিধর কর আমার নাম। মাসখানেক হতে চলল—তা মশায় একটা বাসা খুঁজে পাইনে। আপনার বাড়ি কোথায়?

ফস করে সত্যিকথাটা বেরিয়ে যায়, ভবানীপুর।

বলেই বেকুব।

অতিশয় সদালাপী ভদ্রলোক, সহজে ছাড়বার পাত্র নন। আত্মীয়ের ভাবে গদগদ কণ্ঠে বললেন, অসুখের কথা বলছিলেন কিনা চাকরটাকে—কি অসুখ?

তখন মালুম হল প্রতুলের। তর্কের মধ্যে না গিয়ে জবাব দেয়, কি অসুখ—ডাক্তার জানে। আমি তার কি বলব?

সৃষ্টিধর বলেন, না—তাই বলছিলাম, ভবানীপুরে বাড়ি থাকতে শ্যামবাজারে হোটেলে উঠতে হল কি না!

কথার ধরনটা ভাল নয়। প্রতুল বলল, বাড়ি থেকে চিকিৎসার সুবিধে হয় না। ডাক্তারও থাকেন এদিকটায়—

আর কথা না বাড়িয়ে হন-হন করে সে চলল। ঠিক যে সৃষ্টিধরের ভয়ে তা নয়। নতালালেরও কোর্ট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এলো।

নাঃ—যেমন ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। বেশ হাসিখুশি অলকা। হোটেলের জীবন দুটো দিনেই রপ্ত করে নিয়েছে। প্রতুলকে সে-ই এখন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, এত লোক গিজ গিজ করছে—ভয় আবার কিসের? দুয়োর বন্ধ করে থাকতে যে বলে, সেই মানুষ হল কাপুরুষ।

এ জীবনের স্বাদ জানত না তারা আগে। দু-জনে মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে—কথা নয়, গানের গুঞ্জন। এত কথা কিসের রে বাপু? কথার শেষ নেই, মানেও হয় না। কথার মাঝে অলকার ঘাড় দোলানি, হীরের দুলের ঝিলিক দেওয়া, খিল খিল করে হেসে ওঠা ক্ষণে ক্ষণে। আরো যদি প্রতুল পাশ করে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে সত্যি সত্যি কোন গ্রামের নিভৃত কোয়ার্টারে বসতে পারত—উঃ, ভাবতে মন-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

অলকা বলে, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পাশের ঘরের ও'রা পাকিস্তান থেকে এসেছেন। গিন্নিটি ভারি মিশুক—টেনে ও'দের ঘরে নিয়ে বসালেন। পান খাইনে—তা জোর করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন একটা খিলি। বাসা খুঁজে খুঁজে হয়রান। স্বামী স্ত্রী আর একটি

ছেলে—কোন রকম ঝামেলা নেই। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে—বাবাকে বলে দিয়ে দেবো খান দুয়েক ঘর।

প্রতুল ব্যস্ত হয়ে বলে, সে সব বলা-টলা হয়ে গেছে?

অলকা বলে, তা বলতে যাবো কেন? বোকা নাকি! কত আলাপ-পরিচয় করলেন! ও'র নাম তরলা, আমি কিন্তু নামটাও বলিনি। বললাম, পাটনায় বাড়ি—কলকাতা দেখতে এসেছি হপ্তাখানেকের জন্য। কেমন বানিয়ে বলতে পারি, দেখ।

এই সেরেছে! আমি যে বললাম, বাড়ি ভবানীপুরে—

অলকা হেসে উঠে হাততালি দেয়, কি বোকা রে! মেজদার কথা মনে নেই? ফেরারি আসামী আমরা—খাঁটি কথা বলতে আছে? বাড়ির নম্বরও বলে ফেলেছ বোধ হয়!

আর ওদিকে সুহাসিনীও বড্ড খুশি। কর্তার কাছে দেমাক করেন, কি বলেছিলাম? বউমা যাবার পর লেখাপড়ায় ছেলের কি রকম মন হয়েছে দেখ। সব কথা তোমায় বলতাম না—আগে তো নানান ছুতোয় কলেজ কামাই। এখন দশটার সময় খেয়েদেয়ে বইয়ের গাদা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। দশ মিনিট আগে হবে তো পরে নয়।

ছেলের সুবুদ্ধিতে নৃত্যলালের খুশি হওয়া উচিত। তবু মন খুলে সমর্থন করতে পারেন না।

তা বললে হবে কেন গিন্নি? বউমা কি কলেজের পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকত? কড়া নজর থাকলে বাপ-বাপ বলে কলেজে যেতে দিশা পেতো না। তা দুপুরটা তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুবে আর আমি কোর্টে মক্কেল তাড়িয়ে বেড়াব। হবেই তো ঐ রকম। নিজেদের কিছু নয়—দোষ দিচ্ছ এখন পরের মেয়ের।

অভিনিবেশ দিবাভাগে শুধু নয়—রাত্রিবেলাতেও। এ বাড়িতে সন্ধ্যার পরেই খাওয়ার রেওয়াজ। খাওয়ার পরে প্রতুল বাইরে এক তিল সময় কাটায় না। অলকা ভয় পাবে, তাই মড়ার হাড়-গোড় বাইরের ঘরে ছিল। এখন সমস্ত শোবার ঘরে নিয়ে তুলেছে। বই-খাতাপত্রও সেখানে। খেয়ে দেয়ে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নৃত্যলাল তবু খুঁৎ খুঁৎ করেন, দুয়োর-জানলা এঁটেসেটে দেয় কেন বলো দিকি?

সুহাসিনী বলেন, শীতকাল কিনা! ও আমার বড় শীতকাতুরে—লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়ে আরাম করে পড়ে।

আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ে না, ঠিক জানো? একটা জরুরি মামলার ব্যাপারে সেদিন রাত [illegible] পৌঁছলেন। ইংরেজি ভাষার অনেক মারপ্যাঁচ—একটা কথার বিশ রকম মানে দাঁড় করানো যায়। ঠিক কোন্ জিনিসটা বোঝাচ্ছে এখানে, নৃত্যলাল ভাবতে ভাবতে দিশা করতে পারেন না। বাইরে এলেন। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। ঘরের ভিতর কাজের মধ্যে এসব বোঝা যায় না।

প্রতুলের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন, এই—শুনতে পাচ্ছিস? ভাল ডিক্সনারি কি আছে তোর কাছে, একটা কথার মানে আটকে যাচ্ছে—

সাড়া নেই। এইরকম পড়া পড়ছে বটে—তারই দেমাকে সুহাসিনী বাঁচেন না! দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। তারপর ঠাহর হল, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। গেল কোথায় তা হলে—কি হল? ঘরে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন—দেখা নেই। চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। ঠিকই আছে, সদর দরজা বন্ধ।

রাত থাকতে প্রতুল যথারীতি পাঁচিল টপকে এলো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, শিকল খোলা। বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। খুলল কে শিকল? তার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে—সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! নৃত্যলাল অপেক্ষা করতে করতে শুয়ে পড়েছেন ঐখানে। তারপরে ঘুম—

বাপের মুখোমুখি না পড়ে—প্রতুল বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসল। আর মনে মনে নানারকম কৈফিয়ৎ ভাঁজছে। নৃত্যলাল উঠে তারপর বৈঠকখানায় এলেন তো সুড়ুৎ করে সে চলে গেল ভিতরে। বাপে ছেলের লুকোচুরি চলছে যেন। নৃত্যলাল এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি কাউকে—সুহাসিনী অন্নদা কেউ কিছু জানেন না। প্রতুলের ভয় আরও বেড়ে যায়, দুরন্ত অভিমানে চোখে জল আসবার মতো। বাবা, তুমি কি ভেবে বসে আছ? তোমাদের হাকিমরা অতি ঘৃণ্য আসামীরও জবাব জেনে নেয়—আর আমায় ডেকে একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে না!

নৃত্যলাল কোর্টে চলে গেলেন। এবং রোজ যেমন কলেজে যায়, প্রতুলও বেরুল। সোজা একেবারে অমলের হস্টেলে। সে নেই—কোনদিন থাকে না এমন সময়। জানা আছে প্রতুলের—কিন্তু ঐ কাণ্ডের পর বাপের চোখের উপর দিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে আসে কেমন করে? ফিরবে কখন অমল? তার কোন ঠিকঠাক নেই। আচ্ছা, রইলাম বসে—

সৃষ্টিধর দুপুরবেলাটা টো-টো করে বেড়ান, আজকে ঘরে আছেন। তরলা বলছিলেন ছেলেটার অসুখ-অসুখ—সেই-জন্যে নাকি? দু-জনে যেন বচসাও বেধে গেছে।

অলকার মজা লাগে। স্বামী-স্ত্রী হলেই কি এই? তাদের এখনো এদিন আসেনি—কিন্তু আসবে ঠিক বিয়েটা কিছু বাসি হয়ে গেলে। ......প্রতুলের আসার সময় হয়ে গেছে, আসে না কেন আজ এখনো? একা একা বই পড়তে ভাল লাগে না। —তা এই এক কাজ হল অবিশ্যি, লুকিয়ে লুকিয়ে, ও'দের ঝগড়া শোনা। কথাগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, ঝাড়তে হবে প্রতুল এলে তার উপর। সেই কতক্ষণ থেকে তোমার পথ তাকিয়ে আছি,—কথা বলব না তো, একটা কথাও নয়।

কান পেতে শোনে, কি বলছেন ও'রা। সর্বনাশ, তাদের কথাই যে! ছেলেটার কি একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন হয়েছে—সৃষ্টিধর তাই নিয়ে তিলকে তাল করছেন।

কেন যাও ও-ঘরে তুমি? কিসে কি হল, কে জানে? দেশ-ঘর ছেড়ে এই তো পথে পথে বেড়াচ্ছি। এর উপর যক্ষ্মার ছোঁয়াচ যদি কুড়িয়ে নিয়ে এসো—

সভয়ে তরলা বলেন, কার যক্ষ্মা?

ঐ যে বউটা, যার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব তোমার—

তরলা বলেন, কি বলছ? গোলগাল কেমন সুন্দর চেহারা—তার যক্ষ্মা হতে যাবে কেন?

ও রোগের লক্ষণই এই। বাইরে নাদুস-নুদুস, ভিতরটা ঝাঁঝরা। ভবানীপুরে বাড়ি—তা বাড়ির লোকে দূর করে দিল, শেষটা এই হোটেলে এনে তুলতে হয়েছে—

তরলা প্রতিবাদ করেন, বাড়ি তো পাটনায়। বউ আমায় নিজে বলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, বোঝ তাহলে। স্বামী বলে ভবানীপুরে বাড়ি, বউ বলে পাটনায় পাপ না থাকলে ঢাকাঢাকি করতে যাবে কেন?

কলকাতার শহর দেখতে এসেছে নাকি পাটনা থেকে! আমি তাতে বললাম, ঘর থেকে তো একলহমা বেরোও না ভাই জানলা দিয়েই শহর দেখছ নাকি?

সৃষ্টিধর বলেন, তাগত আছে বেরোবার হাঁটাহাঁটি করলেই মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুবে—ও ব্যাধির এই নিয়ম।

অলকার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। প্রতুল বলেছে এই কথা—সত্যি নাকি তার এ অবস্থা? টি-বি-রোগের প্রধান লক্ষণ শোনা আছে, রোগী নিজে কিছু সন্দেহ করে না, সে ভাবে, চমৎকার স্বাস্থ্য তার।

বিকালের দিকে ছেলের জ্বর বাড়ে। তিনটি মারা গিয়ে তার পরে এই গুঁড়ো— সৃষ্টিধর ক্ষেপে গেছেন। যত অপরাধ যে অলকার। বিষম চেঁচামেচি লাগিয়েছে বিষ ছড়ানো হচ্ছে হোটেলে অধিষ্ঠ

রে। নিজে তো যাবেই, সাথেসঙ্গে আরো -পাঁচটাকে যদি সাপটানো যায়।

তরলা সামলানোর চেষ্টা করছেন, আঃ—চ্ছে কি বলো তো? আমি বলছি, মিথ্যে সন্দেহ তোমার। রোগপীড়া কিছু নয়। ভদ্রলোক ঠাট্টা করেছেন তোমার কাছে। কম্বা অন্য কিছু হতে পারে।

বলো, কি তাহলে? ইনি একরকম বলেন, উনি অন্যরকম। ডাকাতির আসামী? না কি ইলোপমেণ্ট—স্বামী-স্ত্রী সেজে ঢুকিয়ে রয়েছে। পাজির পা-ঝাড়া হল ম্যানেজারটা—টাকার লোভে পাপ এনে ঢুকিয়েছে। হোটেলে কত ভাল ভাল মানুষ আসে, মেয়েছেলে নিয়ে আছেও কতজনা! দূর করে দেবো আজকেই ওদের। ম্যানেজার না শোনে—আমরা নিজেরাই বিহিত করব। উপর-নীচে জন পঞ্চাশ তো হবো—এ সমস্ত যে শুনবে, সে-ই ক্ষেপে যাবে।

অলকা আর দাঁড়াতে পারে না, ফিরে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। উঃ, কখন আসবে তুমি? আসবে না আজকে মোটেই? সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলে বুক কেঁপে ওঠে। ঘাড় ধরে এই বের করতে আসে বুঝি জন পঞ্চাশ! কি করবে সে এখন, কি উপায়? মেজদা-টাও এসে পড়ত যদি—ঈশ্বর মেজ-দা'কে না হয় এনে দাও—

অমল হোস্টেলে ফিরে দেখে প্রতুল বসে আছে। উস্কো খুস্কো চেহারা।

সমস্ত শুনে সে হাসতে লাগল।

কর্তা ভেবেছেন, বউ বিহনে তুই বখে গেছিস। তাই চুপচাপ আছেন। ছেলের কেলেঙ্কারি নিয়ে তো ঢাক পেটানো যায় না!

প্রতুল আহত কণ্ঠে বলে, এত বছর ধরে মানুষ করলেন—বাপের এই বিশ্বাসটুকু নেই ছেলের উপর?

বিয়েয় আর একটা ঘাড়ে চাপে, তখন থেকে মানুষ চতুষ্পদ হয়ে যায় কি না!

হাসি থামিয়ে অতঃপর অমল গম্ভীর বলে, অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে ভাই। আর কাজ নেই—পাটনা থেকে ফিরে আসুক এবার অলকা—

প্রতুল বলে, ফিরতেই হবে—না ফিরে উপায় আছে কিছু? এর পরে আর আমার হাতে বেরুনো হবে না। আর দিনমানেও মাটকে ফেলবে কিনা, কে জানে?

ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেলল।

একটা হপ্তা থাকব বলে এসেছিলাম, দু'দিনে সব শেষ। হোটেলের এই দুটো দিন অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইল। একটা বড় শিক্ষা হল—বাপের ভাতের উপর থেকে যে বিয়ে করে, সে হল এক নম্বর আহাম্মক।

আবার তাগাদা দেয়, ওঠ্ তাহলে। বোনকে পৌঁছে দিয়ে আয় পাটনা থেকে। সেই এগারোটা থেকে আমি ধন্না দিয়ে আছি—

অমল ঘাড় নাড়ে, উঁহু—আসব কিসে? ওদিক থেকে একটা ট্রেনও এ সময়ে নেই—উর্ধ্বমুখী হয়ে একটুখানি হিসাব করে বলল, সকালবেলার আগে কোন উপায় নেই ভাই। ঐ সময় দিল্লী এক্সপ্রেসে এসে পৌঁছবে।

প্রতুল বিরক্ত কণ্ঠে বলে, দুত্তোর! আবার ঘণ্টা দশ-বারো দেরি পড়ে গেল। হস্টেলে তবে বলে কয়ে চল—ঐখানে রাতে থাকবি। বিষম ভীতু তোর বোন—এতক্ষণ কি করছে কে জানে? বাহাদুরি কেবল আমাদের কাছে!

সৃষ্টিধর ম্যানেজারের অফিসে হামলা দিয়েছেন। রীতিমতো একটা দল সঙ্গে।

যে আসবে, তাকেই অমনি জায়গা দেবেন? খবরবাদ নেবেন না, কি মতলবে আসছে বুঝেসমঝে দেখবেন না—টাকা গুণে দিলেই হয়ে গেল!

এক একজনে এক এক রকম বলে। জবাব দিতে গেলে আরও ক্ষেপে যায়। এই মারে তো এই মারে! বিপন্ন ম্যানেজার এমনি সময় প্রতুলকে দেখে অকূল সমুদ্রে যেন কূল পেলেন।

আসুন—এই দিক দিয়ে হয়ে যাবেন মশায়। আপনার বাড়ি কোথায় শুনিয়ে দেন তো ভদ্রলোকদের—

প্রতুল বলে, ভবানীপুরে—

আপনার স্ত্রী বলেছেন পাটনায়। আরও নানান রকম উল্টোপাল্টা কথা। আমি যে মারা যাচ্ছি মশায় সেই ঠেলায়!

তার বাড়ি সেখানে—মানে বিয়ের আগ পর্যন্ত বরাবরই ছিল কি না! অভ্যাস বশে বলে ফেলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, রোগী এনে তুলেছেন—কি রোগ সেটা ঠিক করে বলুন। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপশন দেখান। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই। এমন রোগ যে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করতে দিল না—

অমল পিছনে পড়ে ছিল, ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলে, রোগ আর নেই। বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে। দুটো দিনেই বেশ ভাল রকম চিকিৎসা হয়ে গেছে।

ম্যানেজার চমকে ওঠে, হপ্তার কথা বলে ঘর নেওয়া হল যে?

হপ্তার টাকা মিটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা। অসময়ে কোথায় যাই—রাতটুকু শুধু রেহাই করুন আপনারা।

কথা পেয়ে সকলে নরম হল। আর সত্যি যে অসুখ-বিসুখ, বউটাকে যারা চোখে দেখেছে—তাদের সেরকম মনে হয় না। তরলা এসে এমনি সময় ডাকলেন, ছেলে খুব ঘামছে—জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে এই-বার।

সকালবেলা অলকা এসে শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করল।

চোখে দেখতে পেয়েই মন জুড়িয়ে যায়। নৃত্যলাল গাঢ় স্বরে বললেন, আয় মা। ক'দিন ছিলিনে—বাড়ি একেবারে অন্ধকার। তাসের আড্ডা তুলে দিয়েছি—

অলকার নিজের কোট—হোটেলের সেই ডাঙার মাছের অবস্থা নেই। কালকের কান্নার পর ঝিকিমিকি হাসি এখন। হেসে মুখ-চোখ নাচিয়ে বলে, আমারও কি ভাল লাগছিল? তাই দেখে বাবা বললেন, কাজ নেই—তোর নিজের বাড়ি চলে যা। মা দুঃখ করতে লাগল, এতকাল খাইয়ে পরিয়ে দু-মাসের মধ্যে মেয়ে পর হয়ে গেল। মেজদা ফিরে আসছিল, তারই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী এক্সপ্রেসে—

ও বেহাই, মা-জননী এসে গেছে এই যে! আপনি বললেন, যায়নি মোটে পাটনায়। আপনারা এক ট্রেনেই তো আসছেন—

সবিস্ময়ে অলকা বলে, বাবা এখানে?

হ্যাঁ, কালকে টেলিগ্রাম করে দিলাম তোকে নিয়ে চলে আসবার জন্য। ব্যস্ত হয়ে উনি একাই চলে এসেছেন। কই, অমল গেল কোথায়?

অমল গতিক বুঝে চক্ষের পলকে সরে পড়েছে। আর প্রতুল এ সমস্ত কিছুই জানে না—বাইরের ঘরে মহাশব্দে সে পাঠা-ভ্যাস করছে। শক্ত এগজামিনের পড়া—বাজে ব্যাপারে মন দিলে চলে না।

১

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা। গ্রীষ্মকাল। ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার সত্যবতীকে ও খোকাকে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও আমি হ্যারিসন রোডের বাসায় পড়িয়া চিংড়িপোড়া হইতেছি।

ব্যোমকেশের কাজকর্মে মন্দা যাইতেছিল। ইহা তাহার পক্ষে এমন কিছু নূতন কথা নয়; কিন্তু এবার নৈষ্কর্ম্যের দৈর্ঘ্য ও নিরবচ্ছিন্নতা এতই বেশী যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। উপরন্তু খোকা ও সত্যবতী গৃহে নাই। মরিয়া হইয়া আমরা শেষ পর্যন্ত দাবা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমি মোটামুটি দাবা খেলা জানিতাম, ব্যোমকেশকে শিখাইয়াছিলাম। প্রথম প্রথম সে সহজেই হারিয়া যাইত; ক্রমে তাহাকে মাত করা কঠিন হইল। অবশেষে একদিন আসিল যেদিন সে বড়ের কিস্তিতে আমাকে মাত করিয়া দিল।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ে গৌরবের হানি হয় না জানি। কিন্তু যাহাকে মাত্র কয়দিন আগে হাতে ধরিয়া দাবার চাল দিতে শিখাইয়াছি, তাহার কাছে হারিয়া গেলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সন্দেহ হয়। আমার চিত্তে আর সুখ রহিল না।

তার উপর এবার গরমও পড়িয়াছে প্রচণ্ড। সেই যে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন গলদঘর্ম হইয়া সকালে ঘুম ভাঙিয়াছিল, তারপর এই দেড় মাস ধরিয়া গরম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি যে হয় নাই এমন নয়, কিন্তু তাহা হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব তাপের মাত্রা বর্ধিত করিয়াছিল। দিবারাত্র ফ্যান চালাইয়াও নিষ্কৃতি ছিল না, মনে হইতেছিল সারা গায়ে রসগোল্লার রস মাখিয়া বসিয়া আছি।

দেহমনের এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থা লইয়া একদিন পূর্বাহ্নে তক্তপোষের উপর দাবার ছক পাতিয়া বসিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ আমাকে গজ-চক্র করিবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করিয়া আনিয়াছে, আমি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া অনর্গল ঘর্মত্যাগ করিতেছি, এমন সময় বাধা পড়িল।

দরজায় খুট্‌খুট্‌ কড়া নাড়ার শব্দ। ডাক পিওন নয়, তাহার কড়া নাড়ার ভঙ্গীতে একটা বেপরোয়া উগ্রতা আছে। তবে কে? আমরা ব্যগ্র আগ্রহে পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। এতদিন পরে সত্যই কি নূতন রহস্যের শুভাগমন হইল!

ব্যোমকেশ টপ করিয়া পাঞ্জাবিটা গলাইয়া লইয়া দ্রুত গিয়া দ্বার খুলিল। আমি ইতিমধ্যে নিরাবরণ দেহে একটা উড়ানি চাদর জড়াইয়া ভদ্র হইয়া বসিলাম।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক। আকৃতি মধ্যম, একটু নিরেট গোছের, চাঁচা-ছোলা ধারালো মুখ, চোখে ফ্রেমহীন ধূমল কাচের চশ্‌মা। পরিধানে মরাল-শুভ্র প্যাণ্টলুন ও সিল্কের হাতকাটা কামিজ। পায়ে মোজা নাই, কেবল বিনুনি-করা চামড়ার গ্রীসান স্যাণ্ডাল। ছিম্‌ছাম্‌ চেহারা।

মার্জিত কণ্ঠে বলিলেন,—'ব্যোমকেশ বাবু—?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিই।—আসুন।'

সে ভদ্রলোকটিকে আনিয়া চেয়ারে বসাইল, মাথার উপর পাখাটা জোর করিয়া দিল। ভদ্রলোক একটি কার্ড বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিলেন।

কার্ডে ছাপা ছিল—

নিশানাথ সেন
গোলাপ কলোনী
মোহনপুর, ২৪ পরগণা
ই বি আর

কার্ডের অন্য পিঠে টেলিগ্রামের ঠিকানা 'গোলাপ' এবং ফোন নম্বর।

ব্যোমকেশ কার্ড হইতে চোখ তুলিয়া বলিল,—'গোলাপ কলোনী। নামটা নতুন ধরনের মনে হচ্ছে।'

নিশানাথ বাবুর মুখে একটু হাসির ভাব দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'গোলাপ কলোনী আমার ফুলের বাগান।
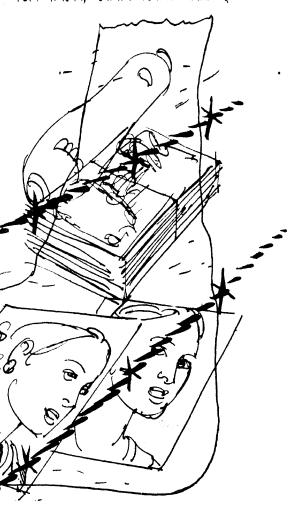
আমি ফুলের ব্যবসা করি। শাকসবজিও আছে, ডেরি ফার্মও আছে। নাম দিয়েছি গোলাপ কলোনী।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'ও।—মোহনপুর কলকাতা থেকে কত দূর?'

নিশানাথ বলিলেন,—'শিয়ালদা থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। তবে রেলওয়ে লাইনের ওপর পড়ে না। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।'

নিশানাথ বাবুর কথা বলিবার ভঙ্গীটি ত্বরাহীন, যেন আলস্যভরে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই মন্থরতা যে সত্যই আলস্য বা অবহেলা নয়, বরং তাঁহার সাবধানী মনের বাহ্য আবরণ মাত্র, তাহা তাঁহার সজাগ সতর্ক মুখ দেখিয়া বোঝা যায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বাক্-সংযমের ফলে তিনি এইরূপ বাচন ভঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

ব্যোমকেশের বাক্-প্রণালীও অতিথির প্রভাবে একটু চিন্তা-মন্থর হইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনি বলছেন ব্যবসা করেন। আপনাকে কিন্তু ব্যবসাদার বলে মনে হয় না, এমন কি বিলিতী সওদাগরী অফিসের ব্যবসাদারও নয়। আপনি কতদিন এই ব্যবসা করছেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'দশ বছরের কিছু বেশী।—আমাকে আপনার কী মনে হয় বলুন দেখি?'

'মনে হয় আপনি সিভিলিয়ান ছিলেন। জজ কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট।'

নিশানাথ বাবুর ধোঁয়াটে চশমার আড়ালে চোখদুটি একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি শান্ত-মন্থর কণ্ঠেই বলিলেন,—'কি করে আন্দাজ করলেন জানি না। আমি সত্যিই বোম্বাই প্রদেশের বিচার বিভাগে ছিলাম, সেশন জজ পর্যন্ত হয়েছিলাম। তারপর অবসর নিয়ে এই দশ বছর ফুলের চাষ করছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত?'

'সাতান্ন চলছে।'

'তার মানে সাতচল্লিশ বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন। যতদূর জানি সরকারী চাকরির মেয়াদ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত।'

নিশানাথ বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আমার ব্লাড-প্রেসার আছে। দশ বছর আগে তার সূত্রপাত হয়। ডাক্তারেরা বললেন মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ করতে হবে, নইলে বাঁচব না। কাজ থেকে অবসর নিলাম। তারপর বাংলা দেশে এসে ফুলের ফসল ফলাচ্ছি। ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই, কিন্তু রক্তের চাপ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাবনা চিন্তা কিছু নেই বলছেন। কিন্তু সম্প্রতি আপনার ভাবনার বিশেষ কারণ ঘটেছে। নইলে আমার কাছে আসতেন না।'

নিশানাথ হাসিলেন; অধরপ্রান্তে শুভ্র দন্তরেখা অল্প দেখা গেল। বলিলেন,—'হ্যাঁ—। এটা অবশ্য অনুমান করা শক্ত নয়। কিছুদিন থেকে আমার কলোনীতে একটা ব্যাপার ঘটছে—' তিনি থামিয়া গিয়া আমার দিকে চোখ ফিরাইলেন,—'আপনি অজিত বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, উনি আমার সহকারী। আমার কাছে যা বলবেন ওঁর কাছে তা গোপন থাকবে না।'

নিশানাথ বলিলেন,—'না না, আমার কথা গোপনীয় নয়। উনি সাহিত্যিক, তাই ওঁর কাছে একটা কথা জানবার ছিল। অজিত বাবু, blackmail শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি?'

আকস্মিক প্রশ্নে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। বাংলা ভাষা [illegible] বাকি নাই যে বঙ্গভারতী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাবকে বিদেশী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম,—'Blackmail—গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। যতদূর জানি এককথায় এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই।'

নিশানাথ বাবু একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাহোক, ওটা অবান্তর কথা। এবার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি শুনুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সংক্ষেপে বলবার দরকার নেই, বিস্তারিত করেই বলুন। তাতে আমাদের বোঝবার সুবিধা হবে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'বেশ।—আমার গোলাপ কলোনীতে যারা আমার অধীনে কাজ করে, মালীদের বাদ দিলে তারা সকলেই ভদ্রশ্রেণীর মানুষ, কিন্তু সকলেই বিচিত্র ধরনের লোক। কাউকেই ঠিক সহজ সাধারণ মানুষ বলা যায় না। স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা আমার কাছে এসে জুটেছে। আমি তাদের থাকবার জায়গা দিয়েছি, খেতে পরতে দিই, মাসে মাসে কিছু হাত খরচ দিই। এই সর্তে তারা কলোনীর কাজ করে। অনেকটা মঠের মত ব্যবস্থা। খুব আরামের জীবন না হতে পারে, কিন্তু না খেয়ে মরবার ভয় নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন। এদের পক্ষে স্বাভাবিক পথে জীবন নির্বাহ সম্ভব নয় কেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'এদের মধ্যে একদল আছে যারা শরীরের কোনও না কোনও খুঁতের জন্যে স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। যেমন পানুগোপাল। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে, অথচ সে কানে ভাল শুনতে পায় না, কথা বলাও তার পক্ষে কষ্টকর। অ্যাডেনয়েডের দোষ আছে। লেখাপড়া শেখেনি। তাকে আমি গো-শালার ভার দিয়েছি, সে গরু-মোষ নিয়ে আছে।'

'আর অন্য দল?'

'অন্য দলের অতীত জীবনে দাগ আছে। যেমন ধরুন ভুজঙ্গধরবাবু। এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কম দেখা যায়। ডাক্তার ছিলেন, সার্জারিতে অসাধারণ হাত ছিল; এমন কি প্ল্যাস্টিক সার্জারি পর্যন্ত জানতেন। কিন্তু তিনি এমন একটি দুর্নৈতিক কাজ করেছিলেন যে তাঁর ডাক্তারির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন কলোনীর ডাক্তারখানায় কম্পাউন্ডার হয়ে আছেন।'

'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

ব্যোমকেশ অতিথির সম্মুখে সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—'ব্ল্যাড্ প্রেসার বাড়ার পর ছেড়ে দিয়েছি।' তারপর তিনি ধীর অত্বরিত কণ্ঠে বলিতে সুরু করিলেন,—'কলোনীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও নূতনত্ব নেই, দিনের পর দিন একই কাজের পুনরভিনয় হয়। ফুল ফোটে, শাকসবজি গজায়, মুর্গী ডিম পাড়ে, দুধ থেকে ঘি মাখন তৈরি হয়। কলোনীর একটা ঘোড়া-টানা ভ্যান আছে, তাতে বোঝাই হয়ে রোজ সকালে মাল স্টেশনে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসে। ম্যুনিসিপাল মার্কেটে আমাদের দুটো স্টল্ আছে, একটাতে ফুল বিক্রি হয়, অন্যটাতে ঘি মাখন শাকসবজি। এই ব্যবসা থেকে যা আয় হয় তাতে ভাল ভাবেই চলে যায়।

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ মাস ছয়েক আগে একটা ব্যাপার ঘটল। রাত্রে নিজের ঘরে ঘুমচ্ছিলাম, জানলার কাঁচ ভাঙার

ঝনঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জেলে দেখি মেঝের ওপর পড়ে আছে—মোটরের একটি স্পার্কিং প্লাগ্।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'স্পার্কিং প্লাগ!'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ। বাইরে থেকে কেউ ওটা ছুঁড়ে মেরে জানলার কাচ ভেঙেছে। শীতের অন্ধকার রাত্রি, কে এই দুষ্কার্য করেছে জানা গেল না। ভাবলাম, বাইরের কোনও দুষ্ট লোক নিরর্থক বজ্জাতি করেছে। গোলাপ কলোনীর কম্পাউণ্ডের মধ্যে আসা-যাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই, গরু-ছাগল আট্‌কাবার জন্যে ফটকে আগড় আছে বটে, কিন্তু মানুষের যাতায়াতের পক্ষে সেটা গুরুতর বাধা নয়।

'এই ঘটনার পর দশ বারো দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। তারপর একদিন সকাল বেলা সদর দরজা খুলে দেখি দরজার বাইরে একটা ভাঙা কারবুরেটার পড়ে রয়েছে। তার দু'হপ্তা পরে এল একটা মোটর হর্ন। তারপর ছেঁড়া মোটরের টায়ার। এইভাবে চলেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মনে হচ্ছে টুকরো টুকরো ভাবে কেউ আপনাকে একখানি মোটর উপহার দেবার চেষ্টা করছে। এর মানে কি বুঝতে পেরেছেন?'

এতক্ষণে নিশানাথ বাবুর মুখে একটু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'পাগলের রসিকতা হতে পারে।—কিন্তু আমার এ অনুমান আমার নিজের কাছেও সন্তোষজনক নয়। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ঘূরন্ত পাখার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল,—'শেষবার মোটরের ভগ্নাংশ কবে পেয়েছেন?'

'কাল সকালে। তবে এবার ভগ্নাংশ নয়, একটি আস্ত ছেলেখেলার মোটর।'

'বাঃ! লোকটি সত্যিই রসিক মনে হচ্ছে। এ ব্যাপার অবশ্য কলোনীর সবাই জানে?'

'জানে। এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আচ্ছা, আপনার মোটর আছে?'

'না। আমাদের কোথায়ও যাতায়াত নেই, মেলামেশা নেই,—সামাজিক জীবন কলোনীর মধ্যেই আবদ্ধ। তাই ইচ্ছে করেই মোটর রাখিনি।'

'কলোনীতে এমন কেউ আছে যার কোনও কালে মোটরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল?'

নিশানাথবাবুর অধরপ্রান্ত সস্মিত ব্যঙ্গভরে একটু প্রসারিত হইল,—'আমাদের কোচম্যান মুস্কিল মিঞা আগে মোটর ড্রাইভার ছিল, বারবার র‍্যাশ্ ড্রাইভিংএর জন্যে তার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।'

'কি নাম বললেন, মুস্কিল মিঞা?'

'তার নাম নুরুদ্দিন কিম্বা ঐ রকম কিছু। সকলে ওকে মুস্কিল মিঞা বলে। মুস্কিল শব্দটা ওর কথার মাত্রা।'

'ও—আর কেউ?'

'আর আমার ভাইপো বিজয়ের একটা মোটর বাইক ছিল, কখনও চলত, কখনও চলত না। গত বছর বিজয় সেটা বিক্রি করে দিয়েছে।'

'আপনার ভাইপো। তিনিও কলোনীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। ম্যুনিসিপাল মার্কেটের ফুলের স্টল সেই দেখে। আমার ছেলেপুলে নেই, বিজয়কেই আমার স্ত্রী পনরো বছর বয়স থেকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন।'

ব্যোমকেশ আবার ফ্যানের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল,—'মিস্টার সেন, আপনার জীবনে কখনও—দশ বছর আগে হোক বিশ বছর আগে হোক—এমন কোনও লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন কি যার মোটর ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক আছে? ধরুন, মোটরের দালাল কিম্বা ঐ রকম কিছু? মোটর মেকানিক—?'

এবার নিশানাথ বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও চাপা শুনাইল। বলিলেন,—'বারো বছর আগে আমি যখন সেশন জজ ছিলাম, তখন লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আমার এজলাসে এসেছিল। তার একটা ছোট মোটর মেরামতের কারখানা ছিল।'

'তারপর?'

'লাল সিং ভয়ানক ঝগড়াটে বদ্‌রাগী লোক ছিল, তার কারখানার একটা মিস্ত্রিকে মোটরের স্প্যানার দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছিল। বিচারে আমি তাকে ফাঁসির হুকুম দিই।' একটু হাসিয়া বলিলেন,—'হুকুম শুনে লাল সিং আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হল। আপীলে আমার রায় বাহাল রইল বটে, কিন্তু ফাঁসি মকুব হয়ে চৌদ্দ বছর জেল হল।'

'চৌদ্দ বছর জেল! তার মানে লাল সিং এখনও জেলে আছে।'

নিশানাথবাবু বলিলেন,—'জেলের কয়েদীরা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে তাদের মেয়াদ কিছু মাফ হয়। লাল সিং হয়তো বেরিয়েছে।'

'খোঁজ নিয়েছেন? জেল বিভাগের দপ্তরে খোঁজ নিলেই জানা যেতে পারে।'

'আমি খোঁজ নিইনি।'

নিশানাথ বাবু উঠিলেন। বলিলেন,—'আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, আজ উঠি। আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি। দেখবেন যদি কিছু হদিস পান। কে এমন অনর্থক উৎপাত করছে জানা দরকার।'

ব্যোমকেশও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—'অনর্থক উৎপাত নাও হতে পারে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাহলে উৎপাতের অর্থ কি সেটা আরও বেশী জানা দরকার।' প্যাণ্টুলুনের পকেট হইতে এক গোছা নোট লইয়া কয়েকটা গণিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন,—'আপনার পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে গেলাম। যদি আরও লাগে পরে দেব।—আচ্ছা।'

নিশানাথ বাবু দ্বারের দিকে চলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'ধন্যবাদ।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া নিশানাথ বাবু দ্বিধাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—'আর একটা কথা মনে পড়ল। সামান্য কাজ, ভাবছি সে কাজ আপনাকে করতে বলা উচিত হবে কিনা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বলুন না।'

নিশানাথ কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান করতে হবে। সিনেমার অভিনেত্রী ছিল, নাম সুনয়না। বছর দুই আগে কয়েকটা বাজে ছবিতে ছোট পার্ট করেছিল, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। যদি তার সন্ধান পান ভালই, নচেৎ তার সম্বন্ধে যত কিছু খবর সংগ্রহ করা যায় সংগ্রহ করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তার একটা ফটোগ্রাফ জোগাড় করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যখন সিনেমার অভিনেত্রী ছিল তখন

ফটো জোগাড় করা শক্ত হবে না। দু' এক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে খবর দেব।'

'ধন্যবাদ।'

নিশানাথ বাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রথমেই পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, তারপর নোটগুলা টেবিল হইতে তুলিয়া গণিয়া দেখিল। তাহার মুখে সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। নোটগুলি দেরাজের মধ্যে রাখিতে রাখিতে সে বলিল,—'নিশানাথ বাবু কেতা-দুরস্ত সিভিলিয়ান হতে পারেন কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক নন।'

আমি উড়ানির খোলস ছাড়িয়া দাবার ঘুঁটিগুলি কৌটায় তুলিয়া রাখিতেছিলাম, প্রশ্ন করিলাম,—'কেন?'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ তক্তপোষে আসিয়া বসিল, বলিল,—'পঞ্চাশ টাকা দিলাম বলে ষাট টাকার নোট রেখে গেছেন। লোকটি বুদ্ধিমান, কিন্তু টাকাকড়ি সম্বন্ধে ঢিলে প্রকৃতির।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা ব্যোমকেশ, উনি যে সিভিলিয়ান ছিলেন, তুমি এত সহজে বুঝলে কি করে?'

সে বলিল,—'বোঝা সহজ বলেই সহজে বুঝলাম। উনি যে-বেশে এসেছিলেন, সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক ও বেশে বেড়ায় না, নিজের পরিচয় দেবার জন্যে কার্ডও বের করে না। ওটা বিশেষ ধরনের শিক্ষাদীক্ষার লক্ষণ। ওঁর কথা বলার ভঙ্গীতেও একটা হাকিমী মন্থরতা আছে।—কিন্তু ও কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে উনি কিজন্যে আমার কাছে এসেছিলেন।'

'তার মানে?'

'উনি দুটো সমস্যা নিয়ে এসেছিলেনঃ এক হচ্ছে মোটরের ভগ্নাংশ লাভ; আর দ্বিতীয়, চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না।—কোনটা প্রধান?'

'আমার তো মনে হল মোটরের ব্যাপারটাই প্রধান।—তোমার কি অন্যরকম মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। নিশানাথ বাবু চাপা স্বভাবের লোক, হয়তো আমার কাছেও ওঁর প্রকৃত উদ্বেগের কারণ প্রকাশ করতে চান না।'

কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিলাম,—'কিন্তু যে-বয়সে মানুষ চিত্রাভিনেত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে ওঁর সে বয়স নয়।'

'তার চেয়ে বড় কথা, ওঁর মনোবৃত্তি সে রকম নয়; নইলে বুড়ো লম্পট আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। ওঁর পরিমার্জিত বাচনভঙ্গী থেকে মনোবৃত্তির যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম তাতে মনে হয় উনি মনুষ্য জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ঘৃণাও করেন না; একটু তিক্ত কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব। উচ্ছের সঙ্গে তেঁতুল মেশালে যা হয় তাই।'

উচ্ছে ও তেঁতুলের কথায় মনে পড়িয়া গেল আজ পুঁটিরামকে উক্ত দুইটি উপকরণ সহযোগে অম্বল রাঁধিবার ফরমাশ দিয়াছি। আমি স্নানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম,—'তুমি এখন কি করবে?'

সে বলিল,—'মোটরের ব্যাপারে চিন্তা ছাড়া কিছু করবার নেই। আপাতত পলাতকা অভিনেত্রী সুনয়নার পশ্চাদ্ধাবন করাই প্রধান কাজ।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিল, ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'Blackmail কথাটা সম্বন্ধে নিশানাথ বাবুর এত কৌতূহল কেন? বাংলা ভাষায় blackmail-এর প্রতিশব্দ আছে কিনা তা জেনে ওঁর কি লাভ?'

আমি মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিলাম,—'আমার বিশ্বাস ওটা অবচেতন মনের ক্রিয়া। হয়তো লাল সিং জেল থেকে বেরিয়েছে, সে-ই মোটরের টুকরো পাঠিয়ে ওঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।'

'লাল সিং যদি জেল থেকে বেরিয়েই থাকে, সে নিশানাথ বাবুকে blackmail করবার চেষ্টা করবে কেন? উনি তো বে-আইনী কিছু করেন নি; আসামীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া বে-আইনী কাজ নয়। তবে লাল সিং প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে। হয়তো এই বারো বছর ধরে সে রাগ পুষে রেখেছে। কিন্তু নিশানাথ বাবুর ভাব দেখে তা মনে হয় না। তিনি যদি লাল সিংকে সন্দেহ করতেন তাহলে অন্তত খোঁজ নিতেন সে জেল থেকে বেরিয়েছে কি না।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইল। নিজ মনেই বলিল,—'নিশানাথ বাবুর স্মৃতিশক্তি বোধ হয় খুব প্রখর।'

'এটা জানলে কি করে?'

'তিনি হাকিম-জীবনে নিশ্চয় হাজার হাজার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেছেন। সব আসামীর নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি লাল সিংয়ের নাম ঠিক মনে করে রেখেছেন।'

'লাল সিং তাঁকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল, হয়তো সেই কারণেই নামটা মনে আছে।'

'তা হতে পারে' বলিয়া সে আবার সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিল।

আমি বলিলাম,—'না না, আর সিগারেট নয়, ওঠো এবার। বেলা একটা বাজে।'

২

বৈকালে ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তো আজকাল সিনেমার দলে ভিড়ে পড়েছেন। তা তোমার চেনাশোনা কেউ ওদিকে আছেন নাকি?'

অবস্থাগতিকে সাহিত্যিক মহলে আমার বিশেষ মেলামেশা নাই। যাঁহারা উন্নলাট সাহিত্যিক তাঁহারা আমাকে কলকে দেন না, কারণ আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখি; আর যাঁহারা সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিবার পর শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ আমার নাই। কেবল চিত্র-নাট্যকার ইন্দু রায়ের সহিত সদ্ভাব ছিল। তিনি সিনেমার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সহজ মানুষের মত বাক্যালাপ ও আচার ব্যবহার করিতেন।

ব্যোমকেশকে ইন্দু রায়ের নামোল্লেখ করিলে সে বলিল,—'বেশ তো। ওঁর বোধ হয় টেলিফোন আছে, দেখ না যদি সুনয়নার খবর পাও।'

ডায়রেক্টরী ঘাঁটিয়া ইন্দুবাবুর ফোন নম্বর বাহির করিলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন, আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—'সুনয়না! কৈ, নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না তো। আমি অবশ্য ওদের বড় খবর রাখি না—'

বলিলাম,—'ওদের খবর রাখে এমন কারুর খবর দিতে পারেন?'

ইন্দুবাবু ভাবিয়া বলিলেন,—'এক কাজ করুন। রমেন মল্লিককে চেনেন?'

'না। কে তিনি? সিনেমার লোক?'

'সিনেমার লোক নয় কিন্তু সিনেমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এমন লোক নেই যার নাড়ীনক্ষত্র জানেন না। ঠিকানা দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। অতি

অমায়িক লোক, তাঁর শিষ্টতায় মুগ্ধ হবেন।' বলিয়া রমেন মল্লিকের ঠিকানা দিলেন।

সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ ও আমি মল্লিক মহাশয়ের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। দেখিলাম, রমেন বাবু ধনী ও বিনয়ী, তাঁহার বয়স চল্লিশের আশেপাশে, হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘ আকৃতি; মুখখানি পেঁপে ফলের ন্যায় চোয়ালের দিকে ভারী, মাথার দিকে সঙ্কীর্ণ, গোঁফজোড়া সূক্ষ্ম ও যত্নলালিত; পরিধানে শৌখিন দেশী বেশ—কোঁচানো কাঁচি ধুতির উপর গিলে-করা স্বচ্ছ পাঞ্জাবি; পায়ে বার্নিশ পাম্প।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া এবং আমরা ইন্দুবাবুর নির্দেশে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া রমেন বাবু যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদর আপ্যায়নের ফাঁকে ব্যোমকেশ কাজের কথা পাড়িল, বলিল,—'আপনি শুনলাম চলচ্চিত্রের বিশ্বকোষ, সিনেমা জগতে এমন মানুষ নেই যার নাড়ীর খবর জানেন না।'

রমেনবাবু সলজ্জ বিনয়ে বলিলেন,—'ওটা আমার একটা নেশা। কিছু নিয়ে থাকা চাই তো। তা বিশেষ কারুর কথা জানতে চান নাকি?'

'হ্যাঁ, সুনয়না নামে একটি মেয়ে বছর দুই আগে—'

রমেনবাবু চকিত চক্ষে চাহিলেন,—'সুনয়না! মানে—নেত্যকালী?'

"........তা বিশেষ কারুর কথা জানতে চান নাকি?"

'নেত্যকালী!'

'সুনয়নার আসল নাম নৃত্যকালী। তার সম্বন্ধে কোনও নতুন খবর পাওয়া গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনয়নার কথা আমরা কিছুই জানি না—নামটা ছাড়া। আপনার কাছে খবর পাব এই আশায় এসেছি।'

রমেনবাবু বলিলেন,—'ও—আমি ভেবেছিলাম আপনি পুলিশের পক্ষ থেকে—। যাহোক, নেত্যকালীর অনেক খবরই আমি জানি, কেবল ল্যাজা আর মুড়োর খবর পাইনি।'

'সেটা কি রকম?'

'নেত্যকালী কোথা থেকে এসেছিল জানি না, আবার কোথায় লোপাট হয়ে গেল তাও জানি না।'

'ভারী রহস্যময় ব্যাপার দেখছি। এর মধ্যে পুলিশের গন্ধও আছে!—আপনি যা যা জানেন দয়া করে বলুন।'

রমেনবাবু আমাদের সিগারেট দিলেন এবং দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিলেন। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'ঘটনাচক্রে নেত্যকালীর সিনেমা-লীলা প্রস্তাবনা থেকেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল; আর যবনিকা পতন পর্যন্ত সেই লীলার খবর যে রেখেছিলাম তার কারণ মুরারি আমার বন্ধু ছিল। মুরারি দত্তর নাম বোধ হয় আপনারা জানেন না। তার কথা পরে আসবে।

'আজ থেকে আন্দাজ আড়াই বছর আগে একদিন সকালের দিকে আমি গৌরাঙ্গ স্টুডিওর মালিক গৌরহরি বাবুর অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটি নতুন মেয়ে দেখা করতে এল। গৌরহরি বাবু তখন বিষবৃক্ষ ধরেছেন; প্রধান ভূমিকার অ্যাক্টর অ্যাক্‌ট্রেস্ নেওয়া হয়ে গেছে, কেবল মাইনর পার্টের লোক বাকি।

'সেই নেত্যকালীকে প্রথম দেখলাম। চেহারা এমন কিছু আহা-মরি নয়; তবে বয়স কম, চটক আছে। গৌরহরি বাবু ট্রাই নিতে রাজি হলেন।

'ট্রাই নিতে গিয়ে গৌরহরি বাবুর তাক্ লেগে গেল। ভেবেছিলেন ঝি চাকরানীর পার্ট দেবেন, কিন্তু অভিনয় দেখার পর বললেন, তুমি কুন্দনন্দিনীর পার্ট কর। নেত্যকালী কিন্তু রাজি হল না, বললে, বিধবার পার্ট করবে না। গৌরহরি বাবু তখন তাকে কমলমণির পার্ট দিলেন। নেত্যকালী নাম সিনেমায় চলে না, তার নতুন নাম হল সুনয়না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'বিধবার পার্ট করবে না কেন?'

রমেনবাবু বলিলেন—'কম বয়সী অভিনেত্রীরা বিধবার পার্ট করতে চায়না। তবে নেত্যকালী অন্য ওজর তুলেছিল; বলেছিল, সে সধবা, গেরস্ত ঘরের বৌ, টাকার জন্যে সিনেমায় নেমেছে, কিন্তু বিধবা সেজে স্বামীর অকল্যাণ করতে পারবে না। যাকে বলে নাচতে নেমে ঘোমটা!'

'আশ্চর্য বটে। তারপর?'

'গৌরহরি বাবু তাকে মাইনে দিয়ে রেখে নিলেন। শুটিং চলল। তারপর যথাসময় ছবি বেরুল। ছবি অবশ্য দাঁড়াল না, কিন্তু কমলমণির অভিনয় দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্য তার মেক্‌আপ্। সে নিজে নিজের মেক্-আপ করত; এত চমৎকার মেক্-আপ করেছিল যে পর্দায় তাকে দেখে নেত্যকালী বলে চেনাই গেল না।'

'তাই নাকি! আর অন্য যে-সব ছবিতে কাজ করেছিল—?'

'অন্য আর একটা ছবিতেই সে কাজ করেছিল, তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতায়। শ্যামা ঝি'র পার্ট করেছিল। সে কী অপূর্ব অভিনয়! আর, শ্যামা ঝিকে দেখে কার সাধ্য বলে সে-ই বিষবৃক্ষের কমলমণি। একেবারে আলাদা মানুষ!—এখন মনে হয় নেত্যকালীর আসল চেহারাটাও হয়তো আসল চেহারা নয়, মেক্-আপ্।'

'তার আসল চেহারার ফটো বোধ হয় নেই?'

'না। থাকলে পুলিশের কাজে লাগত।'

'হুঁ। তারপর বলুন।'

রমেনবাবু আর একবার আমাদের সিগারেট পরিবেশন করিয়া আরম্ভ করিলেন—

'এই তো গেল সুনয়নার সিনেমা-জীবনের ইতিহাস। ভেতরে ভেতরে আর একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছিল। সুনয়না সিনেমায় ঢোকবার মাস দুই পরে স্টুডিওতেই মুরারির সঙ্গে তার দেখা হল। মুরারিকে আপনারা চিনবেন না, কিন্তু দত্ত-দাস কোম্পানির নাম নিশ্চয় শুনেছেন—বিখ্যাত জহরতের কারবার। মুরারি হল গিয়ে দত্তদের বাড়ির ছেলে। অগাধ বড়মানুষ।

'মুরারি আমার বন্ধু ছিল; এক গেলাসের ইয়ার বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে, যাকে স্ত্রীদোষ বলে তা একটু আছে, ওটা তেমন দোষের নয়। মুরারিরও ছিল। পালে পার্বণে একটু আধটু আমোদ করা, বাঁধাবাঁধি কিছু নয়। কিন্তু মুরারি সুনয়নাকে দেখে একেবারে ঘাড় মুচড়ে পড়ল। সুনয়না এমন কিছু পরী-অপ্সরী নয়, কিন্তু যার সঙ্গে যার মজে মন। মুরারি সকাল বিকেল গৌরাঙ্গ স্টুডিওতে ধর্না দিয়ে পড়ল।

'মুরারির বয়স হয়েছিল আমারই মতন। এ বয়সে সে যে এমন ছেলেমানুষি আরম্ভ করবে তা ভাবিনি। সুনয়না কিন্তু সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। তার বাড়ি কোথায় কেউ জানত না, ট্রামে বাসে আসত, ট্রামে বাসে ফিরে যেত; কোনও দিন স্টুডিওর গাড়ি ব্যবহার করেনি। মুরারি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারেনি তার বাসা কোথায়।

'মুরারি আমাকে মনের কথা বলত। আমি তাকে বোঝাতাম, সুনয়না ভদ্রঘরের বৌ, ভয়ানক পতিব্রতা; ওদিকে তাকিও না। মুরারি কিন্তু বুঝত না। তাকে তখন কালে ধরেছে, সে বুঝবে কেন?

'মাস ছয়-সাত কেটে গেল। সুনয়না মুরারিকে আমল দিচ্ছে না, মুরারিও জোঁকের মত লেগে আছে। এই ভাবে চলেছে।

'স্বর্ণলতায় সুনয়নার কাজ শেষ হয়ে গেল। সে স্টুডিও থেকে দু'মাসের মাইনে আগাম নিয়ে কিছুদিনের ছুটিতে যাবে কাশ্মীর বেড়াতে, এমন সময় একদিন মুরারি এসে আমাকে বললে, সব ঠিক হয়ে গেছে! আশ্চর্য হলাম, আবার হলাম না। স্ত্রীজাতির চরিত্র, বুঝতেই পারছেন। সুনয়না যে অন্য মৎলবে ধরা দেবার ভাণ করছে তা তখন জানব কি করে?

'দত্ত-দাস কোম্পানির বাগবাজারের দোকানটা মুরারি দেখত। দোকানের পেছনদিকে একটা সাজানো ঘর ছিল। সেটা ছিল মুরারির আড্ডা-ঘর, অনেক সময় সেখানেই রাত কাটাতো।

'পরদিন সকালে হৈ হৈ কাণ্ড। মুরারি তার আড্ডা ঘরে মরে পড়ে আছে। আর দোকানের শো-কেস্ থেকে বিশ হাজার টাকার হীরের গয়না গায়েব হয়ে গেছে।

'পুলিশ এল, লাস পরীক্ষার জন্যে চালান দিলে। কিন্তু কে মুরারিকে মেরেছে তার হদিস পেলে না। সে-রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল তা বোধ হয় আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। মুরারি আর কাউকে বলেনি।

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, অথচ না বললেও নয়। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের খাতিরে পুলিশকে গিয়ে বললাম।

'পুলিশ অন্ধকারে হাঁ করে বসে ছিল, এখন তুড়ে তল্লাস শুরু করে দিলে। সুনয়নার নামে ওয়ারেণ্ট বেরুল। কিন্তু কোথায় সুনয়না। সে কর্পূরের মত উবে গেছে। তার যেসব ফটোগ্রাফ ছিল তা থেকে তাকে সনাক্ত করা অসম্ভব। তার আসল চেহারা স্টুডিওর সকলকারই চেনা ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারের পর আর কেউ সুনয়নাকে চোখে দেখেনি।

'তাই বলছিলাম সুনয়নার ল্যাজামুড়ো দুইই আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। সে কোথা থেকে এসেছিল, কার

মেয়ে, কার বৌ কেউ জানে না; আবার ভোজবাজির মত কোথায় মিলিয়ে গেল তাও কেউ জানে না।'

রমেনবাবু চুপ করিলেন। ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল,—'মুরারিবাবুর মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছিল?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'তার পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছিল।'

'কোন্ বিষ জানেন?'

'ঐ যে কি বলে—নামটা মনে পড়ছে না—তামাকের বিষ।'

'তামাকের বিষ! নিকোটিন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিকোটিন। তামাক থেকে যে এমন দুর্দান্ত বিষ তৈরি হয় তা কে জানত!—আসুন।' বলিয়া সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'ধন্যবাদ, আর না। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন—'

'সে কি কথা! বেরুনো তো রোজই আছে, আপনাদের মতো সজ্জনের সঙ্গ পাওয়া কি সহজ কথা!—আমি যাচ্ছিলাম একটি মেয়ের গান শুনতে। নতুন এসেছে, খাসা গায়। তা এখনও তো রাত বেশী হয়নি, চলুন না আপনারাও দুটো ঠুংরি শুনে আসবেন।'

ব্যোমকেশ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—'আমি তো গানের কিছু বুঝি না, আমার যাওয়া বৃথা; আর অজিত ধ্রুপদ ছাড়া কোনও গান পছন্দই করে না। সুতরাং আজ থাক। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার যদি খবরের দরকার হয়, আপনার শরণাপন্ন হব।'

'একশ'বার। যখনই দরকার হবে তলব করবেন।'

'আচ্ছা, আসি তবে। নমস্কার।'

'নমস্কার! নমস্কার!'

৩

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শুনিতে পাইলাম, পাশের ঘরে ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। দুই চারিটা ছাড়াছাড়া কথা শুনিয়া বুঝিলাম সে নিশানাথবাবুকে সুনয়নার কাহিনী শুনাইতেছে।

নিশানাথবাবুর আগমনের পর হইতে আমাদের তাপদগ্ধ কর্মহীন জীবনে নূতন সঞ্জীবতার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই ব্যোমকেশ যখন টেলিফোনের সংলাপ শেষ করিয়া আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং বলিল,—'ওহে ওঠো, মোহনপুর যেতে হবে'—তখন তিলমাত্র আলস্য না করিয়া সটান উঠিয়া বসিলাম।

'কখন যেতে হবে?'

'এখনি। রমেনবাবুকেও নিয়ে যেতে হবে। নিশানাথবাবুর কথার ভাবে মনে হল, তাঁর সন্দেহ ভূতপূর্ব অভিনেত্রী সুনয়না দেবী কাছাকাছি কোথাও বিরাজ করছেন। তাঁর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, রমেনবাবু গিয়ে আসামীকে সনাক্ত করতে পারেন।'

আটটার মধ্যেই রমেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। তিনি লুঙ্গি ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিয়া বৈঠকখানায় আনন্দবাজার পড়িতেছিলেন, আমাদের সহর্ষে স্বাগত করিলেন।

ব্যোমকেশের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি উল্লাসভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—'যাব না? আলবৎ যাব। আপনারা দয়া করে পাঁচ মিনিট বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' বলিয়া তিনি অন্দরের দিকে অন্তর্ধান করিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি তৈয়ার হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। একেবারে ফিট্‌ফাট বাবু; যেমনটি কাল সন্ধ্যা দেখিয়াছিলাম।

শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি আমাদের টিকি কিনিতে দিলেন না, নিজেই তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকি কিনিয়া ট্রেনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেখিলাম আমাদের চেয়ে তাঁরই ব্যগ্রতা ও উৎসাহ বেশী।

ঘণ্টাখানেক পরে উদ্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছান গেল লোকজন বেশী নাই; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি লোক পান চিবাইতে চিবাইতে দোকানীর সহিত রসালাপ করিতেছে। ব্যোমকেশ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'গোলাপ কলোনী কোন দিকে বলতে পারেন?'

লোকটি এক চক্ষু মুদিত করিয়া আমাদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর এড়ো গলায় বলিল,—'চিড়িয়াখানা দেখতে যাবেন?'

'চিড়িয়াখানা!'

'ঐ যার নাম চিড়িয়াখানা তারই নাম গোলাপ কলোনী। আজব জায়গা—আজব মানুষগুলি। অমন চিড়িয়াখানা আলিপুরেও নেই। তা—যাবার আর কষ্ট কি? ঐ যে চিড়িয়াখানার রথ রয়েছে ওতে চড়ে বসুন, গড়গড় করে চলে যাবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, স্টেশন প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি জীর্ণকায় ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েদের স্কুল কলেজের গাড়ির মত লম্বা ধরনের গাড়ি। তাহার গায়ে এককালে সোনার জলে 'গোলাপ কলোনী' লেখা ছিল, কিন্তু এখন তাহা প্রায় অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। গাড়িতে লোকজন কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না, কেবল ঘোড়াটা একক দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িয়া মাছি তাড়াইতেছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম গাড়ির পিছনের পা-দানে বসিয়া একটি লোক নির্বিষ্টমনে বিড়ি টানিতেছে। লোকটি মুসলমান, বয়স হইয়াছে। দাড়ির প্রাচুর্য নাই, মুখময় ডুমো ডুমো ব্রণের ন্যায় মাংস উঁচু হইয়া আছে, চোখ দুটিতে ঘোলাটে অভিজ্ঞতা; পরনে ময়লা পায়জামার উপর ফতুয়া। আমাদের দেখিয়া সে বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া বলিল,—'কলকাতা হতে আসতেছেন?'

'হ্যাঁ। গোলাপ কলোনী যাব।'

'আসেন। আপনাগোর লইয়া যাইবার কথা বাবু কইছেন। কিন্তু মুস্কিল হইছে—'

বুঝিলাম ইনিই মুস্কিল মিঞা। ব্যোমকেশ বলিল, 'মুস্কিল কিসের?'

মুস্কিল বলিল,—'রসিকবাবুরও এই টেরেনে আওনের কথা। তা তিনি আইলেন না। পরের টেরেনের জৈন্য সবুর করতি হইব। তা বাবু মশয়রা গাড়ির মধ্যে বসেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রসিক বাবুটি কে?'

মুস্কিল বলিল,—'কলোনীর বাবু, রোজ দুবেলা রেলে আয়েন যায়েন। আজ কি কারণে দেরি হইছে। বসেন না, পরের গাড়ি এখনই আইব।'

মুস্কিল গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে মানুষ বসিবার স্থান তিন চারিটি আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থান স্তূপীকৃত শূন্য চ্যাঙারির দ্বারা পূর্ণ। অনুমান করা যায় প্রত্যহ প্রাতে এইসব চ্যাঙারিতে গোলাপ কলোনী হইতে ফুল শাকসবজি স্টেশনে আসে এবং কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইয়া যায়; ওদিকে কলিকাতা হইতে পূর্বদিনের শূন্য চ্যাঙারিগুলি ফিরিয়া আসে। কর্মী মানুষগুলিরও যাতায়াত এই ভ্যানের সাহায্যেই সাধিত হয়।

রৌদ্রের তাপ বাড়িতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকার

চেয়ে গাড়ির ছায়ান্তরালে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া আমরা গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম।

মুস্কিল মিঞা গাল্পিক লোক, মানুষ পাইলে গল্প করিতে ভালবাসে। সে বলিল,—'বাবু মশয়রা দুই চারিদিন হেথায় থাকবেন তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আজই ফিরব।—তুমিই মুস্কিল মিঞা?'

মুস্কিল মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল,—'নাম তো কর্তা সৈয়দ নুরুদ্দিন। কিন্তু মুস্কিল হৈছে বাবুরা আদর কৈরা মুস্কিল মিঞা ডাকেন।'

'এ আর মুস্কিল কি?—কতদিন আছ গোলাপ কলোনীতে?'

'আন্দাজ সাত আট বছর হৈতে চলল। তখন বোষ্টম ঠাকুর ছাড়া আর কোনও কর্তাই দেখা দেন নাই। আমি পুরাণ লোক।'

'হুঁ। তোমার গাড়ি আর ঘোড়াও তো বেশ পুরনো মনে হচ্ছে।'

মুস্কিল আক্ষেপ করিয়া বলিল—'আর কন্ কেন কর্তা। ঘোড়াটার মরবার বয়স হইছে, নেহাৎ আদত পড়ে গেছে তাই গাড়ি টানে। বড় বিবিরে কতবার কইছি, ও দুটা গাড়ি ঘোড়ারে বাতিল কৈরা নূতন মটর-ভ্যান খরিদ কর। তা মুস্কিল হৈছে, বড় বিবি কয় টাকা নাই।'

'বড় বিবি কে? নিশানাথ বাবুর স্ত্রী?'

'হ'। ভারি লক্ষ্মীমন্তর মেইয়া।'

'তিনিই বুঝি কলোনী দেখাশোনা করেন?'

'দেখাশুনা কর্তাবাবুও করে। কিন্তু টাকাকড়ি হিসাব নিকাশ বড়বিবির হাতে।'

'তা বড় বিবি টাকা নাই বলেন কেন? কলোনীর ব্যবসা কি ভাল চলে না?'

মুস্কিল মিঞার ঘোলাটে চোখে একটা গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—'চলে তো ভালই। এত ফুল ফল ঘি মাখন আণ্ডা যায় কোথায়? তবে কি জানেন কর্তা, লাভের গুড় পিপড়ো খাইয়া যায়।' বলিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ চক্ষে আমাদের তিনজনকে একে একে নিরীক্ষণ করিল।

মুস্কিল মিঞার নিকট হইতে ব্যোমকেশ হয়তো আরও আভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহ করিত, কিন্তু এই সময় দক্ষিণ হইতে একটি ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিল এবং অল্পকাল পরে একটি ক্ষিপ্রচারী ভদ্রলোক আসিয়া গাড়ির কাছে দাঁড়াইলেন। ইনি বোধ হয় রসিকবাবু।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু আকৃতি ম্লান ও শুষ্ক। বৃষকাষ্ঠের মত দেহে লংক্লথের পাঞ্জাবি অত্যন্ত বেমানানভাবে ঝুলিয়া আছে, গাল-বসা খাপ্‌রা-ওঠা মুখ, জোড়া ভুরুর নীচে চোখদুটি ঘন-সন্নিবিষ্ট। মুখে খুঁৎ-খুঁতে অতৃপ্ত ভাব। গাড়ির মধ্যে আমাদের বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ আরও খুঁৎখুঁতে হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনারা—?'

ব্যোমকেশ নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,—'নিশানাথ বাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন—।'

রসিকবাবুর ঘন-সন্নিবিষ্ট চোখে একটা ক্ষণস্থায়ী আশঙ্কা পলকের জন্য চমকিয়া উঠিল; মনে হইল তিনি ব্যোমকেশের নাম জানেন। তারপর তিনি চট্ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—'মুস্কিল, গাড়ি হাঁকাও। দেরি হয়ে গেছে।'

মুস্কিল ইতিমধ্যে সামনে উঠিয়া বসিয়াছিল, ঘোড়ার নিতম্বে দু'চার ঘা খেজুর ছড়ি বসাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

রসিকবাবু তখন আত্ম-পরিচয় দিলেন। তাঁহার ন রসিকলাল দে, গোলাপ কলোনীর বাসিন্দা, হগ্ সাহেবে বাজারে তরি-তরকারির দোকানের ইন্‌-চার্জ।

এই সময় তাঁহার ডান হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িতে চমকি উঠিলাম। হাতের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি আঙুলগুলো না কে যেন ভোজালির এক কোপে কাটিয়া লইয়াছে!

ব্যোমকেশও হাত লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শান্তস্ব বলিল,—'আপনি কি আগে কোনও কল-কারখানায় কা করতেন?'

রসিকবাবু হাতখানি পকেটের মধ্যে লুকাইলে ম্লানকণ্ঠে বলিলেন,—'কটন মিলের কারখানায় মিস্ত্রি ছিলা ভাল মাইনে পেতাম। তারপর করাত-মেসিনে আঙুলগুলে গেল। কিছু খেসারৎ পেলাম বটে, নাকের বদলে নরুন কিন্তু আর কাজ জুটল না। বছর দুই থেকে নিশানাথবাবু পিঁজরাপোলে আছি।' তাঁহার মুখ আরও শীর্ণ-ক্লিষ্ট হইয় উঠিল।

আমরা নীরব রহিলাম। গাড়ি ক্ষুদ্র সহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া খোলা মাঠের রাস্তা ধরিল।

ভাবিতে লাগিলাম, গোলাপ কলোনীর দেখি অনেকগুলি নাম! কেহ বলে চিড়িয়াখানা, কেহ বলে পিঁজরাপোল। না জানি সেখানকার অন্য লোকগুলি কেমন! যে দুইটি নমুনা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় চিড়িয়াখানা ও পিঁজরাপোল দুটি নামই সার্থক।

৪

রাস্তাটি ভাল; পাশ দিয়া টেলিফোনের খুঁটি চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় মার্কিন পথিকৃৎ এই পথ ও টেলিফোনের সংযোগ নিজেদের প্রয়োজনে তৈয়ার করিয়াছিল, যুদ্ধের শেষে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পথের শেষে আরও যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়িল; একটা স্থানে অগণিত সামরিক মোটর গাড়ি। পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধভাবে গাড়িগুলি সাজানো; সর্বাঙ্গে মরিচা ধরিয়াছে, রঙ্ চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শ্রেণীবিন্যাস ভগ্ন হয় নাই। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় এ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার গোরস্থান।

এই সমাধিক্ষেত্র যেখানে শেষ হইয়াছে সেখান হইতে গোলাপ কলোনীর সীমানা আরম্ভ। আন্দাজ পনরো-কুড়ি বিঘা জমি কাঁটা-তার দিয়া ঘেরা, কাঁটা-তারের ধারে ধারে ত্রিশিরা ফণি-মনসার ঝাড়। ভিতরে বাগান, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে লাল টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঠি। মালীরা রবারের নলে করিয়া বাগানে জল দিতেছে। চারিদিকের ঝলসানো পরিবেশের মাঝখানে গোলাপ কলোনী যেন একটি শ্যামল ওয়েসিস্।

ক্রমে কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ফটকে দ্বার নাই, কেবল আগড় লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। দুইদিকের স্তম্ভ হইতে মাধবীলতা উঠিয়া মাথার উপর তোরণ-মাল্য রচনা করিয়াছে। গাড়ি ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

ফটকে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই একটি বাড়ি। টালির ছাদ, বাংলো ধরনের বাড়ি; নিশানাথ বাবু এখানে থাকেন। আমরা গাড়ির মধ্যে বসিয়া দেখিলাম, বাড়ির সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া একটি মহিলা ঝারিতে করিয়া গাছে জল দিতেছেন। গাড়ির শব্দে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন; ক্ষণেকের জন্য একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম। তারপর তিনি ঝারি রাখিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা তিন জনেই যুবতীকে দেখিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ বক্রচক্ষে একবার রমেনবাবুর পানে চাহিল। রমেনবাবু অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, কথা বলিলেন না। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কলিকাতার বাহিরে পা দিয়া রমেনবাবু কেমন যেন নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতার যাঁহারা খাস বাসিন্দা, তাঁহারা কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করিলে ডাঙায় তোলা মাছের মত একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

গাড়ি আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিলে আমরা একে একে অবতরণ করিলাম। নিশানাথ বাবু দ্বারের কাছে আসিয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পাজামা ও লিনেনের কুর্তা। হাসিমুখে বলিলেন,—'আসুন। রোদ্দুরে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়।'—এই পর্যন্ত বলিয়া রসিক দে'র প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রসিক দে আমাদের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিয়াছিল এবং অলক্ষিতে নিজের কুঠির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া নিশানাথ বাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, তিনি বলিলেন, —'রসিক, তোমার হিসেব এনেছ?'

রসিক যেন কুঁচ্‌কাইয়া গেল, ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আজ্ঞে আজ হয়ে উঠল না। কাল পরশুর মধ্যেই—'

নিশানাথ আর কিছু বলিলেন না, আমাদের লইয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বসিবার ঘরটি মাঝারি আয়তনের; আসবাবের জাঁকজমক নাই কিন্তু পারিপাট্য আছে। মাঝখানে একটি নিচু গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি গদিযুক্ত চেয়ার। দেয়ালের গায়ে বইয়ের আলমারি। এক কোণে টিপাইয়ের উপর টেলিফোন, তাহার পাশে রোল্‌-টপ্‌ টেবিল। বাহিরের দিকের দেয়ালে দুটি জানালা, উপস্থিত রৌদ্রের ঝাঁঝ নিবারণের জন্য গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা দিয়া ঢাকা।

রমেনবাবুর পরিচয় দিয়া আমরা উপবিষ্ট হইলাম। নিশানাথ বাবু বলিলেন, —'তেতে-পুড়ে এসেছেন, একটু জিরিয়ে নিন। তারপর বাগান দেখাব। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হবে।' তিনি সুইচ্‌ টিপিয়া বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'আপনার বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে দেখছি।'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ, আমার নিজের ডায়নামো আছে। বাগানে জল দেবার জন্য কুয়ো থেকে জল পাম্প করতে হয়। তাছাড়া আলো বাতাসও পাওয়া যায়।'

আমিও ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলাম, টালির নীচে সমতল করিয়া তক্তা বসানো, তক্তা ভেদ করিয়া মোটা লোহার ডাণ্ডা বাহির হইয়া আছে, ডাণ্ডার বাঁকা হুক হইতে পাখা ঝুলিতেছে। অনুরূপ আর একটা ডাণ্ডার প্রান্তে আলোর বাল্‌ব।

পাখা চালু হইলে তাহার উপর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ঘাসের টুক্‌রা ঝরিয়া টেবিলের উপর পড়িল। নিশানাথ বলিলেন,—'চড়ুই পাখি। কেবলই পাখার ওপর বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। ক্লান্তি নেই, নৈরাশ্য নেই, যতবার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ততবার বাঁধছে।' তিনি ঘাসের টুকরাগুলি কুড়াইয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'ভারী একগুঁয়ে পাখি।'

নিশানাথবাবুর মুখে একটু অম্লরসাক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'এই একগুঁয়েমি যদি মানুষের থাকত!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মানুষের বুদ্ধি বেশী, তাই একগুঁয়েমি কম।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাই কি? আমার তো মনে হয় মানুষের চরিত্র দুর্বল, তাই একগুঁয়েমি কম।'

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে হাস্য-কুঞ্চিত চোখে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'আপনি দেখছি মানুষ জাতটাকে শ্রদ্ধা করেন না।'

নিশানাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া হাল্কা সুরে বলিলেন,—'বর্তমান সভ্যতা কি শ্রদ্ধা হারানোর সভ্যতা নয়? যারা নিজের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে তারা আর কাকে শ্রদ্ধা করবে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল এমন সময় ভিতর দিকের পর্দা নড়িয়া উঠিল। যে মহিলাটিকে পূর্বে গাছে জল দিতে দেখিয়াছিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে একটি ট্রে'র উপর কয়েকটি সরবতের গেলাস।

মহিলাটিকে দূর হইতে দেখিয়া যতটা অল্পবয়স্কা মনে হইয়াছিল আসলে ততটা নয়, তবে বয়স ত্রিশ বছরের বেশিও নয়। সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, সুশ্রী মুখ, টক্‌টকে রঙ; যৌবনের অপরাহ্ণে আসিয়াও দেহ যৌবনের লালিত্য হারায় নাই। সবার উপর একটি সংযত আভিজাত্যের ভাব।

তিনি কে তাহা জানি না, তবু আমরা তিনজনেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশানাথবাবু নীরস কণ্ঠে পরিচয় দিলেন, —'আমার স্ত্রী—দময়ন্তী।'

'এতে কারুর আঙুলের টিপ্‌ দেখছি না...'

আমাদের দিকে চোখ ফিরাইয়া যুবতী লজ্জায় যেন শিহরিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি হাঁসগুলিকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কলোনীর পিছন দিকে প্রকাণ্ড ই'দারার পাশে কয়েকটা ঘর রহিয়াছে, সেইখানে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিশানাথ বলিলেন, 'মুস্কিলের বৌ। কলোনীর হাঁস-মুর্গীর ইনচার্জ।'

মনে আবার একটা বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিল। এখানে কি প্রভু-ভৃত্য সকলেরই দ্বিতীয় পক্ষ? ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওদিকে কোথায় গেল?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ওদিকটা আস্তাবল। মুস্কিলও ওখানেই থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়।'

'ওদের মধ্যে কে ভদ্র কে অভদ্র বলা শক্ত। জাতের কড়কড়ি নেই কিনা।'

'কিন্তু পর্দার কড়াকড়ি আছে।'

'আছে, তবে খুব বেশী নয়। আমাদের দেখে নজর বিবি এখন আর লজ্জা করে না। আপনারা নতুন লোক তাই বোধহয় লজ্জা পেয়েছে।'

নজর বিবি! নামটা যেন সুনয়নার কাছ ঘেঁষিয়া যায়! চকিতে মাথায় আসিল, যে স্ত্রীলোক খুন করিয়া আত্মগোপন করিতে চায়, মুসলমান অন্তঃপুরের চেয়ে আত্মগোপনের প্রকৃষ্টতর স্থান সে কোথায় পাইবে? আমি রমেনবাবুর দিকে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন দেখলেন?'

রমেনবাবু দ্বিধাভরে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'উঁহু, নেত্যকালী নয়।—কিন্তু—কিছু বলা যায় না—'

বুঝিলাম, রমেনবাবু নেত্যকালীর মেক্-আপ করিবার অসামান্য ক্ষমতার কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল মিঞার বৌ দিবারাত্র মেক-আপ করিয়া থাকে ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব?

ইতিমধ্যে আমরা আর একটি বাড়ির সম্মুখীন হইতেছিলাম। ভোজনালয় যে রাস্তার উপর তাহার পিছনে সমান্তরাল একটি রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে একটি কুঠি। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে কে থাকে?'

নিশানাথ বলিলেন, 'এখানে থাকেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত আর তাঁর মেয়ে মুকুল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নেপাল গুপ্ত—নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। বছর তিন-চার আগে এঁর নাম খবরের কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

নিশানাথ বলিলেন, 'অসম্ভব নয়। নেপালবাবু এক কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাত্রে গিয়ে ল্যাবরেটারিতে কাজ করতেন। একদিন ল্যাবরেটারিতে বিরাট বিস্ফোরণ হল, নেপালবাবু গুরুতর আহত হলেন। কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করলেন নেপালবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে বোমা তৈরি করছিলেন। চাকরি তো গেলই, পুলিশের নজরবন্দী হয়ে রইলেন। যুদ্ধের পর পুলিশের শুভদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু চাকরি আর জুটল না। বিস্ফোরণের ফলে তাঁর চেহারা এবং চরিত্র দুই-ই দাগী হয়ে গিয়েছে।'

'সত্যিই কি উনি বোমা তৈরি করছিলেন? উনি নিজে কি বলেন?'

নিশানাথ মুখ টিপিয়া হাসিলেন,—'উনি বলেন গাছের সার তৈরি করছিলেন।'

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। নিশানাথ বলিয়া চলিলেন, 'এখানে এসেও সার তৈরি করা ছাড়েন নি। বাড়িতে ল্যাবরেটারি করেছেন, অর্থাৎ গ্যাস-সিলিণ্ডার, বুনসেন বার্নার, টেস্ট-টিউব, রেটর্ট ইত্যাদি যোগাড় করেছেন। একবার খানিকটা সার তৈরি করে আমাকে দিলেন, বললেন, পেঁপে গাছের গোড়ায় দিলে ইয়া ইয়া পেঁপে ফলবে। আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উনি শুনলেন না—'

'শেষ পর্যন্ত কি হল?'

'পেঁপে গাছগুলো সব মরে গেল।'—

নেপালবাবুর কুঠিতে প্রবেশ করিলাম। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর একটি অর্ধ-উলঙ্গ বৃদ্ধ থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে দাবার ছক। ছকের উপর কয়েকটি ঘুঁটি সাজানো রহিয়াছে, বৃদ্ধ একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আছেন। সেই যে ইংরেজী খবরের কাগজে দাবা খেলার ধাঁধা বাহির হয়, শাদা ঘুঁটি প্রথমে চাল দিবে এবং তিন চালে মাত করিবে, বোধহয় সেই জাতীয় ধাঁধার সমাধান করিতেছেন। আমরা দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন না।

নিশানাথ বাবু আমাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বুঝিলাম ইনিই বোমারু অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত।

নেপালবাবু বয়সে নিশানাথের সমসাময়িক, কিন্তু গুণ্ডার মত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে কালো, মুখের একটা পাশ পুড়িয়া ঝামার মত কর্কশ ও সচ্ছিদ্র হইয়া গিয়াছে; বোধকরি বোমা বিস্ফোরণের চিহ্ন। তাঁহার মুখখানা স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো এতটা ভয়াবহ ছিল না, কিন্তু এখন দেখিলে বুক গুরগুর করিয়া ওঠে।

নিশানাথ ডাকিলেন,—'কি হচ্ছে প্রফেসার?'

নেপালবাবু দাবার ছক হইতে চোখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখ দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলাম। চোখদুটা আকারে হাঁসের ডিমের মত এবং মণির চারিপাশে রক্ত যেন জমাট হইয়া আছে। দৃষ্টি বাঘের মত উগ্র।

তিনি হেঁড়ে গলায় বলিলেন, 'নিশানাথ! এস। সঙ্গে কারা?'

দেখিলাম নেপালবাবু আশ্রয়দাতার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা বলেন, এমনকি কণ্ঠস্বরে একটু মুরুব্বিয়ানাও প্রকাশ পায়।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। নেপালবাবু শিষ্টতার নিদর্শন স্বরূপ হাঁটু দুটির উপর কেবল একটু কাপড় টানিয়া দিলেন। নিশানাথ বলিলেন, 'এঁরা কলকাতা থেকে বাগান দেখতে এসেছেন।'

নেপালবাবুর গলায় অবজ্ঞাসূচক একটি শব্দ হইল, তিনি বলিলেন, 'বাগানে দেখবার কি আছে তোমার? আমার সার যদি লাগাতে তাহলে বটে দেখবার মত হত।'

নিশানাথ বলিলেন, 'তোমার সার লাগালে আমার বাগান মরুভূমি হয়ে যেত।'

নেপালবাবু গরম স্বরে বলিলেন, 'দেখ নিশানাথ, তুমি যা বোঝো না তা নিয়ে তর্ক কোরোনা। সয়েল কেমিস্ট্রির কী জানো তুমি? পেঁপে গাছগুলো মরে গেল তার কারণ সারের মাত্রা বেশী হয়েছিল—তোমার মালীগুলো সব উল্লুক।' বলিয়া একটা আধ-পোড়া বর্মা চুরুট তক্তপোষ হইতে তুলিয়া লইয়া বক্ত-দন্তে কামড়াইয়া ধরিলেন।

নিশানাথ বলিলেন, 'সে যাক, এখন নতুন গবেষণা কি হচ্ছে?'

নেপালবাবু চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, 'তামাক নিয়ে experiment আরম্ভ করেছি।'

'এবার কি মানুষ মারবে?'

নেপালবাবু চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন, 'মানুষ মারব! নিশানাথ, তোমার বুদ্ধিটা একেবারে সেকেলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না। বিজ্ঞানের কৌশলে বিষও অমৃত হয়, বুঝেছ?'

ঠোঁটের কোণে গোপন হাসি লইয়া নিশানাথ বলিলেন,—'তামাক থেকে যখন অমৃত বেরুবে তখন তোমাকে কিন্তু প্রথম চেখে দেখতে হবে।—এখন যাই, বেলা বাড়ছে, এঁদের বাকী বাগানটা দেখিয়ে বাড়ি ফিরব। হ্যাঁ, ভাল কথা, মুকুলের নাকি ভারি মাথা ধরেছে?'

নেপালবাবু উত্তর দিবার পূর্বে ঘনঘন চুরুট টানিয়া ঘরের বাতাস কটু করিয়া তুলিলেন, শেষে বলিলেন, 'মুকুলের মাথা! কি জানি, ধরেছে বোধহয়।' অবহেলা ভরে এই তুচ্ছ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া বলিলেন, 'অবৈজ্ঞানিক লে-ম্যান হলেও তোমাদের জানা উচিত যে নতুন ওষুধ প্রথমে ইতর প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়, যেমন ইঁদুর গিনিপিগ। তাদের ওপর যখন ফল ভাল হয় তখন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু মানুষের ওপর ফল যদি মারাত্মক হয়?'

'এমন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয় যারা মরলেও ক্ষতি নেই। অনেক অপদার্থ লোক আছে যারা ম'লেই পৃথিবীর মঙ্গল।'

'তা আছে।' অর্থপূর্ণভাবে এই কথা বলিয়া নিশানাথ দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশের বোধ হয় এত শীঘ্র যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি বুঝি ভাল দাবা খেলেন?'

এতক্ষণে নেপালবাবু ব্যোমকেশকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন, ব্যাঘ্রচক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—'আপনি জানেন দাবা খেলতে?'

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল,—'সামান্য জানি।'

নেপালবাবু ছকের উপর ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,—'আসুন তাহলে এক দান খেলা যাক।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আরে না না, এখন দাবায় বস্‌লে দু' ঘণ্টাতেও খেলা শেষ হবে না।'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দশ মিনিটেও শেষ হয়ে যেতে পারে।—আসুন।'

ব্যোমকেশ আমাদের দিকে একবার চোখের ইশারা করিয়া খেলায় বসিয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে দুজনের আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। নিশানাথ খাটো গলায় বলিলেন,—'নেপাল খেলার লোক পায় না, আজ একজনকে পাকড়েছে, সহজে ছাড়বে না।—চলুন, আমরাই ঘুরে আসি।'

বাহির হইলাম। আমরা যে-উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে ব্যোমকেশের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক নয়, রমেনবাবুর উপস্থিতিই আসল।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া পিছন দিকে জানালা খোলার শব্দে আমরা তিনজনেই পিছু ফিরিয়া চাহিলাম। বাড়ির পাশের দিকে একটা জানালা খুলিয়া গিয়াছে এবং একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে রুক্ষ উৎকণ্ঠা-ভরা চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আমরা ফিরিতেই সে দ্রুত জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

এক নজর দেখিয়া মনে হইল মেয়েটি দেখিতে ভাল; রঙ্ ফরসা, কোঁকড়া চুল, মুখের গড়ন একটু কঠিন গোছের। রমেনবাবু স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বন্ধ জানালার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বলিলেন,—'ও কে?'

নিশানাথ বলিলেন,—'মুকুল—নেপালবাবুর মেয়ে।'

রমেনবাবু গভীর নিশ্বাস টানিয়া এবার সশব্দে ত্যাগ করিলেন,—'ওকে আগে দেখেছি—সিনেমার স্টুডিওতে দেখেছি—'

নিশানাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন,—'কিন্তু ও সুনয়না নয়?'

রমেনবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন,—'না—বোধহয়—সুনয়না নয়।'

৬

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথ বাবুকে প্রশ্ন করিলাম,—'আচ্ছা, নেপালবাবুরা কতদিন হল এখানে এসেছেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'প্রায় দু' বছর। এক-আধ মাস কম হ'তে পারে।'

মনে মনে নোট করিলাম, সুনয়না প্রায় ঐ সময় কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ঠিক-ঠিক সময়টা মনে নেই?'

নিশানাথ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'দু' বছর আগে, বোধ হয় সেটা জুলাই মাস। মনে আছে, আমার স্ত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দেবার দু' তিন দিন পরেই ওরা এসেছিল।'

'আপনার স্ত্রী—লেখাপড়া—'

'আমার স্ত্রীর মাঝে লেখাপড়া আর বিলিতী আদব কায়দা শেখবার শখ হয়েছিল। মাস আষ্টেক-দশ নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করেছিলেন, একটা বিলিতী মেয়ে-স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষালো না। উনি স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসবার দু' তিন দিন পরে নেপালবাবু মুকুলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।'

সংবাদটি হজম করিয়া পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলাম,—'নেপালবাবু কলোনীর কোন্ কাজ করেন?'

নিশানাথ অম্লতিক্ত হাসিলেন,—'বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, দাবা খেলেন, আর সব কাজে আমার খুঁৎ ধরেন।'

'আপনার খুঁৎ ধরেন?'

'হ্যাঁ, আমি যে-ভাবে কলোনীর কাজ চালাই ওঁর পছন্দ হয় না। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর হাতে পরিচালনার ভার দিলে ঢের ভাল চালাতে পারেন।'

'উনি তাহলে কোনও কাজই করেন না?'

একটু নীরব থাকিয়া নিশানাথ বলিলেন, 'মুকুল খুব কাজের মেয়ে।'

মুকুল কাজের মেয়ে হইতে পারে; পিতার নৈষ্কর্ম্য সে নিজের পরিশ্রম দিয়া পুরাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা আসিব শুনিয়া তাহার মাথা ধরিল কেন? এবং জানালা দিয়া লুকাইয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিবারই বা তাৎপর্য কি?

মোড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। সামনে পিছনে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার ধারে দূরে দূরে কয়েকটি কুঠি (নক্সা পশ্য)। কুঠিগুলির ব্যবধান স্থল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের গাছ। প্রচুর জলসিঞ্চন সত্ত্বেও ফুলগাছগুলি মুহ্যমান।

মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিশানাথ পিছনের কুঠির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন,—'সব-শেষের কুঠিতে রসিক থাকে। তার এদিকের কুঠি ব্রজদাসের। ঐ যে ব্রজদাস বারান্দায় বসে কি করছে।'

তিনি সেইদিকে আগাইয়া গেলেন,—'কি হে ব্রজদাস, কি হচ্ছে?'

কুঠির বারান্দায় একটি প্রবীণ ব্যক্তি মাটিতে বসিয়া একটা হামান্ দিস্তা দুই পায়ে ধরিয়া কিছু কুটিতেছিল। বেঁটে গোলগাল লোকটি, মাথায় পাকা চুলে বাবুরি, গলায় কণ্ঠি, কপালে হরিচন্দনের তিলক। নিশানাথের গলা শুনিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন,—'একটা গরু রুলিয়েছে, তার জন্যে জোলাপ তৈরি করছি,—নিমের পাতা তিলের খোল আর এণ্ডির বিচি।'

'বেশ বেশ। যদি পারো প্রফেসর গুপ্তকে একটু খাইয়ে দিও, উপকার হবে।' বলিয়া নিশানাথ ফিরিয়া চলিলেন।

বৈষ্ণব ব্রজদাস মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দু'টি কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু নয়, বেশ সজাগ এবং সতর্ক। দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার চক্ষে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল তাহা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেন না। নিশানাথও পরিচয় দিলেন না।

ফিরিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথ বলিলেন—'ব্রজদাস চিরকাল বৈষ্ণব ছিল না। ও বৈষ্ণব হয়ে গরুবাছুরগুলোর ভারী সুখ হয়েছে। বড় যত্ন করে, গো-বদ্যির কাজও শিখেছে। গো-সেবা বৈষ্ণবের ধর্ম কিনা।'

নিশানাথবাবুর কথার মধ্যে একটু শ্লেষের ছিটা ছিল। প্রশ্ন করিলাম,—'উনি বৈষ্ণব হবার আগে কী ছিলেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'জজ-সেরেস্তার কেরানি। ওকে অনেকদিন থেকে জানি। মাইনে বেশী পেত না কিন্তু গান-বাজনা ফুর্তির দিকে ঝোঁক ছিল। সেরেস্তার কেরানিরা উপরি টাকাটা সিকেটা নিয়েই থাকে। কিন্তু ব্রজদাস একবার একটা গুরুতর দুষ্কার্য করে বসল। ঘুষ নিয়ে দপ্তর থেকে একটা জরুরী দলিল সরিয়ে ফেলল।'

'তারপর?'

'তারপর ধরা পড়ে গেল। ঘটনাচক্রে আমিই ওকে ধরে ফেললাম। আদালতে মামলা উঠল, আমাকে সাক্ষী দিতে হল। ছ' বছরের জন্যে ব্রজদাস শ্রীঘর গেল। ইতিমধ্যে আমি চাকরি ছেড়ে কলোনী নিয়ে পড়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে ব্রজদাস সটান এখানে এসে উপস্থিত। দেখলাম, একেবারে বদলে গেছে; জেলের লাপ্‌সি খেয়ে খাঁটি বৈষ্ণব হয়ে উঠেছে। আমি সাক্ষী দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিলাম সেজন্যে আমার ওপর রাগ নেই বরং কৃতজ্ঞতায় গদগদ। সেই থেকে আছে।'

বলিলাম,—'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।'

নিশানাথ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'ঠিক তাও নয়। ওর মনের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছি না। তবে লক্ষ্য করেছি ও মিথ্যে কথা বলে না।'

কথা বলিতে বলিতে আমরা আর একটা কুঠির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, শুনিতে পাইলাম কুঠির ভিতর হইতে মৃদু সেতারের আওয়াজ আসিতেছে। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে নিশানাথ বলিলেন,—'ডাক্তার ভুজঙ্গধর। ওর সেতারের শখ আছে।'

রমেনবাবু একাগ্র মনে শুনিয়া বলিলেন,—'খাসা হাত। গৌড়-সারঙ্ বাজাচ্ছেন।'

ডাক্তার ভুজঙ্গধর বোধহয় জানালা দিয়া আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেতারের বাজনা থামিয়া গেল। তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—'একি মিস্টার সেন, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কেন? রোদ লাগিয়ে ব্লাড্ প্রেশার বাড়াতে চান?'

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দৃঢ় শরীর, ধারালো মুখ। মুখের ভাব একটু ব্যঙ্গ-বঙ্কিম; যেন বুদ্ধির ধার সিধা পথে যাইতে না পাইয়া বিদ্রূপের বাঁকা পথ ধরিয়াছে।

নিশানাথ বলিলেন,—'এঁদের বাগান দেখাচ্ছি।'

ডাক্তার বলিলেন,—'বাগান দেখাবার এই সময় বটে। তিনজনেরই সর্দিগর্মি হবে। তখন হ্যাপা সামলাতে হবে এই নাম-কাটা ডাক্তারকে।'

'না, আমরা এখনি ফিরব। কেবল বনলক্ষ্মীকে একবার দেখে যাব।'

ডাক্তার বাঁকা হাসিয়া বলিলেন,—'কেন বলুন দেখি? বনলক্ষ্মী বুঝি আপনার বাগানের একটি দর্শনীয় বস্তু, তাই এঁদের দেখাতে চান?'

নিশানাথ সংক্ষেপে বলিলেন,—'সেজন্যে নয়, অন্য দরকার আছে।'

'ও—তাই বলুন—তা ওকে ওর ঘরেই পাবেন বোধহয়। এত রোদ্দুরে সে বেরুবে না, ননীর অঙ্গ গলে যেতে পারে।'

'ডাক্তার, তুমি বনলক্ষ্মীকে দেখতে পার না কেন বল দেখি?'

ডাক্তার একটু জোর করিয়া হাসিলেন,—'আপনারা সকলেই তাকে দেখতে পারেন, আমি দেখতে না পারলেও তার ক্ষতি নেই। —সে যাক, আপনার আবার রক্ত-দান করবার সময় হল। আজ বিকেলে আসব নাকি ইন্‌জেকশনের পিচ্‌কিরি নিয়ে?'

'এখনো দরকার বোধ করছি না।' বলিয়া নিশানাথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

৭

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রক্তদানের কথা কি বললেন ডাক্তার?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ব্লাড-প্রেশারের জন্যে আমি ওষুধ-বিষুধ বিশেষ খাই না, চাপ বাড়লে ডাক্তার এসে সিরিঞ্জ দিয়ে খানিকটা রক্ত বার করে দেয়। সেই কথা বলছিল। প্রায় মাসখানেক রক্ত বার করা হয়নি।'

এই সময় ব্যোমকেশ পিছন হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। নিশানাথ অবাক হইয়া বলিলেন,—'এ কি! এরি মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল?'

ব্যোমকেশের মুখ বিমর্ষ। সে বলিল,—'নেপালবাবু লোকটি অতি ধূর্ত এবং ধড়িবাজ।'

'কী হয়েছে?'

'কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করছে কিছু বুঝতেই দিলে না। তারপর যখন বুঝলাম তখন আর উপায় নেই। মাত হয়ে গেলাম।'

আমরা হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসি নয়। নেপালবাবুকে দেখে মনে হয় হোৎকা, কিন্তু আসলে একটি বিচ্ছু।'

আমরা আবার হাসিলাম। ব্যোমকেশ তখন এই অরুচিকর প্রসঙ্গ পাল্টাইবার জন্য বলিল,—'পিছনের কুঠি'র বারান্দায় যাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম উনি কে?'

'উনি ভূতপূর্ব ডাক্তার ভুজঙ্গধর দাস।'

'উনি এখানে কদ্দিন আছেন?'

'প্রায় বছর চারেক হতে চলল।'

'বরাবর এইখানেই আছেন?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য ডুব মারেন, আবার ফিরে আসেন।'

'কোথায় যান?'

'তা জানি না। কখনও জিগ্যেস করিনি, উনিও বলেন নি।'

এতক্ষণে আমরা বনলক্ষ্মীর কুঠি'র সামনে উপস্থিত হইলাম। ইহার পর কলোনীর সম্মুখভাগে কেবল একটি কুঠি, সেটি বিজয়ের (নক্সা পশ্য)। আমাদের উদ্যান পরিক্রমা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

নিশানাথবাবু বারান্দার দিকে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিতেছে; তাহার বাম বাহুর উপর কোঁচানো শাড়ি এবং গামছা, মাথার চুল খোলা। সহসা আমাদের দেখিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইল এবং ডান কাঁধের উপর কাপড় টানিয়া দিল। দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সে স্নান করিতে যাইতেছে।

নিশানাথবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া সেই কথাই বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী, তুমি স্নান করতে যাচ্ছ। আজ এত দেরি যে?'

বনলক্ষ্মী মুখ নিচু করিয়া বলিল,—'অনেক সেলাই বাকি পড়ে গিছল জ্যেঠা-মশাই। আজ সব শেষ করলুম।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী হচ্ছে আমাদের দর্জিখানার পরিচালিকা, কলোনীর সব কাপড়-জামা ওই সেলাই করে। —আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি বনলক্ষ্মী। তোমাকে শুধু বলতে এসেছিলাম, মুকুলের মাথা ধরেছে সে রাঁধতে পারবে না, দময়ন্তী একা রান্না নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তুমি সাহায্য করলে ভাল হত।'

'ওমা, এতক্ষণ জানতে পারিনি!' বনলক্ষ্মী কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুত আমাদের সামনে দিয়া বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বনলক্ষ্মী চলিয়া গেল কিন্তু আমার মনে একটি রেশ রাখিয়া গেল। পল্লীগ্রামের শীতল তরুচ্ছায়া, পুকুরঘাটের টলমল জল —তাহাকে দেখিলে এই সব মনে পড়িয়া যায়। সে রূপসী নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে; মুখখানিতে একটি কাঁচ স্নিগ্ধতা আছে। বয়স উনিশ-কুড়ি, নিটোল স্বাস্থ্য-মসৃণ দেহ, কিন্তু দেহে যৌবনের উগ্রতা নাই। নিতান্ত ঘরোয়া আটপৌরে গৃহস্থঘরের মেয়ে।

বনলক্ষ্মী দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ বলিল,—'রমেনবাবু, কি বলেন?'

রমেনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'মিছে আপনাদের কষ্ট দিলাম। আমারই ভুল, সুনয়না এখানে নেই।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এখানে আর কোনও মহিলা নেই?'

'না। চলুন এবার ফেরা যাক। খাবার তৈরি হতে এখনও বোধহয় দেরি আছে। তৈরি হলেই দময়ন্তী খবর পাঠাবে।'

সিধা পথে নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া পাখার তলায় বসিলাম। রমেনবাবু হঠাৎ বলিলেন,—'আচ্ছা, নেত্যকালী—মানে সুনয়না যে এখানে আছে এ সন্দেহ আপনার হ'ল কি করে? কেউ কি আপনাকে খবর দিয়েছিল?'

নিশানাথ শুষ্কস্বরে বলিলেন,—'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। It is not

my secret. অন্য কিছু জানতে চান তো বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা অবান্তর প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না। কেউ কি আপনাকে blackmail করছে?'

নিশানাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'না।'

তারপর সাধারণ গল্পগুজবে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পেটের মধ্যে একটু ক্ষুধার কামড় অনুভব করিতেছি এমন সময় ভিতর দিকের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বনলক্ষ্মী। স্নানের পর বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, পিঠে ভিজা চুল ছড়ানো। বলিল,—'জ্যেঠামশাই, খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিশানাথ উঠিয়া বলিলেন,—'কোথায়?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'এই পাশের ঘরে। আপনারা আবার কষ্ট করে অতদূর যাবেন, তাই আমরা খাবার এখানে নিয়ে এসেছি।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'চলুন। ওরাই যখন কষ্ট করেছে তখন আমাদের আর কষ্ট করতে হ'ল না।—কিন্তু আর সকলের কি ব্যবস্থা হবে?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'গোঁসাইদাদা রান্নাঘরের ভার নিয়েছেন।—আসুন।'

পাশের ঘরে টেবিলের উপর আহারের আয়োজন। তবে ছুরি-কাঁটা নাই, শুধু চামচ। আমরা বসিয়া গেলাম। রান্নার পদ অনেকগুলি : ঘি-ভাত, সোনামুগের ডাল, ইঁচড়ের ডালনা, চিংড়িমাছের কাটলেট, কাঁচা আমের ঝোল, পায়স ও ছানার বরফি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। দময়ন্তী দেবী ও বনলক্ষ্মীর নিপুণ পরিচর্যায় ভোজনপর্ব পরম পরিতৃপ্তির সহিত সম্পন্ন হইল। লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবী অতি সুদক্ষা গৃহিনী, তাঁহার চোখের ইঙ্গিতে বনলক্ষ্মী যন্ত্রের মত কাজ করিয়া গেল।

আহারান্তে আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। পান ও সিগারেট লইয়া বনলক্ষ্মী আসিল, টেবিলের উপর রাখিয়া আমাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কৌতূহলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

'তোমরা এবার খেয়ে নাও' বলিয়া নিশানাথও ভিতরে গেলেন।

বনলক্ষ্মীকে এতক্ষণ দেখিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যেন একটা ধারণা করিতে পারিয়াছি। সে স্বভাবতই মুক্ত-প্রাণ extrovert প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে চাপিয়া রাখিয়াছে, দমন করিয়া রাখিয়াছে, কাহারও কাছে আপন প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিতেছে না।

কিছুকাল ধরিয়া ধূমপান চলিল। নিশানাথ ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—'আপনাদের ফিরে যাবার তাড়া নেই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাড়া থাকলেও অসমর্থ। মিসেস সেন যে-রকম খাইয়েছেন, নড়বার ক্ষমতা নেই। আপনি কি বলেন, রমেনবাবু?'

রমেনবাবু একটি উদ্গার তুলিয়া বলিলেন,—'খাওয়ার পর নড়াচড়া আমার গুরুর বারণ।'

নিশানাথ হাসিলেন,—'তবে আসুন, ও-ঘরে বিছানা পাতিয়ে রেখেছি, একটু গড়িয়ে নিন।'

একটি বড় ঘর। তাহার মেঝেয় তিন-জনের উপযোগী বিছানা পাতা হইয়াছে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি একানে খাট; খাটের পাশে টুলের উপর টেবিল-ফ্যান। অনুমান করিলাম নিশানাথবাবুর এটি শয়ন-কক্ষ। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ, তাই ঘরটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। আমরা বিছানায় বসিলাম। নিশানাথবাবু টেবিল-ফ্যানটি মেঝেয় নামাইয়া চালাইয়া দিলেন। বলিলেন,—'এ ঘরের সীলিং ফ্যানটা সারাতে দিয়েছি তাই টেবিল-ফ্যান চালাতে হচ্ছে। কষ্ট হবে না তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'দিনের বেলা শোয়া আমার অভ্যাস নেই—'

'তাহলে বসুন, খানিক গল্প করা যাক।'

নিশানাথ বসিলেন। রমেনবাবু কিন্তু পাঞ্জাবি খুলিয়া লম্বা হইলেন। গুরুভক্ত লোক, গুরুর আদেশ অমান্য করেন না। আমরা তিনজনে বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'বনলক্ষ্মী কি চলে গেছে?'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ, এই গেল। কেন বলুন দেখি?'

'ওর ইতিহাস শুনতে চাই। ও যখন গোলাপ কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে তখন ওর নিশ্চয় কোনও দাগ আছে।'

'তা আছে। ইতিহাস খুবই সাধারণ। ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এক লম্পট ওকে ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে, তারপর কিছুদিন পরে ফেলে পালায়। গাঁয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই, কলকাতায় খেতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে।'

'কতদিন আছে?'

'বছর দেড়েক।'

'ওর গল্প সত্যি কিনা যাচাই করে-ছিলেন?'

'না। ও নিজের গ্রামের নাম কিছুতেই বলল না।'

'হুঁ। গোলাপ কলোনীর সন্ধান ও পেল কি করে? এটা তো সরকারী অনাথ আশ্রম নয়।'

নিশানাথ একটু মুখ গম্ভীর করিলেন, বলিলেন,—'ও নিজে আসেনি, বিজয় একদিন ওকে নিয়ে এল। কলকাতায় হগ্ মার্কেটের কাছে একটা রেস্তোরাঁ আছে, বিজয় রোজ বিকেলে সেখানে চা খায়। একদিন দেখল একটি মেয়ে কোণের টেবিলে একলা বসে বসে কাঁদছে। বনলক্ষ্মীর তখন হাতে একটি পয়সা নেই, দু'দিন খেতে পায়নি, স্রেফ চা খেয়ে আছে। ওর কাহিনী শুনে বিজয় ওকে নিয়ে এল।'

'ওর চাল-চলন আপনার কেমন মনে হয়?'

'ওর কোনও দোষ আমি কখনও দেখিনি। যদি ওর পদস্খলন হয়ে থাকে সে ওর চরিত্রের দোষ নয়, অদৃষ্টের দোষ।' এই বলিয়া নিশানাথ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন। 'এবার বিশ্রাম করুন' বলিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার এই হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া কেমন যেন বেখাপ্পা লাগিল। পাছে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে আরও কিছু বলিতে হয় তাই কি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন?

আমরা শয়ন করিলাম। মাথার কাছে গুঞ্জনধ্বনি করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। পাশে রমেনবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নাক ডাকিতেছে না, চুপি চুপি জল্পনা করিতেছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই একটি চটক-দম্পতী কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছাদের একটি লোহার আংটায় বাসা বাঁধিতেছে। চোরের মত কুটা মুখে করিয়া আসিতেছে, কুটা রাখিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পাখার মৃদু শব্দ হইতেছে—ফরুর্ ফরুর্—

চিৎ হইয়া শুইয়া তাহাদের নিভৃত গৃহ-নির্মাণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিয়া আসিল।

৮

বৈকালে আবার বাহিরের ঘরে সমবেত হইলাম। দময়ন্তী দেবী চায়ের বদলে শীতল ঘোলের সরবৎ পরিবেশন করিয়া গেলেন। নিশানাথ বলিলেন, 'রোদ একটু পড়ুক, তারপর বেরুবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় মুস্কিল গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যায় সেই গাড়িতে গেলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাবেন।'

সরবৎ পান করিতে করিতে আর এক দফা কলোনীর অধিবাসিবৃন্দের সহিত দেখা হইয়া গেল। প্রথমে আসিলেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত, সঙ্গে কন্যা মুকুল। মুকুল অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, নিশানাথ

'বাবা! কি করছ তুমি!...'

জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এবেলা তোমার মাথা কেমন?'

মুকুল ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া বলিল,—'সেরে গেছে'—বলিয়া যেন একটু সন্ত্রস্ত-ভাবে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, একটু খস্‌খসে; সর্দি-কাশিতে স্বরযন্ত্র বিপন্ন হইলে যেমন আওয়াজ বাহির হয় অনেকটা সেই রকম।

এবেলা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে যদি এত বেশী প্রসাধন না করিত তাহা হইলে বোধহয় তাহাকে আরও ভাল দেখাইত। কিন্তু মুখে পাউডার ও ঠোঁটে রক্তের মত লাল রঙ্ লাগাইয়া সে যেন তাহার সহজ লাবণ্যকে ঢাকা দিয়াছে। তার উপর চোখের দৃষ্টিতে একটা শুষ্ক কঠিনতা। অল্প বয়সে বার-বার আঘাত পাইয়া যাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের চোখেমুখে এইরূপ অকাল-কঠিনতা বোধহয় স্বাভাবিক।

এদিকে নেপালবাবুও যেন জাপানী মুখোশ দিয়া মুখের অর্ধেকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে কুটিল কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'কী, এবেলা আর এক দান হবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ্ করবেন।'

নেপালবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—'ভয় কি? না হয় আবার মাত হবেন। ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেললে খেলা শিখতে পারবেন। কথায় বলে, লিখতে লিখতে সরে, আর—'

ভাগ্যক্রমে প্রবাদবাক্য শেষ হইতে পাইল না, বৈষ্ণব ব্রজদাসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নেপালবাবু তাঁহার দিকে ফিরিলেন,—'কি হে ব্রজদাস, তুমি নাকি গরুকে ওষুধ খাওয়াতে আরম্ভ করেছ? গো-চিকিৎসার কী জান তুমি?'

ব্রজদাস মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে—'

'বোষ্টম হয়ে গো-হত্যা করতে চাও! নিশানাথ, তোমারই বা কেমন আক্কেল? হাজার বার বলেছি একটা গো-বদ্যি জোগাড় কর, তা নয়, দুটো হেতুড়ের হাতে গরু-গুলোকে ছেড়ে দিয়েছ।'

নিশানাথবাবু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিলাম, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

নেপালবাবু বলিলেন,—'যার কর্ম তারে সাজে। আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে দু'দিনে গরুগুলোর চেহারা ফিরিয়ে দেব। আমি শুধু কেমিস্ট্ নই, বায়ো-কেমিস্ট্, বুঝলে? চল বোষ্টম, তোমার গরু দেখি।'

ব্রজদাস কাতর চক্ষে নিশানাথের পানে চাহিলেন। নিশানাথ এবার একটু কড়া সুরে বলিলেন,—'নেপাল, গরু যত ইচ্ছে দেখ, কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে যেও না।'

নেপালবাবু অধীর উপেক্ষাভরে বলিলেন,—'তুমি কিছু বোঝো না, কেবল সর্দারি কর। আমি গরুর চিকিৎসা করব। দেখিয়ে দেব—'

ছুরির মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিশানাথ বলিলেন,—'নেপাল, আমার হুকুম ডিঙিয়ে যদি এ কাজ কর, তোমাকে কলোনী ছাড়তে হবে।'

নেপালবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার হাঁসের ডিমের মত চোখ হইতে রক্ত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'আমাকে অপমান করছ, তুমি—আমাকে? এত বড় সাহস! ভেবেছ আমি কিছু জানি না?—ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি!'

নিশানাথ শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরা ফুলিয়া দপ্-দপ্ করিতেছে। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'নেপাল, তুমি যাও—এই দণ্ডে এখান থেকে বিদেয় হও—'

নেপালবাবু হিংস্র মুখবিকৃতি করিয়া আবার গর্জন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর দিক হইতে মুকুল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। 'বাবা! কি করছ তুমি! চল, এক্ষুনি চল'—বলিয়া নেপালবাবুকে টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুলের ধমক খাইয়া নেপাল-বাবু নির্বিবাদে তাহার সঙ্গে গেলেন।

পরিণতবয়স্ক দুই ভদ্রলোকের মধ্যে সামান্য সূত্রে এই উগ্র কলহ, আমরা যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। এতক্ষণে লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস বেগতিক দেখিয়া নিঃসাড়ে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং ডাক্তার ভুজঙ্গধর কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। নিশানাথবাবু শিথিল দেহে বসিয়া পড়িলে তিনি সশব্দে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিত ভাবে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া নিশানাথের পাশের চেয়ারে

হাসিলেন। বলিলেন,—'বেশী উত্তেজনা আপনার শরীরের পক্ষে ভাল নয় মিঃ সেন। যদি মাথার একটা ছোট্ট শিরা জখম হয় তাহলে নেপাল গুপ্তর কোনও ক্ষতি নেই—কিন্তু—। দেখি আপনার নাড়ী।'

নিশানাথ বলিলেন,—'দরকার নেই, আমি ঠিক আছি।'

ডাক্তার আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন, একে একে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'এ'দের সকালে দেখেছি, কিন্তু পরিচয় হয়নি।'

নিশানাথ বলিলেন,—'এ'রা বাগান দেখতে এসেছেন।'

ডাক্তার মুখের একপাশে বাঁকা হাসিলেন,—'তা মোটর রহস্যের কোনও কিনারা হল?'

আমরা চমকিয়া চাহিলাম। নিশানাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'ওঁরা কি জন্যে এসেছেন তুমি জানো?'

'জানি না। কিন্তু আন্দাজ করা কি এতই শক্ত? এই কাঠ-ফাটা গরমে কেউ বাগান দেখতে আসে না। তবে অন্য কী উদ্দেশ্যে আসতে পারে? কলোনীতে সম্প্রতি একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটছে। অতএব দুই আর দুয়ে চার।' বলিয়া ব্যোমকেশের দিকে সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু। কেমন, ঠিক ধরেছি কিনা?'

ব্যোমকেশ অলস কণ্ঠে বলিল,—'ঠিকই ধরেছেন। এখন আপনাকে যদি দু'একটা প্রশ্ন করি উত্তর দেবেন কি?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু আমার কেচ্ছা আপনি বোধহয় সবই শুনেছেন।'

'সব শুনিনি।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

ব্যোমকেশ সরবতের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়া বলিল,—'আপনি বিবাহিত?'

ডাক্তার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি অবাক হইয়া চাহিলেন। তারপর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, বিবাহিত।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'বিলেতে।'

'বিলেতে?'

ডাক্তার তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস হাসিমুখে প্রকাশ করিলেন,—'ডাক্তারি পড়া উপলক্ষে তিন বছর বিলেতে ছিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু তিনি বেশী দিন কালা আদমিকে সহ্য করতে পারলেন না, একদিন আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমিও দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলাম। তারপর থেকে আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।'

টেবিলের উপর হইতে সিগারেটের টিন লইয়া তিনি নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাইলেন। তাঁহার কথার ভাব-ভঙ্গীতে একটা মার্জিত নির্লজ্জতা আছে, যাহা একসঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটা প্রশ্ন করব।—যে অপরাধের জন্যে আপনার ডাক্তারির লাইসেন্স খারিজ করা হয়েছিল সে অপরাধটা কি?'

ডাক্তার স্মিতমুখে ধোঁয়ার একটি সুদর্শনচক্র ছাড়িয়া বলিলেন,—'একটি কুমারীকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।'

৯

মুস্কিল মিঞার ভ্যানে চড়িয়া আমরা স্টেশন যাত্রা করিলাম। নিশানাথবাবু ম্রিয়মানভাবে আমাদের বিদায় দিলেন। নেপাল গুপ্তর সঙ্গে ওই ব্যাপার ঘটিয়া যাওয়ার পর তিনি যেন কচ্ছপের মত নিজেকে সংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ডাক্তার ভুজঙ্গধর আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'চলুন, খানিক-দূর আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার বলিলেন,—'ব্যোমকেশ বাবু, আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, কিন্তু আমার গোড়ার প্রশ্নের জবাব আপনি দিলেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোন্ প্রশ্ন?'

'মোটর রহস্যের কিনারা হল কি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না। কিছুই ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার কোনও ধারণা আছে না কি?'

'ধারণা একটা আছে বৈ কি। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না। আমার ধারণা যদি ভুল হয়, মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হবে।'

'তবু বলুন না শুনি।'

'আমার বিশ্বাস এ ওই ন্যাপ্‌লা বুড়োর কাজ। ও নিশানাথবাবুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বাইরে যেমন দাম্ভিক, ভেতরে তেমনি প্যাঁচালো।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুকে ভয় দেখিয়ে ওঁর লাভ কি?'

'তবে বলি শুনুন। নেপালবাবুর ইচ্ছে উনিই গোলাপ কলোনীর হর্তাকর্তা হয়ে বসেন। কিন্তু নিশানাথবাবু তা দেবেন কেন? তাই উনি নিশানাথবাবুর বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ লাগিয়েছেন, যাকে বলে war of nerves. নিশানাথবাবুর একে রক্তের চাপ বেশী, তার ওপর যদি স্নায়ু-পীড়ায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েন, তখন নেপালবাবুই কর্তা হবেন।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুর স্ত্রী রয়েছেন, ভাইপো রয়েছেন। তাঁরা থাকতে নেপাল-বাবু কর্তা হবেন কি করে?'

'অসম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু—অসম্ভব নয়।'

'কেন?'

'মিসেস সেন নেপালবাবুকে ভারী ভক্তি করেন।'

কথাটা ভুজঙ্গধরবাবু এমন একটু শ্লেষ দিয়া বলিলেন যে, ব্যোমকেশ চট্ করিয়া বলিল,—'তাই নাকি! ভক্তির কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

ভুজঙ্গধরবাবু একপেশে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি বুদ্ধিমান লোক, আমিও একেবারে নির্বোধ নই; বেশী কথা বাড়িয়ে লাভ কি? হয়তো আমার ধারণা আগাগোড়াই ভুল। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন, আমার যা ধারণা আমি বললাম। এর বেশী বলা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।—আচ্ছা, এবার আমি ফিরব। ওরে মুস্কিল, তোর পক্ষিরাজ একবার থামা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা কথা। মুকুলও কি বাপের দলে?'

ডাক্তার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে মুকুলেরও স্বার্থ আছে।'

গাড়ি থামিয়াছিল, ডাক্তার নামিয়া পড়িলেন। মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, নমস্কার। আবার দেখা হবে নিশ্চয়।' বলিয়া পিছন ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের গাড়ি আবার অগ্রসর হইল। ব্যোমকেশ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের আচরণ একটু রহস্যময়। তিনি নেপালবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু মুকুল বা দময়ন্তী দেবী সম্বন্ধে প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন কেন? ...কী উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে এত-দূর আসিয়াছিলেন?...তাঁহার থিওরি কি সত্য? নেপালবাবু মোটরের টুক্‌রা উপহার দিতেছেন?...সুনয়না তো এখানে নাই। কিম্বা আছে, রমেনবাবু চিনিতে পারেন নাই।...মোটরের টুক্‌রা উপহারের সহিত সুনয়নার অজ্ঞাতবাসের কি কোনও সম্বন্ধ আছে?—

স্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিতে গিয়া জানা গেল ট্রেন আগের স্টেশনে আটকাইয়া গিয়াছে, কতক্ষণে আসিবে ঠিক নাই। ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া ভ্যানের পা-দানে বসিল, নিজে একটি সিগারেট ধরাইল এবং মুস্কিল মিঞাকে একটি সিগারেট দিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

'কদ্দিন হল বিয়া করেছ মিঞা?'

মুস্কিল সিগারেটটিকে গাঁজার কলিকার মত ধরিয়া তাহাতে এক টান দিয়া বলিল, 'কোন্ বিয়া?'

'তুমি কি অনেকগুলি বিয়ে করেছ নাকি?'

'অনেকগুলি আর কৈ কর্তা। ক্যাবল দুইটি।'

'তা শেষেরটিকে কবে বিয়ে করলে?'

'দ্যাড় বছর হৈল।'

'কোথায় বিয়ে করলে? দ্যাশে?'

'কলকত্তায় বিয়া করছি কর্তা। গফুর শেখ চামড়াওয়ালা—কানপুরের লোক, কলকত্তায় জুতার দোকান আছে—তার বিবির বুন হয়।'

'তবে তো বড় ঘরে বিয়ে করেছ।'

'হ। কিন্তু মুস্কিল হৈছে, উয়ারা সব পাচ্ছিমা খোট্টা—বাংলা বুঝে না। অনেক কষ্টে নজর জানেরে বাংলায় তালিম দিয়া লইছি।'

'বেশ বেশ। তা তোমার আগের বৌটি মারা গেছে বুঝি?'

'মারা আর গেল কৈ? বাঁজা মনিষ্যি ছিল, মানুষটা মন্দ ছিল না। কিন্তু নতুন বৌটারে যখন ঘরে আনলাম, কর্তাবাবু কইলেন, দুটা বৌ লৈয়া কলোনীতে থাকা চলব না। কি করা! দিলাম পুরান বৌটারে তালাক দিয়া।'

এই সময় হুড়মুড় শব্দে ট্রেন আসিয়া পড়িল। মুস্কিল মিঞার সহিত রসালাপ অসমাপ্ত রাখিয়া আমরা ট্রেন ধরিলাম।

ট্রেনে উঠিয়া ব্যোমকেশ আর কথা বলিল না, অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু রমেনবাবু, গাড়ি যতই কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমরা দুজনে নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। একবার সুনয়নার কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আদালতে হলফ্ নিয়ে যদি বলতে হয়, তাহলে বলব সুনয়না ওখানে নেই। কিন্তু তবু মনের খুঁৎখুঁতুনি যাচ্ছে না।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু সুনয়না ছদ্মবেশে ওখানে আছে এটাই বা কি করে হয়? রাতদিন মেক্-আপ্ করে থাকা কি সম্ভব?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'সুনয়না ছদ্মবেশে কলোনীতে আছে একথা আমিও বলছি না। ওখানে স্বাভাবিক বেশেই আছে। কিন্তু সে ছদ্মবেশ ধারণ করে সিনেমা করতে গিয়েছিল, আমি তাকে ছদ্মবেশে দেখেছি, এটা তো সম্ভব?'

এই সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'ঝড় আসছে!'

উৎসুকভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম। কিন্তু কোথায় ঝড়। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখি সে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। বলিলাম,—'ঝড়ের স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

সে চোখ খুলিয়া বলিল,—'এ ঝড় সে ঝড় নয়—গোলাপ কলোনীতে ঝড় আসছে। অনেক উত্তাপ জমা হয়েছে, এবার একটা কিছু ঘটবে।'

'কি ঘটবে?'

'তা যদি জানতাম তাহলে তার প্রতিকার করতে পারতাম।' বলিয়া সে আবার চোখ বুজিল।

শিয়ালদা স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। রমেনবাবুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। সুনয়নার দুটো স্টিল-ফটো জোগাড় করতে হবে। একটা কমলমণির ভূমিকায়, একটা শ্যামা-ঝি'র।'

রমেনবাবু বলিলেন, 'কালই পাবেন।'

১০

পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠ শেষ হইলে ব্যোমকেশ নিজের ভাগের কাগজ সযত্নে পাট করিতে করিতে বলিল,—'কাল চারটি স্ত্রীলোককে আমরা দেখেছি। তার মধ্যে কোন্‌টিকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে হয়?'

স্ত্রীলোকের রূপ লইয়া আলোচনা করা ব্যোমকেশের স্বভাব নয়; কিন্তু হয়তো তাহার কোনও উদ্দেশ্য আছে, তাই বলিলাম,—'দময়ন্তী দেবীকেই সবচেয়ে সুন্দরী বলতে হয়—'

'কিন্তু—'

চকিত হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু কি?'

'তোমার মনে কিন্তু আছে।' ব্যোমকেশ সহসা আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল,—'কাল রাত্রে কাকে স্বপ্ন দেখেছ?'

এবার সত্যই ঘাবড়াইয়া গেলাম,—'স্বপ্ন! কৈ না—'

'মিছে কথা বোলো না। কাকে স্বপ্ন দেখেছ?'

তখন বলিতে হইল। স্বপ্ন দেখার উপর যদিও কাহারও হাত নাই, তবু লজ্জিতভাবেই বলিলাম,—'বনলক্ষ্মীকে।'

'কি স্বপ্ন দেখলে?'

'দেখলাম, সে যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে, আর হাসছে।—কিন্তু একটা আশ্চর্য দেখলাম, তার দাঁতগুলো যেন ঠিক তার দাঁতের মত নয়। যতদূর মনে পড়ে তার সত্যিকারের দাঁত বেশ পাটি-মেলানো। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম, কেমন যেন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—'

ব্যোমকেশ অবাক হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'তোমার স্বপ্নেও দাঁত আছে!'

'তার মানে? তুমিও স্বপ্ন দেখেছ নাকি? কাকে?'

সে হাসিয়া বলিল,—'সত্যবতীকে। কিন্তু তার দাঁত নিজের মত নয়, অন্যরকম। তাকে জিগ্যেস করলাম, তোমার দাঁত অমন কেন? সত্যবতী জোরে হেসে উঠল, আর তার দাঁতগুলো ঝর্ ঝর্ করে পড়ে গেল।'

আমিও জোরে হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম,—'এসব মনঃসমীক্ষণের ব্যাপার। চল, গিরীন্দ্রশেখর বসুকে ধরা যাক, তিনি হয়তো স্বপ্নমঙ্গলের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

এই সময় দ্বারের কড়া নড়িল।

ব্যোমকেশ দ্বার খুলিয়া দিলে ঘরে প্রবেশ করিল বিজয়। ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আমি নিশানাথবাবুর ভাইপো—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পরিচয় দিতে হবে না, বিজয়বাবু, কাল আপনাকে দেখেছি। তা কি খবর?'

বিজয় বলিল,—'কাকা চিঠি দিয়েছেন। আমাকে বললেন চিঠিখানা পৌঁছে দিতে।'

সে পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিল। বিজয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহার মন খুব স্বস্থ নয়। সে রুমাল দিয়া গলার ঘাম মুছিল, একটা কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইল।

ব্যোমকেশ চিঠি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'বসুন।'

বিজয় ক্ষণকাল ন যযৌ হইয়া রহিল, তারপর চেয়ারে বসিল। অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল, 'কাল আমিও আপনাকে দেখেছিলাম, কিন্তু তখন পরিচয় জানতাম না—'

'পরিচয় কার কাছে জানলেন?'

'কাল সন্ধ্যের পর কলোনীতে ফিরে গিয়ে জানতে পারলাম। কাকা আপনাকে কোনও দরকারে ডেকেছিলেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'একথা আপনার কাকাকে জিগ্যেস করলেন না কেন?'

বিজয়ের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'কাকা সব কথা আমাদের বলেন না। তবে ঐ মোটরের টুকরো নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাই বোধহয়—'

'মোটরের টুকরো সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'আমার তো মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষি। মাইল খানেক দূরে গ্রাম আছে, গ্রামের ছোঁড়ারা প্রায়ই ঐ মোটরগুলোর মধ্যে এসে খেলা করে। আমার বিশ্বাস তারাই বজ্জাতি করে মোটরের টুকরো কলোনীতে ফেলে যায়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, আচ্ছা ওকথা যাক। প্রফেসার নেপাল গুপ্তর খবর কি?'

বিজয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে বলিল, 'কাল ফিরে গিয়ে শুনলাম নেপালবাবু

কাকাকে অপমান করেছে। কাকা তাই হ্য করলেন, আমি থাকলে—'

'নেপালবাবু কলোনীতে আছেন এখনও?'

বিজয় অন্ধকার মুখে বলিল,—'হ্যাঁ। মুকুল এসে কাকিমার হাতে পায়ে ধরেছে। কাকিমা ভাল মানুষ, গলে গেছেন, কাকাকে গিয়ে বলেছেন। কাকা কাকিমার কথা ঠেলতে পারেন না—'

'তাহলে নেপালবাবু রয়ে গেলেন। লোকটি

পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিল

ভাল নয়, গেলেই বোধহয় ভাল হত। আচ্ছা বলুন দেখি, ওঁর মেয়েটি কেমন?'

বিজয় থমকিয়া গেল। একবার বিস্ফারিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, 'মুকুল! বাপের মত নয়—ভালই —তবে—। আচ্ছা আজ উঠি, দেরি হয়ে গেল —দোকানে যেতে হবে। নমস্কার।'

বিজয় ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'বিজয় সুনয়নার ব্যাপার বোধ হয় জানে না। কিন্তু মুকুলের কথায় অমন ভড়কে পালাল কেন?'

আমি বলিলাম, 'কাল ডাক্তার ভুজঙ্গধরও মুকুল সম্বন্ধে খোলসা কথা বললেন না—'

'হুঁ। এখন নিশানাথবাবু কি লিখেছেন দেখা যাক। কিন্তু তিনি চিঠি লিখলেন কেন? টেলিফোন করলেই পারতেন।'

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশের মুখের ভাব ফ্যাল্‌ফেলে হইয়া গেল। সে বলিল, 'ও—এই জন্য চিঠি?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি লিখেছেন নিশানাথবাবু?'

'পড়ে দেখ' বলিয়া সে আমার হাতে চিঠি দিল।

ইংরেজী চিঠি, মাত্র কয়েক ছত্র—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে যে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম সে কার্যে আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনাকে যে টাকা দিয়াছি আপনার পারিশ্রমিক রূপে আশা করি তাহাই যথেষ্ট হইবে। ইতি

ভবদীয় নিশানাথ সেন।

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া নিরাশ কণ্ঠে বলিলাম, 'নিশানাথবাবু হঠাৎ মত বদলালেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাছে এই প্রশ্ন তুলি তাই তিনি টেলিফোন করেন নি, চিঠিতে সব চুকিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু কেন?'

'বোধহয় তাঁর ভয় হয়েছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। নিশানাথবাবুর জীবনে একটা গুপ্ত রহস্য আছে। শুনলে না, কাল রাগের মাথায় নেপাল গুপ্ত বললেন— ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি?'

'তাহলে নেপালবাবু ওঁর গুপ্ত রহস্য জানেন?'

'জানেন বলেই মনে হয়। এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয় দেখিয়ে ওঁকে blackmail করছেন।'

'কিন্তু—কাল নিশানাথবাবু তো বেশ জোর দিয়েই বললেন, কেউ তাঁকে blackmail করছে না।'

'হুঁ—' বলিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল এবং ধূমপান করিতে করিতে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সকাল বেলাটা মন খারাপের মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। একটা বিচিত্র রহস্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, অনেকগুলো বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটা নাটকীয় সংস্থা চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছিল, নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হইবার পূর্বেই কে যেন আমাদের প্রেক্ষাগৃহ হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

বৈকালে দিবানিদ্রা সারিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ একান্তে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কিছু লিখিতেছে। আমি তাহার পিছন হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ডায়েরির মত একটা ছোট খাতায় ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে লিখিতেছে। বলিলাম, 'এত লিখছ কি?'

লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'গোলাপ কলোনীর পাত্র-পাত্রীদের একটি চরিত্র-চিত্র তৈরি করেছি। খুব সংক্ষিপ্ত চিত্র—যাকে বলে thumb-nail portrait.'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু গোলাপ কলোনীর সঙ্গে তোমার তো সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। এখন চরিত্র-চিত্র এঁকে লাভ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'লাভ নেই। কেবল নিরাসক্ত কৌতূহল। এখন অবধান কর। যদি কিছু বলবার থাকে পরে বোলো।'

সে খাতা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

নিশানাথ সেন: বয়স ৫৭। বোম্বাই প্রদেশে জজ ছিলেন, কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে গোলাপ বাগান করিয়াছেন। চাপা প্রকৃতির লোক। জীবনে কোনও গুপ্তরহস্য আছে। সুনয়না নামে জনৈকা চিত্রাভিনেত্রী সম্বন্ধে জানিতে চান। সম্প্রতি কেহ তাঁহাকে মোটরের টুকরো উপহার দিতেছে। (কেন?)

দময়ন্তী সেন: বয়স আন্দাজ ৩০। এখনও সুন্দরী। বোধহয় নিশানাথের দ্বিতীয় পক্ষ। নিপুণা গৃহিণী। কলোনীর সমস্ত টাকা ও হিসাব তাঁহার হাতে। আচার আচরণ সম্ভ্রম উৎপাদক। দুই বছর আগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়মিত কলিকাতা যাতায়াত করিতেন।

বিজয়: বয়স ২৬-২৭। নিশানাথের পালিত ভ্রাতুষ্পুত্র। ফুলের দোকানের ইন-চার্জ। দোকানের হিসাব দিতে বিলম্ব করিতেছে। আবেগপ্রবণ নার্ভাস প্রকৃতি।

'কাকাকে ভালবাসে, সম্ভবত কাকিমাকেও। নেপালবাবুকে দেখিতে পারে না। মুকুল সম্বন্ধে মনে জট পাকানো আছে—একটা গুপ্ত রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পানুগোপালঃ বয়স ২৪-২৫। কান ও স্বরযন্ত্র বিকল। লেখাপড়া জানে না। নিশানাথের একান্ত অনুগত। চরিত্র বিশেষত্বহীন।

নেপাল গুপ্তঃ বয়স ৫৬-৫৭। কুটিল ও কটুভাষী। প্রচণ্ড দাম্ভিক। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। এখনও এক্সপেরিমেণ্ট করেন, ফল কিন্তু বিপরীত হয়। নিশানাথকে ঈর্ষা করেন, বোধহয় নিশানাথের জীবনের কোনও লজ্জাকর গুপ্ত কথা জানেন। দময়ন্তী দেবী তাঁহাকে ভক্তি করেন। (ভয়ে ভক্তি?)

মুকুলঃ বয়স ১৯-২০। সুন্দরী কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। রুজ পাউডারের সাহায্যে মুখসজ্জা করিতে অভ্যস্ত। বর্তমান অবস্থার জন্য মনে ক্ষোভ আছে কিন্তু পিতার মত হঠকারী নয়। প্রায় দুই বছর পিতার সহিত কলোনীতে বাস করিতেছে।

ব্রজদাসঃ বয়স ৬০। নিশানাথের সেরেস্তার কেরানি ছিল, চুরির জন্য নিশানাথ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ব্রজদাস কলোনীতে আশ্রয় লইয়াছে। সে নাকি এখন সদা সত্য কথা বলে। লোকটিকে দেখিয়া চতুর ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

ভুজঙ্গধর দাসঃ বয়স ৩৯-৪০। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অবস্থার শোচনীয় অবনতি সত্ত্বেও মনের ফূর্তি নষ্ট হয় নাই। ধর্মজ্ঞান প্রবল নয়, লজ্জাকর দুর্নৈতিক কর্মে ধরা পড়িয়াও লজ্জা নাই। বনলক্ষ্মীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। (কেন?) ভাল সেতার বাজাইতে পারেন। চার বছর কলোনীতে আছেন।

বনলক্ষ্মীঃ বয়স ২২।২৩। স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী; যৌন আবেদন আছে—(অজিত তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে)। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না সে কুলত্যাগিনী। চঞ্চলা নয়, প্রগলভা নয়। কর্মকুশলা; একটু গ্রাম্য ভাব আছে। দেড় বছর আগে বিজয় তাহাকে কলোনীতে আনিয়াছে।

মুস্কিল মিঞাঃ বয়স ৫০। নেশাখোর (বোধ হয় আফিম) কিন্তু হুঁশিয়ার লোক। কলোনীর সব খবর রাখে। তাহার বিশ্বাস কলিকাতার দোকানে চুরি হইতেছে। দেড় বছর আগে নূতন বিবি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে, পুরাতন বিবিকে তালাক দিয়াছে।

নজর বিবিঃ বয়স ২০-২১। পশ্চিমের মেয়ে, আগে বাংলা জানিত না, বিবাহের পর শিখিয়াছে। ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হয়। কলোনীর অধিবাসীদের লজ্জা করে না, কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে ঘোমটা টানে।

রসিক দেঃ বয়স ৩৫। নিজের বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট নয়। দোকানের হিসাব লইয়া নিশানাথের সহিত গণ্ডগোল চলিতেছে। চেহারা রুগ্ন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন। (কালো ঘোড়া?)

খাতা বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কেমন?'

ব্যোমকেশ আমাকে বনলক্ষ্মী সম্পর্কে খোঁচা দিয়াছে, আমিও তাহাকে খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'ঠিক আছে। কেবল একটা কথা বাদ গেছে। নেপালবাবু ভাল দাবা খেলেন উল্লেখ করা উচিত ছিল।'

ব্যোমকেশ আমাকে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তারপর হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, শোধ বোধ।'

সন্ধ্যার সময় রমেনবাবুর চাকর আসিয়া একটি খাম দিয়া গেল। খামের মধ্যে দুইটি ফটো।

ফটো দুইটি আমরা পরম আগ্রহের সহিত দর্শন করিলাম। কমলমণি সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলমণি, লাবণ্যে মাধুর্যে ঝলমল করিতেছে। আর শ্যামা ঝি সত্যই জবরদস্ত শ্যামা ঝি। দুইটি আকৃতির মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য নাই। এবং গোলাপ কলোনীর কোনও মহিলার সঙ্গে ছবি দুইটির তিল মাত্র মিল নাই।

১১

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিল টেলিফোনের শব্দে।

টেলিফোনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন, টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ কখনও কখনও ভয়ঙ্কর ভবিতব্যতার আভাষ বহন করিয়া আনে। যেন তারের অপর প্রান্তে যে-ব্যক্তি টেলিফোন ধরিয়াছে, তাহার অব্যক্ত হৃদয়াবেগ বিদ্যুতের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

বিছানায় উঠিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দুই তিন মিনিট পরে ব্যোমকেশ টেলিফোন রাখিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে চোখে একটা অনভ্যস্ত ধাঁধা-লাগার আভাস; সে বলিল, 'ঝড় এসে গেছে।'

'ঝড়!'

'নিশানাথবাবু মারা গেছেন। চল, এখনি বেরুতে হবে।'

আমার মাথায় যেন অতর্কিত লাঠির ঘা পড়িল। কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম,—'নিশানাথবাবু মারা গেছেন! কি হয়েছিল?'

'সেটা এখনও বোঝা যায়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে আবার না হতেও পারে।'

'কিন্তু এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না। আজ মারা গেলেন?'

'কাল রাত্রে। ঘুমন্ত অবস্থায় হয়তো রক্তের চাপ বেড়েছিল, হার্টফেল করে মারা গেছেন। রাত্তিরে কেউ জানতে পারেনি, আজ সকালে দেখা গেল বিছানায় মরে পড়ে আছেন।'

'কে ফোন করেছিল?'

'বিজয়। ওর সন্দেহ হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। ভয় পেয়েছে মনে হল।—নাও, চট্‌পট্ উঠে পড়। ট্রেনে গেলে দেরি হবে, ট্যাক্সিতে যাব।'

ট্যাক্সিতে যখন গোলাপ কলোনীর ফটকের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখনও আটটা বাজে নাই, কিন্তু সূর্যের তাপ কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাগান নিঝুম; মালীর কাজ করিতেছে না। কুঠিগুলিও যেন শূন্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কোথাও জনমানব নাই।

আমরা নিশানাথবাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। তাহার চুল এলোমেলো, গায়ে একটা চাদর, পা খালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। ভাঙা গলায় বলিল,—'আসুন।'

বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন, আগে একবার দেখি, তারপর সব কথা শুনব।'

বিজয় আমাদের পাশের ঘরে লইয়া গেল; যে-ঘরে সেদিন দুপুরবেলা আমরা শয়ন করিয়াছিলাম সেই ঘর। জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরের একপাশে খাট, খাটের উপর শাদা চাদর-ঢাকা মৃতদেহ।

আমরা খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চাদর তুলিয়া লইল।

নিশানাথবাবু যেন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে কেবল সিল্কের ঢিলা পায়জামা, গায়ে জামা নাই। তাঁহার মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো, যেন মুখে অধিক রক্ত সঞ্চার হইয়াছে। এ ছাড়া মৃত্যুর কোনও চিহ্ন শরীরে বিদ্যমান নাই।

নীরবে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—'এ কি! পায়ে মোজা!'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—নিশানাথের পায়ের চেটো পায়জামার কাপড়ে প্রায় ঢাকা ছিল—এখন দেখিলাম সত্যই তাঁহার পায়ে মোজা। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল, —'গরম মোজা! উনি কি মোজা পায়ে দিয়ে শুতেন?'

বিজয় আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহের উপর আবার চাদর ঢাকা দিয়া বলিল,—'চলুন,

দেখা হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছেন কি? ডাক্তারের সার্টিফিকেট তো দরকার হবে।'

বিজয় বলিল,—'মুস্কিল গাড়ি নিয়ে সহরে গেছে, ডাক্তার নগেন পাল এখানকার বড় ডাক্তার—। কি বুঝলেন, ব্যোমকেশ-বাবু?'

'ও কথা পরে হবে।—আপনার কাকিমা কোথায়?'

'কাকিমা অজ্ঞান হয়ে আছেন।' বিজয় আমাদের পাশের ঘরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল। পর্দা সরাইয়া দেখিলাম, ও ঘরটিও শয়নকক্ষ। খাটের উপর দময়ন্তী দেবী বিস্রস্তভাবে পড়িয়া আছেন, ডাক্তার ভুজঙ্গধর পাশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন; মাথায় মুখে জল দিতেছেন, নাকের কাছে অ্যামোনিয়ার শিশি ধরিতেছেন।

আমাদের দেখিতে পাইয়া ভুজঙ্গধরবাবু লঘুপদে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণগম্ভীর; স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চটুলতা সাময়িকভাবে অস্তমিত হইয়াছে। তিনি খাটো গলায় বলিলেন,—'এখনও জ্ঞান হয়নি। তবে বোধহয় শিগ্‌গিরই হবে।'

ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন—'প্রায় তিন ঘণ্টা। উনিই প্রথমে জানতে পারেন। ঘুম ভাঙার পর বোধহয় স্বামীর ঘরে গিয়েছিলেন, দেখে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এখনও জ্ঞান হয়নি।'

'আপনি মৃতদেহ দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আপনার কি মনে হয়? স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ডাক্তার একবার চোখ বড় করিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। পাকা ডাক্তার আসুন, তিনি যা হয় বলবেন।' বলিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আবার দময়ন্তী দেবীর খাটের পাশে গিয়া বসিলেন।

আমরা বাহিরের ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে বৈষ্ণব ব্রজদাস বাহিরের ঘরে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া নত হইয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার মুখে শোকাহত ব্যাকুলতার সহিত তীক্ষ্ম উৎকণ্ঠার চিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন,—এ কী হল আমাদের! এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলাম, এখন কোথায় যাব?'

আমরা উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'কোথাও যাবার দরকার হবে না বোধহয়। কলোনী যেমন চলছে তেমনি চলবে।—বসুন।'

ব্রজদাস বসিলেন না, দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জানালায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কাল নিশানাথবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'বিকেল বেলা। তখন তো বেশ ভালই ছিলেন।'

'ব্লাড-প্রেশারের কথা কিছু বলেছিলেন?'

'কিছু না।'

বাহিরে মুস্কিলের গাড়ি আসিয়া থামিল। বিজয় বাহিরে গিয়া ডাক্তার নগেন্দ্র পালকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার পালের হাতে ব্যাগ, পকেটে স্টেথস্কোপ; লোকটি প্রবীণ কিন্তু বেশ চটপটে। মৃদুকণ্ঠে আক্ষেপের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিতে করিতে বিজয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কথার ভগ্নাংশ কানে আসিল—'সব রোগের ওষুধ আছে, মৃত্যু রোগের ওষুধ নেই......'

তিনি পাশের ঘরে অন্তর্হিত হইলে ব্যোমকেশ ব্রজদাসকে জিজ্ঞাসা করিল,—'ডাক্তার পাল প্রায়ই আসেন বুঝি?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'মাসে দু' মাসে একবার আসেন। কলোনীর বাঁধা ডাক্তার। অবশ্য ভুজঙ্গধরবাবুই এখানকার কাজ চালান, নেহাৎ দরকার হলে এ'কে ডাকা হয়।'

পনরো মিনিট পরে ডাক্তার পাল বাহির হইয়া আসিলেন। মুখে একটু লৌকিক বিষণ্ণতা। তাঁহার পিছনে বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবুও আসিলেন। ডাক্তার পাল ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মনে হইল তিনি বিজয়ের কাছে ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছেন। তারপর চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ হইতে শিরোনামা-ছাপা কাগজের প্যাড্ বাহির করিয়া লিখিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, —'মাফ করবেন, আপনি কি ডেথ্-সার্টিফিকেট লিখছেন?'

ডাক্তার পাল ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

'এ কি! পায়ে মোজা!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি তাহলে মনে করেন স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ডাক্তার পাল ঠোঁটের কোণ তুলিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন,—'স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কিছু নেই, সব মৃত্যুই অস্বাভাবিক। শরীরের অবস্থা যখন অস্বাভাবিক হয়, তখনই মৃত্যু হতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা ঠিক। কিন্তু শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা আপনা থেকে ঘটতে পারে, আবার বাইরে থেকে ঘটানো যেতে পারে।'

ডাক্তার পালের ভ্রূ আর একটু উপরে উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু, না? আপনি কী বলতে চান আমি বুঝেছি। কিন্তু আমি নিশানাথবাবুর দেহ ভাল করে পরীক্ষা করেছি, কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। মৃত্যুর সময় কাল রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। আমার

বিচারে কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ও'র মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়, তারপর ঘুমন্ত অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। যারা ব্লাড-প্রেশারের রুগী তাদের মৃত্যু সাধারণত এই-ভাবেই হয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু ও'র পায়ে মোজা ছিল লক্ষ্য করেছেন বোধহয়। এই দারুণ গ্রীষ্মে তিনি মোজা পরে শুয়ে-ছিলেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

ডাক্তার পালের মুখে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেল। তিনি বলিলেন,—'ওটা যদিও ডাক্তারী নিদানের এলাকায় পড়ে না, তবু ভাববার কথা। নিশানাথবাবু এই গরমে মোজা পায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আর কেউ তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় মোজা পরিয়ে দিয়েছে তাই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়? কেউ সে-চেষ্টা করলে তিনি জেগে উঠতেন না? আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আগে একটা কথা বলুন। ব্লাড-প্রেশারের রুগী পায়ে মোজা পরলে ব্লাড-প্রেশার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি?'

ডাক্তার পাল বলিলেন,—'তা আছে। কিন্তু মাথার শিরা ছিঁড়ে মারা যাবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ডাক্তারবাবু, আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবেন না। নিশানাথবাবুর শরীরের মধ্যে কী ঘটেছে বাইরে থেকে হয়তো সব বোঝা যাচ্ছে না। পোস্টমর্টেম হওয়া উচিত।'

ডাক্তার তীক্ষ্ম চক্ষে কিছুক্ষণ ব্যোম-কেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর কলমের মাথা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—'আপনি ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন। বেশ, তাই ভালো, ক্ষতি তো আর কিছু হবে না'। ব্যাগ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'আমি চললাম। থানায় খবর পাঠাব, আর অটোপ্সির ব্যবস্থা করব।'

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিজয় ফিরিয়া আসিল, ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া দু' হাতে মুখ ঢাকিল।

ভুজঙ্গধরবাবু তখনও ভিতর দিকের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি সদয় কণ্ঠে বলিলেন, 'বিজয়বাবু, আপনি নিজের কুঠিতে গিয়ে একটু শুয়ে থাকুন। আমি না হয় একটা সিডেটিভ্ দিচ্ছি। এ সময় ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

বিজয় হাতের ভিতর হইতে মুখ তুলিল না, রুদ্ধ স্বরে বলিল, 'আমি ঠিক আছি।'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখে একটু ক্ষুব্ধ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, —'নিশানাথবাবুও ঐ কথা বলতেন। শরীরে রোগ পুষে রেখেছিলেন, ওষুধ খেতেন না। আমি রক্ত বার করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, দরকার নেই, আমি ঠিক আছি। তার ফল দেখছেন তো?'

ব্যোমকেশ চট করিয়া তাঁহার দিকে ঘাড় ফিরাইল, বলিল,—'তাহলে আপনিও বিশ্বাস করেন এটা স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন, — 'আমার বিশ্বাসের কোনও মূল্য নেই। আপনাদের সন্দেহ হয়েছে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন। কিন্তু কিছু পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া যাবে না কি করে জানলেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু একটু মলিন হাসিলেন। 'আমিও ডাক্তার—ছিলাম একদিন।' বলিয়া ধীরে ধীরে ভিতর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ বিজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গধরবাবু ঠিক বলেছেন, আপনার বিশ্রাম দরকার—'

বিজয় কাতর মুখ তুলিয়া বলিল,—'আমি এখন শুয়ে থাকতে পারব না ব্যোম-কেশবাবু। কাকা—' তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

'তা বটে। আচ্ছা, তাহলে বলুন কাল থেকে কি কি ঘটেছে। কাল সকালে আপনি আমাকে চিঠি দিয়ে দোকানে গেলেন। ভাল কথা, আপনার কাকা আমাকে কি লিখেছিলেন আপনি জানেন?'

'না। কি লিখেছিলেন?'

'লিখেছিলেন আমার সাহায্য আর তাঁর দরকার নেই। কিন্তু ওকথা যাক। আপনি কলকাতা থেকে ফিরলেন কখন?'

'পাঁচটার গাড়িতে।'

'কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'কাকা বাগানে বেড়াচ্ছেন দেখেছিলাম। কথা হয়নি।'

'শেষ তাঁকে কখন দেখেছিলেন?'

'সেই শেষ, আর দেখিনি। সন্ধ্যের পর আমি এখানে আসছিলাম কাকার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে কিন্তু বাইরে থেকে শুনতে পেলাম রসিকবাবুর সঙ্গে কাকার বচসা হচ্ছে—'

'রসিকবাবু? যিনি শাকসবজির দোকান দেখেন? তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে বচসা হচ্ছিল?'

'সব কথা শুনতে পাইনি। কেবল কাকা বলছিলেন শুনতে পেলাম—তোমাকে পুলিশে দেব। আমি আর ভেতরে এলাম না, ফিরে গেলাম।'

'হুঁ। রাত্রে খাবার সময় কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না। আমি—সকাল সকাল খেয়ে আবার আটটার ট্রেনে কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'আবার কলকাতায় গিয়েছিলেন?' ব্যোমকেশ স্থির নেত্রে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

বিজয়ের শুষ্ক মুখ যেন আরও ক্লি[illegible] হইয়া উঠিল। সে একটু বিদ্রোহের স[illegible] বলিল,—'হ্যাঁ। আমার দরকার ছিল।'

কী দরকার ছিল এ প্রশ্ন ব্যোমকে[illegible] করিল না। শান্ত স্বরে বলিল,—'কখ[illegible] ফিরলেন?'

'বারোটার পর। নিজের কুঠিতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে মুকু[illegible] এসে—'

'মুকুল?'

'মুকুল ভোর বেলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল কাকিমার চীৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখল কাকিমা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন আর কাকা মারা গেছেন। তখন মুকুল দৌড়ে গিয়ে আমাকে তুলল।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট মুখে দিতে গিয়া থামিয়া গেল, সিগারেট আবার কৌটায় রাখিতে রাখিতে বলিল,—'রসিকবাবু কোথায়?'

বিজয় বলিল,—'রসিকবাবুকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কুঠি খালি পড়ে আছে।'

'তাই নাকি?'

এই সময় ব্রজদাস কথা বলিলেন। তিনি এতক্ষণ জানালায় ঠেস দিয়া নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন, এখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—'রসিকবাবু বোধ হয় কাল রাত্রেই চলে গেছেন। ও'র কুঠি আমার পাশেই, রাত্রে ও'র ঘরে আলো জ্বলতে দেখিনি।'

বিজয় বলিল,—তা হবে। হয়তো কাকার সঙ্গে বকাবকির পর—'

ব্যোমকেশ বলিল—'হয়তো ফিরে আসবেন। কলোনীর আর সবাই যথাস্থানে আছে তো? নেপালবাবু—?'

'আর সকলেই আছে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, এবার বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় এ সন্দেহ আপনার হল কেন?'

বিজয় বলিল,—'প্রথমে ও'র পায়ে মোজা দেখে। কাকা শীতকালেও মোজা পরতেন না, মোজা তাঁর ছিলই না। দ্বিতীয়ত, আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম জানলা বন্ধ রয়েছে।'

'বন্ধ রয়েছে!'

'হ্যাঁ, ছিট্‌কিনি লাগানো। কাকা কখনই রাত্রে জানলা বন্ধ করে শোননি। তবে কে জানলা বন্ধ করলে?'

'তা বটে।—বিজয়বাবু, আপনাকে একটা ঘরের কথা জিগ্যেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার কাকার জীবনে কি কোনও গোপন কথা ছিল?'

বিজয়ের চোখের মধ্যে যেন ভয়ের ছায়া পড়িল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—'গোপন কথা! না, আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না জানা আশ্চর্য নয়। হয়তো তাঁর যৌবনকালে কিছু ঘটেছিল। কিন্তু কোনও দিন সন্দেহও কি হয়নি?'

'না।' বলিয়া বিজয় ক্লান্তভাবে দু' হাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় দেখিলাম বৈষ্ণব ব্রজদাস কখন নিঃসাড়ে ঘর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমাদের মনোযোগ বিজয়ের দিকে আকৃষ্ট ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য করি নাই।

ভিতর দিকের দ্বার দিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন, খাটো গলায় বলিলেন,—'মিসেস সেনের জ্ঞান হয়েছে।'

বিজয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গমনোদ্যত হইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহাকে ক্ষণেকের জন্য আটকাইলেন, বলিলেন,—'পোস্ট্-মর্টেমের কথা এখন মিসেস সেনকে না বলাই ভাল।'

বিজয় চলিয়া গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে দময়ন্তী দেবীর ঘর হইতে মর্মান্তিক কান্নার আওয়াজ আসিল।

'কাকিমা—।'

'বাবা বিজয়—।'

ভুজঙ্গধরবাবু একটা অর্ধোচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস চাপিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া গেলেন। আমরা নেপথ্য হইতে দুইটি শোকার্ত মানুষের বিলাপ শুনিতে লাগিলাম।

১২

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'সাড়ে ন'টা। এখনও পুলিশ আসতে অনেক দেরি। চল একটু ঘুরে আসা যাক।'

'কোথায় ঘুরবে?'

'কলোনীর মধ্যেই এদিক ওদিক। এস।'

দু'জনে বাহির হইলাম। দময়ন্তী দেবীর ঘরে কান্নাকাটির শব্দ এখনও থামে নাই। বিজয় কাকিমার কাছেই আছে। ভুজঙ্গধরবাবুও বোধ হয় উপস্থিত আছেন।

আমরা সদর দরজা দিয়া বাহির হইলাম। বাঁ-হাতি পথ ধরিয়াছি, কয়েক পা যাইবার পর একটা দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। বাড়ির এ পাশে কয়েকটা কামিনী ফুলের ঝাড় বাড়ির দু'টি জানালাকে আংশিক ভাবে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দু'টি জানালার আগেরটি নিশানাথবাবুর ঘরের জানালা, পিছনেরটি দময়ন্তী দেবীর ঘরের। দেখিলাম, দময়ন্তী দেবীর জানালার ঠিক নীচে একটি স্ত্রীলোক সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া একাগ্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে চকিতে মুখ তুলিল এবং সরীসৃপের মত ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হইল।

মুস্কিলের বৌ নজর বিবি।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া ছিল। বলিলাম,—'দেখলে?'

ব্যোমকেশ আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল,—'জানলায় আড়ি পেতে শুনছিল।'

'কি মতলবে?'

'নিছক কৌতূহল হতে পারে। মেয়ে-মানুষ তো! নিশানাথবাবু মারা গেছেন অথচ ওরা বিশেষ কোনও খবর পায়নি। সরাসরি জিগ্যেস করবারও সাহস নেই। তাই হয়তো—'

আমার মনঃপূত হইল না। মেয়েরা কৌতূহলের বশে আড়ি পাতিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি শুধুই কৌতূহল?

গোহালের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম পানুগোপাল নিজের কুঠির পৈঁঠায় বসিয়া হতাশা-ভরা চক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দু' হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরিয়া কিছু বলিতে চাহিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না। তারপর সে আবার বসিয়া পড়িল। এই অসহায় মানুষটি নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে কতখানি কাতর হইয়াছে একটি কথা না বলিয়াও তাহা সে প্রকাশ করিল।

আমরা দাঁড়াইলাম না, আগাইয়া চলিলাম। সামনের একটা মোড় ছাড়িয়া দ্বিতীয় মোড় ঘুরিয়া নেপালবাবুর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

নেপালবাবু অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় তক্তপোষে বসিয়া একটা বাঁধানো খাতায় কিছু লিখিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া

আমাদের দেখিয়া দ্রুত খাতা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন

দ্রুত খাতা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। চোখ পাকাইয়া আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—'আপনারা!'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের পাশে বসিল, দুঃখিত মুখে মিথ্যা কথা বলিল,—'নিশানাথবাবু কাল চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আজ এসে দেখি—এই ব্যাপার।'

নেপালবাবু সতর্ক চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন এবং অর্ধদগ্ধ সিগার ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা তো একেবারে ঘাবড়ে গেছি। নিশানাথবাবু এমন হঠাৎ মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।'

নেপালবাবু ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—'ব্লাড্ প্রেশারের রুগী ঐভাবেই মরে। নিশানাথ বড় একগুঁয়ে ছিল, কারুর কথা শুনত না। কতবার বলেছি—'

'আপনার সঙ্গে তো তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল!'

নেপালবাবু একটু দম লইয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, সদ্ভাব ছিল বৈকি। তবে ওর একগুঁয়েমির জন্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত।'

'কথা কাটাকাটির কথায় মনে পড়ল। সেদিন আমাদের সামনে আপনি ওঁকে বলেছিলেন, ভাঙবে নাকি হাটে হাঁড়ি! তা থেকে আমার মনে হয়েছিল, আপনি ওঁর জীবনের কোনও গুপ্তকথা জানেন।'

নেপালবাবুর এবার আর একটু ভাব-পরিবর্তন হইল, তিনি সৌহৃদ্যসূচক হাসিলেন। বলিলেন,—'গুপ্তকথা! আরে না না, ও আপনার কল্পনা। রাগের মাথায় যা মুখে এসেছিল বলেছিলাম, ওর কোনও মানে হয় না। —তা আপনারা এসেছেন, আজ তো এখানে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই, হবে বলেও মনে হয় না। মুকুল—আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হবারই কথা। উনিই তো প্রথম জানতে পারেন। খুবই শক লেগেছে।—আচ্ছা নেপালবাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করি। আপনার মেয়ের সঙ্গে কি বিজয়বাবুর কোনও রকম—'

নেপালবাবুর সুর আবার কড়া হইয়া উঠিল,—'কোনও রকম কী?'

'কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা—?'

'কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার মেয়ে আমার নয়। তবে—প্রথম এখানে আসার কয়েকমাস পরে বিজয়ের সঙ্গে মুকুলের বিয়ের কথা তুলেছিলাম। বিজয় প্রথমটা রাজী ছিল, তারপর উল্টে গেল।' কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন।—'বিজয়টা ঘোর নির্লজ্জ।'

ব্যোমকেশ সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিল,—'বিজয়বাবুর কি চরিত্রের দোষ আছে?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দোষ ছাড়া আর কি! স্বভাবের দোষ। ভাল মেয়ে ছেড়ে যারা নষ্ট-কুলটার পেছনে ঘুরে বেড়ায় তাদের কি সচ্চরিত্র বলব?'

বিজয়-মুকুলঘটিত রহস্যটি পরিষ্কার হইবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু বাধা পড়িল। ভুজঙ্গধরবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—'মুকুল এখন কেমন আছে?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'যেমন ছিল তেমনি। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা। তুমি একবার দেখবে?'

'চলুন। কোথায় সে?'

'শুয়ে আছে।' বলিয়া নেপালবাবু তক্তপোষ হইতে উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, আমরাও তাহলে উঠি।'

নেপালবাবু উত্তর দিলেন না, ভুজঙ্গবাবুকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাতাটা তক্তপোষের উপর পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ টপ্ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া দ্রুত পাতা উল্টাইল, তারপর খাতা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল,—'চল।'

বাহিরে রাস্তায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'খাতায় কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিশেষ কিছু নয়। কলোনীর সকলের নামের ফিরিস্তি। তার মধ্যে পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীর নামের পাশে ঢ্যারা।'

'তার মানে?'

'নেপালবাবু বোধহয় কালনেমির লঙ্কা-ভাগ শুরু করে দিয়েছেন। ওঁর ধারণা হয়েছে উনিই এবার কলোনীর শূন্য সিংহাসনে বসবেন। পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীকে কলোনী থেকে তাড়াবেন, তাই তাদের নামে ঢ্যারা পড়েছে। কিন্তু ওকথা যাক, মুকুল আর বিজয়ের ব্যাপার বুঝলে?'

'খুব স্পষ্টভাবে বুঝিনি। কী ব্যাপার?'

'নেপালবাবুরা কলোনীতে আসার পর মুকুলের সঙ্গে বিজয়ের মাখামাখি হয়েছিল, বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। তারপর এল বনলক্ষ্মী। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয় তার দিকে ঝুঁকল, মুকুলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিলে।'

'ও—তাই নষ্ট-কুলটার কথা। কিন্তু বিজয়ও তো বনলক্ষ্মীর ইতিহাস জানে। প্রেম হলেও বিয়ে হবে কি করে?'

'বিজয় যদি জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় কে বাধা দেবে?'

'নিশানাথবাবু নিশ্চয় বাধা দিয়েছিলেন।'

'সম্ভব। তিনি বনলক্ষ্মীকে স্নেহ করতেন কিন্তু তার সঙ্গে ভাইপোর বিয়ে দিতে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না।—বড় জটিল ব্যাপার অজিত, যত দেখছি ততই বেশী জটিল মনে হচ্ছে। নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে অনেকেরই সুবিধা হবে।'

'নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এ বিষয়ে তুমি নিঃসংশয়?'

'নিঃসংশয়। তাঁর ব্লাড্-প্রেশার তাঁকে পাহাড়ের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, তারপর পিছন থেকে কেউ ঠেলা দিয়েছে।'

নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বিজয় বলিল,—'কাকিমাকে ভুজঙ্গধরবাবু মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন। কাকিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাল। ঘুম ভাঙলে অনেকটা শান্ত হবেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা যাবে।'

১৩

এগারোটার সময় পুলিশভ্যান আসিল। তাহাতে কয়েকজন কনেস্টবল ও স্থানীয় থানার দারোগা প্রমোদ বরাট।

প্রমোদ বরাটের বয়স বেশী নয়; কালো রঙ, কাটালো মুখ, শালপ্রাংশু দেহ। পুলিশের ছাঁচে পড়িয়াও তাহার মনটা এখনও শক্ত হইয়া ওঠে নাই; মুখে একটু ছেলেমানুষী ভাব এখনও লাগিয়া আছে। করজোড়ে ব্যোমকেশকে নমস্কার করিয়া তদ্গত মুখে বলিল,—'আপনিই ব্যোমকেশ-বাবু?'

বুঝিলাম পুলিশের লোক হইলেও সে ব্যোমকেশের ভক্ত। ব্যোমকেশ হাসিমুখে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিশানাথবাবুর মৃত্যুর সন্দেহজনক হাল বয়ান করিল। প্রমোদ বরাট একাগ্রমনে শুনিল। তারপর ব্যোমকেশ তাহাকে লইয়া মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় ও আমি সঙ্গে গেলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বরাট দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় মেঝের উপর একটা লঘু গোলক বাতাসে গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে দেখিয়া বরাট নত হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইল। খড়, শুকনা ঘাস, শণের সুতা মিশ্রিত একটি গুচ্ছ। বরাট বলিল,—'এটা কি? কোত্থেকে এল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চড়াই পাখির বাসা। ঐ দেখুন, ওখান থেকে খসে পড়েছে।' বলিয়া ঊর্ধ্বে পাখা ঝুলাইবার আংটার দিকে দেখাইল। দেখা গেল চড়াই পাখিরা নির্বিকার, শূন্য আংটায় আবার বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

খড়ের গোলাটা ফেলিয়া দিয়া বরাট মৃতদেহের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চাদর সরাইয়া মৃতদেহের উপর চোখ বুলাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'পায়ে মোজা দেখছেন? ঐটেই সন্দেহের মূল কারণ। আমি মৃতদেহ

[illegible]হীন, পুলিশের আগে মৃতদেহ স্পর্শ করা অনুচিত হত। কিন্তু মোজার তলায় কী আছে, পায়ে কোনও চিহ্ন আছে কিনা জানা দরকার।'

'বেশ তো, এখনই দেখা যেতে পারে' বলিয়া বরাট মোজা খুলিয়া লইল। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া পায়ের গোছ পর্যবেক্ষণ করিল। আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় পায়ের গোছের কাছে অল্প দাগ রহিয়াছে; মোজার উপর ইল্যাস্টিক গার্টার পরিলে যে-রকম দাগ হয় সেই রকম।

দাগ দেখিয়া ব্যোমকেশের চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সে বরাটকে বলিল—'দেখলেন?'

বরাট বলিল,—'হ্যাঁ। বাঁধনের দাগ মনে হয়। কিন্তু—এ থেকে কী অনুমান করা যেতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অন্তত এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে নিশানাথবাবু মৃত্যুর পূর্বে নিজে মোজা পরেন নি, আর কেউ পরিয়েছে।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু কেন? এর কি কোথাও মানে হয়? আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'বোধ হয় পেরেছি। কিন্তু যতক্ষণ শব পরীক্ষা না হচ্ছে ততক্ষণ কিছু না বলাই ভাল। আপনি মৃতদেহ নিয়ে যান। ডাক্তারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলবেন গায়ে কোথাও হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের চিহ্ন আছে কিনা।'

'বেশ।'

আমরা আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বরাট কনেস্টবলদের ডাকিয়া মৃতদেহ ভ্যানে তুলিবার হুকুম দিল। বিজয় এতক্ষণ কোনও মতে নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ কোমল স্বরে বলিল,—'আপনার আজ আর সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই, আমরা যাচ্ছি। আপনি বরং কাল সকালে যাবেন।—কি বলেন, ইন্সপেক্টর বরাট?'

বরাট বলিল,—'সেই ভাল। কাল সকালের আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। আমি কাল সকালে ও'কে নিয়ে আপনার বাসায় যাব।'

'বেশ। চলুন তাহলে। আপনার ভ্যানে আমাদের জায়গা হবে তো?'

'হবে। আসুন।'

ব্যোমকেশ বিজয়ের পিঠে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাস দিল, তারপর আমরা দ্বারের দিকে পা বাড়াইলাম। এই সময় ভিতরের দরজার সম্মুখে বনলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক শ্রীহীন, পরনের ময়লা শাড়ির আঁচলে কালি ও হলুদের ছোপ। আমাদের সহিত চোখাচোখি হইতে সে বলিল,—'[illegible] আপনারা খেয়ে যাবেন না[illegible]'

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল,—'রান্না! কে রাঁধলে?'

বনলক্ষ্মী চোখ নামাইয়া সংকুচি[illegible] বলিল,—'আমি।'

তাহার আঁচলে কালি ও হলুদের দাগ, অনভ্যস্ত রন্ধনক্রিয়ার চিহ্ন। [illegible] কলোনীর একজন মাথা ঠাণ্ডা [illegible] যত মর্মান্তিক ঘটনাই ঘটুক এতগুলো লোকের আহার চাই তাহা সে ভোলে নাই। দেখিলাম, বিজয় মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিয়া আছে, যেন তাহাকে এই নূতন দেখিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। খাওয়া থাক। এমনিতেই আপনাদের কষ্টের শেষ নেই, আমরা আর হাঙ্গামা বাড়াব না। আপনি বরং এ'দের ব্যবস্থা করুন।' বলিয়া বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করিল।

বনলক্ষ্মী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ভারী গলায় বলিল,—'চলুন, স্নান করে নেবেন।'

আমরা বাহির হইলাম।

পুলিশ ভ্যান একটি শবদেহ ও কয়েকটি জীবন্ত মানুষ লইয়া কলিকাতার অভিমুখে চলিল।

পথে বেশী কথা হইল না। এক সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'রসিক দে নামে একটি লোক কলোনীতে থাকত, কাল থেকে সে নিরুদ্দেশ। খুব সম্ভব দোকানের টাকা চুরি করেছে। তার খোঁজ নেবেন। তার হাতের আঙুল কাটা। খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।'

বরাট নোটবুকে লিখিয়া লইল।

ঘণ্টা খানেক পরে বাসার সম্মুখে আমাদের নামাইয়া দিয়া পুলিশ ভ্যান চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন মনটা বিভ্রান্ত হইয়া রহিল। নিশানাথবাবুর ছায়ামূর্তি মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিকাল বেলা তিনটার সময় দেখিলাম ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া বাহির হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায়?'

সে বলিল,—'একটু খোঁজ খবর নিতে বেরুচ্ছি।'

'কার খোঁজ খবর?'

'কারুর ওপর আমার পক্ষপাত নেই, কলোনীর অধিবাসীদের যার খবর পাব জোগাড় করব। আপাতত দেখি যদি ডাক্তার ভুজঙ্গধর আর লাল সিং সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করতে পারি।'

'লাল সিংকে ভোলোনি?'

'কাউকে ভুলিনি।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিষ্ক্রান্ত হইল।

[illegible] সে বাহির হইবার আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোন আসিল। বিজয় কলোনী হইতে টেলিফোন করিতেছে। ওদিকের খবর ভালই, [illegible]ময়ন্তী দেবী এখনও জাগেন নাই। অন্য খবরের মধ্যে, ব্রজদাস গোঁসাইকে পাওয়া যাইতেছে না, দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন।

[illegible] অভিনব সংবাদ। প্রথমে রসিক দে, তারপর বৈষ্ণব বাবাজী! ইনিও কি কলোনীর টাকা হাত সাফাই করিতেছিলেন?

ব্যোমকেশ ফিরিলে সংবাদ দিব বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। যেন অনেকদিন একজ্বরী ভোগ করিবার পর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ব্যোমকেশ রৌদ্রের জন্য ছাতা লইয়া বাহির হইয়াছে, বৃষ্টিতেও ছাতা কাজে আসিবে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ফিরিল। জামা কাপড় ভিজিয়া গোবর হইয়াছে, ছাতাটার অবস্থা ঝোড়ো কাকের মত; সে সেই অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া পরম তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল—'পুঁটিরাম, চা নিয়ে এস।'

তাহাকে বিজয়ের বার্তা শুনাইলাম। সে কিছুক্ষণ অন্যমনে রহিল, শেষে বলিল,—'একে একে নিভিছে দেউটি। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মুস্কিল মিঞা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কিন্তু বাবাজী এত দেরিতে পালালেন কেন? পোস্ট মর্টেমের নাম শুনে ঘাবড়ে গেছেন?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তারপর তোমার কি হল? ভুজঙ্গধরবাবুর খবর পেলে?'

'নতুন খবর বড় কিছু নেই। তিনি যা যা বলেছিলেন সবই সত্যি। চীনে পটিতে তাঁর ডিসপেন্সারি আর নার্সিং হোম ছিল। অনেক রোজগার করতেন। তারপরই দুর্মতি হল।'

'আর লাল সিং?'

ব্যোমকেশ ভিজা জামা খুলিয়া মাটিতে ফেলিল, বলিল,—'লাল সিং বছর দুই আগে জেলে মারা গেছে। তার স্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু চিঠি ফিরে এসেছে। স্ত্রীর পাত্তা কেউ জানে না।'

বাহিরে বৃষ্টি চলিতেছে; চারিদিক ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পুঁটিরাম চা আনিয়া দিল। ব্যোমকেশ চায়ে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল,—'এই বৃষ্টিটা যদি কাল রাত্তিরে হত তাহলে নিশানাথবাবুর মোজা পরার একটা মানে পাওয়া যেত, মনে হত উনি নিজেই মোজা পরেছেন। অন্তত সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যেত না। ভাগ্যিস কাল বৃষ্টি হয়নি!'

১৪

পরদিন সকাল বেলা বরাট ও বিজয় আসিল। বিজয়ের পা খালি, অশৌচের বেশ। ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিল।

ব্যোমকেশ বরাটের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল,—'কৈ, পোস্ট্ মর্টেম রিপোর্ট দেখি।'

বোতাম-আঁটা পকেট খুলিতে খুলিতে বরাট বলিল,—'পরিষ্কার রিপোর্ট, সন্দেহ-জনক কিছুই পাওয়া যায়নি। রক্তে কোনও বিষ বা ওষুধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার মধ্যে হেমরেজ্ হয়ে মারা গেছেন!'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দাগ নেই?'

'কনুইয়ের কাছে শিরের ওপর ছুঁচ ফোটানোর কয়েকটা দাগ আছে কিন্তু সেগুলো দু' তিন মাসের পুরোনো।'

'আর পায়ের দাগ?'

'ডাক্তার বলেন ও-দাগের সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।'

বরাট রিপোর্ট বাহির করিয়া দিল। ব্যোমকেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহা পড়িল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া রিপোর্ট বরাটকে ফেরত দিয়া বলিল,—'দেহ থেকে কিছু পাওয়া যাবে আমার মনে করাই অন্যায় হয়েছিল।'

বরাট বলিল,—'তাহলে কি সোজাসুজি ব্লাড্ প্রেশার থেকে মৃত্যু বলেই ধরতে হবে?'

'কখনই না। হত্যাকারী ব্লাড প্রেশারের সুযোগ নিয়েছে, তাই হত্যার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কিন্তু—কিভাবে সুযোগ নিয়েছে বুঝতে পারছি না। আমাকে যদি তদন্ত চালাতে হয় তাহলে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা কিছু চাই তো। আপনি কাল বলেছিলেন, মোজা পরার কারণ বুঝতে পেরেছেন। কী বুঝতে পেরেছেন আমায় বলুন।'

বিজয় এতক্ষণ আঙুল দিয়া কপালের দুই পাশ টিপিয়া নির্জীবভাবে বসিয়াছিল, এখন চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশও তাহার পানে চাহিয়া একটু যেন ইতস্তত করিল। তারপর বলিল,—'সব প্রমাণ আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে। কিছু অনুমান করতে পারছেন না?'

বরাট বলিল,—'না, আপনি বলুন।'

'চড়াই পাখির বাসা মেঝেয় পড়েছিল, তা থেকে কিছু ধরতে পারলেন না?'

'না।'

ব্যোমকেশ আবার একটু ইতস্তত করিল। 'বড় বীভৎস মৃত্যু' বলিয়া সে বিজয়ের দিকে সসঙ্কোচ দৃষ্টিপাত করিল।

বিজয় চাপা গলায় বলিল,—'তবু আপনি বলুন।'

ব্যোমকেশ তখন ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনাদের বলছি, কিন্তু কথাটা যেন চাপা থাকে'—নিশানাথবাবুর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়ি-কাঠের আংটা থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ব্লাড্ প্রেশার ছিলই, তার ওপর শরীরের সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে মাথায় চাপ দিয়েছিল। মাথার শিরা ছিঁড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হল। তারপর তাঁকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশে মোজা খুলে নিয়ে যেতে ভুলে গেল। চতুর অপরাধীরাও ভুল করে, নইলে তাদের ধরবার উপায় থাকত না।'

আমরা স্তম্ভিত হতবাক হইয়া রহিলাম। বিজয়ের গলা দিয়া একটা বিকৃত আওয়াজ বাহির হইল। দেখিলাম, তাহার মুখ ছাই-বর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বরাট প্রথম কথা কহিল, বলিল,—'কী ভয়ানক! এখন বুঝতে পারছি, পাছে পায়ে দড়ির দাগ হয় তাই মোজা পরিয়েছিল। আংটায় দড়ি পরাবার সময় চড়াই পাখির বাসা খসে পড়েছিল—ঘরে একটা টুল আছে, তাতে উঠে আংটায় দড়ি পরাবার কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যোমকেশ-বাবু, একটা কথা। এত ব্যাপারেও নিশানাথ-বাবুর ঘুম ভাঙল না?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথবাবু বোধ হয় জেগেই ছিলেন। রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এই ব্যাপার হয়েছিল। কাল ডাক্তার পাল তাই বলেছিলেন, রিপোর্ট থেকেও তাই পাওয়া যাচ্ছে।'

'তবে?'

'জানা লোক নিশানাথবাবুকে খুন করেছে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম হত্যাকারী ইন্‌জেকশন দিয়ে প্রথমে তাঁকে অজ্ঞান করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। আজ-কাল এমন অনেক ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে যাতে দু' মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায় অথচ রক্তের মধ্যে ওষুধের কোনও চিহ্ন থাকে না—যেমন Sodium Pentothal. কিন্তু শরীরে যখন ছুঁচ ফোটানোর দাগ পাওয়া যায় নি তখন বুঝতে হবে সাবেক প্রথা অনুসারেই নিশানাথবাবুকে অজ্ঞান করা হয়েছিল।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ স্যান্ড ব্যাগ্। ঘাড়ের ওপর মোলায়েম হাতে এক ঘা দিলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে, অথচ ঘাড়ে দাগ থাকবে না।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। তারপর বিজয় পাংশু মুখ তুলিয়া বলিল—'কিন্তু কে? কেন?'

তাহার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'তা এখনও জানি না। আর একটা কথা বুঝতে পারছি নাঃ মিসেস সেন রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে নিশ্চয় পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি কিছু জানতে পারলেন না!'

বিজয় নিজের অজ্ঞাতসারে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্খলিত কণ্ঠে বলিল—'কাকিমা! না, না, তিনি কিছু জানেন না—তিনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—'

আমরা অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল—'ও কথা যাক। যথা-সময়ে সব প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে। আপাতত একটা কথা বলুন তো, নিশানাথ বাবুর উত্তরাধিকারী কে?'

বিজয় উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল—'আমি আর কাকিমা—সমান ভাগ।'

ব্যোমকেশ ও বরাটের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বরাট উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল—'আজ তাহলে ওঠা যাক। বিজয়-বাবুর এখনও অনেক কাজ, মৃতদেহ সৎকার করতে হবে—'

সকলে উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—'ওবেলা আমরা একবার কলোনীতে যাব। ভাল কথা, রসিক দে'র খবর পাওয়া গেল?'

বরাট বলিল—'আমি লোক লাগিয়েছি। এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।'

ব্যোমকেশ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—'ব্রজদাস বাবাজী ফিরে আসেন নি?'

বিজয় মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল—'ইন্সপেক্টর বরাট, আপনার একজন খদ্দের বাড়ল। ব্রজদাসেরও খোঁজ নেবেন।'

বরাট লিখিয়া লইতে লইতে বলিল,—'ওদিকে যখন যাবেন থানায় একবার আসবেন নাকি?'

'যাব।'

তাহারা প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রায় আধ ঘণ্টা ঘাড় গুঁজিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল। আমি দুটো সিগারেট শেষ করিবার পর নীরবতার মৌন উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম—'বিজয়কে কী মনে হয়? অভিনয় করছে নাকি?'

ব্যোমকেশ ঘাড় তুলিয়া বলিল—'এ যদি ওর অভিনয় হয়, তাহলে ওর মত অভিনেতা বাংলা দেশে নেই।'

'তাহলে কাকার মৃত্যুতে সত্যিই শোক পেয়েছে। কাকিমাকেও ভালবাসে মনে হল।'

'হুঁ। এবং সেইজন্যেই ওর ভয় হয়েছে।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর আবার প্রশ্ন করিলাম—'আচ্ছা, মোটরের টুকরো পাঠানোর সঙ্গে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর কি কোনও সম্বন্ধ আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।'

'লাল সিং তো দু বছর আগে মরে গেছে।

নিশানাথ বাবুকে তবে মোটরের টুকরো পাঠাচ্ছিল কে?'

'তা জানি না। কিন্তু একটা ভুল কোরো না। মোটরের টুকরোগুলো যে নিশানাথ-বাবুর উদ্দেশ্যেই পাঠানো হচ্ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি নিজে তাই মনে করেছিলেন বটে, কিন্তু তা না হতেও পারে।'

'তবে কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না। দুই-তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম উত্তর দিবে না, তখন অন্য প্রশ্ন করিলাম—মুনয়না-উপাখ্যানের সঙ্গে নিশানাথ বাবুর মৃত্যুর যোগাযোগ আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মুরারি দত্তকে মেরেছিল মুনয়না নিকোটিন বিষ খাইয়ে। নিশানাথ-বাবুকে মেরেছে পুরুষ।'

'পুরুষ?'

'হ্যাঁ। নিশানাথবাবু লম্বা-চওড়া লোক ছিলেন না, তবু তাঁকে দড়ি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একজন স্ত্রীলোকের কর্ম নয়।'

'তা বটে। কিন্তু মোটিভ কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিল।

'আমাকে নিশানাথবাবু ডেকেছিলেন, এইটেই হয়তো সব চেয়ে বড় মোটিভ্!' বলিয়া সে সিগারেট ধরাইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

১৫

সায়াহ্নে মোহনপুরের স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখনও গ্রীষ্মের বেলা অনেকখানি বাকী আছে। স্টেশনের প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া দেখি কলোনীর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, মুস্কিল মিঞা পা-দানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

মুস্কিলকে এ কয়দিন দেখি নাই, সে যেন আর একটু বুড়া হইয়া গিয়াছে, আরও ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেলাম করিয়া বলিল, —'বিজয়বাবু আপনাগোর জৈন্য গাড়ি পাঠাইছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওরা ঘাট থেকে ফিরেছে তাহলে?'

মুস্কিল বলিল,—'হ—ফিরছেন।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

মুস্কিল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'আর নূতন খবর কী কর্তা। সব তো শেষ হইয়া গিছে।'

'তা বটে। চল—কিন্তু একবার থানা হ'য়ে যেতে হবে।'

'চলেন।—কর্তাবাবুর নাকি ময়না তদন্ত হৈছে?'

'হ্যাঁ। তুমি খবর পেলে কোত্থেকে?'

'শুনু শুনু কানে আইল। তা ময়না তদন্তে কী জানা গেল? সহজ মৃত্যু নয়?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা পাশ কাটাইয়া গেল, বলিল,—'সে কথা ডাক্তার জানেন। মুস্কিল মিঞা, তুমি তো আফিম খেয়ে ঝিমোও, তুমি এত খবর পাও কি করে?'

মুস্কিলের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, সে বলিল,—'আমি ঝিমাইলে কি হৈব কর্তা, আমার বিবিজানটার চারটা চোখ চারটা কান। তার চোখ কান এড়ায়া কিছু হৈবার যো নাই। আমি সব খবর পাই। একটা কিছু যে ঘটবো তা আগেই বুঝছিলাম।'

'কি করে বুঝলে?'

মুস্কিল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ আক্ষেপভরে হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিল,—'মেইয়া মানুষ লইয়া লুটখুট। রাতের আঁধারে এ উয়ার ঘরে যায়, ও ইয়ার ঘরে যায়—ই সব নষ্টামিতে কি ভাল হয় কর্তা? হয় না।'

'...আমার বিবিজানটার চারটা চোখ, চারটা কান।...'

বিস্মিতস্বরে ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কার ঘরে যায়?'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মুস্কিল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল,—'কারে বাদ দিমু কর্তা? মেইয়া লোকগুলাই দুষ্ট হয় বেশী, মরদের সর্বনাশের জৈন্যই তো খোদা উয়াদের বানাইছেন।'

'মানে—তুমি বলতে চাও রাত্রে কলোনীর মেয়েরা লুকিয়ে পুরুষদের ঘরে যায়। কে কার ঘরে যায় বলতে পার?'

'তা কেমনে কৈব কর্তা? আঁধারে কি কারো মুখ দেখা যায়। তবে ভিতর ভিতর নষ্টামি চলছে। এখন কর্তাবাবু নাই, বড়বিবিও সাদাসিধা মেইয়া, এখন তো হদ্দ বাড়াবাড়ি হৈব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মেয়েরা কারা তা নাহয় বলতে পারলে না, কিন্তু কার ঘরে যায় সেটা তো বলতে পার।'

মুস্কিল একটু অধীরস্বরে বলিল,—'কি মুস্কিল, সেটা আন্দাজ কৈরা লন না। মেইয়া লোক জোয়ান মরদের ঘরে যাইব না তো কি বুড়ার ঘরে যাইব?'

মুস্কিল মিঞার জীবন-দর্শনে মার-প্যাঁচ নাই। মনে মনে হিসাব করিলাম, জোয়ান মরদের মধ্যে আছে বিজয় রসিক পানু-

গোপাল। ডাক্তার ভুজঙ্গধরকেও ধরা যাইতে পারে।

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'চল, এবার যাওয়া যাক। থানা কতদূর?'

'কাছেই, রাস্তায় পড়ে।' মুস্কিল চালকের আসনে উঠিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

থানায় উপস্থিত হইলে প্রমোদ বরাট আমাদের খাতির করিয়া নিজের কুঠুরিতে বসাইল এবং সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া মৃদু-হাস্যে বলিল,—'নিশানাথবাবুকে কেউ খুন করেছে এ প্রত্যয় আপনার হয়েছে?'

বরাট বলিল,—'আমার হয়েছে, কিন্তু কর্তারা তানানানা করছেন। তাঁরা বলেন, পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যখন কিছু পাওয়া যায়নি তখন ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ কি! আমি কিন্তু ছাড়ছি না, লেগে থাকব।—আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সন্দেহ এখনও কারুর ওপর পড়েনি। কিন্তু এই ঘটনার একটা পটভূমিকা আছে, সেটা আপনার জানা দরকার। বলি শুনুন।' বলিয়া সুনয়না ও মোটরের টুকরা সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিল।

শুনিয়া বরাট উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,—'ঘোরালো ব্যাপার দেখছি। —আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপাতত দুটো কাজ করা দরকার। এক, কলোনীর সকলের হাতের টিপ্ নিতে হবে—'

'তাতে কী লাভ?'

'ওটা থাকা ভাল। কখন কি কাজে লাগবে বলা যায় না।'

বরাট একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'কাজটা ঠিক আইনসংগত হবে কিনা বলতে পারি না, তবু আমি করব। দ্বিতীয় কাজ কী?'

'দ্বিতীয় কাজ, আমরা কলোনীতে যাচ্ছি, আপনিও চলুন। আপনার সামনে আমি কলোনীর প্রত্যেককে প্রশ্ন করব, আপনি শুনবেন এবং দরকার হলে নোট করবেন।'

'কী ধরনের প্রশ্ন করবেন?'

'আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে, সে রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কে কোথায় ছিল, কার অ্যালিবাই আছে কার নেই, এই সব নির্ণয় করা।'

'বেশ, চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক, কাজ সেরে ফিরতে রাত হবে।'

টিপ্ লইবার সরঞ্জাম সহ একজন হেড্ কনেস্টবল আমাদের সঙ্গে চলিল।

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় কলোনীতে পৌঁছিলাম। গতরাত্রির বর্ষণ এখানেও মাটি ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে। বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিজয়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন। বিজয়ের মুখে এখনও শ্মশানবৈরাগ্যের ছায়া লাগিয়া আছে। ভুজঙ্গধরবাবুর মুখ কিন্তু প্রফুল্ল, তাঁহার মুখে অম্লরসাক্ত একপেশে হাসি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমাদের সঙ্গে প্রমোদ বরাট ও কনেস্টবলকে দেখিয়া বিজয়ের চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আসুন। বিজয়বাবুকে মোহমুদ্গর শোনাচ্ছি—কা তব কান্তা—নলিনীদলগত-জলমতিতরলং—'

তাঁহার লঘুতা সময়োচিত নয়; মনে হইল বিজয়ের মন প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি আধিক্য দেখাইতেছেন।

বরাট পুলিশী গাম্ভীর্যের সহিত বলিল,—'আপনাদের সকলের হাতের টিপ্ দিতে হবে।'

বিজয়ের চোখের প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, ভুজঙ্গধরবাবুও চকিতভাবে চাহিলেন। ব্যোমকেশ ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিল,—'কলোনী থেকে যে-ভাবে একে একে লোক খসে পড়ছে, বাকিগুলি কতদিন টিকে থাকবে বলা যায় না। তাই সতর্কতা।'

বিজয় বলিল,—'বেশ তো—নিন।' তাহার চোখের দৃষ্টি নীরবে প্রশ্ন করিতে লাগিল—কেন? নতুন কিছু পাওয়া গেছে কি?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আশা করি কারুর আপত্তি হবে না। কারণ যিনি আপত্তি করবেন স্বভাবতই তাঁর ওপর সন্দেহ হবে। ভুজঙ্গধরবাবু, আপনার আপত্তি নেই তো?'

'বিন্দুমাত্র না। আসুন—' বলিয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠ বাড়াইয়া দিলেন।

বরাট কনেস্টবলকে ইঙ্গিত করিল, কনেস্টবল অঙ্গুষ্ঠের ছাপ তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ভুজঙ্গবাবু বাঁকা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'দেখছি আমি ভুল করেছিলাম। আঙুলের ছাপ যখন নেওয়া হচ্ছে তখন লাস পরীক্ষায় কিছু পাওয়া গেছে।'

তাঁহার এই অর্ধ-প্রশ্নের জবাব কেহ দিল না। কাগজের উপর তাঁহার ও বিজয়ের নাম ও ছাপ লিখিত হইলে ভুজঙ্গবাবু বলিলেন—'আর কার কার ছাপ নিতে হবে বলুন, আমি কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

বরাট বলিল,—'সকলের ছাপই নিতে হবে। মেয়ে পুরুষ কেউ বাদ যাবে না।'

'মিসেস্ সেনেরও?'

'হ্যাঁ, মিসেস্ সেনেরও।'

'বেশ—আও সিপাহী।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটা কথা। টিপ্ নেবার সময় সকলকে বলে দেবেন যেন আধ ঘণ্টা পরে এই বাড়িতে আসেন। দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

ভুজঙ্গধরবাবু কনেস্টবলকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিজয় আলো জ্বালিয়া দি[illegible]

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, এ[illegible] আপনি আমাদের সওয়াল জবাবের এ[illegible] জায়গা করে দিন।'

বিজয় বলিল,—'কি করতে হবে ব[illegible] করে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এ ঘরটা [illegible] ওয়েটিং রুম—যাঁরা সাক্ষী দিতে আস[illegible] তাঁরা এ ঘরে বসবেন। আর [illegible] আমরা বসব, প্রত্যেককে আলাদা [illegible] করা হবে। কি বলেন ইন্সপেক্টর ব[illegible]'

বরাট বলিল,—'সেই ঠিক হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে [illegible] ও ঘরে একটা টেবিল [illegible] চেয়ার আনিয়ে দিন। আর কিছু [illegible] হবে না।'

বিজয় [illegible] গেল। [illegible] কনেস্টবল সহ [illegible] —'এই নিন, [illegible] একটু গোলমাল [illegible] শেষ পর্যন্ত [illegible] বলে দিয়েছি, [illegible] আমিও আসছি [illegible] তিনি প্রস্থান করিলেন।

১৬

নিশানাথ [illegible] সেই [illegible] টেবিলের দুই পাশে [illegible] কেশ ও বরাট, [illegible] আমি দ্বারের কাছে [illegible] দুই ঘরের দিকেই [illegible] মাথার উপর উজ্জ্বল [illegible] জ্বলিতেছে।

প্রথমে দময়ন্তী দেবীকে ডাকা হইল। বিজয় তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরের ঘর হইতে লইয়া আসিল, তিনি শূন্য চেয়ারটিতে বসিলেন। বিধবার বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, মাথায় সিঁদুর নাই, সুন্দর মুখখানিতে মোমের মত ঈষদচ্ছ পাণ্ডুরতা। তিনি নতনেত্রে স্থির হইয়া রহিলেন।

বিজয় চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল, বলিল,—'আমি যদি এখানে থাকি আপনাদের আপত্তি হবে কি?'

ব্যোমকেশ একটু অনিচ্ছাভরে বলিল,—'থাকুন।' তারপর কোমলকণ্ঠে দময়ন্তী দেবীকে দুই চারিটি সহানুভূতির কথা বলিয়া শেষে বলিল,—'আমরা আপনাকে বেশী কষ্ট দেব না, শুধু দু' চারটে প্রশ্ন করব যার আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তর দিতে পারবে না।—আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কতদিন আগে?'

দময়ন্তী দেবীর নত চক্ষু ব্যোমকেশের মুখ পর্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি, তবু যেন তাহার মধ্যে একটা সংকল্প রহিয়াছে। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'দশ বছর আগে।'

অতঃপর নিম্নরূপ সওয়াল জবাব হইল। দময়ন্তী দেবী আর দ্বিতীয়বার চক্ষু তুলিলেন না, নিম্নস্বরে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

ব্যোমকেশঃ আপনাদের যখন বিয়ে হয় নিশানাথবাবু তখন চাকরিতে ছিলেন?

দময়ন্তীঃ না, তার পরে।

ব্যোমকেশঃ কিন্তু কলোনী তৈরি হবার আগে?

দময়ন্তীঃ হ্যাঁ।

ব্যোমকেশঃ তাহলে বিয়ের সময় নিশানাথবাবুর বয়স ছিল সাতচল্লিশ বছর?

দময়ন্তীঃ হ্যাঁ।

ব্যোমকেশঃ মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত?

দময়ন্তীঃ উনত্রিশ।

ব্যোমকেশঃ বিজয়বাবু কবে থেকে আপনাদের কাছে আছেন?

বিজয় এই প্রশ্নের জবাব দিল, বলিল,—'আমার দশ বছর বয়সে মা বাবা মারা যান, সেই থেকে আমি কাকার কাছে আছি।

ব্যোমকেশঃ আপনার এখন বয়স কত?

বিজয়ঃ পঁচিশ।

লক্ষ্য করিলাম বিজয়ের চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত দু'টাও দময়ন্তী দেবীর কাঁধের উপর আড়ষ্টভাবে ন্যস্ত হইয়া আছে। সে যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যোমকেশ নিশ্চয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু সে নির্লিপ্তভাবে আবার প্রশ্ন করিল।

ব্যোমকেশঃ বছর দুই আগে আপনি কলকাতার একটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কি নাম স্কুলটির?

দময়ন্তীঃ সেণ্ট মার্থা গার্লস্ স্কুল।

ব্যোমকেশঃ হঠাৎ স্কুলে ভর্তি হবার কি কারণ?

দময়ন্তীঃ ইংরেজি শেখবার ইচ্ছে হয়েছিল।

ব্যোমকেশঃ মাস আষ্টেক পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন?

দময়ন্তীঃ হ্যাঁ, আর ভাল লাগল না।

বরাট এতক্ষণ খাতা পেন্সিল লইয়া মাঝে মাঝে নোট করিতেছিল। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল—

ব্যোমকেশঃ পরশু রাত্রে আপনি খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘর থেকে কখন ফিরে এসেছিলেন?

দময়ন্তীঃ প্রায় দশটা।

ব্যোমকেশঃ নিশানাথবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

দময়ন্তীঃ (একটু নীরব থাকিয়া) শুয়ে পড়েছিলেন।

ব্যোমকেশঃ ঘর অন্ধকার ছিল?

দময়ন্তীঃ হ্যাঁ।

ব্যোমকেশঃ জানালা খোলা ছিল?

দময়ন্তীঃ বোধহয় ছিল। লক্ষ্য করিনি।

ব্যোমকেশঃ সদর দরজা তখন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

দময়ন্তীঃ (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশঃ আপনি বাড়িতে এলেন কি করে?

দময়ন্তীঃ পিছনের দরজা দিয়ে।

ব্যোমকেশঃ সে-রাত্রে—তারপর আপনি কি করলেন?

দময়ন্তীঃ শুয়ে পড়লাম।

ব্যোমকেশঃ নিশানাথবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন? অর্থাৎ বেঁচে ছিলেন?

দময়ন্তীঃ (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশঃ আপনি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেন নি? কি করে বুঝলেন?

দময়ন্তীঃ নিশ্বাস পড়ছিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—'সুনয়না নামের কোনও মেয়েকে আপনি চেনেন?'

দময়ন্তীঃ না।

ব্যোমকেশঃ কিছুদিন থেকে আপনার বাড়িতে কেউ মোটরের টুকরো ফেলে দিয়ে যায়—এ বিষয়ে কিছু জানেন?

দময়ন্তীঃ যা সকলে জানে তাই জানি।

ব্যোমকেশঃ আপনার জীবনে কোনও গুপ্তকথা আছে?

দময়ন্তীঃ না।

ব্যোমকেশঃ নিশানাথবাবুর জীবনে কোনও গুপ্তকথা ছিল?

দময়ন্তীঃ জানি না।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল,—'উপস্থিত আর কোনও প্রশ্ন নেই। বিজয়বাবু, এবার ও'কে নিয়ে যান।'

বিজয় সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর দময়ন্তী দেবীর হাত ধরিয়া তুলিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার পা কাঁপিতেছে। তাঁহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় তীক্ষ্ম প্রশ্নের আঘাত না করিলেই বোধহয় ভাল হইত।

ইতিমধ্যে বসিবার ঘরে জনসমাগম হইতেছিল, আমি দ্বারের কাছে বসিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে আসিল পানুগোপাল, ঘরের কোণে গিয়া যথাসম্ভব অদৃশ্য হইয়া বসিল। তারপর আসিলেন সকন্যা নেপালবাবু; তাঁহারা সামনের চেয়ারে বসিলেন। নেপালবাবুর মুখের পোড়া দিকটা আমার দিকে রহিয়াছে তাই তাঁহার মুখভাব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মুকুলের মুখে শঙ্কিত উদ্বেগ। সে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর নিম্নকণ্ঠে পিতাকে কিছু বলিল।

সর্বশেষে আসিল বনলক্ষ্মী। তাহার মুখ শুষ্ক, যেন চুপসিয়া গিয়াছে; রান্নার কাজ সম্ভবত তাহাকেই চালাইতে হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুকুল গভীর বিতৃষ্ণাভরে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বনলক্ষ্মী একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর ধীরপদে খোলা জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গরাদের উপর হাত রাখিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

এদিকে বিজয় ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেবীর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়াছিল, চাদরে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল,—'এবার আমার এজেহারও না হয় সেরে নিন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ তো। আপনাকে সামান্যই জিজ্ঞাসা করবার আছে।'—

লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবীকে জেরা করার সময় বিজয় যতটা তটস্থ হইয়া ছিল, তাহার তুলনায় এখন অনেকটা স্বস্থ। কিন্তু ব্যোমকেশের প্রথম প্রশ্নেই সে থতমত খাইয়া গেল।

ব্যোমকেশঃ কিছুদিন আগে নেপালবাবুর মেয়ে মুকুলের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। আপনি প্রথমে রাজী ছিলেন। তারপর হঠাৎ মত বদলালেন কেন?'

বিজয়ঃ আমি—আমার—ওটা আমার ব্যক্তিগত কথা। ওর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই।

ব্যোমকেশ তাহাকে একটি নাতিদীর্ঘ নেত্রপাতে অভিষিক্ত করিয়া অন্য প্রশ্ন করিল। বলিল,—'পরশু বিকেলবেলা আপনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে রাত্রে আবার কলকাতা গিয়েছিলেন কেন?'

বিজয়ঃ আমার দরকার ছিল।

ব্যোমকেশঃ কী দরকার বলতে চান না?

বিজয়ঃ এটাও আমার ব্যক্তিগত কথা।

ব্যোমকেশঃ বিজয়বাবু, আপনার ব্যক্তিগত কথা জানবার কৌতূহল আমার নেই। আপনার কাকার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে আপনি আমাদের ডেকেছেন। এখন আপনিই যদি আমাদের কাছে কথা গোপন করেন তাহলে আমাদের অনুসন্ধান করে লাভ কি?

বিজয়ঃ আমি বলছি এর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।

ব্যোমকেশঃ সে বিচার আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয় না?

দেখিলাম বিজয়ের মনের মধ্যে একটা

দুজনে খাটের পায়ের কাছে দাঁড়াইলাম। ক্ষুদ্র নিরাভরণ ঘর; লোহার খাটটি ছাড়া বলিতে গেলে আর কিছুই নাই।

ব্যোমকেশ হাল্কা গল্প করার ভঙ্গীতে বলিল,—'কী হয়েছিল বলুন দেখি? বাইরে থেকে কেউ ঢিল ছুঁড়েছিল?'

বনলক্ষ্মী দুর্বল কণ্ঠে বলিল,—'কিছু জানি না। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হল ডাক্তারবাবুর টিঞ্চার আয়োডিনের জ্বলুনিতে।'

'কপালে ছাড়া আর কোথাও লেগেছে নাকি?'

বনলক্ষ্মী ডান হাত তুলিয়া দেখাইল,—'হাতে কাঁচের চুড়ি ছিল, ভেঙে গেছে। হাতে একটু আঁচড় লেগেছে। বোধহয় হাতটা মাথার কাছে ছিল, একসঙ্গে লেগেছে—'

'তা হতে পারে।' ব্যোমকেশ হাত পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'প্রথমে বোধহয় ইট্ আপনার হাতে লেগেছিল, তাই মাথায় বেশী চোট লাগেনি। আচ্ছা, কে ইট্ ছুড়তে পারে? কলোনীতে এমন কেউ আছে কি, যে আপনার প্রতি প্রসন্ন নয়?'

বনলক্ষ্মী ব্যথিত স্বরে বলিল,—'মুকুল আর নেপালবাবু আমাকে—পছন্দ করেন না। তা ছাড়া—তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া ভুজঙ্গধরবাবুও আপনার ওপর সন্তুষ্ট নন।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভুজঙ্গবাবু হয়তো আপনাকে দেখতে পারেন না, কিন্তু সেজন্যে ও'র কর্তব্যে ত্রুটি হয় না।'

বনলক্ষ্মীর অধরে একটু তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—'না, তা হয় না। আমার কপালে খুব টিঞ্চার আয়োডিন ঢেলেছেন।'

ব্যোমকেশ হাসিল,—'যাক। —ব্রজদাস বাবাজী আর রসিকবাবুর সঙ্গে আপনার কোনও রকম অসদ্ভাব—?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'ব্রজদাস ঠাকুর খুব ভাল লোক ছিলেন, আমাকে স্নেহ করতেন। কেন যে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন—।'

'আর রসিকবাবু?'

'রসিকবাবুকে আমি দেখেছি, এই পর্যন্ত। কখনও কথা হয়নি।—তিনি মিশুক লোক ছিলেন না, নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন।'

'ওকথা যাক। আপনি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো?'

বনলক্ষ্মী একটু হাসিল,—'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে বাঁধা বুলিটা আউড়ে নিই। সে রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

বনলক্ষ্মীর চোখে অন্ধকার জমিয়া উঠিল। অতি অস্ফুট স্বরে সে বলিল,—'কাকাবাবুর মৃত্যু তাহলে—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাই মনে হচ্ছে।'

বনলক্ষ্মী ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'সে রাত্রে রান্নাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসার পর আমি অনেকক্ষণ কলে সেলাই করেছিলুম।'

বাহিরের ঘরে একটি পায়ে-চালানো সেলাইয়ের মেশিন দেখিয়াছি; পূর্বে নিশানাথবাবু বনলক্ষ্মীকে দর্জিখানার পরিচালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়িল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলিল,—'আপনি তো কলোনীর সকলের জামা-কাপড় সেলাই করেন। অনেক কাজ জমা হয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'না, কাজ বেশী জমা হয়নি। কাকাবাবুর জন্যে সিল্কের একটা ড্রেসিং গাউন তৈরি করছিলুম।' বনলক্ষ্মীর চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি সে রাত্রে যখন সেলাইয়ের কল চালাচ্ছিলেন, তখন ভুজঙ্গধরবাবুকে সেতার বাজাতে শুনেছিলেন? ও'র কুঠি তো আপনার পাশেই।'

বনলক্ষ্মী চোখ মুছিয়া মাথা নাড়িল,—'না, আমি কিছু শুনিনি। কানের কাছে কল চলছিল, শুনব কি করে!' তাহার যেন একটু রাগ-রাগ ভাব।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল,—'শুধু যে ভুজঙ্গধরবাবু আপনাকে দেখতে পারেন না তা নয়, আপনিও তাঁকে দেখতে পারেন না। ভুজঙ্গধরবাবু সে-রাত্রে নিজের ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছিলেন, অন্তত তাই বললেন। আপনি যদি না শুনে থাকেন, তাহলে বলতে হবে উনি মিথ্যে কথা বলেছেন।'

এবার বনলক্ষ্মীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। লজ্জা ও অনুতাপ-ভরা মুখে সে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—'না! উনি সেতার বাজাচ্ছিলেন। আমি কল চালাবার ফাঁকে ফাঁকে শুনেছিলাম!'

ব্যোমকেশ তাহার হাতটি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'তবে যে আগে বললেন শোনেননি!'

বনলক্ষ্মীর অধর স্ফুরিত হইল, অনুতাপের সহিত অভিমান মিশ্রিত হইল। সে বলিল,—'উনি আমার সঙ্গে যেরকম ব্যাভার করেন—'

'কিন্তু কেন ও রকম ব্যবহার করেন? কোনও কারণ আছে কি?'

বনলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া একবার কপালের উপর আঙুল বুলাইয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—'সে আপনার শুনে কাজ নেই।'

'কিন্তু আমার যে জানা দরকার।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ আবার অনুরোধ করিল। তখন বনলক্ষ্মী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার কথা বোধহয় শুনেছেন, নিজের দোষে ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছি। কাকাবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই—নইলে—

'আমি এখানে আশ্রয় পাবার পর ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যাভার করেছিলেন। উনি খুব মিশুক, ও'কে আমার খুব ভাল লাগত। উনি চমৎকার সেতার বাজাতে পারেন। আমার ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনার দিকে ঝোঁক, কিন্তু কিছু শিখতে পারিনি। একদিন ও'র কাছে গিয়ে বললুম, আমি সেতার শিখব, আমাকে শেখাবেন?'......

'তারপর?'

বনলক্ষ্মীর চোখ ঝাপ্সা হইয়া গেল—'উনি যে প্রস্তাব করলেন, তাতে ছুটে পালিয়ে এলুম......আমি জীবনে একবার ভুল করেছি তাই উনি মনে করেন আমি—'

তাহার স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গবাবু তো খাসা মানুষ। একথা কেউ জানে?'

বনলক্ষ্মী জিভ্ কাটিল,—'আমি কাউকে বলিনি। একথা কি বলবার? বললে কেউ বিশ্বাস করত না......যে-মেয়ের একবার বদনাম হয়েছে—'

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। বনলক্ষ্মী চমকিয়া ত্রস্তস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'উনি—বিজয়বাবু আসছেন। ও'কে যেন কিছু বলবেন না। উনি রাগী মানুষ—'

'ভয় নেই' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারের কাছে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'কি হল? পানুগোপালের কাছ থেকে কিছু বার করতে পারলেন?'

বিজয় বিষণ্ণ বিরক্তির সহিত বলিল,—'কিছু না। পানুটা ইডিয়ট; হয়তো ওর কিছুই বলবার নেই, যখন বলতে পারবে তখন দেখা যাবে অতি তুচ্ছ কথা। আপনাদের কোনই কাজে লাগবে না।'

'তা হতে পারে। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই, কাজের কথাও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'কাল সকালে আর একবার চেষ্টা করে দেখব।'

'আচ্ছা। আজ চলি তাহলে।'

'আসুন। দরকার হলে কাল টেলিফোন করব।'

বিজয় রহিয়া গেল, আমরা বাহিরে

আসিলাম। কুঠি হইতে নামিবার স্থানটি অন্ধকার। বরাট টর্চ জ্বালিল।

পাশের যে জানালা দিয়া বনলক্ষ্মীর শয়নঘর দেখা যায়, তাহার নীচে একটা কালো কাপড়-ঢাকা মূর্তি লুকাইয়া ছিল, টর্চের প্রভা সেদিকে পড়িতেই প্রেতমূর্তির মত একটা ছায়া সট্ করিয়া সরিয়া গেল, তারপর গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হইল। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে বরাটের হাত হইতে টর্চ কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা বোকার মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর অন্ধকারে হোঁচট্ খাইতে খাইতে তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিতেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—'ধরতে পারলাম না। নেপালবাবুর কুঠির পিছন পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেল!'

বরাট বলিল,—'লোকটা কে আন্দাজ করতে পারলেন?'

'উহুঁ। তবে মেয়েমানুষ। দৌড়ুবার সময় মনে হল বাতাসে গোলাপী আতরের গন্ধ পেলাম। একবার চুড়ি কিম্বা চাবির আওয়াজও যেন কানে এল।'

'মেয়েমানুষ—কে হতে পারে?'

'মুকুল হতে পারে, মুস্কিলের বিবি হতে পারে, আবার দময়ন্তী দেবীও হতে পারেন।—চলুন, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।'

বরাট স্টেশন পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইয়া দিতে আসিল—ট্রেন তখনও আসে নাই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে। ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি মনে করবেন না আমি আপনার ওপর সর্দারি করছি। এ কাজে আমরা সহযোগী। আপনার পেছনে পুলিসের অফুরন্ত এক্তিয়ার রয়েছে, আপনি যে-কাজটা পাঁচ মিনিটে পারবেন, আমি করতে গেলে সেটা পাঁচ দিন লাগবে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি—'

বরাট হাসিয়া বলিল,—'কি কাজ করতে হবে বলুন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'গুপ্তচর লাগাতে হবে। কলোনী থেকে কে কখন কলকাতায় যাচ্ছে তার খবর আমার দরকার। যেই খবর পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিফোন করবেন।'

'তাই হবে। কলোনীতে আর স্টেশনে লোক রাখব।—বনলক্ষ্মীর ভাঙা চুড়িটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে কী করা যাবে?'

'ওটা ফেলে দিতে পারেন। ভেবেছিলাম পরীক্ষা করাতে হবে, কিন্তু তার দরকার নেই।'

'আর কিছু?'

'আপাতত আর কিছু নয়।—আজ যা দেখলেন শুনলেন তা থেকে কি মনে হল? কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'দময়ন্তীকে সব চেয়ে বেশী সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়।'

'স্ত্রীলোকের সহকারী থাকতে পারে তো।'

ব্যোমকেশ চকিতে বরাটের পানে চোখ তুলিল।

'সহকারী কে হতে পারে?'

'সেটা বলা শক্ত। যে-কেউ হতে পারে। বিজয় হতে বাধা কি? ও যে-ভাবে কাকিমাকে আগলে আগলে বেড়াচ্ছে দেখলাম—'

'হাঁ—ভাববার কথা বটে। ওদিকে নেপালবাবুর সঙ্গেও দময়ন্তী দেবীর একটা প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে।—

'আচ্ছা, দময়ন্তীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে?'

'দুর্নাম কিছু শুনিনি, বরং ভালই শুনেছি।'

'আপনার গাড়ি এসে পড়েছে। হ্যাঁ, রসিক দে'র সবজি-দোকানের হিসেব-পত্র দেখবার ব্যবস্থা করেছি। যদি সত্যিই চুরি করে থাকে, ওর নামে ওয়ারেন্ট বার করব।'—

ট্রেনের শূন্য কামরায় ব্যোমকেশ একটা বেঞ্চিতে চিৎ হইয়া আলোর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—'চিড়িয়াখানাই বটে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হঠাৎ একথা কেন?

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কি? নাম কাটা ডাক্তার সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, মুখপোড়া প্রফেসার রাত দুপুরে মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলে, কর্তাকে দোর-বন্ধ বাড়িতে ঢুকে কেউ খুন করে যায়, কিন্তু পাশের ঘরে গৃহিণী কিছু জানতে পারেন না, কর্তার ভাইপো খুড়োর তহবিল ভেঙে সগর্বে সেকথা প্রচার করে, বোষ্টম ফেরারী হয়, গাড়োয়ানের বৌ আড়ি পাতে—। চিড়িয়াখানা আর কাকে বলে?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজকের অনুসন্ধানে কিছু পেলে?'

'এইটুকু পেলাম যে সবাই মিথ্যে কথা বলছে। নির্জলা মিথ্যে বলছে না। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে এমনভাবে বলছে যে কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে ধরা যায় না।'

'বনলক্ষ্মীও মিথ্যে বলেছে?'

'অন্তত বলবার তালে ছিল। নেহাৎ বিবেকের দংশনে সত্যি কথা বলে ফেললে।'

'আচ্ছা, অ্যালিবাই সম্বন্ধে কি মনে হল?'

'কারুর অ্যালিবাই পাকা নয়। বিজয় বলছে, ঠিক যে-সময় খুন হয় সে-সময় সে কলকাতায় ছিল, অথচ তার কোনও সাক্ষী প্রমাণ নেই, বেনামী চিঠিখানা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নেপালবাবু মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন, কেউ তাঁদের খেলতে দেখেনি। ডাক্তার অন্ধকারে সেতার বাজাচ্ছিলেন, একজন কানে শুনেছে কিন্তু কেউ চোখে দেখেনি। বনলক্ষ্মী কলে সেলাই করছিল, সাক্ষী নেই। দময়ন্তীর কথা ছেড়েই দাও। এর নাম কি অ্যালিবাই?'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ বাহিরের সুপ্যমান আলো-আঁধারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর যখন মুখ ফিরাইল তখন দেখিলাম তাহার ললাটে চিন্তার ভ্রূকুটি। সে বলিল, 'বনলক্ষ্মী একবার আমার হাত ধরেছিল, লক্ষ্য করেছিলে?'

বলিলাম, 'লক্ষ্য আবার করিনি! তুমিও দু'হাতে তার হাত ধরে কত আদর করলে দেখলাম।'

ব্যোমকেশ ফিকা হাসিল, 'আদর করিনি, সহানুভূতি দেখাচ্ছিলাম। —কিন্তু আশ্চর্য বনলক্ষ্মীর বাঁহাতের তর্জনীর ডগায় কড়া পড়েছে।'

বলিলাম, 'এ আর আশ্চর্য কি? যারা সেলাই করে তাদের আঙুলে কড়া পড়েই থাকে।'

ব্যোমকেশ চিন্তাক্রান্ত মুখে সিগারেটে একটা সুখ-টান দিয়া সেটা বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর আবার লম্বা হইয়া শুইল।

সে-রাত্রে বাসায় ফিরিতে সাড়ে এগারোটা বাজিল। আর কোনও কথা হইল না। তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১৮

ঘুম ভাঙিল মাথার মধ্যে ঝন্‌ঝন্ শব্দে। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, মনে হইল কানের কাছে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কয়েক দিন আগে ঘুমের মধ্যে এমনি আর্ত আহ্বান আসিয়াছিল।

আজ আর বিছানায় থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে আসিয়া টেলিফোন ধরিয়াছে। আমি তক্তপোষের পাশে বসিয়া একতরফা সংলাপ শুনিলাম—

......হ্যালো ...বিজয়বাবু! ......কী! মারা গেছে! কখন?......কী হয়েছিল......আমি যেতে পারি, কিন্তু এখন গিয়ে লাভ কি? ......আপনি বরং ইন্‌স্পেক্টর বরাটকে ফোন করুন, তিনি ব্যবস্থা করবেন...... হ্যাঁ, পোস্ট মর্টেম হওয়া চাই, আর ওষুধের শিশিটা পরীক্ষা হওয়া চাই......আচ্ছা—'

টেলিফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ একটা আরাম চেয়ারে বসিল। আমার ঠোঁটের কাছে যে প্রশ্নটা ধড়ফড় করিতেছিল তাহা বাহির হইয়া আসিল,—'কে? কে গেল?'

ব্যোমকেশের চোখে মুখে যেন দুঃস্বপ্নের জড়তা লাগিয়া ছিল, সে মুখের উপর হাত চালাইয়া তাহা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল,—'পানুগোপাল। কিছুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বোধ হয় কানে ওষুধ দিয়েছিল; ওষুধের শিশিটা ছিপি-খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওষুধে বিষ মেশানো ছিল, বিষের জ্বালায় সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায়। সেইখানেই মৃত্যু হয়েছে।—আমার দোষ। আমার ভাবা উচিত ছিল, পানু যদি সত্যিই কোনও গুরুতর কথা জানতে পেরে থাকে তাহলে তার প্রাণের আশঙ্কা আছে। কেন সাবধান হইনি! কেন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি! কিন্তু কাল বিজয় বললে, ওটা একটা ইডিয়ট, হয়তো কিছুই বলবার নেই। আমার মনও সেই কথায় ভিজে গেল—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ চুপ করিল। তাহার তীব্র আত্মগ্লানির মধ্যে আবার কোন নূতন সংশয় মাথা তুলিয়াছে, সে মুখের উপর একটা হাত ঢাকা দিয়া নীরব হইয়া রহিল।

তারপর সকাল হইল; পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। ব্যোমকেশ কিন্তু চা স্পর্শ করিল না, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাইল না, মোহগ্রস্তের মত মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আরাম চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

আমার মনটা বিকল হইয়া গিয়াছিল। পানুগোপাল ছেলেটা প্রকৃতির কৃপণতায় অসুস্থ দেহ লইয়া জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। তাহার হৃদয় ছিল, হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ছিল। নিশানাথবাবু তাহাকে ভালবাসিতেন, আমারও তাহাকে ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সংবাদ কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধিয়া রহিল।

বেলা বারোটার সময় ব্যোমকেশ নিঃশব্দে উঠিয়া স্নানাহার করিল, তারপর পাখা চালাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। সে যে দিবা-নিদ্রা দিবার জন্য শয়ন করিল না তাহা বুঝিলাম। পানুগোপালের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দোষী মনে করিতেছে, একান্ত নিভৃতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চায়। এবং যে অদৃশ্য নরঘাতক পর-পর দুইটি মানুষকে নিঃশব্দে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল তাহার ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়া তাহাকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে চায়।

অপরাহ্নে দুইজনে নীরবে বসিয়া চা-পান করিলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা শাণ দেওয়া ক্ষুরের মত হিংস্র এবং কঠিন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট লইয়া প্রমোদ বরাট আসিল। ব্যোমকেশের হাতে রিপোর্ট দিয়া বলিল,—'নিকোটিন বিষে মৃত্যু হয়েছে। ওষুধের শিশিতেও নিকোটিন পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ বরাটের সম্মুখে সিগারেটের টিন রাখিয়া পুঁটিরামকে আর এক দফা চায়ের হুকুম দিল; রিপোর্ট পড়িয়া কোনও মন্তব্য না করিয়া আমার হাতে দিল।

রাত্রি দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। পানুর কানের মধ্যে ক্ষত ছিল, রাত্রে শয়নের পূর্বে শিশির ঔষধে তুলা ভিজাইয়া কানে দিয়াছিল। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। কিন্তু কাল কেহ অলক্ষিতে আসিয়া তাহার ঔষধে বিষ মিশাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বিষ রক্তের সহিত মিশিবার অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।—পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ও বরাটের মুখের কথা হইতে এই তথ্যগুলি প্রকাশ পাইল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'মৃতদেহ কে প্রথম আবিষ্কার করে?'

বরাট বলিল,—'নেপালবাবুর মেয়ে—মুকুল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বরাটের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'এবারেও মুকুল। আশ্চর্য।'

বরাট বলিল,—'যা শুনলাম, ভোর রাত্রে উঠে বাগানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েটার অভ্যেস।'

'হুঁ।—আপনি খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন?'

'সকলকেই সওয়াল করেছিলাম কিন্তু কাজের কথা কিছু পেলাম না।'

'পানু যে-ওষুধ কানে দিত সেটা কি ভুজঙ্গধরবাবুর দেওয়া ওষুধ?'

'হ্যাঁ। ওষুধে ছিল স্রেফ গ্লিসারিন আর বোরিক পাউডার। ভুজঙ্গধরবাবু বললেন তিনি মাসে এক শিশি পানুকে তৈরি করে দিতেন, পানু তাই কানে দিত। কাল রাত্রি দশটার আগে কোনও সময় হত্যাকারী এসে তার শিশিতে নিকোটিন মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত পানু তখন খেতে গিয়েছিল।'

'কে কখন খেতে গিয়েছিল খবর নিয়েছেন?'

'সকলে একসঙ্গে খেতে যায়নি, কেউ আগে কেউ পরে। পানু খেতে গিয়েছিল আন্দাজ পৌনে দশটার সময়, অর্থাৎ আমরা চলে আসবার পরই।'

'কাল রান্না করেছিল কে?'

'দময়ন্তী আর মুকুল। দু'জনেই সারা-ক্ষণ রান্নাঘরে ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুঁটিরাম চা ও জল-খাবার দিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিকোটিন। অজিত, লক্ষ্য করেছ, দ্বিতীয়বার নিকোটিনের আবির্ভাব হল।'

বলিলাম,—'হ্যাঁ। তার মানে—সুনয়না।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু সুনয়না বা অন্য কোনও স্ত্রীলোক নিশানাথবাবুকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারে এ প্রস্তাব আমরা আগেই খারিজ করেছি। ধরে নিতে হবে সুনয়নার একজন সহকর্মী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সহকর্মী কিম্বা সহকর্মিণী। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যে-কাজ অসম্ভব, দু'জন স্ত্রীলোক মিলে সে কাজ সহজেই করতে পারে। কিন্তু আসল কথা নিকোটিন। এ বিষ এল কোত্থেকে? ইন্‌স্‌পেক্টর বরাট, আপনি নিকোটিন সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

বরাট বলিল,—'ওটা একটা ভয়ঙ্কর বিষ এই জানি। আপনার মুখে সুনয়নার কথা শোনবার পর খোঁজখবর নিয়েছিলাম, দেখ-লাম ওষুধের দোকানে ও-মাল পাওয়া যায় না; কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এক যদি কোনও বড় ফ্যাক্টরীতে তৈরি হয় তো বলতে পারি না।'

'এক হতে পারে যে-ব্যক্তি বিষ ব্যবহার করেছে সে নিজে একজন কেমিস্ট কিম্বা কোনও কেমিস্টকে দিয়ে বিষ তৈরি করিয়েছে।'

'তা হতে পারে। কেমিস্ট তো একজন হাতের কাছেই রয়েছে—নেপাল গুপ্ত।'

'যদি নেপাল গুপ্ত হয়, সুনয়নার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?'

'বাপ-বেটি হতে বাধা কি?'

আমি বলিলাম,—'নেপালবাবুর সঙ্গে দময়ন্তী দেবীরও যোগাযোগ আছে—তাঁরা দু'জন হতে পারেন।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—'দময়ন্তী দেবী আর বিজয় হতে পারে, বিজয় আর বনলক্ষ্মী হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর দময়ন্তী হতে পারে, দময়ন্তী আর ভুজঙ্গধর হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর ব্রজ-দাস হতে পারে, এমন কি মুস্কিল মিঞা আর নজর বিবি হতে পারে। সম্ভাবনা অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু কেবল সম্ভাবনার কথা গবেষণা করে কোনও লাভ হবে না। পাকাপাকি জানতে হবে।'

বরাট জলযোগ শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—'বেশ তো, পাকাপাকি জানার একটা উপায় বলুন না। পুলিসের দিক থেকে আর কোনও বাধা নেই, পানুকে যে খুন করা হয়েছে, আমার কর্তারা তা স্বীকার করবেন; সুতরাং পুলিশের যা-কিছু কর্তব্য সবই আমি করতে পারি। এখন কি করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এক, কলোনীর সকলের কুঠি খানাতল্লাস করে দেখতে পারেন, কিন্তু নিকোটিন পাবেন না। আমার মনে হয় রুটিন মাফিক কাজে কোনও ফল

হবে না। বরং আপাতত কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকাই ভাল।'

'চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'একেবারে হাত গুটোবার দরকার নেই। ব্রজদাস আর রসিকের তল্লাস যেমন চলছে চলুক। রসিকের দোকানের খাতাপত্র পরীক্ষা করুন। আর কলোনীতে গুপ্তচর বসান। কে কখন বাইরে যাচ্ছে সেটা জানা বিশেষ দরকার।'

বরাট গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—'আজ থেকেই লোক লাগাবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু পানুর ব্যাপারে সব গোলমাল হয়ে গেছে। কাল থেকে হবে।—কলোনীতে আর কারুর হঠাৎ মৃত্যুর যোগ নেই তো?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'বোধ হয় না। থাকলেও আমরা ঠেকাতে পারব না।'

১৯

দুই দিন গোলাপ কলোনীর দিক হইতে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না; প্রমোদ বরাটও খবর দিল না। মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন কলোনীর কথা যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ টেলিফোনের দিকে চোখ রাখিয়া অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দু'একবার আমরা দাবার ছক সাজাইয়া বসিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, খেলা জমিল না।

তৃতীয় দিন বিকাল বেলা চা পানের পর ব্যোমকেশ বলিল—'আমি একটু বেরুব।'

আমারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিলাম,—'কোথায় যাবে?'

'সেন্ট্ মার্থার স্কুলে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। তুমি কিন্তু বাড়িতেই থাকবে। যদি টেলিফোন আসে—'

ব্যোমকেশ চলিয়া গেল। তারপর দু'ঘণ্টা কড়িকাঠ গুনিয়া কাটাইয়া দিলাম। ছ'টা বাজিতে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বাজিল। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

বরাট টেলিফোন করিতেছে। বলিল, —'বেরিয়েছেন?—তাঁকে বলে দেবেন ভুজঙ্গধরবাবু কোট-প্যাণ্ট পরে পৌনে ছ'টার ট্রেনে কলকাতা গেছেন। —আর একটা খবর আছে, রসিক দে'র খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন হাজার টাকার গরমিল। রসিকের নামে ওয়ারেন্ট বার করেছি।'

'কলোনীর খবর কী?'

'নতুন খবর কিছু নেই।'

বরাট টেলিফোন ছাড়িয়া দিবার পর মনটা আরও অস্থির হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গধর বাবু কলিকাতায় আসিতেছেন এ সংবাদের গুরুত্ব কতখানি কিছুই জানি না। ব্যোমকেশ কখন ফিরিবে?

ব্যোমকেশ ফিরিল সওয়া ছ'টার সময়। ভুজঙ্গধরবাবুর সংবাদ দিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, —'ট্রেন এসে পৌঁছতে এখনও আধঘণ্টা। অনেক সময় আছে।' বলিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি দ্বারের নিকট হইতে বলিলাম, —'রসিক দে দোকানের তিন হাজার টাকা মেরেছে।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল—'বেশ বেশ।'

পাঁচ মিনিট পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি আধবয়সী ফিরিঙ্গী। পরিধানে ময়লা জিনের প্যাণ্টলুন ও রঙ-চটা আলপাকার কোট, মাথায় তেল-চিটে নাইট ক্যাপ, ছাঁটা গোঁফের ভিতর হইতে আধ-পোড়া একটা চুরুট বাহির হইয়া আছে।

বাহির হইয়া আসিল একটি আধবয়সী ফিরিঙ্গী

বলিলাম—'এ কি, গোয়েন্দা পিদ্রু সেজে কোথায় চললে?'

সাহেব কড়া সুরে বলিল,—'None of your business, young man.' বলিয়া পা ঘষিয়া ঘষিয়া বাহির হইয়া গেল।

তারপর সাড়ে দশটার আগে আর তাহার দেখা পাইলাম না। একেবারে স্নান সারিয়া গরম চায়ের পেয়ালা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

আমি বলিলাম,—'কোট-প্যাণ্টলুনের একটা মহৎ গুণ, পরলেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। আশা করি মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোট-প্যাণ্টলুনের আর একটা মহৎ গুণ, বেশী ছদ্মবেশ দরকার হয় না। —তুমি বোধহয় খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছ?'

'তা উঠেছি। এবার তোমার হৃদয়ভার লাঘব কর।'

'কোনটা আগে বলব? ভুজঙ্গধরবাবুর বৃত্তান্ত?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল, —'বুঝতেই পেরেছ ফিরিঙ্গী সেজে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ভুজঙ্গধরবাবু কোথায় যান দেখা। স্টেশনে তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর পিছু নিলাম। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। তাঁকে অনুসরণ করা শক্ত হল না। তিনি

ভুজঙ্গধরবাবু গিয়ে তাদের সঙ্গে খাটো গলায় কথা বললেন

ট্রামে চড়লেন, আমিও ট্রামে চড়লাম মৌলালির মোড়ে এসে তিনি নামলেন আমিও নামলাম। তারপর ধর্মতলা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। গলির পর গলি, তস্য গলি দেখলাম ফিরিঙ্গিপাড়ায় এসে পোঁছেছি। ভালই হল, পাড়ার সঙ্গে আমার ছদ্মবেশ খাপ খেয়ে গেল। কোট-প্যাণ্টুলুনের ওই মাহাত্ম্য, যে পাড়াতেই যাও বেমানান হয় না।'

'তারপর?'

'একটা এ'দোপড়া বাড়ির দরজার পাশে দুটো স্ত্রীলোক দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভুজঙ্গধরবাবু গিয়ে তাদের সঙ্গে খাটো গলায় কথা বললেন, তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। স্ত্রীলোক দু'টো দাঁড়িয়ে রইল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তাদের দেখে কি রকম মনে হল?'

ব্যোমকেশের মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—

'দেবতা ঘুমালে তাহাদের দিন
দেবতা জাগিলে তাদের রাতি
ধরার নরক সিংহদুয়ারে
জ্বালায় তাহারা সন্ধ্যাবাতি।'

'তারপর বল।'

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। ভুজঙ্গধরবাবুর চরিত্র আমরা যতটা জানতে পেরেছি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই এ'দোপড়া বাড়িটাই তাঁর একমাত্র গন্তব্যস্থল কিনা তা না জেনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমি বাড়ির সামনে দিয়ে একবার হে'টে গেলাম, দেখে নিলাম বাড়ির নম্বর উনিশ। তারপর একটা অন্ধকার কোণে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেয়ে দুটো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে ভুজঙ্গধরবাবু বেরুলেন। আশে পাশে দৃক্‌পাত না করে যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে চললেন। আমিও চললাম। তারপর সটান শেয়ালদা স্টেশনে তাঁকে ন'টা পঞ্চান্নর গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

চায়ের পেয়ালা এক চুমুকে শেষ করিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। আমি বলিলাম,—'তাহলে ভুজঙ্গধরবাবুর কার্য-কলাপ থেকে কিছুই ধরা গেল না?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'কেমন যেন ধোঁকা লাগল। ভুজঙ্গধরবাবু যখন দরজা থেকে বেরুলেন তখন তাঁর পকেট থেকে কি একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। ঝিনিৎ করে শব্দ হল। তিনি দেশলাই জেলে সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন। দেখলাম

একটা চাবির রিঙ, তাতে গোটাতিনেক বড় বড় চাবি রয়েছে।'

'এতে ধোঁকা লাগবার কি আছে?'

'হয়তো কিছু নেই, তবু ধোঁকা লাগছে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর বলিলাম, —'ওদিকে কী হল? সেণ্ট্ মার্থা স্কুল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবী মাস আষ্টেক স্কুলে যাতায়াত করেছিলেন। রোজ যেতেন না, ইংরেজি শেখার দিকেও খুব বেশি চাড় ছিল না। স্কুলে দু' তিনটি পাঞ্জাবী মেয়ে পড়ত, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন—

'পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। দময়ন্তী দেবী পাঞ্জাবী ভাষা জানেন।'

এই সময় টেলিফোন বাজিল। ব্যোমকেশ টপ্ করিয়া ফোন তুলিয়া লইল—'হ্যালো......ইন্স্পেক্টর বরাট! এত রাত্রে কী খবর?......রসিক দে ধরা পড়েছে! কোথায় ছিল......অ্যাঁ। শিয়ালদার কাছে 'বঙ্গ বিলাস' হোটেলে! সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু ছিল?......মাত্র ত্রিশ টাকা!......আজ তাকে আপনাদের লক্-আপে রাখুন, কাল সকালেই আমি গিয়ে হাজির হব। ......আর কি! হ্যাঁ দেখুন, একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আপনার একজন লোক পাঠিয়ে সেখানকার হালচাল সব সংগ্রহ করতে হবে......১৯ নম্বর মির্জা লেন......হ্যাঁ, স্থানটা খুব পবিত্র নয়......কিন্তু সেখানে গিয়ে আলাপ জমাবার মতন লোক আপনাদের বিভাগে নিশ্চয় আছে...... হাঃ হাঃ হাঃ......আচ্ছা, কাল সকালেই যাচ্ছি......নমস্কার।'

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, আজ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া যাক, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

২০

গোলাপ কলোনীর ঘটনাবলী ধাবমান মোটরের মত হঠাৎ বানচাল হইয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, তিন দিন পরে মেরামত হইয়া আবার প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন সকালে আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মোহনপুরের স্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম। আকাশে শেষরাত্রি হইতে মেঘ জমিতেছিল, সূর্য ছাই-ঢাকা আগুনের মত কেবল অন্তর্দাহ বিকীর্ণ করিতেছিলেন। আমরা পদব্রজে থানার দিকে চলিলাম।

থানার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি এমন সময় নেপালবাবু বন্য বরাহের ন্যায় থানার ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমাদের দিকে মোড় ঘুরিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ছুটিয়া চলিলেন।

ব্যোমকেশ ডাকিল,—'নেপালবাবু, শুনুন —শুনুন।'

নেপালবাবু যুযুৎসু ভঙ্গীতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহার কাছে গিয়া বলিল,—'এ কি, আপনি থানায় গিয়েছিলেন! কী হয়েছে?'

নেপালবাবু ফাটিয়া পড়িলেন,—'ঝক্-মারি হয়েছে! পুলিসকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, আমার ঘাট হয়েছে। পুলিসের খুরে দণ্ডবৎ।' বলিয়া আবার উল্টামুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল—'কিন্তু ব্যাপারটা কি? পুলিসকে কোন বিষয়ে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন?'

ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে নেপালবাবু বলিলেন,—'না না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। কোন্ শালা আর পুলিসের কাজে মাথা গলায়। আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তাই—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু আমাকে বলতে দোষ কি? আমি তো আর পুলিস নই।'

নেপালবাবু কিন্তু বাগ মানিতে চান না। অনেক কষ্টে অনেক পিঠে হাত বুলাইয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে কতকটা ঠাণ্ডা করিল। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা হইল। নেপালবাবু বলিলেন,—'কলোনীতে দুটো-দুটো খুন হয়ে গেল, পুলিস চুপ করে বসে থাকতে পারে কিন্তু আমি চুপ করে থাকি কি করে? আমার তো একটা দায়িত্ব আছে! আমি জানি কে খুন করেছে, তাই পুলিসকে বলতে গিয়েছিলাম। তা পুলিস উল্টে আমার ওপরেই চাপ দিতে লাগল। ভাল রে ভাল—যেন আমিই খুন করেছি!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি জানেন কে খুন করেছে?'

'এর আর জানাজানি কি? কলোনীর সবাই জানে, কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস কারুর নেই।'

'কে খুন করেছে?'

'বিজয়! বিজয়! আর কে খুন করবে? খুড়ীর সঙ্গে ষড় করে আগে খুড়োকে সরিয়েছে, তারপর পানুকে সরিয়েছে। পানুটাও দলে ছিল কি না!'

'কিন্তু—পানু কিসে মারা গেছে আপনি জানেন?'

'নিকোটিন। আমি সব খবর রাখি।'

'কিন্তু বিজয় নিকোটিন পাবে কোথায়? নিকোটিন কি বাজারে পাওয়া যায়?'

'বাজারে সিগারেট তো পাওয়া যায়। যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি আছে সে এক প্যাকেট সিগারেট থেকে এত নিকোটিন বার করতে পারে যে কলোনী শুদ্ধ লোককে তা দিয়ে সাবাড় করা যায়।'

'তাই নাকি? নিকোটিন তৈরি করা এত সহজ?'

'সহজ নয় তো কী! একটা বকযন্ত্র জোগাড় করতে পারলেই হল।' এই পর্যন্ত বলিয়া নেপালবাবু হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন, তারপর আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্টেশনের দিকে পা চালাইলেন।

আমরাও সঙ্গে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি বৈজ্ঞানিক, আপনার কথাই ঠিক। আমি জানতাম না নিকোটিন তৈরি করা এত সোজা।—তা আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন? কলোনীতে ফিরবেন না?'

'কলকাতা যাচ্ছি একটা বাসা ঠিক করতে —কলোনীতে ভদ্দর লোক থাকে না—' বলিয়া তিনি হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা থানার দিকে ফিরিলাম। ব্যোমকেশের ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র হাসি খেলা করিতে লাগিল।

থানায় প্রমোদ বরাটের ঘরে আসন গ্রহণ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'রাস্তায় নেপাল গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল।'

বরাট বলিল,—'আর বলবেন না, লোকটা বদ্ধ পাগল। সকাল থেকে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বিশ্বাস বিজয় খুন করেছে, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ কিছু নেই, শুধু আক্রোশ। আমি বললাম, আপনি যদি বিজয়ের নামে পুলিসে ডায়েরী করাতে চান আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পরে যদি বিজয় মানহানির মামলা করে তখন আপনি জানেন। এই শুনে নেপাল গুপ্ত উঠে পালাল। আসল কথা বিজয় ওকে নোটিস্ দিয়েছে; বলেছে, চুপটি করে কলোনীতে থাকতে পারেন তো থাকুন, নৈলে রাস্তা দেখুন, সর্দারি করা এখানে চলবে না। তাই এত রাগ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমারও তাই আন্দাজ হয়েছিল।—যাক, এবার আপনার রসিককে বার করুন।'

রসিক আনীত হইল। হাজতে রাত্রিবাসের ফলে তাহার চেহারার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। খুঁৎখুঁতে মুখে নিপীড়িত একগুঁয়েমির ভাব। আমাদের দেখিয়া একবার ঢোক গিলিল, কণ্ঠার হাড় সবেগে নড়িয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে জেরা করিয়া ব্যোমকেশ কোনও কথাই বাহির করিতে পারিল না। বস্তুত রসিক প্রায় সারাক্ষণই নির্বাক হইয়া রহিল। সে চুরি করিয়াছে কি না এ প্রশ্নের জবাব নাই, টাকা লইয়া কী

করিল এ বিষয়েও নিরুত্তর। কেবল একবার সে কথা কহিল, তাহাও প্রায় অজ্ঞাতসারে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'যে রাত্রে নিশানাথবাবু মারা যান সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছিল?'

রসিক চোখ মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, বলিল, 'নিশানাথবাবু মারা গেছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। পানুগোপালও মারা গেছে। আপনি জানেন না?'

রসিক কেবল মাথা নাড়িল।

তারপর ব্যোমকেশ আরও প্রশ্ন করিল কিন্তু উত্তর পাইল না। শেষে বলিল,—'দেখুন, আপনি চুরির টাকা নষ্ট করেন নি, কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি আমাদের জানিয়ে দেন কোথায় টাকা রেখেছেন তাহলে আমি বিজয়বাবুকে বলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়ে নেব, আপনাকে জেলে যেতে হবে না।—কোথায় কার কাছে টাকা রেখেছেন বলবেন কি?'

রসিক পূর্ববৎ নির্বাক হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যোমকেশ হাল ছাড়িয়া দিল। বলিল,—'আপনি ভাল করলেন না। আপনি যে-কথা লুকোবার চেষ্টা করছেন তা আমরা শেষ পর্যন্ত জানতে পারবই। মাঝ থেকে আপনি পাঁচ বছর জেল খাটবেন।'

রসিকের কণ্ঠার হাড় আর একবার নড়িয়া উঠিল, সে যেন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল। তারপর আবার দৃঢ়ভাবে ওষ্ঠাধর সম্বন্ধ করিল।

রসিককে স্থানান্তরিত করিবার পর ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল,—'এদিকে তো কিছু হল না—কিন্তু আর দেরি নয়, সব যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে—'

বরাট বলিল,—'কী প্ল্যান?'

প্ল্যান কিন্তু শোনা হইল না। এই সময় একটি বকাটে ছোকরা গোছের চেহারা দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইয়া বলিল,—'ব্রজদাস বোষ্টমকে পাক্‌ড়েছি স্যার।'

বরাট বলিল—'বিকাশ! এস। কোথায় পাক্‌ড়ালে বোষ্টমকে?'

বিকাশ ঘরে প্রবেশ করিয়া দন্তবিকাশ করিল,—'নবদ্বীপের এক আখড়ায় বসে খঞ্জনী বাজাচ্ছিল। কোনও গোলমাল করেনি। যেই বললাম, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে, অমনি সুস্‌সুড় করে চলে এল।'

'বাঃ বেশ। এই ঘরেই পাঠিয়ে দাও তাকে।'

ব্রজদাস বৈষ্ণব ঘরে প্রবেশ করিলেন। গায়ে নামাবলী, মুখে কয়েক দিনের অঙ্কোরিত দাড়ি-গোঁফ মুখখানিকে ধুতুরা-ফলের মত কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, চোখে লজ্জিত অপ্রস্তুত ভাব। তিনি বিনয়াবনত হইয়া জোড় হস্তে আমাদের নমস্কার করিলেন।

বরাট ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিল, ব্যোমকেশ ব্রজদাসের দিকে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—'বসুন।'

ব্রজদাস যেন আরও লজ্জিত হইয়া একটি টুলের উপর বসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি হঠাৎ ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো? যতদূর জানি কলোনীর টাকাকড়ি কিছু আপনার কাছে ছিল না।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আজ্ঞে না।'

'তবে পালালেন কেন?'

ব্রজদাস কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, নিশানাথ বলিয়াছিলেন ব্রজদাস মিথ্যা কথা বলে না। ইহাও কি সম্ভব? পাছে সত্য কথা বলিতে হয় এই ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন! কিন্তু কী এমন মারাত্মক সত্য কথা?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, ও কথা পরে হবে। এখন বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানেন?

ব্রজদাস বলিলেন,—'না, কিছু জানি না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে—?' ব্যোমকেশ থামিয়া গিয়া বলিল, 'নিশানাথবাবুর মৃত্যুর রাত্রে আপনি কলোনীতেই ছিলেন তো?'

'আজ্ঞে, কলোনীতেই ছিলাম।'

লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস এতক্ষণে যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছেন, কাঁচুমাচু ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আমি আর ডাক্তারবাবু একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে এলাম, উনি নিজের কুঠিতে গিয়ে সেতার বাজাতে লাগলেন, আমি নিজের দাওয়ায় শুয়ে তাঁর বাজনা শুনলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'ও!—ভুজঙ্গধরবাবু সেতার বাজাচ্ছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মালকোষের আলাপ করছিলেন।'

'কতক্ষণ আলাপ করেছিলেন?'

'তা প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। চমৎকার হাত ও'র।'

'হুঁ। একটানা আলাপ করেছিলেন? একবারও থামেন নি?'

'আজ্ঞে না, একবারও থামেন নি।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যেও নয়?'

'আজ্ঞে না। সেতারের কান মোচ্‌ড়াবার জন্য দু'একবার থেমেছিলেন, তা সে পাঁচ-দশ সেকেন্ডের জন্য, তার বেশি নয়।'

'কিন্তু আপনি তাঁকে বাজাতে দেখেন নি?'

'দেখব কি করে? উনি অন্ধকারে বসে বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি ও'র আলাপ চিনি, উনি ছাড়া আর কেউ নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল।—

'আপনি কলোনীতে আসবার আগে থেকেই নিশানাথবাবুকে চিনতেন?'

আবার ব্রজদাসের মুখ শুকাইল। তিনি উস্‌খুস করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ও'র সেরেস্তায় কাজ করতেন, উনি সাক্ষী দিয়ে আপনাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চুরি করেছিলাম।'

'বিজয় তখন নিশানাথবাবুর কাছে থাকত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দময়ন্তী দেবীর তখন বিয়ে হয়েছিল?'

ব্রজদাসের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, তিনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'উত্তর দিচ্ছেন না যে? দময়ন্তী দেবীকে তখন থেকেই চেনেন তো?'

ব্রজদাস অস্পষ্টভাবে হ্যাঁ বলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'তার মানে নিশানাথ আর দময়ন্তীর বিয়ে তার আগেই হয়েছিল—কেমন?'

ব্রজদাস এবার ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'এই জন্যেই আমি পালিয়েছিলাম। আমি জানতাম আপনারা এই কথা তুলবেন। দোহাই ব্যোমকেশ বাবু, আমাকে ও প্রশ্ন করবেন না। আমি দশ বছর ও'দের অন্ন খেয়েছি। আমাকে নিমকহারামি করতে বলবেন না।' বলিয়া তিনি কাতরভাবে হাত জোড় করিলেন।

ব্যোমকেশ সোজা হইয়া বসিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'এ সব কী ব্যাপার?'

ব্রজদাস ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'আমি জীবনে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, আর মিথ্যে কথা বলব না। জেল থেকে বেরিয়ে আমি বৈষ্ণব হয়েছি, কণ্ঠী নিয়েছি; কিন্তু শুধু কণ্ঠী নিলেই তো হয় না, প্রাণে ভক্তি কোথায়, প্রেম কোথায়? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর মিথ্যে কথা বলব না, তাতে যদি ঠাকুরের কৃপা হয়।—আপনারা আমায় দয়া করুন, ও'দের কথা জিগ্যেস করবেন না। ও'রা আমার মা বাপ।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল,—'আপনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম যে আপনি

মিথ্যে কথা বলেন না, কিন্তু নিশানাথ সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতেও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে। মিথ্যে কথা না বলা খুবই প্রশংসার কথা, কিন্তু সত্যি কথা গোপন করায় কোনও পুণ্য নেই। ভেবে দেখুন, সত্যি কথা না জানলে আমরা নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা করব কি করে? আপনি কি চান না যে নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা হয়?'

ব্রজদাস নতমুখে রহিলেন। তারপর আমরা সকলে মিলিয়া নির্বন্ধ করিলে তিনি অসহায়ভাবে বলিলেন,—'কি জানতে চান বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথ ও দময়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারে কিছু গোলমাল আছে। কী গোলমাল?'

'ও'দের বিয়ে হয়নি।'

বোকার মত সকলে চাহিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রথমে সামলাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি প্রশ্ন করিয়া ব্রজদাস বাবাজীর নিকট হইতে যে কাহিনী উদ্ধার করিল তাহা এই—

নিশানাথবাবু পুণায় জজ ছিলেন, ব্রজদাস ছিলেন তাঁর সেরেস্তার কেরানি। লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের অপরাধে দায়রা-সোপর্দ হইয়া নিশানাথের আদালতে বিচারার্থ আসে। দময়ন্তী এই লাল সিংএর স্ত্রী।

নিশানাথের কোর্টে যখন দায়রা মোকদ্দমা চলিতেছে তখন দময়ন্তী নিশানাথের বাংলোতে আসিয়া সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া থাকিত, কান্নাকাটি করিত। নিশানাথ তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন, সে আবার আসিত। বলিত, আমি অনাথা, আমার স্বামীর সাজা হইলে আমি কোথায় যাইব?

দময়ন্তীর বয়স তখন উনিশ-কুড়ি; অপরূপ সুন্দরী। বিজয়ের বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ, সে দময়ন্তীর অতিশয় অনুগত হইয়া পড়িল; কাকার কাছে দময়ন্তীর জন্য দরবার করিত। নিশানাথ কিন্তু প্রশ্রয় দিতেন না। বিজয় যে দময়ন্তীকে চুপি চুপি খাইতে দিতেছে এবং রাত্রে বাংলোতে লুকাইয়া রাখিতেছে তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না।

লাল সিংএর ফাঁসির হুকুম হইয়া যাইবার পর নিশানাথ জানিতে পারিলেন। খুব খানিকটা বকাবকি করিলেন এবং দময়ন্তীকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দময়ন্তী কিন্তু তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বালক বিজয়ও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া নিশানাথ দময়ন্তীকে বাংলোয় থাকিতে দিলেন। বাড়ির চাকরবাকরের কাছে ব্রজদাস এই সকল সংবাদ পাইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের আপীলে লাল সিংএর ফাঁসীর হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাস হইল। দময়ন্তী নিশানাথের আশ্রয়ে রহিয়া গেল। হাকিম-হুকুম মহলে এই লইয়া একটু কানাঘুষা হইল। কিন্তু নিশানাথের চরিত্র-খ্যাতি এতই মজবুত ছিল যে প্রকাশ্যে কেহ তাঁহাকে অপবাদ দিতে সাহস করিল না।

ইহার দু'এক মাস পরে ব্রজদাসের চুরি ধরা পড়িল; নিশানাথ সাক্ষী দিয়া তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন। তারপর কয়েক বৎসর কী হইল ব্রজদাস তাহা জানেন না।

ব্রজদাস জেল হইতে বাহির হইয়া শুনিলেন নিশানাথ কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, তিনি নিশানাথের সন্ধান লইতে লাগিলেন। জেলে থাকাকালে ব্রজদাসের মতিগতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। সন্ধান করিতে করিতে তিনি গোলাপ কলোনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া ব্রজদাস দেখিলেন নিশানাথ ও দময়ন্তী স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতেছেন। নিশানাথ তাঁহাকে কলোনীতে থাকিতে দিলেন, কিন্তু সাবধান করিয়া দিলেন, দময়ন্তীঘটিত কোনও কথা যেন প্রকাশ না পায়। দময়ন্তী ও বিজয় পূর্বে ব্রজদাসকে এক-আধবার দেখিয়াছিল, এতদিন পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তদবধি ব্রজদাস কলোনীতে আছেন। নিশানাথ ও দময়ন্তীর মত মানুষ সংসারে দেখা যায় না। তাঁহারা যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন ভগবান তাহার বিচার করিবেন।

ব্যোমকেশ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ইন্সপেক্টর বরাট, চলুন একবার কলোনীতে যাওয়া যাক। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।'

ব্রজদাস করুণ স্বরে বলিলেন,—'আমার এখন কী হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনিও কলোনীতে চলুন। যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।'

২১

প্রমোদ বরাটের ঘর হইতে যখন বাহিরে আসিলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা। পাশের ঘরে থানার কয়েকজন কর্মচারী খাতা-পত্র লইয়া কাজ করিতেছিল, বরাট বাহিরে আসিলে হেড-ক্লার্ক উঠিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বরাটকে কিছু বলিল।

বরাট ব্যোমকেশকে বলিল,—'একটু অসুবিধা হয়েছে। আমাকে এখনি আর একটা কাজে বেরুতে হবে। তা আপনারা না হয় এগোন, আমি বিকেলের দিকে কলোনীতে হাজির হব।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সব সময় সকলে এক সঙ্গে গেলেই চলবে। আপনি কাজে যান, সন্ধ্যে ছ'টার সময় স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আমাদের খোঁজ করবেন।'

বরাট বলিল,—'বেশ, সেই ভাল।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'কিন্তু আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি এখন কলোনীতে ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু যে-সব কথা হল তা কাউকে বলবার দরকার নেই।'

'যে-আজ্ঞে।'

ব্রজদাস কলোনীর রাস্তা ধরিলেন, আমরা স্টেশনে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের চোখে ঠুলি আঁটা ছিল। দময়ন্তী নামটা প্রচলিত বাংলা নাম নয় এটাও চোখে পড়েনি। অমন রঙ্ এবং রূপ যে বাঙালীর ঘরে চোখে পড়ে না এ কথাও একবার ভেবে দেখিনি। দময়ন্তী এবং নিশানাথের বয়সের পার্থক্য থেকে কেবল দ্বিতীয় পক্ষই আন্দাজ করলাম, অন্য সম্ভাবনা যে থাকতে পারে তা ভাবলাম না। দময়ন্তী স্কুলে গিয়ে পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করেন এ থেকেও কিছু সন্দেহ হল না। অথচ সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। নিশানাথবাবু বোম্বাই প্রদেশে সাতচল্লিশ বছর বয়সে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের বাঙালী তরুণীকে বিয়ে করলেন এটা এক কথায় মেনে নেবার মত কথা নয়।—অজিত, মাথার মধ্যে ধূসর পদার্থ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে আসছে, এবার অবসর নেওয়া উচিত। সত্যান্বেষণ ছেড়ে ছাগল চরানো কিম্বা অনুরূপ কোনও কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তাহার ক্ষোভ দেখিয়া হাসি আসিল। বলিলাম—'ছাগল না হয় পরে চরিও, আপাতত এ ব্যাপারের তো একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দময়ন্তী নিশানাথবাবুর স্ত্রী নয়, এ থেকে কী বুঝলে?'

ক্ষুব্ধ ব্যোমকেশ কিন্তু উত্তর দিল না।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তালা লাগানো ছিল, তালা খুলাইয়া ভিতরে গিয়া বসিলাম। একটা কুলিকে দিয়া বাজার হইতে কিছু হিঙের কচুরি ও মিষ্টান্ন আনাইয়া পিত্ত রক্ষা করা গেল।

আকাশে মেঘ আরও ঘন হইয়াছে, মাঝে মাঝে চড়বড় করিয়া দু'চার ফোঁটা ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যা নাগাদ বেশ চাপিয়া বৃষ্টি নামিবে মনে হইল।

দুইটি দীর্ঘবাহু আরাম কেদারায় আমরা লম্বা হইলাম। বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে। আমি মাঝে

মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছি, মনের মধ্যে সুক্ষ্ম চিন্তার ধারা বহিতেছে—দময়ন্তী দেবী নিশানাথের স্ত্রী নয়, লাল সিংএর স্ত্রী......মানসিক অবস্থার কিরূপ বিবর্তনের ফলে একজন সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ কর্ম করিতে পারেন?......দময়ন্তী প্রকৃত-পক্ষে কিরূপ স্ত্রীলোক? স্বৈরিণী? কুহকিনী? কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাহা মনে হয় না......

সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিশ ভ্যান্ লইয়া বরাট আসিল। আকাশের তখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে মনে হয় রাত্রি হইতে আর দেরি নাই। মেঘগুলো ভিজা ভোট-কম্বলের মত আকাশ আবৃত করিয়া দিনের আলো মুছিয়া দিয়াছে।

বরাট বলিল,—'বিকাশকে আপনার উনিশ নম্বর মির্জা লেনে পাঠিয়ে দিলাম। কাল খবর পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিকাশ—! ও—বেশ বেশ। ছোকরা কি আপনাদের দলের লোক, অর্থাৎ পুলিসে কাজ করে?'

বরাট বলিল,—'কাজ করে বটে কিন্তু ইউনিফর্ম পরতে হয় না। ভারী খলিফা ছেলে। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

স্টেশনের স্টলে এক পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিয়া আমরা বাহির হইতেছি, একটা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিল। দেখিলাম নেপালবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন, হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের দেখিতে পাইলেন না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'উনি এগিয়ে যান। আমরা আধ ঘণ্টা পরে বেরুব।'

আমরা আবার ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। একথা সেকথায় আধ ঘণ্টা কাটাইয়া মোটর ভ্যানে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কলোনীর ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল—'এখানেই গাড়ি থামাতে বলুন, গাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। অনর্থক সকলকে সচকিত করে তোলা হবে।'

গাড়ি থামিল, আমরা নামিয়া পড়িলাম। অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়াছে। আমরা কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিশানাথবাবুর বসিবার ঘরের পাশের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সদর দরজার কড়া নাড়িল। বিজয় দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাদের দেখিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল,—'আপনারা!'

ভিতরে দময়ন্তী চেয়ারে বসিয়া আছেন দেখা গেল। ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল, —'দময়ন্তী দেবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

আমাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দময়ন্তী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'উঠবেন না। বিজয়বাবু, আপনিও বসুন।'

দময়ন্তী ধীরে ধীরে আবার বসিয়া পড়িলেন। বিজয় চোখে শঙ্কিত সন্দেহ ভরিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

আমরা উপবিষ্ট হইলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়িতে আর কেউ নেই?'

বিজয় নীরবে মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ যেন তাহা লক্ষ্য না করিয়াই নিজের ডান হাতের নখগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'দময়ন্তী দেবী, সেদিন আপনাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন সব কথা আপনি বলেন নি। এখন বলবেন কি?'

দময়ন্তী ভয়ার্ত চোখ তুলিলেন—'কি কথা?'

ব্যোমকেশ নির্লিপ্তভাবে বলিল,—'সেদিন আপনি বলেছিলেন দশ বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। নিশানাথবাবু আপনার স্বামী নন—'

মৃত্যুশরাহতের মত দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিলেন,—'না না, উনিই আমার স্বামী—উনিই আমার স্বামী—' বলিয়া নিজের কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ ঢাকিলেন।

বিজয় গর্জিয়া উঠিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

বিজয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ব্যোম-কেশ বলিয়া চলিল, 'আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয় কথায় আমাদের দরকার ছিল না। অন্য সময় হয়তো চুপ করে থাকতাম, কিন্তু এখন তো চুপ করে থাকবার উপায় নেই। সব কথাই জানতে হবে—'

বিজয় বিকৃত স্বরে বলিল, 'আর কী কথা জানতে চান আপনি?'

ব্যোমকেশ চকিতে বিজয়ের পানে চোখ তুলিয়া করাতের মত অমসৃণ কণ্ঠে বলিল, 'আপনাকেও অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে, বিজয়বাবু; অনেক মিছে কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু সে পরের কথা। এখন দময়ন্তী দেবীর কাছ থেকে জানতে চাই, যে-রাত্রে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয় সে-রাত্রে কী ঘটেছিল?'

দময়ন্তী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিজয় তাঁহার পাশে নতজানু হইয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ডাকিতে লাগিল, 'কাকিমা—কাকিমা—!'

প্রায় দশ মিনিট পরে দময়ন্তী অনেকটা শান্ত হইলেন, অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন। ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল—'সত্য কথা গোপন করার অনেক বিপদ। হয়তো এই সত্য গোপনের ফলেই পানুগোপাল বেচারা মারা গেছে। এ পর আর মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলবেন না।'

দময়ন্তী ভগ্ন স্বরে বলিলেন,—'আমি মিথ্যে কথা বলি নি, সে রাত্রির কথা যা জানি সব বলেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, কী ভয়ঙ্কর ভাবে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছিল তা বিজয়বাবু জানেন। আপনি পাশের ঘরে থেকেও কিছু জানতে পারেন নি, এ অসম্ভব। হয় আপনি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বাড়িতে ছিলেন না, কিম্বা আপনার চোখের সামনে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছে।'

পূর্ণ এক মিনিট ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বিজয় ব্যগ্র স্বরে বলিল,—'কাকিমা, আর লুকিয়ে রেখে লাভ কি। আমাকে যা বলেছ এ'দেরও তা বল। হয় তো—'

আরও খানিকক্ষণ মূক থাকিয়া দময়ন্তী অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—'আমি বাড়িতে ছিলাম না।'

'কোথায় গিয়েছিলেন? কি জন্যে গিয়ে-ছিলেন?'

অতঃপর দময়ন্তী স্খলিত স্বরে এলো-মেলোভাবে তাঁহার বাহিরে যাওয়ার ইতি-হাস বলিলেন। দীর্ঘ আট মাসের ইতিহাস; তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে অনাবশ্যক জটিল ও জবড়জং হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

আট নয় মাস পূর্বে দময়ন্তী ডাকে একটি চিঠি পাইলেন। লাল সিংএর চিঠি। লাল সিং লিখিয়াছে—জেল হইতে বাহির হইয়া আমি তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি, ছদ্মবেশে গোলাপ কলোনী দেখিয়া আসিয়াছি, তোমাদের সব কীর্তি জানিতে পারিয়াছি। আমি ভীষণ প্রতিহিংসা লইতে পারিতাম কিন্তু তাহা লইব না। আমার টাকা চাই। কাল রাত্রি দশটা হইতে এগারটার মধ্যে কলোনীর ফটকের পাশে যে কাচের ঘর আছে সেই ঘরে বেঞ্চির উপর ৫০০৲ টাকা রাখিয়া আসিবে। কাহাকেও কিছু বলিবে না, বলিলে তোমাদের দুজনকেই খুন করিব। এর পর আর আমি তোমাকে চিঠি লিখিব না (জেলে বাংলা শিখিয়াছি কিন্তু লিখিতে চাই না), টাকার দরকার হইলে মোটরের একটি ভাঙা অংশ বাড়ির কাছে ফেলিয়া দিয়া যাইব। তুমি সেই রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ৫০০৲ টাকা কাচের ঘরে রাখিয়া আসিবে।—

চিঠি পাইয়া দময়ন্তী ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেলেন। কিন্তু নিশানাথকে কিছু বলিলেন না। রাত্রে ৫০০৲ টাকার নোট কাচের ঘরে রাখিয়া আসিলেন। কলোনীর

টাকাকড়ি দময়ন্তীর হাতেই থাকিত। কেহ জানিতে পারিল না।

তারপর মাসের পর মাস শোষণ চলিতে লাগিল। মাসে দুই তিন বার মোটরের ভগ্নাংশ আসে, দময়ন্তী রাত্রে কাচের ঘরে টাকা রাখিয়া আসেন। কলোনীর আয় ছিল মাসে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার, কিন্তু এই সময় হইতে আয় কমিতে লাগিল। তাহার উপর এইভাবে দেড় হাজার টাকা বাহির হইয়া যায়। আগে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত, এখন টায়ে টায়ে খরচ চলিতে লাগিল।

নিশানাথ টাকার হিসাব রাখিতেন না, কিন্তু তিনিও লক্ষ্য করিলেন। তিনি দময়ন্তীকে প্রশ্ন করিলেন, দময়ন্তী মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে স্তোক দিলেন; আয় কমিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন, খরচ বাড়ার কথা বলিলেন না।

এইভাবে আট মাস কাটিয়াছে। নিশানাথের মৃত্যুর দিন সকালে দময়ন্তী আবার একখানি চিঠি পাইলেন। লাল সিং লিখিয়াছে—আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, যাইবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চাই। তুমি রাত্রি দশটার সময় কাচের ঘরে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। যদি এগারটার মধ্যে না যাইতে পারি তখন ফিরিয়া যাইও। আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলে কিম্বা আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে খুন করিব।

সে রাত্রে আহারের পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেখিলেন, নিশানাথ আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। দময়ন্তী নিঃশব্দে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু লাল সিং আসিল না। দময়ন্তী এগারোটা পর্যন্ত কাচের ঘরে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিশানাথ পূর্ববৎ ঘুমাইতেছেন। তখন তিনিও নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া নিশানাথের গায়ে হাত দিয়া দময়ন্তী দেখিলেন নিশানাথ বাঁচিয়া নাই। তিনি চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ নত মুখে সমস্ত শুনিল, তারপর বিজয়ের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'বিজয়বাবু, আপনি এ কাহিনী কবে জানতে পারলেন?'

বিজয় বলিল—'তিন চার দিন আগে। আমি আগে জানতে পারলে—"

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল,—'অন্য কথাটা, অর্থাৎ আপনার কাকার সঙ্গে দময়ন্তী দেবীর প্রকৃত সম্পর্কের কথা আপনি গোড়া থেকেই জানেন। কোনও সময় কাউকে একথা বলেছেন?'

বিজয় চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'না কাউকে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বরাটকে বলিল,—'চলুন এবার যাওয়া যাক।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'একটা খবর দিয়ে যাই। লাল সিং দু' বছর আগে জেলেই মারা গেছে।'

২২

পুলিশ ভ্যানে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবীর কথা সত্যি বলেই মনে হয়। নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছিল কেউ দময়ন্তীকে blackmail করছে; তাই যেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যান সেদিন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। কথাটা তাঁর মনের মধ্যে ছিল তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল,—'এখন কথা হচ্ছে, কে blackmail করছে? নিশ্চয় এমন লোক যে দময়ন্তীর গুপ্ত কথা জানে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের জ্ঞানত তিনজন এই গুপ্ত কথা জানে—বিজয়, ব্রজদাস বাবাজী আর নেপালবাবু। নেপালবাবু জানলে মুকুল জানবে। সব মিলিয়ে চারজন; আরও কেউ কেউ থাকতে পারে, যাদের আমরা নাম জানি না। আর কিছু না হোক হত্যার একটা স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভ পাওয়া গেল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ধরা যাক নেপালবাবু blackmail করছিলেন। আট মাস ধরে তিনি বেশ কিছু দোহন করেছেন, আরও অনেক দিন ধরে পেনসন্ ভোগ করবার ইচ্ছে আছে, এমন সময় দেখলেন নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছে, তিনি আমাকে ডেকে এনেছেন। নেপালবাবুর ভয় হল এমন লাভের ব্যবসাটা বুঝি ফেঁসে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি যদি ধরা পড়েন তাহলে ইতিপূর্বে তাঁর কন্যার সাহায্যে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন তাও প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাঁর কন্যাটিও যে চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না ওরফে নৃত্যকালী তাও আর গোপন থাকবে না।' রমেন মল্লিককে আমাদের সঙ্গে দেখে তাঁর এ রকম সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি তখন কী করবেন? নিশানাথকে মারতে পারলে সব সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, নির্ভয়ে blackmail চালানো যায়। কিন্তু নিশানাথের মৃত্যুটা স্বাভাবিক হওয়া চাই; সুতরাং নিশানাথ যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে মারা গেলেন। কিন্তু তবু খুঁত রয়ে গেল। পুলিশের যাতায়াত শুরু হল। তার ওপর পানুগোপালটা কিছু দেখে ফেলেছিল। অতএব তাকেও সরানো দরকার হল। মোটামুটি এই মোটিভ।'

বরাট বলিল,—'তাহলে এখন কর্তব্য কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা প্ল্যান আমার মাথায় ঘুরছে, কিন্তু সে বিষয়ে পরে ব্যবস্থা হবে। আজ রাত্রেই একটা কাজ করা দরকার, আবার আমাদের কলোনীতে ফিরে যেতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে কলোনীর লোকগুলির ওপর নজর রাখতে হবে।'

'কী উদ্দেশ্যে?'

'আজ মেঘৈর্মেদুরমম্বরং—অভিসারের উপযুক্ত রাত্রি। দেখতে হবে কেউ কারুর ঘরে যায় কিনা। আপনি রাজী?'

'নিশ্চয় রাজী। কিন্তু আগে চলুন আমার বাসায় খাওয়া দাওয়া করবেন।'

বরাটের বাসায় আহার শেষ করিয়া আবার যখন বাহির হইলাম রাত্রি তখন সওয়া নটা। একটু আগে যাওয়া ভাল, পালা শেষ হইবার পর প্রেক্ষাগৃহে রাত জাগিয়া বসিয়া থাকার মানে হয় না। বরাট আমাদের জন্য দুইটা বর্ষাতি জোগাড় করিয়া লইল।

কলোনী হইতে আধ মাইল দূরে গাড়ি থামানো হইল, ড্রাইভারকে এইখানে গাড়ি রাখিতে বলিয়া আমরা পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। আকাশ তেমনি থমথমে হইয়া আছে, প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামে নাই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে বটে, কিন্তু তাহা অবগুণ্ঠিতা বধূর মুচকি হাসির মত লজ্জিত; তাহার পিছনে গুরু গুরু ডাকও নাই।

কলোনীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটিও কুঠিতে আলো জ্বলিতেছে না, কেবল ভোজন গৃহে আলো। সকলেই আহার করিতে গিয়াছে। ব্যোমকেশ চুপি চুপি আমাদের নির্দেশ দিল,—'অজিত, তুমি বিজয়ের কুঠির আনাচে কানাচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বোসো, বিজয় ছাড়া আর কেউ আসে কিনা লক্ষ্য করবে।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি দময়ন্তীর খিড়কি দরজার ওপর নজর রাখবেন।'

'আর আপনি?'

'আমি নেপালবাবুর সদর আর অন্দর দু' দিকেই চোখ রাখব। একটা করবীর ঝাড় দেখে রেখেছি, সেখান থেকে দু' দিকেই দৃষ্টি রাখা চলবে।'

বরাট ও ব্যোমকেশের বর্ষাতি-পরা মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আমি বিজয়ের কুঠির এক কোণে একটা ঝোপের মধ্যে আড্ডা গাড়িলাম।

পনরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ভোজন-কারীরা একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। তারপর বিজয়ের পায়ের শব্দ শুনিলাম; সে নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল। বনলক্ষ্মীর ঘর অন্ধকার, সে বোধ হয় এখনও রান্নাঘরে আছে।

বসিয়া বসিয়া দময়ন্তী ও নিশানাথের চিন্তাই মনে আসিল; যে-কঙ্কালটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে কল্পনার রক্ত-মাংস সংযোগ করিয়া মানুষের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম।—দময়ন্তী বোধ হয় লাল সিং-এর মত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর স্বামীকে ভালবাসিত না, কিন্তু স্বামী খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে অশিক্ষিত রমণীর স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে বিচারকের করুণা-ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তারপর বিজয় ও নিশানাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, দাম্পত্য জীবনে যে-কোমলতা পায় নাই তাহার আশায় লুব্ধ হইয়াছিল। নিশানাথও ক্রমশ নিজের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই সুন্দরী অনাথার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছিল, বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নীতি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এই একান্ত অপরিচিত স্থানে আসিয়া দময়ন্তীর সহিত বাস করিতেছিলেন।...... দোষ কাহার, কে কাহাকে অধিক প্রলুব্ধ করিয়াছিল, এ প্রশ্নের অবতারণা এখন নিরর্থক। কিন্তু এ জগতে কর্মফলের হাত এড়ানো যায় না, বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। নিশানাথ কঠিন মূল্য দিয়াছেন, দময়ন্তীও লজ্জা ভয় ও শোকের মাশুল দিয়া জীবনের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যে ছিদ্রান্বেষী শত্রু তাঁহাদের দুর্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া কৃমিকীটের ন্যায় আত্মপুষ্টি করিতে চায় সে নিমিত্ত মাত্র। আবার তাহাকেও একদিন মাশুল দিতে হইবে—

বিজয়ের ঘরে আলো নিভিয়া গেল; পাশের কুঠিতে বনলক্ষ্মীর আলো জ্বলিল। কিছুক্ষণ পরে বনলক্ষ্মীর ওপাশের কুঠিতে ভুজঙ্গধরবাবুর সেতার বাজিয়া উঠিল! কী সুর ঠিক জানি না, কিন্তু দ্রুত তাহার ছন্দ তাল, অসন্দিগ্ধ তাহার ভঙ্গী; যেন বহিঃ-প্রকৃতির রসালসতায় নূতন উদ্দীপনা প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, বিরহী প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছে—

কাজর রুচিহর
রজনী বিশালা,
তছুপর অভিসার
[illegible] [illegible]বালা—

দশ মিনিট পরে সেতার থামিল, ভুজঙ্গ-ধরবাবু আলো নিভাইলেন। কয়েক মিনিট পরে বনলক্ষ্মীর আলোও নিভিয়া গেল। সব কুঠিগুলি অন্ধকার।

আপন আপন নিভৃত কক্ষে ইহারা কি করিতেছে—কী ভাবিতেছে—? এই কলো-নীর তিমিরাবৃত বুকে কোন্ মানুষটির মনের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে? বনলক্ষ্মী এখন তাহার সংকীর্ণ বিছানায় শুইয়া কি ভাবিতেছে? কাহার কথা ভাবিতেছে?—যদি অন্তর্যামী হইতাম......

অলস ও অসংলগ্ন চিন্তায় বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম। পায়ের শব্দ! দ্রুত অথচ সতর্ক। আমি যে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম তাহার পাশ দিয়া বিজয়ের কুঠির দিকে যাইতেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

যেখানে লুকাইয়া আছি সেখান হইতে বিজয়ের সদর দরজা দশ-বারো হাত দূরে। শুনিতে পাইলাম খুটখুট শব্দে দরজায় টোকা পড়িল; তারপর দ্বার খোলার শব্দ পাইলাম। তারপর নিস্তব্ধ।

এই সময় আকাশের অবগুণ্ঠিতা বধূ একবার মুচকি হাসিল। আর আধ মিনিট আগে হাসিলে বিজয়ের নৈশ অতিথিকে দেখিতে পাইতাম।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট। কুঠির আরও কাছে গেলে হয়তো কিছু শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সাহস হইল না। অন্ধকারে হোঁচট্ কিম্বা আছাড় খাইলে নিজেই ধরা পড়িয়া যাইব।

দ্বার খোলার মৃদু শব্দ! আবার আমার পাশ দিয়া অদৃশ্যচারী চলিয়া যাইতেছে। আকাশ-বধূ হাসিল না। কাহাকেও দেখা গেল না, কেবল একটা চাপা কান্নার নিগৃহীত আওয়াজ কানে আসিল। কে?—কান্নার শব্দ হইতে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু যেই হোক সে স্ত্রীলোক!

তার পর আরও এক ঘণ্টা হাত-পা শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম কিন্তু আর কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে ভাবিতেছি, কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিস্‌ফিস্ গলা শুনিলাম—'চলে এস। যা দেখবার দেখা হয়েছে।'

ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছায়া-মূর্তির মত বরাট দাঁড়াইয়া আছে। তিন-জনে ফিরিয়া চলিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কি দেখলে বল। —অজিত, তুমি?'

আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিলাম।

ব্যোমকেশ নিজের রিপোর্ট দিল,—'আমি একজনকে নেপালবাবুর খিড়কি দিয়ে বেরুতে শুনেছি। নেপালবাবু নয়, কারণ পায়ের শব্দ হাল্কা। পনরো-কুড়ি মিনিট পরে তাকে আবার ফিরে আসতে শুনেছি।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি?'

বরাট বলিল,—'আমি দময়ন্তীর বাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে শুনিনি। কিন্তু অন্য কিছু দেখেছি।'

'কী?'

'বনলক্ষ্মীকে তার ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি। আমি ছিলাম দময়ন্তীর বাড়ির পিছনের কোণে; বনলক্ষ্মীর ঘরের আলো জ্বলছিল দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আলো নিভে গেল, আমি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম। একবার একটু বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম বনলক্ষ্মী নিজের কুঠি থেকে বেরুচ্ছে।'

'কোন দিকে গেল?'

'তা জানি না। আর বিদ্যুৎ চমকায় নি।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'মুস্কিল মিঞার বৌ মিথ্যে বলেনি। এখন কথা হচ্ছে, বিজয়ের ঘরে যে গিয়েছিল সে কে? মুকুল, না বনলক্ষ্মী? যদি বনলক্ষ্মী বিজয়ের ঘরে গিয়ে থাকে, তবে মুকুল কোথায় গিয়েছিল?'

২০

শেষ রাত্রির দিকে কলিকাতায় ফিরিয়া পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম আকাশ জলভারাক্রান্ত হইয়া আছে, অজও মেঘ কাটে নাই। বসিবার ঘরে গিয়া দেখি তক্তপোষের উপর ব্যোমকেশ ও আর একজন চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে। আমার আগমনে লোকটি ঘাড় ফিরাইয়া দন্ত বাহির করিল। দেখিলাম—বিকাশ।

আমিও তক্তপোষে গিয়া বসিলাম।

বিকাশের মুখখানা বকাটে ধরনের বটে কিন্তু তাহার দাঁত-খিঁচানো হাসিতে একটা আপন-করা ভাব আছে। তাহার বাচন-ভঙ্গীও অত্যন্ত সিধা ও বস্তুনিষ্ঠ। সে বলিল,—উনিশ নম্বরে গিয়ে জান্ কয়লা হয়ে গিয়েছে স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কী দেখলেন শুনলেন বলুন।'

বিকাশ সঙ্কোচে বলিল,—'কি আর দেখব শুনব স্যার, একেবারে লঝ্‌ঝড় মাল, নাইটীন্-ফিফ্‌টীন্ মডেল—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। ওখানে কি কি খবর পেলেন তাই বলুন।'

বিকাশ বলিল,—'খবর কিস্‌সু নেই। ও বাড়িতে দু'টো বস্তাপচা ইস্ত্রীলোক থাকে—'

'দু'টো!' ব্যোমকেশের স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

'আজ্ঞে। বাড়িতে তিনটে ঘর আছে, কিন্তু ইস্ত্রীলোক থাকে দু'টোই।'

'ঠিক দেখেছেন, দু'টোর বেশী নেই?'

বিকাশের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল,—'দু'টোর জায়গায় যদি আড়াইটে বেরোয় স্যার, আমার কান কেটে নেবেন। অমন ভুল বিকাশ দত্ত করবে না।'

'না না, আপনি ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু তৃতীয় ঘরে কি কেউ থাকে না, ঘরটা খোলা পড়ে থাকে?'

'খোলা পড়ে থাকবে কেন স্যার, বাড়িওয়ালা ও ঘরটা নিজের দখলে রেখেছে। মাঝে মাঝে আসে, তখন থাকে।'

'ও—' ব্যোমকেশ আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

তারপর বিকাশ আরও কয়েকটা খুচরা খবর দিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং ছাপার অযোগ্য বলিয়া উহ্য রাখিলাম।

বিকাশ চলিয়া যাইবার পর প্রায় পনরো মিনিট ব্যোমকেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'ব্যস্, প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। অজিত, তুমি নীচের ডাক্তারখানা থেকে কিছু ব্যাণ্ডেজ কিছু তুলো আর এক শিশি টিংচার আয়োডিন কিনে আনো দেখি।'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কি হবে ওসব?'

'দরকার আছে। যাও, আমি ইতিমধ্যে কলোনীতে টেলিফোন করি।— হ্যাঁ, গোটা দুই বেশ পুরু খাম মনিহারী দোকান থেকে কিনে এনো।' বলিয়া সে টেলিফোন তুলিয়া লইল।

আমি জামা পরিতে পরিতে শুনিলাম সে বলিতেছে, —'হ্যালো......কে, বিজয়বাবু? একবার নেপালবাবুকে ফোনে ডেকে দেবেন? বিশেষ দরকার।......'

সওদা করিয়া ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ করিয়াছে, টেবিলে ঝুঁকিয়া বসিয়া দুইটি ফটোগ্রাফ দেখিতেছে।

ফটোগ্রাফ দুইটি সুনয়নার, রমেনবাবু যাহা দিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—'এবার মন দিয়ে শোনো।'—

দু'টি খামে ফটো দুইটি পুরিয়া সযত্নে আঠা জুড়িতে জুড়িতে ব্যোমকেশ বলিল,—আমি কিছুদিন থেকে একটা দুর্দান্ত গুণ্ডাকে ধরবার চেষ্টা করছি। গুণ্ডা কাল রাত্রে বাদুড়বাগানের মোড়ে আমাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে। আঘাত গুরুতর নয়; কিন্তু গুণ্ডা আমাকে ছাড়বে না, আবার চেষ্টা করবে। আমি তাকে আগে ধরব, কিম্বা সে আমাকে আগে মারবে, তা বলা যায় না। যদি সে আমাকে মারে তাহলে গোলাপ কলোনীর রহস্যটা রহস্যই থেকে যাবে। তাই আমি এক উপায় বার করেছি। এই দু'টি খামে দু'টি ফটো রেখে যাচ্ছি। একটি খাম নেপালবাবুকে দেব, অন্যটি ভুজঙ্গধরবাবুকে। আমি যদি দু'চার দিনের মধ্যে গুণ্ডার ছুরিতে মারা যাই তাহলে তাঁরা খাম খুলে দেখবেন আমি কাকে কলোনীর হত্যা সম্পর্কে সন্দেহ করি। আর যদি গুণ্ডাকে ধরতে পারি তখন আমার অপঘাত-মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে; তখন আমি খাম দু'টি ও'দের কাছ থেকে ফেরত নেব এবং গোলাপ কলোনীর অনুসন্ধান যেমন চালাচ্ছি তেমনি চালাতে থাকব। বুঝতে পারলে?'

বলিলাম,—'কিছু কিছু বুঝেছি। কিন্তু এই অভিনয়ের ফল কি হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ফল কিছু হবে কি না এখনও জানি না। মা ফলেষু। নেপালবাবু বারোটার আগেই আসছেন। তুমি এই বেলা আমার হাতে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দাও। আর, তোমাকে কি করতে হবে শোনো।'—

আমি তাহার বাঁ হাতের প্রগণ্ডে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম; টিংচার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া বেশ মোটা করিয়া তাগার মত পটি বাঁধিলাম; কামিজের আস্তিনে ব্যাণ্ডেজ ঢাকা দিয়া একফালি ন্যাকড়া দিয়া হাতটা গলা হইতে ঝুলাইয়া দিলাম। এই সঙ্গে ব্যোমকেশ আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিল—

বেলা এগারটার সময় দ্বারের কড়া নড়িল। আমি দ্বারের কাছে গিয়া সশঙ্ক-কণ্ঠে বলিলাম—'কে? আগে নাম বল তবে দোর খুলব।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল,—'আমি নেপাল গুপ্ত' সন্তর্পণে দ্বার একটু খুলিলাম; নেপালবাবু প্রবেশ করিলে আবার হুড়কা লাগাইয়া দিলাম।

নেপালবাবুর মুখ ভয় ও সংশয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'এ কি! মতলব কি আপনাদের?'

ব্যোমকেশ তক্তপোষের উপর বালিসে পিঠ দিয়া অর্ধশয়ান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—'ভয় নেই, নেপালবাবু। এদিকে আসুন, সব বলছি।'

নেপালবাবু দ্বিধাজড়িত পদে ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ ফ্যাকাসে হাসিয়া বলিল,—'বসুন। টেলিফোনে সব কথা বলিনি, পাছে জানাজানি হয়। আমাকে গুণ্ডা ছুরি মেরেছে—' কাল্পনিক গুণ্ডার নামে অজস্র মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে কহিল,—'আপনিই কলোনীর মধ্যে একমাত্র লোক, যার বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়, তাই এই খামখানা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার মৃত্যু-সংবাদ যদি পান, তখন খামখানা খুলে দেখবেন, কার ওপর আমার সন্দেহ বুঝতে পারবেন। তারপর যদি অনুসন্ধান চালান, অপরাধীকে ধরা শক্ত হবে না। আমি পুলিসকে আমার সন্দেহ জানিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পুলিসের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা সব ভণ্ডুল করে ফেলবে।'

শুনিতে শুনিতে নেপালবাবুর সংশয় শঙ্কা কাটিয়া গিয়াছিল, মুখে সদম্ভ প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি খামখানা সযত্নে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'ভাববেন না, যদি আপনি মারা যান, আমি আছি। পুলিসকে দেখিয়ে দেব বৈজ্ঞানিক প্রথার অনুসন্ধান কাকে বলে।'

দেখা গেল ইতিপূর্বে তিনি যে বিজয়কে আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহার মনে নাই। বোধ হয় বিজয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু একটা কথা, আমার মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত খাম খুলবেন না। গুণ্ডাটাকে যদি জেলে পুরতে পারি, তাহলে আর আমার প্রাণহানির ভয় থাকবে না; তখন কিন্তু খামখানি যেমন আছে তেমনি অবস্থায় আমাকে ফেরত দিতে হবে।'

নেপালবাবু একটু দুঃখিতভাবে সর্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল,—'অজিত, পুঁটিরামকে বলে দাও এ বেলা কিছু খাব না।'

'খাবে না কেন?'

'ক্ষিদে নেই।' বলিয়া সে একটু হাসিল।

আমি বেলা একটা নাগাদ আহার শেষ করিয়া আসিলে ব্যোমকেশ বলিল,—'এবার তুমি টেলিফোন কর।'

আমি কলোনীতে টেলিফোন করিলাম। বিজয় ফোন ধরিল। বলিলাম,—'ভুজঙ্গধরবাবুকে একবারটি ডেকে দেবেন?' ভুজঙ্গধরবাবু আসিলে বলিলাম,—'ব্যোমকেশ অসুস্থ, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আপনি আসতে পারবেন?'

মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন,—'নিশ্চয়। কখন আসব বলুন।'

'চারটের সময় এলেই চলবে। কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবেন না। গোপনীয় ব্যাপার।'

'আচ্ছা।'

চারটের কিছু আগেই ভুজঙ্গধরবাবু আসিলেন। দ্বারের সম্মুখে আগের মতই অভিনয় হইল। ভুজঙ্গধরবাবু চমকিত হইলেন, তারপর ব্যোমকেশের আহ্বানে তাহার পাশে গিয়া বসিলেন।

সমস্ত দিনের অনাহারে ব্যোমকেশের মুখ শুষ্ক। সে ভুজঙ্গধরবাবুকে গুণ্ডা-কাহিনী শুনাইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহার নাড়ী দেখিলেন, বলিলেন,—'একটু দুর্বল হয়েছেন। ও কিছু নয়।'

ব্যোমকেশ কেন সমস্তদিন উপবাস করিয়া

আছে বুঝিলাম। ডাক্তারের চোখে ধরা পড়িতে চায় না।

ভুজঙ্গধর বলিলেন,—'যাক, আসল কথাটা কি বলুন।' আজ তাঁহার আচার আচরণে চপলতা নাই; একটু গম্ভীর।

ব্যোমকেশ আসল কথা বলিল। ভুজঙ্গধর সমস্ত শুনিয়া এবং খামখানি একটু সন্দিগ্ধভাবে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'এ সব দিকে আমার মাথা খ্যালে না। যা হোক, যদিই আপনার ভালমন্দ কিছু ঘটে—আশা করি সে রকম কিছু ঘটবে না—তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি বোধ হয় এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি, তাই ঝেড়ে কাশছেন না। কেমন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। নিঃসন্দেহ হতে পারলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, সটান পুলিসকে বলতাম—ঐ তোমার আসামী।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চা ও সিগারেট সেবন করিয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিদায় লইলেন।

আমি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি ট্রাম ধরিয়া শিয়ালদার দিকে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ এবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল,—'ম্যয় ভুখা হুঁ। —পুঁটিরাম!'

২৪

ভুজঙ্গধরবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে রিমঝিম, তারপর ঝমঝম। দীর্ঘ আয়োজনের পর বেশ জুত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র থামিবে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী হইতে অনুমান হইল, তাহার উদ্যোগ আয়োজনও চরম পরিণতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, ক্রমাগত সিগারেট টানিতেছে। এ সব লক্ষণ আমি চিনি। জাল গুটাইয়া আসিতেছে।

মেঘের অন্তরপথে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল। আটটার সময় ব্যোমকেশ প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল; অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোনের মধ্যে গুজ-গুজ করিল। তাহার সংলাপের ছিন্নাংশ হইতে এইটুকু শুধু বুঝিলাম যে, গোলাপ কলোনীর উপর কড়া পাহারা রাখা দরকার, কেহ না পালায়।

রাত্রে ঘুমের মধ্যেও অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ জাগিয়া আছে এবং বাড়িময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল। সকালে দেখিলাম, মেঘগুলো ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে; বৃষ্টির তেজ কমিয়াছে, কিন্তু থামে নাই। এগারোটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইয়া পাণ্ডাস সূর্যালোক দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া গুটি গুটি বাহির হইতেছে দেখিয়া বলিলাম,—'এ কি! চললে কোথায়?'

উত্তর না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ফিরিল বিকাল সাড়ে তিনটার সময়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজও কি একাদশী?'

সে বলিল,—'উঁহু, কাফে সাজাহানে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে দিব্যি চর্ব্য-চোষ্য হয়েছে।'

'যদি নেপাল গুপ্ত কিম্বা ভুজঙ্গ ডাক্তার দেখে ফেলত!'

'সে সম্ভাবনা কম। তাঁরা কেউ কলোনী থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে গ্রেপ্তার হতেন।'

'যাক, ওদিকে তাহলে পাকা বন্দোবস্ত করেছ। এদিকের খবর কি, গিছলে কোথায়?'

'প্রথমত কর্পোরেশন অফিসে। ১৯নং মির্জা লেনের বাড়িটার মালিক কে জানবার কৌতূহল হয়েছিল।'

'মালিক কে—ভুজঙ্গধরবাবু?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'না, একজন স্ত্রীলোক।'

'আর কোথায় গিছলে?'

'রমেনবাবুর কাছে। সুনয়নার আরও দুটো ফটো জোগাড় করেছি।'

'আর কি করলে?'

'আর, একবার চীনে পটিতে গিয়েছিলাম দাঁতের সন্ধানে।'

'দাঁতের সন্ধানে?'

'হ্যাঁ। চীনেরা খুব ভাল দাঁতের ডাক্তার হয় জানো?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্নান-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, অথচ নাটকের নায়কনায়িকাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন?

পরদিন সকালে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া ঝলমলে রোদ উঠিয়াছে, ব্যোমকেশ খবরের কাগজ রাখিয়া বলিল,—'আটটা বাজল। এস, এবার আমাকে কাটা সৈনিক সাজিয়ে দাও। কলোনীতে যেতে হবে।'

'একলা যাবে?'

'না, তুমিও যাবে। গুণ্ডা ধরা পড়েছে, কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই। একজন রক্ষী সঙ্গে থাকা দরকার।'

'গুণ্ডা কবে ধরা পড়ল।'

'কাল রাত্তিরে।'

'আজ কলোনীতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?'

'ছবির খাম ফেরত নিতে হবে। আজ এস্পার কি ওস্পার।'

তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। বাহির হইবার পূর্বে সে একবার প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে লইলাম।

মোহনপুরের স্টেশনে বরাট উপস্থিত ছিল। ব্যোমকেশের রূপসজ্জা দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসছেন কি, ভেক না হলে ভিখ পাওয়া যায় না। আমার গুণ্ডার নাম জানেন তো? সজ্জনদাস মিরজাপুরী। যদি দরকার হয়, মনে রাখবেন। আজ কাগজে ঐ নামটা পেয়েছি, কাল রাত্রে বেলগাছিয়া পুলিস তাকে ধরেছে।'

'বাঃ! জুতসই একটা গুণ্ডাও পেয়ে গেছেন।'

'অমন একটা আধটা গুণ্ডার খবর প্রায় রোজই কাগজে থাকে।'

কলোনীতে উপস্থিত হইলাম। ফটকের কাছে পুলিসের থানা বসিয়াছে, তাছাড়া তারের বেড়া ঘিরিয়া কয়েকজন পাহারাওলা রোঁদ দিতেছে। বেশ একটা থমথমে ভাব।

ফটকের বাহিরে গাড়ি রাখিয়া আমরা প্রবেশ করলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল, নিশানাথবাবুর বারান্দায় বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবু বসিয়া আছেন। ভুজঙ্গধরবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া কাগজ মুড়িয়া রাখিলেন। বিজয় ভ্রুকুটি করিয়া চাহিল। আমরা নিকটস্থ হইলে সে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল,—'এর মানে কি, ব্যোমকেশবাবু? অপরাধীকে ধরবার ক্ষমতা নেই, মাঝ থেকে কলোনীর ওপর চৌকি বসিয়ে দিয়েছেন। পরশু থেকে আমরা কলোনীর সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি।'

ব্যোমকেশ তাহার রুক্ষতা গায়ে মাখিল না, হাসিমুখে বলিল,—'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যেখানে খুন হয়েছে সেখানে একটু আধটু অসুবিধে হবে বৈকি। দেখুন না আমার অবস্থা।'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আজ তো আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। গুণ্ডা কি ধরা পড়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, সজ্জনদাস ধরা পড়েছে।'

'সজ্জনদাস! নামটা যেন কোথায় দেখেছি! —ও—আজকের কাগজে আছে। তা—এই সজ্জনদাসই আপনার দুর্জনদাস?'

'হ্যাঁ, পুলিস কাল রাত্রে তাকে ধরেছে। তাই অনেকটা নির্ভয়ে বেরুতে পেরেছি।'

'তাহলে—?' ভুজঙ্গধরবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। আসুন, আপনার সঙ্গে কাজ আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুকে লইয়া আমরা তাঁহার কুঠির দিকে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, —'খামখানা ফেরত নিতে এসেছি।'

ভুজঙ্গধর বলিলেন,—'বাঁচালেন মশাই, ঘাড় থেকে বোঝা নামল। ভয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাকেই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। —একটু দাঁড়ান।'

নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া তিনি মিনিট খানেক পরে খাম হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ খাম লইয়া বলিল,—'খোলেননি তো?'

'না, খুলিনি। লোভ যে একেবারে হয়নি তা বলতে পারিনা কিন্তু সামলে নিলাম। হাজার হোক, কথা দিয়েছি। —আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, সত্যি কি কিছু জানতে পেরেছেন?'

'এইটুকু জানতে পেরেছি যে স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার।'

'তাই নাকি!' কৌতূহলী চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি মস্তকের পশ্চাৎভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

'ধন্যবাদ।—আবার বোধহয় ওবেলা আসব।' বলিয়া ব্যোমকেশ নেপালবাবুর কুঠির দিকে পা বাড়াইল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' ভুজঙ্গধরবাবু প্রশ্ন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, —'নেপালবাবুর সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুর চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, মুখে অর্ধ-হাস্য লইয়া মস্তকের পশ্চাৎভাগে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

নেপালবাবু নিজের ঘরে বসিয়া দাবার ধাঁধা ভাঙিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া এমন কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন যে, মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশকে চোখের সামনে দেখিয়া তিনি মোটেই প্রসন্ন হন নাই। তারপর যখন সে খামটি ফেরত চাহিল তখন তিনি নিঃশব্দে খাম আনিয়া ব্যোমকেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া আবার দাবার ধাঁধায় মন দিলেন।

আমরা সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নেপালবাবু আগে হইতেই পুলিসের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহার উপর ব্যোমকেশের ব্যবহারে যে মর্মান্তিক চটিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

২৫

কলোনী হইতে আমরা সিধা থানায় ফিরিলাম। বরাটের ঘরে বসিয়া ব্যোমকেশ খাম দুটি সযত্নে পকেট হইতে বাহির করিল। বলিল,—'এইবার প্রমাণ।'

খামদুটির উপরে কিছু লেখা ছিল না, দেখিতেও সম্পূর্ণ একপ্রকার। তবু কোনও দুর্লক্ষ্য চিহ্ন দেখিয়া সে একটি খাম বাছিয়া লইল। খামের আঠা-লাগানো স্থানটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল,—'খোলা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

অতঃপর খাম কাটিয়া সে ভিতর হইতে অতি সাবধানে ফটো বাহির করিল; ঝক্‌ঝকে পালিশ করা কাগজের উপর শ্যামা-ঝি'র ভূমিকায় সুনয়নার ছবি। বরাট এবং আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলাম, তারপর বরাট নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—'কৈ, কিছু তো দেখছি না।'

ছবিটি খামে পুরিয়া ব্যোমকেশ সরাইয়া রাখিল। দ্বিতীয় খামটি লইয়া আগের মতই সমীক্ষার পর খাম খুলিতে খুলিতে বলিল,—'এটিও মনে হচ্ছে গোয়ালিনী মার্কা দুধের মত হস্তদ্বারা অস্পৃষ্ট।'

খামের ভিতর হইতে ছবি বাহির করিয়া সে আলগোছে ছবির দুই পাশ ধরিয়া তুলিয়া ধরিল। তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'আছে—আছে! বাঘ ফাঁদে পা দিয়েছে!'

বরাট ছবিখানা ব্যোমকেশের হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া একাগ্রচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর দ্বিধাভরে বলিল,—'আছে। কিন্তু—'

ব্যোমকেশের মুখে চোখে উত্তেজনা ফাটিয়া পড়িতেছিল, সে একটু শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আপনার 'কিন্তু'র জবাব আমি দিতে পারব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাঘ এবং বাঘিনীকে এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে।—চলুন আর দেরি নয়, খাতাপত্র নিয়ে নিন। আপনাদের বিশেষজ্ঞদের অফিস বোধহয় কলকাতায়?'

'হ্যাঁ। চলুন।'

বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের মন্তব্য লইয়া আমরা যখন বাহির হইলাম তখন বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা এতক্ষণ কাহারও মনে ছিল না; ব্যোমকেশ বরাটের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—'আসুন, আজ আমাদের বাসাতেই শাক-ভাত খাবেন।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু—ও কাজটা যে এখনও বাকী—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কাজটা পরে হবে। আগে খাওয়া, তারপর থানাতল্লাস—তারপর আবার গোলাপ কলোনী। গোলাপ কলোনীর বিয়োগান্ত নাটকে আজই যবনিকা পতন হবে।'

*　*　*

গোলাপ কলোনীতে নিশানাথবাবুর বহিঃকক্ষে সভা বসিয়াছিল। ঘরের মধ্যে ছিলাম আমরা তিনজন এবং দময়ন্তী দেবী ছাড়া কলোনীর সকলে। রসিক দে'কেও হাজত হইতে আনা হইয়াছিল। দময়ন্তী দেবীর প্রবল মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে সভার অধিবেশন হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল। দুইজন সশস্ত্র পুলিশ কর্মচারী দ্বারের কাছে পাহারা দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় আটটা। মাথার উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সামনের দেয়ালে নিশানাথবাবুর একটি বিশদীকৃত ফটোগ্রাফ টাঙানো হইয়াছিল। নিশানাথের ঠোঁটের কোণে একটু অম্লরসাক্ত হাসি, তিনি যেন হাকিমের উচ্চ আসনে বসিয়া নিরাসক্তভাবে বিচার-সভার কার্যবিধি পরিচালন করিতেছেন।

ব্যোমকেশের মুখে আতপ্ত চাপা উত্তেজনা। সে একে একে সকলের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল,—'আপনারা শুনে সুখী হবেন নিশানাথবাবু এবং পানুগোপালকে কারা হত্যা করেছিল তা আমরা জানতে পেরেছি।'

কেহ কথা কহিল না। নেপালবাবু ফস্‌ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া নির্বাপিত চুরুট ধরাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'শুধু যে জানতে পেরেছি তা নয়, অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। অপরাধীরা এই ঘরেই আছে। অন্নদাতা নিশানাথবাবুকে যারা বীভৎসভাবে হত্যা করেছে, অসহায় নিরীহ পানুগোপালকে যারা বিষ দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে, আইন তাদের ক্ষমা করবে না। তাদের প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। তাই আমি আহ্বান করছি, মনুষ্যত্বের কণামাত্র যদি অপরাধীদের প্রাণে থাকে তারা অপরাধ স্বীকার করুক।'

এবারও সকলে নীরব। ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের মধ্যে যেন সুপারি-লবঙ্গর মত একটা কিছু ছিল, তিনি সেটা এ গাল হইতে ও গালে লইলেন। বিজয় একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল। মুকুলকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহার মুখে রুজ পাউডার নাই; রক্তহীন সুন্দর মুখে অজানিতের বিভীষিকা।

ঘরের অন্য কোণে বনলক্ষ্মীও চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখে প্রবল উদ্বেগের ব্যঞ্জনা নাই। সে কোলের উপর হাত রাখিয়া আঙুলগুলো লইয়া খেলা করিতেছে, যেন অদৃশ্য কাঁটা দিয়া অদৃশ্য পশমের জামা বুনিতেছে।

আধ মিনিট পরে ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ, তাহলে আমিই বলছি।—নেপালবাবু, আপনি নিশানাথবাবুর সম্বন্ধে একটা গুপ্ত-কথা জানেন। আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম তখন অস্বীকার করেছিলেন কেন?'

নেপালবাবুর চোখের মধ্যে চকিত আশঙ্কার ছায়া পড়িল, তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন,—'আমি—আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'থাক্‌, কেন অস্বীকার

করেছিলেন তার কৈফিয়ৎ দরকার নেই। কিন্তু কার কাছে এই গুপ্তকথা শুনেছিলেন? কে আপনাকে বলেছিল?—আপনার মেয়ে মুকুল?' ব্যোমকেশের তর্জনী মুকুলের দিকে নির্দিষ্ট হইল।

নেপালবাবু ঘোর শব্দ করিয়া গলা পরিষ্কার করিলেন। বলিলেন,—'হ্যাঁ—মানে—মুকুল জানতে পেরেছিল—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কার কাছে জানতে পেরেছিল?—আপনার কাছে?' ব্যোমকেশের তর্জনী দিগ্দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত বিজয়ের দিকে ফিরিল।

বিজয়ের মুখ শাদা হইয়া গেল, সে মুখ তুলিতে পারিল না। অধোমুখে বলিল,—'হ্যাঁ—আমি বলেছিলাম। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করিল,—'আর কাউকে বলেছিলেন?'

বিজয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যাকুল চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর আবার অধোবদন হইল। উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক্, আর একটা কথা বলুন। আপনি দোকান থেকে যে টাকা সরিয়েছিলেন সে টাকা কার কাছে রেখেছেন?'

বিজয় হেঁটমুখে নিরুত্তর রহিল।

'বলবেন না?' ব্যোমকেশ ঘরের অন্যদিকে যেখানে রসিক দে বৃষকাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়াছিল সেইদিকে ফিরিল—'রসিকবাবু, আপনিও দোকানের টাকা চুরি করে একজনের কাছে রেখেছিলেন, তার নাম বলবেন না?'

রসিকের কণ্ঠের হাড় একবার লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু সে নীরব রহিল; আঙুল-কাটা হাতটা একবার চোখের উপর বুলাইল।

ব্যোমকেশের অধরে শুষ্ক ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—'ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের একনিষ্ঠা! কিন্তু একটা কথা বোধহয় আপনারা জানেন না। বিজয়বাবু, আপনি যার কাছে টাকা জমা রাখছেন, রসিকবাবুও ঠিক তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখছিলেন। এবং দুজনেই আশা করেছিলেন যে, একদিন শুভমুহূর্তে বামাল সমেত গোলাপ কলোনী থেকে অদৃশ্য হয়ে কোথাও এক নিভৃত স্থানে রোমান্সের নন্দন-কানন রচনা করবেন! বলিহারি!'

রসিক এবং বিজয় দুজনেই একদৃষ্টে একজনের দিকে তাকাইয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল,—'বসুন, বসুন, আমি যা জানতে চাই তা জানতে পেরেছি, আর আপনাদের কিছু বলবার দরকার নেই।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি বনলক্ষ্মী দেবীর বাঁ হাতের আঙুলগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখুন।'

বরাট উঠিয়া গিয়া বনলক্ষ্মীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বনলক্ষ্মী ক্ষণেক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বাঁ হাতখানা সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

ভুজঙ্গধর এইবার কথা কহিলেন। একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন,—'কী ধরনের অভিনয় হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না—নাটক, না প্রহসন, না কমিক অপেরা!'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই বরাট বলিল,—'এ'র তর্জনীর আগায় কড়া পড়েছে, মনে হয় ইনি তারের যন্ত্র বাজাতে জানেন।'

বরাট স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ভুজঙ্গধরবাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—'তাহলে কমিক অপেরা।'

ব্যোমকেশ ভুজঙ্গধরবাবুকে হিম-কঠিন দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বলিল,—'এটা কমিক অপেরা নয় তা আপনি ভাল করেই জানেন; আপনি নিপুণ যন্ত্রী, সুদক্ষ অভিনেতা। —কিন্তু আপাতত আর্ট ছেড়ে বৈষয়িক প্রসঙ্গে আসা যাক। ভুজঙ্গধরবাবু, ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়িটা বোধহয় আপনার, কারণ আপনি ভাড়া আদায় করেন। কেমন?'

ভুজঙ্গধর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার গলার একটা শির দপ্দপ্ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'কিন্তু কর্পোরেশনের খাতায় দেখলাম বাড়িটা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসের নামে রয়েছে। নৃত্যকালী দাস কি আপনার স্ত্রীর নাম?'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের উপর দিয়া যেন একটা রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইয়া গেল; মানুষের অন্তরে যতপ্রকার আবেগ উৎপন্ন হইতে পারে, সবগুলি দ্রুত পরম্পরায় তাঁহার মুখে প্রতিফলিত হইল। তারপর তিনি স্বস্থ হইলেন। সহজ স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, নৃত্যকালী আমার স্ত্রীর নাম, ১৯ নম্বর বাড়িটা আমার স্ত্রীর নামে।'

'কিন্তু—কয়েকদিন আগে আপনি বলেছিলেন, বিলেতে থাকা কালে আপনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন!'

'হ্যাঁ। তারই স্বদেশী নাম নৃত্যকালী—বিলিতী নাম ছিল নিটা।'

'ও।—নিটা-নৃত্যকালী-সুনয়না, আপনার স্ত্রীর দেখছি অনেক নাম। তা—তিনি এখন বিলেতে আছেন?'

'হ্যাঁ।—যদি না জার্মান বোমায় মারা গিয়ে থাকেন।'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'তিনি মারা যাননি। তিনি বিলিতী মেয়ে নন, খাঁটি দেশী মেয়ে; যদিও আপনাদের বিয়ে বিলেতেই হয়েছিল। আপনার স্ত্রী এই দেশেই আছেন, এমনকি এই ঘরেই আছেন।'

'ভারী আশ্চর্য কথা।'

'ভুজঙ্গধরবাবু, আর অভিনয় করে লাভ কি। আপনারা দুজনেই উঁচু দরের আর্টিস্ট, আপনাদের অভিনয়ে এতটুকু খুঁত নেই। কিন্তু অভিনয় যতই উচ্চাঙ্গের হোক, শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না। অসতর্ক মুহূর্তে আপনি ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন।'

'ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। বুঝলাম না।'

'আপনি বুদ্ধিমান, কিন্তু ভয় পেয়ে একটু নির্বুদ্ধিতা করে ফেলেছেন। খামটা আপনার খোলা উচিত হয়নি। খামের মধ্যে যে ছবিটা ছিল, সেটা আপনি নিজে দেখেছেন, স্ত্রীকেও দেখিয়েছেন, ছবির ওপর আপনাদের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। নৃত্যকালী ওরফে সুনয়না ওরফে বনলক্ষ্মী যে আপনার সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

ভুজঙ্গধর চকিত বিস্ফারিত চক্ষে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিলেন, বনলক্ষ্মীও অবাক বিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। ভুজঙ্গধর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার হাসির অর্থ সুনয়নার সঙ্গে বনলক্ষ্মীর চেহারার একটুও মিল নেই, এই তো? কিন্তু যে-কথাটা সকলে ভুলে গেছে আমি তা ভুলিনি, ডাক্তার দাস। আপনি বিলেতে গিয়ে প্ল্যাস্টিক্ সার্জারি শিখেছিলেন। এবং বনলক্ষ্মীর মুখের ওপর শিল্পীর হাতের যে অস্ত্রোপচার হয়েছে একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই তা ধরা পড়বে। এবং তাঁর সব দাঁতগুলিও যে নিজস্ব নয়, তাও বেশী পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না।'

বনলক্ষ্মীর মুখ-ভাবের কোনও পরিবর্তন হইল না, বিস্ময়বিমূঢ় ফ্যাল্‌ফেলে মুখ লইয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। ভুজঙ্গধর কয়েক মুহূর্ত নতনেত্রে চাহিয়া যখন চোখ তুলিলেন, তখন মনে হইল অপরিসীম ক্লান্তিতে তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছে। তবু তিনি শান্ত স্বরেই বলিলেন,—'যদি ধরে নেওয়া যায় যে বনলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, তাতে কী প্রমাণ হয়? আমি নিশানাথবাবুকে খুন করেছি প্রমাণ হয় কি? যে-সময় নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়, সে সময় আমি নিজের বারান্দায় বসে সেতার বাজাচ্ছিলাম। তার সাক্ষী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি যে অ্যালিবাই তৈরি করেছিলেন, তা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু ধোপে টিকবে না। সে-রাত্রে

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আপনি মিনিট পাঁচেক সেতার বাজিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাকী সময়টা বাজিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী। বনলক্ষ্মী দেবী অস্বীকার করলেও তিনি সেতার বাজাতে জানেন, তাঁর আঙুলে কড়া আছে।'

'এটা কি প্রমাণ? না জোড়াতাড়া দেওয়া একটা থিওরি!'

'বেশ, এটা থিওরি। আপনি নিশানাথ-বাবুকে খুন করেছেন এটা যদি আদালতে প্রমাণ নাও হয়, তবু আপনাদের নিষ্কৃতি নেই ডাক্তার। আপনার ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়ি আজ বিকেলে পুলিস খানা-তল্লাস করেছে; আপনার বন্ধ ঘরটিতে কি কি আছে, আমরা জানতে পেরেছি। আছে একটি অপারেটিং টেবিল এবং একটি স্টীলের আলমারি। আলমারিও আমরা খুলে দেখেছি। তার মধ্যে পাওয়া গেছে—অপারেশনের অস্ত্রশস্ত্র, আপনাদের বিয়ের সার্টিফিকেট, আন্দাজ বিশ হাজার টাকার নোট, তামাক থেকে নিকোটিন চোলাই করবার যন্ত্রপাতি, আর—'

'আর—?'

'মনে করতে পারছেন না? আলমারির চোরা-কুঠুরির মধ্যে যে হীরের নেকলেসটি রেখেছিলেন, তার কথা ভুলে গেছেন? মুরারি দত্তর মৃত্যুর সময় ওই নেকলেসটা দোকান থেকে লোপাট হয়ে যায়।—নিশানাথ এবং পানুকে খুন করার অপরাধে যদি বা নিষ্কৃতি পান, মুরারি দত্তকে বিষ খাওয়াবার দায় থেকে উদ্ধার পাবেন কি করে?'

ভুজঙ্গধরবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বরাট রিভলবার বাহির করিল। কিন্তু রিভলবার দরকার হইল না। ভুজঙ্গধর বনলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে দাঁড়াইলেন। তারপর যে অভিনয় হইল তাহা বাংলা দেশের মঞ্চাভিনয় নয়, হলিউডের সিনেমা। বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গধরের কণ্ঠলগ্না হইল। ভুজঙ্গধর তাহাকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া লইয়া তাহার উন্মুক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহক্ষরিত স্বরে বলিলেন,—'চল, এবার যাওয়া যাক।'

মৃত্যু আসিল অকস্মাৎ, বজ্রপাতের মত। দুজনের মুখের মধ্যে কাচ চিবানোর মত একটা শব্দ হইল; দুজনে একসঙ্গে পড়িয়া গেল। যেখানে দেয়ালের গায়ে নিশানাথের ছবি ঝুলিতেছিল, তাহারই পদমূলে ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

আমরা ছুটিয়া গিয়া যখন তাহাদের পাশে উপস্থিত হইলাম, তখন তাহাদের দেহে প্রাণ নাই, কেবল মুখের কাছে একটু মৃদু বাদাম-তেলের গন্ধ লাগিয়া আছে।

বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গধরের কণ্ঠলগ্না হইল

বিজয় দাঁড়াইয়া দুঃস্বপ্নভরা চোখে চাহিয়া ছিল। তাহার চোয়ালের হাড় রোমন্থনের ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে নড়িতেছিল। মুকুল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় বলিল, 'এস—চলে এস এখান থেকে—'

বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল, বোধহয় শুনিতে পাইল না। মুকুল তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

২৬

পরদিন সকাল বেলা হ্যারিসন রোডের বাসায় বসিয়া ব্যোমকেশ গভীর মনঃসংযোগে হিসাব কষিতেছিল। হিসাব শেষ হইলে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'জমা ষাট্ টাকা, খরচ ঊনষাট্ টাকা সাড়ে ছয় আনা। নিশানাথবাবু খরচ বাবদ যে ষাট্ টাকা দিয়েছিলেন, তা থেকে সাড়ে নয় আনা বেঁচেছে।—যথেষ্ট, কি বল?'

আমি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যান্বেষণের ব্যবসা যে রকম লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত আমাকেও গোলাপ কলোনীতে ঢুকে পড়তে হবে দেখছি।'

বলিলাম, 'ছাগল চরানোর প্রস্তাবটা ভুল না।'

সে বলিল,—'খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। ছাগলের ব্যবসায় পয়সা আছে। একটা ছাগলের ফার্ম খোলা যাক, নাম দেওয়া যাবে—ছাগল কলোনী। কেমন হবে?'

'চমৎকার। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই।'

'নেই কেন? বিদ্যাসাগর মশাই থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-কাজ করতে পারেন, সে-কাজ তুমি পারবে না! তোমার এত গুমর কিসের?'

বিপজ্জনক প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়া বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, কাল সমস্ত রাত কেবল স্বপ্ন দেখেছি।'

সে চকিত হইয়া বলিল,—'কি স্বপ্ন দেখলে?'

'দেখলাম বনলক্ষ্মী দাঁত বার করে হাসছে। যতবার দেখলাম, ঐ এক স্বপ্ন।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া

বলিল,—অজিত, মনে আছে, আমি একবার বনলক্ষ্মীকে স্বপ্ন দেখেছিলুম। আমি সত্যবতীকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আসলে একই কথা। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় কথা। বনলক্ষ্মীর দাঁত যে বাঁধানো তা আমাদের চর্মচক্ষে ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু আমাদের অবচেতন মন জানতে পেরেছিল—তাই বারবার স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের জানাবার চেষ্টা করেছিল। এখন আমরা জানি বনলক্ষ্মীর ওপরের পাটির দুপাশের দুটো দাঁত বাঁধানো, তাতে তার মুখের গড়ন হাসি সব বদলে গেছে। সেদিন ভুজঙ্গধর 'দন্তরুচি কৌমুদী' বলেছিলেন তার ইঙ্গিত তখন হৃদয়ঙ্গম হয়নি।'

'দন্তরুচির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল নাকি?'

'তা এখনও বোঝোনি? সেদিন সকলের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছিল। বাইরের ঘরে বনলক্ষ্মী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। যেই তার সাক্ষী দেবার ডাক পড়ল ঠিক সেই সময় ভুজঙ্গধরবাবু ঘরে ঢুকলেন। বনলক্ষ্মীকে এক নজর দেখেই বুঝলেন সে তাড়াতাড়িতে দাঁত পরে আসতে ভুলে গেছে। যারা বাঁধানো দাঁত পরে, তাদের এরকম ভুল মাঝে মাঝে হয়। ভুজঙ্গধর দেখলেন,—সর্বনাশ। বনলক্ষ্মী যদি বিরল-দন্ত অবস্থায় আমার সামনে আসে, তখনি আমার সন্দেহ হবে। তিনি ইশারা দিলেন—দন্তরুচি কৌমুদী। বনলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কপালে চুড়ি-সুদ্ধ হাত ঠুকে দিলে। কাচের চুড়ি ভেঙে কপাল কেটে গেল, বনলক্ষ্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বনলক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে ভুজঙ্গধর তার কুঠিতে চললেন। বিজয় যখন তাঁর সঙ্গ নিলে, তখন তিনি তাকে বললেন—ডাক্তারখানা থেকে টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি নিয়ে আসতে। যতক্ষণে বিজয় টিঞ্চার আয়োডিন নিয়ে বনলক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে বনলক্ষ্মী দাঁত পরে নিয়েছে।'—

দ্বারে টোকা পড়িল।

ইন্‌স্পেক্টর বরাট এবং বিজয়। বিজয়ের ভাবভঙ্গী ভিজা বিড়ালের মত। বরাট চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, চা খাওয়ান। কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি। তার ওপর সকাল হতে না হতে বিজয়বাবু এসে উপস্থিত, উনিও ঘুমোননি।'

পুঁটিরামকে চায়ের হুকুম দেওয়া হইল। বরাট বলিল,—'ব্যাপারটা সবই জানি, তবু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে। আপনি বলুন—আমরা শুনব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, আপনিও শুনবেন? গল্পটা আপনার পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়।'

বিজয় ম্রিয়মান স্বরে বলিল,—'শুনব।'

'বেশ, তাহলে বলছি।' অতিথিদের দিকে সিগারেটের টিন বাড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল—'যা বলব তাকে আপনারা গল্প বলেই মনে করবেন, কারণ তার মধ্যে খানিকটা অনুমান, খানিকটা কল্পনা আছে। গল্পের নায়ক নায়িকা অবশ্য ভুজঙ্গধর ডাক্তার আর নৃত্যকালী।

'ভুজঙ্গধর আর নৃত্যকালী স্বামী-স্ত্রী। বাঘ আর বাঘিনী যেমন পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু বনের অন্য জন্তুদের ভালবাসে না, ওরাও ছিল তেমনি সমাজ-বিরোধী, জন্মদুষ্ট অপরাধী। পরস্পরের মধ্যে ওরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। ওদের ভালবাসা ছিল যেমন গাঢ় তেমনি তীব্র। বাঘ আর বাঘিনীর ভালবাসা।

'লণ্ডনের একটা রেজিস্ট্রি অফিসে ওদের বিয়ে হয়। ডাক্তার তখন প্ল্যাস্টিক সার্জারি শিখতে বিলেতে গিয়েছিল, নৃত্যকালী বোধ হয় গিয়েছিল কোনও নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে। দুজনের দেখা হল, রতনে রতন চিনে নিলে। ওদের প্রেমের মূল ভিত্তি বোধ হয় ওদের অভিনয় এবং সঙ্গীতের প্রতিভা। দুজনেই অসামান্য আর্টিস্ট; সেতারে এমন হাত পাকিয়েছিল যে বাজনা শুনে ধরা যেত না কে বাজাচ্ছে, বড় বড় সমজদারেরা ধরতে পারতনা।

'দুজনে মিলে ওরা কত নীতিগর্হিত কাজ করেছিল তার হিসেব আমার জানা নেই—স্টীলের আলমারিতে যে ডায়েরিগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো ভাল করে পড়লে হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে—কিন্তু ডাক্তারের বৈধ এবং অবৈধ ডাক্তারি থেকে বেশ আয় হচ্ছিল; অন্তত উনিশ নম্বর বাড়িটা কেনবার মত টাকা তারা সংগ্রহ করেছিল।

'কিন্তু ও ধাতুর লোক অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না, অপরাধ করার দিকে ওদের একটা অহেতুক প্রবণতা আছে। বছর চারেক আগে ডাক্তার ধরা পড়ল, তার নাম কাটা গেল। ডাক্তার কলকাতার পরিচিত পরিবেশ থেকে ডুব মেরে গোলাপ কলোনীতে গিয়ে বাসা বাঁধল। নিজের সত্যিকার পরিচয় গোপন করল না। কলোনীতে একজন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়, তা হোক নাম-কাটা। নিশানাথবাবু তাকে রেখে নিলেন।

'নৃত্যকালী কলকাতায় রয়ে গেল। কোথায় থাকত জানি না, সম্ভবত ১৯ নম্বরে। বাড়ির ভাড়া আদায় করত, তাতেই চালাত। ডাক্তার মাসে একবার দুবার যেত; হয়তো অবৈধ অপারেশন করত।

'নৃত্যকালী সতীসাধ্বী একনিষ্ঠ স্ত্রীলোক ছিল। কিন্তু নিজের রূপ-যৌবন ছলা কলায় ফাঁদ পেতে শিকার ধরা সম্বন্ধে তার মনে কোনও সঙ্কোচ ছিল না। ডাক্তারেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর ওপর, সে জানত নৃত্যকালী চিরদিনের জন্য তারই, কখনও আর কারুর হতে পারে না।

'বছর আড়াই আগে ওরা মতলব করল নৃত্যকালী সিনেমায় যোগ দেবে। সিনেমায় টাকা আছে, টাকাওয়ালা লোকও আছে। নৃত্যকালী সিনেমায় ঢুকল। তার অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ। নৃত্যকালী যদি সিধে পথে চলত, তাহলে সিনেমা থেকে অনেক পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু অবৈধ উপায়ে টাকা মারবার একটা সুযোগ যখন হাতের কাছে এসে গেল তখন নৃত্যকালী লোভ সামলাতে পারল না।

'মুরারি দত্ত অতি সাধারণ লম্পট, কিন্তু সে জহরতের দোকানের মালিক। ডাক্তার আর নৃত্যকালী মতলব ঠিক করল। ডাক্তার নিকোটিন তৈরি করল। তারপর নির্দিষ্ট রাত্রে মুরারি দত্তর মৃত্যু হল; তার দোকান থেকে হীরের নেকলেস অদৃশ্য হয়ে গেল।

'প্রথমটা পুলিশ জানতে পারেনি সে রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল। তারপর রমেনবাবু ফাঁস করে দিলেন। নৃত্যকালীর নামে ওয়ারেন্ট বেরুল।

'নৃত্যকালীর আসল চেহারার ফটোগ্রাফ ছিল না বটে, কিন্তু সিনেমা স্টুডিওর সকলেই তাকে দেখেছিল। কোথায় কার চোখে পড়ে যাবে ঠিক নেই, নৃত্যকালীর বাইরে বেরুনো বন্ধ হল। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন চলে না। ডাক্তার নৃত্যকালীর মুখের ওপর প্ল্যাস্টিক অপারেশন করল। কিন্তু শুধু সার্জারি যথেষ্ট নয়, দাঁত দেখে অনেক সময় মানুষ চেনা যায়। নৃত্যকালীর দুটো দাঁত তুলিয়ে ফেলে নকল দাঁত পরিয়ে দেওয়া হল। তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তখন কার সাধ্য তাকে চেনে?

'তারপর ওরা ঠিক করল নৃত্যকালীরও কলোনীতে থাকা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর এক জায়গায় থাকা হবে, তাছাড়া টোপ গেলবার মত মাছও এখানে আছে।

'জহরের দোকানে বিজয়বাবুর সঙ্গে নৃত্যকালীর দেখা হল; তার করুণ কাহিনী শুনে বিজয়বাবু গলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে নৃত্যকালী কলোনীতে গিয়ে বসল। ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর পরিচয় আছে কেউ জানল না,

পরে যখন পরিচয় হল [illegible] ঝগড়ায় দাঁড়াল। সকলে জানল ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর আদায় কাঁচকলায়।

'নিশানাথ এবং দময়ন্তীর জীবনে দুটো কথা ছিল। প্রথমে সে কথা জানতেন বিজয়বাবু আর ব্রজদাস বাবাজী। কিন্তু নেপালবাবু তাঁর মেয়ে মুকুলকে নিয়ে কলোনীতে আসবার পর বিজয়বাবু মুকুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আবেগের মুখে তিনি একদিন পারিবারিক রহস্য মুকুলের কাছে প্রকাশ করে ফেললেন।—বিজয়বাবু, যদি ভুল করে থাকি, আমাকে সংশোধন করে দেবেন।'

বিজয় নতমুখে নির্বাক রহিল।

ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল—

'মুকুল ভাল মেয়ে। বাপ যতদিন চাকরি করতেন ততদিন সে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছে, তারপর হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয় হল; কচি বয়সে তাকে অন্ন-চিন্তা করতে হল। সে সিনেমায় কাজ জোগাড় করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু হল না। তার গলার আওয়াজ বোধ হয় 'মাইকে' ভাল আসে না। তিক্ত মন নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কলোনীতে এল এবং বারোয়ারী রাঁধুনীর কাজ করতে লাগল।

'তারপর তার জীবনে এল ক্ষণ-বসন্ত, বিজয়বাবুর ভালবাসা পেয়ে তার জীবনের রঙ বদলে গেল। বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে, হঠাৎ আবার ভাগ্য বিপর্যয় হল। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয়বাবু মুকুলের ভালবাসা ভুলে গেলেন। বনলক্ষ্মী মুকুলের মত রূপসী নয়, কিন্তু তার একটা দুর্নিবার চৌম্বক শক্তি ছিল। বিজয়বাবু সেই চুম্বকের আকর্ষণে পড়ে গেলেন। মুকুলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

'প্রাণের জ্বালায় মুকুল নিশানাথবাবুর গুপ্ত কথা বাপকে বলল। নেপালবাবুর উচ্চাশা ছিল তিনি কলোনীর কর্ণধার হবেন, তিনি তড়পাতে লাগলেন। কিন্তু হাজার হলেও অন্তরে তিনি ভদ্রলোক, blackmail-এর চিন্তা তাঁর মনেও এল না।

'এদিকে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তার অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী জেনেও তাকে বিয়ে করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। নিশানাথ কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন, কুল-ত্যাগিনীর সঙ্গে তিনি ভাইপোর বিয়ে দেবেন না। বংশে একটা কেলেঙ্কারিই যথেষ্ট।

'কাকার হুকুম ডিঙিয়ে বিয়ে করবার সাহস বিজয়বাবুর ছিল না, কাকা যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। দুই প্রেমিক প্রেমিকা মিলে পরামর্শ হল : দোকান থেকে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছে জমা করবেন, তারপর যথেষ্ট টাকা জমলে দুজনে কলোনী ছেড়ে চলে যাবেন। ওদিকে রসিক দের সঙ্গে বনলক্ষ্মী ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিল। রসিক কপর্দক-হীন যুবক, সেও বনলক্ষ্মীকে দেখে মজেছিল; বনলক্ষ্মীর কলঙ্ক ছিল বলেই বোধ হয় তার দিকে হাত বাড়াতে সাহস করেছিল। বনলক্ষ্মীও তাকে নিরাশ করেনি, ভরসা দিয়েছিল, কিছু টাকা জমাতে পারলেই দুজনে পালিয়ে গিয়ে কোথাও বাসা বাঁধবে। এইভাবে রসিক এবং বিজয়বাবুর টাকা ১৯ নম্বর মির্জা লেনের লোহার আলমারিতে জমা হচ্ছিল।

'তারপর একদিন বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছেও পারিবারিক গুপ্ত কথাটি বলে ফেললেন। ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ঐ এক বিপদ, যখন আবেগ উপস্থিত হয়, তখন অতিবড় গুপ্ত কথাও চেপে রাখতে পারেন না।

'গুপ্ত কথা জানতে পেরে বনলক্ষ্মী সেই রাত্রেই ডাক্তারকে গিয়ে বলল; আনন্দে ডাক্তারের বুক নেচে উঠল। অতি যত্নে দুজনে ফাঁদ পাতল। নিশানাথকে হুমকি দিতে গেলে বিপরীত ফল ফলতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী দেবী স্ত্রীলোক, কলঙ্কের ভয় তাঁরই বেশী। সুতরাং তিনিই blackmail-এর উপযুক্ত পাত্রী।

'দময়ন্তী দেবীর শোষণ শুরু হল; আট মাস ধরে চলতে লাগল। কিন্তু শেষের দিকে নিশানাথবাবুর সন্দেহ হল, তিনি আমার কাছে এলেন।

'সুনয়না কলোনীতে আছেন এ সন্দেহ নিশানাথের কেমন করে হয়েছিল তা আমি জানি না, অনুমান করাও কঠিন। মানুষের জীবনে অতর্কিত অভাবিত ঘটনা ঘটে, তেমনি কোনও ঘটনার ফলে হয়তো নিশানাথের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা নিষ্ফল।

'নিশানাথের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা রমেন মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে কলোনীতে গেলাম। রমেনবাবুকে ডাক্তার চিনত না, কিন্তু সুনয়না চিনত; স্টুডিওতে অনেকবার দেখেছে, মুরারি দত্তর বন্ধু। তাই রমেনবাবুকে দেখে সুনয়না ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না, সুনয়নার খোঁজেই আমরা কলোনীতে এসেছি।

'দাস দম্পতি বড় দ্বিধায় পড়ল। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে? বনলক্ষ্মী যদি কলোনী ছেড়ে পালায় তাহলে খুঁচিয়ে সন্দেহ জাগানো হবে, পুলিশ বনলক্ষ্মীকে খুঁজতে আরম্ভ করবে। বনলক্ষ্মী যদি ধরা পড়ে, তার মুখে অপারেশনের সূক্ষ্ম চিহ্ন বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে যাবে, বনলক্ষ্মীই যে সুনয়না তা আর [illegible] হবে উপায়?

'নিশানাথবাবু যত নষ্টের গোড়া, তিনিই ব্যোমকেশ বক্সীকে ডেকে এনেছেন। [illegible] যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহলে সুনয়নার [illegible] হয়ে যাবে, নিষ্কণ্টকে দময়ন্তী দেবীর রুধির শোষণ করা চলবে।

'কিন্তু নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রতিপন্ন হওয়া চাই। তাঁর ব্লাড্ প্রেশার আছে, ব্লাড্-প্রেশারের রুগী বেশির ভাগই হঠাৎ মরে—হার্ট-ফেল্ হয় কিম্বা মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়। সুতরাং কাজটা সাবধানে করতে পারলে কারুর সন্দেহ হবার কথা নয়।

'ভুজঙ্গধর ডাক্তার খুব সহজেই নিশানাথকে মারতে পারত। সে প্রায়ই নিশানাথের রক্ত-মোক্ষণ করে দিত। এখন রক্ত-মোক্ষণের ছুতোয় যদি একটু হাওয়া তাঁর ধমনীতে ঢুকিয়ে দিতে পারত, তাহলে তিন মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হত। অ্যাড্রেনালিন ইন্‌জেক্‌শন দিলেও একই ফল হত; তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝোলাবার দরকার হত না। কিন্তু তাতে একটা বিপদ ছিল। ইন্‌জেক্‌শন দিলে চামড়ার ওপর দাগ না থাক, শিরার ওপর দাগ থেকে যায়, পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষার ধরা পড়ে। নিশানাথের গায়ে ইন্‌জেক্‌শনের চিহ্ন পাওয়া গেলে প্রথমেই সন্দেহ হত ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ওপর। সুতরাং ভুজঙ্গধর সে রাস্তা দিয়ে গেল না; অত্যন্ত স্থূল প্রথায় নিশানাথবাবুকে মারলে।

'ব্যবস্থা খুব ভাল করেছিল। বেনামী চিঠি পেয়ে বিজয়বাবু কলকাতায় এলেন। ওদিকে লাল সিংএর চিঠি পেয়ে রাত্রি দশটার সময় দময়ন্তী পিছনের দরজা দিয়ে কাচ-ঘরে চলে গেলেন। রাস্তা সাফ, ডাক্তার সেতার বাজাচ্ছিল, বনলক্ষ্মীর হাতে সেতার দিয়ে নিশানাথের ঘরে ঢুকল। সম্ভবত নিশানাথ তখন জেগে ছিলেন। ডাক্তার আলো জেলেই জানলা বন্ধ করে দিলে। তারপর—

'দুটো ভুল ডাক্তার করেছিল। কাজ শেষ করে জানলাটা খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাড়াতাড়িতে মোজা জোড়া খুলে নিয়ে যায়নি। এ দুটো ভুল যদি সে না করত তাহলে নিশানাথবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে কারুর সন্দেহ হত না।

'পানুগোপাল কিছু দেখেছিল। কী দেখেছিল তা চিরদিনের জন্যে অজ্ঞাত থেকে যাবে। আমার বিশ্বাস সে বাইরে থেকে ডাক্তারকে জানলা বন্ধ করতে দেখেছিল। নিশানাথের মৃত্যুটা যতক্ষণ স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হয়েছিল ততক্ষণ সে কিছু বলেনি, কিন্তু যখন বুঝতে পারল মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তখন সে উত্তেজিত হয়ে যা দেখেছিল

বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, সে কিছু বলতে পারল না।

'ডাক্তার বুঝল পানু কিছু দেখেছে। সে আর দেরি করলে না, পানুর অবর্তমানে তার কানের ওষুধে নিকোটিন মিশিয়ে রেখে এল।

'তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনাদের জানা, নতুন করে বলবার কিছু নেই।—কাল ডাক্তার আর বনলক্ষ্মীর আত্মহত্যা আপনাদের হয়তো আকস্মিক মনে হয়েছিল। আসলে ওরা তৈরি হয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল, 'কিন্তু সায়েনাইডের ক্যাপসুল কখন মুখে দিলে জানতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দুটো সায়নাইডের ক্যাপসুল ডাক্তারের মুখে ছিল, মুখে করেই এসেছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার কথা মাঝে মাঝে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখন প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিনি। তারপর ডাক্তার যখন দেখল আর নিস্তার নেই, তখন সে উঠে বনলক্ষ্মীকে চুমো খেল। এ শুধু প্রণয়ীদের বিদায় চুম্বন নয়, মৃত্যু চুম্বন। চুমু খাবার সময় ডাক্তার একটা ক্যাপসুল স্ত্রীর মুখে দিয়েছিল।'—

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশই আবার কথা কহিল,—'যাক, এবার আপনারা দু'একটা খবর দিন। রসিকের কি ব্যবস্থা হল?'

বরাট বলিল,—'রসিকের ওপর থেকে বিজয়বাবু অভিযোগ তুলে নিয়েছেন। তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'ভাল। বিজয়বাবু, পরশু রাত্রে আন্দাজ এগারোটার সময় যে-মেয়েটি আপনার ঘরে গিয়েছিল সে কে? মুকুল?'

বিজয় চমকিয়া মুখ তুলিল, লজ্জা-লাঞ্ছিত মুখে বলিল,—'হ্যাঁ।'

'তাহলে বনলক্ষ্মী গিয়েছিল স্বামীর কাছে। ডাক্তার সেতার বাজিয়ে তাকে ডেকেছিল। মুকুল আপনার কাছে গিয়েছিল কেন? আপনি ওদের কলোনী থেকে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন, তাই সে আপনার কৃপা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল?'

বিজয় অধোবদনে রহিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'বিজয়বাবু, আশা করি আপনি মুকুলকে বিয়ে করবেন। সে আপনাকে ভালবাসে। এত ভালবাসা উপেক্ষার বস্তু নয়।'

বিজয় মৌন রহিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। মুকুলের সঙ্গে হয়তো ইতিমধ্যেই পুনর্মিলন হইয়া গিয়াছে।

বিদায়কালে বিজয় আমতা আমতা করিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তা শোধ দেবার নয়। কিন্তু কাকিমা বলেছেন আপনাকে আমাদের কাছ থেকে একটা উপহার নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'কি উপহার?'

বিজয় বলিল,—'কাকার পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা ছিল, দু'চার দিনের মধ্যেই কাকিমা সে টাকা পাবেন। ওটা আপনাকে নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া হাসিল। বলিল,—'বেশ, নেব। আপনার কাকিমাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাবেন।'

প্রশ্ন করিলাম,—'ছাগল কলোনীর প্রস্তাবটা কি তাহলে মুলতুবি রইল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা বলা যায় না। এই মূলধন দিয়েই ছাগল কলোনীর পত্তন হতে পারে। বিজয়বাবু, প্রস্তুত থাকবেন, গোলাপ কলোনীর পাশে হয়তো শিগ্গির ছাগল কলোনীর আবির্ভাব হবে।'
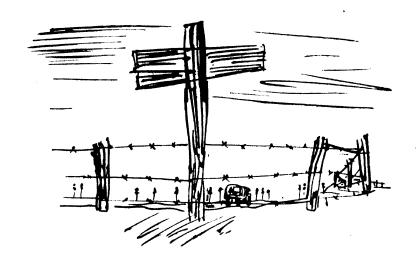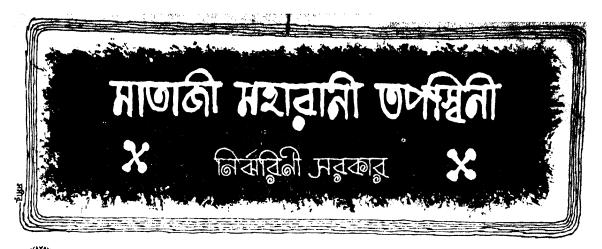
রতবর্ষে যে সব মহামনস্বিনী ও বীরাঙ্গনা জন্মগ্রহণ করে' ভারতভূমিকে পবিত্র করেন, মাতাজী ছিলেন তাঁদেরই অন্যতমা। এই অসামান্যা দেবী, মাতাজী মহারানী তপস্বিনী, এই নামেই জন সমাজে পরিচিতা ছিলেন। নামের অর্থ এই যে একাধারে তিনি মাতাজী অর্থাৎ লোকজননী, মহারানী অর্থাৎ অসীম শক্তিময়ী, বীরাঙ্গনা ও পরমৈশ্বর্যশালিনী ও ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা তপস্বিনী। সত্য সত্যই এই নাম তাঁর জীবনে একান্তভাবে সার্থকতা লাভ করেছিল।

মাতাজীর জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যেন তাঁর সমগ্র জীবনখানিই তপস্যা তেজ শক্তি বীরত্ব গৌরব দ্বারা পূর্ণ ছিল। আর এই বোধও মনে আসে যে, জাতীয়ত্ব-বোধ ও স্বদেশের প্রতি অতুলনীয় প্রেমই তাঁর জীবনব্যাপী কঠিন তপশ্চর্যার মূলে ছিল; প্রত্যেকটি কাজই তিনি স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য করেছিলেন। তাঁর তৃস্বসা ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাতা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ। সম্ভবত এই মাসীমাতার কাছ হতেও মাতাজী শিশুকাল হতেই জাতীয়ত্ববোধ ও সাহসিকতা সম্বন্ধে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। মাতাজীর প্রধান কীর্তি নারীদের শিক্ষার জন্য মহাকালী পাঠ-শালার প্রতিষ্ঠা, তার মূলেও ছিল সেই স্বদেশপ্রেম। মাতাজী মনেপ্রাণে বুঝে-ছিলেন, নারীই জাতির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং ভবিষ্যৎ-জাতির স্রষ্টা। নারীজাতির শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকলে কোন জাতিই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। দেশের প্রকৃত শক্তি ও কল্যাণ মাতৃশক্তি উদ্বোধনের ভিতরেই নিহিত রয়েছে। আমাদের বাংলার কবি বলেছেন—

"না জাগিলে যত ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

মাতাজী এর সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি ভারতের মাতৃশক্তি আবার যাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ জাগ্রত করবার প্রেরণাদাত্রীরূপে আবির্ভূতা হতে পারে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে মূর্তিদান করবার সাধনা গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা এরই ফলস্বরূপ।

ভারত-নারীর কৌলিক বিশেষত্ব ও তাদের মহান সদ্‌গুণাবলী যাতে বিকাশ লাভের প্রেরণা পায়, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে সেগুলি যাতে আমরা হারিয়ে না ফেলি এইটিই তাঁর একান্ত কামনার বিষয় ছিল। পরের ভাল গুণগুলি আমরা গ্রহণ

মাতাজী মহারানী তপস্বিনী

করব, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য কখনও বর্জন করব না, নারীদের শিক্ষা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দেরও এই মত ছিল; তিনি মাতাজী-প্রতিষ্ঠিত এই পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালী এবং বালিকাদের পূজার্চনা, ব্রত উপবাস, স্নিগ্ধশুচিতাপূর্ণ পরিবেশ, সংস্কৃত পাঠে অনুরাগ প্রভৃতি দেখে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলেন।

শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি এবং যে পন্থার অনুসরণ করি, সেই শিক্ষা কখনও বা হয় কুশিক্ষা অর্থাৎ পরের অনুকরণ, অহমিকা ও গর্ববুদ্ধি, বিলাসিতার দিকে গতিলাভ, আবার কখনও বা হয় অশিক্ষা অর্থাৎ আলস্য জড়তা স্বার্থপরতার বীজ মনের ভিতর বপন করা।

শিক্ষা চিরদিনই সংস্কৃতির বাহক। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাবধারা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যে শিক্ষা সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে, সে শিক্ষাকে কখনও সুশিক্ষা বলা যায় না। এককালে বাংলা দেশে নারীদের ভিতর পুঁথিগত শিক্ষা একেবারে ছিল না বললেই চলে, কিন্তু তবুও জাতীয়তাবোধজনিত এমন একটা সংস্কার অন্তর্নিহিত ভাবে ছিল, যার ফলে পল্লীগ্রামেও অনেক মহাপ্রাণা নারীর উদ্ভব হয়েছিল। মাতাজী চেয়েছিলেন শিশু-মনে সেই শিক্ষার বীজ বপন করতে যা সময়ক্রমে অংকুরিত ও ক্রমবিকশিত হয়ে ভারতীয় নারীর কুলক্রমাগত উচ্চভাবগুলিকে সংস্কার-জনিত আবিলতা দুর্বলতা হতে মুক্ত করে নারীকে উন্নততর অনুভূতি ও জ্ঞানের অধিকারিণী করবে।

দেবী মহাকালী হলেন সকল শক্তির আধারস্বরূপা, সেইজন্য এই শিক্ষালয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল মহাকালী পাঠশালা। হিন্দু ধর্মের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান আছে। এই লৌকিক আচরণের দ্বারা এক-দিকে সুফল হয়, আবার ক্ষেত্রভেদে কুফল হতে পারে। প্রত্যেক আচরণ ও বাইরের অনুষ্ঠানের সঙ্গেই যদি না আন্তরিক উচ্চভাবের সংযোগ থাকে, তা'হলে অনুষ্ঠানগুলি দিনে দিনে প্রাণহীন অন্ধ সংস্কাররূপে পরিণত হয়ে পড়ে, আবার অন্যদিকে এইসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই বালিকারা নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ এইসব কৌলিক সদ্‌গুণগুলির অধিকারিণী হতে পারে।

সংস্কৃত শ্লোকগুলির নির্ভুল আবৃত্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবদেবীর পূজার্চনা শিশুমনে এমন একটি প্রভাব আনে যাতে তার নিজের অজ্ঞাতেও মনের ভিতর জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হয়। শিশু-মনের এই রহস্য মাতাজীর অজ্ঞাত ছিল না। আত্মপ্রত্যয় এবং জাতীয় সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা এই গুলিই প্রত্যেক জাতির পক্ষে উন্নতির ও অগ্রগতির পথে এক বিশেষ অবলম্বন। মাতাজী জানতেন যে, এককালে এই শিশুরাই জাতির জননীর পদ অধিকার করবে। তখন প্রতি ঘরে ঘরে কর্তব্য-পরায়ণা, ত্যাগশীলা, আত্মসমর্পিতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রেরণাদাত্রী জননীর আবির্ভাবে জাতি আবার নব জীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ এবং কলকাতা নগরীকেই মাতাজী কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী এই পাঠশালার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও কলকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থ বাড়িটি এই জন্য বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেন। সেই সময় আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এই পাঠ-শালার প্রয়োজনীয়তা অন্তরে অনুভব করে মাতাজীকে সাহায্য করেন। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে মাতাজীর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা কুমার নরেন্দ্রলাল খাঁ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা পরলোকগত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর মাসে মাসে ৬০ টাকা এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের সময় ১০০০ টাকা বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য দিতেন। প্রথমে ২০টি ছাত্রী নিয়ে পাঠশালা আরম্ভ হয়েছিল, পরে ছাত্রীসংখ্যা আশাতিরিক্ত-রূপে বেড়ে যাওয়াতে ও সেই কারণে স্থানাভাবের অসুবিধার জন্য মাতাজী পাঠশালার জন্য নিজস্ব বাটী তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সংগৃহীত অর্থ এবং নিজের যা কিছু সমস্তই এই বিদ্যালয়ের বাটী তৈরির জন্য নিঃশেষে ব্যয় করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ঋণগ্রস্ত হন। কিন্তু দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তাঁকে সেই ঋণদায় থেকে মুক্ত করেন। বিবেকানন্দের শিষ্যা হেনরিয়েটা মুলারও মাতাজীকে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সাহায্য করেন। স্বামী সারদানন্দও বিলাতে এই পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মাতাজীকে পাঠিয়ে দেন। পরে এই মহাকালী পাঠশালার ১৬টি শাখা নানা জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল।

মাতাজীকে বুঝতে হলে তাঁর আশ্চর্য ঘটনাবহুল জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না, তাঁর জীবন যেন একটি বীরত্বময় গাথা, তপস্যা ও বীরত্বের সম্মিলিত কর্মধারায় তাঁর সমগ্র জীবন জনকল্যাণের জন্য নিয়োজিত। ইনি ছিলেন রাজবংশোদ্ভবা এবং চিরকুমারী। তাঁর পিতৃকুল ছিলেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশের আর্কটের রাজবংশ, তাঁর মাতামহ-বংশ ছিলেন আর্নি প্রদেশের ভূস্বামী। তাঁর পিতা নারায়ণ রাও আর্কট প্রদেশের রায়-বেলুড়ের দুর্গাধিপতি ছিলেন। তাঁদের বংশে কন্যা ছিল না বলে নারায়ণ রাও সস্ত্রীক কন্যার প্রার্থনায় হর-পার্বতীর উপাসনায় ব্রতপালন করেছিলেন এবং এই ব্রতপালনের ফলেই এই অলোকসামান্যা দেবীকে কন্যারূপে লাভ করেন। ছোট-বেলায় তাঁর নাম ছিল সুনন্দাবাঈ।

ছোটবেলা থেকেই সুনন্দার জীবনে নানা বিষয়ে প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। সাত বছর বয়সেই তিনি লঘু-কৌমুদী ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। এর পর সংস্কৃত চর্চায় তাঁর একান্ত মনঃসংযোগ দেখা যায়। কালিদাসের রচনাগুলি যেমন তাঁর প্রিয় ছিল, সেইরকম সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রগুলিও তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। আবার পিতার দুর্গ যখন তিনি পরিভ্রমণ করতেন, তখন দুর্গপ্রাচীরস্থ অস্ত্রগুলি দেখে ও চারণের মুখে প্রাচীন গাথা শুনে তাঁর হৃদয় বীররসে উদ্দীপিত হয়ে উঠত। "হায়, এই মহাপরাক্রান্ত জাতির বংশধরগণ আজ কিনা পরাধীনতা বরণ করে নিয়েছে" এই চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়ে তাঁর মনকে এমন এক সাধনার পথে আকর্ষণ করে নিত, যে-পথে সংসারের সুখভোগ তুচ্ছ বলে মনে হয়, যে-পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। সে-পথ পরম তপস্যার পথ। তাই তিনি একদিন গোপনে একাকিনী গৃহত্যাগ করে চলে যান। এই সাহসিকা তরুণী কোন বিপদ বা বাধা গ্রাহ্য না করে নিঃসম্বলে অশ্বারোহণে দূর পথ অতিক্রম করে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। ছোটবেলা হতেই তিনি অশ্ব-চালনায় নিপুণা ছিলেন। অশ্বচালনা তাঁর অতি প্রিয় আনন্দ ও খেলার বিষয় ছিল। শাস্ত্রের মত তিনি শস্ত্রবিদ্যাতেও সুদক্ষা ও অতি সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে মাতাজী দুরূহ পঞ্চাগ্নি তপস্যার ব্রত গ্রহণ করে দিনের পর দিন চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে কঠোর তপস্যার মধ্যে মগ্ন রইলেন। এই তপস্যার দীক্ষা তিনি কোন গুরুর কাছে গ্রহণ করেছিলেন জানা যায় না। তপস্যার সময়েই চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

সকলেই তাঁর অসাধারণত্ব তাঁর পবিত্রতা ও সংসারাতীত মহিমময় ভাব অনুভব করে তাঁকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। মাতাজী কত খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন তার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন তাঁর মাসিমা ঝাঁসির রানী বিদ্রোহে যোগদান করেন, তখন তিনিও যে সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'স্বরাজ' পত্রিকা থেকে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় যে বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, তাঁর সংগৃহীত সেই বিবরণ থেকে এখানে আমরা কিছু তুলে দিচ্ছি—"সেই সময়ে ভারতে স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা হয়, সিপাহীরা বিদেশীর বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য রণরঙ্গে মাতিয়া ওঠে, ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ এই সমর-রঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এই ঝাঁন্সির রানী আমাদের মাতাজীর মাতৃস্বসা ছিলেন। স্বভাবতঃ তিনিও তাঁহার মাতৃস্বসার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনিও অশ্বপৃষ্ঠে মুক্ত তরবারি হস্তে রণস্থলে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন।"

বিদেশীর পরাধীনতা হতে দেশকে মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর বরাবরই ছিল, তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনার পর তিনি পিতার দুর্গের পুরনো অস্পৃশ্যদের সংস্কার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। দুর্গপ্রাচীরের উপরের কামানগুলিতে মরিচা ধরে গিয়েছিল, সেগুলি ঘষে-মেজে ও মেরামত করে আবার কাজের উপযোগী করে দুর্গ-প্রাচীরের উপর সাজিয়ে রাখবার জন্য প্রহরীদের হুকুম দিলেন। তার ফলে পুরনো দুর্গ আবার নবশ্রী ধারণ করল। আসন্ন যুদ্ধের আগে যেভাবে দুর্গ রক্ষার আয়োজন করা হয়, এই আয়োজনকে যেন তার পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছিল। এতে ইংরেজ শাসকবর্গ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা রাজকুমারীকে বন্দী করে ত্রিশিরাপল্লীর এক পার্বত্য-দুর্গে বন্ধ করে রাখলেন। অবশেষে কিছুদিন পরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই নজরবন্দী অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্তি-দান করেন। মুক্তি পাওয়ার অল্পদিন পরেই মাতাজী আবার তপস্যার জন্য নৈমিষারণ্যে চলে যান। তপস্যার ভিতর দিয়েই মানুষ যে নিজের শক্তি সম্বন্ধে চেতনার পথ খুঁজে পায়, মাতাজীর এই তপস্যার ভিতর যেন সেইটিই প্রকাশ পেয়েছে। পর-জীবনে যে ভারতনারীদের ভিতর শিক্ষা বিস্তাররূপ কর্মসাধনার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাও তাঁর তপস্যারই আর এক রূপ।

তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্তা ও দৃঢ় সংকল্প-শীলা, আমরা তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তার পরিচয় পাই। নৈমিষারণ্যে থাকার সময়ে স্থানীয় গৌরীশঙ্কর মন্দিরে পূজা করতে মন্দিরের অধিকারী পাণ্ডার কাছে তিনি বাধা পেয়েছিলেন; তখন পূজার উপকরণগুলি গৌরীশঙ্করের নামে জলে বিসর্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন, নিজেই তিনি নৈমিষারণ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন ও তাতে গৌরীশঙ্করের মূর্তি স্থাপনা করে সেই মন্দিরে তপস্যা ও অর্চনা করবেন। সত্যই তিনি তাঁর সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করেছিলেন। যখন তিনি নৈমিষারণ্যে তপস্যানিরতা ছিলেন, সম্ভবত সেই সময়েই তাঁর মাতাজী মহারানী তপস্বিনী নাম সাধারণ্যে প্রচারিত হয়।

সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজের কবল-মুক্ত হওয়ার জন্য মাতাজী স্বাধীন নেপাল রাজ্যে চলে যান এবং কিছুদিন নেপালে বসবাস করেন। নেপালে থাকবার সময়েও মাতাজীর কর্মসাধনা সমভাবেই অক্ষুণ্ণ ছিল। গঙ্গা দেবীর মন্দির স্থাপনা করে নেপালবাসীর কাছে তিনি দেবীরূপে পূজিতা হন। নেপালে থাকবার সময়েও তিনি নেপালবাসীদের মনে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তুলবার জন্য একান্ত চেষ্টা করেন।

১৯০৭ সালের ২০শে এপ্রিল বৃদ্ধ বয়সে কাশীধামে মাতাজীর তপস্যাপূত বিচিত্র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর তিরোধানের পর বাংলাদেশের বহু সংবাদপত্রে তাঁর জীবনী ও কর্মসাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকা থেকে এখানে কিছু তুলে দিয়ে তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর অন্তর্ধানের পর 'স্বরাজ' লেখেন—"মাতাজীর চরিত্র অদ্ভুত; ঐশ্বর্য, তপস্যা, বিদ্যা, বীরত্ব, মাতৃজনসুলভ কারুণ্য এত-গুলি গুণ একাধারে কোথাও দেখা যায় না। মাতাজী রমণী ছিলেন, কিন্তু তাঁর তেজঃপ্রভাবে রাজা-রাজড়াও পর্যন্ত কম্পান্বিত হইত। মাতাজী তপস্বিনী বটেন, কিন্তু তিনি মূর্তিমতী রণচণ্ডী ছিলেন। চোরবাগানে যখন মহাকালী পাঠশালা ছিল, তখন পর্যন্ত মাতাজীর কটিদেশ সর্বদাই স্বর্ণমণ্ডিত অসি দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। অসিখানি বাঁকাইয়া কটিতে বাঁধা যাইত। অসিধারিণী তপস্বিনী, তুমিই যথার্থ স্বরাজনেত্রী, তোমার পণ বৃথা হইবে না। বঙ্গদেশে স্বরাজের সূচনা হইবে। তাহার আয়োজন তুমি করিয়া গিয়াছ, তোমার আশীর্বাদে বঙ্গদেশ বীর-প্রসবিনীতে পূর্ণ হইবে।"

চতুরীলাল

বনফুল
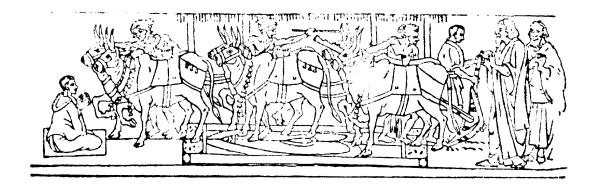
চতুরীলালের নাম আপনারা নিশ্চয় শোনেন নাই। আমিও শুনি নাই। সে নিজেই আসিয়া সেদিন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিল। বলিল, তাহার দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় নাকি আমার চিকিৎসায় দুই বৎসর পূর্বে ভাল হইয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে আমার নিকট আসিয়াছে নিজের চিকিৎসা করাইবার জন্য।

বলিলাম, "আপনার হয়েছে কি—"

চতুরীলাল সহসা হাত দুটি জোড় করিয়া ফেলিল।

"সব কথা বলবার আগে একটা কথা জানতে চাই হুজুর। আপনার 'ফিস' কত?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে ডাক্তারবাবু। কিছু কম করুন।"

"আপনি সত্যিই যদি দশ টাকা দিতে না পারেন, কম করব বইকি। খুব গরীব যদি হন একেবারেই কিছু নেব না—"

এই কথায় চতুরীলালের চোখে-মুখে যে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহা অপূর্ব। তাহা শ্রদ্ধা, যাহা-ভাবিয়াছিলাম-তাই-ব্যঞ্জক একটা ভাব এবং চতুরতার এক অবর্ণনীয় সমন্বয়। ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে সে বামগুম্ফ-প্রান্তে ধীরে ধীরে তা দিতে লাগিল। অর্থাৎ ভাবিতে লাগিল অতঃপর কি বলা যায়।

আমি আর একটি রোগী লইয়া পড়িলাম। তাহাকে বিদায় করিয়া চতুরীলালের দিকে চাহিলাম আবার। চতুরীলাল বলিল, "আমার বাড়ির কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তিনিও এম-বি-বি-এস। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাই নি, আপনার কাছেই এসেছি। আসতে আমার খরচ লেগেছে তিন টাকা বারো আনা। ট্রেনভাড়া আড়াই টাকা, জলখাবার এক টাকা, রিক্সাভাড়া চার আনা। ফিরে যেতেও প্রায় ওই খরচই লাগবে। আপনি ফিস কিছু কম করুন ডাক্তারবাবু। দুটি টাকা আপনাকে দেব আমি।"

"আমি তো বলছি সত্যি যদি আপনার দেবার ক্ষমতা না থাকে, ও দু'টাকাও দিতে হবে না। আপনার বিবেক যা বলে তাই করুন। আমি আর কি বলব আপনার মতো ভদ্রলোককে।"

চতুরীলাল এই কথায় নীচের ঠোঁটটি উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বারান্দায় গিয়া নাকটা ঝাড়িয়া আসিল। তাহার পর স্মিতমুখে বলিল, "রাজেন্দর সিং আমাকে বলেছিল, আপনি দয়ার সাগর। যে যা দেয় নিয়ে নেন।"

"আগে হয়তো দয়ার সাগর ছিলাম। কিন্তু ক্রমশই জিনিসপত্রের দাম যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সাগর আর থাকতে পাচ্ছি কই, ডোবা হয়ে যাচ্ছি—।" চতুরীলাল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছেন, সকলেরই অবস্থা সমান। আমার কিছু জমি আছে, ধান মন্দ হয়নি, দামও পেয়েছি খারাপ নয়, কিন্তু খরচ—"

চতুরীলালের খরচের বর্ণনা শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। পরিচিত এক ভদ্রলোক মোটরযোগে হন্তদন্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শালীর নাকি নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ভদ্রলোক চাকুরি করেন। ভাল চাকুরি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধে ডালপালাসমেত গোটা শ্বশুরবাড়িটাই আসিয়া ভর করিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানী এবং বাস্তুহারা, বলিবার কিছু নাই। শালীটি আসিয়াই টাইফয়েডে পড়িয়াছে।

চতুরীলালকে বলিলাম, "আপনি একটু বসুন। আমি আসছি এখনি—"

চলিয়া গেলাম। একটা ইনজেকশন দেওয়ার পর ভাগ্যক্রমে শালী সামলাইয়া গেল। ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। দেখিলাম চতুরীলাল তখনও বসিয়া আছে। বারান্দায় আর একটি রোগিনীও আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার নাকটা ফোলা, চোখ দুইটি লাল, মুখময় অসংখ্য ছোট ছোট গুটি। মেয়েটি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল।

চতুরী বলিল, "আপনাকে পাঁচ টাকা দেব ডাক্তারবাবু। নিন, এবার আমার কথা শুনুন—।" রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু রাগ প্রকাশ করাটা শোভন নয়।

হাসিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকার বেশি দেবার আপনার ক্ষমতা নেই নাকি, সত্যি?"

চতুরীলাল মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি রাজেন্দর সিংয়ের আত্মীয়। আমাকে কিছু খাতির করবেন না?"

আমিও উত্তরে মুচকি হাসিলাম।

আমার হাসি দেখিয়া মরীয়া হইয়া চতুরীলাল বলিল—"বেশ, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। ছ'টাকা—" গণিয়া গণিয়া ছ'টি টাকা সে আমার সম্মুখে রাখিয়া হাত জোড় করিল।

"বেশ কি হয়েছে বলুন—"

চতুরীলাল তাহার রোগের বিবিধ বর্ণনা শুরু করিল। বর্ণনা শুনিয়া বুঝিলাম, চতুরীলাল সম্ভবত বহুমূত্র ব্যাধিতে কাবু হইয়াছেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করিলাম, প্রচুর চিনি।

"খুব খান নাকি?"

"খুব। ছেলেবেলায় খেতে পাই নি। এখন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আপনার আশীর্বাদে খাবার অভাব নেই এখন। খুব খাই—"

চতুরীলালের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কিন্তু আপনার যা অসুখ হয়েছে, তাতে বেশি খাওয়া তো চলবে না। খাওয়া কমাতে হবে।"

"সেটি পারব না হুজুর। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন, ধারে তাঁর মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল। একবেলা খাওয়া, তাই জুটত না সব দিন। এখন আপনার আশীর্বাদে সামলে উঠেছি অনেকটা। ঘরে গাই আছে, ধান হয়, আলু হয়, আখ হয়—এখন যদি আবার আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে—"

হাত উল্টাইয়া এবং মুচকি হাসিয়া চতুরীলাল বক্তব্য শেষ করিল।

"কিছুদিন সংযম করুন। চিনি, ভাত, আলু এই তিনটে অন্তত ছেড়ে দিন"

"ওই তিনটেই তো প্রিয় খাদ্য আমার। ও তিনটে ছেড়ে দিলে খাব কি"

"তাহলে ইনজেকশন নিন। কিন্তু তার আগে আপনার রক্তটা দেখা দরকার, রক্তে চিনির পরিমাণ কত আছে।"

"রক্তেও চিনি থাকে না কি?"

"থাকে বইকি। রক্তে চিনির পরিমাণ বেশী হলেই তো সেটা পেচ্ছাপ দিয়ে বেরোয়—"

"ও—"

চতুরীলাল পুনরায় কিছুক্ষণ গুম্ফ-প্রান্ত পাকাইয়া অবশেষে বলিল—"তার মানে খরচ—"

"অনেক খরচ। রক্ত পরীক্ষা করতেই যোল টাকা লাগবে। তারপর ইনজেকশন পিছু খরচ আছে। রোজ অন্তত একটা করে ইনজেকশন দিতে হবে। বেশ খরচ এতে। তার চেয়ে কিছুদিন সংযম করেই দেখুন না—"

"এই আমার যথাসর্বস্ব..."

চতুরীলাল নীরবে গোঁফে তা দিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ত পরীক্ষার জন্যে আমি আট টাকার বেশি দিতে পারব না। দয়া করুন একটু—করতেই হবে—"

করিতেই হইল। বুঝিলাম শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছি।

চতুরীলালের রক্ত লইলাম। বলিলাম, "আপনি বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। রক্তটা পরীক্ষা করে তারপর আপনার ব্যবস্থা করব।"

বারান্দায় যে মেয়েটি এতক্ষণ আধ-ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে একেবারে আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান বাবু আমাকে—"

"কি হয়েছে বল আগে, পা ছাড়, পা ছাড়—"

পা ছাড়িয়া সে নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোমটা সরাও, দেখি কি হয়েছে—"

দেখিলাম। সংশয় রহিল না, কি হইয়াছে। সিফিলিস। চতুরীলালও ব্যগ্র আননে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। মেয়েটিকে বলিলাম, "তোমার যা হয়েছে, তা সারাতে গেলে অনেক খরচ করতে হবে। পারবে?"

মেয়েটি দুইটি রুপার বালা আঁচলের তলা হইতে বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিল।

"এই আমার যথাসর্বস্ব। এই নিয়ে আমার অসুখটা সারিয়ে দিন আপনি ডাক্তারবাবু।"

"বালা নিয়ে কি করব। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমার। ওষুধের যা ন্যায্য দাম—তাই জোগাড় কর—"

সমুদ্রে সকাল, কন্যাকুমারিকা — আলোকচিত্রী মদন দত্ত

"কত দাম—"

"ভাল করে চিকিৎসা করলে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পড়বে। তোমার রক্তটাও পরীক্ষা করতে হবে—"

"তার কত লাগবে?"

"দশ টাকা। তা-ও না হয় আমি ছেড়ে দেব। ওষুধের দাম কিন্তু লাগবেই......"

মেয়েটি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

"বালা দুটোর দাম কত?—"

"আমি তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। এখন বেচতে গেলে কি দাম পাব জানি না।"

চতুরীলাল বলিল—"দশ টাকার বেশি কেউ দেবে না—ভিতরে গালা আছে—"

মেয়েটি আবার আমার পা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম—"তুমি বাইরে বস। দেখি আমি কি করতে পারি। হাসপাতালে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, দেখ সেখানে যদি বিনাপয়সায় কোনও ব্যবস্থা হয়—"

"সেখানে গিয়েছিলাম। তারাও টাকা চায়—"

"তবে আর কি হবে—"

মেয়েটি চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি হবে, আচ্ছা বাইরে গিয়ে বস, দেখি কি করতে পারি।"

কিছুদিন পূর্বে এক বিলাতী কম্পানি কিছু ঔষধ বিনামূল্যে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম তাহাই কাজে লাগাইব।

সহসা চতুরীলাল বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ও সেরে যাবে?"

"যাবে—"

চতুরীলাল পুনরায় বামগুম্ফ-প্রান্ত ধরিয়া টানিতে শুরু করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—"দিন ওকে ওষুধ। দাম আমি দেব—"

"আপনি?"

চতুরীলাল কিছু না বলিয়া কোমর হইতে একটি গেঁজে বাহির করিয়া পাঁচখানি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিল।

হাসিয়া বলিল, "মায়া জিনিসটা বড় খারাপ ডাক্তারবাবু। মায়াই ডুবিয়েছে আমাদের—"

চতুরীলালের মুখে এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। একটা সন্দেহ হইল।

"আপনার কেউ হয় না কি?"

"না। তবে—"

চতুরীলাল ইতস্তত করিতে লাগিল।

"খুলেই বলুন না, ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। ওর মুখটা আমার মায়ের মুখের মতো অনেকটা—"

তাহার পর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার মাসখানেক পরে মা-ও মারা যান। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ, মায়ের কোন চিকিৎসাই করাতে পারি নি—"

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, চতুরীলালের চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে।

যাত্রী

জীবনানন্দ দাশ

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিল কবে;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে ইঙ্গিত ছিল—
সেই সব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিল এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে—আলো জল আকাশের টানে;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ পৃথিবীর দেশে;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি—চারিদিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম;
কাকে তবু?
পৃথিবীকে? আকাশকে? আকাশে যে সূর্য জ্বলে তাকে?
ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে?

যেই কুজ্ঝটিকা ছিল জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যেসব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে পলে;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় প্রেমে;
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।

তবু আলোপৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে করে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে;

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহাল ভোরে—কাহিনীর কত শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে;
নব নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড়;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

ভোর হয়ে এল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভোর হ'য়ে এল কবি তোর।
নীড়ছাড়া বনপাখি
করে দূরে ডাকাডাকি,
খোপে খোপে কাঁদে কবুতর।

জীবন-রজনী-শেষে
দাঁড়ায়ে শিয়রদেশে
মরণ-অরুণ ওই
চাহিয়া নির্নিমেষে;
তোরই ঘুম ভাঙাতে
তোরই পথ রাঙাতে
বাহিয়া তিমিরতরী এল সে।

যে-আলো নয়নাতীত
সেই আলো হাতে তার,
যে-বোঝা বহনাতীত
সেই বোঝা মাথে তার,
তোরই জ্বালা সহিতে
তোরই বোঝা বহিতে
এতদিনে অবসর পেল সে।

রবিশশী জ্বেলে জ্বেলে
এই যে রজনী জাগা,
কেঁদে হেসে ভালবেসে
এই যত ভাল লাগা,
কোজাগরী অভিনয়—
আর নয় আর নয়,
ঘুরিয়ে দে এ দুয়ারে চাবি রে!

আজ আর ডাকিস নে
ভক্তের ভগবানে,
সুখে দুখে মুখে বুকে
কোথায় সে সেই জানে;
এল যে-করুণাময়,
আঁখিভরা বরাভয়,
নম' সে-অবশ্যম্ভাবীরে।

ওরে কবি, নবপ্রভাতে
রবিশশীতারা জ্বালা
রজনীর দীপমালা
মিবিছে অরুণ-প্রভা-তে।

সমাপ্তি

অজিত দত্ত

আয়ু কি জীবন? ম্লান বৈকালের বিষণ্ণ বাতাসে
বারবার স্বস্তিহীন এ-জিজ্ঞাসা আসে।

যত ভালোলাগা আর যত প্রেম, সব জড় করে'
যেন লঘু একগাছি হার,
সুদীর্ঘ আহ্নিকচক্রে শুধু তুচ্ছ উপলে প্রস্তরে
বোঝা গুরুভার।
তবু এই বেঁচে থাকা বড় মনে হয়,
জানিনা এ-তুচ্ছতায় জীবনের কোন্ পরিচয়।

আজ ভাবি, জীবনের হয়তো দেখেছি আবির্ভাব,
হয়তো বা কোনো ক্ষণে স্তব্ধ ছিল আয়ুর আরাব।
বাসনার কামনার আকাঙ্ক্ষার একান্ত আগ্রহ
যে প্রেমেরে একদিন ব্যাপ্ত করে ছিল অহরহ,
সেখানে কি দেখেছি জীবন?—
দুঃসহ ব্যথায় সুখে ভরা সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ!

অথবা কি কোনোদিন অহেতুক আত্মবিস্মৃতিতে
শুধু ভালোলাগা মাঝে জীবন এসেছে ছোঁয়া দিতে?
আনন্দে, সন্তোষে, সুখে, অশ্রুতে, কোথায়
জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়?
জীবন কি আছে জয়ে, সংগ্রামে কি আলস্য-বিলাসে?
আকুল অধীর প্রেমে সে কি মৃদু লঘুপায়ে আসে?

বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
কেবলি জিজ্ঞাসা জাগে—আয়ুতে কি জীবন ফুরায়?

অনন্যা

মণীন্দ্র রায়

স্তাবকের মতো সকালসন্ধ্যা
একটি কথাই যদি বলি, তার
কারণ জানবে তুমি অনন্যা,
তোমার উপমা খুঁজে পাওয়া ভার।

জানি বটে তুমি নবফাল্গুনে
রঙে রঙে আন যে দাক্ষিণ্য
চৈত্রের খর তৃষার আগুনে
পুড়ে যায় সেই খেয়ালী চিহ্ন।

জানি; তবু দেখি দগ্ধ আকাশে
আন কোথা হতে বৈশাখী মেঘ;
যা-কিছু শুকনো ঝরে যায়, আসে
চিকন সবুজে দৃপ্ত আবেগ।

এমনি করেই যতো গান গাও
জীবনের সঙ্গে রাগিনী তোমার
ফিরে আসে—যেন আকাশে উধাও
পাখি খোঁজে নীড়ে আশ্রয় তার।

অথবা তুমি এ প্রাচীনা পৃথ্বী!
শত হিমযুগে তুষারঝড়কে
ছিন্ন করেছ অগ্নিদীপ্ত
প্রেমের সূর্যোদয়ের খড়্গে!

একটি কথাই বলি তাই, আর
বেশী কী বলব, হে রাজকন্যা,
প্রাণের প্রতীক—কবিতা আমার!
স্বপ্নে কর্মে তুমি অনন্যা॥

ছায়া

দিনেশ দাস

গনগনে দিনের আঁচ নিভে গেলে
সায়াহ্নের সবুজ আকাশঃ
নামে অবকাশ।
খণ্ডিত কার্জন পার্ক, ছায়াপুরী——
ছায়া-ছায়া অন্ধকারে তুমি-আমি ছায়াময়-ছায়াময়ী ঘুরি।
মাঝে মাঝে ডুব দিই মুখর নৈঃশব্দ্য হ'তে
কলকল জলের মতই নির্জন জনতার স্রোতে।

একদা এখানে ছিল নিঃসাড়
একটি সবুজ হ্রদ টলটলঃ
হয়তো তুমিও ছিলে আলো-নীল জল——
আমি এক বেগুনী পাহাড়।

মনে হয়
আজ নয়,
আর-এক জীবনে
অনেক হেঁটেছি যেন আমরা দু'জনে,
কোন্ ফাঁকে
আঙুলে আঙুল লাগে,
কখন তোমার ডানা ছুঁয়ে যায় আমার বুকের নীড়,

কখনো আমার বাহু আলগোছে
ছুঁয়েছে তোমার বুক নরম নিবিড়।

উনুনের নিবু-নিবু আঁচে
শিখা নেই তাপ আছেঃ
ছায়া-ছায়া অন্ধকার ধূসর অথই
দু'টি ছায়া ঘোরে ফেরে ছায়ার মতই,
একটি অদৃশ্য সূচে হঠাৎ কখন
বাঁধা পড়ে দু'টি ছেঁড়া মন।

সহসা আকাশে সাদা চাঁদের প্রদীপঃ
টিপ্ টিপ্
তারার জোনাকী ওড়ে
সময় মোমের মত পোড়ে
আকাশ সবুজ——
তোমাকে দেখায় যেন আলো-আলো সবুজ-সবুজঃ
ছায়া, কায়া হয়—প্রলাপ, আলাপ——
কাদার দেহেতে ফোটে রক্তগোলাপ,
উন্মুখ
শরীরে বাঁকা চাঁদের ধনুক!

টুকরো কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

[১]

নিবের মুখে যখন ঝরে চতুর মিলের ঝংকার—
ভর্তি মনের ফুর্তি সে নয়--
রামধনুকের টংকার!
—শূন্যে ওঠে, শূন্যে কাঁপে—
নড়ে না কাক-পক্ষী।
পদ্যলেখক সহজে বন অনুপ্রাসের ঝক্কি॥

[২]

মস্তো আকাশ ছেঁটে পেলাম
ছোট্ট ছাদের ঢাকনি।
দুর্দম সব স্বপ্ন হলো
বোতল ভরা চাটনি।
প্রাণের আগুন নিঃশেষে হায়—
কখন-যে যায় জুড়িয়ে।
হঠাৎ দেখি চন্দ্র-সূর্য—
সবাই গেছেন বুড়িয়ে॥

[৩]

বাল্মীকি-ব্যাস স্বর্গতি, তাই, ছড়ারা পায় তক্ত।
গণভোটের দাবীতে মন
লোকায়তের ভক্ত।
অসুরকে মা ত্রিশূলে বিঁধে
দেখান হাসির খেলা।
অসুর মারে মনুষ্য হয়, মর্ত্যে বানায় কেল্লা॥

[৪]

শুকনো টিলায় রুক্ষ শিলায়
আবাদ হলো শূন্য।
অবিশ্বাসের ধুলোয় ফসল
ফললো পাথরচূর্ণ!
কসরতি নয়, পাণ্ডিত্য নয়, মাথাটা দাও ঘুরিয়ে।
ভালোবাসায় যায় যদি যাক্ সমস্ত সুখ গুঁড়িয়ে॥

বৈরাগ্যবারিধি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বৈরাগ্য নিয়েছি মনে। গোলাপী রঙের সমারোহ
লুপ্তপ্রায়; অপরাহ্নে জীবনের পর্বতশিখরে
অঢেল গৈরিক রঙ অস্তরাগে জানায় বিদ্রোহ,
বাসনা বিক্ষিপ্ত আজি কম্পমান নক্ষত্রনিকরে।

বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছিনু ব্যাকুল বৈকালে,
তখনও আসেনি সন্ধ্যা, সবেমাত্র অপরাহ্ন বেলা,
দেখিনু অবাক হয়ে ঢেকে গেছে অসংখ্য শৈবালে
সে মানস-সরোবর; স্তব্ধ হংসমিথুনের খেলা।

জীবনে বসন্তদিনে এসেছিল ফুলের জোয়ার
এসেছিল দক্ষিণের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য সেদিন,
আষাঢ়ের নবমেঘে সজল মিনতি সবাকার
শুনেছিনু বারবার; আশা ছিল সংশয়বিহীন।

আমার সম্মুখ দিয়ে একে একে চলে গেল তারা
ছায়ামূর্তি অবিকল, চঞ্চল চরণে গেল সরে'
তাদের চলার পথে আমি ছিনু সজাগ প্রহরা,
বিলুপ্ত স্মৃতির মাঝে আপনারে রাখিয়াছি ধরে।

বৈরাগ্য নিয়েছি মনে, এ বৈরাগ্য কাহার উপর?
নিজের ঐশ্বর্য পানে সতৃষ্ণ নয়নে যদি চাই,
বিগত দিনের গত বৈভবের ব্যথায় অন্তর
এমনি বিহ্বল যদি, ঋতুরঙ্গে মিথ্যা হলো ছাই।

এ মোর বৈরাগ্য নহে; পলাতক মনের গভীরে
নৈরাশ্য বেঁধেছে বাসা জীর্ণ বাসনার তন্তু ঘিরি'
নিজেরে বঞ্চনা করি আসিলাম বৈতরণীতীরে
যে পথ এলাম ফেলি', সেই পথ বলে এস ফিরি।

কিছুই লাগে না ভালো; দিগন্তের ধূসর প্রচ্ছদে
ভেসে ওঠে ধীরে ধীরে যৌবনের স্বপ্নময় দ্বীপ,
কে বুলায় যাদুদণ্ড জীবনের শ্যামল সম্পদে
কে জ্বালে আঁধার ঘরে নিজ হাতে সন্ধ্যার প্রদীপ?

সংগঠন

নিশিকান্ত

দেবি দুর্গে,
দুর্গতি-দলন গতি কোনরূপে রাখিবে কোথায়?
কল্পান্তর উদ্ভাসিয়া প্রকাশিবে কোন প্রহরণ?
আলোকের গণ-ধাত্রি, গণেশ জননি, বসাধায়
গণাসুর সাধে তার অন্ধকার অঙ্গ-সংগঠন!

মহাশক্তি,
সমগ্র মানবতার মর্মহীন চেতনার মাঝে
শিব-বিদ্রোহীর বীর্য অন্ধতায় গঠিত, উদ্ধত,
বিশ্বের উদয়াচল আবরিয়া অলক্ষ্যে বিরাজে
অসিত-পর্বতাকারে, সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মত!

জগন্মাতা,
জগতের মর্মদেশে ভবান্তর সাধন ভূমিতে
স্বরূপা মনস্বীরূপে সাধো তব সংগঠন-দীপন ঃ
আলোক-বৈরী এই পৃথিবীর তিমির-অম্বিতে
জাগিয়া উঠুক তেজো বিজ্ঞান, সৌর-শিহরণ।

ভগবতি,
সৃজন-শিখার খড়্গে অসুরের অসৎ রূপান্তর,
হোক তব সংগঠনে মানবতা সর্বাঙ্গ-সুন্দর।

কলাবতী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তুমি-ই আমার সব: তৃষাদীর্ণ প্রথম যৌবনে
দিয়েছো অজস্র হাতে; অকৃপণ শুভ্র সমুজ্জ্বল
ঢেলেছো প্রাণের পাত্রে অন্তলীন আবর্ত-উচ্ছল
মধুর মুখর ধারা,—অন্তরীক্ষের আলো অন্ধ মনে
জেলে দিয়ে রৌদ্রেঝড়ে আমাকে ক'রেছো সচেতন
দারুণ দুঃসহ দিনে, সংবর্তের ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে
বিচিত্র বীণার তারে ঢেউ তুলে আশা জেলে চোখে
দীপ্ত করো বারংবার শঙ্কাতুর আমার যৌবন।

কণ্টকিত সংসারের একান্ত গভীরে ভূকম্পন
সংহারী যুগের তাপে,—দ্বন্দ্ব মৃত্যু বাদ বিসম্বাদে
অগ্নি জ্বলে জনপদে, বাত্যাহত আমার যৌবন
তোমারি প্রসাদে ফের ভরে' ওঠে অম্লান স্বাদে।

ছন্দে সুরে বর্ণে গানে, কলাবতী, হৃদয়কন্দরে
ঝরাও নির্ঝরধারা, বাঁচি তাই মড়কে ও ঝড়ে॥

অভিজ্ঞান

বটকৃষ্ণ দে

সমস্ত শ্রাবণ ভ'রে কান্নার করুণ স্বরলিপি
মেঘের মৃদঙ্গে মন গেয়ে গেলো, তার আবাহনী,
হৃদয় পুড়িয়ে, আহা, কতো শিখা জ্বালা হ'লো, দীপ হ'য়ে
নিভে গেলো, আঁধার ছড়ালো শুধু আশার অশনি!

আসে নি সে, আসে নি সে, উতরোল আশ্বিনের মন
তার, ভুলে গেছে কার অশ্রুঘন অশ্রুত শ্রাবণ
কেটেছে তাকেই ডেকে; কার দৃষ্টি ঘাসে-ঘাসে ফুল
ফোটালো, আকাশে হাসি, পথে পথে ছড়ালো বকুল;

জানে না সে, জানবে না—আমার অশ্রুর স্ফীত ফেনা
সমুদ্রে শঙ্খের গায়ে কারুকার্য করে,—ঝিনুকের
হৃদয়ে মুক্তার মুখ এঁকে রাখে, সংগোপনে; সে না
জানুক, তবুও সে তো সু-উজ্জ্বল প্রসন্ন সুখের
দিনে, এই দান তার বুকে ধরে; আমার ব্যথাকে
বরনের অভিজ্ঞানে পূর্ণ করে, মূর্ত করে রাখে॥

কাছের বিকেলে—পাশে আছে যারা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেল পাঁচটা তাও পার হ'লো ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
আসেনি নিমেষ রায়।
সকলেই জানে কোনো কিছু হ'লে এজমালী ইলাদির
সেলাইয়ে বসাটা ছল।
দলে দলে যতো অফিস ফেরত বাবুরা ফিরছে বাড়ি
বড়ো রাস্তায় ট্রাম-বাস্ চঞ্চল।
যতো মেঘ জমে মনের কোনায়
ডোবে ইলাদিদি সেলাইয়ে বোনায়
ততো বেপরোয়া পদতাড়নায় ঘোরে ঘর্ঘর কল।
বড়ো রাস্তায় মোটরের ভেঁপু, ঘড় ঘড় চ'লে ট্রাম;
ক্ষেমী পিসি আজ আফিমের শোকে করেননি হরিনাম।

জ্যোতিষী বলেছে—ভাগ্যের চাকা
ঘুরবে, আনবে উড়ো কিছু টাকা
ভাবছি তো তাই নতুন ঘোড়াটা এবার ধরতে হ'বে।
বিকেলের মাঠ হ'লো মেছোহাট ছেলেদের কলরবে।
......মাঠ থেকে মন ফিরিয়ে আনলে ঘরে
বইমুখো মীরা গলা ছেড়ে শনি পড়া মুখস্থ করে।
ক্ষেমী পিসি শনি ব'লেই চলেন——
আমাকে যে দেখি যমও ভুললেন
হরি, হরি, আর কেন মিছে বেঁচে থাকা?
ঝণ্টু ভেঙেছে টুনুর র‍্যাকেট
মারলেন খুব কাকা।
নামাবলি যাঁর জরার জ্যাকেট
কুঁজো ঠাকুমাটি প্রথম ব্র্যাকেট
ইচ্ছাটি তাঁর আদুরে নাতিকে
অঞ্চলতলে প্রশ্রয় দিয়ে ঢাকা

অকারণে তিনি বেরিয়ে এসেই পাকালেন গোলমাল
হাত-ধরা যাঁর চোখ ভরা জল হুজির আছেই সর্দি হাসে না।
মিটিমিটি হেসে চক্ষু ঘুরিয়ে অসীম কৌতূহলে
খুড়তুতো বোন বেবী ছুটে এসে বলে—
জানো গো ইলাদি গণক বলেছে গুনে
নিজে কানে এসো শুনে
এ-মাসে তোমার হ'বেই একটি রাঙা টুকটুকে বর
তারপর এই বছর ঘুরতে হ'বেই একটি ইয়ে......
হাসি চাপে ইলা গম্ভীর মুখে; শুধু ঘর্-ঘর্-ঘর্
ইলাদির কল বিরামবিহীন চলে——
কোঁদল করছে যেন ইলাদিদি সেলাই করার ছলে!
বেবীটা তো কতো ছোটো তার চেয়ে তবু কী এঁচড়ে পাকা!
জেনে-শুনে তবু কী আদর দেন বলেন না কিছু কাকা।

সেলায়ের কলে—'এলো না, এলো না'
সুর বাজে। ইলা পেলো না পেলো না,
বৃথা জানা হ'লো নিমেষ রায়ের আছে বিস্তর টাকা।
বড়ো রাস্তায় ট্রাম-বাস্ চলে, সেলায়ের কল ঘরে,
ঘরে ও বাইরে ঘোরে ঘর্ঘর চাকা!
কপালে যে দেখি ঘাম দেখা দিলো
আহা ইলাদি গো, বেগড়োলো বুঝি পাখা!
স্বপ্নের সুতো খালি খালি ছেঁড়ে
ববিনের সুতো বারে বারে কেটে যায়!
এলো না নিমেষ রায়
বৃথাই হ'লো যে ইলাদি তোমার এত পাউডার মাখা।
হ'বে কি নেহাৎ সমূহ বেহাত নিমেষ রায়ের টাকা।

তুষারাচ্ছাদিত পথ, গাড়োয়াল

আলোকচিত্রী—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দত্ত

বীজাণু

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কোথায় কি-এক পোকা না-জেনে যে দিতেছে কামড়ঃ
জীবন সে-বিষে জরোজর;
পারদ লাফিয়ে ওঠে থরোথর থার্মোমিটারে——
বারেবারে, দেহে তাপ বাড়ে।
চোখ জ্বলে, বুক ফাটে—
চেতনা নিথরঃ
জ্বর—খুব জ্বর।

ছোটো ক'টি বিষের বীজাণু
কুরে কুরে খায় হাড়, ঘাড় আর জানু;
প্রাণ খোঁজে একমুঠো করুণার কণা——
ঘুম ভাঙে—ঘুমহীন, খরতর নোতুন যাতনা।
রোগী কি কাতর, অসহায়!
আপন ছায়ারে দেখে দেয়ালে ছড়ানো
মৃত্যুর মতন ভয় পায়।

তারপর নিয়মমাফিক
ওষুধ ও পথ্য ঠিক-ঠিক;
নীলাকাশ, নীল ভোর, শরতের গিনিগলা রোদের মতন——
ঘুঘু-ডাকা দূর বনঃ
সবুজ স্বপনঃ
শরীরে আবার সেই পরিচিত জীবনের পুরো আয়োজন।

জ্বরের জটিল সব পোকা
যত কেন অগণন আর চোখা-চোখা
তরল ওষুধ আর ওষুধের ছুঁচ দিয়ে তাকে মারা যায়——
রোগীর হলুদ ফিকে ঠোঁটে
টকটকে চাঁদ ওঠে লাল এক রঙীন আশায়।

তবু বুঝি সব ধোপ টিঁকে
আরেক পোকার ঝাঁক
ছিলো আর থেকে যায় আর কোনো দিকে;
আজ কিংবা কাল
ছুঁচে যার কিছুতেই মেলেনা নাগালঃ
ছুঁচের মতন শুধু থেকে-থেকে পৃথিবীকে বেঁধে নিরন্তর।
সভ্যতাকে শুষে নেয়,
ইতিহাস পায়ে মোছে, ধুলো করে গ্রাম বা নগর!

প্রেমবিবর্ত

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

একবার ইচ্ছে করে চেখে দেখি
বিগত যুগের প্রেম ঃ
অনেকটা কান্না আর হা-হুতাশ
অনেকটা অভিমান, আর
অকারণে টেনে আনা বেদনা নিয়ে
বিনিয়ে বিনিয়ে বিলম্বিত লয়ে রচিত
কাঁচা কাব্যঃ
জড়ানো, পাকানো পুরনো দিনের প্রেম—
সাত কথার পর আসল কথা—
সাত মাসের পর মধুমাস।

ইচ্ছে করে ডুব দিয়ে দেখি
বিগত প্রেমের অতলে।
চোখে দেখি ঝালর-ঝোলানো,
ঝুমকো দেওয়া, ঘোমটা দেওয়া প্রেম!

এ যুগের বৈরাগিণী মেয়ে
বসে নেই তিতিক্ষায়;
আছে একটি বাস্তব ইঙ্গিতের পথ চেয়ে।
প্রচ্ছন্না বধূ, প্রয়োজনেই বহুদর্শী।

স্বাগত হে স্বৈরিণী, এ যুগের বধূ,
ক্লীব সম্ভাবনা আর
গ্রামজ বংশের অনুক্রমকে নির্মূল করে,
নিয়ে এসো বলদীপ্ত রক্তবীজ।
বহুজনের তৃপ্তিতে তুমি কল্যাণী।
বহুজনের কল্যাণে তুমি মহীয়সী।
ধ্বংস করো,
ড্রয়িংরুমের নীল আলোয়
গুরুজনের নেপথ্য প্রশ্রয়ে
চুক্তিবদ্ধ নির্লজ্জ প্রেম।
নিষ্কলত্র নিষ্কলঙ্ক জীবনের যজ্ঞালয়ে
জ্বলুক স্বৈরিণীর কটুমাংস।
এ কালের যজ্ঞ নারীমেধ!

ছবি

কানাই সামন্ত

সজল কজ্জলরাগ অশ্রুভরা মেঘে
দিগ্‌বলয়। বনশ্রেণী তারই ছায়া লেগে
গাঢ়নীল বাষ্পে ঢাকা। স্থিরশিহরণ
নবীন ধান্যের ক্ষেত শ্যামলবরন
নতোন্নত ধরণীর দূর হতে দূরে।
ঊর্মিশিহরিত হেথা সরসীমুকুরে
হর্ষকণ্টকিততনু খর্জুর, গম্ভীর
তালতরুচ্ছবি কাঁপে। কাকচক্ষু নীর
ভেদ করি কোকনদ কহ্লারের ফুল
হাসে সেই সাথে সাথে। সহসা ব্যাকুল
উড়ে পড়ে শুভ্র পক্ষে হানিয়া চমক
মাঠ হতে, তড়াগের তট হতে বক
সাশ্রুনীল দিক্‌পটে। মনে হয়, কবি-
কল্পনার এ পৃথিবী; সত্য নয়, ছবি।

বুধুয়ার পাখি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জানো এটা কার বাড়ি? শহুরে বাবুরা ছিলো কাল—
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা-দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনাঃ
তাই কোনো পাখিও বসে না!
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে——
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।

এবারে রিখিয়া ছেড়ে বাবুডির মাঠে
বুধুয়া অবাক হয়ে হাঁটে
দেহাতি পথের নাম ভুলে
হঠাৎ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের মতো মুখ তুলে
ভাবেঃ ওটা কার বাড়ি, কার অত নীল?
আমার ঘরের চেয়ে আরো ভালো, আরো
নিকোনো উঠোন তার, পাখিবসা বিরাট পাঁচিল!
ওখানে আমিও যাবো, কে আমায় নিয়ে যেতে পারো?

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায় কানায় আলো পথের কলসে ভরা থাকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি,
রূপোলী ডানায় যার নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি॥

ট্রেন

গোপাল ভৌমিক

রাত্রির আঁধার কেটে ট্রেন চলে যায়
বজ্‌বজ্‌ কিংবা ফল্‌তায়
কে রাখে হদিশ?
মাঝরাতে কানে আসে তীব্র এক শিস——
তারপর কেঁদে ওঠে এক দল কাক——
ঘটে গেল কোন্‌ দুর্বিপাক।

আবার স্তব্ধতা নামে——
টেলিগ্রাফের থামে থামে
ঝুলে থাকে নরম আঁধার——
স্পর্শভীরু জীবনের কোমল সত্তার
যেন এক মুগ্ধ প্রতিরূপঃ
মৃদু সুরে কথা-বলা অন্ধকার-স্তূপ
আবার কখন হবে ভেঙে খান খান——
সেতারে বেসুরো হবে তান।

ট্রেনের মতন এক হিংস্র সরীসৃপ
ছায়ার মতন ঘিরে জীবনের দ্বীপ
নেমে যায় অন্ধকার অবচেতনায়——
সৃষ্টি-লগ্নে অগ্নি-বৃষ্টি হৃদয়ে ছড়ায়।
সে মুহূর্তে অন্ধকার গেয়ে ওঠে গান——
সরীসৃপ-ট্রেন এসে কেটে দেয় তান।

স্বগত সন্ধ্যা

আনন্দ বাগচী

সময়ের যাদুঘরে জীবনের রং মরা নয়
বালুছায়া মগ্ন হয়, গানের কলির মত নদী
এঁকে বেঁকে ক্লান্ত হয়, তবু মন পাতিলে উদ্দাম
শ্রান্তিহীন, নেই তার আজো ছড়া-কাটার অবধি!

হৃদয়ের মৃগমদে, পৃথিবীর সে-পুরোনো প্রেমে
আজো সে শরিক। আজো অন্য এক মেয়ের মুখের
বিচিত্রায় মুগ্ধ চোখ, তার নামে আজো আসে নেমে
স্বর্গের শিশির-সুখ তৃণ-বুকে, আজো সে-গানের……

বৃষ্টির সীমান্ত নেই, জোনাকী মেয়ের দুই হাত
হাতে নিয়ে কথা দেয়, খোঁপায় চুম্বন গুঁজে দিয়ে
নেশা করে, বিছানায় তারা গুণে ভোর করে রাত,
(গানের কলির নদী চোখে ঘুম ঃ ঠোঁটে ক্লান্তি নিয়ে!)

চিরকাল একদিন চোরাবালি বিকেলের চরে
সন্ধ্যার আবহ রচে' পাখির কাকলি কুয়াশায়
ধুয়ে যায়, ধুয়ে গেলে, মানুষের নাম যাদুঘরে
ঝ'রে যায়, তবু মন আবার আবার তার ছড়া কেটে যায়।

স্বীকৃতি

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

অনেক ক্লান্তির মাঠ পার হয়ে অবশেষে যদি
মহুয়াছায়ায় করি জীবনের শিবির স্থাপন,
এবং বিতত করি যদি তা উজ্জ্বল অগণন
নক্ষত্র শেফালিকীর্ণ নমনীল দিগন্ত অবধি,
হিসাবসর্বস্ব এই পৃথিবীর সঙ্গে নিরবধি
ব্যবধান সৃষ্টি করে যদি এই বিরক্ত জীবন
স্বপ্নের মহুয়াতলে শান্তি খোঁজে, তবে তুমি মন
ঘোলাটে কোরো না তার আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছশাদা নদী।

জীবনের চাঁপারঙ সকালের প্রসন্ন আশ্লেষ
হতে আমি বার বার হয়েছি বিশ্লিষ্ট, তাই আজ
দীঘল ক্লান্তির মাঠ পার হয়ে মহুয়াছায়ায়
এবার রচনা করি প্রাণের মৈত্রেয়ী মমতায়
মর্ত্যের সঙ্গীত দিয়ে অমর্ত্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ;
প্রাত্যহিক জীবনের অনাত্মীয় অসহ আওয়াজ
শান্তির গায়ত্রী যার ভাঙে না।
আমাকে কেউ তাই
যদি বলে পলাতক, তবে কোন দেবো না দোহাই॥

সূর্য-ভস্ম

শ্রীযতীন্দ্র সেন

সূর্যের আলোর সোনা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ঝরে' ঝরে';
তৃষা আর দাহ নিয়ে আদিগন্ত ধু ধু করে বালুকা [illegible]।
সাহারার হাহাকার বাতাসে বাতাসে কেঁদে ফিরে হা-হা-স্বরে;
[illegible]তার রিক্ততায় বন্ধ্যা মূক মৃত্তিকার দহিছে পঞ্জর।

হেথায় মরুর বুকে তরুর পিপাসা নিয়ে মূর্ছাতুর, একা——
গণিতেছি মৃত্যুদিন, পলে পলে পদধ্বনি শুনি কান পাতি';
কামনার কুহুধ্বনি আমার আকাশে নাই; বেদনার কেকা——
তা-ও আজি স্তব্ধ হায়! তৃণের মমতাহীন মরুমায়া সাথী!

বজ্রাহত বনস্পতি, নিঃসঙ্গ দাঁড়ায়ে শুধু হেরি দুঃস্বপন;
দাবদগ্ধ দেবদারু দীর্ণবক্ষ, শ্যামলিমা লুপ্ত অরণ্যের;
নভোচারী মেঘ হতে নেমে আসে ধারা নহে,—বিদ্যুৎদহন;
হেথায় আগুন জ্বালে মুঠি মুঠি স্বর্ণরেণু জ্বলন্ত সূর্যের!

সে আলোক পান করি' জানি বন্ধ্যা মৃত্তিকায় শিহরি' শিহরি'—
দেখা নাহি দিবে হায় হেথা কভু স্বর্ণশীর্ষ শস্যের মঞ্জরী!!

যুগ্ম

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কি জানি কেমন পূর্ণতা পায় কিসে
আশ্লেষ-তলে রেখায়িত বন্ধন!
তোমার দৃষ্টি আমার দৃষ্টি মিশে'
একটি পাত্র হয়ে ওঠে দুটি মন।

পরস্পরের চোখে দেখি ঘন কালো
মাঝের পৃথিবী হারায় অবধি ক্ষীণ।
তোমার রাত্রি তুলে ধরে মোর আলো
তোমারই অমায় লুকায় আমার দিন।

স্বপ্ন-সত্যে স্বতন্ত্র ঘুম-ঘোরে
একই স্রোতে বয়। প্রতি তরঙ্গ চলে
দুজের ঢেউকে ভেঙে-চুরে দিয়ে জোরে,
আমাদের মুখ আমাদেরই ঠোঁটে গলে।

এত যে শব্দ, থেমে যায়—সব কথা
যত বলা আর ইচ্ছা কুলুপে আঁটা।
সেতু বেঁধে দেয় দৃষ্টির নীরবতা
চূড়া বেঁধে ওঠে দুধারে পাথর কাটা।

তোমার তালুতে আমার রসনা-ধার
খসখসে তান খোঁজে সুর-শৃঙ্গার॥

নদীর মনে

শিশিরকুমার দাশ

নির্জন নদীর কান্না তীরে তীরে ঢেউ হয়ে লাগে
ঘুরে আসে কত দেশ—ঘুরে আসে কত বনভূমি
শালবনে পাতার আড়ালে বুঝি সেই সুর জাগে।

বলে যায় বালুকার কানে কানেঃ শোন শোন তুমি
আমার অগাধ জল কেঁদে মরে না পেয়ে ঠিকানা
তুমি কোন পথ জানো? বলে নদী বালুকারে চুমি'।

তবু দেখি হাওয়া আসে—কোথা হতে না পাই নিশানা
ঝরে পাতা—ওড়ে বালি—আকাশ ছড়ায় কিছু আলো
কান্নার স্রোতের মাঝে নৌকা আসে নাম নেই জানা।

প্রতিদিন ঝরে রোদ—ভেঙে যায় কুয়াশার কালো
কান্না যেন থেমে যায়; ভুল ক'রে গেয়ে ওঠে পাখিঃ
কার্তিকের সন্ধ্যা হ'লে কারা বলেঃ দীপ জ্বালোজ্বালো।

তবু বলে নদী কেঁদেঃ সবই তবে হ'ল বুঝি ফাঁকি
একদিন ভালোবেসে—এই বনে এই তীরে তীরে
রেখে গেছি সারামন—বেঁধে গেছি জীবনের রাখী।

অথচ কে জ্বালে দীপ অন্ধকারে আজো ধীরে ধীরে
জেগে থাকে মাঠে মাঠে কান্না আর ভালোবাসা নিয়ে
নির্জন নদীর মতঃ ছায়া দিয়ে মনটিকে ঘিরে॥

কোনো নায়িকাকে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

যদিই ও-চোখে এ-আঁখির ছায়া
ক্ষণ-অবকাশে দুলালো,
তবে একবার এস কাছে, আনো
স্ফুরিত অধর—ফুল্ল।

জানি যে সময় পৃথিবীর পথে
পরিক্রমায় ফিরতে
ক্ষণ-সৌরভে ফুটে ঝরে হবে
বিচূর্ণ নানা তীর্থে।

তাই ক্ষণিকের এই অবসরে
জেলে গান, রূপ-দীপ ত
হে মধুচারিণী, করো এ প্রাণকে
ভালবাসা-পরিতৃপ্ত।

যে-ছায়া নিবিড়,—চোখে ভিড় [illegible]
স্বপ্নের জাল [illegible]
বিদ্যুৎশিখা প্রেম তাকে ঘিরে
কাঁপবে কি আঁখি-[illegible]
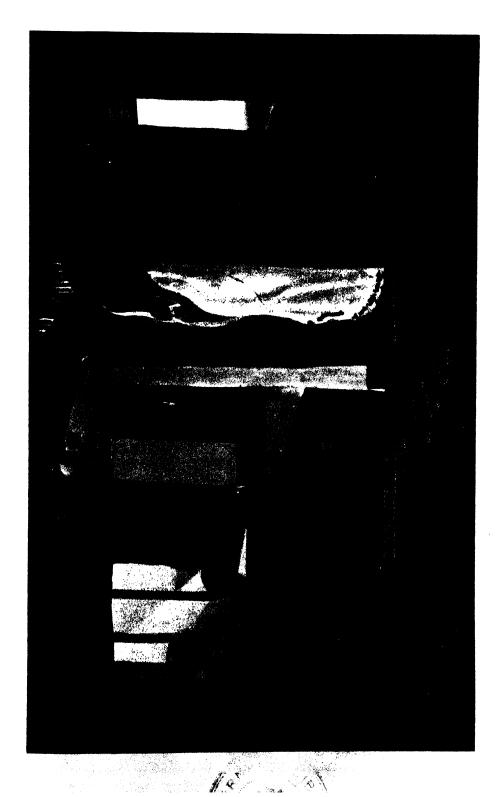
ভোরের আলো

শিল্পীঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেংগল অটোটাইপ কোং

সবিতা দেবীর সৌজন্যে
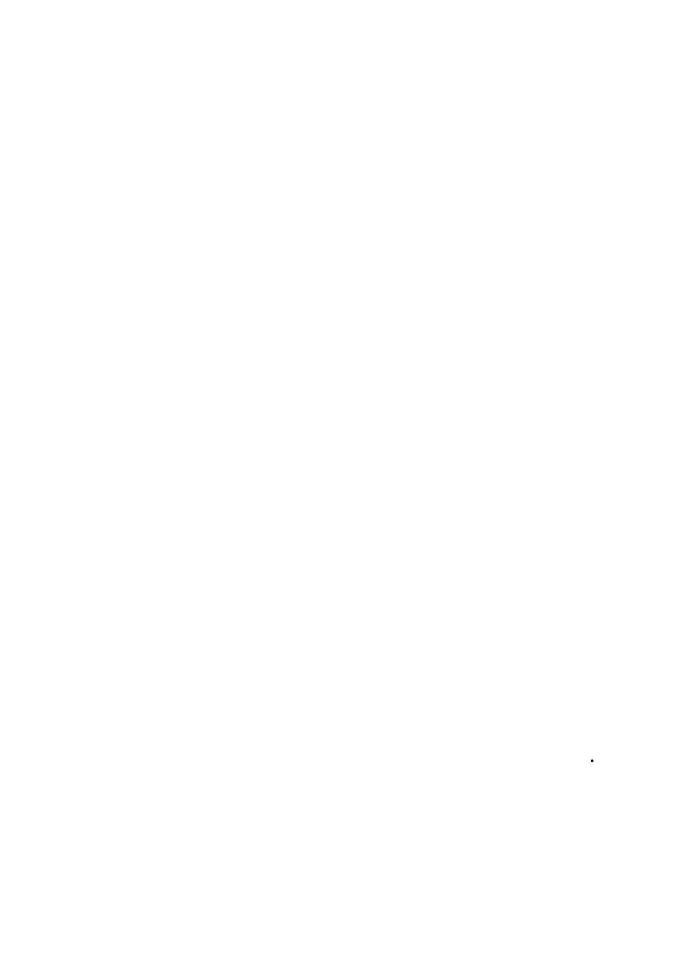
বঙ্গদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজার পদ্ধতিতে একটি বিস্ময়কর অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ আছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যাহা অতীব মূল্যবান। নবদ্বীপের নবদ্বৈপায়ন স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে লিঙ্গপুরাণের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, শারদীয়া মহাপূজা চারিটি অনুষ্ঠানে বিভক্ত ("শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্মময়ীশুভা") — স্নপন, পূজন, বলিদান ও হোম। অদ্যাপি এই চারিটি কর্ম পৃথক সংকল্প করিয়া নামে-মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, লক্ষ্য করা আবশ্যক, প্রথম স্নপনকর্মটি অন্য কোন দেবতার পূজাঙ্গরূপে বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজার বিধান শৈবাগম ও পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবাগমের অনুশাসনে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হয়। একটি বচনানুসারে প্রতিমা সাতপ্রকার ঃ—

মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লৌহজা রত্নজা তথা।
শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমা সপ্তমী তথা॥

তন্মধ্যে তিনটি সদাঃ পূজিত হইবে, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে নাঃ—

কৌসুমা গন্ধজা চৈব মৃন্ময়ী প্রতিমা হিতা।
তৎকালপূজিতাশ্চৈব সর্বকামফলপ্রদাঃ॥

স্নপনকর্ম প্রতিষ্ঠাবিধির অন্তর্গত এবং বাঙ্গালা দেশে সকল দেবতার মৃন্ময়ী প্রতিমায় তাহা যথোচিত রহিত হইয়া গিয়া কেবল মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমায় কেন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হইত এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া জনসমাজে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। সোমনাথমন্দির ধ্বংস হওয়ার পর হইতে সর্বত্র মন্দিরে শিলামূর্তির প্রতিষ্ঠা অনেক কমিয়া যায় এবং মৃন্ময়ীর পূজা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ঐ সময়েই সম্ভবতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন পদ্ধতিকারগণ মৃন্ময়ীর পূজাঙ্গ-রূপে "দর্পণে" স্নপনকর্মের বিধান করিয়া দুর্গোৎসবের সুপ্রাচীন মাহাত্ম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ইহাই বাঙ্গালার একটিমাত্র "মহাপূজা" বটে এবং অদ্যাপি স্নানের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়।

প্রতিষ্ঠা-তন্ত্রানুসারে শিলাদি প্রতিমা নির্মিত হওয়ার পর প্রতিমার নিকট (যে দেবতার প্রতিমা তাঁহার নিকট নহে) প্রার্থনা করিয়া ("রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব" ইত্যাদি) পৃথক "স্নানমণ্ডপে" লইয়া গিয়া প্রতিমাকে ভদ্রপীঠে স্থাপন করিয়া "ভদ্রং কর্ণেভিঃ" মন্ত্র আবৃত্তি করিবে। তাহার পর যথাক্রমে শুদ্ধজল ও গন্ধজল দ্বারা স্নান করাইয়া তাহা শুদ্ধ-বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে এবং শিল্পী, বিপ্র প্রভৃতি কর্মিসকলের ও আচার্যের তুষ্টি-বিধান করিবে। আচার্য নানা মন্ত্র পাঠ করিয়া সুবর্ণশলাকা ও ঘৃত দ্বারা নেত্রের অভ্যঞ্জন, মসুরচূর্ণ দ্বারা উদ্বর্তন, উষ্ণজলে ক্ষালন ও চন্দনে অনুলেপন করিয়া যথাক্রমে নদীর জল, রত্নজল, চন্দনোদক, তীর্থজল-পূর্ণ মৃৎকলস, গন্ধজল, পঞ্চমৃত্তিকা, সিকতাজল, বল্মীকজল, মঙ্গলৌষধিজল, পঞ্চকষায়, পঞ্চগব্য নাগকেশর ও পদ্মজল এবং উত্তরকলস ও সর্বশেষে পুনঃ গন্ধজল দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপর ৮১ কলসে স্নান করাইবেঃ—

একাশীতিপদন্যস্তৈর্ঘটৈর্মালয়ভূষিতৈঃ।
ইদমাপেতি মন্ত্রেণ [illegible]॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত এই সাধারণ স্নপন-বিধি প্রতিষ্ঠাকালে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইত, প্রতি বৎসর নহে। প্রচলিত দুর্গা-পূজার স্নানবিধি অনেক বেশী অনুষ্ঠান-বহুল এবং তাহার মন্ত্রাদিও অনেক স্থলে পৃথক্। দুঃখের বিষয়, কোন দুইটি পদ্ধতির সর্বাংশে মিল নাই এবং শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকারদের মূল পদ্ধতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৭শ শতাব্দীর একজন পরম প্রামাণিক গ্রন্থকার সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির দুর্গোৎ-সবপদ্ধতি কেবল আবিষ্কৃত হইয়াছে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৭০৫নং সংস্কৃত পুঁথি)। তন্মধ্যে স্নপনবিধির কোন কোন অনুষ্ঠান অজ্ঞাতপূর্ব ও কৌতূহলজনক। একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। অধিকাংশ পদ্ধতিতে "অষ্টমঙ্গল-সংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে" বলিয়া স্নানবিধি সমাপ্ত হইয়াছে। রামনাথের পদ্ধতিতে "ইত্যষ্টমঙ্গলং" বলিয়া অষ্ট-মঙ্গলস্নানের দ্রব্যনির্ণয়ের পর লিখিত আছে—"অথ রাগাদিস্নানং" অর্থাৎ বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সহকারে স্নান। কিন্তু তাঁহার সময়ে ঐরূপে রাগাদির বাদ্যযন্ত্র না থাকায় ঘণ্টাবাদ্য সহকারেই কার্য সম্পন্ন হইত ("ইদানীং তাদৃশবাদ্যাভাবাৎ সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা ইতি শ্রবণাৎ ঘণ্টাবাদেন কুর্বন্তি")। কি কি রাগ ও কি কি বাদ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল রামনাথ তাহা যথাযথ উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্র দেবকীরাগেণ ত্রিভুবনবিজয়বাদ্যেন
কলসত্রয়েণ।
মেঘমল্লাররাগেণ ইন্দ্রবিজয়বাদ্যেন
কলসচতুষ্টয়েন।
অভিষেকবাদ্যেন দেশীয়রাগেণ কলসত্রয়েণ।
গুর্জরীরাগেণ সংগ্রামবিজয়বাদ্যেন
কলসত্রয়েণ।
ধানসীরাগেণ মধুরীবাদ্যেন কলসাভ্যাং।
ভৈরবীরাগেণ করতালবাদ্যেন একঘটেন।

ইহার পর "পুরুষসূক্তেন স্নাপয়েৎ" বলিয়া রামনাথ যজুর্বেদ হইতে পুরুষ-সূক্তের ষোলটি ঋক্ যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া স্নানবিধি সমাপ্ত করিয়াছেন। রামনাথ অপর একটি গ্রন্থে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করিয়াছেন—"গন্ধর্ব রায়" নামক এক "মহাকুলীন" রাজা। তাঁহার পরিচয়াদি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামনাথের পদ্ধতি অনুসারে উক্ত রাজা কিরূপ সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করিতেন, উক্ত স্নানবিধি হইতে তাহা অনুমান করা যায়। তাহার অনেকাংশই ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতিচিহ্ন পদ্ধতিকারগণ বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। নানাস্থানের পদ্ধতি শ্রদ্ধার সহিত সংগ্রহ করিলেই বাঙ্গালীর এই জাতীয় মহোৎসবের ঐতিহ্য ও ক্রমপরিণতি ঠিকমত জানা যাইতে পারে। যে সুপ্রাচীন যুগে ত্রিভুবনবিজয়াদি বাদ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল আলোচ্য রাজসিক স্নানবিধির সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত সেই স্বাধীন যুগের চিত্র কল্পনানেত্রে অবলোকন করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়।

সে একাকী বসিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল--

আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন, যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবেশ, তেমনি সুশিক্ষিত। ওকে কেক বিক্রি করতে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম কোন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে অভাবে পড়ে ফিরিঅলার কাজ করছে। কিন্তু লোকটা বল্‌লে কি না সে ইংরেজ, নাম জেমি গ্রীন। ওর ইংরেজী ভাষা আর উচ্চারণ শুনে অবিশ্বাস করা কঠিন, কোন দেশী লোককে এমন ইংরেজি বলতে শুনিনি। কেবল যে ব্যাকরণ শুদ্ধ তা নয় ভাষার মারপ্যাঁচ সব জানে। আর উচ্চারণ! বই প'ড়ে তো উচ্চারণ শেখা যায় না। প্রথমে সন্দেহের বশে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধের সময়ে কত অভিসন্ধি নিয়ে কতলোক আসে, জিজ্ঞাসা করতেই হয়— পাশ ঠিক আছে তো? সে অমনি পকেট থেকে পাশ বের ক'রে বল্‌ল, সার্জেণ্ট সাহেব পরীক্ষা করে নাও, খোদ ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান হোপ সাহেবের হাতের অক্ষর কিনা।

তাই তো বটে। ব্রিগেডিয়ার হোপ ৯৩ নম্বরের কর্নেল, তাঁর হস্তাক্ষর সবাই চেনে!

কিন্তু এখানে কেন?

কি করবো সাহেব, যেখানে রুটি সেখানে জুটি।

সবই যেন বুঝলাম কিন্তু এমন ইংরেজি শিখলে কোথায়? তুমি তো ইংলণ্ডে যাওনি।

সাহেব আমরা দুপুরুষের ফৌজী মেস খানসামা। আমার বাবা ছিল ৮২ নম্বর রেজিমেণ্টের খানসামা, পরে আমিও কিছুদিন ছিলাম। তারপরে রেজিমেণ্টটা পাঞ্জাবে চলে' গেলে আমি আর যাইনি।

তারপরে একটু হেসে বলল, সাহেব গ্রামার-স্কুলে আর ইংরেজি ভাষার কতটুকু শেখা যায়? ওখানে ইংরেজি সরস্বতীর তো গাউনপরা মূর্তি। ভাষা শিখতে হয় তো ফৌজী মেস। দেখি সাহেব কাগজগুলো।

এ বিলাতী কাগজ, এতে তোমার দরকার কি?

সাহেব, যে দেশ বাপের জন্মে দেখলাম না তার খবর জানতে বড্ড ইচ্ছে করে।

খবরের কাগজগুলো নিয়ে উল্টে পাল্টে লোকটা যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

এমন সময়ে ঘরের বাইরে গোলমাল শুনে তাকিয়ে দেখি জেমি গ্রীনের কেকের বাক্স-বাহী চাকরটার সঙ্গে ফৌজী লোকদের বচসা আরম্ভ হয়েছে।

এমন বীভৎস চেহারার লোক আগে দেখিনি। জেমি গ্রীন যেমন সুপুরুষ, লোকটা তেমনি পাষণ্ডাকৃতি, জুটেছে ভালো, দেবদূতের সঙ্গে শয়তান।

লোকটা বলছে ফৌজী আদমিরা কেক খেয়েছে, এখন দাম দিতে নারাজ।

আমি কিছু বলবার আগেই জেমি গ্রীন বলে উঠল, ভাইসব, ঠাট্টা ঠাট্টা, কিন্তু কেক খেয়ে দাম না দেওয়া বোধ করি হাইল্যাণ্ডী ঠাট্টা।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ব্যাপারটা তখনি মিটে গেল।

শুধোলাম, জেমি গ্রীন এই বস্তুটিকে সংগ্রহ করলে কোন্ জাহান্নাম থেকে? কোন্ দিন তোমাকেই খুন করবে, যা চেহারা।

সাহেব জাহান্নম কি আর দূরে কোথাও আছে। কানপুরে ওকে পেলাম। সব লোক তো এসব মেহনতী কাজে আসতে চায় না। লোকটা খুব খাটিয়ে। শরীরটাও মজবুৎ, কখনো অসুখ-বিসুখ করতে দেখি নি।

ওর পরিচয় কি?

ও তো বলে ইংরেজ।

ইংরেজ? এমন পাকা আবলুশের রং হ'ল কি ক'রে?

ওর মা নেটিভ খৃষ্টান।

বাপ?

নাম বলতে পারে না, একটি তো নয়।

একটি নয়?

না, রেজিমেণ্টের সবাই, মায় খানসামা অবধি সেই গৌরব দাবী ক'রে থাকে।

দুজনেই হেসে উঠলাম।

নাম?

মিকি। আচ্ছা সাহেব এবারে আসি।

'টাটকা তাজা কেক' হাঁকতে হাঁকতে জেমি গ্রীন ও মিকি বিদায় হ'য়ে গেল।

ফরবেস-মিচেলের চিন্তাসূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছিল কামানের আওয়াজে। উত্তর দক্ষিণ দুই দিক থেকেই আসছিল কামানের শব্দ, সমান দূরত্ব তাই সমান অস্পষ্ট। উত্তরে আলমবাগে জেনারেল উট্রামের কামানের ধ্বনি, আর দক্ষিণে স্যার রবার্ট নেপিয়ারের কামানের আওয়াজ কানপুরে।

কিন্তু তার আজকার অভিজ্ঞতা এমনি অভিনব যে চিন্তার ছিন্নসূত্র তখনি জোড়া লেগে যাচ্ছিল, আর সে কেবলি ভাবছিল— আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন।

৩

এমন সময়ে অদূরে 'গোয়েন্দা', 'গোয়েন্দা' রব শুনতে পেলাম। ঐ রবের সঙ্গে আজকাল খুব পরিচিত হয়েছি। যেখানে বৃটিশবাহিনী সেখানে চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোয়েন্দা এসে হাজির হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছাকাছি যত গাছ আছে সেগুলোর ডালে তাদের মৃতদেহ ঝুলতে থাকে। অবশ্য আমাদের গোয়েন্দাদেরও ঐ অবস্থা হয় বুঝতে পারি! দুই পক্ষের মধ্যে এ লড়াই যে-ভাবে চলছে তাকে কশাইগিরি ছাড়া কি বলা যায়। দুই পক্ষই সমান নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, না আছে বাছ না আছে বিচার।

গোয়েন্দা! গোয়েন্দা।

শব্দ এবার আমার ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হওয়ায় কৌতূহলী হ'য়ে বাইরে বেরুলাম। বেরিয়ে দেখি—একি? এ যে জেমি গ্রীন আর মিকি?

যে পাহারাওয়ালা ওদের বেঁধে নিয়ে এসেছিল বল্‌লে—এরা লখ্‌নৌর বেগমের গোয়েন্দা। দুজনেই মুসলমান। কর্নেল সাহেব বিচার করেছেন, কাল ভোরে ওদের লটকিয়ে দেওয়া হবে। কর্নেল সাহেবের হুকুম আজ রাতটা ওরা আপনার জিম্মায় থাকবে।

আবার মনে হ'ল আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন।

ওরা মুসলমান শুনবামাত্র কয়েকজন সৈন্য বলে উঠ্‌ল, নিয়ে এসতো বাজার থেকে খানিকটা শুওরের মাংস, হতভাগা দুটোর মুখে গুঁজে দি, জাহান্নমে যাবার আগে বস্তুটার স্বাদ পেয়ে যাক্, কখনো তো পায়নি।

আমি বল্‌লাম, সাবধান, বন্দী আমার জিম্মায়। যে ওরকম অসভ্যতা করবে তার চাপরাশ উর্দি খসিয়ে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করবো।

আমার কথা শুনে লোকগুলোর উৎসাহ দমে গেল; যে-যার কাজে চলে গেল। জেমি গ্রীন আর মিকিকে ঘরের মধ্যে তুললাম। অপমানের হাতথেকে বেঁচে যাওয়ায় গ্রীন আমাকে ধন্যবাদ দিল, বলল সার্জেণ্ট সাহেব, অনেক ধন্যবাদ, খোদা তোমার ভালো করবেন।

সে আরও বললে,—গ্রেপ্তার হ'বার পরে মনের মধ্যে অনেকখানি আগুন নিয়ে এখানে এসেছিলাম। তোমার সদয় ব্যবহারে তার কতক নিভ্‌ল। লালমুখো ইংরেজের কাছে এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। আরও একবার আর একজন ইংরেজের কথায় মনে এমনি ভাবের উদয় হয়েছিল।

সে একটি ঘটনার উল্লেখ করলো। সে বলল, কানপুরে গঙ্গার উপরে বৃটিশ যে নৌকোর পুল বানিয়েছে তার রক্ষার জন্যে নিকটবর্তী একটা শিবমন্দির ধ্বংস করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। কর্নেল নেপিয়ার যখন সেই মন্দিরটা উড়িয়ে দেবার আয়োজন করছে তখন একদল ব্রাহ্মণ এসে বলল— হুজুর ঐ মন্দিরটা রক্ষা করুন।

নেপিয়ার বলল, দেখো তোমাদের স্পষ্ট করে একটা কথা বলি। তার আগে বলে নিই যে, এ মন্দিরটার উপরে আমাদের

রাগের কোন কারণ নেই, তবে পুল রক্ষার জন্যে ওটা ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু তাতেও না হয় মন্দিরটা ছেড়ে দিতে পারি যদি তোমরা আমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দাও।

নেপিয়ার বলল,—কিছুদিন আগে বিবিঘরে বহু ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে হত্যা করা হ'য়েছে। তখন তোমরা সকলেই এখানে ছিলে। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে যে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে? এমন একজনও কি আছে যে তাদের হ'য়ে দুটো কথা বলেছিলে, বলেছিলে অসহায় নারী ও শিশু হত্যা করা পাপ? যদি তোমরা বলো যে হাঁ আমি বলেছিলাম, সিপাহীপক্ষ শোনে নি, তাতেই আমি খুশী হ'ব—মন্দির বেঁচে যাবে। ব্রাহ্মণের দল মুখ নিচু ক'রে চলে গেল। কি আর বলবে। নেপিয়ার হুকুম করলেন, বারুদে আগুন দেওয়া হ'ল—গুম্, মন্দিরের ভাঙা ইঁট কাঠ আকাশে লাফিয়ে উঠল।

সে বলল, আমি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, সব শুনলাম, সব দেখলাম। মনে মনে নেপিয়ারকে প্রশংসা করলাম।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে গ্রীন বলল,—সার্জেণ্ট, তোমার কথায় আজ আমার ফাঁসির আসামীর মনটা শান্ত হ'ল। খোদার কাছে শান্তভাবে যেতে পারবো, গিয়ে আবার তোমার ভালো করবার জন্য আরজি করবো।

তার এই ধন্যবাদের বদলে আমি তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে আদেশ করলাম। সে খুশী হ'য়ে নমাজ পড়তে লাগলো। অবশ্য পায়ণ্ডর্শনি মিকির বাঁধন খুলে দিতে সাহস করিনি, আর সে বোধ করি নমাজ পড়বার জন্যে ব্যস্তও ছিল না। সে এক পাশে মুখ গোঁজ ক'রে বসে খুব সম্ভব মনে মনে আমার মুণ্ডপাত করছিল।

ওর নমাজ পড়া শেষ হলে আমি একজন পাহারাওয়ালাকে বাজার থেকে একজন মুসলমান হোটেলওয়ালাকে ডেকে আনতে বললাম। হোটেলওয়ালা এলে বললাম, এরা দু'জন যা খেতে চায় দাও, আমি খরচ দেবো।

হোটেলওয়ালা বল্‌ল, সে কি কথা সাহেব। এই ফাঁসির আসামীরা মুসলমান, আজ তাদের খানা জুগিয়ে দাম নেবো? আর আপনি যদি দিতে পারেন আমরা কি দিতে পারিনে? না, দাম দেওয়া চলবেনা।

জেমি গ্রীন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খানা খেয়ে আয়েস ক'রে তামাক টেনে স্থির হ'য়ে বসলে আমি তাকে বললাম, জেমি গ্রীন, তোমাকে শিক্ষিত ভদ্রবংশজাত ব্যক্তি বলে মনে হয়, তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে কেন? নিশ্চয় এই হীন বৃত্তির সঙ্গে অনেক ক্ষোভ আর অনেক রহস্য জড়িত। সরল ভাবে তোমার জীবনকথা আমাকে বলো—আমি লিখে আমাদের দেশের কাগজে ছাপবো।

খুব উপকার হবে সাহেব, কারণ লণ্ডন ও এডিনবরায় আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছে।

লণ্ডন ও এডিনবরায়? তোমার বন্ধু?

আশ্চর্যবোধ হচ্ছে? আমার জীবনকথা শুনলে বিস্ময়ের নিরসন হবে। আমার বিদেশী বন্ধুরা আমাকে গোয়েন্দা বলে জানবে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হ'তে পারে?

তুমি কি গোয়েন্দা নও?

সাধারণত গোয়েন্দা বলতে যা বোঝায় আমি তা নই, তবে আমি সিপাহীপক্ষের লোক বটে। আমার জীবনকথা শুনলে বুঝতে পারবে কেন আমি কোম্পানীর চাকুরে হয়েও বিদ্রোহীপক্ষে যোগ দিলাম! বুঝতে পারবে কোন্ ক্ষোভ, কোন্ জ্বালা আমাকে চাকুরির মায়া ছাড়িয়ে এমন আত্ম-নাশের পথে টেনে আনলো। আর বুঝতে পারবে কি না জানিনে, এই জ্বালা, এই ক্ষোভ কেবল আমার একার নয়, আমার মতো ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকেরই। সাহেব একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আসন্ন মৃত্যুকালে বোধ করি ভবিষ্যতের জানলা দরজা একটু ফাঁক হয়ে যায়, যেদিন ইংরাজি-শিক্ষিত লোকে তোমাদের প্রতি বিরূপ হবে সেদিন তোমাদের হিন্দুস্থানের মসনদ টলবে। গোঁয়ার সিপাহীদের সাধ্য কি সে আসন টলায়। দেশময় আজ যে কাণ্ড চলছে এ হচ্ছে পুরনো হিন্দুস্থানের অন্তিম বিকার; এ ঝড় কেটে গেল; কিন্তু যে ঝড়ে তোমাদের হিন্দুস্থান ছাড়া করবে, তার কেন্দ্র হচ্ছে বেরিলি কলেজের মতো নয়া তালিম। সেদিনকার সেই ঝড়ের আকর্ষণে তমাম হিন্দুস্থান উথল যায়েগে। তখন জানবে তোমাদের আসন টলল। বোধ করি সেদিন ভালো করে জানবারে অবকাশ পাবে না; সমস্ত এক লহমায় হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

সে যখন এই কথাগুলো বলছিল আমি স্থির করেছিলাম আজ রাতটা জেগেই কাটাবো। প্রথমত তার কাহিনী শোনবার কৌতূহল, দ্বিতীয়ত জেগে থাকলে চোখের উপরে রেখে তাকে খানিকটা মুক্ত অবস্থায় রাখতে পারবো। নয় তো হাত পা বেঁধে ফেলে রাখতে হয়। তাই সারারাত্রি জাগবার উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে বসলাম। বললাম, জেমি গ্রীন আমার কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে, বলো, তোমার নাম, ধাম, বংশ পরিচয়, পূর্ব বৃত্তান্ত কি?

সে সুরু করলো—

আমার আসল নাম মহম্মদ আলি খাঁ, রোহিলখণ্ডের এক অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান জায়গীরদার পরিবারে আমার জন্ম। আমি বেরিলি কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করি। সেখানকার শেষ পরীক্ষায় আমি প্রথম হলাম, দেশী ও ইংরেজ সব ছাত্রের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়ে-ছিলাম। এবারে প্রশ্ন হল—এখন কি করবো? চাকুরিতে ঢুকবো কি? বাবা বললেন যে, কোম্পানীর চাকুরি গ্রহণ করো। তিনি বললেন, রাজত্ব কোম্পানীর, এখন মান সম্মান টাকাকড়ি কোম্পানীর চাকুরিতে। কোম্পানীর চাকুরি নাও।

তাই নিলাম। কোম্পানীর ফৌজী এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করলাম। সেই থেকে আমার পরীক্ষা আরম্ভ হল। ভাগ্যের কি লীলা। এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের জমাদার নিযুক্ত হলাম আমি, আর আমার উপরওয়ালা হল এক ইংরেজ বিলেতে থাকলে যে মিস্ত্রী ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না। কেন এমন হল? না আমি দেশী লোক। আমার গুণপনা যতই হোক একজন আকাট মূর্খ ইংরেজের উপরে ওঠবার আমার শক্তি হল না। আর সে লোকটার কি দম্ভ আর অবহেলা। প্রতি মুহূর্তে সে বুঝিয়ে দিত যে সে ইংরেজ আর আমি নেটিভ। অল্প-দিনেই আমার মন বিষাক্ত হয়ে উঠল, প্রথমে তার উপরে, তারপরে কোম্পানীর ব্যবস্থার আর তার রাজত্বের উপরে। সাহেব, আজ যে পথে আমায় দেখছ সে পথে টেনে এনেছে কে? ঐ লোকটার মতো দম্ভী ইংরেজ। এ কেবল আমার একলার অভিযোগ নয়—আমার মতো ইংরেজি-শিক্ষিত সমস্ত ভারতীয়েরই অভিযোগ। তবে সকলে হয়তো অসন্তোষ প্রকাশ করে না, হয়তো সুযোগ পায় না, হয়তো সাহস পায় না। কিন্তু তাই বলে যদি ধরে নাও যে তারা সুখে আছে তবে মস্ত ভুল করবে। জলের চাপে বাঁধ কি একদিনে ভাঙে? চাপ প্রতি মুহূর্তে পড়ছে, ঠিক কখন ভাঙবে তা কে বলতে পারে। এ বিদ্রোহ সেই বাঁধ-ভাঙার তাণ্ডব। এইজন্যেই বলেছিলাম যে কোম্পানীর মসনদ টলবে যখন ইংরেজি-শিক্ষিত দেশী লোক বিদ্রোহ করে বসবে। কোম্পানী যদি ইংরেজি শিক্ষা না দিত এ দেশে কখনো বিদ্রোহ হত না। তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষাই বিকৃত হয়ে উঠে একদিন তোমাদের এ দেশ ছাড়া করবে। আজ কি সেই দিন এসেছে?

এই বলে কিছুক্ষণ মহম্মদ আলি খাঁ চুপ করে বসে রইলো, তারপরে আবার আরম্ভ করলো—

বাবা সব অবস্থা শুনে চাকুরি ছেড়ে দিতে উপদেশ দিলেন। কোম্পানীর চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে চলে এলাম। আবার প্রশ্ন হল এখন কি করি? চললাম লখনৌর দিকে নবাব নসরুদ্দিনের সরকারে চাকুরি নেবার আশায়। লখনৌ গিয়ে শুনলাম নেপালের মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর গোরখপুরে এসেছেন, তিনি শীঘ্রই বিলাত যাবেন, চান একজন ইংরেজি-জানা সেক্রেটারি। তাঁর কাছে গিয়ে দরখাস্ত করলাম, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়ে আমাকে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করলেন। চললাম ইংলণ্ডে। সেখানকার একটি ঘটনায় সাহেব তুমি নিশ্চয় কৌতূহল অনুভব করবে। এডিনবরায় জঙ্গ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করবার যে আয়োজন হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ৯৩ নম্বর হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট! তখন কে জানতো যে তাদেরই একজনের উপরে ভার পড়বে আমার জীবনের শেষ রাত্রি পাহারা দেবার।

জেমি গ্রীন তার আত্মকথা বলে যাচ্ছিল আর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম থানার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে প্রহর বেজে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কয়টি ক্রমে সংক্ষিপ্ততর হ'য়ে আসছে।

তারপরে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে কয়েক বছর বিভিন্ন দেশী রাজা আর নবাবদের সরকারে চাকুরি করলাম। শেষে দেখা হ'ল আজিমুল্লা খাঁর সঙ্গে। তার কথা নিশ্চয় শুনেছ, এখন সে বিদ্রোহের একজন পাণ্ডা, নানা সাহেবের ডান হাত। তখন সে ছিল নানা সাহেবের এজেণ্ট। আমি আগে ইংলণ্ড গিয়েছি শুনে আমাকে সে সঙ্গে নিল। তার বিলাত যাবার উদ্দেশ্য ছিল লর্ড ডাল-হৌসির যে ফার্মানবলে নানা গদিচ্যুত হ'য়েছিল ইংলণ্ডে গিয়ে পার্লামেণ্টের মেম্বরদের কাছে দরবার ক'রে তা নাকচ করা। সাহেব একটা বিষয় ভেবে দেখো, এ দেশের লোক কোম্পানীর উপরে যতই বিরক্ত হোক না কেন ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার উপরে খুব তাদের ভরসা। যেদিন এ ভরসা তাদের যাবে, তারা বুঝবে এ দেশের কোম্পানী আর ওদেশের পার্লামেণ্ট একই ব্যবস্থার ডান হাত বাঁ হাত সেদিন এ দেশ থেকে তোমাদের রুটি উঠল। সাহেব আজিমুল্লা খাঁ নিতান্ত মুন্সী লোক, শাসন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে তার ভরসার অন্ত নেই। তার বিশ্বাস একজনে যদি ফার্মান দিতে পারে, আর একজনে তা নাকচ্ করতে পারবে না কেন? সে বিশ্বাস যখন ভাঙে তখন এই সব মুন্সী লোক ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের বিদ্রোহের তুলনায় এই সব গাঁওয়ার সিপাহীদের বিদ্রোহ ছেলে-খেলা।

আচ্ছা ইংলণ্ডে গিয়ে তোমরা কি করলে?

সে ইতিহাস বিস্তারিত ব'লে লাভ নেই। মোটের উপরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড খরচ হ'ল। বৈঠকখানায় আর মজলিশে আমাদের আদর অভ্যর্থনার অন্ত রইলো না। কিন্তু আসল কাজের বেলায় ঢু ঢু। আশ্চর্য জাত তোমরা সাহেব, সামাজিক আসরে তোমরা ভদ্রতার অবতার, আফিসের চেয়ারে এক একটি পাথরের মূর্তি। এইজন্যেই লোকে তোমাদের জাত হিসাবে ভণ্ড বলে। হয়তো সে অভিযোগ ঠিক নয়, হয়তো ওইটেই তোমাদের জাতিগত প্রকৃতি। আবার ফিরলাম দেশের দিকে। এবারে এলাম ইস্তাম্বুল হ'য়ে। গিয়েছিলাম ক্রিমিয়ায়, তখন সেখানে রুশের সঙ্গে তোমাদের লড়াই চলছে। একটা যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় দেখে ভাবলাম তবে তো এরা অজেয় নয়। ভাবলাম রাশিয়ানদের হাতে যদি হারে ভারতীয়দের হাতেই বা হারবে না কেন? এমন সময়ে একজন রাশিয়ান এজেণ্টের সঙ্গে আজি-মুল্লা খাঁর পরিচয় হ'ল। আমাদের মনোভাব জেনে সে বলল, তোমরা বিদ্রোহ কর না কেন? দেখছ তো ওদের বীরত্ব। তার কথা শুনে আজিমুল্লা খাঁর মনে বিদ্রোহের পরি-কল্পনা প্রথমে এলো। আজিমুল্লা স্থির করলো প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করতে হবে আর কোম্পানীর বনিয়াদ উপড়ে ফেলতে হবে।

তার পরে জেমি গ্রীন একটুখানি নীরবে থেকে বলতে লাগলো,—এবারে যেন আমাকে নয়, নিজেকেই—সেই বিদ্রোহ ঘটেছে, আর ঐ যে কিছুক্ষণ আগে বিলাতী খবরের কাগজগুলো পড়লাম তা থেকেই জানতে পেরেছি কোম্পানীর বনিয়াদও আলগা হয়ে গিয়েছে, পার্লামেণ্ট এবারে নিজ হাতে শাসনভার নেবে! কোম্পানী গেল, ইংরেজ গেল না। হয়তো এতে দেশের ভালই হবে। ভালই হোক আর মন্দই হোক, একশ বছর। কোম্পানী একশ বছর সময় পেয়ে ছিল, পার্লামেণ্টও একশ বছরের বেশি সময় পাবে না।

এর পরের কথা সবাই জানে সাহেব তুমিও জানো। মীরাট, বেরিলি, কানপুরে আগুন জ্বলে উঠল। আমি ভাবলাম এ সুযোগ ছাড়া নয়। এমন সময়ে শুনলাম সিপাহীরা দিল্লী গিয়ে বাহাদুর শাহকে আবার হিন্দু-স্থানের মসনদে বসিয়েছে। স্থির করলাম দিল্লীতেই আমার স্থান, সেখানে নিশ্চয় এঞ্জিনিয়ারের দরকার আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে রাখা আবশ্যক। তাদের নিয়ে গেলাম রোহিলা-খণ্ডের সুদূর এক গ্রামে। তার পরে চললাম দিল্লীর দিকে।

একটা কথা বলবে? কানপুরের বিবিসরের হত্যাকাণ্ড কি দেখেছ?

না, সে সময়ে আমি রোহিলাখণ্ডে গিয়ে স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে।

আচ্ছা একথা কি সত্য যে মেয়েদের হ করবার আগে তারা ধর্ষিত হয়েছিল?

সাহেব এদেশের লোককে তোমরা জা না, তারা নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু পা কখনো নয়।

এ হত্যাকাণ্ডের আসল কারণটা কি

আমি যতদূর জানি নানার ইচ্ছা ছি না। কিন্তু তাকে অনিবার্যভাবে বিদ্রো সঙ্গে জড়িয়ে ফেলাই এর উদ্দেশ্য, য নানা আর পিছিয়ে না যেতে পারে।

কে এর নেতা ছিল? আজিমুল্লা খাঁ

হয়তো সে ছিল। কিন্তু আসল নানার হারেমের এক বাঁদী, জুবেদী নাম।

স্ত্রীলোক?

বিস্মিত হয়ো না সাহেব। স্ত্রীলে দানবের মতো দানব আর কোথায়?

এসব শুনলে কার কাছে?

তাঁতিয়া টোপির কাছে, বিবিস কাণ্ডের পরে নানার সঙ্গ ছেড়ে সে যায়।

হত্যা করলো কারা? নানার সৈনা না, তারা স্রেফ অস্বীকার করেছিল তবে?

ঐ দানবীটা টাকার লোভ দেখিয়ে ক কতক কশাইকে সংগ্রহ করেছিল।

হত্যাকারীদের একজনের বর্ণনার স তোমরা ঐ মিকির বড্ড বেশি মিল। জা কিছু?

নিশ্চয় জানি না। তবে হলে আশ্চ হব না।

তবে ওকে তোমার অনুচর করলে কেন?

আগে সন্দেহ হয়নি, পরে শুনেছি।

তখন ওকে পরিত্যাগ করলে না কেন?

তখন আর উপায় ছিল না। ছাড়া পেলেই ও গিয়ে আমাকে ধরিয়ে দিত। সাহেব আল-কাতরায় হাত দিলে হাতে কালি লাগবেই। মিকির সঙ্গদোষে আমার সব শুভ সংকল্প মলিন হয়ে গিয়েছে। হয়তো সেই অপরাধেই আজ এই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়লাম।

যাক্, এবার যা বলছিলে বলো।

স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে রেখে দিল্লী গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেনাপতি বখ্ত খাঁ আমাকে জানতো, তার ইচ্ছাতে আমি বাদ-শাহী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়ে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু কাজ করবার কি উপায় আছে? সেনাদের মধ্যে কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, শহরে কোন ব্যবস্থা নেই। আর কে যে কর্তা, কয়জন যে কর্তা স্থির নেই। প্রত্যেক বাদশাজাদা আসে, একবার ক'রে হুকুম ক'রে যায়। সকলেরই মাতব্বরি করবার শখ, কিন্তু সাধ্য কারো

নেই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখনই বুঝলাম। হ'লও তাই।

বাদশার অবস্থা কিরকম?

ওরকম সিংহাসনের চেয়ে জেল ভালো, তাতে জায়গা কিছু বেশি, হাত পা নাড়বার সুযোগ আছে।

তাঁর বাদশাহী করবার শক্তি কিরকম?

সে একবার কপালে হাত ঠেকালো, বললো, জীর্ণ নৌকোয় সমুদ্র পার হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তাঁর পক্ষেও হিন্দুস্থানের বাদশাহী করা সম্ভব।

তিনি কি বিদ্রোহের মূলে ছিলেন?

সমস্ত শাহাজানাবাদে তাঁর চেয়ে নিরীহ নির্দোষ কেউ ছিল না।

তার পরে?

বৃটিশ ফৌজ দিল্লী অধিকার ক'রে নিলে বাদশাজাদা ফেরোজ্ শা, সেনাপতি বখ্ত খাঁ আর আমি যমুনা পার হ'য়ে মথুরায় চলে এলাম। তখনো আমাদের অধীনে ত্রিশ হাজার ফৌজ ছিল।

থানার ঘড়িতে তিনটা বাজলো। মিকি এক কোণে আগের মতো মুখ গুঁজে ব'সে আছে, হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়েছে।

সাহেব আমার সময় ফুরিয়ে এলো, হয়তো আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক পড়বে। তার আগে তোমাকে ব'লে সব চুকিয়ে দিই। তুমি লিখতে বলছ, যার চোখে পড়বে সে বুঝবে মহম্মদ আলি খাঁ গোয়েন্দা ছিল না, ছিল বাদশাহী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার।

আমার সঙ্গীরা অন্য দিকে গেল। আমি গেলাম লখ্নৌ, সেখানে গিয়ে নবাবী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলাম। লখ্নৌতে ফৌজের অবস্থা ও ব্যবস্থা দিল্লীর চেয়ে ভালো, কিছু কাজ করবার উপায় ছিল। সেকেন্দ্রাবাগ আর শা নুজফ-কে কেন্দ্র ক'রে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গ'ড়ে তুললাম। নভেম্বর মাসে সে বাধা অতিক্রম করতে তোমাদের হিমসিম হ'য়ে ছিল।

খুব মনে আছে। তাই বলো, সে লাইন তুমি গড়ে ছিলে। আমরা সে-সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রেছিলাম নিশ্চয় কোন ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারের কাজ। কথাটায় অনেকেই বিশ্বাস করেছিল, কারণ একটা জনশ্রুতি আছে যে, শাদা চামড়ার কোন কোন লোক সিপাহী দলে যোগ দিয়েছিল।

সে কথা একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু ঘটনার ওসব ডালপালার মধ্যে প্রবেশ করলে আসল কথা আর শেষ হ'য়ে উঠবে না।

শুধু একটা প্রশ্ন। বৃটিশ সৈন্য যখন আক্রমণ করছিল তুমি কোথায় ছিলে?

শাহনজফের উপরে। আর তুমি?

শাহনজফের নীচে।

আজ তুমি উপরে, আমি নীচে।

এবারে......নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করতে হবে

জেমি গ্রীন, কে উপরে কে নীচে তার চূড়ান্ত স্থির কি এখানে হয়? যাক্, তারপরে তোমার কথা বলো।

বৃটিশ সৈন্য লখ্নৌর অবরোধ মোচন করতে পারলো না, কেবল রেসিডেন্সির অধিবাসীদের নিয়ে চলে এলো। লখ্নৌর সকলে জয়ের আনন্দে মগ্ন হ'ল। আমি বললাম--আনন্দ করবার সময় আসেনি। বৃটিশ সৈন্য আবার আসবে। এবারে অনেক বেশী প্রস্তুত হ'য়ে অতএব কালব্যাজ না করে শহরের অবরোধ আরও দৃঢ় ক'রে তোলো। লেগে গেলাম সেই কাজে। করেওছি। এবারে লখ্নৌ শহরে গেলে জেমি গ্রীনকে তোমার মনে পড়বে। এমন সময়ে খবর এল, বৃটিশ সৈন্য শীঘ্রই কানপুর পরিত্যাগ করবে লখ্নৌ অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে।

এ সময়ে তুমি লখ্নৌ ছাড়লে কেন?

সেই কথাতেই আসছিলাম। শুনেছিলাম এবারে বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে অনেক শক্তিশালী কামান, অনেক আয়োজন। প্রস্তুতিটা কিরকম, দেখা দরকার মনে হ'ল।

গুপ্তচর পাঠালে না কেন?

তারা কামানের শক্তির কি খবর রাখে? বড় জোর সংখ্যাটা গিয়ে আমাকে জানাতে পারবে। তাই স্থির করলাম আমাকেই যেতে হবে। গেলাম কানপুরে। ফিরিওয়ালা সাজলাম, তখনই পেলাম মিকিকে! হায়, কে জানতো তখন আমি পাপের সঙ্গ নিলাম। যাই হোক, বৃটিশ তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে যা জানবার সব জানলাম। মনে হ'ল ফিরবার মুখে একবার উনাও শহরটা দেখে যাই। উনাও শহর ছেড়ে রওনা হবার মুখে একজন মুসলমান আমাকে চিনে ফেলল, বেরিলিতে থাকতে সে আমাকে চিনতো। তারপরে বিচার। তার পরে এখন আমি তোমার কাছে! এই তো আমার ইতিহাস। এবারে বলো মহম্মদ আলি খাঁ কি গুপ্তচর?

জেমি গ্রীন, সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আমি নেবো না। লিখবো তোমার কথা। ভবিষ্যৎ দেবে উত্তর, হয় তো সে উত্তরে তোমার অসম্মান হবে না।

এমন সময়ে থানার ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। ছ'টায় ফাঁসির সময় স্থির হয়েছে। কি বলবো ওকে ভাবছি এমন সময়ে জেমি গ্রীন বলে উঠল—

সাহেব সময় হ'য়ে এল, একবার শেষ নমাজ প'ড়ে নিই।

হাত মুখ ধুয়ে সে নমাজ পড়তে লাগলো।

সারা রাত্রি জাগরণে মিকি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নমাজ শেষ হ'লে জেমি তার মাথার লম্বা চুলের মধ্যে থেকে একটি সোনার আংটি বের করলো, বলল, আমার সঙ্গে আর যা কিছু ছিল বিচারের আগে সব নিয়ে নিয়েছে, এটার সন্ধান পায়নি।

তারপর আঙটি-টা আমার হাতে দিয়ে বলল, সাহেব এটা তুমি রাখো। না, না, অস্বীকার ক'রো না, এর দাম সামান্যই। ইস্তাম্বুলের একজন ফকির আমাকে দিয়েছিল, বলেছিল মন্ত্রপড়া এ আঙটির অসাধারণ ক্ষমতা, যার কাছে থাকবে তাকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করবে। কত বিপদ না আমি উদ্ধার পেয়ে গিয়েছি এই আঙটির জাদুতে। কিন্তু পাপীর সঙ্গ নিয়েছি ব'লে আঙটির জাদু এবারে আর খাটলো না, ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবে। লখনৌ সহরে গিয়ে এবার যখন মহম্মদ আলি খাঁর প্রস্তুত অবরোধের সম্মুখীন হবে, তখন মহম্মদ আলি খাঁর প্রদত্ত এই জাদু-আঙটি তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি ভাবছ সাহেব শত্রুকে কেন দিলাম? কে শত্রু, কে মিত্র তা নিশ্চিতভাবে জানবো কি উপায়ে? আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়ে তোমার কাছে যে সদয় ব্যবহার পেলাম, এ কি শত্রুর কাছে প্রত্যাশিত। আমার মন স্নিগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। আজ আমার আর কি আছে? ওটা রাখো। মাঝে মাঝে চোখে পড়লে হতভাগ্য জেমি গ্রীনকে মনে পড়বে। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই, কোম্পানীর রাজত্বের উৎখাত চেয়েছিলাম, তা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কেবল—

এতক্ষণে সে যেন ভেঙে পড়ল, বলল—কেবল স্ত্রী আর ছেলে দুটির কথা মনে পড়ছে। জানি তারা নিরন্তর আমার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। আজ সকালে উঠে তারা যখন আমার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করবে, তখন আমার মৃত দেহ ফাঁসি-গাছে লম্বমান। তারা জানতেও পাবে না। কতদিন পরে খবর পাবে কে জানে? আল্লা হাকিম, তোমার মর্জির আমরা কি বুঝি?

অগত্যা আঙটিটা নিয়ে পকেটে রাখলাম।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন সৈন্য এসে ওদের দুজনকে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন উনাও পরিত্যাগ করবার সময়ে থানার কাছে একটা গাছে ওদের দেহ লম্বিত দেখতে পেলাম। জেমি গ্রীনের শেষ উক্তি মনে পড়লো, এতক্ষণে ওর স্ত্রী পুত্র নিশ্চয় ওর নিরাপত্তার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। মনে পড়লো, আল্লা হাকিম, তোমার মর্জির আমরা কি বুঝি!

৪

তারপরে ঘটনার চাপে জেমি গ্রীনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে পড়লো ১১ই মার্চ 'বেগমকুঠি' আক্রমণের সময়ে। আমাদের ৯৩ নম্বর রেজিমেন্টের হুকুম হল 'বেগমকুঠি' আক্রমণ করবার। বেগমকুঠি প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা, প্রতিরোধ লাইনের কেন্দ্র। তার প্রত্যেক জানলা, দরজা, কার্ণিশ সশস্ত্র সিপাহীতে পূর্ণ, ভিতরে কত সৈন্য আছে কে জানে।

আমরা বেগমকুঠির সম্মুখে এসে দেখি কুড়ি ফিট গভীর এক পরিখা। সেটা অতিক্রম করতেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা পড়লো। কিন্তু বেগমকুঠিতে আর প্রবেশ করা যায় না। তখন স্থির হল যে, কামান দিয়ে দেয়ালের কতকটা উড়িয়ে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। কামান দিয়ে দেয়ালের কতকটা সহজেই উড়িয়ে দেওয়া গেল, তিন চারজন মানুষ ঢুকতে পারে এমন ফুকর হয়েছে। কর্নেল আদেশ করলেন, চারজন সৈন্য চারটা বারুদের থলি নিয়ে ঐ ফুটো দিয়ে বেগম-কুঠির মধ্যে লাফিয়ে পড়বে, আর তারপর বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবে। এ নিশ্চিত মৃত্যুর আদেশ, কিন্তু যুদ্ধ তো আদর আপ্যায়ন মাত্র নয়, এমন আদেশ প্রয়োজন হলে দিতে হয়। চারজন বারুদের থলি পিঠে বেঁধে, ইসারায় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ঐ ফুটোর দিকে যাত্রা করলো। ঐ চার জনের মধ্যে আমি একজন। আমাদের লক্ষ্য করে বেগমকুঠি থেকে গুলী চলছে। তবু অনাহত ফুটোর কাছে এসে পৌঁছলাম। এবারে লাফ দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করতে হবে। জেমি গ্রীনের সেই আংটিটা আঙুলে ছিল, একবার সেটার দিকে তাকালাম। আর তখনই মনে পড়লো, হাইল্যাণ্ডের একটা পার্বত্য গ্রামে আমারও স্ত্রী এবং দুটি পুত্র আমার নিরাপত্তার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করছে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত পরেই...তারা জানতেও পারবে না... কতদিন পরে জানতে পারবে কে জানে...... এমন সময়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হুকুম করলো, জাম্প।

আর একবার জেমি গ্রীনের আঙটিটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে Jaws of death-এর মধ্যে লাফ মারলাম।

আমি কি করে বাঁচলাম জানিনে, আমার তিনজন সঙ্গীই মারা পড়লো।

লখনৌ সহর অনেককাল অধিকৃত হয়েছে, বিদ্রোহ অনেককাল প্রশমিত হয়েছে, আমি সৈন্যবাহিনী অনেককাল পরিত্যাগ করেছি, এখন আমি বৃদ্ধ, হাইল্যাণ্ডের নিজ গ্রামে বাস করছি। জেমি গ্রীনের আঙটি এখনো আমার অনামিকায় রয়েছে। মৃত্যুকালে এ আঙটি আমার পুত্রকে দিয়ে যাবো, আর তাকে বলে যাবো সে-ও যেন এমনি শেষ সময়ে তার পুত্রকে দিয়ে যায়।

জেমি গ্রীন গোয়েন্দা ছিল কিনা তার উত্তর ইতিহাস দিক, তবে আমার বিশ্বাস আমি স্থির করে নিয়েছি। নইলে মৃত্যুকালে তাঁর আঙটি পুত্রকে দিয়ে যাবার সংকল্প করতাম না।*

* Reminiscences of the Great Mutiny 1857-59 by Forbes-Mitchell.

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ

শ্রীসরলাবালা সরকার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের যে চিত্রটি আছে, তাহাতে দাক্ষিণাত্যের একটি ইতিহাস পাওয়া যায়। মন্দিরমালা-অলংকৃত দক্ষিণপ্রদেশ। কোথাও বা বনপথ আবার কোথাও বা লোকালয়।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে মত্ত গজের ন্যায় প্রভু পথে চলিতেছেন, সংগে আছেন একটিমাত্র অনুচর, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস।

ভক্তগণ আলালনাথ পর্যন্ত তাঁহার সংগে আসিয়াছিলেন। আলালনাথ হইতে তাঁহাদের বিদায় দিয়া প্রভু একাকী চলিলেন, ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"মত্ত সিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন,
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্তন।"

পিছনে পিছনে কৃষ্ণদাস বস্ত্র ও জলপাত্র লইয়া আসিতেছেন সেদিকে প্রভুর দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখের পথে। আজ তিনি পথের পথিক, নিঃসংগ। এই নিঃসংগতার ভিতর যেন এক পরম প্রত্যাশিত সংগের অনুভূতিতে ভাবরসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

প্রথমে পথে পড়িল কূর্মস্থান। এই কূর্মস্থানে বাসুদেব নামে একজন কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার গলিত কুষ্ঠে পোকা হইয়াছিল। চলিবার সময় সেই সব পোকা যদি মাটিতে পড়িয়া যাইত ব্রাহ্মণ সযত্নে পোকাগুলিকে তুলিয়া আবার ক্ষতের উপর রাখিয়া দিতেন। কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ প্রভুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া শুনিলেন, প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। তখন মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

প্রভুর গমনপথে কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু বহু দূর হইতে প্রভু হঠাৎ ফিরিয়া আসিলেন কূর্মস্থানে। যেখানে বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন সেখানে আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন আলিংগন-পাশে। মুহূর্তের মধ্যে বাসুদেব যেন নবজীবন ফিরিয়া পাইলেন। প্রভুর স্পর্শে তাঁহার চির-জীবনের যত দুঃখ সব দূর হইয়া গেল এবং শরীরের ব্যাধিও দূর হইল।

"প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সংগে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অংগ সুন্দর হইল।"

দক্ষিণ ভ্রমণের পথে প্রত্যেক স্থানে প্রভুর এইরূপ অপূর্ব লীলার উল্লেখ আছে—

"এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সব লোক বৈষ্ণব হইল প্রভুর সম্বন্ধে।"

পথে যাহাকে দেখেন তাহাকেই আলিংগন করেন আর বলেন 'হরি হরি বল।' সেই লোকটিও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিতে বলিতে সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই আলিংগন করে।

"এই মতে বৈষ্ণব হৈল সর্বদক্ষিণ দেশ।"

এই যে "বৈষ্ণব" শব্দটি, ইহার তাৎপর্য এক অপূর্ব ভাবময় অনুভূতি, যে অনুভূতিতে হিংসা দ্বেষ ও স্বার্থবোধ দূর হইয়া এক অপূর্ব আনন্দরসে মন বিভোর হইয়া যায়।

ইহার পর 'জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে'র উল্লেখ আছে। সম্ভবত এইটিই অধুনা 'ওয়ালটেয়ার' নামে পরিচিত।

যেখানে যেখানে প্রভু পদার্পণ করিতে-ছেন, সেখানেই লোকের ভিড় হইতেছে। শত শত দর্শনার্থী ছুটিয়া আসিতেছে পাগলের মত। কোন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সে-রাত্রি সেখানে থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষেই আবার পথ চলিতেছেন।

নৃসিংহের স্থান হইতে আসিলেন গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে। প্রভু যখন দক্ষিণ ভ্রমণে বাহির হন, তখন সার্বভৌম বিদায়কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হ'ন তিনি বিদ্যানগরে।
তোমার সংগের যোগ্য তিঁহ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম।
শুদ্র বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।"

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দ রায় ছিলেন বিদ্যানগরের শাসন-কর্তা। ইঁহার পিতা ভবানন্দ রায় ও অপর চারি ভ্রাতা সকলেই রাজ দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

দক্ষিণ ভ্রমণের পথে রামানন্দের সহিত মিলন এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে ইহার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নয়। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের মূল উৎস কোথায় রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়া প্রভু সেই তত্ত্বটি যেন উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন আর রাম রায় উত্তর দিয়া যাইতেছেন, আর প্রভু বলিতেছেন—এহো বাহ্য আগে কহ আর। এইভাবে এই আলোচনা নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ হইতে অরম্ভ করিয়া কৃষ্ণে সর্বকর্মার্পণ, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎ আরাধনা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং জ্ঞানশূন্য ভক্তি পর্যন্ত আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন প্রভু "এহো বাহ্য" ছাড়িয়া বলিলেন, "এহো হয় আগে কহ আর।"

ক্রমশ প্রেমভক্তি ও দাস্য প্রেম হইতে "সখ্য প্রেমে" যখন রাম রায় উপস্থিত হইলেন তখন প্রভু বলিলেন, "এহোত্তম আগে কহ আর।"

ইহার পর যশোদার বাৎসল্যপ্রেম, তাহার পর ব্রজগোপীর কান্তাপ্রেম। কিন্তু ইহার পরও যখন প্রভু বলিলেন,

" * * * আগে কহ শুনিতে পাই সুখে,
অপূর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে।"

তখন রাম রায় শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের উল্লেখ করিলেন।

শ্রীমতী রাধিকা। এই নামটির ভিতরে যেন কামগন্ধহীন প্রেমই মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

কৃষ্ণে আহ্লাদিতে তাহে নাম হ্লাদিনী।

* * *

হ্লাদিনীর সারাংশ তার হয় 'প্রেম' নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী।

* * *

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম।

লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাটি পরিধান।
কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
সৌন্দর্য কুংকুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর, তিনে অঙ্গ বিলেপন।

শ্রীমতী রাধার যে চিত্র রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর আলোচনায় অংকিত হইয়াছে তাহার সামান্য অংশমাত্র এখানে দেওয়া হইল। রামানন্দ রায় বলিয়া চলিতেছেন আর প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, "বল, বল রাম রায়, আরও বল আরও বল। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার ভাব-বিলাসের অমৃত রস আস্বাদন করাইয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর।"

রামানন্দ বলিলেন "বুঝিবার ও বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার ভাষার সীমা তো এই পর্যন্ত। তবে একটি গান আমি তোমাকে শুনাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি স্বরচিত একটি গান গাহিলেনঃ—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।

[প্রথমে নয়নে নয়নে মিলনে অনুরাগের সঞ্চার হইল, সেই অনুরাগ দিনে দিনে বাড়িতে বাড়িতে আর তাহার সীমা রহিল না।]

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি।"

[এই যে অনুরাগ ইহাতে রমণী বা রমণ বলিয়া কিছু ছিল না, দুটি চিত্ত এক অপূর্ব আকর্ষণে নিষ্পেষিত হইয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল।]

"না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন
দুঁহুকে মিলনে মধ্যস্থ পাঁচবান।

[এই মিলন ঘটাইবার জন্য কোনও দূতী বা অন্য কাহারও সন্ধান করি নাই, কেবল এক অপূর্ব অমৃতময় আকর্ষণই উভয়ের মিলনে মধ্যস্থ হইয়াছিল।]

"অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুজন কো প্রেমকি ঐছন রীতি?"

[এখন মনে হইতেছে যেন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই তোমাকে দিয়া সংবাদ পাঠাইতে হইতেছে। সখী, সুজনের প্রেমের কি এইরূপ রীতি হয়?]

"এ সখি। সে সব প্রেম কাহিনী
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।"

[সখি আজ আমার দূতীর প্রয়োজন হইয়াছে; সেই প্রেম কাহিনী তিনি বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই তুমি তাঁহাকে আবার সেই দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিও।]

রামানন্দ রায় এই পর্যন্ত বলিতেই ভাবাবেশে প্রভু তাঁহার মুখ হাত দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পরে বলিলেন,

"প্রভু কহে, সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।"

ইহার পরেও তিনি কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং রামানন্দও তাহার এইভাবে উত্তর দিয়াছিলেন,

"প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার,
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্তি-গণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?
কৃষ্ণপ্রেমী ভক্ত বলি যাহার হয় খ্যাতি।
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি।
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের শ্রেয়ঃ ধর্ম?
রাধাকৃষ্ণের প্রেম কেলি যে গীতের মর্ম।
শ্রেয়ঃ মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ হয় সর্বসার?
কৃষ্ণভক্ত-সংগ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।
কাহার স্মরণে শুদ্ধ হয় তনুমন?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা একান্ত স্মরণ।
ধ্যান মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান।" ইত্যাদি

প্রভু দশদিন বিদ্যানগরে ব্রাহ্মণের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রতিদিন রামানন্দ রায় সন্ধ্যার পর সেখানে আসিতেন ও সমস্ত রাত্রি তাঁহাদের মধ্যে এইভাবে আলোচনা হইত। দশদিন পরে যে দিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেদিন রাম রায়কে বলিলেন, "রায়, তুমি এবার বিষয়ের কার্য ছাড়িয়া দিয়া নীলাচলে যাও, আমি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইজনে নীলাচলে কৃষ্ণগুণকীর্তন করিয়া সুখে দিন কাটাইব।" রাম রায় তদনুসারে রাজার নিকট পদত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন।

ইহার পর প্রভু আবার পথে বাহির হইলেন।

দক্ষিণ দেশে প্রধানত রামানুজপন্থী বৈষ্ণবই অধিক। ইহার ভিতর আবার শ্রীসম্প্রদায়, রাম উপাসক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ইহা ছাড়া কর্মী, জ্ঞান-মার্গী, তত্ত্ববাদী, শৈব ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতের উপাসকও আছেন। প্রভু মল্লিকার্জুন তীর্থে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে গৌতমী গঙ্গা নামক নদীতে স্নান করিয়া 'মহেশ' শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। আবার দাসরাম মহাদেবকেও দর্শন করিলেন। ইহার পর অহোবল গমন করিয়া সেখানে নৃসিংহদেবের মন্দিরে নৃসিংহ দর্শন করিলেন। তাহার পর সিদ্ধবট নামক স্থানে সীতাপতি রঘুনাথ দর্শন করিলেন। যখন যেখানে যাইতেছেন, তখন সেই সেইভাবে বিভোর হইতেছেন। কখনও বা গালবাদ্য করিয়া শিবের স্তুতি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, আবার নৃসিংহ দেবের মন্দিরে গিয়া 'প্রহ্লাদেশ' বলিয়া নৃসিংহের স্তুতি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন।

সিদ্ধবটে গিয়া যখন রঘুনাথের মন্দিরের সম্মুখে স্তবপাঠ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তখন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ দিবারাত্র রামনাম জপ করেন। প্রভু একদিন তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া স্কন্দতীর্থে কার্তিকেয় দর্শনের জন্য গমন করিলেন এবং দর্শন শেষে আবার সেই পথেই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন, দেখিলেন ব্রাহ্মণ অনবরত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপ করিতেছেন।

প্রভু বলিলেন, "একি, তোমার এ দশা কেন? রঘুপতি রামচন্দ্র কি তোমাকে ত্যাগ করিলেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু, তিনি তো আমার অন্তরেই আছেন, কিন্তু তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি রাম-নাম জপ করিতে গিয়া অনবরত কৃষ্ণ-নামই মুখে আসিতেছে, এবং ইষ্টদেব রামের নাম জপ করিয়া আমি যে সুখ পাইতাম, ঠিক তেমনি আনন্দ কৃষ্ণ-নামেও অনুভব করিতেছি। তুমিই কি সেই রামচন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ"—কাতরে ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন।

এখান হইতে প্রভু বৃদ্ধকাশী নামক স্থানে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। তাহার পর তাঁহার একদল তার্কিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতিতে মহাপণ্ডিত এবং মায়াবাদী। প্রভুকে ইঁহারা বিচার করিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিলেন।

এইভাবে দক্ষিণ দেশে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রচারিত হইল। তখন দলে দলে বিদ্যাবলাঢ্য পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ প্রভুর নিকটে আসিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ আচার্যগণও আসিলেন এবং বিচারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রথমে এইভাবে বিচারে সম্মত হন নাই, কিন্তু উঁহাদের অহংকার চূর্ণ করিবার জন্য শেষে সম্মত হইলেন।

বহু দার্শনিক পণ্ডিতকে বিচারক করিয়া সভা আহ্বান করা হইল। বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কপ্রধান। বিতর্কের মধ্য দিয়াই বিচার চলিল। কিন্তু বৌদ্ধাচার্য নূতন নূতনভাবে প্রশ্ন উঠাইলেও প্রভুর দৃঢ় যুক্তিতে সকল প্রশ্নগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। বৌদ্ধাচার্য দার্শনিক-পণ্ডিত-সভায় বিতর্কে পরাজিত হইয়া লজ্জিত হইলেন এবং ভয় পাইলেন।

বিচারে হারিয়া বৌদ্ধগণ সকলে একত্র হইয়া প্রভুকে অন্য উপায়ে ধর্মচ্যুত ও অপদস্থ করিবার জন্য এক কুমন্ত্রণা

করিলেন। তাঁহারা সমাদর করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপবিত্র অন্ন আনিয়া 'শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ' বলিয়া থালি করিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন এই সন্ন্যাসী পরম বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণুর প্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এই অপবিত্র অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার ধর্ম নষ্ট হইবে এবং তিনি সকলের উপহাসের পাত্র হইবেন।

কিন্তু সেই অন্নের থালা প্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিবামাত্র কোথা হইতে একটি প্রকান্ড পাখি উড়িয়া আসিয়া ঠোঁটে করিয়া থালাশুদ্ধ অন্ন তুলিয়া লইয়া গেল। উড়িয়া যাইবার সময় তাহার ঠোঁট হইতে খসিয়া থালাটি উপবিষ্ট বৌদ্ধাচার্যের মাথার উপর পড়িল।

মস্তকে দারুণ আঘাত পাইয়া বৌদ্ধাচার্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শিষ্যগণ গুরুর এই অবস্থা দেখিয়া অদূরে দণ্ডায়মান প্রসন্নবদন সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া 'অপরাধ ক্ষমা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর'—বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ—অপরাধভঞ্জন, তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে গুরুকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার নাম কীর্তন কর, তাহা হইলেই ইনি চৈতন্য পাইবেন।"

শিষ্যগণ তাহাই করিলেন এবং—

"চেতন পাইয়া আচার্য উঠে 'হরি' বলি।"

কিন্তু মহাপ্রভু আর সেখানে থাকিলেন না, তিনি 'ত্রিপদী ত্রিমল্ল' নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। ত্রিমল্লে বেংকট পর্বতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আছেন এবং ত্রিপদীতে রঘুনাথ আছেন। ইহার পর 'পানা নরসিংহ' গ্রামে নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করিলেন। এই নৃসিংহ মূর্তিকে চিনির পানা ভোগ দেওয়া হয়। সে জন্য এই গ্রামের নাম পানা নরসিংহ।

ইহার পর শিবকাঞ্চী আসিয়া শিবদর্শন করিলেন। ইহার পর বিষ্ণুকাঞ্চী আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য তীর্থস্থান। অসংখ্য দেবমন্দির। কোথাও শিবমন্দির, কোথাও বা বিষ্ণুমন্দির। ত্রিকাল-হস্তীস্থানে মহাদেবের মন্দির, আবার পক্ষীতীর্থেও মহাদেবের মন্দির আছে। বৃদ্ধকোল তীর্থে আছেন শ্বেত-বরাহ। পীতাম্বর শিব ও শিয়ালী ভৈরবী দেবী দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যেকটি তীর্থ ও দেবমন্দির পরম ভক্তিভরে দর্শন করিয়া চলিতেছেন। প্রভু কাবেরী-তীরে আসিলেন। এখানে গো-সমাজ-শিব আছেন। বেদাবন নামক স্থানেও শিবমন্দির আছে। এই শিবের নাম অমৃতলিঙ্গ শিব।

দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের দারুণ বিরোধ। কিন্তু মহাপ্রভু এই বিরোধের ধার দিয়াও যান নাই। শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণুমূর্তি, নৃসিংহ বা বরাহ সর্বত্রই তিনি ভাবাবেশে প্রেমে নৃত্য করিয়াছেন, সকল মূর্তিতেই তিনি সেই 'এক'কে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। তবুও অনেক স্থানে শৈবগণও বৈষ্ণবধর্মানুরাগী হইয়াছেন। তাঁহার সংস্পর্শে বিদ্বেষবুদ্ধি অন্তর্হিত হইত ইহাই হয়তো তাহার কারণ।

দেবস্থান, কুম্ভকর্ণ কপাল ও পাপনাশন প্রভৃতি তীর্থ অতিক্রম করিয়া প্রভু শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র বা শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। কাবেরী নদীর তীরে রঙ্গনাথ জীউর প্রকান্ড মন্দির। বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। 'বরষার চারি মাস শ্রীহরিশয়ন'। এখন চাতুর্মাস্য ব্রতের সময়। এ সময় সাধু সন্তগণ পর্যটন হইতে বিরত হইয়া কোন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জপ, শাস্ত্রাদি চর্চা ও ধ্যান ধারণায় সময় কাটান। প্রভু যেখানেই যান সেখানেই তাঁহার দর্শনার্থীর জনতা হয় এবং সকলেই তাঁহার সেই অপূর্ব নৃত্য, কীর্তন ও ভাবাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীরঙ্গমে বেংকট ভট্ট নামে এক শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে চাতুর্মাস্য যাপনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

"তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা রসে,
ভট্ট সঙ্গে গোঁয়াইলা সুখে চারি মাসে।
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরূপ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন।"

এই চারি মাস বেংকট ভট্টের গৃহে লোক-সমাগমের অবধি রহিল না। শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ এক এক দিন এক একজন ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সেই নিমন্ত্রণ লইয়া যাঁহারা আসিতেছেন, প্রত্যেকেরই পরম আগ্রহ, সকলেরই ভয় পাছে তিনি নিমন্ত্রণের দিন না পান।

শ্রীরঙ্গমে একজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মন্দিরে আসিয়া গীতা পাঠ করেন। ব্রাহ্মণের সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান নাই। তথাপি নিজের আনন্দে নিজেই পাঠ করিয়া যান। তাঁহার অশুদ্ধ উচ্চারণে লোকে উপহাস করে, কেহ বা নিন্দা করে। সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজের মনের আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, আনন্দে রোমাবলী কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা কম্প হইতেছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মে প্লাবিত হইতেছে।

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া প্রভুর অতিশয় আনন্দ হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কিভাবে এই সব শ্লোকের তাৎপর্য গ্রহণ করেন?"

"মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়,
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়?
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি মূর্খ, শব্দের অর্থ জানি না। গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য গীতা পাঠ করিতেছি। উচ্চারণ শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ হইতেছে তাহা বুঝিবার মত বিদ্যা আমার নাই। কিন্তু যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণ দেখি অর্জুনের রথে রথরজ্জু ধারণ করিয়া শ্যামল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়ি। তাই গীতা পাঠ ছাড়িয়া আমার উঠিতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "গীতা পাঠে তোমারই অধিকার। কেননা গীতার যাহা সার অর্থ তাহা তুমিই বুঝিয়াছ।" এই বলিয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সেই আলিঙ্গনে ব্রাহ্মণ যেন শ্যামল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণেরই স্পর্শের অনুভূতি লাভ করিলেন। সেইদিন হইতে ব্রাহ্মণ যে চারি মাস প্রভু শ্রীরঙ্গমে ছিলেন প্রতিদিন বল্লভ ভট্টের গৃহে গিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন।

বল্লভ ভট্ট প্রভুকে চারি মাস নিজ গৃহে পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব জন্মিয়াছে, মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুকও চলে। এই হাস্য-কৌতুক ভট্টের উপাসনা লইয়া। বল্লভ ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠার সীমা নাই। তাঁহার এই একান্ত ভক্তিভাব দেখিয়া প্রভু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু আবার রহস্য করিতেও ছাড়েন না।

"প্রভু কহে, ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
কান্তবক্ষস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি।
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ করে গোচারণ।
সাধ্বী হৈয়া চাহে কেন তাহার সঙ্গম?"

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী। তিনি আমার রাখাল ঠাকুরের জন্য কেন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বল দেখি?

"ভট্ট কহে কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ।
* * *
কৃষ্ণ সঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম নহে নাশ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর উপহাস?
প্রভু কহে দোষ নহে, ইহা আমি মানি।
রাসে স্থান না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি।"

ব্রজ গোপীগণ রাসলীলায় কৃষ্ণসঙ্গিণী হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী কেন সে অধিকার পাইলেন না?

ভট্ট বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। ঈশ্বরের লীলার তাৎপর্য কি করিয়া বুঝিব, তুমি যদি বুঝাইয়া দাও তাহা হইলে বুঝিতে পারি।"

প্রভু বলিলেন, "ব্রজের ভাব আর ঐশ্বর্য-ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্রজের ভাবে যে নিবিড় মাধুর্য আছে, ঈশ্বরবোধে ভগবানের উপাসনায় সে মাধুর্য সম্ভব হয় না।"

"তারে ঈশ্বর করি না জানে ব্রজজন।"

যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধেন, আবার সখারা খেলায় জিতিয়া তাঁহার কাঁধে চড়ে। ইহাই ব্রজের ভাব।

"ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

রাখাল ছেলে কৃষ্ণের মাধুর্যে নারায়ণ-অঙ্কস্থিতা লক্ষ্মীও বিমুগ্ধা হন, কিন্তু নারায়ণ কখনই গোপীর মন হরণ করিতে পারেন না।

ইহার পর বলিলেন, "ভট্ট, দুঃখ করিও না, আমি উপহাস করিয়াছি, ইহার মধ্যে বস্তুত কোন ভেদই নাই।"

"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।"

ভট্ট গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু লক্ষ্মীনারায়ণের আমার উপর পূর্ণ কৃপা। তাঁহাদের কৃপাতেই তোমার চরণ দর্শন পাইয়াছি, আর তাঁহাদের কৃপায় তোমার মুখে কৃষ্ণভক্তির মহিমা শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

চতুর্মাস শেষ হইল, বিদায়ের সময় আসিল। প্রভু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, ভট্টের গৃহ আর হৃদয় শূন্য হইয়া গেল।

ঋষভ পর্বতে নারায়ণের মন্দির। পরমানন্দ পুরী সেখানে চাতুর্মাস্য যাপনের জন্য রহিয়াছেন। পরমানন্দ পুরী পরম ভক্ত এবং মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পুরী গোঁসাই বলিলেন, "চাতুর্মাস্য শেষ হইয়াছে, এবার আমি নীলাচলে গিয়া পুরুষোত্তম দর্শন করিব।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বিশেষ সুখী হইলেন এবং বলিলেন, তিনিও শীঘ্রই নীলাচলে ফিরিবেন।

শ্রীশৈলে গিয়া প্রভু শিবদুর্গা দর্শন করিলেন। তাহার পর দক্ষিণ মথুরা হইয়া কামকোষ্ঠী নামক স্থানে গিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখিলেন রন্ধনের কোন আয়োজনই নাই।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন আমার প্রভু রামচন্দ্র বনে বাস করিতেছেন, সেখানে ফলমূল ছাড়া আর কিছুই তো মিলে না। লক্ষ্মণ ফলমূল আর শাক সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি ফিরিলে তবে তো মা জানকী আহারের আয়োজন করিবেন।" ব্রাহ্মণের এই ভাব দেখিয়া প্রভু অতিশয় সুখী হইলেন।

পরে ব্রাহ্মণ অতিথির জন্য রন্ধন করিলেন বটে, কিন্তু নিজে উপবাস করিয়া রহিলেন। তাঁহার এইভাবে অনশনের কারণ জানকীকে কিনা রাক্ষস রাবণ স্পর্শ করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল! এই কথা শুনিয়া আর কি বাঁচিবার জন্য ইচ্ছা হয়? আর আমার এ জীবনে কোন প্রয়োজন নাই।"

প্রভু বলিলেন, "সে কি কথা? সীতাদেবীকে কখনও কি রাক্ষস স্পর্শ করিতে পারে? রাবণ যাঁহাকে চুলে ধরিয়া নিয়াছিল তিনি প্রকৃত সীতা নন, মায়াসীতা।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাসিত করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কিছু ভোজন করিলেন।

তাহার পর দুর্বেশন, দুর্বেশন হইতে মহেন্দ্র শৈল। সেতুবন্ধে আসিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। রামেশ্বর দর্শন করিয়া এক বিপ্রসভায় কূর্মপুরাণের পাঠ শুনিলেন। কূর্মপুরাণ হইতে তখন পতিব্রতা উপাখ্যান পাঠ হইতেছিল। পরম পতিব্রতা সীতাদেবী, রাক্ষস-স্পর্শের ভয়ে অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্নিদেব তাঁহাকে লইয়া কৈলাসে পার্বতীর নিকট রাখিয়া আসিয়া মায়াসীতা দিয়া রাবণকে বঞ্চনা করেন। রাবণ বধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় প্রকৃত সীতাকে আবার ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রভু এই বিবরণ সম্বলিত কূর্মপুরাণের পত্রটি ব্রাহ্মণের কাছে চাহিয়া লইলেন।

"নূতন পত্র লিখিয়া গ্রন্থে লাগাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল॥"

পত্রখানি লইয়া আবার প্রভু দক্ষিণ মথুরায় ফিরিলেন এবং সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের নিকট সেই পত্রখানি দিলেন।

"বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন।
মহাদুঃখ হইতে মোরে করিলে নিস্তার।"

ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিয়া প্রভু আবার চলিলেন। ইহার পরের তীর্থগুলির নাম এইরূপ।

তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তাম্রপর্ণী নয়-ত্রিপদী, চিয়ড়তালা এখানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছেন। তিলকাঞ্চিতে শিব, গজেন্দ্র-মোক্ষণে বিষ্ণুমূর্তি, পানাগড়ি তীর্থ ও চামতাপুরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, মলয় পর্বতে অগস্ত্য-দেব, ইহার পর কন্যাকুমারী।

এইবার প্রত্যাবর্তনের পথ।

এ পথেও বহু তীর্থ। পয়স্বিনী নদীর তীরে আদি কেশবের মন্দির। এখানে তাঁহার বহু মরমী ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থখানি তিনি এখানেই পান।

অনন্ত পদ্মনাভ, সিঙ্গেরী মঠ, মৎস্য-তীর্থ, পঞ্চ-অপ্সরা তীর্থ, ফল্গু তীর্থ, গোকর্ণ শিব ও শূর্পারক তীর্থ প্রভৃতি তীর্থ এই পথে পড়ে। এই পথে উড়ুপ কৃষ্ণ ও নর্তক গোপালকৃষ্ণ নামে দুইটি মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন, তত্ত্ববাদী নামে এক সম্প্রদায় এই বিগ্রহের সেবক। ইঁহাদের মধ্বাচার্য তর্কের পথ হইতে ভক্তির পথে লইয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্বাচার্যই এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

পাণ্ডুপুরে বিঠ্ঠল ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে আসিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর অপর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রভুর জন্মস্থান [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরঙ্গপুরী যখন শুনিলেন নবদ্বীপ তাঁহার জন্মস্থান, তখন তিনি বলিলেন, "বাংলা দেশে গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে যখন তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন আমি নবদ্বীপে গিয়া জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। মিশ্রের ব্রাহ্মণী শচী দেবী যেন সাক্ষাৎ জগন্মাতা, বিদেশী সন্ন্যাসীকে সন্তানের ন্যায় তিনি সেবা করিয়াছিলেন। [illegible] রন্ধনবৈপুণ্যের তুলনা হয় না। [illegible] হাতের রান্না মোচার ঘণ্টের [illegible] এখনও মনে আছে। বিশ্বরূপ নামে [illegible] পরম সুন্দর যে গোপাল সন্ন্যাস [illegible] শঙ্করারণ্য নাম নিয়াছিল, এই [illegible] তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।"

দক্ষিণ ভ্রমণে আসিবার সময় প্রভু [illegible] বলিয়াছিলেন, "আমি দাদা [illegible] সংবাদের জন্য দক্ষিণে যাইতেছি [illegible]" প্রত্যাগমনের পথে তিনি সেই [illegible] পাইলেন।

তাহার তীর্থযাত্রা ফিরিবার পথে [illegible] বটী, দণ্ডকারণ্য, নাসিক, ব্রহ্মগিরি ও [illegible] গোদাবরী প্রভৃতি তীর্থ পড়িয়াছিল। [illegible] কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক গ্রন্থ একখানি [illegible] তিনি পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভ্রমণে ফিরিবার পথে মল্লার [illegible] স্থানে 'ভট্টমারী' নামে এক সম্প্রদায় [illegible] লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। [illegible] নামে সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মের নামে [illegible] বৃত্তি করিত ও কতকটা বামাচারী সম্প্রদায়ের [illegible] আচরণ ইহাদের ভিতর দেখা যাইত। প্রভুর সঙ্গী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে ইহারা স্ত্রী ও অর্থের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া [illegible] গিয়াছিল। কিন্তু পরে প্রভুর [illegible] ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য চরিতকার পরিশেষে লিখিয়াছেন দক্ষিণ ভ্রমণ অতি সংক্ষেপেই লেখা [illegible] আরও লিখিয়াছেন—

"দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে।"

ইহাতে মনে হয় প্রভুর মরমী সখা স্বরূপের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণ সম্বন্ধে [illegible] রায় রামানন্দের সহিত আলোচনার সময় তিনি নিজে কিছু বলিয়াছিলেন, [illegible] ঘটনাগুলি কৃষ্ণদাসের নিকট ভক্তগণ প্র[illegible] করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন।

পৌরুষ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(এক)

শাখা লাইন, গাড়ির চলাচল কম, একটা যদি হাতছাড়া হয়ে গেল তো হাঁ করে বসে থাকো। তা ঘণ্টা তিনেক তো বটেই।

নিজের দোষে হাতছাড়া হয়ে গেলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে, অন্ততঃ মানুষে খুঁজে বের করে একটা, এ তাও নয়, গাড়ি লেট। দু দশ মিনিট হলেও কথা ছিল, চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, এখনও গাড়ির কোনও খোঁজ খবরই নেই।

এই সময় দুদিক থেকে গাড়ি আসবার কথা, ছোট স্টেশন হলেও প্ল্যাটফর্মে কিছু লোক জমেছে। লেট হয়েছে দক্ষিণ অর্থাৎ কলকাতার দিকের গাড়িটা। আমি যাব উত্তরে। আমার গাড়িটা আসতে এমনিই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় আছে; এখানে একটু কাজ ছিল, সেরে নিয়ে স্টেশনেই এসে বসে আছি। নূতন জায়গা, আজই প্রথম এসেছিলাম। .

মেঠো জায়গা, কলকাতা থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে, তাই যাত্রীদের সাজ পোষাকে সেই রকম একটা ছাপ আছে। ভদ্রবেশধারী যাত্রী গুণে গেঁথে জন পাঁচ ছয় নজরে পড়ে, অর্থাৎ ডেলি প্যাসেঞ্জারের স্টেশন নয়; যদি থাকে তো ওরই মধ্যে দু চারজন থাকতে পারে। তবে একজনের সাজগোজ একটু বেশী বিশিষ্ট। অবশ্য আর একটু দক্ষিণে গেলে এমন কিছু নয়, তবে এ সমাবেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ট্রাউজার্স, গায়ে পাঁশুটে রঙের বুশ শার্ট, পায়ে মোটা ক্রেপ-শু, হাতে একটা ফেল্ট হ্যাট। চেহারাটিও আছে, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

আমি ভিড় থেকে আলাদা হয়ে প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে গিয়ে সিগারেট টানছিলাম, স্টেশনের দিকে পেছন ফিরেই। অন্যমনস্কই ছিলাম, জুতার শব্দে ফিরে

দেখি স্যুটধারী এবং আরও একজন হন হন করে এগিয়ে আসছে, দ্বিতীয় ভদ্রলোকটির আরও বয়স হয়েছে, একটু প্রবীণ গোছের। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

স্যুটধারী বললে—"কি কাণ্ডটা দেখেছেন তো? এ ব্যাপার আমরা আর কতদিন সহ্য করব? ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পর সাত বছর হয়ে গেল।"

হেসে বললাম—"সেইটেই কি সহ্য করবার পক্ষে যুক্তি নয়? অভ্যেস হয়ে আসছে তো?......আপনি লেট হবার কথা বলছেন নিশ্চয়?"

"তিন কোয়ার্টার হয়ে গেল, এখনও বলে দেড় ঘণ্টা লাগবে, ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে। ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে তো তার ব্যবস্থা কর, দুনো ভাড়া করে টাকা ত লুটছিস খুব।"

বললাম—"করা তো উচিত।"

"উচিত জ্ঞান যদি থাকত তো অনেক আগেই সব ঠিক হয়ে যেত মশায়, ঘাড় ধরে করাতে হবে। শ্যালদা সেকশনে দেখলেন তো?"

সেই রকম কিছু ভেবেছে নাকি? ওদিকে ভিড়টার দিকে চেয়ে নিয়ে বললাম—"সেটা তো উচিত নয়, রোজ চলেও না......তারা নেহাৎ সহ্য করে করে না পেরে শেষে......"

অপর ভদ্রলোকটি একেবারে রুখে এগিয়ে এলেন।

"চলে মশাই, রোজ এই রোগ হলে রোজ ঐ রকম ওষুধের দরকার। এই তালে স্টেশন মাস্টারটিকে বাইরে টেনে এনে বেশ দু ঘা দেওয়া যায় চাঁদা করে, দেখবেন কাল থেকে এই গাড়িই বাবা বলে পাঁচ মিনিট আগে এসে হাজির। ঐ দাবাই।"

স্যুটধারী অল্প একটু হেসে ভদ্রলোককে টেনে নিলে, বললেন—"পণ্ডিত মশাই চটেছেন। অবশ্য উচিত তাই, তবে তার আগে কানুন মতোই কাজ করে দেখা যাক না। না হয়, লোকগুলো যেমন ক্ষেপে উঠছে আপনি ব্যবস্থা করবে।......আপনাকে তাই ডাকতে এসেছি।"

জিগ্যেস করলাম—"কি করবেন?"

"শেষ পর্যন্ত করবার যা তা ঠিক করে রেখেছি আমি, এই পণ্ডিত মশাই, আরও ঐ যে ও'রা দাঁড়িয়ে রয়েছেন—পরামর্শ হয়ে গেছে আমাদের, আর তাতে চোখে সরষে ফুল দেখিয়ে ছেড়ে দেবে বাছাধনদের। তবে তার আগে যদি একটু হুমকি দিয়ে কাজ আদায় হয় তো সেই চেষ্টা করব ঠিক করেছি—আমার মনে হয় তাইতেই হয়ে যাবে।"

"হুমকিটা কি?"

"ঐ পণ্ডিতমশাই যা বললেন তাই, তবে আমি ভেবে দেখছি ঠিক ওভাবে না গিয়ে একটু ভাঁওতা দিয়ে দেখা প্রথমে—মানে এদিকে লোকগুলোকে নরম নরম করে একটু তাতিয়ে দিই ভেতরে ভেতরে—কিছু করবে না, শুধু একটু জটলা করবে, এক আধটা শ্লোগান আওড়াবে—আমরা আর বরদাস্ত করব না—টিকিট বেচেছে গাড়ি দিক!—ওদিকে আমরা এই কজন যে ভদ্রলোক রয়েছি, আপনি নিয়ে ছজন হব, স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে বলি, আপনি টেলিগ্রাফ করে দিন মশাই, একটা ব্যবস্থা করতে শীগ্গির, ক্ষেপে উঠছে সব, আমরা ততক্ষণ ঠাণ্ডা করে রাখছি কোন রকমে......"

আমার দৃষ্টিটা আপনি একবার পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত উঠে গেল, প্রশ্ন করলাম—"ব্যবস্থাটা কি করতে পারে আন্দাজ করেন?"

পণ্ডিত মশাই আবার ঠেলে এগিয়ে এলেন, আমায় তাতাতে না পারার জন্যে যেন আরও রুক্ষ হয়ে উঠেছেন, বললেন—"তাও আমাদের বলে দিতে হবে, ট্যাঁকের পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে? যে কোন উপায়ে পৌঁছে দিক—মাথায় করে দিয়ে আসুক......"

উচিত না হলেও একটু হাসি এসেই গেছে ঠোঁটে, বললাম—"সেটা তো সম্ভব নয়; আর সে ব্যবস্থা করলেও আরও লেট হয়ে যাবে না কি?"

স্যুটধারী ও'কে আবার একটু সরিয়ে বললে—"ব্যবস্থা খুব হতে পারে, যদি চায়। দুটো স্টেশন পরেই জংশন, সেখান থেকে লোক্যাল ছাড়ে, গাড়ি আছে; কিছু না হোক, খান দুই গাড়ি দিয়ে একটা ট্রেন পাঠিয়ে দিক—নিদেন একখানা গাড়িও এই করে আমাদের অন্তত জংশন পর্যন্ত পৌঁছে দিক, তারপর ওখান থেকে মেন লাইনের অনেক ট্রেন পেয়ে যাব।"

আমার কোন স্বার্থ নেই, অন্য দিকের যাত্রী, তবে একটা গোলমাল না করে বসে সেইজন্যে কথায় একটু আটকে রাখবার চেষ্টা করছি; বললাম—"সে ব্যবস্থা হতে হতে তো রেগুলার সার্ভিসের গাড়িটাই এসে পড়তে পারে, বরং আগেই এসে পড়তে পারে........."

পণ্ডিত মশাই আবার উপছে উঠলেন—"সে এখনও বিশ বাঁও জলে, এর পর বলবে ইঞ্জিন ডিরেল হয়েছে। ...ও'কে ছেড়ে দিন, অত ইয়ে তো; আসুন আমরা কজনেই ঠিক করে নোব, ও যত ডেকে ডেকে পরামর্শ করতে যাবেন, ততই পেছিয়ে যাবে, বাগড়া দেবার লোকই তো বেশী জগতে।"

আমার দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্যুটধারীর জামায় একটা টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম—"যদি আপত্তি না থাকে তো আপনারা দ্বিতীয় উপায়টা কি ঠাউরেছেন একবার শুনতাম।"

পণ্ডিতমশাই টানছিলেনই, স্যুটধারী তবুও ঘুরে দাঁড়াল; বললে—"ড্যামেজ স্যুট মশাই, এই যে দেরিটা হলো, ক্ষতিপূরণ দিক রেলওয়ে। বেশ তো আপনি এই হুমকির ব্যাপারে না থাকতে চান, ঐখানে আমাদের সঙ্গে এসে জয়েন করুন, এখন ওরা ব্যবস্থা করুক বা না করুক ক্ষতি যা হবার তা হয়ে হয়ে গেছে, আমরা ছাড়ব না। আমার কথাই ধরুন......"

হাতটা উলটে ঘড়িটা দেখে নিলে।

"গবর্নমেণ্টের একটা বড় বিল্ডিং কনট্রাক্ট ধরবার জন্যে আমি এদিকে ইটের সন্ধানে এসেছিলাম। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমার মিনিস্টারের সঙ্গে ঠিক ইলেভন ফরটি ফাইভে এনগেজমেণ্ট—ওয়েট করবেন...আর তো কোন মতে সম্ভব নয় আমার পৌঁছুন—গেল তো সব চান্স? ড্যামেজ দিক রেলওয়ে, আমি ছাড়ছি না।......হিয়ার ইজ মাই কার্ড......"

বড় কথা বলতে বলতে গরম হয়ে গেছে, তাইতেই ইংরেজী বুলিগুলোও, একটা পকেট বুক টেনে নিয়ে একটা কার্ড বের করে দিলে।

মোটা আইভরি ফিনিশ শৌখীন কার্ড কিন্তু নামের সঙ্গে যে কটা অক্ষর দেখলাম তাতে মনে হলো, এ কার্ড রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত না পৌঁছুলে যেন ভালো। তবে সে কথা বলবার আমার কোন তাগিদ নেই, কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ এ একটা গ্রাউণ্ড বৈকি, ছাড়বেন কেন?...... আর এ'র?"

পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে যুবককেই প্রশ্নটা করলাম।

"উনি হচ্ছেন পুরুত, ও'র তো সমস্ত প্রোগ্রাম আজ আপসেট।...আপনি বলুন না পণ্ডিত মশাই।"

এমনি সব কিছুই ডেলি-প্যাসেঞ্জারের মতো, মাথায় একটি শিখা দেখে এতক্ষণ একটু ধোঁকা লেগেছিল, সেটা মিটল। পণ্ডিত মশাই বলে উঠলেন—"আমার ড্যামেজ স্যুট সোজা ড্যামেজ স্যুট হবে না, তারা হেজিপেজি লোক নয়, বনগাঁয়ের রায়চৌধুরী, বুঝিয়ে দেবেখন বাছাধনদের। নাতনীর ষষ্ঠীপুজো —বড় ছেলের প্রথম সন্তান—আমি আটটা বত্রিশের গাড়িতে গিয়ে পুজো দেওয়াব, কাঁচা পোয়াতি উপোস করে বসে আছে—বড়লোকের ঝি বড়লোকের বৌ, এমনিই ফিট হয়ে পড়তে পারলে আর কিছু চায় না, তারপরে এই উপোস—হুলুস্থুলু পড়ে গেছে বাড়িতে এতক্ষণ—বুড়ো হন্যে হয়ে রয়েছে। আমি বলব আমার কি দোষ মশাই? আপনি রেলের কাছে ড্যামেজ আদায় করুন। করবে সে—বনগাঁয়ের রায়চৌধুরীকে আপনারা চেনেন না, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করে ও ড্যামেজ আদায় করবে। তারপর

আমার নিজের ড্যামেজ—পুজো সেরে এগারটা চল্লিশেরটায় আফিস পৌঁছবার কথা, বড়বাবুকে একটু বলে এসেছিলাম—বলব দিন মশাই ঠেসে এক পানিশমেণ্ট—মাস-খানেকের জন্যে সাসপেণ্ডই করে দিন, আমি কেস সাজিয়ে ব্যাটাদের ঘুঘুচক্র দেখিয়ে দিই......"

সুটধারী ঠোঁটে অল্প একটু হাসি টেনে দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে শুনছিল, বললে—"এঁর এই —একেবারে দুদিক থেকে চাপ; তারপর ঐ ওঁরাও রয়েছেন—একজনের এঁর মতনই আফিস, একজনকে বৌবাজারে গিয়ে কাটা-কাপড়ের দোকানে বসতে হবে—মোটা ড্যামেজ; তাই বলছিলাম আপনিও জয়েন করুন না আমাদের সঙ্গে, এক সঙ্গে অনেক গুলো কেস ঠুকে দিলে......আমি আবার সেকেন্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, আপনি?"

বললাম—"ক্লাসের কথা তো উঠছে না, আমি যে একেবারেই উল্টো দিকের যাত্রী। নৈলে আপনাদের সঙ্গে নেমে পড়া যেত না হয়—মুফতে যদি দু' পয়সা এসে যায় হাতে......"

পণ্ডিত মশাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "তা অন্যদিকের যাত্রী তো আগে বলতে হয়, এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট আর ক্রমাগতই কু'পরামর্শ—এটা করলে এই হবে, ওটা করলে এই হবে। ...চলুন...যত্তো সব!..."

যুবকের জামায় টান দিলেন।

যুবক কিন্তু নড়ল না, সিগারেটটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে —"আমি একটা কথা ভাবছি—বেশ তো, আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান, তবে আমাদের সঙ্গে মিশে যদি কেস্ করতে রাজি থাকেন তো এই দিকের একটা টিকিট কিনে নিন না —বেশি দূরে না, এই চুঁচড়ো কি চন্দননগর —কোথায় যাচ্ছেন সে তো আর কেউ দেখতে আসছে না।"

ফিচলেমি বুদ্ধি দেখে হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠছিল, সেটাকে যতটা সম্ভব অল্প করে নিয়ে বললাম—"একেবারে উত্তরকে দক্ষিণ করে দোব?"

"দরকার যে। বড্ড বাড়াবাড়ি, মাঝে মাঝে একটু সাজা হওয়া দরকার নয়?"

ভালো করেই হেসে উঠে বললাম—"নিজের সাজার কথাটাও তো ভাবতে হবে; সেখানে যে আবার উকিল-ব্যারিস্টারও নিয়ে যাওয়া চলবে না।"

(দুই)

"আমরা—বাঙালী জাতটাই...!"

কী, সেটা আর প্রকাশ করে বললে না, ঘুরে একটা দারুণ অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকটা দূরেই আরও তিনজন যে জটলা করে ভিড় বাড়াচ্ছিল, তারাও সঙ্গ নিলে, সমস্ত দলটা স্টেশনের দিকে চলল। এরা তিনজন যেমন কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে ঘুরে ঘুরে দৃষ্টিপাত করছে—বুঝলাম পরিচয়টা বেশ গুছিয়েই দিয়েছে ওরা দুজনে। সমস্ত দলটার গতি যে রকম চঞ্চল তাতে এটাও বেশ আন্দাজ করা গেল যে 'বাঙালী জাতটা...' বলতে আমি একলাই; ওদের কর্মপদ্ধতি ঠিক হয়ে গেছে, একটা কিছু করবেই।

সেটা যে ড্যামেজ সুট জাতীয় কিছু নয় এগিয়েছি, খানিকটা গেছিও এমন সময় একটি ব্যাপার হলো।

অতি তুচ্ছ ব্যাপার, নিত্যই ঘটছে, তবু তাতেই হাওয়াটা হঠাৎ যেমন বদলে গেল, মনে হলো, আর না এগুলেও চলে।

ছই-দেওয়া একটি গোরুর গাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তার মধ্যে থেকে দুটি স্ত্রীলোক নেমে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠে এল। একটি বয়স্থা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ, হাতে একটি সস্তা টিনের সুটকেশ; অপরটি অল্প বয়সের, বছর কুড়ির ওপর নয়, তার হাতেও গামছায় বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি। বেশ বোঝা যায় চাষাভূষো

"একেবারে উত্তরকে দক্ষিণ করে দোব?"

সেটাও একটুখানির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাঁচজনে আলাদা আলাদা হয়ে প্ল্যাটফর্মের এখানে ওখানে পড়ল ছড়িয়ে। স্টেশনের ওদিক পর্যন্ত; তারপর দু'চারজন দু'চারজন ক'রে প্রত্যেককে কেন্দ্র ক'রেই দল পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দলের মধ্যে থেকে যে রকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে—হ্যাঁ হ্যাঁ আলবৎ!...দেখে নোব!...তাতে মনে হয় শ্রাদ্ধ অনেক দূরেই গড়াবে।

'বাঙালী জাতটা' বেশ ভীত হয়ে পড়েছি। দলগুলো পুরু হচ্ছে, ওদিককার দুটো মিলে গিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে, স্টেশনের ভেতর থেকে কর্মচারীরাও এসেছে বেরিয়ে। আর দর্শকমাত্র হয়ে চুপ ক'রে থাকা চলে না। এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবার আগে কিছু একটা করা দরকার ভেবে

ঘরের মেয়ে, সস্তা খুব রং চঙে কাপড় চোপর, সিঁথিতে প্রচুর সিঁদুর, প্রচুর তেল দিয়ে খোঁপাটি টান ক'রে বাঁধা, দুদিকে দুটি সস্তা ক্লিপ আঁটা।

বেশ কালোই, তবে চাষী গৃহস্থের প্রচুর স্বাস্থ্য রয়েছে শরীরে; আর বেশ সপ্রতিভ। পুঁটুলিটা দু'হাতে হাঁটুর কাছে ধরে রেখে দোলাতে দোলাতে বেশ খোলা নজরেই স্টেশনের দ্রষ্টব্যগুলি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

গাড়োয়ান গোরু খুলে স্টেশন ঘরের দিকে চলে গিয়েছিল। এসে বয়স্থা স্ত্রীলোকটির হাতে দুখানা টিকিট দিয়ে বললে—"কয়, গাড়ির নাকি এখনও লেট আছে, ঘণ্টা খানেক; তা রবো, না তোমরা পারবে

ব'সতে ঠিক ক'রে নিয়ে? আমি তা'হলে তাড়াতাড়ি যেয়ে উদিকটা সেরে নিতুম।"

বয়স্থা বললে—"সে ঠিক ক'রে নেবখোন; তুমি যাও গিয়ে।"

মেয়েটা বললে—"তুমি কিন্তু শীগ্গির এসবে আবার, ব'লে দিনু।"

উত্তর হলো—"তা এস্‌বো এস্‌বো। কান্নাকাটি করবি নি।"

বয়স্থা একটু হেসে উত্তর করলে—"করবে নি, তুমি যাও; ছেরকালটা যেন কান্নাকাটিই করে সবাই!!..."

লোকটা পা বাড়াতে মেয়েটি অল্প রাগে-হাসিতে বয়স্থার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে একটু চাইলে।

ঘটনা শুধু এইটুকু, এইটুকুকে যদি যায়ই ঘটনা বলা।

ওদিকে আরও কিছু নয়, বরং অত যে ঘটবার ছিল কিছুই আর ঘটল না; সমস্তটুকু আস্তে আস্তে কেমন যেন এলিয়ে গেল।

অথচ কোন রকম বেয়াদবি নয়, কিছু নয়। কেউ এক পা এগিয়েও গেল না ওদিকে, বরং যতটা সম্ভব দূরেই স'রে স'রে দাঁড়াল, এবং যতটা সম্ভব অন্যদিকে ঘুরে ঘুরেও। আলাদা আলাদা হয়েও বেশির ভাগ; কেউ বের করলে বিড়ি, কেউ প্ল্যাটফর্মের ধারে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল ঘণ্টা খানেকের লেট গাড়ি আর কত দূরে, কেউ আকাশের দিকেই রইল চেয়ে, কেউ আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল, আস্তে আস্তে তুড়ি দেওয়া থেকে মনে হলো, আস্তে আস্তে গান ধরেছে। দলটা আর দানা বাঁধতে পারলে না।

সবচেয়ে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল সুটধারীই। প্রথমটা এদিকেই নিরুদ্দেশভাবে একটু ঘোরাঘুরি করলে, তারপর এদিক ওদিক চাইতে চাইতে নিরুদ্দেশভাবেই পায়চারি করতে করতে ভ্যাজাল ছেড়ে একেবারে স্টেশনের পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু যাবার সময় কাছাকাছি একটু দাঁড়িয়ে রুপোর কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে, সেটা ধরিয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে গেল। অবশ্য, ওদিকে ঘুরেও চাইলে না, বরং লম্বা ক'রে যে ধোঁয়াটা ছাড়লে, সেটাও ছাড়লে উলটো দিকেই মুখ ক'রে।

স্টেশনের পেছনটুকু একেবারেই নিরিবিলি। ঘরের সংলগ্ন একফালি জায়গা। কষ্টে সৃষ্টে হাত ছয়েক চওড়া হবে, তবে নিরিবিলি ছাড়া ওখানে দাঁড়াবার আর একটা সঙ্গত ওজুহাত আছে, সামনে একটি ঝাঁকড়া গাছ, বেশ একটি ছায়া পড়েছে। আর, যে ভ্যাজাল একেবারেই পছন্দ করে না তার পক্ষে আর একটা সুবিধে হয়তো এই যে ওখানে দাঁড়ালে স্টেশনের সামনের দিকটা একেবারেই দেখা যায় না, অনেক দূর পর্যন্তই; এক, ওরা দুটিতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায় যদি একটু আধটু নজর পড়ে। অবশ্য আন্দাজই আমার, দূর থেকেই তো দেখছি। ও-ও ওদিকে অনেকখানি দূরেই।

সামান্য এই ব্যাপার, এইভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবে অবশ্য ঘণ্টাখানেক নয়, তিন কোয়ার্টারও নয়, টেনে-বুনে আধঘণ্টা। এক ভাব, শুধু হয়তো যে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল সে বিড়ি বের করেছে, যে বিড়ি টানছিল সে আকাশের দিকে চোখ তুলেছে। স্টেশন এক রকম শব্দহীন, শুধু ক'জন কুলি মিলে গোটাকতক মালগাড়ি নিয়ে পাশের লাইনে সাজাচ্ছে গোছাচ্ছে, মাঝে মাঝে তারই ঠোকাঠুকির যা আওয়াজ।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুঁটুলিটা দোলাচ্ছে, মাঝে মাঝে দুজনে হয়তো একটু আধটু কথা হচ্ছে।

পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্ল্যাটফর্মের শেষা-শেষি, আগে আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, প্রায় সেইখানটায়। আমি প্ল্যাট-ফর্মের সেই যে মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, চারিদিকে নজর রাখবার সুবিধে বলে আর নড়িনি। বেশ অনেকক্ষণ যখন কেটে গেছে, প্রায় আধঘণ্টার কাছাকাছি, পণ্ডিত মশাইয়ের হঠাৎ কি মনে হলো, বাইরের দিকে চেয়েই ছিলেন দাঁড়িয়ে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার দুই আমায় দেখলেন, তারপর আমার সামনে দিয়েই স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ কি ভেবে যেন আবার একটু পেছিয়ে এসে আমায় জিগ্যেস করলেন —"ইয়ে—দেশলাই আছে আপনার কাছে?

আমার হঠাৎ কি ম'নে হলো, হয়তো কিছু একটা আন্দাজ করে থাকব, বলে বসলাম —"আজ্ঞে না, দিতে পারলাম না তো।"

"তা'হলে ও'র কাছেই যেতে হলো।"

নেহাৎ সামনাসামনি পড়ে গিয়ে চক্ষু লজ্জায় প'ড়ে একটা রিস্ক নিয়েছিলেন; না পেয়ে বেশ খুশীই; হন হন ক'রে এগিয়ে গিয়ে সুটধারীর পাশে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

এই সময় উত্তর দিকে একবার চাইতে গিয়ে আমার দৃষ্টিটা এক জায়গায় আটকে গেল; লাইনটা কিছু দূর গিয়ে যেখানে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার একটু ওদিকেই গাছ-পালার মাথায় একটা যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেটা আর একটু স্পষ্ট হলো এবং তার পরেই বাঁকের মুখ থেকে একটা ইঞ্জিন বেরিয়ে এল। প্রথমটা মনে হলো মালগাড়িই, প্যাসেঞ্জারটা তো এত শীঘ্র আসবার কথা নয়, তারপর বাঁকের মুখে খানিকটা বেরিয়ে আসতেই বোঝা গেল, না, প্যাসেঞ্জারটাই।

আশ্চর্য হচ্ছি ওদের কাণ্ড দেখে, অবশ্য এমন নিরিবিলি কোণ বেছে দাঁড়িয়েছে, প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে একরকম দেখাই যায় না; তবুও তো খানিকটা আওয়াজ হলোই, গাড়ি আসার, গাড়িতে চড়ার, আর সে আওয়াজ তো মাল গাড়ির ঠোকাঠুকির আওয়াজের সঙ্গে ভুল হবার নয়।

কিন্তু ওদের একেবারেই হুঁস নেই। সুটধারী স্টেশনের উলটো দিকে মুখ ক'রে সেই রকম দাঁড়িয়ে; ডান হাতে সিগারেট, বাঁ হাতটা বুকে চেপে বিলাতী কায়দায় একটু একটু দুলছে; পণ্ডিত মশাই বিড়ি ধরিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টেনে যাচ্ছেন।

আলাপ যে হচ্ছে তার মধ্যে থেকে স্টেশনের এদিককার শব্দ ছাড়িয়ে শুনতে পাচ্ছি—উকিল...ব্যারিস্টার...হাইকোর্ট...মিনিস্টার ... ড্যামেজ...ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড!...

আলাপ প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে চাইবার সময় ঘাড়টা আর একটু বাড়িয়ে এক আধবার এদিকেও নিচ্ছে দেখে, পণ্ডিত মশাইও হয়তো ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার তখুনি ফিরে দাঁড়াচ্ছেন ওদিকে। বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

ব্যাপারটাও নিশ্চয় বিশেষ কিছু নয়। নিতান্ত হাল্কা একটু শিভ্যালরি...আমি পুরুষ, আমার এই পরিচ্ছদ, আমার এই স্টাইল, আমার এই বুলি—অন্তত এক্ষেত্রে দেখার ইচ্ছার চেয়ে দেখানর ইচ্ছাটাই প্রবল, খানিকটা শোনানও। নিতান্তই নিরীহ নির্লিপ্ত একটু শিভ্যালরি, হাল্কা অবসর বিনোদন—গাড়িটা যতক্ষণ না এসে পড়ছে।

লেট গাড়ি, মিনিট খানেকও দাঁড়াল না, বাঁশি বাজিয়ে সশব্দে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল দুজনে, সামনে পেয়ে ওদেরই জিগ্যেস করতে হলো—"কলকাতার গাড়ি বেরিয়ে গেল?"

দুদিকেরই মুখের চেহারা দেখছি, বয়স্থার চোখ দুটো কপালে উঠেছে, মেয়েটিরও যতটা সম্ভব।

"আপনেরা কোলকাতায় যাবে? ওমা! তা এতক্ষণ!!..."

এগিয়ে এসে আমায় যে প্রশ্নটা করলে তাতে একটা চাপা আক্রোশই লেগে ছিল—

"ডাউনের গাড়ি...তা একটু বলে দিতে পারলেন না?"

বললাম—"ভাবলাম ডিস্টার্ব করলে কি মনে করবেন আবার...নিরিবিলিতে সিগারেট-টুকু খাচ্ছিলেন..."

দৃষ্টিটা যে হানলে তার অর্ধেকটুকুই দেখতে পেলাম, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কি ভেবে হনহনিয়ে স্টেশনের দিকে চলল দুজনে।

সে দিন হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই, বসে বসে এক পুরনো অ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। সবই প্রায় বিদিশী বন্ধুদের ছবি। দিশী লোকরা নিজেদের ছবি তোলান খুব কম। আর তোলালেও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করেন ততোধিক কম।

আশ্চর্য! প্রথম ছবিটাই ক্যাপটেন রবার্ট...এর। আসল পদবীটা বললুম না। ক্যাপ্টেন-এর মৃত্যু একটু রহস্যময়। ডাক্তাররা অবশ্য বলেছিলেন, নার্ভাস এগ্‌জস্‌শন; ক্যাপটেন যুদ্ধক্ষেত্রে যে শেল শক্‌ খেয়েছিলেন, তারই শেষ অবস্থা। কিন্তু আমি ক্যাপ্টেন-এর মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পূর্বে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে খানিকটে সময় কাটিয়েছিলুম। সে সময় তিনি যেসব কথা আমায় বলেছিলেন, ডাক্তাররা তা শুনলে অসুখটার কি নাম দিতেন—বলা শক্ত।

সেই জন্য ক্যাপ্টেন-এর আদত নামের বদলে তাঁকে ক্যাপ্টেন গ্রীন বলে বর্ণনা করছি। গ্রীন অতি সাধারণ ইংরিজী পদবী। তার থেকে কেউ কিছু ধরতে-ছুঁতে পারবেন না। কি জানি, আমার এই লেখাটা কখন কার চোখে পড়ে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ক্যাপ্টেন-এর এক সময় বেশ নাম-ডাক ছিল। আসল নাম বললে, অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলবেন। সেটা ঠিক কাজ হবে না।

ক্যাপ্টেন গ্রীন পাক্কা লণ্ডন কক্‌নি। লণ্ডনের পথেঘাটেই মানুষ। এককালে লণ্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করে বেড়াতেন। তবে সে অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর তিনি টট্‌নহ্যাম কোর্ট রোডে এক ছোট স্টেশনারি দোকান দেন। দোকানের ঠিক মাথার উপরেই একটা ছোট্ট ঘরে বসবাস করতেন। হাতে কিছু জমতেই বিয়ে করে বসলেন। তখন পাশের আর-একটা ঘরও নিতে হয়েছিল।

রবার্ট গ্রীন-এর পড়াশুনোর বাতিক ছিল। মিউডি আর টাইমস-এর লেনডিং লাইব্রেরি থেকে হরেক রকমের বই আনিয়ে, অবসর সময়ে বসে বসে পড়তেন। এই নিয়ে মিসেস গ্রীন-এর সঙ্গে তাঁর একটু খিচ-খিচ চলত। ভর সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার বায়স্কোপ নাচগানের আড্ডা—এসব ছেড়ে, বই মুখে নিয়ে ঘরে পড়ে থাকলে কোন্ স্ত্রীই বা মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন?

বেশ সব চলছিল। এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। রবার্ট গ্রীন বইপত্তর ছুঁড়ে ফেলে, দোকানের ভার স্ত্রীর উপর চাপিয়ে প্রথম হিড়িকেই ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এই যুদ্ধেই বোঝা গিয়েছিল, লণ্ডন-কক্‌নিরা কী চিজ, তারা কোন্ ধাতুতে গড়া। ভয়ডর জানে না, কিছুতেই পেছপাও নয়, স্বচ্ছন্দে হাসি-মুখে মৃত্যুবরণ করে। অথচ, তাই নিয়ে গর্ব-বড়াই নেই। কেউ সে সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করতে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

গ্রীন যুদ্ধে অসম্ভব বীরত্ব দেখিয়ে ভি-সি পেয়ে গেলেন। ভিক্টোরিয়া ক্রশ-এর গৌরব পেলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যটি একেবারে ভেঙে গেল। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই, ভিতরে কি যেন একটা

গলদ রয়ে গেল। মাঝে মাঝে সেটা বিচিত্র-ভাবে আত্মপ্রকাশ করত। ডাক্তাররা বলতেন, শেল্ শক্-এর আফটার এফেক্ট।

ধীরে ধীরে গ্রীন ক্যাপ্টেন হলেন। শরীর জখম হলেও শেষ পর্যন্তই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে যুদ্ধ খতম হল। ১৯১৯-এর গোড়ায় ক্যাপ্টেন গ্রীন বাড়ি ফিরে এলেন। ইংরেজরা বড় মজার জাত। তাদের কাছে সৈনিকপুরুষদের আদর ততক্ষণই, যতক্ষণ না লড়াই থামছে। তারপর তুমি কার, কে তোমার। এর কারণ বোধ হয় ইংরেজরা আদবেই মিলিটারি মেজাজের লোক নয়। কাজকারবার ভালো করে চালিয়ে যেতে পারলেই তারা খুশী।

ভাগ্যিস গ্রীন-এর স্টেশনারি দোকানটা তখনো ছিল। নইলে, শুধু আর্মি পেনসন-এর উপর নির্ভর করে থাকতে হলে, তাঁর দিন চলা ভার হতো। এদিকে গ্রীন-এর মনে মনে পলিটিক্সে নামবার ভারি ইচ্ছে। পারলামেণ্টে ঢোকবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। গ্রীন বেশ বক্তৃতা দিতে পারতেন। চেষ্টা-চরিত্র করে বক্তৃতা দেওয়ার কৌশলটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। স্থানে-অস্থানে যখন-তখন বক্তৃতা দিতে দিতে ও-বিষয়ে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শেষে, নাম মনে নেই, কোন্ এক কনস্টিট্যুয়েন্সি থেকে পারলামেণ্টে রিটার্নড্ হয়ে গেলেন।

ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর সঙ্গে আমার খুব আলাপ জমে গিয়েছিল। আমি মাঝে-মাঝে তাঁকে তাতাতুম। এদেশের শিক্ষার্থীরা ওদেশে গিয়ে কেন সহজে বিলিতী ফ্যাক্টরিতে কাজ শেখবার জন্যে ঢুকতে পায় না—এই নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রীন একবার পারলামেণ্টে তুমুল বচসা লাগিয়ে দিলেন। তাতে, আশাতীত কিছু লাভ না হলেও, খানিকটা ফল যে ফলেছিল—তা মানতেই হবে।

একটু প্রতিষ্ঠা হতেই, আর তার সঙ্গে খানিকটা অর্থাগম ঘটতে ক্যাপ্টেন গ্রীন তাঁর টটনহ্যাম কোর্টের বাসাটা তুলে দিলেন। স্টেশনারির দোকানটাও উঠিয়ে দিলেন। দিয়ে, টুইক্নহ্যামে এক বাড়ি নিলেন। টুইক্নহ্যামকে লণ্ডনের শহর-তলি বলা চলে। বাড়িটা এক জমিদারের। সে-জমিদার এক-আধ পুরুষে নন, চোদ্দ পুরুষ ধরে ব্যারনেট। মহাযুদ্ধের ফলে, অনেক পুরনো বনেদী জমিদার ঘরে দুর্গতির একশেষ। ট্যাক্স দিতে দিতে প্রাণান্ত। অনেক জমিদারই ঘরবাড়ি বাগান-বাগিচা আসবাবপত্তর বেচে-বুচে খানিক টাকা সংগ্রহ করে দু-পয়সা রোজ-গারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধকালে আমাদের ব্যারনেট ক্যাপটেন গ্রীন-এর সঙ্গে এক রেজিমেণ্টে ছিলেন। দুজনের মধ্যে প্রণয়ও ঘটেছিল। ক্যাপ্টেন গ্রীন এক লড়াইএ ব্যারনেটকে গোলার মুখ থেকে টেনে বের করেছিলেন। একটু শস্তাদরেই ব্যারনেট তাঁর টুইক্নহ্যামের বাড়িটা ক্যাপ্টেন গ্রীনকে পাঁচ বছরের মেয়াদে লিজ দিয়ে দিলেন। শস্তাই হল, বলতে হয়। কারণ, ব্যারনেট তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে সেলামি আদায় করলেন না। আর, গাই-এর সঙ্গে যেমন একটা বাছুর পাওয়া যায়, তেমনি ক্যাপ্টেন গ্রীন বাড়ির সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্যে জমিদার-বাড়ির গ্লাস-প্লেট লিনেন ফারনিচর লাইব্রেরি ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গেলেন।

টুইক্নহ্যামের বাড়িটা নেবার কিছু-দিন পরেই ক্যাপ্টেন গ্রীন আমাকে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন, আমি যেন তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়ে দিন পনেরো তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে আসি। লিখেছেন : তুমি এলে আমরা সবাই খুব খুশী হব। পুনশ্চ—ড্রেস্-সুট আনবার দরকার নেই। ড্রেস্-সুটের বালাই না থাকলে, বিলেতে পাঁচ-দশ দিন লোকের বাড়ি বেড়িয়ে আসতে কোনই হ্যাংগাম নেই। গোটা ছয়েক শার্ট কলার আর রুমাল, দু-চার জোড়া মোজা, দু-তিনটে টাই, একসুট পায়জামা আর একসুট ভালো গোছের কোট-প্যাণ্ট, একটা টুথব্রাশ, এক টিউব দাঁত-মাজা চুল আঁচড়াবার চিরুনি-বুরুশ, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, একজোড়া স্লিপার ব্যাগে পুরে যাত্রা করলেই হল।

আমার হাতে তখন এমন কিছু কাজ ছিল না, যার জন্যে লণ্ডনে বসে থাকতে হবে। আর, টুইক্নহ্যাম কিই বা দূর; ট্রেনে বাসে এই আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ব্যাপার। সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সন্ধ্যের মুখে ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর বাড়ি হাজির হলুম। তখন বসন্তকাল, কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল পড়ো-পড়ো। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালাগুলোর গায়ের ধুলো-বালি ধুয়ে-মুছে গিয়ে উজ্জ্বল তাদের শ্যামশ্রী। বড্ড ভালো লাগছিল।

ওখানকার বাড়িগুলো সব ভিলা প্যাটার্নের। একটার সঙ্গে আর একটা গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে নেই। সব বাড়িতেই বেশ একটু কমপাউণ্ড আছে। বাড়িগুলো কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের। কোনোটা কাঠের, কোনোটা পাথরের, কোনোটা আবার পোড়া ইঁটের। শহরের মতো সব বাড়ি-গুলো এক ধরনের, এক মাপের নয়। কোনোটা উঁচু, কোনোটা নিচু, কোনোটা আবার মাথায় মাঝারি সাইজের।

সদর গেটটা আলগা ভেজানো ছিল। সেটা দিয়ে ঢুকে, কাঁকর বিছানো রাস্তা বেয়ে তিনধাপ পাথরের সিঁড়ি উঠে সদর দরজা। ঘণ্টা টিপতেই দরজা খুলে গেল। সামনেই প্রকাণ্ড হল। ক্যাপ্টেন গ্রীন, মিসেস গ্রীন আর তাঁদের মেয়ে এথেল সেখানে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মুখ দেখে মনে হল, আমায় আসতে দেখে তাঁরা সত্যিই খুশী। আমি একে-একে তিনজনের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলুম। ক্যাপ্টেন-এর চেহারাটা বড় শুকনো-শুকনো মনে হল। মিসেস্ গ্রীন সেই আগের মতোই মোটা-সোটা গোলগাল হাসিখুশিতে ভরা। মুখে সর্বদা খই ফুটছে। এথেল বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ভদ্রমহিলা হতে চলল। নামজাদা এক মেয়ে-স্কুলে পড়ে, গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। স্কুলে ফ্রেঞ্চ শিখছে, পিয়ানো বাজাচ্ছে, দু-একটা ওয়াটার-কলর ছবিও আঁকছে। আজকাল সে খুব ধীরে ধীরে কথা বলে, পাছে পূর্ব-সংস্কারবশত কক্‌নি ভাষা মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে পড়ে। তার মা হ্যাটকে অ্যাট বললে, কি হেয়ারকে এয়ার বললে, মার মুখের দিকে একদৃষ্টে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে।

হল্-এর ঠিক মাঝখান দিয়ে একজোড়া কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির কি কারুকার্য! দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে তারিফ করতে হয়। হল্-এ আলো জ্বলছে, তবুও যেন কিরকম অন্ধকার-অন্ধকার। ভালো করে চেয়ে দেখি, সমস্ত দেওয়ালগুলো আর ওপরের সিলিংএ কাঠের প্যানেল করা। সে কাঠের রং এক সময় কি ছিল, বলা যায় না; কিন্তু এখন একেবারে কুচ-কুচে কালো। তার উপর দেওয়ালের যেখানে যেটুকু ফাঁক-ফোঁক আছে, সমস্তই কালো-কালো পুরনো ঢাল-তলোয়ারে ভর্তি। অন্ধকার হবেই তো।

ক্যাপ্টেন গ্রীন বললেন, চল চ্যাটার্জি, তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে আনি। সুট-কেশটা মাটিতে নামিয়ে রেখেছিলুম, উঠিয়ে নিলুম। ক্যাপ্টেন-এর পিছু-পিছু সিঁড়ি বেয়ে চললুম। যখন প্রায় দেড়তলার ল্যানডিং-এর কাছ বরাবর পৌঁচেছি, তখন দেখি, সামনের দেওয়ালে সাত ফুট লম্বা এক প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো। গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো এক বিরাট মানুষের মূর্তি। তিনি কোন্ যুগের মানুষ, বুঝতে পারলুম না। ইংরিজী পোষাকতত্ত্বে আমার এমন অধিকার নেই যে, বলে দিতে পারি, তিনি কুইন এলিজাবেথের আমলের কি কুইন অ্যান-এর আমলের লোক। তবে কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলের লোক যে নন, তা বলতে পারি। ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর বন্ধু ব্যারনেট-এরই কোনো পূর্বপিতামহ হবেন।

হঠাৎ মানুষটার চোখের উপর আমার চোখ পড়ায় ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে

উঠল। সুটকেশটা অসাড়ে হাত থেকে খসে পড়ে গেল। স্পষ্ট মনে হল, লোকটার আমার উপর বিষম রাগ। যেন বলতে চায়, তুই বেটা ঐ ব্যাগের মতো গ্রে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার্স আর ঐ অদ্ভুত ছিটের টুইড কোট পরে কি সাহসে এই জমিদারবাড়ি ঢুকেছিস? কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? একটু সমীহ নেই? একেবারে অনধিকার প্রবেশ? আমি ঘামতে লাগলুম।

ক্যাপটেন গ্রীন আমার সুটকেশটা তুলে নিলেন। আমার অবস্থা দেখে বললেন, আমারও মাঝে মাঝে ঐরকম হয়। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝলুম না। ক্যাপ্টেনএর এক হাতে আমার সুটকেশ, আর এক হাত খালি। খালি হাতটায় আমায় বগলদাবা করে বললেন, চল। আমি চোখ বুজে জায়গাটা পার হলুম। এমনি ভয়।

উপরে উঠে, আমার ঘর দেখে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম। একেবারে হাল-ফ্যাশনের সাজসজ্জা। ফিকে নীল রঙের ওয়লপেপারে দেওয়াল মোড়া। ঘোর নীল রঙের পুরু কার্পেট কাঠের মেজেয় পাতা। খাট-বিছানা, চেস্ট অভ ড্রয়ার্স, টেবিল-চেয়ার, ড্রেসিং টেবল, চামড়ার আর্মচেয়ার—সবই একালের জানা জিনিস। কেবল ফায়ার প্লেস আর তার উপরের ম্যান্টেলপিসটা বাড়িরই মতো পুরনো। তা হোক, কিন্তু ভারি সুন্দর জিনিস। ওদের সঙ্গে নতুন ঝকঝকে পেতলের হাতা-চিমটে পোকার একবারেই মানাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন গ্রীন বুঝিয়ে দিলেন, বাড়ির এদিকটা হালে তৈরি।

ক্যাপ্টেন গ্রীন আমার সুটকেশটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিলেন। তারপর কোথা থেকে চট্ করে আনকোরা নতুন এক শিশি স্মেলিং-সল্ট এনে হাজির করলেন। তিনি কি করে জানলেন জানিনে, আমার মাথাটা বড্ড ধরে উঠেছে। গ্রীন চলে যেতে আমি সুটকেশ থেকে কাপড়চোপড় বের করে চেস্ট অভ ড্রয়ার্সে সাজিয়ে রাখলুম। পায়জামা সুট বের করে খাটের উপর বালিশের নীচে গুঁজে দিলুম। টুকিটাকি জিনিসগুলো ড্রেসিং টেবিলের উপর সাজালুম। তারপর বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলুম, আমি তো আইন-পড়িয়ে মাথা-ঠাণ্ডাওয়ালা লোক। একটা ছবি দেখে এমনধারা কেন হল? এখনো একলা থাকতে গা ছমছম করেছে। ভেবে কূলকিনারা পেলুম না।

গং বেজে উঠল। কাপড় ছাড়তে যাবার ঘণ্টা। চানের ঘর পাশেই। সেখানে গিয়ে প্রথম মাথাটা বেশ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিলুম। বড় আরাম হল। তারপর ড্রয়ার থেকে ডার্ক
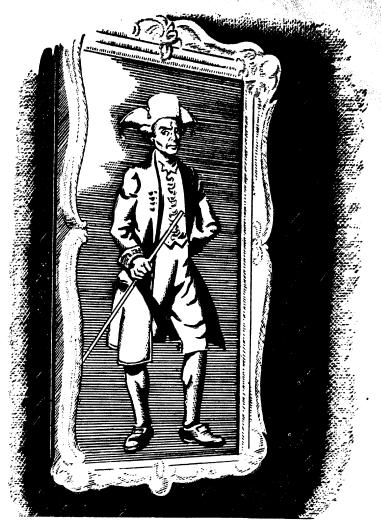
সাত ফুট লম্বা এক প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো

ব্লুভি-রু সুটটা বের করে পরলুম। জুতো জোড়াটার ধুলো ঝেড়ে ভেলভেটের প্যাডটা তার উপর বারকয়েক বুলিয়ে নিলুম। আবার গং বাজল। এটা ডিনার বেল্, অর্থাৎ আহার প্রস্তুত। ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখি, করিডরে ক্যাপ্টেন গ্রীন দাঁড়িয়ে। বুঝলুম, আবার সেই ছবি পেরুতে হবে। তিনি আমার সঙ্গে থাকতে চান না, পাছে কোন অঘটন ঘটে।

মিসেস গ্রীন আর এথেলও তাঁদের ঘর থেকে বেরুলেন; তাঁদের আগে যেতে পথ ছেড়ে দিলুম। দেখলুম, তাঁরা দিব্যি সহজেই ছবিটা পার হয়ে গেলেন, কোন-রকম চাঞ্চল্য নেই। আমারই এত ভয় কেন? ভাবলুম, চেষ্টা করে দেখি, আমিও ভয় তাড়াতে পারি কি না। কিন্তু ছবির কাছে আসবার আগেই ক্যাপ্টেন গ্রীন আমার হাত ধরেছেন। আপনা হতেই চোখ বুজে এল। গা সিরসির করে উঠল। চোখ খুলতে দেখি, একতলায় পৌঁছে গেছি। একতলাতেই ডাইনিং-রুম।

এরকম অদ্ভুত ডাইনিং-রুম ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখি নি। এর পরেও না। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া এক প্রকাণ্ড হল। তার একদিকটায় আলো আর এক-দিক আবছা অন্ধকার। যে-দিকটায় অন্ধকার, সেদিকে এক মস্ত বড় ডাইনিং টেবিল শূন্য পড়ে আছে। তার চারধারে অন্ততপক্ষে একশো চেয়ার। পুরু চামড়ার গদি-আঁটা, চেয়ারের পিঠে ব্যারনেটদের কোট্ অভ আরমস সোনার জলে নক্সাকাটা। যে-দিকে আলো, সেদিকে একটা ছোট গোল টেবিলে চারজনের জায়গা করা। গেলাশ পেলেট ছুরি-কাঁটা-চামচ সাজানো। গোল টেবিলের মাথায় বসলেন ক্যাপ্টেন গ্রীন। তাঁর উল্টোদিকে মুখোমুখি

মিসেস গ্রীন। তাঁদের এক পাশে এথেল আর একপাশে আমি। মিসেস গ্রীন অনর্গল কথা বলে চলেছেন, এথেল মাঝে মাঝে দু-একটা, আর আমি হুঁ-হাঁ করে কথা কাটিয়ে দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন গ্রীন একেবারে চুপ। একমনে খেয়ে চলেছেন। কিছুই যেন জমতে চাচ্ছে না। সবই কেমন খাপ-ছাড়া খাপছাড়া ভাব। কি একটা অনির্দিষ্ট অদৃশ্য বাধা সবতাতেই এসে পড়ছে।

কোনোরকমে খাওয়া শেষ হল। বিলিতী কেতা অনুসারে মিসেস গ্রীন আর এথেল আমাদের ছেড়ে ড্রয়িং-রুমে চলে গেলেন। এই সময়টা পুরুষদের মদ খাবার সময়। মুখ আলগা করে খানিকক্ষণ খিস্তির ইয়ারকিও ঐ সময় দেওয়া চলে। আমি মদ খাইনে, দু-একটা বাদাম-আখরোট ক্র্যাকারে ভেঙে মুখে পুরছিলুম। ক্যাপ্টেন গ্রীন ব্যারনেটদের মনোগ্রাম খোদাই করা কাট্-গ্লাসের ভিনিশিয়ন গেলাশে পোর্ট ঢাললেন। কিন্তু যেই মুখে তুলবেন, ওমনি অমন সুন্দর গেলাশটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার। তাকিয়ে দেখি, ক্যাপ্টেন গ্রীন ডাইনিংরুমের অন্ধকার দিকটায় একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

ক্যাপ্টেন-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও ঐ অন্ধকার অংশের দিকটায় তাকালুম। প্রথম দু-এক মিনিট কিছুই দেখতে পাই নে। তারপর তাকাতে তাকাতে অন্ধকারটা যখন চোখ-সহা হয়ে এল, তখন দেখি সেখানের দেওয়ালেও একটা প্রকাণ্ড ছবি ঝোলানো। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংএর দেওয়ালের মতো অত বড় না হলেও প্রমাণসই। ইনিও বোধ হয় ব্যারনেটের পূর্বপুরুষদের আর একজন হবেন। অন্ধকারে তাঁর চেহারাটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে যেন আগুন হানছে। আগুনের ফিনকি ছিটিয়ে চোখদুটো যেন বলতে চায়, আস্পর্ধা তো কম নয়? আমার সাধের ভিনিশিয়ন গেলাশে তোদের ঐ পচা মদ ঢেলে খাওয়া হচ্ছে? কোথাকার বেল্লিক!

কাঁচ-ভাঙার শব্দে মিসেস গ্রীন ড্রয়িং-রুম থেকে দৌড়ে এলেন। একবার আড়-চোখে ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর দিকে চাইলেন, তারপর আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, কিছু মনে কোরো না মিস্টার চ্যাটার্জী। শেল্ শক্-এর ফল। এখানে আসা অবধি ক্যাপ্টেন-এর ঐরকম একটা না একটা কিছু হচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে বলছি, উনি কিছুতেই দেখাবেন না। শেল্ শক? হবেও বা।

ক্যাপ্টেন গ্রীন তখনো সেই অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মিসেস গ্রীন তাড়াতাড়ি একটা কাঁচের কুঁজো থেকে, তারই মাথায় ঢাকা দেওয়া সাদামাটা এক গেলাশে একটু জল গড়িয়ে ক্যাপটেনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, খাও। ক্যাপ্টেন কলের পুতুলের মতো সেটা এক ঢোঁকে গিলে ফেললেন। জল খেয়ে, ক্যাপ্টেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তার মুখে আবার রক্তের আভা ফিরে এল। লজ্জিত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মিসেস গ্রীন-এর পিছন পিছন আমরা ড্রয়িংরুমে এলুম। ক্যাপ্টেন-এর জন্যে এক পাত্র কড়া কফি আনানো হল। দুধ-চিনির বদলে তাতে দু-এক চামচ পুরনো ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপটেন সেটা শেষ করলেন। তাতে আরো একটু তাজা হলেন, দেখলুম। এথেল আপন মনে তার পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। এদিকে তার দৃকপাত নেই। আমার মনে কত কথা কেবলি তোলপাড় করছে— ক্যাপ্টেন না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে শেল্ শক্ খেয়েছেন, কিন্তু আমার কি হল। ম্যাপে-ল্যানে ছাড়া কোনো যুদ্ধক্ষেত্র তো চোখেও দেখি নি, আমার কেন এমনধারা অসোয়াস্তি?

হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হল। সামনে চেয়ে দেখি, এথেল-এর বাজনা থেমে গেছে। এথেল আর তার মা একবার পিয়ানোর ডালা খুলে দেখছেন, আর একবার তার পিছন থেকে ধাক্কা মারছেন, আবার একবার তার দুপাশে টোকা মেরে দেখছেন। পিয়ানো বাজতে বাজতে হঠাৎ যে থেমে গেছে, আর বাজে না। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে এগিয়ে গেলুম। ওরে বাবা! আবার যে আর একটা ব্যারনেট। সামনের দেওয়ালের ছবির থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। এথেলএর উপরই তার যত আক্রোশ। কিন্তু এথেল-এর মনে কোন ছাপ পড়ল না। কেবল আমারই কেমন মনে হতে লাগল, ছবির ব্যারনেট এথেলের উদ্দেশে বলছে, তুই ছুঁড়ি তো আচ্ছা বেয়াদব! তুই আমাদের এই সাতপুরুষের ড্রয়িংরুমে মিউজিক-হল্-এর ঠুনকো ঠুংরির গৎ বাজাতে একটুও দ্বিধা-সঙ্কোচ করলি নে? বেয়াকুব বেআক্কেলে কোথাকার? নিজের চেয়ারে ফিরে এলুম। পাশেই ক্যাপ্টেন গ্রীন। তাঁর মুখ থেকে এক অস্ফুট আওয়াজ বেরুলো—হুঁ!

না, আর পারা যায় না। শুতে যাওয়াই ভালো। কিন্তু আজ রাত্তিরে ঘুমের দফা গয়া। একটা বই সঙ্গে রাখা বুদ্ধির কাজ হবে। ড্রয়িং রুমের পাশেই লাইব্রেরি। পা টিপে টিপে সেখানে ঢুকলুম। বই ঘাঁটতে আমার সবসময়েই আনন্দ। ছেলে-বয়েসে ও বিষয়ে আরো উৎসাহ ছিল। বাপরে বাপ! কি দেওয়াল-ঠাসা বই! ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত শেল্ফ উঠে গেছে। একটিও কিন্তু এ কালের বই নয়। একদিকে কেবল গ্রীক ল্যাটিন। আর একদিকে ইংরিজী ক্ল্যাসিক্স। অন্য দুদিকে পাঁচমিশুলি-ইতিহাস ভূগোল দর্শন ভ্রমণ-কাহিনী জীবনচরিত যুদ্ধবিদ্যা ব্ল্যাক-আর্টস— কিছুই বাদ নেই। আর বাইব্‌লই কত রকমের। বড় মেঝো ছোট। এ তোমার কাপড়ে রেক্সিনে কি বোর্ডে বাঁধানো ডাসট-জ্যাকেট পরানো ফঙ্গবেনে কেতাব নয়। রীতিমতো ব্রাউন চামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নক্সাকাটা সোনার জলে নাম লেখা ভারি-ভারি চৌকো টালির মতো বই।

ইংরেজদের একটা মহা সদ্‌গুণ, তারা সদাসর্বদা অতিথির পিছনে লেগে থাকে না। একা একা বই-এর নাম পড়তে পড়তেই খানিক সময় কেটে গেল। কিন্তু ঘুম তাড়াবার মতো একটা বইও চোখে পড়ল না। অর্থাৎ সেল্ফে একটাও ডিটেক্টিভ উপন্যাস দেখতে পেলুম না। বানিয়ন-এর পিল্‌গ্রিমস প্রোগ্রেস বইটা সেল্ফে আছে দেখলুম। ওটা আমার পরিচিত বই। ওইটেই নেব বলে স্থির করলুম। মধুর অভাবে গুড় দিয়েই কাজ সারতে হবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! বইটা শেল্ফ থেকে টেনে বের করতেই কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি উল্টো টান দিয়ে সেটাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করলে। টানা-টানিতে বইটা ধপ করে মেজের উপর পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ তুলতে দেখলুম, দুটো সেল্ফের মাঝখানের একটু ফাঁকে আর এক ব্যারনেট। তার মুখে কি ক্রূর হাসি! এ-কি বাড়িরে বাবা। কোথাও কি একটুকুও শান্তি নেই? চোদ্দপুরুষ ব্যারনেটেরা সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে।

বইটা আমার হাত থেকে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়েছিল। এক জায়গায় পাতা খোলা। খোলা পাতার দুদিকেই নানা-রকমের দৈত্যদানার ছবি এনগ্রেভ করা। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হল, দৈত্য-দানাগুলো মূর্তি ধারণ করে আমায় ঘিরে ফেলছে। ব্যস, আর কিছু জানি না......

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, আমি উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে। কোট-কলার-জুতো খুলে নেওয়া হয়েছে। মুখে বিস্বাদ ব্র্যাণ্ডির জ্বালা। আমার খাট ঘিরে ক্যাপ্টেন গ্রীন, মিসেস গ্রীন আর এথেল। তাঁদের যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। ক্যাপ্টেন গ্রীন জিজ্ঞেস করলেন, চ্যাটার্জি কেমন বোধ হচ্ছে? কথার ভাবে মনে হল, তিনি কিছু একটা অনুমান করেছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দিলেন না। কি জানি কেন আমি সত্যিই বেশ স্ফূর্তিবোধ করছিলুম। ব্র্যাণ্ডির প্রভাবে

কি? আমি বললুম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি বেশ ভালোই বোধ করছি। গ্রীনরা চলে গেলেন।

আমি বুঝলুম, ঘুমের চেষ্টা বৃথা। মাথার কাছের সবুজ শেড্ দেওয়া রিডিং ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই খুললুম। ক্যাপ্টেন গ্রীন ওপন্‌হায়মের লেখা একটা নতুন নভেল রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওপন্‌হায়মের নভেলেও বেশীক্ষণ মন বসাতে পারলুম না। সারা সন্ধ্যেবেলার ঘটনাগুলো মনের মধ্যে তুলকালাম করে বেড়াতে লাগল। যদিও হালফ্যাশানে সাজানো বেডরুমে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের নীচে শুয়ে শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাস্যকর বলে মনে হতে লাগল, তবুও ব্যারনেটের এই চোদ্দ পুরুষের বাড়িতে আর একদিনও থাকতে ভরসা হল না।

কি করে ভদ্রতা রক্ষা করে গ্রীনদের কাছ থেকে বিদায় নেব ভাবছি, এমন সময় দরজায় টোকা মেরে প্রবেশ করলেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন গ্রীন। আমায় জেগে থাকতে দেখে তিনি একটু মৃদু অনুযোগ করলেন। আমি আমতা-আমতা করে বললুম, লন্ডনে আমার এক বিশেষ জরুরী কাজ আছে। সেটার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ এখন মনে পড়ল। আমি ভোরের প্রথম গাড়িতেই লন্ডনে ফিরে যাব, ভাবছি। মিসেস গ্রীনকে আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা জানাবেন। ক্যাপ্টেন গ্রীন কিছু বললেন না। শুধু তাঁর একটা হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন; ভাবটা, আমি সব বুঝেছি। ক্ষমা প্রার্থনার কোন দরকার নেই।

খানিকক্ষণ চুপচাপে কেটে গেল। ক্যাপ্টেন গ্রীন বললেন, ভোর পাঁচটাতেই একটা গাড়ি আছে। আমি তোমায় তাতে তুলে দিয়ে আসব। তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে হাউস অভ্ কমন্স-এ দেখা কোরো। ক্যাপ্টেন-এর মুখ বড়ই বিষণ্ণ। পাঁচটার গাড়িই ধরলুম। গাড়ি ছাড়বার উইসল্ পড়তে ক্যাপ্টেন আমার হাত টেনে নিয়ে শেক্‌হ্যান্ড করলেন। স্পর্শে প্রাণভরা স্নেহের আভাস।

ট্যুইক্‌নহ্যাম থেকে ফিরে আসার সাতদিন পরে একদিন সকালবেলায় টাইমস্ কাগজে পড়লুমঃ গত রাত্রে হাউস অভ কমন্সএ বক্তৃতা দিতে দিতে ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্রীন ভি-সি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনি এখন চিকিৎসার্থে কিং এডওয়ার্ডস হাসপাতালে আছেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, ক্যাপ্টেন গ্রীন সোম্‌সএর যুদ্ধে আহত হন এবং শেল্‌-শক্‌এ তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

পরদিন হাসপাতালের সুপারিন্টেন্‌ডেন্টএর কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেনঃ সুবিধামতো যে কোনো সময়ে আপনি ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্রীন-এর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলে তিনি সুখী হবেন। চিঠি পেয়ে তখুনি গেলুম। এক হাতে কিছু ফুল, আর এক হাতে কিছু কালো আঙুর নিয়ে। ক্যাপ্টেন-এর ক্যাবিনে ঢুকে দেখি, তিনি মুড়ি-সুড়ি দিয়ে শুয়ে। এক ফিট্‌ফাট ধোপদোরস্ত নার্স একধারে এক চেয়ারে বসে কি একটা বই পড়ছে। আমায় দেখে, দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত থেকে ফুল আর আঙুর নামিয়ে নিল। তারপর চুপি চুপি আমায় বললে, ক্যাপ্টেনকে বেশীক্ষণ বকাবেন না যেন। আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি, ঠিক পনেরো মিনিট পর ফিরে আসব।

নার্সের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে ক্যাপ্টেন আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি চেয়ারটা তাঁর খাটের কাছে টেনে এনে বসলুম। এই সাতদিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন-এর কি চেহারা হয়েছে। অমন সুস্থ-সবল জোয়ান সুশ্রী চেহারার লোকের এই চেহারা! সেই চেহারার উপর মৃত্যুর আঙুলের যেন ছাপ দেখতে পেলুম।

ক্যাপ্টেন গ্রীন অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, দেখ চ্যাটার্জী, ডাক্তাররা সবাই ধরে নিয়েছেন, আমার অসুখটা সেই পুরনো শেল্‌-শক্‌-এর দরুন। কিন্তু আমি জানি, আমার অসুখটার সত্যি কারণ কি! কিন্তু সেটা আমি আমার দেশের কোনো ব্যক্তিকেই খুলে বলতে পারছি নে। শুনলেই ওরা হয় হেসে উঠবে, নয় ভাববে শেল্‌-শকএ আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি।

একটু থেমে দম নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রীন বলে চললেন, চ্যাটার্জি, তুমি ভারতবর্ষের লোক, তুমি ঠিক বুঝবে। তাই, একমাত্র তোমায় খুলে বলছি। তোমরা এসব অনেক দেখেছ, অনেক শুনেছ। তোমরা আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবে না কিংবা আমাকে পাগল ভাববে না। শেল্ শক্-টক্ ওসব কিছু নয়। আমার অসুখ আরম্ভ ট্যুইক্‌নহ্যামের ঐ বাড়ি নেওয়ার থেকে। ঐ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার প্রস্তাব আমার স্ত্রীর কাছে অনেকবার করি। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বলেন, যুদ্ধের পর মনোমতো ভালো বাড়ি পাওয়া এক বিষম দায়। ভালো বাড়ি যখন একবার পাওয়া গেছে তখন এখান থেকে আর কিছুতেই নড়ছি নে।

আমি কেন যে ঐ বাড়ি ছেড়ে যেতে চাই, তার সঠিক কারণটা তাঁকে অবশ্য খুলে বলতে পারলুম না। কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকল। এর পর আমি বলেছিলুম, ব্যারনেটদের যত সব ছবি আছে, সেসব একত্র করে একটা ওয়্যার-হাউসের গুদোমে রেখে দেওয়া যাক। তাতেও মিসেস গ্রীন-এর আপত্তি। বললেন, ওই ছবিগুলোই তো বাড়ির আসল শোভা। ছবিগুলো না থাকলে বাড়ি একেবারে ন্যাড়া-ন্যাড়া হয়ে যাবে। আমার স্ত্রীর আর মেয়ের কাছে ঐ ছবিগুলো আর পাঁচটা ছবির মতো। ওদের যত উপদ্রব আমার উপর। তোমারও উপর মন্দ নয়।

ছবির কথা শুনে আমার গা শিউরে উঠল। ক্যাপ্টেন গ্রীন একটু জল খেয়ে নিলেন। তারপর আবার শুরু করলেনঃ ঐ ছবিগুলোতে কি যাদু আছে, তা আমি এখনো ঠিক বের করতে পারি নি। তুমি হয়তো পেরেছ। কিন্তু ছবির ঐ মরা ব্যারনেটগুলো আমার কাছে একেবারে জলজ্যান্ত। তাঁরা সর্বদাই আমার উপর দৃষ্টি দিয়ে আছেন। যেন নিজেরই বাড়িতে আমি একদল স্পাই পুষে রেখেছি। কী যন্ত্রণা। তাঁরা কখনো বিদ্রূপ করছেন, কখনো রাগ করছেন, কখনো বা যেন তেড়ে মারতে আসছেন। তোমাকে বলব কি চ্যাটার্জি, তুমি চলে যাবার পর ছ'-রাত্তির আমি চোখের পাতা দুটো এক করতে পারি নি। মনে হল ভিতর থেকে যেন সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। দেখছ তো এই অবস্থা। একটু সেরে উঠলেই সুইট্‌জারল্যান্ডে বেশ দিনকতকের জন্যে সরে পড়ব......

নার্স ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই মুখের উপর এক আঙুল রেখে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন গ্রীন চুপ করে গেলেন। আমি উঠলুম।

সেরে আর উঠতে হল না। তিনদিন পরে সকালবেলায় টাইম্‌সএর অবিচুয়ারি কলম-এ পড়লুমঃ কাল সন্ধ্যে সাতটায় ক্যাপ্টেন গ্রীন কিং এডওয়ার্ডস হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বিকেলে কেন্‌সল গ্রীন সেমেট্রিতে তাঁর সমাধি হবে।

বাড়ির কাছেই জন্ বারকারের মস্ত স্টোর। সেখান থেকে একটা কালো রঙের টাই কিনলুম। টুপির চারধারে কালো ক্রেপের ব্যান্ড লাগিয়ে নিলুম। বাড়ির মোড়ের রাস্তায় ৯নং বাস ধরলুম। ৯নং বাস সোজা কেন্‌সল রাইস্ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে সেমেট্রি দু মিনিটের পথ।

আমি যখন সেমেট্রিতে পৌঁছলুম, তখন পাদরি-সাহেব ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছেনঃ ধুলোমাটির এই নশ্বর দেহ পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই ফিরে যাচ্ছে।

টুপি হাতে করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পুরানো দিনের কথা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

লপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বোদা বন্দর। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে শীর্ণ-তোয়া পাথরাজ নদী। রাজকীয় মহিমা কিছুই নেই। বর্ষাকাল ছাড়া সব সময় হাঁটুজলও থাকে না। প্রাচীনেরা বলতেন, এককালে ঐ নদীতে করতোয়া আতরাই হয়ে কিস্তী-নৌকা যাতায়াত করতো। তাই বন্দর নামটা রয়ে গেছে। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে এর নাম নগরকুমারী। এখান থেকে দশ মাইল পূর্বে করতোয়ার পূর্ব তীরে একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ দেবী-ভ্রামরী—চলতি নাম বোদেশ্বরী। তাঁর নামেই বোদা হয়েছে। বৌদ্ধযুগ ও পাল নরপতিদের অনেক কীর্তি চারদিকে ছড়ান রয়েছে, হয়তো মহাযানীয় বৌদ্ধদের বোধেশ্বরীর অপভ্রংশে বোদা নাম হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে বোদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। থানা, সবরেজেস্ট্রী আপিস, পোস্টাপিস, কোচবিহার রাজ-কাছারী, গোবিন্দজী ও মদনমোহনের মন্দির, জিলা বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়, মাইনর স্কুল, দোকান-পশার, আড়তদার এবং সপ্তাহে দুবার হাট এই নিয়ে গ্রামখানি জমজমাট ছিল। কয়েক ঘর সচ্ছল জোতদার ব্যবসায়ী ও চাকুরে এই নিয়ে ভদ্রসমাজ। অধিকাংশই পূর্ববঙ্গীয়, পরস্পরের বাস্তুকে এঁরা বাসা বলতেন, বাড়ি বলতেন না। পার্শ্ববর্তী দুএকখানা গ্রামে সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী মুসলমান এবং রাজবংশী জোত-দারও ছিলেন। এই নিয়ে ছিল সেখানকার ভদ্রসমাজ। অন্যান্য বৃত্তিজীবী এবং কৃষি-জীবীরাও ছিল। ভদ্রসমাজের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ—এঁরাই ছিলেন বৃটিশ রাজমহিমার বাস্তবমূর্তি। সাধারণ লোক এই "ভাটিয়া" বা বাঙ্গালদের প্রীতির চোখে দেখতো না, সমীহ করতো। রাজ-কাছারীতে বা থানায় এদের প্রতি অভদ্র ও রূঢ় ব্যবহার করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অভিমানী অপমানিত কৃষকের অশ্রু-ছলছল নতমুখ দেখে, আমার শিশুমন বেদনায় ভরে উঠতো। কিন্তু সমাজের এই কাঠামোটাকে আমরা সে বয়সে সহজভাবেই মনে নিতাম।

গ্রামখানি সুন্দরই ছিল। শীতকালের নির্মেঘ আকাশের উত্তর প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারমৌলী শিখরমালা প্রদীপ্ত রবিকরে অপরূপ হয়ে শোভা পেত। বসন্তে নাগ-কেশর ফুলের গাছগুলি অজস্র মৌমাছির কলগুঞ্জনে সংগীতময় হয়ে উঠতো। কিন্তু সবচেয়ে সেরা হল বর্ষাকাল—বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল তো এক নাগাড়ে চলো সাতদিন দশ দিন। বর্ষার পর অতি ক্ষণস্থায়ী শরৎকাল—তার পর সুরু হত শীত। শরৎকাল রূপে রূপে অপরূপ। দিগন্ত থেকে দিগন্ত প্রসারিত সবুজ ধানের ক্ষেত, বৃহৎ, প্রাচীন দীঘিগুলিতে প্রস্ফুটিত অজস্র পদ্মের শোভা, আকাশে পালে পালে হংসবলাকা—সব নিয়ে এক মোহময় পরিবেশ স্মরণ করিয়ে দিত পুজো আসছে। দীর্ঘ ছুটির আর পুজোর আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভের আশায় আমাদের কিশোর মন উত্তেজিত হয়ে উঠতো। বড় হয়ে দেখেছি, জেলখানা থেকে মুক্তির দিন যখন নিকটবর্তী হত, মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠতো—সময় যেন সীসার তালের মত ভারি হয়ে বুকে চেপে বসতো। ঠিক তেমনি-ভাবে কলকাতার স্কুল-কারাগার থেকে গ্রামে ফেরার দিন গুণতাম, ভাইবোন প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়তো, পড়ায় মন বসতো না।

বার মাসে তের পার্বণ—তার মধ্যে পুজো আর দোল প্রধান। দুর্গাপুজো বাঙালীর সর্ববৃহৎ সামাজিক উৎসব। সম্বৎসর পরে গৃহপ্রত্যাগত চাকুরীয়া ও ছাত্রসমাজের বৃহৎ আনন্দ সম্মেলন। গ্রামে তিন চারখানা পুজো হত। রাজসরকারের পুজোই প্রধান—পাঁঠা আর মহিষ বলির রক্তে মণ্ডপপ্রাঙ্গণ লাল হয়ে যেত। রাতে হত যাত্রাগান। এই দুটোই ছিল পুজোর প্রধান অঙ্গ। দেখেছি, বলির সময় বৈষ্ণবঘরের ছেলেরা দূরে চলে যেতো, অসহায় পশুর মরণাহত আর্তনাদ শুনে তাদের চোখ ছলছল করতো। আমাদের কিন্তু অমন হত না। এরই নাম সংস্কার। মহিষ বলির দিন পুজোপ্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। তিন তিনটা বলি হবার পর—জনতা ঝাঁপিয়ে পড়তো উষ্ণ রক্তধারার ওপর। ওদের ধারণা ঐ রক্ত পায়ে মাখলে বর্ষার হাজা ও পাকুই সারে।

সেবার গ্রামে ফিরে দেখি, একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভদ্রসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে—রাজভক্ত আর স্বদেশী। রাজ-কাছারীর কর্তা স্বদেশী দলে, তাই দেবীর অঙ্গ থেকে ঝলমলে ডাকের সাজ অন্তর্হিত হয়েছে। মুকুট, আঁচলা, গহনা সবই রং-করা মাটির। রাজভক্ত মহল আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, সত্য দারোগা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বাজারে বিলাতী নুনের পাশে মলিন করকচের স্তূপ। সস্তা জার্মানী ও জাপানী খেলনা মনিহারীর অভাব নেই—সাদা জাভা চিনিও আছে। বয়কট ও স্বদেশীর বাণী হ'ল—নুন, চিনি ও কাপড়। কাপড় নিয়েই হ'ল সমস্যা। মাঞ্চেস্টারের ধুতি শাড়ি অঢেল, কিন্তু দিশী কাপড়? স্বদেশীরা দলে ভারী নয়, তবু কাছারীর কর্তা তম্বির করে দুচার গাঁট বোম্বাইএর ধুতি এনে-ছিলেন। তার না আছে পাড়ের বাহার, না আছে ছিলা, এক এক হাত অন্তর এক এক রকম বুনানী, কোন কোন স্থানে ৪।৫ আঙুল পড়েনের সুতোই নেই,—তার ওপর মোটা ও কোরা। ছেলেদের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। বাঁচোয়া ছিল, বিলিতী সুতোয় বোনা তাঁতের কাপড় বয়কট হয়নি। অবশ্য মাঞ্চেস্টারের ঠেলায় তাঁতীরা সুতো নাতা গুটিয়েই ফেলেছিল, ভদ্রসমাজের স্বদেশী আন্দোলনে তাঁতীরা বাঁচলো। শিমলাই নীলরঙের ধুতি উড়নী এবং কিছু বোম্বাই পট্টবাস দিয়ে স্বদেশীরা পুজোর নববস্ত্রের সমস্যা মেটালেন। কিন্তু রাজ-ভক্তরাই দলে ভারী, তাদের ঠেকান গেল না। আমাদের স্বদেশী দলের কয়েক ঘরের মেয়েরা বেনারসী, মুর্শিদাবাদী রেশম এবং মোটা লাল কাল সাদাসিদে পাড়ের তাঁতের শাড়িতে সন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু কল্কাদার কস্তাপাড় অথবা রকমারী রংএর বাহার দেওয়া পাছা-পেড়ে শাড়ির প্রলোভন ঠেকান গেল না। এ নিয়ে দলাদলি মনকষাকষি এমনকি নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের হৃদ্যতাও কমে গেল। অতি ছোট ভদ্রসমাজের যখন এই অবস্থা, আমরা ছেলের দল রায়বাড়ির মেজকাকার নেতৃত্বে নূতন উন্মাদনায় জাতীয় ভাবের আসব পান করছি। কিন্তু মুসলমান ও রাজবংশীরা আমাদের কথা শুনলো না। ভদ্রসমাজেও দলাদলি।

তবু ছাত্রের দল পুজোর ঢং বদলে দিল। বিশ্বজননী দেশজননী হয়ে দেখা দিলেন। বৈরাগী বাউলের আগমনীর গান আর পুরাতন ভক্তির গান ছাপিয়ে উঠলো তরুণ-দের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত। ভারতমাতা ও বঙ্গমাতার স্তবগীতি লোকসাধারণও অবাক হয়ে শুনতে লাগলো—বন্দে মাতরম্ মন্ত্রটি এক নূতনভাবে ভরে উঠলো। এমনকি নদে জেলার যাত্রার দলের ছেলেরাও স্বদেশী গান গেয়ে আসর জমিয়ে তুললো।

মেজকাকা আমাদের হিরো। গোলামখানা ছেড়ে মাণিকতলার জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ

গিরিকন্যা

আলোকচিত্রী—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

করেছেন। তার ঘরে বৈষ্ণবের অষ্টপ্রহরীর মত স্বদেশী আন্দোলনের কীর্তন চলেছে। আমিও কলকাতায় সুরেন বাড়ুজ্যে, বিপিন পাল, কাব্যবিশারদ, ডাঃ আবদুল গফফরের বক্তৃতা শুনেছি, যুগান্তর, সন্ধ্যা ও ভারতী নিয়মিত পাঠ করি, কিন্তু মেজকাকার তুলনায় আমি কতটুকুই বা জানি। তিনি নেতাদের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন, অর্ধ-উচ্চারিত রহস্যময় ভাষায় একান্ত অনুরক্তদের কাছে গুপ্ত বিপ্লবী দলের কথাও বলেন; বিলেত থেকে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার 'তলোয়ার' কাগজও একখানি দেখালেন। মেজকাকার কথা শুনি, আর বিস্ময়ে সর্বশরীর অপূর্ব ভাবাবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আমার মনে জন্মভূমি স্বদেশের পরিধি ছিল অতি সংকীর্ণ—তার মধ্যে মানবীমাতা ছিলেন মনের সবখানি জুড়ে। এই অবরুদ্ধ মনের দ্বার-বাতায়ন খুলে গেল। কল্পনায় দেখলাম, দশপ্রহরণ-ধারিণী মা আবার ভারতের বুকে দাঁড়িয়েছেন, অরাতি বিনাশের সংকল্পে তাঁর দিব্য আনন কঠিন—ত্রিনয়নে বহ্নিজ্বালার দীপ্তি। হিমালয় থেকে কুমারিকা যেন একটা মহৎ সম্ভাবনার আবেগে দুলছে। কিশোর মনের অজ্ঞতার মধ্যে কল্পনা অবাধ হয়ে ওঠে। জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত ভেদ ও দুর্বলতা এবং ইংরাজ রাজশক্তির প্রবল পরাক্রম—এ দুই-ই তখন বুদ্ধির অগোচর ছিল।

মেজকাকার পরেই নাম করতে হয় রজনী-দার। রিপন কলেজে বিএ পড়েন, ব্যায়াম-পুষ্ট সুগঠিত দেহ। দল বেঁধে কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে আর ইডেন গার্ডেনে বাগে পেলেই সাহেব মারেন। বাড়ি আসবার পথে দার্জিলিং মেলে "ইউরোপীয়ান অনলি" গাড়িতে উঠে একাই দুটো ফিরিঙ্গিকে কিভাবে মেরে লোপাট করেছেন সেই সব গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলেন। আর কলকাতার থিয়েটারের কথা উঠলে তো কথাই নেই। গিরিশবাবুর সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, ক্ষিরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি', প্রতাপাদিত্য, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ—এমনি কত নাটকের কথা। আমাদের পরিবারে থিয়েটার দেখা বারণ ছিল, রজনীদার গল্পগুলো গিলতাম। যাত্রা থিয়েটারের পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও জাতীয় গৌরববুদ্ধি জাগ্রত করে এমন নাটকের অভিনয় হয়—রজনীদার মুখে শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। মনে আছে, সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় পোড়বাজার কংগ্রেস একজিবিশনে মথুর সাহার দলের "মাতৃপূজার" অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

মহাসপ্তমীর প্রভাত; ঢোল আর কাঁসীর বাজনায় গ্রাম মুখারত। প্রভাতের পাখীর মত কলরব করে ছেলেমেয়েরা জাগলো। ওঠ ওঠ চল চল—'নতুন' কাপড়-জামা পরবার তর সয় না। শরতের সোনালী রোদে চারদিক প্রসন্ন ভেজা সবুজ ঘাসের শীষে শিশিরবিন্দুগুলি রোদে ঝলমল করছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে সামিয়ানার তলে জমায়েত হল। ঝুমঝুমি ও নানারকম বাঁশীর শব্দ, সকলের মুখে আনন্দের হাসি। মা এসে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করে দাঁড়িয়েছেন—আনন্দময়ীর আগমনে সত্য-সত্যই লোকে দুঃখ ভুলেছে। সম্মুখে দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবী, সহজ বিশ্বাস, সরল ভক্তি নিয়ে সকলেই মা মা বলে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছে। পাশের গাঁগুলি থেকে কৃষক মেয়েরা এসেছে—বলিষ্ঠ দেহে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, বুকানি করে "ফোতা" পরা, গলায় টাকার মালা হাঁসুলী আর নকল প্রবালের হার, হাতে চওড়া রূপোর খাড়ু, পিঠে বাঁধা কচি শিশু। চুল থেকে তেল গড়িয়ে সিঁথির সিঁদুর কপালে লেপ্টে গেছে। বিস্ময় ও ভক্তিতে দেবীদর্শন করছে। ধূপের গন্ধ, রাশি রাশি জবাফুল আর বেলপাতা, পুরোহিতের সমুচ্চকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ, সমস্ত মিলে পূজামণ্ডপ যেন পবিত্রতায় ভরে উঠেছে।

এ কদিন গুরুজনদের শাসন নেই, পারিবারিক জীবনের বাঁধাধরা কড়াকড়ি শিথিল হয়ে গেছে। প্রত্যেক পুজোবাড়িতে নিমন্ত্রণ, কোথাও নিরামিষ, কোথাও বলির পাঁঠার ঝোল-ভাত। লুচি পায়েস দই মিঠাই মণ্ডার ছড়াছড়ি। জোতদার বাড়ির পুজোয় দলে দলে প্রজা প্রসাদ পেতে এসেছে। কর্তারা নিজেরা পরিবেশন করছেন, সকলকে পরিতোষ করে খাওয়াচ্ছেন। অমন যে রাশভারী মৈত্রমশায়, যাঁকে দেখলে ছেলেরা রাস্তা ছেড়ে দৌড় দিতো, তিনিও হেসে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, ছেলেবুড়ো সকলকেই সমানভাবে আদর করছেন। সমাজের রীতি-নীতির মধ্যে জাতিভেদের কড়াকড়ি প্রচুর; কিন্তু পুজোর কটা দিনের হৃদ্যতায় তা কারো পক্ষে পীড়াদায়ক হ'ত না। দেখতে দেখতে অষ্টমী নবমী ফুরিয়ে গেল। আবাহন পুজো তারপর বিসর্জন। দশমী প্রভাতের ঢাকের বাদ্যেও যেন কান্নার সুর। পুজোর চেয়ে বিসর্জনের ব্যথাই যেন বেশী করে বুকে বাজতো।

বিসর্জনের পর পুজোমণ্ডপের আনন্দের হাট ভেঙে গেল। দুপুর না হতেই "দেবী-ডুবার" ঘাটে মেলা বসেছে। বাতাবী লেবু, চিনির সাজ বাতাসা, মিঠাই-মণ্ডার পাশে মিষ্টি আলুসিদ্ধ ভাগা দিয়ে বিক্রী হচ্ছে। মাটির রং-করা ঘোড়া, নানা রকমের চিত্রকরা পুতুল—শোলার কাকাতুয়া পায়রা, নানা মনোহারী দ্রব্য,—মেলায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের ভীড়। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা বার করা হল। রাজ-কাছারীর পাইক বরকন্দাজরা বন্দুক, সড়কী, আসা-সোঁঠা আড়ানী নিয়ে প্রতিমার সঙ্গে শোভাযাত্রা করে চললো। গ্রামের ভদ্রব্যক্তিরা নগ্নপদে প্রতিমার অনুগামী হলেন। মেলার একপ্রান্তে সতরঞ্চি ও জাজিম পাতা হয়েছে, পান তামাক দিয়ে ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। নদীর দুই পার লোকে লোকারণ্য। কলার ভুরায় চারখানি প্রতিমা শীর্ণ নদীর বুকে একধার থেকে অন্য ধারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সূর্যাস্তের নির্দিষ্ট সময়ে বন্দুকের আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হল। তারপর আর ইতর-ভদ্রে তফাৎ রইল না। আলিঙ্গন, নমস্কার, প্রণাম চললো। তারপর আর আনন্দ কোলাহল নেই—ছেলে-বুড়ো সবাই নীরবে নতশিরে গ্রামের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। মায়েরা ধান দূর্বা দিয়ে ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন। খেতে দিলেন, চিঁড়ে-মুড়ির মোয়া, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের তক্তি—সে রাত অরন্ধন।

পরদিন সকালে হাড়ীরা বাড়ি বাড়ি মাছ দিয়ে গেল,—একজন শঙ্খচিল দেখিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করলো। প্রত্যেক বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে কর্তারা দুর্গানাম লিখে পার্বণী দিতে লাগলেন। ছেলেরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মায়েদের প্রণাম করে এলো—পুজো ফুরিয়ে গেল। কুয়াশায় ঢাকা নিরানন্দ সন্ধ্যা নিস্তব্ধ।

অনেক অনেক বছর কেটে গেছে। কতবার শরৎ এসেছে, মহাপুজার আনন্দে মানুষ মেতে উঠেছে। শহর ছেড়ে পল্লীর ক্রোড়ে ছুটে গেছে। পাটের টাকায় সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে পুজার মহাসমারোহ প্রিয়জনের আনন্দ-সম্মেলনের কত সুখস্মৃতি মনে গাঁথা হয়ে আছে। আজও শরৎকাল এলেই সেই সব কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে; মা মা বলতে চোখ জলে ভরে ওঠে। পদ্মা যমুনা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরী মধুমতী বিধৌতা দেশজননীর অপরূপ রূপের স্মৃতি জেগে ওঠে। কোথায় ভারত আর কোথায় বিশ্বমানবের জয়যাত্রায় মুখরিত এই বৃহৎ পৃথিবী। সব লুপ্ত হয়ে যায়, নদীমেখলা কাননকুন্তলা শ্যামা বঙ্গভূমির অপরূপ রূপে হৃদয় ও মস্তিষ্ক অভিভূত হয়ে যায়। কানে সারাক্ষণ ধ্বনিত হয়, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। চণ্ডীমণ্ডপ আলো-করা দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবীর বিশ্বজনমনলোভা রূপ যেন দেশজননীরই প্রতিচ্ছায়া। এই মাকে সত্য-সত্যই বিসর্জন দিয়ে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আমরা আজ পথে-প্রান্তরে পরবাসী। আজকের দুঃখ লজ্জা মনস্তাপে পুরানো দিনের স্মৃতি অশ্রুবাষ্পে মলিন হয়ে গেছে; তবু আশা মরে না। বিসর্জনই শেষ নয়, আবার বোধন হবে, উচ্চারিত হবে আবাহন-মন্ত্র! মায়ের কোলে সকল ভাই-এর আনন্দ-সম্মেলনে মিলিতকণ্ঠে ধ্বনিত হবে—বন্দে মাতরম্।

হোটেলের গল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্টেশনে নেমে গাড়ির সহযাত্রী বললেন, 'সস্তা হোটেল চান তাও যথেষ্ট আছে পুরীতে। স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি মনোমোহনে যেতে পারেন। শুনেছি রেট খুব সুবিধে। তিন টাকায় থাকা খাওয়া জলখাবার সব পাবেন। কিন্তু কি দরকার। আমি বলি এক যাত্রায় পৃথক ফলে কাজ কি। আমার সঙ্গে চক্রতীর্থেই চলুন।'

লোভ যে না হল তা নয়। কিন্তু মনিব্যাগের কথাটা একটু চিন্তা করে হাতজোড় করে তাঁকে বিদায় নমস্কার জানালাম—'আজ্ঞে না, আমি বরং স্বর্গদ্বারের দিকেই যাই। ওদিকে দু'একজন চেনাজানা আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ তো, আশা করি পরে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে।'

সহযাত্রীটি শৌখীন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পুরীতে যখন আসেন, অভিজাত হোটেলেই থাকেন। কিন্তু আমি তিরিশ টাকার সীজন টিকেট কেটে দু সপ্তাহের জন্য সফরে বেরিয়েছি। সম্বল প্রায় নিঃশেষিত, তাই প্রত্যেকটি পয়সা হিসাব করে চলতে হয়। রিক্‌শায় উঠে মনোমোহনের নামটাই বললাম।

মিনিট পনের পরে অপরিসর অপরিচ্ছন্ন এক গলির মধ্যে রিক্‌শাওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিল। আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওই তো হোটেল বাবু।'

হোটেল যে তাতে ভুল নেই। পাছে লোকে বিশ্বাস করতে না চায়, স্বীকার করতে দ্বিধা করে তাই দুটি কাঠের থামে টিনের সাইনবোর্ড এ'টে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে ইংরেজি আর বাংলায় লেখা আছে মনোমোহন হোটেল—পুরী।

সাইনবোর্ডের পিছনে খড়ের ছাউনির নিচু পুরনো একটি বাড়ি। সামনে সরু খোলা বারান্দা। একধারে একখানি তক্তপোষ পাতা। তার ওপর উপুড় হয়ে বসে পাতলা রোগামত এক ভদ্রলোক কি যেন হিসাব মিলাচ্ছেন। আমি এক মুহূর্ত স্যুটকেশ আর হোল্ডঅলটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনোমোহন সম্বন্ধে মনস্থির করতে আর দেরি হোল না। রিকশাওয়ালাকে হাতের ইশারায় ডেকে জিনিসদুটো ফের চাপিয়ে দিয়ে বললাম, 'অন্য কোথাও নিয়ে চল।'

মনে মনে ভাবলাম অত বেশী হিসাব করে কি হবে। না হয় দু'একটা জায়গা কমই দেখব। পুরী থেকেই সোজা ফিরে যাব কলকাতায়। যে কটা দিন এখানে থাকব একটু আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই থেকে যাই।

কিন্তু রিক্‌শায় গিয়ে উঠতে না উঠতেই একটি মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'ওকি ফিরে যাচ্ছেন যে। আসুন, আসুন।'

দোরের ফিকে নীল রঙের পর্দা সরিয়ে বারান্দা পার হয়ে তিনি একেবারে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিরিশ বত্রিশ বছরের একটি বাঙালী বধূ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুরের মোটা দাগ। তার ওপরে চওড়া গাঢ় লালপেড়ে শাড়ির আধখানা আঁচল। গায়ের রং ফর্সা বলে বেশ মানিয়েছে। হাতে শাঁখার সঙ্গে দু'গাছি করে চুড়ি। আর তেমন কোন আভরণ নেই। কিন্তু মনে হল আভরণ ও'র গায়ে মানাত।

মৃদু হেসে তিনি আরও একটু এগিয়ে এলেন। যেন নিজেই আমার বিছানা স্যুটকেসটা টেনে নামাবেন। তারপর তেমনি মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'বাড়ির অবস্থা দেখে ফিরে যাচ্ছিলেন বুঝি।'

গলায় শুধু অনুনয় নয়, যেন একটু অনুযোগের সুরও আছে।

তিনি আবার বললেন, 'আসুন।'

এরপর আর ফেরা যায়না। আমি নিঃশব্দে বাক্স বিছানা নিজেই নামিয়ে নিলাম। কিন্ত তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি, ওগুলি দিন আমাদের হাতে।'

'আমার কাছে দিন।' বারান্দার সেই

হিসাবরক্ষী ভদ্রলোক এতক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। কালো বেঁটেখাট চেহারা কিন্তু দেখতে রোগা বলে তত বেঁটে মনে হয় না। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রং কালো। জামার রং সাদা। ঠিক জামা নয়, হাতকাটা একটা ফতুয়া গায়ে। বাঁ হাতের কব্জিতে দামী একটি সোনার ঘড়ি। অন্য বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে ঘড়িটা ঠিক যেন তেমন মানানসই হয়নি।

ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ একটু ধমকে উঠলেন, 'এবার এসেছ, আমার কাছে দিন। এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে ইনি তো চলেই যাচ্ছিলেন।'

তারপর মহিলা আমার দিকে ফিরলেন, হেসে বললেন, 'আমার স্বামী।'

বললাম, 'আপনার ধমক শুনেই তা বুঝতে পেরেছি।'

মহিলা এবার ভারী অপ্রতিভ হলেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'খেয়াল একটু কম।'

ভদ্রলোক ততক্ষণে এসে আমার বিছানা স্যুটকেস হাত থেকে তুলে নিয়েছেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আহা-হা, আপনি কেন। চাকর বাকর কাউকে ডাকুন।'

তিনি বললেন, 'চাকরটা আবার ছুটি নিয়েছে কদিন ধরে।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। মহিলা বোধ হয় আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। তাই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'বানিয়ে বলছিনে, সত্যিই ঠাকুর চাকর আমাদের আছে। কিন্তু থাকলে হবে কি, তাদের ওপর তেমন ভরসা করতে পারিনে। বেশী মাইনে দেওয়ার সাধ্য তো নেই। বেশী কাজ কোত্থেকে পাব। প্রায় সবটা নিজেদেরই করে কর্মে নিতে হয়। আসুন।'

মহিলা ঘরের পর্দাটা এবার টেনে সরিয়ে দিলেন। তার আগেই গুটি চারেক ছেলে-মেয়ে বারান্দায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বড়টি মেয়ে। বছর পনের হবে বয়স। বাড়ন্ত গড়ন। মায়ের মতই সুন্দর চেহারা। নাক চোখের ধরনটা আরো তীক্ষ্ণ। পরনে চাঁপা রঙের ফ্রক। মাথার লম্বিত বেণী কোমর ছাড়িয়ে পড়েছে। দরিদ্র হোটেলওয়ালার মেয়ে বলে মনে হয় না। তার পাশে হাফ প্যান্ট পরা তিনটি ছোট ছোট ছেলে।

মহিলাটি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার মেয়ে অঞ্জলি, এবার থার্ড ক্লাশে উঠেছে। পাকিস্তানের ঝামেলায় গোড়ার দিকের দুটি বছর নষ্ট হয়েছে। নইলে এবার ফার্স্ট ক্লাসে পড়ত।'

অঞ্জলির মার মুখে একটু আত্মপ্রসাদের ছাপ পড়ল। বললেন, 'পড়াশুনোয় ভালোই।' ছেলেদের দেখিয়ে বললেন, 'ওদেরও স্কুলে দিয়েছি।' তারপর আবার ফিরে তাকালেন মেয়ের দিকে। 'অঞ্জু, তোমাকে তো নতুন শাড়ি কিনে দেওয়া হয়েছে। যাও সেখানা পরে এসো।'

মেয়েটি এবার বোধ হয় একটু লজ্জা পেল। পর্দা সরিয়ে তাড়াতাড়ি পাশের একটি কামরায় গিয়ে ঢুকল। শিগগির আর বেরোল না।

দেখলাম বাড়ির বাইরের দিকটা যত জীর্ণ আর নৈরাশ্যকর, ভিতরটা তেমন নয়। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো গুছানো। আসবাবপত্র তেমন বেশী না হলেও যা আছে তাতে বেশ কাজ চলে যায়। মাঝখানের হলঘরটি বড়। মাঝারী আকারের গোল একখানা টেবিল পাতা। গদি ছাড়া গদিওয়ালা খানকয়েক চেয়ারও আছে। তবে ফার্নিচারগুলি যে বেশ পুরনো তা বোঝা যায়। পালিশ বলতে আর কিছু নেই। রং সব কালো হয়ে গেছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ছাড়া কয়েকখানি বাঁধানো ছবিও আছে। দূর থেকে স্পষ্ট করে কিছু আর দেখা যায় না। কিন্তু বড় বড় হরফে কার্পেটের অলংকৃত অক্ষরে স্বাগত কথাটি যে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে তা সহজেই পড়া যায়। নীচের দিকে ছোট অক্ষরে শিল্পীর নাম—কমলা।

হোটেলের মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করে নিলাম। যতীন পাল। তিনিও আমার নাম ধাম কদিন এখানে থাকব সব জেনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনি তাহলে বসুন কল্যাণবাবু। চা টা খান। আমি বাজারটা সেরে আসি।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'থলি-টলি দাও। বেলা সাতটা বেজে গেছে।'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'ঘড়িটা হাতে বেঁধেই যাওয়া হচ্ছে বুঝি?'

যতীনবাবু ফিরে দাঁড়ালেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কেন ঘড়িটা কি তোমার দরকার আছে?'

মহিলাটির মুখ এবার আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হেসে বললেন, 'শোন কথা, ও ঘড়ি দিয়ে আমি কি করব। হোটেলে থাকলে সুবিধে হয় তাই বলছিলাম। নিয়ে যাচ্ছ যাও। কিন্তু সোনার ঘড়ি না পরলেও তুমি যে হোটেলের মালিক তা সবাই বুঝতে পারবে।'

এতক্ষণে ঘড়িটার দিকে আমার ফের চোখ পড়ল। যতীনবাবুর সরু কব্জির তুলনায় গোল ঘড়িটা বেশ কিছু বড় বলে মনে হলো।

যতীনবাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি কয়েকটা থলি আর ঝুড়ি স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন, ফর্দ দিলেন একখানা, তারপর বললেন, 'মাছ যা আনবে দেখে শুনে এনো। তুমি বাজারে গেলেই জেলেনীরা তোমাকে ঠকায়।'

যতীনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কি করব বল, আমার ঠকবারই কপাল।'

তাঁর স্ত্রী কথাটা কানে তুললেন না। বললেন, 'আজ অনেক জিনিস আনতে হবে। আসবার সময় রিক্‌শা করে এসো। রোদের মধ্যে হেঁটে আসবার দরকার নেই।'

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আপনার কি কোন স্পেশাল অর্ডার আছে? আমরা ফাউল টাউল সবই করি।'

বললাম, 'আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার কিছু দরকার নেই। আপনারা যা করেন তাতেই চলবে।'

যতীনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আপনি এবার হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি ততক্ষণ চা-টা করি।'

বললাম 'আপনাকে কিছু ব্যস্ত হতে হবেনা মিসেস পাল।'

এই ইংরেজী সম্বোধনে তিনি বেশ একটু লজ্জিত হলেন, একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেন বুঝে নিতে চাইলেন, আমি পরিহাস করছি কিনা। একটু বাদে বললেন, 'আমাকে এখানে সবাই অঞ্জুর মা বলে ডাকে।'

হেসে বললাম 'আর আপনার নিজের নামটা কি শুধু কার্পেটেই তোলা থাকে?'

কমলা দেবী এমন লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামালেন, এমনভাবে উঠে গেলেন সেখান থেকে যে আমি ভারী অপ্রস্তুত বোধ করলাম। সত্যি ভদ্রমহিলা না জানি কি মনে করলেন। মাত্র আধঘণ্টার অবকাশে প্রতি অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলা ভারী অশোভন হয়েছে। কিন্তু তিনি তো' আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সুরু করেছেন। তাঁর ওই তাকাবার ভঙ্গি, লজ্জা পেয়ে উঠে যাওয়ার ভঙ্গিটুকু ভারি অদ্ভুত লাগল। তিনি যেন উত্তীর্ণযৌবনা, চার সন্তানের মা নন, যেন বহুদিনের অভ্যস্ত হোটেল-ওয়ালী নন, নিত্য বহু অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে যাঁকে আলাপ পরিচয় করতে হয়, তাদের সেবা যত্ন করতে হয়; ওঁর লজ্জা পাওয়ার ধরন দেখে মনে হলো কমলা যেন এখনো আধখানা ঘোমটায় ঢাকা একটি কুলবধূ। লজ্জাটুকু এতই স্বাভাবিক ছিল যে মোটেই বেমানান মনে হলো না।

খানিক বাদে চা টোস্ট, অমলেট নিয়ে তিনি যখন ফের এসে দাঁড়ালেন, আমি একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম:

'কিছু মনে করলেন না তো?'

কমলা দেবী হেসে সহজভাবে বললেন, 'বাঃ মনে আবার কি করব। আপনার বাড়ি কোথায়?'

'পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুরে।'

'আমাদেরও তাই। ঢাকা বিক্রমপুরে। দেশদেশী লোক আপনারা যদি একটু ঠাট্টা পরিহাস করেনই তাতে রাগ করব আমি এমন মানুষ নই। কিন্তু রাগ হওয়ার মত কথা মাঝে মাঝে শুনতে হয়। এমন সব কথা যাতে সত্যিই গা জ্বলে।'

টোস্টে কামড় দিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম 'তাই নাকি?' কমলা দেবী মুখ নিচু ক'রে বললেন 'হ্যাঁ। সস্তা হোটেল, বেশির ভাগই সস্তা দরের মানুষ আনাগোনা করে। সবাই তো সমান নয়।'

একটু থেমে বললেন, 'পরের কথা কি বলব, নিজেদের আত্মীয়স্বজনই কলকাতায় বসে দুর্নাম রটায়। কিন্তু নিজের দুর্নামের কথা আর ভাবিনে, ভাবি ছেলেমেয়েগুলির জন্যে।'

ভেবে অবাক হলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কি করে, এমন অন্তরঙ্গ সুরে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারলেন কি করে। অবশ্য পরে খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম।

চা খাচ্ছি, ভিতর থেকে আট ন বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে কিছু নেই, সে এসে কোঁদলের ভঙ্গিতে বলল, 'মা আমি বললাম আমি চা দিই, তুমি নিজেই নিয়ে এলে!'

কমলা দেবী বললেন, 'তুমি কেন চা দিতে আসবে রণ্টু? দুপুরে তোমার স্কুল আছে না, পড়াশুনো আছে না?'

রণ্টু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, এখন স্কুল, পড়াশুনো কত কি। রাস্তার বাজে লোককে চা-দেওয়ার বেলায় যা রণ্টু তুই যা। আর ভদ্রলোক বাবুদের দেখলে, নিজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে! আমাকেও দিতে দেবে না, দিদিকেও দিতে দেবে না। বকশিসটা সব একার নেওয়া চাই, না?'

রাগে, লজ্জায় কমলা দেবীর মুখখানা মুহূর্তকাল আরক্ত হয়ে রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ছিঃ রণ্টু, মায়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না কি? যাও ভিতরে যাও।'

রণ্টুও বোধহয় এবার লজ্জা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

কমলা দেবী আরও একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'জানেন ওদের জন্যেই ভাবনা।'

'মা, এদিকে আসুন একবার ডালটা দেখে যান।' রান্নাঘর থেকে ঠাকুরের ডাক এল। কমলা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

মাছ তরকারিতে থলি আর ঝুড়ি ভরে হোটেলের বাজার নিয়ে এলেন যতীনবাবু, স্ত্রীকে ডেকে হুকুমের ভঙ্গিতে বললেন, 'কই কোথায় গেলে সব, তাড়াতাড়ি এগুলি তুলে নাও। কত বেলা হয়ে গেছে। আজ আর অফিসের লোকদের ভাত দেওয়া যাবে না।'

কমলা দেবী বললেন, 'খুব যাবে, তুমি অত ব্যস্ত হয়োনা।'

তারপর দুজনে দু'খানা বঁটি পেতে রান্নাঘরের সামনে মাছ তরকারি কুটতে বসে গেলেন। এমন কি রুণ্টু ছুণ্টু টুনিরা পর্যন্ত হাতে হাতে জোগান দিতে লাগল। আমি উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মাথার আঁচল পড়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখে কমলা দেবী আঁচলটা ফের মাথায় তুলে দিয়ে হেসে বললেন, 'আপনি এখানে দাঁড়াতে পারবেন না, রান্নার ঝাঁজ লাগবে। আপনি বরং আপনার ঘরে গিয়ে ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। ও মা, আপনার ঘরই তো এখনো ঠিক ক'রে দেওয়া হয়নি। অঞ্জু ও অঞ্জু এদিকে একটু এসো তো মা।'

পাশের একটি ঘর থেকে গুণ গুণ ক'রে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সে শব্দ বন্ধ হলো। সেই কিশোরী মেয়েটি ফের এসে দাঁড়াল সামনে। এবার নীলরঙের একটি শাড়ি পরে এসেছে। স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে চুলের রাশ পিঠভরে ছড়ানো। শুধু আমি নয়, অঞ্জলির মাও মুগ্ধচোখে একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন নিজের প্রথম যৌবনকে মেয়ের দেহে ফের চাক্ষুষ করলেন, অনুভব করলেন। স্মিতমুখে বললেন, 'যাও ও'র ঘরখানা ঠিক ক'রে গুছিয়ে দিয়ে এসো।'

অঞ্জলি বলল, 'কোন ঘরখানা দেব মা।'

কমলা দেবী হেসে বললেন, 'তুমি নিজেই পছন্দ ক'রে দাও না।'

অঞ্জলির মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল।

আমি ফের হলঘরে গিয়ে বসলাম। খানিকবাদে মেয়েটি এসে দাঁড়াল। মুখ নিচু ক'রে বলল, 'ওই কোণের দিকের ঘরখানা আপনার জন্যে। জিনিসপত্র সব রেখে এসেছি। ও-ঘর থেকে একটুখানি সমুদ্র দেখা যায়।'

অঞ্জলি চোখ তুলে এবার একটু হাসল।

একটুখানি সমুদ্র! মনে মনে ভাবলাম আমাদের পক্ষে একটুখানি সমুদ্রই ভালো।

বাইরের বৃহৎ সমুদ্রও দেখলাম। নামলাম নুলিয়ার সাহায্যে, চান করলাম, সাঁতরালাম। কিন্তু ফিরে আসবার পর সে সমুদ্র একটু-খানি হয়েই মনের মধ্যে মিশে রইল।

ফিরে এসে দেখি হোটেলে ভিড় বেড়েছে। এঘরে ওঘরে গিজ গিজ করছে লোক। হল-ঘরে সকালের চায়ের টেবিল এখন খাওয়ার টেবিলে রূপান্তরিত হয়েছে। সস্তা ট্রাউজার আর হাফ শার্ট পরা কয়েকজন ভদ্রলোক খেতে বসেছেন। উৎকলবাসী সতের আঠের বছরের পৈতেপরা একটি ছেলে পরিবেশন করছে। যতীনবাবু আর কমলা দেবী হাতে হাতে জোগান দিচ্ছেন, জল, নুন, লেবু দিয়ে যাচ্ছেন। কোন কোন জায়গায় কমলা দেবীকে ভাত তরকারি পরিবেশন করতেও দেখলাম।

এক ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার ঘরে যান। খাবার সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বললাম, 'এত তাড়া কিসের। এ'দের সব হয়ে যাক। আমি বরং যতীনবাবুর সঙ্গেই খাব।'

কমলা দেবী মৃদু হেসে বললেন, 'না না, আমাদের অনেক বেলা হয়ে যাবে। কষ্ট হবে আপনার। আপনি বসুন গিয়ে।'

ছোট্ট ঘর। তক্তপোষের সামনে আকাঠার ছোট একখানি টেবিল। খবরের কাগজ পেতে তার ওপরই ভাতের থালা এনে রাখলেন কমলা দেবী। শুকতো, শাক পিটালি থেকে শুরু হলো। যেন হোটেলে আসিনি, কোন গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছি।

চিতল মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললাম, 'সব নিজে রেঁধেছেন?'

কমলা দেবী কোন জবাব দিলেন না। স্মিতমুখে শুধু পরিবেশন ক'রে যেতে লাগলেন।

আমার কথার জবাব দিলেন যতীনবাবু। তিনিও কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, 'সব ওর নিজের হাতের রান্না। ঠাকুরের ওপর কি ভরসা করা চলে? তাকে দিয়ে শুধু নামিয়ে নেওয়া হয়। এ হোটেলের মাছ মাংস ডিমের খুব নাম আছে। অনেক বড় বড় অফিসার, বাইরের সৌখীন সব বড় বড় বাবু এখান থেকে খাবার নিয়ে যান। যাঁরা একবার খান তাঁরা সবাই সুখ্যাতি করেন।'

কমলা দেবী লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, 'হয়েছে! তুমি এবার থামতো। যিনি খাচ্ছেন তিনি কিছু বলছেন না, তুমি প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

লজ্জিত হ'য়ে বললাম, 'বলবার সময় পাচ্ছি কই। সত্যি রান্নাগুলি চমৎকার হয়েছে।'

কমলা দেবী প্রশংসাটুকু নীরবে গ্রহণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'বাড়িটা যদি একটু ভাল হোত, লোকজনকে যদি থাকবার জায়গা দিতে পারতাম তা'হলে আর কথা ছিল না। শহরে সাধারণ ভদ্রলোকদের জন্যে যে সব ভালো হোটেল আছে, তাদের চেয়ে একেবারে পিছনে পড়ে থাকতামনা। কিন্তু এমন বাড়িতে কে আসবে বলুন।'

বললাম, 'ভালো দেখে একটা বাড়ি নেননা কেন।'

কমলা দেবী ম্লানমুখে বললেন, 'সে যে

অনেক টাকার দরকার। এখানকার খরচই কুলিয়ে উঠতে পারিনে।'

বিকেল বেলায় চা খেতে খেতে যতীনবাবুর কাছে ও'দের হোটেল কেনার কাহিনী আরো খানিকটা শোনা গেল।

কোনদিন তাঁকে যে হোটেল খুলতে হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু সংসারে অনেক অভাবিত ঘটনাই ঘটে। পাটের অফিসে চাকরি, দালালী, মনোহারী দোকান, করেছেন জীবনে অনেককিছুই। শেষে এই সমুদ্রতীরে এসে হোটেলও খুলতে হয়েছে। এই মনোমোহন হোটেল অনেকদিনের পুরোন। বছর পনের হলো বয়স। কিন্তু তাঁর হাতে এসেছে মাত্র তিন বছর। এক বন্ধুর সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিই কথাবার্তা বলে কিনে দিয়েছেন এই হোটেল। ঠাকুর চাকরের ভরসায় থাকতে পারেননি। স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদেরও আনিয়ে নিয়েছেন। না এনে উপায় ছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় দেশ ছাড়বার পর স্ত্রী-পুত্রকে কলকাতায় দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় এনে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ঘর দোরের কষ্ট। কতদিন আর সেখানে ফেলে রাখা যায়। তাই হোটেলেই আনিয়ে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম কমলার ভারী লজ্জা, ভারী সংকোচ। হোটেলে ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলে থাকতে পারে? কিন্তু এখন শুধু কমলা থাকেনই-না, নিজেই হোটেল চালান। জিনিসপত্রের অপচয়, ঠাকুর চাকরের চুরি, আরো নানারকমের ব্যাপারে খুব লোকসান যাচ্ছিল। ক'মাস যেতে না যেতে যতীনবাবু ভেবেছিলেন হোটেলটা কারো কাছে বিক্রি ক'রে দেবেন। কিন্তু কমলা বাধা দিলেন, বললেন, 'আর কত ভাগ্য পরীক্ষা করবে। হোটেল বিক্রি ক'রে দিলে শেষে দাঁড়াবে কোথায়।

কমলা ভিতরে ছিলেন, পর্দার আড়ালে ছিলেন। এবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ঘোমটা খুলে না ফেললেও অনেক ওপরে তুলে ফেললেন। নিজে আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন খদ্দেরদের। একটু একটু ক'রে ফের তাদের ভিড় বাড়তে লাগল। লোকসানের পালা কাটিয়ে উঠে লাভের মুখ দেখলেন যতীন বাবু। আজকাল খেয়ে খরচে দু পয়সা না থাকলেও সকলের থাকা-খাওয়ার খরচটা চলে যায়।

যতীনবাবু বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে কত যে কথা শুনতে হয় তার ঠিক নেই। আত্মীয় বন্ধুরাই নিন্দা রটায় বেশী, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে কলকাতা থেকে এখানে এসে তারা নিজের চোখে মজা দেখে গেছে। গিয়ে রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমরা নাকি শুধু ভাতই বেচি না, ধর্মও বিক্রি করি।'

বললাম, 'বলুক গিয়ে তাদের যা খুশি। আমার তো মনে হয় আপনি সত্যিই এতদিনে আপনার সহধর্মিণীকে পেয়েছেন। জীবন-সঙ্গিনী টঙ্গিনী বড় ধোঁয়াটে কথা। আজ-কালকার দিনে জীবিকার সঙ্গিনীই আসল সঙ্গিনী। এতদিনে আপনি পুরোপুরি স্ত্রীকে পেয়েছেন।'

যতীনবাবু চাটা শেষ ক'রে বিড়ি ধরালেন, একটু হেসে বললেন, 'দূর থেকে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু সংসারে কেউ কাউকে পুরোপুরি পায়না মশাই। একদিক থেকে পেতে হয়, আর একদিক থেকে ছাড়তে হয়।'

ও'র কথার ভঙ্গিতে চমকে উঠলাম, বললাম, 'তার মানে?'

যতীনবাবু ফের একটু হাসলেন, 'বলছি। আমার সঙ্গে কথা বলবে আমার স্ত্রীর সে সময় কই। দিন-রাত খদ্দের নিয়েই ব্যস্ত। তারা কে কি খায়, কে কি ভালবাসে তা বুঝতে না জানলে কি দুটো পয়সা আসে ? তাকে দোষ দেব কি, দায় ঠেকে ঠেকে আমারও এমন একটা ভাব এসে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপের চেয়ে যেন দুগণ্ডা পয়সার দাম বেশী।'

আমি একটুকাল চুপ করে রইলাম। সমস্যার এদিকটার কথা ভাবি নি।

একটু বাদে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। কতদূর পড়াশুনো করেছিলেন?'

যতীনবাবু আমার দিকে তাকালেন, 'কেন বলুন তো?' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনার সন্দেহ ঠিকই। কলেজের গন্ধ গায়ে লেগেছিল। দু'বছর ছিলাম জগন্নাথ হলে। বাকী বছর কটি বোধ হয় এই জগন্নাথধামেই কাটবে।'

চারদিন ছিলাম পুরীর মনোমোহন হোটেলে। দেখলাম যতীনবাবুর চেয়ে তাঁর স্ত্রী কাজ করছেন বেশি। তরকারি কুটছেন, রাঁধছেন, খদ্দেরদের সঙ্গে হেসে আলাপ করছেন। দুদিন তো নিজেই গিয়ে বাজার করে আনলেন।'

একদিন দুপুরবেলায় দেখলাম রন্টুর হাতের মুঠি থেকে কি যেন কেড়ে নিতে চাইছেন। ছেলে কিছুতেই দেবে না। তার মুখ কাঁদো কাঁদো। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম, 'কি ব্যাপার?'

কমলা ততক্ষণে ছেলের নরম হাতের মুঠি খুলে ফেলেছেন। একখানা নতুন চকচকে আধুলি।

কমলা বললেন, 'এটা কি--কোথায় পেলি, সত্যি করে বল।'

রন্টু বলল, 'বকশিস পেয়েছি। সুরেন-বাবুর পিঠ ডলে দিয়েছিলাম। তিনি খুশী হয়ে আমাকে পুরো আধুলিটা দিয়ে দিয়েছেন, বললেন ওতে আর কারো ভাগ নেই।'

কমলা রুখে উঠলেন, 'বাঁদর ছেলে, ভাগ নেই! যাও, এ পয়সা তুমি সুরেনবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। হতভাগা, তোমার কি মানসম্মান জ্ঞান একেবারেই নেই, তুমি কি হোটেলের চাকর যে, খদ্দেরদের খুশী করে পয়সা নিতে হবে? যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

রন্টু নিতান্ত অনিচ্ছায় যেতে যেতে বলল, 'বা-রে, বাবাকে যখন সেদিন সেই ভদ্রলোক পাঁচ টাকা বকশিস দিলেন, তখন কোন দোষ হলো না, আর আমি নিলেই দোষ।'

কমলাদেবী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে আমাকেই সাক্ষী মেনে বললেন, 'শুনলেন ছেলের কথা!'

তারপর তাঁর গলা ভার হয়ে এল, 'সবাই মিলে আমার ছেলেমেয়েগুলিকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে চায়। কারো একটু মায়া-দয়া হয় না। আমি অঞ্জুকেও তো বেশী-দিন এখানে আর রাখতে পারব না। কতক্ষণ আর চোখে চোখে রাখব বলুন। সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক অঞ্জুকে ফুল সাধছেন, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছেন। আমি গিয়ে বললাম, ও তো আপনার মেয়ের বয়সী, চলুন আমার সঙ্গে বেড়াবেন। ভদ্রলোক মুখ নিচু করে বেরিয়ে গেলেন, আর এ মুখো হন নি। সবাই কি ভাবে বলুন তো?'

বললাম, 'যাই ভাবুক, আপনার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না।

খানিক বাদে নিচু গলার মৃদু আলাপ কানে এল। যতীনবাবু সস্ত্রীক পাশের ঘরেই থাকেন। তাঁদের গলা।

যতীনবাবু বলছেন, 'তুমি তিন নম্বর ঘরের ভদ্রলোককে কালই ঘর ছেড়ে দিতে বলেছ?'

কমলাদেবীর গলা, 'হ্যাঁ। ও'রা ভদ্রলোক নন।'

'হোটেল চালাতে গেলে অত জাত-বিচার চলে না। ও'রা স্বামী-স্ত্রীতে দিন পনের থাকতেন। একশ টাকা তো হোতই, কিছু বেশিই পাওয়া যেত বোধ হয়।'

'ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়, ওদের চালচলন দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি।'

'স্বামী-স্ত্রী না হোক, স্ত্রী-পুরুষ তো বটে। তুমি তো ওদের সঙ্গে আর কুটুম্বিতা পাতাতে যাচ্ছ না?'

'তাই বলে ছেলেমেয়েগুলির ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না? ওরা কি সব বিশ্রী হাসা-হাসি করছিল। অঞ্জু পড়াশুনো ছেড়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এই বয়সে ওসব দেখা কি ভালো?'

'দেখুক, ভাল-মন্দ সবই দেখতে দাও। বেছে নিতে দাও। তুমি কদিন ওর চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখবে?'

'ঠুলি পরাব কেন। যতদূর পারি ওদের চোখের সামনে থেকে নোংরা জিনিস ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।'

'দু-এক গাছা ঝাঁটায় কুলোবে না।'

'না কুলোক, আমি তোমার মত হাল ছেড়ে দিই নি।'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

'হাল তো তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।'

যাওয়ার আগের দিন বিকেলে আমি টাকা পাঁচেকের মত কিছু জিনিসপত্র কিনে নিলাম। আর সেই সঙ্গে সেরখানেক সন্দেশ নিয়ে এলাম যতীনবাবুর ছেলে-মেয়েদের জন্যে।

কমলাদেবী খুব আপত্তি করতে লাগলেন, কিছুতেই নেবেন না। বারবার বললেন, 'না না, এ আপনার ভারী অন্যায়, এসব কি?'

বললাম, 'অন্যায় কিসের। মনে করুন অঞ্জুদের কাকা তাদের এই সামান্য কিছু খাবার এনে দিয়েছে। এর বেশি সাধ্য তো তার নেই।'

আমার এই কথা শুনে কমলাদেবীর দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে থেকে উঠে গেলেন। ও'র এই অদ্ভূত ব্যবহারে আমি কিছুক্ষণ বিস্মিত অপ্রতিভ হয়ে রইলাম। ও'কে তো আমি বিন্দুমাত্র অপমান করি নি, তবু তিনি অত দুঃখ পেলেন কিসে। কেন তাঁকে চোখের জল গোপন করবার জন্য ছুটে অন্য ঘরে যেতে হলো।

আমার সেই ছোট্ট ঘরটুকুতে ফিরে গেলাম। জানলা দিয়ে খানিকটা সমুদ্র সত্যিই চোখে পড়ে। সন্ধ্যার শান্ত ছায়া নামছে একটু একটু করে। তবু উত্তাল ফেনিল ঢেউগুলির আছড়ে পড়ার বিরাম নেই।

'একি, একা একা এমন চুপ করে অন্ধকারে বসে আছেন যে?' ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারলাম কে।

কমলাদেবী ঘরে ঢুকে বললেন, 'আলোটা জ্বালব?'

বললাম, 'জ্বালুন।'

চেয়ারটা তিনি নিজেই একটু সরিয়ে নিয়ে তাতে বসে পড়ে বললেন, 'বিকেলে তো খাবারটাবার কিছুই খেলেন না। এখন এনে দেব?'

'না, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।'

'দেখুন তো কি অন্যায়। কেন বাইরে খেতে গেলেন। এক কাপ চা অন্তত খান।'

'তা দিতে পারেন।'

অঞ্জলিকে ডেকে তিনি এক কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন।

বললাম, 'দু কাপের কথা বললেই তো পারতেন।'

তিনি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি। আপনি খান।'

খানিক বাদে অঞ্জলি চায়ের কাপ এনে সামনে রাখল। বলল, 'মা, ঠাকুর তোমাকে ডাকছে।'

কমলা দেবী বললেন, 'তাকে ডাল চড়িয়ে দিতে বল, আমি আসছি।'

শুধু আমি নয়, আমার ছেলে-মেয়েরাও সেইকথা বলাবলি করছে।'

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি কে?'

মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঠাকুরকে রান্না দেখিয়ে দেওয়ার ফাঁকে কমলা কাহিনীটি আমাকে বললেন।

"গত বছর বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। ব্যবসা খুব মন্দা চলছে। হোটেলে লোকজন তেমন আর আসে না। অথচ খরচ তো আছে। নিজেদের খোরাকি, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর ব্যয় কোনটাই তো বাদ দেওয়ার জো নেই। মাসটা কি ক'রে চালাব তাই

'যাও, এ পয়সা তুমি... ফিরিয়ে দিয়ে এসো...'

অঞ্জলি চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, 'তোমার বাবা কোথায়?'

অঞ্জলির মা-ই জবাব দিলেন, 'তিনি একটু বাইরে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। যাও, অঞ্জু তুমি পড়তে বসো গিয়ে।'

অঞ্জলি চলে গেল।

আমি বললাম, 'আমার ব্যবহারে আপনি যদি মনে কোন দুঃখ পেয়ে থাকেন—

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'ছি ছি ছি, আপনার কথায় আমি কোন দুঃখ পাইনি। আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? আপনার মত এমন ভদ্রতা আমাদের সঙ্গে আর কেউ করেনি। এমন আপনজনের মত ব্যবহার হোটেলে এসে আমি শুধু আর একজনের কাছ থেকে পেয়েছি। আপনি আসা অবধি, বারবার তার কথাই আমার মনে পড়ছে।

ভাবছি হঠাৎ উনি সেদিন সন্ধ্যা বেলা এক ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, 'দেখ কে এসেছে।'

"দেখবার মতই চেহারা। ফর্সা রঙ, লম্বা চেহারা। ঠিক ছিপ ছিপে নয়, বেশ হৃষ্ট পুষ্টই বলা যায়। মোটের উপর বেশ সুপুরুষ মানুষটি।

"উনি বললেন, 'আমার বন্ধু সত্য চৌধুরী। ঢাকায় একসঙ্গে পড়েছি, কলকাতায়ও কিছুদিন এক মেসে ছিলাম। তোমাকে তো কতবার বলেছি ওর কথা। মনে নেই?'

"দেখুন কাণ্ড। মানুষকে এমন লজ্জায়ও ফেলতে পারেন। প্রথম বয়সে কত বন্ধু-বান্ধবের গল্পই তো করেছেন। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় না হ'লে সকলের নাম কি সব সময় মনে থাকে।

"সত্যবাবু বললেন, 'আপনার অত সংকোচের কোন কারণ নেই বউদি। ও যেমন কতকগুলি মিথ্যা কথা বলল, আপনিও তেমনি বলে দিন হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে আছে। রোজই তো দু'ঘণ্টা ক'রে সত্যবাবুকে নিয়ে আমার আলাপ হয়।'

"ও'র কথার ধরনে না হেসে পারলাম না, বললাম, 'আগে না হলেও এরপর থেকে হবে। আসা যাওয়া না থাকলে কি আত্মীয়তা বন্ধুতা থাকে?'

"সত্যবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছেন, যতীন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়েই ছিল। এবার যখন উদ্দেশ পেয়ে গেলাম ফি মাসে একবার ক'রে আসব।'

"তারপর আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ দিব্যি হোটেলখানা করেছ তো। নামটিও খাসা। কিন্তু ভাই ওসব মনোমোহন-টোহন না, একেবারে মনোমোহিনী ক'রে দাও।'

"আমি লজ্জা পেয়ে পাশের ঘরে চলে গেলাম। উনিও একটু লজ্জিত হলেন, বললেন, 'সত্য তুমি ঠিক আগের মতই আছ।'

"তারপর উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ভালো ক'রে খাতির যত্ন করো।'

"বললাম, 'সে কি বলে দিতে হবে? তোমার বন্ধু—'

"উনি বললেন, 'শুধু বন্ধু নয়, অবস্থাও বেশ ভালো, বিয়েথা করেনি। কোন ঝামেলা নেই। যদি ভালো লেগে যায় একমাস দেড়মাসও এখানে থেকে যেতে পারে। ওদিককার বড় হোটেলে থাকবে বলে যাচ্ছিল। সমুদ্রের ধারে দেখা, জোর ক'রে টেনে নিয়ে এলাম।'

"আমি বললাম, 'কি দরকার ছিল। আমাদের এই হোটেলে ও'র মত মানুষের কি তেমন আদর যত্ন হবে।'

"উনি বললেন, 'তুমি যখন আছ আদর যত্নের জন্যে তেমন চিন্তা নেই। সাতটা বাবুর্চি খানসামা যা না পারবে তুমি একাই তা করতে পারবে। আর খাওয়া দাওয়ার জন্যে একটু আলাদা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো তাহলেই হবে।'

"আপনার এই ঘরই তাঁর জন্যে ঠিক ক'রে দিলাম। এই ঘরখানাই আমাদের হোটেলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো। ঝেড়ে-পুছে গুছিয়ে বিছানা পেতে ঠিক ঠাক ক'রে রাখলাম। অঞ্জুকে বললাম ফুলদানীটা সাজিয়ে দে। মানুষটি যে শৌখীন তা দেখেই বুঝেছিলাম।

"সত্যবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'একি, এযে ফুলশয্যা সাজিয়েছেন দেখছি। এত নরম বিছানায় আমার কিন্তু ঘুম আসবে না।'

"আমি হেসে বললাম, 'না হয় জেগেই থাকবেন।'

"শুধু বিছানা নিয়ে নয়, খাওয়া নিয়েও খুব হৈ চৈ উৎপাত আরম্ভ করলেন। ও'র জন্যে আলাদা জলখাবার, আলাদা মাছ মাংসের কারীর ব্যবস্থা করেছিলাম, সত্যবাবু তা রাখতে দিলেন না।

"আমার স্বামীকে ডেকে বললেন, 'ওহে হোটেলওয়ালা, তোমার চক্রান্ত তো ভালো মনে হচ্ছে না। মাসের শেষে আমার নামে দুশো টাকার বিল ক'রে দেবে তাই ভেবেছ?'

"উনি হেসে বললেন, 'তোমার এক-পয়সাও দিতে হবে না, তুমি খাও।'

"কিন্তু সত্যবাবুর উদ্দেশ্য তা নয়। তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে বসে খাব। ওসব কালিয়া পোলাওয়ে কাজ নেই। আপনার হাতের ডাঁটাচচ্চড়ি আর পুঁটি মাছের অম্বল খাওয়ান দেখি।'

"এমন মানুষের কাছে কোন আড়াল আবডাল রাখা যায় না। তা রইলও না। দু'দিনের মধ্যে তিনি একেবারে ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ আরম্ভ করলেন। রণ্টু ছণ্টু তো ও'র খুব ভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের নিয়ে সকালে বিকালে সারা শহর চষে বেড়ান। সমুদ্রে নামলে আর উঠতে চান না। গোটা সমুদ্রই যেন ও'র কাছে বাড়ির পুকুর হয়ে উঠল।

"একদিন আমাকে বললেন, 'চলুন আপনি আজ আমার সঙ্গে নাইতে যাবেন।'

"আমি হাত জোড় ক'রে বললাম, 'রক্ষে করুন, আপনার সঙ্গে নাইতে নামলে আমার এবেলায় কুলোবে না।'

"তিনি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। না হয় ও বেলাই আসবেন।'

"আমি বললাম, 'তাই কি হয়। আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন, আনন্দ আহ্লাদ করতে এসেছেন। আমাকে হোটেলের কাজ-কর্ম দেখতে হয়।'

"সত্যবাবু বললেন, 'আপনি যদি অমন খোঁটা দিতে সুরু করেন, আমিও সন্ধ্যা থেকে হোটেলের সব কাজ-কর্ম দেখব। কুটনো কোটা বাটনা বাটা সব ক'রে দেব। দেখবেন আমার অসাধ্য কাজ নেই।'

"হেসে বললাম, 'তা এখনই দেখতে পাচ্ছি।'

"কিছুতেই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। অনুরোধ নয়, জোর জবরদস্তি। তাঁর সঙ্গে সমুদ্রে যেতেই হলো। অবশ্য আমার সঙ্গে রণ্টু ছণ্টুরাও এল। উনি আসতে পারলেন না। তা হলে হোটেল খালি থাকে। এমন উপযুক্ত ঠাকুর চাকর নয় যে তাদের ওপর ভরসা করতে পারি।

"ছেলেদের নাওয়া হয়ে গেলে তিনি আমাকে জোর ক'রে সমুদ্রের মধ্যে টেনে নামালেন। আমি বললাম, 'একটা নুলিয়া নিন।'

"তিনি বললেন, 'এখানে আমার চেয়ে সেরা নুলিয়া কেউ নেই।'

"বললাম, 'নিজের ওপর আপনার যত বিশ্বাস আমার কিন্তু ততখানি বিশ্বাস নেই। আপনার সঙ্গে যেতে আমার ভয় ক'রে।'

"তিনি হেসে আমার দিকে তাকালেন, 'সত্যি? এবার কিন্তু আপনি আমার মনেও ভয় ধরিয়ে দিলেন।'

"আমি ভারী লজ্জা পেলাম। কথাটার যে আর এক রকমের অর্থ হয়, তা ভাবিনি।

"তিনি বললেন, 'চলুন, নেমেই যখন পড়েছি ভয় ক'রে আর লাভ কি, ডুবি যদি দুজনেই ডুবব।'

"ও'র মুখের কোন আগল নেই। কিন্তু ঠাট্টা তামাসা সব ওই মুখেই। আমরা আলাদা আলাদাই চান করলাম। তিনি আমার কাছেও এলেন। তীর থেকে ছণ্টুকে ফের ডেকে নিয়ে অনেকদূর অবধি সাঁতরে নিয়ে গেলেন। তবু আমি সেদিন ও'কে বেশী দেরি করতে দিলাম না। তাড়া দিয়ে তাগিদ দিয়ে সকাল সকালই ফিরে এলাম। এসে দেখি দু'চারজন লোক খেতে এসেছে, আর উনি মুখ গম্ভীর ক'রে বসে আছেন।

"বললাম, 'ব্যাপার কি।'

"উনি বললেন, 'ব্যাপার আবার কি। সব অগোছাল পড়ে আছে। লোকজন কোথায় কে বসে তার ঠিক নেই। কেবল একজনকে নিয়ে থাকলেই হবে?'

"বললাম, 'তার মানে?'

"উনি একটু হেসে বললেন, 'মানে কিছু নেই। বলছি কি, জিনিসটা চালু ক'রে ভালো করলে না। এর পরে সবাই যে তোমার সঙ্গে সমুদ্রে নাইতে চাইবে।'

"উনি অবশ্য ঠাট্টার সুরেই কথাটা আমাকে বললেন, তবু ধরনটা আমার ভারী বিশ্রী লাগল।

"বিকেল বেলায় দেখি সত্যবাবু চা খেতে খেতে মুচকি মুচকি হাসছেন।

"বললাম, 'হাসছেন যে।'

"তিনি বললেন, 'যতীনের মুখের ভাব দেখে। দেখুন এই ভয়েই বিয়ে করিনে।'

"'কোন্ ভয়ে?'

"'স্বামী হলেই হিংসুটে হ'তে হয়।'

"হেসে বললাম, 'আপনি ভয়ানক দুষ্টু।'

"দিন কয়েক বাদে উনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্য আগাম টাগাম কিছু কিছু দিয়েছে?'

"বললাম, 'না তো।'

"'তাহ'লে চেয়ে নাও।'

"'আমার লজ্জা করে। ঠাট্টা তামাসা করতে করতে তোমার পক্ষে চেয়ে নেওয়াই ভালো। আমি বলি আগাম নেওয়ার দরকারই

বা কি। চেনা জানা মানুষ। টাকা হাতে এলেই খরচ। মাসের শেষে থেকে টাকাটা পেলেই সুবিধে হবে।'

"উনি বললেন, 'যেটা সুবিধে হয় কর।'

"সত্যবাবুকে উনি কোন ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন কি না জানি না, দেখি সেইদিনই ঘুমুতে যাওয়ার আগে একখানা একশ' টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'বউদি, রেখে দিন।' আমি বললাম, 'একি এত টাকা দিয়ে কি হবে।'

"তিনি বললেন, 'আহা রেখে দিন না। আমি তো আর দু একদিনের মধ্যেই যাচ্ছি না। ভেবেছি এখানকার একেবারে পার্মানেণ্ট বাসিন্দা হয়ে থাকব।'

"হেসে বললাম, 'ভালোইতো। কিন্তু আপনার কাজকর্ম চাকরিবাকরির কি হবে?'

"তিনি বললেন, 'চাকরি একটা আপনার এই হোটেলেই আপনি ঠিক করে দেবেন। চাকরের সে পদের জন্যে একখানা দরখাস্ত এখনই দিয়ে রাখলাম।'

"বললাম, 'আহাহা, চাকরের মতই চেহারা-খানা কিনা।' তিনি হেসে আমার দিকে তাকালেন, 'নয় বুঝি? তাহলে চেহারাটাই কাল হলো দেখছি।'

"তিনি সব শুদ্ধ ঊনত্রিশ দিন এখানে ছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে কাছাকাছি অন্য জায়গাগুলিও দেখে টেখে এলেন। একদিন গেলেন কোণারক আর একদিন ভুবনেশ্বর। আমাকেও যাওয়ার জন্যে সাধাসাধি, টানা-টানি। কিন্তু হোটেল ফেলে আমি কি করে যাই। আমার কি একদিনও ছুটি নেওয়ার জো আছে। কিন্তু গিয়ে না দেখতে পারলেও সত্যবাবুর মুখে আমি সব শুনলাম। গল্প করতে ওঁরও ভারী আনন্দ। হোটেলের কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর তিনি বসে বসে গল্প করতেন। কতকাল আগেকার সেইসব সুন্দর সুন্দর মন্দির আর মূর্তি। ভারি নাকি চমৎকার দেখতে। আহা এত কাছে তবু দেখার ভাগ্য হলো না।

"এবার ওর যাওয়ার দিন এলো। কলকাতায় নাকি জরুরী কাজ আছে। চিঠি এসেছে। আর দেরি করবার জো নেই।

"আমি বললাম, 'কি মশাই, তবে নাকি একেবারে স্থায়ীভাবে থাকবেন? এখন এত তাড়া কিসের? এবার যদি যেতে না দিই।'

"তিনি বললেন, 'অমন করে বলবেন না বউদি। যতীন শুনলে এক্ষুণি ঘাড় ধরে বিদায় করে দেবে। ও তো আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।'

"বললাম, 'তাই না আরো কিছু। যত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার মতলব।'

"তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'নিজেরও যে দোষ নেই তা নয়। সেই ভয়েই তো পালাচ্ছি।'

"ওর কথার জবাব দেবে কে।

"আমার স্বামী এর মধ্যে কয়েকদিন টাকাটা চেয়েছেন। আমি দিইনি, দিলেই খরচ হয়ে যায়। ভেবেছি মাসকাবারের তেল কয়লার বিলগুলি ওই টাকা থেকে এবার শোধ দেব। এবার সত্যবাবুর যাওয়ার সময় সেই নোট-খানা বের করে আমার স্বামীর হাতে দিলাম। বললাম, 'হিসেব করে দেখ কত হলো, সব নিয়ে দরকার নেই। রুণ্টু ছণ্টুর জন্যে উনি তো এই আজও মিষ্টি নিয়ে এসেছেন, এর আগেও মাঝে মাঝে খরচপাতি করেছেন। কিছু বাদসাদ দিয়ে বাকি যা থাকে ওঁকে ফেরত দাও।'

"উনি নোটখানা নিয়ে মোড়ের স্টেশনারি দোকানটায় ভাঙাতে গেলেন। তারপর মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এসে বন্ধুর দিকে নোট-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সত্য তুমি আমার সঙ্গেও জাল জুয়াচুরি করবে এটা আশা করিনি।'

"আমি রান্না ঘরে মাংস মাখছিলাম। সেই লংকা হলুদ মাখা হাত নিয়েই ছুটে এসে দাঁড়ালাম। কী হলো! দেখি সত্যবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"আমি আবার বললাম, 'কি হয়েছে।'

"আমার স্বামী বললেন, 'এ নোট জাল?'

"সত্যবাবু বললেন, 'তা হবে, সব নোটই তো আর খাঁটি হয় না।'

"আমি বললাম, 'বিচিত্র কি, ও'র কাছে কেউ যদি জাল নোট গছিয়ে থাকে সে দোষ তো ও'র নয়।'

"আমার স্বামী আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি থামো।' তারপর সত্যবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'নোটখানা বদলে দাও সত্য।'

"'আমার কাছে তো আর নোট নেই।'

"'তাহলে খুচরো টাকাই দিয়ে দাও।'

"সত্যবাবু বললেন, 'তাও এখন নেই। তোমার টাকা আমি কলকাতা গিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

"আমার স্বামী বললেন, 'তার চেয়ে তুমি বরং এখান থেকে চিঠিপত্র লেখ, কি টেলিগ্রাম করে দাও, কালই টাকা এসে যাবে।'

"সত্যবাবু বললেন, 'সে হয় না। আমার আগে কলকাতায় যাওয়া দরকার।'

"আমার স্বামী বললেন, 'সেখানে গেলে তোমার আর পাত্তা পাওয়া যাবে নাকি? দেখ সত্য, এই পুরীতেই তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক রকম অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু তুমি যে আমার সঙ্গেও—; সত্যি তোমার গুণের অভাব নেই।' উনি একটু হাসলেন।

"সত্যবাবু বিদ্রূপটুকু স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'তা ঠিক।'

"উনি বললেন, 'বেশ, এতই যদি তোমার যাওয়ার তাগিদ ঘড়িটা রেখে যাও। টাকা পাঠালেই ওটা আমি তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

"আমি বললাম, 'ছিঃ, চেনাজানা মানুষ, এই সামান্য কটা টাকার জন্যে—'

"আমার স্বামী ফের ধমক দিলেন, তুমি চুপ কর।'

"সত্যবাবু ততক্ষণে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে ফেলেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তাতে কি। একটা স্মৃতিচিহ্ন অন্তত থাক।'

"কথাটা কাঁটার মত আমার বুকে এসে বিঁধল। আমি কাউকে কোন কথা না বলে সেখান থেকে উঠে গেলাম।

"তারপর তো এই বছর খানেক হলো, তিনি টাকাও পাঠাননি, ঘড়িও নেননি।

"আমি ও'কে কতদিন বলেছি, সত্যবাবুর খোঁজ নিয়ে তাঁর ঘড়িটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করো। উনি হেসে জবাব দিয়েছেন, 'তার খোঁজ করতে হলে পাঁচটা মহাদেশ চষে বেড়াতে হয়। আমার অত অর্থসামর্থ্য নেই। ঘড়ির জন্যে ভেব না। তার যা ব্যবসা তাতে এমন নিত্য নতুন ঘড়ি তার হাতে আসে। আর কেবল কি ঘড়ি? দেখি কিছুদিন, তারপর এটা বিক্রি করে তোমাকে একটা লেডীস ওয়াচ কিনে দেব। এটা তো তোমার আর হাতে বাঁধবার জো নেই।'

"বলেছি, 'আমি বাঁধতে চাইওনে।'

"সত্যবাবুর সম্বন্ধে আমার স্বামী যা শুনেছেন তা কতখানি সত্যি আমি জানিনে, কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর যদি কোনরকমে কোনদিন পরিচয় হয়ে যায় তাঁকে বলবেন টাকা কটা ফেলে দিয়ে তিনি যেন ঘড়িটা নিয়ে যান; তিনি যেন আমার মুখ রাখেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁকে কাকা বলে ডেকেছিল, তিনি যেন সেই ডাকের মান রাখেন।"

কমলা দেবীর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। হোটেলে লোকজন আসতে শুরু করেছে।

পরদিন ভোরে যখন আমি বিদায় নিলাম হোটেলের বাজার এসে গেছে। কমলা দেবী বঁটি পেতে বসে বড় একটা রুই মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছেন। আমার নমস্কারের বিনিময়ে সেই হাতেই হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার জানালেন।

রিক্সায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার জীর্ণ বাড়ি আর জংধরা সাইনবোর্ডখানার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সংস্কারের গতিপথ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাগবাজারের যাদব চাটুজ্যের বিধবা পত্নী সাবিত্রীবালার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে।

অন্তিম কাল অর্থে অবশ্য ঠিক অন্তিম মুহূর্ত নয়: যে স্বল্পীভূত কালের মধ্যে অন্তিম মুহূর্ত সুনিশ্চিত হয়েছে, সেই কাল দেখা দিয়েছে।

সাবিত্রীবালার বয়স আটষট্টি বৎসর অতিক্রম করেছে: ব্যাধি পুরাতন জ্বরাতিসার। এ বয়সে এ ব্যাধি শুকনো খড়ে কেরোসিন তৈলের ন্যায় মারাত্মক সংযোগ। চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতিগুলি সবই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। হোমিওপ্যাথরা প্রথমেই হাল ছেড়েছে: অ্যালোপাথরাও দিন চারেক হ'ল হার মেনেছে: সর্বশেষে কলিকাতার এক খ্যাতনামা কবিরাজ পাঁচনবড়ি খলনুড়ির আয়ুধ নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোনো দিকে সুবিধা কিছু দেখা যায় না,—সাবিত্রীবালার পরলোকগমনের পথে সবুজ পতাকা ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। যে অবসন্ন পাকযন্ত্র সামান্য জলবার্লি পরিপাক করতেও অক্ষম হ'য়ে পড়েছে, সে যন্ত্র উগ্র কবিরাজি ঔষধ থেকে গুণাবলি নিষ্কাশিত করে দেহের শিরা-উপশিরায় চালান দেবে, এমন সম্ভাবনা কবিরাজ তাঁর সুনিবিড় নাড়ী-পরীক্ষার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সাবিত্রীবালার দুই পুত্র, অজয়নাথ এবং অভয়নাথ। অজয়নাথের স্ত্রী প্রতিভাময়ীর দুই পুত্র ও এক কন্যা। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে অভয়নাথের স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করে মারা গিয়েছিল: তারপর অভয়নাথ আর বিবাহ করেনি।

সাবিত্রীবালার এই সংসার সুখের সংসারই বলতে হবে। বহুকাল পূর্বে স্বামীর এবং বৎসর আষ্টেক পূর্বে কনিষ্ঠ পুত্রবধূর মৃত্যু ভিন্ন এ সংসারে ও-কারবার এ পর্যন্ত বন্ধই ছিল। সম্প্রতি তৃতীয় কারবার আসন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু সে কারবার নিজের বিষয়ে। পরিণত বয়সে পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী রেখে পরলোক-গমন গৃহিণীর পক্ষে কামনারই কথা। সুতরাং মৃত্যুসাগরে প্রবিষ্ট হবার জন্য জীবননদী মোহানার এলাকায় উপনীত হয়েছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হলেও সাবিত্রীবালার মনে বিশেষ ক্ষোভ ছিল না।

কিন্ত সংসারের যে একান্ত অসহায় পদার্থটি হস্তপদমুখচক্ষুহীন হয়েও স্নানাহার পূজা-অর্চনার অপেক্ষা রাখে, সেই প্রাণেশ্বর শিবের কথা ভেবে সাবিত্রীবালার মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বছর দশেক পূর্বে ঘটনাচক্রে পড়ে এক অজ্ঞাত অপরিচিত সাধুর হস্ত হতে এই বিগ্রহটি কতকটা বাধ্য হয়েই তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রথমে নিতান্ত সাধারণ সৌজন্যের বশবর্তিনী হয়ে সে এক মামুলি পূজারীকে নিযুক্ত ক'রে অনাহূত অনীপ্সিত আগন্তুকের জন্য নিম্নতম সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল।

হয়ত নিতান্ত কৌতুকপরবশ হ'য়েই সাবিত্রীবালা মাঝে মাঝে পূজার সময়ে উপস্থিত থেকে পূজা দেখত। তারই অপ্রচুর অবকাশে সেই নিরবয়ব প্রাণহীন শিলাখণ্ড তার অন্তরের গোপন প্রদেশে নিঃসাড়ে অতর্কিতে যে সুদৃঢ় আধিপত্য স্থাপিত করেছিল, তা প্রকাশ পেয়েছিল যেদিন পূজার সময়ে কোনো বিষয়ে পূজার নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করে সে বলেছিল, "কাল থেকে আমি নিজে পুজো করব,—তোমাকে আর পুজো করতে হবে না পূজারী।"

বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হ'য়ে পূজারী জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেন না?"

অপ্রিয় কথা না বলে সাবিত্রীবালা উত্তর দিয়েছিল, "আমারই ত ঠাকুর,—ইচ্ছে হয় না আমার পুজো করতে?"

"কিন্তু মা, আপনি ত' সংস্কৃত মন্ত্র জানেন না?"

পূজারী বলেছিল, "কিন্তু মা, আপনি ত' সংস্কৃত মন্ত্র জানেন না?"

এ কথার উত্তরে সাবিত্রীবালা জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা ঠাকুর, এই বাণেশ্বর শিবকে তুমি কি মনে কর? —এ শুধু পাথরের নুড়ি, না এর মধ্যে ভগবান আছেন?"

ব্যগ্রকণ্ঠে পূজারী বলেছিল, "সে কি কথা মা! ভগবান নিশ্চয়ই আছেন।"

সাবিত্রীবালা বলেছিল, "তা যদি থাকেন তা হ'লে বাঙলা মন্ত্রেই চলবে; কারণ ভগবান যখন সর্বজ্ঞ, বাঙলা ভাষাও বুঝবেন। কিন্তু এ যদি শুধু নুড়ি হয় তা হ'লে, শুদ্ধই হোক আর অশুদ্ধই হোক, তোমার সংস্কৃত মন্ত্রেরই দরকার।"

এ কথার উত্তরে পূজারী আর কোনও প্রতিবাদ করা নিরর্থক মনে করেছিল।

কিন্তু পূজারীর প্রতিবাদ নীরব হলেও পরদিন আরম্ভ হয়েছিল পুত্রবধূ প্রতিভাময়ীর প্রতিবাদ। সকালে চায়ের বৈঠকে সাবিত্রীবালাকে অনুপস্থিত দেখে শাশুড়ীর কক্ষে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "চা খেতে গেলেন না মা?"

সাবিত্রীবালা উত্তর দিয়েছিল, "আমার একটু দেরি হবে বউমা, তোমরা খেয়ে নাও।"

"কেন?—দেরি হবে কেন?"

"একটু কাজ আছে।"

"কি কাজ মা?"

স্মিতমুখে সাবিত্রীবালা বলেছিল, "বিশেষ কোনো কাজ নয়,—কতকটা অকাজই বলতে পার।"

তখন পর্যন্ত প্রতিভাময়ীর খেয়াল হয়নি, —হঠাৎ সাবিত্রীবালার পরিহিত বস্ত্রের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে বিস্মিতকণ্ঠে সে বলেছিল, "এ কি মা! গরদের শাড়ি পরেছেন কেন?"

হাসিমুখে সাবিত্রীবালা উত্তর দিয়েছিল, "গরদের শাড়িও ঐ অকাজেরই অঙ্গ।"

অকাজটা বস্তুত কি, তা আবিষ্কার করতে প্রতিভাময়ীর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শাশুড়ীর সন্ধানে ইতস্তত ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ সে দেখে সেই কৃষ্ণবর্ণ নুড়ির সম্মুখে আসন পেতে ব'সে সাবিত্রীবালা নিমীলিতনেত্রা; তার করপুটে তামার কুশীর উপর উৎসর্জনোদ্যত পুষ্পার্ঘ্য।

সে সময়ে কোনো মন্তব্য না করে ধীর-পদক্ষেপে প্রতিভাময়ী সরে এসেছিল। কিন্তু প্রথম সুযোগেই সে সাবিত্রীবালাকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি। বলেছিল, "মা, আপনি তা হলে শেষ পর্যন্ত নিজেকে হারালেন।"

যদিও ব্যাপারটা বুঝতে সাবিত্রীবালার বিশেষ বাকি ছিল না, তথাপি হাসিমুখে সে বলেছিল, "নিজেকে পেলাম কবে বউমা, যে হারালাম? তবু কেমন করে হারালাম শুনি?"

হাসিমুখে প্রতিভাময়ী বলেছিল, "যেদিন আপনি দু হাত পেতে ঐ পাথরের টুকরো নিয়েছিলেন, সেই দিনই ভয় হয়েছিল একদিন হয়ত ওর মধ্যে নিজেকে হারাবেন। আজ তো তাই হ'ল মা। আজ ত' আপনি চোখ বুজে ঐ নুড়িকে পুজো করে এলেন।"

"অনেক কাজ চোখ বুজেই করতে হয় বউমা। খোলা চোখে বিচার বিবেচনার অসুবিধে আছে।"

"কিন্তু বিচার-বিবেচনার অসুবিধেকে পাথরের নুড়ি দিয়ে এড়িয়ে যাওয়াটাই ত কুসংস্কার মা? উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরকে যদি মানি ত তার অর্থ কিছু হয়ত বুঝি; কিন্তু নিষ্প্রাণ নুড়িকে মানার কি অর্থ থাকতে পারে তা বুঝিনে।"

একথার উত্তরে হাসিমুখে সাবিত্রীবালা বলেছিল, "ভয় পেয়ো না বউমা। ছেলেবেলায় নিষ্প্রাণ কাঁচের পুতুল নিয়ে মানুষ-মানুষ খেলা খেলেছিলে ত'! ধর এও আমার সেইরকম নিষ্প্রাণ নুড়ি নিয়ে বৃদ্ধ বয়সের ঈশ্বর-ঈশ্বর খেলা।"

প্রতিভাময়ী উত্তর দিয়েছিল, "এ কিন্তু আপনার শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হচ্ছে মা। ভয় পেতে আপনি মানা করছেন,—কিন্তু বিয়ের পর এ সংসারে এসে যে শাশুড়ীর মার্জিত রীতি-নীতি দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম, আজ যদি সেই লোরেটোর পাশ করা শাশুড়ী নুড়ি পুজো করতে বসেন, তা হলে ভয় না পেয়ে কি করি বলুন?"

এ কথারও সাবিত্রীবালা হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিল, "না, না, বউমা। ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার শাশুড়ী লোরেটোর পাশ করা মেয়ে, কিন্তু তুমি ত কনভেণ্টে বাস করা মেয়ে। লোরেটোর চেয়ে কনভেণ্টের কৌলীন্য অনেক জোরালো। এ সংসারের মার্জিত রীতি-নীতি তুমি বজায় রাখতে পারবে।"

২

এই যে শাশুড়ী-বধূর আলোচনার মধ্যে মার্জিত রীতি-নীতির উল্লেখ, এ যে-বস্তুই হোক না কেন, যাদব চাটুজ্যের পরিবারে এর আমদানী করেছিল প্রধানত যাদব চাটুজ্যের স্ত্রী সাবিত্রীবালা;—এবং পুত্রবধূ প্রতিভাময়ী করেছিল এ বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুষ্টি সাধন।

সাবিত্রীবালার প্রবেশের পূর্বে বাগবাজারের চাটুজ্যে বংশে একমাত্র লক্ষ্মীরই ছিল আসন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উপস্থিত সে বংশে পরস্পরের প্রতি বিরোধপরায়ণা বলে বিদিতা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সদ্ভাবের সহিত অবস্থিতি দেখে পাড়ার লোক ও আত্মীয়-স্বজন বিস্ময় বোধ করে। লক্ষ্মীর

পেঁচা এবং সরস্বতীর হাঁস নির্বিবাদে একত্রে এ বংশে বাস করছে। তবে এই ব্যতিক্রমের ব্যাপারে একটু বিবেচনার কথাও আছে। সরস্বতীর এই হাঁসটি ত ঠিক ভারতীয় মরাল নয়, পরন্তু বিলাতি সোয়ান (Swan); এমনকি সরস্বতী নিজেও বীণা-বাদিকা ততটা নন, যতটা গিটারবাদিকা। বোধ হয় সেই কারণে ইংরাজি সাহিত্য-পুস্তকহস্তা বিজাতীয়া সরস্বতীর প্রতি ভারতীয় লক্ষ্মীর স্বজাতিদ্রোহিতা ততটা উগ্র হ'তে পারে নি।

লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের বংশে অকস্মাৎ একদিন সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ দেখা গেল,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটা পরীক্ষা যাদবচন্দ্র কতকটা কৃতিত্বেরই সহিত উত্তীর্ণ হ'ল। তারপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল সাগরপারে ইংলন্ডের দিকে। বংশে নূতন আলোকের দীপ্ততর প্রভার মোহে যাদবচন্দ্রের পিতাও উল্লসিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু পাছে ইংলন্ড থেকে যাদব বিদ্যার সহিত একটি অবিদ্যাকেও সঙ্গিনী ক'রে নিয়ে আসে সেইজন্য পরামর্শ হ'ল বিবাহ দিয়ে কুমীরের পথ বন্ধ ক'রে তারপর বিলাত পাঠাবার।

মেমসাহেবদের দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে যাদবচন্দ্র যাতে স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষা-হীনতার তমিস্রা দেখে আহত না হয়, সেইজন্য জোর অন্বেষণ চলল শিক্ষিতা পাত্রীর। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধান পাওয়া গেল লোরেটো হ'তে সিনীয়ার কেমব্রিজ পাশ করা সাবিত্রীবালার। মহা সমারোহে যাদবচন্দ্রের সহিত তার বিবাহ হ'য়ে গেল।

বিবাহের কিছুকাল পরে, যাদবচন্দ্রের বিলাত যাবার কথা, কিন্তু সুরূপা সুশিক্ষিতা সাবিত্রীবালার যৌবন-সরোবরের মধ্যে তার বিলাতী শিক্ষালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন ঘাড় গুঁজে ডুব মারলে যে, কেউ তাকে টেনে তুলতে পারলে না; এমন কি, তার পিতাও না। অভ্যাসটা জিইয়ে রাখবার জন্যেই বোধ হয় সাবিত্রীবালা মাঝে মাঝে সখ ক'রে যাদব-চন্দ্রের সহিত ইংরাজিতে কথোপকথন করত; আর, স্ত্রীর মেমসাহেবি ভাষা ও উচ্চারণের নিকট নিজের ইংরাজি উচ্চারণের অপকৃষ্টতা অনুভব ক'রে যাদবচন্দ্র ইংলন্ড না যাবার খানিকটা ক্ষতিপূরণ লাভ করত।

সভ্যতা ও শিক্ষার যে দীপশিখাটুকু সাবিত্রীবালা তার পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসেছিল, যাদবচন্দ্রের এবং যাদবচন্দ্রের পিতার উস্কানিতে সংসারের চতুর্দিকে তা প্রভা বিকীর্ণ করলে। কালক্রমে একদিন কনভেণ্টে পড়া মেয়ে প্রতিভাময়ী এসে সেই প্রভাকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুললে। বাগবাজারের চাটুজ্যে পরিবার একটা নূতন ধরণের আলোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। একথা পাড়ার লোকের কাছে অবিদিত ছিল না।

একদিন চাটুজ্যে বাড়ি থেকে প্রাচীন কুল-পুরোহিতকে নির্গত হ'তে দেখে পাশের বাড়ির কর্তা বলেছিল, "কি ভট্‌চার্জি মশায়, এখনও তাহ'লে যাতায়াত চলছে?"

কথাটার নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে হাসিমুখে ভট্টাচার্য বলেছিল, "এই ক্বচিৎ-কদাচিৎ। সাবেক গৃহিণীর আমলে সবই ছিল, হালের গৃহিণীর আমলে প্রায় সবই গেছে।"

প্রতিবেশী বলেছিল, "ও প্রারটুকু যেতেও আর খুব বিলম্ব হবে না।...... বাড়িতে পাদ্রী সাহেবদের যাতায়াত আরম্ভ হয় নি?"

"বোধ হয় এখনো হয়নি।"

"না হ'লেও শীঘ্রই হবে। ক্রমশ ও পরিবারে অন্নপ্রাশন নামকরণ প্রভৃতি অসভ্য ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে ভট্‌চাজ্যি মশায়। —চালু হবে ব্যাপটিজ্‌ম্।"

ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ শব্দের যথার্থ অর্থ না বুঝলেও ভাবার্থ বুঝে "তা আশ্চর্য নয়" ব'লে হাসতে হাসতে ভট্টাচার্য প্রস্থান করেছিল।

এ সকল বহু পূর্বের প্রাগবাণেশ্বর যুগের কথা। উপস্থিত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হ'য়ে সাবিত্রীবালা তার মৃত্যুর পরে বাণেশ্বরকে নিয়ে যে সমস্যা উপস্থিত হবে তার দুশ্চিন্তায় নিমীলিতনেত্রে মগ্ন ছিল, এমন সময়ে কানে ডাক পেঁছিল, "মা!"

চোখ খুলে পেয়ালা হস্তে প্রতিভা-ময়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাবিত্রীবালার মুখে বিরক্তি দেখা দিলে। "কি এনেছ বউমা? বার্লি?"

প্রতিভাময়ী উত্তর দিলে, "হ্যাঁ মা, একটু খান।"

"বার্লি খেয়ে আর কিছু হবে না বউমা, বরং একটু জল দাও, খাই। দেহের মধ্যে বাঁধনগুলো আল্‌গা হ'য়ে আসছে, আর বেশি দেরি নেই।"

"এটুকু খেয়ে ফেলুন মা।"

"আচ্ছা খাচ্ছি। ঐ চেয়ারটায় ব'সে আ । একটা কথা শোন।"

নিকটবর্তী তেপায়ে বার্লির পাত্রটা রেখে চেয়ারে উপবেশন ক'রে প্রতিভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা মা?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সাবিত্রীবালা বললে, "আমার মৃত্যুর পর বাণেশ্বরজীর কি ব্যবস্থা হ'লে ভাল হবে শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। নুড়ি হলেও ভগবানের নাম-করা নুড়ি ত?—অনাদরে রেখে কাজ নেই। সেবার খরচের সালিয়ানা একটা ব্যবস্থা ক'রে বাণেশ্বরজীকে আখড়ায় দিয়ো। আখড়া কাকে বলে জান?"

"জানি, আখড়ায় অনেক বাড়ির ঠাকুরের একসঙ্গে সেবা হয়।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সাবিত্রীবালা বললে, "না বউমা, তাও কাজ নেই। ভট্‌চাজ্যি মশায়কে দিয়ে একটা দিন দেখিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিইয়ো। তাহ'লে আর কোনো গোল থাকবে না।"

কোনো কথা না ব'লে প্রতিভাময়ী চুপ ক'রে রইল।

অধীর আগ্রহে সাবিত্রীবালা বললে, "চুপ ক'রে থেকো না বউমা, উত্তর দাও।"

প্রতিভাময়ী বললে, "আচ্ছা মা, তাই হবে।"

সাবিত্রীবালার চক্ষুপ্রান্ত হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। প্রসন্ননেত্রে প্রতিভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এবার দাও তোমার বার্লি।"

৩

সেই দিনই মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রীবালার প্রাণবায়ু দেহ হ'তে নির্গত হ'য়ে মহাকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরদিন প্রত্যূষে প্রতিভাময়ী তার দেবর অভয়নাথকে বললে, "ঠাকুরপো, আজ তোমরা সকালে চা-টা কিছু খাবে না। দুপুর বেলায় হবিষ্যি করবে; আর, সন্ধ্যার পর ফল আর দুধ খাবে।"

সকৌতূহলে অভয় জিজ্ঞাসা করলে, "হবিষ্যি কি ক'রে করতে হয় বউদি?"

হাসিমুখে প্রতিভাময়ী বললে, "খেয়ে করতে হয়। আলোচালের ভাত, মটরডাল ভাতে, রাঙা আলু কাঁচকলা ভাতে গাওয়া ঘি দিয়ে একসঙ্গে মেখে খেতে হয়।"

'হবিষ্যি'র বিবরণ শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অভয় বললে, "ও ত' একরকম

পিণ্ডিই হলো বউদি। জীবন্ত অবস্থায় আমাদের পিণ্ডি খাওয়াবে না কি?"

প্রতিভাময়ী বললে, "ও কথা বলতে নেই। হবিষ্যি খুব ভাল জিনিস। এই অনিয়ম অত্যাচারের কয়েক দিন হবিষ্যি করলে শরীর তোমাদের ভাল থাকবে।"

পরদিন সোমবার। প্রত্যূষে অভয়নাথ প্রতিভাময়ীকে বললে, "কালকের মতো বারোটা হ'লে চলবে না বউদি। আজ নটার মধ্যে হবিষ্যি খাইয়ে দিয়ো, —নইলে অফিস যেতে দেরি হ'য়ে যাবে।"

অজয় এবং অভয় দুজনেই বড় বড় ইংরাজ সওদাগরি অফিসে উচ্চপদের কর্মচারী। নিজ নিজ অফিসের কেরানীরাও তাদের সেজ সাহেব ছোট সাহেব ব'লে উল্লেখ করে।

অফিস যাওয়ার প্রস্তাব শুনে প্রতিভাময়ী বললে, "আজ অফিস যাবে?"

"অবশ্য যাব।"

"দুজনেই?"

"দুজনেই।"

"কিন্তু কাচ গলায় দিয়ে যেতে হবে, তা মনে রেখো।"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে অভয় বললে, "বল কি বউদি! অর্ধনগ্ন অবস্থায় অফিস গেলে অফিসে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে।"

প্রতিভাময়ী বললে, "কিন্তু সুট পরে জুতো পায়ে দিয়ে গাড়িতে উঠলে পাড়ায় হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। তবে একান্ত যদি সুট পরে যেতে চাও, জুতো পরা কিছুতেই চলবে না, খালি পায়ে যেতে হবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অভয় বললে, "বল কি বউদি? সুট পরে খালি পায়ে অফিস গেলে আমার বড় সায়েব আমাকে দফতরীর টুলে বসিয়ে দেবে।"

"তবে দুই ভায়ে দরখাস্ত ক'রে ছুটি নাও। স্ত্রীর মাথা ধরেছে শুনলে সাহেবরা ছুটি দেয়, আর মা মারা গেছে শুনলে দেবে না?"

শেষ পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত ক'রেই কাচের সমস্যার সমাধান করতে হল। কিন্তু সংগে সংগে আর এক সমস্যা দেখা দিলে মাথা কামানোর প্রস্তাব নিয়ে।

প্রতিভাময়ী বল্‌লে, "ওমা, সে কি কথা! মা মারা যাওয়ার অশৌচ, চুল না ফেললে শুদ্ধ হবে কেমন করে?"

অভয় বল্‌লে, তুমি আস্তে আস্তে গোঁড়া হিন্দু হয়ে যাচ্ছ বউদি।"

প্রতিভাময়ী বললে, "বেশ ত' পাদ্রী ডেকে ক্রিশ্চান হ'য়ে চুল রাখ,—রাজী আছি। কিন্তু জাত লেখাবার সময়ে হিন্দু ব'লে জাত লেখাবে, অথচ মার অশৌচের চুল ফেলবেনা, —এ কেমন কথা!"

অজয় বল্‌লে, "আমার বড় সায়েব নতুন লোক, মাত্র দু মাস বিলেত থেকে এসেছে,— আমাকে ন্যাড়া দেখলে চিনতে পারবে না।"

অভয় বল্‌লে, "আমার বড় সাহেব চিনতে পারবে, কিন্তু পছন্দ করবে না। তার ফলে আমার মাথায় চুল ওঠা পর্যন্ত হয় সে অফিস আসা বন্ধ করবে, নয় আমাকে বন্ধ করতে হবে।"

প্রতিভাময়ী বল্‌লে, "তা হ'লে একেবারে মাস তিনেকের ছুটি নাও,—চুল উঠলে অফিস যেয়ো।"

অজয় বললে, "সর্বনাশ! এই যুদ্ধের দুঃসময়ে তিন মাসের ছুটি চাইলে চাকরি যাবে!"

প্রতিভাময়ীর মতের কিন্তু পরিবর্তন হ'ল না, বললে, "সে যাই হোক্, মাথা তোমাদের কামাতেই হবে।"

কামানের আগের দিন কিন্তু দুই ভাই অজয় ও অভয় একটা কাগজ হাতে প্রতিভাময়ীর নিকট উৎফুল্ল মুখে উপস্থিত হল। অজয় বললে, "মাথা কামাবার সমস্যার সমাধান হয়েছে প্রভা। খুব বড় এক পণ্ডিত বিধান দিয়েছেন।"

অনুত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "কি বিধান দিয়েছেন?"

"প্রায়শ্চিত্তের মতো কোনো ব্রাহ্মণকে দশ টাকা দশ টাকা ক'রে দান করলে মাথা মুড়োতে হবে না।"

"এ বিধানের জন্যে পণ্ডিতকে কত দিতে হল?"

"তাঁকেও দশ টাকা দশ টাকা কুড়ি টাকা। একুনে চল্লিশ টাকা। শস্তাই বল্‌তে হবে।"

"খুব শস্তা। ব্রাহ্মণ কি তিনিই হবেন?"

"তেমন কিছু বলেন নি, তবে আমরা ঠিক করেছি তাঁকেই দান করব।"

"তাই কোরো।"

"আর তোমার কোনো আপত্তি নেইত' প্রভা?"

মাথা নেড়ে প্রতিভাময়ী বললে, "না। পণ্ডিতে বিধান দিয়েছে, মুর্খে আপত্তি করবে কেন?"

পরদিন কিন্তু মুর্খের এক চালে পণ্ডিতের বিধান বানচাল হবার উপক্রম করলে।

বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট বাগানের মতো আছে, গংগার তীরে না গিয়ে সেই-খানেই ঘাট কামানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বার বাড়িতে দান গ্রহণের জন্য বিধানদাতা পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছে, এমন সময়ে বিনোদিনী নামে সংসারের আশ্রিতা এক বিধবা স্ত্রীলোক ছুটে এসে বললে, "বড়দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে! বউদিদি মাথা মুড়োতে বসেছেন, এতক্ষণে দিগম্বর বোধ হয় আধখানা মাথা কামিয়ে ফেললে!"

"বলিস কিরে!" ব'লে অজয়নাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলে,—পিছনে পিছনে অভয়নাথও।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দুই ভায়ে দেখলে প্রতিভাময়ীর কানের পাশে চুলে জল ঘষতে ঘষতে দিগম্বর নাপিত অনুযোগের নাকি-সুরে বল্‌ছে, "আমি কিন্তু বাপের জন্মে এমন বিশ্রী কাণ্ড শুনিনি!"

অজয় বললে, "একি কাণ্ড প্রভা!"

অবনত মস্তকে থেকেই প্রতিভাময়ী বললে, "মাথা মুড়োচ্ছি। আমার ত আর বড় সাহেবের ভয় নেই।"

অভয় বললে, "খুব জব্দ করেছ বউদিদি, এখন দয়া ক'রে একটু স'রে বোসো, আমরা দু ভায়ে মাথা মুড়োই। বড় সাহেবের ভয় নেই তোমার, কিন্তু আমাদের ওপর কি মায়াও একটু নেই? তুমি নেড়া হলে এ বাড়িতে ছ মাস টেঁকতে পারা যাবে না!"

৪

সাবিত্রীবালার অসুখ বেড়ে উঠলে বাণেশ্বরের পূজার জন্য একজন পূজারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিনোদিনী পূজার আয়োজন ক'রে রাখে, সুবিধামতো এক সময়ে এসে পূজারী পূজা সেরে যায়। নিরুপায় বাণেশ্বর এই ধরাবাঁধা আবেগ-বিহীন পরিচর্যায় বোধ করি অপ্রতিভ হ'য়ে সন্তুষ্ট থাকেন।

কিন্তু এই অতি সাধারণ পরিচর্যা কখন আরম্ভ হ'ল আর কখন হ'ল শেষ সে বিষয়ে একান্ত উদাসীন পরিজনবর্গের মধ্যে মাত্র একটি প্রাণী কয়েকদিন থেকে প্রতিদিন কোন এক সময় নিঃশব্দে অলক্ষ্যে এসে একটি প্রসাদ-কণিকা মুখে দিয়ে দেবতাকে কৃতার্থ ক'রে যায়, সে বার্তা বিনোদিনীরও আগোচর ছিল।

কিন্তু সাবিত্রীবালার মৃত্যুর সপ্তম দিনে সর্বপ্রথম বিনোদিনীর মনে ঘটনাক্রমে কথাটা সংশয়িত হ'ল। অভয়নাথের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সে বললে, "ছোড়দাবাবু, বারোটা বেজে গেল কিন্তু এখনও পূজারী না আসায় বাণেশ্বরজীর পূজো হল' না।"

ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে অভয় বললে, "তাতে বাণেশ্বরজীর এমন কি অসুবিধা হয়েছে?"

"কিন্তু বউদিদি যে এ পর্যন্ত জলস্পর্শ না ক'রে রয়েছেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে অভয় বললে, "কেন?"

"কি জানি। তিন-চার বার জল খাবার কথা বললাম, বলেন আচ্ছা আচ্ছা, হবে অখন। বোধ হয় বাণেশ্বরজীর পূজো না হলে খাবেন না।"

ত্বরিত পদে প্রতিভাময়ীর সকাশে উপস্থিত হয়ে অভয় বললে, "একি কথা বৌদি!"

সকৌতূহলে প্রতিভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা বলত?"

"তুমি নাকি বাণেশ্বরের পুজো না হ'লে জল খাবে না?"

কুণ্ঠিত চক্ষে প্রতিভাময়ী বললে, "কে বললে ওকথা তোমাকে? বিন্দি পোড়ারমুখী বুঝি? অমন হাউড়ে মানুষ দুটো যদি থাকে!"

বিনোদিনী অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল, প্রতিভাময়ীর মন্তব্য শুনে চট্ ক'রে অন্তরালে সরে গেল।

উদ্বেগক্ষুব্ধ কণ্ঠে অভয় বললে, "না, না, বৌদি, তুমি আমাদের ভাবিয়ে তুললে! তোমার নৈতিক পতন আরম্ভ হয়েছে!"

স্মিত মুখে প্রতিভাময়ী বললে, "কিচ্ছু ভাবনা নেই তোমার; নৈতিক পতন আরম্ভ হয়নি, ঠিকই আছি আমি।' তারপর এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে বললে, "দেখ, শুধু বাইরের দিকই ত' নয়, অন্তরের দিকটাও দেখতে হবে। সকলের পরিচর্যা না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির কেউ একজন অভুক্ত থাকলে, কি-জানি-যদি সংসারের একটু মঙ্গল হয়, তাহলে থাকলেই বা একজন কিছুক্ষণ অভুক্ত।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অভয় বললে, "হয়েছে বৌদি! ভেতরে ভেতরে কোন অশুভ মুহূর্তে ঐ সর্বনেশে 'কি জানি-যদি' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ তুমি,—আর তোমার কোনো আশা নেই! ঐ 'কি-জানি-যদি' মন্ত্রের জোরে আমাদের যত কিছু কুসংস্কার টে'কে আছে; আর, ঐ কি-জানি-যদি মন্ত্রের জোরেই তোমার বাণেশ্বরও আমাদের সংসারে টে'কে যাবেন। তারপর ঐ মন্ত্রেরই খিড়কির দোর দিয়ে একে একে ঢুকবেন ইতু, ঘেঁটু প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতারা। শোন বৌদি, তুমি বলছ বাড়ির সকলের পরিচর্যা না হওয়া পর্যন্ত একজনের অভুক্ত থাকা উচিত। হয়ত' উচিত; কিন্তু বাণেশ্বরের পরিচর্যা না হওয়া পর্যন্ত তোমার জল স্পর্শ করা চলবে না, একথাও কি তুমি বলতে চাও? বাণেশ্বরকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তা থেকে তিনি আধছটাকও খান না এ তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে? ইচ্ছে হয়, পুজোর আগে আর পরে নৈবেদ্য ওজন করে দেখো।"

সহাস্য মুখে প্রতিভাময়ী উত্তর দিলে, "মহাপুরুষদের স্মৃতিপুজোর দিনে তোমরা যে ফটোগ্রাফে মাল্যদান কর, সে মালা কি ফটোগ্রাফের গলায় পড়ে? পড়ে না। বিশ্বাস না হয়, এবার ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখো, মালা আটকে থাকে ফটোগ্রাফের ফ্রেমের কাঠে।"

অভয় বললে, "এসব যুক্তি হচ্ছে 'কি-জানি-যদি' মন্ত্রের তাঁবেদার যুক্তি, ইংরিজিতে যাকে বলে Sophistry। দোহাই বৌদি, এসব অপযুক্তির জালে জড়িয়ে পোড়োনা। এ পর্যন্ত তোমাদের সংসারে যেমন হয়ে আসছে, তোমার আমলে তাই বজায় থাক। সুনীতি থাকুক তোমার দেবতা, সুরুচি তার বাহন; আর, ঈশ্বর অদ্বিতীয় হ'য়ে অগোচরে বিরাজ করুন। পাঠিয়ে দাওনা তোমার বাণেশ্বরকে কোনো আখড়ায়, সব ল্যাঠা চুকে যাক্। মা ত' নিজে তোমাকে আখড়ায় পাঠাবার উপদেশ দিয়ে গেছেন।"

একটু চিন্তাবিষ্ট হয়ে প্রতিভাময়ী বললে, "এজমালি সেবার মধ্যে পাঠিয়ে কাজ নেই। ভট্‌চাজ্যি মশাইকে দিয়ে একটা শুভ দিন দেখিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়াব। সে কথাও মা ব'লে গেছেন। কিন্তু, আমি বলি কি ঠাকুরপো, মার শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ক'টা দিন আর বিদেয় করে কাজ নেই, বাণেশ্বরজী বাড়িতেই থাকুন।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অভয় বললে, "বাণেশ্বরজী? বাণেশ্বর নয়?"

হাসিমুখে প্রতিভাময়ী বললে, "আচ্ছা বাপু বাণেশ্বরই সই।"

ঈষৎ গভীর স্বরে অভয় বললে, "একটা কথা বলব বৌদি?"

"কি কথা বল?"

"বাণেশ্বরকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবার শুভদিন কোনোদিন আসবে না। তার বদলে শীঘ্রই আসবে সেই অশুভ দিন যেদিন তুমি নিজে তোমার বাণেশ্বরজীর পুজো আরম্ভ করবে।"

সহাস্যমুখে সজোরকণ্ঠে প্রতিভাময়ী বললে, "নিজে?—কক্ষণো নয়।"

সহজ সুরে অভয় বললে, "দেখা যাবে। ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখলাম।"

৫

ভবিষ্যদ্বাণীটা শুধু ফললই না,—ফলতে খুব বিলম্বও করলে না।

দিন আষ্টেক হ'ল সাবিত্রীবালার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম চুকে গেছে,—সংসার অনেকটা স্বাভাবিক ধারায় ফিরে এসেছে। বেলা আটটার সময়ে বারান্দায় ব'সে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অভয়নাথ উঠি উঠি করছিল, অফিস যাওয়ার চেষ্টায় এবার লাগতে হবে, এমন সময়ে পেছন দিক থেকে মাথার ওপর হিড়িক ক'রে জলের মতো কি পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভাময়ী, পরিধানে লালপাড় গরদের শাড়ি, কপালে সিঁদুর আর চন্দনের ফোঁটা, বাঁ হাতে কোশার ভিতর থেকে উঁচু হয়ে আছে একটা সাদা গোলাপ ফুল। সেইটেই বোধ হয় জল ছেটাবার অস্ত্র।

মাথায় হাত দিয়ে শুঁকে দেখে অভয় বললে, "কি ব্যাপার!"

প্রসন্নমুখে প্রতিভাময়ী বললে, "স্নান-জল।"

সবিস্ময়ে অভয় বললে, "স্নানজল? কার স্নানজল?"

"বাণেশ্বরজীর।"

"তা অন্য লোকের নাওয়া জল আমার মাথায় কেন?" তারপর হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি পুজো করলে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ও,—তাই।" আর কোনো মন্তব্য না ক'রে অভয়নাথ পুনরায় খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করলে।

প্রতিভাময়ী মনে করেছিল ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণ নিয়ে অভয়নাথ হয়ত খুব খানিকটা লাফালাফি করবে, নয় ত' বাণেশ্বরকে তার পুজো করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু অভয়নাথ সে-সব কিছুই না করায় অগত্যা সে বিনা অভিযোগেই কৈফিয়ৎ দিতে প্রবৃত্ত হ'ল; বললে, "তাই কেন, জানো? কাল হঠাৎ দেখি পুজোরীর দু' হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রী রকমের একজেমা। একজেমা না সারা পর্যন্ত ওকে আসতে মানা করেছি।"

খবরের কাগজটা ভাঁজ ক'রে পাশের টি-পয়ে রেখে প্রতিভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে অভয় বললে, "সে জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই, একজেমা ভারি ছিনে রোগ, সহজে সারতে জানে না।" তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "সংস্কারও কম ছিনে জিনিস নয় বৌদি, এও সহজে ছাড়তে চায় না; যুগে যুগে পুরুষে পুরুষে তার গতি বজায় রেখে চলে। এই দেখ না, বাণেশ্বর মার কাঁধে সওয়ার ছিলেন, উপস্থিত সওয়ার হয়েছেন তোমার কাঁধে, তারপর যথাসময়ে সওয়ার হবেন তোমার বউমার কাঁধে।"

মাথা নেড়ে প্রতিভাময়ী বললে, "কক্ষনো না। আমার কাঁধ থেকে তিনি আখড়ায় নেমে যাবেন। দিন দেখাবার জন্যে শীগ্‌গির ভটচাজ্যি মশায়কে ডাকিয়ে পাঠাতে হবে।"

"তোমার পুজোরীর হাতে একজেমা হয়েছে; তোমার ভটচাজ্যির পায়ে বাত হবে।" ব'লে অভয়নাথ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

(ক)

এক বৎসরের উপর হ'য়ে গেল, গত বৎসরের (১৩৫৯ সালের) পূজার কিছু পূর্বে, ক'লকাতায় এক শিল্প প্রদর্শনী হ'য়েছিল, পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন করেন। ভারতীয় চিত্রকলার আর অন্য শিল্পের একটি সংগ্রহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে দেখাবার কথা স্থির হয়। দিল্লীর কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের আনুকূল্যে ক'লকাতার অ্যাকাডেমি-অভ-ফাইন আর্টস—আমেরিকার জন্য এই ভ্রমণশীল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অ্যাকাডেমির পরিচালকগণ উদ্‌যোগী হয়ে নানা স্থান থেকে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের কাজ কিছু ছবি ভাস্কর্য প্রভৃতি সংগ্রহ করেন, আর সেই সংগ্রহ আমেরিকায় যাবে স্থির হয়। আমেরিকায় ভারতের শিল্পের নিদর্শন কি কি যাচ্ছে তা ক'লকাতার শিল্পরসিকদের দেখাবার জন্য এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—অ্যাকাডেমি-অভ-ফাইন আর্টস, ক'লকাতার মিউজিয়মের পিছনের বাড়ি "মিউজিয়ম হাউস"এ।

রাজ্যপাল ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এই উদ্‌ঘাটন-সমারোহ উপলক্ষ্যে এসে যথারীতি তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ ক'রলেন। এই ভাষণে কিভাবে এই প্রদর্শনী পাঠাবার কথা স্থির হয়, কেমন করে ছবির সংগ্রহ করা হ'ল, কাদের কাদের সাহায্য পাওয়া গিয়েছে এই কাজে, এই সব কথা রাজ্যপাল প্রকাশ করলেন, তাঁর লিখিত ভাষণ শেষ ক'রে, তিনি একটু চমকপ্রদভাবেই শ্রোতাদের কাছে বললেন—"এই তো আমার ভাষণ শেষ হল। এটা গতানুগতিকভাবে লেখা, এর মধ্যে যা বলা হ'ল সমস্তই হ'চ্ছে অ্যাকাডেমিরই কথা। আমার কথা নয়। আমি এইবার আধুনিক ভারতের শিল্পের প্রকাশ সম্বন্ধে আর শিল্পীদের আদর্শ আর কর্তব্য সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা আপনাদের কাছে ব'লবো।

"আমার মনে হয়, ভারতের শিল্পীদের কাজ হ'চ্ছে ভারতের যা সত্যকার জীবন আর সত্যকার আদর্শ তাই তাঁদের তুলির আঁচড়ে ছবিতে, আঙুলের আর হাতের কায়দায় মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা। এর জন্য চাই দরদ-ভরা চোখ,—এর জন্য চাই সত্য বস্তুকে ধরবার শক্তি, এর জন্য চাই যথার্থ শিল্পীর হাত।

"আমি নিজে শিল্পী নই, শিল্পরসিক নই। তবে জীবনে ছোটখাট এমন ঘটনা এমন ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে অহরহঃ আসে। সেগুলির ভিতরকার চিরন্তন সত্যকে ধ'রে শিল্পের মধ্যে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে পারলেই শিল্পীর কৃতিত্ব, তার শিল্পী নামের সার্থকতা। আমি এই রকম তিনটি ঘটনা বা তুচ্ছ ব্যাপারের কথা আপনাদের ব'লতে চাই।

"বহুদিন পূর্বে আমাকে একবার খুব সকাল সকাল রেলে ক'রে ক'লকাতার বাইরে যেতে হয়। বেলা সাতটা বোধ হয় তখনও হয়নি। আমি হাওড়া স্টেশনে এলুম। স্টেশনে তার পূর্বেই সাড়া প'ড়ে গিয়েছে, দিনের হৈ চৈ স্টেশন-হেন হট্ট-স্থানে আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। হাওড়া স্টেশনের বিরাট হ'ল-ঘরে তখনই মানুষের ভিড় বেশ লেগে গিয়েছে। আমি স্টেশনে পেঁছেছি, কি একখানা বাইরের ট্রেন স্টেশনের এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা প্লাটফর্মের লোহার বেড়া পেরিয়ে পিলপিল ক'রে শহরের পথের পানে আসছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ, লোকের কলরব—কুলী আর যাত্রীদের হৈ হৈ, শান্তি-পূর্ণ আবহাওয়া ত্রিসীমানায় নেই। আমি ধীরে ধীরে ভিড় কাটিয়ে ভুঁয়ের উপরে চ্যাটাই মাদুর শতরঞ্চি বিছিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যে-সব গ্রাম্য যাত্রীরা বসে রয়েছে তাদের বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্লাটফর্মের দিকে আমার গাড়িতে ওঠবার জন্য যাচ্ছি। সকাল বেলা, পূর্বদিকে গঙ্গার ওপারে সূর্য দেখা দিয়েছে, সূর্যের রশ্মি স্টেশনের মাঝের রাস্তা দিয়ে কতকটা প্লাটফর্মের ভিতরেও এসে প'ড়েছে। সেই ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে একটি দৃশ্য দেখে আমি যেন চমকে উঠলুম, অদ্ভুত সুন্দর লাগল। একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, বাঙালী, ব্রাহ্মণ, ভিড়ের মধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্লাটফর্মের উপরে একটু বসবার জায়গা ক'রে নিয়েছেন। সকাল বেলা, ওরই মধ্যে তিনি পূব দিকে মুখ করে, স্টেশনের মাঝখানে এক আপিসের কাঠের দেয়ালের দিকে ঘেঁষে আসন পেতে ব'সে, সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রছেন। মধ্য বয়সের মানুষটি, চোখ বুজে ব'সে বোধ হয় ধ্যান করছেন, মুখের উপরে পূবের আলো এসে পড়েছে। মুখের মধ্যে এমন একটা তন্ময়তা ফুটে উঠেছে, যে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ভদ্রলোক একাগ্রচিত্তে তাঁর উপাস্যের আরাধনা ক'রছেন, বাইরের এই হৈ চৈ চেঁচামেচি যেন তাঁকে স্পর্শ ক'রতেও পারছে না, নিজের মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রশান্তির মধ্যে যেন ডুবে র'য়েছেন। এই যে সংসারের গোলমালের মধ্যে থেকেও নির্লিপ্ততার সাধনা, এই যে ভগবানের চিন্তায় তন্ময়তা, এই যে ঈশ্বরকে ধরবার আকুল আবেগ, এটি আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটি মস্ত বড় দিক। এই জিনিসকে আমাদের শিল্পীরা ছবিতে আর মূর্তিতে ধ'রে নিয়ে বিশ্বমানবের চোখের সামনে উপস্থাপিত ক'রতে পারবে না?

"দ্বিতীয় ঘটনাটিও বহু দিনের কথা। মারাঠা দেশে পুণা স্টেশনে পেঁছেছি, স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। যেখানে যাবো, তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলছে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলাপ করছি। এদিকে চোখের সামনে আর একটি ব্যাপার ঘটছে, সেটির প্রতিও দৃষ্টি রাখছি। একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে, স্টেশনের ধারেই একটু ঘাসে-ভরা চাতালের

উপরে ব'সে, তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ভাত আর একটা তরকারির মতন তৈরী ক'রে থালায় সাজিয়ে খেতে বসতে যাচ্ছেন। মনে হ'ল, লোকটি দূরে থেকে যাত্রা করে এসেছেন, খাওয়া হয়নি হয়তো তাঁর পুরো একদিন। ক্ষুধার অন্ন রে'ধে খেতে বসবেন। এমন সময়ে সাহেবী পোষাক পরা একটি লোক, ফিরিঙ্গী বা মিশ্র জাতীয়, তাঁর খাবার জায়গার পাশ দিয়ে চলে গেল, লোকটির ছায়া ঐ ব্রাহ্মণের গায়ে আর প্রস্তুত অন্নের উপরে প'ড়ল। অমনি ব্রাহ্মণ বাড়া ভাত ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, কাউকে কিছু বললেন না। একজন ঝাঁটা হাতে ভাঙ্গী বা মেথর সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলেন, সে এল, ব্রাহ্মণের কথা শুনে কাপড় পেতে বসল, ব্রাহ্মণ থালা-সুদ্ধ ভাত তরকারি তার কাপড়ের উপরে ঢেলে তাকে দিয়ে দিলেন। তাঁর খাওয়া বোধ হয় সেদিনের জন্যও হ'ল না। আমি সব ব্যাপারটা দেখলুম। ব্রাহ্মণের মুখে কোনও রাগের লক্ষণ দেখলুম না। বরং একটু আত্মপ্রসাদের ভাব খুশি-খুশি ভাব। তাঁর এই সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির প্রতি আমি সহানুভূতি দেখাতে পারি না—মানুষের ছায়া পড়তেই অন্ন অশুদ্ধ হ'ল এ ধরনের সেকেলে মনোভাব আজকালকার মানুষের পক্ষে সমর্থন করা অসম্ভব। তাঁর নিজের ধর্মের সূক্ষ্ম বা উচ্চস্তরের বিচারও একথা স্বীকার করবে যে, সর্বভূতে যখন নারায়ণ তখন ভগবানের চোখে কোনও মানুষ অপবিত্র নয়। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা যখন ঐ ধরনের, সেই ধারণার বশেই তিনি সব কষ্ট মেনে নিয়েও চলতে রাজি, আর এইভাবে উপবাসের কষ্ট স্বীকার ক'রেও তিনি যে তাঁর আদর্শ পালন করতে পারলেন, তার জন্য তাঁর মুখে একটা তৃপ্তির ভাবও আমি দেখলুম। এই যে রাগ-দ্বেষহীন তৃপ্তি, নিজের উপরে দুঃখ নিয়েও যে ধার্মিক কর্তব্য পালনের তৃপ্তি, সেটা কি আমাদের শিল্পীদের হাতে ধ'রে রাখবার বিষয় নয়? সেটাও তাঁরা সমগ্র জগতের সহৃদয় ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না?

"আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ ক'রবো। মধুপুরে আমার একখানি বাড়ি আছে, পূর্বে অবসর যাপনের জন্য সেখানে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করতুম। ঐ অঞ্চলটা সাঁওতালদের দেশ। একদিন সকালে রাস্তায় একটি সাঁওতাল মেয়েকে দেখলুম। মাথায় একটা বড় মাটির কলসী নিয়ে চলেছে। গায়ের রং মিশ কালো, নাক চেপটা, ঠোঁট পুরু। দৈহিক সৌন্দর্য বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, তার কিছুই তার নেই—না গৌরবর্ণ গায়ের রঙ, না টিকোলো নাক, না পাতলা ঠোঁট, পরিষ্কার মুখ-চোখ। কিন্তু সবটা জড়িয়ে মেয়েটির আকৃতিতে এমন একটি স্নিগ্ধ শ্রী, একটা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ছিল, যা দেখে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। চোখ ফিরোতে পারা যায় না। গায়ের রঙ নিকষের মত কালো, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভা যেন ঠিকরে প'ড়ছে। গায়ের ত্বক্ অদ্ভুত মসৃণ। চোখে মুখে চলনে-বলনে আদিম যুগের সরলতা। মাথায় কলসী নিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে সহজভাবে চ'লছে যেন রানী। পরনে একখানা সাদা মোটা খদ্দরের শাড়ি, বোধ হয় আট হাতী হবে, প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে; কিন্তু তার চওড়া টকটকে লাল পাড়টা যেন জ্বলজ্বল ক'রছে; মেয়েটির মাথায় এক রাশ কালো চুল, এলো খোঁপা ক'রে ঘাড়ের উপরে বাঁধা, সাঁওতালরা ফুল ভালবাসে, চুলের মধ্যে মেয়েটি একটি লাল ঝুমকো জবা পাতাওয়ালা ছোট্ট ডাল-সুদ্ধ গ'জে রেখেছে। তার গায়ের কালো রঙ। আর চুলের কালো রঙের সঙ্গে শাড়ির চওড়া লাল পাড়, আর মাথার জবা ফুলের লাল অদ্ভুত সুন্দরভাবে মানিয়েছে—এই দুই কড়া রঙের সমাবেশ ভারী চমৎকার একটি সমঞ্জস বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। যে ভারতবর্ষ চলে যাচ্ছে, আমাদের গ্রামীণ জীবনে আর আদিবাসীদের জীবনে যে সারল্য আর সহজ সৌন্দর্য এখনও সহজলভ্য, তার ছবি, যেমন এই সাঁওতাল মেয়েটিতে দেখেছিলুম, তা আমাদের শিল্পীরা তুলে ধরতে পারবেন না?"

রাজ্যপাল মহোদয় এইখানেই তাঁর বক্তৃতা শেষ ক'রে দিলেন, তারপরে তিনি প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতে গেলেন। কাছেই আমি বসেছিলুম, আর পাঁচজনের সঙ্গে আমিও তাঁর অনুসরণ ক'রলুম। আমার পাশেই আমার বিশেষ পরিচিত আর শ্রদ্ধার পাত্র একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি বাঙালীদের মধ্যে একজন নামী ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে রাজ্যপাল মহাশয়ের বক্তৃতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটু প্রশংসামূলক আলাপও হ'ল। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন হ'য়ে গেলে, রাজ্যপাল মহাশয়কে আমি বললুম—আপনি তো পুরোপুরি কবি মানুষ। যে চোখে আপনি জীবনকে অবলোকন করেন তা তো অন্তর্নিহিত ভাবশুদ্ধি আর সৌন্দর্যে ভরপুর। এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি আপনি যে সরলভাবে আমাদের এখনই শুনিয়ে দিলেন, সেগুলি সেইভাবে যদি লিপিবদ্ধ করে দেন, কি ইংরিজিতে আর কি বাঙলায়, তাহলে এক অপূর্ব রস সৃষ্টি হবে। রাজ্যপাল মহাশয় বললেন, ওহে, দেখ জাতের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি, একটা উচ্চ-জীবনের আর আদর্শের হাওয়া এখনও বইছে। ব্রাহ্মণ্যের চিন্তার মধ্যে আর পরলোকসর্বস্বতার মধ্যে ভারতের সনাতন আত্মা এখনও বে'চে আছে। আমাকে লিখতে বলছো আমার সময় কোথা? —ঐ যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তুমি কথা কইছিলে ও'কে তুমি চেনো? আমি বললুম, হাঁ, ওঁকে খুব চিনি, উনি ভবানীপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী অমুক মুখুজ্যে। রাজ্যপাল বললেন, খাঁটী লোক হে, ওঁর কাছ থেকে দু গাঁট কাপড়ের প্রতিশ্রুতি এইমাত্র পেলুম—পুজো আসছে, ঘরছাড়া-শরণার্থীদের অবস্থা তো জানো, একখানা করে কাপড় দিয়েও যদি দু পাঁচজনের মুখে পুজোর সময়ে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটানো যায়, সেই চিন্তাই আমাকে এখন ভাবিয়ে তুলেছে। তাই দেখছ না, সকলের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে ঘুরছি।

(খ)

ছবি-আঁকা শিল্পীর আদর্শ সম্বন্ধে রাজ্যপাল মহাশয়ের মত মহাপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির কথা শুনে অনুরূপ বিষয়ে আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির চিন্তা আর কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

১৯২১ সাল, বত্রিশ বছর পূর্বের কথা, তখন লণ্ডনে ছাত্ররূপে আমি বাস করছি। কিছুকাল হ'ল ভারতবর্ষ বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী। লণ্ডনে YMCA কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় ছাত্রদের কেন্দ্র Shakspere Hut নামক বাড়িটিতে (এখন এ বাড়ির অস্তিত্ব আর নেই, Gower Street-এর পাশে এক ছোট রাস্তার উপরে কাঠের এই বেশ বড় এক-

তলা বাড়িটি তখন ভারতীর ছাত্রদের হৈ চৈয়ে গম গম করত) আহূত এক সভায় তিনি ছাত্রদের সামনে তাঁর সাম্প্রতিক ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা দেন। তখন ভারতে মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয়তা আন্দোলন, ইংরেজ সরকারকে বর্জন করার জন্য অসহযোগ অন্দোলন পুরো জোরে চলছে। ভারতে ছাত্রেরাও তাতে যোগদান করেছে। এই ইংরেজ শিল্পীটি একজন সত্যকার গুণী মানুষ ছিলেন, ভারতের অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাও হয়েছিল, কিন্তু বোধ হয় তাঁর মনের গোপন কোণে একটু প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ ছিল, এই-ভাবে সারা দেশে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তিনি বোধ হয় পছন্দ করেন নি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় ছাত্রদের উপদেশ দিলেন—দেখ, রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক সময়েই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তোমরা ছাত্রেরা সর্জনা-মূলক কাজেই লেগে যাও, বড় বড় বই লেখো, ছবি আঁকো, বড় বড় সংগঠনমূলক কাজকেই মুখ্যবস্তু বলে গ্রহণ করো, রাজনীতির ছ্যাঁচরামির ঊর্ধ্বে ওঠবার চেষ্টা করো।

তাঁর এই ধরনের মন্তব্যে ছেলেরা একটু বিচলিত হয়ে উঠল। এ যেন অযাচিত উপদেশ—ইংরেজ গুরুমশাইরাও তখন ভারতে ছাত্রদের এই রকম উপদেশ দিতেন, এই উপদেশের পিছনে ইংরেজের জাতিগত স্বার্থ আর প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখবার মনোভাবও উঁকি দিত। কাজেই কারো এ রকম কথা ভাল লাগত না। লন্ডনের ঐ সভায় সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের মনের কথা অতি চমৎকারভাবে বক্তার উক্তির উত্তরে বুঝিয়ে দিলে একটি গুজরাটী মুসলমান ছাত্র। কি যেন আব্বাসী ছিল তার নাম, এটা মনে আছে, সে ব্যারিস্টারী পড়ছিল, ছিল ইংলণ্ডে বসে কয়েক বৎসর ধরে। আব্বাসী বললে, "শ্রদ্ধেয় বক্তা মশায়ের উত্তরে আমি খালি বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জন রাস্কিনের একটি স্বকীয় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করবো, আর কিছু বলবো না। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বক্তা মশায় আমাদের রাজনীতি ছেড়ে গঠনাত্মক কাজ, কাব্য উপন্যাস লেখা, শিল্প রচনা করা, ভাল ভাল ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া প্রভৃতি কাজে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তাঁকে আমি রাস্কিনের নিজের লেখা এই অভিজ্ঞতাটুকু শোনাতে চাই।

"রাস্কিন বলছেন, বহুদিন পূর্বে তিনি ইংলণ্ডের এক পাড়াগাঁ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ছবি আঁকবার জন্য—প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটি গ্রামে এক ছোট গেঁয়ো হোটেলে তিনি গিয়ে ওঠেন। সেখানে পোঁছোবার পরের দিন, সকালবেলায় আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকায় মনের আনন্দে ছবি আঁকবার উদ্দেশ্যে তিনি ছবি আঁকার সরঞ্জাম—রঙ, প্যালেট বা রঙ মিশাবার পাটা, ইসেল বা ছবির ক্যাম্বিস বসাবার ফ্রেম, নিজের বসবার জন্য ছোট ক্যাম্বিসের টুল প্রভৃতি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন—গ্রামের বাহিরে গাছ-পালা আর নদীযুক্ত স্থানে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর বাসস্থান হোটেলে দোতলার একটি ঘর তিনি নিয়েছিলেন—দোতলায় ওঠবার পাথরের সিঁড়ি আবর্জনায় ভরা, আর বহুদিন সেই সিঁড়ি ধোয়া-মোছা হয় নি। তাঁর মন খুঁত খুঁত করতে লাগল—হোটেলের মালিককে ডেকে বললেন, বাপু হে, সিঁড়িটা ধুয়ে মুছে একটু পরিষ্কার করো না কেন? হোটেল-ওয়ালা বললে, মশাই, আমার অত সময় নেই, আর চাকরও আর নেই। কে অত কষ্ট এখন করে? অতিথিরাও কিছু বলেন না। রাস্কিন তখন কোনও জবাব না দিয়ে ছবি আঁকবার জন্যই বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু নোংরা সিঁড়ি বেয়ে তাঁর বাসগৃহে আবার গিয়ে উঠতে হবে, তাঁর মনে একটু অস্বস্তিভাব হচ্ছিল। শেষটা তিনি ছবি আঁকতে যাবার মতলব সে বেলার জন্য অন্ততঃ স্থগিত রাখলেন, ছবি আঁকার সরঞ্জামের বোঝা ঘাড়ে করে আবার গায়ের মধ্যে হোটেলে ফিরে এলেন। ঘরে জিনিসপত্র রেখে কোট খুলে কোমরে এক apron বা সাদা গামছা ঝুলিয়ে কামিজের আস্তিন গুটিয়ে তিনি স্বয়ং লেগে গেলেন সিঁড়ি সাফ করবার কাজে। পাতকুও থেকে বালতি বালতি জল এনে সিঁড়িতে ঢেলে বুরুষ দিয়ে ঘষে ঘষে সব পরিষ্কার করে ফেললেন। এইভাবে সারা সকালটা ছবি না এঁকে সিঁড়ি পরিষ্কার করার কাজেই কাটিয়ে দিলেন। সব যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, সিঁড়িটা ঝক ঝক করতে লাগল। তাঁর মনে একটা আত্ম-প্রসাদ এল। নিজের কৃতি দেখে নিজেই বললেন, That was one of the finest pictures I ever painted এই যে আবর্জনা সাফ করে স্থানটির পূর্ব শ্রী ফিরিয়ে আনলেন, এই তাঁর ছবি আঁকা হল।"

আব্বাসী তার বক্তব্য রাস্কিনের কথা বলেই সাঙ্গ করলে, টীকা টিপ্পনী কিছু করলে না। আমরা সকলেই বেশ খুশী হলুম, বেশ বুদ্ধিমানের মত আভাসে ইঙ্গিতে যা বলবার তা বলে দিলে। আমাদের সেদিনকার বক্তা নিরুত্তর হয়ে রইলেন—পরে শুনেছিলুম, বন্ধুদের কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁর আসল কথা ধরতেই পারে নি—সেটা হচ্ছে ধ্বংসের চেয়ে সৃজনের পথই শ্রেয়স্কর। কথাটা সত্য—কিন্তু তখনকার দিনে ভারতের যা অবস্থা ছিল তাতে করে রাষ্ট্রীয় জীবনে clean slate না হলে নোতুন করে আবার সুন্দর ছবি আঁকা, নবীন সৃজন সম্ভবপর ছিল না।

মারীচ

ই মেয়েটার জন্যেই যা কিছু ভাবনা আমার—আস্তে আস্তে কথাটা বললে কুশলদাস পোরবন্দরওয়ালা। ঠিক মাথার ওপর জ্বলছে ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা। তার আলোয় কুশলদাসের কাঁচা-পাকা ধূসর চুলগুলোকে হঠাৎ যেন বেমানান একটা পরচুলার মতো মনে হল। উঁচু কপালটার ছায়া পড়ে ক্লান্ত চোখ দুটোকে দেখালো দুটো অন্ধকার কোটরের মতো।

রতন সিং হাতের পাইপটার ছাই ঝাড়ল। অন্যমনস্ক গলায় বললে, সত্যিই দুর্ভাগ্যের কথা কুশলদাসজী। মেয়েটি আপনার দেখতে শুনতে ভালো, অথচ—

অথচ। সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে প্রথমে চোখে চমক লাগলেও তারপরেই আস্তে আস্তে মন সংকুচিত হয়ে আসবে। দ্বিতীয় বারের দৃষ্টিতে দেখা যাবে—গভীর কালো চোখের তারায় প্রাণের কোনো তরল তরঙ্গ খেলে বেড়াচ্ছে না; নিভে-যাওয়া মোমবাতির গলিত অংশের মতো কঠিন একটা আবরণ সেখানে। ঠোঁট দুটো সব সময়েই অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে—কোনো ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সে দুটোকে চেপে রাখতে পারেনি। উনিশ বছরের শরীরে তিন বছরের মস্তিষ্ক।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুশলদাস।

—সবই ভগবানের ইচ্ছা।

—সে তো বটেই।—এ ছাড়া সান্ত্বনার আর কোনো ভাষা খুঁজে পেল না রতন সিং। ট্রাউজারের পকেটে পাইপটা পুরে উঠে দাঁড়ালো।

—তাহলে কাল সকালে আপনি আসছেন

তো আমার বাংলোয়? কন্ট্রাক্টটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে?—রতন সিং উৎসুক প্রশ্ন করলে।

—আসব বই কি। জরুর।

—নমস্তে।

—নমস্তে।

পায়ের ভারী কম্বিনেশন জুতোটার আওয়াজ তুলে রতন সিং বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই সাড়া তুলল তার ল্যাণ্ড্ রোভারের এঞ্জিন, তারপরে বাইরের শান্ত অন্ধকারে শব্দের ঢেউ তুলে দূরান্তে মিলিয়ে গেল সেটা।

দু' হাতে কপালটা টিপে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল কুশলদাস। মনের ওপরে একটা অর্থহীন ভার। মাথার ভেতরে ছিন্ন ছিন্ন পেঁজা তুলোর মতো অন্ধকার ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। মৃদু অনিশ্চিত যন্ত্রণায় পীড়িত হচ্ছে সমস্ত স্নায়ু।

উঠে ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। কোথাও বাতাস নেই আজ—অসহ্য গুমোটে অন্ধকারটা আচ্ছন্ন। রতন সিংয়ের ল্যাণ্ড্ রোভার অনেক দূরে চলে গেছে এখন, তবু তার পোড়া তেলের গন্ধটা স্তব্ধ হয়ে আছে এখনো—যেন কাছাকাছি একটা কটুগন্ধ ফুল ফুটেছে কোথাও।

চোখ তুলল কুশলদাস। চক্রবাল ছাওয়া উঁচু নিচু মাঠের ওপরে তিমিরাবগুণ্ঠিত শালের বন। সেই শালবনের শেষে—প্রায় অনেকখানি আকাশের কাছাকাছি—মহাশূন্যে কতগুলো অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। এক একটা বিশাল অর্ধবৃত্তের আকারে জ্বলছে আগুন—মনে হচ্ছে অগ্নিমালা দুলছে

আকাশের গলায়, অথবা কেউ হাজার হাজার অলৌকিক চিতা জ্বেলে দিয়েছে শূন্যতার শ্মশানে। তামাটে মেঘের মতো তার উত্তাপ ছড়িয়ে আছে দিকে দিগন্তে।

পাহাড়ে আগুন জ্বলছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে জ্বলেনি—জ্বালিয়েছে মানুষেই। ওই আগুনে পুড়ছে বিড়ি-পাতার জঙ্গল। অগ্নি পরীক্ষায় ভালো হবে পাতাগুলো। হাজার হাজার মণ বিড়ি-পাতার জন্মভূমি উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের এই অরণ্য অঞ্চল।

কুশলদাস তাকিয়ে রইল আকাশ জোড়া অগ্নিবলয়ের দিকে। তিন পুরুষ ধরে এই সহরটায় তারাও বিড়ি-পাতার ব্যবসা করে আসছে। বিষণদাস পোরবন্দরওয়ালা অ্যাণ্ড সন্স। বিড়ি লীভ্‌স্ মার্চেণ্টস। বিষণদাস তার বাপের নাম। বিষণদাস মারা গেছে কুড়ি বছর আগে—অ্যাণ্ড সন্সের বড় ছেলে রামনিক্‌দাস এখানকার ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেছে সুরাটে। শুধু অতবড় নামটার ভার বয়ে এখানে ক্লান্ত দিন কাটিয়ে চলেছে কুশলদাস।

ব্যবসার সেদিন আর নেই। একবার অবশ্য স্বর্ণযুগ এসেছিল—উনিশ শো তিরিশ সালের পরে একটানা কয়েক বছর। মহাত্মা গান্ধীর নাম বুকে নিয়ে সেদিন বিলিতী সিগারেট বর্জন করেছিল সারা ভারতবর্ষের মানুষ। লাখপতিরা পর্যন্ত দামী সিগারেটের টিন রাস্তায় ফেলে দিয়ে বিড়ি ধরেছিলেন। তারপর আবার উল্টো মুখে চাকা ঘুরে গেল—যে বেগে বিলিতী সিগারেট চলে গিয়েছিল, তার দ্বিগুণ বেগে ফিরে এল আবার। সেই সঙ্গে মাথা চাড়া দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরাও। বিষণদাস কোম্পানিকে ছাড়িয়ে উঠল আরো পাঁচ-সাতটা গুজরাটি কোম্পানি—দু' একজন বাঙালী এসেও ভাগ বসালো তার ওপরে।

হয়তো ভালোই করেছে রামনিকদাস। তার চিঠিপত্রে কুশলদাস জানতে পারে ঘিয়ের ব্যবসায় সে মুঠো মুঠো টাকা কুড়োচ্ছে এখন। কুশলদাসও পারত। যে ব্যবসায় এখন আর শাঁস নেই, সময় থাকতে তা বিক্রী করে দিয়ে শুরু করতে পারত নতুন পালা। কিন্তু এখানকার এই সারি সারি পাহাড় আর প্রেতভূতির মতো অরণ্য—এই পাথরের মতো লাল মাটি—এই শান্ত নির্জীব দিন—এ যেন তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কুশলদাসের মনে হয় কী যেন একটা আছে এখানে—একটা মায়া—একটা যাদু। তারই জালে সে জড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। জীবনের শেষ দিনগুলো এরই মধ্যে কাটাতে হবে তাকে—তার মুক্তি নেই।

পেছন থেকে কার ছোঁয়া লাগল। ফিরে তাকালো কুশলদাস। একটা অস্ফুট আওয়াজ এল : রোটি।

মেয়েটা। বাসমতী। দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলল একটা। বুড়ী ঝিটা আজ হয়তো দাঁত মেজে দেয়নি ওর।

বাসমতী আবার বললে, রোটি!—ক্ষিদে পেয়েছে ওর।

সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে কুশলদাস বললে, চল্ বেটি—চল্।

সকালে উঠে গ্যারেজ থেকে পুরোনো গাড়িটা বের করলে কুশলদাস। বহুদিন আগেকার জার্মান গাড়ি। বাইরের চেহারাটা লক্কর হয়ে গেছে, চটে গেছে রঙ—টোল খেয়েছে এখানে ওখানে। পেছনের একটা মাড্-গার্ড উড়ে বেরিয়ে গেছে অনেকদিন আগে, চলার সময় বুড়োর দাঁতের মতো ঝর্‌ঝর্ করে সামনের বনেটটা। কিন্তু অনেক যুদ্ধে জেতা সেনাপতির মতো এঞ্জিনটা শক্ত আছে এখনো। কখনো কখনো তেল টানে না কারবুরেটারে—চলতে চলতে অসন্তুষ্ট গুঞ্জন তোলে এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো। তবুও বিশ্বাসী পুরোনো সঙ্গী গাড়িটা। প্রতিবাদ করে, বিদ্রোহ করে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট স্টার্টার হ্যাণ্ডেল মারবার পর এঞ্জিন সাড়া দিলে। কুশলদাস বেরিয়ে পড়ল রতন সিংয়ের বাংলোর উদ্দেশে।

পীচের নতুন মসৃণ পথ। পীচ তো দূরে থাক, পথটার অস্তিত্বই ছিল না আগে। বড় বড় পাথর, এলোমেলো জঙ্গল আর উঁচু-নিচু টিলা ছড়িয়ে ছিল অমার্জিত আদিমতায়। কিন্তু ভানুমতীর খেল্ লেগেছে কয়েক বছরে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে হিংস্র পাহাড়ী নদীর ওপরে তৈরি হচ্ছে নতুন বাঁধ। যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ ঘুরে বেড়াত, বাঘের সোনালি শরীর গুঁড়ি মেরে থাকত ঝোপের আড়ে, মণির মতো রোদ চমকাত রাজ-গোক্ষুরের ফণায়—আজ সেখানে গোড়া-পত্তন হয়েছে মসৃণ ক্যাল্‌কাটা বম্বে হাইওয়ের। জঙ্গলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নদীর এপারে-ওপারে তৈরি হয়েছে বিদ্যুৎ-ঝলমলে সারি সারি কংক্রীটের বাংলো। সারা ভারতবর্ষ থেকে এসে জড়ো হয়েছে এক্‌জিকিউটিভ, এস-ডি-ও, কেরানী আর কণ্ট্রাক্টারের দল।

মৃত দানবের পাঁজরার ওপরে ময়-দানবের কাণ্ড-কারখানা। চলতে চলতে ক্লান্ত চোখে তাকালো কুশলদাস। সমস্ত আয়োজনগুলোকে কেমন অনধিকারের মতো মনে হয়—মনে হয় স্পর্ধার মতো। এর পরে তৈরি হবে বড় বড় হ্রদ—ভেঙে যাবে লক্ষ একর অরণ্যভূমি। এই পাহাড়—এই জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এদের ওপর কেমন একটা জান্তব মায়া পড়ে গিয়েছিল কুশল-দাসের। কখনো কখনো একটা অর্থহীন বেদনা পীড়ন করে তাকে; হয়তো অনভ্যাসের ব্যথা, হয়তো অপরিচিতের প্রতি সংশয়। মাটির বুক সহস্রদীর্ণ করার এই যে আয়োজন—এ যেন আঘাত করতে থাকে তারও বুকের ভেতরে।

এতদিন এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রতি কোনো লক্ষ্যই ছিল না তার। যেমন নির্লিপ্ত নিরাসক্তির মধ্যে সে তলিয়ে ছিল—তেমনিভাবেই আত্মমগ্ন হয়ে থাকত সে। তৈরি হত দৈত্যের মতো বাঁধ—জোনাক-জ্বলা বনের ভেতরে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠত হাজার হাজার কিলোওয়াটের দীপালি—নতুন মানুষের চলাফেরায় নতুন হয়ে আসত এই নগণ্য শহর। কিন্তু সেদিনও দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে দুলত অগ্নিবলয়; গুণতে হত হাজার হাজার বস্তা বিড়ির পাতা। জড়বুদ্ধি অসহায় মেয়েটার দুশ্চিন্তায় বোবা করুণার মালা গেঁথে গেঁথে কেটে চলত দিন। কিন্তু রতন সিং—

চৈত্রের সকাল। এরই ভেতরে রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে জ্বলন্ত রুপোর মতো। পাশের একটা ন্যাড়া পাহাড়ের কোলে সূর্যস্নান করছে দীর্ঘ সেগুন বন; একটি পাতা নেই তাদের গায়ে, আচমকা মনে হয় কঙ্কালবাহু মেলে একদল প্রেত দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ ছেঁড়া চুলের মতো শুকনো শ্যাওলা ঝুলছে পাথরে পাথরে। ঝর্ণার শুকনো খাত যেন ঝুলে পড়া মরা সাপের জিভ।

কংক্রীটের একটা নতুন ব্রীজের ওপর উঠে এল গাড়ি। যে নদীকে বাঁধবার জন্যে এত আয়োজন—বড় বড় পাথরের বাঁধনে সে পড়ে আছে নির্জীবের মতো। হঠাৎ নদীটার জন্যে একটা সুগভীর করুণায় ভরে উঠল তার মন। চারদিকের চড়া রোদে পিপাসা জ্বলে উঠল গলার ভেতরে—যেন খানিক সিরিশ কাগজ কেউ ঘষছে সেখানে।

কলোনি শুরু হয়ে গেছে। শাখার মতো ছোট ছোট পথ ছড়িয়ে গেছে দু' পাশে। তারই একটা ধরে বাঁক নিলে কুশলদাস। এসে পৌঁছুল ছোট একটা বাংলোর সম্মুখে।

গাড়ির শব্দে বেরিয়ে এল রতন সিং।

—আসুন—আসুন।

দু'খানি ঘরের কোয়ার্টার—তারই এক-খানাতে ড্রয়িং রুম করে নিয়েছে রতন সিং। কয়েকটা সোফা। একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল। একরাশ ফাইল, খানকয়েক ডাইরি, একটা ব্লু-প্রিণ্ট্। অকারণে একটা গ্লোব

দাঁড়িয়ে আছে সকলের মাঝখানে, আর তার দু'পাশে দুটো শূন্য ফুলদানি।

ঠান্ডা ছায়ায় ঘেরা ঘর। রতন সিং মাথার ওপরকার পাখাটা খুলে দিয়েছে। শরীর জুড়িয়ে গেল।

—একটু চা খাবেন কুশলদাসজী?

—না, এক গ্লাস জল।

—আচ্ছা, আনাচ্ছি—

রতন সিং বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কুশলদাসের চোখ প্রথমে দেওয়ালে একটি বাঁধানো ফোটোর ওপর গিয়ে পড়ল। মাথায় পাগড়ি আর গায়ে শেরোয়ানি পরে দেশী পোষাকে রতন সিং দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে আছে তৃপ্তির সরল হাসিতে। ওর স্ত্রীই নিশ্চয়। বাসমতীকে মনে পড়ল—জ্বালা করে উঠল চোখ। কুশলদাস দৃষ্টি নামিয়ে আনল। হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে গ্লোবের বৃত্তটা। ওটা কেন কিনেছে রতন সিং? পৃথিবীতে যেখানে যত রিভার স্কিম আছে, সবগুলোতে কণ্ট্রাক্টারি পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে নাকি ও?

রতন সিং ফিরে এল। পেছনে চাকরের হাতে একটা ট্রে। তার ওপর ফুলকাটা কাচের গ্লাসে সবুজ রঙের সরবৎ।

—এ আবার কেন?

সামনের সোফায় রতন সিং বসে পড়ল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, ও কিছু না—ঘরেই থাকে। যা গরম এখানে!

গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলে কুশলদাস।

রতন সিং বললে, গোবিন্দরাম এখুনি আসবেন। আমি খবর পাঠিয়েছি।

সামনের একটা টিপয়ে কুশলদাস দ্বিধাভরে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। বললে, কিন্তু কণ্ট্রাক্টারির কাজ বিশেষ কিছু তো জানা নেই আমার।

রতন সিং হাসলঃ এখানে যারা কাজ করছে তাদের অর্ধেকই আপনার চেয়ে কম জানে। খাটবে কুলিরা—দেখবে অন্যলোক—আপনাকে শুধু বিল দিতে হবে আর মজুরি মেটাতে হবে।

—কিন্তু কিছু টাকা তো অন্তত চাই।

—আপনার তো সাবকণ্ট্রাক্ট। টাকা দেবেন গোবিন্দরাম। মাঝখান থেকে কমিশন আপনার।

সরবতের গ্লাসটা তুলে নিয়ে কুশলদাস এক চুমুকে শেষ করল এবার। তাকাল বিহ্বলের মতো।

—কিন্তু আমাকে এত বিশ্বাস করবেন কেন গোবিন্দরাম?

—বিশ্বাস করার লোকই তো খুঁজছেন উনি। এতদিন অনেক ঠকেছেন—এবারে চান খাঁটি মানুষ। সেদিক থেকে আপনার ওপরেই সব চেয়ে নির্ভর করা যায়। ত্রিশ বছর ধরে ব্যবসা করছেন—তা ছাড়া শহরে মানী লোক আপনি। আর—

আর? কুশলদাস তাকিয়ে রইল।

—আমি বিশেষ করে বলেছি আপনার কথাই। গোবিন্দরাম আমাকে জানেন।

কুশলদাস তবু জবাব দিল না। একটা জিজ্ঞাসা ঘুরছে নিজের ভেতরে। কেন এমন বিশেষ করে তারই কথা বলছে রতন সিং? কী দেখেছে তার মধ্যে? যে কণ্ট্রাক্টারির জন্যে তার কোনোদিন কোনো লোভই নেই, কেন তারই মধ্যে তাকে টেনে নামাতে চাইছে এমন করে?

রতন সিং বললে, গোবিন্দরামকে খুশি করুন কুশলদাসজী। টাকার জন্যেই দেশ ছেড়ে এত দূরে আমি ছুটে এসেছি,,

—বসুন, বসুন। বাত্‌চিত হোক।

শুরু হল আলোচনা। বাঁধের কথা, লেবারের কথা, জেনারেল ম্যানেজারের আর এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ারের কথা—ডান হাতে বাঁ হাতে কে কি রকম গুছিয়ে নিচ্ছে তার কথা। তিক্ত ক্ষোভ। তীব্র পরচর্চা। জ্বালা ধরা মন নিয়ে অশ্লীল নারী-ঘটিত ইঙ্গিত। একটা চুরুট ধরিয়ে গোবিন্দরাম বলে চলল, রতন সিং খেই ধরিয়ে দিতে লাগল।

শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোবিন্দরাম।

—আমাদের মতো অনেস্ট্ কণ্ট্রাক্টার যারা, তাদেরই কিছু হয় না। যারা চুরি করতে পারে, তাদেরই পোয়া বারো। আমাদের বিল ছ মাস এক বছরে আদায় হয়

কাঁপছে—এক
করছে এঞ্জিন।
...নতে পাচ্ছে ওর
...ন্য চঞ্চল হয়ে উঠছে
করতে হবে মেয়েটাকে—
...য় দিতে হবে আজ। বড়
...গেছে এতদিন।

সই করে

আপনিও এসেছেন। কী হবে বিড়ি-...
ব্যবসা করে? দশ বছরে যা আপনি...
তাই আপনার হাতে চলে ...
মাসের মধ্যে।

চাকরটা ফিরে এল। ...
রামজী।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দ...
দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল...

গোবিন্দরামজী ...
উগ্র সাহেবিয়ানা। ...
টাক কপালের ...
লাল টকটকে ...

—পণ্ডিত ...
কুশলদাসজী ...

—ভারী ...
বাড়িয়ে ...
মনে হল ...
চেপে ...য়ে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো

একবার কিছু একটা ভাবতে চাইল কুশলদাস, কিন্তু ভাববার মতো কিছু খুঁজে পেল না। মনের মধ্যে শক্ত শিকড়ওয়ালা চারাগাছের মতো কী একটা উপড়ে ফেলল সজোরে, তারপর খস্ খস্ করে সই করে ফেলল কাগজটায়।

—কাল থেকেই শুরু হোক। কী বলেন কুশলদাসজী?

—তাই হোক।—পীড়িত জবাব দিলে কুশলদাস। কপাল থেকে খানিকটা ঘাম মুছে ফেলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু কপালে কোনো ঘাম ছিল না।

গোবিন্দরাম মস্ত একটা হাই তুলল: যাক—একটা দুর্ভাবনা মিটল আমার। নিজের দেশোয়ালী লোককে কাজ দিয়ে কী ঠকাই ঠকেছি! এবারে স্বস্তি পাব।—গোবিন্দরাম রতন সিংয়ের দিকে তাকালো: আজ আমার শিকারে যেতে ইচ্ছে করছে।

—বেশ তো, খুব ভালো কথা।—রতন সিং উৎসাহিত হয়ে উঠল: চলুন না রঙ্গামার জঙ্গলে আপনিও যাবেন নাকি কুশলদাসজী?

দিন —আমি?

ব্যবসার সে...নি কি কখনো শিকার অবশ্য স্বর্ণযুগ

তিরিশ সালের পরে ...শীর্ণ হাসি হাসল মহাত্মা গান্ধীর নাম ... আজকাল।

বিলিতী সিগারেট বর্জন ...রে, সে কি আর ভারতবর্ষের মানুষ। লাখ ...গোবিন্দরাম হেসে দামী সিগারেটের টিন রাস্তা... যেতে হবে বিড়ি ধরেছিলেন। তারপর আব...

মুখে চাকা ঘুরে গেল—যে বেগে ... সিগারেট চলে গিয়েছিল, তার দ্বি... বেগে ফিরে এল আবার। সেই সঙ্গে মাথ... চাড়া দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরাও। বিষণদাস কোম্পানিকে ছাড়িয়ে উঠল আরো পাঁচ-সাতটা গুজরাটি কোম্পানি—দু' একজন বাঙালী এসেও ভাগ বসালো তার ওপরে।

হয়তো ভালোই করেছে রামনিকদাস। তার চিঠিপত্রে কুশলদাস জানতে পারে ঘিয়ের ব্যবসায় সে মুঠো মুঠো টাকা কুড়োচ্ছে এখন। কুশলদাসও পারত। যে ব্যবসায় এখন আর শাঁস নেই, সময় থাকতে তা বিক্রী করে দিয়ে শুরু করতে পারত নতুন পালা। কিন্তু এখানকার এই সারি সারি পাহাড় আর প্রেতভূতির মতো অরণ্য—এই পাথরের মতো লাল মাটি—এই শান্ত নির্জীব দিন—এ যেন তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কুশলদাসের মনে হয় কী যেন একটা আছে এখানে—একটা মায়া—একটা যাদু। তারই জালে সে জড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। জীবনের শেষ দিনগুলো এরই মধ্যে কাটাতে হবে তাকে—তার মুক্তি নেই।

পেছন থেকে কার ছোঁয়া লাগল। ফিরে গেছে। হারিয়ে গেছে ঘুমন্ত গ্রামগুলোর আলোর ছিটে।

পথটা পাহাড়ে উঠেছে খাড়াই বেয়ে বেয়ে। গোবিন্দরাম গাড়ি থামালো।

—জঙ্গল এসে গেছে। স্পট্‌টা জ্বালাও রতন সিং। গাড়ির ব্যাটারী কেমন তোমার?

—একদম নতুন।

—ঠিক আছে।

স্পট্ লাইট বের করে ব্যাটারীর সঙ্গে তার জড়াতে লাগল রতন সিং—গোবিন্দরাম সাহায্য করতে লাগল তাকে। আর কুশলদাস বসে রইল তেমনি নিথর হয়ে। এক হাতে ধরা আছে রাইফেলটা। কতদিন শিকার করেনি—কতদিন একটা গুলীও ছোড়েনি সে। তাই আজ রাত্রে অরণ্যটাকে অদ্ভুত আর অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে তার। ঝিঁঝির স্বর বাজছে—থেকে থেকে উঠছে কুক্কোর ডাক। অন্ধকার জঙ্গলে যেন একা প্রহর জাগছে পাখিটা।

জঙ্গলের রাত। অচেনা—মৃত্যুময়। নিজের ভেতরেও যেন তেমনি কোনো একটা অরণ্যের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কুশলদাসের। যেন পথ খুঁজে পাচ্ছে না—যেন নিজেই জানে না, হাতড়াতে হাতড়াতে কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে সে। আচমকা মনে পড়ে গেল আসবার সময় বাসমতীকে ঘুম পাড়িয়ে আসেনি আজ। ঘুমিয়েছে তো মেয়েটা? শোয়ার সময় সে চুলে হাত বুলিয়ে না দিলে ঘুম আসে না ওর। উনিশ বছরের শরীরে তিন বছরের মস্তিষ্ক—অসহায় শিশুর মতো কুশলদাসের মধ্যেই ওর মরে যাওয়া মাকে খুঁজে পায়।

মৃদু বেদনার আমেজটা কেটে গেল গোবিন্দরামের কর্কশ গলায়।

—ব্যাস্—ঠিক হো গিয়া। আমি গাড়ি টা...চ্ছি—তুমি স্পট্ লাগাও রতন সিং।

ওপরে ...ড নড়ল। চলল মন্থর গতিতে। দু ঝাঁকে ... নিঃশব্দ কালো জঙ্গলের ওপর সোনালি শ...র নীলাভ আলো নেচে চলল আড়ে, মণির ...খর মতো।

গোক্ষুরের ফণায় পত্তন হয়েছে মসৃ... হাইওয়ের। জঙ্গলে ...আওয়াজ করল একটা—নদীর এপারে-ওপারে ...ড়ালো গাড়ি। ঝর্ণার ঝলমলে সারি সারি ...সীমান্তে একরাশ সারা ভারতবর্ষ থেকে এ... হয়ে দাঁড়িয়েছে এক্‌জিকিউটিভ, এস-ডি-...লোয় দপ্ দপ্ কন্‌ট্রাক্‌টারের দল। ...প—জানোয়ারের

মৃত দানবের পাঁজরার দানবের কান্ড-কারখানা। চতব্ধ মুহূর্তে। ক্লান্ত চোখে তাকালো কুশলদা... গোবিন্দরামের আয়োজনগুলোকে কেমন অনধিব লক্‌লকিয়ে মনে হয়—মনে হয় স্পর্ধার মো... পরে তৈরি হবে বড় বড় হ্রদ—ভেঙে প্রদীপ দুটো। চঞ্চল হয়ে চারিদিকে খুঁজছে স্পট্। কোথাও কিছু নেই!

—মিস্‌ড!—হতাশার আকৃতি শোনা গেল গোবিন্দরামের গলায়।

—বাঘ ছিল—সক্ষোভে জানাল রতন সিং।

—প্রথমটাই ফসকে গেল। রাতটা মাটি হবে আজ—আবার আক্ষেপ শোনা গেল গোবিন্দরামের।

—ট্রাই এগেন—রতন সিং আশ্বাস দিলে। নিরাশায় মন্থর হয়ে আবার এগিয়ে চলল গাড়ি—স্পট লাইট তেমনি অক্লান্তভাবে লেহন করতে লাগল ঝিল্লীমন্দ্রিত অরণ্য।

প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। গোবিন্দরাম হতাশ হয়ে উঠল।

—এবার ফেরা যাক রতন সিং। মিছে-মিছি ব্যাটারীটা নষ্ট করে লাভ নেই কিছু।

—হিস্-স্-স্—সেই মুহূর্তেই আবার শিস্ টানল রতন সিং: কুশলদাসজী—এবার আপনার—স্পট লাইটে এবার সবুজ নয়—লাল প্রদীপ। আরো বড়, আরো জ্বলন্ত। দশ বছর পরে আবার রাইফেলের ট্রিগার টানল কুশলদাস।

একটা জান্তব আর্তনাদ—ধপ করে পড়ার শব্দ—অসহায় ছট্‌ফটানি। কুশলদাস নল নামিয়ে আর একটা গুলী ছুঁড়ল সেদিকে। পরিষ্কার দেখা গেল ধূসর রঙের একটা বড় আকারের প্রাণী ছট্‌ফট্ করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়!

—সম্বর! স্টিয়ারিং ছেড়ে বাইরে প্রায় লাফিয়ে পড়ল গোবিন্দরাম। কুশলদাসের হাতে প্রকান্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, প্রথমবারেই লক্ষ্যভেদ! কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স—কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্!

প্রথমবারেই লক্ষ্য ভেদ! তাই বটে!

আর সম্বর হরিণ নয়—টাকা শিকার। আর লক্ষ্য ভুল হল না কুশলদাসের। সময় কেটে চলল। ন্যাড়া সেগুন বন আবার পাতার ঐশ্বর্যে ভরে উঠল, শুকনো ঝর্ণার খাতে নামল জলের তোড়, মরা নদীর গর্জন শোনা যেতে লাগল দূর-দূরান্তের থেকে। বম্বে ক্যাল্‌কাটা হাইওয়ে আরো মসৃণ হয়ে উঠল চলন্ত মোটরের চাকায়, গলে-পড়া তেলে। সময় চলল।

বিড়ি-পাতার ব্যবসা প্রায় বন্ধ। পাহাড়ের মাথায় মাথায় আর আগুন জ্বলে না, বর্ষার মেঘ ঘনায় আকাশে। নীল মেঘের ছায়ায় কালো হয় অরণ্য—পাতা থেকে জল গড়ায়—অগ্নিদাহনের পরে চলে অশ্রু-বর্ষণের পালা।

বাঁধের সামনে শোলা হ্যাট মাথায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখে কুশলদাস। অসহ্য গরমে পায়ের তলার পিচ্ চট্‌চটে হয়ে উঠে জুতোর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চারদিকে আবর্তিত হয় যন্ত্রমুখর বাতাস। অতিকায় স্টোন-ক্রাশার কর্কশ শব্দে বড় বড় পাথরকে

গুঁড়ো করে চলে—মিক্সারের মধ্যে তৈরি হয় তরল কংক্রীট—ছোট ছোট রেল গাড়ি কংক্রীটের পাত্রগুলো বয়ে নিয়ে যায় ক্রেনের কাছে, ক্রেনের শিকল অবিশ্রাম ওঠা-নামা করে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে—যেখানে কুলি-কামিনরা পিলারের পর পিলার গেঁথে তুলছে।

মাঝে মাঝে গোবিন্দরাম আসে—খোঁজ-খবর করে রতন সিং। নতুন মাতালের মতো এই নতুন জীবনের নেশায় মগ্ন হয়ে আছে কুশলদাস। বাসমতীর কথাও মনে পড়ে না সারাদিন। বিকেলে ফিরে এসেও তলিয়ে বসতে হয় নিজের কাগজপত্রের মধ্যে।

—রোটি!

আগে আগে কাছে আসত বাসমতী, অভ্যস্ত নিয়মে জানাত ক্ষুধার কথা। কিন্তু আর জানায় না। জানিয়ে লাভ নেই।

—রোটি!

একদিন ধমক দিয়েছিল কুশলদাসঃ আমি কি জানি রোটির খবর? আমি কি তৈরি করি? বুড়ীর কাছে যা। কাজের সময় বিরক্ত করিস নি।

তারপর থেকেই আর আসে না মেয়েটা। উনিশ বছরের শরীরে তিন বছরের মস্তিষ্ক। কিন্তু আর কিছু না বুঝুক, বোঝে স্নেহ, বোঝে বিরূপতা। পশুর মতো নির্বোধ অভিমান নিয়েই সরে গেছে মেয়েটা—এখন আর বিরক্ত করে না।

কাজ—কাজ। কাজের কি অন্ত আছে? এই বেয়াল্লিশ বছর ধরে যে মন্থর নিরুত্তাপ জীবনের মধ্যে স্থবির হয়ে ছিল কুশলদাস, আজ সেখানে এসে গেছে ঝড়ের তাড়া। পাহাড়ে-জঙ্গলে যে জ্যোৎস্নার টুকরো ঝকমক করত, আজ তারা মিশে গেছে একরাশ ঝকঝকে টাকায়। নতুন মদ—নতুন নেশা। কখনো কি মনে পড়ে না মেয়েটার কথা? পড়ে। রতন সিং আজকাল প্রায়ই আসে না—জীপ্ হাঁকিয়ে সন্ধ্যার পর কোনো কোনো দিন আসে গোবিন্দরাম। রাত বাড়ে—কাজের কথা হয়। তারপর অনেক রাতে কুশলদাস যখন উঠে আসে শোওয়ার ঘরে, তখন করুণ ভঙ্গিতে অসহায় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। করুণা হয়—বুকের মধ্যে সহানুভূতির ছোঁয়া লাগে। ভারী অযত্ন হচ্ছে মেয়েটার, ভারী অবিচার করা হচ্ছে ওর ওপরে। কিন্তু ক'দিন—আর ক'দিন। আস্তে আস্তে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রায় চাপা প্রার্থনার স্বরে কুশলদাস বলে, তোর জন্যেই বেটি, তোর জন্যেই। যাতে তোর আখের গুছিয়ে যেতে পারি—তোর দেখা-শোনার জন্যে একটা মোটা টাকা জমিয়ে রেখে যেতে পারি, এসব তো তারই জন্যে। নইলে আমার আর কী—কিসের আর প্রয়োজন আছে আমার!

তবু খটকাও লাগে দু একদিন। আজ-কাল মাঝে মাঝে কেমন করে যেন তাকায় বাসমতী। নির্বোধ চোখে জল নয়, অথচ জলের মতো চক চক করে কী একটা। তিন বছরের মস্তিষ্কের অন্ধকারে কোথায় যেন প্রদোষের স্পর্শ লেগেছে। একটা বুঝেছে—কিছু একটা ... কী হতে পারে—কী সে?

সময় চলে। টাকা আসে। আবার শু... যায় নদীর জল। আবার পাতা ঝরে ঝ... নগ্ন হয়ে যায় সেগুন বন। ঝর্ণার কঠিন নুড়ি-ছড়ানো খাতগুলো মরা সাপের জিভের মত ঝুলে থাকে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় সিঁদুরে মেঘের মতো উত্তাপ-বৃত্ত বিকীর্ণ হয়—মহাশূন্যে চিতা জ্বলে, অগ্নিমালা দুলতে থাকে আকাশের গলায়। হাওয়ায় হাওয়ায় আসে দগ্ধবনের উত্তাপ—দরজা-জানলার খড়খড়িতে আছড়ে পড়ে।

বিকেলের শেষ আলোয় বাড়ির দিকে রওনা হল কুশলদাস। প্রসন্নতায় ভরা মন। আজ হিসেব করে দেখা গেছে, এক বছরের সাব্-কন্ট্রাক্টারিতে ভাগে পড়েছে ন' হাজার টাকা।

মোটা ভারী মুখে, চিবুকের তলায় মাংসের ভাঁজ দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে গোবিন্দ-রাম বলেছে, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্। ঠিক যেমন করে বলেছিল, সেদিন রাত্রে সেই সম্বর হরিণটাকে শিকার করবার পরে।

পুরোনো গাড়ির বনেটটা কাঁপছে—এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করছে এঞ্জিন। আজ কুশলদাস গান শুনতে পাচ্ছে ওর মধ্যে। বাসমতীর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে মন। একটু আদর করতে হবে মেয়েটাকে—একটু স্নেহের প্রশ্রয় দিতে হবে আজ। বড় অবিচার হয়ে গেছে এতদিন।

শুয়ে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো
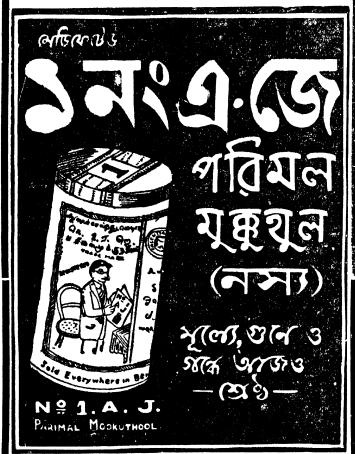
হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ি ঝিটা। পাগলের মতো মাথা কুটতে লাগল পায়ের তলায়।

—কী হল? কী হল?

—বাস্‌মতী—একটা জান্তব গলায় নামটা উচ্চারণ করেই বুড়িটা আবার মেজের ওপর মাথা কুটতে লাগল।

বাস্‌মতী?

দপ করে বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল কুশলদাসের। এক লাফে উঠে এল ওপরে। উত্তর পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হল না বেশিক্ষণ। ঘরের দরজা খোলা। বিকেলের করুণ আলো এসে পড়েছে বাস্‌মতীর মুখের ওপর—মেজেতে কাত হয়ে শুয়ে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো। এই মুহূর্তে আশ্চর্য সুন্দর আর কমনীয় হয়ে উঠেছে সে—পূর্ণ কোমল শরীরে তিন বছরের মস্তিষ্ক এখন নিশ্চিন্ত ঘুমে প্রশান্ত হয়ে গেছে।

পাশে একটা ছোট শিশি। বিষের।

—বেটি! ঘর ফাটানো একটা চিৎকার করে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়ল কুশলদাস।

এল পুলিশ। এল ডাক্তার। অটোপ্‌সি। হাইড্রোসায়ানিক। অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড—সি ওয়াজ ক্যারিয়িং!

তিন বছরের শিশু। কে তাকে দেখিয়েছিল সর্বনাশের পথ? কে দিয়েছিল তিন বছরের মস্তিষ্কে কুড়ি বছরের এই ভয়ংকর সমাধান? কোথা থেকে এল হাইড্রোসায়ানিক?

কেউ জানত না—শুধু বুড়ি ছাড়া। কেউ জানত না—দুপুরে যখন কুশলদাস শোলার টুপি মাথায় দিয়ে বাঁধের কাজ দেখত, তখন চোরের মতো এসে থামত একটা ল্যাণ্ড্ রোভার। কেউ জানত না পকেট ভর্তি করে টফি আর লজেন্স নিয়ে আসত রতন সিং—উঠে যেত ওপরে। কেউ জানত না—এক বুড়ি ছাড়া।

কণ্ট্রাক্ট—কণ্ট্রাক্ট ছাড়া আর কী! কুশলদাস পেল ন হাজার, বুড়ি পেল পাঁচশো। পাওয়া নিয়ে কথা—মূলমন্ত্রটা একই।

ক্যারিয়িং—সুইসাইড্। কেলেঙ্কারি নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামালো না, পুলিশ নয়, কুশলদাসও না। ও দুঃস্মৃতিটা ভুলে যাওয়াই ভালো। ওই গভীর ক্ষতটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত।

তাই বটে। টাকার আর প্রয়োজন নেই—তবু তো অভ্যাস যায় না কুশলদাসের। তেমনি হয়েই এসে দাঁড়ায় বাঁধের ধারে। বিরাট একটা দন্তুর দানবের মতো স্টোন-ক্রাশার যন্ত্রটা পাথরগুলোকে গুঁড়ো করে

চলে; মিক্‌সারে তৈরি হয় তরল কংক্রীট; ছোট রেলের ছোট এঞ্জিন তীক্ষ্ন বাঁশি বাজায়—ক্রেনের ওঠা-নামা চলে অবিশ্রাম।

কাজ দেখে কুশলদাস। বিল করে। হিসেব করে গোবিন্দরামের সঙ্গে। প্রথম প্রথম এড়িয়ে চলত রতন সিং—পালিয়ে থাকত সভয়ে। এখন বুঝতে পেরেছে ঝড়ের মেঘ গেছে কেটে। কুশলদাস ঘুণাক্ষরে কিছু জানে না—সন্দেহও করেনি। বুড়ি ঝিটা চলে গেছে দেশে—একেবারে নিশ্চিন্ত এখন।

তারপরে জড়তা ভেঙে কাছে এগিয়ে এল রতন সিং। আবার হাসি, আবার গল্প, আবার রসিকতা। আবার আসা-যাওয়া। কোথায় একটু ফাঁক ছিল, আবার জুড়ে গেছে সমস্ত।

—আহা, মরে গেল মেয়েটা!

—সবই ভগবানের ইচ্ছা!—মাটির দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয় কুশলদাস।

—কে যে ক্রিমিন্যাল, তারই সন্ধান পাওয়া গেল না! রতন সিং উত্তেজিত হয়ঃ লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত।

মাটি থেকে মুখ তোলে না কুশলদাস। তেমনি নিচু গলায় বলে, কেউই ক্রিমিন্যাল নয়—সবই বরাত।

তারপরে যখন রাত হয়, তখন কুশলদাসের গাড়িতে করেই বাঁধে ফিরে যায় রতন সিং। আগে ভয় করত—অন্ধকার সেগুন বন আর রুক্ষ পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে অস্বস্তিতে ছম ছম করত শরীর। এখন আর করে না। কুশলদাসকে তার চেনা হয়ে গেছে।

আজও রাত সাড়ে আটটায় কুশলদাস বললে, চলো, পৌঁছে দিই তোমাকে।

—চলুন।

কালো কঠিন রাত্রি। অগ্নিবলয়িত চক্রবালের আকাশ। হাজার ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলল গাড়ি।

হঠাৎ চমকে উঠল রতন সিং।

—এ কোন্‌ দিকে চলছে গাড়ি?

—রঙ্গামার জঙ্গলে।

—কেন?—গাড়ির মধ্যে শক্ত হয়ে গেল রতন সিংয়ের শরীর।

—এমনি বেড়িয়ে আসব। বড় মাথা ধরেছে।

—এই রাতে। না—না থাক। সভয়ে রতন সিং বললে, সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক কিছু নেই, এসব রিস্‌ক নেওয়া কি উচিত হবে?

—আমি এদিকের লোক। তোমার ভয় নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাঁধে যেতে মাইল ছয়েক ঘুরপথ পড়বে। আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।

গাড়ি থেকে নেমে পড়তে ইচ্ছে হল রতন সিংয়ের—পারল না। নিজের ভয়ের কাছে হার মানতে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে তার। পকেট হাতড়ে পাইপটা বের করল, কিন্তু ধরাতে পারল না। পর পর আট দশটা কাঠি জ্বলে গেল অনর্থক।

দু ধারের কালো কালো গাছের সারি ছাড়িয়ে—ঘুমন্তপ্রায় গ্রামের আলোর ছিটেগুলো পার হয়ে শুরু হল অরণ্য। আবার ঝিঁঝির কলমন্ত্র—আবার অন্ধকারে কুক্কো পাখির ডাক। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল ঘ্যাঁচ করে।

এতক্ষণের নিঃশব্দতায় রতন সিংয়ের যে স্নায়ুগুলো এক ধরনের আত্মমন্থনে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেল তারা। চমকে উঠে দাঁড়াতে গেল—গাড়ির শক্ত হুডটা সবেগে আঘাত করল মাথায়।

—কী হল? কী হল?—অবরুদ্ধ স্বর রতন সিংয়ের।

মৌন একটা নির্মম হাসি হাসল কুশলদাস।

—কারবুরেটারে গোলমাল হয়েছে বোধ হয়। বনেট খুলে দেখতে হবে। তোমার কাছে টর্চ আছে সিং?

—আছে।—বিহ্বলভাবে জবাব দিলে রতন সিং। চারদিকে আদিম বন্যতা। রঙ্গামার জঙ্গল। বাঘ আছে, বুনো হাতি আছে এবং সঙ্গে একটা অস্ত্র নেই কিছু। গাড়ি খারাপ হওয়ার মতো জায়গাই বটে। গাড়ির চলার শব্দে অরণ্যের যে ধ্বনি-তরঙ্গ আবছা আবছা শোনা যাচ্ছিল—এখন তারা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঝিঁঝির ডাক এমন ভয়ঙ্কর তীব্র হয় এ তার জানা ছিল না—জানা ছিল না কুক্কো পাখির আহ্বান এমন প্রেতলৌকিক।

—একবার নেমে টর্চটা ধরতে হবে সিং।

দ্বিধাভরে দরজা খুলে নামল সিং, সেই সঙ্গে কোমরে লুকোনো রিভলভারটা বের করল কুশলদাস। এই সুযোগ—এতদিন এরই অপেক্ষায় কাটিয়েছে সে। প্রতীক্ষা করেছে দানবিক ধৈর্যের সঙ্গে। তার রাত—তার মুহূর্ত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে রতন সিং একটা অবাক্ত আর্তনাদ করল। তার পায়ের থেকে মাত্র তিন হাত দূরে ফণা তুলেছে রাজগোখরা—হামাড্রায়াড। সাক্ষাৎ মৃত্যু দুলছে ক্ষমাহীন আক্রোশে। আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে রতন সিং।

কুশলদাসের রিভলভার গর্জন করল—দুটো আওয়াজ হল পর পর। রতন সিংয়ের পিঠ লক্ষ্য করে নয়—গোখরোর ফণায়। সম্বর শিকারীর লক্ষ্য আজো ভ্রষ্ট হয়নি।

—তোমার সঙ্গে রিভলভার ছিল?—মূঢ়তার চমক কাটবার পরে রতন সিংয়ের জিজ্ঞাসা।

—ছিল।—তিক্ত গলায় কুশলদাস বললে, মাত্র দুটো গুলীই ছিল তাতে।

গাড়ির ভেতরে, ঝিঁঝিঁ আর কুক্কো-ডাকা সেই অন্ধকারের কোলে রতন সিং ঠায় বসে আছে। আসছি বলে কোথায় চলে গেছে কুশলদাস—এক ঘণ্টা পার হতে চলল—এখনো ফিরল না। উৎকণ্ঠায় তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে তার। জোরে চেঁচিয়ে ডাকতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। হাতি আছে—বাঘ আছে। তা ছাড়া—তা ছাড়া—হামাড্রায়াড্‌ কখনো একা থাকে না।

গাড়ির চাবিটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে কুশলদাস। পালাবারও পথ নেই। আতঙ্কে গাড়ির মেজেতে রতন সিং বসে রইল হামাগুড়ি দিয়ে।

আর কুশলদাস—কুশলদাস ততক্ষণ জঙ্গল পার হয়ে একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। তার তিনদিক ঘিরে জ্বলছে অগ্নিবলয়। অসহ্য তাপে ঝলসে যাচ্ছে শরীর। পোড়া বিড়ি-পাতার গন্ধ উঠছে—কীটপতঙ্গ পোড়ার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, কোথাও একটা মৃত জানোয়ারও পুড়ছে নিশ্চয়। আর তারি মাঝখানে—অসংখ্য জলন্ত চিতার কেন্দ্রভূমিতে শ্মশান চণ্ডালের মতো দাঁড়িয়ে আছে কুশলদাস পোরবন্দরওয়ালা। হাতের শূন্য রিভলভারটা সে ছুড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই।

পালাবে? কোথায় পালাবে? যে স্বর্ণমারীচ তাকে পথ ভুলিয়ে এখানে এনেছে—তাকে হত্যা করবার মতো তীর তার হাতে নেই। রতন সিংকে খুন করতে পারার মতো মনের জোর তার ছিল না—ওই গোখরোটাকে গুলী করা নিজের কাছে একটা দুর্বল কৈফিয়ৎ ছাড়া তো আর কিছু নয়। ওই বাঁধ—ওই স্টোনক্রাশার—ওই গোবিন্দরাম—এদের হাত থেকে আজ আর মুক্তি নেই তার।

পুরোনো পরিচিত বন্ধুর মতো একটা আগুনের শিখা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এল তার কাছে—নিঃশব্দে ধুতির একটা প্রান্ত স্পর্শ করল। টেরও পেল না কুশলদাস। মানসিক অগ্নিচক্রের মাঝখানেই সে তেমনি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপমতী নগরী

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসে একটা সাদামাঠা নাম আছে এ শহরের—মাণ্ডু। উত্তর ও মধ্যভারত একদা সে-নামে উচ্চকিত হত। প্রতিবেশী রাজ্যের কাছে সে-নাম ছিল নিরতিশয় ভীতি ও ঈর্ষার কারণ। আজ মাণ্ডুকে শহর বলে উল্লেখ করলে ব্যঙ্গই করা হবে। জঙ্গলে-ঢাকা বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দর্শনীয় ইমারত, কাকচক্ষুজল এক প্রশস্ত দীঘিতে উদ্দাম পদ্মবনের অজস্রতা, আর বাস যেখানে এসে দাঁড়ায় তার কাছাকাছি খানকয়েক জীর্ণ কুঁড়ে ঘর—মালব-সুলতানদের একদা-প্রখ্যাত রাজধানীর এই কালদষ্ট অবশেষ। ফতেপুর সিক্রীর চেয়েও বেশী পরিত্যক্ত, বিজয়নগরের থেকেও বেশী জনহীন আজকের বিগতগৌরব মাণ্ডু।

বিন্ধ্য পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে, নর্মদা উপত্যকার সন্নিহিত উত্তরে, খাড়া পাহাড়ের ওপর সমতলভূমিতে এই বিস্তীর্ণ নগরী মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে, প্রাকৃতিক দিক দিয়ে, সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত রাজধানী ছিল। কৃষ্টি, কলা, শৌর্য, ঐশ্বর্য—কোন কিছুতেই সে-রাজধানীর প্রতিপত্তি নগণ্য ছিল না। মাণ্ডুর অপ্রতিহত তরবারি অর্ধেক রাজপুতানা জয় করে একদিকে যেমন গুজরাট থেকে যমুনা অবধি প্রসারিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি ও দর্শনের চর্চায় তার স্থান ছিল শিরাজ আর সমরখন্দের সমপর্যায়ে। শক্তি ও বিদ্যার এমন একত্র-সমাবেশ মুসলমান আমলের ভারতবর্ষে আর কোথাও হয়েছিল কি না সন্দেহ। সে শোভাযাত্রা আজ সমাপ্ত হয়েছে। বিগত

রূপমতী মঞ্জিল

কালের অপসৃত জীবনপ্রবাহের ওপর প্রকৃতি দেবী অপার করুণায় তাঁর শ্যামল স্নেহাঞ্চলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন। এই অন্তিম আচ্ছাদনের নীচে মাণ্ডু এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী মাত্র।

ইন্দোর থেকে দীর্ঘ পথ বাসে অতিক্রম করতে করতে সে বিস্মৃত কাহিনীর রোমন্থন করছিলুম মনে মনে। মাণ্ডুর ইতিহাস-স্বীকৃত খ্যাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে আফগান আমল থেকে; তার আগের পরিচয় কিংবদন্তী দিয়ে ঢাকা। এই লোকশ্রুতির ধূসর অতীতে কোন্ এক কাঠুরে নাকি দিন-শেষে ঘরে ফিরে দেখে যে তার কুঠারখানির রঙ হয়েছে কাঁচা সোনার মত। রাজার কাছে খবর পেঁছিল। গভীর অরণ্যে পাওয়া গেল এক পরশ-পাথর কাঠুরিয়া অজ্ঞাতসারে যার ওপর ক্ষণকালের জন্য তার কুঠারখানি রেখেছিল কোনো সময়ে। পরশ-পাথরের দৌলতে রাজা অপরিসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন আর এই সুরক্ষিত অধিত্যকায় এমন এক রাজধানী নির্মাণ করলেন যার বৈভবের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কিছু কেউ কখনো দেখেনি।

এই অতুল বিত্তশালী নগরী লুণ্ঠন করে তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর নাকি পত্তন করা হয় আফগান আমলের মান্ডু শহর। ইতিহাসে এ-কিংবদন্তীর পুরোপুরি স্বীকৃতি নেই তবে এ-অঞ্চলে অধুনা ক্বচিৎ দৃষ্ট হিন্দু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ থেকে এরকম অনুমান করা অসংগত নয় যে খৃস্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতক অবধি উজ্জয়িনীর প্রমর রাজবংশই মান্ডুতে আধিপত্য করে গিয়েছেন। তারপরে প্রবলতর প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁরা ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

দিল্লীর পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শক্তিশালী বাহিনী মালব-প্রান্ত জয় করবার পর প্রায় দেড়শো বছর অবধি এ-অঞ্চল দিল্লীর এক সুবা হিসেবে শাসিত হয়েছে। পনের শতকের প্রথমে সুবাদার হোসাঙ শাহ ঘোরী দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে মালবকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারী মাহমুদ খালজীর সমকক্ষ সেনাপতি সে-সময়ে ভারতবর্ষে আর ছিলেন কিনা সন্দেহ। দিল্লীর প্রতি আক্রমণকে তাঁরা শুধু অনায়াসে প্রতিহতই করেননি, তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে মালবের সীমান্ত গুজরাট থেকে যমুনা অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। বিশ্রুতকীর্তি মান্ডুর খ্যাতি-প্রতিপত্তির তাঁরাই রচয়িতা। আজও এ-রাজধানীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে ক'টি অপূর্ব ইমারত ভগ্নদশায় টিকে আছে ও যেগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আফগান সৌধ বলে সাধুবাদ করে থাকেন, তা তাঁদেরই প্রযত্নে নির্মিত। জীবনের অধিকাংশ সময় রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করলেও সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুই মালব-সুলতান যে দুর্লভ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা আর এক বিস্ময়। তাঁদের জীবিতকালে, ইসলাম ধর্ম ও দর্শনের চর্চায় মান্ডু এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, সে-সময়ে মুসলমান জগতের প্রখ্যাত সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি থেকে শাস্ত্রবেত্তারা এখানে নিয়মিত গতায়াত করেছেন।

হোসাঙ ও মাহমুদের বহু যত্ন, বহু পরিশ্রমের এই রাজধানীকে সর্বনাশের পথে নিয়ে গেলেন পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন। জীবনে কখনো মদ্যপান করেননি বলে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁকে চরিত্রবান বলেছেন। নামাজের কখনো কোনো খেলাপ করেননি বলে ধার্মিক নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন সম্ভোগের যে এলাহি দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন তা দিল্লীর শাহেনশাহ মোগল বাদশাহেরাও অতি উদ্দাম কল্পনায় কখনো চিন্তা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।
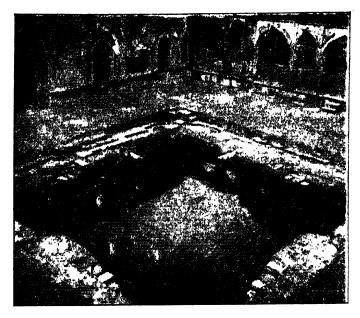
হামামের চারিদিকে রূপমতীর মহল

রাজদফতরের সর্বত্র তিনি কেবলমাত্র সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করেন। মান্ডুতে তাঁর "জাহাজ মহল" প্রাসাদে ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ হারেমে অতি সুচারুরূপে তিনি একদা এরূপ পনের হাজার রমণীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরেস্তা লিখেছেন—"এদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী, সংগীতজ্ঞা, নর্তকী, সূচীশিল্প-নিপুণা প্রভৃতি সর্ববিধ পর্যায়ের স্ত্রীলোকই ছিল। দরবারে, পুরুষের সামরিক পোষাকে, তীরধনুক হাতে পাঁচশো তুর্কী যুবতী তাঁর ডানদিকে দাঁড়াত আর বাঁদিকে অনুরূপ পোষাকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাঁড়াত পাঁচশো হাবশী স্ত্রীলোক। যথাকালে এই মদ্যপান-বিমুখ, নামাজনিষ্ঠ রমণীবিলাসীটি তাঁর যুবা পুত্র নাসিরুদ্দিনের হাতে প্রাণ হারান। এই পিতৃহত্যার কার্য-কারণ এতই সুস্পষ্ট যে, এবিষয়ে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

গিয়াসুদ্দিনের পর মান্ডুর প্রতিপত্তির ইতিহাস দীর্ঘও নয়, গৌরবেরও নয়। হোসাঙের সময় থেকেই প্রতিবেশী গুজরাটের সঙ্গে মান্ডুর স্থায়ী বিরোধ চলে আসছিল। পৈতৃক হারেমের তীরধনুধারী যুবতীদের দিয়ে নাসিরুদ্দিন গুজরাট-সুলতানের শক্তিশালী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেন না। প্রায় একশো বছর গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত থাকবার পর, ১৫৪২ খৃস্টাব্দে ভারত-সম্রাট শের শাহ-শূর মান্ডু অধিকার করে নিলেন ও সুজা খাঁকে এ-অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সুজা খাঁর পুত্র বজ বাহাদুর আমার আজকের একাহিনীর নায়ক। পরে, আরও বিস্তৃতভাবে এঁর বিষয়ে বলবার অবকাশ হবে। আত্মভোলা, ভারতীয় মার্গ-সংগীতে অসামান্য পারদর্শী, মান্ডুর এই শেষ সুলতান আকবর বাদশার কাছে পরাজিত হয়ে দেশত্যাগী হলেন। তারপরে, ঔরংগজেবের সময় অবধি অন্যতম মোগল সুবার রাজধানী হিসেবে মান্ডুর কিছু কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। মোগল শক্তির পতনের পর, সর্বগ্রাসী অরণ্যকে রোধ করবার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সে-অরণ্যে, বহু আয়াসে, আজ অল্পস্বল্প পথঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। ক্বচিৎ আগত উৎসাহী পর্যটক সে পথে পরিভ্রমণ করে হয়ত দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন। জনমানবহীন মান্ডুর ভারাক্রান্ত বাতাসে কোনো প্রতিধ্বনি না তুলে তা নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

* * *

ধূলিধূসরিত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাস এসে দাঁড়াল ধার শহরের বাজারে। একদা-প্রখ্যাত প্রমর রাজকুলের বংশাবতংসেরা আজও এখানে বসবাস করেন। ছোট শহর। কিছু কিছু কাঁচা-পাকা বাড়ি, চায়ের দোকান, পুরী-তরকারির হোটেল। দ্বিপ্রাহরিক দানাপানির আশায় নেমে এলুম। মান্ডুগামী আলাদা বাস এখান থেকে ছাড়বে একঘণ্টা পরে। আমার গন্তব্যস্থল এখনও কুড়ি মাইল দূর।

হোটেলওয়ালা হিন্দীভাষী নয়। তবু তার মাদরী-জবানে ইতস্তত-প্রক্ষিপ্ত গুটি-কয়েক হিন্দী শব্দ চয়ন করে যা বুঝলুম তাতে রাত্রির কোনো আস্তানা মান্ডুতে যোগাড় করা দুর্ঘট হবে মনে হ'ল। বাসের

যাত্রীদের কাছেও ইতিপূর্বে এ প্রশ্ন করেছিলুম; অনিশ্চিত উত্তর পেয়েছি। মাত্র দশ ক্রোশ দূরের লোকের কাছে এতথ্য সংগ্রহ করতে না পারা, মান্ডু যে আজ কতদূরে পরিত্যক্ত তার আর এক নিরিখ। নিরুপায় হয়ে, হত্যা দিয়ে গিয়ে পড়লুম মান্ডুগামী বাসের ড্রাইভারের কাছে। রোজ সে একবার গাড়ি নিয়ে সেখানে যায়, তার কাছে কিছু হদিস মিলতে পারে। ড্রাইভার আর তার বেরাদর কন্ডাক্টরে বহুত কথা কাটাকাটি হল, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর শূন্যেই ঝুলে রইল পূর্ববৎ। নতুন বাসের একজন সহযাত্রী শুধু বললেন, ডাকবাংলোর মত একটা আস্তানার কথা তিনি শুনেছেন বটে, তবে সেটা যে মান্ডুর কোথায় তা তাঁর কোনো ধারণা নেই। মুসাফিরিতে এরকম মুসীবৎ নতুন নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। মনস্থির করে নিজের জায়গাটিতে গ্যাঁট হয়ে বসলুম।

অসমতল পথে বাস চলেছে সিধা দক্ষিণে। দূরে দূরে ছোটখাট গ্রাম; যাত্রী নামছে, উঠছে। পথের দুধারে কচিৎ এক-আধটা পড়ো বাড়ি, ভাঙা মসজিদ। গম্বুজের ফাটলে বট অশ্বত্থ শাখাবিস্তার করেছে; জীর্ণ দেওয়ালে জমেছে বহুযুগের শ্যাওলা। এপথ দিয়ে একদা হোসাঙ ও মাহমুদের চতুরঙ্গ বাহিনী অভিযানে বেরিয়েছে দিকে দিকে; ফিরে এসেছে জয়দৃপ্ত পদক্ষেপে। দূরদূরান্তর থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসেছেন এপথ দিয়ে মালবের প্রখ্যাত রাজধানীতে। আজ সে সমস্ত গল্পকথা মাত্র। অনেক দেখেছে এপথ; অনেক অভিজ্ঞতা জমে আছে তার স্থবির মনের কোণে। আজ আর কোনো চাঞ্চল্য নেই; চাঞ্চল্যের কোনো হেতুও নেই। গভীর আলস্যে শুয়ে শুয়ে আজ শুধু বিশ্রাম আর বিস্মৃতি।

অনেকদূর এসে সড়ক এক জায়গায় ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে; সামনেই, খাদের ওপারে, মান্ডু কেল্লার ভেঙেপড়া দেওয়াল আর টুটাফাটা ফটক। বিন্ধ্য পর্বতের সমতলশীর্ষ যে শাখাটি নর্মদার গতিপথের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, তার শেষ সাত মাইল দৈর্ঘ্যকে অবশিষ্ট মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এই গভীর গহ্বর। প্রান্তীয় অংশটুকু প্রস্থে প্রায় পাঁচ মাইল ও অন্যান্য দিকে খাড়া পাহাড়ের প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সুরক্ষিত। আঁকাবাঁকা পথে বাস এপারে উঠে এল। এদিকের রক্ষাব্যূহের কাছ থেকে নজর করে বুঝলুম বিপক্ষবাহিনীর কাছে মান্ডু কেন একদা অলঙ্ঘ্য ছিল। অরণ্যের উদ্যত বাহু থেকে সাময়িকভাবে ছিনিয়ে-নেওয়া সংকীর্ণ পথ; বাস সে-পথে কষ্টেসৃষ্টে চলতে পারে। দুপাশের লতাগুল্মের আচ্ছাদনে কত যে ইট-পাথরের স্তূপ তার আর ইয়ত্তা নেই। অকস্মাৎ অরণ্য অপসৃত হতেই অনেকখানি খোলা জায়গায় এসে পড়লুম; রাস্তার দুপাশে দুটি অপূর্ব ইমারত—হোসাঙ শাহের নির্মিত জুম্মা মসজিদ আর মাহমুদ খালজীর স্মৃতিসৌধ। বাস এখানেই ফিরতি পথের মোড় নেবে; আমার সামান্য তল্পি নিয়ে নেমে এলুম।

রাস্তার পাশে এক চালাঘরের দাওয়ায় জন দুই লোক বসে গল্প করছিল। বলল, আধ মাইল দূরে 'জাহাজ মহলে'র কাছে রাত্রিবাসের মত আস্তানা মিলতে পারে। এসব ইমারতের দেখাশোনা যে করে সে-ই সেখানকার চৌকিদার। বার তের বছরের এক হাফ-প্যান্ট-পরা ছেলে কখন যে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করিনি; এগিয়ে এসে বললে, সেখানে সে নিয়ে যেতে পারে আমাকে। জামা পরে আসি বলে এক ছুটে সে আর-একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। বার হয়ে এল যখন, দেখি গায়ে হাফ-সার্ট, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া লোম-ওয়ালা কালো মুসলমানী টুপি। পুরো-দস্তুর 'গাইডের' সজ্জা করে এসে আসগর বললে, চলুন।

অতি প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে আমরা প্রথমে জুম্মা মসজিদের প্রবেশ কক্ষে উঠে এলুম। বিশাল গম্বুজে ঢাকা ছাদ; দেওয়ালে এনামেল করা টালির বিচিত্র নক্সা। জাফরি-কাটা জানালা দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর ভেতরে এসে পড়েছে। পশ্চিমের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে বিশাল অঙ্গনে; আগাছায় আকীর্ণ শ্রীহীন অঙ্গন। উচ্চ খিলানের ওপর চারিদিকে দীর্ঘ পরিধি-প্রাকার। একেবারে পশ্চিমে, মসজিদ। তার বিশালতা ও গঠন-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব বলেছেন, ভারতবর্ষে এরকম আফগান সৌধ আর দুটি নেই। মান্ডুর যৌবনকালে, পরবের নামাজের দিনে, এই উপাসনাগার আমীর ওমরাহের অত্যুজ্জ্বল জনতায় দ্যুতিমান হয়ে উঠত। আর আজ, আলোটুকু পড়ে এলে, পাশের জঙ্গল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসবে শেয়ালের দল, মিম্বরের আশে পাশে নিরুপদ্রব রাত্রিবাসের অভ্যস্ত আশায়।

জুম্মা মসজিদের লাগোয়া পশ্চিমে হোসাঙ শাহ ঘোরীর মর্মর স্মৃতি-সৌধ। রাস্তা থেকে এটি দেখা যায় না; মসজিদের পেছনে সুড়ঙ্গপথে অনেক উঁচুনিচু সিঁড়ি অতিক্রম করে আসগর এনে দেখালে। শ্বেতপাথরের দেওয়ালে, গম্বুজে এত শ্যাওলা জমেছে যে, লক্ষ্য করে না দেখলে সাধারণ ইট-চুন-সুরকির তৈরি বলেই মনে হয়। প্রাঙ্গণে লতাগুল্মের নিরঙ্কুশ প্রতাপ; কার্নিস ভেঙে পড়েছে এখানে সেখানে; ভেতরে আবছা অন্ধকারে মালবের প্রখ্যাত সুলতানের অন্তিম শয্যা। শাহজাহানের সময়েও মান্ডুর স্থপতিরা যে কিরূপ সম্মানিত ছিলেন তার একটি নিদর্শন আছে এখানে। প্রবেশদ্বারের ওপরে একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে চারজন নামজাদা মোগল স্থপতি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এখানে এসেছিলেন। এই দলের অন্তর্গত ওস্তাদ হামিদ তাজ-মহলের নির্মাণ-ব্যবস্থায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

জুম্মা মসজিদের মুখোমুখি মান্ডুর আর এক কৃতী সুলতান মাহমুদ খালজীর স্মৃতি-সৌধ। কালের করাল করাঘাতে এ ইমারতটির বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই। একদা যে বিশাল গম্বুজ পথের ওপারের বিখ্যাত মসজিদকেও লজ্জা দিত, তা আজ সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হয়েছে। শূন্য আকাশে শুধু কয়েকটি ন্যাড়া দেওয়াল মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসহায়-ভাবে। এ স্মৃতি-সৌধের এক কোণে

চিতোরের রাণা কুম্ভের পরাজয়ের স্মারক হিসেবে যে সাত-তলা মিনারটি মাহমুদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাও আজ ভেঙে পড়েছে। মাহমুদের বিজয়ী তরবারি একদা অর্ধেক রাজপুতানাকে পদানত করেছে; দিল্লীর মসনদে বারবার ফেলেছে দুশ্চিন্তার ছায়া। আজ সে প্রতাপ ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়েছে লজ্জায় আর সর্বজয়ী কাল অপরিসীম তাচ্ছিল্যে তাঁর স্মৃতিগুলিকে অবাধ বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।......অন্ধকার হয়ে আসছে; আসগর বললে, চলুন ডাকবাংলোর দিকে যাওয়া যাক।

এরকম পান্থশালা ভারতবর্ষে আর ক'টা আছে জানিনে। সুলতানী হারেমের পাশাপাশি কয়েকটি কুঠুরি নিয়ে ডাক-বাংলো এমন কিছু পথেঘাটে নজরে পড়ে না। পাথরের সিঁড়ি উঠে এসেছে দোতলার প্রশস্ত ছাদে; ছাদের একপাশে টানা একসার গম্বুজশীর্ষ ঘর। তার একটিতে আমার আজকের রাত্রিবাস নির্দিষ্ট। চৌকিদার সলামত খাঁ তৈল-তন্ডুল যোগাড়ের উদ্দেশ্যে টাকা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আসগরও বিদায় নিলে; বললে, কাল সকালে এসে তিনমাইল দূরে বজ বাহাদুরের প্রাসাদ দেখাতে নিয়ে যাবে।

পূর্ণ চাঁদ উঠে এল মাণ্ডুর নির্মল আকাশে, ঠিক যেমন উঠে আসে বাংলা দেশের আকাশে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে। একটা ইজি চেয়ার টেনে বাইরের ছাদে এসে বসেছি। সামনেই সুলতান গিয়াসুদ্দিনের প্রমোদ-প্রাসাদ "জাহাজ মহল" ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অপরূপ দেখাচ্ছে। এ প্রাসাদের সুসজ্জিত ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠনের উজ্জ্বল দ্যুতি একদা চন্দ্রালোককে লজ্জা দিত; সন্নিহিত দীঘির কালো জলে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ত সে আলো। আজ সমস্ত প্রাসাদে নীরন্ধ্র অন্ধকার; জ্যোৎস্নাও সেখানে ঢুকতে ভয় পায়। তেতলার প্রশস্ত ছাদে, ইন্দ্রসভার আড়ম্বরে, কত বসন্ত-রজনী একদা অতি-বাহিত হয়েছে মদনোৎসবে। আজ সেখানে শ্মশানের নীরবতা। বর্ণে, গন্ধে, ঐশ্বর্যে, প্রাণোচ্ছলতায় আকীর্ণ এ প্রমোদপুরী কালের নির্মম প্রহারে আজ কংকালসার, হৃতসর্বস্ব। অতীতের প্রেত আজও কি ঘুরে বেড়ায় কক্ষে কক্ষান্তরে? হারেমের নীচতা আর গ্লানি, ক্রূর ষড়যন্ত্র আর স্বার্থপুষ্ট হানাহানি আজও কি পঙ্কিল করে তোলে শতাব্দীর আবদ্ধ বাতাস?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। উঠে বসলুম সলামত খাঁর ডাকে; বললে, খাবার তৈরী। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে একবার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছাদে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। না, আমারই ভুল। নূপুরের তান, তরল হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে না বাতাসে। গিয়াসুদ্দিনের পনের হাজার তুর্কী, তাতার, খোরাসানী, পারসিক যুবতীর কাহিনী নিছক গল্পকথা মাত্র। এই নিস্তব্ধ রাত্রে 'জাহাজ মহলে'র ত্রিসীমানায় আছি শুধু আমি আর কাছেই কোনো কুঠুরিতে বৃদ্ধ সলামত খাঁ।

* * *

খুব ভোর বেলা আসগর এসে হাজির। লাজুক ছেলেটি, কথা কয় কম, পাকা "গাইড" হবার অন্ধিসন্ধি কিছুই জানে না। বললে, বজ বাহাদুর-রূপমতীর প্যালেস দেখতে যাবেন না?

মাণ্ডুর শেষ সুলতান বজ বাহাদুর আর তাঁর অপূর্ব রূপগুণবতী প্রেয়সী রূপমতী। মাণ্ডুর সমস্ত বৈভব, সমস্ত জয়কীর্তির ঊর্ধ্বে এই আত্মভোলা প্রণয়যুগলের প্রেমকাহিনী আমার চিত্তকে আজও আকর্ষণ করে। কিছু কিংবদন্তী, কিছু সত্য ঘটনার উপাদানে সে কাহিনী আজও দক্ষিণ রাজপুতানার চারণগীতির প্রধান বিষয়বস্তু। বজ বাহা-দুরের রাজত্বকালে, মাণ্ডুর অনতিদূরে, নর্মদা-বেষ্টিত এক দুর্গের অধিপতি ছিলেন এক রাঠোর সর্দার। তাঁর সুন্দরী কন্যা রূপমতী কৈশোরেই কবিত্ব ও সংগীতকলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। একদা সখীদের সঙ্গে সন্নিহিত অরণ্যে ভ্রমণকালে মৃগয়ারত বজ বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কৈশোরের ভীরুতায়, প্রথমে বজ বাহাদুরের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে তিনি নাকি শপথ করেন যে, মাণ্ডু মালভূমির ওপর নর্মদা প্রবাহিত হলে তিনি বজ বাহাদুরের সঙ্গে বিবাহে রাজী হবেন। কিন্তু দিনশেষে প্রণয়ী-যুগল যখন পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন তখন আত্মসমর্পণের আর বাকি নেই। পর-দিন রাঠোর-সর্দার এই কুল-নাশিনীর কীর্তি অবগত হয়ে রাজপুত মর্যাদা-বিধিতে যে একমাত্র পন্থার এক্ষেত্রে ব্যবস্থা আছে তার আয়োজন করলেন; রাত্রি প্রভাত হবার আগে রূপমতীকে বিষপান করতে হবে। পুর-নারীদের কাতর অনুনয় ব্যর্থ হলো। মূর্ছিতা রূপমতী স্বপ্ন দেখলেন, দেবী নর্মদা এসে বলছেন মাণ্ডুর দক্ষিণ সীমায় এক প্রস্রবণ-পথে নর্মদাবারি ইতিমধ্যেই মাণ্ডু-মালভূমিতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে; এ বিবাহ শুভ হবে। অকস্মাৎ নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করে বজ বাহাদুর সসৈন্যে রাঠোর দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপরে পরাজিত প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন বীরভোগ্যা, তৃপ্তা রূপমতীকে। মাণ্ডুতে মহাসমারোহে তাঁদের বিবাহ নিষ্পন্ন হল।

ফেরেস্তা লিখেছেন, এ সময়ে মালব প্রান্তে ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ছিল এবং বজ বাহাদুর এ শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। রূপমতীর সঙ্গীত-প্রতিভায় যেন গঙ্গা-যমুনার মিলন হল। নর্মদা-প্রস্রবনের পাশে বজ বাহাদুর যে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তার প্রশস্ত ছাদে কত জ্যোৎস্নারজনী অতিবাহিত হতে লাগল ছায়ানট-কেদার-বেহাগ-মাল-কোষের গুঞ্জরণে। খাড়া পাহাড়ের একেবারে কিনারায় রূপমতীর মঞ্জিল নামে যে হর্ম্য

সুলতান গিয়াসুদ্দিনের প্রমোদপুরী 'জাহাজ মহল'

সাগরদীঘিতে বজরা ভেসে যেত পূর্ণিমা নিশীথে

এখনও ভগ্নদশায় টিকে আছে সেখানেও কত কবিতা, কত গান, কত আকুল প্রণয়-নিবেদনে এ দম্পতির দিবসযামিনী স্বপ্নের মত কাটতে লাগল। অনতিদূরে বিস্তীর্ণ জলাশয় সাগরদীঘিতে সুসজ্জিত বজরা ভেসে যেত পূর্ণিমা নিশীথে। পদ্মবনের মাদকতায়, মালবের সুপ্তিমগ্ন আকাশের নীচে কত বিহ্বল মুহূর্তের স্বাদ পেলেন বজ বাহাদুর ও রূপমতী।

ছ'বছর কাটল এই সুমধুর আত্ম-বিস্মৃতিতে। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আফগান ওমরাহেরা অসন্তুষ্ট হতে লাগলেন। ওদিকে দিল্লীর তক্তে বাদশাহ আকবর, সম্ভবত তাঁর প্রচণ্ড সঙ্গীতানুরাগবশত সুরের পাগল এই সুলতানের কিঞ্চিৎ খবরা-খবর নেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। সেনাপতি আদম খাঁর নেতৃত্বে শক্তিশালী মোগল বাহিনী মাণ্ডু আক্রমণ করল। তিনি পরাজিত হলে সমস্ত পুরনারীকে যেন হত্যা করা হয় এই নির্দেশ রেখে বজ বাহাদুর রণক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। মাণ্ডু দুর্গে ফিরে আসবার তিনি আর অবকাশ পেলেন না। আফগান ওমরাহদের বিশ্বাসঘাতকতায় আদম খাঁ সহজেই লড়াই ফতে করলেন। পলাতক বজ বাহাদুর প্রথমে খান্দেশের সুলতান ও পরে মেবারের উদয় সিংহের সহযোগিতায় মাণ্ডু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এদিকে পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে প্রাসাদ-প্রহরীরা অধিকাংশ পুরনারীকে হত্যা করলে। গুরুতরভাবে আহত রূপমতী এক শিবিকায় আরোহণ করে পিত্রালয়ে পলায়নের চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ পথ অতিক্রম করবার পর আদম খাঁর সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে এল। মাণ্ডুতে সুচিকিৎসায় রূপমতী আরোগ্যলাভ করলেন। মোগল সেনাপতি আদম খাঁ পরিতৃপ্তিভরে আদেশ দিলেন, শাদির আয়োজন কর। মাত্র তিনদিন সময় চাইলেন নিরুপায় রূপমতী; তারপরে যেন আদম খাঁ তাঁর মহলে আসেন।

নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় রূপমতীর কক্ষে বড় সমারোহ। আলো জ্বালা হয়েছে সবগুলি ঝাড়-লণ্ঠনে; অগুরু চন্দনের গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত। কুসুমাস্তীর্ণ পালঙ্কে শুয়ে আছেন রূপমতী, ছ'বছর আগে বিবাহের দিনে যে অপরূপ সজ্জা করে-ছিলেন সেই সাজে। বহু আশা বুকে নিয়ে আদম খাঁ প্রবেশ করলেন। একি! রূপমতী কি নিদ্রিতা? ওড়্‌না উন্মোচন করলেন আদম খাঁ। রূপমতী নিস্তব্ধ কেন? নাম ধরে ডাকলেন বিজয়ী মোগল সেনাপতি—কোনো উত্তর নেই।...বিষপাত্র নিকটেই পড়ে ছিল। ...নিষ্ঠুর মোগল-সেনাপতি আদম খাঁরও দয়া হল। রূপমতীর শবদেহ তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যাবার তিনি অনুমতি দিলেন। সেখানে, তাঁর প্রিয় পদ্মদীঘির মাঝখানে ছোট্ট একটু দ্বীপে সমাহিত করা হল রূপমতীকে। আর, পলাতক জীবনের শেষে, বজ বাহাদুর যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁরও মৃতদেহ এখানে এনে রূপমতীর কবরের পাশে কবর দেওয়া হল। মাণ্ডুর অদূরে, সারঙপুরে এই প্রণয়ী-যুগলের শেষ বিশ্রামস্থান আজও দর্শক-চিত্তকে বিচলিত করে আর চারিদিকের অনাদৃত পদ্মবনে ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়।

বজ বাহাদুরের প্রাসাদ থেকে নতমস্তকে তিন মাইল পথ ফিরে আসছি। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলিনি; আসগর উসখুস করছে, এটা সেটা কথা বলে থেমে যাচ্ছে—কী হল আমার? বাঁধের মত উঁচু রাস্তা; নীচে জঙ্গলে ঢাকা অসমতল জমিতে দূরে দূরে পড়ো বাড়ি, ভাঙা মসজিদ। সড়কের পাশে এক জায়গায় সাইন-বোর্ডে লেখা "ইকো পয়েণ্ট"। আমার মনোযোগ অন্তত এবিষয়ে আকৃষ্ট হবে এই আশায় এক পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে আসগর তীব্র চীৎকার করলে। পর পর চার পাঁচবার তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলুম। বললুম রূপমতী বলে ডাকতে। আসগর ডাকলে রূপমতী...। ক্রম-অনুচ্চ শব্দে দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে সে নাম দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।...

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

নার্সারি স্কুল

প্রভাত দেবসরকার

এই সবে অরবিন্দের বিলাতের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মান লাভের সংবাদটা টেলিগ্রামে এসে পৌঁছল।

টেলিগ্রাফ-পিওনের সাইকেলের ঘণ্টাটা দূরে অস্পষ্ট মিলিয়ে যেতে যেন অপরেশ-বাবুর খেয়াল হলো, পিওনটাকে কিছু বকশিশ করা উচিত ছিল। এত বড় আনন্দের সংবাদ তিনি আর কোনদিন পাননি। জীবনভোর শুধু দুঃসংবাদই পেয়ে এসেছেন।

খানিকক্ষণ টেলিগ্রামটা হাতে করে' অপরেশবাবু চুপ করে' বসে রইলেন। আনন্দটা তাঁর বড় বেশী বাজছে আজ দুঃখের মত। আর কারো সঙ্গে এ আনন্দটা যদি ভাগ করে' উপভোগ করতে পারতেন! নিজের মনে সংবাদটা কখন মনের গভীরে ডুব দিয়ে অনেক দুঃখ বেদনার শুক্তি আহরণ করছে। চোখের কোল দুটো কখন ভারী হ'য়ে উঠেছে। অজান্তে দু' ফোঁটা অশ্রুও ঝরে পড়ল টেলিগ্রামটার ওপর।

দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল! অরবিন্দকে প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্তি করে' দিয়েছিলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে অপরেশবাবুর। নিজে দেখতে পারেন না, বাড়িতেও কেউ নেই দেখবার; ছেলেটা পাঠে বড় অমনোযোগী হ'য়ে উঠছিল। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে, প্রথমভাগটা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়েও সে শেষ করতে পারেনি। অপরেশ-বাবুও পেড়াপিড়ি করেন নি তেমন। মা-মরা, রুগ্ন ছেলে যেমন পারে শিখুক, চাপ দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু বছর খানেক অপেক্ষা করবার পর ফল সেই একই দাঁড়াল—খোকা পড়াশোনায় যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হ'য়ে রইল। প্রথমভাগের রেলগাড়িটা কিছুতে নড়ল না আর। অপরেশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক'দিন ছেলেকে তিনি বিশেষভাবে দেখবার চেষ্টা করলেন। শেষটা বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। কানমলা আর চড়চাপড়ে খোকার কান্নাই বাড়ল কেবল, পড়াশোনা এগোল না কিছু। তার ওপর, মাঝখান থেকে বিধবা বোন এসে আরো গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললেন, "এমনি ছেলে তোমার, জজ-বেরেস্টার হবে নাকি যে তুমি অমন করে' মারধোর আরম্ভ করচো! মা-মরা দুধের ছেলেটাকে মারতে তোমার মায়া হয় না দাদা? ওর শরীরে কি আছে দেখেচো, ক'খানা হাড় খালি।"

ঐখানেই অপরেশবাবুর সব চেষ্টার শেষ হ'য়ে যায়। পিসির কোলের মধ্যে আঁচলে মুখ ঢেকে খোকা ফোঁপাতে থাকে। অপরেশবাবুরও মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। হঠাৎ এত নির্দয় তিনি হ'লেন কি করে'? আজ এতটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটল কেন তাঁর?

অনেক বিবেচনা করে' তিনি ছেলেকে স্কুলে দেওয়াই ঠিক করলেন। একটা বাঁধা-বাঁধির মধ্যে এলে খোকার মনের গতিক ভাল হ'তে পারে। পাঁচটা সমবয়সীকে পড়তে দেখলে নিজেরও পড়বার চাড় হ'বে খোকার। আবার পিসি মাঝখানে এলেন। তাঁর আপত্তির কারণ অন্য—"পাঁচজনের সঙ্গে ঠায় বসে পড়বার মত খোকার স্বাস্থ্য নয়। ঐ তো ছেলের চেহারা, ফুঁ সহ্য হয় না—পাঁচ জনের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে' লেখা-পড়া শিখবে, তার চেয়ে ছেলেটাকে তুমি বিলিয়ে দাও দাদা, ও-ও বাঁচুক তুমিও বাঁচো।"

তা সত্ত্বেও অপরেশবাবু একদিন ছেলের হাত ধরে পাড়ার কাছেপিঠে একটা নার্সারি স্কুলে এসে উপস্থিত হ'লেন। পথে ছেলেকে তিনি স্কুলটা যে কত মজার জিনিস, কত নতুন নতুন বন্ধু পাবার জায়গা, বোঝালেন, ছেলের ভয় ভাঙাতে রাস্তায় সমবয়সী ছেলেমেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখো ওরা কেমন স্কুলে যাচ্ছে!

সেখানে গিয়ে কত পড়বে, খেলা করবে, দিদিমণিরা ভালবাসবে।"

পিসির মনোভাব খোকার জানা থাকলেও কী ভেবে সে বাবাকে আশ্বস্ত করে' বলেছিল, "আমিও ওদের মত পড়বো!"

অপরেশবাবু মনে মনে ভারি খুশি হ'য়ে উঠেছিলেন ছেলের সুবুদ্ধিতে। এতদিন ছেলেকে স্কুলে দিলে আর এমনটা হ'তো না—সেদিনকার তাড়নার জন্যে নিজেকে অপরেশবাবু দোষী করেন। ছেলেকে তিনিই তো বাড়তে দেননি! আরো দোষ ওর পিসির।

স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকে আর ছেলের মুখে কথা নেই। পিসির আদরে একলা ঘরে মানুষ ছেলেটা কেমন যেন বোবা হ'য়ে গেল। অপরেশবাবু লক্ষ্য করে' ছেলেকে অন্যমনস্ক করতে বললেন, "কত বড় স্কুল দেখ খোকা! এইখানে তুমি পড়বে।"

খোকা হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। ভয়-বিহ্বল চোখে বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অপরেশবাবু মনে মনে প্রমাদ গোনেন। মুখে বললেন, "পছন্দ হয় তো তোমার? ঐ দেখ তোমার বন্ধুরা তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। যাও, ওদের সঙ্গে ভাব কর।"

ছেলে বাপের হাত ছাড়ে না। ভয়ও কাটে না তার। অপরেশবাবুর মনটাও হু হু করে' ওঠে ছেলের মুখচোখের চেহারা দেখে। একবার ভাবেন, ফিরে যান, আর একদিন এসে চেষ্টা করবেন। এভাবে ছেলেকে রেখে যাওয়াটা ঠিক হ'বে না।

না, দুর্বলতাকে অপরেশবাবু প্রশ্রয় দেবেন না। ঐ করে' ছেলে তাঁর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। আর দেরি নয়, আজই ছেলেকে ভর্তি করবেন।

হাত ছাড়িয়ে অপরেশবাবু ছেলেকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "বোকার মত চুপ করে আছ কেন? কি, স্কুলে পড়বে না?"

ছেলে উত্তর দেয় না, অবাধ্য ঘোড়ার মত কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অপরেশবাবু মুস্কিলে পড়েন। এ আবার কি ভাব ছেলের! শেষে বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "চল্ ফিরে যাই। মুখ্খু হ'য়ে থাকবি!"

তবুও ছেলের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপরেশবাবু ইতস্তত করেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো ফিরে যেতেই হ'বে, যে বেয়াড়াপনা আরম্ভ ক'রেছে ছেলে।

ঠিক সেই সময় একটি মহিলা কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্কুলে ঢুকছিলেন। পিতাপুত্রের এরকম 'ন যযৌ' ভাব দেখে থমকে দাঁড়ালেন, খানিক কি ভাবলেন নিজের মনে, এগিয়ে এসে খোকার হাত ধরে বললেন, "এস আমরা সবাই পড়তে যাই। লিলি তুমি এর হাত ধর।"

খোকা কিন্তু তেমনি কাঠ, গোমটা মুখ—আর কারো হাত ধরতে সে রাজী নয়। ছেলের ব্যবহারে অপরেশবাবু অপ্রস্তুত বোধ করেন। ছেলেকে ভয় দেখিয়ে বলেন, "যতই কর, তোমাকে এখানে আজ রেখে যাবই। আর নিয়ে যাব না, যেমন কে তেমন! পাজী ছেলে কোথাকার!"

মহিলাটি মুখে এক রকম উ-স্ উ-স্ শব্দ করে' বলেন, "না খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এস, কিছু ভয় নেই! খেলনা দেবো কত।"

আরো যেন অপ্রস্তুত বোধ করেন অপরেশবাবু। ঠিক বুঝতে পারেন না ছেলেকে শাসন করার জন্যে মহিলাটি গায়ে পড়ে তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছেন কি না। অপরেশবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন মহিলাটিকে। না, কোন সন্দেহ হয় না। কেমন একটা শান্ত, স্নিগ্ধ ভাব আছে সে-মুখে। হয়তো ভুলই করেছেন অপরেশবাবু।

খোকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মহিলাটি বললেন, "ছোট্ট ছেলে, ওদের সেন্টিমেণ্ট বুঝে কাজ না করলেই মুস্কিল; ভয় দেখান কোন মতেই উচিত নয়!"

সন্দিগ্ধ সুরে অপরেশবাবু বললেন, "দেখুন আপনি যদি পারেন বাগে আনতে!"

মনে হ'লো বিজয়িনীর মত মহিলাটি হাসলেন।

কিন্তু খোকা কারো সম্মান রাখলো না। মনে হ'লো বিজয়িনীর মত মহিলাটি কৌতুক বোধ করতে লাগলেন ছেলের ব্যবহারে। বিজয়িনীর মুখটা না-পারার লজ্জায় বার বার লাল হ'য়ে উঠতে লাগল।

যেই অপরেশবাবু চোখের আড়ালে সরে আসেন, অমনি খোকা পিছু পিছু চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে ক্লাশ থেকে উঠে আসে। যতক্ষণ অপরেশবাবু সামনে থাকেন ততক্ষণ মুখ গোঁজ করে' দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে মহিলাটি বলেন, "আজ আপনি ওকে নিয়ে যান। প্রথম দিন বলে' অমন করছে। দু'দিনে ঠিক হ'য়ে যাবে।"

যেন ইচ্ছে করে সন্তুষ্ট মনে ছুটি দিচ্ছেন এমনি ভাবে খোকার থুতনিটা হাতের চেটোর ওপর তুলে ধরে মহিলাটি বললেন, "আজ যাও, কাল আবার এসো, কেমন?"

একদিন নয়, খোকা অমনি প্রায় পনের বিশ দিন করেছিল। অপরেশবাবু ছেলের ওপর রাগ করে ভেবেছিলেন, চুলোয় যাকগে, ছেলেকে পড়াবেন না আর! তে'দড়-বেদড় ছেলে, ওর কিছু হ'বে না।

ছেলের ওপর রোজ যতই রাগ করুন অপরেশবাবু, ভারি খারাপ লাগতো তাঁর ক্লাসে বসে খোকা যখন হাতের মুঠো দিয়ে দুটো চোখ রগড়ে-রগড়ে ফোঁপাত। আড়াল থেকে দেখে তাঁর কেমন মনে হ'তো—হত-ভাগা ছেলেটার কেউ নেই। সেই সঙ্গে ইলার কথাও বুঝি, মরে গিয়ে তাঁকে বড় জব্দ করে গেছে। খোকার মা আজ বেঁচে থাকলে এ দুঃখ তাঁকে পেতে হ'তো না। অনেকদিন পরে চোখ দুটো তাঁর ঝাপসা হয়ে আসে।

শ্রীমতী রমা বসুও বোধ হয় হেরে গিয়েছিলেন। এমন ছেলে তিনি কখনো দেখেননি। একি বিপরীত মনস্তত্ত্ব ছেলের! কিছুতেই বাগ মানে না! একদিন রমা বসু নালিশের সুরে চিঠি লিখেছিলেন অভি-ভাবকের কাছে। চিঠিটা আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন অপরেশবাবু। চেষ্টা ক'রলে এখনি বার করতে পারেন চিঠিটা। "মহাশয়, অরবিন্দকে লইয়া বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি। ক্লাসে তাহার কান্না কিছুতেই থামান যায় না, ফলে আর সব ছেলেদের কিছু পড়ান বা লিখানো যায় না। কেন যে কাঁদে বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেয় না। কেহ-কেহ প্রথম প্রথম স্কুলে আসিয়া কাঁদে সত্য, কিন্তু অরবিন্দর মত এমনি ধারা কেহ করে না। বুঝাইয়া ভুলাইয়া কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারি নাই। যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন।......"

চিঠিটা হাতে করেই অপরেশবাবু ছুটে এসেছিলেন। প্রকারান্তরে রমা বসুর অযোগ্যতার জন্যে অভিযোগ করেছিলেন। যদি নাই পারবেন তা হ'লে তাঁরা স্কুল খুলে রেখেছেন কেন; সব ছেলে যে সমান হ'বে তার কোন মানে নেই। রমা বসুর প্রথম দিনের অভ্যর্থনার কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে অপরেশবাবু ছাড়েন না। ছেলের হ'য়ে রাগ করে' উঠে আসবার সময় তিনি রমা বসুকে শাসিয়ে আসেন, গভর্নিং বডিতে কথাটা তুলবেন—ছোট ছেলে কাঁদলে যদি ভোলান না যায়, তা হ'লে নার্সারি স্কুল করবার দরকার কি? অভিভাবকদের ফাঁকি দেবার অর্থই বা কি?

রমা বসু স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন উলটো অভিযোগে। ছেলের পক্ষ নিয়ে অপরেশ-বাবু যে এমনি ধারা করবেন তিনি ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেন নি। অরবিন্দকে নিয়ে তিনি কি করবেন ভাবতে না পেরেই পরামর্শের জন্যে চিঠিটা লিখেছিলেন। অতটুকু ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করবার মত বুদ্ধি তাঁর নয়। ছি ছি, কী লজ্জা! শিক্ষয়িত্রী হিসেবে একী অধঃপতন!

অপরেশবাবু থামলে রমা বসু শান্ত স্বরে বললেন, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ভেবেছিলুম আপনার কাছে কোন পরামর্শ পাব। দেখি আর কিছুদিন চেষ্টা করে। দয়া করে ক্ষমা করবেন।"

নিজের ব্যবহারে অপরেশবাবুও তত-ক্ষণে কম লজ্জিত হননি। ছেলেটার জন্যে তার মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না। হঠাৎ অপরেশবাবু আত্মসমর্পণের মত বলেন, "কি করি বলুন দিকি! আমিও কি কম জ্বালাতন হচ্ছি ওকে নিয়ে। ওর মা থাকলে এসব ঝামেলা আমাকে পোহাতে হ'তো না। হারামজাদা ছেলের কি যে মতলব! মাপ করবেন, অযথা আপনাকে দোষারোপ করেচি, রূঢ় কথা বলেচি।"

নিঃশব্দে রমা বসু চোখ তুলে অপরেশ-বাবুর মুখের দিকে চাইলেন। সত্যিই অরবিন্দের জন্যে ভদ্রলোকের ভাবনার অন্ত নেই! যদি রাগ করে থাকেন তারও যেন যথেষ্ট কারণ আছে।

অপরেশবাবু মাথা নিচু করে টেবিলের ওপর কাঁচের পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। রমা বসুর মুখ থেকে কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় তিনি আছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে উভয়ের মধ্যে নীরবতাটা এত প্রকট হ'য়ে ওঠে যে, ছোট্ট অফিস-ঘরটায় কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে কারো খেয়াল হয় না। কেউ-ই লক্ষ্য করেননি, বাইরে দিনের আলো কখন নিভে গেছে। অফিস-ঘরের ঠিক পিছনে সদর রাস্তার ওপর বড় বড় গাছগুলো বাসায়ফেরা পাখিদের আর্তস্বরে ভরে উঠেছে।

ঘরের আলোটা এখন জেলে দেওয়া খুবই উচিত। কিন্তু কি জানি কেন, রমা বসু নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকেন। অপরেশবাবুও মুখ ফুটে আলোটা জ্বালাবার কথা বলতে পারেন না। ঘরের কোনখানে সুইচবোর্ড তা তিনি জানেনও না, তা ছাড়া।

একসময় আলো অবশ্য জ্বলেছিলো, কিন্তু অপেরেশবাবু আর কোনো অজুহাতে অপেক্ষা করতে পারেননি। হাত তুলে একটা নমস্কার করে তিনি বিদায় নিয়ে-ছিলেন সেদিন। চলে আসার সময় চেয়ারটা নড়ে যে শব্দ হয়েছিল আজো তা যেন কানে লেগে আছে। তারপর কতবার শব্দটার কথা মনে মনে ভেবে অপরেশবাবু কুণ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু কখনো রমা বসুকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারেননি, শব্দটায় তিনি কী ভেবেছিলেন তখন-তখন? ঘনিষ্ঠ হ'তে কতদিন ভেবেছিলেন জিজ্ঞেস করবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর হ'য়ে ওঠেনি। কী যে সংকোচ আর লজ্জা!

আশ্চর্য, তারপর ছেলে তাঁর একেবারে বদলে গেল! কে বলবে ওকে নিয়ে একদিন অপরেশবাবু কোমর বেঁধে রমা দেবীর সংগে ঝগড়া করতে ছুটে গিয়েছিলেন। বরং এখন একদিন স্কুলে না গেলে ছেলের মেজাজ বিগড়ে যায়। কি গুণ যে রমা বসু করেছিলেন কে জানে।

চেনাই যায় না... অপরেশবাবু নির্বাক

আরো চিঠি রমা বসু অপরেশবাবুকে লিখেছিলেন। কিন্তু সে সবই অরবিন্দর পড়াশুনো সম্পর্কে—কেমন একটা উৎ-কণ্ঠিত আগ্রহ প্রকাশ পেত তাঁর চিঠিতে! অরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল বড় উচ্চ, আশাও ছিল সুবৃহৎ; এ ছেলে কিছু একটা না হয়ে যাবে না কালে, প্রকারান্তরে সেই কথা তিনি জানাতে চাইতেন অভিভাবককে।

প্রথম বছরেই বাৎসরিক পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম হ'লো। অপরেশবাবু আনন্দ-আতিশয্যে স্থির থাকতে পারেননি। সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাতে ছুটে এসে-ছিলেন রমা বসুর কাছে। ভাগ্যে সেদিনও স্কুলে কেউ ছিল না, থাকলে অপরেশবাবুর এই আনন্দ-উত্তেজনার কী মানে করতো কে জানে।

স্মিত মুখে রমা বসু অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন!"

কোনরকমে চেয়ারে বসে অপরেশবাবু কি বলতে গিয়ে যেন কি বলে ফেললেন, "আপনি যা করেচেন তার তুলনা হয় না!"

রমা বসু নিঃশব্দে হাসলেন। অপরেশ-বাবুর মনের কথাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন হয়তো।

তখনও অপরেশবাবুর উত্তেজনা কাটেনি। জড়িত কণ্ঠে বললেন, "আপনার হাতে ভাগ্যে পড়েছিল! ঐ ছেলে যে কোন-দিন লেখাপড়া করবে আশা করিনি—প্রথম প্রথম কি বেগটাই না দিয়েছিল!...অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে!"

রমা বসু কোন উত্তর দেন না, তেমনি হাসেন নিঃশব্দে।

ঝোঁকের মাথায় আরো কি যেন অবান্তর কথা অপরেশবাবু বলে ফেলেছিলেন সেদিন। রমা বসু স্থির হ'য়ে শুনেছিলেন।

আত্মপ্রশংসায় উদ্ভাসিত মুখটা তাঁর মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন কঠিন হ'য়ে উঠেছিল। অপরেশবাবু অপ্রস্তুতের মত খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে এসেছিলেন। রমা দেবী কি রাগ করলেন?

না, রমা বসু কিছুই মনে করেননি অপরেশবাবুর সেদিনকার ব্যবহারে। খোকার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বরং উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছিল। খোকার এক বিশেষ স্নেহশীলা, আত্মীয়ার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নেপথ্যে ভালমন্দর সব দায়িত্বও সেই সঙ্গে। এরপর অনেকদিন তিনি খোকার হাত ধরে অপরেশবাবুর দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছেন। খোকা কি খুশী!

ছেলের হাত থেকে বইখাতা নিতে নিতে অপরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই একলা এলি? কতদিন তোকে বারণ করেচি একলা আসিস্‌নি, গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা। কোন্‌দিন চাপা পড়বি!"

ছেলের অসম সাহসে অপরেশবাবু রাগ করেন।

ধীরে সুস্থে অরবিন্দ অনেকক্ষণ পরে বাপকে আশ্বস্ত করে! "বড় দিদিমণির সঙ্গে এলুম। তিনি তো দিয়ে গেলেন আমাকে।"

নির্দিষ্ট সময়ে চাকরটা কেন খোকাকে রোজ আনতে যায় না, বোনের কাছে অপরেশবাবু কৈফিয়ৎ চাইছিলেন। খোকার কথা শুনে তাঁর বিশ্বাস হয় না, বলেন— "ফের বাজে কথা বলচো! দিদিমণি দিয়ে গেছেন! তিনি তোমার চাকর?"

অরবিন্দ চুপ করে যায়। তার শিশু-মন বুঝে উঠতে পারে না দিদিমণির তার সঙ্গে আসাটা এমন কি অন্যায়, অসম্ভব ব্যাপার।

সেইদিনই রমা বসুকে অপরেশবাবু একখানা চিঠি লিখেছিলেন, "খোকাকে যেন কোনোদিন একলা না ছাড়া হয়। চাকর গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। দেরি হ'লে আটকে রাখবেন। আপনার কষ্ট স্বীকারের জন্যে ধন্যবাদ জানবেন।"

তবুও তো কতবার খোকাকে পৌঁছে দিতে রমা দেবীকে আসতে হ'লো! ছুটির পর বাড়ি যাবার জন্যে অরবিন্দ গিয়ে হাত ধরলে তিনি না এসে পারেন কি ক'রে।

যেদিন প্রথম রমা দেবী অপরেশবাবুর বাড়ি এসেছিলেন, সেদিনের কথাটা আজো স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ভাবতেই পারেননি, কোনোদিন কোনো ছলে রমা দেবী তাঁর গৃহে পদার্পণ করবেন। দুজনেই দুজনকে দেখে চমকে উঠেছিলেন; বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সারা দেহ যেন অপরেশবাবুর অবশ হ'য়ে গিয়েছিল। আজো সেই শিহরিত অনুভূতিটা মনের গভীরে অম্লান হয়ে আছে। রমা দেবী তখন দালানে বসে খোকার পিসির সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

চোখ নামিয়ে রমা দেবী অপরেশবাবুর বোনের সঙ্গে ঘরকন্নার কথায় মন দিলেন। পাশে বসে অরবিন্দের চোখে মুখে কী খুশিটাই না উপচে উঠেছিল সেদিন।

ঘাড় গুঁজে নিজের ঘরে এসে স্থির হ'য়ে চেয়ারে বসেছিলেন অপরেশবাবু। অকারণে এত আত্মস্থ তিনি আর কোনদিন হননি। কী যে আবোল তাবোল নিজের মনে ভেবেছিলেন তখন তার ঠিক নেই।

তাঁর গৃহে রমা দেবীর হঠাৎ আগমনের কারণটা বোন যেভাবেই ব্যক্ত করুক না কেন, আসল কারণটা কিন্তু অব্যক্তই থাকে।

রমা দেবী চলে যেতে বোন বললেন, "খোকার দিদিমণি বলে গেলেন ওর স্বাস্থ্যের দিকে যেন বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বড় রুগ্ন ছেলে, ওঁর ভয় করে।"

অন্যমনস্কের মত অপরেশবাবু বললেন, "বলছিলেন নাকি? আর কি বললেন?"

বোন ঠিক কার প্রশংসা করছে অপরেশবাবু বুঝতে পারেন না। "খোকার কী সুখ্যাতি! অমন ছেলে নাকি ওঁর স্কুলে একটিও নেই।"

অপরেশবাবু চুপ করে থাকেন।

বোন বললে, "মানুষটা খুব ভাল দাদা! খোকাকে কি ভালটাই বাসে। যতক্ষণ ছিল কেবল খোকার কথা, কি করে, কি খায়, কখন্ শোয়, কখন্ পড়ে, কি খেলে? সব খুঁটিয়ে জানা চাই।"

অপরেশবাবু হেসে বলেন, "মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী বল!"

বোন প্রতিবাদ করে, "না দাদা তুমি যা ভাবচো তা নয়। ভারি শান্ত, মিষ্টি স্বভাব মেয়েটির!"

তবু এ-ভাল প্রমাণসাপেক্ষ। খোকার জন্যে যে ভাল, আর কারো জন্যে সে ভাল নাও হ'তে পারে। বোনের এ কেবল অতিশয়োক্তি। আর কোনো কারণে কি রমা দেবী এ বাড়িতে আসতে পারেন না? আরো স্পষ্ট কারণ কি কিছু থাকতে পারে না?

কয়েকবার আসাযাওয়ার পর পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হ'তে আলাপটা বেশির ভাগ অরবিন্দর পড়াশোনা নিয়েই হ'তো। রমা দেবীর স্কুলের মেয়াদ তো খোকার শেষ হ'য়ে এসেছে—এর পর কোন্ স্কুলে পড়বে, কি ভাবে পড়বে, তাই নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না। এক এক ক'রে যত নাম-করা স্কুলের নাম করতেন রমা দেবী, চুপ করে অপরেশবাবু শুনে যেতেন। কোনো মন্তব্য করতেন না।

রমা দেবী বিশেষ একটি বিদ্যালয় সম্বন্ধে জেদ করলে অপরেশবাবু বলতেন, "আপনি যেটা ভাল মনে করেন সেইখানেই খোকা পড়বে—এর আর বলবার কি আছে! স্কুল কলেজের আমি কি বুঝি!"

মাথা নেড়ে রমা দেবী বলতেন, "আপনার ছেলে, আপনি বলবেন না তো আমি বলবো!"

কি ভেবে পরিহাস করেই হয়তো অপরেশবাবু উত্তর করতেন, "আপনারও ছেলে।"

রমা দেবী চুপ করে টেবিলের কোণটা খুঁটতেন, নয় তো আর কোনো কাজ আছে বলে' উঠে যেতেন। পরিহাসকে লোকে কেন যে সত্যি ভাবে! নিজের মনে অপরেশবাবু কতদিন ভেবেছেন, এ-রকম পরিহাস তিনি খোকার শুভানুধ্যায়িনীর সঙ্গে করবেন না—ছি ছি, কেন যে তার এমন দুর্মতি হয়!

রমা দেবী একদিন যেন কথায় কথায় বলেছিলেন, "ছেলের কথা শুনেছেন? আজকাল আবার মাসি বলতে শিখেচে। বলে ফুলমাসি!"

ছোট ছেলে। ওর দোষ কি। যা শেখাবে তাই শিখবে! অপরেশবাবু কৌতুক বোধ করেন, "তাই নাকি! কে শেখালে?"

রমা দেবী উত্তর করেন না, লজ্জায় বোধ হয় আরক্ত হয়ে ওঠেন। সম্বোধনটা যে-ই শেখান তিনি তাঁর রূপের কথাও মনে রেখেছেন!

হেসে অপরেশবাবু বললেন, "যার কাছে শিখুক, মিথ্যে তো শেখেনি!"

রমা দেবী মাথা তুলতে পারেন না, ছি ছি, কি লজ্জা! কথাটা না তুললেই হতো। জেনে শুনে এমন বোকামি কেউ করে! ছেলেকে অপরেশবাবুই শিখিয়েছেন, একি আবার বলতে হয়!

অবনতমুখী রমা দেবীর রূপটা নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে করতে অপরেশবাবু ভাবেন, খোকার পিসির নামকরণটা ঠিকই হয়েছে। কে জানে এত রূপ যাঁর তাঁর পক্ষে এ-ব্রত মানায় কি না!

খোকা বড় স্কুলে ভর্তি হলে পরও রমা দেবী সম্বন্ধ রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে এসে খোকার পড়াশোনা বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন। অপরেশবাবুর বোন খোকার নতুন স্কুল সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক অভিযোগ করতেন—ভাল পড়ায় না, ফাঁকি দেয় ইত্যাদি। শেষটা বলতেন, "ও-স্কুলে খোকার কিচ্ছু হবে না! একটা বাজে স্কুল!"

রমা দেবী খোকাকে জিজ্ঞেস করতেন তার স্কুলের কথা। খোকা চুপ করে থাকতো। ভালমন্দর সে কি জানে! মনে মনে হেসে

রমা দেবী মুখে বলতেন, "এ বছরটা যাক, আসচে বছর বদলে দিলে হবে।"

হায়, তিনি যদি জানতেন খোকার স্কুল কে ঠিক করে দিয়েছেন!

খোকার পিসি রমা দেবীকে প্রায়ই এসে খোকাকে দেখে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন, "এই তো এখানে, আপনার যাবার পথে ছেলেটাকে দেখে যাবেন! পড়াশোনার আমি কি বুঝি, দাদা তো নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত! আপনি ছিলেন আমরা তবু নিশ্চিন্ত ছিলুম, এখন কে দেখে তার ঠিক নেই! ছেলেটা এবার বয়ে যাবে।"

ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে পিসির দুর্ভাবনাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের। তা হোক, রমা দেবী তাঁকে সাধ্যমত নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করতেন। ইদানীং বোধ হয় একটু বেশী-ই আসতেন তিনি খোকাকে দেখতে। কেউ না-হলেও কেমন যেন একটা অনুক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর এ'দের সঙ্গে। বাড়িটার কাছে এলেই রমা দেবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। যাব না, যাব না করেও একসময় ঢুকে পড়তেন।

একদিন অমনি ঢুকে পড়ে রমা দেবী বড় অপ্রস্তুত হয়েছিলেন নিজের কাছে। ভাগ্যে আর কেউ তাঁকে দেখেনি, না হ'লে ফাঁকা বাড়িতে অসময়ে তাঁর আসা নিয়ে সন্দেহ করতো। পড়ুয়া ছেলে খুঁজতে কেউ এ-সময়ে গৃহস্থের বাড়ি আসে না কি! আর এলেও বাড়িতে যখন কেউ নেই তখন চলে যাওয়াই উচিত নিঃশব্দে।

তবু রমা দেবী অনেকক্ষণ দালানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। নাম কারো জানেন না বলে হয়তো কোন শব্দ করেননি মুখে--- আর এ-সময় অরবিন্দ কিছুতে বাড়িতে থাকতে পারে না জেনেও তার নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে-ছিলেন।

এ অবস্থায় চলে যাওয়াই তো উচিত। না, রমা দেবী চলে যাননি। ঘরের মধ্যে কেউ আছে কি না জানবার তার আগ্রহ হয়েছিল। এসেছেন যখন দেখেই যান।

বাইরে তখন অন্ধকার হয়ে এলেও ঘরের ভেতরটা অস্পষ্ট নয়। চেয়ারে-বসা অপরেশ-বাবুর স্থির মূর্তিটা দেখা যায়। তিনি যেন গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে রমা দেবী বললেন, "এরা সব কোথায়?"

"যাদবপুরে আমার এক বোনের বাড়ি।"

তেমনি যেন অন্যমনস্ক মনে হয় অপরেশবাবুকে।

দু'জনের আর কোন প্রশ্ন করবার থাকে না। চুপ করে এ সময় মুখোমুখি বসে থাকাটাও কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হয়।

ওঠবার আগে রমা দেবী একবার জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা কেমন পড়াশোনা করছে?"

'ভাল' বলে, কি যেন ভুল হয়ে গেল অপরেশবাবুর। হঠাৎ রমা দেবীর হাতটা ধরে জড়িতকণ্ঠে বলেন, "বসুন, অনেক কথা আছে।"

রমা দেবী চুপটি করে বসেছিলেন অবশ্য, কিন্তু কোন কথাই আর হয়নি উভয়ের মধ্যে।

তারপর অনেকদিন রমা দেবী আর আসেননি। নিজের মনে লুকোচুরিটা তিনি বোধ হয় ধরতে পেরেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁর হয়তো পরিষ্কার নয়।

একদিন অপরেশবাবুর বোন কথায় কথায় রমা দেবীর কাছে ভাইএর সংসারবিমুখতা নিয়ে অনেক দুঃখ করলেন। ছেলের জন্য উনি বিয়ে করবেন না, এ কি একটা যুক্তি-যুক্ত কথা! না হয় তিনি মানলেন, তখন ছেলে ছোট ছিল, সৎমা অযত্ন করবে---এখন তো ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে করতে আপত্তি কি?

রমা দেবী সায় দিলেন। এতটুকু ছেলের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ ভেবে যদি কেউ আর সংসার করতে না যায়, তাকে হয়তো যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়, কিন্তু সাধারণ সংসার-ধর্মে মেনে নেওয়া যায় না। আর ছেলের জন্যে এখনি এত স্বার্থত্যাগ করার অপরেশবাবুর দরকার কি?

সমদুঃখী ভেবে অপরেশবাবুর বোন বললেন, "দাদা কারুর কথা শুনবেন না। পেড়াপিড়ি ক'রলে বলেন, তিনি অনেক বুড়ো হ'য়ে গেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা প্রশ্নও করে বসেন অপরেশবাবুর বোন, "আচ্ছা, দাদার বয়েস আপনার কত মনে হয়? বুড়ো মনে হয় কি ও'কে?"

রমা দেবী ফাঁপরে পড়েন। কি বলবেন ভেবে পান না। পুরুষ মানুষের বয়েস নিয়ে কোনদিন যে কেউ তাঁকে মধ্যস্থ মানবে, তিনি ভাবতে পারেননি।

অপরেশবাবুর বোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, "দাদা আমার চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়।"

মনে মনে রমা দেবী কৌতুক বোধ করেন, অপরেশবাবুর বোনের বয়েস হিসাবের প্রক্রিয়াটা দেখে। কিন্তু পরমুহূর্তে মুখটা তাঁর কালি হ'য়ে যায় যখন অপরেশবাবুর বোন আবার তাঁকে বলেন, "দাদার জন্যে একটা ভাল দেখে মেয়ে দেখে দিন না; একটু বয়েসওলা---"

সেদিন সেই ফাঁকা বাড়িতে অপরেশবাবু সহসা বিচলিত হ'য়েছিলেন কি তাঁকে অপমান করতে, না তিনি নিজে থেকে সে অপমান কুড়িয়েছিলেন? সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে আজকে এ প্রশ্ন-উত্থাপনের কোন মানে আছে কি?

ধীরে ধীরে রমা দেবী বলেছিলেন, দেখবো! হয়তো দেখতেনও, কিন্তু অপরেশ-বাবু মুস্কিল করলেন। প্রায়ই তাঁকে অরবিন্দের নাম করে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। না এলে অভিযোগ করে' দীর্ঘ পত্র লিখতেন। সে-পত্রের ভাষা সব সময় যথেষ্ট পরিষ্কার মনে হ'তো না রমা দেবীর। ফলে একদিন এমন হ'লো যে, এ বাড়িতে ঢোকার তাঁর মুখ রইল না।

অপরেশবাবুর বোন সুধাময়ী তাঁকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন, একদিন হঠাৎ এসে পড়ে রমা দেবী আড়ালে থেকে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শুনে ফেলেছিলেন।

সুধাময়ী বলছিলেন, "বিয়ে না কর বুঝি, তা বলে একটা মাস্টারনীকে! কেন, ভূ-ভারতে কি মেয়ে নেই, না, তুমি অপোড়ো? তোমার বয়েসে লোকে অমন বারবার বিয়ে করে---"

অপরেশবাবু চুপ করে ছিলেন, কোন উত্তর করেননি।

সুধাময়ীর মুখ দিয়ে তখন নিশ্চয়ই সুধা নির্গত হয়নি, ভাইকে নীরব দেখে তিনি বলেছিলেন, "তাই খোকার ওপর এত দরদ, খোকা-অন্ত প্রাণ! আর খবর নাও, দেখবে কত কাণ্ড করে' রেখেছে। ওদের জাত-জন্ম আছে?"

অপরেশবাবু বোনকে চুপ করতে বললেন। কিন্তু সুধাময়ী চুপ করবার জন্য এ প্রসঙ্গ সেদিন তোলেননি। দ্বিগুণ উত্তেজনায় বললেন, "অত বড় ধুমসী আইবুড়ো থাকে কেন? বিয়ে হ'লে এতদিন সাত ছেলের মা হ'য়ে যেত! তোমরা ভাবো শখ করে' সংসার করেনি, না, আর কিছু! শখ ওদের অন্য। কণ্ঠিবদলে কাজ হয়! কুলের কথা আর জানতে কারো বাকি নেই---"

অপরেশবাবু বিরক্তির সুরে বোনকে বারণ করলেন, "আঃ কি ইতরামি হ'চ্ছে। তুই না পারিস চলে যা, আমি বিয়ে করবো না। করলেও তোকে কোনদিন জানাবো না।"

আর কি কথা হয়েছিল রমা দেবী শোনেননি আড়াল থেকে। যেমন চুপিসাড়ে এসেছিলেন তেমনি চুপিসাড়ে সরে গিয়েছিলেন---অভাবিত আঘাতে মুখচোখ যেন থে'ৎলে গিয়েছিল।

প্রথমটা অভিমান করেই অপরেশবাবু নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করেছিলেন। দরকার কি একজন যদি কোনো কারণে সংবাদ নেবার আর কোন আগ্রহ বোধ না করে উপযাচক হয়ে তিনিই বা মনে করিয়ে দেন কেন? বাধ্যবাধকতা তাঁর কিছু নেই

রমা দেবীর হৃদয় সম্পর্কে। তবু মাসখানেক পরে একদিন অপরেশবাবু রমা দেবীর স্কুলে দেখা করতে এসেছিলেন। অকারণে এত সঙ্কোচ তিনি আর কখনো বোধ করেননি। অল্প দু'একটা কথায় রমা দেবীকেও যেন আর বোঝা গেল না। শিক্ষয়িত্রীর নির্লিপ্ত কাঠিন্যে অপরেশবাবু ভয় পেলেন, অপমানও বোধ করলেন। উঠে আসবার সময় মনকে প্রবোধ দিলেন, ভারি তো একটা মেয়েছেলে, তার আবার এত অহঙ্কার! কেন?

আর যেন শেষ পর্যন্ত রাগ করেই অপরেশবাবু দ্বিতীয় বার বিয়ে করলেন। সুধাময়ীর মনোমত মেয়েই পাওয়া গিয়েছিল। মেয়েটি ভালই, অপরেশবাবুর সংসারে কোন বিপরীত কাণ্ড ঘটলো না। অরবিন্দ নতুন-মা'কে সহজভাবেই নিলে।

হয়তো অপরেশবাবু ভুলে গিয়েছিলেন, কি মনে রাখার আর আবশ্যকতা বোধ করেননি। অরবিন্দ ভালই লেখাপড়া করছিল, সংসারেও তাঁর শান্তির অভাব ছিল না।

কিন্তু খোকার যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার খবর বেরুলো সেদিন কয়েকবার মনের নিভৃতে রমা দেবীর কথা অপরেশবাবুর স্মরণ হয়েছিল। পুত্রের সাফল্যে তিনি আজ যেমন আনন্দলাভ করছেন, আর-একজনও বোধ হয় ঠিক সেই রকম আনন্দ লাভ করতেন, কি তারও বেশী—সে খোকার পাঠাভ্যাসের প্রথম শিক্ষাদাত্রী।

অপরেশবাবু ভোলেননি বলেই এত আনন্দে ঘুণাক্ষরে তাঁর নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু সুধাময়ী সহজে ভুলে গিয়েছিলেন বলে অনায়াসেই রমা দেবীর নাম করেছিলেন, "সে কিন্তু বরাবরই বলতো খোকা জলপানি পাবে! না দাদা?"

বোনের কথা শুনে অপরেশবাবু ম্লান হেসেছিলেন। সংসারে কার কথায় যে কি হয় তিনি আজো বুঝতে পারলেন না! খোকা ফেল করলেই বা রমা দেবীর কথার মূল্য নিরূপণ করবার কি দরকার হতো আজ! মিছিমিছি আর তার কথা তোলা কেন?

হয়তো আর কোনকালেই দরকার হতো না, যদি না একদিন রমা দেবী নিজে থেকে পুরোন পরিচয়-সূত্রটা তুলে ধরতেন। খুব একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তখন অপরেশবাবু কাটাচ্ছিলেন—হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেলেন, দ্বিতীয় স্ত্রী উমা বাপের বাড়িতে মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করেছেন; ঠিক তার তিন দিন পরে সুধাময়ী গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসবার সময় গাড়ি চাপা পড়ে হাসপাতালে যান। একটিমাত্র চাকর সম্বল করে অরবিন্দকে নিয়ে অপরেশবাবু কোন রকমে সংসারের হাল ধরে আছেন। আজ বাদে কাল খোকার আবার বি-এ পরীক্ষা।

অপরেশবাবুর সেদিন এই কথাটা মনে হয়েছিল, জীবনের প্রকৃত উপলব্ধি দুঃখে। আবার দুঃখ পাবার জন্যেই মানুষ সুখের কামনা করে। ভুল যা হয়, দুঃখকে চিহ্নিত করবার জন্যে। কাউকে খুশী করবার কোন ক্ষমতাই নেই কারো।

একলা একলা ঘরে বসে অপরেশবাবু খোকার পরীক্ষার কথা ভাবছেন। এর ওপর ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ভাল করলে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলাত যেতে পারে। সে কবেকার কথা, রমা দেবীও যেন অরবিন্দ সম্বন্ধে অনুরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বড় হয়ে তুমি বিলেত যাবে তো!"

খোকা সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়েছিল। উভয়েঃ ছেলেমানুষিতে অপরেশবাবু হেসেছিলেন। কবে খোকা বিলাত যাবে, তার অহঙ্কারে সেদিন রমা দেবীকে অদ্ভুত গরবিনী মনে হয়েছিল অপরেশবাবুর।

সুধাময়ী অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, "ছেলে আগে বাঁচুক!"

আজ সে রমা দেবীও নেই, সুধাময়ীও নেই, অরবিন্দর বিলাত যাবার সূচনা যদি সফল হয়!

চোখ দুটো রগড়াতে গিয়ে অপরেশবাবুর মনে হ'লো, চোখে বোধহয় ভুলই দেখছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর বাড়িতে সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা কার বধূর আগমন হ'বে? আত্মীয়স্বজন?

চেনাই যায় না। আরো আশ্চর্য, রমা দেবী এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। অপরেশবাবু নির্বাক।

টেবিলের কোণটা ধরে' সলজ্জ কণ্ঠে রমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছেন?"

জড়িত কণ্ঠে অপরেশবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আপনি?"

হাসির বোধহয় শব্দ হলো, রমা দেবী বললেন, "কেমন দেখছেন? ভাল নয়?"

অবাক হ'য়ে চেয়ে অপরেশবাবু বললেন, "ভালই। তারপর—"

আবার হাসলেন রমা দেবী। উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড়টা সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন।

শিক্ষয়িত্রীর এ শীলতাবোধে অপরেশবাবু কেমন যেন বিমূঢ় বোধ করেন।

ঠিক সেই সময় পরীক্ষা দিয়ে অরবিন্দ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে ইতস্তত করছে।

অপরেশবাবু গাঢ় স্বরে ছেলেকে ডাকলেন, "এস, প্রণাম কর। মাসিমা হ'ন।"

রমা দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন। হেসে-কেঁদে বললেন, "খোকা কত বড় হ'য়ে গেছে!"

অরবিন্দ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভেতর নতুন মানুষটাকে সে কেমন সন্দেহের চোখে দেখে।

অপরেশবাবু ছেলেকে রমা দেবীর পরিচয় দিতে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন, কেমন যেন দুর্বোধ্য আর অস্পষ্ট হয়ে আসে তাঁর স্বর। "সেই যে যিনি......তুমি যখন......তোমাকে প্রথম যে স্কুলে......"

রমা দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অরবিন্দর হাত ধরলেন। হাত ছাড়িয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে অরবিন্দ সরে দাঁড়াল। অপরেশবাবুর মনে পড়ল, প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে খোকা ঠিক এমনি ধারা করেছিল। সেদিন ছেলেকে যেভাবে তিরস্কার করেছিলেন আজ তা সম্ভব নয়। শুধু মাথায় নয়, বুদ্ধিতে ছেলে অনেক বড় হ'য়ে গেছে। তবু দৃশ্যটা দৃষ্টিকটু।

অপরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন পরীক্ষা দিলে?"

রমা দেবীকে গ্রাহ্য না করে অরবিন্দ বললে, "ভাল।"

"ফার্স্ট ক্লাশ থাকবে তো?" অপরেশবাবুও রমা দেবীর অস্তিত্ব ভুলে যান।

বাপ-ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "কি পরীক্ষা?"

"বি-এ!" অপরেশবাবু ছেলের দিকে চেয়ে বললেন।

আনন্দ-বিস্ময়ে রমা দেবী অরবিন্দকে ভাল করে লক্ষ্য করেন। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিতে কি দীপ্ত, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখখানা, আত্মস্থ নবীন তাপস। সে ক্রন্দনরত, কোলের কাছে টেনে নেওয়া শিশুটি আর নেই।

রমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "কি অনার্স নিয়েছো?"

অরবিন্দর তেমনি ভাব, কেন জানি না, বাইরের লোকটাকে সে কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। চুপ করে রইল।

অপরেশবাবু উত্তর দিলেন, "ম্যাথামেটিকস্!"

রমা দেবী বিস্ময় প্রকাশ করেন, "খোকা অঙ্কে কাঁচা ছিল না?"

ছেলের উন্নতিতে অপরেশবাবু হাসলেন হয়তো গর্বে, কিন্তু অরবিন্দ তেমনি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কে জানে এ ছেলের ঔদ্ধত্য কিনা।

রমা দেবী বললেন, "বাঃ! এই তো চাই। আমি জানতুম, বড় হ'লে খোকা খুব বড় হ'বে!"

তবু কি ছেলের অঙ্গস্পর্শ করে' আশীর্বাদ করা যায়! অপ্রস্তুতের মত রমা দেবী এক সময় সরে আসেন।

রমা দেবী চলে গেলে যেন অপরেশবাবুর খেয়াল হয়, হঠাৎ এতদিন পরে এত সাজ-গোজ করে আসার উদ্দেশ্যটা কি। দেখিয়ে গেলেন কত সুখে আছেন? বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছেন? প্রকারান্তরে তাঁকে জানানো, কারো জন্যে কারো কিছু যায় আসে না! তিনি দিব্যি আছেন, তাঁর কোন দুঃখ নেই। আরো, সামান্যা শিক্ষয়িত্রার ঐশ্বর্য প্রাপ্তির অহমিকাও হ'তে পারে! তাঁকে ঘুরিয়ে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়েই রমা দেবী এসেছিলেন, কোন দরকার ছিল না তাঁর আসবার।

মনে মনে অপরেশবাবু কিছুটা খুশী হন। তিনি না পারেন, তাঁর ছেলে রমা দেবীর সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার করেছে। আদিখ্যেতা। কি সম্বন্ধ ও'র সঙ্গে? এবার এলে তিনি তাঁর মুখের ওপর বলবেন, আর কোনো সম্বন্ধে উভয়ের দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

না, শেষ পর্যন্ত মুখে কোন কথাই বলতে পারেননি অপরেশবাবু রমা দেবীকে। বরং এরপর মাঝে-সাজে রমা দেবী এলে তিনি খুশীই হ'তেন। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের কোথায় যেন একটা অদ্ভুত কামনা উন্মুখ হ'য়ে থাকতো। তিনি প্রতীক্ষা করতেন!

একদিন অকপটে নিজের সব কথা তিনি রমা দেবীকে আবার আপন ভেবে বলেছিলেন। কি দুর্বুদ্ধিতে যে তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন কেবল দুঃখ পাবার জন্যে! জীবনে তিনি সুখ পেলেন না।

রমা দেবী চুপ করে শুনেছিলেন। হয়তো তিনি সব খবরই জানতেন। কে জানে, অপরেশবাবু আজ তাঁকে দোষী করছেন কিনা।

নিজ মুখে কিছু না বললেও রমা দেবীর বর্তমান সচ্ছল অবস্থার একটা সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল। একদিন দু'দিন ছাড়া গাড়িটা অপরেশবাবুর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াত। গাড়ি থেকে রমা দেবী ধীর পদক্ষেপে নেমে আসতেন। কোনো দিকে না চেয়ে সোজা অপরেশবাবুর বাইরের ঘরে এসে বসতেন—কখনো মুখোমুখি, কখনো একলা। তারপর আবার কতক্ষণ পরে উঠে যেতেন। মাঝে মাঝে ঢোকবার পথে কি বেরবার সময় অরবিন্দর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'তো, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কোন কথা হ'তো না—কি যে ছেলেটির মনোভাব রমা দেবী বুঝতে পারতেন না। কেন অমন বিরূপ সে কে জানে।

যথা সময়ে কানাঘুষা একটা উঠেছিল। অপরেশবাবুর মত একটা সামান্য লোকের ঘরে ঘন ঘন এত বড় ঘরের ঘরণীর আনা-গোণা কেন? পাড়ার লোকের শোফারটা চেনা, গাড়িটাও চেনা যে! আত্মীয় সম্পর্ক যে নয় কে না জানে! প্রথমটা অপরেশবাবু কান দেননি। পাড়ার লোক অমন বলে।

শুধু স্তম্ভিত নয়, মনে মনে অপরেশবাবু শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন, মাস তিনচার পরে একদিন যখন অরবিন্দ তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার মত জিজ্ঞেস করলে, "উনি রোজ আসেন কেন?"

অপরেশবাবু ছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারলেন না, কি উত্তর দেবেন ভেবেও পান না। ছি ছি, কি লজ্জা!

বাইরে কি শুনেছে কে জানে, অরবিন্দ পুনরায় তিক্ত প্রশ্ন করে, "উনি কে? কেন আসেন? দরকার কি—"

অপরেশবাবু চোখ তুললেন। বিরক্তির সুরে বললেন, "অত খবরে তোমার কাজ কি?"

অনেকটা শ্লেষ করেই যেন অরবিন্দ বাপের মুখে মুখে উত্তর করলে, "দরকার আছে বলেই জিজ্ঞেস করচি আপনাকে?"

অপরেশবাবু চীৎকার করে বললেন, "আমি বলচি, কোন দরকার নেই তোমার। যাও।"

মনে হ'লো, অরবিন্দ মুখে হাসি নিয়ে বাপের সামনে থেকে সরে গেল। অপরেশবাবু সাতদিন ছেলের সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি। লজ্জার চেয়ে তিনি ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন অরবিন্দর ওপর। আশ্চর্য, পরোক্ষ অপবাদে কেমন যেন আবার আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন রমা দেবীর প্রতি। মনে মনে ছেলেকে অকৃতজ্ঞ বলে' দোষারোপ করেছিলেন। সংসারটাই অমন! সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি একদিন চলে যাবেন—ঐ ছেলের মুখ চেয়ে চিরকাল তিনি কেবল দুঃখই ভোগ করে গেলেন!

আবার রমাদেবীই তাঁকে এ লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কি হয়েছিল তাঁর কে জানে, একদিন তিনি নিজে থেকে আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর মত অরবিন্দ তাঁকেও অপমান করেনি তো? কিছুই বলা যায় না।

রমা দেবীর শেষ চিঠিটা অপরেশবাবু রেখে দিয়েছেন, কৃতী হ'য়ে ছেলে ফিরে এলে দেখাবেন। সংসারে অকারণে কত বড় ভুল হয়, নিদারুণ, হৃদয়হীন!

অরবিন্দ যেদিন বিলাত যাত্রা করে সেই দিন কি তার পরের দিন রমা দেবীর চিঠিখানা অপরেশবাবু ডাকে পান। প্রথম তুমি সম্বোধন করে রমা দেবী পত্র দিয়েছিলেন।...

"ভাববে এতদিন পরে আবার খোঁজ নিচ্ছি কেন? কেনই বা এলুম, কেনই বা চলে গেলুম। বিশ্বাস করবে কি যদি বলি, কিছু না, এমনি। একদিন আলাপ পরিচয় ছিল তো! না, তাও অস্বীকার করো?...... তুমি যখন বোঝাতে এসেছিলে আমি বুঝতে চাইনি; আবার আমি যখন বোঝাতে গেলুম তুমি বুঝতে পারলে না। না, না, এ কারো দোষ নয়—ভাগ্যের। মেনেও নিয়েছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারিনি। মনে হ'য়েছিল এর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি যদি—না থাক সে কথা। দ্বিতীয়বার সংসার করে তুমি কি সুখ পেয়েছ জানি না, প্রথমবারেই আমি বঞ্চিত হয়েছি। স্বামী-সুখ! হায়রে কপাল! তোমার তবু ছেলে আছে, আমার? অনেক দুঃখে তাই তোমাদের কথা মনে হয়েছিল। একদিন খোকাকে নিয়ে যে ভাববিনিময় হয়েছিল, আজো যদি তার কিছু থেকে থাকে ভেবে ছুটে গিয়েছিলুম। তোমার জন্যে নয়, খোকার জন্যে। আমারই ভুল, খোকা যেন তেমনটি আছে—মাসি বলে সমাদর করবে, ভালবাসবে, বুকের মধ্যে মুখ লুকোবে! অরবিন্দ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমাদের সন্দেহ করলে। আর মুখ রাখবার, সান্ত্বনা পাবার, আমার জায়গা আছে? তোমার বোন (তিনি মারা গেছেন, কিছু বলব না) আর তোমার ছেলে কী চোখে যে আমাকে দেখেছে! মাস্টারনী! তবু তোমার সেকথা ভুলতে পারিনি—ছেলে তোমারও!

অরবিন্দ কেন আমার হ'লো না? সে কি আমার দোষ?"

চিঠির সঙ্গে রমা দেবী তাঁর শিক্ষয়িত্রী-জীবনের সামান্য আয়ের সঞ্চয় দেড় হাজার টাকার একখানি চেক পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, খোকার উচ্চ শিক্ষায় খরচ হলে তিনি মরে শান্তি পাবেন, তবু নিজেকে সার্থক মনে করবেন।

আজ চার বছর অপরেশবাবু সে-চেক ভাঙাননি, যত্ন করে তুলে রেখেছেন। খোকা ফিরে এলে তার হাতে তুলে দিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। বিশ্বাস আছে, এ উপহার খোকা প্রত্যাখ্যান করবে না।

অপরেশবাবুর সেই চেকটার কথা মনে পড়ল। এত আনন্দেও তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল—এতদিনে চেকটা অচল হ'য়ে গেছে সত্যি-সত্যি!

বাংলা ও রাজস্থানে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে যে, যে বাংলার মাটিতে বিদেশীদের মতে কবি আর বিপ্লবী ফুলের মত গজায় সে-দেশের পাঠকের কাছে মুসলমান যুগে স্বাধীনতা যুদ্ধে আগুয়ান রাজস্থানের চারণ কবিতা নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।

আমরা বাংলা দেশে বৃটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবার জন্য যে যুদ্ধ করেছি তার মূলে রাজস্থানের প্রেরণা ছিল খুব বেশী। কবি রঙ্গলালের সময় থেকেই বাঙালী ভেবে এসেছে

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের বইয়ে সেই স্বাধীনতার জন্য আবেগের সুরই আমাদের কানে ও মনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বার বার। তার পর আমরা চারণ কবিতার উন্মাদনা পেলাম দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে। যখনি দেশ দুর্দশায় পড়েছে, মুসলমানের হাতে আত্মসমর্পণের ভয় এসে গেছে, তখনি চারণ কবিরা দেশের অতীত গৌরবের, পূর্বপুরুষের বীরত্বের গান গেয়ে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই
আবার তোরা মানুষ হ।"

এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন চারণ চারণীরা। কিন্তু যে সময় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশকে ডাক দিতে হয় নি সে সময় থেকেই সুরু করা যাক।

রাজোয়ারার (রাজস্থানের) সব চেয়ে বড় কবি ছিলেন চাঁদ বরদাই। সব চেয়ে প্রাচীন কবিও বটে। কারণ তার আগেকার আর কোন কবির প্রামাণিক কোন কবিতা বা পুঁথি আমরা পাই না। তিনি যে-যুগের মহাকবি সে-সময়ের চলিত রাজস্থানী আর অন্যান্য প্রদেশের ভাষা যথা খাড়ি বোলি, ব্রজভাষা, পুরবিয়া বা বাংলা এদের মধ্যে এমন কিছু তফাৎ তখনো ফুটে উঠে নি। সাধারণ লোকের মধ্যে তারো আগে চলতি ভাষা প্রাকৃত ভেঙে বিভিন্ন প্রদেশে মাগধী, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি আলাদা ভাষার গোষ্ঠী তৈরী হতে লাগল। প্রত্যেক প্রদেশে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মুখের ভাষায় কপাট পড়ে যেতে আরম্ভ হল। আজ আবার সে কপাট খুলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাওয়ার কল্যাণে হিন্দী ভাষার প্রসার হচ্ছে। আজ রাজস্থানী ভাষাও হিন্দীর মধ্যে মিলিয়ে যেতে চলেছে। রাজোয়ারার কবিরা এরই মধ্যে কবিতা লিখতে সুরু করেছেন—ডিংগলে নয়, মাড়বারীতে নয়, চলিত হিন্দীতে।

কাজেই প্রাচীন রাজস্থানী কবিতার নমুনা হিসাবে চাঁদ বরদাইয়ের দাম এ-যুগে আরো বেশী। দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের সভাকবি বন্ধু আর সামন্ত ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্য শুধু কাব্য নয়, তার মধ্যে পাই ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্ব। তখনি মুসলমানরা বেশ ভালভাবে কায়েমী হয়ে এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে আর বহু হিন্দুরাজার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। এমন কি কণোজের রাজা জয়চাঁদের দলে ছিল বহু মুসলমান সেনাপতি। লাহোরে এত মুসলমান ছিল যে তাদের সংসর্গের ফলে চাঁদের কবিতায় প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।

তুলসীদাসের যেমন চৌপাই, সুরদাসের যেমন পদ, বিহারীলালের যেমন দোহা কবিতা তাঁদের কবিতার খুব বৈশিষ্ট্যময় রূপ, চাঁদের তেমনি বিশিষ্ট কবিতার রূপ হচ্ছে ছপ্পয়। বীররসের তাণ্ডবে ভরা এই ছপ্পয় কবিতা রাজস্থানীদের বহু প্রেরণা বহু উন্মাদনা জুগিয়ে এসেছে। প্রাচীন বাংলা ভাষার ব্যবহার ও শব্দের গড়নের কথা মনে রাখলে চাঁদের কবিতার কথাগুলি পড়তে অসুবিধা হবে না। তালব্য 'শ'র জায়গায় দন্ত্য 'স' ব্যবহার করা হত সে-সময়ের রাজস্থানীতে।

(কবি ও নামের কবিতা)

সুনি গজ্জনৈ অবাজ চঢ়য়ো সাহাব দীন বর।
খুরাসান সুলতান কাগ কাবিলিয় মীর ধুরে।
জংগ জুরন জালিম জুঝার ভুজ সার সার
ভুয়।
ধর ধমংকি ভজি সেস গগন রবি লুপ্পি
রৈন হুয়।

মিঠে বর্ণনাতেও বীরগাথার এই কবি নেহাৎ কম যেতেন না। সোমেশ্বরের ছেলে রাজা পৃথ্বীরাজের বর্ণনাঃ—

(দোহা কবিতা)

কামদেব অবতার হুয়, সুয় সোমেসর নন্দ
সহস কিরণ ঝলহল কমল, রিপি সমীপ
বর বিন্দ॥
সুনত শ্রবণ প্রথিরাজ জস, উমগ
বাল বিধি অঙ্গ।
তন মন চিত চহুবান পর, বস্যো
সুরত্তহ রঙ্গ॥

রূপের ও শৃঙ্গারের বর্ণনাতেও মহাকবির হাত ছিল খুব পাকা। প্রাচীন বাংলার মূল সংস্কৃত শব্দ ভেঙে ভেঙে মিঠে কথা তৈরি করার কৌশল রাজস্থানীতে খুব বেশী ছিল না। তবু যা ছিল তাই বা কম কি? পৃথ্বীরাজের প্রিয় রাণী পদ্মাবতীর বর্ণনাঃ—

মনহুং কলা সসি ভান কলা সোলহ
সো বন্নিয়
বাল বেস সসিতা সমীপ অমৃত রস
পিন্নিয়॥
বিগসি কমল মৃগ ভ্রমর বৈন খঞ্জন
মৃগ লুট্টিয়া।
হার কীর জরুবিম্ব মোতি নখ সিখ তাহি
ঘুট্টিয়া॥

আরেক জায়গায় কবি বলছেনঃ—

অরুণ অধর তিয় সধর বিম্ব ফল
জানি কীর ছবি।

কিন্তু সে যুগে বাইরের শত্রুকে লোকে ভয় করতে শেখেনি। কাজেই চাঁদের কাব্যে যদিও বীরত্বের ব্যঞ্জনা আছে—পরের যুগের চারণ-কবিদের কাব্যে যে রুদ্ররসের ডিম ডিম ডমরু ধ্বনি পাওয়া যায় তার প্রতিধ্বনি পৃথ্বীরাজ রাসো মহাকাব্যে নেই। পরের যুগের চারণরা গ্রামে গ্রামে হলদে পোষাক পরে ঘুরে বেড়িয়ে লোককে মাতিয়ে বেড়াতে লাগল। শুধু যুদ্ধে যাবার ডাক শুনিয়ে ত দিন যেতে পারে না, তাই

ইতিহাস, পূর্বপুরুষদের ইতিকথা আর রূপকথাও সে-কবিতার মধ্যে থাকত অনেক।

সমস্ত রাজোয়ারার স্বাধীনতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষার একটি ছোট কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিতা হচ্ছে এইঃ—

মহি জাতাং চিচাতা মহিলা
এ জয় মরণ তণাং অবসান।
রাখো রে কিহি ক রাজপুতো
মরদ হিন্দু কী মুসলমান॥

সংসারে পুরুষের জন্য মৃত্যুর শুধু দুটি সময় আছে। এক হচ্ছে যখন তার জমি অর্থাৎ দেশ-বাড়ি চলে যায়। আর অন্যটি হচ্ছে যখন তার স্ত্রী অন্যের কবলে পড়ে অসহায় হয়ে চেঁচাতে থাকে। ওরে কেউ ত এসে হিন্দু মুসলমান রাজপুতের ধর্ম বাঁচাও।

এই একটি কবিতার মধ্যে সমস্ত রাজোয়ারার রক্তমাখা ইতিহাসে যে সব আগুন-জ্বালা জহর ব্রতের কাহিনী আছে তার মর্মকথা খুলে ধরা হয়েছে। যে চিতার আগুনে বারবার রাজপুতানীরা নিজেদের বিসর্জন দিয়েছিলেন তবু বিধর্মী শত্রুর হাতে ধরা দেন নি, সে আগুন-জ্বালা পাই আমরা চারণদের কবিতাতে। একবার মহারাণা প্রতাপ যুদ্ধের পর যুদ্ধে হেরে, মেবারের পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে থাকতে দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে যান। কয়েকদিন খেতে না পাওয়ার পর একদিন ঘাসের বীজের আটার রুটি রাজপরিবারের সবাই খেতে পেলেন। কিন্তু সেই রুটির মধ্যেও রাজকুমারীর ভাগের রুটি বেড়ালে খেয়ে গেল। শত পরাজয়ের দুঃখ আর দুর্দশাতে যা করতে পারেনি রাজকন্যার কান্নাতে তা এবার করে দিল। মহারাণা প্রতাপ আর সহ্য করতে না পেরে আকবরের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। রাজপুতনার শেষ অহংকার মোগলের প্রতাপে মুছে যেতে চলল।

যদিও অন্য সব রাজপুত বংশই মোগলের বশ মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, অনেকেই মনে মনে সে জন্য দুঃখী ছিলেন আর প্রতাপের শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়াতে মনে মনে খুব গর্ব আর আনন্দ বোধ করতেন। এমন কি আকবরের রাজসভাতে যাদের থাকতে হত তারাও মনে মনে মেবার স্বাধীন থেকে যাক এই চাইতেন। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় কবি ছিলেন বিকানীরের রাজার ভাই পৃথ্বীরাজ। তিনি দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আকবরকে বলেন যে, এই বশ্যতা-স্বীকারের চিঠিটা সত্যিই প্রতাপের লেখা কি না তা যাচাই করে দেখতে চান। আকবর আনন্দে এত আত্মহারা হয়ে ছিলেন যে এই অনুরোধে রাজী হলেন। তখন পৃথ্বীরাজ খুব কৌশলে প্রতাপকে এমন এক কবিতা লেখেন যার প্রেরণা তাকে সমস্ত ফুরিয়ে যাওয়া বীরত্ব ফিরিয়ে দিল। তিনি দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে আকবরের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে নামেন আর ক্রমে ক্রমে চিতোর বাদে মেবারের প্রায় সমস্তটাই জিতে নেন।

পৃথ্বীরাজ সেই একই সময়ে দেশপ্রেমের অমর প্রেরণায় আরো কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা লিখে ছিলেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের আখ্যানে যে কবিতাটি প্রতাপকে পাঠান হয়েছিল তার বদলে আর একটি কবিতার অনুবাদ দিয়েছেন। এই কবিতাটির মূল হচ্ছে এইঃ—

নর তেয় নিমাণা নিলজী নারী আকবর
গাহক বট অবট।
চৌহটে তিন জায়র চীতোড়ো বেচৈ
কিম রজপুত বট॥
রোজায়তাং তনৈ নবরোজৈ জেথ
মুসানা জনা জন।
হিন্দু নাথ দিলীচে হাটে পতো ন
খরচৈ ক্ষত্রী পণ॥

* * *

জাসী হাট বাত রহসী জগ অকবর ঠগ
জাসী একার।
রহ রাখিয়ো খত্রী ধ্রম রাণৈ সারালে
বরতী সংসার॥

যেখানে পুরুষের মান গেছে আর নারীর গেছে লজ্জা আর আকবর যেখানে গ্রাহক সেই খোলা বাজারে গিয়ে চিতোরের অধিপতি কেমন করে রাজপুতের ধন বিক্রি করে দেবে? মুসলমানের নওরোজের সময় প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব লুণ্ঠিত হয়ে গেছে; কিন্তু হিন্দুপতি প্রতাপ কি করে সেই দিল্লীর বাজারে আপন ক্ষত্রিয় পণ খরচ করে ফেলবেন?.....ঠগরূপী আকবরও একদিন এই সংসার থেকে চলে যাবে আর হাটও উঠে যাবে। কিন্তু সংসারে এই কথাটি অমর হয়ে থেকে যাবে যে ক্ষত্রিয় ধর্মে অটুট থেকে সেই ধর্ম এক রাণা প্রতাপই রক্ষা করেছেন।

এই নওরোজে রাজপুতানীর সতীত্ব ও রাজপুতের মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়ার কাহিনী একটি অমর চারণ কবিতায় আছে। পৃথ্বীরাজের নিজের স্ত্রী কিরণময়ীই এই মহাবিপদে পড়েছিলেন ও শেষ পর্যন্ত নিজের বুকের তলায় লুকানো ছোরার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে ফিরে আসেন। কাজেই পৃথ্বীরাজ যোদ্ধা হিসাবে নিরুপায় হলেও কবিতার সাহায্যে প্রতাপকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যে বলবেন তা স্বাভাবিক।

সেই প্রেমিক বীর-কবির পত্নী মারা গেলে আত্মহারা পৃথ্বীরাজ লিখলেনঃ—

তো রান্ধ্যো নহিং খাবস্যাং,
রে বাগদে নিসম্ভ।
মো দেখত তু বালিয়া, লাল রহংদা হস্ত॥

ওরে আগুন, তোরে দিয়ে রাঁধা কোন জিনিস আর আমি খাব না। তুই আমার চোখের সামনে লালদেবীকে (সুন্দরী স্ত্রীকে) জ্বালিয়ে দিয়েছিস, আর তার অস্থি অবশেষ রইল।

পরে পৃথ্বীরাজ আবার বিয়ে করেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা যশলমীরের রাওৎকন্যা চম্পাদেবী সুরসিক স্বামীর কাছে প্রিয় শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ হয়ে কাব্য রচনা আরম্ভ করলেন। ডিংগল ভাষার অমর কাব্য রূপমণি-মংগলে এই কবিদম্পতীর দুটি কবিতা আছে।

পৃথ্বীরাজ দাড়ি থেকে একটি শাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন তা পিছন থেকে দেখতে পেয়ে চম্পা হাসতে শুরু করলেন। আয়নার উপর চম্পার মুখের হাসি দেখে পৃথ্বীরাজ বললেনঃ—

পীথল ধোলা আবিয়াঁ, বহুলো লাগী খোড়।
পুরে জীবন পদমণী, উভী সুহ মরোড়॥
পীথল পলী ঠমুকিয়াঁ, বহুলী লগ গই মোড়।
স্বামিনী হাঁসা করে, তালী দে মুখ মোড়॥

এমন রসাল অথচ ব্যথায় ভরা কবিতা শুনে স্বামীর মনের গ্লানি মিটাবার জন্য চম্পা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেনঃ—

প্যারী কহে পীথল শুনো,
ধোলাং দিস মত জোয়।
নরাং নাহরাং ডিগমিরাং,
পাকাং হো রস হোয়॥
খেড়জ পক্কা ধোরিয়াং, পন্থজ গ উধাং পাব
নরাং তুরং গাং বন ফলাং পক্কাং পক্কাং সাব।

ভরা-যৌবনা পদ্মিনী স্ত্রী স্বামীকে মাথার পাকা চুল তুলতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে। স্বামীর মুখে সে সম্বন্ধে কবিতা শুনে স্ত্রী উত্তর দিচ্ছে যে শোন, শোন, প্রিয়ার কথা শোন। মানুষ, সিংহ আর দিগম্বর অর্থাৎ সন্ন্যাসী পাকা অর্থাৎ পরিপূর্ণ হলেই রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব আর সাহসের কথা রাজস্থানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শাজাহানের ছেলেদের মধ্যে যখন সিংহাসন নিয়ে লড়াই হয় তখন এক এই যশোবন্ত সিংহের ভয়েই আওরংগজেব সর্বদা অস্থির থাকতেন। শেষ পর্যন্ত আফগানদের ঠান্ডা রাখবার জন্য দুরন্ত শীতের জায়গা কাবুলে তাঁকে সুবেদার করে পাঠিয়ে আওরংগজেব ঠান্ডা হন। সন্দেহ আছে যে, সেখানে বিষ খাইয়ে এই মরুভূমির কাঁটাকে উপড়িয়ে ফেলা হয়।

এই মরু-প্রান্তরের দুঃসাহসী বীরের রসাল কবিতার একটুখানি নমুনা দেখলে দেখা যাবে যে, সে সময়কার বাংলা আর রাজস্থানীতে ভাষার বা ভাবের তফাৎ এমন কিছু ছিল নাঃ—

মুখশশি বা শশি সোঁ অধিক,
উদিত জ্যোতি দিনরাতি।
সাগর তে উপজি ন য়হ,
কমলা অপর সোহাতি॥
নৈন কমল য়ে এন হৈ, ঔর কমল কেহি কাম।
গমন করত নৌকী লগৈ, কনকলতা য়হ বাম।

এত গেল রাজরাজড়াদের জন্য লেখা বা তাঁদের লেখা কবিতা। রাজস্থানের চারণ কবিতা বলতে শুধু এটুকুই বোঝায় না। কারণ চারণদের প্রতিভা আর পৃথিবী ছিল অনেকদিকে ছড়ানো। তারা যে দেশের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে, কাজেই দেশের মনের ছাপ তাদের মধ্যে পুরোপুরিই পাওয়া যাবে। দেশপ্রীতি বা আদিরস ছাড়াও সরল সহজ লোকগীতিও তারা রচনা করেন, গেয়ে বেড়ান।

নববর্ষের প্রথম ন' দিন ধরে রাজস্থানে গৌরীদেবীর পুজো আর উৎসব হয়। আমরা যেমন শারদীয়া পুজোর সময় প্রবাসী প্রিয়জনের ফিরে আসার পথ-চেয়ে থাকি ঘরে ঘরে বা তাদের সঙ্গে আবার মিলিত হতে চাই রাজপুতরাও গাঙ্গোর পুজোর সময় ঠিক তেমনভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধু শরৎ আর বসন্তে প্রকৃতির আর মানুষের মনের যেটুকু তফাৎ থাকে সেইটুকুরই ছায়া এসে পড়ে। গানে গানে তারা গেয়ে যায়—"মাতাল করা বসন্ত ঋতু এসেছে। গাঙ্গোরের নিত্য রঙ্গীন উৎসব এসেছে। হৃদয় আমার উতলা হয়ে উঠেছে। শরীরে ভরে উঠেছে গোলাপের সৌন্দর্য আর যৌবন। হে প্রিয় রসিক, তুমি ত প্রবাসে অনেক উপায় করেছ, এখন ঘরে ফিরে এসো। দিল্লীর দুয়ারে নহবত বাজছে, এখন তুমি ফিরে এসো।"

নেচে নেচে রাজপুত-রাজপুতানীরা গ্রামে গ্রামে গেয়ে চলেঃ—

হামরো প্যারা আজ তো
গুলাবী গাঙ্গোর ছে।
জোড়ী রা প্যারা আজ তো
বসন্তী গাঙ্গোর ছে।
হামারা প্যারা রাজা।

এমন আনন্দের সময় যদি স্বামী বাইরে বিদেশে যেতে চায়, তাহলে গ্রামবধূ চারণ কবিতা গেয়ে তাকে বারণ করবে। বলবে

মহারা মাথা নৈ মহিমদ ল্যাব।
মহারা হেজ্যা মারু ইহাং হো রেবো জী।
ইহাং হো রহো উগতা সুরজ
ইহাং হো রেবো জী॥

কিন্তু হায় মিলনকে ছাপিয়ে ওঠে বিদায়ের সুর, ঠিক যেমন করে বাংলার ঘরে ঘরে পুজোর শেষে উমাকে বিদায় দিতে হয়। নতুন বিয়ের কনে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। মন যেতে হয়ত চায়, কিন্তু চরণ চলতে চায় না।

ঘড়ি এক থড়িলো থোবুজে রে গায়র
বানরো।
মাতা বাই সে' মিলোয়া
দি রে হাতিলা বানরো॥

একটু দাঁড়াও আমার কবি স্বামী, একটু তোমার ঘোড়া থামাও। আমি মায়ের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই।

রাজপুত মালবিকাদের মধ্যে চলতি এই হৃদয়-নিংড়ানো গানখানার দুঃখ-বেদনা শারদীয়া পুজোর শেষদিনে বাঙালীর অন্তরের একেবারে মাঝখানে তার প্রতিধ্বনি তুলবে।

বেহাগ

সুশীল রায়

র থেকে বা কাছ থেকে যখনই কোনো গান এসে কানে ঢোকে অমনি হাঁটু দুলে ওঠে তাপসের। কখনো কখনো ঘাড় নড়ে ওঠে, আঙুলে বেজে ওঠে তুড়ি। ছেলেবেলা থেকেই নাকি তার গানের উপর স্বাভাবিক এই টান। বয়স বেড়েছে, কিন্তু এই টান তাতেও কমে নি, বরঞ্চ আগে থেকে অনেক বেড়েছে।

কোনো জলসা হোক, বিচিত্র অনুষ্ঠান হোক, স্কুল পালিয়ে চুপ করে তার সেখানে যাওয়া চাই।

আদর ক'রে মা বলতেন, আমার তপু গান-পাগলা। কালে ও মস্ত গাইয়ে হবে।

জুতো বুরুশ করতে করতে সে গানের সুর ভাঁজে। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে সে হাত নাড়ে। ভিতরে যে পদার্থ আছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন যা দরকার, তা হচ্ছে চর্চা।

কিন্তু কাউকে তার পছন্দ নয়, এমন একজন লোক তাপস পায় না যার সে শাকরেদী করতে পারে।

ভিতরটা তার সুরের আঁচে আগুন, বাইরে তার তাপ চেপে রাখা যায় না। পোশাকে-আশাকে চালে-চলনে তাপস হয়ে উঠল সত্যিকার একজন গাইয়ে। হাতের তিন আঙুলে চারটি আঙটি, পায়ে কাবলি স্লিপার, গিলে-করা পাৎলা আদ্দির জামা গায়ে।

ছেলের হালচাল দেখে দিগম্বরের ভাবনা হয়, বলেন, লেখাপড়াও ছেড়ে দিল, ওর ভবিষ্যতের কথাই ভাবি।

ভবানী দেবী বলেন, ভাগ্য মানুষে নিজের সঙ্গেই নিয়ে আসে; তোমার ভাবনার দরকার নেই। তোমার পাঁচটি ছেলেই সমান বিদ্বান হবে—এতটা আশা কর কেন। হাতের পাঁচটি আঙুল কি তোমার সমান?

দিগম্বর বলেন, সে কথা নয়। ভাবি, পড়াশুনা করলেই পারত।

ভবানী হয়তো একটু বিরক্তই হন, বলেন, তুমিও লাট হলেই পারতে। সকলকে দিয়ে সব কাজ যদি হত তাহলে আর কথা ছিল না। আমার এ ছেলে হবে গাইয়ে।

উৎসাহ পেয়ে তাপসের মধ্যে এল উদ্যম। গানকেই সে তার প্রাণ ক'রে নিল। মনে মনে সে ভজনা করে গানের, গানের ভাবনা ছাড়া তার আর কোনো ভাবনা নেই। গুন-গুন ক'রে ভজন গায় তাপস—চাকর রাখ জী। গলা খুলতে ভরসা হয় না, গলা তার তৈরি কি না, তা এখনো পরখ ক'রে দেখা হয় নি।

মনে মনে বিশ্বাস করে তাপস, অন্তরাত্মা দিয়ে যা তপস্যা করা যায় তার ফল হয়ই। ফল হল, তাপস পেয়ে গেল তার ওস্তাদ।

রেল লাইনের উপর দিয়ে সারাদিন মাল-গাড়ি আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করে, চাকায় ও রেলে ধাক্কা লেগে সারাদিন এ দিকটায় লৌহ আর্তনাদ বাজে। কিন্তু গভীর রাত্রে নেমে আসে শান্তি। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রেন শাণিত হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে চাকার শব্দে স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে চলে যায় অবশ্য। কিন্তু এ ছাড়া সব শান্ত। সেই শান্ত অন্ধকারের স্তব্ধ সমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে যেন এক মহাসংগীত।

কান পেতে তাপস সেই সঙ্গীত শোনে। ক'দিন থেকেই শুনছে। কার এই গলা, কার এই গান—দিনের প্রখর আলোয় সে সবই কেমন ঝাপসা হয়ে যায়।

ক'দিন খোঁজখবরের পর তাপস জানতে পারল রেল লাইনের ওপারের ব্যানার্জি-পাড়া লেনে দিন কয়েক হল এসেছেন নাকি একজন তরুণ গায়ক।—মহাদেব নন্দী।

ভাড়া বাড়ি। দু কামরার বাসা। এরই মধ্যে অন্দরের ও আসরের আয়োজন করে

নিতে হয়েছে। বাইরের দিকের ঘরের মেঝেতে লম্বা শতরঞ্জি বিছানো। এইখানে বসে গানের বৈঠক।

পুরোদমে বৈঠক চলেছে। তবলায় বাজছে বোল, তানপুরোয় ঝঙ্কার এবং সেই সঙ্গে মেয়েগলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্জে উঠছে পুরুষকণ্ঠ। দরজার বাইরে কতকগুলো জুতো ও স্লিপার হুড়োহুড়ি করতে করতে এইমাত্র যেন থেমে গেছে, এমনি এলোমেলোভাবে স্তূপ করা।

দরজার বাইরে সন্তর্পণে কে এসে যেন দাঁড়াল। মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরিপাটি করে কোঁচানো, গায়ে সূক্ষ্ম সুতির গিলে করা জামা, জামার নীচে থেকে জালি-গেঞ্জির আভা।

মহাদেব চোখ বন্ধ করে তান দিচ্ছিল। তার চোখে তাই এ দৃশ্য পড়ল না। কিন্তু ঘরের আর সকলে দেখল। সকলেই এক সঙ্গে তাকাল বাইরের দিকে। এতে সামান্য কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকবে। চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাদেব তার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল, কিছু ঘটেছে যার জন্যে এই অমনোযোগ। তাই সে চোখ খুলল। এই অচেনা আগন্তুককে দেখেই তার গলা থেমে গেল। গান থামিয়ে মহাদেব বলল, কাকে দরকার।

—আমি মহাদেব নন্দীর কাছে এসেছি।

—আসুন। উঠে এল মহাদেব, জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম।

—শ্রীতাপসকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মুখোপাধ্যায় ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি। তাপসকুমার নামেই আমার—

মহাদেব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, থাক্ থাক্ আর পরিচয় দরকার নেই। আসুন, বসুন।

তাপস ফরাসের এক পাশে আলগোছে বসল। পায়ের ধুলোয় শতরঞ্জির রং বদলে গেছে।

তাপস বলল, সে কি। সব থেমে গেল যে। গান চলুক।

চায়ের প্লেটে পান ছিল, একটা মুখে পুরে ওপাশ থেকে একজন বলল, গান আলাদা জিনিস মশাই, চলুক বললেই কি চলে। এ কি টাইমপিস ঘড়ি যে, দম দিয়ে কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠবে।

যে মেয়েটা গান শিখছিল, সে মুখে আঁচল তুলে নিয়ে হাসি ঢেকে ফেলল।

তাপসের নিজেকে যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ হল। সে বুঝতে পারল, তার হঠাৎ এভাবে এসে পড়ায় সব যেন কেমন ভেস্তে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে ব'সে ছিল সে, এবার একটু ঢিল হয়ে বসে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

মহাদেব বলল, কি খবর বলুন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমা সাফ করতে করতে তাপস বলল, এলাম আপনার কাছে একটু শিখব-টিখব ব'লে। শুনেছি আপনি খুব ভাল ট্রেনার।

মহাদেব হাসল, বলল, নাম-টাম রটেছে তাহলে।

যে লোকটি মুখে পান পুরলো একটু আগে, সে বলল, রটেছে মানে! তোমাকে টেনে আনলাম এ-পাড়ায় আর নামটা প্রচারেরই ব্যবস্থা হবে না?

তাপস আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে বলল, না না। কারো মুখে শুনে আসি নি। নিজের কানে শুনে এসেছি।

মহাদেব চোখ ইশারা করে বলল, কি?

—আপনার গান। আপনার গলা। লাইনের ওপারে থাকি। রোজ রাত্রে শুনি।

মহাদেব যেন তৃপ্তি বোধ করল। নিজের গলা দিয়ে নিজের নাম প্রচার সে নিজেই করেছে, এতে তার গৌরব যেন বাড়লই।

পান চিবতে চিবতে নিরাপদ বলল, হবে না? গলাখানা কেমন।

মেয়েটি মিনমিন করে কি-যেন বলল, শোনা গেল না।

নিরাপদ বলল, সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, ব'লে যান নি রবি ঠাকুর? সঙ্কোচ করে কথা বলা তোমার ফ্যাশান, নীলিমা। এতে রোজ রোজ তুমি নিজেকেই অপমান করছ। গলা ছেড়ে কইতে পার না।

নীলিমা বলল, আপনার কথাটাই বলছিলাম। উঃ, কী গলা।

নিরাপদ হো-হো ক'রে হেসে বলল, কার গলা? আমার, না, মহাদেবের?

নীলিমা আঙুল দিয়ে মহাদেবকে দেখিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এত খুঁত ধরতে পারেন।

মহাদেব মুখ গম্ভীর করে বসে বলল, আমরা এখানে গান ঠিক শেখাই নে। গানের সাধনা করাই। সাধনা ছাড়া সঙ্গীত নেই। থাকলেও আমরা মানি নে।

তাপসের ঠিক যেন মনের মত কথা। তার মুখের কথাটাই যেন বের হয়েছে মহাদেবের মুখ থেকে। সে বলল, আমিও চাই এমনি লোক। ছেলেবেলা থেকে গানে ঝোঁক, মনের মত ওস্তাদ পাই নি বলে তাই আজ পর্যন্ত শিখতে পারি নি।

মহাদেব তানপুরায় টংকার দিল, তবলায় চাঁটি পড়ল, নীলিমা বাঁ হাঁটুর উপর কনুই রেখে বাঁ হাতে বাঁ কান চাপা দিয়ে বসল। শুরু হল বেহাগের আলাপ, আলাপের শেষে চোখ বন্ধ ক'রে গেয়ে উঠল মহাদেব—

নাম জপন ক্যোঁ ছোড় দিয়া—
ক্রোধ ন ছোড়া, ঝুঠ ন ছোড়া,
তন মন ধন ক্যোঁ ছোড় দিয়া।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ব'সে তাপসও চোখ বুজল। তার সমস্ত তন্ত্রী ও তন্তুও যেন ওই বেহাগের রাগিণীতে ঘরবিবাগী হয়ে উঠেছে।

আসর ভাঙতে অনেক বেলা হল। এত বেলার জন্যে তৈরি হয়ে আসেনি তাপস। খিদেয় নাড়ি জ্বলছিল, কিন্তু তার জন্যে তার কোন কষ্ট নেই। আজ সে যে ধন পেয়েছে, এ ধন আর সে ছাড়বে না কিছুতে। তার নাম তাপস; কিন্তু কেবল নাম দিয়ে নয়, সে তার তপস্যা দিয়ে তাপস হবেই।

বান্ধব-নাট্য-মন্দির নাম দিয়ে নিরাপদরা এদিকে একটা ড্রামাটিক ক্লাব করেছে। আদি বান্ধবমন্দির ভেঙে তার এই নাট্যশাখাটা গড়ে তোলা হয়েছে। নবগঠিত এই ক্লাবের কোনো গাইয়ে ছিল না, সেইজন্যেই মহাদেবকে এদিকে নিয়ে আসা। আদি ক্লাবের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যেই নিরাপদের এই উদ্যোগ।

নিরাপদই বলে, মহাদেব গাইয়ে যেমনই হোক, ও আমাদের অ্যাসেট। ওকে দাঁড় করাতে পারলে আমাদের ক্লাবও দাঁড়িয়ে যাবে।

এইজন্যে মহাদেবের জন্যে নিরাপদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সে যে একজন অসাধারণ আর্টিস্ট, নিরাপদের দল একথা প্রচার করে থাকে।

বান্ধব-মন্দির আগে বছরে একবার পুজোর আগে কোনো একটা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক লিখিয়ে যাত্রা করত। তার মিউজিক ডিরেক্টর ছিল নিখিল বাগচী। নিখিলের নাম-ডাক ছিল এদিকে বেশ। কিন্তু মহাদেব আসার পর থেকে নিখিল চাপা পড়তে আরম্ভ করে। এই সুযোগে নিরাপদদের ক্লাব নিজেরা নাটক লিখিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল যাত্রা। গানে সুর দিল মহাদেব। রামের রাজ্যাভিষেক নিয়ে লেখা নাটক, খুব করুণ দৃশ্য আছে কয়েকটি এবং সেই সঙ্গে অভিশাপ ও নিয়তি নামে দুইটি ভূমিকা সৃষ্টি করে তাদের মুখে দেওয়া হয়েছে বেদনার্ত গান।

এই গান শুনে অনেকে কেঁদেছে। চিকের ফাঁক দিয়েও অনেককে চোখের জল মুছতে দেখা গেছে। এতে আর কিছু না হোক, নিরাপদদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। মহাদেবের নাম চালু হয়েছে এ-অঞ্চলের অন্দরে অন্দরে।

মেয়েরা আসতে আরম্ভ করেছে খুব। তারা গান শিখতে আসে। মহাদেবের গলাই কেবল আছে, এমন নয়; তার সঙ্গে

বাড়তি আর একটা জিনিসও মহাদেবের আছে, নিরাপদরা এ কথাও প্রচার করতে ত্রুটি করে নি, সে-জিনিসটি হচ্ছে হৃদয়। স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অতি সামান্য বেতনে গান শেখায় মহাদেব।

এইজন্যে মহাদেবের অবসর কম। সকাল দুপুর বিকেল—তিন বেলাই তাকে বসতে হয় গান নিয়ে। দলে দলে মেয়ে আসে। তাপস সারাদিন এক কোণে ব'সে থাকে চুপ ক'রে।

নীলিমা বলল, আমাদের দিকে নজর কিন্তু ক'মে যাচ্ছে মহাদেবদা।

মহাদেব তাপসের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা দু'জন হচ্ছ আমার প্রথম শিষ্য, তোমাদের দিকে নজর কখনো কম হ'তে পারে?

তাপস বলল, ঠিক। তা কখনো কম হ'তে পারে? আমার কিন্তু একথা কখনো মনে হয় নি।

নীলিমা একটু ঝাঁজ দিয়েই বলল, আপনি মহানুভব। তার উপর বাপের টাকা আছে।

মহাদেব বলল, ও কথা থাক। তোমাদের দুজনের জন্যে এবার থেকে স্পেশাল ক্লাস নেব। সন্ধ্যের পর।

এতে তাপস চট ক'রে রাজি হয়ে গেল। তার আর অসুবিধে কি। তার বাড়ি তো বেশি দূর না, লাইন পেরলেই। কিন্তু অসুবিধে নীলিমার। তাকে যেতে হয় ঢাকুরিয়া পেরিয়ে যাদবপুর।

মহাদেব বলল, পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। তার জন্যে ভাবনা নেই।

কিন্তু পৌঁছে দেবার কোনো ব্যবস্থাই হ'ল না। মহাদেব মনে মনে যে হিসেব করেছিল, তা গোলমাল হয়ে গেল। তাপস নিজের উদ্যোগেই যাবে, মহাদেব এইরকম ভেবেছিল—কিন্তু তাপস গা করে না। তার যেন রোজই কি কাজ থাকে। তা ছাড়া, তাপসকে নীলিমারও বিশেষ পছন্দ নয়। লোকটা কেমন আড়ষ্ট, আর কেমন-যেন অদ্ভুত ধরনের। গান শিখতে এসেছে, কিন্তু গলা খুলতে চায় না। বলে, ব'সে ব'সে শুনি। ধীরে ধীরেই রপ্ত হয়ে যাবে।

কয়েক বছর কেটে গেছে। আদি বান্ধব-মন্দিরে এখন কেবল তাস খেলা হয়, বান্ধব-নাট্য-মন্দির যাত্রা-থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে এখন খেলে ব্যাডমিণ্টন। ক্লাব দুটোর পরিবর্তন বা বিবর্তন, যাই বলা যাক, একটা-কিছু ঘটেছে। কিন্তু মহাদেবের আর কোনো বদল নেই। সে বসেছে শিকড় গেড়ে। শিকদারবাগান লেনে সে ছিল অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অপরিচিত, দুটি ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে এদিকে এসে এখন হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী।

তার ছাত্রীদের মধ্যে অনেকের বিয়ে হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—বেহালায়, বরাহনগরে, বনহুগলীতে টালিগঞ্জে। তাদের এলাকায় কোনো জলসা হলে তাদের স্বামীদের উদ্যোগে ডাক আসে মহাদেবের। ইস্কুল-মাস্টারি নিয়ে নীলিমাও বছর-দুই হল আসানসোলে চলে গেছে। পুরনোদের মধ্যে আছে একমাত্র তাপস।

জলসায় পুরনো ছাত্রীরা দেখে তাদের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে এসেছে সেই পুরনো লোকটি! কী যেন নাম? মনে পড়ে তাদের—তাপসকুমার।

আসানসোল থেকে গরমের ছুটিতে নীলিমা কলকাতায় এসে ব্যানার্জিপাড়ায় এল একদিন। মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকেই সে দেখল, ঘর ভরতি মেয়ে। মহাদেব তাদের গলা সাধার প্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন। নীলিমা নমস্কার ক'রে বসল। ব'সে ওদিকের কোণের দিকে তাকাতেই দেখল, সেই লোকটি—তাপসকুমার।

লোকটা পুরনো, কিন্তু একটু যেন নতুন ব'লে ঠেকল নীলিমার। পরনের জামা-কাপড়ে জেল্লা যেন কিছু কম।

তাপস ওখান থেকেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে ঘাড় কাৎ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, ভালো আছেন?

নীলিমা বলল, চলে যাচ্ছে।

মহাদেব এতক্ষণে বলল, এই যে, কি খবর বল। আড়াই বছর কেটে গেল, একটা খবর পর্যন্ত নিলে না। কেমন আছ? একটু মোটা হয়েছ দেখছি।

নীলিমার স্পষ্টভাষী ব'লে বদনাম আছে, বলল, খবর নেওয়া মানেই তো আপনাকে ডিস্টার্ব করা। এসে ব'সে আছি পাঁচ মিনিট, এতক্ষণে নজরে পড়লাম।

নীলিমা উঠে দাঁড়াল, বলল, আজ যাই। দিন-কয়েক আছি কলকাতায়, আবার পারি তো আসব। আপনিও বড় ব্যস্ত আছেন। আচ্ছা চলি, কি বলে গিয়ে, তাপসবাবু।

মহাদেব বলল, এস।

তাপস তার অনুকরণ ক'রে বলল, আচ্ছা।

পথে নেমে এল নীলিমা। আচ্ছা লোক যা হোক। যেমন ওস্তাদ, তেমনি তার শাকরেদ। এতদূর থেকে দেখা করতে এল, একটা ভদ্রতা বা সৌজন্য দেখাতে পারল না তারা। আর সে জীবনে কখনো আসবে না এখানে।

গত মাসে নিরাপদের বিয়েতে গিয়েছিল মহাদেব ও তাপস। বিয়ে থেকে আসার পর থেকে নিরাপদর সঙ্গে আর দেখা নেই। তাপসও যেন কেমন-একটু মনমরা। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ক্লাস হয়, তাপস চুপচাপ ব'সে থাকে এক কোণে; কারো দিকে তাকায়ও না, কোনো কথার মধ্যে থাকেও না।

জিজ্ঞেস করলে বলে, ভাবছি। ওই সুরগুলো টুকে নিচ্ছি মনে মনে। এবার একদিন বসব শিখতে।

—নিরাপদর সঙ্গে দেখা হয়?

—উঁহু। বিয়ের পর থেকে আর আসে না।

—বিয়েতে গিয়েছিলে? বউ কেমন হ'ল।

তাপস একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, গ্র্যান্ড। এগজাক্ট নীলিমার মত দেখতে।

—নীলিমা কে?

তাপস মাথা তুলে তাকায়, বলে, তাকে চেন না বুঝি? একজন ছিল এখানে।

দিগম্বরের এখন প্রায় দিগম্বর অবস্থা। পেন্সন পাচ্ছেন, চলে যাচ্ছে। বড় ও মেজ ছেলে বিয়ে ক'রেছে, দু'জনেই বম্বেতে আছে; কিছু পাঠাতে পারে না। ছোট দু'জন কলকাতাতেই ছোট চাকরি নিয়েছে। আয় বেশি না। আর একটির হিসেব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।

ভবানী দেবী বলেন, বাদ দাও না ওকে। মনে কর, ও ছেলে তোমার হয় নি।

দিগম্বর ছোট গামছা পরে কলঘরে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে বললেন, ছেলে তো কোনোটাই আমার হয় নি। আমার কথা

বলছি নে, তোমার কথাই ভাবছি। আমি গত হ'লে কে দেখবে?

—আর চারজন যেমন দেখছে, ওও তেমনি দেখবে। তা ছাড়া গানে কি পয়সা নেই। মহাদেব নন্দী সংসার চালাচ্ছে না?

দিগম্বর বললেন, সবাই তো মহাদেব নন্দী নয়, কেউ কেউ যে আবার তাপস মুখুজ্জে। সাত বছরে গান শেখা হয় না? বিশ্বেস করিনে।

দিগম্বর কলঘরে ঢুকে পড়লেন।

আর যারই যত উদ্বেগ থাক্, তাপসের বিন্দুমাত্র কোনো চঞ্চলতা যেন নেই। সে নিয়মিত হাজিরা দেয় মহাদেবের আসরে, নিয়মিত বসে থাকে এক কোণে, কখনো কখনো বা মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দেয় গানের সঙ্গে সঙ্গে।

কাজ যে সে করে না একেবারে, এমন তো নয়। একটা আসরে এইভাবে সঙ্গ দেওয়া কি কাজ নয়? আরো তো কত গাইয়ে আছে এ শহরে, তাদের বৈঠকে এমন একজন লোক কি কেউ দেখেছে?

মহাদেব বুদ্ধিমান লোক। সে তাপসকে লক্ষ্য করে, দরকার হ'লে দু-একটা কথা বলেও, কিন্তু তাকে কোনোদিন সামান্য বাধা দেয় না।

একদিন মহাদেব ভিতরের ঘর থেকে এ ঘরে এসেই বলল, এই যে এসেছ তাপস, এক কাজ কর, হারমোনিয়ামটা বের কর। ওরা সব এসে পড়ল ব'লে।

প্রথমটা তাপস চমকে উঠেছিল, হঠাৎ তুমি সম্বোধনটা শুনে তার আশ্চর্য লাগে। একবার মহাদেবের মুখের দিকে চেয়ে নেয়, ও কিছু না, এতদিনের পরিচয়ের দরুন ওটা নেহাতই আন্তরিকতার নমুনা ব'লে তার মনে হয়। কিন্তু ওই একই কারণে তার দিক থেকে ও ধরনের সম্বোধন করা যে সম্ভব নয়, তা সে বোঝে। তাপস ধীরে ধীরে উঠে হারমোনিয়াম বের করল। না বলতেই তবলাও চৌকির তলা থেকে টেনে তুলল।

পুবের রোদ্দুর এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। মহাদেব একটা সিগারেট ধরিয়ে চাপ চাপ ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল। আজ তার মনে নতুন-একটা খুশি যেন এসেছে। কিসের এ খুশি, বুঝতে চেষ্টা করল না তাপস।

মহাদেব বলল, খুব চটেছে।

তাপস বলল, কে?

মহাদেব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাঁধ দুলিয়ে একবার হাসল, বলল, মেয়েদের কাণ্ড। বড় সেণ্টিমেণ্টাল। লম্বা অনুযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে একটা।

সে কে, তাপস দ্বিতীয়বার আর তা জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ইতিমধ্যে একে একে আসতে আরম্ভ করল মেয়েরা। গান শুরু হয়ে গেল।

মনোরমা বলল, বাবা বলছিলেন, নতুন কোনো গান দিতে। আমার মাসিমা এসব গান শিখে গেছেন আপনার কাছ থেকে। বাবার তাই এগুলো পুরনো লাগে।

মহাদেব মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, চোখে তার কৌতুক খেলে গেল, সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার মাসিমার কাছে বুঝি তোমার বাবা রোজ গান শোনেন?

মেয়েদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল অমনি। মনোরমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

মনোরমা গানের খাতা তুলে নিয়ে বলল, আপনি ভারি অসভ্য।

ব'লেই সে হনহন ক'রে চলে গেল। তাপসের মুখ দেখে মনে হ'ল, সে যেন একটু খুশি হয়েছে। আপনি থেকে চট্ ক'রে তুমি ব'লে যে তাকে সম্বোধন করতে পারে, তার এমন-একটু শিক্ষা হওয়া ভালো। সেও মনোরমার মত অমনি যদি লাফ দিয়ে উঠে চলে যেতে পারত, তবে মন্দ হ'ত না। কিন্তু সে শক্তি যেন তার নেই। কিসের মায়ায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়েছে, কিসের বাঁধনে সে যেন বাঁধা পড়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দিগম্বর মারা গেলেন। একটা অঘটন ঘটে গেছে মনে হ'ল মহাদেবের। এই আসরের ওই কোণটা ফাঁকা। আজ আট-ন বছর যে স্থানটা ছিল ভরাট, আজ তা শূন্য।

এগার দিন বাদে ন্যাড়ামাথায় একটা রুমাল বেঁধে পুনরায় নিজের কোণটি দখল ক'রে বসল তাপস। আসরের শূন্যতা পূরণ হ'ল বটে, কিন্তু আসরটার কেমন যেন মৃতপ্রায় দশা। মেয়ের সংখ্যা খুব কম, যারাও আসে তারাও বড় গম্ভীর।

মহাদেব বলল, মেয়েদের নিয়ে বড় মুশকিল। মনোরমা যা-তা কথা রটিয়েছে। মেয়েরা তাই আসতে চায় না। আমি নাকি ওদের বাপ-মা তুলে রসিকতা করি। সেদিন বলছিলাম না, খুব চটেছে? সে কে জান?

—কে?

—আসানসোলের নীলিমা। তাকে নাকি সেবার যথেষ্ট খাতির করা হয় নি।

তাপস একটু নড়ে বসল, মাথা নীচু করল, কোনো মন্তব্য করল না।

মহাদেব বলল, মেয়েরা বড় দাম্ভিক হয়, তাই না?

তাপস সামান্য একটু হাসল, বলল, কি জানি।

সামান্য একটু তামাশা থেকে এমন অসামান্য ব্যাপার ঘটবে, এতটা আশঙ্কা করেনি মহাদেব। মহাদেবও নিজেকে গাইয়ে বলে বিশ্বাস করে না, সে হচ্ছে গানের কারবারি। তার সেই কারবার এবার প্রায় যায়-যায় হয়ে উঠল। এবার তার জীবিকায় এসে যেন হাত পড়েছে। কি করা যায় কিছু সে বুঝে পাচ্ছে না। নিরাপদর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু নিরাপদও নাকি এখানে নেই। ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে। বউয়ের নাকি অসুখ। তবু বরাত ভালো মহাদেবের, এ-দুঃসময়ে তার সঙ্গী আছে একজন।

তাপস বলল, আমিও যে কি করব, তাই ভাবছি। গানের দিকে এলাম, কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি। বাধা দিল মহাদেব, বলল, নীরব কবি যদি থাকতে পারে, নীরব গায়ক থাকবে না কেন? তুমি হচ্ছ সাধক, তুমি সেই নীরব কবি।

তাপসের মন দমে গিয়েছিল, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। তপস্যার তপোবন সে পায়নি, কিন্তু সে পেয়েছে আসরের একটি কোণ, সেই কোণে সে বসল দৃঢ় হয়ে।

মহাদেবের কথায় কাজ হয়েছে দেখে সে মনে মনে খুশি হল। এই অসময়ে একজন সঙ্গীকে হাতছাড়া করা ঠিক না।

মহাদেব বলল, কদিন থেকেই ভাবছি। ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি। ভাবছি, বাড়ীতে সুবিধে দেওয়া হবে প্রচার করলে যদি মেয়েরা আবার আসে।

তাপস বলল কি সুবিধে।

—মেয়েদের পৌছে দেওয়া হবে। এতে তোমার কোনো অসুবিধে নেই নিশ্চয়।

তাপস বলল, কী আর অসুবিধে।

কিন্তু বীজ পুঁতলেই ফল ফলে না। সময় লাগে। মহাদেবের এই নতুন পরিকল্পনার ফল ফলতে কিছু দেরি হল। মেয়েরা আসতে আরম্ভ করল একে একে। পুরনোর মধ্যে কেউ না, সব নতুন মুখ।

আসর ভাঙার পর তাপস তাদের ট্রামে-বাসে তুলে বা বাসায় পৌছে দিয়ে আসে।

এ কাজ তাপসের খুব খারাপ লাগছে না। ভালো ভালো জামা কাপড় পরা মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বলতে যাওয়া দেখে পাড়ার পাঁচটা ছেলের কাছে তার তো কদর বাড়ছে। কদরের কি কোনো দাম নেই।

সে শান্তিপুরী ধুতি নেই, মিহি কাপড়ের গিলে করা জামা নেই, হাতে আঙটিও নেই; এখন পরনে ঢোলা পাজামা ও ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। আর্টিস্ট হলে এমনি এলোমেলো সাজই মানায়। সেদিক থেকেও তাপসের মনে কোনো গ্লানি নেই।

এইভাবে দিন কাটাতে কাটাতে তাপসের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সে

সত্যিই একজন আর্টিস্ট। হাতে একটি ছোট্ট পিতলের হাতুড়ি নিয়ে মাথা নীচু করে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে করতে সে চলেছে, জিতেন্দ্র গুপ্তের ডাক্তারখানা থেকে ওদের প্রতিবেশী হরিপদ বলল, কি সার্, গাইয়ে, কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?

তাপস মাথা তুলে চেয়ে বলল, তবলাটা নিয়ে আসি গিয়ে।

মনে মনে হাসতে লাগল তাপস, এবার লোকে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আরম্ভ করেছে। কই অ্যাদ্দিন আছে এদিকে, কেউ তো কোনোদিন তাপস কি তাপসবাবু ব'লে ডাকেনি। এখন সবাই বলে সার্, বলে গাইয়ে।

মাথা দুলিয়ে, গুন গুন ক'রে আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে টাটা রোদ মাথায় নিয়ে হেঁটে চলে তাপস।

ফেরার পরে হরিপদ বলল, কদ্দুর এগলো?

কথার মানে না বুঝে তাপস বলল, ধীরে ধীরে চলেছে।

হো হো করে হেসে উঠল হরিপদ। বলল, হাল ছেড়ো না, যেমন বিড় বিড় করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাও, মনে হয় কেল্লা বুঝি ফতে করে ফেললে।

কিন্তু হরিপদরা চেনে না তাপসকে। তার মনে সে জোর কই, সে সাহস? সে যায় নিছক একজন চরণদার হয়ে! সে যে ইতিমধ্যে মহাদেবের আসরে পাতা শতরঞ্চিটার ধুলোরই শামিল হয়ে গেছে, তা জানে না হরিপদরা। কিংবা জেনে-শুনেই তারা এই ন্যাকামো করে?

তাপস তবলা নিয়ে ঢুকতেই চটে লাল হয়ে উঠল মহাদেব, বলল, . বেকুব না রাস্কেল, কী তুমি? শেফালি ব'সে আছে কখন থেকে, তাকে দিয়ে আসতে হবে না? তবলা এখন না এনে বিকেলে আনলে হত না।

তাপস ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল, এখনই বুঝি তাকে মহাদেব বরখাস্ত করে দেবে। চৌকির নীচে তবলাটা তাড়াতাড়ি চালান করে দিয়ে সে মহাদেবের চোখের দিকে চেয়ে বলল, দিয়ে আসছি। দুপুরে টাইম দিয়েছিল কিনা।

ব্যঙ্গ ক'রে উঠল মহাদেব, ইডিয়টের মত আর কথা বলো না। টাইমের জ্ঞান খুব দেখিয়েছ।

শেফালিকে নিয়ে রওনা হল তাপস। শেফালির তানপুরাটা নিয়ে নিল নিজের হাতে। ধীরে ধীরে সে হেঁটে চলল তার পাশাপাশি। আর মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, মানুষটি বড় ভালো বুঝলেন? আপনাদের অসুবিধে হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তাই চটেছেন, ও কিছু না।

অন্যমনা— শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার

ডিস্পেন্সারিতে বসে হরিপদ এই দৃশ্যটি দেখে মনে মনে হয়তো ঈর্ষান্বিত হল। কিন্তু হরিপদরা জানে না ঈর্ষার পাত্র তাপস নয়।

শেফালিকে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আবার হরিপদর সঙ্গে দেখা। হরিপদ বলল, কি রকম দেয় তোমাকে?

—কে?

—তোমার মনিব। মহাদেব নন্দী।

তাপস বলল, কী করে দেবে? তার তো চলা চাই। বাড়তি যদি হয়, তবে নিশ্চয় পাব।

হরিপদ বলল, তোমার চলে কী করে?

—ভাইরা আছে। তারা চালায়।

হরিপদ হাসল। কোনো কথা বলল না। ডিস্পেন্সারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, তাপস তুড়ি দিয়ে আর মাথা নেড়ে কি-যেন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।

ব্যানার্জিপাড়া লেনে ঝলমলে রোদ্দুরে বিচিত্র শাড়ির রং জ্বলে ওঠে রামধনুর বর্ণালির মত। সে রঙের আগে আগে চলে আধময়লা পাজামা ও ঢিলে পাঞ্জাবির একটি অগ্রদূত। দিনের পর দিন চলেছে এইভাবে, এইভাবে কেটে যায় বছরও।

নিবাপদ বদলি হয়ে গেছে মুসৌরী। তাই তার সঙ্গে অনেকদিন আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ক' দিনের ছুটি নিয়ে এবার সে এসেছে। মহাদেবের সঙ্গে রাস্তায় তার দেখা। মহাদেবের আসর এখন জমজমাট, সে খবর দিতে সে ভোলেনি। নিরাপদ হেসে

সিগারেট ধরলে
কবে থেকে?

আকুল। একটা বাল্য-লীলার মত মনে হয় সব। একটা ছেলেমানুষী রেষারেষির জন্য মহাদেবকে এখানে টেনে আনা। এখন সেই মহাদেবই এখানকার একজন পাকা বাসিন্দে।

নিরাপদ বলল, যাব যাব। দেখে আসব তোমার আসর।

মহাদেব বলল, প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম মাঝখানে। তখন মনে হত—ফি-পদ বিপদ-ময় নিরাপদ নাই কোনোখানে।

নিরাপদ মহাদেবের পিঠ চাপড়ে দিল।

পরদিন মহাদেবের আসরে গিয়ে উপস্থিত হল নিরাপদ। উঁকি দিয়ে দেখল, সব নতুন মুখ—সব অজানা অচেনা। আর একটু ভিতরে ঢুকতেই দেখল একটা অতি পরিচিত পুরাতন মুখ বসে—তাপসকুমার। কিন্তু সে জেল্লা আর নেই, নেই সেই আগের জলুস।

মহাদেব বলল, এস এস। ভিতরে এস।

পাঁচ-ছয় বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরে ঢুকল নিরাপদ।

মহাদেব বলল, এ কে?

—কন্যা।

—তোমার মেয়ে?

—হ্যাঁ।

তাপস কোণ ছেড়ে উঠে এসে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে, কি যে দেখছে, বোঝা কষ্ট। তাপসের তাকাবার ধরন দেখে মেয়েটা নিরাপদর কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। আর এক পা এগিয়ে তাপস তাকাল মেয়েটির দিকে।

হঠাৎ মহাদেবের গলা শুনে তাপস সোজা হয়ে দাঁড়াল। মহাদেব বলল, আমার চটিটা গেল কোথায়?

চৌকির নীচে উঁকি দিয়ে পেল না তাপস, শতরঞ্জির ভাঁজ থেকে বের করে মহাদেবের পায়ের কাছে এগিয়ে দিল।

চটি পায়ে দিয়ে মহাদেব ভিতরে গেল।

নিরাপদর কাছে সব যেন কেমন অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক ঠেকল। সে আড়চোখে তাকাতে লাগল তাপসের দিকে।

তাপস মেয়েটির দিকে চেয়ে নিরাপদকে বলল, আপনার মেয়ে? গ্র্যান্ড দেখতে হয়েছে কিন্তু।

মহাদেব ফিরে এসে বলল, চা করতে বলে এলাম। তাপস, শোনো, চট ক'রে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস। জলদি এস, মেয়েদের আবার পেঁাছে দিতে হবে।

হাত পেতে পয়সা নিয়ে তাপস মহাদেবকে বলল, দেখেছেন? এগজাক্ট নীলিমার মত দেখতে।

মহাদেব তাপসের মুখের দিক চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, বলল, আচ্ছা যাও।

নিরাপদ বলল, ওর মায়ের মতই নাকি দেখতে হয়েছে। ও কি বলছিল?

—নতুন কিছু না। পুরোনো কথা। বলব অখন।—ব'লে মহাদেব কি-যেন চিন্তা করতে লাগল।

নিরাপদ বলল, হঠাৎ যেন বড় চিন্তায় পড়লে।

মহাদেব মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, চিন্তার কথাই বটে। ভাবছিলাম ওই তাপসটার কথা।

নিরাপদ বলল, ঠিক। লোকটা কী ছিল, কী হয়ে গেল! আমিও ভাবছিলাম তাই।

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগল মহাদেব। বলল, বলব অখন।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে হনহন করে চলে আসছে তাপস, হরিপদ ধরল, বলল, সিগারেট ধরলে কবে থেকে?

তাপস বলল, না, আমার না।

মনিবের বুঝি? বিনে মাইনের এ কাজে দরকার কি?

—কি করব তাহলে?

হরিপদ বলল, কাজের অভাব? কম্পাউন্ডার হবে? চাকরি খালি আ দিতে পারি জোগাড় ক'রে।

চাকরির কথা শুনে তাপস যেন ভ পেয়ে গেল, বলল, আঠার বছর আছি লাইনে, সে লাইন কি ছেড়ে আসা ভালো

হনহন ক'রে চলে গেল তাপস। নিরাপ তার মেয়েকে নিয়ে না চলে যায়, এই যে তার তাগাদা।

পূর্ণতার সাধক রবীন্দ্রনাথ

শান্তিদেব ঘোষ

বীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য পূর্ণতা সাধন। অর্থাৎ একই সঙ্গে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে মানুষের মন ব্যাপ্ত হবে, কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে মানুষের শক্তি ব্যাপ্ত হবে, সৌন্দর্য-বোধের দ্বারা সমস্ত জগতে মানুষের আনন্দ ব্যাপ্ত হবে এইটিই হলো তাঁর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনের আদর্শ।

তিনি ছিলেন অধ্যাত্মসাধনায় একান্ত বিশ্বাসী জ্ঞানী। গভীর জ্ঞানের উৎস উপনিষদের বাণী ছিল তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের পক্ষে ধ্রুবতারার মত। নিভৃত উপাসনায় নিজের চিত্তকে মহাজ্ঞানের উৎস আবিষ্কারে নিযুক্ত করেছেন দিনের পর দিন। যে অখণ্ড এক প্রাণের প্রকাশ থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটি যে কি তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি, যা জল-স্থল-আকাশ-বাতাস-ফলফুল, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশিত, বাইরে থেকে দেখতে যার একটির সঙ্গে অপরের কোন যোগ নেই বলেই মনে হয়, তার প্রত্যেকটি আর সকলের সঙ্গে অদৃশ্য এক যোগসূত্রে বাঁধা; অথবা সকলেই অদৃশ্য এক মহাশক্তির বিকাশ, বা সকলের মধ্য দিয়েই সেই অখণ্ড এক সত্তা নিজের আনন্দকে প্রকাশ করে চলেছে। এই অনুভূতি থেকেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সবের সঙ্গে নিজের প্রাণের একটি আন্তরিক টান অনুভব করতেন, সবেতেই ছিল তাঁর বিশেষ আনন্দ।

এই সব আলোচনা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচয় সাধিত হলে স্বভাবতই আমাদের মনে হবে যে, অধ্যাত্ম-সাধনার সাধক বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে তাঁর পক্ষে উচিত ছিল নির্জন সাধনার জন্য সন্ন্যাসী হওয়া। কিন্তু তিনি ছিলেন সংসারী, তাই নিজের বাস্তব জীবনের কর্মভারকে তিনি অস্বীকার করলেন না। স্পষ্টই বললেন,—"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।" তাছাড়া দেখলাম, দেশ ও মানবসেবার মহৎ প্রেরণায় শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে তৈরী করতে গিয়ে কর্মের কি জটিলতার মধ্যেই না তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন!

গুরুদেব বলতেন এইরূপ "পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে কথা-সুরে রেখায় বর্ণে মানব সম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে।"

রবীন্দ্রনাথের স্ব-কৃত প্রতিমূর্তি

তিনি সাহিত্যে ও কাব্যে দেশে যুগান্তর এনেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন, "শুধু ভাষার মধ্যেই জীবনের সমস্ত প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ হয় না। সেইজন্য আমরা আমাদের ভাষায় প্রকাশ ছাড়া অন্যদিক দিয়েও জীবন ও অনুশীলনের প্রকাশভঙ্গী চাই।" গানে, নাচে, অভিনয়ে, ছবি আঁকায় তাঁর হৃদয় শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিল এই কারণেই।

তিনি যে বিশ্বমৈত্রী বোধের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন তার কারণ হল তাঁর মধ্যে সেই পূর্ণতার বিকাশ। সকলকেই তিনি আত্মীয়বোধে দেখতে শিখেছিলেন, সেইজন্যে তাঁর বাণী গদ্যে পদ্যে গানে সব দেশের সব কালের মানুষের হয়ে দেখা দিল। এইভাবে গুরুদেবকে কেন্দ্র করে তাঁর অধ্যাত্মজীবন, কর্মজীবন ও আনন্দের জীবনের একটি আর একটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। যেমন, তাঁর জ্ঞানের সাধনা প্রকাশ পেল আনন্দের ভিতর দিয়ে কাব্যে, গানে, নাচে, চিত্রে ও নাটকের সাহায্যে। বাস্তব কর্মজীবনের জটিলতার মধ্যে থেকেও সেই জীবন, বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি গভীরতর ইচ্ছারই প্রকাশ হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। যে-কারণে শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের কাজের আরম্ভে প্রত্যুষে ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপক-কর্মীদের একত্র মেলতে বললেন। সেখানে যে গান করতে হয় সমবেত মন্ত্রপাঠের পর, তা হল উপাসনার গান বা পূজার গান। সারাদিনের কর্মশেষে রাত্রের বৈতালিক গান করার রীতিও তিনি প্রচার করেছিলেন ঐ কথা ভেবে। শান্তিনিকেতনের প্রথম জীবনে বহু বৎসর যাবৎ অতি প্রত্যুষে তিনি দিনের পর দিন মন্দিরে ছাত্র, অধ্যাপকদের নিয়ে উপাসনায় বসতেন। সেখানে যেসব আলোচনা তিনি করেছেন তা 'শান্তিনিকেতন গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তব কর্মজীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম-চিন্তার এমন সুন্দর সামঞ্জস্য বড় দেখা যায় না। সুতরাং গুরুদেবকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে তাঁর জ্ঞানের, কর্মের ও আনন্দের জীবনটিকে এক সঙ্গে ধরতে হবে, বুঝতে হবে। তাই গানের আলোচনায় তাঁকে অন্য সুরকার বা গাইয়েদের সঙ্গে এক

দলে ফেলে ভাবলে চলবে না। গানের ভিতর দিয়ে তাঁর আনন্দের জীবনের একদিক যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সেই গানই যে তাঁর পরিপূর্ণ জীবনের একটি অখণ্ড প্রকাশ সে-কথাও মনে রাখতে হবে। গুরুদেবের সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন যে কতখানি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, তাঁর লেখা ও তাঁর গানের সাহায্যে সেই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করব। সাধারণ সুরকার বা ওস্তাদেরা সঙ্গীতকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করেন, বা অনুভব করেন, গুরুদেব ঠিক সেভাবে তাকে দেখেন নি, তিনি তাকে আরো বড় উপলব্ধির মধ্যে পেয়েছিলেন। যা প্রকৃত সাধকরা ছাড়া আর কেউ পায় না।

সঙ্গীতের রস নিয়ে আমাদের প্রাচীনেরা গভীরভাবে চিন্তা করে গেছেন। তাঁরা ভাবতেন সঙ্গীতের কারণ কি, কেনই বা তা মন আকর্ষণ করে এবং কেন সঙ্গীত একটা অনির্দেশ্য আবেগে প্রাণ পূর্ণ করে তোলে, প্রাণকে উদাস করে। চিন্তার গভীর স্তরে নেমে গিয়ে তাঁরা একদিন অনুভব করলেন যে, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে গান শুনে তারই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি। তাঁরা বললেন যে, সমস্ত মানবজীবনও অনন্তের রাগিনীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত ছাড়া কিছুই নয় এবং চন্দ্র সূর্য তারা ওষধি বনস্পতি, সকলেই এই বিশাল বিশ্বসঙ্গীতে নিজের একটানা একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। এই রকমের এক চিন্তা থেকেই ভগবানে বিশ্বাসীদের মনে 'নাদব্রহ্ম'-রূপ তত্ত্বচিন্তার উদয় হয় এবং তাঁরা আরো বলেন যে, সুরের সাহায্যেও ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সঙ্গীতের এই আদর্শের প্রতি গুরুদেবেরও যে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল তা তাঁর গানে, লেখায় তিনি বারে বারে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখছেন,—"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, সেই সুরে মানুষের সুখ-দুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অপরূপতা লাভ করে। তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে।"

আমাদের জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজন কোনখানে সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, "আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।"

সঙ্গীতে গুরুদেবের আনন্দ কত গভীর ছিল, কিভাবে তিনি তার রস অনুভব করতেন, এতক্ষণ তার পরিচয় পেলাম। কিন্তু সেই উপভোগের আনন্দ যখন গান সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করে তখন সে আনন্দের আর সীমা থাকে না। তাঁর নিজেরই জীবনে অনুভূত এমনই এক আনন্দের কথা প্রকাশ করে বলছেন, "গুণ গুণ স্বরে ভৈরবী তোড়ী রামকেলী মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিনী সৃজন করে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটি অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা দিল, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার একটা সঙ্গীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল......।"

অন্যত্র লিখছেন, "তুই মনে করিস্ আমার কোন ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে, তাকে নাম দিতে পারিনে।" এই গানের সাহায্যেই তাঁর জীবন মুক্তি খুঁজেছিল বলেই বলতে পেরেছিলেন যে,—"মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের মাঝে দেয় সাড়া।"

সঙ্গীতের এইরূপ একটি আদর্শের উপর তাঁর জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই দেখেছি তাঁর গানের প্রেরণায় সে কি প্রচণ্ড বেগ, একটার পর একটা গান তৈরি করে চলেছেন। সুর যে কোথা থেকে তখন ছাড়া পেয়ে যেমন খুশি ছুটে আসতো তা কে জানে। অনেক সময় সুরগুলি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে তেমনি আবার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁর মন থেকে চলে যেত। কত মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে সহসা এক সুরের ধ্বনি তাঁর অন্তরে আঘাত করেছে, কোথায় ভেসে গেছে নিদ্রা। সেই হঠাৎ পাওয়া সুরকে বাণীতে ছন্দেতে যতক্ষণ না ধরে রাখতে পেরেছেন ততক্ষণ তাঁর আর সোয়াস্তি নেই। যদি কোন কারণে সে সুরটি হারিয়ে গেল, তবে তার জন্যে কি তীব্র বেদনাই না মনে জেগেছে।

এক সময় আমাদের শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীতের সম্মানজনক স্থান ছিল না বলে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "সঙ্গীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে; আমাদের কলেজ নামক কেরানি-গিরির কারখানা-ঘরে শিল্প সঙ্গীতের কোন স্থান নাই।......মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মুখস্ত করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে, সেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি।"

অন্যত্র বলেছেন, "যেসকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন; তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে।"... "ইংরেজ ত ভাষা ভূগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখবে। এই সকল ললিতকলা শিক্ষার দ্বারা তার পৌরুষ খর্ব হচ্ছে এমন প্রমাণ হয় না। সঙ্গীত-নিপুণ বলে জার্মাণ জাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞান চর্চায় পিছপাও, একথা কে বলবে? বস্তুত আনন্দ প্রকাশ জীবনী-শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ।"

পূর্ণত্বের বিকাশে সঙ্গীত যে মানুষের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় গুরুদেবের চিন্তায় ও কর্মে তা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে এমনটি আর দেখা যায় না। এবং তার অন্তরের বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ একের বোধকে তিনি গানের ভিতর দিয়ে যেভাবে সহজ সরল ও মধুর করে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তাকেও বলব এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

তাঁকে আমাদের যদি ঠিকভাবে জানতে হয়, তবে তাঁর এই পরিপূর্ণ জীবনটিকে স্মরণ করতে হবে, জানতে হবে। এও জানতে হবে যে তিনি কেবল কবি ছিলেন না, কেবল সাহিত্যিক ছিলেন না, কেবল মানবপ্রেমিক কর্মী ছিলেন না, আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন না। তিনি কেবল গীতকার নন, চিত্রকার নন, তিনি দেখা দিয়েছিলেন এসবের একত্র মিলনে একটি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ হিসেবে। এবং এইরূপ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার পরিচয়ও জগতে বিরল।

অকৃতজ্ঞ

আশাপূর্ণা দেবী

সুরমা কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি বইটা শেষ করিয়া বিছানায় পিঠ পাতিয়াছি মাত্র। ঘুম তখনো আসে নাই, হঠাৎ পাশের বাড়ি হইতে একটা তীব্র চীৎকার ধ্বনিতে সচকিত হইয়া উঠিলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে কথাটি কানের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হইল, তাহা এই—সর্বনাশ করেছে! এই বর্ষার রাতে—শ্মশানে যাইয়ে ছাড়লো—!

মনের অগোচর পাপ নাই।

পাশের বাড়ির গৃহকর্তা দিবাকরবাবুর সাদ্বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ভদ্রলোক ঘণ্টা কতক কাটাইয়া সকালে মারা গেলেই পারিতেন। মরণকালেও প্রতিবেশীকে ফাঁসাইয়া যাওয়ার বুদ্ধিটি ঠিক আছে।

চীৎকারে সুরমারও ঘুম ভাঙিয়াছে, সে ধরমর করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল, —সর্বনাশ হয়ে গেলো যাঃ। হায়! হায়! এই বর্ষার রাতে—আহা।

উঠিয়া আলো জ্বালিলাম।

'আহা'টা কাহার জন্য ঠিক ধরিতে পারিলাম না। পরলোকযাত্রীর জন্য, না শ্মশানযাত্রীদের জন্য? কিন্তু পরলোক-যাত্রীর আর 'আহা'র প্রয়োজন কি? পার্থিব রক্তমাংসের দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে আত্মা ঊর্ধ্বলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছে, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় আবরণটুকুর গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগে কিনা, লাগিলেও—প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিমোনিয়ার ভয় থাকে কিনা, অবশ্যই কাহারও জানা নাই। কাজেই অনুমান করিতেছিলাম এ সমবেদনা শ্মশান-যাত্রীদের জন্য। কিন্তু ভুল ভাঙিল! ভালো করিয়াই ভাঙিল।

যেই মাত্র তাহারই কথায় সায় দিয়া বলিয়াছি—সত্যি মরবার আর সময় পেলেন না ভদ্রলোক, এখন ওঁর সঙ্গে পাড়া-পড়শীও মরুক, তদ্দণ্ডেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিহরিয়া উঠিল সুরমা।

কথাটা যে শেষ করিতে পারিয়াছিলাম, সে বোধকরি বিদ্যুৎ-শিহরণের ক্ষণিক স্তব্ধতার সুযোগেই।

সুরমা ঘৃণার সঙ্গে ঝাঁজ মিশাইয়া শ্লেষের সুরে ধিক্কার দিল, তা' সত্যি, ঘড়ি দেখে মরা উচিত ছিলো বটে ভদ্দরলোকের। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়, তাই সময়টা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি। ....উঃ ধন্যি প্রাণ বটে! মানুষটা এই জলঝড়ের রাতে চিরদিনের মতো চলে গেলো—আর তোমার এখন চিন্তা হচ্ছে পাড়াপড়শীর কষ্ট! হায় হায়! আমি শুধু ভাবছি, ও বাড়ির দিদির কী সর্বনাশটাই না হয়ে গেলো।

যথেষ্ট অপ্রতিভ বোধ করিতেছি—তবু খাটো হইলাম না। "বোধ"টাকে শোধ দিবার উদ্দেশ্যে গম্ভীরভাবে বলিলাম—চিন্তা আমার নিজের জন্যে নয়। পাছে রাত-দুপুরে নতুন বর্ষার জলে ভিজে, তোমারও 'ও বাড়ির দিদির' মতো সর্বনাশ ঘটাই, সেই ভয়।

বলা বাহুল্য সুরমা আর উত্তর করিল না। শুধু একটা জ্বলন্ত দৃষ্টির সাহায্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া জানালার ধারে সরিয়া গেলো। এই জানালাটা হইতে দিবাকরবাবুর ঘরের কিয়দংশ দেখা যায়।

নিজের বিছানা হইতেই উঁকি মারিয়া দিবাকরবাবুর জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ-দৃশ্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছি—

দিবাকরবাবুর বিছানাটা—না না দিবাকরবাবুতো আর নাই—দিবাকরবাবুর মৃতদেহের বিছানাটা ঘরের ওদিকে, জানলার আড়ালে। দেখিবার উপায় নাই। এদিকে যা দেখা যাইতেছে—সে কেবল অনেকগুলো মানুষের বিশৃংখল ঠেলাঠেলি, আর কানে আসিতেছে নানা কণ্ঠের বহুবিধ টুকরা টুকরা মন্তব্য।

* * *

বৃষ্টির প্রবল বেগ আর নাই, মেঘাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার আকাশের গা হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি জল ঝরিতেছে। ...... পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে যেন জীবনের স্পন্দন নাই। এই বিষণ্ন বিধুর প্রকৃতির মাঝখানে মৃত্যু জিনিসটা কী সুন্দর মানানসই!

জানলার বাহিরে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে মনে হইল প্রকৃতির এই পটভূমিকায় একখানি মৃত্যুর ছবির যেন একান্তই প্রয়োজন ছিল।

দিবাকরবাবু মারা না গেলে হয়তো শিল্পীর আয়োজনকে সম্পূর্ণতার রূপ দিতে আমারই মারা যাইতে ইচ্ছা হইত, এবং মরণকালে সুরমাকে আদেশ দিয়া যাইতাম—"গুঞ্জরি করুণ তান, ধীরে ধীরে করো গান, বসিয়া শিয়রে। যদি কোথা থাকে লেশ, জীবন স্বপ্নের শেষ, তা'ও যাক মরে"।

কিন্তু অতোটা করিবার প্রয়োজন হইবে না। দিবাকরবাবু আমার কাজ কমাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

তা ছাড়া ব্যাপারটা এই, দিবাকরবাবুর আত্মীয়বর্গ আমার মতো কবি নয়, তাই—ক্যানভাসের গায়ে খোঁচা লাগিয়া যাওয়া নির্লজ্জ একটা ছেঁদার মতো, এই শান্তগম্ভীর পটভূমিকার গায়ে, দিবাকরবাবুর ঘরের প্রখর বিদ্যুদালোকিত জানলাটা নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহারই ভিতর হইতে শোকের উদ্দাম ঝড়ের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

নানা কণ্ঠের কলকাকলীর বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দিয়া দিয়া অনুমান করিতেছি কোন একটি ভদ্রমহিলা মূর্চ্ছা গিয়াছেন!

'ও বাড়ির দিদি', অর্থাৎ স্বয়ং দিবাকরবাবুর স্ত্রী হওয়াই সম্ভব। সম্পূর্ণ বাজেলোক হওয়াও অসম্ভব নয়।

বয়স কম হয় নাই, জীবনে অনেক মৃত্যুর দৃশ্য দেখিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, বিসদৃশ ঘটনাও যে কত চোখে পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জায়গায় দেখিয়াছি—মৃত পুত্রের শিয়রে বসিয়া নতনয়না জননী নিঃশব্দ-শোক বহন করিতেছেন, আর জ্ঞাতি পিসি বাড়ি বহিয়া আসিয়া বুক চাপড়াইয়া বুকে কালশিরা পড়াইতেছেন।

আবার এও দেখিয়াছি—লোকারণ্যের মাঝখানে, জামাই কুটুম্বের সামনে, মধ্য বয়সী সদ্যোবিধবা স্বামীর শবদেহটাকে ঠ্যালা দিয়া দিয়া—"ওগো তুমি যে বলেছিলে" ধুয়োর সাহায্যে, স্বামী-দেবতা কোন দুর্বল মুহূর্তে কখন কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারই ফিরিস্তি দাখিল করিতেছেন এবং কোন মুখে সেইসব মূল্যবান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রতারক ভদ্রলোক স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে রওনা হইতেছেন, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন।

'ফাঁকি দিবার' মতলবটা যে কোনো অবস্থাতেই কাহারও বড়ো থাকে না, স্বেচ্ছায় সানন্দে কেউ যে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায় না, এটুকু বিবেচনাবোধ কয়জনেরই বা থাকে?

অতএব তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অভিযোগ করেন—"ও গো, তোমার মনে যদি এই ছিলো, তবে কেন—" ইত্যাদি।

ভাগিস মৃত ব্যক্তির শ্রবণশক্তি লোপ পায়, তাই রক্ষা! নচেৎ—এই শোভা সম্পদময়ী পৃথিবী হইতে নিতান্ত নিরুপায় চিত্তে বিদায় লইতে বাধ্য হইবার বেদনার উপর এই নিষ্ঠুর অভিযোগ মরার উপর খাঁড়ার ঘা' হইত সন্দেহ নাই।

কতো কিছু বিসদৃশ ব্যাপারইতো সংসারে অহরহ ঘটে, তবু বাঙালীর সংসারে মৃত্যুকে সামনে লইয়া যেমন বিসদৃশ কান্ড ঘটে এমন বোধকরি আর কোথাও নয়।

মূর্চ্ছার ব্যাপারেও এমন একটা কিছু হওয়া অসম্ভব নয়, কাজে কাজেই কান খাড়া করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি—মূর্চ্ছিতা মহিলাটি কে।

হঠাৎ নিজের ঘরেই 'ফোঁস্ ফোঁস্' শব্দে চমকিত হইলাম। সুরমা কাঁদিতেছে।

—কী মুস্কিল! নিজের অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গেল—কি মুস্কিল। তুমিও কাঁদছো নাকি?

গলার সাড়া পাইলাম না, 'ফোঁস ফোঁস' শব্দটাই আর একটু বৃদ্ধি পাইল। অগত্যা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইল। ভাবিতেছিলাম যতক্ষণ না ও-বাড়ি হইতে ডাক পড়ে একটু গড়াইয়া লই, মরুকগে!

কাছে গিয়া কহিলাম, কি হলো! তুমি অমন কান্নাকাটি সুরু করে দিলে কেন?

এবার গলার সাড়া পাইলাম, তোমার মতন নির্মায়িক পাষাণ নই বলে।

পাষাণত্বের অপবাদ বহিয়াও সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? কান্নার কারণ যাহাই হোক, ক্রন্দনপরায়ণা পত্নীকে বিনা-সান্ত্বনায় ফেলিয়া রাখিয়া যে-স্বামী উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিতে পারে তাহাকে 'পাষাণ' বলিলেই বা কতোটুকু বলা হয়?

অবশ্য সান্ত্বনার ভাষাটা খুব মোলায়েম করিতে পারি না, বকুনির মতো শুনিতে লাগে, কিন্তু কি করিব? যে-কালে প্রত্যহ দাড়ি কামাইতাম, সে-কালের সান্ত্বনার ভাষা একালে কি মুখে আনা যায়?

—কি হচ্ছে কি—বলিয়া প্রায় ধমক দিলাম। হাত ধরিয়া একটু টানমারা গোছের করিয়া বলিলাম, জানলার ধার থেকে সরে এসো দিকিন, দেখে কি হবে? আর দিবাকরবাবু যে মরবেনই এতো জানাই ছিলো। ওর জন্যে আর—

সুরমা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সেই হাতে জানালার গরাদেটা ভালোভাবে চাপিয়া ধরিয়া সুগম্ভীর প্রশ্ন করিল—জগতের সবাইকেই একদিন মরতে হবে এ-ও তো জানা কথা, তাই বলে কাউকে মরতে দেখলে হাসতে হবে?

কান্না এবং হাসির মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা আছে কি না প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি, হঠাৎ ও বাড়িতে "বাবা গো—" ধ্বনিতে আর একটা হৃদয়বিদারী তীক্ষ্ণ চীৎকার উঠিল। নূতন তরঙ্গ! বুঝিলাম কমলা শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া পেঁৗছাইল।

কমলা দিবাকরবাবুর বড়ো মেয়ে।

গলাটা তাহার চাঁচাছোলা, মাজা। সে ঘরের মধ্যে সপাটে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাটা ছাগলের মতো ছটফট করিতে করিতে কাঁদিতেছে—"বাবা গো, আমরা আর কার কাছে এসে দাঁড়াবো? কার কাছে 'এটা দাও, ওটা দাও' বলে আবদার করবো?...বাবা, তুমি যে এখনো আমাকে 'খুকি' বলে ডাকতে বাবা......।"

নাক ঝাড়িবার জন্য বোধহয় উঠিতে হইল কমলাকে। এই সময় দিবাকরবাবুর বিধবা বড়োভাজের ভারী ভারী গলা শোনা গেলো—বাবা কানাই, তোদের মাসীকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে নিয়ে যা দিকিন। মিনিটে মিনিটে মূর্চ্ছো যুচ্ছে, সামলায় কে? গোলমালের বাড়িতে এ কী কেলেঙ্কার বাবা! শোকও কি বড়মানষি দেখানো? ছিঃ। এসব মানুষের দশের মাঝখানে আসতে নেই, শোক নিয়ে আপনার ঘরে পড়ে থাকতে হয়। দরজার সম্মুখে পথ বন্ধ করে—ই কি!

বুঝিলাম বিধবা ভদ্রমহিলা নিজের পোজিশনের অভাবে সধবা ছোট জায়ের বড়ো-লোক বোনের প্রতি বরাবর যে মনোভাব উহ্য রাখিতে বাধ্য থাকিতেন, গোলমালের মধ্যে এই উপলক্ষে সেটা ব্যক্ত করিয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু বাঁচা কি এতোই সোজা?

একজন এইমাত্র মারা গিয়াছে বলিয়াই যে সেই সুযোগে অপর একজন বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াও বাঁচিয়া যাইবে, এমন ঘটনা তো সংসারে ঘটিতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরবাবুর মেজ মেয়ে অমলার ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—তুমি তো বেশ বলছো বড় জ্যেঠি, মাসীমা

এই দুঃসংবাদ শুনে নিশ্চিন্দি হয়ে বাড়ি বসে থাকবেন? মার মুখ চাইবার জন্যে জগতে আর কে রইলো বলো? মায়ের পেটের বোনের মতন মায়া করতে আরতো কেউ আসবে না?

অর্থাৎ মায়ের পেটের বোনের কাছে জায়েরা যে নস্যামাত্র সেটা বিধবা বড়োজ্যেঠিকে মুহূর্তে সমঝাইয়া দিল অমলা।

এতোক্ষণে বুঝিলাম, মূর্ছিতা মহিলাটি দিবাকরবাবুর স্ত্রী নয়, শ্যালিকা। অনুমানে ভুল হয় নাই।

আরো নানা কণ্ঠের কলরব ভাসিয়া আসিতেছে......সব কণ্ঠ পরিচিত নয়, সব কণ্ঠ পরিষ্কার নয়, কাজেই আগাগোড়া সব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এমন স্তব্ধ রাত্রি না হইলে হয়তো কিছুই বোঝা যাইত না।

দিবাকরবাবুর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীর সরু গলা, বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নাটা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। সে বলিতেছে—"ও মেজদি, মেজ বটঠাকুর যে আমার হাতের চা ছাড়া আর কারুর হাতের চা খেতে চাইতেন না! দিনের মধ্যে দশবার যে তাঁর 'ছোট-মা'র কাছে চায়ের হুকুম পাঠাতেন!"

সত্যই বটে, মৃত্যু মানুষের মনকে কতো কোমল করিয়া আনে।

এ-বাড়ির ছোটবৌয়ের বরাবর 'মুখরা' বলিয়া একটা বদনাম আছে। গৃহিণীর মারফৎ এমন রিপোর্ট বহুবার পাইয়াছি যে, 'দশবার চায়ের হুকুমের' পরিবর্তে ভাসুর হইয়াও নাকি দিবাকরবাবুকে, দশ-দশে একশো কথা শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ সেই হুকুমটাকেই স্মরণ করিয়া ভাসুরের স্নেহের পরিচয়ে অভিভূত হইতেছেন ছোটবৌ।

কান খাড়া করিয়া আছি, ওই বুঝি ডাক পড়ে।

দিবাকরবাবুর ছোটভাই হিমাকরই ডাক দিবে মনে হয়।

আন্দাজ করিতেছি......ভাগ্নে বঙ্কিম এতোক্ষণে খাট আনিয়া ফেলিয়াছে। ছোকরা করিৎকর্মা আছে। ফুল, ফুলের মালা আনিতে গিয়াছেন বোধ হয় শ্যালি-পতি। ভদ্রলোকের গাড়ি আছে, চট করিয়া রাত-বিরেতে নিউমার্কেটে ছোটা তাঁর পক্ষে সহজ।

ফুল, চন্দন, ধূপ, অগুরু, নববস্ত্র ইত্যাদি সব কিছু আনিয়া ফেলার পর, নূতন করিয়া ভয়ংকর আর একটা তরঙ্গ উঠিবে, বহু বিলাপে ক্লান্ত আত্মীয়দের স্তিমিত শোকাগ্নিতে আর একবার ইন্ধন পড়িবে, তবে তো শ্মশানযাত্রীদের কাজ আরম্ভ।

কি মুস্কিল, 'মান' কিসের?

তা'ছাড়া মৃত্যুর পর দাহ করার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় একটা সময়ের মাপ তো আছেই। এতো গোলমাল না হইলে অনায়াসে বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লওয়া যাইত।

সুরমা কহিল—তুমি তাহলে যাবে না?

—না যাইয়ে ছাড়বে? ইয়ে না গেলে ভালো দেখাবে কেন? যাবো—ডাকুক।

—ডাকার অপেক্ষায় বসে থাকবে? ওদের এই দুঃসময়ে তোমার মানটাই বড়ো হলো?

—কি মুস্কিল, 'মান' কিসের? এইসব মেয়েলি ব্যাপারগুলো খানিকটা না কমলে তো আর কিছু করা যাবে না? গিয়ে দাঁড়াবোই বা কোথায়?

—যেমন করে আর পঞ্চাশটা লোক দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্য করে দেখো, একা তুমি বাদে পাড়ার সবাই এসে হাজির হয়েছে কি না......লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

নূতন করিয়া সুরমার প্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম।

পাড়ায় আমার নিন্দা রটিবার ভয়েই এতো ব্যাকুল হইয়াছে সে। দূর-ছাই, কেন আর পাতা বিছানাটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছি। মায়া কাটাইয়া ফেলাই ভালো।

কাটানোর অভ্যাস রাখাও দরকার।

এই যে দিবাকরবাবু কেমন স্বচ্ছন্দে মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

বাহির হইবার তোড়জোড় করিতে করিতে খেয়াল হইল, চাকরটা আজ ছুটি লইয়াছে, ছেলেমেয়ে দুইটার কাছে থাকিবে কে? ওদের অবশ্য ঘুম ভাঙে নাই, কিন্তু—ঘুমন্ত দুইটাকে একা রাখিয়া যাইব?

প্রশ্ন করিতেই সুরমা অবাক হইয়া প্রতি-প্রশ্ন করিল—"ওদের কে আগলাবে মানে? আমি কোথায় যাচ্ছি?"

অবাক আমিও হই।

—তুমি যাবে না?

—আমি কোথায় যাবো?

—মানে আর কি, দিবাকরবাবুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে—

—সান্ত্বনা দেবার সময় তো আর পালাচ্ছে না? শোক যখন রইলো, সান্ত্বনাও থাকবে।

আমি অবহিত করাইয়া দিই, বড়ো 'ইয়ের' সময়টাতে মানে তুলে নিয়ে যাবার সময়টাতে—সেই ধরাধরি কাণ্ডগুলো তো আছে।

—ধরবার লোকও আছে। সুরমার স্বরে বিরক্তি গোপন থাকে না—মেয়েরা রয়েছে। ভাই ভাজ এসেছে, মায়ের পেটের বোন রয়েছে, এর মধ্যে 'নিষ্পর'কে ভালোই বা লাগবে কেন?...... আমি এখন এই অসময়ে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করে মরি আর কি! নাইতে হবে না? কেশে মরছি কাল থেকে—

—হ্যাঁ সে তো জানি। আমারই কি ইচ্ছে? তবে তোমাকেও আবার পাছে কেউ কিছু বলে—

—আমাকে আবার কে কি বলবে! সুরমা অগ্রাহ্যভরে উত্তর দেয়—মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের এতোবড়ো সর্বনাশের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে সবাই যদি না পারে।

বুঝিলাম নিন্দাবাদকারী 'জোঁকে'দের মুখে ছিটাইয়া দিবার উপযুক্ত লবণ আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সুরমা।

বলিলাম—তবে চলো, দোরটা বন্ধ করবে।

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়া দোর দিয়া গেলো।

রাস্তায় নামিবার পর ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া দেখিলাম, যে-সর্বনাশের দৃশ্য মেয়েমানুষের পক্ষে দাঁড়াইয়া দেখা অসম্ভব, সেই দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় সুরমা মাথাটাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া প্রায় গরাদের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে।

দিবাকরবাবুর ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

বলিবার মতো কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

মনে হইতেছে—বহুবার দেখা একখানি পুরনো নাটকের পুনরভিনয় দেখিতেছি।

কোথাও কোনো নূতনত্ব নাই।

না প্লটে, না দৃশ্যে, না সংলাপে।

'পৃথিবীটা একটা বিরাট নাট্যশালা' এ আবিষ্কার যে ভদ্রলোক প্রথম করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ ছিলো সন্দেহ নাই, এ একটা দার্শনিক তথ্য।

কিন্তু দার্শনিকের তো আর বাড়তি দুইটা চোখ থাকে না, তেমন করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেই দার্শনিক হওয়া যায়।

নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়া সামনের দৃশ্যকে একটু উদাস চক্ষে দেখিতে পারিলেই অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আমার চোখেও প্রত্যক্ষ বস্তুগুলো কেমন যেন আবছা লাগিতেছে। মানুষগুলোকে সাজানো পুতুল মনে হইতেছে......যেন এ সমস্তই মেক্‌আপ। সব কিছুই কৃত্রিম। পুতুলগুলো নিজ নিজ অভিনয় করিয়া যাইতেছে মাত্র।

ওই যে কানাইয়ের মামা, শ্রান্ত কানাই

বেচারাকে ঠায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নীতি-নক্ষত্রের হিসাব লইতেছেন—ডাক্তার কখন কখন আসিয়াছিল, কোন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল, ঠিক কি কি কথা বলিয়াছিল, ইত্যাদি। উনি কি জানেন না এসব প্রশ্ন এখন কতো অর্থহীন?

তবু ওই দস্তুর।

মৃতের সম্বন্ধে নিজের আগ্রহের পরিধি বোঝানো।

আবার ওই যে ঘরের কোনে দিবাকরবাবুর মেজ-বেহান অমলার শাশুড়ী একটা ট্রাঙ্কের গায়ে মাথাটি হেলাইয়া উদাস-ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, দেখিয়া মনে হইতেছে পৃথিবীটা যে মরীচিকা মাত্র, এ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় নাই ওঁর, তিনিই কি জানেন না এই দস্তুর! জানেন এ রকম 'সীনে' ঘাড় সোজা করিয়া খাড়া বসিয়া থাকাটা দৃষ্টিকটু। মনে মনে হয়তো ভাবিতেছেন...যা বুঝছি বৌমাটিকে এখন আর চট করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। শ্রাদ্ধ-শান্তি না মিটলে কি আর যেতে চাইবে? মরবো আমিই এই বর্ষায় বাতের শরীর নিয়ে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলে।...বলতে তো পারবো না কিছু।

বধূ অমলা ভাবিতেছে......যাবার কথা একবার তুলবে বোধ হয়। আচ্ছা তুলুক না একবার, এমন শোনানো শুনিয়ে দেবো।......

ওই যে দিবাকরবাবুর বিধবা বড়ো ভাজ—'ওরে কানাই বলাই, তোরা এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলি—' বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, ওঁর হৃদয় হইতেই কি একটি পর্বতভার নামিয়া গেল না? ওঁর মনের কোণে কি চকিতের জন্য এই কথাটিই ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছে না...... "কি মেজগিন্নী, এইবার?...'বিধবা মাগী' বলিয়া বড়ো যে হেনস্থা করিতে—"!

আবার স্বয়ং দিবাকরবাবুর স্ত্রী, ওই যে কান্নাকাটির পর স্তব্ধ হইয়া মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছেন, উনি কি এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরব্যাপী সুখময় দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতিমণ্ডিত দিনগুলি, অথবা সেই দীর্ঘকালের সঙ্গীটির স্নেহ-মমতা প্রেম-ভালোবাসার কথা চিন্তা করিতেছেন? না ভাবিতেছেন—'যে নিরামিষ হেঁসেলকে এতোদিন বাড়তি অপব্যয় ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া আসিয়াছি, অবশেষে সেই হেঁসেলেরই মেম্বার হইতে হইল!

দিবাকরবাবু থাকিতেই তো ছোট জা-দেওর সমীহ মান্য রাখিয়া চলিত না, না জানি এর পর কি করিবে।'......

যে যাই ভাবিতে থাকুক, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবার জো নাই। দস্তুরমাফিক সবই হইতেছে।

ভবিষ্যতে বাঁধাইয়া রাখিয়া পূজা করুক, অথবা অসাবধানে ফেলিয়া দিক, আপাতত ছেলেরা মৃত পিতার দুই পায়ের তলায় রক্তচন্দন মাখাইয়া কাগজে ছাপ লইল, ছেলেদের মামী কোথা হইতে একখানা পকেট-গীতা আনিয়া মৃতের বুকের উপর স্থাপনা করিলেন, তুলসীপাতায় চন্দন দিয়া 'ওঁ হরি' লিখিয়া কপালে সাঁটিয়া দেওয়াও হইয়াছে। মেয়েরা পরিপাটি করিয়া চন্দন পরাইতেছে বাপকে।

'মৃত্যু' আর 'বিবাহ'—এই দুইটা ঘটনার মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!

সেই ফুল-মালা-চন্দন, সেই লোকজন, আত্মীয়-কুটুম্বের সমারোহ, সেই আলো...ত্রিপল...লুচি-পটলভাজা। তফাতের মধ্যে কান্না আর হাসি।

প্রাণটা হাঁফাইয়া আসিতেছে।

নামিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দার্শনিকের উদাস ভঙ্গী লইয়া একটা সিগারেটও ধরাইলাম।

গুঁড়ি গুঁড়ি জল পড়াটা বন্ধ হইয়াছে। মেঘমেদুর আকাশটাকে আরো স্তিমিত দেখাইতেছে। মনে হইতেছে ও যেন নীচের দিকে ম্লান-করুণ দৃষ্টি মেলিয়া ভাবিতেছে—'এতো কৃত্রিমতার ভার বহন করিয়া পৃথিবী এখনো টিঁকিয়া আছে কেমন করিয়া?'

যদিও—একবারের চেষ্টায় একটিমাত্র দেশলাই-কাঠিতেই সিগারেটটা ধরাইতে পারিলাম বলিয়া মনটা একটু প্রসন্ন লাগিতেছিল, তবু এই শ্রীহীন ঘোলাটে রাত্রিতে নিঃসঙ্গ রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আমারও মনে হইল, সত্যই তো পৃথিবী এখনো টিঁকিয়া আছে কিসের উপর ভর করিয়া?

তার পুরনো বনেদের সবটাই তো ধ্বসিয়া পড়িতে বসিয়াছে। স্নেহ, প্রেম, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সব কিছুই তো আজ এক একটা অন্তঃসারশূন্য শব্দ মাত্র। বহুদর্শনের চালুনিতে ফেলিয়া দেখিতে বসিলে আগাগোড়াই তলায় ঝরিয়া পড়ে।

কানে আসিল......'জয়ন্তবাবু? জয়ন্তবাবু কোথায় গেলেন?' এই রে, আমার জন্য ডাকপড়া সুরু হইয়াছে! হওয়াই স্বাভাবিক, দিবাকরবাবু লোকটি বেশ বিশাল আকৃতির ছিলেন। আর শক্তিশালী বলিয়া একটু খ্যাতি পাড়ায় এখনো আছে আমার।

দিবাকরবাবুর জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা নটা-দশটার কম নয়, কিন্তু কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, শেলেট্-পাথরের মতো ম্লান আকাশের নীচে ছায়াচ্ছন্ন মৌন পৃথিবী যেন সময়ের জ্ঞান ভুলিয়া জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে।

দিবাকরবাবুর দাবার আড্ডার নিত্য-সঙ্গী সত্যপ্রসন্নবাবু আমাদের দলপতিত্ব পার্ট লইয়াছেন। তিনি পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়াই 'হাঁ হাঁ' করিয়া ওঠেন—

—শুনুন, শুনুন,—কেউ নিজের বাড়ি যাবেন না একখুনি; আগে ওঁদের বাড়ির দরজায় আগুন ছোঁবেন, নিমপাতা দাঁতে কেটে—জল-মিষ্টি খাবেন, তবে বাড়ি। তারপর যে যার বাড়ি গিয়ে কষে আদা-চা খান গে। পরিশ্রমটা তো কম হয়নি—উঃ, যা লাশ!

আয়োজনের ত্রুটি নাই, দরজার চৌকাঠের বাহিরে আগুন ও নিমপাতা মজুত রহিয়াছে।

দরজার কাছে আসিতেই থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

দিবাকরবাবুর সাধের 'জিমু'টা একপাশে গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। গলার বকলসে শিকলটা ঝুলিতেছে, শিকলের অপর প্রান্তটা মাটিতে পড়িয়া, কোথাও বাঁধা নাই।

এই 'জিম'টি একটি ভয়ঙ্কর জীব।

কুশ্রী একটা দেশী কুকুর মাত্র; কিন্তু দিবাকরবাবুর আদরে যেন 'ধরাখানা সরা' দেখে। ওর জন্য দিবাকরবাবুর দরজাটা অভ্যাগতের আতঙ্কস্থল। বিনা প্রতিবাদে কাহাকেও বাড়িতে ঢুকিতে দেওয়া 'জিমে'র নীতিবিরুদ্ধ। মানুষ দেখিলেই 'ঘোঁ ঘোঁ' রবে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিবে। বাড়ির কেহ আসিয়া শিকল টানিয়া ধরা ভিন্ন বাহিরের লোকের সাধ্য কি যে, ভিতরে ঢোকে।

আশ্চর্য! কাল কোথায় ছিলো কুকুরটা? বিনা বাধায় এতো লোক আনাগোনা করিয়াছে?

বোধ করি, বুদ্ধি করিয়া কেহ কোথাও আটকাইয়া রাখিয়াছিল।

আজ আবার দরজায় আসিয়া বসিয়াছে।

দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

না ভয়ে নয়।

আজ অপ্রতিবাদে দুয়ারের দখল ছাড়িয়া দিয়া, নিজেই চোরের মতো নিতান্ত এক-পাশে বসিয়া আছে সে, 'ঘোঁ ঘোঁ' করিয়া উঠিবে, এমন আশঙ্কার হেতু নাই।

দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি—ভয়ে নয়।

দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি—

পৃথিবীটা যে আজো কিসের উপর টিঁকিয়া আছে জিমের মুখের উপর তাহার উত্তর লেখা রহিয়াছে দেখিয়া।

ঘোলাটে ঘোলাটে দুইটি নিষ্প্রভ পশু-চক্ষুর কোল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে।

রুক্ষ-কর্কশ গালের চামড়ার উপর রেখাটা সুস্পষ্ট।

নীচু হয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কামিনী উঠে দাঁড়াল, তারপর দুহাত তুলে পিঠের ওপর ছড়ানো চুলের রাশি জড় করে খোঁপা বাঁধতে লাগল।

তন্বী, শ্যামা কামিনী, মসৃণ একটি শ্যামশোভায় ঝলমল করছে তার সর্বাঙ্গ। নাক চোখ মুখ তার নিখুঁত নয় কিন্তু তার যৌবন নিখুঁত। সবচেয়ে আশ্চর্য তার দুটি চোখের ঘন কালো রং আর সেই কালো চোখের মণি দুটোতে যেন কোন ধারালো অস্ত্রের দীপ্তি।

বাঁয়া তবলা সামনে রেখে বিনায়ক মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। এই দেখা তার নতুন নয়, তবু প্রতিদিনকার মত আজো নতুন বলে মনে হচ্ছে। রোজ যেন কামিনীকে সে তিল তিল করে আবিষ্কার করছে, রোজই কামিনী যেন একটু একটু করে তিলোত্তমা হয়ে উঠছে।

তার সেই মুগ্ধতাকে লক্ষ্য করে কামিনীর চোখের মণিদুটো আরো চঞ্চল হয়ে উঠল, মুচকি হেসে বলল, "অমন করে দেখছ কি?"

"দেখছি একজনকে—"

"কে?"

"আমার প্রেয়সীকে।"

"তাই বলে অমন হাঁ করে?"

"উপায় কি—দেখলেই যে নেশা ধরে যায়—নেশায় কি মানুষের হুঁস থাকে?"

"এখনো নেশা ধরে—এই পাঁচবছর বাদেও?" কামিনীর চোখ রহস্যাতির্যক হয়ে উঠল।

তার সেই পুরনো প্রশান্ত হাসি হাসল বিনায়ক, বলল, "পাঁচবছরে নেশা আরো গাঢ় হয়েছে।"

"বটে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

স্ত্রীর দিকে আগের মতই তাকিয়ে রইল বিনায়ক—স্বামীর সেই মুগ্ধ, অচঞ্চল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিজের চঞ্চল চাউনিকে একটু স্থির করার চেষ্টা করে মিটিমিটি হাসতে লাগল কামিনী। একতলা প্যাটেল চত্তলের পূবকোণার এই ছোট্ট ঘরটাতে ক্রমে মুগ্ধ স্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠতে লাগল। চিঞ্চোলীর দিক থেকে ভেসে আসা মেঘ-জালে বাঁধা দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছিল, রবিবারের ছুটি তখন বিকেল-শেষের উদাস হাওয়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল।

হঠাৎ নড়ে উঠল কামিনী, সমস্ত শরীরে একটা ছন্দের হিল্লোল বইয়ে সে বলল, "এবার বাজাও দেখি—"

স্তব্ধতা ভেঙে আচমকা তবলার বোল শোনা গেল। যেন গাছের ডাল থেকে হঠাৎ একদল পাখি কলরব করে উঠল, বাঁধন-ছেঁড়া এক শব্দের হরিণ যেন হঠাৎ শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল। আর তবলার সেই বোলের সঙ্গে ঘুঙুরের বোল সুর মেলাল।

ভরত-নাট্যম্। কোল্হাপুরে শিখেছিল কামিনী। বিনায়ক তখন সবে বম্বে থেকে একটা ক্লথ মিলের স্ট্রাইকের ব্যাপারে এক বছর জেল খেটে ফিরে এসেছে। কোল্হা-পুরে মাসি থাকত, নতুন করে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার আগে ক'টা দিন সে জিরোতে এসেছিল। সেখানে বন্ধু পুসলকরের বাড়িতে গৌরীপুজোর জলসাতেই কামিনীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ নয়, আবিষ্কার। পুসলকর পরিচয় করিয়ে দেবার পর ছেলেমেয়েদের নাচগান আরম্ভ হল। শেষে নাচতে দাঁড়াল কামিনী—মানে দাঁড়াতে বাধ্য হল কিন্তু মুস্কিল হল একটা। তবল বাজাবে কে।

পুসলকর বলল, "বিনায়ক।"

বিনায়ক বলল, "জেলখানায় গিয়ে ভুলে গেছি ওসব।"

প্‌সেলকর বলল, "তবলার সামনে একবার বোস্ তো, তারপর দেখব ভুলেছিস কিনা।"

বাজাতে হয়েছিল। প্রথমে হাত খুলছিল না, কিন্তু কামিনীর নাচের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা হঠাৎ বিনায়কের জড়ত্বকে শুকনো পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নাচ সে বোঝে না, মুদ্রার অর্থ তার কাছে অজানা, কিন্তু কঠিন ও কোমল দেহবল্লরীর গতিভঙ্গিমা যখন তালের সঙ্গে মিশে এক দৃশ্যমান ছন্দ সৃষ্টি করতে লাগল তখন সে যেন নেশাগ্রস্তের মত বাজাতে লাগল। সেই বাজনা শুনে কামিনীরও যেন নেশা জন্মাল, আর দুজনের নেশা এক হয়েই পরে অনুরাগের সৃষ্টি করল।

পূর্বরাগের পালা মাস ছয়েক চলেছিল। তারপর বম্বেতে চাকরি পেল বিনায়ক—প্ল্যাস্টিক কোম্পানীতে মাস গেলে একশ' টাকা। সেই চাকরি পেয়েই হিসেব কষতে বসল বিনায়ক। দারিদ্র্য, স্বদেশ-সেবা, শ্রমিক-আন্দোলন, দু'বার জেলভোগ—সব কিছুর ভেতর দিয়ে তার বত্রিশ বছর কেটে গেছে। ছোটবেলা থেকে সে নীতিবাক্যে বিশ্বাস করেছে, জীবনে তা বর্ণে বর্ণে পালন করেছে। আজো সেই পথে আছে বলে সে বুঝতে পারছে যে, তার থার্ড ক্লাসের বিদ্যে দিয়ে সে আর বেশী কিছু করতে পারবে না। সে যা জানে তা দিয়ে একশ' দেড়শ'র বেশি রোজগার হবে না। গুণের মধ্যে তবলা বাজানো কিন্তু তা দিয়ে সে রোজগার করবে না কারণ শিল্পীর জীবন অনিশ্চিত। তার সবচেয়ে বড় গুণ যে অভিজ্ঞতা ও জীবন-বোধ সমাজে তার দাম নেই। অথচ যৌবন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। দরিদ্র ভারতবাসীর আয়ুর অংক তার জানা আছে বলে বিনায়ক হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। নগ্নতা, উপবাস, আর ব্যাধির ভয়কেও অগ্রাহ্য করে সে বিয়ে করার বিষয়ে নিষ্পত্তি করে ফেলল। কোলহাপুরের থেকে কামিনী তার গরীব বিধবা মায়ের সঙ্গে এল, ক'দিন পরেই বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর প্যাটেল চত্তলের ছোট্ট একটি ঘর আর তার ভগ্নাংশ একটি রান্নাঘরে তাদের দ্বৈত জীবনের সঙ্গীত আর সঙ্গত শুরু হল। রোজ ভোর-সকালে উঠে কামিনী রাঁধতে বসে। বিনায়ক উঠে কফির পেয়ালা নিয়ে চার পয়সা দামের মারাঠী খবরের কাগজটা পড়ে। তারপর সে স্নান করে খায়, খেয়ে উঠে খাকি ট্রাউজার আর লংক্লথের শার্টটা পরে, কোলহাপুরী চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে নেয়। ছোট্ট একটা নিকেল-ভরা ডিবের ভেতর জলখাবার ভরে খবরের কাগজ আর তিলক লাইব্রেরি থেকে আনা বইটা তার ফুলতোলা থলিতে ভরে সে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। অদ্ভুত এক চাহনি দেখা দেয় তখন বিনায়কের চোখে, প্রশান্ত একটা হাসি খেলে তার ঠোঁটের কোণে। তারপর সে চলে যায়।

একা একা দিন কাটে কামিনীর। প্যাটেল চত্তলের এঘরে ওঘরে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় সে। নায়েকের ঘরে কোথায় কি আছে, ছবিলদাসের ঘরের কোথায় ছুঁচ-সুতো থাকে, মীরচান্দানীদের আলমারির কোথায় উইপোকা বাসা বেঁধেছে—সব কিছু জানা হয়ে যায় তার। শুয়ে, বসে, গল্প করে, গল্পের বই পড়ে, দিবাস্বপ্ন দেখে দিন শেষ হয়। সমুদ্রের দিক থেকে জোলো হাওয়া আসে ঘরের ভেতর, বিষণ্ণ আধো-আলো আধো-অন্ধকার গোধূলি বেলায় যখন মনের তার থরথর কাঁপতে থাকে, তখন সেই ফুলতোলা কাপড়ের থলিটি হাতে বিনায়ক ফিরে আসে। কাঁপুনিটা থেমে যায়।

আবার রান্না, খাওয়া, এলোমেলো গল্প, ঘুম। মাঝে মাঝে বিনায়ক তবলা নিয়ে বসে, রেওয়াজ করে—সেই সঙ্গে কামিনী নাচে। প্রথম প্রথম চত্তলের অন্যান্য বাসিন্দারা উঁকিঝুঁকি মারত, কিন্তু কামিনী তারপর থেকে দরজা জানালা বন্ধ করে নাচত। সারাদিন ধরে যে অব্যক্ত বেদনা একাকিত্বের চাপে জমা হয়ে উঠত তা নাচের সময় ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যেত।

কিন্তু কিছুদিন পর থেকে ধোঁয়া দাগ রেখে মেলাতে লাগল। দিনের পর দিন এমনি কাটবে? যখন সে নাচ শিখত, যখন সে কোলহাপুরের পরিচিত গণ্ডীতে নাচ দেখাত এখানে ওখানে, তখন সবাই কত প্রশংসা করত! কত লোক তার রূপ আর গুণের প্রশংসা করে বলেছে যে সিনেমাতে গেলে তাকে সবাই লুফে নেবে। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে সে বরাবর এই ছবিই দেখেছে যে সবাই তাকে দেখে মুগ্ধ, সবাই তার নাচ দেখে হাততালি দিচ্ছে, রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে গেলে সবাই কানাকানি করছে, "কামিনী—ওই সেই বিখ্যাত কামিনী"—কিন্তু আজ তা ভাবতে গেলে চোখে জ্বালা ধরে কেন?

বিনায়ক সেটা টের পায় কি পায় না বোঝা যায় না—একইরকম প্রশান্ত থাকে সে; একই রকম স্থির, ধীর, স্বল্পবাক। দিন আর রাতের প্রহরগুলোকে সে যেন সারাজীবনের জন্য হিসেব করে ঠিক করে নিয়েছে। ঘুম ভাঙার পর থেকে আবার ঘুমোন পর্যন্ত নির্ভুল তার হিসেব। কিন্তু তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে সে কামিনীর দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি মেলে তাকায়, মাঝে মাঝে হঠাৎ কামিনীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়, বেড়াতে যায় চৌপাটি আর ক্যানারি ভেঙে, মালাবার পাহাড়ে আর মার্ভের নির্জন বেলাভূমিতে। কিন্তু তাও যেন হিসেব করা জীবনের হিসেব করা বাজে খরচ। কামিনীর শুধু পা বেদনাই সার হয়, চিত্তের কোন শান্তি হয় না।

শুধু ভালো লাগে মাঝে মাঝে সিনেমায় গেলে। মাসে দুমাসে একবারের বেশি তা কুলোয় না। কিন্তু সেই সময়টাতেই কামিনী বাঁচে, অন্ধকারে আলোকিত পর্দার জীবনে সে মিশে যায়, ভুলে যায় যে পাশে তার স্বামী বসে আছে। তারপর সিনেমা যখন শেষ হয়ে যায়, ফুলতোলা থলিটা হাতে বিনায়ক যখন কামিনীর হাত ধরে ভীড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশংসামুখর ঘরমুখো দর্শকদের মন্তব্যগুলো কামিনীর কানে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চলতে চলতে সে ভাবে যদি সে নাট্যকলার চর্চা করতে পারত, তাহলে হয়ত তার বিষয়েও লোকেরা এমনি চর্চা করত!

উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই কীট যখন মনের অন্ধকূপে চাপা ছিল, ঠিক তখনই এল বিনায়কের বন্ধু পাণ্ডুরঙ্গ।

ছিমছাম, ফিটফাট, কথাবার্তায় চৌকস লোক পাণ্ডুরঙ্গ। বিনায়কের বাল্যবন্ধু সে, বয়সে সে দু'তিন বছরের ছোট। অনেকদিন দেখা হয়নি দু' বন্ধুতে, প্রায় ছ'বছর বাদে আবার দেখা হল। দেখা হতেই বিনায়ক তার বন্ধুকে সোজা প্যাটেল চত্তলে টেনে নিয়ে এল।

"কামিনী—এই আমার বাল্যবন্ধু পাণ্ডুরঙ্গ—রজত ফিল্মস্-এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রোডাকসান ম্যানেজার—"

ফিল্ম! সিনেমা! নতুন করে আবার পাণ্ডুরঙ্গের দিকে তাকাল কামিনী।

পাণ্ডুরঙ্গ হাত জোর করে সহাস্যে বলল, "জেল ফেরৎ দাগী আসামীটা যে আপনার মত চারুদর্শনা একটি স্ত্রীরত্নকে এনে গৃহলক্ষ্মী করবে একথাটা আগে জানা থাকলে বিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগটা আমার বন্ধ হত না—"

বিনায়ক মৃদু হেসে বলল, "তোরা সিনেমা'র লোকগুলো একটু বেশী কথা বলিস, আর টকি হওয়ার পর থেকে তো সবাই একেবারে ছবির সংলাপ আওড়াস—"

"হবেই"—পাণ্ডুরঙ্গ চটপট জবাব দিল, "কারণ এটা আমার মতে অ্যাটম-যুগ নয়, সিনেমা-যুগ—"

বিনায়ক মাথা নেড়ে বলল, "একথাটা

ঠিক বলেছিস, সিনেমা যে কী বস্তু তা তোকে দেখেই টের পাচ্ছি—"

"কেন?"

"তা নয়ত কি? ছিলি ঘোর স্বদেশী, ঘোর নীতিবাগীশ"—

ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখদুটি পিট-পিট করে পাণ্ডুরঙ্গ হাসল, বলল, "হয়েছি ঘোর চালিয়াৎ, ঘোর উচ্ছৃঙ্খল—"

"ঠিক—কিন্তু কেন পাণ্ডুরঙ্গ?"

"কারণ এই সিনেমা-যুগটা চরিত্র-হীনতারও যুগ—"

"ঠাট্টা রাখ—বোস, বসে সব খুলে বল। কামিনী দুপেয়ালা—"

পাণ্ডুরঙ্গ কামিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "চা আর তার সঙ্গে গাঠিয়া ভাজা বা বটোটা বড়া একটা কিছু চাই—আমার কিন্তু ভারী খিদে পেয়েছে বৌদি—"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—" কামিনী খুশী মনে তাদের দ্বিতীয় এবং শেষ কামরা, মানে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু তার কান রইল দুবন্ধুর কথা-বার্তার দিকে। পাণ্ডুরঙ্গ তখন নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করেছে। স্টোভটা ধরিয়ে জল চাপিয়ে দিল কামিনী, তারপর দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। পাণ্ডুরঙ্গ তখন বলতে শুরু করেছে। বাপ মারা যাবার পর স্বদেশী নেশাটা যখন সংসারের চাপে ফিকে হয়ে এল, তখন থেকে জীবনের স্রোতে ভাসতে আরম্ভ করল সে। ইনসিওরেন্সের দালাল, এখানে সেখানে অস্থায়ী চাকরি, গ্রীষ্মকালে লস্যি'র দোকানদার, সিল্ক্ মিলের কেরানী, বাড়ির দালাল, তারপর সিনেমা হাউসের গেট-কীপার। সেখান থেকেই হঠাৎ নেশাটা গাঢ় হল আবার—স্বদেশীর নেশার বদলে সিনেমার নেশা। সিনেমার জগৎ তাকে বার-বার হাতছানি দিতে লাগল আর কানের পাশে ধ্বনিত হল লাখ লাখ টাকার মধুর নিক্কণ। পরিবর্তনশীল জগতে এই অস্থায়ী জীবনও বারবার বদলায়—পাণ্ডুরঙ্গও বদলাল। এখন সে রজত ফিলমসের প্রোডাক্শান অ্যাসিস্ট্যান্ট—আসলে সেই সব। প্রডাক্শান ম্যানেজার তো তাকে ছাড়া এক পাও চলে না। প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টারও তার কথা অমান্য করতে পারে না। দিগ্বিজয়ী শিবাজীর দেশবাসী সে—রজত ফিলমসের সবাইকে জয় করেছে, বশ করেছে।

কামিনী মনে মনে পাণ্ডুরঙ্গের বিষয়ে শ্রদ্ধাবোধ না করে পারল না। প্যাটেল চত্তলের পূবকোনার ছোট্ট ঘরটা পাণ্ডু-রঙ্গের কথা আর হাসিতে গমগম করতে লাগল, অভিনেতা'র মত হাত পা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, লেখকের মত সাজানো গোছানো চোখাচোখা কথা বলে পাণ্ডুরঙ্গ আবহাওয়াটা বদলে দিল। বিনায়ক চুপ করে বসে শুনতে লাগল তা, আর মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে সে আসতে লাগল। একদিন সে কামিনীর নাচও দেখে ফেলল।

নাচ শেষ হলে সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করে দিল, "আহাহা—বৌদি, মনে রাখার মত জিনিস আপনার নাচ। আপনার সিনেমায় নামা উচিত, হিরোইন হওয়া উচিত—"

নাচতে নাচতে রক্ত গরম হয়েছিল, কথাটা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে কায়েম হয়ে বসল। বিনায়কের মুখে তখন যে একটা অন্ধকার ছায়া দেখা দিল সেদিকে কামিনীর চোখ পড়ল না, তার দুচোখের সামনে তখন অসংখ্য ছবির পরদায় তারই নৃত্যগীত প্রেমাভিনয় দেখতে পেল সে।

মনের অন্ধকূপে যে কীটটা নির্জীব হয়ে ছিল, সে এবার সজীব হয়ে উঠল, বাড়তে লাগল। পাণ্ডুরঙ্গ এসে মাঝে মাঝে সেই কীটকে পুষ্ট করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল। কেউ কি বড় শিল্পী হয়েই জন্মায়? কার মধ্যে কী শক্তি লুকানো আছে তা কি কেউ বলতে পারে? পাণ্ডুরঙ্গ না হলে যে অনেক তারকা ফিল্মে নামবার সুযোগই পেত না, তা শুনে শুনে কামিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহু-দূরপ্রসারী হয়ে উঠল, গাড়ি বাড়ি বিলাসিতা'র অসংলগ্ন কাটা-কাটা ছবির সঙ্গে লাখ লাখ টাকার ঝনৎকার মিশে তাকে দুঃসাহসিনী করে তুলল।

কৃধান ধান ধান ধা—কৃধান ধান ধান ধা—বিনায়ক বাজিয়ে চলে আর কামিনী নাচে। বরাবরকার মত, তার চরিত্রের ঋজুতার মতই ধীর স্থিরভাবে বাজিয়ে যায় বিনায়ক। বেলা পড়তে থাকে, তাল বদলায়, লয় বাড়ে ও কমে, ঘুঙুরের তালে চেতনা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। নাচের অর্থ পুরো বোঝে না বিনায়ক, বাঁদিকে গ্রীবা হেলিয়ে বাঁ হাতের আলপদ্ম-মুদ্রায় কি বোঝাতে চায় কামিনী, কেন যে সমের মুখে পৌঁছে ষোল মাত্রার চারমাত্রাতেই শুধু সে পদক্ষেপ করে, মাঝে মাঝে কেনই বা সে বিপরীত বাহুর ওপর প্রতি হাত রেখে প্রতি দুমাত্রায় একবার করে দুচোখের সেই আশ্চর্য মণি দুটোকে এক-বার ডাইনে একবার বাঁয়ে নিয়ে মৃদুমধুর হাসে, কিচ্ছু বোঝে না বিনায়ক, তবু সে বাজায়। বাজাতে বাজাতে অবসন্ন দিবা-লোক ক্রমে রক্তিম হয়ে ওঠে, শেষে এক-সময় বর্ণহীন হয়ে সন্ধ্যালোকে বিলীন হয়ে যায়।

কামিনী হঠাৎ থেমে বলল, "ব্যস্—আজ আর না—"

বিনায়কও থামল।

পেছন থেকে পাণ্ডুরঙ্গের গলা শোনা গেল, "সাধু-সাধু—"

ওরা দুজনে দরজার দিকে তাকাল। ভেজানো দরজা ঠেলে পাণ্ডুরঙ্গ ভেতরে এল, বলল, "রোজ ভোর বেলায় সূর্য ওঠে, কিন্তু তবু প্রতি সকালেই তাকে নতুন করে অভ্যর্থনা করি আমরা—"

কামিনীর ললাটে, গ্রীবায়, কণ্ঠে তখন শ্রম-জনিত স্বেদবিন্দু গলিত মুক্তোর মত চক্চক্ করছে, রক্তের উচ্ছ্বাসে রক্তিম মুখটার প্রতি রোমকূপে তা অভ্রকণার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাণ্ডুরঙ্গের কথায় সে কৃতজ্ঞতাবোধ না করে পারল না। তার নাচ, তার শরীরের গঠন, তার রূপ আর গুণ নিয়ে ভাই পাণ্ডুরঙ্গের মত বহুদিন কেউ এমন প্রশংসা করেনি।

বিনায়ক অভ্যর্থনা জানাল, "এসো হে পাণ্ডুরঙ্গ। বসো, একটু কফি চলবে?"

"রাজী—বৌদি যদি শুধু এক গেলাস জলও দেন তাহলেও চলবে"—

"বাঃ— তা দেব কেন?" কামিনী ঘুঙুর খুলে ফেলছিল, এবার উঠে দাঁড়াল, "আমরা গরীব হলেও কি ভাইবন্ধুর—"

পাণ্ডুরঙ্গ কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "সাবাস্—স্ত্রীজাতিকে চটিয়ে দিলে যে দুটো জিনিস পাওয়া যায়, তা আমি জানি—হয় ঝাঁটা, না হয় মিষ্টি"—

সবাই হাসল কিন্তু বিনায়ক কেন যেন জোরে হাসতে পারল না। আজকাল পাণ্ডুরঙ্গের দিকে তাকালেই মাঝে মাঝে কেন যেন সুটবুটপরা একটা শেয়ালের কথা মনে পড়ে তার। পরমুহূর্তেই লজ্জা পায় বিনায়ক-ছিঃ, এ কী ঈর্ষ্যা, এ কী সংকীর্ণতা তার! কিন্তু—

পাণ্ডুরঙ্গ বলল, "আজ বেশীক্ষণ বসতে পারব না ভাই বিনায়ক—শুধু তোমাদের বলতে এসেছিলাম যে, কাল থেকে আবার আমাদের শুটিং শুরু হচ্ছে—একদিন দেখতে এসো"—

বিনায়ক হাসল শুধু।

কামিনী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "যাব নিশ্চয়ই যাব—বসুন ভাই পাণ্ডুরঙ্গ, কি না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবেন না।"

ইলেকট্রিক ট্রেনে দাদরে যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। স্টেশন থেকে মিনিট কয়েক হাঁটলেই স্টুডিও--সেখানেই রজত ফিলমসের অফিস।

স্টুডিয়োর গেট থেকে ভেতরে ঢুকতে যেতেই চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাণ্ডুরঙ্গ এসে হাজির। কামিনীর ওপর চোখ কয়েক সেকেন্ড নিবদ্ধ হয়ে রইল তার, তারপরেই কলকণ্ঠে সে অভ্যর্থনা জানাল, "আরে আসুন—আসুন—এইদিকে"—

তাকাবার মতই দেখাচ্ছিল কামিনীকে। বর্ষার নতুন ঘাসের মত স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল তার মুখখানা। রূপ মানে তো মৃগনয়ন, দীর্ঘকেশ, মরালগ্রীবা এবং আরো উপমা নয়—রূপ মানে একটা কিছু যা আলোর মত, যা বর্ণের মত, যা দৃষ্টি এবং মনকে অভিভূত করার মত। কিছুদিন আগে কেনা কলাপাতা রংয়ের মারাঠী শাড়িটাকে অতি যত্নে পরেছে কামিনী, গলায় পরেছে সোনার দানা-মেশানো এয়োতীর চিহ্ন মঙ্গলসূত্র, চোখের নীচে কাজলের চারুরেখা, মস্ত বড় খোঁপাটিকে ঘিরে রজনীগন্ধা আর জড়ির সুতো দিয়ে গাঁথা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি মালা।

প্রডাকশান ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল পাণ্ডুরঙ্গ। সুদর্শন, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ছোকরা—নাম প্রিয়লাল। তলোয়ারের মত ধার তার কথায় আর চাউনিতে। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে বিনায়কদের নিয়ে ফ্লোরের এক কোণে বসিয়ে দিল সে।

ডাইরেক্টার মিঃ গুণরাজের সঙ্গেও আলাপ হল। এতবড় নামজাদা লোক, কিন্তু কী নিরহঙ্কার, অমায়িক! হেসে হেসে কথা বলতে বলতে চা আনার হুকুম দিল গুণরাজ, চেয়ার টেনে তাদের পাশে বসল।

তখন লাইটিং হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দূরে আড্ডা দিচ্ছে। কামিনী ঘামতে ঘামতে গুণরাজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, আর আড়নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল শিল্পীদের। ছোট্ট, সুন্দর সেটখানি—ঠিক যেন বাস্তবের মত। কামিনীর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠল।

বিনায়কের মনের অবস্থা টের পাওয়া যায় না। ওকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায় এই পরিবেশে। বড় বড় সার্চ-লাইটগুলোর আলোর দীপ্তি, চীৎকার, ব্যস্ততা, হাসি—

"পাঁচ নম্বর দো"—

"টিল্ট্ আপ"—

"কাটার লাগাও"—

কত শব্দ! জীবন এখানে অনবরত উষ্ণ প্রস্রবণের মত টগবগ করছে। বিনায়ক সবার দিকে তাকায়, তাকাতে তাকাতে গুণরাজকে দেখে। লোকটার বয়স মাঝারী—আত্মতৃপ্ত, যশস্বী লোক—কিন্তু দুচোখের মণি দুটো তার সাপের চোখের মত। কামিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার তার সেই চোখ দুটো কামিনীর মুখ থেকে পায়ের দিকে নামছে।

"চা নিন—"

"থাক্—"

"লাইটস্ রেডি—ই—ই—ই?"

"না না, তা হবে না—আপনি আমাদের অতিথি"—

"রে—ডি—ই—ই—ই"—

গুণরাজ উঠে দাঁড়াল, বলল, "মনিটার প্লীজ"—

সহকারী ডাইরেক্টার হাঁক দিল, "আর্টিস্টরা আসুন"—

আলো—কী তীব্র আলো—কী অদ্ভুত এই আলোর ঔজ্জ্বল্য! আলোর নীচে উজ্জ্বল জীবনের প্রতীক ওই অভিনেতা আর অভিনেত্রী। শিল্পকর্ম, আনন্দ, যশ, অর্থ, সুখ, শান্তি—অসংলগ্ন কথা আর

বেলা পড়তে থাকে, তাল বদলায়...

ছবির মিছিল মস্তিষ্কের কোটরে বারবার চলাফেরা করে।

মোহগ্রস্তের মত অনেকক্ষণ বাদে ফ্লোর থেকে বেরোয় ওরা দুজনে। সঙ্গে পাণ্ডুরঙ্গ। বাইরেও যেন স্বপ্নলোক এই স্টুডিয়ো। ঝকঝকে সব গাড়ি থেকে চিত্র-তারকারা এসে নামছে। এই আশ্চর্য, পৃথক আর আলো-ঝলমল জগতে সে যদি—

"কেমন লাগল?" পাণ্ডুরঙ্গ হঠাৎ প্রশ্ন করল বিনায়ককে।

ফুলতোলা কাপড়ের থলিটা হাতে চলতে চলতে বিনায়ক হঠাৎ চমকে উঠল, বলল, "অ্যাঁ? ভাল। কোনদিন তো আগে দেখি নি—বেশ নতুন লাগল চোখে"—

ঘড়িটা পুরোন, কিন্তু চলে ঠিক—বিনায়ক সেই পুরোন ঘড়ির কাঁটাকে মানে—প্রতিদিনকার মত আজো সে এগারোটার সময় শুয়ে পড়ল। আজ কামিনীকে যেন নূতন লাগছে তার চোখে।

"কামিনী"—

"কি?"

"কাছে এসো"—

"কি?"

"বোস"—

"কি বলবে?"

"আলোটা আর ভালো লাগছে না"—

"নিভিয়ে দিচ্ছি"—

আলোটা নিভল, কিন্তু কামিনী আর কাছে ফিরে এল না, জানালার কাছে গিয়ে বসল সে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়াতে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত আরো অন্ধকার হয়ে চিঞ্চোলীর যে মাঠ আর জলাভূমিকে

দুর্নিরীক্ষ্য করে তুলেছে—সেইদিকেই তাকিয়ে রইল কামিনী।

বিনায়ক একবার অন্ধকারে হাসল, তারপর চোখ বুজল।

ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল বিনায়কের জীবন। ভোর হতেই কাগজ পড়ে, কফি খেয়ে, দাড়ি কামিয়ে চান করল সে, তারপর খেয়েদেয়ে তার সেই ফুলতোলা ছোট্ট থলিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এঘরে ওঘরে আড্ডা দিতে লাগল কামিনী। গতকালকার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল। নায়েকের বৌ কাছে সরে এল, ছবিলদাসের মেয়ের চোখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা ঘনাল, আর মীরচান্দানীর শালীর চোখে বিগতযৌবনার ঈর্ষা কালো হয়ে উঠল।

এমন সময়ে চত্তলের একটা গুজরাটী ছেলে এসে বলল, "আপনার স্বামীর বন্ধু আপনাকে ডাকছে"—

কামিনী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাণ্ডুরঙ্গ ঘরে এসে বলল, "এক পেয়ালা চা বৌদি"—

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—

কামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিনায়ক বাড়ি নেই। প্যাটেল চত্তল ভাত-রুটি পেটে ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে যাঁতা-পেষার শব্দ আসে একটা ঘর থেকে। সমুদ্রের ওদিক থেকে জোলো হাওয়া আসছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, বাতাসের দোলা লেগে টুপটাপ জল পড়ে বাড়ির পেছনকার গাছ-পালা থেকে। মাঝরাতের মত ভৌতিক দুপুরবেলাটা।

পাণ্ডুরঙ্গ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে একবার দেখল কামিনীকে, রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "মিঃ গুণরাজ তো কাল আপনাকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন বৌদি"—

"কি যে বলেন"—

"মিথ্যে নয়—পরের বইটাতে যেমন নায়িকা তিনি কল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে আপনি হুবহু মিলে যান"—

শুনতে শুনতে কামিনীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

পাণ্ডুরঙ্গ বলতে লাগল, "আপনার আগ্রহ দেখেই আমি ব্যাপারটা আগে থেকে ঠিক করেছিলাম—গুণরাজ আমাকে বলেছেন যে, আপনার আগ্রহ থাকলে তিনি আপনার কথাটা বিশেষ করে ভাববেন। আপনি নৃত্যপটীয়সী হওয়ায় আরো আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। তাছাড়া নতুন শিল্পী আমাদের নিতেই হবে। দেশের অবস্থাটা কী—এখন কি আর লাখ টাকা দিয়ে লোক নেওয়া যায়? তাহলে—কী মত আপনার?"

কামিনী উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করছিল, হেসে বলল, "আজ ওকে বলব—কিন্তু—কিন্তু আমি কি সত্যি পারব?"

"আপনি যথার্থ শিল্পী বলেই এ প্রশ্ন করছেন—আপনার মধ্যে যে কী আছে, তা আপনি জানেন না"—কামিনীর দিকে তাকিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ মিটিমিটি হাসতে লাগল।

আজ মনের মধ্যে ভালবাসার প্রদীপটি আর জ্বলে নি। লাইব্রেরি থেকে আনা গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসটা খানিকটা পড়ে বিনায়ক সযত্নে তা তাকে তুলে রাখল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কামিনী তাকে লক্ষ্য করছিল, এবার কাছে এসে বসল বিছানায়, বলল, "শুয়ে পড়ছ যে?"

"শোওয়া উচিত বলে"—

"না, আজ গল্প করো"—

"কেন?" বিনায়ক হাসল।

"এমনি—আমার ভাল লাগবে"—

"কিন্তু আমার যে ভাল লাগবে না—আমি দিনমজুর, আমার একটু ঘুম দরকার"—সেই একই প্রশান্ত হাসি বিনায়কের ঠোঁটের কোণে খেলে গেল।

"না—না"—কামিনী কাছে ঘেঁষে এল। তার শরীরের উত্তাপটা আজ বেশী মনে হল বিনায়কের।

"বেশ তো—বল কী বলতে চাও"—বিনায়ক স্ত্রীকে সপ্রেমে কাছে টেনে নিল।

"থাক, তোমার তো ঘুম পাবে।" কামিনী ঠোঁট ওল্টাল।

"তুমি ভারী ছেলেমানুষ"—

"না তো কি—আমার বয়স কত?"

"তা ঠিক"—দু'হাতে কামিনীর মুখখানি ধরে দেখতে লাগল বিনায়ক।

কামিনী স্বামীর মুগ্ধতা লক্ষ্য করে বলল, "একটা কথা বলব?"

"বল"—

"মিঃ গুণরাজের পরের ছবিতে একজন হিরোইন দরকার—আমাকে দেখে নাকি ও'র পছন্দ হয়েছে"—

"আমি ভাগ্যবান লোক।" বিনায়ক সহজভাবেই বলল।

"না ঠাট্টা নয়, তোমার কি মত?"

"মত কিসের?"

"আমি যদি সিনেমাতে যোগ দিই?"

হাত দুটো সরিয়ে নিল বিনায়ক, স্ত্রীর দিকে নতুন করে তাকাল। কিছুক্ষণ তার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, "তুমি কি খুব ভেবেচিন্তে একথা বলছ?"

"হ্যাঁ"—

"কেন?"—

"কারণ—কারণ বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না, আর ভালো লাগে না বলে আমি যা-তা কাজও তো করতে পারব না। তাছাড়া দিনরাত তোমার এই পরিশ্রম আমার ভালো লাগে না—আমাদের সংসার যে ভবিষ্যতে এতটুকুই থাকবে তা তো জোর করে বলা যায় না"—

"তুমি সিনেমাতে গেলেই সব সমস্যা দূর হবে?"

"আমার তো তাই মনে হয়—আর আমি তো সাময়িকভাবে যোগ দেব"—

"হুঁ"—

"হুঁ মানে?"

ক্লান্ত ভঙ্গীতে স্ত্রীর দিকে তাকাল বিনায়ক, বলল, "সিনেমার জগৎটাতে যত আলো তত অন্ধকার কামিনী—ওখানে জীবন সুস্থ থাকে না"—

"কি বলতে চাও তুমি?"

"আমার এতে সমর্থন নেই।"

কামিনী স্বামীর কাছ থেকে সরে বসল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বিনায়ক চোখ বুজল।

চিঞ্চোলীর রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেল। সমুদ্রের ধারে এদিকটাতে বেআইনীভাবে মদ বেচাকেনা চলে। অনেক রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝে এমনি ট্রাক যায়, কি করে যে আইনের চোখে—

কামিনী স্বামীর দিকে তাকাল, মৃদু ও অকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমার যদি ইচ্ছে করে? যদি আমি সুযোগ পাই? যদি আমি যোগ দিই?"

বিনায়ক চোখ বুজেই জবাব দিল, "আমি বাধা দেব না"—

স্বামীর দিকে তাকিয়ে অভিমানে দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল কামিনীর বাধা দেবে না—কিন্তু বলার ভঙ্গী বি অমনি হওয়া উচিত? স্বামীর ভালবাস কি তাহলে তার স্বার্থপরতারই আর একট নমুনা? সত্যিকারের ভালবাসা হলে বি বিনায়ক অমন চোখ বুজে থাকতে পারত

ঠিক সাড়ে ছ'টায় রোজ বাড়ি ফে বিনায়ক।

রোজই দরজা খোলা থাকে, কিন্তু আ তা বন্ধ। মাঝে মাঝে বাজারে য কামিনী—এখানে বিকেলেই বাজার জমে সেজন্য দুজনের কাছেই একটা করে চা থাকে। আজো হয়ত বাজারে গে কামিনী।

দরজা খুলে বিনায়ক ভেতরে গে পোষাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে স্টোভ ধর সে, চা খেয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা ব তুলে নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু পড়
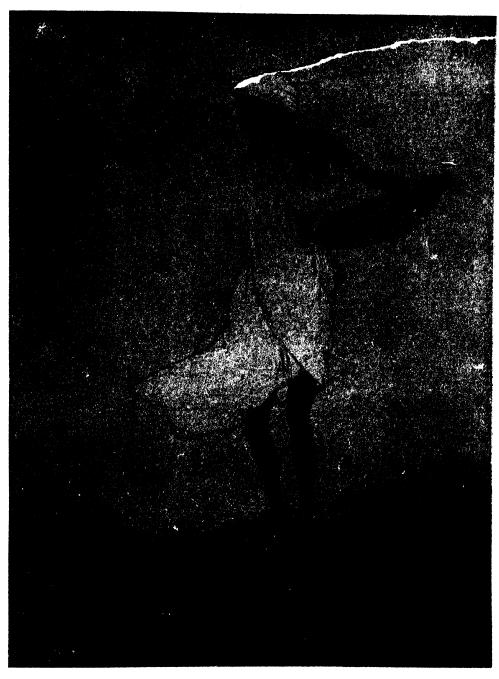
সৈন্ধবা

শিল্পীঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

সবিতা দেবীর সৌজন্যে

কেমন যেন লাগে। বিকেলে এসে কামিনীকে একবার না দেখলে যেন সব কিছু সহজ মনে হয় না। বইয়ের ওপর চোখ রইল বটে তার, কান রইল বাইরের দিকে।

কিন্তু কানে কোন শব্দ এল না। যোগেশ্বরী পাহাড়ের দিকে মেঘের গায়ে লাল রংয়ের ছিটে দেখে টের পাওয়া গেল যে, আরবসাগরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সামনের কাঁচা রাস্তাতে এদিককার শেষ ইলেকট্রিক বাতিটা জ্বলে উঠল, আর সেই আলোর সংকেত পেয়েই যেন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল চারদিক। তবু কোন লঘু পায়ের শব্দ কানে এল না। রাত হল। ঘড়ির কাঁটা দেখে রান্না চাপিয়ে দিল বিনায়ক। আরো রাত হল। ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী আজ রাত সাড়ে ন'টায় খাওয়াটা হল না।

দশটা বাজল।

হঠাৎ কামিনীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজার গোড়ায় এগিয়ে গিয়ে পাণ্ডুরঙ্গকে দেখতে পেল বিনায়ক।

পাণ্ডুরঙ্গ হাসল, "পৌঁছে দিতে এসেছিলাম রে বৌদিকে।"

"ও"—

"যাই তা'হলে, রাত হয়েছে"—

"তা হয়েছে"—

"হ্যাঁ—পরে দেখা করব—আমার আবার কাজ আছে"—

পাণ্ডুরঙ্গ অন্তর্হিত হলো।

কামিনী ভাল শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে মৃদুকণ্ঠে বলল, "রজত ফিল্মসের প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—সেই কোলাবাতে থাকে"—

"হুঁ"—

"কী বড়লোক! উঃ—আমার তো"—

বিনায়ক কথা কেটে বলল, "তুমি একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল হয়—আমার খিদে পেয়েছে"—

কামিনী ঢোঁক গিলে একবার স্বামীর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বুঝল না সে। বড় নির্বিকার মুখটা, ভাবলেশহীন।

খেয়ে উঠে বিনায়ক মশলা মুখে দিয়ে বলল, "তা'হলে হিরোইনের কাজটা পাবে মনে হচ্ছে?"

কামিনী চঞ্চল হয়ে কাছে এল। হেসে বলল, "প্রোডিউসার তো খুব ইচ্ছুক মনে হল।"

"তোমার কি ইচ্ছে?"

কামিনীর শরীর টান টান হয়ে উঠল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমার ইচ্ছে তো তোমাকে বলেছি।"

বিনায়ক আর কথা বলল না।

পরদিন বিনায়ক ফ্যাক্টরী যাবার উদ্যোগ করছে, কামিনী রান্নাঘরের দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বলল, "আজও হয়ত আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।"

বিনায়ক একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, "বেশতো—আমার কোন অসুবিধে হবে না।"

কামিনী দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরল।

আজও কামিনীর ফিরতে রাত হল। কিন্তু আজ মনটা তার বড় ভালো, রীতিমত উত্তেজিত সে। খুশির প্রাবল্যে চিঞ্চোলীর নির্জন পথটা দিয়ে সে একাই ফিরেছে, একটুও ভয় করেনি। বাড়ি ফিরে দেখল যে দরজা ভেজানো, ভেতরে বিনায়ক শুয়ে আছে। তার ঘুমন্ত মুখটাকে দেখে কামিনীর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। বেচারী।

স্বামীর কাছে গিয়ে সে ডাক দিল, "শুনছ—ও স্বদেশী মহারাজ।" আদর করে বার বার ডাকল সে।

বিনায়ক চোখ মেলল।

"কামিনী!"

"হ্যাঁ—না খেয়েই শুয়েছ যে। ওঠ—খাবে চল।"

বিনায়ক হাসবার চেষ্টা করল, ঘুমজড়ানো চোখের দৃষ্টি তার অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এল এবার। সে বলল, "আজ আমি স্বার্থপর হতে শিখলাম কামিনী—একা একাই খেয়ে নিয়েছি।"

কামিনী হাসল। "খেয়েছ! যাক্ বাঁচলাম—ভাল করেছ"—

হাসল বটে, কিন্তু মনে মনে কি খুশি হল কামিনী? মোটেই না।

"কি খবর তোমার? হিরোইন হওয়ার রোমাঞ্চকর পর্বের কতদূর এগোল?"

"কাল আমার টেস্ট হবে—ক্যামেরা আর সাউন্ড দুই-ই।"

"পাশ করলেই তো স্বর্গরাজ্য?"

"তার মানে? তুমি কি ঠাট্টা করছ?"

"ঠাট্টা! মাঝরাতে ঘুমচোখে মানুষ ঠাট্টা করে না। আচ্ছা কামিনী, তুমি কি সত্যি শেষ পর্যন্ত পাগল হলে?"

কামিনী শক্ত হয়ে দাঁড়াল, "পাগল কেন?"

"কেন জানি না, তবে তোমায় দেখে তাই মনে হচ্ছে। কামিনী, আমাদের দেশ এখনো নারীকে সম্মান করতে শেখেনি।"

"শেখেনি বলেই শেখাতে হবে।"

"তার মানে তুমি সিনেমাতে যাওয়ার বাসনাটা পরিত্যাগ করতে পারছ না?"

"না"—

"বেশ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

বিনায়ক পাশ ফিরে শুল। কামিনী বসে বসে জ্বলতে লাগল রাগে, অভিমানে। বিনায়কের কী হয়েছে? এমন সংকীর্ণ তো সে আগে ছিল না। স্বার্থপর। এতদিনে তার স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। না, সে হারবে না, সে স্বামীকে দেখিয়ে দেবে যে, শিল্পী হয়েও সংসার করা যায়।

"কামিনী"—

বিনায়ক হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল, "একটা কথা ভেবেছিলাম বলব না—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, না বললে আমি শান্তি পাব না।"

কামিনী তাকাল, "কী কথা?"

"তোমার সিনেমাতে যোগ দেওয়াটা আমার পছন্দ নয়। সেদিন সিনেমার জগৎটাকে আমার সুস্থ বলে মনে হল না। ওখানে বড় বেশী আলো, তার চেয়েও বেশী অহঙ্কার—মানুষের চিত্তবৃত্তি ওখানে সরল পথে চলতে পারে না—ওখানে তাদের গতি বক্র—টাকার জোরে মানুষেরা ওখানে শিল্প আর শিল্পীদের সর্বনাশ করে, দেশকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। তুমি ওখানে যেয়ো না কামিনী—আমার অনুরোধ।"

"তার মানে তুমি আমায় দিনের পর দিন ঘরে বসে কাটাতে বলো?" কামিনী জ্বলে উঠল।

"সংসার করতে বলি।"

"দিনরাত তোমার চরণাশ্রিত দাসী হয়ে নিজের সত্তাকে লোপ করে দেব?"

"তোমার আমার জীবন এক।"

"তার মানে তোমার এই দারিদ্র্য-বিলাসকে সারাজীবনের জন্য বরণ করে নেব?"

"ভারতবর্ষের সবাই দরিদ্র, কামিনী"—

"না—না—না"—কামিনী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কথা আমি মানব না। তুমি স্বার্থপর—তুমি ভীরু—তুমি আমার বিষয়ে ভয় পাচ্ছ, আসলে তুমি আমায় খারাপ ভাবছ। তোমার এই ভুল ধারণা আমি ভাঙব তবে ছাড়ব—আমি সিনেমাতে যোগ দেবই দেব।"

বিনায়কের মুখচোখ হঠাৎ আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল, সেই পুরোন হাসি ফিরে এল তার ঠোঁটের কোণে, কয়েক মুহূর্ত কামিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "এর পর আর কোনদিন এ নিয়ে কথা বলব না কামিনী—আমায় মাপ কর।"

এবার সে সত্যিই শুয়ে পড়ল। কামিনী ছুটে বাইরের বারান্দায় গেল। বাইরে অন্ধকার, অনেক দূরে ল্যাম্প-পোস্টটা দেখা যাচ্ছে, রাস্তা নির্জন। সেই অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল কামিনী আর জ্বলতে লাগল। আলো, যশ, অর্থ, শিল্প আর পাণ্ডুরঙ্গের মিষ্টি মিষ্টি কথা তার সমস্ত চৈতন্যকে মোহগ্রস্ত করেই রাখল।

ভোরে উঠতে দেরি হল কামিনীর। উঠে দেখল যে, ঘরে বিনায়ক নেই। হয়ত

কোথাও গেছে, চত্তলের অন্য কোন ঘরে।

কিন্তু বেলা বাড়তে লাগল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলে যে বিনায়ক, সে আজ কোথায় সময় নষ্ট করছে? আজ কি রবিবার? কিন্তু তার সেই ফুলতোলা থলি তো নেই! তাহলে? ওঃ, রাগ করেছে। কাল রাতের ব্যাপারটা ভোলেনি বিনায়ক। কিন্তু স্বামীর এমন অভিমান তো কামিনী আগে কখনো দেখেনি। নির্বিকার, প্রশান্ত বিনায়ক এত মেজাজী!

কিন্তু তারও তো মেজাজ আছে। কামিনীও তো রাগ অভিমান করতে পারে। না, সে মুষড়ে পড়বে না। বিকেলে হয়ত বিনায়ক ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে।

বেলা বারোটার পর স্টুডিয়োতে যাওয়ার কথা ছিল, কোনমতে চাট্টি খেয়ে কামিনী গেল।

পাণ্ডুরঙ্গ হেসে বলল, "ব্যাপার কি কামিনী দেবী, মুখটা শুকনো যে—মানের পালা-টালা বুঝি"—

"না না—এমনি"—

"বসুন, বসুন। গুণরাজ সাহেবকে খবর দিচ্ছি"—

"আজ আমার টেস্টটা"—

"হবে হবে—ব্যস্ত কেন?"

কিন্তু হল না। সেটে বসে বসে ঢুলুনি আসতে লাগল কামিনীর। গুণরাজ এসে মাঝে মাঝে দু'একটা আজে বাজে কথা আর রসিকতা করে যেতে লাগল।

বিকেল হতেই সে বিদায় নিল। পাণ্ডু-রঙ্গ বলল যে, পরের দিন টেস্ট হবে।

বাড়ি ফিরল কামিনী। প্রায় দৌড়ে। কিন্তু কোথায় বিনায়ক? দরজা তালাবন্ধ যে।

দরজাটা খুলল কামিনী। শূন্য ঘর।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। আকাশে মৌসুমী মেঘের গুরু গুরু ডাক শোনা গেল। তবু এল না বিনায়ক।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে আর মীরচান্দানীর শালী এসে দু'একবার উঁকি মেরে গেল। রাতেরবেলা এই সময় বিনায়ক নেই, এ তারা প্রায় দেখেই নি।

মাঝরাতে মৌসুমী তাণ্ডব শুরু হল। হাওয়ার ধাক্কায় দরজা জানালা থেকে খট্ খট্ শব্দ হতে লাগল, বৃষ্টিধারার অশ্রান্ত বর্ষণশব্দের সঙ্গে বাতাসের গোঙানি শুনে কামিনীর বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পাঁচ বছর ধরে তারা একসঙ্গে জীবনযাপন করছে, ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল হিসেব-করা জীবন। এই হিসেবী জীবনের ক্লান্তিকে যার কিছুদিন ধরে অসহ্য মনে হয়েছিল, আজ কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনের একটি হিসেব ভুল হতেই চোখের ঘুম পালিয়ে গেল।

ভোর হতেই কামিনী ছুটল প্লাস্টিক কোম্পানীতে। এভাবে যে স্বামী তাকে শাস্তি দেবে, তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বামীকে সে পেল না। খোঁজ নিয়ে শুনল যে, আজ থেকে বিনায়ক ছুটি নিয়েছে। হঠাৎ কি এক জরুরী ব্যাপারে কাল সে খুব দৌড়ো-দৌড়ি করে ছুটি নিয়েছে—আপাতত দশ-দিনের জন্য।

রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে চলতে লাগল কামিনী। বিনায়ক যে এমন কঠোর হতে পারে, তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

কিন্তু এবার?

জিদ চাপল তার। সে রজত ফিল্মসের অফিসে গেল। গুণরাজ তাকে খুব খাতির করে বসাল। পাণ্ডুরঙ্গ আর প্রিয়-লাল দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করল কামিনীর টেস্ট নেবার জন্য।

গুণরাজ নিজে কামিনীর মেক-আপ তদারক করল। কামিনীর মাথার ভেতর তখন এক জটিল অবস্থা। বিনায়কের আঘাতের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর নতুন অনুভূতি। রংয়ের প্রলেপের সঙ্গে সে যেন কোন এক গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। গুণরাজ সাহেবের তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টিটাও রঙের ঘোরে যেন বদলে গেল, ভালো লাগল।

তারপর টেস্ট হল।

তীব্র আলো পড়ল তার মুখের ওপর।

"হটিন"—

"ঘুরে দাঁড়ান"—

"যে কবিতাটি আপনাকে বলতে বলেছি তা আবৃত্তি করুন"—

গলা কাঁপল বৈকি, কিন্তু তবু এক অদ্ভুত তীব্র স্বাদ। যে আলোক-বৃত্তের মধ্যে কামিনী দাঁড়িয়ে আছে, তার বাইরে কি কিছু আছে, কেউ আছে?

টেস্ট হতেই আড়ালে পাণ্ডুরঙ্গ বলল, "ও. কে.—চমৎকার—আপনি নির্ঘাৎ রোলটা পাবেন"—

কিন্তু এবার কেঁদে ফেলল কামিনী।

"কাঁদছেন কেন কামিনী দেবী?" পাণ্ডু-রঙ্গ অবাক হল।

কামিনী কান্নার বেগ একটু থামিয়ে বলল, "আপনার বন্ধু কাল থেকে বাড়িতে নেই।"

"সে কি! কেন?"

ঠিক সেই সময়েই গুণরাজ এসে পড়ল কাছে, কামিনীর চোখে জল দেখে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল, কামিনীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "কাঁদছেন কেন?"

পাণ্ডুরঙ্গ হেসে বলল, "আনন্দে স্যার"—

"বটে! তা অমন হয়—এতবড় একটা কেরিয়ার—অমন হয়"—

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গুণরাজ অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা বলে কামিনীকে নানা আশা দিল, নানা স্বপ্ন দেখাল।

সন্ধ্যের পর পাণ্ডুরঙ্গ কামিনীকে প্যাটেল চত্তলে পৌঁছে দিল, বসে বসে সব শুনল, জানল।

রাত হল। তবুও পাণ্ডুরঙ্গ ওঠবার না করে না।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে, আ মীরচান্দানীর শালীরা দেখে গেল বিনায়ক আজো নেই এবং কামিনী একজ পরপুরুষের সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত ক বলে যাচ্ছে।

রাত প্রায় এগারোটার সময় পাণ্ডুর বিদায় নিল।

দু'দিন কেটে গেল। কিন্তু বিনা আর এল না। দু'দিন ধরে আরো ভা কামিনী। দুঃখ রাগ আর অভিমানের দু দিকটা কাটিয়ে উঠল সে। বিনায় অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহারটার কথা য সে ভাবতে লাগল, ততই তার মাথা গ হয়ে উঠতে লাগল, তার গোঁ চাপল সে নিজের পায়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে বিনায়ক ফিরে না এলে সে বিনায় কাছে যাবে না।

সেদিন সকালে পাণ্ডুরঙ্গ এসে হা

"আজ তোমার নেমন্তন্ন কামিনী

পাণ্ডুরঙ্গ ক্রমেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে

নাম ধরে ডাকাটা ভাল লাগল কামিনীর, কিন্তু পাণ্ডুরঙ্গের কথা ধরনটা বড় সহজ, রাগা যায় না।

"নেমন্তন্ন?"

"মিঃ গুণরাজের বাড়িতে পার্টি নতুন কয়েকজন লোক আসবে সে আলাপ করিয়ে দেবেন তিনি। আসবে, কেমন?"

"আচ্ছা—কিন্তু আমার টেস্টের ফল?"

"ওখানেই জানতে পাবে"—পা মিষ্টি করে হাসল, "মনে রেখো, ন'টায় পার্টি"—

"অত রাতে?"

"এ সব বিলিতিয়ানা—বোঝ না তৈরী থেকো তাহলে, আমি এসে গাড়ি করে নিয়ে যাব"—

বেলা বাড়ে। দুপুর হয়। ঘ সময় কাটে না। আরব সাগরের দিক মেঘের ধোঁয়া আকাশ দিয়ে গড়িয়ে যোগেশ্বরী পাহাড়ের দিকে। আলো খেলা শুরু হয় চিঞ্চোলীর জ

রাস্তার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা জোলো হাওয়া ঘরের ভেতর এসে স্মৃতির পাতা উলটে দিয়ে যায়। যেদিকেই তাকায় কামিনী, বিনায়কের কথা মনে পড়ে। পাঁচ বছরের অজস্র খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ে আর অবাক হয় কামিনী। সেই বিনায়ক এমন কাণ্ড করল! বিয়ের আগেকার দিনগুলো যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়—কোলহাপুরের সেই দিনগুলো।

ঘরে বসে সময় কাটে না।

কিন্তু তবু সময় ঠিকই কাটে।

সন্ধ্যে হয়। আয়নার সামনে বসে সাজতে আরম্ভ করে কামিনী। নিজের রূপ দেখে আস্তে আস্তে সে ভুলে যায় সব কথা, নিজেকে ভালো লাগে তার, চোখের কোণে কাজল লাগাতে লাগাতে যখন সে নিজেকে নতুন করে ভালবেসে ফেলে, তখন হঠাৎ আবার মনে হয় যে, এই আত্মরতির সুখটাও যেন পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না একজনের জন্য।

মোটরের শব্দ হয়।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের বোন আর মীরচান্দানীর শালী বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। প্যাটেল চত্তলের পূব-কোণার ঘর থেকে বেরিয়ে কামিনী যখন পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে গুণরাজের গাড়িতে গিয়ে চড়ে তখন তারা চিনতেই পারে না। স্বামী থাকতে মেয়েটার এই আশ্চর্য দেহসৌষ্ঠব আর রূপ কোথায় ছিল?

গাড়ির শব্দটা মিলিয়ে যায়, কিন্তু প্যাটেল চত্তলের নবজাগ্রত কৌতূহল মেলায় না। বিনায়কের উধাও হওয়া আর কামিনীর এই রূপান্তর নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনায় প্যাটেল চত্তল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মেয়েরা মেয়েদের গা টেপাটেপি করতে থাকে, হাসতে থাকে আর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে মেয়েরা স্বামীদের কাছ ঘেঁষে কামিনীর নামে কুৎসা করতে করতে তাদের গায়ে ঢলে পড়ে।

চিঞ্চোলীর রাস্তায় শেষরাতের তরল অন্ধকারে যখন মোষের দুধের বোঝা নিয়ে পশ্চিমা গোয়ালারা চলাচল শুরু করেছে, তখন গাড়িটা ফিরে এল।

চত্তলের দু' একজন বারান্দায় বসে দাঁতন করছিল তখন। কামিনীকে তারা ঘরে যেতে দেখল। গাড়িতে শুধু ড্রাইভার ছিল।

ঘরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কামিনী। তার চুল আলুথালু, তার শাড়ির পাট অন্তর্ধান করেছে, তার চোখের তারাতে আগুনের জ্বালা। রাত্রির স্মৃতিটা দেহের প্রতি রোমকূপে এক অশুচি-প্রলেপের মত লেগে রয়েছে—জ্বলছে—

রাত ন'টায় গিয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কামিনী। গণ্যমান্য অনেক লোক ছিল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া, হাস্য-পরিহাস শুরু হল। মদ যেখানে নিষিদ্ধ মদ খাওয়াটাই সেখানে সবচেয়ে বড় আভিজাত্য। কামিনীর কাছে গেলাস দিতেই কামিনী তা সরিয়ে দিল।

পাণ্ডুরঙ্গ কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "অতিথিদের অপমান হবে—খেয়ে ফেলো—খুব হালকা জিনিস"—

কামিনী খেতে বাধ্য হল। কি দরকার চটিয়ে—গুণরাজ রাগলে এখন সে দাঁড়াবে কি করে?

তারপরে তার খেয়াল নেই কখন নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছে। কি করেছে সে। খেয়াল হল গুণরাজের শয়নকক্ষে। অবিবাহিত গুণরাজের রোমশ বুকের পাশে কামিনীর নেশাটা যখন তরল হল, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে—। তখন তার সমস্ত শরীর যেন একটা ফার্নেসের মধ্যে জ্বলছে—

আয়নাটা তুলে নিল কামিনী, মুখের চেহারা দেখে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দরজার সামনে দিয়ে প্যাটেল চত্তল উঁকি মেরে যেতে লাগল। ছেলে বুড়ো মেয়ে—সবাই। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ দোলা লেগেছে, প্রতিদিনকার ডাল, আচার আর রুটির জীবনে আজ নতুন একটা মুখরোচক জিনিসের আমদানি হয়েছে।

কিন্তু কেউ ভেতরে এল না।

ঠাণ্ডা মেঝের ওপর ঠায় বসে রইল কামিনী।

দুপুর হল।

এতক্ষণে একজন ভেতরে এসে দাঁড়াল। কামিনী তাকাল।

পাণ্ডুরঙ্গ। তার মুখে হাসি।

"কি করছ কামিনী?—তোমার টেস্ট দেখেছি আমরা—ফার্স্ট ক্লাস—গুণরাজ সাহেব তো একেবারে"—

"বেরোও"— কামিনী এতক্ষণে যেন প্রাণ ফিরে পেল।

ছোট চোখ আরো ছোট করল পাণ্ডুরঙ্গ, "মানে? কি হল?"

ঘরের কোণে গিয়ে তরকারি কাটার বড় ছুরিটা তুলে নিল কামিনী, ঘুরে বলল, "বেরোও বলছি—নইলে"—

বাকিটা আর বলতে হল না। পাণ্ডুরঙ্গ এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যাটেল চত্তলের পূবকোণার ঘরটাতে একদিন সুখ ছিল, শান্তি ছিল। আজকাল সেখানে নরকের অশান্তি পাক খেতে লাগল। ধুলো জমল ঘরের মধ্যে, বিছানা-পত্র ময়লা হল, অযত্নে মলিন হয়ে উঠল সব কিছু, তক্তাপোষের নীচে বিনায়কের বাঁয়া-তবলা অনড় হয়ে পড়ে রইল।

দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু বিনায়ক এল না।

বর্ষার দিন শেষ হতে চলল। মৌসুমী মেঘের আবেগ কমে এল, আকাশের নীল রং পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল, তবু কোন খবর পাওয়া গেল না বিনায়কের।

একা একা ছটফট করে কামিনী। প্যাটেল চত্তল হাসাহাসি করে, কানাকানি করে। অতীতের মত মাঝে মাঝে দু'একবার চেষ্টা করেছিল কামিনী—প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আলাপ করে ভুলতে চেয়েছিল একটু। কিন্তু নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে আর মীরচান্দানীর শালী কথা বলেনি তার সঙ্গে, হাই তুলে, কাজের বাহানা দিয়ে এড়িয়ে গেছে, সরে গেছে।

কিন্তু দিন চলবে কি করে? সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে কামিনী আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠল। অপরাধ আর গ্লানির বোঝা তার এবার পাথর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সব দিক থেকেই কি হেরে যাবে সে? তাহলে সে বাঁচবে কি করে? বাঁচার কোন অর্থ নেই বটে, কিন্তু এখনো তো শিল্প-জগৎ তাকে অস্বীকার করেনি।

হঠাৎ সেদিন সে আবার আয়নার সামনে বসল, অনেক যত্ন করে সাজগোজ করল, চোখের কোণে কাজল লাগাল, তারপর বাড়ি থেকে বেরোল।

প্যাটেল চত্তল আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাণ্ডুরঙ্গ অবাক হয়ে বলল, "তুমি?"

"হ্যাঁ—আসতে নেই নাকি?" কামিনী হাসল জোর করে।

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" পাণ্ডুরঙ্গকে আজ কুৎসিত দেখাল।

"গুণরাজ সাহেব কোথায়?"

"তিনি ব্যস্ত।" পাণ্ডুরঙ্গ অন্যদিকে পা বাড়াল।

"আমার খুব দরকার।" কামিনী মরিয়া হয়ে বলল।

"তিনি খুব ব্যস্ত।" পাণ্ডুরঙ্গ কেটে পড়ল।

কামিনীর মাথায় রক্ত চড়ল, সে সোজা গুণরাজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরেতে অল্পবয়সী একটি সুন্দরী মেয়ে বসে গুণরাজের সঙ্গে গল্প করছে।

"কামিনী!"

"দেখা করতে এলাম।"

"বোস বোস"—গুণরাজ হাসল। সেই অপরিচিতা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একটু মেক-আপ রুমে যাও মিত্রা—আমি আসছি"—

মিত্রা হেসে বেরিয়ে গেল। কামিনী দেখল যে মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। কোথায় যেন একটা ঈর্ষা জ্বলতে লাগল তার বুকে।

"তারপর? কি খবর কামিনী?"

আড়ষ্ট হয়ে কামিনী বলল, "আমি—আমি কাজ চাইতে এলাম"—

"কাজ—কি কাজ দেব?"

"আপনি যে আমায় পরের বইয়ের নায়িকার ভূমিকার জন্য কথা দিয়েছিলেন"—

"কিন্তু কথা তো তুমিই ভেঙেছ কামিনী"—

কামিনী অবাক হয়ে তাকাল, "কেন?"

"কোথায় ছিলে এতদিন? আমি অন্য মেয়ে ঠিক করেছি—ঐ মিত্রা"—

"কিন্তু—আমি—আপনি"—

"ওর সঙ্গে কনট্রাক্ট সই হয়ে গেছে"—

আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল কামিনী, "আর আমি?"

গুণরাজ হাসল, "বড় কাজ আর নেই—ভেরি সরি—তবে অন্য একটা অফার দিতে পারি তোমাকে"—

"কি?"

"তুমি আমার বাড়িতে থাকো—সত্যি কথা বলতে কি, তোমার মত মেয়েদের আমার খুব ভালো লাগে"—

কামিনী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, "আমি কাজ চাই।"

"কাজ! বেশ, তাহলে চারদিনের একটি কাজ পাবে—রোজ পঞ্চাশ টাকা হিসেবে"—

কামিনীর সুর চড়ল, "আমি নায়িকার ভূমিকা চাই"—

"চেঁচিও না কামিনী—চাইলেই সব পাওয়া যায় না"—

"কেন? আমার টেস্ট?"

"হিরোইন হবার টেস্টে তুমি ফেল করেছ কিন্তু অন্য টেস্টে"—

"বদমাশ্—শয়তান"—

পেপার-ওয়েটটা ছুঁড়ে মারল কামিনী। তার পাহাড়ী রক্ত মুহূর্তে মাথায় চড়ে গেল।

লোকজন এল। কামিনীকে বের করে দিল তারা চড়চাপড় মেরে।

একজন বলল, "হিরোইন সাজবে!—ইঃ—আয়নাতে মুখ দেখগে বিবি।"

আয়নাতে মুখ দেখল কামিনী। অনেক বদলেছে সে। সে যে নিজেকে সুন্দরী মনে করত, তা কার কথায়? কার চোখ দিয়ে যে সে নিজেকে এতদিন দেখেছে, তা আজ সে টের পেল। কি আছে তার? চোয়ালটা বড়, নাকটা বোঁচা, রংটা ময়লা, মিত্রার সঙ্গে সে তো পাশাপাশিও দাঁড়াতে পারবে না। তবে?

এবার? এবার?

মাস কাটল।

চওলের মালিক তাগিদ দিল। মঙ্গল-সূত্র তো বেচা যায় না, চুড়ি চারগাছা বেচল সে।

অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হল কামিনী, তারপর একদিন প্লাস্টিক কোম্পানীতে গেল বিনায়কের খোঁজে। শরীরটা খারাপ লাগছিল, তবু গেল। কিন্তু গিয়ে যা শুনল, তাতে পায়ের নীচেকার মাটি দুলে উঠল। বিনায়ক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। অন্য কোথায় নাকি সে বেশি মাইনের একটা চাকরি পেয়েছে—দেড় শো টাকা মাইনে।

বাড়ি ফিরল সে, ফিরে শুয়ে পড়ল।

যখন চোখ মেলল, তখন তার গা পুড়ে যাচ্ছে, তখন রাত গভীর।

জানালার গোড়ায় কার যেন ফিসফিস ডাক শোনা গেল।

"এই—দরজা খোল—এই"—

প্যাটেল চওলের কোন ক্ষুধার্ত পশু ডাকছে। চওলেই বারবণিতার সন্ধান পেয়েছে সে। কামিনী তিক্ত হেসে চোখ বুজল। যা হবার হোক।

কিন্তু হল না কিছুই, জ্বর বাড়ল।

ক্রমে চওল জানল। কে একজন গিয়ে একজন বুড়ো মারাঠী ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার বলল, "টাইফয়েড।"

প্যাটেল চওল ব্যস্ত হয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডাকল। কামিনীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল তারা। আপদ গেল।

হাসপাতালে ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাওয়ায় নার্স, জ্বর দেখে।

দিনের পর দিন কাটে।

বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে যায় দিনগুলো। জ্বর ছাড়ে দিন পনেরো বাদে। তারপর আরো ক'দিন কাটে সুস্থ হতে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখে কামিনী। কিন্তু কিছু ভাবে না। কি হবে ভেবে? যা হবার হোক।

বর্ষার ঘোর কেটে গেছে—আকাশের নীলে চোখ ভরে ওঠে, সাদা সাদা মেঘের নৌকো পার্লার এরোড্রোমের দিকে উড়ে যায়। কোথায় যায়? হারানো দিন আর রাতের মত কোথায় যায় ওরা—কোন দিগন্তে?

আরো সাত আট দিন বাদে একদিন সকালে নার্স এসে বলল, "আজ তুমি ছাড়া পাবে।"

কামিনী তাকাল, "আজই?—আরো ক'দিন থাকা যায় না?"

নার্স হাসল, "সবাই যেতে চায় আর তুমি থাকতে চাও? না ভাই, আমাদের বেডের বড় দরকার—তা ছাড়া তুমি তো ভাল হয়ে গেছ"—

বেলা তিনটে নাগাদ ছাড়া পেল কামিনী। নার্স সংগে সংগে এল বাইরে পর্যন্ত।

হাসপাতালের গেটের কাছে এসে বড় দুর্বল মনে হল, কামিনী দাঁড়াল। এবার? কোথায় যাবে সে? কি করবে? কোল্‌হাপুরে এমন কেউ তো নেই আর। প্যাটেল চত্তলে গিয়ে কিসের জোরে থাকবে সে? মুহূর্তের জন্য পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার এসে তার চোখের সামনেটা গ্রাস করল। এবার কি হবে?

"কামিনী"—

কে! যেন ইন্দ্রজাল ঘটল। অন্ধকার দূর হল। কামিনী দেখল যে, গেটের বিপরীত দিকে বিনায়ক দাঁড়িয়ে। সেই খাকি ট্রাউজার আর লংক্লথের শার্ট-পরা বহু পরিচিত ঋজু আকৃতি, হাতে তার সেই ফুলতোলা থলিটা।

এগিয়ে এল বিনায়ক, কামিনীর হাত ধরে বরাবরকার মত প্রশান্ত হেসে বলল, "ট্যাক্সিটা ওদিকে কামিনী—আর একটু হাঁটতে হবে"—

কেমন যেন বোবা হয়ে গেল কামিনী। বিনায়ক কি ব্যংগ করছে, প্রতিশোধ নিতে এসেছে, শাস্তি দিতে এসেছে? লজ্জা, দুঃখ, আনন্দ—কোন কিছুই হচ্ছে না কেন তার ভেতর?

বিনায়ক বলল, "চল কামিনী"—

প্যাটেল চত্তল দু'দিন ধরে ফিসফিস করল। স্বামীদের বুকে ঘেঁষে মেয়েরা অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ কথা বলতে আর শুনতে লাগল।

চত্তলের পুবকোণার ঘরে বিনায়ক বদলেছে কি? বোঝা যায় না। ঘড়ির কাঁটা ধরে এখনো সে একইভাবে চলে। নতুন কোম্পানীটাতে সাড়ে দশটায় কাজ শুরু হয়—তাই আজকাল আগের চেয়ে আধ ঘণ্টা দেরি করে বেরোয় বিনায়ক। ফেরে আগের মতই, আগের মতই বই পড়ে ঘুমোয়।

কিন্তু বিছানা আলাদা। কামিনী মাটিতে শোয়। সকাল থেকে আগের মতই রান্না করে সে। বিনায়ককে খেতে দেয়, স্বামী অফিসে গেলে নিজে খায়, তারপর সারা দুপুর বসে বসে ঝিমিয়ে কাটায়।

কিন্তু কামিনী কি বেঁচে আছে? না—এর চেয়ে তার মৃত্যু ভালো ছিল। হাসপাতাল তাকে বাঁচিয়েছে এক দফা—বিনায়ক আবার নতুন করে ফল আর দুধ এনে বাঁচাতে চাইছে।

সে বিনায়কের দিকে তাকাতে পারে না। বিনায়ক একই রকম—নির্বিকার, নিঃশব্দ। যেচে সে কিছুই বলে না। কামিনীর ভয় হয়। একী জীবন! ঘৃণার দেওয়াল তুলে বিনায়ক কেন তাকে দগ্ধাচ্ছে? এ তার কেমন ঔদার্য? এর চেয়ে শাস্তি পাওয়া ঢের ভালো। দরজা বন্ধ করে বিনায়ক তাকে একদিন ধরে মারুক না— তার দেহের পাপ হয়ত ঝরে পড়বে। না, আরো দু'একদিন দেখবে সে, তারপর গলায় দড়ি দিয়ে শেষ করবে এই জীবন।

কিন্তু দু'দিন আরো কেটে গেল। একইভাবে আত্মধিক্কারের জ্বালা সেদিন বিকেলে কামিনীর মনে চরম হয়ে উঠল। নাঃ— আজই—আজই—

সন্ধ্যের সময় বিনায়ক ফিরে এল।

কামিনী চা এনে তাকে দিয়ে রান্নাঘরে সরে গেল।

বিনায়ক চা শেষ করে বসে কি যেন ভাবতে লাগল, তারপর তক্তাপোষের তলা থেকে বাঁয়া-তবলাটা টেনে বের করল। ইস্‌ কি ধুলো জমেছে! ধুলো ঝেড়ে সে তবলা ঠুকে বাজাতে শুরু করল।

অনেকদিন পর আজ প্যাটেল চত্তলের পুবকোণার ঘরে শব্দের হরিণ শূন্যে লাফ দিয়েছে।

আবার—আবার! টিঁকতে পারে না কামিনী—এক পা এক পা করে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বিনায়ক তার দিকে তাকাল, সেই পুরোন প্রশান্ত হাসি হেসে বলল, "অনেকদিন তোমার নাচ দেখিনি—ঘুঙুরটা আজ নিয়ে এসো তো কামিনী"—

হঠাৎ কি যেন হল—ছুটে ঘরের কোণ থেকে ঘুঙুর-জোড়া নিয়ে এসে কামিনী পায়ে বাঁধতে বসল। বাঁধা শেষ হতেই হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিনায়ক বাজনা থামাল না, বলল, "কেঁদো না কামিনী—ছিঃ, আমার বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে"—

কামিনী মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। এতদিন দেখেনি, চোখের জলের ভেতর দিয়ে স্বামীকে সে আজ নতুন করে দেখল।

আমাদের শিল্পপ্রীতি সাধারণত প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলা, মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়াও মানুষের শিল্পসৃষ্টির যে বহুবিধ ঐশ্বর্য ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে আমাদের আকর্ষণ ও অনুরাগ আশ্চর্যরকমে পরিমিত। এই অবহেলিত রূপলোকের একটি দৃষ্টান্ত হলো আমাদের পুতুল শিল্পের জগৎ। এ জগতে কোন শিল্প-সম্রাট অথবা যুগ-অধিনায়ক নেই। একান্ত অখ্যাত ও পরিচয়হীন শিল্পী-মানুষের নীরব রূপসাধনায় সে-জগৎ বিচিত্রিত। ইতিহাসের ধূসর অধ্যায়ে যখন চারুশিল্পের আবির্ভাব সন্দেহজনক তখনও আদিম মানবসমাজের অবলুপ্ত পরিচয়-চিহ্নের মধ্যে পোড়ামাটির পুতুল অথবা খেলনার আবিষ্কার এ-শিল্পের অগ্রগামিতা ও চিরন্তনতা প্রকাশ করছে। যুগে যুগে মানবসমাজের বিবর্তনের সংগে শিল্পকলাও তার নতুন অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই যে পুতুল গড়ার প্রেরণা তা মানুষের সমাজে চিরদিনই পরিবর্তন-হীন। কী আদিম যুগে, কী আধুনিককালে, অপরিবর্তনীয় শিশুমনের হাসিকান্নার আশ্রয় হয়ে তার আবেদন সনাতন হয়ে রইলো।

অথচ কোন শিল্পের ইতিহাস এই পুতুল সৃষ্টির রহস্যকে অথবা তার রচয়িতাকে কোনদিন বিশেষ প্রাধান্য অথবা মূল্য দেয়নি। সমাজের কোন বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সংগে যেমন কোনদিন তার কোন যোগ ছিল না, সমাজের উপরতলার কোন অনুগ্রহ অথবা প্রসাদপ্রত্যাশী হয়েও তাকে থাকতে হয়নি। এই কৃপাদৃষ্টির অভাবেই এরজন্যে রচিত হয়নি কোন শিল্পশাস্ত্র অথবা শিল্পবিদ্যানিকেতন। এর শিল্পীদের কাছে একটিমাত্র শাস্ত্রই প্রচলিত। তা হচ্ছে শিশুমন এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের সমস্ত শিল্পসৃষ্টি উৎসারিত হতো।

এই পুতুল শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা স্নেহমিশ্রিত ঔদাসীন্য আছে। সাধারণত সুসম্পূর্ণ কোন চারুশিল্পের মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভংগীর বিশিষ্টতা এবং শিল্পের রূপারোপে আঙ্গিকগত কুশলতাই শিল্পের প্রাথমিক আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে, এবং দর্শকের পরিণত মনের সংগে শিল্প দৃষ্টিকোণের ঐক্য যোজনাতেই সে শিল্পের সমাদর নির্ভরশীল। ঠিক এই মনোভাবের দরুণ আমাদের শিল্প-অনুভবকে বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টির দিকে সমানভাবে প্রসারিত করতে পারি না এবং সমান ঔৎসুক্য ও অনুরাগের সৃষ্টি হয় না। পুতুল হলো মুখ্যত শিশুদের উদ্দেশে রচিত শিল্পকলা, এই পরিচয়পত্রই আমাদের পরিণত মনে প্রথমত একটা বাধার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত যে শিল্পধারণা ও আঙ্গিকের সংগে আমরা সচরাচর পরিচিত, পুতুলের মধ্যে তার প্রয়োগ ও পরিচয় এতো অল্প যে সেটা আমাদের রসগ্রহণের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠে। তবুও এই পরিণত-মনের কৃপাকে উপেক্ষা করেই এই শিল্প যুগে যুগে আশ্রিত ও বর্ধিত হয়েছে, বহুবিচিত্র ফর্ম ও বর্ণের ফুলকারীতে এক রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে।
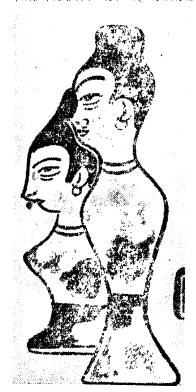
মা ও মেয়ে (মাটির পুতুল)—
স্কেচ্ ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

এই পুতুল শিল্পরচনায় বাংলাদেশের এক বিশিষ্টতা আছে। বস্তুত বাংলার এই পুতুল শিল্প এতো বিচিত্র ও ব্যাপক যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া একরকম অসম্ভব বলা চলে। তারপর যে উপাদানে এই পুতুল সাধারণত রচিত হতো তা এতো ক্ষণভংগুর যে সময়ের স্থূলে হস্তাবলেপে তার নিশ্চিহ্নতা অবশ্যম্ভাবী। ফলে বিবর্তনের ধারাটিও আজ অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব শিল্পকলা আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকেও এর বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো চলে না। তবে এখনো কদাচিৎ যে সব পুতুলের প্রাচীন নমুনা সংগ্রহ করা যায় (আজ থেকে বছর পঞ্চাশের মধ্যে রচিত) এবং সম্প্রতিকালে যে সকল শিল্পী সেই প্রাচীন ধারানুসারী পুতুল তৈরী করছেন তার থেকে সে শিল্প সম্বন্ধে শিল্পী-সমাজের মনোভাব এবং দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতা অনুভব করা যাবে। আধুনিক-কালে সৃষ্ট বাংলাদেশের যে কোন পুতুল সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক এবং পৃথকী-করণের মনোভাব নিতে হবে। আধুনিক বিকৃত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে শিক্ষিতসমাজের রূপদৃষ্টির প্রতি আশ্চর্যরকমে বিতৃষ্ণা, বিদেশী কলে তৈরী অভংগুর চটকদার পুতুলের আবির্ভাব, এই শিল্পে নিয়োজিত শিল্পীসমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ ভিন্ন পেশা গ্রহণ, এইসব কারণে এই শিল্প-কলার প্রান্তীয় সত্তা মৃত্যুমুখী হয়েছে। এখনো যাঁরা অতীত দিনের গুণ টেনে চলে-ছেন তাঁদের রচনার মধ্যেও সে রূপদৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। পুরোনো দিনের ছাঁচের ওপর

কিছুটা আধুনিকতার প্রভাবে পড়ে এক বর্ণসঙ্কর রূপ সৃষ্টি হচ্ছে।

অবশ্য বাংলার পুতুলশিল্পের এই দুঃসময় আরো ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলা বিভাগের পর থেকে। অবিভক্ত বাংলাদেশের যেসব অঞ্চল একদা পুতুল রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল তার মধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব স্থানের পুতুল শিল্পীরা অধিকাংশই হিন্দু হবার দরুণ আজ বাস্তুত্যাগী হয়ে দুর্ভাগ্যের পসরা বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং অনিবার্যভাবে এই শিল্পকলার উপরেও দুর্ভাগ্যের যবনিকা নেমে এসেছে। কলকাতার কালীঘাট অঞ্চল একদা এক শৈলীর পুতুলের জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলো। কিন্তু সেখানে আজ সবচেয়ে আঘাত হেনেছে কলে তৈরী বিদেশী পুতুলের সমারোহ।

তবুও এই পরিস্থিতির মধ্যে এখনো সন্ধান করলে মাঝে মাঝে পুতুলের অপূর্ব নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে এখনো আধুনিকতার বিবর্ণ আবহাওয়া সামাজিক পরিবেশকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করেনি সেখানকার শিল্পীর হাতে প্রাচীন অনুস্মৃতি নিয়ে রচিত পুতুলের মধ্যে রূপের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং বাংলাদেশের পুতুলশিল্প সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে গেলে যে সকল পুতুলের মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পশৈলী ও আঙ্গিকের প্রকাশ এখনো সুস্পষ্ট সেগুলির মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখা উচিত। অবশ্য অনেকস্থলেই বাইরের প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে এবং দেশীয় শিল্পশৈলীর সঙ্গে ভিন্ন প্রাদেশিক ও বিদেশী শিল্পশৈলীর সংমিশ্রণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলা শিল্পরীতির প্রভাব যেখানে মুখ্য সেগুলিকে বাংলার পুতুল শিল্পের নিদর্শন বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

বাঙালী শিল্পীদের পুতুল রচনার উপাদান অত্যন্ত সাধারণ। মাটি, কাঠ, বাঁশ, শোলা প্রভৃতি তাদের শিল্পসৃষ্টির মূল উপাদান। ঢালাই পিতলের কাজ কোন কোন স্থানে লক্ষ্য করা গেলেও সেগুলি বিশেষত্ব-বর্জিত। উড়িষ্যায় কষ্টিপাথর ও নরম পাথরের তৈরী যে অপূর্ব মূর্তি অথবা পুতুলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলাদেশে তার নিদর্শন একেবারেই দুর্লভ। বাংলাদেশের পুতুল প্রধানত মাটি, কাঠ অথবা শোলার তৈরী। মাটির তৈরী পুতুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাঁচে ঢালাই হয়ে থাকে। ছাঁচে তৈরী হবার পর রৌদ্রে শুকিয়ে তাকে আগুনে পুড়িয়ে নেয়া হয় এবং তার ওপর রঙের প্রলেপ দেয়া হয়ে থাকে। নিছক হাতে তৈরী পুতুলের নিদর্শন খুবই অল্প। দুই একটি নমুনা যা পাওয়া যায় তাতে শিল্পীর ফর্ম সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা

বাঁশের তৈরী প্যাঁচা (বর্ধমান)

লক্ষণীয়। এইগুলির সঙ্গে হরপ্পায় আবিষ্কৃত পুতুলের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তার থেকে কোন সম্বন্ধ আবিষ্কারও নেহাৎ কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়।

সাধারণভাবে বাংলার পুতুলশিল্পকে দুটিভাগে ভাগ করা চলতে পারে। একটি অনুকারক, যার উদ্দেশ্য শিল্পের মধ্যে
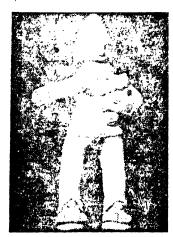
পোড়ামাটির খেলনা (ময়মনসিংহ)

দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুরূপের ভ্রম উৎপাদন করা। দ্বিতীয়টি হলো ছান্দসিক, যার লক্ষ্য শিল্পসৃষ্টির মধ্যে একটা গতি ও ছন্দের দোলা লাগানো। অবশ্য এই উদ্দেশ্যটি যে শিল্পীদের মনে সচেতন থেকে শিল্প-সৃজনে সাহায্য করেছে তা নয়, একান্ত অবচেতন মন থেকে উৎসারিত হয়ে শিল্প-ফর্মকে প্রভাবিত করেছে।

এখন প্রথমেই ছান্দসিক শিল্পের রূপ পরিচয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। রূপ প্রকাশের দিক থেকে ছান্দসিক শিল্প-গুলির মধ্যে প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। প্রথমত একশ্রেণীর পুতুল আছে যার মধ্যে মূর্তিগঠনের (plastic form) কুশলতা, বস্তুরূপের বর্তুলতা ও ঘনত্বের আভাস বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আর একদিকে সেইসব পুতুল যার মধ্যে চিত্ররূপ গঠনের (pictorial form) দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে।

যেসব পুতুল চিত্ররূপ গঠনের বিশিষ্টতা-সম্পন্ন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে প্রধানত কাঠের পুতুলের মধ্যে। এর সুষমা ব্যক্ত হয়েছে রেখাব্যবহারের কুশলতায় এবং আলঙ্কারিক বোধ থেকে। অথচ কোথাও জটিল ডিজাইন সৃষ্টি করে এর আবেদনকে জটিলতর করে তোলা হয়নি। শিল্পীর উপাদান ও আধার যে কাঠ তাকে যতোদূর সম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে খোদাই করে একটা প্রাথমিক আদল ফুটিয়ে তোলা হয়। তারপর শুরু হয় শিল্পীর তুলি ও রঙের ব্যবহার এবং এই রঙ ও রেখার মধ্যে দিয়েই শিল্পবস্তুত প্রাণ ও চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে ছান্দসিক মাটির পুতুলগুলির মধ্যে এক সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের পৌরাণিক এবং প্রচলিত লৌকিক ধর্মীয় দেব-দেবীর বিভিন্ন রূপারোপ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বলরাম, গণেশজননী, লক্ষ্মী, বংশীধারী কৃষ্ণ, গণেশ, গোপাল প্রভৃতির অত্যন্ত ঘরোয়া ও লোকায়ত রূপ এইসব শিল্পরূপের আশ্রয়। আবার কিছুটা বাস্তবপন্থী জীবনযাত্রার দৃশ্য, যেমন কলসী কাঁখে রমণী, স্তন্যদানরতা মাতা, গ্রামের বধূ প্রভৃতি। দেবদেবী ও মানবমানবী রূপের পরেই আসে পশুপক্ষী, প্রাণী জগতের রূপের মেলা। বাঘ, ঘোড়া, গাধা, হাতি, গরু, বিড়াল ও বিভিন্ন প্রকারের পাখি শিল্পীর কল্পনার স্পর্শে যেন রূপান্তরিত হয়ে আমাদের সম্মুখে ধরা দেয়। শিল্পীরা নিঃসংশয়েই জানতেন তাঁদের এই সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা ও একমাত্র গ্রাহক হলো মানবশিশু। সুতরাং পশুপাখি রচনার সময় শিল্পীর মন শিশুর মানসলোকের আশ্রয়ী হতো—যাদের অপরিণত অভিজ্ঞতা ও ভাবাবেগ এই জগতকে অতিপ্রাকৃত কল্পনার আলোকে রঙীন করে দেখে। তাদের কল্পনা ও ভাবাবেগের কিছুটা স্পর্শ যদি এর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারা

যায় তবেই তাঁর শিল্পের সার্থকতা। তাই এইসব শিল্পীর রচিত পাখি কোন বিশিষ্ট পাখির প্রতিরূপ নয়, শিশুকল্পনার প্রতীক হয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। হাতি সেখানে কোনক্রমেই চিড়িয়াখানায় দৃষ্ট হাতির প্রতিরূপ নয়, শিশুর বিস্মিত দৃষ্টি ও অতিকৃত কল্পনার আধার হয়ে তা রূপ পরিগ্রহ করেছে। বস্তুরূপ দর্শনে ও শ্রবণে শিশুর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, কিছুটা বাস্তবের সংগে কল্পনার মিশ্রণ হয়ে যে অপ্রাকৃত রূপ-কল্পনার সৃষ্টি হয়, অধিকাংশ পুতুল সেই শিশু-মানসিকতার প্রতিফলন।

কাঠের পুতুলের মধ্যে রমণী-মূর্তির আধিক্য। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বাংলার কাঠের পুতুলের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। এদিক থেকে কাশ্মীর এবং রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলের কাঠের পুতুল বিষয় ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে এক বিশাল রূপ-অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

মাটি বা কাঠ যে মাধ্যমেই এই শিল্পকলা রচিত হোক না কেন গঠনের বৈচিত্র্য ব্যতীতও বর্ণ ব্যবহারে আশ্চর্য সমতা জ্ঞান এই শিল্পকে সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় করেছে। মাটির পুতুলগুলি সবসময়েই গঠন উৎকর্ষের দিক থেকে তার প্রাথমিক ছাঁচের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে পরবর্তী শিল্পীর কোন স্বাধীন সত্তা ও কৃতিত্ব নেই। কিন্তু রঙ ও তুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীই স্বাধীন এবং সেখানে শিল্পীর বর্ণবোধের স্বকীয় বিশেষত্বই শিল্পকে রসোত্তীর্ণ করে। বর্ণবোধহীন শিল্পী গতানুগতিক প্রথায় কোন রকমে একাধিক রঙের প্রলেপ দিয়েই মুক্ত, এবং আধুনিক কালে এই বর্ণবিশেষত্বহীন পুতুলের প্রাচুর্যই বেশী।

সাধারণ বর্ণব্যবহারের দিক থেকে মিশ্রবর্ণের ব্যবহার অল্প। কয়েকটি প্রধান রঙের ব্যবহারের মধ্যেই এদের বর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে নীল, হলুদ, লাল, গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, কমলা, কালো এবং খয়ের রঙই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টির দিক থেকে সহনশীল করে এইসব বিভিন্ন বর্ণের অনুলেপের মধ্যে থাকে শিল্পীর কৃতিত্ব। তারপর অকম্পিত ও প্রবহমান তুলির ব্যবহারে বস্তুর গঠনটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় শিল্পবস্তুতে আলঙ্কারিক গুণবৃদ্ধির কাজ। সেখানেও তুলি ও রঙ ব্যবহারের দক্ষতার উপর শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভরশীল। কোথাও কোথাও সহজ আলঙ্কারিক ডিজাইনের প্রয়োগে শিল্পবস্তুকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বস্তুত শিল্পীর রঙ ও তুলির সার্থক ব্যবহারের মধ্যেই থাকে এই শিল্পের প্রধানতম সফলতা। রঙ ও রেখার এই গুণটি গ্রহণ করে আজকাল অনেক শিল্পীই বিখ্যাত হবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের রচিত শিল্প আজ অনন্যতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা লাভ করছে।

কাঠের পুতুল (বর্ধমান)

বিশুদ্ধ অনুকারক পুতুল-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা হলো কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সৃষ্ট পুতুলগুলি। অবশ্য এ ধারাটি এখন সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিল্পীরা জীবিকার জন্যে আজ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। শিল্পের এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিদেশী অনুকারক শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই শিল্পধারাটির পত্তন হয়। পৌরাণিক দেবদেবীর ভাবপূর্ণ সুকুমার মূর্তি এঁরা সুচারুভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্ত যে অতীন্দ্রিয় ধ্যান-কল্পনায় দেব-দেবীর মূর্তিতে অলৌকিক ও অপ্রাকৃত রহস্যের স্পর্শলাভ হয় এগুলির মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় কল্পনার স্থান নেই। তা যেন বাস্তব দেহধারী মানবমানবীর ঐশ্বরিক প্রতিরূপ। কিন্তু এদের সবচেয়ে সাফল্য এসেছে বাস্তব ঘরোয়া ও জ্যানরে (genre) মূর্তি রচনায়। সে বাস্তবতা এতো আশ্চর্য রকমে সম্পূর্ণ যে তা দর্শনে বাস্তবের ভ্রম উৎপন্ন হতে বাধ্য।

এই অনুকারক শিল্পের একটি ব্যর্থ সংস্করণ আজকাল চালু হতে আরম্ভ করেছে। এইসব সৃষ্টির মধ্যে সে নিখুঁত বাস্তববোধ অথবা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় নেই। সে শিল্প নিছক বাস্তবের প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের শিল্পরুচির মধ্যে আজ নিঃসংশয়েই এক হাওয়া বদলের পালা চলেছে। সেই রুচি আজ এতো বিবর্ণ ও অনুর্বর যে পুরাতন শিল্পমূল্যের প্রতিও যেমন আমরা শ্রদ্ধা হারিয়েছি নতুন শিল্পমূল্য আবিষ্কারের প্রতিও তেমনি উদাসীন। পুতুল সৃষ্টির মধ্যেও সেই মৃত্যু-বিবর্ণতা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরাতনের জের টেনে আজো যাঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে সেই সৃজনী প্রেরণা আজ স্তিমিত। তাই অধিকাংশ পুতুলই শুধু মাটি ও রঙের প্রাণহীন সৃষ্টি মাত্র। অবশ্য পুতুল শিল্পের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশই সর্বাংশে দায়ী। এই শিল্পকে আজ একটা অর্থকরী মর্যাদা দেবার জন্যে কোন দিক থেকেই কোন প্রচেষ্টা নেই। প্রাচীন ঐতিহ্যগত পুতুল শিল্পের যে সকল বৈশিষ্ট্য এখন লুপ্ত হতে চলেছে, বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা নিকেতন মারফৎ সেইগুলির পুনরুদ্ধার এবং নতুন কালের নতুন পরিবেশের মধ্যে তাদের সংযোজনার পন্থা আবিষ্কারের এক বিশাল গবেষণার ক্ষেত্র আজ পড়ে রয়েছে। এখনো বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে বিভিন্ন মেলায় বাংলার নিজস্ব পুতুল শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু শিল্পীদের রচিত আঞ্চলিক শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। সেইগুলি সংগ্রহ, তাদের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ আমাদের শিল্প শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন পাঠের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। তারপর যেসব শিল্পী আজ দেশ বিভাগের ফলে শেওলার মতো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছেন তাঁদের জীবনধারণের নিশ্চিত পন্থাও আজ দেশবাসীকে করে দিতে হবে। সেই শিল্পীকুলকে এই অবলুপ্তির বিপর্যয় থেকে আজ রক্ষা করতে না পারলে নিছক ফোক আর্ট প্রীতি ও গণশিল্পের দোহাই দিয়ে এই অমূল্য শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

সন্তোষকুমার ঘোষ

বেলা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম এসেছিল গৌরাঙ্গ, একটু পরে টুটুলকে কোলে নিয়ে এল মণিমালা।

তখনও জিনিসপত্র গোছান হয়নি। ভাঙা তোরঙ, ছেঁড়া তোষক, লক্ষ্মীর পট, ডালা-কুলো-কৌটো ঘরময় ছড়ান। ঘুলঘুলির মত ছোট্ট জানালা দিয়ে শেষ বেলার মরা আলো পড়েছে ঠিক আস্তর-খসা দেয়ালে, ঘরের কোণে কোণে ঝুল, আধ-অন্ধকারে একটা মাকড়শা ওৎ পেতে বসে আছে।

মণিমালা একবার চারদিকে চেয়ে নিল, টুটুলকে বসিয়ে দিল সেই আগোছাল হাঁড়ি ডেকচির মাঝখানে, তারপর হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল।

গৌরাঙ্গ দেশলাই-কাঠি দিয়ে কানে সুখ-সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, নাকেও সেই কাঠিটাই দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় অনর্গল হাসির শব্দে চমকে তাকাল। কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, কী হল।

মণিমালা তবু হাসছে, ঘোমটা খসে পড়েছে, হুঁস নেই, হাসির শেষ নেই।

কিন্তু সেই শেষ। এর পরে মণিমালাকে অনেক দিন কেউ হাসতে দেখেনি।

পাকা বাড়ি থেকে খোলার দোচালা। বেশী দূর নয়, ঢালু মসৃণ রাস্তা, নামতে কোন আয়াস নেই, অন্তত শরীরের নেই। তবু মণিমালার চোখমুখের ভঙ্গি কি রকম বদলে গেছে।

বিকার নেই গৌরাঙ্গর। আসবাবের মধ্যে ছিল ঝাপসা একটা আয়না, এর মধ্যে সেটার ধুলো ঝাড়তে লেগে গেছে।

—এটা কোন্ দেয়ালে ঝোলাব বল তো, পুবে না পশ্চিমে। পশ্চিমেই ভাল, কী বল। এদিকে জানালা আছে, দিব্যি আলো রিফ্লেক্ট করবে, মুখখানা অন্তত দু' পোঁচ ফর্শা দেখাবে। এসে দাঁড়াও দেখি এখানে, কই এস?

মণিমালা একচুল নড়ল না। হাসি নিবে গেছে, চোখের মণি দুটো এখন নীল-নিশ্চল। গৌরাঙ্গ চোখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু উৎসাহে ভাটা পড়ল না। বোঁচকার মধ্যে ছিল মুখ-বাঁকান কাঁচি, সেটা দিয়ে গোঁফের সংস্কার করতে লেগে গেল। সব শেষে পড়ল জুলপি নিয়ে। বলল, কত বড় জুলপি পছন্দ তোমার, চোখের লেভেল, না কানের লতি। মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক, কী বল।

টুটুলকে কোলে নিয়ে মণিমালা বাইরের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। খোলা হাওয়া পেয়ে টুটুল খুশী, নিদাঁত মুখে কানছোঁয়া হাসি। ঘরের ভিতরে গৌরাঙ্গ ফিলিম-গানের এক কলি গাইছে, তাও শোনা গেল। ওদের কোন বদল হয়নি তো, ওরা ঠিক আছে। শুধু মণিমালার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। অনেক দেশ আর নগরী কবে নিশ্চিহ্ন হল, ইতিহাস সে কথা লিখে রাখে, কিন্তু একটি সামান্য মেয়ের মুখের হাসি কবে নিঃশেষে মুছে গেল সে হিসাব কারও নেই।

এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বড় বাড়ির ছাত, যেখান থেকে মণিমালারা এসেছে। তেতলা পাকা বাড়ি, চুড়োয় শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তির নীচে লেখা 'কৃষ্ণধাম, স্থাপিত তেরশ তিন সাল।' কার্নিশে সাজান ফুলের টব, বাঁশের খুঁটিতে বেতারের তার জড়ান।

ওই বড় বাড়ির সবটা জুড়েই যে মণিমালারা ছিল তা নয়। তেতলার তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে এক প্রফেসর, তার পরিজন বলতে দূর সম্পর্কের এক ভাই, আর নিঃসন্তান বৌ। ফুলের টব তাদের। বৌয়ের নাম কেউ জানে না, মেয়ে মহলে তার চলতি নাম আশি টাকার দিদি, কেননা তেতলার ঘর তিনখানার ভাড়া আশি টাকা।

তাঁর সবচেয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী দোতলার

গিন্নী, শাঁসাল সরকারী চাকুরের স্ত্রী, থপ্‌থপে ভারী মানুষ, অনেক ছেলেপুলের মা। দোতলার পাঁচখানা ঘরের তিনখানা এঁর দখলে, রেডিওটাও এঁর। এঁরও একটা নাম অবশ্যই আছে, কিন্তু যেটা প্রচলিত, সেটা হল ষাট টাকার দিদি।

ষাট টাকার দিদি এমনিতে ভাল মানুষ, পানের বাটা সমুখে নিয়ে পা ছড়িয়ে সারাক্ষণ বসেই আছেন, জাঁতি নিয়ে শুপুরি কুচি-কুচি করছেন, কিন্তু আশি টাকার দিদির সঙ্গে বড় রেশারেশি। বলেন, আমার হার্টের ব্যামো, তিনতলায় উঠতে বুক ধড়ফড় করে, নইলে আশি টাকা ভাড়া কি আমি দিতে পারি না। করে তো কলেজের মাস্টারি, কতই বা মাইনে পায়, আমাদের উনি সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন সেও তো এই তিন বছর হয়ে গেল।

যে সায় দিয়েছিল তার দিকে এক খিলি পান বাড়িয়ে দিয়ে ষাট টাকার দিদি বলেন, 'বড় দেমাক, বড় ঠ্যাকার। প্রথম যেদিন এল, সেদিন ওকে একটা পান দিয়েছিলুম, ছুঁলে না। বলে, পান খেলে দাঁত খারাপ হয়। মরে যাই। আমি তোমাকে বলে রাখলুম তিরিশ টাকার বৌ, আমার পল্টু তো আসছে বছর এনট্রেন্স পাশ দেবে, তখন ওই আশি টাকার দিদির সোয়ামীকে আমি পাইবেট মাস্টার রাখব।'

তবু, 'আশি টাকার দিদি' তিনিও বলেন। বলতে হয়।

দোতলার বাকী দুখানা ঘরের অধিশ্বরী হল তিরিশ টাকার বৌ। স্বামী সদর রাস্তার মনিহারী দোকান 'সাবিত্রী স্টোর্সে'র দু'আনা পার্টনার, ষাট টাকার দিদির মাস-কাবারী সিঁদুর আর বড় মেয়ের পাউডার এই দোকান থেকেই আসে, সুতরাং সব কথায় ইনি সায় দিয়ে চলেন।

এ ছাড়া আছে চল্লিশ টাকার বৌ, কোন একটা দিশী কারখানার ক্যাশিয়ারের স্ত্রী, একতলার আড়াইখানা ঘর এঁর দখলে। দেড়খানা নিয়ে থাকেন পঁচিশ টাকার দিদি, সাইনবোর্ড পেণ্টার অনন্ত দাসের ঘরনী। একখানা ঘরে শোয়া-খাওয়া সব চলে, বাকী আধখানা সাইন-আর্টিস্ট স্বামীর স্টুডিও।

একখানা মাত্র ঘর নিয়ে ছিল মণিমালা। তার ঘরখানা সবচেয়ে অন্ধকার, তবু তো সেটা কৃষ্ণধাম। ছাতে দস্তুরমত কড়িবরগা ছিল, এ রকম খাপরার চাল নয়। পনেরো টাকার বৌ মণিমালা ষাট টাকার দিদির সমান না হক, সিকিভাগ সম্মান নিয়ে বেঁচে ছিল।

সিঁথির সিঁদুরে যেমন মণিমালা এয়োতি, কৃষ্ণধামের পরিচয়ে তেমনি ছিল ভদ্র। সে-পরিচয় জন্মের মত ঘুচে গেল, মণিমালার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে কি সাধে।

কালিঝুলি মাখা কতগুলো লোককে এদিকে আসতে দেখে মণিমালা ত্রস্ত হয়ে উঠল। ওরা বুঝি এই বস্তিরই বাসিন্দা, চেহারা দেখে তো মনে হয় মজুর কি বড় জোর মিস্ত্রী। মণিমালার দিকে তাকাতে তাকাতে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টুটুলকে বুকে চেপে ধরল মণিমালা, মাথার কাপড় ভাল করে টেনে দিল।

কৃষ্ণধামের লোকেরাও অবশ্য ওর দিকে তাকাত। ষাট টাকার দিদির বড় ছেলে গোবিন্দ, এখনও ভাল করে গোঁফই ওঠেনি, বই-পড়ার ছুতো করে বারান্দায় আসত, বইয়ের পাতার আড়াল থেকে ওকে দেখত। সাইন-আর্টিস্ট অনন্ত তো একেবারে সোজা-সুজি তাকাত। মণিমালার কখনও রাগ হয়নি, বরং মজাই পেয়েছে। একজন কিশোর, আরেকজন সংসারী, পোষমানা ভদ্রলোক, বেশী বাড়াবাড়ি করতে ভরসা পাবে না। বড় জোর একটু আড়চোখে চাওয়া, একটু শিস।

কিন্তু বস্তির লোকগুলো তো অন্য গোত্রের। মণিমালা শুনেছে এরা তাড়ি খায়, ঘরের মেয়ে মানুষকে ধরে মারে, পরের বৌ-ঝি টেনে বার করে। গৌরাঙ্গর ঠিক-ঠিকানা নেই, রাত-বিরেতে বাড়ি আসে, নয়ত ঘরের মধ্যে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—মণিমালার গায়ে কাঁটা দিল।

রাস্তার কলতলায় উলঙ্গ কটি ছেলে নাচছে, জল ছেটাচ্ছে এর ওর গায়ে, মণিমালার পায়ের ঠিক নীচে বয়ে যাচ্ছে খোলা নর্দামার স্রোত। নাকে কাপড় দিয়ে না হয় দুর্গন্ধ ঠেকান গেল, কিন্তু শরীরের সব কটি ঘৃণা-কঠিন পেশীকে মণিমালা সহজ করবে কি করে।

সামনের বস্তির কোণের ঘরে কে একটা মেয়ে একটানা কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে কেঁদে যাচ্ছে, ভিতরের উঠোনে দুজন লোক হঠাৎ মোটা গলায় গান ধরল, গ্যাস পোস্টটার নীচে ছায়া-ছায়া কটা মূর্তি হিন্দী কি তার চেয়েও দুর্বোধ্য ভাষায় বচসা করছে।

মণিমালা আর বসে থাকতে ভরসা পেল না, ঘরে গিয়ে গৌরাঙ্গকে ঠেলতে লাগল, এই ওঠো, ওঠো, আজ না তোমার 'নাট্যপীঠ' থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার কথা।

গৌরাঙ্গ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল, অবেলায় মাটিতে ঘুমিয়ে দৃষ্টি ঈষৎ-রক্তাভ, রোমশ দেহের উপরার্ধ খালি, নিম্নার্ধে মণিমালারই একটা ছেঁড়া শাড়ি কোনমতে জড়ান।

নিদ্রাতুর গলায় গৌরাঙ্গ বলল, সন্ধে হয়ে গেছে নাকি। উঠে রাস্তার কলে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল, গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে বলল, আচ্ছা, আমি তা হলে আসি। ফিরতে রাত হবে, ভয় পেও না।

ভয় মণিমালা পায়নি, কিন্তু ভরসাও নেই। দরজায় খিল এঁটে বসেছে বটে, কিন্তু জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে হাত সরছে না, থাক সব ছড়ান, কাল সকালে দেখা যাবে।

সবে তো রাত আটটা, এরই মধ্যে চার-দিক নিঝুম, মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ শব্দ, ইঁদুরগুলো নর্দামায় লাফিয়ে পড়ছে। আঙিনায় বেসুরো গলা দু'টি আরও উচ্চ-গ্রামে উঠেছে। আর কোন আওয়াজ নেই, কেরোসিন রেশনের রাত, ঘরে ঘরে বাতি নেবান।

সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে মণিমালা নিমেষে সেই বাড়িতে চলে গেল, যেখানে এখনো ঘরে ঘরে বিজলী আলো। ষাট টাকার দিদির বড় মেয়ে সুস্মিতা হারমোনিয়াম সমুখে রেখে পাড়া মাথায় করছে; ছোট মেয়ের কী অসুখ হয়েছিল ছেলেবেলায়, সে চেঁচায় না, পটের বিবি হয়ে আয়নার সমুখে বসে থাকে, মাঝে মাঝে এ-গালে একটু রঙ মাখে ও-গালে একটু পাউডার বোলায়, সুর্মাদানে কাঠি ডুবিয়ে চাহনি স্নিগ্ধতর করে; সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হতেই ফিরে ফিরে চায়, অমূল্য আজ এখনও আসছে না যে। অমূল্য ওদের লতায়-পাতায় জড়িয়ে কি রকম যেন আত্মীয় হয়, ষাট টাকার দিদি তাকে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছেন। আশি টাকার দিদির প্রফেসর স্বামী সের বারো ওজনের একটা বইয়ে মুখ গুঁজে আছেন, তাঁর দূর সম্পর্কের আশ্রিত ভাই প্রতুল রান্না ঘরে ভাজা ইলিশ খেতে খেতে ম্যাটিনিতে দেখে আসা ইংরেজি ফিল্মের গল্প বলছে। চোখ বড়-বড় করে আশি টাকার দিদি বলছেন, বল কী ঠাকুরপো, ওদেশের মেয়েরা এমন অসভ্য হয়। জল-জ্যান্ত স্বামী রয়েছে, তার চোখের সমুখে—

রুমালে মুখ মুছে দেওর বলে, একটা সিগারেট ধরাই বৌদি?

—ধরাও না?

—দাদা যদি এসে পড়ে। দাঁড়াও দরজাটা ভেজিয়ে দিই।

ও-পাশের ঘরে চল্লিশ টাকার বৌ লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা নভেল নিয়ে সেই যে সন্ধ্যার সময় কাৎ হয়েছেন, এখনও ওঠবার নাম নেই। ওদিকে উনুনে দুধ ধরে গেল, কেঁদে কেঁদে সারা হল কোলের মেয়েটা, চল্লিশ টাকার বৌ কি আর এ-জগতে আছে যে হুঁশ থাকবে।

সেই স্বর্গে তো ছিল মণিমালাও। কোন পাপে তার এমন দুর্গতি হল, কার শাপে। একটু একটু করে চোখ দু'টি জ্বলতে থাকে, কিসে আশি টাকা, ষাট টাকা চল্লিশ টাকার দিদিরা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

রূপে? না। এত যে অভাবে অনটনে আছে মণিমালা, ভাল করে খায়নি কতকাল,

ভাল একটা শাড়ি পরতে পায়নি, তবু শ্রীটুকু বজায় রেখেছে। পায়ের ওপর পা রেখে যে সব বৌ-ঝিরা আছে কৃষ্ণধামে, তারাও কিছু অপ্সরী উর্বশী নয়।

গুণেও না। মণিমালা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, আই এ-র বইও এনে রেখেছিল। শেলাইয়ের সার্টিফিকেট এখনও ওর বাক্সে তোলা আছে। হঠাৎ বিয়ে না হয়ে যেত যদি, মণিমালা আঙুলে হিসাব করল, এত-দিনে এম এ পাশ করবার কথা। কৃষ্ণধামে আশি টাকার দিদিই শুধু ম্যাট্রিক পাশ, ষাট টাকার দিদির বড় মেয়ে সুস্মিতা আই এ, ফেল, আর কার পেটে কত বিদ্যে, মণিমালার জানা আছে।

বিয়ে অবশ্য বাবা-মা ওর ভাল হবে বলেই দিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ তখন এমন ছিল না। ফিটফাট, ছিপছিপে চেহারা, বইয়ে যাকে বলে তরুণ। বি এ পাশ, কী একটা কোম্পানির সেলস অর্গানাইজার ছিল গৌরাঙ্গ।

সেই চাকরি এক কথায় একদিন গৌরাঙ্গ ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির মত উপার্জনের জীবন তার ভাল লাগে না, গৌরাঙ্গ এবার থিয়েটারে নামবে।

থিয়েটার? উজ্জ্বল দীপমালা, প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে মুগ্ধ সহস্র দর্শক, নয়নমোহন দৃশ্যপট, মঞ্চ, সেখানে তার স্বামী, তারই, ঘনঘন হাততালি, মণিমালা রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

একদিন পাশ পেয়ে মণিমালা থিয়েটার দেখতেও গিয়েছিল। বসে ছিল অনেকক্ষণ ধরে, যা কল্পনা করেছিল তা-ই। দৃশ্যের পর দৃশ্য, অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা, দীর্ঘ বক্তৃতা—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—মুহুর্মুহু হাত-তালি, কিন্তু গৌরাঙ্গকে কোথাও দেখতে পেল না।

পরদিন দেখা হতে জিজ্ঞাসা করল। গৌরাঙ্গ বললে, ছিলুম তো। তবে আমার ছোট্ট পার্ট, ভিড়ের সীনে। তুমি দেখতে পাওনি?

মণিমালা দমে গেল। ওকে অভয় দিয়ে গৌরাঙ্গ বললে, পরের বইটাতে আমাকে বড় পার্ট দেবে, সুজিত বাবু বলেছেন।

মাস কাবার হল। মণিমালা রোজই আশায় থাকত, আজ গৌরাঙ্গ মাইনে পাবে। সাতদিন কেটে গেল, গয়লা, কয়লা, মুদী, বাড়িওয়ালা বারবার তাগাদা দিয়ে ফিরে গেল। রেশনের দিন গত্যন্তর না দেখে মণিমালাকে মুখ ফুটে চাইতে হল।

—মাইনে পাওনি—

সিগারেটে পরিপূর্ণ টান দিয়ে গৌরাঙ্গ বললে, মাইনে, কীসের মাইনে?

মণিমালা হাসবে কি কাঁদবে ঠিক পেল না।—বাঃরে, তুমি থিয়েটারে চাকরি করছ না?

ধোঁয়ার চক্র রচনা করতে করতে গৌরাঙ্গ বললে, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। আরে, নতুন চাকরি, তিন মাস তো এখন প্রবেশন। প্রবেশন বোঝ? বোঝ না। এ তিন মাস সুজিত মল্লিক আমাকে শুধু যাওয়া-আসা আর পান-সিগারেটের খরচা দেবে।

আঁচলে একটা আধুলি বাঁধা ছিল, গিঁট খুলে মণিমালা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল

রোজ পাঁচটা সিগারেট বরাদ্দ, কিন্তু কাল পুরো এক প্যাকেট হাতিয়েছি বাওয়া।

ক্রমে ক্রমে আসল রহস্য জানতে মণি-মালার বাকি রইল না। চাকরি গৌরাঙ্গ ছাড়েনি, চাকরিই ছেড়ে গেছে তাকে। বড়-লোকের ছেলে সুজিত মল্লিক, কলেজ আমলের মুখচেনা, তাকে ধরে গৌরাঙ্গ থিয়েটারে ভিড়েছে। পার্ট এখনও পায়নি, হয়ত কোনদিন পাবে। মাইনে-পত্তর ঠিক অবশ্যই হবে, তার আগে সাত মণ তেল তো পুড়ুক।

কিন্তু সে-থিয়েটারে গৌরাঙ্গ টিঁকে থাকতে পারল না। সুজিত মল্লিকের সঙ্গে সামান্য কারণে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিল।

মণিমালা, তখন তার নাকছাবি গেছে, বলল, এবার?

মুচকি হেসে গৌরাঙ্গ বললে, সে-ব্যবস্থাও কি করিনি ভেবেছ।

গৌরাঙ্গ এবার গেল রঙ্গনিকেতনে। মাস পুরো হবার আগেই মণিমালার হাতে ষাট টাকা দিয়ে বলল, দেখলে?

আগেকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল চল্লিশ, মণিমালারা চলে এল কৃষ্ণধামে; ঘরভাড়া পনেরো টাকা, যা-হোক কোনক্রমে চলে যাবে।

তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি সে-চাকরিও গৌরাঙ্গর গেল। কেন গেল, প্রথমে মণি-মালার কাছে ভাঙেনি। বলেছিল, এ-লাইন হল রোলিং স্টোনের, যত গড়াবে, যত থিয়েটার বদলাবে, তত নাম, তত যশ, তত টাকা।

তারপর একদিন গৌরাঙ্গর মুখেই মণি-মালা, তখন কানের দুল দুটি গেছে পোদ্দারের ঘরে, চাকরি যাবার রহস্যটা শুনতে পেল। গৌরাঙ্গ সেদিন ঈষৎ মত্ত

হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। নেশার ঝোঁকে পা দু'টি জড়িয়ে ধরল মণিমালার, হাউ-মাউ করে কেঁদে বলল, অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

কী অন্যায়, না সাজঘরে ময়নামতীর হাত ধরে টেনেছিল। অ্যাকট্রেসের হাত ধরে টানায় থিয়েটারী নীতিশাস্ত্রের কোথাও মানা নেই, তবে নাকি ময়নামতী অ্যাকট্রেসদের মধ্যে প্রধানা, খোদ ডিরেকটরের স্নেহ-নজর তার ওপরে, উদ্বাহু বামন গৌরাঙ্গকে তিনি অর্ধচন্দ্র দিয়ে দূর করলেন, নেহাৎ দয়া-পরবশ হয়ে পুলিশে দিলেন না।

কাঠ হয়ে মণিমালা শুনছিল, মুখের সবটুকু রক্ত শুষে গেছে। গৌরাঙ্গর জবানবন্দি শেষ হতে একবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে এল আড়ি পেতে কেউ শুনেছে কিনা।

অনেকদিন গৌরাঙ্গর কোন কাজ জুটল না। সারা সকাল গোঁফ আর জুলপির কেয়ারি করে কাটাল, সারা দুপুর মেজেয় গড়িয়ে গড়িয়ে তৈরি করল খাসা একটি ভুঁড়ি। শুধু সন্ধের দিকে বেরুত কাজের খোঁজে।

অনেক রাত অবধি মণিমালা, তখন গলার হার গেছে, কোলে টুটুল, আশায় আশায় জেগে থেকেছে। গৌরাঙ্গ ফিরলে জিজ্ঞাসা করেছে, হল কিছু?

গৌরাঙ্গ বলেছে, ফুঃ। বাজার বড় টাইট। থিয়েটারের পর থিয়েটার পট-পট উঠে যাচ্ছে, শালারা স্টেজ ভাড়া দিয়েই কুল পাচ্ছে না, অ্যাক্টরদের দেবে কী। নটকেশরীর নিজেরই এ-সীজনে কোন কনট্রাক্ট নেই, চুপ-চাপ বসে আছেন, দাড়ি কামানর আয়না সমুখে রেখে একলাই অ্যাক্ট করে যাচ্ছেন।— সেই সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশটা।

তিক্ত গলায় মণিমালা বলেছে, তুমি না লেখাপড়া শিখেছিলে? থিয়েটারের আশা ছেড়ে দাও, অন্য কাজ দেখ। যা-হোক একটা ভদ্রলোকের চাকরি—

হাতের গ্রাস পাতে রেখে গৌরাঙ্গ চেঁচিয়ে উঠেছে, থিয়েটারের কাজ ভদ্রলোকের নয়? আমরাই হলুম আসল ভদ্রলোক, অ্যাক্টর, আর্টিস্ট। মাস্টার-পেশকার, দোকানদার নই।'

ছ'মাস ভাড়া বাকি পড়ল, বাড়িওয়ালার দরোয়ান লাঠি ঠুকে আস্ফালন করে গেল ওদের দরজায়। মণিমালা, ততদিনে তার মণিবন্ধও খালি, কোনমতে তাকে ঠেকিয়ে ঘরে ফিরে এল।

গৌরাঙ্গ তখন পোষা, পেয়ারের টিয়াটাকে ছোলা-ছাতু দিচ্ছে। ফিস ফিস করে বলল, চলে গেছে?

—গেছে। খালি হাত দু'টি নাড়িয়ে মণিমালা বলল, কিন্তু এবার? আমার চুড়ি ক'গাছিও গেছে যে।

খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, তা যাক। তেলে-জলে মানুষ, সিঁদুরে মেয়ায় সতী। তা তো তোমার কেউ কেড়ে নিতে পারছে না?

—কিন্তু কাল সকালে কোর্টের লোক এনে পথে বের করে দেবে যে।

—দেবে না। চোখ বুজে হাতে বরাভয় মুদ্রা করে গৌরাঙ্গ বলল, দেবে না। তার আগেই আমরা পালিয়ে যাব।

—পালিয়ে যাব?

—পালিয়ে যাব। দৃঢ়স্বরে গৌরাঙ্গ বললে।—আমি ঘর ঠিকও করে এসেছি। বেশি দূর নয়, এই মোড়টা ছাড়িয়ে দু'পা মোটে।

দূরে নয়, তবু দূরে। কত দূর, আজ এই খোলার চালের নীচে ছত্রখান হাঁড়ি-কুড়ির মধ্যে বসে টের পাচ্ছে কৃষ্ণধামের পনেরো টাকার বৌ। ঝুপ ঝাপ, ঝুপ ঝাপ, ইঁদুরগুলোর জলকেলি এখনও শেষ হয়নি, ভরসা পেয়ে আরশোলার ঝাঁক চৌকাটের নীচের গর্ত থেকে উঠে এসেছে, অধ-অন্ধকার দেয়ালের কোণে বিনিদ্র একটা মাকড়সা তখন থেকে জাল বুনে চলেছে। ওদিক ঝাঁপবন্ধ ঘরের ভিতর থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে একটি মেয়ের একটানা একঘেয়ে বকানি।

চুপে চুপে চলে এসেছে ওরা। ষাট টাকার দিদির ঘরে পানের বাটা ঘিরে তখন মহিলা মজলিশ, বিজলীপাখাশীতল তেতলার ঘরে আশি টাকার প্রফেসর দিদির চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু, ঠেলগাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বেরিয়ে পড়েছে গৌরাঙ্গ, একটু পরে টুটুলকে কোলে নিয়ে মণিমালা।

কেউ টের পায়নি।

ঘুম ভেঙে উঠে মণিমালা দেখল, গৌরাঙ্গ এরই মধ্যে কখন উঠে টিয়া পাখিকে ছোলা-জল খাওয়াতে বাইরে নিয়ে গেছে। প্রতিবেশী দু'একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যে ভাবও জমে গেছে তার। আড়াল থেকেই মণিমালা শুনল, দস্তুরমত বক্তৃতা করে গৌরাঙ্গ কাকে যেন কী বোঝাচ্ছে।

কবাট একটু ফাঁক করে মণিমালা উঁকি দিল। শ্রোতাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী, মোটা লোক, হাফপ্যান্ট পরে দাঁতন করছে। কাল সন্ধ্যায় বেসুরো গলায় যারা গান ধরেছিল, এই লোকটাই হয়ত তার একজন। আরেকটা লোক—রোগা সিড়িঙ্গে, ওর মুখের রগগুলো এখান থেকে দেখা যায়, গোনা যায় বুকের হাড় ক'খানা—উঠোনে উবু হয়ে বসেছে। গৌরাঙ্গ যা বলছে তাতেই ঘাড় নেড়ে বলছে, ঠিক ঠিক।

মণিমালা কবাটটা বন্ধ করে দিল।

গৌরাঙ্গ ফিরে এলে বলল, ওই লোকগুলোর সঙ্গে তুমি কী এত কথা বলছিলে।

থতমত খেয়ে গৌরাঙ্গ বলল, কেন, কী হল।

ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে রুদ্ধস্বরে মণিমালা বলল, নির্লজ্জ, বেহায়া। সব তো খুইয়েছ, সামান্য সম্মানটুকু তাও তুমি রাখলে না। যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে গলাগলি—

ভুরু কুঁচকে গৌরাঙ্গ বলল, ওরা ছোটলোক কিসে।

—নয়? বস্তিতে থাকে—

গৌরাঙ্গ এবার হো-হো করে হেসে উঠল।—অজগুবী যত ধারণা তোমার। ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ কী বলত?

—নেই?

একটু ভেবে গৌরাঙ্গ বলল, আছে। ওরা বিড়ি টানে আর আমি একটা শস্তা সিগারেটই বারবার নিবিয়ে নিবিয়ে খাই।

—আর কিছু না?

—আর কিচ্ছু না। মণিমালার কানের কাছে মুখ নামিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, ওরা কে জান। ওদের একজন বালতির কারখানার হেডমিস্ত্রী, আরেকজন বাজনা মেরামতের দোকানের কারিগর। ওরা আর্টিজান, আমি আর্টিস্ট।

মণিমালার জবাবের অপেক্ষা করে গৌরাঙ্গ বলল, দাও দেখি কিছু পয়সা, বাজারটা ঘুরে আসি। আমাকে আবার বেরুতে হবে।

মণিমালা তবু প্রশ্ন করল না দেখে গৌরাঙ্গ নিজেই বলল, একটা টিপস্ পেয়েছি। এবার আর থিয়েটার-টিয়েটার নয়, ফিল্ম। কাল এক জায়গায় কথা বলে এসেছি। প্রথমে অবিশ্যি কিছুদিন এক্সট্রা থাকতে হবে, তাই বা মন্দ কী। ফ্রী ট্রান্সপোর্ট, ক্যাশ ডাউন। তোমাকে একদিন সুটিং দেখিয়ে আনব। কই, বাজারের পয়সা দাও?

আঁচলে একটা আধুলি বাঁধা ছিল, গিঁট খুলে মণিমালা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

গৌরাঙ্গ বাজারে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটি বৌ। রঙ ময়লা, নিরাভরণ হাত দুটি লিকলিকে, কপালে বড় করে টানা সিঁদুরের টিপ। গায়ে একটা সেমিজ পর্যন্ত নেই, আধময়লা শাড়ির নীচে সরু সরু দুটি পা হাঁটু অবধি দেখা যায়, পায়ের ফাটা-ফাটা দুটি পাতায় কতকাল আগে পরা মুছে-আসা আলতার দাগ।

বৌটি বলল, বসব?

মণিমালা হাঁ-না কিছু বলল না। একে আপনি বলবে, না তুমি, ঠিক করতেই কয়েক পল কাটল। শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলল, তুমি বুঝি এখানেই থাক।

বৌটি বলল, এই তো, পাশের ঘরেই।

আমাদের উনি আজ আপনার কর্তার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনারা আগে কৃষ্ণধামে থাকতেন, না?

মণিমালা বলল, হুঁ।

বৌটি হঠাৎ বলল, আপনার বরটি বেশ ভাই। শুনলুম ভাল পাট করেন। আমাদের ওনাকে পাশ দেবেন। আমার তৈরী চা নিজে সেধে নিয়ে খেলেন।

মণিমালা হঠাৎ বলল, আচ্ছা কাল রাত্তিরে কাঁদছিল কে। অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে ককিয়ে।

বৌটি মণিমালার কাছ ঘেঁষে এল, ফিস্ ফিস্ করে বলল, আপনি শুনেছেন? সে দিদি এক কেলেঙ্কারি। ওদিককার ঘরে ষণ্ডাগোছের একটা হিন্দুস্থানী থাকে, সে মাসখানেক হল একটা মেয়েকে এনে লুকিয়ে রেখেছে।

মণিমালার হাত-পা ভীরু কচ্ছপের মুখের মত ভিতরে সেঁধে গেল। —লুকিয়ে রেখেছে। লোকে পুলিশে খবর দেয় না?

—সাহস পায় না। লোকটা শুনি এ পাড়ার গুণ্ডাদের সর্দার। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে, বেরিয়ে যাবার সময় তালাচাবি এঁটে দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কী মারটা যে মারে, দিদি মেয়েটার প্রাণফাটা চিৎকার শুনলে আপনার চোখে জল এসে যেত।

চোখে জল এসেছিল মণিমালার, ভয়ে। কোনমতে দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে সামলে নিলে। ঠিক তখুনি টুটুল ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠল, মণিমালা যেন বাঁচল, ছুটে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বৌটি বলল, খোকার বুঝি খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে দেননি কিছু?

—ও-বাড়ি রোজ দুধ ঠিক করা ছিল, গয়লাকে তো ঠিকানা দিয়ে আসা হয়নি।

—গয়লা? কৃষ্ণধামে যে গয়লা দুধ দেয় দিদি?

মণিমালা মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

উজ্জ্বল চোখে বৌটি বলল, সে তো এখানেই থাকে, এই চারখানা ঘর পরেই, আপনি জানেন না বুঝি? ডেকে আনি?

—না!

হঠাৎ সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মণিমালা, বৌটি ভয়ে বিস্ময়ে তিন পা পিছিয়ে গেল। টুটুল চমকে উঠে আরও বিকট গলায় কেঁদে উঠল, মণিমালা নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরল বুকে। বুকে কিছু নেই, টুটুল আরও চেঁচাবে, চেঁচাক, কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাক। তবু যে-গয়লা তাকে সেলাম করত, মাইজী বলত, প্রাণ গেলেও মণিমালা তাকে জানতে দেবে না, ও-বাড়ির পনেরো টাকার বৌ তারই সঙ্গে এক বস্তিতে বাসা নিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বৌটি বলল, এবারে যাই দিদি। দুপুরে আবার আসব।

—এস। মণিমালা যান্ত্রিক অভ্যাসে বলল, কিন্তু হাসল মনে মনে। দুপুরে এসে বৌটি তাকে এ-ঘরে খুঁজে পাবে না। আজ দুপুরে কেন, কোন দুপুরেই না। কোথায় যাবে, মণিমালা ঠিক করে ফেলেছে।

রোজ দুপুরে ষাট টাকার দিদি মেঝেয় দু' পা ছড়িয়ে বসেন। পানের বাটা সামনে, জাঁতি হাতে কুচি-কুচি করে শুপুরি কাটেন, খয়ের, জায়ফল, এলাচ, অন্যান্য মসলা সামনেই সাজান থাকে।

প্রথমে আসে চল্লিশ টাকার বৌ। ষাট টাকার গিন্নী হেসে বলেন, এস, এস। কর্তা বুঝি এই বেরুল?

চল্লিশ টাকার বৌ একেবারে গিন্নীর কোল ঘেঁষে বসে, পোষা বেড়ালের মত। বলে, দিন দিদি, আমি শুপুরি কুচোই।

গিন্নী বলেন, থাক, থাক, তোমার হাত কেটে যাবে। সেদিন মাছ কুটতে গিয়ে আমাদের ওপরের ওনার কী হয়েছিল, জান না? বলে মুখ টিপে হাসেন।

ভাল মানুষের মত চল্লিশ টাকার বৌ বলে, মাছ তো ওর দেওর কেটে দেয় শুনেছি।

ফিক্ করে হেসে গিন্নী বলেন, তবে আর বলছি কেন। সেদিন কী হয়েছিল জান না বুঝি?

ততক্ষণে নীচে থেকে পঁচিশ টাকার বৌ এসে জুটেছে, সাইনবোর্ড পেন্টারের ঘরনী, তার পিছনে দোতলার তিরিশ টাকার বৌ, সাবিত্রী স্টোর্সের দু' আনা মালিক স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে এই মাত্র ছুটি পেল। গিন্নীর মেয়েরাও আছে, তবে একটু দূরে, একজন ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত, একজন তার নখ নিয়ে।

ষাট টাকার গিন্নী সবাইকেই সহাস্যে ডাকেন, এস বৌ, ব'স। তিরিশ টাকার বৌকে গিন্নী বলেন, কেমন যেন রোগা-রোগা দেখছি, আবার বুঝি——?

বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করেন না, শ্রোতারা ঠিক বুঝে নেয়। তিরিশ টাকার বৌ লাল হয়ে দু' হাতে মুখ ঢাকে। —কী যে বলেন দিদি।

দিদি বলেন, আহা লজ্জা কী। আমরা তো আপ-টু-ডেট নই, তেমন বিদ্বান সোয়ামীর হাতে পড়িনি, ওষুধ-বিসুধ কত কি আছে, খেতে প্রবৃত্তিও হয় না।

ইঙ্গিতটার লক্ষ্য তিনতলার প্রফেসারের বৌ। শ্রোতাদের একজন চাপা গলায় বললে, খায় বুঝি।

আরেকজন বললে, বিদ্বান সোয়ামী, কিন্তু তাকে কেয়ার করছে কত। সেদিন ছাতে কাপড় শুকোতে গেছলুম, জিভ কেটে শেষ পর্যন্ত পালাতে পথ পাই না।

পানের বাটা ঘিরে কৌতূহলী চক্র আরও ছোট হয়, উৎসুক কয়েকটি কান পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে আসে।

হঠাৎ কখন দীর্ঘ একটি ছায়া পড়ে ঘরের মেঝেয়, দরজার পাশে আধ-ময়লা শাড়ি-ঘেরা দুটি পা, নিরাভরণ শঙ্খসম্বল কৃশ-কুণ্ঠিত দুটি হাত চৌকাট ধরে আছে, কেউ লক্ষ্যও করে না।

—কী দেখেছিলে, ভাই, কী দেখেছিলে। আন্দাজে ধরে নিয়েছে সবাই, তবু স্বকর্ণে শুনে আশ মেটাতে চায়।

বক্তার কণ্ঠ আরও নীচে নেমে যায়, তবু শুনতে পায় সকলে, চোখে চোখে চটুল ইঙ্গিতে একটি কলঙ্ক-কাহিনী ভাষা পায়।

ষাট টাকার দিদি বলছিলেন, স্বামী অমন ব্যোম ভোলানাথ, তাই এমন সাহস পায়, পড়ত আমাদের ওনার মত কারুর হাতে, লাথি মেরে রাস্তায় কবে দূর করে দিত।

হঠাৎ চল্লিশ টাকার বৌ ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলে, চুপ, চুপ। কে যেন দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে না?

চৌকাটে হাত রেখে দাঁড়ান শীর্ণকুণ্ঠিত ছায়ামূর্তিটির দিকে এতক্ষণে সকলের নজর পড়ে। ও কে? সেদিন দুপুরে ভাড়া না দিয়ে চুপে চুপে যারা সরে পড়েছে, সেই পনেরো টাকার বৌ, না?

অপ্রসন্ন মুখে বড় গিন্নী বলেন, বস।

পাটিতে বসতে ভরসা পায় না। সঙ্কুচিত মণিমালা শানের ওপরই বসে। লজ্জিত, ত্রস্ত, কম্পিত স্বরে বলে, দেখা করতে এলুম।

অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না, ষাট টাকার গিন্নীর হাতে জাঁতি দ্রুত চলে, রেকাবে শুপুরি কুচিয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে তিরিশ টাকার বৌ পুরনো কথার জের টেনে বলে, আমার তো মনে হয় ওর স্বামী কিছু এখনও টের পায়নি। পেলে, হাজার হোক, পুরুষ মানুষ, কিছুতেই—

চোখের ইসারায় বড় গিন্নী ওকে চুপ করতে বলেন। সেই অন্তরঙ্গ নিয়ে রচিত আসরটুকু এখন আর নেই, জাতিচ্যুত একটা মেয়ে যেচে ভাব পাতাতে এসেছে, কে জানে ওর মনে কী আছে, হয়ত স্পাই, হয়ত এক-খানা কথা সাতখানা করে ওপরে গিয়ে লাগাবে।

চল্লিশ টাকার বৌয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, চুড়ি কি ভেঙে তৈরি করলে বৌ, না নতুন গড়িয়েছ।

অপ্রতিভ চল্লিশ টাকার বৌ হাতখানা টেনে নেয়। —ভেঙেই গড়ালুম দিদি, নতুন কোথায় পাব, যা বাজার পড়েছে। মজুরী ছাড়া এক ভরি বেশি লেগেছে, তাতেই উনি খচখচ করছিলেন। আপনার হারটা তো নতুন, দিদি?

বুকের কাপড় টানতে গিয়ে ষাট টাকার দিদি আরও সরিয়ে দেন, হারটা যাতে

সকলের স্পষ্ট নজরে পড়ে। —নতুনই করলুম ভাই, আমি তো ভেঙে গড়াতেই চেয়েছিলুম, উনি দিলেন না। বলেন, ওতে শুধু সোনা নষ্ট। পুরনোটা হালকা, যেমন আছে, তোলা থাক, মেয়েদের বিয়েয় তো লাগবে।

এর পরে তিরিশ টাকার বৌয়ের দুল, আর পঁচিশ টাকার বৌয়ের আংটি নিয়ে কিছু আলোচনা না করলে ভাল দেখায় না। ষাট টাকার গিন্নী সমদর্শী, কাউকেই নিরাশ করেন না। সবচেয়ে শেষে তাঁর নজর পড়ে তার দিকে, পাটির ধার ঘেঁষে সন্তর্পণে শানের ওপর যে বসেছে।

অনুকম্পিত কণ্ঠে বলেন, তোমার হাত দুটি একেবারে খালি বৌ? সধবা মানুষ, একেবারে শাদা হাত ভাল দেখায় না। আর কিছু না হোক, দু'গাছি কেমিক্যাল চুড়ি তো গড়িয়ে নিতে পার।

হাত দু'খানি তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে টেনে নেয় মণিমালা, লজ্জায় অপমানে চোখের তারা দুটি জ্বলতে থাকে।

সেই আগুন বিনিদ্র রাত্রে জল হয়ে পল্লব, কপোল, কণ্ঠ ভিজিয়ে নামে। কিসে ছোট সে ওদের চেয়ে, লেখাপড়ায়, রূপে, গুণে—কিসে। শুধু অক্ষম, অবিবেচক একটা অমানুষের হাতে পড়েই চিরকাল তাকে আঁচল ভরে করুণা আর উপেক্ষা কুড়িয়ে যেতে হবে? ড্রেনের কাদায় ছপ ছপ করে লাফিয়ে পড়ছে ইঁদুর, নিঃশব্দ পায়ে আরশোলা ঘরময় ঘোরাঘুরি করছে, অসতর্ক একটা পতঙ্গ মাকড়সার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল, ও-পাশের তালাচাবি বন্ধ ঘরে বন্দী মেয়েটি সমানে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে। নিশ্চিন্ত, সুখসুপ্ত একটি পুরুষের পাশে শুয়ে শুয়ে হতমান, কিন্তু তেজী একটি মেয়ের সর্বাঙ্গ ক্ষোভে, ঘৃণায় কঠিন হয়ে উঠল।

তেতলার আশি টাকার ঘরেও অভ্যর্থনার বিশেষ রকমফের হয় না। ভেজান দরজা ঠেলে মণিমালা দেখল, খুড়তুতো দেওরের সঙ্গে ক্যারম খেলছে প্রফেসরের বৌ। ওকে দেখে বিশেষ প্রীত হল না, তবু খুশি-খুশি মুখে বলল, আসুন, ভাই। নীচের ঘরে খুব জমেছে বুঝি।

মণিমালা বললে, ওখানে যাইনি তো।

আশি টাকার দিদি বলেন, ষাট টাকার গিন্নী মোসায়েব জুটিয়েছেন ভাল। দোকানদার আর সাইন বোর্ডওয়ালার বৌদের সঙ্গে কী যে এত গুজগুজ ফুসফুস, বুঝিনে। একটা ভাল কথা নেই, দিনরাত শুধু পরচর্চা।

আশি টাকার দিদি নিজেও কিছু ভাগবত আলোচনা করেন না, গলা নামিয়ে বলেন, এর চেয়ে উনি নিজের মেয়েদের ওপর নজর রাখলে ভাল করতেন।

অতিশয় উৎসুক গলায় মণিমালা বলল, কী করেছে মেয়েরা?

প্রফেসর-গিন্নি হাই তুলে বললেন, কী করতে বাকি রেখেছে তাই বল। সেবারে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে এক্সকার্সনের নাম করে সুস্মিতা তিন রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এল না? কোথায় ছিল, কে ছিল সঙ্গে?

আশি টাকার দিদি কানে কানে একটা নাম বললেন। মণিমালা রুদ্ধ আগ্রহে বলল, সত্যি?

—ঠাকুরপো দেখেছে যে। সেও যে সেবারে ওখানেই এক ফুটবল টীমের হয়ে খেলতে গিয়েছিল। সব নিজ চক্ষে দেখে এসেছে।

টেবিলে ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধার গুচ্ছ থেকে একটি তুলে মণিমালা ঘ্রাণ নিল। কী সুন্দর ঝকঝকে সাজান আপনার ঘরখানা দিদি। ফুলের শখ কার, আপনার কর্তার?

আমার কর্তার ফুলের শখ? হেসে উঠল প্রফেসর বৌ। উনি একখানা ঘর বইয়ে ঠেসে রেখেছেন, পারলে এ ঘরটাও বোঝাই করে ফেলেন, আমি শুধু ঠেকিয়ে রেখেছি। ফুল নিয়ে আসে ঠাকুরপো, যুঁই, বেল, কেয়া। ছাতে কত টব লাগিয়েছে দেখেননি? এ ঘরে যা কিছু আছে সব ওর পছন্দ। এই যে বুদ্ধমূর্তি এটা তিব্বতীদের কাছ থেকে কিনেছে চল্লিশ টাকা দিয়ে।

চোখে জলের ঝাপটা দিতে আশি টাকার দিদি কলঘরে গেলেন, মণিমালা ঘুরে ঘুরে সাজান ঘরখানা দেখতে লাগল। ফুলদানি, চুলের কাঁটা, হাতি-দাঁতের চিরুনি, ফ্রেমে বাঁধানো ফটো, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার স্বচ্ছ মসৃণ কাচ। ছুঁয়েও সুখ।

আশি টাকার দিদি কলঘর থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়েছিলেন, পিছন থেকে দেওর ডাকল, বৌদি শোন।

আড়ালে যেতেই দেওর রুষ্ট কিন্তু চাপা গলায় বলল, ওই মেয়েমানুষটাকে একলা ঘরে রেখে তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে? কী আক্কেল তোমার। এ ঘরে আমার কত শখের জিনিস—

—কী বলছ, এত ছোট প্রবৃত্তি কি ওর হবে।

—বিশ্বাস কী। নির্দয়, কটুকণ্ঠে দেওর বলল, ভাড়া ফাঁকি দিয়ে বস্তিতে গিয়ে জুটেছে, ওদের অসাধ্য কিছু নেই।

ঘরে ফিরে এসে কিছুক্ষণ উসখুস করল আশি টাকার দিদি। ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না ভাই, ঠাকুরপো সিনেমায় যেতে বলছে। খুব ভাল কী একটা ছবি এসেছে, ম্যাটিনি-শো, টিকিট কেনাই আছে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে মণিমালা নীচে নেমে এল। দুঃসহ গ্রীষ্মে পীচ গলে কাদা হয়েছে, নাহয় চোখ দুটো ঝলসেই গেল, কিন্তু হাঁটু দুটো ঠকঠক কাঁপে কেন।

পানে চুন দিতে কেবলি ভুল হয়ে যাচ্ছে, শুপুরি কুচোতে গিয়ে জাঁতিটা বারবার ঠেকে যাচ্ছে আঙুলে, ষাট টাকার দিদি আজ এত উত্তেজিত।

—বলো কি চল্লিশ টাকার বৌ, প্রফেসর একেবারে লম্বা ছুটি নিয়ে দেশান্তরী হল, দেওরটা গেল মেসে?

—তাই তো শুনলুম, দিদি।

—আর বৌটা? ষাট টাকার দিদি উৎসুক, উত্তেজিত, তবু একটি প্রচ্ছন্ন সুখ উপচে পড়ছে তাঁর গালের টোলে, চিবুকের তৃতীয়, অতিরিক্ত ভাঁজে।

সৌরমণ্ডলীর আজও তিনি মধ্যমণি, গ্রহ-উপগ্রহ আজও তাঁকে ঘিরে ঘন হয়ে বসেছে।

—আর বৌটা?

—সে বুঝি গেল বাপের বাড়ি।

তিরিশ টাকার বৌ ভাল মানুষী গলায় বললে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে দিদি।

পঁচিশ টাকার বৌ বললে, মেনিমুখো স্বামীকে বলিহারি যাই। নিজে পালিয়ে গেল, বৌটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে পারল না?

শুপুরি কাটা বন্ধ রেখে ষাট টাকার গিন্নী বললেন, পাখির বাসা ভাঙল তা হলে, দেমাকের ডিম ফাটল। কিন্তু আমি ভাবি, হাওয়াটা দিলে কে।

অনাহূত কুণ্ঠিত একটি ছায়ামূর্তি আজও চৌকাট ধরে দাঁড়িয়েছে, তাকে কেউ দেখেনি। চল্লিশ টাকার বৌ বললে, হাওয়া?

—মানে কথাটা কেউ প্রফেসরের কানে তুলেছে নিশ্চয়, নইলে বোম-ভোলানাথ টের পেল কি করে।

ঘরের ওপাশ থেকে বড় মেয়ে সুস্মিতা বলে উঠল, ঠিক বলেছ মা। ওথেলো নাটকেও—

ধমক দিয়ে ষাট টাকার গিন্নী বলেন,

তুই চুপ কর। বড়দের কথায় আসিস কেন। ভক্তমণ্ডলীর দিকে চেয়ে বললেন, ফুলের টবগুলো এবারে ছাগলে মুড়োবে। কত শখ, কত অহংকার, সব ফুরুৎ হল তো। আগে খবর পেলে চেয়ার খাটগুলো কিনে রাখতুম।

ডবল পানের এক খিলি গালে তুলে দিলেন ষাট টাকার গিন্নী, প্রসন্ন হাসি বিকিরণ করে বললেন, যাক, ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। ওপরের ঘর ক'খানা খালি হয়ে আমার ভালই হল। আসছে মাসে সুস্মিতার বিয়ে, অনেক আত্মীয় কুটুম আসবে, কোথায় জায়গা দেব ঠিক করতে পারছিলুম না, এবারে বাড়িওয়ালাকে বলে একটা বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।

—সব ঠিক হয়ে গেছে, দিদি?

ম্যাগাজিনের পাতা খুলে অন্যমনস্ক হবার ভান করেছে সুস্মিতা, সেদিকে স্নেহ-কটাক্ষ হেনে বড় গিন্নী বললেন, এক রকম সব। দানসামগ্রী, গহনার লিস্টি পর্যন্ত। বিলেত ফেরৎ ছেলে, নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করেছে, পণ বলে কিছু নেবে না তো। তা আমি অন্যদিকে দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছি। আসছে রবিবার ত্রয়োদশী, সেদিন পাকা দেখা, তারপর দু'হাত এক হলে আমি নিশ্চিন্তি। মেয়ের আমার কপাল ভাল, গোয়াবাগানের মিত্তির, নাম শোনোনি?

কবাটের আড়াল থেকে একটি ছায়া-মূর্তি নিঃশব্দে সরে গেল, ষাট টাকার গিন্নী চমকে উঠে বলে উঠলেন, কে? কে গেল?

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে আধময়লা, ছায়াছায়া একটা শাড়ি, চল্লিশ টাকার বৌ উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে ছিন্ন গুণ্ঠনের ফাঁকে রুক্ষ, পাটল বর্ণ একটি আলগা খোঁপার আভাস দেখতে পেল শুধু। ফিরে এসে বলল, বোধ হয় পনেরো টাকার বৌ।

—সেই যারা বস্তিতে পালিয়ে গেছে? কেউ ডাকে না, কেউ চায় না, রোজ রোজ ও আসে কেন।

পানের বাটা থেকে হাত গুটিয়ে গিন্নী বললেন, কী জানি, আমার ভাল ঠেকছে না। বুক ধড়ফড় করছে। সুস্মিতা, এক গ্লাস জল দে দেখি।

বিকেল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি সন্ধ্যাকে আরও তাড়াতাড়ি ডেকে এনেছে। গলির মোড়ে গ্যাসের বাতি নিবু-নিবু, ভিতরের [illegible] মোটা দুটি কণ্ঠের সঙ্গে ক্যানেস্তারার সঙ্গত; ড্রেনের ফাঁক দিয়ে ক'টা ইঁদুর কুতকুতে চোখে চেয়ে আছে। বন্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে শোনা যাচ্ছে একটি বন্দী মেয়ের ক্লান্ত কান্না।

থাক, সেদিকে দৃষ্টি নেই মণিমালার, বুকের নীচে বালিশ টেনে উপুর হয়ে শুয়ে সে চিঠি লিখছে। নরম, নিভাঁজ, শাদা কাগজ, দোয়াতে একবার কলম ডোবায় মণিমালা, এক এক লাইন লেখে, গোটা গোটা হস্তাক্ষর, ফিরে ফিরে পড়ে। ঘরের কোণে তোরঙ্গের ওপর স্তূপ করা ভিজে কাঁথা, ছেঁড়া তোষক আর ময়লা চাদর, কলঙ্কিত চিমনির নিষ্প্রভ আলো, সবটা ভাল দেখা যায় না।

সেই আধ-অন্ধকারে সাপের মণির মত জ্বলছে একটি মেয়ের চোখ, যার স্বামী উপার্জন করে না, থিয়েটারের মেয়ের হাত ধরে টানতে বাধে না যার রুচিতে, ভাড়া বাকি ফেলে বৌকে সে এনে তুলেছে বস্তিতে।

কবাটে টোকা পড়ল, মণিমালা বালিশের নীচে কাগজটা ফেলল লুকিয়ে। চকিত কণ্ঠে বলল, কে।

আবার টোকা পড়ল। কম্পিত হাতে ছিটকিনি খুলে মণিমালা এক পাশে সরে দাঁড়াল। ঝড়ের মত অন্ধবেগে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে মণিমালার পলক পড়ল না।

ষাট টাকার দিদি কথা বাড়ালেন না, ওর হাত দুটি জড়িয়ে বললেন, 'আমার সর্বনাশ ক'র না পনেরো টাকার বৌ।' ত্রস্ত বেশ, ত্রস্ত কম্পিত কণ্ঠ।

শান্ত স্বরে মণিমালা বলল, স্থির হয়ে বসুন। বলুন তো কী হয়েছে।

দ্রুত-রুদ্ধ কণ্ঠে ষাট টাকার দিদি বললেন, আমি জানি সব। জানি, আশি টাকার বৌয়ের ঘর কে ভেঙেছে। তুমি শোধ নিয়েছ। কিন্তু সুস্মিতার সর্বনাশ তুমি ক'র না মা, আমাকে পথে বসিও না। আমি, আমি তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব।

বুকটা দ্রুত ওঠা-পড়া করছে ষাট টাকার গিন্নির, দরদর ঘাম ঝরছে। অনুনয় নত স্বরে বললেন, সুস্মিতাও এসেছে। আমরা মা-মেয়ে তোমার পা দুটি জড়িয়ে পড়ে থাকব যতক্ষণ না তুমি কথা দিচ্ছ।

মণিমালা চেয়ে দেখল, দরজার বাইরে আরেকটি ছায়া-শরীর সংকুচিত হয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। গাঢ় রঙ্গিন শাড়ি পরনে, কিন্তু সুস্মিতার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, বিস্ফারিত দৃষ্টি।

শূন্য চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মণিমালা, ফণার মত আধ-খসা ঘোমটা, মুখের রেখা ক'টি বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। আশি টাকার দিদির সুখনীড় ভাঙে, ষাট টাকার দিদিকে বস্তিতে টেনে আনে, তাঁর বিদুষী-রূপসী মেয়েকে লুটিয়ে দেয় পায়ের কাছে, এমন মরণকাঠি খুঁজে পেয়েছে সকলের ছোট, সকলের করুণার উঞ্ছজীবিনী পনেরো টাকার বৌ।

হঠাৎ নিষ্ঠুর শুষ্ক কণ্ঠে হেসে উঠল মণিমালা। এ-বাড়িতে পা রেখেই একবার হেসেছিল, তারপর এই প্রথম।

নব্যশিক্ষা ও বঙ্গসংস্কৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে নব্যশিক্ষার প্রকৃত দান প্রধানতঃ সভা-সমিতির ভিতর দিয়া সমাজদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবহিত হন। চিন্তা কর্মের দ্যোতক। নব্যশিক্ষিতেরা বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা, পাঠ, প্রবন্ধ-রচনা, আলোচনা ও বিতর্কাদির মারফত সেবাকার্যেও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। শিক্ষা-প্রসার এবং সমাজ-কল্যাণের ভিতর দিয়াই সেবাকার্য প্রথমতঃ সুরু হয়। তবে এসব বিষয়ের মূল প্রেরণা আসে উক্ত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইতে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করার প্রবৃত্তিও এই সময়ের আলোচনাদির ফল।

কলিকাতা বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন-কেন্দ্র হওয়ায়, শিক্ষা-সংস্কৃতিরও মূলাধার হইয়া দাঁড়ায়। এখান হইতে নব্য-শিক্ষা শিক্ষিত যুবজনের ঐকান্তিক সহায়তায় দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করে। কলিকাতায় ও ইহার আশেপাশে বহু সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা মুখ্যতঃ ধর্মানুশীলন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার সংস্কৃতির দিকও বিশেষ প্রবল ছিল। গত শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ইহার শাখা ঢাকা নগরীতে ও বঙ্গের অন্যত্র, এমনকি সুদূর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার আদর্শ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তত্ত্ব-বোধিনী সভা বা কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম-সভা অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। নিছক ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা, বিতর্ক যে-সব সভা-সমিতিতে হইত এবং তাহার ফলে যুবক সমাজ জাতীয় উন্নতি সাধনে প্রণোদিত হইতেন—গত শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে কলিকাতার তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এরূপ কয়েকটি সভা বা সঙ্ঘের বিষয়ে মাত্র এখানে যৎসামান্য বলিব। কেননা প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নাই। এই সকল সভা-সমিতির কোন কোনটি দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে এত কৃতিত্ব দেখায় যে, উহারা স্বতন্ত্র আকারে আলোচিত হওয়ারও যোগ্য। আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। ঐ সময়কার এই ধরনের প্রত্যেকটি সভার কথাও এখানে বলা সম্ভব হইবে না।

পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটি

এ সময়কার সভা-সমিতির কথা বলিতে গেলে প্রথমেই এই সভাটির নাম উল্লেখ করিতে হয়। সে যুগে সভা-সমিতির নামের বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল। কলিকাতার কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উচ্চশ্রেণীর যুব-ছাত্রগণ মিলিয়া ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর বড়বাজারে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল বহুতর বর্ধিষ্ণু ও খ্যাতনামা বাঙালী পরিবারের আবাসস্থল ছিল। ঐ অঞ্চলের রাস্তার নাম এখনও আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। শতাব্দী কালের মধ্যে ইহার রূপ কতখানি বদলাইয়া গিয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই অঞ্চলে জয়গোপাল সেনের ভবনে পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটির নিয়মিত অধিবেশন হইত। ইহার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের (১৮৫৩ ও ১৮৫৪) সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' পাইয়াছি। ইহা হইতে জানা যায়, সে সময় হিন্দু কলেজের অন্যতম বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্র কবিবর মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাক এই সভার সভাপতি ছিলেন। সভায় নিয়মিত শিক্ষা সাহিত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। সমাজে শিক্ষা প্রসারের উপায় সম্বন্ধেও যে আলোনা হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সভাপতি গৌরদাস ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবিশনে (৩১শে ডিসেম্বর ১৮৫৪) একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটি বয়সে বেথুন সোসাইটির অগ্রগামী হইলেও, শেষোক্ত সভার আদর্শেই ইহার পরিচালনা করা কর্তব্য। সম্বৎসর ধরিয়া সভায় যে-সব বিষয় আলোচিত হয় তাহাতে সভ্যগণ জ্ঞানাহরণে বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জ্ঞানাহরণে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আহরিত বিদ্যা যাহাতে সমাজ সেবায়ও নিয়োজিত করেন সে বিষয়ে তিনি আবেদন জানান। ষষ্ঠ বৎসরে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরাও আসিয়া সভায় যোগদান করেন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং প্রসারকল্পে এই সমাজের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য, এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য। হুগলী উত্তরপাড়ার জনহিতৈষী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এইরূপ একটি সভা বা সমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়া দেশী-বিদেশী প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ১৮৫০ সনের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার কয়েক মাস পরে, ডিসেম্বর মাসে। ১৮৫০, ১৪ই ডিসেম্বর দিবসীয় 'সত্যপ্রদীপ' সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করিয়া একটি বিবরণ প্রদান করেন। ইহার দুই সপ্তাহ পরে ২৮শে ডিসেম্বর উক্ত সাপ্তাহিকে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে'র একটি সংশোধিত ও বিস্তারিত অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয়। সভার উদ্যোক্তা ও প্রথম সভ্যদের মধ্যে মাত্র তিন জন বাঙালীর নাম পাই—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত। রাধাকান্ত

দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই ইহার সঙ্গে যোগ দেন। ইউরোপীয় সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, জন ক্লার্ক মার্সম্যান, পাদ্রি ডবলিউ কে, ডব্লিউ এস্ সীটন-কার প্রভৃতি। সিবিলিয়ান হজসন প্রাট এবং 'সত্যপ্রদীপ' সম্পাদক মেরিডিথ টাউনসেন্ড বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক এবং বেথুন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহেব সভাপতি নিযুক্ত হন। পাদ্রি লঙও প্রতিষ্ঠার কিছু পরে সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

সমাজ ইংরেজীতে 'ভার্নাকুলার ট্রানশ্লেশন কমিটি' এবং প্রায়শঃ 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' নামে অভিহিত হইত। নাম হইতেই সমাজের উদ্দেশ্য অনেকটা প্রতীত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর 'সত্যপ্রদীপে' প্রকাশিত অনুষ্ঠানপত্রে উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খৃীস্টান নলেজ সোসাইটি কি ইস্কুল বুক সোসাইটি কিম্বা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার নিয়ম মতে সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম২ যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।"

ইংরেজী সাহিত্য হইতে জ্ঞানগর্ভ পুস্তকসমূহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সমাজ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মনস্থ করেন। যোগ্য বাঙালী সাহিত্যিকদের দ্বারা সংশোধিত করিয়া অনূদিত পুস্তকসমূহ প্রকাশ করা হইবে স্থির হয়। প্রথমেই নিম্নলিখিত পুস্তক ভাষান্তর করিতে সমাজ উদ্যোগী হইলেনঃ

"রবিনসন ক্রুসো। বেকন সাহেবের প্রবন্ধ-বাক্য। ইতিহাসের সমকালীন ঘটনা। আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুন। চেম্বর্স ও নাইট সাহেবের ও পেনী ম্যাগাজিনের প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যা-বিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক। মহা-পীটরের আয়ুর বিবরণ। কলম্বসের আয়ুর বিবরণ। ক্লাইব সাহেব ও ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের বিষয়ে মাকালি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য।"

প্রতিষ্ঠার পরে, উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে সমাজের কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথম বৎসরেই কার্তিক ১২৫৮ বঙ্গাব্দ হইতে বিলাতের ম্যাগাজিনের আদর্শে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হইল; ইহার সম্পাদক হইলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভাপতি বেথুন বিলাত হইতে বিস্তর ব্লক আনাইয়া দিয়াছিলেন। সমাজের প্রধান কার্য—অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ। প্রথমে ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহের অনুবাদ-প্রকাশে হস্তক্ষেপ করা হইলেও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কোন কোন পুস্তক অনূদিত ও সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। মৌলিকগ্রন্থও ক্রমে প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। সমাজ অনুবাদক, সংকলক ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতাকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিতেন, পুস্তক প্রকাশের ভার নিজেই বহন করিতেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ৬ষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। মধ্যে দুই বৎসরের উপর বন্ধ থাকিয়া ১৭৮১ শকের (ইং ১৮৬০) চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশের পর এখানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'কে পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব বহন করিতে হইত। একারণে ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। ১৮৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সমাজ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হন। তবে সোসাইটির সঙ্গে সমাজের নামও ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করিত। এই সম্মিলিত সমাজের আনুকূল্যে ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরই সম্পাদনায় 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক সচিত্র মাসিক পত্র (১ পর্ব ১ খণ্ড; মাঘ, সংবৎ ১৯১৯) প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-ভাষানুবাক সমাজের আনুকূল্যে অনুবাদ, সংকলন ও মৌলিক পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে ১৮৬১ সনে বিক্রেয় ছিল মোট একত্রিশখানি। এই সমাজ পাদ্রি লঙ্ সম্পাদিত ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সনের দুই-খানি অভিনব পঞ্জিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেথুন সোসাইটি

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর পর তাঁহারই নামে ১৮৫১ সনের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধিবেশনের একটি স্থায়ী স্থল ছিল—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটার। আর ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ফ্রেডারিক জে· মৌএট। এ সভার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী 'সমাজ' হইতে বিভিন্ন ও ব্যাপক; কতকটা পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটি'র অনুরূপ বলা যায়। তবে বেথুন সোসাইটিতে কলিকাতার বিদ্বানেরা প্রায় সমুদয়ই সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। কয়েকজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ প্রথমাবধি বরাবর ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ মৌএট উক্ত তারিখে কলেজ থিয়েটারে কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্ন দেশীয় ও বিদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একটি সভায় আহ্বান করেন। এই প্রাথমিক আলোচনা বা প্রতিষ্ঠা-সভায় যোগ দেন ডাঃ মৌএট ব্যতীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, পাদরি লঙ, ডাঃ স্প্রেঙ্গার প্রভৃতি। মৌএট সভাপতিরূপে বলেন, কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি বা কৃষি-সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু এদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট থাকায় বাঙালী সাধারণ বিদ্বজ্জনের মেলামেশা সেখানে সম্ভব নয়। সমাজকল্যাণকর বিষয়াদি আলোচনার সুযোগ সুবিধা সীমাবদ্ধ। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র মিলনক্ষেত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছিল। দেবেন্দ্র-

অক্ষয়কুমার দত্ত
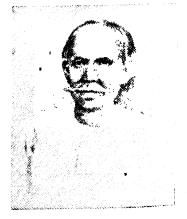
নাথ ঠাকুর, ডাঃ চক্রবর্তী ও ডাঃ স্প্রেঙ্গার আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সভা স্থাপিত হইল। ভারতহিতৈষী, স্ত্রীশিক্ষার একান্ত সমর্থক বেথুন সাহেবের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে সভার নাম দেওয়া হইল বেথুন সোসাইটি। সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি এইঃ

A Society be established for the consideration and discussion of

questions connected with literature and science.

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই এই সভার প্রতিষ্ঠা। সমসাময়িক রাজনীতির চর্চা নিয়ম করিয়া একেবারে বাদ দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভা আরো কতকগুলি নিয়ম ধার্য করেন। প্রতি মাসে একবার করিয়া উক্ত স্থলে সভা হইবার কথা হইল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, জনস্বাস্থ্য, পৌরসংস্থার জ্ঞানবৃদ্ধি-মূলক ও সমাজহিতকর নানা বিষয়ের বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও বিতর্ক হইত এখানে। সভার প্রথম সভাপতি—ডাঃ মৌএট এবং সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রথমেই সভার যাঁহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। ইঁহাদের মধ্যে চারিজন ইংরেজ এবং কুড়িজন বাঙালী। বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, জগদীশনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, রসিকলাল সেন, প্রসন্ন-কুমার মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। ইঁহাদের মধ্যে প্যারীচাঁদের পর দীর্ঘকাল সোসাইটির সম্পাদকত্বে ব্রতী ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র ও কৈলাসচন্দ্র বসু। ডাঃ মৌএটের মত বিখ্যাত পাদরি ডাঃ আলেকজান্ডার ডাফও কয়েক বৎসর সোসাইটির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন।

বেথুন সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে-বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়; ইহার কোন কোনটি বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও দ্যোতক হইয়াছিল। সোসাইটির প্রথম মাসিক অধিবেশনে ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন—বক্তৃতার বিষয় ছিল কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি। কর্ণেল এইচ গুডউইনের একটি বক্তৃতার ফলেই ১৮৫৪ সনে কলিকাতায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা ও শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন হয়। ১৮৫৩ সনের প্রথমে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলায় এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' (১২ মার্চ, ১৮৫৩) লিখিয়াছিলেন :

"বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

প্যারীচাঁদ মিত্র

কেশবচন্দ্র সেন

বেথুন সোসাইটি দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার অত্যল্পকাল পরেই ঢাকায় বিখ্যাত ডেপুটী রামশঙ্কর সেনের উদ্যোগে ইহার একটি শাখা স্থাপিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয়ে দেশী বিদেশী বহু সাহিত্যিক সুধী ও মনীষী সোসাইটির মাসিক অধিবেশনগুলিতে বক্তৃতা দিয়া-ছিলেন, প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এখানে বিপিনচন্দ্র পাল এবং প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রবন্ধ পাঠ করেন। বেথুন সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধসমূহ কখন কখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইত। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বেথুন সোসাইটির স্থান অতি উচ্চে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বঙ্গভাষানুশীলন সভা; বিদ্বন্ মনোরঞ্জিনী সভা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের নিমিত্ত কলিকাতার বাহিরেও সভা-সমিতির আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৫২-৫৩ সনে অল্পকালের ব্যবধানে হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে এবং চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বোড়ালে ঐ একই উদ্দেশ্যে দুইটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁতরাগাছির সভার নাম বঙ্গভাষানুশীলন সভা; ইহা ২২শে আগস্ট ১৮৫২ তারিখে স্থাপিত হয়।

এই সভা সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' ২৬ আগস্ট, ১৮৫২ তারিখে লেখেন:—

"হাওড়ার অন্তঃপাতী সাঁতরাগাছি গ্রামে গত রবিবার অপরাহ্নে [২২শে আগস্ট] চারি ঘটিকা সময়ে কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগি যুবক কর্তৃক [বঙ্গভাষানুশীলন সভা] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বাবু নীলকমল ভাদুড়ী সম্পাদক ও শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য সহকারী সম্পাদকের স্বরূপ মনোনীত হইয়াছেন। সভা প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে আরব্ধ হইয়া ৬টা পর্যন্ত থাকিবেক। ধর্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য নানা উপকারজনক ও মঙ্গল সাধন বিষয়ে রচনা পাঠ ও তর্ক-বিতর্ক আদি হইবেক। সাঁতরাগাছির এই শুভকর অনুষ্ঠান অতি প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।"

দক্ষিণ বোড়ালের বিদ্বন্ মনোরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠার কথা ২৮শে জানুয়ারী ১৮৫৩ তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে"

প্রকাশিত হয়। ঐ অঞ্চলের "কতিপয় সুসভ্য বিদ্যানুরাগি" ব্যক্তি এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে সভার অধিবেশনের দিন ধার্য হয়। প্রত্যেক সভায় সভ্যদিগের অভিপ্রায়ানুসারে একজন সভাপতির পদে নিযুক্ত হইতেন। সভাধ্যক্ষ ছিলেন চারিজন। সম্পাদক নিযুক্ত হন চন্দ্রকুমার দে। সভা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য তেরটি নিয়ম নির্ধারিত হয়। অষ্টম ও নবম নিয়মে সভার মূল উদ্দেশ্য যথাক্রমে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে : "এই সভায় যে কোন প্রশ্ন হইবেক তাহা সভ্য কর্তৃক লিখিত হইয়া পঠিত হইবেক" এবং "কোন প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিত হইবেক না।"

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা; ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া

সরকারী ইঞ্জিনীয়ার কর্নেল ই গুডউইন ২রা মার্চ ১৮৫৪ তারিখে বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে "Union of Science, Industry and Arts" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারেই কলিকাতায় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। মার্চ মাসের মধ্যেই যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। এই সভার সভাপতি হইলেন কর্নেল গুডউইন স্বয়ং; সম্পাদক হন হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কমিটিতে ছিলেন সিসিল বিডল, পাদরি লঙ, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ পনরজন গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালী। কিছুকাল পরে রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিও সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। সভার প্রধান কাজ কলিকাতায় একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ৬ই এপ্রিল (১৮৫৪) সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একখানি অনুষ্ঠানপত্র সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইলে ১৬ই আগস্ট ১৮৫৪ তারিখে কলিকাতায় চিৎপুরে এই শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

সাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ বৃদ্ধিও সভার উদ্যোক্তাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকার্য প্রদর্শন ও তাহাতে উৎসাহ দান এবং অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য শিল্পপ্রদর্শনীরও মধ্যে মধ্যে আয়োজন করিতেন এই সভা। তবে এই ধরনের প্রথম শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় কলিকাতার টাউন হলে ১৮৫৫ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকর্ম বাদে বাঙালী প্রধানদের গৃহে সংরক্ষিত চিত্রাদি ও সাধারণের শিল্পকর্মের নিদর্শনসমূহও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা এখানে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ তারিখে "সংবাদ প্রভাকর" এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে লেখেন :

"আমরা টৌনহালে গমন করিয়া
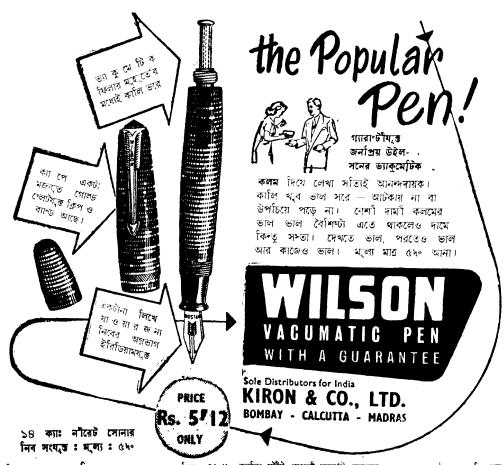
তথাকার মনোহর শোভা দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, কর্নেল গুডউইন সাহেব অল্প দিবসের মধ্যে এত চিত্র প্রতিমূর্তি ও মৃৎ মূর্তি এবং হাড়ের ও কাঁচের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আমরা এমত বিবেচনা করিতে পারি নাই, টৌনহালের যে দিগে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছি, সেই দিগের মনোহর শোভা দর্শন করত চক্ষের সার্থকতা জন্মিয়াছে, যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা আর দেখিতে বিলম্ব করিবেন না।"

মধ্যে মধ্যে ভীষণ অর্থাভাব দেখা দিলেও শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা শিল্প-বিদ্যালয়টি একাদিক্রমে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৮৫৬ সন হইতে কিছু কিছু সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহা ইহার আবশ্যক উন্নতি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যাহা হউক, সভা প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকর্মের যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিল তাহাতে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে কারু ও চারু শিল্পের প্রতি অনুরাগ ক্রমেই বাড়িয়া চলে। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৬৪ সনের ২৯শে জানুয়ারী শিল্পবিদ্যালয়টি সরকারের হাতে গিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

ঐ যুগেই ফটোগ্রাফি চারুশিল্পের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। শিল্পবিদ্যালয়েও ১৮৫৭ সন নাগাদ ইহা অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এদেশে ফটোগ্রাফির বহুল প্রচার ও উন্নতিকল্পে ১৮৫৬ সনের ২রা জানুয়ারি কলিকাতায় ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া নামক একটি সভা স্থাপিত হয়। ইহারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ফ্রেডারিক জে মৌএট। সভাপতি হইলেন মৌএট সাহেব; আর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। একটি অধ্যক্ষ সভাও গঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে রাজেন্দ্রলাল ছিলেন সভার শুধু কোষাধ্যক্ষ। কিন্তু ১৯৫৭ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে সময় সরকার ইংরেজ ও বাঙালীদের মধ্যে বিচারবৈষম্য দূর করিবার মানসে একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইংরেজরা টাউন হলে সভা করিয়া ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিল। বাঙালী প্রধানেরাও ঐ স্থলে আর একটা সভা করিয়া সরকারী প্রস্তাবের সমর্থন করেন। এই সভার অন্যতম বক্তারূপে রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন যে, এদেশে যে সব ইংরেজ আসে তাহার এক প্রধান অংশ বিলিতী সমাজের আবর্জনা। রাজেন্দ্রলালের এই উক্তির ফলে ইংরেজ সমাজে ঘোর বাদানুবাদ সুরু হয়। ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে ইংরেজ সদস্যেরা সংখ্যাধিক ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ভোটে রাজেন্দ্রলাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি হইতে অপসারিত হন।

সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি

এই সমিতির প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁহার কাশীপুরস্থ বাসভবনে ১৮৫৫, ১৫ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই সমিতি স্থাপিত হয়। সমাজের উন্নতিকল্পে সমবেত প্রয়াস যে এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল তাহা নাম হইতেই বুঝা যায়। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া

কালীপ্রসন্ন সিংহ

সমিতি সমাজের সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। সমিতির কর্মকর্তৃ সভার অধ্যক্ষরূপে সে যুগের বহু প্রসিদ্ধ বঙ্গ মনীষীকে দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাক, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক কিশোরী-চাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

প্রতিষ্ঠার পরেই সমিতি কয়েকটি কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। স্ত্রী-জাতির উন্নতিকেই কর্তৃপক্ষ সমাজোন্নতির কর্মসূচীতে প্রধান স্থান দেন। সমিতির আনুকূল্যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন দানা বাঁধিবার পূর্বেই সমিতি ঐ উদ্দেশ্যে কার্য আরম্ভ করেন। বঙ্গবাসীদের পক্ষ হইতে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ব্যবস্থাপক সভায় যে আবেদন পাঠানো হয় তাহার নিমিত্তও সমিতি বিশেষ শ্রমস্বীকার করেন। বাল্যবিবাহ বর্জন, বহুবিবাহ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টায়ও সমিতি অতিশয় তৎপর হইয়াছিলেন। প্রজাসাধারণের উন্নতি-চিন্তায়ও সমিতির সদস্যগণ নিবিষ্ট হন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতির পরই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম উল্লেখ করিতে হয়। তবে এ সভার অন্যতম লক্ষ্য সমাজসেবা হইলেও মূল উদ্দেশ্য বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন ও সাহিত্যসেবীদের উৎসাহদান। কালীপ্রসন্ন সিংহ চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিতেই বাংলা সাহিত্যের চর্চার জন্য একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ('সংবাদ প্রভাকর'—১৪ জুন ১৮৫৩)। ইহাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা একথা জোর করিয়া বলা না চলিলেও এটির মধ্যেই যে শেষোক্ত সভার বীজ উপ্ত হইয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৮৫৫ সনে এই সভা দ্বারা বিদ্যা তথা সাহিত্যানুশীলন আত্যন্তিকভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বরচিত প্রবন্ধ, কবিতাদি এখানে পাঠ করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সুধী মনীষিগণ বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। সাহিত্যাদির আলোচনায় তাঁহারা যোগ দিতেন নিয়মিতভাবে। সে যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিক্ষাব্রতীরাও আহূত হইয়া ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে এখানে বক্তৃতা দিতেন। সভার বার্ষিক অধিবেশনগুলি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। সমসময়ের সংবাদপত্রসমূহে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইত।

সভার একখানি মুখপত্র ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে। এখানি প্রতি মাসে সদস্যদের রচনাসম্ভারে পূর্ণ হইয়া বাহির হইত। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকদের পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানে রত থাকিয়া সভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কবিবর মধুসূদন দত্তকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখে সভা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ইহার পক্ষে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ একখানি মানপত্র দেন। ভারতবর্ষের অকৃত্রিম সুহৃদ্ পাদ্রি লঙের বিলাত যাত্রার দিন সভা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র দিয়াছিলেন (১লা মার্চ ১৮৬২)। বিদ্যোৎসাহিনী সভার আনুকূল্যে ১৮৫৬ সনে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। প্রকাশ্যভাবে ইহার দ্বার উন্মোচিত হইল ১৮৫৭, ১১ই এপ্রিল

দিবসে। এখানে 'বেণীসংহার নাটক', 'বিক্রমোর্বশী নাটক' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' অভিনীত হইয়াছিল।

সমাজ-সেবাও ছিল এই সভার একটি অংগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সভা পূর্বাপর সাহায্য করেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে সভা আইন-সভায় স্মারকলিপি প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথম বিধবা-বিবাহকারীদের এক সহস্র টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সভার পক্ষে। সহরের মধ্যস্থল হইতে বেশ্যাদের বাসস্থান তুলিয়া লইয়া নগরপ্রান্তে যাহাতে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্যে সভার পক্ষে কালীপ্রসন্ন সিংহ আইন সভায় ১৮৫৬ সনে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

নাম হইতে মনে হইতে পারে যে, এই সোসাইটি একটি রাজনৈতিক সভা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে; প্রেসিডেন্সী কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেরা মিলিয়া সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সনে ইহা স্থাপন করেন। এখানে কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা হইত; আবার মাঝে মাঝে আহূত হইয়া মনীষী ও শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানে বক্তৃতা দিতেন। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ হাত ছিল। তখনও তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এই সভায় পাদরি লঙ, একেশ্বরবাদী পাদরি ড্যাল প্রমুখ ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের আলোচনায় যোগদান করিতেন। কেশবের চরিতকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেনঃ

"With the aid of these gentlemen [the Rev. J. Long and the Rev. C. H. A. Dall], and with some of his friends Keshub established about this time a literary society called the British India Society, with the somewhat pompous object of 'the culture of literature and science'. Here religious subjects were sometimes discussed, and we all witnessed with a great deal of amusement the somewhat furious passages at arms between Mr. Long and Mr. Dall, both of them so recently deceased." (*Keshub Chunder Sen*, first published in 1887.)

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একটি মাসিক অধিবেশনের বিবরণ সম্প্রতি পাইয়াছি ('দি ইংলিশম্যান'—২২ আগস্ট ১৮৫৭)। প্রেসিডেন্সী কলেজে ২০শে আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে এই অধিবেশন হয়। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ হেলিউর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রাথমিক বক্তৃতায় তিনি এরূপ একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের ঔদাসীন্যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার পর এদিনকার বিশেষ বক্তা শিক্ষাব্রতী কার্কপ্যাট্রিক 'মানুষের কর্তব্য' সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগদান করিয়া পাদ্রি ড্যাল কতগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপঃ

". . . he strongly reminded his hearers they should never forget this valuable axiom that 'truth helps truth', and that every new discovery should have, and did have, for its object, an amelioration in the social condition of mankind. They should reflect that man was made up of power, of wisdom, of justice, of love, and such being the case, it ought to be one of their main and principal endeavours in this world to make themselves useful, useful to themselves, useful to their friends, useful to their neighbours and to the rest of the world."

পাদ্রি ড্যাল বলেন যে, মানব জাতির সামাজিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি মানুষ শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় এবং প্রেম হইতে সঞ্জাত। আমাদের প্রধান করণীয়—নিজেদের, বন্ধুবান্ধবদের, প্রতিবাসীর এবং সমগ্র মনুষ্য সমাজের কল্যাণ সাধন। জানা যায়, সোসাইটি বড়বাজারস্থ ফেমিলি লিটারারি ক্লাব বা গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ২৯শে আগস্ট, ১৮৫৮ আবেদন করেন। সানন্দে প্রস্তাব গ্রহণান্তর উক্ত সমাজ ইহাকে নিজেদের অংগীভূত করিয়া লইলেন।

ফেমিলি লিটারারি ক্লাব বা বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ

উক্ত সমিতি বড়বাজারস্থ বিখ্যাত রামমোহন মল্লিকের ভবনে ১৮৫৭, ২৭শে এপ্রিল স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রসাদদাস মল্লিক রামমোহনের পৌত্র। ধনীর দুলাল হইয়াও প্রসাদদাস সাহিত্যপ্রীতি বশে এই সমিতিটি দীর্ঘকাল পালনপোষণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বরাবর ইহার সম্পাদক। কলিকাতার সুবিখ্যাত ইংরেজ ও বাঙালীরা বিভিন্ন সময়ে ইহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। পাদ্রি লঙ্ সমাজের সভাপতিত্ব করেন ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৬ সন এবং পরে ১৮৭১—৭২ সন পর্যন্ত। পাদ্রী কে এস ম্যাকডনাল্ডও বহু বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন। সমাজের ষোড়শ অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি পদে বৃত হন।

সভার প্রথম নিয়ম হইল—প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান করা হইবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। ১৮৫৯ সন হইতে পাদ্রি লঙের অনুরোধে নিয়ম বদল লইয়া ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিবে স্থির হয়। সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, শিক্ষা সমস্যা, সমাজ সংস্কার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি বিবিধ হিতকর বিষয়েরই এখানে আলোচনা চলিত। সমাজের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মনীষী ও সুধী ব্যক্তিও ইহার অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। পাদ্রি ড্যাল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালবিহারী দে, বিচারপতি জে বি ফিয়ার প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিতেন। নবম বার্ষিক অধিবেশনে (২৭ এপ্রিল ১৮৬৬) পাদ্রি লঙ্ তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দেন "Social Science—its utility for India" বা ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এই বিষয়টি লইয়া কিছুকাল আলোচনা চলে। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতায় 'বেংগল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশন' বা 'বংগীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ' গঠিত হয়।

সমাজ অন্যান্য হিতকর কার্যেও অবহিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ বর্ষে কৃষি বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধের জন্য উৎকৃষ্ট লেখকদের পুরস্কৃত করেন। সমাজ-কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে একটি এংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ও পরিচালনা করিতেন। বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ জ্ঞানানুশীলন এবং সমাজ-সেবার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ('বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে'র বিশদ বিবরণ ১৩৩৮ হইতে ১৩৪১ বংগাব্দের 'সুবর্ণ বণিক সমাচারে' প্রকাশিত ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

মাত্র ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৭ সনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের ধর্ম ব্যতিরিক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজসংস্কারমূলক কয়েকটি সভার সামান্য বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। সে যুগের বাঙালী-জীবনে জ্ঞানার্জন ও সমাজকল্যাণ স্পৃহা কত গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল ইহা হইতে তাহা আমাদের বোধগম্য হয়। পরবর্তী যুগের বাঙালীদের মধ্যে যে সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধের অতি দ্রুত উন্মেষ হইয়াছিল তাহার মূল রহিয়াছে এই সকল সভা-সমিতির ভিতরে।

মিষ্টিদিদি

বিমল মিত্র

জ আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিন। চিঠি পেয়ে আজও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কলকাতায় এলাম!

অথচ মিষ্টিদিদি আমার আপন দিদিও না, দূরসম্পর্কের দিদিও নয়।

তবু মিষ্টিদিদি ছিল বুঝি আমার আপন দিদির চেয়েও বড়। বলতো—যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি, তুই আমার কাছে কাছে থাক পল্টু—

মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপ চাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা হাল্কা শরীর, ধবধবে রং। ফিন্‌ফিনে সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিংএর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়ত তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়ত খেয়াল হলো—গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো গঙ্গার ধারে।

জামাইবাবু বলতো—পল্টুকে সঙ্গে নিও মিষ্টি—কোথাও যদি হঠাৎ টলে পড়ে যাও, তখন......

মিষ্টিদিদিও মাঝে মাঝে বলতো—তোদের সবাইকে খুব কষ্ট দিচ্ছি রে আমি—

আমি বলতাম—বাঃ, কষ্ট কিসের—

মিষ্টিদিদি বলতো—না, তোর জামাইবাবুর দেখ তো, কখনও কোনও অসুখ হতে দেখিনি—আমার জন্যেই তো কোথাও যেতে পারে না, আমার জন্যেই তো এত চাকর-বাকর রাখা—শঙ্করকেও দূরে পাঠাতে হলো তো শুধু আমার শরীরের জন্যেই—

মিষ্টিদিদির ঝি অবশ্য থাকতো সঙ্গে। মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না-একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়ত রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্‌সে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হতে পারে। আশ্বিন মাসের দুপুর বেলাই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়ত তখন আপিসে যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে—আমার বুকটা যেন কেমন করছে—তুমি আজ যেও না কোথাও—

জামাইবাবু তখন কোটপ্যান্ট পরে তৈরি। নীচে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বললে—আমার যে আজ একটা জরুরী কাজ ছিল—

মিষ্টিদিদি বলতো—কাজটাই তোমার বড় হলো?

জামাইবাবু কেমন অপ্রস্তুত-ব্যস্ততায় যেন বলতো—আমি বরং গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মিষ্টিদিদির পাতলা শরীর যেন কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতো। বলতো—আমি আর ক'দিন—আমি মরে গেলে তুমি যত খুশী কাজে বেরিও না—কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না—

সত্যিই তো তখন আমাদেরও মনে হতো মিষ্টিদিদি আর ক'দিনই বা বাঁচবে। কলকাতার হার্ট স্পেশালিস্টরা কেউ রোগ ধরতে পারতো না মিষ্টিদিদির। কতবার কলকাতার বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছে। ভিয়েনা থেকে এসেছে। আমেরিকা থেকে এসেছে। জামাইবাবু মোটা মোটা টাকা দিয়ে সব রকম চিকিৎসা করিয়েছে। কেউ রোগ ধরতে পারেনি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বলে গেছে রোগীর মনে কোনও রকম উত্তেজনা হতে দেওয়া উচিত নয়। একটু উত্তেজনা হলেই আর বাঁচানো যাবে না রোগীকে।

মিষ্টিদিদি বলতো—আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশী যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িও—আমি দেখতেও আসবো না, কিন্তু যে দু'টো দিন বেঁচে আছি আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও—

তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্যে জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু।

দু'টো দিন—

অথচ 'দুটো দিন' 'দুটো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি আমি কেবল তাই ভাবতাম। তবে অপূর্ব স্বাস্থ্য বটে জামাইবাবুর। একটা দিনের

জন্যে অসুখ করেনি, একদিন সর্দি হলো না। চল্লিশ বছরের জামাইবাবুকে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা মনে হতো দেখে। ভোর বেলা উঠতো। উঠে সামনের সমস্ত বাগানটা জোরে জোরে হেঁটে নিত দশ পঁচিশবার। একদিনও শুনিনি জামাইবাবুর মাথা ধরেছে। কখনও ডাক্তারের কাছে সঁপে দিতে হয়নি নিজেকে। কবে যে ওষুধ খেয়েছে তা মনেই পড়ে না জামাইবাবুর। এমনি অটুট স্বাস্থ্য। এমনি আঁট শরীর।

কিন্তু তবু জামাইবাবুকে গঞ্জনা শুনতে হতো মিষ্টিদিদির কাছে।

রবিবার। খাবার টেবিলে হয়ত সবাই খেতে বসেছি। জামাইবাবুও খাচ্ছে একমনে।

মিষ্টিদিদি বললে—ওমা, ওই অতগুলো মাংস তুমি সত্যি খাবে নাকি?

কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো জামাই-বাবু। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর মাংসর প্লেটটা পাশে ঠেলে দিয়ে বললে—তাইতো—আমাকে বড্ড বেশি মাংস দিয়েছ দেখছি, ঠাকুর—

মিষ্টিদিদিকে আমি লক্ষ্য করছি তখন। ঝাল ডাঁটাচচ্চড়ি একরাশ নিয়েছে পাতে। বারবার চেয়ে চেয়ে ভাতও নিয়েছে এক হাঁড়ি। পোনা মাছের কালিয়ার সবটাও শেষ করে ফেলেছে। কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছে মিষ্টি-দিদি। তারপর নিঃশব্দে কখন মাংসের প্লেটটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আরো মাংস দিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের দুজনের ডবল খেয়ে কখন শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে বসে ডাঁটা চিবোচ্ছে মিষ্টি-দিদি। জামাইবাবু লক্ষ্য না করুক আমি তা করেছি।

তবু মিষ্টিদিদি ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বললে—বেশি খেয়ো না বলে দিলুম—ওতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে না—

জামাইবাবু বললে—কই, আমি তো বেশি খাইনি—

মিষ্টিদিদি বললে—এক একজনের ধারণা একগাদা খেলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে—ওটা ভুল—

জামাইবাবু বললে—নিশ্চয়—

এমন সময় ঠাকুর বললে—মা, আমড়ার চাটনি করেছিলুম, দিতে ভুলে গেছি—

মিষ্টিদিদি বললে—ভুলে গেছ ভালোই হয়েছে—ওঁকে আর দিও না—আমার এই প্লেটে বরং একটুখানি দাও, কেমন রেঁধেছ চেখে দেখি—তুই নিবি নাকি পল্টু?

বললাম—তা দিক একটুখানি—

মিষ্টিদিদি বললে—না না, থাক তোকে আর নিতে হবে না—এই বয়েস থেকে বেশি খাওয়া অভ্যেস করিস নে—পেট ভরে খাবি না কখনও, এই বলে রাখলুম, একটু খালি রেখে খেতে হয়—

তা ঠাকুর শুধু আমড়ার অম্বলই দিলে না। পুরনো ঠাকুর জানে সব। শুধু অম্বল মিষ্টিদিদি খেতে পারে না। সঙ্গে দুটি ভাত চাই। ঠাকুর ভাতও এনে দিলে মিষ্টিদিদিকে।

ঠাকুর বললে—আর দুটো ভাত দেবো মা—

তখন সব ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মিষ্টিদিদি বললে—না, না, পাগল হয়েছ ঠাকুর—একে দেখছ আমার শরীর খারাপ—আমাকে কি তুমি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি—

কী জানি আমার কেমন জামাইবাবুকে দেখে মনে হতো তার যেন পেট ভরেনি। এক গ্লাশ জল ঢকঢক করে খেয়ে উঠে পড়তো জামাইবাবু।

মিষ্টিদিদি বলতো—খেয়ে উঠে যেন এখনি আবার শুয়ো না গিয়ে ঘরে—

—না না শোব কেন, এখন আমার কত কাজ—

মিষ্টিদিদি বলতো—না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, খেয়ে উঠে শুলেই যত অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের উৎপাত—

জামাইবাবু তারপর নিজের ঘরে চলে যেত। আর মিষ্টিদিদির তখন নিজের স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে থাকবার পালা। বলতো—আমার যে কী কপাল—ইচ্ছে না হলেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে বিছানায়—

সেবার জামাইবাবুর একটা মস্ত প্রমোশন হলো আপিসে। শুধু প্রমোশন নয়, সমাজে, পাড়ায়, আপিসে সর্বত্র সেটা হিংসে-উদ্রেক করার মতো প্রমোশন। অর্থবান মানুষ জামাইবাবু। এক সঙ্গে দুখানা গাড়ি রাখবার মতন অবস্থা। বাড়ির আর্থিক স্ফীতিটাও উল্লেখযোগ্য। অথচ সমস্ত নিজের চেষ্টায়। অল্প অবস্থা থেকে শুধু কর্তব্যনিষ্ঠা আর পুরুষকারের জোরে বাড়ি গাড়ি আর মিষ্টিদিদির মালিক হতে পেরেছে।

বিয়ের আগে মিষ্টিদিদিকে চিনতাম না। তবে শুনেছি মিষ্টিদিদির কথা।

মা বলতো—সে রীতিমত লড়াই বেধে গিয়েছিল মিষ্টির বিয়ের সময়ে—পটল বলে আমি বিয়ে করবো, চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ বলে আমি বিয়ে করবো। দিনরাত মনোহরদার বাড়ি দশ বিশটা ছেলের ভীড়, টেনিস খেলা চলে ওদের—আর মিষ্টি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে খেলা দেখতো—

আমি জিজ্ঞেস করতাম—মিষ্টিদিদি খেলতো না মা?

—হ্যাঁ ও আবার খেলবে কী! ও কেবল ওর শরীর নিয়েই ব্যস্ত, ওর জন্যে মনোহরদা পর্যন্ত ফতুর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কেবল ডাক্তার আর ওষুধ—কী যে রোগ কেউ বলতে পারে না—শুধু বলে বিশ্রাম নিতে

হবে। ওই মেয়েকে নিয়ে মনোহরদা'কে কি কম ভুগতে হয়েছে—শেষে মনোহরদা সকলকে ডেকে বললে—আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মেয়েকে কখনও খাটাবে না, কখনও কাজ করাতে পারবে না—ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে যেমন আমি করছি—শুনে সবাই রাজি, বড় বড় লোকের ছেলে সব—বড় বড় চাকরি করে। হাজার দেড় দুই টাকা করে সব মাইনে পায়—শুনে আমরা তো চাইবাসার মেয়েরা সব হেসে বাঁচি নে—ওই তো পাতলা হাড় জিরজিরে চেহারা, কদিন আর বাঁচবে, একটা ছেলে হলেই তো হাড্ডিসার হয়ে যাবে—তা কী সব আজকালকার ছেলেদের পছন্দ জানিনে—সবাই বলে রাজী—

বাবা বলতেন—তা রোগা হওয়াই তো ভালো—খাবে কম—

মা বলতো—হ্যাঁ খাবে নাকি কম, কথা শোন, দিনরাত যে খাচ্ছে কেবল, কী করে হজম করে মা কে জানে, মনোহরদা তো ওই মেয়ের জন্যেই দেউলে হয়ে গেল শেষকালে, কাঠের ব্যবসা ছিল মনোহরদার। তা মেয়ের খাওয়ার জ্বালায় দেনা হলো চারদিকে—সকাল থেকে উঠেই মেয়ের খাওয়া, মুখে একটা-না একটা কিছু লেগেই আছে, চকোলেট, বিস্কুট, লজেঞ্জ, মাংস, মাছ, শাক, খাদ্য অখাদ্য কিছু আর বাদ নেই—

বাবা বলতেন—তা যদি হজম করতে পারে ক্ষতি কী?

মা বলতো—তুমি আর ঠেস দিয়ে কথা বলো না বাপু, এই তো এতদিন এসেছি তোমার সংসারে, কেউ বলুক দিকিনি আমার জন্যে কটা পয়সা তোমার খরচ হয়েছে ডাক্তারের পেছনে—

বাবা হেসে উঠতেন হো হো করে। আর মা থেমে যেতো গম্ভীর হয়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলতাম—মা, তারপর—তারপরে কী হলো?

মা বললে—তারপরই গোল বাধলো, সবাই যখন রাজী তখন মনোহরদা উপায় না দেখে বললে মিষ্টি যাকে বেছে নেবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব—তা ওদের মধ্যে পটলই ছিল সব চেয়ে মজবুত, দৌড়তে পারতো, কম বয়েস, নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছে, কুস্তিকরা চেহারা। মিষ্টির বরাবর রাগ ছিল পটলের ওপরে—

জিজ্ঞেস করলাম—রাগ ছিল কেন মা?

—তা রাগ থাকবে না, মিষ্টি নিজে হাওয়ায় উড়ে যায়, একটু কাজ করলে মাথা ঘোরে, ঘুম না পাড়ালে ঘুম আসে না, তার চোখের সামনে অত মজবুত চেহারার মানুষকে ভালো লাগবে কেন? তা মিষ্টি শেষ পর্যন্ত পটলকেই বিয়ে করতে রাজি হলো—

এসব ছোটবেলায় মার কাছে গল্প শুনেছিলাম। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়বার কথা হলো, তখন পটল-জামাইবাবুই লিখলে—পল্টুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, এখানে থেকেই লেখা-পড়া করবে ও—কোনও অসুবিধে হবে না—

আসবার সময়ে মা বলে দিয়েছিল—বাড়িতে যেন বেশি গোলমাল কোরো না—একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর, তাকে পর্যন্ত কাছে রাখেনি পটল, পাছে মিষ্টির শরীর খারাপ হয়—

আমি যখন মিষ্টিদিদির বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন শঙ্কর থাকতো দেরাদুনে। উডমণ্ড স্ট্রীটে বাড়ি করার পেছনেও ওই সেই একই কারণ। এ পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী সাহেব সুবো। বিরাট দশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। ঘন গাছপালা। বাড়ি থেকে রাস্তা বা পাশের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। কোনও রকম শব্দ আসে না এখানে। নিঝুম নির্জন আবহাওয়া। শুধু এক একবার এক একটা পাখীর ডাক দুপুর বেলায় শান্তি ভঙ্গ করে। শঙ্কর যখন জন্মাল, সেই প্রথম দিনটি থেকে তার ভার নিয়েছিল নার্স। দিনের মধ্যে এক-একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে মিষ্টিদিদির কোলে রাখা হতো। কিন্তু জামাইবাবুর হুকুম ছিল—শঙ্কর কাঁদলেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একেবারে মিষ্টিদিদির কানের এলাকার বাইরে। ভয় ছিল ছেলের কান্না শুনলেই মিষ্টিদিদির হার্টফেল হতে পারে। মিষ্টি-দিদি যদি থাকতো দক্ষিণের ঘরে শঙ্করকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে একেবারে সুদূরে উত্তরে। হয়ত একেবারে বাগান পেরিয়ে ওদিকের মালীদের ঘরে। যেখানে ছেলে কঁকিয়ে কাঁদলেও মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্য-হানির আশঙ্কা নেই। সেই ছেলে ক্রমে এক বছর বয়েসের হলো। দু'বছরের হলো। বড় জ্বালাতন করতে লাগলো তখন। হুড়মুড় করে দৌড়ে বেড়ায়, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সেই গোলমালে একদিন মিষ্টিদিদি হার্টফেল করে আর কি! ভীষণ অবস্থা। ডাক্তার এল। নার্স এল। অক্সিজেন গ্যাস এল। জামাইবাবু দু'রাত ঘুমোলো না।

অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয়ে, ডাক্তার সান্যালের অনেক চেষ্টায় সে-যাত্রা টি'কে গেল মিষ্টিদিদি। কিন্তু জামাইবাবু আর দায়িত্ব নিলে না। শেষকালে কী হতে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে!

মিষ্টিদিদি সেরে ওঠার পর জামাইবাবু বললে—শঙ্করকে আমি দেরাদুনে পাঠিয়ে দিই কী বলো—ওখানে ওরা ট্রেণিংটা ভালো দেয়। আর ওরা যত্নও করে খুব ছোট ছোট ছেলেপেলেদের—

মিষ্টিদিদি ছল ছল চোখে বললে—কী কপাল দেখো আমার, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কাছে রাখতে পারবো না, আদর করতে পারবো না—

—তাতে কী হয়েছে, তুমি সেরে উঠলেই...

মিষ্টিদিদি বলতো—আর সেরেছি, বেশি দিন আর নেই আমার বুঝতে পারছি, বড়জোর দিন পনেরো—তারপর আমি মরে গেলে, ওকে কিন্তু তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে তোমার কাছে কাছে রেখো—

তারপর কত পনেরো দিন কেটে গেছে, পনরো বছর কাটতে চললো কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে। দামী দামী

বিস্কুট কেক লজেঞ্জ খেয়েছে, দামী দামী গাড়ি চড়েছে। মিষ্টিদিদির শোবার ঘর এয়ার-কণ্ডিশনড্ করা হয়েছে. ওষুধ, বিশ্রাম, আরাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব জুগিয়েছে জামাইবাবু। তবু অসুখ সারেনি মিষ্টিদিদির।

অথচ কত সাবধানতা, কত সতর্কতা মিষ্টিদিদির জীবনের জন্যে।

পাশের গাছের ডালে একটা কাক পর্যন্ত ডাকলে বুক ধড়ফড় করতো মিষ্টিদিদির। হাঁ-হাঁ করে তাড়িয়ে দিতে হতো। ঝড় বৃষ্টির দিনে যদি জোরে মেঘ ডেকে উঠতো তো আপিস থেকে টেলিফোনে খবর নিতো জামাইবাবু—মিষ্টি কেমন আছে। খবরের কাগজটা আগে নিজে পড়ে তবে জামাইবাবু পড়তে দিতো মিষ্টিদিদিকে। অনেক খুন-জখমের খবর থাকে ওতে। সে-সব পড়ে যে-কোনও মুহূর্তে হার্ট ফেল হতে পারে। কতবার কত প্রমোশনের সুযোগ এল জামাইবাবুর। এমন সচরাচর আসে না কারোর। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে গেলে মাইনে হতো পাঁচ হাজার টাকা। ওখানকার মাটির তলায় খনির সম্বন্ধে গবেষণা করতে জামাইবাবুকেই পাঠানো ঠিক করলো ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট। মাইনে ছাড়া টি-এ আছে অনেক।

কিন্তু প্রত্যেকবার মিষ্টিদিদি বলেছে—আর দুটো দিন আমার জন্যে সবুর করো—আর বেশি দিন কষ্ট দেব না তোমাদের—

অপ্রস্তুত হয়ে গেছে জামাইবাবু।

—আর দুটো দিন শুধু, দু'দিন পরে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাবো—তখন তুমি যেখানে খুসী যেও—

এ-সব আজ থেকে প্রায় পনেরো বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই অল্প বয়েসেও আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছে এ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। বড় স্বার্থপর মনে হয়েছে মিষ্টিদিদিকে। এই আরাম, এই বিশ্রাম, এই অর্থ অপচয়, এই বিলাসিতা থেকে পাছে বঞ্চিত হয়, পাছে পরিশ্রম করতে হয় মিষ্টিদিদিকে, তাই যেন এই ছলনা।

শঙ্কর যখন পুজোর আর গরমের ছুটিতে আসতো বাড়িতে, জামাইবাবু যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বলতো—ওদিকে যেও না শঙ্কর, তোমার মা'র শরীর খারাপ, জানো তো—

শঙ্করও যেন কেমন বিব্রত হতো। ও-বয়েসের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম হৈ চৈ করা, খেলা, চীৎকার করা। কিন্তু পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল শেষকালে। যেন কলক তায় আসতে ভালো লাগতো না তার। আবার স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো। কেবল বলতো—কবে যে ছুটি ফুরোবে—

মনে আছে একবার বলেছিল—এখানে আমার বড় মন-মরা লাগে—ভালো লাগে না মোটে—

—কেন?

শঙ্কর বলেছিল—কী জানি—

আপন যারা তারা এত কম বয়েসে পর হয়ে যায় কেমন করে তা ভেবে আমারও অবাক লাগতো। আমারও মা ছিল। যখন ছুটিতে বাড়ি গেছি, সে অন্যরকম। আমাকে আদর করবার জন্যে কতরকম আয়োজন, কত রান্না কত কী উৎসব আনন্দ হতো। আর এ-ও তো মিষ্টিদিদির ছেলে। বড়লোকের ছেলে! আরো আনন্দ হওয়া উচিত বৈকি!

কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও ভুলে হো হো করে হেসে উঠতো, কোথা থেকে ঝি এসে বলতো—চুপ করো খোকাবাবু, মা'র বুক কেমন করছে—

মায়ের ঘরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে যদি শঙ্কর কোনওদিন ঢুকে পড়তো, অমনি দশজন ঝি-চাকর হাঁ হাঁ করে উঠতো—এদিকে না—এদিকে না—

বাড়িটা যেন হাসপাতাল। অথচ যে রোগী সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, খায় দায়, সাজ পোষাক করে। মিষ্টিদিদি বিকেল-বেলা স্নান করে। স্নানের শেষে এসে বসে আয়নাটার সামনে। দু'জন ঝি আসে এগিয়ে। তখন বেরোয় রুজ, লিপ্‌স্টিক, তেল, সেণ্ট, পাউডার—আরো কত কি। ভালো ভালো পোষাকী সাড়ি বেরোয়। ব্লাউজ বেরোয়। আলতা বেরোয়। এক ঘণ্টা ধরে সাজিয়ে গুজিয়ে ফিটফাট করে দেয়। তারপর ইজি চেয়ারটা বারান্দার সামনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে রাখা হয়। সেই সাজ, সেই পোষাক পরে মিষ্টিদিদি গিয়ে তখন আস্তে আস্তে বসে ইজি চেয়ারে। কোনও কথা নেই, কোনও কাজ নেই—শুধু বসে থাকা, আলস্যের ঢেউএ গা এলিয়ে দেওয়া। এত আলস্য যে কী করে সহ্য করে মিষ্টিদিদি কে জানে। কিন্তু সবাই ভাবতুম, আর তো মাত্র দুটো দিন; হয়ত আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা—তারপরেই তো শেষ!

ছুটির সময় দেশে গেলে মা সব শুনে বলতো—ও মেয়ে মনোহরদাকেও ওমনি করে জ্বালিয়েছে—ও পটলকেও জ্বালিয়ে ছাড়বে—দেখিস্—

কিন্তু জামাইবাবুর অদ্ভুত ধৈর্য। স্ত্রীর জন্যে এমন আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ক্ষতি স্বীকার করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। অথচ স্ত্রৈণ বলবো কেমন করে। কোথায় যেন মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কিম্বা চেহারায় একটা যাদু ছিল।

রোজই সকালবেলা জামাইবাবু একবার করে মিষ্টিদিদিকে জিজ্ঞেস করতো—আজ কী খাবে তুমি—কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার—

মিষ্টিদিদি কোনওদিন বলতো—আজকে ফাউল আনতে বলে দাও ঠাকুরকে—

কোনদিন বলতো—আজ মাটন্—

আবার কোনওদিন বলতো—আজ টোস্ট আর ফাউল কাট্‌লেট্ করতে বলো ঠাকুরকে—

কোনও কোনও দিন আবার বলতো—চলো আজ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ির রান্না আর ভালো লাগছে না—

এমন কোনওদিন হলো না যেদিন মিষ্টিদিদি বলেছে—আজ শরীরটা খারাপ—কিছু খাবো না—

জামাইবাবু যদিই বা কোনওদিন বলতো—এত শীতে আর নাই বা বেরোলে—যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়—

মিষ্টিদিদি বলতো—আর তো মাত্র কটা দিন—যে ক'দিন বাঁচি করে নিই—

তা এসব হলো পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা।

মিষ্টিদিদির বাড়িতে থেকে আই-এ পাশ করেছি, বি এ পাশ করেছি, এম এ পাশ করেছি। করে চাকরি সূত্রে বিলাসপুরে এসেছি। খবর পেয়েছিলাম—মিষ্টিদিদি

পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
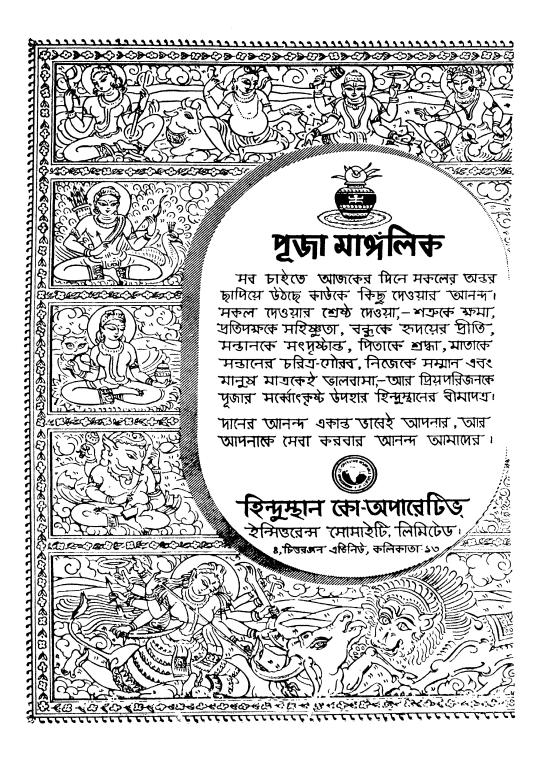
তখনও বেঁচে আছে। একদিনের জন্যেও কখনও জ্বর হতে শুনিনি, একদিনও উপোস করতে শুনিনি। আর শুনেছি মিষ্টিদিদির জন্যে জামাইবাবু নিজের প্রমোশন, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ত্যাগ করে উডমন্ড্ স্ট্রীটের বাড়িতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ মা'র চিঠিতে সেবার জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে চমকে উঠেছিলাম।

জামাইবাবুরে কখনও অসুখ হতে দেখিনি। সে-মানুষ এমন হঠাৎ মারা গেল! জ্বর নয়, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা নয়, হঠাৎ নাকি হার্ট ফেল করেছে।

কিন্তু ভয়ও হয়েছিল মিষ্টিদিদির জন্যে!

মিষ্টিদিদি এ-শোক কেমন করে সহ্য করবে কে জানে। জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শোনামাত্র মিষ্টিদিদিরই তো হার্ট ফেল করার কথা!

সমবেদনা জানিয়ে মিষ্টিদিদিকে একটা চিঠিও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু সে-চিঠির কোনও উত্তরও পাইনি বহুদিন।

সেবার যখন কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম গিয়ে।

ঠিক সেইরকম ইজি চেয়ারে মিষ্টিদিদি বসে। রুজ পাউডার লিপস্টিক, সিল্ক, সেণ্ট, সাবান, ওষুধ—কোনও কিছুরই ব্যতিক্রম নেই। পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাক্তার সান্যাল বসে ছিলেন।

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—অনেক কষ্টে তোমার মিষ্টিদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছি পল্টু—খুব শক্ পেয়েছিলেন—তিন দিন সেন্স্ ছিল না—

বললাম—শংকর কোথায়? শুনলাম সে নাকি কলকাতায় ফিরে এসেছে—

ডাক্তার সান্যাল বললেন—এই তো বেরোল যেন কোথায়, তাকেও বারণ করেছি বেশি কাছে আসতে—এত উইক হার্ট, কোনও এক্সাইটমেণ্ট্ সহ্য হবে না—কনস্ট্যাণ্ট্ কেয়ার নিতে হচ্ছে—

মিষ্টিদিদি বলেছিল—চলো একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসি—গাড়িটা বার করতে বলো—

ডাক্তার সান্যাল আপত্তি করলেন—এ অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় আপনার—উইক হার্ট নিয়ে...

মিষ্টিদিদি উঠলো। বললে—আর তো দুটো দিন—দুটো দিন হয়ত মোটে বাঁচবো—সারা জীবনই তো ভুগছি, এখন আর ভালো লাগে না—যা হয় হবে—

মনে আছে, যে দু'দিন ছিলাম উডমন্ড্ স্ট্রীটে, ডাক্তার সান্যাল দিনরাত মিষ্টিদিদির পাশে পাশে থাকতেন। কিন্তু আমার যেন কেমন ভালো লাগতো না। মিষ্টিদিদির পোষাক পরিচ্ছদেও তখন কোনও পরিবর্তন দেখিনি। সাড়ি, গয়না, সিল্ক, সেণ্ট্—তা-ও পুরোমাত্রায় রয়েছে। একবার মনে হলো—হয়তো স্বাস্থ্যের জন্যেই ও-সব পরেছে। হঠাৎ বৈধব্যের সাজ পরলে হয়ত জামাইবাবুর কথা বেশি করে মনে পড়ে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে শক্ লাগবে হার্টে। হয়ত সেইজন্যেই। হয়ত সেইজন্যেই জামাইবাবুর মস্ত অয়েল পেণ্টিংখানা হল্ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেরাত্রে মিষ্টিদিদির বাড়িতেই ছিলাম। শংকর এল সন্ধ্যের পর।

আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। বললে—পল্টুমামা তুমি—

বললাম—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—কোথাও না—

—সেই দুপুর বেলা বেরিয়েছিলি আর এলি এখন—এতক্ষণ কী করছিলি?

শংকর যেন আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখেছিলাম। বলেছিল—কিছু ভালো লাগছিল না, চৌরঙ্গীর ধারে মাঠে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিলাম একলা—একলা—

এ বয়েসের ছেলের পক্ষে এমন করে সময় কাটানো কেমন যেন অস্বাভাবিক।

বললাম—আজকাল খেলাধুলো করিস তুই? সেই টেনিস খেলা কেমন চলেছে তোর?

—এখানে এসে পর্যন্ত ও-সব ছুঁইনি পল্টু মামা—

সেদিন খাবার টেবিলে ডাক্তার সান্যালও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন মনে আছে। মিষ্টিদিদির পাশেই তার চেয়ার। ডাক্তার পাশে বসা দরকার। কখন মিষ্টিদিদির কী বিপদ হয়।

শংকর চুপ চাপ দূরে বসে খাচ্ছিল।

মিষ্টিদিদি একবার বললে—ঠাকুর, তোমার বুদ্ধি তো বেশ, খোকাকে অত গুচ্ছের মাংস দিয়েছ কেন শুনি?

শংকর অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে—আমাকে বলছ মা?

—হ্যাঁ তোমাকেই তো বলছি, অত খাও কেন, খাওয়াটা হবে লাইট, পেটে চাপ যেন না পড়ে—ঠাকুর না হয় ইডিয়ট্, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের স্কুলে এত সব শেখায়, হাইজিন্ শেখায় না?

ডাক্তার সান্যাল বললেন—আপনি অত উত্তেজিত হবেননা মিসেস সেন—

মাছের একটা মুড়ো চুষতে চুষতে মিষ্টিদিদি বললে—আমি আর ক'দিন ডাক্তার সান্যাল—কিন্তু ছোট ছেলেরা যদি এই বয়েসেই স্বাস্থ্যের গোড়ার কথাগুলো না শেখে তো কবে শিখবে—

ডাক্তার সান্যাল বললেন—আমি আপনাকে বারবার তো বলেছি মিসেস সেন, এইসব সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মোটে ভাববেন না—ওতে আপনার হার্ট আরও উইক হয়ে যাবে—

মিষ্টিদিদি ডাঁটা চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললেন—ঠাকুর আজকে চচ্চড়িতে ঝাল দিতে ভুলে গেছ তুমি—

ঠাকুর দাঁড়িয়েছিল পেছনে। বললে—কই, ঝাল তো দিয়েছি মা—

—ছাই ঝাল দিয়েছ—ডাঁটা চচ্চড়ি ঝাল না হলে খাওয়া যায়?

তারপরে আমাকে সাক্ষী মেনে মিষ্টিদিদি বললে—হ্যাঁ পল্টু, তুই বল্ তো—ঝাল হয়েছে চচ্চড়িতে?

বললাম—আমি তো চচ্চড়ি খাইনি—

—কেন? তুই চচ্চড়ি খাস্ না?

ঠাকুর বললে—ওটা শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম মা—

মিষ্টিদিদির গলা একটু চড়ে উঠলো—কেন? শুধু আমার জন্যে কেন? তুমি বুঝি আমাকেই খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও? আমি মরে গেলেই তোমরা সবাই বাঁচো না?

ঠাকুর রীতিমত অপ্রস্তুত। শংকরও দেখলাম খাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে আছে। আমিও কম অপ্রস্তুত হলুম না। আমাকে চচ্চড়ি না দেওয়াতেই তো এই কাণ্ড!

মিষ্টিদিদি বললে—আমার যেমন কপাল—যার হার্ট দুর্বল তার যে কেন বেঁচে থাকা—

তারপর মাংসর বাটিটা শেষ করে বললে—অথচ যার থাকবার কথা তিনি কেমন টপ্ করে চলে গেলেন—আর আমিই কেবল মরতে পড়ে রইলুম—

ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির মুখের কাছে মুখ এনে বললেন—আঃ, আমি বার বার আপনাকে বলেছি না মিসেস সেন, ওসব কথা

াটে মনে আনবেন না—ওতে মিছিমিছি র্বল হার্টকে আরো দুর্বল করা—

তারপর ঠাকুরকে বললেন—তুমি এখান কে যাও তো ঠাকুর, আর আমাদের কিছু ্কার নেই—তোমরা সবাই মিলে দেখছি র রোগটাকে বাড়িয়ে দেবে কেবল—

খানিক পরে আমার কানে কানে বললেন—ঙ্করকে নিয়ে তুমি চুপিচুপি টেবিল থেকে ঠ যাও তো পল্টু, দেখছো তোমার মিষ্টি-দি একসাইটেড হতে সুরু করেছে—াও শিগগির—

তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আমার। ঙ্করেরও খাওয়া শেষ হয়নি। কিন্তু মিষ্টিদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার াতলা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে, কান ুটো ঠিক যেন করমচার মতন লাল হয়ে ঠেছে। সত্যিই বোধহয় হার্টের ্যালপিটেশন হলে ওইরকম হয়।

সেদিন নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে উঠে াসেছিলাম খাবার টেবিল থেকে মনে আছে।

মনে আছে পরে ডাক্তার সান্যাল লেছিলেন—মিস্টার সেন এর শোকটা উনি খনও ভুলতে পারছেন না কিনা—ওইটেই দনরাত ভোলাবার চেষ্টা করছি দেখছনা মস্টার সেন-এর অয়েল পেন্টিংখানা পর্যন্ত াই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে—

আর একদিন বলেছিলেন—ওরা তো ছলেন আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফ্—াই শোকটা অত লেগেছে মিসেস সেন-এর, টনি তো মাছ মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন আমি দেখলুম এই স্বাস্থ্যের ওপর যদি আবার খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার চলে তা হলে তো আর বাঁচাতে পারবো না আমি শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে......

যে ক'দিন উডমণ্ড স্ট্রীটে ছিলাম সে ক'দিন কেবল মনে পড়তো জামাইবাবুর কথা! সত্যিই তো, তার তো যাবার কথা নয় এত শিগগির। কিন্তু এক একবার মনে হতো জামাইবাবু মরে গিয়ে বোধহয় বেঁচেছে।

শঙ্কর আর আমি এক ঘরে এক বিছানায় শুতাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হতো যেন পাশে উসখুস করছে শঙ্কর।

ডাকতাম—শঙ্কর—

—হুঁ—

—ঘুমোসনি এখনও?

—ঘুম আসছে না পল্টুমামা—

—কেন ঘুম আসছে না রে, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলি বুঝি?

—না, কোনওদিন রাত্তিরে ঘুম আসে না আমার—

—কেন?

—কী জানি—

বারো বছরের শঙ্কর সেদিন তার ঘুম না-আসার কোনও কারণ বলতে পারেনি। আমিও যেন কারণটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি সেদিন।

একবার ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন মনে আছে।

মিষ্টিদিদি বলেছিল—আমার আবার জন্মদিন কেন—আর ক'দিনই বা বাঁচবো—

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—আপনার জন্মদিনটা তো একটা উপলক্ষ্য মিসেস সেন—লক্ষ্য আপনাকে একটু আশা দেওয়া, আপনার জীবনটা যে মূল্যবান এইটে মনে করিয়ে দেওয়া, আপনি যেন এতে আপত্তি করবেন না মিসেস সেন—

মিষ্টিদিদি বলেছিল—কিন্তু আমি কি অত হৈ চৈ গোলমাল উত্তেজনা সহ্য করতে পারবো—আমার হার্টের যা...

আর ডাক্তার সান্যাল আমাদের উপহার-গুলো সামনের তেপায়া টেবিলের ওপর গিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তার সান্যাল দিয়ে-ছিলেন দামী হীরে সেট্ করা একটা ব্রোচ। এখন মনে হয়, সে-জিনিসের দাম তখন ছিল খুব কম করেও আট ন'শো টাকা।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল—এত দামী জিনিস কেন দিলেন আমাকে—আমি আর ক'দিনই বা পরতে পারবো এ-সব—

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—ওই সব কথা আজকের দিনে আর মুখে আনবেন না মিসেস সেন—

আমি আর শঙ্কর দিয়েছিলাম নিউ মার্কেট থেকে কেনা রজনীগন্ধার দুটো ঝাড়—

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল—ফুলই আমার

দেখছো তোমার মিষ্টিদিদি একসাইটেড হতে সুরু করেছে

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—আমি তো আছি মিসেস সেন—ভয় কি...আপনার দীর্ঘ-জীবনের কামনা নিয়েই তো এই উৎসব—সংসারের খুঁটিনাটি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা—এতে হার্ট বরং ভালোই হবে—আমি বলছি—আপনি কোনও কিছু করবেন না, আপনি যেমন রোজ ইজি চেয়ারটায় বসে থাকেন তেমনি বসে থাকবেন শুধু—আমরা পাঁচজনে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করবো—

তা হলেও তাই। ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হলো মিষ্টিদিদির ঘর। বিছানা, ফার্নিচার, ড্রেসিং টেবল, যেদিকে মিষ্টিদিদির চোখ পড়তে পারে সব দিকে শুধু ফুল আর ফুল। শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়েছিল মিষ্টি-দিদির সেই প্রথম জন্মোৎসব। মিষ্টিদিদি যেমন করে সেজে গুজে বসে থাকতো সেদিনও তেমনি করেই বসে ছিল। সন্ধ্যে-বেলা শুধু আমরা তিনজন—আমি, শঙ্কর

পক্ষে ভালো রে—ফুলের মতই দু'দিন আমার পরমায়ু—

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল মিষ্টিদিদির চোখ। পাতলা শরীর যেন থর থর করে কেঁপে উঠেছিল একটু। কিন্তু ডাক্তার সান্যাল ছিলেন তাই খুব সামলে নিয়েছিলেন সেদিন।

তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা মিষ্টিদিদির নাকের কাছে নিয়ে আমাদের বলেছিলেন যাও পল্টু শঙ্কর—তোমরা এখান থেকে শিগগির চলে যাও—মিসেস সেন-এর অবস্থা যা দেখছি......

মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা সেদিন সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রতি বছর যেখানেই থাকি, মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কখনও চিঠি কখনও টেলিগ্রাম গেছে আমার কাছে। আর প্রত্যেকবারই আমি এসেছি। কিন্তু ভুলেও কখনও ফুল উপহার দিইনি। ফুল মিষ্টি-দিদির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না।

ফুল দেখলেই নাকি তার মনে পড়তো ফুলের মতই তার ক্ষণস্থায়ী জীবন—ফুলের মতই তার পরমায়ু ক্ষণিক! ও কথাটা মনে পড়া হার্ট ডিজিজের রোগীদের পক্ষে তো মারাত্মক!

মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব প্রত্যেক বছরেই হতো। শুধু মাঝখানে বছর দুই বন্ধ ছিল। সে সময়ে ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নিয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে।

মিষ্টিদিদি নাকি প্রথমে রাজি হয়নি। বলেছিলেন—আর তো কটা দিন—তার জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা—

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি—

আমি তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয়ে চলেছি। কোনও খবর রাখতে পারিনি মিষ্টিদিদির। বিলাসপুর থেকে যাচ্ছি জব্বলপুরে। জব্বলপুর থেকে নাইনিতে। নাইনি থেকে এলাহাবাদে। শুনেছিলাম উডম্যান্ড স্ট্রীটের বাড়িতে শঙ্কর থাকতো একলা। কেমন যেন মায়া হতো ওর কথা ভেবে। জন্মের পর থেকে বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ ভোগ করবার অবকাশ হয়নি জীবনে। নিঃসঙ্গ নির্ভরহীন শৈশব কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে শঙ্কর। মনে হতো এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিলে ভালো হতো! কিন্তু কে দেবে?

সেবারে কথাটা পেড়েছিলাম মিষ্টিদিদির কাছে।

বলেছিলাম—এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিয়ে দাও মিষ্টিদিদি—

মিষ্টিদিদি বলেছিল—আর কটা দিন, তারপরেই তো আমার ইহলীলা শেষ, তখন সবাইকে ছুটি দিয়ে যাবো আমি, শঙ্করও বিয়ে থা করে সুখে থাকতে পারবে—আর দুটো দিন আমার জন্যে ও সবুর করতে পারবে না—

ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পর যেবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণ হলো—সেবার ভেবেছিলাম স্বাস্থ্য বোধহয় ফিরেছে মিষ্টিদিদির। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সেই একই অবস্থা। তেমনি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আগেকার মত।

আমার আনা উপহারটা সামনের টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেমন আছো মিষ্টিদিদি?

মিষ্টিদিদি তেমনি সিল্ক, সার্টিন, জর্জেটে স্নোতে পাউডারে মুড়ে বসে ছিল।

বললে—আমার আর থাকা—আর বোধহয় বেশি দিন নয়—

বললাম—বাইরে গিয়েও সারলো না শরীর?

মিষ্টিদিদি বললে—এ মরবার আগে আর সারছে নারে পল্টু—

বলে চকোলেট চুষতে লাগলো।

কিন্তু শরীর সারাবার জন্যে মিষ্টিদিদির চেষ্টারও তা বলে অন্ত ছিল না। ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতেন। কখনও পুরী, কখনও চিলকা, কখনও উটি, কখনও অন্য কোথাও। ডাক্তার সান্যাল কবে একদিন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন মিষ্টিদিদিকে। সে কোন যুগে। জামাইবাবু তখন বেঁচে। তারপর কতদিন কেটে গেল। রোগও সারলো না মিষ্টিদিদির। আর ডাক্তার সান্যালও গুরু দায়িত্ব থেকে বুঝি মুক্তি পেলেন না।

হঠাৎ সেবার শংকরের আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে দৌড়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

এমন আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটলো—যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে।

ভয় হয়েছিল এবার আর মিষ্টিদিদিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। শংকরের এমন শোকে নিশ্চয় মিষ্টিদিদি হার্ট ফেল করবে। সেবার জামাইবাবুর শোক মিষ্টিদিদি যদিও বা ভুলতে পেরেছে ডাক্তার সান্যালের চেষ্টায়, শংকরের অপমৃত্যুর আঘাত নিশ্চয়ই অসহ্য হয়ে উঠবে! হয়ত গিয়ে দেখবো শংকর তো নেই-ই, মিষ্টিদিদিও বেঁচে নেই আর।

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে উডমন্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছোলাম। শংকরের এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম শংকর হয়ত মিষ্টিদিদিকে আঘাত দেবার জন্যেই এই পথ বেছে নিয়েছে। হয়ত শংকর ভেবেছিল এই ভাবেই একমাত্র মিষ্টিদিদির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

কিন্তু শংকর তো জানতো না মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট।

ভেতরে ঢোকবার রাস্তাতেই বাইরের ঘরে ডাক্তার সান্যাল বসেছিলেন।

বললেন—পল্টু, এসেছ—শুনেছ বোধহয় খবরটা—?

বললাম—শংকর কেন এমন করলো? কী হয়েছিল?

ডাক্তার সান্যাল সে বৃত্তান্ত বললেন। বরাবর নির্বাক নির্বিরোধ শংকর, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি। মনে আছে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন—যদি সুইসাইড না করতো তো নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত শেষকালে—দেখতে—

বললাম—মাথা খারাপই বা হলো কেন?

ডাক্তার সান্যাল বললেন—ডাক্তারী শাস্ত্রে একে বলে মেনিয়া—বেশি ব্রুডিং নেচারের লোক হলে এরকম হয়—হয় সুইসাইড করে নয়তো পাগল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত—

তারপর বললেন—তোমার মিষ্টিদিদিকে যেন এ খবরটা বোলো না আবার পল্টু—ওঁকে জানানো হয়নি এখনও—

—মিষ্টিদিদি জানে না?

—না, জানানো হয়নি, জানালে এ-যাত্রা আর বাঁচাতে পারতুম না। মিস্টার সেন-এর বেলায় জানি কিনা—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো, ছেলের মৃত্যু কোনও মা-ই সহ্য করতে পারে না—তার ওপর মিসেস সেন-এর হার্ট-এর অবস্থা এখন আরও খারাপ, যে-কোনও দিন যে-কোনও বিপদ ঘটতে পারে—

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে মিষ্টিদিদির ঘরে ওঠবার সময় মনে আছে আমার যেন খুন চেপে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল—শংকরের অপমৃত্যুর খবরটা আমিই শোনাবো মিষ্টিদিদিকে। দেখি পরখ করে মিষ্টিদিদির হার্ট ফেল হয় কিনা! যদি হয় তাতেও আমার দুঃখ নেই। মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদির নাম কে রেখেছিল জানি না, কিন্তু মিষ্টিদিদির কোনও-খানটা যেন আর মিষ্টি নয়।

কিন্তু সমস্ত সংকল্প আমার মিষ্টিদিদির সামনে গিয়ে ভেসে গেল।

সেই সিল্ক, সেন্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডার। সেই ইজিচেয়ার—সেই শরীর খারাপের অভিযোগ। সেই চকোলেট চোষা। সেই ঝি-এর বসে বসে পায়ে হাত বুলোন।

সত্যি, কিছুই বলতে পারলাম না সামনে গিয়ে।

মিষ্টিদিদি বললে—আর কটা দিন, তারপর তোদের সবাইকে মুক্তি দেব পল্টু—বলে চকোলেট চুষতে লাগলো মিষ্টিদিদি।

উডমন্ড স্ট্রীট থেকে তার পরদিন দেশে গিয়েছিলাম। মা বললে—শংকর আমাদের সোনার টুকরো ছেলে তাই অপঘাতী হলো, নইলে অন্য ছেলে হলে মাকেই খুন করতো—মনোহরদাও বেঁচে থাকলে ও-মেয়েকে গুলী করে মারতো দেখতিস—

বুঝতে পারলাম না। বললাম—কেন?

—তা না তো কি, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে, তা নয় বিধবা মাগী বিয়ে করে বসলো—শংকর কি সাধ করে অপঘাতী হয়েছে ভাবিস—

বললাম—কে বিয়ে করেছে?

—ওই মিষ্টি, ডাক্তারকে বিয়ে করে বসলো অত বড় ছেলে থাকতে!

তা এসব ঘটনাও প্রায় পনেরো বিশ পঁচিশ বছর আগেকার। তারপর প্রতি বছরেই মিষ্টি-দিদির জন্মদিনটিতে কলকাতায় গেছি। উপহার দিয়ে এসেছি যথারীতি। ডাক্তার সান্যাল প্রতিবারের মত মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যের জন্যে সতর্কতা নিয়েছেন। কোনও উত্তেজনা না হয়, কোনও অশান্তি না হয় মনে। তা হলেই মিষ্টিদিদিকে আর বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার সান্যাল বারবার বলেছেন মিষ্টিদিদির হার্টের যা অবস্থা তাতে যে কোনও দিন যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু গত পনেরো বিশ পঁচিশ বছরে কত কোটি কোটি মুহূর্তে নিঃশব্দে মহাকালে গিয়ে লয় হয়েছে, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি! তারপর যেবার ডাক্তার সান্যালেরও মৃত্যু-সংবাদ পেলাম সেবারও ভালো করে জানতাম কিছুই ঘটবে না মিষ্টিদিদির। বেশ জানতাম মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট। ভালো করেই জানতাম মিষ্টিদিদি আর যা-ই হোক—মিষ্টি নয় মোটেই। তবু গেছি মিষ্টি-দিদির বাড়িতে। মিষ্টিদিদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারিনি কখনও।

এই গত বছরেও আবার মিষ্টিদিদির জন্ম-দিনে কলকাতায় এসেছিলাম।

ভালো করেই জানতাম—মিষ্টিদিদি তেমনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। পায়ে সুড়সুড়ি দেবে ঝি। সিল্ক, সেণ্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে সেজেগুজে চুপ করে থাকবে। তেমনি প্রতিবারের মতই উপহার দেব। রাখবো গিয়ে তেপায়া টেবিলের ওপর।

বলবো—কেমন আছো মিষ্টিদিদি—

মিষ্টিদিদি তেমনি করেই বলবে—আমার আর থাকা, আর তো দুটো দিন—দুটো দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো রে পল্টু—

বলে মিষ্টিদিদি তেমনি করেই ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চকোলেট চুষবে আর আরামে গা এলিয়ে দেবে প্রতিবারের মত। সত্যি, সৃষ্টিকর্তা যেন মিষ্টিদিদিকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছিল এ-সংসারে।

কিন্তু গতবারের জন্মদিনে মিষ্টিদিদি সত্যি সত্যিই আমায় অবাক করে দিয়েছিল।

উডমন্ড স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েও প্রথমে কিছু টের পাইনি। তেমনি চাকর-বাকর-ঝি-মালি সবই ছিল। কিন্তু সেই পরিচিত ইজিচেয়ারটা খালি।

একজন ঝিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মিষ্টিদিদি কোথায়?

ঝি বললে—ঘরে শুয়ে আছেন—অসুখ করেছে—

জিজ্ঞেস করলাম—অসুখ কবে হলো?

ঝি বললে—কাল থেকে, হঠাৎ পড়ে গেছেন কাল—

তা সত্যিই অসুখ হয়েছিল মিষ্টিদিদির। ঘরে গিয়ে দেখি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপর। সমস্ত দেহটা অসাড়। অনড়। ধরে পাশ ফেরাতে হয়। মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হয়। সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। প্যারালিসিসে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে মিষ্টিদিদিকে। তবু তারি মধ্যে কেউ বুঝি পাউডার স্নো রুজ, লিপষ্টিক মাখিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে। পায়ে কোনও সাড় নেই। তবু একজন ঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে নিচেয় বসে বসে।

বরাবরের অভ্যাস মত বলেছিলাম—কেমন আছো মিষ্টিদিদি—

মিষ্টিদিদি আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিল, কিছু কথা বলতে পারেনি। শুধু ঠোঁট দুটো যেন ঈষৎ নড়তে লাগলো। মনে হলো যেন বলতে চাইছে—আমার আর থাকা-থাকি......আমার আর ক'টা দিন—কটা দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো পল্টু... এবার সত্যি আর বেশি দিন নয়......

মিষ্টিদিদির চোখ দিয়ে জল পড়ে পাউডার স্নো ধুয়ে গেল। মিষ্টিদিদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম জীবনে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল মিষ্টিদিদি যেন এখনও মিথ্যে কথা বলছে—ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের—এ-ও যেন ভাণ, এ-ও যেন মিষ্টিদিদির নতুন একরকমের ছল। একেবারে না মরলে আর মিষ্টিদিদিকে বিশ্বাস নেই......

তা এ হলো গত বছরের কথা।

এবারও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিন। চিঠি পেয়ে মিষ্টিদিদির জন্মদিনে এবারও আবার কলকাতায় এসেছি।

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ভূমিব্যবস্থার সংস্কার

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পশ্চিম বাংলায় জমিদারী উচ্ছেদ বিল অবশেষে আইন-সভায় আনা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, আইনসভা হতে তা শীঘ্রই পাশ হয়ে যাবে। আমাদের দেশে ভূমি ও ভূমিজ আয়ই অর্থনৈতিক কাঠামোর খুব বৃহৎ অংশ পরিব্যাপ্ত করে আছে। সেইজন্য ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার না হলে দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর বদল হবে না। এদিকে নজর পড়তে শুরু হয়েছে সে কথা সেই-জন্য আশার কথা।

কিন্তু আশার কথা হলেও এ প্রসঙ্গে ভাববার কথা অনেক আছে। এমন এক সময় ছিল যে সময় অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, জমিদারদের সরিয়ে দিলেই দেশের জনসাধারণের বিশেষ করে চাষীদের অবস্থা ফিরে যাবে। তা ছাড়া ভূমি হতে আয়ের বহু অংশ জমিদারদের হাতে থেকে যাচ্ছে এবং তা রাষ্ট্রের হাতে এসে জনহিতার্থে ব্যয় হতে পারছে না। আজ কিন্তু চিন্তা-ধারার বদল হয়েছে। সরকারী আয়ের খতিয়ানে ভূমি রাজস্ব আর খুব একটা বড় দফা নয়, তার চেয়ে বেশী আয় একসাইজ বা সেলস ট্যাক্স থেকে হয়। আর জমি-দারদের তো সরাতেই হবে কিন্তু সেই সঙ্গে আরও ব্যবস্থাও করতে হবে—তা না হলে চাষীর অবস্থা ফিরবে না এই বোধও জনসাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে সঞ্চয় করছে। আগে লোকে জমিদারী উচ্ছেদকে দেখতো কেবল মালিকানার আইনগত পরিবর্তন হিসেবে; এখন সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটাকে অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠন হিসেবে লোকে বুঝতে শুরু করেছে। সেই দিক থেকে পশ্চিম-বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে দু চারটি কথা আলোচ্য।

২

পশ্চিম বাংলায় জমিদারী উচ্ছেদ সম্বন্ধে যে বিলটি আনা হয়েছে তার মোদ্দা কথা তিন চারটি। তার প্রথম কথাটি হল, উপস্বত্বভোগীদের স্বত্ব উচ্ছেদ করা হবে। এই উপস্বত্বভোগী কারা? দুই ধারায় বলা হয়েছে যারা মালিক এবং মধ্যস্বত্বভোগী (যেমন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার ইত্যাদি) রায়তি প্রজা বা চাঁদনী প্রজার উপরে আছে তারাই উপস্বত্বভোগী। অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে বা চাঁদনী প্রজাস্বত্ব আইনে যারা প্রজা বলে স্বীকৃত তারা উপ-স্বত্বভোগী নয়, তাদের উপরের থাক-গুলিই উপস্বত্ব। সে হিসেবে উপস্বত্ব উচ্ছেদ হলে কেবলমাত্র ঐ সব উপরের থাকগুলিই উচ্ছেদ হবে। দ্বিতীয় মোদ্দা কথা হল, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রজারাও আবার নিজেরা চাষ না করে ভাগ-চাষী বা কোলরায়তদের উপর চাষের ভার ছেড়ে দিয়ে নিজেরা খাজনা উপভোগ করছে। সে ক্ষেত্রে তারা আইনের প্যাঁচে নামমাত্র প্রজা হলেও কার্যত ছোটখাট—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে খুব বড় বড়—উপস্বত্বভোগী জোতদার। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের উচ্ছেদ না করবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। সেইজন্য বিলটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার প্রয়োজনবোধ করলে এই ধরনের প্রজাদের উপস্বত্বও উচ্ছেদ করতে পারবেন। তবে এদের বেলায় ক্ষতি-পূরণের হার হবে ল্যান্ড এ্যাকইজিশন আইন অনুসারে অর্থাৎ বাজার দরে। জমিদার বা পত্তনীদারদের মত নিচু হারে নয়। তৃতীয় মোদ্দা কথা হল জমিদার ও পত্তনীদার ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে—নীট আয় যত বেশী হবে ক্ষতিপূরণের হার তত কম। প্রথম এক হাজার টাকা আয় পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের হার হল আয়ের পনের গুণ; অন্য দিকে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে যে আয় তার ক্ষতিপূরণ চার গুণ। দেবত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আয়ের বেলায় অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের পরি-মাণ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী না হলে নগদ দেওয়া হবে,—অন্যথায় ঋণপত্রে দেওয়া হবে। চতুর্থ মোদ্দা কথা হল এই যে, উপস্বত্ব উচ্ছেদের সময় জমির মালি-কানার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতলস্থ সকল অধিকার, খনিজ দ্রব্যে অধিকার, হাট-বাজার খেয়াঘাট বন ও অন্যান্য সায়রাতি স্বত্ব, এস্টেটের জমিতে অবস্থিত বাড়ি ইত্যাদি সমস্ত স্বত্বই উচ্ছেদ হবে। কেবল কয়েকটি জিনিস ভূতপূর্ব মালিকদের ছেড়ে দেওয়া হবে, যথা—বাস্তুভিটা, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পাকা বাড়ি, পনের একরের অনধিক খাস চাঁদনী জমি, দোফশলী খাস জমির অনধিক পঁচিশ একর ও তৎসংলগ্ন পুকুর, চাবাগান ও ফলের বাগান, মিল ফ্যাক্টরী ও কারখানা ইত্যাদি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় আরও কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই যে সব ছাড় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সব-গুলিতেই ভূতপূর্ব মালিকদের ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রজা হয়ে থাকতে হবে এবং ঐ সব স্বত্বের জন্য খাজনা দিতে হবে—কেবল বাস্তু ভিটার খাজনা লাগবে না। পঞ্চম মোদ্দা কথা হল, এই সব স্বত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর রাষ্ট্র কি নূতন ভূমিব্যবস্থা প্রচলন করবে। এ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিলে কোনও চিত্রই দেওয়া হয় নি, সবটাই রাষ্ট্র খুশি মত ভবিষ্যতে করবেন বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে কোনও স্থানীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উপরও রাজস্ব আদায়ের ভার দিতে পারেন। বিলের ১২ ধারাটির প্রয়োজনীয় অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি।

All estates and all interests of intermediaries therein, which have vested in the State....shall be managed according to such rules as the State Government may from time to time make in this behalf: Provided that the State Government may at any time, if it so **thinks fit, entrust** the management of such estates and such interests to any local body or agency on such terms and conditions, as it **may, by general or special order, fix.**

এর বেশি কোনও কথা বিলটিতে নেই। সবটাই রাজ্য সরকারের উপর এবং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাই কি ধর্মের পরাকাষ্ঠা নয় ? …

বস্তুত এ সব বিষয়ে যাঁরা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় কেবল প্রথম ধাপ হিসেবেও যেটুকু করবার দরকার ছিল এই বিলে সেটুকুও নেই। এ বিষয়ে আমি over-revolution-এর পক্ষপাতী নই, কেননা স্বয়ং লেনিন বলে-ছিলেন over-revolution মানে counter-revolution. এত বেশী না করলে এখন কিছুই কোরো না, এ রকম স্বল্পবেশী প্রতিবিপ্লবী কৌশল জগতে ব্যবহৃত হতে প্রায়ই দেখা যায়,—এমন কি এই বিষয়টি সম্বন্ধেও হয়েছে। সেইজন্য এই বিষয়টি আর ধামাচাপা পড়তে দেওয়া প্রতিবিপ্লবী বা অতিবিপ্লবী কোনও অজুহাতেই উচিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, এমন কি যে সব জিনিস অন্যান্য রাজ্য সরকারও করেছেন, সেটুকুও না হলে বিলটি কার্যক্ষেত্রে অচল হয়ে যাবে একথা প্রত্যেক লোকেরই ভাবার প্রয়োজন আছে।

এই প্রসঙ্গে তুলনা হিসেবে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের আইনটির কথা উল্লেখ করছি। জমিদারদের উচ্ছেদ করা হবে, বেশী আয় হলে ক্ষতিপূরণের হার কম হবে ইত্যাদি কথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আইনগুলিতে প্রায় একইরকম। সেখানে হেরফের যা সামান্য আছে, তা সুদূরপ্রসারী বা মৌলিক নয়। কিন্তু মৌলিক তফাৎ ঘটে যায় জমিদারের তলায় উপস্বত্বভোগী কতদূর হবে, তাই নিয়ে এবং ভবিষ্যতে ভূমিব্যবস্থা কি হবে তাই নিয়ে। বিহারের বা উড়িষ্যার আইনে নূতন ভূমিব্যবস্থার কোনও নির্দেশ নেই। কিন্তু উত্তর প্রদেশের আইনে আছে। ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণে সেখানে উপস্বত্বভোগীর এত স্তরও গড়ে ওঠে নি। তবু সেখানে প্রত্যক্ষভাবে চাষীদের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করা হয়েছে। আইনটির দ্বিতীয় অংশে গ্রামসমাজ ও গ্রামসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে; তারা কৃষির উন্নতি, বন বজায় রাখা, গ্রামের রাস্তার উন্নতি, হাট-বাজার চালানো, জমি একত্রিকরণ, কুটির-শিল্পের উন্নতি, মাছের চাষ ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকবে। ভূমিদার, সিরদার এবং আসামি —এই তিনরকম ছাড়া অন্য কোনরকম প্রজা-স্বত্ব থাকবে না। উক্ত আইনের ১৯ ধারায় যে সব চাষী পড়ে, তারা হবে সির জমির মালিক; যারা অস্থায়ী স্বত্বে কতকগুলি বিশেষ চাষ করত, তারা হবে আসামি। বাকি সবাই ভূমিদার। এরা কি সর্তে ভূমিদার হয়েছে, তা এখন সবাই জানেন। তারা তাদের পূর্বতন বার্ষিক খাজনার দশগুণ টাকা জমা দিয়ে এই স্বত্বের অধিকারী হয়েছে। গো-চারণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে সির-দারী অধিকার জন্মাবে না। ভূমিদারী স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য বটে, কিন্তু তাতে অনেক বাধানিষেধ করা হয়েছে; যদি কোনও হস্তা-ন্তরের ফলে ভূমিদারের জমি মোট ত্রিশ একরের বেশী হয়ে যায়, তাহলে তা হস্তান্তর করা চলবে না; জমি বন্ধক রেখে এমনভাবে ধার করা চলবে না যাতে পরে মহাজনকে জমি কোবালা করে দেবার সর্ত থাকে; বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন অশক্ত অসমর্থ বা বিধবা বা নাবালক হলে) জমিতে উপস্বত্ব স্থাপন চলবে না; বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভূমি-দারের জমি সিরদারের হাতে যাবে না বা সিরদারের জমি ভূমিদারের হাতে যাবে না; কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে ভূমিদারী স্বত্বেরও উত্তরাধিকার থাকবে না—অন্য ক্ষেত্রে ভূমি-দারের মৃত্যু ঘটলে কিভাবে উত্তরাধিকার হবে তা-ও ১৭১ ধারায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পার্টিশনের অনুমতির ব্যবস্থাও আছে। ভূমিদার উচ্ছেদযোগ্য হবে না। গ্রামের সমস্ত ভূমিদার ও সিরদার সম্মিলিত এবং এককভাবে, সরকারী রাজস্বের জন্য দায়ী থাকবে। সরকারী রাজস্বও নির্ধারিত হবে গ্রামের ভূমিদার ও সিরদারদের সমস্ত জমি একত্র হিসেব করে। রাজস্ব স্থির করবার সময় জমির ফসলের পরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে এবং বাড়তি ফসলের কত ভাগ রাজস্ব ধার্য হবে তা ঠিক করা হবে graduated scale-এ,—অর্থাৎ যার ফসল সবচেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত থাকবে তার উপর সবচেয়ে চড়া হারে রাজস্ব ধার্য হবে (২৬৪ ধারা)। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রেই ভূমিদারদের উপর শতকরা ৫০ ভাগের উপর রাজস্ব ধার্য করা হবে না। রাজস্ব না দিলে গ্রেপ্তার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল, রাজস্ব বাকি পড়লে কলেক্টর সারা গ্রামটিকেই ক্রোক করতে পারবেন (২৮৯ ধারা)। জমির মালিকেরা সমবায় প্রতিষ্ঠান হলে সেই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে জমি সেই প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করতে পারবে (২৯৮ ধারা)। যাদের জমি অর্থনৈতিক ইউনিটের কম এরকম প্রজাদের ২/৩ অংশ দরখাস্ত করলে

সমবায় সমিতি গড়ে দেওয়া হবে (২৯৯ ধারা)। ঐসব মালিকের উত্তরাধিকারীরাও মালিকদের মৃত্যুর পর সমবায় সমিতির অংশীদার হবেন (৩১৩ ধারা)। ঐসব সমিতির কর্তব্য হবে জমি একত্র করা (৩১৪ ধারা)। অর্থনৈতিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই আইনও যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি। তা হলে অন্তত এতখানি হস্তান্তর খণ্ডীভবন ও নির্বাধ উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা থাকত না। তা ছাড়া চাষের সম্বন্ধে আরও ব্যাপক ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এই আইনে চাষীদের স্বত্ব ও চাষের ব্যবস্থা নিয়ে তবু কিছুটা বিধান করা হয়েছে—যা পশ্চিমবাংলার বিলে একেবারেই নেই। এর অর্থ এ নয় যে. পশ্চিম বাংলায় ঐসব বিষয়ে উত্তর প্রদেশের বিধানই কাম্য। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা নয়। যেমন উত্তরপ্রদেশে চাষীরা যেসব অধিকার এতদিন পেয়েছে, সে সব অধিকার বাংলার চাষী বহুকাল থেকেই ভোগ করে আসছে। সে হিসেবে চাষীদের মালিকানা আরও বিস্তৃত করার প্রশ্ন উত্তরপ্রদেশে উঠতে পারে—বাংলায় নয়। কিন্তু প্রশ্নটা সেখানে নয়। প্রশ্নটা হল এই যে, তারা তাদের প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অনুসারে এবিষয়ে যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখানে কিছুই আপাতত করা হয়নি। সেই কারণে ভূমি ব্যবস্থায় কি কি অর্থনৈতিক ব্যাপার ঘটছে, তা ভাল করে উপলব্ধি না করতে পারলে আমরা প্রকৃত ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের পথ খুঁজে পাব না। এই অর্থনৈতিক ব্যাপার বুঝতে গেলে ইতিহাসের দিকেও একটু মুখ ফেরানো দরকার, বর্তমান অবস্থাটাও ভাল করে জানা দরকার।

৩

ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভবও নয়, তার কোনও প্রয়োজনও নেই। দু একটি প্রধান প্রধান কথার উল্লেখ করছি। মোগল সাম্রাজ্যের সময় চাষী-জমিদারদের সম্বন্ধ একালের মত বিধিবদ্ধ আইনে নিয়ন্ত্রিত ছিল না বটে, কিন্তু চাষীদের দুটি বড় অধিকার ছিল। প্রথমটি হল খাজনার হার। যেটি আসল জমা সেইটেই ছিল খাজনা। টাকার দরকার হলে বিভিন্ন সময়ে তার উপর আবওয়াব চড়ানো হয়েছে বটে, কিন্তু আসল জমা বদলায় নি। অর্থাৎ খাজনার একটা স্থায়িত্ব বরাবরই মেনে আসা হয়েছে। তার উপর আজকালকার সেস-এর মত আবওয়াব সুজা খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁ ইত্যাদি চড়ালেও আসল খাজনার নড়চড় হয়নি। দ্বিতীয়ত তখন বহু জমি পতিত ছিল এবং প্রধানত চাষবাসের উপরই সরকারী রাজস্ব নির্ভর করত। সেইজন্য চাষবাস একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে রাজস্বের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য যারা খোদকস্ত প্রজা—অর্থাৎ যাদের বাস্তুভিটে এবং ক্ষেতখামার একই গ্রামে, তাদের পারতপক্ষে উচ্ছেদ করা চলত না। এই হিসেবে খাজনার স্থায়িত্ব এবং অধিকারের স্থায়িত্ব এই দুটি দিকেই চাষীরা কার্যক্ষেত্রে অনেকখানি অধিকার উপভোগ করত এর বহু প্রমাণ সেকালের কাগজপত্রে আছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সবই গেল উল্টে। ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থার প্রধান দুটি স্তম্ভ হল কনট্র্যাক্ট বা চুক্তির অবাধ অধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ঝোঁক। বর্তমানে অবশ্য আমরা বুঝতে পেরেছি এই দুটির অবাধ ব্যবহার কি সংকট সৃষ্টি করে। চুক্তির অবাধ অধিকার আসলে হয়ে দাঁড়ায় সবল কর্তৃক দুর্বলকে পীড়নের যন্ত্রমাত্র, কেননা সমানে সমানে চুক্তি না হলে আসলে কোনও চুক্তিই হতে পারে না। আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ঝোঁক পড়তে পড়তে বহু সময়েই যে সমাজের ক্ষতি হয় এবং পরিণামে তা সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় সংকট নিয়ে আসে সেকথাও এখন নূতন করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্যাপিটালিজমের এই দুটি মূলমন্ত্র শিল্প বা বাণিজ্যে অবস্থাবিশেষে কিছু পরিমাণে চলা সম্ভব হলেও কৃষি ও ভূমির ব্যাপারে তা একেবারেই অচল। কেননা, প্রত্যেক দেশেই ভূমি সীমাবদ্ধ—রাষ্ট্রের স্বার্থে তার যেমন খুশি ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে দেওয়া একেবারেই চলে না। বিশেষত এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ভর করে প্রধানত ভূমির উপরে—সেইজন্য সেখানে এরকম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও অচল। অথচ ইংরেজ আমলের গোড়ায় আমাদের ভূমিব্যবস্থায় ঠিক এই অচল জিনিসই প্রবলভাবে চালু করা হয়। দেওয়ানী গ্রহণের পর হতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত তো কোম্পানী আটাশ বছর ধরে কেবলই যেন তেন প্রকারেণ রাজস্ব আদায়ের নির্মম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করেনি, যার ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। সেই মন্বন্তরে চাষের জমি অর্ধেক পতিত হয়ে যায়, জনসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমে। তারপর যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে একটা বাঁধাধরা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হল, তখন তার রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিলেও অর্থনৈতিক দিকে দেখা যায় মৌলিক সূত্রগুলির একেবারে বদল ঘটানো হয়েছে। প্রথমত চাষীদের অধিকার সমস্তই অস্বীকার করা হল। জমিদারেরা জমির মালিক হলেন, কিন্তু চাষীকে রক্ষা ও চাষের উন্নতির ব্যাপারে কোনও আইন রইল না। তাঁদের অবাধ অধিকার দেওয়া হল প্রজাদের উপর, প্রজারা চুক্তি পালন না করলে তাদের আটকে রাখার অধিকার পর্যন্ত পরে দেওয়া হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে, জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থে চাষীকে রক্ষা ও চাষের উন্নতি করবেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুকালের মধ্যে এমনই বদলে গেল যে, জমিদারদের আর প্রজা খুঁজতে হল না, প্রজারাই জমি খুঁজতে লাগল। সুতরাং চাষীকে রক্ষা করার আর কোনও তাগিদ জমিদারদের রইল না। উপরন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি অনুসারে যত আইন পাশ হতে লাগল ততই উপস্বত্ব বাড়তে লাগল। জমিদার তো মালিক, অতএব তিনি যদি পত্তনীদারকে ইজারা দেন তো কার কি বলবার আছে? আবার পত্তনীদার যতটুকু মালিকানা পেয়েছেন তারই অধিকারে তিনি যদি দরপত্তনীদার বসান তাতেই বা কার কি বলবার আছে? পত্তনী রেগুলেশন পাশ হবার পর থেকে এই ধারাই চলতে লাগল। আর চাষীদের তখন কোনও আইনগত অধিকার ছিল না। অতএব জমিদার যদি ভালো বুঝে চাষীকে উচ্ছেদ করেন তাতেই বা কার কি বলবার আছে? কিন্তু এইভাবে চলতে চলতে যখন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ জিনিস চলতে পারে না তখন চাকা ঘুরল।
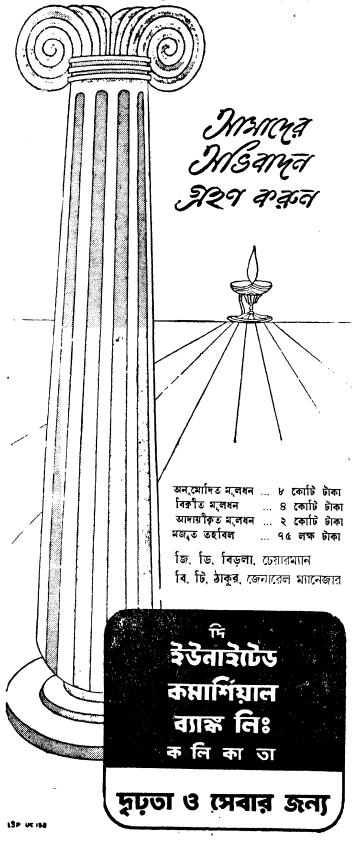
১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে চাষীদের প্রায় সম্পূর্ণ মালিক করে দেওয়া হল। সে আইনেও হস্তান্তর প্রভৃতির কিছু বাধা ছিল—জমিদারদের সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল। ভাবটা যেন এই যে, যখন জমিদারেরাই চাষের উন্নতির জন্য দায়ী (যদিচ তাঁরা তা মোটেই ছিলেন না) তখন প্রজা বেছে নেবার অধিকারও তাঁদের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, জমিদারেরা ঐ অধিকার প্রয়োগ করেন চাষের উন্নতির জন্য নয়, টাকা আদায়ের অস্ত্র হিসাবে। নতুন প্রজা টাকা দিলেই কোথায়ও সম্মতির অভাব হয় না। ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে সেই কথাটাই খোলাখুলি বলা হল এই সব হস্তান্তরের উপর একটা ফী বসিয়ে দিয়ে। ১৯৩৮ সালের সংশোধনে সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন খাজনা দিয়ে গেলেই প্রজারা কার্যক্ষেত্রে পুরো মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৮৮৫ সাল হ'তে এখন পর্যন্ত চাষের ও চাষীর অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থ-নৈতিক কারণগুলির বিশ্লেষণ ও যথাব্যবস্থা করা হয়নি। যেন জমিদারের বদলে চাষীরা মালিক হলেই সব সমস্যা মিটে গেল। এই মালিকানার উপর ঝোঁক একেবারে ধনতান্ত্রিক মনোভঙ্গীর লক্ষণ। কিন্তু তা'তে সমস্যা যে মেটেনি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, চাষীরা মালিক হবার পর থেকে সেখানে অবাধে জমি হস্তান্তর হয়েছে, ফলে জমি গিয়েছে জোতদার ও মহাজনদের হাতে, জমির মালিক চাষী পরিণত হয়েছে ভাগ-চাষীতে। তা ছাড়া যেখানে প্রজারা মালিকানা-চ্যুত হয়নি সেখানেও তারা কোল-রায়ত ইত্যাদি নানা under tenant এবং ভাগচাষী আমদানি করে নিজেরা ক্ষুদে জমিদার ও উপস্বত্বভোগী হয়ে বসেছে। তারা মালিক, তাদের অধিকার আছে, তারা যদি ইজারা দেয় তো কার কি বলবার থাকতে পারে। সেইজন্য এককালে জমিদারদের স্তরে যে পর্ব ঘটে গিয়েছিল প্রজাদের হাতে অধিকার আসা মাত্র প্রজাদের স্তরে আবার সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল—সবই মালিকানার খেলা! সেই কারণে আজ যারা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞায় 'প্রজা' তারা যে সকলেই চাষী এমন কথা যেন কেউ কল্পনা না করেন। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা নয়। 'প্রজাও' ক্ষুদে উপস্বত্বভোগী,—আসল চাষী হল হয়তো ভাগচাষীরা। আজ যদি ভাগচাষীদের আবার মালিক করে দেওয়া হয় এবং সে মালিকানার উপর কোনও বিধিনিষেধ না থাকে তাহলে বর্তমান অবস্থায় দেখা যাবে যে, কিছুকালের মধ্যেই তারাও আরও ক্ষুদে মালিক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নীচে বিভিন্ন স্বত্ব সৃষ্টি হতে থাকবে। কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে অনুধাবন করে সেই অনুসারে

মালিকানা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে এ জিনিস বন্ধ হতে পারে না। মালিকানা দিয়ে তারই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এইসব সমস্যার সমাধান হবে, এই ক্যাপিটালিস্ট ধারণা সম্পূর্ণ অচল। বিশেষত আমাদের দেশের মত ভূমিপ্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং এখনকার মত সংকটাপন্ন অবস্থায়।

ভূমিব্যবস্থার আইনগত কাঠামোর ফলাফল কি হয়েছিল সে কথার আলোচনা উপরে করেছি। তা হতে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক দিক্‌টাও আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গত দেড় শ' বছরের অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রধান দিক্‌গুলির উল্লেখ সংক্ষিপ্তভাবে করি। এই দেড় শ' বছরকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, ১৭৭০ সাল (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) হতে ১৮৭০ সাল। দ্বিতীয়, ১৮৭০ সাল হতে ১৯১৪-১৮ সাল। তৃতীয়, ১৯১৮ সাল হতে ১৯৪৬ সাল। চতুর্থ, ১৯৪৬ সাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

পূর্বে বলেছি, হাণ্টার সাহেবের মতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মোট জনসংখ্যার ⅓ অংশ (চাষীদের ½ অংশ) মারা গিয়েছিল এবং কর্ষিত জমির পরিমাণ ⅓ কমে গিয়েছিল। তার উপর আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও চাষীরা কেবল ভূমিনির্ভর ছিল না। আখ তামাক নীল পাট তুলা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ তো যথেষ্টই ছিল—কোলব্রুক, বুকানন-হ্যামিলটন এবং অন্য বহু লোকের রচনায় ও রিপোর্টে তার বর্ণনা আছে—কিন্তু তা ছাড়া গোপালন, ফলের বাগান হতে শুরু করে হাতে পাট বোনা বয়নশিল্প ইত্যাদি বহুবিধ কুটীরশিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এইসব বহুমুখীন আয় থাকায় চাষীদের অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু বৈদেশিক মূলধন ও যন্ত্রশক্তির আঘাত, সেই সঙ্গে এখানে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার, কৃষি ও ভূমিব্যবস্থার বদল, অস্বাভাবিক বৈদেশিক বাণিজ্যব্যবস্থার ফলে কৃষির ও কৃষকের শোষণ এবং সর্বোপরি সমস্ত কুটীরশিল্প ও অন্যান্য আয়ের ধ্বংস—এই সমস্ত কারণে চাষীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তারা সম্পূর্ণ জমি-নির্ভর হয়ে পড়ল, উপরন্তু ছিয়াত্তরের ধাক্কায় তারা দুর্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে পড়ল, তার উপর চাপল ধনতান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক বহির্বাণিজ্যের জন্য বাধ্যতামূলক কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি। সুতরাং সে অবস্থার নিদারুণতা সহজেই বোঝা যায়। এ অবস্থায় বহু জমি পতিত হয়ে থাকবে তা আশ্চর্য নয়। সেইজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিক পরেই জমিদারেরাই প্রজা খুঁজে বেড়াতে বাধ্য হতেন, নতুন জমি হাঁসিল করবার জন্য প্রজাদের কিছু সুবিধাজনক সর্তও দিতেন এসব প্রমাণ আছে। এমন কি, অন্য কোনও জমিদার চাষীদের বেশি সুবিধা দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে না যেতে পারে তার জন্যও হফ্‌তম পন্‌হম রেগুলেশনের বলে আটক করবারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মোটামুটি ১৮২৫ সাল নাগাৎ অবস্থা বদলে গেল। জনসংখ্যা বেড়ে আবার পূর্বের মতই হয়ে দাঁড়াল। অথচ এ সময় আর পূর্বের মত অন্য কোনও জীবিকা ছিল না—বরং যা ছিল তা-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। সুতরাং জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর চাপ পড়তে শুরু হল। সৌভাগ্যবশত তখনও পতিত জমি অনেক ছিল—গ্রাণ্ট সাহেবের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাত্র বাংলার ১/৫ অংশে চাষ হত এবং কর্ন-ওয়ালিশের মতে এক-তৃতীয়াংশ চাষযোগ্য জমি সে সময় পড়ে ছিল। সুতরাং জমি হাঁসিল হতে শুরু হল। এই আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারেরা উপস্বত্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন—পত্তনী রেগুলেশন পাশ হয় ১৮১৯ সালে। অর্থনৈতিক বিবর্তন এইভাবে চলতে থাকায় জমিদারদের আর চাষীরক্ষা ও চাষের বিস্তার করবার কোনই তাগিদ রইল না, প্রজারাই প্রাণের তাগিদে চাষ বিস্তার করতে শুরু করল। জমি-দারেরাও খাজনা বৃদ্ধি শুরু করে দিলেন। ১৮২২ সালের ১১নং রেগুলেশন হতে শুরু করে ১৮৫৯ রেণ্ট য়্যাক্ট পর্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন হয় তা হতেই তা বোঝা যায়। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে সরকারও ছাড়েন নি। ১৭৯৩ সালে সমস্ত জমি ভাল করে জরীপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি; সেইজন্য যতখানি জমি আন্দাজ করে রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল তার চেয়ে আসলে অনেক সময় বেশি জমি ছিল। ক্রমে জরীপ করে সরকার তার উপর রাজস্ব বসিয়ে দিতে লাগলেন। জমির জন্য তাগিদ আরও বাড়বার সঙ্গে সরকার খাসমহল জমিও হাঁসিল করতে শুরু করলেন—এই সময় হতেই সুন্দরবন হাঁসিল হতে শুরু হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, ১৮৭০ সাল নাগাৎ জমির উপর চাপ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, কর্ষিত জমির পরিমাণও বেড়েছে, উপস্বত্ব যথেষ্ট সৃষ্টি হয়েছে এবং চাষীর অবস্থা হীন হয়েছে।
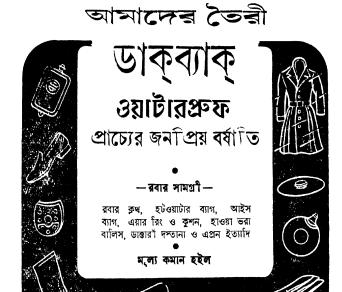
তার বহু নজীর আছে। কেবলমাত্র দু'টি তিনটি নজীরের উল্লেখ করছি। ১৮৭১ সালের সেস্ আইনের জন্য যেসব কাগজ-পত্র তৈরী হয় তা হতে দেখা যায়, যে সব জেলা আগে হাঁসিল হয়েছিল এবং বেশী সমৃদ্ধ ছিল সেখানে উপস্বত্ব-ভোগীর সংখ্যা বেশী, অন্যত্র কম। সারা বাংলার হিসেবে গড়ে একজন জমিদারপ্রতি ছ' জন মধ্যস্বত্বভোগী ছিল; কিন্তু পূর্বের জেলাগুলিতে অর্থাৎ ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারপ্রতি মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা গড়ে পাঁচ, পশ্চিম ও মধ্য বাংলার জেলাগুলিতে আট। আর প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে ১৮৩১ সালের পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সুবিখ্যাত হোল্ট ম্যাকেনজি ২৬২৭নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, চাষ বেড়েছে কিন্তু উন্নত হয়নি। জেমস মিল ঐ কমিটিরই সামনে চাষীদের দুর্দশা বর্ণনা করেছিলেন ৩৩৫১নং প্রশ্নের উত্তরে।* আরও পরে ১৮৭৮ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা সরকার রিপোর্ট করলেন The condition of the ryots is bad. এই হল প্রথম যুগের ইতিহাস।

দ্বিতীয় যুগ যখন আরম্ভ হল, তখন আশংকা করা অস্বাভাবিক নয় যে, জনবৃদ্ধির সংগে সংগে একেবারে চরম সংকট উপস্থিত হবে। বাস্তবিক তা ঘটতও। কিন্তু কতকগুলি কারণে তা ঘটতে ঘটতে কিছুটা বেঁচে যায়। তার প্রধানতম কারণ হল এদেশে ধনতন্ত্রের আর একটা পর্যায় আরম্ভ। এদেশে বৈদেশিক মূলধনের প্রবেশের তিনটি স্তর আছে। একেবারে প্রথম যুগে সে স্তর হল, সজোরে এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট করে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে ওদেশ থেকে পণ্য-দ্রব্য পাঠানো। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় বিদেশী মূলধন ওদেশ থেকে শিল্পদ্রব্য তৈরী করে পাঠানোর সংগে সংগে সরাসরি এদেশেও এসে হাজির হয়েছে এবং নানা-রকম প্রতিষ্ঠান গড়ছে। তৃতীয় স্তরে দেখা যায় এদেশী মূলধনের সংগে বিদেশী মূলধনের রফা। কিন্তু সে কথা যাক। আলোচ্য সময়ে ঐ দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়েছে। রেল-লাইন প্রতিষ্ঠা, কাপড় কল, চটকল শুরু হয়েছে। তাতে কিছুটা জীবিকার সংস্থান হতে শুরু হয়েছে। হাণ্টারের বই হতে দেখা যায়, বাঁকুড়ার মত অনুর্বর জেলা হতে এই সময়েই আসামের চা-বাগানে কুলি চালান শুরু হয়েছে। তার উপর এই সময় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা কারণে মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে ধানের দামের যে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া আছে, তা হতেও দেখা যায়, ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এক মণ ধানের দর পাঁচ আনা সাত আনা হতে শুরু করে পনের আনা এক টাকার উপরে যায়নি, কিন্তু তারপর তা আর এক টাকার নীচে বড় নামেনি। এই সব নানা কারণে সে সময় হুগলী প্রভৃতি জেলায় প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ১০৪৫ হলেও এবং তার মোট জমির ৮৯%. চাষ হয়ে গেলেও (হাণ্টারের Statistical Account) দ্রষ্টব্য। তা হতে জানা যায়, ম্যালেরিয়া মহামারীর পরও প্রথম সেন্সাসের সময়, অর্থাৎ ১৮৭২ সালে, সেখানে বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যা ছিল ৬১০ জন, আর মোট জমির ৯৪% কর্ষিত ছিল) অত্যন্ত গভীর সংকট খুব স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও তা ঠিক হয়নি। জনসংখ্যা ক্রমে যত বেড়েছে, শিল্প ও অন্যান্য জীবিকার প্রসার যত শ্লথ হয়ে এসেছে, জমির উপর চাপ ক্রমে ক্রমে যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই অবস্থা ক্রমে ক্রমে হীন হয়েছে বটে। কিন্তু তবু তারা ক্ষয় হতেও হতেও কোনরকমে টিকে ছিল।

তৃতীয় যুগে এবং সব চেয়ে বেশি করে চতুর্থ যুগে এই টিকে-থাকাটুকু উড়ে গেল—একেবারে প্রলয় বন্যা বইতে শুরু হল। তৃতীয় যুগেই এ জিনিস শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখনও তা তবু যেটুকু বাঁধনের মধ্যে ছিল চতুর্থ যুগে তা একেবারে সীমানাহীন হয়ে অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তৃতীয় যুগে বিশ্ব-ব্যাপী মন্দা, সে সময় কৃষিজ দ্রব্যের দাম

* প্রশ্নোত্তরগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

Q. 2627. Is the cultivation of land supposed to have improved since the Permanent Settlement?

A. (By Holt Mackenzie, 18th April, 1832).

I should say rather extended than improved,—it has very greatly extended. I am not aware of any essential improvement . . . we may look for poverty and distress under the zamindary system in India so long . . . as the people cling to their fields though rendered worthless . . . through repeated extraction, ...

Q. 3351. Do you think the ryots have accumulated capital?

A. (By J. Mill, 9th August, 1831).

The ryots cannot have done this without an extension of capital equal to those effects. They have multiplied considerably, and then the families increase, there is sub-division of the property, and, in consequence, . . . there is a stimulus to the members of the family among whom the sub-division has been made to increase their income by accepting to cultivate the waste.

(See Zamindari Settlement in Bengal, 1879)

পড়ে যাওয়া, চাষীদের ঋণভার বৃদ্ধি ও আর্থিক সংকট, তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মূল্য বৃদ্ধি, ১৯৫৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, কৃষি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ উলট-পালট ইত্যাদিতে বাংলার কৃষি ও কৃষক সমাজ সম্পূর্ণ জেরবার হয়ে গিয়েছে। তার ফলে জমি হস্তান্তর হয়েছে যথেষ্ট, ভাগচাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু চাষী জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শহরে এসেও জীবিকা পায় নি। এইভাবে বিরাট ধ্বংসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এর উপর এসে পড়ল চতুর্থ যুগের ধাক্কা। যুদ্ধের সময় জীবিকার যে প্রসার হয়েছিল তা কমল; শিল্পে চলল ছাঁটাই। জীবিকা সংকুচিত হতে লাগল, অথচ দেখা যায়, ১৯২১ সাল হতেই আমাদের জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার উপর শরণার্থীদের আগমনে চাপ বৃদ্ধি পেল। এজেই সমস্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে ধসে পড়বে এবং তার সঙ্গে ভূমিব্যবস্থা যে আরও বেশি ধসে পড়বে তা মোটেই আশ্চর্য নয়। তার বহু প্রমাণ আছে। একটা কথাই বলি। পশ্চিম বাংলায় কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ৮০ ভাগের উপর জমি ইতিপূর্বে কর্ষিত হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর তার উপর আরও সাড়ে পঁচিশ লক্ষ একর জমি কর্ষিত হয়েছে দেখা যায়। এ জিনিস পরিকল্পনার ফল নয়; (১৯৪০-৪১ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ পশ্চিম বাংলায় ৮৭,৩০,৫০০ একর; ১৯৪৯-৫০ সালে তা ১,১২,৮০,৮০০ একর) অন্য জীবিকা না পেয়ে জনসংখ্যার বিপুল চাপ জমির ক্রমক্ষীয়মান আয়ের ক্ষীণতর অংশের জন্য তীব্রতর মারামারি করছে এ তারই সর্বনাশা লক্ষণ মাত্র।

৪

ভূমিব্যবস্থা প্রকৃত সংস্কার করতে হলে, সেইজন্য, এখনকার অর্থনৈতিক লক্ষণগুলি আরও একটু জানা দরকার। সেই লক্ষণগুলির কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। এ বিষয়ে ১৯৫১ সালের পশ্চিম বাংলার সেনসাস্ রিপোর্টে একটি চমৎকার উক্তি আছে। তার মোদ্দা কথা হল, কি ভূমি কি ভূমি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা সর্বত্রই নিদারুণ ক্ষয় দেখা যাচ্ছে। উক্তিটি উদ্ধৃত করছিঃ—

The aggregate livelihood of the people has certainly not kept pace with the increase of population and is lagging far behind. This will be very clear if we take the proportions of population of working age 15-55 or 15-50 at each census and compare them with the number of self-supporting persons per 10,000 of total population. The gap is widening more in the rural than in urban areas, proving that a greater and greater proportion of the rural population is being compelled to fall back upon the land and dispute what nourishment and employment it provides. In the urban areas, a big share of the employment and sustenance available are appropriated b y persons born outside the State, and there also, except for certain expanding mills and factories, employment is scarce and fiercely disputed . . . Any improvement in the field of agriculture must be contingent on improvement in all other spheres of life, else the level of improvement cannot be sustained but must inevitably slide back. It is possible to conclude with the slick observation that as soon as agriculture begins to produce an inevitable surplus, it will carry a benefecient impulse to industry and commerce and supply them with the necessary compelling power. For, undoubtedly in our country the agrarian question is still the root of the matter. But the solution of this question must radiate towards, draw its sustenance from, and embrace all spheres of activity at once and not presume to achieve much by making progress in one or several watertight directions only. That is the crux of the matter and as such it would be idle to think of measures to improve agriculture alone without thinking of simultaneous adjustment in all directions and all planes, which alone is capable of extinguishing the antethesis between town and country and bringing about a mutually supporting relationship between the exploiting town and exploited village.

এই উক্তি হতেই আমাদের অবস্থার একটা চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এরই লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করছি। (১) বাংলা দেশে একদিকে মালিকানার আইন প্রবল থাকায় অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণুতা বহুকাল থেকে শুরু হওয়ায় অন্য প্রদেশের অপেক্ষা পশ্চিম বাংলায় উপস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেশি। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, নিজের জমি চাষ করে এমন চাষী পশ্চিম বাংলায় মোট জনসংখ্যার ৩২·৩%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা ৬২·২%। প্রধানতঃ অপরের জমি চষে এমন চাষী ও তাদের পোষ্যবর্গ পশ্চিম বাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২·০%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা শতকরা ৩·৪% ভাগ। তফাৎটা সহজেই বোঝা যায়। বিহারে অনুরূপ হিসেব যথাক্রমে ৫৫·২% এবং ৮·২%। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছায়া পড়েছে

সেখানেই ভাগচাষীর অনুপাত বেশি, মালিক চাষীর অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। মোট জনসংখ্যার তুলনায় উপস্বত্বভোগীদের অনুপাত বিহার ও পশ্চিম বাংলায় শতকরা ০·৬%, উত্তরপ্রদেশে ১·৫%। অর্থাৎ বাংলায় স্বল্পতর লোকের হাতে অধিক জমি আছে। (২) অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, ভূমির মালিক চাষী ক্রমে ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হচ্ছে। ফ্লাউড কমিশন এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবার পর মাত্র ছ' বছর পরে ১৯৪৬ সালে ইশাক সাহেব এ বিষয়ে আবার তথ্যাদি সংগ্রহ করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তা হতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের এই কয়টি বছরেই প্রভূত অবনতি ঘটেছে। নীচে উল্লিখিত হিসেব হতে দেখা যায় যে, তিন-একরের বেশি জমি রাখে এমন লোকের সংখ্যা কমছেঃ—

চাষে চাষ হচ্ছে। (৪) কিন্তু এছাড়াও দেখা যাচ্ছে কৃষিতে উপার্জনশীল লোকের অনুপাত কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে একজন উপার্জনকারীর উপরে যতগুলি পোষ্য ছিল এখন তা তার চেয়ে বেশি, কেননা পোষ্য-বর্গের মধ্যে যারা সক্ষম তাদেরও অন্য কোনও জীবিকা নেই। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার যে অংশ কৃষি-বৃত্তিতে স্বোপার্জনশীল তার অনুপাত ক্রমশই কমছে। ১৯০১ সালে তা ছিল ১৯·৮%, ১৯১১ সালে ২৩·৪%, ১৯২১ সালে ২৩·৪%, ১৯৩১ সালে ১৮·৫%, ১৯৫১ সালে ১৪·৯%। অর্থাৎ ১৯৫১ সালের অবস্থা ১৯০১ সালের চেয়েও খারাপ। (৫) অবস্থা কতদূর খারাপ হয়েছে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় চাষীদের ঋণভারের হিসেবে। এ বিষয়ে

জমির মালিকানার প্যাটার্ণ

	ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট (অবিভক্ত বাংলা)	ইশাক রিপোর্ট (অবিভক্ত বাংলা)
১। মোট পরিবারসংখ্যার শতকরা কত অংশ তিন একর পর্যন্ত জমি রাখে ...	৫৭·২%	৭৬·১%
২। মোট পরিবারসংখ্যার শতকরা কত অংশ তিন একরের বেশি জমি রাখে ...	৪২·৮%	২৩·৯%

(৩) ফ্লাউড কমিশনের সময় দেখা গিয়েছিল মোট জমির শতকরা ২২·৬% ভাগ ভাগচাষে চাষ হত। এখন যেসব অনুসন্ধান হচ্ছে তা হতে সিদ্ধান্ত করা চলতে পারে যে, এখন মোট জমির ৩৫% অংশ ভাগ-

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকার যে অনুসন্ধান করেছেন তা হতে জানা যায়, ভাগচাষীদের মোট ঋণের মধ্যে শতকরা ৫৫·৯% হল কেবল খরচ মেটাবার জন্য। অন্যান্য শ্রেণীদের বেলায় অনুরূপ হিসেব এইরকমঃ—জমির মালিক ৫৪·৯%, বড় চাষী ৩৫·৩%, ছোট চাষী ৪৪·৩১%, ক্ষেত-মজুর ৭১·৭%। এমনকি জমির ছোট ছোট মালিকদেরও এই অবস্থা! (৬) অন্য দিকে জোতদারদের প্রবল অভ্যুত্থানের আন্দাজ পাওয়া যায় ইশাক্ রিপোর্ট হতে। তাতে দেখা যায় যে কেবলমাত্র বাস্তু জমি আছে অথচ অন্য কোনও জমি নেই এমন পরিবার মোট পরিবারসংখ্যার শতকরা ৩৬·৪%, অথচ তারা মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮% অংশের মালিক। যারা অনধিক এক একরের মালিক এমন পরিবারগুলি মোট পরিবার-সংখ্যার শতকরা ১৭·৭% অংশ, তাদের হাতে জমি আছে মোট জমির শতকরা ৪·২%। যারা এক হতে তিন একরের মালিক তাদের বেলায় অনুরূপ হিসেব দু'টি হল ২২·০% এবং ১০·৯%। তিন থেকে পাঁচ একরের মালিকদের অনুরূপ হিসেব ৯·৬% এবং ১৪·৭%। আর পাঁচ একরের উপর যারা জমি রাখে তাদের হিসেব ১৪·৩% এবং ৬২·৪%। অর্থাৎ যারা জনসংখ্যার শতকরা ১৪·৩% ভাগ তারা মোট জমির শতকরা ৬২·৪% ভাগের মালিক—অথচ যারা জনসংখ্যার শতকরা ৩৬·৪% ভাগ তারা মোট জমির মাত্র শতকরা ১·৮% অংশের মালিক! এ হতেই অবস্থাটা বোঝা যায়। তার উপর ঋণভার সম্বন্ধে ঐ তথ্যানুসন্ধানে আরও জানা যাচ্ছে যে বর্তমানে জোতদারেরাই মহাজনের স্থান অধিকার করেছে এবং তারা আবার সাধারণ বন্ধক নেবার বদলে টাকা ধার দেবার সময় একেবারেই কোবালা লিখিয়ে নিচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, জোতদারেরা একাধারে বৃহৎ জমির মালিক, সেইসঙ্গে মহাজনও আবার কোবালা লিখিয়ে নেবার ফলে আরও জমি আবার তাদেরই হাতে গিয়ে পড়ছে। জোতদারদের এই প্রবল অভ্যুত্থান বাংলার কৃষিব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং ভয়াবহ ঘটনা।

সুতরাং এই সমস্ত লক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে প্রথমত জীবিকা হিসেবে কৃষি আর এত লোকের পক্ষে চলছে না, অত্যধিক চাপে ভেঙে পড়েছে; দ্বিতীয়ত, কৃষির মধ্যে যারা যারা আছে সকলেই ক্ষয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেই সব চেয়ে নীচের তলার লোক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং অন্যদিকে জোতদারেরা প্রবল হচ্ছে। তৃতীয়ত কৃষি যে ন্যূনতম জীবিকাও জোগাতে পারছে না, অথচ অন্য কোনও জীবিকাও নেই, সে কথাটা বোঝা যায় পোষ্যবর্গের অনুপাত বৃদ্ধিতে।

পশ্চিম বাংলায় ভূমিতে এই নিদারুণ সংকটের সময় যদি কৃষি-ব্যতিরিক্ত অন্য জীবিকার প্রসার হত তাহলে এই সংকট-মোচনের একটা পথ হত তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু পূর্বেই সেন্সাস রিপোর্ট হতে যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি তা হতে বোঝা যায় যে সেরকম কোনও প্রসার তো হয়ই নি—উপরন্তু সংকুচন হয়েছে। এরও বহুবিধ প্রমাণ আছে। দুই একটির উল্লেখ করছি। (১) পশ্চিম বাংলায় দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ যেমন বাড়তে থাকে প্রথম দিকে তেমনই কৃষি নির্ভর লোকের অনুপাতও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ বোঝা যায় জনসংখ্যার চাপ কৃষি বহন করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে লোকসংখ্যার চাপ বেড়ে চললেও কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত আর বাড়ে না, বরং কমে। তখন বোঝা যায়, গ্রামাঞ্চলে লোক বাড়ছে বটে; কিন্তু তারা আর কৃষিতে নির্ভরশীল হতে পারছে না। অথচ তারা যে শিল্প বা অনুরূপ কোনও জীবিকাও পাচ্ছে না তার প্রমাণ তারা গ্রামেই রয়ে গিয়েছে, শহরে আসতে পারেনি। অনেকে অবশ্য শহরে এসেও বৃত্তি পায় না, কিন্তু তবু আশায় আশায় আসে। এরা সে আশাটুকুও করে না, তাই নিষ্কর্মা হয়ে গ্রামাঞ্চলেই বসে থাকে। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় অধিকাংশ জেলাতেই ১৯১১ হতে ১৯২১ সালের মধ্যেই ঐ সীমারেখা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে—অথচ তবুও গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বেড়েই চলেছে। নীচের হিসেবটি হতে তা বোঝা যাবে :

শুধু গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ—(ক)
প্রতি হাজার জনে কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত—(খ)

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	(ক)	(খ)	(ক)	(খ)	(ক)	(খ)	(ক)	(খ)
পশ্চিমবাংলা ...	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১	৪৫২	৬০৭
প্রেসিডেন্সি বিভাগ ...	৫৫০	৪৯০	৩৯৪	৬৫০	৩৯৯	৬২৯	৩৬৮	৫৭৭
বর্ধমান বিভাগ ...	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭১৮	৫৬৩	৭১৩	৫৫২	৬৩৪

দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই ১৯২১ সালে সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রতি হাজারে কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত সেই বছরই সব চেয়ে বেশী। তারপর তা কমেছে, অথচ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বেড়েই চলেছে। (২) শিল্প যে বেশি লোকের বৃত্তি জোগাতে পারেনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। বেশির ভাগ শিল্পেই দেখা যায় অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস হতে জানা যায়, Primary Industriesগুলিতে ১৯০১ সালে স্বোপার্জনশীল লোকের সংখ্যা ছিল ৫,৫৫,৫৬২, কিন্তু ১৯৫১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩,৪৭,৪০৩। Plantation Industriesগুলিতে অনুরূপ হিসাব—১৯০১ সালে ৩,০০,২৬৫, এখন ২,৫৬,৯৩৯। Processing and manufacture — Foodstuffs, Textiles, Leather & Products thereof—এতে দেখা যায়, যৎসামান্য বৃদ্ধি হয়েছে—গত চল্লিশ বছরে মাত্র ত্রিশ হাজার। কিন্তু বেশির ভাগ শিল্পেই কমবার লক্ষণ। এমনকি তুলো-বয়ন শিল্পেও ১৯০১

সালের হিসেব ছিল ৮৮,৪৮৪, এখন তা ৭৬,৬০৫। যেগুলিতে কিছু প্রসার হয়েছে তার মধ্যেও অবাঙালীর জীবিকাই বেশি—কাজেই তা বাংলার ভূমির উপর চাপ লাঘব করতে সহায় হয় নি। (৩) তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, শিল্পেও উপার্জনশীল লোকের অনুপাত কমছে। ১৯০১ সালে শিল্প-জীবিদের প্রতি দশ হাজারে ৭৭০ জন ছিল উপার্জনশীল। ১৯১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০৪। তার পরেই পতন শুরু। ১৯২১ সালে তা দাঁড়ায় ৭২৯, ১৯৩১ সালে ৫৫১, আর এখন তা ৬৭১। (৪) তাছাড়া আরও দেখা যাচ্ছে, যারা কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকায় নির্ভর করত (যেমন শিল্পজীবীরা) তারা অনেক সময় জমি হতে কিছুটা আংশিক এবং অপ্রধান আয় পেত। সে হিসেবে পূর্বে তারা জমির উপর নির্ভর করত যতখানি এখন সেই নির্ভরতা বহুগুণ বেড়েছে। সেন্সাস রিপোর্টের ৪৬৭-৮ পৃষ্ঠা হতে হিসেবটি সংকলিত করে দিচ্ছি:—

যাচ্ছে। কাঠামোর মৌলিক অদল বদল না করে, জীবিকা বিস্তারের সত্যকারের ব্যবস্থা না করে, অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রসরণশীল শক্তির আবির্ভাব না ঘটিয়ে শুধু কেবল জমির মালিকানা বদল করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে এ চিন্তা অত্যন্ত ভুল। আসলে এ সংকট ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই চরম সংকট। আসলে তার থেকে উদ্ধার পেতে হবে। জমিদার বিলোপ তার প্রথম এবং অনিবার্য ধাপ হলেও তা সামান্য ধাপ।

৫

সেইজন্য ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের কথা প্রকৃতভাবে ভাবতে গেলে সমস্ত দেশের

বর্ধমান বিভাগ

কৃষি-ব্যতিরিক্ত-জীবিকা-নির্ভর স্বোপার্জনশীল প্রতি ১০০০০ লোকের মধ্যে কতগুলি স্বোপার্জনশীল লোক অপ্রধান বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে—

	নিজের জমি চাষ	ভাগ চাষ	ক্ষেতমজুরী	উপস্বত্ব ভোগ	মোট
১৯২১ সাল ...	৩৯		১৬	৫	৬০
১৯৫১ সাল ...	৬৩১	৮৭	৭৯	৩৪	৮৩১

কি নিদারুণ পার্থক্য! ৬০ হতে ৮৩১! প্রায় চৌদ্দগুণ বৃদ্ধি! শিল্প যে জীবিকা যোগাতে পারে নি, শিল্পজীবীদের আবার যে বেশি পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতে হচ্ছে তার জাজ্বল্য প্রমাণ এর চেয়ে আর বেশি কি হতে পারে!

আর অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। এ হতেই বাংলার চিত্রটা বোঝা যায়। সে চিত্র সত্যই ভয়াবহ। মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে আমাদের ক্ষয় শুধু যে ভূমি-ব্যবস্থাতেই হচ্ছে তাই নয়, শিল্প প্রভৃতি জীবিকাতেও হচ্ছে। যা কিছু ছিল প্রলয়-ভাঙনে তা ভেঙে চুরে একেবারে চুরমার হয়ে

অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে না মিলিয়ে ভাবলে চলে না। আমরা শিল্পে কতখানি প্রসার লাভ করব? অন্য জীবিকায় কত-লোককে জমি হতে সরাতে পারব? আমা-দের কৃষি কি ধরনের হবে? তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে শিল্পের কাঁচামাল জোগানো অথবা খাদ্য সরবরাহ? কি পদ্ধতিতে চাষ হবে? বড় বড় জমিতে ট্র্যাকটর দিয়ে চাষ, অথবা ছোট ছোট জমিতে মানুষ দিয়ে চাষ? বড় জমিতে ট্র্যাকটর দিয়ে চাষ করলে তো চাষ হতে অনেক কম লোকের কর্মসংস্থান হবে; যারা উৎখাত হবে তারা তাহলে যাবে কোথায়? এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঠে পড়ে, যার প্রকৃত আলোচনা করতে গেলে পশ্চিম-বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষিনীতি শিল্পনীতি এমন কি বাণিজ্যনীতি করনীতি শুল্কনীতি এবং সমগ্র পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়েই আলোচনা করতে হয়। সে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আপাতত বৃহত্তর উদ্দেশ্যের আভাসমাত্র দিয়েই ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের কথাই আলোচনা করব।

জগতে বিভিন্ন দেশে, বিশেষত প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এবং পূর্ব য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমে-রিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে, এরকম ধরনের সংকট যে আসেনি তা নয়। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে সেই সংকট মোচন করবার চেষ্টা করেছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় এই প্রচেষ্টার রূপ হল প্রচণ্ডবেগে শিল্পের অগ্রগতি এবং সেই শিল্পেরই রথচক্রে কৃষিকে বেঁধে দেওয়া। সেইজন্য বেশি লোক ঝুঁকেছে শিল্পের দিকে, চাষে সেজন্য ট্র্যাকটর

আমদানি কঠিন হয়নি। তার উপরে সেখানে জনসংখ্যার চাপও অপেক্ষাকৃত কম ছিল: চীনে জনসংখ্যার চাপ খুবই বেশি। তারাও মুক্তি খুঁজছে নতুন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শিল্পবিস্তার ঘটিয়ে। কিন্তু শিল্প-স্থাপনার গতিবেগ চীনে রুশিয়ার মত অত প্রচণ্ড নয়, তার উপরে জমিতে লোকও বহু। সেইজন্য সেখানে অত বিরাট পরিমাণে ট্র্যাক্টর চালানো সম্ভবপর হয়নি, চাষীরা অনেকক্ষেত্রে জমির মালিকও আছে—কেবল বড় চাষী ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে ভূমি পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। এ দুটি দেশের বিবর্তনের গতিবেগ এবং লক্ষ্যের সামান্য পার্থক্য থাকলেও মোটের উপর একটা বিষয়ে উভয় দেশই একমত। সেটা হল এই যে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রধানত শিল্পের মাধ্যমে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে দেখি অন্য অনেক দেশ আছে যারা এতখানি অগ্রসর হতে পারে না। যেমন কিছুকাল আগের পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলি। এসব দেশে যে ভূমি সংস্কার হয়েছে তার মোদ্দা কথা হল একটা চাষী পরিবার খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে এই রকম জমি তার হাতে তুলে দেওয়া। তারই সংগে আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে জমিদারী উচ্ছেদ, জমি একত্রীকরণ, চাষীর ঋণভার লাঘব, উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ, পতিত জমি উদ্ধার, ইত্যাদি। কিন্তু এ সবেরই লক্ষ্য হল চাষী পরিবারকে খাইয়ে পরিয়ে টিকিয়ে রাখা—তার বেশি কিছু নয়। রুশিয়ার মত তাদের নিয়ে একেবারে উলট-পালট করে শিল্পের সংগে তাদের প্রত্যক্ষত জুড়ে দেওয়া হয় নি। হয়তো পরের ধাপে তা হবে, কিন্তু রুশিয়ার মত এক ধাপে তা হয় নি। আপাতত চাষীরা একটু বাঁচুক, তারপর শিল্পোন্নতির জন্য তাদের নাড়াচাড়া করা যাবে, এইরকম ভাবখানা। রুশিয়ার মত এক ধাপে তারা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় নি, বা পারে নি।

ভারতবর্ষে যেভাবে জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে তা হতে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, আমরা এক লাফে উড়ে যেতে মোটেই চাইছি না, ধীরে সুস্থেই এগোতে চাইছি। বরং একটু বেশি ধীরে সুস্থেই চলতে চাচ্ছি, যদিচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিল্পের কিছুটা ছায়া কৃষির উপর আনা হয়েছে। প্রথমত সকলেই জানেন, কৃষির শ্রীবৃদ্ধিই আমাদের পরিকল্পনার প্রধানতম লক্ষ্য, শিল্প অপেক্ষাকৃত গৌণ। দ্বিতীয়ত জমিদারী উচ্ছেদের পরের কার্যক্রম সম্বন্ধে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, যারা ভালো চাষী তাদের জমি নিয়ে নাড়াচাড়া করা হবে না, কিন্তু যারা তা নয় এবং যাদের জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাদের সমবায়ের চৌহদ্দীতে টেনে আনা হবে। তৃতীয়ত চাষের ও চাষীর অবস্থার উন্নতির জন্য প্রধান ঝোঁক দেওয়া হয়েছে ভাল সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর। অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু নেহাৎ অচল কেবল সেইটুকুর বিলোপ সাধন করে বাকিটার জন্য নির্ভর করা হয়েছে কৃষি কৌশলের উন্নতির উপর (technological improvements)। অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ বদল ঘটিয়ে তাকে উন্নততর নতুন কাঠামোর মধ্যে ফেলে প্রসরণ শক্তি সঞ্জাত হবার পথ পরিষ্কার করে নতুন করে গড়া হয় নি। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা উপলব্ধি করলে বলতেই হয় যে, এটুকুতে সংকট মোচন হবে না—অন্তত পশ্চিম বাংলার মত গভীর সংকটাপন্ন প্রদেশের মুক্তি হবে না। Tecnological improvements তো চাই-ই, পুরোমাত্রাতেই চাই। কিন্তু শুধু তা দিয়ে এতখানি গভীর সংকট মোচন হয় না। তাতে কিছুক্ষণের জন্য সূচিকাভরণের কাজ হতে পারে হয়তো, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে মৃত্যুরোধ হবে না। সেইজন্য tecnological improvements করবার সংগে সংগে বর্তমান অবক্ষয়ী অর্থনৈতিক কাঠামোর বদলে উন্নততর শক্তিশালী প্রসরণশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাই—তাতেই কলাকৌশলের উন্নতির প্রকৃত ফল মিলতে পারে।

বাংলা দেশে এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করতে হলে ঠিক কি কি জিনিস করা দরকার তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু দু'চারটি কথা সহজেই বোঝা যায়। বাংলা দেশে কৃষির কৌশলের যতই উন্নতি হোক তা দিয়ে এত জনসংখ্যার স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায় না। পশ্চিম বাংলায় মোট কর্ষণযোগ্য জমি আছে ১ কোটি ২১ লক্ষ একর। পাঁচজনের পরিবার পিছু পাঁচ একর করে জমি দিলেও (অর্থাৎ মাথাপিছু এক একর) পশ্চিম বাংলায় জমি হতে কোনও কালেই ১ কোটি ২১ লক্ষ লোকের চেয়ে বেশির জীবিকা সংস্থান হতে পারে না। অথচ ১৯৫১ সালের সেনসাসেই দেখা যায়, এখন জমির উপর নির্ভর করছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ

লোক অর্থাৎ ২১ লক্ষ বাড়তি লোক। তার উপর জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য জীবিকার প্রসার না হয় তাহলে বাড়তি লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে। কৃষি কৌশলের উন্নতি করে হয়তো এর কিছু অংশকে কৃষিতে রাখা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সবটা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সেইজন্য শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকার প্রসার ঘটাতেই হবে। বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এদিকে বিশেষ কোনই ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেদিকে ব্যবস্থা না করলে কোনও উপায়ই নেই—সে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও একটা কথা আছে। পশ্চিম বাংলায় এখন যেভাবে শিল্প-বিস্তার হয়েছে সেভাবে শিল্পবিস্তার হলে কোনও লাভ হবে না। একটা চিত্তরঞ্জন ফ্যাক্টরী বা একটা নূতন ইস্পাত কারখানা হলে সেইসব ফ্যাক্টরীতে আট দশ হাজার লোকের কর্ম-সংস্থান হতে পারে বটে; কিন্তু তার প্রভাব দেশময় ছড়িয়েও পড়বে না, দেশের কাঠামোও দ্রুত বদলাবে না। এখনই দেখা যায়, কলিকাতা ও আসানসোলের শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে বাংলার বাকী অংশ অত্যন্ত অনগ্রসর—কোনও কোনও ক্ষেত্রে উড়িষ্যার চেয়েও পশ্চাৎপদ। শিল্পের কেন্দ্র তো শহর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাচীন শিল্পের তাগিদে যেসব শহর গড়ে উঠেছিল (যেমন, শান্তিপুর, কাটোয়া, রামজীবনপুর ইত্যাদি) তা এখন ক্ষয়িষ্ণু। অর্থাৎ কলিকাতা ও বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের প্রভাব এইসব জায়গায় প্রবেশ করে নূতন কোনও প্রেরণা জাগায়নি, উপরন্তু খাদ্য এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলের শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য ভবিষ্যতে শিল্পবিস্তার করতে হলে তা নূতনভাবে করতে হবে। অর্থাৎ কৃষিজীবনের সঙ্গে তাকে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে দিতে হবে। তা হলে কৃষকের জীবনও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হবে, অন্যদিকে শিল্পগুলিও পুঞ্জীভূত হয়ে শোষণের কারণ হবে না। দেশময় এই বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আর সেই সঙ্গে এই কাঠামোর মধ্যে নতুন কৃষিব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে হবে।

বস্তুত কমিউনিটি প্রোজেকটের মূল কথাও এই। সে হিসাবে তার মূলগত ভঙ্গীটা ঠিক। কিন্তু তার আকার এত ছোট এবং চারপাশের অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ না করেই এমনভাবে সেগুলিকে চালু করা হচ্ছে যে, সেগুলির সাফল্য
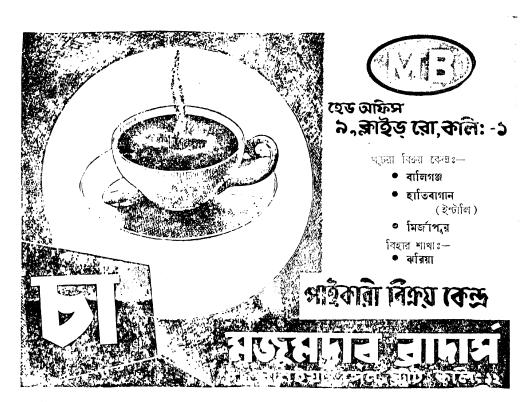
সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটেছে। সেইজন্য প্রয়োজন হয়েছে ঐ মূলগত ভঙ্গীটিকে দেশময় এখনই প্রসারিত করে দেওয়া এবং যেসব শক্তি তাতে আঘাত করবে তাদের কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করা। তারজন্য প্রয়োজন হলে অন্য দেশ ও অন্য প্রদেশ হতে যেসব আঘাত আসবে তাও নিবারণ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে আমার মতে বাংলা দেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা উচিত। প্রথম, মোটামুটি বর্ধমান বিভাগ। দামোদর ময়ূরাক্ষীর উন্নততর সেচ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটিকে নূতনভাবে ঐ আদর্শে গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয় অঞ্চল উত্তরবঙ্গ। এখানে অত বড় নদী নেই। কিন্তু বর্ষার সময়ে নদীগুলির খুব জোর হয়। সেগুলিতে সুইটজর-লণ্ডের মত ছোট ছোট বাঁধ বেঁধে ছ'মাস বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হতে পারে। তৃতীয় অঞ্চল মধ্যবাংলার ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল—বিশেষত মুর্শিদাবাদ নদীয়া। গঙ্গা বাঁধের সাহায্যে সেচ ও জলনিকাশ এবং উত্তর কলিকাতা গ্রিডের বিদ্যুৎ, এই দুয়ের সাহায্যে এখানে অগ্রসর হতে হবে। চতুর্থ অঞ্চল সুন্দরবন। এখানকার ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। চারটি অঞ্চলের জন্য চারটি বোর্ড থাকবে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের মত। সরকার তাদের অর্থ দেবেন ও তদারক করবেন, তারা সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সামগ্রিক পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে কাজ করে যাবে। তাহলে কাজও অগ্রসর হবে, সর্বাজিনিসই রাইটার্স বিল্ডিংএ কেন্দ্রীভূত হয়ে বিলম্ব ঘটাবে না। প্রসরণশীল নূতন অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠতেও দেরি হবে না।

৬

এখন আমরা শেষ প্রশ্নে এসে পেঁছিলাম। যদি পশ্চিম বাংলায় কৃষি ও কৃষককে ঐ আদর্শ পালনের উপযুক্ত করে তুলতে হয় তাহলে কিরকম ভূমি ব্যবস্থা করতে হবে? অন্যদিকে যখন ঐসব বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে থাকবে তখন তার সাফল্যের জন্য ভূমিব্যবস্থা কিরকম হওয়া প্রয়োজন? এর উত্তরে কয়েকটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

(১) জমিদার বা অন্য উপস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের সম্বন্ধে কোনও তর্ক নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কেবল এইটুকু যথেষ্ট নয়। বিশেষত তথাকথিত প্রজাদের মধ্যে যারা সত্যকারের চাষী নয়, অথচ যাদের হাতেই এখন প্রচুর জমি পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তাদেরও উপস্বত্বভোগী বলে গণ্য করতে হবে এবং বিলোপ ঘটাতে হবে। তা না হলে আসল চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে না—পুনর্বণ্টনের জন্য জমিও পাওয়া যাবে না।

(২) এইরকমভাবে সকল উপস্বত্বভোগীর উচ্ছেদ ঘটলে যখন রাষ্ট্রের সঙ্গে চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে তখন চাষীদের অধিকার কি হবে? এসম্বন্ধে বহু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। কমিউনিস্ট পরি-চালিত কিষাণ সভাও বলে থাকেন যে চাষীরা হবে জমির পুরো মালিক। কিন্তু ইতিহাসের যে আলোচনা পূর্বে করেছি তা হতে দেখা গিয়েছে মালিকানার হাতবদল এই রোগের কোনও ঔষধ নয়। আসলে মালিকানার উপর এই ঝোঁক ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। তার উপর চাষী সমাজের হাতে মালিকানা নির্ব্যূঢ়স্বত্বে ছেড়ে দেওয়া সমাজের পক্ষে আরও বিপজ্জনক, কেননা চাষীরা যে ভয়ানক রক্ষণশীল এবং বাইরের তাগিদকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে একথা মার্কস হতে স্টালিন সবাই বলেছেন, দেশে দেশে এমন কি রুশিয়াতেও তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে। সেই-জন্য খুব সুস্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে যে, জমির মালিক আসলে সমাজ, অন্য সকলেরই মালিকানা সমাজের স্বার্থের উপরে নয়। সেইজন্য চাষীরা মালিক হবে বটে, কিন্তু নির্ব্যূঢ় স্বত্বে নয়—সমাজের দাবীকে অস্বীকার করে তাদের অধিকার থাকতে পারে না।

(৩) বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতির কতক-গুলি রূপ আছে। সে রূপ দিতে হলে শুধু বিশুষ্ক অর্থনীতির নির্দেশ মানলেই চলবে না—বাস্তব অবস্থার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। রুশিয়াতে অনেক পরিমাণে যৌথ মালিকানা বহুকাল প্রচলিত ছিল; ১৯০৬ সালের স্টোলিপিন ভূমিসংস্কার ব্যবস্থাতেই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আমদানি হয়। কিন্তু এই ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও রুশিয়াতে নির্মালিক যৌথ ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত করতে কি বেগ পেতে হয়েছিল সেকথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষে

চাষের জমির মালিকানার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চরম নিদর্শন হাজার হাজার বছর ধরে পাওয়া যায়। জমির প্রতি চাষীর টান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মালিকানার টান অসম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলেও তাদের মালিকানা সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে একথা চিন্তা করা যায় না। সুতরাং আজ যদি আমরা তা করবার প্রয়োজন বোধ করি তা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, আমাদের সকল সমস্যার একমাত্র প্রতিকারস্বরূপ আমরা এতদিন যে নির্বাধ মালিকানার কথাই ভেবে এসেছি সে ঔষধও একেবারে অচল। চাষী মালিক বা peasant proprietorship-এর কথা আমরা অত্যন্ত বেশি শুনি। একথাও সত্য যে, জমির উপর টান চাষীদের এত বেশি যে, মালিক না হলে তারা সাধারণত কাজই করতে চায় না। এমন কি রুশিয়াতেও অত্যন্ত কঠিন ও ব্যাপক বলপ্রয়োগ ছাড়া যৌথ চাষ সম্ভব হয় নি। সেইজন্য এখানে চাষীর মালিকানা বিলোপ করা বাস্তববুদ্ধি-বর্জিত হবে। কিন্তু চাষীকে মালিক বলার সংগে সংগে কিছু কিছু বাধানিষেধও অবশ্য প্রয়োগ করতে হবে, কেননা চাষীর স্বার্থও, সমাজের স্বার্থের উপরে নয়। উত্তরপ্রদেশের আইনে উত্তরাধিকার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এই মনোভংগীরই পরিচায়ক। আরও একটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করি।

'মীরাট' শহরের নিকটে গংগাখাদুরে বা অন্যত্র যেসব নতুন কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আগাগোড়াই সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে—কেবল তার মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও কিছু পরিমাণ জমি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন Collective Farm-এর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই সমবায় সমিতির আইন-কানুন হতে জানা যায়, তাঁরা এদিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। তার মধ্যে একটি ধারা হচ্ছে, সমবায় সমিতির সভ্য না হলে কলোনীতে কেউ জমি বা বাড়ি পাবেন না এবং প্রত্যেক সভ্যকে কলোনীর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে; নিজেরা বা অনুমোদিত ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যে যদি পর পর দুই ফসলে জমি চাষ না করা হয় তাহলে সমবায় সমিতির সভ্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। কোনও সভ্যের মৃত্যু হলে কেবল একজন মাত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সেই সভ্য জীবদ্দশাতেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যাবেন। উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে সমবায় সমিতির অন্য সভ্যদের মধ্যে সেই জমি বিলি করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্যেরা এইসব নিয়ম-কানুন মেনে সমবায় সমিতির নির্দেশমত চাষ-আবাদ করে যাবেন ততক্ষণ তাঁদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সে জমি ভোগ করবার অধিকার থাকবে। কিন্তু তাঁরা জমিতে উপস্বত্ব সৃষ্টি (বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া) করতে পারবেন না, জমি হস্তান্তর করতে পারবেন না বা অন্য কোনভাবে জমিকে দায়াবদ্ধ করতে পারবেন না। সর্বসাধারণের উপকারে লাগে এমন কোনও কাজ হলে সকলকেই সে কাজে খেটে দিতে হবে। সভ্যেরা যা কিছু জিনিসপত্র কিনবেন তা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়েই কিনবেন। বাইরের কোনও মহাজনের কাছে তাঁরা টাকা ধার করতে পারবেন না। সভ্যেরা কেউ ঠিকমত চাষ না করলে সমিতি অন্য সভ্যের সাহায্যে সেই জমি চাষ করিয়ে নিতে পারবেন। এইরকম বহু সর্ত আরোপ করা হয়েছে। যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা Model Byelaws for Co-operative Land Settlement Society under the Colonization Scheme, U.P. পড়ে নেবেন। এর প্রত্যেকটিই যে বাংলাদেশে চলবে এমন কথা বলছি না—কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের সর্তাধীন চাষী-মালিকানা না হলে এখানে কৃষির কোনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

(৪) এই সংগে গ্রামাঞ্চলের শাসনব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করতে হলে যেমন নতুন ধরনের পরিকল্পনা চাই, তেমনই চাই অর্থ এবং উপযুক্ত সংগঠন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্
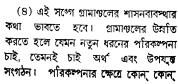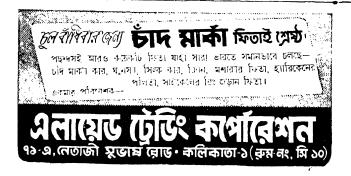
দিকে জোর দিতে হবে সেকথা পূর্বেই বলেছি। এখন অর্থ ও সংগঠনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। একটি কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে কৃষিও একটা শিল্প এবং তার জন্যও প্রয়োজনমত মূলধন চাই। এখন চাষীর ও চাষের মূলধন কেউই বিশেষ জোগায় না—তা জোগাড় করতে হয় চাষীকে বা ভাগচাষীকেই। তাদের ক্ষীণ সম্বল হতে তারা যতটুকু পারে করে, কিছু পরিমাণ বাইরে থেকে ধারও করে। সরকারী সাহায্য খুব সামান্যই তারা পায়। তাদের যেটুকু সম্বল তা এতই সামান্য যে তা হতে তারা বহু ক্ষেত্রে অন্নবস্ত্রের জোগাড়ই করতে পারে না, চাষের জন্য মূলধন জমানো তো দূরের কথা। এভাবে চাষের উন্নতি হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ সরবরাহ করতে হবে। এ পর্যন্ত সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কিছু করতে পারে নি তার বহু কারণ আছে বটে, কিন্তু তার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, তারা চাষীকে ব্যক্তিক ভিত্তিতে টাকা ধার দিয়ে এসেছে। এখন যদি চাষীর হাতে মালিকানা রেখেও তাকে উপরোক্ত সর্তাধীন করা হয় এবং চাষের বহু ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আরও একটু অগ্রসর হতে হবে। সেটা হল এই যে, তলাকার শাসনপদ্ধতিই বদলে দিতে হবে। এ পর্যন্ত সরকারের উন্নতিমূলক বিভাগগুলির সঙ্গে শাসনমূলক বা কর-আদায়ী বিভাগের কোনও অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ নেই। কানুনগোরা ইচ্ছেমত কৃষিঋণ আদায় করে চলে যান, আবার কৃষি বা সেচ বিভাগ নিজেদের ইচ্ছেমত স্কীম করে চলে। ভবিষ্যতে তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য প্রয়োজন, এক একটা ইউনিয়ন বা অনুরূপ এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক একটি পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। তারাই খাজনা আদায়ের জন্য দায়ী থাকবে (উত্তর প্রদেশে বহু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ মারফৎ রাজস্ব সংগ্রহ হচ্ছে এবং তাতে রাজস্ব-আদায়ের খরচ মোট আদায়ী রাজস্বের মাত্র শতকরা ৬% বা ৭% হচ্ছে বলে প্রকাশ)। আর তারা সরকারী রাজস্ব দেবার দায়িত্বও নেবে। সেই সঙ্গে সরকার ভূমিরাজস্বের একটা মোটা অংশ (অথবা আদায়-খরচ বাদে সবটাই) সেই পঞ্চায়েতের হাতে ফেরত দেবেন। সেই তহবিল হতে তারা গ্রামোন্নয়নের কাজ করবে। বড় সেচ বা বড় রাস্তা—যা এই পঞ্চায়েতের সাধ্যাতীত—তা অবশ্য সরকার নিজেরাই করবেন। কিন্তু সকল ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপরই ন্যস্ত থাকবে। এইভাবে জনসাধারণের দায়িত্ববোধও বাড়বে, তারা দেশগঠনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবারও সুযোগ পাবে। যে পঞ্চায়েৎ খাজনা আদায় করবে না বা দোষ করবে তাদের সেখানে উন্নতিমূলক কাজ ব্যাহত হবে। ফলে জনমত জাগ্রত হবে এবং তাদের কাজ করতে বাধ্য করবে। এইভাবে দেশময় কর্মোদ্যম চলতে থাকবে, কেবল সরকার ও সরকারী কর্মচারীর উপর চাতকবৃত্তি করবার অভ্যাস ক্রমে নষ্ট হয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কাজ হতে পারবে। তাতেই দেশ গড়ে উঠতে পারে, নচেৎ নয়। অবশ্য সরকার সব ব্যাপারটিরই তত্ত্বাবধান করবেন এবং কোন পঞ্চায়েৎ অন্যায় করলে সে পঞ্চায়েৎকে দায়িত্বচ্যুত করতেও সরকার পারবেন। এমন কি যদি কেউ টাকা চুরি করে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তার কাছ থেকে সে টাকা আদায়ের অধিকারও সরকারের থাকা উচিত। এইভাবে বজ্রপাত এবং বারিবর্ষণ বিভাগের সম্মিলিত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মর্মরের মিনতি (ইতালীয় ভাস্কর্য) আলোকচিত্রী—শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ

(৫) পরিশেষে ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার কথা আলোচ্য। বাড়তি জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে পুনর্বণ্টিত না হলে ভূমিব্যবস্থা-সংস্কার সফল হবে না। পূর্বের আলোচনায় দেখা যায়, মোটের উপর আমাদের বাড়তি জমি নেই। কিন্তু যেটুকু আছে, তার মধ্যেও যদি বণ্টনে অসমতা থাকে তাহলে তার কি নিদারুণ ফল হয় সেকথা সহজেই অনুমেয়। সেইজন্য কৃষি হতে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু লোক তো সরাতে হবেই। কিন্তু যে পরিমাণ লোক কৃষিতে থাকবে তাদের মধ্যেও একজনের হাতে অনেক জমি, আর একজনের হাতে কোন জমিই নেই—এমনতর ব্যবস্থা চলতে থাকলে কোনও আশা নেই। ভূমির পুনর্বণ্টন সেইজন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী জমি পুঞ্জীভূত হচ্ছে জোতদারদের হাতে—সে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে পুনর্বণ্টনের জন্য অতি সামান্য জমিই পাওয়া যাবে।

এই সকল মূলনীতির উপর ভূমিব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে তবেই সে ভূমিব্যবস্থা আমাদের উন্নততর ও প্রসরণশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভিত্তি হতে পারে। তার সঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের ও আনুষঙ্গিক বাণিজ্যের প্রভাব যুক্ত হলে প্রসারশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। ভূমিব্যবস্থা সংস্কার সেই উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম উপায় মাত্র এই মৌলিক কথাটা ভুলে গিয়ে যদি কেবল মালিকানার হাত বদল করেই নিশ্চিন্ত থাকি তাহলে উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ঢেঁকির মালিক যেই হোক না কেন ঢেঁকিকে পদাঘাত খেতে হবেই। তা হতে বাঁচলে হলে তার মালিক-বদল হলে হবে না, আসলে তার ঢেঁকিজন্ম থেকেই মুক্তি চাই।

রেবেকা সোরেনের কবর

আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার বুকে। কারানপুরা—যার আদি নাম কর্ণপুর।

কিংবদন্তী শোনা যায়, মহাভারত-চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিল এটা। দুসাদ দুবে মাহাতো সিংরা শুধু বলেই খালাস নয়। পাহাড়ের গায়ে এক সারি প্রাচীন গুহার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানায়, কর্ণের দরবার। আর অরণ্যচর বীড় হড়দের যে দলটা তীর ছোঁড়ার সময় বুড়ো আঙুলটা মুড়ে রাখে তাদের দেখিয়ে বলে, একলব্যের বংশধর ওরা।

কে কি বলছে না বলছে, জংলা ডেরার সান্তালরা অবশ্য তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না, তবে রাখে কান। ঢেড়া কাঠির ডুগডুগির দিকে। সে ডুগডুগি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয়, লোক লাগবে বাঁশরিয়ার খাদানে, কিংবা নাটুয়া দল তাঁবু ফেলেছে বিন্‌কাগাড়ায়।

এমনি এক ডুগডুগির ডাক শুনেই মেয়ে-মরদের ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার রামলীলার মাঠে।

ভিখারিয়ার নাচ এসেছে, ভিখারিয়ার নাচ। নামে নাচ, আসলে গান। কানে আঙুল দেয়া কবিগানের লড়াই। যা শোনবার আগ্রহে আঠারো ক্রোশ পথ হাঁটতেও উৎসুক হয়ে ওঠে দেহাতীরা, কোলিয়ারির হড় হো ভূম্পি খাড়িয়া রেজাকুলির দল।

তাই ডুগডুগি শুনতে না শুনতে প্লাবন নামলো রামলীলার মাঠে, কুড়ি কামিন আর জোয়ান সান্ডা, বাচ্চা বুড়ো হাড়াম হপন্‌, সবাই।

ভিড়ের মুখে গা ভাসিয়ে রূপমতীও এসে পৌঁছলো। পৌঁছলো যখন, তোতা আর ম্যোর ভিখারিয়া ছাড়ে নি তখনও।

'ভিখারিয়া হ'ল গ্রামের নাম, তা থেকে
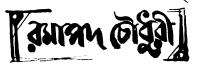
ভিখারিয়ার নাচ।' বোঝালেন কারানপুরা কোলিয়ারীর কম্পাসবাবু।

মারাঠী ম্যানেজার সাঠে সাহেব মাথা নাড়লেন। ও তল্লাটের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ডিক্‌সন আর এজেন্ট ফার্ন-হোয়াইট চুরুট-চাপা ঠোঁটে বললেন, আই সী!

সব কৃতিত্বটুকু কম্পাসবাবুই নিয়ে নিচ্ছেন দেখে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিশীরজী। বললেন, তোতা পাখী আর ময়ুর সেজে দু'জন লোক আসবে এখনি, নাটকটার কাহানী বলে দেবে।

কাহানী? ফার্নহোয়াইট ভুরুতে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

ঠিকাদার সাহানা বললেন, কাহানী না ছাই। ভিলেজ স্ক্যাণ্ডাল, যত সব কেচ্ছা ভিন গাঁয়ের মেয়েদের নামে। ছড়া বেঁধে গাইবে ওরা, আর পারে তো সে-গাঁয়ের লোক জবাব দেবে গান গেয়ে। না পারে তো লাঠিসোঁটা নিয়ে হৈ হৈ করে উঠবে।

মিশীরজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার। ভিখারিয়ার নাচ হয়েছে অথচ দু' চারটে খুন জখম হয়নি এমন ঘটনা আমরা অন্তত শুনি নি।

বলতে না বলতেই হৈ হৈ চিৎকার উঠলো ওদিক থেকে।

না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার নয়। তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি, ম্যোর অর্থাৎ ময়ূরের পেখম আঁটা আরেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মত চেহারা হয়েছে দু'জনেরই। দু'জনেই সুর

করে করে গান সুরু করেছে। মূল গায়েন যতক্ষণ না এসে পেঁাছয় দলবল নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।

তোতা আর ম্যোরকে আসতে দেখেই আনন্দে হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে উঠেছে কুলিকামিন কোড়াকুড়ির দল।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা আসরের চার-পাশে উবু হয়ে বসা নোংরা জনতার ভিড় যে কতদূর অবধি ছড়িয়ে গেছে ঠাহর হয় না। আর জনতাকে ঘিরে এক সারি ফার্নেসের মত বড় বড় আগুনের কুণ্ড। কারানপুরার খাদানে কয়লা থাকতে শীতে কাঁপবে কেন লোকগুলো, ফার্নহোয়াইট তাই পঁচিশ বাকেট কাঁচা কয়লা স্যাঙশন করেছেন। অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে সেগুলো, আসরকে চারপাশ থেকে মালার মত ঘিরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী তো নয়, যেন সিন্ধবাদের কুড়িয়ে-পাওয়া হাঁড়ি থেকে দুলে দুলে উঠছে এক একটা দৈত্য।

দেহাতীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে দেখ-ছিলেন ফার্নহোয়াইট, ডিকসন, সাঠে আর ঠিকাদার সাহানা। শেষ জনের ইঙ্গিতেই কে যেন সামনের টুলে দু' বোতল হুইস্কি আর আনুষঙ্গিক রেখে গেল।

ফার্নহোয়াইটের কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না। দোষও দেয়া যায় না। কাছে পিঠে রূপমতীর মত মেয়ে যৌবন কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি অন্যদিকে চোখ যায়!

সান্তালদের ভিড়ে এমন মেয়ে? আশ্চর্য হয়েই তাকিয়েছিলেন ফার্নহোয়াইট। আর তা লক্ষ্য করেই সাহানা ফিসফিস করে বললেন, রূপমতী! আমাদের তিন নম্বর খাদে কাজ করে মেয়েটা।

রূপমতী। ফার্নহোয়াইটের বাউণ্ডুলে ছেলেটা যার পিছনে ছায়ার মত ঘুরতে চায়।

খাদানে নেমে আজ মাটিকাটারি প্লটে, কাল মাল-কাটারিদের কাছে পিঠে ঘুরঘুর-করা সান্তাল মেয়েমরদ কারো চোখ এড়ায়নি। কানাঘুষো ফিসফিস, চোখে হাসি মুখে আঁচল-চাপা কৌতুক বোধ করেছে রেজা-মেয়ের দল। সবাই লক্ষ্য করেছে কার খোঁজে জল কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। লক্ষ্য করে দেখেছে রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখোচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্ণা নামে বাউণ্ডুলে সাহেবটার মুখেচোখে। আর, আর রূপমতীও বোধ হয় ছোকরা সাহেবের এই নির্লজ্জ পাগলামি দেখে ফিক করে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে।

কিন্তু দিনের পর দিন এমনি একভাবে আসা, দেখা হওয়া, হাসি, কৌতুক...কেমন যেন নেশা ধরে যায় রূপমতীর। ঝুড়িটা উল্টে নিয়ে তার ওপর বসে পা ছড়িয়ে একদিন লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে গল্প না করতে পেলেও বোধ হয় মন খারাপ হয় না রূপমতীর। মন খারাপ হয় দৈনন্দিন নেশা না মিটলে।

এদিকে কানাঘুষো হাসাহাসি থেকে ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেশ টের পাচ্ছিল রূপমতী। সান্তাল পট্টির বুড়ো-বুড়িরাও বলাকওয়া সুরু করেছিল।

লালোয়া কুড়ুখও বেজাত, কিল্লির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি বেশী গুণগুণ করে না। যত আপত্তি ম্যাকু সাহেবের বেলা।

সাহেব। ও হ'ল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদেরও ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে ওরা সান্তালদের। যেমন করেছে ঐ মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রোজিকে।

তাই রূপমতীকেও সাবধান করে দিয়েছিল পট্টির সর্দারনী, মুণ্ডা গিতিওড়ার কুড়ি-মেয়েরা, ওঁরাও ধুমকুড়িয়ার কুমারী মেয়ের দল।

আর সান্তাল পাড়ার ছিমছাম মেয়ে সোনা মিরু কানে কানে, রূপমতীকে বলেছিল, বুড়ারা নজর রাখছেন তুয়ার পানে। সাবধানে রইতে কইলাম।

আর সোনা মিরুর এই সাবধান-বাণী শুনেই ভয় পেয়ে গেল রূপমতী। বুড়ারা নজর রাখছেন! কেন, তা রূপমতী ভালো করেই জানে।

বিটলা!

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বছর খানেক আগের একটি দৃশ্য।

বিটলা হওয়ার পর তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখেছে ও সেবাস্তিনার মাকে। সান্তাল পঞ্চায়েতের ভয়ে ওঁরাও মুণ্ডারাও কথা বলতো না, এক পয়সার তেল কি নুন কিনতে পেতো না শনিচারীর হাটেও। অশ্লীল ঠাট্টা বিদ্রূপ, নোংরা অঙ্গভঙ্গী করে তাকে পাগল করে তুলতো বারো বছরের বাচ্চাগুলোও। আর, আর—

ভাবতেও শিউরে ওঠে রূপমতী।

জোয়ান বুড়ো সবাই ধরম অধরম ভুলে হল্লা বাধাতো তার ডেরায়, রাতে বিরেতে।

লাজশরমের বালাই ছিল না লোকগুলোর।

তাই কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিল রূপমতী।

এক শুধু ছুপছাপ দেখাশোনা লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। দু' কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমাণ্ডির খাদানে। দু'জনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না। ভাবতো রূপমতী।

সন্ধ্যে পার না হতেই পট্টির পথ ধরতো ও, সাহস হ'ত না আগের মত, ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে রয়েবসে রসিকতা করতে। মালিকের হুকুম না নিয়ে যেত না আড্ডায়, আখড়ায়। কিন্তু ভিখারিয়ার ডুগডুগি উপেক্ষা করতে পারলো না ও। এসে হাজির হ'লো তাই রামলীলার মাঠে।

ভিড় থেকে উঠে এসে সটান গিয়ে দাঁড়ালো ও মিঠা পানির দোকানটার সামনে। লাল নীল নানা রঙের বোতলে সস্তা লেমনেড আর চা বিস্কুট নিয়ে রীতিমত একটা দোকান বসে গেছে। আর কি আশ্চর্য, এই শীতেও যত চাহিদা ঐ দুর্লভ মিঠাপানির।

রূপমতী খাটো শাড়ির আঁচলে বাঁধা খুচরো পয়সা গুণতে-গুণতে তাকালো এদিক ওদিক। অর্থাৎ পিয়াস গলার নয়, মনের। খুঁজছিল লালোয়া কুড়ুখকে। দুফেরী পাল্লার কাজ সেরে সটান এখানেই চলে আসবার কথা তার।

আসবে ঠিকই, জানে রূপমতী। ভিখিরিয়ার নাচ আর রূপমতীর নাম—দু দুটো হাতছানি উপেক্ষা করার মত ছাতির জোর লালোয়ার মত বাইশ বছরের সান্ডার অন্তত নেই। তবু একটু অধীর না হয়ে পারে না ও। সাঁঝের আওয়াজ শোনা যায় নি এখনো। ভয় সেটুকুই। কাজ শেষ করে হাতের শাবল নামিয়ে রেখে লালোয়াটা খাদানে বসেই গল্প শুরু করে দেয় কোন কোনদিন, ডিনামাইটের সাবধানী ঘণ্টিটাও শুনতে পায় না। এমনি এক ব্লাস্টিংয়ের সময়েই কয়লার সীম চাপা পড়ে মারা গেছে রূপমতীর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই হরবনশী।

এদিক ওদিক খুঁজে আবার গিয়ে আসরে বসলো রূপমতী। টের পেল না ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে কোথায় লালোয়া কুড়ুখ এক মনে তোতা আর ম্যোরের গান শুনছে। ভিড়ের গলায় গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

ভিখারিয়া জমে উঠলো এদিকে। সন্ধ্যা নামলো। ঘন হ'ল অন্ধকার। আর মূল গায়েন থেকে সবাই এসে একে একে দেখা দিয়ে গেল।

এদিকে রূপমতী, ওদিকে লালোয়া—ভিখারিয়াওয়ালাদের মুখে অপরের কুৎসা শুনে হাসছিল হো হো করে। কিন্তু কে জানতো সে গানের ধুয়ো ঘুরে ঘুরে রূপমতীতে এসে ঠেকবে।

"বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মত তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি ছুপছাপ মন রূপমতীর। গরীবে সে মোতি কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-ছুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিশ।"

এত কাব্য করে বলবার লোক তো নয় ভিখারিয়ার নাটুয়ারা। তাই গানটা কেমন যেন অসহ্য লাগলো লালোয়ার। অপেক্ষা করলো কেউ জবাব দেয় কিনা শোনবার জন্যে। কিন্তু সবাই শুধু হো হো করে হাসলো। এমন কি রূপমতী নিজেও। আর রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে একটা কয়লার চাঙড় পেয়ে সেটাই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো লালোয়া, গায়েনকে লক্ষ্য করে।

হৈ হৈ হট্টগোল। আসরসুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায়। একদল লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করলো গায়েনের দিকে। আরেক দল তাড়া করে এলো লালোয়া কুড়ুখকে।

ফার্নহোয়াইট, ডিকসন, সাঠে আর সাহানার নেশা জমে উঠেছে তখন। কার হাত থেকে যেন গেলাসটা ছিটকে পড়লো ঝনঝন শব্দ করে। রঙিন চোখ চেয়ে ব্যাপারটা ঠাহর করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সাঠে। টলতে টলতে দু' কদম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া? চিল্লাতা কাহে?

কেউ হয়তো শুনলো না তার কথা। উত্তর দিলো না কেউ।

রূপমতীও ভয়-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। কি করবে, কি করা উচিত কিছুই যেন ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর চোখজোড়া লালোয়ার মুখের ওপর পড়তেই ভিড়ের দিকে ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও।

আর পরমুহূর্তেই থেমে পড়তে হ'ল। কাঁধের ওপর ভারী হাতের অনুভব পেয়েই ফিরে তাকালো রূপমতী।

ফার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকু সাহেব বললে, যাও মাৎ।

বলে রূপমতীর হাত ধরে ডাক দিলো, চলো ডেরামে ভাগ চলো রূপমটি।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো রূপমতী, পারলো না। অসহায় চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকু সাহেবের মুখের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়টা যেন রূপমতীর দিকে ভেঙে পড়লো। লালোয়া

কুড়ুখের ওপর যত রাগ, সব এসে পড়লো রূপমতীর ওপর।

পাপ যদি না কইরেছে তো রূপমতীর নামে ছড়া বাঁধবে কেন ভিখারিয়ারা, কুইলার চাঙড় ছঁড়বে কেন লালোয়া কুড়ুখ। ও হ'ল সান্তাল, সাথাসাথী কিসের এত লালোয়ার সঙ্গে! আসরটা ভাঙে দিবার তরেই তৈরী ছিল কুড়িটো। বলাবলি করলো সকলে।

বলে রূপমতীর দিকেই ছুটে এলো দলটা।

পাশ থেকে মরিয়ম ফিসফিস করে বললে, পালায় যা পালায় যা রূপমতী।

আর ম্যাকু বললে, আও, চলে আও রূপমটি। বলেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়ে অন্ধকারে নেমে পড়লো।

নির্জন ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে এসেই পা থেমে পড়লো রূপমতীর। অস্ফুটে বললে, লালোয়া? লালোয়ার কি হবেক সাহেব? পর মুহূর্তেই ম্যাকুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আছি ইখানে, লালোয়াকে তু বাঁচারে সাহেব! কান্না এলো যেন ওর গলা ঠেলে।

—ডরো মাৎ।

রূপমতীর পিঠে ভারী হাতখানা রেখে সান্ত্বনা দিলো ম্যাকু।

আর এই সময়েই বাতাস চিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো রূপমতী। ম্যাকু সাহেবের চওড়া বুক টের পেল ঝ'ড়ো পায়রার ছটফটানি।

আশ্লেষ শিথিল করে ম্যাকু বললে, যাও ডেরামে যাও রূপমটি। লালোয়া বাঁচেগা। বলেই আসরের দিকে ছুটতে সুরু করলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডেরার দিকেই পা বাড়ালো রূপমতী।

লালোয়া বাঁচলো, কিন্তু ভিখারিয়াদের টাঙির ঘায়ে জখম হ'ল তার একখানা হাত। আর জখম হ'ল সান্তাল পট্টির মান ইজ্জৎ।

রূপ-ঝরানো ফূর্তি নিয়ে হাসি হাসি মুখে হেলেদুলে বেড়াতো রূপমতী। ফার্নহোয়াইট বা ডিকসন হঠাৎ যদি বা কখনো খাদে নেমেছে কয়লার সীম পরীক্ষা করতে, কিম্বা ওভারবার্ডেনের স্তূপ ডিঙিয়ে দেখতে গেছে ঠিকাদারের 'সাক্ষী'র নাপী ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা তো মাথার ঝুড়ি ফেলে বড়ো বড়ো চোখের কৌতুক আর কৌতূহল মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে রূপমতী, সাহেবের মুখ পানে চোখ এঁটে। শনিচারীর হাটে হুড়ু কিনতে গিয়ে ফিরেছে রঙিন কাচের জলচুড়ি নয়তো গলায় পুঁথিআঁটা হাঁসুলি পরে। কেউ সন্দেহ করে নি, দোষ দেখে নি কেউ। খাদানের রেজা, কদমে কদমে তার চোখ রাখলে চলে না। মন জুগিয়ে চললে তবেই ঘরে চালের জোগান আসে, সে খবর সবাই জানে। তা বলে এমন বেআবু হয়ে ইজ্জৎ হারানো?

ভিখারিয়ার গায়েন কিনা ছড়া বাঁধলো রূপমতীর নামে। সান্তাল পট্টির মান রইলো কোথায় তা হ'লে?

বুড়ো চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েৎ ডাকলো। ডাকলো রূপমতীর বাপ মাধো সোরেনকে।

আর সে খবর দিয়ে গেল রূপমতীর সই সোনা মিরু।

বললে, পঞ্চায়েৎ ডাকছে বুড়ো চুন্দু।

—কানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রূপমতী।

সোনা মিরু হেসে বললে, ভিখারিয়ার রাতে ম্যাকু সাহেবের সাথে পাপ কইরেছিস স্মরণ নাই তুয়ার?

—হুঁ। হাসলো রূপমতী। বললে, পঞ্চায়েৎ বৈসক। কাল চুন্দু বুড়ার ঘাড়ে বাকটো ফেলায় দিব, হুঁ।

কিন্তু ঘাড়ে বাকেট ফেলে দিয়ে চুন্দু বুড়োকে মেরে কি হবে, দুর্নাম ঘুচবে কে।

সারনাতলায় পঞ্চায়েৎ বসলো, আর পঞ্চায়েতের লোক এক কথায় বিচার দিলো।

—বিটলা।

মাধো সোরেন ফিরলো মাঝ রাতে। মেয়েকে ডেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, রূপতী!

—কি আপ্‌দ?

মাধোর চোখ সজল হ'ল।—পঞ্চায়েৎ বিটলার বিচার দেছে রূপতী!

—বিটলা? হতাশ চোখ মেলে প্রশ্ন করলো রূপমতী।

—বিটলা? চমকে উঠলো ম্যাকু সাহেব খবরটা শুনে।

খাদানের কাজ সেরে ফেরবার সময় ম্যাকুকে খবরটা জানাতে গিয়েছিল সোনা মিরু।

সোনা মিরু চোখ মুছে বললে, হুং সায়েব, তুই পাপ কইরেছিস, তুই ইবার বাঁচা উয়ারে।

কিন্তু বাঁচাতে বললেই তো বাঁচানো যায় না।

দুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ম্যাকু। জেলেকনাইটের কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বসলো তার ওপর। আর টিপলারে যেখানে কয়লার স্তূপ জমছে বাকেট উল্টে উল্টে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, কি করা উচিত।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকু। ধীরে ধীরে, নিজেরই অজান্তে কখন সান্তাল পট্টির দিকে পা বাড়ালো।

শুধু পট্টির হুকুমই নয়, পাঁচ গাঁয়ের মানকি তখন পঞ্চায়েতের বিচার দিয়ে দিয়েছে।

ভিখারিয়ার গানই নয়, হৈ হল্লার সুযোগ নিয়ে রূপমতী ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছিল কেন তা কারো বুঝতে বাকি নেই।

অতএব। বিটলা।

বিচার শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রূপমতী। যে লোকগুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জৎ কাড়বে ওর। ক্ষিদের যন্ত্রণায় কিংবা রোগে ভুগে ভুগে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও তখনও দয়া মায়া দেখাবে না কেউ।

বিটলা! বিচার দিলো বড়ো পঞ্চায়েৎ। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের সান্তাল ছেলে ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেললো রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে আরেক দল এলো তীর ধনুক উঁচিয়ে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আর অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিলো, কেউ টানলো তার শাড়ির আঁচল।

আর মাঝে মাঝে হৈ হৈ চিৎকার। বাচ্চা ছেলেগুলোও ছড়া কাটতে সুরু করলো। দু হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা রূপমতীর ওপর।

এদিকে বাঁশ পোঁতা হ'ল রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরোনো ঝাঁটা, আর ভাত খাওয়ার পর ফেলে দেয়া শালপাতা বেঁধে দেয়া হ'ল বাঁশের ডগায়। কেউ উনোন ভাঙলো, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করলো।

কিন্তু তারপর, তারপর পাড়ার মেয়েরা পালালো সেখান থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলো, লজ্জাশরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

উলঙ্গ লোকগুলোর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারলো না ম্যাকু।

গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, বীস্টস।

সামনের টুল থেকে হুইস্কির আরেকটা চুমুক দিলেন।

কথাগুলো শুনলো রূপমতী, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুর দিকে, অপমান আর নির্যাতনের হাত থেকে যে ওকে বাঁচিয়েছে।

রাতটাও কাটলো ফার্নহোয়াইটের বাংলোতেই, যে বাংলোর কোণের ঘরে ও'রাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়ার রাত কাটতো।

রূপমতীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো মেরিয়া।—সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর ওপর, ডর নাইরে রূপমতী।

ডর নাই? যত ভয়ডর তো সেইজন্যেই। খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী

গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে...বললে, বীস্ট্‌স্‌

যাকে সামনে পেলো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো রূপমতীর গায়ে।

ম্যাকু সাহেবকে দেখে ভয়ে থেমে পড়লো সবাই।

গায়ে কাপড়টা কোন রকমে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো রূপমতী। কপাল থেকে ঝরঝর রক্ত পড়ছে তখন। সারা গায়ে কাদা।

ম্যাকু এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরলো রূপমতীর একখানা হাত। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো বাংলোয়।

ফার্নহোয়াইট বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্ময়ে কপালে ভুরু তুলে তাকালেন। অর্থাৎ কি ব্যাপার?

বাউণ্ডুলে ম্যাকু এক মুখ হেসে বললে, মাই লেডী লাভ, মাই ওয়াইফ।

তারপর বললো সব ঘটনাটা।

শুনে হাসলেন ফার্নহোয়াইট।—এ প্রাইজ ইণ্ডিড, এ প্রাইজ ফর ইওর শিভাল্‌রি। বলে

এক জিনিস আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্য।

পীরিত ওর লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু' কুড়ি টাকা জমলেই।

তা নয়, ম্যাকু সাহেব হাসতে হাসতে এসে বলে কিনা রূপমতীকে সাদী করবে ও।

বিজাত খিস্টানের সঙ্গে সাদী? লালোয়াকে মুছে ফেলে ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে মিতালী পাতাতে হবে?

মেরিয়া বোঝালো রূপমতীকে।—ম্যাকু সাহেবের বাপটা আমারে সুখে রেইখেছেরে রূপমতী, বেটাও সুখে রাখবেন তুয়ারে। বলছে বিয়া করবে বটে।

শুনে ভয়ে কাঁপলো রূপমতী।

শিকল ছিঁড়ে পালালো ফার্নহোয়াইটের বাংলো থেকে।

হোক্‌ বিটলা। পট্টিই ভালো ওর। তবু তো লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে দেখা করতে পাবে লুকিয়ে।

আর, আর বুড়ো বাপ মাধো সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?

অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে ফিরে গেলো রূপমতী। পা টিপে টিপে ঝাঁপি সরালো, ঢুকলো ভেতরে।

মাধো সোরেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন কাশছে খুক খুক করে। আর জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে থেকে থেকে।

রূপমতী ডাকলো ধীরে ধীরে।—আপুং।

—রূপতী? আইছিস? চোখ খুললো মাধো।

রূপমতী এগিয়ে এলো কাছে, বাপের নির্বিকার মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। দেখলো মাধো সোরেনের দু' চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশঙ্কায় আগ্রহে প্রশ্ন করলো, আহার পাইছোন না আপুং?

মাধো বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেল মাধো। বিটলা হয়েছে রূপমতী। তাই মাধোর ঘুন্সিতে কড়ি থাকলেও দাম নাই তার। হাটের লোককেও জানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েৎ। হুড়ু বেচবে না কেউ ওকে, সিম-সিমারি কিনবে না।

—পট্টির সক্কল ডাইনী কইছে তুয়ারে। ডাইনীর বাপে ভুখা মইরতে হবেক।

—সোনা মিরু? আশায় আশায় প্রশ্ন করলো রূপমতী।

হাসলো মাধো।—ধুমকুড়িয়ার মায়া বটে সোনা, পঞ্চায়েতে ডর নাই উয়ার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপমতী। পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে।

সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেছে রূপমতী।

তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করলো। হয়তো লালোয়া কুড়ুখ আসবে, সব বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে।

কিন্তু লালোয়ার দেখা মিললো না। পঞ্চায়েতের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে সাহস পেল না হয়তো।

শুধু সোনা মিরু একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে এসে খাবার রেখে গেল। আর চাপা গলায় বলে গেল, ইখান থাকে পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা। সান্তালরা সব দল বাইন্ধা হামলা করবে তুয়ার পরে, আমি শুনেছি।

ভয় চাপা গলায় বললে সোনা মিরু, ভয় বাড়িয়ে দিলো রূপমতীর।

কিন্তু কি করবে রূপমতী? কি করতে পারে।

সারা রাত বসে বসে ভাবলো ও। তবু বুড়ো বাপ মাধো সোরেনকে ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পরের দিন সোনা মিরুর কথাই ফললো। রাত না বাড়তেই রূপমতী হৈ হল্লা শুনতে পেলো। দল বেঁধে আসছে সান্তালের দল। ঝাঁপির ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো রূপমতী। কুৎসিত উত্তেজনার হাসি চমকে উঠছে তাদের মুখে চোখে।

আর বুড়ো মাধো সোরেন নিঃশ্বাস চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, পালায় যা রূপতী, তু পালায় যা।

পিছনের ঝাঁপি খুলে পালালো রূপমতী। বুড়ো বাপের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে পালালো অন্ধকারে।

ম্যাকু সাহেবের বাংলোর পথ ধরে।

ম্যাকু সাহেব ওকে বিয়া করবে বলেছে, ম্যাকু সাহেব ওকে আশ্রয় দেবে।

ওরাঁওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়া বলেছে, সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর ওপর, ডর নাই-রে, সুখ্যে রাইখবে।

সব কানাকানি, খেউর হল্লা চুপ হয়ে গেল।

পঞ্চায়েৎ বললে, মানকির বিচার মিছা হয় না। পাপ কইরছিল রূপমতী, আপন পাপীর ঘরে ঠাঁই পায়েছে।

কোলিয়ারির সান্তাল কুলিকামিনরা বললে, বিটলাটো ঠিকই হইছে, কিন্তুক ডাইনী ইবার সান্তালদের মজুরী কাটবেক। বুড়ো সাহেবের বেটার ঘরণী হইছে উও।

ডিকসন সিগারেটের টুকরোটা জুতোয় মাড়িয়ে বললে, ন্যুইসেন্স। একটা সান্তাল গার্লকে কিনা বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তুলতে দিলো ফার্নহোয়াইট?

মিশিরজী আর সাহানা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলো।

কম্পাসবাবু চোখ কুঁচকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

আর সোনা মিরু এসে বসলো লালোয়া কুড়ুখের ক্লান্ত গাঁইতিটার পাশে। কোমরের গামছাটা খুলে পাখার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জোয়ান মানুষটো সায়েবের ডরে লুকায় থাকবি?

দীর্ঘশ্বাস ফেললে লালোয়া। বললে, সমঝায়ে দেখ তুই, কুমাণ্ডির খাদানে কাম মিলবেক বটে, ধাওড়ায় ঘর মিলবেক। বিটলার ডর নাই।

সোনা মিরু বললে, হুঁ সমঝাবো রূপমতীরে। কিন্তুক তুয়ার দুইটো হাতে ঘর বাঁধবার হইল নাই, একটো হাতে কি ঘর
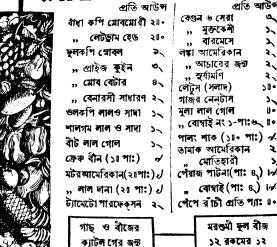
বাঁধবার পারেনে? কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে বিষন্ন হাসি হাসলো লালোয়া।

কিন্তু রূপমতী বুঝলো না।—লালোয়া? শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। বললে, ওটা মরদ বটে না ধুমকুড়িয়ার কুড়ি? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?

শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো লালোয়া। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই গিয়ে হাজির হল বাংলোর বাগানে।

ফার্নহোয়াইটের বাচ্চা মেয়েটার পেরাম্বুলেটর ঠেলছিল রূপমতী।

প্রথমটা চিনতে পারে নাই, ভাবছিল আয়াটাকেই জিজ্ঞেস করবে রূপমতীর খবর। কিন্তু বাঁক ঘুরে রূপমতী সামনা-সামনি হতেই সারা মুখ ম্লান হয়ে গেল লালোয়ার।

মাজা ঘষা রূপ, তকতকে ফর্সা একখানা শাড়ি, চুলে যত্নের চাকচিক্য।

লালোয়া বললে যা বলবার। অনুনয়, অনুযোগ।

আর রূপমতী শুধু অসম্মতির ঘাড় নাড়লো।

—ম্যাকু সাহেব কে তুয়ার, ও কি বিয়া করবে সান্তাল মায়েকে?

রূপমতী হাসলো। বললে, হুঁ। গির্জায় যায়ে খিস্টান হবো, ম্যাকু সায়েব বলছে উ আমার হাসবাঁধ বটে।

সত্যিই হ'ল তাই। শুনলো কোলিয়ারির সবাই। সুন্দরগড়ের সাদা-আলখাল্লা পাদ্রী সাহেব বাইকে চেপে এসে হাজির হ'ল একদিন, ছোট্ট গির্জার অল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল কিছুই বুঝলো না রূপমতী। শুধু বুঝলো, ওর নতুন নাম হ'ল রেবেকা। রূপমতী থেকে রেবেকা। সান্তাল থেকে খিস্টানী।

খুশিতে উছলে উঠলো রূপমতীর মন। পরের রবিবারেই ওদের বিয়া। তারপর? তারপরই ওকে রেবেকা মেমসায়েব বলবে খাদানের কুলিকামিনরা। আর পঞ্চায়েতের যারা বিটলার জন্যে চিৎকার করেছিল তারাই সেলাম জানাবে দেখা হ'লে।

এ যেন হারানো ইজ্জৎ ফিরে পাওয়া। লালোয়ার সঙ্গে ঠিগিয়া হ'লে কি এ সম্মান পেতো ও? সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হ'ত। কে কি কানাঘুষা করে, কে কি বিচার দেয়।

ম্যাকুর কাছে কতবারই তো শুনেছে ও, বিয়ের পর ম্যাকু হবে ওর হেরেল, স্বামী। খিস্টানী ভাষায় যাকে বলে হাসবাঁধ। অর্থাৎ হাসব্যান্ড।

আমলকীর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রূপমতী সব ভুলে গেল। ভাবলে, সুখের জীবন বুঝি মোড় নিলো এবার।

কিন্তু ভুল ভাবলো রূপমতী।

কোলিয়ারির চাকরি তো জুয়ার টাকা। আসতে যেতে সময় লাগে না। হিসেবের গলদ ধরা পড়লো, কোলকাতার আপিস জানালো ফার্নহোয়াইট বিদায় নিতে পারে চাকরী থেকে।

ফার্নহোয়াইট ছেলেকে ডেকে বললো, চাকরী যাক্, দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু টাকাগুলো ওড়ানোর জন্যে। তুমিও তো রোজগারের ধার দিয়ে গেলে না।

চুপ করে রইলো ম্যাক্।

ফার্নহোয়াইট বললে, তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে এবার। ভাবছি, ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে থাকবো, আর যদি চাকরি একটা পেয়ে যাই ভালই।

—আমি? প্রশ্ন করলো ম্যাকু।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোন ডোরা এসে পৌঁছবে এই সপ্তাহেই। তার সঙ্গে আসছে পার্সিভালের মেয়ে সিলভিয়া।

—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

ফার্নহোয়াইট হাসলেন।—তার যোগ্য হতে পারো তো পার্সিভাল নিশ্চয় একটা রেলের চাকরি তোমাকে দিতে পারবে।

—বিয়ে?

—কপালে চোখ তুলছো কেন? লাভ ইজ্‌ন্ট্ সামথিং ইম্পসিবল্!

মৃদু হেসে ফার্নহোয়াইট বললেন, রেবেকার কথা ভাবছো? ওটা কি বিয়ে নাকি? রোজগারের টাকাগুলো নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তোমার পাগলামির জন্যে দু' পাঁচশো টাকা খেসারৎ দেবার সঙ্গতি এখনো আছে।

শুনে কি একটা দাঁতে চিবোনো কটূক্তি করে সরে পড়লো ম্যাকু।

কিন্তু দিনকয়েক পরেই যখন ডোরার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌঁছলো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হ'ল বাপের কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আর ফার্নহোয়াইট রূপমতীকে ডেকে বললেন, চৌকিদারের ঘরটা খালি আছে, এক'টা দিন ওখানে থাকবে।

খুশী মনেই রাজী হ'ল রূপমতী। সত্যি তো। মেয়ে এসেছে, এসেছে মেয়ের সাথী। ও থাকলে বেমানান হবে বড়ো। আর অসুবিধেও হবে রূপমতীর নিজের।

সেই কথা বুঝিয়েই একদিন লরীতে মালপত্র তুললেন ফার্নহোয়াইট। ডোরা আর সিলভিয়া আগেই চলে গিয়েছিল। তাই বিদায়-মুহূর্তে রূপমতীর কান্না-ঝরা চোখ মুছিয়ে দিলো ম্যাকু। বাপের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখও মুছলো হয়তো।

বললে, ফিরে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর নিয়ে যাবো রেবেকাকে।

সজল চোখে আনন্দের হাসি দেখা দিলো রূপমতীর।

যাবার সময় এক গোছা নোট গুঁজে দিলো ম্যাকু, রূপমতীর হাতে।

লরী ছেড়ে দিলো, পিছনে পিছনে ফার্নহোয়াইটের ছোট্ট মোটরখানাও।

কিন্তু ম্যাকু ফিরলো না আর।

ফার্নহোয়াইটের জায়গায় মাস কয়েক পরে এলেন মিস্টার পেরেরা। এসেই বাবুর্চিকে বললেন, চৌকিদারের ঘর থেকে সান্তাল মেয়েটাকে তাড়াও।

রাঙা টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙালো রূপমতী। বললে, কে জানিস আমি? ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

শুনে হাসলো বাবুর্চি, হাসলেন মিস্টার পেরেরা। মিশিরজী, সাহানা, কম্পাসবাবু সবাই হাসলেন। আর ঠাট্টা বিদ্রূপের ছড়া বাঁধলো সান্তাল পট্টির মেয়েপুরুষ।

হাসবাঁধ। সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে ম্যাকু, তা কি এখনো বোঝেনি নাকি মেয়েটা?

হাসলো সবাই, হাসলো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

গির্জার সামনের ঘরটায়, যেখানে বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠে আসতে হ'ল রূপমতীকে সেখানেই ভীরু ভীরু চোখে উঁকি মারলো সে একদিন।

রূপমতীর চাটাইয়ের এক কোণে ভয়ে ভয়ে বসলো লালোয়া। বললে, চল রূপমতী, ইখান থেকে কুমাণ্ডীর খাদানে চলে যাই।

চোখ রাঙালো আবার রূপমতী। বললে, পাপের কথা সান্তাল কুড়িদের সাথে বলবি, আমি খিস্টানী বটি, পাপ করি না আমি। ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

সোনা মিরুও এলো একদিন দেখা করতে।

বললে, খাবি কি রূপমতী? খাদানে কাম নিবি তো চল্, মুনশিরে বলি।

—খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকু সায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকু সায়েবের ইজ্জৎ খতম্ করতে চাস তুরা?

—ম্যাকু সায়েবের ইজ্জৎ? রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো সোনা মিরু।—উ আর ফিরবে নাইরে, উ আর ফিরবে নাই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো রূপমতী।—ম্যাকু সায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যাছে। কয়ে যাছে ফিইরা আসবে।

কিন্তু ফিরলোনা ম্যাকু সায়েব। আর ম্যাকু সায়েবের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে অনাহারে, অভাবে দারিদ্র্যে রূপ হারালো রূপমতী। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো তার।

লালোয়া কুড়ুখ এলো একদিন। বসে গল্প করলো অনেকক্ষণ, তারপর অনুরোধ জানালো কুমান্ডির খাদানে যাবার।

আর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলো রূপমতী।

কিন্তু হাসি মুছে গেল ক্রমশঃ তার মুখ থেকে।

ফিরলো না ম্যাকু।

তবু ম্যাকুর বাচ্চাকে মানুষ করে তোলবার স্বপ্ন দেখলো রূপমতী। এক ইঁটের দেওয়াল দেয়া দেহাতী গির্জার পশ্চিমের ছোট্ট ঘরটায় চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখলো।

ছেলে বড়ো হবে, খাদানের সাহেব হবে তার ছেলে। সোনা মিরু বলে কি না খাদানে কাজ নিতে। নিজের মনেই হাসলো রূপমতী। সে হ'ল ম্যাকু সাহেবের বৌ, ইজ্জৎ নাই তার?

সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে ঠেলে আসতো প্রতি রবিবার। বাইবল্ পড়ার পর আর আর খিস্টানীদের সঙ্গে রূপমতীও সুর টেনে টেনে গাইতো প্রার্থনার গান, তারপর ইশু বোঙার কাছে বলতো, ম্যাকু সাহেবেরে তাড়াতাড়ি পাঠায়ে দে ইশু বোঙা। পাদ্রী যাবার সময় সান্ত্বনা জানিয়ে যেত। কখনো বা ও'রাও আর মুণ্ডা খিস্টানীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যেত রূপমতীকে।

সোনা মিরুও আসতো মাঝেসাঝে। এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত এনে রাখতো তার পাশে। বসতো, গল্প করতো।

আর বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনলেই ছুটে আসতো রূপমতী। ঐ বুঝি ম্যাকু সাহেবের গাড়ি এলো। এক মুখ আশা-উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ছুটে আসতো রাস্তা অবধি। তারপর মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস বুকে পুষে ফিরে যেতো।

সোনা মিরুকে বলতো, ফিরবো রে ফিইরা আসবেক। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা পারবো কানে।

লালোয়াও এসেছে কোন কোনদিন। সোনা মিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করেছে, রূপমতীটো পাগল হইছে।

সোনা মিরুও এসে জানিয়েছে, কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে রূপমতী। বলেছে, মুনশিকে বলে কাম ঠিক্ করে দেবে।

আর রূপমতী হেসেছে সে-কথা শুনে। ম্যাকু সায়েবের ওড়া গমকে অর্থাৎ ঘরণী কিনা খাদে গিয়ে ঝুড়ি বইবে? তাতে যে ম্যাকু সায়েবের ইজ্জৎ নষ্ট হবে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটেছে। শেষে মৃত্যুও ঘনিয়ে এলো একদিন।

দুপুরের ছুটির সাইরেন বাজার পর এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত নিয়ে এসে সোনা মিরু ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো রূপমতীর বীভৎস চেহারা দেখে। এনামেলের থালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রূপমতীর বুকের কাছ থেকে তুলে নিলো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে। তারপর—

চাঁদা তুলে কবর দেয়া হ'ল রূপমতীর। সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে এলো আবার, বাইবেল্ থেকে দু' লাইন বিড় বিড় করে চলে গেলো।

কবরের নিস্তব্ধতায় নামিয়ে দেয়া হ'ল রূপমতীর মৃতদেহ।

কবর নয়, মাটির ঢিবি। তার ওপর দু' টুকরো কাঠ আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা ক্রশ পুঁতে দেয়া হ'ল।

তারপর খিস্টান পল্লীর সবাই ভুলে গেল রূপমতীর কথা।

ভুললো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

কারানপুরার কুলিকামিন, কোড়া কুড়িরা বলে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এসে বসতো ও কবরের পাশে, ভয়ে ভয়ে হাত বোলাতো কবরের মাটির ওপর। চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে সে-মাটি ভিজে যেতো কোন কোনদিন। তারপর এক সময় মাটির প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে চলে যেতো লালোয়া।

খিস্টান পল্লীর সান্তালরা বলে, লালোয়ার দেখাদেখি সোনা মিরুও এসে বসতো কবরের পাশে। রূপমতীর ঘুম ভেঙে যাবে এই ভয়ে একটাও কথা বলতো না সে। শুধু কোন কোনদিন প্রদীপটা এগিয়ে দিতো নিজেই, কিংবা লালোয়ার হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে চকমকি ঠুকে ঠুকে নিজেই জ্বালাতো সেটা।

সান্তাল পাট্টির বুড়হা বুড়হির দল বলে—শালপাতার আড়াল-দেয়া প্রদীপের শিখাটা জ্বলতো তারার মত, দেখেছে তারা নিজের চোখে, প্রতিদিন দেখতে পেতো।

আর তা দেখে একে একে সান্তাল পল্লীর সবাই এসে বসতে সুরু করলো রূপমতীর কবরের পাশে।

এসে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিরে যাওয়া।

এ প্রদীপের শিখা সবাই দেখতে পেতো দূর থেকে।

ক্রমশ মুর্গী বলি সুরু হ'ল রূপমতীর কবরের পাশে, পৌষ পরবে নাচ সুরু হ'ল। ও'রাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধলো সাদা আর কালো খিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খিস্টানরাই জিতলো শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্ন-হোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।

বড়ো বড়ো হরফে পাথর খোদাই করে লেখা হ'ল রেবেকা সোরেনের নাম।

আজও কারানপুরার কোলিয়ারিতে রেবেকা সোরেনের কবর ঘিরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলে। লালোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই।

কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিভে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জ্বালাতে পারতো।
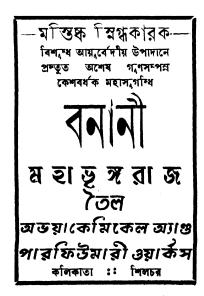
সে আলো জ্বলতো শুধু সোনা মিরুর বুকে।

হরিনারায়ণ

লীলা মজুমদার

আ/ড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম নতুন ছেলেটির চেহারার সঙ্গে ফিরপিটির চেহারার একেবারে কোনও তফাৎ নেই। সেই রোগা [illegible] শরীর, সেই লিকলিকে হাত পা, সেই [illegible] চোখ, সেই হঠাৎ হঠাৎ ইদিক উদিক তাকানো। এসে বসল ঠিক আমারই পাশে। নগা বটুরা তাই দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল আর রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ঠিক করলাম ছেলেটাকে এইসা কষে দাবড়ে দেব যে আর জন্মে কক্ষনও আমার দিকে এগুবে না।

এমন সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ছেলেটি বলল—"ভুবনডাঙ্গা, ঠ্যাঙ্গাড়ের মাঠ—এই সব নাম শুনেছিস কখনও? সেখানে শ্যাওড়া গাছের ধারে ধারে কেয়া বনের আড়ালে আড়ালে মাটি খুঁড়লে কত যে হাড়গোড় পাওয়া যায় তার ঠিক নেই। বুঝলি, সেইখানে আমার বাড়ি।"

তখন ইতিহাস ক্লাশ, অবনীবাবু দেখতে ঐ রকম ভালো মানুষ হ'লে কি হবে, আসলে উনি হ'লেন একটি কেউটে সাপ। বই থেকে চোখ তুলবার আমার সাহস হচ্ছে না, অথচ ছেলেটি কানের কাছে অনর্গল বকে যেতে লাগল, আর সড় সড় ক'রে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। খুব ঘেঁষে এসে আমার বইএর মধ্যে প্রায় মুখ গুঁজে ফেলে, বলতে লাগল—

"তুই বন্ধু লোক, তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই, আমার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সারা গুষ্টি খুঁজে দেখলে একটাও ভালো লোক পাওয়া যাবে না। সব খুনে, ডাকাত, ঠগ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। কি ভীষণ মিথ্যাবাদী আর কি দারুণ অসৎ যে আমার বাপঠাকুরদারা সে না দেখলে বিশ্বাস করবি না।"

ঘণ্টা পড়ে গেল, অবনীবাবু চলে গেলেন, অঙ্কের বই হাতে করে অনঙ্গবাবু এলেন। উনি হ'লেন ঐ আরেকজন—অবনীবাবুর মত, কিন্তু তাঁর চেয়েও সাংঘাতিক। নতুন ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আর খচ্‌খচ্‌ ক'রে সব অঙ্ক টুকে নিতে লাগল। তখন আর বিশেষ কথা হ'ল না। সেই সব তেলচিটে বাঁশ বেয়ে বাঁদর ওঠার অঙ্ক, ও আমার কখনই ঠিক হয় না, আজও হ'ল না। কিন্তু ও ব্যাটা দেখলাম সব ঠিক করে কষে রাখল। যাই হোক, তারপর রতন মাষ্টারের বাংলা ক্লাশ। ঢিলে হাতার লম্বা পাঞ্জাবী প'রে কোঁচা দুলিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখ ক'রে কোনও দিকে না তাকিয়ে উনি রবিবাবুর কবিতা পড়তে লাগলেন, আর ছেলেটা আবার আমার বইএ মুখ গুঁজে বলতে আরম্ভ করল,—

"বুঝলি, সারা জীবনে ও'রা কেউ একটা ভালো কাজ করেন নি, লোক ঠেঙিয়ে, লোক ঠকিয়ে, ডাকাতি করে, মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে শেষটা প্রত্যেকে বুড়ো বয়সে হরিনাম শুনতে শুনতে নিজেদের বিছানায় শুয়ে শান্তিতে মারা গেছেন। আর জানিসই ত' যারা হরিনাম শুনতে শুনতে মারা যায়, তারা সব্বাই স্বর্গে যায়।"

রতন মাষ্টার একটা কবিতা শেষ ক'রে, অন্যমনস্কভাবে চারদিকে একবার তাকিয়ে, আবার আরেকটা সুর করে পড়তে সুরু করলেন। ছেলেটা বলল, "কি সুখেই যে সব ছিলেন সেকালে সে আর তোকে কী বলব। বাড়ীতে গোরু, বালতি বালতি দুধ দিচ্ছে, দই হচ্ছে, ক্ষীর হচ্ছে, ছানা হচ্ছে, সন্দেশ হচ্ছে, ঘি হচ্ছে। গাছ ভরা আম কাঁঠাল, বাগানভরা তরিতরকারী। একবার সাহস ক'রে যদি ভুবনডাঙ্গা যাস ত' এখনও কিছু কিছু দেখবি। সবার হাতে মোটা মোটা সোনার তাগা, গলায় সোণা দিয়ে বাঁধান রুদ্রাক্ষের মালা। সবাই নিরামিষ খেতেন, ত্রিসন্ধ্যে জপতপ করতেন। আর ঘরে ঘড়া ঘড়া মোহর, সে রাখবার জায়গা হয় না, আদাড়ে বাদাড়ে কলসীতে পুরে পুঁতে রাখা হ'ত। কতক মনে থাকত, কতক আবার ভুলেও যেতেন। এখন ত' যে কেউ জায়গা বুঝে মাটি খুঁড়ে সে সব বের করে আনতে পারে, না বলবার একটা লোকও নেই।"

আমি একবার আড় চোখে ছেলেটার দিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আমিই হলাম শেষ বংশধর, আর সব মরে ঝরে চাঁচা পোঁচা হয়ে গেছে।"

তারপর পকেট থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চেহারা দেওয়া এত বড় একটা টাকা বের ক'রে বলল—"ধরে দেখ, কি রকম ভারী, একেবারে খাঁটি রুপো। আজকাল চেয়ে চেয়ে লোকে পায় না। আর ওঁরা এ সব যেখানে সেখানে ফেলে দিতেন। এটা আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে কুড়িয়ে পেয়েছি। যাস একবার—এমনি কত পড়ে আছে।"

ঘণ্টা পড়ল, রতন মাষ্টার পড়েই যাচ্ছেন। নগা বটুরা মহা হট্টগোল লাগিয়ে দিল, "স্যার, ঘণ্টা পড়ে গেছে স্যার।" রতন মাষ্টারও অন্যমনস্কভাবে বই বন্ধ করে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। জ্ঞানবাবু এলেন।

জ্ঞানবাবুর ইংরিজি ক্লাশেও যে কেউ সাহস ক'রে কথা বলে এই প্রথম দেখলাম। নতুন ছেলেটা আমার বই দিয়ে একটুখানি মুখ আড়াল করে অম্লান বদনে বকে যেতে লাগল। "দেখ্‌, এই যে সব লোকরা জেল খাটে, জরিমানা দেয়, তাদের আমি ভারী ঘৃণা করি। অন্যায় করলে আমার একটুও রাগ হয় না, কিন্তু ধরা পড়লে আর আমি তাকে ক্ষমা করি না। বুঝলি, আমার বাবার ঠাকুরদা রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মুখে একটা পান পুরে লম্বা লম্বা বাঁশের রণ-পা চড়ে অনায়াসে পঞ্চান্ন মাইল দূরে বর্ধমানে গিয়ে এর ওর তার বাড়ী থেকে ঠেঙিয়ে পিটিয়ে পুঁটলিভরে সোনাদানা নিয়ে আবার রণ-পা চেপে ভোরের আগে বাড়ী ফিরে, রণ-পা দুটোকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে, পুঁটলি তাল গাছের আগায় বেঁধে রেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। ভোর বেলা পুলিশের লোকে সন্দেহ ক'রে এসে হাজির হত। ঠাকুরদাদা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, পায়ে এতটুকু কাদা পর্যন্ত লেগে নেই। তারা বার বার মাপ চেয়ে চলে যেত। কিন্তু ঠাকুরদাদা ভারী ভদ্রলোক ছিলেন, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। ভেবে দেখ্‌, সেই শীতের সকালে মাঠঘাট থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা উঠছে, আমলকী গাছের পাতায় একটু রোদ লেগেছে, আর লাল লাল চোখ করে ঠাকুরদা পুলিশদের ক্ষীর দিয়ে কলা দিয়ে খ্যাসরাপাতি ধানের খই খাওয়াচ্ছেন।"

তারপর টিফিনের ছুটি হ'ল, আমি ঘণ্টা পড়ামাত্র মেজদাদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করলাম। মেজদা বোধ হয় খুব খুশি হ'ল না। কিন্তু ঐ নগা বটুদের কাছে গেলেই নতুন ছেলেটার সম্বন্ধে সাত সতেরো জিজ্ঞাসা করবে, আমার আর সে সব বলতে ইচ্ছা করছিল না।

টিফিনের পর পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত ক্লাশ, তখন সবাই গল্প করে। ছেলেটা ত' আবার আমার পাশে বসেছে, কাছে এসে বলতে আরম্ভ করল,—

"দেখ্‌, আমার পূর্ব পুরুষরা যে রকম পাষণ্ড ছিলেন, আবার তেমনি দয়ালুও ছিলেন। এ দিকে এক কোপে শত্রুর মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার ওদিকে লোকের দুঃখের কথা শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মহৎ লোকেরা ঐরকমই হন। বুঝলি, একবার ও'রা সিউড়ির

"কি ভীষণ মিথ্যাবাদী আর কি দারুণ অসৎ যে আমার বাপ-ঠাকুরদারা........"

ওদিকে কোথাকার এক মহা অহংকারী জমিদারকে উচিত শিক্ষা দিতে গেছেন। সব কিছু তছনচ ক'রে দিয়ে, তাল তাল লুট নিয়ে ফিরছেন, এমন সময় ঐ জমিদার আর তার সাত ছেলে, কে'দে এসে পায়ে পড়ল, 'তারা কাজকর্ম কখনও করতে শেখে নি, এখন খাবে কি? তাই শুনে আমার পিতৃপুরুষেরা হাউ হাউ ক'রে কে'দে উঠে, লুটের জিনিষ ত' ফিরিয়ে দিলেনই, নিজেদের হাত থেকে সোণার তাগা খুলে তাও দিয়ে দিলেন, ঘোড়া চড়ে যাচ্ছিলেন, সে সব ঘোড়া দিয়ে দিলেন। পায়ে হে'টে বারো মাইল পথ পার হতে বিকেল হয়ে গেল।"

তারপর দু' ঘণ্টা ড্রইং ক্লাশ। এবার সকলের যা স্ফূর্তি, জায়গা টায়গা বদল করে যার যেখানে খুশি বসছে, পেন্সিল কাটবার ছুতো করে এদিক ওদিক ঘুরছে, ভীষণ গল্প করছে। নগা বটুও অন্য দিনের মত আমার আশে পাশে ঘুরতে লাগল। আমি যেন দেখতেই পাইনি, এমনি ক'রে ছবি আঁকার তোড়জোড় করতে লাগলাম। ছেলেটাও চুপ করে বসে রইল, ছবি টবি ত' মোটে আঁকতে পারে না দেখলাম।

ক্লাশটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে বলল,—"দেখ, ভালো হয়ে আর কে কবে বড়লোক হয়েছে তুই-ই বল না? আমার দশা দেখ্, কি একটা মোটা জামা কাপড় পরে তোদের সংগে পড়াশুনো করতে এসেছি। ভালো হওয়ার

এইটি আমার বড় ছেলে হরিনারায়ণ

উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কী করি বল, রক্তের মধ্যে আমার ডাকাতি রয়েছে। ভাবছি গরমের ছুটির পর আর স্কুলে আসব না। ভুবনডাঙগার পুরোন বাড়িটা রয়েছে, মাটি খু'ড়লেই তাল তাল মোহর রয়েছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। ভাবছি আস্তে আস্তে পুরোন ব্যবসাটা আবার [illegible] দিয়ে নিই। আসবি নাকি আমার সংগে? যা অংক কষলি দেখলাম, তোর ভবিষ্যৎটা ত' একেবারে অন্ধকার।"

কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। পড়া শুনো ছেড়ে দিয়ে ভুবনডাঙগার ঠ্যাংগা [illegible] মাঠে ঘুরে বেড়াব, দইক্ষীর খাব, এতে আর [illegible] কী আছে? কিন্তু মুস্কিল হল মা বাবা আর আমার ছোট বোন ফুটকি যে [illegible] দুষ্টু লোককে দেখতে পারে না। এখন [illegible] করা যায়? ঠিক এমনি সময় হেডমাষ্টার[illegible]এর সংগে সংগে হেড কেরাণীবাবু এসে আমাদের ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন।

কেরাণীবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলেন,—"হ্যাঁ স্যার, এইটিই আমার বড় ছেলে হরিনারায়ণ, এর ছোট আরও তিনটি আছে। নিজের ছেলে ব'লে বলছি না, কিন্তু এমন সত্যবাদী সৎ ছেলে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

আর গুরুজনের প্রতি কী ভক্তি। আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবকে ত' এক রকম পূজো করে। একে স্যার, এই ক্লাশে না নিলে হবে না।"

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে হেড মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ভাবছি কাল কোথায় বসা যায়।

এ দেশে এখন রাজা কোথায়? আর রাজাই বা কোথায়? রাজা-রাজড়া একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে—এদেশ, ওদেশ অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই। কিছুকাল পরে 'রাজা' কথাটা, ঠাকুমার গল্পের ঝুলির মধ্যেই থেকে যাবে—রাক্ষস খোক্কসের গল্পের মতো।

বারোশ' বছর আগেকার কথা—আর কথাটা হোল, এই বাংলাদেশেরই। বাংলার অবস্থা তখন ছিল, ঠিক যেন "মাৎস্য ন্যায়"। মাছ থেকে এসেছে এই কথা। বড় বড় ধাড়ী মাছগুলো করে কি, ছোট ছোট মাছগুলোকে পেলেই গিলে খেয়ে ফেলে। তখন এমনিতরো ছিল এ দেশের অবস্থা।

বাংলাদেশ তখন ছিল রাজায় রাজায় ভর্তি। রাজা বলতে, জমিদার-রাজা। জমিদারে জমিদারে খুব চলতো লড়াই-যুদ্ধ। এক জমিদার আর এক জমিদারকে দেখতে পারতো না। বড় জমিদার ছোট জমিদারকে গ্রাস করে নিতো। বাংলাদেশময় ছিল অশান্তি, বিশৃংখলা। রাজার মত রাজা একজনও ছিলেন না। দেশটা তখন ছিল অরাজক। এরই সুযোগ নিয়ে তখন বাংলা দেশের উপর আক্রমণ চলছিল চতুর্দিক থেকে। বিদেশী রাজারা এসে বাংলার গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতো, লোকেদের মেরে ধরে, লুঠ পাট করে নিয়ে চলে যেতো। কোন জমিদারেরই কি ক্ষমতা ছিল, এই সব অত্যাচার থেকে বাংলাকে বাঁচাবার? কারুরই ক্ষমতা ছিল না। এমনি ছিল তখনকার বাংলা।

একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন তখন উত্তর বাংলায়। তাঁর নাম দয়িতবিষ্ণু। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন মহা-বিদ্বান, যে জন্য বাংলার পণ্ডিত সমাজ তাঁকে খুব মান্য করতো। দয়িতবিষ্ণুর ছেলে হোল ব্যপট। বাপট পণ্ডিতের ছেলে হয়েও বিদ্যা-চর্চার দিকে না গিয়ে অস্ত্র চর্চা ধরলেন—দেশের অবস্থা দেখে। তাতে ফল হোল খুব ভালই।

অস্ত্র চর্চা করে তিনি মহাবীর হোয়ে উঠলেন। দুর্বলদের রক্ষা করতে লাগলেন, আর দেখতে দেখতে একজন প্রবল জমিদার হয়ে উঠলেন। তারপর শত্রুদের দমন করতে লাগলেন, চোর-ডাকাত, বদমাইসদের উচ্ছেদ করতে লাগলেন, আর নানা জায়গায় দুর্গ তৈরী করে ফেললেন। দেশময় তাঁর সুনাম রটে গেল।

ব্যপটের এক ছেলে। নাম তাঁর গোপাল দেব। পিতার তিনি উপযুক্ত পুত্র। খুব প্রতাপশালী তিনি। শত্রু দমনে তিনি ছিলেন পিতার চেয়েও সিদ্ধহস্ত। চোর-ডাকাতে তাঁকে যমের মতো ভয় করতো। দুষ্টু জমিদারেরা তাঁর কাছে ঘে'সতো না—বিষম ভয় করতো তাঁকে। ছোটদের তিনি সব সময় সকল রকম আপদ বিপদে সাহায্য করতেন। তাঁর নিজের এলাকা ছিল খুব শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব স্থান। লোকেরা তাঁকে মান্য করতো ঠিক রাজার মতন।

গোপালদেবকে দেখে, বাংলার অন্য সব জায়গার লোকেদেরও নজর পড়লো তাঁর উপর। এই সকল লোক ভীষণভাবে অত্যাচার-জর্জরিত। সর্বদাই থাকে অশান্তিতে—ঘুম নেই চোখে। এরা সবাই বললে, দেশ তো অরাজক হোয়ে রয়েছে। এই অরাজক দেশে গোপালদেবকে যদি রাজা করা যায় তো সব দিকে ভাল হয়। তাঁর মতো যোগ্য রাজা আর পাওয়া যাবে কোথায়? এই ভেবে সবাই ঠিক করে ফেললে—গোপালদেবই হবেন দেশের রাজা। তখন দেশশুদ্ধ লোক সবাই মিলে গোপালদেবকে করলেন বাংলার রাজা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এলেন; হাতী ঘোড়া এলো, লোক লস্কর সবই এলো, রাজ সিংহাসন এলো। মহা উৎসব করে, মহাসমারোহ করে গোপাল-দেবের রাজ্যাভিষেক হোল, তিনি সারা বাংলার রাজা হোয়ে বসলেন।

গোপালদেবের রাজা হওয়াতে খুব ভালই হোল। সমস্ত বাংলার অরাজকতা চলে গেল। দেশ সুশাসনে এলো। সকলেই সুখী হোল। সারা বাংলা ধনে ধান্যে, সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। গোপালদেব ছিলেন মহাবীর, মহাপরাক্রমশালী। কিন্তু অপরের রাজ্য নিয়ে নিজের রাজত্ব বাড়াবার ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না। তাঁর রাজ্য আপনা হোতেই বেড়ে চললো বহু দূর অবধি—একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। গোপালদেব ছিলেন সত্যই রাজার মতো রাজা। তিনি দেশের উন্নতির দিকে, সমাজের উন্নতির দিকে মন দিলেন। লোকেদের জ্ঞানলাভ হবে কিসে, আর প্রজারা সুখে থাকবে কি করলে সে দিকেও তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। তাঁর রাজ্যটি হোল বেশ সুখের রাজ্য।

গোপালদেবের মহিষীর নাম ছিল দেদ্দদেবী। এ'দের একটি সন্তান হয়। তিনি হোলেন স্বনামধন্য ধর্মপাল। ধর্মপাল হোলেন রাজার ছেলে। তিনি খুব যুদ্ধকৌশলী আর মহাবীর। ইনি রাজা হয়ে খুব দিগ্বিজয় করেন আর নিজের রাজ্যকে এক বিরাট রাজ্যে পরিণত করেন।

এ সব কতকালের কথা—কোন্ যুগের কথা! শোনা যায়, গোপালদেবের সমাধির চিহ্ন নাকি এখনো আছে, আর রোজ সন্ধ্যায় সেখানে নাকি প্রদীপও জ্বলে।

কবিগুরুর সরবৎ

শ্রীসুনির্মল বসু

বিশ্বকবি রবি ঠাকুর সকাল বেলা নিত্য
কাচের গ্লাসে সরবৎ খান, রোজ দিয়ে যায় ভৃত্য;
সবুজ রংয়ের সিরাপ বুঝি, বেজায় সেটা মিষ্টি!
দুটি দুয়েক দুষ্টু ছেলের পড়লো তাতে দৃষ্টি।
কবিগুরু খান কি ওটা, সবুজ রংয়ের দ্রব্য?
বিদেশ থেকে আমদানি ঠিক, সহজ নহে লভ্য;
আলোচনা করছে তারা, একটু যদি পায় রে
আস্বাদে তার জীবন তাদের ধন্য হয়ে যায় রে।
সকাল বেলা রোজই তারা করছে এটা লক্ষ্য,
আশে পাশে ঘুরছে যেথা কবিগুরুর কক্ষ।
কবির কাছে চাইবে তারা একটু সিরাপ চাখতে
ভরসা নাহি হচ্ছে এমন, পারছে না আর থাকতে।
কবিগুরু বুঝতে পারেন ছেলে দুটির ইচ্ছে',
সকাল বেলা চাকর যখন সরবৎ তাঁর দিচ্ছে
গেলাস রেখে উঠে হঠাৎ গেলেন চলে বাইরে,
ছেলে দুজন জানলা দিয়ে দেখতে পেল তাইরে।
যেই না কবি বের হয়েছেন সিরাপ ফেলে সদ্য
দৌড়ে এসে ঢুকলো দুজন কবির ঘরের মধ্য।
কবি এখন বাইরে গেছেন কিছুক্ষণের জন্য,
এই সুযোগে চাখবে সিরাপ, জীবন হবে ধন্য।
গ্লাসের কাছেই চামচ ছিল, চামচ তুলে হস্তে
গ্লাসের মাঝে এবার তারা ডুবায় শশব্যস্তে;

আর কী তোফা সবুজ সিরাপ, আনন্দে আর হর্ষে
যেই না গলায় ঢাললো তারা, চক্ষে দেখে শর্ষে।
পেটের নাড়ি উলটে আসে, 'ওয়াক ওয়াক' শব্দ,
সবুজ সিরাপ চাখতে গিয়ে আচ্ছা রকম জব্দ।
ব্যাপারটা কি! ব্যাপারটা কি!! জাগছে বড় সন্ধ,
কবিগুরুর সরবতে যে বিদ্ঘুটে এক গন্ধ।
দেখতে বটে লোভনীয়, সরবৎ নয় ঠিক তো!
যেমনি বোঁদা, তেমনি সোঁদা, তেমনি আবার তিক্ত।
খবর নিতে বল্লে তখন কবির চাকর বৃদ্ধ
"রোজ সকালে খান যে বাবু নিমের পাঁচন সিদ্ধ,
কবিরাজের ব্যবস্থা এ, সারবে বাবুর পিত্ত,
তাই সকালে যোগাই পাঁচন" বল্লে হেসে ভৃত্য।

মনের মতো ভাড়াটে

'স্বপন-বুড়ো'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জগদ্দল জোয়ারদার।

মনের মতো ছোটখাটো একটি বাড়ী তিনি তৈরী করেছেন, এইবার মনের মতো এক ঘর ভাড়াটে পেলেই তিনি খুশী।

সারা জীবন খেয়ে-না-খেয়ে একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে জগদ্দলবাবু এই ছোটখাটো বাড়ীটি একটি নিরিবিলি অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন। এ বাড়ীর প্রত্যেকখানি ইট তাঁর বুকের পাঁজর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আগাগোড়া মিস্ত্রি দিয়ে তৈরী করিয়েছেন এই বাড়ী—কোনো ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নেন নি। সেজন্যে তাঁর গর্বের সীমা নেই।

ভুঁড়ি দুলিয়ে সবাইকে ডেকে তিনি বাড়ীখানি দেখান আর নিজের মুখেই তার ব্যাখান করেন উচ্ছ্বসিতভাবে। নিখুঁত, সুন্দর একতলা বাড়ী—মোট পাঁচখানি ঘর। দুখানি ঘরে তিনি নিজে থাকবেন—আর তিনখানি ঘর ভাড়া দেবেন।

নির্ঝঞ্ঝাট একটি পরিবার খুঁজছেন তিনি। তাঁর নিজের ত' কোনো বালাই নেই, তিনি স্বয়ং, আর তাঁর দুটি ছেলে। একজন চাকরী করে, আর ছোট ছেলে ইস্কুলে পড়ে। সম্প্রতি আবার চাকুরে ছেলেটি অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। কাজেই রইলেন মাত্র দুটি প্রাণী। সেজন্য শোবার পক্ষে একখানি ঘরই যথেষ্ট। আর একটি বাড়তি ঘর রইল বৈঠকখানা হিসেবে।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছোট এক ঘর ভাড়াটে জুটল—স্বামী, স্ত্রী আর একটি ছোট ছেলে। সংসারে তাদের কোনো ঝামেলা নেই।

তারাও বাড়ীখানি দেখে খুব খুশী। নিরিবিলি পল্লীতে বাড়ী, জল-কলের কোনো অসুবিধে নেই। শুধু মাঝখানে একটি বারোয়ারী উঠোন। তবে একটি সুবিধে এই যে, বিপত্নীক জগদ্দলবাবু সব সময় বাড়ীর বাইরে বাইরেই থাকেন—শুধু স্নান-খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমুনো ছাড়া।

নতুন ভাড়াটে কেবলরামবাবু একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক। যেখানকার যে জিনিসটা সেখানে গুছিয়ে রাখা চাই। ক্যালেন্ডারটা ঠিক মতো ঝোলানো থাকবে দেয়ালে। কিন্তু বাতাসে পাতা ফর্ ফর্ করলে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ছবিটি একটু বেঁকে থাকলে তাঁর অস্বোয়াস্তির সীমা থাকে না! প্রথম দিনই বাসায় এসে তিনি সব গোছগাছ করে ফেল্লেন।

সারা দিন গলদঘর্ম হয়ে খেটে সন্ধ্যেবেলা তিনি বাথরুমে ঢুকে স্নান করে নিলেন।

যাক এইবার নিশ্চিন্ত।

শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে বটে তবে রাত্তিরটা আরাম করে ঘুমুনো চলবে।

তাড়াতাড়ি যাহোক ভাতে-ভাত দিয়ে রাত্তিরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে—কোলবালিশটা টেনে নিয়ে কেবলরামবাবু আরাম করে বিছানায় গা গড়িয়ে দিলেন। কেবলরামবাবু একটু নিদ্রাবিলাসী মানুষ। একটু কম খেলে বরং ভালই থাকেন; কিন্তু রাত্তিরে না ঘুমিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, কিন্তু ঘুমটা চাই, একটানা। রাত্তিরে কোনো কারণে ঘুম ভেঙে গেলে—তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। সারাদিন হাই ওঠে; অফিসের কাজে মন বসে না, কেবলি মাথাটা ঠুকে যায় টেবিলের ওপর।

এ-হেন ঘুমকাতুরে কেবলরামবাবু তো কোলবালিশ টেনে শুয়ে পড়লেন।

নতুন ঝক্‌ঝকে বাড়ী—ইঁদুর, আরশুলোর উৎপাত নেই, মনে মনে আশা আছে ঘুমটা ভালই হবে।

সাধা-নিদ্রা সহজ পথেই এসেছিল। কিন্তু রাত দুপুরে হঠাৎ বাঘ ডাকে কোথায়?

আচম্‌কা কেবলরামবাবুর ঘুমটা কাচের বাসনের মতো খান্ খান্ করে ভেঙে গেল।

তাইত! পাশের ঘরেই বাঘ ডাকছে। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। না-না, আর দেরী করা নয়। বাড়ীওয়ালাই তো ও ঘরে শুয়েছেন।

শহরতলীর একান্তে বাড়ীখানি। আজকালকার দিনে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়ত সুন্দরবন থেকে এসে বাঘ ঢুকেছে একটা ওই ঘরে। ভদ্রলোকের ভাগ্যে কি হয়েছে—কে জানে!

না—না, কোনোমতেই আর দেরী করা উচিত হবে না।

কোনো রকমে কাছা-কোঁচা সামলে নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কেবলরামবাবু—

তারপর জগদ্দলবাবুর বন্ধ দরজায় ধাক্কাতে সুরু করলেন—

ও মশাই, শীগ্গীর উঠুন, ঘরের ভেতর বাঘ ঢুকেছে—একেবারে জ্যান্ত বাঘ মশাই—!

কি মুস্কিল! ভেতর থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।

তখন মরিয়া হয়ে কেবলরামবাবু চ্যাঁচাতে লাগলেন—এখনো বেঁচে থাকেন তো সাড়া দিন মশাই;—পুলিশ ডাকবো, না, ডাক্তার ডাকবো?

কেবলরামবাবুর চ্যাঁচামেচিতে আশে-পাশের বাড়ীর লোকজন সব জেগে উঠেছে। কেউ দোতলা, কেউ জানালার ধার থেকে হাসছে সেই নিশুতি রাত্রে।

শেষকালে এক বুড়ো ভদ্রলোক দয়া পরবশ হয়ে ওকে জানালেন, ও মশাই, আপনি নতুন

মানুষ এ পাড়ায় এসেছেন, তাই ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি। ও বাঘ-টাগ কিছু নয় মশাই, স্রেফ জগদ্দলবাবুর নাকের ডাক।

অ্যাঁ! নাকের ডাক?

আজ্ঞে হ্যাঁ, নাকের ডাক। রাত্তিরে ডাকে কিনা! আপনি সারারাত্তির ধরে ওখানে চ্যাঁচালেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙবে না। মাঝখান থেকে আমাদেরই শুধু জেগে বসে থাকতে হবে। তার চাইতে এক কাজ করুন,—নিজের ঘরে গিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ুন গে।

কেবলরামবাবু প্রথমটা ভারী লজ্জিত হলেন। তারপর উদয় হ'ল ওর ক্রোধ। কী রকম বে-আক্কেলে মানুষ এই জগদ্দলবাবু! এই রকম করে নাক ডাকালে কেউ পাশের ঘরে ঘুমুতে পারে?

একবার ভাবলেন পুলিশ ডাকবেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন—তাতে আরো বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে। From frying pan—to the fire!

নাঃ, রাতটা কোনো রকমে কাটুক। এ বাসায় তিনি আর একদিনও থাকছেন না। দু মাসের বাড়ী ভাড়া আগাম দেয়া আছে। তা যাক্ সে টাকা জলে! এই বাড়ীতে কোনো মানুষ বাস করতে পারে?

কেবলরামবাবু সারা রাত উঠোনে পাইচারী করে বেড়ালেন। দুটো চোখের পাতা এক করতে পারলেন না।

শান্ত মানুষ কেবলরামবাবু এত চটে গিয়েছিলেন যে, সকাল বেলা উঠে বাড়ীওলা জগদ্দলবাবুকে একটি প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন না—সোজাসুজি গাড়ী ডেকে সরাসরি বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

জগদ্দলবাবু নিজের দুর্বলতার কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন—কিন্তু সেটা যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠবে তা তিনি ধারণা করতে পারেন নি।

মহিলাটি আপ্রাণ চীৎকার করছেন আর রাম নাম জপছেন অবিরত

দিন সাতেক অনুসন্ধানের পর আর এক ঘর ভাড়াটে পাওয়া গেল।

একটি বিধবা মহিলা দিন-রাত্তির জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকেন। তাঁর দু তিনটি ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ে।

মহিলা তো প্রথমে ফিনাইল দিয়ে গোটা বাড়ীটা ধুয়ে ফেল্লেন। তারপর ছড়িয়ে দিলেন গোবর জল।

জগদ্দল জোয়ারদার সভয়ে তাকিয়ে দেখলেন—ঘরের দেয়ালগুলি বাঘের পিঠের মতো চক্কর মেরে গেছে। তবু ভয়ে কিছু বলতে পারেন না—যদি মেজাজ দেখিয়ে ভাড়াটে চলে যায়।

সয়েই থাকবেন বলে স্থির করলেন জোয়ারদার মশাই।

কিন্তু সেই দিনই গভীর রাত্তিরে এক সঙ্গে সেই নিষ্ঠাবতী মহিলা আর তাঁর তিন ছেলে-মেয়ের মরাকান্না শুনে গোটা পাড়া সচকিত হয়ে উঠল!

ছুটে এলেন আশে-পাশের বাড়ীগুলির মহিলারা। ব্যাপার কি?

না, ভূতের ভয়ে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ঠেরিয়ে ধরে বিধবা মহিলাটি আপ্রাণ চীৎকার করছেন আর 'রাম' নাম জপছেন অবিরত।

অন্য বাড়ীর মেয়েরা যত তাঁকে বোঝাতে যায় যে, ওটা ভূতুড়ে কাণ্ড নয়—নিছক নাকের ডাক—কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনতে রাজি নন।

সেই রাত্তিরেই বোচকা-বুচকি বেঁধে তাঁর বোনের বাড়ীতে উঠে চলে গেলেন নিষ্ঠাবতী মহিলাটি।

সকাল বেলা জগদ্দল জোয়ারদারের মুখে আর টু শব্দটি নেই। কে যেন একেবারে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে! প্রতিদিন ভোরে তিনি যে আমেজ করে অম্বুরি তামাক টানেন—সে ব্যাপারেও বিশেষ বিতৃষ্ণা দেখা গেল তাঁর!

পরদিন বিভিন্ন দৈনিকে বাড়ী ভাড়ার কলমে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি অনেকেরই চোখে পড়ল:

= বাড়ী ভাড়া =

সহরতলীর নিরালা অঞ্চলে নবনির্মিত একতলা বাড়ীর তিনটি ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাড়ী, কল-জল-আলোর সুবন্দোবস্ত। বধির পরিবারের আবেদন সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। জগদ্দল জোয়ারদার, ৪৯।৩।ডি, আক্কেল রামের ২য় গলি, বেহালা।

বিনিময়

শ্রীনরেন্দ্র দেব

একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেদিন শ্রীপতিবাবুর "সনাতন হিন্দু হোটেলে" এসে বেশ পেট ভরে ডাল, ভাত, ভাজা, মাছের ঝোল, অম্বল, মায় দই-চিনি পর্যন্ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন।

খাবার সময় হোটেলওয়ালা শ্রীপতিবাবু যখন সবিনয়ে তাঁর কাছে খাওয়ার মূল্য বাবদ পয়সা চাইলেন, ভদ্রলোক বেশ সপ্রতিভভাবেই হেসে বললেন, পয়সা কোথায় পাবো মশাই? আমি একেবারেই নিঃস্ব! আমার শুধু এই 'একতারা'টিই ভরসা! অবশ্য আমি পয়সা দিতে না পারলেও আপনার ভাত নিশ্চয়ই অমনি খেয়ে যাব না জানবেন। আপনাকে আমি গান শুনিয়ে খুশী ক'রে দিয়ে যাবো।

শ্রীপতিবাবু বললেন—দেখুন মশাই, আমি একজন গরীব ব্যবসাদার! গানের কোনও দাম নেই আমার কাছে। সুরের মাধুর্যও বুঝি না কিছু। পাওনা পয়সাটা পেলেই খুশী হবো।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি কি বলছেন? বনের পশুপক্ষীও যে সুর শুনে মুগ্ধ হয়! এ নিশ্চয় আপনার অহেতুক বিনয়!

এঁদের এই আলাপ-আলোচনা শোনবার জন্য সেখানে তখন সনাতন হিন্দু হোটেলের অনেক-গুলি কৌতূহলী পৃষ্ঠপোষক চারু পাশে জড়ো হয়ে রীতিমতো একটি ভিড় জমিয়ে তুলে-ছিলেন।

ভদ্রলোক করুণভাবে একবার তাঁদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে হোটেলওয়ালা শ্রীপতিবাবুকে বললেন—আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে গান শুনিয়ে পয়সা-পাওয়ার চেয়েও বেশি খুশী করতে পারি?

সমবেত ভদ্রলোকদের মধ্যে কে যেন বলে উঠলেন—তা' বেশত? মন্দ কি? গান দু'একখানা আগে শুনেই দেখুন না শ্রীপতিবাবু, তারপর দেখা যাবে—

শ্রীপতিবাবু এ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বললেন, বেশ, গান গেয়ে যদি সত্যিই খুশী করতে পারেন, তখন বিবেচনা করা যাবে।

ভদ্রলোক আবার সমবেত সকলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন? আপনাদের সকলেরই ত' এই মত?

সকলে সমস্বরে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! গান ধরুন আপনি।

ভদ্রলোক একতারাটিতে ঝংকার দিয়ে এইবার গান ধরলেন—

চমৎকার গান। অপূর্ব কণ্ঠস্বর! চারপাশে সমবেত সমস্ত লোক মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলেন। ভদ্রলোক একটির পর একটি গান গাইছেন আর হোটেলওয়ালা শ্রীপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন—কেমন মশাই! খুশী হয়েছেন ত?

হোটেলওয়ালা বলে—উঁহু! একটুও খুশী হ'তে পারলুম না। আপনি পয়সা দিয়ে যান।

চার পাশের লোক হোটেলওয়ালার এই ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে উঠে বললেন—সে কি মশাই? এমন সুন্দর গান! আমরা সকলেই ত' শুনে খুশী হয়েছি!

শ্রীপতিবাবু বললেন—কথা ছিল ওঁর সঙ্গে—আমাকে খুশী করবার, আপনাদের ত' নয়! লোকগুলি চুপ!

ভদ্রলোক তখন নিরুপায় হ'য়ে পকেট থেকে তাঁর শূন্য মনিব্যাগটি বার করে খুলে তার মধ্যে আঙুল পুরে যেন পয়সা বার করে দিতে যাচ্ছেন এমনি ভঙ্গীতে গান ধরলেন—

"তবে, খুলে দে তোর রত্ন থলি,
ও অচেনা পথিক বণিক!
মিটিয়ে যা তোর পাওনা দেনা!"

গানের এই দু'এক কলি গেয়েই তিনি হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার আপনি খুশী হচ্ছেন নিশ্চয়?

ভদ্রলোক এতক্ষণে পয়সা বার করে দিচ্ছেন দেখে শ্রীপতিবাবু একমুখ হেসে বললেন—নিশ্চয়! এতক্ষণে খুশী হয়েছি—

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগটি বন্ধ করে পকেটে পুরে একতারাটি তুলে নিয়ে বললেন—ধন্যবাদ! আমি জানতুম আপনি আমার শেষ গানটি শুনে খুশী না হ'য়ে পারবেন না! আসি তবে। নমস্কার!

ভদ্রলোক চলে গেলেন। হোটেলওয়ালা শ্রীপতিবাবু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সেদিকে চেয়ে আছেন দেখে আশেপাশের লোকগুলি সব হো হো ক'রে হেসে উঠলো!

শ্রীপতিবাবু ভীষণ রেগে উঠে বললেন—যত সব জোচ্চোরের দল! লোক ঠকাবার কত রকম ফন্দিই জানে?

শ্রেষ্ঠদান

শ্রীনীশ রায়

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই কবে সংসারের সকল আকর্ষণ তুচ্ছ করে আত্মীয় প্রিয়জনদের অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানা সত্যকে জানবার জন্যে। তারপর কতোকাল কেটে গিয়েছে। পিতা শুদ্ধোধন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; বেশী দিন বেঁচে থাকা আর সম্ভব হবে না; আর বেঁচে থেকে লাভই বা কী? তবু ভারী ইচ্ছে হয় একবার অন্ততঃ ছেলেকে দেখবেন।

সিদ্ধার্থ তখন বুদ্ধত্ব লাভ করে যে পরম সত্যকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তার প্রচার নিয়ে দিনরাত মেতে রয়েছেন। বারাণসী ও মগধ অঞ্চলেই প্রধানত প্রচার-কার্য চলছে। বুদ্ধদেব তখন রাজগৃহে। শুদ্ধোধনের কাছ থেকে একের পর এক দূত এলো তাঁর কাছে—একবার কপিলাবস্তু গিয়ে যেন বৃদ্ধ পিতাকে দর্শন দেন এই অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু শাক্যদূত যারা এসেছিল তারা সবাই বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিয়ে সঙ্ঘেই থেকে গেলঃ কপিলাবস্তুতে ফিরে গেল না কেউ। এর পর শুদ্ধোধন উদয়ী নামে তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালেন রাজগৃহে। বিশেষ করে তাকে বলে দিলেন যে, সে যেন ফিরে এসে তাঁকে অবশ্যই জানায় বুদ্ধদেবের কি অভিপ্রায়।

ছুটে এলেন শুদ্ধোধন—সংগে অসংখ্য নরনারী

উদয়ী যথাকালে রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের কাছে তাঁর পিতার অনুরোধ জানালে। পূর্বগামীদের মত উদয়ীও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে; কিন্তু বুদ্ধদেব তাকে কপিলাবস্তু ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন; তাকে আরোও জানাতে বল্লেন যে তিনি কপিলাবস্তু দর্শনে যাবেন এই সর্তে যে তিনি নগরের মধ্যে অবস্থান না করে কোন এক বিহারে অবস্থান করবেন।

শুদ্ধোধন এই খবর জানতে পেরে—দীর্ঘকাল অদর্শনের পর পুত্রকে দেখবার আশায় অধীর হয়ে উঠলেন। নগরের অনতিদূরে তিনি এক বিহার নির্মাণের আদেশ দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সেখানে গড়ে উঠলো ন্যগ্রোধারাম নামে এক সুন্দর বিহার। তারপর একদিন শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধদেব উপস্থিত হলেন সেই বিহারে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন শুদ্ধোধন—সংগে তাঁর দর্শনার্থী পুণ্যলোভী অসংখ্য নরনারী। বুদ্ধের চরণস্পর্শে কপিলাবস্তুর বিহার ধন্য হয়ে উঠলো। দলে দলে নরনারী বুদ্ধের বাণী শুনে সঙ্ঘে প্রবেশ করতে লাগলো—সপ্তাহকাল মধ্যে প্রায় সত্তর হাজার নরনারী তাঁর শরণাগত হলো। শুদ্ধোধন নিজেও বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সত্যসন্ধানী পুত্রের কাছে পিতা করলেন আত্মসমর্পণ। শুদ্ধোধনের দৃষ্টান্ত দেখে রাজপরিবারের সবাই একে একে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। রাজকুমারদের প্রায় কেউই বাদ গেলেন না। এমনি সময় হঠাৎ মনে পড়লো সবাই যদি দীক্ষা গ্রহণ করে তবে শুদ্ধোধনের অবর্তমানে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? শেষ পর্যন্ত ভদ্রিক নামে এক শাক্যকুমারকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করানো হলো—সঙ্ঘে প্রবেশ না করে রাষ্ট্র-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন ভদ্রিক।

শাক্যরাষ্ট্রের মেয়েরাও বুদ্ধের বাণী শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের অনুমতি লাভ করে দলে দলে তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করতে ছুটে এলেন। শাক্যরাষ্ট্রের অন্যতম নায়ক মহানাম। তাঁর স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে এই পুণ্য-লোভাতুরদের দলে যোগ দিতে চলেছেন। গা ভর্তি তার মহামূল্য অলংকার। সংঘারামের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছেন তখন একজন তাঁকে বল্লেন—যিনি সকল ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে সর্বত্যাগী মহাপুরুষ বলে কীর্তিত হয়েছেন—তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে অলংকারবাহুল্য বর্জন করাই শোভন। কথাটা রাজবধূর মনে লাগলো। সংগে সংগে তাঁর এক সহচরীর হাতে সব অলংকারপত্র তুলে দিয়ে তিনি তাকে বল্লেন, সেগুলো নিয়ে রাজপ্রাসাদে রেখে আসতে। বেচারী সহচরী কতো আশা নিয়ে ছুটে চলেছিল ইষ্টদেব দর্শন করতে। কিন্তু তা হলো কই? রাজবধূর অলংকারের বোঝা নিয়ে ফিরে চল্লো সে রাজপ্রাসাদের দিকে। কিন্তু গন্তব্যস্থল অবধি শেষ পর্যন্ত পেঁছিনো আর হলো না। পথেই বেচারীর প্রাণহীন দেহ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অন্তর্যামী দেবতার অজানা রইল না তার মনের কথা। সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করলেন বুদ্ধ, পরিচারিকা রত্নাবলীর জীবনদান থেকে। মৃত্যুতে অনুভব করলেন তিনি অমৃতের স্পর্শ।

দেখছি ক'দিন ধ'রে—পরীক্ষা দিয়ে
দেখাটি দেয় না খোকা, বেড়ায় পালিয়ে।
খেলার সাথীরা ওর হৈ চৈ করে,
মনমরা খোকা শুধু বসে রয় ঘরে।
হয়ত কোথাও কিছু গড়বড় হবে,
খারাপ হলো কি ওর পরীক্ষা তবে?
কাছে ডেকে বলি—খোকা, কি হোল তোমার?
এমন বিমনা কভু দেখিনি ত আর।
কেঁদে খোকা বলে—কোথা আছো ভগবান,
রাশিয়ার রাজধানী করো 'তেহারাণ'।
বাক্য সরে না মুখে, বনে' যাই বোকা,
হলো কি কমিউনিষ্ট ক্ষুদে এই খোকা?
সামলিয়ে বলি—খোকা, এ যে রাজনীতি!
এই বয়সেই কেন এসবেতে প্রীতি?
'তেহারাণে' রাশিয়ার হবে রাজধানী—
তোমারে রাশিয়া বুঝি দেয় উস্কানি?
ভালো কথা নয় খোকা, ছেড়ে দাও ঝোঁক,
রাশিয়ার রাজনীতি বড় ভয়ানক।

খোকা বলে—না-না বাবা, রাজনীতি নয়,
ভূগোলে এবার আমি ফেল নিশ্চয়।
রাশিয়ার রাজধানী যাইনিকো শিখে,
ভুল করে' এসেছি যে 'তেহারাণ' লিখে।

রামমোহনের মাসতুত ভাই, খাসতালুকে কাজ করে,
পথে সেদিন যেতে যেতে
কি খেয়ালে হঠাৎ মেতে
ঝুলতে সুরু করে দিলেন একটা ছোট গাছ ধরে।
আমরা বলি ব্যাপার কি এ—
তিনি বলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে,—
"দেশজননীর বুকের উপর হাঁটতে আমার লাজ করে।"

শিশিরবাবুর পিসির ছেলে তিসির তেলের কারবারে—
বেশ করেছে পয়সা কড়ি,
পুরোনো এক ভয়সা গাড়ি
কিনে, তাতে চড়ে বসে ঘুরল লেকের চারধারে।
কারণটা কি জানতে গেলে
বল্ল, "এমন হাওয়া খেলে
ছটি মাসের মধ্যে নাকি সারা দেহের ভার বাড়ে।"

* * *

দুজন চেনেন দুজনাকেই, ভাড়া থাকেন এক বাড়ী,
এ যদি গান সুরু করেন—
উনি তবে তবলা ধরেন;
বেশ মজাতে থাকেন দুজন, দুজনারই টাঁক ভারী।
সেদিন দেখি বিকেল বেলা,
বোঝাই করে দুইটি ঠেলা—
হাওড়া গিয়ে চড়ল শেষে, রাঁচী যাবার এক গাড়ী।

এসো কাকা এসো, কাকাতুয়া যাও দেখে,
খাঁচার ভিতরে ছোলা-ছাতু যাও রেখে।

ফটো—শ্রীসুনীল ঘোষ

বিকিকিনি

জসীম উদ্দীন

দাম দিয়ে যে কিনতে চাহ, এমন খুকু কোথায় পাবে,
মিষ্টি হাসির এ রামধনু ঠোঁট দুটিতে কে দেখাবে?
দুষ্টু দুটি কালো চোখে কে ছড়াবে দুষ্টু-মিটি,
মিহিহাসির দীপ-দানীটি কে দোলাবে মিটিমিটি।

হাসি দিয়ে কিনবে যদি বিলিয়ে দেব মুখটি হাসির,
ভালবেসে চাও যদি বা, সুরটি দেব ভাল-বাঁশীর।
গল্প বলে চাও যদি বা দেব তোমায় প্রাণটি ধরে,
ছড়ার গড়া ঝুমঝুমিটি বদল দেব গড়িয়ে প'ড়ে।
পুতুল দিয়ে পুতুল হয়ে করব খেলা কোলটি ঘেসে,
দাম দিয়ে কি কিনবে খুকু? বিনা-মূলে বিকিয়েছে সে।

ঝগড়ার ফল

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

খোকনের পড়ার টেবিলে সে কী কাণ্ড সেদিন। একেবারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। রাত দুপুর। পুরী নিঃঝুম। এমন সময়—খোকনের পড়ার টেবিলে সে কী ঝগড়া—একেবারে তুলতামাল।

পাখীর পালকের কলম ছিল এক পাশে। সে ফরফর করে বলে উঠলঃ দেখো কালি, তোমারি যত দোষ। তুমি সাদা কাগজের উপর অমন ঝকঝকে দাগ আঁকো বলেই তো দুষ্টু খোকন দিনরাত আমাকে হাতের মুঠোয় ধরে এমন করে কষ্ট দেয়।

ফোঁস করে দোয়াতের কালো কালি উঠল কলকলিয়ে; আরে রেখে দাও কলম তোমার বড় বড় বাত। তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই। আমি তো বাপু কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। চুপটি করে দোয়াতের মাঝে বসে থাকি। তুমিই তো খামোকা খামোকা দিনরাত আমাকে খুঁচিয়ে মারো।

ভাঙা কাসির মত কঁকিয়ে উঠলো দোয়াত; তুমি ঠিক বলেছ ভাই কালি, ওই কাঠ-ঠোকরা কলমই যত নষ্টের গোড়া। ওই তো দিনরাত আমাকে ঠুকরে ঠুকরে খায়।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল কলম: কী, সব আমার দোষ? আর তোমরা দুজন সাধুপুরুষ, না? বলি, তোমরা দুজন একজোট না হলে কি দুষ্টু খোকন কখনো আমায় এত যন্ত্রণা দিত? আমার এমন সুন্দর পালকগুলো কেমন ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। আমার এমন সোনা-রঙের মুখ-খানি কালিতে কালিতে কিম্ভূত হয়ে গেছে। তোরা—তোরাই আমার এ দুর্দশার জন্য দায়ী।

বলতে বলতে কলম মনের দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তাই না দেখে দোয়াত আর কালি হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। হাততালি দিতে দিতে বলে উঠলঃ

ছিঁচকাঁদুনে নাকে ঘা।
তেলেভাজা বেগুণ খা।

এত সব হৈ-হট্টগোলে খোকনের গেল ঘুম ভেঙে। হাই তুলে সে বিছানায় উঠে বসল। বেড্-সুইচ টিপে আলোটা জেলে দিল।

কী আশ্চর্য! সব চুপচাপ। দোয়াত কলম কালি—সব একেবারে স্পিকটি-নট্! যেন অঘোর ঘুমে অচেতন! অথচ এতক্ষণ এরাই ঝগড়া করে পাড়া মাথায় করে তুলেছিল!

রকম-সকম দেখে খোকনের ভারি রাগ হয়ে গেল। দুত্তোর যত জঞ্জাল! ছোটকাকা তো ফাউণ্টেনপেন একটা কিনেই দিয়েছেন। এসব সাত ঝামলোয় আর কাজ কি? দাও সব ফেলে আস্তাকুড়ে।

রাগের মাথায় খোকন দোয়াত কালি কলম সব ছুঁড়ে ফেলে দিল আস্তাকুড়ে। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে।

আর এদিকে—

সেই নোংরা আস্তাকুড়ে দোয়াত কলম কালির তখন কি অবস্থা তাই একবার ভাবো।

খোকনের ঝকঝকে টেবিলে তকতকে টেবিল-ক্লথে বাবুরা এতদিন তোফা আরামে ছিলেন। দুই বেলা ঝাড়া-মোছা—আদর যত্ন—কত।

আর এখন—

হায়রে আস্তাকুড়! উনুনের ছাই—মাছের কানকো, কাঁঠালের ভুতি, পচা ভাত, মরা ইঁদুর—

উঃ মাগো, প্রাণ যে যায়!

হায় হায় করে উঠল দোয়াত কলম কালি। তারা এখন হাপুস নয়নে কাঁদে আর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেঃ বেশ তো ছিলাম রাজার সুখে। ছাই, কেন যে গেলাম ঝগড়া করে মরতে। তাইতো এত দুঃখু এখন কপালে।

পরদিন সকালে কর্পোরেশনের ময়লা-গাড়ি এসে তাদের তুলে নিয়ে গেল।

কোন্ স্বর্গে জানো?
ধাপার মাঠে।

লালাবাবুর সন্ন্যাস

শ্রীকার্তিক দাশগুপ্ত

—১—

'মহারাজ, উঠিয়ে, দিন আখের হুয়া,—দারোয়ানের ডাকে কৃষ্ণচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কৃষ্ণচন্দ্র কাঁদির জমিদার, মহারাজারই মত তাঁহার প্রতিপত্তি, সেই রকমই ধনসম্পত্তি আর মান-মর্যাদা, লোকেও তাঁহাকে বলে মহারাজা।

সেরেস্তার কাজকর্ম দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্রের তন্দ্রা আসিয়াছিল। আসনের উপরেই শরীর এলাইয়া দিয়া তিনি হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, তখনও তাঁহার ঘুম ভাঙিতেছে না, দেখিয়াও সেরেস্তার আমলারা তাঁহাকে জাগাইতে সাহস করেন নাই। দারোয়ান পুরানো লোক, ছেলেবেলায় কৃষ্ণচন্দ্রকে কোলে-পিঠে করিয়াই খেলা দিয়াছে, সে-ই শেষে ডাকিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙাইল।

চোখ মেলিয়াও কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীনের মত চাহিয়া রহিলেন। অস্ফুটস্বরে বার দুই দারোয়ানের কথারই আবৃত্তি করিলেন—'দিন আখের হুয়া!'

কয়েকদিন যাবতই তাঁহার মন বড় চঞ্চল ছিল। জমিদারী কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে সময় সময় বলিয়াও উঠিতেন—'বিষয়, না বিষ!' সম্প্রতি ইহার একটা কারণও ঘটিয়াছিল। তাঁহারই প্রজা এক ব্রাহ্মণের দেবোত্তর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ তাহা উদ্ধারের জন্য জমিদারের নিকট দরবার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুইদিন চেষ্টা করিয়াও কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। মনের আপশোষে পরদিন তিনি আত্মহত্যা করেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'বিষয়-আশয়ের কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই তো ব্রাহ্মণ তাঁহার দেখা পান নাই, আর ব্রাহ্মণও তো প্রাণ দিলেন সেই বিষয়-আশয়েরই মায়ায়। কাজেই; বিষয় বিষ না তো কি!'

মন ভার করিয়াই তিনি উঠিলেন। তাঁহার মনের চিন্তারও শেষ হইল না—'দিন তো আখের হুয়া! বিষয়ের মায়ায় এখনও এ কি আমি করিতেছি!'

—২—

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে কৃষ্ণচন্দ্রের বেড়াইবার স্থান। প্রত্যহই বৈকালে সেখানে বেড়াইতে যান। নদীর পারে পারাপারের খেয়াঘাট। পরের দিন বেড়াইতে গিয়া দেখেন খেয়াঘাটে মেছুনীদের ভীড়, ওপারে যাওয়ার জন্য তাহারা বসিয়া আছে। পাটনীর আসার দেরী দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল—'বেলা গেল, পারে যাব কখন?'

কথাটা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মন ছ্যাং করিয়া উঠিল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে, নিজের মনের দিকে কান পাতিয়া শুনিলেন কে যেন বলিতেছে—'দিবা অবসান হলো, কি কর বসিয়া মন!' সেদিনও সারারাত তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না—'হায় হায়, জীবনের বেলা যে গড়াইয়া গেল, বিষয়ের মায়ায় এখনও একি করিতেছি আমি!'

পরের দিন আবার সেই রকমই এক ব্যাপার। কৃষ্ণচন্দ্র পথ দিয়া আসিতেছেন। পথের পাশে এক ধোবার চালাঘর; মা-মরা ছোট মেয়েটির সংগে তাহার বাবা সেখানে থাকে। সেই ঘরের মধ্যে মেয়ের স্বর শোনা গেল—'বাবা, বেলা যে গেল, বাস্‌নায় আগুন দেও।'

বাসনা! শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলেন—'বাস্‌না তো নয়, বাসনা। সত্যই তো, জীবনের বেলা ফুরাইয়া আসিতেছে, মনের বাসনায় আগুন দিয়া এখনও কি মুক্তির পথে যাইতে হইবে না?'

চলিতে চলিতে তিনি মনঃস্থির করিয়া ফেলিলেন—আর এ বাসনার বন্ধনে আটক থাকিলে চলিবে না। আয়ু দিনদিনই শেষ হইতেছে, এবার পরপারের কাণ্ডারীর উদ্দেশে ছুটিতে হইবে।

—৩—

সংসারের বন্ধন কাটিবার পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র সংসারের প্রতিও কর্তব্য ভুলিলেন না। গুরুমাতার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া, রাণী কাত্যায়নীকে শান্ত করিয়া, আত্মীয়স্বজনের নিকটে বিদায় লইয়া তিনি চলিলেন ছয়মাসের পথ শ্রীবৃন্দাবনধামের উদ্দেশে। সেইখানেই তো শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা করিয়াছেন, সেই স্থানেরই রজে মহাপ্রভুর পদরজ মিশিয়াছে, সেই পবিত্রতীর্থ বৃন্দাবনই তাঁহাকে পরপারের কাণ্ডারীর সন্ধান দিবে।

কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়াও নরনারায়ণের সেবার কথাই প্রথমে তাঁহার মনে হইল।—

আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনীপরে।
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥

তিনি ভাবিলেন—'আমার একেলার স্বার্থ দেখিলেই তো চলিবে না; এ স্থানে গড়িয়া তুলিতে হইবে অপরেরও শান্তির আশ্রয়,—রাজা-ফকির, কাঙাল-ভিখারী সকলেরই জন্য'। এই সংকল্প করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন দিব্য এক মন্দির, আর তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার দিব্য মূর্তি। সেখানে দেবপূজার সংগে নিত্য অতিথি-অভ্যাগত কাঙাল-ফকিরের সদাব্রতের বাধা থাকিবে না।

—৪—

কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুমাতা আশীর্বাদ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—'বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতে গেলেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। সেখানে মানস সরোবরের তীরে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী। শ্রীগোবিন্দের নামেই তিনি দিনরাত বিভোর। তাঁহার নিকটে গিয়া 'ভেকদীক্ষা' লইও। তাহাতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।'

নরনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হাঁটিতে হাঁটিতে গোবর্ধন পাহাড়ের দিকে চলিলেন। সেখানে গিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—'প্রভু, আমাকে দয়া করুন, আমি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা চাই।'

কৃষ্ণদাস নাম জপ করিতে করিতে বলিলেন—'বাবা, শ্রীগোবিন্দজী তোমার মংগল করুন! কিন্তু তোমার দীক্ষার সময় এখনও তো হয় নাই।' কেন হয় নাই, তাহা আর খুলিয়া বলিলেন না।

হতাশ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন—এমন কি অপরাধ তাঁহার, যাহার জন্য দীক্ষার সৌভাগ্যও তাঁহার হইল না?

মন্দিরের পাশে কৃষ্ণচন্দ্রের থাকার মহল। সেদিন সেখানে গিয়াই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন—'সত্যই তো! দীক্ষার উপযুক্ত এখনও তো আমি হই নাই। আমার এই শোবার ঘর! শোবার জন্য পাতাও রহিয়াছে পালংক আর জাজিম-বালিশ! এ সবই তো রাজশয্যা! এখনও শোওয়ার বিলাস ছাড়িতে পারি নাই। আমার উপর গুরুর কৃপা কেনই বা হইবে? মনে মনে ছিঃ ছিঃ করিতে করিতে তখনই তিনি ঘর ছাড়িয়া আসিলেন; আর বাহিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন পথের পাশে এক গাছতলায়। সেখানে শুইয়া তাঁহার মনে হইল—'কাঙাল-ফকির কত লোকই তো গাছ-তলায় পড়িয়া থাকে। তাহারাও তো আমারই মত মানুষ।'

সেই গাছতলায়ই কৃষ্ণচন্দ্রের শীত বর্ষা কাটিল। তারপর দীক্ষা পাওয়ার ভরসায় চলিলেন গোবর্ধন পাহাড়ে কৃষ্ণদাসের নিকটে।

কিন্তু এবারেও তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল না। গোবিন্দনাম জপ করিতে করিতে কৃষ্ণদাস তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—না, বাবা, এখনও তোমার দীক্ষার সময় হয় নাই।

—৫—

আবার ফিরিতে হইল। গাছতলায় বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দুঃখ করিতে লাগিলেন।

রাত্রে খাবার সময় প্রসাদ মুখে দিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার চমক লাগিল—তাই তো, সত্যই তো তাঁহার দীক্ষার সময় এখনও হয় নাই।।

ময়ূরাক্ষীর তীরে কৃষ্ণচন্দ্রের বেড়াইবার স্থান

কৃষ্ণচন্দ্রের দুইবেলার খাবার আসে মন্দির হইতে, থালায় থালায় সাজাইয়া ঠাকুরের ভোগের ছত্রিশ রকমের প্রসাদ। ভোগের সেই সামগ্রী দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—'আমি চাই সন্ন্যাস, আর আমার খাবারের ঘটা এত! এ যে রাজভোগ! ঠাকুরের প্রসাদ এক কণাই যথেষ্ট। এখন হইতে কণিকা-প্রসাদই আমি সেবা করিব। আর গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়া পেট চালাইব।'

কিন্তু মাধুকরী করিতে গিয়াও মুস্কিল! গৃহস্থরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্রকে অনেকবারই দেখিয়াছেন। এখন তাঁহাকে মাধুকরী করিতে দেখিয়া আঁজল ভরিয়া খাবার-দাবার আনিয়া তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি

পুরিয়া দেন। কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য কিছু নিজের জন্য রাখিয়া বাকী সকলই বিলাইয়া দেন রাস্তায় কাঙাল ভিখারীকে।

—৬—

কিছুদিন পর তাঁহার মনে হইল—এতদিনে হয়তো আমার দীক্ষার সময় হইয়াছে। এইবার যাই দেখি গোবর্ধন পাহাড়ে।

কিন্তু এবারেও সেখানে গিয়া ফল হইল না। কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'বাবা, আরও একটু দেরী আছে। তোমার দীক্ষার সময় এখনও হয় নাই।'

এবারে কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি ঠিক করিতেই পারিলেন না—আরও একটু দেরীর কারণ কি?

একদিন সে-কারণ তাঁহার মনের কাছে ধরা পড়িল। পরদিন ভোরে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সর্বপ্রথমেই তিনি মাধুকরী করিতে গেলেন শেঠজীর মন্দিরে। শেঠজীর মন্দির শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দিরেরই কাছে। সেই মন্দিরে মথুরার শেঠদের স্থাপিত শ্রীরংগজীর মূর্তি। এক সময়ে দুই মন্দিরের পাশের একখণ্ড জমি সম্পর্কে শেঠেরা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুধে মামলা করেন। সেই মামলায়

কৃষ্ণদাস বাবাজী দিনরাত শ্রীগোবিন্দের নামে বিভোর

কৃষ্ণচন্দ্রের জয় হয়। মনের আক্রোশে শেঠেরা কৃষ্ণচন্দ্রকে আসামী করিয়া আর একটা মিথ্যা মামলা করেন। নিজেদের কয়েকজন লোককে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহারা নালিশ করেন কৃষ্ণচন্দ্রের হুকুমে সেই লোকগুলিকে খুন করা হইয়াছে। এই মামলার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল, কাহারও বিশ্বাস হইল না যে, কৃষ্ণচন্দ্র এমন কাজ করিতে পারেন। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী-প্রমাণের জোরে শেঠদের জয় হইল। কৃষ্ণচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হইলেন, খুনের দায়ে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল।

তখন ইংরেজ কোম্পানীর আমল। দিল্লীর বাদশা নামেমাত্র দিন-দুনিয়ার মালিক, আসলে রাজ্য চালান কোম্পানীর লোকেরা। দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন এক ইংরেজ। তিনি এক বাঙালীর নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। সেই বাঙালী ভদ্রলোক কৃষ্ণচন্দ্রকে বিশেষভাবে চিনিতেন। শেঠদের চক্রান্তের কথাও তাঁহার অজানা ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের ফাঁসির হুকুমের সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন,—'সাহেব তোমার রাজ্যে নাকি আজকাল পশ্চিমদিকে সূর্য উঠে।' শিক্ষকের ব্যঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া ছাত্র তাঁহার কথার রহস্য জানিতে চাহিলেন। তখন শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় দিয়া সাহেবকে বলিলেন, একমাস সময় পাইলে তিনিই এ মামলা মিথ্যে প্রমাণ করিতে পারিবেন। তাহার পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের ফাঁসি স্থগিত রাখার প্রয়োজন। সাহেব শিক্ষকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সেই ভদ্রলোকের চেষ্টায় এক মাসের মধ্যেই খুনের রহস্য ফাঁস হইয়া গেল। যে-লোকগুলি খুন হইয়াছে বলিয়া মামলা করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই আশেপাশের এলাকায় জীবন্ত পাওয়া গেল। ফলে, কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পাইলেন আর শেঠদের লোকদের কঠিন শাস্তি হইল। এই ঘটনায় দুই পক্ষেরই মনে অনেকদিন ধরিয়া বিদ্বেষ জমিয়া ছিল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দিরের লোকজন দেখিলে ভীষণ রাগে শেঠেরা গজগজ করিতেন; মিথ্যার প্রতি দারুণ ঘৃণায় কৃষ্ণচন্দ্রও শেঠদের অপরাধে শ্রীরংগজীর মন্দিরের দিকে যাইতেন না।

—৭—

এতদিন পরে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর জুড়িয়া ভগবানের বাণীর প্রতিধ্বনি উঠিল—

হিংসাদ্বেষ-শূন্য মন, বন্ধু বিশ্বে সর্বজন,
দয়ামায়া সকলের প্রতি।
শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, তুল্য মান অপমান,
সেই ভক্ত প্রিয় মোর অতি॥

ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলিয়া, মান-অপমান তুচ্ছ মনে করিয়া তাই তিনি ছুটিয়া গেলেন সর্বাগ্রে শ্রীরংগজীর মন্দিরে। সেখানে গিয়া সদরে দাঁড়াইয়া মাধুকরীর ধ্বনি করিলেন—'জয় রাধে, জয় রাধে!'

শেঠদের কর্তা তখন শ্রীরংগজীর মন্দিরেই ছিলেন। মাধুকরীর স্বর শুনিয়া তিনি সদরের দিকে তাকাইয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দিরের কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। আকস্মিক বিস্ময়ের বেগ কাটাইয়া শেঠজী নিজেই ছুটিয়া গেলেন সদর দরজায়। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র 'জয় রাধে, জয় রাধে' বলিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন দুইজনেরই চোখে প্রেমের বন্যা বহিতে লাগিল।

কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখেন—সম্মুখে স্নিগ্ধ জ্যোতির মণ্ডলী, আর তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া হাস্যময় এক মহাপুরুষ! কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়াই চিনিলেন—তিনি আর কেহ নন, গোবর্ধন পাহাড়ের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস বাবাজী!

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণচন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'চলো, বৎস, আমার আশ্রমে। তোমার দীক্ষার সময় হইয়াছে। আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।'

—৮—

গোবর্ধন পাহাড়ের মানস সরোবরের তীরে কৃষ্ণচন্দ্রের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা হইল। তখন তাঁহার নাম হইল শ্রীচৈতন্যদাস। কৌপীনের অধিকারী হইয়া তিনি গুরুদেবের আশ্রমের নিকটেই এক কুটীর তৈয়ার করিয়া রহিলেন।

কাঁদির ধনী জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র কিংবা গোবর্ধন পাহাড়ের চৈতন্যদাস বাবাজী,—কৃষ্ণচন্দ্রের ইহাই প্রধান পরিচয় নয়। তাঁহার খাঁটি পরিচয়—তিনিই মহাত্মা লালাবাবু। আর তাঁহার সন্ন্যাস? —যাঁহারা পরপারের কড়ি কুড়াইতে চান তাঁহাদেরই পথের আলো।

রান্নার ছড়া

শ্রীবেনু গঙ্গোপাধ্যায়

খুকু রাঁধে ইটকুচি জলেতে
ওষুধের খলেতে
কি মজার রান্না!
যদি কেউ নিন্দাটি করেছ
একেবারে মরেছ
শোন বসে কান্না।
সারা দিন কুটো বাটা করে-ও
জলে ঘট ভরে-ও
যেন পাকা গিন্নী!
বসে বসে হাত নাড়ে ঘুরিয়ে
কত কিছু ফুরিয়ে
গোলে কাঁচা সিন্নি।
দেখ তার ভাত রাঁধা ধুলোতে
বিনা চালে চুলোতে
কাঁকরের মিষ্টি।
খেয়ে যায় পুতুলেরা সদলে
মানুষের বদলে
মেয়ে অনাছিষ্টি!

নিরানন্দ বাজারে

প্রভাত বসু

নিরানন্দ-বাজারে
নেই কোনো রাজা রে!
নেই রাণী, নেই ভূত
নেই পরী অদ্ভুত,
খেলা নেই—আছে শুধু
দিন রাত সাজা রে!

যাও যদি সেথা ভাই,
পাবে খালি কান্নাই—
ঝুরিভাজা নেই সেথা
আছে ধানি লংকা;
কভু যদি গাও গান
নিশ্চয় যাবে প্রাণ,
হাসো যদি—জরিমানা
দু' হাজার তংকা!

ছেলে-মেয়ে বুড়ো ধাড়ি
সব ক'রে থাকে আড়ি,
কোনো দিন কারু সাথে
কেউ কথা কয় না।
বাজারে খেলনা কই?
কোথায় ছবির বই?
নেই হাতী, নেই ব্যাঙ—
নেই টিয়া-ময়না।

'নিরানন্দ-বাজারে'
নেই গজা, খাজা রে!
'পুজো-সংখ্যা'—তাও নেই
সে বাজার-মাঝারে॥

মানিক গোসাঁই
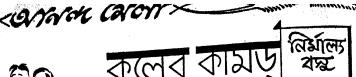
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাকোড়দার
ক'লকাতাতে
মেজাজ নাকি
পাড়ার সবাই
দেখলে তাকে
তার দফা শেষ,
গলার আওয়াজ
যেমনি মোটা
ঘরের ভিতর
তুলনা তার
বিদ্ঘুটে সব
ছেলেরা তাই
সেই ভয়েতেই
সেদিন বুঝি
'ক্লাস টেনে'তে
কিসের চাঁদা?
'যন্নবতি'
'কালিদাস'
'মধুসূদন',
'ব্রাহ্স্পর্শ',
'শুশ্রূষা'তে
ইংরাজীতে
'লেফ্টন্যাণ্ট'
পারিস যদি,
লেখাপড়ায়
'সরস্বতী'
কাকে বলে রে,
'বহুব্রীহি'
বুক ফুলিয়ে
কোনোমতে
পেনোর মেশো
প'ড়বি তো পড়
"য়্যাটম্ নাকি
তাই যদি হয়,
আপনি আমি
বলতে পারেন,
ভ'ড়কে গিয়ে
যা বলতে যায়,
যেই বলেছে,—
হাঁকলো গোসাঁই,
হাত ধরে তার
ঘণ্টার পর
মেশোর যখন
গোসাঁই বললে,
মাফ্ করবেন,
পেটে ধরে ফাঁপ,
তাই যাকে পাই,
ডাক্তারবাবু
মাণিক গোসাঁই,
দর্জিপাড়ায়
তিরিক্ষি খুব,
বলে, 'লোকটার
সবাই পালায়,
গোসাঁই তাকে
কানে গেলেই
তেমনি সরু,
কইলে কথা
আর কিছু নাই,
বানান সবায়
নাম রেখেছে
যায় না কেউ আর
গিয়ে হাজির
পড়ছে শুনে
ক'টাকা চাই?
বানান কিরে?
আর 'দিবানিশি'র
'ভাগীরথী',
'প্রত্যুত্থান',
দন্ত্য-স'য়
বলতো বানান,
আর 'ভিটল' দেখি,
বানান-পিছু
চাম্চিকে সব,
বানানে ভুল,
'কোয়াসি-প্যাসিভ্'
কার নাম বল?
গিয়ে শেষে
পালিয়ে বাঁচে
সেদিন নাকি
গোসাঁই-ফাঁদে
বদলে দিলেই
বলুন দেখি
যা কিছু সব
পাকলে কেন
পেনোর মেশো
গোসাঁই তাকে
"বুঝছি না তো,
"ঘাড় বুঝবে
পথ থেকে টেনে
ঘণ্টা চললো
আই ঢাই প্রাণ
"একটু চা খান,
আপনাকে আমি
বুকে ধরে চাপ
ডেকে চা খাইয়ে
বলেছেন আমার
মস্ত জমিদারী
পেল্লায় এক বাড়ী।
কেউ ঘ্যাঁসে না কাছে;
মাথাতে ছিট আছে।'
যদি বা কেউ গ্যাছে,
ফেলবে কথার প্যাঁচে!
চক্ষু ছানাবড়া;
তেমনি আবার চড়া!
মাৎ হয়ে যায় পাড়া,
'গ্যাম্প্লিফায়ার' ছাড়া।
জিগেস করেন বুড়ো
'ডিকসনারি খুড়ো'।
চাইতে ক্লাবের চাঁদা।
সপ্টের কোন্ দাদা।
বললে গোসাঁই, "রোস্,
দিতে বলছি, বোস্।
বল দেখি তার মানে?
দীর্ঘ ঈ কোন্খানে?
'কার্তবীর্যার্জুন',
লেখ্ দেখি 'প্রসূণ'?
কোন্টা হ্রস্ব-উকার?
'নেবুকাড্নেজার'?
চট্ করে দে লিখে।
দেবো আমি পাঁচসিকে।
কিছুতে নাই মাথা;
হাতে চাঁদার খাতা!
উদাহরণ দে তো?
রোজ সে কি কি খেতো?"
এক্কেবারে হাঁদা,
সপ্টের সেই দাদা।
কোথায় যেতে যেতে,
ছিল যেন ওৎ পেতে।
সোনা হয়ে যায় সীসে!
গাধা ঘোড়া হয় কিসে?
য়্যাটমের ভিরকুটি;
ছ'রকুটে যায় ফুটি?"
আমতা আমতা করে;
অমনি চেপে ধরে।
কি যে বলতে চান?"
না বুঝে কোথায় যান?"
এনে বাইরের ঘরে
তুমুল তর্ক করে।
পালাই পালাই মন
হয়েছে অনেকক্ষণ!
আটকে রেখেছি ব'লে,
কিছু না তর্ক হ'লে
দু পাঁচটা কথা কই।
ওষুধ হচ্ছে ওই।"

কুলের কামড়

নির্মাল্য বসু

ঝালনুন দিয়ে টোপাকুল খেতে কেই বা না ভালবাসে?
নাম শুনেই তো জিভে যেন জল আসে।
কিন্তু সেদিন এই কুল নিয়ে আচম্কা গেল ঘটে
ভীষণকাণ্ড—অভুতপূর্ব দুর্ঘটনাই বটে।
বিষম বিপদ ঘটে যেত ঠিকই কিন্তু কী করে যেন
হঠাৎ শেষটা হয়ে গেল মধুরেণ!
'ডাংগুলি ফ্রেণ্ড' গাবুর সঙ্গে সেদিন রোয়াকে ব'সে
বিকেল বেলাটা জমেছিল বেশ অম্লমধুর রসে:
এমন সময় হঠাৎ কিন্তু কুলের একটি আঁটি
হাব্লার পেটে ঢুকে পড়ে সব করে দিল রস মাটি।
আর তা নিয়েই হুলুস্থুলুটা জোর বেঁধে গেল শেষে—
কী কাণ্ডটাই ঘটে যেত যদি আমি না যেতাম এসে?
হয়তো বা হাবু মূর্ছাই যেত আরেকটু কিছু হলে;
এমন ভড়কে দিয়েছিলো গাবু যা-তা সব কথা বলে।
দু'চোখ কপালে তুলে আর প্রায় আধ হাত জিভ কেটে
বলেছে সে তারে কুলগাছ নাকি জন্মাবে তার পেটে
নির্ঘাৎ—নির্ঘাৎ!
তাই তো হাবুর মাথায় বজ্রাঘাত।
বুকের ভেতর তাই টিপ্ টিপ—ভয়ে প্রাণ খাঁচাছাড়া
পেটের মধ্যে সত্যিই যদি গজায় কুলের চারা
তা হলে উপায়? হয়ত কোনও উপায় ছিল না শেষে;
তক্ষুনি ঠিক সেখানে যদি না পড়তাম আমি এসে।
আমিও প্রথমে থ' মেরে গেলাম—ব্যাপারটা শুনে তাই—
এমন ধারাটি ঘটবে যে কভু স্বপ্নেও ভাবি নাই।
অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলেটিলে—চেপেচুপে হাসিটারে—
তারপর আমি বল্লাম দুজনারে,

'আঁটি থেকে গাছ হয় এটা ঠিকই—কিন্তু জল না পেলে
গাছ কি কখনও জন্মাতে পারে? জানিস নে বোকা ছেলে!
কুল খেয়ে জল খাস্নি তো? ব্যস্—তাহলে একটু পরে
কুলের চারাটা শুকিয়ে শুকিয়ে আপনিই যাবে মরে'।
যাই হোক্ করে সেবারে হাবুর খুব ফাঁড়া গেল কেটে;
সত্যিই বলছি কুলগাছ আর হয় নাই তার পেটে।
এর পরও যদি কুল খাও কেউ—সাবধানে খেয়ো যেন,
এখনও কি আর বলে দিতে হবে—কেন?

মুক্ত বন্দী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বন্দী ছাড়া পেয়ে নিরাপদে ঘরে পেঁাছেও শুধু মাত্র কথার ঠিক রাখতে আবার স্বেচ্ছায় শত্রুর কাছে ফিরে এল্মে; এটা আজকালকার দিনে বিশ্বাস করা শক্ত বৈকি! কিন্তু আগে এ এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। আমাদের দেশের ইতিহাসে তো এমন গল্প ঝুড়ি ঝুড়ি মেলে—পাশ্চাত্য দেশেও এ রকম ঘটনা একেবারে বিরল নয়। আজ ফরাসী দেশের একটি কাহিনী শোনাব।

অনেক দিন আগেকার কথা। প্রায় ছয় শো বছর কি তারও আগেকার ঘটনা। ফরাসী দেশের ব্রিটানী অঞ্চলে এক গরীব নাইটের ঘরে বাত্রান্দ্ দ্য গ্যেস্‌লীন জন্মগ্রহণ করেন। নাইট কাকে বলে জানো তো? আজকাল যে সে নাইট হতে পারে—নাইট হওয়া মানে নামের আগে একটা 'স্যর্' শব্দ জোড়া দেওয়া; কিন্তু আগে তা ছিল না। নানাভাবে শৌর্য বীর্য উদারতা আত্মত্যাগ প্রভৃতি দেখাতে পারলে তবে 'নাইট' করা হতো।

সুতরাং নাইট হলেই যে ধনী হবে তার তো কোন মানে নেই। বরং আগেকার দিনে নাইটরা যে যুদ্ধে যেতেন, তার সব খরচ ছিল নিজেদের। বাত্রান্দ্-এর বাবাও গরীব ছিলেন। বাত্রান্দ্ দেখতেও ছিলেন কুশ্রী, তার ওপর লেখাপড়ায় একদম মন ছিল না। ঝোঁক ছিল কেবল দুষ্টুমিতে আর ঘোড়ায় চড়া, বল্লম ছোড়া প্রভৃতি খেলাতে। ওঁর মা হাল ছেড়ে বলতেন, এমন বদমাইস ছেলে আমি এতখানি বয়সে আর কোথাও দেখিনি!

এইভাবেই দিন কাটে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল ওদের কাছাকাছি রেনে শহরে টুর্নামেণ্ট বা শৌর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। পাড়ায় বেশ সোরগোল উঠল। চারদিকে সাজ সাজ রব। বাত্রান্দের বাবার পুরানো মরচে-ধরা বর্মটিরও মাজাঘষা শুরু হয়ে গেল। কামারশালায় তো ঠকাঠকের বিরাম নেই। বাত্রান্দ্ এসব দেখে আর থাকতে পারলে না, এসে বাবাকে ধরলে, 'আমি যাবো বাবা'!

তখন মোটে ওর চোদ্দ বছর বয়স। বাবা তো হেসেই আকুল! তুই যাবি কি? এ কী ছেলেখেলা পেয়েছিস্। যা ভাগ্!

বাত্রান্দ্ কিন্তু হাল ছাড়লে না। ওর বাবাও যেমন বেরোলেন, সেও তার বুড়ো টাট্টুঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো অন্য পথে।

টুর্নামেণ্ট শুরু হলো। প্রথম দুজন নাইটে বর্শাযুদ্ধ হলো। একজন তো হারবেনই—যেমন একজন আহত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁকে ধরাধরি করে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো—আর বাত্রান্দ্‌ও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। সেই আহত নাইটের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল—'আপনার বর্শা আর বর্মটা একবার দিন, দোহাই আপনার!'

প্রথমটা তিনিও হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু ছেলেমানুষের কান্নাকাটিতে তাঁর মন গললো। তিনি বর্ম, বর্শাই শুধু নয়, ঘোড়াটাও দেবার হুকুম দিলেন। বাত্রান্দ্ সেজেগুজে এসে প্রতিযোগীদের খাতায় নাম লেখালে।

একটু পড়েই তার ডাক পড়ল। ওর সঙ্গে যিনি প্রতিযোগিতায় এলেন প্রথম আঘাতেই তিনি গেলেন পড়ে। তারপর এলেন আর একজন, আরও একজন—যিনি আসেন তাকেই আর বেশিকাল দাঁড়াতে হয়না। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কে এ লোকটি? এর খেলা তো আগে কখনও দেখিনি।...... অবশেষে এলেন বাত্রান্দের বাবা—বাত্রান্দ্ এই প্রথম কথা কইলেন—বললেন, 'এঁর সঙ্গে আমি লড়ব না।

তখনকার দিনে এটাকে সবাই অপমানকর বলে মনে করত। (কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবরা প্রতিযোগিতা করতে যাননি বলে কর্ণ চিরকালের মত ওদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন—মনে আছে তো?) বাত্রান্দের বাবা তো রেগে আগুন। তখন বাত্রান্দ্ হেসে নিজের শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেললেন। আনন্দে হেসে কেঁদে ওর বাবা গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বিজয়ী পুত্রকে।

বাত্রান্দ্ বড় হয়ে শুধু যে দিগ্বিজয়ী বীর হলেন তাই নয় বড় সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি প্রায় কারুর কাছেই হারেন নি—কেবল ইংরেজ সেনাপতি রাজকুমার এডওয়ার্ডের কাছে ছাড়া। এই রাজকুমারই হলেন বিখ্যাত ব্ল্যাকপ্রিন্স—দুর্ধর্ষ বীর। এঁর অধীনে ইংরেজ সৈন্য প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল।

ব্ল্যাকপ্রিন্সের কাছেই বাত্রান্দ্ প্রথম হারলেন আর বন্দী হলেন। সে ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

তখনকার দিনে বন্দী হলে মুক্তিপণ দিয়ে তবে ছাড়া পেতে হত। যে যত বড় উচ্চপদস্থ লোক, তার কাছে তত বেশি টাকা দাবী করা হত। কিন্তু বাত্রান্দের বেলা সে-কথা প্রথমটা উঠলই না কারণ ব্ল্যাকপ্রিন্স নিজে বীরের সম্মান জানতেন। তিনি প্রথম থেকেই বন্ধুর মত আচরণ করতে লাগলেন—একসঙ্গে খাওয়া-বসা-শোওয়া-শিকার করা—আমোদ আহ্লাদ, সব। এমনি করে কোথা দিয়ে যে এক বছর কেটে গেল তা, না বাত্রান্দ্, না ব্ল্যাকপ্রিন্স কেউই খেয়াল করলেন না।

কিন্তু লোকে কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ব্ল্যাকপ্রিন্সের কাণেও দুএকটা কাণাঘুষা পেঁাছল। তিনি বাত্রান্দ্‌কে ডেকে বললেন, 'ওহে লোকে বলছে যে, পাছে ছাড়া পেয়ে তুমি আবার আমার সঙ্গে লড়াই বাধাও এই ভয়ে তোমাকে ছাড়ছি না। তোমাকে নাকি আমি ভয় করি।'

গোঁফে চাড়া দিয়ে বাত্রান্দ্ বললেন, 'হ্যাঁ,

বাত্রান্দ্ বল্লেন—এঁর সঙ্গে আমি লড়ব না

কথাটা আমিও শুনেছি। এ তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা!'

'তাহলে তো এবার তোমাকে ছাড়তে হয়। তা কত মুক্তিপণ চাইব বলো ত?'

যা হয় একটা নামমাত্র পণ নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দেবেন এমনিই ইচ্ছা ছিল ব্ল্যাকপ্রিন্সের, তাই ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু বাত্রান্দ্ সে ধার দিয়েই গেলেন না। বললেন, 'এক লক্ষ মোহর?'

ব্ল্যাকপ্রিন্স ত অবাক্!— 'সে কি? অত টাকা পাবে কোথায়?'

'—দরকার হলে আমার ব্রিটানীর সবচেয়ে গরীব চাষীও তার যথাসর্বস্ব বেচে টাকা এনে দেবে।...তার জন্য ভাবিনা।

তা ছাড়া ওর চেয়ে কম টাকা দিলে আমার ইজ্জত থাকে না যে!'

ব্ল্যাকপ্রিন্স অগত্যা বললেন, 'বেশ, তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি দেশ থেকে টাকাটা জোগাড় করে এনে আমাকে দিয়ে যেও'। বাত্রান্দ্ যে নাও ফিরতে পারেন, এমন কথাটা তাঁর মনে হল না একবারও।

বাত্রান্দ্ দেশে পৌঁছবার পর দরকারমত টাকা উঠতে সত্যিই খুব দেরী হল না। কিন্তু গোল বাধল টাকাটা নিয়ে ফেরবার সময়। বার বার যুদ্ধে ও-অঞ্চল একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। কেউই পেটপুরে খেতে পায়না। বিশেষত অন্ধ খঞ্জ পীড়িত সৈন্যদের উপবাস করে থাকতে দেখে বাত্রান্দ্ আর স্থির থাকতে পারলেন না। পথে পথে দুচার টাকা করে সাহায্য করতে করতে যখন আবার ইংরেজ শিবিরের

বাত্রান্দ্ বল্লেন—এক লক্ষ মোহর

কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন আর এক কপর্দকও তাঁর কাছে নেই।

অবশ্য তখনও অনায়াসে তিনি ফিরে যেতে পারতেন। ধরবার মত লোক কেউ ছিল না কাছাকাছি। ব্ল্যাকপ্রিন্স আর কী করতেন? কিন্তু সে কথা বাত্রান্দের মনে একবারও এল না। যতক্ষণ না মুক্তি-পণের টাকা তিনি দিতে পারছেন ততক্ষণ সম্মানে বন্ধ। তিনি নিঃস্ব হয়ে এসে দাঁড়ালেন ব্ল্যাকপ্রিন্সের সামনে।

কথাটা যখন শিবিরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল তখন ইংরেজ অর্থাৎ শত্রুপক্ষের ব্যারণরাই যে যতটা পারলেন চাঁদা তুলে দিলেন, ফ্রান্সের রাজাও খবর পেয়ে, যাকিছু ছিল তাঁর কোষাগারে—পাঠিয়ে দিলেন।

মুক্তিপণের টাকা মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাত্রান্দ্ বন্ধুর কাছে বিদায় নিলেন, 'আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে কেমন?'

বাদশা! বাদশা তো বটেই—তবে কুঁড়ের বাদশা!

বাদশার বৌ কিন্তু ভারী ভালো। তার অবিশ্যি বেগম হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু তা না হয়ে বৌমণি হয়েই আছে।

বৌমণির আবার সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়েও আছে। মেয়ে আর মাকে সবাই খুব ভালবাসে। যা কিছু কষ্ট কেবল বাদশার জন্য।

দুঃখের সংসার—চলে না যেন আর। বৌমণি কত যে বোঝায় কিন্তু বাদশা যেমন তেমনি। শুধু কি বৌমণি—পাড়ার লোক কত বলে।

বৌমণি কষ্ট দুঃখ করে যা আনে তাতে কোনদিন চলে কোনদিন চলে না।

পাড়ার লোকের সাহায্যে তো আর বারো-মাস চলবে না,—বৌমণি তা জানে বলে কারুর কাছে সাহায্যের জন্য যায় না। তার বিশ্বাস চেষ্টায় সব হয়—আন্তরিক ইচ্ছায় অসাধ্য সাধন করা যায়।

তাদের ছোট কুটীরের সামনে—যে জমিটা পড়ে থাকতো, মায়ের সাহায্যে মেয়ে তাকে বাগান করে তুলেছিল। মাটি কুপিয়ে, জল ঢেলে বাগানের সব গাছে নানা সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়েছিল। ফুল দেখতে সে খুব ভালোবাসতো। ভোর হলেই সে তার ছোট্ট বাগানটিতে চলে আসতো। ফুলেদের সঙ্গে কথা বলতো, গল্প করতো, হাসতো—তারা যেন ওর বন্ধু। একটা ফুলকেও সে গাছ থেকে ছিঁড়তো না।

মা বলে আমার চাঁদের মত মেয়ে—মা তাই বলে চন্দ্রা, ডাকে চাঁদ।

চাঁদ তার ছোট্ট হাতে যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে বাগানটিকে সুন্দর করে তোলে।

লোকে বলে : বাদশার দেখে শেখা উচিত—চাঁদের মত ছোট্ট মেয়ে নিজে হাতে কী চমৎকার বাগান তৈরী করেছে। মেয়েটা যে ফুল তুলতে দেয় না—না হলে যে রকম সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে তাতে কি আর ওদের কোনো অভাব থাকতো—কিন্তু তাতো দেবে না—কি আর হবে বলো!

বৌমণি কিছু বলে না—তার কারণ চাঁদের ছোট হাতে তৈরী ছোট্ট বাগান তার একান্ত আপন প্রাণের জিনিস।

বাদশা শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে কাটায়—বাগানটাকে দেখতেও পায় কিন্তু কিছুই বলে না।

বাগানের লাল, নীল, গোলাপী, ভায়লেট, হলদে ফুলগুলো যখন দল মেলে ফুটে ওঠে চাঁদের আর হাসি ধরে না—তাদের কাছে গিয়ে কত কথা সে বলে চলে। ফুলগুলিও বাতাসে কেঁপে কেঁপে তার কথার উত্তর দেয়—সে ভাষা কেবল চাঁদই বোঝে। চাঁদ তাদের কাছে থাকে, খেলা করে, তাদের সেবা করে—চাঁদের বাগান আলো হয়ে ওঠে।

মা ভাবে মেয়েকে কিছুই দিতে পারি না তবু বাছা আমার এই নিয়ে ভুলে আছে। না আছে পেটভরে খাবার না আছে উপযুক্ত জামাকাপড়—না আছে প্রয়োজনমত জিনিস। তবু বেচারী বাগান নিয়ে ভুলে আছে—থাক।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসে, বলেঃ দেনা ভাই চাঁদ তোর বাগানের ফুল দু' চারটে—কী সুন্দর ফুলগুলো যেন আলো করে ফুটেছে।

ঝড়ে বাগানটা তচ্নচ্ হয়ে গেছে

চাঁদ বলে, না ভাই, ওরা আমার বন্ধু, ছিড়লে ওদের লাগে, গাছে থাকুক, দূর থেকে দেখ, গায়ে হাত দিলে ওদের এত কষ্ট হয় যে সব ঝুর ঝুর করে ঝরে যায়—মা বলে ওদের অভিমান হয়—কেন অমন করে মানুষেরা ছেঁড়ে, তাই।

ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করে বলে ওঠেঃ হ্যাঁ তাই নাকি আবার হয়। সবাই তো ফুল তোলে, পুজো করে, বাড়ীতে সাজিয়ে রাখে, চুলে পরে, মালা গাঁথে—ওদের আবার নাকি কষ্ট হয়—দিবি না তাই বল।

রাগ করে চলে যায় ওরা!

কিন্তু চাঁদ তবুও একটা ফুলও ছেঁড়ে না।

দিন চলে যায়।

চাঁদের আলো করা বাগান যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছে। চাঁদ মাকে জিজ্ঞাসা করলো—মা বলতো কেন আর আগের মত আমার বাগানে ফুল ফুটছে না—কেন ওরা আগের মত হাসছে না, কথা বলছে না?

মা বলে : তুমি বোধ হয় আগের মত ওদের যত্ন করো না ভালবাসো না!

চাঁদ চীৎকার করে বলে : না, না ওদের আমি খুব ভালোবাসি—যত্ন করি।

একদিন হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে ঝড় উঠলো, কালো মেঘের হাঁক ডাকে—বিদ্যুতের ঝলকানীতে বজ্রের তর্জন গর্জনে পৃথিবী কেঁপে উঠতে লাগলো। যেন প্রলয় হয়ে যায়—এমনি ব্যাপার! গভীর রাতের দিকে যদিও বা ঝড় থামলো তারপর নামলো প্রবল বৃষ্টি।

পুরো একদিন পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়ে বৃষ্টি থামল।

কোনো লোকই কোনো কাজ করতে পারেনি। চাঁদও ঘর থেকে বেরোতে

বিরাট প্রাসাদ—সামনে ফুল বাগানটি

পারেনি। রাত্রে প্রবল ঝড়ের মধ্যে তার মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতো।

সেদিন যখন দুর্যোগ কেটে গিয়ে প্রসন্ন সকাল দেখা দিল—চাঁদ বাইরে এসে দেখলো—তার বাগানের আর অবশিষ্ট কিছু নেই। অত সাধের বাগানের ঐ অবস্থা দেখে চাঁদ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। মা বাগানের দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল্লেন—গাছগুলি শুধু জঙ্গলের রূপ নিয়ে বাগানে পড়ে আছে। ঝড় বৃষ্টিতে তাদের আসল রূপ কোথায় হারিয়ে গেছে। লম্বা লম্বা হয়ে আগাছার মত তারা পড়ে আছে—ঝড়ে উড়ে গেছে কচি ডালপালা, নরম পাতা,—প্রবল বৃষ্টি ধারায় থেঁতলে গেছে তাদের দেহ।

সারাটা দিন চাঁদ কি কান্নাটাই না কাঁদলে। মা যত বোঝান চাঁদ ততই কাঁদে।

বাদশা ঘরের কোন থেকে সবই দেখছিল হয়তো বা মনে কিছু হচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা আকাশ ভরে জ্যোছনার আলো উঠেছে। কে বলবে গত দু'দিন ধরে এই দুর্যোগ চলেছে। ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে মায়ের কাছে শুয়ে ছিল চাঁদ—কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে তার। মা গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলছে আবার তোমার বাগান ভালো হবে। আবার গাছে গাছে ফুল ফুটবে। সুন্দর সুন্দর ফুল—আবার তুমি খেলবে ওদের সঙ্গে—দুঃখ করো না।

চাঁদ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো—মায়ের মত সুন্দর কে একজন এসে তাকে বলছে; কি চাঁদ, এত দুঃখ কেন তোমার?

ঠোঁট ফুলিয়ে চাঁদ বল্লে : আমার ফুল বাগান—

ওঃ সেইজন্য দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু জানো চেষ্টার অসাধ্য কাজ কিছু নেই—তোমরা বাগান আবার আগের মত—আগের মতই বা কেন—আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে উঠবে। যদি তুমি চেষ্টা করো।

চেষ্টা! চেষ্টা—কথা শেষ করতে পারলে না চাঁদ। সুন্দরী মহিলাটী অনেক আদর করে বল্লেন, হাঁ চাঁদ, চেষ্টার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। তা ছাড়া মনের জোরে অনেক কাজ হয়—তুমি চেষ্টা কর দেখো পরশুর মধ্যে তোমার বাগান আবার আগের মত হবে। চেষ্টা কর, মনের জোর রাখো।

চাঁদ চীৎকার করে উঠলো : চলে যাচ্ছ কেন বলে যাও—আমি তো চেষ্টা করবই, মনের ইচ্ছাও আমার আছে—আর?

চাঁদ চোখ খুলে ফেললে, নিজের চীৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। চাঁদের ফুটফুটে আলোয় বাগানের দিকে চেয়ে তার মনে হলো কে যেন চলে যাচ্ছে আর অনেক দূর থেকে খুব আস্তে একটা মিষ্টি শব্দ আসছে : চেষ্টা কর—আর মনের জোর রাখো—তোমার সোনার স্বপ্ন মাটীর তলায় লুকিয়ে আছে—চেষ্টা কর চাঁদ চেষ্টা কর।

চাঁদের চীৎকারে মা আর বাবা ছুটে এলো। বাদশাকে আসতে দেখে দু'জনেই খুব অবাক হয়ে গেছে। চাঁদ একটু ভেবে বল্লে : আমাকে কি বলে গেল জানো বাবা? বল্লে চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। আর মনের জোর রাখো। বাদশা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চাঁদ চেষ্টা করেছে বৈ কি! দু'দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার বাগান আবার আগের মত করে তুলেছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা—তার বাবা বাদশা এসে এবার তাকে সাহায্য করেছে। কুয়ো থেকে ভারে ভারে জল এনে—বাগান পরিষ্কার করে, দু'দিন ধরে কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেছে।

বাগান ফুলের মেলায় ভরে উঠেছে।

চাঁদ তার বাগান ফিরে পেয়েছে সত্যি—কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কান্ড ঘটলো—বাদশা আর কুঁড়ের বাদশা নেই—সে এখন রীতিমত পরিশ্রমী হয়ে উঠছে।

অনেকদিন কেটে গেছে।

চাঁদের ছোট্ট কুটীরখানি আর নেই—সেখানে এক বিরাট প্রাসাদ দেখা যায়—কিন্তু সামনের সেই ছোট্ট ফুল বাগানটী আরো ঝলমলে হয়ে আছে।

চাঁদ বড় হয়েছে।

বাদশাও এবার সত্যিকারের বাদশা হয়েছে।

লিকপিকে পালোয়ান

শ্রীপুষ্পেন সরকার

লিক্‌পিকে পালোয়ান খক্ খক্ কাশে
গোম্‌রা মুখেতে কভু হাসি নাহি আসে।
বাব্‌রি ঝাঁকড়া চুলে উকুনেতে ঠাসা
কানেতে আঠালু ভরা গায়ে উই-বাসা।
দেহটাই শুধু সার মোটে বল নাই
পাঁচ সের মুড়ি তার ভোরবেলা চাই।
আঁধারেতে ভয় পায় পেঁচা যদি ডাকে
গাধা যদি গান ধরে চোখ বুজে থাকে।

ব্যাঙ যদি ডেকে ওঠে জলে নাহি নামে
আরসুলা টিকটিকি দেখলেই ঘামে।
তবু তার বলা চাই আমি পালোয়ান
লিক্‌পিকে মনে করে খুব সে জোয়ান।

ঝোলাঝুলির কোলাকুলি

বুদ্ধুভুতুম

পড়ার বইয়ের কথার মতন কাজ করলেও যে এতো দুর্ভোগ ভুগতে হয়, বেচারা ব্যাচার তা জানা ছিল না। কিন্তু সেদিন তার কপালে তাই ঘটে গেলো একেবারে ঝুটমুট্।

হ্যাঁ, ব্যাচা দোষ অবশ্য প্রায়ই করে থাকে আর তার জন্যে পাখার বাঁট, বেলনার ডাঁট, এমন কি খুন্তির দুচার ঘা পুরস্কার সে পেয়েও থাকে। তবে সেদিনের ব্যাপারে ব্যাচার যদি দোষ থেকে থাকে, তা হলে তার জন্যে দায়ী ব্যাচা নয় মোটেই। দায়ী হচ্ছে ব্যাচাদের বাইরের জ্ঞান বাড়াবার বই, "জ্ঞান বিজ্ঞানের ঝোলাঝুলি"।

ঝোলাঝুলি'র পাতায় ব্যাঙের কথার সঙ্গে কোলাকুলি হতেই ব্যাচা আবিষ্কার করে ফেললে "...... ব্যাঙের মাংস খাইতে অতি সুস্বাদু। বিভিন্ন দেশে ব্যাঙের ঝোল অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।"

এমন সুস্বাদু মাংসের কথা বইতে পড়া মাত্তরই ব্যাচার সরল মনেও কেমন একটা জটিল বাসনা চেগে উঠলো যে, জ্ঞানীলোক মাত্রেই সকলের ব্যাঙের মাংস চেখে দেখা উচিত। ছোট বোন নেপীর সঙ্গে তাই সে গোপন সলা-পরামর্শ করে রান্নার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললে।

কপালগুণে সেদিন সুযোগও জুটে গেলো। কাল থেকে বিষ্টি নামতেই, ব্যাচা ব্যাঙ শিকারের থলে খুঁজতে লেগে গেলো। কিন্তু থলে মেলাই হলো দায়। কোনটার মুখ এ্যাত্তো বড়, কোনটার গায়ে ফুটো-ফুটো ইঁদুরের গঙ, কোনটা আবার একেবারে পাশবালিশের খোল। নেপী যদিও একটা জুটিয়ে এনে দিলে, তবে তার মধ্যে হাতগলাতেই তলাটা ফেঁসে গিয়ে হাত বেরিয়ে কুকুরের জিভের মতন 'হ্যা—হ্যা' করতে লাগলো।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর ব্যাচার মনে হলো, ঠাকুমার নামের ঝোলাটাই ব্যাঙ রাখার একমাত্র আধার। ঝোলাটা যেন ব্যাচার ব্যাঙ ধরার জন্যই কে অর্ডার দিয়ে করিয়ে এনেছে। মুখটা বেশী বড়ও না আবার ছোটও না—ভেতোর থেকে ব্যাঙ পালাবার উপায়ও নেই মোটে। তা ছাড়া মুখের গোড়ায় কায়দা করে এমন ফাঁস করা যে, গলায় ঝোলাও, কব্জিতে ঝোলাও আঙুলে ঝোলাও কোন অসুবিধে নেই।

ব্যাচা আর দেরী করলে না। ফস করে দ্যাল থেকে ঝোলানো ঝোলাটা নামিয়ে ফেললো। ঝোলাটা দ্যালে ঠোকর খেয়ে ঠং করে উঠলো। ব্যাচা পুলকিত হয়ে উঠলো, "আরি বাস! ঝোলার মালা খালি ঠকঠক করে না, আবার ঠং-ঠংও করে।"

ব্যাচা বাইরে এসেই সাত তাড়াতাড়ি ঝোলার মধ্যে ঠং করা জায়গাটা আন্দাজ করে হাত পুরে দিলে। ব্যাচার হাতে উঠে এলো একটা ঘসা-ঘসা গোল পদার্থ। ব্যাচা প্যাচার মতন চেয়ে দেখলে সে যা মনে করেছিল তা নয়, ওটা ঠাকুমার আফিমের গোল টিনের কৌটো।

আশা ভঙ্গ হওয়াতে ব্যাচা একটু চুপসে গিয়েই আবার ফুলে উঠলো। ভবিষ্যতে নেপীর রথের চাকা বানাতে কাজে লাগবে বলে সে আফিমটা চেঁচে পুঁচে ফেলে দিয়ে কৌটাটা তার হাফপ্যান্টের ডাব্বুস-পকেটে ফেলে দিলে। হরি নামের মালাটা কি মনে করে সে নিজের গলায় গলিয়ে নিলে।

* * *

খানা-ডোবায় ঘণ্টা দুয়েক মেলাই কসরৎ করবার পর ব্যাচা গোটা চারপাঁচ রাম রাম সাইজের কোলা ব্যাঙ ধরে ফেললে। তারপর সেগুলোকে হরি নামের ঝোলায় ভরে, গলায় মালা দুলিয়ে সারা গায়েমুখে কাদার তিলক মেখে ভক্ত পেল্লাদ মার্কা হয়ে আহ্লাদে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে।

উঠানে পা দিয়েই ব্যাচা বুঝতে পারলে বাড়ীতে কি একটা অঘটন ঘটে গেছে তার অনুপস্থিতিতে। কান খাড়া করতেই সে শুনতে পেলে ঠাকুমার হেঁসেল ঘরে কেমন একটা সোর

থলের তলাটা ফেঁসে হাত বেরিয়ে কুকুরের জিবের মত হ্যা হ্যা করতে লাগলো

হচ্ছে। জানলার পাশ থেকে উঁকি মেরে ব্যাচা যা দেখলে ও শুনলে তাতে তার চোখ প্রায় ছানা বড়া হবার মতন হয়ে গেলো। সে দেখতে পেলো, দ্যালে ঠেস দিয়ে ঠাকুমা একেবারে নিঝ্ঝুম মেরে নট নড়ন-চড়ন ভাবে বসে আছেন। আর তাঁকে ঘিরে পান্না পিসি, বড়াই দিদি, বুড়ী দাসী সবাই জটলা পাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে হাঁকছে, "ঝোলা—ঝোলা—ব্যাচা—ব্যাচা।"

বেগতিক বুঝে ব্যাচা উঠান থেকেই সটকাবার তাগ্ করলো। কিন্তু পা টিপে এগুতে গিয়েও ভিজে মাটীতে সড়াৎ করে তার পাটা কেমন স্লিপ খেয়ে গেলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পান্না পিসির শ্যেন চোখের সঙ্গে তার চোখেরও কেমন ঠোকাঠুকি হয়ে গেলো। আর যায় কোথা? দেখবা মাত্তর পান্না পিসি তাকে যেন ছোঁমেরে নিয়ে ঠাকুমার রান্না ঘরে ফেল্লেন। তারপর সবার আগে দুই গালে দুই থাবড়া মেরে কথা বল্লেন;"এ্যাঁ, লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হচ্ছ্যা? হরিনামের ঝোলা নিয়ে খেলা? বলিহারী সাহস তোর;—শ্রীঠাকুর দেবতার ভয় নেই, এ্যা!"

বড়াই দিদি এক টানে তার গলায় ঝোলানো মালাটা পট করে ছিঁড়ে নিয়েই চট করে কানটা মুলে দিয়ে বলে উঠলো, "হতভাগা তুই ঠাকুমার মালা নিয়ে কাদা-কেষ্ট সেজে বেড়াচ্ছিস, আর এদিকে যে ঠাকুমার আহ্নিক হচ্ছে না, কখন উনি মুখে জল দেবেন?"

পান্না পিসি আর এক হ্যাঁচকায় ব্যাচার কব্জি থেকে হরিনামের ঝোলা ছিনিয়ে নিয়ে "এই নাও মা তোমার কৌটো" বলে ঝোলার মুখ ফাঁক করে তিনি যেমনি হাত পুরে দিতে যাবেন, অমনি হরিনামের ঝোলা কটর কটর কথা কয়ে উঠলো।"

পান্না পিসি "উরি মা এটা কি?" বলতে না বলতেই ব্যাঙটা তড়াক করে তাঁর নাক বরাবর লাফ মেরে দেখিয়ে দিলে তার আসল পরিচয়টা কি।

পান্না পিসি ঠোঁট উল্টে চোখ বুজেই "ওঃ মাগো, সাপ সাপ" বলেই হাতের ঝোলা মাটীতে ফেলে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। এই সুযোগে ঝোলার ফাঁকা মুখ পেয়ে গোটা কতক ব্যাঙ বেরিয়ে এসে ঘরময় থপাথপ 'লিফ্ট্ ফ্রগ' খেলা সুরু করে দিলে। বড়াই দিদি, পান্না পিসি ব্যাঙেদের সাথে সাথে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াতে বেড়াতে হাঁকতে লাগলেন "তাড়া-তাড়া, মার—মার!"

সকলের চেঁচামেচিতে একটা ব্যাঙ কেমন বেশী রকম ঘাবড়ে গিয়ে এক লাফে একবারে ঠাকুমার কোল থেকে মাথায় চড়ে বসলো। ঠাকুমা এতো গোলেও নিঝঝুম হয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। মাথায় ব্যাঙ উঠতেই তাঁর ঝিমুনি নিমেষে কেটে গেলো। তিনি তাল গাছের মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তুবড়ির মতন আওড়াতে লাগলেন, "রাম রাম হরে হরে—রাম রাম হরে হরে।"

রাম নামে ভূত পালায় তো ব্যাঙ কোন ছার! ব্যাঙ বাবাজীও রাম নাম শুনে ঠাকুমার মাথা ছেড়ে লাফ মেরে পড়বি তো পড়, পড়লো গিয়ে কোণে রাখা এক কড়াই দুধের মধ্যে। বড়াই দিদি কড়াই দেখে হায় হায় করে উঠলো।

ব্যাচা তার শিকার করা ব্যাঙদের ব্যাঙ বাজি দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গিছলো। তার হঠাৎ মনে হলো এই সময় একটা কিছু করা দরকার। তাই কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ফস করে গিয়ে আঁশ চুপড়ীটা নিয়ে এসে চুবড়ী চাপা দিয়ে ব্যাঙ- ঠান্ডা করতে লেগে গেলো।

ব্যাচার ব্যাপার দেখে পান্না পিসি কেঁদে উঠলেন, "এই এ্যা, কোথা যাবো মা—নিরামিষ ঘরে ব্যাঙও ঢোকালি আঁশও ঢোকালি।"

ব্যাঙটা তাঁর নাক বরাবর লাফ মেরে দেখালে—তার আসল পরিচয়টা কি।

ব্যাচা হামাগুড়ি দিয়ে একটা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরতে ধরতে জবাব দিলে, "এসব ব্যাঙের গায়ে তো আঁশ নেই পিসি, এরা যে গেছো ব্যাঙ। একেবারে নিরমিশ্যি! লাফ দেখে বুঝতে পারছো না?"

ব্যাচা হামা টানতে টানতে সরল বিজ্ঞান উদ্ধৃত করে বড়াই দিদিকে বোঝাতে চাইলে যে, আঁশহীন ব্যাঙেদের আমিষ ভাবা পান্না পিসির কত বড় ভুল। কিন্তু পিছন থেকে হঠাৎ তার পিঠের ওপর চটাৎ—পটাৎ কি যেন পড়ে বেজায় জ্বালা ধরিয়ে দিলে। মুখ ফিরিয়ে ব্যাচা

দেখলে পাম্নাপিসি একটা ভাঙা পাখার ডাঁট দিয়ে তার পিঠের চামড়ার সহ্যশক্তি পরখ করতে লেগে গেছেন। মুখে তাঁর ফটফট করে খৈ ফুটছে আর দুঃখের শোকে চেহারাটাও হয়ে উঠছে প্রায় শিশু রামায়ণের তাড়কার মত।

তিনি পাখার ডাঁটটা ব্যাচার একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে চেল্লাতে লাগলেন, "হতভাগা, অপকম্ম করে আবার বই দেখানো, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে। যেখানে খুসী চলে যা-অলপ্পেয়ে কোথাকার! অমন ছেলের কিসের দরকার!"

এলো পাথারী পাখার ডাঁট চালানোর হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যাচা পাম্না পিসির গলার উপর নিজের গলা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বিকট সুরে হাউ হাউ করে কুমীরী কান্না কেঁদে উঠলো "ওরে বাবারে, মরে গেলুম রে! এঃ—হে—হেঃ। ও ঠাকুমা মেরে ফেল্লে হে—এঃ—এঃ।" বলতে বলতে প্রায় সে এক রকম গড়াগড়ি দিয়েই ঘর থেকে চম্পট দিলে।

ঠাকুমা গর্জে উঠলেন "মেরে ফ্যাল, সবাই মিলে মা-মরা ছেলেটাকে মেরে ফ্যাল। আমার হয়েছে যত জন্নালা!"

ঠাকুমার জন্নালাটা ব্যাচা ঠিক না বুঝতে পারলেও তার পিঠটা যে জন্নালা করছিল, এটা সে বেশ বুঝতে পারছিল। নিরাপদ স্থানে

ভাংগা পাখার ডাঁট দিয়ে পিটের চামড়ার সহ্যশক্তি পরখ করতে লেগে গেছেন

নেপীর সাথে বসে একটা প্যায়রা চিবুতে চিবুতে লাঞ্ছিত জীবনের কথা স্মরণ করে ব্যাচার কি মনে হলো। সে প্যায়ারা ফেলে নেপীকে বললো "দ্যাখ নেপী, ভাঁড়ার ঘর থেকে খানিকটা পুরোনো তেঁতুল আনতে পারিস চুপি চুপি। কেউ দেখলে কান মুলো দেবো কিন্তু—হুঁ!"

তেঁতুল আনায় একটা নতুনত্বের গন্ধ পেয়ে সে বেশ উৎফুল্ল হয়েই উঠলো। এ বিষয়ে যে তার কত বুদ্ধি তার পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলে উঠলো, "হুঁ, অমনি দেখতে পেলেই হলো আর কি! এই এমনি করে আঁচলের তলায় লুকিয়ে আনবো। কেউ জানতেও পারে না, দেখো না।" বলেই নেপী বাড়ীর দিকে দৌড় মারলে এবং মিনিট দশেকের মধ্যে এক খামচা পুরোনো তেঁতুল আর বুদ্ধি করে খানিকটা নুনও এনে হাজির করলে।

খানিকটা তেঁতুল আর নুন নেপীর হাতে দিয়ে তাকে বিদেয় করে ব্যাচা খানিক বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ঠাকমার ঘরে গিয়ে "ঠাকুমা", বলে মোলায়েম সুরে হাঁক মারলে।

ব্যাচার আগেকার হেনস্থার কথা স্মরণ করে ঠাকুমা তাঁর সোহাগের ওপর আর একটু সোহাগ চড়িয়ে বল্লেন, "আয় বেচুন আয়। দুটো নাড়ু খাবি?"

ব্যাচা উত্তর দিলে, "না ঠাকুমা, তোমার প্রণাম করতে এলাম। তোমাদের বড্ড জ্বালিয়েছি ঠাকুমা, মাফ্ করো।" বলেই সে পরম ভক্তি-ভরে ঠাকুমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

ব্যাচার অসময়ে অহেতুক ভক্তি আর কথা বলার ঢং দেখে ঠাকুমা তো ব্যোম হয়ে খানিক সময় চেয়ে রইলেন, তারপর তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 'বাছা-বাছা, মাণিক-মাণিক' একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই ব্যাচা তার হাফ্ প্যান্টের পকেট থেকে ঠাকুমার ঝোলার সেই আফিমের কৌটো বের করে তার ঢাকনা খুলে, বড় মার্বেল সাইজের একগুলি কোঁৎ করে গিলে বসলো।

ঠাকুমা, "কি খেলিরে কি খেলিরে?" করে কাছে আসতেই সে দাওয়ার খুঁটিতে মাথা রেখে মহাদেবের মতন চোখ কপালে টেনে, ধরা-ধরা গলায় বলে উঠলো, "আ—ফি—ম্"!!

"এ্যাঁ—আপিন্! ওরে পাম্না, ওরে ও বড়াই, দৌড়ে আয়—সব্বোনাশ হয়ে গেলো—ব্যাচা আপিন খেয়েছে রে।"

পাম্না পিসি, বড়াই দিদি, আরো অনেকেই ব্যাচার ঠাকুমার ঐ ডাক শুনে ছুটে এলেন। দেখতে দেখতে খবরটাও চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো—ব্যাচা আফিম খেয়েছে; তার যায় যায় অবস্থা।

পাম্নাপিসি ব্যাচার মাথায় ফন্ ফন্ করে ভাঙ্গা পাখার বাতাস দিতে দিতে ব্যাচার ঠাকুমাকে একবার শুধোলেন, "হ্যাঁ মা সত্যিই আপিন খেয়েছে তো?"

ব্যাচার ঠাকুমা বলে উঠলেন, "তুই বলিস কিরা! আমি নিজের চোখে দেখলুম, এই এ্যাত্তো বড় এক ডালা, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? ঐ তো আমার কৌটো খুলেই খেলে। কালই যে সদ্য সদ্য আপিন কিনে এনেছিলুম—ওর পকেটে কৌটো ধরা আছে ছিল রে। কি শত্তুর রে—কি শত্তুর।"

খবর পেয়ে, পাড়ার প্রবীণ কবিরাজ চক্রবর্তী মশাইও এসে পড়লেন। তিনি ব্যাচার নাড়ী ধরে চোখ বুজলেন। আমরা আশঙ্কায় সকলে তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। খানিক বাদে তিনি অভয় দিলেন, "কিছু ভয় নেই। নাড়ী এখন বেশ তেজী আছে। তবে দেখতে হবে রুগী যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। ওকে তুলে বসিয়ে হাঁ করিয়ে গলায় পালকের সুড়সুড়ি লাগাও।"

দুচারজন তক্ষুনি ব্যাচাকে তুলে বসিয়ে, কানের কাছে 'ব্যাচা—ব্যাচা' করে তারস্বরে চীৎকার করতে লেগে গেলো। ব্যাচার পিসতুতো ভাই পটলা, ব্যাচার কানের কাছে ঠাং-ঠাং করে একটা কাঁসর পিটোতে সুরু করে দিলে।

ব্যাচার বন্ধু কেলো, অনেক কষ্টে একটা কাকের পালক জোগাড় করে এনে বন্ধুর কর্তব্য করলে। কবরেজ মশাই ভরসা দিলেন ওতেই হবে। ভরসা পেয়ে কেলো দুহাতে ব্যাচার মাড়ি ফাঁক করে হাঁ করাতে গিয়ে, "উরে বাপস্!" বলেই বুড়ো আঙুলটা ঝাড়তে ঝাড়তে সেটা নিজের মুখেই পুরে ফেল্লে।

সবাই শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করে উঠলো "কিরে—কি?"

কেলো জবাব দিলো, "বাপস্, কট্ করে ব্যাচার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। আর একটু হলে বুড়ো আঙুল হারা হয়ে যেতুম ক'বুরেজ মশাই!"

কবুরেজ মশাই শুধু বল্লেন, "বুঝলাম!" বলে ব্যাচার নাড়ী ধরলেন, চোখের পাতা টেনে দেখলেন। তারপর দুটো লোককে পয়সা কবুলে করে হুকুম দিলেন, "আর উঠোনময় ছোটা ব্যাচাকে। বসতে চাইলেই মারবি ছিপ্টি। রুগী ভালো হলে ডবল বখ্শিস্!"

লোক দুটো তক্ষুনি এগিয়ে এসে ব্যাচার দুই বগলে হাত পুরে হিড়্‌হিড় করে উঠানে নামিয়ে দৌড় করানো সুরু করে দিলে। ও সে কি দৌড়! নাকে দড়ি বেঁধে নতুন ঘোড়াকে সহিসরা যেমন ছোটায়, লোকদুটোও ব্যাচাকে নিয়ে তেমনি উঠান চষতে লাগলো। ব্যাচা একটু ঢিল দিলে ওরা মারে রন্দা আর ক্যাতরালে কবুরেজ মারেন পায়ে ছিপটি। ব্যাচাকে মানের দায়ে চোখ বুজে ছুটতে হয় খালি।

দশ মিনিট যেতে না যেতেই ওষুধ ধরেছে বলে মনে হলো। ব্যাচা তার ব্যোম মহাদেব মার্কা ভাব ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলো, "একটু জল—"

পাম্নাপিসী জলের ঘটী নিয়ে দৌড়ে আসতেই কবুরেজ মশায় হাঁ-হাঁ করে বাধা দিয়ে উঠলেন। তারপর লোক দুটোর ওপর তম্বী করে হেঁকে উঠলেন, "ছোটা না ব্যাটারা, ছোটা না!"

ধরা ধরা গলায় বলে উঠলো "আ-ফি-ম্"

এক পাক ছুটেই ব্যাচার জিভ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় বলে উঠলো, "আমায় ছেড়ে দে না রে, আমি তো আফিম খাইনি।"

ঠাকুমার কানে কথাটা যেতেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আমি নিজের চোখে দেখেছি চক্কোত্তি মশায়, এই এত্ত বড় গুলি।"

"সে তো পুরোনো তেঁতুল!" ব্যাচার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

'চক্কোত্তি' কবুরেজ ছাড়বার পাত্র নয়। "ও সব শুনিসনে তোরা। আফিম ধরলে রুগী অমন অনেক কথা বলে থাকে। ছোটা—আরও ছোটা।" বলে তিনি হাঁক পাড়লেন।

"হ্যাঁ, বলেই থাকে! ঐ নেপীকে জিগ্গেস করো না—ঐ তো এনে দিছলো ভাঁড়ার থেকে", ব্যাচা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

নেপী আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য প্রতিবাদ করে উঠলো, "হ্যাঁ, আমি এনেছিলুম—তুইতো আমায় আগে আনতে বললি।"

ব্যাচা কাঁদতে কাঁদতে ও ভাঙ্গা গলায় ভেংচি কেটে বল্লে, "হ্যাঁ—বলেছিলুম!"

ওদের কথা শুনে কবুরেজ মশাই ও আরও অনেকেই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মরণজয়ী ছেলে

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

যীশুর জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার কথা।

ইহুদীরা তখন মিশরে থাকে। ওরা যখন ওদেশে প্রথম গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তখন মিশরের লোকেরা ইহুদীদের বেশ খাতির করত। কিন্তু আস্তে আস্তে মিশরীরা দেখল যে, ইহুদীরা খেটেখুটে বেশ পয়সা-কড়ি রোজগার করছে, আরামে দিন কাটাচ্ছে। মিশরের মানুষদের চেয়ে ইহুদীদের ধনদৌলত অনেক বেশি হয়ে পড়ল। এই দেখে মিশরীরা মনে মনে হিংসেয় জ্বলে মরতে লাগল। ওরা ভাবল, এ ভারি অন্যায়—আমাদের দেশ, আমাদের মাটি, আর কোথা থেকে একদল বিদেশী উড়ে এসে জুড়ে বসে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। তা কি ক'রে সওয়া যায়!

অমনি তারা রাজার কাছে গিছে নালিশ করল, বল্‌ল—"ওদের হয় তাড়িয়ে দিন, নয়, ধ্বংস করুন। ওই ভিন্ন দেশের মানুষগুলো আমাদের দেশের শহরবাজার জাঁকিয়ে বসে থাক্‌লে আমরা যাবো কোথায় মহারাজ!"

মিশরের রাজাদের বলা হয় ফারাও। ফারাও রেমেশিস্ ভাবলেন একেবারে লোকগুলোকে মেরে ফেল্‌লে ভালো হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—ওদের সব খুব শক্ত শক্ত মেহনতের কাজে লাগিয়ে দিই। বাস, রাজার হুকুমে ইহুদীরা সবাই দিনমজুর হয়ে গেল। রাস্তাঘাট তৈরী, বাঁধ বানানো, প্রাসাদ গড়া এইসব কাজ তাদের বরাদ্দ।

হ্যাঁ, আরও একটা আদেশ তিনি দিলেন।

কোনো ইহুদীর বংশে যদি পুত্রসন্তান জন্মায় তবে তাকে হত্যা করা হবে। অবিশ্যি এই হুকুম দেবার আগে যারা জন্মেছিলো তারা বাঁচল। আর মেয়েদের প্রাণ কেড়ে নেওয়াটা নেহাৎ খারাপ দেখায়, তাই মেয়েরা বাঁচল।

ফারাও রেমেশিসের হুকুম যা তা ব্যাপার নয়। কাজেই ইহুদীরা সবাই মাথা পেতে সেই আইন মেনে চলতে লাগল। মায়েদের কান্নায় কান্নায় মিশরের বাতাস বিষন্ন।

চার পাঁচ শ' বছর আগে যারা মিশরে এসেছিল পেটের দায়ে তারা তো কবে মরে বেঁচে গেছে। এখন যারা বেঁচে রইল তারা যেন মরে বাঁচতে চাইল।

এমন সময় হ'ল কি।

আম্‌রাম নামে এক ইহুদীর ঘরে এল এক সোনার চাঁদ ছেলে। আমরামের আরও দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। তবু তার বৌ বললে—এমন চাঁদপানা ছেলেকে আমি মরতে দেবো না। যেমন ক'রে পারি একে বাঁচাবোই বাঁচাবো।

ওদের বাড়িতে যেন ছেলেপুলে হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে আমরাম চলতে লাগল। ওরা সব সময় ঘরদোর বন্ধ ক'রে রাখে।

এমনি করে চার মাস কাটল, লুকিয়ে লুকিয়ে।

এদিকে ছেলেটি বেশ চনমনে হয়েছে—তার হাত-পা ছোঁড়ার দাপট বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে গলার আওয়াজও খুব জোরালো হয়ে উঠেছে। ও বেচারী তো আর জানে না যে, ইহুদীর ছেলের বাড়-বাড়ন্ত হওয়াটা বেয়াদপী। ছেলে যদি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে ত তার মায়ের বুক কেঁপে ওঠে—হাসির শব্দ যদি পড়শীর কানে যায়!

হ'লও তাই। একদিন ওরা টের পেল যে, পাড়াপড়শীরা কানাঘুষো করছে আমরামের বাড়িতে কচি ছেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন!

আমরামের বৌ বুঝল, আর রক্ষা নেই। এ ছেলেকে বাড়িতে রাখলে বাঁচানো যাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে ছেলের মা করল কি—ফুটফুটে চার মাসের ছেলেটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। কাপড়ের তলায় ঢেকেঢুকে নিয়ে গেল ছেলেকে নীল নদের তীরে। সেখানে বসে বসে মা একটি খেজুর পাতার ছোটখাট ঝুড়ি বুনল। তারপর সেই ঝুড়িতে বেশ ক'রে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিল—যাতে ঝুড়ির ভেতরে জল না ঢুকে পড়ে।

মায়ের প্রাণ কান্নায় উথল-পাথল। তবু মা ভাবল—ছেলের ভাগ্য যদি তেমন প্রসন্ন হয়, তবে এই নদীর জলে ভাসতে ভাসতে পৃথিবীর কোনো ঠাঁয়ে গিয়ে ছেলেটি বাঁচতে পারে। আর মিশরে থাকলে তো তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

নিজে হাতে মা দিলেন নিজের ছেলেকে ভাসিয়ে।

এর পর হ'ল কি—রাজকন্যা নদীতে স্নান করতে এসে দেখলেন, কী সুন্দর একটি শিশু শ্যাওলার মধ্যে আটকে যাওয়া এক চুবড়িতে শুয়ে খেলা করছে।

ফারাও রেমেশিসের কন্যা ত টুকটুকে বাচ্চাটিকে দেখে মহাখুশি! তিনি বললেন—এমন সুন্দর শিশু, একে আমি নিয়ে যাবো। মানুষ করব। জলে ভেসে আসা শিশুর গায়ে ত আর লেখা নেই যে সে ইহুদীর ছেলে। তাই রাজকন্যার করুণায় সে শিশুটি প্রাণ পেল।

কিন্তু এখন মহা মুস্কিল—এতটুকু ছেলেকে দুধ খাওয়াবে কে? এর সেবা যত্নই বা কিভাবে করা যায়!

রাজকন্যার এই চিন্তা দূর করল তার এক দাসী। এই দাসীটি আর কেউ নয়,—আমরামেরই মেয়ে। মেয়েটি রাজকন্যাকে বলল—আমার জানাশুনো একজন আছেন, যদি অনুমতি করেন ত তাঁকে ডেকে আনতে পারি। তাঁর বুকের দুধ খেয়ে এ ছেলে বেঁচে যাবে—এই কিছুদিন আগে তাঁর ছেলে হয়ে মারা গেছে কি না!

তাই হ'ল। আমরামের ছোট ছেলে মোজেস এমনি ভাবে ফারাওএর পরোয়ানাকে কলা দেখাল। সে রাজবাড়িতে দিব্যি আদরে-আদরে মায়ের কোল আলো ক'রে বড় হতে লাগল।

ছেলেবেলা থেকেই বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, মোজেস ছেলেটি বড় সোজা মানুষ হবে না। তার খুব বুদ্ধি, আর সাহসও যথেষ্ট।

কালে কালে মোজেস বড় হ'ল। এখানে সেখানে ঘোরাফেরা ক'রে বেড়ায় সে। তাকে কেউ কিছু বলতে ভরসা পায় না—রাজকন্যার পুষ্যি ছেলে—যা তা কথা নয়।

এখন একদিন হয়েছে কি—বুড়ো এক ইহুদীকে একজন জোয়ান মিশরী বে-ধড়ক মারছিল। এই না দেখে মোজেস করল কি, সেই জোয়ানটাকে এ্যায়সা মার মারল যে, সেই দশাসই মিশরীটা মরেই গেল।

মিশরে এর আগে এমন অঘটন আর কেউ কখনও দ্যাখেনি। এতকাল তো ওই হতভাগা ইহুদীদের মারধর করাটা সবাই সৎকাজ ব'লেই জেনেছে, করেছে। আর আজ কিনা মিশরী মানুষ খুন হ'ল ইহুদীকে মেরেছে ব'লে!

তবে কিনা মোজেসকে সামনা সামনি কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, তাই তখনকার মত ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে গেল। তবু আড়ালে সবাই বলাবলি করতে লাগল—হ'লই বা রাজকন্যার পুষ্যি ছেলে, তা ব'লে মানুষ মারবার এক্তিয়ার তার নেই। তা ছাড়া যে লোকটাকে মোজেস মেরে ফেলল সে তো কোনো অপরাধ করেনি—শুধু শুধু এইভাবে হামলা। আর এও দ্যাখো, ব্যাটা বুড়ো ইহুদীটাকে মোজেস ছেড়েই দিল। আরে বাপু, ইহুদীটা নিশ্চয় ঘুঘু, নইলে ওকে খামাখা একটা মিশরী মারধর করত না। মোজেসের এটা খুব অন্যায়।

মোজেস হচ্ছে সাদাসিধে শক্তিশালী যুবক। আর একদিন সে যেই দেখল যে, দুজন ইহুদী নিজেরা মারামারি করছে, অমনি সে এগিয়ে গেল। বলল—ব্যাপার কি ভাই, তোমরা কেন এরকম করছ?

যারা এতক্ষণ হাতাহাতি করছিল তারা মোজেসের কথা শুনে টিটকারি দিয়ে বলল—

মা দিলেন নিজের ছেলেকে ভাসিয়ে

ও বাবা এ যে দেখি বড় ওস্তাদ ছোকরা। সেদিন তো ও-ই মিশরীটাকে সাবাড় করেছে। আজ বুঝি আমাদের ওপর ওস্তাদী ফলাতে চাও। যাও—যাও, খুনী কোথাকার—তোমার সাধুগিরিতে আমাদের সুবিধে হবে না।

এদিকে হ'ল কি—রাজার কানে উঠল সেই খুনের নালিশ। অমনি মোজেসের নামে পরোয়ানা বেরুলো, একেবারে ফাঁসীর হুকুম।

তখন মোজেস দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেই যে মোজেস চলে গেল তারপর আবার যখন মিশরে সে ফিরল তখন তার শক্তি আর সাহস ঢের বেড়ে গিয়েছে। সে কেন ফিরেছিল জানো? ইহুদীদের উদ্ধার করবার ব্রত নিয়ে সে ফিরে এসেছিল মিশরে। দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য মিশর থেকে ইহুদী সমাজের সব মানুষকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল মোজেস। সে আর এক ইতিহাস।

গ্রামোফোনের গল্প

শ্রীসন্তোষকুমার দে

ক্যামেরায় যেমন কোন লোকের ছবি তুলে রাখা যায়, গ্রামোফোন রেকর্ডে তেমনি তার গলার স্বর, হাতের বাজনার সুর ধরে রাখা যায়। যে যন্ত্রে এই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, মৃত ব্যক্তিরও গলার স্বর অবিকল শুনতে পাওয়া যায়—তাই হল গ্রামোফোন। গ্রামোফান তৈরীর গল্প বলি এবার।

টমাস এলভা এডিসনকে বলা হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যাদুকর। গ্রামোফোনও মূলতঃ তাঁরই আবিষ্কার। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মানুষের কণ্ঠস্বরকে যন্ত্রে ধরে রাখবার উপায় আবিষ্কার করেন। একটি গোল নলের গায়ে ধাতব পাতে স্বরকম্পন রেখা ধরে নিয়ে স্টাইলাস পিন দিয়ে বাজিয়ে আবার অনুরূপ স্বর শোনানো সম্ভব হয়। গোল নলটি একটি হাতল ঘুরিয়ে বাজাতে হত। বিজ্ঞান-আলোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হলেও এই যন্ত্র কোনো কাজে লাগেনি। এখন অফিসে ব্যবহারের 'ডিকটাফোন' যন্ত্র এই যন্ত্রেরই অতি উন্নত সংস্করণ বলা চলে। এডিসন যখন এই যন্ত্র তৈরী করেন, তাঁর আশা ছিল, এ দিয়ে স্টেনোগ্রাফারের কাজ সহজ করা যাবে। তখন তা সম্ভব হয়নি, বর্তমানের ডিকটাফোন জাতীয় যন্ত্রে সে কাজ অতি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। ঐ যন্ত্রের সুমুখে চিঠিপত্র বক্তৃতা ইত্যাদি বলে গেলে তার রেকর্ড হয়ে যায়, পরে আবার তা বাজিয়ে শুনে টাইপিস্ট টাইপ করে দিতে পারে।

যাক্, যা বলছিলাম। গ্রামোফোনকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন টেলিফোন আবিষ্কর্তা বেল ও তার সংগী টেইনটার। তাঁরা ১৮৮১ সালে ওয়াশিংটন শহরে ভোলটা ল্যাবরেটরীতে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, তাতে মোমের নলে শব্দতরংগ ধরা পড়ল। বাজাবার যন্ত্র এডিসনের আবিষ্কৃত হাতে ঘোরানো যন্ত্রের অনুরূপ। তবে এ যন্ত্র স্বরোৎপাদন আরো স্বাভাবিক হল।

১৮৮৮ সালে ওয়াশিংটন শহরেই জার্মান বৈজ্ঞানিক এমিল বার্লিনার বর্তমানে চলতি গোল চাকতির মতো রেকর্ড তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর আগে প্রত্যেকটি গোল নলে রেকর্ড করতে হত গায়কের দ্বারাই, অবশ্য একসংগে অনেকগুলি নলে রেকর্ড করে একই গান তোলা যেত, কিন্তু গায়ক গাইবার সময়েই তা করতে হত। একখানা মূল সমতল রেকর্ড হতে কি করে হাজার হাজার সংখ্যায় তৈরী করা যায়, তারও পদ্ধতি বার্লিনার আবিষ্কার করেন। রেকর্ড তৈরীতে বার্লিনারের পদ্ধতি আজও অনুসরণ করা হচ্ছে, যদিও নানা বিষয়ে অনেক উন্নতি করা গেছে।

এপর্যন্ত সব যন্ত্রই হাতে ঘুরিয়ে বাজাতে হত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনার আরো উন্নত ধরণের যন্ত্র তৈরী করলেন যা অল্পায়াসে বাজানো যেত। স্বরবর্ধক চোংগাও বার্লিনার প্রথম ব্যবহার করেন।

বার্লিনারের সহকর্মী ফ্রেড গোসবার্গ ঘড়ির যন্ত্রের মতো কোনো স্প্রীং চালিত মোটর দিয়ে রেকর্ড ঘুরাবার কথা চিন্তা করেন এবং কয়েকটি কারখানায় চেষ্টা করে বিফল হলে শেষে এলরিজ জনসন সেই মোটর তৈরী করে দেন। জনসনের তৈরী মোটরযুক্ত ফনোগ্রাফ বিখ্যাত 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' ট্রেড মার্কের কুকুরটির সুমুখেও দেখা যায়। জনসন পরে এর হাতলটি উপরদিক থেকে পাশের দিকে করায় দম দেওয়ার আরো সুবিধা হয়। ধুতুরার ফুলের মতো চোংগা দেওয়া গ্রামোফোন এক সময়ে খুব চলত। তার নাম ছিল—মরণিং গ্লোরি।

পরে চোংগাটি বাক্সের তলায় লুকিয়ে একটি সুন্দর কাঠের আসবাবের মতো গ্রামোফোন বেরুল—তার নাম 'ভিকট্রোলা'। ভিকট্রোলা খুবই জনপ্রিয় হয়। এর তলায় রেকর্ড রাখবার ক্যাবিনেট থাকত।

এর থেকে পরে সুটকেশের মতো বহনযোগ্য Portable গ্রামোফোন তৈরী হয়। স্বরবর্ধক চোংগাটা তাতেও আছে, তবে বাক্সের ভিতরে লুকানো থাকায় দেখা যায় না। ডালাবন্ধ করবার সময় সাউণ্ড বক্সটা যেখানে গুটিয়ে রাখা হয়, সেই ফাঁক দিয়েই স্বর বেরিয়ে আসে।

অনেকের ধারণা রেডিও আবিষ্কার হওয়ায় গ্রামোফোনের প্রসার কমেছে। কার্যতঃ কিন্তু তার উল্টো। রেডিওর মাধ্যমে রেকর্ডগুলি আরো বেশি জনপ্রিয় হয়, চাহিদা বাড়ে, সংগে সংগে গ্রামোফোনের চাহিদাও বাড়ে। খাস আমেরিকায়—যেখানে রেডিওর প্রসার সবচেয়ে বেশি, এমনকি একই পরিবারে একাধিক সেটও থাকে, সেখানেও ১৯৪৬ সালে আশি লক্ষ গ্রামোফোন চলত, ১৯৫১ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় দুই কোটি কুড়ি লক্ষ। তবে এখন গ্রামোফোন মেসিনের আকার-প্রকারে আরো বৈচিত্র্য এসেচে। রেডিও আর গ্রামোফোন একত্রেও করা হয়—তার নাম রেডিওগ্রাম। রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ড বাজিয়ে তার স্বর রেডিওর লাউড স্পীকার বা শুধু লাউড স্পীকার মাধ্যমে কমানো বাড়ানো যায়। অটোচেঞ্জার যন্ত্রে একসংগে ৮।১০ খানা রেকর্ড চাপিয়ে দিলে যন্ত্রেই রেকর্ড বদলে বদলে একটার পর একটা এক পিঠ করে বাজায়। অটোচেঞ্জার যুক্ত রেডিওগ্রাম অর্থাৎ অটো-রেডিওগ্রামে লংপ্লেয়িং রেকর্ড বাজালে নির্ঝঞ্ঝাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনা যায়—যন্ত্রের কাছেও যেতে হয় না। এসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রে দম দিতে হয় না, তা বলাই বাহুল্য। অটোরেডিওগ্রামে রেকর্ডের স্বর খুব কমানো বাড়ানো যায়, আর স্বর এত স্পষ্ট হয় যে, মনে হয়, গায়ক পাশে বসেই গাইছেন।

বাবাকে বোলো না, এ এক নতুন খেলা,
জুতো পালিশের খেলায় কাটছে বেলা।

ফটো—শ্রীক্ষীরোদ রায়

পুপুর কাজ

শ্রীনন্দদুলাল সরকার

পুপু। ঘোষেদের সেই ছ-বছরের ছোট মেয়ে 'পুপু'। যার তুলতুলে গাল, ঢলঢলে চোখ, কাজল-কালো চুল। মুখে কথার খৈ ফুটছে—সেই পুপুদের পাশের বাড়ীতে এসেছে নতুন ভাড়াটে। গুজরাটি তারা। কাজেই তাদের নিয়ে কারুর তেমন ঔৎসুক্যই ছিল না। তবুও রাতের দিকেই জানা গেল পুপু ইতোমধ্যেই তাদের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে।

বাবার পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে পুপু হঠাৎ বলে উঠে, "বাপি, আমার মতো জাকীর জন্যেও একটা পুতুল এনে দিও।"

"জাকী? জাকী আবার কে রে?"

একগাল খিল্‌খিলিয়ে হেসে পুপু জবাব দেয়, "তুমি কিস্‌সু না বাপি, তুমি কিস্‌সু না। কোন্‌নো খবর রাখো না। আমাদের পাশেই জাকীরা যে ভাড়াটে এসেছে—তাও জানো না। জাকী আমার বয়সী কি না। তাই খুব ভাব হয়ে গেছে।"

কাঁচের ডিস্‌ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো

অবাক হয়ে বাপি শুধায়, "ওরা না গুজরাটি?"

"তাতে কি। ওরা তো বাংলা জানে। জাকী জানে, ওর মা জানে। জানো বাপি ওর মা খুব ভালো লোক।"

"সে কি রে? এই সবে তো আলাপ হলো। এরই মধ্যে কি করে বুঝলি ওর মা খুব ভালো লোক?"

"কেন—ওর যে খুব ভালো ব্যবহার। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে কতো আদর করলো"—বলতে বলতে পুপু তার বাপির আরও কোল ঘেঁষে তার ছোট হাতটি দিয়ে বাপির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "ওর মা আমায় বসিয়ে খাবার জন্যে অনেক খোসামুদি করলো। বার বার খেতে বলছিল—তাই তো খেলুম। না খেলে অসভ্যতা হতো, না বাপি?"

"হুঁ"—

"ওদের দেশের কি সব খাবার—খুব ভালো খেতে। জাকীকেও একদিন আমায় খাওয়াতে হবে—না বাপি?"

"হুঁ"। এখন ঘুমাও—অনেক রাত হয়েছে।

পরদিনই যে পুপু তার নতুন-সাথী জাকীকে খাওয়াতে নিয়ে আসবে তা আর কে জানতো। আর পুপুই কি ছাই জানতো যে এদিকে তার মা খেয়েদেয়ে আজ মোমিনপুরে মামাবাড়ী বেড়াতে চলে যাবেন। ফিরে আসতে গড়িয়ে যাবে বিকেল। যাই হোক ডেকে যখন এনেছে, তখন তো আর না খাইয়ে তাকে শুধু মুখে ফেরৎ দেওয়া যায় না। খাওয়াবো বলে *ডেকে নিয়ে এসে না খাওয়ালে পুপুর মানটা থাকে কোথায়? তা'হলে সে কি আর জাকীদের সামনে মুখ দেখাতে পারবে নাকি কোন দিন? ছিঃ! ছিঃ! তাও কি হয়? কোথায় কি থাকে, পুপু তো সবই জানে।*

এই না মতলব করে জাকীকে বসিয়ে পুপু এগিয়ে এলো কাঁচের ডিস নিয়ে আসতে। ডিস ছিল খাবারের আলমারির মাথায়। পুপুর সেখানে হাত যায় না। কাজেই টুল এনে তাতে উঠে ডিস নিল। ডিস হাতে নিয়ে নামবার সময় টুল সামলাতে গিয়ে ডিস গেল হাত থেকে ফসকে পড়ে মাটিতে। আর যায় কোথা! ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁচের ডিস ভেঙে টুকরো টুকরো। পুপু গেল বেজায় ঘাবড়ে। মা এসে জানতে পারলে আর কিছু বাকী থাকবে না। কি করে! পুপু তাড়াতাড়ি কাঁচের টুকরোগুলো কুড়াতে থাকে বাইরে ফেলে দেবে বলে। কুড়িয়ে প্রায় শেষ করে এনেও ছিল—হঠাৎ একটি সুঁচালো-টুকরো প্যাঁট্‌ করে বিঁধে গেল তার বুড়ো আঙুলে। উহু-হু-হু! কি ব্যথা! সারা হাতটা টন্‌টন্‌ করে উঠলো—অথচ সেদিকে নজর দেবার তখন তার সময় নেই......

তাড়াতাড়ি টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো করে উঠোন পেরিয়ে, দেওয়াল টপকে ফেলে দিতে এগিয়ে গেল পুপু। এদিকে সে তো জানতো না যে, উঠোনে জল পড়ে শ্যাওলা জমে পিছল হয়ে আছে। তাই সাবধান না হয়ে এগুতে গিয়েই পুপু একেবারে পা পিছলে আলুর দম—হাত ছড়িয়ে চিৎপাত, একেবারে কুপোকাৎ!......

মাথা খায় মাটিতে ঠোকা। ঝন্‌ঝন্‌ ক উঠে পায় মাথা। উপায় কি। অনুপা হয়ে মাথা ব্যথা নিয়েই উঠে দাঁড়াতে হ পুপুকে——

উঠেই নজর পড়ে তার জামার দিকে ওমা! তার এতো সাধের ভয়েলের ফ্রকট যে একেবারে মাটি—কাদায় লটপট্‌। বি বিশ্রী আর নোংরা হয়ে গেছে—খানিকট ছিঁড়েও গেল। আঙুলের টন্‌টনানি মাথার ঝন্‌ঝনানি এ-সব এযাবৎ পুপু সহ করে থাকতে পারলেও ফ্রকের জন্য সে প্রায় কেঁদে ফেলে। জামার কথা ভাবতেই মনের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠে......অথচ কাঁদবারও তার সময় নেই। কি করে! অগত্যা গোমরা মুখে পায়ের কাদা ধুতে পুপু কলঘরে যায়।

জলের ড্রামের ওপর ছিল একটা পিতলের বড় ঘটি। জল ভরতি হতেই সেটা হয়ে উঠলো বেজায় ভারী। অত ভারী ওজন সামলাতে না পারায় হাত থেকে ঘটিটা গেল ফসকে। আর ফসকে পড়বি তো পড় সজোরে দুম্‌ করে পড়লো গিয়ে একেবারে

ঘটিটা দুম্‌ করে পড়ল পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর

পুপুর পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর। পুপু আর ঠিক থাকতে পারলো না। সব কিছু ভুলে গিয়ে ব্যথায় "ওমা গো" বলে চীৎকার করে উঠলো।

"কি হয়েছে রে, কি হয়েছে রে"—বলে মা-ও ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন। তার পর সব জেনে শুনে তিনি বললেন, "ছি-ছি পুপু! তুমি দিন দিন ভীষণ বেয়াড়া হয়ে উঠছো। তোমাকে কতদিন না বলেছি যে তুমি ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষের মতো থাকবে। তা না—বড়দের সব কাজ করতে যাওয়া। এখন ঠেলা বুঝলে তো। আর কখ্‌খনো এমন করবে না। মনে রেখো—"যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।"

অবশ্যি পুপু আর জাকীর সে দিন ভুরিভোজনটা ভালই হয়েছিল।

পেট ফাঁপা রবারের হাঁস প্যাঁক প্যাঁক। প্যাঁক প্যাঁকের ফাঁপা পেট টিপলেই প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁক্ করে ডেকে উঠবে। উঁরি ব্যাস! বাছাধনের ফাঁপা পেটের ফাঁকে ফাঁকে কি যত রাজ্যের দুষ্টু মতলব। রাতের ঘুরঘুট্টি কেটে গেলো, দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লো—পুতুলদের সবার চোখে ঘুম এলো। গাবদা-গাবুস হাতি ঘুমুলো, ভুঁস-ঠাসা পুষি ঘুমুলো, খোকন-পুতু-সোনা ঘুমুলো। ওমা! ওনার তখন চক্ষে ঘুম নেই গা! যাদু তখন মটকা মেরে জানলার ওপর বসে থাকবে। বসে বসে পিট পিট করে চেয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। রোজ! রোজ! রোজ! পুকুরের ঝকঝকে জলে গাছের ছায়া পড়েছে। গাছের ডালে ডালে পাখী নাচছে, গান গাইছে, ফুড়ুক ফুড়ুক উড়ে বেড়াচ্ছে। পুকুরের বুকে শ্বেত-পদ্মের কুঁড়ি ফুটেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে। ব্যাঙ-ব্যাঙাচি খেলা করছে, ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ ডাকছে, ড্যাড্যাং ড্যাডাং ডিগ-বাজী খাচ্ছে। জ্যান্ত হাঁসের কাচ্চা-বাচ্চা জলের ওপর ঘাড় দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে সাঁতার কাটছে। প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক হাঁক দিচ্ছে, পদ্মপাতার এ-ধার ও-ধার ঘুরে-ফিরে লুকো-চুরি খেলা করছে। পুকুর-পাড়ে কাশফুলে, ঘাসে ঘাসে ফড়িং উড়ছে, ফুলে ফুলে প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে মধু খাচ্ছে—সব দেখবে। দেখবে আর ভাববে—দুর ছাই কি যে সব কুনো পুতুলগুলো জুটেছে! ঘরের কোণটি ছাড়া কিচ্ছুটি জানে না। পুকুর পাড়ে খেলতে যেতে বলি—ভয়েই গল! আমি হাঁস, শুকনো ডাঙায় কি আর রাতদিন ইদিক-উদিক করতে ভালো লাগে? আজ রাত হোক না—দেখাচ্ছি মজা!

সেদিন রাতে পুতুলদের তখনও কারো ঘুম ভাঙেনি। গাবদা-গাবুস হাতি চোখ বুজে শুঁড় ঝুলিয়ে ঘুমুচ্ছে; পুষি ম্যাঁও ম্যাঁও ল্যাজ পাকিয়ে গোঁফ ফুলিয়ে ঘুমুচ্ছে; আর খোকন-পুতু সোনা তুলতুলে বিছানায় হাত ছড়িয়ে পাশ-বালিশটি পায়ে জড়িয়ে ঘুম দিচ্ছে। আর প্যাঁক-প্যাঁক কি করছে? ওমা! প্যাঁক-প্যাঁক ঠায় জেগে! জেগে জেগে উস্খুস্ করছে, ঘুস ঘুস করছে। একবার সোনার মুখ দেখছে—খোকার ঘুম ভাঙলো নাকি! একবার হাতির শুঁড় দেখছে, হাতির শুঁড় নড়লো নাকি! একবার পুষির ল্যাজ দেখছে—পুষির ঘুম টুটলো নাকি! আরে ওরা জাগবে কি? এখনও তো পুতুলদের ঘুম-ভাঙবার রাতই হয়নি। দেখছে, খানিক দাঁড়াচ্ছে, ভাবছে, খানিক বসছে, খানিক উঠছে, খানিক চলছে। তারপর! তারপর কি যে ভাবলো, বলা নেই কওয়া নেই চট্ করে মারলে ছুট পাই পাই। নর্দমার ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে বাগানে পড়ে ছুট্-ছুট্-ছুট্। ফাঁপা-পেট নেড়ে নেড়ে, হাপুস হুপুস হাঁফ ছেড়ে বাগান দিয়ে সট্টান এক্কেবারে পুকুর পাড়ে।

রাত দুপুরে পুকুর পাড়—চুপচাপ নিঃসাড়! ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে জোনাক পোকা মিট্ মিট্ মিট্ আলো জ্বালিয়ে উড়ছে। ঝিঁঝি পোকা এ-ধার ও-ধার ঝিঁঝিঁঝিঁ ডাকছে। ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্—ব্যাঙ-ছানারা দুচারটে জলের ওপর ছলাৎ ছলাৎ নাচছে।

হাতির ল্যাজ ধরে সোনা চেঁচিয়ে উঠল—ওমা! ইঁদুর!

হুতোম পেঁচা ক্যাচ ক্যাচ ক্যাচ গাছের ডালে হাঁকছে, ঝট্ পট্ পট্ পাখার ঝাপট দিচ্ছে। তাই-না দেখে প্যাঁক-প্যাঁকের চক্ষুস্থির। বুক করছে দুর দুর। মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ। এখন কি করবে সে?

কি আর করবে! এখন তো আর ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। আর তার ভয় পাবারই বা কি আছে? পুকুরের জলে নেমে পড়লে তার কি হবে? সে তো হাঁস! কিন্তু জলে সে নামবে কেমন করে—যদি ডুবে যায়! ধ্যাৎ, তাই আবার হয় নাকি? হাঁস হলেই তো সে সাঁতার জানবে। যদি কেউ খেয়ে ফেলে! এ্যা ম্যা, ওকে আবার খাবে কি। ও তো শরীর রবার দিয়ে ঢালাই করা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি কত সাত-পাঁচ ভাবছে। ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে এধার ওধার আড়ে আড়ে দেখছে। এমন সময় আচমকা "ঘ্যাঁও-ঙ-ঙ-ঙ!"

ই-ই-ই-ই-ই! একটা এত্ত বড়ো কট্কটে ব্যাঙ! বিটকেল হাঁক পেড়ে থপথপিয়ে এক্কেবারে প্যাঁকপ্যাঁকের পেছনে ধপাস্। যেই না লাফিয়ে পড়া হাঁস বাছাধনের পিলে ছ্যাৎ করে চমকে উঠলো। চমকে ওঠা কি তাই মরি-বাঁচি ধাঁই করে একেবারে পুকুরের ডুবোন জলে ঝপাং! কট্কটে ব্যাঙটা গ্যাঙ-ঙ-ঙ-ঙ করে কি জোর হেসে উঠলো। উঁরি ব্যাস্! বলব কি সঙ্গে সঙ্গে অমনি দশ-বিশ-তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-একশোটা ব্যাঙ একসঙ্গে গ্যাঙ্-গোঙ্-ঘিঙ্-ঘ্যাঙ্-প্যাঙ্-ম্যাঙ্-চ্যাঙ্—চিৎকার শুরু করে দিলে। কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাবার গোত্তর!

প্যাঁক্-প্যাঁক্ প্রাণটি নিয়ে আঁকপাঁকিয়ে জলে ভেসে তড়বড়িয়ে সাঁতার কেটে পালাতে যাবে কি—আর এক কাণ্ড! ফাঁপা পেট ভুড়-ভু ভুড়ভুড় গুড় ভুড়ভুড় করে কেন? গা ভারি হয়ে সুড় সুড়িয়ে জলের মধ্যে ডোবে যেন! এই সেরেছে! হাঁদা প্যাঁক-প্যাঁক এক্কেবারে গাধা। বোকাটা জানে না—ওর পেটের মধ্যে ছেঁদা। ছেঁদায় আঁটা বাঁশি! তাইতো পেট টিপলে বাঁশি প্যাঁক-প্যাঁক করে। ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ ভুড় ভুড় ভুড় গুড় গুড় গুড় করে পেটের মধ্যে জল সেঁদুতে সেঁদুতে যেই প্যাঁক-প্যাঁক ডুবুডুবু—অমনি একেবারে কেঁদে ককিয়ে উঠলো! কট্কটে ব্যাঙ তাই না দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, "ডুবলো, ডুবলো! মার মার লাথি মার।" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝট্পট্ এক বাচ্ছা-ব্যাঙ তড়াং করে লাফিয়ে পড়ে, ছুট্টে গিয়ে প্যাঁক-প্যাঁকের পেটের তলায় ক্যাৎ করে এক লাথি! উঃ বাবা! খুব বেঁচেছে। মারা কি তাই প্যাঁক-প্যাঁক চিৎপটাং। পেটের গর্ত ওপর দিকে মাথার গর্ত নিচের দিকে। চিৎ হয়ে চোঁ-চোঁ পোঁ-পোঁ চরকিবাজি! প্যাঁক-প্যাঁক হাঁস-ফাঁস করতে লাগলো, পা ছুঁড়তে লাগলো।

ওদিকে জলের ওপর প্যাঁক-প্যাঁক ঘুরছে, এদিকে খেলাঘরে পুতুলদেরও মাথা ঘুরছে। খোকন-পুতু সোনার ঘুম ভাঙলো, প্যাঁক-প্যাঁককে খেলতে ডাকলো—সাড়া পেলো না। পুষি ম্যাঁও-ম্যাঁও

আবার কাঁদে! এক্ষুণি দেব কান মলে

চোখ চাইলো প্যাঁক-প্যাঁককে হাঁক পাড়লো—সাড়া পেলো না। হাতি—গাবদা মুখ তুললো শুঁড় নাড়লো, প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক নাম ডাকলো—সাড়া পেলো না। তাই তো! তাই তো প্যাঁক-প্যাঁকটা গেল কোথা? হাতির চোখে

সোনা চায়, সোনার চোখে হাতি চায়। পুষির চোখে গাবদা চায়, গাবদার চোখে পুষি চায়। তিনজনে চোখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো।

এমন সময় খুট্ খুট্ খুট্। নর্দমার ইঁট নড়ছে না? বলতে বলতেই, চোখের পাতা পড়তে পড়তেই কালো কুচ্‌কুচে একটা এইয্যা বড় গেছো ইঁদুর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দেখে শুনে ভয়ে-ময়ে পুতুলদের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সোনা তো হাতির পেছনে গিয়ে ল্যাজ জড়িয়ে চাপা গলায় কাঁপা সুরে চেঁচিয়ে উঠলো—ওমা! ইঁদুর!

হুম্! গেছো ইঁদুর এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, আমি তোমাদের ভয় দেখাতে আসিনি। চুরি করতে আসিনি। তোমাদের গায়ের আটা খেতে আসিনি। তোমাদের হাঁস-বন্ধু পুকুরের জলে সাঁতার কাটতে গিসলো। ব্যাঙেরা তাকে লাথি মেরে জলের মধ্যে উল্টে দিয়েছে। চিৎপটাং হয়ে জলের ওপর সে ভাসছে—সেই খবরটা দিতে এসেছি। এক্ষুনি গিয়ে তাকে তোলবার ব্যবস্থা কর, নইলে তার আর টিকি দেখতে পাবে না।
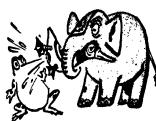
হাঁসের পেটের যত জল—একেবারে ব্যাঙের মুখে

আমি ঘরে কোলের ছেলেকে একা রেখে এসেছি। আমায় না দেখতে পেলে হয়ত কাঁদবে। তার বাপ খাবারের জোগাড় করতে ভাঁড়ার ঘরে গেছে। আমি যাচ্ছি—বলে যেমন করে এসেছিল তেমনি করে চলে গেল।

গাবদা বললে আমি জানি। পই পই করে বারণ করলুম যাস্ না। তা কানে নিলে? যাক্ যা হবার হয়েছে। চলো পুকুর-পাড়ে। যাহোক তো করতে হবে! খোকন-সোনা আমার পিঠে চাপো। এই ম্যাঁও-ম্যাঁও আমার মাথায় চাপ—বলে হাতি হাঁটু গেড়ে বসলো।

সোনা কাঁচু-মাঁচু হয়ে বললে—ও বাবা! বাইরে যেতে হবে?

সোনার কথার সুর টেনে পুষিও বললে—এ্যাঁ, বাইরে যেতে হবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নইলে ওকে বাঁচাবে কি করে? ভয় পেলে চলবে না। আর আমি তো আছি।

খোকন-সোনা সুড় সুড় করে হাতির ল্যাজ বেয়ে পিঠের ওপর চেপে বসলো, পুষি ম্যাঁও ম্যাঁও হাতির শুঁড় বেয়ে মাথায় গিয়ে বসলো। হাতি গলার ঘণ্টা ঠং ঠংগিয়ে বাজিয়ে শুঁড় দিয়ে ঘরের দরজা ঠেলে, বাইরে বেরিয়ে, চললো পুকুর-পাড়ে।

পুকুর-পাড়ে গিয়ে তো সব চক্ষু ছানাবড়া! যা বলা কি তাই হয়েছে! প্যাঁক-প্যাঁক ঠ্যাং উঁচিয়ে মাঝপুকুরে জলের ওপর মুখ গুঁজড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! এখন কি করে ডাঙায় তুলবে? ব্যাপার দেখে সবাই একেবারে হতভম্ব! আর তাই কেউ কি সাঁতার জানে যে চট্‌পট্ সাঁতরে তুলে আনবে। তাই তো! তাই তো! আচ্ছা, একটা উপায় করতে পারা যায় তো! হাতি অমনি গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলো—"হয়েছে রে, হয়েছে! ঢিল নোঙর! এই পুষি চট্ করে ঘরে লাটাই থেকে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে আন দিকিনি।

পুষি কিছু ভাবলো না। পুষি কিছু জিজ্ঞেসও করলো না। মারলো টেনে চোঁ চোঁ ছুট। ঝটপট আনলো ছিঁড়ে এত্তো সুতো। খোকা বাঁধলো সুতোয় খোলামকুচি। সুতো ধরে সাঁই-ই-ই-ই করে উল্টো হাঁসের পেটের দিকে ছুঁড়লো। যাঃ সুতো পৌঁছল না। আরও জোরে ছুঁড়লো—এবারও না। শেষবার আরও জোরে, ছোট্ট হাতে যত জোর। যাঃ ফস্কে গেল। সোনার হাত টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্। আর কেই বা ছুঁড়বে? হাতি পারে না ছুঁড়তে, পুষিও পারে না ছুঁড়তে। শেষ অবধি ঢিল নোঙরে কাজ হলো না। আবার সবাই ভেবে পড়লো।

এমন সময় সোনা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে—আচ্ছা গাবদা-গাবুস্ এক কাজ করলে হয় না? নৌকো করে পুকুরের মাঝখানে যদি যাওয়া যায়?

নৌকো! নৌকো কোথায়?

কেন ঐ তো কাগজ পড়ে আছে? কাগজ দিয়ে নৌকো করতে আমি জানি। বলে ছুটে সোনা একটা গোটা খবরের কাগজ বাগানের ওপর থেকে নিয়ে এলো। নৌকো করতে বসে গেল।

হাতি বললে, ঠিক! ঠিক!

নৌকো হলো, এবার চাপবে কে?

পুষি বললে, গাবদা-দাদা তুমি বড় আছ, তুমিই চেপে যাও।

আরে ধ্যাৎ, কাগজের নৌকো কখনও আমার ভার সইতে পারে? গাবদা বললে, সোনা তুমি মানুষ-পুতুল, তুমিই চেপে যাও।

ওরে বাব্বা! আমি! একা! যদি ডুবে যাই।

আরে তুমি ফুর্‌ফুরে হাল্কা পুতুল, তুমি ডুববে কি? যাও তাড়াতাড়ি!

নৌকোর ওপর জুজুর মত সোনা চেপে বসলো। হাতি শুঁড়ে ক'রে ধ'রে নৌকো জলের ওপর ভাসিয়ে দিলে। ভাসিয়ে দিয়ে শুঁড়ে করে এমন ঠেলা দিলে যে, নৌকো একেবারে যায় যায়। সোঁ-ও-ও-ও-ও ক'রে তীরবেগে নৌকো এগিয়ে গেল। বেসামাল হয়ে কাৎ হয়েছে কি অমনি ছলাৎ ক'রে এক ঝলক জল নৌকোর মধ্যে ঢুকেছে। আর কি নৌকো ডুবুডুবু। উঃ উঃ উঃ গেল-গে-ল! ওরে বাস্‌রে বাস! কি ভাগ্যি! লাগবি তো লাগ্ নৌকো একেবারে পদ্মপাতার গায়ে। খোকা অমনি ধড়মড়িয়ে টপাং করে লাফিয়ে পদ্মপাতা আঁকড়িয়ে ধরলে। একেবারে পাতার ওপর! ওঠা কি তাই নৌকো ডুব জলে টুপুস্। অমনি খোকা ভ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললে। দেখে শুনে হাতিও ভ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ করলে, পুষিও ভ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ। পুকুর-পাড়ে কান্নার গুলতান উঠলো।

এমন সময় থপাস্ থপ্! পদ্মপাতার ওপর—এত্তোবড় ব্যাঙ্। ব্যাঙ্ গলায় গমক দিয়ে ধমক দিলে। কি হয়েছে এ্যাঁঃ!

ব্যাঙের পিঠে চাপলো সোনা—আর হাতির পিঠে ম্যাঁও-ম্যাঁও ও প্যাঁক প্যাঁক

রাত দুপুরে পুকুর-ধারে কি হচ্ছে যত-সব—

ধমক খেয়ে খোকন সোনা আরও জোরে কেঁদে উঠলো।

আবার কাঁদে! চুপ করলি। দেখি এক্ষুনি কান মলে দেব।

ভয়ে ময়ে সোনা কান্নার সুর নামি ফুঁস্‌স্, ফুঁস্‌স্ করতে লাগলো।

কি হয়েছে এ্যাঁ। রাত দুপুরে পু পাড়ে একেবারে ছুঁচোর কেত্তন সুর দিয়েছে। বল কি হয়েছে?

সোনা ভয়ে জুজু হয়ে গলা কা ব বললে, দেখনা আমাদের বন্ধু প্যাঁক-প্যা জলে ডুবে গেছে। নৌকো চেপে তু তুলতে এসেছিলুম আমার নৌকোও ডু গেছে। পুকুর-পাড়ে হাতি আর পু কাঁদছে। আমি যেতে পারছি না।

ব্যাঙ ভেংচি কেটে বলে উঠলো, নাব

তা তোদের কেন জলের ধারে ঘুর ঘুর! পুতুল, পুতুলের মত থাকতে পারিস না। কই, প্যাঁক-প্যাঁক কই?

ঐ যে—ঐ! তুমি ওকে তুলে দাও না! আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।

বেশ, আমি তুলে দিচ্ছি। ফের যদি দেখি কোনদিন পুকুর পাড়ে তা'হলে আর রক্ষে থাকবে না। বলেই ব্যাঙ গ্যাঙ্ ক'রে জলের মধ্যে ডুব দিলে। ডুব সাঁতারে প্যাঁক-প্যাঁকের কাছে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে ল্যাজ চিপ্টে টেনে নিয়ে তুললো পদ্মপাতার ওপর। পদ্মপাতায় উঠে প্যাঁক-প্যাঁক হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে কি—গা-গতর ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপছে, বুক ধুক্‌পুক্ নাচছে, পেট আই ঢাই করছে!

ব্যাঙ্ বললে, না, আর বেশী দেরি করলে চলবে না। এক্ষুণি কবরেজখানায় যেতে হবে। পেটের ওপর নুনের বস্তা চাপাতে হবে।

সোনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, কেমন ক'রে ডাঙায় যাব?

ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি! ব'লেই ব্যাঙ্ পদ্মপাতার ওপর থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মুখ দিয়ে পদ্মপাতার ডাঁটি কুট্ কুট্ ক'রে কেটে ফেললে। পদ্মপাতা ভেসে উঠলো। ছুটে গাবদার কাছে গিয়ে ঢিল নোঙরের সুতোটা নিয়ে—পাতার ডাঁটিতে বেঁধে দিলে। হেঁকে বললে, হাতি সুতো টানো। হাতি শুঁড়ে ক'রে সুতো টানতে লাগলো। পদ্মপাতার ওপর প্যাঁক-প্যাঁক আর খোকন সোনা বসে বসে ভেসে ভেসে চললো।

পদ্মপাতা ডাঙায় লাগতেই সোনা-পুতু তড়তাড়িয়ে নেমে গেল। প্যাঁক-প্যাঁক নড়তে পারে না, চলতে পারে না, মুখ দিয়ে রা বেরোয় না।

হাতি তাড়াতাড়ি শুঁড় দিয়ে আলতো আলতো প্যাঁক-প্যাঁক্‌কে জড়িয়ে ধ'রে ওপরে তুললে। ব্যাঙ্‌ও ওপরে উঠে এলো। তারপর ব্যাঙ্ চোখ পাকিয়ে বললে, আর যদি কোনদিন দেখি পুকুর-পাড়ে তা'হলে—কথা শেষ না হতেই—প্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁক্ —ফ্যাঁ স্ স্ স্ স্ এ্যাঃ ম্যাগো ম্যাঃ ব্যাঙের ধমক খেয়ে হাতি চমকে উঠে যেই না প্যাঁক-প্যাঁককে শুঁড়ে ক'রে বেসামাল চেপে ধরেছে—বলব কি—অমনি পিচকিরি দিয়ে হাঁসের পেটের যত রাজ্যের জল সব ছেঁদা দিয়ে একেবারে ব্যাঙের মুখে। অমন রাগে টং ব্যাঙ প্রথমে হক্‌চকিয়ে গিসলো। তারপর ব্যাপার দেখে নিজেই ঘ্যাঙ্-ঙ-ঙ-ঙ ক'রে এমন হেসে উঠলো যে, সেই হাসি দেখে গাবদা-হাতি, ম্যাঁও-ম্যাঁও পুষি, সোনা-পুতু কেউ না হেসে থাকতে পারলো না। হো-হো-হি-হি! পেটের জল বেরিয়ে যেতে প্যাঁক-প্যাঁক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো! হঠাৎ মুখে কথা ফুটলো। মুখ চুমসে বললে, কবরেজখানায় আমি যাব না! নুনের বস্তা পেটে দেব না। আমি ভালো হয়ে গেছি। ব্যাঙ্ বললে, কই দেখি। পেটটা টিপে টাপে বললে, হাঁ, যাক্ খুব ভাগ্যি সব জল বেরিয়ে গেছে। এখন ঘরে চলো। চলো আমি তোমাদের পেঁছে দিই। সোনা আমার পিঠে চাপো।

ব্যাঙের পিঠে সোনা চাপলো, হাতির পিঠে ম্যাঁও ম্যাঁও, প্যাঁক-প্যাঁক। ঘরে পেঁছে ব্যাঙ বললে, এবার যাই। খোকা বললে, দাঁড়াও একটু। তারপর ছুটে গিয়ে পুতুল-বাক্সের ডালা খুলে একটু রঙিন ছবি আঁকা কাগজ নিলে। নিয়ে কি লিখলে। তারপর ব্যাঙের হাতে দিলে। ব্যাঙ খুলে দেখলে—লেখা। কাল আমাদের খেলাঘরে তোমার নেমন্তন্ন! আসবে কিন্তু। ব্যাঙ টুক্ ক'রে সোনার গালে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বললো—ঠিক আসব। তারপর ব্যাঙ্ থপ্‌থপিয়ে লাফ দিয়ে চলে গেল।

প্যাঁক প্যাঁকের সঙ্গে আড়ি নয়—ভাব!

ফটো—শ্রীঅমিয় তরফদার

—শুভেচ্ছা—

জাতির জাতীয় উৎসব এলো
তাইতো হলেও দীন,
যে যেভাবে পারে প্রমাণিতে চাহে
কেহ নহে তারা হীন।
উৎসব হ'ল—উদার হৃদয়ে
সকলেরে ভালবাসি
দুঃখী-দীনের অশ্রু মুছিয়ে
সেখানে ফোটানো হাসি,
তাইতো আমি যা পেরেছি এনেছি
কুড়ায়ে আশিস, প্রীতি
তোমাদের হাতে দিই প্রীতি ভরে
কাহিনী, কথা ও গীতি।

—মৌমাছি

য়াল ঘটক বলল, গড়ন? চমৎকার!

নবীনবাবু বললেন, হুঁ!

—গায়ের রঙ? একেবারে দুধে-আলতা!

—হুঁ!

—চুল? সে আর কী বলব!

—হুঁ!

—গানবাজনায়—

—হুঁ!

—আর লেখাপড়ার কথা তো আগেই বলেছি। এইবার—

—বি এ পাশ করেছে! এতক্ষণ শুধু হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিলেন নবীনবাবু, এবার প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লেন, বেরিয়ে যাও। গেট আউট। এক্ষুণি। এই মুহূর্তে—

থতমত খেয়ে দয়াল বলে, আজ্ঞে—

—আজ্ঞে! ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি। গ্র্যাজুয়েট মেয়ে গছাতে এসেছ তুমি আমার কাছে! লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে! বদমাস কাঁহাকা!

—আজ্ঞে গালাগাল দিচ্ছেন কেন!

—গালাগাল দিচ্ছি! তোমাকে যে এখনো আস্ত রেখেছি এই তোমার ভাগ্যি! নবীনবাবু সোজা হয়ে বসলেন, গে-ট আ-উ-ট।

তড়াক করে দয়াল এবার উঠে পড়ল।

—আপনি বলেছিলেন বলেই—

—তাই বলে লেখাপড়া জানা মেয়ের কথা বলেছিলাম?

—আজ্ঞে আজকাল ভালো পাত্রী বলতে তো—

—লেখাপড়া জানা মেয়ে! বেরুলে তুমি ঘর থেকে!

হন হন করে দয়াল বেরিয়ে গেল। অপমানে তার মাথা ঝিমঝিম করছে, দুই চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে।

এমন অপমান সত্যিই সে জীবনে আর হয়নি। ভালোমন্দ নানা ধরনের নানা মেজাজের লোকের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়, ভালোমন্দ নানা কথা তাকে শুনতেও হয়। সেসব শুনতে হয় নিজের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে, ছোটখাট প্রতারণা ধরা পড়ে গেলে। কিন্তু বিনা দোষে বিনা অপরাধে এই রকম অপমান!

এম-এ পাশ সরকারী বড় চাকুরে পাত্রের জন্যে গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর সম্বন্ধ এনে সে এমন কি পাপ কাজ করেছে? তাও যদি পাত্রীর অন্য দিকে কোন গলদ থাকত, কথা ছিল। সর্বদিক দিয়ে আদর্শ পাত্রী। তার ওপর বড়লোক বাপের এক মেয়ে। নেহাৎ নবীনবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয় বলেই, অশোককে বিশেষ স্নেহ করে বলেই না সম্বন্ধটা এনেছিল। নইলে চাটুজ্যেদের মেজ ছেলের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারলে এ থেকে কোন্‌না সে হাজার দুই হাতাতে পারত—এপক্ষ থেকে এক হাজার, ওপক্ষ থেকে এক হাজার।

—ঘটক মশাই।

দয়াল ফিরে তাকাল।—অশোক!

পাশে এসে অশোক বলল, বাবার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না ঘটক মশাই।

—না বাবা, মনে আর কি করব। আমরা কি মানুষ! দয়ালের গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

—না না, সত্যি কিছু মনে করবেন না। বাবা মানুষ খারাপ নন, শুধু শিক্ষিতা মেয়েদের ওপর প্রচণ্ড রাগ। নইলে—কথা থামিয়ে একবার চার পাশে তাকিয়ে নিল অশোক। তারপর বলল, চলুন, ওই মোড়ের রেস্তোরাঁয়। একটা জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। ভীষণ গোপনীয় কথা।

দয়াল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নবীনবাবুর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এল। তাঁর মনে হল, সত্যি, দয়ালের ওপর হঠাৎ এমন রেগে না উঠলেও হত। দয়ালের কি দোষ!

কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ের নামেই রেগে ওঠার ওপরেও তো তাঁর কোন হাত নেই। শিক্ষিতা মেয়ের নাম শুনলেই যে মাথায় তাঁর রক্ত উঠে যায়। তিনি কি করবেন? চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক রণরঙ্গিণী মূর্তি, কানে বেজে ওঠে ইংরেজী-বাংলা মেশানো কয়েকটি অশ্রাব্য বুকনি, আর থেকে থেকে মিহি গলার গর্জন—শাট্ আপ্! শাট্ আপ্! শাট্ আপ্! ভাবলে এখনো সমস্ত শরীরে মনে জ্বালা ধরে যায় নবীনবাবুর। শাট্ আপ্! তাঁকে বলে শাট্ আপ্!

কি অপরাধ ছিল তাঁর? তিনি কি ইচ্ছে করে যেচে গিয়ে ওর গায়ের ওপর পড়েছিলেন? একে বুড়ো মানুষ, তায় বাসে প্রচণ্ড ভিড়—ধাক্কার চোটে হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে—।

তাই বলে গাড়িভর্তি লোকের সামনে তাঁর মেয়ের বয়েসী মেয়েটা তাকে যা-নয়-তাই বলে উঠল? যাচ্ছেতাই বলে অপমান করল? প্রতিটি কথায় একবার করে শুনিয়ে দিল যে পাড়াগাঁয়ের বোকাহাবা মুখখু মেয়ে নয় সে—ইউনিভার্সিটির ছাত্রী—মুখ দেখেই নবীনবাবুর মতলব সে টের পেয়ে গেছে!

ছি ছি ছি—ভাবলে নবীনবাবুর মাথা আজো কাটা যায়। কী অপমান! অতগুলি লোকের সামনে কী অপমান! ভাগ্যিস চেনা-শোনা কেউ ছিল না গাড়িতে। থাকলে নিশ্চয় তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হত, সেইদিন, বাড়ি ফিরেই।

বাড়ি ফিরে গলায় দড়ি সেদিন দেননি নবীনবাবু. কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জীবন ভরে এর শোধ তিনি নেবেন। পাড়াগাঁয়ের কোন বোকা হাবা মুখখু মেয়ের সংগেই ছেলের তিনি বিয়ে দেবেন। খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপিয়ে দেবেন সেই খবর।

সারা দেশের লেখাপড়া জানা মেয়েরা দেখুক—কেমন একটা সুপাত্র ফস্কে গেল তাদের হাত থেকে, আপশোস করে মরুক তারা।

পাত্রী বড়ই পছন্দ হয়েছে নবীনবাবুর। আহা, এই রকম একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়েই না তিনি খুঁজছিলেন।

এ-ও নানা প্রশ্ন করার পর ফের প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করলেন।

—তোমার নামটা যেন কি বললে মা?

মাথা নিচু করে মেয়েটি বলল, কুমারী—

—বলো মা, বলো—লজ্জা কি!

—কুমারী অমিয়বালা দেবী।

—বেশ বেশ! আচ্ছা, এই কাগজটিতে পরিষ্কার করে নিজের নামটি লেখ দেখি মা।

মেয়েটি টেবিলের ওপর থেকে প্যাডটা কাছে টেনে নিল। নবীনবাবু নিজের পেনটি এগিয়ে দিলেন।

আস্তে আস্তে মেয়েটি নিজের নাম লিখল, ইংরেজীতে।

দেখেই দুই ভ্রূ কুঁচকে উঠল, সন্দেশ মুখে পোরা মুলতুবী রেখে নবীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, হুঁ, হাতের লেখাটা বেশ ভালোই। তুমি কতদূর পড়েছ মা?

মেয়েটিকে জবাব দেবার অবসর না দিয়ে পাশ থেকে তার বাবা বলে উঠলেন, এইবার আই—

—আই-এ! নবীনবাবু টান হয়ে বসলেন, আই-এ পাশ! ট্রামে-বাসে কলেজে যাও?

পাত্রী চুপ। পাত্রীপক্ষের অভিভাবকরা পড়ে গেলেন দ্বিধায়। হাঁ, বা না—কোন্ জবাব দেবেন? আধুনিক যুগের আই-এ পাশ মেয়ে একা একা যাতায়াত করতে পারে না কিম্বা করে না—এটা কি দোষের, না গুণের? কলেজের গাড়িতে যায় শুনলেই কি পাত্রের পিতা খুশী হবেন? কিন্তু তখন যদি বলেন যে, আই-এ পাশ মেয়ের একা একা যাওয়া-আসার সাহসটুকু না থাকলে কি লাভ অমন আই-এ পাশের? আবার ট্রামে-বাসে যায় শুনলেও যদি ক্ষেপে যান? হাজার হলেও বুড়ো মানুষ তো!

—কই, কথা বল? নবীনবাবু এবার পাত্রীকে ছেড়ে পাত্রীর বাপ-ভাইয়ের দিকে তাকালেন, কিসে যায় আসে?

খানিক ইতস্তত করে পাত্রীর বাবা বললেন, কলেজের গাড়ি অবিশ্যি ঠিক আছে। তবে—গাড়িতেও যায়, আবার দরকার পড়লে—ও কি, ও কি—

নবীনবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। পাশ থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে একটি কথাও না বলে সকলকে বেকুব বানিয়ে রেখে তরতর করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কলেজে পড়েন! ট্রামে-বাসে যান! শাট্ আপ্!

সারাটা রাস্তা তিনি নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে চললেন।

কলেজে পড়েন! ট্রামে-বাসে যান! শাট্ আপ!

বাড়ি ঢোকা মাত্র গৃহিণী তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি গো কি হল?

শাট্ আপ্! গর্জে উঠলেন নবীনবাবু।

—মরণ! তিন পা পিছিয়ে গেলেন গৃহিণী।—বলি তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে আনলেন নবীনবাবু। সখেদে বললেন, মাথা খারাপ হয়নি গিন্নি, এখনো মাথা আমার খারাপ হয়নি। তবে হবে, শিগ্গীরই হবে—ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে মাথাটা আমার খারাপ হয়েই যাবে।

সত্যি মাথা খারাপ হবার জোগাড়। ঘটককে বাতিল করে নিজেই নবীনবাবু মেয়ের খোঁজে উঠে পড়ে লাগলেন। লেখাপড়া-না-জানা মেয়ের খোঁজ পেলেই মেয়ে দেখতে রওনা হন। কিন্তু ফিরে আসেন মেজাজ বিগড়ে। আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে।

পাড়াগেঁয়ে বোকাহাবা মুখ্খু মেয়ে এই কলকাতা সহরে মিলবে কি করে? দুচারজন যদি থেকেও থাকে, অশোকের মত পাত্রের কথা তাদের বাবা-মা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। প্রথমেই তারা সন্দেহ করে বসে—নির্ঘাত পাত্রের মারাত্মক কোন গলদ আছে, নইলে অমন ছেলের জন্যে বাপ তার খুঁজবে কেন হাবাবোকা মুখ্খু মেয়ে?

শেষ পর্যন্ত এক রিফিউজী কলোনীতেও গেলেন নবীনবাবু, গেলেন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর মুখে সন্ধান পেয়ে। কিন্তু আদর করে বসিয়ে জলখাবার খাইয়েদাইয়ে পাত্রের খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিয়ে পাত্রীর দাদা কিনা বলে বসল, পাত্র তাদের ঠিক হয়ে গেছে! বিয়ে সামনের সাতাশে!

—অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলাম, বুঝলে গিন্নি, ভালোভাবে খোঁজ নিলাম, ও স্রেফ ধাপ্পা। আমায় ওরা ধাপ্পা দিয়েছে।

—তোমারও বাপু জেদ কম নয়—

—থামো!

ছেলের সামনে ধমক খেয়ে মুখ কালো করে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অশোক এক মনে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চলল।

ছেলেকেই এবার নবীনবাবু সালিশ মানলেন, তুই-ই বল বাবা এরকম ধাপ্পা দেয়া কি ওদের উচিত হয়েছে?

অশোক ঘাড় হেঁট করে রইল।

—লজ্জা কি, বল। উপযুক্ত ছেলে তুমি, তোমার কথাটাও তো শুনতে হয়। বলো।

কত কথা শুনছেন আমার। মুখে কিছু বলল না, মনে মনে হাসল অশোক।

—বুড়ো বয়েসে এই দৌড়োদৌড়ি! প্রাণ বেরিয়ে গেল।

আমতা আমতা করে অশোক বলল, আপনি এক কাজ করতে পারেন বাবা। নিজে ছুটোছুটি না করে দয়াল ঘটককেই—

—দয়াল ঘটক? আবার?

—না না, মানে—ওই তো ওর পেশা। সব রকমের খোঁজ ওদের হাতে থাকে। প্রথমবার ভুল করেছিল বলে—

—দয়াল ঘটক! মুখে আপত্তির জের টানলেও মনে মনে নবীনবাবু ভাবলেন, কথাটা অশোক কিন্তু মিথ্যে বলেনি। লেখা-পড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলে তো! কিন্তু কি করে আবার তিনি দয়াল ঘটককে ডাকবেন? কি করে মুখ ফুটে বলবেন তাকে কথাটা?

কিন্তু না, অত আত্মসম্মানের কথা ভাবলে এখন তাঁর চলবে না। চারদিকে যেরকম হইচই পড়ে গেছে, ছেলের বিয়ে তাঁকে দিতেই হবে—দিতে হবে একটি বোকা মুখখু মেয়ের সঙ্গেই। এবং অবিলম্বে।

•

অতঃপর দয়াল ঘটকের সম্বন্ধ আনা পাত্রীর সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল অশোকের।

নবীনবাবুর একমাত্র ছেলের বিয়ে—আড়ম্বর বিয়ের নেহাত কম হল না।

পাত্রী অবিশ্যি ঠিক পাড়াগাঁয়ের নয়, টালিগঞ্জের। তবে টালিগঞ্জ পাড়াগাঁ ছাড়া কি। সবদিক দিয়ে বধূ হয়েছে একেবারে নবীনবাবুর মনের মতন—ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন।

চেহারায় কোন খুঁত নেই। সত্যিই সুন্দরী। মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কোনমতে বানান করে করে নিজের নামটি শুধু লিখতে পারে—তাও বাংলায়।

তাও নামটি তার ভাগ্যিস মনীষা—যুক্তাক্ষরবর্জিত।

উঠতে বসতে এখন শুধু বৌমা।

বৌমাকে ছাড়া এক দন্ড চলে না নবীন-বাবুর।

তাঁর গৃহিণীরও না।

মাঝে মাঝে আপশোস করে অশোক, কিগো—আমায় কি একেবারে ভুলে গেলে? বাতিল করে দিলে?

—আঃ ছাড় ছাড়। দিনের বেলা—ছিঃ!

—দিনের বেলা! বটে!

কটাক্ষ করে মনীষা বলে, বটেই তো! এখুনি গিয়ে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে, নইলে তাঁর ঘুমই হবে না।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা নবীনবাবু রান্নাঘরের সামনে এসে ডাকলেন, বৌমা।

শাশুড়ীর পাশে বসে মনীষা তরকারি কোটায় সাহায্য করছিল, শ্বশুরের গলার স্বর শুনেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—তোমার চিঠি বৌমা। এই নাও। খামটা বাড়িয়ে দিয়ে নবীনবাবু বললেন, ঠিকানায় মনীষা মুখার্জি এম এ লেখা। এর মানে কি বৌমা?

শুনে বুক হিম হয়ে গেল মনীষার।

—তুমি এম এ পাশ বৌমা?...কই, জবাব দাও।

তরকারিকোটা বন্ধ হয়ে গেল গৃহিণীর। হাঁ করে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

—বৌমা!

—ঠাট্টা করেছে বাবা।

—ঠাট্টা?

—হ্যাঁ বাবা, নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে মৃদু হাসি টেনে মনীষা বলল, এ আমার বন্ধুর লেখা চিঠি। ওরা শুনেছে কিনা আপনি লেখাপড়া-জানা মেয়ের ওপর খুব চটা, তাই—

আচমকা হো হো করে হেসে উঠলেন নবীনবাবু, সারা বাড়ি কাঁপিয়ে। ঘর থেকে ছুটে এল অশোক, রাঁধুনি রান্না রেখে বেরিয়ে এল, চাকরটা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে নবীনবাবু বলতে লাগলেন, ঠাট্টা! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! নাঃ, সাহস আছে বটে আমার বৌমার বন্ধুর। সাবাস। সাবাস! তা শোন বৌমা, তোমার সব বন্ধুদের ডেকে একদিন নেমন্তন্ন খাইয়ে দাও।

স্বামী-স্ত্রী—অশোক আর মনীষার মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়ে যায়।

অশোক গুটিগুটি ফিরে যাচ্ছিল, নবীন-বাবু ডাকলেন, শুনেছিস খোকা, বৌমার বন্ধুর কীর্তি। খামে ঠিকানা লিখেছে

মনীষা মুখার্জি এম এ। শুনেছে কিনা আমি—

অশোক শুধু বলল,—অ!

—শোন, এই রোববারেই এক ভোজের জোগাড় করছি। দু'তিনজন বন্ধুবান্ধবকে বলব, বৌমার বন্ধুদের ঠিকানাগুলো নিয়ে আজ বিকেলেই তুই তাদের নেমন্তন্ন করে আয়। বুঝলি?

ঢোঁক গিলে অশোক বলল, আচ্ছা! সামনাসামনি আর তাকাল না, পাছে চোখাচোখি হয়ে যায় মনীষার সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বন্ধু বলতে কলকাতায় মনীষার কেউই নেই। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে তো, শহরে বন্ধু জুটবে কোত্থেকে। এমনকি, টালিগঞ্জ থেকে যে বন্ধুটি ঠাট্টা করে চিঠি লিখেছিল, যার জন্যে এত কাণ্ড, সেও এল না। তার অভিভাবক আসতে দিতে রাজী হলেন না।

শুনে অবশ্য নবীনবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন। আবার মনে মনে খুশীও হলেন বড় কম না। হাঁ, আদর্শ বৌমা পেয়েছেন তিনি, সব দিক দিয়ে আদর্শ। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন।

—পরিবেশনটা কিন্তু তুমিই করো বৌমা।

—আমি?

—হ্যাঁ বৌমা। তাই রীতি। আমার যে তিনজন বন্ধু আসবে বিয়েয় তারা আসতে পারেনি। ওদের বৌভাতের নেমন্তন্ন করেছি। রাঁধুনি দিয়ে—বুঝলে না?

মনীষা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।—আপনি যা বলবেন।

—বৌমা আমার মা-লক্ষ্মী। সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে নবীনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

বজ্রপাত হল খাওয়ার আসরে।

আধো ঘোমটা টেনে জবুথবু হয়ে রাঁধুনির পিছন পিছন মনীষা ঢুকল। রাঁধুনির হাতে ভাতের পাত্র মনীষার হাতে হাতা। পাত্র থেকে ভাত তুলে তুলে দুজনের পাতে দিয়েছে, তৃতীয়জনকে দিতে যাবে, হঠাৎ ভদ্রলোক বলে উঠলেন—

—মনীষা না?

হাত কেঁপে গেল মনীষার। হাতাটা থালার কিনারে কাৎ হয়ে গেল।

—মাস্টার মশাই!

মাস্টার মশাই! সামনে একটা চেয়ারে খাওয়ার তদারকে বসে ছিলেন নবীনবাবু। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, তুমি একে চেন বৌমা? জনার্দন তুমিও?

—চিনি না! অমায়িক হেসে জনার্দনবাবু বললেন, আজ তিরিশ বছর কলেজে মাস্টারি করছি, কত ছেলেমেয়ে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু—

—বৌমা তোমার ছাত্রী ছিল?

—ছিল মানে? অমন একটি ছাত্রী আমি জীবনে পাইনি। বি এ ফাইনালের সময় পিঠে কার্বাংকল হল, তাই নিয়েই—ওকি নবীন, না না, কার্বাংকল ছোঁয়াচে রোগ নয়।

তারপর এম এ পাশ করল ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে—

নবীনবাবু ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মনীষা টপ করে বসে পড়ল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অশোক—টুক করে সরে গেল।

—বৌমা এম এ পাশ!

—শুধু লেখাপড়ায় নয় নবীন, এমন মেয়ে—

—আমায় মাপ করো ভাই তোমরা। মাথাটা কেমন ঘুরছে। আমি একটু গড়িয়ে আসি। টলতে টলতে নবীনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রিত তিনজনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঘটনার নাটকীয়তায়। নবীনবাবু বেরিয়ে যেতেই অশোক এসে ঘরে ঢুকল। সবিনয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না আপনারা,

বাবার ব্লাডপ্রেশারটা ইদানীং বড্ড বেড়েছে—প্রায়ই এমন মাথা ঘুরে ওঠে, তাই—

নবীনের না হয় ব্লাডপ্রেশার বেড়েছে, কিন্তু নতুন বৌমার? তারও কি ব্লাডপ্রেশার? সামনে বিমূঢ়ের মত বসে থাকা মনীষার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সকলের মনে হানা দিয়ে গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বললেন না—নবীনের খামখেয়ালী মেজাজের কথা জানতে তো তাঁদের বাকি নেই। খেয়ে উঠেই হয়ত দেখবেন ঘর থেকে গুম হয়ে যে মানুষ অভদ্রের মত বেরিয়ে গেল, বৈঠকখানায় সে পেতে বসে আছে দাবার আসর।

কিন্তু খাওয়াদাওয়ার শেষে জনার্দনবাবুরা বৈঠকখানাতেও নবীনের দেখা পেলেন না। সত্যি নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছেন নবীনবাবু।

মনীষার মুখ গেছে শুকিয়ে, কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেছে সে।

—প্রথমেই আমি বলেছিলুম, আমি পারব না, অভিনয় করতে আমি পারব না।

—অভিনয়ে তো তোমার ভুল হয়নি মণি। আর সবটাই কি অভিনয়!

—কিন্তু ধরা তো শেষ পর্যন্ত পড়তেই হল। এ আমি জানতাম! কি হবে! এখন আমি কি করি। বুড়ো মানুষ না খেয়ে শুয়ে রইলেন মা'ও কিছু খেলেন না—

—আমি ভেবেছিলাম, হয়ত ক্রমে বাবার মত বদলাবে। মনে তো বাবার কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই। তখন সব বলে ক্ষমা চেয়ে নেব।

—কিন্তু ও'রই বা কি দোষ! পিছন থেকে যোগমায়া বলে উঠলেন। দোষ তোমারও কম নয় বৌমা।

আগে জানান না দিয়ে শাশুড়ি কখনো এ-ঘরে ঢোকেন না, আজ ব্যতিক্রম। মনীষা অপরাধীর মত একপাশে সরে দাঁড়াল।

আকুল স্বরে অশোক বলল, তুমি যদি সব কথা শোন মা—

—আমি জানি। বিয়ের আগে দয়াল নিজেই আমাকে সব বলেছে।

—দয়াল! বিয়ের আগে! তবু তুমি রাজী হয়েছিলে মা? জেনেশুনেও?

—আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি বাছা। ছেলে ভেতরে ভেতরে একজনকে পছন্দ করে বসে আছে, এম-এ পাশ সোমত্থ ছেলে—আর তার গলায় আমি একটা পাড়াগেঁয়ে অকাট মুখ্খুকে এনে ঝুলিয়ে দেব! আমি মা না!

—মা! মনীষা ক'কিয়ে উঠল।

—নাকের জলে তুমি আর কেঁদোনা মা। ধমক দিয়ে যোগমায়া বললেন, দেখলে গা জ্বলে যায়। অত লক্ষ্মীপনা তুমি দেখাতে গেলে কেন? লেখাপড়া জানা মেয়েদের হয়ত হাজার দোষ থাকে, কিন্তু আজকালকার দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া না জানলে আবার মানুষ হয়! তুমি যদি সত্যি মুখ্খু মেয়েমানুষের মত আচার-ব্যবহার করতে, দেখতে উনিই তখন তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। ও'কে জানতে—

—বাবা আসছেন। বলে তাড়াতাড়ি ঘরের এক কোনায় গিয়ে আশ্রয় নিল মনীষা।

দরজার কাছে এসে গম্ভীরভাবে নবীন-বাবু বললেন, তুমি এখানে! আর আমি ডেকে ডেকে—

—মিছে কথা বলো না। পাশের ঘর থেকে ডাকলে আমি শুনতে পেতাম। গৃহিনী মুখিয়ে উঠলেন।

—তাহলে আমি মিছে কথা বলছি!

—ইচ্ছে করে কি আর বলছ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মনের ভুলে ভুল বকছ।

—হুম্। নবীনবাবু চাপা হুংকার ছাড়লেন। একটু থেমে হতাশভাবে বললেন, তুমিও তাহলে ওই দলে। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র! দয়াল পর্যন্ত ওর মধ্যে। কালই যদি সে ব্যাটাকে আমি—

—কালকের কথা কাল। এখন চলো, খাওয়াদাওয়া সারো। আর লোক হাসিওনা।

—না। অসম্ভব। নবীনবাবু সবেগে মাথা নাড়তে লাগলেন, অসম্ভব। এ বাড়ির অন্নজল আমি আর মুখেও তুলবনা। কাল সকালের গাড়িতেই আমি কাশী—

—যেও, তাই যেও। এখন দুটি মুখে দিয়ে আমাদের উদ্ধার করো। তোমার জন্যে মেয়েটা উপোস করে থাকবে? সারাদিন খাটাখাটনি গেছে, তার ওপর এই শরীরে—এই অবস্থায়—

—মানে? চোখ কোঁচকালেন নবীনবাবু।

—মরণ! মুখ ঝামটা দিয়ে গৃহিনী বললেন, যাও তো তুমি এখন এখান থেকে!

—না। তোমার হুকুমে যাব? এ বাড়ি আমার বাড়ি। যার না পোষায় সে-ই বেরিয়ে যাক—দূর হয়ে যাক।

—তাই ভালো বাবা। এতক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক এবার কথা বলল, তাই ভালো। ওর মা বারবার সেদিন বলছিল, ওকে না হয় আমি এখুনি গিয়ে টালিগঞ্জে—

—চোপ রও। প্রচন্ড এক থাপ্পর উঁচিয়ে নবীনবাবু বললেন, তুই কে? তোকে আমি সব লেখাপড়া করে দিয়েছি যে কত্তাত্তি ফলাতে এসেছিস?

—আজ্ঞে—

—ফের কথা? ছেলেকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে গৃহিনীকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে নবীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানালেন, বৌমা!

শ্বশুরকে দেখেই আতংকে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল, শ্বশুরের গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজেও মনীষা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

—এসো কাছে এগিয়ে এসো।

গুটি গুটি পায়ে মনীষা এগিয়ে এল।

শ্বশুরের পায়ের তলায় মনীষা হয়ত লুটিয়ে পড়ত, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি তাকে বুকে টেনে নিলেন।

—লেখাপড়া জানা—মানে সত্যিকারের শিক্ষিত মেয়েরা কী ডেঞ্জারাস মা! আমাকে শেষ পর্যন্ত আমাকেও তুমি বোকা বানিয়ে দিলে!

যোগমায়া এবং অশোক কি যেন বলতে যাচ্ছিল, একই সঙ্গে দুজনকে ধমক দিয়ে গর্জে উঠলেন নবীনবাবু—শাট্ আপ্! শা-ট্ আ-প্!
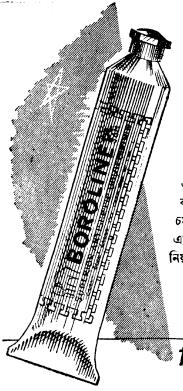
লৌকিকসাহিত্যে আগমনীর গান

বেলা দে

আমাদের লোকসাহিত্য খাঁটি জিনিস। বাংলার জলবাতাস আর মাটিতে এর সৃষ্টি। এর পরিচয় বাউলের গান, মেয়েলি ছড়া বা গান, বারমাসী, জাগ গান, সারি গান, ব্রতর গান, আর আগমনীর গান প্রভৃতি। এই প্রবন্ধে আমি অবশ্য শুধুমাত্র বাংলা দেশের আগমনীর গান সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা করব।

বাংলা দেশে পূজো বলতে বিশেষ করে শারদীয়া পূজোর কথাই আমাদের সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। এমন ভাব ও অন্তরের যোগাযোগ কোন পূজোতেই অনুভূত হয় না। দুর্গা জগজ্জননী হলেও এখানে বাঙালীর হৃদয়ে তিনি কন্যারূপেই আসীনা। প্রকৃতির রূপ রস ছন্দ ও বর্ণ-সমারোহের মধ্যে আমাদের দেশের কবিরা দেখেছেন মূর্তিমতী মহাপ্রকৃতি জগজ্জননীকে। যখন শরতে প্রকৃতি অসীম সৌন্দর্যে চারিদিক ভরিয়ে দেয়, বর্ষার দুর্গম পল্লীপথ শুকিয়ে সুগম হয়, তখন মায়ের মন কেঁদে ওঠে কন্যার বিরহে। এই পটভূমিকা ভাবপ্রবণ বাঙালীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব ভাবরাশির সৃষ্টি করে। তাই নিজের বিবাহিতা কন্যাকে তিনদিনের জন্য এনে আবার স্বামীর বাড়ি পাঠানোর স্মৃতি বাঙালী পিতামাতার মনে পূজোর সময়ে বিশেষ করে যাদের বাড়িতে দুর্গা-পূজো হয়, তাঁদের মনে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাই দেখি বাংলাদেশের আগমনী গানের মধ্যে দিয়ে সারা বাংলায় সে বিরহ-সংগীত ঘোষিত হয়ে ওঠে—

"আমার মনে আছে এই বাসনা
জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা।
ঘর-জামাতা করে রাখব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে করব দ্বিতীয় কৈলাস,
হরগৌরী চক্ষে হেরব বারমাস,
বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না।
সপ্তমী অষ্টমী পরে নবমীতে
মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে,
বিল্বপত্র দিয়ে পূজব ভোলানাথে
ভুলে রবে ভোলা যেতে চাইবে না।"

একটি বছর শেষ হয়ে গেছে। মেনকা দুর্গার কোন সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে গিরিরাজের কাছে বলছেন—

"বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।
দিবানিশি শোকে সারা,
না হেরিয়া প্রাণতারা
বৃথা এই আঁখিতারা সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম, মিছে করি গৃহকর্ম,
মিছে এই সংসার-ধর্ম সকলি অসার।
তুমি তো অচলপতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি জলে প্রাণের কুমার।
ত্রিজগতে নাহি অন্যে একমাত্র সেই কন্যে
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার।"

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি! গিরিরাণীর অন্তরের বেদনা স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। দুর্গার চোখের কোণে জল। বলছেন—"মাগো, আমায় নিয়ে এসো, আমি অনেকদিন তোমাদের দেখিনি।" ঘুম ভেঙে যায়, আশার আনন্দে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। কিন্তু কই, উমা তো আসে নি?

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে!
—গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে
এই এখুনি শিয়রে ছিল,
গৌরী আমার কোথা গেল হে?
অচেতনে পেয়ে নিধি,
চেতনে হারালাম গিরি হে।
ধৈর্য না ধরে মম জীবনে।"

গিরিরাজের কাছে মেনকা নিজের স্বপ্নের কথা প্রকাশ করলেন—

"গত নিশিযোগে আমি হে
দেখেছি যে দুঃস্বপন।
এল হে আমার সেই তারা ধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে মা কৈ, মা কৈ,
মা কৈ আমার, দেখা দাও দুঃখিনীরে।
অমনি দু'বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি — আমি নই।"

কৈলাস থেকে উমাকে নিয়ে আসবার জন্য রানী গিরিরাজকে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন কিন্তু গিরিরানীর সে অন্তরের ব্যথা গিরিরাজকে বিচলিত করতে পারল না। তাই তখন গিরিরানী বলছেন—

"গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে।
না হেরি তনয়ামুখ হৃদয় বিদারে।
তরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে।"

স্বপ্নও সত্য হয় তাই গিরিরানীর জীবনেও স্বপ্ন সত্যরূপে দেখা দিল। দুর্গা এসেছেন এক বছর পরে মায়ের কাছে। গিরিপুরে আজ আনন্দের ঢেউ উঠেছে। সহচরীরা আগমনবার্তা নিয়ে এলো 'ওঠো রানী তোমার অন্তরের মণি এসেছে। তোমায় খুঁজছে—'

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী, তোর ঈশানী—
লয়ে যুগল শিশু কোলে
'মা কই আমার' বলে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।"

গিরিরানী ছুটে গেলেন মেয়েকে দেখতে তারপর সেই শুভ সংবাদ আগে গিরি-রাজের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন—

"গিরিরাজকে ডেকে দে গো
আমার গৃহে গৌরী এলো।
নাশিতে আঁধার রাশি, উমাশশী প্রকাশিল
এই নগরে লোক ছিল ঘরে ঘরে
কেবা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে সকলে
সানন্দ মনে
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ
পুরে গেল।"

দুর্গা এলেন। অনেকদিন পরে কন্যাকে কাছে পেয়ে গিরিরানীর আর আনন্দ ধরে না। কন্যা হলেও উমা মহাদেবী! তাই অভ্যর্থনার এত ব্যস্ততা—এত আয়োজন। কন্যা এসেছে, মা ব্যস্ত হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, স্বামিগৃহে কন্যার সুখ সুবিধার খোঁজ নিচ্ছেন, এটি স্বাভাবিক। মেনকা কি বলেছিলেন জানি না, কিন্তু বাঙালী

তার নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে স্বামিগৃহপ্রত্যাগতা কন্যা সম্বন্ধে মায়ের কি জ্ঞাতব্য থাকতে পারে—তাই সে বলতে পারলো—

"কেমন করে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল্‌না তাই
কত লোকে কত বলে
শুনে প্রাণে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে!
এবার নিতে এলে, বলব হরে,
উমা আমার ঘরে নাই।"

আনন্দের মধ্য দিয়ে কয়েকটি দিন কেটে যায়। তারপর আসে বিদায়ের পালা। লক্ষ লক্ষ বাসনা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে, সবই মার কাছে নিবেদন করবার ইচ্ছা ছিল উমার, কিন্তু আর হল না—সময় নেই, কারণ এদিকে নন্দী উমাকে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। সে এসে স্বয়ং গিরিরাজ-দুহিতাকে বলছে—

"তোমায় নিবার জন্য এসেছি
চল গো উমা, গিরিরাজের ঝি।
শঙ্করে পাঠাইছে মোরে
কাল আইসাছে দশমী
চল গো উমা, গিরিরাজের ঝি।"

গিরিরানীর অন্তর কেঁদে উঠল! মেয়েকে বললেন অনেকদিন পরে এসেছিস, এরই মধ্যে কেন যাবি? আরো কিছুদিন না হয় থাক্ না—

"এসেছিস মা থাক মা উমা দিনকত
হয়েছিস ডাগর ডোগর কিসের এখন
ভয় এত?
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস, তাই হয়েছিস পর
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস,
নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই ততো।"

উমা নিরুত্তর! বিদায়ের ব্যথায় মুখখানি ম্লান। গিরিরানী বুঝতে পারেন, জামাইয়ের আদেশমত তাঁকে আজই চলে যেতে হবে। কন্যাবিদায়ের দৃশ্যের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্যই নেই, চারদিকেই যেন বিদায়বেলার বিষাদরাগিনী বেজে ওঠে! এখানে প্রাণের যোগ আছে বলেই কান্না আসে। মেয়েরা তখন সবাই গাইতে থাকেন—

"মায়ের দুঃখ হইল ভারী।
যাত্রা করে কৈলাসপুরে
উমাশঙ্করী।
মায়ের নেত্রনীরে বক্ষ ভাসে,
যায় গো হৃদয় বিদারি।
স্বর্ণঘট পূর্ণ করি,
আম্রপল্লব তার উপরি
দিয়াছে নারী
শান্তি করে দ্বিজবরে
বেদমন্ত্র উচ্চারি।
যাত্রার মঙ্গল যত
সম্মুখে রাখি সমস্ত
মনেরই মত।
মুখে শিব শম্ভো বলে
চলে দোলা ভর করি।
সন্তানের যে মমতা
মা বিনে আর কেউ বোঝে না
দ্বিজ রাধানাথে বলে
যাতনা হইল ভারী।"

এমনি ধারা কত গান যে দেখতে পাওয়া যায় তার শেষ নেই। এই দুর্গাপূজাকেই উপলক্ষ্য করে যে সঙ্গীত-সাহিত্যের সৃষ্টি বাংলা দেশে হয়েছে তা অনবদ্যভাবে সমৃদ্ধ। পল্লীগীতিতেও এই ভাবগাম্ভীর্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, পল্লীগীতির ভাষা স্থানে স্থানে অমার্জিত হলেও ভাবের পূর্ণতায় তা আজো অম্লান হয়ে আছে।

বাংলার দুর্গোৎসব

যক্ষ্মার কথা

শ্রীসুধাংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশে রোগীর সংখ্যা দিন দিন খুব কমে যাচ্ছে।

ভারতে অধুনা প্রতি বৎসর অন্তত পাঁচ লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যু হয় ক্ষয় রোগে, তার অর্থ প্রতি মিনিটে ভারতে একটি লোক ক্ষয় রোগে মারা যায় এবং অন্তত ২৫।৩০ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ভারতে যক্ষ্মারোগে ভোগে।

পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এক সময়ে এত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি যক্ষ্মারোগে কখনও ভোগেনি, এবং এখন ভুগছে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে বরং ক্রমশই যক্ষ্মার প্রকোপ এত কমে যাচ্ছে যে, মনে হয় এই শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে; যেমন সে সব দেশ থেকে দূর হয়েছে ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, বসন্ত, ডিপথিরিয়া, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগ।

কলকাতা ও তার শহরতলিতে শতকরা ৩।৪ জন যক্ষ্মা রোগে ভুগছে এবং তাদের অন্তত অর্ধেক যক্ষ্মা বীজাণু ছড়াচ্ছে

বি-সি-জির অন্যতম আবিষ্কর্তা ডঃ ক্যালমেট

(open cases)। এদের মধ্যে অনেকেই জানে না যে, তারা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। লক্ষণ প্রকাশ পাবার পরও অনেকে আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেয় না। কারণ রোগ ধরা পড়ে জানাজানি হলেই কর্মচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে। অনেক যক্ষ্মা-

যক্ষ্মা-বীজাণুর আবিষ্কর্তা জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট কক্

রোগী অজ্ঞতাবশত নিজের সন্তানদের, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের যক্ষ্মা বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত করে, তাঁদের ভবিষ্যতে রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে। গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে কলকাতা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য সহরে যক্ষ্মার প্রকোপ অনুরূপ কিংবা আরও বেশীভাবে বেড়ে গেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে। গ্রামাঞ্চলে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ অনেকটা কম; কিন্তু ক্রমশ শহর থেকে এই রোগ বাংলা তথা ভারতের সুদূর পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কাজকর্ম উপলক্ষে শহরে গিয়ে লোকে অনেক সময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন সে পল্লীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা চিকিৎসায়, খারাপ চিকিৎসায় ও খাদ্যাভাবে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে অপর সকলের মধ্যে এই ভীষণ ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

যক্ষ্মা সম্পূর্ণ চিকিৎসাসাধ্য

যক্ষ্মা আজকাল চিকিৎসা-সাধ্য রোগ বিশেষত যদি প্রথম অবস্থায় ধরা পড়ে। যক্ষ্মা প্রথম অবস্থায় ধরা পড়তে পারে যদি লক্ষণ প্রকাশের সংগে সংগেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। প্রথম অবস্থায় যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণগুলি হলঃ—

(ক) শরীরে অযথা অবসাদ বিশেষত বিকালের দিকে। পূর্বাভ্যস্ত পরিশ্রমে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্লান্তি।

(খ) বিকালের দিকে ঘুসঘুসে জ্বর, নাড়ীর দ্রুতগতি, চোখ জ্বালা, ক্ষুধামান্দ্য।

(গ) শরীরের ওজন হ্রাস, দুর্বলতা বোধ, রাত্রে অতিরিক্ত ঘাম, বুকে স্থায়ী ব্যথা।

(ঘ) খুকখুকে কাশি, ঔষধ সেবনের পরও একমাসের অধিককাল স্থায়ী।

(ঙ) কফের সহিত রক্তের ছিটা কিংবা কাশির সংগে টাটকা রক্তপাত।

আরও অনেক প্রকার লক্ষণ যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় প্রকাশ পায় কিন্তু সেগুলি সাধারণের বোধগম্য নয়। তবে একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। তা হল এই যে, যদি কেউ ২।৩ মাসের মধ্যে কয়েকবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় বা সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হন, তবে নিশ্চিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। যাঁদের পূর্বে প্লুরিসি হয়েছে তাঁদের যদি উপরি উক্ত যে কোনও লক্ষণ কিছুদিন যাবৎ চলতে থাকে, তবে অচিরে বক্ষের এক্স-রে ছবি (X-Ray) লওয়ার ব্যবস্থা করবেন। বিশেষত কাশির সংগে টাটকা রক্তপাত হলে, তা গলার শির ছিঁড়ে বের হয়েছে বলে মনকে কখনও প্রবোধ দেবেন না বা অন্য কারও, এমন কি চিকিৎসকেরও, স্তোক-

ডঃ ক্যালমেটের সহকর্মী ডঃ গেরাঁ

বাক্যে ভুলবেন না। রক্তপড়া দিন সাতেক বন্ধ থাকলেই (সে সময়েও চিকিৎসার প্রয়োজন) নিকটস্থ এক্স-রে ক্লিনিকে গিয়ে (চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শের পর) বক্ষের এক্স-রে ছবি তোলাবেন। কফে যক্ষ্মা-বীজাণু আছে কিনা তাও পরীক্ষার জন্য আপনার চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় ব্যবস্থা করবেন। যদি এক্স-রে কিংবা কফ-পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ফুসফুসের যক্ষ্মা হয়েছে, তাহলে আপনার চিকিৎসক তখনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই। সম্ভব হলে স্যানাটোরিয়ম কি যক্ষ্মা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু ভারতে যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যার তুলনায় হাসপাতালে শয্যা এত কম (প্রতি ২০০টি রোগীর জন্য একটি শয্যা) যে গৃহ-চিকিৎসার ব্যবস্থাই (domiciliary treatment) অধিকাংশ রোগীকে বাধ্য হয়ে করতে হয়। সারা ভারতে যক্ষ্মারোগীদের জন্য মাত্র ১২।১৩ হাজার শয্যা আছে এবং প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক, দুই হাজার শয্যা আছে যক্ষ্মারোগীদের জন্য।

প্লুরিসি—অনেক ক্ষেত্রেই ফুসফুসে যক্ষ্মার পূর্বাভাস

প্লুরিসির নাম অনেকেই শুনেছেন, কারণ এ একটি সাধারণ রোগ। প্লুরিসি মানে প্লুরার প্রদাহ। প্লুরা হ'ল ফুস-ফুসের গায়ের একটি পাতলা আবরণ এবং এই আবরণ বক্ষপঞ্জরের ভিতরটাও আচ্ছাদন করেছে। প্লুরার যে অংশ ফুসফুসকে আচ্ছাদন করেছে ও অন্য অংশ যা বক্ষপঞ্জরের ভিতর আচ্ছাদন করেছে তাদের মধ্যে, সুস্থ অবস্থায়, কোন ব্যবধান থাকে না বললেই চলে। কিন্তু প্লুরার প্রদাহ হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই অতিসূক্ষ্ম ব্যবধানের মধ্যে রস বা জলের সঞ্চার হয়। তখন ইংরেজীতে তাকে 'প্লুরাল এফিউশন' (Pleural effusion) বলে। যদি জল না জমে তবে শুষ্ক বা 'ড্রাই প্লুরিসি' (Dry Pleurisy) বলে। এ রোগ অনেক সময় খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়। কারণ

প্লুরার দুই অংশ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষিত হতে থাকে।

প্লুরিসি কয়েকটি কারণে হতে পারে—নিমোনিয়া, রিউম্যাটিক জ্বর এবং যক্ষ্মা-বীজাণুর আক্রমণ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, সামান্য একটু বুকে ব্যথা হল—হয়ত তার দুদিন আগে জলে ভেজা হয়েছে। ব্যথাটা আর যায় না, ক্রমে বাড়তে লাগল এবং জ্বরও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করল। এরূপ অবস্থায় অবিলম্বে ডাক্তার দেখান উচিত। প্লুরিসি হয়েছে কিনা ডাক্তারেরা স্টেথ্‌স্‌কোপ দ্বারা ও অন্য উপায়ে যথা এক্স-রে ছবি দ্বারা জানতে পারেন। অধিকাংশ প্লুরিসিই যক্ষ্মার পূর্বাভাস। সেইজন্য ডাক্তার যদি বলেন, প্লুরিসি হয়েছে তবে কখনও তা অবহেলা করবেন না। চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন ও পুষ্টিকর খাদ্য খাবেন। আজকাল প্লুরার এফিউশনে চিকিৎসকগণ প্রয়োজন বোধে স্ট্রেপ্টো-মাইসিন, পি· এ· এস কিংবা আই· এন· এচ· ক্যালসিয়ম, ভিটামিন ইত্যাদি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, শতকরা ২৫ জন প্লুরিসি রোগীর ভবিষ্যতে ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য পুনরায় বলছি যে, প্লুরিসিকে কখনও অবহেলা করবেন না। প্লুরিসির উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে এবং পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্তত ছয়মাস বিশ্রাম গ্রহণ না করলে ২।৩ বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। প্লুরিসি সেরে যাওয়ার পর তিন বৎসরের বেশী সময় যদি কেহ সুস্থ থাকে, তবে তার যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। প্লুরিসি সেরে গেলে পরও প্রতি তিন মাস অন্তর বক্ষের এক্স-রে ছবি তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এই উপায়েই অতি সত্বর ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা ধরা পড়ে। প্লুরিসিতে ভোগা রোগীর যদি পূর্ববর্ণিত যে কোনও লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা (Haemoptysis) তবে তৎক্ষণাৎ বুকের এক্স-রে করাবেন। আজকাল কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে বহু এক্স-রে ক্লিনিক হওয়ায় এক্স-রে ছবি তোলানোর অনেক সুবিধা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রসারিত হলে ভবিষ্যতে হয়ত গ্রামাঞ্চলে এক্স-রে ছবি নেবার সুবিধা হবে।

যক্ষ্মা বীজাণু তথ্য

যক্ষ্মা যে সংক্রামক ব্যাধি সে সম্বন্ধে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই বহু দেশের জনগণের প্রতীতি ছিল, কিন্তু তার সঠিক প্রমাণ কিছু ছিল না। প্রমাণ পাওয়া গেল, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ, যেদিন জার্মান চিকিৎসক রবর্ট কক (Dr Robert Koch) যক্ষ্মা বীজাণু আবিষ্কারের খবর বার্লিন মেডিকেল সোসাইটীর অধিবেশনে প্রকাশ করে সারা বিশ্বের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। এই আবিষ্কার ও যক্ষ্মা সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ গবেষণার জন্য তিনি ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যক্ষ্মা বীজাণুর বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল Mycobacterium tuberculosis, এই বীজাণু কয়েক প্রকারের হয় এবং মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশুপক্ষী, মৎস্য ও সরীসৃপের শরীরে ক্ষয়রোগের উৎপত্তি করে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গো-যক্ষ্মায় বহু গরুর অকালে মৃত্যু হ'ত এবং এই যক্ষ্মাগ্রস্ত

গরুর কাঁচা দুধ পান করে ঐ সকল দেশে কত শত শিশুর ও অল্পবয়স্কদের যে মেনিনজাইটিস্ ও অস্থির ক্ষয়রোগে প্রাণহানি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজকাল রোগগ্রস্ত গাভীর বিনাশ সাধন করাতে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ থেকে গো-যক্ষ্মা লোপ পেয়েছে। ফলে গো-যক্ষ্মা বীজাণু (এটি মানব-যক্ষ্মা বীজাণু থেকে কিছু আলাদা রকমের) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যু একেবারে কমে গেছে। আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলা দেশে, গো-যক্ষ্মা (Bovine Tuberculosis) প্রায় দেখা যায় না এবং দুধ ফুটিয়ে খাওয়া হয় ব'লে গো-যক্ষ্মার বীজাণু মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না। গো-যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়, কিন্তু মানবযক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা গোজাতি কদাচিৎ আক্রান্ত হয়। এই দুই প্রকার যক্ষ্মা বীজাণু ছাড়া পক্ষীযক্ষ্মা বীজাণু (Avian Tuberculosis) দ্বারাও কদাচিৎ মানুষের আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ আছে। যাঁরা মুরগী, হাঁস ও অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষীর সংস্পর্শে থাকেন তাঁদেরই এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। মৎস্য ও সরীসৃপ যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই।

যক্ষ্মা বীজাণু আকারে এত ক্ষুদ্র যে, হাজার হাজার বীজাণু একটি আলপিনের মাথায় স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। তা'হলেই বুঝতে পারছেন যে, স্থূলচক্ষে এদের দর্শন মেলে না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় এদের দেখতে গেলে এবং তাও আবার বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এদের রঙ করলে (stain) তবে দেখা যায়। এমন ভীষণ শত্রু অথচ সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। কাজেই চোখে দেখা না গেলেও যে সকল বস্তুতে ও অবস্থায় এই অদৃশ্য শত্রুর থাকার সম্ভাবনা—যথা যক্ষ্মারোগীর কফ, বালিশ, বিছানা, রুমাল, গামছা, তোয়ালে, জলের গ্লাস, বাটি, থালা, পুস্তক ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য এবং মল মূত্র—সেগুলো সম্বন্ধে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর অতি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যক্ষ্মা বীজাণু উত্তাপ, রৌদ্র ও বীজাণুনাশকের (লাইসল, ডেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডার, কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি) সংস্পর্শে অতি সহজেই ধ্বংস হয়। কিন্তু অন্ধকার, ঠাণ্ডা, রৌদ্র—বাতাসবিহীন গৃহে ও গৃহস্থিত আসবাবপত্রে যক্ষ্মা বীজাণু বহুকাল জীবিত থাকতে পারে।

শরীরের প্রতিষেধক বা প্রতিরোধ ক্ষমতা

মানুষের শরীরে যক্ষ্মা বীজাণু প্রধানত প্রশ্বাসের সঙ্গে এবং কখনও কখনও খাদ্যের সঙ্গে প্রবেশ করে। খাদ্যের সঙ্গে প্রবেশ করে' যক্ষ্মা বীজাণু অন্ত্র আক্রমণ করে, যেমন গোযক্ষ্মা বীজাণু দুগ্ধের সঙ্গে প্রবেশ ক'রে শিশুদের রোগগ্রস্ত করে। আমাদের দেশে সাধারণত যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে এসে তার কাশির সঙ্গে নির্গত (Droplet Infection) যক্ষ্মা বীজাণুগুলি প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা নিজ ফুসফুসের মধ্যে অজানিতে টেনে নেই। সেই বীজাণুগুলি ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে সামান্য একটি স্থানের ও তার পরিবাহক লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ সৃষ্টি করে। পরে ঐ স্থানে একটি গুটিকা বা টিউবারকল্ উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইংরেজীতে ক্ষয়রোগের নাম টিউবারকুলোসিস্ বা সংক্ষেপে টি বি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঐ প্রদাহ শরীরস্থ স্বাভাবিক প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ক্ষমতার (Native Resistance) দ্বারা দমিত হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের ঐ স্থানের পরিবাহক লসিকাগ্রন্থির (Lymph Gland) প্রদাহ সেরে যায়। মানবদেহের যক্ষ্মা বীজাণুর প্রথম আক্রমণকে প্রাথমিক আক্রমণ (Primary Infection) বলে

এবং প্রাথমিক আক্রমণ দমনের সংগে শরীরে আর একপ্রকার প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় —একে লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Acquired Resistance) বলে। প্রাথমিক আক্রমণ যে কোনও বয়সে হ'তে পারে। আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা এত বেশী যে, শহরবাসীরা ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই শতকরা ৭০।৮০ জন প্রাথমিক আক্রমণে আক্রান্ত হয়। এই প্রাথমিক আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় টিউবারকুলিন পরীক্ষা দ্বারা (Tuberculin Test)। খুব সামান্য মাত্রায় যক্ষ্মা বীজাণু নিঃসৃত টিউবারকুলিন ইনজেকসন দিলে যদি শরীরের ঐ স্থানের চামড়া ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে লাল হয় ও সামান্য ফুলে ওঠে তা'হলে বুঝতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির প্রাথমিক আক্রমণ হয়ে গেছে এবং সে ব্যক্তি টিউবারকুলিন পসিটিভ্ (Tuberculin Positive)। কখন যে প্রাথমিক আক্রমণ হয়ে গেছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানবার উপায় থাকে না। কারণ সে সময় কোনওরূপ লক্ষণ সাধারণত প্রকাশ পায় না। পরে টিউবারকুলিন পসিটিভ্ হ'লে প্রাথমিক আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। সংগে সংগে শরীরে লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতার নিদর্শন মেলে। অবশ্য লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে বলেই একেবারে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই। কারণ প্রাথমিক আক্রমণ সেরে যাবার পর ফুসফুস ও লসিকাগ্রন্থিতে সুপ্ত অবস্থায় কিছু বীজাণু থেকে যায়। লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাইরে থেকে যক্ষ্মা বীজাণুর পুনরাক্রমণ হ'তে আমাদের রক্ষা করে কিন্তু শরীরস্থ সুপ্ত বীজাণুগুলি সুযোগ ও সুবিধা পেলে আবার জেগে ওঠে, যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়। শরীরের দুর্বল অবস্থায়, যথা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধির পর, নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, মানসিক অশান্তিতে, মেয়েদের গর্ভবতী অবস্থায় ও প্রসবের পর এবং বহুমূত্র (Diabetes) রোগ থাকলে শরীরস্থ সুপ্ত যক্ষ্মা বীজাণুগুলি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে কোটি কোটি বীজাণুতে পরিণত হয় এবং ফুসফুস বা শরীরের অন্য কোনও তন্তু, যথা ফুসফুসের অন্য স্থানে, গ্রন্থি, অস্থি, বৃক্ক, মূত্রাশয়, জননেন্দ্রিয়, স্নায়বিক ঝিল্লী (Meninges) এমন কি সারা শরীরে এককালে (Miliary) আক্রমণ করতে পারে। এইপ্রকার শরীরস্থ বীজাণু দ্বারা আক্রমণকে অন্তস্থ পুনরাক্রমণ (Endogenous Re-infection) বলে। সাধারণত এইভাবেই যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে কোন কোনও ক্ষেত্রে প্রাথমিক আক্রমণ দমন করতে না পারলে আক্রমণ রোগে পরিণত হয় এবং যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইপ্রকারের রোগ (Progressive Primary) অনেক সময় কিশোর কিশোরীর মধ্যে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বা সর্বদা কাশি ও কফ নিঃসরণকারী অসাবধান যক্ষ্মারোগীর নিয়ত সান্নিধ্যে সুস্থ টিউবারকুলিন পসেটিভ ব্যক্তির লব্ধ প্রতিষেধক ক্ষমতা অতিক্রম করে কোটি কোটি বীজাণু প্রশ্বাসের সংগে ফুসফুসে প্রবেশ করে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ করাতে পারে। একে বহিরাগত পুনরাক্রমণ বলে (Exogenous Re-infection)। লেখকের ধারণা সাধারণত বয়স্কদের যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পায় অন্তস্থ পুনরাক্রমণের ফলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যক্ষ্মা বীজাণুর রোগ-লক্ষণ প্রকাশ **করার ক্ষমতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে সংক্রামিতের শরীরের প্রতিষেধক (স্বাভাবিক ও লব্ধ) ক্ষমতার উপর।** তা যদি না হ'ত তবে স্বামীর বা স্ত্রীর যক্ষ্মা হ'লে সকল ক্ষেত্রেই একে অপরকে যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত করতেন। কিন্তু সাধারণত তা ত হয় না। অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাধি পরস্পরকে আক্রমণ করে, এ দেখেছি। এ সম্বন্ধে (Conjugal Tuberculosis) বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও লেখকের অভিজ্ঞতা সমর্থিত হয়েছে। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে স্বামী-স্ত্রীর দুইজনেরই যক্ষ্মা হয়েছে, এইরূপ রোগী সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবৎ তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে (স্বামী রোগী হ'লে স্ত্রীর এবং স্ত্রী রোগী হলে স্বামীর বক্ষের এক্স রে ছবি তোলা হয়েছে) যে, শতকরা মাত্র ১৫ জনের যক্ষ্মা পাওয়া গেছে; বাকী ৮৫ জন একে অপরকে সংক্রামিত করেনি।

বি সি জি ইনজেকসন

এই ইনজেকসন দ্বারা যক্ষ্মার বীজাণুর বিরুদ্ধে শরীরে লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা

(Acquired Resistance) উৎপাদন করা যায়। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, বহিরাগত অনাহূত রোগ-উৎপাদক শক্তিশালী যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা যদি শরীরে যক্ষ্মা প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক ক্ষমতার উৎপত্তি হয়, তবে আর বি সি জি ইনজেকশনের প্রয়োজন কি? সত্যই প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে আছে কিনা, তার প্রমাণ টিউবারকুলিন পরীক্ষা করলেই পাওয়া যায়। এই টিউবারকুলিন পসিটিভ্ ব্যক্তিদের বি সি জি ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই; কারণ তা'তে কুফল হ'তে পারে। সেইজন্য বি সি জি ইনজেকশন দেওয়া হয় তাদেরই যারা টিউবারকুলিন নেগেটিভ; অর্থাৎ যাদের শরীরে যক্ষ্মা বীজাণু প্রবেশ করেনি। সদ্যোজাত শিশু, অল্পবয়স্ক কিশোর কিশোরী, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত টিউবারকুলিন নেগেটিভ হয় এবং তাদেরই বি সি জি ইনজেকশন দেওয়া হয়। খুব কমসংখ্যক পূর্ণবয়স্কের মধ্যে আমাদের দেশে টিউবারকুলিন নেগেটিভ মেলে—তাদের দেওয়া যায়। বি সি জি ইনজেকশন কোনওরূপ ক্ষতিকর নয়। বি সি জি সম্বন্ধে অনেকে লেখককে প্রায়ই প্রশ্ন করেন যে, ভবিষ্যতে যক্ষ্মা নিবারণের জন্য নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের বি সি জি টিকা দেবেন কিনা? আমাদের দেশে যক্ষ্মার এত আধিক্য যে, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা টিউবারকুলিন নেগেটিভ প্রমাণিত হবে, তাদের সকলকেই বি সি জি টিকা দেওয়া উচিত। টিকা নেবার ২।৩ মাস পর আবার টিউবারকুলিন পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে, টিউবারকুলিন পসিটিভ হয়েছে কিনা। পসিটিভ হ'লে বুঝতে হবে, টিকা নেবার পর শরীরে লব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে। বি সি জি সর্বদাই রক্ষক, কখনও ভক্ষক হয় না। বি সি জি কখনও ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করেছে এখনও অবধি তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বি সি জি একপ্রকার যক্ষ্মা বীজাণু। গো-যক্ষ্মা হ'তে দুজন ফরাসী চিকিৎসক, ডাঃ ক্যালমেট (Dr. Calmette) ও ডাঃ গেরাঁ (Dr. Geurin) ১৯০৮ সালে বীজাণু সংগ্রহ করে ১৩ বৎসর ধরে অনেক প্রক্রিয়ার দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেবরেটরীতে বীজাণু উৎপাদন (Culture) ক'রে তাদের রোগ উৎপাদনী শক্তি নিষ্ক্রিয় করতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐ বীজাণুগুলির বংশধরদের রোগ-নিবারণী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এজন্য বি সি জি ইনজেকশন নিলে শরীরে রোগ-নিবারণী ক্ষমতা উৎপন্ন হয় অথচ যক্ষ্মারোগ হয় না। বি সি জি টিকা দেওয়ার পর সাধারণত ৫।৭ বৎসর কি আরও অধিককাল রোগ-নিবারণী শক্তি শরীরে থাকে। লেখক ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে ১৯৫০ সালে কয়েক মাস অতিবাহিত ক'রে বি সি জি অভিযানের ফলে কিরূপে সেই সকল দেশ থেকে যক্ষ্মারোগ প্রায় দূরীভূত হয়েছে, তা দেখে এসেছেন। সে সব দেশের যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা এত কম যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই হাসপাতালের অনেক শয্যা রোগীশূন্য হয়ে আছে। অথচ আমাদের দেশে শতকরা মাত্র একটি যক্ষ্মা-রোগীর জন্যও শয্যা হাসপাতালে নাই।

প্যারিসের বিখ্যাত পাস্তুর ইন্স্টিটিউটে (যেখানে বি সি জি আবিষ্কৃত হয়) অশীতিপর বৃদ্ধ ডাঃ গেরাঁর সঙ্গে লেখকের ভারতে বি সি জি টিকা প্রচলনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। লেখক বি সি জি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছেন তা'তে ভারত সরকারের বি সি জি অভিযান সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। নরওয়েতে বি সি জি টিকা বাধ্যতামূলক। ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি ইউরোপের সকল দেশেই বি সি জি টিকা লক্ষ লক্ষ ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতে দশ লক্ষের বেশী বি সি জি টিকা গত ৩।৪ বৎসরে দেওয়া হয়েছে। লেখকের পুত্রকন্যারা ১৯৪৯ সালেই বি সি জি টিকা নিয়েছে।

অবশ্য বি সি জি দিয়েই নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। যক্ষ্মারোগ নিবারণের অন্যান্য উপায় হল—(১) শিশু ও অল্পবয়স্কদের যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে না রাখা, (২) যক্ষ্মারোগীর নিজে সাবধান হওয়া যাতে অপর কেহ সংক্রামিত না হয়, যেমন কাশির সময় সর্বদা মুখে রুমাল চাপা দেওয়া এবং কফ সর্বদা পিকদানিতে ফেলা এবং পরে পিকদানির কফ বীজাণুনাশক ঔষধ এবং উত্তাপের দ্বারা ধ্বংস করা। সুস্থ ব্যক্তির পুষ্টিকর খাদ্য আহার যেমন, ডাল, ভাত, রুটির সঙ্গে সাধ্যমত দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ফল, শাকসবজি পরিমিত ব্যবহার। মুক্ত বায়ু সেবন, এক বিছানায় একজনের বেশী না শোয়া, কারো উচ্ছিষ্ট না খাওয়া। পরিমিত পরিশ্রম ও বিশ্রাম করা ও মাদকদ্রব্য বর্জন করা। যে গৃহস্থ খাদ্যের দিকে নজর রাখেন, তাঁর গৃহে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা কম। লেখক অনেক স্থলে দেখেছেন যে, যে অর্থ পুষ্টিকর খাদ্যে ব্যয় করা উচিত তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যয় বা সঞ্চয় করা হয়।

যক্ষ্মা সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা

(ক) সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা যে, সমুদ্রতটে বা পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু সেবন না করলে যক্ষ্মারোগের উপশম হয় না। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে যখন যক্ষ্মারোগের বিশেষ কোনও চিকিৎসা ছিল না, তখন ভারতে ছিল মাত্র পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত অতিব্যয়সাধ্য কয়েকটি যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়ম। সেখানে মুক্তবায়ু সেবন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে যক্ষ্মা নিরাময়ের সাহায্য করা হ'ত। তখন এবং এখনও অতিধনীরা সুইজারল্যান্ডে আত্মীয়স্বজনকে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য পাঠান। লেখক সুইজারল্যান্ডের যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় লেস্যাঁ (Leysin) ও ডাভসে (Davos) কয়েকজন ভারতীয় রোগী ও রোগিনীকে অযথা ভারতীয় অর্থ ব্যয় করতে দেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। পাশ্চাত্ত্য দেশে কখনও কখনও ধনী রোগীকে চিকিৎসার জন্য আজকাল পাঠান হয় কেবল অতিআধুনিক অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজনে। সুইজারল্যান্ডে সেইজন্যে অবশ্য যাওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে, যদিও ইউরোপের অন্য প্রায় সকল দেশেই অনেক কম ব্যয়ে এমন কি ভারতেও সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য আজকাল পাহাড়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ "কোলাপ্স" চিকিৎসার (এ পি ও পি পি ইত্যাদি দ্বারা বাতাস দিয়ে ফুস্‌ফুসকে সংকুচিত রাখা) ভারতে প্রবর্তন হওয়ায় এবং তারপর অস্ত্রচিকিৎসা —থোরাকোপ্লাস্টি ইত্যাদির প্রবর্তনের পর এবং গত ৫।৭ বৎসরে আধুনিক শক্তিশালী যক্ষ্মানিরাময়কারী ঔষধ—স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পি এ এস (কিংবা পি এ সি) এবং আইসোনিয়জিড্ বা এইচ এন এচ ইত্যাদির আবিষ্কারের পর যক্ষ্মা চিকিৎসার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত এই সকল ঔষধ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ব্যবহারের পর বহু রোগীকে অতি আধুনিক উপায়ে অস্ত্রচিকিৎসা করে সম্পূর্ণ নীরোগ করা সম্ভব। আজকাল একটি ফুস্‌ফুস যদি যক্ষ্মারোগে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে সেই ফুস্‌ফুসকে অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে মাত্র একটি ফুস্‌ফুস নিয়ে বহু রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন এবং কাজকর্ম করছেন। রোগীকে সেরে গিয়ে পুনরায় কার্যক্ষম হতে হবে,

এই জন্যে বিশেষজ্ঞেরা আজকাল বলেন যে, রোগী যদি নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে, তবে শীঘ্রই সে কর্মক্ষম হ'তে পারে। পাহাড়ে গিয়ে যক্ষ্মা সারালে অনেক সময় বাক্সের আঙুর ফলের মত অবশিষ্ট জীবন যাপন করতে হয়।

(খ) অনেকের ধারণা, যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক রোগ—সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যক্ষ্মা-জর্জরিত মৃতপ্রায় মাতার গর্ভজাত শিশু সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে গত ৭ বৎসরে বহু গর্ভবতী রোগিনী সন্তান প্রসব করেছেন। জন্মাবার পরই রোগিনীর আত্মীয়রা সদ্যোজাতকে গৃহে নিয়ে গিয়ে পালন করে সুস্থ সবল শিশুতে পরিণত করেছেন। অবশ্য যত্ন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা চাই প্রথম কয়েক মাস।

হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগিণী মাতার পার্শ্বে যদি শিশুকে রাখা হ'ত তবে নিশ্চয় টি বি মেনিনজাইটিসে শিশুর মৃত্যু হ'ত। এরূপ প্রায়ই হয়ে থাকে সাধারণ গৃহে। মাতার কাশির সঙ্গে কোটি কোটি বীজাণু নির্গত হয়ে ক্ষুদ্র শিশুকে জর্জরিত ক'রে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। যক্ষ্মাগ্রস্ত মাতাপিতা যদি সাবধান না হন তবে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অন্যান্য সন্তানদের এবং নিকট আত্মীয় রোগী গৃহস্থ অন্যান্য শিশুদের যক্ষ্মা বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত করেন। অনেক সময় শিশুদের রোগ তখনই প্রকাশ পায় না; কয়েক বৎসর পরে বিশেষত কৈশোরের শেষে বা যৌবনে নানা কারণে এ সুপ্ত রোগ জেগে ওঠে। যক্ষ্মারোগী মাতাপিতার সন্তানদের যক্ষ্মা হয় সংক্রমণের জন্য, কিন্তু সাধারণের ধারণা—বংশানুক্রমিকতার জন্য।

(গ) অনেকেরই ধারণা আছে, যে গৃহে যক্ষ্মারোগী বাস করেছে চিরকালের জন্য তা সুস্থ ব্যক্তির বাসের অযোগ্য। তা মোটেই নয়। সাবধানী রোগীর থেকে ৪।৫ হাত দূরে একই ঘরে অন্য বিছানায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি শুলে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সম্ভব হ'লে রোগীর ঘরে অন্য কারও শোয়া উচিত নয়, বিশেষত কিশোর কিশোরী ও শিশুদের। যে ঘরে কোনও যক্ষ্মারোগী বাস করেছিলেন, যদি ৭।৮ দিন ঐ ঘরের দরজা জানালা খুলে রেখে দেওয়া হয় এবং ঘরের মেঝে ও ৩।৪ হাত অবধি দেওয়াল কয়েকবার উত্তমরূপে ফেনাইল দিয়ে ধুয়ে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ঘরের দেওয়াল কড়িকাঠ অবধি চুণকাম ক'রে নেওয়া হয়, তা'হলে সে ঘরে সুস্থ ব্যক্তির বা শিশুর বাস করাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, রোগীর পরিত্যক্ত বিছানা বালিশ ইত্যাদি কখনই ব্যবহার করবেন না—ঐগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা একান্ত কর্তব্য। আসবাবপত্র ফেনাইল জলে ধুয়ে ৭।৮ দিন রৌদ্রে রেখে ব্যবহার করা চলে। যে বাড়িতে যক্ষ্মারোগী ছিল নির্ভয়ে সে বাড়ি ভাড়া নিতে পারেন, তবে সে গৃহের ঘরগুলি উপরোক্ত উপায়ে সংশোধিত করে নেবেন।
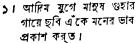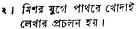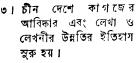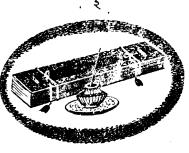
অসত্য শহর

দীপক চৌধুরী

*"Teeming city, city full of dreams,
Where the spectre in full daylight
hooks the passer-by".*
—BAUDELAIRE

সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের একটা ম্যানশনের দুতলার ফ্ল্যাটে কুমারী সুচিত্রা সেন পায়চারি করছিলেন। ঘরখানার আয়তন একশ ষাট বর্গ ফুট। রাস্তার দিকে একটা জানালা আর ওপাশের বাড়ির দিকেও একটা জানালা আছে। ওপাশের বাড়িতে কোটিপতি মধুবাবু রাত দুটোর পর বাতি নিভিয়ে দিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেনের ঘরের দিকে চেয়ে থাকেন ব'লে ওদিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে হয়। তাতে এদিকের বাতাস ওদিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারেনা। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য-সৌধ হরপ্পার মতো প্রাচীন ও পতনশীল হয়ে' উঠছে। টেবিলের উপরে অনেকগুলো বই এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। নানান বিজ্ঞানের মোটা মোটা ইংরেজী বই। কুমারী সুচিত্রা সেন কলকাতার এক মেয়ে-ইস্কুলের ভূগোলের টিচার।

রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর কোনদিনই ঘুম আসে না। আজও আসে নি। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন, হাত দিয়ে অ্যাসপিরিনের শিশিটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। দু ঘণ্টা ঘুমের জন্য প্রতিদিন তাঁকে চার আনা ক'রে খরচ করতে হয়। কেবল তাই নয়। ভোরবেলা বিছানায় শুয়েই তিনি বড় চামচের দু'চামচ ফ্রুট সল্ট খেয়ে ফেলেন, মোক্ষদা গরম জলের গেলাশ নিয়ে মশারির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাত খাওয়ার আগে এক দাগ লিভার মিক্সচার খেয়ে উঠেই দুটো হজমি বড়ি তাঁর গিলে ফেলতে হয়। ভূগোল পড়াতেপড়াতে একগাদা ছাত্রীর সামনেই তিনি কাশতে আরম্ভ করেন। তারপর তিনি একটা চ্যাপ্টা কৌটা থেকে প্যাস্টিল বার ক'রে কণ্ঠনলীর আশেপাশে জিভ দিয়ে প্যাসটিল-নিঃসৃত রস লাগাতে থাকেন।

বিকেলের দিকে তাঁর বোধহয় একটু একটু জ্বরও হয়। সেই জন্য সপ্তাহে দুবার করে ইনজেকশন নিতে হয়। তারপর কলকাতায় এপিডেমিক তো লেগেই আছে। আগে এপিডেমিকের একটা সিজিন ছিল; আজকাল যখন তখন কলেরা বসন্ত হচ্ছে। এর উপর বিহার থেকে আমরা মানভূম, সিংভূম পেলুম না, পেলুম গুটিকয়েক প্লেগ-বাহী ইঁদুর। অতএব কলেরা বসন্তের প্রতিষেধকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্লেগের ইন্‌জেকশনও নিতে হয়।

কুমারী সুচিত্রা সেনের গোটা অস্তিত্বটাই বৈজ্ঞানিক সতর্কতার কাঁটাতার দিয়ে সুরক্ষিত। মিনিট গুনে গুনে তিনি ঘণ্টা কাটান, ঘণ্টা গুনে দিন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, অনেক রকমের প্রশ্ন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সামান্য সর্দিকাশির গোড়া মারতে পারল না, অথচ আণবিক বোমার বাহাদুরী দেখাচ্ছে বিকিনী দ্বীপের উপর! আণবিক বোমার পরীক্ষাটা কলেরা, বসন্ত কিংবা ক্যান্‌সারের উপর করলেই তো হ'তো? কুমারী সুচিত্রা সেন নিজের মনেই প্রশ্নটা করলেন, আর সেই সময় চেয়ে রইলেন দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রের দিকে। শীর্ণ এবং রক্তশূন্য লম্বা আঙুলটা দিয়ে তিনি মানচিত্রের উপরেই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম ক'রে সাগর ও মহাসাগর পার হ'তে লাগলেন। ভূগোলের শিক্ষয়িত্রী তিনি, বিকিনী দ্বীপের সঠিক অবস্থান না জানলে তাঁর জ্ঞানের অভাব ধরা পড়বে।

টুং ক'রে সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে রিক্সা চলার আওয়াজ হ'লো। কুমারী সুচিত্রা সেন প্রতিদিনই রাত দুটোর সময় রিক্সা চলার আওয়াজ পান। আওয়াজটা তাঁর মধ্যরাত্রির সঙ্গী। আওয়াজটা না শুনলে তিনি যেন হাঁপিয়ে ওঠেন, তাঁর মধ্যরাত্রির সঙ্গ-বিরহিত জীবন অসহ্য মনে হয়। আজও শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে এলেন জানালার কাছে।

রিক্সাওয়ালাও রাত জাগছে। কুমারী সুচিত্রা সেন আর একা নন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাওয়ালাও জেগে আছে। বৈজ্ঞানিক

মানুষের কাছে রাত আর দিনের মধ্যে কোন তফাৎই নেই—এমন কি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ঘুমের প্রয়োজন তাও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তিনি দেখলেন রিক্সাওয়ালা একটা গামছা কোমরে জড়াচ্ছে। কোমরটা ওর এতো সরু যে, হাওড়া হাটের চোদ্দ পয়সার গামছা দিয়ে ওরকম দু'টো কোমরই জড়িয়ে ফেলা যায়। রিক্সাওয়ালা দেহে তাগদ রাখে। মানচিত্র-দেখা চোখ দিয়ে তিনি রিক্সাওয়ালার গোটা জীবনটাই যেন দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক ভদ্রলোক রোজই আসেন রাত দু'টোর সময়। রিক্সাওয়ালার শেষ সওয়ারী। আসেন তিনি হাজরা লেনের দিক থেকে। মোড়ে এসে একটু বিশ্রাম করেন তিনি। তারপর রিক্সায় চেপে একটা বিড়ি ধরিয়ে আদেশ দেন, "চলো।" মাতাল? কুমারী সুচিত্রা সেন জানেন মাতাল কখনও সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। তার পা কাঁপবেই। কিন্তু ভদ্রলোকটির পা কখনও কাঁপে না। ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পর, তাঁর নিদ্রাহীনতার মানসিক কষ্ট হ্রাস পায়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটিও যেন রাত জাগছেন, এই কথা ভেবে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন টেবিলের কাছে।

ডানদিকের দেওয়ালে একটা তাক আছে। তাতে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সব সাজানো থাকে। সরষের তেল, কিছু মশলা, ডাল এবং ছোটখাট আরও ক'টা জিনিস তিনি টিনে ভর্তি ক'রে সাজিয়ে রেখেছেন। মাইনে পেয়ে প্রতি মাসে তাঁর ডাল-মশলা কিনতে হয় না। আড়াই সের ডাল কিনলে তিন মাস তাঁর খেয়ে এবং না-খেয়ে বেশ চলে যায়। কুমারী সুচিত্রা সেনের মুখে স্বাদের কোন বালাই নেই। পেটে নেই ক্ষিধের জ্বালা। ট্যাবলেট আর ইন্‌জেকশনের জোরে তিনি কোনরকমে
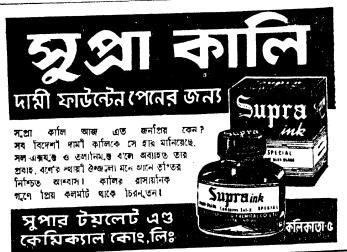
ইস্কুলে ভূগোল পড়িয়ে সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে ফিরে আসেন। খাওয়ার বর্বরতা কেবল মোক্ষদারই আছে। সেই জন্যই সে নিজের ইচ্ছে মতো রান্না করে, পেট ভরে ভাত খায়, রাত্রিবেলা টানা আট ঘণ্টা ঘুমোয়।

মোক্ষদার উপর তাঁর মাঝে মাঝে রাগ হয়। কেবল মোক্ষদার উপর নয়, যারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটায় তাদের প্রত্যেকের উপর। সভ্য মানুষের সামনে কতো সমস্যা, কতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, কতো মীমাংসার কাজ রয়েছে। আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে নষ্ট করলে এদের বর্বরতা ঘুচবে কি করে? প্রাগৈতিহাসিক মোক্ষদারা কেমন ক'রে যে ঘুমের অন্ধকারে আছে, ভেবে তিনি খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন! যে-যুগে ঐশী প্রত্যাদেশের অকর্মণ্য ভাবপ্রবণতা ছিল, সে-যুগের চব্বিশ ঘণ্টার দীর্ঘতা আজকে চব্বিশ মিনিটের বেশী নয়।

সময়ের হিসেবটা ঠিক হওয়ার পর এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল ঘি-এর টিনের উপর। ভেজিটেবল ঘি। খাঁটি ও অকৃত্রিম গব্য ঘৃতের কথা ভাবতে গেলে যেন বেদ-বেদান্তের যুগেই ফিরে যেতে হয়! শোনা যায়, প্রাচীন ভারতে খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যেত বলেই সবল ও অকর্মণ্য আর্যরা উৎফুল্ল মনে বেদবেদান্ত পড়তেও পারত। কুমারী সুচিত্রা সেনের মুখ দিয়ে হঠাৎ একটা ঢেঁকুর উঠে এল। হজম না হওয়ার ঢেঁকুর। কুমারী সুচিত্রা সেনের পাকস্থলীতে 'বনস্পতি'র বিপ্লব চলেছে। ধনপতিদের ভেজিটেবল ঘিয়ের কারখানা আছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপকরণ ভেজিটেবল্ ঘি। কলে প্রস্তুত, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় না। ভূগোলের শিক্ষয়িত্রীর মুখে রাত দুটোর সময়েও হাসি এল। ধনপতিদের শোষণ-লিপ্সায় নতুন ক'রে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচিত হচ্ছে!

রিক্সাওয়ালা চলে যাওয়ার পর তিনি চারটে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে এলেই ঘুম আসবে। এবার তিনি ওপাশের জানালাটা খুলে দিলেন। কোটিপতি মধুবাবু সারারাত ধরে চেষ্টা করলেও ও'কে আর দেখতে পাবেন না। পাকস্থলী পচে গেলেও কুমারীত্ব তাঁর বাঁচিয়ে চলতেই হবে। যে-দীর্ঘ সময় তাঁর জীবন থেকে খসে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। যে-টুকু সময়ের মূলধন তাঁর হাতে আছে, তা থেকে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ভাগবখরা দিয়ে খরচ করা চলবে না। সময় বড় সংক্ষিপ্ত। তা ছাড়া মানুষ তাঁর কাছে আসবেই বা কেন? তাঁর বিদগ্ধ জীবনের চারপাশে কেবল বিজ্ঞানের তিক্ততা আছে, ভালবাসার মধু নেই। অতএব প্রকোষ্ঠ তাঁর নির্মক্ষিক।

কুমারী সুচিত্রা সেনের একটা অতীত ছিল। আধুনিক মানুষদের অতীতের মতো তা স্মরণযোগ্য নয়। এযাবৎকাল যাঁরা বর্তমানকে অতীতের একটা বর্ধিত অংশ ব'লে মনে ক'রে এসেছেন, তাঁরা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল নন। প্রাগৈতিহাসিক মোক্ষদার ন্যূনতম অংশও পাওয়া যাবে না কুমারী সুচিত্রা সেনের মধ্যে। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্তমানের মতো অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিচ্ছিন্ন হ'লেও তাঁর পিতা পিতামহের নাম ঠিকানা একটা ছিল। বিশ বছর আগে বিধবা মার মৃত্যুর পর কুমারী সুচিত্রা সেন চলে আসেন কলকাতায়। অতীতের অংশটাকে কেটে রেখে এলেন সেনহাটি গ্রামে। কোন্ এক মামা না পিসেমশাইর কলকাতার বাড়িতে থালাবাসন মেজে তিনি
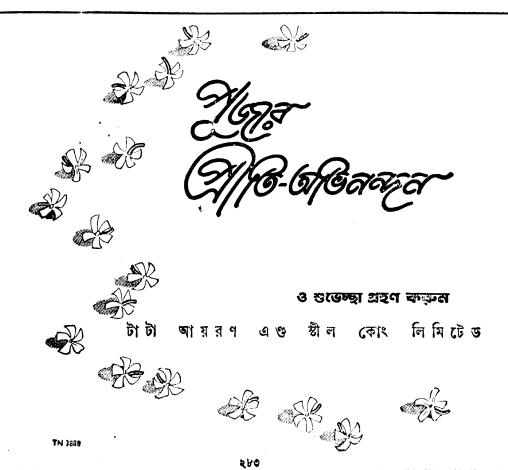
নিজস্ব সম্পদ
MBS
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭সি, ১৬৭সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে ফোন: ৩৪-১৭৬১ গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯১বি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা ফোন- পিকে: ৪৪১১

বি-এ পাশ করলেন। বি-এ পাশ করবার পর চাকরি পেলেন একটা মেয়ে-ইস্কুলে। পঞ্চাশ টাকা থেকে মাইনে বাড়তে বাড়তে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়াল একশ প'চাত্তর টাকা। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের এক ঘরের ফ্ল্যাটে তিনি উঠে এসেছেন এগারো বছর আগেই। মামা বা পিসেমশাইর বাড়ির অতীত তিনি সযত্নে তাঁদের কাছেই ফেলে এলেন, কেবল বর্তমানকে তাঁর বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়ার জন্য। সাহায্য যা তিনি পেয়েছিলেন তার বিনিময়ে তিনি দিয়ে এসেছেন তাঁর বাসনমাজার অনাদায়ী পারিশ্রমিক। অর্থ-শাস্ত্রের আদানপ্রদানের নিয়মানুসারে কেউ কোন দিক থেকে এক পয়সাও ঠকলেন না।

আজ যেন তাঁর মনে হ'লো, নির্মক্ষিক প্রকোষ্ঠে দু-এক ফোঁটা মধুর সন্ধান থাকলে মন্দ হ'তো না। মধু? মানে, ভালোবাসার মধু। ঠিকানাহীন লক্ষ লক্ষ আধুনিক মানুষের মতো তিনিও যেন ফ্ল্যাট বাড়িতে আত্মগোপন ক'রে আছেন—ইটসুরকির মধ্যে তিনি বোধ হয় আশ্রয় পান নি। ইটসুরকির মধ্যে আর যাই থাক, মধু নিশ্চয়ই নেই। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা, তিনি চেয়েছিলেন মাইনে। দুটোই তিনি পেয়েছেন। গত এগারো বছর থেকে তিনি মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন, সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের ঘরে, যার আয়তন একশ ষাট বর্গ ফুট। এধারে ফাঁকা রাস্তা, ওধারে মধুবাবুর ঘর। এরই মাঝখানে তিনি পায়চারি করেন। স্বয়ং-সম্পূর্ণ বর্তমানের গর্ব তাঁর অনেক। গর্ব তাঁর নিজের কুমারীত্বের কঠিন তপস্যায়, গর্ব তাঁর চারিত্রিক পরিশুদ্ধতায়। তিনি জিতেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে জিতলেন? প্রতিপক্ষ কে?

ইস্কুলের কমনরুমে বসে কুমারী সুচিত্রা সেন নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন দুটো উত্থাপন করলেন। সামনের চেয়ারে বসে অঙ্কের টিচার সুকুমারী দত্ত তাঁর বাচ্চা ছেলের জন্য উলের জামা বুনছিলেন। কুমারী সুচিত্রা সেন মনে মনে বিরক্তবোধ করতে লাগলেন। ইস্কুলটা তো জামা বুনবার জায়গা নয়? সুকুমারী দত্ত কি জানেন না, এসব জামা-কাপড়ের জন্য আলাদা দোকান আছে, বুনবার জন্য আছে আলাদা লোক? একটু পর এলেন ইংরেজীর শিক্ষয়িত্রী মিস মীরা গুপ্ত। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, "আবার একটা স্ক্যাণ্ডেল হলো! আমাদের সিনিয়র টিচার মিস ঘোষ বিয়ে করতে যাচ্ছেন।"

উলের জামা বুনতে বুনতে সুকুমারী দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "তাতে তোমার এতো আপত্তি কেন মীরা?"

"মিস ঘোষ তো আর জীববিদ্যা চিবিয়ে
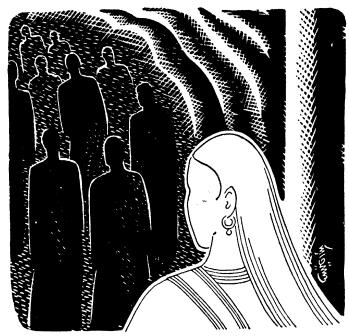
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ...অশান্ত মানুষের ছায়ার মিছিল

খেয়ে ফেলতে পারেন না? ষাট বছর বয়সে তিনি কি প্রমাণ করতে যাচ্ছেন?"

"কেবল কোন কিছু প্রমাণ করবার জন্যই কি আমরা বেঁচে আছি? মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার আত্মীয়তা সব বন্ধ ক'রে দেবে নাকি মীরা?"

প্রায় দুমণ ওজনের মেদমজ্জার স্তূপ নিয়ে মিস মীরা গুপ্ত ধপাস করে বসে পড়লেন একটা কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে। তারপর তিনি বললেন, "মিস ঘোষের শরীরে আত্মা আছে বলে আমি জানতুম না। থাকার মধ্যে আছে তো বাত। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কেবল বাতের ব্যথা—আর—"

বাধা দিয়ে সুকুমারী দত্ত বললেন, "বিয়ের পর ব্যথা-বেদনা সব সেরে যাবে।"

মিস গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "কেন? আপনি কোন ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন নাকি?"

"পেয়েছি। তোমরা নামটা সবাই লিখে নাও।" কুমারী সুচিত্রা সেনের বাতের ব্যথা নেই বটে, তবুও তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বোধ হয় কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় সুকুমারী দত্ত বললেন, "ভালবাসার ওষুধ ছাড়া এ যুগের মানুষ ব্যাধিমুক্ত হ'তে পারবে না মীরা। যন্ত্রগুলোও চলে, তাদেরও মাঝে মাঝে তেল-গ্রীজ চাই।"

কুমারী সুচিত্রা সেন ব্যাগ থেকে দুটো ভাইটামিন ট্যাবলেট নিয়ে খেয়ে ফেললেন। ইস্কুল ছুটির সময় হয়েছে। ট্যাবলেট দুটো না খেয়ে তিনি কলকাতার ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে পারেন না।

মিস মীরা গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার সর্বরোগনাশক ওষুধটি বোধ হয় স্বপ্নে পাওয়া? দিন না তবে সুচিত্রার পচা পাকস্থলী আর ফুসফুসের ব্যাধি সারিয়ে?"

"সারবে বৈ-কি, নিশ্চয়ই সারবে। একবার চেষ্টা করতে অসুবিধে কি?"

"অসুবিধে আছে বৈ-কি মিসেস দত্ত। জীববিদ্যার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আমরা মূর্খতার সংস্কার দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি না। মিলন হবে প্রজাতির সঙ্গে প্রজাতির, মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র।"

"মীরা, মানুষ যদি মানুষকে ভাল-বাসতে না পারল, তবে তোমার জীববিদ্যার গোটা বিজ্ঞানটাই একদিন বনে-জঙ্গলে পরিত্যক্ত হবে।"

একটু থেমে সুকুমারী দত্ত পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাও কি বিজ্ঞানের সাহায্যে পাওয়া যায়?"

"যায়। ইনজেকশন নিতে হবে। ইন-জেকশনের জোরে আমরা পান্তাবুড়ীকেও আজ যুবতী করতে পারি।"

"কিন্তু তুমি তো তোমার বয়স কমাতে পারছ না মীরা? পান্তাবুড়ীর সঙ্গে তোমার দেখছি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।" একটু হেসে সুকুমারী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ি গিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হবে,
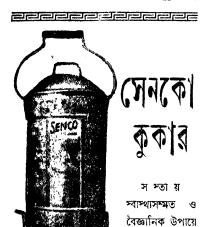
স্বামী হয়তো এতক্ষণে অফিস থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁরও জলখাবার চাই। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না।

আজ ক'দিন থেকে কুমারী সুচিত্রা সেন ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পায়চারি ক'রে চলেছেন। তিনি বিয়ের কথাই ভাবছিলেন। বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর সমাজের কথা মনে পড়ল। সমাজ? তিনি জানেন কলকাতায় কতোগুলো রোড, স্ট্রীট আর লেন আছে, সমাজ নেই। তিনি স্মরণ করলেন সেনহাটির কথা। সেনহাটিতেও সমাজ বোধ হয় একটা ছিল। কেবল সমাজ হ'লেই চলবে না, তাঁর নিজের একটা পাকা ঠিকানা চাই। ঠিকানার আগে চাই পিতৃ-পরিচয়। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তিনি জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। স্বর্গীয় পিতার নাম তাঁর মনে পড়েছে! গত বিশ বছরের ভগ্নস্তূপ থেকে তিনি একটা পরিচয় উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন। কিন্তু ঠিকানা? সেন-হাটিতে তাঁর কিছু নেই। কোন আত্মীয়-স্বজনের নাম তাঁর মনে পড়ল না। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, বিয়ে তো হবে তিন তলার ছাদে, তবে তাঁর সেনহাটিতে ঠিকানা খুঁজে লাভ কি? তিনি পায়চারি করতে লাগলেন, আর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। আজ আর তাঁর জীববিদ্যার কথা মনে পড়ল না। হাই-ইস্কুলও ক্রমশ আবছা হয়ে আসতে লাগল। কেবল মনে পড়তে লাগল সুকুমারী দত্তের হাতে সেই উলের জামাটা। শীত প্রায় এসে গেল, উলের জামাটা তাঁর আজও শেষ হয়নি। বাচ্চাটা নিশ্চয়ই মেজেতে হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। কে জানে হয়তো মিসেস দত্তের অসাবধানতার জন্য বাচ্চার ঠান্ডা লাগতে পারে।

হঠাৎ তিনি চাইলেন রাস্তার দিকে। রাত দুটো বেজে গেল, অথচ রিকসা-ওয়ালাটা আজ আর মোড়ে এসে অপেক্ষা করছে না তার শেষ সওয়ারীর জন্য। তিনি খুবই বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। কেবল বিস্ময় নয়, তাঁর সঙ্গিহীন জীবনের বেদনা বাড়তে লাগল প্রতি মুহূর্তে। তিনি একা! তিনি ভেঙে পড়ছেন। অ্যাসপিরিনের শিশিটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন যে, ভদ্রলোকটি চারদিকে চেয়ে চেয়ে রিকসাটাকে খুঁজছেন। আধুনিক মানুষের ঠিকানার যখন কোন স্থায়িত্বই নেই, তখন রিকসাওয়ালাই বা প্রতিদিন সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে অপেক্ষা করবে কেন? কুমারী সুচিত্রা সেন অ্যাসপিরিনের শিশিটা হাতে নিয়েই এসব আধুনিক কথাগুলো ভাবছিলেন। ভাবছিলেন বটে, কিন্তু চেয়ে ছিলেন ভদ্রলোকটির দিকেই। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ভদ্রলোকটি সরে এলেন জানলার দিকে। অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটল! কুমারী সুচিত্রা সেনের হাত থেকে শিশিটা পড়ে গেল সামনের রাস্তায়। আর পড়ল বোধ হয় ভদ্রলোকটির মাথায়! শিলং-এর পাহাড়ে দুর্ঘটনা যা ঘটেছিল, তা তো গাড়ির সঙ্গে গাড়ির, তাতে অমিত রায়ের রোমাণ্টিক বেলুনটা কেবল একটু নড়ে-চড়ে উঠেছিল, ফাটেনি। কিন্তু সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে ভদ্রলোকটির বোধ হয় আঘাতই লাগল। টিংচার আয়োডিনের একটা নতুন শিশি হাতে নিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেন তরতর ক'রে নেমে এলেন এক তলায়। একশ' ষাট বর্গফুটের সীমাবদ্ধতায় জীবনের স্পন্দন এল।

দু' সপ্তাহ পর কুমারী সুচিত্রা সেন এলেন ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস মিস দীপ্তি মিত্রের ঘরে। এক মাসের ছুটি চাই তাঁর।

"ছুটি? কেন?" জানতে চাইলেন মিস মিত্র।

"পরশুদিন আমার বিয়ে।"
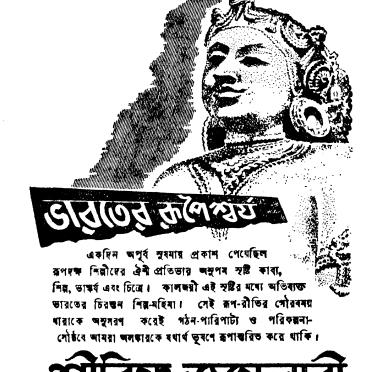
"বিয়ে? মানে, ঐ যে কি বলে—ইউ মীন, মেয়ে-পুরুষে মিলে ঐ যে কি সব বিয়ে-টিয়ে হয়, সেই রকম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পরশু রাত আটটায় লগ্ন। আপনি আসবেন কিন্তু।"

মিস দীপ্তি মিত্র খড়িমাটিমাখা ডাস্টার দিয়ে নিজের চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমারও একবার বিয়ের লগ্ন এসেছিল সুচিত্রা।"

"বিয়ে হয়নি বুঝি?"

"হয়েছিল। কিন্তু সাতদিন পর লোকটা পালিয়ে যায়।"

"কেন?"

"লোকটার নাকি আরও তিনটে বৌ ছিল। সুচিত্রা, তোমার মধ্যে শিক্ষা আছে, কৃষ্টি আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। অতএব পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস ক'রো না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেই মানুষ পুরুষ-মানুষ হয় না।"

"এখন আর উপায় নেই। বিয়ের চিঠি ছাপানো হ'য়ে গেছে।"

"বিয়ে তো ছাপাখানায় হয় না সুচিত্রা? বিয়ে হয় মনের সঙ্গে মনের, দেহের সঙ্গে দেহের। তোমার এই দু'টো জিনিসেরই অভাব। তা সত্ত্বেও এক মাসের ছুটি তোমায় আমি দিলুম। রাঁচি থেকে বেড়িয়ে এসো, হজমশক্তি বাড়বে। আমি প্রতি বছরই একবার করে যাই।"

বিয়ের চিঠি ক'খানা হাতে নিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেন হাঁটতে লাগলেন কমনরুমের দিকে। মানুষের জীবনে ত্রিশ বছরই শেষ বছর নয়। তবু আজ তাঁর কাছে ত্রিশ বছরের বোঝাটা যেন খুবই ভারী ব'লে মনে হ'লো। কেউ যেন তাঁকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিতে চায় না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর সব আয়োজন এ'রা ব্যর্থ ক'রে দিতে চান। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন না। সঙ্গী তাঁর চাই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিস মীরা গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "ভদ্রলোকটির পদবী কি? থাকেন কোথায়?"

"আমার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবুর। তাঁর পদবী কিংবা ঠিকানার সঙ্গে নয়। তিনি পুরুষমানুষ, সেইটে জানাই কি আমার কাছে যথেষ্ট নয় মিস গুপ্ত?"

"বোধ হয় নয়। বৈজ্ঞানিক মতে এক-বার পরীক্ষা করিয়ে নিয়ো।"

মিস গুপ্তের বিজ্ঞানপ্রীতির প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন জানিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেন বললেন, "লগ্ন আটটায়। ট্রামে চেপেই

আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবেন।"

বিয়ের দিন সন্ধ্যে সাতটার সময় কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবুর মনে পড়ল, রাত আটটায় তাঁর বিয়ের লগ্ন। সাত দিন পূর্বে তিনি বিয়ের বাবদ পাঁচশ' টাকা আগাম পেয়েছিলেন শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে। উপস্থিত পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন যে, পাঁচ শ' টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ টাকা অবশিষ্ট আছে। তিনি চললেন এক সস্তার গলিতে। ক্যানিং স্ট্রীটের দালাল-বন্ধু বটকেষ্ট পালকে খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নিলেই বিয়ের রাতটা পার ক'রে দিতে অসুবিধে হবে না। ধার ফেরত দেয়ার বন্দোবস্ত তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন।

বটকেষ্টকে খুঁজে বার করলেন তিনি। পঞ্চাশ টাকা ধার পাওয়ার পর তিনি বললেন, "দ্যাখ্ বটকেষ্ট, পাঁচ শ' টাকার লক্ষ্মী যখন এল, তখন পরিষ্কার দেখলুম। কিন্তু লক্ষ্মী যখন পালিয়ে গেল, তখন কিছুই দেখতে পেলুম না।"

চোখ রগড়ে বটকেষ্ট পাল বললেন, "গলির এমাথা থেকে সেমাথা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করলে কেউ দেখতে পায় না। লক্ষ্মী বড্ড পিছলে দেবতা। বুঝলি অম্বিকে?"

অম্বিকাবাবু বুঝলেন কিনা জানা গেল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন কলেজ স্কোয়ারের সামনে। দোকান থেকে জামা, ধুতি ও জুতো কিনলেন অম্বিকাবাবু। কিন্তু পরবেন কোথায়? ঢুকে পড়লেন কলেজ স্কোয়ারেই। তারপর ময়লা কাপড়গুলো রাখবার জন্য একটা নির্ভরযোগ্য ঠিকানাও পাওয়া গেল, স্টিম লণ্ড্রি। কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু বটকেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে চললেন বিয়ে করতে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানীর প্রথম শ্রেণীতে চেপে।

রাত আটটা বাজতে মাত্র পনরো মিনিট বাকী। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের তিন তলার ছাদে কলরব উঠল, "বর কি তবে আসবেন না?" না এলেই যেন মিস মীরা গুপ্তের ঈর্ষাকাতর মনে শান্তি ফিরে আসে। কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু মিস মীরা গুপ্তকে নিরাশ করে দিয়ে তিন তলায় উঠতে লাগলেন। পেছন থেকে বটকেষ্ট পাল জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে অম্বিকে, পা কাঁপছে না কি?"

"পা কাঁপছে না, বুক কাঁপছে। ফুসফুসের তো কিছুই নেই।"

"প্রেম করে বিয়ে করছিস, ফুসফুসের দরকার হবে না। ভয় নেই, এগিয়ে যা।"

অম্বিকাবাবু এগিয়ে গেলেন। তিন তলার একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে মুখটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন ছাদের দিকে। দেখতে পেয়েই মিস মীরা গুপ্ত কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বর এসেছে। উলু দাও, উলু দাও।"

সবাই কলরব করতে লাগলেন, উলু কেউ দিতে পারলেন না। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের

তিন তলার ছাদে কুমারী সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয়ে গেল রাত আট-টার লগ্নে।

পরের দিন কালরাত্রি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অম্বিকাবাবু বললেন, "বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।"

তিনি অবশ্য রাত্রে আর ফেরেননি, ফিরলেন পরের দিন ভোরবেলা।

আজ ও'দের ফুলশয্যা।

বেলা দশটার সময় অম্বিকাবাবু বললেন, "শ' খানেক টাকা দাও। দু চারটে শাড়ি-ব্লাউজ কিনতে হবে।"

সুচিত্রা দেবী নিঃশব্দে স্বামীর হাতে একটা একশ টাকার নোট তুলে দিলেন। অম্বিকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে শ' টাকার নোটখানা তুলে ধরলেন উপরের দিকে। তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে তিন চারবার টোকা মারলেন। নাকের কাছে নোটখানা ধরে অম্বিকাবাবু বললেন, "নতুন কাগজ তাই গন্ধ ছাড়ছে। এসব জিনিস ধরেও সুখ, শুঁকেও সুখ। কি বলো?"

সুচিত্রাদেবী কিছুই বললেন না। বলে কোন লাভও নেই। তিনি স্বামী চেয়েছিলেন, স্বামী পেয়েছেন। তার পায়ের কাছে জীবনটাকে এখন নিবেদন ক'রে দিতে পারলেই তিনি বে'চে যান। মোক্ষদার মতো আট ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেই তাঁর সমস্যার সমাধান হয়।

অম্বিকাবাবু অতঃপর একটা পরিচিত হিন্দী গানের প্রথম লাইনটা শিষ দিতে দিতে নেমে গেলেন এক তলায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি সুর করে বললেন, "তুমি লয়লা, আমি মজনু।" হেসে ফেললেন সুচিত্রাদেবী। 'নির্ভরতার হাসি। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হ'য়ে বন্দরে পৌঁছবার হাসি।

রাত আট-টা বাজল, অম্বিকাবাবু ফিরলেন না।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে লাগল ন'টা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা। তিনি এজানলায় ওজানলায় উঁকি দিতে লাগলেন। প্রথমে পাঁচ মিনিট পর পর শেষে এক মিনিট পর পর চলল তাঁর উঁকি দেয়া। অন্বেষণের গভীরতা বাড়তে লাগল তাঁর। সুচিত্রা দেবী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর তিনি পায়চারি করতে পারছেন না। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘরের দরজা খোলা রইল।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন সুচিত্রা দেবী ঃ সেনহাটির অতীতটাকে কোনরকমে উদ্ধার করা যায় কিনা। ফিরে যাওয়া যায় কি সেখানে? প্রতিবেশীকে ভালবাসবেন তিনি, ভালবাসবেন সেনহাটির আম-কাঁটালের বাগান, বকুল-কদম বাদ যাবে না কেউ। রায় বাবুদের দিঘির জলে তিনি সাঁতার কাটবেন। অনেক লম্বা দিঘি—কচুরিপানার অনেক বিষ রয়েছে তাতে। থাক না বিষ। বিষ দিয়ে তো বিষের ব্যথা ঘোচে! পাকস্থলীতে যে-বিষ জমেছে সেই বিষের বোঝা তিনি নামিয়ে দেবেন

রায় বাবুদের দিঘির জলে। সুচিত্রাদেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। অ্যাসপিরিনের ঘুম।

একটু পর তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে? কে?"

লাফিয়ে উঠলেন তিনি ফুলশয্যা ছেড়ে। জ্বালিয়ে দিলেন বাতি। একশ' ষাট বর্গ-ফুটের সীমাবদ্ধতা যেন আরও সংকুচিত হ'ল। তিনি বোধহয় দম আটকেই মারা যাবেন!

সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তিনি লজ্জা পেলেন। কেবল দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই তাঁর প্রথম লজ্জা। অসত্য শহরের নেশা যেন তাঁর কাটতে লাগল, মরফিয়ার নেশা।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। আমি বটকেষ্ট পাল।"

বিলম্বিত সুরে সুচিত্রা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই আপনার?"

"এখন বোধহয় আমি কেবল টাকাটাই ফেরত চাই। অম্বিকা আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিল।"

অসত্য শহরে তাঁর নারীত্ব-নিষ্ঠার বিনিময় মূল্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা! এবার সুচিন্তিত সত্যের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন সুচিত্রাদেবী। সত্যকে গ্রহণ করতে হলে তাঁর সরে যেতে হবে অন্য শহরে, যে-শহরে মরফিয়ামিশ্রিত সভ্যতা নেই। উপস্থিত তিনি কি করবেন?

অম্বিকাবাবুর ঋণ শোধ দেয়ার দায়িত্ব কি তাঁর? যদি শোধ না দেন? শোধ না দিলে বটকেষ্ট পালের হিসেবের খাতায় চিরদিন তিনি বন্ধকী বস্তুর মতো পড়ে থাকবেন অপরের অধিকার আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু লক্ষ, লক্ষ, কোটি, কোটি অম্বিকাবাবুদের গুপ্ত ঋণের বোঝা তিনি কি পারবেন শোধ দিতে? পারবেন না। তা হ'লে তাঁকে থাকতে হবে এই অসত্য শহরেই আত্মগোপন ক'রে। বটকেষ্ট পালদের দৃষ্টি তিনি এড়িয়ে চলতে পারবেন না। ওদের সামনে রেখেই তিনি গত বিশ বছর ধরে পান করেছেন জীবনের সহস্র লজ্জা, কুণ্ঠির বিষপাত্র থেকে।

ড্রয়ার থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে তিনি বটকেষ্ট পালকে দিয়ে দিলেন। একটা রূঢ় কথাও বললেন না তিনি। এমন কি অভিযোগ-বিক্ষত একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না সুচিত্রা দেবী। জনৈক বটকেষ্ট পালের ঋণ তিনি আজ শোধ করতে পারলেন। ক্রমে ক্রমে হয়তো অসংখ্যের ঋণও শোধ করবেন সুচিত্রা দেবী। তারপর বিশ্বাস ও ভালবাসার রাস্তা ধরে একদিন তিনি উপনীত হবেন সত্য শহরের সিংহ দরজায়। বটকেষ্ট পালরা তাঁকে পেছন থেকে প্রণাম জানাবে।

টাকা পাওয়ার পর আজো বটকেষ্ট পাল সুচিত্রা দেবীর পায়ের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে তিনি বল্লেন, "অন্য একদিন আসবেন, যখন আপনার সুবিধে হয়। আলাপ পরিচয় করব। আজকের মতো সেদিনও আমার দরজা খোলাই থাকবে। নমস্কার।"

জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কুমারী সুচিত্রা সেন। রাত দুটো বাজলো। চোখে তাঁর জল এল আজ। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি কলকাতার ইট সুরকির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছেন, সঙ্গিহীন জীবনের শূন্যতা ভরাট করতে চেয়েছেন সিমেণ্টের শক্ত মাটি দিয়ে! আজ তাঁর দু'ফোঁটা চোখের জলে সিমেণ্টের গাঁথুনি গেল ভেসে! ইচ্ছে হচ্ছিল, তুফানের উন্মত্ত আবেগ নিয়ে জীবনে একবারটি কেবল প্রাণখুলে কাঁদবেন তিনি। মরফিয়ামাতাল অবশ মানুষগুলোকে তিনি চোখের জলে ভাসিয়ে দেবেন আজ।

লজ্জা পেলেন কুমারী সুচিত্রা সেন। লজ্জা পেলেন এই ভেবে যে, এযুগের

সভ্য মানুষরা কাঁদতেও জানে না! ওরা জানে না, বড় সৃষ্টির উৎস রয়েছে বড় কান্নার বুকে। তিনি চোখ বুঁজলেন। হাত বাড়ালেন জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে—শীর্ণ ও রক্তশূন্য আঙুলগুলো যেন আলোর লোভে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের নীরব সমুদ্রে শুরু হ'লো ব্যথার আলোড়ন, বেদনার প্রলয়। সমুদ্র মন্থনের উম্বেল তরঙ্গমালা যেন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে! তবু তিনি চোখ বুজে রইলেন। দৃষ্টিপাত করলেন নিজের অন্তরের দিকে। দেখলেন তিনি ঃ সেখানে সেবকবৈদ্য স্ট্রীট উহ্য হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর ইস্কুল, হারিয়ে গেছেন কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু।

অসত্য শহরের সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন কুমারী সুচিত্রা সেন। সহসা তাঁর মনে হ'লো, সামনের দিক থেকে অম্বিকাবাবু আসছেন! কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু এ নয়। তাঁর স্বামী অম্বিকাবাবু আসছেন ভালবাসার মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে। কুমারী সুচিত্রা সেন সঙ্গী পেলেন।

মধুবাবু কিংবা বটকেষ্ট পালদের আর তিনি ভয় করবেন না। ওধারের জানলাটা খুলে দিলেন তিনি। খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন মধুবাবুর ছায়া। কোটিপতি মধুবাবু আজ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মধুবাবুর এ অস্থিরতা কিসের? কুমারী সুচিত্রা সেন দেখলেন, জগতের বুক জুড়ে চলেছে অশান্ত মানুষের ছায়ার মিছিল।

তাদের অস্থির পদচারণের মধ্যে লেখা রয়েছে অসত্য শহরের মরা ইতিহাস।

মনোবিশ্লেষণে রাশিবিজ্ঞানের দান

পূর্ণেন্দুকুমার বসু
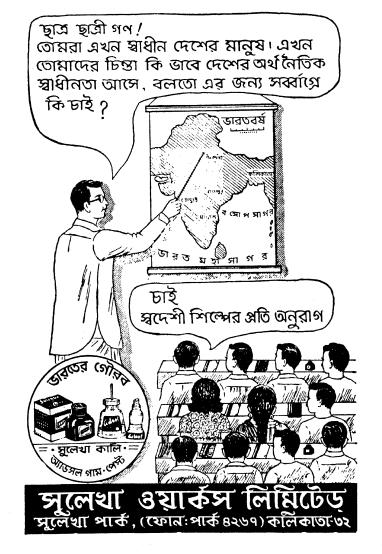
ভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাবতে আরম্ভ করলে মানুষে মানুষে যে ভেদ বিদ্যমান তার কারণ কি? পার্থক্য ত শুধু দেহে নয় মনেও। এই প্রশ্নের সমাধান মানুষ আজও সঠিক-ভাবে করতে পারেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মানুষের দেহের গঠনের তফাৎ কেন হয়, তার কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায়, তার নাম Genetics. এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো না। এই প্রবন্ধে মানুষের মানসিক ক্ষমতা-প্রকাশের তারতম্য কেন হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। মানসিক ক্ষমতার প্রকাশ বললেই বোধ হয় বিষয়টি তেমন পরিষ্কার হলো না। একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন। দুটি বালক সাধারণ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একই সঙ্গে পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর দেখা গেল, প্রথম বালকটি দ্বিতীয়টির অপেক্ষা অনেক ভাল করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষকের মন্তব্য সাধারণত হয়, প্রথম বালকটি দ্বিতীয় বালকটির অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। সেই দুটি বালকই একটি বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষায় (Vocational test) একই সঙ্গে পরীক্ষা দিল। এবার দেখা গেল, দ্বিতীয়টি এই পরীক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়েছে, এবারের ফল প্রথমবারের ঠিক বিপরীত। এই রকমভাবে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন মানুষের মানসিক ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকাশ-ধারা আমরা দেখতে পাই। অতএব কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে তাকে বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন বলা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। যদি কোন উক্তি করতেই হয় তা হলে কোন বিশেষ পরীক্ষা উল্লেখ করেই তা করা সমীচীন। মানুষের বুদ্ধির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কেন বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়? এর কি কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা অসম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে তার সঙ্গে যে কারণে দৈহিক গঠনের তারতম্য হয়, তার কি কোন যোগাযোগ আছে?

বহুদিন থেকেই মানুষের চেষ্টা চল্‌ছিল কেমন করে মানসিক ক্ষমতার একটা পরিমাপ পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আঠারো শতক পর্যন্ত যে সব চেষ্টা হয়েছিল, তার বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ঊনিশ শতকের প্রথমে গল্ এবং আরো দু'এক জন গবেষণা করে ঠিক করলেন যে, মানুষের কাজের প্রেরণা আসে মাথা থেকে, অতএব বুদ্ধির পরিমাপ এবং মাথার আকৃতির সঙ্গে বেশ একটা যোগাযোগ আছে। ভার্নন তাঁর বইয়ে লিখেছেনঃ—

"One of the most popular doctrines of the early nineteenth century was the phrenology of Gall and others which assumed that the strength of each faculty was indicated by the prominence of bumps on the appropriate parts of the skull." (1)

চার্লস স্পিয়ারম্যান

উপরোক্ত যুক্তি এমনই স্থূল যে, বেশী দিন এ ধারণা স্থায়ী হলো না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস গ্যাল্টন দেখাবার চেষ্টা করলেন, মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে আকৃতির কয়েকটি লক্ষণের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা। তিনি দেহের সেই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন, যার সঙ্গে মানুষের মানসিক ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু এই গবেষণার ফলও কিছুই কার্যকরী হয়নি। বিশ্ববিখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী কার্ল পিয়ারসন রাশি-তথ্যের সাহায্যে দেখালেন, মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে দেহের গঠনের কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি তাঁর গবেষণাগুলি ধারাবাহিক-ভাবে Biometrikaতে প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণাগুলি থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, মানসিক ক্ষমতা এবং দেহের গঠন প্রণালীর মধ্যে কোন সহগতি (correlation) নেই। যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, তার দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়। গবেষণার প্রথম স্তর এইখানেই শেষ হলো। সিদ্ধান্ত হলো দেহের গঠন প্রণালী হতে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ বা সেই সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে অন্যান্য গবেষকরা সন্ধান করতে লাগলেন যে, দৈহিক লক্ষণ থেকে বুদ্ধির পরিমাপ যদি সম্ভব না হয় মানসিক লক্ষণ থেকে তার পরিমাপ হওয়া সম্ভব কিনা। এই জন্য তাঁরা মানুষের শরীরে চিত্তের উত্তেজনাজনক বস্তু (stimulus) প্রয়োগ করলেন এবং সেই সঙ্গে মানসিক লক্ষণ (Reactions) লক্ষ্য করতে লাগলেন। মানসিক লক্ষণের বিভিন্ন প্রকাশ থেকে বুদ্ধির পরিমাপ করাও কিছুতেই সম্ভবপর হলো না। মনো-বিশ্লেষণের যে ইতিবৃত্ত দিলাম তা থেকে এটাই পরিষ্কার বোঝা গেল যে, এভাবে এগোলে আমাদের কাজের বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনোবিশ্লেষণের নতুন ধারা প্রবর্তিত হলো। এর পুরোভাগে রইলেন রাশিবিজ্ঞানীরা আর মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা।

সমস্ত বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, জীবজগতে বা পদার্থ জগতে যে অসংখ্য জিনিস ঘটে যাচ্ছে, তাকে সীমাবন্ধ ভাবের (concepts) সাহায্যে ব্যক্ত করা। বর্তমান ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে এগনো হয়েছে। মানুষের মনকে আমরা যা ভাবি তা নয়। তা এলোমেলোভাবে কাজ করে না, একটা ধারাবাহিক ভাবেই মন কাজ করে যায়। প্রত্যেক কাজ করার জন্য মানুষের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। একে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়েছে 'প্রাইমারী এবিলিটী'। মানুষের মনের গঠন হয়েছে এই বিচিত্র প্রাইমারী

এবিলিটীর সমাবেশে। এই ভাবকে রাশি-বিজ্ঞানী থার্স্টন (Thurston) অতি সুন্দর-ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:—

"We proceed on the assumption that mind is structured somehow, that mind is not a patternless mosaic of an infinite number of elements without functional groupings. In the interpretation of mind we assume that mental phenomena can be identified in terms of distinguishable functions which do not all participate equally in everything that mind does." (2)

ধরা হয়েছে যে এই প্রাইমারী এবিলিটীর উপরেই মানুষের কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে। এই কাজ কোন মানুষ ভালভাবে করতে পারে, কেউ পারে না। বর্তমান ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় যে, যে পেরেছে তার মধ্যে প্রাইমারী এবিলিটীগুলি রয়েছে আর যে পারেনি তার মধ্যে এর অভাব রয়েছে। অতএব এখন দাঁড়াচ্ছে এই যে, মনোবিশ্লেষণ করতে হলে এই প্রাইমারী এবিলিটীর খোঁজ করতে হবে। যদি আমরা জানতে পারি এগুলি আছে কিনা, যদি থাকে তা হলে এর মাত্রা কি রকম, তা হলে আমরা মানসিক ক্ষমতার একটা পরিমাপ করতে পারবো। উপরিউক্ত অংশ থেকে এটা বোঝা যাবে, কেন আমরা কোন লোককে একেবারে বুদ্ধিমান বা একেবারে বুদ্ধিহীন বলতে পারি না। যে কাজ দেখে আমরা মত প্রকাশ করবো তার জন্যে হয়তো যে এবিলিটী-গুলির প্রয়োজন, তা তার মধ্যে আছে, অন্য কাজে দিলে সে হয়ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, কারণ অন্য এবিলিটীগুলি তার মধ্যে নাও থাকতে পারে। রাশিবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই এবিলিটীগুলি কিভাবে বার করা যায়। প্রাইমারী এবিলিটী-গুলিকে ফ্যাক্টর (Factor) বলা হয়। কোন মানুষের মানসিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে হলে তাকে অনেকগুলি পরীক্ষা দিতে হবে। এর ফল থেকে ফ্যাক্টরগুলি বার করা প্রয়োজন। পরীক্ষার গ্রহণ-প্রণালী সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে পরীক্ষা-প্রণালী স্থির

করে থাকেন। সর্বপ্রথম ছেলেদের জন্যে পরীক্ষা প্রণালী তৈরী করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনেট্ (Binet)। তাঁর এই পরীক্ষা-প্রণালীগুলি এমন সুন্দরভাবে করা হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত প্রায় সব দেশে বিনেট স্কেল (Binet scale) চালু রয়েছে। পরে আরো নানা পরীক্ষা-প্রণালী তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমেরিকান আর্মি আলফা টেস্ট। কোন মানুষকে পরীক্ষা করা হলে তার দক্ষতার মাপ আমরা পাই তার নম্বর থেকে, যাকে বলা হয় স্কোর (score)। এই স্কোর হলো তার দক্ষতার মাপ-কাঠি। ফ্যাক্টর থিওরীর সূচনা করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যান। তিনি বলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি ফ্যাক্টর আছে, যার নাম জি-ফ্যাক্টর। এর জন্যই যে কোন পরীক্ষায় তার সাধারণ বোধ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর সংগে কোন বিশেষ পরীক্ষায় যোগ্যতা দেখাতে হলে, প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের ফ্যাক্টরের (Specific Factor)। এই বিশেষ ধরনের ফ্যাক্টর মানুষে মানুষে বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান থাকে। মানুষের পারদর্শিতার তারতম্য হয় এই দু'টি ফ্যাক্টরের পরিমাণের উপর।

প্রশ্ন হতে পারে, যখন অনেকগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে, তার স্কোর থেকে কি করে বলা সম্ভব স্পিয়ারম্যানের থিওরী চলবে কি না? ধরা যাক্ অনেকগুলি পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়েছে কোন একটি বিশেষ-শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের উপর। প্রত্যেক পরীক্ষার যে স্কোর পাওয়া যাবে, সেই স্কোর-গুলি থেকে রাশিবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সহগতি ছক্ (Correlation Table) তৈরী করা সম্ভব।

স্পিয়ারম্যানের থিওরী হিসাবে যদি মনোবিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমাদের কয়েকটি স্তরের (Stage) মধ্যে দিয়ে যেতে হবে; (১) পরীক্ষা নির্বাচন, (২) স্কোর থেকে সহগাঙ্ক ছক্ তৈরী, (৩) সহগাঙ্কগুলির মধ্যে বিশেষ ধর্ম পুরোপুরি বজায় আছে কি না পরীক্ষা করা, (৪) প্রত্যেক মানুষের জন্যে G এবং S বের করা। G এবং S কোন মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারলে তার বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ আমরা অতি সহজেই পেতে পারি। সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যাপারটি জটিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণের সহজ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাশিবিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে মনোবিশ্লেষণের ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও মূল কাঠামো বজায় আছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী থার্সটন বললেন, মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ হিসাবে আমরা স্কোর নিয়ে থাকি, এটা ত শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে ব্যক্তি এবং পরীক্ষা দুটোরই উপর। অতএব কোন পরীক্ষায় কোন বিশেষ স্কোর নির্ভর করে প্রাইমারী এবিলিটী বা ফ্যাক্টরের এবং ফ্যাক্টর লোডিং-এর (Factor Loading) সমন্বয়ের উপর। ফ্যাক্টর লোডিং নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার উপর এবং ফ্যাক্টর নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর।

থার্সটনের থিওরীতে (Multiple factor Theory) একটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ ধরনের ফ্যাক্টর ধরা হয় নি, তিনি বলেছেন, একটি সাধারণ ফ্যাক্টর সবার মধ্যে আছে এ ধরার কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য ফ্যাক্টর স্বতন্ত্র, কিন্তু এমন হতে পারে কয়েকটি পরীক্ষার মধ্যে কতকগুলি ফ্যাক্টর একই রয়ে গেছে। এদের বলা হয় Group Factor।

থার্সটনের থিওরী স্পিয়ারম্যানের থিওরী অপেক্ষা সাধারণ (General) কিন্তু বিশ্লেষণ-প্রণালী জটিলতর। এই প্রবন্ধে ফ্যাক্টর এবং লোডিং কিভাবে বার করা হয়

তা আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রথমত, পরীক্ষার স্কোর হতে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে সহগাঙ্কগুলি বার করতে হবে। সহগতি ছকই বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ। ছক্ থেকে পরীক্ষার লোডিংগুলি ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসবে, সবার শেষে অর্থাৎ যখন সবগুলি লোডিং বার করা হয়ে গেছে তখন ছকে আর কোন সংখ্যা থাকবে না। তারপর লোডিং থেকে প্রাইমারী এবিলিটি-গুলি এক এক করে বেরুবে। কোন দুটি ব্যক্তির যদি স্কোর সমীকরণ লেখা যায়, তাহলে তাদের মানসিক ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রবন্ধের প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছিলাম, মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় কেন? এর উত্তর বোধ হয় এখন খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। পরীক্ষায় উৎকর্ষ দেখাতে হলে কতকগুলি প্রাইমারী এবিলিটী বা ফ্যাক্টরের সমন্বয় প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে এই ফ্যাক্টরগুলি কম বেশী নানানভাবে থাকে, এইজন্যই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। রাশিবিজ্ঞানীরা ফ্যাক্টরগুলি কেমনভাবে কষে বার করতে হবে তার গাণিতিক প্রণালী বিশদভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু এই প্রাইমারী এবিলিটী-গুলির বোঝানর দায়িত্ব মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের।

প্রবন্ধের প্রথমে আর একটি প্রশ্ন তুলেছিলাম, যে কারণে দৈহিক গঠনের তারতম্য হয় তার সঙ্গে কি প্রাইমারী এবিলিটী বা ফ্যাক্টরের কোন সম্বন্ধ আছে? বিজ্ঞানী টমসন জানিয়েছেন যে, এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সম্ভব। মানুষের দৈহিক গঠনের মূলে আছে এমনি ধারা আণবিক কতকগুলি ফ্যাক্টর যার নাম Gene। টমসন বলেছেন প্রাইমারী এবিলিটীগুলি হয়েছে এই জিনিগুলির সমন্বয়ে। টমসনের গবেষণা সম্বন্ধে গিলফোর্ড তাঁর বইয়ে লিখেছেন,

"In fact there is more than an analogy in Thomson's conception for he suggests that any activity carried out by an individual may be regarded as a sample of these Unitary Mendelian qualities. If then by any process of factor analysis we can single out the unitary abilities many genetic problems may be solved." (3)

মানুষের জন্ম হয় কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিসের সমাবেশে। যখন এই ক্ষুদ্র অংশগুলি প্রথম মিলিত হয়, তখন জীবনের কোন লক্ষণ থাকে না, এমনই অদ্ভুত ব্যাপার এই ক্ষুদ্র অংশগুলির যাকে বলা হয়েছে Gene বা Factor। মানুষের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার গঠনে তাদের প্রভাব খুব বেশী।

পদার্থ বিজ্ঞানে বর্তমানে যে গবেষণা চলেছে, তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বস্তুজগতের গঠন-প্রণালীর মূলে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সব, যাদের চোখে দেখা যায় না। এই পদার্থগুলির বিভিন্ন সমাবেশে পদার্থের অবস্থা বিভিন্ন হয়। মনুষ্যজগতেও অনুরূপ ব্যবস্থা চলেছে, যার পরিচয় আমরা অনেকে জানি না। এ জগতেও মানুষের দৈহিক এবং মানসিক গঠনের মূলে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সব, যাদের আমরা দেখতে পাই না। এদেরই বিভিন্ন সমাবেশের জন্য আমরা মানুষে মানুষে তফাত দেখতে পাই। পদার্থজগতে এবং মনুষ্যজগতে এই যে মহান ঐক্য রয়েছে গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছে।

(1) The Structure of Human Abilities—P. Vernon Chap. 1
(2) Multiple Factor Analysis—Thurstone. Chapter I.
(3) Psychometric Methods—Guilford. Chapter XIV.

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি জ্ঞান, তুমি কর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
মাতা ও দেশমাতৃকা
তোমারই অনন্ত রূপের প্রকাশ
শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করি
অসত্য হতে আমাদের সত্যে নিয়ে চল
অন্ধকার হতে আমাদের আলোকে নিয়ে চল
সূরযমল নাগরমল
কলিকাতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পচর্চা

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পকলার নানা ক্ষেত্রে তাদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করবার আমার সুযোগ হ'য়েছিল। সমস্ত দেশটা ঘুরে নানা জ্ঞান লাভ করেছি, সন্দেহ নেই, তবুও যখন কেউ বলেন কি দেখলেন, কেমন লাগল, শিল্পীদের অবস্থা কি সেখানে, শিল্পকলায় তাদের বিশেষ কোন দান আছে কি না, তার যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। কোন জাতির অন্তরের মণি-কোঠায় পৌঁছুতে হ'লে তার জন্য ধৈর্য চাই এবং অন্তরের যোগাযোগ স্থাপনের অবকাশ চাই।

গোটা মার্কিণ দেশটা ঘুরেছি। সহর থেকে সহরে দেখেছি তাদের চিত্রশালা, শিল্প বিদ্যালয়; পরিচিত হ'য়েছি শিল্পী, ভাস্কর, ইত্যাদি সমগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে, তাঁদের স্টুডিও'তে নিমন্ত্রিত হ'য়েছি প্রায়ই। তাঁদের কাজ দেখেছি এবং আমার নিজের কাজও তাঁদের দেখিয়েছি। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি শিল্পীদের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে কারো কারো সঙ্গে, যা স্থায়ী হ'বে আমার জীবনে।

টেরাকোটা মূর্তি শিল্পী—মেরী ফুলার

জন্হালেমের প্রতিচ্ছবি (টেম্পেরা) শিল্পী—মার্গারেট পিটারসন
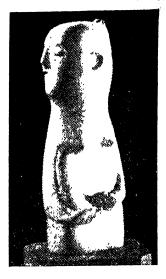
সুরু থেকে, শিল্পকলায় এঁরা ইয়োরোপ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, আজও করেন। তবে প্রভেদ এই যে, আজ তাঁরা যন্ত্র সভ্যতায় ইয়োরোপ থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাঁরা মনে করেন, শিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি তাঁদের ব্যাহত হ'তে পারে না। বিজ্ঞানের কৃপায় প্রতি পাদক্ষেপ যেমন এক একটি আশ্চর্য আবিষ্কার বিগত আবিষ্কারকে ছাড়িয়ে যায় অবলীলাক্রমে, তেমনি 'আর্টের' দিক দিয়েও এই দ্রুত পট-পরিবর্তন তাঁদের একটা জাতীয় মনোভাবের লক্ষণ বলেই মনে হ'ল। অর্থাৎ নূতন কিছু না দেখলে এঁরা সন্তুষ্ট হন না কিছুতেই। জনসাধারণও এ বিষয়ে আগ্রহ-শীল। শিল্পচেতনা তাঁদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাঁরা সাধারণত চিত্রশালা, শিল্পবিদ্যালয় ও শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াকে বিশেষভাবে কাম্য মনে করেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, তাঁদের দেশে যাদুঘর, চিত্রশালা, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্তই জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছে এবং চালু আছে। এই প্রতিষ্ঠান-গুলোতে মার্কিণ ক্রোরপতিদের দানও সামান্য নয়। বহুকাল যাবৎ তাঁরা ইয়োরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন প্রভূত অর্থের বিনিময়ে। আজ সেই সব শিল্পসামগ্রী জনসাধারণের জন্য দান করেছেন। শুধু শিল্পসামগ্রীই নয়, তার জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা গড়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরই অর্থ অকাতরে ঢেলে দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠান-গুলোর জন্য। আশ্চর্য হ'য়েছি দেখে। তুলনা করেছি মনে মনে আমাদের অর্থবানদের সঙ্গে তাঁদের দেশের শিল্পরসিক অর্থবান-

দের। নিরাশ হ'য়েছি এই ভেবে যে, কত ফাঁকির উপর আমাদের সমস্ত কিছুই গড়ে তোলবার অভিনয়। শিল্পের প্রতি আমাদের দেশের বিত্তশালী লোকদের দরদ কত কম তা ভেবে হতাশ হয়েছি প্রতি পদে। বিখ্যাত কয়েকজন ক্রোরপতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তাঁদের অদম্য উৎসাহ এবং কর্মক্ষমতা দেখেছি নিজের চক্ষে। তাঁদের মধ্যে একজন সমঝদার গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইয়োরোপীয় শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। নিজের বসত বাটিকেই করেছেন 'চিত্রশালা'। তাঁর প্রতিনিধিরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা পৃথিবীতে—বিশেষভাবে ইউরোপে—শিল্প নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টায়। প্রভূত অর্থের বিনিময়ে আহরণ করছেন একটি একটি চিত্র, ভাস্কর্য অথবা অন্য কোন শিল্প-নিদর্শন। সযত্নে রক্ষা করছেন সেগুলোকে। যাচাই করছেন নানা-ভাবে তার উৎকর্ষ। প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে ছোট্ট বাড়ি নির্মাণ করেছেন সহরের উপকণ্ঠে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীতে সাধারণ-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জীবনে কি ক'রে তাঁদের সংগ্রহ অতি উচ্চ পর্যায়ে তুলতে পারেন। তাঁরা সমস্ত সংগ্রহ দিয়ে যাবেন দেশের জন্য। নিজেদের অট্টালিকাও দিয়ে যাবেন সেই সঙ্গে। তা ছাড়া প্রভূত বিত্ত রেখে যাবেন এই সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য।

এ দেশের যাদুঘরগুলো এত বৃহৎ এবং এত সুপরিকল্পিত যে, ইয়োরোপের কোন দেশে এমন কি ইংলণ্ডেও তা দেখি নি। শিল্পবিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধেও সেই একই

কথা বলা চলে। যেখানে যা প্রয়োজন সব কিছুরই ব্যবস্থা এ'রা করে রেখেছেন আগে থেকেই; আর নিয়তই চেষ্টা চলেছে সব কিছুকেই আরও উন্নত করার জন্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বড় সব সহরেই যাদুঘর চিত্রশালা ছড়িয়ে আছে। শিল্প-বিদ্যালয়ও তাদের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। এ'দের সভ্যতা নিতান্ত স্বল্পকালের এবং নিজস্ব শিল্পধারাকে সম্পদ হিসাবে এ'রা গণ্য করেন না। তবুও সম্প্রতি এরা বিশেষ-ভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। "মার্কিণ স্কুল" হিসাবে প্রতিটি চিত্রশালায় এরা যে শিল্পিগোষ্ঠীর কাজ গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপে ১৯শ শতাব্দীতে স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সন্দেহ। যা হক এইভাবেই এ'রা ইউরোপীয় শিল্পকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। একথা এ'রা অস্বীকার করেন না, বরং গর্বের সঙ্গেই স্বীকার করেন।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যা কিছু ভাল তাই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ও এখনো করছেন। তাঁদের যাদুঘর, চিত্রশালাগুলি ঘুরে ঘুরে যখন দেখেছি তখন অবাক হয়েছি দেখে, কত দেশ থেকে কত কিছু এ'রা সংগ্রহ করে দেশের শিল্প-সংগ্রহ কত উন্নত পর্যায়ে আনতে পেরেছেন! ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনও সেখানে স্থানে স্থানে রয়েছে। তবে অন্য দেশের সংগ্রহের তুলনায় তা সামান্য ব'লতে হবে। বোস্টনে আনন্দ কুমার-স্বামীর সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এত উন্নত রুচির ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য মার্কিন রাষ্ট্রে আর কোথাও লক্ষ্য করিনি। ফিলাডেলফিয়াতে একটি যাদুঘরে দেখেছি দক্ষিণ ভারতীয় একটি গোটা মন্দিরকে উৎপাটিত করে এনে বসান হ'য়েছে। তেমনি চীন দেশীয় বুদ্ধমন্দিরও নিয়ে গেছেন তাঁদের যাদুঘরের সংগ্রহ হিসাবে। এই সব যাদুঘর ও চিত্রশালায় বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিয়তই এ'রা করে চ'লেছেন। তার জন্য এত পরিপাটি ব্যবস্থা আমি অন্য কোন দেশে দেখিনি।

মার্কিন দেশে শিল্পকলার অগ্রগতি নিজের চোখে দেখে যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি সর্বদাই একথা মনে হ'য়েছে এই যে এগিয়ে যাবার নেশায় ছুটে চলেছে এই দেশ, তাতে সত্যি সত্যি এ'রা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে কি? মনে হয়

এদেশের শিল্পিগোষ্ঠী আজ সত্যিকার পথ খ‍ুঁজে পাচ্ছেন না। সৃষ্টির আনন্দ থেকেও হয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। কারণ আমি যতদূর দেখতে পেলাম বিজ্ঞানের থেকে বিজ্ঞাপনের আলোড়নে এদেশের শিল্পের আবহাওয়া কুজ্ঝটিকাময়। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে এবং তার ভাষা সমালোচকেরা জনসাধারণকে পরিবেশন না করলে অনেকেই এক পাও অগ্রসর হতে পারেন না।

যেখানেই গিয়েছি শিল্পীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী এবং অতিথিবৎসল জাত এ'রা। নানাভাবে এ'রা অতিথিদের পরিচর্যা করতে ভালবাসেন। এমন আন্তরিক প্রীতি আমি পৃথিবীর অন্যত্র বড় পাইনি।

নাম করা শিল্পীদের অতিথি হয়েছি—কখনো কখনো শুনেছি তাদের সুখ দুঃখের কথা। অনেকেই দুঃখ করেছেন—বলেছেন তেমন আদর নেই শিল্পীদের। কেউ তাঁদের চায় না। টাকাওয়ালা লোকগুলো শিল্পনিদর্শন কিনতে যায় ইউরোপে। লক্ষ টাকার ছবি কেনে অথচ দেশের শিল্পীরা যা করছে তা চেয়েও দেখে না।

একটি যাদুঘরের বিশিষ্ট কর্মকর্তা আমাকে বললেন, মিঃ চক্রবর্তী কি দেখছো? দেশে গিয়ে এই সব ছেলেদের শিখতে বলবে না কি? দোহাই তোমার—ভারতবর্ষ যেন এই বীভৎস শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত না হয়। তোমরা যে কত বড় সভ্যতার উত্তরাধিকারী তোমাদের দেশের লোক আশা করি তা বুঝতে পারে। আমাদের অনুকরণ করো না তোমরা, সর্বনাশ হবে তাহলে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, অগ্রগতির এই যে ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে পৃথিবীতে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। যদি ধ্বংসের কোন উপকারিতা থাকে তবে তাই থেকে আবার নূতন সৃষ্টির কার্য আরম্ভ হবে, কেবল সেই আশা করছি।

আধুনিক ও অতি আধুনিক শিল্প সৃষ্টিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি; যা আমাকে সত্যিকার আনন্দ দিয়েছে। তা হল এদের ব্যবহারিক শিল্প। বাড়িঘর, আসবাবপত্র এবং নিত্যব্যবহারের জিনিসকে এরা নূতন নূতন রূপে ও পরিকল্পনায় রূপায়িত করেছেন। কারুশিল্পে এই ভাবের নূতন ব্যঞ্জনা জনসাধারণের মধ্যে শিল্পবোধকে নিয়তই জাগ্রত করতে সহায়তা করে। শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে কারুশিল্পের রকমারি কাজ চলেছে। মেয়েদের গয়নাগাটি, চীনামাটির ফুলদানি, বাসন, পেয়ালা, ছাপা কাপড়ে নানা প্রকার নক্সা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে আধুনিকতার ছাপ মনকে তাজা রাখে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও এ বিষয়ে এ'রা উৎসাহ দিচ্ছেন প্রচুর। প্রতিটি স্কুলে শিল্পকলা ও কারুশিল্প শিক্ষা করবার এমন সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, যা আমাদের কল্পনাতীত। মোট কথা, সমগ্র দেশটি প্রবল আগ্রহ নিয়ে যা জানবার মত তা জানতে চায়; শুধু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, যা তারা উপভোগ করতে পারে, যা থেকে তারা আনন্দ পেতে পারে, এমন সব কিছু তারা আয়ত্ত করতে চায়।

সাত্বত ধর্মই অধুনা সাধারণভাবে বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা এবং সাত্বত ধর্ম বৈদিক ধর্ম। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ববর্তী নিরুক্তকার শাকপূনি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি আচার্যগণ এই সমস্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদে বিষ্ণুর অপর নাম উরুগ্রাম, পৃশ্নিগর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই নাম গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম সাত্বতী শ্রুতি।

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষে র্মুনিনা সহ।
সংবাদ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৪।৭)

মহর্ষি শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"বৎস, কিরূপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের সঙ্গে মহামুনি শুকদেবের সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার ফলে এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বতী শ্রুতি আবির্ভূতা হইয়াছেন।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবের পরিচয়—"বৈষ্ণবোভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞ স্বয়মেবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেনচ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।"

এই বিষ্ণুই সর্বব্যাপক বিভু বাসুদেব কৃষ্ণ। ইনিই দেবকীনন্দন, যশোদা-দুলাল। বেদে নানাস্থানে সংক্ষেপে গূঢ়ভাবে কৃষ্ণের কথা আছে। উপনিষদে এই কৃষ্ণই মধুব্রহ্মরূপে, রসব্রহ্মরূপে, আনন্দব্রহ্মরূপে আস্বাদিত হইয়াছেন। বিবিধ পুরাণে, কাব্যে, নাটকে ইঁহারই লীলাকথা বর্ণিত হইয়াছে। আস্বাদনের মাধুর্যে, অনুভূতির ক্রম পরিণতিতে উপনিষদের কৃষ্ণই মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীগীতগোবিন্দে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদোক্ত বৃষোৎসর্গ পদ্ধতিতে দশদিক্‌পাল পূজায় অনন্তদেবের পূজামন্ত্র এইরূপ——

ওঁ কালিকো নাম সর্পো নব নাগ সহস্রবলঃ।
যমুনাহ্রদেহসোজাত যো নারায়ণবাহনঃ॥
যদি কালিকদূতস্য যদি কাঃ কালিকাদ্ভয়ং।
জন্মভূমি পরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের কালীয়দমনলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়।

তৈত্তিরিয় আরণ্যকে "নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসশিষ্য দেবকী-(পুরাণে শ্রীমতী যশোদারও অপর নাম দেবকী)পুত্র কৃষ্ণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ঘোর নামক আঙ্গিরস ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে যজ্ঞদর্শন-বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। "তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়......।" ৩।১৭।১৪ নারায়ণ উপনিষদে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥
এতদর্থ এবাঙ্গিরসং হ্যথর্বাঙ্গিরসং যোহধীতে
প্রাতরধিয়ানো রাত্রিকৃত পাপং নাশয়তি॥

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃষ্ণকেই বাসুদেব বলিয়াছেন—যথা—"অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ" এবং "জঘান কংসান্ কিল বাসুদেবঃ"।

মহাভারত শান্তি পর্বে (৩৪১) বাসুদেব নামের অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন——

ছাদয়ামি জগদ্বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাং শুভিঃ।
সর্বভূতাধি বাসশ্চ বাসুদেব স্ততোহহম্॥

ইহার সঙ্গে ঈশোপনিষদের "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" শ্লোকটি তুলনীয়। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর গোবিন্দ ও দামোদর নাম আছে।

পাণিনির "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুঙ্" সূত্র হইতে জানা যায়—পূর্বকালে বাসুদেব ও অর্জুনের উপাসক দুইটি সম্প্রদায় ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সংকর্ষণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। "শঙ্কর বিজয়" গ্রন্থে সেকালের ছয়টি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়।

ভক্তাঃ ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পঞ্চরাত্রিনঃ।
বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব দ্বাদশা ভবন্॥
(৬ষ্ঠ প্রকরণ)

ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন এই ছয়টি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। (সাত্বত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত) ক্রিয়া এবং জ্ঞানভেদে ইহারা দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, আচার্য শঙ্কর স্বীয় মত প্রচারব্যপদেশে "অনন্তশয়ন" নামক স্থানে এক মাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের অনেককে স্বমতে আনয়ন করেন। সেই সময় "বৈষ্ণব" সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন শার্ঙ্গপাণি। "পাঞ্চরাত্র" সম্প্রদায়ের একজনের নাম মাধব। "বৈখানস" সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যাসদাস এবং "কর্মহীন" সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন নামতীর্থ। আচার্য শঙ্কর "মরুন্ধ" নগরে বিশ্বকসেনের বহু উপাসককে স্বমতে আনয়ন করেন। এই সম্প্রদায়ও বৈষ্ণব নামে পরিচিত।

(১) ভক্ত সম্প্রদায়—উপাস্য বাসুদেব। ইহাদের দুই শ্রেণী, বিষ্ণুশর্মানুসারী ও ব্রহ্মগুপ্তানুসারী।

(২) ভাগবত সম্প্রদায়,—পর, ব্যূহ, বিভব অন্তর্যামী ও অর্চা এই পঞ্চরূপের উপাসক। শ্রীভগবানের নামকীর্তনাদি এই সম্প্রদায়ের উপাসনা।

(৩) বৈষ্ণব সম্প্রদায়—নারায়ণ বিষ্ণু উপাস্য। ইহারা বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদি ধারণ করে।

(৪) পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়,—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা-মূর্তি ইহাদের উপাস্য। নারদ পঞ্চরাত্র ইহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহবাদ ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

(৫) বৈখানস সম্প্রদায়,—উপাস্য বিষ্ণু। ইহারাও তিলকমুদ্রাদি ধারণ করে। নারায়ণোপনিষদ ইহাদের প্রামাণিক শ্রুতি।

(৬) কর্মহীন সম্প্রদায়,—ইহাদের মতে বিষ্ণু-উপাসকের অপর কোনরূপে কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। পরবর্তীকালে—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আচার্য রামানুজ শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। মধ্বাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় নামে পরিচিত। রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামী এবং চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন আচার্য নিম্বার্ক। শ্রী সম্প্রদায় লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রচার করেন। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, এই সম্প্রদায় অধুনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা

করে। বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত মতের প্রচারক, উপাস্য শ্রীবালগোপাল। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব, তৎশিষ্য নামদেব, ইঁহার শিষ্য ত্রিলোচন। ত্রিলোচনশিষ্য বল্লভাচার্য। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার প্রবর্তক। বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায় এখন বল্লভাচারী নামে পরিচিত। আচার্য নিম্বার্ক শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। দর্শনমতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইঁহারা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরূপে উপাসনা করেন। বাংলার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার মতানুবর্তী আচার্যগণ দর্শনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত সম্প্রদায়ও সাত্বত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সকলেই সাত্বত ধর্মের অনুষ্ঠাতা।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে সাত্বতধর্মের প্রসঙ্গ আছে। রাজা উপরিচর-বসু ইন্দ্রের সখা ছিলেন। তিনি সূর্যমুখ নিঃসৃত সাত্বত বিধি অনুসারে নারায়ণের উপাসনা করিতেন। ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন কালে নারায়ণের মুখ, চক্ষু, বাক্য, কর্ণবিবর ও নাসা হইতে, এককালে অণ্ড হইতে এবং পরে নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া—পর পর সপ্তবার নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম গ্রহণ পূর্বক ফেণপা ও বৈখানস প্রভৃতি ঋষিগণকে ও অন্য দেবগণকে প্রদান করেন। দেবর্ষি নারদও নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই ধর্মই কথিত হইয়াছে। এই ধর্মের অপর নাম ভাগবত-ধর্ম। একান্ত ধর্ম। মহাভারত শান্তিপর্বে (৩৪৬।১১) বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন—

হে নৃপোত্তম, পূর্বে এই মহান্ ধর্ম বিধিযুক্ত সূত্রাকারে হরিগীতায় কথিত হইয়াছে। জনমেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়ন স্পষ্টতরূপেই বলিয়াছেন—

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে বিমনস্ক অর্জুনকে এই ধর্ম স্বয়ং ভগবান বলিয়াছিলেন।

মহাভারত শান্তিপর্বে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই একান্ত ভক্তিযুক্ত নারায়ণ-পরায়ণ মানব সতত পুরুষোত্তমকে ধ্যান করিয়া সর্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে—নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠাতা একান্ত ভক্তগণের বাসুদেবই একমাত্র আশ্রয়। সাংখ্য, যোগ, উপনিষদজ্ঞান ও পাঞ্চরাত্র মার্গ পরস্পরের অঙ্গস্বরূপ। ইহাই সাত্বতধর্ম বা ভাগবতধর্ম।

পদ্মপুরাণ বলেন, সত্ত্বস্বরূপ, সত্ত্বাশ্রয়, সত্ত্বগুণাত্মক কেশবকে যিনি অনন্যমনে উপাসনা করেন তিনিই সাত্বত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।১৩।৩) নারদ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে। ভগবান মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন—

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনং
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগং পরিচর্যাবিধির্হরে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১৩।৩)

পঞ্চরাত্র সপ্তবিধ

পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং।
ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠং
কাপিলং তথা।
গৌতমীয়ং নারদীয়মিদং সপ্তবিধং স্মৃতং॥

এই সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের সংখ্যা একশত আট এবং ইহা ক্রিয়াপাদ, চর্যাপাদ, জ্ঞান-পাদ ও যোগপাদ—এই চারি অংশে বিভক্ত। পঞ্চরাত্রের সর্বশেষ গ্রন্থকার দেবর্ষি নারদ। ইনিই মহর্ষি বেদব্যাসকে সরস্বতী নদী-তীরে ভাগবতধর্মের উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীনারদ একতম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বিধাহি ভাগবত সম্প্রদায় প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাব্রহ্মনারদাদি দ্বারেণ। অন্যতস্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারেণ।" এই দুই ধারা হইতেই পূর্বোক্ত শ্রীব্রহ্মাদি চারি সম্প্রদায় এবং তৎপূর্ববর্তী ভক্ত ভাগবতাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। মূলত ইহারা সকলেই সাত্বত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চরাত্র শব্দের ব্যাখ্যায় মহাভারতকার বলিয়াছেন—এই শাস্ত্রে চারি বেদ ও সাংখ্য-যোগ একত্র সন্নিবিষ্ট আছে, তাই ইহার নাম পঞ্চরাত্র। কেহ কেহ বলেন—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও পাশুপত এই পঞ্চ মতবাদ

যাহার প্রভায় রাত্রির মত নিষ্প্রভ হইয়াছে, তাহাই পাঞ্চরাত্রধর্ম। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

জ্ঞানবচনের নাম রাত্র। জ্ঞান পঞ্চবিধ। পরমতত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি, যোগ ও তামস এই পঞ্চজ্ঞানমূলক শাস্ত্রের নাম পঞ্চরাত্র। ঈশ্বরসংহিতায় বর্ণিত আছে শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারদ্বাজ পঞ্চঋষি পঞ্চরাত্রিতে এই ধর্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাই এই ধর্মের নাম পাঞ্চরাত্র ধর্ম।

আচার্য রামানুজ পাঞ্চরাত্র মতবাদের সর্বপ্রধান প্রবর্তক। এমন কি, দেবাদেশ অগ্রাহ্য করিয়াও বহু তীর্থে তিনি পাঞ্চরাত্র বিধান প্রবর্তনের প্রবল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পথপ্রদর্শক আচার্য যামুন স্বীয় আগম প্রামাণিক গ্রন্থে ঈশ্বরসংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। যামুন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে বর্তমান ছিলেন। ইঁহারই কিছু পূর্বে উত্তর ভারতে কাশ্মীরে পাঞ্চরাত্র মতবাদের অপর একজন প্রামাণিক পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন—উৎপলদেব। ইনি জয়াস্য, নারদসংগ্রহ, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। খ্যাতনামা দার্শনিক ন্যায়মঞ্জরী প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট স্বীয় গ্রন্থের প্রামাণিক প্রকরণে পঞ্চরাত্রাদি আগমের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছে।

স্মরণাতীতকালেই পাঞ্চরাত্র মতবাদের সঙ্গে পৌরাণিক মতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। পঞ্চরাত্র ধর্ম প্রায়শ আচরণপ্রধান। এবং পৌরাণিক ধর্ম অনেকটা অনুরাগপ্রধান। উভয়তই একাগ্র নিষ্ঠায় ভগবৎশরণাগতি অনুস্যূত রহিয়াছে।

বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল যে ব্রাহ্মণেরও বন্দনীয়, এ আদর্শ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যেই প্রথম উদ্ভূত এবং সমাদৃত হয়। আচার্য রামানুজ শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। চণ্ডালবংশসম্ভূত শঠারির পাদুকার তিনি নিজ নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। শঠারির দিব্য প্রবন্ধ তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল। শিষ্যগণকে তিনি বার বার শঠারির পদাঙ্ক অনুশরণেই উপদেশ দিতেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত উক্ত রাগমার্গের ভজন বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের আলোয়ারগণই জীবনে প্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইঁহারা প্রায় লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। শ্রীরাধাকে পুরোবর্তিনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রাচীন তামিল কবিতা সংগ্রহ "সঙ্গম" শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা গানে পূর্ণ। কুলশেখর প্রভৃতি আলোয়ারগণের কিছু পরেই দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিল্বমঙ্গল এবং পূর্ব ভারতে কবি শ্রীজয়দেব আবির্ভূত হন। জয়দেবের প্রায় তিনশত বৎসর পরে বাংলার ব্রজভূমি নদীয়ায় পঞ্চরাত্র আগম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের সমন্বয় মূর্তিরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহারই করুণায় আমরা শ্রীশ্রীগীতার—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

পুরুষোত্তমকে শ্রীবৃন্দারণ্যের কালিন্দীতীরবর্তী কেলিকুঞ্জে "গোপবধূবিট"রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চ্যাটার্জি—আসুন, এই ঘরে আসুন। এই ঘরেই আপনি মিসেস্ চ্যাটার্জিকে পড়াবেন। বসুন, আপনি বসুন। কী নাম যেন আপনার বললেন?

ব্যানার্জি—বিষাণ ব্যানার্জি।

চ্যাটার্জি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষাণ ব্যানার্জি। আমার ওয়াইফ্, মানে মিসেস্ চ্যাটার্জি বলেছেন,—এক সময়ে নাকি আপনার সঙ্গেই ও'র বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কী কপাল দেখুন! আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাড়িটা খুঁজে বের করতে আশা করি কষ্ট হয়নি বিষাণ বাবু?

ব্যানার্জি—না। কিছুমাত্র না। আপনার চিঠিতে বাড়ির নম্বর দেওয়া ছিল। আর তা ছাড়া আপনার নাম বলতেই দেখলুম, আপনাকে এপাড়ার সবাই চেনে।

চ্যাটার্জি—আমাকে চিনুক আর না চিনুক মশায়, বাড়িটা আমার সবাই চেনে। এতো বড় বাড়ি আর এতো সুন্দর বাড়ি এ মুলুকে আর নাকি একটিও নেই; এ বাড়ির নামটা জেনেছেন তো?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ। "বৈজয়ন্তী"।

চ্যাটার্জি—ওই জয়ন্তীর নাম থেকেই বৈজয়ন্তী নাম দিয়েছি। জয়ন্তী এতে ভারী খুশী। আপনি জানেন তো জয়ন্তীকে।

ব্যানার্জি—হ্যাঁ, এক সময়ে জানতাম বৈকি, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

চ্যাটার্জি—তা দেখবেন কিছু বদলায়নি। অতো গরিবের মেয়ে এতো বড়লোকের ঘরে পড়েও আজ পর্যন্ত বড়মানুষী চাল-চলন ধরতে পারলোনা। কিন্তু তা বলে ওর ওপর রাগ করতে পারি না। আমি বলেছিলাম, বিলাত ফেরত কোন প্রফেসরকে তোমার মাস্টার রেখে দিই, জয়ন্তী। রাজী হল না। কোত্থেকে মশায় আপনার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বের করে আপনাকেই ধরে নিয়ে এলো। তা আপনি পারবেন ওকে পড়াতে? আপনার বিদ্যার দৌড়তো দেখলাম বি এ বি টি। এতোকাল পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করেছেন। সহরের এই সব আদব-কায়দা,—মানে এই সব জিনিসগুলোই ও একেবারে জানে না—মানে ইংরিজীটাই আপনি একটু বেশী জোর দেবেন—বুঝেছেন স্যার?

ব্যানার্জি—দেখা যাক্।

চ্যাটার্জি—আপনার শোবার ঘর-টর—ওসব জয়ন্তীই দেখিয়ে দেবে। মাইনে তিনশো টাকা—সে ঠিকই আছে। আগাম কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন—জয়ন্তীকেও বলতে পারেন। কিন্তু শুধু গাল-গল্প না করে পড়াবেন—বিশেষ করে ওই ইংরিজীটা। আচ্ছা আসি। আমার আবার অফিসের তাড়া আছে। আমি জয়ন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আরে আরে, মেঘ না চাইতেই জল। এই যে জয়ন্তী এসে গেছে। [জয়ন্তীর প্রবেশ] জয়ন্তী, এই নাও তোমার মাস্টার—বিষাণ ব্যানার্জি। আমার যা বলবার তা ওঁকে সব বলেছি। এইবার তোমার পড়াশুনার সব ব্যবস্থা করে নাও। অফিস থেকে ফিরতে আমার রাত হবে। আর হ্যাঁ, লাঞ্চও আজ আমি বাইরে খাচ্ছি। চিয়ারিও!

[প্রস্থান]

জয়ন্তী—অবাক হয়ে কী দেখছো? বসো বিষাণদা।

বিষাণ—বসছি।

[বিষাণ বসিল। জয়ন্তীও তাহার সামনে একটি সোফায় বসিল।]

বিষাণ—আমাকে নিয়ে তোমার আবার এ খেলা কেন বলতে পারো, জয়ন্তী?

জয়ন্তী—এর মধ্যে খেলাটা আবার কি দেখলে, বিষাণদা? আমার মাস্টার দরকার, তোমার চাকরি দরকার,—যোগাযোগ হবে না?

বিষাণ—অক্সফোর্ডের একজন এম এও তো তোমার মাস্টার হতে পারতেন, জয়ন্তী?

জয়ন্তী—কী রকম মাস্টার আমার চাই, সেটা আমারই বোঝবার কথা, বিষাণদা।

বিষাণ—কিন্তু একজন বি এ বি টির মাইনে তিনশো টাকা কেন হচ্ছে, সেটা কি আমার বোঝবার কথা নয়, জয়ন্তী? এর মানে কী?

জয়ন্তী—মাইনেটা কী কম মনে হচ্ছে বিষাণদা?

বিষাণ—না, বড্ড বেশী মনে হচ্ছে, এবং কেন হচ্ছে সেইটাই আমি বুঝতে চাই।

জয়ন্তী—তোমার মাইনে ওখানে কতো ছিল, বিষাণদা?

বিষাণ—সে সামান্যই ছিল।

জয়ন্তী—তাঁরা হয়ত তোমার মূল্য বোঝেননি। কিন্তু তাই বলে আমি এ কথাও বলবো না যে, আমিই তোমার মূল্য বুঝেছি কিংবা মূল্য দিচ্ছি। কিন্তু আর এ সব কথাই বা কেন, বিষাণদা? তুমি এ চাকরি নিয়েছো—চাকরিতে যোগ দিয়েছো।

[ইলেকট্রিক বেল টিপিয়া জয়ন্তী বয়কে ডাকিল।]

চা খাবে, না কফি?

বিষাণ—এটা আমার চা বা কফি খাওয়ার সময় নয়।

[বয়ের প্রবেশ]

জয়ন্তী—বয়, দু পেয়ালা কফি।

[বয়ের প্রস্থান]

বিষাণ—তোমার স্বামী বলছিলেন, তুমি বদলাওনি। তিনি ঠিকই বলেছেন। তোমার স্বভাব এতোটুকুও বদলায়নি। বদলেছে তোমার চেহারা। তুমি আরো সুন্দর হয়েছো।

জয়ন্তী—আমি যে সুন্দরী, একথা তোমার মুখে আজ এই প্রথম শুনলাম, বিষাণদা। তুমি আমাকে মনে মনে ভালোবাসতে—আমি জানতাম। কিন্তু মুখ ফুটে তা তুমি একদিনও আমায় বলোনি।

বিষাণ—তোমার স্বামী বলে গেলেন, গাল-গল্প না করে পড়াশোনা করতে। তোমার পড়াশোনার জন্যেই আমি এসেছি। একশো টাকা মাইনে পেতাম। তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে আমায় তোমরা এনেছো। তিনগুণ বেশী খাটতে আমি এসেছি—পড়াতে, তোমার গল্প শুনতে নয়।

[বয় কফির ট্রে আনিয়া দুইজনের সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।]

জয়ন্তী—ছাত্রীকে ভালো করে বুঝতে হবে, তবে তো তুমি তাকে পড়াবে।

বিষাণ—তোমাকে আমার বুঝতে এতটুকু বাকী নেই, জয়ন্তী!

জয়ন্তী—এতদিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। আজ আমি কী,—কী তুমি বুঝেছো?

বিষাণ—বুঝেছি—আজও আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, জয়ন্তী।

জয়ন্তী—তুমি আমাকে ছাই বুঝেছো। তুমি না খেলে আমি খেতে পারি? এই তুমি আমাকে বুঝেছো?

বিষাণ—খাচ্ছি।

জয়ন্তী—(হাসিয়া) হাাঁ, তবে খানিকটা বুঝেছো। কিন্তু আর কি বুঝেছো বলো দেখি শুনি।

বিষাণ—বুঝছি, এ বিয়েতে তুমি সুখী হওনি জয়ন্তী।

জয়ন্তী—বল—

বিষাণ—তোমার মনের এই জ্বালা আর তুমি বইতে পারছো না, তাই তুমি আমাকে টেনে এনেছো এখানে—আমাকে সব বলে হালকা হতে।

জয়ন্তী—মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলে যাচ্ছো, বিষাণদা। আচ্ছা, আজ থাক্। চল তোমার থাকবার ঘর দেখিয়ে দিই। মেসোমশায় ভালো আছেন? আচ্ছা, তুমি বিয়ে করলে না কেন, বিষাণদা?

বিষাণ—যার নিজের ভাত জোটে না, সে কেন বিয়ে করেনি—এ প্রশ্ন এক শুধু সেই করতে পারে, আজ যার ভাতের অভাব নেই... দুহাতে ভাত ছড়াচ্ছে।

জয়ন্তী—ভাত তো আমারও জুটতো না একদিন, বিষাণদা। বাড়িসুদ্ধ লোক পর পর ক'দিন না খেয়ে আছে দেখে একদিন সন্ধ্যারাতে নিজের পাড়া থেকে চলে যাই আর এক পাড়ায়,—যে পাড়ায় আমাকে কারুর চেনবার কথা নয়। পথের এক কোণে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু দাঁড়িয়েছিলাম বললে ঠিক বলা হবে না। ভঙ্গীটাই ছিল এমন, যেন আমি বেশ-একটু বিপন্ন এবং আমার কিছু বলবার আছে—মানে আমার চালচলনটা বেশ একটু সন্দেহজনক......বেশ একটু কৌতূহল-উদ্দীপক হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম।

বিষাণ—তোমার রূপ আছে—বুদ্ধি আছে—অভিনয় করতে তুমি জানো। তোমার পক্ষে এসব এতটুকু অসম্ভব নয়।

জয়ন্তী—সেদিন আমার মনের যা অবস্থা, ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। দরকার ছিল আমার টাকার। "শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে"—আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, আমাদের ভাত জুটছে না। আশ্চর্য, যাকেই বললাম, কেউ আমাকে বিমুখ করলে না।

বিষাণ—এক রাত্রে কতো রোজগার হল?

জয়ন্তী—চার আনা।

বিষাণ—কী বলছো তুমি জয়ন্তী। তোমার চেহারার এতো বড় অপমান—এও আমায় শুনতে হল!

জয়ন্তী—না, বিষাণদা। অপমান করবার সুযোগ দিইনি বলেই চার আনা। বাড়ির ঠিকানাটা দিলে কিম্বা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলে খুব কম করে চল্লিশটে টাকা নিয়ে সেই রাতে ঘরে ফিরতে পারতাম—আশা করি এটা তুমি বিশ্বাস করবে, বিষাণদা। একটি লোকই পেয়েছিলাম, যে আমার কথা শুনে কোনো প্রশ্ন না করে পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল—পিছু ফিরে একটিবার চাইলো না এবং শুনে আশ্চর্য হবে, তার জামা-কাপড় ছিল খুবই ময়লা আর হাতে ছিল বাজারের থলি। মানে, সাহায্য করবার মতো লোক একেবারেই নয়,—সাহায্য পাবার যোগ্যতাই যার বেশী।

বিষাণ—সাহায্য নিতে এই রকম লোকই তুমি বেছে নিলে জয়ন্তী?

জয়ন্তী—তখন রাত দশটা বাজে। অপমান না করে সাহায্য করতে পারে, দান করতে পারে—কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও যখন এমন লোক মিললো না, তখন মনে পড়লো তোমার কথা। খুঁজতে লাগলুম, তোমার সমগোত্র লোক—মানে, গরিব লোক—আর, তখন আর আমার অপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। ছোট-ভাইবোনগুলো আমার পথ চেয়ে বসেছিল কি না!

বিষাণ—তুমি এটা অন্যায় বলছো, জয়ন্তী। অপমান না করে বড়লোকও যে উদার হয়, গরিবের মেয়ের দুঃখে-দুঃখিত হয়,—গরিবের মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, তাকে রাজরানীর সম্মান দিতে পারে, তার প্রমাণ কি তোমার জীবনে একেবারেই নেই, জয়ন্তী?

জয়ন্তী—(হাসিয়া) না, নেই।

বিষাণ—তুমি কি মিস্টার চ্যাটার্জিকে অযথা অপমান করছো না জয়ন্তী?

জয়ন্তী—চ্যাটার্জি সাহেবই আমাকে অপমান করেছেন। পেটের জ্বালায় সে অপমান আমি মাথা পেতে নিয়েছি, ইচ্ছা করে—খুশী হয়ে—এতোটুকু অনুতাপ না করে।

বিষাণ—অপমানের রকমটা জানতে পারলে তবে বুঝতে পারি, জ্বালাটা তোমার কোথায়।

জয়ন্তী—বাড়ি ফিরতে আমার রাত হয় দেখে পাড়ার লোকেরা আমাকে যে আখ্যা দিতে লাগলো, মা সেটা সইতে পারলেন না। বাবা আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না বিষাণদা, বাবা খুব অন্যায় করেছিলেন।

বিষাণ—আমিও তো তাই-ই করতাম।

জয়ন্তী—কেন করবে না? নিশ্চয়ই করবে। মেয়েদের চরিত্রে কলঙ্ক—কেউ সইতে পারে না। কিন্তু বিষাণদা, তার দুদিন পরে মা যখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন—নিছক খেতে না পেয়ে আর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে না পেরে, সেটাও তো সইবার নয়।

বিষাণ—ঘটনাটা আমরা যখন শুনলাম, তখন আমরা 'হায় হায়' করেছি।

জয়ন্তী—আমি করি নি। মিস্টার চ্যাটার্জির দামী গাড়িটা বস্তি-উন্নয়নের অজুহাতে আমাদের পাড়ায় প্রায়ই ঘোরা-ঘুরি করতো। মিস্টার চ্যাটার্জিকে চিনতে আমার বাকি ছিলো না। সমাজ-সেবার নামে আমার সেবা করতে চাইলে আমি বললাম,—আপত্তি নেই, তবে সেটা পাকা-পাকিভাবে করতে হবে। কী ভেবে তিনি রাজী হলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিষাণ—এ বিয়ের তবে এই ইতিহাস।

জয়ন্তী—হ্যাঁ, বিষাণদা। বাবা আর ভাইবোনেরা—এমন কি অসহায় পাড়া-প্রতিবেশীরাও দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। শুধু দুঃখ এই, মা আজ নেই।

বিষাণ—চ্যাটার্জি সাহেব তোমার সম্মানই রেখেছেন। অপমান করেছেন বললে অবিচার করা হবে নাকি?

জয়ন্তী—আমার অপমানটা তুমি বুঝবে না, বিষাণদা। সেটা বুঝেছি আমি। ভালবেসে আমরা কেউ কাউকে বিয়ে করি নি। তাঁর ছিল রূপের মোহ। আমার ছিল টাকার প্রয়োজন। তিনি চেয়েছিলেন এই বুড়ো বয়সে এমন একজন 'মিসেস্'—যাকে সভা-সমিতিতে, পার্টিতে, ক্লাবে সগর্বে পাশে রেখে আর সকলের চোখ ঝলসে দিতে পারেন। ভালবেসে তিনি আমাকে বরণ করেন নি, টাকা দিয়ে তিনি আমাকে কিনেছেন। আমি তাঁর বধূ নই......আমি তাঁর বিবাহিতা রক্ষিতা।

বিষাণ—আমি বলবো, তিনি যতো তোমাকে না অপমান করেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী অপমান করেছো তুমি—তোমাকে। পেটের ক্ষুধা মেটানোই কি জগতে সবচেয়ে বড় কথা?

জয়ন্তী—নয়?

বিষাণ—আচ্ছা, মানছি হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্যে কি চুরি করতে হবে? ডাকাতি করতে হবে? আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হবে? দেহ-বিক্রয় করতে হবে?

জয়ন্তী—হ্যাঁ, হবে। সব দেশে, সব যুগে তা-ই হয়েছে, তা-ই হয়।

বিষাণ—না, কখনো না। সভ্য-সমাজে তা হয় না।

জয়ন্তী—অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখানে যখন তা হচ্ছে, তোমার আমার সমাজ আজ আর সভ্য-সমাজ নয়। সভ্যতার মুখোস খুলে ফেল, বিষাণদা। যে সমাজে এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, অনাহারে এতো মৃত্যু,—সেখানে সভ্যতার আইন, আচার-বিধি চলবে না, চলে না। জঙ্গলের আইনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখানকার আইন।

বিষাণ—খুব বড়ো বড়ো কথা তোমার মুখে শুনছি আজ। তোমাকে আমি কী শেখাবো বুঝছি না। আমাকে যে কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে, তাও বুঝছি না।

জয়ন্তী—তোমাকে আমি ভালোবাসি বিষাণদা। পেটের ক্ষুধা মিটেছে, কিন্তু মনের ক্ষুধা তো মেটে নি। তাই তোমাকে চাই......তাই তোমাকে এনেছি। তুমি আমি হাত ধরাধরি করে দেশের কাজ করব, এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। এতকাল তা হয় নি। এখন হবে।

বিষাণ—কিন্তু—

জয়ন্তী—এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই। আমি জানি, তুমিও আমাকে ভালোবাসো, বিষাণদা।

বিষাণ—কিন্তু—

জয়ন্তী—যতো 'কিন্তু'ই বল, যেটা সত্যি, সেটা আর মিথ্যে হবে না, বিষাণদা। ভালোবাসার ব্যাপারটা মেয়েরা যেমন বোঝে, তোমরা তেমন বোঝো না। কে আমাকে ভালোবাসে—সেটা বুঝতে আমার এতোটুকু ভুল হবে না।

বিষাণ—কিন্তু তোমার এই বিয়ের পর—

জয়ন্তী—এই অসভ্য সমাজে—জঙ্গলের আইনে কোনো দোষ নেই......কোনো পাপ নেই।

[নেপথ্যে মিস্টার চ্যাটার্জির গলা শোনা গেল—"বয়, বয়"।]

জয়ন্তী—এ কী? সায়েব এরি মধ্যে ফিরে এলো যে?

বিষাণ—তখন থেকে আমরা এখানে বসে গল্প করছি দেখলে খুশী হবেন না, জয়ন্তী। অন্তত একখানা পড়ার বই-টই—

জয়ন্তী—না, না, কিছু দরকার নেই। এ সমাজে সব চলে।

[দোতলা হইতে একতলার সিঁড়িপথে জন দুই লোক যেন উপর হইতে নীচে ছুটিয়া নামিতেছে এরূপ পদশব্দ শোনা গেল। জয়ন্তী ও বিষাণ চমকিয়া উঠিল।]

বিষাণ—ব্যাপার কী?

জয়ন্তী—তাইতো।

[সেই মুহূর্তেই আলুলায়িত-কুন্তলা, বিপর্যস্তবসনা যে সুন্দরী যুবতীটি এই কক্ষে প্রবেশ করিল সে এই বাড়িরই আয়া। নাম রেবা। তাহার চেহারায় যৌবনের উগ্রতা এবং উচ্ছলতা আছে।]

রেবা—দেখুন তো, এসব কী?

[কিন্তু সেখানে অপরিচিত এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ যথাসম্ভব সংযত হইল।]

জয়ন্তী—কে—সাহেব?

রেবা—হ্যাঁ। অফিসের ড্রয়ারের চাবি ফেলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ওপরে গিয়ে দেখেন, আপনি নেই। তাই আমাকে—

জয়ন্তী—জ্বালাতন করছিলেন। তা চাবিটা কোথায়?

রেবা—জানি না, দেখছি। আপনি আসুন।

[রেবা ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

বিষাণ—একটা যেন ঝড় বয়ে গেল। ব্যাপার কী?

জয়ন্তী—এই সমাজের আর একটা কাহিনী। মেয়েটি ছিল অনাথা। সাহেবের সেই সমাজ-সেবার ব্রত। চোখে পড়ে; কিন্তু দেবার মতো পরিচয় নেই বলে আয়ার চাকরি দিয়ে সাহেব একেও দয়া করেছেন। কিন্তু সে দয়াটা মাঝে মাঝে এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, মেয়েটা সইতে পারে না।

বিষাণ—কী ভীষণ!

[মিস্টার চ্যাটার্জি'র প্রবেশ।]

চ্যাটার্জি—(জয়ন্তীকে) সেই থেকে তুমি এখানে জয়ন্তী?

জয়ন্তী—কে বললে?

চ্যাটার্জি—অফিসের ড্রয়ারের চাবিটা ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম। নিতে এসে তোমার আয়ার কাছে শুনি, সেই থেকে তুমি এখানে। তা বেশ, তা বেশ। পড়াশোনার কথাই হচ্ছিল বুঝি?

জয়ন্তী—তা ছাড়া আর কি? কিন্তু চাবি তুমি পেয়েছো?

চ্যাটার্জি—তোমার আয়াকে খুঁজে আনতে বলেছি।

জয়ন্তী—হ্যাঁ। ও তোমার সব জানে—আমার চেয়ে বেশী জানে। প্রাইভেট সেক্রেটারি বলা যায়।

[চাবির একটি চেন হাতে লইয়া রেবার পুনঃ প্রবেশ।]

রেবা—(চাবির চেনটি সাহেবকে দিয়া) নিন্। আপনি যেখানে বলেছিলেন, সেখানে ছিল না। অনেক খুঁজে তবে বের করেছি।

জয়ন্তী—(চ্যাটার্জি'র প্রতি সকৌতুকে) বলিনি!

চ্যাটার্জি—(আয়াকে) তোমার কর্ত্রী তোমার প্রশংসা করছিলেন রেবা। বলছিলেন,—তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি।

রেবা—(জয়ন্তীকে) কেন যে আপনি এমনভাবে আমাকে লজ্জা দেন!

জয়ন্তী—লজ্জার কথাতো নয়। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!!

[সকলেই ভীষণ চমকিয়া উঠিল।]

চ্যাটার্জি—ভূমিকম্প? কই না।

জয়ন্তী—হ্যাঁ। ওই আবার—সর্বনাশ হলো—সর্বনাশ হলো—হ্যাঁ, ওই—ওই—শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়—শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়—

[জয়ন্তী নিজেই টিপয়, সোফা, ইত্যাদি ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটোছুটি করিতে লাগিল।]

চ্যাটার্জি—য়্যাঁ! এসো, এসো—

[তাড়াতাড়ি রেবার হাতটি চাপিয়া ধরিল।]

রেবা—না, না, ছাড়ুন।

চ্যাটার্জি—না, না, সব বাইরে এসো—বাইরে এসো—

[ভীতত্রস্ত হইয়া রেবাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।]

বিষাণ—কিন্তু কই?

[জয়ন্তী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

জয়ন্তী—ভূমিকম্প না হাতি? ভূমিকম্পের ভয় দেখিয়ে তোমায় দেখালাম, আমরা কোথায়। কে-ই বা স্বামী, কে-ই বা স্ত্রী! এ সমাজে কোনো দোষ নেই—কোনো পাপ নেই।

যবনিকা

বাংলার নাট্যশালা

চন্দ্রশেখর
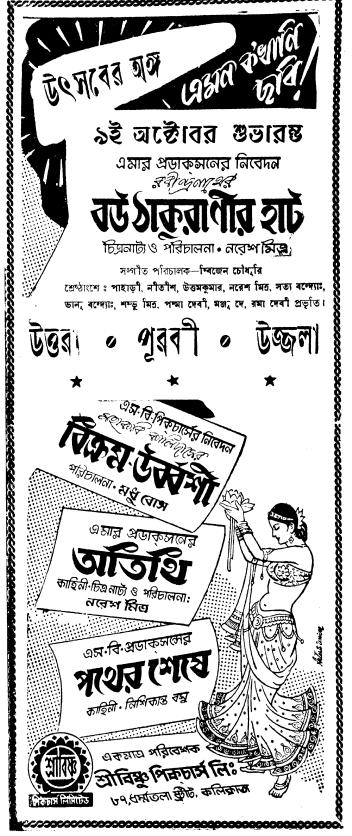
বহুজনের আক্ষেপ—বাঙলার নাট্যশালা নাকি মরণোন্মুখ। নতুন নাট্যকার নেই, উল্লেখ-যোগ্য নাটক লেখা হচ্ছে না, অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে নতুন প্রতিভার সন্ধান মিলছে না। এই অবস্থায় কলকাতার পেশাদারি রঙ্গালয়গুলি শিবরাত্রির সলতের মত টিম টিম করে কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু তাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ জেগেছে। এভাবে আর বেশীদিন তাদের টিঁকিয়ে রাখা বোধ-করি সম্ভব হবে না—এমনি অনেকের ধারণা।

আমার নিজের মতে কিন্তু এতখানি হতাশ হবার কোন কারণ নেই। দুর্দিনের দুর্যোগ আজ কেবলমাত্র বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ওপরই ঘনিয়ে আসে নি, তার প্রভাব জাতীয় শিল্প-প্রচেষ্টার অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রকট। তাছাড়া সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্দিন আজ নতুন নয়। প্রতিভাধর নট বা নাট্যকারকে কেন্দ্র করে বারে বারেই এখানে জোয়ার এসেছে—তারপরেই সুরু হয়েছে ভাঁটার টান। এই জোয়ার-ভাঁটার দোটানার মধ্যেই হয়েছে বাঙলা রঙ্গালয়ের ক্রম-বিবর্তন। সাময়িক বিপর্যয় তাকে উদ্বেলিত করেছে, কিন্তু তার প্রাণশক্তি তাতে নিঃশেষিত হয় নি। সাধারণ নাট্যমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একথা অবশ্য অস্বীকার করা চলবে না যে এবারে ভাঁটার টান চলেছে অনেকদিন ধরে। তাই আশার আলোর চেয়ে হতাশার অন্ধকারই ঘনিয়ে উঠছে বেশী সাধারণের মনে। রঙ্গালয়ের এই দুর্দিন শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। জগৎ জোড়া এর প্রভাবে প্রতীচ্যের বহুদেশের রঙ্গালয়ই আজ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। শুনেছি পেশাদারি থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আজ তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। অথচ সেদেশে আর যারই অভাব থাক, সাচ্ছল্যের অভাব যে নেই তা সর্বজনবিদিত।

এসব সত্ত্বেও বাঙলা নাট্যশালার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সংশয় বোধ করছি না। বরং দিকে দিকে তার জয়যাত্রার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সেই কথা বলতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শহরের পেশাদারি রঙ্গালয়ে দর্শকের অভাব ঘটেছে, একথা যেমন সত্য, সাধারণের মনে যে নাট্যানুরাগের অভাব নেই সে-কথাও তেমনি অনস্বীকার্য। কলকাতায় নানা বেতানক ও অবেতানক সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের যারা খবর রাখেন, তারাই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই সম্পর্কে যেটা বড় কথা সেটা এই যে এঁদের অনেকের মধ্যেই সত্যকার প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে। আগেকার সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়গুলির মত এঁরা কেবলমাত্র পেশাদারি থিয়েটারের অতিচর্বিত নাটক-গুলির অভিনয় করেই সন্তুষ্ট থাকেন না—নতুন নাটকও তাঁরা লিখিয়ে নেন নিজেদের অভিনয়ের জন্যে। এই সব নাটকের মাধ্যমেও কয়েকজন কুশলী নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাদের রচনা বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। এই সব নাটক ও অভিনয়ের খ্যাতি শহরের বাইরেও যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এমন কতকগুলি সম্প্রদায় আছে যারা কলকাতায় নিজস্ব রঙ্গালয়ের অভাবে নিয়মিতভাবেই শহরের বাইরে অভিনয়ের আসর বসিয়ে আসছে—আজ আসানসোলে, কাল বর্ধমানে, পরশু মুর্শিদাবাদে এমনি-ভাবে। এদের ক্রমবর্ধনশীল খ্যাতি পেশাদারি থিয়েটারওয়ালাদের এমনভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে যে তাঁরা এদের স্টেজভাড়া দিতে চান না নিজেদের অভিনয়ে দর্শক-সংখ্যা হ্রাসের ভয়ে।

এই সব প্রগতিশীল সম্প্রদায় ছাড়াও অনেক সৌখীন দল আছে অভিনয় করে রোজগার করা যাদের পেশা নয়। এদের সভ্যেরা অভিনয় করেন নিজেদের নাট্যোৎসাহের প্রেরণায়, তাঁদের কর্মময় জীবনের অবসর যাপনের সুষ্ঠু উপায় হিসাবে। এঁদের আসরেও একাধিক নতুন ও সুলিখিত নাটকের উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখেছি।

এই সব অভিনয় যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কোন অতি-বিখ্যাত শিল্পীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ নেই এসব অভিনয়ে। ভাড়া-করা স্টেজের বিবর্ণপ্রায় দৃশ্যপট ও ভাঙাচোরা আসবাবপত্র যে সব অভিনয়ের আঙ্গিক দৈন্যই সূচিত করে তার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা শ্রেণীর কষ্টদায়ক আসনে বসে এ'রা সত্যিকার নাট্যানুরাগের পরিচয় দেন সৌখীন শিল্পীদের গুণের সমাদর করে। এবং এই সূত্রে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সখের দলের অভিনয় বলে ভিড়ের কমতি হয় না এই সব আসরে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের

গতানুগতিক অভিনয়ের তুলনায় এই সব নাট্য-প্রচেষ্টা দর্শক আকর্ষণ করে অনেক বেশী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুদক্ষ শিল্পী, কুশলী নাট্যকার এবং সাধারণের নাট্যানুরাগ কিছুরই অভাব নেই আজকের নানাভাবে বিপর্যস্ত বাঙ্‌লা দেশেও। তাই নাট্যশালার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত না হয়ে পারি না।

তবুও যে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ এখানে ভালভাবে চলছেনা তার মূল কারণ তাদের যাঁরা চালক ও ধারক তাঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব। তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে নবসৃষ্টির প্রেরণা নেই। তাঁদের সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হয় জমা-খরচের খাতার ডানদিকের সঙ্গে বাঁদিকের সমতা রক্ষা করবার চেষ্টায়। তারপর শীর্ষস্থানীয়দের চাহিদা মেটাতে তাঁদের পুঁজি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন অনটনের গহন বনে পথ হারিয়ে তাঁদের না থাকে সাহস, না কোন উৎসাহ। ফলে গতানুগতিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য চলেছে বাঙ্‌লার পেশাদারি রঙ্গালয়ে।

অথচ বার বার দেখা গেছে—সাধারণ নাট্যামোদীরা কত অল্পে সন্তুষ্ট। একটু ভাল নাটক, মন-ছোঁয়া অভিনয়, আঙ্গিকের একটুখানি পারিপাট্য—এই সব পেলেই তারা রাতের পর রাত ভিড় করে সেই অভিনয় দেখতে আসে। নাম করবার প্রয়োজন নেই; হালের মঞ্চ-সফল নাটকগুলি একটু নেড়েচেড়ে দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। তবু বাঙ্‌লা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় চলে না বলে যদি খেদোক্তি শুনতে হয় তাহলে আমাদের মঞ্চপতিদের ব্যবসায়-দক্ষতার নিশ্চয়ই তারিফ করা চলে না। গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতের যুগে—যাকে আমাদের নাট্যশালার সুবর্ণ যুগ বলা হয়—একই নাটক শতাধিক রজনী ধরে অভিনীত

হবার কথা কেউ শুনেছেন কি? অথচ বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের ভাঙা হাটে গত পাঁচ বছরের মধ্যে কতগুলি নাটক এই গৌরব লাভ করেছে তার হিসাব নিলে বিস্মিত না হয়ে থাকা যাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাঙালীর নাট্যোৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি, যাঁরা নাট্যশালা চালাচ্ছেন তাঁদের অপটুতায় পেশাদারি রঙ্গালয়ের বর্তমান দুরবস্থা।

বাঙালীর নাট্যোৎসাহে ভাঁটা পড়া তো দূরের কথা, নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে আজকাল যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাকে অভূতপূর্ব বল্লেও অত্যুক্তি করা হবে না। পেশাদারি রঙ্গালয়ের বাইরে বৈতনিক ও অবৈতনিক নানা সম্প্রদায়ের বহুবিধ নাট্য প্রচেষ্টার উল্লেখ আগেই করেছি। এসব ছাড়াও এই কলকাতার শহরেই এত বিভিন্ন রকমের নাচ-গান ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের আসর বসে নিয়মিতভাবে যে তাদের সঠিক হিসাব দাখিল করা সহজ নয়। এই সব আসরে উচ্চশ্রেণীর রূপদক্ষতার বিকাশ মোটেই বিরল নয়। বাঙ্‌লা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এই সব ললিত কলায় আজ এমনি পরাদর্শী হয়ে উঠেছে যা দশ-বিশ বছর আগেও কল্পনার অতীত ছিল।

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প 'স্বদেশী' শিল্প কি-না

পঙ্কজ দত্ত

গত ২০শে আগস্ট তারিখের একটা খবরঃ

"চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র ও সরঞ্জামাদির আমদানীকারকদের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল দিল্লীতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বলে অনুযোগ উত্থাপন করেন যে, গত দু' দফায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি আমদানী করার যে লাইসেন্স ও কোটা দেওয়া হয়েছে, তা সরকারী আইনের বরাদ্দ পরিমাণের চেয়েও কম।"

এর আগে গত জুন মাসে ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল নতুন চলচ্চিত্র আইনে শিল্পকে যে বহুবিধ বাধা ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য দিল্লীতে বেতার ও তথ্য মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফেডারেশনের নানা আবেদনের মধ্যে চলচ্চিত্রের যন্ত্র ও সরঞ্জাম এবং রূপসজ্জার উপকরণ আমদানীর সুবিধে করিয়ে দেবার কথাও ছিল। ডাঃ কেশকার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পরিমাণ রূপসজ্জার উপকরণ আমদানী করার অনুমতি করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কাঁচা ফিল্ম, রাসায়নিক দ্রব্য ও রূপসজ্জার উপকরণাদির প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারত থেকে প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি টাকা বাইরের নানা দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। বস্তুত, ভারতে ছবি তোলার জন্যেই হোক, আর দেখাবার জন্যেই হোক, যা কিছু যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতি যাবতীয় কিছুই আনাতে হয় ইউরোপ বা আমেরিকার কোন না কোন জায়গা থেকে। কোন যন্ত্রের যদি একটা স্ক্রুও বিগড়ে যায়, সেটির আর্থিক মূল্য যতো নগণ্যই হোক, বিদেশ থেকে আনিয়ে না নিলে সম্পূর্ণ যন্ত্রটিই বিকল হয়ে পড়ে থাকবে।

বছরে পৌনে তিন শ' খানিরও বেশী ছবি তোলা হয় বলে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে হলিউডের পরই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র শিল্প বলে পরিগণিত করা হয়। কিন্তু কি মর্যাদা এই 'বড়ো' হয়ে থাকার? ভারতের চেয়ে অর্ধেকেরও কম ছবি তোলা হয় ইতালীতে, কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পের যে কোন অঙ্গের কাজে লাগতে পারে, এমন কোন জিনিসই নেই যা ইতালিতে তৈরী হয় না। ফ্রান্স আরও কম ছবি তৈরী করে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলেও অল্পবিস্তর সব রকম জিনিসই ওদেশে তৈরী হয়। ইতালি বা ফ্রান্স অবশ্য অন্যান্য দেশের জিনিসও ব্যবহার করে, কিন্তু দরকার হলে নিজেদের পায়ের ওপরে দাঁড়াবার যোগ্যতা ওদের আছে। হলিউড যে আজ এতো বড়ো তার মূলেতেই রয়েছে চলচ্চিত্র-শিল্পে ব্যবহৃত সমুদয় বস্তু বিষয়ে আমেরিকার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এতটুকু একটু কুটোর জন্যেও হলিউডকে কোন দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ছবি তোলার কাঁচা মাল ও সরঞ্জাম, ছবি দেখাবার যন্ত্রপাতি এবং তৈরী ছবির জন্যেও আমেরিকার ওপরে নির্ভর করে রয়েছে। বৃটেনও বড়ো একটা অন্য দেশের ওপরে নির্ভরশীল নয়। জাপান ভারতের তুলনায় কতো ছোট দেশ, কিন্তু ছবির সংখ্যা গুণতি করে চলচ্চিত্র-শিল্পের বৃহত্ব নির্ধারণ করতে গেলে জাপানই আসলে হলিউডের পরই সবচেয়ে বেশী ছবি তোলার কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। যুদ্ধের আগে জাপানের স্থান ছিলো প্রথম: বছরে তখন জাপানে ছ'শোখানিরও বেশী ছবি তৈরী হওয়ার হিসেব পাওয়া যায়। জাপানও চলচ্চিত্রের জন্য দরকারি সব জিনিসই স্বদেশেই উৎপাদন করে: যুদ্ধের আগে ওরা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু যুদ্ধ হেতু উৎপাদনের পরিমান হ্রাস হওয়ায় যেটুকু নেহাৎ না হলে চলে না, মাত্র সেইটুকুই ওরা, প্রধানত আমেরিকা থেকে, আনিয়ে নিচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে তারও বোধ হয় দরকার হবে না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সাহিত্যসৃষ্টি "পথের পাঁচালী"র চিত্ররূপে নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র চিত্ররূপে চন্দ্রাবতী, দীপ্তি রায় ও নির্মলকুমার।

পৃথিবীর বৃহৎ চলচ্চিত্র-শিল্পগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতকেই সমস্ত কিছুর জন্যে বিদেশের ওপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। কি হিসেবে তাহলে এ শিল্পকে স্বদেশী শিল্প বলে অভিহিত করা যায়? চলচ্চিত্রের শিল্প কর্ণধাররা কথায় কথায় গভর্নমেণ্টের মুণ্ডপাত করেন। তারা বলছেন চলচ্চিত্র-শিল্পকে প্রসারিত করার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কোন সহায়তাই দিতে চায় না। কিন্তু সহযোগিতা দেবেই বা কি করে? ভারতের মতো ছত্রিশ কোটি অধিবাসীর বিরাট দেশে হাজার তিনেক চিত্রগৃহ এতো অপ্রতুল যে জনপ্রতি হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। এর পাঁচ গুণ চিত্রগৃহের সংখ্যাও প্রচুর মনে হবে না যখন দেখা যাবে যে, ইতালির চার কোটি লোকের জন্যে রয়েছে পনের হাজারেরও বেশী চিত্রগৃহ, কিংবা রাশিয়ার উনিশ কোটি লোকের জন্যে রয়েছে তিরিশ হাজার অথবা আমেরিকার সতেরো কোটির জন্যে রয়েছে বিশ হাজার চিত্রগৃহ। ওসব দেশের কারুর সঙ্গে পাল্লা না দিয়েও অভাবটা মোটামুটি রকম পুষিয়ে যাবার জন্যে যদি আমাদের দেশে আরও হাজার দশেক চিত্র-গৃহ তৈরী করতে হয়, তাহলে ভারত থেকে সরাসরি কয়েক শত কোটি টাকা বিদেশের কোথাও না কোথাও সরঞ্জামাদির জন্যে চালান করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি জিনিস

সবচেয়ে বিত্তশালী দেশ আমেরিকার গভর্নমেণ্টও অতো টাকা তো দূরের কথা, একটি পয়সাও ঐভাবে বিদেশে চলে যেতে দেবে না। আমাদের দেশে একটা সিনেমা বাড়তে দেওয়া মানে বেশ মোটা অঙ্কের কিছু টাকা বিদেশে চালান করে দেওয়া; তেমনি একখানা ছবি বেশী তোলা মানেই হাজার কতক টাকা বিদেশে পেঁাছে দেওয়া। তাহলে কি সার্থকতা এমন শিল্পের! হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প বছরে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, ফিল্ম, রূপসজ্জার উপকরণ, সাজপোশাকের উপাদান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ষ্টুডিওর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, চিত্রগৃহের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মায় সীট পর্যন্ত, পাবলিসিটির নানা উপকরণ ইত্যাদি বাবদ প্রায় ততো টাকাই বিদেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। পৃথিবীর কোন গভর্নমেণ্ট এই একতরফা বহির্গামী অর্থপ্রবাহ অবিরলগতিতে চলতে দিতে পারে? আর, পৃথিবীর কোন্ দেশের কোন্ শিল্পের লোকে নিজের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থকে এইভাবে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়?

আমাদের চিত্রশিল্পের কর্ণধাররা রয়েছেন যেন মেসবাড়ীর অনাত্মীয় বাসিন্দার মতো। সংসার চালাবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান সর্বক্ষণই। দেশটাকেও যেন তাঁরা নিজেরই বাড়ী বলে গ্রাহ্য করতে চান না। সব তাদের করে-কম্মে দিতে হবে, সব-কিছু তাঁদের সামর্থ্যের নাগালে ধরে দিতে হবে; দেশের কোন সুবিধে হবে না-হবে, সে ব্যাপারে একেবারেই তারা অচেতন থাকতে চান। যুদ্ধের সময়ে অঢেল টাকা রোজগার করে দু'হাতে উড়িয়ে যখন শেষ করতে পারা যাচ্ছিল না, তখন কর্ণধারদের কেউ কেউ 'হেন করেংগা, তেন করেংগা' বলে বুকনীর তোড় ছেড়ে স্বপ্নক্ষেপা মনদের তুষ্ট কবার চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধ বাধতেই বিদেশ থেকে জিনিস আমদানী নিয়ন্ত্রিত হতেই সবায়ের মাথায় হাত পড়েছিল, বিদেশের ওপর নির্ভর করে থাকা যে কি সর্বনাশের ব্যাপার, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছিল সবাইকে; চলচ্চিত্র-শিল্প তো বন্ধ হবারই দাখিল হয়েছিল। এবং এটাও ঠিক যে, এখনকার বৃটিশ গবর্নমেণ্ট যদি যুদ্ধের সময়ে লোকের "মোরেল" ঠিক রাখা এবং যুদ্ধের প্রচার কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশী বলে গ্রাহ্য না করতো, তাহলে এক ফুট ফিল্ম আমদানী করার জায়গা কোন জাহাজে পাওয়া যেতো কি না সন্দেহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর বুঝতে চাইলেন না কেউ। যুদ্ধ থামার পর মাল আমদানীর বাধানিষেধ সরল হতেই যুদ্ধকালীন সংকল্প ও পরিকল্পনার কথা রাতারাতি সবাই ভুলে গেলেন। আরম্ভ হলো

গভর্নমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা—এটা আনিয়ে দাও, ওটা আনিয়ে দাও, না হলে এই 'স্বদেশী' শিল্প বাড়তে পারছে না। দাবী-দাওয়ার মধ্যে একটা টোপ ফেলে রাখা হয়েছে এই বলে যে, চলচ্চিত্র-শিল্প থেকে বহু হাজার লোক অন্নের সংস্থান করে এবং তারা এই দেশেরই লোক, সুতরাং চলচ্চিত্র-শিল্পকে সব রকম সুবিধে করে দিতে গভর্নমেণ্ট বাধ্য! কিন্তু এ-যুক্তি ধুয়ে বেরিয়ে যায় যখন মনে করা যায় যে, চলচ্চিত্র-শিল্পকে রাখতে গিয়ে প্রতি বছর যতো টাকা বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে, সে টাকাটা দেশে খরচ করতে পারলে চলচ্চিত্রে বর্তমানে যত লোক নিযুক্ত তার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে কাজ দেওয়া যেতে পারে। কেন পাঁচসালা পরিকল্পনায় চলচ্চিত্রের কথা নেই, এই থেকেই তো তা বোঝা যায়। তবে চলচ্চিত্রও একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প; হাজার কতক লোকের অন্নের সংস্থান করে দেওয়াটাই ওর পরম সার্থকতা নয়, দেশের আত্মাকে সুষ্ঠু ও সুস্থ করায় ওর প্রভাবশালী ক্ষমতাটাকে প্রকৃত কাজে নিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করাটাই হচ্ছে আসল কথা।

শিল্প কর্ণধারদের বর্তমানের মতো মনোবৃত্তি থাকতে শিল্পের অবস্থা ফেরবার আশা কম, আর গবর্নমেণ্টের কাছ থেকেও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ সুদূরপরাহত। চোখের সামনে সকলেই দেখছে ধুলোর মতো টাকা উড়িয়ে ছবি তুলে যাওয়া হচ্ছে এবং পঁয়ত্রিশ লাখ, চল্লিশ লাখ......ষাট লাখ ...খরচ করার বড়াইও করা হচ্ছে। অনবরতই বিপুল বৈভবের জৌলুষই সামনে তুলে ধরা হচ্ছে বড়ো বড়ো করে। অথচ একটি আধলাও কেউ বরাদ্দ রাখছেন না একটা এমন কোন কিছু তৈরী করার জন্যে, যেটা স্থায়িভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পের কাজে লাগতে থাকবে, আর সেই জিনিসটির জন্যে অন্ততঃ বিদেশের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে না। রঙীন ছবি তোলা দরকার হয়ে পড়েছে,—ছবিতে অভিনবত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যে তো বটেই, তা ছাড়া রঙের সাহায্য পেলে বর্ণবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ছবিতে অনেক নতুন কিছু দেখানোও যেতে পারে, যা সাদা-কালো ছবিতে সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় নেই তার। ছবিকে রঙীন করার আমাদের কোন পদ্ধতি নেই, যা কিছু করিয়ে আনতে হবে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। "আন" এবং "ঝাঁসী কি রাণী" তোলা হলো বহু লক্ষ টাকা খরচ করে, এতো টাকা যে একটার ওপরে আর একটা সাজিয়ে গেলে বোধহয় আকাশটাই ছোঁয়া যেতো। কিন্তু তা থেকে যদি ছবি দুখানির প্রযোজক দুজন মিলে একতলা উঁচু পরিমাণ টাকা কোন বিজ্ঞান পরিষদ, বিজ্ঞান শিক্ষালয় বা বৈজ্ঞানিকের হাতে রঙীণ ছবি তৈরীর একটা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য দানও করতেন তাহলে আজ বোধহয় আমাদের দেশকে ছবি রঙীণ করার জন্য বেলজিয়াম, ইটালি, বৃটেন কিংবা আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। এই যে ত্রিস্তর ছবি ও দৃশ্য পরিব্যাপক পর্দার উদ্ভাবন হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেসবের আমদানী একদিক থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের জৌলুষ ও প্রতিপত্তি যেমন বাড়িয়ে দেবে তেমনি সমগ্র দেশের ধনভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওদুটি প্রবর্তন করার জন্য বিদেশে কয়েক কোটি টাকার চালান করতে হবে বলে। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের এ পর্যন্ত একজনও কেউ নিজেদেরই কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ত্রিস্তর ছবি বা দৃশ্য পরিব্যাপক পর্দার সুবিধে করিয়ে দেবার উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। অথচ কেউ কেউ ত্রিস্তর ছবি তুলবেন বলে ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ ত্রিস্তর ছবি তোলার জন্য নতুন যে সব সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তদ্বরুণ প্রচুর টাকা দেশ থেকে চালান করে দেওয়ার একটা নতুন উদ্যোগ। বৃটেনও উদ্‌গ্রীব হয়েছে ত্রিস্তর ছবি এবং দৃশ্যপরিব্যাপক পর্দার ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য কিন্তু তার জন্যে বৃটেনের চিত্রশিল্প যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আনতে আমেরিকা বা অন্য কোন দেশে

অর্ডার পাঠাচ্ছে না, কিংবা গভর্ণমেণ্টের ওপরেও চাপ দিচ্ছে না বিদেশ থেকে আনিয়ে দেবার জন্য অথবা সরকারি ধনভাণ্ডার থেকে খরচ করে ওসব তৈরী করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। ওদেশের চলচ্চিত্র শিল্পেরই নিজস্ব অনুশীলনাগার আছে, তার সংগে যুক্ত রয়েছেন বৈজ্ঞানিক এবং কুশলীবৃন্দ। নতুন কিছু উদ্ভাবন হলে দেশেতেই সে জিনিসটা সবায়ের পক্ষেই সুলভ করে দেওয়ার জন্য ওরা তৎপর হয়ে ওঠে। ত্রিস্তর ছবি বা দৃশ্যপরিব্যাপক পর্দার ক্ষেত্রেও ওরা তেমনিই তৎপর হয়ে উঠেছে—চলচ্চিত্র শিল্প কর্ণধারদের নির্দেশে ওরা পরীক্ষা ও অনুশীলন কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং এটা অব্যর্থ যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়াই চলচ্চিত্র শিল্প নিজের থেকে সব করে নিতে পারবে আর সেই সংগে পাশ থেকে গড়ে উঠতে থাকে আর একটা 'ইণ্ডাষ্ট্রি।' এইভাবেই ওদের চলচ্চিত্র শিল্প দেশের একটি নিজস্ব শিল্প হয়ে উঠতে পেরেছে। আমেরিকাতেও রয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট মোসন

পিকচার রিসার্চ কাউন্সিল। চলচ্চিত্রের যা কিছু প্রয়োজন সবই উদ্ভাবিত হয় এদের দ্বারাই।—গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে না ওরা, আর বিদেশের ওপরে নির্ভর করার কথা তো ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ইতালির চলচ্চিত্র শিল্পেরও অমনি অনুশীলন পরিষদ আছে, ফ্রান্সেরও, আর রাশিয়ার তো বটেই। আরও অনেক দেশেরই রয়েছে ঐ রকম ব্যবস্থা। নেই কেবল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র শিল্প ভারতে! প্রত্যেকটি কিছুর জন্য বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে, কিন্তু তবুও বড়াই করতে হবে 'ভারতীয়' চলচ্চিত্র শিল্প বলে! শুধু সেই কথাই নয়, এই 'ভারতীয়' চলচ্চিত্র শিল্পের জোরই বা কোথায়? ইওরোপে একটা আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ঘটলেই তো এ শিল্প ঢলে পড়বে।

শুধু যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, সাজসরঞ্জাম এবং অন্যান্য সব উপকরণের জন্যেই বিদেশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ছবির আত্মাতেও বিদেশী প্রভাব মুঞ্জরিত করার দিকেই নজর রয়েছে বেশী। বিদেশী ছবি কিভাবে দৃশ্য রচনা করে, ওদের মতো সাজপোষাক আসবাবাদিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করা, ওদের মতো করে সঙ্গীত যোজনা, ওদের ঢঙে অভিনয় করা, ওদের ছবির দৃষ্টিভঙ্গী ধরে কাহিনী পরিকল্পনা করা ইত্যাদির সাহায্যে ছবির চেহারা ও অন্তরদেশকে বিদেশী করে তোলার দিকেই লক্ষ্য রয়েছে সকলের। সব চিত্রনির্মাতার আদর্শ বিদেশী শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছানো যায়। আর আজকাল তো বড়োদের চেষ্টাই হচ্ছে কিভাবে বিদেশের জন্য ছবি তৈরী করা যায়। আমাদের ছবির আঙ্গিক ও আত্মিক রূপে যে সত্যিই বিদেশীর অনুকরণ তা তো বিদেশী সমালোচকরাই বলে থাকেন। ইওরোপ ও আমেরিকার যারা এদেশের ছবি দেখেছেন তারাই বলেন এই কথাই। ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ ষ্টাইল কিছু নেই। যেমন রয়েছে আমেরিকার, বৃটেনের, ফ্রান্সের, জার্মাণীর, রুশিয়ার, ইতালির, জাপানের এবং অন্যান্য দেশের। ছবি দেখলেই বলে দেওয়া যায় এটা বৃটেনের, ওটা আমেরিকার, কিংবা ইতালির বা রুশিয়ার। ছবির মধ্যে যার যার দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকে। আর আমাদের ছবির উৎকর্ষ যাচাই করতে সব চেয়ে গ্রাহ্য করা হয় বিদেশীদের মতকে। এর একটা উদাহরণ ছবিতে গান ব্যবহার নিয়ে। ভারতীয় ছবিতে গান ব্যবহার করা হয়, বিদেশীরা বলেন। এখনকার চিত্রনির্মাতারাও ধুয়ো তুলেছেন ছবিতে গান থাকার দরকার নেই এবং তার দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা বিদেশী ছবির উল্লেখ করেন। কিন্তু এদেশের দর্শকসাধারণই যে গানের

এমনি ধারা বিদেশী ছবিকে আদর্শ বলে ধরে নেবার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারক এবং দেশের জনসাধারণ ভারতীয় ছবিকে কেন যে পরম আত্মীয়ের আসনে বসাতে পারছে না তার কারণই হচ্ছে ভারতীয় ছবির চেহারা ও মন আত্মীয়ের মতো নয় বলেই।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের এই সর্বতোময় নির্ভরশীলতা দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। বিদেশী ছবি আমাদের দেশের ধাতে সয় না, আপামর জনসাধারণের কাছে তার আদরও নেই। বিদেশী ছবি আমাদের দেশের নৈতিক মান নষ্ট করে দিচ্ছে বলেও প্রচণ্ড অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এমন উপায় নেই যে বিদেশী ছবির আমদানী বন্ধ করে দেওয়া যায়। আমেরিকা কি বৃটেনের ছবি বন্ধ করতে গেলেই ওরাও কাঁচা ফিল্ম বা ছবি তোলা ও দেখানোর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমাদের বিক্রী করা বন্ধ করে দিতে পারে। এরকম আশঙ্কা অমূলক নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যদি ওদের মুখাপেক্ষী না হতো তাহলে নিজেদের ইচ্ছামত পথে চলায় বা যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন বাধাই হয়তো থাকতো না।

অথচ আমাদের দেশে কি-না হতে পারে? চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য দরকার যাবতীয় কিছু তৈরী করার জন্য যতো রকমের কাঁচা মাল দরকার তার প্রায় সমস্তই আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক উচ্চতম পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক ও কুশলীরা আছেন বহু। দরকার শুধু এদের নিয়োজিত করার মত মন ও অধ্যবসায়। একটা কোন জিনিষ তৈরীর ব্যবস্থা হওয়া মানে তাই নিয়ে একটা আলাদা শিল্প গড়ে তোলা। এইভাবে এক একটা করে সব জিনিষ তৈরী হতে থাকলে ছোট বড়ো অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। আর তখনই কেবল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা হবে দৃঢ়তর এবং সুদূর-প্রসারী, আর তখনই ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প একটি স্বদেশী শিল্প বলেই সর্বজনের আদরণীয় হবে। কিন্তু কোথায় সেই সব উদ্যোগীদের দল?

শারদীয়া

আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ মহালয়া - ১৩৬১ ॥
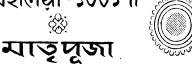
মাতৃপূজা

মা আসিতেছেন। বাংলার আকাশে বাতাসে রব উঠিয়াছে। বেণু-বীণাধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভৈরব সে রব। আর্ত, পীড়িত, নিরাশ্রয় নরনারীর রোদন-নিনাদে দিক্‌চক্রবাল মুখরিত। মাতৃপূজার এমনই ভয়াবহ প্রতিবেশ। দেখিতেছ কি মায়ের বেশ? জটাজুট সমাযুক্তা জননী। কোটিচন্দ্রনিভাননী যিনি তাঁহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, অম্লান পঙ্কজের মালা দরবিগলিত উত্তপ্ত অশ্রুধারায় বিশুষ্ক, কনকোত্তম মায়ের কান্তি কজ্জলে লিপ্ত হইয়াছে। শারদীয় সূর্যের স্বর্ণাভ দ্যুতি মায়ের আবির্ভাবে যেন তিমিররাশিতে আবৃত হইল। ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণা জননী। সন্তানস্নেহে তিনি উন্মাদিনী। পাগলা মেয়ে বুঝি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সোনার আঁচল ধূলায় লুটাইতেছে। মায়ের পূজা করিবে কি? সত্যই যদি এমন পাগলিনী জননীর পূজা করিতে চাও, নিজেরা পাগল হইয়া যাও। মায়ের বিপুল বেদনার উপলব্ধিতে তোমাদের অন্তর উত্তপ্ত করিয়া তোল। মায়ের সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমাদের সর্বস্ব উৎসর্গ কর—দাও, সব কিছু, মায়ের চরণে তোমাদের জীবনের সব সাধনা, সকল কামনা বাসনা রক্তপদ্মের অর্ঘ্যোপহার দাও। মায়ের সন্তানের চোখের জল মুছাও।

জননী রাজরাজেশ্বরীরূপে আবার জাগিবেন। তাঁহার মুখের ঈষৎ-সহাস-অমল হাসি তোমাদের অঙ্গনে অঙ্গনে খেলিবে। মাতৃপূজার মধুর লগ্নে মঙ্গলশঙ্খ বাজিবে। ভয় কি? মা আমাদের শক্তিময়ী। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, দৈত্য-বধের জন্য রুদ্রের ধনু আমিই আনত করিয়াছিলাম। আমিই জনগণের জন্য সংগ্রাম করি। আমার সেই রণ-নৃত্যতালে ভূলোক-দ্যুলোক কম্পিত হয়। দুর্গতিহারিণী দুর্গানামে দুর্গমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়। মাতৃপূজা সার্থক হোক।

প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা, হয়ত বা তার চেয়ে বেশী দিনেরও হতে পারে। তখন আমরা খুবই ছোট ছিলাম। তখন থেকেই সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ-লাভের লালসা। বুঝি না কিছুই, তবু পাশে বসে তাঁদের কথাগুলি গিলি। কথার মধ্যে যেটুকু গল্প তাতে মজা পাই, আর যা বুঝতে পারিনে তাও শুনে যাই।

ছিলাম কাশীতে। সাধু-সন্ন্যাসীর তো সেখানে কমতি নেই, কেউ অখ্যাত কেউ বিখ্যাত। খ্যাতদের মধ্যে একজনের কথাই আজ বলব। তাঁর নাম শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। তখনই তিনি বৃদ্ধ। তাঁর বয়স কত কেউ বলতে পারে না। অর্থাৎ তখনই তাঁর অনেক বয়স হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ছিলেন আমার অগ্রজদের বন্ধু। কাজেই আমাদেরও মান্য। প্রমথনাথ ছিলেন বিশুদ্ধানন্দজীর বহু শিষ্যের অন্যতম। তাঁরা তাঁর কাছে অতিদুরূহ সব দর্শনশাস্ত্র পড়তেন। সে সব কথা বুঝবার সাধ্য তো আমাদের তখন ছিল না। তবু দূরে বসে বিশুদ্ধানন্দজীর কথা শুনতাম। বুঝি বা না-বুঝি কথা শুনেই মন খুশী। তিনি যখন আমাদের বোধগম্য সরল মনোরম ভাষায় গল্প বলে যেতেন তখন আর আমাদের পায় কে?

গল্প বলবার অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর। একদিকে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান রাজা-মহারাজাদের গুরুস্থানীয়, অন্যদিকে তিনি শিশু-ব্রজগোপালদের মন হরণ করে গল্প বলতেও পারেন। অপরূপ তাঁর বলবার ভঙ্গী। অভিজ্ঞতারও তাঁর অন্ত নেই। রাজনীতিতে তাঁর দৃষ্টি ও ধী-শক্তি অতুলনীয়। কেউ কেউ বলতেন তিনিই নাকি সিপাহী-বিদ্রোহের নানাসাহেব। তিনি নানাসাহেব কিনা জানি না। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর বহুদিন হিমালয়ের সব দুর্গম প্রদেশে, নেপালের সব দুঃসাধ্য স্থানে অজ্ঞাতবাস করে যখন তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি পরমহংস। তখন সারা ভারতে তাঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে, বিশেষরূপ সন্দেহ করলেও ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁর গায়ে হাত দিতে কখনও সাহস করেনি।

নেপালটা ছিল তখনকার দিনের ইংরেজ-দ্রোহীদের একটি আড্ডা।

সিপাহী-বিদ্রোহের আট দশ বছর পূর্বে যখন ইংরেজরা মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের ছেলে কুমার দলীপ সিংহের উপর দারুণ অন্যায় ও অত্যাচার করেন, তখন দলীপের মা মহারানী জিন্দন দারুণ রুষ্ট হলেন। কিন্তু তিনি করবেন কী? দলীপ যখন শিশু তখন থেকেই তিনি ইংরেজদের আশ্রিত। অথচ তারপরে শিখদের মধ্যে যখন যেখানে কোন অন্যায় ঘটেছে, তার জন্য তাঁরা ক্রমাগত দণ্ড দিয়েছেন কুমার দলীপকে। যদিও দলীপের কাছে কারও যাবার সাধ্য ছিল না। তিনি ছিলেন একেবারে ইংরেজদেরই হেপাজতে।

দলীপের কাহিনুর জোর করে কেড়ে নেওয়া হল। তাঁদের অঙ্গীকৃত পেনশন দলীপকে কখনই দেওয়া হল না।

দলীপকে যখন ইংরেজরা প্রায় কয়েদ করে রেখেছেন তখন তাঁর সঙ্গে না তাঁরা রাখতে দিয়েছেন শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহেব, না থাকতে দিয়েছেন কোন শিখ জ্ঞানী-গুরুকে। পুরোহিত হিসেবে তাঁকে দেওয়া হল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। সে যেমন ধূর্ত তেমনই ইরেজদের আজ্ঞাবহ গোলাম। সেই ব্রাহ্মণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দলীপকে যদি সে শিখধর্ম হতে সরিয়ে আনতে পারে তবে তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

দলীপ ছিলেন শিখদের ভবিষ্যৎ গুরু-স্থানীয়। তাঁকে শিখধর্ম হতে বিচ্যুত করতে পারলে শিখজাতি তাদের ভবিষ্যৎ ঐক্য হারাবে। অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়বে।

সেই ব্রাহ্মণ দলীপকে শিখধর্মে বিশ্বাস হতে সরিয়ে আনলে। তখন আরম্ভ হল খৃীষ্টান মিশনারীদের কাজ। একদিন শোনা গেল, দলীপ খৃীষ্টান হয়েছেন। পাদরিদের হাতে তাঁর দীক্ষার কথা শুনে শিখ-জাতির মাথায় বজ্রাঘাত হল। রাজমাতা জিন্দন ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতী। যেমন তাঁর সৌন্দর্য, তেমনি তাঁর বিচক্ষণতা। কিন্তু তিনি নিরুপায় নিঃসহায়। ভাবগতিক দেখে তাঁকে একসময়ে কাশীর নিকটে চুনার দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। শেষে অত্যাচার এমন কঠোর হয়ে উঠতে লাগল যে রাজমাতা জিন্দন বাধ্য হয়ে চুনার দুর্গ হতে পালিয়ে নেপালের জঙ্গলে, হিমালয়ের পর্বত-কন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

রানী জিন্দনকে ভারত থেকে তাড়িয়ে ইংরেজরা বড় ভাল কাজ করেনি। সেইখানে রাজমাতা রাজদ্রোহীদের জন্য এমন একটি দুর্গম আশ্রয় তৈরি করে তুললেন যে বছর দশেক পরে নানাসাহেবও নাকি সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এসব গল্প আমি শুনেছি বিশুদ্ধানন্দজীর মুখে। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক জ্ঞানী লোক। কোন ধর্মের প্রতিই তাঁর কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। তিনি নিজে হিন্দু হয়েও শিখ-ধর্মের বিরুদ্ধে সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অন্যায় ব্যবহার সইতে পারেননি। আবার খৃীষ্টীয় মিশনারীদের এই অন্যায় অত্যাচার তিনি খৃীষ্টপন্থের অনুপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

অথচ মিশনারীদের দেওয়া একখানি বাইবেলে দলীপ সিংহের স্বাক্ষর ছিল। বাইবেলখানা কোনগতিকে একবার আমার হস্তগত হয়। একজন পাদরি আমাকে তা দিয়েছিলেন। বইখানা একদিন বিশুদ্ধানন্দ-জীকে দেখালাম। তাতে তিনি বললেন,

হায়, হায় ধর্মের নামে কি দুর্গতিই এ'রা করছেন। খ্রীষ্ট ছিলেন মহাপুরুষ। কী মহাপুরুষের কী সব অপূর্ব বাণী এদের হাতে পড়ে কী লাঞ্ছনাই পেয়েছে। তবে দোষ দেব কার। আমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতও তো এই নীচতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি।

আসলে সব ধর্মেই তো একই ভগবানের কথা। তিনিই জগৎ-পিতা, তিনিই জগন্মাতা। যিনি জগন্মাতার সেবক তিনি তাঁর সব সন্তানকেই সমান ভালবাসবেন। সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করবেন। কারণ সর্বধর্মে সর্বরূপে চলেছে তাঁরই উপাসনা।

"সর্বরূপময়ী দেবী
সর্বদেবীময়ং জগৎ।"

কথাটা হল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সারতত্ত্ব। সমস্ত শাক্ত শাস্ত্রে এই সত্যতাই নানা উপলক্ষে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দজীর মত বৈদান্তিকের মুখে এইরূপ শাক্তবাণী কেউ প্রত্যাশা করেননি।

আমরা তো তখন ছেলেমানুষ, কিন্তু তাঁর মুখে এই কথাটা অনেকের কাছেই একটু অপ্রত্যাশিত ঠেকল। তাঁর চারদিকে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলে একজন যোগমার্গী সাধক ছিলেন। সবাই তাঁকে শ্যাম সাধু বলে ডাকতেন। এই শ্যাম সাধু কিছুকাল পরে উৎকট যোগ-সাধনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারে নগ্ন হয়ে ঘুরতেন।

শ্যাম সাধু ছিলেন অতিশয় খাঁটি ও জ্ঞানী লোক। তাঁর মত মানুষ কেন ন্যাংটা ফেরেন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্যাম সাধু একবার বলেছিলেন, "সারা বাজার ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, পছন্দমত পাড়ই মেলেনি। এই পাড়ের শোকে কাপড়ই ছেড়ে দিয়েছি।"

যখন বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল, তখন পর্যন্ত তিনি কাপড়-পরা স্বাভাবিক মানুষ। যদিও দিনরাত্রি যোগমার্গে তাঁর তখন কঠিন সাধনা চলেছে।

শ্যাম সাধু বলে উঠলেন, "একি বাবা, আপনি বৈদান্তিক, মহাদার্শনিক। আপনার মুখে এসব চণ্ডী-তত্ত্ব কেন?" তাতে বিশুদ্ধানন্দজী বলেছিলেন, "বেদান্তেরও তো সেই একই কথা। তাঁরাও বলেন, 'সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম। সর্বম্ ব্রহ্মময়ং জগৎ'।" এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বললেন। তার সারতত্ত্ব হল এই,

"সর্বরূপময়ী দেবী, সর্বদেবীময়ং জগৎ।"

কথাটাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আরম্ভ করলেন মনোরম গল্প, বড় বড় গুণীরা যেমন গুরুগম্ভীর রাগিণী আলাপের পর বীণাযন্ত্রে তোলেন অতি মধুর সব গৎ, যাকে দক্ষিণ ভারতে বলে মুরলী।

বিশুদ্ধানন্দজী সারা হিমালয়ের গল্প করতেন। নেপালের পশ্চিম সীমা কালী নদীর থেকে পূর্ব সীমা ইলাম জেলা পর্যন্ত। কতস্থানে কত দেবী মন্দিরের কথা।

সেদিন একটি মন্দিরের কথা বললেন, যেখানে দেবীমূর্তি নগ্নপৃষ্ঠা। অর্থাৎ যেখানে দেবীর পৃষ্ঠে কোন বস্ত্রাবরণ নেই। পিঠের উপর লাল ডোরা ডোরা দাগ। দেবীর এই রূপের কথা জিজ্ঞেস করাতে সেখানকার বৃদ্ধেরা নাকি এক গল্প বলেছিলেন যে, সেখানে কোন কালে ছিল একটি ছোট রাজ্য। রাজা শাক্ত, দেবীপূজক। নবরাত্র অর্থাৎ শরৎকালের দুর্গাপূজার সময় এসেছে। সেবারে বড় দুর্ভিক্ষ। চারদিকে ভিক্ষুকের দল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় থেকে আরম্ভ করে কিরাতী, গুরুং, তামাং প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের সবাই দুটি অন্নের প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজা সেবারেও জাঁক করে পুজো করছেন। ভিক্ষুক ঠেকানো দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এক তামাং নারী তার ক্ষুধিত কটি সন্তান নিয়ে পূজা-মণ্ডপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলে কটি 'ভাত' 'ভাত' করে ব্যাকুল হয়ে মণ্ডপের মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছে আর পুরুত অস্থির হয়ে উঠেছেন। তামাংএর ছেলে পূজা-মণ্ডপে ঢুকলে সব পূজোই নষ্ট হয়ে যাবে।

থালা হতে দুটি ভাত মণ্ডপের মেঝেতে কখন পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার্ত ছেলে বাইরে থেকে ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে তাই খুঁটে মুখে দিয়েছে। হঠাৎ পুরুত দেখতে পেয়ে 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন।

রাজা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি রেগে আগুন হয়ে ছেলের মা'র পিঠে হাতের বেত (কোড়া) দিয়ে এমন কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন যে, মেয়েটির পিঠে রক্ত-মাখা দাগ বসে গেল। দরিদ্র মার পিঠে একটু বস্ত্রের আবরণও তো ছিল না।

চারদিকে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। পূজা-মণ্ডপের পাশেই ছোট নদী বা ঝরণা। তাতে ভোগের জন্য মাছ ধোওয়া হচ্ছিল। সেই মাছগুলোর মধ্যে একটা মাছ নাকি উচ্চস্বরে হা-হা করে হেসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল। যেন জানাল, "দুয়ারে এলেন মা, হায় হতভাগা, তবু চিনলিনে।"

এই অদ্ভুত ব্যাপারে সবাই বিস্মিত, স্তব্ধ। মাছের হাসি এক দারুণ দুর্লক্ষণ। রাজার মনেও ভাবনা জাগল, "এ কি হল?" সন্ধ্যারতির সময় পুরুত পূজামণ্ডপে ঢুকেই চমকে আতঙ্কে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "একি দেখলাম! দেবীরও পৃষ্ঠে আবরণ নেই। সারা পিঠে কোড়ার দাগ। সব দাগ বেয়ে রক্ত পড়ছে। এখন আরতি করি কেমন করে?"

রাজা রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন, "এ বছর দুর্ভিক্ষ, আমি আমার ক্ষুধার্ত ছেলেপিলে নিয়ে এসেছিলাম তোমাদের দুয়ারে। তোমাদের দয়া পেলাম না, পেলাম কোড়া!"

রাজা হাতজোড় করে বললেন, "বড় অপরাধ হয়েছে মাগো, চিনতে পারিনি। অবোধ সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়ো না। ক্ষমা কর, দয়া কর। আমাদের পূজা ব্যর্থ হতে দিও না।"

দেবী বললেন, "তথাস্তু। এই মন্দিরে চিরদিন দেবীর পূজা হবে নগ্ন-পৃষ্ঠে, কোড়ার রক্তমাখা দাগসহ। মনে যেন থাকে বাছা, আমিই সর্বরূপে তোমাদের দুয়ারে আসি। তোমাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করি। সেই দয়াই হল আসল পূজা। এইটুকু না থাকলে তোমাদের সব আড়ম্বর অর্থহীন, আর পূজা প্রাণহীন।" দেবী-পূজার সার তত্ত্ব হল যা চণ্ডীরও সার কথাঃ—

"সর্বরূপময়ী দেবী
সর্বদেবীময়ং জগৎ।"

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে 'ছিন্নপত্রে' গ্রথিত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর যে অসামান্যতা তা কবির ভাষাতেই বিবৃত করা যেতে পারে—

কলকাতা ৭ই অক্টোবর [১৮৯৪]

আমিও জানি, তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই ইচ্ছা করলেও তাদের এ সমস্ত দিতে পারিনে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোন কথা বুঝবিনে কিম্বা ভুল বুঝবি কিম্বা বিশ্বাস করবিনে কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই-জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই-রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভাল করে জানে না—আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সংগে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না—তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজ ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না—এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়।... আমি ত আরো অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, নানান্ লোকের নানান্ ধরণ নানান্ রকম-সকম...তারা নিজেও সমস্ত জিনিষ নিজের ধরণে দেখে এবং তাদের নিকটবর্তী সকলেও তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে—সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।...সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে—সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারিনে: কেবল গল্পগুজব আলাপপরিচয় হাসি-তামাসা নয়। বায়রণ মুরকে যে সমস্ত চিঠি-পত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রণের স্বভাব প্রকাশ পায়নি, মুরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে—সে সব চিঠি যত ভালই হোক্ তাতে বায়রণের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি, মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করেচে। যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—
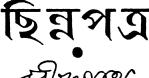
"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।"

—ছিন্নপত্রের ১২৬ সংখ্যক পত্রের অমুদ্রিত অংশ

ছিন্নপত্র

আর একখানি চিঠিতে কবি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

শিলাইদহ ১১ই মার্চ ১৮৯৫

...আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেই-গুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেকদিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি—সেগুলো বোধ হয় তোর বাক্সের মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবনসংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয় কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটি দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা যদি দীর্ঘ-কাল বাঁচি তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব—আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।—

এই চিঠিগুলি স্বহস্তে নকল করে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন, তা অংশতঃ ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

যে চিঠিগুলি সম্পূর্ণই বর্জিত হয়েছিল সেগুলি কিছুকাল পূর্বে শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত হয়ে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে চিঠিগুলি ছিন্নপত্রে আংশিক মুদ্রিত হয়েছে তার অমুদ্রিত অংশ ছিন্ন আকারেও সর্বসাধারণের সুখ-পাঠ্য হবে বিবেচনায়, সংকলিত এবং বিশ্ব-ভারতী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর অনুমোদন-ক্রমে প্রকাশিত হল; এরূপ আরো কতক-গুলি অংশ আছে। এগুলি ছিন্নপত্রের যে-সকল চিঠির অংশ, সেগুলির সঙ্গে মিলিয়ে যাঁরা পড়তে ইচ্ছুক তাঁদের জন্যে পত্রের সূচনায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিয়েছিল।' —'মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু...বিশাল বিশ্বের আয়োজন' প্রত্যক্ষ করবার জন্য 'পৃথিবীর কবি' তরুণ বয়স থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বারবার বিদেশ-পরিক্রমা করেছেন, কিন্তু কিছুকাল বিদেশবাসের পরেই, কর্তব্য **যতই থাকুক-না, আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে থাকুন বা শ্রদ্ধাপরায়ণ বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে থাকুন, স্বদেশে ফিরবার জন্য অন্তরের মধ্যে তীব্র** ব্যাকুলতা বোধ করতেন। **এই পত্রাংশ দ্বিতীয়বার বিলাত বাসকালে লিখিত।**

লণ্ডন। ৩ অক্টোবর [১৮৯০]

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারত-ভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়—এ দেশের মত তার এত ক্ষমতা এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালবাসে। আমার আজন্মকালের যা'-কিছু ভালবাসা, যা'-কিছু সুখ সমস্তই তার কোলের উপর আছে—এখানকার আকর্ষণ চাক্‌-চিক্য আমাকে কখনই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্য সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারি এক কোণে বসে মৌমাছির মত আপনার মৌচাকটি ভরে ভালবাসা সঞ্চয় করতে পারি তাহলেই আর কিছু চাইনে।

এই চিঠি লিখবার তিন দিন পরে, ৬ অক্টোবর, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারিতে লিখছেন—'এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছিনে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না।...আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি;...সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি সহজে ভালোবাসতে পারি।...অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।' —এক মাসের বিলাত-প্রবাস -(১০ সেপ্টেম্বর—৯ অক্টোবর ১৮৯০) **সমাপ্ত হল।**

দেশে ফিরবার পর **রবীন্দ্রনাথকে পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করতে হয়—ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির অধিকাংশ জমিদারি থেকেই লেখা। পরবর্তী পত্রাংশ দুটি জমিদারি পরিচালনাকালীন বিচিত্র** অভিজ্ঞতার বিবরণ—প্রথম চিঠিটি ছিন্নপত্র গ্রন্থের ১৭ সংখ্যক পত্রের **সূচনাংশ এবং দ্বিতীয়টি ২০ সংখ্যক পত্রের অংশ, 'কিন্তু তার কোনো** লক্ষণ নেই...উকুন বাচছে' বাক্যের পরবর্তী।

কালিগ্রাম [জানুয়ারি ১৮৯১]

আমি যখন তোকে চিঠি লিখতে সুরু করেছি তখন এখান-কার একজন আমলা তার দারিদ্র্যদুঃখ, বেতন বৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারি বক্‌বক্‌ করছিল—সে বকে যাচ্ছিল আর আমি লিখে যাচ্ছিলুম, শেষে এক জায়গায় থেমে তাকে সংক্ষেপে এইটুকু বুঝিয়ে দিলুম যে, বুদ্ধিমান লোক যখন কোন একটা প্রার্থনা পূরণ করে, তখন সেটা সঙ্গত বলেই করে, এক বারের জায়গায় পাঁচবার বলা হল বলে করে না। ভাবলুম এমন একটা সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথার পর সে লোকটা একেবারে নিরুত্তর হয়ে থাকবে—কিন্তু দেখলুম ফলে তার বিপরীত হয়ে দাঁড়াল; উল্টে সে আমাকে প্রশ্ন করলে, বাপমায়ের কাছে ছেলে যদি সকল কথা না বল্‌বে, তবে কার কাছে গিয়ে বল্‌বে? আমি উপস্থিতমত তার কোন সদুত্তর দিতে পারলুম না। পুনশ্চ সেও বকে যেতে লাগল আমিও লিখে যেতে লাগলুম। কোথাও কিছু নেই খামকা বাপ মা হয়ে বসার বিষম ল্যাঠা।

সাজাদপুর [ফেব্রুয়ারি ১৮৯১]

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোন মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোম্‌টায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারি ভিতর থেকে কাঁসির মত যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সঙ্কোচ কিম্বা কাকুতি-মিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে পুরো আবদার এবং পরিষ্কার তর্ক; স্পষ্ট করে বলে "নায়েব মশায় আমার সুক্ষ্ম বেচার করে না।" তাকে উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় কিছুই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারা যায় না—সে কেবলি বলে, "আমি ব্যাধবা, আমার নাবালক ছাওয়াল।" তার আর কোন উত্তর নেই। তার সঙ্গে তর্ক করব কি, আমার হাসি পায়। সে আবার আধখানা মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে আড়চোখে আড়চোখে আমার মুখের ভাব দেখে। দরবারের মধ্যে যেদিন একটা মেয়ে আসে সেদিন আসর সরগরম হয়ে ওঠে, পেয়াদার হাঁকডাক কমে যায়, অন্যান্য পুরুষ প্রার্থীদের নিজ নিজ নিবেদন জানাবার অবসর থাকে না।

এই চিঠিখানি ছিন্নপত্রের ৪৭ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ, কবির পারিবারিক জীবনের একটি সুমধুর অন্তরঙ্গ দৃশ্য।

বোলপুর। শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ [মে ১৮৯২]

এখানকার যত চাকরবাকর সব মন্দির সামলাতে ব্যস্ত পাছে সেই রঙিন্‌ কাঁচের বুদ্‌বুদ্‌টি ভেঙে চুরে ফেটে যায়। তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড় বড় পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে—কিন্তু ঝড়ের চোটে পর্দা কুটিকুটি হয়, দড়ি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে যায় পর্দার কাষ্ঠদণ্ডগুলো ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয় এবং সেইগুলো আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে মন্দিরের কাঁচ চুরমার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে একটা ঝড়ের সময় সেই পর্দার লাঠি খেয়ে মন্দিররক্ষকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। উপরে গিয়ে দেখি এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় আমার পুত্রটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝড়ের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌ল, আমি খোকাকে বল্লুম, খোকা, তোর গায়ে জলের ছাট লাগ্‌বে, এইখানে এসে চৌকিতে বোস্‌—খোকা তার মাকে ডেকে বল্‌লে, মা, তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি। বলে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগ্‌ল। খোকা যে চুপচাপ করে বসে বসে কি ভাবে এবং আপন মনে হাসে এবং মুখভঙ্গী করে এক এক সময় তার আভাস পাওয়া যায়—বোঝা যায়, সেও তার এই অতিক্ষুদ্র জীবনের যৎসামান্য গুটিকতক পূর্বস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দেখেছি এক এক সময়ে কোন কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে' বসে—বাবা শিলাইদয়ে নদী ছিল—না?—অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম। সেদিন ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা করছিল, আজ কি বার? ছোটবৌ বল্লেন, রবিবার। খোকা বল্লে, আজ তাহলে শিলাইদয়ে স্টীমার চল্‌চে না। সবচেয়ে খোকাতে রেণুতে যে রকম কাণ্ড চলে দেখ্‌তে বেশ লাগে। রেণু যদি দেখ্‌লে খোকা কোথাও চুপচাপ করে শুয়ে আছে অম্‌নি তার ঘাড়ের উপর পড়ে' তার মুখের উপর মুখ রেখে তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেয়—খোকা এম্‌নি স্নেহময় মিষ্টি করে তাকে রাণী রাণী বলে আদর করে এবং সমস্ত সহ্য করে! খোকাটাকে ঘুমোতে দেখ্‌লেই রেণু তাকে মারাপিট টানাটানি ঠেলাঠেলি করতে থাকে—খোকা তাকে অনুনয় করে' বলে, রাণী আমাকে একটু ঘুমোতে দে—কিন্তু যখন দেখে রেণু কিছুতেই তাকে ছাড়ে না, তখন উঠে বসে তার

সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করে, কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করে না। কিন্তু বোলির সঙ্গে ওদের দুজনের তেমন বিশেষ ভাব নেই—রেণু ত প্রায় সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বোলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। মনে হয় বোলির সঙ্গে যেন ওদের স্বভাবের মিল নেই—বোলিটা ওদের দলছাড়া।

ছিন্নপত্রের ৫১ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ। নির্জনতা সম্বন্ধে কবি যে-বাসনা এই চিঠিতে ও অন্যত্র (যথা, ৩০শে জুন [১৮৯৪] তারিখের চিঠিতে) প্রকাশ করেছেন, তা অবশ্য তাঁর জীবনে পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না, জনারণ্যের মধ্যেই তাঁকে একাকিত্বের সাধনা করতে হয়েছিল।

শিলাইদহ। সোমবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ [জুন ১৮৯২]

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটাকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাতপা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারিনে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক্,—কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন।......বোধহয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভাল ভাল সম্বন্ধ খুঁজে পেতে পারবেন—তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।

ছিন্নপত্রের ৫৭ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ—পূর্ব পত্রের 'মানুষের ঘনিষ্ঠতা' প্রসঙ্গের আভাস এই চিঠিতেও আছে।

শিলাইদহ। সোমবার ২২শে জুন [১৮৯২]

কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেচি। একটু আধটু বদলসদল হয়েছে—নাটকে আবার খুব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না—কাজটা অনেকটা চৌঘুড়ি হাঁকানোর মত—অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে যুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া—সুতরাং ওর মধ্যে একটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।......বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব জাগিয়ে রাখা সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই—দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ব-বহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ এবং প্রায় অসাধ্য বল্লেই হয়। পৃথিবীতে ছোটখাট আত্মীয়তা প্রতিদিন আস্‌চে এবং যাচ্চে—আমার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান বন্ধন কিছুই নেই—তাদের যেখানে সংসারের কেন্দ্র, তাদের গুরুতর সুখদুঃখ যার চারদিকে আবর্তিত হচ্চে আমার পক্ষে সে একরকম সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন স্থলে সকলরকম বাধা অতিক্রম করে পরস্পরকে টানাটানি করে রাখ্‌বার কি এমন অত্যাবশ্যক পড়েচে!

ত্রিংশোত্তীর্ণ কবি যে 'ছায়াময় শান্তিময় সঙ্গীতময় ছোট স্রোতের' জীবনের কল্পনা করছেন, যে 'একটুকু বাসা'র স্বপ্ন বার বার তাঁর কাব্যে দেখি—'এ বাসা আমার হয়নি বাধা, হবেও না'—একদিকে মর্মান্তিক আত্মীয়বিয়োগের বজ্রাঘাতে তাঁর গৃহ বিদীর্ণ, অপরদিকে তাঁকে নব নব কর্মভার গ্রহণ করে বৃহৎ জীবনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। —চিঠিখানি ছিন্নপত্রের ৫৮ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ।

সাজাদপুর। ২৮শে জুন [১৮৯২]

যা হোক্, মোদ্দা কথাটা হচ্চে, এবারে যখন কলকাতায় ফিরব, তখন মাঝে মাঝে অভির গান শুন্‌ব এবং তোরা সব বাজনা বাজাতে ইচ্ছে করবি আমাকে শ্রোতার মধ্যে গণ্য করে নিস্। এবারে কলকাতায় ফিরে কত কি যে করব তার ঠিক নেই—কাজ করব, গান করব, হাস্‌ব, গল্প করব, ভালবাস্‌ব, রাত্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নব সূর্যোদয়কে আনন্দে অভ্যর্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব—বিক্ষিপ্ত জীবনকে সংহত করে এনে বেশ একটি ছায়াময় শান্তিময় সঙ্গীতময় ছোট স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। লেখার চেয়ে করা কিঞ্চিৎ শক্ত কিন্তু সেই কঠিন হবে বলেই সুখ আছে।—

সাজাদপুরের যে পোস্ট-মাস্টারটিকে উপলক্ষ্য ক'রে পোস্ট-মাস্টার গল্পের রচনা, ছিন্নপত্রের ৬০ সংখ্যক চিঠিতে তাঁর প্রসঙ্গ আছে—'এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প ক'রে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ও'র আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে'—তার পরের অংশ—

সাজাদপুর। ২৯শে জুন [১৮৯২]

...তাই জন্যে খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।......তিনি আমাদের মুন্সেফ বাবুর গল্প করছিলেন, ব্যাপারটা শুনে এবং তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে হেসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কথাটা হচ্চে এই, মুন্সেফ বাবু হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে শিব দেখ্‌তে পেয়েচেন। প্রথম দিন দেখ্‌লেন শিব, তার পরদিন দেখ্‌লেন কালী, তার পরদিন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—সমস্ত বৈকুণ্ঠপুরী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাৎ নেবে এসেচে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বল্‌চেন—ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, দেখ্‌তে পাচ্চেন না ঐ চোখ, ঐ জিব্। যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে কাজেই দেখতে পাচ্চে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভর নেই, তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্চে না। আমাদের পোস্ট-মাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁটাল দিয়ে ঠাকরুণের ভোগ হয় সেইদিন তিনি দেখ্‌তে পান—কিন্তু ক্ষীরটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কোন্‌টাকে চোখ বল্‌ছিলেন মশায়? মুন্সেফ বলেন, দেখ্‌তে পাচ্চেন না? ঐ যে ঐ উপরে!—পোস্টমাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলুম।—কোনদিন বা মুন্সেফ তাঁকে বলেন—আচ্ছা মশায়, আপনি ওটা কি লক্ষ্য করে দেখেছিলেন, আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌বামাত্র কি যেন একটা গাছের উপর এসে বস্‌ল! আর উপর থেকে দুচার ফোঁটা জল পড়ল!—পোস্টমাস্টার ভালমানুষের মত মুখ করে উত্তর দেন—আজ্ঞে হাঁ—গাছটা নড়েছিল বটে। সে গাছটার চারদিক বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে—মুন্সেফ সেখানে দু বেলা পুজো দিচ্চেন, শাঁখ ঘণ্টা বাজ্‌চে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে বসে গাঁজা টানচে এবং চোখ বুজে বল্‌চে ঐ কালী মায়ীকে দেখ্‌তে পাচ্চি! এক-একটা লোক আবার সেখানে গিয়ে মূর্ছা যায় এবং মূর্ছিত অবস্থায় দৈববাণী বল্‌তে থাকে। বিবিধ প্রকার বুজরুকি হতে আরম্ভ হয়েচে। পোস্টমাস্টার বল্‌ছিলেন, আপনাদের জমিদারীতে ম্যাজিস্ট্রেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগুলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন, আপনার উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা। আমিও মনে করচি একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক, কিছুদিন এই হুজুকটা চল্লে সাজাদপুর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে।

বিপৎকালে, এমন কি প্রাণের আশংকা থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ধৈর্য ও স্থিরবুদ্ধির একাধিক দৃষ্টান্ত আছে—ছিন্নপত্রের ৬২ সংখ্যক পত্রে তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়—এই চিঠিখানি তার

স্কেচ

(রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র 'নীতু'র প্রতিকৃতি)

শিল্পী

শ্রীনন্দলাল বসু

স্কেচ— শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

শেষাংশ। পরবর্তী 'সাজাদপুর পথে। শুক্রবার। [জুলাই ১৮৯৪]' চিহ্নিত পত্রাংশেও প্রকৃতির পরিহাসের কিছু বিবরণ আছে।

শিলাইদহ। ২০শে জুলাই [১৮৯২]

আমি যখন অন্য নৌকোয় চড়ে ডাঙগায় এসেছি তখনও বোটটা যায় যায়—সৌভাগ্যক্রমে ডাঙগার এতটা কাছাকাছি এসেছিল যে কারো ডোব্‌বার সম্ভাবনা ছিল না—কিন্তু বোটটা যেত এবং সেই সঙ্গে আমার খাতাগুলো এবং অন্যান্য লেখাগুলো যেত। মাঝিরা বল্‌চে এ যাত্রাটাই ভাল নয়—তিনবার এই রকম হল—কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তোলবার সময় দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে যায় আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মাঝি মারা পড়ত, তার পরে সেই পাণ্টির খালের মধ্যে বটগাছে মাস্তুল বেধে গিয়েছিল সেও যে নিতান্ত কম বিপদ হয়েছিল তা নয়, সেখানে স্রোতের খুব তীব্র বেগ ছিল—তার পরে এই ব্রিজ-বিভ্রাট। আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্চে খুব সঙ্কটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছুমাত্র হাঁউমাউ করিনি, বুদ্ধি স্থির ছিল। মাস্তুলটা যে কি রকম ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়বে তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলুম—মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিলুম তার কোনটাই অসঙ্গত হয়নি। উঃ, তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা কি রকম হ'ত!—

ছিন্নপত্রের ৯৭ সংখ্যক পত্রে কবি প্রসঙ্গক্রমে লিখছেন—'বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে একরকম শ্রীহীনত্ব আছে, তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়'—এই পত্রের শেষাংশ—

পতিসর। রবিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৪]

ব-কে দেখলেও আমার ঐরকম একটা সসম্ভ্রম করুণার উদয় হয়—ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত, অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়। সব পুরুষ বেঠোভেন কিম্বা ব- নয়, এবং বেঠোভেন ও ব-কে যে মেয়েরা ভালবাসে তাও নয়—কিন্তু ওঁদের মধ্যে আমি খুব একটা সৌন্দর্য দেখতে পাই। সাধারণতঃ পুরুষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড অসহায়তা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়বুদ্ধিত্ব মিশল আছে বলে তাদের প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃস্নেহের উদ্রেক হয়। আমার বোধ হয় ছেলেরা যত বেশি মাতৃস্নেহ জাগ্রত করতে পারে এমন মেয়েরা নয়। যাহোক এসব কথা অনেকটা আনুমানিক—নিজের প্রকৃতির মধ্যে যে একটা মেয়েলি অংশ আছে তারই কাছ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়।

ছিন্নপত্রের ১০৪ সংখ্যক পত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরবর্তী অংশ—

শিলাইদহ। ২৪শে জুন [১৮৯৪]

কেবল তোর চিঠি পাওয়ার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে যে আমার এত কথা মনে হল তা নয়—থেকে থেকে এই কথাটা আমার মনে হয়, এবং জীবনের তীব্রতম সুখদুঃখবাসনাও যে স্থায়ী নয় এ কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে ভারি কষ্ট হয়। এর একটা উত্তর এই যে, সুখদুঃখ স্থায়ী না হোক তার ফল স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে আমাকে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে ফলভোগ কেন করাচ্চে? মানুষকে এসব মিথ্যা আশ্বাস কে দিয়েছে যে, প্রেম মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে, যে মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজে সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প রচনা করে নিজে সান্ত্বনা লাভ করচে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ পত্রের শেষাংশ—

...সত্য এবং সুন্দরকে মানুষ মাঝে মাঝে পৃথক করে নেয়—Science সত্য থেকে সুন্দরকে বাদ দেয় এবং কাব্য সুন্দরকে সত্য হিসাবে খাতির করে না। Science-এ যে সৌন্দর্য পাওয়া যায়, সেটা হচ্চে সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য—কাব্যে যে সত্য পাওয়া যায়, সেটা হচ্চে সৌন্দর্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সত্য। স্থান অল্প বলে তুই এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।

ছিন্নপত্রের ১০৭ সংখ্যক পত্রে শিলাইদহে নির্জনবাস-প্রসঙ্গে কবি বলছেন—'আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানা-ঘরের মতো; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে—কেউ যখন বাইরে থেকে আসে তখন...কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে আমার অবসরের তাঁতে চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্‌পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন।' এই পত্রের সূচনাংশ—

শিলাইদহ। শনিবার ৩০শে জুন [১৮৯৪]

আমি মনে করেছিলুম, সমস্ত গোলমাল একদিনে সেরে ফেলাই ভাল। নির্জনতার একটা প্রোগ্রাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়, তখন তার অখণ্ড সম্পূর্ণতাটুকু মাঝে মাঝে ভাঙতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না—কেননা একবার একদিনের মতও ভেঙে গেলে আবার তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বরঞ্চ প্রথম দিনকতক মনটা যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না বলে উড়ু উড়ু করতে থাকে তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়। এখন আমি আমার কাজের অবসরগুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি—সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারি একটা গোলযোগ বেধে যায়। কল্পনা জীবটি হরিণীর মত ভীরুস্বভাব, প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়, তার পর আবার যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তাহলে কিছুকালের মত আবার তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেইজন্যে আমার এই নির্জন রাজ্যে, যেখানে আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে, হয়, এমন লোক আসুক যে আমার কল্পনার চেয়ে প্রিয়, নয়, এমন লোক আসুক যার প্রতি আমার মনোনিবেশ করবার তিলমাত্র আবশ্যক নেই। এর মাঝামাঝি হলেই মুস্কিল।

'যখন স্টেশনে তাঁকে [অতিথিকে] পৌঁছে দিয়ে আবার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই কত লোকসান হয়েছে।'—এই বাক্যের পরবর্তী অংশ—

আমি ঠিক কি রকম ভাবে আমার জীবনটিকে রচনা করছি অন্যলোকে তা কি করে বুঝবে। যখন অন্য লোকের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে রচনা করে থাকি—তখন পরস্পরের জন্যে যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই, এমন কি নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ একলা থাকি—আমার সম্পূর্ণ "আমি" কারো জন্যে কোন মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে—অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিষ নির্ভয়ে চারিদিকে বিছিয়ে দেয়—সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।

পল্লীবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই পত্রাংশে বর্ণিত হয়েছে—ছিন্নপত্রের ১০৮ সংখ্যক পত্রের সূচনাংশ—

সাহাজাদপুর পথে। শুক্রবার। [জুলাই ১৮৯৪]

আমি এখন পথে। কাল যখন দুপুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বল্লে, ধর্মাবতার আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকালবেলা ছাড়লে ভাল হয়।" আমি তার কারণ জিজ্ঞাস্য করাতে বল্লে, ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড় অযাত্রা। আমি বল্লুম, আমি প্রমাণ করে দেব, আজ যাত্রা শুভ—আমি নির্বিঘ্নে সাজাদপুর পোঁছব। এই বলে গ্রহতারাতিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম। পথে স্থানে স্থানে পদ্মার ভয়ানক স্রোত—জল ঘুরে ঘুরে ফুলে ফুলে ডাঙার উপর গিয়ে ঠেসে পড়চে—বোট কিছুতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থর্ থর্ করে কাঁপে, যারা গুণ টানচে তারা সকলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না—আমি ভাবলুম, গ্রহতারাতিথি এইবার বুঝি আমার নাকের উপর তুড়ি দিচ্ছে। খানিকটা দূর গিয়ে গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম, তখন পাল পাওয়া গেল—তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতে লাগলুম। বিকেলে পাঁচটা ছটা বেলায় ইছামতী নদীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল।......

ছিন্নপত্রের উক্ত চিঠির শেষাংশে, রচনা বা ভাবপ্রবাহ 'কথায় তর্জমা' প্রসংগে শেষে কবি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন—

সেইজন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয়নি। হয়ত আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মত প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

এই ভাবের কথা অন্যত্রও আছে—অনুরূপ কথা আছে, পরে মুদ্রিত ৮ই আগস্ট [১৮৯৪] তারিখের পত্রাংশে—'আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারিনি—যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারিনে।'

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি সম্বন্ধে কবির মন্তব্য আছে নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে—ছিন্নপত্রের ১০৯ সংখ্যক চিঠির শেষাংশ।

সাহাজাদপুর পথে। ৭ই জুলাই [১৮৯৪]

লেখবার বাসনা ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধ স্যাঁৎসেতে অবস্থায় লেখা হয় না।—আমি ভাবছিলুম, এই সংকীর্ণ বাঁকা ইছামতীর ভিতর দিয়ে আমি যতবার গেছি, তোকে রোজ চিঠি লিখেছি—এবারেও লিখছি। আমার মফস্বলের চিঠিগুলো ঠিক সেই একই স্থান একই দৃশ্য একই অবস্থার মধ্যে বারম্বার লেখা—সবগুলো মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় কতই যে পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় তার আর সংখ্যা নেই। বোধহয় কতবার অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছি। কলকাতায় থাকলে নিত্য নতুন কথা বলা সহজ—কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটি মাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং স্বয়ং আমি—এই দুটি বিষয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক—এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই কিন্তু মানুষের পএন্ট অফ ভিয়ু এবং প্রকাশ করবার ভাষা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—কাজেই সহস্রবার পুনরুক্তি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বারম্বার একই কথা শুনে শুনে তোর বোধ হয় আমার মফস্বলের মনের ভাব এবং দৈনিক জীবন একরকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে—তুই বোধহয় অনায়াসে আমার মফস্বলের চিঠি জাল করে লিখতে পারিস্। এবারে যদি বৃষ্টি না হয়ে রৌদ্র হত, এবং জানলার কাছে বসে সমস্ত দিন নদীতীরের দৃশ্য দেখতে পেতুম, তাহলে নিশ্চয় এই বাঁকা নদী সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখতুম, যা পূর্বে নিদেন চারবার লিখেছি, এবং মনে করতুম যেন এসব কথা এই প্রথম লিখ্‌চি। কেবল তাই নয় মনে হত, ইছামতী নদীতীর দেখে আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক যেমন আমার কাছে তেমনি তোর কাছে একটা অসামান্য মস্ত খবর সেটাকে ঠিক যথার্থভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা, সেটাকে দুর্গম মনোরাজ্য থেকে সমূলে সংগ্রহ করা এবং আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যক কাজ। আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাতলেখক তারা পাগলের রূপান্তর। আমার সেটা অনেকটা ঠিক বোধহয়—মনের ভাব ব্যক্ত করতে না পারলে দুঃখ অনুভব করা এটা একটা পাগলামী মাত্র।..যারা সম্পূর্ণ অথবা বারো আনা পাগল তারা নিজের পাগলামী বুঝতে পারে না। আমি জানি আমার এক অংশ পাগল—যতই ইচ্ছা করি চেষ্টা করি আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না, আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে •আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।

ছিন্নপত্রের ১১২ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ—

শিলাইদহ। ৮ই অগস্ট [১৮৯৪]

আমাদের দুটো জীবন আছে একটা মনুষ্যলোকে আর একটা ভাবলোকে—সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেক-গুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই তখনি সেগুলি চোখে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি—আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারিনি—যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারিনে; কারণ, ভাষা ত কেবল আমার একলার নয়—ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জন্য—আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি, সাধারণ তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় না।

'জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান' (ছিন্নপত্র, ৮০)—এই কথার প্রতিধ্বনি পাই নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে—১১৫ সংখ্যক পত্রের সূচনায়।

শিলাইদহ। ১৩ই অগস্ট [১৮৯৪]

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরয় যা তুচ্ছ, যা কেবল-মাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্য লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি—আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারিনে।

বাংলাদেশের নদীতীর, মাঠ ও শরতের দৃশ্য কবিকে কিভাবে মুগ্ধ করত, তার আভাস পাই ছিন্নপত্রের ১২২ সংখ্যক পত্রে—তার সূচনাংশ—

বোয়ালিয়া পথে। ২২শে সেপ্টেম্বর [১৮৯৪]

আজ চতুর্দিক নির্মল হয়ে ভারি সুন্দর রোদ উঠেছে। ছোট নদী, সুতীব্র স্রোত, তারি প্রতিকূলে গুণ টেনে চলাতে ক্রমাগত কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দ কানে আসচে। এতদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর আজ শরতের নবীন রৌদ্রে নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রামগুলি এমন একটি আরাম-পুলকের ভাব প্রকাশ করচে! আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে দুর্দিনের স্মৃতি সমস্ত একেবারে মুছে গেছে। যেন জগতে কোনকালেই আনন্দের অবসান ছিল না। এই আকাশভরা

সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে—সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্যের মত দেখাচ্চে।

ঐ চিঠির শেষাংশে—

আমি সেইজন্যে পর্বতের চেয়ে সমুদ্রতীর ঢের বেশি ভালবাসি—পুরীতে যেদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম—একদিকে ধূসর বালি ধূ ধূ করচে, আর একদিকে গাঢ় নীল সমুদ্র এবং পাণ্ডু নীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে—সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কিরকম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারি ইচ্ছে হয়েছিল—পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ছোট বাড়ি তৈরি করে পড়ে থাকি—এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জন শব্দ দূর স্বপ্নের মত কানে এসে লাগে। সন্ন্যাসীরা যেমন করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তাহলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম। কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর—মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

ছিন্নপত্রের ১২৩ সংখ্যক পত্রে কবি সুখদুঃখতত্ত্ব আলোচনা করে বলেছেন—'সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম, সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়।...আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখদুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে।' এই পত্রের শেষাংশ—

বোয়ালিয়া। সোমবার ২৪শে সেপ্টেম্বর [১৮৯৪]

কিন্তু সংসারের সর্বত্রই ক্ষতিপূরণের একটা নিয়ম আছে, যাকে বলে Law of Compensation। প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়। যারা অনুভবশক্তির জড়ত্ববশত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিক জীবনের সন্তোষসুখে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য, তারা সেটাকে কবিতার অলঙ্কার বলে জ্ঞান করে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য, যে সুখ সাংসারিক সুখ নয় এবং যে দুঃখ সাংসারিক দুঃখ সেইটেকে পরিত্যাগ করে চলাই জীবনযাত্রার আদর্শ বলে জ্ঞান করে এবং কারো সাধ্য নেই তাদের মনে এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি জন্মিয়ে দেওয়া, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, যারা অত্যন্ত বৃহৎ দুঃখের দ্বারা দুঃখ পাচ্চে তারাও তোমার মত কৃপাপাত্র নয়। আমি আমার ভাবটা ঠিক পরিষ্কার করতে পেরেচি কিনা জানিনে—আমাদের মনের যেগুলো যথার্থ কথা সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে, যে অন্যের কাছে তাদের ঠিক পরিদৃশ্যমান করে তোলা, ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা ভারি কঠিন বলে মনে হয়—সেইজন্যে গোড়ায় চেষ্টা করতেই ভয় হয়। যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য, যা আমাদের জীবনের মর্মস্থলে বিরাজ করে—তাকে আমরা নানা আকারে নানা কথায় নানা কাজে অজ্ঞাতসারে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করি—কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে তাকে অন্যের কাছে, এমন কি, নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড় শক্ত—ভয় হয়, পাছে যে জিনিসটা অন্তঃকরণের পক্ষে একান্ত সত্য, সেইটেই বাইরে বেরতে গেলে কাল্পনিক বেশ ধারণ করে আসে।

১২৪ সংখ্যক পত্রের শেষে কবি লিখছেন 'এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।' —তার অনুবৃত্তি—

বোয়ালিয়া। ২৫শে সেপ্টেম্বর [১৮৯৪]

কৃতকার্য হয়েছি কিনা জানিনে—কারণ, প্রকাশ হওয়া লেখকের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না পাঠকের অভিজ্ঞতার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কিছুদিন হল তোর একখানি চিঠিতে এই অন্তরজীবনের প্রকাশ দেখে আমি ভারি খুসি হয়েছিলুম—নিশ্চয় তুই অনেক সময় তোর নিজের ভিতরকার এই যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিস্, কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে প্রকাশ করতে চাস্‌নে—তোর সন্দেহ হয় যে, এক-এক দিনের সেই ভাবটাই সত্য, না, প্রতিদিনের তুচ্ছতাই সত্য। সেরকম সন্দেহ করিসনে। কারণ, সত্যকে সন্দেহ করলে অনেক সময় সত্যকে নষ্ট করা হয়। যে সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড় বলে অনুভব করি সেই মুহূর্তগুলিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য করে ভবিষ্যতে পথ প্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সৌন্দর্যউজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে—সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মত থাক্‌ত, ক্রমশ এমন দৃঢ় বিশ্বাস এমন সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ত না। অনেকদিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠ্চে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।

১২৫ সংখ্যক পত্রে দুর্গোৎসব-প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি—পত্রের শেষাংশ—

কলকাতা। ৫ই অক্টোবর [১৮৯৪]

তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তারপর আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালবাসি অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষমাত্র—কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র আমার কাছে সেই শব্দ সঙ্গীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে "মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব একরকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল—কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাংলা দেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে' আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

১২৭ সংখ্যক পত্রের উল্লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে—পত্রের শেষাংশ—

বোলপুর। শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর [১৮৯৪]

ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেইজন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে। এক জায়গায় পাহাড় থেকে হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে এসে পড়ে লোকটার মনে "sensation of the desert" বলে একটা ভাবের উদয় হয়েছিল—সেইখানে সে বলেছে পাহাড় পর্বতের চেয়ে এইরকম প্রশস্ত মরুভূমি তার লাগে ভাল।

"Solitude is a true balm, which heals up the many wounds that the chances of life have inflicted; its monotony has a calming effect upon nerves made over-sensitve from having vibrated too much; its pure air acts as a douche which drives petty ideas out of the head. In the desert too, the mind sees more clearly, and mental processes are carried on more easily."

মন যখন সংসারক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে থাকে তখন সে আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করে অনেকটা ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু সে যখন বিশ্রাম করতে চায়, তখন তাকে শয়ন করাবার জন্যে দিক হতে দিগন্ত পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি শয্যা বিছিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে—তখন সে একা একটি দেশ জুড়ে পড়ে থাকতে চায়—তখন সমস্ত সহর ঘুরে সে আর জায়গা খুঁজে পায় না, অবারিত আকাশ এবং প্রান্তর এবং সমুদ্র না হলে তার আর চলে না। কোন ইংরাজ ভ্রমণকারী এই sensation of the desert-কে ঠিক সুখকর বলে মনে করত কি না আমি সন্দেহ করি। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের যতগুলো বই পড়েছি প্রায় সবগুলিতেই তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতি এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারো উপর করেন নি।

শিলাইদহের কয়েকটি সুন্দর সকাল ও সন্ধ্যার চিত্র—

শিলাইদহ। ১৪ই ডিসেম্বর অক্টোবর [১৮৯৪]

আজ মনে করলুম সকালবেলায় চরের উপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি—কিন্তু কুয়াশা দেখে পিছিয়ে আসা গেল। আকাশেও কালপরশুকার মত অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসচে। কাল কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় এই মেঘের টুকরো-গুলোতে সন্ধ্যার আভা লেগে কি যে চমৎকার দেখতে হয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। পশ্চিম দিকের এক জায়গায় ছোট ছোট কোঁচানো কোঁকড়ানো মেঘ সোনালি হয়ে উঠে এক নতুনরকম শোভা ধারণ করেছিল। কত রকমেরই যে রং চতুর্দ্দিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মত সুবিখ্যাত রংকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধৃষ্টতা-মাত্র। কেবল আকাশে নয়, পদ্মার জলে এবং বালির চরেও কাল হঠাৎ রঙের ইন্দ্রজাল লেগে গিয়েছিল। আবার নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল—সেইজন্যে সমস্ত নদীতে সূর্য্যরশ্মির সমস্ত বর্ণের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য্য স্পন্দন হচ্ছিল যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আবার পদ্মার মাঝে মাঝে যে সকল জায়গায় জলের নীচে চর পড়েচে সে জায়গায় জল শান্ত ছিল—সেইসব স্থির জলে পরিষ্কার সোনার লাবণ্য একেবারে মসৃণ তরল উজ্জ্বল কোমল নির্মল হয়ে পড়েছিল—চারিদিকে বিচিত্র রংয়ের বিচিত্র নৃত্যের মাঝে মাঝে সেই স্থির বিষণ্ণ সূর্য্যাস্তের নিশ্চল আভা অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তার পরে আবার বালির চরের উপরেও সূর্য্যাস্তের বিচিত্র তুলি পড়েছিল।

শিলাইদহ। ১৮ই ফেব্রুয়ারি [১৮৯৫]

আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে—নিতান্ত বাজে কাজ—এরকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায় ...

এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল—তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চীৎ হয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে একটি কাব্য পাঠ করচে—ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে—ওকে বোধহয় ধরে পিটুলেও "দেওয়ান গোবিন্দরামের" সমালোচনা করতে বসতে পারে না।

শিলাইদহ। ২৩শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৫]

এইবার বসন্তকালটা পড়ল। এই সময়টা যদি আমার কোন দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত, যদি বন্ধনমুক্ত থাকতুম, তাহলে বেশ হত—তাহলে কল্পনার রাশ ঢিলে করে দিয়ে পূর্ণ অবসরের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারতুম —বড় আরামে জানলাটির কাছে গিয়ে বসতুম—এবং লেখা, পড়া, ভাবনা সবই বেশ ভরপুরভাবে হতে পারত।

শিলাইদহ। বুধবার ১৬ই ফাল্গুন ১৩০১ [মার্চ ১৮৯৫]

কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি। দুপুর বেলাটিও খুব নিস্তব্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে—খুব ছেলেবেলায় ইস্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জ্জন ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাড়িগুলোর শূন্য নিস্তব্ধ ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদূর আকাশের চীলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে যেরকম মন-কেমন করতে থাকত আজও ঠিক সেইরকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে।...

আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার পুকুরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়চে—তখন ই—খুব ছোট ছিল —সেও আমাদের দলের একটি ছিল—তোষাখানার সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি থেকে সেই ই—কোথায় কতদূরে চলে গেছে—আমিও আর এক লাইনে বহুদূরে এসেছি—তারপরে এমনি করে লাইন যদি বরাবর সোজা টেনে চলা যায় তাহলে সেই দক্ষিণদ্বারী যোড়াসাঁকোর তোষাখানার ঘর থেকে কোন রহস্যান্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তার ঠিকানা নেই।

ছোট বৌ = সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী
বেলি = জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবী
রেণু, রাণী = মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবী
খোকা = জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ
অভি = ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা দেবী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত
বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

নীলতারা

পরশুরাম

যাট বৎসর আগেকার কথা, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল। তখন কলকাতায় বিজলী বাতি মোটর গাড়ি রেডিও লাউড স্পীকার ছিল না, আকাশে এয়ারোপ্লেন উড়ত না, রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত হন নি, লোকে হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলত। কিন্তু রাখাল মাষ্টার মনে করত সে আরও উঁচু দরের কবি, হতাশের আক্ষেপের চাইতেও ভাল কবিতা লিখতে পারে। সে তার অনুগত ছাত্র নারানকে বলত, আজ কি একখানা লিখেছি শুনবি?—ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলি মাখে গায়। আর একটা শুনবি?—শুষ্ক বৃক্ষে ঝটিকার প্রভাব কোথায়। আর কেউ পারে এমন লিখতে?

রাখাল মুস্তৌফী শুধু এনট্রান্স পাস, কিন্তু বিদ্বান লোক, বিস্তর বাংলা ইংরেজী বই পড়েছিল। সেকালে বেশী পাস না করলেও মাষ্টারি করা চলত। কবিতা রচনা ছাড়া গান বাজনা আর দাবা খেলাতেও তার শখ ছিল। প্রথম বয়সে রাখাল বেহালা জুবিলি হাইস্কুলের থার্ড মাষ্টারি করত, তার পর দৈবক্রমে রূপচাঁদপুরের রাজাবাহাদুর রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর সুনজরে পড়ে দু বৎসর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিল। কোনও কারণে সে চাকরি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়। তার পর দশ বৎসর কেটে গেছে, এখন রাখাল বেহালায় তার পৈতৃক বাড়িতেই থাকে এবং আবার জুবিলি স্কুলে মাষ্টারি করছে।

যখনকার কথা বলছি তখন রাখালের বয়স প্রায় তেত্রিশ। সুপুরুষ, কিন্তু চেহারার যত্ন নেয় না, উস্কখুস্ক চুল, দাড়ি কামায় না, তাতে একটু পাকও ধরেছে। পাড়ার লোকে বলে পাগলা মাষ্টার। সেকালে লোকে অল্প বয়সে বিবাহ করত, কিন্তু রাখাল এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে সে একাই থাকে, তার মা দু বৎসর আগে মারা গেছেন।

রবিবার, সকাল আটটা। রাখাল তার বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা তক্তপোশে বসে হুঁকো টানছে আর কবিতা লিখছে। বাড়ি থেকে প্রায় এক শ গজ দূরে একটা আধপাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। রাখাল দেখতে পেল, একটা ভাড়াটে ফিটন গাড়ি এসে থামল, তা থেকে দুজন সাহেব আর একজন বাঙালী নামল। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, আরোহীরা হনহন করে রাখালের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

সাহেবদের একজন লম্বা রোগা, গোঁফদাড়ি নেই, গাল একটু তোবড়া, সামনের চুল কমে যাওয়ায় কপাল প্রশস্ত দেখাচ্ছে। অন্য জন মাঝারি আকারের, দোহারা গড়ন, গোঁফ আছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁদের বাঙালী সঙ্গীটি কালো, পাকাটে মজবুত গড়ন, চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফের ডগা পাক দেওয়া, পরনে ধুতি আর সাদা ড্রিলের কোট। রাখাল হুঁকোটি রেখে অবাক হয়ে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল।

কাছে এসে লম্বা সাহেব হ্যাট খুলে বললেন, গুড মর্নিং সার। অন্য সাহেব হ্যাট না খুলেই বললেন, গুড মর্নিং বাবু। তাঁদের বাঙালী সঙ্গী নীরবে রইলেন।

রাখাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে বলল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং সার। ভেরি সরি, আমার বাড়িতে চেয়ার নেই, দয়া করে এই তক্তপোশে—এই উড্‌ন প্ল্যাটফর্মে বসুন।

লম্বা বললেন, দ্যাট্‌স অল রাইট, আমরা বসছি, আপনিও বসুন। মিস্টার রাখাল মুস্তৌফীর সঙ্গেই কি কথা বলছি?

—আজ্ঞে হাঁ।

দুই সাহেব নিজের নিজের কার্ড রাখালকে দিয়ে তক্তপোশে বসলেন, রাখালও বসল। আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন, সাহেবের সঙ্গে একাসনে বসতে তিনি পারেন না।

গুফো সাহেব মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, এই বেঙ্গলী বাবু হচ্ছেন আমাদের দোভাষী বাঞ্ছারাম খাঞ্জা। বোধ হয় এ'র দরকার হবে না, আপনি ইংরেজী জানেন দেখছি, আমরা সরাসরি আলাপ করতে পারব। ওয়েল মুস্তোফী বাবু, আমার এই ফেমস ফ্রেন্ডের নাম আপনি শুনেছেন বোধ হয় ?

কার্ড দুটো ভাল করে পড়ে রাখাল বলল, আজ্ঞে শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না, ভেরি সরি।

—কি আশ্চর্য, আপনি তো একজন শিক্ষিত লোক, স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে এ'র কথা পড়েন নি?

—পুওর ম্যান সার, স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন কোথা পাব ? শুধু বঙ্গবাসী জন্মভূমি আর মাঝে মাঝে হিন্দু পেট্রিয়ট পড়ি।

—ইংরেজী গল্পের বই পড়েন না ?

—তা অনেক পড়েছি, স্কট ডিকেন্স লীটন জর্জ ইলিয়ট আমার পড়া আছে।

—ক্রাইম স্টোরিজ পড়েন না ?

—রেনল্ড্‌সের বিস্তর নভেল পড়েছি, মায় মিস্ট্রিজ অভ দি কোর্ট অভ লন্ডন।

—ফর শেম মুস্তোফী বাবু! ওর বই ছুঁতে নেই, দেশদ্রোহী বজ্জাত লোক।

—তিনি কি করেছেন সার ?

—সে লিখেছে, ফ্রেঞ্চ জাতি সবচেয়ে সভ্য, নেপোলিয়নের মতন গ্রেট ম্যান জন্মায় নি, আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এতই অপদার্থ যে যত সব জার্মান বদমাশ ধরে এনে আমাদের রাজকুমারীদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। যাক সে কথা। তা হলে আমার এই বিখ্যাত বন্ধু সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না ?

রাখাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, শুধু এইটুকু জানি, ইনি এই প্রথম এদেশে এসেছেন, কিন্তু আপনি নতুন আসেন নি।

লম্বা সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, দ্যাট্‌স ফাইন! আর কি জানেন মিস্টার মুস্তোফী ?

—কাল রাত্রে আপনাদের ভাল ঘুম হয় নি।

—ভেরি ভেরি গুড! আর কি জানেন ?

—আপনারা কাল লংকা খেয়েছিলেন।

—লংকা? ইউ মীন সীলোন, আইল্যান্ড অভ রাবণ?

—আজ্ঞে সে লংকা নয়। হিন্দী নাম মিরচাই, ইংরিজী নামটা মনে আসছে না। রেড অ্যান্ড গ্রীন পড—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে, চিলি, রেড পেপার, ক্যাপ্‌সিকম, ভেরি হট স্পাইস।

লম্বা সাহেব তাঁর বন্ধুকে বললেন, ওহে ওআটসন, দেখছ তো, সায়েন্স অভ ডিডক্‌শন এই বেঙ্গলী জেন্টলম্যান ভালই জানেন। নাঃ, এদেশে শারলক হোম্‌সের পসার হবে না।

ওআটসন বললেন, মুস্তোফী বাবু আপনি কি ইয়োগা প্র্যাকটিস করেন?

রাখাল বলল, যোগশাস্ত্র? না, তা আমার জানা নেই। আমার বাবা কবিরাজি করতেন—ইন্ডিয়ান সিস্টেম অভ মেডিসিন, তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু শিখেছি। সমস্ত লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে কারণ অনুমান করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ওআটসন প্রশ্ন করলেন, কাল রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় নি তা বুঝলেন কি করে?

শারলক হোম্‌স বললেন, এলিমেন্টারি ওআটসন, অতি সহজ। আমাদের মুখে মশার কামড়ের দাগ রয়েছে। আমরা মশারির মধ্যে শুই নি, পাংখাপুলারও মাঝরাত্রে পালিয়েছিল। কিন্তু আর দুটো বিষয় টের পেলেন কি করে ?

রাখাল বলল, খুব সহজে। আপনি এসেই টুপি খুলে আমাকে 'সার' বললেন। অভিজ্ঞ সাহেবরা সামান্য নেটিভকে এত খাতির করে না। এতে বুঝলাম আপনি এই প্রথমবার বিলাত থেকে এসেছেন। ডক্টর ওআটসন টুপি খোলেন নি, আমাকে 'বাবু' বললেন, তাতে বুঝলাম ইনি পাক্কা সাহেব, নতুন আসেন নি, এদেশের দস্তুর জানেন।

—লংকা খাওয়া জানলেন কি করে?

—আপনার আঙুলে তামাকের রং ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সিগারেট সিগার বা পাইপ টানেন। ডক্টর ওআটসনের মুখে সিগারেট ছিল, কিন্তু আপনার ছিল না। আপনি মাঝে মাঝে জিবের ডগা বার করছিলেন, অর্থাৎ জিব জ্বালা করছে। অনভ্যস্ত লোকে লংকা খেলে এইরকম হয়, সিগারেট টানতে পারে না। ডক্টর ওআটসন পাকা লোক, লংকায় ওঁর কিছু হয় নি।

হোম্‌স হেসে বললেন, চমৎকার! এই ওআটসনের কথা শুনেই কাল রাত্রে হোটেলে মাল্লিগাটানি সুপ, চিকেন কারি, আর বেঙ্গল ক্লাব চাটনি খেয়েছিলাম, তিনটেই প্রচণ্ড ঝাল। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গী এই মিস্টার খাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

বাঞ্ছারামকে নিরীক্ষণ করে রাখাল বলল, ইনি তো পুলিসের লোক, চুলের ছাঁট, গোঁফের তা, আর ড্রিলের কোট দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া থুতনির নীচে টুপির ফিতের দাগ রয়েছে।

বাঞ্ছারাম খাঞ্জা মাতৃভাষায় বললেন, হুঃ, তুমি খুব চালাক লোক বট হে। আর ভি কিছু শুনাও তো দেখি?

—পঞ্চকোটে বাড়ি। সম্প্রতি খুব মার খেয়েছিলেন, কাঁধে আর হাতে লাঠির চোট লেগেছিল। তার জড়ানো মির্জাপুরী লাঠি, তার ছাপ এখনও চামড়ার ওপর রয়েছে।

—আমার গায়ের দাগটাই দেখলে হে? শালা বলদেও পানওয়ালাকে কি পিটান পিটাইছি তার খবর রাখ মাষ্টর?

হোম্‌স বললেন, মুস্তোফী, আওআর ফ্রেন্ড খাঞ্জার মুখ দেখে বুঝছি এ'র সম্বন্ধেও আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, আপনি ও কি টোবাকো খাচ্ছিলেন? ভার্জিনিয়া টার্কিশ ম্যানিলা জাভা কিউবা কইম্বাটুর প্রভৃতি তেষট্টি রকম টোবাকো আমি ধোঁয়া শুঁকেই চিনতে পারি, কিন্তু আপনারটা বুঝতে পারছি না। স্মেল্‌স গুড।

—এর নাম দা-কাটা তামাক, খুব সস্তা আর কড়া।

—ড্যাকোটা? আমি যে শ্যাগ খাই তার চাইতে ভাল গন্ধ। কোথা পাওয়া যায়? আমি কিছু নিয়ে যেতে চাই।

—আমিই আপনাকে দু-তিন সের দিতে পারি, আমার বাড়ির তৈরি। কিন্তু পাইপে খাওয়া তো চলবে না, এইরকম হাবুলবাবুল চাই, হুক্কা কিংবা গড়গড়া। তার কায়দা আপনাকে শিখতে হবে। বিউটিফুল সায়েণ্টিফিক ইনভেনশন সার, জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া রিফাইন্ড হয়ে আসে, জিব জ্বালা করে না।

এ'র সম্বন্ধেও আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে

—আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। আচ্ছা, এখন কাজের কথা হ'ক। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝেছেন?

—আপনারাও পুলিসের লোক?

—না, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তবে দরকার হলে পুলিসকে সাহায্য করি বটে। আর আমার বন্ধু এই ডক্টর ওআটসন আমার সহকর্মী।

—রূপচাঁদপুরের কুমার স্বর্ণেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে পাঠিয়েছেন তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিছু জানি না, আমার কাছে কোনও খবর পাবেন না।

হোম্‌স বললেন, মিস্টার খাঞ্জা, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, আপনি ওই গাড়িতে গিয়ে বসুন।

বাঞ্ছারাম চোখ পাকিয়ে রাখালকে বললেন, ও মশায়, বেশী ফড়ফড় ক'রো না, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, সাহেবদের কাছে যা জবানবন্দি করবে তাতে তুমিই ফাঁদে পড়বে।

বাঞ্ছারাম চলে গেলে হোম্‌স বললেন, মুস্তৌফী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার চেষ্টার ফলে আপনার ভালই হবে।

রাখাল বলল, কুমার বাহাদুর আপনার মারফত আমাকে ঘুষ দিয়ে সন্ধান নিতে চান নাকি?

—তিনি ভাল মন্দ যে কোনও উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চান, কিন্তু আমার পলিসি তা নয়। তাঁর স্বার্থ আর আপনার মঙ্গল দুইই আমি সাধন করতে চাই। আমি জানি, আপনি একজন সরলস্বভাব শিক্ষিত সৎলোক, আপনার উপর অনেক পীড়ন হয়েছে। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, এদেশে আসবার আগে আমি যা শুনেছি এবং এখানে এসে অনুসন্ধান করে যা জেনেছি, সবই আমি বলে যাচ্ছি, যদি কোথাও ভুল হয়, আপনি জানাবেন।

—বেশ, আপনি বলে যান।

শার্লক হোম্‌স বলতে লাগলেন।—মাস খানিক আগে রূপচাঁদপুরের কুমারের এজেন্ট মিস্টার গ্রিফিথ লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বললেন, লেট রাজা রোপেন্ডর—

রাখাল বলল, রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ।

—হাঁ হাঁ। ওই চোয়াল ভাঙা নামটা উচ্চারণ করা শক্ত, আমি শুধু রাজা বলব। গ্রিফিথ আমাকে যা জানিয়েছিলেন তা এই।—এক বৎসর হল রাজা মারা গেছেন। দ্যাট ওল্ডম্যান এক স্ত্রী থাকতেই আর একটি ইয়ং গার্ল বিবাহ করেছিলেন। নূতন রানীকে খুশী করবার জন্য তিনি তাঁকে বিস্তর অলংকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সব চেয়ে দামী হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড স্টার স্যাফায়ারের ব্রোচ।

রাখাল বলল, তার নাম নীল তারা, ব্লু স্টার। অতি মহামূল্য রত্ন, যার কাছে থাকে তার অশেষ মঙ্গল হয়। রাজার এক পূর্বপুরুষ দু শ বৎসর আগে এক পোর্তুগীজ বোম্বেটের কাছ থেকে কিনেছিলেন। ও রত্নটি নাকি সীলোনের কোনও মন্দির থেকে লুট হয়েছিল।

—দ্যাট্‌স রাইট। আপনি সে রত্ন দেখেছেন?

—না, শুধু বর্ণনা শুনেছি। তার পর?

—দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক মাস পরেই পড়ে গিয়ে রাজার পা আর কোমরের হাড় ভেঙে যায়, প্রায় আট বৎসর শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা যান। তার পর হঠাৎ একদিন নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। রাজার যিনি উত্তরাধিকারী—কুমার বাহাদুর, বিস্তর খোঁজ করেছেন, কিন্তু নীল তারা পান নি, পলাতক রানীরও কোনও খবর পান নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—রানী ফিরে আসুন, তিনি সসম্মানে রাজবাড়িতে নিজের মহলে থাকবেন, প্রচুর বৃত্তিও পাবেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি, এদেশের পুলিসও কোনও সন্ধান পায় নি। ঠিক হচ্ছে মুস্তৌফী?

—ওই রকমই শুনেছি বটে। কিন্তু রাজার বিবাহের ব্যাপারটা আরও জটিল।

—তা আমি জানি, সব রহস্যের আমি সমাধান করেছি। তার পর শুনুন। কুমার বাহাদুর তাঁর বিমাতার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নন, তিনি শুধু রত্নটি উদ্ধার করতে চান। নীল তারা নূতন রানীর হাতে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ওল্ড রাজা জখম হলেন, অনেক বৎসর কষ্টভোগ করে মারা গেলেন। তার পর নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। এস্টেটে নানারকম অমঙ্গল ঘটছে, ফসল হয় নি, খাজনা আদায় হচ্ছে না, তিনটে বড় বড় মকদ্দমায় হার হয়েছে, প্রজারা দাঙ্গা করছে, কুমার ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন। তাঁর বিশ্বাস, সবই নীল তারার অন্তর্ধানের ফল।

—আপনি তা মনে করেন না?

—না। নীল তারা যতই দামী হক, একটা পাথর মাত্র, অ্যালুমিনার পিণ্ড, তার শুভাশুভ কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও রত্ন সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার আছে। কুমারের লণ্ডন এজেণ্ট গ্রিফিথ আমাকে বলেছিলেন, নীল তারা ছোট রানীর ডাউরি বা স্ত্রীধন নয়, ও হল রাজবংশের সম্পত্তি, এয়ারলুম, পাগড়িতে পরবার অলংকার। যিনি রাজা হবেন তিনিই এর অধিকারী। কুমার বাহাদুর শীঘ্র রাজা খেতাব পাবেন, সেজন্য নীল তারা তাঁরই প্রাপ্য। ছোট রানী তা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

রাখাল বলল, মিছে কথা। সমস্ত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত দান বিক্রয়ের অধিকার বৃদ্ধ রাজার ছিল, তিনি ছোট রানীকে যা দিয়েছেন, তা স্ত্রীধন।

—আমি এখানকার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মত নিয়েছি। তিনিও মনে করেন স্ত্রীধন, তবে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে আর প্রিভিকাউনসিলের বিচারে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যাই হক, নীল তারা উদ্ধারের জন্য কুমার বাহাদুর আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—কুমার আমার কাছেও লোক পাঠিয়েছিলেন, ভয়ও দেখিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আমি ছোট রানীর সন্ধান জানি। আপনি এদেশে এসে কিছু জানতে পেরেছেন?

—আমি এসেই রূপচাঁদপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমাদের লেট ল্যামেণ্টেড রাজা বাহাদুর একটি স্কাউনড্রেল ছিলেন, যেমন লম্পট তেমনি নেশাখোর, আর ঘোর অত্যাচারী। দশ বৎসর আগে তাঁর এস্টেটে রামকালী রায় নামে একজন কাজ করতেন। তাঁর সন্তান ছিল না, সাবিত্রী নামে একটি অনাথা ভাগনীকে পালন করতেন। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী, তখন তার বয়স আন্দাজ ষোল। রূপচাঁদপুরেরই একটি ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল। পাত্র আর পাত্রীর পরিবারের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল, কাছাকাছি বাসের ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। পাত্রের কাছে পাত্রী লেখাপড়া শিখত। বিবাহের কথা হচ্ছে জেনে রাজা মেয়ের মামা রামকালীকে বললেন, খবরদার, অন্য কোথাও চেষ্টা করবে না, আমিই তোমার ভাগনীকে বিবাহ করব। মামা সাহসী লোক, রাজার কথা শুনলেন না, যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তার সঙ্গেই বিবাহের আয়োজন করলেন। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উপস্থিত, কন্যার মামা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত, পুরোহিত মন্ত্রপাঠের উপক্রম করছেন, এমন সময় রাজা সদলবলে উপস্থিত হলেন। কেউ কোনও বাধা দিতে সাহস করল না, কারণ রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর তাঁর সঙ্গে পুলিসের দারোগাও শান্তিরক্ষা করতে এসেছিল। রাজার অনুচররা মেয়ের মামা আর বরের হাত পা বেঁধে তাদের সরিয়ে ফেলল, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হল। তখন রাজা বরের আসনে বসলেন, তাঁর নিজের পুরোহিত মন্ত্র পড়ল, রাজার এক মোসাহেব কন্যার খুড়ো সেজে অচৈতন্য সাবিত্রীকে সম্প্রদান করল। বিবাহের পর রাজা তাঁর নূতন পত্নীকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। মামা দেশত্যাগী হলেন, আর পাত্রটি তার মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

—সেই পাত্রের পরিচয় আপনি জানেন?

—তার সঙ্গেই কথা বলছি। নাম রাখাল মুস্তৌফী, স্কুল মাস্টার, নিজেকে খুব বড় কবি মনে করে, যদিও তার একটা কবিতাও এ পর্যন্ত ছাপা হয় নি।

—নিজেকে বড় মনে করা কি দোষের?

—বোকা লোকের পক্ষে দোষের, তোমার আর আমার মতন বুদ্ধিমানের পক্ষে দোষের নয়।

—তার পর বলে যান।

—নূতন রানী সাবিত্রী বহুদিন পীড়িত ছিলেন। তাঁকে খুশী করে বশে আনবার জন্য রাজা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, বিস্তর অলংকার মায় নীল তারা দিয়েছিলেন, বাসের জন্য আলাদা মহল আর অনেক দাসদাসীও দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মিশন স্কুলের সিস্টার থিওডোরাকে বাহাল করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরেই রাজা মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে জখম হয়ে শয্যা নিলেন। নূতন রানী তাঁর টীচারের সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলেন।

—সাবিত্রী এখন কোথায় আছে তাই বলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না, সব কথা একে একে বলছি। রাজার মৃত্যুর পর নূতন রানীর উপর কড়া পাহারা বসল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী, সিস্টার থিওডোরার সঙ্গে পরামর্শ করে পালাবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন দুপুর রাত্রে চুপি চুপি রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা আর অলংকার এবং একজন বিশ্বস্ত দাসী। নীল তারা নিয়ে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু থিওডোরার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাও নিলেন। তার পর কলকাতায় এসে মিস সিসিলিয়া ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলার বাড়িতে উঠলেন। থিওডোরাই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

—সাবিত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রানী বললেন, আমি রাজবাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়েছি, এখানে এক মেয়ে স্কুলে চাকরিও যোগাড় করেছি। নীল তারা আমি রাখতে চাই না, আপনি নিয়ে যান,

কুমারকে দেবেন। আমি বললাম, বিনামূল্যে দেবেন কেন, আপনার আর মুস্তৌফীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খেসারত আদায় করে তবে দেবেন। রানী বললেন, আমার কিছু স্থির করবার শক্তি নেই, মামা মামীও বেঁচে নেই যে, তাঁদের উপদেশ নেব। আপনি মুস্তৌফীর সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি যা বলবেন তাই হবে। মুস্তৌফী, তোমার উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা আছে, গ্রেট রিগার্ড।

—তিনি কি খ্রীষ্টান হয়েছেন?

—সিস্টার থিওডোরা তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রানী মোটেই রাজী হন নি।

—রানী বলবেন না, বলুন সাবিত্রী দেবী।

—ভেরি ওয়েল, সাবিত্রী দেবী, দি গডেস সাবিত্রী। দেখ ওআটসন, প্রেমে পড়লে নজর খুব উঁচু হয়, মনের ম্যাগনিফাইং পাওআর বেড়ে যায়। তোমার বিবাহের আগেও এই রকম দেখেছিলাম।

হোম্‌স তাঁর পকেট থেকে একটি বাক্স বার করে খুলে দেখালেন—সোনার ফ্রেমে বসানো নীল তারা, সুপারির মতন গড়ন, কিন্তু আরও বড়, ফিকে ঘোলাটে নীল রং, ভিতরে উজ্জ্বল তারার মতন একটি চিহ্ন, তা থেকে ছ দিকে ছটি রশ্মি বেরিয়েছে।

হোম্‌স বললেন, বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে তরল উত্তপ্ত অ্যালুমিনা ধীরে ধীরে জমে গিয়ে এই রত্ন উৎপন্ন হয়েছিল। এর বাজার দর খুব বেশী হবে না, বড় জোর দশ হাজার টাকা। কিন্তু কুমার যখন এর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন আর ফিরে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছেন তখন তাঁকে চড়া দাম দিতে হবে। মুস্তৌফী, বল কত টাকা আদায় করব?

রাখাল বলল, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, যা স্থির করবার আপনিই করুন।

—কবিদের বিষয়বুদ্ধি বড় কম, অবশ্য অনারেবল এক্সেপশন আছে, যেমন লর্ড টেনিসন। শোন মুস্তৌফী, আমি চার লাখ আদায় করব, সাবিত্রী দেবীর দুই, তোমার দুই। এর বেশী চাইলে কুমার ভড়কে যেতে পারেন। তা ছাড়া আমাদের এদেশে আসার খরচ আর পারিশ্রমিকও তাঁকে দিতে হবে। ব্যাংক অভ বেঙ্গলে সাবিত্রীর অ্যাকাউণ্ট আছে, কুমার সেখানে চার লাখ জমা দিলেই তাঁকে নীল তারা সমর্পণ করব। আজ সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—সাবিত্রীর ঠিকানা কি?

—তিন নম্বর কর্নওআলিস থার্ড লেন। মুস্তৌফী, আজই বিকালে তাঁর কাছে যেও। আশা করি তোমার কুসংস্কার নেই, বিধবা হলেও বাগ্‌দত্তা পাত্রীকে বিবাহ করতে রাজী আছ?.........তবে আর ভাবনা কি, go, woo and win her. কাল সকালে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। গুড বাই।

ওআটসন বললেন, এক্সকিউজ মি মুস্তৌফী বাবু, দাড়িটা কামিয়ে ফেলো। গুড বাই।

রাখাল বিকালে চারটের সময় সাবিত্রীর কাছে গিয়ে রাত সাড়ে আটটায় ফিরে এল। তার ছাত্র নারান বারান্দায় বসে ছিল। রাখাল বলল, কে ও, নারান নাকি? হারিকেনটা উসকে দে।

আলো বাড়িয়ে দিয়ে নারান বলল, একি মাস্টার মশায়, আপনাকে যে চেনাই যায় না!

—দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছি। এত রাত্রে তুই যে এখানে?

—বাঃ ভুলে গেছেন! আপনি যে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যেবেলা ব্যাট্‌ল অভ সেজমুর পড়াবেন।

—দুত্তোর সেজমুর, ও আর এক দিন হবে। আজ ট্রামে আসতে আসতে কি একটা বানিয়েছি শুনবি? —বরষে ধারা, ভূমি শীতল, তাপিত তরু পেয়েছে জল; টানিছে রস তৃষিত মূল, ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল। তোদের হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন পারে এমন লিখতে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

দাদু, এবার আপনি কি প্রবন্ধ লিখছেন?" গৌরী জিজ্ঞাসা করেছে।

আমার প্রবন্ধের যে সমালোচনা শুনেছি, তাতে আর একদম লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

চম্পকার খেদোক্তি স্মরণ হচ্ছে,—"আপনি সোজা করে লেখেন না কেন? আমরা যে বুঝতে পারি না।"

বুড়ীর অভিমান,—"দাদু, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কতটুকু-যে আপনার প্রবন্ধ বুঝতে পারব!"

ইরার স্পষ্ট কথা,—"উপাখ্যান লিখবেন না।"

স্তুতির তর্জন,—"দাদু, আপনার ভারী অহংকার হয়েছে—আপনি যা তা লিখতে আরম্ভ করেছেন। আমরা ছোটবেলায় রামায়ণে পড়েছি, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল। আপনি নাকি লিখেছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয় নাই। রাম কি তবে খেলা করতে লংকায় গেছলেন?"

মাধুরীর মিনতি,—"আপনি আপনার কথা লিখুন।"

তাই আমার কথাই লিখছি।

১৮৯১ সালে

১৮৯১ সাল। জানুআরি মাস। আমি কটকে। একদিন সকাল বেলা একটি লোক একটা কাগজ দিয়ে গেল।

"কি কাগজ?"

"মানুষ গণতি হবে।"

"মানুষ গণতি হবে ত আমার কি?"

হাতের লেখা ওড়িয়া। আমি তখন ওড়িয়া পড়তে পারিতাম না। বিকালবেলা সেই কাগজখানা নিয়ে আমার প্রতিবেশী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত উকিল, নিজের অট্টালিকায় বাস করতেন। সদাশয় মানুষ। তিনি কাগজখানা পড়ে বললেন, "সেন্সাস হবে; কালেক্টর সাহেব আপনাকে সুপার-ভাইজার করেছেন।"

শুনে আমি বিরক্ত হলাম। পরে ভাবলাম, আমার ছাত্রাবস্থায় সেন্সাস হয়ে গেছে, কিছুই জানি না। ব্যাপারটা কি, দেখা যাক।

কিছুদিন পরে, একদিন সকালবেলা তিন-চারজন গণনাকারী এক এক খাতা-হাতে আমার কাছে এলেন। আমি সেই প্রথম সেন্সাসের কাগজ দেখি। নাম, পুরুষ কি স্ত্রী, বয়স, জাতি, ইত্যাদি আট-নয়টা ঘর। তাঁরা বললেন, "আর সব হচ্ছে, বয়স ঠিক লিখতে পারছি না। লোকে নিজে নিজের বয়স বলতে পারে না। কেউ বলে 'বিশ-চল্লিশ', কেউ বলে, 'দু-কুড়ি পার হয়েছে', কেউ বলে, 'কত দেখছেন?' কেউ বলে, 'আপনিই বলুন না।' পুরুষদেরই এই অবস্থা, তাদের নারীদের বয়স কেউ জানে না।"

কথাটা শুনতে নূতন ঠেকল। কিন্তু সত্য। যার প্রয়োজন হয় না, তা আমাদের মনে থাকে না। নিরক্ষর বলে নয়, সকল লোকেরই তাই। কোন্ সালে জন্ম হয়েছিল, কে সে সাল জানে, আর কে-বা মনে রাখে? পূর্বকালে জন্মতিথি পালনের বিধি ছিল। সেদিন ঠাকুরের পূজা দেওয়া হত। জীবনের এক নূতন বৎসরে প্রবেশ করছি, ঠাকুরের আশীর্বাদ চাই। আর সেই সংগে বয়সটাও জানা পড়ত। কিন্তু জন্মতিথি সকলে পালন করত না। জন্মতিথি-দিনে নববস্ত্র পরিধান, আর কিছু ভোজ্য না হোক, পায়স খাবার বিধি ছিল। অনেক মা দড়িতে গাঁট দিয়ে রাখতেন।

"আপনারা কি করছেন?"

"কি আর করব? কখনও চেহারা দেখে, কখনও কথা শুনে, কখনও ছেলের বয়স দেখে একটা লিখছি। নারীদের বয়স জানবার কোনও উপায় নাই।"

"এর বেশী আর কি হবে? দেখছি, আর সব বৃত্তান্ত ঠিক হবে, কিন্তু বয়স প্রায় সবই ভুল। 'হরে দরে হাঁটু জল' ধরলেও ভুল থাকবে।"

দিন কয়েক পরে আর এক গণনাকারী খাতা দেখাতে এলেন।

"কই, আপনি এখনও কাজ আরম্ভ করেন নাই?"

"করেছি বৈ কি।"

"আপনার খাতা যে সব সাদা!"

"এদিকে নয়, ওদিকে দেখুন।"

তিনি খাতার শেষের পাতা খুলে দেখালেন। আমি দেখি, তিনি খাতার শেষ পাতা হতে আরম্ভ করে পেছিয়ে পেছিয়ে এসেছেন।

"এ কি করেছেন? এ যে ফারসী কেতাব—ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।"

"জমিদারী সেরেস্তায় এই দস্তুর।"

"এটা কি জমিদারী কাগজ? এ চলবে না। নূতন খাতায় প্রথম পাতা হতে আবার লিখুন।"

তিনি অবশ্য একটু দুঃখিত হলেন। তিনি কালেক্টরির এক মুহরী। পূর্বে কিছুদিন এক জমিদারের গোমস্তা ছিলেন।

ডান দিক থেকে লেখা, কান-ফোঁড়া খাতা আমাদের বাড়িতেও দেখেছিলাম। গোমস্তা থোকা, খতিয়ান ইত্যাদি কাগজ এইরকম লিখতেন। তখন বিশেষ লক্ষ্য করি নাই। অনেক বৎসর হয়ে গেল, বিষ্ণুপুরে গানের তাল শেখাবার দুখানি খাতা পাওয়া গেছল। তাতে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ লেখা ছিল। সেও ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা। আবিষ্কর্তা আশ্চর্য হয়ে গেছলেন। আমি এর উৎপত্তি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বহুকাল হতে বিষ্ণুপুরে গান-বাজনার চর্চা আছে। পূর্বে গান শেখাবার টোল ছিল। সেই টোলের ছাত্রদের জন্যে এই খাতা লেখা হয়েছিল।

একদিন আর এক গণনাকারী তাঁর খাতা দেখাতে এলেন। দেখি, একজনের নামের পরে 'ধর্ম'-এর ঘর ফাঁক আছে।

"ধর্ম লেখেন নাই কেন?"

"সে বলতে পারে নাই।"

আমার ভারী আশ্চর্য ঠেকল।

"চলুন, আমি দেখব।"

তার ঘর বেশী দূরে ছিল না। আমি একটু দূরে দাঁড়ালাম। গণনাকারী তাকে ডাকলেন। সে একবার গণনাকারীর দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল। বয়স, বছর পঞ্চাশ। গণনাকারী প্রশ্ন করলেন,—

"তোর ধর্ম কোন্?"

"মোর ধর্ম?" চিন্তিত হয়ে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগল। নিকটে তার বয়সী একজনকে জিজ্ঞাসা করলে; সে চুপ করে

রইল। আবার এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগল। একটু পরে বলল, "মোর ধর্ম মোর।" তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখে একটু হাসিও দেখা গেল। যেন এক গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। গণনাকারী হতাশ হয়ে আমার কাছে এলেন।

"আপনি দেখছেন না, ওর গলায় মালা আছে? হিন্দু ছাড়া কার গলায় মালা থাকে?"

"তা জানি, কিন্তু সে না বললে আমি কেমন করে লিখি?"

বাসায় ফিরবার পথে লোকটির উত্তর ভাবতে লাগলাম। সে ঠিক উত্তর দিয়েছে। "তোর ধর্ম কি?" এই কথার কি উত্তর হবে? "মোর ধর্ম মোর"—কথাটা সত্য। আমার ধর্ম তোমার ধর্ম নয়, তোমার ধর্ম আমার ধর্ম নয়। ধর্ম শব্দের অনেক অর্থ আছে। গীতার ভগবদ্‌উক্তি,—

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার স্মরণ লও। অতএব ধর্ম অনেক। ইংরেজীতে What is your religion? বললে যা বুঝায়, বাংলায় 'তোর ধর্ম কি?' বললে তা বুঝায় না।

অহিংসা-সত্যমস্তেয়ং
সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

পরের অনিষ্টচিন্তা করবে না, সত্য হতে ভ্রষ্ট হবে না, চুরি করবে না, দেহের ও মনের শুচিতা রক্ষা করবে এবং ইন্দ্রিয় সংযম করবে। মনু সকলের পক্ষেই এই এই ধর্ম পালনীয় করেছেন।

লোহার ধর্ম, জলের ধর্ম এক নয়। এখানে ধর্ম শব্দে গুণ। পশুধর্ম, মনুষ্যধর্ম পৃথক। এখানে ধর্ম স্বভাব। ধর্ম পৃথক বলেই পশু ও মানুষ পৃথক করতে পারি। লোকের কুলধর্ম আছে। সেখানে ধর্ম বিশেষ আচার। আদালতের নাম ধর্মাধিকরণ। পূর্বে আদালতের বিচারপতিকে ধর্মাবতার বলা হত। এখানে ধর্ম অর্থে ন্যায়। মানব-সমাজের কল্যাণার্থে মনু প্রভৃতি ঋষি ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এখানে ধর্ম সামাজিক বিধান। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ধর্ম-যুদ্ধ। কারণ, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য সিংহাসন দুর্যোধন দেন নাই, তার উদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধ।

গীতায় ধর্ম শব্দের দুই-তিন অর্থ আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চার-বর্ণের চার প্রকার ধর্ম ছিল। সে ধর্ম বর্তমানকালের কর্তব্য।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। সে অর্জুনের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অর্জুন ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালনে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ধর্ম ধরতে গেছলেন। অর্জুন সে কর্মের অনুপযুক্ত। এতে সমাজের অকল্যাণ হত। আর এক স্থানে,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ইত্যাদি। এখানে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান, সে ধর্ম ন্যায়ান্যায় বিবেক। সংসারে আমরা এক এক ধর্ম পালন করছি। প্রত্যেক মুহূর্তে বিচার করি না। মনুর উপদেশ,—

আচারঃ পরমোধর্মঃ,

সে আচার বেদ ও স্মৃতিসম্মত আচার, সদাচার, শিষ্টাচার। আমরা হিন্দুধর্ম পালন করি, কিন্তু সে ধর্মের স্বরূপ জানি না। আমাদের আচার দ্বারা এই ধর্মের স্বরূপ ব্যক্ত হয়।

এক এব সুহৃদ্‌ ধর্মঃ,

এখানে ধর্ম পুণ্যকর্ম, নিধনের পরেও আমাদের সঙ্গে যায়। মনু বলেন, যে কর্মে আত্মপ্রসাদ জন্মে সেটাই ধর্ম। এখানেও ধর্ম, দান-আর্তসেবাদি পুণ্য-কর্ম।

সংসারে অনেক সময় আমাদের চিন্তিত হতে হয়, এখন কি কর্তব্য? এ পথে চলি, কি সে পথে চলি? মহাভারতে যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োর্বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যিনি অপরের সহিত ভিন্নমত নন (অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত); ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে। অতএব, সেই পথই পথ, যে পথে বহু লোক গমন করেছেন।

এমন অমূল্য উপদেশ আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে পথে বহু লোক গেছে, সে পথ নিশ্চয় নির্বিঘ্ন। যখন তারা যেতে পেরেছে, তুমিও পারবে। এখানে 'মহাজন' মহাপুরুষ নয়। মহাপুরুষ খুঁজতে গেলে, মহাপুরুষ কে, প্রথমে সে বিচার আবশ্যক হয়। সকলে সকলকে মহাপুরুষ বিবেচনা করে না। তারপর, যে অবস্থায় পড়ে চিন্তিত হয়েছি, সে অবস্থায় আমার মহাপুরুষের কোনও উপদেশ না থাকতে পারে। ধর্মবিচারের তুল্য কঠিন বিচার আর একটি নাই। যারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয় নাই, তাদের জন্য এ উপদেশ নয়।

ধর্ম প্রসঙ্গে কটকের সূর্য মারোয়াড়ীকে মনে পড়ছে। তার ইতিহাস একটু লিখি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। কটকে বালু-বাজার নামে একটা বড় রাস্তা আছে। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। এর উত্তরে ও দক্ষিণে বহু ভদ্রলোকের বাস। উকিল, হাকিম, বড় চাকুরে, ইস্কুল-কলেজ এরই নিকটে। দক্ষিণে কাঠজুড়ী নদী। উত্তর হতে নদীতে যাবার দু-তিনটি পথ আছে। সেখানে চৌমাথা। এক চৌমাথায় একটা নিমগাছ আছে। গোড়াটা ইঁট দিয়ে বাঁধান। এইজন্য সেই জায়গাটার নাম নিমচৌড়ী। নিমচৌড়ীর পশ্চিমে সূর্য মারোয়াড়ীর দোকান ছিল। ঘরখানা বড়। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল, ঘি, গুড়, চিনি, রাঁধবার মশলা, পানের মশলা, কাগজ, মোমবাতি, সব পাওয়া যেত। সে অঞ্চলটায় এ সবের দোকান ছিল না। কিনতে গেলে এক-দেড় মাইল দূরে চৌধুরী-বাজারে যেতে হত। সূর্য মারোয়াড়ীর দোকান হওয়াতে আমাদের সকলের সুবিধা হয়েছিল। সে বিশ্বাসী, কখনও ওজনে কিংবা দামে ঠকাত না। অনেক সময় বাড়ির মেয়েরা ফর্দ করে তার দোকানে চাকর পাঠিয়ে দিত। সূর্য মারোয়াড়ী সে সব জিনিস দিয়ে দাম নিয়ে বিদায় করত। বালু-বাজারের দক্ষিণে একটু দূরে আমার বাসা ছিল। বড় রাস্তায় আসতে হলেই আমাকে নিমচৌড়ীতে আসতে হত। সকালে এলে দেখতাম, সূর্য মারোয়াড়ী দোকানে বসেছে, স্নান করেছে, কপালের বাঁদিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত চন্দন, মাথায় একটু শিখা। মনে হত, ধন্য মারোয়াড়ী, কোন্‌ মরুদেশে তোমার বাস, তুমি এখানে এসে দোকান ফেঁদেছ! শত ধন্য তোমার বুদ্ধি! এইরকম দোকানের অভাব ছিল, তুমিই বুঝতে পেরেছিলে; আর বেছে বেছে তুমিই এই চৌমাথায় দোকান করেছ। সূর্য মারোয়াড়ী মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন। একদিন শুধালাম,—

"তোমাদের এমন বুদ্ধি কেমন করে হয়?"

"বাবুজী, আপনারা যখন ইস্কুল-কলেজে যান, আমরা তখন দোকানে বসি। আমরা মূর্খ মানুষ, কোন রকমে দিন চালাই।"

'কোন রকমে'ই বটে। বাল্যকালে হিতোপদেশে পড়েছিলাম,—

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো-বলম্‌। যার বুদ্ধি আছে তার বল আছে, অবোধের বল কোথায়? এইরূপ বলা যেতে পারে, "বুদ্ধির্যস্য ধনং তস্য অবোধস্য কুতোধনম্‌।" যার বুদ্ধি আছে, সে ধন পায়, যার বুদ্ধি নাই সে ধন পায় না।

একদিন সূর্য মারোয়াড়ীকে বলি, "দেখ, তুমি এক টাকা সের কি আরও কমে ঘি এনেছ। ঘিয়ের দাম পাঁচ সিকা নাও; তুমি কি বলে দেড় টাকা চাও?"

"বাবুজী, য়হ্‌ বেপার কী বাত্‌ হৈ, ধরম কী বাত্‌ নহীঁ হৈ।"

কথাটা আমায় ভাবিয়ে দিলে। এখানে 'ধরম' অর্থে ন্যায়ান্যায়-বিবেচনা। অর্থাৎ মারোয়াড়ী বলতে চেয়েছিল, সে তার ইচ্ছা-মত দাম নিতে পারে, তাতে তার অধর্ম হবে না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বেপারে ধর্ম অবশ্য আছে। যে কর্ম দ্বারা নিজের মঙ্গল হয়, সেটা ধর্ম। আর, যে কর্ম দ্বারা বহুর মঙ্গল হয়, সেটা ধর্ম। বেপার, বহুর সহিত ব্যবহার। বহুর মঙ্গল হলে আমারও মঙ্গল হয়। বহু উৎপীড়িত হলে আমিও উৎপীড়িত হই। অতএব যে পণ্যে বহু-লোকের প্রয়োজন, সে পণ্যের মূল্য যথেচ্ছা বাড়াতে পারা যায় না। কিন্তু অসৎ বণিক আছে, একজোট হয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেয়। তখন রাজাকে তাদের দৌরাত্ম্য হতে প্রজা রক্ষা করতে হয়। ছয়শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে সামান্য পণ্যের মূল্যের ষোড়শাংশ বণিকের লভ্য বাঁধা ছিল, অর্থাৎ শতকরা ৬৷০। বর্তমান কালেও আমাদের রাজারা নানাবিধ পণ্য-মূল্যের নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বণিকেরা অধর্ম না করলে এর প্রয়োজন হত না।

১৯০১ সালে

১৯০১ সাল। জানুআরি মাস। আমি কটকে। একদিন সকালে বাসায় বসে আছি। একটি লোক একখানা কাগজ দিলে।

"কি কাগজ?"

"কালেক্‌টর সাহেবের পরোয়ানা।"

ওড়িয়াতে টানা লেখা। হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় পড়ে বললেন, "এই যে সেন্‌সাস হবে, আপনি ইয়োরোপীয়দের সেন্‌সাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছেন।"

"বেশ। কোথায় কোন্ সাহেব আছেন, কে জানে? শহরটি দৈর্ঘ্যে ৬।৭ মাইল, প্রস্থে ২ মাইল। আমি কোথায় গিয়ে কাকে খুঁজব? আর, আমাকে কি করতে হবে, তাও ত লেখা নাই।"

হয়ত পরে সাহেবদের নাম আসবে, আর আমাকে কি করতে হবে, তাও লেখা থাকবে, এই আশায় কাগজটা ফেলে রাখলাম।

দোসরা পরোআনা এল না, কোন গণনা-কারীও এল না। আমি কিছুই করলাম না। ৩১ মার্‌চ্ সেন্‌সাসের শেষ দিন; রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সেন্‌সাসের কাজ চলবে। বেলা ১১টার সময় আমার এক প্রাক্তন ছাত্র, তখন কলেজের এক শিক্ষক, এসে বললেন, "আপনি যে ইয়োরোপীয়দের সেন্‌সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, আপনি কি করেছেন?"

"কিছুই না।"

"সে কি!"

"কেউ কিছু বললে না, কি করব?"

"আপনি কালেক্‌টর সাহেবের কাছে যেয়ে জানালেন না কেন? আপনার জানা উচিত ছিল। যাক, আজ একটু বেরিয়ে যা পারেন করে আসুন। ইয়োরোপীয়েরা সেন্‌সাস-কাগজ পেয়েছে, তারা লিখে রাখবে। শুনলাম কমিশনার সাহেবের কুঠিতে কেউ যায় নাই।"

তিনি সে পাড়ার সেন্‌সাস সুপার-ভাইজার।

১২টার সময় স্নানাহার সেরে ১টার সময় এক ভৃত্যকে গাড়ি আনতে পাঠালাম। ইতিমধ্যে আমি আমার কলেজের পরিচ্ছদ পরেছি। তখন আসামের এড়ীর কোট ও প্যান্‌ট্ পরতাম। তখনকার দিনে কলেজের প্রায় সকল শিক্ষকই চোগা-চাপকান পরতেন। কেহ বা শুধু চাপকান। আদালতের উকিলবাবুরা চাপকানের উপর পাটকরা উড়ানী বুকের উপর 'চেরা' করতেন। আমি আমার চাকরি আরম্ভে কোট ধরেছিলাম। বছর দুই আমার সহকর্মীদের অনুরোধে চোগা-চাপকানও পরেছিলাম। কিন্তু আমার যে ব্যবসায়, তাতে বস্ত্র-বাহুল্য বিপজ্জনক। তখন পুনর্বার কোট ধরি। এই কোটের ক্রমবিকাশের ইতিহাস চমৎকার। পূর্বে ভদ্রলোকেরা ধুতি ও প্যান্‌টের উপরে চায়না কোট পরতেন। সে কোট গায়ে মানাত না, ঢল ঢল করত। চায়না কোট গেল, পার্শী কোট এল। পার্শী কোট হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকে, গায়ে আঁট হয়ে বসে, বিশ্রী দেখায়। সেই কোট ক্রমশ ছোট হয়ে উরুর মাঝ পর্যন্ত ঝুলত। এই কোট ঠিক পার্শী কোট নয়, অনেকটা ইংলিশ কোট, গলা পর্যন্ত বোতাম। তখন আমার বয়স ৪১, দেহ পুষ্ট, এই কোট পরলে বেশ মানাত।• চোখে সোনার চশমা, বুক-পকেটে ঘড়ি, রুপার একটু চেন বাইরে দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি এল দুটার সময়। বাইরে গিয়ে দেখি, গাড়িখানি নানাবর্ণ, আর অশ্ব দুটি ছাগতুল্য।

"অহে, আমাকে অনেকদূর যেতে হবে ঘুরতে হবে, তোমার ঐ ঘোড়া যেতে পারবে?"

"না পারলে এনেছি কেন?"

"তা বটে। কোথায় কোথায় সাহেবদের কুঠি আছে, তুমি জান?"

"জানি বৈ কি। আমিই সাহেবদিকে নিয়ে যাই।"

গাড়োআনের এই দুই সপ্রতিভ উত্তর শুনে কৌতুক বোধ করতে লাগলাম। আর আমার মনের জড়তাও দূর হয়ে গেল। তখন বুঝলাম, আমার সঙ্গে একজন চাপরাশী থাকলে সাহেবরা বুঝতে পারত, আমি যে-সে লোক নই। আমি তাদের বাড়ি যাব, যদি তারা বলে, 'আপনি কে? আপনাকে কাগজ দেখাব না', তখন আমার কি গতি হবে? সে পরোআনাখানাও হারিয়েছি। এই চিন্তা ক্ষণমাত্র উঠে মিলিয়ে গেল।

শহরের পশ্চিম হতেই আরম্ভ করি। পশ্চিমে ডগরপাড়া জানতাম, সেখানে এক ঘর ফিরিঙ্গী আছে।

"চল ডগরপাড়ায়।"

আমার রথ যাত্রা ঘোষণা করতে করতে চলল। প্রায় দেড় মাইল দূরে ডিসোজা নামে এক ফিরিঙ্গীর বাড়ির ভিতরে রথ ঢুকল। গাড়ি-বারাণ্ডায় দেখি, জন-দুই সাহেব মেম, আর কতকগুলো ছেলে বসে আছে। আমার রথ সেখানে ঢুকতেই একজন সাহেব এসে দাঁড়াল।

"কি চাই?"

"সেন্‌সাস কাগজ আনুন।"

কাগজ এনে দিলে। একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম।

"ঠিক লেখা হয়েছে ত?"

"হাঁ।"

আমার রথ আরও পশ্চিমে চলে খানিকটা ঘুরে পূর্বমুখ হল। এদিকে নতুন আসছি, কোথায় সাহেব আছে, জানি না। রথ উত্তরমুখ হল। এক বড় কুঠির ভিতর ঢুকল (ভাল বড় বাড়ি, বিশেষত ফাঁকা জমি থাকলে সে বাড়িকে কুঠি বলে)। রথ কুঠির ভিতরে ঢুকে স্বীয় ধ্বনি করতে করতে একেবারে গাড়ি-বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। ৫।৭ ধাপ উঠলে বারাণ্ডা। উঠে দেখি, দু-খানি চেয়ার পাশে পাশে আছে। এক বুড়ী মেম বেরিয়ে এল। আমি যেন তার কতকালের পরিচিত।

"আসুন, আসুন, বসুন।" চেয়ার দেখিয়ে দিলে, আর নিজে পাশের চেয়ারে বসল।

"আপনি মাঝে মাঝে আসেন না কেন? আমরা কথা কইবার লোক পাই না। ঐ ওরা আছে—(আঙুল দিয়ে পূর্ব-উত্তর কোণে প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্‌চ্ দেখিয়ে দিলে) ঐ ওরা। আমাদের কাছে আসে না, আমাদের ঘৃণা করে। বলে, আমরা পৌত্তলিক। আমরা মেরীর পূজা করি, সেটা কি পুতুল? আমরা চার্‌চে বাতি জ্বালি, পুতুল কোথায়? আর, কত কি নিন্দা করে। বলে, আমরা দুশ্চরিত্র।" এইভাবে তাদের বিরুদ্ধে ওরা কি বলে, তাই বলতে লাগল। আমি অবাক! আমাকে শুনিয়ে কি হবে? আর তার সঙ্গে বসে গল্প করি, আমার সময় কোথায়? বুড়ীর কথা ফুরয় না। আমাকেই বলতে হল, "আমার এখন বসবার সময় নাই, আমি সেন্‌সাস কাজে ঘুরছি।"

বুড়ী কাগজ নিয়ে এল। দেখলাম, সেখানে জন দশ-বার থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে বারাণ্ডা হতে

নামছি, বুড়ী "আবার আসবেন, আবার আসবেন" বলতে লাগল। পরে শুনেছিলাম, Roman Catholic Convent, আর বুড়ী সেটার Mother Superior.

আমার রথ কুঠি হ'তে বেরিয়ে এসে পূর্ব-উত্তর মুখে গেলে একটা ছোট-খাট সাহেব পাড়া পেত। সেখানে জনকয়েক ফিরিঙ্গীও থাকত। কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হয় নাই। রথ দাক্ষিণমুখ হয়ে পূর্ব মুখে চলল। সেটা মিশন রোড। সে রাস্তায় Baptist Mission-এর আড্ডা। রথ এক জায়গায় থামল। রাস্তার উপরেই এক বাড়ি। বাড়িখানি ছোট, কিন্তু সুন্দর। নিচু পাঁচিলের গায়ে জবা ফুলের গাছ আছে। অনেক লাল ফুল ফুটে আছে। ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই এক সাহেব বেরিয়ে এলেন। পোশাক ফিটফাট। বয়স বছর চল্লিশ, হৃষ্টপুষ্ট দেহ, কিন্তু অশ্বেত শ্বেত নয়। সেন্‌সাস কাগজে দেখলাম, তিনি একা থাকেন। কাগজে একটি ঘর ফাঁক রেখেছেন। ইংরেজীতে সে-ঘর Nationality.

"এ ঘর ফাঁক রেখেছেন কেন?"

উত্তর নাই। আবার বললাম,—

"ফাঁক রাখা চলবে না।"

খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলেন। পরে,—"I am a European" বলেই আমার মুখপানে তাকালেন, যেন আমি স্বীকার ক'রে নিলেই তিনি বেঁচে যান।

"তা আপনি যাই হোন, ফ্রেঞ্চ হোন, জার্মান হোন, এইখানে লিখুন।"

পরে শুনেছিলাম, তিনি এক ডেপুটি। আর বুঝেছিলাম, Eurasian শব্দের Eurটুকু নিয়ে asianটুকু কেটে peanটুকু দিয়েছেন।' কিন্তু তিনি ভুলেছিলেন European নামে কোনও Nation নাই।

'ইয়োরোপীয়ান' সাহেবের বাড়ি হতে বেরিয়ে একটু পূব দিকে এগিয়ে আমার সারথি রথখানা ডানদিকের এক ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল।

"এখানে কি?"

"এখানে সাহেবরা থাকে।"

বাইরে জনপ্রাণী ছিল না। উঁচু পাঁচিল, রুদ্ধদ্বার, বৃহৎ কপাট, ভিতর হ'তে অর্গলবদ্ধ। এ কি জেলখানা না কি? কি করা যায়। এদিকে পাঁচটা বাজে। এমন সময় একখানা কপাটের একটা চৌকা চোরা দুয়ার খুলে গেল। এক ছোকরা মুখ বাড়িয়ে দেখলে, আবার বন্ধ করলে। একটু পরে একখানা কপাটের সিকি খুলে এক শ্বেতাঙ্গী বিবি বেরিয়ে এল (সাহেব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিবি, মেম নয়। তাসে এর প্রমাণ আছে)। বিবির বয়স অল্প, মুখ অপ্রসন্ন। এসেই রোদ্রস্বরে বলছে,—

"আপনি কি চান?"

"সেন্‌সাস কাগজ দেখতে চাই।"

"কিন্তু আমি আপনাকে ঢুকতে দেব না।"

"আমি ঢুকবার জন্য ব্যগ্র নই। কিন্তু দেখব, কাগজে ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে।"

বিবির মুখ শাদা হয়ে গেল। যদি মিলিয়ে দেখতে চাই, তা হলে সর্বনাশ! কিছু না বলে ভিতরে ঢুকল, অর্গল বন্ধ হল। তিন-চার মিনিট পরে আবার সেই রকম কপাট অল্প খুলে বেরিয়ে এসে এক গোছা কাগজ দিলে। বুঝলাম, এটা একটা Christian Convent. দেখলাম, সেখানে ৪২জন থাকে, সব স্ত্রীলোক। আমি বিবিকে শুধালাম,—

"ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে ত?"

মাথা নিচু করে—"হাঁ।"

"এই কাগজ নাও, আমি ভিতরে ঢুকব না।"

রথে উঠলাম।

"চল টেলিগ্রাফ আপিসে।"

জানতাম, সেখানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী থাকে। রথ মন্থরগতিতে চলল। আর, আমার মনে হতে লাগল, যারা Convent-এ অবরুদ্ধ আছে, তারা কতদিন হতে আছে? এত উঁচু পাঁচিল কেন? কার ভয়ে দ্বার খোলা হয় না? মেয়েদের বয়স দেখি নাই। দেখলে বুঝতাম, কোন্ দুর্ভিক্ষের সময়ে এদের এনেছে, আর সেই অবধি পালন করছে। খ্রীষ্ট ধর্মের এ এক মহাগুণ। মিশনারীরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছেন, আর আমরা যাদের বাঁচাতে পারি নাই, যাদের নির্মম হয়ে ছেড়ে দিয়েছি, এঁরা তাদের কুড়িয়ে এনে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা কতদিকে কত উপকার করেছেন, কত আতুরের সেবা করেছেন, তার ইয়ত্তা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ সেবাধর্ম প্রচার করে গেছেন। সে ধর্ম নিষ্কাম। যিনি অনুভব করেন,—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তে ঈশ্বর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁর নিকট নরসেবা আর নারায়ণ-সেবা এক।

আমার রথ টেলিগ্রাফ আপিসের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। যাবামাত্র ৫।৬জন ফিরিঙ্গী আমার রথ ঘিরে দাঁড়াল। সেখানে আলো নাই, সকলের মুখ দেখতে পেলাম না।

"সেন্‌সাসের কাগজ সব ঠিক লেখা হয়েছে?"

একজন কাগজ আনতে দৌড়াল।

"আমি আর ভিতরে ঢুকব না। লিখতে কি আর আপনারা ভুল করেছেন?"

শুনে ভারী খুশী।

আমি রথ ফিরালাম। আর পূর্বদিকে যাব না। বাসা হতে ৪ মাইল এসেছি। এখন ফিরতে হবে। অশ্বযুগের গতি আরও মন্থর হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বড় রাস্তা দিয়ে পুরাতন কাছারি বাড়ি পেরিয়ে 'উদ্‌যোগী সমিতি'র স্বদেশী ভাণ্ডারের কাছে এলাম। উদ্‌যোগী সমিতি দেশী দ্রব্য বিক্রয় ও প্রচারের নিমিত্ত এই ভাণ্ডার খুলেছিলেন। যেখানে কবি রাধানাথ রায়ের প্রতিমূর্তি আছে, সেখানে রাস্তার অপরদিকে এই ভাণ্ডার ছিল। আমি সেখানে একটু দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিলাম, দেখি সেই সকালের আমার প্রাক্তন ছাত্র সেখানে এসেছেন।

"আপনি এখনও কমিশনারের কুঠি যান নাই?"

"কখন যাব, বল? এই টেলিগ্রাফ আপিস হতে আসছি। দেখ না, রাত্রি সাড়ে দশটা।"

"এখনই যান। কমিশনার সাহেব অস্থির হয়েছেন। ফটক হতে তাঁর গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।"

বাসায় যাওয়া হল না।

"চল কমিশনার সাহেবের কুঠি।"

তৎকালে উড়িষ্যা প্রদেশে কটক, পুরী, বালেশ্বর, এই তিন জেলা ছিল। মোগলরাও এই তিন জেলায় স্বামিত্ব করে গেছলেন। এই কারণে এর নাম মোগলবন্দী। আর, উড়িষ্যার পশ্চিমে ছোট-বড় ১৮টি দেশীয় রাজ্য ছিল। নাম, গড়জাতমহল। রাজগণ অল্পস্বল্প কর দিয়ে ব্রিটিশের স্বামিত্ব স্বীকার করতেন। কমিশনার সাহেব সে সকল রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই কারণে তাঁর পদগৌরব সমধিক। ফটকের দুইদিকে দুই সান্ত্রী বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত। যে-সে লোক কুঠিতে ঢুকতে সাহসী হত না। কুঠি বড়, অনেক জমি, ফটক হতে কুঠি পর্যন্ত উঁচু দেবদারু গাছের বীথি। আমার রথ সে পথ দিয়ে একেবারে কুঠির গাড়ি-বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াল। কুঠির সামনে দেখি, ৫।৭ জন চাকর বসে আছে। শুক্ল-পক্ষ; তাদের দেখা যাচ্ছে। সাহেব গাড়ি-বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর, আমি যাবার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম—

"Where is my dhobi gone?"

আমি গাড়ি হতে নেমে ৫।৬ ধাপ উঠে সাহেবকে অভিবাদন করলাম।

"So you have come?"

"I must come. It's not yet twelve."

আলো জবলছিল। ঘড়ি বার করে দেখালাম, প্রায় সাড়ে এগারটা।

"My dhobi is not here to-night. What's to be done?"

"সে নিত্য কোথায় থাকে? তার বাড়ি কোথায়?"

"সে এখানেই থাকে, ঘরেও যায়। ঘর শহরে। আমি তার ঘরে কোন চাকর পাঠাতে পারি নাই। আজকের রাত এখানে থাকতে হবে, আমি চাকরদের বার বার বলেছিলাম। কি করা যাবে?"

"সে নিশ্চয় তার ঘরে গর্ণাত হয়েছে। গণনাকারী ঘর দেখে মানুষ গণেছে।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"এতে আর সন্দেহ কি?"

সাহেব শান্ত হলেন।

"আমি আপনার কাগজটা একবার দেখতে চাই।"

"নিশ্চয়।"

অমনই দৌড়ে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এলেন। ইয়োরোপীয়দের সেনসাস কাগজে একটা ঘর ছিল—কি কি ভাষা জানেন। আমি দেখলাম, সাহেব সে ঘরে শুধু English লিখেছেন।

"আপনি কি ইংলিশ ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না?"

"নিশ্চয় জানি। আমি ফ্রেঞ্চ জানি, জার্মানও বুঝি।"

"তবে লেখেন নাই কেন?"

"লিখব কি?"

"নিশ্চয়।"

মেম-সাহেব দোয়াত-কলম আনলেন। সাহেবের হাত কাঁপছে; তিনি কি ভুলই করতে যাচ্ছিলেন! তিনি কি লিখলেন, আমি আর দেখলাম না। তাঁর মুখ এখন প্রসন্ন। আমি অভিবাদন করে ধন্যবাদ নিয়ে নেমে এলাম। গাড়িতে উঠে দেখি, তখন চাকরগুলি উঠে দাঁড়িয়েছে। আমারই আগমনের জন্য কমিশনার সাহেব তাদের এত রাত্রি পর্যন্ত এক জায়গায় বসিয়ে রেখেছিলেন।

বাসায় ফিরলাম। রাত্রি ১২টা।

ইংরেজ চরিত্রের এক মহাগুণ লক্ষ্য করলাম। নিয়মানুবর্তিতা তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি কমিশনার, উড়িষ্যা প্রদেশের বিধাতা। পাছে একটি লোকের গর্ণাততে ভুল হয়, তিনি সেই ভয়ে কাতর।

এর বিপরীত গুণও ছিল। কটকে শুনেছি, কুক সাহেব নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। একদিন তিনি একটা বে-আইনী হুকুম দিয়েছিলেন। সেরেস্তাদারবাবু তাঁকে বলছেন,—

"হুজুর, য়হ্ হুকুম বে-আইন হুআ।"

সাহেবের ঠোঁটে কুইল পেন ছিল। তিনি পেনটি নামিয়ে রেখে,—

"সেরেস্তাদারবাবু, য়হ্ আইন কৌন কিয়া? হমারা বাপদাদা, কি আপকা বাপদাদা?"

"হুজুর, আপকা বাপদাদা।"

"ব্যাস্।"

মানুষ-গর্ণাত নূতন ব্যবস্থা নয়। পূর্বকালে অনেক সভ্য দেশে মানুষ-গর্ণাত হত। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে গেলেই জনসংখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি জানতে হত। আমাদের দেশে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী কৌটিল্য রাজ্যশাসন-প্রণালীর এক অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে গেছেন; নাম, অর্থশাস্ত্র। তাতে আছে, গোপ নামে এক রাজকর্মচারী মানুষ-গর্ণাত-কর্মে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি দশ কুলের, বিশ কুলের অথবা চল্লিশ কুলের নরনারীর জাতিগোত্র নাম ও বৃত্তি এবং আয়-ব্যয় লিখে রাখতেন। গোপের আরও কাজ ছিল। তিনি সমাহর্তার (Collector)-এর অধীনে থেকে পাঁচ বা দশগ্রামের হিসাব রাখতেন। অমরকোষেও গোপ, বহুগ্রামের অধিকারী। ছয় শত বৎসর পূর্বেও বঙ্গদেশে গোপের বৃত্তি 'লিখন' ছিল, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে লিখিত আছে। এঁরাই পরে পাটোয়ারী নাম পেয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে চরিত্র-অঙ্কন

শ্রীসরলাবালা সরকার

টকে অঙ্কিত চরিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকারেরও সংস্পর্শ লাভ করা যায়। গিরিশচন্দ্র বহু নাটক রচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভাবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পাত্র ও পাত্রীগণের মুখ দিয়া তিনি যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহার ভিতর যে তাঁহার নিজের উক্তিও প্রচ্ছন্ন আছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে আছে সামাজিক সমস্যার চিত্র, সেইসঙ্গে সেই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিতও আছে। কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ এবং কতকগুলি বিবাহিতা ও বিবাহযোগ্য কন্যা কি দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে, "বলিদান" নাটকটি তাহারই একটি বাস্তব চিত্র। গ্রন্থশেষে ঘনশ্যামের উক্তির ভিতর দিয়া আমরা গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটি পাই:—"আমাদের সমাজে আজ কন্যার পিতার এই পরিণাম; ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা। প্রতি গৃহে দারিদ্র্য। সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান!—তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করিতে পরাঙ্মুখ হই না।"

সেই পীড়ন গত যুগে যেভাবে ছিল, এখন অবশ্য ঠিক সেইভাবে নাই, কেননা এখন নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলেই জাতি যাইবে ইহাই শাস্ত্রের উক্তি, একথা কেহই মানেন না। যাহা হউক সে-কালের যে চিত্র গিরিশচন্দ্র দিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কন্যার পিতৃগৃহ। কন্যার সহিত একটি ঝিকে তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হইয়াছিল, সেই ঝিটি ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া কন্যার মাতা ভীতা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হয়েছে? তুই চলে এলি কেন?"

ঝি। "হবে কি গো? নাচ্‌তেছে—নাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্ছে—মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে।

কন্যার মাতা। ও বাছা—ব্যগ্রতা করি, সব বল্, ক'নে কি তাদের পছন্দ হয়নি?

ঝি। বল্‌বো,—তবে শুনবে? পাল্কী খুলে, বউয়ের মুখ দেখে তোমার বেয়ান অমনি ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লো। বলে, "ওমা, কোথাকার কাটকুড়ুনি এলো গো—কোথাকার হা'ঘরের মেয়ে আনলুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—কর্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো—

গিরিশচন্দ্র

তোমার সাধের মোহিত বাঁদিনী এনেছে গো—তোমার মোহিতকে ডোম্ ডোক্‌লা বিদেয় করেছে গো।" ইত্যাদি—

গিরিশচন্দ্রের এই বর্ণনা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়, ৪০।৫০ বৎসর পূর্বের এটি একটি প্রত্যক্ষ সামাজিক চিত্র।

"শাস্তি কি শান্তি" নাটকটি আর একটি সামাজিক চিত্র। এটি হিন্দু সমাজের বিধবা, বালিকা বিধবার উপর সামাজিক অনুশাসন এবং পদস্খলিতা বিধবার সমস্যা লইয়া লিখিত।

এই পুস্তকে তিনটি বিধবার চিত্র আছে, একটি বিধবা তপস্বিনী, আর একটি বালিকা বিধবা, পিতা তাহাকে যে পাত্রের সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়াছিলেন, সে অতি কুচরিত্র, অর্থের জন্য স্ত্রীকে কুচরিত্র ধনবানের হস্তে সমর্পণ করিতেও তাহার কুণ্ঠা নাই, এবং ষড়যন্ত্র করিয়া সে সেইরূপই করিতে চাহিয়াছিল। আর একটি বিধবা স্বামীর বন্ধুর প্রলোভনে পতিত হইয়া অবৈধ সন্তানের জননী হইয়াছিল এবং শেষে পিতার হস্তেই তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়।

এই গ্রন্থে হরমণি নামে এক মহিলার কথা আছে, তিনি অনাথাদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রম পতিতা অথবা পবিত্রা আবাসহীনা নির্যাতিতা নারীমাত্রেরই আশ্রয়-স্থল ছিল। আত্মহত্যায় উদ্যতা একজন পতিতাকে তিনি এই বলিয়া আত্মহত্যায় নিবৃত্ত করেন, "তুমি কিছু ভেব না। পাপ যদি করে থাক, সৎকার্য করে কুকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করো। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ করতে পারবে। তোমার নিজের অবস্থার অন্য অভাগিনীদের তুমিই আশ্রয় হবে। তাতেই ভগবানের কৃপায় তোমার তাপিত হৃদয় শান্ত হবে।"

"ভ্রান্তি" নাটিকাটিকেও এক হিসাবে সামাজিক নাটক বলা যায়। এই নাটকে 'রঙ্গলাল' নামে একটি চরিত্র আছে। গঙ্গা নামক একটি বারবণিতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "তোমায় আমি বুঝতে পারলুম না। পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকীও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাকো, বে' থাও করোনি, খবর নিয়ে

জেনেছি, মেয়েমানুষের কাছেও যাও না। দান ধ্যানও করো, এদিকে পুজো-অর্চ্চনার ধারও ধার না।"

গঙ্গা রঙ্গলাল তাহাকে চিনিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে রঙ্গলাল যখন উত্তর করিলেন যে, তিনি চিনিতে পারেন না, তখন গঙ্গা তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আজ ক' বছরের কথা, আমি ঠাকুরতলায় সর্দিগর্মি হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি; বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এলে। আপনি নীচে শুয়ে নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন করলে, ভালবাসার লোকও সে রকম করে না। তারপর যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।"

ইহাই রঙ্গলালের চরিত্র।

রঙ্গলালের মিথ্যা কথা বলিতেও সংস্কারে বাধে না, যদি সে মিথ্যা অন্যের উপকারের জন্য প্রয়োজন হয়।

রঙ্গলাল প্রহরীদিগকে ভুলাইয়া শালিগ্রাম সিংহ ও তাহার পুত্র নিরঞ্জনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন, কিন্তু নিজে ধরা দিলেন, পাছে সেই নির্দোষ প্রহরীদের দণ্ড হয়। তিনি গঙ্গাকে দিয়াই প্রহরীদের ভাং খাওয়াইয়া দিলেন, আবার মুক্ত হইয়া গঙ্গাকে সম্মুখে দেখিয়া অপর একটি বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য যখন তাহার সাহায্য চাহিলেন, তখন গঙ্গা তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, তোমার পরের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? এদিকে তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই মানো না, সামনে দেবীমন্দির, মায়ের সামনে একবার মাথাটাও নোয়ালে না।" রঙ্গলাল বলিলেন, "মায়ের কোলে ছেলে থাকে, ক'বার প্রণাম করে বল। ক'বার স্তব-স্তুতি করে? ক'বার বলে তুমি হ্যান, তুমি ত্যান?"

রঙ্গলাল আরও বলিলেন, "অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না।...আমি বলি—থাকো মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্‌চার্য্যির মুখে চিড়িং চাড়াং ফিড়িং ফাড়াং শোনো।"

গঙ্গা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাস্তিক নাকি?"

তখন রঙ্গলাল বলিলেন, "আমি নাস্তিক? যে আমায় নাস্তিক বলে সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ।...মানুষ আমার দেবতা। যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ,—মন্ত্র পড়ে যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হয় না,—যার সেবায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়,— যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না—ভাল করেছি কি মন্দ করেছি—যে দেবতার পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।"

ইহাই রঙ্গলালের উক্তির ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের উক্তি এবং তাঁহার গুরু-ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দেরও উক্তি।

রঙ্গলাল তাঁহার বক্তব্যটি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার জন্য বলিলেন, "পুণ্যের ফলে স্বর্গসুখ হয় একথা শুনেছো তো। দেখ, একদিন একজনকে—যার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, যার খুব তেষ্টা পেয়েছে তাকে একটু জল দিও—খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' ক'রবে, শুনে তোমার যে সুখ হবে, কোনও ব্যাটার চোদ্দপুরুষে কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে এত সুখ কল্পনাও কর্‌তে পারে নি।"

ইহাই রঙ্গলালের প্রকৃত সুখের কল্পনা।

বইখানির নাম "ভ্রান্তি", লোকে ভুল বুঝিয়া কত কি অন্যায় করে, ইহার পরিচয় এই পুস্তকের পাতায় পাতায় আছে। বইয়ের শেষ দিকে নিরঞ্জন যখন ভুল বুঝিয়া বন্ধু পুরঞ্জনকে অস্ত্রাঘাত করিল, এবং ভ্রান্তির অবসানে "ভাই, ভাই নিরস্ত্র তোমায় বধ করলেম" বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন রঙ্গলাল তাহাকে বলিলেন, "তা ক'রেছ-ক'রেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই।...আর একটি কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ কর। পুরঞ্জন আহত, তুমিই এ কার্য্যের ভার লও।"

"হারানিধি" নাটকে অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার ভিতর শয়তান-রূপী মোহিনীর চরিত্রে বিশেষ দৃঢ়তা আছে। গুরুতর অন্যায় করিয়াও তাহার বিন্দুমাত্র অনুতাপ হয় না। সে তাহার স্ত্রীকে বলে, "তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয় জান না। সাতহাত মাটী কোদ্‌লাও একটা পয়সা পাবে না, ক্রোর টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জন্দালিয়ে প্রজা শাসন ক'রতে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয় কেড়ে নিতে হয়—তবে বড়লোক হয়। তুমি এ সব জান না; যেমন জান না, আমি জান্‌তে বলিনি—ঘরে ব'সে খাও দাও থাক, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিও না, এই আমার কথা। আমি চোখ বুজ্‌লে, মেয়েরেই বিষয় হবে; তুমি যদি দয়া, ধর্ম, শাপ মন্যি শেখাও, তা হ'লে এই অট্টালিকা দেখ্‌ছো—দু'দিনে মাঠ হবে।"

মোহিনী তাহার আবাল্য বন্ধু হরিশকে ষড়যন্ত্র করিয়া সর্বস্বান্ত করিয়াছে। হরিশ যখন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল, তখন মর্মাহত হইয়া বলিল, "তুমি সবই কি ভুলে গেলে? তুমি সাঁতার দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমায় বাঁচাই,—তোমার মা'র গহনা চুরি করেছিলে, তোমার বাপ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই। তোমার কষ্ট হবে ব'লে তোমায় বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুরে শুই; হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা করে-ছিলে, তোমায় বাঁচাবার জন্য তোমায় আগুলে হাড়ীর লাঠি খেয়ে ছ'মাস শয্যাগত থাকি, এখনও আমার গায়ে লাঠির দাগ আছে। আমি বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর তুমি গলায় ছুরী দিচ্ছ?"

উত্তরে মোহিনী বলিল, "তুমি মূর্খ, তুমি কথামালাও পড়নি? বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল; তুমি কি জান না, সারস বাঘের মুখ থেকে নিজের মাথা বার করে এনেছিল এই ঢের! গরিবলোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্য মাথা দেবে, বড়লোকের জন্য মেয়েমানুষ যোগাবে, কুকুরের মত দুটি খাবে আর থাক্‌বে!"

এই মোহিনীর একমাত্র দুর্বলতা কন্যার প্রতি স্নেহ। কন্যার জননী তাই কন্যাকে দিয়াই স্বামীর নিকট যত কিছু আবেদন পাঠান। মোহিনী হরিশের বাস্তুভিটা গ্রাস করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিতেছে তাই কন্যাকে জানাইলেন যে, "তোর দ্যাখন্-মাসীদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া কর্তাবাবু তাহাদের তাড়াইয়া দিবেন।"

সরলা বালিকা পিতাকে কর্তাবাবু বলিয়া ডাকে এবং শোনা কথা মুখস্থ করিয়া পাকা পাকা কথা বলে। তাহার মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া মোহিনীর কঠিন চিত্তও যেন মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গৃহিণীর উপর রাগিয়া যায় যে মেয়েকে সে দয়া মায়া প্রভৃতি শিখাইতেছে।

মায়ে মেয়ের পরামর্শ হইতেছিল, মোহিনীমোহন আসিতেছে দেখিয়া পত্নী কমলা ত্রস্তা হইলেন, কন্যার বাক্যপ্রবাহে বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর!"

হেমা। চুপ্ করবো কি গো? আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই, স্পষ্ট কথা বলবো।

মোহিনীমোহন প্রবেশ করিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ক্ষেপী, কি রে?"

হেমা। কর্তাবাবু তুমি দেখনহাসি মাসিদের উঠিয়ে দিও না; আমি একটা অখদ্যে অবধ্যে প'ড়ে আছি, আমারও তো মুখ চাইতে হয়! আমি নানান জন্‌দায় ঘুরি—সুশীলা দিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়ুই।

মোহিনী। তোরে কে বল্লে রে? কে বল্লে রে?

হেমা। হুঁ! তোমায় ব'লে আমি থানা-পুলিস করি আর কি!

মোহিনী। (কমলাকে দেখাইয়া) এ বলেছে?

হেমা। হ্যাঁ, তোমায় পেটের কথা ভাঙি, তুমি মার গর্দান নাও! কর্তাবাবু, তোমায় বল্‌ছি বাছা, তুমি কিন্তু দেখনহাসি মাসীদের গায়ে হাতটা দিতে পারবে না।

মোহিনী। না, না, কে বল্লে? মিছে কথা। যা, শুগে যা।

হেমা। যাচ্ছি বাপু। দেখো, যেন তাদের নাইতে কেশটি না ছে'ড়ে।

মোহিনী। ক্ষেপি, আমায় চুমু খেয়ে গেলিনি?

হেমা। বাছারে, যত বুড়ো হচ্ছি যেন ভীমরথী হচ্ছে। (চুমো খাইয়া) আসি, বাছা। ভাল কথা মনে—কর্তাবাবু একটা টাকা দাও; বেইবাড়ী তত্ত্ব ক'রতে পাচ্ছিনি, বর ক'নে ঘরে আনতে পাচ্ছিনি।

মোহিনী। (টাকা দিয়া) এই নে, এই নে যা।

হেমা। 'যা' বাক্য বল্‌তে আছে? বল এস।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলে মোহিনী-মোহন স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিল, অবশেষে প্রহারও করিল। হেমাঙ্গিনী ঘুমায় নাই, পিতার ক্রুদ্ধ চিৎকার ও প্রহারের শব্দ শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল, বলিল, "ও কর্তাবাবু কি করলে, কি করলে, মা ম'রে যাবে, মা ম'রে যাবে! আমায় মেরে ফেল, কর্তাবাবু, আমায় মেরে ফেল।"

এইভাবের অনেক কথাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে বলিল। এবং পিতা চলিয়া গেলে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে সকল কথা বলিতে লাগিল তাহার ভাবার্থ এইরূপঃ—"ও—মা, তুমি আমার মাথা খেয়ে কেন এলি মা? আমি কেঁদে কেঁদে বাঁচবোনা মা, মা তুই আমায় ভাঁড়াস্ নি মা, আমি দেখেছি মা তোকে বড্ড মেরেছে, মা তোর গতর ভেঙে দিয়েছে মা! ও মা, তুই বড় দুঃখী মা! ওগো মাগো, তুই কেন হেথা এয়েছিলি গো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো, আমার দুঃখিনী মাকে কেন কর্তাবাবু মারলে গো?"

এই কন্যা হেমাঙ্গিনীর জন্যই শেষে মোহিনীমোহনের চরিত্রের পরিবর্তন হইয়াছিল।

এই সব নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বিপুল বেগে চলিয়াছে। গ্রাম্যভাষা বহু স্থলে আছে, কিন্তু সেগুলি না থাকিলে চরিত্র পরিস্ফুট হইত না।

প্রায় প্রত্যেক নাটকেই এমন কতকগুলি চরিত্র আছে যেগুলি কতকটা খেয়ালী বা পাগলের ছদ্মাবরণে মহৎ চরিত্র। "জনা" নাটিকার বিদূষক, "পাণ্ডবগৌরব-এ" কঞ্চুকি, "শাস্তি কি শান্তি"র পাগল, "ভ্রান্তি" নাটকে রঙ্গলাল প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র। আবার বারবণিতার মনেও যে প্রচ্ছন্ন উচ্চভাব থাকে তাহাও গিরিশচন্দ্র তাঁহার অনেক নাটকেই দেখাইয়াছেন। "হারানিধি" নাটকে কাদম্বিনী নামে একটি পতিতার চরিত্র আছে। মোহিনীমোহন তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া ঘরের বাহির করে। বাহির করিয়া আনিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। কাদম্বিনী যখন গঙ্গায় আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল তখন হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে বাঁচায়। কাদম্বিনীকে নীলমাধব "মা" বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতেই কাদম্বিনীর মন আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া গেলঃ—

"তুমি আমায় মা বলেছ? তুমি অভাগিনীকে 'মা' বলে ডেকেছ, গঙ্গাদেবী সাক্ষী,—জগন্মাতা রণে বনে দুর্গমে তোমায় রক্ষা ক'রবেন।" এই বলিয়া কাদম্বিনী আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করিয়া মোহিনীর উপর প্রতিশোধ লইবার উপায় খুঁজিতে চলিয়া গিয়াছিল। পরে সে হরিশের ও নীলমাধবের অনেক উপকার করে। কিন্তু কাদম্বিনী ষড়যন্ত্র করিয়া মোহিনীর নিকট হইতে স্বীকৃতিনামা (Affidavit) আদায় করিয়াছে নীলমাধব যখন জানিতে পারিল তখন মর্মাহত হইল। বলিল, ""তুমি যখন আত্মহত্যা করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার জন্য গঙ্গাতীরে প্রতিশোধের কথা বলেছিলাম বটে, কিন্তু সে কি এই প্রতিশোধ? * * যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল অন্য প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করেছিল, জগতের হিতে রত হয়ে তারে তুমি দেখাতে পারতে যে, তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যে উৎসাহের তুমি প্রকাশ করেছ, ঈশ্বর উপাসনায় যদি তোমার সেই উদ্যম, সেই উৎসাহ থাকতো, তুমি দেবী হ'তে! কিন্তু এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাতে আর তোমাতে প্রভেদ কি? অগ্র পশ্চাৎ!"

নীলমাধবের চরিত্র অতি অপূর্ব। সে তাহার শত্রুগণকে ভালবাসা দিয়াই হার মানাইয়াছে। মোহিনীকে তাহার একরারের কাগজগুলি ফিরাইয়া দিয়াছে, দুষ্টপ্রকৃতি গুণনিধিকেও তাহার বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছে। যদিও সহজে ইঁহাদের মতি পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু অবশেষে সকলেরই মতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

নীলমাধব, মোহিনীমোহনকে কাগজ-গুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "মশাই এ কাগজগুলি নিন, আমাদের বাড়ী সম্বন্ধে একরার আর কনভেয়ান্স্ (conveyance)।"

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় পেলে?"

নীলমাধব বলিল, "আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।" সেই মুহূর্তেই মোহিনীর চৈতন্যের উদয় হইল। ভাবিল, "এই নীল-মাধব, যে পরম শত্রুকেও হাতে পাইয়া আঘাত করে না। আর আমি? আমি হরিশের কিনা সর্বনাশ করেছি, অথচ সেই হরিশ ছেলেবেলা থেকেই আমায় কত বিপদে বাঁচিয়েছে। গহনা চুরি করে হরিশের ঘাড়ে দোষ দিলাম, বললাম হরিশের পরামর্শেই চুরি করেছি। সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলাম, বাড়ী এসে বললাম হরিশই আমাকে সাঁতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল; দাঙ্গা করে বললাম হরিশের পরামর্শেই দাঙ্গা করতে গিয়েছিলাম, এদিকে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তার অস্থি চূর্ণ হ'ল। সেই হরিশের ছেলেই তো এই নীলমাধব। হরিশের ছেলে যেমন হওয়া উচিত, তাই সে হয়েছে।"

এই পুস্তকে অঘোরের চরিত্রও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অতি অপূর্ব, স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাই তাহার জীবনপথের নিয়ামক হইয়া তাহাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উন্নত জীবনে প্রবর্তিত করিয়াছে।

"মায়াবসান" নাটকে সাতকড়ি চাটুজ্যের চরিত্র আর এক দিক দিয়া অত্যাশ্চর্য। চাটুজ্যের একমাত্র আনন্দ লোকের বিপদ ও দুঃখে। যে পরিবারে সকলে মনের মিলে আনন্দে আছে সেখানে কোনও উপায়ে বিবাদ বাধাইতে পারিলেই চাটুজ্যে পরমানন্দিত হন। এজন্য তিনি পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে করেন না, অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সৎকার্য সাধনের জন্য তিনি অ্যাটর্নি ও উকিলের সহিত বন্ধুত্ব করেন, পরামর্শদাতারূপে তাহাদের পথ-নির্দেশ করেন, অনবরত আদালতে যাওয়া-আসা করেন।

কালীকিঙ্কর বসু একজন প্রবীণ ভদ্র-লোক। বিজ্ঞান-সাধনার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তিনি নিজে অবিবাহিত, দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, একটি ভাগিনেয় ও একজন বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ইঁহারাই তাঁহার পরিবার। ভাইপো দুইটি এক বছরের ছোট বড়;

অবিরত তাহাদের তর্ক ও সেই সূত্রে ঝগড়া লাগিয়াই আছে। এই ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া মোকদ্দমা বাধাইবার জন্য সাতকড়ি চাটুজ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অ্যাটর্নি কৃষ্ণধন বসুর বাড়ি গেলেন। কৃষ্ণধন অবশ্য বিবাদ বাধিলেই খুশী, কিন্তু বলিলেন, "খুড়ো রয়েছেন, তিনিই সব মিটিয়ে দেবেন। আর যদি ঘরোয়া পার্টিশন হয়, খুড়োই মধ্যস্থ হ'য়ে করে দেবেন।"

কিন্তু সাতকড়ি নিরাশ হইবার পাত্র নহেন। তিনি অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "আরে মশাই দেখুন না চেষ্টা করে, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? উকিলের বুদ্ধি কুমারের চাক, যত ঘুরুবেন ততই ঘুরবে।"

কৃষ্ণধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তো বেশ হেড ক্লিয়ার দেখ্‌ছি, আপনি কি করেন, মোক্তারী না ল' ব্রোকারী?"

সাতকড়ি। আমি কিছুর মধ্যেই নই, অমনি পাগল ছাগল একটা পড়ে থাকি, একটু তেজারতি আছে, আর এই আপনাদের পাঁচ-জনের কাজকর্ম করে বেড়াই, শুধু বাড়ীতে পড়ে ঘুমিয়ে আর কি কোরবো?"

"আপনার লাভ?"

সাতকড়ি। লাভ আর কি, আমি মশাই আমুদে মানুষ, টাকা যত হোক্ না হোক্ আমার আমোদ হ'লেই হল।

অ্যাটর্নি চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন, "আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্‌চিপ্ ফর মিস্‌চিপ্‌স্ সেক...উই আর ফ্রেন্ডস্, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।"

এই আমোদের জন্য সাতকড়ি বসু-পরি-বারটিকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। দুই ভাইয়ের বিবাদ বাধাই-লেন, কালীকিংকরবাবুকে পাগল প্রমাণ করিবার জন্য ডাক্তারের সাহায্য ও ঔষধের সাহায্য লইলেন। কালীকিংকরবাবুর রিসার্চের কাগজগুলিও চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেননা জানিতেন সেগুলি কালীকিংকরবাবুর নিকট বহুমূল্য ধন।

কিন্তু তাঁহার চুরি করা হইল না। চাবি পড়িয়া আছে দেখিয়া যখন চাবি লইয়া বাক্স খুলিতে যাইবেন তখন কালীকিংকরবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে ও চাটুজ্যে?"

সাতকড়ি। আজ্ঞে—আজ্ঞে।

কালী। ভয় করছো কেন? কি চাও নাও। আমি কিছু বোল্‌বো না।.........

সাত। আজ্ঞে না, আমি টাকাকড়ি চাইনে।

কালী। তবে. তবে কি চাও? যা চাও বল, আমি এখনি দিচ্ছি। কেবল একটি কথা আমায় সত্য বল, তোমারও তো বয়েস হয়েছে; মানবজীবনে কি দেখ্‌লে—লাভা-লাভ কিছু বুঝ্‌লে? কি চাও—নাও, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞে আমি টাকাকড়ি নিতে আসিনি। এতে যে টাকাকড়ি নাই, তা আমি জানি। এ বাক্সটা কেবল আপনার হাতে টোকা কাগজে ভরাট, সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো মনে করেছিলাম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজ্ঞে, আপনার টাকায় দরদ নাই, স্ত্রীলোকে দরদ নাই, মান-সম্ভ্রমের খাতির করেন না—দরদের ভিতর এক, ভাইপো, ভাইপো বৌ, আর রঙ্গিণী। আর বলেন তো এক ভাগ্‌নে। তা তাঁরা তো নিরুদ্দেশ, ভাগ্‌নেটিও ভাবে বুঝছি—কোন দিন চম্পট দেন। তা হলেই এদিক একরকম ফুরুল, আর দরদের ভিতর দেখেছি, আপনার বিদ্যার আর ঐ কাগজগুলির। * তাই ভেবেছিলাম ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝতে পারলাম না।

সাত। আজ্ঞে, ছেলেবেলায় মাষ্টার গল্প করেছিলেন—'কে একজন ফরাসী পণ্ডিত রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখেই মানুষের আনন্দ।' আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেম, জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তারপর দেখলেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে, তখন প্রাণটা একটু ঠান্ডা হ'ল, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। ঐ কাগজগুলি যথার্থই আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জেগে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার প্রতি লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যবহার দেখেছি, বিজ্ঞানচর্চায় জীবন উপেক্ষা করে তাড়িত পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা যা দেখেছি, যা যা বুঝেছি, সব ঐ কাগজে টুকে রেখেছি—কেন জান? ভেবেছিলাম, এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানবদুঃখের এক কণাও কমবে না।

এবার সাতকড়ি কাগজ না লইয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল; কেননা সে বুঝিতে পারিয়াছে ঐ কাগজের উপর এখন আর কালীকিংকরবাবুর কোন মমতা নাই।

কালীকিংকরবাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মনে কর, যারা পরের উপকার করে, তারা আহম্মুখ।' উত্তরে সাতকড়ি বলিল, 'তা নয়, তবে যার যা সখ, যে যাতে আমোদ পায়।'

কালীকিংকর আশ্চর্য হইয়া ভাবিলেন, পরের অনিষ্টই এর জীবনের ব্রত! কিন্তু আশ্চর্য, একে তো একদিনও বিমর্ষ দেখি না।

"মায়াবসানে" সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যেটি বিশেষ চরিত্র সেটি 'রঙ্গিণী' নামে একটি মেয়ের চরিত্র। রঙ্গিণীর পরিচয় সে বিন্দি-বৈষ্ণবীর কন্যা। বিন্দি ও তাহার শিশু-কন্যাকে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় কালীকিংকরবাবু ও তাঁহার দেবীসমা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা আশ্রয় দেন। সেই হইতে রঙ্গিণী প্রথমে তাঁহাদের আশ্রিতা পরে কালীকিংকরবাবুর কন্যাতুল্যা, ছাত্রী ও শিষ্যারূপে দিনে দিনে তাঁহারই শিক্ষায় মনোবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

বসু পরিবারে বহু বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। যাদব ও মাধব দুই ভাই পরস্পর-বিরোধ করিয়া মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহারা অ্যাটর্নি ও উকিলের এবং চাটুজ্যের পরামর্শে কাকাকে পাগল করিতে গিয়া বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়াছে এবং সেই ঔষধ তাহাদের মাতৃসমা অন্ন-পূর্ণার হাত দিয়াই ঔষধ বলিয়া খাওয়ানো হইয়াছে; তাহার পর অন্নপূর্ণার নামে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগে তাহাকে পুলিসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। রঙ্গিণীও এই ষড়যন্ত্র-জালের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কিন্তু নানা বিপদে পড়িয়াও তাহার মনের বল ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং তাহার নির্মল চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমা স্পর্শ করে নাই। সে কালীকিংকরবাবুকে বিষাক্ত ঔষধ পানের পর শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহার মানসিক সুস্থতা যাহাতে ফিরিয়া আসে, অবিরত সেই চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহাকে বলিয়াছে, 'ছোটবাবু তুমি একটু চেষ্টা কর, আরাম হ'বার জন্য ইচ্ছা কর, তা হলেই আরাম হবে।'

মানুষ কেন পাগল হয়? কালীবাবু রঙ্গিণীকে বলিয়াছেন, 'মানুষ পুত্রশোকে পাগল হয়, কেননা ভাল হ'লে তার ছেলেকে মনে পড়বে, সর্বস্বান্ত হ'য়ে পাগল হয়, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা, পরমাত্মীয়ের শত্রুতা এসমস্ত ভোলবার জন্যই লোকে পাগল হয়, সুস্থ হ'তে সে চায় না।'

রঙ্গিণী তাঁহাকে বলিয়াছে, 'ছোটবাবু, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাকতো, তা হলে কৃতজ্ঞতার কিসের আদর? অধর্ম যদি না থাকতো, তবে প্রকৃত ধর্মের আদর কিসের? অসত্য যদি না থাকতো, তা হলে সত্যের আদর কিসের?' রঙ্গিণী আরও বলিল, 'যন্ত্রণা এড়াবার ভয়ে পাগল হয়ে মরবে এই কি তোমার ইচ্ছা? আমার ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা,

যদি একদিন ভাল হয়ে তার পরদিনই তোমার মৃত্যু হয়, ভগবান যেন তাই করেন। ** ছোটবাবু তোমার জন্য আমারও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু আমি পাগল হব না,—তুমি যন্ত্রণার ভয় কর, তাই তুমি আরাম হতে চাও না, কিন্তু তোমারই শিক্ষায় আমার যন্ত্রণার ভয় নাই, যন্ত্রণাতেই আমার আনন্দ।'

কালীকিংকর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল হয়ে কি কোরবো? আর যদি পরের উপকার করি, তাতে আমার লাভ কি?'

উত্তরে রঙ্গিণী বলিল, 'ছোটবাবু এ-কথার উত্তর তো তুমি আমায় শিখাওনি! ** তুমি আমাকে শিখিয়েছ, যে লাভের কথা ভাবে, সে ধর্মপথে চ'লতে পারে না, সত্য বলতে পারে না, পরোপকার ক'রতে পারে না, আমি তাই শিখেছি।'

ইহার পর কালীকিংকর রঙ্গিণীকে প্রশ্ন করিলেন, 'ভাল হব?'

রঙ্গিণী বলিল, 'হাঁ'। আবার প্রশ্ন করিলেন 'তুমি সত্যি সত্যি বল আমি ভাল হ'য়েছি?' রঙ্গিণী উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলিল, 'আমি সত্যি বলছি, তুমি ভাল হ'য়েছ।' কালীকিংকরবাবু সেই মুহূর্তেই অনুভব করিলেন, তিনি পূর্বের মতই সম্পূর্ণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবল লাভ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রঙ্গিণীর উপর তাঁহার কতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।

কিন্তু রঙ্গিণী নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িল। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় তাহাকে শয্যার আশ্রয় লইতে হইল। কালীকিংকরবাবু তাহাকে বাগানের ভিতরের নির্জন বাড়িতে আনিয়া রাখিলেন এবং শুশ্রূষার জন্য নিজেও সেখানে থাকিলেন। এই বাড়িতেই তাঁহার দুই ভাইপো পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে তাঁহার কাছে আশ্রয় লইতে আসিল। বলিল, 'কাকাবাবু আমাদের বাঁচান। পরের পরামর্শে আমরা এসব অন্যায় কাজ করেছি।'

কালীকিংকর বলিলেন, 'পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা ক'রেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালক-কাল থেকে শুনেও বোঝনি যে, এসব কুকাজ? ** জেলের ভয়ে অস্থির হ'য়ে আমার পায়ে ধরতে এসেছ, আর সেই জেলে বড় ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে? ** তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ,—সমাজবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ নীতিবিরুদ্ধ পাপ!' বলিয়া তাহাদের যখন কোন সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তাঁহার পুরাতন চাকর শান্তিরাম বলিল, '** এরা দুর্জন,

স্কেচ— শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু
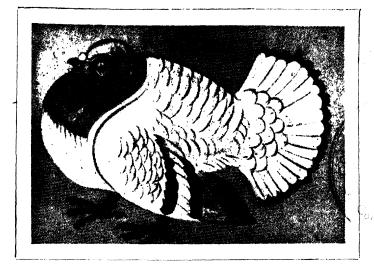
এদের সাজা দিতে চাও, আর এদের যে বে দিয়ে এনেছ, সেডা মনে রাখ। ** মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জন বল্‌তোনি। প্যাটের ছেলে ডরিয়ে আইসে পায় ধরতিছে, আর পা ঝিনকুটে ফেলতিছে?' **

রঙ্গিণী দুই ভাইয়ের আর্তনাদ শুনিয়া রুগ্ন শয্যা হইতে উঠিয়া আসিল, ও ব্যাপারটি দেখিল। কালীকিংকর যখন বলিলেন, 'পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি করবে?'

রঙ্গিণী। পাপের দণ্ড! মার্জনা নাই? তবে তো মানবদেহ ধারণ মহা বিপদ। যদি মার্জনা না থাকে, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব? এজীবন কার্যপ্রবাহ, সকল কার্যই কোন না কোনভাবে কলুষিত, যদি দণ্ড হয়, মার্জনা না থাকে, তা হলে তো অনন্ত কালেও নিস্তার নাই।'

কালী। কে বললে মার্জনা নেই? ভগবান অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জনা করেন।

রঙ্গিণী। তবে কি মার্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? ** যদি মানুষের মার্জনা নিষেধ হয়, তা হলে এমন হীন-জন্ম আর নাই।

কালীকিংকর বুঝিলেন যে, তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছিলেন, তাই সকল দিক ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি বুঝিলেন যে, এখন 'প্রতিহিংসাই বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিল, তাই সত্যের দোহাই দিয়ে ভয়ার্ত বালকদের মার্জনা করি নাই।'

এই গ্রন্থে বহু চরিত্র আছে। প্রত্যেক চরিত্রেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার ভিতর একটি চরিত্র গণপতি। গণপতি শর্মা ব্রাহ্মণ, প্রকাশ্যে গণকের কাজ করেন, ভিতরে ভিতরে এমন মহা দুষ্কর্ম নাই যে, তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার কথায় একটি মুদ্রাদোষ আছে, 'বিবেক করুন গে।' তাঁহার নিকট একটি বিষবড়ির থলি থাকিত, সেই থলির বড়ি বহু দুষ্কৃতিকারীর প্রয়োজন সাধনে লাগিত এবং গণপতির অর্থ লাভ হইত। এই গণপতিই রঙ্গিণীর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ নূতন মানুষ হইয়া গেল এবং শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, সে বিষবড়ির থলি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়া নিজে দুটি বড়ি খাইয়া আত্মহত্যা করিল।

গণ। এই দুটো পেটে যাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গঙ্গা নাও।

হলধর। ভটচায, কি করলে, কি করলে?

গণ। বিবেক করুন গে, বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম, আর দুটো উদরে দিলেম, এই স্ত্রীহত্যাটা আমা হতেই হয়েছে। ** বিবেক করুন গে—থলিটা মা গঙ্গা নিলেন, ওতে কম করে হাজার ঘর উৎসন্ন যেতো,—আর এ জড় থাকলে হাজার থলি সৃষ্টি হ'তো, বংশপরম্পরা বিদ্যেটা চল্‌তো।

বইখানির নাম "মায়াবসান"। গ্রন্থকার দেখাইতে চাহিয়াছেন, সৎকার্য ও পরোপকার প্রভৃতিও একটি মায়া, অর্থাৎ বাহিরে পুণ্যের আবরণ থাকিলেও ভিতরে থাকে আত্মশ্লাঘা, খ্যাতি কামনা, নিজেকে বড় করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি। গ্রন্থশেষে কালীকিংকর আত্মবিশ্লেষণ করিয়া যে সত্যটি লাভ করিয়াছেন, সেটি তাঁহার কথায় 'মুখে যতই বলি নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু

অভিমান ফলকামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফলকামনায় পরহিত ক'রেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম, পর-আপন বোধ বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম, রইলেম কি—জগতে মিশলেম।'

"তপোবল" গ্রন্থে আছে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যার ইতিহাস। বিশ্বামিত্র তপস্যায় এমন ক্ষমতা লাভ করিলেন যে, তিনি নূতন স্বর্গ-সৃষ্টি নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। 'কি ব্রাহ্মণত্ব?' ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অরুন্ধতী স্বামী বশিষ্ঠকে ব্রহ্মতেজ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে বশিষ্ঠ যখন বলিলেন, 'আমি তেজ সংবরণ ক'রলে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমায় বধ করবে।' উত্তরে অরুন্ধতী বলিলেন, 'প্রভু ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণের জন্মমৃত্যু আছে, তা তো কই শ্রীমুখে শুনিনি।'

অন্যত্র, 'ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম ব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয়?' বিশ্বামিত্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়। * * যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই ব্রাহ্মণ।'

স্বভাবত মানুষ মৃত্যুভয়ভীত, দুর্বল, ও কাপুরুষ, কিন্তু তবুও সে পৌরুষেরই পূজক; মানুষ স্বার্থপর, আত্মস্বার্থ ব্যতীত সে অন্য কিছু কল্পনাও করিতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যের তুলিকায় অঙ্কিত মহা-বীরগণের কাহিনী, মহান আত্মত্যাগীর কাহিনীই তাহার মনকে পরিতৃপ্ত করে। সে যেন সেই সকল চরিত্রের ভিতর ডুবিয়া নিজের 'হারানো আমি'র সন্ধান পায়। এই পথেই সাহিত্যের সার্থকতা।

আবার অন্যদিকে আছে চিকিৎসকের রোগনিদান নির্ণয়ের ন্যায় সাহিত্যিকের মনোবিশ্লেষণ।

"জনা" নাটিকার হরিভক্ত নীলধ্বজ রাজা। তাঁহার বিশ্বাস তিনি হরিভক্ত, এবং হরি-ভক্ত বলিয়া নিজের সম্বন্ধে অভিমানও তাঁহার আছে। রানী জনা একস্থলে তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ—

"ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন?
জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত নিশ্চয় পরাজয়,
তবু—বীরপণে ধরি ধনুর্বাণ
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান।
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল
রণচক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র রণে।
* * *
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার!"

"কালাপাহাড়ে" চিন্তামণির উক্তিতে মানব মনস্তত্ত্বের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে, "নিঃস্বার্থে তো দয়া, পরের উপকার। তবে ভাই শোন। আমার দয়া আছে, দয়া ক'রে যদি কারুকে কিছু দিই তো মনে হয়, যদি একটা মেলা হ'তো, লোক জড় হ'য়ে দেখতো। কারুকে কিছু যদি লুকিয়ে দিই, মনে হয় আমি না হয় লুকিয়ে দিচ্ছি, আর পাঁচজন দেখলে তো তাদের চোখে আগুন লাগতো না। যদি কখনও কারুর উপকার করি, আর সে যদি জন্মের মত আমার গোলাম না হয়, অমনি রাগের পরিসীমা থাকে না। বলি, বেইমান! সয়তান! অকৃতজ্ঞ!"

"নসীরাম" নাটকে রাজপুত অনাথনাথ নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "নসীরাম, তোমার সংসারে চাইবার কিছু নাই?

উত্তরে নসীরাম বলিয়াছিল, "চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাওতো, পাই না পাই তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব সুন্দরী ছুঁড়ি পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কে কোথায় যাবে তার ঠিকানা নাই। টাকা-কড়ি আজ বোলছো তোমার—তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার। না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দুমুঠো ধুলো ধরনা কেন, বল এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।"

"মনের মতন" নাটকে ফকীর। "যন্ত্রণার হাত হ'তে নিস্তার পেতে চাও, তা'হলে মানুষ হ'য়ে জন্মেছ কেন? প্রস্তর হতে পারতে, তা'হলে কোন যন্ত্রণাই উপভোগ ক'রতে হত না। মানবজীবনে যন্ত্রণাই পরম বন্ধু। যদি দুঃখকে আদর ক'রে সুখকে প্রত্যাখ্যান করতে পার তা হ'লে দেখবে যাকে তুমি সুখ বল সে বাঁদীর মত তোমার পিছনে পিছনে ঘুরছে।"

গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেকটি নাটকেই বহু-বিচিত্র চরিত্রচিত্রের ভিতর জীবন-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত আছে। এখানে তাঁহার জন্মভূমি সম্বন্ধে একটি রচনা, ও দেশাত্ম-বোধ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

প্রবন্ধটি 'কুসুমমালা' পত্রিকায় প্রকাশিত গরুড় নামে একটি প্রবন্ধ। "পুরাণে শুনি গরুড় মাতার দাসীত্ব মোচন করিবার জন্য সুধা আনিতে যাত্রা করেন, পথে দেবসেনার সহিত ঐরাবত আরোহণে দেবরাজ ইন্দ্র বিরোধী হন। মাতৃবৎসল বিহঙ্গরাজ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও জয় করেন, বজ্রাঘাতে তাঁহার একটিমাত্র পালক খসে। চক্রধারী বিষ্ণুও তাঁহার গতিরোধে সমর্থ হন না।"

এই পর্যন্ত বলিয়াই গিরিশচন্দ্র মাতৃভূমির দাসীত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে গ্যারিবল্ডির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, "ইতিহাস বলে, যখন গ্যারিবল্ডি যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে ফিরিতেন, তখন আপাদমস্তক অরিশোণিতে পরিপ্লুত অবস্থায় ফিরিতেন; দুর্গম রণসন্ধি মাঝে শত্রুর অস্ত্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না। মায়ের বীর সন্তান, মাতৃভূমির দুঃখে একান্ত বিকল, সেই দুঃখই তাঁহার সহায়; অপর কাহারও সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেন না। জননীবৎসল কৃষক জগন্মান্য গ্যারিবল্ডী হইয়াছিলেন।"

তিনি দোকানীর ছেলে গ্যাম্বেটার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "গ্যাম্বেটা দোকানদারের ছেলে। আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু একান্ত জন্মভূমি-বৎসল। কেহ কেহ বলেন তাঁহার কোন বিশেষ গুণ ছিল না। কিন্তু মহাগুণসম্পন্ন হইয়াও কেহ ই'হার অপেক্ষা অধিক কার্য করিতে পারেন নাই। যখন ফ্রান্সে সম্রাটসৈন্য সিডন-সমরে পরাজিত হইল, মেট্ বিপক্ষ-পদে লুণ্ঠিত হইল, প্যারিস নগরী লৌহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ও অনলবর্ষণে জর্জরীভূত, এই দোকানীর ছেলে তখন কি কার্যই না সম্পন্ন করিয়াছেন?

"ফ্রান্স যখন অস্ত্রধারীরহিত—গ্যাম্বেটার উৎসাহে যেন মন্ত্রবলে সৈন্য সৃষ্টি হইল, কঠিন জার্মন-হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত ফ্রান্স নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল।

"যুদ্ধবিদ্ মাত্রেরই অভিমত এই যে, প্যারিস যদি কুলাঙ্গার কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইত, প্যারিস রক্ষকেরা মরণে কৃতসঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে জীনাজয়ী ফ্রান্সকে বিসমার্কের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইত না। সন্ধি স্থাপনের পর সকলেই ভাবিল ফ্রান্স আর ইউরোপে প্রাধান্য পাইবে না; কিন্তু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত গ্যাম্বেটা অচিরে আশার অতীত কার্য সম্পাদন করিলেন। ফিনিক্স পক্ষী যেমন অগ্নি হইতে নবকলেবর ধারণ করিয়া উঠে, গ্যাম্বেটার মন্ত্রবলে ফ্রান্স সেইরূপ উঠিল। সভয়ে জার্মনি দেখিতে লাগিল, ফ্রান্স আর ঋণগ্রস্ত দুর্দশাপন্ন নয়, লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী তাহার রক্ষার্থে প্রাণ দিতে উৎসুক। ফ্রান্সের রাজনীতি সমস্ত ইউরোপের ঈর্ষার কারণ হইল। অসামান্য রণকৌশলসম্পন্ন নেপোলিয়নের পদতলে প্রুসিয়া বিনাযুদ্ধে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জয়ী বীরদম্ভে নিয়ম করিয়া দিলেন, প্রুসিয়া চল্লিশ সহস্র অস্ত্র-ধারীর অধিক সৈন্য রাখিতে পারিবে না। ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্বে ব্লুচারের সৈন্যগণ যখন ইংরাজ সৈন্যের সহিত সখ্যভাবে হস্তধারণ করে তখন প্রুসিয়ার অত্যন্ত দৈন্যদশা। সেনার জুতা নাই, পরিচ্ছদ নাই,

উপযুক্ত অস্ত্র নাই, তাহাতে আবার নেপোলিয়নের লৌহ নিয়মে অতি অল্প সৈন্যই রণক্ষেত্রে আসিতে পারে, প্রুসিয়ার সেই একদিন! কিন্তু মাতৃমন্ত্রবলে প্রুসিয়ার সে দুর্দিন কাটিয়া গেল, সমস্ত প্রুসিয়া কৃতসংকল্প হইল যে, পাঁচ বৎসর প্রুসিয়ার প্রত্যেক নাগরিকই অস্ত্রধারণ করিবে।

"পরাজিত প্রুসিয়া গোপন সাধনায় কি দুর্দম হইয়া উঠিল! যে অষ্ট্রিয়ার ভয়ে সদাই কম্পিত সেই অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কামানের বজ্রনাদে সন্ধির নিয়মাবলী লিখাইল।

"মাতৃমন্ত্রের এই শক্তি, এ কি ইউরোপেরই নিজস্ব? তাহা নয়। ভারতবর্ষে রাণা প্রতাপ মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাঁহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও গৌরব-বর্ধক। * * *

ভারতবর্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টা কেন সফল হয় নাই, ইহা লইয়া নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র কিছু কিছু বলাইয়াছেন, "বৈষ্ণবী" নাটকে রণেন্দ্রনাথের উক্তিতেঃ—

"হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ;—
আত্মশ্লাঘা, দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি অভিমান
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশ—
ধর্ম অভিমানে
স্বজাতি বান্ধব পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা
স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে।"

ফকিররাম। বাবা, বীরত্বের অহংকারেই হিন্দু জাতির পতন হয়েছে। তুমি নেতা, কিন্তু সৎনামের জয় পরাজয়ের কথা ভাবলে না, বীরত্ব জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বসলে যে কারতরফ খাঁর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে যদি তোমার পরাজয় হয় তবে সৎনামের পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এই রকম বীরত্ব করে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার করতে চান নি আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরি চালালে, আর বীরত্বের গর্ব না করে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন, রাজ্য দিলেন। * * * মুসলমানের গুণ কি জানো? তারা কার্যসিদ্ধি চায়, আত্মগৌরব চায় না। ছলে বলে কৌশলে বাদ্শার কার্য হলেই হোল, তোমার মত বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে দেশের সর্বনাশ করে না।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে?

ফকিররাম। না, দেশের কর্তব্য সাধন করতে হবে। রামভক্ত হনুমান কৌশলে রাবণের মৃত্যুবান হরণ করেছিলেন। দেশের কার্যে আত্মাভিমান ত্যাগ করাই উচিত।

"বৈষ্ণবী" নাটকে গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, রণেন্দ্রের চিত্ত-দুর্বলতাই সৎনামী সম্প্রদায়ের পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-অংকন-নিপুণতার পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং আমার মত অক্ষমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, তাঁহার এক একখানি নাটক পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আলোচনার ভার যদি কোন সুলেখক গ্রহণ করেন তবে হয়তো সেই মহাকবির রচনার সৌন্দর্য ও আদর্শের কতকটা পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

শ্মশান-চাঁপা

পৌষের সেই শেষ রাতে, কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের বুক-জোড়া কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নতুন সাহসের সুখে হন-হন করে পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাত্র এই দিন তিনেক হলো আমরা এই টাউনেরই নতুন একটা বান্ধব সমিতি হয়ে উঠেছি। যিনি আমাদের এই ক'জনকে নিয়ে এই সমিতি গড়েছেন, তিনি অবশ্য আমাদের মত জুনিয়র নন। তিনি হলেন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার কাঞ্চনবাবু, আমাদের ফুটবলের নেতা ভোলাদা যাঁকে কাঞ্চনকাকা বলে ডাকেন, তিনি।

কাঞ্চনকাকা হলেন সমিতির প্রেসিডেণ্ট, আর পেট্রন হলেন সেই কুমার সাহেব, তিন-পাহাড় রাজ এস্টেটের কুমার সাহেব, টাউনের কাছেই মধুপুর রোডের ধারে এক নিরালায় যাঁর বাগানবাড়ি।

মানুষের উপকারের কাজ করছি আমরা, তবে মরা মানুষের উপকার। আমাদের কাঁধের উপর মচমচ শব্দে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া দুলছে, আর সেই সঙ্গে খাটিয়ার উপর নড়বড় করে দুলছে তহবিল তছরুপের মামলার আসামী উমেশপ্রসাদের কাটা-ছেঁড়া শবের মাথা আর হাত-পা।

মাঠের ঢালু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছোট নদীটা এখানে প্রবল, বেশ একটু চওড়া হয়েছে। নদীর বুকে অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির উপর এখানে ওখানে যেন জ্বলন্ত রক্ত ছিটানো রয়েছে। বাঁশবনের গা-ভাঙা কটকট শব্দগুলি একটা মাথা-পাগলা হাওয়ার ঝড়ে হঠাৎ এক একবার ছুটে আসছে, আর নদীর আধ-হাঁটু জলের পাশে বালিয়াড়ির উপর দপ্ করে ঝলসে উঠছে জ্বলন্ত অঙ্গার, পৌষের শেষ রাতের কুয়াশা যেন ভয়ে ভয়ে অসহায়ের মত সেই নিভুনিভু চিতারই হাসির জ্বালায় পুড়ছে।

এ কেমন একটা জগতের কাছে এসে পড়েছি? ভোলাদা বললেন—ঐ তো শ্মশান।

শ্মশানের চেহারার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ভয় হয়তো সত্যিই আরও ভয়াল হয়ে উঠতো, কিন্তু কাঞ্চনকাকা আমাদের মনগুলিকে সেই সুযোগই দিলেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ানো সেই শ্মশানেরই বুকের দিকে তাকিয়ে আমাদের পিছনে আস্তে আস্তে চলতে চলতে কাঞ্চনকাকা বললেন—আমাদের এই বান্ধব সমিতিটা যদি ঠিক থাকে, যদি আর একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারি, আর টাকার দিক দিয়ে যদি কুমার সাহেবের ব্যাকিং পাই, তবে মিউনি-সিপ্যালিটির আসছে ইলেকশনের পর সুধাসিন্ধুকে আর চেয়ারম্যান থাকতে হবে না। আমিই হব চেয়ারম্যান, বুঝলে ভোলা?

হঠাৎ কাঞ্চনকাকা একটা হাঁক দিলেন—এইবার ডাইনে ঘুরে ঐ আপিস-ঘরের কাছে দাঁড়াও।

আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে, এ-হেন একটা অদ্ভুত জায়গাতে, যেখানে শুধু মানুষের চেহারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেখানে একটা আপিস-ঘর থাকতে পারে, আর সেই আপিস-ঘরের ভিতরে টেবিলের পাশে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বুকের কাছে মস্ত একটা রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে একটা কলম নিয়ে বসে থাকতে পারে।

আমাদের হাঁপ-ধরা গলা থেকে একটা ক্লান্ত হরিবোল আপিস-ঘরের দরজার কাছে বেজে উঠতেই ভিতরের টেবিলের উপর লণ্ঠনের কালিমাখা আলোর পিছনে হঠাৎ চমকে উঠলো একটা আবছায়াময় মাথা, আর এক জোড়া ধোঁয়াটে চোখ।

লণ্ঠনের আলো একটুখানি উসকিয়ে দিয়ে আর মুখ তুলে লোকটা আমাদের দিকে তাকালো। ভোলাদা আস্তে আস্তে আমাদের কানের কাছে বললেন—ঐ, ঐ লোকটাই হলো ঘাটবাবু, চব্বিশ ঘণ্টা যার ডিউটি, আর মাইনে হলো বাইশ টাকা সাত আনা।

—লোকটা কেমন যেন। ভোলাদা আবার
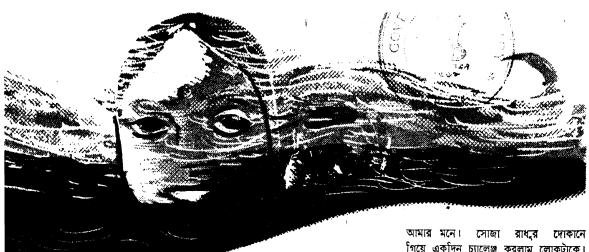
ফিসফিস করে বললেন। এর আগে অন্তত বার দশেক এখানে এসেছেন ভোলাদা। দেখেছেন ভোলাদা, লোকটা ঘুমোয় না। দিন হোক, আর রাত হোক, লোকটা ঠিক অমনি এক জোড়া জাগা চোখ নিয়ে চুপ করে বসে থাকে, কোন্ দিকে আর কিসের দিকে যে তাকিয়ে আছে, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

ঘাটবাবুর মুখটা ভাল করে দেখবার জন্য আমরা চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলাম। বয়সে লোকটাকে ভোলাদার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে হলো, বোধ হয় তিরিশেরও বেশি। শরীরটা শুকনো আর চিমড়ে, কিন্তু মুখটা সে-রকম নয়।

ভোলাদা বললেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই.........।

কথাটা আর শেষ করলেন না ভোলাদা। আপিস-ঘরের টেবিলের কাছে তেমনি চুপ করে বসে আর আস্তে একবার কেশে নিয়ে ঘাটবাবু গম্ভীর স্বরে বলে—পাশের ঐ রেস্ট ঘরের ভিতরে গিয়ে মড়া নামিয়ে রাখুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছন থেকে গা-ঘেঁষা অন্ধকারটা যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কাঞ্চনকাকা বললেন—কি হে ঘাট, খুব ভাল ডিউটি দিচ্ছ দেখছি। বলি, এরকম হুকুম দিয়ে কথা বলতে শিখলে কবে?

সঙ্গে সঙ্গে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে যেন কুঁকড়ে গেল ঘাটবাবুর অদ্ভুত চেহারাটা। সত্যি, কাঞ্চনকাকার পার্সোনালিটি আছে, নইলে টাউনের একটা মানুষের ধমকে এইরকম ভয়ানক ছাই, অঙ্গার আর ধোঁয়ার আত্মাটাও ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কেন?

পাশাপাশি দুটি টিনের শেড, মাঝখানে জ্বালানি কাঠের একটা ছোটখাট পাহাড়। যত শাল কেঁদ আর কুলগাছের টেরা-বাঁকা আর গাঁটভরা টুকরো, যেন কতগুলি শক্ত-শক্ত কনুই কব্জি হাঁটু আর গোঁড়ালির স্তূপ।

—রাম! ও রাম! পাশের শেডে অফিস-ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ধরাগলায় আস্তে আস্তে ডাকছে। ভয়ে ভয়ে রাম নাম করছে নাকি কেউ?

হাসলেন কাঞ্চন কাকা।—ডোমটার ঘুম ভাঙাচ্ছে ঘাট। যে ডোমটা চিতা সাজায়, তার আসল নাম হলো ভালুয়া। কিন্তু টাউনের লোকে ওকে রাম নাম দিয়েছে।

—কেন কাঞ্চন কাকা?

—ভয়ে, ভয় তাড়াবার জন্য। রাম নাম শুনে শ্মশানের ভুত-প্রেত দূরে সরে যায়।

—আশ্চর্য, এই ভুত-প্রেতের রাজ্যে পাঁচ বছর ধরে পড়ে আছে লোকটা, ঐ ঘাটবাবু!

কাঞ্চন কাকা বলেন—যাবে কোন্ চুলোয়? আর ও বেটাও তো একটা ... আমার সন্দেহ হয়...।

হঠাৎ কথাটা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা অন্য একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন,—লোকটার জন্মেরই কোন ঠিক নেই।

তার পরে একটা গল্পই বলে ফেললেন কাঞ্চনকাকা—লোকটা কোথা থেকে একদিন টাউনে এসে জুটলো। ভদ্রলোকদের মেসে বেশ ভদ্রলোকের মতই থাকে, আর চাকরির চেষ্টা করে। ক'দিনের মধ্যে জুটিয়েও ফেললো একটা চাকরি। রাধু সাহার অত বড় কাপড়ের দোকানের ম্যানেজার হলো একটা নতুন লোক, শুনেই কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগলো আমার মনে। সোজা রাধুর দোকানে গিয়ে একদিন চ্যালেঞ্জ করলাম লোকটাকে।

রাধু সাহার দোকানে, গণেশের মূর্তির পাশেই বসে ছিল নতুন ম্যানেজার। কাঞ্চন কাকা একেবারে সামনে এসে প্রশ্ন করেছিলেন লোকটাকে।

—আপনার পিতার নাম?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বোবার মত তাকিয়ে রইল লোকটা। তার পরেই পিতার নাম বললো।

কিন্তু রেহাই দিলেন না কাঞ্চন কাকা। এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়লেন। —বাঁকুড়া জেলা না হয় হলো, কোন্ গাঁ? কোন্ থানা? মামাবাড়ি কোথায়? মামার নাম কি? বাপ বেঁচে নেই, বেশ তো, কাকাদেরই নামগুলি বলুন।

চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে লোকটার বুকে ধড়ফড়ানি তুলে কাঞ্চন কাকা আবার প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণ যখন, তখন স্পষ্ট করে বলে ফেলুন না, আপনার গোত্র কি? কোন গাঁই আর কোন্ মেল?

 সুবোধ ঘোষ

কোন উত্তর দিল না লোকটা। দেখে শুনে রাধু সাহাও অবাক হয়ে গেল। গণেশের মূর্তির প্রায় গা ঘেঁষে বসে আছে এই কেমন একটা অমানুষ!

লোকটাও হঠাৎ ছটফট ক'রে একটা লাফ দিয়ে গদি থেকে উঠে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো; তারপর একটা দৌড় দিয়েই চলে গেল।

গল্প শেষ ক'রে কাঞ্চন কাকা বললেন—কিন্তু তবু ঠিক চলে গেল না। কি অদ্ভুত জেদ। কবে আর কেমন ক'রে বেকুব চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর মন ভুলিয়ে লোকটা আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিল,

আমি জানতেই পাইনি। একদিন এখানে এসে দেখি, সেই লোকটাই রেজিস্টার খাতা নিয়ে কাজ করছে।

এইবার শক্ত গলায় কাশলেন কাঞ্চন কাকা।—বেটা এখানে এসেও বদমায়েসী শুরু করলো।

—কি?

—থানা থেকে কমপ্লেন পেয়ে আমিই একদিন এখানে এসে রেজিস্টার খাতা চেক করলাম। দেখলাম, হ্যাঁ, কমপ্লেন মিথ্যে নয়। লোকটা মৃতের বাপের নাম গোল-মাল ক'রে দেয়। ত্রিবেদী মশাই-এর মৃত ছেলের নামের পাশে বাপের নাম লিখেছে, অমুক রায়।

ভোলাদা—ভুল ক'রে নিশ্চয়ই।

রাগ করেন কাঞ্চন কাকা—তুমিও যে সুধাসিন্ধুর মত কথা বলছো ভোলা। ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছা ক'রেই এই কাণ্ড করতো। আরও অনেকগুলি নামেরও ঐ দশা করে ছেড়েছে। আমি ওকে তাড়িয়ে ছাড়বো।

ভোলাদা। তাড়িয়ে লাভ কি কাঞ্চন কাকা?

কাঞ্চন কাকা—লাভ আছে বৈকি।

বাঁশবনের কট্‌কট্ থেমেছে, পাখি ডাকছে, নদীর জল দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চন কাকা বললেন—তা ছাড়া, এটা শ্মশান, এটাও একটা পবিত্র স্থান, এখানে ঐ রকম একটা ইয়েকে রাখা উচিত নয়।

ভোলাদা বলেন—আমার কেমন বিশ্বাস, লোকটা যেন জেগে জেগে......।

কাঞ্চন কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে রাখ তোমার বিশ্বাস। আমার কেমন সন্দেহ হয়, লোকটা হলো একটা......।

দুজনেই তাঁদের কথার অর্ধেকটুকু বলে চুপ ক'রে গেলেন। মাঝখান থেকে আমাদের মনের ধারণাগুলি আরও গোল-মাল হয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম না, ভোলাদার বিশ্বাসটা কি? আর কাঞ্চন কাকাই বা কি সন্দেহ করছেন।

টাউনে ফেরার পথে সেই কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল, একটা টিনের ঘর রয়েছে, চারদিকে মাদার গাছের বেড়া। মাঠের মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড একটা ডাস্টবিন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলাদা বললেন—ওটা হলো ঘাট-বাবুর কোয়ার্টার।

কদিন পরেই আমরা দেখলাম আর দেখে আমাদের চোখগুলিও যেন একটা অবুঝ বিস্ময়ে চমকে উঠলো। সন্ধ্যাবেলা টাউনের সিনেমা হাউসের সামনের সড়কে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটবাবু। ছাই ধোঁয়া আর অন্ধকারের দেশে বাস করে যে লোকটা, সেই লোকটা আবার এই আলোর রাজ্যে কেন? দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল। কালিমাখা লণ্ঠনের আলোকের পিছনে যার এক জোড়া ধোঁয়াটে চোখ দেখেছি, তাকেই দেখছি, জ্বল-জ্বল এক জোড়া চোখ নিয়ে পানের দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় পান খাবার শখ হয়েছে।

একবার, দুবার, তিনবার, আরও অনেক-বার দেখলাম, টাউনের ভিতরেই ঘোরা-ফেরা করছে ঘাটবাবু। দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, টাউনের কুকুরগুলিও বোধ হয় লোকটার গা থেকে পোড়া জীবনের গন্ধ পায়। সত্যিই, নারায়ণ মোদকের দোকানের সামনে একদিন দেখলাম, তিন-চারটে খেঁকি কুকুর পিছন থেকে খেউ খেউ করে ডাকতে ডাকতে ঘাটবাবুকে যেন তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। একটা শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে একমনে আর আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের কাছ থেকেই বার বার ঘাটবাবুর চালচলনের খবর পাচ্ছিলেন কাঞ্চনকাকা, আর শুনে চমকে উঠছিলেন। বললেন—লোকটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে দেখছি। আমার কেমন সন্দেহ হয় যে...।

বুঝতে পারি না, কিসের সন্দেহ। ক'দিন পরে বান্ধব সমিতির বৈঠকে কাঞ্চনকাকা আরও জোর গলায় তাঁর সন্দেহটাকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন।—খবর পেয়েছি লোকটা চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর কাছেও একবার এসেছিল, চারদিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্তও দিয়ে গিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, ভয়ানক সন্দেহ হয়......।

কাঞ্চন কাকার এই ভয়ানক সন্দেহের চিৎকারের পর প্রায় ছ'টা মাস পার হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বান্ধব সমিতির কাছে আবার একটা কাজের ডাক এল।

কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচমচ্ করে, আর সেই সঙ্গে নড়বড় করে গলিত কুষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া চরণবাবুর এইটুকু একটা শরীর। কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আমরা এগিয়ে চলেছি ঘাটের দিকে। হঠাৎ ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে যেন একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন কাঞ্চনকাকা।—এই রে, ঠিক, বেটা ঠিকই কোন্ এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ ক'রে বসে আছে।

উপুড়-করা ডাস্টবিনের মত দেখতে নয়, ঘাটবাবুর কোয়ার্টার যেন রঙীন একটা ছবির মত। কে জানে, কবে পাতকুয়োর ধারে পেঁপে গাছগুলি এত বড় হয়ে উঠলো। মাদার গাছের বেড়ার উপর অপরাজিতার লতা ঝুলছে। টকটকে লাল গাঁদা ফুটে রয়েছে পাতকুয়োর সামনে। আর সব চেয়ে রঙীন হয়ে ঝলমল করছে আর একটা জিনিস। পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে একটা ভেজা রঙীন শাড়ি হাওয়ায় দুলে দুলে শুকোচ্ছে। শ্মশানের ধোঁয়ার জ্বালা আর মৃত্যুর ময়লা ছাই-এর রুক্ষতায় মাখা সেই ডাস্টবিনের মত ঘরটাকে চূর্ণ করে দিয়ে সেখানেই যেন একটা নতুন কুটিরে শৌখীন জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।

ইস্! সহ্য করতে পারছিলেন না কাঞ্চনকাকা। —লোকটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত বিয়েও ক'রে ফেললো। কিন্তু এই অন্যায়ের, এই ভাঁওতার, এই জোচ্চুরির ফল ওকে একদিন পেতেই হবে।

সত্যিই একটা শক্ পেয়েছেন কাঞ্চনকাকা, যে লোকটাকে নিতান্তই একটা অশুচি জীব বলে মনে করেন কাঞ্চনকাকা, যে লোকটা তার নিজের পরিচয়ই বলতে পারে না, সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ এক সুখী ঘরের জাত সমাজ ও বংশের বেড়া ভেঙ্গে একটা মেয়েকে যেন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কাঞ্চনকাকা আবার নিজের মনেই গজরে উঠলেন—জানতে হবে, লোকটা সত্যিই বিয়ে করেছে, না ইয়ে করেছে।

মাঠের উপর দিয়েই জোরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে মস্ত বড় একটা মোটর গাড়ি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আর উল্লাসের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমাদের পেট্রন পেট্রন, আমাদের পেট্রন কুমার সাহেব, তোমরা একটু থাম।

কুমার সাহেবের গাড়িও থেমে রইল কিছুক্ষণ। দিব্যি ফরসা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা কুমার সাহেবের। ধবধবে আদ্দির জামা গায়ে। চোখের কোণে সুর্মার সরু প্রলেপ। কোলের উপর একটা রাইফেল নিয়ে বসে আছেন কুমার সাহেব, এই মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরের ঐ হরতকীর জঙ্গলে তিতির শিকার করতে চলেছেন।

মোটর গাড়ির ফুট বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন কাকা কিছুক্ষণ কুমার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন, মিউনিসিপালিটির আগামী ইলেকশনের কথা।

আবার হর্ন বাজিয়ে মাঠের উপর দিয়ে, আর ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের মাদার গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে, কুশ ঘাসের উপর মোটরের চাকার চওড়া দাগ এঁকে দিয়ে ছুটে চলে

গেল কুমার সাহেবের গাড়ি। আমরা এগিয়ে চললাম ঘাটের আপিস-ঘরের দিকে এবং আপিস-ঘরের দরজার কাছে এসে কাঞ্চন কাকার রাগ একেবারে মত্ত হয়ে ফেটে পড়লো।

ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে যেয়ে প্রশ্ন করলেন কাঞ্চনকাকা।—সত্যি কথা বলো, বিয়ে করেছো, না ইয়ে......।

ঘাটবাবু বলে—বিয়ে করেছি।

কাঞ্চনকাকা—ঠিক ক'রে বলো।

ঘাটবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সপ্তপদী হয়েছে, কুশণ্ডিকা হয়েছে। নিয়মমত মন্ত্র পড়ে হোম করা হয়েছে। আর কি জানতে চান ?

শান্তভাবেই আর বেশ শ্রদ্ধা রেখে কথা বলছিল ঘাটবাবু। কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা ভীরু-ভীরু আবেদনও ছিল। যেন কাঞ্চনকাকার কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করছে ঘাটবাবু। যেন বিশ্বাস করেন কাঞ্চনকাকা, মানুষে যেভাবে বিয়ে করে ঠিক সেইভাবেই এই বিয়ে হয়েছে। তবে যদি এর মধ্যে কোন অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায় ঠিক ঘাটবাবুর জীবনের অন্যায় নয়, সেটা ভুলে গেলেই তো হয়।

কাঞ্চনকাকা সব শুনে নিয়ে বললেন—তবু এ বিয়ে বিয়েই নয়। বুঝতে পারছো আমার কথাটা ?

কাঞ্চনকাকার প্রশ্নের আঘাতে সেই মুহূর্তে ঘাটবাবুর চোখ দুটো ধোঁয়াটে হয়ে গেল। এই প্রশ্ন যেন ঘাটবাবুর প্রাণের অবৈধ অস্তিত্বটাকেই টানাটানি ক'রে চিৎকার করছে, সমাজের মানুষের ঘরে ঢুকে বিয়ে করার কোন অধিকার নেই যে প্রাণের কোন শখ আহ্লাদ আর ইচ্ছার।

আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কাঞ্চনকাকা আমাদের কাণের কাছে আর একবার আস্তে আস্তে গজরালেন।—লোকটা সত্যি যদি কোন বাজে ছুঁড়িকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতো, তা'হলে কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বুঝেছি, বেটা সত্যিই পরিচয় ভাঁড়িয়ে একটা ভদ্রলোকের মেয়েকেই বিয়ে করেছে, ছিঃ। আমার সন্দেহ হয়......।

সন্দেহ নিয়ে কি ভাবতে ভাবতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা। আমরা ঘাটবাবুর কাছে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালাম।

দিব্যি মানুষের মতই দেখাচ্ছে ঘাটবাবুকে। পরিষ্কার একটা টুইলের কামিজ পরেছে ঘাটবাবু। রোগা শুকনো চেহারাটার মধ্যে একটা চকচকে হাসি-হাসি ভাব যেন ফুটে রয়েছে। হাতে একটা নতুন ঘড়িও দেখলাম। আমাদের দেখে একটু খুশি হয়েই ঘাটবাবু ডাক দেয়—আসুন ভাই, একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

প্রথমেই বললে—আমি আর এখানে থাকছি না। এ কাজ ছেড়ে দেবই দেব। এখানে কি মানুষে থাকে? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই ভাগাড়ের কাছে থাকা অসম্ভব।

হঠাৎ ফিক ক'রে হেসে ফেলে ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদির এখন পাঁচমাস।

হাসি-হাসি চোখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপরেই আমাদের দিকে তাকায় ঘাটবাবু। আপনাদের বৌদি দেখতে বেশ সুন্দর, মাইরি বলছি। একদিন ফটো দেখাবো আপনাদের।

—এখনি দেখান না।

ঘাটবাবু—ফটো তোলানো হয়নি এখনো।

—কবে তোলাবেন ?

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে একেবারে গলে যায় যেন।—এই ধরুন, আর চার মাস, তারপর আরও ছ'মাস। বাচ্চাটার অন্নপ্রাশনের দিনে টাউনে গিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে একখানি বড় সাইজের ফটো তোলাবো, মাগ-ছেলেকে নিয়ে এক সঙ্গেই। কেমন, কথাটা ভাল বলিনি ?

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ঘাটবাবুই আবার প্রশ্ন করে।—ছ' মাস বয়স হলেই তো অন্নপ্রাশন দিতে হয়, তাই না ?

আমরা বলি—হ্যাঁ।

—রাম নাম সৎ হ্যায়! গম্ভীর স্বরে একটা ক্লান্ত আক্ষেপের কোরাস যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আপিস ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপরেই আর একটা। বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওদিকে চলে যাও। সার্টিফিকেট রেখে ওদিকে সরে পড়। যত সব!

সার্টিফিকেটগুলিকে অবহেলার সঙ্গে খাতার নীচে চেপে রেখে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে ঘাটবাবু। হরিবোল, রাম-রাম, ধোঁয়া, ছাই আর জ্বলন্ত অঙ্গারের এই পৃথিবীটাকে কোন মতে যেন ঘৃণা চেপে সহ্য করছে ঘাটবাবু। দূরের জীবনময় সংসার থেকে খেদানো যত আবর্জনা যেন এখানে দিনরাত্রি মিছিল ক'রে আসছে। এখানে কি জীবনের শখ আর আহ্লাদ নিয়ে বাস করা যায় ?

কুষ্ঠী চরণবাবু ছাই হয়ে যাবার পর আমরা যখন আবার মাঠের পথ ধরে ফিরে চললাম, তখন কাঞ্চনকাকা আমাদের কাছ থেকেই শুনলেন, ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—ওর কথার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করো না। ও যাবে না, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আমার খুব সন্দহ হয়, লোকটা হলো একটা......।

হঠাৎ কথা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকালেন, তারপরেই আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন—চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো, অনেক বেলা হয়েছে।

আমরাও একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, কুমার সাহেবের মোটর গাড়ি ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরছে, থামছে, আবার চলে যাচ্ছে। যেন মাদার গাছের বেড়ার ঝোপে তিতির সন্ধান করছেন কুমার সাহেব।

অনেকগুলি মাস পার হয়ে যাবার পর আবার। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচমচ করে আর নড়বড় করে ফাঁসিতে মরা দুর্ধর্ষ ডাকাত ইন্দ্র সিং-এর শরীর।

কিন্তু ওকি? ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের আবার এ দশা হলো কেন? ডাস্টবিনের মত উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা টিনের ঘর। চারদিকে মোটর গাড়ির চাকার আঘাতে মাটির উপর ক্ষতের রেখা আঁকা রয়েছে, গেল বর্ষার জলেও মুছে যায়নি। কোথায় অপরাজিতা লতা আর কোথায় বা লাল টকটকে গাঁদা? দড়িতে কোন রঙীন শাড়ি দুলে দুলে শুকোয় না। তবে কি ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছে ?

ভুল ধারণা। দেখলাম, রেজিস্টার খাতা তেমনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে ঘাটবাবু। লোকটা শুকিয়ে পাকিয়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চনকাকা সোজা সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—খুব না বলেছিলে যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তবে এখনো রয়েছে কেন ?

ঘাটবাবু বলে—যাব।

কাঞ্চনকাকা—কবে ?

ঘাটবাবু—শিগগিরই।

কাঞ্চনকাকা—ভাল কথা, কিন্তু মিথ্যে কথা। যাবার হলে তুমি এতদিনে চলে যেতে।

ঘাটের দিকে যেতে যেতে কাঞ্চনকাকা আবার যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন।—বুঝেছি, তোমাকে না সরালে তুমি সরবে না। আমার সন্দেহ হয়......।

কাঞ্চনকাকা চলে যেতেই আমরা ঘাটবাবুকে ঘিরে ধরলাম।—কই ঘাটবাবু, সেই ফটো কই? সেই যে বলেছিলেন, তারপর এক বছর তো পার হয়েই গিয়েছে।

ঘাটবাবু বলে—ফটো তোলানো হয়নি।

—কেন ?

ঘাটবাবু—আপনাদের বৌদি এখানে নেই।

—কোথায় ?

ঘাটবাবু—বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

—ছেলে ?

ঘাটবাবু হাসে—ছেলে হয়েছে নিশ্চয়ই, এতদিনে না হবার তো কথা নয়।

—কবে আসবে ওরা?

ঘাটবাবু আবার হাসে—আসবে, তবে আসতে একটু দেরি করবে নিশ্চয়, রাগ ক'রে চলে গিয়েছে কি না!

আর কোন কথা না বলে আবার দূরের দিকে আনমনার মত তাকিয়ে রইল ঘাটবাবু।

এক বছর, দু'বছর, তারপর আর একটা বছর পার হয়ে গেল। বান্ধব সমিতির কাজ চলতেই থাকে। আর শ্মশানঘাটে গিয়ে ঘাটবাবুকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই, বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে কলম নিয়ে তেমনই বসে আছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত, সব সময়েই জেগে রয়েছে ঘাটবাবুর চোখ। ভোলাদা বলেন— আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই কি যেন দেখছে।

কাঞ্চনকাকা ভোলাদার কথা শুনে তেমনি চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন,—বাজে কথা, আমার সন্দেহ হয়......... ।

ঘাটবাবু নামে এই লোকটার কথার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করা উচিত নয়; ঠিকই বলেছিলেন কাঞ্চনকাকা। এই যাব, শিগগির যাব, যাবই-যাব করে করে বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে। কিন্তু যায় না।

আর, কোথায় বা সেই ফটো? একেবারে ভুয়ো একটা কথার কারসাজি মাত্র। বাপের বাড়ি থেকে বউ এইবার আসবে, এল বলে, এইবার নিশ্চয় আসবে বলে মনে হচ্ছে, এই-রকম শুধু বাজে কথার ছলনায় আমাদের প্রশ্নগুলিকে এতদিন ধরে ঠকিয়ে আসছে ঘাটবাবু। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর বউ-ছেলে ফিরে এল না।

সেদিন আমরা একেবারে শ্মশানের বালিয়াড়ির উপর নেমে এসে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এক সাধুর সৎকার করছি। শুনেছি, ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে দেহত্যাগ করেছেন এই সাধু। কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমাদের ঘাটবাবুকে এইবার চলে যেতেই হবে মনে হচ্ছে।

—কেন?

কাঞ্চনকাকা—পুলিশও ওকে সন্দেহ করছে। সন্দেহভাজন ব্যাড ক্যারেক্টরের খাতায় ওর নাম চড়েছে।

ভোলাদা চমকে উঠলেন—কেন? কি করেছে ঘাটবাবু?

কাঞ্চনকাকা—আমাদের পেট্রন কুমার সাহেবই ওর নামে থানাতে ডায়েরী করিয়েছেন। লোকটা প্রায়ই রাত্রিবেলার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মধুপুর রোডে কুমার সাহেবের সেই বাগানবাড়ির পাঁচিলের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করতো। দারোয়ানেরা বললে, ভয় দেখাবার জন্য প্রেতের গলার স্বর নকল করে লোকটা কাঁদতো। একদিন ধরা পড়ে গেল, মারও খেল, তারপর পুলিশ ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রিবেলা টাউনের দিকে ওর যাওয়াও নিষেধ করে দিয়েছে পুলিশ।

সাধুর চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। হঠাৎ যেন একটা লাফ দিয়ে এসে চিতার কাছে হাজির হলো ঘাটবাবু। উসকো-খুসকো চুল, লাল চোখ, ছেঁড়া খাঁকি কামিজ, ধুতির খুঁট কোমরে জড়ানো।

এসেই চিতার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করলো ঘাটবাবু।—বাঃ, এ কেমন সাধু রে বাবা। সাত মণ কাঠ শেষ করে তবু এখনো ছাই হলো না। ওরে রাম, লগি দিয়ে ওর আঁতড়ির পিণ্ডিটাকে পিটিয়ে দে একবার।

এ চিতা থেকে ও চিতা, ঘুরে ঘুরে যেন শুধু টিটকারী দিয়ে ফিরতে থাকে ঘাটবাবু। টাউনের জীবন, আর সেই জীবনের মানুষ-গুলিকে যেন এইখানে এক বধ্যভূমির মধ্যে বাগে পেয়েছে ঘাটবাবু, আর ঘেন্না করে করে প্রতিশোধ তুলছে।

আবার হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওটা কে পুড়ছে রে রাম? নন্দ মুদি বোধ হয়।

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে যেন মুখ ভেংচে ফেলে।—তিন আনার একটা সাবান একদিন ধারে চেয়েছিলাম ওর কাছে, কিন্তু দেয়নি।

নন্দ মুদির শ্মশান-বন্ধুরা রাগ করে তাকায়—এসব আবার কি রকমের কথা বলছো ঘাটবাবু।

রামের কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে ঘাটবাবু—বেশ গনগনে আঁচ হয়েছে চিতাটার, কিছু আগুন সরিয়ে রাখ্ রাম, আর আমার চা-এর কেটলিটা নিয়ে আয়।

আবার দূরে আর একটা চিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ওটা কে রে রাম? সেই খেমটাওয়ালী নাকি?

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু—আসছে হোলিতে নাচবার বায়না নেয়নি?

আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু চেঁচাতে থাকে—এখন আর কি-ই বা এমন মড়ার ভীড় দেখছেন। কার্তিক মাসটা আসুক, তখন দেখবেন, খেলা কেমন জমে।

—আমার সন্দেহ হয়, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাঞ্চনকাকা, আর ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে যেয়ে কড়া ধমক ছাড়লেন—কি পেয়েছ ঘাট, অ্যাঁ? মৃতের প্রতি এরকম ব্যবহার করলে তোমাকে আমি তিন দিনের মধ্যেই...... ।

ঘাটবাবু হেসে ফেলে—চলেই যাব স্যার, কারও কাঞ্চনকায়া তো রবে না, তবে আর মিছে কেন...... ।

বলতে বলতে নদীর আধহাঁটু জলের উপর দিয়ে ছপ্-ছপ্ করে হেঁটে আপিস-ঘরের দিকে চলে গেল ঘাটবাবু। ভোলাদা বলেন—লোকটা মদ খেয়েছে বোধ হয়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—মদ তো কুমার সাহেবও খান, কিন্তু তাই বলে কি এরকম অমানুষের মত......আমার ঠিকই সন্দেহ হয় যে......... ।

যাবার আগে দেখলাম, একটু অন্যরকম হয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে নিয়ে যেন ছটফট করছে। চোখের দৃষ্টিটাও আর সেইরকম নয়। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আর যেন কিছু দেখবার নেই। যেন বহুদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে চোখ দুটো এইবার ভরসা হারিয়ে একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। চলে যাবার জন্যই যেন ছটফট করছে ঘাট-বাবুর হাত-পাগুলি।

কিন্তু কি বিশ্রী ঘাটবাবুর এইসব কথা আর চিৎকার। যাবার আগে যেন একবার মানুষের জীবনের বেদনাগুলিকে এই শ্মশানের বালুতে আছড়ে আছড়ে হেসে নিচ্ছে লোকটা।

শেষ রাতের অন্ধকার। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এতক্ষণ আমরা সড়কের ধারেই একটা বটের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় শান্ত হয়ে পড়েছিল আমাদের সমিতির পেট্রন কুমার সাহেবেরই এক রাণীজির দেহ।

কাঞ্চনকাকার কাছ থেকে লোক এসে খবর দিতেই সেই সন্ধ্যাতেই আমরা দৌড়ে গিয়ে মধুপুর রোডের ধারে সেই বাগান-বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়েছিলাম। বাগান-বাড়ির ভিতর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়েই একবার বের হয়ে এলেন কাঞ্চনকাকা। মৃত্যুর সার্টি-ফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। তারপর কুমার সাহেবের মোটরগাড়িও ভিতর থেকে বের হয়ে এল। মধুপুর রোডের অন্ধকার ভেদ করে কুমার সাহেবের গাড়ি তখনই দূরের তিনপাহাড় গড়ের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। মোটরগাড়ির গর্জনের মধ্যেই শুনতে পেলাম, গাড়ির ভিতরে একটা ছোট ছেলের গলার নাকানি আর ক্ষীণ স্বরের কান্না। তারপরেই কাঞ্চনকাকার নির্দেশমত দোতলার ঘরের এক পালঙ্কের উপর থেকে সিল্কের চাদরে ঢাকা রাণীজিকে কাঁচা কাঠের

খাটিয়ায় তুলে নিয়ে আমরা সোজা ঘাটের দিকে রওনা হয়ে এতদূর চলে এসেছি।

ভোলাদা'কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।—কে এই রাণীজি ভোলাদা? কুমার সাহেবের স্ত্রী?

ভোলাদা বললেন—না।

—তাহলে কে ইনি?

ভোলাদা বিরক্ত হয়ে বলেন—কুমার সাহেবদের নানা রকমেরই রানীজি থাকেন, ইনিও একরকমের রানীজি হবেন।

আবার সেই কুশঘাসে ছাওয়া মাঠ, সেই আপিস-ঘর, আর সেই ঘাট। আর সেই রকমই বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা টেনে নিয়ে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে বসে রয়েছে আবছায়াময় ঘাটবাবু।

আমাদের হরিবোল থামতেই লাফ দিয়ে উঠে এল আর কাঞ্চনকাকার দিকে একটা কাগজ তুলে দেখিয়ে হেসে ফেললো ঘাটবাবু।—রেজিগনেশন স্যার, আর অবিশ্বাস করবেন না, এইবার চলেই যাচ্ছি।

কাঞ্চনকাকা কটমট ক'রে তাকালেন, তারপর আমাদের কানের কাছেই ফিসফিস ক'রে বললেন—ক'দিন আগেই চলে গেলে ভাল করতে বাছা। তাহ'লে এরকম একটা শাস্তির গলাধাক্কা আর খেতে হতো না।

—কি বললেন কাঞ্চন কাকা?

কাঞ্চনকাকা বলেন—কিছু না, অন্যায় করলে প্রতিফল পেতেই হয়, এই আর কি!

রেস্ট ঘরের ভিতরে খাটিয়ার উপর সিল্কের চাদরে আবৃত রাণীজি পড়েছিলেন। কাঞ্চনকাকা বললেন,—ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা নামিয়ে দাও।

চাদর সরিয়ে দিতেই ভাল ক'রে দেখলাম। হ্যাঁ, রানীজিরই মত সুন্দর মুখ বটে। কাঞ্চনকাকা'র নির্দেশ মতো একটা লণ্ঠনও ঝুলিয়ে দিলাম রেস্টঘরের কাঠের থামের গায়ে।

কাঞ্চনকাকার কথাবার্তা, চোখের চাউনি আর ঘোরা-ফেরার ভঙ্গী কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো। যেন একটু বিচলিত হয়েছে কাঞ্চনকাকার বেপরোয়া মনের সাহসগুলি। কোন রাতের অন্ধকারকেই যিনি কোনদিন গ্রাহ্য করেননি, শ্মশানের ভয়গুলিকেই এক ধমকে যিনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, সেই কাঞ্চনকাকার চোখ দুটো যেন ছমছম্ করছে।

—মানুষটার গতর কিরকম? ক'মণ কাঠ লাগবে শুনি। বলতে বলতে রেস্ট ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো ঘাটবাবু। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আমাদের ডাক দিলেন—তোমরা এদিকে এসে বসো।

রেস্ট ঘরের ইঁটের সিঁড়ি দিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটা নেড়া চাঁপা গাছের কাছে, ধোঁয়ার জ্বালায় কালো হয়ে গিয়েছে যে গাছটা, আর ফুলও কোনদিন ধরে না।

দেখলাম, রাণীজির মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়েই এই নেড়া চাঁপা গাছটারই মত একেবারে থমকে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল, রাণীজির মুখের ঢাকা আর একটু নামিয়ে দিলো, তারপর খাটিয়ার পাশে মেজের ধুলোর উপর ধপ্ ক'রে বসে পড়লো ঘাটবাবু।

ভোলাদা আস্তে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি?

কাঞ্চনকাকা বললেন—থাক গে, কিছু বলো না। ওর যা ইচ্ছে হয় করুক।

রাণীজির সিঁদুরমাখানো সিঁথি, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল আর টিপলাগানো কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে ঘাটবাবু। একটা মরা মেয়েমানুষের সুন্দর মুখের উপর লুব্ধ সাপের মত সিরসির ক'রে ঘাটবাবুর রোগা আর শুকনো হাতটা ঘুরছে। আবার মনে হয়, যেন অনেক যন্ত্রণায় অস্থির একটা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদেরও মনে ছ্যাঁক ক'রে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কি কাণ্ড! শ্মশানের লোকটা দূরের টাউনের জীবনের একটা মানুষকে এরকম ভালবাসা দেখাচ্ছে কেন? যেন বলতে চাইছে ঘাটবাবু; জীবনটাই একটা শাস্তি, ওর মধ্যে থাকতে নেই, চলে এস আমার কাছে।

আর রাণীজির মুখটা দেখে মনে হয়, এক পলাতকার প্রাণ যেন জীবনের ভয় থেকে এতদিনে মুক্ত হয়ে এই ভস্ম আর অঙ্গারের রাজ্যে এক ঘাটবাবুর কাছে এসে শান্তির আশ্বাস নিচ্ছে।

ভোর হলো, পাখি ডেকে উঠলো, চিতা সাজিয়ে ফেললো রাম। শান্ত চোখ নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সবই দেখলো ঘাটবাবু। নদীর বালিয়াড়িতে নেমে ভাল করে দেখলো, ভাল ক'রে চিতা সাজানো হয়েছে কিনা।

রাম-নাম-সৎ-হ্যায় ধ্বনির সঙ্গে শব নিয়ে আরও কয়েকটি দল এল। সবারই সঙ্গে আলাপ করে ঘাটবাবু। একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে, আর ভোরের শ্মশানের এই বাতাসকেই যেন ভালবেসে ফেলেছে ঘাটবাবুর অশান্ত আত্মা।

—মোটা মোটা গেঁটে কাঠগুলি আর দিস না রাম, পুড়তে বড় দেরি করে, আর বড় ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলে।

বলতে বলতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। এখানে ঠাঁই নিতে এসে যেন কারও কষ্ট না হয়, যেন ব্যথা না পায় শবগুলি, বড় যত্ন আর বড় মায়া নিয়ে কাজ দেখছে ঘাটবাবু।

একটু দূরে একটা ভিখারীর চিতার দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু ব্যথার্তভাবে আক্ষেপ করে।—আঃ, বেচারাকে ওরকম আধপোড়া ক'রে ফেলে রাখিস না রাম, আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দে।

টাউন থেকে এত দূরে, এই নিরালা মাঠের শেষে এই নদীর বালিয়াড়ির বুকে ছাই আর অঙ্গারগুলিও যেন একটা সংসার, যেন ভালবেসে ঘরও বাঁধা যায় এখানে। দুই চোখে তৃপ্তি আর শান্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। তারপরেই কাঞ্চনকাকার হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যায়।

রাণীজির চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেবার পর আমরা যখন টাউনে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন দুপুরও পার হয়ে গিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়েই দেখলাম, রেজিস্টার খাতার উপর মাথা নামিয়ে আর মুখ লুকিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। ঘুম? কি আশ্চর্য, এতদিন পরে ঘাটবাবুর চোখে ঘুম!

কাঞ্চনকাকা আস্তে আস্তে বললেন—উঃ, খুব শাস্তি পেল লোকটা।

তারপরেই ব্যস্তভাবে বলেন—যাওতো ভোলা, ওর কাছ থেকে রেজিগনেশন চিঠিটা চেয়ে নিয়ে এস।

ভোলাদা একটু দ্বিধা করেন। —ও যখন নিজেই চলে যাবে বলছে, তখন আমরা আর কেন......।

কাঞ্চনকাকা—তবু আমার সন্দেহ হয় ভোলা। ওর কথা বিশ্বাস করো না। তাছাড়া, আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে। আমাদের পেট্রন কুমার সাহেব যার নামে পুলিশে ডায়েরী করিয়েছে, সেই লোকটাকে এখানে থাকতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

ভোলাদা এগিয়ে যেয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয়—ও ঘাটবাবু।

পর মুহূর্তে রেজিস্টার খাতার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন ভোলাদা। পা টিপে টিপে ফিরে এসে ফিসফিস করে বলেন—শিগগির আসুন কাঞ্চনকাকা, এসে দেখে যান, লোকটা আবার নাম গোলমাল ক'রে রেখেছে।

কুমার সাহেবের এক রাণীজী মারা গিয়েছেন, সার্টিফিকেটেও তাই লেখা আছে, কিন্তু এসব কী অদ্ভুত মিথ্যা কথা! মৃতার নাম সুমিতা গাঙ্গুলী, বয়স পঁচিশ, সধবা, সন্তানবতী, একটি ছেলে,

হার্টের অসুখে মৃত্যু, মৃতার স্বামীর নাম মাধব গাঙ্গুলী, রেজিস্টারের ছক-কাটা এক একটা ঘর পূর্ণ ক'রে মৃতার এই অদ্ভুত মিথ্যা পরিচয় লিখে রেখেছে ঘাটবাবু। আর সেই মিথ্যা কথাগুলির পাশেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে মিথ্যুক লোকটা।

কাঞ্চনকাকা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর গলার স্বরে একটু কর্কশ জোর এনে ডাক দিলেন—ওহে মাধব গাঙ্গুলী।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠলো—বলুন।

এ কি কান্ড! তাহ'লে এই ঘাটবাবুই হলো মাধব গাঙ্গুলী, আর ঐ, যে রাণীজি এতক্ষণ ধরে চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, তিনিই হলেন এই মাধব গাঙ্গুলীর ঘরের মানুষ সুমিতা গাঙ্গুলী, যার রঙীন শাড়ির রং অনেক দিন ঝলমল ক'রে বাতাসে দুলেছিল ঐ কোয়ার্টারের পেঁপে গাছের কাছে। এই ব্যাপার! এতদিনে আমাদের কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘাটবাবুরই বউ তাহ'লে একদিন এখান থেকে চলে গিয়ে রাণীজি হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো, বউ-ছেলে নিয়ে ফটো তোলাবার সুযোগ আর পেল না ঘাটবাবু।

কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমার রেজিগনেশন চিঠিটা আমার কাছেই দিয়ে দাও ঘাট।

হঠাৎ হেসে উঠলো ঘাটবাবু—না।

তারপরেই চিঠিটা পকেট থেকে বের ক'রে আর ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে দিয়ে বেশ শান্ত ও হাসি-হাসি চোখ নিয়েই ঘাটবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাঞ্চনকাকা আবার তাঁর চোখে হঠাৎ একটা শক পেলেন যেন। যেতে চায় না কেন লোকটা? হাসে কেন লোকটা? আর এই কি শাস্তি-পাওয়া মানুষের চেহারা? দিব্যি শান্ত দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মত।

বোধ হয় ঘাটবাবুকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই কাঞ্চনকাকা বলেন—এখানে, এই চিতার ধোঁয়ার মধ্যে এভাবে তোমার পড়ে থেকে আর লাভ কি ঘাট?

কিন্তু তবু কোন হতাশার ব্যথা জাগে না, কোন আক্ষেপ নেই, কোন আতঙ্ক নেই ঘাটবাবুর চোখে। বরং কাঞ্চনকাকার দিকে তাকিয়ে আর চুপ ক'রে কি-যেন ভেবে নিয়ে, তারপর হঠাৎ উৎসাহে একটা আবেদন ক'রে বসে ঘাটবাবু। —আমাকে একটা খবর বলবেন স্যার।

কাঞ্চনকাকা বলেন—বলো, কিসের খবর চাও?

ঘাটবাবু—রাণীজির ছেলেটা কেমন আছে?

চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কাঞ্চনকাকা। খবরটা বোধ হয় জানেন কাঞ্চনকাকা, কিন্তু সেই খবর বলতে তাঁর মত মানুষেরও মন দুরদুর ক'রে উঠছে। শুনলেই লোকটা আবার একটা শাস্তির আঘাত পাবে, তাই খবরটা না বলবার জন্যই বোধ হয় কাঞ্চনকাকা অন্য কথা পাড়লেন।—তোমার মাইনেটাইনে আর এক পয়সাও বাড়বে না ঘাট, তোমার চলে যাওয়াই ভাল।

ঘাটবাবু বলে—ছেলেটো নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে এতদিনে।

কাঞ্চনকাকা—হ্যাঁ বড় তো হয়েছে, কিন্তু......।

ঘাটবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু কি? বলুন না স্যার।

কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কাঞ্চনকাকা বলেন—কিন্তু যে ভয়ানক একটা রোগে ধরেছে, আর বেশি দিন টিকবে কিনা সন্দেহ।

ঘাটবাবুর সারা মুখ জুড়ে ঝক্ ক'রে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আনন্দের বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে।—বলেন কি স্যার।

কাঞ্চনকাকা ভ্রূকুটি করেন—কি বললে ঘাট?

ঘাটবাবু—তাহ'লে বলুন, ছেলেটাও শিগগির আসছে, এল বলে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে দুপা পিছনে সরে গেলেন কাঞ্চনকাকা, যেন একটা হিংস্র ও ভয়াল প্রেতের হাতের ধাক্কা খেয়েছেন।

রাম নাম সৎ হ্যায়! ধ্বনি শোনা যায়। হন হন ক'রে হেঁটে, আর কাঁধের উপর খাটিয়াতে ফুল ছড়ানো বিছানার উপর শব শুইয়ে নিয়ে একটা দল ঘাটের আপিসের কাছে প্রায় এসে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে ঘাটবাবু—ওরে ও রাম, দেখতো কে এল?

রাম বাইরে থেকেই উত্তর দেয়—বোধ হয় এক শেঠজী আসছেন।

ঘাটবাবু—ঠিক করে দেখে বল্ রাম, একটা ছোট ছেলে নয় তো?

রাম বলে—আরে, না বাবু।

বদ্ধ মাতালের মত চেচাঁতে থাকে ঘাটবাবু—আরে হ্যাঁ বাবু, না এসে থাকতে পারবে কেন, এল বলে, আসতেই হবে।

বউ ফিরে এসেছে, এইবার ছেলেও আসছে, লোকটা যেন শ্মশানের এই ধোঁয়ার মধ্যে আবার ঘর বাঁধবার আনন্দে লাফাচ্ছে। কিরকম ভাবে হাত কাঁপাচ্ছে, যেন একটা ছোটছেলেকে কোলে নেবার জন্য নিশপিস করছে লোকটার হাত।

ঘাটবাবুর এই সব চিৎকার শুনতে বিশ্রী লাগে, শুনে আমরা সবাই চমকেও উঠি, কিন্তু কাঞ্চনকাকা যেন একেবারে কেমন হয়ে গেলেন। যেন একটা বিভীষিকার দাঁতের শব্দ শুনছেন, দুটো অপলক চোখ নিয়ে, দম বন্ধ করে আর দুই হাঁটুর কাঁপুনি কোনমতে সামলে কিছুক্ষণ ঘাটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কাঞ্চনকাকা, তারপরেই দু' লাফ দিয়ে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে ছিটকে পড়েন।

—কি হলো কাঞ্চনকাকা? আমরাও তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে কাঞ্চনকাকার কাছে দাঁড়াই। কিন্তু কাঞ্চনকাকা আর দাঁড়ালেন না। যেন তাঁর বুকের পাঁজরের ভিতরে ভয়ংকর কালো একটা ভয় ঢুকে পড়েছে। —আমার সন্দেহ হয়, এতদিন ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

ভোলাদা—কি?

কাঞ্চনকাকা—পিশাচ, পিশাচ, লোকটা মানুষই নয়।

বলতে বলতে মাঠের উপর দিয়ে প্রায় দৌড় দিয়েই ছুটে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা।

যাবার আগে ভোলাদাকেই আমরা প্রশ্ন করলাম—আপনি কি মনে করেন ভোলাদা?

ভোলাদা—আমার বিশ্বাস, লোকটা মানুষই, তবে স্বপ্নের মানুষ।

—তার মানে?

ভোলাদা—লোকটা জাগা চোখে স্বপ্ন দেখে, ওটা মনের একটা রোগ।

আপিস ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শ্মশানের ধোঁয়ার দিকে প্রতীক্ষায় অপলক হয়ে আছে ঘাটবাবুর চোখ। লাল লাল অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আর হাসি-হাসি দুটো চোখ যেন চাঁপার মতই ফুটে রয়েছে।

ভোলাদা বলেন—বল দেখি, লোকটা কি স্বপ্ন দেখছে?

আমরা একটু ভেবে নিয়ে বলি—বোধ হয়, বউ-ছেলে নিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে ফটো তোলাচ্ছে।

এই যদি ছিল মনে

অন্নদাশঙ্কর রায়

য়দেবকে টাঙ্গায় তুলে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আবার আসবেন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" পড়ে যেতে যেতে গদি আঁকড়ে ধরে জয়দেব বলল, "যতদিন বাঁচি, আসবই, বৌদি। একটু মনে রাখবেন।"

সমীরণ চলল সেই টাঙ্গাতেই বন্ধুকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে। রাজা কী মাণ্ডি। সেখানেও সেই একই দৃশ্য।

"আবার এসো।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" জয়দেব কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত রেখে বলল, "গুড বাই নয়। ফরাসীরা যেমন বলে, অ রিভোয়া।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরল সমীরণ। টাঙ্গায় নয়, পায়ে হেঁটে। আধ মাইল পথ। বেশীক্ষণ লাগে না। তবু একটু বেশীক্ষণই লাগল। বন্ধুর কথা ভাবছিল।

"তোমার বন্ধুকে এবার এতটা কাহিল দেখব আশা করিনি," বলল কুমকুম।

"আমিও আশা করিনি।"

"কী হয়েছে ও'র? বয়স তো মাত্র তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ।"

"কেমন করে বলব? তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন।"

"কই, এক বছর আগে তো এমনটি দেখিনি।"

"না। সেবার ওকে বেশ সুস্থই মনে হয়েছিল। তবে ওর কথাবার্তায় কেমন একটা অশান্ত ভাব লক্ষ করেছিলুম। এবার ওর কথাবার্তায় বাঁধুনি নেই। কেমন একটা ঢিলে ঢালা ভাব। লক্ষ করলে তো, 'যতদিন বাঁচি'।"

"হ্যাঁ। 'একটু মনে রাখবেন।' বাপরে, বিরাট বড়লোক! এক কলকাতা শহরেই চার পাঁচখানা বাড়ি। অগুনতি চা বাগান। তাঁকে একটু দয়া করে মনে রাখব কিনা আমি, আধখানা ভাড়াটে বাড়িতে যার অর্ধেক জীবন কেটে গেল।"

সমীরণ আহত হয়ে বলল, "তবু তো সস্তায় আছো। দিল্লী হলে কী করতে? এই টাকায় এর চেয়ে আরাম একমাত্র আগ্রাতেই সম্ভব।"

কথাটা ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আমি বলছিলুম কি ও'র অগাধ টাকা। চিকিৎসা করালে সেরে যাবে।"

"ঐখানে তোমার ভুল, কুমু। ঐখানে তোমার ভুল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা গরীব, কিন্তু দুঃখী নই। আর আমার বন্ধু জয়দেব গরীব নয়, কিন্তু দুঃখী।"

"কেন? দুঃখ কিসের? তোমার মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়না। একটিও সন্তান হয়নি, বৌ মরে গেছে অল্প বয়সে। তারপর থেকে আজ হিল্লী কাল দিল্লী করে বেড়ানো হচ্ছে। নিষ্কর্মার ধাড়ী। সম্পত্তিগুলো যে দেখাশুনা করবে সেটুকুও উদ্যম

নেই। তুমি বলছ দঃখী। আমি দেখছি সুখী।"

সমীরণ তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সুখ কিসে আর দুঃখ কিসে তা কি তুমি জানো না, কুমু? এই যে আমরা আমাদের চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে আছি, তুমি নারী আর আমি পুরুষ, এই যে আমরা এখনো তেমনি ভালোবাসি, তুমি প্রিয়া আর আমি প্রিয়, এরই নাম সুখ। আর ঐ যে ও বেচারা টাকার জন্যে বিয়ে করে টাকা নিয়ে বসে আছে, বিয়ে গেছে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে, একটা ছেলে কি মেয়ে নেই যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে, একটা কাজও নেই যে স্নেহপ্রেমের অভাব ভুলিয়ে রাখবে, ওরই নাম দুঃখ। তোমাকে যদি কেউ জয়দেবের ভাগ্য দিয়ে এ ভাগ্য কেড়ে নিত তুমি সুখী হতে?"

"ষাট। ষাট। তোমার মুখে কিছু আটকায় না," বলে কুমকুম স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল। মধুর হেসে বলল, "লাখ টাকার বদলে অমন ভাগ্য চাইনে।"

সমীরণ তখনো ভাবছিল বন্ধুর কথা। "তা কি জয়দেব জানত। কতটুকু দূরদৃষ্টি মানুষের! নিয়তি তাকে টোপ দিয়ে বঁড়শিতে গাঁথে। সে মাছের মতো লোভে পড়ে, মাছের মতো মরে। জয়দেবকে বাঁচাতে হবে।"

"হাঁ। সুচিকিৎসা চাই। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

"ও কথা ভেবে বলিনি। এ কি দেহের রোগ যে চিকিৎসায় সারবে!"

কুমকুম বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "তা হলে ও'র একটা বিয়ে দাও। এখনো দাম্পত্য সুখ, সন্তান-সুখ হতে পারে।"

"কিন্তু" সমীরণ গম্ভীরভাবে বলল, "ব্যাপার অত সোজা নয়। প্রত্যেক বছর ও তাজমহল দেখতে আসে, আমাকে টেনে নিয়ে যায় ওর সঙ্গে। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি তাজমহলের দিকে চেয়ে। তারপর কথা বলি। জানতে চাই আমি, ও কি ওর মমতাজের জন্যে এখনো বিরহ বোধ করছে? ওর ব্যথার কি অবসান নেই? ও উত্তর দেয়, বিরহবোধ অসাড় হয়ে গেছে। তাজমহল দেখে আবার জাগে কি না পরখ করার জন্যেই আসে। জাগে না। তখন জিজ্ঞাসা করি, আবার বিয়ে করতে বাধা কী? বলে, বাধা অন্য ধরনের। স্মৃতি যদিও স্মৃতি হয়ে গেছে তার বিয়ের পণযৌতুক তো স্মৃতি হয়ে যায়নি। আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলে স্মৃতির পিতার দান ভোগ করা উচিত হবে না। ওটা দুর্নীতি। অথচ বাড়িগুলো, চা বাগানগুলো ফিরিয়ে দিলে ওর চলবে কী করে, স্ত্রীকে পুষবে কী করে?"

কুমকুম বিরক্ত হয়ে বলল, "নিজেরও তো ঘটে বিদ্যাবুদ্ধি আছে। অক্সফোর্ডের ডি লিট। ও'র মতো ডিগ্রী থাকলে তোমাকে লেকচারার হয়ে পড়ে থাকতে হতো না। প্রোফেসর কি রীডার হতে।"

সমীরণ করুণ হেসে বলল, "ঐখানেই তো গোল। আমি কলকাতার এম এ বলে আমার মানহানি হয় না, আমি যেখানে হোক একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারি। কিন্তু ও যে নামকরা বিদ্বান, অক্সফোর্ডের ডি লিট। ও যদি আমার মতো লেকচারার হয় তা হলে ওর মানসম্ভ্রম থাকবে না। ওকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হবে হাত দিয়ে খেতে হবে, কেউ টের পাবে না যে বিলেত-ফেরত বড় সাহেব।"

"তাতে কী হয়েছে।"

"এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই তুমি ও কথা বলতে পারলে। তখনকার দিনে ওর মতো লোকের পক্ষে মানসম্ভ্রম বজায় রাখা একটা জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল। বড় চাকরি ওর পাওনা, কিন্তু গবর্নমেণ্ট তা দেবে না। কারণ ও ভারতীয়। ওর চেয়ে যারা নিকৃষ্ট তারা ইংলণ্ডে জন্মেছে বলে ওর পাওনা কেড়ে নেবে। এর প্রতিবাদে ও ছোট চাকরি নেবেই না। দেশী স্টাইলে থাকলে গবর্নমেণ্ট বলত, তা তুমি তো সস্তায় চালাতে পারো দেখছি, তোমার অত মাইনের দরকার কী? তাই ও বিলিতী স্টাইলে থাকবে। এটাও প্রতিবাদ।"

কুমকুম বলল, "অদ্ভুত লোক তো।"

"তখনকার দিনে ওটা অদ্ভুত ঠেকত না। মনে হতো, আমরা সস্তায় থাকি বলে আমাদের বেতন কম, বড় বড় চাকরিগুলো আমাদের দিলে বেতনও কমতে কমতে ছোট চাকরির মতো হবে। তার চেয়ে বড় চাকরির উপর দাবি রেখে বেশী খরচে থাকা ভালো।"

কুমকুম কিছুতেই সমর্থন করতে পারল না। সমীরণ হেসে বলল, "আমি আমার বন্ধুর যুক্তিটাই পেশ করছি। আমার যুক্তি নয়। ও রকম যার যুক্তি সে মনের মতো কাজ না পেলে কাজ করবেই না। বাপের অন্ন ধ্বংস করবে ক্যালকাটা ক্লাবে ঘর নিয়ে আস্তানা গেড়ে। বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবে সুদিনের আশায়।"

"তা হলে ও'র মাথা তখন থেকেই খারাপ।"

"তাই যদি হতো, ও অত বড় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসত না। ক্যালকাটা ক্লাবে সকলের সঙ্গে ওর আলাপ। তাঁদের একজনের ওকে ভালো লেগে গেল। মেয়ের বিয়ে দিলেন ওর সঙ্গে। তখন আর কী। রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব। চাকরির কথা আর কে ভাবে। স্ত্রীকে ভালোবাসাই ওর চাকরি।"

কুমকুম চিমটি কেটে বলল, "এটা তোমার বানানো।"

সমীরণ বৌকে একটু আদর করে বলল, "তখনো আমার বিয়ে হয়নি। আমি তখন নেপাল রাজ্যে কোনো মতে একটা চাকরি জুটিয়েছি। জয়দেবের বিয়ের খবর পেয়ে ভাবছি, আহা, আমার যদি অমন একটি শ্বশুর মিলে যেত! তা হলে কি আর পরের চাকরি করি! ঘরের চাকরিতেই লক্ষ্মী।"

কুমকুম মাথা নেড়ে বলল, "কখনো না। তুমি কখনো ও কাজ করতে না।"

"কী জানি! তোমার বাবার যদি জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগান থাকত আর তিনি যদি ওগুলোর অর্ধেক শেয়ার আমার নামে লিখে দিতেন তা হলে কি আমি এই সুদূর প্রবাসে লেকচারার হয়ে জীবনপাত করতুম! বলা যায় না।"

"খুব বলা যায়।" কুমকুম কঠোর হয়ে বলল, "তুমি এইখানেই থাকতে, এই বাড়িতেই, আর আমাকে একটা রাঁধুনী রাখতে দিতে না। তুমি দিলেও আমি রাজী হতুম না। আরেক রকম মানসম্ভ্রম আছে জয়দেব বাবু তার ধার ধারেন না।"

সমীরণ খুশী হয়ে কুমকুমের হাত মুখে ছুঁইয়ে বলল, "তখনকার দিনে মনে হতো জয়দেব জিতে গেছে, আমি হেরে গেছি। এখন মনে হচ্ছে কী, বলব?"

"থাক, মিথ্যে কথা বলতে হবে না।" কুমকুম হাত সরিয়ে নিল। তার চোখে মুখে আনন্দের ছটা। "তার পর?"

"তার পর জয়দেব সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতে লাগল। কলকাতার অভিজাত মহলের সব ক'টা দরজা তার কাছে খুলে গেল। আজ গবর্নমেণ্ট হাউসে লাঞ্চন, কাল রাজেন মুখুজ্যের সঙ্গে ডিনার, পরশু বর্ধমান হাউসে ফ্যান্সী ড্রেস। স্ত্রীভাগ্যে ধন। ধন অনুসারে সম্মান। জয়দেব প্রাণপণে সতীসেবা করল। আমি তো তার সিকির সিকিও করিনি।"

"কেন করবে? আমার বিয়েতে কী পেয়েছ যে করবে?" ক্ষুব্ধ হলো কুমকুম।

"অমনি অভিমান করা হলো! আগে শোন সবটা।" এর পরে সমীরণ বলল জয়দেবের দুর্ভাগ্যের কথা। কর্মসংস্থানের জন্যে তার যেটুকু উদ্যোগ ছিল সেটুকুও চলে গেল। সে যে একজন কর্মপ্রার্থী, সরকারী মহল বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, কোথাও কেউ মনে রাখল না। শ্বশুরের পার্টনার বলেই সে পরিচয় দিতে ও পেতে থাকল। কয়েক বছর পরে দেখা গেল সে অকর্মণ্য। অক্সফোর্ডের পাঠ বেবাক ভুলে গেছে। শত্রুরা রটায় ঘোড়ার ডাক্তার। অশ্ব-চিকিৎসার জন্যে তার কাছে কল্ আসে।

কুমকুম খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে যায়।

"তার পর একদিন আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্মৃতি মারা যায়। জয়দেব দেওয়ানা হয়ে মহাদেবের মতো ঘুরে বেড়ায়। সেই যে ওর ঘোরা রোগ শুরু হলো বারো বছরেও সারল না। আবার তাকে সংসারী করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। এমনকি শ্বশুরের তরফ থেকেও। তিনি তাকে সত্যি স্নেহ করতেন। কিন্তু সে আর ওমুখো হবে না।"

কুমকুম অভিভূত হয়েছিল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলল, "সামনে আরো দুর্ভোগ আছে। যদি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয় কে ওঁর সেবা করবে। নার্সকে দিয়ে কি সেবা হয়? নার্স করে শুশ্রূষা। বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি আর বইতে পারছেন না ওঁর নিঃসঙ্গতা। ওঁর আবার বিয়ে করাই উচিত। আর যখন বিরহবোধ নেই বলছ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু বিয়ে করলে খাবে কী, খাওয়াবে কী? শ্বশুরের সম্পত্তি তো ভোগ করতে অনিচ্ছা। এদিকে চাকরির বাজারে আরো তো অক্সফোর্ডের ডি লিট ডি ফিল দেখা দিয়েছে তাদের চাকরি না দিয়ে কে ওকে চাকরি দেবে? ও তো অধ্যাপনার অযোগ্য। ওর চেয়ে আমার বাজারদর বেশী।" সমীরণ সগর্বে তাকায়।

"কিন্তু শ্বশুরের সম্পত্তি যাকে বলছ তা তো এখন ওঁরই সম্পত্তি। শ্বশুর তো চিরকালের মতো দিয়েই দিয়েছেন। কেই বা কেড়ে নিচ্ছে যে ওঁকে চাকরি করতে হবে।"

"ঠিক। কিন্তু এটাও বেঠিক নয় যে প্রথম স্ত্রীর দৌলতে যা পেয়েছিল তা দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিলে বেইমানি হবে। তোমার মতো উঁচু দরের মেয়েরা কখনো তা ছোঁবে না। বলবে, যাও, ফিরিয়ে দাও। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করো। যেমন তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি আছে।"

কুমকুম চিন্তিত হয়ে বলল, "তা হলে ওঁর সমস্যার সমাধান কী।"

"আমার মতে" সমীরণ বিচক্ষণের মতো বলল, "ওর এখন যে কোনো একটা কাজ নেওয়া উচিত, যে কোনো বেতনে। কাজ করতে করতে ও কাজের যোগ্য হবে। নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়ানো একটা অভিশাপ। ওয়ার্ক থেরাপি ওর চিকিৎসার পদ্ধতি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মতো কল্যাণ আর নেই। কপালের ঘর্মে অন্ন অর্জন করো, যীশু খ্রীষ্টের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রমের অন্ন খেতেও মিষ্টি লাগে। গবর্নমেণ্ট হাউসের লাঞ্চনের চেয়ে।"

কুমকুম গালে হাত দিয়ে বলল, "এই যদি তাই ছিল তবে অক্সফোর্ড যাওয়া কেন, এত খেটে করে ডি লিট পাওয়া কেন, বড় চাকরি না জুটলে চাকরি করব না এই ধনুর্ভঙ্গ পণ কেন, ডিগ্রী ভাঙিয়ে বিয়ে কেন, স্ত্রীর টাকায় আয়েস কেন, সম্পত্তি ত্যাগ করার কল্পনা কেন? এমন অবধূতকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে মন থেকে রাজী হবে? ওয়ার্ক থেরাপি ছাড়া আর একটা থেরাপি আছে। তা না হলে কি ওঁর অসুখ সারবে!"

(২)

রূপকথায় আছে, রাজার ছেলে আর রাখাল ছেলে, দুজনায় গলায় গলায় ভাব। এও কতকটা তেমনি। বড় হয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও রাজার ছেলে নয় জয়দেব, রাজার জামাই। আর রাখাল ছেলে নয় সমীরণ, ছেলের রাখাল।

সমীরণ অনেক চেষ্টা করল জয়দেবকে কোনো একটা কাজে লাগাতে। সে ধরাছোঁয়া দিল না। এক নম্বর কুঁড়ের বাদশা। একটা না একটা ছুতো ধরে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবে। যেন গরজটা তার নয়, কর্মদাতার। তার ধারণা সারা ভারতে যেখানে যত কর্মদাতা আছে সকলে তার শ্বশুরের মতো উপযাচক হয়ে তাকে ধরে বেঁধে অফিসের বেদীতে বসিয়ে দিয়ে বলবে, তুভ্যমহং সম্প্রদদে। সে দয়া করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, গৃহ্ণামি।

"কেন, ওরা কি জানে না যে, আমি যোগ্য পাত্র? আমিই যোগ্যতম পাত্র? কে না জানে ভূ-ভারতে আমার নাম?" এই হলো তার জিজ্ঞাসা। তথা অভিযোগ।

এর উত্তরে সমীরণ লেখে, "সব সত্যি। তা হলেও একটা দরখাস্ত করতে হয়।"

সে দরখাস্ত করবে না। তার দাবি আগেকার দিনে যা ছিল আজকের দিনেও তাই থাকবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে তাকে ধুতি পরে কলেজে পড়াতে হবে? বিশেষ যখন ছাত্ররাই কোট প্যাণ্ট পরছে।

দিল্লীতে ওর জন্যে তদ্বির করতে হলো। যাতে ওকে পররাষ্ট্র বিভাগে নিযুক্ত করে দক্ষিণ আমেরিকায় বা তিব্বতে চালান দেওয়া যায়। বলিভিয়াতে ওকে কন্সাল করার কথা উঠেছিল। কিন্তু ও নিজেই ভাঙচি দেয়। স্প্যানিশ ভাষা ও শিখবে না। ওকে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দিতে হবে। যে দোভাষীর কাজ করবে।

আসলে ও বাবু হয়ে গেছে। খাটবে না। খাটতে অক্ষম। ওর জন্যে আরেকজন খাটবে। তাও যদি আরেকজনকে খাটিয়ে নিতে জানত। •পরের উপর ছেড়ে দিয়ে ভেসে বেড়ানো ওর দ্বিতীয় প্রকৃতি। সরকারী চাকরিতে ও খাপ খাবে কী করে! বেসরকারী চাকরিতেও বাবুয়ানা চলে না। বাইরে সাহেবিয়ানা, ভিতরে বাবুয়ানা, এই দস্তুর ও এই ধাত নিয়ে কোথাও কর্মপ্রাপ্তির আশা নেই। বেচারা জয়দেব!

ওর শ্বশুর ওকে পলিটিক্সে নামতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পার্টি ফাণ্ডে টাকা ঢালতে পারলে কিছু না হোক এম এল সি হতে পারত। কিন্তু ভেক ধারণ করতে হবে শুনে ও বেঁকে বসল। ওকে অনেক করে বোঝানো হলো যে ভেক ধারণ করলেই বিলিতী মদ ছাড়তে হবে এমন কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ও সাফ বলে দিল, ভণ্ডামির মধ্যে আমি নেই। শোন কথা!

ও যে-নিষ্কর্মা সেই নিষ্কর্মা রয়ে গেল। তফাতের মধ্যে ওর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ল। পরের বছর শীতকালে যখন আগ্রা গেল তখন ওর ঠোঁট অনবরত কাঁপছে। কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলছে, হয়তো একটা অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করছে, এক রাশ আবোল তাবোল হয়তো। বাক্যের উপর, কণ্ঠের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। পরক্ষণেই বলছে, য়্যাঁ। বলেছি আমি অমন কথা! অত্যন্ত ক্লিষ্ট কাতর মুখভাব। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। ওকে না ধরলে ও পড়ে যাবে। পোশাক পরিচ্ছদও আঁটসাট নয়। রাস্তার মাঝখানে খুলে যাবে। একদিন রাতের পায়জামা পরে দিনের বেলা আগ্রা শহরের বুকের উপর দিয়ে চলেছে, খেয়াল নেই যে, ওটা তার শোবার ঘর নয়। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে বলছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে, আহা, কী মনোমুগ্ধকর! থেকে থেকে ভ্রূ কোঁচকায়, দাঁতে দাঁত চাপে। দিনের বেলা যখন তখন হাই তোলে। ঝিমিয়ে পড়ে। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। চোখে ভয়ের চিহ্ন।

"ভাই সমীর," জয়দেব বলে আর্ত স্বরে, "আমার সমস্তক্ষণ ভয়, কোন দিন ঘুমের মধ্যে চলে যাব। কেউ জানতে পাবে না যে আমি মরে গেছি। আমিও না। ভাবতেই আমার হাত পা জমে হিম হয়ে যায়। মাথা গরম হয়ে ওঠে চায়ের কেটলির মতো।"

"কেন? এ রকম ভয় কেন? এত ভয় কিসের?" সমীরণ উদ্বেগের সঙ্গে শুধায়।

"জেগে থাকলে ভয় থাকে না। ঘুমিয়ে পড়লেই ভয়। সেইজন্যে আমি যতক্ষণ পারি জেগে থাকি। রাতটা এক রকম জেগে জেগেই কাটে। ঘুমোই কখন জানো? দিনের বেলা যখন লোকজন চারদিকে রয়েছে। মারা গেলে টের পাবে। তার আগে ডাক্তারকে খবর দেবে। দিনের বেলা ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে।"

সমীরণ শুনে অবাক হয়। জয়দেব বলতে থাকে, "দিনের বেলাও কি ঘুম আসে, ভাবছ? যেই একটু অচেতন হয়ে পড়ি অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসি। বুকে হাত দিয়ে দেখি ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। টিকটিক করে চলছে দেখে আশ্বস্ত হই।"

"ভারী দুঃখিত হলুম শুনে। তুমি ঘুমোও। আমার সামনেই ঘুমোও।"

"কিন্তু এই ঘুম যদি শেষ ঘুম হয়!" জয়দেব বুদ্ধিমানের মতো বলে, "কী করে জানব যে শেষ ঘুম নয়?"

"এসব মরবিড চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, জয়। ঘুম পেলে নির্ভয়ে ঘুমোবে। জোর করে জেগে থেকো না। কই, এসব তো আগে শুনিনি। কবে থেকে এমন হচ্ছে?"

"অনেক দিন।"

সমীরণ জানতে চায় কোনো রকম চিকিৎসা চলছে কিনা। জয়দেব বলে এক এক করে অনেক রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি পরীক্ষা করা গেছে। ইলেকট্রিক শক নেওয়া হয়েছেও।

সমীরণ শিউরে উঠল। "বলো কী! শক থেরাপি! তাতেও সারল না!"

"না। তাতে আরো খারাপ হলো।"

সমীরণ এইবার কথাটা পাড়ল। "তোমাকে আগেও বলেছি, ভাই। এখনো বলছি। তোমার হাতে কাজ নেই, অথচ টাকা আছে। এই থেকে তোমার রোগ। এর প্রতিকার হচ্ছে হাতে কাজ নেওয়া, হাত থেকে টাকা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। যদি না ও টাকা তোমার স্বোপার্জিত হয়। আমার পরামর্শ শোন। তোমার চিকিৎসার প্রণালী ওয়ার্ক থেরাপি। এ যদি করো তোমার সব ভয় কেটে যাবে। তুমি বাঁচবে।"

জয়দেব কেবল কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়তে থাকল। "তোমার ওই এক কথা। কাজ। কাজ। কাজ। কী কাজ? কত বেতন? কতটকু স্বাধীনতা? কী পরিমাণ তাব্দর তোয়াজ খোশামোদ? না জেনে না বুঝে অমনি ফস করে কাজ নিয়ে আমি ছুঁচো গিলে মরি আর কী। আর ঐ টাকাটা ঝেড়ে ফেলে দেবার কথা বলছ। ওটা আমারই মনের কথা। ফী মাসে একবার করে অ্যাটর্নির বাড়ি যাই। বলি, একটা ট্রাস্ট ডীড তৈরি করে দেখাতে পারেন? এ টাকা আমার নয়। আমি ট্রাস্টি।"

"তারপরে?"

"তারপরে আর কী? অ্যাটর্নি মুসাবিদা করে। আমার পছন্দ হয় না। প্রায়ই ব্যাকরণের ভুল থাকে। অমন অশুদ্ধ ইংরেজী দলিলে আমি হেন মানুষ সই করতে পারি?"

"মুসাবিদা ক বছর ধরে চলছে?"

"সাত আট বছর।"

সমীরণ গালে হাত দিয়ে থ হয়ে বসল।

"হবে। হবে। ওটা পরের কথা। আগেরটা আগে। কথা হচ্ছে কেন বাঁচব? কার জন্যে বাঁচব? তুমি এর উত্তর পেয়ে গেছ বলে দিন-রাত খাটছ। সে খাটুনি শখের নয়, তবু সুখের। তুমি জানো যে তোমার উপর আরো পাঁচটি প্রাণীর ভাগ্য নির্ভর করছে। ভাই সমীর, তুমি যখন বলো যে কর্মই হচ্ছে সর্বরোগহর তখন তোমার মনে থাকে না যে আমার উপর একটি প্রাণীরও দায়িত্ব নেই।"

এইখানে জয়দেবের ব্যথা। ওয়ার্ক থেরাপি এর কী করতে পারে। তবু সমীরণ আরো একবার বলে দেখল। "সমাজের কাছ থেকে যা নিচ্ছ, সমাজকে তার বিনিময়ে কী দিচ্ছ? তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সমাজ যে খরচটা করছে সেটা যার তহবিল থেকে আসুক না কেন সমাজেরই তো বটে। তুমি তার বদলে সমাজকে শ্রম দান করছ না, বিদ্যা দান করছ না, সৃষ্টি দান করছ না, আনন্দ দান করছ না। তুমি কি খাতক নও? চোর নও?"

জয়দেব এর উত্তরে বলল, "আমার

বিবেকও আমাকে দুবেলা এই বলে খোঁটা দিচ্ছে। আমি বলছি, বেশ তো। আমি চলে যাচ্ছি এ জগৎ থেকে। তাহলে তোমাকে অত বিব্রত হতে হবে না। মরণ। মরণেই আমার সমাধান।"

সমীরণ তার বন্ধুর দুটো হাত চেপে ধরে বলল, "তোমাকে বাঁচতে হবে, জয়। বলো কী করলে তুমি বাঁচবে? তোমার সর্ত কী? তোমার জন্যে আমরা কী করতে পারি?"

জয়দেব ভেবে বলল, "কী আর করতে পারো? আমাকে যেতে দাও। একটা মানুষ বাড়লে বা কমলে কী আসে যায় দেশের বা ধরিত্রীর?"

সমীরণ তাকে পীড়াপিড়ি করল হোটেল থেকে উঠে গিয়ে সমীরণের বাসার অপর অংশ ভাড়া নিতে। তাহলে চোখে চোখে রাখতে পারবে তাকে।

"আমার কি অসাধ। কিন্তু দুটি জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। মাটিতে বসতে পারব না। পঁচিশ বছর বসিনি। দিশী ধরণের পায়খানায় যেতে পারব না। পঁচিশ বছর যাইনি। সত্যি আমার কষ্ট হয়। তোমরা বলবে সাহেবিয়ানা।" জয়দেব বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু রাজী হলো না।

তখন সমীরণ আর করে কী। কলেজ থেকে এক মাস ছুটি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। অবশ্য আগ্রাতেই। রাত্রে বাড়ি গিয়ে শোয়। বাকী সময়টা ওকে চোখে চোখে রাখে।

এর ফলে জয়দেবের মনের আর একটা দিক অনাবৃত হলো। এত দিন হয়নি যে এইটেই আশ্চর্য। আগে যেমন ও কথায় কথায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলত এখন তেমনি আর একটি প্রসঙ্গ। কথায় কথায় সেক্স। ঘোরতর নিন্দা করত, আদৌ অনুমোদন করত না, তবু পঞ্চাশ বার মুখে আনত। কান দুটো লাল হয়ে উঠত সমীরণের। পণ্ডিত হলে কী হয়। কাণ্ডজ্ঞান এত কম যে, অন্য লোক শুনছে কি না গ্রাহ্য করত না। একদিন তো কুমকুমের সাক্ষাতেই এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল যে কুমকুম দৌড় দিয়ে উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েরা তখন বাড়ি ছিল না।

"জয়, তোমাকে আর একটা থেরাপি পরীক্ষা করতে হবে। আমার বৌ বার বার বলছে। আমি বলতে চাইনি, বিশ্বাস করিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে বাঁচাতে হলে মেয়েলি টোটকাও কাজে লাগতে পারে।"

"কে বলছেন? বৌদিদি? তাহলে তো অবশ্য শুনতে হয়।"

"হাঁ। কিন্তু কী করতে বলছে, জানো?"

"কী?"

"আর একবার বিয়ে।"

জয়দেব মনে মনে খুশি হলো। বাইরে এমন ভাব দেখাল যেন ফাঁসির হুকুম হয়েছে। তার পরে যা বলল তা সমীরণের কাছে নবসংবাদ।

বছর দুই আগে মুসোরী বেড়াতে গিয়ে সে তার বন্ধু শার্দূল সিংএর অতিথি হয়। শার্দূল তাকে নিয়ে যায় নিজের বন্ধুর বাড়ি আলাপ করিয়ে দিতে। সেখানে তার নিমন্ত্রণ হয় ডিনারে। বুফে ডিনার। যে যার প্লেট হাতে করে টেবল পরিক্রমা করে, পরিক্রমা করতে করতে যার যা রুচি তুলে নেয়। প্লেট ভরে গেলে কোথাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা চক্কর দিতে দিতে পেট ভরাতে হয়। খবরদার, বসতে পারবে না। ত্রিসীমানায় চেয়ারও নেই যে বসবে। এ হলো দাঁড়ানো ভোজ।

জয়দেব অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নয়। কোথাও বসতে পারে কি না খুঁজতে খুঁজতে বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো। দেখল অন্ধকারে আরেক জন বসে থাচ্ছে। মেয়েটি তার অবস্থা অনুমান করে বলল, "আসুন, বসুন। ধরা যদি পড়ি তো এক সঙ্গে পড়া যাবে। আমি বলব, ইনি বসেছিলেন দেখে আমি বসেছি। আপনি বলবেন, ইনি বসেছিলেন দেখে আমি বসলুম। আপনি কি বাঙালী?"

মেয়েটিও তাই। বাঙালী না হলে এমন ক্লেশকাতর কে হবে! পরিচয় দেওয়া নেওয়া হলে জয়দেব আবিষ্কার করল মেয়েটি আর কেউ নয়, ফুল। তার প্রথমা প্রিয়া। ফুল, যার সঙ্গে বিয়ের ফুল ফুটল না। সে অনেক কথা। সমীরণ কিছু কিছু জানে। সেই ফুল এখন বিধবা হয়ে পশ্চিমের একটি কলেজে অধ্যাপনা করছে। ছেলেমেয়ে হয়েছিল, জীবিত নেই। সেও এখন নিঃসঙ্গ।

কী সুন্দর হয়েছে তাকে দেখতে! পরিপূর্ণ গড়ন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। বয়স চল্লিশ হবে। বয়সেরও একটা মহিমা আছে। এ মহিমা আঠারো বছর বয়সে ছিল না। জয়দেব অন্ধকার বারান্দা থেকে আলোয় নিয়ে এলো তাকে। তার প্লেট আবার ভরে দিল। এবার মিষ্টিতে। আহা, তার জীবন যদি ভরে দিতে পারত আবার! এবার মাধুরীতে।

সেই দিনই লোকচক্ষের আড়ালে প্রস্তাব করল তার কাছে, "ফুল, তুমিও একাকী, আমিও একাকী। এসো, এ নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করি।"

"তার মানে কী? বিয়ে?" ফুল চমকে উঠল।

"হাঁ বিয়ে। না করে যে ভুল করেছি করে সে ভুল সংশোধন করব।"

"ছি! তা কি হয়! তোমাকে বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে না স্মৃতির কাছে? আমাকে অজিতের কাছে? ইচ্ছা করলে আমরা বিয়ে করতে পারতুম যখন ওরা ছিল না। এখন ওরা নেই বলে কি আমরা বিয়ে করতে পারি!"

(৩)

সমীরণের মুখে কাহিনীটা শুনে কুমকুম বলল, "এখন বুঝতে পারছি ও'র কী হয়েছে; কেন হয়েছে। কিন্তু ফুলটি কে? চেনো নাকি?"

"চিনতুম। গরীবের মেয়ে। অরক্ষণীয়া। বাপ পণ দিতে পারে না। জয়দেব বিনা পণে বিয়ে করতে রাজী। কিন্তু ওর বাবা নারাজ হলেন। ছেলে ভালো পাশ করে জলপানি পেয়েছে, বিলেত যাবে, ফিরে এলে হবে সোনার খনি। বাংলাদেশের দিক্‌পাল ছেলের বিয়ে দেবেন তিনি শুধুমাত্র সুন্দর মুখ দেখে? বিনা পণে বিয়ে করতে হয়, সমীরণ রয়েছে। ও তো ওই সব করে বেড়ায়, রোগীর সেবা, বন্যাপীড়িতের সাহায্য, আরো কত কী।"

কুমকুম হেসে বলল, "তা তুমি করলে পারতে। কেমন সুন্দরী বৌ পেতে।"

"তার বেলা দেখা গেল ওর বাপ জহুরী বটে। রূপের কদর বোঝেন। অমন সুন্দর মেয়ের বিয়ে উনি যার তার সঙ্গে দেবেন না। হলোই বা অরক্ষণীয়া। জয়দেব বিলেত চলে গেলে ওর বিয়ে হয়ে গেল লখনউ-প্রবাসী এক ডাক্তারের সঙ্গে। দোজবর।"

"তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। কিন্তু কী করবে, বলো! তোমার কপালে লেখা ছিল আমার সঙ্গে বিয়ে, যেমন জয়দেবের কপালে লেখা ছিল স্মৃতির সঙ্গে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে জয়দেব আর ফুল কী করবে?"

"কী আর করতে পারে! মাঝখানে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সেসব কি এত সহজে মুছে ফেলা যায়? ফুল আর বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। জয়দেব করলেও করতে পারে। অন্য কোনো মেয়েকে।"

"তা হলে সেই পরামর্শ দাও ও'কে। আর দেরি করে ফল কী হবে? দিন দিন বিয়ের অযোগ্য হয়ে উঠছেন না?"

সমীরণ বলল, "অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হলে ওর বিয়ে হয়ে যেত অনেক দিন আগে। আমার মনে

হয় ও ফুলের জন্যেই অপেক্ষা করছে। করতে থাকবে, যদি বেঁচে থাকে।"

কুমকুম পরামর্শ দিল, "তুমি বরং ফুলকে একখানা চিঠি লেখো। কেউ যদি ওঁকে বাঁচাতে পারে তো সে তোমার ওই ফুল।"

সমীরণ রাত জেগে লিখল একখানা চিঠি। স্ত্রীকে পড়তে দিল, বন্ধুকে দিল না। দেখা যাক ফুল তার কী উত্তর দেয়। যদি কোনো আশা না থাকে তা হলে জয়দেবের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কী ব্যবস্থা তা পরে ভাবা যাবে।

ফুল উত্তর দিল। দীর্ঘ উত্তর। তাতে তার জীবনের সব কথা ছিল। বিধবা হয়ে সে কত কষ্টে পড়াশুনা করেছে, পড়াশুনা করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। তার চাকরি তার কাছে এত মূল্যবান যে, বিয়ের জন্যে সে তা ছাড়বে না। চাকরিও করবে, ঘর-সংসারও করবে, এমন যদি হতো তা হলে হয়তো বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখত। কিন্তু জয়দেবের মতো বড়লোক স্ত্রীর কর্মস্থানে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতেন না। কী-ই বা কাজ আছে যা তিনি করতে পারতেন!

আর একটা কথাও সে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল। জয়দেব হয়তো ছেলেমেয়ে চাইবেন। সে কিন্তু আর মা হতে চায় না।

চিঠিখানা কুমকুমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সমীরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জীবন কেন এত জটিল! যা হওয়া উচিত কেন তা হয় না! হলে কত ভালো হতো। তবু হবে না।

কুমকুমও গম্ভীর হয়ে গেল চিঠিখানা পড়ে। মাথা নেড়ে বলল, "কোনো আশা নেই। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ।"

সমীরণ বন্ধুকে জানতে দিল না ফুল কী লিখেছে। এমনি কথায় কথায় বলল, "জয়, তোমার বৌদিদির মতে তোমার আবার বিয়ে করা উচিত।"

জয়দেব আগ্রহের সঙ্গে শুধালো, "কাকে? কাকে?"

"যাকে তোমার ভালো লাগে। মেয়ে দেখতে চাও তো দেখাতে পারি। এই আগ্রা শহরেই বহু বাঙালী পরিবার আছেন। বিবাহযোগ্যা কন্যাও অনেক। বয়ঃস্থা পাত্রীও বড় কম নেই। চল না বিনা নোটিশে বাড়ি বাড়ি কল করা যাবে। প্রবাসী বাঙালীর এত বড় সুহৃদ আর নেই, এই বলে আমি তোমার পরিচয় দেব। তার পরে তোমার ডি লিট ইত্যাদির উল্লেখ করব।"

জয়দেব দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "না ভাই। জীবনে আর ও পাট নয়। বিয়ের আগে ওসব ঢের হয়েছে। আমাকে যেতে দাও।"

সমীরণ বুঝতে পারল জয়দেব সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। যেমন কাজকর্মের চেষ্টা তেমনি বিবাহের চেষ্টা। ওর দিক থেকে উদ্যম নেই, উদ্‌যোগ নেই। বন্ধুরা যদি তৎপর হয়ে কিছু করতে পারে করুক। ওর মনের মতো হলে ও সায় দেবে, না হলে দেবে না। তিলে তিলে মরবে।

"অদ্ভুত লোক!" মন্তব্য করল কুমকুম।

"কিন্তু আমি ভাবছি কী করে ও বাচবে!" সমীরণ মুখ ভার করে থাকল।

"ভগবান জানেন। তুমি আমি কী করতে পারি!"

"এখনো একটি পদক্ষেপ বাকী আছে। সেইটি নেওয়া যাক।"

"সেটি কী।"

"ফুলের চিঠিখানা ওকে পড়ে শোনানো।"

কুমকুম বলল, "তার আগে একবার ওঁর হার্ট পরীক্ষা করা দরকার। কে জানে, যদি হার্ট ফেল করে মারা যান।"

সমীরণ ভয়ে ভয়ে চিঠিখানা পকেটে পুরে জয়দেবের হোটেলে চলল। সবটা ওকে পড়ে শোনাতে হবে না! যেটুকু ও সইতে পারবে সেইটুকুই শোনাবে।

জয়দেব শেক্‌স্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করছিল। "টু বি অর নট টু বি।" হ্যামলেটের সেই প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তি। সমীরণকে দেখে বলল, "তার পর, হোরেশিও। কী সমাচার? তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বড় কেক কিনেছি আজ।"

সমীরণ তাকে আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে নিল। তার পরে চিঠিখানা খুলে পড়ল। ভয় করেছিল জয়দেব আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়বে, হয়তো মূর্ছা যাবে। কিন্তু যা দেখল তা অবিশ্বাস্য। খপ করে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে জয়দেব বুকে চেপে ধরল। তার চোখে আনন্দের অশ্রু। মুখ দিয়ে কথা সরে না।

"তা হলে, হ্যামলেট। কী করবে?"

"ফুল যা করতে বলবে তাই করব। সব ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে থাকতে বলে, থাকব। ওকে ছাড়তে হবে না কিছু।"

"তা হলে তুমি বাঁচবে তো?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। ফুল যদি বাঁচায় নিশ্চয় বাঁচব।"

"কিন্তু মনে রেখো," সমীরণ তাকে সতর্ক করে দিল, "ও চাকরি ছাড়বে না। লখনউতে ওর নিজের জায়গায় থাকবে। তুমি পারবে লখনউতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে? ওখানকার সমাজে হাস্যাস্পদ হতে? সেবার ঘরজামাই হয়েছিলে, এবার ঘরস্বামী হতে?"

জয়দেব গদগদ স্বরে বলল, "পারব, পারব। সব কিছু পারব। ফুল রাজী হলে আমিও রাজী। এতদিন লুকিয়ে রেখেছ। বলো নি কেন?"

"কিন্তু, জয়, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়। ও তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তুমি ছেলেমেয়ে চাইবে, ও কিন্তু মা হবে না আর।"

"না হলে আমার নালিশ করবার কিছু থাকবে না। সকলের কি ছেলেমেয়ে হয়! কত মেয়ে বন্ধ্যা! কত পুরুষ বন্ধ্য!"

সমীরণ ভেবেচিন্তে বলল, "বেশ, তা হলে তাই হোক। এখন তুমি সোজা লখনউ চলে যাও। ফুলের সঙ্গে মোকাবিলা করো। চিঠিপত্রে পাকাপাকি হতে পারে না।"

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"কেন? দরকার আছে?"

"গেলে ভালো হতো।"

সব কথা শুনে কুমকুম বলল, "আশ্চর্য লোক! এমন স্ত্রৈণ আমি দেখিনি। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে যাও তুমিও পত্নীব্রত হবে। কিন্তু আমার কী মনে হয়, জানো! ফুল তোমাদের দু'জনকেই 'ফুল' করবে। পাঁজি দেখে যেয়ো, যাতে এপ্রিল ফুল হতে না হয়।"

চলল দুই বন্ধু লখনউ। সেই প্রথম যৌবনের মতো উৎসাহ নিয়ে।

ফুলকে চিঠি লিখে তার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সে তাদের অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে ফুলের বোনেরা থাকে। একজনের বিয়ে হয়নি এখনো। আরেকজন বিরহিণী, স্বামী বিদেশে।

আপ্যায়নের পালা শেষ হলে যখন কাজের কথার সময় এলো ফুল ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিড়িয়াখানা দেখাতে। লখনউর

চিড়িয়াখানার চার দিকে বেড়া নেই। অতি চমৎকার নৈসর্গিক পরিবেশ। বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ স্থান।

সমীরণই কথাটা পাড়ল। বলল, "ফুল, তোমার তো মনে আছে পঁচিশ বছর আগে কী হয়েছিল। দোষটা জয়দেবের ছিল না। অবশ্য পিতার অবাধ্য হতে পারত। কিন্তু তা হলে ওর বিলেত যাওয়া হতো না।"

"সে সব যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কী করতে হবে, তাই বলো।"

"তুমি যা বলবে। ও তোমার উপরে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে।"

ফুল ফিক করে হেসে বলল, "ওহ্! তাই নাকি!" তারপরে সকৌতুকে বলল, "আমি যা বলব তাই হবে?"

জয়দেব অস্ফুট স্বরে বলল, "তাই হবে।"

ফুলের উজ্জ্বল চোখ টর্চের মত পড়ল জয়দেবের মুখে। সে চাউনি তার মর্ম ভেদ করল। ফুল বলল হাসতে হাসতে তামাশা করে কি সত্যি সত্যি, "আমি বলি তুমি আমার বোন গুল-কে বিয়ে করো। দেখলে তো আমার চেয়েও সুন্দরী। এম এ পাশ করে বসে আছে। কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে হবে, আমি জানি।"

সমীরণ লক্ষ্য করল জয়দেব একদম ঘাবড়ে গেল। পড়ে যেত, যদি না সমীরণ তাকে ধরে ফেলত। তিনজনেই বসল একটা নিরি-বিলি কোণ দেখে।

ফুল বলল, "সমীরদা, তুমিই বলো, যার ছোট বোন আটাশ বছর বয়সেও অনূঢ়া, সে যদি এমন একটি অসাধারণ সুপাত্র পায়, তা হলে বোনের বিয়ে দেবে, না নিজের সুখ খুঁজবে?"

সমীরণ বলল, "কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল, ফুল, তা হলে আমাদের কেন আগে সে কথা জানালে না?"

"জানালে কী হতো? তোমরা আসতে না?"

জয়দেব এর উত্তর দেবে ভেবে সমীরণ নিরুত্তর রইল। কিন্তু সেও নির্বাক। কী ভাবছে সেই জানে। বোধ হয় শেক্স্-পীয়ারের হ্যামলেটের মত "টু বি অর নট টু বি।"

ফুল স্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, "তোমার ভালোর জন্যে বলছি, জয়। আমি যে তোমার সেবা করতে পারব সে আশা দুরাশা। আমাকে খেটে খেতে হয়, আমার অত সময় কোথায়। আমি তো আমার চাকরিটি ছাড়ব না। কী পাবে তুমি আমার কাছ থেকে? আর একটা কথা তো চিঠিতেই খুলে লেছি। মুখে নাই বা বললুম।"

জয়দেব তখনো নির্বাক। মনে হলো সে ফুলের সঙ্গে একমত। সমীরণ তার বন্ধুর

আমি বলি তুমি আমার বো ন গুল-কে বিয়ে করো

জন্যে রীতিমতো লজ্জিত বোধ করছিল। বিয়ে পাগলা হয়তো ফুলের বদলে গুলকেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে। ফুলের পক্ষে কত বড় অপমান! এক জীবনে বার বার দু'বার! ফুল কি প্রথম বারের অপমান ভুলতে পেরেছে!

ফুল যেন হুল ফুটিয়ে দিল। "জয়, তুমি ক'বার ঘরজামাই হবে! আমাকে বিয়ে করলে ও ছাড়া তোমার গতি নেই। আমি তোমার কলকাতার বাড়িতে গৃহিণীপনা করতে যাচ্ছিনে। তোমাকেই আসতে হবে আমার লখনউর বাড়িতে আমার সঙ্গী হতে। তার চেয়ে গুলকে বিয়ে করে নিয়ে যাও। ও তোমার কোনো দুঃখ রাখবে না। তোমার ঘর-সংসার দেখবে। তোমার ছেলে-মেয়ের মা হবে। তোমার সেবা করবে।"

এইবার জয়দেবের মুখ ফুটল। সে সমীরণকে সম্বোধন করে বলল, "তুমিই বুঝিয়ে বোলো ফুলকে। আমি বললে কি বিশ্বাস হবে ওর! আমি চাই স্মৃতির ধন ভোগ না করতে। তার মানে সম্পূর্ণ নির্ধন হতে। ভিখারী শিবকে বিয়ে করতে চাইবে কোন উমা! গুল কখনো রাজী হবে না। ফুল যদি রাজী হয়। হবে কি?"

ফুল তার ডান হাতখানা নিজের ডান হাতে নিয়ে বলল, "ঈশ্বর সাক্ষী। সমীরদা সাক্ষী। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি ছাড়া তোমার——"

"কেউ নেই, ফুল, কিছু নেই।" জয়দেব ভেঙে পড়ল।

সমীরণ তাদের আশীর্বাদ করে তাড়া-তাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

অনুষ্টুপ ছন্দ
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ঠিখানা হাতে করে সৌদামিনীর বাবা শিবশঙ্কর চাটুজ্যে স্তব্ধভাবে বসে রইলেন। বালাখানার বারান্দায় তক্তপোশে বসে ছিলেন সৌদামিনীর পিতামহ কালীশঙ্কর। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার চিঠি?

—বেয়াই মশায়ের।

—কি লিখেছেন?

—বেয়ানকে নিয়ে বিকেলে তিনি এখানে আসছেন।

—কি ব্যাপার!

—সদুকে নিয়ে রাত্রের মেলে বোম্বাই যাবেন।

—বোম্বাই! সেখানে কি?

—জামাই আসছেন।

এতক্ষণে পিতামহের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হল। বছর চারেক আগে সৌদামিনীর বিবাহ হয় প্রণবকৃষ্ণের সঙ্গে। তার মাস ছয়েক পরে হঠাৎ প্রণব বিলাত চলে যায় ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে। সেই প্রণব ব্যারিস্টার হয়ে ফিরছে।

প্রণবের বিলাতযাত্রাকে আকস্মিকই বলা যায়। এরকম একটা সম্ভাবনা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তার পিতা প্রসন্নবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে খুব নামজাদা উকিল ছিলেন না। যে অর্থ তিনি উপার্জন করতেন তাতে ভদ্রভাবে পরিবার প্রতিপালনটাই সম্ভব ছিল। তার বেশি নয়। বস্তুত প্রণব বিবাহের পূর্বে যথারীতি এম. এ. ও আইন ক্লাসেই ভর্তি হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাদের পরিবারে অপ্রত্যাশিত শুভগ্রহের মতো আবির্ভাব হল তার মাতামহ বনার্জি সাহেবের।

বনার্জি সাহেব বিলাত না গিয়েও দুর্দান্ত সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। বহুকাল পূর্বে সামান্য কেরানি হিসাবে তিনি ভারত গবর্নমেণ্টের সামরিক হিসাব বিভাগে প্রবেশ করেন। কন্যার বিবাহকালেও সেই অবস্থাই ছিল। তার অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তখন তাঁর একমাত্র কন্যা তরঙ্গিনী ছাড়া সংসারে আর কোনো বন্ধনই রইল না। এবং কর্মসূত্রে যতই তাঁকে দূর দূরান্তরে ঘুরতে হল, বন্ধনও ততই শিথিল হতে লাগল। ফলে, আহার বিহার, আচার-আচরণ সর্বদিকেই সাহেব হওয়ার তিনি অবাধ সুযোগ লাভ করলেন। তখন থেকেই কন্যা-জামাতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ কয়েকখানা চিঠিপত্র এবং কখনও-সখনও দু'একখানা মূল্যবান উপহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

এই অবস্থায় তাঁর সম্বন্ধে নানা সম্ভব-অসম্ভব গুজবও প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিনীর কানে পৌঁছত। তার অল্পই গৌরবের, বেশির ভাগই লজ্জার। বস্তুত যখন বনার্জি সাহেব বর্মায় পদস্থ সরকারী কর্মচারী, তখন সেখানকার লাটসাহেবের কোনো নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহের খবরও কন্যা-জামাতার গোচরে এসেছিল।

এই সমস্ত গুজবের কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা কোনোদিনই যাচাই হয়নি। তিনি অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পরেও না। কন্যা-জামাতার পক্ষে তার অধিকাংশই যাচাই করার মত প্রসঙ্গও নয়। সে সুযোগও তিনি দিলেন না। কারণ কলকাতা আসার অল্পদিনের মধ্যেই দৌহিত্রকে বিলাত পাঠিয়ে এবং মোটা অঙ্কের কয়েকখানা কোম্পানির কাগজ কন্যা-জামাতার হাতে সমর্পণ করে অকস্মাৎ একদা তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। যেন এইজন্যেই তাঁর কলকাতায় আসা।

মৃত্যুর পরে গঙ্গাতীরে তাঁর দেহ দাহ করা হবে অথবা খ্রিস্টানমতে কবরস্থ হবে সে নিয়ে কোলাহল যে বাধেনি তা নয়। কিন্তু প্রসন্নবাবু সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে হিন্দুমতেই তাঁর সমস্ত শেষ কার্য সম্পন্ন করলেন।

প্রণব তখন বিলাতে।

এই সাহেব মাতামহটির সংবাদ সৌদামিনীর পিতৃকুল যথাসময়ে পান নি। পেলে, যেরকম রক্ষণপন্থী হিন্দু তাঁরা তাতে, এ বাড়িতে মেয়ের বিয়ে তাঁরা দিতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত প্রণবের বিলাতযাত্রাও তাঁরা সমর্থন করেননি।

তবু এতদিন একরকম চলে আসছিল। এখন জামাতা ফিরে আসার পরে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সম্ভাবনা কল্পনা করে সৌদামিনীর পিতা এবং পিতামহ উভয়েরই টিকি পর্যন্ত কণ্টকিত হয়ে উঠল।

উভয়েই স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসে রইলেন। নানা চিন্তা এলোমেলোভাবে তাঁদের মাথায় আসতে লাগল।

কালীশঙ্করবাবু অবশেষে বললেন, গুরুদেবের কাছে পালকি পাঠাও। তিনি আসুন। তারপরে—

তারপরেই বা কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে তিনি অন্যমনস্কভাবে গড়গড়ার নলের দিকে হাত বাড়ালেন।

এতবড় একটা সামাজিক খড়্গ যখন মাথার উপর ঝুলছে, সৌদামিনী তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্দরের বাগানে পাড়ার ক'টি সমবয়সী বান্ধবীর সঙ্গে লবণ সহযোগে কাঁচা আমের সদ্ব্যবহার করছিল। খবরটা তাদের কাছেও এসে পৌঁছল। কিন্তু সৌদামিনী অথবা তার বান্ধবীদের কাছে বিপদটা খুব ভয়াবহ বলে বোধ হল না। তাদের সকলেরই ভিতরটা আনন্দে যেন তরঙ্গিত হয়ে উঠল। এবং সেই আনন্দের আতিশয্যে হাতের নুন এবং কাঁচা আম মাটিতে ফেলে দিয়ে বাগানের নিরিবিলি একটা কোণে গিয়ে তারা ঘনিষ্ঠভাবে বসল।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, তোর কি ভয় করছে সদু?

—করছে।

—আনন্দ হচ্ছে না?

—কি জানি!

—তুই যাবি না তোর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে?

কি ব্যবস্থা হবে তার কিছুই না জেনেও সৌদামিনী সহজ কণ্ঠেই বললে, যাব বই কি!

—দেখা হলে কি বলবি?

—কি জানি!

—কিন্তু সে তো সাহেব হয়ে ফিরছে। বাংলা ভুলেই গেছে নিশ্চয়। তুই তো ইংরিজি জানিস না, কি করে কথা বলবি তার সঙ্গে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সৌদামিনী ওদের দিকে চাইতে লাগল। এ আশঙ্কা তার মনে এতকালের মধ্যে একদিনও জাগেনি। সাহেবের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমটা কী হতে পারে ভেবে না পেয়ে সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিব্রত হয়ে পড়ল। তবু বললে, বলব দেখিস।

অর্থাৎ তার কিশোরী মনে এই আশাটা কি করে যেন জাগল যে দুটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি অনুকূল হলে ভাষার অভাব বাধার সৃষ্টি করবে না।

এবং তখনই বললে, বাংলা ভুলবে কেন, আমাকে তো বাংলাতেই চিঠি লেখে।

এমন সময় অন্দরে তার ডাক পড়ল। গুরুদেব এসেছেন।

এই গুরুদেবের সঙ্গে সৌদামিনীর নাতিনী সুবাদ। সৌদামিনী গিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই বৃদ্ধ

হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিলেন। পাকা দাড়ি নেড়ে বেসুরো গলায় গান ধরলেনঃ

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

সৌদামিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালাল।

গুরুদেব ডাকতে লাগলেন, সদু, শোন্ শোন্। কথা আছে।

দরজার আড়াল থেকে সদু বললে, কি বলুন।

—আমার খাবার আজ তুই তৈরি করবি। কেমন?

—আচ্ছা।

সৌদামিনী গুরুদেবের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচল।

গুরুদেব কালীশঙ্করের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে বললেন, এর মধ্যে চিন্তার কিছু নেই ভাই। ও-ই ওর স্বামী। ম্লেচ্ছ হোক আর যাই হোক্, ও-ই ওর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ওর মুখের হাসি দেখে টের পাচ্ছ না, ওর মন কি চাইছে!

—কিন্তু সমাজ?

—সমাজ থেকে বাধা তো আসবেই।

—তা হলে? আমাদের অবস্থা কি হবে?

—কোনো পরিবর্তনই হবে না। তুমি তো সদ্বংশেই কন্যা সম্প্রদান করেছ। পাত্র তার পরে যদি সমুদ্রযাত্রা করে, কি ম্লেচ্ছ হয়, সে অপরাধ তোমার নয়।

—কিন্তু আমার নাতনী, আমার নাত-জামাই, তাদের পরিত্যাগ করতে হবে তো?

গুরুদেব মুহূর্তকাল কি যেন চিন্তা করলেন। তারপরে বললেন, সে চিন্তা আজ করে লাভ নেই। শাস্ত্রে এর প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। কিন্তু সে পরের কথা পরে হওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত সদুকে ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

আবার বললেন, তোমার-আমার যে সমাজ, এ সমাজ আর বেশিদিন এই জায়গায় থাকবেও না। এরও পরিবর্তন আসন্ন। আমরা হয়তো কোনোদিনই সদুর হাতে অন্নগ্রহণ করতে পারব না। আজ তাই শেষবারের মতো ওর হাতের রান্না খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বাবাজিদের এ ঝামেলা পোয়াতে হবে না, দেখে নিও।

বলে বৃদ্ধ আবার তাঁর পাকা দাড়ি নেড়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সুতরাং সৌদামিনী শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বম্বে চলল। এত লম্বা ভ্রমণ এর আগে কখনও সে করেনি। শস্য-শ্যামলা বাঙলার মেয়ে সে। দেখে এসেছে সবুজ ধানের ক্ষেত, খড়ে-ছাওয়া স্নিগ্ধ গৃহ, জল-থৈ-থৈ পুষ্করিণী। দেখেনি কঠিন রুক্ষ মাটি, আকাশের কোলে মিশে-যাওয়া ধোঁয়াটে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, ধু ধু করা শূন্য মাঠ। দেখতে দেখতে কখন এক সময় তারই মধ্যে ডুবে গেল তার মন। ডুবে গেল প্রণব, ডুবে গেল হর্ষ-ভয়-অধীরতা।

বিহার...... যুক্তপ্রদেশ...... রাজপুতানা...... মহারাষ্ট্র......। শান্ত প্রভাত......ইস্পাতের মতো শানানো প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন...... উদাস গোধূলি......রহস্যভরা অন্ধকার রাত্রি......।

হঠাৎ এক সময় চুপি চুপি তরঙ্গিনী বললেন, বৌমা, প্রণবকে দেখে এত বড় ঘোমটা না-ই টানলে। বিলেত থেকে ফিরছে, অত লজ্জা হয়তো সে পছন্দ করবে না।

সে কি কথা! শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে......সৌদামিনী ঘেমে উঠল।

সৌদামিনীর মনের এই অবস্থা তিনি উপলব্ধি করলেন তার ভয় এবং সংকোচও। তাই তখন-তখনই আর কিছু বললেন না। কিন্তু বম্বেতে হোটেলে পৌঁছে নিরিবিলি প্রসঙ্গটা আবার তুললেন। এবারে আর শুধু মুখে নয় সৌদামিনীর ঘোমটাটা নিজের হাতে ভ্রূর উপর পর্যন্ত টেনে দেখিয়ে দিলেন, ঘোমটা কতটা পর্যন্ত নামবে। এবং তাকে দিয়ে কয়েকবার মকশোও করিয়ে নিলেন।

দেখলেন, স্বচ্ছন্দ সৌদামিনী এর ফলে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কষ্ট হল। নিজের মন যে এতে খুব সায় দিলে তাও নয়। কিন্তু উপায় কি! প্রণব কেমন হয়ে ফিরছে কেউ জানে না অবশ্য। কিন্তু যেমন হয়েই ফিরুক এক গলা ঘোমটা দেওয়া জবরজং একটা বৌকে বম্বে ডকে দেখা যে কিছুতেই পছন্দ করবে না, এ বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত।

সৌদামিনী প্রণবকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। যখন জাহাজ থেকে সিঁড়ি দিয়ে যাত্রীরা নামছে, প্রণবকে দেখেই প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিনী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো প্রণব! ওই তো খোকা! সৌদামিনীর চোখ তখন দিশেহারার মতো ছটফট করে খোঁজ করছে, কোন্‌টি প্রণব। তার স্মৃতিতে সম্বলের মধ্যে গালের কাটা দাগ। সেইটেই সে প্রত্যেকের মুখে খুঁজছে। কিন্তু এত দূর থেকে সে কি দেখা যায়!

তার মাথার ঘোমটা ভ্রূর কাছ থেকে কখন সীমন্তের কাছে এসে ঠেকেছে। তবু প্রণবকে সে দেখতে আর পাচ্ছে না।

আগ্রহের আতিশয্যে কিশোরী মেয়ের লজ্জা-সরম যেন এক মুহূর্তের জন্যে কোথায় উবে গেল। অধৈর্যের সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরল, কই মা! কোন্‌টি মা!

আগ্রহের আতিশয্য তরঙ্গিনীরও কম নয়। সৌদামিনীর কথার অশোভনতা তাঁর চোখেই পড়ল না। বাঁ হাত দিয়ে সৌদামিনীকে পিছন থেকে টেনে সামনে এনে সেই হাতে তার চিবুক তুলে এবং ডান হাতে প্রণবকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওই যে গো, ওই দাড়িওলা কালো মোটা লোকটির পিছনে! আমাদের দেখতে পেয়েছে! দেখ না হাত নাড়ছে কেমন করে!

তরঙ্গিনী স্বামীকে একটা ঠেলা দিলেন।

ফেরবার সময় প্রসন্নবাবু ও তরঙ্গিনীর জন্যে একটা 'কুপে' এবং প্রণব ও সৌদামিনীর জন্যে আর একটা 'কুপে'র ব্যবস্থা হল। তরঙ্গিনীই এই ব্যবস্থার মূলে। এতক্ষণে দু'জনে পরস্পরকে স্পষ্ট করে দেখবার এবং ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাবার সুযোগ লাভ করল।

বম্বে থেকে ট্রেন যখন ছাড়ল, সৌদামিনী যখন চেয়ে দেখলে কামরার মধ্যে আর কেউ নেই, শুধু প্রণব আর সে,—তখন তার বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। একবার সে মাথায় ঘোমটাটা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তা চুলের সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা। অগত্যা বাধ্য হয়ে সামনের বেঞ্চের এক কোণে জড়সড় হয়ে সে বসে রইল।

প্রণব আড়চোখে চেয়ে চেয়ে কিছুক্ষণ এই অবস্থা দেখতে লাগল। প্রথমে তার মনে জাগল কৌতুক, তার পরে করুণা। ধীরে ধীরে এসে যখন সে সৌদামিনীর পাশে বসল, ও তখন ঘেমে উঠল। ওর সমস্ত শরীর, বিশেষ করে উন্মুক্ত বাহুযুগলের নিম্নাংশ তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মাথা একেবারে বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

প্রণব তার অবস্থা বুঝলে কি না কে জানে। হয়তো বুঝলে, নয়তো বুঝলে না। শুধু তার কম্পিত করতল নিজের করতলে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে, কেমন ছিলে?

সোদামিনী বলতে চাইল, ভালো। কিন্তু কথা বার হল না, শুধু ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল একবার।

প্রণব বললে, এবারে ফেরবার সময় জাহাজে বড় কষ্ট পেয়েছি। 'সি সিক্‌নেসে' তিন দিন উঠতে পারিনি।

'সি সিক্‌নেস' বস্তুটা যে কি সোদামিনী জানে না। প্রণবও ওর বাংলা প্রতিশব্দ জানে না বোধ হয়। তবু ওটা যে কোনো-একটা অসুখ এইটে বুঝেই চমকে উঠে সোদামিনী সমস্ত সংকোচ ভুলে প্রণবের মুখের দিকে বেদনার্ত চোখ মেলে চাইলে।

বললে, এখন সেরে গেছে তো?

দুষ্টুমি করে প্রণব বললে, একটু আছে এখনও। এইখানে।

বলে সোদামিনীর করতল বুকের উপর রাখলে: বুঝতে পাচ্ছ?

হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই সেখানে বোঝবার ছিল না। সোদামিনী ভাবলে, ওইটেই ব্যাধি।

বললে, কলকাতা গিয়েই ডাক্তার দেখাবে।

—এ সব অসুখ সারানো ও-সব ডাক্তারের কাজ নয়, অন্য ডাক্তার দরকার।

বুকের সেইখানে হাত বুলোতে বুলোতে সোদামিনী বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে বললে, অসুখ পুষে রাখতে নেই। অন্য ডাক্তারই দেখিও। দেরি করো না।

—না। দেরি আর করব না।

ব'লে প্রচণ্ড বলে সোদামিনীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, রোগ পুষে রাখা ঠিক নয়। চিকিৎসা এখন থেকেই আরম্ভ হোক। মুখ তোলো।

মুহূর্ত মধ্যে সোদামিনীর সমস্ত দেহে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। গ্রন্থিগুলি শিথিল এবং তনুলতা অবশ হয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবী যেন চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সময়ের কোনো বোধ রইল না।

কতক্ষণ সোদামিনী এইভাবে বক্ষোলগ্ন হয়ে ছিল কে জানে। চৈতন্য ফিরতে অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললে, ছাড়।

তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে প্রণবকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। লজ্জিত ক্ষীণ হাস্যে বললে, অনেক দেরি হয়ে গেল।

প্রণব ওকে নীচে থেকে তুলে পাশে বসিয়ে সহাস্যে উত্তর দিলে, তাতে কি হয়েছে! Better late than never.

সোদামিনী ওর পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে বললে, ইংরিজি বোলো না। আমি বুঝতে পারি না। কেমন ভয় করে।

প্রণব হেসে বললে, আচ্ছা আর বলব না। কিন্তু তুমি ইংরিজি শিখবে সদু?

স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনে সোদামিনী বিস্মিত হল। বললে, তুমি আমার নাম করছ?

সকৌতুকে প্রণব বললে, কেন, তাতে দোষ আছে নাকি?

—না, দোষ ঠিক নেই। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে কোন দিন গুরুজনদের সামনে নাম করে নিজেও লজ্জা পাবে, আমাকেও লজ্জায় ফেলবে।

তোর কি ভয় করছে সদু?

—তাতেই বা দোষ কি! ইচ্ছে করলে তুমিও আমার নাম ধরে ডাকতে পার।

প্রণব হাসতে লাগল।

এবারে সৌদামিনী যেন একটু বিরক্তই হল। বর্ষীয়সী মহিলার মতো গম্ভীর তিরস্কার করে বললে, ছি ছি! তোমার যা মুখে আসছে তাই বলছ! দেখি, পা'টা।

বলে হেঁট হয়ে আবার তার পায়ের ধুলো নিলে।

প্রণবের অত্যন্ত কৌতুক বোধ হচ্ছিল। বাঙালী বধূ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার ছিল না। যাদের দেখেছে তারা মা, বোন, মাসি, পিসি। সৌদামিনীকে যে যখন দেখেছে, তখন তার বয়স মোটে বারো। তাও সে কি দেখা! একবার, কি দু'বার,—তাও বলতে গেলে ঘুমন্ত মেয়েকে। মেয়েছেলে সে প্রথম দেখছে আসলে বিলেত গিয়ে। এবং তাদের সঙ্গে তুলনায় তার কৌতুকই বোধ হবার কথা।

বললে, কিন্তু ডাকতে তো হবে। কি বলে ডাকব তখন?

এবারে সৌদামিনীর চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। বললে, কি বলে ডাকে জান না?

প্রণবের মনে পড়ে গেল কি বলে ডাকে। কিন্তু বললে, না।

সৌদামিনী দু'বার চেষ্টা করলে। পারলে না।

প্রণব বললে, বল।

—ওগো বলে।

বলেই সৌদামিনী প্রণবের মুখের দিকে আর চাইতে পারলে না। তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে লাগল।

পরদিন ভোরে প্রথম যেখানে ট্রেন থামল, প্রসন্নবাবু সেইখানে তরঙ্গিনীকে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

মাকে দেখে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নিজের বেঞ্চে বসল। সৌদামিনী নিঃশব্দে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। তরঙ্গিনী ছেলের কাছে বসে গল্প জুড়লেন। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর সৌদামিনীর দিকে। সেখানে কি তিনি দেখলেন তিনিই জানেন। কিন্তু পরের স্টেশনে যখন তিনি নেমে গেলেন, তাঁর দুটি ঠোঁটের কোণেই হাসি এবং কৌতুক জমেছে প্রচুর।

দুই

হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রণব দেখলে বাড়ি থেকে দুটো চাকর এসেছে। দুজনই অপরিচিত। এরা উর্দিপরা। নগ্নদেহ রামলগিন নয়। মালপত্র নিয়ে তারা পিছনে আসবে। ওরা দুখানা ফিটনে আগেই বেরিয়ে পড়ল।

সেই পুরনো কলকাতা। যদিও মাঝে মাঝে পরিবর্তন চোখে পড়ে। হয়তো একটা নতুন রাস্তা, নয়তো কোনো সুদৃশ্য বাড়ি। কিন্তু ওদের গাড়ি এসে থামল সেই পুরনো ছিদাম মুদির লেনে নয়,—একেবারে বালিগঞ্জে, ব্রাইট স্ট্রীটে।

—এ-বাড়িতে কবে এলে? —মায়ের দিকে চেয়ে প্রণব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

—মাস দুই হল।—উত্তর দিলেন তরঙ্গিনী,—সবাই ও'কে বললে, ওখানে থেকে তোমার প্র্যাক্‌টিসের অসুবিধা হবে, তাই।

—ভালো করেছ। দাদামশাই অনেক টাকা রেখে গেছেন, না?

—দু' লাখের ওপর। তাছাড়া ওঁরও প্র্যাক্‌টিস বেড়েছে। এটা মাস ছয়েক হল কেনা হয়েছে। তার পরে মেরামত করতে আরও মাস চারেক গেছে।

বাড়িটা প্রণবের খুব পছন্দ হয়েছে। নির্জন ছায়ায়-ঢাকা রাস্তার উপর অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছোট একখানা বাড়ি। ভারি সুন্দর!

তার নীচের অফিস-ঘরখানি সুসজ্জিত। এ ছাড়াও সোফা দিয়ে সাজানো একখানা বসবার ঘরও আছে। আর আছে একখানা ঘেরা-বারান্দা, বেশ চমৎকার হয়েছে। লোক তো ওরা বেশি নয়। বাবা, মা আর ওরা দু'জন।

এক সময় আড়ালে পেয়ে সৌদামিনী বললে, ব্যবস্থা দেখেছ তো? নীচের অফিস ঘরটা তোমার, আর ওপরের শোবার ঘরটা আমার। তুমি সাহেব হয়েছ বলে আমি তো আর মেম-সাহেব হইনি। যখন তখন হুট করে ওপরে আসবে না।

—না। শুধু যখন তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হবে, তখন নীচের থেকে আমি চিৎকার করে ডাকব : ওগো!

—হ্যাঁ। আমি তখন ওপর থেকে চিৎকার করে সাড়া দোব : কি গো, কি গো, কী গো!

—নীচে থেকে বাবা ছুটে বেরিয়ে আসবেন,

—ওপর থেকে মা ছুটে বেরিয়ে আসবেন,

—নাইস!

—আবার ইংরিজি বলছ! বলিনি, আমার ভয় করে?—তর্জনী উঁচিয়ে সৌদামিনী শাসন করলে।

—আর বলব না।—প্রণব তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করলে।

মা এক সময় ডেকে বললেন, হ্যাঁরে খোকা, উনি বলছিলেন তোর বিলিতি রান্না খাওয়া অভ্যেস হয়েছে, ঠাকুরের রান্না কি ভালো লাগবে?

প্রণব তৎক্ষণাৎ বললে, কেন লাগবে না মা? বিলিতি রান্না তো চার বছরের অভ্যেস। তার আগের কুড়ি বছর তো তোমার হাতের মাছের ঝাল আর শুক্তো খেয়েই কেটেছে।

তরঙ্গিনী খুশি হলেন, ছেলে তেমন সাহেব হয়নি।

তবু বললেন, দেখিস, লজ্জা করিস না যেন!

সন্ধ্যাবেলায় প্রসন্নবাবু ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমার হাইকোর্ট তো এখন ছুটি, খুলতে দেরি আছে। এবারে গরমও পড়েছে অসম্ভব। কদিন দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসবে?

প্রণব হেসে বললে, না বাবা। শীতের দেশে থেকে থেকে শীতে আর রুচি নেই। এ গরমটা বরং ভালোই লাগছে। তার চেয়ে বরং—

—বরং?

—যদি যেতেই কোথাও হয় তাহলে বর্ধমান থেকে ঘুরে এলে হয় না?

—সেখানে কি?

—ওঁদের ওখানে আর কি! বিলেত থেকে ফিরে এলাম। একবার দেখা করতে যাওয়া বোধ হয় উচিত।

প্রসন্নবাবু বুঝলেন। বললেন, আরও কিছুদিন থাক প্রণব। ওখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে।

—অসুবিধা! —প্রণব বিস্মিতভাবে চাইলে।

একটু ইতস্তত করে প্রসন্নবাবু বললেন, অসুবিধা মানে অন্য কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জানোই তো। তোমার বিলেত যাওয়া নিয়ে এর মধ্যেই ওঁরা কিছু সামাজিক অসুবিধায় পড়েছেন। এর ওপর এখনই তোমরা গেলে ওঁরা বিব্রত বোধ করবেন। তার চেয়ে দার্জিলিং যাওয়া ভালো।

এরকম একটা সম্ভাবনা যে প্রণবের অজ্ঞাত, তা নয়। কিন্তু এই কলকাতা শহরে আত্মীয়-সমাজ যে রকম সমাদরে তাকে গ্রহণ করেছে, তাতে সেকথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

প্রসন্নবাবুর কথা শুনে সে চুপ করে রইল।

প্রসন্নবাবু বলতে লাগলেন, দার্জিলিং গেলে বৌমাকে সুদ্ধ নিয়েই যাবে। আমার একটি মক্কেলের বাড়ি আছে সেখানে। তাদের বলে রেখেছি, যাও যদি সে বাড়িটা পাওয়া যাবে।

তা হলে মন্দ হয় না। প্রণব খানিকটা উৎসাহিতই বোধ করলে।

বললে, তাই যাওয়া যাবে বরং। আপনি এবং মা-ও যাচ্ছেন তো?

—না। সামনের সোমবারে স্বামীজি আসছেন। পূর্ণিমার দিন আমরা দীক্ষা নোব।

স্বামীজির প্রসঙ্গে প্রণবকে উৎসাহিত বোধ হল। জিজ্ঞাসা করলে, এই স্বামীজি কে বাবা?

—একটি বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসী। কনখলে এঁর আশ্রম। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। বড় ভালো লেগেছে ওঁকে আমাদের।

—তাহলে এ সময়ে আমরা বাইরে যাব?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, তাতে কি হয়েছে! সাধু-সন্ন্যাসী তোমাদের ভালো লাগবার কথা নয়।

প্রণবও হাসলে। বললে, ভালো লোককে সবাই ভালোবাসে।

বলে ভিতরে চলে গেল। বোধ করি দার্জিলিং যাওয়া সম্বন্ধে সৌদামিনীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে।

সৌদামিনী তখন তরঙ্গিনীর শোবার ঘরে। তরঙ্গিনী খাটে শুয়ে, আর সৌদামিনী তাঁর পা তলায় বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বাইরে থেকে প্রণব উঁকি দিলে। সৌদামিনী সামনেই বসে। প্রণবকে তার দেখা উচিত ছিল। কিন্তু দু' তিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেও সে যে প্রণবকে দেখেছে এমন মনে হল না।

বাধ্য হয়ে প্রণব তার শোবার ঘরে গিয়ে একটা ঈজি-চেয়ারে বসে একখানা ইংরিজি উপন্যাস খুলে পড়তে আরম্ভ করলে।

তার মাথায় তখন দার্জিলিংএর স্বপ্ন। ইংরেজী উপন্যাস তার চোখে ঝাপসা হয়ে আসছে।

আবার একবার এসে সে উঁকি দিলে।

এবারও সৌদামিনী তাকে চেয়ে দেখলে কি না বোঝা গেল না। হতে পারে, শাশুড়ীর কাছে বসে সে লজ্জায় বাইরের দিকে চাইতেই পারেনি। কিন্তু তার চোখের তারায় প্রণবের অস্পষ্ট একটা ছায়াও কি পড়েনি?

তাহলে কি করে পড়ল আড়ালে থেকেও তরঙ্গিনীর মনের চোখের তারায় সেই অস্পষ্ট ছায়া? হয়তো অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট।

তিনি গুরুদেবের প্রসঙ্গ বন্ধ করে হঠাৎ

পিছনে এসে দাঁড়াল

বললেন, প্রণব বোধ হয় ওপরে এল বৌমা। দেখ, তার কি দরকার।

সৌদামিনী লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

এই লজ্জা তরঙ্গিনীর ভালো লাগল। কিন্তু তাঁর কেমন মনে হয়, বিলেতে সাহেব-মেমের অবারিত জীবনযাত্রা দেখে যারা অভ্যস্ত হয়েছে, খুব বেশি লজ্জা তারা পছন্দ করে না। প্রণবের সম্বন্ধে তাঁর সেই ভয়।

সুতরাং আবার বললেন, যাও মা। বোধ হয় কোনো দরকারেই এসেছে। কবারই তার পায়ের শব্দ পেলাম যেন।

সৌদামিনী তথাপি নীরব। কিন্তু তরঙ্গিনী ছাড়লেন না। জোর করেই তাকে উঠিয়ে দিলেন এবং হুকের উপর থেকে মালাটা নিয়ে খাটে ঠেস্ দিয়ে জপ করতে বসলেন।

দীক্ষার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গুরুদেবকে দেখে পর্যন্ত তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এর ভালো-মন্দ লাভ-ক্ষতি কিছুই যেন আর তাঁকে আকর্ষণ করছে না। দীক্ষার আর কদিনই বা বাকি! কিন্তু এই কটা দিনের বিলম্বই যেন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে।

লজ্জিত সৌদামিনী শোবার ঘরে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছিলে?

প্রণব আবার তার ঈজিচেয়ারে ফিরে এসে নিরুপায়ভাবে ইংরেজী উপন্যাসে মন দিয়েছিল। সৌদামিনীর কণ্ঠের উত্তাপ সে খেয়ালই করলে না।

খুশি হয়ে বললে, অনেক কথা আছে সদু। কাছে—

ওর কথার মাঝখানেই সৌদামিনী ধমক দিয়ে বললে, ফের নাম ধরে ডাকে! তুমি ভারি বেহায়া!

হেসে প্রণব বললে, আচ্ছা আর গুরু-জনের নাম ধরে ডাকব না। আর্যে! কাছে আসুন, বলি।

ওর কথার ভঙ্গিতে সৌদামিনীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুচ্চমকের মতো মুহূর্তে একটু-খানি হাসি খেলে গেল। কিন্তু তখনই শক্ত হয়ে আগের মতো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, না, ওইখান থেকেই বল।

—তা হলে থাক। রাত দুটোয় যখন গোটা কলকাতা শহর ঘুমিয়ে পড়বে, আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না, তখন বলা যাবে বরং।

তার কণ্ঠেও যেন ঈষৎ উত্তাপের আভাস।

কিন্তু সৌদামিনী গ্রাহ্য করলে না।

—সেই ভালো।

বলেই আর দাঁড়াল না।

সৌদামিনী নীচে গেল। প্রসন্নবাবুর অফিস-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে আর কেউ নেই ঘরে। চেয়ারে বসে গড়গড়ির নলটি আলতোভাবে মুখে দিয়ে তিনি ঘুমুচ্ছেন, কি কিছু ভাবছেন, পিছন থেকে বোঝা গেল না।

সৌদামিনী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ওঁর চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল।

শাশুড়ীর চেয়ে শ্বশুরের কাছেই সৌদামিনী প্রশ্রয় বেশি পায়। সত্য কথা বলতে গেলে, শাশুড়ী যদিও তাকে তিরস্কার বড় একটা করেন না তবু তাঁকে, কি জানি কেন, সে মনে মনে বিলক্ষণ ভয় পায়। কোনো একটা অন্যায় করে ফেললে তরঙ্গিনী তিরস্কার না করে যদি হাসেনও, সৌদামিনীর বুকটা তবু দুরুদুরু করে ওঠে। এ শঙ্কা প্রসন্নবাবুর ক্ষেত্রে জাগার প্রশ্নই ওঠে না।

সৌদামিনী লক্ষ্য করলে, প্রসন্নবাবু

গড়গড়িতে টান দিচ্ছেন, কিন্তু ধোঁয়া বার হচ্ছে না। কলকের দিকে চেয়ে মনে হল, আগুনটা নিভে গেছে সম্ভবত।

প্রসন্নবাবু ভেবেই যাচ্ছেন, কি হয়তো ঘুমিয়েই গেছেন। ওর আসা টেরই পাননি।

সৌদামিনী নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। বারান্দায় যে-চাকরটাকে পেলে তাকে কলকেটা বদলে দিতে বললে। তারপর আবার ফিরে এসে প্রসন্নবাবুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবাবু হেসে চোখ মেললেন। ডান হাত দিয়ে সৌদামিনীকে সামনে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতক্ষণ এসেছ মা?

—একটু আগে। এসে দেখি, আপনার কলকের আগুন নিবে গেছে। কলকেটা কাউকে বদলে দিতে বলেন নি কেন বাবা?

—কারণ,—প্রসন্নবাবু সহাস্যে বললেন—আমি জানতাম, তুমি এখনই আসবে। এসেই সব ব্যবস্থা করবে।

সৌদামিনী মাথা দুলিয়ে হেসে বললে, আমি যদি এখন না আসতাম বাবা?

প্রসন্নবাবুও হাসলেন। বললেন, তা কি হয় মা! তা হলে ছেলেরা বাঁচে কখনও?

সৌদামিনী আর কিছু বললে না। আবার সে পিছনে এসে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে আসছিল। প্রসন্নবাবু আটকে রাখলেন।

বললেন, খানিক আগে প্রণব এসেছিল। তাকে বললাম, বড্ড গরম পড়ে গেছে, হাইকোর্টও বন্ধ। এই সময় ক'দিনের জন্যে তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে আসুক বরং।

এই বাড়িতে সকলের মধ্যে প্রণবকে তার ভয় করে না। কিন্তু সকলের থেকে দূরে, গুরুজনের চোখের আড়ালে, বিদেশে প্রণবের সঙ্গে একা কাটাতে তার ভয় করে।

বললে, তা কি করে হয় বাবা! ক'দিন পরে আপনাদের দীক্ষা। আমরা থাকব না?

—তোমরা থেকে আর কি করবে মা?

—বাঃ! বেশ! দীক্ষা নেওয়া দেখব না আমরা?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, দেখার তো কিছু নেই মা। সমারোহ ব্যাপার তো কিছু নয়। তার জন্যে তোমাদের থাকার কোনো দরকার হবে না।

—তা যেন হল না। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখব না?

—দেখবে বই কি মা, কতবার দেখবে! তিনি তো চলে যাচ্ছেন না। কিছুদিন থাকবেন এখানে।

সৌদামিনী বুঝলে, এই খবরটা দেবার জন্যেই প্রণব উসখুস করছিল। কিন্তু তার ভালো লাগছিল না।

বললে, সে বিশ্রী লাগবে বাবা। আমার এ সময়ে কোথাও যেতে মোটে ইচ্ছা করছে না।

ওর অনিচ্ছা দেখে প্রসন্নবাবু হেসে ফেললেন। কারণটা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বললেন, তাহলে থাক। কিন্তু গেলে ভালো করতে মা। ক'বছর ঠাণ্ডা দেশে ছেলেটা থেকে এল, এই গরমটায় ওর শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে।

সৌদামিনীর মনে এসেছিল বলে, আমরা গরম দেশেরই লোক। দু'দিন বিলেত ঘুরে এলে যদি এত ঝামেলা পোহাতে হয়, তা হলে বিলেত না যাওয়াই ভালো। কিন্তু গুরুজনের সামনে স্বামীর প্রসঙ্গে কথা বলা বেহায়াপনা। এ সব প্রসঙ্গে সৌদামিনী চুপ করেই থাকে। এখনও চুপ করেই রইল।

তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললে, আমার যে কী ইচ্ছে করছে তাঁকে দেখতে! মায়ের সঙ্গে সেই গল্পই হচ্ছিল এতক্ষণ।

—গুরুদেবের গল্প? তোমার মায়ের ওঁকে খুব ভালো লেগেছে।

—হ্যাঁ। যা বললেন, তাতে লাগবারই কথা বাবা। তাঁর চোখ নাকি অদ্ভুত! আর শরীরের লাবণ্য—

বাধা দিয়ে প্রসন্নবাবু বললেন, সেই-গুলোই বড় কথা নয় মা। আসলে বড় হচ্ছে তাঁর সাধনা। কিছুই না করে শুধু তাঁর কাছে বসে থাকলেই মন-সংসার থেকে বহু উঁচুতে উঠে যায়। সেইটেই তাঁর পরিচয়। কাছে বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।

প্রসন্নবাবু দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে গড়গড়ির নলটা মুখে তুলে নিয়ে বললেন, বেশ, তাই হোক। তোমরাও থাক, দেখ তাঁকে।

উঁকি দিয়ে দেখলে, তাই বটে

সৌদামিনী নিশ্চিন্ত হয়ে উপরে গেল। তরঙ্গিনীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে, তিনি খাটে নেই। এর পিছনেই একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেটা ঠাকুর-ঘর। সেখানে পাশের দেওয়ালের মাঝখানে একটা জল-চৌকির উপর সুদৃশ্য কার্পেটের আসন। তার উপরে একটি সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। সিংহাসনের দু'পাশে জল-চৌকির উপর দু'টি ধুপদানি। সামনে একটা রেকাবিতে থাকে শঙ্খ, কিছু ফুল।

এখন সন্ধ্যার পরে ফুল অবশ্য নেই।

কিন্তু এঘর থেকেই ধুপের গন্ধে সৌদামিনীর সংশয় রইল না যে, তরঙ্গিনী পুজোর ঘরে।

উঁকি দিয়ে দেখলে, তাই বটে।

সৌদামিনী বারান্দার এদিকে এসে দাঁড়িয়ে অকারণে নীচের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু প্রণবের কণ্ঠস্বরের উত্তাপটুকু—কতটুকুই বা উত্তাপ, বোঝা যায় না বললেই চলে,—সেইটুকুই তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না।

সে আবার শোবার ঘরের দিকে চলল।

বেশি দূর যেতে হল না, ঝি বললে, দাদাবাবু থিয়েটার দেখতে গেছেন গো! মাকে বলে গেলেন, ফিরতে রাত হবে।

সৌদামিনী লজ্জা পেয়ে গেল। ঝিটাও তার মনের কথা টের পেয়েছে নাকি! মাগো, কী লজ্জার কথা!

মুখে বললে, বাঁচা গেল! ওই কথাটা জানবার জন্যেই আমার এতক্ষণ ঘুম হচ্ছিল না।

পুরনো ঝি। সেও কম যায় না।

বললে, তা লুকুলে কি হবে বৌদি! ঘুম সত্যিই হচ্ছিল না।

—তাই নাকি! তুই আমার মনের ভিতর ঢুকে দেখে এসেছিস, না?

ঝিও নথ ঘুরিয়ে বললে, মনের ভিতর ঢুকতে হবে কেন বৌদি, দেখলাম ঘুর-ঘুর করছ, তাই বললাম।

এবারে সৌদামিনী সত্যিই লজ্জা পেয়ে গেল। কৃত্রিম ক্রোধে হাত ঘুরিয়ে বললে, খুব করেছিস। যা, ভাগ্ এখান থেকে।

ঝি হাসতে হাসতে চলে গেল।

সৌদামিনী দুম দুম করে গিয়ে আলো জেবলে খাটের উপর শুয়ে পড়ল, যেন সে কাউকে গ্রাহ্য করে না।

ইংরেজী উপন্যাসখানা প্রণব খাটের উপর ফেলে গিয়েছিল। না দেখে শোয়ায় সেইটে ওর পিঠে লাগল।

একটু অস্ফুট শব্দ করে হাত বাড়িয়ে সেইটে সে পিঠের তলা থেকে বার করলে। একবার সেটা খুলে আলোতে দেখলে। ইংরেজী। সেটাকে বালিশের পাশে সরিয়ে রেখে দিলে।

—বৌমা!

—যাই মা।

সৌদামিনী ধড়মড় করে উঠে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—খোকা থিয়েটারে গেছে। ফিরতে রাত হবে বলে গেছে। ওর খাবারটা শোবার ঘরে টিপয়ের ওপর ঢেকে রেখ। জলও রেখ এক গ্লাস।

সৌদামিনী চুপ করে রইল।

শাশুড়ী বলতে লাগলেন, তার আবার গুণ অনেক। হয়তো রাত-দুপুরে ফিরে এসে স্নান করতে চাইবে। দিও না স্নান করতে। চারদিকে খুব অসুখ-বিসুখ হচ্ছে।

সৌদামিনী তথাপি নিরুত্তর।

তরঙ্গিনী কি ভেবে বললেন, তোমার কথা না শুনলে আমাকে জানিও। আমি জেগেই থাকব। তবু যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাই বললাম।

সৌদামিনী তা জানে। প্রণব বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। সুতরাং সে এসে খেয়ে না ঘুমনো পর্যন্ত তরঙ্গিনীর চোখে ঘুম আসবে না, এ পরিচয় আরও দুর্ভাবনার ইতিমধ্যেই সে পেয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে বললে, খাবারটা আপনার ঘরে রাখবার কথা বলব?

তরঙ্গিনী হাসলেন। তিনি বুঝতে পারেন, সৌদামিনী তাঁর ছেলেকে ভয় পায়। যদিচ ভয়ের হেতুটা তিনি ভুল অনুমান করেন। ভাবেন, পল্লীগ্রামের এই অশিক্ষিতা বালিকা একমাত্র রূপ ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই তাঁর ছেলের যোগ্য নয় এবং সেই অযোগ্যতার কথা ভেবেই সৌদামিনী ভয় পায়।

পুত্রগর্বে মনে মনে তিনি খুশি হলেন। বললেন, তাই কোরো বরং। আমার ঘরেই রেখ।

বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেখান থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ

মাছের ঝোলে অত ঝোল রেখেছ কেন ঠাকুর? কতবার তোমাকে বলিনি, সাহেব ঝোল বেশি পছন্দ করেন না।

ঠাকুর-চাকরের সামনে তরঙ্গিনী মাঝে মাঝে প্রণবকে সাহেব বলে উল্লেখ করেন। সব সময়ে নয়, মাঝে মাঝে, মনটা খুব ভালো থাকলে।

সাহেব! সৌদামিনী হাসলে, সাহেব না হাতি! পুঁইডাঁটাখোর সাহেব!

সৌদামিনী একটু অপেক্ষা করলে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তরঙ্গিনী নিজের ঘরে যেতেই সে আবার শোবার ঘরে ফিরে এল।

আশ্চর্য এই যে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে হয়েও এবং পল্লীসমাজের খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচারের সমস্ত সংস্কারে আবদ্ধ হয়েও এই 'সাহেব' ডাকটা সৌদামিনীর ভালো লাগে।

সত্যি, প্রণব পুঁই-চচ্চড়ি খায় কেন? শ্বশুর-শাশুড়ী তো ওর জন্যে বেয়ারা-বাবুর্চি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন। সৌদামিনীরও তাতে আপত্তি ছিল না, অন্দরটা নিষ্কলুষ রেখে সমস্ত অনাচার বাইরেই সীমাবদ্ধ থাকত। ওর ইচ্ছা করে, কোট-পেণ্টুলন জুতো-মোজা মায় মাথার টুপিটা পর্যন্ত পরে প্রণব চব্বিশ ঘণ্টা সাহেব সেজে থাকুক। বাইরের দিকে বাবুর্চির হাতে চেয়ার-টেবিলে কাঁটা-চামচ ধরে থাক। তাতে তার কিচ্ছু আপত্তি নেই, বরং ভালোই লাগবে।

বস্তুত সাহেবই যদি সে না হবে, তবে এত অর্থব্যয় করে ওই দূর দেশে এতদিন গিয়ে রইল কেন? সামাজিক গোলযোগ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আরও কত ঝামেলা যে পোহাতে হচ্ছে, এই বা কেন? আবার যদি বাঙালীর ডাল-ভাতের জীবনে ফিরেই আসতে হয়, তাহলে বিলেত যাওয়ার সার্থকতা কি?

প্রণবের এই জীবনযাত্রার প্রণালী সৌদামিনীর ঠিক ভালো লাগে না। সে নিজে মেম-সাহেব হতে চায় না, তাতে তার ভীষণ বিতৃষ্ণা। নিজে সে কঠোর আচারপরায়ণা হিন্দু কুলবধূই থাকতে চায়। কিন্তু স্বামী সাহেব সেজে সাহেবী আচার-ব্যবহার অনুসরণ করলে সে গর্বই বোধ করবে।

কিন্তু প্রণব যেন কী! সে তা পারে না। কেন পারে না? ওর কেমন মনে হয়, মায়ের জন্যেই প্রণব তা পারে না। নইলে তার মনে ইচ্ছা এবং আগ্রহের অভাব নেই।

কে বললে তার আগ্রহের অভাব নেই, কি করে সে টের পেলে এই গোপন কথা, তা সে নিজেও জানে না। শুধু তার মনে হয়,—মনে হয়।

এমন সময় সিঁড়িতে প্রণবের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

তরঙ্গিনীরও সাড়া পাওয়া গেল,—তোর খাবার আমার ঘরে রয়েছে খোকা। ও ঘরে কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এস। স্নান করবে না এত রাত্রে।

প্রণব কি বললে, এত দূরে থেকে সৌদামিনী বুঝতে পারলে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেও তার সাড়া না পেয়ে বুঝলে, প্রণব খেতে বসেছে। সৌদামিনী তৈরি হয়ে রইল।

আরও কিছুক্ষণ যেতে প্রণবের পায়ের আবার সাড়া পাওয়া গেল। সৌদামিনী তৈরি হয়েই ছিল। প্রণব ঘরে আসতেই দ্রুত খাট থেকে নেমে ডান হাতটা কপালে তুলে বললে, সেলাম সাহেব!

প্রণব আশা করেনি, সৌদামিনী একটা পর্যন্ত জেগে থাকবে। বস্তুত তার ব্যবহারে সন্ধ্যাবেলায় সে খুবই চটে গিয়েছিল। নইলে থিয়েটার দেখার তার যে একটা খুব আগ্রহ আছে তা নয়। সে শুধু আজ রাত্রের মতো সৌদামিনীকে এড়াবার জন্যেই সেখানে গিয়েছিল। ভেবেছিল, সে যখন ফিরবে, তখন সৌদামিনী ঘুমিয়ে থাকবে এবং ভোরে সকলের ওঠবার আগে যখন সৌদামিনী উঠবে, তখন তার গভীর ঘুমের সময়।

সুতরাং সৌদামিনীকে এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখে সে প্রসন্ন হয়নি। কিন্তু সেই অপ্রসন্নতা তার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রবণতা নষ্ট করতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি ঠোঁটে একটা আঙুল তুলে সে ত্রস্তভাবে বললে, চুপ।

সঙ্গে সঙ্গে এক-গলা ঘোমটা কেটে সৌদামিনী ব্যস্তভাবে খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার ধারণা শাশুড়ী আসছেন।

প্রণব শান্তভাবে গায়ের জামা খুলে আলনায় রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্তভাবে খাটে এসে শুয়ে পড়ল।

এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট যায়। কেউ আসে না।

প্রণব বললে, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এতক্ষণে সৌদামিনী বুঝলে, ব্যাপারটা রসিকতা।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সৌদামিনী খাটে এসে বললে, এত ভয় দেখাতে পারো তুমি! আমি ভেবেছিলাম, মা আসছেন বুঝি! তাই—

—তাই একগলা ঘোমটা টেনে খাটের পাশে ষষ্ঠীবুড়ির মতো দাঁড়িয়ে পড়লে! তোমার লজ্জার বাহাদুরি আছে।

শেষের দিকে প্রণবের কণ্ঠস্বর একটু কর্কশই শোনাল।

সৌদামিনী বুঝলে সেটা। তার চোখ ছল ছল করে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, তুমি রেগে গেছ তা আমি জানি। সেই জন্যেই জেগে বসে আছি এখনও। কিন্তু আমার দোষ কি বল? সন্ধেবেলা, পাশের ঘরে মা রয়েছেন, কখন কি তাঁর দরকার হবে, ডাকবেন। আমি তখন আসতে পারি ঘরে?

—না, পারো না। সুতরাং তখন যদি আমার একটু গল্পগুজব আনন্দ করার ইচ্ছে হয়, তাহলে তিন টাকা খরচ করে থিয়েটারে যেতে হবে। এই তো!

কাঁদকাঁদভাবে সৌদামিনী বললে, তার আমি কি করব বল।

—না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এখন একটু ঘুমোও। আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।

বলে পাশ-বালিসটা টেনে নিয়ে প্রণব ক্রুদ্ধভাবে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

এবারে সৌদামিনীও রেগে গেল। প্রণবের পাশ ফিরে শোয়ার ভঙ্গিতে সে খুব অপমানিত বোধ করলে।

বললে, তা তুমি রাগই কর, আর যাই কর, মা-বাবার চোখের সামনে দিয়ে আমি তোমার ঘরে আসতে পারব না।

সেও আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরেই সে অঘোরে ঘুমুতে লাগল। আশ্চর্য, প্রণব কিন্তু ঘুমুতে পারলে না।

তিনটে বাজল। সাড়ে তিনটে। ধীরে ধীরে একখানি হাত প্রণব সৌদামিনীর গায়ের উপর রাখলে। ভোরে সকলের ওঠবার আগেই যথারীতি সৌদামিনীর ঘুম যখন ভাঙল, তখনও তার হাতখানি সেইখানে। এই হাতখানি থেকে মুক্ত হতে সৌদামিনীর মন চাইছিল না। কিন্তু ভোর-ভোর হয়ে আসছে। বিছানায় আর সে থাকতে পারে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে হাতখানি নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সে উঠল।

প্রণব জানতেই পারলে না। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে তখন।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় হল দার্জিলিং এসেছে প্রণব, একাই। তার বাবার মক্কেলের বাড়িতে ওঠেনি। একটা হোটেলে উঠেছে। একা এলে হোটেলই ভালো। ঝামেলা থাকে না।

এই হোটেলটা বিলিতি স্টাইলে চলে। মর্নিং টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, সবই আছে। তবু কেমন দিশী দিশী। আসল বিলিতি কাকে বলে প্রণব জানে। যারা জানে না তারা এই শীতার্ত শহরে এই হোটেল থেকেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। প্রণবেরও মন্দ লাগে না নিতান্ত। অনুকল্পেও কাজ চলে যায়।

কিন্তু ভিতরে তার রাগ পোরা আছে। সৌদামিনী যে এলো না, সেই রাগ। ওইটুকু মেয়ের জেদ দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। অথচ কী কৌশলী! একটা অপরিচিত এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে আত্মরক্ষার কৌশলটা ওরা হয়তো জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে নেয়।

এক এক সময় প্রণবের মনে হয় সৌদামিনীর টান যতখানি তার উপরে, তার চেয়ে ঢের বেশি সংসারের উপরে। সে বসে থাকতে পারে না। একখানা বই নিয়ে, কি একটা শেলাই নিয়ে বসে থাকা তার ধাতে নেই। অথচ কাজও কিছু নেই। সুতরাং সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও তরঙ্গিণীর মাথার পাকা চুল তুলছে, কখনও প্রসন্নবাবুর হুঁকো-কলকে থেকে তাঁর স্নানের ঘরের তোয়ালেটির পর্যন্ত তদ্বির করছে, কখনও ভাঁড়ারে কখনও রান্নাঘরে।

সবই করে, শুধু তারই এক ফাঁকে প্রণবের ঘরে এক মিনিটের জন্যে এসে একটু বসার সময় পায় না। আশ্চর্য!

একথা ভাবতেও প্রণবের বুকের ভিতরটা জ্বালা করে ওঠে। তার কেমন মনে হয়, সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা বরফের মতো জমাট। তাতে ভাবের কোনো তরঙ্গ খেলে না। তার কাছ থেকে দূরে-সৌদামিনী বেশ থাকে। কত তার উৎসাহ, কত তার অনুরাগ। কিন্তু তার কাছে এলেই কেমন যেন সে জমে যায়!

কেন এমন হয়? শিক্ষার অভাবে?

দার্জিলিংএর পথে পথে গুণ্ঠনমুক্তা স্বচ্ছন্দবিহারিনী বঙ্গললনাদের দেখতে দেখতে সে সংকল্প করলে, এবারে ফিরে গিয়ে সৌদামিনীর লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্যে মাকে বলতেও সে লজ্জা করবে না। লজ্জা করলে চলবে না। মাষ্টারের কাছে সৌদামিনী হয়তো পড়তে রাজি হবে না। দরকার হলে একজন মেম-শিক্ষয়িত্রীই রাখা যাবে বরং। এ রকম জবরজং করে ফেলে রাখা ঠিক নয়। প্রণবের সমস্ত জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে তাহলে।

সেইদিন সূর্যাস্তের কিছু আগে 'টাইগার হিল' যাওয়ার পথে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বরদা মিত্র তার নাম।

কলেজে ওর সঙ্গে পড়েনি অবশ্য। বোধ হয় দুই-এক ক্লাস উপরেই পড়ত। এখানে ওকে সে চিনত না। বিলেতে পরিচয়। এক সঙ্গে দুজনে পাস করে এক জাহাজেই ফেরে।

চমৎকার ছেলে এই বরদা। ভিতরে তার অফুরন্ত উদ্যমের যেন একটা ফোয়ারা রয়েছে। চিৎকার ছাড়া সে কথা বলতে পারে না, দৌড়নো ছাড়া হাঁটতে পারে না।

প্রণবকে দেখে সে দূরে থেকেই চিৎকার করে উঠল,—হ্যালো, মুক! তুমি!

কাছে এসে ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, কবে এলে?

বরদার পাশে আর একটি মেয়ে চৌদ্দ-পনের বৎসরের। পাৎলা ছিপছিপে লম্বা গড়ন। শ্যামবর্ণ। সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু ছোট্ট ললাটে, পাৎলা ঠোঁটে এবং উজ্জ্বল দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

তার দিকে একবার চেয়ে প্রণব জবাব দিলে, পাঁচ-ছ' দিন হল। তুমি কবে?

—হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ামাত্র। বাবা-মাও ছিলেন, পরশু ফিরে গেছেন কলকাতায়। এখন আমি আর আমার বোন সুচরিতা।

তারপরে সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, ইনি আমার বন্ধু প্রণব মুকার্জি, আমরা বিলেতে 'মুক' বলে ডাকতাম। তোমার সঙ্গে এক জায়গায় মিল আছে সু, তোমার মতো ওরও টেনিস খেলায় প্রচণ্ড নেশা।

সুচরিতা নিঃশব্দে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। কোনো কথা না বললেও বোঝা গেল, খেলার প্রসঙ্গে প্রণবের সম্বন্ধে তার উৎসাহ জেগেছে।

চলতে চলতে বরদা বললে, সু এবার এণ্ট্রান্স দেবে।

সুচরিতা সংশোধন করে বললে, দেবার কথা।

—হ্যাঁ, দেবার কথা। অর্থাৎ যতক্ষণ না টেস্টে উত্তীর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ এণ্ট্রান্স দিচ্ছে একথা ও কিছুতে বলতে দেবে না।

বরদা হাসলে।

সুচরিতা প্রণবের দিকে চেয়ে বললে, বলা উচিত নয়। বলুন?

প্রণব সায় দিলে, নিশ্চয়।

বরদা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় উঠেছ?

প্রণব তার হোটেলের নাম করলে। তোমরা?

বরদা বললে, তোমার হোটেলের থেকে দূরে নয়। তোমার ঘর থেকে নীচের দিকে

চাইলে দেখাও বার হয়তো। ফেরবার সময় তোমাকে চিনিয়ে দোব। 'টাইগার হিলে' যাচ্ছ তো? আমরাও।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আছ কদিন?

প্রণব হেসে বললে, আর ভালো লাগছিল না। পালাব ভাবছিলাম। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, যে কদিন তোমরা আছ থাকতে পারি।

—চমৎকার হবে তা হলে!

কথাটা বলে সুচরিতা অকারণেই কেমন লজ্জা পেয়ে গেল।

—আমরা এখনও দিন দশেক তো আছিই। কি বল্ সু?

বরদা সুচরিতার দিকে সম্মতির জন্যে চাইলে।

সুচরিতা সায় দিলে, নিশ্চয়ই। আমার তো নেমে যেতে ইচ্ছেই করছে না।

প্রণব বললে, আমিও সে ক'দিন আছি তা হলে।

খুব খুশির সঙ্গে সে একবার বরদার দিকে আর একবার সুচরিতার দিকে চাইলে।

সুচরিতা প্রণবকে জিজ্ঞাসা করলে, 'টাইগার হিলে' এই কি আপনি প্রথম যাচ্ছেন?

প্রণব উত্তর দিলে, না, আরও একদিন গেছি।

—সূর্যোদয় দেখেছেন?

প্রণব হেসে ফেললে। বললে, না। শুধু টাইগার হিলে নয়, সূর্যোদয় বস্তুটাই আমার দেখতে বাকি আছে। চিরকাল আমি অত্যন্ত দেরিতে উঠি।

সুচরিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। প্রণব অবাক হয়ে ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন করে সৌদামিনী হাসতে পারে? এমন পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছল হাসি? প্রণব তো শোনেনি কখনও। সুচরিতার চেয়ে সে যে বিশেষ বড় তা তো নয়। দু' এক বৎসরের বড় হয়তো। কিন্তু তাকে মনে হয় যেন কত বড়। আর সুচরিতা যেন এক ফোঁটা মেয়ে।

হাসি থামিয়ে সুচরিতা বললে, আপনি একেবারে দাদার গোত্র। দাদাও সকালে উঠতে পারে না। কতবার এখানে এলাম। এবারও তো অনেকদিন আছি। কিন্তু এ পর্যন্ত দাদা একবারও সূর্যোদয় দেখতে গেলে না।

বরদা হেসে বললে, তোদের চিৎকারে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে যায়, আর আমার ভাঙে না ভাবিস? ঘুম ভাঙে। কিন্তু ঐ ভোরে ঠাণ্ডায় লেপের মধ্যে থেকে দেহটা বার করতে পারি না!

প্রণব সায় দিয়ে বললে, আমারও ঠিক তাই। কিন্তু যেতে একদিন হবে, বুঝলে বরদা, নইলে দার্জিলিং আসাই মিথ্যে।

বরদা সাড়া দিলে না।

কিন্তু সুচরিতা উৎসাহের সঙ্গে বললে, কবে যাবেন বলুন। আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। কেবল কাল হবে না।

কাল যেতে হবে না শুনে প্রণবের দেহ যেন নববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, কাল নয় কেন?

—কাল সকালে আমাদের একটি আত্মীয়ের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। পরশু হতে পারে। যাবেন?

প্রণব বরদার দিকে অসহায়ভাবে চাইতেই বরদা হেসে ফেললে।

বললে, ওকে অত তাড়া দিসনে সু। তাহলে পরশু গিয়ে হয়তো দেখবি, ও কলকাতা পালিয়েছে।

প্রণব ব্যস্ত হয়ে বললে, না, না। ওর কথা শুনবেন না। পরশুই যাওয়া যাবে।

টাইগার হিল থেকে হোটেলে ফিরে এসে প্রণব কলকাতায় চিঠি লিখতে বসল। এসে পর্যন্ত বাড়িতে কয়েকখানা চিঠি সে অবশ্য দিয়েছে। কিন্তু সৌদামিনীকে একখানা চিঠিও দেয়নি। আজ চিঠি লিখতে বসল তাকেই।

এ ক'দিনের ঘোরাঘুরি এবং দ্রষ্টব্য স্থানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বাকিটা সে সুচরিতার কথাতেই ভর্তি করলে। কী সুন্দর মেয়েটি, কেমন সপ্রতিভ, আসছে বারে সে যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে এবং সুনিশ্চিত জলপানি পাবে, সমস্ত জানিয়ে শেষে পরশু ভোরে তারা দুজনে যে আবার টাইগার হিল যাবে, তাও লিখলে। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে তার কেবলই মনে পড়তে লাগল, বরদা এবং সুচরিতার কথা। কিন্তু কোন বাড়িতে তারা এসে উঠেছে, খোশগল্পে এমনই সে মশগুল হয়ে উঠেছিল যে, সেইটাই জেনে নেওয়া হয়নি। ওর ঘরের জানালা খুললেই সেই বাড়িটা নাকি দেখা যেতে পারে। সে-চেষ্টা সকালে উঠেই সে করেছে। কিন্তু এতগুলো বাড়ি তার চোখে পড়ল যে, তার মধ্যে ওদের বাড়িটা বেছে নেওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সে বাড়িতেও ওরা এখন নেই। কোথায় নাকি তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সেও যে কোথায়, তাও অজ্ঞাত। সুতরাং চা-পানের পর এলোমেলো ঘোরা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু তাতেও একটা প্রতিবন্ধক আছে। ওর হোটেলের ঠিকানাটা তাদের জানা। নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পথে তার হোটেলেও তারা একটা ঢু' দিয়ে যেতে পারে। সে না থাকলে তারা ফিরে যাবে। থাকলে তার ঘরেও আড্ডা জমতে পারে।

অনেক চিন্তার পর প্রণব না বেরনোই স্থির করলে এবং কার্যকালে দেখা গেল, ও ঠিকই স্থির করেছে। একটু বেলা হতেই ওরা দুজনে ঠিক তার হোটেলে এসে উপস্থিত।

সুচরিতা বললে, আপনি বেরন নি?

প্রণব বললে, না।

সুচরিতা দাদার দিকে চেয়ে হেসে বললে, তুমি ঠিকই বলেছিলে দাদা।

বরদা সগর্বে উত্তর দিলে, বলব না? আমি চিনি যে ওকে।

প্রণবের দিকে চেয়ে সুচরিতা বললে, ফেরবার পথে দাদা বললে আপনার হোটেল হয়ে যাওয়া যাক। আমি বললাম, নিষ্ফল। এই চমৎকার সকালে আপনি নিশ্চয় বেরিয়েছেন। দাদা হেসে বললে, আপনি যা কুঁড়ে এবং শীত-কাতুরে, কোথাও বেরননি! দেখছি, ঠিক তাই।

হেসে প্রণব জবাব দিলে, ঠিক তাই। কিন্তু কুঁড়েমির জন্যেও নয়, শীতের ভয়েও নয়।

—তবে কিসের ভয়ে?

—আমার কেমন মনে হচ্ছিল, ফেরার পথে আপনারা এদিক হয়ে যেতে পারেন। সে সময় পাছে আমাকে না পান, সেই ভয়েই এই সুন্দর সকালেও কোথাও বেরোই নি।

বরদা একটা চেয়ারে আরাম করে বসে বললে, ভালোই করেছ। তোমার কাছে ভালো চুরুট আছে? দাও তো একটা।

প্রণব দেশলাই আর চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে দিলে।

তারপর সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, বলেছিলেন আমার ঘরের জানালা খুললে আপনাদের বাড়িটা দেখা যেতে পারে। তাই কি কম বার উঁকি দিলাম!

সুচরিতা বললে, দেখা যেতে পারে। দেখি দাঁড়ান।

সে প্রণবের পাশে জানালায় এসে দাঁড়াল। একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি।

সুচরিতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ বললে, ওই তো দেখা যাচ্ছে! ওই যে, ওই লাইনে একটা দুটো, তিনটের পরে ফোর্থ বাড়িটা। বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—ওইটে। এখান থেকে যত কাছে মনে হচ্ছে তত কাছে অবশ্য নয়। অনেকখানি ঘুরে যেতে হবে। সেই কথাটা বল না দাদা।

—বলি।—বরদা খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে

বললে,—আজ বিকেলে তোমাকে আমরা ওখানেই নিয়ে যাব মুক্‌।

প্রণব বিস্মিতভাবে বললে, সে কি!

বরদা গুছিয়ে বলতে পারছে না দেখে সুচরিতা বললে, হ্যাঁ। আপনি আপত্তি করতে পারবেন না। বাবা মা চলে যাওয়ার পর অত বড় বাড়িতে আমাদের ভারি একা বোধ হচ্ছে। আমাদের ঠাকুর চাকর রয়েছে। সুতরাং আপনার হোটেলে পড়ে থাকার কোনই মানে হয় না।

তখন তখনই প্রণব রাজি হয়ে যেতে পারলে না। ভাবতে লাগল।

বরদা হেসে বললে, ভাবনা মিছে মুক। সু যখন ধরেছে, তখন আজ বিকেলে তুমি ওখানে চলে গেছ ধরে নিতে পার।

সুচরিতাকে এরই মধ্যে যতটুকু সে চিনেছে তাতে মনে হল, বরদার কথা মিথ্যে নয়। আপত্তি নিষ্ফল। বিশেষ হোটেলের একঘেয়েমিতে সে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সে আর বাধা দিলে না। সকালেই সৌদামিনীকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। ওরা চলে যেতেই নতুন ঠিকানা জানিয়ে প্রসন্নবাবুকে আবার একখানা চিঠি দিয়ে দিলে।

চার

দীক্ষা উপলক্ষে কি ভেবে প্রসন্নবাবু বৈবাহিককে একখানা চিঠি লিখে-ছিলেন। বিশেষ কিছুই নয়, দীক্ষার তারিখটা জানিয়ে লিখেছিলেন, এই উপলক্ষে একবার যদি আসতে পারেন, অনেকদিন পরে দেখা হয়।

চিঠি পেয়ে শিবশংকর বিশেষ বিব্রত বোধ করলেন। কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে না যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু তাতে বেয়াই ক্ষুন্ন হতে পারেন। সে ঠিক হবে না। আবার যদি যান এবং বেয়াই যদি খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন, তাহলেও কঠিন অবস্থা। হয়তো এই থেকেই উভয় পরিবারে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

পিতা-পুত্র এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারলেন না। পালকি গেল গুরুদেবের কাছে। এই পরিবারে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

গৌরবিনোদ ন্যায়-পঞ্চানন ও অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বহু জমিদারের গুরু। সুতরাং নিঃসন্দেহে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর চতুষ্পাঠীতে অনেক দূর থেকে ছাত্রেরা আসে ন্যায় এবং স্মৃতি অধ্যয়নের জন্যে। অথচ থাকেন তিনি সামান্য পর্ণকুটিরে।

সে প্রণবের পাশে জানালায় এসে দাঁড়াল

শিষ্যদের কাছ থেকে বহু টাকা তিনি নিশ্চয়ই পেয়ে থাকেন; কিন্তু তার সমস্তই টোলের ছাত্রদের পিছনে ব্যয়িত হয়।

এই সদাহাস্যময় সুরসিক পণ্ডিতের কাছে শিষ্যগৃহের পালকি আসতেই তিনি তাতে চড়ে বসলেন। কালীশংকর নিশ্চয়ই কোন কারণে বিব্রত। সুতরাং বিলম্ব করা ঠিক নয়।

গিয়ে দেখেন বিব্রত ঠিকই এবং যা তিনি আশংকা করেছিলেন, তাই নিয়েই।

বললেন, চিন্তা কি! আমি সুদ্ধ যাব।

শিবশংকর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও যাবেন?

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, যাব বইকি বাবা! আমার ছোট গিন্নী সেখানে রয়েছে! কতদিন দেখিনি। আমাকে তো যেতেই হবে!

সুতরাং দুজনেই চললেন। শিব-শংকরের আর কোন চিন্তা রইল না।

সন্ধ্যায় ওঁরা গিয়ে উঠলেন এক আত্মীয়-গৃহে। সেখানে রাত্রিযাপন করে সকালে এলেন প্রসন্নবাবুর বাড়ি। তিনি ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে চিনতেন। উভয়কেই সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন।

সত্য কথা বলতে কি, এতখানি তিনি প্রত্যাশা করেন নি। নিমন্ত্রণ করেছিলেন বটে, কিন্তু সত্যসত্যই যে তিনি এসে পড়বেন এবং একা নয়, গুরুদেবকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে, এ তিনি ভাবতে পারেন নি!

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, সে শালা কোথায়?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, দার্জিলিং গেছে।

—তার মানে পালিয়েছে! আয়ান ঘোষের সম্মুখীন হবার তার সাহস নেই। ভীরু, কাপুরুষ!

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার 'তিনি' কোথায়? তিনিও কি দুর্জয়-লিঙ্গে?

নিতান্ত সুপরিচিত রসিকতা। প্রসন্ন-বাবু হেসে বললেন, বৌমা এই সময়ে কিছুতেই দার্জিলিং যেতে রাজি হলেন না। চলুন ভিতরে। আসুন বেয়াই মশাই।

গুরুদেবের সঙ্গে মেয়ের কাছে যাবার সাহস শিবশংকরবাবুর নেই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মুখের আগল তো নেই। কি রসিকতা বাপের সামনেই মেয়েকে করে বসবেন, কে জানে।

ইসারায় বললেন, উনি ফিরে আসুন, তার পরে।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের কিন্তু কোনো দিকেই খেয়াল নেই! তিনি তখন বললেন, ইনি রয়ে গেলেন আর তিনি সাহেব চলে গেলেন দার্জিলিং! বাঃ! বেশ তো!

লজ্জিতভাবে প্রসন্নবাবু বললেন, না তারও

যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমিই জোর করে পাঠালাম।

—ভালো করনি বাবা। আমাদের সমাজের ভিত্তি কোথায়, গড়ন কেমন, কি তার মূল সুর, এর সঙ্গে ছেলেদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। এতো ইংরেজের বইতে লেখা নেই! চোখে দেখবে, বুদ্ধি দিয়ে ভাববে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে, তবে তো তার স্বধর্মকে চিনবে। বিলেত গেলেই তো আর সত্যি সত্যিই সাহেব হয়ে যায় না!

বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন এবং তখনই অন্দরে তাঁর বেসুরো গলার গান শোনা গেল :

"নাতনী লো সই,
কোথায় গেলি তুই?
দুটো মনের কথা কই।"

প্রসন্নবাবু বাইরে পালিয়ে এলেন। কিন্তু এ গলা সৌদামিনীর ভোলবার কথা নয়। সে উপরে কি করছিল। গুরুদেবের গলা শুনে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল।

ওকে দেখামাত্র তিনি আবার গান ধরলেন :

"আজ তোমারে দেখতে এলাম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাই সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাকব নাকো,
এসেছি দুদণ্ডের তরে।"

—থামুন, থামুন। এটা সাহেব-বাড়ি, ওসব গান চলে না।—বলতে বলতে সৌদামিনী ঢিপ করে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মুখে-মাথায় নিলে।

তাড়াতাড়ি তাঁর জন্যে মেঝেতে একখানা আসন বিছিয়ে দিলে এবং নিজে অদূরে বসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা আসেন নি?

—এসেছেন বইকি! নীচে তোর শ্বশুরের সঙ্গে গল্প করছেন। কেমন আছিস বল।

—ভালো।

বলবার দরকার ছিল না। দেহ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মুখখানি কেমন করুণ দেখাচ্ছে যেন। সেটা গুরুদেবের দৃষ্টি এড়াল না।

বললেন, কিন্তু তোর মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে? বিরহে, না আমাকে দেখে?

সৌদামিনী মুখ নিচু করে হেসে জবাব দিলে, কি জানি!

ওর হাসিটা কেমন যেন লাগল গুরুদেবের। এ রকমের হাসি যেন তাঁর পরিচিত।

বললেন, ছেলে-পুলে হবে না কি?

সৌদামিনী ছিটকে বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, আপনার কাছে বসবার উপায় নেই।

গুরুদেব হাসতে লাগলেন। বললেন, পালাসনে। শোন শোন। কথা আছে।

একটু পরেই শাশুড়ীকে নিয়ে সৌদামিনী ফিরে এল।

তরঙ্গিনী ভক্তিভরে ও'র পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, আজ আমাদের সত্যিই বড় সৌভাগ্যের দিন ঠাকুর মশাই যে, এ বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আজ আমার বাড়ি পবিত্র হল।

গুরুদেব যেন আর সে মানুষই নন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, ও কি কথা মা। ওকথা বললে আমার অপরাধ হয়। তোমাদের দীক্ষা দেখবার জন্যেই আমাদের ছুটে আসা। প্রসন্নবাবাজি যখন গুরু নির্বাচন করে নিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসামান্য ব্যক্তি।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—এখনও হয়নি। তবে এসেছি যখন তখন তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে কি যাব?

গুরুদেব হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, দীক্ষার সময়টা কখন?

—দশটার পরে।

—তা হলে তারও তো আর দেরি নেই। তোমরা তৈরি হয়ে নাও মা। আমি এখন নীচে যাই।

নীচের একটি ঘরে একখানি অনতিপ্রশস্ত চৌকিতে এক খণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর স্বামীজি একাকী তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁর জন্যে একটা নতুন গড়গড়াই কেনা হয়েছে। পরিধানে একখানা সিল্কের গেরুয়া। চোখে চশমা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে।

দেখলে ভক্তি হয় সত্যই। দেহে একটা অপার্থিব লাবণ্য যেন ঝকঝক করছে। চোখ দুটি সর্বদাই ঢুলুঢুলু,—যেন এ পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও বিচরণ করছে সব সময়।

প্রসন্নবাবু ন্যায়পঞ্চানন ও শিবশঙ্করবাবুকে সেখানে নিয়ে এলেন। ও'রা দুজনেই তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

স্বামীজি ব্যস্তভাবে পা সরিয়ে নিলেন। বললেন, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না। ঠাকুর আপনাদের কল্যাণ করুন।

অভ্যাগতদের জন্যে মেঝেতেও একখানা কার্পেট পাতা ছিল। ও'রা দু'জনে সেইখানে এবং প্রসন্নবাবু খালি মেঝেতেই উপবেশন করলেন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, দীক্ষার সময়ও হয়ে এল।

হাতের ইংরেজি খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে স্বামীজি বাঁ হাতের রিস্ট ওয়াচটা দেখলেন।

বললেন, হুঁ তোমরা আর দেরি কোরো না। তৈরি হয়ে নাও গে।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, আমরাও এখন উঠি স্বামীজি। সন্ধ্যায় আছেন তো? তখন এসে আপনার কাছ থেকে অনেক উপদেশ শুনব। ওঠ বাবাজি।

ও'রা স্বামীজিকে প্রণাম করে উঠলেন। প্রসন্নবাবু সঙ্গে সঙ্গে এলেন। বাইরে এসে হাত জোড় ক'রে বললেন, আপনাদের কিন্তু আমি আহারের জন্যে চাপ দিলাম না।

তার জন্যে ওঁরা দুজনেই মনে মনে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু ও'রা কোনো কথা বলবার আগেই প্রসন্নবাবু বললেন, ঠাকুর মশাইকে খেতে বলি এ সাহস আমার নেই। আপনাকে বলতে পারতাম বেয়াই মশাই। কিন্তু ভাবলাম থাক। আমি আত্মীয় হয়ে যদি আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা না বুঝি, তা হলে কে বুঝবে?

প্রসন্নবাবু ম্লানভাবে হাসলেন।

আবার বললেন, আপনারা এসেছেন এ আমার কত বড় ভাগ্য! কিন্তু সমাজের ব্যবস্থায় সেই ভাগ্য দুর্ভাগ্যে দাঁড়াল। আপনাকে তো কতবার পাবার আশা রাখি, কিন্তু ও'কে পাব কোথায়?

বলে ন্যায়পঞ্চাননের পায়ের ধুলো নিলেন।

ন্যায়পঞ্চানন ও'র মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, এজন্যে তুমি দুঃখ কোরো না বাবাজি। দৌহিত্রের মুখ না দেখা পর্যন্ত শিবশঙ্কর তো এখানে আহার করতে পারে না। সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

প্রসন্নবাবুর সত্যই সে খেয়াল ছিল না। বললেন, তা বটে। তা হলে বিকেলে আসছেন তো দু'জনে?

শিবশঙ্কর বললেন, নিশ্চয়ই। সদুর সঙ্গে এখনও তো আমার দেখাই করা হয়নি।

—তাই নাকি!—প্রসন্নবাবু বললেন,—তা হলে তো নিশ্চয়ই আসছেন। আচ্ছা, আমার আবার—

উভয়েই বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি যান, তৈরি হয়ে নিন গে।

রাস্তায় নেমেই ভাগ্যক্রমে একখানা ঠিকা গাড়ি পাওয়া গেল। তাইতে উঠে দুজনেই নীরবে বাইরে চেয়ে রইলেন। প্রসন্নবাবুর কথায় প্রকাণ্ড বড় একটা বোঝা উভয়ের বুক থেকে নেমে গেল। সেইটেই উভয়ে নিঃশব্দে উপভোগ করতে লাগলেন।

হঠাৎ এক সময় ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করলেন, সদুর সম্বন্ধে এ'রা কি তোমাদের কোনো খবর দিয়েছেন?

—না তো। কি খবর?—শিবশঙ্কর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—মনে হল মেয়েটা সন্তানসম্ভবা।

—তাই নাকি? শুনলেন সে কথা?

—শুনিনি। ওর মুখখানা দেখে তাই মনে হল। তোমরা কোনো খবর পাওনি তা হলে?

ও'রা বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আর কোনো কথা হল না। কিন্তু খবরটা শুনে আনন্দে শিবশঙ্করবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এবং শিবশঙ্কর বাবু বিকেলে যখন প্রসন্নবাবুর বাড়ি পৌঁছলেন, স্বামীজি তখন ড্রইং রুমে একটা সোফায় অর্ধশায়িত। হাতে গড়গড়ার নল। পা-তলায় মেঝেতে একখানা বাঘের চামড়া পাতা। সেইটেতে প্রসন্নবাবু বসে।

ঘর নিস্তব্ধ। স্বামীজি অন্যমনস্ক হয়ে কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছেন। আর প্রসন্নবাবু তন্গতচিত্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তিনি কি ভাবছেন তাও তিনিই জানেন।

এক সময় স্বামীজি প্রসন্নবাবুর দিকে চাইলেন এবং কি যেন বলতে গেলেন। এমন সময় ও'দের দুজনকে প্রবেশ করতে দেখে স্বামীজি সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আসুন। নমস্কার!

ও'রাও সবিনয়ে নমস্কার ক'রে সামনের দুটি সোফায় বসলেন।

স্বামীজি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, আহারের সময় আপনাদের দেখতে পেলাম না তো? প্রসন্ন বললেন, আপনারা চলে গেছেন।

ও'রা ঠিক বুঝতে পারলেন না, স্বামীজি ভিতরের রহস্যের কতখানি জানেন। তাই কুণ্ঠিতভাবে শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জেগেছে। ইউরোপ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত। সুতরাং জিজ্ঞাসুকে ইউরোপ যেতেই হবে। নইলে দেশ বড় হবে না, দেশের লোক কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবে। তা তারা থাকতে চায় না। তাই একদিন যেমন নালন্দা কিংবা মিথিলার দিকে ছাত্রদের স্রোত শুরু হয়েছিল, আজ তেমনি শুরু হয়েছে ইউরোপের দিকে। একে ঠেকাবেন কি করে?

ও'রা জবাব দিলেন না।

স্বামীজি বলতে লাগলেন, আজ জামাই বিলেত গেছে, না খেয়ে জাত বাঁচালেন। কাল যখন ছেলে যাবে, মেয়ে যাবে, নাতি যাবে, নাতনী যাবে, তখন কি করবেন? ক্রমাগত বর্জন করে করে সমাজ অন্তঃসার-শূন্য হয়ে যাবে। ন্যায়পঞ্চানন মশাই, সমাজকে বাঁচাবার পথ ওদিকে নয়।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, তা যে একেবারেই ভাবছি না, তা নয়। ভাবছি বলেই শিবশঙ্কর বাবাজীর সঙ্গে আমি নিজে এসেছি। কিন্তু জানেনই তো সংস্কার সহজে ভাঙতে চায় না।

ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন।

স্বামীজি সিংহ-গর্জনে বললেন, সেই সংস্কার এবারে ভাঙতে হবে। নইলে সমাজপতির আসন ছেড়ে দিতে হবে।

—আমরা তো তার জন্যে তৈরিই আছি স্বামীজি। আপনাকে গর্জন করতে হবে না, কৃতান্ত নিজেই ডাক দিয়েছেন। শুধু যাবার আগে আপনাদের মতো মহাপুরুষের কাছ থেকে শুনে যেতে চাই, হাজার হাজার লোক বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলেই আমার দেশ বড় হয়ে যাবে? আর কিছুরই দরকার নেই?

গর্জনের কথায় স্বামীজি যেন একটু লজ্জিত হলেন। প্রায় প্রত্যহ বহু লোকের সামনে ওজস্বিনী বক্তৃতা দেওয়ার ফলে ওটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন, আরও অনেক কিছু দরকার স্বীকার করি। তাও অর্জন করতে হবে। যাঁরা বিলেত যাচ্ছেন তাঁরা তো তাতে বাধা দিচ্ছেন না। তা হলে তাঁদের পতিত করা হচ্ছে কেন?

—অন্যায় হচ্ছে। সুতরাং নিশ্চিত জানবেন, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এ'রা পতিত থাকবেন না। তথাপি এ'দের সম্বন্ধে ভয় করবার কি কিছুই কারণ নেই?

—কি ভয় বলুন।

—আমাদের সমাজ যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি। সে তো আজ থেকে নয়, সতীদাহ নিরোধের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তারপরে বলুন।

—আজ ভাঙনের খেলা চলেছে। সমাজ-ব্যবস্থায় যা কিছু অন্যায়, যা কিছু যুগের অনুপযোগী, নির্মমভাবে তাকে ভাঙা হচ্ছে। তারপরে একদিন গড়বার দিন আসবে। ভয় করি সেইদিনকে।

—কেন?

—সেদিন হয়তো আমরা, ন্যায়পঞ্চাননের দল, থাকব না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জানবেন, ভারতবর্ষের প্রাণধর্মকে, তার ঐতিহ্যকে, আর আত্মাকে আমরা যেমন করে চিনেছি, ইংরেজের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে তেমন করে চেনা যায় না। সেদিন নতুন ভারতবর্ষ এবং তার নতুন সমাজ গড়বার দায়িত্ব যাঁরা নেবেন, আমাদের আশঙ্কা, তাঁদের চোখ থাকবে বিলেতের দিকে। বিলেতের অনুকরণে ভারত গড়বার চেষ্টায় অনেক দুর্দৈব জমা হবে। কোনো জাতকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে বড় করা যায়, আমরা ন্যায়পঞ্চাননের দল তা বিশ্বাস করি না, যেমন বিশ্বাস করি না আমাদের অশ্বত্থ গাছকে কোনো প্রক্রিয়ায় ওক গাছ করা যায়। যায় মনে করেন?

—না। কিন্তু আপনি অত দূরের কথা এখন থেকে ভেবে বিচলিত হচ্ছেন কেন?

—বিচলিত হচ্ছি তখন আমরা থাকব না এইজন্যে।

—থাকবেন না কেন?

—কারণ আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আজ আমাদের হাতে সমাজ আছে বলে যাঁদের আমরা পতিত করেছি, দিন আসছে যখন তাঁরাই আমাদের পতিত করবেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে......জানেনই তো।

ন্যায়পঞ্চানন বালকের মতো হাসতে লাগলেন।

স্বামীজি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, তাই বা মনে করেন কেন?

—মনে করি? অনুমান? না স্বামীজী এ আর অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা চিরকালকার টুলো পণ্ডিতের বংশ। আমার অন্য ছেলেরাও তাই। তারা যজন-যাজন অধ্যাপনা নিয়েই আছে। কিন্তু ছোটটিকে তার দাদারা দিলে ইস্কুলে। গেল বারে সে পঁচিশ টাকা জলপানি পেয়ে এণ্ট্রান্স পাশ করেছে। শুনি, সেও নাকি বিলেত গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন দেখছে! আর কি করি বলুন।

স্বামীজী হেসে বললেন, সেই কথাই তো বললাম ন্যায়পঞ্চানন মশাই। আজ নাৎ-জামাইএর বেলায় না হয় না খেয়ে জাত বাঁচালেন, সেদিন কি করে বাঁচাবেন?

—এমনি করেই বাঁচাব। যেমন ক্ষতকে কেটে ফেলে দিয়ে বাকি দেহটাকে বাঁচাতে হয়।

ন্যায়পঞ্চাননের চোখ দুটো একবার যেন ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

—কিন্তু এদের আপনি ক্ষত ভাবছেন কেন?

—এরা স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট বলে। স্বধর্ম মানে আমি সনাতন হিন্দুধর্ম বলছি না, স্বধর্ম মানে ভারতের প্রাণধর্ম।

—কি করে ভ্রষ্ট হল? সাহেব হয়ে গেছে বলে?

—সাহেব হলে তো বাঁচতাম। কিন্তু সে তো হবার নয়। এরা রইল ত্রিশঙ্কু হয়ে।

স্বামীজি হেসে বললেন, এদের সম্বন্ধে এই মত একদিন আপনাকে পরিবর্তন করতে হবে, যেদিন এদের আরও ভালো করে চিনবেন।

এতক্ষণে ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন। বললেন, মরবার আগে পরিবর্তন করতে পারলে শান্তিতেই যাব। কিন্তু তা কি সত্যিই হবে?

বলেই চেয়ে দেখেন, শিবশঙ্কর নেই।

জিজ্ঞাসা করলেন, শিবশঙ্কর বাবাজি কোথায় গেলেন?

প্রসন্নবাবু বললেন, বৌমার কাছে।

—কিন্তু তাকে তো এইবার খবর দিতে হবে বাবা। সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল। এবারে আমাকে উঠতে হবে।

প্রসন্নবাবু বেয়াইকে ডাকতে গেলেন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, আপনার সঙ্গে আলোচনায় পরম প্রীত হলাম স্বামীজি। আমাদের বৃত্তি ধীরে ধীরে আপনাদের হাতে চলে যাচ্ছে, ভালোই হচ্ছে। আমাদের অধঃ-পতনের জন্যেই এমনটি হচ্ছে। সেজন্যে

মনে কোনো ক্ষোভ নেই জানবেন। এই যে, শিবশঙ্কর এসে গেছেন। এবারে উঠি স্বামীজি, জয়োস্তু!

ন্যায়পঞ্চানন সকালে এসে প্রণাম করে-ছিলেন, যাবার সময় আশীর্বাদ করে গেলেন। একমাত্র শিবশঙ্কর ছাড়া আর কেউ বোধকরি এটা লক্ষ্য করলেন না।

পাঁচ

ন্যায়পঞ্চানন এবং শিবশঙ্কর ফিরে এসে সৌদামিনীর সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা জানাতে সেখানেও মেয়ে-মহলে একটা প্রকাণ্ড আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সৌদামিনী এ বাড়ির বড় মেয়ে। সুতরাং তার সন্তান-সম্ভাবনায় একটু বিশেষ আনন্দ হবারই কথা।

শিবশঙ্কর তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এখনই লাফিও না। পাকা খবর কিছু নয়। বেয়ান বললেন, আরও দু'এক মাস না গেলে বোঝা যাবে না।

এ রকম সংবাদে মেয়েদের সহজে নিরস্ত করা যায় না।

তাঁরা বললেন, তবে যে ঠাকুর মশাই বললেন—

—হ্যাঁ। ঠাকুর মশাই বললেন, বেয়ানও বললেন, আমারও দেখে তাই মনে হল। তবু এখনই নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি।

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে শিবশঙ্করের মা বললেন, ওরে দেখিস, এসব খবর মিথ্যে বড় একটা হয় না। সদুও মা হবে! কী আশ্চর্য ব্যাপার! সে নিজেই তো এই সেদিনও খিড়কির বাগানে ছুটে ছুটে খেলে বেড়িয়েছে! আজও সে নিজের যত্ন করতে করতে শেখেনি। ছেলের যত্ন করবে কি করে কে জানে!

শিবশঙ্করের মা ফোকলা দাঁতে হাসতে লাগলেন।

এ ব্যাপারে শিবশঙ্করের বলার কিছু নেই। তিনি হাসতে হাসতে উপরে উঠে গেলেন। মেয়ের হয়ে কোমর বেঁধে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নামলেন শিবশঙ্করের স্ত্রী।

—কেন? আপনাদের তো আরও কম বয়সে ছেলে হয়েছিল। ছেলের যত্ন আপনারা করতে পেরেছেন, আর আমার মেয়ে পারবে না? আমার মেয়েকে কী ভাবেন আপনারা?

এমন সময় গুরুদেবের পিছু পিছু কালীশঙ্কর অন্দরে এলেন। বৌমার শেষের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল।

বললেন, তোমার মেয়ে কি সোজা মা! সে ঝড়ের মতো ইংরেজি বলে, ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খায় আর লাট সাহেবের বাড়িতে নাচে। বিশ্বাস না হয় ঠাকুর মশাইকে শুধোও।

না স্বামীজী, এ আর অনুমান নয়,

—তা নাচবেই তো। আমাদের মেয়ে রণ-রঙ্গিণী, সিংহবাহিনী। আপনাদের মেয়ের মতো জবুথবু ষষ্ঠী বুড়ি তো নয়। সে নাচবে, হাওয়া খাবে, আবার বাড়ি ফিরে ছেলেকে বুকে করে মানুষও করবে। দেখবেন!

কালীশঙ্করের স্ত্রী বললেন, তা বেঁচে থাকলে দেখতে হবে হয়তো। কিন্তু খবরটা যখন পাওয়া গেল তখন আসল কাজটা করে রাখ। পাঁচ সিকে পয়সা বিনোদরায়ের জন্যে আর পাঁচ সিকে মা আনন্দময়ীর জন্যে মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখ। পাকা খবর এলে ভোগ দেবে।

সৌদামিনীর মা ব্যস্তভাবে দুটি যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বিনোদরায় এবং মা আনন্দ-ময়ীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, যা বলেছেন মা!

তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল, আরও একটি মানৎ এখনও পরিশোধ করাই হয়নি। বললেন, ওই দেখুন মা, কি ভুল হয়ে গেছে!

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, কি আবার ভুল হল?

—বাবা তারকনাথের একটা মানৎ শোধ করাই হয়নি।

—সে আবার কবে করেছিলে?

—অনেক দিন আগে। জামাই ভালোয়-ভালোয় এসে পৌঁছুবেন বলে করেছিলাম।

শাশুড়ী বিরক্তভাবে বললেন, ওই তোমার দোষ বাছা। মানৎ করবার সময় একগাদা করে বস, তারপরে আর শোধ কর না! ভারী খারাপ অভ্যেস।

লজ্জিতভাবে সৌদামিনীর মা বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম মা। তা ছাড়া তারকনাথ যাবার লোকও তো পাওয়া যায় না বড়।

—ছেলে-মেয়ে-জামাইএর মানৎ নিজে গিয়েই শোধ করা ভালো। আমাকেও তো বলনি?

—আপনি ঠাট্টা করেন বলে ভয়ে বলিনি।

এবারে শাশুড়ী হেসে ফেললেন। বললেন, তা বাছা, এই বুড়ি যদ্দিন বেঁচে আছে, তদ্দিন তোমাদের ছেলে-মেয়ে-জামাই নিয়ে খোঁচা একটু খেতেই হবে। লজ্জায় মানৎ লুকুলে চলবে কেন?

—এবারে যেন মা—

—মেয়েটা নেয়ে-ধুয়ে ছেলে কোলে করে আসুক, আমি নিজে তোমাকে বাবা তারকনাথের ঠাঁই নিয়ে যাব।

বলেই কি কথা মনে পড়ায় কালীশঙ্করের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তখন মেঝেয় একরাশ কাগজপত্র বিছিয়ে জমিদারী সংক্রান্ত কি একটা কাগজ

খ‍ুঁজছিলেন। গ‍ৃহিণীকে দেখে তাঁর দিকে চাইলেন।

গ‍ৃহিণী বললেন, হ্যাঁগা, এইবার!

—কি এইবার।

—সদ‍ুর খবরটা যদি সত্যি হয়, প্রথম ছেলে, আনতে তো হবে।

কথাটা কালীশংকরও যে ভাবছিলেন না তা নয়। কিন্তু ভেবে কোন দিশা পাচ্ছিলেন না। আনা উচিত। অথচ আনা অসম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু গ‍ৃহিণীকে সে কথা বলতে ইচ্ছা করল না। বললেন, দেখি আগে পাকা খবরই তো আস‍ুক।

গ‍ৃহিণীও নাছোড়বান্দা। বললেন, খবর যদি সত্য না হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কি করবে তাই শ‍ুধোতে এলাম।

কালীশংকর অসহায়ভাবে ও'র দিকে চাইলেন। একট‍ু ভেবে ধীরে ধীরে বললেন, সেই সমস্যার কথাই তো ভাবছি মেজবৌ। কিন্তু ভেবে কোন দিশা পাচ্ছি না।

দিশা গ‍ৃহিণীও পাচ্ছিলেন না। দ‍ুশ্চিন্তায় তিনিও দরজার গোড়ায় বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন।

রাত্রেই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কালীশংকরকে বলেছিলেন, যা করা হচ্ছে সেটা নিতান্তই জোড়াতালি। জোড়াতালি বেশিদিন থাকে না। অথচ সম্পর্কটা জোড়াতালি নয়, স্থায়ী।

স্বামীজির কথাটাও তাঁর মনে লেগেছিল, সমস্যা সমাধানের পথ ওটা নয়। বিলেত যাওয়ার ঢেউ এসে গেছে, সত্যকার শিক্ষার জন্যেই হোক, আর জীবিকার্জনের ব্যবস্থার জন্যেই হোক। তাকে রোখা যাবে না। স‍ুতরাং সমাজকে বাঁচাবার জন্যে তাকে আরও একট‍ু প্রশস্ত, আরও একট‍ু উদার করতে হবে।

স্বামীজির সংগে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই, অর্থাৎ যেদিন থেকে প্রণবের ফিরে আসার কথা হয়েছে সেই দিন থেকেই, এই সমস্যার কথা নানা দিক দিয়ে তিনি ভাবছিলেন। সমাধানের পথ খ‍ুঁজছিলেন। এবারে কলকাতা থেকে ফিরে এসে সেই পথ যেন তিনি খ‍ুঁজে পেয়েছেন। রাত্রে কালীশংকরের সংগে এই নিয়ে অনেক আলোচনা তিনি করলেন।

বললেন, প্রসন্নবাব‍ুকে যে রকম ব‍ুদ্ধিমান এবং বিবেচক দেখলাম তাতে তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে, এমন কাজ তিনি কখনও করবেন না। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। ছেলে হবার সময় সদ‍ু এখানে আসতে পারবে না, প‍ুজা-পার্বণে জামাই আসবেন না, তাঁদের বাড়ি গিয়ে তোমরা উঠতে পারবে না,—এ রকম আত্মীয়তাই বা কতদিন টে'কতে পারে?

শ‍ুষ্ক ম‍ুখে কালীশংকর বললেন, কিন্তু উপায়ই বা কি?

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, উপায় একটা পেয়েছি। এখন প্রণবভায়া রাজি হলে হয়।

—কি উপায়? —কালীশংকর যেন তথাপি ভরসা পাচ্ছিলেন না।

—প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে এর জন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

—হ‍ুঁ।—কালীশংকর ভাবলেন। বললেন, —শ‍ুধ‍ু প্রণব কিংবা প্রসন্নবাব‍ুই নয়, সমাজপতিদের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

সংগত কথা। এ ক্ষেত্রে যে দ‍ুটি পক্ষ, তাদের উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, প্রসন্নবাবাজির সম্মতি পেলে তখন আমি নিজে সমাজপতিদের সংগে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

—তাহলে প্রণবভায়া ফিরে এলে আপনাকেই এর জন্যে কলকাতা যেতে হয়।

ন্যায়পঞ্চাননের তাতে আপত্তি নেই। শিষ্যের বিপদে তাকে উদ্ধার করা তাঁর ধর্ম।

তিনি বললেন, ইতিমধ্যে কাল সকালে তোমাদের এখানকার প্রধানদের সংগে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

এখানকার প্রধানদের সম্বন্ধে কালীশংকরের দ‍ুশ্চিন্তা খ‍ুব বেশি নয়। এ গ্রাম তাঁর জমিদারি। কিছ‍ুটা লাঠির জোরে, কিছ‍ুটা মামলা-মোকদ্দমার হয়রানির মধ্যে ফেলে এদের সম্মতি আদায় করা তাঁর মতো দ‍ুর্দান্ত জমিদারের পক্ষে শক্ত হবে না। ভয় তাঁর পঞ্চগ্রামী সমাজকে। তারা তো আর তাঁর প্রজা নয়!

কিন্তু ন্যায়পঞ্চাননকে তিনি চেনেন। লাঠির জোরে সমাজকে দাবিয়ে রাখবার প্রসংগ তাঁর মতো নির্ভীক তেজস্বী ব্রাহ্মণ কখনই সহ্য করবেন না। স‍ুতরাং মনের কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন না।

ম‍ুখে বললেন, বেশ তো!

স‍ুতরাং পরদিন সকালে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের ডাকলেন এবং কথাটা তাদের কাছে পাড়লেন। তাঁর য‍ুক্তি-তর্ক সকলে যে খ‍ুব ব‍ুঝল তা মনে হল না। সম‍ুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছ সহবাস, ম্লেচ্ছ আহার যদি অপরাধ হয়, তাহলে তার শাস্তিও অপরাধীর প্রাপ্য। সমাজ সেই শাস্তি থেকে যদি কোনো বিশেষ অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেয়, তাহলে সমাজের শ‍ৃংখলা কি করে থাকবে?

ন্যায়পঞ্চানন তার জবাব দিলেন। বললেন, যার শাস্তি দেবার অধিকার আছে, মার্জনা করারও তার অধিকার আছে। তাতে শাস্তিদাতার শক্তি খর্ব হয় না।

কিন্তু কেন মার্জনা করবে?

অন‍ুতপ্তকে মার্জনা করা অন্যায় নয়। সেক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে, অপরাধীর এই অন‍ুতাপ আন্তরিক কি না অথবা শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের কৌশল মাত্র। মার্জনার সার্থকতা হচ্ছে অপরাধ হ্রাসে। যদি দেখা যায়, কাতারে কাতারে লোকে সম‍ুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, ম্লেচ্ছদেশে অখাদ্য ভোজন করছে আর ফিরে এসে সমাজের কাছ থেকে মার্জনা লাভ করছে,—তাহলে তাকে মার্জনা বলে না, প্রশ্রয় বলে। প্রশ্রয়ে অপরাধ কমে না, বাড়ে।

চ‍ুরির ক্ষেত্রে, কিংবা অন্য কোন নৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে। কিন্তু এটা ঠিক সেই শ্রেণীর অপরাধ নয়। একদিন ভারত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেদিন শিক্ষার জন্যে কারও সম‍ুদ্রযাত্রার আবশ্যক হত না। কিন্তু কালের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত আজ আর জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ নয়। তাকে বড় হতে গেলে বিদেশ থেকেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ করে আনতে হবে। তার জন্যে কিছ‍ু অনাচার অবশ্যম্ভাবী। দেশের ভাবী কল্যাণের দিকে চেয়ে সেই অবশ্যম্ভাবী অনাচারের ত্র‍ুটি যদি সমাজ মার্জনা করতে না পারে, তাহলে সমাজকেই ঠকতে হবে।

এমনি অনেক তর্কবিতর্ক হল। কোনদিনই তর্কের মীমাংসা হয় না। এখানেও হত না। অবশেষে অক্ষয় চক্রবর্তী এই তর্কে ছেদ টানলেন।

অক্ষয় বললেন, ঠাকুরমশাই, শাস্ত্র আমরা জানি না। কিন্তু আপনাকে জানি। জানি যে, যা অন্যায়, যা অশাস্ত্রীয় তা নিজেও আপনি কিছ‍ুতে করবেন না, অন্যকেও করতে দেবেন না। স‍ুতরাং আপনি যদি বলেন, জামাতা বাবাজি প্রায়শ্চিত্ত করলে আপনি তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তা হলে আমাদেরও আপত্তির কোন কারণ নেই। আমরা আপনার উপরই সমস্ত ভার দিলাম।

অন্যেরাও সায় দিলেন, অক্ষয় সংগত কথাই বলেছেন।

অক্ষয় বললেন, কিন্তু আমরাই তো আর সমগ্র হিন্দ‍ু সমাজ নই। পঞ্চগ্রামী সমাজ আছে। তার মতও নিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। —ন্যায়পঞ্চানন বললেন,—কিন্তু আপনারা হলেন গ্রাম্য-সমাজ। আপনারাই সকলের আগে। আপনাদের সম্মতি যখন পাওয়া গেল তখন এইবার আমি পঞ্চগ্রামী সমাজের কাছে যাব।

তাঁকে বেশ উৎসাহিত বোধ হল। কালীশংকরবাব‍ুও সমস্ত ক্ষণ নিঃশব্দে ধৈর্যের সংগে এই বিতর্ক শ‍ুনছিলেন।

বস্তুত তাঁদের গ্রাম্য-সমাজকে তিনি জানেন। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর ভয় বেশি ছিল না। ভয় পঞ্চগ্রামী সমাজ সম্বন্ধেই। এবং সে ভয় রইলই, যদিও গুরুদেবের পাণ্ডিত্যে এবং প্রভাবে তাঁর আস্থা যথেষ্টই।

ছয়

দার্জিলিং থেকে ফিরে আসার পর প্রণবের যে পরিবর্তনটা সাধারণের চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে তার শারীরিক পরিবর্তন। প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিনী এই সাধারণেরই অন্তর্গত। প্রণবের রংটা বরাবরই ফর্সা। দার্জিলিং সেই ফর্সা রঙের উপর যেন একটা লাল আভার হাল্কা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। তার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সকলে খুশি হলেন।

শুধু সৌদামিনীই বুঝলে, তা ছাড়াও পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা দেহে নয়, মনে। শুধু তারই চোখে পড়ল, দেহের মতো সেখানেও একটা হাল্কা লালের ছোপ লেগেছে। খুবই হাল্কা অবশ্য এবং তার জন্যে সে কিছুমাত্র বিচলিত হল না।

হাইকোর্ট খুলে গেছে। সুতরাং দার্জিলিং থেকে নেমেই প্রণব কাজের মধ্যে পড়ল। এখন আর সে দেরিতে ওঠে না। খুব ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সিনিয়রের বাড়ি যায়। সেখান থেকে দশটায় ফিরে স্নানাহার সেরে কোর্ট। ফিরতে পাঁচটা। তার পরে মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে টেনিস র‍্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে যায় বরদার বাড়ি। সেখানে টেনিস খেলার লন আছে। বরদার বাবা ধনী লোক। যেদিন রাত্রে সিনিয়রের বাড়ি 'কনসালটেশন' থাকে, সেদিন খেলা থেকে বাড়ি ফিরেই আবার সিনিয়রের বাড়ি যায়। যেদিন থাকে না, সেদিন বাড়ি ফিরেই অফিস-ঘরে বসে। মামলার কাগজপত্র সিনিয়রের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করে। কাজ চলে অনেক রাত্রি অবধি। আবার হাতে কাজ যেদিন থাকে না সেদিন সন্ধ্যা এবং খানিক রাত্রি পর্যন্ত বরদাদের ওখানেই কাটায়। বরদার বাবার সংগীতে অনুরাগ আছে। সুচরিতা নিজেও গান জানে এবং ভালো ওস্তাদের কাছে গান শিখছে। মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গানের মজলিস বসে। সেদিন প্রণব ওদের ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলেও ডিনার করে। সেদিন ওর মুখে সৌদামিনী যেন কি রকম একটা গন্ধ পায়। প্রণব বলে, ভিনিগারের। সৌদামিনী ভিনিগারও জানে না, তার গন্ধও চেনে না। সুতরাং মনে তার কোন সন্দেহও জাগে না।

প্রণবের কাজে অনুরাগ এবং শ্রমের আগ্রহ দেখে প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণী উভয়েই খুশি। প্রসন্নবাবু নিজে উকীল, তিনি জানেন অন্তত ওকালতির ক্ষেত্রে পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। তার পরিশ্রম এবং কর্মানুরাগ দেখে তাঁদের মনে প্রণবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোনালি আশা জাগে।

সৌদামিনীও খুশি হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। যখন প্রণবের কাজ ছিল না, তার অফিসের টেবিলে ব্রীফ জমেনি, তখন তার মনে জাগত সৌদামিনীর সঙ্গলাভের ক্ষুধা। সৌদামিনীর কাছে সেটা ছিল একটা মস্ত বড় ভয়ের ব্যাপার।

সে পল্লীগ্রামের জমিদারের কন্যা। সেখানকার চাল-চলন একেবারে মোগল যুগের। সেখানে সদর থেকে অন্দরে আসার পথে আরও দুটো মহল। সেখানে সকালেই পুরুষেরা বেরিয়ে যায় সদরে। বাইরেই স্নান সেরে অন্দরে একবার খেতে আসে। খেয়ে আবার বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রি ন'টায়। সমস্ত দিন অন্দরে পুরুষের এই অনুপস্থিতিতেই সে অভ্যস্ত। এইটেই তার সংস্কারের মধ্যে রয়েছে। দিনের বেলায় সকলের সামনে প্রণবের ঘরে যাওয়া তার কাছে গভীর লজ্জা এবং কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং প্রণবের কর্মব্যস্ততায় লজ্জা এবং কলঙ্কের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে বেঁচেছে। সেইটেই তার পক্ষে খুশির বিষয়। প্রণবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা সে ঘামায় না, সে বয়সও তার নয়।

প্রণব অবাক হয়ে যায়, ওর মধ্যে নারী-সুলভ ঈর্ষা এবং অন্য নারী সম্বন্ধে সতর্কতাবোধের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দেখে। দার্জিলিং থেকে প্রণব সুচরিতার উল্লেখ করে যে চিঠি দেয়, তার উত্তরে সৌদামিনী সুচরিতাকে ভালোবাসা জানায় শুধু—নারীসুলভ কৌতুকবশে একটা পরিহাসও করেনি।

এখানেও মাঝে মাঝে প্রণব সুচরিতার গল্প করে। হয়তো বলে—

—মেয়েটা যেমন চমৎকার গান গায়, তেমনি চমৎকার টেনিস খেলে!

সৌদামিনী বড় বড় চোখ মেলে শোনে। জিজ্ঞাসা করে, জোরে জোরে গলা খুলে গান গায়?

—নিশ্চয়।

—পাশের বাড়ির বেটাছেলেরা শুনতে পায় তো?

—কেন পাবে না?

—রাস্তার লোকেরাও শুনতে পায়?

—শুনতে পায় মানে? এক একদিন দেখি, গেটের গোড়ায় রাস্তার লোকের ভিড় জমে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে!

সৌদামিনী এই নির্লজ্জতার নিন্দা করে না, মেয়েমানুষের গান গাওয়ার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। শুধু গভীর লজ্জায় তার নিজের দেহটা যেন শিউরে সংকুচিত হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি সে অন্য প্রসঙ্গ তোলে।

টেনিস খেলা সম্বন্ধেও তার কোনো ধারণা ছিল না। সে ভাবত, তাস খেলার মতো ঘরে বসে কোনো খেলা বুঝি। বারে বারে শুনতে শুনতে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, খেলাটা কেমন?

প্রণব বুঝিয়ে দিতেই সৌদামিনীর বড় বড় চোখ আরও বড়বড় হয়ে উঠল। সমস্ত মুখে কে যেন এক ঝলক আবীরের ঝাপটা দিলে। মুখ নিচু করে শুধু বললে, মাগো! এমনি ছুটে ছুটে খেলা!

ব্যস্। আর কিছু নয়।

গভীর রাত্রে প্রণব হয়তো জিজ্ঞাসা করে, সুচরিতাকে তোমার ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন?

—তার সঙ্গে খেলাধুলো করি, মিলিমিশি।

সৌদামিনী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় কথায় ইঙ্গিতটা আর একটু স্পষ্ট হওয়ায় তাড়াতাড়ি প্রণবের মুখ চেপে ধরলে,

—ছিঃ, ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও ওরকম বলতে নেই।

প্রণব অবাক হয়ে যায়। সৌদামিনী কী! শিশু না নির্বোধ!

প্রণব বললে, ভাবছি তোমার জন্যে একজন মেম মাষ্টারনী রাখব। তোমাকে লেখাপড়া শেখাবে।

কুণ্ঠিতভাবে সৌদামিনী বললে, আমি কি পারব?

—কেন পারবে না?

—আমার পড়তে ভালো লাগে না যে! কত কষ্টে 'বোধোদয়' শেষ করেছি সে আমিই জানি।

সৌদামিনী লজ্জিতভাবে হাসলে।

—পড়তে পড়তেই ভালো লাগবে দেখ।

—বেশ। দেখব। মাকে একবার জিজ্ঞেস কোরো কিন্তু।

—করেছি। তাঁর আপত্তি নেই।

—আমি লেখাপড়া শিখলে তুমি খুশি হবে?

—খুব খুশি হব যদি মন দিয়ে পড়।

—বেশ।

কিন্তু গলায় তার জোর নেই। সে যেন নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার পড়াশুনো হবে না। তবু প্রণব যদি খুশি হয়, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

বললে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা খুব চালাক-চতুর হয়, না?

—হয়ই তো।

—সুচরিতা খুব চালাক-চতুর, না?

—নিশ্চয়ই।

—একদিন আনবে তাকে? তোমার মুখে ক্রমাগত তার কথা শুনে শুনে তাকে দেখতে ভারি ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রণব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আনত মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বললে, সেটা ঠিক হবে না সদু।

—কেন?

—তোমার যদি তাকে দেখে নিজেকে ছোট মনে হয়, তাহলে ভারী কষ্ট পাব আমি।

সৌদামিনী বিস্মিতভাবে বললে, ছোট মনে হবে কেন? সে লেখাপড়া শিখেছে বলে? টেনিস খেলতে পারে বলে?

—হ্যাঁ।

সৌদামিনী খিল খিল করে হেসে ফেললে। বললে, ছাই লেখাপড়া, ছাই টেনিস খেলা! মেয়েদের ছোট-বড় তাতে নয়।

—তবে?

এবারে সৌদামিনী স্বামীর বুকে মুখ লুকোল। বললে, সে আমি বলতে পারব না।

—কেন বলতে পারবে না? বলতেই হবে।

প্রণব জোর করে তার সুন্দর মুখখানা তুলে ধরলে।

বিব্রতভাবে সৌদামিনী বললে, তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, আর এটা জানো না?

—না। কিসে ছোট-বড় বল। রূপে?

—ছাই রূপ!

—তবে?

বাধ্য হয়ে সৌদামিনীকে বলতে হল। কোনোরকমে বললে, স্বামী-সৌভাগ্যে।

সুতরাং সুচরিতা কেন, কোনো মেয়ের কাছেই সৌদামিনী নিজেকে ছোট মনে করে না। মন তার ঈর্ষা থেকে মুক্ত।

প্রণব অবাক হয়ে ওর লজ্জারুণ সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবলে সেই জানে, অকস্মাৎ তার নিজের মুখও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

প্রণবের খুব ইচ্ছা করে একদিন বরদা আর সুচরিতাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। রাত্রে ওদের বাড়ি প্রায়ই সে খায়। কিন্তু দুটি মস্ত বড় অন্তরায়ের জন্যে পারে না। প্রথমত সৌদামিনী কিছুতেই বরদার সামনে বার হতে প্রস্তুত নয়। দ্বিতীয়ত ওরা কায়স্থ। ওদের সঙ্গে বসে সৌদামিনী কিছুতেই খাবে না।

ঝি-চাকরের সামনেই সে প্রণবের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়, আর প্রথমত বরদার সঙ্গে, দ্বিতীয়ত তারই সামনে প্রণবের সঙ্গে কথা বলবে সে, সৌদামিনী? কেটে ফেললেও পারবে না।

একসঙ্গে খাওয়ার কথায় সৌদামিনী হেসেই খুন! একে তো সে বামুনের মেয়ে, কায়স্থের সঙ্গে খাবে? তার উপর মেয়ে-পুরুষের একসঙ্গে বসে খাওয়ার কথা সেতো বাপের জন্মে শোনেনি! প্রণব কি সত্য বলছে, না ঠাট্টা করছে?

সুতরাং সে আশা ছেড়েছে। বিশেষত তরঙ্গিনীও যখন এই ব্যাপারে বধূর দিকে।

মায়ের সঙ্গে প্রণব তর্ক করেছে, কেন, বন্ধুবান্ধবের সামনে বার হলে দোষ কি?

—দোষ না থাকলে শাস্ত্রে নিষেধ করবে কেন?

—কোন্ শাস্ত্রে নিষেধ করেছে বল?

—সব শাস্ত্রেই নিষেধ করেছে। নইলে মেয়েরা কথা বলে না কেন?

এর উপর তর্ক চলে না।

প্রণব বললে, আচ্ছা বরদার সামনে না হয় বার হল না, খেতেও না বসল। সুচরিতার সঙ্গে খেতে দোষ কি?

—দোষ আছে বই কি! তারা কায়েত আর আমরা বামুন।

—আমরা কিসের বামুন! বামুনের কোন্ কাজটা করি?

—নাই করলাম। কিন্তু 'জাত' যখন রয়েছে, তা যখন মিথ্যে নয়, তখন মানবিনে?

—না, মানব না। আমি তো সবই খাই, সকলের সঙ্গেই খাই, বিলেতে ম্লেচ্ছের হাতে ম্লেচ্ছের সঙ্গেও খেয়েছি।

—পুরুষমানুষে সব পারে। তাদের দোষ নেই।

—আর যত দোষ মেয়েদের বেলায়?

এবারে তরঙ্গিনী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে। তা হবে না? মেয়েরা হল ঘরের লক্ষ্মী। তারা অনাচারী হলে ঘর-সংসার ভেসে যাবে না?

—বরদার ঘর-সংসার কি ভেসে গেছে?

—যেত, যদি বরদার মা না থাকতেন। নিজের পুণ্যে তিনি সব আটকে রেখেছেন।

—তাই নাকি! তুমি কি বরদার মাকে চেন?

একগাল হেসে তরঙ্গিনী বললেন, কাল যে আলাপ হল।

—তাই নাকি! কোথায়?

—গোঁসাইদের ঠাকুরবাড়িতে ভাগবত শুনতে এসেছিলেন। দিব্যি মানুষ বাপু! কত গল্প হল। আমাদের কোচোয়ানটা তো চেনে ও'দের। সেই আলাপ করিয়ে দিলে।

অবাক হয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, এইখান থেকে অতদূর গিয়েছিলে ভাগবত শুনতে!

—দূর আর কি খোকা! গাড়িতে গিয়েছিলাম, গাড়িতে এসেছি! বৌমাকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রণব এর কিছুই জানে না।

জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে বেটাছেলেরা যায় না?

—কত! আর যা সুন্দর পাঠ হল!

—আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। সেখানে কত বেটাছেলে গিয়েছিল। তাদের চেন না, কেমন লোক তাও জানো না। তাতে দোষ নেই। আর যে বরদা আমার বন্ধু, যাকে খুব ভালো ক'রে চিনি-জানি, তার সামনে ওর বেরনো দোষের! শাস্ত্রের নিষেধ আছে!

তরঙ্গিনী আবার রেগে গেলেন।

বললেন, কী বাজে বকিস খোকা! সে হল দেবালয়। সেখানে আবার দোষ আছে?

—না। যত দোষ ভদ্রলোকের বাড়িতে। আমার তো মনে হয়, যত জঞ্জাল জমে আছে এই দেবালয়গুলোতেই। ইচ্ছে করে, কালাপাহাড়ের মতো এইগুলোকেই সব আগে দিই গুঁড়িয়ে!

—খোকা!

তরঙ্গিনী চিৎকার ক'রে উঠলেন। তাঁর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সৌদামিনী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে মায়ে-ছেলেয় তর্ক শুনছিল। তরঙ্গিনীর চিৎকারে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। শাশুড়িকে এমন রাগতে, এমন ক'রে চিৎকার করতে সে কখনও দেখেনি।

প্রণবও থমকে গেল।

তার মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার একটা কথা। ও তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ছেলেমহলে তখন একটা নাস্তিকতার ঢেউ এসেছে। ওকেও স্পর্শ করেছে সেই ঢেউ। নবলব্ধ বিদ্যার ঝাপটা দিয়ে ওর অশিক্ষিতা জননীকে সেদিনও এমনি করে আঘাত করতে গিয়েছিল।

বলেছিল, ভগবান মিথ্যা, ভগবান নেই। বলেছিল, তরঙ্গিনীর ঠাকুর-ঘরে পটে-বাঁধানো ওই যে রাধা-কৃষ্ণের ছবি, ওটা নিতান্তই পটুয়ার আঁকা ছবি, ভগবান নয়।

তরঙ্গিনী সেদিনও এমনি করে চিৎকার করে উঠেছিলেন। এমনি করে তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে এসেছিল। ভয়ে প্রণব সেদিনও পালিয়েছিল, আজও পালাল।

সৌদামিনী আস্তে আস্তে ও'র কাছে এসে দাঁড়াল। তরঙ্গিনীর চোখের

বিদ্যুৎ তখন মেঘে শ্যামল হয়ে এসেছে। আঁচলে চোখ মুছে ভারী গলায় তরঙ্গিণী সৌদামিনীকে বললেন, আজ শনিবারের বার-বেলায় যা বলতে নেই ছেলেটা তাই বলে গেল। লেখাপড়া শিখে যেন ভূত হচ্ছে!

ও'র কথার ভঙ্গিতে ভয়ে সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে। বললে, কি হবে মা?

ওর ভয় দেখে তরঙ্গিণী হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, ভয় কি মা! ওর সব পাপ আমি নিলাম। এ কদিন আর কিছু খাব না। সামনের মঙ্গলবারে কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে পুজো দিয়ে আসব।

—আমিও যাব মা।

—যেও।

—এ তিনদিন আমিও উপোস করে থাকব মা।

তরঙ্গিণী হেসে ফেললেন, দূর পাগলী মেয়ে! তিনদিন উপোস করা কি সোজা কথা! তুমি ছেলেমানুষ, পারবে কেন?

কিন্তু সৌদামিনীও ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে, খুব পারব। আপনি দেখবেন, আমার কিছু কষ্ট হবে না।

গর্বিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তরঙ্গিণী ওর দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, হ্যাঁ মা, তুমি পারবে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার তো এখন উপোস করা চলবে না মা। নইলে, এ তো তোমারও কাজ। তোমাকে আমি বাধা দিতাম না।

শাশুড়ীর কথার ইঙ্গিতে সৌদামিনী লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল। তার ইচ্ছা ছিল, শাশুড়ীর সঙ্গে এই উপবাসটা সে করে। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিঃসন্দেহে শাশুড়ী তাকে কিছুতেই উপবাস করতে দেবেন না।

ওর ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে তরঙ্গিণী সান্ত্বনা দিলেন, কিছু ভয় পেও না মা। আমি প্রাশ্চিত্যি করলেই তোমাদের সবারই করা হবে। তুমি সীতারামকে একবার ডাকো তো মা। একবার বাজারে যাবে।

সৌদামিনী উঠে গেল।

বিকেলে সুচরিতাদের ওখানে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মনটা প্রণবের এমনই খারাপ হয়ে গেল যে, সুচরিতা এবং টেনিস কোনোটাই তাকে টানতে পারলে না। একা একা গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। ভালো লাগল না। ফোর্টের পিছনে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। নির্জন তীর। গঙ্গার জলে আধখানায় সূর্যাস্তের সোনা, আধখানায় আসন্ন সন্ধ্যার সীসা। তাইতে দুলছে কটি যূথভ্রষ্ট নৌকা।

সেইখানে প্রণব অনেকক্ষণ বসে রইল। কিন্তু সেও বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। মনে পড়ল সুচরিতাকে। বেচারা নিশ্চয় অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে করে এখন তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে যাবে বলে না যাওয়া কোনোদিন হয়নি। হয়তো ও ভাবছে, প্রণবের অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? হয়তো খবরটা নেওয়ার জন্যে বরদার উপর চাপ দিচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না। খালি মনে পড়ছে মায়ের সেই প্রদীপ্ত ভঙ্গী, সেই বিরক্তি ও আশঙ্কায় রুক্ষ দুটি চোখ। সেখানে এখনই ফিরে যাওয়া যায় না।

কিন্তু এখানে এই নির্জন নদীতীরেই বা একলা কতক্ষণ কাটাবে?

প্রণব উঠল। ধীরে ধীরে গড়ের মাঠ পার হয়ে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল এবং ট্রামে চড়ে বসল। তারপর কখন এক সময় সুচরিতাদের ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ল নিজেই টের পেল না।

সুচরিতা তার নীচের পড়বার ঘরে এসে ভাবছিল পড়তে বসবে, না গান গাইবে। বরদা প্রণবের খবর নিতে যেতে রাজি হয়নি। মনটা তার সেজন্যে একটু চঞ্চল হয়ে ছিল। তার মনে কি যেন একটা সুর গুন গুন করছিল। কথা নয়, শুধু সুর। সেই সুরও খুব স্পষ্ট নয়। যেন অনেক দিনের ভুলে যাওয়া একটা সুর।

এমন সময় সামনের বাগানের কাঁকর-বিছানো রাস্তায় অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে চাইতেই দেখলে নিতান্ত অন্য-মনস্কভাবে প্রণব হন হন করে এদিকে আসছে।

ছুটে বেরিয়ে এল সুচরিতা। মেশিন-গানের গুলীর মতো এক ঝাঁক প্রশ্ন বেরিয়ে এল তার গলা থেকেঃ টেনিস খেলতে আসেননি কেন? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? অমন করে চেয়ে আছেন কেন? শরীর ভালো আছে তো? বাড়িতে অন্য কারও অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরেই আসছিল। হঠাৎ প্রণব বললে, ঘরের মধ্যে আলোয় নয় সু। আলো সহ্য করতে পারছি না। বরদা কোথায়?

—ওপরে। ডাকব?

—আসবে এখন। চল 'লনে' গিয়ে বসিগে।

উপরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েনি এমন একটা প্রান্তে ওরা দুজনে বসল।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু চায়ের কথা বলে আসিগে দাঁড়ান।

সুচরিতা উঠছিল। প্রণব ওর হাত ধরে বসিয়ে বললে, কিছু দরকার নেই সু। তুমি বোসো, একটু গল্প কর। আমার মনটা ভালো নেই আজ।

—কেন? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন?

—না, না। তার সঙ্গে ঝগড়ার সুযোগই কম।

—সুযোগ কম কেন?

—কারণ সমস্ত দিন দুজনে দেখাই হয় না।

—সে আবার কি!

—তাই। রাত্রে আমি যখন শুতে যাই তাকে ঘুমন্ত দেখি, খুব ভোরে সে যখন উঠে যায় আমাকে ঘুমন্ত দেখেই যায়।

সুচরিতা খিল খিল করে হেসে ফেললে। বললে, আশ্চর্য কথা! জাগ্রত অবস্থায় কেউ কাউকে দেখেন নি?

—প্রায় সেই রকমই। যেন লুকোচুরি খেলা চলছে।

প্রণবও হাসলে। বললে, সব কথা শুনলে তুমি হাসবে সু। সব তুমি বুঝতেও পারবে না।

—বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারব না?—সুচরিতার সুরে কৌতূহল।

—না। তার কারণ যে-বাড়িতে এবং যে-সমাজে ও মানুষ হয়েছে, সে-বাড়ি এবং সে-সমাজ তুমি কখনও দেখনি।

—সেটা কি সমাজ?

—প্রাচীন হিন্দু সমাজ।

—আমরাও কি হিন্দু সমাজের নই?

—তোমরা আধুনিক হিন্দু সমাজের, প্রাচীন সমাজের নও।

—সে সমাজ কি এ-সমাজের থেকে আলাদা?

—মনের দিক দিয়ে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে অনেকখানি আলাদা।

—যেমন?

—যেমন তোমার দাদার সঙ্গে তোমার বৌদির রাত্রি দশটার আগে দেখা হবে না, এ তুমি ভাবতে পারো?

—সর্বনাশ! কিন্তু আপনাদের এ বাড়িটা তো আর সে-সমাজের মধ্যে নয়। এখানে প্রাচীন নিয়ম চলবে কেন?

কারণ মা রয়েছেন। তাঁর ঠাকুর-ঘরে রাধাকৃষ্ণ রয়েছেন। তা ছাড়া সদু নিজেই রয়েছে।

সুচরিতা সবিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপরে হঠাৎ এক সময় মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বললে, সব বাজে! আমাকে ঠকাবার জন্যে এই গল্প ফেঁদেছেন!

—তোমার দোষ নেই। গল্প বলেই মনে হয়। অথচ সত্যি।

সুচরিতা তেমনি করে বললে, কক্ষনো সত্যি নয়। সত্যি হতেই পারে না।

এ আপনারই দুষ্টুমি। আমি হলে দুদিনে সব দুষ্টুমি বের করে দিতাম।

প্রণব যেন চমকে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, তুমি হলে...হ্যাঁ তুমি হলে...কিন্তু তুমি তো হলে না সু।

সুচরিতার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একবার দুলেই ফের স্থির হয়ে গেল। তার মাথার উপর তারায় ভরা নীল আকাশ। আর পাশে একটি রজনীগন্ধার ঝাড় মন্দ মন্দ হাওয়ায় দুলছে।

সুচরিতা বললে, চলুন ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা যাক। দাদাকেও খবর দিই। আর, চা একটু খাবেন না?

—না সু, ধন্যবাদ।

তারপর রিস্টওয়াচটা দেখে বললে, এঃ। দশটা বাজে! এইবার ফিরতে হবে। আর ঘরে যাব না।

—দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—আজ থাক। অনর্থক দেরি হয়ে যাবে।

—তাই বলে এখানে এসে, এতক্ষণ কাটিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ভালো দেখাবে?

প্রণব ডান হাতখানা ওর কাঁধের উপর রেখে বললে, ভালো নয় মন্দ নয়,—ভালো-মন্দের অতীত কোনো লোকের খবর,—আজ নয়, যখন আরও বড় হবে, আরও বুঝতে শিখবে তখন যদি পাও আমাকে জানিও। এটা ভালো নয়, ওটা মন্দ, এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। সংসারে সমাজ আছে, সদু আছে, মা আছেন, তাঁর রাধাকৃষ্ণ আছেন,—তারই আড়ালে দুটি-একটি দুঃখী মানুষের শীর্ণ কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে কচিৎ-কখনও শুনতে পাই। তার বেশি কি কোনো দিনই পাওয়া যাবে না?

প্রণব আর দাঁড়াল না। যেমন হন হন করে এসেছিল, তেমনি হন হন করে চলে গেল।

সাত

বিকাল বেলা প্রসন্নবাবু প্রণবকে তাঁর অফিস-ঘরে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে একখানা চিঠি।

বললেন, তোমার শ্বশুরবাড়ির গুরুদেব ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে মনে আছে? বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি। শুধু পণ্ডিতই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রণবের ঠিক মনে পড়ে না। বিশেষ সকালেই প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতের প্রসঙ্গে তার মন খুব খুশি হল না। সে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল।

প্রসন্নবাবু বললেন, তোমার বিলেত যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে পল্লী-সমাজে খুব ঘোঁট প্যাকিয়ে উঠেছে। বেয়াই মশাইরা খুব বিপন্ন এবং বিব্রত। তোমাকে বোধহয় বলা হয়নি, আমাদের দীক্ষার সময় নিমন্ত্রণ পেয়ে ন্যায়পঞ্চানন মশাই এবং তোমার শ্বশুরে দুজনেই এসেছিলেন। আমি তাঁদের এখানে আহারের জন্যে বলিনি, পাছে তাঁরা বিব্রত হন।

প্রসন্নবাবু প্রণবের দিকে চাইলেন।

আবার সেই খাওয়া-ছোঁয়ার প্রশ্ন! প্রণব রিস্টওয়াচটা খুলে এই অবসরে দম দিতে লাগল।

প্রসন্নবাবু বলতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো দুটো-একটা উপলক্ষ্যের সম্পর্ক নয়। আমাদের জন্যে তাঁরা যদি সামাজিকভাবে বিপন্ন কিংবা বিব্রত হয়ে থাকেন, তাঁদেরকে আমাদের রক্ষা করা উচিত নয় কি?

এতক্ষণে প্রণব উত্তর দিলে, কিন্তু এতদূর থেকে কিভাবে আমরা তাঁদের রক্ষা করতে পারি? তাঁরা ধনী, সেখানকার জমিদার, সুতরাং যথেষ্ট প্রভাবশালী। আমাদের কাছ থেকে কি সাহায্যই বা তাঁরা প্রত্যাশা করতে পারেন?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, না, টাকা-পয়সা লোকজন নিয়ে গিয়ে তাঁদের সাহায্য করতে হবে না। বলেছি তো, তাঁরা সামাজিক-ভাবে বিপন্ন।

বিপদের পরিমাণটা জানবার জন্যে প্রণব নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে রইল।

প্রসন্নবাবু যেন আপন মনেই বলতে লাগলেনঃ

আমাদের দীক্ষার সময়ে তাঁরা এলেন, কিন্তু এ বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতে পারলেন না সমাজের ভয়ে। কাল তাঁর ছোট মেয়েটির বিয়ে হবে, বৌমা কিংবা তুমি যেতে পারবে না। কিন্তু সেও তো পরের কথা। আপাতত বৌমার সন্তান হবে। প্রথম সন্তান। প্রসূতির এসময় মায়ের কাছে থাকা খুবই দরকার। কিন্তু—

প্রসন্নবাবু চুপ করলেন।

প্রণব বললে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কি করতে পারি বলুন।

প্রসন্নবাবু বললেন, ন্যায়পঞ্চানন মশাই লিখেছেন প্রায়শ্চিত্তের কথা। সমাজপতিদের মত তিনি আদায় করেছেন।

আবার প্রায়শ্চিত্ত!

প্রণব দেবমন্দিরগুলো ভেঙে দেবার হুমকি দিয়েছিল। উপরে মা তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন,—তিনদিন নিরম্বু উপবাস। আবার প্রায়শ্চিত্ত?

শান্তকণ্ঠে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, আমার অপরাধ কি? কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

প্রসন্নবাবু বললেন, সমাজের বিধি লঙ্ঘনের অপরাধ। কিন্তু সে প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক। আমরা সমাজবদ্ধ জীব। ন্যায় অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার অন্য লোকে করবে। আমরা যে-পথে বাধা সব চেয়ে কম, সেই পথটাই বেছে নিই। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে প্রশ্ন না তুলেই আমাদের তাতে রাজি হয়ে যেতে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না।

উপেক্ষাভরে হেসে প্রণব বললে, তাতেই আমাদের সমাজ বেঁচে যাবে?

—বলেছি তো সে বিবেচনার ভার আমাদের উপর নয়। তার জন্যে বড় বড় পণ্ডিতেরা আছেন, সমাজপতিরা আছেন।

তেমনি করে হেসে প্রণব বললে, আমাদের উপর শুধু যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবার ভার!

অবিচলিতভাবে প্রসন্নবাবু বললেন, হ্যাঁ।

প্রণব নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রসন্নবাবু বললেন, ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে চিঠির জবাবটা দিতে হবে। তুমি কি ভাববার জন্যে সময় চাও।

প্রণবের বুকের ভিতর একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বললে, না, সময়ের আর কি দরকার! আপনি কি আদেশ করেন বলুন।

—কোন আদেশ করি না খোকা। আমার কোন আদেশ নেই। —প্রসন্নবাবু ব্যস্ত-ভাবে উত্তর দিলেন।

প্রণবের ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা বিদ্যুচ্চমকের মতো মিলিয়ে গেল। বললে, কিন্তু আপনি তো প্রায়শ্চিত্তের পক্ষে?

—হাঁ। আমি প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করি বলে নয়, শান্তি ফিরে পাবার এইটেই সহজ পথ বলে।

—বেশ। আপনাদের সকলের যদি তাই মত হয়, তা হলে তাই হোক।

—তা হলে ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে সেই কথাই লিখে দিই?

—দিন। কি করতে হবে আমাকে?

—তা তো বলতে পারব না। যাগ-যজ্ঞ কিছু হবে বোধ করি।

—মস্তক-মুণ্ডন কিংবা—

প্রসন্নবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন,—না, না। নিশ্চিন্ত থাকো, সে রকম কিছু

হবে না। আর,—প্রসন্নবাবুর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হাসির রেখা খেলে গেল,—শাস্ত্রে সে রকম কিছু থাকলে তারও বিকল্প ব্যবস্থা আছে।

—কি ব্যবস্থা?

—চুলের মূল্য ধরে দিলেই ফুরিয়ে যাবে।

কলকেটায় বোধ হয় আর আগুন ছিল না। গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে প্রসন্নবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

প্রণবের মাথায় আর যেন কিছু নিচ্ছে না। তরঙ্গিনীর কঠিন উপবাস তার মনের কব্জাগুলো যেন শিথিল করে দিয়েছে। আর যেন তার কাজ করবার শক্তি নেই। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সে তার অফিস-ঘরে চলে এল।

অনশনের তৃতীয় রাত্রি। নীচে থেকে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়িতেই প্রণব সৌদামিনীর গলা পেলে। তরঙ্গিনীর ঘরে মেঝেয় বসে সে সুর করে মহাভারত পড়ছিলঃ

"বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব ভাগ্যবলে।
কিন্তু সব নষ্ট হৈল নিজ কর্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি, কি করিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥"

প্রণব ঘরে এসে দাঁড়াতেই সৌদামিনী এক গলা ঘোমটা টেনে পড়া বন্ধ করে দিলে।

রাত্রি দশটা হবে। তরঙ্গিনী খাটে চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে পাঠ শুনছিলেন। সৌদামিনী পড়া বন্ধ করতেই চোখ মেলে প্রণবকে দেখে হাসলেন।

দুদিন প্রণব লজ্জায় এদিকে আসেনি। দুদিন প্রণবকে তিনি দেখেন নি। তরঙ্গিনী হাসলেন, অপূর্ব সে হাসি। মুখখানি উপবাসে কৃশ। তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো শীর্ণ হাসি। চাঁদের মতোই সুধায় ভরা।

বললেন, বৌমা, খোকার খাবার জায়গা এই ঘরের মেঝেয় করে দাও।

প্রণব বললে, বাইরে থেকে আমি খেয়ে এসেছি মা। আমার খাবার ইচ্ছে নেই।

গত দুদিন ধরে প্রণব খাচ্ছে না। দুপুরে একবার বসতে হয়, বসে। রাত্রে বাইরে থেকে খাওয়ার অজুহাতে না খেয়েই থাকে। তরঙ্গিনীর কানে গেছে সে কথা।

বললেন, জানি। দুদিন ধরেই তোমার ক্ষিধে নেই, বাইরে থেকে খেয়ে আসছ। দুষ্টুমি না করে খেতে বোসো।

কী শীর্ণ তরঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর! কিন্তু স্পষ্ট, কোথাও জড়তা নেই।

শান্ত ছেলের মতো প্রণব খেতে বসল। মায়ের চোখের সামনে তাকে পেট ভরেই খেতে হল। নিঃশব্দে খেয়ে উঠে নিজের ঘরে শুতে গেল।

একটু পরে সৌদামিনী পান দিতে এল। বললে, আমি আজকে মায়ের ঘরেই শোব।

—কেন?

একটু দ্বিধা করে সৌদামিনী বললে, এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু নাড়িটা ওঁর দুর্বল। রাত্রে একজন কাছে থাকা ভালো। হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়।

—তাই শোওগে। দরকার মনে করলে আমাকেও ডেকো।

একটু থেমে সৌদামিনী বললে, একটা কথায় কি কাণ্ড বাধালে বল তো?

প্রণব প্রথমে লজ্জিতভাবে বললে, হুঁ।

তারপরে বললে, কিন্তু এ বোধ হয় ভালোই হল সদু।

—কেন?

—মাঝে মাঝে অল্প অসুখ-বিসুখ শুনেছি ভালো। সেই সুযোগে ডাক্তারে এসে গোটা শরীরটা দেখে যেতে পারেন। তাতে করে কোনো কোণে কোনো বড় রোগ গোপনে বাসা বাঁধার সুযোগ পায় না।

সৌদামিনী কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে। বললে, তার মানে তুমি বলতে চাও, যার মনে আরও যা বড় পাপ আছে, এই সুযোগে তাও ধরা পড়ে যেতে পারে?

—পারেই তো। উপবাসটাই মা করছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত তো আমাদের সবারই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্তত আমার তো আরম্ভ হয়ে গেছেই।

অবাক হয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার আবার কি বড় পাপ?

—সদু, পাপের কি কোন বিশেষ একটা চেহারা আছে? কারও বা ধোপদুরস্ত পাপ, কারও বা ময়লা। আবার তুমি যাকে পুণ্য মনে কর, আমি হয়তো তাকে পাপ মনে করি; আমি যাকে পুণ্য মনে করি, তুমি হয়তো তাকেই পাপ মনে কর।

সৌদামিনী অবাক হয়ে গেল। অন্য সময় হলে এ কথায় হয়তো তার হাসি আর থামতে চাইত না। কিন্তু ওঘরে মা উপবাসী। হাসির সময় এখন নয়।

তাই বললে, তাই আবার হয় নাকি! পাপ যা তা সবারই কাছে পাপ, পুণ্য পুণ্য।

প্রণব হেসে বললে, সত্যযুগের মানুষের সময় তাই ছিল বটে। কিন্তু এটা তো আর সত্যযুগ নয়। এই লম্বা সময়ের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিতে অনেক গিঁট পড়েছে। এখন আর জিনিসটা অত সোজা নেই। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে সকলের বোধও এখন এক রকম নয়, বিচারও তার এক রকম হয় না।

সৌদামিনী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন অনেক কথা এইটু সময়টুকুর মধ্যে ভাববার চেষ্টা করলে।

বললে, তোমার কথা শুনি যখন, ভারী মিষ্টি লাগে। তারপরে যখন নিরিবিলি ভাবতে বসি, বুঝতে পারি না তুমি ঠাট্টা করলে না সত্যি বললে।

—তোমার মেমসাহেব আসছেন?—প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

—এই দুদিন আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।

—আরও কিছুদিন তোমার মেমসাহেব আসুন, আরও খানকয়েক ইংরিজি বই পড়, তখন বুঝবে আমি ঠাট্টা করিনি।

এবারে সৌদামিনী কড়া করে বললে, কিন্তু এও তো বাপু অন্যায়! ইংরিজি বই না পড়লে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বোঝা যাবে না?

—যাবে, কিন্তু অন্য রকম করে। ইংরেজদের একটা কি সুবিধা জানো, জাত হিসাবে ওরা খুব ভক্তিমার্গের নয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বিচারে ভক্তির চেয়ে বুদ্ধিটাকেই ওরা ব্যবহার করে। আমরা ব্যবহার করি ভক্তিটাকে। কাজেই আমাদের বুঝের সঙ্গে ওদের বুঝ সব জায়গায় মেলে না।

—তাই তোমার সঙ্গেও আমাদের মিলছে না? কিন্তু বাবাও তো অনেক ইংরিজি পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে তো মেলে।

প্রণব হাসলে। বললে, কি জানি। আমার সন্দেহ আছে, চুপ করে থেকে উনি মিলিয়ে নেন।

একটু চুপ করে থেকে সৌদামিনী বললে, মেয়েটাকে কাল আমি ছাড়িয়ে দোব জানো?

প্রণব চমকে উঠল,—সে ভদ্রমহিলার অপরাধ?

—অপরাধ কিছু নেই। আমাদের ঠাকুরমশাই বলেন, মানুষের বুদ্ধির একটা সীমা আছে। সব কিছুই বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না। এমন অবস্থায় তার উপর নির্ভর করার চেয়ে ভক্তির উপর নির্ভর করাই সুবিধা।

হেসে প্রণব জবাব দিলে, নিশ্চয়ই সুবিধা। কিন্তু তোমাদের পক্ষে নয়, সুবিধাটা ঠাকুর মশাইদের পক্ষে। বুদ্ধির সীমা আছে বললে? সত্যি কথা। সেজন্যে তার ভুলেরও সীমা আছে। কিন্তু ভক্তির নিজেরও যেমন কোন সীমা নেই, তার ভুলেরও না। ঠাকুরমশাইদের—

—আচ্ছা থাক। তুমি আবার সেই রকম কথা আরম্ভ করলে। আমি চললাম। আলোটা কি জ্বলবে?

প্রণব আবার হাসলে। বললে, আমার ঘরের আলো জ্বলবে সদু, ওকে জ্বলতে দাও।

আবার সেই হেঁয়ালি। হেঁয়ালি সৌদামিনী বুঝতেও পারে না, সইতেও পারে না।

বললে, জ্বলুক তাহলে।

বলেই সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট করেই প্রণব সিনিয়রের বাড়ি বেরিয়ে গেল।

পুরোহিত মহাশয়ের আসতে একটু দেরিই হল। তিনি আসতেই সৌদামিনী, একজন ঝি এবং আরও দুজন চাকর নিয়ে তরঙ্গিনী গাড়ি করে কালীঘাট যাত্রা করলেন। তখন তাঁর নাড়ি একটু দুর্বল বটে, কিন্তু মন বেশ সবলই রয়েছে। নিজেই সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গাড়িতে উঠলেন। গঙ্গার ঘাটে নিজেই গাড়ি থেকে নেমে স্নান করে এলেন। এবং মায়ের মন্দিরেও চমৎকার হেঁটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন।

পুজোর শেষেও এক ফোঁটা চরণামৃত ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। সৌদামিনীর ইচ্ছা ছিল, তরঙ্গিনীকে একটু সরবৎ খাইয়ে গাড়িতে তোলে। কিন্তু তরঙ্গিনী কিছুতে রাজি হলেন না। বাড়ির বাইরে পাঁচজনের ছোঁয়া-নাড়া আহার্য-পানীয়ে তাঁর বরাবরই বিতৃষ্ণা।

বললেন, আর তো কিছু নয় মা। খালি শরীরটা ভীষণ হাল্‌কা বোধ হচ্ছে। একটু হাওয়াতেই টলে যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছু অসুবিধা নেই।

দেখা গেল, নিতান্ত মিথ্যা তিনি বলেননি।

বাড়ি ফিরে আধ গ্লাস মিছরির সরবৎ খেয়ে তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ শুয়ে রইলেন। ঘণ্টাখানেকও নয় বোধ করি। প্রণব যখন খেতে বসল, প্রতিদিনকার মতো তিনি তার খাওয়ার সামনে বসে। মুখে প্রতিদিনকার তেমনি মিষ্টি হাসি।

—তোমার দুর্বল বোধ হচ্ছে না তো মা?—ভয়ে ভয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

—শোনো ছেলের কথা! উপোসে মেয়েদের কি কিছু হয় রে! কিছুই হয় না। বার ব্রত আমাদের তো লেগেই আছে। কষ্ট হলে কি পারতাম!

প্রসন্নবাবুও পাশেই খেতে বসেছিলেন। অনশনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাও তিনি বলেননি। এখন তরঙ্গিনীকে অনেকটা সুস্থ দেখে পরিহাসের প্রলোভন সামলাতে পারলেন না।

বললেন, আমি তো বাড়ি বসে প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, এখনই লোক আসবে খবর দিতে যে, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

তরঙ্গিনী হেসে বললেন, সে ভাগ্য কি করেছি! তোমাকে রেখে, ছেলে ছেলের বৌকে রেখে যেদিন যাব, সে তো আমার সুখের দিন।

প্রসন্নবাবু বললেন, যাই বল, তোমার নাড়ির অবস্থা দেখে ডাক্তারের মুখের ভঙ্গী যেমন হল, তাতে মনে মনে আমি ভয়ই পেয়েছিলাম।

তরঙ্গিনী আবার হেসে উঠলেন। বললেন, দেখ তোমার ওই ডাক্তারের কথা আর আমাকে বলো না। ওরা কিছু জানে না। মানুষ যে শুধু নাড়ির জোরে বেঁচে নেই, এইটেই ওরা বোঝে না। আমার তো কিছু ভয় হয়নি। ডাক্তারে যখন বললে, ওঁকে বিছানা থেকে উঠতে দেবেন না, আমি তো হেসেই বাঁচি না।

প্রণব বললে, কিন্তু সত্যিই যদি তোমার একটা কিছু হত মা!

ওর ভীত মুখের দিকে চেয়ে তরঙ্গিনী খুব কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, হলই বা রে! ওইখান থেকে ওইটুকু ক্যাওড়াতলা, তোরা আমাকে কাঁধে করে ফেলে দিয়ে আসতে পারতিস না?

প্রণব হাসতে পারলে না। বললে, চিরজীবন এ খেদ আমার রয়ে যেত যে, তোমাকে আমি মেরে ফেললাম।

প্রসন্নবাবু বললেন, কাঁকড়া তার বাচ্চাগুলোকে বুকের মধ্যে রাখে, যতদিন না বেরবার মতো বড় হয়। সেইখানে থেকে তারা মায়ের রক্ত-মাংস কুরে কুরে খেয়ে বড় হয়। তারপর একদিন দেখা যায়, মা'টা মারা গেছে। গায়ের শক্ত খোলাটা ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। সেই শুকনো খোলা থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাগুলো আনন্দে নৃত্য করছে। খোকা, কাঁকড়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত স্থূল বলে আমাদের চোখে পড়ে, মানুষেরটা আর চোখে পড়ে না।

প্রণবের হাতের গ্রাসটা মধ্যপথেই থেকে গেল। বললে, আপনি বলছেন মানবশিশুও অমনি করে তার মাকে মেরে ফেলে?

—অবিকল। শুধু অমনি স্থূলভাবে নয়। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উনি মরতে চলেছিলেন, এটা চোখে পড়বার মতো বড়। কিন্তু প্রতিদিন তোর জন্যে তিল তিল করে উনি যে জীবন দিচ্ছেন, সে তো চোখে পড়ার নয়?

উদ্যত গ্রাসটা মুখের মধ্যে পুরে নিরুত্তরে প্রণব কি যেন ভাবতে লাগল।

আট

তরঙ্গিনীর অনশন প্রণবের মনের উপর প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে। সে স্থির করলে, শুধু তরঙ্গিনীর সঙ্গেই নয়, এ বাড়িতেই আর ধর্ম কিংবা সমাজ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নয়। করার কোনো আবশ্যকও নেই। এ বাড়ির কেউ তো তার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। নিজের পথে অবাধে চলবার স্বাধীনতা যখন তার রয়েছে, তখন অকারণে অন্যের পথ মাড়াবার আবশ্যক কি?

কিন্তু এখন থেকে তরঙ্গিনী সম্বন্ধে তার মনে একটা নিদারুণ ভয়ের উদ্রেক হল। তিনি বুদ্ধি দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করেন না। তর্ক করে কাউকে দলে আনতে চান না। তর্ক করে তাঁকে দলে আনাও যায় না। অথচ তাঁর একান্ত আপনজনের বাক্যে অথবা আচরণে যখনই মনে হবে ধর্ম ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তখনই প্রায়োপবেশন করবেন! এও তো বড় ভয়ংকর কথা!

প্রায়শ্চিত্তে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাকে সে ভালোবাসে এবং মায়ের অনশনে ভয় পেয়ে গেছে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করলে। ন্যায়পঞ্চানন মশাই স্বয়ং এবং শিবশংকর প্রায়শ্চিত্ত-সভায় উপস্থিত রইলেন। চুলের মূল্য ধরে দেওয়া হল। সুতরাং প্রণবের হাইকোর্ট যাওয়ার কোনো অসুবিধা হল না। একথাটা লজ্জায় বন্ধুমহলে সে বলতেই পারলে না। চেপে গেল।

প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস প্রসন্নবাবুও হয়তো করেন না। তাঁর মতো আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাপারটা নিতান্তই একটা সুবিধাজনক সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু উভয় পক্ষের অন্য সকলেই এই শ্রেণীর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী। মোট কথা, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এতে খুশি হলেন।

ন্যায়পঞ্চানন এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। শিবশংকরের উপায় ছিল না। সৌদামিনীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক-গৃহে তিনি অন্নগ্রহণ করতে পারেন না। সন্তান হবার জন্যে সৌদামিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার সময় তিনি বেয়াই-বেয়ানকে শাসিয়ে গেলেন, মা আনন্দময়ী যদি মুখ তুলে চান, তিনি নিজেই সৌদামিনীকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন এবং সেই সময় পরীক্ষা হবে তাঁরা কত খাওয়াতে পারেন!

কি একটা পর্বোপলক্ষ্যে সেদিন ছুটি ছিল। প্রণবকে কোর্টে যেতে হয়নি। সেদিন প্রথম সৌদামিনী দিনের বেলায় তার ঘরে এল এবং অনেকক্ষণ রইল।

মনটা তার ভারী।

বললে, সবাই সন্দেহ করে তুমি আমার ওপর রেগে আছে। কিন্তু আমি জানি তা সত্যি নয়।

প্রণব ওর একখানি হাত ধরে নিজের পাশে বসালে। জিজ্ঞাসা করলে, তাই নাকি! কি করে জানলে?

সগর্বে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সৌদামিনী বললে, জানি। তুমি বল না সত্যি কি না।

—সত্যি। আমার সম্বন্ধে যা তুমি জানবে, তাই সত্যি।

—কি করে? তোমাকে আমি ভুল বুঝতেও তো পারি।

—পারো। কিন্তু তা হলেও সেই ভুলটাই সমস্ত সত্যের চেয়ে বড়।

সৌদামিনী অবাক হয়ে গেল। প্রণবের কথা অনেক সময়েই তার হেঁয়ালি মনে হয়।

বললে, সে আবার কি! ভুল কখনও সত্যির চেয়ে বড় হয়?

—হয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হয়।

—কি করে?

—সে বুঝতে গেলে, আজ তো আর ট্রেন পাবে না সদু। বাপের বাড়ি গিয়ে রাত্রে তেতলার ছাদে উঠে আকাশের শুকতারার দিকে চেয়ে হঠাৎ যদি মনে হয় ওটা তারা নয়, আমারই চোখ, তোমারই বিরহে ছলছল করছে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে।

সৌদামিনী একটু চিন্তা করে বললে, তারা দেখে আমার কখনও ওরকম মনে হয় না।

—এবারে হতে পারে। না হলে তুমি ফিরে এস, তখন বুঝিয়ে দোব।

—তাই দিও।

—বাপের বাড়ি যেতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—তা আবার হবে না? তবু মাঝে মাঝে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—কেন? উত্তর দাও। কেন বল?

সৌদামিনীকে বলতে হল, তোমার জন্যে।

এবং এইটে বলতেই তার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। তারপরে মাথা তুলে বললে, দিনের বেলায় তোমার ঘরে আসি না, তোমার সঙ্গে গল্প করি না, তুমি কত রাগ কর। তুমি তো জানো না, তোমার ঘরে না এলেও তোমার কাছাকাছিই আমি থাকি। আমি চলে গেলে বুঝতে পারবে।

—এখনও পারি। কিন্তু খুব ভালো বুঝতে পারি না।

দুজনেই হেসে উঠল।

এবারে সৌদামিনীই ওর একখানা হাত চেপে ধরলে। বললে, তুমি কবে বর্ধমান যাচ্ছ বল।

—খোকাকে দেখতে যাব।

সৌদামিনীর মুখ পলকের জন্যে রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা ঝেড়ে ফেলে বললে, তার আগে যাবে না?

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি উঠে...

—তুমি ডাকলেই যাব।
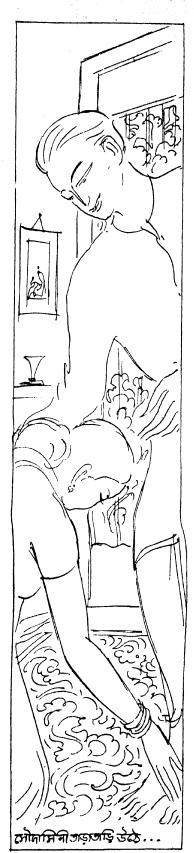
—আমি তো এখন থেকেই ডাকতে আরম্ভ করলাম। চল।

—তোমার সঙ্গে? গাড়ু-গামছা নিয়ে?

—হ্যাঁ।

বাইরে কার যেন পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি উঠে প্রণবের পায়ের ধুলো নিলে।

প্রণব বাধা দিয়ে বললে, ও আবার কি হচ্ছে?

পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সৌদামিনী বললে, ওই তো আমাদের সম্বল গো! সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া আর তোমাদের পায়ের ধুলো।

তারপর ব্যস্তভাবে বললে, কে বোধ হয় ডাকতে এসে ফিরে গেল। কী লজ্জা! তুমি কিন্তু যেতে দেরি করো না, বুঝলে?

দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে তখনই আবার সে ফিরে এল। বললে, আমার কেমন যেন ভয় করছে, জানো?

তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

—না, ভয় কি! ভয় কিসের!

—কি জানি কিসের। তুমি কিন্তু যেতে দেরি করো না।

আবার একবার প্রণবের পায়ের ধুলো নিয়ে চোখের জল মুছে সৌদামিনী চলে গেল।

সৌদামিনী চলে যাওয়ার পরে দুটো তত্ত্ব প্রণবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথম, সৌদামিনী সত্যই সব সময় তার কাছে কাছে ছিল; দ্বিতীয়, সুচরিতার উপর তার যে আকর্ষণ সেটা অহেতুক নয়। সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার কারণ আছে।

প্রথম তত্ত্ব পরিষ্কার হল সহজেই। দেখলে, তার কোর্টে যাওয়ার পোশাক এখন আর ঠিক ধোপ-দুরস্ত থাকে না। শার্ট, কোট এবং ট্রাউজারের ভাঁজ ভেঙে যাচ্ছে। ভুলে খালি সিগারেটের টিন পকেটে করে নিয়ে গিয়ে মুস্কিলে পড়ে। সকালের দ্বিতীয় পেয়ালা চা'টা সবদিন আসে না। নিয়মিতভাবে জুতোয় কালিও পড়ে না। দুপুরের টিফিনটাও যেন একঘেয়ে হচ্ছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটা এত সহজে বোঝা গেল না। বিকেল হলেই সুচরিতা তাকে টানে। প্রণব মনকে প্রবোধ দেয়, ওটা সুচরিতার জন্যে নয়, টেনিস খেলার জন্যে। কিন্তু যখন দেখলে সুচরিতার আসন্ন পরীক্ষার সামনে টেনিস খেলা বন্ধ থাকলেও টান একটা বাজছে এবং তার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের সামনে ভাসছে টেনিস-বল নয়, সুচরিতার মুখখানি এবং

পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও বোসেদের টেনিস-লন তাকে টানতে পারছে না, তখন মনে হল এই টানটা অহেতুক নয়। এর সম্বন্ধে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

কিন্তু কি সতর্ক হবে সে? কি সতর্ক হতে পারে? সে সুচরিতাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু কি অজুহাতে ছেড়ে দেবে? বন্ধুর বাড়ি, যেখানে ঘন ঘন তার যাতায়াত, সুচরিতা ছাড়াও যেখানে আরও অনেকে আছে, যাদের সঙ্গে তার মনে বন্ধন পড়েছে—তাদের সে ছাড়বে কি বলে? তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে না?

জাগুক। প্রণব নিজেকে শক্ত করলে। সে সব প্রশ্নের জবাব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবেই। না পাওয়া যায়, না যাবে। কিন্তু সুচরিতাদের বাড়ি আর নয়।

এক মাসেরও উপর সে সুচরিতাদের বাড়ি গেল না।

তখন সবে শীতের আমেজ পড়েছে। সেদিনটা কিসের যেন ছুটি। সকালে সিনিয়রের বাড়িও যাবার নেই। প্রণব সকালবেলায় খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় একখানা গাড়ি এসে ওদের বাড়ির গেটে থামল। আর তার থেকে কলরব করতে করতে নেমে এল সুচরিতা ও বরদা।

ওর হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিয়ে সুচরিতা বললে, চলুন।

—কোথায়?

—বোটানিকস্‌সে।

—সেখানে কি?

—পিকনিক।

—তার মানে?

বরদা মানেটা বুঝিয়ে দিলেঃ সুচরিতার টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। মা ওকে ক'টা টাকা দিয়েছেন পিকনিকের জন্যে। এবং যেহেতু আমাদের আজ কোর্ট নেই, সেহেতু আমাদেরও ওর সঙ্গে যেতে হবে!

প্রণব হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে তুমি এবারে এণ্ট্রান্স দিচ্ছ, একথা এখন বলা চলে?

—না। এখনও না।—সুচরিতা জবাব দিলে,—টেস্টের ফল না বেরনো পর্যন্ত নয়। চলুন, উঠুন। আমাদের আবার মার্কেট হয়ে যেতে হবে।

—সর্বনাশ! কপালে চোখ তুলে প্রণব বললে, —রাঁধছেন কে?

—আমি।—সগর্বে সুচরিতা জবাব দিলে।

বরদা সঙ্গে সঙ্গে বললে, কিন্তু মা সঙ্গে এত ফল আর মিষ্টি দিয়েছেন যে, তুমি নির্ভয়ে আসতে পার।

ঘাড় বেঁকিয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে সুচরিতা বললে, তার মানেটা কি হল? আমি রাঁধতে জানিনা, আমার রান্না মুখে দেওয়া যাবে না, এইতো?

বরদা সবিনয়ে বললে, তা জানি না। তবে, আমার অবশ্য নয়, কিন্তু প্রণবের মনে সেই প্রশ্নটাই উঠেছে। মুখে ওর এক ফোঁটা রক্ত নেই, দেখছিস না?

—দেখছি। তোমরা দুজনেই খুব সাধু! তারপরেই প্রণবকে আবার একটা তাড়া দিলে,—নিন, উঠুন। 'The taste of the pudding is in the eating.' খেয়ে বুঝবেন রাঁধতে পারি কি না।

তাড়া খেয়ে প্রণব বিব্রতভাবে বললে, এই পোশাকে যাব?

—ক্ষতি কি! শ্বশুরবাড়ি তো আর যাচ্ছেন না!

—তা হলেও এই মর্নিং গাউনটা।

—আচ্ছা, ওটা বদলে একটা চাদর গায়ে দিয়ে আসুন। তিন মিনিট সময় দিলাম।

অন্যরূপ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও প্রণবকে যেতে হল।

ওরা যখন খেতে বসল, সুচরিতা ওদের তাক লাগিয়ে দিলে। প্রত্যেকটি রান্না ভালো হয়েছে।

বরদা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোকে তো রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় কোনোদিন যেতে দেখলাম না। এমন রান্না শিখলি কোথায়?

—খাওয়া যাচ্ছে?

—চমৎকার হয়েছে!

সুচরিতা প্রণবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার অভিমত কি? বাড়ি গিয়ে নিন্দে করবেন তো?

—সে যদি করি তো স্বভাবের দোষে। সুচরিতা, তুমি কি বাড়ির মাপে রেঁধেছ, না বাইরের মাপে?

—বাড়ির আর বাইরের মাপ কি পৃথক?

—নিশ্চয়ই। বাইরে ক্ষিধে বাড়ে।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল। সামনে রান্নাগুলো সাজানো ছিল। যার যা প্রয়োজন, বাঁ হাতে করে চামচ দিয়ে তুলে নিচ্ছে।

সুচরিতা বললে, দুর্জনের স্বভাব বদলায় না। তবু আপনার যত খুশি প্লেটে তুলে নিতে পারেন, যদিও জানি খাওয়ার পরে নিন্দে আপনি করবেনই।

হঠাৎ প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, সুচরিতা, চাকরটার রান্না খাইয়ে ব্রাহ্মণের জাত মারলে না তো? এবারে তা হলে আর মাকে বাঁচানো যাবে না।

—সে আবার কি?

প্রণব মায়ের অনশনের গল্পটা ওদের শুনিয়ে দিলে। শুনে ওরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আহারান্তে সুচরিতা বললে, সাহেবরা তো খাবার খেয়ে সারা সকাল দিব্যি ঘুরে বেড়ালেন, আর আমি বেচারী সমস্তক্ষণ হাঁড়ি ঠেললাম।

বরদা ঘাসের উপর মিষ্টি রোদে শুয়ে পড়ে বললে, এবার মেমসাহেব ঘুরে আসুন, সাহেবরা ঘাসে গড়াগড়ি দিক।

—বারে! আমি একা একা কোথায় ঘুরব?

—'মুক'কে সঙ্গে নাও। ও গল্প করেছে বেশি, খেয়েছে কম, হয়তো পারবে তোর সঙ্গে ঘুরতে। আমার নড়বার ক্ষমতা নেই।

সুচরিতা প্রণবের দিকে চাইতেই সে বললে, কি আর দেখবে সু। খালি গাছ!

—গাছই দেখব। উঠুন।

প্রণবকে উঠতে হল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে সুচরিতাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বললে, খেয়ে-দেয়ে বেশি ঘোরা যায় না। এইখানে একটু বসি আসুন।

বসার পরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এতদিন আসেননি কেন, বলুন তো?

—তোমার পরীক্ষার জন্যে।

—আমি কি চব্বিশ ঘণ্টাই পড়ি? আধ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে গল্প করতে পারতাম না?

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা ওকে ঠেলা দিলে,—বলুন, কেন আসেন নি?

—সে একটা খুব আশ্চর্য কারণ। নাই শুনলে।

—না, শুনব। বলুন।

—যদি সইতে না পারো?

—তবু শুনব। দেখি সইতে পারি কিনা। বলুন।

—তা হলে শোন। আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে গেছেন।

—স্ত্রীমাত্রেই গিয়ে থাকে। তার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে?

—আশ্চর্যটা তার মধ্যে নয়, পরে।

—তা হলে সেই পরের কথাটাই আগে বলুন।

—তিনি যাওয়ার পরে আবিষ্কার করলাম, তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। অথচ সে পথে বহু সামাজিক বাধা। সুতরাং সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। তাই যাইনি।

তার স্বীকৃতির দুঃসাহসী ঋজুতায় সুচরিতা মুহূর্তে কয়েক স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার দৃষ্টি আটকে গেল ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাথায় যেখানে এক ফালি রোদ ঝলমল করছে সেইখানে। কিন্তু পৃথিবী একটু দুলেই ফের স্থির হয়ে গেল। সেই দিকে চেয়েই সুচরিতা বললে, কিন্তু তবু আপনাকে আসতে হল। বুঝলেন,

যথেষ্ট সতর্ক কিছুতেই হওয়া যায় না?

—তোমার হাতের সুন্দর রান্নার বিনিময়ে তাও বুঝলাম।

সুচরিতার দৃষ্টি তখনও সেই ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথার উপরেই। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি।

কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করলে, এখন হয়তো আমার শেষ পরীক্ষার পড়া আরম্ভ হবে। তার পরেও তো আসবেন না?

—না আসাই তো বাঞ্ছনীয় সু।

—কোনোদিনই তো আর আমাদের দেখা হবে না?

—না হওয়াই কি উচিত নয়?

সুচরিতা জবাব দিলে না। তার ঠোঁটের কোণে আবার একটা বাঁকা হাসি ঈষৎ ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল।

বললে, চলুন, ওঠা যাক এইবারে।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলে, পাস করতে পারলে কি পড়ব বলুন তো,—সায়েন্স না আর্টস?

প্রশ্ন শুনে প্রণব থমকে গেল। এতক্ষণ ধরে আড়চোখে সুচরিতাকে সে লক্ষ্য করে আসছিল। একটা হাল্‌কা মেঘ তার মুখের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে খেলে যাচ্ছিল। এর মধ্যে কখন তার মুখ সহজ হয়ে গেছে টের পায়নি। এমন সহজ একটা প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে বললে,—তোমার কোন্‌টা ভালো লাগে?

সুচরিতা হেসে জবাব দিলে, ভালো লাগালাগি আর কি! আমরা তো খুব ভালো ছাত্রী নই। আমাদের ভালো লাগিয়ে নিতে হয়।

—তবে আর কি! বিয়ের বাজারে আর্টস্ আর সায়েন্সের একই মূল্য।

—যা বলেছেন!

বলে সুচরিতাও ওর সঙ্গে হাসতে লাগল।

নয়

মাঘের মাঝামাঝি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল: সৌদামিনীর অবস্থা উদ্বেগজনক; চলে আসুন।

তরঙ্গিনী কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর যাবার উপায় নেই। ছেলের শ্বশুর বাড়ি যাওয়া যায় না। প্রসন্নবাবু বোঝালেন, তিনি গিয়েই সৌদামিনীর অবস্থা সম্বন্ধে টেলিগ্রাম করবেন। দরকার বুঝলে, লোকও পাঠাতে পারেন।

প্রথম যে ট্রেনটা পাওয়া যায়, তাইতেই প্রসন্নবাবু এবং প্রণব বর্ধমান চলে গেলেন। সঙ্গে ঝগড়ু চাকর। বাচ্চা চাকর, সৌদামিনীর বড় অনুগত। সে কিছুতেই ছাড়লে না।

তরঙ্গিনী বললেন, নিয়ে যাও ওকে। বৌমাকে বড় ভালবাসে ছেলেটা। দরকার বুঝলে ওকেই পাঠিয়ে দিও এখানে। ও রাস্তা চেনে। স্টেশন থেকে একলাই আসতে পারবে।

গাড়িটা ও'দের স্টেশনে পেঁছে দিয়ে ফিরে আসতেই তরঙ্গিনী একটা ঝি সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট চলে গেলেন। বৌমার জন্যে মায়ের কাছে ধর্ণা দেবেন। সরকারকে বলে গেলেন, যখন যে খবর আসবে তৎক্ষণাৎ কেউ গিয়ে যেন তাঁকে জানিয়ে আসে।

প্রসন্নবাবুরা গিয়ে পেঁছলেন বিকেল বেলায়। শিবশঙ্করবাবু অনুমান করেছিলেন, শুধু প্রণব নয়, প্রসন্নবাবুও আসবেন। সুতরাং স্টেশনে দুখানি পালকি গিয়েছিল।

সেখানেই গমস্তার কাছে খবর পেলেন, একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, কিন্তু প্রসূতির অবস্থা ভালো নয়। শহর থেকে বড় ডাক্তার এসে কাল রাত্রি থেকে রয়েছেন। আর টাকা যা খরচ হচ্ছে বাবু!

টাকার কথা শোনবার ধৈর্য ও'দের নেই। তৎক্ষণাৎ পালকি করে ওঁরা ছুটলেন।

গিয়ে দেখলেন, বালাখানার বাইরে দুপ্রান্তে দুখানা তক্তপোশে কালীশঙ্কর ও শিবশঙ্কর বসে।

কালীশঙ্কর কাঁদছেন না। চোখে তাঁর জল নেই। শুধু থেকে থেকে তাঁর বিশাল বপু কেঁপে উঠছে আর কেমন একটা আশ্চর্য কণ্ঠে মাঝে মাঝে ডাকছেন,—মা, মা! সে ডাক শুনলে মানুষের বুকের রক্ত স্তব্ধ হয়ে যায়।

আর ও পাশের তক্তপোষে তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে অঝোরে কাঁদছেন শিবশঙ্কর। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অবরুদ্ধ কান্নার দমকে দেহটা আন্দোলিত হচ্ছে, সেইটে বোঝা যাচ্ছে।

বালাখানার ভিতরে শহরের বড় ডাক্তার এখানকার দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে ফিস ফিস করে কি আলোচনা করছেন।

প্রসন্নবাবু এবং প্রণব কালীশঙ্করের সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁর শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। শিবশঙ্কর ছুটে এসে প্রসন্নবাবুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

ও'রা বুঝলেন, সব শেষ!

ব্যাপার দেখে ভিতর থেকে স্থানীয় একজন ডাক্তার বেরিয়ে এসে ধমক দিলেন, ওকি করছেন বড়বাবু! ও'দের ভিতরে নিয়ে যান। ওরে, কে আছিস!

চাকরকে দিয়ে প্রসন্নবাবুদের আসার খবর ভিতরে পাঠানো হল। শিবশঙ্কর ও'দের সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

অন্দর নিস্তব্ধ। শুধু একটা চাপা কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠছে। তার ফলে সেই স্তব্ধতা যেন অসহ্য ভারী হয়ে উঠেছে। তখনও সব শেষ হয়নি।

নীচে একটা বিছানায় সৌদামিনী শুয়ে শান্তভাবে। দুর্বল দেহ নড়াচড়া করবার শক্তি রাখে না। ক্লান্ত চোখ অর্ধনিমীলিত। অদূরে পৃথক শয্যায় নবজাত শিশু শুয়ে।

নীচের তলায় এই অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে কুঠুরিটিই এ বাড়ির সনাতন আঁতুর ঘর। সন্তান প্রসবের প্রথম কয়েকটি দিন, যে ক'টি দিন প্রসূতির জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এইখানেই তাকে কাটাতে হয়।

আরও নোংরা ছিল। শহরের বড় ডাক্তারের ধমকে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবু এই পরিষ্কৃত ঘর দেখেই প্রসন্নবাবু এবং প্রণব উভয়েই শিউরে উঠলেন।

কিন্তু প্রতিবাদের সময় এটা নয়। সময় যদি হত, তা হলেও প্রতিবাদ নিষ্ফল। যে শুনবে, সেই হাসবে। সূতিকাগার শাস্ত্রমতে অশুচি। সেটা তো আর সত্যই শয়নঘরে হতে পারে না। আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষের লোক এমনি ঘরেই জন্মে আসছে। তার ফল যে বিশেষ খারাপ হয়নি, ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা তার প্রমাণ। আজ দুপাতা ইংরেজি পড়ে সনাতন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উলটে দেবার চেষ্টা করলে চলবে কেন?

ও'রাও কিছু বললেন না। নিঃশব্দে ভিতরে এলেন।

প্রসন্নবাবু ডাকলেন, বৌমা!

সৌদামিনী শুনতে পেলে কি না বোঝা গেল না। শুধু একখানা হাত এলোমেলোভাবে ও'দের দিকে বাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। প্রণব ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেই হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলে।

প্রণবের হাতখানিকে সেই শীর্ণ অবশ হাত যেন ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতে লাগল গলার দিকে, গালের দিকে, ঠোঁটের দিকে। সৌদামিনী একটুখানি হাঁ করলে এবং প্রণবের হাতটা মুখের ভিতরে আসতেই যেন জোরে কামড়ে ধরতে গেল।

স্থানীয় একজন ডাক্তার এসে গিয়েছিলেন, বোধ হয় একটু আগে যে ঔষধটা দেওয়া হয়েছে তার ফলাফলটা দেখবার জন্যে।

প্রণবের হাতটা ওর মুখের মধ্যে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি সাবধান করে দিলেন,—কামড়ে দেবে। সরিয়ে নিন হাতটা। ও বিকারের ঘোরে রয়েছে।

তাই বটে। প্রণব তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলে।

প্রসন্নবাবু রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তারের পিছু পিছু। ঘরে বসেই প্রণব শুনতে পেলে, ডাক্তার ইংরিজিতে

প্রসন্নবাবুকে বললেন, কোনো আশা নেই। আর কয়েকটা মিনিট।

নিঃশব্দে একা বসে রইল প্রণব। শাশুড়ী ধীরে ধীরে পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

কোনো আশা নেই! আর কয়েকটা মিনিট —কয়েকটা গুরুভার স্তব্ধ মিনিট। ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দ হবে না, কিন্তু মিনিট কয়টি কেটে যাবে। মনে হবে, সেকেণ্ড নেই, মিনিট নেই, ঘণ্টা নেই, বার-মাস বৎসর কিছুই নেই। কিছুই নড়ছে না, কিছুই চলছে না, অনন্ত কালের মধ্যে সমস্ত স্তব্ধ, স্থির, অচঞ্চল। সমস্ত গতি এবং সমস্ত শব্দ যেন মৃত্যুর প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সৌদামিনীর বুকের পেণ্ডুলামও তখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রণবের চোখের সামনে ভেসে উঠল সৌদামিনীর সেই আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখ, বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ, আর সেই কথা—আমার কেমন ভয় করছে গো, তুমি যেতে দেরি করো না যেন।

কিন্তু দেরিই হয়ে গেল,—অত্যন্ত বেশি দেরি।

এখন শুধু একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে—এবারে সমস্ত ভয় ঘুচেছে কি? মৃত্যুলোকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে? প্রেমে অতৃপ্তি, বিরহে মাধুর্য, মিলনে শঙ্কা আছে? সেখানেও কি একটা হৃদয় আর-একটি হৃদয়ের মধুচক্র বিন্দু বিন্দু করে পিপাসা দিয়ে পূর্ণ করে রাখে?

প্রণব চমকে চেয়ে দেখলে, ক'টি লোক এসে সৌদামিনীর মুমূর্ষু দেহ উঠানে তুলসী-তলার নীচে নামিয়ে রাখছে। শাশুড়ী এসে শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়েছেন। বাড়ি কান্নার রোলে পূর্ণ।

প্রণব আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাইরে।

শহরের বড় ডাক্তার অনাবশ্যক বিবেচনায় আগেই চলে গেছেন। কালীশঙ্কর স্তব্ধ অসহায়ভাবে তাঁর জায়গাটিতে বসে। কান্নার রোল উঠতেই শিবশঙ্কর ভিতরে চলে গেছেন।

তাঁর তক্তপোশে প্রসন্নবাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার দুজন বসে বসে রোগের আনুপূর্বিক অবস্থা বিবৃত করছেন। প্রসন্নবাবু মনো-যোগের সঙ্গে সেই বিবরণ শুনছেন।

প্রণবের সে সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ নেই। কারণটা যাই হোক, সৌদামিনী নেই,—এই পৃথিবী খুঁজে কোথাও আর তাকে পাওয়া যাবে না।

প্রণব ধীরে ধীরে কালীশঙ্করবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। ডাকলে, দাদু!

কালীশঙ্কর চমকে ওর দিকে চাইলেন। কী অসহায় সেই দৃষ্টি! অত বড় দুর্দান্ত জমিদার, কিন্তু সমস্ত তেজ যেন তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেছে,—পড়ে আছে এক তাল ছাই।

ও'র অবস্থা দেখে প্রণবের ভারী কণ্ঠ হল। আরও সরে ও'র কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকলে, দাদু!

কালীশঙ্কর উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁটটা কেঁপে উঠল শুধু। একখানি লোলচর্ম শিথিল বাহু নিশব্দে প্রণবের কাঁধের উপর রাখলেন।

প্রণব বললে, চলুন, আমরা ওদিকে যাই।

উত্তরে কালীশঙ্করের গলার ভিতর থেকে প্রথমে একটা অব্যক্ত ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরল শুধু। তারপর গলা ঝেড়ে অনেক চেষ্টা করে কোনো রকমে বললেন, কি করে যাব?

—কেন?

—আমি উঠতে পারছি না। দুপুর থেকে এইখানেই বসে। হাঁটুদুটো জমে গেছে যেন।

প্রণব একটু কি ভাবলে। বললে, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি চলুন।

ওদের মূল বাড়ির বাইরে একটা আট-চালা। সেটা কাছারি বাড়ি। প্রণব ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে কালীশঙ্করকে সেইখানে একখানা চেয়ারের উপর বসালে।

আর একখানা চেয়ার টেনে এনে প্রণব নিজে তাঁর পাশে এসে বসল।

দুজনেই নিঃশব্দ।

হঠাৎ কালীশঙ্কর যেন একটু হাসলেন। প্রণব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চাইতেই উনি বললেন, আমি কেন এখনও বেঁচে আছি বলতে পার?

প্রণব চুপ করে রইল।

কালীশঙ্কর বলতে লাগলেন, শাস্ত্রে বলে, কেউ কারো নয়। সবই মায়া। মানলাম। বলে, যার যখন কাজ ফুরিয়ে যায়, সে তখন চলে যায়। তা হলে এই সতেরো বছর বয়সেই সদুর কাজ ফুরিয়ে গেল, আর সাতাত্তর বছর বয়সেও আমার কাজ ফুরলো না?

প্রণব তথাপি চুপ করে রইল।

—এবারে এসে আমার কাছে নিরিবিলি বসে কেবল তোমারই গল্প করত। কবে কি কথায় তোমাদের ঝগড়া হয়েছিল, কেমন করে ভাব হল,—কত তোমার রূপ, কত তোমার গুণ, কত তোমার বিদ্যা—কেবলই এই সব কথা। কথা বলতে বলতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বোধ করি সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি ভাববার জন্যেই নিষ্প্রভ চোখ দুটি একবার বন্ধ করলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেনঃ

—এবারে তোমার চিঠি এলে সহজে পড়তে দিত না। একটি টাকা নিয়ে তবে পড়তে দিত। জিজ্ঞেস করতাম, টাকা কিসের জন্যে? হেসে জবাব দিত, পরের চিঠি পড়ার জরিমানা।

—আপনাকে একটু তামাক দিতে বলি দাদু?

—কাকে বলবে? কেউ কি আছে? সব বাড়ির ভিতরে। তারপরে শোন।

বৃদ্ধ অকস্মাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি ভুলে গেলেন, সৌদামিনী নেই?

প্রণব বললে, দেখি দাঁড়ান। ওহে কি তোমার নাম? এদিকে শোন।

লোকটি ভিতর থেকে হন হন করে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। কাছে এসে প্রণাম করে জানালে, তার নাম রামপদ।

—রামপদ, বাবা, বাবুকে একটু তামাক দিয়ে যাও তো।

রামপদর এতক্ষণে খেয়াল হল, বাবুকে অনেকক্ষণ তামাক দেওয়া হয়নি। লজ্জিত-ভাবে জিভ কেটে বললে, এই যে, দিই বাবু।

কালীশঙ্কর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেনঃ তারপরে শোনো ভাই—

দশ

সৌদামিনীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস প্রণবের জীবনে একটা প্রচণ্ড অবসাদ এল। বন্ধুসংস্পর্শ ভালো লাগে না, কাজ ভালো লাগে না, অবসরও ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। যে দু'একটা দিন সেখানে থাকে, বৃদ্ধ কালীশঙ্করের সঙ্গে বসে গল্প করে,—শুধুই সৌদামিনীর গল্প।

এমনি করে মাস ছয়েক কাটল। খোকা হামা দিতে শিখল। তার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রসন্নবাবু তাকে বাড়ি নিয়ে এলেন, ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন দিলেন, আর মামার বাড়ি পাঠালেন না।

নাম দেওয়া হল বিমানবিহারী।

বিমান ঠাকুরমার গলার হার, দাদুর বুকের পাঁজর।

তাকে পেয়ে প্রণবও যেন আবার একটু সুস্থ হল। ধীরে ধীরে কর্মে স্পৃহা আসতে লাগল। আবার নিয়মিতভাবে কোর্টে এবং সিনিয়রের বাড়ি যাওয়া আরম্ভ করলে।

তরঙ্গিনী এবং প্রসন্নবাবু প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও সৌদামিনীকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সুতরাং তার অকালমৃত্যু তাঁদেরও খুব বেজেছিল।

কিন্তু প্রণবের দিকে চেয়ে সে শোকেরও তাঁরা অবসর পেলেন না।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে এল যেন বিমানই। তাকে নিয়ে, শুধু প্রসন্নবাবু আর তরঙ্গিনীই নয়, প্রণবও যেন এই প্রবল শোকে একটা অবলম্বন পেলে। বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে সিনিয়রের বাড়ি যাওয়ার আগে যেটুকু সময় পায়, প্রণব ওকে নিয়ে খেলা করেই সময় কাটায়।

কিন্তু বাঙালী সমাজে বৈবাহিক ক্ষেত্রে শূন্যতার অবকাশ নেই। চারিদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে হাওয়া ছুটে আসে সেই শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্যে। প্রণবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু কি তরঙ্গিনী কি প্রসন্নবাবু কেউই এরকম কোনো প্রস্তাবে আমল দিলেন না,—নিজেদের আগ্রহের অভাবের জন্যে নয়, প্রণবের দিকে চেয়েই। নিজেদের স্বল্পবাক, উদারহৃদয়, স্নেহপ্রবণ সন্তানকে তাঁরা ভালো করে চেনেন।

সুতরাং সেদিক দিয়ে প্রণবের জীবন-যাত্রা নিরংকুশভাবেই চলতে লাগল। সকালে সিনিয়রের বাড়ি, দুপুরে কোর্ট, বিকেলে বিমানবিহারী, সন্ধ্যায় হয় সিনিয়রের বাড়ি নয় ব্রীফ। ধীরে ধীরে তার পসার বাড়তে লাগল এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে জুনিয়র ব্যারিস্টারদের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আয়ও তখন---সুতরাং চালচলনও---মোটের উপর ভালোই।

ওদের ঘোড়ার গাড়িটা এখনও আছে। কিন্তু প্রণব নিজের জন্যে একখানা মোটর গাড়ি কিনেছে। প্রসন্নবাবু কোর্টে যান ঘোড়ার গাড়িতেই। কোর্টে যেতে এখন আর তাঁর খুব ইচ্ছা করে না। কিন্তু কিছুটা অভ্যাস। পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। কিছুটা বা মক্কেলের জেদাজেদি। সুতরাং একবার করে যেতে হয়। ফেরবার সময় রোজই বিমানের জন্যে হয় পোশাক, নয় খেলনা, নয় তো খাবার কিনে আনেন। সেটা ক্রমেই একটা অভ্যাসে দাঁড়াচ্ছে।

বন্ধুমহলে প্রায়ই দুঃখ করেন, আর এ ছ্যাঁচরামি ভালো লাগে না ভাই। ছেলেটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। এইবার ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাকি জীবনটা ঠাকুরের আশ্রমে গিয়ে কাটাই। তরঙ্গিনী যে এবিষয়ে বাধা দিচ্ছেন তাও নয়। বরঞ্চ তাঁরও এতে সাগ্রহ সম্মতি আছে।

তবু হচ্ছে না। প্রসন্নবাবুর জীবনের স্রোত সেই পুরাতন খাতেই বয়ে চলেছে। তার আর ইতরবিশেষ নেই।

ইতরবিশেষ বরং কিছুটা ঘটেছে তরঙ্গিনীর। ও'দের তবু বাইরের একটা জগৎ আছে। মক্কেল আছে, ব্রীফ আছে, কোর্ট আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু তরঙ্গিনীর কি আছে বিমান ছাড়া?

এবং বিমানের দুষ্টুমিও যেন দিন দিন বাড়ছে। সেদিন সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে রক্তারক্তি! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তার জঠরের মধ্যে। সুতরাং সামনে যা পাচ্ছে, তাই মুখে পুরছে। জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করছে। সবচেয়ে যেন বেশি আক্রোশ তার ঠাকুমার ঠাকুরঘরের উপর। সুযোগ পেলেই সেখানে হানা দেয় এবং সিংহাসন থেকে ঠাকুরকে নীচে নামিয়ে নিজে সেইখানে গিয়ে বসে।

ভয়ে তরঙ্গিনীর বুক দুরু দুরু কেঁপে ওঠে। কী অনাসৃষ্টি ছেলে বাবা! এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! বিমানকে তিনি খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু কিসের তিরস্কার! প্রত্যুত্তরে বিমান তার কচি কচি দুধে-দাঁত ক'টি বের করে কৌতুকভরে হাসে!

ওকে নিয়ে তরঙ্গিনীর ঝামেলার আর অন্ত নেই। ঠাকুর গেছেন, পুজো গেছে, এমন কি সংসারের কাজ-কর্ম পর্যন্ত গেছে। এর উপর যদি বিমানের অসুখ করে, তা হলে তো নিজেও গেছেন।

এই অবস্থায় একদিন গুরুদেব এলেন।

তিনি বেরিয়েছিলেন তীর্থ পর্যটনে। পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে পাঁচ বৎসর পরে তিনি ফিরলেন। ক'দিন ধরেই সন্ধ্যার পরে প্রসন্নবাবুর মস্ত বড় হল-ঘরে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের সমাগম হতে লাগল। স্বামীজি তাঁর ভ্রমণের গল্প করতে লাগলেন। কত মঠ, কত মন্দির, কত বন, কত পর্বত, গুহাবাসী কত অগ্নিসম তেজস্বী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদের কত বিভিন্ন শাখা, কত মত কত পথ,—সেই সব অপূর্ব কাহিনী সুললিত স্বরে তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন।

বিমানও এই সভায় তরঙ্গিনীর পাশে সেজেগুজে গম্ভীরভাবে বসে থাকে। অনেক অপরিচিত লোকের মধ্যে হয়তো ভয়েই দুষ্টুমি করে না। তার দৃষ্টি স্বামীজির গেরুয়া রঙের অদ্ভুত টুপিটির উপর। স্বামীজি যতক্ষণ আলোচনা করেন, একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে সেই টুপিটির দিকে।

একদিন সেইটেকে সে সরিয়ে ফেলে তার খেলাপাতির মোটর গাড়ির ঢাকা বানিয়ে ফেললে।

খুঁজতে খুঁজতে স্বামীজি তাকে ধরে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধু-চোরে একটা অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল! এতদিন দুপুরে বেলায় তরঙ্গিনীই বিমানের একমাত্র সাথী ছিলেন, এখন থেকে আর একজন জুটে গেলেন, স্বামীজি।

একদিন দুজনে খেলা খুব জমে উঠেছে, এমন সময় বিমানকে খুঁজতে খুঁজতে তরঙ্গিনী সেইখানেই এসে উপস্থিত!

স্বামীজি তাঁকে দেখে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, এ হরিণশিশু কোথায় পেলি মা!

বিমানকে কোলে টেনে নিয়ে তরঙ্গিনী হেসে জবাব দেন, খোকার ছেলে। মা তো নেই।

সে দুঃখের কথা স্বামীজি এসেই শুনেছেন।

স্বামীজি বললেন, তা হোক। পালা, পালা। এরা দামোদরকে পর্যন্ত বাঁধতে পারে। যশোদা পারেনি, কিন্তু এরা পারে। বাঁচবি যদি পালা। ভরতের হরিণ-শিশুর গল্প জানিস তো? এ যে আমাকেই বাঁধে!

তরঙ্গিনী সেইখানে বসে পড়লেন। সভয়ে বললেন, কি হবে বাবা! আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা, জীবনের বাকি ক'টা দিন আপনার কাছেই কাটাই। কিন্তু একে কার কাছে রেখে যাই বাবা?

স্বামীজি হাসলেনঃ তুমি ভাবছ মা, তুমি ছাড়া আর ওকে দেখবার কেউ নেই? ওর মা গেছে, তবু মানুষ হচ্ছে। আর তুমি না থাকলে ও মানুষ হবে না?

তরঙ্গিনী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে যেন আপন অন্তরের মধ্যে এই অতি সারবান কথাগুলি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বললেন, সবই বুঝি বাবা। তাঁর কোটি চক্ষু প্রতিটি মানুষের দিকে নিয়ত জেগে রয়েছে। কিন্তু সংসারী জীবের তবু তো মন মানে না।

স্বামীজি ধর্মজগৎ থেকে এবার কর্মজগতে নামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, প্রণব কি বিবাহ করতে রাজি নয়?

—খুব চাপ অবশ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে যেন রাজি নয়, বৌমাকে যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

স্বামীজি আর কিছু বললেন না। কিন্তু বিকেলে নিজেই প্রণবকে নিয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হিন্দু-বিবাহের

প্রভৃতি বিলাতী আসবাব এঘরে ওঘরে কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু সজ্জাটা বিলাতী নয়, দেশী।

তরঙ্গিনীর ঠাকুরঘর এবং শোবার ঘর বাদে অন্য ঘরগুলিকে সে বিলাতী কেতায় সাজিয়ে ফেললে। এখন থেকে বিমানকে নিয়ে ওরা টেবিলে খেতে আরম্ভ করল এবং খাবার সময় অরুণা প্রায়ই আক্ষেপ করতে লাগল যে, এই ঠাকুরটা শুক্তো-চচ্চড়ি-ডালনা ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানে না। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে এখানে প্রণব চুপ করে থাকে।

বিমানের ইস্কুলটা ছিল একেবারেই দেশী। আর পোশাকটা ছিল অর্ধেক দেশী, অর্ধেক বিলাতী,—হরগৌরীর মতো। দেশী ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে অরুণা ওকে একটা খাস বিলাতী স্কুলে ভর্তি করে দিলে। সেটা এখানে নয়, দার্জিলিং-এ। সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে গেল। ভাগ্যদেবতার এই নিদারুণ সক্রিয় পরিহাসে প্রণব হাসল।

—হাসছ কেন?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে।

—বিমানকে পাঠানো সম্বন্ধে মাকে যে তুমি এত সহজে রাজি করতে পারবে, আমি ভাবিনি।

—এ বিষয়ে মায়ের মত করানো কি তুমি খুব শক্ত ভেবেছিলে?

—ভেবেছিলাম। তোমাকে তাহলে বলি শোনঃ

প্রণব বলতে লাগলঃ

বিমানকে জন্ম দিয়েই ওর মা যখন মারা গেলেন, তখন প্রথম কয়েকটা মাস ও মামার বাড়িতেই ছিল। একটু শক্ত হতেই মা ওকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে বিমানই ওঁর পুজো-আর্চা, ধ্যান-ধারণা, বার-ব্রত হয়ে দাঁড়াল। বাবা-মায়ের তখন ইচ্ছা বাকি জীবনটা ওঁদের গুরুদেবের সান্নিধ্যে কাটানো। কিন্তু সে কি করে সম্ভব? আমার বিবাহে অনিচ্ছা, ওঁরাও দাসী-চাকরের হাতে বিমানকে সমর্পণ ক'রে আশ্রমে যেতে পারেন না।

—সেইজন্যে তোমার ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে আমাকে বিয়ে করলে?

—প্রধানত তাই বটে। তবে, স্বামীজি বলেন, হিন্দু-বিবাহে স্বামীই তো শুধু স্ত্রীকে বিয়ে করে আনে না।

—কে বিয়ে করে আনে তবে? পাড়া-প্রতিবেশীরা?

—অতখানি না হলেও কাছাকাছি বটে। আমাদের বিবাহে দেহটাই মুখ্য নয়। স্ত্রী এখানে সহধর্মিণী। স্ত্রী এখানে সমস্ত পরিবারের মধ্যেই স্বামীকে পায়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়।

—অর্থাৎ শুধু দেহ নয়, হৃদয়টাও বিবাহ-ব্যাপারে নিতান্ত অবান্তর। কি বল?

অরুণার কণ্ঠে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলে।

প্রণব বললে, অনেকটা। তার মানে, হৃদয়াবেগটা সংযত করতে হবে। স্বামীজির মতে আবেগ বস্তুটা উচ্ছৃংখল। একমাত্র ঠাকুরের জন্যে আবেগ ছাড়া অন্য সমস্ত আবেগকে সংযত করে না রাখতে পারলে বিপদ ঘটে। সেইটেই নাকি সাধনার গোড়ার কথা,—চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

—ইংরিজিতে তাকেই বলে ডিসিপ্লিন। বিমানকে যেখানে পাঠান হল সেখানে শুধু মনের নয়, দেহের ডিসিপ্লিনের ওপরও জোর দেওয়া হয়।

—কিন্তু মন আর হৃদয় এক নয়।

—সম্ভবত নয়। ঠিক যেমন স্বামীজি আর আমি এক ব্যক্তি নই। যে জন্যে তাঁর সকল কথা আমি মানি না।

—শুনেছ, স্বামীজি আবার আসছেন?

—না। শুনেছি তিনি আসাম গেছেন।

—হ্যাঁ। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে আশ্রমে ফিরবেন। তোমার বাবাও তো তাঁর শিষ্য।

—জানি। কিন্তু বাবা আর আমিও এক ব্যক্তি নই।

অরুণা হাসল।

প্রণব বললে, আশ্রমে ফেরবার সময় বাবা আর মাকেও বোধ হয় তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

অরুণা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—আশ্রমে।

—সেখানে কি?

—বললাম তো, বাবা আর মায়ের ইচ্ছা শেষ জীবনটা সেখানেই কাটান।

এবারে অরুণা চিন্তিত হল। তার ইস্পাতের মত ধারাল কণ্ঠ যেন কোমল হয়ে এল।

জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি তাঁদের কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—জানি না। হলেও সেজন্যে বোধ হয় যাচ্ছেন না।

—তবে?

—দেখ, আশ্রমের ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না। বোধ হয় সাধন-ভজনের সুবিধার জন্যেই সেখানে যাওয়া। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—বিমান চলে গেল। ওঁদের বোধ হয় মনে হয়েছে, এখানে থাকার প্রয়োজন আর নেই। বিমানের জন্যেই তো থাকা।

—শুধু সেইজন্যে? আর কোন প্রয়োজন নেই?

—আবার কি?

—কেন, তুমি আছ, আমি আছি।

প্রণব হাসল। বলল, আমরা বড় হয়েছি। নিজেদের সংসার দেখে নিতে শিখেছি। আমাদের জন্যে এই বয়সে ওঁদের সংসারে আটকে থাকার কোন কারণ নেই।

অরুণা চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। ওঁদের চলে যাওয়ার কথাটা তার ভাল লাগল না। এ তো কদিনের জন্যে তীর্থ-ভ্রমণে যাওয়া নয়। এমন কি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াও শুধু নয়। এ যে একেবারে সংসারত্যাগ!

ওর চিন্তিত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে প্রণব বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কর।

কিন্তু অরুণার কণ্ঠে সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বিমানকে পাঠান নিয়ে মা কিংবা বাবা কোন আপত্তি করেননি?

—না তো। তুমি কি কোন আপত্তি আশংকা করছিলে?

প্রণব প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, দুজনেই সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন?

—সানন্দে কি না জানি না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মত দিয়েছিলেন। কোন আপত্তি করেননি।

প্রণব আর কিছু বলল না। একটু যেন বিস্মিত হল। কিন্তু ভাবল, হয়তো সংসার-ত্যাগের ব্যাকুলতাতেই আপত্তি করেননি। কিংবা হয়তো ভেবেছেন, এ ভাল হল যে, অরুণার সুখপরায়ণ অযোগ্য হস্ত থেকে বিমানকে মানুষ করার ভার শিক্ষিতা ইংরেজ-রমণীর হাতে গেল। কে জানে কি তাঁরা ভেবেছেন। প্রণব ওঁদের মনের কথা জানে না।

অরুণা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওঁরা আমার জন্যেই চলে যাচ্ছেন না তো?

—তা তো জানি না অরুণা। তুমি তো জানো, ওঁদের সঙ্গে এ আলোচনা আমি কখনও নিজে থেকে করি না।

অরুণা ম্লানমুখে নিঃশব্দে বসে রইল।

প্রণব বলল, তোমার জন্যে নয় বোধ হয়। কেননা আশ্রমে যাবার ইচ্ছা ওঁদের অনেক দিনের। তুমি আসায় হয়তো সেই সুযোগ ঘটেছে।

অরুণা তথাপি সাড়া দিল না।

স্বামীজির থাকবার কথা দুদিন। কিন্তু থাকতে হল প্রায় এক সপ্তাহ। তরঙ্গিনীদের গোছগাছ করা আছে; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেওয়া আছে। অনেক কিছুই করার আছে, যা দুদিনের কাজ নয়।

সুতরাং ওঁদের জন্যে স্বামীজিকেও থাকতে হল।

প্রণবের এই সময়টা যেন কাজ অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। সকালে যে সময়ে সে সিনিয়রের বাড়ি যেত, কাজের চাপে এখন তার চেয়ে অনেক আগে যাচ্ছে। ফিরে এসে বিশ্রামের অবসর নেই। তখনই দুটো নাকে-মুখে গুঁজে কোর্টে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন সিনিয়রের বাড়ি থেকেই হয়তো কোর্টে বেরিয়ে যায়। কোন দিন হয়তো কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে পারে না। একেবারেই সিনিয়রের বাড়ি চলে যায়। ফেরে রাত্রি এগারটায়।

অরুণা অনুযোগ করে,—মা'রা চলে যাচ্ছেন। হয়তো আর কোন দিনই ফিরবেন না। আর এই সময়টায়—

বাধা দিয়ে প্রণব বলল, কি করব বল? মক্কেলের কাজ, তারা তো শুনবে না।

নয়তো বলে, কি হবে মায়া বাড়িয়ে অরুণা, সংসারে এসে পর্যন্ত মায়ের কোলে আমি একেশ্বর। কখনও কাউকে অংশ দিতে হয়নি। তারপরেও যদি আশ না মিটে থাকে, কোনদিন মিটবে না। কিন্তু সেই স্বার্থের লোভে মাকে তো আমি আটকে রাখতে পারি না!

অরুণা কুণ্ঠিতভাবে তরঙ্গিনীর পিছু পিছু ঘোরে। তাঁর ফাই-ফরমাস খাটে। বাঁধা-ছাঁদা করে। কুণ্ঠিতভাবে, কেননা তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে যে, হয়তো বা তারই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এঁরা চলে যাচ্ছেন।

অথচ তরঙ্গিনীর ব্যবহারে সে রকম কোন ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি বেশ হাসি-খুশী। কথায় কথায় তাঁর অরুণাকে প্রয়োজন হচ্ছে। সন্ধ্যায় ছাদে বসে তাকে তিনি সংসার সম্বন্ধে কত উপদেশ দিচ্ছেন। গৃহলক্ষ্মীর কর্তব্য কি,—গুরুজন, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় শিক্ষা দিচ্ছেন। তার কিছু অরুণার মনের মত হচ্ছে, কিছু না হচ্ছে না। না হলেও নিঃশব্দে সমস্তই সে শুনে যাচ্ছে।

অরুণা নানা ব্যাপারে বুঝতে পারছে তার উপর তরঙ্গিনীর কত স্নেহ। কখনও পুরাতন বৃদ্ধা ঝি বাসিনীকে বলছেন, বাসিনী, বৌমা আমার ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। তুই রইলি, আমার মত করে সব দিক সামলে নিবি, সমস্ত কিছু চালিয়ে নিবি। যেন কারও কোন কষ্ট-অসুবিধা হয় না।

কেন, তুমি আছ, আমি আছি!

কখনও ডাকছেন ঠাকুরকে। বলছেন, ঠাকুর, কে কি খায়, কে কি খেতে ভালবাসে, বৌমা ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না। তুমি সমস্ত কাজ গুছিয়ে করবে।

সন্ধ্যাবেলায় বললেন, খোকা আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে বৌমা। কেন জান?

—বলছেন, কাজের নাকি খুব চাপ।

—ছাই চাপ! —তরঙ্গিনী হেসে উঠলেন,—বুড়ো ছেলে, পাছে তোমাদের সামনে কেঁদে ফেলে, তাই অমন করছে। বুঝতে পারছ না?

—তাই হবে মা! বোঝা যায়, ওঁর মন ভাল নেই। কিন্তু ভয়ানক চাপা তো!

—তুমি ঠিক ধরেছ মা। ভয়ানক চাপা। বাইরে থেকে মনে হয়, খুব গম্ভীর, খুব শক্ত। আসলে কিন্তু ভয়ানক নরম।

সে রাত্রেও প্রণব ফিরে এল অনেক রাত্রে। এসে মাকে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। বললে, আজ আমি তোমার ঘরে খাব মা।

—বেশ তো। অ বৌমা, বাসিনীকে বল খোকার খাবার জায়গা এই ঘরে করে দিতে।

খেতে বসে কিন্তু সে একটা কথাও বললে না। মুখ নিচু করে নিঃশব্দে খেয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই তরঙ্গিনীরা চলে যাবেন।

খেয়ে উঠে প্রণব বললে, আমি তোমার ঘরেই শোব মা।

—বেশ তো।

বিমানের জন্যে তরঙ্গিনীর ঘরে ছোট খাটের বদলে একটা বড় খাট পাতা হয়। সেটা এখনও আছে। সুতরাং আর এক-জনের শোয়ার কোন অসুবিধা নেই।

সেইখানে শুয়ে সারারাত্রি মাতা-পুত্রে একান্তে কত গল্প হল। সৌদামিনীর গল্প আর বিমানের গল্প। নতুন বিবাহের পর সৌদামিনীর গল্প সে কারও সঙ্গে করেনি। বিবাহের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত আনন্দ সে সৌদামিনীর কাছে পেয়েছে, স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তাই সে বলতে লাগল।

তারপর বিমানের গল্প।

—সেখানে সে কেমন আছে মা, কে জানে! তোমার কাছে না শুলে তার ঘুম হত না। কে জানে, এখন কি করে ঘুমচ্ছে।

শুনে তরঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। মুখে বললেন, ভালই

আছে সে, ভাবছিস কেন? আমি ভাবি না, তুই ভাবছিস! সবই ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যায়। ওর বয়সী আরও কত ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে সেও দেখবি বেশ আছে।

—সেই কথাই তো মেমসাহেব লিখেছে। নিজে তো সে এখনও চিঠি লিখতে পারে না। তার নিজের হাতে চিঠি পেলে সুস্থ হতাম। তার নিজের হাতের চিঠি এলে প্রথম চিঠিখানা তখনই আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দোব। কেমন?

—দিস। আমার ঠিকানাও দিয়ে দিস। মেমসাহেব যেন মাঝে মাঝে আমাকেও চিঠি দিয়ে ওর কথা জানায়।

—বড়দিনে ও তো আসছে মা। সেই সময় একবার আসবে?

—না বাবা। আর ফেরার ইচ্ছা নেই। তোমাদের আর একটি যখন খোকা-খুকু হবে, বিমানকে শুদ্ধ নিয়ে তখন একবার বরং যেও। আর একটা কথা বলে যাই। ভগবান যেদিন তাঁর চরণে টেনে নেবেন, তখন টেলিগ্রাম পেলে সমস্ত কাজ ফেলেও যেন ছুটে যেও। যত শক্ত হবারই চেষ্টা করি, মনে হচ্ছে সে সময় তোদের মুখ না দেখতে পেলে বুঝি শান্তি পাব না।

প্রণব চট্ করে বললে, না-ই গেলে মা। এখানে থেকে কি ধর্ম করা যায় না?

তরঙ্গিনী তাড়াতাড়ি বললেন, না বাবা। ও সব কথা বলিস না। ভোর হয়ে আসছে। ঘুমো এবার।

বলে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

বারো

অনেক দিন পরে বিমানের একখানা চিঠি এল। এইটেই তার প্রথম চিঠি। বাঁকা-বাঁকা, ভাঙা-ভাঙা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা। বেশ বোঝা যায়, ওর পিছনে বসে আছেন ওর শিক্ষয়িত্রী, অথবা কোনও বড় ছেলে।

প্রণব তখন অফিসে বসে একটা জটিল মামলার সমাধান খুঁজছিল। চিঠিখানা পড়ে খুশি হয়ে তখনই সে চলল উপরে অরুণাকে চিঠিটা দেখাবার জন্যে।

অরুণা তখন একটা সোফায় বসে তার বাচ্চা ফক্সটেরিয়ারটাকে আদর করছিল। এটা কদিন হল অরুণার জামাইবাবু ওকে উপহার দিয়েছেন। আপাতত এটাকে নিয়েই তার সময় কাটছে।

যেটা আগে ছিল তরঙ্গিনীর ঠাকুরঘর, সেইটেই হয়েছে কুকুরটার শয়নঘর। ওর জন্যে একটা ছোট্ট খাট কেনা হয়েছে এবং কম্বল। কম্বলের একটা জামাও ওর জন্যে তৈরি হয়েছে।

প্রণব চিঠিখানা ওর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, বিমানের চিঠি। নিজের হাতে লেখা। পড়।

অরুণা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে ফেলল। বলল, ইংরিজিতে লিখেছে! কী আশ্চর্য!

—সত্যি। ও যে এত শিগ্গির লিখতে শিখবে ভাবিনি। আজকেই এটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি বলে গিয়েছিলেন।

—নিশ্চয়। মা তো পড়তে পারবেন না। কিন্তু তবু খুব খুশি হবেন। বাবা পড়ে শোনাবেন এখন।

—তাঁদের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে। হয়তো সেখানেও বিমান চিঠি দেবে। তবু এটা পাঠিয়ে দেওয়া হক। আর শোন, আমার একটি সাহেব মক্কেল একটা ভাল বাবুর্চির কথা বলেছে। আজকে তাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। তার সঙ্গে কথা বল। কিন্তু তাই বলে ঠাকুরকেও তাড়িও না যেন।

—রাঁধবার জন্যে দুজন লোক থাকবে?

—তা থাক। অনেক দিন আছে, বুড়ো বয়সে যাবে কোথায়? তাছাড়া তোমার ঝি-চাকরের রান্নাও তো দরকার। তারা তো আর বাবুর্চির হাতে খাবে না।

—সে ঠিক। ওটাও থাকবে তাহলে। কিন্তু দুটো রান্নাঘরও তো দরকার হবে তাহলে?

—বাবুর্চির রসুইখানা নীচে করো।

—তাই হবে। কিন্তু তুমি সন্ধ্যার আগে ফিরছ তো?

—কেন বল তো?

—বাঃ! ভুলে গেলে? বায়োস্কোপের টিকেট কেনা হয়েছে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো আজকেই। ফিরব।

অরুণা একটা কটাক্ষ হেনে বললে, দেখ, ডুবিও না যেন! আর শোনো, আমি বলছিলাম কি, বাবুর্চি পাওয়া গেলে, পার্টিটা সামনের রবিবারে না করে পরের রবিবারে করলে ভাল হয় না?

—তাতে কি সুবিধা হবে?

—বিমান থাকতে পারবে। তার তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

—সেই ভাল। বিমানের কথা আমার মনে ছিল না। সে খুব খুশি হবে।

—তাছাড়া, বড়দিনের বন্ধে সুচরিতাও নিশ্চয় কলকাতায় আসবেন। তিনিও যোগ দিতে পারবেন। চোখে তো দেখলাম না, শুধু নামই শুনেছি। এই সূত্রে পরিচয় হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের লনটা ঠিক করে ফেলতে হবে।

অন্যমনস্কভাবে প্রণব জবাব দিলে, হ্যাঁ।

—কেন বল তো?

প্রণবের ধ্যান ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—তোমার সুচরিতা কেমন টেনিস খেলেন, একবার দেখব।

—ও।

প্রণব আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললে, আমি চললাম। কতকগুলো জরুরী দলিল নীচে ফেলে রেখে এসেছি।

কুকুরটাকে একটু আদর করে প্রণব নীচে চলে গেল।

সেদিন সকালে প্রণবের হাতে কোনও কাজ ছিল না। নীচের বসবার ঘরে একটা সোফায় বসে অলসভাবে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। বাইরে একটা গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে দেখে সর্বনাশ!

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে তার নতুন বেয়ারাটা আটকেছে। ভিতরে ঢুকতে দেবে না। তারও দোষ নেই। ন্যায়পঞ্চাননের পায়ে একজোড়া তালতলার চটি, গায়ে শুধু একটা বনাতের আলোয়ান। বেয়ারাটা ভেবেছে, কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অথবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—এসেছে বোধ হয় ভিক্ষার জন্যে। এবাড়িতে যে এখন ভিক্ষুক প্রায়ই আসে তা নয়। হয়তো সে তার অতীত অভিজ্ঞতার উপর কিছু বুদ্ধি খরচ করে এই ধারণায় উপস্থিত হয়েছে।

সুতরাং ন্যায়পঞ্চানন যত বলছেন, তিনি ভিতরে যাবেন, প্রণবের সঙ্গে দেখা করবেন, বেয়ারা ততই তাঁকে ধমকাচ্ছে, সাহেব এখন ছোট-হাজিরায়, এখন দেখা হবে না।

ছোট-হাজিরা কি বস্তু ন্যায়পঞ্চানন জানেন না। ধমক খেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে উঠেছেন। তিনি তবু তাকে বোঝাচ্ছেন, যে-হুজুরই আসুন বাপু, আমার তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

বেয়ারা গম্ভীর চালে নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নাড়ছে, যাওয়া হবে না।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে প্রণব ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করলে। বললে, আসুন, আসুন। খবর সব ভাল তো? কখন এলেন আপনি?

ন্যায়পঞ্চানন তখন ঘেমে উঠেছেন। বললেন, দাঁড়াও ভাই, আগে একটু সামলে নিই, তারপরে জবাব দিচ্ছি।

সোফায় আরাম করে বসে বললেন, এসেছিলাম তকিপুরের রাজবাড়িতে শ্রাদ্ধের

পণ্ডিত-বিদায় নিতে। কালকের দিনটা সেই-খানেই গেছে। ও'রা তো আজকাল আর দেশে থাকেন না। এখানেই হল। তা খুব ধুমধাম করেছে ভায়া।

ন্যায়পঞ্চানন শ্রাদ্ধের ফর্দ দিতে লাগলেন।

অন্যমনস্কভাবে প্রণব বললে, তারপর?

—তারপরে সকালে ভাবলাম, তোমার সঙ্গে, তোমার নতুন গিন্নীর সঙ্গে একবার দেখা করে না গেলে তোমার শ্বশুর দুঃখ করবেন। আবার দুদিন পরে খবর হয়তো তুমি পাবেই, তখন তুমিও দুঃখ করবে। তা এসে কি বিপত্তি দেখ। তোমার বেয়ারাটা—

ন্যায়পঞ্চানন হাসতে লাগলেন। বললেন, বেশি বসবার সময় নেই। আমাকে আবার যেতে হবে সেই বাগবাজার।

—সেখানে কি?

—সেখানে একবার যেতে হবে রামজয় শিরোমণি মশায়ের কাছে। একটা অনুপপত্তি আছে। চল, তোমার গিন্নী দেখে আসি। না, পর্দানশীন করে রেখেছ?

প্রণব হেসে বললে, না না। চলুন, আশীর্বাদ করে আসবেন। কিন্তু আপনার আহারাদি? এইখানে দুটি খেয়ে গেলে—

—সে পরে হবে। এখন চল তো।

অরুণার সম্বন্ধে প্রণবের ভয় আছে। এই স্বল্পবাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্পর্কে বেয়ারার মতো তারও ভুল করার সম্ভাবনা যে নেই, তা নয়। প্রণবের ইচ্ছা ছিল অরুণাকে আগে এ'র সম্বন্ধে সতর্ক এবং সচেতন করে দিয়ে তারপরে এ'কে নিয়ে যাবে। কিন্তু ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয় আপন খেয়ালেই রয়েছেন। সে সুযোগ প্রণব পেলে না। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তার সঙ্গেই চলেছেন।

সুতরাং সিঁড়ি থেকেই প্রণব হাঁকতে লাগলঃ এই দেখ, কাকে নিয়ে আসছি। চিনতে পার কি না দেখ।

অরুণা তখন দোতলার বারান্দায় সোফায় বসে তার সারমেয়শাবককে নিয়ে মত্ত। প্রণবের চিৎকারে সে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ।

হতাশভাবে সে আবার সোফাতেই বসতে যাচ্ছিল।

প্রণব বলল, সৌদামিনীর পিতৃকুলের পুরুতদেব। মস্ত বড় পণ্ডিত। প্রণাম কর।

অরুণা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কখনও দেখেনি, তা নয়। কিন্তু এই শ্রেণীর উত্তরীয়মাত্র-সম্বল পণ্ডিতদের উপর তার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু স্বামীর কথায় এবং স্বাভাবিক অভ্যাসবশত ঈষৎ হেসে দু হাত কপালে তুলে ছোট একটি নমস্কার করল।

এই বারান্দায় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আরও একবার এসেছেন। তখন এটা খালি ছিল, সোফা সেট্টা ছিল না। এই খালি বারান্দায় আসন পেতে সৌদামিনী পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেইখানে, অঙ্কে সারমেয়-শাবক নিয়ে, অপূর্ববেশা এই তরুণীর ক্ষুদ্র নমস্কারের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কুকুরের বাচ্চা থেকে তাঁর হত-চকিত দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল অরুণার পায়ের হাল্কা চটি জোড়ায়।

অরুণার নমস্কারের উত্তরে স্খলিতকণ্ঠে একবার বললেন, জয়োঽস্তু। তার পর আবার বললেন, বেশ বেশ।

প্রণব দাঁড়িয়ে প্রমাদ গণতে লাগল।

কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিত তখনই নিজেকে সামলে নিলেন। উচ্চ হাস্যসহকারে বললেন, বাঃ! তোমার স্ত্রীভাগ্য তো বড় ভাল হে! চমৎকার বউ পেয়েছ!

ও'র সহজ রসিকতায় প্রণব যেন বুকে বল পেলে। উনি বসতে দ্বিধা করছেন দেখে তাড়াতাড়ি ও'র দিকে একটা কাঠের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, এতে আপনার অন্তত ঈর্ষার কিছু নই। স্ত্রীভাগ্য আপনার মতো কজনের?

—তুমি কি আমার ব্রাহ্মণীকে দেখে বলছ, না অনুমানে বলছ?

ন্যায়পঞ্চানন চেয়ারটায় বসে খানিকটা নস্য আরাম করে নাসিকাবিবরে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রণব সহাস্যে বললে, তাঁকে দেখার আবশ্যক করে না। আপনার পরিতৃপ্ত মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

—তাই নাকি? তা তোমরা ব্যারিস্টার মানুষ, লোকের মুখ দেখেই তার ভিতরের কথা টের পাও।

—ঠিক টের পাই কি না বলুন।

—তা কি করে বলি বল? এমন তো হতে পারে, পাছে তোমার চন্দ্রাননা গৃহিনীকে নিয়ে পলায়ন করি সেই ভয়ে এ একটা আত্মরক্ষার কৌশল মাত্র।

বলেই ন্যায়পঞ্চানন অট্টহাস্য করে উঠলেন।

এই রসিকতা সহ্য করা অরুণার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, এক মিনিট আপনারা গল্প করুন, আমি এখনই আসছি।

ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গি ন্যায়পঞ্চাননের দৃষ্টি এড়াল না। রসিকতা বন্ধ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলন, তোমার খোকাকে দেখছি না,—কি যেন তার নাম?

—বিমান। সে তো এখানে নেই। দার্জিলিং-এ পড়ে।

সবিস্ময়ে ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কেন? এখানে অসুবিধা কি হল?

—না, অসুবিধা নয়। সেখানে শিক্ষা-দীক্ষাটা খুব ভাল হয়।

—ও। বাবা-মা?

—তাঁরা তো স্বামীজীর আশ্রমে চলে গেছেন।

—তাই নাকি? শুনিনি তো। বাঃ! বাঃ! উত্তম! 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ'। খুব ভাল। চিঠিপত্র পাও।

—খুব কম।

—কমই তো হবে ভাই। এই মায়া-প্রপঞ্চময় সংসার যাঁরা পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের কাছে ঘন ঘন সংবাদ তো প্রত্যাশা করতে পার না। বেশ, বেশ! তাঁদের কল্যাণ হোক! লিখ, আমি তাঁদের আশীর্বাদ করছি। স্বামীজিকেও নমস্কার জানিও।

তারপর বললেন, তাহলে এ বাড়িতে তোমরা দুজনে কপোত-কপোতী। নিরন্তর কূজন চলেছে। অ্যাঁ!

প্রণব হেসে বললে, আপনি ভুল করছেন। এখনকার তরুণদের আপনাদের কালের মতো অখণ্ড অবকাশ তো নেই। কূজন করবে কখন?

—তাই নাকি? তা ত জানতাম না। তোমরা তাহলে আর বর্ষায় 'মেঘদূত' পড় না?

—না। সময় কই? তার বদলে গাদা গাদা ব্রীফ পড়তে হয়।

—অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি ভাবতাম,—যাই হক, এবারে উঠতে হবে। এটা কে?

বাবুর্চিটা কি প্রয়োজনে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। তার দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং বিচিত্র পোশাক দেখেই ন্যায়পঞ্চানন সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করেছেন।

এবং প্রণব উত্তর দেবার পূর্বেই বাবুর্চি একটা দীর্ঘ সেলাম ঠুকে বললে, জি হুজুর! আমি এনায়েৎ। সাহেবের খানা পাকাই!

সর্বনাশ!

ন্যায়পঞ্চানন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, হুঁ। আচ্ছা উঠলাম ভাই। কল্যাণ হোক, তোমাদের কল্যাণ হোক।

এর পরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে তাঁকে আটকানো নিষ্প্রয়োজন। প্রণব গেট পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরে আসতেই অরুণা যেন প্রণবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লঃ

—কে ওই অসভ্য লোকটা? সরাসরি ওপরে এনে হাজির করেছিলে?

প্রণব হাসলে। বললে, ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম, ও'র সঙ্গে ব্যবহারে তুমি আর একটু স্থিরবুদ্ধি এবং কৌশল দেখাবে।

—স্থিরবুদ্ধি এবং কৌশল? কেন? গরজটা কিসের?

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বললে,

সিঁড়ি থেকে যেমন উচ্ছ্বসিতভাবে চাঁচাতে লাগলে, মনে হল বুঝি মিঃ জাস্টিস্ হোয়াইটকে নিয়ে আসছ!

—না। ইনি মিঃ জাস্টিস্ ব্রাউন, এখন অবসর নিতে চলেছেন।—প্রণব গম্ভীরভাবে বললে,—অরুণা ইংরেজ আমাদের অভিভূত করেছে। সেই স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। সেই দুর্বার গতিপথে ন্যায়পঞ্চাননদের বাধা কুটোর মতো ভেসে যাবে, তাও জানি। তবু নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে কটিবস্ত্রসম্বল যে ভিক্ষোপ-জীবীর দল আমাদের সনাতন ধর্ম এবং প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অশ্রদ্ধা কর না।

—করব না। কিন্তু তাই বলে যা বিশ্বাস করি না, তোমার মতো তারই ফাটা-পায়ের ধুলো নিতে পারব না। মাগো! বেয়ারা-খানসামারা কি হাসাহাসিই করলে!

—আমি কিন্তু হাসিনি। বিদায় দিলাম, কিন্তু ভক্তিভরে প্রণাম করেই বিদায় দিলাম।

—কেন? বিদায়ই যদি দিই, তাহলে ভক্তিটা আবার কেন? ভণ্ডামি নয় সেটা?

—না। তার কারণ বোধ হয়, ইংরেজিয়ানায় তোমার মত এখনও আমি পোক্ত হতে পারিনি। বোধ হয়, ও'দের সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশা এখনও নিঃশেষ হয়নি।

—প্রত্যাশাটা কিসের শুনি?

—আগুনের।

—আগুনের! তার মানে?

—তার মানে, অনেক দিন পরে একদিন হয়তো ইংরেজ হওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ব। এ'দেরও বংশ সেদিন হয়ত নিঃশেষিত-প্রায় হবে। আমার কেমন মনে হয়, সেইদিন কোন অগ্নিহোত্রী কোথাও কোনো গুহায় যদি আত্মগোপন করে থাকেন, তাঁরই কাছে গিয়ে হয়তো হাত পাততে হবে।

এ সমস্ত কথা অরুণার মেমসাহেবের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে। সুতরাং দুর্বোধ্য।

বিস্ফারিত চোখে সে বললে, সর্বনাশ! তুমি যে গির্জার পাদরি সাহেবের মতো গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিতে শুরু করলে!

প্রণব হেসে বললে, তাই তোমার মনে হবে। কারণ, গুরুগম্ভীর বক্তৃতার নমুনা হিসাবে ও ছাড়া আর কিছুই তোমার সামনে নেই। কিন্তু অরুণা, ঢালের আর একটা দিকও আছে। ভাববার কথা উভয় দিকেই যথেষ্ট।

—তুমিও এসব ভাব নাকি? আমি তো জানি, ভাববার সময় বলতে তো তোমার ডিনারের পর। তখন তো নেশার মৌজে গোলাপী লোকে থাক।

অরুণা উপহাসভরে হাসতে লাগল।

প্রণব স্বীকার করলে, তুমি নিতান্ত মিথ্যা বলনি অরুণা। সুস্থভাবে ভাববার সময় আমার নেই। তবু এক একদিন কি হয় জান, চোখে গোপালী নেশার আমেজ, হাতের সিগারেট থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে, আর মাথার ওপরে উদার অনন্ত আকাশে লাখো লাখো তারা চিকমিক করে, তখন, মাঝে মাঝে, এসব চিন্তাও মাথায় আসে। যাই হোক তোমার জন্যে একখানা মোটরের অর্ডার দিয়েছি। আজ দুপুরে নিয়ে আসবে। চড়ে দেখ, পছন্দ হলে ওদের বলে দিও। না হলে, অন্য গাড়ি আনতে বল।

অরুণা উৎফুল্ল হয়ে উঠলঃ তাই নাকি! আজকেই আসবে?

—সেই রকমই তো কথা। আর তোমার লনও তো প্রস্তুত।

—দেখেছ? কেমন হয়েছে?

—চমৎকার!

—সত্যি। এই মালিটা ভালো। এটাকেই রাখব ভাবছি। একটু মাইনে হয় তো বেশি নেবে। তা হোক, লোকটা কাজের।

—আচ্ছা, পল্টু বোসের পার্টিটা কবে?

—থার্টিন্থ, রবিবারে।

—বিমান আসছে কবে?

—টোয়েণ্টিয়েথ্, দার্জিলিং মেলে। সেদিন হাতে কোনো কাজ রেখ না যেন।

—না। সুচরিতাও আসছে তার পরের দিন।

—আমরা কি স্টেশনে যাব রিসিভ করতে?

—কি দরকার? পরের দিন সকালে গেলেই চলবে।

প্রণব নীচে নেমে গেল।

তেরো

জলপাইগুড়ি পৌঁছুবার কিছুদিন পরে কি মনে করে সুচরিতা প্রণবকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। নিতান্ত মামুলী চিঠি। তাতে ছিল, জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক বিবরণ, তার নতুন কর্মজীবনের কাহিনী এবং প্রণব-দের কুশল প্রার্থনা। এর উত্তরে প্রণব একটা আবেগপূর্ণ চিঠি দেওয়ার ফলে উভয়ের হৃদয়দ্বার অনর্গল হয়ে যায়। চিঠিগুলি ইংরেজিতে লেখা। তার অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ

প্রণব জবাব দিয়েছিলঃ

শিক্ষাবিভাগে চাকুরি নিয়ে তোমার জল-পাইগুড়ি যাওয়ার খবর বরদার কাছ থেকে আগেই পেয়েছিলাম। এতদিন পড়াশুনার অজুহাতে তুমি বিবাহে সম্মত হওনি। কিন্তু এম-এ পাশ করার পরেও যখন হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে তুমি জলপাইগুড়ি চলে গেলে তখন তোমার বাড়ির সকলে বিস্মিত এবং ব্যথিত হন। তোমার এই ব্যবহারের কারণ তাঁদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু আমার কাছে ঠিক ততখানি দুর্জ্ঞেয় নয়। সেজন্যে আমিও মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছি।

অথচ কীই বা করা যেতে পারত?

তুমি বোধ হয় জেনেই গেছ যে, পড়বার জন্যে বিমানকে দার্জিলিং পাঠান হয়েছে। সুবিধা পেলে তার সংগে দেখা করার চেষ্টা করো।

অরুণা এবং আমি নিজে ভালই আছি।

এর উত্তর দিতে সুচরিতার কদিন দেরি হয়েছিল। হবারই কথা। মনটা তার কিছুতে যেন তৈরি হতে চাইছিল না। ওদের মন তৈরি হতে সময় নেয়। কিন্তু একবার তৈরি হলে আর দ্বিধার লেশমাত্রও রাখে না।

সুচরিতা লিখেছিল প্রথমেই বিমানের কথা। তার ফলে চিঠিটা শুরু করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কয়েক দিনের একটা ছুটি পেলেই বিমানের সংগে দেখা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। তারপরেঃ

আমার চাকুরি নেওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছে দুর্জ্ঞেয় বোধ হলেও তোমার কাছে হয়নি কেন বুঝলাম না। কি কথা মনে করেই বা তুমি কষ্ট পাচ্ছ? আমার অবিবাহিত জীবনের কথা? আমাদের দেশে মেয়েরা বড় একটা অবিবাহিত জীবনযাপন করে না সত্য। কিন্তু কেউ কেউ তো করছে এখন। বিবাহিত জীবনের শৃংখল কেউ কেউ পছন্দ করেন না। অন্য কোনও কারণে হয়ত কারও বিবাহে অনিচ্ছা জন্মে। আজকের দিনে সেটা এমনই কি অস্বাভাবিক?

তা ছাড়াও আরও কিছু কি তুমি ভেবেছ? যেমন ধর, আমি তোমায় ভাল-বেসে ফেলেছি, এমনই গভীর ভালবাসা যে তোমাকে পাওয়ার কোনও আশাই যখন রইল না, তখন অবিবাহিত থাকারই সংকল্প করলাম? তা যদি হয়, তাহলে পুরুষের পক্ষে সে তো কষ্টের কথা নয়, গর্বের কথাই। তুমি কষ্ট পাচ্ছ কেন তাহলে?

এই খোঁচা প্রণবকে বিঁধল। তার সংযমের বাঁধ ভাঙল। সে লিখলে একখানা লম্বা চিঠি। লিখলেঃ

কষ্ট পাচ্ছি কেন? যে কষ্ট অপরাধী বিবেককে পেতেই হবে, তার থেকে কে আমাকে বাঁচাবে বল? সুচরিতা, জীবনটা যদি সত্যই স্বপ্ন হত আর স্বপ্নটা জীবন,

কী আনন্দই না হত তাহলে! কিন্তু বিধাতার পরিহাস কোন পথে চলে কেউ জানে না। একটা অনিবার্য বিধানে তোমার কাঁধে চিরকৌমার্য চাপিয়ে দিয়ে নিজে কাঁধে তুলে নিলাম অনুশোচনার বোঝা। বাইরে থেকে মনে হবে এ আমারই কাজ, এর দায়িত্ব আমারই। অথচ আমি জানি, তুমিও জান, এই ঘটনাপ্রবাহের উপর আমার কোনই হাত ছিল না।

অবসর বড় একটা পাই না। এও বিধাতার আর একটা পরিহাস, তিনি আমাকে প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিস্টার করবার জন্যে যেন উঠে-পড়ে লেগেছেন। সুতরাং শান্তভাবে, সুস্থভাবে, গভীরভাবে নিজের কথা ভাববার সময়েরও একান্ত অভাব।

তারই মধ্যে ক্বচিৎ কোনও রাত্রে আইন-ঘটিত কোনও ব্যাপারে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের জন্যে চোখে ঘুম আর নামে না, মনে পড়ে তোমাকে। পাশে শুয়ে অরুণা, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কল্পনা কর সুচরিতা, পাশে শুয়ে অরুণা,—অসতর্ক, অসজ্জিত, নিরস্ত্র এবং নিশ্চিন্ত; ভাবছি তোমার কথা! একজন বিবেকবান ভদ্রলোকের পক্ষে এ কি সহজ শাস্তি!

তোমার বিবেক পরিষ্কার। তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তোমার জীবন নির্মল। চোখে তপস্যার অঞ্জন। আমার বিবেক দংশনপরায়ণ, হৃদয় শূন্য, জীবন জ্বালাময়, চোখে কলঙ্কের কালিমা! অথচ,—কে জানে তুমি নিজে কি ভাব,—বাইরের লোকে ভাববে আমিই সব-পাওয়াদের দলে, তুমি সব-হারাদের। তোমার জন্যে রইল কৃচ্ছ্রসাধনার সমস্ত গৌরব, আমার জন্যে অপকলঙ্ক।

একে তুমি বিধাতার পরিহাস বলবে না তো কি বলবে?

এই চিঠিখানা পাওয়ার পর কয়েকদিন সুচরিতার দেহ যেন শোলার মত হালকা হয়ে গেল। তার পা যেন মাটি ছোঁয়-ছোঁয়-ছোঁয় না। তার হৃদয়ের কোষে-কোষে যেন অনবরত মধুক্ষরণ হচ্ছে, আর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে স্বপ্ন। সকল কথা যেন সে শুনতে পায় না। অনেক কথা শুনতে পায়, কিন্তু বুঝতে পারে না। বক্তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

এ তার হল কি?

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে যায়। অকারণেই হয়ত কাছের মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে ছোট ছোট মেয়েদের গল্প বলতে বলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে যায়,—খেই খুঁজে না পেয়ে লজ্জা পায়। না যায় খেলার মাঠে, না বেড়াতে।

কত বার যে দোয়াত-কলম নিয়ে প্রণবের চিঠির জবাব দিতে বসল তার আর ইয়ত্তা নেই। কখনও একটা লাইনও লিখতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়। কখনও এক লাইন লিখেই সেটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একটি বিশেষ কথা বিশেষ একটি ভঙ্গিতে সে লিখতে চায়। কিন্তু না খুঁজে পাচ্ছে সেই বিশেষ কথাটি, না সেই ভঙ্গিটি। এবং যে জিনিসটি সুনিশ্চিত আছে, হারায়নি,—সেই জিনিসটা খুঁজে না পেয়ে যেমন মনের মধ্যে অস্বস্তি ভারী হয়ে ওঠে, তেমনি একটা অস্বস্তি ওর মনের উপর সব সময় জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রইল।

অবশেষে লিখলে শুধু দুটি লাইনঃ

২২শে কলকাতায় ফিরছি। দেখা করবে তো? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাত্র দুটি লাইন। কিন্তু মনে হল লেখা ও না-লেখা মিলিয়ে যেন দুশো লাইন। এবং এইতেই তার সকল কথা লেখা হয়ে গেল।

প্রণব কিন্তু তবু সংক্ষিপ্ত হতে পারলে না। অবশ্য হবার চেষ্টাও করেনি সে। লিখলেঃ

সমুদ্রে যার জাহাজ-ডুবি হয়ে যায়, তরঙ্গ যার একমাত্র অবলম্বন, পৃথিবীতে তার চেয়ে অকুতোভয় আর কেউ নেই। সে খোঁজে মণি নয়, মাণিক্য নয়,—ভেসে-চলার যে-কোনও একটা অবলম্বন। সম্ভব হলে হাঙরের পিঠে চড়েও সে সমুদ্র পাড়ি দিতে প্রস্তুত।

আমার অবস্থাও তাই।

সুতরাং কাউকে আমার ভয় নেই। তোমাকেও না। আর আমাকে? না, আমাকেও কারও ভয় নেই,—তোমারও না, অরুণারও না।

অতএব নির্ভয়ে তুমি আসতে পার। তুমি এলেই আমি দেখা করব। সম্ভবত সস্ত্রীক। তাছাড়া আমার বাড়ির পার্টিটা শুধু তোমার আর বিমানের জন্যেই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা আছে। আর আছে টেনিস। আমাদের লনটা কি সুন্দর হয়েছে দেখবে এসে। তোমার সঙ্গে একটা গেম খেলবার জন্যে অরুণা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এই চিঠিটা পাওয়ার পরে, সুচরিতার দেহের যেটুকু ওজন ছিল তাও যেন আর রইল না। সে যেন বাতাসে উড়তে লাগল। ২২শের তখনও হপ্তাখানেক দেরি। কিন্তু তার যেন মনে হল সাতটা বছর। এবং এই সাত বছর যেন কোনও দিন কাটবে না।

অতএব দেহটা যদিচ তার জলপাই-গুড়িতেই পড়ে রইল,—হাজিরা দেয় আর ক্লাস করে,—মনটা অতদিন অপেক্ষা করতে না পেরে বিনা টিকিটেই একদিন কলকাতা পালিয়ে গেল, এমন সঙ্গোপনে যে বাইরের লোকে তো জানতে পারলেই না, সে নিজেও পারলে না।

চৌদ্দ

সকালে প্রণব কাজের চাপে সুচরিতাদের বাড়ি যেতে পারলে না। টেলিফোনে জানিয়ে দিলে সন্ধ্যায় অরুণা এবং বিমানকে নিয়ে যাবে। এবং সন্ধ্যাবেলায় সবসুদ্ধ গিয়ে উপস্থিত হল।

ঘরে তখন সুচরিতা আর তার মা বসে গল্প করছিলেন। বরদা কি একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছে। প্রণবদের আসার কথা সে জানে। বলে গেছে শীঘ্র ফেরার চেষ্টা করবে।

প্রণবের অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গে সে কথা জানিয়েই সুচরিতার মা বললেন, এবারে ওকে আটকাও প্রণব। জিজ্ঞেস কর ওকে, কী দুঃখে ও চাকরি করতে গেছে, কেনই বা বিয়ে করতে চাইছে না। তোমার কথা শোনে। তুমিই জিজ্ঞেস কর। উনি তো জিজ্ঞেস করেনই না। আমি জিজ্ঞেস করলে হাসে। অথচ চাকরি করে মেয়ের চেহারা কি চমৎকার হয়েছে দেখ।

প্রণব বললে, সত্যি সু। তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। শরীর কি ভালো ছিল না।

—ওটা তোমাদের চোখের ভুল। শরীর ভালো থাকবে না কেন?

সুচরিতা হাসতে লাগল। বিমানকে কোলে টেনে নিয়ে বললে, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে মিসেস মুখার্জির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। তুমি কবে এলে বিমান?

বিমান জবাব দিলে, পরশু। আমাদের পার্টিতে আসছেন তো?

—তোমার মা-বাবা নেমন্তন্ন না করলে কি করে যাই বাবা? অনেক নেমন্তন্ন পাওনা আছে তোমার মায়ের কাছে। তোমাদের লন দেখার নেমন্তন্ন, তোমার মায়ের টেনিস খেলা দেখার নেমন্তন্ন,—তারপরে—

বাধা দিয়ে অরুণা সহাস্যে বললে, ওসব আবার কোথায় শুনলেন?

—শুনব কেন? 'ইংলিশম্যানে' বেরিয়েছে যে! সবাই দেখেছে।

—তাই বুঝি! ইংলিশম্যানে বেরুবে আপনার খেলার খবর;—আমাদের নয়।

সুচরিতার মা বিমানকে টেনে নিয়ে বললেন, ওরা ঝগড়া করুক ভাই, আমরা ওঘরে বসে বসে গল্প করিগে চল।

গল্পের নামে বিমান খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, কি গল্প বলবেন, অ্যাড-ভেঞ্চারের?

—না ভাই, আমি মুখ্যু মানুষ, ওসব ইংরেজি গল্প জানিনে। আমি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প জানি। আর যদি আরও ভাল গল্প শুনতে চাও তাহলে ভীম-অর্জুনের গল্প বলতে পারি।

বিমান উৎসাহভরে বললে, তাই বলুন। ভীমের গল্প সেই ঠাকুমার কাছে শুনেছি, আর শুনিনি। ভুলেই গেছি প্রায়।

ঠাকুমার নামে সুচরিতার মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মায়ের খবর কি প্রণব? চিঠিপত্র দেন তো?

প্রণব জবাব দিলে, মাঝে মাঝে দেন। খুব বেশি নয়।

—আহা! শান্তি পেয়ে গেছেন আর কি! আমার মতো মহাপাপী তো নন!

সুচরিতার মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সুচরিতা হেসে বললে, অমন করে নিশ্বেস ফেল না মা। এঁরা ভাববেন সত্যিই বুঝি তুমি মহাপাপ করেছ!

—করেছি বই কি—সুচরিতার মা জবাব দিলেন,—নইলে প্রণবের মা দিব্যি হাসতে হাসতে আশ্রমে চলে গেলেন, আর তোমার বিয়ের ভাবনা ভাববার জন্যে আমি এখানে পড়ে আছি?

—দোহাই তোমার! তুমি আর আমার বিয়ের ভাবনা কর না। তার চেয়ে হাসতে হাসতে আশ্রমে চলে যেতে চাও তো বল, আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি এই ছুটির মধ্যে।

—তাই তো বলবি! চল ভাই, ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব না, ও ঘরে গিয়ে গল্প করব। তুমি নোনতা ভালবাস, না মিষ্টি?

বিমান উত্তর দেবার আগেই সুচরিতা বললে, দুই-ই।

—দুই-ই? বেশ, বেশ। চল, দেখি দুই-ই কতখানি ভালবাসতে পার।

বলে বিমানকে নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

যাবার সময় বিমান সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, ঠাকমার কাছে গল্প শুনেই আমি আবার আসব মাসিমা।

ওর গাল টিপে দিয়ে সুচরিতা বললে, নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে মাসিমা বলতে কে শিখিয়ে দিলে বিমান, বাবা?

কেউ শিখিয়ে দেয়নি। বিমান নিজেই বুদ্ধি করে বলেছে।

কিন্তু সে উত্তর দেবার আগেই অরুণা বললে, আমি। বলে দিয়েছি পিসিমা না বলে মাসিমা বলতে। আপনার আপত্তি আছে?

সুচরিতা হেসে বললে, কিছুমাত্র না। শুধু বুদ্ধিটা কার, তাই জানতে চাইছিলাম।

বিজয়িনীর মতো স্বামীর দিকে চেয়ে

অরুণা চট করে বললে, তাহলে আর 'আপনি' নয়। আমরা একবয়সীই হব। আমি তোমাকে সুচরিতাদি বলব, তুমি বলবে অরুণাদি। অথবা পরস্পরের শুধু নাম ধরেও ডাকতে পারি। কেমন?

—তাই হবে।

বিজয়িনীর মতো স্বামীর দিকে চেয়ে অরুণা বললে, তোমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলছিলে, এমন হিংসা হচ্ছিল!

—জানি। মেয়েরা বড়ই ঈর্ষাপরায়ণ।—প্রণব সগর্বে বললে।

—তাই বুঝি! ওরা দুজনেই হেসে উঠল,—আর পুরুষদের মনে ঈর্ষা দ্বেষ কিচ্ছু নেই, না?

—না। তারা সাধু লোক।—প্রণব জবাব দিলে।

—তার নমুনা তুমি। কি বল?

বলে সুচরিতা কি রকম করে হাসতে লাগল।

অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, কাল বিকেলে আসছ তো সুচরিতাদি?

—কাল বিকেলে? কি ব্যাপার!—সুচরিতা বললে।

প্রণব অরুণার হয়ে জবাব দিলে, ওর নতুন লনে তোমার সঙ্গে এক গেম খেলবার জন্যে অরুণা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

—তাই নাকি?—সুচরিতা হাসতে লাগল, আর তো খেলি না অরুণাদি। খেলা ভুলেই গেছি বলতে পার।

—আহা! এত ভালো খেলতে, এর মধ্যে সেই খেলা আবার ভোলা যায়!—অরুণা বিশ্বাস করতে পারছে না।

প্রণব বললে, যায়। সাধনা করলে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেও ভোলা যায়। আমি তোমাকে বলিনি অরুণা, সুচরিতা এখন ভোলার সাধনায় মত্ত। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ভুলেছে, আর টেনিস খেলা ভুলতে পারবে না? কী যে বল তুমি!

সবাই হাসতে লাগল।

সুচরিতা বললে, ভোলার সাধনাই বটে! ভোলানাথের সাধনা।

অরুণা ঠাট্টা করে বললে, উমার মতো নাকি?

—কি জানি কার মতো! কিন্তু আমার র‍্যাকেটটা কি আছে? খুঁজে দেখতে হবে।—সুচরিতা চিন্তিতভাবে বললে।

প্রণব বললে, তাই দেখ। দেখে একটা গেম খেল। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে?

সুচরিতা তখনই ওর দিকে ফিরে বললে, সে কথা জানবার জন্যে খেলা দেখতে হবে প্রণববাবু? আমি তো না দেখেই বলতে

পারি, আমি হেরে যাব। তোমার সঙ্গেই বা কদিন জিতেছি বল।

বলে তখনই কথার সুর ফিরিয়ে অরুণাকে বললে, তুমি প্রণববাবুর কাছে কি শুনেছ জানি না। কিন্তু খেলতে সত্যিই আমি ভালো পারি না। শেষ পর্যন্ত হারি।

প্রণব হেসে বললে, ঠিক তার উলটো অরুণা। তোমাকে ও ভাঁওতা দিচ্ছে। ওর খেলায় তোমার মতো জৌলুস নেই। তোমার মতো চক্ষের পলকে আশ্চর্য মার মারতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত স্টেডি। অনেক দিন তাই ওকে হারাতে হারাতে নিজেই হেরে গেছি।

অরুণা বললে, এই দেখ! একে একে তোমার কৃতিত্ব প্রকাশ হচ্ছে!

—সব বাজে কথা অরুণাদি—সুচরিতা হেসে বললে,—আমি হারব সুনিশ্চিত জেনেই প্রণববাবু সান্ত্বনা দিচ্ছে আমাকে। ওর কথা শুনো না।

প্রণব বললে, না শুনতেও পার। কিন্তু জেতবার ইচ্ছা থাকলে শুনতেই হবে। ওর সঙ্গে জিততে গেলে অরুণা, তোমাকে তোমার চমক-লাগানো খেলা ছাড়তে হবে। ওর মতো সতর্ক হয়ে ধীরভাবে খেলে যেতে হবে। নইলে সুচরিতাকে হারানো অসম্ভব।

এমন সময় বরদা হৈ হৈ করে ঢুকল। অরুণার দিকে চেয়ে বললে, কতক্ষণ এসেছেন?

কোপকটাক্ষ হেনে অরুণা জবাব দিলে, সে খবরে দরকার কি! এলেন তো আমাদের ওঠবার সময়ে। আর দু'মিনিট পরে এলে দেখাই হত না। কোথায় গিয়েছিলেন? গিন্নি কোথায়?

হাত জোড় করে বরদা বললে, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় ছিল না। বাঁ হাতটা একেবারেই ভেঙে গেছে। প্রতিমাকে সেখানেই রেখে আসতে হল সেজন্যে।

অরুণা চমকে উঠল,—কোথায় রেখে এলেন? কার হাত ভেঙেছে?

—আপনারা শোনেন নি কিছু?—বরদা বললে,—আমার শালার।

—কি করে হাত ভাঙল? কত বড় ছেলে?

—কলেজে পড়ে। ঘোড়ায় চড়া শিখতে গিয়ে এই বিপত্তি। দেখুন কাণ্ড! বাঙালীর ছেলে, করবি তো চাকরি! আবার ঘোড়ায় চড়া কেন বাপু? হয়েছেও তেমনি শাস্তি!

বরদা হাসতে লাগল। সবাই আশ্বস্ত হল, আঘাত বেশি হলেও খুব ভয়ের কিছু নেই।

বরদা জিজ্ঞাসা করলে, কি কথা হচ্ছিল তোমাদের? মনে হচ্ছে আমি এসে যেন রস-ভঙ্গ করলাম।

অরুণা বললে, সুচরিতাদির খেলার সুখ্যাতি হচ্ছিল।

বরদা বললে, মুক বলছিল তো? কলকাতা শহরে সু'র খেলার ওই একমাত্র সমজদার।

সুচরিতা জোর পেয়ে গেল,—তুমি বল তো দাদা, তুমি তো অরুণাদির খেলা দেখেছ।

বরদা বললে, মিসেস মুকার্জির খেলা তোর চেয়ে ঢের ব্রিলিয়ান্ট। ওঁকে যদি তুই হারাতে পারিস তাহলে এই জন্যে পারবি যে, তুই খুব স্টেডি।

অরুণা মনে মনে খুব খুশি হচ্ছিল।

প্রণব বললে, আমিও সেই কথাই বলছিলাম স্যার। তার বেশি কিছু নয়।

বরদা বললে, তাহলে অন্তত একবারের জন্যে তুমি চাটুবাদিতার অভিযোগ থেকে মুক্ত হলে। কিন্তু খেলাটা হচ্ছে কবে?

অরুণা বললে, কাল।

—আমার নিমন্ত্রণ আছে তো?—বরদা জিজ্ঞাসা করলে।

—নিশ্চয়ই। আপনিই তো আম্পায়ার। অরুণা বললে।

—কেন মুকের ওপর ভরসা হচ্ছে না? —বরদা হাসলে।

—না।—অরুণাও হাসলে।

—কিন্তু খেলার শেষে খাওয়া-দাওয়া আছে তো?

—নিশ্চয়ই। রাত্রে ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে আসবেন।

সুচরিতার দিকে চেয়ে প্রণব বললে, অর্থাৎ ঘুষ! এই ঘুষেই বাঙালী জাতটাকে খেলে। তুমি খেল না সুচরিতা।

—না, খেলব।—সুচরিতা বললে।

—আম্পায়ার ঘুষ খাবে জেনেও খেলবে?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি মরিয়া হয়ে উঠলে সু? ভয় বলে কিছু নেই?

—না।—সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলতে লাগল,—"সমুদ্রে যার জাহাজ-ডুবি হয়ে যায়, তরঙ্গ যার একমাত্র অবলম্বন, পৃথিবীতে তার চেয়ে অকুতোভয় আর কে আছে? সে খোঁজে মণি নয়, মাণিক্য নয়,—ভেসে চলার যে-কোনো একটা অবলম্বন। সম্ভব হলে হাঙরের পিঠে চড়েও সে সমুদ্র পাড়ি দিতে প্রস্তুত।"

—সর্বনাশ!—বিস্ময়ে বরদা গালে হাত দিলে।—তুই কি জলপাইগুড়ি থেকে কাব্যের ইনজেকশন নিয়ে এসেছিস?

বরদার কথার ভঙ্গিতে সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু নিজেদের হাস্যে মশগুল হয়ে না থাকলে বুঝতে পারত, প্রণবের হাসিটা নিতান্তই কাষ্ঠহাসি। সে যেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে।

এমন সময় সুচরিতার মা এসে জানালেন, ন'টা বাজে।

অরুণা চমকে উঠল,—নটা! সে কি! ওঠ, ওঠ। বিমান কোথায়?

সুচরিতার মা বললেন, সে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুচরিতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, তাহলে তাকে আর তুলে কাজ নেই। কাল সকালে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ব'লে এমন করুণভাবে প্রণবের দিকে চাইলে যে, অরুণা আপত্তি করার আগেই প্রণব বললে, বেশ তো! থাক না। চল অরুণা, আর দেরি করা নয়।

—চল।

বিমানকে ফেলে যেতে অরুণার মনটা কিন্তু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। কিন্তু প্রণবের কথার উপর আর কিছু বলতেও পারলে না।

সুচরিতা এবং অরুণা পরস্পরের খেলা না দেখলেও প্রণব এবং বরদা উভয়েরই খেলার সঙ্গে পরিচিত। দু'জনেই যে ভালো খেলে সে বিষয়ে ওদের সন্দেহ নেই। বিশেষ আজকে জেতবার আগ্রহে দু'জনেরই হাত খুলে গেছে। একটা দেখবার মতো খেলা! এবং দেখতে দেখতে প্রণব আর বরদা দু'জনেই উল্লসিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রণব যে কতগুলো ছবি তুললে তার ইয়ত্তা নেই। লনের মধ্যে দু'জনে যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো ছুটে বেড়াতে লাগল। সে একটা দৃশ্য!

খেলায় কোনও মীমাংসা হল না। দু'জনেই সমান।

খেলার শেষে সুচরিতা এবং অরুণা দু'জনেই দু'জনের নৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করতে লাগল।

বরদা বাধা দিয়ে বললে, পরস্পরের পিঠ-চুলকানির জন্যে যথেষ্ট সময় রয়েছে। সে সব পরে হবে। আপাতত আম্পায়ারি করে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। কি আছে বের করুন।

অরুণা হেসে বললে, আসুন আমার সঙ্গে। দেখি গলা-ভেজাবার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না।

তারপরে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, খেলা দেখে তোমারও কি গলা শুকিয়ে গেছে?

—একটু গেছে বই কি!

—এস তাহলে।

—চল, আমি এখনই আসছি।

ওরা চলে যেতেই প্রণব সুচরিতার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। সুচরিতা চোখ নামিয়ে নিলে।

প্রণব শান্ত কণ্ঠে বললে, তুমি ইচ্ছে করে জিতলে না সু।

জড়িত কণ্ঠে সুচরিতা বললে, না না, অরুণাদি চমৎকার খেলে।

প্রবণ বললে, টেনিস খেলাটা আমিও কিছু বুঝি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। অরুণাও ভালো খেলে সত্যি। তবু তুমি আজ ইচ্ছে করে জিতলে না।

সুচরিতা চুপ করে রইল।

প্রণব ধীরে ধীরে বলতে লাগল,—তুমি আশ্চর্য মেয়ে সু! তোমার খেলা দেখতে দেখতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। খেলায় হার জিত দুইই আছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের মনে সন্দেহমাত্র না জাগিয়ে না-জিততে গেলে কতখানি নিপুণতা দরকার, আজকে তোমার খেলা দেখে তা বুঝতে পারলাম।

সুচরিতা তথাপি নিরুত্তর।

প্রণব বললে, কিন্তু তুমি জেত না কেন সুচরিতা? জেতবার জন্যে মানুষের মনে যে স্বাভাবিক এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, তোমার কি তাও নেই?

এবারে সুচরিতা হাসলে। কান্নার মতো হাসি। ওর চোখেও যেন সেই কান্নার স্বচ্ছ ছায়া।

বললে, খেলাটা আয়ত্ত হয়ে গেলে হার-জিতের আর কী মানে হয়, প্রণববাবু? বড় কোনটা, খেলাটা না হার-জিতটা?

—হার-জিতটা। খেলা এক সময় শেষ হয়, কিন্তু হার-জিতটা তারপরেও থাকে।

—নিরর্থক থাকে থাক। আমি ওর কোনো মূল্য দিই না।

রেগে প্রণব বললে, কেন না তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর। তোমার পৃথিবী, তোমার আনন্দ, তোমার স্বপ্ন তোমার নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ।

ওর রাগ দেখে সুচরিতা হেসে ফেললে। বললে, ব্যারিস্টার সাহেব, তোমার সঙ্গে কথায় পারা কঠিন। কিন্তু গলা তোমার অনেকক্ষণ থেকে শুকিয়ে রয়েছে, মিছে তর্ক করে তাকে আরও কষ্ট দিও না। ওই দেখ, অরুণাদি ডাকাডাকি করছে। যাও।

গট্‌গট্‌ করে প্রণব চলে গেল।

ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে সুচরিতা আপনমনেই হাসতে গেল। কিন্তু কোথায় ছিল কান্নার সমুদ্র, বাঁধ ভেঙে ওর দু-চোখের কূল ছাপিয়ে উথলে উঠল।

আপন মনেই বলতে লাগল,—টেনিস খেলায় তুমি তো দিকপাল। তোমার চোখে তো খেলার অতি সূক্ষ্ম মারটাও এড়িয়ে যায় না মনে কর। কিন্তু আজকের খেলায় আমি যে জিতলাম না এইটেই তোমার চোখে পড়ল, হেরে গেলাম সেটা আর চোখে পড়ল না?

—মাসিমা!

বিমান কখন এসে পাশে বসেছে টের পায় নি। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি সাড়া দিলে, কি বাবা?

—খেলতে গিয়ে তোমার কি লেগে গেল?

—না বাবা।

—তবে কাঁদছ কেন?

ব্যস্তভাবে আড়ালে চোখের জল মুছে ফেলে সুচরিতা সভয়ে বললে, কী বোকা ছেলে তুমি! কাঁদিনি তো। কাঁদব কেন?

বিমান দেখলে, তাই বটে। চোখে কান্নার চিহ্নও নেই। লজ্জিতভাবে বললে, আমি ভাবলাম তুমি কাঁদছ বুঝি!

সুচরিতা ওকে বুকে জড়িয়ে হেসে উঠল।

অরুণা এসে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলের সঙ্গে এত হাসি কিসের?

মাথা দুলিয়ে সুচরিতা জবাব দিলে, হাসির কথা পৃথিবীতে কতই আছে, সব তুমি নাই শুনলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?

অরুণা বললে, একটু ক্লারেট ছিল। বের-করে গলাটা ভিজিয়ে দিয়ে এলাম।

—তাহলে মন ভিজতে এখনও বাকি আছে। ওই দেখ, প্রণববাবু তোমাকে ডাকা-ডাকি করছেন।

সুচরিতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

অরুণা সেদিকে ফিরে চাইলেই না। বললে, ডাকুক। তুমি তো জানো না সুচরিতাদি, মন ওর একেবারে সাহারা মরুভূমি। সপ্তসিন্ধুর জলেও ভেজে না।

অরুণা হাসতে লাগল। বললে, মনের জন্যে ভাবি না সুচরিতাদি। ও মন ভেজবার নয়। ভাবনা গলাটার জন্যে। একটু সময় নিলেও শেষ পর্যন্ত ওটা ভেজে। আর না ভিজলে ডাকে।

সুচরিতা হেসে বললে, ওই দেখ, আবার ডাকছে!

পাশ দিয়ে একটা বেয়ারা যাচ্ছিল। অরুণা তার হাতে এক থোলো চাবি দিয়ে সাহেবকে দিতে বলে দিলে। বললে, ওই বড়টা সেলারের চাবি।

তারপর সুচরিতাকে টেনে উঠিয়ে বললে, ডিনার তৈরি। চল, আমাকে একটু সাহায্য করবে। ডিনার না পড়লে ওঁরা উঠবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমার বৌদি তো আসতে পারলেন না। তাঁর ভাইটি আছে কেমন?

—এখনও চিন্তার কারণ রয়েছে।—সুচরিতা অরুণার সঙ্গে যেতে যেতে বললে।

পনেরো

কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, —যেমন করে সাধারণত যায়। অরুণার কোলে একটি মেয়ে এসেছে, মাধবী। বিমান সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে। পড়াশুনায় খুবই সে ভালো, প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে অনেক প্রাইজ নিয়ে আসে।

বারে প্রণব এখন বেশ নাম করেছে। ভালো রোজগার করছে। চেহারার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। কেবল একটু মোটা হয়েছে, মুখখানা আর একটু ভারিক্কি এবং খুব লক্ষ্য করলে কানের কাছে দু-চারটে পাকা চুলও দেখা যায়।

তখন ফাল্গুন মাস। শীতের আমেজ রয়েছে। কোর্ট থেকেই প্রণব অরুণাকে টেলিফোন করলে, তার বাইরে যাবার জিনিস-পত্র বেঁধে-ছেঁদে ঠিক করে রাখতে। কোর্ট থেকে ফিরেই তাকে চিটাগাং মেল ধরতে হবে।

একটা দুরূহ ফৌজদারী মামলা আর কি! শরীরটা তার কদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু একে মোটা টাকা ফি, তার উপর মক্কেলের সনির্বন্ধ অনুরোধ, সর্বশেষে সুচরিতা, এই ত্র্যহস্পর্শে এই অসুস্থ শরীরেও তাকে সুদূর চট্টগ্রামে টেনে নিয়ে চলল।

তার শরীর অসুস্থ দেখে অরুণা সঙ্গে যাবার কথা ভেবেছিল। অসুবিধাও ছিল না যখন সুচরিতা ওখানে। কিন্তু বিমানের কি একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। তাকে একা রেখে যাওয়া যায় না এবং পরীক্ষা না দিয়ে বাইরে যেতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। তার উপর মাধুরীটার দাঁত উঠছে। তারও শরীর খুঁতে খুঁতে করছে।

এইসব নানা কারণে আগ্রহ সত্ত্বেও অরুণার যাওয়া সম্ভব হল না। মনকে এই বলে বোঝালে যে, সুচরিতা যখন ওখানে রয়েছে তখন প্রণবের জন্যে চিন্তার কোন কারণ নেই।

কয়েক বছর হল দিন কয়েকের আগু-পিছু প্রথমে সুচরিতার মা এবং তারপরে বাবা মারা যান। সেই সময় সুচরিতা কলকাতায় এসেছিল। আর আসেনি, কিছুটা হয়তো কাজের চাপে, কিছুটা হয়তো আকর্ষণের অভাবে। সেই থেকে সুচরিতার সঙ্গে এদের দেখা নেই। প্রথম প্রথম এক-আধখানা চিঠি আসত-যেত। ইদানীং তাও বন্ধ।

সুতরাং বরদার কাছ থেকে ঠিকানা নিতে হল টেলিগ্রামে সুচরিতাকে প্রণবের যাওয়ার তারিখ, সময় এবং প্রয়োজনটা জানাবার জন্যে। প্রণব যাত্রা করার পর অরুণা আরও

একখানা জরুরী টেলিগ্রাম করলে, প্রণবের স্বাস্থ্যের খবরটা দিয়ে।

চট্টগ্রামে যদি ভালো হোটেল থাকে, মক্কেল হয়তো তাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে তুলবে। না থাকলে হয়তো একটা বাড়ি ভাড়া করে রাখবে। এই শরীরের অবস্থায় দুটোই খারাপ। তাই সুচরিতাকে সে বিশেষ করে অনুরোধ জানালে প্রণবকে তার নিজের বাড়িতে নিজের চোখের সামনে রাখতে। তাহলে অরুণা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

অবশ্য একটা কি বড় জোর দুটো দিনের মামলা। একটা সকালে পৌঁছুবে। সেদিন এবং বিশেষ আবশ্যক হলে হয়তো তার পরের দিনটা থেকে রাত্রেই প্রণব ওখান থেকে যাত্রা করবে। সঙ্গে বিশ্বাসী ভৃত্য ঝগড়ুও যাচ্ছে। তার উপর নির্ভর করা যায়। চাকরটা শুধু বিশ্বস্ত নয়, বুদ্ধিমানও। তাকে তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, চট্টগ্রাম পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে যেন সাহেবের শরীরের অবস্থা জানিয়ে কলকাতায় জরুরী তার করা হয়।

এখন চিন্তার কথা সুচরিতা চট্টগ্রামে থাকলে হয়। সে না স্কুল পরিদর্শনে মফঃস্বলে বেরিয়ে গিয়ে থাকে। তা যদি হয়, তাহলে ওর অফিসের কেউ কি ওর টেলিগ্রাম খুলবে? খুলে যেখানে ও গেছে সেখানে লোক দিয়ে হোক, টেলিগ্রাম করে হোক, ওকে কি খবর দেবে? এত বুদ্ধি কি ওর অফিসের লোকদের হবে?

প্রণবকে একলা পাঠিয়ে এইসব নানা চিন্তায় অরুণা সারারাত্রি এক ফোঁটা ঘুমুতেই পারলে না।

সকালে উঠেই পোস্টাফিসে জানিয়ে দিলে চট্টগ্রাম থেকে তার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে সেটা যেন তৎক্ষণাৎ বিশেষ লোক দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর জন্যে তাকে বখশিশ দেওয়া হবে।

এবং তারপরেও বিমানকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে বিশবার শুধু ঘর-বার করতে লাগল। কিছুতে যেন আর শান্তি পায় না।

সকালে সুচরিতা যখন চট্টগ্রাম স্টেশনে প্রণবকে আনতে গেল, প্রণব তখন বেহুঁস। কিন্তু জ্বরে নয়, মদে। মক্কেলের মুখ শুখিয়ে আমসি! এত টাকা খরচ করে বড় ব্যারিস্টার নিয়ে আসা হল। সকালেই মামলা উঠবে। এবং এই যদি মূল্যবান ব্যারিস্টারের অবস্থা হয়, তাহলে একে কোর্টে নিয়েই বা যাওয়া যায় কি করে? আর নিয়ে গিয়েই বা হবে কি!

এই অবস্থায় সুচরিতা যখন প্রস্তাব করলে প্রণব তার বাড়িতে উঠবে, তখন মক্কেলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মামলার অবস্থা যা হবার হোক, এই অর্ধ-অচৈতন্য মূল্যবান দেহটার দায়িত্ব যে তাকে নিতে হবে না, এইতেই সে কৃতার্থ হয়ে গেল।

সেলাম করে সবিনয়ে বললে, ঠিক দশটায় মামলা আরম্ভ হবে মেমসাব।

সুচরিতা নিজের ঠিকানা দিয়ে বললে, ঠিক আছে। এই ঠিকানায় সাড়ে নটার মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসবেন। সাহেব তৈরি থাকবেন।

মক্কেলটি এই অপ্রত্যাশিত আশ্বাসের পরে প্রণবের সমস্ত দায়িত্ব সুচরিতার ঘাড়ে চাপিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝগড়ু শুষ্ক মুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখে সুচরিতা তবু খানিকটা আশ্বস্ত হল,—তুই এসেছিস! তবু ভালো।

কিন্তু ভালো যে কোথাও আছে, এমন সম্ভাবনার চিহ্নমাত্রও ঝগড়ুর মুখ-চোখের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বরং শুষ্ক মুখ শুষ্কতর করে ঝগড়ু আরও জানালে, সাহেবের একটু জ্বরও আছে বোধ হয়।

—এর ওপর জ্বরও আছে! বাঃ! কিন্তু তোমার সাহেবের মক্কেলটিও কি সরে পড়লেন?

এদিক ওদিক চেয়ে ঝগড়ু বললে, তাই তো মনে হচ্ছে।

—হুঁ।

কিন্তু এই স্টেশন এবং এখানকার লোক-জন সুচরিতার কিছু কিছু পরিচিত, বিশেষ করে তার আরদালিটার। সে কোথা থেকে একটা 'ইনভ্যালিড চেয়ার' নিয়ে এল এবং কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে কতকগুলি কুলির সাহায্যে বাইরে অপেক্ষমান মোটর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললে।

সুচরিতার বাসাটা চমৎকার! একটা টিলার উপর, অনেকখানি হাতাওয়ালা, ছবির মতো মনোরম একটা বাংলো।

আশ্চর্য! সেইখানে পৌঁছেই প্রণব চোখ মেললে এবং কারও সাহায্য না নিয়েই টলতে টলতে নেমে পড়ল। বললে, বাঃ! চমৎকার বাংলোটি পেয়েছ তো? নাইস, নাইস!

সুচরিতা অবাক।

ঝগড়ুর দিকে চেয়ে প্রণব বললে, সেই মক্কেলটি কোথায় গেল?

সুচরিতা বললে, ভেগেছে।

—ভাগবে কি! তার টিকি যে আমার হাতে!

—তাহলে টিকি রেখেই ভেগেছে। সাড়ে ন'টায় আসবে বলে গেছে। তুমি কি করবে বলতো? এখনই ব্রেক ফাস্ট করবে, না স্নান করে এসে?

—স্নানটা করা দরকার সু।

সুচরিতা হেসে বললে, সে তো আমি বুঝছি। কিন্তু ঝগড়ু বলছে কাল তোমার একটু জ্বরের মতো হয়েছিল। অরুণাদিও সেই মর্মে টেলিগ্রাম করেছে।

—করেছে নাকি? ওই এক ব্যস্তবাগীশ!

তারপরে ঢোঁক গিলে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললে, কিন্তু দশটায় মামলা, স্নান না করলে তো দাঁড়াতে পারব না।

—তা হলে যা থাকে অদৃষ্টে, গরম জলে স্নানটা করে নাও। মক্কেলের অতগুলো টাকা নষ্ট করা ঠিক হবে না।

—না। তাতে বদনাম হবে। তার চেয়ে জ্বর ভালো। তারপরে তুমি তো আছই। জলে তো আর পড়িনি! ওরে ঝগড়ু!

ঝগড়ু সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

তার দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে প্রণব বললে, না। তোকে দিয়ে হবে না। তুই তো এখানকার কিছুই জানিস না।

—কেন? কি দরকার? চুরুট? তাও আনিয়ে রেখেছি।—সুচরিতা হাসতে হাসতে বললে।

—রেখেছ নাকি? না, চুরুটে আমারও কখনও ভুল হয় না, অরুণারও না। চুরুট নয়।

—তবে?

—একটা টেলিগ্রাম করতে হত অরুণার কাছে। তোমার চাপরাশিটাকে—

বাধা দিয়ে সুচরিতা বললে, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তুমি শুধু তাড়া-তাড়ি স্নানটা করে ব্রেকফাস্ট সেরে নাও দেখি। মক্কেল এসে দেখুক তুমি সুস্থ, তার মামলা নিরাপদ। স্টেশনে বেচারার শুকনো মুখখানা দেখে পর্যন্ত মন ভালো নেই।

প্রণব হো হো করে হেসে উঠলঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা রাত্রি ওর মামলার কাগজপত্র পড়তে পড়তেই এসেছি। মামলা ভালো। ও জিতে যাবে।

—তাই নাকি! কিন্তু সারারাত্রি মামলার কাগজপত্র পড়বার মতো অবস্থা ছিল তোমার? মনে তো হয় না।

—সেটা যে ভ্রান্তি, মামলার ফলেই তা টের পাবে। এখন কোথায় তোমার বাথরুমটা দেখিয়ে দিতে বল তো। হয়তো, এখানকার উকিল মামলাটা বোঝাবার জন্যে এখনই এসে হাজির হবে।

প্রণব ব্যস্তভাবে চলে গেল।

ন'টার মধ্যে প্রণব তৈরি হয়ে গেল। উকিল বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। পোশাক পরেই প্রণব সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল এবং উকিলকে কুশল-প্রশ্নের অবকাশমাত্র না দিয়ে মামলার মধ্যে ডুবে গেল।

সাড়ে ন'টায় মক্কেল এসে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল। সেলাম করে বললে, গাড়ি তৈরি সাহেব।

—চলুন।

গাড়িতে উঠে প্রণব উকিলকে দু'টি একটি প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তরে উকিল যখন অনর্গল বকতে লাগল, প্রণব তখন চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করছে। উকিলের সব কথা তার কানে গেল বলে মনে হল না।

কলকাতা থেকে বড় ব্যারিস্টার এসেছে। সুতরাং কোর্ট বসতে এক মিনিটও বিলম্ব হল না। আদালত লোকে লোকারণ্য। ঠিক দশটায় আরম্ভ হল মামলা।

সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা।

প্রণবের জেরায় দেখতে দেখতে সাক্ষীদের চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলতে লাগল আর তারই মধ্যে জোনাকি পোকার মতো উড়তে লাগল কোটি কোটি সরিষার ফুল। তাদের মুখ থেকে তখন কত হ্যাঁ না হয়ে গেল আর কত না হ্যাঁ, তার সীমা-সংখ্যা রইল না।

লাঞ্চের আগেই এ পর্ব শেষ করে দিয়ে প্রণব ছুটল সুচরিতার বাড়ি লাঞ্চে। তার মুখ তখন রক্তাভ।

সুচরিতা ভয় পেয়ে গেলঃ তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—খুব ভালো।—প্রণব জবাব দিলে,—কিন্তু খুব হালকা খেতে হবে, এত নয়। গিয়ে আবার সওয়াল আছে। ভরপেটে সুবিধা হবে না। কেবল,—প্রণব একটু হাসলে,—কিছু মনে কর না। অভ্যাসটা এমন হয়ে গেছে... ঝগড়ু!

সে যেন তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস পানীয় ঠিক করে ডিনার টেবিলে রেখে গেল।

কোনমতে লাঞ্চ সেরেই প্রণব আবার ছুটল কোর্টে। মক্কেল সব সময়েই তার পিছনে পিছনে গরুড় পক্ষীর মতো ঘুরছে। সওয়াল শুরু করেই প্রণব কোর্টকে বললে সে আজ রাত্রেই ফিরতে চায়। কোর্ট যদি দয়া করে এক ঘণ্টা বেশি সময় বসে তাহলে ফেরা সম্ভব। ছ'টার মধ্যে সওয়াল-জবাব শেষ হয়ে যাবে।

ব্যারিস্টারের সময়, যা মুহূর্তে মুহূর্তে টাকা প্রসব করে, তার মূল্য জজসাহেব বোঝেন। স্বচ্ছন্দ চিত্তে তিনি এক ঘণ্টা সময় দিতে সম্মত হলেন।

তখন আরম্ভ হল প্রণবের বাগ্মিতা। যেন বাক্যের তুবড়ি-বাজি। কখনও ফরিয়াদির প্রতি কঠোর মন্তব্যে কটু, কখনও আসামীর প্রতি করুণায় কোমল, কখনও বা পরিহাসে চটুল। বাক্যের পর বাক্য, যুক্তির পর যুক্তি, বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ চলছে খরবেগা স্রোতস্বিনীর মত তরঙ্গভঙ্গে। কণ্ঠে কখনও বীণার ঝঙ্কার, কখনও বা কামানের গর্জন।

জনতা স্তব্ধ, আদালত স্তব্ধ।

ঠিক ছ'টায় উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব যখন শেষ হল, তখন রায় কোন্ পক্ষে যাবে সে নিয়ে কারও মনে আর সংশয় রইল না।

ধীরে ধীরে জনতার কণ্ঠে জাগল স্তূয়মান গুঞ্জন। বিচারক কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে কোর্ট বন্ধ করে উঠে গেলেন। একটু একটু করে ভিড় হালকা হতে লাগল।

প্রণব তখন চেয়ারে বসে ছটফট করছে। ডাকলে, ঝগড়ু।

ঝগড়ু ছুটে এল।

—জল!

ঝগড়ু জলের মানেও জানে, পরিমাণও জানে। কিন্তু প্রণবের মুখ দেখে ভয় পেয়ে সে যেন দ্বিধা করতে লাগল।

—জল! —অস্থিরভাবে প্রণব আবার হাঁকলে।

ঝগড়ু ছুটে নিয়ে এল পানীয়।

এক নিশ্বাসে সেটা পান করে প্রণব বললে, গাড়ি কোথায়?

তখন ছুটে এল মক্কেল, এল উকিল। প্রণব তখন কাঁপছে। বললে, শিগগির বাড়ি নিয়ে চলুন। শরীরটা ভাল লাগছে না, ভিড় সইতে পারছি না।

ওর মুখ আরক্ত। শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য নেই। 'ইনভ্যালিড চেয়ার' ছিল। তাইতে বসিয়ে বহু কষ্টে পুলিশের সাহায্যে ভিড় সরিয়ে ওকে মোটরে তোলা হল।

পথে হাওয়ায় একটু সে সুস্থ বোধ করলে।

উকিল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার হার্টে কোন—

প্রণব বললে, না। বোধ হয় জ্বর। কলকাতা থেকে একটু জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সেইটে বোধ হয় উত্তেজনায় এবং ভ্রমণে কিছু বেড়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু সেটা যে নিতান্তই স্তোক, গাড়ি থেকে প্রণবকে নামাবার সময় সকলেই তা টের পেল। ওর সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। গা পুড়ে যাচ্ছে।

অবস্থা দেখে সুচরিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝগড়ুরও অবস্থা একই রকম। তার সাহেবকে সে চেনে। এখন বোধ করি জ্বরে বেহুঁস, তাই সাড়া নেই। আর একটু জ্বর কমলেই গান এবং বক্তৃতা আরম্ভ হবে। কোথায় থাকবে লেপ, কোথায় বালিশ, কোথায় বা বিছানা। এ-বাড়িতে কারও আর আহার-নিদ্রার উপায় থাকবে না। সে কথা ভাবতেই ভয়ে তার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

মুখটি শুকিয়ে সুচরিতার কাছে এসে দাঁড়াল।

—মা!

ঝগড়ু ওস্তাদ চাকর। বিমানের মত সেও সুচরিতাকে মাসিমা বলে ডাকে। কিন্তু সাহেবের এই অবস্থায় তার মনে সংশয় এসেছে, এখন মাসিমাতে কুলবে কি না। সুতরাং করুণ কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন করলে।

—কি রে! — সুচরিতা সাড়া দিলে।

—এ অবস্থায় সাহেবকে তো কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায় না। জ্বর যে দু'এক দিনে ছাড়বে, তাও মনে হয় না। ওঁদের আসবার জন্যে কি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দেওয়া হবে?

—তুই কি বলিস?

—সেখানে খোকাবাবুর পরীক্ষা। খুকুমণির জ্বর। নইলে মা কি আর সাহেবকে একলা ছেড়ে দিতেন? সঙ্গে আসতেন। অথচ একটু অসুখ হলে সাহেব বাড়িসুদ্ধ লোককে পাগল করে তোলেন। তাই ভাবছি—

ঝগড়ু কথাটা শেষ না করেই বিজ্ঞের মত ভাবতে লাগল।

সুচরিতা হেসে বললে, তোকে কিছুই ভাবতে হবে না ঝগড়ু। তোর সাহেব তো আর সত্যি সত্যি লাটসাহেব নয়। দেখি না, কেমন করে সবসুদ্ধ আমাদের পাগল করে!

সুচরিতা হাসলে। আবার বলল, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনিও এখনই এসে পড়বেন। তিনি কি বলেন দেখা যাক। এখন থেকেই ব্যস্ত হবার কি আছে?

—কিন্তু কালকে ফিরে না গেলে মা ভাবতে পারেন।

—তা পারেন। সেজন্যে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক বরং যে মামলার জন্যে সাহেবের ফিরতে আরও দু'তিন দিন দেরি হতে পারে।

এই কথাটা ঝগড়ুর মাথায় আসেনি। উল্লসিত হয়ে বলল, সেইটেই সব চেয়ে ভাল।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেলেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাবার আগে

সুচরিতা ঝগড়ুকে বলে গেল, তুই কিন্তু সব সময় কাছাকাছি থাকবি ঝগড়ু। তোকে হয়তো সাহেব খুঁজবেন।

সেকথা বলা অনাবশ্যক। ঘরের বাইরে দরজার পাশে ঝগড়ু একটা টুল নিয়ে এসে বসল। জানে, সাহেব সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুমের দফা রফা!

ষোল

ঝগড়ুর কথায় বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন ছিল না। সে রাত্রিটা প্রণব একরকম বেঘোরে কাটাল। সুচরিতা সকল সময় তার বিছানার পাশে। ঝগড়ু বারান্দায় টুলের উপর। কারও চোখে ঘুম নেই।

কিন্তু ভোর থেকে যেই জ্বরটা কমতে আরম্ভ করল অমনি সঙ্গীত, অভিনয় এবং আনুষঙ্গিক কারুকলা সম্বন্ধে প্রণবের অনুরাগ সশব্দে প্রকাশ পেতে লাগল। তার মধ্যে বাংলা আছে, ইংরেজিও আছে। একই নিশ্বাসে রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত এবং নিধুবাবুর টপ্পা গীত হতে লাগল। অনেক সময় পরস্পরের লাইন পর্যন্ত মিশে যেতে লাগল। সে যে কি অপূর্ব বস্তু, কানে না শুনলে রসগ্রহণ সম্ভব নয়।

তার সঙ্গে চলে অভিনয়। যাঁরা বলেন, 'পূর্ব পূর্ব, পশ্চিম পশ্চিম এবং এই দুইএর মধ্যে মিলন সম্ভব নয়'—প্রণবের অভিনয় শুনলে তাঁদের ভ্রান্তি নিরসন হবে। এই দেখা গেল সেক্সপীয়রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, পরক্ষণেই দেখা গেল গিরিশচন্দ্রের বজ্র-হুঙ্কারে সেক্সপীয়র ধরাশায়ী। আর পূর্ব ও পশ্চিমে মিলন? দুপুর নাগাদ ম্যাকবেথ ও জনার মধ্যে দু দুবার পরিণয় আসন্ন হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত দিন অভিনয় ও সঙ্গীতসুধা বিতরণের পর সন্ধ্যার মুখে জ্বরটা ছাড়ল। সমস্ত দিন ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছগুলোর যে অবস্থা হয়, প্রণবের অবস্থাও তখন সেই রকম। অবসাদে তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল।

সাহেবের সম্বন্ধে ঝগড়ুকে বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। এই অবস্থা দেখে খুশিতে তার চোখ চকচক করে উঠল।

ফিস ফিস করে বললে, এইবার সাহেব ঘুমোবেন। আর ভয় নেই।

সুচরিতা হেসে বললে, যা কাণ্ড দেখলাম, তোমার সাহেবের ভয় আমার জীবনে ঘুচবে না বাবা। তা সে তুমি যতই ভরসা দাও।

কথাটা মিথ্যা নয়।

অবস্থা দেখে সুচরিতা স্তব্ধ ....

ঝগড়ু হেসে বললে, না, আর ভয় নেই মাসিমা। জ্বরটা ছেড়ে গেছে।

এবং জ্বরটা ছাড়া মাত্রই ঝগড়ু সুচরিতাকে আবার 'মাসিমা' বলতে শুরু করেছে!

সুচরিতা কিন্তু এত লক্ষ্য করলে না। বললে, ভয় তো জ্বরের জন্যে নয় বাবা। তার ডাক্তার আছে, ওষুধ আছে। কিন্তু গান-বক্তৃতার ডাক্তারই বা কোথায়, ওষুধই বা কোথায়?

এই অভিযোগ ঝগড়ু অস্বীকার করতে না পেরে লজ্জিত ভাবে হাসলে। বললে, কিন্তু আপনার মতো সেবা করতে আমি কখনও দেখিনি। সারারাত্রি চোখের দুই পাতা এক করেননি।

সুচরিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তুই কি করে জানলি?

—আমারও তো চোখে ঘুম ছিল না। রাত্রে যখনই ঘরে এসেছি দেখেছি, হয় মাথায় বরফ দিচ্ছেন, নয়তো আর কিছু করছেন।

—যাক, বাঁচা গেল! তাহলে তোর মায়ের কাছে আমার নিন্দে করবি না।

হাত কচলে অপরাধীর মত ঝগড়ু বললে, কী যে বলেন মাসিমা! আমি করব আপনার নিন্দা! চোখে দেখেও?

তারপরে হেসে বললে, জানেন মাসিমা, গেলবারে ঠিক এমনি হয়েছিল। মা পর্যন্ত ভয়ে কাছে যেতে পারতেন না। নার্স ডাকতে হয়েছিল। এবারেও ভেবেছিলাম, তাই বুঝি করতে হয়!

ঝগড়ু হাসতে লাগল। লোকটা তোয়াজ করতে জানে।

সুচরিতা সভয়ে বললে, দাঁড়া বাবা, হাসিস না। জ্বরটা রাত্রে আবার না আসে!

ঝগড়ু তৎক্ষণাৎ বললে, না মাসিমা, আর আসবে না।

—কি করে জানলি?

—সেবারও আসেনি কি না। সাহেবের জ্বর ছেড়ে গেলে আর আসে না।

সুচরিতা হাসলে,—তাই নাকি! তুই এসব ছেড়ে দিয়ে এবার ডাক্তারি কর। সাহেবের সঙ্গে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি কতকগুলো শিশি-বোতল কিনে দিচ্ছি। এইখানে প্র্যাকটিসে বসে পড়।

সারারাত্রি দুজনেরই স্নায়ুর উপর অসম্ভব টান গেছে। দুজনেরই মধ্যে এখন যেন খোশগল্পের মৌজ এসে গেছে।

ঝগড়ু বললে, তা আমি পারি মাসিমা। আসলে মানুষ ভয় পায় বলেই না ডাক্তার ডাকে! নইলে জ্বরে সত্যি সত্যি কিছু হয় না। খালি দুদিন একটু কষ্ট দেয়।

—বলিস কি রে! জ্বরে কিছুই হয় না?

—কি আর হবে মাসিমা! আমাদেরও তো জ্বর হয়। ডাক্তারও ডাকতে পারি না। কী

আর হয় আমাদের? দু'দিন ভুগে আবার সেরে উঠি।

—সবাই কি সেরে ওঠে রে?

—না ওঠে না। তারা ডাক্তার ডাকলেও বাঁচে না। তাহলে কি আর রাজা-মহারাজারা মরত? বলুন।

—নিশ্চয়।

একটু ভেবে ঝগড়ু আবার বললে, ডাক্তারে জীবন দিতে পারে না মাসিমা। শুধু সন্ন্যাসীরা পারেন।

--তাই নাকি?

—হ্যাঁ। মরা মানুষ বাঁচাতে পারে, এমন সন্ন্যাসী আমি জানি।

—তাই নাকি রে! তাহলে যাওয়ার আগে তার ঠিকানাটা রেখে যাস। একা থাকি, হঠাৎ যদি মরবার মতো হই তাঁর কাছে গিয়ে পড়তে পারি।

ঝগড়ু মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল,—অত সহজ নয় মাসিমা। তাঁরা পারেন, কিন্তু বাঁচান না।

—তাহলে আর কি সুবিধা হল?

--কিছুই সুবিধা হল না। ওইটেই মজা! ঝগড়ু সগর্বে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

পুরো তিন ঘণ্টা প্রণব একনাগাড়ে অবসন্নের মতো ঘুমলে। যখন চোখ মেললে তখন রাত্রি ন'টা বেজে গেছে। সুচরিতাকে দেখে ওর চোখে একটা শ্রান্ত হাসি শীতের শেষ অপরাহ্নের রোদের মতো ভেসে উঠল।

বললে, কি রকম ভয় দেখিয়েছিলাম!

ওর হাসি দেখে সুচরিতার মুখে হাসি ফুটল। বললে, অতীত কালটা কি বিনয়ে ব্যবহার করলে? নইলে ভয় আমার এখনও ঘোচেনি।

প্রণব লজ্জিতভাবে হাসলে। একখানা অবশ হাত সুচরিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমাকে কত কষ্ট দিলাম।

সুচরিতা ওর হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। একটু পরে ওর ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটু-খানি হাসির রেখা ঈষৎ ঝিলিক দিয়েই মুহূর্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রণব নির্নিমেষে ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সেই কিশোরী মেয়ের কচি মুখ আর নেই। এখন অনেক গম্ভীর, অনেক পরিণত হয়েছে। ওর হাসিটা তার দৃষ্টি এড়াল না।

জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ?

শাড়ির প্রান্ত দিয়ে যেন ঠোঁটের হাসিটাই মুছে ফেলে সুচরিতা বললে, না হাসিনি।

--দেখলাম হাসলে।

--এমনি হাসলাম।

--এমনি কখনও মানুষ হাসে?

—পাগলে হাসে বই কি।

প্রণব ছাড়লে না। বললে, তুমি তো পাগল নও। কেন হাসলে বলতে হবে।

—কি হবে শুনে?

--হবে। তুমি বল।

সুচরিতা বললে, কষ্টের কথা বলছিলে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে আরাম আমি কোনোদিন চেয়েছি?

—কোনোদিন চাওনি, না সুচরিতা?

প্রণব চোখ বন্ধ করে কি যেন ডুবে ডুবে খুঁজতে লাগল।

বললে, তোমাকে দেখলে আমার কি মনে হয় জানো?

সুচরিতা নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

প্রণব বললে, মনে হয় তুমি যেন মহাশ্বেতা। তোমরা জন্ম জন্ম শুধু তপস্যাই করে যাও, না সুচরিতা? তপস্যার আনন্দেই তপস্যা, ফলের প্রত্যাশায় নয়।

সুচরিতা ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেল। বললে, আঃ! কি বাজে বকচ?

প্রণব করুণভাবে হাসলে,—আশ্চর্য! বাজে কথা বলার অবসর বড় পাই না। যে কথা মক্কেলের পকেট থেকে অর্থ টেনে আনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সেই কথাই বলি। কিন্তু আজ সেই সব মূল্যবান কথাই তুচ্ছ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অনর্গল অর্থহীন বাজে কথার মালা গেঁথে যাই শুধু।

সুচরিতা হেসে বললে, এই অবেলায়? সে কি ভালো লাগবে?

প্রণব যেন মুষড়ে গেল। সুচরিতার দিকে চেয়ে দেখলে, ওর ভীরু চোখে সেই চঞ্চলতা আর নেই। পরিণত মুখ গাম্ভীর্যে ভরন্ত। নিজের কানের পাশেও একবার হাত দিলে, যেখানে গুটি কয়েক পাকা চুল চিকচিক করতে দেখেছে।

তবু বললে, অবেলা কি সকল ক্ষেত্রে বেলার দিকে চেয়েই ঠিক করতে হয় সুচরিতা? তোমার ভরন্ত মুখের দিকে আর আমার পাকা চুলের দিকে চেয়ে?

—তাই তো সবাই করে থাকে।

তা বটে। কিন্তু প্রণবের মনটা কোন পথে পাক খাচ্ছে কে জানে। সে হঠাৎ বললে, আচ্ছা আমরা যদি তা না করি? আমরা যদি গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে দিই?

—লোকে হাসবে।

—হাসলেই বা।

—লোকের হাসিকে তুমি ভয় পাও না?

--পাই। কিন্তু যদি স্থির করি ভয় কিছুতেই পাব না, তাহলে?

সুচরিতা অবাক হয়ে ওর কঠিন চোখের দিকে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে সেই কাঠিন্য যেন গলে যেতে লাগল। প্রণব ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সুচরিতা আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে। বুঝলে, প্রণব ঘুমিয়ে গেছে।

একটু পরে ঝগড়ু আর সুচরিতার চাপরাশি দুজনে মিলে একখানা লোহার খাট ওদিকের দেওয়ালের দিকে পাতলে। তাদের পিছনে সুচরিতা। সেই শব্দে প্রণব চোখ মেলে চাইলে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, খাট কি হবে?

সুচরিতা হাসলে। চাপরাশিকে বললে, বিছানাটা নিয়ে আয়।

ওরা দুজন চলে যেতে বললে, শোব।

—তুমি! এই ঘরে!—বিস্ময়ে প্রণবের চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে।

—উপায় কি, বল। হঠাৎ যদি তোমার কিছু দরকার হয়।

—কেন, ঝগড়ু তো ছিল সুচরিতা।

সুচরিতা উপেক্ষার একটা চুমকুড়ি কাটলে। জবাব দিলে না।

বোধ করি আগের রাত্রে জাগরণের জন্যেই সুচরিতার যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য না উঠলেও চারিদিক অনেকখানি ফর্সা হয়ে এসেছে। দেখে প্রণব খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত। ঝগড়ুটা এসে বোধ হয় ওর পিঠের নীচে বালিশটা দিয়ে গেছে। ওর চোখের তারায় ক্ষুধার আগুন যেন দুখানা ছোরার মত ঝকঝক করছে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই সুচরিতা উঠে বসল। বললে, ঘুম ভেঙে গেছে তো আমাকে ডাকনি কেন?

উত্তরে বিড় বিড় করে প্রণব কি যে বললে, ঠিক বোঝা গেল না।

সুচরিতা উঠতে উঠতে বললে, ঝগড়ুকে বলি, তোমার মুখ ধোবার জল-টল দিক।

প্রণব বললে, দরকার নেই। আমি বাথরুম থেকে এসেছি।

--নিজেই? বাঃ! খুব বাহাদুর ছেলে হয়েছ তো?

হাসতে হাসতে সুচরিতা বেরিয়ে গেল। বলে গেল, ঝগড়ু তোমাকে পথ্য দিচ্ছে। আমি স্নান সেরে এসে ওষুধ দোব।

ওর ফিরতে দেরি হল না। পিঠের উপর ভিজে এলোচুল, পরনে একখানি শাদা আটপৌরে শাড়ি। সদ্যস্নানে মুখ এবং অনাবৃত বাহুযুগল সুমার্জিত।

ঔষধটা ঢালতে ঢালতে বললে, রোগের সময় যে লোকটা ওষুধ খাওয়ায় তার উপরেই রাগ সবচেয়ে বেশি হয়, না?

প্রণব হেসে ঔষধটা খেয়ে মুখটা বিকৃত করলে। তারপরে সে ধাক্কাটা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে কলকাতা ফেরবার দিনে কোন গাড়ি নেই?

—কেন বল তো?

—সোমবারে একটা বড় মামলা আছে। রবিবারে পৌঁছতে পারলেই সুবিধা হয়।

প্রণব ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চাইলে।

সুচরিতা নতমুখে টিপয়ের ঢাকাটা ঝাড়ছিল। কিন্তু প্রণব যেমন আশঙ্কা করছিল, এ প্রস্তাবে মোটেই সে বিরক্ত হল না। বলল, কাজের মানুষ, যাওয়া নিতান্ত দরকার হলে যেতেই হবে। তার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু দিনের গাড়িতে অসুবিধা আছে। তোমাকে রাত্রের গাড়িতেই যেতে হবে।

—ডাক্তারের একটা অনুমতি নিতে হবে।

—তা হবে। কিন্তু জরুরী কাজ যদি থাকে, যাওয়া যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহলে ডাক্তার সঙ্গে করেও যেতে হবে। উপায় তো নেই?

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা বলল, তোমাকে জোর করে আটকাবার ইচ্ছে আমার নেই। তবু আমি বলি, অত্যন্ত খেটেছ, শরীর তোমার ভাল নয়। নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকলে দু একদিন থেকে যাও। এ জায়গাটা ভাল। বিশ্রামও হবে, চিকিৎসাও হবে।

বিশ্রাম এবং চিকিৎসার নামে প্রণব হাসল। বলল, আমরা দিনমজুরি খাঁটতে এসেছি সুচরিতা। আমাদের জীবনে মৃত্যুর আগে বিশ্রাম নেই।

—তা বললে কি হয়?

—হতেই হয়। না হয়ে উপায় কি? ভাগ্যিস এই মামলাটা পেয়েছিলাম, তোমার এখানে এসে পড়েছিলাম আর অসুখটা হয়েছিল,—নইলে এ ছুটিই বা আমাকে কে দিত?

করুণ ওর কণ্ঠস্বর।

সুচরিতা একখানা চেয়ার ওর খাটের একান্ত সন্নিকটে টেনে নিয়ে এসে বসল। বলল, তোমার সঙ্গে বিমান আর মাধুরীর জন্যে কিছু জিনিস দোব। বিশেষ কিছু নয়। কী-ই বা পাওয়া যায় এখানে! যাবে তো নিয়ে?

—মজুরি লাগবে।

—কত মজুরি বল।

প্রণবের ঠোঁটের কাছে উত্তরটা এসে গিয়েছিল। জোর করে আটকে ফেলল। সুচরিতার দৃষ্টি এড়াল না। প্রশ্নটা করে সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

তাড়াতাড়ি বলল, ওদের দেখতে ভারী ইচ্ছা করে।

—চল না একবার কলকাতায়। আমার সঙ্গেই চল।

অন্যমনস্কভাবে সুচরিতা বলল, এখন হয় না। অন্য এক সময় যাব বরং।

তারপর বলল, এসে পর্যন্ত তো নাচিয়ে বেড়ালে। অরুণাদির কথাটাও জিজ্ঞেস করবার ফুরসত পাইনি। কেমন আছে সে?

—খুব ভাল নয় বোধ হয়।

—কেন?

—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখি শুয়ে আছে। মনে হয়, ওর শরীরটা খুব সুস্থ নয়।—একটু থেমে প্রণব আবার বলল,—ভাবি জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কাজের চাপে ভুলে যাই। ও নিজেও কিছু বলে না।

—খুব অন্যায়। ফিরে গিয়েই খবর নেবে এবং আমাকে জানাবে। আর টেনিস খেলে না?

—না। অসম্ভব মোটা হয়ে গেছে। পারেও না খেলতে।

মোটা হওয়ার প্রসঙ্গে সুচরিতা খুব হেসে উঠল। বললে, বল কি! খুব মোটা হয়েছে?

—মিসেস দত্তকে মনে আছে? প্রায় সেই রকম।

খুব মনে আছে। মিসেস দত্তের প্রসঙ্গে সুচরিতার হাসি যেন আর থামতে চায় না।

হাসি থামলে বলল, তাহলে কি ঠিক করলে? আজ রাত্রের মেলেই?

—হ্যাঁ। আমার মক্কেল কি ভেগে গেছে?

—না। রোজই আসছেন। মামলা জিতে খুবই খুশি হয়েছেন। এখনি আসবেন। তোমাকে একলা পাঠাতে আমার সাহস হচ্ছে না। হয় উনি নিজে তোমার সঙ্গে যান, নয় তো লোক দিন।

—দেখ কি করে। এখন তো আর গরজ নেই।

আলস্যে প্রণব একটা হাই তুলল।

সতেরো

জরিপের লোকেরা জমি মাপ করার জন্যে একটা শিকল টেনে টেনে নিয়ে যায়। চাকুরি-জীবনও তেমনি একটানা একটা শিকল টেনে নিয়ে যাওয়া,—এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে। এর মধ্যে যেটুকু বৈচিত্র্য, তা শিকল টেনে নিয়ে যাওয়ায় নয়,—এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়ায়।

সুচরিতাও তেমনি একটা শিকল টেনে নিয়ে চলেছে। জলপাইগুড়ি থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে মালদহে, তারপরে রাজসাহী, বাঁকুড়া, দিনাজপুর এবং বহরমপুর। কোথাও দু বৎসর, কোথাও তিন বৎসর, কোথাও বা আরও বেশি। এর মধ্যে ক্বচিৎ-কখনও দু একদিনের ছুটিতে কলকাতায় এলে কখনও বা প্রণবের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনও বা হয়নি।

বাঁকুড়া থেকে দিনাজপুরে বদলি হবার সময় সুচরিতা খবর পায়, বিমান তার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। বদলির পথে কলকাতা হয়েই ওকে আসতে হয়েছিল। আনন্দ করে বিমানকে ও কিছু টাকার ইংরেজি সাহিত্য কিনে উপহার দিয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে প্রণব নিজের বাড়িতে যে পার্টি দিয়েছিল তাতে যোগদান করা পর্যন্ত তার অপেক্ষা করার উপায় ছিল না বলে অরুণা তাকে বিশেষ একটা নিমন্ত্রণ করেছিল। তখন অরুণা মিসেস দত্তকেও ছাড়িয়ে গেছে। একতলা থেকে দোতলায় উঠতেও দম লাগে। সুচরিতা এই নিয়ে খুব রঙ্গ করে গিয়েছিল।

বিমানের ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার খবর সুচরিতা আদৌ পেয়েছিল কি না, পেলে কোথায় পেয়েছিল ঠিক মনে পড়ে না। ও তখন প্রোমোশনের জন্যে তদ্বিরে খুব ব্যস্ত ছিল। চিঠি যদি পেয়ে থাকে তাহলে আনন্দজ্ঞাপন করে একটা উত্তরও নিশ্চয়ই দিয়ে থাকবে।

এই প্রোমোশনটা ওকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। ভুল করেছিল, একবার বিলেত না গিয়ে। সেখান থেকে শিক্ষা সম্পর্কে যে-কোনো একটা শস্তা ডিগ্রী নিয়ে এলে এত তদ্বিরের দরকার হত না। এখনও এইজন্যে এত দৌড়-ঝাঁপ, ধরাধরির উৎসাহ সে দেখাত না, যদি তার অবসর নেওয়ার আরও অনেক বিলম্ব থাকত। কিন্তু অবসর নিতে আর মাত্র কয়েকটি বৎসর। তারপরেও অবশ্য আরও কিছুদিন চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সুচরিতার নেই। দীর্ঘকালীন চাকুরির একঘেয়েমিতে সে ক্লান্ত। আর ভাল লাগে না চাকুরি। একলা প্রাণী। চাকুরি হলও অনেক দিন। যে টাকা এই দীর্ঘ দিনে সে জমিয়েছে, তাতে কলকাতায় ছোট একখানা বাড়ি তৈরি করে শেষ জীবনটা চমৎকার কেটে যাবে।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় বিমানের ইণ্টারমিডিয়েট পাশের খবর সে পেয়েছিল কি না ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু দিনাজপুর থেকে যখন সে বহরমপুরে বদলি হয়ে এল, তার কয়েক মাস পরেই একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র তার হাতে এল। তাতে সই আছে দুজনেরই,—প্রণবের এবং অরুণার।

সেটা হচ্ছে বিমানের বি-এ পাশের খবর। একসঙ্গে বি-এ পাশের এবং বিলাত যাওয়ারও।

বিমান বি-এ'তে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে এবং বিলেত যাচ্ছে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে। মফস্বল থেকে কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করে সুচরিতা সবেমাত্র ফিরেছে, এমন সময় চিঠিখানা তার হাতে এল।

সুচরিতা তখন চুল খুলেছে স্নান করতে যাবার জন্যে।

কিন্তু স্নান করতে যাওয়া হল না। বারান্দায় একখানা ঈজিচেয়ারে বসে কত কী সে ভাবতে বসল:

সেই সৌদামিনীর ছেলে! সৌদামিনীকে সে চোখে দেখেনি। কিন্তু কল্পনা করতে পারে। ফুটফুটে দীর্ঘাবগুণ্ঠিতা একটি মেয়ে যার পদ্মফুলের মত দুটি পায়ে বিশ্বের লজ্জা জড়িয়ে আছে। সমস্ত দিন সে থাকে আকাশের তারার মত অনেক দূরে,—অনেক দূরে। তাকে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না,—পৃথিবীর নাগালের বাইরে। রাত্রের অন্ধকারে সব কিছু যখন আবছায়া, সব কিছু রহস্যময়,—এক ফোঁটা যুঁইফুলের মত সে তখন প্রণবের বিছানায় এসে টুপ ক'রে পড়ে। ভোরের আলো ফুটতেই সে আলোতে আবার সে মিলিয়ে যায়। গন্ধ ছাড়া কোনো চিহ্নই রেখে যায় না।

তারপরে একদিন থেকে রাত্রেও আর সে এল না। দিন এবং রাত্রির কোনো সময়েই প্রণব আর তাকে খুঁজে পেলে না। কিন্তু যাওয়ার সময় ওই মেয়েটিই প্রণবকে কতখানি ধাক্কা দিয়ে গেল, তা আর কেউ না জানলেও সুচরিতা জানে।

তারই চিহ্ন বিমান! সে চলল বিলেত দেবদুর্লভ সিভিল সার্ভিস চাকুরির জন্যে।

এতদিন চাকুরি করেছে, ছুটি সুচরিতা নেয়নি বললেই চলে। অনেক ছুটি তার জমে গেছে। সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত করে তখনই সুচরিতা অরুণাকে টেলিগ্রাম করে আনন্দ এবং পার্টিতে যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করল। এবং বসে বসে যাওয়ার দিন গুনতে লাগল। আর এই বালিকাসুলভ আগ্রহে তার নিজের মনেই হাসি আসতে লাগল। এতদিন কোথায় ছিল এই আগ্রহ? অফিসে বসে ফাইলের পর ফাইল, আর টুরে বেরিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, ধুলোভরা মেঠো রাস্তা আর সোনালী ফসল,—তার মধ্যে কবার মনে পড়েছে প্রণবদের কথা? মনে প'ড়ে কবার মন ছুটে যাবার জন্যে পাখা ঝাপ্‌টেছে?

আশ্চর্য জীবন!

যেন একখানা শাড়ি। কোনোটা রঙিন, লতা-পাতা নকশা-কাটা, কোনোটা বা স্রেফ শাদা। আর বয়সগুলো পাড়। চারিদিকে ঘিরে ঘিরে বাঁধতে চায়,—পারে না। মাঝখানের জমির উপর কিছুতে ওর ছায়া পড়ে না। বাঁধনের মধ্যে থেকেও জীবন সেখানে মুক্ত, মহাকালের রাজস্বের বাইরে।

প্রণবদের পার্টিতে বাইরের নিমন্ত্রিত একমাত্র সুচরিতা। আর সবাই কলকাতাতেই থাকে। অরুণা বলল, সুচরিতাকে ওদের বাড়িতেই তুলতে হবে। সেবারে প্রণবের অসুখে যা সেবা সে করেছিল, এতদিন পরেও অরুণা তা ভুলতে পারেনি। ইচ্ছা, যে কটা দিন সুচরিতা কলকাতায় থাকে, নিজের কাছেই রাখবে। এ বিষয়ে প্রণব আর অরুণা একদিন গিয়ে বরদা আর তার স্ত্রীর সম্মতিও নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সেকথা ওরা সুচরিতাকে জানাল না। সুচরিতার টেলিগ্রাম পেয়ে ওরা তখনই প্রি-পেড টেলিগ্রাম করলে তার ট্রেন এবং পৌঁছবার সময়টা জানবার জন্যে।

সুতরাং শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেই সুচরিতা দেখলে প্রণব এবং অরুণা তার জন্যে প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

ওর দিকে চেয়েই প্রণব হো হো করে হেসে উঠল,—দেখছ অরুণা, সুচরিতারও মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অরুণা হেসে বলল, তা আর ধরবে না কেন? আমার ধরেছে আর ওর ধরবে না? বয়স তো হচ্ছে সবারই।

প্রণব বলল, তা নয়। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, একরাশ কালো চুল নিয়ে সুচরিতা গাড়ি থেকে নেমেই আমার এই দুগ্ধধবল মাথার দিকে চাইবে, সে অসহ্য!

এতক্ষণে সুচরিতা কথা বললে,—তার আর অসহ্য কি! ছেলে বিলেত যাচ্ছে। দুদিন পরে বউ আসবে, জামাই আসবে। এখন চুল কাঁচা থাকলেই অসহ্য। বল অরুণাদি?

—নিশ্চয়। তোমার জিনিস সব নেমেছে?

সুচরিতা চেয়ে দেখে বললে, হ্যাঁ।

চাপরাশিটাও সায় দিলে। একটা কুলির মাথায় সেগুলো চাপিয়ে ওরা বেরল। বাইরেই প্রণবের প্রকাণ্ড বড় গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল। তাইতে গিয়ে বসল।

অরুণা হেসে বললে, কোথায় যাচ্ছি জানো তো?

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—আমাদের বাড়ি। এ কটা দিন সেখানেই কষ্ট করে থাকতে হবে।

—কষ্ট করে?—সুচরিতা হাসলে।—থাকা যাবে। কিন্তু দাদা রাগ করবে না তো?

—তাঁদের অনুমতি নিয়ে রেখেছি।

প্রণবের দিকে চেয়ে সুচরিতা বললে, ভালোই হল। তোমার সঙ্গে কতকগুলো বৈষয়িক আলোচনাও আছে। পার্টির ঝামেলা মিটলে সুস্থ হয়ে করা যাবে। আমি সা[...] দিনের ছুটি নিয়েছি।

—সর্বনাশ!—প্রণব বললে।—সা[...] সা[...] বৈষয়িক আলোচনা? না, নাপিত দেখলে চুল কাটার কথা মনে পড়ে?

—কেন? আমি কি মানুষ নই? আমা[...] কি বৈষয়িক আলোচনা থাকতে নেই? ন[...] ফি দোব না বলে পাশ কাটাতে চাইছ —সুচরিতা হাসলে।

অরুণা বললে, ও ওইরকমই হয়েছে। টাক[া] ছাড়া আর কিছুই জানে না।

—তাই নাকি?—সুচরিতার কণ্ঠে হাসি[র] লহর।

—হ্যাঁ। খালি হাইকোর্ট চেনে, আর মক্কেল চেনে। আর সব ভুলে গেছে। চুল যত পাকছে, টাকার লোভও ততই বাড়ছে।

প্রণব বললে, বলে যাও। আমি পুত্তলিকা,—চক্ষু আছে দেখিতে পাই না, কর্ণ আছে শুনিতে পাই না। যা খুশি বলে যাও।

ঘাড় বেঁকিয়ে অরুণা বললে, হ্যাঁ, তুমি সেই লোক! পুত্তলিকা! তোমার সম্বন্ধে বরং বলা যেতে পারে, তোমার চক্ষু নাই তবু দেখিতে পাও, কর্ণ নাই তবু শুনিতে পাও!

অরুণা এবং সুচরিতা দুজনেই হেসে উঠল।

বিকেলে এক সময় সুচরিতা প্রণবকে বললে, দেখ, আমার তো রিটায়ার করার সময় প্রায় হয়ে এল।

—বল কি! এরই মধ্যে?

—এরই মধ্যে কি গো! চাকরিতে ঢুকেছি কি আজ! মনে পড়ে না কবে।

—তারপরে?

—এইবার তো একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় দরকার।

—এইটেই কি তোমার সেই বৈষয়িক ব্যাপারটা?

—হ্যাঁ, এইটেই।

—তারপরে বল।

—এখন আমার জন্যে তোমাদের কাছাকাছি কোথাও একটুখানি জায়গা কিনে একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় বানিয়ে দাও।

অরুণা বললে, হরিশ বাগচীর বাড়ির পাশের জায়গাটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?

প্রণব বললে, হয়নি বোধ হয়। হলে জানতে পারতাম। নেবে ও জায়গাটা? কাঠা পাঁচেক হবে।

সুচরিতা বললে, তুমি বললে নিতে পারি।

প্রণব উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক আছে। ভদ্রলোক আমারই মক্কেল। তুমি ফিরে যাবার আগেই ওটা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপরে বাড়ির ব্যবস্থা করার অসুবিধা হবে না।

সুচরিতা বললে, দেখ আমি একলা মানুষ। বড় বাড়ির কোনো দরকার নেই। ছোট্ট বাড়ি হবে। চারপাশে খানিকটা করে জায়গা থাকবে পড়ে। চিরজীবন খেটে এলাম। অবসর নিয়েও নিষ্কর্ম বসে থাকতে পারব না। একটু বাগান করব। তাই নিয়ে সকাল সন্ধ্যা কাটবে।

—টেনিস লন চাই না?

সুচরিতা হেসে বললে, না। ওসব ভুলে গেছি।

অরুণা বললে, তুমি কিন্তু এখনও খেলতে পারবে। আমার মত মোটা তো হওনি।

সুচরিতা বললে, না না। ও আর ভালো লাগে না। একটুখানি বাগান হলেই চলবে।

প্রণব বললে, আচ্ছা, তোমার জমি আর বাড়ির জন্যে নিশ্চিন্ত থেক। ও ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বেশ ধুমধাম এবং আনন্দের সঙ্গে পার্টি শেষ হয়ে গেছে। অরুণা কিছুক্ষণ হল বিমানকে নিয়ে বেরিয়েছে, কি সব কেনাকাটি করতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার নিয়ে সুচরিতা একাই বসে ছিল, দূরে একটা পামগাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে, সেইদিকে তাকিয়ে।

প্রণব আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জিজ্ঞেস করলে, কি দেখছ? চাঁদ?

হেসে ঘাড় নেড়ে সুচরিতা জানালে হ্যাঁ।

—গ্লোরিয়াস্! না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুচরিতা বললে, আসলে কলকাতায় চাঁদ ওঠে না, জানো?

—কলকাতায় চাঁদ কি করে তবে?

—কোনোমতে রাত্রিগত পাপক্ষয়। চাঁদ ওঠে কলকাতার বাইরে। এক একটা রাত্রে এমন চমৎকার চাঁদ ওঠে যে, মানুষ ঘুমতে পারে না,—পাগল হয়ে যায়!

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, তার চেয়ে আমাদের কলকাতার এই চাঁদ ভদ্র। আর কিছু না পারুক, পাগল করে না। বেশ নিরীহ বোকা-বোকা চাঁদ!

সুচরিতা বললে, যে যেমন তার চাঁদও তেমনি। কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

—নীচে।

—কাজ করছিলে?

—না ভাবছিলাম। তোমার জমিটার কথা চালাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি। ভাবছিলাম, তোমার ছুটি হয়ে যাবে। আমার ছুটি পেতে কত দেরি!

সুচরিতা হেসে উঠলঃ তোমার এর মধ্যে

প্রণব আর একখানা চেয়ার টেনে...
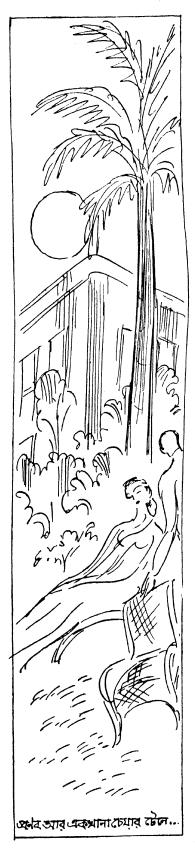
ছুটি কি? বিমান ফিরে আসুক, মাধুরীর পড়াশুনা শেষ হক, ওদের বিয়ে হক, তারপরে—

—তারপরেও না সুচরিতা। ছুটি সবারই জীবনে আসে না। দেখনি, কত লোক রেকাবে পা রেখেই মরে!

—পুরুষে তেমনি মৃত্যুই তো কামনা করে।

—কখনও না। পুরুষ কি যাত্রার দলের সেনাপতি যে সকল সময়ই যুদ্ধ করবে, সকল সময়ই চেঁচাবে? তারাও অবসর চায়। অপরাহ্ন বেলায় একটু বিশ্রাম। কেউ পায়, কেউ পায় না।

—কেন পায় না?

—যারা মধ্যাহ্নকে মারে, তাদের অপরাহ্ন বিঁধিয়ে ওঠে।

এতক্ষণ সুচরিতা খেয়াল করেনি। এখন ওর মুখে সে যেন মদের গন্ধ পেলে।

বললে, তার মানে কি?

—তার মানে কি তোমার জীবনের আয়নাতে কোনোদিন দেখতে পাওনি? তোমার সদুকে মনে পড়ে?

—তাঁকে তো দেখিনি কখনও।—সুচরিতা ইতস্তত করে বললে।

—তাই বটে। তুমি তাকে দেখনি।—আজ আমি তাকে দেখলাম সুচরিতা।

সুচরিতা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

প্রণব যেন মনের ঝোঁকেই বলতে লাগলঃ আমার মদের গ্লাসে হঠাৎ তার মুখ ভেসে উঠল।

—সত্যি?—সুচরিতা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

সত্যি।—প্রণব বলতে লাগল,—অবিকল সৌদামিনী, শুধু চোখ দুটো যেন বিমানের।

হঠাৎ প্রণব বলল, আচ্ছা এমন তো হতে পারে সুচরিতা, যে মানুষ সত্যি সত্যি মরে না। তার সন্তানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

সুচরিতার বিস্ময়ের আর শেষ নেই। এ সব কী বলছে প্রণব? এ কি সুরার প্রসাদে? না, ওর মস্তিষ্ক সুস্থ নেই? অস্ফুট স্বরে কোন মতে বলল, পারেই তো।

প্রণব আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গে সুচরিতার মনে পড়ে গেল প্রসন্নবাবু ও তরঙ্গিনীর কথা।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা তোমার বাবা-মা সেই যে কোন্ আশ্রমে গিয়েছিলেন, তাঁদের খবর কি?

—সে তো অনেক দিনের কথা সুচরিতা। তাঁরা তো অনেক দিন গত হয়েছেন।

শুনে সুচরিতা দুঃখিত হল। বলল, তাই নাকি! মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—কয়েক ঘণ্টার জন্যে হয়েছিল। স্বামীজির মৃত্যুর পর বাবাই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি যখন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন মায়ের জীবনের সামান্যই আর বাকি। বাবা আশ্রমে নেই, মাধুকরীতে বেরিয়েছেন। আশ্রমের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? তাঁরা বললেন, ঠাকুরের পাদোদক। আশ্রমে নাকি ঠাকুরই একমাত্র চিকিৎসক এবং পাদোদকই তাঁর একমাত্র ওষুধ।

—ঠাকুর কে?

—শ্রীভগবান স্বয়ং। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তি।

—আর বাবা?

—তাঁর সঙ্গে মৃত্যুকালে আমার দেখা হয়নি। একেবারে মৃত্যুর খবরই এল টেলিগ্রামে।

প্রণব চুপ করলে। তারপর বলল, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহও নাকি শেষ বয়সে পায়ে *হেঁটে বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমারও মাঝে মাঝে সংসার ত্যাগের বাসনা হয়। এটা বোধ হয় আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে।*

সুচরিতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তার পরে?

—তার পরে আর কি? মক্কেলরা টাই চেপে ধরে আটকে রাখে। যেতে দেয় না।

প্রণব হাসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার কখনও ও রকম ইচ্ছা হয় না?

সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলল, তোমার কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে হয় বই কি!

আঠারো

প্রণব এবং অরুণা যেদিন বিমানকে জাহাজে তুলে দেবার জন্যে বম্বে যাত্রা করল, সুচরিতাও সেই দিনই বহরমপুরে ফিরে এল। সুচরিতাকেও ওরা বম্বে নিয়ে যাবার জন্যে জেদ করেছিল। ওর নিতান্ত অনিচ্ছাও ছিল না। কিন্তু তাহলে কাজে যোগ দেবার দিনে ফিরতে পারবে না বলে যায়নি।

বিমানকে জাহাজে তুলে দিয়েই ওরা বম্বে থেকে সুচরিতাকে তারে সেকথা জানিয়েছিল।

প্রণব ফিরে এসে সুচরিতার জন্যে জমি কেনা এবং তার পরে বাড়ি তৈরি করায় মন দিলে। বাড়ির যে নকশা সে পাঠাল তা সুচরিতার খুব পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি তৈরি আরম্ভ হতে প্রণব এবং অরুণা তাকে কয়েকখানিই চিঠি দিলে নিজের চোখে একবার দেখে যাবার জন্যে। দূরের পথ তো নয়। সুচরিতা শনিবার অফিসের পর বেরিয়ে সোমবার সকালে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু সুচরিতার কেমন স্বভাব, সে ইঁট-কাঠের কাঠামোটা একেবারেই সইতে পারে না। লিখল, বাড়ি সম্পূর্ণ না হলে ও কিছুতেই যাবে না।

ইতিমধ্যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে মধ্যপথেই সমস্ত বন্ধ হয়ে রইল। অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অরুণা মারা গেল।

খবরটা সে পেলে কয়েকদিন পরে। প্রণবের চিঠিতে নয়, বরদার চিঠিতে। দুপুরে হঠাৎ অরুণা মারা যায়। তখন তার কাছে প্রণব কিংবা মাধুরী, কেউই ছিল না। প্রণব হাইকোর্টে, মাধুরী স্কুলে। শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার বুকের ভিতরটা কি রকম করে ওঠে এবং খানসামা বেয়ারারা কিছু বোঝবার আগেই দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। ডাক্তার ডাকারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে প্রণব এবং মাধুরী যখন ছুটে এল, তখন সব শেষ।

চিঠি পেয়ে সুচরিতা স্তম্ভিতের মত বসে রইল।

অরুণাকে প্রণব যে কত ভালবাসত সুচরিতা জানে। সুতরাং এই নিদারুণ আঘাত যে কি করে প্রণব সহ্য করবে, তা সে ভেবেই পেলে না। এবং সেই চিন্তা সমস্ত ক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

আশ্চর্য এই মানুষটির ভাগ্য! বাপ-মায়ের একটিমাত্র সন্তান। দুজনের কাজ থেকেই অপর্যাপ্ত স্নেহ এবং আদর পেয়ে এসেছে। স্নেহ ছাড়া ও একটি দিন বাঁচতে পারে না। অরুণা চলে যাওয়ার পরে কি করে বাঁচবে ও? কাছে বিমান পর্যন্ত নেই। মাধুরী ছোট মেয়ে। সে বাবাকে সান্ত্বনা দেবে কি, তার নিজেরই সান্ত্বনার প্রয়োজন।

প্রণবের শুধু তো জীবন নয়, জীবনযাত্রার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল অরুণা। সেই জীবনযাত্রাকে সে রূপ দিয়েছিল। নিজের হাতে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছিল। এখন ও আশ্রয় করবে কাকে?

আশ্চর্য প্রণবের ভাগ্য! সৌদামিনী এল, চলে গেল। অরুণার হাতে প্রণবকে দিয়ে তরঙ্গিনীও একদিন সরে গেলেন। এখন সেই অরুণাও গেল চলে। ওর স্নেহপ্রবণ হৃদয় যখন যে ডালকে আশ্রয় করেছে, সেইটেই গেছে ভেঙে।

এমন দেখা যায় না।

সুচরিতা প্রথমে ভাবল, সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু বুঝল তার কোনও অর্থ হয় না। কি নতুন সান্ত্বনা দেবে সে? কোন কথা তার অজ্ঞাত? ভাষার প্রলেপে শোকের কোন ক্ষত কবে শুকিয়েছে?

তার চেয়ে এই সময় একবার যেতে পারলে ভাল হয়,—সান্ত্বনা দিতে নয়, তার শোকের অংশ নিতে। প্রণবের কাছে এই দুর্দিনে যদি সত্য সত্যই কিছুর প্রয়োজন থাকে, তা সান্ত্বনার নয়, তার শোকের অংশ গ্রহণের।

দরখাস্ত করে ছুটি নেওয়ার সময় এখন নেই। সুচরিতা স্থির করল, সামনের শনিবার অফিসের পর সে বেরিয়ে যাবে। খবর দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। পরের সোমবারটা কিসের একটা ছুটি আছে। সে রবি, সোম দুটো দিন থেকে মঙ্গলবার সকালে ফিরে আসবে। অরুণার জন্যে তার নিজের মনটাও অস্থির হয়ে আছে। কাজে মন বসছে না।

বিকেলে সুচরিতা কলকাতায় পৌঁছল।

বরদার বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে স্নান সেরে তখনই সে প্রণবের বাড়ি এল। বরদা সকাল-সকাল কোর্ট থেকে ফিরেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। পথে প্রণব সম্বন্ধে কত কথাই সুচরিতা ভাবতে ভাবতে চলল। *কি করছে সে, কেমন দেখবে তাকে? কি তাকে বলা যায়? সান্ত্বনার কোনও কথাই সুচরিতার মুখে আসে না যে!*

কিন্তু বাড়ি ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল। প্রণব বরদার সঙ্গে টেনিস খেলছে!

সুচরিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা তন্ময় হয়ে খেলছে। ওর দিকে চাইবার সময়ও কারও নেই।

একটা ফাঁকে ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বরদা এবং প্রণব উভয়েই চিৎকার করে উঠল,—কখন এলে?

সুচরিতা সাড়া দিলে না। শুধু একটু হাসল। এমনটি সে প্রত্যাশা করেনি। ঝগড়ু একটা বেতের চেয়ার এনে দিলে।

খেলার শেষে ওরা দুজনেই এসে বসল।

প্রণব বলল, তোমার বাড়িটা নিয়ে এইবার লাগব সুচরিতা। নানা কারণে অনেক দেরি হয়ে গেল। চল, যাবে দেখতে? কাছেই তো।

বরদা বলল, চমৎকার হচ্ছে রে তোর বাড়িটা। প্রণবের রুচি আছে।

প্রণব খুশি হয়ে উঠল। বলল, তবু তো এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এর পরে যখন রাস্তা হবে, বাগান হবে, তখন যেতে যেতে লোকে একবার দাঁড়িয়ে দেখে যাবে। যাবে দেখতে?

সুচরিতা বলল, না। প্রতিমায় খড়ের উপর মাটি দেওয়া, আর ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকি দিয়ে বাড়ি তৈরি, বলেছি তো, ও আমি একেবারে সইতে পারি না। বাড়ি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন যাব।

—বেশ তাই যেও।—প্রণব বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল,—সুচরিতা, তোমার ছুটি কদিন।

—সোমবার রাত্রের ট্রেনে যাব।

—তোমার রিটায়ার করার দেরি কত?

—এখনও বছর দেড়েক আছে। অবশ্য আরও কিছু দিন মেয়াদ বাড়ান যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে না। ভাবছি, মাস ছয়েক পরেই এক বছরের ছুটি নোব। ছুটিটা পাওনা আছে। তারপরে দিন কয়েকের জন্যে কাজে যোগ দিয়েই অবসর নোব। আর পারছি না।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রণব কথা বলছিল। অরুণার প্রসঙ্গ ওঠেইনি। এখন সুচরিতার শেষ কথায় প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস যেন প্রণবের অন্তরের একেবারে অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল।

বলল, আমিও আর পারছি না সু।

সুচরিতা ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। কিন্তু আশ্বস্তও হল। এই প্রণবকেই খুঁজছিল সে।

বলল, তোমার কথা ভেবে কোনও দিশা পাই না।

প্রণব বলল, আমিও না। সেজন্যে ভাবিও না আর। সুচরিতা, কবির কাব্যে পুরুষকে সহকার তরু আর নারীকে মাধবীলতার সঙ্গে তুলনা করেছে। সেই কথাই জেনে এসেছ। আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক উলটো। সংসারযাত্রায় পুরুষই মাধবীলতা, মেয়েরা মাচা।

প্রণব কি ভেবে হাসল। বলল, তোমরা আমাদের কত যত্ন করে মাচায় তুলে বাড়িয়ে তোল, বাঁচিয়ে রাখ। তারপরে কোনও নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ একদিন সরে যাও। আমরা তখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাই।

প্রণব চুপ করল। বলল, আজ আমি কত অসহায়! কোথাও যেন, কিছুতে যেন জোর পাচ্ছি না।

আবার একটা সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তবু কবির উপমার মতো বাকি জীবন সহকারের ভূমিকাই অভিনয় করে যেতে হবে!

সুচরিতা একটা কথাও বলতে পারল না।

বরদা বলল, তা কেন হবে মুক? বাইরের ঝড়-ঝাপটা আমরাই তো সহ্য করি। মেয়েরা আমাদের ওপর নির্ভর করেই চলে।

প্রণব বলল, হ্যাঁ। বাইরের ঝড়-ঝাপটা সম্বন্ধে তাই বটে। কিন্তু ঝড় তো শুধু বাইরেই নেই, ভিতরেও আছে। সেটা সামলায় ওরা। সে ঝড়ও যে কত প্রচণ্ড, তোমার কোনো ধারণা নেই বরদা। শুধু তাই নয়, আমরা ওদেরই হাতের সৃষ্টি, জান?

—কি রকম?—বরদা জিজ্ঞাসা করল।

প্রণব বলতে লাগল,—পৃথিবীতে প্রথম যখন এলাম, মা আমাদের এক রকম করে সৃষ্টি করতে লাগলেন। সেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবার আগেই এল বধু। তার হাতে আবার আমরা নতুন করে সৃষ্ট হতে আরম্ভ করলাম। আমাদের জীবনের সঙ্গে ওরা জড়িয়ে দিতে লাগল নতুন অভ্যাস, নতুন অভাববোধ। সেও এক রকমের আফিম। তারপরে ওদের ছাড়া এক মুহূর্তও আমাদের চলে না। আমাদের জীবনযাত্রায় ওরা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সে এক আশ্চর্য কৌশল বরদা। কদিনের জন্যে বাইরে কোথাও যাও। গেলেই টের পাবে।

প্রণব হাসল। বলল, তোমাকে বলি শোন, প্র্যাকটিস আমি ছেড়ে দেব স্থির করেছি বরদা।

বরদা চমকে উঠল,—সে কি! এমন ভাল প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবে?

—হ্যাঁ। ওতে আর আমার রুচি নেই। ও আর আমি পারব না। যে কটা মামলা হাতে নিয়েছি, সেগুলো করতেই হবে। ইতিমধ্যে সুচরিতা অবসর নিয়ে এলেই আমিও অবসর নেব। আর পারছি না।

এমন সময় ঝগড়ু চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়ে গেল। সুচরিতা নিঃশব্দে ওদের চা তৈরি করতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

চা খাওয়ার পরে বরদা উঠল। সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করল, তুই এখন যাবি না সুচরিতা?

—হ্যাঁ যাব, চল।

সুচরিতা উঠে দাঁড়াল। একবার যেন কি একটা বলবার জন্যে প্রণবের দিকে চাইল। তারপরে কিছুই না বলে বরদার আগে আগে চলতে লাগল।

পরদিন সকালে।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। বরদা নীচে তার অফিস-ঘরে চলে গেছে। কিন্তু সুচরিতা তখনও চায়ের টেবিলে বসেই তার বৌদির সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় প্রণবের কাছ থেকে ফোন এল:

—তুমি কি ব্যস্ত আছ সুচরিতা?

—না। এখানে আর ব্যস্ততা কি?

—তাহলে আসবে একবার? এস না?

—এখনই?

—হ্যাঁ।

—বেশ তো। যাচ্ছি।

—গাড়ি পাঠিয়ে দিই তাহলে স্মরণ করে

—দাও। কার করে

সুচরিতা গিয়ে যখন পৌঁছুল প্রবল বাধা ওকে নিয়ে গেল একেবারে শো ত্রকন্যাদের অরুণার কাপড়-জামার আলমারিটা; জোর প্রণব স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়িয়ে করলে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি একটি যাবে না? ীরা

—না। মামলা যেদিন থাকে না, সেদি আর কোর্টে যাই না। কিন্তু কি মুস্কিলে পড়েছি বল তো, মাধুরী স্কুলে যাবে, কিন্তু তার জামা-কাপড় খুঁজে পাচ্ছি না।

আলমারির ভিতরে চেয়ে সুচরিতা বলল, এটা তো অরুণাদির জামা-কাপড়ের আলমারি। অন্য কোথাও আছে বোধ করি।

—অন্য কোথায় থাকতে পারে বল তো?

—মাধুরী জানে না?

—না। সে সকালে মাষ্টারের কাছে পড়ে, দুপুরে স্কুলে যায়, সন্ধ্যায় আবার মাষ্টারের কাছে পড়ে।

—চল দেখিগে।

অন্য ঘরে, অন্য একটা আলমারি থেকে সুচরিতা মাধুরীর জামা-কাপড় বের করে দিল। মাধুরীকে ডেকে দেখিয়ে দিল আলমারিটা।

বলল, আর এই আলমারি দুটোয় তোমার বাবার জামা-কাপড় থাকে। এখন থেকে শুধু তোমার নিজেরটা নয়, ওঁরটারও ভার তোমার ওপর রইল। তোমাদের ধোপা কি বারে আসে?

মাধুরী প্রথমে বলল, জানি না।

তারপরে বলল, বোধ হয় রবিবারে।

সুচরিতা ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে, কোলের কাছে টেনে, আদর করে বলল, এখন থেকে তোমার মায়ের সব কাজের ভার তোমাকেই নিতে হবে মাধু। তুমিও যদি ভেঙে পড় মা, তোমার বাবাকে কে দেখবে? তিনি বাঁচবেন কি করে? দেখবে তো?

মায়ের প্রসঙ্গে মাধুরীর চোখ ছলছল করে উঠল। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। কোনোমতে ঘাড় নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

সুচরিতা আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে তো?

—হ্যাঁ।

—দাদার মতো ফার্স্ট হতে পারবে তো?

—ওরে বাবা!

সুচরিতা আশ্বাস দিয়ে বলল, কেন পারবে না? খুব পারবে। মন দিয়ে পড়, তাহলেই পারবে।

মাধুরীকে ছেড়ে দিয়ে সুচরিতা প্রণবের ঘরে গেল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রণব দূরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল।

শুনে সর কাছে একখানা চেয়ার টেনে নাকি ! ব বসল।

ছিল? ়া বলল, তোমাকে কিছু ভাবতে

—ব তোমার মাধুরী খুব ভাল মেয়ে। স্বামীদিন ভাবতে দেয়নি, ভাবেনি। এখন হয়ে তোমার এবং ওর নিজের সমস্ত কাজই আবে।

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা বুঝল, প্রণবের মনটা খুব নিশ্চিন্ত হল না। বলল, তারপরে আর কটা মাস! আমি এসে পড়লে আর তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না।

—কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি আসবে তো?

ওর ভয় দেখে সুচরিতার হাসি পেল। বলল, আসব গো,—ভয় পেও না,—দেখো ঠিক আসব।

প্রণব কি রকম শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। বলল, কি জানি। আমার সবেতেই কেমন যেন ভয় করে।

আপন মনে নিঃশব্দে প্রণব কি যেন ভাবতে লাগল। হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ রাত্রেই ফিরবে বলছিলে না?

—হ্যাঁ।

—গাড়ি ক'টায়?

—নটায়।

—অরুণা থাকলে এবারও তোমাকে ও বাড়িতে উঠতে দিত না কিছুতে। যাই হোক, আমি ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে যাব, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

সুচরিতা জিজ্ঞসা করল, বিমানকে খবরটা জানান হয়েছে?

—না। সকলে নিষেধ করছে। ও এখন সামনের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। এর ওপরে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সবাই বলল, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপরে জানালেই চলবে।

সুচরিতাও সায় দিল। বলল, সে মন্দ নয়।

প্রণব বলল, আমিও বলি মন্দ নয়। কিন্তু সে কি জানতে পারবে না ভেবেছ? তার মন ডাকবে না? যখন সবাই চিঠি দেবে, শুধু তার মা দেবে না, তখন প্রশ্ন জাগবে না তার মনে?

সুচরিতা উত্তর দিতে পারল না।

প্রণব বলল, অনেক বড় বয়স পর্যন্ত বিমান জানতই না যে, অরুণা তার নিজের মা নয়। নিজের মাকে সে দেখেইনি। একেই নিজের মা ভাবত। বড়ো বয়স পর্যন্ত তার মায়ের কাছেই খাওয়া, মায়ের কাছেই শোয়া। ও বিলেত যাবে, অরুণা ভেবেই অস্থির, মাকে ছেড়ে বিমান থাকবে কি করে! অথচ নিতান্ত শিশুকালটা বিমানের বাইরেই কেটেছে স্কুলের মেমসাহেবদের ...। সেও অরুণারই ব্যবস্থা। কিন্তু যেটুকু চরিত্রের পরিবর্তন বিমানের হয়েছিল, পরে অরুণা নিজেই আবার তা চুনকাম করে দিয়েছিল।

সুচরিতা বলল, অনেক তো দেখলাম। বাঙালীর ছেলে সাহেব হয় না। গোড়ায় গোড়ায় সাহেব হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোটাকতক কদভ্যাস ছাড়া আর কিছুই রাখতে পারে না।

—সত্যি। প্রত্যেক জাত পৃথক ধাতুতে গড়া। তুমি উঠছ সুচরিতা?

—উঠি। বেলা হল।

—আচ্ছা। ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়ি নিয়ে হাজির হব।

সুচরিতা উঠল।

উনিশ

মাস আন্টেক পরে সুচরিতার বাড়ি তৈরি হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সেই সময়ে উপর থেকে তার ঢাকায় বদলীর হুকুম এল। হুকুমটা প্রায় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত। সে এক রকম করে নিজের মনকে তৈরি করেছিল এবং সেই অনুযায়ী একটা কর্মসূচীও তৈরি করছিল। এমন সময় এই আদেশ!

সরকারী নিয়ম-কানুনে এই আদেশ অমান্য করবার ফাঁকির অভাব ছিল না। কিন্তু তার অসুবিধা ছিল এই যে, এর সঙ্গে একটা প্রোমোশনও গাঁথা ছিল,—তার প্রাক্-অবসর শেষ প্রোমোশন। চাকুরির নৌকা প্রায় ঘাটে আসার মুখে সেটা হারাতে তার মন চাইছিল না।

ঢাকা যাওয়ার পথে এই কথাটা প্রণবকে বুঝিয়ে সে ঢাকা চলে গেল। কলকাতায় নিশ্চিন্তভাবে ফিরতে তার মাস-ছয়েকের বেশি দেরি হবে না।

প্রণব হাসল। বলল, বুঝলাম, এই কুটোগাছটার উপর নির্ভর করে এখনও ছ' মাস আমাকে ভাসতে হবে।

সুচরিতা দুঃখ পেল। বলল, উপায় কি বল? না গেলে যদি চলত, বিশ্বাস কর, আমি কখনই যেতাম না। আমার মন এখানেই পড়ে রইল।

প্রণবও বোঝে তা। সুতরাং আর কিছু বলল না। বলল, বিমান কেবল্ করেছে, পরীক্ষা সে ভালই দিয়েছে। ফল বেরুতেও দেরি নেই।

সুচরিতা বলল, ভাল খবর এলে তখনই আমাকে জানাবে। অরুণার কথা লেখে না?

—লেখে না! সে সন্দেহ করেছে, অরুণার খুব অসুখ হয়তো। সে যে নেই, একথা এখনও ভাবেনি। এসে শুনবে।

—তার ফেরারও তো দেরি নেই?

—এই পরীক্ষায় যদি সফল হয়, তাহলে বেশি দেরি নেই। নইলে ব্যারিস্টারী পাশ করেই ফিরবে। তাতে দেরি হবে।

—ভগবান করুন, যেন সফলই হয়।

তারপরে সুচরিতা মাধুরীকে বলল প্রণবের দিকে দৃষ্টি রাখতে। শেষে ঝগড়ুকে।

বলল, ঝগড়ু, সাহেব যেখানে যখন গেছেন, তুমিই সঙ্গে গেছ। তোমার মত করে সাহেবকে কেউ চেনে না। সাহেবের ভার তোমার মা-ও তোমার ওপরই দিয়ে গেছেন, আমিও তাই দিয়ে গেলাম। মাধুরী ছেলেমানুষ, তাতে পড়ায় ব্যস্ত। তুমি সমস্ত কাজের মধ্যেও একটি চোখ আর একটি কান ও'র দিকে রাখবে।

অরুণার প্রসঙ্গে ঝগড়ু হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

গাড়িতে ওঠবার সময় সুচরিতা প্রণবকে বলল, আমার বাড়িটার জন্যে একটা চাকর আর একটা মালী এখনই দরকার হবে বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দরকার হবে।

—তাহলে দুজন লোক এখনই ঠিক করবে। তাদের কি মাইনে লাগবে জানিও, আমি মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব। আর বাগানটা—

সুচরিতা হাসলে।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বাগানটার কি বলছিলে বল।

—এখনও অন্তত ছ'মাস সময় পেলে তুমি। ফিরে এসে যেন দেখি বাগানটা অনেকখানি তৈরি হয়েছে।

—চেষ্টা করব সুচরিতা।

—আমি কি কি ফুল ভালোবাসি মনে আছে তো? আমাদের ও বাড়ির বাগানটা আমারই তৈরি।

প্রণব বললে, তার জন্যে তো ছ'মাস সময়ই দিলে সুচরিতা। এই ছ'মাস সেই কথা মনে করবারই চেষ্টা করব।

—দেখি কেমন মনে করতে পার। না পারলে আমাদের বুড়ো মালীকে জিজ্ঞেস কর। সে হয়তো বলতে পারবে।

এবারে প্রণব হাসলে। বললে, বুড়ো মালীর সাধ্য কি সুচরিতা! পারলে আমিই পারব। না পারলে, তোমাকেই এসে করতে হবে। এর মধ্যে আর বুড়ো মালীর কোনো জায়গা নেই। ওই তোমার গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। যত শীঘ্র পার, ফিরে আসার চেষ্টা করো।

ঢাকা মেল চলতে আরম্ভ করল।

ঢাকা গিয়ে সুচরিতার কিছুতে কাজে মন বসে না। অফিসের মামুলী কাজ অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয়। তার চেয়ে বরং ভালো লাগে মফঃস্বলে ঘুরতে। ভালো লাগে সবুজ ক্ষেত, জল-থৈ-থৈ বিল, বিলে শাপলাফুলের সমারোহ। মন খানিকটা ভুলে থাকে, বালি-হাঁসের সঙ্গে সঙ্গে অবারিত আকাশে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে পারে।

ঢাকায় ফিরে এলে আবার যেন খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে প্রথমে খবর এলো মাধুরীর ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েদের একটা স্কলার-শিপ পেলেও পেতে পারে। কলেজে ভর্তি হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

সুচরিতা প্রণবকে লিখলে, মাধুরী পড়তে চায় পড়ুক। কিন্তু এখন থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টাও যেন চলে। ভালো পাত্র পেলে যেন হাতছাড়া না করে।

প্রণব জবাব দিলে, সে কি সহজ কাজ! ও সব মেয়েরাই পারে। সুতরাং সুচরিতা ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই হবে না।

সুচরিতা হাসলে মনে মনে। প্রণব তার সংসারের সঙ্গে সুচরিতাকে জড়াতে চায়! কিন্তু সমস্ত জীবন যে সংসার এবং সমাজের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং এখনও বেড়াচ্ছে, তাকে সংসারে জড়াবার চেষ্টা নিতান্তই দুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর কিছু কাল পরে খবর এল বিমানের সাফল্যের। এখন সে কিছুদিন শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা নেবে। তারপর জানা যাবে কোনখানে তাকে চাকুরি করতে হবে।

এটা সত্যই একটা সুখবর। বিমান ভালো ছেলে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে এদেশের এবং বিলেতের যত ভালো ছেলের সঙ্গেই। সুতরাং ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা একটা ছিলই। সুচরিতা তৎক্ষণাৎ আনন্দজ্ঞাপন করে তার করে দিলে। বিমানের পরবর্তী খবর জানবার জন্যেও যে সে উৎসুক হয়ে রইল, তাও টেলিগ্রামে জানিয়ে দিলে।

আরও কয়েক মাস পরে খবর এল, বিমান বিলেত থেকে জাহাজে যাত্রা করেছে। সঙ্গে নবপরিণীতা ইংরেজ-দুহিতা। সে বিহার-উড়িষ্যা চাকুরিতে গেছে এবং তার প্রথম চাকুরিস্থল মজঃফরপুর।

সুচরিতা বাঙালী মেয়ে। সুতরাং বাংলা দেশে এত উপযুক্ত মেয়ে থাকতে বিমানের মতো একটি সুপাত্র যে ইংরেজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করলে, এটা তার খুব ভালো লাগে না। তবু যখন বিবাহ হয়েই গেছে, তখন কি আর করা যায়! সে এর জন্যেও আনন্দ জানালে।

এর পরের খবর, বিমান ক'লকাতায় কয়েকদিন থেকে মজঃফরপুর চলে গেছে এলেনকে নিয়ে। চমৎকার মেয়ে এই এলেন! প্রণব তার ব্যবহারে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় এবং কর্মিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে গেছে।

এরও পরের খবর হচ্ছে, মাধুরীর বিবাহ। মাধুরীর মাসিমার জয় হোক, তিনি একটি সুপাত্র সংগ্রহ করেছেন। ছেলেটি বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এসে টাটায় একটি ভালো চাকুরি করছে। মাধুরীর মাসিমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে নিকট আত্মীয়। কি যেন একটা উপলক্ষ্যে কলকাতা এসেছিল। মাসি সেইসূত্রে একদিকে ছেলে, ছেলের বাপ-মা এবং অন্যদিকে মেয়ে, মেয়ের বাপকে নিমন্ত্রণ করে দুই পারের মধ্যে সেতুবন্ধন করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং ওপক্ষের সম্মতি-সংগ্রহের ভার নিয়ে নিয়েছেন। ভাবী বৈবাহিক ও বৈবাহিকার সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছে তাতে প্রণবের মনে হয়, সম্মতি-সংগ্রহ কঠিন হবে না। কারণ মাসির কাছে যতদূর জানা গেল, ছেলেটির নাকি মাধুরীকে খুবই পছন্দ হয়েছে। সে রকম ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণের প্রথম দিকেই দুই হাত এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

উপসংহারে প্রণব জানতে চেয়েছে, যদি তাই হয় তাহলে সুচরিতার তৎপূর্বেই আসা একান্ত প্রয়োজন। নইলে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করবে কে? প্রণব এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, এলেন হিন্দু-বিবাহের কিছুই জানে না এবং বিমান ছেলেমানুষ।

চিঠি পেয়ে সুচরিতা এক চোট খুব হাসলে। বাংলাতেই লিখলেঃ

"সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু তুমি দুই দুইবার বিবাহ করিয়াও যদি বিবাহের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক, আমি একবারও বিবাহ না করিয়া সে সম্পর্কে পরিপক্ব হইয়াছি, একথা তোমার মস্তিষ্কে কিরূপে আসিল? শুনিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই প্রকার অসম্ভব এবং উদ্ভট বিশ্বাস মাঝে মাঝে আসে। তুমিও কি প্রতিভাশালী হইবার চেষ্টা করিতেছ?

"যাহা হউক, আমি এইমাত্র প্রাক্-অবসর ছুটির দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্তের অদৃষ্টে কি আছে জানি না। যদি ছুটি পাই, অবশ্যই যাইব। না পাইলে তুমি যেন বুদ্ধি করিয়া বিবাহ পিছাইয়া দিবার চেষ্টা করিও না। ঐ মাসিকে আনাইয়াও নির্দিষ্ট দিনে শুভকার্য সুসম্পন্ন করিও। আমি বড় ভয়ে ভয়ে রহিলাম।"

সুচরিতার ভয় নিতান্ত অমূলক নয়। যখন তার বাঁধা-ছাঁদা প্রায় তৈরি, তখন তার দরখাস্তের উত্তর এল, এ সময়ে তাকে ছুটি দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এবং সেই খবর শুনেই নিজের একান্তে [illegible] প্রণব এ বিয়েতে দাঁড়াতে [illegible] বসল। কিন্তু বরদা তাতে প্রবল বাধা দিলে এবং মাসী ও তাঁর পুত্রকন্যাদের আগে থেকেই নিয়ে এসে একপ্রকার জোর করেই নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ সুসম্পন্ন করলে।

সুচরিতা এই বিবাহে জামাইকে একটি হীরার আংটি এবং মাধুরীকে একটা হীরা ও পান্না-বসানো ব্রেসলেট উপহার দিলে।

কিন্তু প্রণব রেগে তার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করলে না।

জানুয়ারীর গোড়ায় কর্তৃপক্ষ জানালেন, পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে সুচরিতাকে দেড় বৎসরের ছুটি দেওয়া হল। খবরটা তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করে সুচরিতা বরদা আর প্রণবকে জানালে।

বরদার জবাব এল, কিন্তু প্রণব নিঃশব্দ।

সুচরিতা বরদাকে চিঠি লিখলে, প্রণব কি কলকাতায় নেই? সে টেলিগ্রামের জবাব দিলে না কেন?

বরদা জানালে, কলিকাতায় থাকিবে না কেন? সুচরিতার উপর হইতে তার রাগ এখনও যায় নাই, তাই জবাব দেয় নাই।

সুচরিতা তখন প্রণবকে লিখলে, "তোমার কাছে বাড়ির চাবি বলিয়া ভয় পাইতেছি না। দাদার বাড়ি আছে, না-হয় তোমার বাড়ির গেটে গিয়াও মোট-পোঁটলা লইয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু তুমি রাগ করিলে কলিকাতা তাহার সহস্র বিজলী-বাতি লইয়াও আমার কাছে অন্ধকার। তোমার রাগ যদি নিতান্তই না পড়িতে চায়, তাহা হইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিও। আমি বরং কাশী চলিয়া যাইব। এ বয়সে সেখানে যাওয়াই তো উচিত।"

প্রণবের রাগ অনেকটা এই চিঠি পাওয়ার পর গেল বটে, কিন্তু ঝাঁঝ গেল না। উত্তরে সে লিখলে, "তোমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিব না, তুমি সত্যই আসিতেছ,—এত কষ্ট তুমি আমাকে দিয়াছ। কাশী যাইবার ভয় দেখাইয়াছ, কিন্তু তুমি কি দুঃখে কাশী যাইবে? বলি নাই, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ পদব্রজে বৃন্দাবন গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া-ছিলেন? আমার পিতামাতার কথা তো জানোই। সন্দেহ হইতেছে, তোমার উৎপাতে আমাকেই না শেষ পর্যন্ত কাশী গিয়া সন্ন্যাস লইতে হয়!"

সুচরিতা হাসলে। লিখলে, "তোমাকে দোষ দিব কি, শিয়ালদহ না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিব না যে, সত্যই কলিকাতা আসিলাম। তবে ছুটি পাইয়াছি, তাহাতে আর ভুল নাই। এখন

যদি ট্রেন-স্টিমার বন্ধ হইয়াও যায়, ভাসিতে-ভাসিতে, গড়াইতে-গড়াইতেও তোমার পায়ের কাছে গিয়া ঠেকিব, ইহাই মনকে বুঝাইতেছি। একত্রিশে জানুয়ারী ঢাকা হইতে আমি বাহির হইবই। আমি তোমাকে ঢাকা হইতে একটি এবং গোয়ালন্দ হইতে আর একটি টেলিগ্রাম করিব। এত কষ্টের ছুটি, একটু সমারোহ না হইলে মানাইবে কেন?"

এ বিষয়ে প্রণব সুচরিতার সঙ্গে একমত। এত কষ্টের ছুটি এবং এত প্রত্যাশার আসা, সুতরাং সমারোহ করা দরকার বইকি!

পয়লা ফেব্রুয়ারীর আর মাত্র দশটা দিন দেরি। প্রণব বরদার স্ত্রীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। বললে, সুচরিতার বাড়িতে খাট-পালঙ্ক, আসবাব-পত্র, এক প্রস্থ বিলিতী এবং এক প্রস্থ দিশী বাসনপত্র, সমস্ত কিনেছি। এখন চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, ময়দা, মশলাপাতির একটা ফর্দ করে দিন তো। কিনে রেখে দোব। মায় কয়লা পর্যন্ত। ঠাকুরও একটা ঠিক করেছি। এসেই যেন ও দেখে, ওর বাড়ি ওকে অভ্যর্থনা করার জন্যে সর্বরকমে প্রস্তুত।

বরদার স্ত্রী হেসেই অস্থির!

বরদা বললে, ওহে, যে-সে দিনে ওবাড়িতে ওঠা হবে না। গৃহপ্রবেশের দিন দেখে তবে যাবে।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কী!

—হ্যাঁ। গুরুদেবকে বলেছি, তিনি একটা ভালো দিন দেখে দেবেন।

প্রণব তো অবাক।

—গুরুদেব! গুরুদেব কি? তোমার আবার গুরুদেব আছে নাকি?

—আছেন বই কি! ষাট বচ্ছর বয়স হল, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

—সর্বনাশ! —বরদার স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে,—আপনিও মন্ত্র নিয়েছেন নাকি?

বরদার স্ত্রী হেসে সায় দিলে।

বরদা বললে, সুতরাং তাড়াতাড়ি করে এখনই ও-বাড়িতে তুলো না। সুচরিতা ঢাকা থেকে এখানেই এসে উঠবে। তারপরে কাছাকাছি একটা ভালো দিন দেখে, যাগ-যজ্ঞ করে ও-বাড়িতে সে যাবে। সুচরিতাকেও সেকথা আমি লিখে দিয়েছি।

—যাগ-যজ্ঞ! —প্রণব যেন আকাশ থেকে পড়ল,—ওসব তুমি বিশ্বাস কর নাকি?

—করি বই কি! —বরদা বললে।

—হায়, হায়! আমিই শুধু পরলোকের পাথেয় সংগ্রহে পিছিয়ে রইলাম!—কৃত্রিম দুঃখে প্রণব কপালে করাঘাত করলে।

বরদার স্ত্রী বললে, আপনার এখনও দেরি আছে মুকার্জি সাহেব।

সুচরিতা হাসলে। লিখলে:—

—কেন? আমার বয়স কি ষাট হয়নি?

—যে রকম যৌবনসুলভ উদ্দাম-উৎসাহ দেখছি, মনে তো হয় না। —বরদার স্ত্রী পরিহাস করে জবাব দিলে।

—তা বলতে পারেন।

প্রণব চলে গেল। কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িতে বিমান নেই; মাধুরীও শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বেয়ারা-খানসামার সংসার। বাইরেই বা কে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কী যেন তার হয়েছে!

৩১শে জানুয়ারী, সকাল বেলা।

বাঁধা-ছাঁদা করার আর কিছুই নেই। এ ক'দিন বাঁধা-ছাঁদাই সে করলে। সেগুলো মালগাড়িতে যাবার, তা আগেই চলে গেছে। যেগুলো তার সঙ্গে যাবে, সেইগুলোই রয়েছে শুধু। বাকি ছিল শুধু বিছানা, কাল রাত্রেও যাতে শুতে হয়েছে। চাকরটা এসে জানালে, তা-ও হোলড-অলে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে সে ভিতরের দিকের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। এমন সময় পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে দেখে মূর্তিমান প্রণবকৃষ্ণ!

—হ্যাল্লো!

বলেই প্রণব সুচরিতাকে জাপ্টে জড়িয়ে ধরলে। চাকরগুলো পর্যন্ত অবাক।

সুচরিতা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে। তার বিস্ময়ের আর শেষ নেই। বললে, তুমি! কি ব্যাপার! মামলা নাকি?

প্রণব ধপ্ করে বসল। বললে, হায় ভগবান! ব্যারিস্টার পি কে মুখার্জি কবে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছে। তবু তাকে দেখলে বন্ধুজনেরও মামলা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না!

সুচরিতা হেসে বললে, তাহলে হঠাৎ আবির্ভাব কেন?

প্রণব বললে, তোমাকে নিতে। বিশ্বাস করতে পারছ না, না? কিন্তু সত্যিই তাই। সকালে হঠাৎ মনে হল, তুমি তো সাক্ষাৎ বিঘ্নেশ্বরী। বেরুবার মুখে আবার যদি কোন বিঘ্ন হয়, তাহলে পাগল হয়ে যাব। তার চেয়ে নিজেই গিয়ে নিয়ে আসি না কেন? সুনিশ্চিত হওয়া যাবে।

—তাই এলে?

—বাধা কোথায়? তোমার কর্তৃবাচ্য আছে, কর্মবাচ্য আছে। আমার তো শুধু ভাববাচ্য। সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল।

সুচরিতা চাকরটাকে ইঙ্গিত করলে সাহেবের জুতো খুলে দেবার জন্যে। নিজের হাতে ওর কোট-টাই খুলে ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে এল।

বললে, ভালোই করেছ। এতদিন কাটালাম, কিন্তু ভয় হচ্ছিল, আজকের দিনটা বুঝি

আর কাটাতে পারব না। তোমাকে দেখে ভরসা হচ্ছে দিনটাও কাটবে। কিন্তু বেশি বুদ্ধি করতে গিয়ে একটা অসুবিধা করেছি।

—নেভার মাইন্ড! কি অসুবিধা বল, আমি সুরাহা করে দিচ্ছি।

সুচরিতা হেসে বলল, তাছাড়া উপায়ও নেই। এইটেকে রেখে অন্য দুটো চাকরকে কদিন আগেই মাইনে মিটিয়ে বিদায় দিয়েছি। আজকে আর রান্না-বান্না করব না ঠিক করে রাত্রে ঠাকুরটাকেও বিদায় দিলাম। এখন তুমি এলে, সুতরাং রান্না দুটি করতেই হবে। আমি রাঁধব, আর তুমি আমাকে সাহায্য করবে, কেমন?

—চমৎকার!

—তাহলে স্নান করে এস। আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি। কিন্তু জামা-কাপড় এনেছ তো? নইলে আমার শাড়ি পরতে হবে কিন্তু।

প্রস্তাব শুনে প্রণব অট্টহাস্য করে উঠলঃ বাঃ! ঝগড়ু আছে যে সঙ্গে!

—ওঃ! সেও এসেছে সঙ্গে! তাহলে আর চিন্তা কি! যাও, আর দেরি করো না।

চারিদিকে চাইতে চাইতে প্রণব বললে, না, আর দেরি কিসের? কিন্তু তোমার টেবিল-চেয়ার, আসবাবপত্র কোথায়? কিছুই দেখছি না যে!

—তার কিছু মালগাড়িতে কলকাতা যাত্রা করেছে। বাকি বন্ধুবান্ধবকে বিলিয়ে দিয়েছি।

প্রণব যেন উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রাণের আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না।

চীৎকার করে উঠলঃ হুর্‌রে! কী ভালোই যে লাগছে আমার সুচরিতা! আমার সমস্ত জীবন যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে, বহুকাল পরে সম্পূর্ণ অভাবিতরূপে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে পথের ধারে জীর্ণ একটি স্টেশনের বিশ্রামঘরে। আজ দুপুরটা আমরা কি করে কাটাব জানো?

প্রণবের চোখের স্বপ্ন ধীরে ধীরে যেন সুচরিতার চোখেও সঞ্চারিত হচ্ছে। বললে, কি করে?

প্রণব বললে, গল্প করে। তুমি বসবে ওই সুটকেসটার উপর, আর আমি এই বিছানাটার ওপর। আর এই হতশ্রী ঘর। দেখবে কত কালের কত হারিয়ে-যাওয়া গল্প আবার ফিরে আসবে। আমরা নতুন করে আবার সেই পুরনো জীবন ফিরে পাব। সে যে কত ভাগ্যের কথা, তা আর বলবার নয়।

যেন নাচতে নাচতে প্রণব বাথরুমে চলে গেল।

কুঁড়ি

বরদা শক্ত লোক। দিন দেখা-দেখিতে প্রণব আর সুচরিতা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সে করে। এবং শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছাই জয়ী হল। একদিন ভালো পণ্ডিত এনে যাগ-যজ্ঞ করে সুচরিতা তার নতুন বাড়িতে গেল।

প্রণব বাধা দিলে না। কিন্তু খুব কৌতুক বোধ করলে।

এর পরে সুচরিতা একটা বাঁধা কার্যক্রমের মধ্যে পড়ল। প্রণবের সংসার সে সহজেই একটা বন্দোবস্তের মধ্যে এনে ফেললে। যার জন্যে সেখানে রোজ সকালে যাওয়ার দরকার হয় না। হঠাৎ কোন কারণে দরকার হলেও ঝগড়ু এসে নির্দেশ নিয়ে যায়।

সুতরাং সুচরিতার কাজের মধ্যে দাঁড়াল সকালে বাগান করা, দুপুরে নিদ্রা এবং বই পড়া। বিকেলে প্রণবের সঙ্গে একটু টেনিস খেলা। আবার সে প্রণবের পাল্লায় পড়ে টেনিস খেলা আরম্ভ করেছে। তাছাড়া করবেই বা কি? সময় তো কাটাতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে ফিরে এসে আবার বই-টই কিছু পড়ে।

সেদিন সকালে একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সুচরিতা কাদায় নিজে আর বাগানে নামতে পারেনি। মালীটা কাজ করছিল, আর সে নিজে বারান্দায় বসে মাঝে মাঝে খবরের কাগজখানা ওল্টাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে মালীর কাজ দেখছিল।

খবরের কাগজ সম্বন্ধে সুচরিতার ঔৎসুক্য বরাবরই কম। খবরের কাগজ একখানা রাখতে হয়, তাই রাখে। মাঝে মাঝে পাতা ওল্টায়। খুব যে পড়ে, তা নয়। শুধু একটি জায়গা নির্দিষ্ট দিনে মন দিয়ে পড়ে, নিয়োগ-বদলির জায়গাটা। তার চেনা-জানা লোকেরা কে কোথায় বদলি হচ্ছে দেখে।

এইভাবেই সে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় প্রণব এসে পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরল।

বিরক্তভাবে সুচরিতা বললে, আঃ! চোখ ছাড়! এখনই চাকর-বাকরে দেখে ফেলবে!

প্রণব চোখ ছেড়ে দিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসতে সুচরিতা বললে, তোমার বয়স কি দিন দিন কমছে? কী যে কর!

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, দেখ সু, মানুষের বয়স একটা নয়।

—কটা তবে?

—দুটো। একটা মনের, একটা দেহের।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দুটোর তালও এক নয়, মাপও এক নয়।

প্রণব মাঝে মাঝে এরকম দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে। সুচরিতার খুব কৌতুক বোধ হয়।

বললে, কি রকম শুনি?

প্রণব বললে, কারও মনের বয়স দ্রুত তালে চলে, দেহেরটা ঢিমে তালে। আবার কারও দেহেরটাই দ্রুত তালে চলে, মনেরটা ঢিমে তালে।

—তার ফলে কি হয়?

—তার ফলে কোথাও দেখা যায়, ত্রিশ বছরের ছেলে মনের দিক দিয়ে তেষট্টি বছরের হয়ে গেছে। আবার হয়তো তেষট্টি বছরের বুড়ো মনের দিক দিয়ে ত্রিশ বছরের হয়ে রয়েছে।

—শেষেরটির দৃষ্টান্ত তুমি?

—তা বলতে পার। তার জন্যে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু যে-কথাটা তোমাকে বলতে এসেছিলাম, সেইটে বলি।

—বল।

—কাল সৌদামিনীর মৃত্যুদিন। অরুণাতে আমাতে এই দিনটি বরাবর শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্তভাবে পালন করে এসেছি। এবারে অরুণা নেই, তুমি আছ। আসবে কাল সকালে?

—আসব বই কি! নিশ্চয় আসব।

কি কথা ভাবতে ভাবতে প্রণব বললে, অরুণা যখন নতুন এসেছে,—খুব নতুন অবশ্য নয়,—তখন তার সঙ্গে একদিন টেনিস খেলেছিলে। মনে আছে?

—আছে।

—সেদিন তুমি জিততে পারতে, কিন্তু ইচ্ছে করে জেতোনি। মনে আছে?

দুষ্টুমি করে সুচরিতা বললে, তা মনে নেই।

—হ্যাঁ। কিন্তু সৌদামিনীর কাছে তুমি তেমন করতে পারতে না।

—তার মানে?

—তার মানে, সর্বত্র তার ইচ্ছেটাই জয়ী হত। অন্যেরটা নয়।

—কি করে?

—কি জানি, কি একটা আশ্চর্য উপায়ে। দেখেছি কি না।

প্রণব চুপ করে গেল। তারপরে হঠাৎ বললে, কিন্তু একটা আশ্চর্য কথা জানো, কি সৌদামিনী, কি অরুণা, কেউ-ই আমাকে সম্পূর্ণ পায়নি।

রুদ্ধশ্বাসে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—সকল সময়ই শেষ বেঞ্চের একটা কোণে একটুখানি জায়গা তুমি দখল করে বসে ছিলে। সেই ফাঁকটুকু ওরা কেউ-ই ভরাতে পারেনি। সে যে আমার পক্ষে কী ভয়ানক

অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল, তা আর বলবার নয়।

সুচরিতা নিরুত্তরে শুধু শুনে যেতে লাগল।

প্রণব বললে, তোমার কথা কত যে ভেবেছি, কত রকম করে যে ভেবেছি, তার আর শেষ নেই। কেবলই মনে হয়, তুমি আমাকেও ফাঁকি দিলে, নিজেও ফাঁকি পড়লে।

এতক্ষণে সুচরিতা যেন নাড়া দিয়ে উঠল। বললে, তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি, একথা কি করে বল?

—তাই সুচরিতা। তুমি ভেবেছ ভালোবাসলেই পাওয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তা নয়। না পেলে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না।

সুচরিতা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, পাওয়া তুমি কাকে বল?

—কাকে বলি, তুমি জান না? কিন্তু তোমার অন্তর জানে। তাই সেদিন জিততে গিয়েও তুমি ইচ্ছে করে জিততে পারোনি। যখন দ্বিধা থাকে না, শঙ্কা থাকে না, এমনকি, সঙ্কোচের আবরণও ফিকে হয়ে আসে, একজন আর একজনকে তখনই পায়।

—ওটা হয় বোধ হয় দেহটার জন্যে।

—দেহটার জন্যেই তো। কিন্তু শুধু ভালোবাসলেই দেহের ঊর্ধ্বে ওঠা যায় না। তার জন্যেই পেতে হয়। পাওয়া সম্পূর্ণ হলে দেহ তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন ছেলের সামনেই মা অসঙ্কোচে স্বামীর পাশে শুয়ে থাকতে পারে। নইলে চোখ টিপে ধরলেও মালীর ভয়ে সঙ্কোচে শিউরে উঠতে হয়। আমার কথাটা বুঝতে পারছ?

সুচরিতা সাড়া দিলে না।

অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, পাওয়া সম্পূর্ণ হয় কখন?

—যখন একজনকে নইলে আর একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে, তখনই।

—তখনই?

সুচরিতা নিঃশব্দে ভাবতে লাগল। সে যা বুঝে এসেছে, যা ভেবে এসেছে, একেবারে তার শিকড়ে যেন নাড়া পড়েছে। কতক্ষণ ধরে সে ভাবলে। ভাবতে ভাবতে আপনমনেই হঠাৎ এক সময় শিউরে উঠল।

প্রণব তখন অন্যমনস্ক। এটা তার চোখেই পড়ল না।

যে ঘরটিতে তরঙ্গিনীর ঠাকুরঘর ছিল, তিনি চলে যাওয়ার পরে সেইটিতেই ছিল অরুণার ফক্স-টেরিয়ার। কিন্তু কুকুর সম্বন্ধে প্রণবের কোনদিনই অনুরাগ বিশেষ ছিল না। কুকুরটি ছিল মাধুরীর অনুগত। সুতরাং মাধুরীর বিবাহের পরে সে তাকে নিজের সঙ্গে টাটানগর নিয়ে গেছে।

এখন সে ঘরটা খালি। তারই একদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিনীর দুটি অয়েল-পেন্টিং,—সন্ন্যাসজীবনের নয়, গৃহী জীবনের। আর তারই সামনের দিকের দেওয়ালে পাশাপাশি সৌদামিনী ও অরুণার দুটি অয়েল-পেন্টিং। সব ক'টি ছবির গলাতেই বড় বড় মালা ঝুলছে। আর তার নীচে দুখানি জলচৌকির উপরে ধূপদানীতে অনেকগুলি করে ধূপকাঠি পুড়ছে।

প্রণব সুচরিতাকে সেই ঘরে নিয়ে এল। দুজনে নিঃশব্দে শান্তভাবে বসে একে একে সকলের জন্যেই প্রার্থনা করলে, অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে ওরা পাশের ঘরে এসে বসল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বাবার স্বামীজিকে তুমি দেখনি, না সুচরিতা?

—না।

—আশ্চর্য মানুষ! আমি জানি না সাধনমার্গে তিনি কতদূর উন্নতি করেছিলেন। ওসব আমি বুঝিও না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ দর্শন ছিল, সেটা আমার ভাল লেগেছিল।

—কি সেটা?

—সব আমার মনে নেই। এতদিন পরে মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু একটি কথা বেশ মনে আছে এবং সেই উদ্ধত যৌবনেও ভাল লেগেছিল। সেটি হচ্ছে, সে-ই তোমার যথার্থ আত্মীয় যে তোমাকে তোমার চরিতার্থতার পথে চলতে সাহায্য করে। বাপ-মা'ই বল আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাই বল, সমস্ত সম্পর্কের সার্থকতা এই মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে।

—আর হৃদয়? হৃদয় কিছু নয়?

—স্বামীজির মতে ওটা কিছুই নয়,—বিলাস মাত্র।

—এইটে তোমার ভাল লাগল?

—নরনারীর সম্পর্কে ওটাও একটা দিক সুচরিতা। এই মুহূর্তে যখন সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি কি প্রীতি নিবেদন করছিলাম, তখন এই দিকটা বেশ লাগছিল।

—এটা তো পারস্পরিক?

—নিশ্চয়ই। পরস্পর পরস্পরকে তার চরিতার্থতার পথে সাহায্য করে বলেই এটা পবিত্র। হিন্দু-বিবাহের মূল কথা নাকি এই।

সুচরিতার এটা খুব ভাল লাগল না। হৃদয়কে বাদ দিয়ে কোন সম্পর্কের কথা ভাবলে সে আর রস পায় না। অথচ স্বামীজি বলেন, হৃদয়টা বিলাস,—ওটা শুধু বাঁধে, আর কিছু করে না।

সুচরিতা বললে, ওটা সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের নয়।

—না। আমার কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধেই একটা চূড়ান্ত মত নেই। এক একটা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা দৃষ্টিভঙ্গি ভাল লাগে। আজ এই দর্শনটি ভাল লাগল কেন জান?

—ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রীতি জানবার সুবিধা হল বলে।

—হ্যাঁ। কিন্তু কৃতজ্ঞতা আমার ওইখানেই শেষ হয়ে গেল না।

—তবে?

—আমার পাশে সশরীরে যে বসে ছিল তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছল; ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। অন্তরের মধ্যে খুব স্পষ্ট যে অনুভব করতে পারছিলাম তাও নয়। কিন্তু এই তৃতীয়টিকে বাহির এবং অন্তরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছিলাম। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি!

প্রণব হাসতে লাগল।

কিন্তু সুচরিতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে। বললে, আমি এবারে উঠি।

—যদি উঠতে না দিই? যদি বেঁধে রেখে দিই?

সুচরিতা জানে প্রণবের মাথায় কি কথা ঘুরছে। জানে, এই কথার সবটাই পরিহাস নয়। জানে, একটা প্রচণ্ড শক্তি নিরন্তর প্রণবকে যেন ঠেলছে। তাকেও যে ঠেলছে না তা নয়। কিন্তু তাকে অমন ব্যস্ত করতে পারে না। মনকে সে বুঝিয়েছে, এই সমাজে এই বয়সে ওটা সম্ভব নয়। তাতে করে ভুল করাই হবে।

বললে, আচ্ছা এই বসলাম। বল তোমার কি কথা।

—আমার একটিই কথা, তোমাকে বেঁধে রেখে দেওয়া। যে ভুল অতীতে করেছি, তার সংশোধন করা।

—তার সংশোধন করতে গিয়ে আর একটা ভুল করবে?

—ভুল নয়, এইটেই সত্যি। সৌদামিনীর মৃত্যুর পরে এই সত্যকেই গ্রহণ করা আমার উচিত ছিল। ভয়ে পারিনি। সুচরিতা, আমি স্থির করেছি, কোন ভয়েই এই সত্যকে আর অস্বীকার করব না।

—কি করবে?

—তোমাকে বিবাহ করব।

—জোর করে? — অস্বস্তির সঙ্গে সুচরিতা হো হো করে হেসে উঠল।

প্রণব এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে বললে, হ্যাঁ সুচরিতা, দরকার হলে জোর

করব। তুমি জানো সে জোর আমার মধ্যে আছে।

—লোকে কি বলবে?

—তাদের যা খুশি।

—ছেলে-মেয়েরা কি ভাববে?

—তাদের যা খুশি। সুচরিতা, তোমাকে পেতে গেলে সমস্ত দ্বিধা, সংকোচ এবং ভয়ের উর্ধ্বে আমাকে উঠতে হবে। সমস্ত জীবন তোমাকে পেলাম না। কিন্তু আর হারাতে পারব না।

—কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে আমাকে কেন পেতে চাও? কি হবে পেয়ে?

প্রণব একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, এ প্রশ্ন আমার মনেও যে ওঠেনি তা নয়। দুজনেই জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি, তবু পরস্পরকে চাই কেন? না, কোন জবাব পাইনি। বোধ করি তোমাকে পাওয়ার জন্যেই পেতে চাই। পেয়ে ধন্য হতে চাই। এছাড়া কোন জবাব দিতে পারব না।

সুচরিতা স্থাণুর মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি ভাবতে সময় চাও সুচরিতা?

সুচরিতা তথাপি নিরুত্তর।

এবারে প্রণব ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে ওর পাশে বসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম সুচরিতা?

ওর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। শান্ত, সংযত কণ্ঠে বললে, তাহলে থাক সুচরিতা।

এবারে সুচরিতা ভেঙে পড়ল।

—অমন করে আমাকে লোভ দেখিও না গো, অমন করে আমাকে লোভ দেখিও না।

হাতখানি টেনে নিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সুচরিতা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একুশ

আশ্চর্য মানুষ এই প্রণব। মনের মধ্যে কোন গোলমাল নেই। বয়সের ব্যবধানও মানে না। দিনের বেলায় যদি বা একটু অর্গল থাকে, সন্ধ্যার পরে দোতলার দক্ষিণের খোলা বারান্দায় মদের গ্লাসের সামনে বসলে তাও আর থাকে না। তখন 'সকল মানুষ আমার ভাই, তিন ভুবন আমার স্বদেশ'। বিমান, মাধুরী কিংবা জামাতা বনবিলাসের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তাও ঠিক পিতাপুত্রের সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

সুতরাং বিবাহ সম্পর্কে মনঃস্থির করামাত্র তিনি অকপটে সে কথা তাদের লিখে জানালেন।

বিমান তখন মজঃফরপুর থেকে পুরীতে বদলী হয়ে এসেছে। খবর পেয়ে সে তো স্তম্ভিত। স্ত্রীকে ডেকে বললে, শুনেছ এলেন, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন!

ওঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন এল। বিমানের হাতের মধ্যে চিঠিখানা তখনও কাঁপছিল। কিন্তু সেদিকে না চেয়েই বললে, তাই নাকি! কবে? আমরা সবাই যাচ্ছি তো?

তার মুখে-চোখে খুশি যেন উপচে উঠছে।

গম্ভীরভাবে বিমান বললে, ছিঃ এলেন! বাবার বিয়ে, এ কি ঠাট্টার কথা!

এখানকার সমাজ এবং সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এলেনের এই অল্পদিনে বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি।

থতমত খেয়ে এলেন বললে, কিন্তু এদেশেও বুড়োরা বিয়ে করে তো।

—করে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। বাবা বিয়ে করবেন কি! বড় বড় ছেলেমেয়ে রয়েছে। লোকে বলবে কি!

সত্যি। এদেশে বৃদ্ধের বিবাহ যদি সমাজে নিন্দনীয়ই হয়, তাহলে লোকে তো নিন্দা করবেই।

—কিন্তু—এলেন বললে,—তিনি যদি বিয়ে করতেই চান, তোমরা কি করে আটকাতে পার বল?

—যে করে হোক, আটকাতেই হবে। আমি ভাবছি—

বিমান একটু থেমে এলেনের দিকে চাইলে।

এলেন জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছ বল।

বিমান সোফা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কিছুই ভাবতে পারছি না। মোট কথা, বাবার সঙ্গে একটা কথা হওয়া দরকার। সামনের ছুটিতে আমি নিজে একবার কলকাতা যেতে পারি। কিংবা—

এলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। খুব মনোযোগের সঙ্গে ওর কথা শুনছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কিংবা?

—সব চেয়ে ভাল হয় এলেন, যদি ওঁকেই এখানে আনা যায়।

একটু পরে বললে, সেই সঙ্গে মাধুরীকেও। সে বাবার অত্যন্ত প্রিয়। ওর কথা বাবা কোনদিন ঠেলতে পারেন না।

মতলবটা মাথায় আসতেই বিমান উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, দাঁড়াও, এখুনি দুখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিই,—বাবাকে আর মাধুরীকে। দেখা যাক, কি দাঁড়ায়।

বলেই বিমান লেখবার ঘরে চলে গেল। এবং টেলিগ্রাম দুখানা পাঠিয়ে দিয়ে মিনিট পনর পরে আবার ফিরে এল।

এলেন তখন বাইরের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কি যেন ভাবছিল।

—কি ভাবছ?—বিমান জিজ্ঞাসা করল।

এলেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিছুই ভাবিনি।

তারপর বলল, আমাদের দেশে এরকম হয়। তোমাদের দেশে হয় না। আচ্ছা, যাঁকে বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন তাঁকে চেন, দেখেছ কখনও?

—দেখেছি বই কি! আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু।

—কত বয়স?

বিমান একটু ভেবে বলল, তা চাকরি থেকে যখন অবসর নিতে যাচ্ছেন তখন পঞ্চাশের ওদিকেই হবে।

এলেন সোজা হয়ে বসে বলল, তবে?

বিমান বিস্মিতভাবে বলল, কি তবে?

—কিছু নয়।—বলেই এলেন চুপ করল।

বিমান কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, এই বিয়েতে তুমি যেন বাধা দিতে চাও না মনে হচ্ছে।

—সত্যি।

—কেন চাও না?

এলেন গম্ভীরভাবে বলল, কেননা বুড়ো মানুষদের আমরা ঠিক চিনি না। তাঁদের মনের কথাও জানি না। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাবা এবং সেই ভদ্রমহিলা উভয়েরই ছেলেমি করার বয়স পার হয়ে গেছে, উভয়েরই অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিস্তর,—তাহলে ছুটে বাধা দিতে যাওয়ার আগে শান্তভাবে একটু চিন্তা করা দরকার নয় কি?

বিস্ময়ে বিমানের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

এলেন বলতে লাগল,—তুমি জিজ্ঞেস করলে, কি ভাবছিলাম। কি ভাবছিলাম জানো? এই কথাই। ভাবছিলাম, ভালবাসা শুধু আমাদের বয়সেরই একচেটিয়া কিনা। কিন্তু জবাব পেলাম না।

—কার কাছ থেকে?

—নিজের মনের কাছ থেকেই।

বিমান অসহিষ্ণুভাবে বলল, কিন্তু আমাদের সমাজে এ ব্যাপার যে কতখানি হাস্যকর, তোমার ধারণা নেই।

এলেন শান্তভাবে বলল, না। সেইজন্যেই তোমাকে বাধা দিতে পারছি না। চুপ করে রয়েছি।

অনেকক্ষণ পরে আপনমনেই বিমান বলল, মাধুরী এ খবর পেয়েছে কি না কে জানে।

—তুমি তাকেও টেলিগ্রাম করলে না?

হাই তুলে বিমান বলল, করলাম তো। এখানে আসতেও লিখেছি। ভাবছি, আমার মত বাবা তাঁকেও চিঠি লিখেছেন কি-না। তাহলে এতক্ষণ হয়তো সে কেঁদে-কেটে রসাতল করছে।

বিমানের অনুমান মিথ্যা নয়। মাধুরীও তারই সঙ্গে প্রণবের চিঠি পেয়েছিল এবং কেঁদে-কেটে রসাতলই করছিল।

বনবিলাস তখন অফিসে। সে সকালে অফিসে যায়। দুপুরে খেতে আসে, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে আবার অফিস চলে যায়। প্রণবের চিঠিটা এল সে অফিস চলে যাবার পরেই।

সমস্ত বিকেলটা সে ছটফট করে কাটাল। কী সর্বনেশে চিঠি! বনবিলাস ফিরে না আসা পর্যন্ত সে এই চিঠির মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না। তার সব গোলমাল লাগছে।

বনবিলাস ফিরে আসতেই মাধুরী তাকে পোশাক ছাড়বারও ফুরসত দিলে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, শুনেছ, শুনেছ, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন!

—বাঁচা গেল! অনেকদিন পরে একটা বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে!

বনবিলাস কোটটা খুলে হ্যাংগারে রাখল।

—বাবার বিয়ে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ?—মাধুরীর বড় বড় চোখ দিয়ে টপ টপ করে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বিব্রত হয়ে বনবিলাস বলল, ঠাট্টা আমি করছি, না তুমি করছ?

—আমি করছি?— মাধুরীর জলভরা চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

—না তো কি? বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন, একথা তো তুমিই বললে।

—সে তো সত্যি কথা। এই দেখ বাবার চিঠি।

মাধুরী প্রণবের চিঠিখানা বনবিলাসকে দিলে।

বনবিলাসের বাঁ হাতটা তখনও টাই-এর উপর। কিন্তু টাই আর খোলা হল না। পাশের চেয়ারে বসে পড়ে এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলল। তারপর শূন্য-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

অবশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, বাবা রসিকতা করেননি তো? তিনি তা পারেন।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মাধুরী বলল, কখ্খনো না। বাবা না লিখলেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি, এ নিশ্চয় সেই সুচরিতা মিত্তিরের কাণ্ড!

—তিনি কে?

ঘৃণার সঙ্গে মাধুরী বলল, কে জানে, কোথাকার ইন্সপেক্টেস অব স্কুল্‌স না কি যেন ছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি করেছেন। মা থাকতেই আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা ছিল। এখন হয়তো আরও বেড়েছে।

—তুমি জানতে এঁকে?

—জানতাম। কিন্তু এ রকম ভাবিনি। মাসিমা বলতাম, মাসিমার মতোই দেখতাম। নইলে কি ঢুকতে দিতাম!

মাধুরীর চোখে একটা হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল।

বনবিলাস মনে মনে হাসল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম লোক?

—মন্দ নয়।

স্পষ্টাস্পষ্টি ভাল বলতে মাধুরীর বাধল।

বনবিলাস বললে, তবে আর কি? লাগিয়ে দাও।

তপ্ত কড়ায়-ফেলা মাছের মত মাধুরী যেন জ্বলে উঠল। বললে, হ্যাঁ। লাগিয়ে দোব। কি জানো? আগুন। আমি কালই কলকাতা যাচ্ছি।

ওর অবস্থা দেখে বনবিলাস ভয় পেয়ে গেল। বললে, কালই! সর্বনাশ! এই রাগের মাথায় যেও না। বরং পরশু যেও। শনিবার আছে, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ক্রোধের জ্বালায় মাধুরী তখন ছটফট করছে। বললে, তুমি শনিবারেই এস। আমি আর একটা দিনও থাকব না। আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। রাত্রে গাড়ি থাকলে আজ রাত্রেই চলে যেতাম।

মাধুরীর মনের অবস্থা সেই রকমই।

তবু পরদিনই মাধুরীর যাওয়া হল না। বাঁধা-ছাঁদা সমস্ত তৈরি। সন্ধ্যা ৬টায় গাড়ি। একটু পরেই টিকেট এবং বার্থ রিজার্ভ করবার জন্যে লোক যাবে। এমন সময় বিমানের টেলিগ্রাম এল, অবিলম্বে পুরী চলে আসার জন্যে।

বনবিলাস বললে, তা হলে আজ থাক। আমিও বরং এই সুযোগে কদিনের ছুটি নিই। দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমরা যতক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্নাকাটি করবে, আমি ততক্ষণ সমুদ্রের হাওয়ায় শরীরটা একটু সারাবার চেষ্টা করব।

বনবিলাস এমনিতেই বিশালকায়। দৈর্ঘে প্রস্থে এরকম চেহারা এবং এত স্বাস্থ্য সাধারণত বাঙালীর ঘরে বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং সেই শরীর সারাবার কথায় মাধুরী হেসে ফেললে। তারও মনোগত অভিপ্রায় বনবিলাসের সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু—

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছুটি পেতে কদিন দেরি হবে?

—কিছুমাত্র দেরি হবে না। শনিবার আমরা বেরুতে পারব।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দৌড়টা দেখতে হবে না?

—দৌড় কিসের?

—বুঝতে পারলে না?—বনবিলাস ওকে বিমানের মতলবটা বোঝাতে বসল: শ্বশুর মশায়ের বিবাহের কথা শুনে তোমরা সবাই হৈ হৈ করে কলকাতা যেতে পারতে। কিন্তু সেখানে বৃদ্ধ তাঁর নিজের দুর্গে সমাসীন। কাছে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি সুচরিতা মিত্তির। অর্থাৎ যাকে বলে: "Bearding the lion in his own den"!; ম্যাজিস্ট্রেট দেখলে, সে বড় সুবিধা হবে না। তার চেয়ে ঢের ভাল বৃদ্ধকে তাঁর নিজের দুর্গ থেকে অরক্ষিত এবং নিরস্ত্র অবস্থায় নিজের কোর্টে বার করে এনে চাপ দেওয়া। সুতরাং এই ব্যবস্থা। বুঝলে?

মাধুরী আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল। বললে, তাই তো! আমি তো এত কথা ভাবিনি। কিন্তু তুমিও যাচ্ছ তো?

—যাচ্ছি বটে। কিন্তু সেদিকেও কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি কে মুকার্জি। দুর্গ ছেড়ে তিনি যে বার হবেন এমন তো মনে হয় না।

—তখন কি হবে?

—তখন তোমরাই,—অর্থাৎ তোমার ম্যাজিস্ট্রেট দাদা, শ্বেতাঙ্গিনী বৌদি এবং তুমি,—কামান বন্দুক নিয়ে কলকাতায় মার্চ করবে।

—আর তুমি?

—আমি মনের দুঃখে এখানে ফিরে এসে লোহা ঠ্যাঙাব।

চোখ নাচিয়ে মাধুরী বললে, হুঁ। তাই বই কি! তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে আমি তো কাঁদছি!

বনবিলাস হাসলে। বললে, আচ্ছা সে তো পরের কথা। আপাতত শনিবার সন্ধ্যায় আমরা পুরী যাত্রা করছি, এতে আর ভুল নেই।

বাইশ

কিন্তু যার বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র, সে তখন শয্যাগত।

দিন তিনেক আগে টেনিস খেলতে গিয়ে প্রণবের ডান পা'টা মচকে যায়। সেই থেকেই বৃদ্ধ শয্যাগত। দুদিন তো উঠতেই পারেনি। আজ উঠে বসেছে এবং একটু একটু হাঁটবারও চেষ্টা করছে।

তখন আষাঢ়ের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের উপর রঙের সমারোহ শেষ হয়নি।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় একটা টিপয়ের উপর পা তুলে দিয়ে প্রণব একখানা ঈজিচেয়ারে শুয়ে ছিল। মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে সুচরিতা তার আহত স্থানে কি একটা ঔষধ পেন্ট করে দিচ্ছিল। আরামে প্রণবের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল।

পেন্ট শেষ করে সুচরিতা তার দিকে চাইলে।

কি মুখ!

প্রশস্ত ললাটে, নিমীলিত নেত্রে, মাথার বিরল পক্ক কেশে রক্তমেঘের আভা লেগেছে!

কী মুখের ডৌল! বৃদ্ধের এই রূপ আর কারও চোখে হয়তো পড়বে না, কিন্তু সুচরিতা এই রূপের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল! চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না।

ধীরে ধীরে প্রণব চোখ মেলতেই লজ্জিত সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ঈষৎ হেসে ডান হাতখানি প্রণব ওর মাথায় স্পর্শ করল। সে-স্পর্শে সুচরিতা যেন কেঁপে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, কেমন বোধ হচ্ছে?

—একটু ভাল। তার মানে এখনও অনেকখানি খারাপ।

প্রণব হা হা করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। এসেই মালিশের জন্যে এমন তাড়া দিলে যে, আসল কথাটাই বলা হয়নি।

পাশের কুশন-দেওয়া মোড়ায় বসে সুচরিতা নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে চাইল।

প্রণব একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে বলল, বিয়ের সংবাদ জানিয়ে বিমানকে আমি একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। বলেছি তোমায়?

সুচরিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

প্রণব বলল, দিয়েছিলাম। তার উত্তরে বিমান একটা টেলিগ্রাম করেছে।

সুচরিতা নিঃশব্দে তেমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল।

প্রণব বলল, আমাকে পুরী যাবার জন্যে লিখেছে। কেন, কে জানে। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না লিখেছিলাম। বোধ করি সেইজন্যে। কিন্তু এই ভাঙা পায়ে কি এখন যাওয়া সম্ভব হবে? অবশ্য পা এখন অনেকটা সেরে আসছে। কাল-পরশু থেকে হয়তো মোটামুটি হাঁটতেও পারব। তবু—

পশ্চিমের দিগন্ত থেকে সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। সেই দিকে চেয়ে প্রণব অনর্গল বকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সুচরিতার দিকে চেয়ে থমকে গেল।

তার ঠোঁটের ফাঁকে অতিসূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

প্রণব থমকে গিয়ে প্রশ্ন করল, হাসছ যে!

—না হাসিনি। বোধ হয় তোমার শরীরের জন্যেই পুরী যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করে থাকবে। তাই হবে.

হাসি গোপন করবার জন্যে সুচরিতা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রণবের মনে ধোঁকা লাগল। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে কর বল তো?

এর পর সুচরিতার পক্ষে হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হয়ে উঠল। সে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল।

বললে, তুমি না বক্তৃতায় হাইকোর্ট কাঁপিয়ে দিতে? জটিল মামলা জলের মতো সোজা, আর সোজা মামলা দুশ্ছেদ্য জটিল করে তুলতে?

প্রণব সবিনয়ে স্বীকার করল, সে বদনাম তার ছিল। নইলে মক্কেল টাকা দিত না।

—তবু কি তুমি এই টেলিগ্রামের অর্থ সত্যিই বুঝতে পারছ না?

—যা বুঝেছি, সে তো তোমায় বললাম।

সুচরিতা অবাক হয়ে ওর শান্ত সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে ওর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, সংসারে অনেক লোক দেখলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

—ঠাট্টা করছ?

—না গো, ঠাট্টা করিনি।—সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলতে লাগল,—সাধারণ মানুষের থেকে তুমি স্বতন্ত্র। তুমি অতুলনীয়। তোমাকে যতই দেখছি, এই ধারণা ততই দৃঢ় হচ্ছে।

তারপর কথাটা ফেরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কবে যাচ্ছ তুমি?

—তুমি বলে দাও।

সুচরিতা একটু ভেবে বলল, বিমান যখন লিখেছে, তখন তোমার বেশি দেরি করা উচিত হবে না। আমি বলি, তুমি সোমবার যাও বরং। আমি সরকার মশাইকে বলে দিচ্ছি, তিনি কালকে তোমার বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করবেন। ঝগড়ু তোমার সঙ্গে যাবে।

—আর তুমি? তুমি যাবে না?

সুচরিতার মুখে কিসের যেন একটা কালো ছায়া পড়ল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে বলল, আমার যাওয়া সম্ভবপর হবে না। ঝগড়ু সঙ্গে থাকলে, আমার মনে হয়, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না।

তার কথার তাৎপর্য প্রণব বুঝল কি বুঝল না, বোঝা গেল না। সে চুপ করে রইল।

রবিবার সুচরিতা এল প্রণবের খবর নিতে। দেখে প্রণব সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ এবং নিরাসক্তভাবে ঈজি চেয়ারটায় শুয়ে।

—কেমন আছ?—সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল।

—ভাল।—সংক্ষিপ্ত জবাব।

—বার্থ পাওয়া গেছে?

—গেছে।

—পুরী এক্সপ্রেসে?

—হ্যাঁ। কিন্তু টিকিটটা ফেরত দিতে হবে কালকে।

—কেন?

—স্থির করেছি যাব না।

—যাবে না? সে কি?

—হ্যাঁ। আমি ভেবে দেখলাম সুচরিতা, না যাওয়াই ভাল।

—নিজেকে দুর্বল বোধ হচ্ছে?—সুচরিতার সুরে যেন ব্যঙ্গের আমেজ।

প্রণব এবারে সোজা হয়ে বসল। বলল, দুর্বলতার চিহ্নও আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আমি যে বলিষ্ঠ শুধু সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই এই শরীরে পুরী যেতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করছি না।

একটু চুপ করে থেকে সুচরিতা বলল, কাল অত উৎসাহ দেখলাম, আজ তার কিছুই নেই?

—সুচরিতা, উৎসাহ বোধ করেছিলাম অনেক দিন পরে ওদের দেখব বলে। ওদের দেখবার জন্যে আমার মনটা খুবই ব্যাকুল হয়েছিল। অনেক দিন দেখিনি কি না।

—সেই ব্যাকুলতা নষ্ট হয়ে গেল কি করে?

—ব্যাকুলতা তেমনি আছে সুচরিতা। যেতে পারছি না বলে মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছি।

ওর দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সুচরিতা বলল, তাহলে যাও। না যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

—তুমি তাই মনে কর?—প্রণবের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

—করি। সরকার মশাইকে টিকিট ফেরত দিতে বলে দাওনি তো?

—দিইনি। দোব ভাবছিলাম।

—তাহলে আর দিও না। তোমার মনের মধ্যে জোরের অভাব যদি না থাকে, তাহলে যাও।

—জোরের অভাব কিছুমাত্র নেই। —দৃঢ়কণ্ঠে প্রণব বললে,—এবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

নিশ্চিন্ত হওয়ার কথায় সুচরিতা হেসে ফেলল। বলল, আমার মনে খুব চিন্তা জমেছে, তোমার কি এই সন্দেহ?

—চিন্তা তো হওয়ারই কথা সু।

—না, আমার পক্ষ থেকে কোনো চিন্তা নেই। তুমি জান বিবাহ সম্বন্ধে খুব উৎসাহ আমার নেই। এই যে তোমার কাছাকাছি রয়েছি, তোমার সঙ্গ পাচ্ছি, তোমার সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, এও কোনদিন আমার প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না।

বাধা দিয়ে প্রণব বলল, আবার সেই সব কথা!

—না। এই চুপ করলাম। আর বলব না। শুধু তোমার যাওয়াটা সহজ করে দিচ্ছিলাম।

—আর তোমায় সহজ করতে হবে না।

—না, আর করব না। কিন্তু তুমি যেও। নইলে আমি খুব লজ্জা পাব।

প্রণব বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, লজ্জা পাবে কেন?

—পাব। সে তুমি বুঝবে না।

বলে সুচরিতা বোধ করি রান্নাঘরটা তদারক করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

সোমবার সকালে সুচরিতা আর একবার প্রণবের খবর নিতে এল। পায়ের ব্যথা অনেকখানি সেরে গেছে। নেই বললেই হয়। পুরী যাবার উৎসাহে তাকে অনেকখানি উজ্জ্বলও দেখাচ্ছে দেখে সুচরিতা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

ওকে দেখেই প্রণব উৎসাহের সঙ্গে বলল, এস, এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখ তো, সব জিনিস নেওয়া হল কি না?

—তোমার গোছান সব হয়নি এখনও?

—হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে। এখন

রবিবার সুচরিতা এলো...

তুমি একবার দেখে পাস করে দিলেই হয়।

ঝগড়ু বাঁধা-ছাঁদা করছিল।

তার দিকে চেয়ে সুচরিতা বলল, টেনিস র‍্যাকেটটা খুলে রাখ। ওটা যাবে না।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রণব বলল, ওটা নিয়ে যেতে দেবে না? বৌমা খুব ভাল টেনিস খেলেন। ইচ্ছা ছিল—

—ইচ্ছা এখন থাক। ওই খোঁড়া পায়ে এখন কিছুদিন খেলা হবে না। মশারিটা নিয়েছিস তো ঝগড়ু?

—ওই যাঃ!

ঝগড়ু জিভ কেটে উপরে ছুটছিল, তাকে থামিয়ে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল, মালিশের ওষুধগুলো নিয়েছিস তো?

ঝগড়ু বললে, সেগুলো নিয়েছি মাসিমা।

—আচ্ছা, তাহলে মশারিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি। ওপরের ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, কি নিয়েছিস আর কি নিসনি।

উপরের ঘরের চারিদিকে সুচরিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে। না, আর কিছু ঝগড়ুর ভুল হয়েছে বলে মনে হল না।

সুচরিতা নেমে আসছে, এমন সময় ঝগড়ু বললে, সাহেব তো যাচ্ছেন মাসিমা, কিন্তু কাল রাত্তিরে ওঁর একটু জ্বর হয়েছিল।

ভয়ে সুচরিতার মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, সে কি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে জানাতে বার বার করে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হল, আপনাকে জানানো দরকার।

প্রণবের অসুখের খবর এত লোক থাকতে কেন সুচরিতাকে জানানো ঝগড়ু দরকার মনে করেছে, এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অন্য সময় হলে হয়তো সুচরিতার দৃষ্টি এড়াত না। একটু হয়তো সে লজ্জাও পেত; কিন্তু অসুখের খবরে সে অবসর সে পেলে না।

উদ্বিগ্ন মুখে বললে, কই আমি তো টের পেলাম না।

ঝগড়ু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, একটু জ্বর এখনও আছে বোধ হয়। কিন্তু আমার নাম করবেন না যেন। সাহেব ভীষণ রেগে যাবেন তাহলে।

—আচ্ছা সে ভাবনা তোকে করতে হবে না।

নীচে এসে একথা-সেকথার পর হঠাৎ সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মুখটা শুকনো লাগছে কেন? শরীর ভালো আছে তো?

—খুব ভালো আছে।

—তুমি তো ভালো বলেই খালাস!

বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে প্রণবের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করে সুচরিতা চিন্তিতভাবে বললে, হুঁ। গা'টা একটু গরমই

বোধ হচ্ছে যেন। ওরে ঝগড়ু, থারমো-মিটারটা একবার দে তো বাবা!

প্রণব বহুতর আপত্তি করলে। সুচরিতা সাড়া দিলে না। শুধু ঝগড়ু থার্মোমিটারটা এনে দিলে উত্তাপটা নিলে। দেখা গেল, জ্বরটা একটু আছে। নিরানব্বুই-এর কাছাকাছি।

প্রণব চিৎকার করে বললে, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। দুপুর নাগাদ ওটুকু আর থাকবে না। তারপরে পুরীর মতো জায়গা!

সুচরিতা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রণব চিৎকার করে বোঝাতে লাগল, নিরানব্বুইটা আসলে জ্বরই নয়। ওটুকু উত্তাপ নানা কারণেই ওঠে। হয়তো একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, নয়তো—

কিন্তু সুচরিতার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল। বিমানকে দেখবার জন্যে প্রণব যে রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতে টিকিট কেনার পর, আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন যাওয়া বন্ধ করলে প্রণব তো একটা ধাক্কা পাবেই, বিমানই বা কি মনে করবে কে জানে!

কোন দিকেই সুচরিতা কোন কুল-কিনারা পেলে না।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সরকার মশাইকে একটা খবর দে তো ঝগড়ু। বল এখনি বুকিং অফিস থেকে পুরীর আর একখানা টিকিট কিনে আনতে। বার্থ পাওয়া যায় ভালোই, না যায় যে কোন ক্লাসের এক-খানা হলেই চলবে। যা তো বাবা!

প্রণব অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। সুচরিতা যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলে না।

একটু পরে সরকারকে খবর দিয়ে ঝগড়ু ফিরে আসতেই সুচরিতা উঠে দাঁড়াল। বললে, আর তুই আমার সঙ্গে একবার আয়তো। বেশি কিছু আনতে হবে না, শুধু একটা সুটকেস আর বিছানা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রণব যেন লাফিয়ে উঠল। বললে, তুমি যাবে?

চলে যেতে যেতে সুচরিতা বললে, না গিয়ে উপায় কি? তুমি তো সহজ লোক নও। আমার মুখ না হাসিয়ে ছাড়বে কেন? আয় ঝগড়ু!

এ খোঁচা প্রণব যেন গায়েই মাখলে না। বললে, ভাগ্যিস একটু জ্বরের মতো হয়েছিল!

এমন করে বললে যে, ঝগড়ুটা পর্যন্ত হাসি চাপবার জন্যে পালাল।

তেইশ

স্টেশনে প্রণবদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ওরা দল-কে-দল সবাই এসে-ছিল,—বিমান ও এলেন এবং বনবিলাস ও মাধুরী।

প্রণব ট্রেন থেকে নামল। তার মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। লজ্জা অথবা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। ওরা অবাক হয়ে গেল। এমন কি, একটু যেন দমেই গেল বলতে পারা যায়। কিন্তু উত্তেজনা এবং আশা সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল না। প্রণবকে সঙ্গে করে ওরা মোটরে নিয়ে গিয়ে উঠল। চাকরটাকে বলে গেল, মালপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে আসতে।

সুচরিতা একা মূঢ়ের মতো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমান তাকে চেনে, মাধুরীও। উভয়েই তাকে তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করত। মাসিমা বলে ডাকত। কিন্তু আজ আর চিনতে পারলে না। যেন না দেখেই ওকে এমনিভাবে একা প্লাটফর্মে ফেলে রেখে শুধু বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে চলে গেল।

যাত্রীর দল যে যার গন্তব্য স্থানে চলে গেল। প্লাটফর্ম প্রায় জনশূন্য হয়ে এল। শুধু বিমানের চাকর আর আর্দালী মালপত্র ঘোড়ার গাড়িতে তোলবার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু সুচরিতা সেদিকে চেয়েও দেখলে না। অকস্মাৎ সে যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

—মা!

ঝগড়ু তাকে মা বলে না, মাসিমা বলে। আজ তাকে মা বলেই ডাকলে। তার সুরে জেদের জবরদস্তি।

—মা!

সুচরিতা বিহ্বলের মতো চাইলে।

ঝগড়ু বললে, পুরী আমার চেনা জায়গা মা। অনুমতি করেন তো আমরা দুজনে একটা হোটেলে গিয়ে উঠি।

স্টেশনের প্লাটফর্মে আলো জ্বলছে। কিন্তু সুচরিতার মনে হচ্ছে, আলো যেন জ্যোতিহীন। প্লাটফর্ম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। ঝগড়ুর কথাগুলো পর্যন্ত। সবটা ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্কভাবে সুচরিতা শুধু প্রতিধ্বনি করলে,—হোটেলে!

ওদের পিছনে, অনতিদূরে, একটি শ্বেত-বসনা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা খেয়াল করেনি। হোটেলের নাম শুনে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই ঝগড়ুর চিনতে বিলম্ব হল না। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

নারীমূর্তি সুচরিতার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললে, আমি মিসেস মুখার্জি—আপনাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আসুন আপনি।

ওর কণ্ঠস্বরে সুচরিতা সমবেদনার আভাস পেল। কে জানে ঠিক চিনতে পারলে কি না। ওর প্রসারিত ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলে। কিংবা হয়তো কিছুই ভাবলে না। প্রথম আঘাতের আকস্মিকতায় এবং রূঢ়তায় ভাববার শক্তিই তার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এলেন ওর অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করতে ধীরে ধীরে যেন সুচরিতার সম্বিৎ ফিরে এল।

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝেই অস্ফুট স্বরে বললে, আমায় যেতে বলছ? চল।

বাইরে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দুজনে তাইতে গিয়ে উঠল।

এতক্ষণে যেন ঝগড়ুর মুখ প্রসন্ন হল। সেও ওদের পিছনে পিছনে এসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

সেই রাত্রে প্রণবের জ্বর খুব বাড়ল।

ওকে বাড়ি নিয়ে এসে বিমান এবং মাধুরী আদরে-যত্নে, হাসিতে-গল্পে যেন অভিভূত করে ফেললে। কিন্তু শরীরটা তার ট্রেন থেকেই খারাপ। সুতরাং হাসি-গল্প তার বেশিক্ষণ সহ্য করবার শক্তি ছিল না। শুধু একটু কফি খেয়ে একটু পরেই সে শুয়ে পড়ল।

সুচরিতাদের ট্যাক্সি সেই সময় গেটে ঢুকল। এলেনের আকর্ষণে ভূতাবিষ্টের মত সে এসে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল।

তারপরে বাড়তে লাগল প্রণবের জ্বর, অনেক রাত্রে। সুতরাং বিমানরা তা টেরই পেলে না।

পরদিন সকালে বিমান ও তার স্ত্রী, মাধুরী ও তার স্বামী সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা গোলটেবিলের চারদিকে বসে প্রণবের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় সুচরিতা এল, সদ্যস্নাতা।

মাধুরী এবং বিমানের সঙ্গে ওর যথেষ্ট পরিচয় আগে থেকেই ছিল। এলেনের সঙ্গে স্টেশন থেকে আসবার পথে সামান্য কিছু আলাপ হয়েছিল। শুধু বনবিলাসের সঙ্গে পরিচয় নেই।

প্রণব একদিন সুচরিতাকে বলেছিল, তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন মহাশ্বেতা। আজ সকালে তার মুখের শান্ত গাম্ভীর্যে, অতি সাধারণ বেশে এবং উন্মুক্ত কেশভারে যেন সেই তপস্বিনীই আত্মপ্রকাশ করেছে। ওরা সকলে, বিশেষ করে বনবিলাস এবং এলেন, স্তব্ধ হয়ে সেই অপূর্ব রূপের দিকে চেয়ে রইল।

এলেন এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে তাকে নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসালে।

বিবাহের ব্যাপার নিয়ে প্রথম সুযোগেই যে তার উপর আক্রমণ আরম্ভ হবে, একথা সুচরিতা গোড়া থেকেই অনুমান করেছিল এবং সেজন্যে সতর্ক হয়েই চায়ের টেবিলে যোগ দিয়েছে। আক্রমণটা যে সর্বাত্মক হবে, এ বিষয়েও তার অণুমাত্র সংশয় ছিল না।

মাধুরী তার বিশেষ চেনা এবং অসীম স্নেহের পাত্রী। সুতরাং তার উপর সুচরিতার কিছু ভরসা ছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, প্রথম আক্রমণটা অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিক থেকেই শুরু হল।

মাধুরী অত্যন্ত নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করল, এই বয়সে বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আপনারা কিছু শুনেছেন মাসিমা?

কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে ধুমধামের আক্রমণ নয়। যেন হাঙরের কামড়,—দাঁত বসেছে, কিন্তু বেদনা নেই।

সকলের আগে মাধুরীকে আক্রমণ করতে দেখে সুচরিতা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, কিছু কিছু শুনেছি বই কি মা!

—এ কি ঠিক হচ্ছে? আপনাদের কি বাধা দেওয়া উচিত নয়?

সুচরিতা তেমনি সহাস্যে জবাব দিলে, আমার পক্ষে যতখানি বাধা দেওয়া সম্ভব, তার ত্রুটি হচ্ছে না মা। কিন্তু উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন যদি তোল, তাহলে বলব, সেকথা তোমরা তুলতে পার, আমি পারি না।

সুচরিতার উত্তর দেবার ভঙ্গিতে শুধু মাধুরী নয়, সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এবং বনবিলাস ও এলেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ঝগড়ু এসে সাহেবের জ্বরের সংবাদ দিতেই সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল: জ্বর? খুব বেশি জ্বর? কখন থেকে হয়েছে?

উদ্বেগে ওরা উঠে দাঁড়াল।

শান্ত কণ্ঠে সুচরিতা ঝগড়ুকে বলল, *সাহেবকে জিজ্ঞেস কর তাঁর চা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কি না। আর বোলো এঁরা চা খেয়েই যাচ্ছেন।*

ঝগড়ু সেলাম করে চলে গেল। তার ব্যবহারে যেন অতিরিক্ত সম্ভ্রম। সেও কি সুচরিতার সাহায্যে যুদ্ধে নেমেছে?

ওরা আশ্বস্তভাবে বসল। এবং অস্বস্তি-কর প্রসঙ্গটা আপাতত এইখানেই বন্ধ রইল। সকলের মন তখন প্রণবের অসুখের দিকে। নীরবে চা খেয়ে ওরা ব্যস্তভাবে প্রণবের ঘরের দিকে ছুটল।

কেবল সুচরিতা এক প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়তে লাগল। কেন যে সে ওদের সঙ্গে গেল না, ওই জানে। ওরাও কেউ তাকে ডাকবার প্রয়োজন বোধ করলে না।

জ্বর নিতান্ত কম নয়। একশোর একটু বেশি।

বিমান ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে কতকগুলি জরুরী কাজ সেরে নেবার জন্যে তার অফিস ঘরে এসে বসল। মাধুরী এবং বনবিলাস বেরিয়ে গেল সমুদ্রস্নানে।

এলেন তার সাংসারিক কাজগুলো একবার তদারক করে ধীরে ধীরে এসে সুচরিতার কাছে বসল।

বললে, জ্বর একশোর ওপর।

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই সুচরিতা বললে, রাত্রে দুই পর্যন্ত উঠেছিল।

এলেন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি রাত্রে টেম্পারেচার নিয়েছিলেন?

কথাটা বলেই সুচরিতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেটা কাটিয়া শান্তভাবে

বললে, ওখান থেকে অল্পজ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলেন তো। সমস্ত রাস্তায় সেটুকু ছাড়েনি। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, ট্রেনের থাকলে রাত্রে জ্বরটা বাড়তেও পারে। তাই একবার টেম্পারেচার নিয়েছিলাম।

সুচরিতা আপনমনে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

এলেন সবিনয়ে বললে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব?

সুচরিতা হেসে বললে, না করলেই চলবে না?

—একটি কথা শুধু।—মিনতির সুরে এলেন বললে,—আপনি এখানে এলেন কেন?

শান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে সুচরিতা ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর বললে, বুঝতে পারছ না? ওঁর জ্বর। না এসে আমার উপায় ছিল? একে ভাঙা পা, তার ওপর জ্বর। শুধু ঝগড়ুর ভরসায় ছেড়ে দিতে সাহস হল না।

সুচরিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, এখানে আমার অসম্মানের যে কোনো ত্রুটি হবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু সেই অসম্মান এড়াবারও কোন ছিদ্র ছিল না। আমি বুঝতে পারছি, তুমি অসহায়। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস কোরো, বিয়ের প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ওঁকে নিরস্ত করতে পারি নি।

ধীরে ধীরে এলেন বললে, আমি বুঝতে পারছি।

কিন্তু সেকথা বোধ করি সুচরিতার কানেই গেল না। হাতের খবরের কাগজগুলো মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিতভাবে সে বলতে লাগল,—বাধা দেবার কথাই তো! যাকে বিয়ের বয়স বলে আমাদের দুজনেরই তা বহুদিন পার হয়ে গেছে। ছেলে-পুলে, ঘর-সংসারের উচ্চাশাও আর নেই। তবে আবার বিয়ে কেন? কিন্তু উনি কিছুতেই তা শুনবেন না।

এলেন নিঃশব্দে সাগ্রহে শুনে যেতে লাগল।

সুচরিতা বলে যাচ্ছে,—কেন শুনবেন না, সে তোমরা বুঝবে না। উনিও বোঝাতে পারবেন না। বোঝবার যদি ইচ্ছা থাকে, ওঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে তোমাদেরই বুঝে নিতে হবে।

—আমাকে কিছুই বলতে হবে না মা।—এলেন তাড়াতাড়ি সুচরিতার একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললে,—আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সবাই কি তা বুঝবে?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সুচরিতা বললে, তাও জানি। বুঝবে না। সুতরাং তাদের নিন্দা-উপহাস-ক্রোধ আমাদের সইতেই হবে। এ যদি না পারি তবে কিসের ভালোবাসা? কিন্তু চল, ডাক্তার এলেন মনে হচ্ছে।

ওরা উঠল।

সাত দিন সাত রাত্রি জ্বর ভোগের পর সবে কাল ভোরে প্রণবের জরটা ছেড়েছে। সুচরিতা চায়ের টেবিলে আসেনি। তার চা প্রণবের শোবার ঘরে গেছে।

চায়ের টেবিলে মাধুরী বললে, কাল আমরা যাচ্ছি দাদা।

—কাল? সে কি হয়! বাবা আর একটু সেরে উঠুন।—বাধা দিয়ে বিমান বললে।

বনবিলাস বললে, আর ভয়ের তো কিছু নেই। আমার ছুটিও এদিকে ফুরিয়ে এল। চাকুরি-জীবনে ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার ওপরে আর কথা চলে না।

এলেন বললে, আবার কবে আসছ বল। এবারে কোন যত্নই তোমাদের হল না।

—তার দরকার ছিল না বৌদি।—বনবিলাস বললে,—কিন্তু ভেবে দেখুন তো, উনি না থাকলে আমাদের কি অবস্থা হত!

কদিন থেকে উনি বলতে সবাই সুচরিতাকেই বুঝছে।

এলেন বললে, এ রকম শুশ্রূষা আমি চোখে কখনও দেখিনি। সাত দিন সাত রাত্রি ওই এক চেয়ারে উনি ঠায় বসে!

বনবিলাস উচ্ছ্বসিতভাবে বললে, সেই কথাই বলছি বৌদি। পুরীর সমুদ্র আর ওঁর এই সেবা সব সময় আমার মনে জেগে থাকবে।

একটুখানি টোস্ট দাঁত দিয়ে কামড়ে নিয়ে মাধুরী বললে, ওঁর সবই ভালো, কেবল ওই বেহায়াপনাটা ছাড়া। গিয়ে দেখি, আঁচলে করে বাপির মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন! আমাকে দেখে একটু লজ্জাও পেলেন না! এ বয়সে অতখানি ভালো নয়। যে বয়সের যা!

মাধুরীর মনটা এখনও প্রসন্ন হতে পারেনি।

বনবিলাস হেসে বললে, চাঁদে কলঙ্কের মত ওটুকু থাক না মাধুরী।

হাতের চামচটা প্লেটে ঘষতে ঘষতে মাধুরী বললে, বেশ তা যেন রইল। কিন্তু সত্যি বল তো এ বয়সে বিয়ে করার কোনো মানে হয়?

—হয় তো হয়।—উত্তর দিলে এলেন,—অন্তত ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে আমি তো মানে পেয়ে গেছি। দুজনেরই যৌবন নেই, দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তবু একজনকে নইলে আর একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, এ যে কত বড় কথা ভেবে দেখেছ মাধুরী?

[illegible] মাধুরী বললে, ও। তুমি বুঝি [illegible] এ বিয়ের পক্ষে?

এলেন [illegible] উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বললে, আমি পক্ষেই থাকি, আর বিপক্ষেই থাকি, [illegible] আসে না মাধুরী। তুমি [illegible] এ বিয়েতে বাধা দেবার [illegible]

মাধুরীও রেগে [illegible] বুঝেছি। কিন্তু যাবার আগে আমি [illegible] ওঁদের জানিয়ে দিয়ে যাব যে, এই অন্যায়ে আমাদের সম্মতি নেই।

—অন্যায়!—এলেন যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল।—ন্যায়-অন্যায়ের শেষ কথা তোমার জানা হয়ে গেছে?

মাধুরীর হাত ধরে হঠাৎ এলেন হিড় হিড় করে ওকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। প্রণবের ঘরের বাইরে পর্দার আড়ালে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে এলেন পর্দাটা একটু সরিয়ে দিলে।

ফিস ফিস করে বললে, একে তুমি অন্যায় বল মাধুরী?

মাধুরী উঁকি দিয়ে দেখলেঃ

প্রণবের খাটের পাশে একখানা ঈজিচেয়ারে শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে সুচরিতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার কাঁচা-পাকা চুল বিশৃঙ্খল। চোখের কোলে কালি পড়েছে। শ্রান্ত শুষ্ক মুখ। শীর্ণ দেহ ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়েছে। শুধু শুষ্ক দুটি ঠোঁটের ফাঁকে গভীর প্রশান্তি।

সেই মুখের দিকে চেয়ে মাধুরীও থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্পনা

চিরযৌবনবাবুর আসল নাম অনেকেই জানেন না, আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। 'চিরযৌবন' তাঁহার সাহিত্যিক ছদ্মনাম। এই নামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।

চিরযৌবনবাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঁচিশ বছর পূর্বে যে নবীন বিদ্রোহীর দল বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই একজন। তারপর বন্যার তোড়ে অনেকেই ভাসিয়া গিয়াছেন; মুষ্টিমেয় যে কয়জন স্বকীয়তার বলে টিকিয়া আছেন, চিরযৌবনবাবু তাঁহাদের অগ্রণী। এখনও তাঁহার লেখায় দুর্দম যৌবনের তেজ ও বিদ্রোহিতা বিচ্ছুরিত হয়। তিনি নামেও যেমন, অন্তরেও তেমনি—চিরযৌবন।

চিরযৌবনবাবু বিপত্নীক। জীবনের মাত্র দুই-তিনটা বছর তাঁহার স্ত্রীসংসর্গ ঘটিয়াছিল, অন্যথা প্রায় সারাজীবনই একাকী কাটিয়াছে। একাকিত্বে তিনি অভ্যস্ত। কলিকাতার একটি মধ্যমশ্রেণীর দেশী হোটেলের ত্রিতলের ছাদে একটিমাত্র ঘর, সেই ঘরটিতে তিনি থাকেন। ঘরটির আসবাবপত্রে দেয়ালের ছবিতে শৌখিনতার ছাপ আছে, যদিও তাহা দুর্মূল্য শৌখিনতা নয়। সাহিত্যজীবী মানুষ অনাড়ম্বরভাবে যতখানি শৌখিনতা করিতে পারে, ততখানিই। হোটেলের ম্যানেজার তাঁহাকে স্থায়ী বাসিন্দারূপে পাইয়া গৌরব অনুভব করেন এবং ভৃত্যেরা তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য ছুটাছুটি করে। চিরযৌবনবাবু সুখে আছেন।

কখনও গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সমকালীন সাহিত্যবন্ধুদের সমাগম হয়। খোলা ছাদের উপর মাদুর পড়ে, চা ও সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস সুরভিত হয়। চিরযৌবনবাবু হয়তো নিজের সদ্য-রচিত গল্প পাঠ করেন। তারপর আবার একাকী কল্পনার সমুদ্রে যৌবনের স্বপ্নভরা সোনার তরী ভাসিয়া চলে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চিরযৌবনবাবু বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন। ফাগুন মাস, কিন্তু এখনও সন্ধ্যার পর একটু ঠান্ডা পড়ে। পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবির উপর আলোয়ানটা কাঁধে ফেলিয়া তিনি আয়নার দিকে চাহিলেন। ছিমছাম গৌরবর্ণ চেহারা, মুখের চামড়া এখনও কুঞ্চিত হয় নাই, মাথার চুল বারো আনা কাঁচা আছে। তিনি বুরুশ দিয়া চুলগুলিকে আরও চিক্কণ করিয়া তুলিলেন, সরু গোঁফের উপর একবার আঙুল বুলাইলেন। তারপর দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইলেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাঁহার কণ্ঠে গানের কলি গুঞ্জরিত হইতে লাগিল—বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল—

হোটেলের সদর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তার উপর; সেখান হইতে কুড়ি পঁচিশ কদম দূরে বড় রাস্তার মোড়। চিরযৌবনবাবু হোটেল হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তার দিকে চলিলেন। মাইল খানেক দূরে একটি পার্ক আছে। সেখানে বেঞ্চির উপর বসিয়া একটি সিগারেট সেবন করিবেন, তারপর আবার বাসায় ফিরিবেন।

তখনো রাস্তার আলো জ্বলে নাই। দিনের আলো মৌমাছি-ছোঁয়া লজ্জাবতী লতার মত মুদিয়া আসিতেছে। চিরযৌবনবাবু মোড় ঘুরিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক মোড়ের উপর ল্যাম্পপোস্টের নীচে একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

যুবতী চিরযৌবনবাবু অনেক দেখিয়াছেন, আজকাল রাস্তাঘাটে যুবতী দেখার কোনই অসুবিধা নাই। কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং নির্নিমেষ নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

যুবতীর চেহারা ভাল। রঙ ফরসা, চোখ ও নাক যেমন ধারালো, গাল ও ঠোঁট তেমনি নরম। গড়ন মোটাও নয়, রোগাও নয়, শাঁসে-জলে। ঘাড়ের উপর খোঁপাটি এমনভাবে বাঁধা যেন খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। পরনে ফিকা নীল রঙের জর্জেট। বুকের কাছে দুই বাহুর মধ্যে বালিশের মত একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি

ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ-ভরা চোখে এদিক-ওদিক চাহিতেছে।

দুই মিনিট নিষ্পলক চাহিয়া থাকিবার পর চিরযৌবনবাবু সচেতন হইলেন। মেয়েটিও একবার তাঁহার দিকে ভ্রূ তুলিয়া চাহিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, অসভ্যতা হয়। চিরযৌবনবাবু মেয়েটিকে পাশ কাটাইয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েক পা চলিবার পর কিন্তু তাঁহাকে থামিতে হইল। পিছন হইতে কেহ যেন রাশ টানিয়া ধরিয়াছে। রাস্তায় বেশী লোক ছিল না। চিরযৌবনবাবু কিছুক্ষণ নত-চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ফিরিয়া চলিলেন।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দিকে যতই তিনি অগ্রসর হইলেন ততই তাঁহার গতি শিথিল হইতে লাগিল; তারপর অজ্ঞাতসারেই তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

যুবতী আবার ভ্রূ বাঁকাইয়া তাঁহার পানে চাহিল; তাহার চোখে অস্বাচ্ছন্দ্য ভরা। চিরযৌবনবাবু ঈষৎ চমকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যুবতীর উপর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

মোড় ঘুরিয়া তিনি হোটেলের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। যুবতী তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল, চোখোচোখি হইতেই চোখ ফিরাইয়া লইল।

হোটেলের দ্বারের কাছে আসিয়া চির-যৌবনবাবুর ঘাড় আবার যুবতীর দিকে ফিরিল। সে এইদিকেই তাকাইয়া আছে। চিরযৌবনবাবুর বুকের ভিতরটা একবার প্রবলভাবে হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া উঠিল, তিনি হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আলো জ্বালিলেন না, আলোয়ান আলনায় রাখিয়া আরাম-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইলেন। আজ মনের এই বিহ্বলতার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সিগারেট ধরাইয়া তিনি আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুবতীটি সুন্দরী বটে। কিন্তু চির-যৌবনবাবু লুচ্চা-লম্পট নয়, তবে তাহাকে দেখিয়া তিনি এমন আত্মবিস্মৃত হইলেন কেন? হয়তো যুবতীর দেহে রূপ ছাড়াও প্রবল জৈব আকর্ষণ আছে। কিম্বা চির-যৌবনবাবুরই দেহ-মনে অনাস্বাদিত যৌবনের রস দীর্ঘকাল ধরিয়া বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হইতেছিল, আজ বসন্ত সমাগমে সহসা উছলিয়া উঠিয়াছে।

যুবতীর বাহুবন্ধনের মধ্যে বালিশের মত জিনিসটা বোধ হয় একটি শিশু।—কার শিশু?

চিরযৌবনবাবুর মন স্বভাবতই কল্পনা-প্রবণ। তাঁহার চিন্তা বাতাসের মুখে সাবান-বুদ্বুদের মত ভাসিয়া চলিল।

খুট খুট্—খুট খুট্। দ্বারে কে টোকা দিতেছে।

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। সেই যুবতী দাঁড়াইয়া আছে, বাহুবেষ্টনের
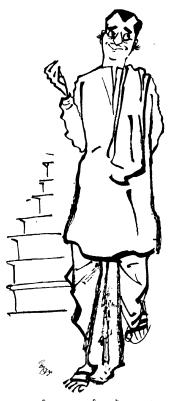
বাগিচায় বুলবুলি তুই—

মধ্যে কাপড় ঢাকা বালিশের মত পুঁটু-লিটি। ভীরু কণ্ঠে বলিল, 'আপনি কি চিরযৌবন—বাবু?'

চিরযৌবনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি?' মেয়েটির গলা কাঁপিয়া গেল।

'আসুন।'

মেয়েটি সঙ্কোচভরে ঘরে প্রবেশ করিল, চিরযৌবনবাবু একটি চেয়ার তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

সে চেয়ারে বসিল না, ঘরের এক পাশে একটি চৌকি ছিল তাহার উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, পুঁটুলিটিকে কোলে শোয়াইয়া দিয়া মুখ তুলিল।

চিরযৌবনবাবু বলিলেন, 'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আজ বোধ হয় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। আপনার লেখা আমার খুব ভাল লাগে।'

চিরযৌবনবাবু একটু সলজ্জতার অভি-নয় করলেন, বলিলেন,—'তৃপ্তি পেলাম। আপনি কি—?'

'আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলুন।'

'তা আচ্ছা। বয়সে আমি যখন বড়—'

'এমন কী বড়? আমার বয়স তেইশ।'

চিরযৌবনবাবু নিজের বয়স বলিলেন না, প্রশ্ন করিলেন,—'তোমার নাম কি?"

'কল্পনা।'

চিরযৌবনবাবু স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার গল্প-উপন্যাসে কল্পনা নামে কোনও চরিত্র আছে কিনা। না, নাই, নূতন নাম।

'তুমি মোড়ে দাঁড়িয়ে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলে বুঝি?'

কল্পনা মুখ নত করিল, তাঁহার কপাল ও গাল দুটি ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। চিরযৌবনবাবু বুকের কাছে সূচি-বিদ্ধবৎ একটু জ্বালা অনুভব করিলেন।

'স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছিলে?'

কল্পনা চকিতে চোখ তুলিয়া আবার নত করিল।

'আমার বিয়ে হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর চিরযৌবন-বাবু লক্ষ্য করিলেন, কল্পনার কোলে বস্ত্র-পিণ্ডটি অল্প অল্প নড়িতেছে, একটি শীর্ণ কাকুতি শোনা গেল।

'বাচ্ছাটির বয়স কত?'

'দশ দিন।'

'দশ দিন!—এ কার বাচ্ছা?'

কল্পনা বিদ্রোহভরা সুরে বলিল,—'আমার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিশু পুনশ্চ আকূতি জানাইল। চিরযৌবনবাবু বলিলেন, 'ওর বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে।'

কল্পনা বলিল,—'হ্যাঁ, ক্ষিদে পেলে উস-খুস করে।'

'তা—ওকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার। কি দেবে? আমার ঘরে টিনের দুধ আছে।'

'এখনও টিনের দুধ খেতে শেখেনি।'

কল্পনা চিরযৌবনবাবুর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তিনি ক্ষণেক বিস্ফারিত

চক্ষে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন।

দশ মিনিট পরে কল্পনা আবার সামনে ফিরিয়া বসিল। পূর্ণেন্দুর শিশু আর কোনও গণ্ডগোল করিল না।

চিরযৌবনবাবু একটু কাশিয়া বলিলেন, 'তুমি কেন আমার কাছে এসেছ বললে না তো। কিছু চাই কি?'

কল্পনা ব্যগ্র চোখে চাহিয়া বলিল,—'চাই। আজ রাত্রির জন্যে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে।'

'তা—তোমার কি আর কোথাও যাবার নেই?'

'না। শুনবেন আমার ইতিহাস? নতুন কিছু হয়তো নয়, কিন্তু শুনলে আপনি বুঝবেন। আমি জানি যৌবনের স্বভাব-ধর্মকে আর যে যা বলে বলুক, আপনি কখনও অপরাধ বলে মনে করবেন না।'

চিরযৌবনবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'না, যৌবনের স্বধর্মকে আমি অপরাধ বলে মনে করি না। বরং যারা যৌবনকে জোর করে পীড়ন করতে চায়, অপরাধী তারাই।'

কল্পনা প্রদীপ্ত চোখে বলিল, 'তাই তো আপনার লেখা এত [illegible]—আপনি চিরযৌবন। এখন আমার ইতিহাস বলি। এই কলকাতা শহরেরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আমি। ঘরে সৎ মা আছেন। বিয়ে দেবার পয়সা বাবার নেই, তাই লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন।

'একজনকে ভালোবেসেছিলাম। ভালবাসা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা হয়তো মন-স্তত্ত্ববিদেরা জানেন। তার কতখানি দৈহিক আকর্ষণ, কতখানি মানসিক, তা বিচার করার মত বুদ্ধি আমার নেই। বোধ হয় ডি এল রায়ের কথাই ঠিক,—যখন থাকে না future-এর চিন্তা থাকে না ক' shame, তারেই বলে প্রেম। আমারও সাময়িক-ভাবে সেই অবস্থা হয়েছিল। বিয়ে হবার উপায় ছিল না, জাতের তফাত। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখা হত। একবার স্বামী-স্ত্রী সেজে এক রাত্রি একটা হোটেলে ছিলাম। তারপর—

'সৎ মা জানতে পারলেন, বাবার কানে উঠল। আমার তখন future-এর চিন্তা ফিরে এসেছে, প্রেমাস্পদকে বললাম—আমাকে বাঁচাও। উত্তরে প্রেমাস্পদ তার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল। তাকে দোষ দিই না। কারণ বিয়ের কথা তার সঙ্গে কোনও দিন হয়নি।

'তারপর যথাসময়ে বাবা আমাকে মেটার্নিটি হোমে ভর্তি করে দিয়ে বলে গেলেন—আর বাড়িতে ফিরে যেও না। তারপর আজ দশ দিন পরে মাতৃত্বের নিদর্শন নিয়ে মাতৃসদন থেকে বেরিয়েছি।'

কল্পনা চুপ করিল। চিরযৌবনবাবু সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে সিগারেটের টোটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—'আজ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? মনে হচ্ছিল কারুর জন্য অপেক্ষা করছ।'

কল্পনা বলিল,—'না। মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমার মত মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারে এমন কেউ রাস্তা দিয়ে যায় কিনা। তারপরেই আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনার অনেক ছবি দেখেছি, চিনতে কষ্ট হল না। ভাবলাম, একটা রাত্রির জন্য যদি কেউ আশ্রয় দিতে পারে তা সে আপনি। তাই এসেছি। দেবেন আশ্রয়?'

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া গিয়া কল্পনার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, গাঢ় স্বরে বলিলেন,—'শুধু এক রাত্রির জন্য নয়, সারা জীবনের জন্যে যদি আশ্রয় চাও, তাও দিতে পারি।'

কল্পনা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে চাহিল—'সত্যি বলছেন?'

চিরযৌবনবাবু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে—'

উদ্দীপ্তকণ্ঠে কল্পনা বলিল,—'কে বলে বয়স হয়েছে? আপনি চিরযুবা—চির-নবীন—'

ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্—!

রূঢ় শব্দে চিরযৌবনবাবু ধড়মড় করিয়া ইজি চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। কেহ দ্বারের কড়া নাড়িতেছে। তাঁহার কল্পনার সাবান-বুদ্বুদ এই শব্দের আঘাতে ফাটিয়া গেল।

আলো জ্বালিয়া তিনি দ্বার খুলিলেন। সামনে দাঁড়াইয়া আছে সেই যুবতী যাহাকে ঘিরিয়া তিনি এতক্ষণ কল্পনার জাল বুনিতেছিলেন। সঙ্গে এক যুবা। প্যান্ট-লুনের উপর পুল্-ওভার; ডাম্বেলভাঁজা চেহারা। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

যুবতীর বুকের কাছে কাপড়ের পুঁটুলি; সে এক হাত মুক্ত করিয়া চিরযৌবনবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—'এই বুড়োটা!'

যুবক উগ্রস্বরে বলিল,—'কি রকম জানোয়ার তুমি হে! বুড়ো হয়েছ এখনও ভদ্রতা শেখোনি? ভদ্রমহিলা একলা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তুমি ড্যাম্ স্কাউন্ড্রেল্—'

মহিলা বলিলেন,—'আমার পম্‌পম্‌এর অসুখ করেছে তাই, নইলে কুকুর লেলিয়ে দিতুম।'

পম্‌পম্ নামধারী ক্ষুদ্র কুকুর নিজের নাম শুনিয়া যুবতীর বাহুবন্ধ বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতে ঝাঁকড়া মাথা তুলিল, চির-যৌবনবাবুকে ধমক দিয়া বলিল,—'ভুক্ ভুক্—'

চিরযৌবনবাবু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময় হোটেলের ম্যানেজার উপরে আসিয়া বলিলেন,—'কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে—?'

যুবক বলিল,—'এই বুড়োটা। আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে। আমার কুকুরটার অসুখ করেছিল, তাই আমার স্ত্রী তাকে নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল, ইতিমধ্যে এই বুড়োটা—'

যুবক চিরযৌবনবাবুর দিকে ঘুষি পাকাইয়া বলিল,—'বুড়ো বলে বেঁচে গেলে, নইলে আজ ঠেঙিয়ে পাট করে দিতুম।'

ম্যানেজার বলিলেন,—'হাঁ হাঁ, বলেন কি, উনি একজন বিখ্যাত—'

যুবক বলিল,—'ড্যাম বিখ্যাত। ডোম চামার লোচ্চা—'

চিরযৌবনবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘর অন্ধকার করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা!—তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি বুড়া হইয়াছেন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছে। অথচ—প্রকৃতির এ কি পরিহাস! তাঁহার মন বুড়া হয় নাই কেন? মন কেন এখনও সরস সজীব আছে? যৌবনের রঙীন নেশায় বিভোর হইয়া আছে?

কেন? কেন? এ কি দুর্বিষহ বিড়ম্বনা!

শূন্যের দর্শনে

বনফুল
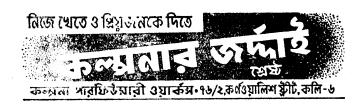
ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ধারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া সেদিনও উপবেশন করিলেন। রোজই উপবেশন করেন। বৈকালে রোদটা যখন পড়িয়া আসে, তখন তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁহাকে গঙ্গার ওই স্থানটির দিকে টানিতে থাকে।

স্থানটির যে বিশেষ কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও নয়। হেলিয়া-পড়া একটা বটগাছের আড়ালে সামান্য একটু স্থান। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, ময়লা আবর্জনাও আছে। ভাদুড়ী মহাশয় যে স্থানে প্রত্যহ বসেন, কেবল সেই স্থানটি—ছোট আসনের মত একটু জায়গা—বেশ পরিচ্ছন্ন। মনে হয় কেহ যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়, ভাদুড়ী মহাশয় রোজ ওই স্থানটিতে বসেন বলিয়া স্থানটি তৃণশূন্য। ভাদুড়ী মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া যখন বসিতে যান তখন ওই তৃণশূন্য স্থানটুকু তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের সঞ্চার করে। একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া ভাবেন, "আমার ছোঁয়াচ লেগে কচি ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেল!" ভাবেন, কিন্তু ঠিক সেই স্থানটিতেই আবার উপবেশন করেন। উপবেশন করিবার পূর্বে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্থানটি একবার ঝাড়িয়া লন। বহুদিন হইতেই এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গভর্নমেণ্টে চাকুরি করিতেন। ভাল চাকুরিই করিতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করিয়াছেন। যখন চাকুরি করিতেন, তখন তাঁহার মোটর ছিল, আরদালি-চাপরাশি ছিল, মানসম্ভ্রম ছিল, অনেক লোক ঝুঁকিয়া সেলাম করিত, ভাল ভাল বাড়িতে বাস করিতেন, তিন পুত্র এবং রূপসী পত্নী লইয়া তিনি বহুলোকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই, সব গিয়াছে। বড় ছেলেটি কুসঙ্গে পড়িয়া বহুদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন খবর তিনি আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মেজ ছেলের পত্নীর সহিত তাঁহার পত্নীর বনিবনাও হয় নাই, সে বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এখন মীরাটে চাকরি করে। চিঠি-পত্রও লেখে না। মেজ ছেলের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ঠিক পরেই তিনি রিটায়ার করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তাঁহার এক বন্ধু স্বামীজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কয়েকদিন স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনিলেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার সহিতও মিলিয়া গেল। ইহাও তাঁহার মনে হইল এতকাল তো সংসারের মোহে আবদ্ধ হইয়া কলুর বলদের মত ঘানি টানিয়াছেন, এখন রিটায়ার করার পরও সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া থাকার কোনও অর্থ হয় না। এইবার পরলোকের চিন্তায় মন দেওয়া উচিত। তাঁহার বন্ধু বিনোদ লস্কর যখন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে আলো দেখিতে পাইয়াছেন, মারোয়াড়ী পূরণমল যখন মন্ত্রের সাহায্যে নিজের আসন হইতে প্রায় এক বিঘৎ উঠিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনিই বা ব্যর্থকাম হইবেন কেন? ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উহাই যদি পথ হয়, তাহা হইলে সে পথে চলিবার যোগ্যতা তাঁহারও নিশ্চয় আছে কিংবা হইবে। বিনোদ লস্কর স্কুলে, কলেজে, চাকুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই তাঁহার তুলনায় হীনপ্রভ ছিলেন। স্বামীজীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং রিটায়ার করার পর তিনি দীক্ষা লইয়া গুরু-প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রহিলেন।

কিছুদিন ইহা লইয়া, আর কিছু না হোক, সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল। নির্জন একটা ঘরে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসিয়া প্রাণায়াম

করিতে ভালই লাগিত। সেই সময়টা অন্তত গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। এই পথে লাগিয়া থাকিলে হয়ত তিনিও ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আলোকবিন্দু দেখিতে পাইতেন, শূন্যেও হয়ত উঠিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রথমত তাঁহার কৃতী তৃতীয় পুত্রটি হঠাৎ যখন যক্ষ্মারোগে মারা গেল, তখন তিনি সহসা ধর্মেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। কোনও করুণাময় সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার শক্তিই যেন তাঁহার আর রহিল না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন হইতে প্রাণায়াম করিবার সময় বুকের এক পাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, একথা শুনিয়া একজন ডাক্তার তাঁহাকে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গুরু-প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিলেন না। গুরুর সংস্রবও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কারণ রিটায়ার করিয়া কলিকাতার যে বাসাটি ভাড়া করিয়া তিনি ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সে বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে বহুকাল পূর্বে তাহার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতাও রিটায়ার করিবার পর দেশে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের কল্পনা ছিল সুবিধা মত খরিদ্দার পাইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিবেন। স্থির করিয়াছিলেন কলিকাতাতেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। কিন্তু যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কলিকাতার গৃহস্থালী পাতিয়াছিলেন, সেই পুত্রই যখন বাঁচিল না তখন কলিকাতার সম্বন্ধে আর কোনও মোহ তাহার রহিল না। এমনিতেই কলিকাতায় বাস তাহার পক্ষে সুখকর ছিল না। যখন চাকুরি করিতেন, তখন ফাঁকা জায়গায় সুনির্মিত বড় বড় বাড়িতে তাহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইত। সে সব বাড়ির তুলনায় কলিকাতার এঁদো গলির মধ্যে অবস্থিত সংকীর্ণ বাসাটি নরকবৎ। তাছাড়া প্রত্যহ থলি হাতে ভিড় ঠেলিয়া বাজার করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল তাহার পক্ষে। এ সব কাজ পূর্বে তাহার আরদালিরা করিত। কিন্তু এখন অত বেতন দিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য নাই। নিজেকেই বাজার করিতে হয়। আয় কমিয়া গিয়াছিল, তৃতীয় পুত্রের পড়া তখনও শেষ হয় নাই। তাছাড়া চিররুগ্না গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হইত। চাকর রাখিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিত না। পুত্রের জন্যই কষ্ট করিয়া কলিকাতায় ছিলেন, পুত্রই যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া পূর্বপুরুষদের ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলেন। বাড়িটি পাকা, বেশ প্রশস্ত উঠান। পাশেই একটি পুষ্করিণী। উঠানে তরি-তরকারি লাগাইয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, পাড়াপড়শীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া একটা নূতন জীবনের স্বাদ কিছু দিনের জন্য তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। গৃহিণীর স্বাস্থ্য পূর্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বাতের

প্রকোপে তিনি সাধারণত শয্যাগতই থাকিতেন, পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহার উপর তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। ডাক্তার থাকেন দুই ক্রোশ দূরে। পদব্রজে গিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হয়। খবর দিবার পরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন না, আসিতে পারেন না। অনেক সময় একদিন, কখনও কখনও দুই-দিন পরে আসেন। পোস্টাফিস হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন কিনিয়া কিছুদিন চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোস্টাফিসও কাছে নয়, প্রায় মাইল দুই দূরে। কুইনিন ফুরাইয়া গেলে পোস্টাফিস হইতেও আনা সব সময় হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কম্প দিয়া জ্বর আসিত, পেটের গোলমাল তো ছিলই, তাছাড়া বয়স ক্রমশ বাড়িতেছিল, দুর্বল হইয়া পড়িতে-ছিলেন। সুতরাং এমন দিনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিল যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখে পড়িয়া আছেন, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবার লোক নাই। পল্লীগ্রামে চাকর বা রাঁধুনী পাওয়া সহজ নয়, অনেক খোশামোদ করিয়া একটি স্থবিরা ব্রাহ্মণীকে তিনি পাচিকা-রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে-ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িত। একটি বাগদী বউ আসিয়া কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি করিত। কিন্তু তাহাকে লইয়াও শান্তি ছিল না। সে যুবতী ছিল, কথায় কথায় ফিক ফিক করিয়া হাসিত, ভাদুড়ী মহাশয়ের সহধর্মিণী সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধ ভাদুড়ী মহাশয় গোপনে গোপনে হয়ত উহার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।

ভাদুড়ী মহাশয় চলৎশক্তিরহিত না হইলে প্রায়ই বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কিন্ত বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইত। বাহিরে বসিবার স্থান কোথায়? একটু দূরে মিত্র মহাশয়দের চণ্ডীমণ্ডপ আছে, মিত্র মহাশয়ও আছেন, ভাদুড়ী মহাশয় গেলে তিনি অভ্যর্থনাও করেন, কিন্ত ভাদুড়ী মহাশয় সেখানে যাইতে চান না। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমান গভর্নমেণ্টের সমালোচনা, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনও প্রকার আলোচনা করিতে মিত্র মহাশয় হয় অপারগ না হয় অনিচ্ছুক। ভাদুড়ী মহাশয়ের ওসব ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি মিত্র মহাশয়কে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলেন।

মিত্র মহাশয়কে বাদ দিলে কাছা-কাছি আর দুইটি মাত্র বাড়ি বাকি থাকে। কিন্তু সে দুইটিও অগম্য। একটি চৌধুরীদের বাড়ি, সেখানে নানাবয়সের বহু বিধবা বাড়ির বৃদ্ধ চাকর নিতাইচরণের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাড়ির কর্তা কলিকাতার 'চৌধুরী অ্যাণ্ড দাস' নামক লৌহব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অর্ধ-স্বত্বাধিকারী। তিনি নিজে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, আত্মীয় বিধবাগুলিকে তিনি দেশের বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছু জমি আছে, বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাইচরণের আনুকূল্যে সেই জমি হইতে বৎসরের খাবারটা সংগৃহীত হয়। চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে ত্রিশটি টাকাও নিতাই-চরণের নিকট পাঠান। জনশ্রুতি এই ত্রিশ টাকার অংশ লইয়া বারটি বিধবার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। যেদিন পিওন আসিয়া টাকাটি দিয়া যায় তাহার পর তিন চারদিন বাড়িতে নাকি কাক-চিল পর্যন্ত বসিতে সাহস করে না।

দ্বিতীয় বাড়িটি অপুত্রক কেনারাম চক্রবর্তীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শুচি-বায়ুগ্রস্তা। স্নান করা, হাত-ধোয়া, চতুর্দিকে গোবরজল এবং গঙ্গাজল ছিটানো এই সব লইয়াই থাকেন তাঁহারা। ভাদুড়ী মহাশয় দুই একবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় লোক খারাপ নন হাসিমুখেই আলাপ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রতিবারেই ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে যদিও কেনারামবাবু মুখে ভদ্রতার চূড়ান্ত করিতেছেন, কিন্ত মনে মনে তাঁহার একটা অস্বস্তি হইতেছে। তাঁহার চোখের ভাষা অন্যরকম। একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন যে, তিনি উঠিয়া আসিবার পরই চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতর হইতে এক বালতি গোবরজল পাঠাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে ভাদুড়ী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেই স্থানটি চক্রবর্তী মহাশয় স্বহস্তে পূর্ণ উদ্যম সহকারে ধুইতে লাগিলেন। ইহার পর ভাদুড়ী মহাশয় আর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই।

সুতরাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাদুড়ী মহাশয় একটু মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কোথাও আশ্রয় নাই। কলিকাতার পার্কগুলির কথা মনে পড়িত, চায়ের দোকানগুলি বিশেষ করিয়া বোস মহাশয়ের ছোট্ট দোকানটির ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কিন্ত কলিকাতায় ফিরিবার আর উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। লজ্জার মাথা খাইয়া মেজ ছেলেকে একটা চিঠি লিখিয়া-ছিলেন, মেজ ছেলে তাহার উত্তরও দিয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি ও মা এখানে চলিয়া আসুন। দেশে কষ্ট করিয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার কি।' তাঁহার স্ত্রী কিন্তু যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি গ্রামে পড়িয়া থাকিবেন তবু পুত্রবধূর হাত-তোলা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্বামীর আত্মসম্মানহীনতার জন্য তাঁহাকে যৎপরো-নাস্তি গঞ্জনাও দিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় অনুভব করিলেন তিনি দ'কে অর্থাৎ কর্দমে আটকাইয়া গিয়াছেন এবং এইভাবেই বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। কাটাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, অসুস্থ এবং রুগ্ন স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, এই অজ গাড়াগাঁয়ে বাকী জীবনটা কাটাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কি লইয়া থাকিবেন? মনের কিছু একটা অবলম্বন চাই তো। ধর্মের উপর আর আস্থা ছিল না, সময় পাইলে মাঝে মাঝে বই পড়িতেন, কিছু বই তাঁহার ছিল। কিন্তু কতক্ষণ বই পড়া যায়? সর্বাপেক্ষা মুশকিল হইত বিকাল বেলাটা।

যখন চাকুরি করিতেন, ক্লাবের মেম্বর ছিলেন, টেনিস খেলিতেন, ব্রিজ খেলিতেন, সময় কাটাইবার কত উপায় ছিল। কিন্তু এই গ্রামে ক্লাব দূরের কথা, পোস্টাফিস নাই, রেলওয়ে স্টেশন নাই। গঙ্গার ওপারে স্টেশন। সেখানে নামিয়া নৌকাযোগে এখানে আসিতে হয়।

ভাদুড়ী মহাশয় অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন ওই স্থানটুকু ছাড়া গ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিবার আর কোন স্থান নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া হেলিয়া-পড়া বটগাছটার নীচে ওই স্থানটুকু তিনি আবিষ্কার করিলেন। গঙ্গাতীরে ওই স্থানটুকু যে তাঁহার সমস্যার সমাধান করিবে একথা অবশ্য তিনি কল্পনা করেন নাই। কিন্তু বসিবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন—ঠিক কি যে অনুভব করিলেন তাহা বর্ণনা করা শক্ত—তবে একটা অননুভূতপূর্ব আরাম যেন তাঁহার সত্তাকে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা সোজা গিয়া উত্তর আকাশে মিশিয়াছে, বামে পশ্চিম আকাশের মেঘমালায় অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণমালা, সে বর্ণের আভা গঙ্গার বুকে এবং উত্তর আকাশের স্তূপীকৃত মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গা চিরকালই বহিতেছে, সূর্যও প্রত্যহ অস্ত যাইতেছে, আকাশে মেঘের আবির্ভাবও কোনও নূতন ঘটনা নহে, কিন্তু সেদিন তাঁহার চক্ষে সবই যেন বড় নূতন ঠেকিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতে রোজই তিনি ওই স্থানটিতে গিয়া বসেন। গত দশ বৎসর হইতে প্রত্যহ বসিতেছেন। প্রতিদিন ওই উত্তর আকাশে নূতন ছবি দেখিতে পান। কোনদিন মেঘ থাকে, কোনদিন থাকে না। যেদিন থাকে সেদিন নূতন ধরনে থাকে, কখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। রোজই নূতন ছবি, সে ছবিও চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকে। পশ্চিম আকাশেও ঠিক তাই। প্রতিদিনে নূতন রং নূতন ঢং নূতন দৃশ্য। গঙ্গার তরঙ্গমালাও যেন প্রতিদিন নূতন রূপে সাজিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বৈকালের এই সময়টুকুর জন্য ভাদুড়ী মহাশয় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, এই সময়টুকুও যেন অভিনব সাজে সাজিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে। এই দশ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মেজ-ছেলেটিও আর নাই, প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সে সপরিবারে মারা গিয়াছে। যে স্থবিরা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত, সে বহুপূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছে। বাগদী মেয়েটি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মহাশয় এখন সম্পূর্ণ একা। একবেলা স্বপাক খান। রান্নার আয়োজন করিতে সকালটুকু কাটিয়া যায়। আহার করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করেন, তাহার পর গঙ্গার ধারের ওই স্থানটুকুতে গিয়া বসেন।

একে একে প্রণাম করিতে লাগিল

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন ভাদুড়ী মহাশয় আহারাদির পর একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস পাঠ করিলেন। —"যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, যখন পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর ঊর্দ্ধ্বে আকাশও ছিল না, তখন কি ছিল? তখন কে সেই মহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলেন? যখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না, দিবারাত্রির প্রভেদ যখন ছিল না তখন সেই নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সেই মহাশূন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিই স্পন্দিত হইতেছিলেন। তিনিই কালক্রমে তেজোরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমে আবির্ভূত হইল কামনা..." এই ধরনের অনেক কথা ছিল। পড়িতে পড়িতে ভাদুড়ী মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে বসিয়া কথাগুলি পুনরায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাশূন্যের মধ্যেই সৃষ্টি-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার জীবনও তো এখন মহাশূন্য, সে শূন্যতার মধ্যে কোনও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে কি? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখে একটা তিক্ত অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর আকাশের মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তর আকাশে কিছু দুগ্ধ-শুভ্র স্তূপ মেঘ একধারে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। সহসা ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল খানিকটা মেঘ আকাশ হইতে খুলিয়া গিয়া যেন তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। একটু পরেই অবশ্য তাঁহার ভুল ভাঙিল। মেঘ নয়, নৌকার পাল। নৌকাটির দিকেই তিনি চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নৌকাটি খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটের ঘাটেই ভিড়িল। নৌকায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পাশেই একটি সুন্দরী মহিলা। চার পাঁচটি নানা বয়সের ছেলেমেয়েও রহিয়াছে।

ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া ভাদুড়ী মহাশয়কেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতে পারেন হরনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি কোনটা—"

"কেন—তাঁর বাড়ি খুঁজছেন কেন আপনি?"

"আমি তাঁর বড় ছেলে। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। অনেকদিন পরে ফিরেছি। কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন বাবা এখানেই আছেন।"

"কে নবু—?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে ভাদুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমার পিতাকে সত্যই চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর হঠাৎ পারিলেন এবং আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"এরা কে—"

"আমি রেঙ্গুনে বিয়ে করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে এসেছি—"

সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সবাই আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শূন্য জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ণ হইয়া গেল।

প্রসাধন

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

"বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন বাংলার আর্টিস্ট সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চলল কতদিন..."॥

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশ বৎসরের ব্যবধানে আবির্ভূত বাংলার কবি ও বাংলার আর্টিস্টের যোগাযোগ বাংলার সংস্কৃতিকে কত বিচিত্ররূপে সমৃদ্ধ করেছে তা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়; পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় তার প্রারম্ভ-যুগের যে পুরাতন একটি নিদর্শন মুদ্রিত হল তারই পরিচয়-প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে।

একথা সর্বজনবিদিত যে 'বাংলার কবি' বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার দৈন্য মোচন করতে ব্রতী হয়েছিলেন; জীবন-স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন "এখনকার দিনে শিশুদের সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।" —শিশুদের জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করে যিনি পরবর্তী-কালে বহু দুঃখস্বীকার করেছিলেন তিনি তরুণবয়স থেকেই সাহিত্যের দিকে শিশুদের অভাব মোচনেও উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ গ্রন্থও গল্পসল্প (বৈশাখ, ১৩৪৮) ছেলেদের হাতেই তিনি দিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগ বালকপত্র পরিচালনা (১২৯২), এ পত্রিকার সূচী দেখলে বোঝা যাবে যে, এতে 'শিশু-দিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া গণ্য করা হয়নি—'ইহার যতটুকু তারা বোঝে ততটুকু তারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহা-দিগকে সামনে ঠেলে।'

দ্বিতীয় উদ্যোগ 'বাল্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশ। এ সকল উদ্যোগেই তিনি নিজে যে কেবল ব্রতী হয়েছেন তা নয়, স্বভাবতই আত্মীয়-বন্ধুদেরও প্রবর্তিত করেছেন, একটি ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী রচনা করে তুলেছেন।

বাল্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ নদী, প্রথম গ্রন্থ অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা। —শকুন্তলা রচনার কথা অবনীন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোনা যাক—

'একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, "তুমি লেখ না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখ।" আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। তা আবার আমি লিখব কি করে? উনি বললেন, "তুমি লেখই না; ভাষার কিছু দোষ হয়—আমিই তো আছি।" সেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগা-গোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন; শুধু একটি কথা লিখেছিলেন সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। ...সেই প্রথম জানলুম আমার বই লিখবার ক্ষমতা আছে।...মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন "ভয় কি, আমি তো আছি"—সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।'—এই প্রসঙ্গ একথাও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের তাপে যে লেখার স্রোত মুক্ত হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকেও তা সম্পূর্ণ মুক্তই রয়ে গেল চিরকাল। —রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তী জীবনে চিত্রচর্চা করেন তখন তা ছিল চিরাভ্যস্ত অবনীন্দ্র-চিত্রশৈলীর সীমাবহির্ভূত।

এই শকুন্তলা (শ্রাবণ ১৩০২) দিয়েই বাল্যগ্রন্থাবলীর সূচনা। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান স্বীকার করলেন 'নদী' (২২ মাঘ ১৩০২) গ্রন্থে। এই সূত্রে বলে রাখা যেতে পারে, বাল্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ অবনীন্দ্র-নাথের ক্ষীরের পুতুল (ফাল্গুন ১৩০২)—এই তিনটি রচনাই শিশুসাহিত্যে দীর্ঘকাল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে।

নদীর অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত যে চিত্রগুলি প্রকাশিত হল সে-সম্বন্ধে এখন কিছু সংবাদ দেওয়া যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সাধনার এই প্রথম যুগ; ইতিপূর্বেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনা অলংকৃত করেছেন, বর্তমানে সে-সকল দুষ্প্রাপ্য, যথা চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), বিম্ববতী (সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯)। —নদীর এই চিত্রগুলি বই ছাপা হবার পর, সম্ভবত অব্যবহিত পরেই, মুদ্রিত পৃষ্ঠার উপর আঁকা অবনীন্দ্রের শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বের রচনা; নদী পুস্তকের স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল বলে জানা নেই। সেই কারণেই হোক বা স্বতন্ত্র আঁকা হয়নি বলেই হোক, এ ছবিগুলি আর প্রকাশিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নদীর চিত্রময় রূপ দেখবার জন্য কবি শেষ পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন।

'নদী' সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বইখানি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভপরিণয় দিনে রবীন্দ্রনাথের উপহার—ইনিও রবীন্দ্র-নাথের অন্যতর ভ্রাতুষ্পুত্র যাঁকে তিনি সাহিত্যসাধনায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, আর এঁর রচনা দিল্লীর চিত্রশালিকা (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫) প্রভৃতি শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে যে অবনীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তিনি বারবার স্বীকার করে গিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের অলংকৃত পৃষ্ঠাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ নদী কবিতাটিই মুদ্রিত হল —রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে শিশু গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে গিয়েছেন, তার ফলে নদীর ধারা-জীবনের এই কবিতাটির বিশিষ্টতা অনেকটা বিস্মৃত—যুক্তাক্ষরবিরল "এই কাব্য-গ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত" হলেও, বয়স্কদেরও যে এর রস-গ্রহণে অন্যমনস্ক থাকবার কারণ নেই; এই সংকলনের দ্বারা আশা করি সেই স্বীকৃতির সহায়তা হবে।

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চল্ চল্ ছল্ ছল্
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে।
সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্ খানে ছুটোছুটি।
ওরা সকলের মন তুষি
আছে আপনার মনে খুশি।

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে।
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু-পাখিদের বাস,
সেথা শব্দ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে আছে মহামুনি।
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধুধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,
শুধু সারারাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা,
সেথায় একা ছিল দিনরাতি
কেহই ছিল না খেলার সাথী;
সেথায় কথা নাই কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।
নিচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।

তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের বয়স কে জানে কত।
তাদের খোপে খাপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো,
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শেওলা যত;
তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে
সে-যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে-যে সদা খেলে লুকোচুরি
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।

পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলি চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো।
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।
তারা সারা দিনরাত খেটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে,
তারা চড়িয়া শিখর-পরে
বনের হরিণ শিকার করে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে;
পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি;
গায়ে আলো করে ঝিক্ঝিক্,
যেন পড়েছে হীরার চিক।
মুখে কল কল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।
তখন কলকল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল;

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১

কোথাও নিচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর;
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়ে এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট,
কোথাও চাষীরা করেছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস,
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিষ দিয়ে দিয়ে নাচে;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলিছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারিদিক হতে তারা,
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে।
তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকিয়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া ক'রে ডাকে।
দেখে এই মতো কত দেশ।
কে-বা গণিয়া করিবে শেষ।
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা-রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু-ধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী,
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা।
তারি ঘাটের সোপান যত,
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি';
নদী এই মতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে,
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে;
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।
কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু-বেলা সকাল সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট;
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট;
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ।
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিক চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধুধু করে বালুচর
সেথায় গাঙ্ শালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস;
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে,
ঘন আম-কাঁটালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ-করা;
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে সাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁ কোঁ ক'রে ঘোরে ঘানি,
কোথাও কুমারের ঘোরে চাক্
দেয় সারাদিন ধ'রে পাক।

মুদি দোকানেতে সারাখন
ব'সে পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথা বসি' পাঠশালা ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।
হেথায় এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি'।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধুলো।

যেদিন পূর্ণিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে;
বনে ও-পারে আঁধার কালো
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি' থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটীরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে;
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে,
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে ওঠে,
কভু ওপারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
সেথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে।
জল চকো চকো করি চাটে।
হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে ওঠে খল খল,
তরী করি' ওঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা প'ড়ে,
তখন জল যায় স'রে স'রে;
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে;
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

নদী চলে যায় যত দূরে
ততই জল ওঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল;
নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা;
ক্রমে নিচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল;
ডাঙা কোন্ খানে পড়ে রয়;
শুধু জলে জলে জলময়।
ওরে এ কী শুনি কোলাহল,
হেরি এ কী ঘন নীল জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা।
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।
ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি' গরজি' ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে'
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে'।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে।
হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা, আর শুধু ঢেউ,
আর নাহি কিছু নাহি কেউ।

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবেনাকো অবসান।
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদা মাটি দিবে ধুয়ে।
তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে সুর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
র'বে অতল আদরে মিশি'।

তাহার নাম কি কেহই জানে?
কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে?
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু পাখীদের বাস,
সেথা শব্দ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে' আছে মহামুনি।

৪ নদী।
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধূধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মত।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া।
শুধু সারারাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি'।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

নদী।
সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমাইতেছিল সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিন রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথী;

ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সকলি দেখিয়া লইতে হবে।
নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।

কে জানে কত ;
খোপে গাঁঠে গাঁঠে
কুটো-কাটে ।
চুলে কালো কালো
করেছে রবির আলো ।
মত
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ ।

নদী
তলে তলে ঝিরিঝিরি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি ।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে ।
সে যে খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি ।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি ।
যদি থাকে পথ জুড়ে,
হেসে যায় বেঁকে চুরে ।

নদী।

সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতন তারা,
তাদের শরীর কঠিন কড়া।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।

১০ নদী।

তারা সারা দিনমান খেটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে।
তারা চড়িয়া শিখর-পরে
বনের হরিণ শিকার করে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তারা তারি মত, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে;

নদী। ১১

পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি;
গায়ে আলো করে ঝিকিমিক্‌,
যেন পরেছে হীরার চিক্‌।
মুখে কল কল কত ভাষে,
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।

১২
তখন কল কল ছুটে জল
কাঁপে টলমল ধরাতল ;
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড় বড়,
তারা ভয়ে পড়ে পড়-পড়।
কত বড় পাথরের চাপ
জলে খসে' পড়ে ঝুপ্ ঝাপ্,

নদী।
১৩
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মত ছোটে।
শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।

নদী।
হেথা খোলা মাঠ,
সমতল পথ ঘাট।
কোথাও চাষীরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস ;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
রাখাল ছেলের
খেলা করিছে গাছের তলে ;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।

নদী ১৫
কোথাও
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে জলধারা
আসে হতে তারা।
নদী বাড়ে
এখন
তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

নদী।

সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া করে ডাকে।

দেখে এই মত কত দেশ,
কেবা গণিয়া করিবে শেষ।

নদী।

কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দুধারে গমের খেত।
কোথাও ছোটখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী,
সেথায় নবাবের বড় কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা।
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।

নদী।

কোথাও শাদা পাথরের পুলে
নদী [illegible]
কোথাও [illegible]
চলে [illegible] ডাক ছাড়ি।

নদী এই মত অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।

নদী।

হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।

কোথাও
যেন আঁকা।
তাহার কে করিবে পরিমাণ;

নদী।
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিখ চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধূধূ করে বালুচর,
সেথায় গাঙ্‌চিলে করে ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে' আসে চলে'।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।

[অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাচিত্রগুলি শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পদাবলী সাহিত্যে লীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা অবলম্বনে যে পদগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলি রাধাকৃষ্ণের মূল রাগ-লীলার পদগুলির মত রসঘন নয় বটে কিন্তু সেগুলিতেও যথেষ্ট হৃদয়-মাধুর্য ও কলাচাতুর্য বর্তমান। এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উপজীব্য বাৎসল্য-রস। পদকর্তারা এই রসের সঙ্গে ভাগবতের মত ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ঘটান নাই।

এ উদ্ধব দাসে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥

অবিমিশ্র জাম্বুনদ স্বর্ণের সহিত যশোদার বাৎসল্য উপমিত হইয়াছে। সমবয়সী ব্রজ-রমণীগণও যশোদার বাৎসল্য সৌভাগ্যের অংশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও—গোপালকে—

হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন খীরে ভিগল বসন।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানি, কিন্তু মা-যশোদা তাহা জানেন না—গোপালের লীলায় অসাধারণ, এমন কি অলৌকিক কিছু দেখিলেও তিনি স্বীকার করেন না। ইহাতেই আমরা ব্রজের বাৎসল্য রসে লোকাতীত আস্বাদ্যমানতা লাভ করি।

আমাদের ভগবানকে যশোদা উদুখলে বাঁধিতেছেন।

নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবন পতি যায় পলাইয়া॥

যশোদা সাধারণ মায়ের মতই অমঙ্গল নিবারণের জন্য গোপালের কপালে গোময়ের ফোঁটা দেন। সাধারণ শিশুরা যেমন হাতে-খড়ির দিন জননীকে প্রণাম করিয়া প্রথম পাঠশালায় যায়, গোপাল তেমনি গোষ্ঠাষ্টমীর দিন যশোদাকে প্রণাম করিয়া পাচন-বাড়ি হাতে প্রথম গোচারণে যায়। গোপালের যখন তখন ক্ষুধা পায়, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য না পাইলে গোপাল ক্ষীর ননী চুরি করিয়া খায়—কেবল অপচয় করিবার জন্যও গোপাল কেবল নিজের ঘরে নয় প্রতি-বেশিনীদের ঘরে ক্ষীরসর চুরি করে, সাধারণ শিশুর মত গোপাল বায়না ধরে, যশোদাকে উত্যক্ত করে। গোপালকে 'অখিল ভুবনপতি' রূপে আমরা জানি বলিয়াই এ সমস্তের মধ্যে আমরা লোকাতীত আনন্দ লাভ করি এবং এই সমস্তকে তাঁহার লীলা বলিয়াই মনে করি। যশোদাও আনন্দ পান, সে আনন্দ বাহ্যত লৌকিক, বাৎসল্যের অতলস্পর্শতায় তাহা দিব্যানন্দ। যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য কিছুতেই বিচলিত হয় না।

যশোদার বাৎসল্যে ঐশ্বর্যভাবের লেশমাত্র নাই, তাঁহার কঠোর পরীক্ষার জন্যই যেন পদকর্তারা গোপালকে দিয়া দুই একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। গোপাল মাটি খাইতেছে শুনিয়া যশোদা ছুটিয়া আসিলেন। তিরস্কৃত হইয়া গোপাল "কই, আমি ত মাটি খাই নাই" বলিয়া মুখব্যাদান করিয়া দেখাইলেন। যশোদা কি দেখিলেন?

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক, নাগলোক, নরলোকগণ॥

ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যের বিশুদ্ধি ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না।

স্বপ্ন প্রায় কি দেখিলু' হেন মনে করে।
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥

ইহার বেশি কথা পদকর্তা বলেন নাই। যশোদা বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মত কম্পিত কণ্ঠে স্তব করেন নাই।

বাল্যলীলা প্রসঙ্গে উদ্ধবদাস ও ঘনরাম-দাস একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মথুরা হইতে এক পশারিণী ফল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে নন্দের দুয়ারে।

শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হইতে পড়িতে পড়িতে।
পশারী নিকটে আসি ফল দেহ বলে হাসি
ধান্য দিল ফলাহারী হাতে॥

গোপালের ছোট্ট মুঠোয় কয়টি ধান্যই বা ধরিয়াছিল, প্রায় সবই ত পথে পড়িয়া গেল—পশারিণী কয়টি ধানই বা পাইল! গোপালকে দেখিয়া পশারিণীর হৃদয় বাৎসল্যরসে বিগলিত হইল। সে বলিল—

ও মোর সোনার চাঁদ কি তোর মায়ের নাম
কার ঘরে হৈল উতপতি।
বহুকাল তপ করি কে পূজিল হরগৌরী
কোন পুণ্য কৈল সেই সতী।
তোমারে করিয়া কোলে কত শত চুম্ব দিলে
নয়নের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চান্দ মুখে
মুঞি যাই হব তার দাসী॥

পশারিণী তখন—

ফল দিল কর ভরি প্রেমভরে গরগর চিতে।

বলরাম দাস বলিয়াছেন—

ধন্য সেই ফলাহারী ফলে পাইল নন্দ হরি।

এ ফল নিশ্চয়ই কর্মফল ত্যাগ। তাহার পরই আছে—

ডালা হৈল রতনে পূরিত।
ফলাহারী সবিস্ময় চিত।

গাঙ্গিনী নদীর পাটনী সোনার সেঁউতি আর সন্তানের জন্য দুধভাতের বর পাইয়া তুষ্ট হইয়াছিল। পশরা রতনে পূরিত হইলেও পশারিণী খেদ করিতে লাগিল—তাহার আকিঞ্চনটা পাটনীর মত ঐহিক নয়, আধ্যাত্মিক।

প্রকৃত কথা—পশারিণীর হৃদয়পশরাই 'রতনে পূরিত হইল।' রবীন্দ্রনাথের কৃপণ কবিতার কথা মনে পড়ে—

মরি, একী কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাওগো কিছু"—
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা নিচু।
তোমার কিবা অভাব আছে,
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে, একটি ছোট কণা॥
যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি—একি,
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজভিখারীরে
স্বর্ণ হ'য়ে এলো ফিরে
তখন কেন চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে।

গোষ্ঠলীলার রসধারার দুটি তট—সখ্য ও বাৎসল্য। গোপালকে গোঠে পাঠাইয়া

যশোদার উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। যাদবেন্দ্রের মা যশোদা বলিয়াছেন—

আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিও মোহন বেণু
ঘরে বৈসে আমি যেন শুনি॥

গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে যশোদা নেতের আঁচলে গোপালের মুখ মুছাইয়া চুমা খাইয়া বলেন—

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রামকানু।
আমি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকায়েছে হিয়া॥
মলিন হয়্যাছে মুখ রবির কিরণে
না জানি ফিরিলা কোন্ গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে।
এক দিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥

অমাতৃগর্ভজাত স্বয়ম্ভু ভগবান রাখাল সাজিয়া সুধা হইতে সুমধুর অনাবিল মাতৃস্নেহ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই অপূর্ব রস উপভোগের জন্যই জননী-জঠরে তাঁহার নরজন্ম পরিগ্রহ। ইহাতে তাঁহার যে পরিতৃপ্তি কোনদিন যোগী-তাপস ভক্তদের স্তবস্তুতিতে তাহা তিনি লাভ করেন নাই। এই মাতৃস্নেহ আবার সর্ব-সংস্কারমুক্ত। রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নহেন, তাহার চেয়ে ঢের বেশী বল্লভা, যশোদা তেমনি তাঁহার গর্ভ-ধারিণী নহেন—তাহার চেয়ে ঢের বেশী স্নেহাতুরা—মূর্তিমতী বৎসলতা। যশোদার মাতৃস্নেহে যে রসের সঞ্চার, নন্দের পিতৃ-স্নেহেও সেই রসেরই সঞ্চার। গোপাল রাখালের পদবীতে উত্তীর্ণ হইলে নন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন নন্দের গোদোহনে সহায়তা করে। নন্দ বাথানে গোদোহন করিতে যাইবেন—আমাদের ভগবানকে তিনি জুতা বহিবার ভার দিলেন। যাদবেন্দ্র লিখিয়াছেন—নন্দরাজ

পায়ের বাধা খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে।
ভকতবৎসল হরি বাধা নিল মাথে॥

যাদবেন্দ্র গোষ্ঠলীলায় অন্য পদে বলিয়াছেন—

যাদবেন্দ্র সঙ্গে লেহ বাধা পানই হাতে দেহ
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়।

ইহা কবির দাস্যভাবের কথা। কবি উচ্চতর রসে বিভাবিত হইয়া নন্দের বাধা ব্রজ-রাখালের মাথায় তুলিয়া দিয়াছেন। এত সাহস ভক্তকবি কোথায় পাইলেন? শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর কবিরা সর্ব-সংস্কারমুক্ত সর্বসংকোচমুক্ত বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের আস্বাদের সঙ্গে এই সাহস লাভ করিয়াছেন।

আমাদের ভগবান্ যে ভক্তের বাধা বহিবার জন্যই রাখাল সাজিয়াছেন। তাই তিনি নন্দের বাধা হাতে না বহিয়া মাথায় ধরিলেন।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানি বলিয়াই তাঁহার রাখালিয়া লীলায় আমাদের চিত্ত বিস্ফারিত হয়, আর রাখাল বালকেরা তাহা জানে না বলিয়াই আমরা ঐ লীলায় রস পাই। রাখাল বালকেরা ঐ লীলা নিঃসংকোচে উপভোগ করিয়া নির্মল আনন্দ লাভ করিয়াছে—সেই আনন্দের ছিটেফোঁটা আমরাও পাই। রাখালদের কাছে কানাই ভগবান না হউন, ব্রজরাজতনয় তো বটে, তাহাতেও তাহাদের মনে সংকোচ জন্মে না। তাহাদের সখ্য সর্বসংস্কারমুক্ত। খাইতে খাইতে মিঠা লাগিলে সখারা বনফল কানুর মুখে তুলিয়া দেয়—

যমুনা পুলিনে বেঢ়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বনপাত তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙা বেণু॥
সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভালো ভালো কৈয়া মুখ হতে লৈয়া
সভে দেই কানু মুখে।

সখ্যপ্রেমের এই উচ্ছিষ্ট দাস্যমন্দিরের ষোড়শোপচার হইতেও শ্রীভগবানের অধিকতর কাম্যধন।

কানাই খেলায় জিতিলে সখাদের কাঁধে চড়িবার সুযোগ পায় কিন্তু খেলায় হারিয়া গেলে সখাদের কাঁধে করিয়া বহিতে হয়—খেলায় হারজিতের ইহাই সর্ত। কানাই সখাদের কাঁধে বহিয়াই ধন্য হয়। তাই সখারা বলে—

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাই-এর সঙ্গে চড়িব কানুর কান্ধে
নয় কান্ধে নিব ঘনশ্যাম।

গোষ্ঠলীলায় কানাই ধেনুর প্রাণেও বাৎসল্যের সঞ্চার করে—

সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠে উপরে।
ধেনু সব সারিসারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

ধেনুগুলি শ্যামঅঙ্গ চাটিয়া গোঠের ধূলি দূর করিয়া দেয়। তাহাদের অঙ্গে রোমাঞ্চের তরঙ্গ সঞ্চার হয়।

সখারা শ্যামগতপ্রাণ, ক্ষণেক কানুর অদর্শনে তাহাদের মনোভাব কি হয় নিম্ন-লিখিত পদে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।—

হিয়ার কণ্টক দাগ , বয়ানে চন্দন রাগ
মলিন হৈয়াছে মুখ শশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া
তোমা বিনে সব শূন্য বাসি॥
নবঘন শ্যাম তনু, ঝামর হৈয়াছে ভানু
পাষাণ বাজিয়াছে রাঙা পায়।
বনে আসিবার কালে হাতে হাত সঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিব মায় ॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার সনে
বসিয়া থাকিব তরুছায়।
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সবার প্রাণ ফাটি যায়॥

সখ্যরস হইতে একধাপ উঠিলেই মধুর রসে পৌঁছান যায়। গোষ্ঠলীলাতেই মধুর রসের সূত্রপাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই রাখাল বেশ যে রমণীমনোমোহন। উদ্ধবদাস রাখালিয়া রূপের বর্ণনা দিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন—

নব ঘন জিনি তনু দখিণ করেতে বেণু
সুবলের কান্ধে বামভুজ।
চূড়া বাঁধা শিখি পুচ্ছ বরিহা মালতী গুচ্ছ
ভাঙভুংগ নয়ন অম্বুজ॥
অলকা তিলক ভালে কানে মকর কুণ্ডলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা পাঁতি কম্বু কণ্ঠ শোভে অতি
মণিরাজ হিয়া পরিসর॥
বনমালা তঁহি লম্বে সারি সারি অলি চুম্বে
ক্ষীণকটি সুপীত বসন॥
নাভি সরোবর পাশে ত্রিবলী লতিকা ভাসে
মগন রমণী মীনমন॥
রামরম্ভা উরু ছাঁদে কত বিধু নখ চাঁদে
অরুণ কমল পদ তলে।
দাঁড়াঞা কদম্ব তলে বঙ্কিম লগুড় হেলে
রঙ্গভঙ্গি নয়ন অঞ্চলো॥
ত্রিগুণ ভঙ্গিম রঙ্গে বেশ নটবর অঙ্গে
হাসিয়া মধুর মৃদুবোলে।
এ দাস উদ্ধব ভনে ভুলিল রমণীগণে
রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥

সুবল কানুর বয়ঃসন্ধিকালের নর্মসখা। গোচারণকালে সুবলের সঙ্গে কানুর প্রাণের কথা হইত। গোষ্ঠলীলায় যে কানুর মাঝে মাঝে অন্তর্ধান ঘটিত, তাহা সুবলেরই সঙ্গে।

'সুবল রহস্য জানে সখীর সমান।'

সুবলই গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলার যোগসূত্র। সুবলের মুখেই কানু রাই-এর পরিচয় পান। নিম্নলিখিত চমৎকার পদটি সুবলের উক্তি।

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেঘ রুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতিমণ্ডলী পন্থ ইহ দেখলি
কোই নাহি রাইক সমানা॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সাগরী সজিল ইহ নাগরী
ধনি রে ধনি ধনা তুয়া ভাগি।
দিবস অরু যামিনী রচই অনুরাগিণী
তোহার হৃদি মাঝারে রহু জাগি॥
নিমেষে নব নৌতনা রাই মুগধলোচনা
অতয় তুহু উহারি অনুরাগী।
রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচল পদপাণি।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
জাগি রহু শশি শেখর বাণী॥

গোষ্ঠের রাখালরূপেই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মুরলীবাদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ গোঠে চলিয়াছেন—তখন—

দেখিয়া গোকুল ইন্দে উছলিল প্রেম সিন্ধু
অবশ হইল প্রেম ভরে।
অনিমিখে চাইয়া রয় লাজে কিছু নাহি কয়,
কাঁপে ধনী মদনের জ্বরে॥

মধ্যাহ্নেই গোষ্ঠবিহারের কাল। কাজেই তপনের তাপ তখন খুবই প্রখর। সেই তপন তাপকে উপেক্ষা করিয়া রাধা গোষ্ঠের দিকেই ছুটিয়াছেন—

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান।
চড়ল মনোরথে ভাবিনী চলিল পথে
তাপ তপন নাহি জ্ঞান॥

কিন্তু রাধাতো নিজের কোন দুঃখ-ক্লেশকে গণ্য করেন না—শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ-ক্লেশই তাঁহাকে ব্যাকুল করে। তাই বংশীবদনের রাধা বলিয়াছেন—

বংশী বটের তল ছায়া অতি সুশীতল
যাইতে না লয় তাহে মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ বরণ॥
পীতধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোকভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥

রাখাল শ্রীকৃষ্ণ রৌদ্রের প্রখর তাপে ঘর্মাক্ত-কলেবর, তাঁহার দশা দেখিয়া রাধার বংশী-বটের তলের শীতল ছায়ায় দাঁড়াইতেও সাধ যায় না।

'বিষম ভানুর তাপে' নন্দদুলালকে গোধন লইয়া আর পাঁচজন সাধারণ রাখালের সঙ্গে গোরুর পাল লইয়া গোঠে যাইতে দেখিয়া রাধা নন্দ-যশোদাকে পথের পাশে দাঁড়াইয়া ধিক্কার দিতেছেন—

আঁখির পুতলি তারকার মণি
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া ঝরে॥
ননীর অধিক শরীর পেলব
বিষম ভানুর তাপে।
জানিবা অঙ্গ গলি পানি হয়
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
বিপিনে বেকত ফণী শত শত
কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙা চরণ ভেদিয়া ছেদিবে
মোর মনে হেন ভায়॥
কেমনে যশোদা নন্দ পিতা সে
হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমন হৃদয় ধরিয়া আছরে
হায়রে বুঝিতে নারি॥
ছারে যাবে যাক অমন সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাক।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিলে
পায় কত সুখ পাক।

রাখাল কানাইএর এখনো বালভাব ঘুচে নাই। তাই রাধার অন্তরে লালনাত্মক ভাব বিগলিত হইয়াছে এই পদে।

আসছে জন্মে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রোঢ়াবাঁধে খোলা বারান্দায়
শীতের সূর্য গড়ায়ে যায়।

পড়ন্ত রোদে পথের প্রান্তে
অশথের পাতা কাঁপছে,
কি শীত গ্রীষ্ম কেঁপেই আসছে তারা;
বলি-বন্ধুর অশথের গুঁড়ি
একঠাঁই খাড়া ভাবছে,
কি শীত গ্রীষ্ম সে শুধু ভেবেই সারা
একশ বছরে উদ্ভট যত ভাবনা।
পড়ন্ত রোদে পিঠ পেতে শুয়ে
দুধোলো গাভীটি জাওরায়,
তন্দ্রিত চোখে ঠাওরায়—
সারা গোজন্মে কোথায় কিসের ভাবনা?
চোয়ালে জাবর, গোয়ালে ফিরেই
কোঁয়ালে বাছুর ও জাবনা।

একই ঠাঁই খাড়া একশ বছর দাঁড়ায়ে
অচল অশথ গুঁড়ি
আঁধারের তলে অন্ধের প্রায়
শিকড়ে শিকড়ে রস হাতড়ায়,
করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।
একই ঠাঁই খাড়া চিরনিদ্‌হারা
ঊর্ধ্বে আকাশ ফুঁড়ি'
পাতায় পাতায় আলো আঁকড়ায়,
শাখায় শাখায় পাখা ঝাপ্‌টায়,
ঝড়ে ঝড়ে মোড়ামুড়ি।
চিরচঞ্চল পায়ে-শৃঙ্খল
অচল অশথ গুঁড়ি!

সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাইটি ভালো,
নধর চিকন কালো;
অচল নয় সে চরে খেতে পারে,
লেজের বাড়িতে ডাঁশ মশা মারে,
ভুলেও ভাবে না দুষ্প্রাপ্যের ভাবনা;
অতীব সরল হিসাব তাহার
দুধের বদলে জাবনা।
উপরন্তু সে জাবর কাটে
পড়ন্ত রোদে ভরা পেট পেতে
ঢুলু ঢুলু আঁখি শীতের মাঠে।
গলার দড়াটা মাঝে মাঝে খোলা পায়,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ-কায়।

এবারের মতো মনিষ্যি হয়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।
সুতরাং সব চেপেই যাই,
রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সর্বযামী,
দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কি হব আমি?
জানায়ে দিতাম আমারও দাবি—
পথের প্রান্তে অশথগাছ, না
সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাভী!
আমার মতন মনিষ্যিদের
খোলা আছে দুটি ভবিষ্যৎ,
হয় গোজন্ম নয় অশথ।

প্রতীক্ষা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি?
জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী;
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে?
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধু ধু করে;
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে;
যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে॥

মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বেষ্টনীবিরহিত;
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই॥

আরও এক বার, হাজার বছর আগে,
বিপ্রলব্ধ আস্থা অস্তরাগে
খুঁজে পেয়েছিল উজ্জীবনের প্রেষণা;
এবং আবার সহস্র বৎসর
পুরে আসে বটে, তবু মন্বন্তর
মানবেতিহাসে সর্বনাশের দেশনা॥

অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে;
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে॥

অভাব হয়তো স্বভাবের অগ্রজ;
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—
প্রতিজ্ঞা রাখে মৃত্যু ভ্রাতার বদলেঃ
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ; যথেচ্ছ পরমাণু;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে॥

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেইঃ
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে;
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি?

মহাজিজ্ঞাসা

জীবনানন্দ দাশ

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নীচে;
সৃষ্টির মনের কথা সেইখানে আবছায় কবে
প্রথম রচিত হ'তে চেয়েছিল যেন।
সে ভার বহন ক'রে চ'লে
আজ কাল অনন্ত সময়
সেকেণ্ডে মিনিটে পলে বার বার ক্ষয়
পেয়েছে; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি
থামিয়ে এ পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি?—
যে স্থিরতা বারবার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে দাহন দেয়,—সেই সব ছাড়া
আরো বড় মানে এক—মহাপ্রাণসাগরের সাড়া?

নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খ'সে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি;
যতদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—
মনে হয় এক আধ কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।

মানুষের কত দেশ কাল
চিন্তা বাথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল
সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের অন্ধ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।

তবু তারা নীলিমার তপনের অমৃতত্ব বুকের আকাশে
ধ'রে নিতে চেয়েছিল বুঝি;—
সাহস সাধনা প্রেম আনন্দের দিক লক্ষ্য ক'রে
আমরাও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি?

এঁকে বেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে—আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;
মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মতো এসে জ্বলে;
যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুরঃ
জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর
জাগিয়ে বুদ্ধির ধাঁধা দু মুহূর্ত দীপ্ত ক'রে পাখি
মানুষকে ফেলে গেল তবু তার চেতনার ভিতরে একাকী।
শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে
কোথায় সে চ'লে গেল তবে।

কিছু শীত কিছু বায়ু আবছা কিছু আলোর আঘাতে
ক্ষয় পেয়ে চারিদিকে শূন্যের হাতে
নীল নিখিলের কেন্দ্রভার
দান ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে হয়?

শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস;—
যদি না মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আ[illegible]
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায়ঃ
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

স্মৃতির গোধূলি

বিষ্ণু দে

ভেঙে গেল ইন্দ্রধনু,
সূর্যাস্ত মিলায় আসন্নের অন্ধকারে
জীবনে রাত্রির নীল পাহাড়ে পাহাড়ে
সপ্তর্ষিরা নিয়ে এল স্মৃতির গোধূলি।
আকাশে আকাশে অশ্রু,
অরুন্ধতী খুলে' এলোচুল।
আর দুটি চোখ জ্বলে শুকতারা সন্ধ্যার তারায়
চামেলিতে নিস্তব্ধ শিশিরে।

সে কি শুধু দিয়ে গেল স্মৃতির গোধূলি?
সেই কি দেয়নি বেঁধে হৃদয়ের বাসা
প্রত্যহের সূর্যোদয়ে আর জীবনের
অস্তগামী সূর্যের আলোয়?

অন্ধকার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
হৃদয়ের আশেপাশে।

তবু তো সে আসে ধীরে ধীরে।
আসা তার পাপড়িতে পাপড়িতে খোলে আশা,
অনির্বাণ চোখ জ্বলে,
যেখানে সন্ধ্যার তারা শুকতারার ভোরে
প্রতীক্ষার প্রতিজ্ঞায় পরিচ্ছন্ন স্থির ঘাসে ঘাসে,
আমাদের কালজয়ী কান্নার শিশিরে॥

শরতের মেঘ

অজিত দত্ত

একটি দুয়ার খুলে রাখো।
তোমার নিভৃত কক্ষে সব দ্বার রুদ্ধ কোরো নাক'।
ওই দ্বারপথে কভু শরৎ-নীলাভা যদি আসে,
কেশভার হয় যদি এলোমেলো সহসা বাতাসে,
তার সাথে মিশে কোনোবার
স্মরণের কণাটিরে প্রবেশের দিয়ো অধিকার।

বিস্মৃতির বন্দিত্বের সোনার শিকলে বাঁধা পাখি,
তোমার ভোরের স্বপ্নে যদি আমি মিশে গিয়ে থাকি—
তবু আজ সে-স্বপ্নেরে শরতের মেঘের মতন
জাগরণে মুহূর্তেক করিবারে দিয়ো বিচরণ।
জানো না কি এ-মেঘের পক্ষপুটে অস্তরাগ মাখা,
গৃহমুখী যূথভ্রষ্ট বিহঙ্গম, শ্রান্ত ক্লান্ত পাখা?

আমার আকাশে কোনো রুদ্ধ দ্বার নাই,
সর্ব দিক মুক্ত হেথা, সহস্র স্মৃতির হেথা ঠাঁই।
তাই, তুমি জানো বা না জানো—
তোমার অস্তিত্বটুকু লক্ষরূপে এখানে ছড়ানো।
সে দুর্বহ অভিশাপ, সে অমৃতময় আশীর্বাদ
ইন্দ্রিয়ের শত পথে ক্ষণে ক্ষণে লভি তার স্বাদ।

তুমি সুখী জানি,
জীবনের বিজয়ীর খেলাঘরে অবরুদ্ধ রানী।
আর আমি নিষ্ফল অস্থির,
যতই ফুরায়ে যাই স্মৃতিগুলি তত করে ভিড়।
তবুও কী বিস্ময় অপার,
জানো না যে এ-আকাশে তোমার বিস্তীর্ণ অধিকার!

শ্রী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

চৈত্রকোষে মধুর সঞ্চয়
মেঘে জলে নয়
সে কেবল তোমার নম্রতা।
তোমার বীজাণু মনে বলে কতো কথা,
আমরা পঞ্চম-রাগ শুনি।
দিকে দিকে আকুলতা বুনি,
নিরুত্তর উত্তর-ফাল্গুনী
আকাশ-শয্যায় চায় ক্ষয়।

তুমি থাকো, ক্ষয় হতে থেকে
বন-নীল লাবণ্যের বন্যা বুকে ঢেকে
পার্বতীর মতো।
তোমায় আনত
দেখতে পাইনে, কাননিকা,
যেন দেখি জ্বলদার্চিশিখা
তৃতীয় নয়নে।

মৃতের শয়নে
স্বপ্নে দেখি কনকাভ বাস,
আরম্ভমানার অভ্রে অদৃশ্য আকাশ
শুভ্রতায় ফিরে আসে ঘরে!
কী প্রভাত, নিবিড় অম্বর!
আমাদের শঙ্কিত প্রহরে
তার ঘ্রাণে প্রাণ নেওয়া যেন পাওয়া স্বরিত অপ্সর,
আকাশের অবসরে খিল-খোলা নীল!
তারপর ধ্বনিত নিখিল।

তোমার হাতের মৃদু নিদ্রার নির্মোকে
আমি ফিরে পাই চোখে
পদ্মমধুবর্ণে স্থির আকাশের অকুণ্ঠ প্রণাম
সুরভিতা পৃথিবীর নাম॥

চোরকাঁটা

দিনেশ দাস

সময়-শিশির পড়ে ঝ'রে,
সঙ্গে তার কোনদিন ঝরিনি অঝোরে,
শিশিরের জলটুকু পরম আরামে
নিয়ে আমি স্নান করি, পান করি, ভ'রে দিই গানে।
তবু এক ফাঁকে
হৃদয়
পুরোনো হয়,
পুরোনো গানের মত জীবনের সব সুর চেনা-চেনা লাগেঃ
সন্ধ্যা-সকালে
মরাডালে
হলুদ পাতার মত প্রাণ থাকে এক ধারে প'ড়ে,
সময়ের চোরকাঁটা বিঁধে আছে মনের কাপড়েঃ
ফোটে তারা এখানে-ওখানে,
পুরনো গোপন ব্যথা ব'য়ে ব'য়ে আনে।

মহাশূন্যে সময় জ্যামিতি কষে,
তারই আঁকা-বাঁকা রেখা ফুটে ওঠে আমার কপালেঃ
দিক্‌চক্রবালে
তারা খসেঃ
এখন আমার দিন সন্ধ্যেবেলায়
কালো শিশিরেতে ডুবে যায়।

হঠাৎ কখন দেখি, মনের কাপড় সরে
স্মরণের চোরকাঁটা ফোটে দেখি সেই অবসরে,
বেঁধে তারা এখানে-ওখানে
গোপন বেদনা শুধু ব'য়ে ব'য়ে আনেঃ
ব'য়ে আনে বৃষ্টি-নীল মাঠ আর হারানো শরৎ
সোনালী মধুর মত রোদ,
সঙ্গে তার উৎসুক উন্মুখ
দু'টি বৃষ্টি-নীল চোখ, সোনালী মধুর মত মুখ।
স্মৃতির হাজার চোরকাঁটা বেঁধে, লাগে,—
তবু ভাল লাগে।

আলোক-তৃষ্ণা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে সূর্য তোমা সম্মুখে রাখি' প্রতিজ্ঞা ছিল মোর
তোমার আলোক মুঠি মুঠি ভরি' ছড়াইব ত্রিভুবনে,
দুয়ারে প্রথম তব করাঘাতে ভাঙিল নিদ্রাঘোর
দিগন্ত হতে আলোকের শিখা পড়ে মনোদর্পণে।

বাহিরে প্রথম নয়ন মেলিয়া দেখিলাম বহুদূরে
তোমার উদয়, সে কি বিস্ময় আলোকে উৎসারিত,
অলক্ষ্য হতে মহা সঙ্গীত বাজে অনাহত সুরে
মহাকাশময় মহিমা তোমার উচ্ছল অবারিত।

অদৃশ্য বায়ু কাঁপিতেছে তার মূর্ছনা অবরোহে
তৃণে তৃণে জাগে তারি কম্পন, বনভূমি পুলকিত,
নয়নে আমার নূতন পৃথিবী জাগে আলোকের মো[illegible]
আমি জাগিলাম শত জনমের জীবনে আকাঙ্ক্ষিত।

শোণিত-কণায় প্রবাহিত হল আলোর উত্তেজনা
আমা হতে আমি বাহির হলাম বাহিরের পৃথিবী[illegible]
হৃদয়-তন্ত্রে বাজিয়া চলিল আলোকের ঝনঝনা
দু' হাত ভরিয়া অজস্র আলো কতটুকু পারি নি[illegible]

তুমি যদি পার আঁধার আকাশে ছড়াও তোমার আ[illegible]
সে আলোক-ধারা নামিয়া আসুক সারা পৃথিবীর [illegible]
হে সূর্য তব সহস্র হাতে করুণার ধারা ঢালো
তমসার তীরে তৃষিত আত্মা তৃপ্তি লভুক সু[illegible]।

মনে ছিল আশা, তবু ত পারিনি, হে সূর্য তব প[illegible]
জ্বালাইতে মোর ক্ষীণ দীপশিখা মাটির প্রদীপটি[illegible]
প্রতিজ্ঞা মোর হল না, সফল, সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে
রাত্রি না হতে ওগো তমোঘ্ন জেগে ওঠ ধীরে ধী[illegible]

স্বদেশ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই ভালো, এই ঘর; গোময় প্রলেপে পরিপাটি
নিকানো উঠোনটুকু, সাদা ফুল, শান্ত গাছখানি
আনন্দে নোয়ায় মাথা, কচিবৃন্তে জীবনের বাণী
আনে হাওয়া, আনে রৌদ্র; অদূরেই সোনামাঠে খাঁটি
প্রাণ জাগে থরে থরে; সার, বীজ, জলের সঞ্চারে
সৃষ্টির রহস্য জাগে, নীলাকাশ থেকে নেমে আসে
কী আশ্চর্য নবধারা, কৃষকের লাঙলের ভারে
মাটির গহনে বেগ, অদূরে পুকুরে জলে ভাসে

সঞ্চিত শেহলা শ্যাম, স্নিগ্ধ শান্ত হিমেল হাওয়ায়

সন্ধ্যায় শরীর কাঁপে, দীপ জ্বলে, গরু ফেরে [illegible]
চেনাপথে দলে-দলে, চাঁদ ওঠে, রহস্যছায়ায়
কাঁপে মাধবীর শাখা; সারা মাঠ মেঠো গন্ধে [illegible]
এই ভালো, এই দেশ; স্ত্রীলোক শিশুর স্মি[illegible]
বৃদ্ধের বিগত স্মৃতি, যুবকের নিভৃত উদ্যম
মাটি ও মাঠের কাজে,—পর্ণকুটিরের অধিবাসী
সুখেদুঃখে দ্বন্দ্বে গড়া; এখানে প্রশান্তি নিরু[illegible]

সামান্য সংসার ঘিরে,—অগ্নিহোত্রী মানুষেরা [illegible]
স্বদেশকে খুঁজে-খুঁজে এইখানে পেয়েছিল মাটি[illegible]

অন্য পট

হরপ্রসাদ মিত্র

মাঝে-মাঝে লাগে উতলা বাতাস,
পর্দাটা ওড়ে হঠাৎ ঝড়ে।
প্রতি-প্রহরের অভ্যাস ধুয়ে
তা তা থৈ থৈ বিষ্টি পড়ে।
জলে ঝঙ্কার। প্রাণে ঝঙ্কার।
নিরহঙ্কার
গভীর মন—
আপনাকে চায়।
আপনাকে পায়।
অজানিত সেই অন্বেষণ!

মিহি তুষারের ফুলে সুশোভন
জারুলের সারি,—
বিষ্টি পড়ে।
ঘাসে-ঢাকা পথ, বাঁধানো উঠোন,
পুরোনো পাঁচিল,
বিষ্টি পড়ে।
কানা ফকিরের ভিখ্-চাওয়া হাত—
হারায়, হারায় প্রশ্ন-জবাব।
শুধু বর্ষার রিমিঝিমিময়
একটি আড়াল!
একটি পটে—
অনেক দিনের তৃষিত মনের
কী গান্ধর্ব মিলন ঘটে!

বহু প্রয়াসের বিফলতা যায়
হঠাৎ তোমার যে-বর্ষণে,
মাঝে-মাঝে তারই উতলা বাতাস
লেগেছে আমার গভীর মনে।

প্রেমের জন্য

মণীন্দ্র রায়

জীবন্ত মন চেয়েছি, দেবে কি পুতুল?
এ তো খেলাঘর নয় যে আকাশপাতাল
যা খুশি ভাবলে আত্মমগ্ন
সময় কাটবে, অবুঝ স্বপ্ন
ঘোচাবে প্রভেদ কী সোনা আর কী পিতল।

ভাল যে বাসবে কেবলই, তা আমি বলিনে।
(যদিও কাম্য তাই, করব না ছলনা!)
দাও উপেক্ষা, অথবা ঈর্ষা,
প্রতিঘাত, ক্রোধ, যা কিছু ইচ্ছা—
যদি চাও কর ঘৃণার আগুনে জ্বালানী,

খেদ নাই তাতে। কিন্তু এই যে মরণ
শুধু তুমি আমি মুখোমুখী, এ কী করুণ!
জানো নাকি এই বানানো স্বর্গে
কালের নিষাদ ধনুকে-খড়্গে
ছায়া ফেলে, মরে মুগ্ধ একচক্ষু হরিণ!

অথবা ঘৃণাতে নয়, প্রেমে যদি এ ফাঁকি
মিটাবে, তাহলে বাড়াও প্রাণের এলাকা।
ঝিল নয়, চাই সে নদীবক্ষ
সাগরে-পাহাড়ে যে পাতে সখ্য,
পলিবানে দেয় নব আশা বালুবেলাকে—

দাও সে মুক্তি! পুতুলপ্রেমের আঙিনা
যদি ভাসে, যদি অশ্রুতে ভরে, ধমনী
ছিঁড়ে যায়, জাগে হৃদয়স্পন্দ,
তবু তো জানব আছি জীবন্ত—
ধরেছি কালের বল্গা মুঠিতে দুজনে॥

কোনার্ক-শান্তিনিকেতন

অশোকবিজয় রাহা

শেষ সূর্য জ্বলে ওঠে কোণার্ক-চূড়ায়,
অদ্ভুত আভায়
জ্বলে ওঠে কাচের আকাশ
ঝলসায় য়ুক্যালিপটাস
রঙের আগুন লাগে শিমুলের ডালে
মাধবীলতার জালে
চমকায় সোনার ঝালর
অবাক আলোর,
নারিকেল-শাখা হতে গ'লে পড়ে ঝিকিমিকি হার—
শুনি শেষবার
শেষ পাখিটির কণ্ঠে শূন্য হতে ঝ'রে পড়ে সুর
দূর হতে দূর।

আজ মনে জাগে
বাইশ বছর আগে
এখানে দেখেছি একদিন
আরো এক শেষ সূর্য চেয়ে আছে নিমেষ-বিহীন
আকাশে মেলেছে ইন্দ্রজাল
মুখে তার চেয়ে আছে পৃথিবীর আশ্চর্য বিকাল,
সেদিনের শেষ অন্তরাগ
মুগ্ধ পৃথিবীর চোখে ছড়ায়েছে স্বপ্নের পরাগ
কণ্ঠে তার রেখে গেছে দান
সুন্দরের গান,
সে-সূর্য আসে নি ফিরে আর
অসীম কালের পথে সে কেবল আসে একবার।

তবু আজো মনে হয় এইখানে পৃথিবীর কাছে
এখনো সে আছে
মুখে তার চেয়ে আছে দূর তালবন
চেয়ে আছে শান্তিনিকেতন
আজো তার অন্তরাগে দিগন্তের মেঘে
উঠেছে রঙের তান জেগে
ঝ'রে পড়ে আলোর ঝঙ্কার
সুদূরে আকাশকোণে স্বপ্ন জ্বলে কাঞ্চনজঙ্ঘার।

বিরহ

অরুণকুমার সরকার

সখী, দুঃখিত দক্ষিণ হাওয়া
চলে গেছে উত্তরে।
শীত যদি আসে, আসুক আমার
নিঃস্ব এ-অন্তরে।
তুমি কাছে নেই, কিবা ব্যবধান
উদ্যানে প্রান্তরে!

কিন্তু কেমনে ম্লান সত্যটা ভুলি
সহৃদয় নয় সময়ের অঙ্গুলি,
অযতনে যদি ঝরে যায় দিনগুলি
ক্ষমা করবে না হিসেবের খতিয়ানে।
ছুটবে কেবল রাত্রি পাগল
প্রভাতের সন্ধানে।

সখী, ভাবনার বাতায়নে আর
উড়ে আসেনাক পাখি
বনগন্ধের সৌরভে মাতোয়ারা,
হাসে না আকুল চামেলি বকুল
পারুল চপল-আঁখি
গৃহ-আঙিনায় কৌতুকে দিশাহারা।
তুমি কাছে নেই, কেবা খোঁজ রাখে
কারা আসে, যায় কারা।

সখী, আর নয়, ফিরে এসো তুমি
বৃথা বয়ে যায় বেলা,
সহৃদয় নয় সময়েব অঙ্গুলি।
দ্যাখো যৌবন প্রৌঢ় এখন
শেষ হয়ে এল খেলা,
তোমাকেই দিই তোমারই এ-দিনগুলি!

ফাঁকি

গোপাল ভৌমিক

সময়-শিবিরে বার বার হানা দিয়ে
জোটেনি কিছুই; ফিরেছি শূন্য হাতে
লুণ্ঠন-শেষে বিরক্তি মনে নিয়ে—
রাতের কাহিনী ভুলেছি আবার প্রাতে।

সোনার হরিণ কতবার দিয়ে ফাঁকি
আমাকে নিয়েছে জলাজঙ্গলে টেনে,
ভেবেছি যখন ধরাই কেবল বাকি
পড়েছি হঠাৎ হতাশ্বাসের ড্রেনে।

অভ্যাস বশে আকাঙ্ক্ষা তবু জাগে,
এ মাটির মনে চন্দ্র-লোকের ছায়া
প্রতিদিন পড়ে; ভেবে বেশ ভাল লাগে
আজ, নয় কাল স্বপ্ন পাবেই কায়া।
ভুল ভেঙে যায় মৃত্যুর মুখোমুখী
যখন দাঁড়াই, দেখি সব বুজরুকি!

মৃত মৎস্যলোক

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

মাছের বাজারে ঘুরি এক আধ বেলা
মাছের পশারী, দেখি, মৃতমাছ নিয়ে করে খেলা।
মনে জাগে শোকঃ
লুপ্ত হয়ে গেছে মৎস্যলোক।
এখন এখানে শুধু সকাল সন্ধ্যায়,
রঙচঙা মাছরাঙা আসর জমায়।

আমাদের সীমান্তের পারে
মাছেরা কি এসে গেছে শহরে বাজারে?
কিংবা সেথা মরা গাঙে আগের মতন আজকাল
লীলাভরে ফুট কাটে রোহিত বোয়াল!
চাঁড়াল দীঘির বিলে আজও আকস্মিক
মরা ঝিনুকের খোলা রাঙা রোদে করে চিকমিক?
আরও বহুদূর—
মন্দাক্রান্তা মধুমতী কার্তিকের কুয়াসা-বিধুর
করে টলমল
সেখানে সহসা কালবাউসের দল
অলক্ষ্যে সাঁতার দিয়ে যায়
কালো সোনা চমকায় গায়!
দুপুরের রোদে ঝিলমিল
চিতলের সাদা বুকে ঝলকায় আকাশের নীল!

সীমান্তের এই পারে খালবিল হয়ে গেছে ছেঁচা।
এখন ওজনদরে শুধু কেনাবেচা।
জীবন্ত ও মরা—
শীতল কাঁচের কক্ষে সুসজ্জিত মাছের পশরা।
আশেপাশে মাছরাঙা চিল আর কাগ;
মেছো মানুষের মোটা আঙুলের দাগ
মাছের সোনার অঙ্গে দেখি ছাপ মারা।
টিপে টিপে কেনাবেচা করে যায় তারা।

সাধ হয়, নিয়ে,
সীমান্তের আগল ডিঙিয়ে
বাউস, কাতলা, রুই, যেখানে যা পাই,
হিজল গাছের তলে কাকপক্ষ জলেতে মিশাই।
মাছের বাজারে সারা বেলা—
ঘুচে যাক মৃতমাছ নিয়ে এই খেলা।

দু এক মুহূর্ত মাত্র

শান্তিকুমার ঘোষ

দু' এক মুহূর্ত মাত্র সূর্য নিবে এলে
আসে এক অন্ধকার ছায়া ফেলে ফেলেঃ
পাখি-পাখালির নীড়ে আর্ত কলরব,
অয়ন-মণ্ডলে সে কি তীব্র ঢেউ খেলে।

পিয়ানোর পাশে মেয়ে তবু স্থির মনে
কালো এক সূর্য দেখে সে টেলিভিশনেঃ
ক্রমে আকাশের গায়ে ফোটে চেনা তারা,
তখনো মানুষ জাগে সুদূরবীক্ষণে।

ডাকে

চিত্ত ঘোষ

উদ্বেল চোখে অবারিত আশ্বিন
উধাও মেঘের ছায়াচঞ্চল দিন
মনের অধীর শাম্পানে হাওয়া লাগে।

রোদ-মুড়ি-দেওয়া সকালের নীল মাঠে
হরিণ হাওয়ারা দল বেঁধে ছোটে, হাঁটে
তোমার চোখে কী বর্ষার বিদ্যুৎ!

তোমাকে দেখেছি চৈত্রে শ্রাবণে
দেখেছি রৌদ্রে হাওয়ায় পাতার কাঁপনে
তোমাকে দেখেছি পৌষে, মেলায়, পাবনে।

উদ্বেল চোখে অবারিত আশ্বিন
উধাও মেঘের ছায়াচঞ্চল দিন
মনের অধীর শাম্পানে হাওয়া লাগে।

জোয়ারের মুখে নির্ঝর-গান
সাত সমুদ্র ডাকে।

মন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই মন ঘুরলো অনেক দেশে
গম্ভীর সমুদ্র কিংবা পাণ্ডুবর্ণ স্থির রাত্রিশেষে।
সওদা অনেক তার দরকারি অদরকারিও
থামলো কখনো পথে ধূলিকীর্ণ ম্লান উত্তরীয়।
তারপর বাঁকা স্মৃতি ইন্দ্রধনু যেন
—কোন এক হৃদয়ের ধ্বনি বাজে কেন?

"আর নয়", ভাবলো সে, "ফিরতেই হবে
"ঘর ছেড়ে কার ডাকে বেরিয়েছি কবে?"

ফিরবে কোথায় সে? কোন গ্রামে? কোন বাড়ি তার?
কোন বিধাতার কাছে তার অভিসার?
দিন যায়, রাত্রি শেষ—গ্রহ থেকে যায় গ্রহান্তরে
অদৃশ্য মন্দিরাধ্বনি মানুষের গম্ভীর অন্তরে॥

বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুগত, এ-জন্মে আমি কেউ না তোমার।

আজ তবু সন্ধ্যায় যখন
জাতিস্মর জ্যোৎস্নার ঝালরে
তোমার হাসির মন্ত্র নীরব ঝর্ণায় ঝরে পড়ে,
আমারও নির্বেদ ঘিরে পূর্ণিমার তিলপর্ণিকার
অগুরু গন্ধের বৃষ্টি—মনে হলো এখানে আবার
তোমার সময় থেকে বহুদূরে শতাব্দীর তীরে
জয়শ্রীজীবন পাবো ফিরে,
ফিরে পাবো পরশ রতন।

মাঠের পিঞ্জর ভেঙে কখন সহসা
কে অনন্যা উঠে এলো, দীপ্তি যার অহল্যার চেয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে আরো দুর্বিষহ ধৈর্যের তমসা,
গৌরীর চেয়েও যার রুচিরাক্ষমালা
প্রতিজ্ঞার প্রতিভায় জ্বালা—
এবার আমায় দেখে ভ্রূকুটির ভস্মরেণু ছেয়ে
দুচোখে শুধালো :
'কী নাম তোমার বলো, হোমাগ্নিশিখায় তাকে জ্বালো।'
দূরে সরে গিয়ে আমি ভীরুকণ্ঠে উত্তর দিলাম :
'এ-জন্মে জানিনা—তবু আর জন্মে আনন্দ ছিলাম।'

শুনে সে-নারীর মুখে সকল স্থৈর্যের আরাধনা
ভেঙে গিয়ে জ্বলে উঠলো ভ্রূযুগবিলগ্ন অগ্নিকণা :
'তুমি সে-আনন্দ বুঝি একদা বুদ্ধের অনুগামী?
প্রভুর প্রয়াণ হলে তোমারই তো শোক
শপথের রূপান্তরে জ্বলেছিলো অভয়, অশোক,
স্মিতমুখে বলেছিলে যুগে যুগে জন্ম-জরা-জ্বালা
পার হয়ে নিয়ে যাবে প্রভুর মৈত্রীর ঝরামালা,
দুয়ারের দুয়ারে গিয়ে ম্রিয়মাণ মানুষের ব্রত
করপুটে তুলে নিয়ে হবে তুমি নূতন সুগত
আমি সে-আকাঙ্ক্ষা শুনে ফল্গুনিবেদনে
বক্ষের দেউলতলে সাজিয়েছি তোমার প্রণামী,
সে-ভিক্ষু এখন তুমি পথে-পথে ভিক্ষুকের মতো
গীতব্রত ঘুরে-ঘুরে কি পেয়েছো জীর্ণ এ-জীবনে?'
এতগুলি কথা বলে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
বৈশাখী নিদাঘে তার শ্রাবণের ঢল নেমে আসে,
জলের একতারা বাজে ত্রিতাপতৃষ্ণার ভালে-ভালে
প্রাণের প্রান্তরে শুকনো আলে।

তারপর চলে যেতে যেতে
তাকালো বিষণ্ণচোখে দরিদ্রধূসর ধানখেতে
বৃষ্টির বাসনা যেন কৃষাণীর দুনয়নে কালো—
বিপুল বিস্ময়ে শুধালাম :
'বলে যাও কী তোমার নাম?'
আবার ভ্রূযুগে তার ভ্রূকুটির আগুন ঘনালো :
'এ-জন্মে জানিনা—তবু আর জন্মে সুজাতা ছিলাম।'

ডাকপাখি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো কথার ভোরে ডাকে তবু একা ডাকপাখি।

যেখানে চেতনা আর নতুন দিনের শুরু হয়—
যেখানে রাতের শেষ, অনিশ্চিত উদ্যত সময়
ঘুমের শিখর থেকে জাগৃতির ঢালু খাতে বয়;
ঘোর-ঘোর সে কথার ভোরে
ক্ষুধিত কান্নার স্বর—সরু সুতো ধ'রে
ক্রমাগত ডাকে শুনি একা ডাকপাখি।
কী সে ডাক? গান তাকি?
গানই যদি হয় তবে কী যে তার মানে
প্রাণ অন্তত তার কিছু-কিছু জানে
সব জেনে গেলে তবু জানবার যতো থাকে বাকি
জীবনের বাকি দিন সে-হিসাব নিয়ে পড়ে থাকি।
সে-পাখিকে চেনো কেউ, জানো কি ঠিকানা?
আধো-আধো চেনা মুখ, অন্ধকারে হয় লেনা-দেনা...
রাত্রির শিশির মেখে চেনে তাকে হৃদয়ের শাখী!
অনেক কথার ভোর ডাকে ডাকে ভ'রে রাখে একা ডাক পাখি।

হৃদয়েরই গাছে তার আছে কোনো নীড়
বুকের কোঠায় তাকে ঢেকে রাখে এক ঝাঁক পাতাদেব ভিড়।
আবছায়া ভোর এলে কুয়াশার আড় থেকে দেখেছি সে-পাখির শরীর।
সোনা রং সে-পাখির ডানা দুটি আগুনের শিখা
তীক্ষ্ণ চঞ্চু, রক্তাভ চিবুক—
ডাক তার খেলা কিংবা হ'বে কোনো দুর্জ্ঞেয় কৌতুক!
সে-ডাকে যে আবহের মাঝপথে শিশিরের জল
থেমে থাকে; শির-শির করে ত্রাসে ঘাসেদের প্রাণ;
সে-ডাকে যে জ'মে যায় ধমনীতে শোণিত তরল;
সে-ডাকে স্তম্ভিত হয় ঝিঁঝিঁদের মূঢ় একতান
সে-ডাকে যে হ'য়ে ওঠে পতঙ্গের কামনা উৎসুক!
সোনা রং সে-পাখির ডানা যেন লেলিহান আগুনের শিখা
তীক্ষ্ণ চঞ্চু, রক্তাভ চিবুক।

বুকের কোটরে ব'সে তীক্ষ্ণ চঞ্চু বিঁধে-বিঁধে তন্তু খুঁটে খায়
তৃষ্ণা মিটায় তপ্ত রক্তের ধারায়।
ধমনী ও শিরা টেনে সেধে-সেধে প'রে নেয় সখ্যতার রাখী।
তাড়াতে চেয়েছি তারে এড়াতে চেয়েছি যেই নিশি-পাওয়া ডাক
অগ্নি যে তোলে মাথা নিয়তির মতো নিত্য বিস্ময় অবাক!
তাকি কভু হয়, আরে, কভু হয় তাকি?
একান্ত নিষ্ঠুর ক্রূর অত্যাগসহন তবু সেই ডাকপাখি।

যে-কথা হয়নি বলা, যে-ডাক হয়নি ডাকা আজো
হৃদয়ের তন্ত্রীতে তারি যতো মূর্ছনা
টন্‌টনে ব্যথা নিয়ে হে পাখি নানান্ সুরে
একটানা ভাঁজো—
সে-ব্যথা-কাহিনী শেষ হ'লো নাকি আজো?

যাদের রেখেছি দূরে...ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন
সবারে করেছি পর, একমাত্র মেনেছি আপন
নিকটের প্রান্তর, সুদূরের অরণ্য গহন।
তবু তো নিস্তার নেই
সেখানেও পিছু নেয় মূঢ় তার ক্রূর সম্মোহন।
সহে না, সহে না আর, বুকের বিবর থেকে ডাকে সেই পাখি—
সহে না কো অন্তরাল, সর্বদা কাছে-কাছে থাকি
যদিও ফেলেছি ঝেড়ে অতীতের প্রীতি-পরিচয়
বিবর্ণ যতো দাগ; কে কবে দিয়েছে বেঁধে সেধে-দেওয়া রাখী
ভুলে গেছি; ফেলেছি সে-সব সঞ্চয়—
বুকের পরতে তবু ঢেকে রাখি এ-পিশাচ পাখি।

এবার করেছি ঠিক আর নয়, নয়—
বুকের বিবর থেকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
হত্যা তাকে করি এই ভয়ঘ্ন তিমিরে;
ইচ্ছা ঠেলা দেয় কই পারিনে তো তবু,
হাত ওঠে নাকো তাই থাকি জবুথবু,
অবরুদ্ধ হৃদয়ের পঞ্জরের ফাঁকে
ডাকে, তবু ডাকে—
আমৃত্যু সে পিছু নেয়, যাতনায় জ্ব'লে যায় প্রাণ,
আমি চলি সেও চলে—
কারো মুখে কথা নেই—চলা তবু চলে অফুরান,
নিরুত্তর, অরুন্তুদ, আশ্চর্য একাকী!
এ-জীবন হবে শেষ তবু কি মিলোবে রেশ
অবিশ্রাম ডেকে যাবে এ-ডাকাত পাখি?
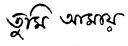
তুমি আমায়

অরুণ সরকার

আমি তোমায় ভালবাসি সে ত' সবাই জানে;
তোমার আমার নাম জড়িয়ে
কানাকানি যায় ছড়িয়ে
পাড়ায় পাড়ায় শহরে সবখানে।

তাই তোমাকে মুখ ফুটে আর
কইনে কথা ভালবাসার,
খেলার কথা, মেলার কথা, গল্প করি নানা;—
যে কথাটা সবাই জানে, সে ত' তোমার জানা!

একটি কথা আমার মনে প্রশ্ন হয়ে আছে
বলি-বলি করেও বলা হয় না তোমার কাছে;
আমি তোমায় ভালবাসি সে ত' সবাই জানে,
একটি কথা আমায় তুমি বলবে কানে কানে?
তুমি আমায়......... বলব না আর, বলব না আর কিছু,
তোমার কথা তুমিই বল, ক'র না মুখ নিচু।

প্রতিদ্বন্দ্বী

সন্তোষকুমার ঘোষ

সাহারানপুর জংশনে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে গল্পটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। অথচ আসলে এটি রোমাণ্টিক গল্প। পরদিন দিল্লী ফিরেই যদি এটি লিখতুম তবে হয়ত সেই কাঁটার কয়েকটি এই রচনাতেও ফুটত।

লিখিনি, ভালই করেছি। গল্পটাকে মনের মত করে সাজাতে চেয়েছি, পছন্দ হয়নি। ভয়ও ছিল। আমার কাছে যেটা স্পষ্ট, সেটা কাহিনীটির শ্রুতিরূপ, দৃশ্যরূপে তার কতটা ধরা পড়বে, কতটা উবে যাবে তার নিশ্চয়তা ছিল না।

তা-ছাড়া, পরে ভেবে দেখেছি, সেদিনের আতঙ্ক অনেকটাই পরিবেশজনিত। ওয়েটিং রুম-লাগোয়া রিফ্রেশমেণ্ট-কামরায় আমরা দুজন মুখোমুখি, টেবিলে ঝকঝকে কাঁটা ছুরি, ধবধবে তোয়ালে; পেয়ালা-প্লেট-পিরিচ, চীনেমাটির বাটি; চামচের টুংটাং [illegible] সাইডিংয়ে সাণ্টিংয়ের বাজ-আওয়াজ। কাচের শার্সির বাইরে ছমছমে ছাই রঙের জোব্বাপরা শীত-আকাশ, তার কপালে ধক-ধক চোখের মত দূর-ইয়ার্ডের দারুণ দু'টি ফ্লাড-লাইট। তবু মাঝে মাঝে লাইনের অরণ্যে পথভ্রান্ত দু'একটি ইঞ্জিন সিগন্যালের ইশারা না পেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই চিৎকার কুয়াশাকে ছুরির মত ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

এই পরিবেশে জোলো প্রেমের গল্পও ভুতুড়ে রূপ ধরে আসে। বিশেষ, বক্তা যদি হয় মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ একজন শিখ, যার পাগড়িতে পাকা চুল আর দাড়িতে ঠিক বয়স লুকানো।

আজ ভাবি সেদিন যদি এক্সপ্রেসটা ফেল করে ফ্রণ্টিয়ার মেলের জন্যে বসে না থাকতুম, তবে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে এ গল্প শোনাই হত না। তাতে অবশ্য ক্ষতি ছিলনা। বাংলা সাহিত্যে আর একটি ক্ষীণায়ু কাহিনী অলিখিত থেকে যেত।

আমরা প্রায় এক সঙ্গে রিফ্রেশমেণ্ট ঘরে ঢুকেছিলুম, প্রথমে আমি, একটু পরেই সম্পূরণ সিং। টেবিলটা আগেই আমার দখলে, সুতরাং ওকে কিছুক্ষণ ইতস্তত করতে হল। অবশেষে দেখলুম লোকটা আমাকে অভিবাদন করলে, সবিনয়ে বললে, 'বসতে পারি?'

মূর্ত সৌজন্য হয়ে বললুম, 'অবশ্যই।'

ওয়েটার যদি আসতে অতিশয় দেরি না করত তবে হয়ত আমাদের আলাপে ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ত; উভয়ের যে কোন একজনের উঠে যাবার তাড়া থাকলেও। বারকয়েক পরিবেশকের কৃপাদৃষ্টিলাভে ব্যর্থ হয়ে হয়ত অভিযোগের খাতায় একটা সই দিয়ে বেরিয়ে যেতুম। হাতের কাছে সচিত্র কোন পত্রিকাও ছিলনা যে না-পড়া চোখে পাতা ওলটাই।

সৌভাগ্যক্রমে দুজনেরই সেদিন প্রচুর অবসর, দু'জনেই এক ফেরি ফেল করে পরেরটার অপেক্ষা করছি। খানা-ঘরে যে হানা দিয়েছি সেও ততটা খিদে ঘোচাতে নয়, যতটা সময় কাটাতে। টেবিলটা এত বড় নয়, যে আগন্তুকের, যদিও অপরিচিত, উপস্থিতি উপেক্ষা করব।

বললুম, 'আপনিও ট্রেন পাননি?'

সম্পূরণ অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিল। প্রশ্নে চকিত হয়ে বলল, 'না। ঠিক এক মিনিটের জন্যে। অথচ ছুটতে ছুটতে

এসেছিলুম।' নিজের কথা বলে অপরেরটাও জিজ্ঞাসা করা রীতি। সম্পূরণ একটু থেমে বললে, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'দিল্লী। আপনি?'

'আরও কিছুদূর—রেওয়ারি।'

এর পরের কথাটা হত 'আজ কী শীত দেখেছেন,' কিন্তু তখনই পরিবেশক সামনে এসে দাঁড়াল, সুতরাং দু'জনেই ভোজ্যসূচী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তালিকাটি আদ্যন্ত পাঠের পর সম্পূরণ ফেরত দিয়ে বললে, 'কফি।'

আমার রসনা লুব্ধ হয়ে উঠেছিল, বিশেষ, তখন মনে পড়েছে তাড়াতাড়িতে ভাল করে খেয়ে আসা হয়নি। একটা রোস্ট ফরমাশ করলুম।

যেই উচ্চারণ করলুম 'রোস্ট', অমনই সম্পূরণ যেন চমকে উঠল। লোহিতাভ, পোড়াতামাটে মুখ সহসা ছাই হয়ে গেছে, ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, একটু-বা ব্যথিত। অতি-প্রকট নাকের নীচে দু'টি পোষমানা কাঁকড়াবিছেকে একটি বলিষ্ঠ রোমশ হাত এতক্ষণ সস্নেহে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল আঙুলগুলো কাঁপছেও।

একটু পরেই রুমাল বার করে সম্পূরণ মুখের সমুখে ধরলে। এবার আমার চমকানোর পালা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললুম, 'মাপ করবেন, আপনি কি অসুস্থ?'

লজ্জিত হয়ে রুমাল ফের পকেটে পুরে সম্পূরণ বললে, 'ধন্যবাদ। না-না আমার কিছু হয়নি। হঠাৎ কেমন যেন— জল আছে?'

পরিবেশক ইতিমধ্যে আমার জন্যে জলের গ্লাস রেখে গিয়েছিল। সেটাই ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। ঢকঢক করে গ্লাস শেষ করে ও টেবিলে রেখে দিলে, ঠক করে শব্দ হল, বুঝলুম ওর স্নায়ুভঙ্গ তখনও পুরোপুরি সারেনি। কফি এল, সেটাকেও এক নিশ্বাসে শেষ করে সম্পূরণ আমাকে মৃদু কণ্ঠে কী বললে—বোধ হয় মার্জনা চাইলে—তারপর এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়েছিলুম। রোস্ট এলে কাঁটা ছুরি নিয়ে নিপুণ অস্ত্রোপচারে মন দিলুম; এ-জাতীয় সার্জারিতে আমার দখল কিছু কম, রীতিমত নাজেহাল হয়ে সম্পূরণের বিসদৃশ আচরণের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

ওয়েটিং রুমে একটু ঘুমিয়ে নেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেখানে পদার্পণ করেই সে-আশা ছাড়তে হল। সারা ঘরে মালপত্র, আসনগুলিও খালি নেই, টেবিলের উপরে এক স্থূলতনু বৃকোদর হাত-পা ছড়িয়ে শয়ান, সম্ভবত নিদ্রামগ্ন। অধমাঙ্গের অর্ধেক আধা-পাৎলুনে ঢাকা, উত্তমাঙ্গ শুধু একটি গেঞ্জিতে—লজ্জা নিবারণের শর্ট-কাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘরর্ ঘরর্ শুনলুম; ওই মগজে ঘুমও থাকতে চায় না, ফাঁক পেলেই পালাতে চায় তাই নাকের মুখে একটা কুকুর পুষে রাখা হয়েছে, সে ঘর্-ঘর্ করে তাড়া দেয়, ঘুম ফের সুড় সুড় করে মগজে গিয়ে ঢোকে।

পায়চারি করতে অগত্যা বাইরে আসতে হল। প্লাটফর্মের সামান্য অংশই আচ্ছাদিত, শেডের বাইরে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটার মত হিম পড়ছে টের পেলুম। শরীরটা ইতিমধ্যেই টুপি, ওভারকোট ইত্যাদিতে ঢেকে নিয়েছি, ঠাণ্ডা লাগবার বিশেষ ভয় ছিল না। তবু লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলুম।

প্লাটফর্মের শেষ সীমানায় আবার সম্পূরণ সিংয়ের মুখোমুখি হতে হল। বুকের উপর হাত আড়াআড়ি রেখে সেও জোরে-জোরে হাঁটছিল। বললুম 'সর্দি-তাড়ানো মেহনত করছেন?'

এদিকে স্টল নেই, আলো এমনিই কিছু কম। সম্পূরণ থমকে দাঁড়াল। অযাচিত সম্ভাষণে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে থাকবে, কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেই রুক্ষ রেখা ক'টি মিলিয়ে গেল।

'আপনি? তখন যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ—'

আমার পদবীটা জুগিয়ে দিয়ে ওকে বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করলুম।

'মিঃ ঘোষ, বিশ্বাস করুন আপনাকে অফেন্ড করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ কী যে হয়ে গেল—'

'আপনি নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

'অসুখ? না ঠিক তা নয়, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'

হাঁটতে হাঁটতে আবার রিফ্রেশমেণ্ট রুমের সামনে এসেছিলুম। বললুম, 'একটু বসবেন? গল্প না হোক, অন্তত এই ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

ওয়েটার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাত্রে প্যাসেঞ্জার এ-ঘরে ঢোকে না। কী আছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সব ফুরিয়ে গেছে। আণ্ডা আছে, চাই তো ভেজে দিতে পারে। আর দু'চার টুকরো মাখন-রুটি।

বখশিশ কবুল করে বললুম, 'তাই আন।' সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে সম্পূরণ সিংয়ের দিকে চেয়েছিলুম। রোস্টের নামে লোকটা ভয় পেয়েছিল, ডিমের নামে মূর্ছা না যায়।

সে রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

সে-কালে ঠাকুরের নাম, নিবাস ইত্যাদি দিয়ে আলাপ শুরু হত। কিন্তু পরিচয়ের মাঝপথে সে-প্রসঙ্গ টেনে আন চলে না। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে পরস্পরের নাম জেনেছি।

বাইরে শীতে কাবু রাত্রি আরও ভালো করে কুয়াশার লেপ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে চূড়ান্ত-চড়া ফ্লাড-লাইটের আলো দু'টি এখন নেশায় ঝিমনো চোখের মত ঘোলাটে নিবু-নিবু। মাঝে মাঝে ঘুমনো প্লাটফর্ম গমগম করে বেজে ওঠে। মেল ট্রেন না মালগাড়ি পাস করছে। কাচের শার্সিতে হিম-তুলি একটার পর একটা ছায়াছবি আঁকে আর মুছে দেয়।

অল্পক্ষণের আলাপ, তবু দু'জনে কখন আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছি হাঁটুর ঠক-ঠক ঠেকাতে ওভারকোট খুলে পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়েছি। সম্পূরণের মুখের একাংশ আমার দিক থেকে ফেরা মাঝে মাঝে একটু ঘোরায় যখন, সেদিকটা দেখতে পাই, কিন্তু স্পষ্ট নয়। দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু আছে, কিন্তু কী, তা ধরতে পারিনে। সম্পূরণ বুদ্ধিমান আমার মনের কথাটা অনুমান করে থাকবে হঠাৎ কাঁটা-ছুরি নামিয়ে রেখে বলল

'বার বার তাকিয়ে কী দেখছেন শিরমানজী, আমার বাঁ চোখটা পাথরের।'

টেবিলের তলায় পা দু'টি সংগে সংগে কেঁপে উঠেছিল মনে আছে। ওয়েটারটা ঘরের এক-পাশে কুণ্ডলী হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই। ঘরের বাইরে নীলকোর্তা দু' একটা কুলিকে চলাফেরা করতে দেখছি বটে, কিন্তু কাচের দরজা-জানলার এ-পাশ থেকে আমার চোখে তারা ছায়ামূর্তি বই নয়।

'আমার বাঁ চোখটা পাথরের।' মনে হল ঠিক এমনি অনায়াসে সম্পূরণ বলতে পারে, আমাকে যেমন দেখছেন আমি তেমন নই। এই পাগড়ি, দাড়ি আর পোশাকের ঠিক নীচেই একটি কঙ্কাল ঢেকে রেখেছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, সম্পূরণ সে-সব কিছু বললেনা, এক হাতের তর্জনী দিয়ে অপর হাতের বালাটা ঠুনঠুন বাজাতে থাকল। বোঝা গেল উত্তেজিত হয়েছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সম্পূরণ, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললে, 'একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই তো পল্টনে কাজ হলনা, নইলে রাওয়ালপিণ্ডির জোয়ান ট্যানারির টাউট হয়েছে, শুনেছেন কোথাও?'

ভালো করে ওর গল্প শোনবার জন্যে, কিংবা লুপ্ত সাহস ফিরে পেতে, সিগারেট ধরিয়ে বসলুম। শিখেদের এ-সব ব্যাপারে রীতিমত শুচিবাই, তাই আগে-ভাগে ওর অনুমতিটাও চেয়ে নিতে ভুলিনি।

সম্পূরণ বললে, 'বয়স হল, কিন্তু খেতির কাজে মন বসল না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তন্দুর-চাপাটির খোঁজে না ঘুরেছি এমন জায়গা নেই, শিবালিক পেরিয়ে চলে গেছি, কুলুভ্যালী, চম্বায়; কসৌলি, মুসুরী, চাক্রাটা। লাহোর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, আম্বালা, দেহলি—কোথাও সুবিধে হল না। শেষ পর্যন্ত চলে গেলুম কানপুরে, ট্যানারির দালালি জুটল। টন-টন চামড়ার কারবার, আমার উপর কাঁচামাল জোগান দেবার ভার পড়ল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতুম, মরা গোরু-বাছুরের খোঁজ করতুম। কয়েকটা কসাইখানার সংগেও বন্দোবস্ত ছিল।

'প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। মনে হত পেটের ধান্দায় কী মহাপাপই করছি। মাঠে মাঠে গোরু চরে, খাটালে ভইস বিচালি খায়, দুধ ঢালে, আমাকে দেখলেই ওরা ড্যাবডেবে চোখ মেলে চাইত, যেন ধমকাচ্ছে, যেন দুষছে। আমি শয়তান, ওদের দুশমন, সেটা ওরাও যেন জানত। হয়ত আমারই ভুল, কিন্তু মনে হত।

'মুসকিলে পড়লুম লড়াই বাধলে। কারখানা থেকে হুকুম হল আরও চামড়া যোগান দাও। ওরা একটা স্যাড্‌লারি ফ্যাক্‌টারির কনট্রাক্ট নিয়েছিল। হাজার-হাজার ঘোড়ার জ্যান্ত চামড়ার উপর মরা চামড়া চাপিয়ে লড়াইয়ের কাজে লাগান হবে।

'আমার ঘোরাঘুরি আরও বেড়ে গেল, কিন্তু যোগান দিয়ে ওদের খুশ করতে পারলুম না। আরও চাই, আরও, আরও। জেলায় জেলায় ঢাডটা ঘুরছে, আমার ভাগে পড়ল দেহ্‌লি আর হারিয়ানা। মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত কী করলুম জানেন? গোপনে গোপনে কড়া বিষ যোগাড় করে নিলুম। শেষরাতের অন্ধকারে খানকটা করে ছড়িয়ে দিয়ে আসতুম মাঠে, যেখানে পরদিন সকালে গোরু চরতে আসবে।

'রোজই দু'একটা মরত। একলা মাঠে গিয়ে তাদের দেখে আসতুম, কিন্তু তাদের ঠাণ্ডা, স্থির, নীল চোখের দিকে চাইতে পারতুম না। দেশে থাকতে আমার নিজেরই একটা প্রিয় গাই ছিল, ক্যাম্বেলপুরের গাই, মিশমিশে কালো রঙ, উটের মত উঁচু, বয়েলের মতো জোয়ান, কিন্তু শান্ত দু'টি চোখ। তার কথা মনে পড়ে যেত। সব বিষনীল গোরুর চোখে আমি সেই ক্যাম্বেলপুরের গাইটির চোখ দেখতে পেতাম।

'তবু সে-কাজ ছাড়িনি। পেটের জ্বালা এমন। মাঠ থেকে ছুটে যেতুম মালিকদের কাছে। বাকি বন্দোবস্ত করা শক্ত হতনা। শস্তাই পড়ত।'

হঠাৎ থামল সম্পূরণ। তোয়ালেয় ঠোঁট মুছল। ঈষৎ লজ্জিত, হেসে বললে, 'কিন্তু আমি আমার গল্প তো আপনাকে শোনাতে চাইনি। তখন কেন হঠাৎ উঠে গিয়েছিলুম তার কৈফিয়ত দিতে চেয়েছি। বাজে কথা বড় বেশি বলা হয়ে গেল।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। প্লাটফর্মটা আবার চকিত, কুলীরা ব্যস্ত, হাতগাড়ি ঠেলে ঠেলে ভেণ্ডরেরা এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ছুটছে। ক্লান্ত, ভাঙা-ভাঙা গলায় সুর করে বলছে, 'সামোসে গরম—চায়!'

সম্পূরণ একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল।—'অমৃতসর-হাওড়া মেল। আমাদের গাড়ির এখনও অনেক দেরি।'

দুর্জয় শীতে ঘুম দেশছাড়া। হাই তুলে বললুম, 'ততক্ষণ গল্প চলুক।'

আমার ছমছমে ভাব কেটে গিয়েছিল। এই লোকটার একটা চোখ ঝুটো হতে পারে, কিন্তু বাকিটা রক্তমাংসের, খাঁটি, অণুমাত্র সংশয় নেই।

সম্পূরণ তখন ওর ঢিলে কোটের পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বার করলে; প্যাক-করা, কিন্তু কিসের, বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলনা। সসংকোচে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'চলে?'

বললুম, 'চলে, কিন্তু চালাবনা। রেল-পুলিশের হাতে পড়তে ইচ্ছে নেই।'

'মিছে ভয় পাচ্ছেন। সভ্যদেশে বখ্‌শিশ আর ঘুষ নামে দুটো জিনিস আছে। একটিতে কাজ না হয় আর একটিতে হবেই।'

উত্তেজিত লোককে ঘাঁটান বৃথা। চুপ করে রইলুম। আলোর সমুখে গ্লাস উঁচু করে ধরে সম্পূরণ মাত্রা ঠিক করলে। টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বললে, 'রোস্ট খেতে দেখে কেন ভয় পেয়েছিলুম এবার সে-কথা আপনাকে বলি।'

মনে আছে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সম্পূরণ সিংয়ের গল্প শুনেছিলুম। মাঝে মাঝে হাত হিম হয়ে গেছে, ওভারকোটের কর্কশ পিঠে ঘষেছি; দূর ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে হঠাৎ থেমে কোন ইঞ্জিন তীক্ষ্ণ, আর্ত চিৎকার করেছে, চমকে উঠেছি। কানের নরম লতিতে একটা মশা বারবার বসে উৎপাত করেছে, মারতে হাত তুলেছি।

কাহিনীটা সম্পূরণ একাই বলে গেছে। খাবার টেবিলে নুনের ডিবে, সসের বাটি এগিয়ে দেবার মত আমি মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে ওকে খেই ঠিক রাখতে সাহায্য করেছি মাত্র।

সম্পূরণ বললে, আমার পেশার কথা আপনাকে বলেছি। এই পেশাই লড়াইয়ের শেষ দিকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গুরগাঁওয়ের এক গাঁওয়ে। এক ট্যাঁকে বিষ আর এক ট্যাঁকে তাড়াতাড়া নোট নিয়ে সেখানেই ক'দিনের জন্যে আস্তানা গাড়লুম। একে গ্রাম, তাতে লড়াই চলছে, খাবার জিনিস আক্রা। আণ্ডা আর মীট মোটে নেই, সব্‌জিও যা হয়, বেশির ভাগ চালান যায় শহরে। পাওয়া যেত দুধ—গোয়ালারা শেষ রাতেই সাইকেলে টিন ঝুলিয়ে দেহলির পথে রওনা হত। মনে হত যেন জোলুশ চলেছে।

মাঠে প্রথমেই সেঁকো বিষ দিলুম না, সোজা পথে চামড়া সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলুম। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ি, মাঠে মাঠে ঘুরি। অড়র আর গেঁহুর ক্ষেতে একদিন পথ হারিয়ে ফেললুম। ঘুরে ঘুরে হয়রান—সেটাও শীতকাল, তবু গায়ে ঘাম ছুটল। যেদিকে চাই, একটা

মানুষ দেখতে পাইনে। ঝিলের ধারে, ঘাসের ঝোপে টীল, ডাক, স্নাইপের কিচির-মিচির শুনি, আমার পায়ের আওয়াজে তারা পলকে পালায়। অনেক দূরে দূরে দেখি খুব বড় বড় পাখি মাটির খুব কাছ দিয়ে, অথচ মাটি না ছুঁয়ে উড়ে চলেছে। এত বড় পাখি, আর মাটির এত কাছে? নজর করে বুঝলুম হিরণ। কখনো হরিণের ছুটে চলা দেখেছেন? হরিণ তো ছোটে না, ওড়ে।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে উঁচুমত যে-জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালুম, সেটা একটা রহট। ইঁদারার মধ্যে ছোট ছোট বাটি ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে জল ছড়ায়, আপনাদের দেশে আছে কিনা জানিনা। ইংরেজীতে বলে পার্সিয়ান হুইল।

সেই কুয়োতলায় তাকে প্রথম দেখলুম। ডালায় সবজি—মুলো, খিরা, আরো কত কী মনে নেই—রহটের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছিল, হাত পেতে বললুম, 'আমাকে দুটো দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে দিলে না, কিন্তু মুখ তুললে। তাকে দেখতে পেলুম। ঘাঘরাটা ময়লা, ওড়নাও ছেঁড়া, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্টি। আর যেটা ভালো লেগেছিল সেটা ওর আব্রু। শহরে শহরে ঘুরে মেয়েদের সম্বন্ধে সব মোহ ঘুচে গিয়েছিল বাবুজী, ওদের শরীর নিয়েও কোন আগ্রহ ছিল না। দেখেছেন তো, ওরা লড়াইয়ে হেরে-যাওয়া ফৌজের মত শুধু নিজেদের পিঠ দেখাতে ভালবাসে?

আস্তে আস্তে মেয়েটি ওড়নায় মুখ ঢেকে দিলে। ওকে ইতস্তত করতে দেখে বললুম, 'কই দাও? পয়সা দেব।'

একটি খিরা আর দুটি মুলো নিলুম। আঁজলা পেতে খেলুম রহটের জল। মেয়েটির কাছে তারপর পথের খোঁজ নিলুম। শুনলুম, আমাকে আরও দু' মীল যেতে হবে। মাইলের আন্দাজ এদের কখনো ঠিক হয় না, ধরে নিলুম অনেক মাইলই হাঁটতে হবে—দুই হতে পারে, আবার দশও। সেই কুয়োতলাতেই জিরিয়ে ফের চলতে শুরু করব স্থির করলুম।

হঠাৎ কোথায় যেন ঝটপট-ডানা একটা আওয়াজ। চমকে দেখি একটা রাজহাঁস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জলের নালা ধরে খেতের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণ ডালার আড়ালে ছিল, দেখতে পাইনি। মেয়েটিও তার পিছনে ছুটেছে, কিন্তু হাঁসটা ততক্ষণ গেঁহুর সবুজে ডুবে গেছে। একটু পরে মেয়েটিও সেখানে ডুবে গেল।

উঠে এল একটু পরেই। এক হাতে রাজহাঁসটার সরু গলা ধরে আছে, আর এক হাতে ঘাঘরার প্রান্ত, ওড়না খসে গেছে, আলের উপর পাতলা পা দুটি ফেলে উঠে আসছে। কাছাকাছি আসঁতে ওর কপালের ঘাম, ঘটনিটোল বুকের ওঠা-পড়া দেখতে পেলাম।

এসে আর বসল না। রাজহাঁসটাকে কাঁখে আর ডালাটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়াল।

মাঠের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে, আমি পিছে পিছে। আমার ভারী জুতোর থপ-থপ শুনে থাকবে। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'আসছ যে।'

বললুম, 'পথ দেখিয়ে দেবে।'

মুখ ঘুরিয়ে ও আবার নীরবে এগোতে থাকল। পাশাপাশি পেঁছে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ঘর কতদূরে।'

জবাব এল না। চুপচাপ হাঁটছি। খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

আমার পেশার কথা ওকে বলতে সংকোচ হল। শুধু বললুম, 'কাজে।'

দীর্ঘ পথ এক সঙ্গে চলতে হলে আড়ি আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কখন মেয়েটির সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে শুরু করেছি, মেয়েটিও জবাব দিচ্ছে, খেয়াল করিনি। কথায় কথায় জানলুম ওদের ঘর আমি যে গাঁয়ে উঠেছি তার কাছেই। কতটা পথ তার হিসেব মাইলে নিলুম না। জেরা করে জানলুম, ওদের বাড়ি থেকে টাটকা টাটকা দুধ দুইয়ে নিলে আমার ওখানে পেঁছতে পেঁছতে ফেনা মরে না।

সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'তবে তুমি আমাকে রোজ আধ সের দুধ দিও। যে কদিন আছি। দাম নগদ পাবে।'

চোখ তুলে ও একবার তাকালে। মাথা নিচু করে বললে, 'আচ্ছা।'

জেরা করে আগেই জেনেছিলুম ওদের মুখ্য জীবিকা এইটেই। ওর শ্বশুর আগে রোজ সাইকেলে দুধ নিয়ে দিল্লী যেত। এখন বয়স হয়েছে, রোজ পারে না।

'শ্বশুরের ছেলে নেই?'

'আছে। লড়াইয়ে।' আমি যে পাশে আছি, সে দিকটা ওড়নায় ঢাকা, ওর মুখ দেখতে পেলুম না। না চোখের পাতা-কাঁপা, না গালের লাল।

ওর নাম অহল্যা। হিন্দু। জানেন ত, হরিয়ানা-প্রান্তে শিখ কম হিন্দু বেশী। আপনার শুনতে খারাপ লাগছে শিরমানজী?

চোখে ঈষৎ ঘোর লেগেছিল। ট্রেনের ভাবনা ঘুচে গেছে, মনে হয়েছিল সাহারান-পুর জংশনের এই রিফ্রেশমেণ্ট-রুমটাই এখুনি দুলে দুলে চলতে শুরু করে দেবে, আমাকে কাল সকালে পেঁছে দেবে দিল্লীতে। বললুম, 'বলে যাও।'

সম্পূরণ সিং আরেক মাত্রা নিজের গ্লাসে, এক মাত্রা আমারটায় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলে।

—খেয়ে নিন, তখন যা বলব তা আরও মিঠে লাগবে। পরদিন সকালে অহল্যা দুধ নিয়ে এসেছিল। মাথায় সব্জির চুবড়ি, সেখানে দুধের ঘট বসানো, চলকে পড়েনি এই আশ্চর্য। কোলে সেই রাজহাঁসটা।

বললুম, 'আজও এটাকে সঙ্গে এনেছ?'

কিছু না বলে অহল্যা হাসল।

'উড়ে যায় যদি?'

'উড়বে না। আমাকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। রোজ তো ওকে ঝিলে ছেড়ে দি। সাঁতরে সাঁতরে আবার ঠিক ফিরে আসে।'

দুধ ঢেলে দেবার সময় ওড়না সরে গিয়েছিল, ওর দীর্ঘ টানা চোখ দুটি দেখতে পেলুম। অহল্যা আজ সুর্মা লাগিয়ে এসেছে।

শুধু দুধ নয়, সব্জিও কিছু রাখলুম। বললুম, 'আণ্ডা দিতে পার?'

'আণ্ডা কোথায় পাব?'

হাঁসটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, 'কেন, এটা পাড়ে না?'

অহল্যা ফের মুখ নিচু করলে। পরে বুঝেছিলুম অল্পেই লজ্জা পাওয়া ওর অভ্যাস। —'এটা মরদ হাঁস জী।'

আমার যে কাজ, তাতে খুব ভোর ভোর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া নিয়ম। মাঠের কোণে তাঁবু, রোজ তিন চারটে কম্বল চাপিয়ে শীতের হামলা ঠেকাই। পরদিন সকালে কিন্তু বেরোতে পারলুম না। রোদ উঠে ঘাসের কান্না মুছে দিলে, শুয়ে শুয়েই দেখলুম। ভাবলুম আজ বড় ঠাণ্ডা, বেরিয়ে কাজ নেই। তারও পরে ও এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। ধমক দিলুম নিজেকে। তবে কি শীতের ভয়টা সাচ্চা নয়, আমি ওরই অপেক্ষায় শুয়ে ছিলুম, ও না-আসা পর্যন্ত বেরোতে মন চাইছিল না, আর সেই দুর্বলতা-টুকুই আলস্যের ঘোমটা পরে এসেছে?

অকারণেই রূঢ় হলুম, ওর উপরে! বললুম, 'যা এনেছ, রাখ ওখানে।'

অহল্যাও কথাটি বললে না, দুধ আর সব্জি নামিয়ে রাখল। চোখ বুজেই ওর হাতের বালার রুনঝুন, আর কোলের রাজ-হাঁসটার ঝটপট শুনলুম।

পরদিনও অহল্যা এল, কিন্তু অনেক দেরি করে। তার ঢের আগে আমি উঠেছি, তাঁবুর পর্দা খুলেছি, বন্ধ করেছি, বিরক্ত হয়ে কিংবা নিজেকে একটা কাজে ব্যস্ত রাখতে, আংগিঠা জেলে চা করতে বসেছি।

তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়ল। অহল্যা এসেছে। মাথায় সব্জির চুব্ড়ি কিন্তু কোলের হাঁসটি নেই। বললুম, 'আজ তোমার এত দেরি হল?' ধমকের চেয়ে গলায় অভিমানটাই বাজল, টের পেয়ে লজ্জা পেলুম। সেটা চাপা দিতেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাঁস কই তোমার?'

'ঘরে রেখে এসেছি। সর্দারজী, চম্পকের ভারি অসুখ।'

চম্পক তবে রাজহাঁসটার নাম। কিন্তু হাঁসের আবার কী অসুখ। শুনলুম, কাল থেকে ও নাকি কেবলি ঘর-দোর নোংরা করছে, খায়নি কিছুই, নিঝুম হয়ে খুপরিতে পড়ে আছে।

'হাঁসের অসুখের কোন দবাই নেই?'

অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার জানা ছিল না। বললুম, 'মণ্ডির কাছে ডাক্তারখানা আছে, সেখানে খোঁজ নিতে পার।' হাসি চাপতে রীতিমত বেগ পেতে হল।

সেদিন বিকেলে সুই-শীত, শরীরটা গরম রাখতে হাঁটতে শুরু করলুম।

কাচের শার্সি ফোঁটা ফোঁটা হিমে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকে চেয়ে সম্পূরণ সিং বললে, শিরমানজী, হরিয়ানার মাঠে এখানকার চেয়েও বেশি শীত পড়ে। যাক, ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝিলের কাছে গিয়ে পড়লুম। আশে-পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর, বুঝলুম একটা গাঁয়ের কাছে এসেছি।

ভিজে কাপড়েই তাড়াতাড়ি উঠে এল

অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঝোপঝাপের ফাঁকে ভালো নজর হয় না, হঠাৎ একটা হাঁসের ডাক শুনে চমকে উঠলুম। সব শেয়ালের এক রা, সব হাঁসেরও সম্ভবত তাই, তবু মনে হল এ চম্পক না হয়ে যায় না। কোথা থেকে ডাকছে ভাল করে দেখব বলে লম্বা লম্বা ঘাস সরিয়ে ঝিলের একেবারে কিনারে গিয়ে উঁকি দিলুম।

দেখি কোমরভর জলে অহল্যা দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট ছোট নুড়ি, জলে একটার পর একটা ছুড়ছে, হাল্কা হাল্কা ঢেউ গোল হয়ে ঝিলের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে; অহল্যা মাঝে মাঝে সুর করে অর্থহীন কয়েকটা বুলি আওড়াচ্ছে। সেটা হাঁস-ডাকার মন্ত্র।

আমাকে দেখে অহল্যা চুপ করে ভিজে কাপড়েই তাড়াতাড়ি উঠে এল। চোখে সুর্মা নেই, মুখে ওড়না নেই, পরনের ঘাঘরাটাও ভিজে গিয়ে এখন আর আবরণ নয়, পায়ের চামড়ারই আরেক পরত-মাত্র হয়েছে। হাঁটু থেকে পাতা অবধি ওর শরীরটা আমি যেন অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কাঁদো কাঁদো মুখ, অহল্যার আজ অন্য কিছুতে দ্রুক্ষেপ নেই, বললে, 'চম্পক পালিয়ে এসে আজ জলে ঢুকেছে। এদিকে ওর অসুখ, ও ঠিক মরে যাবে। ওকে কী করে ফেরাই বলুন তো।' বলে নিজেই আবার ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়তে লাগল, সুর করে ডেকে গেল হাঁসটাকে।

একটু পরে পাড়ের নরম কাদায় ছড়ানো পায়ের পাতার ছাপ রেখে রেখে চম্পক নিজেই উঠে এল। অহল্যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ওকে জড়িয়ে ধরল; কোনদিকে না চেয়ে, আমাকে কিছু না বলে, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল।

পরদিন সূর্য উঠে দেওদার গাছটার পল্লবের ফাঁদে ধরা দিয়েই পাতা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁবুর কানাতে ঝিকিমিকি রোদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, অহল্যার তখনও দেখা নেই। আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরময় অস্থির পায়ে ঘুরছি, দেখি মাঠ পাড়ি দিয়ে এক বুড়ো এদিকেই আসছে। তাঁবুর বাইরে পৌঁছে লোকটা ডালা নামিয়ে হাঁপাতে থাকল, তামাটে মুখে ঘাম। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'অহল্যা বলে এখানে কেউ রোজ—'

বললুম, 'হ্যাঁ, এখানেই। তুমি ওর শ্বশুর? অহল্যা এল না কেন। চম্পকের বুঝি বেশি অসুখ?'

গলায় ঠাট্টার ছোঁয়া ছিল। লোকটা অবশ্য সেটা টের পেলে না, বিনীতভাবে বললে, 'না, অসুখ অহল্যার নিজের। কাল হাঁসটাকে খুঁজতে বেরিয়ে সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ বাইরে ছিল, জলেও ভিজেছে। হাঁসটার জন্যেই বেটি একদিন মরবে।'

'ওটাকে খুব ভালবাসে বুঝি?'

ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে বুড়ো শিশুর মত হাসল।— 'খুব। ওকে ও শুধু তা দিয়ে ফোটায়নি, নইলে আর সবই করেছে। আমার ঘরে গেলে দেখতেন হাঁসের খোপটা উঠোনে নয়, ঘরের ভেতরে, অহল্যার বিছানার ঠিক পাশেই। প্রথম প্রথম বকতুম, এখন কিছু বলি না। একটু বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু ওর দোষ কী সরদারজী। ঘর খালি, আমরা দুজন মাত্র থাকি। একটা বাচ্চা পর্যন্ত নেই।'

বলেই বুড়ো উঠছিল। অনেক বেশি বলে ফেলেছে ভেবে লজ্জা পেয়েছে। বললুম, 'লালা, ব'স। এত তাড়া কিসের।'

ডালাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ো বললে, 'এখান থেকে মণ্ডিতে যাব। এগুলো বিক্রী করে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।'

ওর শিথিল চামড়া আর তোবড়ানো গালের দিকে চেয়ে বললুম, 'এই বয়সেও এত পরিশ্রম করছ, তোমার ছেলে শুনেছি লড়াইয়ে গেছে, সে কিছু খরচ পাঠায় না?'

দেখলুম লোকটার মুখ রক্তলেশহীন হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে বললে, 'আমার ছেলে লড়াইয়ে গেছে আপনাকে কে বললে।'

বললুম, 'অহল্যা।'

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে, চোখ মাটিতে রেখেই, বললে, 'অহল্যা মিছে কথা বলেছে সর্দারজী। আমার ছেলে জেলে।

'জেলে!'

'গিয়েছিল। এতদিনে তার খালাস হয়ে বেরিয়ে আসারও কথা। গাঁয়ের লোকে অনেক কথা রটায় সর্দারজী। কেউ কেউ নাকি ওকে দেহলির চোরিবাজারের একটা গলিতে দেখেছে।'

চোরিবাজার অঞ্চলের সুনাম ছিল না। চুপ করে রইলুম। বুড়ো নিজেই বললে, 'ওমপ্রকাশ এখন নাকি ভালো তবলচি হয়েছে। আর দিনে ওকে দেখা যায় ফতেপুরির ভিড়ে। আপনি নিশ্চয়ই দেহলি যান। খোঁজ নেবেন?'

একটা জোয়ানের চেহারা যেন চোখের সমুখে ভেসে উঠল। রাতে নাচের সঙ্গে যে সংগত করে, দিনে ফতেপুরিতে পরের পকেট হাতড়ায়।

'ওমপ্রকাশ জেলে গিয়েছিল কেন।'

লোকটা অনেকক্ষণ ইতস্তত করলে। বোধ হয় বলবে কি বলবে না স্থির করতে পারছে না। কিন্তু গ্রামের মানুষ স্বভাব-সরল, বেশিক্ষণ কথা চেপে রাখতে জানে না। আত মৃদু, অতি সঙ্কুচিতভাবে বললে, 'সেও শরমের কথা সরদারজী। গাঁয়েরই একটা লোককে ও ছুরি মেরেছিল। মা নেই, ছেলেটা বচপন থেকেই দলে মিশে আর শহরে ঘোরাঘুরি করে নষ্ট হয়ে যায়। এক-রোখা, চটলে আর কোন হুঁশ থাকে না।'

'কিন্তু ছুরি মেরেছিল কেন?'

বুড়ো আবার ঢোক গিললে। মাটিতে রাখা চোখ দুটোই ফেরালে এদিক ওদিক। ডালাটাকে শক্ত করে ধরলে, যেন একটা নির্ভর চাইছে। প্রাণ গেলেও আসল কথাটা ফাঁস না করে দেবার মত মনের জোর খুঁজছে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আবার বললুম, 'ছুরি মেরেছিল কেন?'

'অহল্যা মাঈয়ের মত মেয়ে হয় না, কিন্তু তাকেও সন্দেহ করত। সেই লোকটাকে অহল্যার সঙ্গে বার দুই কথা বলতে দেখেছিল।' বলতে বলতে অহল্যার শ্বশুর যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'লোকটা নেহাত বরাত জোরে বেঁচে গেল, তাই ওমপ্রকাশের ফাঁসি হল না। ঝোপের ধারে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, কতক্ষণ কে জানে, সকালে আমরা দেখি। খুন জমে কালো কালো চাপ বেঁধেছে, তখনো ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। পাশেই একটা নহর—তার জল লাল হয়ে গিয়েছিল সরদারজী।'

বুড়ো হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁপছিল। ঘরের কথা প্রকাশ করার লজ্জা, নিজের ছেলেকে ভালো না বাসতে পারার লজ্জা।

বললুম, 'তুমি এবার যাও, লালা। সময় পেলে বিকেলের দিকে তোমার বাসায় যাব।'

সময় পেয়েছিলুম। আমাকে দেখে ত্রস্ত অহল্যা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল, এক দিনের অসুখে চুলগুলো রুক্ষ, মুখখানি নীরক্ত-রুগ্ন। চম্পক ওর কোলেই, সরু সরু মোম-আঙুল শাদা পালকে বুলিয়ে দিয়ে অহল্যা আদর করছে।

এখন ভাবি সেদিন কী ছেলেমানুষি করেছিলুম। অল্প পরিচিত একটি গ্রাম্য মেয়ে, যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু দুধ আর সব্জি যোগান দেবার, সামান্য অসুখের খবর পেয়েই তাকে দেখতে ছোটা ঠিক হয়নি। সেদিন এতটা বিচার করিনি, দেখেছিলুম আমার পায়ের শব্দে ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ, গায়ের কাপড় টেনেটুনে আরেকটু সম্বৃত হওয়ার প্রয়াস।

'তোমাকে দেখতে এলুম অহল্যা। কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আর তোমার 'চম্পক?'

পাণ্ডুর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'সে-ও ভালো।'

আরও দু-চারটে কথা বলতে চাই, খুঁজে না পেয়ে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বললুম, 'বড়ো ঠাণ্ডা।'

'জী হাঁ।'

'আবার মেঘ করেছে। বর্ষা নামলে ভারী অসুবিধে হবে। বরফ পড়বে, না?'

'পড়তে পারে।'

অহেতুক, অর্থহীন আলাপ। শেষ পর্যন্ত মনে মনে আমার অচতুর রসনাকে ধিক্কার দিয়ে উঠে আসব, দরজা পর্যন্ত এসেও গেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি কালো-কালো চোখ মেলে অহল্যা এক দৃষ্টে আমাকেই দেখছে। মনে হল কিছু বলতে চায়।

বললুম, 'কী, অহল্যা।'

জামার ভাঁজ থেকে সসঙ্কোচে একটা চিঠি বের করে অহল্যা আমার হাতে দিলে।

'আজকের ডাকে এসেছে। পড়ে দেবেন?'

দ্রুত হাতে খামটা ছিঁড়লুম। উর্দু হরফ ভালো পড়তে পারিনে, কিছু সময় লাগল। চিঠিটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'তোমার স্বামীর চিঠি। শীগগির এখানে আসতে পারে লিখেছে। আর—আর' অল্প একটু কেশে সংকোচ জয় করে বললুম, 'তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছে।'

নিষ্প্রভ মুখে লজ্জার ছোপ দেখব ভেবে-ছিলুম। পরিবর্তে কঠিন একটি মুখভঙ্গী দেখতে হল। তিক্ত স্বরে অহল্যা বললে, 'ভালোবাসা!'

স্বল্পালোক ঘরে দীপ্ত দুটি অস্বাভাবিক চোখ জ্বলছে, চম্পকের পালকে সঞ্চরমান আঙুলগুলো দ্রুততর। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, ঝোপ ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে তাঁবুর কাছাকাছি এসে স্বস্তি পেয়েছি। তীক্ষ্ন-তিক্ত একটি স্বর তখনো কানে বাজছে, আর নহরের পাশে আহত, রুধিরাক্ত একটি লোককে ঈর্ষা করেছি। শুধু সন্দেহবশেই হয়ত ওমপ্রকাশ তাকে ছুরি মারেনি।

মাথায় চুবড়ি, কোলে হাঁস, অহল্যা পরদিন খুব ভোরে, প্রায় আলো ফোটার আগেই এল। পা দুটি কাঁপছে, কথা বলবার সময়ে গলাও। অসুখের দুর্বলতা এখনও যায়নি। দুধ নামিয়ে রেখেই বললে, 'আমাকে একটা চিঠির মুসাবিদা করে দিন সরদারজী।'

'কী লিখতে হবে।'

'ও—ও যেন এখানে না আসে।'

'স্বামী ফিরে আসুক তুমি চাওনা?'

অহল্যা বললে, 'না। ওর কোন পতা

ছিল না, সেই ভাল ছিল। ঢের সুখে ছিলুম।'

ওকে কথা দিলুম, চিঠির খসড়া নিয়ে বিকেলেই ওদের বাড়ি যাব। চম্পকের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঠাট্টা করে বললুম, 'ওর খোপটা এবার বিছানা থেকে সরিয়ে উঠোনের কাছে রেখে দিও।'

ঘরে দাঁড়িয়ে রুষ্টস্বরে অহল্যা বললে, 'কেন।'

একটু ভয় পেলুম। কোনমতে জবাব দিলুম 'এমনি। ওমপ্রকাশ কি এতটা পছন্দ করবে।'

অহল্যা বললে, 'আমি ভয় পাইনে।'

কানাডা-ইঞ্জিনের ভাঙা-মোটা গলার আওয়াজ, আবার একটা গাড়ি এল। চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম, সম্পূরণ সিং উঠে গিয়ে দেখে এসে বললে, এ-গাড়ি মীরাট পর্যন্ত যাবে। ফ্রণ্টিয়ার মেল আসতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে। তিন-পোয়া-শেষ বোতলটা দেখিয়ে বললে, এটা ফুরোবার আগেই গল্পও ফুরোবে। বাকিটা শুনুন।

বিকেলের অনেক আগেই সেদিন সূর্য ফেরার, তাঁবুটা থেকে থেকে থরথর কাঁপছে। ঝড় উঠেছে। খোলা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছি, এক একটা ঝাপটায় কাত করে ফেলছে, তবু চলছি। নেশার টান এমনই।

অহল্যাদের দরজায় গিয়ে টোকা দিলুম, সাড়া নেই। জঞ্জাল, গোবর, ছাইয়ের গাদা, তারই উপর দিয়ে বাড়িটার চারপাশে ঘুরলুম। দিন নিবু-নিবু, এরই মধ্যে কখন শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, মাথা বাঁচাতে একটা চালার নীচে দাঁড়াতে হল। শীতার্ত একটা কুকুর হঠাৎ কেঁদে উঠল, জানি না কখন ওর লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির জানলার একটা পাল্লা খুলে গেল, চম্পকের হলদে ঠোঁট দু'টি দেখতে পেলুম। শিলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলুম। চম্পকের ঠিক পিছেই এক জোড়া কালো চোখ, অন্ধকারেও মনে হল, ভীত।

ফিস ফিস করে অহল্যা বললে, 'কী চাই, কী।'

তীব্র শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যায়, বললুম, 'চিঠিটা এনেছি।' হাত বাড়িয়ে ওকে দিতে গেলুম, ও নিলে না, ত্রস্ত স্বরে বললে, 'ছিঁড়ে ফেলুন, ছিঁড়ে ফেলুন চিঠি। দরকার নেই।'

'দরকার নেই, অহল্যা?'

'না। ও আজ দুপুরে এসেছে।'

তবু বুঝি স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলুম। জানালার পাল্লাটা টেনে দিলে অহল্যা, ওর বিহ্বল-ব্যাকুল গলা শুনলুম, 'আর আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। ও হয়ত আপনাকে দেখে ফেলবে, হয়ত দেখে ফেলেছে। আপনি জানেন না ও কী শয়তান, কী নিষ্ঠুর। কী করে ঠিক নেই।'

কাপুরুষের মত, দ্রুত পায়ে সেদিন পালিয়ে এসেছি। হাওয়ায় হাজার সাপের হিম-ছোবল, কানের দুপাশে অগণন শিস। বিদ্যুতের আলোয় একটি ছুরি-ঝলসানো, একটি ক্রূর-বিচিত্র হাসি দেখলুম।

তাঁবুর একটা দিক উড়ে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টাতেও সেটা ঠিক করতে পারলুম না। খাটিয়ায় ঠকঠক করে, কাঁপতে কাঁপতে সারারাত প্রায় জেগে কাটাতে হল। কাঁচা চামড়ার খোঁজে এখানে আসা, কিন্তু সে-চেষ্টা এ-ক'দিন বিন্দুমাত্র করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা নিয়েও বারবার নিজেকে প্রশ্ন করলুম, তবু কী মোহে এখানে পড়ে আছি।

আসবেনা ভেবেছিলুম, তাই অহল্যাকে পরদিন দেখে কম অবাক হইনি। ঝড় নেই, কিন্তু আকাশ এখনও কালো। মাঠের দিকে চেয়ে ওকে বললুম, 'এক রাতে কত ঘাসের ফুল ফুটেছে, দেখেছ। একেবারে ছেয়ে গেছে।'

অহল্যা মৃদু গলায় বললে, 'ফুল নয়, বরফ।' পায়ের একটি পাতা অল্প একটু তুললে। দেখলুম সেখানে রক্তের চিহ্ন-মাত্র নেই। বললুম, 'এই শীতেও হাঁসটাকে বাইরে এনেছ?'

'ঘরে রেখে আসতে ভরসা হলনা।'

এতদিন লক্ষ্য করিনি, আজ দেখলুম চম্পকের হলদে ঠোঁট দুটির উপর নিরীহ দু'টি চোখ। সে-চোখে আতঙ্ক স্পষ্ট।

অহল্যা বললে, 'আমি এবারে যাই। ও হয়ত এসে পড়বে। হয়ত এসেছে। আড়াল থেকে দেখছে।'

বাধা দিইনি। আরও ভালো করে কম্বল জড়িয়ে বিমূঢ়ের মত খাটিয়ায় বসেছিলুম।

তখনও বেলা যায়নি, সেদিনই ওমপ্রকাশ এল। তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়েনি, কেননা আকাশে আলো ছিলনা। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই এসেছিল, তবু চমকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'কে?'

পরনে ডোরা কুর্তা আর ঢিলে পায়জামা, ওমপ্রকাশ ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। —'আমি। পরিচয় দিলে হয়ত চিনবেন। অহল্যা আমার স্ত্রী। এখানে তো সে প্রায়ই আসে, না?'

'সে তো দুধ দিতে।' নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলুম, নইলে কৈফিয়ত দিতে যাব কেন।

'দুধ দিতে।' স্পষ্ট দেখতে পাইনি, তবু ওমপ্রকাশের মুখে একটু হাসি খেলে গেল অনুভব করলুম। —'সে যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'নিমন্ত্রণ? কিসের?' মনে আছে এই দুটি কথা বলতেও গলা কেঁপেছিল।

'বিশেষ কিছু না, ছোট-খাটো একটা উৎসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে কিনা, তাই। ভাবনা করবেন না, খাবারের বন্দোবস্ত ভালোই হয়েছে। রোস্ট হবে—আপনি রোস্ট ভালবাসেন সর্দারজী?'

হালকা গলা, যেন ঠাট্টা করছে। তবু ভরসা পেলুম না, খুঁজে খুঁজে দেশলাই বের করে আলো জ্বাললুম। ওম্‌প্রকাশ হাসছে।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ওকে কী বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার সারাদেহ শক্ত, সমস্ত কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। ওর হাতের দিকে এতক্ষণ তাকাইনি, দেখিনি ওর করতল কাঁচা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, রক্তের ছিটে ওর পায়জামা-কুর্তাতেও।

আড়ষ্ট স্বরে বলতে গেলুম, 'তুমি কি... অহল্যাকে—'

বাকিটা ওমপ্রকাশই অনুমান করে নিলে। কুৎসিত একটা হাসি কষের মত যেন দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।—'হল না। ভুল ভেবেছেন। অহল্যাকে নয়, তার হাঁসটাকে এই শেষ করে আসছি। জোয়ান হাঁস, কী তাজা খুন দেখেছেন। ফিরে গিয়ে ওটাকে তন্দুরে চড়াব। আপনি খাবেন, অহল্যাকেও খাওয়াব। সেটা আরও কড়া শাস্তি হবে, না?' আরেকটু এগিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ওমপ্রকাশ বললে, 'যাকে বিছানায় তুলেছিল, তার মাংস চাখতে অহল্যার মন্দ লাগবে না, কী বলেন!'

যেমন এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ ওমপ্রকাশ সেদিন অন্তর্হিত হয়েছিল। কখন, খেয়াল করিনি। সেদিনই তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে এসেছি। ঘোর দুর্যোগ, ট্রেন যেন থর থর করে কাঁপছে, সমস্ত রাত্রি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি, কী দেখেছি জানেন? রক্তাক্ত ছুরি-হাতে ওমপ্রকাশ ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে, অহল্যা খেতে বসেছে। টপ-টপ চোখের জলে একটি ঝলসানো মাংসের টুকরো নোন্‌তা হয়ে উঠছে। বাবুসা'ব, সেই থেকে কোনদিন রোস্ট খেতে পারিনি।

জানালার শার্সি ঝনঝন কেঁপে উঠল। গমগম ব্যস্ততা, কুলি আর ভেণ্ডরেরা হঠাৎ জেগে উঠেছে। বাইরে উঁকি দিয়ে সম্পূরণ সিং বললে, 'ফ্রণ্টিয়ার মেল এল।'

লেফটেন্যাণ্ট রবার্টস, প্রবিন ও ওয়াটসন ব্রেকফাস্টে বসিয়াছিল, এমন সময়ে রবার্টসের আরদালি অঞ্জন তেওয়ারি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সাহেব, পরশুদিন যে-গোয়েন্দা এসেছিল আজ আবার সে এসেছে।"

রবার্টস একখানা ন্যাপকিনে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "উত্তম, তাকে নিয়ে এসো।"

অল্পক্ষণ পরেই একটা ছোকরাকে সঙ্গে করিয়া অঞ্জন তেওয়ারি ঢুকিল। লোকটা তিন গজী এক সেলামে সাহেবত্রয়কে অভিবাদন করিয়া রবার্টসের হাতে ছোট এক টুকরা কাগজ দিল। রবার্টস পড়িল কাগজে ইংরাজিতে লিখিত আছে, মিস মার্টিনডেল। কাগজখানা সে প্রবিন ও ওয়াটসনের হাতে দিল, তাহারাও পড়িল, মিস মার্টিনডেল।

রবার্টস বলিল, "আশা করি, আমাদের ফাঁদে ফেলবার জন্য কৌশল নয়।"

প্রবিন বলিল, "হস্তাক্ষর ইংরাজি ছাঁদের।"

ওয়াটসন বলিল, "তাহলে আরও কিছু লিখিত থাকত, যেমন অত্যাচারের কথা, যাতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।"

রবার্টস বলিল, "ওয়াটসন, তোমার কথাই ঠিক।"

তিনজনে এবারে হিন্দুস্থানীতে লোকটাকে জেরা আরম্ভ করিল, অঞ্জন তেওয়ারি মাঝে মাঝে সাহায্য করিতে লাগিল।

"গ্রামটা কত দূরে?"

"তা সাহেব আট দশ ক্রোশ হবে।"

"তুমি কখন রওনা হয়েছিলে?"

"কাল খুব ভোরে।"

"এত বেশী সময় লাগল কেন?"

"লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হয়। সিপাহীদের হাতে পড়লে কি আর রক্ষা থাকত।"

"কেন?"

"ঐ কাগজের টুকরো খুঁজে পেলে আমাকে আস্ত রাখত না। সাহেব, সিপাহীদের তো চেন না।"

তাহার শেষ কথাটিতে তিনজনে হাসিয়া উঠিল, ভাবটা হাড়ে হাড়ে চেনে।

"তবে তুমি কোন্ সাহসে কাগজটা আনলে?"

"এই সাহসে," বলিয়া সে কাপড়ের থলির মধ্য হইতে একটা বাঁশের বাঁশি বাহির করিল। বাঁশিটার গায়ে ছোট একটি ফাটল দেখাইয়া বলিল, "মেম সাহেব কাগজটাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তার পরে আমি এইভাবে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে এলাম।" তারপরে পাছে সাহেবগণ ভাবে যে, সে বাঁশি বাজাইতে জানে না, তাই সে সোৎসাহে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

অঞ্জন তেওয়ারি তাড়া দিয়া বলিল, "এই উল্লু থাম্।"

লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিল, "সাহেব, আমি নাচতেও জানি।"

প্রবিন হাসিয়া যাহা বলিল তাহার বাংলা করিলে দাঁড়ায় খুব দীপ্তিমান বালক।

"তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"হেঁটে গেলে যাব।"

"আমরা ঘোড়ায় যাব।"

"তবে কি করে যাব? ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে পারব কেন?"

"তোমাকে ঘোড়া দেখ, চড়তে জানো?"

"ঘোড়ায় চড়তে জানি, হাতিতে চড়তে জানি, এমন কি গাছে চড়তেও জানি।"

সাহেব তিনজন হাসিয়া উঠিল।

অঞ্জন তেওয়ারি ধমক দিয়া বলিল, "চুপ রও উল্লু।"

রবার্টস ইংরাজিতে বলিল, "ওকে আগের দিনে যে-সব জেরা করেছিলাম, আর এক-বার ক'রে দেখি সেদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে কি না।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল, "গাঁয়ের কি নাম?"

"ছোট রামপুর।"

"সেদিন কি বলেছিলে?"

"সেদিনও ছোট রামপুর বলেছিলাম, ও-গ্রাম আজ পাঁচ শো বছর হল ছোট রাম-পুর।"

"ও মুসলমানদের গ্রামে তুমি কেন? তুমি তো হিন্দু।"

"কেন, গাঁয়ে কি গোরু নেই?"

"গোরুর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?"

"গোরু বা মুসলমানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি গোরু চরাই।"

"কেন মুসলমানে কি গোরু চরাতে জানে না?"

"না ওরা গোরু চরায় না, ওরা গোরু খায়।"

তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। ওয়াটসন বলিল, "বাচ্চা ফলস্টাফ।"

"মিস মার্টিনডেল তোমাকে কি করে দেখল।"

"চোখ দিয়ে।"

"প্রবিন, সাবধানে জেরা করো, ও তোমার চেয়ে পাকা।"

"মেমসাহেব মুসলমানকে বিশ্বাস না করে তোমাকে বিশ্বাস করল কেন?"

"এতো অতি সহজ কথা। মেমসাহেব জানে, কোন হিন্দু তাকে সাদি করবে না, তাই আমি খবরটা পৌঁছে দেব বলে তার মনে হয়েছিল।"

"যে-মুসলমান ওকে নিয়ে গিয়েছিল, সে ছাড়াও তো গাঁয়ে অন্য মুসলমান ছিল।"

"সাহেব, দরকার হলে ওরা গাঁ সুদ্ধ একজনকে সাদি করে। সকলেরই মনে আশা আছে, তাই কে আর খবর দেবে?"

"তুমি যখন পরশু এখান থেকে ফিরে গেলে, মেমসাহেব কি বলল?"

"আগে আমি কি বললাম শোনো। বললাম, 'মেমসাহেব তোমার হাতের রোকা না পেলে সাহেবরা আসবে না।' তারপরে অনেকক্ষণ কি ভেবে কোত্থেকে এই লেখা কাগজটুকু এনে আমার হাতে দিল।"

প্রবিন বলিল, "তুমি আমার কাছে নোকরি করবে?"

"কি, লড়াই?"

"না, আমার ছেলেমেয়েদের তদারক।"

"খুব পারব, গোরু চরিয়ে হাত পেকেছে।"

"তোমার নাম কি?"

"ন্যাড়া গোপাল।"

"কাল যে শুধু গোপাল বললে?"

"ভেবেছিলাম মাথা দেখেই ন্যাড়া বুঝতে পারবে, ওটা আর বলতে হবে না।"

সকলে আবার হাসিল। রবার্টস বলিল, "এখন তুমি অঞ্জন তেওয়ারির কাছে থাকো গে, ঠিক সময়ে খবর দেব।"

অঞ্জন তেওয়ারির সঙ্গে ন্যাড়া গোপাল বাহির হইয়া গেল।

রবার্টস বলিল, "খবর ঠিক বলেই মনে হয়।"

প্রবিন বলিল, "কোন সন্দেহ নেই।"

ওয়াটসন বলিল, "ছেলেটি খুব স্মার্ট।" তখন তাহারা স্থির করিল যে, রাত্রে এমন সময়ে রওনা হইতে হইবে যে, একেবারে ভোর রাত্রে গিয়া গ্রাম ঘেরাও করিতে পারে; কেহ সন্ধান পাইবে না, কেহ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে পাইবে না। আরও স্থির হইল যে, তাহাদের তিনজনের সঙ্গে একদল অশ্বা-রোহী থাকিবে, আর সঙ্গে থাকিবে অঞ্জন তেওয়ারি ও গোপাল।

২

কাগজের টুকরা পাঠাইয়া দিয়া অবধি মিস মার্টিনডেলের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সে ভাবিল গোপাল ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে তো, না তার আগেই সিপাহীদের হাতে পড়িবে। আবার কখনো সে ভাবে, গোপাল সিপাহী-দের চর নয় তো? তাহাকে আপন ফাঁসে জড়াইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত প্রমাণের দাবি করে নাই তো? তারপরে মনে হয়, না গোপালকে তো তেমন বলিয়া বোধ হয় না, ছোকরা যেমন সরল, তেমনি মজার, এমন লোক কি গোয়েন্দা হইতে পারে।

তখন তাহার মনে পড়ে অনেক কয়দিন হইল সে ছোকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, সন্দেহের কিছু দেখে নাই। কয়েকদিন আগে গাঁয়ের লোকের কানাঘুষায় সে জানিতে পারিয়াছিল যে, ইংরেজ সৈন্য কানপুর হইতে লখনৌ চলিয়াছে। পাছে তাহারা এই গাঁয়ে আসিয়া পড়ে, একবার সকলের গ্রাম ত্যাগের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। পরে সকলে গ্রামেই থাকিয়া যায়। ইংরেজ সৈন্য পূব দিক দিয়া চলিয়া যাইবে, গ্রামে আসিবে না। তখন হইতে তাহার আধার গোপনে খবর দিবার বুদ্ধি আসে, কিন্তু উপায় কি? তখন গোপালের কথা মনে হয়, গোপালকে আগেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল। এবারে সে গোপালকে ডাকিয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে আলাপ জমাইল।

"গোপাল, কত বেতন পাও?"

"মেমসাহেব, আবার বেতন? আমার ন্যাড়া মাথা আস্ত থাকলেই যথেষ্ট।"

"তোমাকে এরা বুঝি মারে?"

"মারে না! এরা আমাকে মারে, আমি এদের গোরুগুলোকে মেরে তার শোধ নিই।"

"অন্যত্র চাকুরি নাও না কেন?"

"কে আর চাকুরি দিচ্ছে?"

"কেন, কোম্পানীর কাছে?"

"কোম্পানী কি গোরু পোষে?"

"অন্য কাজ দিতে পারে।"

"তবে জোগাড় করে দাও না?"

"সিপাহীরা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে না?"

"সিপাহীর রাজত্ব আর কয়দিন? কোম্পানীর সিপাহী এলো বলে। তারপরে গলার স্বর নিচু করিয়া বলে—"কাছে এসে পড়েছে, লখনৌ যাচ্ছে।"

"যাও না, একবার দেখে এসো।"

"অমনি জানিয়ে আসব যে, তোমাকে আটক করে রেখেছে, কি বলো মেমসাহেব?"

"সিপাহীরা যদি জানতে পারে, তোমাকে আমাকে দুজনকেই মেরে ফেলবে।"

"ন্যাড়া গোপালের পেট থেকে কথা আদায় করা বড় শক্ত, যমে পারে না।"

"তবে যাও না।"

অতঃপর গোপাল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে চলিয়া যায়—আর ফিরিয়া আসিয়া লিখিত প্রমাণ দাবি করে।

মিস মার্টিনডেল ভাবিতেছিল ন্যাড়া গোপালের পেট হইতে যমে কথা আদায় না করিতে পারিলেও হাতের কাগজের টুকরা, তার জন্য যমের দরকার হইবে না, সিপাহীরাই যথেষ্ট। তারপরে ভাবিল, না, ছোকরা চালাক-চতুর আছে, ভয় নাই। তারপর আবার ভাবিল যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন আর দুশ্চিন্তা করিয়া কি ফল?

এমন সময়ে মনসুর প্রবেশ করিল। এই লোকটাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। দিনে রাতে দু'তিনবার সে দেখা দেয়, কখনো হাতে খাদ্য, কখনো চাবুক, অবাধ্য বশ করিবার উপায় মনসুর জানে বটে।

মনসুরের হাতে খানকতক রুটি ছিল, মনসুর বলিল, "কি বিবি, মত বদলেছে?"

"মত আবার কিসের?"

শুধাইল, আশা করি তুমি মিস মাটিনডেল?"

তরুণী বলিল, "তোমার কথা সত্য।"

"তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।"

"আশা করি তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত?"

"এখনি।"

এমন সময়ে ন্যাড়া গোপাল চিৎকার করিয়া উঠিল, "সাহেব, ঐ যে মনসুরকে নিয়ে আসছে।"

সকলে দেখিল, কয়েকজন সিপাহী একটি যুবককে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে।

মিস মাটিনডেল আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র মনসুর বুঝিয়াছিল যে, তাহার মেমসাহেবের আছে, পুরুষের দেহের বীভৎস ব্যগ্র নারী-মনের সেখানে পৌঁছিয়া মিস্ মাটিনডেলকে একেবারে বিদ্রোহিণী করিয়া তুলিল। সে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ অন্যায়, অন্যায়!"

মনস্তাত্ত্বিক হইলে সে বুঝিতে পারিত তাহার মনরূপ মাস্তুলের চূড়ায় একখানা অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত পাল খাটানো হইল।

রবার্টস্ শুধাইল, "এই লোকটা তোমাকে কয়েদ করে রেখেছিল?'

"সিপাহীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।"

"তারপর আটকে রেখেছিল?"

"কোম্পানীর ফৌজ কাছে ছিল না, কাজেই।"

"এখন তো ফৌজ এসেছে, চলো।"

ঐযে মনসুরকে নিয়ে আসছে

স্বপ্ন এবারের মতো শেষ, সে পালাইতেছিল। গ্রামবাসীরা সাহেবদের করুণা পাইবে আশায় তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে।

মনসুরের সুন্দর, সুগঠিত, সবল দেহ বাঁধনের চাপে বিকল হইয়া বীভৎস দেখাইতেছিল। টানাটানিতে তাহার গায়ের কাপড় ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া গিয়াছে, পিঠের ফর্সা রঙের উপরে মোটা মোটা কালশিরা দেখা যাইতেছে, অথচ তাহার মুখের কমনীয়তা এতটুকু কমে নাই, চিবুকের সুডৌল দৃঢ়তা তেমনি অটুট।

পুরুষের বীরবপুর এই বীভৎস অপমানে হঠাৎ মিস মাটিনডেলের অন্তরতম নারী-প্রকৃতি মোচড় খাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মানুষের গোপনতম সত্যতম যে পরিচয়, যেখানে পুরুষ আছে আর নারী

"না।"

"তার অর্থ?"

"আমি এখানেই থাকব।"

তিনজনে চমকিয়া উঠিল, "তুমি কি বলছ? আমাদের বিশ্বাস তোমার মাথা ঠিক নাই।"

"মাথা ঠিক আছে।"

"তবে খবর পাঠিয়েছিলে কেন?"

সত্য কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়, তত বলিবার শক্তি বা ইচ্ছা মিস্ মাটিনডেলের ছিল না। আর থাকিলেও কেন খবর পাঠাইয়াছিল, তারপরে কেনই বা হঠাৎ মতি পরিবর্তন করিল, সে-সব রহস্য সে জানিবে কি প্রকারে? শুধু বলিল, "একবার দেশের লোক দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।"

"আর এখন এই বিদেশী লোকের মধ্যেই থাকবে স্থির করেছ?"

"নিশ্চয়।"

"আশা করি, মতি পরিবর্তন হবে।"

"আশা করি, হবে না।"

"তোমার জন্য কি করতে পারি?"

"ঐ লোকটার বাঁধন খুলে দিতে হুকুম করো।"

মনসুর বন্ধনমুক্ত হইল। তাহার বিস্ময় সবচেয়ে বিস্ময়। প্রথমে বিপদ, পরে বিস্ময়, দুই ধাক্কায় সে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল; কথা বলিবার, ভাবিবার, কি হইতেছে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল।

একজন ইংরেজ-রমণীর বিকৃত রুচি ও অধঃপাত দর্শনে ইংরাজ সৈনিকত্রয় ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের কিছু আর করিবারও ছিল না। তাহারা আর একবার মিস্ মাটিনডেলকে অনুরোধ করিয়া ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহারা একটু দূরে যাইবামাত্র মনসুর মিস্ মাটিন ডেলের কাছে গেল, অনুরোধের সুরে বলিল, "এবার ঘরে ফিরে চলো।"

মিস্ মাটিনডেল মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "চুপ করো নির্বোধ।"

মনসুর ভাবিল, "এ আবার কি বিপদ।"

ন্যাড়াগোপাল স্থির করিয়াছিল, সে আর এ গ্রামে থাকিবে না, সাহেবদের সঙ্গে যাইবে। সে মনসুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ফিরিঙ্গি মেয়েদের মনের কথা বোঝে কোন্ শালা! যেমন ইদ্রি মিদ্রি ভাষা, তেমনি ইদ্রি মিদ্রি ভাব। ঠ্যালা বুঝবে ভাই মনসুর।"

মনসুর ইতিমধ্যেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সকলে গ্রামে ফিরিয়া গেল। কেবল মিস্ মাটিনডেল সেই অর্ধপক্ক শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তেমনি আবক্ষ নিমগ্ন থাকিয়া দেখিল, তাহার স্বজাতি পুরুষত্রয় ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া, অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে, আর মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, মাস্তুল ক্রমে নূতন নূতন পাল তুলিয়া দিতেছে। অপরিচিত আকাশের অভাবিত হাওয়ায় এই তরুণ-তরুণী কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, কোন্ বন্দরে, কোন্ আঘাটায়, কোন্ অতলে!

চল্লিশ বছর আগের কথা। কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গের পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছি। এক হুলুস্থুল ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে আমাদেরই পাশের গ্রামের এক বালক সাধুকে নিয়ে। লোকের মুখে মুখে অনেক অলৌকিক কথা ছড়িয়ে পড়েছে, দশ গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে, প্রত্যহ চলেছে ধুম কীর্তন।

গোড়ার কথা এই। মাধব সাধারণ গৃহস্থ ঘরের তৃতীয় সন্তান। ছেলেবয়স থেকেই কৃষ্ণপুজোয় মতি। মাটির কৃষ্ণঠাকুরের সম্মুখে স্থির হয়ে সে থাকে, পুজো করে, গুন গুন করে হরিনাম করে। মাধবের বয়স যখন দশ কি বার বছর, তখন তাকে আবিষ্কার করলেন তারিণী মোক্তার। ওর বাপকে ডেকে বললেন, এ ছেলে সামান্য নয়, দেবাংশে জন্ম। পূর্বজন্মের অনেক তপস্যায় এমন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ এসেছেন, হেলা করবেন না। কথা শুনে বাপ-মা ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হয়।

শেষ পর্যন্ত ভার তারিণীই নিলেন। টিনের একখানা ছোট চৌচালা ঠাকুর-ঘর তৈরি হল। চতুর্দোলে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, বিধিমত পুজোর সাজসরঞ্জাম। নতুন খেলনা পেলে লোক যেমন খুশী হয়, মাধব তেমনি-ভাবে পুজো নিয়ে মেতে উঠল। মাধব সুকণ্ঠ, দরদ দিয়ে কীর্তন গায়, দুচোখে জলধারা গড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝে ভাব হয়।

তারিণী হলেন শিক্ষাগুরু। চৈতন্য-চরিতামৃত ভাগবত ইত্যাদি পাঠ হয়। বালক সাধু মাধব কীর্তনের আসরে ভাবস্থ হয়ে বসে থাকে, ভক্তরা পায়ের ধুলো নেয়। এমনি অনেক কথা শুনলাম।

একদিন বিকেলে গেলাম বালক সাধুকে দেখতে। সঙ্গে গ্রামের অনেকেই চলেছে। মানিক বসাক বৈষ্ণব, ভক্ত। বলে, বুঝলেন ঠাকুরকর্তা, নদীয়ার যিনি, তিনিই এসে-ছেন। মহাপ্রভুর সব লক্ষণ মিলে যায় ও'র সঙ্গে। আমি হেসে বললাম, বটে।

দর্শন হল। ছোট্ট একটা জলচৌকিতে আসনের উপর মাধব বসেছে, পরনে লাল-পেড়ে ধুতি, গায়ে বৃন্দাবনী ছাপের চাদর। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, তাতে মালতী ফুলের মালা। কিশোর মুখখানিতে মধুর হাসি, শান্ত দৃষ্টি। বালকসুলভ চাঞ্চল্য নেই। ভক্তরা আসছে, প্রণাম করছে, বালক ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করে, হরিপদে মতি হোক। এমন সময় সন্ধ্যার শঙ্খ বেজে উঠল। আরতির সময়। মাধব ঠাকুর-ঘরে গেল। পঞ্চপ্রদীপ ধূপ ধুনা দিয়ে আরতি হল। ভক্তরা কৃতাঞ্জলিপুটে আরতি দেখছে, মাধব তন্ময়। বাদ্য থামল, হরিধ্বনি দিয়ে ভক্তরা মাটিতে গড়াগড়ি দিল। মাধব আসন ছেড়ে ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, ভাবা-বেশে একটু দুলছে, মুখে অনুচ্চস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি। মাধবের মা এসে ওকে অন্দর-মহলে নিয়ে গেলেন। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

এক বছর পর। বড়দার সঙ্গে দেশের বাড়িতে এসেছি। বৈশাখ মাস। এই সময় প্রতি বৎসর আমাদের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব হয়। বালক সাধুর কথা শুনে বড়দাদা উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তারিণী মোক্তারের যোগাযোগে ব্যবস্থা হল। উৎসবের আগের দিন বিকেলে তারিণী মাধবকে নিয়ে এলেন। এক বছরে মাধব একটু বড় হয়েছে, মুখে সেই মধুর হাসি, শান্তশিষ্ট, বিনয়ী। বড়দা আদর করে আশীর্বাদ করলেন। মাধব পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আশীর্বাদ করুন যেন কৃষ্ণপদে মতি থাকে। সবই ঠাকুরের কৃপা, বলে বড়দাদা ঠাকুরের কথা বলতে লাগলেন।

এ বাড়ির ধরন আলাদা। কেউ মাধবকে জীবন্ত ঠাকুর বা অমনি কিছু ভেবে ভক্তিতে

গদগদ হচ্ছে না, অথচ যত্ন ও স্নেহের ত্রুটি নেই। মাধব যেন মানুষ হয়ে খুশীই হল। বৌদিদিদের কাছে কলকাতার গল্প শুনতে চায়। রাতে আমার ঘরেই ওর শোবার ব্যবস্থা। শুয়ে বলে, দাদা ঘুমুলেন না কি? আমি বলি, কেন, মাকে ছেড়ে এসে মন কেমন কেমন করছে? মাধব হাসল। আজ ভক্তের উপদ্রব নেই। দুটো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। গল্প—ছেলেমানুষী গল্প শুরু করা গেল। কলকাতা শহর, রেল স্টীমার সম্বন্ধে ওর প্রচুর কৌতূহল। কথার ফাঁকে বলি, তুই তো ভগবান, চোখ বুজলে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাস। মাধব বলল, কি যে বলেন দাদা, তারিণীবাবুই আমাকে ভগবান করে তুলেছেন। লোকে যে কত বিরক্ত করে! আমি কৃষ্ণনাম করি, এই বইতো নয়।

তামাক খাবার ইচ্ছে হল। কলকেটায় হাত দিয়েছি, মাধব তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে বলে, করেন কি দাদা। নিজেই কলকে নিয়ে বাইরে বারান্দায় গেল। আলসে থেকে ঘসির আগুন দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল। হুকোটা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় নাকি যুদ্ধ লেগে গেছে। আমি বললাম, কলকাতায় নয়, বিলেতে। ইংরেজ জার্মানে যুদ্ধ। গেঁয়ো ছেলেকে ফলাও করে যুদ্ধের কথা শোনাচ্ছি, এমন সময় ও বলে উঠল, যুদ্ধ করুক, কিন্তু ওরা পাট কিনছে না কেন, গাঁয়ের কৃষকেরা এই কথা নিয়ে বলাবলি করে। কথায় কথায় দুজনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা হুলুধ্বনি শুনে ঘুম ভাঙল। বসাকপাড়ার মেয়েরা আঙিনায় দাঁড়িয়ে। মাধব বারান্দায় আসামাত্র পায়ের ধুলো নেবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ওর মুখে বিস্ময় নেই, বিরক্তি নেই—বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মেজবৌদি এসে ওকে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

ঠাকুরের পুজো আরম্ভ হল। শহর থেকে ভক্তরা এসেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ভোগ রান্না নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় হাজার লোক খিচুড়ী প্রসাদ পাবে। ঠাকুর-ঘরের সামনে চাঁদোয়া খাটান হয়েছে, ফরাসে বসে ধর্মকথা আলোচনা চলছে। এমন সময় সেজেগুজে মাধব এল। সঙ্গে তারিণী মোক্তার। মাধব স্থির হয়ে বসে ঠাকুরের কথা শুনছে। ওর মুখে হরিকথা শুনবার জন্য অনেকের কৌতূহল। মাধব মৃদু মৃদু হাসে; বলে, আমি কি জানি, সবই কৃষ্ণের কৃপা।

আমরা ভোগ রান্না নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় গ্রাম্য পুরোহিত হেম ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন। গায়ে পড়ে বলতে লাগলেন, বালক সাধু না আর কিছু! হাবা গোবা ছেলেটাকে নিয়ে তারিণী কারবার খুলেছে ভাল। সব শেখান পড়ান বুঝলে হে। মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ সাধু হয় না, সাধন ভজন চাই। এ বুজরুগি একদিন ভাঙবে দেখে নিয়ো। ছেলেদের কাছে উৎসাহ না পেয়ে হেম ঠাকুর সরে গেলেন।

হরি কর্মকার বললে, ওর ঐ রকম কথা। ভগবানের বিভূতি কার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। আরো তো কত ছেলে আছে, এমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে দিন রাত ভাবে বিভোর হয় ক'জন শুনি!

এমন সময় একটা গোলমাল শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, চৌধুরী-গিন্নী আলু থালু বেশে মাধবকে কোলে নিয়ে বসেছেন, লজ্জা সরম নেই। গোপাল, গোপাল আমার, স্বপ্নে দেখা দিয়ে লুকিয়ে ছিলে, এবার আর ছেড়ে দেব না। তাঁর আদরে, গদগদ কথায়, মাধব লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে আছে, ভক্তগণ চমৎকৃত। আমি এগিয়ে গিয়ে বলি, খুড়িমা, এত লোকের সামনে একি হচ্ছে। তিনি সজল নয়নে বলেন, আমার গোপালকে পেয়েছি, তোরা কি বুঝবি। নিঃসন্তান প্রৌঢ়া মহিলার মা হবার আর্ত আবেগ সম্বরণ করা কঠিন। তারিণী খুশী হয়ে বলে, আপনার গোপাল যখন কৃপা করেছেন, তখন আর ভাবনা কি? জয় মা শচীদেবী। তারিণীর নাটুকেপনায় কেউ কেউ মুখ টিপে হাসল, কিন্তু দেখলাম, অনেকেরই চোখ ভক্তিতে ছল ছল করছে।

পুজো হোম শেষ হল, তারপর প্রসাদ বিতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি জয়, হরিধ্বনির মধ্য দিয়ে সে পর্ব মিটল। অপরাহ্নে মঙ্গলারতির পর কীর্তন। মাধবের দুচোখে জলধারা, ভাবের আবেগে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। মানিকদা ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন। 'জীব তরাতে নিমাই এসেছে—দেখে নেরে দুচোখ ভরে' আখর দিয়ে তারিণীও নাচতে লাগল। এক এক জন দশা পড়ে, আমরা মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করে ঠাণ্ডা করি।

মাধব তিন চার দিন আমাদের এখানেই রইল। বড়দাদার ওকে খুব ভাল লেগেছে। উত্তম আধার, খাঁটি ভক্ত। একবার বেলুড় মঠে গেলেই ও ঠিক পথ পাবে। বড়দাদা ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে চান, মাধবের খুশি ধরে না। আমাকে বলে, দাদা আপনি থাকবেন তো, আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাবেন। আমি হেসে বলি, কলকাতা গেলে তোকে মানুষ করে দেব। কতকগুলো আধ-পাগলা লোকের এই পাগলামি, তোকেও পাগল করে ছাড়বে। মাধব যেন কতকটা অসহায় ভাবেই বলে, কি করি, ছাড়ে না যে। আমি বিদ্রূপ করি, মাধব হাসে—মধুর হাসি।

তারিণী সেয়ানা, কিছুতেই মাধবকে নিয়ে কলকাতা যেতে রাজী হয় না। অনেক সাধ্য সাধনার পর বড়দাদা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তারিণী মাধবকে নিয়ে চলে গেল। কয়েকদিন বালক সাধুর আলোচনা চলল। আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। এর পর দু-চারবার দেশে গিয়েছি, মাধবের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম, মাধব বাপ-মা ছেড়েছে, তারিণীও ছেড়েছে মোক্তারি। আশ্রম হয়েছে, মাধব ঠাকুর গুরু। ধর্মমূঢ়তায় অন্ধ ভক্তিবাদের দেশে আশ্চর্য ঘটনা কিছু নয়। ফকির সাধু মোহন্ত নিয়ে লোকে হঠাৎ খেপে ওঠে, অলৌকিক শক্তির কথা মুখে মুখে ছড়ায়, তারপর সেই সব দুদণ্ডের বুদ্বুদ ফেটে মিলিয়ে যায়। এই বালক সাধু তেমনি একটা সাধারণ ঘটনা।

আট দশ বছর পরের ঘটনা। দেশে যাচ্ছি, ট্রেনের দেরি হওয়ায় স্টীমার ধরা গেল না, সিরাজগঞ্জে রয়ে গেলাম। উঠলাম গিয়ে বড়দাদার বন্ধু শশধর ডাক্তারের বাড়ি। ভাল পশার, অবস্থা সচ্ছল। কলকাতায় পড়ার সময় থিয়োজফি আলোচনা করতেন। বিদেহী ও দেহধারী মহাত্মা ও যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। অন্ধ-আবেগে সাধু-সন্ন্যাসী সেবায় অনেক খেসারত দিয়েছেন, কিন্তু স্বভাব শোধরায় নি। বাড়িটা গৃহ-ডাক্তারখানা এবং ঠাকুরবাড়ির সমন্বয়।

স্নান-আহারের পর ডাক্তারখানার বারান্দায় বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় দেখি, মাধব অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল। বালক যুবক হয়েছে। পরনে হলদে রঙের ধুতি, পায়ে রুপোর পাতে মোড়া খড়ম, গায়ে চাদর। লম্বা কালো চুল মাথার মাঝখানে দু ভাগ হয়ে কাঁধ ছেড়ে এলিয়ে পড়েছে। মুখে সেই মধুর হাসি। ডাকতেই ফিরে তাকাল, দাদা যে, কেমন আছেন। দু হাত তুলে নমস্কার করল, লক্ষ্য করলাম পায়ের ধুলো নিল না। বালক সাধু এখন মাধব ঠাকুর। অবশ্য অন্তরঙ্গ হয়েই আলাপ করল, সকলের খোঁজ-খবর নিল।

শশধর ডাক্তার এসে বারান্দায় আরাম-কেদারায় গড়গড়া নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, চেন নাকি? বললাম, বিলক্ষণ, আমাদের পাশের গাঁয়ের ছেলে। একবার আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন ছিল। সব কথা শুনে তিনি বললেন, শৌর্যেন্দ্র ধরেছিল ঠিক তবে এরা কি জান, এদের সাধন-ভজনের বেশী দরকার হয় না। অল্পতেই নিজের

অপরাহ্ন— শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রূপ বুঝতে পারে। ভগবানের নিত্যলীলার বিভূতি নরদেহে প্রকাশ দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। কদিন এখানে এসেছেন। দীপশিখার আকর্ষণে পতঙ্গের মত কত নরনারী আসছে, ঐশী-শক্তির অমোঘ আকর্ষণ।

দাদার বন্ধু—তাতে অগাধ বিশ্বাস। তর্ক করলাম না। দশ জনের কল্যাণে ঠাকুরের সেবায় মুক্তহস্ত হয়েছেন। লুচি পায়েস মালপো ভোগ চলছে। ভক্ত সমাগমে, হরিকথায় গৃহ মুখরিত। তারিণী দলবল আর মাধব ঠাকুরকে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। সন্ধ্যায় অপূর্ব দৃশ্য। সাজসজ্জে মালাচন্দনভূষিত মাধব চিত্রিত জলচৌকির ওপর বসেছে, সম্মুখে সেই রূপালী খড়ম জোড়া। দু পাশে ফল মিষ্টির নানাবিধ নৈবেদ্য। পুজোর পর আরতি। দু পাশ থেকে মেয়েরা চামর দিয়ে বাতাস করছে, দুহাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে তারিণী পাগলের মত নাচছে, বাজছে খোল করতাল কাঁসর ঘণ্টা। লোকে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে। মাধব নিঃস্পন্দ নির্বিকার, চোখে ভাবালুতা, মুখে মধুর হাসি। এই মাধব একদিন কৃষ্ণপুজো করত, আজ সেই-ই পুজো নিচ্ছে। সহজ ভক্তির নেশায় ও আচ্ছন্ন।

—মাধব, কেমন আছিস?

—দেখতেই পাচ্ছেন দাদা।

—ভাল লাগে এই পুজো-আরাধনা?

—তিনি জানেন, ভাল না লেগে উপায় কি? লোকের আকুতি ফেরাতে পারিনে।

সাধারণভাবে কথা বলে না। এড়িয়ে যেতে চায়। একটা রহস্যঘন সংকোচের আবরণ কিছুতেই সরাতে পারলাম না। অসহযোগ আন্দোলনের কথা, মহাত্মা গান্ধীর কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা, দেশপ্রেমের কথা, সবই কচুপাতার ওপর জলের মত গড়িয়ে পড়ে যায়, ওর মনে পার্থিব ব্যাপার কোন রেখাপাতই করে না। নির্লিপ্ত ভগবান!

ঠাকুরের সেবার সময় হল। আসনের সামনে খাবার সাজান। লোকজন সরে গেছে। শশধর এসে অদূরে জলচৌকিতে বসলেন। তাঁরই পাশে মেঝেতে বসে এক বিধবা যুবতী। আঠার কি বিশ বছর বয়স, শ্যামলা রং, পরিপূর্ণ নিটোল দেহ, চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক উদ্দীপনা —মাধবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিকে দেখে মাধবের মুখ লাল হয়ে উঠল, যেন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল।

খেতে বসে শশধর বললেন, এই যে মেয়েটিকে দেখছ, মহাভক্তিমতী, মাধব ঠাকুরকে মনে করে দেহধারী কানাই। মাধব ঠাকুর ওকে আমল দেয় না। ওর ক্ষোভ নেই। ও দেখা পেয়েছে, পেয়েছে সাধনা ও সাধ্যবস্তু একসংগে। তারিণী তাড়িয়ে দেয়, আবার আসে। এক বছর ছায়ার মত ঘুরছে। কি আশ্চর্য নিষ্ঠা, একেই বলে অব্যাভিচারিণী ভক্তি। সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে, লেখাপড়া কিই বা জানে। তবু ওর মুখে ভক্তির কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। আমি বলি, তুমি এখানেই থেকে যাও। হেসে বলে, বাবা, অকূলে না ভাসলে কূল পাওয়া যায় না। চমৎকার কীর্তন গায়। ওর এই জন্মেই পরম বস্তু লাভ হবে।

কিছু না বললে ভাল দেখায় না, তাই বললাম, আমাদের দেশে মেয়েদের সহজ ভক্তি-নিষ্ঠার তুলনা নেই। মথুরার রাধাকুণ্ডে এক বুড়ীর সংগে দেখা হয়েছিল, তিনি চল্লিশ বৎসর ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করছেন। রাধাগোবিন্দের ভাবে বিভোর। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দেখা পেলেন? শান্তকণ্ঠে বললেন, সব দিতে পারলাম কই বাছা, ষোল আনা মনপ্রাণ দিতে পারলাম কই? হয়তো উন্মাদিনী

এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভক্তের রাজ্য আলাদা।

—ঠিক বলেছ, এত ভক্ত তো আসছে, মালার মত কেউ নয়। এত দয়া, এত করুণা, তবু মালাকে দেখলেই ঠাকুর নিষ্ঠুর কঠিন হয়ে ওঠেন। যে যত বড় আধার, তার পরীক্ষা তত বেশী।

পরের দিন থেকেই যেতে হল। ছেলের দল তাদের পাঠাগারে একটা সাহিত্যানুষ্ঠান করেছে। এদিকে সকাল থেকে দর্শন কীর্তন চলেছে। মাধব বারান্দায় নতমুখে বসে মৃদুস্বরে উপদেশ দিচ্ছে। দূরে বসে আছে মূর্তির মত মালা, মাধবের মুখের উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ। আসর ভাঙল, নতমুখে গুণ গুণ করে একটা কীর্তনের সুর ভাজতে ভাজতে মালা চলেছে অন্দরের দিকে। হঠাৎ ডাকলাম। চকিত হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর যেন নেশায় টলমল করছে। বসল বারান্দার উপর। আমাদের দেশেরই মেয়ে। কথায় কথায় বললাম, কচি বয়স তোমার, এভাবে ঘুরে বেড়ালে লোকে নিন্দে করবে। তার চেয়ে মাধবের কাছে মন্ত্র নিয়ে বাড়ি গিয়ে সাধন-ভজন কর।

—ঐ চরণ ছাড়া ত্রিভুবনে আমার ঠাঁই নেই। যেদিন প্রথম দেখেছি, সেই থেকে আমার এই দশা। ও'র সেবার একটু অধিকার কোনদিন পাই, কোনদিন পাইনে। বড় নিষ্ঠুর দেবতা—দুঃখ দিয়ে আনন্দ দেয়। মাঝে মাঝে লজ্জা পাই, কিন্তু মনের নাগাল পাইনে। অর্থহীন কথার কলকাকলীর ভেতর থেকে ওর অনুরাগ যেন বন্যার মত কূল ছাপিয়ে ওঠে।

ঠাকুর আমার দেহ-মন-প্রাণ আনন্দে ভরে দিয়েছেন—এ সব কথার অর্থ আমার মনে হল মেয়েটা মাধবের প্রেমে পড়েছে। প্রেমের মধ্যে দাহজ্বালা থাকে, থাকে আত্মপীড়নের আনন্দ-বেদনা, তবুও দয়িতের প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকে। অন্তরের গভীরে অতৃপ্তি আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে ফুলের মত ফুটে ওঠে। ঈশ্বরীয় প্রেম আর মানবীয় ভালবাসার মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। মালার ভক্তি অনুরাগস্নিগ্ধ নয়, যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। প্রথম প্রেমের বেদনা-বিধুর অসম্বৃত ভাব।

পরদিন বিদায় নিয়ে স্টীমার ঘাটে চলেছি, এমন সময় মাধব এল। দাদা, আপনার সঙ্গে কথা বলার সময়ই পেলাম না। আমরা হপ্তাখানেকের মধ্যেই আশ্রমে ফিরব। একদিন সময় করে আশ্রমে গেলে খুশী হব। অনেক কথা বলবার আছে।

—তুমি এখন দেহধারী ভগবান, আমি সাধারণ মানুষ, তোমার ভক্তদের দেখলে হাঁপিয়ে উঠি।

—আমার মনের কথা আপনি কি জানবেন। আমিও মানুষ। ছেলেবেলায় ঠাকুর পুজো করতাম, এখন এরা আমাকেই ঠাকুর সাজিয়ে পুজো করছে। ঐ যে কথায় বলে দশচক্রে ভগবান ভুত, আমারও সেই দশা।

—ও সব বৈষ্ণবী বিনয়, আসলে তোমারও এ সব ভাল লাগে। মাধব হাসে। বলে, তবু একবার আশ্রমে পায়ের ধুলো দেবেন।

স্টীমার ছাড়ল। ডেকে বিছানা পেতে বসেছি। পাশে আড্ডা জমেছে। উঠল বালক সাধুর কথা। একজন মাধব ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কাহিনী বলতে লাগলেন। আলিসাকান্দার কোন এক সাহার বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রলাভ, এমনিতর কত কি। লোকটির গল্প বলবার ক্ষমতা আছে। বরইতলীঘাটে স্টীমার এলে গল্পের আসর ভাঙল। লোকটি নামবার সময় বলে গেল, একবার আশ্রমে গিয়ে মাধব ঠাকুরের দর্শনলাভ করবেন, মানব-জনম সার্থক হয়ে যাবে। এই ধর্মের দেশে বিনাবিচারে মেনে চলার অভ্যাস যাদের স্বভাবের মধ্যে পাকা হয়ে আছে, তারা নিজেকেও ভোলায়, অপরকেও ভোলায়। রক্তের ভিতর যে সংস্কার রয়েছে, তা সহজে ছেঁকে ফেলা যায় না।

স্টীমার পূর্বপার ঘেঁষে চলেছে, যমুনার ঘোলা জলের তরঙ্গ আঘাত করছে কোমল নরম তটভূমিকে, বাঁশের লগিতে বাঁধা নৌকোগুলো লাফিয়ে উঠছে, উলঙ্গ জলসিক্ত শিশুর দল পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে স্টীমার। ঘোমটা দেয়া বউ দাঁড়িয়ে আছে কলসী কাঁখে। এমনি টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে মালার মুখখানি মনে ভেসে উঠল। কেন যেন মনে হল, তারিণী আর মালাতে একটা লড়াই চলেছে। তারিণীর বহু যত্নে গড়া ভগবান, এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা নয়। তার মোহের প্রাচীরে ফাটল ধরেছে। মালা ভগবানের ছদ্মবেশের অন্তরালে মানুষকে দেখেছে।

তিন বৎসর পর। একদিন বিকেলে আমার কলকাতার বাসায় মাধব এসে উপস্থিত। দাদা চিনতে পারেন? নত হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল—সেই মধুর হাসি। মাধব! পরনে শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে সোনার বোতাম দেয়া মটকার কামিজ, পায়ে অ্যালবার্ট জুতো, হাতে সোনার হাতঘড়ি। আমার মুখে বিস্ময় ও কৌতূহলের আভাস দেখে বলল, সংসারী হয়েছি দাদা, যুগীপাড়ায় একটা বাসা নিয়েছি, একদিন পায়ের ধুলো দিতে হবে।

—তোমার আশ্রম? শিষ্য-সেবক?

সে সব ঠিক আছে। তারিণী সামলাচ্ছে। ও রটিয়ে দিয়েছে ঠাকুর বৃন্দাবনে তপস্যা করতে গেছেন, বার বৎসর পর আবার আসবেন। না, আমার দিক থেকে কোন ফাঁকি নেই। মালার কথা আপনার মনে আছে?

মাধবের আত্মকাহিনীর মোট কথা,—আশ্রমে মালা অন্তঃসত্ত্বা হয়। তারিণী চিন্তিত হলেন। একটা সদ্‌গতির ব্যবস্থা করে সে মাধব ও মালাকে নবদ্বীপে নিয়ে এল। কলকাতায় একজন নামজাদা ডাক্তার ঠিক করা হল। মালা বেঁকে বসল, মাধবও। অগত্যা ভক্তদাস বাবাজীর আখড়ায় কণ্ঠী বদল করে মাধব ও মালা রয়ে গেল, তারিণী কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমে ফিরে গেল।

—ভগবান নয়, এতদিন ভূত হয়ে ছিলাম দাদা। আমি যে রক্তমাংসের মানুষ তা যখন বুঝতে পারলাম, তখন সমস্ত অতীত এক নিমেষে মিলিয়ে গেল।

সেই বালক সাধু মাধব, ভক্তের ভগবান মাধব আজ সাধারণ মানুষের মত কথা বলতে লাগল। আমি বললাম, আশীর্বাদ করি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখী হও।

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। গায়ের গরম ব্লাউজটার ওপরে পাতলা বর্ষাতিটা চাপিয়ে দোর-গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল কিরণলেখা। তারপর থেমে দাঁড়াল দু' সেকেণ্ডের জন্যে। মুখ না ফিরিয়েই বললে, আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

কেউ সাড়া দিল না—সাড়া পাওয়ার জন্যে অপেক্ষাও করল না কিরণলেখা। এক ঝলক হাওয়ার মতো প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে সে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। নীল বর্ষাতিটা ডুবে গেল নীল্‌চে কুয়াশার আড়ালে।

একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল কি দেখল না ভবতোষ। বালিশে পিঠ উঁচু করে যেমনভাবে শুয়ে ছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে রইল। শুধু তার হাতে খবরের কাগজের একটা পাতা উল্টে গেল একবার। কাগজের খচ্ খচ্ আওয়াজটা কেমন তীক্ষ্ণ ঠেকল কানে, একবারের জন্যে কুঁকড়ে উঠল ভবতোষের কপাল, তারপর জেনেভা বৈঠকে কেন্দ্রিত মনটা অসতর্কভাবে পিছলে পড়ল একটা জুতো কোম্পানির রিফ্লেক্‌শন সেলের বিজ্ঞাপনে।

ঘরটা চুপচাপ এইবার। আঙুলের চাপে একটুও খর্ খর্ করে উঠল না কাগজটা! বাইরে নিঃশব্দ বৃষ্টি। সব চুপ। কাচের জানালার বাইরে আবছা আবছা পেনসিলের টানের মতো ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলো, একটা মেঘলা পাইন গাছের চুড়ো, রাস্তার ওপারে একখানা ভাঙা মোটরের হুড্—সব যেন নিঝুম হয়ে গেল একসঙ্গে। আধশোয়া শরীরে একটা স্তব্ধ সমকোণ রচনা করে জুতোর বিজ্ঞাপনে ডুবে রইল ভবতোষ।

আর কী করতে পারে—কী করবার আছে ওর। দেড় বছর যদি চাকরি না থাকে, যদি দৈনিক কয়েকটা সিগারেটের পয়সার জন্যে হাত পাততে হয় স্ত্রীর কাছে, যদি জীবনটা চারদিক থেকে একটা শক্ত থাবার মতো কুঁকড়ে আসতে থাকে—তা হলে! তা হলে তিনদিনের পুরনো একটা খবরের কাগজকে পরীক্ষার পড়ার মতো লাইনে লাইনে মুখস্ত করা ছাড়া কী করা চলে আর! সিনেমার খবর, জুতোর দাম, পাটের বাজার, জেনেভা বৈঠক আর সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ—সমস্ত একাকার হয়ে যায়। শুধু থেকে থেকে গালে দু'দিনের দাড়ি অস্বস্তির চমক দিয়ে ওঠে—মুহূর্তের জন্যে তাল-গোল পাকিয়ে যায় খবরের কাগজের লাইন-গুলো, আর মনে হয়—বলা যায় না। ছ' পয়সার একখানা ব্লেডের কথা কিছুতেই বলা যায় না কিরণলেখাকে।

আশি ডিগ্রির বিস্তৃতি থেকে এবার ষাট ডিগ্রিতে নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে আনল ভবতোষ। কাগজটা খসে পড়ল মেঝের ওপর। আবার খানিকটা খচ্ খচ্ খর্ খর্ শব্দ। কেমন যেন কানে লাগল ওর। ভবতোষ আজকাল অদ্ভুত রকম স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে। সেদিন জানলার কাচে ডেঙ্গুর মশার মতো কী একটা বসে ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছিল, ওইটে গায়ে এসে পড়লে অস্বাভাবিক গলায় একটা চিৎকার করে উঠবে সে।

এই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন? এরই জন্যে কি মানুষ জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে? এরই জন্যে কি একটা কালো বেরাল যখন-তখন ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, দেওয়ালে নিজের ফটোটা বদলে গিয়ে একটা মরা-মানুষের মুখে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই জন্যেই কি

নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে দু' হাতে? একটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাইল ভবতোষ।

যে কারণে একদিন কিরণলেখা তীব্র আকর্ষণে টেনেছিল ভবতোষকে—আজ ঠিক সেই কারণেই নিজেকে বড় বেশী পরাভূত মনে হয় ভবতোষের। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের দেড়শো ছেলের ঈর্ষাভরা দৃষ্টির সামনে কিরণলেখা ভবতোষের জীবনে এসেছিল। ঠিক স্ত্রী হয়ে নয়—প্রতিপক্ষের মতো। ভবতোষকে সে মেনে নেবে না—মানিয়ে নিতে হবে। পুরুষের মতো লম্বা শক্ত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে একটা স্তব্ধ উগ্রতা—নিরলঙ্কার কাটা-ছাঁটা ভাষা। বইয়ের পাতা থেকে মিনিট খানেকের জন্যে চোখ তুলে শুনেছিল বিয়ের প্রস্তাবটা। তারপর একটা লাল পেনসিল তুলে নিয়ে মার্জিনে দাগ দিতে দিতে বলেছিল, আমার আপত্তি নেই। তবে মাস তিনেকের আগে নয়।

ভবতোষ উচ্ছ্বসিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল কিরণলেখা। দৃষ্টিতে একটা নিরুত্তাপ শাসন।

—পড়ার সময় আর বিরক্ত করো না। কথা তো হয়ে গেল—এবার যেতে পারো।

কিরণলেখার হাত প্রথম মুঠোর মধ্যে নিতে পেরেছিল ভবতোষ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। ভবতোষের হাত কাঁপছিল, কিন্তু কিরণলেখার কঠিন আঙুলগুলোতে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্যের ছোঁয়া ছিল না। সেদিনও নয়—তারপরেও নয়। তিন বছর ধরে সহজ স্বাভাবিক চুক্তির মতো ঘর করছে দু'জনে। ভবতোষ একটা চলনসই চাকরি জুটিয়েছে—মেয়েদের স্কুলে অ্যাসিস্-ট্যাণ্ট হেড্‌মিস্ট্রেস হয়েছে কিরণলেখা। সসম্মানে সংসার করেছে দু'জন—কারো কাছে কাউকে মাথা নিচু করতে হয় নি।

তারপর চাকরি গেল ভবতোষের। অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডালহাউসি স্কোয়ারের রেলিঙে হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে লাগল জি-পি-ওর ঘড়ির কাঁটা দুটোর লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাওয়া। তারপর প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল—এখন? এইবার?

অন্নাভাব হয়তো আসবে না—একটার জায়গায় না হয় তিনটে প্রাইভেট পড়ানো জোগাড় করে নেবে কিরণলেখা। কিন্তু কোন্ মর্যাদা নিয়ে এখন দাঁড়িয়ে থাকবে ভবতোষ—দাঁড়াবে আত্মসম্মানের কোন্ শক্ত ডাঙার ওপরে? এক প্যাকেট সিগারেট—একখানা ব্লেড—

না—চাকরি আর জোটেনি। চাকরি না পাওয়ার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা যাদের আছে, হয়তো ভবতোষ তাদেরই একজন। দু' একবার মুঠোর কাছাকাছি এসেও হাত পিছলে বেরিয়ে গেছে সুযোগ। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে ভবতোষ। কিরণলেখার কাছ থেকেই নিতে হয়েছে সিগারেটের দাম—ব্লেডের খরচ। আর চুক্তি নয়—বশ্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—আত্মসমর্পণ। কিরণলেখার শান্ত করুণার ছায়ায় দিনের পর দিন নিভে গেছে ভবতোষ, গভীর স্নায়বিক শ্রান্তিতে সারা রাত কান পেতে শুনেছে কতগুলো মড়া কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে চলে গেল।

এরই নাম নার্ভাস ব্রেক-ডাউন? টান-টান করে বাঁধা পৌরুষের তারগুলো হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার এই পরিণাম? এরই জন্যে কি দেওয়ালে নিজের ফোটোগ্রাফটা হঠাৎ একটা মড়ার মুখের মতো মনে হয়, এই জন্যেই কি যখন-তখন ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় একটা কালো বেরাল, এই জন্যেই কি একটা বিষাক্ত নেশার পীড়নের মতো কখনো কখনো ইচ্ছে হয়—

কিরণলেখা কর্তব্যে ত্রুটি করেনি। এক মাসও বাকি পড়েনি বাড়িভাড়া, বাদ যায়নি এক সপ্তাহের রেশন। যেমন আসত তেমনি করেই মাংস এসেছে প্রত্যেক রবিবারে। হয়তো দুটোর জায়গায় পাঁচটা প্রাইভেট ট্যুইশন নিয়েছে কিরণলেখা—ভবতোষ জানে না। আগেও যেমন রাত ন'টার পরে সে বাড়ি ফিরত—এখনো তাই ফেরে। হয়তো মাঝখানের ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রামটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে।

আর নিজের ভয়াবহ মনোমন্থনের মধ্যে মধ্যে ভবতোষ ভেবেছে, তার নিজের অক্ষমতা সংসারে তো এতটুকুও ফাঁকার সৃষ্টি করেনি। এতবড় যন্ত্রটার একটা চাকাও কোথাও অচল হয়ে যায়নি তো। একবারও তো কিরণলেখা মুখ ফুটে বলেনি, সংসারে বড্ড টানাটানি যাচ্ছে আজকাল। তা হলে কি ভবতোষ আদৌ না থাকলেও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটত না কিরণলেখার? কল্পনা করতেই আহত পুরুষ আর্তনাদ করে উঠেছে বুকের ভেতরে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমকে মনে হয়েছে—তা হলে আজ সে শুধুই ভার, একটা অনাবশ্যক বোঝা ছাড়া কিছুই নয়!

শেষ পর্যন্ত চোখ পড়েছে কিরণ-লেখার। ভবতোষের প্রতিবাদ সত্ত্বে ডাক্তার এসেছে বাড়িতে।

—চেঞ্জে নিয়ে যান।—একটা টনিকের সঙ্গে ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন।

—চেঞ্জে!—উচ্চকিত হয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ভবতোষ। ফুটবল ম্যাচ্ দেখা ছেড়ে দেবার পরে এত জোরে সে-কখনো আর চিৎকার করে ওঠেনি।

চোখের দৃষ্টিতে স্তব্ধ উগ্রতাটাকে উগ্রতর করে তাকিয়েছে কিরণলেখা শীতল কণ্ঠে বলেছে, সে যা করার আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবেনা।

ভাবতেও হয়নি ভবতোষের। কোথা থেকে টাকা জোগাড় করেছে, ঘরভাড়া করেছে, তারপর এই গরমের ছুটিতে ভবতোষকে নিয়ে এসেছে দার্জিলিঙে—সে-সব কিরণলেখার একার দায়িত্ব। একটা টাকার হিসেব করতে হয়নি, এমন কি পথে কুলির সঙ্গে দরাদরি পর্যন্ত করতে হয়নি ভবতোষকে। চুক্তির পর্ব শেষ হয়ে গেছে—এখন বশ্যতার পালা। আগে নিজের ব্যক্তিত্বকে তলোয়ারের মতো শান দিয়ে রাখতে হত—এখন চলছে কাটা-সৈনিকের ভূমিকা। কিরণলেখার স্নেহচ্ছায়ায় এখন তার তিলে তিলে নির্বাণ আর অলস-কল্পনায় ইন্ধন দিয়ে দিয়ে ভাবা : নিজের সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ করবার মতো দুটো ভালো কবিতার লাইন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

মেঝে থেকে একবার খবরের কাগজটাকে কুড়িয়ে নেবার কথা ভাবল ভবতোষ, কিন্তু উৎসাহ পেল না। নিস্তব্ধ ঘরের শীতল অবসাদের মধ্যে সে তলিয়ে রইল, আর তাকিয়ে দেখতে লাগল বাইরের নীলাভ কুয়াশায় আবছা রেখায় আঁকা নিঃস্পন্দ ইলেক্‌ট্রিকের তার, একটা পাইনগাছের কালির ছোপ, একটা ভাঙা মোটরের হুড, আর—

কিরণলেখা জানত রণজিৎ অপেক্ষা করবে। কোনো প্রতিশ্রুতি দিল না—এমন কি এক বিন্দু আভাস পর্যন্ত দেয়নি কিরণলেখা। তবু লাডেন্ লা রোডের রেলিং ধরে রণজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল। এই অল্প অল্প বৃষ্টি—থেকে থেকে ঘনিয়ে আসা কুয়াশা কোনো এক কাকজ্যোৎস্নায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কবরের মতো নীচের বাড়ি-গুলো আর দূরের ঝাপসা বিষণ্ণ পাহাড়—এরা এমন কিছু আকর্ষণের বস্তু নয় রণজিতের কাছে। প্রায় নির্জন পথের ওপর রণজিতের মূর্তিটা কুয়াশায় অদ্ভুত দীর্ঘ-কায় মনে হল। যেন বিরাট কোনো এক

সমাধিভূমিতে একটা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

—এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন?

কেমন চমকে উঠল রণজিৎ। কেন কে জানে। হয়তো আগে থেকে কিরণলেখাকে দেখতে পায়নি, সেইজন্যেই; হয়তো কিরণলেখা আসতে পারে এই কল্পনাতেই তন্গত হয়ে ছিল সে—এসে পড়ার বাস্তবতাকে ঠিক সহজভাবে মেনে নিতে পারল না।

রণজিৎ বললে, আপনি?

অভিনয়। কিরণলেখা অল্প একটু হাসল ঃ মাছের সন্ধানে বেরিয়েছি। যাব বাজারের দিকে।

—মাছ? এই দুপুরবেলায়?

—দার্জিলিঙের বাজারে এই সময়েই মাছ আসে। আপনি হোটেলে থাকেন, তাই এ-সব খবর জানবার দরকার হয়না। কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছেন আপনি?

—আমি?—রণজিৎ কেমন ঘোলা চোখে তাকাল। অথবা ওর চশমার কাচের ওপর রেণু রেণু বৃষ্টি জমেছে বলেই অমন আবছা দেখাল ওর চোখঃ দার্জিলিঙে এমনি অল্প অল্প বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে।

অভিনয়? কিরণলেখা এবার আর হাসল না, ফেলল শান্ত বিশ্লেষণের দৃষ্টি।

—কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে। জ্বর হয়ে বসতে পারে চট্‌ করে।

—জ্বর? আজ কুড়ি বছরের মধ্যে একদিনও আমার মাথা ধরেনি—বেশ ভরাট

এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন?

পরিতৃপ্ত গলায় বললে রণজিৎ। আবার খানিকটা কুয়াশা এসে রণজিৎকে আড়াল করে দিলে—আবার তাকে অদ্ভুত রকম দীর্ঘকায় বলে মনে হল কিরণলেখার।

কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হল। হঠাৎ যেন কিরণলেখা অনুভব করল, এখনি দুটো বিশাল বলিষ্ঠ বাহুতে রণজিৎ তাকে তুলে নিতে পারে, তারপর নিছক খেয়ালের প্রেরণায় ছুড়ে দিতে পারে সামনের কোনো একটা অতল শূন্যতার ভেতরে। এবং পরক্ষণেই, যেন একটা প্রকাণ্ড কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছে এমনিভাবে, এই কুয়াশা, ওই বাড়িগুলো, দূরের ওই বিষণ্ণ পাহাড়—সব কিছুকে চকিত করে দিয়ে হেসে উঠতে পারে হা হা করে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল কিরণলেখাই ঃ আর কতদিন থাকবেন এখানে?

—কিছু ঠিক করিনি এ-পর্যন্ত। এখনো লম্বা ছুটি রয়েছে হাইকোর্টের। যদি ভালো লাগে, হয়তো আরো দু' সপ্তাহ কাটিয়ে যেতে পারি।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সে-রণজিৎ নয়—কিরণলেখা ভাবল। কোনো মেয়ে কাছে গিয়ে লেক্‌চার নোটের খাতা চাইলে যে-রণজিতের মুখের রঙ্‌ বদলাত বহুরূপীর মতো, করিডোরে কথা কইতে গেলে যার

কপালে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে উঠত, টেলিফোনে কিরণলেখাকে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে যে নিজে তিন-তিনবার কানেক্শন কেটে দিয়েছে, সেই লাজ্বক শান্ত ছাত্রটির সঙ্গে কোনো মিল নেই এই রণজিতের। জীবনের নতুন নাটকে আজ সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেছে তার। এখন সে হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। আত্মবিশ্বাস এসেছে—এসেছে আত্মপ্রকাশের শক্তি। জনশ্রুতি শোনা যায়, ভবতোষের সঙ্গে কিরণলেখার বিয়ের পরে সমানে তিনদিন ধরে বেহালা বাজিয়েছিল রণজিৎ। আজ সেই বেহালার স্মৃতিচিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো এখন রিভলভারের লাইসেন্স্ নিয়েছে রণজিৎ—হয়তো আজকাল সে গ্রে-হাউন্ড্ পোষে বাড়িতে।

কিরণলেখা বলে ফেলল, চলুন, আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত।

কথাটা বলেই মনের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল কিরণলেখা। এই প্রস্তাবটা আসা উচিত ছিল রণজিতের কাছ থেকে। মোলায়েম বিনীত গলায়, কুণ্ঠিত মিনতিতে। তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে, প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত স্মিত হাসিতে কিরণলেখা বলত, বেশ—চলুন।

কিন্তু কেমন উলটো হয়ে গেল ব্যাপারটা। কে জানত, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ক্লাশঘরে কুঁকড়ে থাকা অঙ্কুরটা দার্জিলিঙের কুয়াশায় পাইনগাছের মতো মাথা তোলে! তেমনি ঋজু, তেমনি ঊর্ধ্বমুখী!

যে-হাসিটা কিরণলেখার ছিল, নিজের পৌরুষে সেইটে কেড়ে নিয়ে রণজিৎ বললে, চলুন না, ভালোই তো।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এক ফালি মেঘ-ভাঙা রোদ পড়ল চকচকে পথের ওপর। মেঘ আর কুয়াশায় মিলে আকাশ-মাটি ছাওয়া সাদা পর্দাটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। রণজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—চা খাবেন?

—থাক এখন।

—থাকবে কেন? আসুন না। কিরকম কন্‌কনে ঠান্ডা দেখেছেন! একটু চা নইলে উৎসাহ বোধ হচ্ছে না।

ঠিক তাই। নিজেকে কেমন স্তিমিত মনে হল কিরণলেখারও। প্রতিবাদ করল না।

রাস্তার ডানদিকে এক ধাপ নেমে সাজান ছোট একটা রেস্তোরাঁ। শো-কেসে একখানা অতিকায় পাঁউরুটি, রঙ্-বেরঙের কেক। সবুজ পর্দা ঢাকা ছোট ছোট কেবিন। প্ল্যাস্টিকের বিচিত্র টেবিলক্লথের ওপর রেডিওর অনুকরণে অ্যাশ্‌ট্রে। ফুলদানি থেকে সুইট পী'র একটা হাল্কা আতরের গন্ধ।

দুজনে মুখোমুখি। চা—স্যান্ড্‌উইচ্।

স্যান্ড্‌উইচের একটা কোনা দাঁতে কেটে রণজিৎ বললে, আপনার ওখানে একদিনও যাওয়া হলনা।

টি-পটের নল থেকে উঠে আসা বাদামী ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য করতে করতে কিরণলেখা বললে, এলেই তো পারেন।

—বিনা-নিমন্ত্রণে যাব?—রণজিৎ হাসল।

তা বটে। এ-কথা আজকের রণজিৎ বলতে পারে—বলতে পারে অ্যাড্‌ভোকেট রণজিৎ। কিন্তু কয়েক বছর আগে কি এ-দাবিটা জোর করে করতে পারত সে? সেদিন একটুখানি প্রশ্রয়ের হাসিই ছিল যথেষ্ট, আজ সেখানে আগে বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ করতে হবে কিরণলেখাকে।

কিরণলেখা জবাব দিলনা—কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল মনের ভেতরে। একেবারেই কি সে ফুরিয়ে গেছে—সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে রণজিতের কাছে? তার কঠিন চোখ, তার পুরুষালী চেহারা, তার কাটা-ছাঁটা বৈষয়িক কথার ভঙ্গি—এরা সবাই মিলে কোনো প্রতিক্রিয়াই আর সৃষ্টি করে না রণজিতের মনে? এত শক্তি কি সত্যিই কোথাও ছিল তার?

—বেশ ভালোই আছেন আজকাল?—হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন এল রণজিতের কাছ থেকে।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কুঁজো ঘাড়টাকে সোজা করে বসল কিরণলেখা। ধারাল গলায় বললে, খারাপ থাকবার কী কারণ আছে বলুন?

আঘাতটা কি লাগল রণজিৎকে? বোঝা গেল না। একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধটা ঝাঁকাল একবার,—না—এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—ও।

আবার চুপচাপ। টি-পটের নল দিয়ে রেশমী সুতোর মতো বাদামী রঙের ধোঁয়া। সুইট্-পীর গন্ধ। প্ল্যাস্টিকের টেবিল-ক্লথে বিচিত্র কারুকাজ। রাস্তায় মোটরের হর্ন।

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে তার সোনালী লেবেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রণজিৎ। তারপর : টাইগার হিল থেকে সান্-রাইজ দেখেছেন?

—না।

—যাবেন কাল?—রণজিৎ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনে।

এতক্ষণে নিজের মধ্যে একটা উত্তাপ অনুভব করল কিরণলেখা, এতক্ষণ পরে বুঝি চায়ের প্রতিক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। চশমার কাচের তলায় দেখা যাচ্ছে রণজিতের চোখ। ব্রীফ্ নয়—হাইকোর্ট নয়—এই মুহূর্তে কি নিজের হারিয়ে-যাওয়া ধূলি-ধূসর বেহালাটাকে মনে পড়ল রণজিতের?

—কাল কখন?—চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কিরণলেখা জানতে চাইল।

—অন্তত রাত চারটের মধ্যে বেরুতেই হবে। নইলে দেরি হয়ে যাবে পৌঁছুতে।

—অত রাতে?

রণজিৎ হাসল : ভয় করবে?

ভয়! আবার ছাড়িয়ে যেতে চাইছে রণজিৎ—আবার মাথাটা তুলতে চাইছে অনেক ওপরে। কিন্তু বাইরে এখন আর কুয়াশা

পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,–শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,–আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
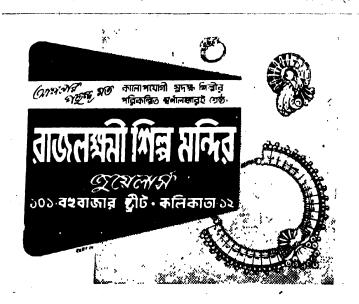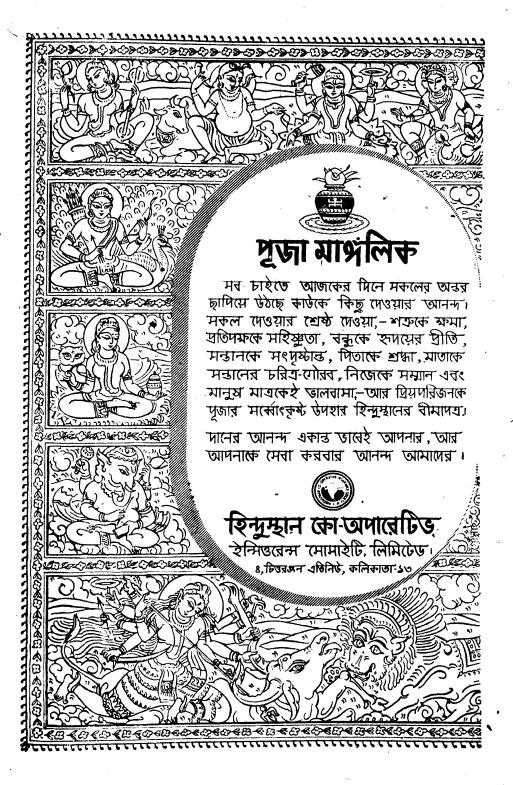
নেই। হঠাৎ রোদ উঠেছে।—তীব্র খরধার রোদ। এই রোদে মনে পড়ে কলকাতাকে। কলেজ স্ট্রীট্। ডবল-ডেকার। ইউনিভার্সিটি—লিফ্ট। পেছন থেকে বাংলা ডিপার্ট-মেণ্টের কবি-কবি চেহারার হ্যাংলা ছেলেটার ছুঁড়ে-দেওয়া মন্তব্য। একটা ঘৃণার দৃষ্টি ফেলতেও অনুকম্পা হয়।

—বেশ, যাব।

রণজিৎ বললে, ধন্যবাদ। কদিন থেকেই প্ল্যান করছি, কিন্তু একা একা যেতে কিছুতেই উৎসাহ হয়না। তাহলে কাল ভোরেই আমি গাড়ি নিয়ে আসব লাডেন্ লা রোডে। হর্ন দেব। আপনি রেডি হয়ে থাকবেন।

—আচ্ছা।

কিন্তু ভবতোষের কথা কেউ তুলল না। রণজিৎ বলল না, মনে করিয়ে দিল না কিরণ-লেখা। রণজিতের সঙ্গে এই শক্তি-পরীক্ষায় কোথাও কোনো ভূমিকা নেই ভবতোষের? এমনকি, দর্শকেরও না। শুধু একবারের জন্যে কিরণলেখা ভাবল, ভবতোষের দাড়ি-গুলো বড় হয়ে গেছে—হয়তো একখানা ব্লেড্ দরকার ওর। আর দরকার একটিন সিগারেট, আজকের খবরের কাগজ।

কিরণলেখা বললে, চলুন—ওঠা যাক এবার। আর বেশি দেরি হলে বাজারে ভালো মাছ কিছুই পড়ে থাকবে না।

লেপ মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে ভবতোষ। ঘুমুচ্ছে কিনা ঠিক বোঝা যায়না। অথবা রাত্রের ঘুমটাকে দিন-রাত্রির একটা ক্লান্তিকর ঝিমুনির মধ্যে প্রসারিত করে নিয়েছে সে। একবার ইচ্ছে করল মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় একটুখানি। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুরে আসা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া হয়তো ভালো লাগবে না ভবতোষের।

চা করতে হবে। কিরণলেখা স্টোভ ধরাতে বসল।

পাশের ঘরে এক মারাঠী ভদ্রলোক আছেন—এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে লাফালাফি করছে সামনে। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মশলা-মেশানো রসুনের উগ্র গন্ধ—কী একটা ভালো জিনিস রান্না হচ্ছে ওখানে। মোটা-গলায় ধমক দিচ্ছেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। জানলার বাইরে একটু দূরের রাস্তায় ছুটিয়া-ঘোড়ায় চেপে চলেছে দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে। স্টোভে পাম্প করতে করতে একবার ভবতোষের দিকে তাকিয়ে দেখল কিরণলেখা। নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে আছে বিছানায়—কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দু হাতের শীর্ণ আঙুলগুলোকে!

ঘরটা খালি। বিশ্রী রকমের খালি। পাশের ঘরে মারাঠী বাচ্চাগুলোর চিৎকার। ভারী একা একা লাগল কিরণলেখার। স্টোভে কেট্‌লি চাপিয়ে বিছানার পাশে বেতের চেয়ারটায় এসে বসল।

ভবতোষ চোখ মেলল। ঝিমুচ্ছিল? জেগেই ছিল? কে জানে!

কিরণলেখা আস্তে আস্তে বললে, তোমার সিগারেট এনেছি—আর ব্লেড্।

—আচ্ছা।

—আর এই আজকের খবরের কাগজ।

—দাও।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল ভবতোষ। কিন্তু পড়ার আগ্রহ দেখা গেল না। নিরাসক্ত শান্তিতে মেলে রাখল বুকের ওপর।

একবার কিরণলেখার মনে হল, কথাটা বলবে ভবতোষকে? বলবে, কাল শেষ রাত্রে রণজিতের সঙ্গে টাইগার হিলে যাওয়ার প্রোগ্রামের কথাটা? জিজ্ঞাসা করবে, তুমিও যাবে নাকি একবার? রাত-দিন তো ঘরেই শুয়ে থাক, এমন করলে শরীর ভালো হবে কী করে? চল না—ঘুরে আসবে একটু?

কিন্তু বলেই বা কী হবে? কিছুতেই জাগান যাবে না ভবতোষকে। একটা অতল নির্বেদের মধ্যে সে নিঃশেষিত। সেখান থেকে কিছুতেই উঠে আসতে চাইবে না। এমন কি, কাল শেষ রাতে রণজিতের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কুৎসিত কল্পনার যে সুযোগ আছে, তাই নিয়ে একবারও চঞ্চল হয়ে উঠবে না ভবতোষ। মনে মনেও না।

একবার হয়তো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবে—হয়তো তাও না। হয়তো লেপটাকে আরো বেশি করে মুখের ওপরে টেনে আনবে। জিজ্ঞাসাও করবে না: কোথায় যাচ্ছ, কখন ফিরবে, অথবা আদৌ আর ফিরবে কিনা।

একেই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন বলে?

শক্ত পুরুষালি চেহারার কিরণলেখা শিউরে উঠল একবারের জন্যে। ঘরটা খালি—বিশ্রী রকমের খালি। চার বছর পরে—বিয়ের চার বছর পরে এই প্রথম ভবতোষের উপস্থিতি অসহ্য লাগল তার কাছে।
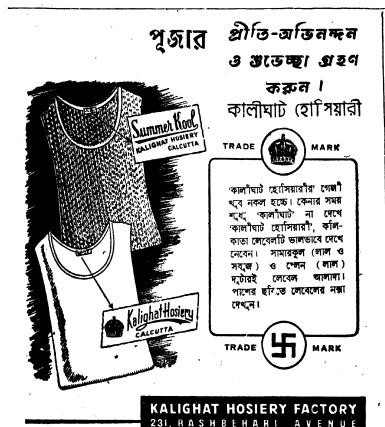
পরক্ষণেই নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে

উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা—যেন মুক্ত করে নিলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে। চায়ের কেট্‌লিতে জলটা টগবগ করে ফুটছে।

পরদিন কিরণলেখার ঘুম ভাঙল ভোর চারটের আগেই।

চোখ মেলতেই দৃষ্টি পড়ল পাশের টি-পয়ের ওপর। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা ঝকঝক করছে ওখানে। কাচের আড়াল থেকে কতগুলো সবুজ অগ্নিবিন্দু হিংস্রভাবে জ্বলজ্বল করছে। রণজিতের আসতে পনর মিনিট দেরি আছে এখনো।

সহজ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়ছে ভবতোষের। হয়তো সেই বর্ণহীন ঘুমে তলিয়ে আছে সে : যেখানে আলো নেই, আকাশ নেই—কিরণলেখা নেই—কেউ নেই। শুধু ছায়ার মতো কতগুলো ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন আছে, অথবা তাও নয়। যাই থাক—সেখানে কিরণলেখা নেই—না থাকলেও ক্ষতি নেই।

একবার রূঢ় একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ভবতোষকে—একটা অর্থ-হীন কান্নায় ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তার চাইতেও সহজ কাজ নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে যাওয়া। কিরণলেখা তাই করল।

ঘরের কোন্ জিনিসটা কোথায় আছে, তার নির্ভুল হিসেব জানে কিরণলেখা। খাট থেকে নেমে তিন পা বাঁ দিকে গেলে আল্‌না— হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে নীল রঙের শাড়িটা। তার পাশেই ঝুলছে ওভারকোট। রিস্ট্‌ওয়াচটা কোটের পকেটেই আছে। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটার পাশেই পড়ে আছে হাতব্যাগ। বর্ষাতি রয়েছে দরজার কাছেই। রাত্রে চুল বেঁধে শুয়েছে—তার জন্যেও কোনো ভাবনা নেই। কস্‌মেটিক সে ব্যবহার করে না—প্রশ্নই ওঠে না তার।

এখন শুধু অপেক্ষা করা—শুধু কান পেতে থাকা রণজিতের মোটরের হর্নের জন্যে। ভবতোষের ঘড়িতে সবুজ অগ্নি-কণায় আরো পাঁচ মিনিট বাকী।

নিঃশব্দে দরজা খুলল কিরণলেখা। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতের মতো চোখে-মুখে এসে পড়ল। ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো যেন হা হা করে উঠল নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসিতে। শীতল-কালো আকাশ অসংখ্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে কিরণলেখার মুখের দিকে তাকাল।

তারপরেই চমকে উঠল সে।

কোথা থেকে তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝলক বয়ে এল একটা। পথের ও-পাশে দীর্ঘ পাইন গাছটার চুড়ো মর্মরিত হল—যেন একটা অতিলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠতে লাগল থরথরিয়ে। ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোতে শাঁ শাঁ করে কান্নার মতো শব্দ বাজল। আর কিরণলেখার মনে হল—ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রণজিতের দীর্ঘ দেহ কিরকম ছায়া ফেলবে কে জানে! ওই রকম অলৌকিক—ওই রকম বিরাট, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত আতঙ্কে তার মনে হবে : এই মুহূর্তে একটা ছোট পাখির মত তাকে মুঠোয় করে তুলে নিতে পারে রণজিৎ—ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে কোনো অতলস্পর্শ খাদের ভেতরে, আর তারপর হো হো করে একটা প্রচণ্ড কৌতুকের হাসিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে রাত্রির অন্ধকারকে!

ভয়! এবার আর নিজের কাছে মন লুকোতে পারল না কিরণলেখা। ভয়। শীতল নিষ্ঠুর অন্ধকার—অসংখ্য নক্ষত্রের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি—পাইন গাছের চুড়োটার অলৌকিক দোলা, আর—আর—

কিরণলেখা ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এল। এক কোণে ছুঁড়ে দিলে ওভার-কোটটা। তারপর পলাতক একটা খরগোশ যেমন করে তার গর্তের মধ্যে এসে লুকোয়—তেমনি করে ডুবে গেল লেপের ভেতরে।

আর আশ্চর্য, এরই জন্যে কি অপেক্ষা করছিল ভবতোষ? সে কি জানত, এমনি একটা কিছু ঘটবে? নইলে আজ দু বছর পাশে পাশে শুয়েও ঘুমের ঘোরে পর্যন্ত যে ভবতোষ কিরণলেখাকে স্পর্শ করেনি, সে কেন তাকে এমন করে জড়িয়ে নিলে বুকের মধ্যে?

বাইরের রাস্তায় একটা মোটর থামল। দুবার হর্ন বাজল। কিরণলেখা আরো বেশি করে সরে এল ভবতোষের বুকের মধ্যে, ভবতোষের হাতটা আরো বেশি করে সাঁড়াশির মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপরে কতবার হর্ন বাজল, কতক্ষণ ধরে অধৈর্য প্রতীক্ষায় বাজতে বাজতে থেমে গেল, কিরণলেখা টেরও পেল না। সমস্ত রাতে বিনিদ্র অস্বস্তির পরে এইবার প্রথম তার চোখ ভরে ঘুম নেমে এল।

কিরণলেখা জানত, রণজিৎ ক্ষমা করবে না। একবার যখন দাবি করতে শিখেছে, তখন সহজে সে-দাবি ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। পোস্ট্‌-গ্র্যাজুয়েটের নিরীহ নিস্তরঙ্গ রণজিতের মধ্যে একটা উগ্র-ক্ষুধার্ত জাগরণের পালা শুরু হয়েছে। আর সে বেহালা বাজায় না—হয়তো রিভল-ভারের লাইসেন্স নিয়েছে এখন।

দুদিন ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে গেল লাডেন্ লো রোড—ম্যাল্—দারোগা বাজারের রাস্তা। যে নেপালী কাঞ্ছাটা দুবেলা বাসন মাজে, ঘর-দুয়োর পরিষ্কার করে, বাজার করল তাকে দিয়েই। আধখানা বুনে-রাখা স্কার্ফটাকে টেনে খুলে ফেলল—তারপর সকাল-বিকেল বসে গেল সেইটেকে নতুন করে বুনতে।

কী ভাবল ভবতোষ—কিছু কি ভাবল? দাড়ি কামাল, পর পর কয়েকটা সিগারেট খেল, এমন কি নিজেই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনল খবরের কাগজ। রাত্রিতে কিরণলখার ওই আত্ম-সমর্পণের মধ্যে কোনো অর্থ কি খুঁজে পেয়েছে ভবতোষ? নিজের ভেতরে কোথাও কি এতটুকু শক্তিকে আবিষ্কার করেছে সে?

দুটো দিন—দুটো তীক্ষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। কোথায় মিলিয়ে গেল কুয়াশা—কোথায় হারিয়ে গেল শীতার্ত বিষণ্ণতার কুহক। পাথর গরম হয়ে উঠল।—উদয়াস্ত ঝকঝক করতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা, চার-দিকের নানা রঙের বাড়িগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল নিষ্ঠুর নগ্নতায়। এই আলোয়—এত প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে কোথায় তলিয়ে রইল রণজিৎ। এই রোদে ঝকঝক করে ওঠে ইউনিভার্সিটির প্রকাণ্ড সাদা বাড়িটা—হেদুয়ার জল—কলেজ স্ট্রীট
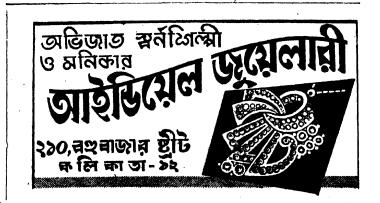
—কলকাতা। এ আলোয় রণজিতের কুঁকড়ে লুকিয়ে থাকার পালা। আর কিরণলেখার বসে বসে ভাবা ঃ এতখানি প্রশ্রয় কী করে সে দিয়েছিল রণজিৎকে—কেমন করে সে বলতে পেরেছিল ঃ আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত?

রণজিৎ এল আরো দুদিন পরে।

এতটা দুঃসাহস কোথা থেকে এল রণজিতের—যে অসংকোচে চলে আসতে পারল সেখানে—যেখানে ভবতোষ আছে? কেমন করে সে দুমদুম্ করে ঘা দিতে পারল দরজায়। যেন দরকার হলে ভেঙে ফেলবে?

তার কারণ ছিল বৃষ্টি—অশ্রান্ত বৃষ্টি। উজ্জ্বল তীক্ষ্ন আকাশ পোড়ো ছাইয়ের মতো রঙ ধরেছিল দিনের বেলা, রাত্রির অন্ধকারে তা আলকাতরার মতো কালো হয়ে উঠল। সামনের পাইন গাছটায় আছড়ে পড়তে লাগল ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক—শন্ শন্ করে আর্তনাদ করে চলল ইলেকট্রিকের তার। আর সেই সময় প্রচণ্ডভাবে দরজায় ঘা দিলে রণজিৎ।

হাতের বোনাটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা—যেন ভূত দেখল। বিছানার ওপরে উঠে বসল ভবতোষ। রণজিতের ওয়াটারপ্রুফ থেকে স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটের ওপর, বৃষ্টিতে চক্-চক্ করছে পায়ের কালো গাম বুট। ওয়াটার-প্রুফটাকে এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে শব্দ করে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। আজ বিনা নিমন্ত্রণেই সে এসেছে।

তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বললে,—অনেকদিন পরে দেখা হল ভবতোষ, ভালো আছো তো?

কী একটা বলতে চাইল ভবতোষ—বলতে পারল না। শুধু দুটো কোটরে বসা চোখের ভিতর থেকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রণজিতের দিকে। সে-দৃষ্টিকে রণজিৎ গ্রাহ্যও করল না।

কিরণলেখা দেখল, বাঘের মতো দপ-দপিয়ে উঠেছে রণজিতের চোখ।

রণজিৎ বললে, সেদিন কথা দিয়েও কেন গেলেন না আপনি? প্রায় আধঘণ্টা ধরে মোটরের হর্ন বাজিয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বাইরে বৃষ্টির একটানা শব্দ—ইলেকট্রিক তারের গুঞ্জন—পাইন গাছটার আর্তনাদ। কী ভয়ংকর—কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে রণজিৎ! এই দুর্যোগের পটভূমিতে যেন হিংস্র একটা বন্য শক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে সে। কে জানে, তার ওভারকোটের পকেটে একটা রিভলভারও আছে কিনা!

হয়তো হাঁটু ভেঙে বসে পড়ত কিরণলেখা—হয়তো বলে বসত ও, ক্ষমা করো আমাকে, এমন অপরাধ আমি আর করব না।—হয়তো রণজিৎ যদি তখন তার হাত ধরে এই ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত, এক বিন্দু প্রতিবাদের শক্তি থাকত না কিরণলেখার।

কিন্তু সেই মুহূর্তে—বৃষ্টি আর হাওয়ার সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে ভয়ংকর গুরু গুরু শব্দ উঠল একটা। সে শব্দ আকাশে নয়—মাটিতে। একটা প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের মতো দুলে উঠল ঘরটা।

খাটের থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ভবতোষ। ধস নামছে!

আবার সেই গুরু গুরু ধ্বনিটা কানে এল। আরো তীব্র—আরো ভয়াল। দপ করে নিভে গেল ঘরের ইলেকট্রিকের আলোটা। মেজেটা দুলতে লাগল, পাশের মারাঠী পরিবারের ঘর থেকে শোনা গেল আকুল কান্নার শব্দ। মড়মড় করে পাইন গাছটা ভেঙে পড়ল—ঘরের পিছন দিকটা হঠাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে টুকরো টুকরো কাঠের মতো ঢাল বেয়ে গড়িয়ে চলল।

একটা পৈশাচিক আর্তনাদ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল রণজিৎ—কিন্ত বেশী দূর যেতে পারল না। সামনে পিছনে দুদিকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঘরের রেখা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অতল অন্ধকারে দূরে-কাছে ক্রমাগতি ধস ভাঙতে লাগল। মানুষের চিৎকার—বুক-ফাটা কান্না—মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি—সব একসঙ্গে মিলে একটা বীভৎস নরকের মধ্যে পৌঁছে দিলে রণজিৎকে।

রণজিৎ দাঁড়াতে পারল না। হাঁটুতে এক বিন্দু শক্তি কোথাও অবশিষ্ট নেই। চোখ বুজে বসে পড়ল পথের ওপর। এই দ্বীপের মতো জায়গাটুকু যে কোনো সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ—

ততক্ষণ বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কিরণলেখার আর্তনাদ তার কানে এসে ঘা দিতে লাগল ঃ আমাকে তোলো, আমাকে তোলো এখান থেকে। আমি এখনো বেঁচে আছি—

উঠে দাঁড়াতে চাইল রণজিৎ—সাধ্য কী! সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে তার। অসহ্য বিষাক্ত যন্ত্রণায় সে কান পেতে শুনতে লাগল কিরণলেখার আকুতি ঃ ওগো কোথায় তুমি! আমি যে এখনো বেঁচে আছি—

চোখ দুটো বোজবার আগে দেখতে পেল রণজিৎ—অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেল। কিরণলেখার কাছে যার কথা শুনেছিল—একটা শবদেহের মতো যাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল বিছানায়, সেই ভবতোষ একটা প্রচণ্ড দানবের মতো ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে প্রাণপণে। এত শক্তি, এমন অমানুষিক শক্তি কোথায় পেল ভবতোষ? কী করে এমন ভয়ংকরভাবে বেঁচে উঠল সে যে কিরণলেখাকে সে বাঁচিয়ে তুলবেই?

একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো রণজিৎ অনু-ভব করল, অনেক বর্ষা—অনেক শরৎ, অনেক সূর্যের আলো আর অনেক অন্ধকার তিলে তিলে এই শক্তি দিয়েছে ভবতোষকে। একটা আকস্মিক আবেগ নয়—একটা উন্মত্ততা নয়, এ শক্তির মধ্যে অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। তার মৃত্যু হয়নি—শুধু আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। জড়তা ছিল কঠিন—তাই তার আবরণ ভাঙবার জন্যে প্রয়োজন হল এমন ভয়াবহ চরম মুহূর্তের।

—আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও তুমি—

উন্মত্ত দানবীয় শক্তিতে কাঠ সরাচ্ছে ভবতোষ। দাম্পত্য জীবনের যে প্রেম তিলে তিলে সংগ্রহ করেছে সূর্য আর নক্ষত্রের অগ্নিকণা—তাই এখন বজ্রপ্রদীপ হয়ে জ্বলছে ভবতোষের রক্তে। কিরণলেখাকে সে-ই বাঁচাবে, সে-ই শুধু বাঁচাতে পারে। সীমাহীন দীনতার হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে রণজিৎ নিশ্চেতনার গভীরে তলিয়ে গেল॥

ঈজিচেয়ার

আশাপূর্ণা দেবী

রাজ্য সরকারের সাহসী পরিকল্পনায় পাহাড় কেটে গড়ে উঠছে নতুন শহর, জঙ্গলের বুক চিরে চিরে তৈরি হচ্ছে মানুষের এগিয়ে যাবার রাস্তা।

চির-রহস্যময় অন্ধকার অরণ্যানীর রহস্য বিদীর্ণ করে দিচ্ছে বুলডোজারের হিংস্র দাঁত, দৈত্যের দেহ নিয়ে একটানা গর্জন করতে করতে ট্রাক্টরের দল ঘুরে মরছে নির্দিষ্ট সীমারেখায়।

পৃথিবীর যেখানে হয়তো কোনোদিন মানুষের পা পড়েনি, সেখানে মানুষের রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রোদ্দুরে গলে জল হয়ে। মানুষ? না মানুষের মতো দেখতে অন্য কোনো প্রাণী?

ওরা—ওই মানুষের মতো দেখতে প্রাণী-গুলো—যারা সভ্যতার আদিযুগ থেকে রোদ্দুরে রক্ত গলিয়ে গলিয়ে পাহাড় কেটেছে, মাটি খুঁড়েছে, পাথর জুড়ে জুড়ে কেল্লা বানিয়েছে, তারা আজও রয়েছে, কিন্তু তাদের ভূমিকাটা যেন নগণ্য হয়ে গেছে।

কুৎসিতদর্শন বিশাল বিশাল এই যন্ত্র-গুলোর পায়ের কাছে বড় বেশী ছোটো দেখাচ্ছে ওদের। ওরা আর কোদালের ছন্দে গান গায় না, যন্ত্রের গর্জনে ওদের গান চাপা পড়ে গেছে। যন্ত্র ওদের গৌরব কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে আত্মতৃপ্তি। আত্মতৃপ্তি বেড়েছে দত্ত সাহেবের দলের। যারা নিজেদেরকে বিধাতার চাইতে কম ভাবে না।

সহকারী চীফ ইঞ্জিনীয়ার দত্ত সাহেব।

এই শহর পরিকল্পনার ভার নিয়েছেন তিনি। কাজে গাফিলতি নেই, নিয়মিত তদারকিতে আসেন, কড়া নজর দেন সব দিকে।

এ সময়টা অধস্তন যাঁরা যাঁরা থাকেন, সবাই সন্ত্রস্ত। এ'রা সারাক্ষণ হাত কচলাবেন, প্রতি কথায় 'হেঁ হেঁ' করবেন, উপদেশ শোনবার আগেই 'ইয়েস স্যার' বলে ঘাড় কাত করবেন, আর দত্ত সাহেবের গাড়ির ধুলো মিলোতে না মিলোতে যে আলোচনা শুরু করবেন, সেটা আর যাই হোক, তাঁর প্রতি প্রীতিসূচক নয়।

প্রীতিতে উথলে ওঠবার কথাও নয়, লোকটা যে ওদের যথেষ্ট অসুবিধে ঘটাচ্ছে। ওপরওলার যদি কর্মশক্তি অফুরন্ত হয়, আর নীতিজ্ঞান টনটনে থাকে, তাহলে নিম্ন-তনদের কম অসুবিধে?

লোকটাকে ওরা ঠিক ভয়ও করে না, করে করুণা। যেখানে চোখের এতটুকু ইসারায় হাজার হাজার টাকা পকেটে উঠতে পারে, এক টুকরো কাগজের গায়ে একটা স্বাক্ষর বসালেই হাওয়ার গায়ে লাখ লাখ টাকার হিসেব লেখা হয়ে যায়, সেখানে যদি লোকটা সারা মাস অসুরের মতো খেটে শুধু মাইনের টাকাটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তার ওপর করুণা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

কিছু সপ্রশংস পিঠ-চাপড়ানি, কিছু মৃদু তিরস্কার, কিছুটা ধমক চমক, আর বেশ কিছুটা উপদেশ বর্ষণের শেষে আবার মোটরের ধুলো উড়ল!

এ তল্লাট থেকে আর এক তল্লাটে।

লাখ লাখ লোক গৃহহারা হয়ে এসেছে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজতে। তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতেই না এত কাণ্ড কারখানা? তা আশ্রয়ের আশ্বাস তারা পাচ্ছে।

জুতোর দোকানের শেলফে সাজানো শূন্য জুতোর বাক্সগুলোর মতো এক মাপের আর এক ধাঁচের অজস্র বাড়ি তৈরি হচ্ছে তাদের জন্যে, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ভেতর বার দুইয়ের ছক অভিন্ন। একটা বাড়িতে বাস করলেই সব বাড়িগুলোয় বাস করার আস্বাদ পাওয়া যাবে।

এই বেশ, এই চমৎকার!

পড়শীর বাড়ি সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল

বসেন, ইচ্ছে বুঝে শরীর বুঝে বাঁ হাতে তুলে তুলে নেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য খুব যে কম নেন তাও নয়।

দত্ত সাহেবের আর উদ্দালকের দুজনের অনুরোধের চাপে পড়ে হয়তো ওদের চাইতে বেশীই নেওয়া হয়ে যায়। ও'রা কেবলই বলেন, "তোমাকে তো বলতে সাহস হয় না, কিন্তু এটা যদি খেয়ে দেখতে। রেঁধেছে বেশ।'

এইভাবে নেহাৎ অনুরোধে পড়ে যা হয় কিছু খেয়ে উঠে পড়েন মিসেস দত্ত।

উঠে বলতে থাকেন, "খাওয়াটা বেশী হয়ে গেল! না জানি রাত্রে কি অবস্থা হয়!"

ডাক্তারের নির্দেশে খানিকক্ষণ বাইরের খোলা হাওয়ায় বসতে হয়। তিন জনেই বসেন বারান্দায় পাতা চেয়ারে।

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, দেহ মন্থর। এ সময় আর হাসি গল্প চলে না, দত্ত সাহেব বলেন, "কই হে উদ্দালক, তোমার বাঁশিটা বার করোনা?"

"এখন আর—আচ্ছা আনছি!"

বাঁশি নিয়ে আসে উদ্দালক। ভালোই বাজায়। এ-সুর বেশী রাত্রিতে কেমন যেন একটা মাদকতা বহন করে আনে। নেশাচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে পড়ে থাকেন দত্ত সাহেব, উদ্দালকও বোধহয় চোখ বুজেই বাজায়।

কখন যে এক সময় মিসেস দত্ত উঠে যান, কারোই চোখে পড়ে না। বলতে গেলে কোনো-দিনই চোখে পড়ে না।

এ সময় চোখে পড়াবার চেষ্টাও বৃথা।

চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে 'ফেণ্ট' হয়ে পড়ে থেকেও দেখেছেন মিসেস দত্ত, দুজনের একজনও তাকায় না। এক সময় ঘাড়ের ব্যথায় চেতনা ফিরিয়ে আনতে হয়।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুজনেরই মুখে। রগের-কাছের-চুলে-পাক-ধরা দত্ত সাহেবের ভারী ভারী মুখ আর কালো সাটিনের মতো চকচকে চুলে ঘেরা উদ্দালকের পাতলা সুগৌর মুখ, তবু যেন প্রায় একরকম।

যেন ওরা সমগোত্র, ওরা সুদূরের।

ওদের একজনেরও নাগাল পাওয়া যায় না —ওরাই যেন পরস্পরের আশ্রয়!

কী সুন্দর, কী পবিত্র মুখ উদ্দালকের।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি—ও কী করল! ও কেন ওর দেশ ঘর আত্মীয়স্বজন সব ত্যাগ করে এখানে পড়ে আছে? ও তো এদের কেউ নয়?

ও ছাত্র-জীবনে কলেজের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিল, ওর কতো ভবিষ্যৎ, কতো সম্ভাবনা। বিলেত যাওয়ার পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি ছিল ওর, কিন্তু কী হল?

কে ওর জীবনের শনি?

আরতি?

দত্ত সাহেব?

না ওর ভাগ্যের অধিপতি গ্রহই স্বয়ং শনি?

বিলেত যাবার আগে কি যেন একটু দরকারে পড়ে দাদার বন্ধু এই দত্ত সাহেবের কাছে এসেছিল উদ্দালক, দরকারটা এখন আর ভেবেও মনে করা যায় না।

শুধু মনে পড়ে, দুতিন দিনের মধ্যে এ শহরের সমস্ত "দ্রষ্টব্য"গুলি দেখতে গিয়ে 'লু' লেগে সৃষ্টিছাড়া রকমের একটা জ্বরে পড়ে গিয়েছিল।

সেই রোগশয্যায় 'মিসেস দত্ত' রূপান্তরিত হলেন 'আরতি দি'তে।

তার পর বম্বে গিয়ে ঠিক যেদিন জাহাজ ছাড়বে, তার আগের দিন খবর পেল, মা মারা গেছেন। বাপ ছিলেন না, মা গেলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। পরবর্তী জাহাজখানাতেও যাওয়া হয়ে উঠল না, তার পরেরটাতেও না।

তারপর থেকে আজ অবধি কতো জাহাজ এল গেল, উদ্দালকের জীবনের জাহাজ আর সমুদ্রে ভাসল না। আটকে রইল বালির চড়ায়।

জগতের অনেক যুক্তিহীন ঘটনার মধ্যে এটা আর একটা।

প্রথম প্রথম ফেরার কথা উঠত। কিন্তু দানা বাঁধতে পেত না। কথা উঠলেই মিসেস দত্ত রুক্ষু রুক্ষু চুলে ঘেরা সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ফিরিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলতেন, আর কটা দিন কষ্ট করো উদ্দালক, আর গোটা কতক দিন সবুর করো। বুকের ভেতর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, বেশী দিন আর আটকে রেখে তোমার ক্ষতি করব না! দেখছ তো তোমাদের দত্ত সাহেবকে? দিন রাতের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা ও'র . কাজ! হয়তো কোন দিন বেচারী-আমাকে নিঃসঙ্গ [illegible] নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কেউ জানতেও পারবে না। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে নিজের ওপরই আমার করুণা হয় উদ্দালক।

দত্ত সাহেব তখনো 'দত্ত দা' হন নি, তখনো রগের চুলে পাক ধরেনি। তিনি ওর যাওয়ার প্রস্তাব শুনলেই তাঁর দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখে হতাশার ছবি ফুটিয়ে আবেগগম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, তুমি চলে গেলে তোমার আরতিকে আর বাঁচানো যাবে না ভাই! আমার এই স্বার্থপর অনুরোধ, তোমার অনেক ক্ষতি করছে জানি,—কিন্তু 'ও মরে যাবে' এ কথা

যে ভাবা যায় না! তুমি জানো না,—ও বাঁচতে চায় না, বাঁচবার কী দুরন্ত ইচ্ছে ওর! তুমি চলে গেলে ও মরে যাবে! দেখছ তো আমাকে?

এর পরেও নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা? মানুষ তো পশু নয়?

ধীরে ধীরে এ পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে উদ্দালক।

যাবার কথা উঠতে পারে একথা আর কেউ স্বপ্নেও ভাবে না।

তা' বেঁচে আছেন আরতি দত্ত আরো অনেক বছর, 'নন্দলালের' মতো এক অদ্ভুত বাঁচা!

বিছানাই তাঁর বাঁচার আশ্রয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে, ফুরিয়ে যাবে জানেন জীবনের সমস্ত সমারোহ, থেমে যাবে সমস্ত গান!

তাই ডাক্তার যদি বলেন, "এবার উঠে পড়ুননা, দত্ত সাহেবকে একটু দেখুন টেখুন, বয়েস তো ও'রও হয়েছে, অথচ কী অমানুষিক পরিশ্রমই করে চলেছেন—খাওয়া দাওয়ার যত্ন দরকার!"

শুনে দুর্বল হৃদয় নিয়েও কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়েন আরতি দত্ত। বলেন, খাওয়ার যত্ন করতে গিয়ে—শেষে ভদ্রলোককে বিপত্নীক করে বসব, এই আপনি চান বুঝি?

বাঁশি থামল, দত্ত সাহেব কোমল স্বরে বললেন, "রাত হয়েছে উদ্দালক!"

"ও তাইতো", অপ্রতিভের হাসি হাসে উদ্দালক, "আপনিও যান! সেই তো ভোর ছটা থেকে জোয়াল কাঁধে?"

দত্ত সাহেব উঠে পড়েন, নিজের ঘরে যেতে যেতে স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, "আরতি, কিছু লাগবে? মনিয়ার মা'কে ডেকে দেবো? লাগবে না কিছু? আচ্ছা ঘুমোও। শুভ রাত্রি!"

অদ্ভুত একটা দরদভরা দৃষ্টিতে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে উদ্দালক! তাকিয়ে থাকে তাঁর ভেজানো কপাটটার দিকে! তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে পড়ে নিজের ঘরে চলে যায়! হয়তো—আরতির কথা তখন মনেও পড়ে না তার!

খাটের ধার ঘেঁষে পাতা বিশেষ আরামের ব্যবস্থা-সম্বলিত সেই ঈজিচেয়ারটায় পড়ে থাকেন মিসেস দত্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! বিছানায় উঠে শুতে ইচ্ছে হয় না। সারাদিন শুয়ে শুয়ে বিছানার আকর্ষণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

হতাশায় আর অভিমানে বুকের মধ্যে কেমন একটা জমাট ব্যথা অনুভব করেন, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করনে, অসুখটা যদি ছলনা, এটা তবে কি? এই অব্যক্ত যন্ত্রণাটা?

সারাদিন ওদের আরতির জন্যে চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু আশ্চর্য, রাত্রে ওরা এতো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয় কি করে? হার্টের অসুখের রোগী কি কখনো রাত্রে হার্ট ফেল করে না?

অথচ ওদেরই বা দোষ কি? ডাক্তারের নিষেধ যে! নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ঘুমের দরকার আরতি দত্তর! কিন্তু কেন তিনি ঘুমোবেন? ঘুমিয়ে লাভ কি তাঁর? ঘুম না হলে তবু তো আগামী কাল ডাক্তারের কাছে কমপ্লেন্ করবার জোরালো একটা বিষয় থাকে হাতে। মুখের চেহারায় সত্যিই ক্লান্তির ছাপ পড়ে তা'তে। তবু তা'তে যদি বিশ্বাস করে ওরা।

হার্টের অসুখের গল্প যে কেউই বিশ্বাস করে না, ডাক্তার নয়, স্বামী নয়, এমনকি উদ্দালকও নয়, এই নিষ্ঠুর সত্য আরতির চাইতে বেশী আর কে জানে?

একঘেয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাকুটে মরতে ইচ্ছে হয় মিসেস দত্তর, হঠাৎ কোনো অলৌকিক উপায়ে একবারের জন্যে হার্ট-ফেল করে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, তোমাদের ধারণা কি নিদারুণ ভুল!

কিন্তু কিছুই পারা যায় না, শুধু বসে বসে ভাবা যায়, দত্তসাহেব উদ্দালককে সহ্য করেন কেন? স্বাভাবিক সরলতায়, না নিষ্ঠুর অবহেলায়? ভাবা যায়, উদ্দালকই বা এখানে রয়ে গেল কেন? কার ওপর মমতায়?

আরতির?

না দত্তসাহেবের?......সন্দেহের এই তীক্ষ্ণ কাঁটা দুটো কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না।

এ যন্ত্রণার কোনো দর্শক থাকে না আমি বাদে।

কিন্তু আমি কি করব? আমার উপায় কি? তুমি যদি তোমার জীবনে ঈজি-চেয়ারকেই বেছে নাও, আরতি,—তুমি যদি না বোঝো—পুরুষের চোখে ঈজিচেয়ারের মূল্য কি, তাহলে আমার কি করবার আছে?

গল্পলেখকদেরও যে বিধাতাপুরুষের মতোই হাত পা বাঁধা!

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

নেকদিন আগের কথা। ১৯২৭ সাল। জুন মাস। এডিনবরা। দেশে ফিরিবার সময় হইয়াছে। ওদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে ইচ্ছা হইয়াছিল, দেশটাকে একটু ঘুরিয়া দেখিব। ওখানকার ট্রেন-ভাড়া খুব বেশী। ওখানকার থার্ড ক্লাসের ভাড়া আমাদের দেশের ফার্স্ট ক্লাসের মত। তাছাড়া ট্রেনে করিয়া বড় বড় শহরে গিয়া নূতন কিছু দেখা যায় না। অবশ্য যাঁহারা বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে যান বা গবেষণা করিতে যান, তাঁহাদের কথা পৃথক। নহিলে সাধারণের চোখে সব শহরই প্রায় সমান। সেই ট্রাম, বাস, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা, আর তাহারই পাশে দীন-দরিদ্রের বস্তি। শেফিল্ড যা, ম্যাঞ্চেস্টারও তা-ই। আমার ইচ্ছা ছিল, দেশের ভিতরটা দেখা ওদেশের পথঘাট, সমুদ্রতীর, বন, পর্বত, হ্রদ, কৃষিক্ষেত্র, পল্লীজীবন প্রভৃতির স্বরূপ দেখিতে হইলে বড় শহরে ঢুকিয়া হোটেলে বাস করিয়া কোন লাভ নাই। সেই জন্য একখানা মোটর সাইকেল কিনিয়া তাহাতে করিয়া দেশটা দেখাই সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য মনে হইল। তদনুসারে একখানা মোটর বাইক কিনিয়া তাহা দ্বারাই স্কটল্যান্ডের বহু স্থান, যেমন স্টারলিং, গ্লাসগো, এবার্ডিন, ডান্ডি প্রভৃতি শহর, ইন্‌ভারনেস পর্যন্ত বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল, ব্যালমোরাল অঞ্চল এবং লখ্‌ লোমন্ড ও লখ্‌ ক্যাট্রিন নামক রমণীয় হ্রদ ও তৎপার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়াছিলাম। কি চমৎকার দৃশ্যাবলী! তারপর ইংলণ্ডেরও বহু স্থান ঘুরিয়াছিলাম। ওদেশের রাস্তা চমৎকার। অল্প দূর পর পরই পেট্রল ও মেরামতের ব্যবস্থা, কিছুদূর পর পরই আহারাদির স্থান প্রভৃতি থাকায়, মোটর-ভ্রমণের পক্ষে খুবই সুবিধা। এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে একখানা পুস্তক হইয়া যাইতে পারে। দুই একটি কথা মনে পড়িতেছে, তাহাই আপাতত বলিতেছি।

ঠিক আমাদের দেশের মত গ্রাম বা ঘরবাড়ি ওদেশে নাই। প্রতিটি গ্রামই একটি ছোট শহর। মাঠে চাষ করিতে দেখিয়াছিলাম ঘোড়ার লাঙল—ট্র্যাক্টর দেখি নাই। অবশ্য সে ঘোড়া বিরাট ঘোড়া। ঘোড়া যে অত বড় হয়, তাহা জানিতাম না। একস্থানে একটি চারণ-ভূমিতে দেখিলাম অনেক ভেড়া চরিতেছে। ভেড়াগুলি আমাদের দেশের এক একটা বাছুরের মত। আর মাঠে ছড়ান রহিয়াছে ফুটবলের আকারের অনেক সাদা সাদা গোলাকার পদার্থ। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ওগুলি টারনিপ—গরু ভেড়ার খাওয়ার জন্য দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের লোকদের ব্যবহার অতি ভদ্র। অনেক জায়গায় বিশেষত উত্তর স্কটল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশে অনেক গ্রামের ভিতর গিয়া গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে কথা বলিয়া জানিতে পারিলাম, তাহারা কালো মানুষ এই প্রথম দেখিল। মনে যাহাই থাকুক, তাহাদের ব্যবহার অতীব ভদ্র ও অমায়িক। চালচলন প্রায় আমাদের পল্লীবাসীর মত। কোন স্থানেই আহার ও বাসস্থানের জন্য কোন প্রকার অসুবিধা পাইতে হয় নাই। উত্তরে ইন্‌ভারনেস হইতে দক্ষিণে কার্লাইল পর্যন্ত সর্বত্রই চমৎকার আবহাওয়া ও চমৎকার দৃশ্যাবলী উপভোগ করিতে পারিয়াছিলাম। কয়েকমাস পূর্বে ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত লেক ডিস্ট্রিক্টস, যেখানে লেক উইন্ডারমিয়ার, লেক গ্রাসমিয়ার প্রভৃতি রহিয়াছে, সেই সকল রমণীয় স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলাম এবং দক্ষিণে আইল-অফ-ওয়াইট পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সমগ্র প্রদেশটাই যেন একটি আস্ত সাজান বাগান। উত্তরে ইনভারনেস হইতে দক্ষিণে আইল-অফ-ওয়াইট পর্যন্ত এই সকল রমণীয় দৃশ্যাবলী যখনই দেখিয়াছি, তখনই সমস্ত আনন্দের মধ্যে বার বার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে একটা কথা, এই সমৃদ্ধির, এই সৌন্দর্যের মূলে রহিয়াছে নিরন্ন ভারতবাসীর দেহের শোণিত, মুখের গ্রাস। ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে ভ্রমণের সময় যাঁহারা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পরলোকে এবং অন্য জন এখানকার একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

এইবার আমার ওদেশের মোটর বাইক ভ্রমণের শেষাংশটুকু বলিব। যাত্রার পূর্বে ইচ্ছা হইল, ফিরিবার পথে খানিকটা পথ বাইকেই যাওয়া যাক। তদনুসারে জিনিস-পত্র সমস্ত পাঠাইয়া দিয়া শুধু বার ইঞ্চি অ্যাটাচি কেস একটা রাখিয়া দিলাম। স্থির করিলাম, এডিনবরা হইতে নেপলস পর্যন্ত বাইকে আসিয়া নেপলসে জাহাজ ধরিব। জাহাজওয়ালাদেরও তাহা জানাইয়া দিলাম। এই সময়ে আরো একটা ছোট্ট খেয়াল হইল। জীবনে কোন প্রকার রাজনীতিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ দেই নাই। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দেশের উপর দিয়া যে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া মনের উপরে একটুও হয় নাই, এরূপ কোন ভারতীয়ের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশে জাতীয় পতাকা তখন একটা ভয়ানক বস্তু। স্বদেশ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা ভয়ানক ব্যাপার। অথচ ওদেশে গিয়া দেখিলাম, যাহাদের ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বেশ নিরাপদেই সকল প্রকার আলোচনা করিতেছে। স্বাধীন দেশের বাতাস যে পৃথক, তাহা কয়েকদিনের মধ্যেই অনুভব করা যায়। যাত্রার প্রাক্কালে হঠাৎ মনে হইল, দেশে তো জাতীয় পতাকা নিষিদ্ধ, এদেশে কোন নিষেধ নাই। সুতরাং এই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যদি এই পতাকা উড়াইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে কেমন মজা হয়। কিন্তু পতাকা পাই কোথায়? মেয়েদের পোশাকের একটা দোকানে গিয়া সাদা, সবুজ ও হলদে তিনটি তিন রংএর চুল বাঁধা রেশমের ফিতা এবং তার সঙ্গে সূচ ও সুতা কিনিয়া আনিয়া একটি ছোট পতাকা প্রস্তুত করিলাম এবং মোটর বাইকের সামনের নাম্বার প্লেটের গায়ে একটি লোহার শলা বসাইয়া তাহাতে এই পতাকা আটকাইয়া দিলাম।

ইনভারনেসের একটি দৃশ্য

যাত্রার দিন আসিল। জিনিসপত্র সব চলিয়া গিয়াছে। এডিনবরা ত্যাগের পূর্বে যে বাড়িটায় ছিলাম সেটা লিবার্টন পল্লীতে। লেপার টাউনের অপভ্রংশ লিবার্টন। এটি আগে কুষ্ঠরোগীদের পাড়া ছিল। এখন অবশ্য এই রোগ ওদেশে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি যে বাড়িতে ছিলাম, তাহার মালিক একজন স্কুলের শিক্ষক। সকালে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অ্যাটাচি কেসটি বাইকের পিলিয়ন সিটে বাঁধা হইল। তাহার মধ্যে শার্ট, কলার রুমাল, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম, দাঁতের পেস্ট, ইংল্যান্ডের রাস্তার ম্যাপ, কন্টিনেন্টের রাস্তার ম্যাপ; ইংল্যান্ডের ড্রাইভিং লাইসেন্স, কন্টিনেন্টের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, পেন্সিল প্রভৃতি। পরিলাম, সুটের উপর ওয়াটারপ্রুফ-ওভারকোট, পায়ে লেগিং, মাথায় টুপি, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌, হাতে মোটরিং গ্লাভস। বাইকের হাতলের সঙ্গে পেট্রল ট্যাঙ্কের উপর আটকাইয়া লইলাম একটি ভ্যানিশিং ট্যাবলেট। ম্যাপ দেখিয়া তাহাতে পঞ্চাশ বা একশ মাইলের মধ্যে পথে যে সব স্থান বা রাস্তার মোড় পড়িবে, তাহা তাহাতে লেখা। প্রতি মোড়েই ত গাড়ি থামাইয়া প্রকাণ্ড ম্যাপ বাহির করিয়া পথের নির্দেশ নেওয়া যায় না। এই পথ শেষ হইয়া গেলে ট্যাবলেটটি মুছিয়া ফেলিয়া আবার আর একশ মাইলের বিবরণ লিখিয়া লইতে হইবে।

বৎসরের এই সময়টিতে আবহাওয়া এবং আকাশের অবস্থা খুবই ভাল থাকিবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। সারাদিন-রাত বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তাঘাট সব কাদায় প্যাচপেচে। বেশি দেরি করাও

অরণ্য-পথ. ইংলন্ড

সম্ভব নয়। সময়মত নেপলসে পৌঁছিয়া জাহাজ ধরিতে হইবে। সুতরাং এই আবহাওয়াতেই যাত্রা করিতে হইল। গৃহ-স্বামী ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার বাইকখানা উলভার হ্যাম্পটন শহরের এ. জে স্টিভেন্স কোম্পানীর প্রস্তুত। সাধারণ নাম এ জে এস। আমি নাম দিলাম, অযশা।

বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলাম আমার প্রফেসার ই টি হুইট্যাকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে। তিনি এবং তাঁহার সহধর্মিণী হাস্যমুখে বিদায় দিতে আসিলেন। দরজার সামনে বাইকের সম্মুখে পতাকা দেখিয়া প্রফেসর জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটা কি? আমি বলিলাম, ওটা আমাদের স্বপ্নের পতাকা। উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। প্রফেসর মহাশয়ের পত্নী আইরিশ। তিনি আমাদের মনোভাব বুঝিতেন। পতাকা দেখিয়া বলিলেন, ওটাকে ঘুরাইয়া ধরিলেই অবিকল আইরিশ পতাকা হয়। আমি বলিলাম, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই এটা খুব পছন্দ করবেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তারপর এতটা পথ বাইকে যাইব শুনিয়া একটু চিন্তান্বিত হইয়া মাতৃসুলভ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, খুব সাবধানে যেও। দেখো যেন কোন দুর্ঘটনা না হয়। আরো দুই একটি কথার পর তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এডিনবরা ত্যাগ করিলাম।

মনে করিয়াছিলাম, আবহাওয়া ক্রমশ ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। মাঝে সামান্য কিছুক্ষণ একটু পরিষ্কার হইয়া পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রায় একশত মাইল আসিয়া নিউক্যাসল-অন-টাইনে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠিলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানেই রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে ব্রেকফাস্টের পর পুনরায় অযশার সহিত যাত্রা শুরু করিলাম। এই দিনই লণ্ডন পৌঁছিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আবহাওয়া সমস্ত দিন অত্যন্ত খারাপ থাকায় বেশি স্পীড দিতে পারা যায় নাই। কাজেই সন্ধ্যার সময়ে কেম্ব্রিজ পৌঁছিয়া সেখানে রাত্রি-যাপন করা স্থির করিলাম। নিউক্যাসল হইতে কেম্ব্রিজ প্রায় আড়াইশো মাইল হইবে। পরদিন প্রাতে লণ্ডন পৌঁছিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম এবং ভিজা কাপড়-চোপড়গুলি কোনমতে শুকাইয়া লইলাম। অযশা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, কোন অসুখ হয় নাই। পতাকাটির দিকে চাহিয়া একটু আনন্দ অনুভব না করিয়া পারিলাম না।

পরদিন লণ্ডন ত্যাগ করিলাম। আকাশের অবস্থা একটু ভাল। রাস্তা অনেকটা শুষ্ক। অযশা নিশ্চিন্ত মনে ছুটিতে লাগিল। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন-ষাট। কখনও কখনও স্পীডমিটারের কাঁটা ষাটেরও উপরে চার পাঁচ বেশি পর্যন্ত দেখাইতেছিল। পথে এক জায়গায় দেখিলাম, রাস্তার পাশেই স্ট্রবেরির বাগান। সেখানেই ছোট দোকান। চাহিলেই গাছ হইতে পাকা স্ট্রবেরি পাড়িয়া আনিয়া ক্রীমের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া যায়। যথাসময়ে ডোভার পৌঁছিলাম। পথে কিছুক্ষণ একটু বৃষ্টি পাইয়াছিলাম। কিন্তু ডোভার পৌঁছিতেই আকাশ আবার বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং এই সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যেই ইংলিশ চ্যানেল পার হইলাম।

এইখানে একটি সামান্য ব্যাপারে মনটা বেশ একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। লণ্ডন হইতে ডোভার পর্যন্ত একটু জোরে বাইক চালনার ফলে বাতাসের চাপে পাতলা রেশমের পতাকাটির অগ্রভাগ হইতে একটু একটু করিয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। পতাকাটির এই দুরবস্থা দেখিয়া একটু মনঃক্ষুন্ন না হইয়া পারি নাই। জাহাজে উঠিয়া এই ছিন্ন পতাকাটিকে খুলিয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সাতাশ বৎসর পূর্বের সে ক্ষোভ আজও অক্ষুন্নই রহিয়া গেল, ইহাই ভাবিয়া আশ্চর্য হই।

চ্যানেলের এপারে ক্যালে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রে একটি হোটেলে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে আবার যাত্রা করিলাম। এমনই দুর্দৈব যে আবহাওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবিরত বৃষ্টি, তাহার সহিত ঝড়। পথে একস্থানে দেখি একটি প্রকাণ্ড গাছ উপড়াইয়া পড়িয়া রাস্তার একপাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত একেবারে রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। বাইক হইতে নামিয়া বাইকটিকে ঠেলিয়া মাঠের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া গিয়া পুনরায় রাস্তায় উঠিতে হইল। পথে একটি ছোট প্রাইভেট হোটেলে লাঞ্চ খাইয়া সন্ধ্যার সময়ে আপাদমস্তক ভিজিয়া প্যারি পৌঁছিলাম।

এখানে সংবাদ লইয়া জানিলাম, এইরূপ আবহাওয়াই ফ্রান্স ও সুইজার-ল্যাণ্ডে চলিতেছে। যাঁহারা পর্যটন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, এখন একা বাইকে করিয়া আলপস্ পর্বত অতিক্রম করা সমীচীন হইবে না। সুতরাং অগত্যা ওখান হইতে অযশাকে মারসাইতে জাহাজে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া ট্রেনেই ভেনিস হইয়া নেপলসে আসিয়া জাহাজ ধরিলাম।

এ দেশেও অযশার সঙ্গে অনেক বেড়াইয়াছি। একবার কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত অসময়। মে মাস। ভয়ানক গরম। বাংলা দেশ ছাড়াইতেই উত্তাপ একশ দশ হইতে এক শ ষোল। তবু অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু এক জায়গায় টায়ারের রবার গলিয়া বাঁশের চোঁছ বিঁধিয়া টায়ার ফাটিয়া গেল। ইহার পর আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। বাড়তি টায়ারটি লাগাইয়া [illegible] ফিরিয়া আসিলাম। মোট বোধ হয় সাত আট শ' মাইলের বেশি চলা হয় নাই।

বহুদিন হইল অযশা বিদায় লইয়াছে। তবু পথে মোটর বাইক দেখিলেই আজও আট বৎসরের নিত্যসঙ্গী অযশাকে মনে পড়িয়া যায়!

রাগিণী মধু-মাধবী

বিল্ডিং এঞ্জিনিয়ার ও কন্ট্রাক্টর পি ভি বকসী টাকার কুমির ব'লে নাম করেছেন। তাঁর বদনাম আছে অনেক রকম; কিন্তু তিনি কৃপণ নন—সুনাম এই একটিই। যেমন দু হাতে টাকা রোজগার করেন, তেমনি দু হাতেই খরচ করেন।

টাকার সঙ্গে সঙ্গে রুচি থাকা—এ বড় কঠিন কথা। কিন্তু পিনাকীভূষণ বকসী একজন এঞ্জিনিয়ার হলেও একজন বড় শিল্পী। তাঁর কন্ট্রাক্টরিতে যেসব বাড়ি উঠেছে তাদের আদল সব আলাদা ধরনের। সেসব বাড়ির ডিজাইন খুব সাধারণ ব'লে মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যেই কোথায় যেন থেকে যায় শিল্পীর হাতের ছোঁয়া।

পিনাকী এইসব ডিজাইনের জন্যে যখন তারিফ শোনেন তখনই মুচকে হেসে একই কথা বলেন। বলেন, সোজার মধ্যেই যে মজা।

পিনাকীকে এইজন্যে অনেকে বলে, মজার মানুষ।

মজার মানুষই বটে। লোকে তাঁর নামে নানা রকমের বদনাম চালু ক'রেছে, তার অন্ত নেই। কিন্তু এতে তাঁর কোনো পরোয়াই নেই, প্রতিবাদই নেই। তিনি নিজের মনে নিজের কাজ ক'রে যান। নতুন ডিজাইনের প্রকাণ্ড ব্লু-প্রিন্ট টেবিলের উপর বিছিয়ে নিয়ে, ইঁট-চুন-সুরকির হিসেব করেন; কুলি-মজুরের অংক ক'ষে বা'র করেন।

কিছুদিন হ'ল স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর বদনামটা হঠাৎ বেড়ে ওঠে। এই সময় দিন-কয়েক মাত্র তাঁকে একটু মনমরা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু টাল সামলে নিতে তিনি বেশি সময় নিলেন না। যেন অট্টহাস্য ক'রে সমস্ত ধিক্কার সেই হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার আরম্ভ করলেন নতুন জীবন।

বিপত্নীক পিনাকীভূষণের জীবনে যেন এল নতুন কাজের প্রেরণা। স্ত্রীবিয়োগের দরুণ জীবনের যে অংশটা ফাঁকা হয়ে গেল, সেই ফাঁক তিনি হয়তো পূরণ ক'রে নিলেন নতুন কন্ট্রাক্ট দিয়ে। এতে ফল খুব খারাপ হ'ল না—অগাধ টাকা আসতে লাগল।

দুই মেয়ে পিনাকীর—মধুমালা ও মাধবী। এই দুই মেয়েকে তিনি মানুষ ক'রে তুলতে লাগলেন অঢেল টাকা ঢেলে।

স্ত্রী মারা যাবার পরই দুই মেয়ের জন্যে বহাল করেছেন দুজন আয়া। মেয়েরা এখন বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আয়াদের সেজন্যে তিনি ছাড়িয়ে দেন নি। এ ছাড়া প্রতি মেয়ের পিছনে দুজন ক'রে ঝি খাটে। বাড়িতে পড়াতে আসেন সকালে আর সন্ধ্যেয় দিদিমণিরা—প্রতি সাবজেক্টের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন টিচার।

পিনাকী দুঃখ ক'রে বলেন, মায়া আর মমতা আমার নেই। থাকার মধ্যে, আপনারা সবাই জানেন, আছে কেবল টাকা। আমি মেয়েদের জন্যে তাই টাকা ঢালছি।

অবিনাশ পাকড়াশি জাত-ঘুঘু, আর পাড়ার গেজেট, তিনি হাসেন, বলেন, তা ঠিক। মেয়েদের জন্যে আপনি যা করছেন, অন্য কোনো বাবার এমন সাধ্য কি। আমিও তো মশাই, আপনারই জুড়ি। ঠিক আপনার মত দুটি টাটকা মেয়ে রেখে একেবারে কাঁচা বয়সে আমাকে একা ফেলে আমার স্ত্রী পরপারে চম্পট দেন। কিন্তু মেয়েদের জন্যে আমি কী আর করতে পেরেছি? নো আয়া, নো লেডি টিচার—নাথিং। কেবল আমার সিস্টার-ইন-ল—

হেসে উঠলেন পিনাকী, বললেন, বাংলায় বলুন।

অবিনাশ বললেন, আমার শ্যালিকার কথা বলছিলাম। তিনি তাঁর দিদির মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটে এলেন, বুক দিয়ে আগলে রইলেন মেয়ে-দুটিকে। স্নেহ দিয়ে মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে তাদের বড় করলেন, তাদের বিয়ে দিলেন। যদি অতগুলো আয়া আর

লেডি টিচার রাখতে হত তাহলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত না?

পিনাকী হাসলেন। কোনো কথা বললেন না।

অবিনাশ একটু দম নিয়ে বললেন, কিন্তু লোকের মন পাওয়া, মশাই, শিবের অসাধ্য। পার্বতীর সাধ্য কি।

—সে কে?

—আমার শ্যালিকার কথা বলছিলাম। নিজের জীবনটা ঢেলে দিয়ে এত করল, তবু যা-তা কথা রটেছে চারদিকে। মানুষের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

—কি কথা?

হাসলেন অবিনাশ পাকড়াশি, বললেন, কি আবার। স্ক্যান্ডাল। আমাকে-ওকে জড়িয়ে যাচ্ছেতাই কথা-সব। কিন্তু আপনি পাকা লোক। ঠিক রাস্তা ধরেছেন। তা ছাড়া আপনার টাকা আছে, কথা কি।

পিনাকী বললেন, ঠিক ধরতে পারলাম না আপনার কথা।

—সোজা কথা। সোজা যখন, তখন নিশ্চয় মজার কথাও। কথাটা আর কিছু না। স্ক্যান্ডাল। লোকের মুখ বন্ধ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার বাড়িটার নাম দিয়েছে সবাই—নন্দনকানন।

পিনাকী বললেন, নামটা ভালো। কিন্তু এ-নাম আমার ঠিক পছন্দ না।

কি কার পছন্দ, কোন্‌টা কার অপছন্দ—এসব বিচার ক'রে দুর্নাম রটে না। তাই পিনাকীর ভালো-লাগা মন্দ-লাগা' অগ্রাহ্য ক'রেই দুর্নাম ভীষণভাবে চালু হল। মাঝে এইসব কথা কিছুটা চাপা ছিল। মনে হয়, সে সময় হয়তো দম নিচ্ছিল সবাই। এবার সকলে একসঙ্গে প্রকাশ্যেই বলাবলি শুরু করে দিয়েছে।

কাজের মানুষ পিনাকী। সারাদিন আপিস-ঘর সরগরম। অনবরত টেলিফোনে ঘণ্টা বাজছে। চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট কড়ি বর্গা ইত্যাদির দর জানাজানি চলেছে। দম নেবার অবসর নেই। এর মধ্যে হঠাৎ পিনাকীর মনের মধ্যে কয়েকটা কথা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

মনে পড়ে মেয়েদের কথা। মায়া আর মমতার বদলে যাদের জন্যে অকৃপণ হাতে টাকা ঢেলে চলেছেন পিনাকী।

মুষড়ে পড়ার লোক তিনি নন। তিনি লোহার মানুষ। সেণ্টিমেণ্ট বা ইমোশন কাকে বলে তিনি জানতেন না। কিন্তু এখন তাঁর মন ভার-ভার হয়ে ওঠে, বুক টনটন ক'রেও ওঠে কখনো-কখনো।

মেয়েরা যে বড় হল। এখন তারা বুঝতে শিখেছে। একটা বেআড়া কথা যদি তাদের কানে পৌঁছয় তাহলে তারা কি মনে করবে, পিনাকীর এইটেই একমাত্র ভয়।

অন্দরমহলের সঙ্গে যোগাযোগ খুব বেশি রাখতে তিনি পারেন নি। রাত্রি যখন গভীর হয়ে আসত তখন ধীরে ধীরে উঠে দোতলার ঘরে গিয়ে তিনি ধড়াচুড়া খুলে হালকা হতেন। খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দক্ষিণের হাওয়া খেতেন। তার পর নিজের ঘরের এক কোণেই বসতেন টেবিলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাইপ মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করতেন বারান্দায়।

এই ছিল তাঁর প্রত্যেক দিনের রুটিন।

হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল, তিনি তাঁর রুটিন একটু বদল ক'রে নেবেন। কেবল তাঁর নিজেরই যে বয়স হয়ে গেল এমন নয়, মেয়েরাও বড় হয়ে উঠল। এখন তাদের দিকে নিজেরই একটু নজর রাখা দরকার।

কয়েকদিন ধরে পিনাকী এই রকম গবেষণা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে যা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেটা ভেঙ্গে নিতে তাঁর কেমন যেন সংকোচ হল। হঠাৎ অসময়ে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলে বাড়ির ঝি-চাকরেরাই-বা কি মনে করবে, মেয়েরাই-বা ভাববে কি। আর-সকলের কথা নাহয় বাদই গেল। অবিনাশ পাকড়াশির বা অন্য কোনো প্রতিবেশীর।

ইতিমধ্যে নন্দনকাননের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। সেই সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছে কত-যে মধুকর, সে-সংবাদও রাখেন না পিনাকীভূষণ।

দুই মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে—এটা অনুমান করেছেন পিনাকী, হয়তো আভাসে দেখেছেনও, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে জানা তাঁর হয়নি। অন্দরমহল সম্বন্ধে তাঁর আতঙ্কই তাঁকে এমনি তফাতে সরিয়ে রেখেছে।

পিনাকীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই ঐই বাড়ির, তবুও কিভাবে বাড়িটার যাবতীয় কাজকর্ম সমানে হ'য়ে চলেছে—একথা ভেবে তিনি বিস্মিত হন না। একটা সুইচ টিপে দিলেই যেমন বিরাট একটি যন্ত্র চালু হয়ে যায়, নিজের মনেই তার যাবতীয় পিস্টন বল্‌বেয়ারিং রোলার হ্যামার একসঙ্গে কাজ করে; পিনাকী জানেন তাঁর এই বৃহৎ অট্টালিকার এই সংসারটি অবিকল সেই পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে।

যন্ত্রের আর-কোনো কলকব্জা নয়, কেবল সুইচটাই তাঁর হাতে।

সামান্য একটি মানুষের অভাবে সব এমন বিশৃংখল হয়ে যেতে পারে—এ ধারণাই এতদিন ছিল না পিনাকীর।

আসলে তিনি নিজেই একটা যন্ত্র হয়ে গেলেন কিনা—এইরকম সন্দেহ হল তাঁর। কিন্তু তিনি নাকি নিছক একজন এঞ্জিনীয়ার নন্, তিনি নাকি শিল্পীও—জীবনে তিনি তাঁর শিল্পী-মনের তারিফ অনেক পেয়েছেন। সেসব কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন। টাকা দিয়ে ধনের ঐশ্বর্য বাড়ে, কিন্তু মনের ঐশ্বর্য বাড়ে কিনা—এই প্রশ্ন জাগল পিনাকীর মনে। নিজের বিরাট বাড়িটার দিকে চেয়ে পিনাকীর নিজেকে অতি দীন আর দুঃখী ব[illegible] মনে হল হঠাৎ।

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পিনাকীভূষণ [illegible]। গেটের বাইরে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে সোফার। পিনাকী গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবলেন। একবার তাকালেন বাড়িটার দিকে। ওর নিভৃত নেপথ্য থেকে তিনি নির্বাসিত। [illegible] হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যেন মনে-মনেই গা-ঝাড়া দিলেন। গেট [illegible] ক'রে

ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে, জুতোর মশ্‌মশ্‌ শব্দ ক'রে পাথর-কুচির রাস্তায় সর-সর পদপাত ক'রে তিনি এগিয়ে চললেন। তর-তর ক'রে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়লেন বারান্দায়। একটু থমকে দাঁড়ালেন। এবার তিনি সরাসরি অন্দরে ঢুকে দাঁড়াবেন তাঁর মেয়েদের মুখোমুখী। আজ তাদের তিনি চমকে দেবেন। পিতার যে-স্নেহ থেকে এতদিন তাদের তিনি বঞ্চিত করেছেন, সেই স্নেহ আজ তিনি মুষল-ধারায় বর্ষণ করতে চান তাদের উপর।

এ বাড়ির ডিজাইন তাঁর নিজের হাতে করা। তাই বাড়িটার করিডর উঠোন সিঁড়ি বারান্দার সঙ্গে অনেককাল দেখা-সাক্ষাৎ না থাকা সত্ত্বেও পথ তাঁর ভুল হচ্ছে না। শানের সঙ্গে জুতোর শব্দ পিনাকীর মনে আক্ষেপের সুরে বেজে বেজে উঠছে। অবিনাশ পাকড়াশির ভাষায় যাকে বলে স্ক্যান্ডেল, সেই দুর্নামের ভয়ই এমন ভীরু ক'রে রেখেছে তাঁকে। হাসিই পায় পিনাকীর।

দোতলার সব কয়টা ঘর ঘুরে কাউকে দেখতে পেলেন না পিনাকী। কেবল দেখলেন, ঝি আর চাকরেরা স্তব্ধ হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে তফাতে তফাতে। পিনাকী কারো দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলেন উপরে—তেতলায়। ডাকলেন, মধুমালা, মাধবী।

সেমিজের মধ্যে চিরুনি চালিয়ে দিয়ে পিঠ চুলকাচ্ছিল শৈবলিনী। আয়নায় একটা ছায়া দেখে সে চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল।

—তুমি কে?

—শৈবলিনী। বড়দি-মণির ঝি।

পিনাকী বলল, দিদিমণি কোথায়?

কিছু-একটা অঘটন নিশ্চয় ঘটেছে। শৈবলিনী কথার উত্তর দিতে পারল না। বলল, নীচে গেছেন বুঝি। দেখছি।

শৈবলিনী ভয়ার্ত হরিণীর মত ঊর্ধ্ব-শ্বাসে নীচে নেমে গেল।

পিনাকী রেলিঙে ভর দিয়ে নীচের দিকে তাকালেন। দেখলেন, দোতলার বারান্দায় পাঁচ-ছয়জন—ঝিই হয়তো ওরা—জড়ো হয়ে ফিশফিশ শব্দে কি-যেন বলাবলি করছে। আরো নীচে চোখ পড়তেই দেখলেন, দুটি চাকর মনের আনন্দে দোতলার দিকে চেয়ে হাসছে।

পিনাকী বুঝলেন কিছু-একটা মজা হয়েছে। কিন্তু মজাটা যে ঠিক কি তা বুঝতে পারলেন না।

রেলিঙে ভর দিয়েই তিনি এবার নীচের দিকে ঝুঁকে চিৎকার ক'রে উঠলেন, মধুমালা, মাধবী।

সিঁড়ির ধাপে-ধাপে শব্দটা নেমে সারা বাড়িময় ছড়িয়ে গেল। কিন্তু কোনো সাড়া ফিরে এল না।

পিনাকী রেলিঙে আর-একটু ঝুঁকে বললেন, এই, কে ওখানে? এদিকে এস। উপরে উঠে এস।

ফাজিল চাকর-দুটোর একটা ডাকটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। পিনাকী বললেন, তোমাকে। তোমাকেই ডাকছি।

পিনাকী পায়চারি করতে লাগলেন ছাদময়। কোথায় গেল ওরা? ঝিটাও যে

যা-তা কথা রটেছে চারদিকে

পালাল, এখন পর্যন্ত তারও আর-কোনো পাত্তা নেই। বাড়িটা আছে কার চার্জে? কে এর মালিক? কিছুই যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না পিনাকীভূষণ। তাঁর জীবনের সমস্ত পরিশ্রম কেমন-যেন ঝুটো আর মিথ্যে হয়ে গেল এক নিমেষে।

চাকরটা সামনে এসে দাঁড়াবামাত্র দাবড়ি দিয়ে উঠলেন পিনাকী—ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে।

চিৎকারে নিজের গলাই বুঝি চিরে গেল পিনাকীর। তিনি কাশতে লাগলেন। কাশতে কাশতে দম প্রায়-বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

এই এত বড় বাড়ি, অবিনাশ পাকড়াশি যার নাম দিয়ে গেছে—নন্দনকানন, সে-বাড়িকে পিনাকীর মনে হল মহাশ্মশান ব'লে। এক গভীর অমাবস্যার রাত্রে পথ ভুলে হঠাৎ যেন তিনি এসে পড়েছেন এখানে। যারা এখানে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তাদের অশরীরী ছায়া বলে মনে হচ্ছে পিনাকীর।

কাশির ঝোঁক থামলে পিনাকী দম নিলেন। বিকট চিৎকার ক'রে তিনি আবার ডাক দিলেন, মধুমালা। মাধবী।

শৈবলিনী আর লক্ষ্মী ছুটে এল। এসে দেখল, পিনাকী বারান্দার চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন।

শৈবলিনী এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে ডাকল, কর্তাবাবু।

—কি? কে তোমরা?

—আমরা দাসী। বড়দি-মণির আর ছোড়দি-মণির।

পিনাকী তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারা কোথায়? নীচে যে খুঁজতে গেলে, পেলে তাদের?

লক্ষ্মী এদের মধ্যে একটু সাহসী। সে বলল, আপনি রাগ করবেন, তাই বলতে পারিনি। তারা সব বেড়াতে গেছে।

—কোথায়?

লক্ষ্মী শৈবলিনীর মুখের দিকে তাকাল, বলল, হয়তো পুরী গেছে, আবার পাহাড়েও গিয়ে থাকতে পারে—কালিম্পঙ।

—কোথায় গেছে জান না?

লক্ষ্মী বলল, ব'লে তো যান নি। এই দু জায়গার নাম করতে শুনেছি।

পিনাকী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আচ্ছা। কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে আবার উঠে এলেন, বললেন, কবে গেছে, ফিরছে কবে।

—গেছেন পরশুর আগের দিন। ফিরতে দশ-বারো দিন হবে বলে গেছেন।

অট্টহাস্য ক'রে উঠতে ইচ্ছে হল পিনাকীর। কিন্তু তিনি উদ্যত হাসিটা গিলে ফেললেন। ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে বললেন, সঙ্গে আর কেউ যায় নি?

—আয়া-মাসিরা গেছেন। কলেজের আরো অনেক ছেলে-মেয়েও নাকি আছে।

—নাকি! ফিরে তাকালেন পিনাকী-ভূষণ, বললেন, নাকি কি? ঠিক যা জান, তাই বল।

লক্ষ্মী বলল, ওই কথাই ঠিক। সবাই দল বেঁধেই গেছে।

পিনাকীর সব দাপট আর দম্ভ পায়ের চাপ দিয়ে একেবারে পিষে দিয়েই চলে গেছে ওরা। বলিহারিই দিতে হয় ওদের এই সাহসকে। তারা-যে পিনাকীকে এমন অবজ্ঞা ক'রে চলে যেতে পেরেছে, এজন্যে তারা পিনাকীর অভিনন্দনই পাবে। ভাড়া-করা স্নেহ দিয়ে পিনাকী তাদের বাঁধতে গিয়েছিল, তার ফল তাকে অবশ্যই ভুগতে হবে। এতে আর নালিশ নেই।

মেয়েদের উপর নালিশ নেই বটে, কিন্তু নিজেকে এজন্যে বেকসুর খালাস দিতে পারেন না পিনাকী।

দিন-কয়েক পিনাকী আপিস-ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ডিজাইন উল্টে দেখায় তাঁর গরজ নেই। ফোনের রিং বাজলেও রিসিভারটা তুলে কানে দিতে ইচ্ছে করে না। টাইপিস্ট আর করেস্পণ্ডেন্স ক্লার্ক দুজনেই আড়-চোখে পিনাকীর দিকে তাকায়। পিনাকীর এই ভাবান্তরের কারণ তারা বোঝে, কিন্তু কিছু না বোঝার ভান ক'রে তারা ব'সে থাকে।

অবিনাশ পাকড়াশির কথাটা কানে টেলিফোনের ঘণ্টার মত আওয়াজ ক'রে ওঠে—নন্দনকানন। নাঃ, নড়ে বসেন পিনাকীভূষণ, নাঃ, ও নামটা তাঁর পছন্দ নয়। বড় একঘেয়ে, বড় পুরনো ও নাম।

পিনাকী বললেন, হেরম্ব, একটা নোট নাও।

নোট-বই নিয়ে এগিয়ে এল হেরম্ব। পিনাকী তিন লাইনের একটা চিঠি ডিক্টেট করলেন।

বললেন, এই নাও লিস্টটা। ওই একই চিঠি এই পনেরটা ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

হেরম্ব বলল, সব ক্যানসেল ক'রে দেবেন? কনট্রাক্ট নেবেন না?

পিনাকী রূঢ়ভাবে জবাব দিলেন, বললেন, ইংরেজি বোঝ না? তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?

সব যোগ দিলে কয়েক লাখ টাকার কাজ। ছোট্ট এই চিঠি দিয়ে সব বাতিল ক'রে দিতে চান পিনাকীভূষণ?

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। আর-কোনো কারণে না হোক, তাদের নিজেদের ভাগ্যও যে তারা বেঁধে ফেলেছে এই পি ডি বকসী কোম্পানির সঙ্গে। এই এক টুকরো চিঠি যে তাদের নিজেদের ভাগ্যকেও বরখাস্তের নোটিশ দেওয়ারই সামিল।

টাইপ শেষ করতে এক ঘণ্টাও লাগল না। পিনাকী পর-পর পনেরোটা চিঠিতে খস খস ক'রে সই ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

হেরম্বর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ঘাবড়ে গেছ? তাই না? ভয় নেই, তোমাদের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই আমি যাব।

—কোথায় যাবেন, সার্?

ক্ষিতীশ উঠে এল। অদূরে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

পিনাকী বললেন, বেড়াতে। দেশ-ভ্রমণে। ঠিক পরদিন থেকেই পিনাকীর আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবিনাশ পাকড়াশিরা তৈরি হয়েই ছিল। এবার তারা কলর শুরু ক'রে দিল। এবার তারা বলল, পিনাকীভূষণ সত্যিই মজার মানুষ। সত্যিই দেবতুল্য লোক। কিন্তু মেয়ে-দুটি যা হয়েছে—তাতে পাড়ায় টেকাই দায়। ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে, এখনো পরে ফ্রক। টেনিস ব্যাট নিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কখন-যে ফিরে আসে, কে তার খোঁজ রাখতে গেছে।

মনে হয়েছিল দেশান্তরীই বুঝি হলেন পিনাকী। কিন্তু দিন-কয়েক বাদে তিনি ফিরে এসে বললেন, না, ওতে মনের জোর দরকার। সে জোর আমার নেই। মেয়েরা ফিরেছে?

—ফিরেছে।

পিনাকী উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠলেন, বালকের মত লঘু পায়ে তিনি ছুট দিলেন। সরাসরি চলে এলে দোতলায়, সেখান থেকে তেতলায়।

পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ শুনে সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে তিনি এগিয়ে এলেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন—মধুমালা বাজাচ্ছে, আর লম্বা একটি ছোকরা পিয়ানোর উপর ঝুঁকে রয়েছে।

সরে এলেন পিনাকীভূষণ। ডাকলেন, মধুমালা, মাধবী।

ছাদের অন্ধকারে দুটো চেয়ার টেনে দু'পাশে সরে গেল।

রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন পিনাকী। মধুমালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছাদের আলো জ্বালতে গিয়ে বলল, কে ওখানে?

পিনাকী বললেন, আমি।

স্কেচ— শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার
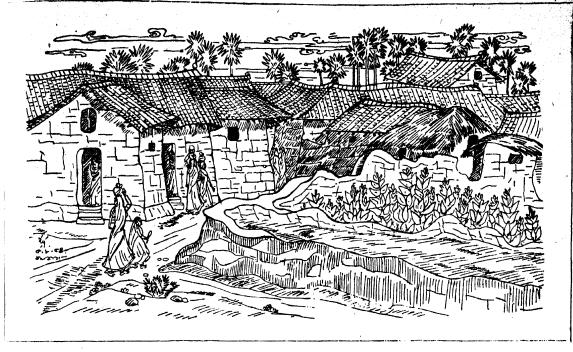
সুইচ টিপে দিয়ে মধুমালা বলল, সে কি, মি? তুমি এখানে?

পিনাকী বললেন, ভুল হয়ে গেছে। চলে চ্ছি।

কাঁধের কাছে নিশ্বাসের শব্দ শুনে, ফিরে কাতেই দেখলেন—মাধবী।

মাধবী বলল, ভিতরে এস।

স্নেহে আকৃষ্ট শিশুর মত পিনাকী ঘরে য়ে সোফার মধ্যে ডুবে বসলেন।

পিনাকী বললেন, কোথায় যাস্ তোরা? জে খুঁজে পাইনে। যাবার সময় তো ত জানিয়ে যেতে হয়!

একথার কোনো উত্তর দিল না দু বোন। পিনাকী এদিক-ওদিক চেয়ে কি-যেন তে লাগলেন, বললেন, ওরা কই?

—কাদের কথা বলছ?

পিনাকী হেসে বললেন, নাম তো জানিনে। র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?

ই মেয়ে দুই পাশে বসল পিনাকী-ের। বলল, আলাপ আর একদিন ক'রো, হয়তো চলে গেছে।

ধবী বলল, কথা ছিল পাহাড়ে যাব। শেষ-বেশ দেখে এলাম সমুদ্র। টেয়ার গিয়েছিলাম।

—হুঁ।

মালা বাবার হাত মুঠির মধ্যে টেনে বলল, তবু যে চিনতে পেরেছ আমাদের, তবু যে আমাদের কথা পড়েছে—এ আমাদের কত ভাগ্য।

দু কাঁধ একসঙ্গে ঝাঁকি দিলেন পিনাকী। কি-যেন বলতে গেলেন, বলতে পারলেন না। কি-একটা আক্ষেপ গুমরে উঠল, চেপে গেলেন তিনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ হয়ে রইল সব। কে কোন্ কথা ব'লে আলাপ চালু ক'রে দেবে—তিনজনে ব'সে একই সঙ্গে হয়তো সেই কথাই ভাবছে।

গা এলিয়ে দিয়ে ব'সে ছিলেন পিনাকী, এবার তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

দুই মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল। বলল, তুমি বদলে গেছ, বাবা।

—কি রকম?

—আমাদের খোঁজ নিলে। সরাসরি ভিতরে চলে এলে।

পিনাকী বললেন, ঠিক ধরেছিস। একেবারে বদলে গেছি। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছি।

মাধবী বলল, শুনছিলাম, কি নাকি সব পাগলামি আরম্ভ করেছ তুমি।

—কি পাগলামি!

মধুমালা বলল, সব কন্‌ট্রাক্ট নাকি ক্যানসেল করছ।

—হ্যাঁ। এবার বদলে যেতে চাই একেবারে। এবার রিটায়ার করব।

—এই বয়সেই রিটায়ার করার কোনো মানে হয় না। মাধবী অনুযোগের সুরে বলল। বলল, এখনো তুমি বেশ শক্ত আছ।

পিনাকী বললেন, কোন্ বয়সে? যে বয়সটা তোরা আন্দাজ করছিস, সেটা তো শরীরের। মনের ফটো একবার নিয়ে দ্যাখ, সে বুড়ো থুত্থুড়ো হয়ে গেছে।

মাধবী বলল, কি-জানি, এসব কথার মানে বুঝি নে।

সামনের দেয়ালে ডিম্বাকৃতি একটি বড় আয়না। এতক্ষণ চোখ পড়েনি। হঠাৎ সেদিকে চেয়ে পিনাকী দেখতে পেলেন নিজেদের। হঠাৎ যেন মনে হল, দুই পাশে দুই কন্যা-সমেত একটা বড় ছবি দেয়ালে দাঁড় করানো আছে।

জীবনে এ এক পরম রমণীয় মুহূর্ত। এই মুহূর্তটা এইভাবে ধ'রে রাখতে পারত যদি কোনো শিল্পী, তাহলে তাকে পিনাকী তাঁর অবশিষ্ট জীবনটা উৎসর্গ ক'রে দিয়ে ধন্য হতেন।

পিনাকী বললেন, আমার কোনো কথারই মানে তোমরা বুঝবে না এখন। এখন তোমরা যে স্বাধীন হয়ে গেছ।

একথা শুনে দু-জনেই বুঝতে পারল যে, পিনাকী একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাই তারা কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

মধুমালা বলল, রিটায়ার ক'রে কি করবে, বাবা?

পিনাকী বললেন, বললে বলবি কবিত্ব করছি। কিন্তু কবিত্ব না। আমি একটু দূরে যেতে চাই—একটু শান্ত হয়ে শান্তিতে থাকতে চাই। ইঁট-কাঠ-লোহা-লক্কড় ঘেঁটে ঘেঁটে ওসবের উপর কেমন অরুচি হয়ে গেছে। দশ বিঘের একটা প্লট দেখে এলাম। একেবারে চৌকো একখণ্ড জমি, আরো ভালো লাগল—তার চারদিক নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। সেখানে বানাব নতুন বাড়ি। একেবারে নতুন ডিজাইনের।

—ধ্যেৎ। বাবা নিশ্চয় ইয়ার্কি করছ। মাধবী হঠাৎ মন্তব্য ক'রে উঠল।

পিনাকী চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, আজকালকার বাবারা সত্যিই বড় বেআড়া আর ফাজিল হয়েছে, কথায় কথায় ইয়ার্কি করে।

মাধবী বলল, তা বলছি নে।

পিনাকী বললেন, আমিও তা বলিনি।

মধুমালা একবার বাবার মুখের দিকে, একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পিনাকী বললেন, ইয়ার্কি করছি ভেব না। এবার তোমাদের বিদায় দিতে চাই। ওই ছেলে-দুটিকে খবর দিয়ো—ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটি নেব।

মাধবী বলল, বেশ। ওরা বুঝি আমাদের বিয়ে করতে এসেছে?

—তবে?

—ওরা আমাদের ফ্রেন্ড।

—হুঁ। পিনাকীভূষণ একটু চিন্তা করলেন।

একটু থেমে পিনাকী বললেন, কাল থেকে আয়া ঝি আর চাকর সব ছাড়িয়ে দেব।

—হঠাৎ? কেন বাবা? মধুমালা পিনাকীর হাত চেপে ধরল।

—আমি দেউলে হয়ে গেছি। ফকির হয়ে গেছি। অনেকটা রোদনের মত শব্দে পিনাকী বললেন।

দুইবোন থতমত খেয়ে গেল। দু পাশ থেকে দু-জন পিনাকীর হাত চেপে ধরে ডাকল, বাবা।

স্বপ্নের ঘোরে কথা বলার মত ধীরে ধীরে পিনাকী বলতে লাগলেন, লোকে বলে আমি লোহার মানুষ। কিন্তু আমাকে আমি চিনি। আমি দুর্বল, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ। লোকে বলে, আমার অনেক টাকা। তা হয়তো আছে। কিন্তু আমি দেউলে, আমি সর্বস্বান্ত।

মধুমালা বাবার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, কেন বাবা, কি হয়েছে? তুমি চুপ কর, তুমি যা চাও তাই হবে।

—এই নন্দনকাননে আমি আর থাকব না। অন্য কোথাও চলে যাব আমি।

মধুমালা পিনাকীর কানে-কানে বলল, জানি জানি। সব শুনেছি আমরাও। ছেড়েই যাব নাহয় এ বাড়ি। জায়গা তো দেখেই এসেছ বাবা। চলে যাব। তোমাকে যদি সকলে ভুল বুঝতে পারে, আমাদেরই-বা তুমি ভুল না বুঝবে কেন।

মধুমালা মাধবীকে ইশারা করতে লাগল, কিন্তু মাধবী কিছুতেই ইশারা বুঝতে পারল না। মধুমালা বলল, ডাক্তার। ডাক্তারে খবর দে। ফোন কর।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিনাকী সোজা হয়ে ব'সে বললেন, কোথায়। কোথায় গেল ও। ডাক্তার কেন আবার? আমি জলজ্যান্ত মানুষ। আমাকে অসুস্থ ক'রে তোলার এ কী ঝোঁক তোমাদের।

মধুমালা বলল, আচ্ছা। ঠিক আছে। আমি ব'লে আসছি ওকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মধুমালা। ও ঘরে গিয়ে দেখে মাধবী ফোন করছে। তার কান থেকে ফোন ছিঁড়ে নিয়ে নামিয়ে রেখে মধুমালা বলল, তুই একটা বোকা। বাবার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে!

—কি ক'রে বলতে হয় কে জানে বাপু। কোনোদিন ব'লেও তো অভ্যেস নেই।

মধু ফিশফিশ ক'রে বলল, বাবা যা বলবেন তাতেই রাজি হবি। জানিস নে, কেমন সেণ্টিমেণ্টাল মানুষ।

—কি ক'রে জানব।

মধুমালা সব ভার বুঝে নিয়েছে বাড়ির। সব ঝি-চাকর-আয়াদের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে—কাউকে পনেরো দিনের, কাউকে-বা এক মাসের। যার খুশি সে পনেরো দিন বা এক মাসের মাইনে নিয়ে আজই চলেও যেতে পারে।

—হেতু কি, দিদিমণি? কি হ'ল। শৈবলিনী এসে জিজ্ঞাসা করল।

—এ বাড়ি ছেড়ে যাব আমরা।

—কোথায় যাওয়া হবে? লক্ষ্মী এসে প্রশ্ন করল।

—ঠিক নেই।

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ বুকের মধ্যে অসহ্য নারভাসনেস নিয়ে বসে আছে। তাদের বরখাস্তের নোটিশ কখন-যে এসে পড়বে তার কোনো ঠিক নেই। পেণ্ডুলামের টিক টিক শব্দ শুনেই তাদের বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জুতোর শব্দ বেজে উঠতেই হেরম্ব আর ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

পিনাকী বললেন, সব ঠিক আছে? যার যা পাওনা ছিল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে? ব্যস, সব পরিষ্কার তবে।

পিনাকী চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, তোমরা ব'সো। তোমরা একজন আমার সহায়, আর একজন সম্বল।

ক্ষিতীশ আর হেরম্ব বসল। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের।

পিনাকী বললেন, ভীষণ ভিতু তোমরা। জীবন হচ্ছে, জান, একটা অ্যাডভেঞ্চার। ভয় কি। ঠিক আছে। তোমরা দু-জন সঙ্গে যাবে আমার। রাজি?

ভয়ে ভয়ে হেরম্ব বলল, কোথায়?

—এই নন্দনকানন ছেড়ে দিয়ে।

ফটকের ওপারে দাঁড়িয়ে অবিনাশ পাকড়াশি পা উঁচু ক'রে ক'রে কি-যেন দেখার চেষ্টা করছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, চোখের পাতার উপর জলের ফোঁটা পড়ায় বার-বার দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

পার্বতী তার হাত ধরে টেনে বলল, পরের খবরে দরকার কি তোমার। পালিয়ে এস।

সতীদাহ সম্বন্ধে ভ্রমনিরাস

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে যাঁহারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেন তাঁহাদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল, হিন্দুরা তাঁহাদের বিধবাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলিত বলিয়া অসভ্য জাতির পর্যায়ভুক্ত। সিন্ধু প্রদেশের দুর্দান্ত শাসক নেপিয়ার সাহেব সতীদাহ নিবারণ উপলক্ষে শাসাইয়াছিলেন, "বিধবাকে পোড়ান যদি তোমাদের ধর্ম হয়, আমারও ধর্ম বিধবাদাহকারীকে ফাঁসি দেওয়া।" ভিন্নধর্মীর প্রচারযুগ এখন বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বিষদন্ত আহরণ করিয়া যেন এক শ্রেণীর হিন্দু স্বয়ংই এখন হিন্দুধর্মের পুরাতন বিধানসমূহ বহুলাংশে বর্বরোচিত বলিয়া খ্যাপন করিতে সমুৎসুক। অন্তত সতীদাহ প্রথাটা যে নিন্দনীয় ছিল তদ্বিষয়ে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রায় সকলেই একমত। দ্বিতীয়ত, কেহ কেহ বেশ উত্তেজনার সহিত লিখিয়াছেন, বাংলা দেশে রঘুনন্দনই ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের ভ্রমাত্মক পাঠ কল্পনা করিয়া এই প্রথার সূত্রপাত করিয়া সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন!! শতাধিক বৎসর পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব ও উইলসন সাহেবের মধ্যে ইহা লইয়া কৌতুকজনক আলোচনা হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, রঘুনন্দনের উক্তি সমগ্র বাঙালী জাতি নির্বাক মেষশাবকের মত মানিয়া চলিয়াছিল, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। রঘুনন্দন একজন সংগ্রহকার মাত্র—পরম্পরাগত বিষয়সমূহে কালক্রমে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যুক্তি দ্বারা তাহাতে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি নূতন কিছু ব্যবস্থা করেন নাই। সতী হওয়া আত্মহত্যার অন্তর্গত, রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণের বচন ("ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী") উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োগস্থলে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র 'ইমা নারীরবিধবা' (১০।১৮।৭) প্রভৃতির শেষ পদ 'অগ্রে' কাটিয়া 'অগ্নে' করিয়াছেন। কিন্তু ইহা রঘুনন্দনের কপোলকল্পিত নহে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'দানচন্দ্রিকা' গ্রন্থে সাধ্বীধর্মপ্রকরণে আমরা 'ঋগ্বেদোক্তমন্ত্রলিঙ্গেহপি ইমা নারীরবিধবাঃ' বচন পাইয়াছি (২৮ পত্রে)। রঘুনন্দনের ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার অপরার্ক 'অগ্রে' পাঠ অপরিবর্তিত রাখিয়াই সহমরণপ্রয়োগে এই ঋক্-মন্ত্রই উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১১১)। বঙ্গদেশের প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকারগণও সহমরণবিষয়ে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সহমৃতার পিণ্ডদান বিষয়ে রঘুনন্দন 'জিকনীয়' অন্ত্যেষ্টিবিধিনামক গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (শুদ্ধিতত্ত্ব, বঙ্গবাসী, সং, পৃঃ ১৭)। জিকন সুপ্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের পূর্ববর্তী গৌড়ীয় স্মার্ত—ভবদেব প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে (পৃঃ ১০২) তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভবদেবও তাঁহার মীমাংসাপ্রকরণে (তিলক পৃঃ ১০০) একটি স্মৃতিবিরুদ্ধ অনাচারের নিদর্শন লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যদের মধ্যে নাকি 'ব্রাহ্মণীর অনুমরণ' প্রচলিত আছে। সুতরাং ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে সহমরণপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রমাণ হইতেছে।

বিশাল ধর্মশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট মনীষী নানা-বিষয়ের মধ্যে সতীদাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধানের উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ করিয়াছেন (Kane's Hist. of Dharmasastra, III. 625—35)। শাস্ত্র ও সমাজের মধ্যে যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানাভাবে চলিয়াছিল, তাহা এখন বিস্মৃত ও অনালোচিত রহিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই সামাজিক আচারমধ্যে সহমরণপ্রথার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সংহিতা ও নিবন্ধে পরে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল মাত্র। ভারতের প্রাচীনতম নিবন্ধকার সর্বমান্য মেধাতিথি অতি স্পষ্টভাষায় পাণ্ডিত্যের সহিত এই প্রথার অশাস্ত্রীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনুভাষ্যে আছে—"পুংবৎ স্ত্রীণামপি প্রতিষিদ্ধ আত্মত্যাগঃ। যদপ্যঙ্গিরসা 'পতিমনুম্রিয়েরন্' ইত্যুক্তং তদপি নিত্যবদবশ্যং (ন) কর্তব্যম্। ফলস্তুতিস্তত্রাস্তি, ফলকামায়াশ্চ অধিকারে শ্যেনতুল্যতা। যথৈব 'শ্যেনেন হিংসাৎভূতানি' ইত্যধিকারস্য অতিপ্রবৃদ্ধদ্বেষান্ধতয়া সত্যামপি প্রবৃত্তৌ ন ধর্মত্বমেবমিহাপি অতিপ্রবৃদ্ধ-ফলাভিলাষায়াঃ সত্যপি প্রতিষেধে তদতিক্রমেণ মরণে প্রবৃত্ত্যুপপত্তের্ন শাস্ত্রীয়ত্বম্। অতোহস্ত্যেব পতিমনু মরণেহপি স্ত্রিয়াঃ প্রতিষেধঃ।" (৫।১৫৬) (সারার্থ—পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ, অনুমরণও সুতরাং নিষিদ্ধ। অনুমরণের বিধিতে ফলশ্রুতি থাকায় তাহা কাম্য, নিত্য নহে—শ্যেনযাগ দ্বারা প্রাণিহিংসা যেমন ধর্মকার্য নহে, তেমনই উৎকট ফলকামনায় আচরিত অনুমরণও শাস্ত্রীয় কর্ম হইতে পারে না)। মেধাতিথির এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কোন সমাজেই সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। বঙ্গদেশে 'মূর্খহা' নামে একটি উৎকৃষ্ট স্মৃতিনিবন্ধ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে প্রচারিত ছিল—তন্মধ্যে একটি মত লিখিত আছে 'কলৌ সহমরণানুমরণয়োরনধিকারঃ ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চেত্যাদিনা নিষেধাদিতি কেচিৎ' (৪৮ পত্রে) অর্থাৎ অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণ কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া সহমরণাদিও নিষিদ্ধ। এই শাস্ত্রযুক্তিও সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। রাজা রামমোহনের পূর্বে সদর দেওয়ানীর পণ্ডিত ঘনশ্যাম সার্বভৌম ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সহমরণের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন—ঘনশ্যাম ছিলেন স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্র।

সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বাধানিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে যে সকল 'সতী' হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম—হাজারে একজনও হয় কি না সন্দেহ। আমরা শত শত পরিবারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি অধিকাংশ বংশে কস্মিন্ কালেও কেহ সতী হন নাই। যে কতিপয় বংশে সতী ছিলেন তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি বিংশ শতাব্দীর পরার্ধেও তদ্বংশীয় ব্যক্তিরা অতি গৌরবের সহিত কীর্তন করিয়া থাকেন এবং বহু স্থলে 'সতী ঠাকুরানীর মঠ' নির্মিত হইয়া তাঁহাদের সমুচিত স্মৃতিতর্পণ সাধিত

হইয়াছে। সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশের অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত সমাজে অনেকটা বাধ্যতামূলক যে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রভাবে বঙ্গদেশেও কোন কোন স্থলে অত্যাচার হইয়া থাকিবে—তাহার সহিত শাস্ত্র ও সমাজের কোনই সম্পর্ক নাই। বিধর্মীর মানস পুত্র সাজিয়া আজ যাঁহারা জোর গলায় সতীদাহের বর্বরতা খ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পাপ-পুণ্যের সমন্বয় সাধিত করিতেছেন এবং নাস্তিক জাতির পর্যায়ভুক্ত হইতেছেন।

প্রশ্ন হইল, এত বাধানিষেধ সত্ত্বেও বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের নারীদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যায় হইলেও সহমরণে প্রবৃত্তি জন্মিত কেন? ইহার মূলে রহিয়াছে প্রথমত আস্তিক্যবুদ্ধি অর্থাৎ পরলোকে অটল বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষে চিরবিরাজমান আদর্শ দাম্পত্যজীবন, যাহার একপ্রকার স্বাভাবিক পরিণতি হইল এক চিতায় আরোহণ। পূর্বকালে সাধনবলে নারীরাও ভীষ্মদেবের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণের শক্তি অর্জন করিতেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর আত্যন্তিক শোকে অথবা যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া এক চিতায় আরূঢ় হইয়া 'সতী' হইতেন। অনেকে জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিতে পারিতেন। উভয়স্থলেই মৃত্যুর পর অগ্নিসংযোগ হইত—ইহারাই প্রকৃত 'সতী'। আমরা কামরূপের সর্বপ্রধান স্মার্ত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ রচিত 'প্রেতকৌমুদী' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

"অনুমরণপ্রকারমাহ বৃহস্পতি
চিতোপরি সম্যবিচেতনং পতিং প্রিয়া হি যা মৃণোতি দেহমাত্মনঃ।
কৃত্বাপি পাপং শতলক্ষমপ্যসৌ পতিং গৃহীত্বা সুরলোকমাপ্নুয়াৎ॥
অত্র সতীশয়নানন্তরং দাহকৈর্ন দাহ্যা ন বা কাষ্ঠাদিকং দেয়ং কিন্তু তন্মরণানন্তরমেব—অন্যথা তাসাং বধভাগিত্বপ্রসক্তেঃ।" (পৃঃ ৫০)

অর্থাৎ বৃহস্পতি বলেন, চিতার উপর অচেতন পতিকে দেখিয়া যে পত্নী দেহত্যাগ করেন, তিনি কোটি পাপ করিয়াও পতিকে লইয়া স্বর্গে যান। সতী চিতায় শয়ন করিলে পরই দাহকেরা অগ্নি কিংবা কাষ্ঠাদি দিবে না, দিবে তাঁহার মরণের পর—নতুবা নারীহত্যার দায় আসিয়া পড়ে। পীতাম্বর রঘুনন্দনের এক পুরুষ পরবর্তী—তিনি জানিয়া শুনিয়াই এইরূপ স্পষ্টোক্তি করিয়াছেন। সতীদাহ রহিত হওয়ার পরও এ জাতীয় 'সতী' প্রায় বৎসরই হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ১২৬০ সালের কার্তিক মাসের একটি ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত হইল। "রঙ্গপুরের নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণ 'আমার মৃত্যুর আর অপেক্ষা নাই', স্ত্রীকে এই কথা বলিয়া শয়ন করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করত একত্রে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ২রা বৈশাখ, ১২৬১)। যোগবলে দেহত্যাগের উদাহরণ গ্রামাঞ্চলে অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়।

প্রকৃত পক্ষে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করা অত্যন্ত বিরল ঘটনা—সহমরণে যাঁহারা দৃঢ়নিশ্চয় পোষণ করিতেন, তাঁহাদের অনেকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত না। তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রে জ্বলচ্চিতারোহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে—রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের প্রারম্ভে তাহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য। লক্ষ্য করা আবশ্যক, সম্ভ্রান্ত পরিবারে আস্তিক্যবুদ্ধি ও দাম্পত্যভাবের পরাকাষ্ঠা বশত হাজারে একজন যে সহমরণোদ্যত হইতেন, তাঁহারা প্রায় কেহই আত্মীয়স্বজনের নিষেধবাক্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না—তাঁহাদিগকে কিছুতেই বারণ করা যাইত না। ইহার ভূরি ভূরি বৃত্তান্ত সাহেবরাও বিস্ময়ের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পাষাণের ন্যায় অচল স্থিরবুদ্ধির নিকট "হুতাশনশ্চন্দনপঙ্কশীতলঃ" হইয়া যাইত—ইহা বিশেষ অতিরঞ্জিত নহে। এইরূপ "আগুনখাকী"র পুণ্যস্মৃতি গ্রামাঞ্চলে অদ্যাপি বেশ জাগরূক আছে।

আমরা উপসংহারে একটি মাত্র সতীদাহের উল্লেখ করিতেছি—ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। ইংরাজ শাসনের আরম্ভে রাজশক্তির আহ্বানে নানা স্থান হইতে ১১ জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মিলিত হইয়া ১১৮০-৮১ সনে "বিবাদার্ণবসেতু" নামক প্রথম হিন্দু আইনের গ্রন্থ রচনা করেন—তাঁহাদের নেতা ছিলেন নবদ্বীপনিবাসী সর্বপ্রধান স্মার্ত পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। এই গোপাল ন্যায়ালঙ্কার পূর্ণ ১০০ বৎসর বয়সে ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ তারিখে স্বর্গত হন এবং তাঁহার পত্নী অশীতিপর বৃদ্ধা মহামায়া দেবী পুত্রপৌত্রাদির সম্মুখে ভাগীরথীতীরে সহগামিনী হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন:—

"She was almost in a state of second childhood, yet her gray hairs availed nothing against this most abominable custom." (The Hindoos, 1st Ed., 1811, Vol. II. Page 560).

এই সুপ্রসিদ্ধ বংশে আর কেহ সতী হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

সুন্দরাজন

প্রভাত দেব সরকার

সবাই উঠে গেলে পর একটি লোক তখনো অবশিষ্ট থাকে আপিসে।

একটি বাতি তখনো জ্বলে, একটি পাখা তখনো ঘোরে। একটি মন তখনো নিবিষ্ট।

এক ধার থেকে ঘর পরিষ্কার করে বাতি নিভিয়ে পাখা বন্ধ করে ফরাশ এসে দোর-গোড়ায় অপেক্ষা করে।

সুন্দরাজনের খেয়ালই থাকে না। মাথা নিচু করে ফাইলপত্তরে একেবারে ডুবে যায়। আপিসের পরেও আপিস শুরু হয়েছে লোকটার।

হাতের বিড়িটা জ্বলে কখন ছাই হ'য়ে যায়, উবু হয়ে বসে থেকে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে, ফরাশ উঠে দাঁড়ায় বার কতক, পা ছাড়িয়ে নেয়। বাবুর উঠবার নাম নেই এখনো! ছুটি মিলবে কখন?

হঠাৎ সুন্দরাজন চোখ তুলে সামনে চাইলে। সব ধোঁয়া-ধোঁয়া কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে যেন। বহু দূর সমুদ্রে ভেসে-যাওয়ার মত সীমাহীন, একাকার।

মুহূর্তের জন্যে, তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সুন্দরাজন বললে, তোম্‌ আ গিয়া!

কোমরের গামছাটা মাথায় বেঁধে ফরাশ এগিয়ে এসে হাসলে। বাবু এমনি। রোজ দেখছে সে। ঘড়ির খেয়াল নেই কিছু! কাজ-পাগল!

সুন্দরাজন জিজ্ঞেস করলে, কাম সারা? ঝাড়ু লাগায়া? সাফ উফ......

ঘাড় নাড়লে ফরাশ। সব ফিনিশ, বাকি শুধু—

ফাইল গুছিয়ে সুন্দরাজন উঠে পড়ে বললে, আও! ঝাড়ু লাগাও ইধার! ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল রাজন। ফরাশকে ডেকে বললে, এক সাথ যায়েগা। হো গিয়া তোমারা?

তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল ফরাশ। এক সাথে যাওয়ায় অর্থ সে বোঝে। পাঁচতলা আপিস বাড়িটা এখন ভুতুড়ে। নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে সে। তারও ভয় করছে! সাড়ে-সাত আট বেজে গেছে!

তেতলার সিঁড়ির কাছে এক সঙ্গে এসে রাজন জিজ্ঞেস করলে, তোম্‌ কাঁহা রহ্‌তা?

ফরাশ দাঁড়াল। এই নিয়ে বাবু তাকে চারদিন জিজ্ঞেস করলেন তার বাসস্থান কোথায়। কি খেয়াল কে জানে।

বিনীত ফরাশ বললে, জানবাজার!

বহুৎ দূর হ্যায়, না? সুন্দরাজন ফুলপাতা-কাটা ছোট্ট থলিটা কাঁধ বদল করে বললে।

নেহি, থোড়া দূর! ফরাশ বুঝতে পারে না স্বল্পভাষী লোকটা তার সঙ্গে আজ হঠাৎ এত আত্মীয়তা করছে কেন। ঘরের খবর জানতে চাইছে অকারণে!

আরো অবাক হলো ফরাশ যখন রাস্তায় নেমে, বলা নেই, কওয়া নেই, সুন্দররাজন একটা দোয়ানি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে বললে, লেও, চা পিও!

অভাবনীয় না হ'লেও অপ্রত্যাশিত। হাত বাড়াতে ফরাশ ইতস্তত করে। যা দেখছে রোজ আপিস বন্ধ করতে এসে তাতে খুটমুট পয়সা খরচ করবার মত লোক মনে হয়নি এই বাবুটিকে। বকশিশ!

আবার সুন্দরাজন বললে, লেও, চা পিও!

হাত পেতে দোয়ানিটি নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ফরাশ। আশ্চর্য ভাল লাগল মুখটা, শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র!

সুন্দরাজন হাসলে। ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে ফরাশটি সেলাম করলে। বিদায় নিয়ে বললে, যাতা হ্যায় বাবু!

অন্যমনস্কের সুরে সুন্দরাজন বললে, আচ্ছা!

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল রাজন। হঠাৎ গন্তব্য যেন সে ভুলে গেছে—উত্তর দক্ষিণ, না পূব পশ্চিম! অবলুপ্ত চেতনায় অদ্ভুত ছায়া-ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে। কোথা থেকে কোথায় যেন এসে পড়েছে চকিতে!

সামনেই কফি-হাউস। ত্রস্ত পায়ে

সুন্দরাজন ঢুকে পড়ে একটা চেয়ার দখল করলে। হাত-পা ছড়ান অবসাদ, বড় ক্লান্ত সে।

কফি। সুন্দরাজন ক্লান্ত সুরে বললে।

হট অর্ কোল্ড? ওয়েটার পাগড়ি নেড়ে জিজ্ঞেস করলে। স্পষ্ট ইংরেজী বললে।

নো, হট। সুন্দররাজন চারপাশ চেয়ে দেখে বললে।

অওর কুছ? কুঁজো হয়ে মুখটা কাঁধের কাছে এনে ওয়েটার ফের জিজ্ঞেস করলে। আর ইংরেজীতে কুললনা।

রাজন ঘাড় নাড়লে।

ওয়েটার দাঁড়িয়ে রইল। রাজন হাতের থলিটা টেবিলের উপর রেখে কি যেন হাঁটকে বার করতে লাগল।

চিপস্, নাটস্? ঘাড় নাড়া বুঝতে পারেনি ওয়েটার।

বুঝি এতক্ষণে বিরক্ত হয় সুন্দরাজন। বললে, কুছ নেহি...কফি এক পেয়ালা ব্যস! জলদি—

চিঠিটা আপিসে এসে পেয়েছিল। তখন তখন একবার চোখ বুলিয়ে পড়েছিল রাজন। দেশ থেকে স্ত্রী চিঠি লিখেছে, নিয়মিত যেমন লেখে—সপ্তাহে একখানা।

চিঠির কথাগুলো যেন নতুন মনে হচ্ছে সুন্দরাজনের। বিমলা এবেলা ওবেলা চিঠি লিখতে শুরু করেছে! এত কথা বিমলা জমিয়ে রেখেছিল—এত কথাও সে বলতে পারে! কাছে থাকতে বোঝা যায়নি!

চিঠিটা টেবিলের কাচে জলছবির মত দেখায়—বিমলার নিরীহ মুখটা বুঝি ফুটে ওঠে! বদলী হয়ে আসবার সময় বিমলা কান্নাকাটি করেছিল, সঙ্গে আসতে চেয়েছিল।

সুন্দরাজন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, কাঁদলে কেন ছেলেমানুষের মত। এ অবস্থায় তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখব। কেলকাটা কি কাছে? তা ছাড়া—

তবু বিমলার কান্না থামেনি, সে স্বামীর সঙ্গে আসবেই। অবস্থা আবার কি?

স্ত্রীর আনত মুখটা তুলে ধরে সুন্দ-রাজন কৌতুক করেছিল, কিছু না। সত্যি? ছেলে হবে কার তা হলে!

কেঁদে বিমলা চোখ ফুলিয়ে রেগে বলেছিল, সবার হয়! তা বলে স্বামীকে ছেড়ে থাকে নাকি দেশে পথে মরবার জন্যে?

রোরুদ্যমানা স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে সুন্দরাজন বলেছিল, তা নয়। বাড়ি-ঘর কিছুর ঠিক নেই—কোথায় নিয়ে যাব, বল! পাগলামি করো না লক্ষ্মীটি!

বিমলা চুপ করেছিল খানিক তারপর। হঠাৎ বদলিতে এসব অসুবিধার কথা সে ভেবে দেখেনি, তার ওপর পেটে এক শত্তুর এসে গেছে আজ ছ'মাস! বিদেশে যদি কিছু হয় কে দেখবে তখন! ছেলে-হওয়া কি, সুন্দর জানে না, সে-ও জানে না।

সুন্দরাজন বুকের উপর স্ত্রীর মাথাটা চেপে ধরে বলেছিল, এ সময় মন খারাপ করতে নেই। কেলকাটা গিয়েই আমি তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আমার এক বাঙালী বন্ধুকে বাড়ি দেখতে বলেছি! বিমলা, তুমি কাঁদলে আমি যেতে পারব না, চাকরি ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই।

চোখ মুছে বিমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। না, না, যত কষ্টই হোক, সে সহ্য করবে। চাকরি এখন তাদের অনেক দরকার।

ঠিক আসবার মুহূর্তে বিমলা কোন হাঙ্গামা করেনি। ওর নাকের নাকছাবিটা বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ওর দীর্ঘ বেণীতে নতুন জরির ফিতে জড়ান ছিল, ঘন কেশভারে কপালটা বড় ছোট দেখাচ্ছিল নাবালিকার মত। কি-জানি রঙ-এর শাড়িটায় বড় সুন্দর মানিয়েছিল ওকে।

ট্রেনে উঠে অনেকক্ষণ সুন্দরাজন নিশ্চেষ্ট হয়ে একধারে চুপ করে বসেছিল—বাক্স-বেডিংএর কথা ভুলেই গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, একটা চাপা কান্না ট্রেনের চাকায় নিষ্পিষ্ট হতে হতে থেমে গেছে। সেই সুরে কানে তালা লেগে আছে এখনো।

বেডিং খুলে চোখ বোজবার আগে সুন্দরাজন বার বার নিজের মনকেই যেন সান্ত্বনা দিয়েছিল, বিমলা কেঁদ না। কেঁদ না! কেঁদ না, আর তুমি কেঁদ না বিমলা!

আশ্চর্য হয়েছিল সুন্দরাজন সকালে ঘুম ভেঙে। বিমলার বদলে সে-ই ঘুমের ঘোরে কত কেঁদেছে তার ঠিক নেই। চোখের কোলে অশ্রুরেখা শুকিয়ে আছে নুন হয়ে। নিঃশব্দ শিশির-কান্নায় আকাশের মত চোখ দুটো ঘোলাটে দেখাচ্ছিল দাড়ি-কামাবার আয়নায়।

প্রথম চিঠিতেই বিদেশে খুব সাবধানে থাকবার উপদেশ দিয়েছিল বিমলা। সুন্দর যেন তার কথা কিছু না ভাবে, অকারণ, আর নিজের শরীরের দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য দেয়।

আসবার আগের দিন বিমলার কান্না-করুণ মুখটার কথা ভেবে সুন্দরাজন মনে মনে হাসছিল, পাক্কা গিন্নী একেবারে।

নিজের কথা বিমলা কিছু লেখেনি। নিজের শরীর নিয়ে কি তার কোন ভাবনাই নেই!

বিমলার চিঠিটা মুড়ে খামে পুরে বুক পকেটে রাখলে সুন্দরাজন। কফির পেয়ালা পাতা। এক চুমুকে শেষ করে চুপ করে বসে রইল। কিছু ভাল লাগছে না, নিজের কথা লিখতে বিমলা ইচ্ছে করে ভুলে গেছে। কি দরকার ছিল তবে এত কথার! মীনাক্ষীর বর চাকরি পেয়েছে কি না, লক্ষ্মীর দেওর আরুভানকাড়ুতে গেল কি না, এসব কথা জানবার জন্যে এত দূরদেশে কেউ বসে থাকে না উৎসুক হয়ে। আর সবাই বলছে, এ বছর চাষের অবস্থা খুব খারাপ, কেননা এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না আজো—সুন্দরাজনের ভারি বয়ে গেছে এতে উদ্বিগ্ন হবার। চাষের জমি তাদের এক ছটাকও নেই। সরকারী চাকরি করছে যখন, তার আর ভাবনা কি! দেশে চাষবাস হোক আর নাই হোক, তারা ঠিকই খেতে পাবে—ওদিকে রাজাগোপাল আছেন, ব্যবস্থা একটা হবেই। বিমলার যত আজেবাজে ভয়।

কফি-হাউস এখন প্রায় ফাঁকা। দু'চারটে টেবিলে দু'চারজন এখনো অপেক্ষা করছে, উঠব উঠব বলে।

পকেট থেকে ছেঁড়া খামটা আবার বার করে পিছন দিকে পেন্সিল দিয়ে কয়েকটা সংখ্যা বসালে সুন্দরাজন—১৩, ৩০, ৩১, ৩০—

আগামী সপ্তাহের মধ্যে যা হোক একটা হয়ে যাবে—দু'শো চল্লিশ দিনের, এদিক ওদিক হলেও আর কতদিন?

বিমলা কি সুন্দরকে লজ্জা করে তাই ও সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করছে না? প্রতিবারই সুন্দর চিঠিতে ওকথা লেখে, প্রতিবারই বিমলা এড়িয়ে যায়। বুড়ি মা আর কি খোঁজ রাখছেন!

এক পেয়ালা কফির জন্যে এক আনাই বকশিশ করলে সুন্দরাজন ওয়েটারকে। নিজেই অবাক হয়ে গেল বাইরে এসে, হঠাৎ এত খরচ সে বিনা কারণে করছে কেন? বিমলার ছেলেপুলে এখনো হয়নি কিছু। এরি মধ্যে—

ইলেক্‌ট্রিক ঘড়িটার দিকে চেয়ে চোখ নামাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন পড়ল। রাত এখন স' আটটা, ভবানীপুরে পৌঁছতে পৌনে ন'টা। বিমলার চিঠি লিখতে আজ রাতে সময় হবে কি না কে জানে! মেসের ব্যবস্থা, ভি ভি মূর্তিরা ক্যারম পিটবে কত রাত পর্যন্ত তার ঠিক কি! কাল বরং সকাল সকাল আপিসে এসে বিমলাকে চিঠি দেবে।

এত আলো, তবু কত ছায়া-ছায়া লাগছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএর এই প্রশস্ত রাস্তাটা—এপার-ওপার হতে গেলে নির্ঘাৎ

হোঁচট খেতে হবে। বিরাট বিরাট বাড়ি গুলো উদাস অবহেলায় স্থির। এত বড় বাড়ি সুন্দরাজনদের দেশে নেই—মাদ্রাজ শহরেও নেই। ইংরেজ রাজত্বের গোড়া-পত্তনের তিন শহরের যত কিছু পক্ষপাতিত্ব এখানে, গাড়ি-ঘোড়া, বাড়ি, রাস্তাঘাট। মাদ্রাজীদের কেউ দেখতে পারে না। আপিসে তারা আর এক জাত; না খাদ্যে, না ভাষায়, না আচার-ব্যবহারে কিছু মিল আছে। কেবল সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের গা শোঁকা কেবল। কেলকাটা আপিসে তাকে বদলি না করলে ভাল হতো। আড়াই মাসে সুন্দরাজন হাঁপিয়ে উঠেছে। কোলিগরা বলে, রাজন কথাই বলে না, সাংঘাতিক লোক! ডোণ্ট মিকস্ উইথ হিম।

সহকর্মীদের মন্তব্য শুনে হাসি পায়, দুঃখ করে সুন্দরাজনের। হায়, কথা বললে তার কথা বুঝবে কে দয়া করে!

শতকরা একজন, সারা আপিসে পাঁচজন তারা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে। কি দরকার ছিল তাকে আরভানকাড়ু থেকে বদলি করে—ছোট পুকুরের মাছ বড় পুকুরে চালান করে।

আবার বুঝি সুন্দরাজন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। এই শহর, এই মানুষ-জন, কোথাও কারো সঙ্গে তার মিল নেই।

হঠাৎ পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে।—এক চুল ব্যবধানে মোটরগাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য, এতটুকু আঁচড় লাগল না সুন্দ-রাজনের কোথাও। চক্ষের পলকে রাজনের মনে হলো, যদি চাপা পড়ে সে মারা যেত সঙ্গে সঙ্গে—কে সে, কোথাকার সে, কি ভাবে তার আত্মীয়স্বজন জানতে পারত? তার ছোট্ট থলিতে লেখা আছে তার নাম, সি এস সুন্দরাজন। কিন্তু কি বুঝত তাতে পুলিশের লোক—তার বাপের নাম, দেশের নাম আছে প্রথম অক্ষর দুটির মধ্যে? কতশতর মধ্যে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সনাক্ত না হয়েই। তারপর মূর্তি, রামকৃষ্ণন, আইয়ার, শ্রীনিবাসন, এরা তার অপঘাত-মৃত্যু সম্বন্ধে কি গবেষণা করত?

দক্ষিণমুখো চলতি বাসটায় উঠতে গিয়ে নিজেকে খুব সামলে নিলে সুন্দরাজন; কণ্ডাক্টর বলনাচের ভঙ্গিতে তার কোমর জড়িয়ে তুলে নিলে। যাত্রীরা ধিক্কার দিলে সুন্দরাজনের অসাবধানতার জন্যে—বাহাদুরি বেরিয়ে যেত আর একটু হলে। কোথাকার ইয়ে—

পরের দিন আপিসে দেশ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেল সুন্দরাজন। কাকা করেছেন—কাম শার্প! আর কিছু না। কাল বিমলার চিঠি পেয়েছে, আজ টেলিগ্রাম—মাথামুণ্ডু কিছুই সুন্দরাজন ভেবে উঠতে পারল না। মৃত্যু বা বিবাহ উপলক্ষ্য ছাড়া তাদের কেউ টেলি করে না, কাকার উদ্দেশ্য কি? বিমলার কিছু হলো না তো? আসন্নপ্রসবা সে, কোন দুর্ঘটনা? না না, কি যা তা ভাবছে সে! বিমলার কিছু হতে যাবে কেন!—চিঠিটা কাল পেলেও তিনদিন আগেও সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল; ছেলে হবার কোন লক্ষণই নিশ্চয় প্রকাশ পায়নি সেদিন পর্যন্ত। হলে কি বিমলা আর না জানত—

কিন্তু টেলিগ্রাম কেন! আর এত লোক থাকতে কাকা কেন, ও'র সঙ্গে তো তাদের আদায় কাঁচকলায়! হঠাৎ এত আত্মীয়তা তিনি করতে ছুটে এলেন কি মতলবে? যা ছিল অনেক আগেই তো তাকে নাবালক পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছেন, আবার—

পাগলামি করে না
লক্ষ্মীটি

এমনিতেই বড় গম্ভীর দেখায়। আজ কেমন যেন বীভৎস দেখাচ্ছে সুন্দ-রাজনকে। শূন্য দৃষ্টিতে ঠায় সে চেয়ে আছে সামনে।

সহকর্মীদের কেউ কেউ লক্ষ্য করলেও সাহস করে নি, স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে ওর কাছে এগিয়ে আসেনি উপযাচক হয়ে। তেঁতুল খেয়ে মুখটা সব সময় টক করে আছে, কে যাবে কথা বলতে, কিছু জিজ্ঞেস করতে!

তবু ওদের মধ্যে সুভাষ কিছু মেলামেশা করত সময় অসময়ে। কুশল জিজ্ঞেস করত, দেশের খবর নিত—আরো তার নতুন বৌ নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতো সুন্দ-রাজনের সঙ্গে!

ইজ শি প্রেটি? এ বিউটি—

সুন্দরের চাঁচা-ছোলা মুখে হাসি ফুটত। অদ্ভুত এক রকম করে ঘাড় নাড়ত রাজন। মধুর স্মৃতিতে উত্তর-

দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে মাথাটা নাড়ত। বিমলার মত সুন্দরী আর কে আছে?

ইউ ব্রাহ্মিণস আর ভেরি অর্থোডক্স?

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজন মাথা নাড়ত: নো না, সে ছিল যুদ্ধের আগে ...তোমাদের দেশেও তো গোঁড়ামি আছে!

হোয়াই ডোন্‌চিউ টেক্‌ ফিস্‌ অর্‌ মিট্‌ মিস্টার?

বিকজ উই ডোণ্ট লায়িক: রাজন মুচকি মুচকি হেসেছিল।

ইটলা, ধোসে খুব ভাল লাগে তোমাদের? হাউ ডু ইউ স্ট্যাণ্ড মিস্টার?

হঠাৎ মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় সুন্দরাজনের: আপ রুচি খানা!

তাড়াতাড়ি সুভাষ নিজেকে শুধরে নেয়, ডোণ্ট মাইণ্ড, এমনি বলচি, চল আজ আমাদের খাবার খাবে! ইউ উইল লাইক ইট ইমেন্‌সলি!

খেয়ে খুব তারিফ করেছিল সুন্দরাজন। বাঙালীরা বেশ খায়! উল্টে সুভাষও দইবড়া, ইটলি খেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল—সিম্পল-এর ওপর বেশ ভাল, পুষ্টিকর! অল্পে পেট ভরে যায়!

সকাল থেকে লোকটাকে সিটে একভাবে বসে থাকতে দেখে সুভাষ উঠে এল। সামনে দাঁড়িয়ে টেবিল ধরে বললে, হোয়াট মিস্টার?

সুন্দরাজন চমকে উঠল। চোখ নামিয়ে বললে, নাথিং, নাথিং!

পাশে একটা খালি চেয়ারে বসে সুভাষ বললে, নো মিস্টার! কিছু হয়েচে তোমার, টেল মি!

চোখ দুটো যেন রাজনের জড়িয়ে যাচ্ছিল। টেলিগ্রামটা দেখিয়ে বললে, বাড়ি থেকে এসেছে...কিচ্ছু বুঝতে পারছি না...হোয়াট অ্যাম আই টু ডু।

টেলিগ্রামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সুভাষ বললে, এক্ষুনি চলে যাও, এর আর করাকরির কি আছে!

সুন্দরাজন উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলে, সামথিং রঙ?

না, তা হ'লেও তোমার যাওয়া উচিত! সুভাষ গম্ভীরভাবে বললে।

দিশাহারা সুন্দর আবার হাত-পা হারিয়ে ফেলে। মনে মনে বললে, নাথিং রঙ! নাথিং রঙ! তবু যাওয়া উচিত!

শেষ পর্যন্ত সুভাষই উদ্যোগী হ'য়ে সুন্দরাজনকে সেই দিনই দেশে পাঠিয়ে দিলে। সাহেবকে বলে' দু' সপ্তার ছুটি করিয়ে দিলে—ওর কাজের ভার নিজে নিলে।

গাড়িতে উঠে রাজন বললে, জান সেন, তুমি না থাকলে আজ আমার ছুটি হ'তো না! সাহেব বিশ্বাস করলেও কাজের জন্যে আমাকে আটকে দিত—তোমার কাজ দেখবে কে! আই অ্যাম গ্রেটফুল!

হয়েছে হয়েছে! এখন ভালয় ভালয় গিয়ে ফিরে এস। প্লে নো মিস্‌হ্যাপ সুভাষ রাজনকে থামালে।

বিদেশে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু ভাই সুভাষ! সুন্দরের গলা ধরে এল বিদায় নিতে গিয়ে। হুইসিল দিয়ে গাড়ি ছাড়ল

সুভাষ বললে, উই আর অল্‌ ফ্রেণ্ডস ডোণ্ট ফরগেট!

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গদ্‌গদ্‌ স্বরে সুন্দর বললে, বাট ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেণ্ড! আই উইল নেভার ফরগেট!

প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে চেয়ে সুভাষ কেন জানি না একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। কলকাতায় এসে লোকটা বড় মুস্কিলে পড়েছে—বড় অসহায় নিঃসঙ্গ বোধ করছে!

দেশে গিয়ে ওভারস্টে করেছে সুন্দরাজন। একটা চিঠি পর্যন্ত দেয়নি তার উপকারী বন্ধুকে। মুখেই বেস্ট ফ্রেণ্ড!

আর বন্ধুরা বললে, তুমিই দেখ এখন, আমাদের ঢের দেখা আছে! ও ম্যাড্রাসি, যাকে বলে এক নম্বর!

সুভাষও বিরক্ত হ'য়েছে। আচ্ছা পাজী লোকটা, টেলিগ্রামটা একটা শো—মতলব ছিল এ আপিস থেকে কেটে পড়বে!

কেউ কেউ বললে, তুমি দেখো, ঠিক

ম্যানেজ করবে ট্রান্সফার! তাল বোঝ না ওদের! যাও এখন সাহেবকে বলে এস—

ক্রমে সুন্দরাজনের কাজের অনেক গলদ পাওয়া যেতে লাগল—চিঠিপত্তর সব কোথায় কি করে রেখে গেছে, এক নম্বর ফাঁকিবাজ ছিল। সাহেবের নোটিসে আনবে সুভাষ! কে ওর জন্যে বেগার খাটতে যাবে রোজ রোজ! তারপর বিশ্বাস নেই, ফিরে এসে তাকেই না ডুবিয়ে দেয় এরিয়ারের জন্যে! একের নম্বর শয়তান।

দেখনি থাকতো কি রকম চোরের মত! সুভাষের মাখামাখি করা উচিত হয়নি।

আপিসে সুন্দরাজনের কথা যখন প্রায় সবাই ভুলে গেছে, আড়ালে নিন্দাবাদ চুপ হয়েছে মুখব্যথায়, একদিন হঠাৎ সে এসে হাজির। দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেছে। কি ব্যাপার!

মুখে অবশ্য কেউ কিছু বললে না। হাজার হোক সৌজন্য-বোধ আছে, বলবারও একটা অধিকার আছে! তারা বলবার কে!

সুন্দরাজনকে ফাইলপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে সুভাষ বললে, তা হ'লে ফিরেই এলে. আমরা ভেবেছিলুম...

সুন্দরাজন কোন কথা বললে না। এক পাশে ফাইলগুলো সরিয়ে রাখতে লাগল।

সুভাষ বললে, দেশের খবর কি? ও-কে?

ফ্যাল ফ্যাল্ করে সুন্দর তার মুখের দিকে চাইলে। অপরাধীর মত মুখটা তার এতটুকু হ'য়ে আছে।

সুভাষ আবার জিজ্ঞেস করলে, অমন করে চাইছ কেন? কি হয়েছে? খবর ভাল তো? দেরি করলে কেন?

চোখের কোলে যেন জল দেখা গেল সুন্দরাজনের। ফাইলগুলো গুছতে গুছতে বললে, আই উইল টেল্ ইউ আফটার-ওয়ার্ডস মিস্টার সেন।

এতক্ষণে সুভাষের যেন মনে হলো, ভুগে ভুগে লোকটা বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছে। ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে! [illegible]রা আধখানা হ'য়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে।

সুন্দরাজনের বৌ মারা গেছে ছেলে [illegible]তে গিয়ে। কিন্তু ছেলেটি বেঁচে আছে। তার একটা ব্যবস্থা করে আসতে এত দেরি [illegible]ছে। নিজের কেউ নেই যে তার [illegible]মায় রেখে আসবে—বুড়িমায়ের কর্ম [illegible] তার ওপর অতটুকু দুধের বাচ্ছা! [illegible] খুঁজে এক দুঃস্থ আত্মীয়ার সন্ধান [illegible] তার কাছে ছেলে রেখে এসেছে—তার [illegible]কগুলি সন্তান, কোলের একটি। ওরই সঙ্গে মানুষ হবে সুন্দরের বংশধর। মাসে মাসে বিশ টাকা ক'রে পাঠাবে সুন্দরাজন, বড় হ'লে টাকা আরো বাড়াবে কি নিজে নিয়ে আসবে!

চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল সুন্দরের কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরা বারণ করলে, তাই! ব্লাডি চাকরির কোন মানে হয় না, বেরাল-বাচ্ছার মত এখানে ওখানে নেড়ে বেড়ায়। কি সর্বনাশ হ'য়ে গেল! কে শুনবে, কে বুঝবে, হাজার মাইল দূরে কে তোমার দুঃখ দেখতে আসবে! চোখের দেখাটা পর্যন্ত সুন্দর দেখতে পায়নি স্ত্রীকে। ও যেদিন স্টার্ট করে বিমলা সেইদিন মারা যায় সন্ধ্যেয়—ঠিক যে সময় হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ে! টেলিগ্রামে তখনি সে বুঝেছিল, দুঃসংবাদ!

সুভাষ সান্ত্বনা দিলে অনেক। চুপ করে সুন্দরাজন শুনলে। ও জানে, এতে সান্ত্বনার কিছু নেই—সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। বিমলা কিছুতে ফিরে আসবে না আর, কেল্কাটার কোন একটি জন-বহুল গলিতে তাদের আশার স্বপ্ন সার্থক হ'য়ে ফুটবে না। বিমলার যে মুখ মনে পড়বে তা কান্নার পরে চোখ মোঁছার, অভিমানে থমথমে! সত্যিকারের সে-অভিমান বিদেশে কোন ভাড়াটে বাসায় সুন্দরাজন ভাঙতে পারবে না আর!

কয়েকদিন আপিসের পর সুভাষ ওর বাসায় এসেছিল। মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ না পেলেও মনে হতো লোকটা নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে। নিজে সুভাষ বিয়ে করেনি, কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগের মর্মবেদনাটা সে বুঝত। যতটুকু পারা যায় সঙ্গ-দানের সান্ত্বনা দিয়ে!

সুভাষের স্বজন-বন্ধুরা ঠাট্টা করত, আর লোক পেলে না, ঐ মদ্রটার দুঃখে এত কাতর! দেখালে বটে একখানা—

সুভাষ কিছু বলত না। কে জানে তার পক্ষে এ বাড়াবাড়ি কি না। সুন্দ-রাজনের মেসের বন্ধুবান্ধবরা তাকে বড় একটা খুশী মনে অভ্যর্থনা করত না! মেসের ওরা ক'জনে ক্যারম কি পিংপং খেলেই যেত অভ্যাসমত, আর ও বসে থাকত সুন্দরাজনের অপেক্ষায়।

মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন সুন্দ-রাজন চোখ লাল করে' জামা কাপড় ছিঁড়ে সুভাষের বাসায় এসে হাজির। কি ব্যাপার? না, মেসের ওদের সঙ্গে মারপিট করেছে—ওদের সঙ্গে সে আর থাকবে না!

এখন সুভাষ ওর উপযুক্ত কি ব্যবস্থা করবে ভেবে পেল না। ঘরে বসিয়ে বললে, এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি! থানায় গিয়ে একটা ডাইরি করে' আসি।

সুন্দরাজন বললে, নো।

তা হ'লে?

জাত-ভাইদের কোন মেসে সুন্দরাজন থাকতে রাজী হ'ল না। কি নিয়ে যে তাদের সঙ্গে বিবাদ সে কথাও স্পষ্ট করে বললে না। সুভাষ আশ্চর্য হলো ও যখন বললে, বাঙালীদের সঙ্গে মেসে বোর্ডিং-এ বাস করতে ওর কোন আপত্তি নেই, বরং ও সেইটেই প্রেফার করে।

সুভাষ অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলে। বললে, অনেক অসুবিধে হবে তোমার রাজন: প্রথম খাদ্যাখাদ্যের, দ্বিতীয় লাইকস্ অ্যান্ড ডিস্লাইকস নিয়ে। বাঙালীদের তো চেন না, তাই বলছি! তুমি সে-সব জায়গায় টিকতে পারবে না।

সুন্দরাজন বললে, আমি পারফেক্ট্লি চিনি। তোমাকে দেখেই চিনেছি! আমি বাঙালীদের সঙ্গে থাকব মিস্টার সেন!

সুভাষ মনে মনে হাসলে। মাথা খারাপ না হ'লে কেউ এমন পাগলামি করে না। কিন্তু সুন্দরাজনকে বোঝান বৃথা, স্বজন-বিরোধে কী যে তার মাথায় ঢুকেছে!

সুভাষ বললে, বেশ আমি দেখব কিন্তু এখুনি তো কোন ব্যবস্থা হ'বে না—দু'একদিন লাগবে খুঁজতে।

সুন্দর বিচলিত কণ্ঠে বললে, না না, আজই একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি মিস্টার সেন!

বাধ্য হয়ে সুভাষ সুন্দরাজনকে নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি ক'রলে এ পাড়া ও পাড়া। শেষে জানাশোনা একটা মেস বোর্ডিং ঠিক করলে। তেতলার একটা ঘরে সুন্দরাজন একলা থাকবে কেবল, খাওয়াটা সে বাইরে সেরে নেবে।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই সুন্দরাজন খুঁত খুঁত করতে লাগল। স্পষ্ট কিছু না বললেও সুভাষ বুঝতে পারে। তারপর একদিন সে স্পষ্টই বললে, মিস্টার সেন, আমার জন্যে কোন পি জি ব্যবস্থা করতে পারো বাঙালী পরিবারে?

সুভাষ বললে, কেন? তোমাদের মাদ্রাজের

অনেকে তো আজকাল ঐ ব্যবস্থা করেছেন! সেখানে গিয়ে থাক না!

সুন্দরাজনের সেই এক আপত্তি। কি যে ওর মাথায় ঢুকেছে, স্বজাতের কথা বললে বিতৃষ্ণায় মুখ ভার করে থাকে।

কিন্তু মাদ্রাজীকে কোন্ বাঙালী ঘরে স্থান দেবে সুভাষ ভেবে পায় না। অনেক হাঙ্গামা!

সুভাষ বললে, দেখব। কিন্তু আমার মতে তোমার নিজের লোকের মধ্যে থাকাই ভাল। আমাদের পাড়ায় অমন একটা পরিবার আছে, বল তো চেষ্টা করে দেখতে পারি! মেস বোর্ডিং-এর চেয়ে ঢের ভাল, আরামেও থাকবে।

সুন্দরাজন ভালমন্দ কিছুই বললে না। মাথায় ওর ভূত চেপেছে। দেশের লোক থেকে নিজেকে ও তফাৎ করতে যায়। কিন্তু বললেই তো হয় না, মেশামিশিটা অত সহজ নয়। গৃহধর্ম আলাদা প্রত্যেক প্রদেশের; সুন্দর চাইলে, সেটা সম্ভব হতে পারে না।

আগে সুন্দর যাদের সংগে ছিল তারা মাপ চেয়ে মিটমাট করে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে। অনেক অনুরোধ করলে, বন্ধুত্বের দোহাই দিলে। সুন্দর রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত ওকে একঘরে করবার ভয়ও দেখালে তারা, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না—সুন্দর ফিরে গেল না।

সুন্দরের ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতাবাসী মাদ্রাজী সমাজে কদিন বিশেষ আলোড়ন উঠল। এখানে বড় বড় যাঁরা চাকুরে তাঁরা ওকে ডেকে অনেক বোঝালেন, স্বজাতির মুখ না ডোবাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। শেষবেশ চেষ্টাচরিত্র করে ওর বদলির ব্যবস্থা করবেন, তাও বললেন।

সুন্দরাজন অবিচলিত। কোন রকম সাড়া করলে না। সুভাষ লক্ষ্য করলে, সবার থেকে ও যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। অফিসে যতক্ষণ থাকত মুখটি বুজে মাথা হেঁট করে কাজে ডুবে থাকত। সুভাষের সংগে অন্তরঙ্গতাটা ওর যেন ইদানীং কমে এসেছিল। নির্বোধের মত অভিমান করে যে কি লাভ কে জানে!

মাঝে একদিন অফিসের ছুটির পর সুভাষই ওকে ডেকে কফি হাউসে নিয়ে গেল। কফি খেতে খেতে সুভাষ বললে, তোমার ব্যাপারটা কি বল দিকি রাজন?

রাজন অনেকদিন পরে হাসলে,—হোয়াট মিস্টার?

জাত ভাই-এর ওপর তোমার রাগ কমছে না কেন? সুভাষ কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলে।

সুন্দরাজন রাগের কথা স্বীকার করলে না। নো মিস্টার, আই হ্যাভ নো কোয়ার্ল!

সুভাষ বললে, যাক, বাঁচা গেল। যাই কর, শেষ পর্যন্ত ইয়োর মেন আর ইয়োর মেন! বিপদে আপদে ওরাই দেখবে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, ইউ নো!

হঠাৎ সুন্দরাজন গম্ভীর হয়ে বললে, মিস্টার সেন, স্বধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ? ইজ ইট লিমিটেড টু স্পেস? তুমি বাংলা দেশে না জন্মে যদি আর কোথাও জন্মাতে, আর কোন ভাষা বলতে তা হলে তোমার স্বধর্ম কি হতো? তুমি যে দেশে জন্মেছো যে ভাষায় কথা বলছো, তোমার স্বধর্ম ভিটামিন করতে তাই কি যথেষ্ট মনে কর?

সুভাষ সুন্দরাজনের কথা শুনে হাসলে। বললে, অমন করে তোমার মত ভেবে দেখিনি! শাস্ত্রে বলে তাই বললুম তোমাকে, সাবধান!

তোমার নিজের কোন মত নেই? সুন্দরাজন জেরা করলে। উত্তর না দিয়ে সুভাষ হাসতে লাগল সুন্দরের হঠাৎ-দার্শনিকতায়। মাথা খারাপের লক্ষণ!

উঠে পড়ে সুন্দরাজন বললে, ওসব কিছু না, স্বার্থপরতাই স্বধর্মের একমাত্র লক্ষণ।

তারপর রাস্তায় নেমে রাজন বললে, এই দেখ না, তোমার আমার মধ্যে এত মেলামেশা এত জানাশোনা তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না, কিনা তোমার স্বধর্ম বাধা দিল! দূর থেকে ভালবাসবে, কিন্তু কাছে টানবে না। ভারতীয় আমরা বাইরে, কিন্তু অন্তরে বড় প্রাদেশিক। অফিসে আমাকে কেউ বোঝে না, বিশ্বাস করে না, উপরন্তু সন্দেহ করে। ঠিক না?

রাস্তার আবছা আলোয় সুভাষ সুন্দরাজনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। অদ্ভুত প্রত্যয়ে তার মুখটা আজ বড় দৃঢ় কঠিন দেখাচ্ছে। কথাগুলো সে উপলব্ধি করেই বলছে মনে হয়।

সুভাষ চুপ করে রইল। বলবার তার কিছু নেই। বাঙালী বাঙালী, মাদ্রাজী মাদ্রাজী! মানুষ হিসাবে এক হলেও কোথায় যেন দুর্লঙ্ঘ্য এক বাধা আছে—সে বাধা বাইরের নয়, ভিতরের।

রাজনকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, রাজনও তাকে বুঝতে পারেনি। দুই মুখের ভিন্ন ভাষাই এক অদৃশ্য অনভিপ্রেত ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে! যদি তারা একই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত তা হলে বাসস্থানের দূরত্ব তাদের অনুভবের, সুখ-দুঃখ বেদনাবোধের কোনই অন্তরায় হতো না!

সুভাষ হঠাৎ সুন্দরাজনের হাতটা ধরে বললে, তুমি দুঃখ করো না ভাই, ওসব কিছু না। এই তো তুমি আর আমি কেমন বন্ধুত্ব করেছি! জাস্ট লাইক ব্রাদার্স!

সুন্দরাজন 'অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল। যেন মস্ত বড় একটা কথার ফাঁকিকে সে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে যায়। বিদায় নিয়ে সুন্দর বললে, বাট্ ফ্রেণ্ডস উইল পার্ট, ব্রাদার্স উইল পার্ট!

সুন্দরাজনের মনের এ ভাব কিন্তু বেশী দিন থাকেনি। আবার সে পূর্বের মত স্বজন-বন্ধুদের সংগে বাস করতে লাগল। আর একটা মাদ্রাজী মেস দেখে সে উঠে গেল। হঠাৎ পত্নী-বিয়োগে ওর মাথার গোলমাল হয়েছিল মনে হয়—সুভাষ না বললেও সুভাষের বন্ধুরা বলত। হয়তো তাই।

সুভাষ কিন্তু পূর্বের মতই মেলামেশা করত। সবচেয়ে সে-ই বেশী সুখী হয়েছিল সুন্দরাজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে বলে। সুস্থ মানুষের মত আচরণ করতে দেখে সবচেয়ে সেই বেশী সুখী বোধ করছে। যা হবার নয় তাই চেষ্টা হয় এক পাগলে করে, নয় অতি-মানুষে

করে। রাজন ও দুটোর কোনটিই নয়। সাধারণ মানুষ সে, রক্তমাংসের।

এরপর কানাঘুষো শোনা গেল, সুন্দরাজন আবার বিয়ে করছে। সেই যে-মেসে ও মারাপিট করেছিল তার এক বোর্ডার শ্রীনিবাসন না রাধাকৃষ্ণন কার এক বোনের সংগে বিয়ের কথাবার্তা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে! টিফিনের সময় ইদানীং ওর টেবিলে এদিক-ওদিক থেকে ওর দেশের লোক কয়েকজন প্রায়ই আসত, গল্পগুজব হাসি-তামাসা করে চলে যেত! সুভাষ দূর থেকে লক্ষ্য করত। এ আর এক সুন্দরাজন, যেন এর সংগে তার কোন পরিচয় নেই।

আশ্চর্য অভিনয় করতে পারে রাজন। মনে করলে হাসি পায় ওর কথাবার্তা সব!

কদিন সুভাষ এড়িয়ে এড়িয়ে চলল ওকে। স্বজনবন্ধুরা যখন ওর আছে, তখন আর ভাবনা কি! আর কি কথা হবে, যেটুকু মিশেছে এ পর্যন্ত ঐ যথেষ্ট!

সুন্দরাজনই একদিন সুভাষকে পাকড়াও করলে অফিসের পর। কি মিস্টার, তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাও! হোয়াই, প্লিজ?

সুভাষ ধরা পড়ে লুকতে চেষ্টা করলে, না না, কে বললে!

রাজন মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললে, বুঝতে পারি আমি যে!

লজ্জায় অধোবদন হয়ে সুভাষ বললে, না না, তুমি ভুল বুঝেচ! আজকাল সময় পাই না, কাজ বেড়েচে দেখছ না!

সুন্দরাজন হাসতে লাগল। কাঁধে হাত দিয়ে বললে, আমি যদি ভুল বুঝিও, তুমি কোনদিন ভুল বুঝ না আমাকে ভাই!

অপ্রস্তুতের মত সুভাষ বললে, না না, কি যে বল! ইউ আর ভেরি সেন্টিমেন্টাল! এস কফি খাই—

না, চল তার চেয়ে মিষ্টি খাই। তোমাদের সুইটস বড় ভাল! সুন্দরাজন এগিয়ে যেতে যেতে বললে।

আর আমরা? সুভাষ কৌতুক করলে।

মার্ভেলাস! আমি যদি তোমাদের একজন হতুম, আমাকে যদি তোমরা একজন করে নিতে! সুন্দরাজনের গলাটা ধরা-ধরা শোনায়।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সুন্দরাজন ঘুরে দাঁড়িয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওর কি খেয়াল হয়, কি যে বকে মরে পাগলের মত।

সুন্দরাজনই খাওয়ালে জোর করে। খেতে খেতে সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, তুমি নাকি বিয়ে করচো? গুড্ নিউজ, উইশ ইউ—

বাধা দিয়ে সুন্দরাজন বললে, হয়েছে, নো উইশ প্লিজ!

বিয়ে করচো তাহলে? সুভাষ তবু কৌতুক করলে।

সুন্দরাজন হাঁ-না কিছু বললে না, গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

কিন্তু বিয়ের কোন লক্ষণই দেখা গেল না সুন্দরাজনের। প্রায় একটা বছর কেটে গেল। আপিসে সুন্দরাজন সেই আবার আগের মতই একলা, নিজের সিটে বসে কাজ করে নিঃশব্দে—কখনো বা সামনের খোলা জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চুপচাপ একেবারে।

আরো, কদিন ধরে সুভাষ আপিসে আসছে না। কে জানে কি হয়েছে তার। কোন রিপোর্ট'ও সে করেনি।

সুন্দরাজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছুটির পর সুভাষের বাড়ি এল একদিন। কি ব্যাপার?

খালি গায়ে সুভাষ বেরিয়ে এল। তুমি?

আমি মনে করি অসুখ-বিসুখ হয়েছে, তাই—রাজন হাসলে।

আমার নয়, বাবার! সুভাষ বললে।

কি অসুখ! সেরিয়াস? রাজনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ, হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার বেড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, এক সাইড পড়ে গেছে।

চুপ করে সুন্দরাজন বন্ধুর বিপদের কথা শুনলে। কি করবে না করবে ভেবে পেল না। বাড়ির ভিতরে না ঢুকে দুজনে খানিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ রাজন অধীর হয়ে বললে, আমি দেখব তোমার বাবাকে।

কি ভাবলে সুভাষ, ইতস্তত করে বললে, এস।

নিঃশব্দে দুজনে রোগীর ঘরে এল। রাজন চেয়ে চেয়ে দেখলে—কে জানে আর কোন ছবির সংগে সে মিলিয়ে নিতে চাইলে কিনা।

পরের দিনও সুন্দরাজন এল আপিসের পর। কোন ডাকাডাকি না করে নিজেই সে রোগীর ঘরে উঠে এল। খানিক বসলে, নিঃশব্দে রোগ-পরিচর্যা লক্ষ্য করলে।

দু' তিনদিন উঠিউঠি আসার পর একদিন ফেরবার সময় বন্ধুর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রাজন জড়িত কণ্ঠে বললে, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড......

সুভাষ কিছু বুঝতে না পেরে বন্ধুর মুখের দিকে চাইলে। ইউ কিপ্ ইট! প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড, আই উইল বি ওবলাইজড্—

সাশ্রুনয়নে সুভাষ চেয়ে দেখলে, অনেকগুলো দশ টাকার নোট সুন্দরাজন তার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

কিছু বলবার আগেই মিনতি করে রাজন বললে, আই নো, এ সময় টাকার দরকার আছে! ডোণ্ট রিফিউজ...আই ডোণ্ট মিন টু......

সুভাষ কিছু বললে না। তার মনে হলো, সুন্দরাজনের এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। পক্ষান্তরে বন্ধুত্বের অমর্যাদা হবে গ্রহণ না করলে।

সুন্দরাজন আর দাঁড়ল না, ব্যস্তসমস্ত ভাবে সরে পড়ল। কিন্তু যথোচিত চিকিৎসা করেও সুভাষের বাবা বাঁচেননি। প্রায় মাসখানেক ভোগবার পর তিনি মারা গেলেন।

অসুখের সময় এসেছে, মারা যাবার পরও রাজন আসা যাওয়া করতে লাগল। যেন পরম আত্মীয় বিপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুভাষের বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত ভুলে গেছে রাজন অজ্ঞাত, অন্য প্রদেশের মানুষ! যেন কতকালের চেনা-পরিচিত স্বজন!

সুভাষকে না পেলেও মার সংগে বসে আলাপ করত রাজন। ভাল বাংলা শিখেছিল সে, কোন অসুবিধে হত না। দুঃখে সান্ত্বনা দিত ঘরের লোকের মত।

কেবল ভাল লাগা নয়, সুন্দরাজনকে বড় আপন-জন মনে হ'তো সুভাষের মা'র। অনেকদিন ছেলেকে তিনি চোখ ছলছল করে বলেছেন, কে বলবে ও আমাদের স্বজন নয়—ভারি ভাল ছেলে! ওর যদি দেশ অত দূরে না হ'য়ে আমাদের দেশে হতো—

তা হ'লে কি হতো? সুভাষ মাকে জিজ্ঞেস করলে।

না, তাই বলছি! আমাদের জাতের হ'লে—মা সম্পূর্ণ করতে পারেন না, মনোগত ভাবটা তাঁর জড়িয়ে যায়। কি বলতে যেন কি তিনি বলে ফেলছেন।

সুভাষ কি বোঝে কে জানে, আর কোন কথা বলে না। তার বিপদে রাজন অনেক করেছে, তার সংসারে এখন ভাবে মিশছে, কৃতজ্ঞতায় মন ভরে আছে। সুন্দরাজন তার আত্মীয়েরও বাড়া।

কিন্তু একথা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও সুভাষ ভাবেনি যে, তার বিপদের কথা ভেবেই একদিন সুন্দরাজন তার অতিথি হয়ে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

শুনেই সুভাষ উড়িয়ে দিলে, আবার পাগলামি করছ, কি অসুবিধে তোমার হলো?

রাজন জেদ করে, না, মেসে তার পোষাবে না। ওদের সংগে তার ভাল লাগে না। অল্ রটন সেলফিস ফেলো!

তা হোক, তুমি ওদের সংগেই থাক, না হয় বিয়ে করে ফেল। দেরি করছ কেন?

সে ব্যাপার কি হলো? সুভাষ কথা ঘোরাতে যায়।

গোল্লায় যাক, কেন তোমার আপত্তি কিসে! বিকজ আই অ্যাম এ ম্যাড্রাসী? সুন্দররাজন উল্টো চাপ দেয়।

সুভাষ ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, সেকি! সেকি!

তা হ'লে কেন তুমি আপত্তি করছ! আমি তোমাদের উপযুক্ত নই! সুন্দররাজনের গলা ভারি হয়ে আসে।

মহা মুশকিলে পড়ে সুভাষ। এ পাগলাটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না সে। বললে, মাকে জিজ্ঞেস করব, দেখি তিনি কি বলেন।

এরপর দুতিনদিন সুন্দররাজন কোন কথা কইলে না। এমন ভাব করতে লাগল যেন সুভাষের সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই নেই। আপিসের মুখচেনা বিদেশী ভদ্রলোক।

এক ঘণ্টা পরে সুভাষ উপযাচক হয়ে রাজনকে বললে, মা রাজী হয়েছেন, কিন্তু—

রাজন আর যেন তত উৎসুক নয়। অন্যমনস্কতার ভান করে। মুখটা ফুলিয়ে থাকে।

সুভাষ বললে, তা হ'লে মাকে কি বলব। কবে থেকে আসছ?

এবার গম্ভীর হ'তে গিয়ে সুন্দররাজন হেসে ফেললে। গদগদ কণ্ঠে বললে, আমি জানি, মা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার কষ্ট হ'লে তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

একদিন সুভাষ বললে, একি হলো ভাই, এসব খরচ তুমি করলে কেন? তুমি এখানে থাও না, তোমার খরচ কি?

সুন্দররাজন চটে ওঠে, আমি তোমাকে আবার বলছি, খরচের কথা আমাকে শেখাতে এস না। আমার খুশি!

সুভাষের মা'ও হার মেনেছেন, বলে বলে তিনি পারেননি এই অদ্ভুত ছেলেটিকে। আশ্চর্য ওর নজর, যেন নিজের সংসার ও করছে—কার কি দরকার নিজে থেকে সংগ্রহ করে আনছে কাউকে কিছু না বলেই।

সুভাষের বোনেদের সঙ্গে ওর যত ভাব, আর সুখদুঃখের কথা সংসারের। এমন-ভাবে বুঝি কেউ মেশে না! সুভাষের মা মেয়েদের আড়ালে কতদিন বলেছেন, রাজনকে দেখে আমার কি মনে হয় জানিস—আমার প্রথম ছেলে বুঝি আবার ফিরে এসেছে! সেই কবে তাকে হারিয়েছিলাম—মনে করতে পারি না! সে ছেলে বেঁচে থাকলে এর চেয়ে বেশি কি আর বাপমায়ের ভাইবোনের সেবা করত! ও বেঁচে থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক, ওকে তোরা বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করিস।

কতদিন মায়ের চোখে জল দেখেছে সুভাষ রাজনের কথা উঠলে। বুঝতে পারেনি কেন। রাজনের সঙ্গে সম্পর্ক তার কেবল বন্ধুত্বের, আর কিছু সে মনে করে না। ওর খেয়াল চেপেছে, তাই তাদের পরিবারে অতিথি হয়ে বাস করছে। মা'র এতটা স্নেহকাতর না হওয়াই ভাল।

রাজনকে নিয়ে নতুনত্বের প্রথম উত্তেজনা কেটে গেলে, অশান্তিকর নানা কালো ছায়া এদিক ওদিক থেকে উঁকি মারতে থাকে। প্রথম প্রথম খেয়াল না করলেও শেষ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে সুভাষ। অফিসের বন্ধুরা নানা কথায় অতিষ্ঠ করে তোলে তাকে। বাঙালীর ঘরে মাদ্রাজীর অত মাখামাখি কেন, নিশ্চয়ই কিছু—

এই 'কিছু'টা সুভাষের বয়স্কা অনূঢ়া বোনদের নিয়ে। আরো, সুন্দররাজন ইতি-মধ্যে আফিসের পরীক্ষা দিয়ে দুতিন ধাপ ওপরে উঠে গেছে সুভাষের চেয়ে। সুতরাং সন্দেহ যদি হয়, ছোট নানাভাবে বড়কে হাতে রাখতে চায়, তা হলে প্রতিবাদ করবার কিছু থাকে না বুঝি। সুভাষের রাগ করাই সার হয়।

রটনাটা সুন্দররাজনের কানে উঠেছিল। ঠিক এভাবে সে ভেবে দেখেনি ব্যাপারটা। স্তব্ধ হ'য়ে ভাবতে লাগল, অতঃপর তার কি করা কর্তব্য।

পাড়ার লোক আত্মীয় বন্ধুরাও নানা রকম কানাঘুষো করতে লাগল সুন্দরকে নিয়ে। একটা নিশব্দ ছিছিকার তাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর লোক পেলে না, অত বড় বড় বোনদের কিনা একটা মাদ্রাজীর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিলে। বুদ্ধি আছে ছোকরার—চাকরিকে চাকরি বজায় থাকবে, বোনেদের কোন্ না একটি হিল্লে হবে। অত বড় বড় ধুমসিদের কে বিয়ে ক'রতে যাবে, কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!

বাইরে থেকে কী শুনে এসে একদিন সুভাষ পাগলের মত রাজনকে যা-তা বলে অপমান করলে। নাকি ইচ্ছে করে মতলব করে রাজন তাদের এই সর্বনাশ করেছে! সে ইডিয়ট বলে শয়তানি বুঝতে পারেনি। ওর জাতভাইরা ওকে ঠিক চিনেছিল।

সুভাষের ছোট বোন ভয়ে জড়সড় ভাই-এর অগ্নিমূর্তি দেখে। মা'ও কিছু বলতে পারছেন না ছেলেকে। রাজন তাদের কি সর্বনাশ করেছে? কি বলছে সুভাষ?—

সুন্দররাজন বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! সুভাষ সমানে চাঁচাতে লাগল, রাসকেল কাঁহাকা, চালাকি মারবার জায়গা পাওনি। গেট আউট। গেট আউট! আই টেল্ ইউ—

এগিয়ে এসে মা শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কাকে কি বলছিস সুভাষ। থাম্, থাম্—

না, ওকে খুন করলে তবে রাগ যায়। ও কি করেচে জান তুমি? সুন্দররাজনের উপর সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘরের এক দিকে সুন্দররাজন সরে দাঁড়ায়, মা পড়ে যান ধস্তাধস্তিতে। ছোটবোন তরু দাদাকে আগলে থাকে।

আছাড় খাওয়া উৎসুক প্রশ্নটা আবার উচ্চকিত হয়ে ওঠে,—কি করেছে রাজন?

সুভাষ চিৎকার করলে,—অকৃতজ্ঞ, স্কাউ-ন্ড্রেল, তোমাকে আমি খুন করব।

ধীরে ধীরে সকল বাধা ঠেলে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল সুন্দররাজন। শান্ত কণ্ঠে বললে, মার ভাই!

ভাই! রাসকেল, শয়তান! কথা বলতে লজ্জা করে না তোর। সুভাষের উদ্যত ঘুষিটা বৃথা গেল না।

এতটুকু কাতরোক্তি না করে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল সুন্দররাজন মা'র মুখের দিকে চেয়ে।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে লাবণ্য বললে, ওকে কিছু বলো না, যা বলবার তোমরা আমাকে বল! আমাকে তোমরা মেরে ফেল, তাড়িয়ে দাও, যা খুশি কর—

মা অবাক হয়ে উভয়ের দিকে চাইলেন। এই তাঁর আত্মজা, আর এই তাঁর বিদেশী ছেলে—কাকে ফেলে কাকে রাখবেন। এদের স্বীকার করে নিলে শুধু কি তিনি লজ্জা পাবেন, ঘরে ঘরে নিন্দা শুনবেন? আর কিছু কি পাওয়া যাবে না, সুন্দররাজনকে আপন বলে কাছে টানলে?

ছি ছি, বিদেশী, পর ও যে! মাদ্রাজী! বুঝি ঘৃণায়, লজ্জায় অনূঢ়া বিগতযৌবনা বোনের দিকে সুভাষ চাইতে পারলে না। অপমানে মনে মনে গর-গর করতে লাগল। জাত মান সব নষ্ট করেছে লাবণ্য!

অনেক কথা বলতে চেয়েছিল সুন্দররাজন, চেষ্টা করলে অনেক কথা বলতে পারত সে। কিন্তু কি হবে বলে, বিদেশী সে—তার কথার কোন মূল্যই নেই।

ধীরে ধীরে সুন্দররাজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। স্বজনভ্রষ্ট, বেইমান সে!

এক ডাকেই বত্রিশজন। নানা জাতের নানান বয়সের।

অফিসে ঢোকবার মুখেই তুলসীবাবু দেখতে পেলেন। গলায় কণ্ঠি, মাথায় মাঝারী আকারের একটি টিকি। মাছ মাংস ছোঁন না। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ।

দরজার গোড়াতেই ডেসপ্যাচার হরিহরবাবু। সর্বদাই ব্যস্ত। কাজ করে কূল পায় না। অথচ পুনার চিঠি পাটনা, আর ঝাঁশিডির চিঠি জলন্ধর। হরদম ওলোট পালোট। কি করে যে যায় তারও হরিহরবাবু হদিস পায় না। প্রথমে দেখতে পেয়ে তুলসীবাবু তাকেই প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ হরিহর, অফিসে আজ চাঁদের হাট যে?

হরিহর মুখ তুলল না। খামে আঠা লাগাতে লাগাতে বলল, হবে না, আজ যে ইণ্টারভ্যু।

—ইণ্টারভ্যু! কিসের? বলতে বলতে তুলসীবাবু থমকে দাঁড়ালেন। অবশ্য এ ওঁর জানবারও কথা নয়। সেলস্ ডিপার্টমেণ্টের সেজো কেরানি। মাল পাচার হবার হিসাব নিকাশই করেন। কত মাল গুদামে উঠল, আর কত গেল। মানুষ আসা-যাওয়ার খবর রাখার কথা ও'র নয়।

হরিহরবাবুর হাতে অফিসের নাড়ি। সব চিঠি ও'র নখদর্পণে। সায়েবদের 'গোপনীয়' লেবেল আঁটা চিঠিও বেমালুম খুলে পড়ে। সাবধানের মার নেই। কোথায় কি হচ্ছে খবর রাখা দরকার বই কি। অন্যায়টা আর কি! চুরি তো আর করছে না। ব্যাপারটা জেনে নিয়ে খামের মুখ এ'টে দিলেই হল। কাক-পক্ষী টের পাচ্ছে না।

তুলসীবাবুর কথার উত্তরে মুখ তুলে বলল, উইলিয়ামের জায়গায় লোক নিচ্ছে যে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট কি ভাবলেন, তারপর বললেন, কিন্তু মেয়েছেলে?

হরিহরবাবু মুচকি হেসে চোখ ঘোরাল, ওইটি বলতে পারব না দাদা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাদের শুধু দেখার পালা।

তা বটে। দেখার পালা ছাড়া আর কি।

জোয়ান ছোকরা। পৌনে ছ ফুট লম্বা, বুকে বুঝি লোহা রেখে পিটনো যায়। এক-মাথা ঢেউ খেলানো চুল। কথায় কথায় কেবল হাসি। বুদ্ধিদীপ্ত কটা চোখ। ঝকঝকে দাঁতের সার। বড় সায়েবের স্টেনো। করিৎকর্মা ছেলে। নিজের চিঠির স্তূপ শেষ করে অন্য টাইপিস্টদেরও কাজ ক'রে দিত।

বড়বাবু পর্যন্ত তারিফ করতেন। মানুষ তো নয় মেশিন। সত্যিই তাই। উইলিয়াম ব্যারন বিশ্বাস মেশিন ছাড়া আর কিছু নয়। একপুরুষে ক্রীশ্চান। বাপ নরহরি বিশ্বাসের কাগজের কারবার ছিল। চিনা-বাজারের এ'দো গলিতে ব্যবসার পত্তন, কিন্তু নরহরির কেরামতিতে আট বছরের মধ্যে রাজসড়কের ওপর দোকান উঠে এল। মিলের সঙ্গে সোজাসুজি বন্দোবস্ত। সায়েব খদ্দেরে দোকান ঠাসবোঝাই। সে দোকান থাকলে উইলিয়ামকে আর সিমসন কোম্পানীতে আড়াই শ টাকার জন্য মাথা খুঁড়তে আসতে হত না। দশটা পাঁচটা বান্দাগিরি। রাজার হালে গদিতে বসে থাকত পায়ের ওপর পা তুলে।

কিন্তু বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ। কাগজের কারবারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। খুরের ঘায়ে ধুলো নয়, মুঠো মুঠো টাকা। শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। মতলব দিলেন ইহুদী সায়েব মিস্টার পল। নিজে ঘোড়ার মালিক। 'ডায়না' আর 'হায়না' দুই পক্ষীরাজ। পুনার মাঠে দিগ্বিজয় করে কলকাতায় সফরে এসেছে। বাজি মাত করবেই। সায়েব নিঃশব্দে খবরটা নরহরির কানে দিলেন। দু'দিন দু'রাত নরহরি ছটফট করল। চোখে ঘুম নেই, মন দুঃখও

যেন ঘোলের সামিল। সব কিছুতে বিতৃষ্ণা। দোকানের স্তূপাকার কাগজ চোখের পলকে রঙিন নোটের রূপ নিল। শুধু পক্ষী-রাজদের পাখার দাপটে। ইতস্তত করে নেমেই গেলেন। তবে প্রথমে সামান্য টাকা। কিন্তু প্রথম চোটেই সামান্য অসামান্য হয়ে ফিলে এল। প্রায় দেড়গুণ! নরহরি বিশ্বাস ট্যাকসি চড়ে বাড়ি ফিরল। বছর তিনেক। তার মধ্যেই ব্যাঙ্কের পুঁজি শেষ হয়ে বাড়িতে হাত পড়ল। দোতলা বাড়ি, আশে পাশে জমির ছিটেও রয়েছে। বন্ধকী টাকার সবটা নিয়ে নরহরি 'মাই ডার্লিং'য়ের পায়ে নৈবেদ্য দিল। বরাত! মাই ডার্লিং অন্য কারো ডার্লিং হয়ে নরহরিকে পথে বসাল। এই সময়ে উইলিয়ামের মা চোখ বুজলেন, তাতেও নরহরির চোখ খুলল না। পল সায়েব নেই, কিন্তু গোপন খবর দেবার লোকের অভাব হল না। একেবারে আনকোরা খবর, ঘোড়ার চোদ্দপুরুষের কুলুজি। বাজিমাত না হয়ে যায় কোথায়। বিশ্বাস অ্যান্ড সন্সের সাইনবোর্ড নামানর সঙ্গে সঙ্গেই নরহরির বুকের ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠল। পুরনো ব্যথা, এতদিন চাপা ছিল, টোটকা ওষুধে মাঝে মাঝে ছেড়েও যেত, কিন্তু এবার ছাড়ল নরহরিকে সঙ্গে নিয়ে।

লেখাপড়া উইলিয়ামের বেশীদূর হয়নি। রেভারেন্ড টমাসের দয়ায় কিছুদিন নিচু ক্লাশে ঘোরাফেরা, টাকার অভাবে স্কুল ছাড়ো ছাড়ো অবস্থা। এবারেও পাদরি করুণা বর্ষণ করলেন, কিন্তু বিনা সর্তে নয়। ধর্ম বাঁধা রেখে উইলিয়ামের লেখাপড়া চলল।

ম্যাট্রিক যখন পাশ করল তখনও উইলিয়াম নয়, শুধু বরেন বিশ্বাস। বছর দুয়েকের মধ্যে জর্ডন নদীর জল মাথায় ছিটিয়ে নামান্তর হল, ধর্মান্তরও।

এসব কথা অফিসের সবাই জানে। উইলিয়ামই বলেছে। লুকোচাপা কিসের। বাপের অর্থ পায়নি বটে, কিন্তু সামর্থ্য তো পেয়েছে। পঁচাত্তর টাকায় শুরু করে আড়াই শতে শেষ। কম কথা।

অবশ্য আড়াই শতে শেষ হবার কথা নয়। ভগবানের মার। অমন জোয়ান মদ্দ, নিরেট চেহারা, বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। ভিতরটা কুরে কুরে খেয়েছে। প্রায় ফোঁপরা। এক্স-রের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু পাঁজরের অবস্থা দেখে উইলিয়াম নিজেই ভয়ে চোখ বুজলো। তার আগেই অফিসে জানাজানি হ'য়ে গিয়েছিল। কাশতে কাশতে রক্তের ছিটে। কিছুটা জামার ওপর, কিছুটা টাইপ করা চিঠিতে। এ যেন বুকের রক্ত দিয়ে কাজ করা। আশ পাশের সবাই আহা আহা করল, কিন্তু পাদমেকং এগল না। অদৃশ্য বীজাণু কখন কাকে আশ্রয় করে ঠিক আছে!

কিন্তু কেরানিরা এও চায় নি। বেশ তো, অসুখ করেছে, লোকটাকে ছুটি দিলেই হয়। এর মধ্যে সারে ভাল, না হলে তো কথাই নেই। তা বলে একেবারে বরখাস্ত করা। এ যেন বড় সায়েবের একটু বাড়াবাড়ি। অন্য কেরানিদের দিকে চেয়েই নাকি উনি এই করেছেন। বাঁচবার রোগ এ নয়। আর আয়ুই যার পরিমিত, তাকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়ার কোন মানে হয়! তাও এই দুর্মূল্যের বাজারে? বরং সে-টাকাটা অন্য সকলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেই হয়। একজনের প্রাণ রাখার চেয়ে দশজনের মন রাখা অনেক দরকারী।

উইলিয়াম কিন্তু ভেঙে পড়ল। বড় সায়েবের কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলের ওপর কাত। ছেলে-মানুষের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। দূরে দাঁড়ান টাইপিস্ট রামতনু বাড়ুজ্যের দিকে চেয়ে বলল, ব্যানার্জি, এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। চাকরি গেলে আমি কি করব। দুবেলা দুমুঠো ভাতই জুটবে না, তা আবার ওষুধ-বিষুধ, ডাক্তারের খরচ আর পথ্য।

কারো কিছু করার নেই। বড় সায়েবের হুকুমের বিরুদ্ধে কে মাথা তুলবে। ফিস-ফাস গুঞ্জন। কানাকানি, টানা সুরে প্রতিবাদ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। উইলিয়াম সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসার সময় প্রায় সকলেই বিচলিত। খুব কাছে আসার দরকার নেই। ছোঁয়াচে রোগ। দুঃখটা দূর থেকেই মালুম হচ্ছে।

প্যান্টের পকেটে দুটো হাত ডুবিয়ে উইলিয়াম 'সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল। ধাপ গুনে গুনে।

মানুষটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাড়পোঁছ শুরু হয়েছিল। উইলিয়ামের আসন আর মেশিন। ফাইলের র‍্যাক আর আশ পাশের টেবিল চেয়ার। কিছু বলা যায় না। বীজাণু শুধু তো উইলিয়ামের হৃদপিণ্ডেই বাসা বাঁধেনি, সবার অলক্ষ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করেছে। অন্য এক আশ্রয়ের সন্ধানে। মানুষটাকেই দু'হাতে সরিয়ে দেওয়া নয়, স্প্রে আর ওষুধের মাধ্যমে তার সব স্মৃতিকেও মুছে ফেলা। রোগগ্রস্ত উইলিয়াম ব্যারন বিশ্বাস যেন কোনদিন এখানে ছিল না।

তবু মনে পড়েছে। অন্য কারুর কাশির শব্দে অনেকে চমকে উঠেছে। জানলার লাল কাচের মাঝখান দিয়ে রোদের ঝলক। তরল আলতার মতন। কাজ করতে করতে সেদিকে নজর পড়তেই ভুরু কুঁচকেছে। অফিস ছাড়েনি উইলিয়াম! হয়তো ছেড়েছে, কিন্তু সারা অফিসে তিল তিল করে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে নিজেকে।

দু'একজন খোঁজখবরও করেছে। হাস-পাতালের ঠিকানা। দূর থেকে একবার না হয় দেখেই আসবে। বড় ভালো ছিল ছোকরা। মানুষের আপদে বিপদে বুক দিয়ে এসে পড়ত। দেখা করতে যাওয়া একবার উচিত বই কি। রোগটা যদি খারাপ না হত, তা হ'লে অনেকেই গিয়ে হাজির হত। বিছানার পাশে বসে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার বাণী আওড়াত। সবাই ছাপোষা মানুষ। ছেলেপুলে নিয়ে সংসার।

কোথা থেকে কি হয়ে যায় বলা যায় না। সর্বনেশে রোগ। নিঃশ্বাসে ভর করে আসে। তারই ঠেলায় সারাটা জীবন দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু আজকের ব্যাপারে নতুন করে শোক উথলে উঠল। এতদিন কাজ চালাচ্ছিল পান্নালাল বসাক। চটপটে ছোকরা। চলনে বলনে সরেশ। উইলিয়ামের মেশিন আর চেয়ার ছুঁলো না বটে, কিন্তু তার কাজ চালিয়ে গেল। বড়সায়েবের অবশ্য মনঃপূত নয়। স্পীড নেই পান্নালালের, প্রতি চিঠিতে গোটা তিনেক ভুল। একে দিয়ে চলবে না।

পান্নালাল মারমুখো। ভুল হয় না কার। মানুষ মাত্রেরই হয়। ইংরেজী প্রবাদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। আসল কথা তা নয়। নিজের জাতভাইকে পোষা। সধর্মীর প্রতি টান। পান্নালালকে স্পীড দেখাচ্ছে। সাত বছর তারকেশ্বর থেকে আটটা তেরোর গাড়ি ধরে অফিস করছে। ঝড় হোক, জল হোক, হাওড়া থেকে অফিস পেঁছিছে সাড়ে তেরো মিনিটে। তা নয়, তা নয়। পান্নালালের আফসোসের অন্ত নেই। সুন্দর মুখের দরকার। কোঁকড়ান চুল আর টানা চোখ। পমেড পাউডারের প্রলেপ। মিঠে মিঠে বুলি।

নন্দ ভালোমানুষ। ফাইল ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল, দশ বছরেও ফাইলের গণ্ডি পার হতে পারল না। এখনও একটা ফাইল খুঁজতে দিন তিনেক। তবে পরিশ্রমী লোক। ফাইলের প্রয়োজনে গুঁড়ি মেরে চেয়ারের তলায় ঢুকে পড়ে, মাঝে মাঝে আলমারির মাথায়। এতক্ষণ পান্নালালের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, এবার বললে, মেয়েছেলে চায় বুঝি?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। নন্দর কথার ধরনে পান্নালালের সারা গা রি রি ক'রে উঠল। বলল, তবে এতক্ষণ শুনছিলে কি?

শুধু নন্দ নয়, অফিসের সবাই শুনল। সেই জন্যই সকাল থেকে মেয়েছেলেদের ভিড়। ছাপা শাড়ি থেকে শুরু করে দামী সিফন। হরের রকমের স্কার্ট।

একদিনে শেষ হল না। জের চলল পরের দিন পর্যন্ত। বড় সায়েব নিজেই যাচাই করলেন। যাঁর জিনিস তাঁর দেখাই ভালো। একটা আধুলীও মানুষ দেখে-শুনে দশবার বাজিয়ে নেয়, আর এতো জলজ্যান্ত মেয়ে।

বাঙালী মেয়েরা পাত্তা পেল না। শিকে ছিঁড়ল একটি ফিরিঙ্গি মেয়ের বরাতে। আইভি স্টোন। এক মাথা কোঁকড়া চুল, শ্যামাঙ্গী। বেশভূষায় উগ্রতা কম। টানা দুটি চোখে বিষাদের ছিটে।

একেবারে কোণের দিকে উইলিয়ামের টেবিল আর মেশিন বসান ছিল, বেয়ারাকে বলে মেয়েটি সেগুলোই এগিয়ে নিয়ে এল। বড় মেশিন, কাজের সুবিধা হবে।

তা তো হবে, কিন্তু যন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে বীজাণু আস্তানা বেঁধেছে, আর একটা রুগ্ন পাঁজরের দূষিত নিঃশ্বাস ছড়ান চাবিগুলোর মধ্যে, তাও জানান দরকার মেয়েটিকে।

পান্নালাল কথা বলবে না। উচ্ছন্নে যাক অফিস, এসবের মধ্যে সে আর নেই। তাই পায়ে পায়ে নীলরতনবাবু এগিয়ে এলেন। বয়েস হয়েছে। ভূভাগের মতন তাঁর মাথার চুলও তিনভাগ পাকা, একভাগ কাঁচা। গালের মাংস কুচকে এসেছে। চেহারা সন্দেহ-উত্তীর্ণ। বুঝিয়ে বললেন আইভিকে। হোলি মাদার বলে সম্বোধন ক'রে রোগের ভয়াবহতার উল্লেখ করলেন। আইভি মন দিয়ে শুনল। তারপর কথা শেষ হতে ফিক ক'রে হেসে বলল, অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না বাবু। বরাতে যা থাকবে তাই হবে, তা বলে এমন মেশিনটা বরবাদ হয়ে পড়ে থাকবে? কথার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে মেশিনের চাবিগুলোর ওপর হাত বুললো, আলতো ছুঁলো রোলারটা। টাইপরাইটার নয়, কোলের ছেলেকে যেন আদর করছে এমনি ভাব।

নীলরতনবাবু সিটে ফিরে এলেন। ডিপার্টমেন্টের সবাই তেরীয়া। কি দরকার ছিল ওই উটকো মেয়েকে এসব কথা শোনাবার। ওরা কি বয়সের সম্মান রাখতে জানে। ওদের আবার বীজাণুর ভয়। এক এক হৃৎপিণ্ডে এক এক ডজন বীজাণু বাসা বেঁধে আছে। কুরে কুরে খাচ্ছে উপাস্থি আর মজ্জা। ফিরিঙ্গি মেয়েদের ব্যাপার পথে ঘাটে চোখ এড়ায় নি। ওর তো আর কিছু হবে না, এখন বড় সায়েবের বুকের পাঁজর থাকলে হয়! সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে চাকরি করতে এসে এখানে না ঘর সংসার পেতে বসে।

বাদলবাবু চিরকালই কথা কম বলেন। গাইয়ে বাজিয়ে লোক। সকলের কথা শুনে চোখ বুজে ব্লটিং প্যাডটা বাজিয়ে নিলেন, তবলা পিটনোর কায়দায়। সুর তুলে বললেন, সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!

যা ভাবা গিয়েছিল তার কিছুই নয়। আইভি স্টোন গম্ভীরভাবে চলাফেরা শুরু করল। এদিক ওদিক চাওয়া নয়, একটি বাজে কথা নয়। মাথা নিচু করে এক মনে চাবি টিপে যায় মেশিনের। হালকা হাতে। টাইপরাইটার নয়, যেন জলতরঙ্গ বাজনা। খেয়াল খুশিতে বাজিয়ে চলেছে। টিফিনের সময় সিট থেকে ওঠে না। বাইরের রেস্তরাঁয় তো নয়ই, বাড়ি থেকেও কিছু আনে না। চুপচাপ টেবিলে মাথা রেখে বসে থাকে।

কেরানিরা টিপ্পনী কাটে। ভাগ্য আইভির যে বাংলা বোঝে না, নয়তো এদের কথা কানে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। মুখ লুকোবার ঠাঁই পেত না।

রাগ পান্নালালেরই বেশী। টেবিলের ওপর পা তুলে শরীর দোলাতে দোলাতে বলে, খাবে কি গো, খরচ হয়ে যাবে যে। পয়সা বাঁচাচ্ছে। বিয়ের খরচ আছে তো। এতো আর আমাদের সমাজ নয়, যে মেয়ের কিছু দেখবার দরকার নেই, কেবল বেনারসী পরে গুটি গুটি পিঁড়িতে গিয়ে বসা, যত চিন্তা মেয়ের বাপের। স্বয়ংম্বরা হবার দোষ অনেক।

নীলরতনবাবু মাথা নাড়লেন, উঁহু, বিয়ে না আরো কিছু। ও মেয়েকে কে ঘরে তুলবে। ওই তো ছিরি। কঙ্কালের ওপর স্কার্ট জড়ান। যে রকমভাবে টেবিলের ওপর মাথা রেখে পড়ে থাকে, আমার তো ভয়ই হয়।

আশে পাশে টিফিন খেতে খেতে অনেক জোড়া চোখ নীলরতনবাবুর দিকে ফেরে। জানা কথা তবু স্পষ্ট শুনতে চায়। মনের অন্ধকার কোণে যে কথাটা লুকিয়ে আছে,

নীলরতনবাবুর খোঁচায় সেটা বাইরের আলোয় এসে দাঁড়াক।

—উইলিয়ামের রোগে আবার না ধরে। নীলরতনবাবু খুব আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন, কিন্তু তাতে ফল হল মারাত্মক। পাখার ব্লেডের শব্দ ছাড়া কারো নিঃশ্বাসের আওয়াজও শোনা গেল না। আশ্চর্য আর কি, তার টেবিল, চেয়ার, তার মেশিন,—তার রোগটা আসতে বাকি থাকবে নাকি?

ছোকরাদের মধ্যে দু একজন কথা বলবার চেষ্টা করেছে। লিফটের মুখোমুখি গুড মর্নিং, কিংবা সিঁড়ির চাতালে মুচকি হাসি। আইভি অভিবাদনের উত্তর দিয়েছে নরম গলায়, হাসির বেলা গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

একেবারে স্টেন তো স্টেনই। রস-কস নেই, কোন উচ্ছলতা নয়, এই বয়সেই জোর করে গাম্ভীর্যের বোরখা জড়িয়ে নিয়েছে। অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল কাজের, তার বেশী কিছু নয়। ছোকরাদের দল হতাশ হয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। দূর, দূরে, বড় সায়েবের যেমন পছন্দ। ভূভারতে আর স্টেনো পেলেন না। ট্রামে বাসে এই বয়সী মেয়েদের দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

তবু বাদলবাবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন। পাড়ার জলসা। বড় বড় গাইয়ে আসছেন, বরোদা গোয়ালিয়র থেকে বিখ্যাত তবলচী। রাগরাগিনীর মারপ্যাঁচ। উচ্চাঙ্গের ব্যাপার। অবশ্য সাধারণের মন-ভুলান ব্যবস্থাও আছে। তটিনী মল্লিকের ব্যাধ-নৃত্য, নাচের দমকে দর্শক ঘায়েল। আঙুলের মুদ্রার কারসাজিতে মানুষ পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। প্রায় হাতে পায়ে ধরে রাজি করান হয়েছে। এর ওপর পারুল বিশ্বাসের আধুনিক গান। 'শুধু তুমি লওগো আমারে' এই গানটাই গত বছরের জলসায় চারবার গাইতে হ'য়েছিল। তাতেও দর্শক তৃপ্ত নয়। স্টেজের ওপর চড়াও হ'য়েছিলো। ওই 'লওগো আমারে'র ঠেলায়। এ ছাড়া হাস্য-কৌতুকের অঢেল বন্দোবস্ত। প্রফেসর তামস ঘোষাল রয়েছেন পুরোভাগে। হাসির চোটে পিলে স্থানান্তরিত হয়, বাঁধান দাঁতের পাটি ছিটকে পড়ে বাইরে।

অফিসের অনেকেই টিকেট কিনল। নিতান্ত বয়স হয়েছে যাঁদের, তাঁরা ওই বয়সের অজুহাতেই এড়াবার চেষ্টা করলেন। যাবার ইচ্ছা খুবই, কিন্তু এ বয়সে রাত-জাগা পোষাবে না।

শেষকালে ছুটির মুখে বাদলবাবু আইভির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একমনে আইভি টাইপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি একটা ভুল হওয়ায় মেশিন থামিয়ে রবারের খোঁজ করতে গিয়েই থেমে গেল। বাদল-বাবু একেবারে পাশে।

খুব আস্তে আইভি জিজ্ঞাসা করল, প্রায় ফিসফিসিয়ে,—কিছু বলবেন?

তাড়া নেই, আপনি হাতের কাজটা শেষ করে নিন।

হাতের কাজ শেষ করতে মিনিট কয়েক। হাত দিয়ে চিঠিটা সরিয়ে আইভি আবার মুখ তুলে চাইল।

বাদলবাবু এগিয়ে এলেন টিকেটের গোছা হাতে নিয়ে। ব্যাপারটা মুখে বোঝাবার দরকার নেই। ছাপানো হ্যাণ্ডবিল রয়েছে। ইংরেজী বাংলা দু-ই আছে দু' পিঠে।

আলতো একবার চোখ বুলিয়েই আইভি হ্যাণ্ডবিল ফেরত দিল। চাপা গলায় বলল, আমায় মাপ করবেন।

কিন্তু অফিসের সবাই নিয়েছে। বাংলা

গান না বুঝলেও কোন অসুবিধা নেই, বৃন্দসংগীত রয়েছে, ভালো আর্টিস্টের নাচ।

এবারে আইভি মাথা নাড়ল। দাঁড়িয়ে উঠে টাইপ-করা চিঠিটা বড় সাহেবের ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, এসব বিলাসিতা করার আমার কোন উপায় নেই। আমাকে মাপ করতে হবে।

স্কার্টের দোলন, গোলাপী মোজা আর হিল-উঁচু জুতো। কাটা দরজার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতেই বাদলবাবু দাঁতে দাঁত ঘষলেন। একটা ভদ্রতাজ্ঞানও নেই। যা পাচ্ছে সবই জমাচ্ছে। দুটো টাকা দিয়ে টিকেট কিনলে বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। বিলাসিতা! যত সব ইয়ে।

বাদলবাবু ফিরে আসতেই গুঞ্জন। অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। কলিজা কি আর টেনে বড় করা যায়, বড় কলিজা নিয়ে জন্মাতে হয়। রোগে পাঁজরা ফোঁপরা করেছিল উইলিয়ামের, কিন্তু দিল চওড়া ছিল। দলবল নিয়ে হাওড়া ময়দানে হাজির, তিন-চারজনের টিকিটের দামই শুধু নয়, সার্কাস ভাঙতে সবাইকে সোডাও খাইয়েছিল। পিকনিক, খেলাধুলো সব বিষয়ে অগ্রণী। কি হ'ল বাদল, নীলরতনবাবু মুখ তুললেন, কোন হাটে জিনিস বিকোতে গিয়েছিলে?

আর দাদা, বাদলের গলায় বিরক্তির মিশেল, আমারই দোষ। ভেবেছিলাম এক-সংগে কাজ করছি এতদিন, একটা কথা হয়তো রাখবে।

অল্পবিস্তর সকলেই চটল। দুটো টাকার তো মামলা। একটা টিকেট কিনলে কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! তা নয়, বাঙালীর সংগে মিশতে নারাজ। সমাজে মাথা হেঁট হবে। হায়রে, তবু যদি রঙের চেকনাই থাকত। খাস বিলেতের আমদানী হ'ত।

অফিসের সবাই যে চটেছে, সেটা আচারে আচরণে প্রকাশই করে ফেলল। মুখোমুখি হলেও চোখ ফিরিয়ে নেওয়া, দেখেও না দেখা। চিঠির ফাইল আগে দু-একজন নিজে হাতে করে আইভির টেবিলে পৌঁছে দিত, কিন্তু আজকাল সব যায় বেয়ারার মারফত।

কিন্তু আইভি নির্বিকার। একমনে নিজের কাজ করে যায়। আগে যা-ওবা মুখ তুলে এদিক-ওদিক চাইত, কাজ করতে করতেই কথার টুকরো ছুঁড়ে দিত কাছাকাছি বসা লোকদের, আজকাল টুঁ শব্দটি নয়।

বাড়তি খবর আনল পান্নালাল বসাক। শনিবারের বাজার। নটা নাগাদ সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিল। ঠাস-বোঝাই, যেমন ট্রাম, তেমনি বাস। পায়চারি করে করে ক্লান্ত। ওরই মধ্যে একটুখানি দেখে একটা বাসে পা দিয়েই হতবাক। এগোবার উপায় নেই, পিছোবারও নয়। বাঁদিকের সিটে আইভি স্টেন। পাউডারের প্রলেপ নেই, উস্কোখুস্কো চুল, ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে-পড়া শরীর। দুটো হাত কোলের ওপর জড়ো করা। হাতল ধরে তাল সামলাতে সামলাতে বার কয়েক চেয়ে চেয়ে পান্নালাল দেখল। বাস বাঁক ঘুরতেই চোখাচোখি। আইভি এক অবাক কাণ্ড করল। চেপে সরে গেল ওপাশে, তারপর পান্নালালের দিকে চেয়ে বলল, বসুন।

দু'এক মিনিট। ব্যাপারটা বুঝতে পান্নালালের কিছু সময় নিল। অফিসে আইভিকে এড়িয়ে যায় পান্নালাল। সামনাসামনি পড়ে গেলেও পাশ কাটায়। পান্নালালের শনি। আজ আইভি না এলে পান্নালালের উন্নতি রোখে কে! ধাপে ধাপে উঠে মাস গেলে বাড়তি কয়েক মুঠো টাকা আসত পকেটে। যেন কানেই ঢোকে নি, এমন ভাব ক'রে পান্নালাল বাইরে চোখ ফেরাল।

কিন্তু তাতেই কি আর নিস্তার আছে। শার্টের কোনায় আলতো টান। মুখ ফেরাতে গলা আরো জোর। আশপাশের সহযাত্রীরা চেয়ে রইল ওর দিকে। হাফ-হাতা শার্ট-পরা এক ভদ্রলোক আনাড়ি হাসলেন, মেমসায়েব বসতে বলছেন আপনাকে।

শার্টের কোনায় আলতো টান

তাতো বলছেন। মেমসায়েব যে পথে বসিয়েছেন পান্নালালকে, সে খবর তো আর এরা রাখে না। পাশে বসিয়ে হয়তো পুরনো কথার জের টানবে। বড়সায়েব আইভির ওপর কত সন্তুষ্ট তারই ফিরিস্তি। এদিক-ওদিক থেকে কিছুটা খবর পান্নালালের কানে ঠিক এসেছে। বড়সায়েবের পারসোনাল কেরানি সোমেন রায়ের মারফত। বড়সায়েব একেবারে বিগলিত। পান্নালাল যে-সময়ের মধ্যে গোটা তিনেক

চিঠি শেষ করত, আইভি নাকি গোটা দশেক চিঠি নিয়ে আসে সেই সময়ে। শুধু বেশী চিঠিই নয়, নির্ভুলও। পান্নালালের মেলা বানাবার ভুলের ঝাড়াঝোপের ওপর বড়-সায়েবকে মুখ খুবড়ে পড়তে হত। অভিধান-বহির্ভূত সব বানান। কিন্তু আজকাল ঝকঝকে তকতকে ছাপা। শ্রী এসেছে চিঠির প্রতি ছত্রে।

তা হবে না কেন? পান্নালালের তো আর ঝাঁকড়া চুল নেই কাঁধ পর্যন্ত। এমন চোয়াল-ওঠা মুখে স্নো-পাউডারের প্রলেপও নয়। আস্তিন-ছেঁড়া শার্টে আর রঙিন ফুলতোলা স্কার্টে অনেক তফাত। শ্রী চিঠির ছাঁদে নয়, মানুষটার মনে। ব্যবসার পত্রও প্রেমপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু উপায় নেই, যা ব্যাপার। পান্না-লাল না বসলে বাসের লোকগুলো ধরেই হয়তো বসিয়ে দেবে। মেমসায়েবের পাশাপাশি।

খুব সাবধানে পান্নালাল বসে পড়ল। গায়ে গায়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি না হয়। কিন্তু উপায় নেই। বাসের ঝাঁকুনিতে অনেকবার পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি। ধুতির কোঁচা উড়ে স্কার্টের ওপর।

আইভিই কথা বলল, বেড়াতে বেরিয়ে-ছিলেন বুঝি?

পান্নালাল একটু আমতা করল, তারপর বলেই ফেলল কথাটা। সিনেমায় গিয়েছিলাম, ইভনিং শো। আপনি? পান্নালাল পাল্টা আক্রমণ করল, ক্লাবে নাকি?

ক্লাব? আইভি ম্লান হাসল। আঙুলের নখগুলো নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, না, ক্লাব নয়, রোজ বিকেলে টুইশান করতে হয় একটা।

—অফিসের পরে?

—হ্যাঁ।

—এই হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার মাস্টারি? কষ্ট হয় না?

—হয় বইকি বাবু, কিন্তু বাড়তি রোজ-গারের আশায় কষ্ট-দুঃখ সবই সইতে হয়।

আর কিছু বলল না পান্নালাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আইভিকে দেখল। হাতে ছেলেদের গ্রামার। আরো গোটা দুয়েক খাতাও রয়েছে। কিন্তু এতো কি দরকার বাড়তি রোজগারের। বাড়িতে আয়না নেই আইভির? সকাল বিকেল প্রসাধনের সময় দেখতে পায় না নিজের ছায়া? চোখের কোণে কালির পোঁচ, ফ্যাকাসে গায়ের রং। রুজ বুলিয়ে গালে রক্তের ছোপ আনার ব্যর্থ চেষ্টা। সৌন্দর্যের প্রীতিদানে অর্থ। নারী বদলে নরনু!

পান্নালাল নেমে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরবে না, বোনের বাড়ি রাস্তা থেকে যাবে।

বেশ রসিয়ে রসিয়ে পান্নালাল কথাগুলো বলল। হাত-মুখ নেড়ে। আশ্চর্য কাণ্ড! উঠতি বয়স। জীবন উপভোগ করার এই তো সময়। অথচ টাকা টাকা করে পাগল হবার জোগাড়।

—তুমি দেখো পান্নালাল। আমরা অনেক দেখেছি। নলিনরঞ্জনবাবু নস্য নিতে নিতে বললেন, টাকা কেউ যদি রোজগার করুক, তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই, কিন্তু সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানটুকুও তো থাকা উচিত। বাদলকে কি রকম অপমানটা করলে দেখলে তো?

দেখেনি আবার! খুব দেখেছে। অফিস-শুদ্ধ সবাই। বেয়ারাগুলো পর্যন্ত মুচকে মুচকে হেসেছে। টাকার দরকার নয় কার। সকলেরই ঘরসংসার আছে, কাচ্ছা বাচ্ছা আছে। মাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। কিন্তু তা বলে দয়া ধর্ম কে আবার বিসর্জন দেয়। তুলসীবাবুর সংসারে তো নেই-নেই লেগেই আছে। নিত্য অসুখ। এক জোড়া পরিবার, কাচ্ছা বাচ্চাও কম নয়। মাসের শেষ দিকে ভদ্রলোকের নাকের জলে, চোখের জলে হতে হয়। কিন্তু তাও তো তিনি বাদল-বাবুকে ফেরান নি। হাজার হোক, ত্রিশ দিন পাশাপাশি বসে কাজ করে, সুখ দুঃখ ভাগা-ভাগি ক'রে নেয়। চক্ষুলজ্জাও তো আছে মানুষের।

বাড়তি রোজগার। তা আবার লোককে ডেকে ডেকে শোনানো। সেদিন সাড়ে দশটা নাগাদ সকলের টনক নড়ল। কি ব্যাপার, দশটা বাজতে না বাজতেই যে অফিসে পৌঁছোয়, কাজ শুরু করে দেয় দশটা দশের মধ্যে, তার আসন খালি। পান্নালাল নিজের সিট ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরল কয়েকবার। উঁকি দিল বড়সায়েবের ঘরে। না, সেখানেও তো নেই। কি ব্যাপার!

ব্যাপার সঠিক জানার আগেই পান্নালালের বড় সায়েবের ঘরে ডাক পড়ল। নোট বই নিয়ে পান্নালাল ছুটল। গোটা তিনেক চিঠি, একটা স্টেটমেন্ট তারপর। বড়সায়েব থামলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপ ধরাতে ধরাতে, বললেন, আইভি স্টোন আসে নি আজ?

পান্নালাল বসাক থতমত। আইভি স্টোনের আসা যাওয়ার খবর কি পান্নালালের রাখার কথা! এক বাড়িতে থাকে দুজনে, না এক ট্রামে বাড়িতে আসা যাওয়া করে?

পান্নালাল বাড়িয়ে উঠতে উঠতে বলল, আসেন নি বোধ হয়। সিটে তো দেখতে

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শিল্পী শ্রীরামকিংকর

…ড়সায়েব চেয়ার ঘোরালেন। এক মুখ …য়া ছেড়ে বললেন, হুঁ। কিন্তু পান্না-…রের ধোঁয়া কাটল না।

…বাইরেও ওই এক কথা।

…কি ব্যাপার পান্নালাল? তোমার যে ডাক …ল?

…মধু অভাবে গুড়, শাস্ত্রে বিধি আছে। …জের মেশিনের সামনে বসতে বসতে …ন্নালাল বলল।

…সায়েব কি বললেন?

…কি আর বলবেন, খুব মনমরা। আইভির …র আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। বিরক্ত হ'য়ে …ল পান্নালাল। একে বড়সায়েবের নোট …ওয়া অভ্যাস নেই মাস আষ্টেক, তারপর …রিবাটাল' কথাটায় জোড়া 'টি' না একটা, …ও মনে পড়ছে না। আবার চেম্বার্স খুলে …লিয়ে নিতে হবে। কামাইটা করবার আর …ন পেল না মেমসায়েব। সোমবার কাজের …র, দিন বুঝে ঠিক ডুব।

…আর একজন কি একটা জিজ্ঞাসা করতেই …ন্নালাল তেতে লাল, কি মুশকিল। মেম-…য়েব আসে নি, আমি তার কি করব। …মাদের ব্যথায় যে বুক টন টন ক'রে …ঠছে।

…বাদলবাবু যেন তৈরিই ছিলেন। সুপারি-…টেণ্ডেণ্টের কান বাঁচিয়ে মিহি সুর ধরলেন, …মার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে।

পরের দিনও তাই। সাড়ে দশটা, পৌনে …গারোটা। আইভি স্টোনের দেখা নেই। …গারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে বড়সায়েব …ন্নালালকে ডাকলেন। জরুরী চিঠি। আর …রি করলে মেল ধরতে পারবে না।

…কোন খোঁজ-খবর নয়, চিঠিপত্রও না। …জে অসুস্থ, কাউকে দিয়ে খবর পাঠালেই …য়। জ্ঞাত-গোষ্ঠীর তো অভাব নেই। ওই …সের মেয়ে একবার মুখের কথা খসালে …াড়াসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে এসে হাজির হবে। …ফিসের একটা নিয়ম-কানুন আছে বই কি। …টির দরখাস্ত নয়, জ্বরজারির সংবাদ নয়, …ফিস অমনি কামাই করলেই হল।

পান্নালালের প্রাণান্ত। একবার বড়-…য়েবের ঘর, একবার সেক্রেটারীর। তাঁতের …কুর মতন টানা পোড়েন। প্রাণ কণ্ঠাগত …হলেই, এবার ওষ্ঠাগত। খিঁচিয়ে উঠল, …ই হ'ত আমাদের বেলা। দেখতেন বড়সায়েব …ন্যে হ'য়ে বাড়িতেই বোধ হয় লোক …াঠাতেন। কিন্তু এখন একেবারে চুপচাপ। কিন্তু জলজ্যান্ত মেয়েটা গেল কোথায় হে? তুলসীবাবু ডেসপ্যাচার হরিহর-বাবুর দিকে চোখ ফেরালেন।

হরিহর চিঠি ওজন করছিল, বাটখারা নামিয়ে বলল, ওরকমভাবে আমার দিকে চাইবেন না দাদা। এমন করছেন যেন আমিই লুকিয়ে রেখেছি বাড়িতে। বদনাম একটা দিলেই হল। একে তো চিঠির ঠিকানা অদল-বদলের গোলমাল রয়েইছে।

নীলরতনবাবু চশমা পরিষ্কার করতে করতে একবার চারদিক দেখে নিলেন, তার-পর বললেন, দেখো কোথায় বুঝি আবার বাড়তি রোজগার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও মাস আট নয়েকের সংসার। এখানে একটা খবর দেওয়া তো উচিত রে বাপু।

টাইপের জোর আওয়াজ, কিন্তু নীল-রতনবাবুর কথাগুলো ঠিক পান্নালালের কানে গিয়েছিল। মেশিন থামিয়ে পান্নালাল কপালে হাত চাপড়াল সজোরে। মাথা নেড়ে বলল, হুঁ, সে কি আর হবে! তা হ'লে পান্নালাল বসাকের ভালো হবে যে? বৃশ্চিক রাশি, সাত বছরের মধ্যে কোষ্ঠীতে ভালো কিছু নেই।

সব দুশ্চিন্তার অবসান হ'ল পরের দিন। দশটা দশের মধ্যে আইভি অফিসে ঢুকল।

আইভিই তো, কিন্তু একি সাজ। কালো পোশাক, মোজা, স্কার্ট থেকে শুরু করে মাথার টুপিটা পর্যন্ত মিশকালো। দুদিন অফিসে আসেনি, সারা দিনরাত বুঝি কেঁদেছে বসে বসে। এখনও অশ্রুর দাগ মিলোয় নি। দুটো চোখ লাল, মেঘ-থমথম মুখ, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পান্নালাল বড় সাহেবের ঘরে ছিল, আইভি ঢুকতেই বেরিয়ে এল।

কেউ যে মারা গেছে সেটা আইভির পোশাকেই প্রকট। খুব আপনজন কেউ। কদিনেও চোখের জল শেষ হয়নি, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বড়সায়েবের সামনেও আইভি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মিনিট দশেক। তারপরই আইভি বাইরে এল। নিজের সিটে বসে মেশিনের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কান্না।

এবারেও সাহস করে নীলরতনবাবুই এগিয়ে গেলেন। খুব আস্তে। চোখের সামনে এভাবে কাঁদবে মেয়েটি, সান্ত্বনা দেওয়াও তো দরকার, হাল্কা আশ্বাসবাণী।

মানুষ চিরদিনের নয়, নীলরতনবাবুর গলায় পাদরির কথার ছোঁয়াচ। শোক করলে মৃত লোক কি ফিরে আসে?

আইভি চোখ তুললে। চোখের জলে সারা মুখ ভিজে একাকার। কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

নীলরতনবাবুও বিচলিত হয়ে পড়লেন। কে এমন সরে গেল আইভির জীবন থেকে!

এধার ওধার থেকে আরো দু-একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আহা, মানুষের বিপদের সময় পিছিয়ে থাকা কখন যায়। ধর্মই না হয় আলাদা, কিন্তু দুঃখবোধের চেতনা তো এক। কান্নার কোন জাত নেই।

—কাকে হারিয়েছেন আপনি? নীল-রতনবাবু একটু ঝুঁকে পড়লেন। মেয়েটি আবার মুখ তুলল। হাত দিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বললো, বিলকে! আপনাদের উইলিয়ম ব্যারন বিশ্বাসকে।

বেশ সময় নিল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে। যা সম্ভব সব করেছি, শেষ পাইটি পর্যন্ত পাঠিয়েছি মাদ্রাজের স্যানাটোরিয়মে। নিজের দিকে চাইনি, কোলের বাচ্ছার দিকেও নয়। কিন্তু একি রোগ! সব দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আইভি কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

খুব অস্পষ্ট প্রথমে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গাঢ় কুয়াসা জমার মতন, তারপর ঘোর কেটে গেল। অস্বচ্ছ কিছু নয়, সব পরিষ্কার। স্বামীর চাকরি পাবার আশায় স্বামীর পদবীও অস্বীকার করেছে আইভি, কি জানি যদি বীজাণুর ভয়ে আইভিকে নিতে অফিসের কর্মকর্তারা রাজী না হন। শুধু কি পদবী! নিজেকেও তো অস্বীকার করেছে, জীবনকে, যৌবনকেও।

কিন্তু সব দিয়েও তো মানুষটাকে আইভি আটকাতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীলরতনবাবু সেই কথাই ভাবলেন। মানুষটাকেই যদি বাঁচাতে পারল না আইভি, তবে নিজের পরিচয়ই বা দিতে গেল কেন। কর্মকর্তারা এখনও তো বীজাণুর ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এখনি নোটিস পাবে আইভি! এ অফিসে তাকে রাখা চলবে না এই মর্মে ছোট্ট এক চিঠি, বড়সায়েবের দস্তখত করা।

সে কথাটা আইভিরও বোধ হয় অজানা নয়। এত চোখের জলের সবটাই কি উইলিয়াম ব্যারন বিশ্বাসের শোকে, তাকে হারানোর জন্য; কিছুটাও কি অনুশোচনার নয়। দুর্বল মুহূর্তে পরিচয়-স্বীকৃতির অনুশোচনা! স্বামীর শোক আর চাকরির শোক দুয়ের মিশেল।

এখনো অনেক দেরি—
তুফানে কামান দেগে লাফ দিয়ে চাঁদ উঠবার ঃ
রি-রি করে পোকা ডাকে, তারামাখা বালি জ্বলে, সাগর আঁধার।
নুন-নুন বালি আর নুনের মতন তারা, সব কিছু লোনা—
সাধ হয় কথা বলি, তবু কে বলেছে যেন—বলো না, বলো না।
ভীষণ গরম রাত. এতটুকু হাওয়া নেই, শুধু হাঁপ ধরে—
ছুটে গিয়ে একবার ডুব দিয়ে আসব কি শীতল সাগরে!
তারাদেরো অনেকেই চুপচাপ ফেলে দিল মেঘের মশারি ঃ
বদল করছে কেউ বারবার জরিদার, বুটিদার শাড়ি।

ঘুম নেই, বুজি চোখ, ঘুম নেই, কিছুতেই ঘুম আসছে না—
পাশের ঘরের যিনি, সকালেই তাঁর সাথে হয়েছে ত চেনা!
ছিপছিপে. ছিমছাম, বাতি-বাতি দোহারা গড়ন
—মনে হল ঃ বেশ খোলা, শান-দেওয়া সচেতন মন;
ঘাসের ডাঁটার মত অপরূপ, তুলি-আঁকা সরল চেহারা—
কান-ছোঁওয়া দুই চোখ, জ্বলজ্বলে বড় বড় তারা;
পাতা দুটি একটু বা বেশীই দিঘল ঃ
ভুল হয়—ঢলে বুঝি পড়বেই জল,
তিলের ফুলের মত নাক;
চিবুকে একটি তিল—বিধাতার খুশি বুঝি—পুরোই মানাক—
কপালেও গুঁড়ো চুল, ভিড় যেন কুচি-কুচি করুণ কমা-র ঃ
পুরোনাম শুনিনিক'—দরজায় শুধু লেখা ঃ মিসেস কুমার।

শহরের ইটকাঠ, সংসার-সমাজের নানা বেড়াজাল
কোনোমতে ছিঁড়েখুঁড়ে সবে তিনি এসেছেন কাল।

বছরে দিনেক একবার
বড় সাধ বরাবর ছুটে এই পুরীতে আসার;
অসীম আকাশ আর সীমাহীন সাগরের এই কানাকানি—
এ তাঁর ধ্যানের রাজধানী।

কি আর খারাপ লাগে!
এখন তাই ত তিনি নিয়মিত একলা আসেন—
কুমারের ভরসায় থেকে থেকে ক বছর খুব ঠকেছেন।
বেশী উঁচু চাকরির, সবিশেষ সরকারী, সরকারী সচিবের
ঠিক যেটা হয় ঃ
ফাইলের পিরামিড পৃথিবী আড়াল করে,
চুরি করে চিরদিন ছুটির সময়—

বালকের মত এক অসহায় মুখ করে—;
গোছগাছ সারা হলে—
সচিব তাকান ঃ
একটা ফাইলে সে যে কি-প্রলয় হতে পারে
সে কথা বোঝান;
ক্ষমা চান সেইবার, শুধু সেই সেইবার, সেবারের মত।
সেবার 'এবার' আর হল না কখনো
দিনে দিনে পুরী দূরে সরেছে নিয়ত।

"যা হোক আলাপ হল, পাশাপাশি দিনকয় থাকব দুজন—
যখনি একাকী আর বড় বেশী ফাঁকা লাগে মন
আসবেন, ডাকবেন যে-কোন সময়;

আমি চাই আকাশ কোনমতে পীড়িত না হয়
সাগরে বেড়াতে এসে;—
সাগরে বেড়াতে এসে
হতে হয় অবিকল সাগরের পাখি
একেবারে খোলামেলা ডানা—
না হলে ত লাল-নীল মেনে নানা মানা
নগরেরি কোলাহলে বেশ সুখে থাকি।—"

বেশ ভালো লেগেছিল জলের মতন সেই ঝকঝকে হৃদয়ের সুর।
মানুষের মনোভাব কখনো কখনো হয় এমন মধুর ঃ
ছোট-ছোট, কুচি-কুচি, ছায়া-ছায়া কথা
তা দিয়েই গড়ে ওঠে কখন দেবতা;
কথার এমন গূঢ় স্বাদ—
নিমেষে ঘনায় ঘন গহন বিষাদ
অথবা সে নীলাকাশে ওঠে মধুচাঁদ!

কাগজ-রেডিয়ো সেরে, শেষ করে আরো কিছু কফি ও পরোটা
যখন খেয়াল হল; কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বেলা এগারটা—
কানে এল কোলাহল, নুন-মাখা নুনিয়ার চড়া হাঁকডাক
সাগর-শিকার করে যারা ফেরে ঘরে—
ধোঁয়াটে আকাশে শুধু ছেঁড়া-ছেঁড়া গুটিকয় সারসের ঝাঁক,
মানুষেরো ভিড় কমে এসেছে সাগরে।

ভিড় কমে মানুষের,
তুফানেরো দাপাদাপি কমে এলে বিজনবেলায়—
কেবল শামুক হাঁটে, ঝিনুকেরা ছবি আঁকে, দুপুরও ত যায়।
আবার সে হাই-তোলা অলস বিকেল
আবার চায়ের বেলা, পেয়ালার টুঙটাঙ-এ মুখর হোটেল ঃ
কেউ খোঁজে দিনশেষ 'মেল';

নানা রঙ, নানা সুর, নানা কথা গোল হয়ে মাঠে আর ঘরে—
কথায় কথায় কবে আমাদেরো দুজনের কথা এসে পড়ে ঃ
সকল কথার সার, আমরাই খাঁটি কথা, বিশেষ বিষয়—
সাগরে সাঁতার আর মুখোমুখি বসে খাওয়া, দুটোর সময়
ঝাউয়ের বনের দিকে খেয়ালী বেড়াতে যাওয়া
ঝাঁ-ঝাঁ-করা রোদে—
যা আসে না সকলের সাধারণ বোধে।

'সবার থাকে কি বোধ! সকলেরি মন নয় জলের মতন—
জলেও শ্যাওলা থাকে—শ্যাওলার মত হয় কারো কারো মন।
জড়িয়ে জড়িয়ে যারা গেরো দিয়ে শুধু বাঁধে জট ঃ
খড়ের মতন যারা মনে করে দেখতেও হবে বুঝি বট—
কপাট-ভেজানো হাসে, বিশেষ কপট;—"

তাদের করুণা করে, একটু করুণ হেসে মিসেস কুমার
সন্ধের আঁধারে তবু আমারেই ডাক দিয়ে পাঠান ওবার
সাগর-রঙের নীল বাতি-জ্বালা তাঁর সেই নিরিবিলি ঘরে—
সময় কাটাতে কিছু আধুনিক ভালো লেখা পড়ে
নতুন তরুণ কবিদের—
চিনির দানার মত মিহি আর ঝরঝরে লিরিক যাদের।

লিরিকের পূজারিণী এমন পাঠিকা আর দেখেছি কজন।
কবিতার থেকে সে ত সবাই তফাতে হাঁটে হাজার যোজন।
কবিতার থেকে যেন ঢের বেশী নিরাপদ হায়না কি বাঘ—
গীটারের চেয়ে কেউ বরং কানের কাছে দামামা বাজাক
—তাও বুঝি মনোরম, সে-ও অনুপম।
মানুষের মন থেকে গলে গেছে সবটুকু করুণার মোম।

হঠাৎ বয়ের ডাকে ডিনারের আয়োজনে হলে পর হুঁশ—
ফুঁয়েতে উড়িয়ে দিয়ে ফিনফিনে ভাবনার জাপানী ফানুস
এগারোটা বাজে দেখে শুভরাত তাড়াতাড়ি জানাতেই হয়।
শুভরাত! হায় রাত, রাতটুকু কেন দিন নয়!
জানালার সাদা কাঁচে সে কথাই লেখে খর তারার আকাশ ঃ
জলে জ্বালে মণিদীপ
মুঠো-মুঠো যে-ফসফরাস—
সেদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে একভাবেঃ
কে ভেবেছে এ রকম অহেতুক ঘুম যে পালাবে।

ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝরে ঝাঁ-ঝাঁ,
টগবগে ফোটা রাত,
মিনমিনে ঘাম—
হাওয়া চুপ করে গেছে—পরে বুঝলাম ঃ
কি যে করি, কি করি বা——
না হয় খানিক গিয়ে ছাদে বসা যাক!
তারপরই মনে হল ঃ কি হবে বা—থাক!
যখন একাকী আর লাগছেই এ রকম, এত ফাঁকা-ফাঁকা ঃ
'সাগরে বেড়াতে এসে'—মনে পড়ে—'হতে হয় সাগর-বলাকা'—
তাহলে খানিক যাই, আঁধার সৈকতময় করি পায়চারি ঃ
মিসেসকে ডাক দিই, তাঁকেও ত অনায়াসে সাথী পেতে পারি!

পেতে পারি। পারো পেতে?
চাইতেই অনায়াসে সব পাওয়া যায়?
সবিশেষ একবার মহিলার কাছ হতে চেয়ে নিলে ঘুমের বিদায়—
যতই বলুন তিনি ঃ
"যখনি খারাপ লাগে—
আসবেন, দ্বিধাহীন ডাকবেন আর—"
তবু তার মানে নয় কখনোই এত ঘন নিশীথ আঁধার।
যতই সহজ হোন, যতই সরল হোন, মহৎ-উদার ঃ
পুরনারী না হলেও, নারীর স্বভাবে পুরো নারী—
রাতে নারী মনেতেও পরে কালো শাড়ি,
সকল কথার পর তবু আরো কিছু কথা রাখে ঠিক বাকি—
ঘরে এসে উড়ে গেল কিছুক্ষণ নিভে-জ্বলে একটি জোনাকি।

হঠাৎ বাতির খোঁজে, টেবিল হাতড়াতে হাত করে চিনচিন ঃ
আঙুলে ফুটেছে এক ছুঁচ না কি পিন—
পিন-ফোটা ব্যথা সে-ই বুকেরো ভেতর যেন করে খচখচ ঃ
যেন কোন কোহিনুর অহেতুক ভেঙেচুরে হল তচনচ ঃ
কিছুতে না-পোষাবে যে-ক্ষতির খরচ
কোনমতে, কোনদিন;
ফিরেও পাব না আর
এ জীবনে যারে—
যতই খুঁজি না কেন সারাবেলা ধরে এই সাগরকিনারে।

রামপ্রসাদ সেন

প্রবোধচন্দ্র সেন

শভক্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের অন্তরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে,
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।

বস্তুত একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের রচনায় বাংলা দেশের প্রাণের কথা যেমন গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অধুনাপূর্বকালে আর কারও রচনায় তেমনভাবে পায়নি। অথচ দুইজনের মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন দীর্ঘ, তাঁদের রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্যও তেমনি গভীর। চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ; তাঁর রচনা চৈতন্যদেবের (১৪৮৫—১৫৩৩) খুব প্রিয় ছিল। রামপ্রসাদ (আনুমানিক ১৭২০—১৭৭৫) আবির্ভূত হয়েছিলেন মোগল আমলের শেষ দিকে এবং তাঁর তিরোভাব ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে ওআরেন হেস্টিংসের শাসনকালে। চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব, রাধাকৃষ্ণের ভক্ত; আর রামপ্রসাদ শাক্ত, কালীর উপাসক। চণ্ডীদাস প্রেমিক এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রূপান্তরিত করে সে প্রেমকে ধর্মের ভাবলোকে স্থাপিত করেছেন। রামপ্রসাদ ভক্ত, তাঁর ভগবদ্‌ভক্তি মাতৃভক্তির বহু বিচিত্র ভাবের মধ্যে নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নরনারীর প্রেম-সম্পর্ককে তিনি ভগবদ্‌-উপলব্ধির উপায়রূপে স্বীকার করেননি; মাতাপুত্রের স্নেহ-সম্পর্কই তাঁর সাধক জীবনের প্রধান অবলম্বন। অথচ উভয়েই এই দুই বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে বাংলা দেশের গভীরতম অনুভূতিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ দান করেছেন। বস্তুত এই দুই কবি বাঙালীর হৃদয়কে যেমন একান্তভাবে অধিকার করেছেন, প্রাচীনকালের আর কোন কবি তা পারেননি। বাংলার জনস্মৃতিতে এই দুই কবির জীবন যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, আর কোন কবি সম্বন্ধেই তা হয়নি। ফলে এই দুই কবি সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতির উদ্ভব হয়েছে, যেমন হয়েছে ভারতের মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে। জনশ্রুতির এই বাহুল্য জনহৃদয়ের অনুরাগেরই পরিচায়ক। বাংলার অন্যান্য বড় কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে জনশ্রুতির এমন আধিক্য দেখা যায় না।

চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ উভয়েই স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের গানের জন্য। শুধু গান নয়, তাঁরা দুজনেই বড় কাব্যও রচনা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বড় কাব্যগুলির কোনটাই খ্যাতি লাভ করতে পারেনি। চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামক বড় কাব্যটি তো বাঙালীর মন থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং কালে এ কাব্যটির একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের ঔৎসুক্যতৃপ্তির বিষয় হয়ে রয়েছে; সাহিত্য-রসিকদের হৃদয়-আকর্ষণ করতে পারেনি বললেই হয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিও পাঠকসমাজের অনাদরের মধ্যেই তলিয়ে গেছে। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের পাশেই রামপ্রসাদের স্থান। গানের জাদুমন্ত্রে এঁরা বাংলার মনকে চিরকালের মতই হরণ করে নিয়েছেন। সে গানের জাদুক্রিয়ার প্রভাব দীর্ঘকালের ব্যবধানেও আজ পর্যন্ত কিছুমাত্র নিষ্ক্রিয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মত মহামনস্বী কবিও এই দুই গীতিকারের মোহন প্রভাবকে সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন। আরও একটি বিষয়ে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনই দুটি যুগের প্রবর্তক বলা যায়। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে চণ্ডীদাস যে প্রেম-সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত করেন, তাঁর পরে দীর্ঘকাল ধরে সে রীতির অনুবর্তন চলল বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে। শ্যামাসঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের অনুবর্তনকারীর সংখ্যা বা জনপ্রিয়তাও কম নয়।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা দেশে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাঁদের সকলের উপরে দুটিমাত্র নাম উজ্জ্বলবর্ণে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ। দুইজনই ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা সাহিত্যরসিক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়কবি। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে "রায় গুণাকর" এবং রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু দুইজনের কবি-প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। ভারতচন্দ্র ছিলেন সভাকবি, রাজসভার মর্যাদা রক্ষার উপযোগী অভিজাত শ্রেণীর মহাকাব্যের তিনি রচয়িতা, অলংকৃত ভাষার অজস্র প্রসাধনে ও বিচিত্র ছন্দোঝংকার সৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ভাবকেও আশ্চর্যভাবে জনমনোরম করে তুলেছেন এবং এই কারুদক্ষতার দ্বারাই তিনি অন্নদামঙ্গলকাব্যকে বর্তমানের খেয়া পার করে ভাবীকালের তীরে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের মত জাত সভাকবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। তৎকালীন উচ্চাঙ্গের শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অধিকারেরও প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্রের অনুবর্তনে তিনি একখানি বড় কাব্যও লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর কালিকামঙ্গল (নামান্তর বিদ্যাসুন্দর) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে তুলনীয় হবারও অধিকারী নয়। ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি রচনায় মুক্তকণ্ঠ। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে নীরব; তাঁর কৃতজ্ঞতা আন্তরিক, কৃতজ্ঞতাকে তিনি মুখরতার মধ্যে পর্যবসিত হতে দেন নি। তাঁর সমস্ত বাণীকে তিনি উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে।

কিন্তু যথার্থ কবিত্ব-সম্পদে এবং হৃদয় থেকে স্বতঃউৎসারিত সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র তাঁর পাশেও দাঁড়াতে পারেন না। চণ্ডীদাসের সময় থেকে তিন শ বছর ধরে বাংলা দেশে যে অজস্র সঙ্গীতের বন্যা বয়ে চলেছিল, ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে কোন দিক দিয়েই রামপ্রসাদ তার অনুবর্তন করেননি; বিষয়বস্তুতে প্রকাশ-ভঙ্গিতে ভাষায় ছন্দে অলঙ্কারে তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক ধারার প্রবর্তন করেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এসব বিষয়ে রামপ্রসাদ কোন পূর্বগামীর

বর্তী কালে রামমোহন যে ধর্মবিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিলেন, তার অরুণাভাস দেখতে পাই রামপ্রসাদের রচনাতেই। কর্মের ক্ষেত্রে যে প্রেরণার অভাব দেখি রামপ্রসাদী গানে, ধর্মের ক্ষেত্রে সেই প্রেরণারই প্রাথমিক আবেগস্পন্দন অনুভব করি সেই গানেরই সুরে ও ছন্দে। সেই প্রেরণার মধ্যেই রয়েছে যুগান্তরের ও ধর্মবিপ্লবের পূর্বাভাস।

আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে,
পদে গয়া গঙ্গা কাশী॥

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী?...
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি
পাবে কাশী দিবানিশি॥

পুণ্য বা মুক্তিলাভের আশায় তীর্থ-যাত্রার নিরর্থকতা সম্বন্ধে এই যে সরল ও স্বাভাবিক প্রত্যক্ষানুভূতি, এটাই ভাবী-কালে বাংলার ধর্মচিন্তায় যুগান্তরের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করে রাখছিল। শুধু তীর্থযাত্রা নয়, মূর্তিপূজা সম্বন্ধেও রামপ্রসাদের মন ছিল মোহমুক্ত। তার নিদর্শন পাই বহু রচনায়।

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে?
মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥...
অশিবনাশিনী কালী,
সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি
প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন
করতে চাও তার উপাসনা।...
জগৎকে পালিছেন যে মা,
পশু পক্ষী কীট নানা।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা?

মন, তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥...
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥...
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি তোর বলিদানে?
তুমি জয় কালী, জয় কালী, বলে
বলি দাও ষড় রিপুগণে॥

এই যে মূর্তিপূজা পশুবলি প্রভৃতি স্থূল উপাসনার বিরুদ্ধে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির প্রকাশ, তা-ই মানুষের মনকে একটা নূতন আদর্শ ও নূতন চেতনার জন্যে উন্মুখ করে তুলেছিল। এই তো গেল ধর্মগত নৈতিক দিক, এহ বাহ্যের দিক। তার অয়মিতি বা সম্মতির দিক কোনটা তাও দেখা দরকার।

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।...
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি
উভয়কে মাথে ধরেছি
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

'ভজন পূজন সাধন আরাধনা, সমস্ত থাব পড়ে' এই আদর্শকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করা তখনকার দিনে সত্যি অপ্রত্যাশিত; ভাবী যুগের অগ্রদূতের পক্ষেই এটা সম্ভব।

এসব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা,
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা।...
প্রসাদ বলে থাকো বসে
ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা
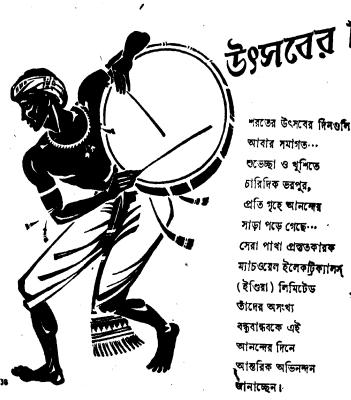
রবীন্দ্রনাথ কালীর কথা বলেননি, কিন্তু টরাজের নৃত্যের তালের সঙ্গে তাল রক্ষার থা আছে তাঁর বাণীতে। আর আছে—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে॥

বিশ্বজীবনের ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ন্দ যখন মিলে যায়, তখন 'ধর্মাধর্ম' বা ভজন পূজন সাধন-আরাধনা' কিছুই থাকে া, তখন সমস্ত জীবনযাত্রাটাই হয়ে ওঠে বিশ্বদেবতার আরাধনা। তাই রামপ্রসাদ লেন—

শোন্‌রে মন তোরে বলি,
ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান,
নিদ্রায় মাকে কর ধ্যান,
ওরে নগরে ফির মনে কর
প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মা-রে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে,
ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দিই শ্যামা মা-রে॥

অর্থাৎ রামপ্রসাদ জীবনকেই পূজারূপে গ্রহণ করেছিলেন। যিনি জীবনকে পূজার পর্যায়ে তুলতে পারেন তাঁকেই তো বলতে হয় সাধক। বস্তুত রামপ্রসাদের মধ্যে তাঁর জীবন, ধর্ম ও গান এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনোই আমাদের ধর্ম হয়ে ওঠে না।... র্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।' 'প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মূল্যগৌরব তত্ত্ব। নটীর পূজা নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধকে নটী অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল, সে তার [illegible]। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল, [illegible] ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য; নটী [illegible] তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত [illegible]। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য [illegible] প্রমাণ করেছে।'

[illegible] যে জীবন-পূজার আদর্শ, বাংলার [illegible]দের মধ্যেও তার নিদর্শন আছে। [illegible] মধ্যেও জীবন-রচনা, গান-রচনা ও [illegible]ধনা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

করিস মানা ওগো বন্ধু,
মানি এমন সাধ্য নাই।...
[illegible] ফুলের নামাজ রং-বাহারে,
[illegible] গন্ধে নামাজ অন্ধকারে,
[illegible] বীণার নামাজ তারে তারে,
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই॥
—মদন বাউল

রামপ্রসাদও আরাধ্য দেবতাকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর অন্তরের ভক্তি-উৎসারিত গানকে এবং সমস্ত জীবন দিয়ে এই সত্যেরই যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এই আত্মনিবেদনের শক্তিতেই তিনি শান্তচিত্তে দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পেরেছেন, বলতে পেরেছেন, 'আমি করি দুখের বড়াই', 'শমন, কি ভয় দেখাও আসি'। এই আত্মনিবেদনের আবেগই তাঁর ভক্তি-সংগীতের উৎসধারায় উৎসারিত করেছে হৃদয়ের সত্য-উপলব্ধিকে।

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ
তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে
তিমিরে তিমিরহরা॥

বিশ্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম-উপলব্ধি, মূর্তিপূজা ও বাহ্য অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা প্রভৃতি যে-সব তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাই রামপ্রসাদের রচনায়, তিনিই যে সে-সবের প্রথম উদ্‌ভাবয়িতা তা নয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে সেগুলি দীর্ঘকাল ধরেই সুপরিচিত ছিল। রামপ্রসাদের কৃতিত্ব এই যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সে-সব তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং দরদঢালা গানের ভাষায় ও সুরে ব্যাপকভাবে দেশের হৃদয়ের কাছে নিবেদন করেছিলেন। এই হিসাবে তিনি পশ্চিমের কবীর দাদু এবং বাংলার বাউল প্রভৃতি কবি-সাধকদের সমগোত্র। তাঁর গানকে আশ্রয় করে এসব নিত্যসত্য দেশের চিত্তে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ভাবী যুগের ভূমিকা রচনা করেছিল বলেই পরবর্তীকালে রামমোহনের শাস্ত্রাশ্রিত ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টা অনেকাংশে সহজসাধ্য হয়েছিল। রামপ্রসাদের গানের কল্যাণে মানুষের মন সর্বময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার জন্যে বহু পরিমাণেই প্রস্তুত হয়েছিল। এই হিসাবে রামপ্রসাদকে রামমোহন-প্রবর্তিত আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায়, যদিও তাঁর মনে ধর্মসংস্কারের কিছুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর আত্মগত সাধন-সংস্কারই রামমোহনের সমষ্টিগত ধর্ম-সংস্কারের আনুকূল্য করেছিল।

আর এক হিসাবেও [illegible] যুগের অগ্রদূত বলা [illegible] সাধক ছিলেন না, তিনি [illegible] তাঁর রচনায় বহু স্থানেই খুব উঁচু স্তরের কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কবিত্বের বিচারেও শাক্তসাধক রামপ্রসাদকে বাংলার বাউল সাধকদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। আধুনিক কালে গীতিকবিতার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে, তারই পূর্বাভাস পাই রামপ্রসাদের গীতাবলীতে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অবশ্য গীতিকবিতার ভাব ও রূপ খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ওই গীতি-কবিতায় কবি-হৃদয়ের অনুভূতি প্রত্যক্ষ প্রকাশের সুযোগ পায়নি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে অনুভূতি ছিল প্রচ্ছন্ন, তার বৈচিত্র্যবিকাশের পথও ছিল অবরুদ্ধ। রামপ্রসাদের গানেই কবিচিত্তের প্রত্যক্ষ প্রকাশের প্রথম পরিচয় পাই। তাতে কবির বেদনাকে পরের জবানিতে প্রকাশ করা হয়নি এবং তাকে গতানুগতিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে স্বচ্ছন্দভাবে ও বহু বিচিত্র রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রগত বা সাহিত্যিক ঐতিহ্যগত কোনো বন্ধন তাতে নেই। রামপ্রসাদের গানে কবির মুক্ত হৃদয়ের মুক্ত প্রকাশ ঘটেছে বন্ধনহীন স্বচ্ছন্দ গতিতে। আর, ভাব ভাষা এবং ছন্দের মুক্ত গতিও আনুকূল্য [illegible] কবির মুক্ত মনের বিকাশকে।

বাংলার গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন মহাগীতিকবির মধ্যে। তার মধ্যে কালের দিক থেকে যেমন, কবির ভাব চিন্তা ও প্রকাশ-গত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তেমনি, রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসের চেয়ে রবীন্দ্রনাথেরই নিকটতর। আধুনিক কালের আদর্শে যাকে বলা যায় যথার্থ লিরিক বা গীতি-সাহিত্য, বাংলা ভাষায় রামপ্রসাদকেই তার প্রথম প্রবর্তক বলে স্বীকার করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গৌরবের আসনেই তাঁর স্থান।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনায় পান্নায় বিজড়িত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
গানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

গয়নার নৌকো বলে এগুলোকে। ভাড়ার রেট বাঁধা। সাঁইতলা অবধি যান তো পাঁচ আনা, তার ঠিক-অর্ধেক পথ বামনডাঙা কিন্তু তিন আনা, সা-গঞ্জ দশ পয়সা, চণ্ডীদ চার আনা। একজন গলুয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে, ছাড়ে নৌকো সাঁইতলা—সা-গঞ্জ—বামনডাঙা-আ-আ-আ——

নৌকো ছেড়ে দিল, হাল-দাঁড় বেয়ে চলে গেল মাঝ-গাঙ অবধি। ঘাটের ঠিক উপরে এক দোকান। ভাল দোকান, বিড়ি সাজা-পান মুড়ির মোয়া—সমস্ত মেলে। বাঁশের মাচা বেঞ্চির মতো করে বসানো দোকানের সামনে। নৌকো চলে যায়—চড়ন্দারেরা কিন্তু গা করে না, গুলতানি করছে ঐ বেঞ্চিতে বসে।

জগা বিশ্বাস ছুটতে ছুটতে এল। হাঁপাচ্ছে—কামারের হাপরের মতো বুকের পেশি ওঠা-নামা করে।

চলে গেল নাকি রে?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে নাকি জগা? যা বললে, আর বোলো না—লোকে হাসবে—

বেকুব হয়ে জগাই হাসতে লাগল।—দেড় ... ভাঁটি হয়ে গেল, এখনো চড়ন্দার ডাকে। ... কাবার হয়ে যাবে যে সাঁইতলা পৌঁছতে!

এক বিরক্ত চড়ন্দার গজর-গজর করছে, ...য় ফৌত—শীতলপাটি কেনার নাম করে ...রয়েছে। এতক্ষণে যে দোকান সুদ্ধ কিনে ...র আসা যায়।

ইতিমধ্যে বিড়ি ধরিয়ে মৌজ করে ...তে বসে পড়েছে জগা। বলে, শীতল-...র শখ হল কার হ্যাঁ?

বলাই বলে, গগন সর্দার টাকা দিয়ে দিয়েছে। সায়ের ডেকে নিয়ে সে গগন আর নেই। টাকার গরম। ঘড়ি ঘড়ি খালে নেমে ডুব দেয়—দেখনি? শীতলপাটি বিনে তার ঘুম হয় না।

অনেকক্ষণ কাটল। মাঝিকে দেখা যায় অবশেষে বাঁধের উপর। জগা তেড়ে উঠেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি বেটা এতগুলো মানুষকে ঠায় বসিয়ে রেখে?

সব কথা বলে ফেলবার আগেই বলাই তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর হাত চাপা দিল। গয়নার নৌকো ঘাটমুখো ফিরছে আবার। সে দিকে তাকিয়ে সন্তর্পণে বলল, চুপ চুপ—চাষামি করবিনে আজকে।

জগা অবাক হয়েছে। নৌকো ঘাটে লাগাল লোকগুলোকে তুলে নেবার জন্য। জন-কুড়িক আগে-ভাগে উঠে বসে আছে ছইয়ের মধ্যে। অত মানুষের সোরগোলে গাঙে তো তুফান উঠবার কথা—কিন্তু কি তাজ্জব, সবাই যেন ধ্যানে বসে আছে। অথবা মানুষগুলোকে খুন করে ফেলে রেখেছে নৌকোর খোলে। তামাক খাচ্ছে—তা-ও অতি সাবধানে। হুঁকো টানার ফড়-ফড় আওয়াজ-টুকুও যেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে ঠাহর করে তখন মালুম হল। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুই মুশলে বাঘের দোসর ঐ বিশ বিশটা মরদ ঠাণ্ডা। তাই বা কেন—একজন হলেন গিন্নিবান্নি মানুষ, লম্বা ঘোমটা টেনে ঘাড় নিচু করে বসে রয়েছেন। ইনি কিছু নন—মুশল হল অপরটি। গোলগাল পরিপুষ্ট গড়ন, কাপড়-চোপড়ের দিব্যি বাহার। আর কমবয়সি মেয়ে বলে জোয়ান পুরুষদের লজ্জা করা তো উচিত—তা সে-ই দেখি নাটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এদিকে সেদিকে মানুষগুলোকে জব্দ রেখেছে।

বিরক্তিভরে জগা বাইরে বসে পড়ল। বর্ষাকাল, আকাশ মেঘে ভরা, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামছে। তা হোক, বৃষ্টির জলে চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভেড়ার পালের মধ্যে নয়।

চলেছে, নৌকো চলেছে। ছপ-ছপ দাঁড় পড়ছে একটানা, মচ-মচ আওয়াজ ওঠে দাঁড়ের বাঁশ-দড়িতে। চতুর্দিকের নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ যা এক ধরনের আওয়াজ। জগা আর পারে না—ক্ষেপে গিয়ে বলে, বাক্যি হরে গেছে—তোমাদের হল কি আজ মাঝি? ভূত দেখেছ? না বেলে-সিঁদুর খেয়ে এসেছ? (বেলে-সিঁদুর কি বস্তু জানিনে, খেলে মানুষের বাক্‌শক্তি একেবারে উপে যায় নাকি।)

মাঝি বলে, বকবক করে মুনাফাটা কি? টেনে গিয়ে এখন জোয়ারের মুখে বামন-ডাঙায় উঠতে পারলে হয়!

হাতে-মুখে চালাও না গো, গীত ধরো একখানা—

চাপা গলায় মাঝি ধমক দিয়ে ওঠে, ভদ্দোরলোকের মেয়েছেলে রয়েছেন—থামো তুমি!

মেয়েছেলে আছে বলে কি মুখে তালা-চাবি এঁটে বেড়াতে হবে? তোমাদের সরম লাগে তো আমি গাচ্ছি—

দাঁড়িদের উদ্দেশ করে বলে, দোয়ার কর তোমরা ভাই সব—

ঘাড় কাত করে গালে বাঁ হাত চেপে ধরে আঁ-আঁ-আঁ করে জগা তান ধরল।

আঃ, কি হচ্ছে?

ফিক করে হেসে ফেলে জগা বলে, গান—

কি ভাবছে বল দির্কিনি মেয়েছেলে? ষাঁড়ের মতন না চেঁচিয়ে গানই ধরো তবে—

জগা বলে, সব গানই বুঝি নাক-কান্না! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরম্ভ করেছিল দুর্দান্ত সুরে। কিন্তু সত্যি গাইতে জানে তো—সুরটা এক সময় মোলায়েম হয়ে উঠেছে, তালমাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের ভিতরে। প্রতিহিংসার ভাব আর তত নেই। আবেগে এমন কি চোখও বুজেছিল—হাতের চেটোয় থাবা দিচ্ছিল নৌকোর পাটায়......খসখসানির আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলল। সেই মেয়েটা ছই থেকে বেরিয়ে এল—কি আশ্চর্য, আঁচল সামলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল সামনে। শাসন করতে এসেছে নাকি? অন্যের কথায় হলো না তো সবল হাতে জোর করে মুখ চেপে ধরে গান থামিয়ে দেবে তার?

গান কিন্তু আপনাআপনি থেমেছে তাজ্জব কাণ্ড দেখে। জগা বিশ্বাসের সামনে বহাল তবিয়তে এসে বসে পুঁটকে এক মেয়ে! পরক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে শুরু করবে আবার প্রবল কণ্ঠে—তার আগেই মেয়েটা বলে ওঠে, খাসা হচ্ছিল—থামলে কেন?

জগা নীরস কণ্ঠে বলে, এ গানের এইখানে থামা—

সে কি গো? মাঝখানে এমনি থেমে পড়লে ভাল লাগে বুঝি?

আমার নিয়ম—

অভিমানে মেয়েটির কণ্ঠ একটু যেন থমথমে হয়ে যায়, আমি না এলে ঠিক তুমি শেষ করতে। বেশ, যাচ্ছি চলে—তুমি গাও।

আমার গান শেষ হয়ে গেছে—

মেয়েটি তর্ক করে, কক্ষনো নয়। যা-তা বোঝালেই হল?

ছইয়ের ভিতর থেকে মাঝবয়সি মেয়েলোকটা হাঁক পাড়েন, কি লাগিয়েছিস রে ভোমর? চলে আয়—

ভোমর কানেও নিল না। বলে, এক-একটা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ থাকে—লোকে যা বলে, ঠিক তার উল্টোটি করে।

ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

বেশ—আমি তবে বলছি, গান আর গেয়ো না।

গাবোই না তো!

এটা কি হল? একমত হয়ে গেলাম যে আমরা! আমি এক কথা বলব, আর ঘাড় হেঁট করে মেনে নেবে তুমি?

জগা বলে, আমার উল্টো-পাল্টা রীত। কখনো লোকের কথা শুনি, কখনো শুনিনে। এখন শুনব।

বাঁক পেরিয়েই বামনডাঙা। গাঙের ধার দিয়ে ছোট ছোট টিনের চালা—কতগুলো গুনে কে বলবে? হাটের দিন এই সব চালায় নানান জায়গার ব্যাপারিরা এসে বেচাকেনা করে; এখন হা-হা করছে। সর্বক্ষণের পাকা দোকানও আছে দুটো—সেখানে সব মেলে, পথিকজনের অসুবিধে নেই। টিউ-কলের (টিউব-ওয়েল) জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে কলা-বাতাসা সহযোগে উত্তম ফলার হতে পারে। আর বেশি উদ্যোগী হও তো চাল-ডাল হাঁড়ি-কাঠ কিনে কোন এক শূন্য চালায় তিনটে ঢেলার উনুন বানিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে নিতে পারো। খালে ঢুকতে হয় এই বামনডাঙা থেকে। শেষ ভাঁটায় খাল জলশূন্য, নিকানো উঠানের মতন—ছোট ছোট মাছ সর-সর করে কাদার উপর দাগ কেটে এদিক ওদিক যাচ্ছে। এই ভাঁটা একেবারে শেষ হয়ে গিয়ে জোয়ার আসবে, খালে জল ঢুকে নৌকো চলাচলের মত হবে। ততক্ষণ এখানে কাছি বেঁধে বসে থাক। এখনো সে দু-তিন ঘণ্টার ধাক্কা।

আর দেখ, মুখে এই তো ফড়ফড়ানি—কাদায় পা ছোঁয়াতে আঁতকে উঠছে মেয়েটা। সাপের মুখে পা দিতেও মানুষে অমন করে না। তা না নামবে তো থাকো নৌকোর খোপে আটক হয়ে—অন্য সবাই চলে-ফিরে বেড়াক। কার দায় পড়েছে—কে পিঠ পেতে দিচ্ছে যে সেই পিঠের উপর চেপে দেড়-মনি বস্তুটি কাদা পার হয়ে ডাঙায় উঠবে! আর যে-ই দিক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। ভোমরের মা তো বেশ নেমে এলেন—তিনিও মেয়েমানুষ, তাঁর আরও বয়স কত বেশি! আর নবাবনন্দিনী দেখ নাকি-নাকি বুলি ছাড়ছে, সবাই চলে গেলে, আমি একা একা পড়ে রইলাম—। যেন পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কেউ! কাদায় নামবে না তো তড়াক করে লাফিয়ে পড়ো এই জগার মত। কাদার জায়গা হাত আষ্টেক হবে—আট হাত যে লাফাতে পারে না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার শাসন কিসের অত?

কিন্তু খোশামুদে লোকও আছে বিস্তর। পুল মেরামত হচ্ছে—বাতিল তক্তা গাদা হয়ে আছে। অত দূর থেকে সেই তক্তা কাঁধে বয়ে বয়ে এনে কাদায় ফেলল। শ্রীমতী ভোমরমণি তক্তার উপর পদারবিন্দ রেখে ডাঙায় উঠবে। এত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও সে গলে গলে পড়ছে। নৌকোর কাড়ালে দাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধরো না গো কেউ তোমরা। নামি কেমন করে তক্তার উপরে?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়েছে হাত ধরে নামাবার তরে। জগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের রকম দেখে হাসে। হঠাৎ সে সকলের আগে ছুটল। কাড়ালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে ভোমরকে নামিয়ে আনবার জন্য। তার মধ্যে সকলের উঁচুতে জগার ইস্পাতের মত কঠিন কালো হাতখানা।

জগা আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—সে যে কি বস্তু, লম্ফ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় ভোমর বুঝে নিয়েছে। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার হাত অমনি মুঠোয় পুরে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে নয়—তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে গড়িয়ে পড়ত, ভোমর শক্ত মেয়ে তাই সামলে নিল কোন গতিকে।

ছুঁচো—বজ্জাতের বেহদ্দ তুমি! রাগে গরগর করতে করতে ভোমর দু-হাতে এক তাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুড়ে মারবে বলে। কোথায় জগা! চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ বাঁধের আড়াল হয়ে গেছে। ধোঁয়া হয়ে আকাশে উড়েই গেছে হয়তো বা!

ছুটতে ছুটতে ভোমরও বাঁধে উঠেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, গেল কোথায়? আচ্ছা, আসবে তো আবার নৌকোয়—তখন!

ক্ষেপেছ? জগা বসে থাকবে নৌকোর জন্য! পায়ে পায়ে এতক্ষণ কত পথ মেরে দিল।

বলো কি?

এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর অত খাল ঘুরতে বয়ে গেছে! নৌকো সাঁইতলা যেতে যেতে ততক্ষণ তার এক মুখ হয়ে যাবে।

তাই। সাঁইতলা যাবার রাস্তা বলে কিছু নেই। দেদার মাঠ, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় জঙ্গল। বৃষ্টির জল জমে আছে। আর পিছলও তেমনি। সেই জল কাদা ভেঙে সন্ধ্যের পরেই জগা সাঁইতলা পৌঁছে গেল। সঙ্গে বলাই।

ঘরে বসে থাকা যায় না, দলের মুরুব্বি গগন সর্দারের বাড়ি গেল। সাঁইতলার বাদায় বাড়ি বলতে এই একটাই। ছ-চালা ঘর, মাটির দেয়াল, বাইনের তক্তার চৌখুপি দরজা। ঘরের ভিতর টেমি জ্বালিয়ে গগন ঝিম ধরে বসে আছে।

কি হচ্ছে কাকা মশাই? হাত-পা কোলে করে কেন? আর সবাই গেল কোথা?

ভাবনা-চিন্তায় মন বড় মিইয়ে আছে জগা, ভাল লাগছে না।

কষে লাগাও স্ফূর্তি—

বাদার সীমানা। গাঙের ওপারে রাত্রিচর নানান পাখি ডাকছে। হরিণ ডেকে উঠল একবার। এপারে নিঃসীম ক্ষেত—তারই মধ্যে এক আধটা যা টিলা পাওয়া গেছে, তার উপরে মানুষ ঘর বেঁধেছে। ঘর আছে এই পর্যন্ত, কার দায় পড়েছে চালের নিচে পড়ে থাকতে? এখানে মানুষ পুরোপুরি জলচর জীব। সাঁ-সাঁ করে ডিঙিনৌকা চলে এপার ঘেঁষে, কত তার গোনাগুনতি নেই। খালে খালে ভেসাল-জাল পাতে। নতুন এক সায়ের হয়েছে সাঁইতলার চরে। এ অঞ্চলে যত মাছ ধরবে, সব এনে সায়েরে তুলতে হবে; ব্যাপারিরা দরদাম করে নিয়ে যাবে সেখান থেকে। বিক্রির মুখে ঝুড়ি অনুযায়ী দু-পয়সা বা চার পয়সা ইজারাদারের পাওনা।

গগন সর্দার মবলগ টাকায় সায়ের ডেকে নিয়েছে। পুঁজিপাটা সমস্ত ঢেলেছে, কিন্তু জমাতে পারছে না। জমবেও না কোন-দিন। গাঁজায় দম মেরে বেলা দুপুর অবধি পড়ে পড়ে ঘুমুবে, ব্যাপারিরা বুঝি ঘরে এসে ঠেলাঠেলি করে ঘুম ভাঙিয়ে হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে যাবে! সায়েরের দরুণ গগন মনমরা হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। চাঙ্গা করবার চেষ্টায় জগা বলে, স্ফূর্তি করো কাকা মশায়। নতুন ছক গুঁটি কিনে আনলাম পছন্দ করে। বলাই আসবে এক্ষুনি, পচাকেও ডাকি। এক হাত হয়ে যাক।

সে কথা কানে না নিয়ে তেমনি শুষ্ক কণ্ঠে গগন বলে, দশটা টাকা কর্জ দিতে পারিস রে জগা?

জগা বলে, বড় মানুষ তুমি, শীতলপাটি নইলে শোওয়া হয় না—তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল কাকা?

দুপুরবেলা কালকে ঘুম হচ্ছিল না—গরমে এপাশ-ওপাশ করছি। আর চোদ্দ-সিকের পয়সা ছিল গাঁটে, ফুটতে লাগল। ঝড়াকসে দিলাম পাটির ফরমাস করে। তখন কি জানি রে বাবা, অদিনে-অক্ষণে পিওন এসে পড়বে? হাটে হাটে ডাক বিলি হয়ে ওঠে না, সেই মানুষ কালকে খাবার মাছের গরজে পাড়া অবধি ধাওয়া করেছে। এসে এই হাঙ্গামায় ফেলে গেল। মাছ না দিয়ে নুড়ো জেবলে দিতে হয় পিওন বেটার মুখে।

তারপর বলে, কাল আবার আসতে বলেছি পিওনকে। দশটা টাকা তার কাছে দিলে মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে।

জগা আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি মনিঅর্ডার করবে কার কাছে কাকা?

আছে রে, মানুষ আছে। দেশে ঘরে আছে সবাই। তোরা টের পাস নে, আমিও ভুলে যাই। গাঁয়ে জাগ্রত আছেন রক্ষেকালী—তাঁর চরণে ফেলে রেখে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে এসেছিলাম। ছিলও বেশ চুপচাপ—ইদানীং বড় চিঠি হাঁটাতে শুরু করেছে—কষ্টে পড়েছে নাকি। ধানাই-পানাই করা মেয়েমানুষের স্বভাব—আমি ওতে আমল দিইনে। কিন্তু এবারে আমার মেজো শালা লিখেছে। গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ—নানান ভয়টয় দেখিয়েছে। তাই একটু ঘাবড়ে যাচ্ছি।

জগার মনটা কেমন হল। গগনের ঘর-সংসার আছে, টাকার দরকার—সেই ধান্দায় কত রকম চেষ্টাচরিত্র করছে, কিছুতেই কিছু হয় না। আর তার হাতে টাকা যেন আপনি ছুটে আসে। যার নেই মূলধন, সেই আসে বাদাবন; লাইসেন্স করবার আইন বাদাবনে ঢুকবার সময়। সে আবার কি রে বাপু—বাঘ-কুমীরের তো লাইসেন্স লাগে না। তাদের কায়দায় চলাচল করে বিনিপুঁজির কারবার চালাও—তোমার টাকায় ময়লা ধরে যাবে। এই যেমন বিশ কাহন গোলপাতা বেচে সে আর বলাই গাদা নোট নিয়ে এলো— বনকরের বাবুকে দুটো টাকা ছাড়া আধলা পয়সা ঠেকায় নি আর কাউকে। চলল এখন মজায় মজায়—খাও দাও আর ঢোলক বাজাও। মনিঅর্ডার কিছু কিছু পাঠিয়ে যে গাঁটের বোঝা হাল্কা করবে, ভুবন ঢুড়েও তেমন একটি মানুষ মিলবে না। আধবুড়ো গগনকে দিয়ে এ সব হয় না। গোনাগুনতি উপার্জন—তার উপরে আচমকা এই চিঠির বজ্রাঘাত বেচারির উপরে! ভেবেচিন্তে জগা বাসায় গিয়ে খুঁটির মাথার গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট এনে গগনকে দিল।

রেটটা খুব সস্তা করে দিচ্ছি কাকা মশায়। এক পয়সা মাত্তোর।

জগার ঔদার্যে গগন অবাক হয়ে গেছে। টাকা প্রতি একদিনের সুদ এক পয়সা—এমন হলে তো বাদা অঞ্চলের সবাই ঋণ করে এক এক হাতি কিনে বসে। খুশিতে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের সুদ পাঁচ আনা হচ্ছে, দিয়ে দিচ্ছি সেটা নগদ—

থলি ঝেড়েঝুড়ে কোনক্রমে ছ'টা পয়সার বেশি উঠল না। তাই তো! তখন আর এক পন্থা মনে এলো।

ডাকো ওদের। খেলায় রোজগার করে তোমার সুদ শুধবো। সুদ কেন, আসলের টাকাও।

ছক পেতে নিজেই চেঁচামেচি শুরু করে। জমায়েত হল সকলে। কুড়ি-কুড়িটা টাকা এক সঙ্গে গগনের হাতে—এখন সে থোড়াই কেয়ার করে দুনিয়াটাকে।

বলে, দশটা টাকা এই আলাদা কাপড়ের খুঁটে বাঁধছি। বাপের হাড় বাবা। পিওন এলে তবে গিঁঠ খুলবো। আর এই দশ টাকা মুঠোয় নিয়ে বসলাম। দেখিস কি রে জগা, পলক না ফেলতে তোর টাকা শোধ হয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ খেলা চলল। গগনের মুখ শুকনো। যাঃ শালা, কি বিশ্রী পড়তা পড়েছে—একটানা খারাপ দানই পড়ছে শুধু। দশ টাকা পুরোপুরি জগাই ফের জিতে নিল। বেটা সকল দিকে তুখোড়। কি করা যায়—কানে জল ঢুকেছে, আবার জল ঢুকিয়ে আগের জল বের করতে হবে। ইতস্তত করে শেষটা কোঁচার খুঁট খুলে অপর নোটটাও বের করে নিল।

ঘণ্টা খানেক পরে তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বি নাকি রে জগা আর কিছু? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। বিশ কর্জ হয়েছে, না হয় পঁচিশই হল। সবই তো চেটেপুঁছে নিয়ে নিলি।

জগা রাগ করে বলে, খোঁটা দেবার কি আছে কাকা মশায়? চুরি জোচ্চুরি করে নিয়েছি, গাঁট কেটেছি, পকেট মেরেছি?

গগন বেকুব হয়ে ম্লান কণ্ঠে বলে, তাই দেখলাম রে জগা, টাকাপয়সা তোর পোষ-মানা। তোকেই কেবল চিনে রেখেছে—যার কাছে যা থাকুক, তোর ঐ গেঁজেয় গিয়ে না ওঠা অবধি সোয়াস্তি নেই। তা এতই দিতে পারলি, নেহাৎপক্ষে আর দুটো টাকা দে বাবা। পিওন বেটাকে আসতে বলেছি—হবে না কিছুই জানি, তবু খানিক চেষ্টা করে দেখা যাক।

জগা উঠে দাঁড়াল তো গগন তার হাত এঁটে ধরেছে। যেতে দেবে না কিছুতে।

হেনকালে মানুষের শব্দ সাড়া উঠানে।

কে গা?

শীতলপাটি ঘাড়ে মাঝি আগে আগে আসছে। বলে, বেরিয়ে এসে দেখ সর্দার মশায়, তোমার আপন লোকেরা সব এসে পড়ল।

বাদারাজ্যে অভাবিত ব্যাপার। হুড়-মুড় করে চারজনেই বাইরে এসেছে। কি আশ্চর্য, বামনডাঙা অবধি গয়নার নৌকোয় যাদের সঙ্গে এসেছে সেই মেয়ে ও মা। সাঁইতলায় তাদেরও গতি, কে ভাবতে পেরেছে? ষণ্ডা গোছের একজন সঙ্গে—গগন মেজো শালার কথা বলছিল, সেই মানুষটি। নৌকোর মধ্যে একেও দেখেছে বটে জগা!

দাওয়ায় পা দিয়ে ভোমরমণি জগাকে দেখে চমকে উঠল।

সেই লোকটা! মেজো মামা, চিনতে পারছ না—শয়তান এইখানে এসে জুটেছে।

যে জগা বাঘ দেখে ডরায় না, মেয়ে-মানুষের মুখোমুখি সে জবুথবু হয়ে গেছে। নেহাৎ লোকে কি বলবে, নইলে ছুট দিয়ে পালাত। তবে ষণ্ডা মামাটি দেখা

গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। বলে, যাকগে—যাকগে। নতুন জায়গায় এসে ঝঞ্ঝাট করিসনে এখন ভোমর।

জগাকে ছেড়ে ভোমর তখন গগন সর্দারকে নিয়ে পড়ল।

টাকা পাঠাও না কেন বাবা? লিখে লিখে লবেজান। এমন জায়গায় এসে উঠেছ—ভাগ্যিস মেজো মামা ছিল, খোঁজে খোঁজে তাই এসে পৌঁছলাম।

গগন জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলে, তা বেশ করেছিস। ঠাণ্ডা হ এখন তোরা। টাকা কাল সকালেই মনিঅর্ডার হয়ে চলে যেতো।

জগা হঠাৎ ক'টা টাকা ছুড়ে দেয় গগনের দিকে। না বুঝে গগন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা গো! বাড়িতে কুটুম—টাকা নইলে মচ্ছব হবে কি দিয়ে?

দাওয়া থেকে তারপরে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল উঠানে। পৈঠা দিয়ে নামবার তাগত নেই, মেয়েটা সেই দিকে। ও যা বস্তু, নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়তে ভরসা করা যায় না।

অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে তার মধ্যে জগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাপে-মেয়েয় কথা হচ্ছে—গগনের ভারি মজাদার জবাব।

বাবা, কি হচ্ছিল এতজনে মিলে ঘরের মধ্যে?

নামগান করছিলাম।

কই, আওয়াজ পাইনি তো?

বিড়বিড় করে করছিলাম। তাতে যা আমেজ আসে, চেঁচামেচিতে তেমন হয় না।

দেয়ালে এক খোল ঝুলানো—অবরেসবরে পেটাপেটি করে। সেইটে খুব কাজে লেগে গেল। কিন্তু ফড়ের ছকগুটি কোন জায়গায় তিন জোড়া চক্ষুর সামনে থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলল, সেইটে একদিন জিজ্ঞাসা করতে হবে কাকা মশায়কে।

জগা আর ও-মুখো হচ্ছে না। কাকা মশায়ের নামগান একটু আধটু কানে আসে দূর থেকে। হায়রে কপাল—সন্ধ্যাবেলা মেয়ে-বউ-শ্যালকের কাছে গগনকে নিয়মিত বাবাজি হয়ে বসতে হচ্ছে। আখের ভেবে না চলার দরুন এই খোয়ার। দেশেঘরে যখন বন্ধন রেখে এসেছ, হাতে টাকা-পয়সা আসামাত্র ওদিকে কিছু কিছু ছাড়লে এই ঝামেলায় পড়তে হত না। বেড়াল তাড়াবার ভালো ফিকির হল, মাছের কাঁটাকুটি দূরে ছুঁড়ে দেওয়া—সেখানে তারা কামড়া-কামড়ি করুক, তুমি নির্বিঘ্ন। ইচ্ছে করে বটে, গগন সর্দারের বন্দীদশাটা একনজর চোখে দেখতে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। তাকেও ধরে যদি নামগানে বসিয়ে দেয়! পয়লা দিন সেই তো কত রাত্রি অবধি চারজনে নামগানে মাতোয়ারা হয়ে ছিলে, এখন পারব না বললে কে শোনে? তার উপরে জগার গানের গলা যৎকিঞ্চিৎ শুনেছেও তো ভোমর!

বলাই একদিন দেখে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে শোনায়, বলব কি ভাই জগা, কাকার কষ্টে পাষাণ ফেটে যায়। সে বাড়ি আর চেনা দায়—উঠান অবধি খুঁড়ে তরিতরকারি লাগিয়ে চেহারা আর এক রকম করে ফেলছে। মাজায় আঁচল বেঁধে মেয়েটা জঙ্গল সাফ করছিল—কাকা মশায় বলে আমি ডাক দিতে জোরে জোরে মাটিতে ঝাঁটা মারতে লাগল। আমারই গায়ের উপরে মারছে যেন। আর ভাই এগুতে সাহস করলাম না।

জগা চিন্তিতভাবে বলল, আপদ বাদাবনে এসে ভর করল, ভারি মুশকিল হল।

তুই কোন উপায় কর জগা, তুই না লাগলে হবে না। গগন-কাকাকে একেবারে পুতুল বানিয়ে তুলেছে—উঠিয়ে দিলে ওঠে, শুতে দিলে শোয়। আবার দেখলাম, গোয়াল তুলবে—তার চাল বাঁধাবাঁধি হচ্ছে। গরু পুষবে। আমাদের এতকালের জায়গা উড়ো আপদ এসে দখল করে নিল। ঝাঁটা মাটিতে মেরেছে—সেই ঝাঁটা কারো পিঠে পড়তে কতক্ষণ!

ঝাঁটার ভয়ে অতএব গগনের বাড়ি যাওয়া চলে না। ভেবে চিন্তে জগা একদিন অন্য একজনের মাছের ঝুড়ি কাঁধে সায়েরে গিয়ে উঠল। বিপদ ঘোরতর! বিনা কাজে এখানেও আড্ডা জমানো মানা। গগন সর্দার হঠাৎ প্রবীণ ও জ্ঞানবান হয়ে উঠেছে। বেশ কেমন চিকন-চিকন ভাব। ভদ্রজনের মতো জলচৌকির উপরে খাতা নিয়ে বসে। কথা বলে ভারিক্কি চালে, হাসে না। জগা যে ছুতো করে মাছের ঝুড়ি কাঁধে গিয়েছে, সেটা আর কেউ না হোক গগন তো বুঝেছে ভাল রকম। তা দেখ, ভাল করে তাকিয়েই দেখল না সে একটিবার। এই মাস দেড়েকের মধ্যে কত পর হয়ে গেছে! কিম্বা হতে পারে মেজো শালা উপস্থিত আছে, তারই ভয়ে। গগন সর্দার গদিয়ান হয়ে বসে, আর শ্যালক মশায় মাতব্বরির চালে চরকির মতো ঘুরছে। এমনি ঘোরাফেরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক আঁজলা মাছ তুলে নিচ্ছে সব ঝুড়ি থেকে। এমনিভাবে নিজেদের ঝুড়িও প্রায় ভরতি। তার কিছু মাছ খাবার জন্য রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিচ্ছে। মেজো শালা এসে এই একখানা বুদ্ধি বের করেছে—রোজগারের নতুন পন্থা। যা গতিক—গগন সর্দার ধাঁ-ধাঁ করে এবার বড়লোক হয়ে উঠবে, কেউ রুখতে পারবে না।

রাগে গরগর করতে করতে জগা নিজের চালা-ঘরে ফিরে এলো। তাদের সাঁইতলা উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। সন্ধ্যার সময় সে দলবল জুটিয়ে আনল—ঢোলক দু'জোড়া কত্তাল আর জনদশেক জোয়ান মরদ। সোরগোল করে গীতবাদ্য লাগাল। যত রাত বাড়ে মজলিস জোরদার হয়ে ওঠে। এ সঙ্গীতে শুধুমাত্র সাঁইতলা নয়—গাঙপারে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেরও ভয় পেয়ে দূর-বনে পালাবার কথা। যার খুশি হোক গিয়ে ভদ্রমানুষ, আমরা ওর মধ্যে নেই—জগার দল মরীয়া হয়ে সেই কথাটা জানান দিচ্ছে।

বামনডাঙায় যাত্রার দল খুলবে, জগাকে তারা ডেকেছিল। সমস্ত দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ছুটোছুটি করে ফিরে এসে দেখে, একজনও আসেনি আজ তার ঘরে। পায়ের কাদার মতো লেপটে থাকে বলাই আর পচা—তারা অবধি নেই। আরে আরে—শাঁখ বাজে যে গগনের বাড়ি থেকে। দিনকে দিন হয়ে উঠল ঘর-গাঁ বানিয়ে ফেলল যে সাঁইতলার চরে।

অনেক পরে পচা ঢেকুর তুলতে তুলতে এ... —লক্ষ্মীপুজো ওদের বাড়ি, খুব ফ... খাইয়েছে রে। তোমাকেও ডাকাডাকি করছি... ফিরেছ টের পেলে ধরে নিয়ে খেতে বসাবে।

শাঁখ কোথা পেলো এ-জায়গায়?

বড়দলের বাজার থেকে কিনে এনেছে। পুরুতও নিয়ে এসেছে। পুজোআচ্চা রীতকর্ম সমস্ত হবে এবার থেকে।

সে রাত্রে আসর বসল না। গুরুভোজনের পর যে যার চালায় ঢুকে শুয়ে পড়েছে। পচাটা তবু আসে যায়—বলাইর পাত্তাই নেই তারপর থেকে।

একদিন জগাকে পথে ধরল, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কোথায়?

এখানে ছিলাম না জগা ভাই। ডিঙি নিয়ে মিঠে জল আনতে গিয়েছিলাম হুই কাছারি-পুকুর থেকে।

ডিঙি করে জল আনতে হয়—কে এত জল খাবে শুনি?

খাবে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি? কার এত নবাবি—ভোমরমণির?

বলাই ঘাড় নেড়ে বলে, চান করবার অত জল কোথা? গামছা ভিজিয়ে গা-হাত-পা মুছবে, মাথায় ঢালবে ঘটিখানেক। নোনাজলে চান করে করে ওর গা চটচট করে—গায়ে নাকি কি সব উঠেছে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, মরেছিস তুই হতভাগা একেবারে গোল্লায় গেছিস—

বড্ড কাতর হয়ে বলল, তাই গিয়েছিলাম।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের হুকুম তামিল করে বেড়াস—মুখ দেখাচ্ছিস কেমন করে তুই?

বলাই লজ্জা পায়না, গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কি যেন মহৎ কর্ম করেছে, পরমানন্দে তার যশোকীর্তন শুনছে।

তারপরে আর এক ব্যাপার—বলাইর যা-হোক তবু দর্শন মেলে, পচা একেবারে ফৌত।

দেখ্ দেখ্, সেটা মরে পড়ে রইল কোথায়—

বলাই খবর দিল, গরু কিনবার জন্য গগন আর সে উত্তরের ডাঙা অঞ্চলে গিয়েছে। গরু এনে গোয়ালে তুলে দেবার পরেও ছাড়ান নেই। রাখালি করতে হবে পচাকেই। আর ভোমর বলেছে, খাঁটি দুধ খাইয়ে খাইয়ে তার লিকলিকে দেহ হাতির মতো মোটা করে দেবে।

গাঙের চরে জগা চাপা আক্রোশে পায়তারা কষে বেড়াচ্ছে। বলাই আর পচা তার ডানহাত বাঁহাত—সেই দুটো হাতেই যখন কোপ হেনেছে, আর রক্ষে নেই তোমার ভোমরমণি। এস্পার কি ওস্পার।

চালায় ফিরে সেই ভাঙা হাট। অন্ধকারে জন চারেক ভূতের মতন বসে আছে। টেমিটা জ্বালেনি কেউ। পচা তো চলেই গেছে, ভোমরমণি একটু আগে এখানেও হানা দিয়ে বলাইকে ডেকে নিয়ে গেছে কোন কাজে। আসরের তোড়জোড় কে করবে তা হলে?

আর, আসলবস্তু ঢোলক—যাবার মু...

সেইটাই গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে দস্যু মেয়েটা। আর কি নিয়ে গেল—তাড়াতাড়ি আলো জেবলে দেখে। অন্ধকারেই ঘরটা খাপছাড়া লাগছিল—যেন বড্ড বেশি ছিমছাম। তাই বটে। এসে পুড়ে এই দেখ ঝাঁটপাট দিয়ে সাফসাফাই করে গেছে ঘরদোর।

জগা রেগে গিয়ে বলে, জিনিসপত্তোর নয়-ছয় করে গেছে রে! আমার কাঁথা গেল কোথায় রে?

ওদেরই একজন বলল, ময়লা হয়ে গেছে বলে কাঁথাটাও নিয়ে গেল। ক্ষারে সিদ্ধ করে কেচে কালকে দিয়ে যাবে। ঢোলক আর দেবে না।

ইয়ার্কি নাকি? বড়দলে গিয়ে সেদিনও ঢোলক নতুন করে ছেয়ে আনলাম। চল্‌ তো দেখে আসি, ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে দেবে না?

দলসুদ্ধ চড়াও হল গগনের বাড়ি।

তোমার মেয়েকে সামাল করো বলে দিচ্ছি কাকা মশায়—

গগন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সে দাপট নেই, কষ্ট হয় দেখলে মানুষটাকে। ডোমরকে দেখতে পেয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জগা আরো গায়ের ঝাল ঝাড়ছে।

তোমার মেয়ে ঘরে ঢুকে আমার জিনিসপত্তোর বয়ে নিয়ে এসেছে। বিহিত না করো তো থানায় এজাহার দেবো।

ডোমর মুখ বাঁকিয়ে বাঁ-হাতে ময়লা কাঁথা তুলে সামনে ছুঁড়ে দেয়।

কত অমূল্য ধন-সম্পত্তি দেখ বাবা, তাই চুরি করতে গিয়েছিলাম। মানুষ নয়—মানুষ হলে এর উপর কক্ষনো শুতে পারত না। মাদুর দিয়ে এসেছি তাইতে শুয়ে আজকের রাত কাটানো হোক। কেচেকুচে কাল কাঁথা ফেরত দিয়ে আসবো।

জগা চটে গিয়ে বলে, আমার ঘরের ভিতর আমি ময়লা কাঁথায় শোব, ভিজে মাটির উপর শোব। অন্য লোকে মোড়লি করতে যাবে কেন? বয়ে গেছে আমার পরের মাদুরে শুতে।

ডোমরের কিন্তু রাগ নেই। মুচকি মুচকি হাসছেও যেন। বলে, শোওগে তবে ভিজে মাটিতে। সে তবু ভালো। মাগো মা—এমন দুর্গন্ধ হাতে করে এইটুকু পথ আনতে আমার গা বমি-বমি করছিল।

জগা বলে, আর আমার ঢোলক এনেছ কেন শুনি? তা-ও কি ময়লা?

চামড়া ছিঁড়ে দেবো বলে। সারারাত ঢ্যাব-ঢ্যাব করো, আমাদের ঘুম হয় না।

সাফ জবাব দিয়ে ডোমর ফরফর করে চলে গেল। এই রকম মেয়েমানুষের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে তো ঘরবাড়ি ছেড়ে বাদাবনে পড়ে থাকার সুখটা কি? গগনকে পরদিন একলা পাওয়া গেল—সায়েরের কাজকর্ম চুকিয়ে বাঁধ ধরে বাড়ি ফিরছে। জগা বলে, ঘরে সেঁদিয়ে আমার সর্বস্ব তছনছ করে গেল। তোমার একদল আমার একদল—দুই দলে লাঠালাঠি করব, সেটা কি সুখের হবে কাকা মশায়? ভালো চাকবে তো মেয়ে ঝটপট দেশে রওনা করো।

গগন অসহায়ভাবে বলে, সে কিছুতে যাবে না। উল্টে আরও মেজো শালাকে পাঠাচ্ছে তার বউ ছেলেপুলে নিয়ে আসার জন্যে।

জগা বলে, দিব্যি তো ঠাণ্ডা মাথায় বলে যাচ্ছ—বলি, পরিণামটা দেখেছ ভেবে? ভোর না হতেই ট্যাঁ-ভ্যা, ঘরের চালে কাক পড়তে দেবে না ঝগড়া ঝাঁটির গুঁতোয়।

গগন বিরস মুখে বলে, উপায় নেই। ওদের ঠেকানো যাবে না। বুড়ো হয়ে পড়লাম, গায়ে বলশক্তি নেই—কি করব?

জগা সদুঃখে বলে, উঃ কাকা মশায়, এত জায়গা থাকতে কিনা তোমার বাড়িতে এই কাণ্ড! কত কষ্টের জমানো আড্ডা—সেদিকে এখন আর চোখতুলে তাকাবার উপায় রাখছে না।

গগন বলে, আমায় দুষছ কেন বাবা? আমি কি আনতে গিয়েছিলাম ওদের? আবার ঐ যে মেজো শালার এক দঙ্গল আনতে যাচ্ছে, আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে নেমে-আসা মেঘের মতো ওপারের ঘন কালো জঙ্গল। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে জগার মনটা কেমন হয়ে যায়। এই যেখানটায় বসে আছে, ক'বছর আগে ঠিক অমনি জঙ্গল ছিল। আস্তে আস্তে গাঁয়ের পত্তন হচ্ছে—জনালয় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে জঙ্গলরাজ্য মুঠির মধ্যে চেপে ধরছে। আবার এখন নতুন চালা বাঁধতে হবে নাকি গাঙের ভাঁটি ধরে কোন এক নতুন জায়গা খুঁজে পেতে নিয়ে? ফাঁকা বাদায় হৈ-হল্লায় দিব্যি দিন কাটাত, ঘর গৃহস্থালীর বিষ নজর এই এতদূর অবধি এসে পৌঁছে গেল?

ভাবতে ভাবতে মরীয়া হয়ে ওঠে। ডোমর আপদটাকে বিদেয় করে দিলে আপাতত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। গগন পারবে না—সে আগের মানুষ আর নেই। ঐ-তে আরও ভয়

কত অমূল্য ধন-সম্পত্তি দেখ বাবা

মুখের কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করল আমাকে?

কিন্তু তোমায় তো তেলচুকচুকে দেখাচ্ছে বেশ। খুব যে দুঃখের পাথারে ভাসছ, মনে হয় না।

বেটা তো মার খেতে পারে—আরে ধরে মারে তবে উপায়টা কি? চানের আগে তেল না রগড়ালে ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বসে, এটা খাও সেটা খাও—করতে থাকে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসে। খেয়ে বিছানায় গড়াতে হয়। দেখে দেখে যায়, ঠিকমতো ঘুমুচ্ছি কি না। শরীরে তেল না চুইয়ে এর পর যায় কোথায়? জগাও এমনি ভাবছে। গাই-বকনা কিনে কিনে গগনের নতুন গোয়ালে ঢোকাচ্ছে। মানুষগুলোকেও ও মেয়ে ঠিক তেমনি জাবনা খাইয়ে দড়ি পরিয়ে শিষ্টশান্ত করতে চায়।

নিশিরাত্রে কলকল ধ্বনে উচ্ছল আবর্তে জলধারা দূরে সমুদ্রে ধেয়ে চলেছে। চাঁদের হয়ে যায়। গগন হেন ব্যক্তির ঐ দশা, তবে আর ভরসা রইল কোথায়? যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। জগাই করবে।

খোঁজখবর নিয়েছে, ডোমর কোনখানে শোয়। ডাকাত পড়বে এক রাতে। ডোমরকে ডাকাতি করে নেবে। হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে নৌকায় তুলে তিন জোয়ার এক ভাঁটি মেরে মাতলার কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে নৌকায় রেলে দুনিয়ার তাবৎ জায়গায় যাওয়া যায়। ফিরে চলে যাবে নিজেদের বাড়ি, অথবা যে চুলোয় খুশি। শিক্ষা হবে শ্রীমতীর—বাদারাজ্য কঠিন ঠাঁই, জীবনে আর চুঁ মারতে আসবে না এদিকে।

ডিঙি জোগাড় করতে হবে। সে কিছু কঠিন নয়। বলাইয়ের কাজ এটা—দূর দূরান্তরে যাবার সময় কতবার এমন নিয়ে এসেছে। গাঙের ধারে বড়দলের হাট বসে। হাটবারে এত নৌকা ডিঙি জমে যে গাঙের জল দেখবার

উপায় থাকে না। সেই সময় বোঠে হাতে গাঙের ধারে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও। তারপর ফস করে এক ডিঙিতে উঠে দড়ি খুলে ঝপাঝপ বোঠে মেরে টানের মুখে গিয়ে পড়ো। আর তোমায় ধরে কে? বাবুরা নেমন্তন্ন-আমন্তন্নে গিয়ে জুতোর জোগাড় করে নেন—সেই রকম কায়দা আর কি! কাজকর্ম চুকে গেলে তারপরে পরের ডিঙি জলে ভাসিয়ে দাও, কিম্বা গোলমাল বুঝলে ডুবিয়ে দাও কোনখানে। ব্যস! এমন কত হয়েছে।

বলাইকে খুব চুপি চুপি বলে দিয়েছে—কাক পক্ষীর কানে এ ব্যাপার না যায়। ভাবগতিক দেখে বলাইর সন্দেহ জাগে।

মুলুক ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি?

জগা মুখ বাঁকিয়ে বলে, আরে আমার কি সুখের মুলুক গো! ছিল বটে তাই, শত্তুর এসে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিল। তারপর সাবধান করে দেয়, খবরদার খবরদার, কেউ জানতে না পারে!

বলাই জিভ কেটে বলে, ছি-ছি!

জানাজানি হয়ে গেলে ধড়ে তোমার মুণ্ডু থাকবে না।

এতসব বলে দিতে হয় না বলাইকে। গলা কেটে ফেলেও ওর পেটের কথা পাওয়া যায় না। তবু অতি গুহ্য ব্যাপার বলেই বারম্বার বলা।

ডিঙি এসে গেছে। সময়টাও ভালো—কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি তিথি। ডাকাত পড়বার রাত্রিই বটে! জগা নিজে একবার সরেজমিনে দেখে এলো। হায়রে কাণ্ড, যে বাড়ি সারারাত্তির জমজম করবে, সন্ধ্যার পরেই সেখানে আলো নিভিয়ে দিয়ে মানুষজন মরে ঘুমুচ্ছে।

বন্দোবস্তে খুঁত নেই। আসল মতলব বলাইকেও বলে নি। এখন অবধি তারা জানে, একটা কোন শক্ত কাজ—আর অনেক পথ ডিঙি বেয়ে যেতে হবে। বাকি সব সময়ে জানতে পারবে। মেঘে-ভরা আকাশ। বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটাও নড়ছে না। চালায় বসে জগা গুড়পান্তা খেয়ে নিচ্ছে তাড়াতাড়ি। আলো জ্বালে নি—আলো দেখে বাইরের কেউ যদি এসে পড়ে তখন আবার নানান কথার তালে পড়ে যাও। তা এমন অন্ধকার, হাত মুখে তুলে তুলে খাচ্ছে—সেই হাতটা অবধি ভালো দেখা যায় না।

চমকে যায়। মানুষ যেন বাইরে! দলের কেউ? কিন্তু পাড়ার মধ্যে উঠবার কথা তো নয়। গেঁয়োবনে ডিঙি ঢুকিয়ে ওরা মড়ার মতন চুপচাপ থাকবে। যা করতে হয়, জগা গিয়ে করবে ঠিক সময়ে। কোন রকম গণ্ডগোল ঘটল নাকি তবে?

ঝাঁপ ঠেলে ঘরে আসে মানুষটি—কি আশ্চর্য, ঝাঁপ ঠেলতে চুড়ি বাজে ঝিনঝিন করে। ভাত সুদ্ধ হাত থেমে যাবে জগার—নিজের ঘরে নিঃসাড় হয়ে একেবারে চোর হয়ে আছে।

ঘরে ঢুকে ভোমর বলল, আলো জ্বালো নি কেন?

বিরক্ত কণ্ঠে জগা বলে, তেল নেই।—

ও—

বসে পড়ল সামনে। আবার প্রশ্ন, খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

হয়ে গেছে খাওয়া—

উঠে পড়ো তা হলে।

সে যখন হয় উঠব। কিন্তু ঘুরঘুট্টি আঁধারে এদ্দুর এসে তুমি এক পুরুষমানুষের ঘরে উঠলে, কেমন মেয়েছেলে তুমি?

বোঝ তবে কেমন! ভোমর খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি এমন মিষ্টি লাগে অন্ধকারে!

হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে আবার বলল, গরজে পড়ে আসতে হল গো। ডিঙি নিয়ে এসেছ কেন?

জগা ঢোক গিলে বলল, না তো! কে বলল?

আমি জানি। গেঁয়োবনে রেখেছ। আনিয়েছ বলাইকে দিয়ে।

বলাইটা বলল বুঝি? দেখে নেবো মিথ্যুকটাকে।

ভোমর বলে, কেন এনেছ তা-ও জানি—

থমথমে আকাশ; আসন্ন জোয়ারে অদূরে গাঙের জলও থমথমে হয়ে আছে। কি সর্বনাশ, হাত গুনতে জানে নাকি মেয়েটা? কিম্বা ডাকিনী-হাকিনী গাঙের চরের শ্মশানঘাটা থেকে উঠে এলো?

ভোমর বলে, আমি জানি—তুমি চলে যাচ্ছ। *নিজের হাতে কোদাল মেরে বাঁধ বেঁধে সাঁইতলায় বসত বানিয়েছ, কেন যাবে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে?*

সর্বরক্ষে রে বাবা! বলাই ফাঁস করেছে—ভাগ্যিস আসল কথা সে জানে না! জগাও তখন খানিক জো পেয়ে যায়। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, কত স্ফূর্তিতে মাদা বেঁধেছিলাম, বসতির মতন আছে কি আর এ জায়গা? নায়েব লেগেছে খালবিল ইজারা বন্দোবস্ত করতে—মানুষ জলের মাছ মারবে, বনের কাঠ কাটবে, তার কোন উপায় থাকতে দেবে না। আর এদিকে তোমার যা কাণ্ড—এর পরে কেউ তো ছাতা ছাড়া বেরুবে না জুতো ছাড়া হাঁটবে না।

ভোমর হঠাৎ কাতর হয়ে বলে, আমায় নিয়ে যাও তবে। তুমি চলে গেলে আমিও থাকবো না এখানে—এই শেষ কথা বলে দিলাম।

জগা আবাক হয়ে বলে, সে কি গো? উড়ে এসে জুড়ে বসলে। আমাদের খেদিয়ে দিয়ে তোমাদেরই তো দিনকাল।

ভোমর বলে, থাকতে দেবে না বাবা এখানে। হরবখত তাই নিয়ে ঝগড়াঝাটি। দেশে সরাতে পারলে বেঁচে যায়। সেখানে না জোটে পেটের ভাত, না আছে মাথার উপর কেউ।

একটা লাগসই জবাব জগা না দিয়ে পারে না। তুমিই তো সকলের মাথায় চড়ে বেড়াও। কার ঘাড়ে কটা মাথা, তোমার মাথার উপরে থাকবে?

ভারি গলা কিন্তু ভোমরের। বলে, যত খুশি গালাগালি দাও, আমি ছাড়ব না। তোমার বাবা ভয় করে, পাড়ার সবাই মান্য করে। তুমি রোখ করে কিছু বললে বাবা না করতে পারবে না। বলে দাও, এখান থেকে না সরায় যেন আমাদের।

একটু থেমে বলে, নয় তো ঐ যা বললাম—তোমার ডিঙিতে জোর করে উঠে পড়ব। মাতলায় নামিয়ে দিও। সেখান থেকে রেলে চলে যাবো ভগ্নিপতির বাড়ি। বোন মরে গেছে—বাবা তাই কিছুতে যেতে দেয় না। ভগ্নিপতি আমায় বিয়ে করতে চায় কি না!

কি মতলবে এত কথা বলছে, কে জানে? জগা বিষম রেগে যায়।

আমি কাউকে কোথাও নিয়ে যেতে পারব না—

তবে যাবো কেমন করে?

হেঁটে চলে যাও, সাঁতার কেটে যাও—সাপে কাটুক, কুমিরে খাক—আমি কিছু জানি নে।

তড়াক করে জগা উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঝাঁপের দুয়োর আগলে বসে ভোমর। বলে, পালাও কেমন করে দেখি। তোমার আমি পিছন পিছন যাবো।

জগা কঠিন হয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, *জানো আমি লোক খারাপ?*

খুন করবে? তাই করো তুমি। জ্যান্ত ফেলে রেখে কিছুতে এখন থেকে যেতে দিচ্ছি নে।

অন্ধকারে ভোমর তার পা এঁটে ধরেছে: আলুল চুল ছড়িয়ে পড়েছে দুই পায়ে। পা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু বড্ড জোরে ধরে আছে। বলিষ্ঠ পুরুষ জগা—মেয়েটার সঙ্গে পেরে ওঠে না। ডাকাতি করতে যাচ্ছিল—তার আগেই ডাকাতি হয়ে যায় তার উপরে।

ঘনান্ধকার। কতক্ষণ রইল এমনি, বলতে পারিনে। তারপরে আলো জ্বালল! রাতের আলোয় মরি মরি কি সুন্দর দেখায় ভোমরমণিকে!

রাতদুপুরে হন্তদন্ত হয়ে বলাই এলো। জগা ঘুমুচ্ছে দেখে অবাক।

বাঃ রে—দিব্যি তুমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছ। আর গেঁয়োবনের মশার কামড় খেয়ে সর্বাঙ্গ আমাদের চাকা-চাকা হয়ে উঠেছে।

ঘুম-ভাঙা রক্তচক্ষু মেলে জগা বলে, কিছু বলেছিলি নাকি বজ্জাত মেয়েটাকে?

বলাই থতমত খেয়ে বলে, না—মানে, ভোমর যে রকম জেরা করতে লাগল, উকিল-মোক্তার কোথায় লাগে! বলেছিলাম, জগা ভাই বিবাগী হয়ে যাবে তোমার কারণে। বলে ফেলে তখন হায়-হায়—করি।

তারপর খুশি হয়ে বলে, যাচ্ছ না তা'হলে? মত বদলেছ?

বড় বড় গাঙ-খাল তোর ঐ পচা ডিঙিতে পাড়ি দেওয়া যায়? দেখে এসে হাত-পা ছেড়ে গড়িয়ে পড়েছি।

বলাই সবিস্ময়ে বলে, ডিঙি খারাপ?

আলকাতরা মাখিয়ে চকচকে করে রেখেছে,, তক্তা সমস্ত ঝাঁঝরা, এক ভাঙা ডিঙি এনে তার আবার ফুটানি করে বেড়াস এর তার কাছে। যা যা—ঘরে গিয়ে ঘুমোগে তোরা সকলে—

অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীসুশীলকুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথনির্দেশক হিসাবে যাঁহাদের রচনা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) পরই তাঁহার সমকালবর্তী ও সহযোগী অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) নাম সুপ্রসিদ্ধ।

নবদ্বীপ হইতে প্রায় চার মাইল দূরে পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী চুপীগ্রামে অক্ষয়কুমার ১লা শ্রাবণ ১২২৭ (ইং ১৫ই জুলাই ১৮২০) সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চুপীর যে স্থলে এই পরিবারের বাস ছিল তাহা নাকি এখন নদীগর্ভে। অক্ষয়কুমারের পিতা পীতাম্বর দত্ত ছিলেন কলিকাতা খিদিরপুরের টলিজ্ নলার (আদি গঙ্গার) কুতঘাটের কেশিয়র ও দারগা। মাতার নাম ছিল দয়াময়ী; কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী ইটলে গ্রামে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। দত্তবংশের আদি পুরুষ দুর্গাদাস দত্তের পুত্র ও অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ রাজবল্লভ বর্ধমান রাজবাড়ির কর্মচারী হইয়া প্রথম টাকীর নিকটবর্তী গন্ধর্বপুর হইতে আসিয়া চুপী গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের জীবনীকার * এই বংশাবলির পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন:—

অক্ষয়কুমারের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র হরমোহন পীতাম্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া তখনকার সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টার আফিসের বড়বাবুর কর্ম করিতেন। প্রায় দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের মনসাতলায় তাঁহাদের বাসাবাটীতে আসিয়া কিছু ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ষোল বৎসর বয়সে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টল সেমিনারিতে ভর্তি হইয়া, তাঁহার পিসতুতো ভাই রামধন বসুর দর্জিপাড়া বাসভবনে অবস্থান করেন। যখন তাঁহার প্রায় ঊনিশ বৎসর বয়স তখন কাশীধামে পিতার মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া অর্থাভাবের জন্যও তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়সে আগরপাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের দুহিতা নিমাইমণির (বা শ্যামামণির) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইহার কিছু পূর্বে প্রায় চতুর্দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার নাকি 'কামিনীকুমার-'এর আদর্শে অধুনালুপ্ত 'অনঙ্গমোহন' নামে একটি শৃঙ্গারাত্মক পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন! কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা হইল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয়। সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপনাদি কার্যের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত হরমোহনের নিকট আসিতেন। এই সূত্রে এবং পরে রামধন বসুর বাড়ির নিকটে নরনারায়ণ দত্তের বাসভবনে 'বাঙ্গলা ভাষানুশীলনী সভা'র সভ্য হিসাবে, অক্ষয়কুমার ক্রমশ গুপ্তকবির স্নেহভাজন হইলেন। গুপ্ত-কবির প্ররোচনায় অক্ষয়কুমার পদ্য ত্যাগ করিয়া গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ-প্রভাকরের একজন বিশিষ্ট লেখক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থের কোন কোন অংশ প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের এরূপে গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ২রা পৌষ ১২৬৩ সালের প্রভাকরে তিনি লিখিলেন—"আমি তাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি।" ইহা উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বর গুপ্তের অলঙ্কারকণ্টকিত গদ্যের প্রভাব অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনায় দেখা যায় না।

খুব সম্ভব ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার ভাগ্যোন্নতির সূত্রপাত। এই সভা প্রথমে তত্ত্বরঞ্জিনী এই নামে ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকার্যের সহায়তার জন্য ২১শে আশ্বিন ১৭৬১ শকে (ইং ৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ সালে) দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁহার জোড়াসাঁকো বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২রা কার্তিক দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহার নাম পরিবর্তিত হয়—তত্ত্ববোধিনী সভা। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ এই সভা সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার"। পরে ১৭৬৩ শকে (ইং ১৮৪১ সালে) ইহা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া, ১৭৮১ শকে (ইং ১৮৫৯ সালে) বিশ
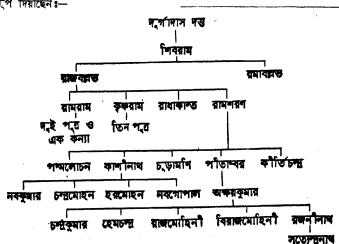
* নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস: অক্ষয়-চরিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। ভাদ্র ১২৯৪ সাল॥ এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত। আর্যদর্শনের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সঙ্কলিত। কলিকাতা ১২৯২ সাল॥ —সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ অনেকাংশে এই দুইটি জীবন-চরিত অবলম্বনে লিখিত।

বৎসর পর লুপ্ত হইয়া যায়। লুপ্ত হইবার প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়া রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে এই সভা কিছুকাল ধরিয়া বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ইহা তুলিয়া দেন। ১১ই পৌষ ১৭৬১ শকে (ইং ১৮৩৯ সালে) অক্ষয়কুমার সভ্য মনোনীত এবং ইহার পর সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইং ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শেষোক্ত পদ ত্যাগ করেন। ইহা উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্ম না হইয়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৩ই জুন ১৮৪০ সালে বাংলা ভাষায়, শিক্ষাদানের জন্য স্থাপিত হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে, এখন যেখানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ি সেইখানে, দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অনুগামী তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত করেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত করিয়াছেনঃ "স্বধর্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে। পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।" ১৭৬২ শকের ১লা আষাঢ় (ইং ১৮৪০ সালে) অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। এই সূত্রে তিনি ইং ১৮৪১ সালে 'ভূগোল' ও ১৮৫৬ সালে (শ্রাবণ ১৭৭৮ শকে) "পদার্থবিদ্যা" এই দুই গ্রন্থ উক্ত সভার আনুকূল্যে ও মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়োগ স্থায়ী হইল না। ইং ৩০শে এপ্রিল ১৮৪৩ সালে (১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখে) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হইলে অক্ষয়কুমার ইহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। পরে ১৮৪৭ সালে উক্ত পাঠশালা অর্থাভাববশত বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু এই সময় অন্য একটি কার্যে অক্ষয়কুমারের সুযোগ উপস্থিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার একটি মুখপত্র প্রচারের প্রয়োজন দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন এবং ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র মাসে (ইং ১৬ই আগস্ট ১৮৪৩ সালে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন, তখন টাকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্র ইং ১৮৪২ সালের জুন মাসে প্রকাশ করেন; এই পত্রের ছয় সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল। সাময়িক পত্র পরিচালনে ইহাই অক্ষয়কুমারের প্রথম অভিজ্ঞতা, যাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার উপকারে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপিত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকেই সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। যদিও এই পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ নির্বাচনী সমিতি (Paper Committee) ছিল, যাহার পাঁচ জন সভ্যের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র* প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী, কার্যত অক্ষয়কুমারই ইহার সম্পাদনা করিতেন এবং ১৮৪৬ সাল হইতে সম্পাদক পদবীতে উন্নীত হইয়া ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সর্বসমেত বার বৎসরকাল দক্ষতার সহিত এই ভার বহন করেন। পত্রিকার একটি সংখ্যায় (১৭৭৫ শক আষাঢ়) বিবৃত হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য ছিল "পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত, ধর্মনীতি, স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, শারীর স্থান, শারীর বিধান" প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক বহু প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অক্ষয়কুমারের কয়েকটি সারগর্ভ রচনা এই পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়া তাঁহার পরবর্তী পুস্তকগুলিতে গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেনঃ "অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।" (বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ২৫)। কি ভাবে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অক্ষয়কুমারের লেখা সংশোধিত হইত, তাহার কিছু বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার আত্মজীবনীতে এই পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ "তিনি (অক্ষয়কুমার) যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ-পাতাল প্রভেদ!" তথাপি, দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেনঃ "তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"

কিন্তু বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্ম এই তিনটি গুরুতর বিষয় লইয়াই অক্ষয়কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ হইয়াছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি বিশিষ্ট মতবাদে অক্ষয়কুমার বিশ্বাসী ছিলেন না। বেদ বা বেদান্ত অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। দেবেন্দ্রনাথও পরে এ মত পরিত্যাগ করেন (ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃঃ ৩১-৩২)। ইহার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'ষড়দর্শন-সংবাদ' (Dialogues of the Hindu Philosophy, Calcutta, 1867) গ্রন্থে এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ "তদীয় আদ্য গুরু রামমোহন রায় শ্রুতি স্মৃতি সর্ব শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরে তদনুচরেরা ক্রমশঃ স্মৃতি পুরাণ ব্রহ্মসূত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সহজ জ্ঞানকেই কেবল শিরোধার্য করিলেন।" (পৃঃ ৪৬২)।

অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। তিনি এইরূপ গণিতানুযায়ী সমীকরণ করিয়াছিলেনঃ

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

অতএব প্রার্থনা = ০!

তিনি বিশ্বাস করিতেন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই ধর্ম, না করাই

* এক রাজনারায়ণ বসু ছাড়া ইহারা কেহই ব্রাহ্ম ছিলেন না।

আদর্শ। এই উদ্দেশ্য লইয়াই যে তিনি বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রস্তাবটি লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন ঃ "অতএব এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্মশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী"। কিন্তু এ মত যে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই, তাহা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে পূর্বোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।

সংস্কৃতে না হইয়া বাংলায় মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা অক্ষয়কুমার প্রথম প্রচলিত করেন রাখালদাস হালদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বল্প-কালস্থায়ী খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজে। পরে দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম-প্রতিপাদক বাক্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম নামক পুস্তক ১৭৭২ শকে (ইং ১৮৫০ সালে) প্রকাশ করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার শাস্ত্রমত ছাড়িয়া যুক্তিপথই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল বৈজ্ঞানিকের মন—অনুসন্ধিৎসু, সমালোচনাধর্মী ও বস্তুবিশ্বাসী। প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে যে চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা দিয়াছিলেন,* তাহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার উদার লক্ষ্য বলিয়া এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ঃ "অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গোতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোন্ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যিশু ও চৈতন্য পরমার্থবিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।"

এইরূপ স্বাধীন চিন্তা ও উদার মতের প্রবর্তন করিয়া অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বর্তী হইয়াও ইহার বিশিষ্ট ধারণা ও কার্যপদ্ধতির অনেক সংশোধন বা উন্নতিসাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তথাপি, ইহার দ্বারা সাধারণভাবে তিনি যুক্তিপথাবলম্বী নব্য-সম্প্রদায়ের ভাব ও চিন্তার গতি অনেক পরিমাণে চালিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইন্ডিয়ন মিরর (Indian Mirror) পত্রিকা (১৫ই জুলাই, ১৮৭৭) যে মন্তব্য করিয়াছিল তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়ঃ "The negative, critical and destructive part of the work of the Brahmo Samaj, thirty years ago, was principally done by

অক্ষয়কুমার

him." কিন্তু এরূপ নানা মতবিরোধ থাকিলেও উদারচেতা দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়-কুমারের প্রশংসা করিয়াই তাঁহার 'ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' পুস্তকে (পৃঃ ২১) লিখিয়াছেনঃ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়-বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।" এই পত্রিকার দ্বারা মুখ্যত ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য সিদ্ধ হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুবিধ লোকহিতকর আন্দোলনের সহিত যোগ ছিল বলিয়া, এবং কেবল অক্ষয়কুমার নয় বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মণীষীর সম্পর্কে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে-যুগের অগ্রগণ্য পত্রিকা হিসাবে শিক্ষিত সমাজের সাধারণ ভাব ও চিন্তার শক্তিশালী নিয়ামক ছিল।

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনা প্রথম এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং পরে অনেকগুলি (যথা 'বাহ্যবস্তু', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'চারুপাঠ' ১ম ভাগ, 'উপাসক-সম্প্রদায়' ইত্যাদি) সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি সাময়িক ও সামাজিক বিষয়ে বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্র-মত অনুসরণ না করিয়াও যুক্তির দ্বারা বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের প্রায় দশ বৎসর পূর্বে (তত্ত্ব-বোধিনী, অগ্রহায়ণ শক ১৭৭২) তিনি 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নীলকর-দিগের উৎপীড়নের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার সময় অক্ষয়কুমারের সহিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইং ১৮৫৫ সালের প্রথমার্ধে বিদ্যাসাগর কতকগুলি মডেল স্কুল বা আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি নর্ম্যাল স্কুলের প্রয়োজন হইল। এই সময় পীড়া ও অন্যান্য কারণের জন্য অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্ম সমাজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিদ্যাসাগরের সুপারিশে ইং ১৭ই জুলাই ১৮৫৫ সালে তিনি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার 'বাহ্যবস্তু' ১ম (১৮৫১) ও ২য় ভাগ (১৮৫৩), চারুপাঠ ১ম (১৮৫৩) ও ২য় ভাগ (১৮৫৪), এবং 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে বিদ্যাসাগরের লিখিত সুপারিশ পত্রেঃ

He is one of the very few best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable, and he is well informed in the elements of general knowledge, and well acquainted with the art of teaching.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে

---

* ধর্মসংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব।
Discourse on the Religious Improvement of Mankind, being the last of five speeches delivered at the Brahmo Samaj at Bhawnipore in the year 1854.

কলিকাতা ১৮৫৫, এই পঞ্চম বক্তৃতাটি ১৭৭৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের বেতন ত্রিশ টাকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ষাট টাকায় দাঁড়াইয়াছিল; এক্ষণে নর্ম্যাল স্কুলে তাঁহার বেতন হইল একশত পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এই সম্মান ও অর্থ-সচ্ছলতা তিনি বেশি দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব সঞ্চিত শিরঃপীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল*। তিন বৎসরমাত্র তিনি এইপদ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারও মধ্যে অনেক সময় পীড়াবকাশেই যাপিত হইয়াছিল। অবশেষে ইং ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি এ কাজ ছাড়িয়া দেন। এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পঁচিশ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাংসারিক ক্লেশ হইতে কতকটা মুক্ত করিল। পরে পুস্তক-গুলির আয় বাড়িয়া যাওয়াতে এই বৃত্তি তিনি ১৭৮৪ শকের পর আর গ্রহণ করেন নাই। শিরোরোগে কাতর হইয়া তিনি পল্লীগ্রামে অবস্থান স্থির করিয়া, বালিগ্রামে গঙ্গাতীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর উদ্যান সমেত 'মোহন-উদ্যান' নামে বাটি নির্মাণ করিয়া বাস করেন। সেখানে মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া এবং বাগানের গাছপালা পরিচর্যা করিয়া আনন্দ পাইতেন। ইহার বহুপূর্বেই বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। Indian Messenger (*May 30, Sunday 1886*) পত্রে রাজনারায়ণ বসু ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned antagonistic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects."

১৮০৮ শকের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৮৬ সালের ২৮ মে) তারিখে দীর্ঘকাল উৎকট রোগভোগের পর ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাধারণ সংস্কারমূলক আন্দোলনে যে অক্ষয়কুমারের কত উৎসাহ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে যুক্তিবাদী নব্য সম্প্রদায়ের সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃৎ সমিতিতে তাঁহার যোগদানে। এই সমিতি ইং ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার সিঁথি-সাতপুকুরস্থ ভবনে প্রথম স্থাপিত করেন। প্রথম অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে এই সমিতির উদ্দেশ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছিল : "স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য বিবাহ বর্জন এবং বহু বিবাহ প্রচলন রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।" ইহার সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগ্ম সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন তৎকালে প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদের ভ্রাতা প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার প্রভৃতি; ইঁহারা কেহই ব্রাহ্ম ছিলেন না।

কিন্তু তৎকালীন যুক্তিবাদী সমাজ-সংস্কারক নব্য সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য হইলে অক্ষয়কুমারের প্রাধান্য ও ক্ষমতার কারণ ছিল লেখক হিসাবে তাঁহার প্রতিপত্তি। বাংলা গদ্যের অন্যতম নির্মাতা ও বিদ্যাসাগরের সহযোগী বলিয়া তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন। তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি নির্ভর করে মুখ্যত তিনটি রচনার উপর—বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দুই ভাগ; চারুপাঠ, দুই ভাগ; এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দুই ভাগ; কিন্তু এই তিনটি পুস্তকই মৌলিক রচনা নয়, অল্পবিস্তর ইংরেজী হইতে সংকলন।

প্রথম পুস্তকটি George Coombe রচিত Constitution of Man নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। এই পুস্তকের মূল তাৎপর্য অক্ষয়কুমার ১ম ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

"শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব প্রণীত "কানসটিটিউশন অব ম্যান" নামক গ্রন্থে... তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। ......ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সংকলনপূর্বক 'বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।...... তদনুসারে পুনর্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে।"

পুনরায় দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন : —"বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-প্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। এ পর্যন্ত কতপ্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কিরূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।"

এই অভিপ্রায় অনুযায়ী যে সকল বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

১ম ভাগে। প্রাকৃতিক নিয়ম; মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি; প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী; মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়; শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; শারীরিক সুস্থতা ও বলাধান; অন্নগ্রহণ; জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবনাদি; শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তিচালনা; শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সকল অনিষ্ট হয় তাহার উদাহরণ; পিতা-

---

* *তাঁহার 'ধর্মনীতি' গ্রন্থের (১৮৫৬) বিজ্ঞাপনে এই "উৎকট" পীড়ার উল্লেখ রহিয়াছে।—যে অভিপ্রায় লইয়া 'বাহ্যবস্তু' রচিত হইয়াছিল, 'ধর্মনীতি' পুস্তক তাহারই অনুবৃত্তি। ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, ধর্ম-প্রবৃত্তির উন্নতিসাধন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা, বালকদিগের শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে। ইহা প্রথম ভাগ বলিয়া কথিত, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু ঠিকই বলিয়াছেন— "অক্ষয়বাবুর প্রণীত বাহ্যবস্তু ও ধর্মনীতি তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে অনুবাদ মাত্র।"*

মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্তে তাহার বিবরণ; অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের বিবাহের অকর্তব্যতা; নিকট সম্পর্কীয়ার পাণিগ্রহণের অনৌচিত্য; ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করার বৈধতা। মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ; দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি; প্রসব বেদনা; অবৈধ বিবাহের ফল; মৃত্যু। আমিষ ভক্ষণের অবৈধতা।

২য় ভাগে। ধর্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার। সামাজিক নিয়ম; প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডবিধানের বিবরণ; নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য; প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কি না; বিদ্যা ও ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার। সুরাপান।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই পুস্তকে অক্ষয়কুমার নিরামিষ আহারের অনুমোদন করিয়াছেন এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন—যদিও এই দুইটি বিষয়ে তিনি সর্বদা নিজের উপদেশ নিজে পালন করিতেন কি না সন্দেহ! সুতরাং এই সব মতবাদ লইয়া তাঁহারই পূর্ববন্ধু ঈশ্বর গুপ্ত 'বাহ্যবস্তু'র যে উপহাস করিয়াছেন তাহা বিচিত্র নয়—

আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুরে ফিরে ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার বাহ্যবস্তু মানবপ্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি আর কই॥
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাছ মাস বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বলবুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পড়ে পূর্ব ভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আগে আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দাও ছেলে খেলা ফেলে দাও "কুম"।
মাছ মাস ভাত খেয়ে সুখে দাও ঘুম॥
করো নাক ধুমধাম টুমটাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
—ইত্যাদি।

চারুপাঠ পুস্তকটি এককালে বহুদিন ধরিয়া পাঠ্যপুস্তক ছিল বলিয়া অধিকতর সুপরিচিত; সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। প্রস্তাবগুলির কয়েকটি তত্ত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব-পদার্থ-সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়া সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন', 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি এককালে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, বাহ্যবস্তু অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, কিন্তু চারুপাঠে (বা ধর্মনীতিতে) তত আড়ম্বর নাই; এই অভিমত যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩) গ্রন্থের প্রথম ভাগের অনেকাংশ প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহা হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেবের Religious Sects of the Hindus নামক প্রবন্ধের (যাহা Asiatic Researches, ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় তাহার) সারাংশ সংকলন করিয়া লিখিত। কিন্তু ইহাতে অক্ষয়কুমার নিজের অনুসন্ধানের পরিচয়ও দিয়াছেন। প্রথম ভাগে প্রায় বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপ সংগৃহীত হইয়াছে। তুলনা করিলে দেখা যায়, সম্প্রদায় হিসাবে—

উইলসনের গ্রন্থে—বৈষ্ণব ২১+শৈব ১৮+শাক্ত ৬=মোট ৪৫। কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে—বৈষ্ণব ৯৯+শৈব ৫৯+শাক্ত ২৪=মোট ১৮২।

দুরারোগ্য রোগে পীড়িত হইয়াও অক্ষয়কুমার অনেক পরিশ্রম করিয়া পুস্তকের দুইভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় ভাগ লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহাই সপ্রমাণ করা যে, ধর্মবিষয়ক সত্য কালে কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করে; হিন্দু ধর্মেও ইহার ব্যত্যয় ছিল না। আধুনিক গবেষণা দ্বারা অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, সত্য, কিন্তু গত যুগে রচিত এই সারগর্ভ পুস্তকে অক্ষয়কুমারের বিদ্যা-বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা ও সারগ্রাহিতার যে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহার মূল্য কিছু কম নহে।

লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমার তাঁহার যুগে যে সুখ্যাতি পাইয়াছেন, পরবর্তী যুগের অনেক সমালোচক তাহার অনুমোদন করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, লেখার রুচি ও সৌষ্ঠব পরবর্তী যুগে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্বে যে সকল মনীষী বাংলা গদ্যের চর্চা করিয়া ইহার মোটামুটি রূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ না হইলেও অক্ষয়কুমার একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার রচনাকে ঠিক রসরচনার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তিনি ছিলেন প্রধানত প্রবন্ধকার, এবং তাঁহার লেখ্য বস্তু ছিল গুরুগম্ভীর ও জ্ঞানমূলক। পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক নিয়মের আলোচনা, ধর্মনীতি বা ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের ইতিহাস লিখিবার জন্য

স্কেচ— শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

তাঁহাকে অনুরূপ সাধুভাষা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষণ বা আলোচনার উপযোগী তাঁহার বাক্যরীতি খুব সহজ বা রসসংপৃক্তা হইয়া ওঠে নাই। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য এবং নূতন শব্দ-গঠনের প্রয়োজন অনিবার্য হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনায় কঠিন, সংস্কৃতবহুল ও অমসৃণ। সমাসের আড়ম্বর নাই, কিন্তু সমাস পরিহার করা সম্ভব ছিল না। এই সকল কারণে তাঁহার রচনা সর্বত্র সুখপাঠ্য হয় নাই। কিন্তু যেখানে কেবল তথ্য বা যুক্তি নয়, অন্তরের আবেগ তাঁহার লেখনীকে চালিত করিয়াছে সেখানে তাঁহার লেখা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (চৈত্র ১৭৭৬) বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছিঃ

"যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রুধার আবির্ভাব হয় না, তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিনকালে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যিনি কোন নববিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যোমৃত প্রিয়পতির শোকমোহে মুহ্যমানা ধরাতলে লুণ্ঠমানা, অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্বে স্বামি-সমাদরে মানিনী ও গৌরবিণী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণশরীরে সাশ্রুনয়নে দিনপাত করিতেছে এবং স্বামিসম্পর্কীয় বিদ্বেষিণীরমণীগণ কর্তৃক নানাপ্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাস-দাসীগণ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতরস্বরে প্রতিবেশীগণের দয়ার্দ্র-হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?'......যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোন কালে কলঙ্কস্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃকুল মাতৃকুল ও ভর্তৃকুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণবধজনিত অশুদ্ধশোণিত-সংস্পর্শে লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারংবার অশৌচগ্রস্ত করিয়াছে,' তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' কোন পতিবিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহারসামগ্রী অর্পণ করিল না, জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?'"

শ্নটি অনেকের কানেই অদ্ভুত শুনাইবে। শরীর আবার লোকের কয়টা থাকে? শরীর ত একটাই—মাতৃগর্ভে একটু বুদ্বুদ মাত্র অবস্থা হইতে কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত হইয়া তাহা ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যৌবনে পরিপুষ্ট হয়, বার্ধক্যে সেইগুলি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, সর্বশেষ মৃত্যু এবং চিতাভস্মে বা কবরের মাটিতে পরিণতি।

তার পর কাহারও কাহারও মতে ইহাও বলা যায়, মানুষের শরীর এ কথাটাই ঠিক নয়, রাহুর শিরের মত অপ্রামাণিক কথা। শিরটাই রাহু, শরীরটাই মানুষ। শরীর কৃশ বা দুর্বল বা রুগ্ন হইলে লোকে কি বলে না, আমি কৃশ বা দুর্বল বা রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি?

হাঁ, তা বলে, আবার ইহাও ত বলে, আমার শরীরটা সুস্থ নয়, ক্রমশ দুর্বল হইতেছে। এখানে শরীর হইতে 'আমি'কে পৃথক বলিয়াই লোকে ধরে। তবে সেই 'আমি'র স্বরূপটা স্পষ্ট সকলের বোধগম্য নয় ইহাও স্বীকার্য। পণ্ডিতেরা বলেন ইহারই নাম অবিদ্যা।

শরীরটাই যে মানুষ, শরীরাতিরিক্ত মানুষ বলিয়া কিছু নাই এ মত দর্শন-শাস্ত্রেও স্থান পাইয়াছে। ইহাকে বলা হয় লোকায়ত মত popular view, এই মতে আত্মা বলিয়া কিছু নাই। পান্তা ভাত গুড় ইত্যাদি যেমন সময়ে মাদকতা শক্তি অর্জন করিয়া মদ বলিয়া গণ্য হয়, শরীরের উপাদানগুলিও সেইরূপ জীবনীশক্তি অর্জন করে। তাহাকে আত্মা বলিতে হয় বল, কিন্তু সেটা শরীরেরই ধর্ম বলিয়া জানিও। আমাদের দেশে প্রবাদ এই যে, এই মতকে যিনি যুক্তি দ্বারা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম চার্বাক (চারু-বাক্)। তাঁহার উপদেশগুলি মনোরঞ্জক বলিয়া ঐ নাম লোকে তাঁহাকে দিয়াছিল। স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদি না থাকিলে আর কষ্ট করিয়া ধর্মার্জনের দরকার কি? জাগতিক সুখ যথেচ্ছ উপভোগ করিয়া যাও।

কিন্তু কোনও দেশেরই ধর্মশাস্ত্র এই মতটা মানিয়া লয় নাই। দেহ-সঙ্গে আত্মার উদ্ভব এবং দেহ-সঙ্গে তাহার বিনাশ ইহা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ নয়, সাধুসন্তগণের (যোগিগণের) অনুভব দ্বারাও সমর্থিত নয়। লোকে কত সৎকার্য করে, তাহার সমুচিত পুরস্কার সব সময়ে পায় না, অসৎকার্যও করে, তজ্জন্য সমুচিত দণ্ডও পায় না। শাস্ত্র বলে, স্বর্গে বা নরকে বা পুনর্জন্মে ঐ সবই পাইতে হইবে। কিন্তু পাইবে কে? আত্মা (অর্থাৎ জীবাত্মা)-ই পাইবে। কি প্রকারে? না, উপযুক্ত এক একটা দেহ আশ্রয় করিয়া। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য তাহাকে দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় স্থূল। মানুষের যে শরীরটা চক্ষে দেখা যায়, হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়, সেটা তাহার স্থূল শরীর। ইহার ভিতরে আছে আর একটা শরীর—তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর, সেটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। স্থূল শরীরের পতন হইলে জীবাত্মা সেই সূক্ষ্ম শরীরটি লইয়া স্বর্গে বা নরকে যায়, এবং তৎসহ দেবদেহ বা নারকীয় দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানকার ভোগের শেষে পুনরায় মনুষ্যলোকে আসিয়া আর একটা নরদেহে (বা কর্মানুসারে যে কোনও জীবদেহে বা জড়দেহে) প্রবেশ করে। তাহা হইলে এই সূক্ষ্ম শরীরটা হইল মানুষের দ্বিতীয় শরীর। ইহাতে থাকে কি? স্থূল দেহের স্থূল উপাদানগুলি বাদ দিয়া আর সবই থাকে। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সতরটা অবয়ব থাকে। সুখ দুঃখ মোহ ভোগ মনের ব্যাপার হইলেও, সূক্ষ্ম শরীর হইতে সে তাহা পায় না, তজ্জন্য তদুপযুক্ত একটা স্থূল দেহ চাই। সূক্ষ্ম শরীরটা কি অমর?—না অমর নয়; ইহারও পতন বা লয় হয়। লয়গত হয় বলিয়া ইহার আর একটা নাম লিঙ্গ—লিঙ্গশরীর।

জীবাত্মার যখন ভোগের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর থাকে না, লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহাই তাহার শেষ দেহ নয়; উহার ভিতরে আছে সূক্ষ্মতর আরও একটা দেহ, তাহার নাম কারণ-দেহ। ভোগ শেষ হইয়াছে কিন্তু জ্ঞানের উদয় হয় নাই বা হইলেও সম্পূর্ণ বিকাশ বা পরিপাক হয় নাই এই অবস্থায় জীবাত্মা ঐ কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বুঝিতে হইবে না, তাহা মনের ব্যাপার। যে জ্ঞানের পরিপাকের অপেক্ষায় কারণ-শরীর থাকে সেটি ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান। কারণ-শরীরে জীবাত্মা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা আবৃত থাকেন। কিন্তু জ্ঞান না থাকিলেও এই শরীরে বা দশায় আনন্দের প্রাচুর্য আছে।

তরবারির খাপকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় কোষ। আত্মাকে যদি একটি তরবারি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার কারণ-শরীরটিকে বলা যায় একটি কোষ,—সর্বনিম্নতম কোষ। আনন্দপ্রচুর বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে আনন্দময় কোষ। সূক্ষ্ম শরীরটি একটা কোষ নয়, তিনটা কোষের সমষ্টি, নীচের দিক হইতে তাহাদের নাম বিজ্ঞানময় কোষ (এই বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্য, ইহা বুদ্ধির ধর্ম), মনোময় কোষ ও প্রাণময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ হইতেছে জ্ঞানশক্তিমান কর্তা, মনোময় কোষ ইচ্ছা-শক্তিমান কারণস্বরূপ, প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান কার্যস্বরূপ। ইহার উপরে স্থূল দেহ, একটি মাত্রই কোষ; নাম অন্নময় কোষ, কেননা উহা অন্নেরই বিকার।

উক্ত তিন শরীরে জীবাত্মার তিনটা ভিন্ন নামও কথিত হইয়াছে। স্থূল শরীরাশ্রিত আত্মার নাম বিশ্ব, সূক্ষ্মশরীরাশ্রিত আত্মা তৈজস, আর কারণশরীরাশ্রিত আত্মা প্রাজ্ঞ। এই নামগুলির ও কোষগুলির অধিক বিশ্লেষণ আর এখানে করিব না।

বেদবেদান্তাদি চিরন্তন সর্বমান্য—যাহাকে বলা যায় official—শাস্ত্রমতে মানুষের এই তিনটিই দেহ। কারণদেহের—অজ্ঞানের—আনন্দময় কোষের ধ্বংসে জীবাত্মা পরমাত্মায় নির্বাণ বা বিদেহমুক্তি লাভ করেন। কিন্তু official শাস্ত্রোক্তির বাহিরে সন্ত মহাত্মগণের অনুভবসিদ্ধ মত আছে যাহার মর্যাদা নগণ্য নহে। মহাত্মা কবীর ইঁহাদের অন্যতম এবং বোধ করি প্রধান। ইঁহারা বলেন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীর মায়া রাজ্যের বস্তু। সিদ্ধ যোগীরা মায়ার আবরণ কাটিয়া গেলে ব্রহ্মনির্বাণ কামনা করেন না। তাঁহারা চাহেন ব্রহ্মাস্বাদ যাহা

জলপ্রপাত-- শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মায়ার রাজ্যে লভ্য নয়। মায়ার গণ্ডীর পরে রহিয়াছে বিন্দুর রাজ্য; ইহাকে কুণ্ডলিনী বা মহামায়ার রাজ্যও বলে। এই রাজ্যে প্রবেশের passport বা অধিকার লাভ হয় সদ্‌গুরু প্রদত্ত দীক্ষা হইতে। দীক্ষা দ্বারা কারণ-দেহের অন্তরে মহাকারণ-দেহের আবির্ভাব হয়। উহাকে বৈন্দব-দেহও বলা হয়। ঐ দেহ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বা নির্মল জ্ঞানময়। এখানে শুদ্ধসত্ত্বাত্মক মন থাকে বলিয়া ইহাকে সমনাঃও বলে। যোগীরা যে ষট্‌ চক্রের কথা বলেন, তাহার ঊর্ধ্বতম চক্র হইতেছে আজ্ঞাচক্র, নরদেহে তাহার স্থান দ্রুযুগলের সন্ধিস্থলে। ইহার উপরে সমনাঃ তারও উপরে উন্মনাঃ। দুইয়ের মধ্যেও একটি দশা আছে যাহাকে বলে কৈবল্য। এইখানে বিন্দুর বা মহামায়ার রাজ্য শেষ হইয়া ভগবদ্‌রাজ্যের আরম্ভ। এখানে মানুষের চতুর্থ শরীর যে বৈন্দব দেহ, তাহার নীচে অর্থাৎ অন্তরতর কৈবল্য দেহের প্রকাশ হয়। সাংখ্যশাস্ত্রে একপ্রকার কৈবল্যের কথা আছে, যখন পুরুষ বা জীবাত্মা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অনাবিল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বেদান্ত শাস্ত্র জাগ্রৎ (স্থূল শরীর,—অন্নময় কোষ), স্বপ্ন (সূক্ষ্ম শরীর—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ) এবং সুষুপ্তির (আনন্দময় কোষের) পরে তুরীয়, বিদেহ বা কৈবল্য দশার কথা স্বীকার করেন। এই কৈবল্য এবং সাংখ্যেরও কৈবল্য হইতে সন্তগণের সম্মত কৈবল্য (সমনাঃ ও উন্মনার মধ্যবর্তী ভাব) পৃথক্‌ ও অনেক উচ্চ বা সূক্ষ্ম। সাংখ্যের কৈবল্যে পুরুষের (আত্মার) দৃশ্য কিছু থাকে না। বেদান্তের কৈবল্যে দৃশ্য দ্রষ্টা এক হইয়া অদ্বৈত অবস্থা হইয়া যায়। সন্তগণের কৈবল্যে অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত, ভগবানের সঙ্গে অভেদে ভেদ বোধ আসে। এই ভেদে আমি আমি, তুমি তুমি এই পৃথক্‌ বোধ থাকে না। আমির অর্থ হয় তুমি, তুমির অর্থ হয় আমি। ইহাই বৈষ্ণবদের কুঞ্জভঙ্গ: রাধার পরিধান কৃষ্ণের বস্ত্র, কৃষ্ণের পরিধান রাধার বস্ত্র।

এই কৈবল্য দেহের পরে আছে হংস দেহ —মানুষের সর্বশেষ বা ষষ্ঠদেহ। ইহার পতন নাই। ইহা উন্মনাঃ অবস্থা বা ভগবৎ পার্ষদের দেহ। ভগবানের নিত্য-লীলায় প্রবেশে বা তাহার অংশ গ্রহণে এই দেহেরই অধিকার।

বলা বাহুল্য, উপরে বিবৃত তত্ত্বাবলী সম্পর্কে আমার নিজের কোনও অনুভব নাই। মায়ারাজ্যের কথা পুস্তকে যেমন পড়িয়াছি এবং মায়াতীত রাজ্যের কথা মহাজনমুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম। পাঠক সাধন দ্বারা এইসব তত্ত্ব অনুভব করিতে উৎসাহী ও সমর্থ হউন ইহাই আমার প্রার্থনা।

সদানন্দের চিত্তশুদ্ধি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সব শুনেটুনে গুরুঠাকুর বললেন — "যেমন দেখছি, তোমার ছেলের আগে চিত্ত-শুদ্ধি দরকার।"

হরঠাকরুন আঁচলে চোখদুটো মুছে িয়ে বললেন—"যা হয় সিচরণের একটা িহিত কর বাবা। ঐ তো বললুম আর ান দোষ নেই বাছার আমার, শুধু ঐ মন বারমুখো হয়ে উঠছে দিনদিনই। াথায় যাত্রা হবে তার ম্যারাপ বাঁধতে ব, কোথায় কথকতা, তার আসর তৈরি াতে হবে, তারপর আজকাল আবার ন কি-সব হয়েছে—কবে কোথায় কে রেছে—দশ দিনের জ্ঞাতি হওয়া দূরে থাক, পুরুষের কেউ নয় বাবা, তার জন্যে দল ধে মাথাকোটা—এর ওপর হুটোপুটি পিটেপনা তো রয়েছেই লেগে। অমন গাং, তা সেটাকে তো গোষ্পদ হেন করে ছে। তা কর, বাউণ্ডুলেপনার বয়েস, টা বাঁচিয়ে যা ইচ্ছে করগে, বারণ করছি কিন্তু বাড়ির ওপর একটা টান থাকবে ? তিলমাত্র নেই। এবার সতের ছেড়ে ারয় পড়বেন, আর কি মানায়? বলনা ? বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু খাওয়া-টুকু নিয়ে। গোঁসাইয়ের দয়া, আর সাত পুরুষের গুরুবল, ক্ষিদেটি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না, পেট কাঁদলেই ছুটে ছুটে আসতে হয়, তাইতেই যা একটু টের পাই—হ্যাঁ,গয়ায় পিণ্ডি দেবার মতন এখনও যাহোক একটা রয়েছে।...তা সে নিত্যি। সদর থেকে 'মা!' বলে একটা হাঁক দিলে, হাত আজাড় রইল তো নিজেই ভাঁড়ারে ঢুকে গেল—মুড়ি, চিঁড়ে, পাটালি মণ্ডা, বাতাসা, যা হাতের কাছে পেলে ঢেলে নিলে, নয়তো একছড়া কলাই—তাড়াতাড়ি কোনরকম করে নিলে পেটে পুরে, তারপর 'মা আসি!'—ব'লে চৌকাঠ পার। একটা ভালমন্দ যদি কিছু করে রাখলাম—দুধটা তো সোঁত বছরই থাকে, তা সে তো..."

"মা আছিস?"—বলে সদর দরজায় একটা ডাক, সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছেলে হনহন করে উঠোনে এসে দাঁড়াল। রংটা কালোর দিকেই। কি একটা মেহনতের কাজে ছিল বোধ হয়, মুখটা তামাটে হয়ে উঠেছে, কপালে ঘাম ঝরছে। বেশ লম্বা চওড়া, এত-খানি বুকের ছাতি। এদিকে কসরত করা ছেলেদের মত যে খুব পেশিবহুল, তা নয়। খেয়েদেয়ে হেসে-খেলে নির্ভাবনায় জীবন কাটিয়ে বেড়াতে পারলে পাড়াগাঁয়ের ছেলে-দের শরীরটা যেমন দাঁড়ায় সেইরকম। বাঁ-গালের উপর দিকে প্রায় ইঞ্চিখানেকের একটা কাটা দাগ, তাতে লালিত্য বাড়ায়নি নিশ্চয়, তবে পৌরুষের দিকটা আরও যেন জাগিয়ে তুলেছে। বয়স সতের হলেও দেখতে যেন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি যুবা।

নূতন লোক দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। তবে তার বেশী কৌতূহল প্রকাশ না করে, যেন, যে-সময়টুকু গেল সেটুকু পূরণ করে নেওয়ার জন্যেই দুতিনটে লাফে উঠোন ডিঙিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে চলে গেল, হাঁড়িকুড়ি ওটকাতে ওটকাতে বললে—"ছানার মুড়কিগুলো শেষ করেছিস, না, নুকিয়েচিস্ কোথাও?"

হরঠাকরুন একবার গুরুঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেন—"ঐ নাও!" উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে বললেন—"ওরে তুই বেরিয়ে এসে আগে বাবাকে গড় করে যা, এবার বৃন্দাবনে গিয়ে কত পুন্যির জোরে দর্শন পেলাম, পায়ের ধুলো দিয়েছেন।"

"তুই যেখান থেকে সেদিন প্যাঁড়াগুলো নিয়ে এলি?"—বলতে বলতে বেরিয়ে এসে

সঙ্গের লোকটার সামনে যে খড়ম-বাঁধা পোঁটলাটা রয়েছে, তার দিকে চাইলে একবার। হরঠাকরুন হাতটা ধরে বললেন—"নে, গড় কর; কত ভাগ্যি তাই পড়ল পায়ের ধুলো। ...আছে মুড়কি, আমি নিয়ে আসছি, তুই ততক্ষণ থির হয়ে বসে দুটো সি-মুখের কথা শোন দিকিন।"

ধরেই টেনে নিয়ে এলেন, ধরেই গড় করালেন, বসিয়ে দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেলেন।

গুরুঠাকুর মাথায় হাতটা বুলিয়ে বললেন —"তোমার নামটি কি বাপু?" একবার অধৈর্যভাবে ঘুরে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চেয়ে নিল ছেলেটি, উত্তর করলে—"সদানন্দ।"

গুরুঠাকুর একটু হেসে বললেন—"বাঃ, চমৎকার নাম। তা সদানন্দ, আনন্দের আসল রূপটা...মানে প্রকৃত যা আনন্দ..."

সদানন্দ ভাঁড়ারের দিকেই চেয়ে ছিল— "তুই আবার লুকিয়ে ফেলবি!" বলে উঠে পড়েই আবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।... ঘরের মধ্যে একটু কাড়াকাড়ি ছেনাছিনি পড়েছে, তার সঙ্গে চাপা শব্দ—

"ওরে, গোটাকতক রেখে থো—বাবার জন্যে..."

"পেসাদ এনেচে?—তো তাই দে..."

"লক্ষ্মীবাবা আমার—ও সদু, আমার মাথা খাস..."

ঐটুকুই; সঙ্গে সঙ্গে জামার পকেটে দুটো মুঠো গুঁজে তিন লাফে বারান্দা আর উঠোন ডিঙিয়ে বাইরে চলে গেল সদানন্দ। ঠিক দোরের মুখে শব্দ উঠল—"মা, আসি গো!"

হরঠাকরুন আস্তে আস্তে এসে আবার বসলেন। মুড়কি নিয়ে ছেলের সঙ্গে কাড়াকাড়িতে মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠেছে, একটু যেন অপ্রস্তুত; ওরই মধ্যে আবার কোথায় যেন একটু গর্বও; আর এমন ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে যে খানিকটা ভয়— যার জন্য গুরুঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া, সে তো আছেই।

বসে হাতদুটি কোলে জড়ো করে একটু হাসলেন, তার অর্থ যাই হোক। গুরুঠাকুর কতকটা যেন কথাটা আবার পাড়বার জন্যই বললেন—"ছেলের নাম সদানন্দ?"

হরঠাকরুন বললেন—"নাম তো সদা[…] নয় বাবা, নাম হচ্ছে ছ'কড়ি। নিজের [ছে…] একটাও তো টেঁকল না, তাই ধাইয়ের কা[ছে] কড়ি দিয়ে কেনা; ঐ উনি আর একটি [না]ম তিনকড়ি।...সেবারে রিসিকেশ থে[কে] অবধূত বাবা এলেন না? তিনিই বললেন 'বেটি, ও আনন্দ নিয়েই আছে। ঐভাবে থাকতে দে।' তাই সদানন্দ নাম দিয়ে গেলে[ন]। তারপর কি করে ঐ নামটাই দাঁড়িয়ে গেছে। তা থাক না ওর আনন্দ নিয়ে বাবা, আ[মি] কি হন্তারক হচ্ছি? স্বভাব-চরিত্রে এতটুকু দাগ নেই, একথা আমি গাঁয়ের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে বলব; রাগ তা কাকে বলে জানে না, পেটটুকু ভরা রইল তো সদানন্দ আমার সত্যিই সদানন্দ বাবা। তা আমি বলি, তুই থাক না তোর আনন্দ নিয়ে —তোর কিসের অভাব যে, তুই মুখ গোমড়া করে বেড়াবি? যা রেখে গেছেন সেইটেকে যদি পাঁচভূতের হাত থেকে আগলে সাগলে রাখতে পারিস...তা দোষ হয়েছে ঐখানে বাবা, আগলে যে রাখবে, তা নিজের সম্পত্তির ওপর টান চাই তো গা, তবে তো গিয়ে সম্পত্তি বুঝবে, তার জন্যে দরদ হবে, আমার আর ক'দিন বল না! তাই বলছিলাম —বরাৎগুণে যদি পায়ের ধুলো পড়ল তো তুমি একটা বিহিত করে দাও বাবা, দোহাই।"

গুরুঠাকুর হেসে বললেন—"বললা[ম] তো—দরকার আগে চিত্তশুদ্ধি।"

হরঠাকরুন আবার নড়েচড়ে গুছিয়ে বসলেন, বললেন—"তোমার দ্বারাই হবে বাবা, আমার মন বলছে। কত সাধুসন্নিসী এলেন, কত-কি করলেন। জলপড়া, ধুনির ছাই, মাদুলি, কবচ; ইস্তক হোম-সস্ত্যেন পজ্জন্ত। খরচের কসুর করিনি বাবা, তা যে যেরকম বললেন—কিন্তু কৈ, তুমি ঐ যে সিমুখ দিয়ে উশ্চারণ করলে, ওকথা তো কেউ আর বলেননি। তুমি কর ব্যবস্[থা] বাবা—কি কি লাগবে আমায় ফিরিস্[তি] করে দাও—খরচের জন্যে ভেবো না তুমি।"

গুরুঠাকুর নিস্পৃহভাবে একটু হাসলেন, বললেন—"খরচ যা হবার তাতো করতেই হবে মা, তবে চিত্তশুদ্ধি সে হল আলা[দা] জিনিস। আর কেউ তোমায় বলেনি ত[া] কারণ আর কারুর তো জানা নেই এ-তত্ত্ব। কথাটা হচ্ছে—সদানন্দের আমার সব[ই] ভালো, কিন্তু ষড়রিপুর মধ্যে প্রধা[ন] রিপুটিই যে রয়ে গেছে শরীরে, মন্ত্র-তন্ত্র ও-সব ধরবে কি করে? গোড়া বেঁধে কা[জ] করতে হবে তো..."

"সে কি জিনিস বাবা, কি থেকে গেছে রিপু না কি বললে—শুনেছি কথাটা— তা..."

রিপু হল যাকে তোমরা শত্রু বল। তা লোভের মতন শত্রু তো আর নেই। অমন ভাল ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে—ক্ষণে ক্ষণে—তার শক্তিটা একবার বাজিয়ে দেখতে হবে তো। তাই আগে ঐ শত্রুকে একটু একটু করে ভিটেছাড়া করতে হবে, তারপর খরচের কথা।...খরচ আছে বৈকি, কিন্তু গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে তো।"

হরঠাকরুন ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন, বললেন—"শুধু একটু খাওয়ার দিকে—তা লোভই বল্‌তে হবে বৈকি, তোমার শ্রীমুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে কথাটা—কিন্তু শুধু ঐ একটু খাওয়ার দিকে বাবা—আর কোন দিকে নয়—এ আমি গাঁয়ের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে পারি।"

চোখ মোছবার জন্য আঁচল তুললেন।

গুরুঠাকুর হেসে বললেন—"এই দেখ! তা খাওয়া ওর বারণ করছে কে? যেমন আছে তেমনি চলবে। এর পর যোগসিদ্ধি হলে থাক না কত খাবে তোমার ছেলে—জহ্নু মুনি গঙ্গা শুষে নিলেন এক গণ্ডূষে, অগস্ত্য অমন বাতাপি রাক্ষসটাকে পেটে একটু হাত বুলিয়ে হজম করে ফেললেন। তবে তার পথ তোয়ের করতে হবে তো..."

হরঠাকরুন চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন—"কি পথ তাহলে বল বাবা।"

"কিছু নয়, ঐ রিপুটিকে আগে একটু শায়েস্তা করে নেওয়া, ঐ হতেই খানিকটা চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে, বীজমন্ত্রটা দিয়ে দিতে পারব কানে...এমন কিছুই মহামারী ব্যাপার নয়—শুধু মাঝে মাঝে একটু উপোস...আপাতত দুটি, মাঝে তিনটি দিন বাদ দিয়ে..."

"সদুর আমার উপোস!...ও বাবা-ঠাকুর ..."

হরঠাকরুন একেবারে কপালে চোখ তুলে বসলেন, এত বড় অসম্ভব প্রস্তাবটা শুনে মুখে আর কথা জোগাচ্ছে না।

ও-ভাবটা অবশ্য কেটে গেল আস্তে আস্তে। ভেবে দেখতে গেলে এমন কিছু নতুন কথাও তো নয়; যাই কর না কেন, সব কিছুর গোড়াতেই উপোস। তবু, সদানন্দ কথায় কথায় ছুটে আসছে না বাইরে থেকে, সমস্ত দিন পেটে কিছু পড়েনি, নেতিয়ে পড়ে আছে বিছানায়—এ যেন ধারণার মধ্যেই আনা যায় না। এর ওপর আবার নূতন গুরুঠাকুর এসেছেন, খেটেখুটে এটা-ওটা-সেটা করছেন হরঠাকরুন, ভালোমন্দ যা জানা আছে, ছেলের যাওয়া-আসা ঘন-ঘন হয়ে উঠেছে, মায়ে-বেটায় লুকোচুরি-কাড়া-কাড়ি গেছে বেড়ে—ঠিক এই সময়েই ঝপ করে উপোসের কথা তুলে বসা,—মা হয়ে এ-শত্রুতা কি করে করেন?

হরেক রকম চেষ্টা করলেন হরঠাকরুন—"হ্যাঁ বাবা, ওর হয়ে আমি যদি উপোস দিই—মা-ই তো; একটা নয়, দুটো, একটা দিনও বাদ না দিয়ে?...না হয় বামুন ডেকে, কিছু দান করেই দিচ্ছি। যেমন আদেশ কর... না হয় চাঁড়াল ডেকে একটা বড় করে সিদে..."

হয় সবই, এর চেয়েও সহজে হয়; কিন্তু যে-বাড়িতে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অষ্ট-প্রহর এইরকম হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে-বাড়িতে তাহলে আর গুরুগিরি করে খেতে হয় না। লক্ষ্য তো রেখে যাচ্ছেন, যে-জিনিসটি একটু যত্ন করে তোয়ের করছেন হরঠাকরুন, সেটি আর একবারের বেশী দুবার করে পাতে এসে পড়তে পাচ্ছে না। সেই সদরের কাছে 'মা আছিস!' বলে হাঁক, শাস্ত্রকথা শোনা ছেড়ে হরঠাকরুন হন্তদন্ত হয়ে উঠে ছুটলেন ভাঁড়ার কি পুজোর ঘরের দিকে; তারপর মুখ মুছতে মুছতে, কি ফতুয়ার পকেটে মুঠো দুটো সাঁদ করাতে করাতে ছেলে এক ছুটে উঠোন পার।

পোঁটলা পুঁটলিতে কি আছে না আছে, নফর ঘনশ্যাম দোর গোড়াটিতে হামেশাই বসে থাকে, প্রভু ভৃত্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়।

হরঠাকরুন একটু অপ্রতিভ হাসি হাসতে হাসতে এসে আবার কোলে হাত দুটি জড়ো করে বসেন, আরম্ভ করেন,—" ঐতো দেখলে বাবা, তাই বলছিলাম, উপোসটা বাদ দিয়ে যদি......"

গুরুঠাকুর হেসেই বলেন—"এই দেখ আবার সেই কথা! বলি হ্যাঁ ঘনশ্যাম, ঘুরছ তো সঙ্গে সঙ্গে, উপোস না দিয়ে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, দেখেছ কারুর বেলায়?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আর কিছু নাই হোক, বোল চাল বেশ রপ্ত। ঘনশ্যাম বলে—"নতুন কথা শুনলাম। আবার ঐদিকে শুদ্ধু না হয়ে মন্তর সেঁদুলে সে মন্তর কুপিত হয়ে অঘটন ঘটিয়ে বসবে যে। এ মন্তর তো যার তার মন্তর নয়।"

এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফোলা ফোলা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, পাকিয়ে পাকিয়ে বলে কথাগুলো। হরঠাকরুন বলেন—"তবে থাক, করুক উপোস একটু। সত্যিই তো, উপোসের মতন জিনিস আছে?"

একটা দিন আবার ভাবেন, তারপর আবার কোলে হাত দুটি জড়ো করে বলেন—"না, উপোস ও করুক, করতেই হবে। দুধ-কলা খেয়েও তো উপোস আছে। বলবখন আমি, বাবাকে বলে সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"
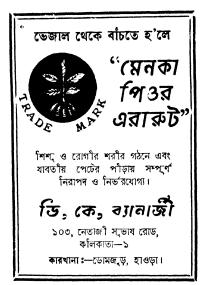
গুরুঠাকুর হাসেন, বলেন—"বোঝাও গো ঘনশ্যাম।"

ঘনশ্যাম বলে—"দুধ-কলা খেয়ে উপোস,

সে তো মন্তরকে কন্না দেখানো মা। বাবা তার মন্তর তো নয়, এত বড় ঠাট্টাটা ঘাড় পেতে নেবে এ মন্তর?"

"তবে থাক। বলবখন, তুই যতক্ষণ পারিস উপোস করে থাক, সন্ধ্যে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবই আমি বাবা, বলব—বাবা তারপরেই মন্তরটা তাড়াতাড়ি ফ‌ুঁকে দেবেনখন।"
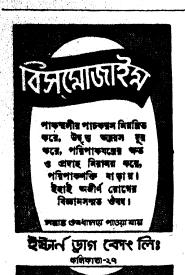
গুরুঠাকুর হেসে বলেন—"শোন হে ঘনশ্যাম।"

ঘনশ্যামকে উপমা বোধ হয় ধার করতেও হয় না, বলে—"রেল যে রেল মাঠাকরুন, সেখানেও ফাঁকি দিয়ে আধা টিকিট চালানো যায় না—উল্টে চার গুণ আদায় করে নেয়, আর এতো হল মন্তর। তাও যার তার মন্তর নয়।"

আর একটা দিন ভাবেন হরঠাকরুন, তারপর বললেন—তাহলে না হয় এযাত্রাটা থাক; একটু একটু করে উপোসটা অব্যেস করিয়ে রাখছেন, তারপর বাবা একদিন এসে দিয়ে দেবেন মন্তর।

গুরুঠাকুর ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"তাহলে তাই হোক, কি বলো? জোর তো চলবে না। তবে দোষটুকু কি হবে জানিয়ে দাও, মন্ত্রশিষ্য না হলেও তো আর পর নয়।"

ঘনশ্যাম বললে—"দোষ নয়? আর দোষ অল্প? ঘরে চোর ঢুকেছে, দারোগাকে জাগিয়ে তুললুম, এখন যদি তাকে বলি..."

হরঠাকরুন ভীতভাবে বলে উঠলেন—"না, না, তাহলে থাক।"

কোন উপায়ই আর যখন রইল না, তখন কথাটা তুলতেও হল ছেলের কাছে।

রাত্রে গুরুঠাকুরের মালসা-ভোগ। তারই ব্যবস্থা হচ্ছিল, সদানন্দ এসে দোরের চৌকাঠের ওপর বসল, বললে—"একটু ক্ষীর দিবি?"

"বলতে নেই, ছিঃ! তোর কবে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে সদু? আগে ঠাকুরের ভোগ দেবেন বাবা..."

"তারপর কিছু রাখে না যে।"

"যা রাখেন তাই ঢের। পেসাদ কি বেশী খেতে হয়?"

"তাহলে সবটা পেসাদ করতে দিস কেন?"

ছানার সঙ্গে মাখতে গিয়ে ক্ষীরের তাল একটুখানি হাত ফসকে শানের ওপর পড়ে যায়। সদানন্দ জানে ওটুকু তারই ভাগ্যে, হাতটা বাড়িয়ে বলে—"দে।"

হরঠাকরুন তুলে নিয়ে চিমটি কেটে একটুখানি বাদ দিয়ে বলেন—"তা নেও। কিন্তু নোলা সামলাও দিকিন এবার; আর তো ভুঁয়ের জিনিস এরকম করে খাওয়া চলবে না।"

সদানন্দ সমস্তটুকু মুখে ফেলে দেয়, জিজ্ঞেস করে—"কেন গা?"

"ওমা, তোর যে মন্তর দিচ্ছেন এবার গুরুঠাকুর। ছেলে সব খবর রাখেন, নিজের খবরটাই রাখেন না; রাখবার ফুরসত থাকবে, তবে তো। আর দিন কোথায়? আজ রোববার, চারটে দিন বাদ দিয়ে আসছে শুক্কুরবার দিন ঠিক হয়েছে।"

"চারটে দিন বাদ দিলি কেন?"

হরঠাকরুন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চান। সদানন্দ নির্বিকারভাবে বলে—"মন্তুরে বামনকে বেশী ডাকে তো। রুপো বলেছিল আমাকেই ওর ঠাকুরমার শিবরাত্রির ব্রেতোয় ডাকবে; মন্তুরে বামন বলে ওর ঠাকুরমা কালীচরণকে ডেকে নিলে।"

"তোর তাহলে মন্তর নিতে আপত্তি নেই? বাঁচলাম! তা দেরি হবে না? উপোস দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে তো। বাবাঠাকুর আবার কি শুদ্ধুর কথা বলেন, আগে কেউ বলেনি।"

"ঠাকুরমশাই কাল যেমন পুর্ণিমের উপোস দিলে সেইরকম, না তুই যেমন একাদশীর উপোস দিস?"

হরঠাকরুন ছানায়-ক্ষীরে মাখতে মাখতে একটু যেন ভেবে নেন, বলেন—"কথা শোন ছেলের! বেটাছেলে, তাকে নাকি আবার বিধবার মতন নির্জলা উপোস দিতে হবে! তবে মন্তর নেবার সময় একটু অনা... হবে না? বাবাঠাকুর ঐ যে বলছিলেন মন্তর, সে ক্ষীর ছানার ওপর গিয়ে প... চলবে না তো। তাই এ যা উপোস, ... কি যে বলে, খাওয়াটা একদিন বাদ ... হবে।...তা বাবাঠাকুর বলছিলেন ঐ ... দিন বাদ দিয়ে তারপর খাও না কত ... জহ্নু মুনি গঙ্গা শুষে ফেললেন।"

"এত তেষ্টা পাবে! উরে ব্বাসরে!" ... দুটো কপালে তুলে ফেলে সদানন্দ।

হরঠাকরুন বলেন—"নাও, কাকে ব... বলো। তেষ্টার জন্যে না, ঐরকম খ্যা..."

য়। আর একজন মুনি, তিনি বাতাবি বলে একটা রাক্ষসকেই হজম করে ফেললেন।"

সদানন্দ খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে—"শুনলাম গল্পটা সেদিন কথকঠাকুরের কাছে; তোর সেই যেদিন বাতিকের জ্বরটা এলনা?...দেখ মা, বাতাবি মতলব করে ঢুকল তো পেট ফুঁড়ে বেরুবে বলে, তা এইরকম করে পেটে হাত বুলিয়ে একটি মন্তর...। হ্যাঁ গা, সেই মন্তরটা দেবে নাকি ঠাকুরমশাই!" উৎসুক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলে।

হরঠাকরুন এ-সুযোগটাও হাতছাড়া করলেন না, বললেন—"মন্তর আবার কটা হয়?... তবে কলিতে কি ততটা তেজ থাকে আর? এখন যদি রাবণ রাজা জন্মায় তো তার কি আর দশটা মুণ্ডু হবে? খ্যামতাটা বাড়ে আর কি। তাহলে বলি বাবাঠাকুরকে? পারবি?"

"শক্তটা কি এমন? আমার তো পায়ও না ক্ষিদে তেমন।"

পাবে কখন? দামাল ছেলে, সে কি ঘেঁষতে দেয় ক্ষিদেকে কাছে? বোধ হয় সেই রূপের পাশে ক্ষুধাতুর কাতর মুখটি কল্পনায় ভেসে ওঠে। তারও উপর এই প্রবঞ্চনা. হরঠাকরুন ধোঁয়ার অছিলায় চোখে আঁচল চেপে ধরেন; চোখ দুটো মুছে নিয়ে ক্ষীর-ছানার তাল থেকে খানিকটা কেটে আলাদা করে নেন; বলেন—"দেখ তো মাথাটা ঠিক হল কিনা।"

স্কেচ— শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

দুপুরে স্বপাক আহারই করেন গুরুঠাকুর; ঘৃতপক্ক তো নয়। হরঠাকরুন ঘনশ্যামকে ডেকে দুজনের সিধে বের করে দিয়ে সদানন্দের ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে দুটো ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন—"সদু উঠলি?"

ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না বলে, দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে। খাবার-টাবার যা [illegible] করবার তোয়ের করে, গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে ডেকে তোলেন হরঠাকরুন। মুখহাত ধুয়ে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যায়। আজ ও-পাট নেই, এখনও তোলেননি।

উত্তর [illegible] গেল না, শুধু সুস্থ নিদ্রার [illegible] টানাটানা নিঃশ্বাস কানে এল। [illegible] একটু দাঁড়িয়ে শুনলেন হরঠা[illegible] তারপর আর কোন আওয়াজ না [illegible] আস্তে চলে এলেন।

[illegible] এদিক-ওদিক করলেন, যদি ও[illegible] তারপর গামছা, মটকার থান আর [illegible]ড়ুলটা নিয়ে রক থেকে নেমে এ[illegible] উঠোনের একধারে একটি ছোট আ[illegible] গাছ উঠছে, তারই তলায় রোজকার মতো [illegible] ধরাচ্ছিল ঘনশ্যাম। গুরুঠাকুর স্নানে গেছেন, এসে রাঁধবেন। হরঠাকরুন এসে বললেন—"আমি একটু গঙ্গা থেকে ডুব দিয়ে আসি ঘনশ্যাম, সদু ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক যতক্ষণ পারে; নিজে থেকে উঠলে একটু বলে দিও; আমি যাব আর আসব।"

ঘনশ্যাম রান্নাঘরের দিকে চাইলে, জিজ্ঞেস করলে—"আমায় কয়লা দিয়ে যাচ্ছ না যে আজ?"

হরঠাকরুন একটু গলা নামিয়ে বললেন—"ছেলের তো উপোস, বাবা মন্তর দেবেন! নিজের মুখে কি হাত ওঠে আজ? তুমিই বল না। হ্যাঁ, আর উঠে যদি খোঁজে আমায় —খাবার দে বলে, তো ওকথাটাও বলে দিও, আর বলবে যেন আজ আর না বেরোয়-টেরোয়; হাক্লান্ত হয়ে পড়বে তো।"

যেতে যেতে বললেন—"বোধ হয় আপনিই বেরুবে না, নেতিয়ে পড়ে থাকবে বিছানায় বাছা আমার।"

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। এর মধ্যে ঘনশ্যাম রাঁধবার সব সরঞ্জাম ঠিক করে ফেলেছে। একটু বড়-তামাক খাবার অভ্যাস আছে; কাদা-লেপা বোকনোটা উনোনে চড়িয়ে তাতে জল ঢেলে তারই একটু ব্যবস্থা করবে, সদানন্দের ঘরের কপাটটা সশব্দে খুলে গেল। সদানন্দ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে হাঁকলে—"মা আছিস? খেতে দে।"

ঘনশ্যাম কলকেতে ভিজে ন্যাকড়া জড়াচ্ছিল, চেহারা দেখে আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে নিলে। একটা লোক অন্য-

দিনের চেয়ে মাত্র খানিকটা বেশী ঘুমিয়েছে তাইতেই সব এমন নিঃশেষে হজম করে ফেলেছে, মনে হচ্ছে যেন কত দিন খায়নি। খুব যে কাহিল তা নয়; কি-খাই, কাকে-খাই গোছের একটা অদ্ভুত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। রোজই দেখেছে সদানন্দকে, কিন্তু এধরনের কোনদিন দেখেনি; বড়-তামাকের সরঞ্জাম পাশে সরিয়ে রেখে চুপ করে চেয়ে দেখতে লাগল।
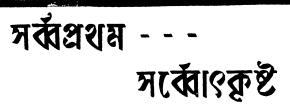
সদানন্দ আর কিছু বললে না। দেয়ালে একটা ইট খোলা, গর্তটার মধ্যে ছাই থাকে, খানিকটা নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পাত-কুয়োর দিকে চলে গেল। এক বালতি জল তুলে তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নিয়ে, তারপর কাপড়েই হাত মুছতে মুছতে রকে উঠে একটু গলা তুলেই বললে—"কোথায় তুই? নিয়ে আয়। এতক্ষণ তুলিস নি কেন? বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেল।"

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে দেখছে। তাড়া-তাড়ি মুখ ধুয়ে খেয়ে নিতে হবে এ-ভিন্ন যেন কোন জ্ঞান নেই; সে উঠোনের মাঝ-খানে বসে, নজরেই পড়ল না।

একটা গলা খাঁকারি দিলে, জোরেই। সদা-নন্দ শুনতেই পেলে না, কি খেয়ালই করলে না, দরদালানের মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়ে হাঁক দিলে—"কোথায় গেলি গো?...মা!"

ঘনশ্যামকে উঠতে হল; খেয়াল হল, যদি কিছু খেয়েটেয়েই বসে তো দায়িত্বটা তারই ঘাড়ে এসে পড়বে। বাইরের রকে দাঁড়িয়ে ডাকলে—"এই যে ইদিকে।...ঠাকরুন গেলেন গঙ্গাস্নানে।"

সদানন্দ ঘুরে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করলে—"খাবারটা রেখে গেল কোথায়?"

"আজ যে উপোস।"

সদানন্দ এগিয়ে এল, জিজ্ঞেস করলে—"কার?"

হাঁ-করে একটু চেয়ে রইল ঘনশ্যাম। একবার পেছনদিকে দেখে নিলে, রকে কত-টুকু জায়গা আছে। এক পা সরে দাঁড়িয়ে বললে—"আপনার। কাল ঠিক হল না উপোস করে শুদ্ধ হয়ে মন্তর নেওয়া হবে? তাই ঠাকরুন বলে গেলেন—আমি গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে আসছি—সদুকে বোলো, একটু বেড়িয়ে টেরিয়ে আসবে তত-ক্ষণ..."

সদানন্দ এগিয়ে গিয়ে দুটো কাঁধ বজ্র-মুষ্টিতে খামচে ধরলে, দাঁতে দাঁতে চেপে বললে—"না খেয়ে কি করে বাইরে যাব? না খেয়ে?—না খেয়ে?—না খেয়ে?..."

কথার তালে তালে তিনটে যা ঝাঁকুনি দিলে, ঘনশ্যামের তাইতেই চোখ দুটো কপালে ঠেলে উঠল। আরও কি হয়, সেই আতঙ্কে একটু একদৃষ্টে চেয়ে রইল,

তারপর আমতা আমতা করে বললে—"আম্মো সেই কথা বললুম তানাকে—পারবে কি করে বেরুতে। বললে—তবে যেন বিছানায় চুপটি করে শুয়ে থাকে।"

"কতক্ষণ চুপটি করে বিছানায় পড়ে থাকবে লোকে?...কতক্ষণ? —কতক্ষণ? অ্যাঁ, কতক্ষণ?"

এবার আর ঝাঁকুনি নয়, দাঁতে দাঁত চেপে ঘাড় দুটো ধরে একবার সামনে টেনে আনে, একবার পেছনে ঠেলে দেয়। বার তিনচার এইরকম করে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে আবার দরদালানে ঢুকে পড়ল। ঘনশ্যাম প্রায় রক থেকে ছিটকে পড়েছিল, কোনরকমে সামলে নিয়ে একেবারে আমলকিতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপরেই ভাঁড়ার ঘরে দুমদাম ঝনঝন শব্দ উঠল। সদানন্দ বাসন আছড়াচ্ছে, হাঁড়ি তিজেল ভাঙছে, মাঝে মাঝে এক একটা শব্দ—"নেই। নেই। এতেও নেই। সব খাইয়েছে। গুরুঠাকুর! নিকুচি করেছে গুরুঠাকুরের!"

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজটা বাইরের দিকে আসছে। ঘনশ্যাম কি ভেবে তাড়াতাড়ি বোকনোর জলটা উনুনে ঢেলে দিলে তারপর একবার সদর দরজার দিকে চেয়ে নিয়ে সিধে-টিধে ছেড়ে পালাতেই যাচ্ছিল, একটা আস্ত হাঁড়ি ঘর থেকে ছিটকে এসে উঠোনের মাঝখানে পড়ে চুরচুর হয়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সদানন্দ রক থেকে লাফ দিয়ে সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। মেহনতে হাঁপাচ্ছে, চোখ দুটো জ্বলছে. যেন খুন চেপে গেছে। ঘনশ্যামের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে, বোধ হয় চেঁচাবার জন্যে হাঁ করেছিল, বাকরোধ হয়ে মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সদানন্দ একটু চেয়েই রইল একদৃষ্টে, তারপর আবার ঘাড় দুটো দুহাতে খামচে ধরে, যেন শরীরে সাড় আনবার জন্যে গোটাকতক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—"আমি উপোস করব না—এই করব না—করব না—করব না।"

চেপে যেন জায়গাটাতে পুঁতে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে, ঘনশ্যামের পা নাড়াটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

"শুনেচিস, উপোস করব না আমি।"—চোখে চোখ রেখে উত্তরের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল। ঘনশ্যাম বললে—"ঠিকও নয় করা......এ-বয়সে।"

সদানন্দ আবার একটা নাড়া দিলে—"কোনও বয়সে নয়। পেট আমার জ্বলছে।"

তারই এক ঝলক আগুন যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে। ঘনশ্যাম বললে—"বামুনের উপোস তো দরকারই হয় না।"

আবার গোটাকতক ঝাঁকুনি, সঙ্গে সঙ্গে

সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল

—"হয়—হয়—হয় দরকার। ঠাকুরমশাই যেমন পুন্নিমের উপোস করলে সেদিন।...কোথায় তোর ঠাকুরমশাই।"

"গঙ্গাস্তানে গেলেন।"

"ডেকে নিয়ে আয়।"

গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে একটা ধাক্কা দিতেই ঘনশ্যাম ছিটকে গিয়ে হাত-তিনেক দূরে সদর দরজার চৌকাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। একটা সুবিধেই; উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে যাবে, সদানন্দ লাফিয়ে গিয়ে ধরে ফেললে, বেড়ালে যেমন থাবার মধ্যে ইঁদুরগুলো ধরে টেনে নিয়ে আসে সেই-ভাবে উঠানের মাঝখানে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে আবার দাঁড় করালে; জিজ্ঞেস করলে—"মালপোগুলো কোথায়, মা যে অতগুলো করলে কাল?"

ঘনশ্যাম কি যেন একটু ভেবে নিলে, তারপর বললে—"বাবাঠাকুরের ঘরে রয়েছে, নে' আসি?"

"নিয়ে আয় সবগুলো, একটাও থাকবে না।"

ঘরে থাকে না কিছুই। গুরুঠাকুরের হাত থেকে যেগুলি পরিত্রাণ পায়, ঘনশ্যামের উদরে গিয়ে নিঃশেষ হয়। ঘনশ্যাম ঘরের মধ্যে গিয়ে আস্তে আস্তে ওপর আর নীচের হুড়কো দুটো লাগিয়ে গুরুঠাকুরের ভারী চৌকিখানা ঠেলে কপাটের গায়ে আটকে দিয়েছে, ততক্ষণে সদানন্দও ছুটে এসে দোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কার ওপর ধাক্কা, লাথির ওপর লাথি আরম্ভ করে দিলে। ঘনশ্যাম পিঠটা চৌকিতে চেপে পা দুটো দেওয়ালে আটকে গলা ছেড়ে পরিত্রাহি চিৎকার তুলতে যাবে, এমন সময় বাইরের দিকের জানালা দিয়ে নজর পড়ল কমণ্ডুলু হাতে গায়ে নামাবলি জড়িয়ে জোরে স্তব আওড়াতে আওড়াতে গুরুঠাকুর খড়ম পায়ে হনহনিয়ে চলে আসছেন।

ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি উঠে এসে গরাদের মধ্যে দিয়ে একটা হাত বের করে নাড়তে নাড়তে চাপা গলায় বললে—"পালান পালান! মন্তর থামান! ক্ষেপে রয়েছে!"

গুরুঠাকুর জানলার কাছে এগিয়ে এসে

ওরই মত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে—"কি হয়েছে বলছ? শব্দ কিসের ওরকম?"

"বুড়ির ছেলে ক্ষেপে গেছে! বদ্ধ উন্মাদ! উপোস করবে না—পারবে না—পারচে না! মালপো খুঁজছে! আপনাকেও তার সংগে......"

"বুড়ি কোথায়? দিয়ে দিক না।"

দমাদ্দম ঘা পড়ছে কপাটে, ওপরের হুড়কোটা ভেঙে ছিটকে পড়ল। ঘনশ্যাম ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার চৌকিটা প্রাণপণে চেপে ধরলে। "বুড়ি গংগাস্তানে! শিগগির গিয়ে—"

ঘুরে চাইতেই দেখে জানলায় কেউ নেই। একটু তফাতে একপাটি খড়ম উলটে রয়েছে, হাত পাঁচ-ছয় দূরে আর এক পাটি; তার পাশেই কমণ্ডলুটা।

ঘনশ্যামের শরীর এলিয়ে আসছে। আর একটি হুড়কোর ভরসা, তারপর চৌকির ঠ্যাকনা দিয়ে এ-দুর্গ যে আর বেশিক্ষণ রক্ষা করা যাবে না সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছে। পোড়খাওয়া লোক, অনেকরকম দেখা আছে, চরম বিপদের মধ্যে মনটা একটু গুছিয়ে নিয়ে জানলার দিকে চেয়েই জিজ্ঞেস করলে—"ঠাকরুনের ছাওয়াল মালপো খেতে চাইছে, দেবো নাকি?"

আর সে রকম চাপা গলায় নয় যে ধাক্কার শব্দে শোনা যাবে না। বেশ গলা খুলেই,—যেন ঠাকুরমশাই মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে খানিকটা দূরে এগিয়ে আসছেন, তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করা। ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ঘনশ্যাম আরও গলা তুলে বললে—"একটু পা চালিয়ে আসুন!"

সদানন্দ প্রশ্ন করলে—"কার সংগে কথা কইছিস?"

ঘনশ্যাম চালিয়েই যাচ্ছে—"দেব না? দিই না দিয়ে, বড় কাতর হয়েছেন ক্ষিদেয়......"

সদানন্দ কপাটের শেকলটা ঝনঝনিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"কার সংগে কথা কইছিস?"

"বাবাঠাকুরের সংগে।"

"কোথায় তোর বাবাঠাকুর?"

"ঐ যে আসচেন মন্তর আওড়াতে আওড়াতে।......মালপো তো রয়েছে, কিন্তু বারণ করছেন যে দিতে, বলচেন—উপোস...

"এই করাচ্ছি বারণ—করাচ্ছি বারণ—এই......কোথায়?..."

ছুটল দোর ছেড়ে। আওয়াজটা প্রথমে শোনা গেল উঠোন থেকে, তারপর সদর দরজায়, তারপর বাইরে, তারপরেই বোধ হয় খড়ম আর কমণ্ডলুতে নজর পড়ল।

ঠাকুরমশাই ততক্ষণ গ্রাম পেরিয়ে গেছেন ঘনশ্যাম জানলা দিয়ে একবার দেখে নিলে বনবনিয়ে ছুটেছে সদানন্দ।

চৌকিটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি নেই, আর যে তেজে বেরিয়ে গেছে সে তেজ নিয়ে ঢুকতেও পারবে না, তবু ঘনশ্যাম একবার সদরে উঁকি মেরে নিয়ে সদরের কপাটটায় আগল দিয়ে দিলে।

বেদম হয়ে পড়েছে, এবার একটু বড় তামাক না হলে আর চলে না। সেজে নিয়ে কলকের গোড়ায় ভিজে ন্যাকড়াটি জড়িয়ে এইবার দেবে টান, খিড়কির দোরে ধাক্কা পড়ল। সংগে সংগে হরঠাকরুনের গলা—"সদা উঠলি বাবা? অ ঘনশ্যাম!"

"ভদ্রা পড়েছে"—বলে কলকেটা আবার নামিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে কপাটটা খুলে দিলে।

হরঠাকরুন কমণ্ডলুটা রেখে ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতে নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন—"ওঠেনি এখনও? থাক তাহলে, উঠিয়ে কাজ নেই।......দেরি হয়ে গেল—যার সংগেই দেখা—অ দিদিমা! অ ঠাকুমা—ছেলেকে নাকি মন্তর নেওয়াচ্ছ? শুনলুম কে নাকি এক মহাপুরুষ এসেছেন, ভালো করে শুদ্ধু করে নিয়ে দেবেন মন্তর বললুম—হ্যাঁ দিদি, এবার যেন মনে হচ্ছে একটু কপাল ফিরেছে......তা মহাপুরুষের দয়া, কি বল ঘনশ্যাম?...তা আজ যেন ফিরতে বড় দেরি হল গংগাস্তান থেকে?

......আরে অ ঘনশ্যাম! একি! সদু আমার যে দেখছি দোর খুলে কখন বেরিয়ে গেছে! তুমি ছিলে না নাকি বাড়িতে?...আর, একি কাণ্ড!—হাঁড়িকুড়ি, থালা বাসন!...অ ঘনশ্যাম, কথা কইছ না যে!......"

ঘনশ্যাম চোখ বুজে টেনে যাচ্ছিল, বললে—"দাঁড়াও ঠাকরুন, একটু দম করে নি, তারপরে কার কপাল ফিরল, কার ভাঙল সে হিসেব দিচ্ছি। তুমি সব ছেড়ে আগে মালপোর ব্যবস্থা করো দিকিন—আমি ততক্ষণে একটু বেরিয়ে দেখি, মহাপুরুষই বা কোন্ দিকে গেল, তার শিষ্যিই বা তল্লাস নিতে কোন্ দিকে আতালি-পাতালি করে ছুটল।"

দেহলি-প্রান্তে

সৈয়দ মুজতবা আলী
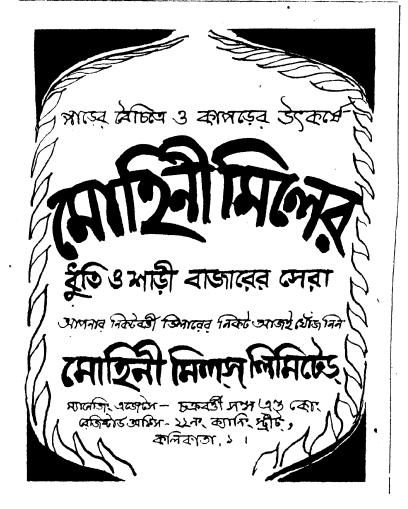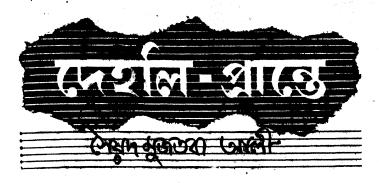
যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিম্বা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পাননি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ 'মাষ্টারি মাষ্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণিজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য, কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না,—আর 'দিল্লী দূর অস্ত্' তো বটেই।
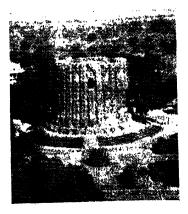
চিত্র ১—কুতুব মিনার

চিত্র ৪—খিলজীর অসমাপ্ত মিনার

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজিতে যাকে বলে ইসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময়-রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময়-রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায় টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশ পানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

চিত্র ৩—কুতুবের গায়ে হিন্দু কারুকার্য ও মুসলিম লিপির সমন্বয়

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার
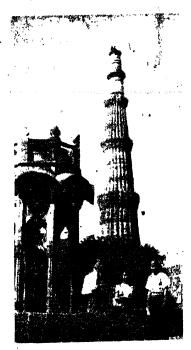
চিত্র ২—ইংরেজের তৈরি বাঁদিকের এই মুকুটটি এককালে কুতুবের উপর 'বিরাজ' করত।

পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি য়োস্‌ক্‌, পেভিলিয়ন্‌), ভিত্তি এমনভাবে জানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্‌টনিকাল্‌ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং উয়োর অ্যান্ড পীসে আছে; জ্যাঁ ক্রিস্তফ উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন (১) তাতে আরকিটেক্‌টনিকাল্‌ বৈশিষ্ট্য থাকে না।

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার পর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলক-ধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন (২)।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিম্বা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায়

---
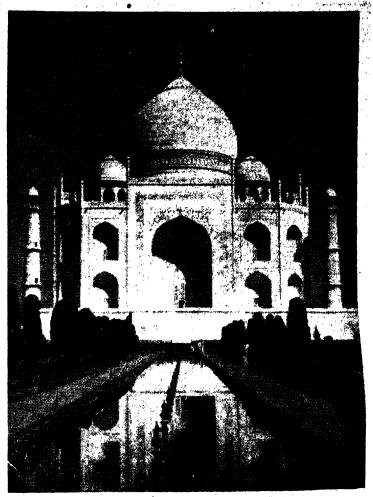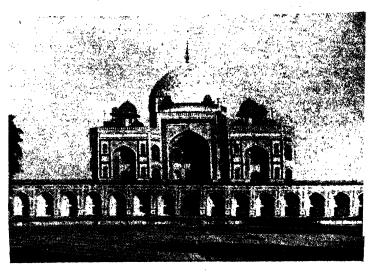
১ 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক ... নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

২ 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি ... দশ দিক—' এবং 'পিকবর-রব নব-পল্লব ...—' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার ... অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল ... পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

চিত্র ৫—তাজমহল

চিত্র ৬—হুমায়ুনের কবর

হেমোমেলিস
সমন্বিত
গায়েমাখা সাবান

প্রিফেক্ট

হেমোমেলিস উইচ্‌ হেজেল নামেও পরিচিত।
ইহা ত্বকের টনিক এবং ত্বককে স্নিগ্ধ
ও শীতল রাখে।

কলিকাতার এজেণ্ট—মেসার্স যশোবন্ত এণ্ড কোং, ৪৬, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ড়ানো হয়েছে) এবং বাস্‌ট্‌গুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্যাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির দিকে তাকাবে ক'জন লোক?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার যো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনো একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেননি বলেই এ-স্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেরই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে, থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদ-বাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু সুলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়—দক্ষিণী ঢংয়ের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মত—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কতরকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে কোনো জায়গাতে, যে কোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায়? উচ্চাঙ্গ মোগল স্থাপত্যমাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি—গেট-ওয়ে) থাকে —তারই উপর নহ্‌বৎখানা—তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সাধারণত ছবি এ জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আর যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির অর্ধেক ছবি তুললে তাতে ঈসথেটিক ইফেক্‌ট্‌' আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

*   *   *

দিল্লীর স্থাপত্য তার রাজবংশানুযায়ী ভাগ করা যায়।

॥ ১ ॥ দাস বংশ

কুতুব মিনার, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের আঙিনায়—সেহ্‌ন্—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকরা নিরনব্বই ভাগের লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দুযুগের।)—সবকটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্‌দীন খিলজী নির্মিত 'আলা-ই-দরওয়াজা'—কুতুবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্‌দীন

চিত্র ৭—রাণী সিপ্রির মিনারিকা, আহমদাবাদ

চিত্র ৮—গিয়াসউদ্‌দীন তুগলকের মকবরা
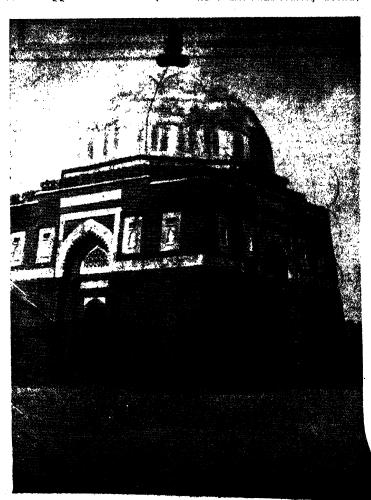
কিম্বা তাঁর ছেলের ('দেবল-দেবীর' বল্লভ) তৈরী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার (৩) দরগার ভিতর (৪)।

॥ ৩ ॥ তুগলক-বংশ

গিয়াসউদ্‌দীন তুগলক (৫) নির্মিত আপন সমাধি—কুতুব থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলকাবাদের সামনে। তুগলকাবাদ

ফিরোজ তুগলক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ-কোট্‌লা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ; ফিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উঁচু ইমারৎ বানিয়ে তার উপরে চড়ান)।

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবংশ

লোদী গার্ডেন্‌স্‌—নয়াদিল্লীর লোদী এস্‌টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ সৈয়দের কবর, (খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশ-গৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

---

(৩), (৫) 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লী দূর অস্ত্' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মুহম্মদ তুগলকের তৈরী 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্‌দীনের মিত্র কবিসম্রাট আমির খুসরো ('দেবলদেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতর।

(৪) ইলতুতমিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।
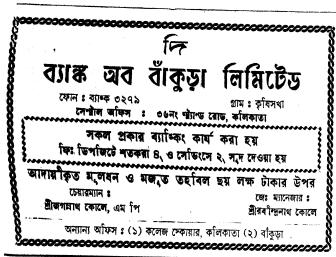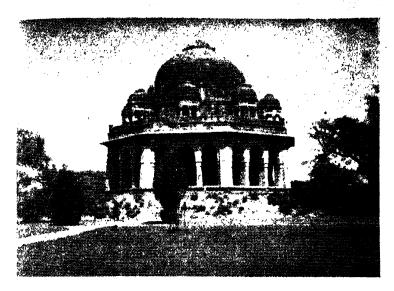
চিত্র ৯—মুহম্মদ শা সৈয়দের কবর

ইসা খানের কবর—হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদী-শৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরী করার সময় পাননি। কেউ কেউ বলেন, পালম এ্যার-পোর্টের সামনে যে দুর্গের মত সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

হুমায়ুনেও এক পুরানা কিলা (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেননি। পুরানা কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে।

হুমায়ুনের বিধবার—আকবরের মাতার—তৈরী হুমায়ুনের কবর। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে—সেকেন্দ্রা, ফতেহ-পুর সিক্রী, আগ্রা দুর্গ। [illegible] সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আৎকা খান, [illegible]জিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান [illegible]না ও আদ্‌হম্ খানের কবর।

শাহজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিলা। [illegible]-ই সামনে চাঁদনী চৌকের কাছে জাম-ই [illegible]জিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী [illegible]জিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের [illegible]রী সমাধি — রৌশনারা-গার্ডেন্‌সের [illegible]তর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেননি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে; কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্টা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফ্‌দর্‌-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ—'কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খান খানার কবর থেকে চুরি করা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমনকি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না কারণ এটি নিজামউদ্দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎব-

উদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে এটি নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুৎব মিনারের কাছেই এবং 'কুৎব-সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসির উদ্‌দীন 'চিরাগ দিল্লী'র। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুৎব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু একসপেরিমেণ্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুৎব প্রথম এবং শেষ একসপেরিমেণ্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি; কাজেই গুণিজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্যর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

কুৎব পাঁচতলার মিনার (১নং ছবি দ্রষ্টব্য)। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশী' ও 'কোণের' পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ। চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক ('যিনি 'অশোক স্তম্ভ' দিল্লী আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লীর অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিক-জনের কৌতূহলের অন্ত নেই (৬)। দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজ-মুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারি-গরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল মশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়ে-ছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটি কয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশী', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে।

(৬) গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুৎবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল না বলে তিনি সেখানে চারপাপড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সত্রাসে তার-স্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুণ্ডুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন। দুই নম্বর ফোটোর বাঁদিকে 'কাটা মুণ্ডু'টা দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ১০—হুমায়ুনের গম্বুজের 'ড্রাম'—নীচের দিকটা—, ছবি এবং গুল্-দস্তাজ

প্রপর্শনের এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মত ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টি-কার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয়নি; কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর এক সঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারৎ গড়েছেন কিন্তু 'কুৎবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে,
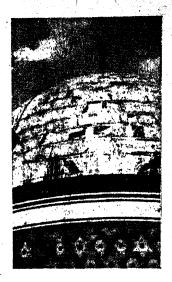
চিত্র ১১—হুমায়ুনের গম্বুজ

চিত্র ১২ — ইলতুৎমাশের গম্বুজহীন কবরে জিওমেট্রিক ডিজাইনের ছড়াছড়ি

কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল বানিয়ে নিজকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুৎবের সংগে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয় (৭)।

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুৎবের সংগে পাল্লা দিতে। তাই কুৎবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুৎবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারৎ মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারৎ খারাপ দেখায়, ছোট হলেও খারাপ দেখায় (সর্বকলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দীনের চূড়া ডবল হলে ফল কি ওৎরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে না হতেই ওপারের ডাক খিলজীর কানে এসে পৌঁছল যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিম্বা অন্য কোনো ইমারতের অংগ হিসেবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা
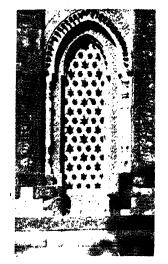
চিত্র ১৩ — আলাউদ্দীন খিলজীর তৈরি আলাই দরওয়াজা

(আমি নামকরণ করলুম, আপনাদের আশীর্বাদ চাই)। কুৎবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলোও কুৎবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সংগে কুৎবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুৎবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাংগে গয়নার ছড়াছড়ি তার চার খানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু' চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারৎটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে (পাঁচ এবং ছয় নং ছবি দ্রষ্টব্য)।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুৎবের আওতার বাহিরে গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সংগে কুৎবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে (৭নং ছবি)। রাজা আহমদের—এ'রই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানী সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা

(৭) অক্টরলনি মনুমেণ্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুৎবের সংগে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সংগে তুলনা করা যায়। বড় বাজারের দালান-কোঠার সংগে কেউ তাজের তুলনা করে না।

চিত্র ১৪—হুমায়ুনের কবর; গুলু-দস্তাজ ও নীচে পদ্মপাতার মোতিফ

মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রে যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভ-লোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

কুৎবের সঙ্গে সঙ্গে—আসলে কুৎব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নত-দর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভারতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তার গায়ে গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখেনি বলে (৮) আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারৎ ভেঙে পড়েছে; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা ইলোরার চিত্রকার শিলাকর দুজনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটা রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মোতিফকে এরা সাপ না না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসসৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া।

চিত্র ১৫—হুমায়ুনের কবর—গুলু-দস্তাজ

এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তার শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ

(৮) ইঞ্জিনীয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-রস আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নীচে। আর্চ, ডোম্ বানাতে 'কী-স্টোন' ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়রী ব্যাপার পাঠক চেম্বার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করিনি। যেমন, কুৎবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয় নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স্) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণা-মাত্র ভুল থাকলে কুৎব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারৎ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ ভলুমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারৎগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওওতল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারৎ ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী
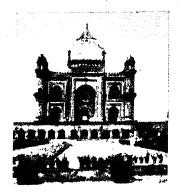
চিত্র ১৬—সফদরজঙ্গের কবর—ওয়েলিংডন এ্যারড্রোমের কাছে

যুগে সেটা সুন্দর হতে আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসসৃষ্টি করে ফেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তন্বঙ্গ গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিতে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে (৮, ৯, ৬, ১০, ১১, ৫নং ছবি দেখুন)।

কিম্বা আর্টের উত্থান পতন দেখুন। কিম্বা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ুনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মত ছত্রি পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিম্বা দেখুন, ভিতরকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'!

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য ফিরে পেল (১২ এবং ১৩নং চিত্র)।

তুগলুক-যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাঁকা—যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো স্লেট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসেনি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ (৮নং চিত্র)।

সৈয়দ-লোদী বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক

থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশী এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণওলা ইমারৎ এবং আট দিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণ-চক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্টি। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপ-স্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য—কেবল মাত্র টারচা স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন (৯নং চিত্র)।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছত্রি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরানী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এত দিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কাজ করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহুরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা (৫ ও ৬নং চিত্র)। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারৎ লাল পাথরের লাল আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল; তাজে তিনই মার্বেলের); হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আর্চ (তার ভিতর দিয়ে নীচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র; গুলদস্তাজ্ (মিনারিকার ও ছোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্ম-কোরকে—(১৪ ও ১৫নং চিত্র) দুই ইমারতেই এক রকম; নির্মাণকালে হুমায়ুন ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোন্‌টি ভালো লাগে? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন ১৬নং ছবি।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা—স্বামীর জন্য। তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী—প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

নেকদিন পরে অবসর পেয়েছে বিমলা—তার অনেক চাওয়া অবসর। বাচ্চা তিনটেকে নিয়ে বাপ মহকুমায় মেলা দেখতে গিয়েছে—সন্ধ দেখা, একটা ফুটো পয়সাও তাদের হাতে দিতে পারেনি, কঠিন অবিশ্বাস দেখেছে বাপের চোখে, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সত্যিই তার একটা ফুটো পয়সার সম্বল নেই, আর কেউ না জানুক, ভগবান......না, ভগবান আর নয়। ভগবানে বিশ্বাস করে না বিমলা। মা গেছে চৌধুরীদের খামারে ধান ভানতে। সারা বাড়িতে বিমলা একা—একেবারে একা।

তাই ত বিমলা আজ অবসর পেয়েছে—সে আজ কাঁদবে। লক্ষ যুগের লক্ষ মানুষের কান্না তার বুকের তলায় জমে আছে। আজ যদি না সে কাঁদতে পারে তবে কবে কাঁদবে সে। হাতের কাজগুলো তাড়াতাড়ি করে সেরে নেয় বিমলা, অবসরকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে পাবে। নিশ্চিন্ত?—হাঁ, ঐ হল, একটা চিন্তাকে লালন করতে প্রত্যাহের বাকি চিন্তাগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

বেলা আড়াইটে। সবেমাত্র হাতের কাজ শেষ করে বিমলা বসবে মনে করছে এমন সময় বাইরে থেকে হাঁক এল,—"বিমলি, বিমলি আছিস"

যতীনকাকা!—যতীনকাকা ডাক-পিওন, তবে কি—

ও দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে—বুকটার মধ্যে কেমন যেন তার ঢিপঢিপ করছে।

চামড়ার স্ট্র্যাপটা গলা থেকে খুলে চাদরে রূপান্তরিত খাকি পাগড়িতে মুখের ঘাম মুছে যতীনকাকা দাওয়ার উপর উঠে বসে ভারিক্কিচালে মিটমিট করে হাসতে থাকে। যতীনকাকা অমন করে হাসছে কেন? তবে কি?......বছর দশেক আগেকার কথা মনে পড়ে যায় বিমলার—নীল খাম, আতরের গন্ধ মাখা। এই যতীনকাকাই সেগুলো দিয়ে যেত, তখন তার মাথার সব চুল এমন করে পেকে যায়নি, খুব গম্ভীরমুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খামখানা বাড়িয়ে দিত। আজ যতীনকাকা একমাথা সাদা চুল নিয়ে অমন করে হাসছে কেন? কি সম্পদ আছে তার ঐ পুরনো চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে! লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার সেই দিকে চেয়ে দেখবে বিমলা, তবে কি তেমনি একখানা নীল খাম......আতরের গন্ধ মাখা......।

—"একটু জল খাওয়া দেখি বিমলি"—প্রসন্ন হাসিমুখে যতীনকাকা বলল।

বিমলা একটা মাজা রেকাবিতে খান কয়েক বাতাসা আর এক গেলাস জল এনে তার সামনে ধরল। অদম্য কৌতূহল তার জানবার, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছে না তার। কেন দেরি করছে যতীনকাকা, তবে কি শুধু জলটুকু খাবার জন্যই......। বেচারাকে সারাদিন কত পথই না ঘুরতে হয়। অস্থির কাতরতা বিমলার মুখে ফুটে ওঠে।

যতীনকাকা আর একবার মুখটা মুছে নিয়ে বললে—"তা বাপু যে যাই বলুক, জামাই মরদের বাচ্চা, কথা যখন দিয়েছে তখন রাখবে বইকি......" নাঃ এবার বিমলা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে। অস্থিরতা ওর দৃষ্টিতে, ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে পর্যন্ত ফুটে ওঠে। যতীনকাকা তেমনি হাসতে হাসতে বললে—"দাঁড়ারে বেটি—দাঁড়া—"

যতীনকাকা ব্যাগটার ফিতে খুলছে। ইস এত দেরিও হয়, নীল খাম......না,—খাম পোস্টকার্ড ত তার হাতে গোছা করে ধরা থাকে?......তবে? যতীনকাকা জাদুকরের মত ব্যাগের মধ্যে হাত পুরে ওরে দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে—একটা অবিশ্বাস্য কিছু বা বোধ হয় বার করবে এক্ষুনি। ধীরে সুস্থে হাতটা বাইরে আনলে যতীনকাকা। হাঁ খামই, তবে নীল নয়—সাদা, নীল ঢেরা কাটা—সাধারণ খামের চেয়ে অনেক বড়—উপরে তিনজায়গায় গালামোহর করা। উপরে ছাপার অক্ষরে কী সব লেখা—বর্ণমালা বিমলার বোধায়ত্ত নয়।

"টাকা পাঠিয়েছে জামাই, ইনসিওর করে। এক আধ টাকা নয়রে—দু—শ—বুঝলি, দাঁড়া তোকে আবার এই দুটো সই করতে হবে।" বিমলার হাতটা কাঁপছে—টাকা, টাকা আছে খামটায়, আর কিছু নেই। নীল কাগজ

না হোক, আতরের গন্ধ না থাক—এমনি দুছত্র লেখা এক টুকরা কাগজ। যতীনকাকার ভাঙা ফাউনটেনপেন দিয়ে কাগজ ভর্তি করে লিখলে—শ্রীমতী বিমলা দাসী।

যতীন সন্তর্পনে ওর হাতে খামটা দিয়ে বললে—"যা বিমলি একটা কাঁচি নিয়ে আয়, অনেক সময় আবার উপরে যা লেখা থাকে ভিতরে তা থাকে না। আমার সামনে খোল, সাক্ষী থাকবে।" এই অবিশ্বাস্য সংখ্যাটা সত্যি না দেখে সে-ই বা যায় কি করে।

বিমলা কাঁচি আনতেই যতীন সাগ্রহে সতর্কতার সঙ্গে খামটার মুখ কেটে ফেলল। তারপর অভ্যস্ত হাতে ভিতরে দুটি আঙুল দিয়ে দুখানা ১০০্ টাকার নোট বার করে আনলে। শালপাতার খালি ঠোঙার মত খামটা ফেলে দিলে যতীন। বিমলা তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফাঁক করে দেখলে—না। একেবারে খালি। একটুকরো কাগজ কোথাও লেগে নেই—অসহায় বোবা শূন্যতা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে বিমলা। যতীনও কি যেন একটা অনুভব করলে। নোট দুখানা ওর হাতে দিয়ে বললে—"তা বিমলি এ একরকম মন্দের ভাল, জামাই ঘর না করুক, কিন্তু ছেলেগুলোকে মানুষ তো করতে পারবি—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।" কেমন একধরনের করুণ হাসি হাসলে যতীন। মনে হচ্ছে লজ্জা পেয়েছে তার প্রথম দিকের অহেতুক উচ্ছলতায়। ব্যাগের স্ট্র্যাপটা আবার গলায় দিতে দিতে বললে—"আজ আসিরে বিমলি, নোটদুটো সাবধানে রাখিস, আর যাকে তাকে ভাঙাতে দিসনি।" যতীন বেরিয়ে যায়। বিমলা তার পথের দিকে চেয়ে থাকে। মেঠো পথ নেমে গেছে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে কাশের বনের ধারে ধারে...... যতীনকাকার সাদা মাথাটা কাশফুলের সঙ্গে যেন একসঙ্গে দোল খায়, তারপর আর তাকে দেখা যায় না।

দুখানা একশ টাকার নোট, একসঙ্গে হাতে করেছে কি বিমলা—কৈ মনে পড়ে না ত। তবু ত এর প্রতি তার আকর্ষণ অনুভব করছে না। ছেলে তিনটিকে মেলায় পাঠিয়েছে, রবারের বেলুন, বাঁশের বাঁশি, টিনের খেলনা কেনবার মত পয়সাও হাতে দিতে পারেনি—কৈ তবু ত তার ইচ্ছে হচ্ছে না নোট দুটোকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতে। বরং ও যেটা শক্ত করে ধরেছে সেটা খাম, গালামোহর করা শূন্যোগর্ভ একটা খাম। আর একবার সেটা ফাঁক করে দেখলে বিমলা, দুবার হাতের উপর ঠুকলে, কিন্তু কৈ—কিছু নেই, শূন্য, মর্মান্তিকভাবে শূন্য।

নবছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বিমলার। মথুরের বয়স চোদ্দ—সে তখন স্কুলে পড়ছে। বেশ লাগত বিমলার, আর সকলের মত মথুর মাঠে কাজ করতে যায় না। সাজিমাটিতে কাচা খাটো ধুতির সামনে কোঁচা দুলিয়ে স্কুলে যায়— বাবুপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে। কথাগুলোও যেন কেমন— যেন অন্যধরনের, কেমন মিষ্টি মিষ্টি, তাদের জাতের অন্য ছেলেদের মত চোয়াড় নয়। ওকে 'বিমল' বলতে। মাগো—কি ছেলে-ছেলে নাম। কিন্তু ভাল লাগত বিমলার। ও বলত— "বিমল তুমি একটু লিখতে পড়তে শেখো। আমি যখন বিদেশ থেকে তোমায় চিঠি লিখব, তখন পড়বে কেমন করে।" বিমলা লিখতে পড়তে সত্যিই শিখেছিল......তারপরই কলকাতা থেকে আতর মাখান নীল খামে চিঠি.........। সব বুঝতে পারিতনা বিমলা, আর তার উত্তরই বা কি লিখবে ভেবে পেত না, বাজে কথাই বেশী লিখত বিমলা—মটর গাছে ফুল এসেছে আর কচি কচি মটরশুটি, খেজুররস জাল দেওয়া হচ্ছে বাগানে, নলেনগুড়ের গন্ধে বাতাস ভরে গেছে, মুংলী কুকুরটা একসঙ্গে তিনটে বাচ্চা পেড়েছে—আর সবশেষে লিখত, তোমাদের স্কুলে গরমের ছুটি হয়—শীতের ছুটি হয় না?

মথুর ছুটিতে ফিরত চিঠিগুলো একরকম বুকে করে নিয়ে। বলত—"কি মিষ্টি করে তুমি লেখ বিমল!" বলে দুহাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিত—সেই উত্তাপটুকু আজও অনুভব করে বিমলা।

যে বছর বি এ পাশ করলে মথুর সেই বছরেই বিমলার জীবনে মাতৃত্বের সংকেত এসেছে। সার্থকতার সংবাদের বিনিময় হয়েছিল ভাষাহারা আনন্দে—মাঝরাতে ওকে নিয়ে মথুর বেরিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নার আলোয়, কাশফুল গুঁজে দিয়েছিল গুচ্ছ করে ওর খোঁপায়। তারপর জেলেদের নৌকো চুরি করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর, অনেক ছড়া মুখস্থ বলেছিল সেদিন—কে সুন্দরী কোথায় কতদূরে নিয়ে যাচ্ছে......এই সব। একটা লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে ওর মাথাটাকে বুকের মধ্যে

টেনে নিয়ে মথুর ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এখন কি ইচ্ছে করে বিমল?"

বিমলা কিছু না ভেবেই বলেছিল "ডুবতে।".

চমকে ওঠে বিমলা। দূরে কাশফুলগুলো মাথা নাড়ছে। মনে হচ্ছে যতীন কাকা বুঝি ফিরে আসছে। হয়ত এসে মাথা চুলকে বলবে—"বিমলি বড্ড ভুল হয়ে গেছেরে, ও টাকাটা সা'দের গদির—তোর নামে একটা চিঠি আছে শুধু।" একটা আতর মাখান নীল খাম। বিস্ফারিত চোখে খানিকটা প্রতীক্ষা করলে বিমলা। নাঃ—

ভাল চাকরি হয়েছে মথুরের। মথুর মাথা নেড়ে বললে, "এমন বড় একটা হয় না, আমাদের সমাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে গভর্নমেণ্টের।" সে সব বুঝতে চায় না বিমলা, তার জীবন কানায় কানায় ভরা—ফাঁক নেই কোনখানে।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা হল। বিমলাকে বুঝিয়ে দিলে মথুর। বিমলা কিছুই বোঝেনি। শুধু মুগ্ধ হয়ে মথুরের দিকে চেয়েছিল। মথুর সেদিন সকালে ষষ্ঠীতলায় তেরঙ্গা নিশান তুলেছে, কি সব বলেছে, অনেক লোক হাততালি দিয়েছে। বিশ্ব-নিন্দুক শ্রীদামকাকাও বলেছেন, "হাঁ মোথরো একটা মানুষের মত মানুষ হয়েছে।" মথুর বলেছে, তুমিও সভায় চল আমার সঙ্গে—আগ্রহে তার হাত চেপে ধরেছে। বিমলা মুচকী হেসে বলেছে—"ছিঃ লজ্জা করবে না?" মথুর আগ্রহ করে বলেছে, "লজ্জা কিসের, জগতে যারাই বড় হয়েছে তাদের সবার পাশে তাদের স্ত্রীরা গিয়ে দাঁড়িয়েছে—উৎসাহ দিয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে শক্তি বলেছে।" বিমলা অত বুঝতে পারেনি, মনে হয়েছে মথুর অনেকদূরের মানুষ—চেনা জানার পার থেকে তার কথাগুলো ভেসে আসছে, যে কথা সে বুঝতে পারে না তবু যেন তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, তারও কেমন যেন হাততালি দিতে ইচ্ছে করে।

খবর এসে গেল—মথুর হাকিম হয়েছে—ম্যাজিস্টর। পুরো সাহেবী পোশাক পরে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে এলো মথুর—অনেক দূরের মানুষ মথুর, কান্নায় গলা বুজে এলো বিমলার। বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পেল বিমলা। মথুর বললে, "এবার কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাব, মেম রেখে লেখাপড়া আর সহবৎ শেখাব। এমন করে জংলী হয়ে থাকলে চলবে না।" বিমলা হাসতে গেল কিন্তু ভয় পেয়ে থেমে গেল। কি বলবে বিমলা, অবুঝ কান্নায় যেন তার বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝ রাতে উঠে বসে বিমলা প্রদীপটা জ্বাললে। একবার ভাল করে দেখবে মথুরকে। ডোরাকাটা ঢোলা পাতলুন পরে ঘুমিয়ে আছে মথুর। আরও একটু নিচু হল বিমলা—মুখে কী যেন একটা অপরিচিত গন্ধ। প্রদীপটা নিভিয়ে দিলে—জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়ল। ওপাশের বিছানায় তার তিনটি সন্তান ঘুমিয়ে আছে। ও ধীরে ধীরে স্বামীকে স্পর্শ করলে, ধরা গলায় ডাকলে—"শুনছো?"

আরো দুবার ডাকতে মথুর চোখ খুললে। বিমলা বললে—"ওগো যাবে আজ আধখানা উঠে বসেছে মথুর। শুধু বিস্ময় বেড়াতে, নদীর ধারে অনেক কাশফুল ফুটেছে"......ওর চোখ দুটো কেমন যেন ভয়ে আর লজ্জায় জড়িয়ে এল, এমন ত আগে হত না।

"তুমি পাগল হয়েছ বিমল"—বিস্ময়ে নয়, কোথায় যেন একটু প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা থেকে গেছে তার কণ্ঠে। 'বিমল' বলে ডেকেছে সত্যি; কিন্তু এ ডাক আদরের নয় অভ্যাসের।

—"শুয়ে পড়, ভোরে উঠে আমার অনেক কাজ রয়েছে।"—অনেক কাজ রয়েছে মথুরের সে কাজের সঙ্গে বিমলার যোগ নেই, সেই কাজ দিয়ে দুজনার পথ বাঁধা পড়েনি।—গোয়ালে বুধি গাইটা ডাকছে, আজ তার জাবনাটা দেখতে পারেনি বিমলা। ও আবার একটা টেমি ধরিয়ে উঠে গেল গোয়ালে—খড় খোল দিয়ে জাবনাটা ভাল করে মেখে দিয়ে এল, ফিরে এসে হাতের গন্ধটা একবার শুকলে—না, মথুরের বিছানার কাছে আর যাওয়া যায় না। কোলের বাচ্চাটার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। একটা নিশাচর পাখি তখন বাইরের কাকজ্যোৎস্নায় অবিশ্রাম ডাকছে।

সেই তার শেষ মিলন-রজনী। তারপর মথুর আর দেশে আসেনি। শুধু বাজে খবর, কে একজন মেয়ে, কি জানি কোন এক নারী সভার সম্পাদিকা...বক্তৃতা করবার সময় কাছে থাকে, মথুরের সঙ্গে শিকারে গিয়ে অসঙ্কোচে বন্দুক চালায়, ভোজ-সভায় বন্ধুদের আপ্যায়িত করে। দোষ ত বিমলার। মথুরের সঙ্গ নিতে পারেনি, পেছিয়ে পড়েছিল তার সংস্কার আর জড়তা নিয়ে। পথ যার মেলেনি ঘর তার মিলবে কোন আশায়—তাইত বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে বিমলা।

কিন্তু এটা কি—অবহেলার উচ্ছিষ্টের মাত্র নোট দুখানা দেখে তার গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে—নীল খামের বিড়ম্বিত অবশেষ। বিমলা টুকরো টুকরো করে নোট দুখানা ছিঁড়ে ফেলে, খামটা ছিঁড়তে গিয়ে এই প্রথম আবিষ্কার করে—তার তলায় কাপড় মারা—ছেঁড়া বেশ শক্ত।

জানাজানি করে দিয়ে গেছে বোধ হয় যতীন। প্রায় একসঙ্গে চারপাঁচজন মেয়ে-পুরুষ কলকণ্ঠে ওর সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করতে উঠোনে এসে থমকে দাঁড়ায়। নোটের টুকরোগুলো এদিকে ওদিকে উড়ে গেছে। হায় হায় করে ওঠে সবাই। গোকুল হুমড়ি খেয়ে সেগুলো সংগ্রহ করতে করতে বললে—"এ কি সর্বনাশ করলি বিমলি, দাঁড়া দেখি, নম্বর ঠিক থাকলে জোড়া দিয়ে মহকুমার অফিসে জমা দিলে ওরা টাকা দেবে।"

গোকুল অনেক চেষ্টা করছে—নম্বর মিলছে না গোকুলের।

স্তব্ধ বিমলা পাথরের মত বসে আছে চোখ বুজে। কি জানি সেও বোধ হয় নম্বর খুঁজছে—নম্বর মিলছে না তারও।

আশীর্বাণী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এল সখা শরৎ
চির উজ্জ্বল,
বাজাল আলোর বাঁশির সুরের সোনালী গৎ,
হেসে উচ্ছল!

সে সুরের সোনার কণায় জ্বলে আগুনের রং
সে হাসির হাওয়া জাগায়—যে থাক জবড়জং,
তরুণের বুকে আনে রাঙা অরুণের মন,
দীপক স্বপন!

হে সবুজ, জাতি-সঞ্জীবন!
শরতের ভারতে ভাঙো সব জড়তা,
মুছে দাও দেশ থেকে ছোট-তা ও বড়-তা,
স্বাধীন বুকের তলে ভেবে নাও আজ,
দশ দিকে নিতে হবে লক্ষ কাজ,
ঘুচাবেই লাজ—
বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ,
উত্তর, দক্ষিণ——মধ্য, পশ্চিম,
বিহার, উৎকল!

সফল করো পণ......আরো হবে উঠিতে,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গৌরব লুটিতে,
ফুটে ওঠো সহস্র——নিযুতে-কোটিতে
জগতের এ যুগের
জ্যোতি-উৎপল!

—লিখেছেন—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার; শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীসুনির্মল বসু; 'স্বপনবুড়ো'; শ্রীরাধারাণী দেবী; শ্রীলীলা মজুমদার; শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু; শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীইন্দিরা দেবী; শ্রীসুমথনাথ ঘোষ; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীধীরেন বল; শ্রীমনোজিৎ বসু; শ্রীবীণা দে; শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত; 'বুদ্ধু ভুতুম'; শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীনন্দদুলাল সরকার; মৌমাছি।

—ছবি এঁকেছেন—

শিল্পী শ্রীধীরেন বল;
" শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত;
" শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ;
" শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী;
" শ্রীসমীর সরকার;
" শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত।

—ফটো তুলেছেন—

শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী;
শ্রীঅমিয় তরফদার।

বাংলার বীর

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বাদশাহী আমলের কথা। বাংলা মুলুককে তখন অনেক অনেক বীরের আবির্ভাব। যেমন—প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়-কেদাররায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরায়, ঈসা খাঁ প্রভৃতি বাংলার বড় বড় ভূঁইয়ার দল। আজ এখানে ঈশা খাঁর গল্পটি বলি।

ঈশা খাঁ ছিলেন একজন স্বাধীন রাজা। খুব তাঁর প্রতাপ, খুব তিনি যোদ্ধা। কিন্তু এক দিনেই তিনি ঈশা খাঁ হননি। ছেলেবেলায় তাঁকে নানান দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। ঈশাখাঁ মুসলমান, কিন্তু তাঁর পিতামহ ছিলেন হিন্দু। পিতামহের নাম কালিদাস গজদানী। তিনি ছিলেন রাজপুত। তিনি বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর তর্কাতর্কি করা খুব ছিল অভ্যাস। একবার তিনি একজন মুসলমান ফকিরের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করেন, শেষে তর্কে হেরে যান। তর্কে হেরে গিয়ে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই থেকে তাঁরা মুসলমান। ঈশাখাঁও মুসলমান। কিন্তু তাঁর ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত।

ঈশাখাঁর পিতা খুব বীর ছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে হেরে যান, আর শেষে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ঈশাখাঁ তখন ছেলেমানুষ। মোগলেরা তাঁকে বন্দী করে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে দেয়। তখন তাঁর দুর্দশার একশেষ হয়। তুরান দেশে তাঁকে চালান করে দেয়। সেখানে বহুকাল তাঁকে থাকতে হয় বহু কষ্ট করে। শেষে নানান ফিকির করে তিনি পালিয়ে আসেন বাংলাদেশে। তখন তিনি যুবক, মহাশক্তিশালী। তিনি অল্প অল্প করে সৈন্য সংগ্রহ করে খুব শক্তিমান হয়ে উঠলেন, আর মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধালেন। যুদ্ধ এমন বাধালেন যে, বাংলার মোগল শাসনকর্তা একেবারে অস্থির। শুধু কি স্থলযুদ্ধ! জলযুদ্ধেও ঈশাখাঁ ছিলেন মস্ত ওস্তাদ। জলযুদ্ধে মোগল শাসনকর্তাকে তিনি একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলেন, আর শাসনকর্তার পুত্রদের বন্দী করে নিয়ে গেলেন। এর এই পরাজয়ের কাহিনী দিল্লীতে আকবর বাদশাহের কানে পৌঁছুল। তিনি তো অবাক হয়ে গেলেন শুনে যে বাংলাদেশে এমন বীরও আছেন! বাদশাহ হুকুম পাঠালেন, বাংলা-বিহারের সকল জায়গীরদার মিলে ঈশাখাঁকে দমন করা। ওকে দমন করাই চাই। দরকার হলে দিল্লী থেকেও সৈন্য যাবে। বাংলার অবস্থা তখন অতি ভয়ানক। বাদশাহ চান বাংলা থেকে রাজস্ব আদায় করতে প্রায় দু'কোটী টাকা। কিন্তু বার ভূঁইয়াদের ভেতর কেউ অতি সামান্য সামান্য করে রাজস্ব দেয়, কেউ বা মোটেই দেয় না, ঈশাখাঁ তো রাজস্ব দেওয়া বন্ধই করে দিলেন, বললেন—তিনি স্বাধীন।

ঈশাখাঁর তখন প্রতাপ কত! আর তাঁর অধীনে তখন দুর্গই বা কত। তাঁর দুর্গগুলির নাম বলি। যেমন—একডালা, রাঙ্গামাটী, ত্রিবেনী, রণভাওয়াল, হাজিগঞ্জ, মস্জিদ, দেওয়ানবাগ, এগারসিন্ধু। এই এগারসিন্ধু দুর্গে খুব একবার যুদ্ধ হয়, মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে। মহা পরাক্রমশালী মানসিংহ এগারসিন্ধু দুর্গ অবরোধ করলেন—ঈশাখাঁ তখন ছিলেন অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে দুর্গ নিয়েছে অবরোধ করে, অতএব মানসিংহকে যুদ্ধে হারাতে হবে, সেজন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঈশাখাঁ হলেন উপস্থিত। কিন্তু মানসিংহের মত গেল বদলে। তিনি যুদ্ধ করতে চাইলেন না। ভাবলেন, ঈশাখাঁ তো বাঙালী। বাঙালীর গায়ে কত আর জোর! আমি একাই ওকে ঠিক করে দোব। তিনি বললেন, সেনায় সেনায় যুদ্ধ করে কাজ নেই, বৃথা লোকক্ষয় করে কি লাভ! তার চেয়ে এসো, তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করি দ্বিরথ যুদ্ধ। যে জিতবে, তারই হবে জয়। ঈশাখাঁ বুক ফুলিয়ে বললেন, বেশ, এসো তাহলে যুদ্ধ করি।

প্রথমে যুদ্ধ হলো, মানসিংহের জামাতার সঙ্গে। জামাতা গেলেন হেরে, আর জামাতা হলেন নিহত। মানসিংহ তখন ভয়ানক রেগে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীষণ অসিযুদ্ধ। দুই পক্ষের সেনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ দেখতে লাগলো। ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে, কি হয় কি হয়! হঠাৎ, ও কি! মানসিংহের অসিটা ঈশাখাঁর অসির আঘাতে দুখণ্ড হয়ে ভেঙে গেল। ঈশাখাঁ মহাবীর, মহাপরাক্রমশালী, কিন্তু কাপুরুষ নন মোটেই। তিনি খাঁ করে নিজের অসিখানা মানসিংহকে দিতে গেলেন।

মানসিংহও মহাবীর। তিনি নিলেন না সে অসি। অসি না নেওয়াতে ঈশাখাঁ তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মানসিংহ অসিও নিলেন না, মল্লযুদ্ধও করলেন না। তিনি ঈশাখাঁর করমর্দন করলেন। করলেন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব। ঈশাখাঁ হলেন জয়ী। তারপর? তারপর আকবর বাদশাহের কাছে ঈশাখাঁর কত সুখ্যাতি করে পাঠালেন। বাদশাহ এই শুনে, খুব খুশী হয়ে ঈশাখাঁকে বাইশটি পরগণার অধিপতি করে দিলেন। ঈশাখাঁ ছিলেন এমনই একজন বীর।

কিন্তু চিরদিন একভাবে যায় না। ঈশাখাঁর মৃত্যু হলো। ঈশাখাঁর স্ত্রী ছিলেন সোনামণি। ইনি চাঁদরায়-কেদাররায়ের ভগ্নী। [illegible] পরাক্রম ছিল অসাধারণ। তখনকারকালে [illegible] অভাব ছিল না। তিনজন রাজা শত্রু [illegible] এঁর। আরাকানের রাজা, ত্রিপুরার [illegible] আর শ্রীপুরের রাজা। এঁরা তিনজন [illegible] সামন্ত পাঠালেন রাণীর বিরুদ্ধে। [illegible] মিলে তাঁর রাজধানী "সোনারগাঁ" [illegible] করলো। মহারাণী তখন এক দুর্গ [illegible] এক দুর্গে গেলেন, সে দুর্গ হলো [illegible] শত্রু এলো এখানে। মহারাণীও [illegible] সঙ্গে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। [illegible] কামান দেগে তাঁর দুর্গের দেওয়াল [illegible] দিলে। রাণী তখন নিরুপায়। [illegible] তিনি তখন [illegible] তিনি এই দুর্গমধ্যে [illegible] অগ্নিকুণ্ড [illegible] [illegible] ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা [illegible]

[illegible] ইতিহাসের [illegible] কথা। কিন্তু [illegible] বাংলায় কি বীর ছিল না? [illegible] জানা নয়?

মানসিংহের অসি ঈশাখাঁর অসির আঘাতে দুখণ্ড হয়ে ভেঙে গেল

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

নকড়ির বড়ই শখ একটা গাই পোষে। তার বৌও বলে—'তা হ'লে ভালোই হয়। দুধেরও অভাব হয় না, আর খেঁদীও দুধের সর খেতে পারে। মেয়েটা রোজই বলে—সর খাবো। কিন্তু যেমন পোড়া বরাত!—এক ফোঁটা দুধই জোটে না, খাবে দুধের সর!'

একদিন দুপুরবেলা হাট থেকে বাড়িতে ফিরে নকড়ি হাসতে হাসতে বৌকে ডেকে বললো—'ওগো শুনছো, কাল ভোরে কাগ ডাকতে না ডাকতেই আমাকে জাগিয়ে দিও। একটা গরু আনতে যাবো।'

কি ব্যাপার—বুঝতে না পেরে বৌ বললো—'গরু আনতে যাবে? কিনে? টাকা পেলে কোথায়?'

'না গো, না গো না, মাগনাই পাওয়া যাবে। হাটের পথে সুরেশ গোয়ালার বাড়ি। সেখান দিয়ে আসতে আসতে আজ শুনতে পেলুম সুরেশ কাকে যেন বলছে—কালো গরুটা দুধ দেয় বটে, কিন্তু বড্ডই বজ্জাত, ওটাকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি। কাল এসে প্রথমে যে চাইবে তাকেই গরুটা অমনিই দিয়ে দেওয়া যাবে। তাই খুব ভোরে উঠেই সকলের আগে গিয়ে তাকে ধরা চাই।'

'হোক না বজ্জাত, দুধ তো দেয়!' মাগনা একটা গরু পাবার আশায় নকড়ি আর তার বৌয়ের মুখে হাসি দেখা দিলো।

নকড়ি বৌকে গোয়ালঘরটার একদিক ঠিক ক'রে রাখতে বললো। সেখানেই গরুটা থাকবে।

নকড়ি খেতে বসেছে, নকড়ির বৌ বললো—'যাক, এবার সবায়ের মুখে একটু দুধ পড়বে। কিন্তু একটা কথা আগেই জানিয়ে রাখছি—খেঁদী দুধটুধের ধার ধারে না, সে খেতে চায় দুধের সর। দুধ জ্বাল দিয়ে তার জন্যে পুরু সর করা যাবে। তা খাবে কিন্তু সব সে-ই।'

—'আ-হা-হা, কথা শোনো। সর সব খাবে তোমার খেঁদী। কেন, পলটু কি ভেসে এসেছে নাকি? সে না সবার ছোটো, খেঁদী তো ধাড়ি মেয়ে!'—নকড়ি প্রতিবাদ জানালো।

বৌ, বললো—'হ'লোই বা পলটু সবার ছোটো, সে তো ব্যাটাছেলে, বড় হ'য়ে রোজগার ক'রে এনে খাবে-ফেলবে কতো। আর খেঁদী মেয়েছেলে, দু'দিন বাদে পরের ঘরে চ'লে যাবে। বাপের বাড়িতে খাওয়া জুটবে আর ক'দিন। ওকে সর না দিয়ে খাওয়াতে হবে পলটুকে!'—বৌ ঠোঁট উলটে মুখের ভংগী ক'রে দেখালো নকড়ির কথা মানে কে।

নকড়িও ছাড়বার পাত্র নয়। সে হাত নেড়ে জানালো—'নাঃ, তা কখনো হবে না।'

খেঁদী মায়ের ন্যাওটা, পলটু বাপের ন্যাওটা। তাই কে সর খাবে তাই নিয়ে দু'জনের কথা কাটাকাটি চললো। সে কথা কাটাকাটি দাঁড়ালো রাগারাগিতে। তারপর তুমুল ঝগড়া।

ঝগড়া শুনে পাশের বাড়ির সাতকড়িখুড়ো নকড়ির বাড়িতে এসে উপস্থিত।

সাতকড়ি-খুড়ো বললো—'কি হে নকড়ি, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া কিসের?'

নকড়ি খুড়োকে বুঝিয়ে দিলো—সে একটা গরু পুষবে। সেই গরুর দুধের সর খেঁদী খাবে না পলটু খাবে সেই কথাই হচ্ছিল।

দুধের সর কে খাবে সে কথায় সাতকড়ি-খুড়ো তেমন কান দিলো না। নকড়ি গরু পুষবে তাই শুনেই সে বললো—'অ্যাঁ, তুমি গরু পুষতে চাও? তা বেশ, পোষো। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখছি বাপু! গরুটা যখন-তখন হাম্বা হাম্বা ক'রে ডাকবে, তাতে তো সকলের ঘুম ভেঙে যাবে। আমার নিজের কথা বলছি না, পাড়ায় আরো তো দশজন বুড়োবুড়ী আছে। তাদের অনেকেরই রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। দুপুরবেলায় তাই তারা চোখদুটো একটু বুজতে চায়। সেই সময় তোমার গরু হাম্বা হাম্বা করে ডেকে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তারা রুখে আসবে না? তখন তাদের থামাবে কে? আমি বলি কি, আমাকে তুমি রোজ এক সের ক'রে দুধ দিও, আমি তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখবো।'

নকড়ি আর কি করে!—আমতা আমতা ক'রে বললো—'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ পরে বাইরে গলার খাঁকারি শুনে নকড়ি চেয়ে দেখে পেছনের বাড়ির তিনকড়িদাদা উপস্থিত।

তিনকড়ি বললো—কি হে নকড়ি, তোমাদের বাড়িতে আজ কুরুক্ষেত্রের লড়াই চলছিলো কেন? ব্যাপার কি?

নকড়ি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই তিনকড়ি-দাদা বললো—'দুধের সরফর তোমরা যাকে ইচ্ছে খাওয়াও, না, তাতে আমাদের কি আসে-যায়? কিন্তু, তুমি যে গরু পুষতে চাও, সেই গরু ছাড়া পেয়ে যখন এ-বাড়ির ও-বাড়ির জিরাত কৃষি নষ্ট করবে, তার গুণাগারী দিতে পারবে? আমি বলি কি, তোমার গরুটার দিকে আমি সব সময়ই নজর রাখবো যাতে এ-বাড়ি ও-বাড়ি না যেতে পারে। তুমি আমাকে রোজ এক সের ক'রে মাখন দিও—ঐ গরুর দুধেরই তোলা টাটকা মাখন।'

নকড়ি আর করে কি? আমতা আমতা ক'রে বললো—আচ্ছা।'

খানিকবাদে থোলো হুকো টানতে টানতে সামনের বাড়ির এককড়ি ঠাকুর্দা এসে হাজির। সে বললো—'কই গেলে হে, নকড়ি? দিনে-দুপুরে তোমার বাড়ি ডাকাত পড়েছিলো নাকি? অত চেঁচামেচি হচ্ছিল কিসের?

নকড়ি সব কথা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললো—'আপনিই বলুন দেখি, ঠাকুর্দা, দুধের সর খেঁদী খাবে না, পলটু খাবে?'

এককড়ি ঠাকুর্দা বললো—'সুবিচার ক'রেই তবে বলছি বাপু, শোনো। কে সর খাবে তা নিয়ে ঘরের মধ্যে অতো ঝগড়াঝাটির দরকার কি? সব ফ্যাসাদই চুকে যাবে অতি সহজেই,—দুধের সর দিয়ে সরবাটা ঘি ক'রে রোজ আমাকেই সবটা দিও। যদি বল কেন?—তা-ও তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি গরু পুষতে চাও, পোষো, তাতে আমাদের মাথাব্যথা কি? কিন্তু ঐ গরু তো একদিন মরবে। তখন সে মড়া ফেলবে কোথায়? নিকটেই ফেলো আর দূরেই ফেলো, মরা গরুর একটা পচা দুর্গন্ধ আসবেই তো! তখন যে গাঁয়ের লোক তোমাকে মারতে আসবে, কে তাদের ধ'রে রাখবে? তোমাকে কথা দিচ্ছি—আমিই তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে দেবো। সেজন্যে রোজ আমাকে ঐ সরবাটা ঘি দিও।'

নকড়ির বৌ ঘরে ব'সে এককড়ি-ঠাকুর্দার কথা শুনছিলো। সে ভাবলো—এককড়ি-ঠাকুর্দাকে ঘি দেওয়ার জন্যে সমস্ত সরই যদি খরচ করতে হয়, তা হ'লে তার খেঁদীর মুখে পড়বে কি?

নকড়িরও মনে হচ্ছিল ঠিক ঐ কথাই। সব সর

নকড়ি হাত নেড়ে জানালো—নাঃ, তা কখনো হবে না

দিয়ে ঘি ক'রে যদি ঠাকুর্দাকেই দিতে হয়, তা হ'লে তার পল্টু খাবে কি?

বৌ নকড়িকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বল্লো—'দ্যাখো, দুধ মাখন সাতকড়ি-খুড়োকেই দাও আর তিনকড়ি-দাদাকেই দাও, তাতে কিছু ক্ষেতি নেই। কিন্তু সরটা বেটে এককড়ি-ঠাকুর্দাকে ঘি ক'রে দিলে খেঁদী খাবে কি?

নকড়ি বৌয়ের সঙ্গে যুক্তি ক'রে একটা ফন্দী করলো। তারপর ফিরে গিয়ে এককড়ি-ঠাকুর্দাকে বল্লো—'ঠাকুর্দা, আপনি কথাটা বলেছেন ঠিকই। কিন্তু গরুটার দুধ যদি প্রত্যহ বাছুরে সব খেয়ে ফেলে তা হ'লে কি হবে?

এককড়ি ঝাঁঝিয়ে উঠ্লো—'বাছুরে দুধ খাবে কি রে? বাছুরটাকে বেঁধে দূরে সরিয়ে রাখ্তে পার্বিনে?'

'তা নয় কর্লুম'—নকড়ি সে কথারও জবাব দিলো—'কিন্তু গরুটার যদি দুধ না-ই হয়?

—'দুধ না হয়!—বল্লেই হ'লো! হ'তেই হবে তার দুধ। সেটা তো আর বলদ নয়।'

নকড়ি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্লো—'আজ্ঞে, যদি বলদই হয়।'

—'মরগে তবে তুই তোর বলদ নিয়ে'—এককড়ি-ঠাকুর্দা রাগ ক'রে এই-না ব'লে হুঁকো টান্তে টান্তে চলে গেলো।

পরদিন ভোরে সুবুদ্ধি-গোয়ালার বাড়ি গিয়ে নকড়ি গাইয়ের বদলে একটা বলদ চেয়ে আনলো। সেটাকে ঢেঁকিঘরে রেখে দিয়ে আপন-মনেই সে বল্তে লাগ্লো—'আঃ, বাঁচা গেলো! গাই-গরু আনলে কত হ্যাংগামেই না পড়তে হ'তো। খেঁদী না পল্টু সর খাবে, সে কথা তো ছিলোই, এককড়ি-ঠাকুর্দার ঘি জোটাতে সব সরটুকুই সাবাড়! তার চেয়ে আমার বলদই ভালো।'

এককড়ি-ঠাকুর্দা রাগ করে হুকো টানতে টানতে চলে গেল

নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অভুর বয়স বছর চৌদ্দ। নীতা বারো। দুটি ভাই বোন। আশ্চর্য সদ্ভাব। দু'জনে।

নীতার জন্মদিন। অভুর মহা ভাবনা। কি উপহার দেবে? কি পেলে বোনটি খুশী হবে? অনেক রকম ভেবে, শেষে একটা যা হয় ঠিক করে ফেলত।

অভুর জন্মদিন এলে নীতারও ওই একই দুর্ভাবনা। দাদাভাইকে কী দেওয়া যায়? সেও নানারকম জল্পনা-কল্পনা করে একটা কিছু কিনে আনতো শেষে।

যে যাকে যাই দিক, কেউ কাউকে কখনো বলতো না যে, এটা তুমি কি দিলে? এ আমার পছন্দ নয়।

অভু যা দিত নীতা পেয়ে খুশী হত। নীতা যা দিত অভু পেয়ে খুশী হত। একজন বলত, 'কী সুন্দর জিনিসটি!' আর একজন বলত, 'কী চমৎকার!'

একদিন তারা জানতে পারলে, আসছে, রবিবার তাদের মায়ের জন্মদিন। এর আগে মায়ের জন্মদিনের কথা তারা কখনো শোনেনি।

ভাই বোনে বসে গেল পরামর্শ করতে। মাকে জন্মদিনে একটা উপহার দিতে হবে। কিন্তু কি দেওয়া যায়?

জীবনে এই প্রথম ভাই বোনে মতের মিল হল না। অভু বলে, মাকে এমন একটা কিছু দেব যা মায়ের কাজে লাগবে। নীতা বলে, না, কাজে লাগার জিনিস দেব না। ভালোলাগার জিনিস দেব।

শেষ পর্যন্ত বাবার মধ্যস্থতায় স্থির হল, যে যার খুশি মতো জিনিস কিনে দেবে। কিন্তু দাম এক হওয়া চাই। বাবা ওদের পার্বণীতে পাওয়া জমানো টাকা থেকে ছেলেকেও দশ টাকা দিলেন। মেয়েকেও দশ।

বাবা, মা, আর অভু, নীতা দুটি ভাই বোন। এই নিয়ে ওদের সংসার। অবস্থা ভাল। খবার টাকার অভাব নেই। কিন্তু মা নিজে রাঁধেন। ঠাকুর রাখেন না। ঝি চাকর অবশ্য আছে।

বাবা বলেন, এটা ভালো। এ ব্যবস্থায় ভালো খাওয়া যায়, আর স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

মা বলেন, শুধু তাই নয়। ঠাকুর না রাখলে অনেক কম খরচ হয়। জিনিসপত্র বাঁচে। সংসারের কত সাশ্রয় হয়।

নীতা যতটা পারে মাকে সাহায্য করে। অবশ্য, বেশি তাকে করতে হয় না। ঝি মানদাই সব করে।

বাবা রোজ, চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিজেই বাজার করে আনেন।

কিন্তু মা রান্না করেন, অভুর এটা পছন্দ হয় না। ওর কেবলই মনে হয় আগুন-তাতে রাঁধতে মার কতই না কষ্ট হয়।

মা তাকে বোঝান, না বাবা, আমার কোনও কষ্টই হয় না। বরং তোমাদের নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে আমার খুব আনন্দ হয়।

অভু চুপ করে মুখ বুজে খায় বটে, কিন্তু মার জন্যে তার মন কেমন করে। খেতে বসে বলে, মা তুমি এত রাঁধ কেন? আমার তো শুধু আলুভাতে ভাত আর মাছের ঝোল হলেই খাওয়া হয়ে যায়।

মা বলেন, বোকা ছেলে, রোজ কি এক রকম খেতে কারো ভাল লাগে? তাই রকম রকম রেঁধে দিই। তোমাদের বাবা যে রকম রকম খেতে ভালবাসেন!

অভু শোনে। কিছু বলে না। মনে মনে বাবার উপর রাগ হয়।

মায়ের জন্মদিনে অভু ঠিক করলে, মাকে একটি ইলেকট্রিক উনুন কিনে দেবে। তাহলে মায়ের রাঁধতে গিয়ে আর আগুনতাতে কষ্ট হবে না। মাটির উনুনের ধোঁয়ায়, আর গন্গনে কয়লার আঁচে মার রাঁধতে খুবই কষ্ট হয়।

নীতা প্রস্তাবটা শুনে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—বাঃ চমৎকার বুদ্ধি বের করেছো দাদাভাই! সে নিজে কিন্তু মাকে কি দেবে অভুকে কিছুই বললে না। তার ইচ্ছে সে মাকে বাবাকে, অভুকে, সক্কাইকে অবাক করে দেবে!

এল সেই বহু প্রতীক্ষিত জন্মদিন। এই কদিন ওরা দুই ভাই বোনে কেবলই চুপি চুপি কত পরামর্শ করেছে। যে যার জিনিস কিনে এনে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। মাকে কিছুই জানতে দেয়নি। মায়ের জন্মদিনে, উপহার দেওয়া তাদের জীবনে যে এই প্রথম!

নিঃশব্দে ফুল এনে লাল নীল ... মালা আর নিশান দিয়ে তাদের পড়ার ঘরখানিকে তারা সাজিয়েছে। মাকে নিয়ে সেখানে আজ উৎসব করবে তারা। সুন্দর রং দিয়ে কাগজের উপর ছবি এঁকে মা আর বাবার জন্য দুখানি

মা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন—ওকি সর্বনাশ করেছিস খোকা?

নিমন্ত্রণপত্র তারা নিজের হাতে তৈরি করেছে। তাতে লিখেছে—"আমাদের পরম পূজনীয়া মা জননীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে অদ্য সন্ধ্যায় অভু-নীতা পাঠাগারে একটি উৎসব অনুষ্ঠান হইবে। আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। যথাসময়ে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

স্থির হয়েছে তারা দুই ভাই বোনে প্রথমে মিলিত কণ্ঠে "জন-গন-মন অধিনায়ক" এই জাতীয় সঙ্গীতটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন করবে। তারপর মাল্য চন্দনে মায়ের অর্চনা। তারপর উপহার প্রণামী। তারপর অভু-নীতা দুজনে মিলে 'কচ ও দেবযানী' আবৃত্তি করবে। তারপর নীতা "মাতৃবন্দনা" নামে একটি গান করবে। অভু বাজাবে। তারপর নীতার 'পূজারিণী' নৃত্যের দ্বারা উৎসব শেষ হবে। চা ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ।

* * *

উৎসব শুরু হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীতের শেষ কলি—'জয় জয় ভারত ভাগ্যবিধাতা' সুরের আকাশে মিলিয়ে শেষ হল। তারপর মাল্য চন্দনে হল মায়ের সুরভি-সুন্দর অর্চনা। মার মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এইবার উপহার প্রণামী। ভাই বোনের মধ্যে অগ্রজ হিসাবে অভুই প্রথম মার হাতে এনে দিলে একটি অতি সুন্দর ছোট্ট ঝক্‌ঝকে চকচকে ইলেকট্রিক স্টোভ।

মার হাসি মুখখানি ছেলের উপহার দেখে একেবারে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠে বললেন, "একি সর্বনাশ করেছিস খোকা? মাকে কি মেরে ফেলবি? এ জিনিস এনেছিস কেন? এ যে মানুষ মারা কল!"

শুনে খোকার মুখখানি এবার শুকিয়ে উঠলো। অভুর কাঁদ কাঁদ ভাব দেখে নীতার চোখ দুটিও জলে ছল্ ছল্ করতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের দুরবস্থা দেখে বাবা উঠে এসে ইলেকট্রিক স্টোভটি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "বাঃ! চমৎকার জিনিস এনেছে অভু। তোমার জন্মদিনে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কিছু হতেই পারে না! শুধু সকেটে প্লাগটি লাগিয়ে দিলেই, ব্যাস্, পাঁচ মিনিটে চায়ের জল গরম হয়ে উঠবে। দুধ জ্বাল দেওয়া হয়ে যাবে। এ্যালুমিনিয়ম প্যানে রাঁধলে ডাল ভাতও পনেরো মিনিটে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

মা রেগে উঠে বললেন, থামো, দুধ গরম করবার জন্য ওই প্লাগ লাগাতে গিয়েইত সেবার আমার পিসিমার ডান হাতখানা পুড়ে ঝল্‌সে গেছে। সেকি মনে নেই? আর মণি—? মণিকে কি ভুলে গেলে এরই মধ্যে? ওই চা করতে গিয়েইত 'শক্' খেয়ে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেল! আর তার জ্ঞান ফিরল না! আহা রে!

বাবা একবার চেয়ে দেখলেন—অভুর দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে! অভু তা কোঁচার খুঁটে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছে!

অভুর মাকে তিনি বললেন, তুমি দেখছি একটি অজ্-পাড়াগেঁয়ে! কবে কার কি হয়েছিল এই ইলেকট্রিক স্টোভ ব্যবহার করতে গিয়ে তাই মনে করে রেখেছ! আর, লক্ষ লক্ষ লোক যে পৃথিবীময় নানা দেশে এই স্টোভ ব্যবহার করছে, কই তারা তো কেউ মরছে না! তাছাড়া তুমিত দেখলেই না এ জিনিসটা ভাল করে। এ এমনভাবে তৈরী যে কিছুতেই শক্ লাগতে পারে না। একেবারে লেটেস্ট! 'শক-প্রুফ'। খোকা! তোমাদের উৎসবের যে চা দেওয়া হবে সেকি তৈরি হয়ে গেছে?

অভু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, না বাবু!

বাবা বললেন, বেশ! আমি তোমার মার এই নতুন উনুনেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা করে দিচ্ছি। নিয়ে এসতো চায়ের সরঞ্জাম।

'এখনি সব এনে দিচ্ছি বাবা!' বলে নীতা ছুটে গিয়ে একখানি ট্রে করে টি-সেট সাজিয়ে নিয়ে এল এবং জল গরম করবার কেটলিটিও নিয়ে এল।

বাবা ইলেকট্রিক স্টোভের প্লাগটি লাগিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা রেডি করে প্রথম

বাবা বললেন, কই গো নীতু! তুমি কি এনেছ...

কাপটি মার হাতে দিলেন। বললেন, তুমি আজকের এই উৎসবের প্রধানা অতিথি—তোমার সম্মান আগে—

মা হেসে ফেললেন। এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, বাঃ। বেশ চা হয়েছে তো? উনুনটা দেখছি ভাল।

বাবা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, শুধু দেখতেই ভাল নয়, কাজেও ভাল এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ! এই দেখ, এতে কালিঝুলের এতটুকু সম্পর্ক নেই। বলেই তিনি উনুনটা তুলে এনে তার সুবিধা অসুবিধা মাকে সব বোঝাতে লাগলেন। কলকব্জা খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন।

মা যেন এবার কতকটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল। বাবা বলতে লাগলেন, এতদিন তুমি আমাদের রেঁধে খাইয়েছ, এইবার আমরা তোমাকে রেঁধে খাওয়াবো। কি বল অভু? উপহার তোমার শুধু উনুনটাই নয়—ও'র কাজের ভার কমিয়ে দেওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য?

অভু ফুঁপিয়ে উঠে বললে, হ্যাঁ বাবু!

বাবা বললেন মাকে, ওগো, ছেলে তোমায় এমন উনুন এনে দিয়েছে যে রান্না এখন থেকে হয়ে উঠবে তোমার খেলার সামিল। বাচ্চারাও এ উনুনে যা খুশী তৈরি করে তোমায় খাওয়াতে পারবে।

মার মুখখানি এইবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অভুকে ডেকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে আদর করে চুমু খেয়ে বললেন—বেঁচে থাক বাবা, রাজা হও। মাকে তুমি এত ভালবাসো জেনে আমার যে কত আনন্দ হচ্ছে কি বলবো? লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, মনে কোনো কষ্ট রেখনা বাবা, আমি জংলী কিনা, তাই আগে বুঝতে পারিনি। তোমার উপহার আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি আজ থেকে রোজ তোমার দেওয়া এই উনুনটিই ব্যবহার করবো—কেমন খুশী ত?

অভুর মুখে একটা প্রসন্নতার হাসির ফুটে উঠলো বটে, কিন্তু বেচারির চোখের জলটুকু তখনও শুকোয়নি। মুখে হাসি, চোখে জল!

বাবা এইবার নীতার দিকে চেয়ে দেখলেন। তারও সেই ছল-ছল চোখে মুখে একটা হাসির ঝিলিক ফুটছে! যেন মেঘের বুকে বিদ্যুৎ খেলছে!

বললেন, কই গো নীতু! তুমি কি এনেছো আজ তোমার মাকে জন্মদিনের উপহার দিতে? নীতা চেয়ে দেখলে, দাদাভাই যেন বড় কাতরভাবে ফ্যাকাসে মুখে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। নীতার কেমন দাদাকে দেখে বড় মায়া হল। সে তার মায়ের জন্যে সমস্ত নিউ মার্কেট ঘুরে ঘুরে খুব চমৎকার একটি লাল মখমলের হ্যান্ডব্যাগ এনেছিল। তাতে জরির কাজকরা এবং মাঝে মাঝে আয়নার টুকরো বসানো। রাতে আলো লেগে হীরে মাণিকের মতো ঝক্‌মক্ করে। মা সেটা পেলে নিশ্চয় খুব খুশী হতেন!

নীতা কিন্তু আর সে ব্যাগটা বার করলে না। পাছে তার দাদাভাই আবার লজ্জা পায়! বললে, বাবু, আমি আর দাদাভাই দুজনে মিলেইত মার জন্যে ওই ইলেকট্রিক স্টোভটা এনেছি! কাল থেকে আমি রান্না করবো যে! মাকে আর রাঁধতে দেব না।

নীতা দুষ্টুমীর চাউনি নিয়ে অভুর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। তার দাদাভাইয়ের মুখখানি যেন তখন নীতার প্রতি অসীম স্নেহে ও কৃতজ্ঞতার দীপ্ত হয়ে উঠেছে?

নীতা বললে, এসো দাদাভাই—মাকে আর বাবুকে আমরা এইবার জন্মদিনের প্রণামটা সেরে নিই!

প্যাঁচা-বাদুড়-বোয়ালে

শ্রীসুনির্মল বসু

প্যাঁচা

(কোটরে বসে)

ঝর্‌লো বাদল ঝম্‌ঝমাঝম্‌ সারাটি রাত ধরে—
বার হওয়া তাই হয়নি আমার আছি উপোষ করে।
এতক্ষণে ভোর হয়েছে, ঝর্‌ছে দিনের আলো,
কি করি হায়, দিনের বেলায় দেখ্‌তে
না পাই ভালো।

ইঁদুর-বাদুড়-ব্যাং-ব্যাঙাচি-ফড়িং-টড়িং হলে
মিট্‌ত কিছু খিদের জ্বালা,
পেট্‌টি যে যায় জ্বলে,—

বাদুড়

(পাশের ডালেই ঝুল্‌ছিল। বাদুড় খাওয়ার কথা
শুনে,—মনে মনে বল্ল)

ইঁদুর-বাদুড় খেতে তোমার সাধ হয়েছে নাকি?
মজা তোমায় দেখাচ্ছি আজ, দাঁড়াও হুতুম-পাখি।'

(জোরে)

আহা-আহা দুঃখ বড় তোমার কথা শুনে,
ভুতুম-দাদা, আমরা সবই মুগ্ধ তোমার গুণে।

প্যাঁচা

কে তুমি হে রসিক-ভায়া, ডাকছ আমায় দাদা,
সত্যি কথা, বুঝ্‌ছি এবার মনটি তোমার সাদা।

বাদুড়

রংটি কালো, মনটি সাদা, মরছি তোমার শোকে,
দিনের বেলা তোমার মতই দেখ্‌তে
না পাই চোখে।

প্যাঁচা

নামকি তোমার? বাদুড় বুঝি,
তোমায় জানি জানি,
পশুও নও, পাখিও নও, আজব তুমি প্রাণী।
তোমার খবর আমার কাছে ভালো করেই জানা,—
যেম্‌নি তোমার রূপ, তেমনি গুণ রয়েছে নানা।

বাদুড়

তা' কিছু ভাই গুণ আছে মোর,
সমস্ত দিন ধরি—
গাছের ডালে কায়দা করে' শীর্ষ-আসন করি।
ঠ্যাং চলে যায় উপর দিকে,—উল্‌টে থাকে মাথা,
সমস্ত দিন ধ্যান করি তাঁর—পরম যিনি ধাতা।
এই ধ্যানেতেই বিদ্যা অনেক লাভ করেছি আমি,
ইচ্ছা মত খাবার আমার জুট্‌ছে দিবাযামী।

প্যাঁচা

বলছ কি হে,—খাবার আসে
তোমার মুখের পরে,—
ইচ্ছামত সাবাড় কর টপ্‌টপাটপ্‌ ধরে?
আমি তো ভাই আঁধার রাতে
হেথায় হোথায় ঘুরি—
তবুতো ছাই পাইনা খেতে পেট্‌টি আমার পুরি।

বাদুড়

অবাক্‌ কাণ্ড, প্যাঁচাদাদা বল্‌ছ অকপটে—
খাট্‌নী খেটেও পাওনা খাবার, আজব কথা বটে!

প্যাঁচা

খিদের জ্বালায় কাতর আমি হচ্ছি গুরুতর,—

বাদুড়

আমার মত হেথায় এসে শীর্ষ-আসন কর।
ধ্যান করো আর মন্ত্র জপো ঝুলে গাছের ডালে
মুখের কাছেই খাবার তোমার
আস্‌বে পালে পালে।
ব্যাং-ব্যাঙাচি আস্‌বে চলে যেথায় যত আছে—
ফড়িংগুলো তিড়িং তিড়িং নাচ্‌বে নাকের কাছে।
ইঁদুর-ছুঁচো-গিরগিটি-জোঁক
আস্‌বে সবাই মিলে
ঘরে বসেই মনের সাধে ফেল্‌বে তাদের গিলে।

প্যাঁচা

আসন করা শিখাও আমায়,—
থাকব ডালে ঝুলে,
আশিস্‌ তোমায় করব ভায়া সমস্ত প্রাণ খুলে।

বাদুড়

এসো এসো কোটর ছেড়ে আসন শিখাই তবে,
মন্ত্র কিছু শিখিয়ে দেব, জপ্‌তে সেটা হবে।

(প্যাঁচা উড়ে এসে বাদুড়ের কাছে বস্‌লো)

এম্‌নি করে ঠ্যাং তুলে দাও আমার মত করে—
আঁকড়ে থাকো আচ্ছা করে' ডালখানারে ধরে।
'ক্লিং-ক্লিং-টিং' মন্ত্র জপো চক্ষু দুটি বুজে—
ঝুল্‌তে থাকো গাছের ডালে
ঘাড়টি তোমার গুঁজে।

প্যাঁচা

(আসন শিখ্‌তে গিয়ে নীচে পড়্‌তে লাগ্‌লো)

ও ভাই বাদুড়, পা দুটিরে তুল্‌তে গিয়ে ড্যালে—
মুখ থুবড়ে এবার আমি পড়ছি-নীচের খালে।
উড়্‌তে যে আর পারছি না ভাই—
মচ্‌কে গেছে ডানা,
দিনের বেলা দেখ্‌তে না পাই—
আমি যে দিন-কানা।

বাদুড়

হো-হো-হো কেমন মজা, বাদুড় খাবে নাকি?
হতচ্ছাড়া হুতুম-থুমো—লক্ষ্মী-ছাড়া পাখি,—
গাছের নীচে প্রকাণ্ড খাল বোয়াল মাছের বাসা—,
তোমায় পেয়ে এবার তারা ভোজ লাগাবে খাসা।

(প্যাঁচা মুখ্‌ থুব্‌ড়ে খালের জলে পড়ল।)

বোয়াল

মুখের কাছে হঠাৎ এসে পড়লো এটা কিরে?
খাবার-বুঝি! টুক্‌রো করে ঠুক্‌রে খাব ধীরে।

(বোয়াল হাঁ করে প্যাঁচাকে গিল্‌তে লাগ্‌লো)

বাদুড়

বোয়াল-দাদা—ভুতুম প্যাঁচা করলো যে বক্‌মারি,
মন্ত্র-আসন শিখ্‌তে গিয়ে ভুল করেছে ভারী।
উল্‌টা হলো ফল্‌টা যে তাই,
আস্‌বে খাবার মুখে,—
নিজেই গেল খাবার হয়ে তোমার মুখে ঢুকে।
হাড়্‌-হাবাতে পক্ষী ওটা—হিংসুটি যে বড়—
উন্‌-পাজুড়ে ভুতুমটারে জলদি হজম কর।

নয়ন চোর

শ্রীবীণা দে

নয়ন চোর! নয়ন চোর!
পাথায় নয়ন গোঁজা তোর!
কোন নাপিতের নয়ন চুরি
করেছিলি, কেন?
আয় রে পাখি
বোস রে হেথা
বল দেখি তোর জীবন-কথা
কী নাম ছিল আগে রে তোর?
কবে থেকে হলি রে চোর?
কীসের অভাব ছিল রে ভাই
করলি চুরি কেন?
আগে কেমন দেখতে ছিলি?
চোর অপবাদ কেন নিলি?
কার বা নয়ন কোথায় পেলি?
কেন হলি চোর?
এমন সবুজ পাখি রে তুই
তোর তরে ভাই বেদনা পাই
ডাকতে গিয়ে থেমে যে যাই
ডাকতে—নয়ন চোর!
ওরে পাখি আয় রে হেথা
বলে যা তোর আসল কথা
ও নয়ন তুই পেলি কোথা?
কেন রে তুই চোর?
ওরে আমার সবুজ পাখি
ওরে নয়নচোর!

এলেম থাকা চাই

'স্বপনবুড়ো'

খোদন বলে, [illegible] মতো অকেজো হয়ে বসে থাকলে এ যুগে কোনো কাজ হয়? এলেম থাকা চাই, বুঝলি?

বন্ধুরা সবাই অবাক হয়ে ওর কথা শোনে। যেন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে চরণামৃত পান করছে!

আর সত্যি কথাই ত!

খোদন কোনো কাজে পেছ-পা হয় না, তাই সব সময় তার জায়গা সবাইকার আগে।

ইস্কুলে সরস্বতী পুজো হয়—খোদন তার মোড়ল। চাঁদা তুলতে, সেই টাকা দৈ-খৈ করে খরচ করতে ওর জুড়ি মেলা ভার। সরস্বতী পুজো হলে কি হবে? সব চাইতে বেশী খরচ হয় মাইক আর বিসর্জনের লরী সাজাতে। পুজোটা সে নমঃ নমঃ করেই কোন মতে সেরে দিতে ওস্তাদ।

পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির পাশেই ও প্রতি বছর এমন চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে, ওর ছবি ফটোতে উঠবেই। সব সময় ঘুরে-ঘুরে করে কাজ করছে, সর্বত্র মোড়লি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু নজর আছে ঠিক ক্যামেরার দিকে। ফটো তোলা হয়ে গেলে, বুক ফুলিয়ে সোল্লাসে বলে, বুঝলি, এলেম থাকা চাই! প্রতি বছরের ফটো পর পর সাজিয়ে রেখেছি ঘরে। কোনোবার ফাঁক যায় নি। একটা ইতিহাসের ধারা সৃষ্টি করছি বুঝলি?

সাথী-সঙ্গীরা ওর কথা শোনে, আর অবাক হয়। সত্যি, এলেম আছে খোদনের। নইলে প্রতি বছর স্কুলের ফুটবল খেলায় গোল দেয় অপরে, খ্যাতি হয় তার! বলে, আমার টিম! আমি কাদা-মাটির মতো একে মেখেছি আর গড়েছি। কে কোন্ 'অ্যাংগেল' থেকে সুট করবে, কোথায় কার 'হেড্' করার পালা, কে পাস করে গোল দেবে—সব খাতা-পেন্সিলে ছক করা আছে। পুতুল নাচে যেমন সুতো টানলেই পুতুলগুলি নৃত্য করতে শুরু করে—এ ঠিক তাই। কাজেই আমার টিম যে জিতবে—এ আমার আগে থেকেই জানা কথা। ক'দিন ধরে নাক উঁচু করে ঘুরে বেড়ায় খোদন! তখন তার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না।

খোদন নেপোলিয়ানের একেবারে অনুরক্ত ভক্ত। নেপোলিয়ানের অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোনো কথা ছিল না, খোদনও এই কথাটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। ঠিক মতো যোগাযোগ করে নিতে পারলে সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যায়। সেই যোগাযোগ কি সবাই করতে পারে? তা পারে না। আর সেই জন্যেই চাই এলেম।

হঠাৎ দেখা গেল, খোদনের পাড়ার বিরাট বাড়িটা ভাড়া হয়ে গেছে আর ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। একেবারে অপরিচিত পরিবার। কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে আলাপ জমিয়ে নিতে না পারলে এমন রসালো নেমন্তন্নটা বাদ পড়ে যাবে।

খোদন তক্কে-তক্কে থাকে, কিন্তু কোনো হদিশ পায় না।

একদিন খোদন লক্ষ্য করে, সে বাড়ির বিপুলকায়া গৃহিণী "যা লেবে নাও ছ' আনা"-ওয়ালাদের একজনকে ডেকে বিয়ের জন্যে টুকি-টাকি জিনিসগুলির দরদাম করছেন। খোদন বুঝলে এই সুবর্ণ সুযোগ। কোনো রকমে পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হল। কোনো রকম ইতঃস্তত না করে বললে, মাসীমা এদের কাছ থেকে কোনো জিনিস নেবেন না, একেবারে বস্তাপচা মাল, আপনাকে নতুন পেয়ে একেবারে ডাহা ঠকিয়ে দেবে।

বিয়ে বাড়ির গিন্নি যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলেন। বললেন,—ঠিক বলেছ বাবা! তোমার মতো একজন করিৎকর্মা ছেলে না থাকলে হয়? তুমি ত' ঘরেরই ছেলে। আজ থেকে দু'বেলা যাবে আসবে, খোঁজ খবর নেবে। আমি তোমাকে নিয়েই বাজার করতে বেরুবো।

একদিন পরেই দেখা গেল—খোদন বিয়ে বাড়ির সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছে। বাজার করা থেকে শুরু করে ভিয়েন চড়ানো পর্যন্ত সব কাজে সে সিদ্ধ হস্ত। শুধু কি তাই? সে তার নতুন মাসীমাকে দিয়ে নিজের বন্ধুর দলকে অবাধে নেমতন্ন করিয়ে নিল।

চিংড়ি মাছের কাটলেটে কামড় দিয়ে বন্ধুরা বললে, হ্যাঁ, ছোঁড়ার 'এলেম' আছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। সামরিক বিভাগে যোগদান করলে ও একটা জেনারেল অবধি হয়ে যেতে পারতো।

এই ব্যাপারের মাসখানেক পরের কথা। একদিন

খোদন বলে—মাসীমা, এদের কাছ থেকে কোন জিনিস নেবেন না

ওর বন্ধু গজানন এসে বললে, ভাই খোদন, সর্দিতে মারা গেলাম, আমায় বাঁচা—

খোদন অবাক হয়ে উত্তর দিলে,—সর্দি হয়েছে—তা ডাক্তারের কাছে যা, আমি তোকে কি করে বাঁচাবো?

—না-রে-না! সে ব্যপার অত সোজা নয়।

আর্তনাদ করে ওঠে গজানন।

—ব্যাপারটা কি খুলে বলত?

সন্দিগ্ধ হয়ে খোদন প্রশ্ন করে।

গজানন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়, আরে ভাই, সে এক মহাভারত। বলি শোন্। আমাদের বাড়ির অভিভাবিকা পিসীমা। বাবা ওকালতি নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। এই পিসীর কোলেই মানুষ। কিন্তু মুস্কিল কি হয়েছে জানিস? পিসীমার ইদানীং এত ছুঁচিবাই হয়েছে যে, কথায়-কথায় স্নান করতে হবে। আর গোবর গিলতে হবে। নইলে ঘরে ঢোকা বারণ। ফলে কি হয়েছে জানিস? বারোমেসে সর্দিতে ভুগছি। কি করি বলত? বাড়ি ছেড়ে পালাবো, না আত্মহত্যা করবো?

খোদন মাথা নেড়ে উত্তর দেয়,—হুঁ! রোগ জটিল তা ত' বুঝতে পারছি। কিন্তু চট্ করে ত' কোনো বিধান দিতে পারিনে।

—তা হলে কি লোটা-কম্বল নিয়ে হিমালয়ে চলে যাবো? খোদন হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,—আরে বোকা, ওখানে ত শীত আরো বেশী। পিসীর জ্বালায় হয়েছে সর্দি, আর ওখানে গেলে হবে ডবল নিমোনিয়া!

—তবে উপায়?

হতাশ হয়ে গজানন বসে পড়ে।

খোদন বললে,—একেবারে আশা ছেড়ে দিস নি। আমায় একটা দিন সময় দে, আমি একটু ভেবে দেখি—

পরদিন দুই বন্ধু গোপনে দেখা করল।

খোদন বললে,—আচ্ছা, তোর পিসীর আর কে আছে বলত?

—না, না, তিন কুলে কেউ নেই। এক মেয়ে ছিল, তার কবে বিয়ে হয়ে গেছে;—এখন ছেলে-পুলে নিয়ে শ্বশুর ঘর করছে।

খোদন জিব দিয়ে তালুতে একটা শব্দ করে উত্তর দিলে, ঠিক হয়েছে। এইবার যেন একটা সুতোর খেই পাচ্ছি।

চোখ বুজে আপন মনে কি যেন বিড়-বিড় করতে থাকে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে, ঠিক হয়েছে, ওষুধ পাওয়া গেছে।

গজানন চোখ দুটো আলুচেরা গোছ করে শুধোয়,—হ্যাঁরে, কি ওষুধ মিলল—বলনা! আমার যে এদিকে হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

—তা হলে বলি শোন্।

খোদন ঘনীভূত হয়ে বসে বলতে থাকে—

—ধর, আমি যেন তোর পিসীর জামাইবাড়ি

থেকে [illegible] যখন বাড়ায় না [illegible]।

—[illegible]?

[illegible], পিসীর আমাদের শক্ত ব্যারাম। [illegible]। আমি যেন তাকে জামাই-[illegible] নিয়ে যেতে এসেছি।

[illegible] মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, এ পর্যন্ত [illegible] আসছে। কিন্তু শেষ রক্ষা করবি [illegible]?

খোদন বললে,—তারও প্ল্যান মাথায় আছে। [illegible] পেঁছে পিসীর মেয়েকে চুপি চুপি [illegible] বলে আস্‌বো যে তার মায়ের মাথা খারাপ হয়েছে। রোজ গঙ্গায় ডুবে মরতে যায়। চোখে চোখে রাখা দরকার। কোনো মতেই যেন আর ছেড়ে দেয় না। পরিষ্কার বল্‌বো, আমি মিথ্যে কথা বলেই নিয়ে এসেছি ওকে। নইলে অপঘাতে প্রাণ হারাবে তার মা!

এইবার গজাননের লাফিয়ে ওঠ্‌বার পালা।

খোদনের হাসি মুখ দেখা গেল, বললে—

বললে,— চমৎকার বুদ্ধি বাৎলেছিস্‌ ত' খোদন! দে পায়ের ধুলো দে—

—ধীরে গজু ধীরে—

খোদন মাঝপথেই গজাননকে থামিয়ে দেয়। গজানন প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার বসে পড়ে।

হঠাৎ তার মাথায় কি প্রশ্ন জাগে। তাই জিজ্ঞেস্‌ করে,—আচ্ছা, বাবাকে কি বলে বোঝাবো? তিনি যখন শুধাবেন—পিসীমা কোথায় গেল?

খোদন বললে,—হ্যাঁ, এটা একটা ভাব্‌নার কথা বটে। আচ্ছা, তোর সেই পিস্‌তুতো বোনের হাতে লেখা কোনো চিঠি আছে তোদের বাড়িতে?

গজানন উত্তর দেয়, আছে বৈ কি। সে আর কারো কাছে চিঠি লেখে না, শুধু মাঝে মাঝে আমার কাছেই বা দু' একখানা পত্র পাঠায়। আমিই ত' বাবাকে সেই খবর কখনো-সখনো জানিয়ে দি, পিসীমাও আমার কথাতে নিশ্চিন্ত থাকে।

খোদনের হাসিমুখ দেখা গেল, বললে,— তা হলে ত' কাজ সোজাই হয়ে গেল। তোর পিস্‌তুতো বোনের একখানি চিঠি আমি তৈরি করে দেবো'খন। ওর মা এখন কিছুদিন তার কাছেই থাকবে। মামা যেন কিছুমাত্র চিন্তা না করেন। ব্যস্‌! তা হলেই সব সমস্যার সমাধান! ওদিকে আমি মেয়েকে এমন ভয় দেখিয়ে আস্‌বো যে, জীবনে আর কখনো তার মাকে তোদের বাড়ি আস্‌তে দেবে না। সব সময় চোখে-চোখে রাখ্‌তে হবে কিনা তাই। আর জানিস্‌ ত', মায়ের আত্মহত্যা করার আশংকা, ওরে বাবা!

সব প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হয়ে গেল।

গজাননের বাবা সব সময় নিজের মাম্‌লা নিয়েই ব্যস্ত। শুধু একবার খবরটা শুনেই নিশ্চিন্ত।

গজানন অকৃতজ্ঞ নয়। খোদন পিসীমাকে রেখে ফিরে এলে সে বন্ধুদের একদিন হোটেলে নেমন্তন করে খাওয়ালে।

খোদন টিপ্পনি কেটে বললে,—আর তোর সর্দি লাগ্‌বার কোনো ভয় নেই গজানন, আমি তোকে বর দিচ্ছি—

কে যেন ফোড়ন দিলে, কিন্তু তাই বলে গোবর খাস্‌নে যেন! আর খোদনের 'এলেমের' কথা সব সময় মনে রাখিস্‌।

এইবার সবাই একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল!

আমার মামাতো ভাই গুপে বল্‌ল—"জানিস্‌, একবার শুধু আমার জন্য আমাদের বাড়ির দশ হাজার টাকার গয়না চোরের হাত থেকে বেঁচে গেছলো।" শুনে আমরা হেসেই কুটোপাটি, কারণ গুপে কুকুরকে ভয় করে, গরুকে ভয় করে, ভূতকে ভয় করে, চোরকে ভয় করে, মাতালকে ভয় করে। গুপে রেগে বল্‌ল "কি? তোদের বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? তবে শোন্‌—

গত বছর শীতের ছুটিতে আমার মামার বাড়ি গেছি, বড় মামীমার মেয়ের বিয়ে। সে সব তোরা ভাবতেই পারিস্‌ না। সাতদিন আগে থাক্‌তে রসুনচৌকী বসেছে, বড় বড় কানাৎ ফেলা হয়েছে, ভিয়েন বসেছে, ঘিয়ের আর মিষ্টির গন্ধে রাজ্যের কুকুর এসে জুটেছে। আত্মীয়-স্বজনও যে যেখানে ছিল, ছেলেপুলে সুদ্ধ এসে সব জমা হয়েছে। [illegible] টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, [illegible] সুবিধা করতে পারে নি, তাই নিয়ে ওদের মধ্যে বকাবকি রাগারাগি, চিলেকোঠায় গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা।

বুঝতেই ত পারছিস্‌ আমার মামাবাড়ির ওরা ভীষণ বড় লোক। খাওয়ার যা ব্যবস্থা, দুধের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, রুই মাছের পাহাড় জমে যাচ্ছে, আমরা খেয়ে কুল পাচ্ছি না। এমনি সময় মেজমামা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "বৌদি, গয়নাগাটি সব তোমরা একটু আগ্‌লে রেখো কিন্তু। এ অঞ্চলে ভীষণ চুরি হচ্ছে।" যেখান থেকে যত মাসিখুড়ি এসেছিলেন সকলের হাতে এই মোটা মোটা তাগা, গলায় ভারী ভারী বিছে হার, আর বাক্স বোঝাই রংবেরং-এর পাথর

মেমসাহেব খুলে দেখে সত্যি সত্যি পেঁয়েকে ভর্তি

বসান সব চুড়ি বালা কানের ঝুম্‌কো। সবার ত' মুখ প্যাঙাশপানা হয়ে গেল। যে যার বাক্সে আরেকটা করে তালা লাগাল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে হাত বুলতে বুলতে মেজমামার শালা বঙ্কুদা বেশ আসর জম্‌কিয়ে বসে রাজ্যের চোরের গল্প বল্‌তে আরম্ভ করল, শুনে সকলের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল। বড় মামা বল্‌লেন 'তা বাপু মন্দ বলিস্‌ নি, আজকাল ভালো মানুষের চেয়ে চোর ছ্যাঁচড়েরই সংখ্যা ঢের বেশী, এমন কি ওরা এখন পরস্পরের কাছ থেকে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে, আর বলিস্‌ কেন?' আমরা ত' হাঁ, সে আবার কি? বড়মামা হেসে বল্‌লেন—'তাও

জানিস্ না? এই ত' গেল বছর আমাদের দলের আপিসের জোটসাহেব করেছে কি, সব রেজিস্টার চিঠি ফিটি থেকে মেলা টাকা সরিয়েছে। এখন রাখে কোথায়, ওদিকে আবার তাই নিয়ে খোঁজ-খবর ধর-পাকড় চল্‌ছে, বাড়ীতেও রাখা যায় না জানাজানির ভয়ে, আবার ঘরেও রাখা যায় না ধরা পড়বার ভয়ে—চোরের ভয়। শেষটা করল কি, টাকাগুলোকে একটা ছোট প্যাকিং কেসে ভরে ম্যাক্লুস্কিগঞ্জে মেম-সাহেবের কাছে পার্শেল করে দিল। উপরে লেখে দিল "সাধারণ লোহার পেরেক"। যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেমসাহেব খুলে দেখে ওমা কি সর্বনাশ সত্যি সত্যি পেরেকে ভর্তি, টাকা-কড়ি হাওয়া! কি ফ্যাসাদ্ বল দিকিনি, না পারে পুলিশে খবর দিতে, না পারে কাগজে ছাপ্‌তে!'

বংকুদাটাকে আমরা দুচক্ষে দেখতে পারি না, সারাক্ষণ শুধু চাল মারে, যেন কোথাকার খাঞ্জাখাঁ এলেন। এদিকে ট্যাঁক ত গড়ের মাঠ, কোথায় কোন্ ফিকিরে কার কাছ থেকে কী বাগান যায়, সর্বদা সেই তালেই আছে। আর আমাদের পেছনে সারাক্ষণ লাগ্‌বে। বড় মামা একটা গোটা গল্প বলে দিবেন, সে ওর সইবে কেন? অমনি বলে বস্‌ল—"ও আর, এমন কি? কথায় বলে 'পুকুর চুরি', তা' আমাদের ওতরপাড়ার কাছে পুকুর চুরি ঠিক না হ'লেও গোটা একটা বাড়ি যে চুরি হয়েছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই। বুঝ্‌লেন বড়দা, ওতরপাড়ার ব্যাপারই আলাদা। এই যুদ্ধের সময় একেবারে গঙ্গার ধারে বাঁশবনের জমিদারদের তিন পুরুষের পুরনো বাড়িটা, দশ বছর খালি থাকবার পর ভাড়া হয়ে গেল। চমৎকার লোক গোপেনবাবু, ব্যবসা করে মেলা টাকা করেছেন। বাগবাজারে জমিদারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিন বছরের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রং টং করে, জঙ্গল সাফ করিয়ে তার ভোল বদ্‌লে দিলেন। লোকটিও ভারী অমায়িক, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাড়ার একটি মাতব্বর হয়ে উঠলেন। স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, দুর্গা পুজো কমিটির পান্ডা, কথায় কথায় পাঁচ টাকা চাঁদা ফেলে দেন, দশ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে দেন। গিন্নীও খাসা লোক, সকলের মুখে তাঁদের প্রশংসা ধরে না।"

গুপে এই অবধি বল্‌তেই আমরা বল্‌লাম—"আরে তুই কি ক'রে গয়না বাঁচালি তাই বল্ না।" রাগে গর গর করতে করতে গুপে বল্‌ল "আরে গোড়া থেকেই শোন না। বুঝ্‌লি তারপর বংকুদা বল্‌তে লাগল—"মাসকাবারে গোপেনবাবু নিজে গিয়ে বাগবাজারে ভাড়া দিয়ে আসেন। সেখানেও তাঁর ভারী খাতির। শেষে একদিন পাড়ার ক্লাবে বল্‌লেন, "বাড়িটা কিনেই ফেল্‌লাম হে, একেবারে সের দরে ইঁট কাঠ বেচে, নতুন করে বাড়ি ফাঁদ্‌ব, কি বলেন" সবাই মহা খুসি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কনট্রাক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। দশ হাজার টাকা দিয়ে গোপেনবাবু পোড়োবাড়ি বেচে দিলেন, চমৎকার সব পুরনো কাঠের কড়ি বর্গা, দরজা জানলা, সস্তাই হ'ল। কনট্রাক্টর পাড়ারই লোক, তা'র সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল দুমাসের মধ্যে বাড়ি ভেঙে লোহালক্কড় ইঁটকাঠ সরিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে হ'বে। ইতিমধ্যে উনি নিজে গিন্নীকে নিয়ে বদ্যিনাথে হাওয়া বদ্‌লাতে যাবেন। ফিরে এসে যা লেখাপড়া দরকার সব হ'বে।

দশ হাজার টাকা নিয়ে গোপেনবাবুরা বদ্যিনাথ গেলেন। ইতোমধ্যে কনট্রাক্টর বাড়ি চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেল। এমনি সময় একদিন স্বয়ং জমিদারবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। কি সর্বনাশ, বাড়ি কোথায় গেল? আর বাড়ি কোত্থেকে আস্‌বে? গোপেনবাবুও একেবারে নিখোঁজ!

বংকুদা গল্প শেষ ক'রে একটিপ নস্যি নিল। এমন সময় মামাদের সরকার মশাই বড় একটা লাল শালুর পুঁটলি এনে বড় মামার কোলে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন—"ধরুন, সিন্দুকে তুলুন, এর মধ্যে দশ হাজার টাকার গয়না আছে।" বড়মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন—"ওমা, তাইত, এই গুপে, যা ত' বাবা এই পুঁটলিটা তোর বড়-মামীমাকে দিয়ে আয় এখনই সিন্দুকে তুলে ফেলুক্।" গেলাম ছুটে। বড় মামীমা ছোট খুকীকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই অর্ধেক ঘুমুচ্ছেন। সিন্দুকের চাবি আমাকে দিয়ে বল্‌লেন—"তুমি ত' বাবা সিন্দুক খুল্‌তে জান, তুলেই রাখ না লক্ষ্মীসোনা।"

পরদিন সকালে মহা হৈ চৈ! ঐ অত বড় লোহার সিন্দুক রাতারাতি তাকে কে খুলে ফেলেছে, দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে, ভিতরে খালি! কান্নাকাটি, রাগারাগি লেগে গেল? বড়মামা পুলিশে খবর দিতে যাবেন বলে চটি পায়ে দিচ্ছেন। বংকুদা, ছোটমামা সবাই চেঁচামেচি করছেন, এমনি সময় আমি গুটিগুটি গিয়ে বড়মামার হাতে লাল সালুর পুঁটলি ও সিন্দুকের চাবিগাছি দিলাম।

"এ্যাঁ, এ কোথায় পেলি?"

"ইয়ে—ওটাকে আমার লেপের মধ্যে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি না।" বড়মামীমা দরজার কাছ থেকে বল্‌লেন, "সেকিরে, সিন্দুকে তুলিস নি নাকি?"...

আমি কিছু বল্‌বার আগেই, বড় খুকীটা এমনি পাজী, বলে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ, ও একা একা গিয়ে সিন্দুকে তুল্‌ল আর কি! ভূতের ভয় নেই?" বড়মামাটামা সবাই হো হো করে হাসতে লাগলেন। শুধু বংকুদা চাপা গলায় বল্‌ল,—"ইডিয়ট্! কোনও কিছুর জন্য যদি নির্ভর করা যায়! স্টুপিড্ কোথাকার!"

এ্যাঁ, এ কোথায় পেলি

রঙ-ছড়া

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

কাক আর কয়লা
বড়ো কালো ময়লা;
লালভাঁড়ে শাদা দুধ
রোজ দেয় গয়লা।
সবুজ গাছের পাতা,
গাঁদা ফুল হল্‌দে;
আকাশ কি নীল আহা,
মন মাতে বল্‌তে!
গেরুয়া কাপড় পরে
সন্ন্যাসী সাধুরাই;
খয়েরী পারের শাড়ি
বড়দির চাই-ই চাই।
তরকারি বেগুনের
গুণ কিছু নেই ধন,
বেগুনী সে রঙ্‌টাই
কেন যেন টানে মন!
সাতরঙা রামধনু
একবার দেখে নেই,
রঙ্-এর আসল রূপ
জানা হবে তাহাতেই।

ভা[illegible] পর্তুগীজদের, ঘরে সামান্যই জমি [illegible] এতখানি—তবু তার জন্যে ওরা কী [illegible] করছে। এইটুকু জমি কোনমতে [illegible] থাকতে চায় প্রাণপণে—এখনও [illegible] আশা করছে যে, এই থেকে একদিন [illegible] ওরা পেয়ে যাবে!

[illegible] প্রথম পর্তুগীজ আসেন—ভাস্কো-দা-গামা। তাঁরই দু-একটা খবর আজ [জা]নাবো। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে [প]ঞ্চম হেন্‌রী বসলেন পর্তুগালের সিংহাসনে। তাঁর চোখে ছিল দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন, সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ছিল বুকে। তিনিই বারে বারে সপ্তডিঙ্গা মধুকর' সাজিয়ে পাঠিয়েছেন [দু]স্তর সাগরের বুকে, অজানা রাজ্য জয়ের প্রচেষ্টায়।

হেন্‌রী মারা গেলেন, কিন্তু এই অভিযান [ব]ন্ধ হ'ল না। প্রাচ্যের অগাধ ঐশ্বর্য—তার [স]ম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনী এসে কানে পৌঁছোয়, পর্তুগালের রাজার চোখ জ্বলে। ভারতের পথে ঘাটে হীরা মণি মুক্তা ছড়ানো [র]য়েছে। পর্তুগাল যদি ভারতবর্ষ জয় করতে না [পা]রে ত সব বৃথা।

কিন্তু ভারত কৈ? কোন্ পথে ভারত!

পর্তুগাল রাজা ইমানুয়েল অস্থির হয়ে [প]ড়লেন।

কাকে পাঠাবেন এই দুঃসাধ্য কাজে?

হঠাৎ কানে এল ভাস্কোদাগামার কথা।

বন্দরেই জন্মেছে লোকটা—সমুদ্র ওর নিত্য-[স]হচর বন্ধু।

যদি কেউ পারে ত উনিই পারবেন।

সত্যিই ভাস্কোদাগামার ভয় ডর ছিল না [সা]গরকে। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে, পর্তুগালের একটি [ছো]ট্ট বন্দরে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই [তাঁ]র ঝোঁক যুদ্ধে, বিশেষ ক'রে নৌ-যুদ্ধে। রাজা ইমানুয়েল ভাস্কোদাগামাকে ডেকে [ব]ললেন, 'যাবে তুমি? পারবে?'

নিশ্চয়ই পারবো। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হ'লে না পারি!'

[১]৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই। টেগাস [illegible]) নদীর মোহনায় সার সার জাহাজ [সাজ]ানো। দুদিকের বেলাভূমিতে অগণিত উৎসুক [নর]নারী—জয়ধ্বনি করছে মুহুর্মুহু—[ইমা]নুয়েলের ও ভাস্কোদাগামার। এরই মধ্যে [যাত্রা] শুরু হ'ল। ১৬০টি লোক সবসুদ্ধ [চল]ল সঙ্গে। রাজা নিজে হাতে ক'রে [ভা]স্কোদাগামার হাতে পর্তুগালের পতাকা [দি]লেন অজানা প্রাচ্যে সে পতাকা স্থাপনের [আশ]ায়—পরিয়ে দিলেন ওঁর গলায় সম্মান [illegible]ক।

ভাস্কোদাগামা ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে [জা]হাজে উঠলেন। আগের রাতটা উপাসনা ক'রে [কা]টিয়ে অজানা বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করলেন। নির্বিঘ্নে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ ক'রে উত্তমাশা অবধি আসা গেল। তারপরই ওঁরা পড়লেন দুর্দান্ত ঝড় জলের কবলে। উত্তমাশা কেউ পেরোতে পারবে না এই ছিল কুসংস্কার। এখন এই ঝড় জলের মুখে পড়ে সেটা বিশ্বাসে দাঁড়াল। নাবিকেরা কেউ যেতে চায় না। ভাস্কোদাগামা যাবেনই। ভগবানের নাম ক'রে বেরিয়েছি, ভয় কি এতটা এসে ফিরে যাবো কাপুরুষের মত—পর্তুগালের নাম ডোবাবো? কখনও না।

নাবিকরাও রীতিমত ভয় পেয়েছে। তারা এগোবে না। বাঁধল ঝগড়া। বিদ্রোহ করলে একদল। ভাস্কোদাগামা কিন্তু বিচলিত হলেন না। ভয় পাবার লোক তিনি নন। ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি—মৃত্যুকে ভয় করেন না। অবশেষে বিদ্রোহীরাই নত হ'ল। ভাস্কোদাগামা ক্ষমা করলেন তাদের। জাহাজ আবার চল্‌ল এগিয়ে।

পূর্ব আফ্রিকায় তখন মুররা (মরক্কোর অধিবাসী) একচেটে ব্যবসা করছে। পর্তুগীজ জাহাজ দেখে ওরা ক্ষেপে গেল। এরা যদি চেপে বসে এখানে তাহ'লে স্বার্থে যে আঘাত লাগে!

তখন আর ভাস্কোদাগামা ওদের ঘাঁটালেন না। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যে কাজে চলেছেন সেটা আগে হওয়া দরকার।

সোজা পুব মুখে চলতে লাগ্‌ল জাহাজ। অবশেষে মেলিন্ডার রাজার সহায়তায় ১৪৯৮ সালের ১০ই মে—অর্থাৎ যাত্রা করার ১০ মাস পরে কালিকটের উপকূলে এসে ভাস্কোদাগামার জাহাজ পৌঁছল। এখন জাহাজেও যে পথটা যেতে দশ দিনের বেশী লাগে না—হাওয়াই জাহাজে লাগে এক দিন।

কালিকটের রাজাদের উপাধি ছিল জামোরিণ। (জামোরিণ কোন বিশেষ রাজার নাম নয়—অনেকে যা ভুল করেন)। ভাস্কোদাগামা যথারীতি জাহাজ থেকে নেমে উপঢৌকন নিয়ে চল্‌লেন জামোরিণের দরবারে। হুজুর যদি দয়া করেন ত গরীবরা এখানে একটু কাজ-কারবার ক'রে খায়!

পর্তুগীজের রাজদূত মনে ক'রে জামোরিণ ওকে যথেষ্ট খাতির করলেন। পর্তুগালের সঙ্গে ব্যাবসা বাণিজ্য করতে তাঁর বিশেষ আপত্তি নেই তাও জানালেন।

কিন্তু হ'লে কি হবে। ভাস্কোদাগামার উপর বিঁধি বাম। ওখানেও ও'দের আগে মুররা এসে পৌঁচেছে এবং বেশ দু-পয়সা লুটছে। পর্তুগীজদের দেখে তাদের মুখ শুকিয়ে উঠল। তারা কান ভারী করতে লাগল নানা কথায়—জামোরিণের আর তাঁর পরামর্শদাতাদের। হঠাৎ এক সময় ভাস্কোদাগামা আবিষ্কার করলেন যে, তিনি ভারতীয়দের হাতে নজরবন্দী। জাহাজে ফিরে যাবার ত নয়ই, ঘর থেকে বেরোবারও অনুমতি নেই।

ভাস্কোদাগামা ছিলেন অতিশয় ধূর্ত। তিনি কথাও বলতে পারতেন ভাল। একদিন এক ছুতোয় জামোরিণের সঙ্গে দেখা করে তিনি এমনই বক্তৃতা দিলেন যে, জামোরিণ গলে জল: ভাস্কোদাগামা সেই সুযোগে নিজের জাহাজে গিয়ে উঠলেন।

মুরদের কানে ও কথাটা পৌঁছল। তারা হাঁ—হাঁ করে ছুটে এল।

এ কী করলেন মহারাজ! ফেরান ফেরান। কয়েদ করুন। সাংঘাতিক লোক ওরা!

জামোরিণ তখনই দুখানা জাহাজ পাঠালেন। ভাস্কোদাগামা ত ফিরলেনই না, উল্‌টে একখানা জাহাজ দখল ক'রে নিয়ে চল্‌লেন নিজের সঙ্গে।......

মুরদের ব্যবহারে বিষম চটেছিলেন ভাস্কোদাগামা—ফেরবার পথে শোধ নিলেন। পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছে একটি মুর শহর সম্পূর্ণ পুড়িয়ে এবং বন্দরের জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিলেন! মুররা কিছুই করতে পারলে না।

এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ির পথ ধরলেন: ১৪৯৯ সালের ২৬শে এপ্রিল দুখানি মাত্র জাহাজ পর্তুগালের তীরে এসে ভিড়ল। বাকীগুলি পথেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঝড়ে জলে ও অন্য কারণে—একটার পর একটা জাহাজ ডুবেছে।

তা হোক্—তবু সেদিন ভাস্কোদাগামার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। 'রাজার প্রাসাদ থেকে দীনের কুটীরে'—ভাস্কোদাগামা তখন দেবতার আসনে বসেছেন!

এরপর ভাস্কোদাগামা আবার যাত্রা করলেন। অবশ্য বেশ কিছুদিন পর। কিন্তু এবার সঙ্গে কুড়িটি যুদ্ধ জাহাজ। এবারে মুরদের শায়েস্তা করতে একটুও দেরি হ'ল না। পূর্ব আফ্রিকাতে পর্তুগীজ বণিকদের জন্য সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আদায় ক'রে নিয়ে চললেন ভারতের দিকে।

এখানে এবার তাঁর ভিন্ন মূর্তি। জাহাজ থেকে কামান দেগে আগেই তিনি প্রায় অর্ধেক কালিকট শহর দিলেন উড়িয়ে। তাঁর এই রুদ্র মূর্তির সামনে জামোরিণ মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। এখান থেকে কোরিণ পর্যন্ত কুঠী পাহারা দেবার জন্য রেখে বজরা জাহাজ বোঝাই পণ্যসম্ভার নিয়ে ভাস্কাদাগামা ফিরলেন দেশে।

এই হ'ল ভারতে পর্তুগীজ রাজত্বের সূত্র-

(শেষাংশ — পরের পাতায়)

ক্যাপ্টেন আর ডলির কাহিনী

শ্রীইন্দিরা দেবী

বিছানায় শুয়ে মুক্তি ফোঁপাতে আরম্ভ করলো। রাগে দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এত বকুনী মিছিমিছি খেতে হলো মায়ের কাছে থেকে। পড়া নেই শোনা নেই, কেবল খেলা আর খেলা—মুক্তি পড়া করেনি? এইসব কথা মা বললেন। কেঁদে কেঁদে মুক্তির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো, পাশেই তার বড় লাল ডলটা শুয়ে ছিল—এ পুতুলটাই মুক্তির সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দের। তার দিকে তাকাতেই মুক্তি জ্বলে উঠলো—এদের জন্যই এত বকুনী। যেই না মনে হওয়া অমনি ডলিকে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে ঘরের কোণের দিকে ফেললো। ডলি সেখানে উপুড় হয়ে গিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু কেই বা তার চিৎকার শুনছে—ডলি তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে কাতরাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে মুক্তি দেখলো ঝি এসে তার ঘুমন্ত ছোট ভাই বাবুয়াকে তার পাশে শুইয়ে দিয়ে গেল। বাবুয়াও খুব বকুনী খেয়েছে, সেও নাকি পড়া করে না।

মুক্তি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আবার ফোঁপাতে লাগলো, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো—তা সে জানে না।

এদিকে মুখ থুবড়ে ডলি এতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে পাশ ফিরবার চেষ্টা করলো। উঃ সারা শরীরে তার কি যন্ত্রণা, নাকটা তো একদম থেঁতলে গেছে। কি হবে তার আর এই কোঁকড়ানো কালোচুল, বড় চোখ, এত সাজ পোশাক! এই সুন্দর মুখে যদি নাকটাই না রইল তাহলে আর কি দরকার বেঁচে থেকে—সবাই তো আর ডলি বলে ডাকবে না— বলবে খাঁদা, খেঁদি! সে কি সহ্য করতে পারা যায়?

ডলি কষ্ট করে পাশ ফিরতে গিয়েই কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগলো। ডলি জোরে 'আঃ' বলে উঠলো।

—কি হয়েছে তোমার, তখন থেকে কাতরাচ্ছ? কে বলে উঠলো।

—কে? ও ক্যাপ্টেন! দেখছো না আমার কী অবস্থা?

ডলি যার সঙ্গে কথা বললো সে হলো খেলাঘরের ক্যাপ্টেন পুতুল, তার আশে পাশে বহু সোলজার পুতুল আছে—তাদের সে চালনা করে। কিন্তু কিছুদিন থেকে তারও দুর্গতির শেষ নেই। বাবুয়া তাদের নিয়ে খেলতে খেলতে—তাদের যত রকমে পারে কষ্ট দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন বললে,—দুই ভাই বোনই সমান, কার কথা বলবো বল? চল আগে তোমায় প্রাথমিক চিকিৎসা করি। চল ঐ ওখানে, হ্যাঁ, এই খাটিয়াটায় একটু শোও,—নাকটা দেখি—দাঁড়াও ওষুধ দিই। আচ্ছা এবার এটা খেয়ে ফেলোতো ডলি। ক্যাপ্টেন-এর কথামত সব করে ডলি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

তারপর ক্যাপ্টেন বললে,—এখন কেমন ভালো মনে হচ্ছে তো ডলি?

—হ্যাঁ অনেক ভালো, তোমাকেও ধন্যবাদ। কিন্তু নাকটা নিয়ে কি হবে ক্যাপ্টেন? ডলি বললে।

ক্যাপ্টেন বললে,—কি বলবো বল—ওরা ভাইবোনে যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে তাতে আর বেঁচে থাকার উপায় নেই। তুমি কাঁদছো মুক্তি ছুঁড়ে ফেলেছে বলে, আর বাবুয়া আমায় কি করেছে জানো? আমার দু'পাশে যত সোগজার ছিল সব সৈন্যগুলোর হাড়গোড় ভেঙেগেছে—অবশিষ্ট যা দু' একটি আছে আমি তাই দিয়েই কাজ চালাই, আর আমার দশা দেখ—সেদিন পায়ের চাপ দিয়ে আমায় তো চেপ্টে ফেলবার যোগাড়, আমি চিৎকার করছি তা সেদিকে দেখেও না, শোনেও না।

এই খাটিয়াটায় একটু শোও—নাকটা দেখি—দাঁড়াও ওষুধ দিই

শেষে কে যেন এলো—[illegible]
মনে হল এরকম [illegible]

ডলি বললে,—বুঝতে তো পারছি [illegible] আমাদের কষ্টের দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। [illegible] জানে না তো—আমিও আগে [illegible] মানুষ ছিলাম—এরকম সুন্দর [illegible] রিবন বেঁধে স্কুলে যেতাম, খেলাধুলো করতাম। আমারও ঘরভর্তি সাজানো খেলাঘর ছিল। আমি একদিন রাগ করে পুতুল ভেঙেছিলাম বলে ভগবান বলেছিলেন, পুতুলের কষ্ট বোঝ না, তোমার শাস্তি হবে—তুমি এখনি পুতুল হয়ে যাও। ওমা! বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুতুল হয়ে গেলাম। আমি খুব কাঁদতে লাগলাম। তখন ভগবান বললেন,—আচ্ছা তুমি যার পুতুল হয়ে যাবে সে যদি দুষ্টু মেয়ে হয় সে যতদিন না ভালো হবে ততদিন তুমি এমনি থাকবে, আর সে যেদিন ভালো হবে, তোমারও পুতুল-জন্ম উদ্ধার হবে।

ডলিকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্যাপ্টেন বললে,—তুমি শুধুই নিজের কথা ভাবছো ডলি, আমার কথা মনে করছ না, বাবুয়ার অত্যাচারের কাহিনী যদি সব বলি তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমি রোজ সকালে উঠে প্রার্থনা করি আমার পুতুল-জন্ম উদ্ধার হোক, বাবুয়ার হাত থেকে বাঁচি।

—তাই নাকি—? আমিও তাহলে সকালে উঠে প্রার্থনা করবো, মুক্তির অনাদর আর সহ্য হয় না।

সেদিন রাত্রি থেকে মুক্তি প্রতিজ্ঞা করেছে আর সে দুষ্টুমী করবে না, দুষ্টুমী না করলে বকুনীও খেতে হবে না। রোজ রাত্রে শোবার সময় এই কথা বাবুয়াকে সে বোঝায়—বাবুয়াও দিদির কথা শোনবার চেষ্টা করে।

সেদিন রাত্রে শুয়ে আধ ঘুমের মধ্যে মু[illegible] আর বাবুয়া দু'জনেই শুনতে পেলো [illegible] বাবাকে বলছেন,—মুক্তি আর বাবুয়া দু'জনে[illegible] খুব লক্ষ্মী হয়েছে, সেই সে দিন বকু[illegible] খেয়েছিল—তারপর!

বাবা বললেন,—তাই নাকি? তাহলে চল ব[illegible] মুক্তির জন্মদিন, মার্কেটে গিয়ে নতুন ন[illegible] খেলনা পুতুল মুক্তি আর বাবুয়ার জন্য কি[illegible] আনি।

জন্মদিনের আনন্দ আর প্রচুর খেলনা পুতু[illegible] রেল, ট্রাম, মোটর গাড়ি ইত্যাদি পেয়ে মু[illegible] আর বাবুয়ার আনন্দ ধরে না। নতুন খেল[illegible] আসার পর যতরাজ্যের পুরানো খেলনা ছি[illegible] ঝুড়ি ভর্তি করে চাকররা সেগুলো বাইরে ফেলে দিল।

মুক্তি আর বাবুয়া আর কোনদিন দুষ্টুম[illegible] করেনি। আর ওবাড়ির দরজার বাইরে গি[illegible] ডলি আর ক্যাপ্টেন পুতুল-জন্ম থেকে উদ্ধা[illegible] পেলো।

(ভারতে প্রথম পর্তুগীজ — শেষাংশ)

পাত। তারপর কিছুদিন ধরে এমনই অপ্রতিহত প্রতাপে এঁরা আধিপত্য বিস্তার ক'রে চললেন যে, মনে হ'ল পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বুঝি একেবারেই দুরাশা নয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই নানা গোলযোগ শুরু হ'ল।

আবারও—একুশ বছর পরে—ভাস্কাদাগামাকে মনে পড়ল। ও'কে বলা হ'ল, আপনি কি যাবেন পর্তুগীজ ভারতের নায়ক হয়ে?'

অতিবৃদ্ধ হয়েছেন ভাস্কাদাগামা, তবু রাজী হলেন। কিন্তু বেশীদিন আর তাঁর পরমায়ু ছিল না। ভারতে পৌঁছবার মাত্র তিনমাস পরে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এই ভারতের মাটিতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

পাতাবাহার

সত্যজিৎ বসু

শহর থেকে অনেক দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে এক বন। সেই বনের এক কোণে সাত-সাতটা শাল গাছ। তাদের মাঝখানে পাতাবাহারের এক চারা।

শালগাছের ফাঁক দিয়ে রোজ সকালে আসে সূর্যের আলো। সেই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করে পাতাবাহারের সাজ। পাতারা দুলে ওঠে, নেচে ওঠে সকালবেলায় ঝির্‌ঝিরে বাতাসে।

ভোর থেকে সকাল। সকাল থেকে দুপুর। সূর্যের সোনালী আলো হয় রূপোলী মিঠে থেকে কড়া, গা যেন পুড়ে যায়। শালগাছেরা তখন ডালপালা মেলে ধরে; ছাতা ধরে যেন পাতাবাহারের মাথায়। কচি পাতাবাহারের চারা ঘুমিয়ে পড়ে দুপুরের ক্লান্তিতে।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য পড়ে হেলে। দুপুর গড়িয়ে হয় বিকেল। আলোর তেজ ক'মে আসে; কিন্তু পশ্চিমের আকাশ হয় লালে-লাল। সপ্তশালের ফাঁক দিয়ে সেই রাঙন আলো এসে পড়ে পাতাবাহারের মাথায়।

চড়ুই বলে : আহা! কী সুন্দর! পাতাবাহারের মাথায় যেন রাঙন-আলোর মুকুট!" চড়ুই-পাখির কথা শুনে চারাগাছের গর্বে বুক দুলে ওঠে।

আকাশের আলো নিভে যায়। বনের বুকে আঁধার নামে।

আকাশে ঝিক্‌মিক্‌ করে তারা আর তারা। চেয়ে দেখে শালগাছ, পাতাবাহারের চারা। ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে জোনাকিরা জ্বলে ওঠে।

চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে। জ্যোছ্‌না পড়ে ছড়িয়ে। শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো যায় জড়িয়ে। সেই আলো ঠিক্‌রে পড়ে পাতাবাহারের পাতায়।

সূর্যের আলোয়, বনের বাতাসে; শালের ছায়ায়, চাঁদের জ্যোৎস্নাতে; মাটির রসে, ভোরের শিশিরে—এম্‌নি ক'রেই পাতাবাহারের দিন যায়, বড় হয় রূপে, রসে, ছন্দে। দোয়েল-শ্যামা গান গায় আনন্দে।

একদিন কোথা থেকে এলো এক কাঠুরের দল। কুড়ুল বসালো শালগাছের গোড়ায়। থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো শালগাছেরা। কাঁপলো যত পাখি—চড়ুই, শ্যামা, চন্দনা—বাসা যাদের শালগাছের ডালে।

মড়্‌মড়্‌ ক'রে শব্দ হ'লো। দু'টো শালগাছ পড়লো মাটিতে লুটিয়ে।

পাতাবাহার উঠ্‌লো চম্‌কে।

কাঠুরেরা নিয়ে গেল শালগাছ-দু'টিকে। নিয়ে গেল বন ছাড়িয়ে, গ্রাম পেরিয়ে—কতদূরে কে জানে! পাতাবাহার ভাবে ভাবে ভাবে।

ক'দিন বাদে খবুরে-পাখি কবুতর এসে খবর দিল—'দেখে এলাম সওদাগরের নায়ে, ডাইনে, আর বাঁয়ে, মাস্তুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শালগাছ দু'টি। সওদাগরের লোকেরা ময়ূরপংখী নায়ে কি সুন্দর ক'রেই না রঙ্‌ করেছে গাছ-দু'টিকে—রঙ্‌-বেরঙের নিশান দুলিয়ে দিয়েছে এ-মাস্তুলে থেকে ও-মাস্তুলে।'

চড়ুই বলে—আহা! কি সুন্দর

পাতাবাহার বলে—'বরাত ভালো। তাইনা ঠাঁই পেল সওদাগরের নায়।'

কবুতর বলে—'তা সত্যি। ময়ূরপংখী যখন যাবে এ-বন্দর থেকে ও-বন্দরে, স্বদেশ থেকে বিদেশে—তখন শালগাছ-দু'টির কতই না মজা!'

—'কিসে?'

—বাঃ তাও বোঝ না! ময়ূরপংখী যখন যাবে বন্দরে বন্দরে, ভিড়বে গিয়ে দেশবিদেশের ঘাটে—তখন শালগাছ-দু'টিও তো দেখবে দেশ-বিদেশ; দেখবে তাদের লোকজন; শুনবে তাদের হাসি-গান-হল্লা। এই বনের কোণায় প'ড়ে থাকলে কি দেখতে পেত এইসব, দেখতে পেত পৃথিবীর বিচিত্র রূপ?'

পাতাবাহার ভাবে—'তাইতো!'

সেই থেকে পাতাবাহারের মনে আর সুখ নেই। রাতদিন বনদেবীর কাছে সে প্রার্থনা জানায়—'মুক্তি দাও বন থেকে, দেখতে দাও পৃথিবীকে।'

চড়ুই বোঝে পাতাবাহারের মনে কথা। কাছে এসে বলে—'অমন প্রার্থনা জানিয়ো না। বেশ আছ, সুখে আছ—পঞ্চশাল এখনও ঘিরে আছে তোমাকে, তোমাকে দেখবে না কেউ, তোমার গোড়ায় পড়বে না কুড়ুলের কোপ। যে-মাটিতে জন্ম সেই মাটিতেই থাক—মাটি-মার কোল ছেড়ে যেতে চেও না তুমি, তোমার তাহ'লে অমঙ্গল হবে।'

পাতাবাহার কাণেও তুল্‌লো না পাখির কথা। মনে মনে ভাবলো—'পাখা আছে, উড়ে বেড়াও—তাইতো বোঝ না বনের বন্দীদের ব্যথা!'

কয়েক মাস বাদে আবার এলো কাঠুরের দল। পঞ্চশালের গোড়াতেই এবার, পড়লো কুড়ুলের কোপ।

বনের পাখিরা ডানা ঝাপটে, ঘুরে, চিৎকার করতে করতে বন ছেড়ে পালালো।

পঞ্চশালের আড়ালে ছিল পাতাবাহার। গাছেরা লুটিয়ে পড়তেই সেদিকে নজর পড়লো সবার।

কাঠুরে-বালক এগো এগিয়ে। ভাবলো—'বাহারে গাছ তো! কি সুন্দর এর পাতা। সওদাগরের নায়ে নিয়ে তুলতে পারলেই ইনাম মিলবে।'

গোড়া ধ'রে আর ওঠানো যায় না পাতাবাহারের গাছ। অনেক বয়স হ'লো, গোড়া তাই শক্ত। কুড়ুলের কোপ পড়লো তাই।

উঃ লাগে, বড্ড লাগে।

কাঠুরে-ছেলের কাঁধে চ'ড়ে চল্‌লো বনের পাতাবাহার। কুড়ুলের কোপ অসহ্য হলেও এবারে তার আনন্দ আর ধরে না। বন থেকে সে পেয়েছে মুক্তি—এবারে চড়বে ময়ূরপংখী নায়, ঘুরে বেড়াবে দেশবিদেশে।

কিন্তু সব গাছ-ই যে নৌকোর মাস্তুল হয় না, পাতাবাহার তা জানে না।

যেতে যেতে কেমন যেন তন্দ্রা আসে পাতাবাহারের—ঘুমে যেন সারা শরীর ঝিমিয়ে পড়তে চায়। একি হ'লো তার! কই সে আনন্দ, কই সে স্ফূর্তি। চোখে যেন সব ঝাপ্‌সা দেখে পাতাবাহার।

ময়ূরপংখী নায়ে তোলা হ'লো পঞ্চশালকে—পাতাবাহারও উঠ্‌লো তাদের সঙ্গে।

সওদাগরের ছেলে এসে বলে—'বাঃ, কি সুন্দর, কি বাহারে পাতা। ঐ পাতা দিয়ে সাজিয়ে দাও ময়ূরপংখীর মাস্তুল।"

সওদাগরের ছেলের কথা তখন আর পাতাবাহারের কানে যায় না। সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে চিরদিনের জন্য।

মাঝিমাল্লারা পাতাবাহারের পাতা দিয়ে সাজিয়ে দেয় ময়ূরপংখীর মাস্তুল। আর, সওদাগরের রাঁধুনি এসে পাতাবাহারের শরীরটাকে ঠেলে দেয় নৌকোর চুল্লিতে। মরা পাতাবাহার পুড়ে ছাই হয়।

কবুতর এসে খবর দিল—দেখে এলাম সওদাগরের নায়ে

সাত টুকরো

শ্রীনন্দদুলাল সরকার

মাত্র সাতটি টুকরো দিয়েও যে কত রকমারি ছবি হতে পারে তা জানো কি?—ভাবছো সে আবার কি? ঠাট্টা না কি? উঁহু মশাই, মোটেই তা নয়! একেবারে সোজা—অতি সোজা। ইচ্ছে করলে তোমরাও করতে পারো—পুরোদস্তুর শিল্পী হয়ে গিয়ে—টেবিল, চেয়ার, পাখি, মানুষ, গাছপালা—যা চাও, তাই টপাটপ তৈরি করে ফেলতে পারো বুঝলে!

কি বললে?—করতে চাও। তা, বেশ তো। আনো তবে একটা পুরু সাদা কাগজ, একটা কাঁচি, একটা তুলি, কালো কালি, আর তোমাদের কম্পাস বাক্সের একটা স্কেল আর পেন্সিল।
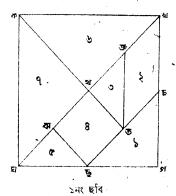
১নং ছবি

এই সেরেছে!—নীনা তুমি তোমার পেন্সিলের শিসটা যে কত মোটা করে রেখেছো, আরও একটু সরু করে নাও। মিন্টু, তুমি ভাই নীল কালি এনেছো—এতে কিন্তু ভালো হবে না, চাইনিজ ইংক্ নিয়ে এসো। এনেছো—আচ্ছা বেশ, বেশ! এখন তাহলে আসল কাজ শুরু করা যাক—কি বল? প্রথমেই সাদা কাগজটা নাও নিয়ে স্কেল ও পেন্সিল দিয়ে ১নং ছবি দেখে ক খ গ ঘ-এর মত একটি বর্গক্ষেত্র আঁকো, অর্থাৎ যার চারপাশই হবে সমান মাপের। এরপর খ গ-এর মধ্যবিন্দু 'চ' এবং গ ঘ-এর মধ্যবিন্দু 'ছ' যোগ কর। চ ছ এর মধ্যবিন্দু 'ত' ও 'ক' যোগ কর। 'থ' ত ক ও খ ঘ-এর ছেদ বিন্দু। 'ছ' ও থ ঘ-এর মধ্যবিন্দু 'ঞ' যোগ কর। থ খ এর মধ্যবিন্দু 'জ' ও 'ত' যোগ কর। এখন দেখ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭—এই সাতটি ঘর হয়ে গেল। এখন এই ঘরগুলিকে কাঁচি দিয়ে বেশ সুন্দর করে কেটে নাও। এবার এই সাতটি টুকরোকে বেশ ভালো করে কালো কালি দিয়ে কালো করে ফেলো। এই যে কালো 'সাতটি টুকরো' হলো—এই সাত মাণিকের কান্ড দেখে তোমাদের তাক্ লেগে যাবে।
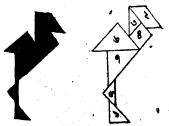
৬ ও ৭নং ছবি

২ ও ৩নং ছবি

দেখতে পাবে সাত টুকরোর সাতশ কীর্তি—অর্থাৎ কিনা এই সাতটুকরো দিয়েই তৈরি হবে হরেক রকম ছবি আর ছবি!

—"কি বললে পুতুল?—ছবি তৈরি করে সেগুলি রাখবে কোথায়? তার জন্য একটা টেবিল চাই? ওঃ! এই তো! বেশ, আগে টেবিলই করবে এসো। সাতটি টুকরোকে ২নং ছবির মতো পরপর নম্বর ম্যাফিক সাজিয়ে যাও—তাহলেই দেখবে একটি সুন্দর টেবিল (৩নং ছবি) হয়ে গেছে।

—"কি বললে পুপু—খুব মজা! আরও চাও। তবে সবচেয়ে সোজা যেগুলো সেগুলো আগে শিখতে চাও? বেশ, তাহলে ৪নং ছবির মতো টুকরোগুলি সাজিয়ে ফেলো তো দেখি—কি হলো! আরে এযে দেখছি বাঁশিওয়ালা (৫নং ছবি) মুখে বাঁশি নিয়ে হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরে ইয়া এক লম্বা ক্ল্যারিওনেট নিয়ে মনের আনন্দে পোঁ পোঁ পোঁ—বাঁশি বাজাচ্ছে। আরে আরে বাজনার শব্দে শ্রোতাও যে এসে গিয়েছে 'বকবাবাজী'। ঐ দেখ না বকবাবাজী কেমন এক ঠ্যাং এ দাঁড়িয়ে একমনে বাজনা শুনছে (৬নং

৪ ও ৫নং ছবি

ছবি)। কি আশ্চর্য আবার বকবাবাজী এলো কোত্থেকে? আরে ঘাবড়াইয়ে মাৎ! এই সাতটুকরো নিয়ে ৭নং ছবির মত চট্‌পট্ সাজিয়ে ফেলো দেখিনি, তাহলে এক্ষুনি দেখবে ঝুপ্ করে বক্‌বাবাজী উড়ে এসে হাজির।

আরে, আরে একি! একি! ছবি ক'রতে পারার আনন্দে ছুট্‌কি দেখি একেবারে নাচতেই শুরু করে দিয়েছে! রসো, রসো—ছুট্‌কির নাচটা তাহলে তোমাদের করে দেখাই। এই-ই এই-ই দেখো (৮নং ছবি)—"ছবির মজা দেখ—ছুটকিমণি নাচে।" কেমন কি না? সাতটুকরোকে ৯নং ছবির মতো সাজিয়ে ইচ্ছে করলে তোমরাও ছুট্‌কিকে মজাসে নাচাতে পারো।
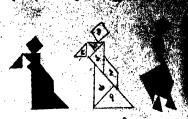
৮, ৯ ও ১০নং ছবি

শুধু কি তাই! ইচ্ছে করলে সাতটুকরো—সাতটি মণি কি না ক'রতে পারে বল তো? "ওড়না উড়ে মিনি চলে" (১০নং ছবি); "ভুলো বসে, রাগে জ্বলে" (১১নং ছবি); "কুঁজো চলে নীচে চেয়ে" (১২নং ছবি); এ সবই কিন্তু ঐ সাতটুকরোর কীর্তি। সাতটি টুকরোকেই এদিক ওদিক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজালেই ঐ সব ছবিগুলি করা যাবে। কিন্তু মনে রাখবে,

১১ ও ১২নং ছবি

একটি টুকরোও কিন্তু কোনও ছবিতেই বাদ দেওয়া চলবে না।

তবে এই সাতটি টুকরো দিয়ে শুধু এই কটিই নয়, ইচ্ছে করলে অনেক অনেক ছবি করা যায়—চেষ্টা করলে তোমরাও করতে পারো।

১৩নং ছবিতে দেখো—দুজন গাট্টাগোট্টা পাহারাদার দাঁড়িয়ে। দুজনেরই চেহারা, সাজ-পোশাক অবিকল এক, তবে একজনের পা আছে, আর একজনের নেই। অথচ দুটি ছবিই কিন্তু ঐ সাতটি টুকরো দিয়েই তৈরি হয়েছে—ছবির কোনও একটিতেও সাতটুকরোর একটুকরো কমও নেই, বেশিও নেই। এই বিদ্ঘুটে ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো, তোমরা যদি কেউ বলতে পারো, চুপিচুপি আমাকে জানিও—কেমন?
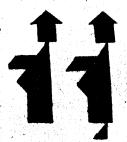
১৩নং ছবি

গালিগুলি সাহেবের টুপি

"বুদ্ধু-ভুতুম"

ভণ্টুদা গো—ভণ্টুদাকে চেনো না? সেই যে বেঁটে-খাটো, মোটা-সোটা, ভালুকে ভালুক চেহারা, খবে ইংরিজি-বাংলা বলে—আরে সেই যে সেবার যাকে পাগলা বলে রাস্তা থেকে পুলিশরা ধরে এনে রাজপুরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলো, সেই ভণ্টুদা। লোকে বলে যে, পটলা-প্যাংচাদের 'ডব্‌গার' করতে গিয়েই নাকি ভণ্টুদা পাগলা বনে যায়। কিন্তু পটলার দল বলে যে, এটা স্রেফ একটা ডাহা মিথ্যে। উনি নিজেই পথের মাঝে পাগলামি শুরু করে দিয়েছিলেন বলে পুলিশ এসে ঠান্ডা করে।

কথাটা ঠিক সত্যিও না—মিথ্যেও নয়; এই মাঝামাঝি। হয়েছিল কি, সেবার বোসপাড়ার বিজয়া সম্মেলনের বিচিত্র অনুষ্ঠানের জন্য এক ম্যাজিসিয়ান যোগাড় করতে গিয়ে যখন বেজায় বেঘোরে পড়ে গেলুম, তখন পটলা আমাদের নিয়ে গেলো তার বিখ্যাত ভণ্টুদার কাছে।

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতেই হবে। কারণ আমরা গিয়ে দেখলাম, ভণ্টুদা রকে বসে পা দিয়ে চুরুট-চাখছেন আর আমাদেরই মতন কতগুলো ছেলেকে সাহেব ঠ্যাঙানোর গল্প শোনাচ্ছেন। আমাদের দেখেই তিনি "হ্যাল্লো বয়েজ!" বলে এমন আপ্যায়িত করে উঠলেন যা, মনে হলো আমাদের দলের সব্বাই-ই ওঁর অনেক কালের চেনা।

পটলা ছিল আমাদের মুখপাত্র। তাকে সামনে দেখেই তিনি রক থাবড়ে বলে উঠলেন, "কাম্ মাস্টার পট্যাটো। সিট্ বলটু অন্ দি রক্।" মানে, বলটুর মতন এঁটেসেটে রকে বাস্।

আর দুবার বলতে হলো না। পটলা দেখলুম বিগলিত হয়ে জুবড়ে-মুবড়ে গোল মালুর মতন রকে বসে পড়লো।

পটলার মতন ছেলেকে এক ডাকে আলু বানাতে দেখে পটলার ভণ্টুদার ওপর আমাদের বেশ সমীহ হলো। আমাদের দলের গাড়ুকে পাছে ঘটি আর চিংড়িকে পাছে তিনি কাকড়া বানিয়ে দেন সেই ভয়ে আমরা তফাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভণ্টুদা শুরু করলেন, "কি মাস্টার পট্যাটো? এনি ফুটবল ফাইনাল? প্রেসিডেন্ট ঠিক করতে হবে? সাহিত্যিক না স্পোর্টস হিরো? দেশনায়ক না ফিল্ম স্টার? কাকে চাই বলো—সে (Say)।"

পটলা আমাদের হয়ে নিবেদন জানালো যে, ওসব কিছু নয়। এবারে তাদের বিচিত্রানুষ্ঠান হবে, সেই জন্য একজন ভালো ম্যাজিসিয়ান ওঁকে ঠিক করে দিতে হবেই হবে।

ভণ্টুদা, "বি—চি—ত্র—অনুষ্ঠান!" বলে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন কথাটা বলে আমরা ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি। ভণ্টুদা তারপর নিজের টেকো মাথায় নিজেই চ্যাট্ করে একটা চাঁটা মেরে, হাসি টেনে বলে উঠলেন,—"মানে ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম! ভেরি গুড্ বয়েজ, ভেরি গুড! ম্যাজিসিয়ান তা আমি ঠিক করে দেবো। ওয়ান্ডারফুল ম্যাজিসিয়ান, এক নম্বর ম্যাজিসিয়ান, ব্রিলিয়ান্ট ম্যাজিসিয়ান—গালি-গুলি গিলি-গলি ঘেগিরা পাশাকে ঠিক করে দেবো। আমার ভেরি নিকট ফ্রেন্ড। চার্জ—নাথিং। তবে তোমাদের একজনকে আমার সংগে যেতে হবে। নইলে ম্যানার্স থাকে না—ম্যানার্স!!"

ভণ্টুদার কথা শুনে মনে হলো, ভণ্টুদা কি মহৎ—কি উদার! ছোটদের কি অকৃত্রিম বন্ধু তিনি! কি নাম শোনালেন তিনি। জাদুসম্রাট গালিগুলি-গুলিগালি! নাম শুনেই যখন গা ঘুলিয়ে যায়, খেলা দেখলে নিশ্চয়ই তখন মাথা গুলিয়ে যাবে না কে বলে?

সাহেবী পোশাক পরে, টুপি হাতে, চুরুট মুখে দিয়ে ভণ্টুদা যখন গাড়িতে এসে উঠলেন......

নির্ধারিত দিনে আমি আর পটলা ট্যাক্সী নিয়ে ভণ্টুদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। ভণ্টুদা তৈরীই ছিলেন। সাহেবী পোশাক পরে টুপি হাতে, চুরুট মুখে দিয়ে ভণ্টুদা যখন গাড়িতে এসে উঠলেন, তখন আমাদের মনে হলো গাড়ি যেন আলো হয়ে উঠলো। তাঁর পাশে বসতে পেয়ে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে হতে লাগলো।

পরকে আপন করবার ক্ষমতা যে ভণ্টুদার কতখানি, ট্যাক্সী চলতেই তা টের পেলাম। আমাদের যাবার কথা ছিল পূর্ব কলকাতায়—কিন্তু ভণ্টুদার হুকুমে গাড়ি চললো দক্ষিণে বেলতলায়। সেখানে মাসতুতো বোনের ননদাইয়ের সংগে খানিক আলাপ করে ভণ্টুদা এলেন তালতলাতে। তার মামাতো দাদার শালার বাড়ি। তারপর গেলেন ফুলবাগানে পিসতুতো ভায়ের ভায়রার বাড়ি। সেখান থেকে যখন গন্তব্যস্থলে গিয়ে গাড়ি থামলো, তখন আমাদের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। কারণ, ভণ্টুদা তো নেমেই গ্যাট্ ম্যাট করে চলে গেলেন একটা ফ্ল্যাটওয়ালা বাড়ির গেটের মধ্যে। আর মিটারের দিকে চেয়ে আমাদের চোখ মিট্ মিট্ করতে লাগলো। বেশী দেরি থাকলে ট্যাক্সীর মিটার পাছে টকাটক্ বেড়ে যায় সেই ভয়ে পটলা আর আমি ক্লাবের দেওয়া গাড়ি ভাড়া ছাড়াও আরও কিছু দিয়ে পূর্বজন্মের ধার শোধ করলুম।

ট্যাক্সী বিদেয় করার পর দেখি ভণ্টুদা ভ্যানিশ্। গেটের ভেতরে বাইরে কোথাও তাঁর চিহ্ন নেই। আমি আর থাকতে না পেরে বলে ফেললুম,—"তোর ভণ্টুদা তো আচ্ছা ফ্যাকালুশ্ মার্কা রে।"

পটলার মুখ শুকুলেও বুকের জোর ছিল বললে, "এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠ না।"

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই দেখি, শেষ মাথায় একটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভণ্টুদা ধোঁয়া ছাড়ছেন আর মুরুব্বী চালে হাসছেন। আমাদের দেখেই তিনি নাটুকে ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "বয়েজ! হিয়ার লিভস্ ইণ্ডিয়ার ওয়ান্ডারফুল ম্যাজিসিয়ান, মিঃ গালিগুলি-গিলিগালি সায়েব।" বলেই তিনি সামনে হ্যাট্-র‍্যাকে রাখা অনেক টুপির মাঝে নিজের টুপিটাও ছুঁড়ে দিলেন। আমাদের নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের মধ্যে বসতে না বসতেই হঠাৎ কে বাঁকা সুরে বলে উঠলো, "গুড্ মরণিং।"

আমরা মুখ ঘুরিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবু ঘরের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, "সায়েব বাড়ি নেই। থ্যাংক ইউ!"

বক্তাকে আবার একবার সন্ধানের চেষ্টা করতেই দেখি, আমাদের সামনেই একটা গোল টেবিলের ওপর রাখা মড়ার খুলির মস্ত চোয়াল দুটো খটাখট্ নড়ছে।

পটলা ভয় পেয়ে তিন লাফে চৌকাঠ পেরিয়ে গেলো। আমি ঢোক গিলতে গিলতে ওঠ্‌বস করতে লাগলাম।

ভণ্টুদা আমাদের ব্যাপার দেখে হো-হো করে হেসে বলে উঠলেন "দ্যাটস্ এ্যা কাকাটো ট্রিক্স মাস্টার পট্যাটো। ভয়ের নাথিং—নট কিচ্ছু!" ওটা আসলে একটা কাকাতুয়ার খাঁচা। একটা স্যাম্পেল খেলা দেখাতেই তোমাদের এখানে আনলুম। ঘাব্‌ড়াও মাৎ! নাম এ্যান্ড ঠিকানা রেখে গেলুম, সব অলরাইট্ হয়ে যাবে।"

ভণ্টুদা কথা বলতে বলতেই কোনও দিকে না

ডিমটা গড়গড়িয়ে এসে ডালুদির নাকের উপর পটাং করে ভেঙ্গে গেল

তাকিয়ে র‍্যাক থেকে টুপি তুলে নিয়ে, খাট করে মাথায় সেটা তড়তড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আমরাও চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতন তাঁর অনুসরণ করলাম। আর আছাড়া আমাদের বলারও বিশেষ কিছু ছিল না। গালিগুলি সাহেবের নমুনা খেলা দেখেই আমরা ভাবে বিভোর হয়ে ভন্টুদার পাশ্‌ পাশ্‌ চলতে শুরু করলাম।

কতদূর গেছি। হুঁস নেই। সামনে দিয়ে একজন বেশ তাকিয়া মতন ভদ্রমহিলা, হাতে একটা ফুল-কাটা ব্যাগ নিয়ে আমাদের দিকেই আসছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে ভন্টুদা উচ্ছ্বসিত হয়ে "হ্যালো ডালুদি!" বলেই সাহেবী কায়দায় টুপি তুলে নমস্কার করলেন।

ডালুদি ভন্টুদার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁরে ভন্টে, তুই আজকাল হাঁস বয়ে বেড়াস নাকি?"

তাঁর কথায় আমাদের নজর গিয়ে পড়লো ভন্টুদার মাথার ওপর। দেখি যে, ভন্টুদার টেকো মাথায় সত্যি একটা চীনা হাঁস দিব্যি তা দিচ্ছে। আমরা হাসবো না কাঁদবো ঠিক করতে পারলুম না।

ভন্টুদাও মাথায় হাত দিয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেলেন। হাঁসটাকে মাথা থেকে টানতে

দুটি সাদা পায়রা টুপিটা ঠোঁটে ধরে এনে তার মাথার উপর উড়তে লাগলো

টানতে বলে উঠলেন, "না—মানে এই বাবলুকে আমার পোষা হাঁসটা দেবো বলে তোমার ওখানে যাচ্ছিলুম।"

হাঁসটাকে টেনে নামাতেই ভন্টুদার মাথা থেকে একটা ডিম গড়গড়িয়ে এসে ডালুদির নাকের ওপর পটাৎ করে ভেঙে গেলো। আর সেই ভাঙা ডিমের মধ্যে থেকে দুটো মুনিয়া পাখি ফরফর করে তাঁর নাকের সামনে দিয়ে উড়ে গেলো।

"উরে মাগো" বলেই ডালুদি দুই ডানা মেলে টাল খেয়ে গেলেন। ভন্টুদাও সেই তক্কে গোঁত্তা খেয়ে ভোঁ দিলেন।

এ অবস্থায় আমাদের ডালুদিকে সামাল দেওয়া উচিত, না ভন্টুদাকে পাকড়ানো উচিত, তা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। তবে মনে হলো—ডালুদির নাক মোছা সারা হলে, আমাদের কাণ দুটো বোধ হয় আস্ত রাখবেন না। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য মহাজন ভন্টুদার পথ ধরলুম।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে যখন ভন্টুদাকে ধরলুম, তখন দেখি আর এক কাণ্ড। ভন্টুদা দেখি মুখে এক চুরুট ঢুকিয়ে 'পাইড্‌ পাইপারী' চালে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছেন, কিন্তু তাঁর মাথার টুপিটা মাথায় নেই। সেটা তাঁর মাথার প্রায় বিঘৎ দুয়েক ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। মজার দৃশ্য দেখবার জন্যে ভন্টুদার পিছনে এক পাল লোক লেগে গেছে, কিন্তু তা ভন্টুদার খেয়ালই নেই।

ভন্টুদা চলতে চলতে ইঁটে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে টক্কর দিয়ে পড়বার মতন হলেন। পড়তে পড়তে তাঁর টুপির কথা মনে হওয়াতে টুপি সামলাবার জন্য মাথায় হাত দিতেই, তাঁর হাতটা গিয়ে ঠেকলো নিজের তেলো মাথায়। ভন্টুদার পিছনে একটা হাসির হর্‌রা বয়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ভন্টুদা সামনে একটা পানওয়ালার দোকানের আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেন। শুধু দেখলেন না, দেখেই একেবারে আঁৎকে উঠলেন। তিনি টুপি ধরবার জন্য এক লাফ্‌ দিলেন। টুপিটাও তাঁর লাফের সংগে সংগে একটু ওপরে উঠে গেলো। ভন্টুদা আর একবার চেষ্টা করলেন। ফল সেই একই হলো। খেলাটা জমেছে মনে করে দর্শকরা "আউর এক দফে উস্তাদ, আউর এক দফে!" বলে উৎসাহ জানালে।

ভন্টুদা আরো বারকতক ভালুকের লাফ মেরে হয়রাণ হয়ে শেষে ছুট্‌ দিলেন। দর্শকরাও তাঁর পিছনে ছুটে চললো। এবারে হার মানতেই টুপিটা সাঁৎ করে তাঁর মাথায় আপনা থেকেই বসে পড়লো। ভন্টুদার দর্শকেরা খুব জোরসে হাততালি বাজালে। ভন্টুদা দেখি রাগের চোটে দাঁতে দাঁত দিয়ে খপাৎ করে টুপিটা ধরে একেবারে ভিড়ের মাথা পার করে দিলেন। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই, দু'টো সাদা পায়রা টুপিটা ঠোঁটে ধরে এনে তাঁর মাথার ওপর উড়তে লাগলো। ভন্টুদা রাগে দুঃখে ক্লান্তিতে ঝপ্‌ করে ফুটপাতের ওপর থেবড়ে বসে পড়লেন। টুপিটাও পায়রাদের ঠোঁট থেকে তাঁর কোলের কাছে পড়ে উল্টে গেলো।

ধাবমান দর্শকরা, "ক্যায়া খেল! সাব্বাস ওস্তাদ!" বলে হাততালি আর সিটি দিয়ে ভন্টুদাকে তারিফ করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, "বাবা তান্ত্রিক সাধু আছে। আমাদের ছোলনা, কেনো মহারাজ!" অনেকে ভন্টুদার পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন।

ভন্টুদার তখন প্রায় ক্ষ্যাপবার মতন অবস্থা। তিনি দু'হাতে টুপির আস্তর ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্ষ্যাপার মতন আওড়াতে লাগলেন, "বাবা না মুণ্ডু! সব ব্যাটা সেই গালি-গুলি বাবার কাজ। আমার টুপি বদলে দিয়ে ব্যাটা এখন আমার মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছে! আজ ব্যাটার টুপি শেষ করবো তবে ছাড়বো!" এই বলে যতই তিনি টুপির আস্তরের পর আস্তর ছিঁড়তে লাগলেন, ততই তার ভিতর থেকে লালনীল রেশমী রুমাল আর ফিতে বেরিয়ে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে লাগলো।

আর দর্শকরাও তেমনি, "ইয়া উস্তাদ—কো উস্তাদ!" করতে লাগলো।

ভন্টুদার বিচিত্র অনুষ্ঠান আরও খানিক দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেঁ-ব্রা-চ্‌ করে একটা খাকি রঙের ঘেরা টোপের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই পটলা আমার হাত ধরে পাশের গলিতে পিট্‌টান দিলে, বাকীটা দেখবার আর সৌভাগ্য হলো না।

বার-বিচার

শ্রীরাধারানী দেবী

সোমবারে তাই জন্ম হলে সৌম্য হবে মূর্তি।
ইস্কুলেতে সবার প্রিয়, মেজাজ সদাই ফূর্তি॥
মঙ্গলবার, জন্ম হলে অমঙ্গলের হয়।
পরীক্ষাটির সময় এলেই অসুখটি ঠিক হয়॥
বুধে যাদের জন্ম, তারা বুদ্ধিমানই হবে।
যতই খেলুক—পাশের বেলায় উপর দিকেই রবে
বেস্পতিবার জন্মালে হয় অল্প খেটেই পাশ
বৃত্তি কিন্তু পায় না তারা 'লেটার' ঘেঁষেও নাস
শুক্রবারে জন্ম হলে নেই দুনিয়ায় ভয়।
পরীক্ষাতে তাদের খাতা 'আশি'র তলায় নয়
শনির জাতক এগজামিনে পাবেই পাবে কম
সঠিক-জবাব লিখলেও হয় পরীক্ষকের ভ্রম
রবিবারে জন্ম যাদের, তারাই শুধু ধন্য।
পরীক্ষা না দিলেও আছে প্রাইজ তাদের জন্য

লেখা

শ্রীপ্রেমেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখতে যেন পারিনে কো,
ভেবেছেন সবাই :
কা'র নাম যে 'লেখা' বলে
দেখিয়ে দিতে চাই।
কাকের ছানা, বকের ছানা,
ফুটকি, কমা, বানান নানা,
রাখছি লিখে জড়িয়ে টানা
ভরিয়ে খাতাটাই।

আবোল-তাবোল মোটেই এ নয়,
নয়কো হিজি-বিজি;
মনের মাঝে জমেছিল
অনেক ইংরিজি।
আপনি যা-সব ছিলাম শিখে,
ইকিড়-মিকিড় রাখছি লিখে,
থাকবে না আর কোনো পাতার
কোথাও সাদা ঠাঁই॥

ম্যাঁও / নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সারাটা দিন আকাশটা ঘোলাটে আর আবহাওয়াটাও অসহ্য রকমের গুমোট। সন্ধ্যার দিকে শুরু হলো পড়তে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টির ফোঁটা। শ্যামনগর থেকে একটা রোগী দেখে ফিরছিলাম গাড়িতে। রাত্রি তখন গোটা এগার হবে। টিপ্ টিপে বৃষ্টি-ঝরা মেঘলা আকাশ কালো রাত্রির অস্পষ্টতায় যেন রহস্যের মত মনে হয়।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেশ মেজাজেই চল্লিশের উপরে স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো চলমান গাড়ির চাকায় কি যেন বেঁধে ছিট্‌কে গেল এবং সংগে সংগে একটা শব্দ কানে এলো—'ম্যাঁও'!

বুঝলাম গাড়ির চাকায় একটা অসতর্ক বিড়াল চাপা পড়েছে, তারই শেষ আর্ত করুণ চিৎকার, ম্যাঁও! ভ্রুক্ষেপ করলাম না। যেমন গাড়ি আরো একটু জোরে চালাবার জন্য এক্সিলেটারে পা দিয়েছি, আবার কানে এলো সেই শব্দ' ম্যাঁও!

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েই গাড়ি থামিয়ে দিয়ে দরজা খুলে নীচে নামলাম। কিন্তু অন্ধকারে গাড়ির চাকাগুলো ও আশপাশ ভাল করে দেখেও কিছু নজরে পড়ল না। আবার উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে যেমন ক্লাচ্ ছেড়েছি সেই শব্দ—ম্যাঁও!

আবার গাড়ি থামাতে হলো। আবার নামলাম। আবার সব দেখলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

কিন্তু গাড়িতে চেপে আবার যেমন স্টার্ট দিয়েছি সেই শব্দ—ম্যাঁও!

ব্যাপার কি! বিড়াল তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, তবে বিড়ালের ডাক আসছে কোথা থেকে। ভাবলাম যাক গে। চুলোয় যাক। বাড়ি ফিরতে হবে, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। গিয়ার দিয়ে ক্লাচ্ ছাড়লাম।

গাড়ি সামান্য এগিয়েছে কি না এগিয়েছে আবার সেই ম্যাঁও!

ভাল জন্জালাতনে পড়া গেল তো। বাধ্য হয়ে নামলাম। কিন্তু কোথায় কি!

আবার গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে এগুতে যাবো সেই ম্যাঁও!

তবু চালালাম গাড়ি সামনের দিকে।

কিন্তু সংগে সংগে কানে আসতে লাগলো সেই ম্যাঁও! ম্যাঁও! ম্যাঁও—

তবে কি চাকার সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছে বিড়ালটা! নামতেই হলো আবার! ও মা! ও কি! অন্ধকারে অম্বর, গাড়ির ঠিক চাকার সামনে মস্ত একটা ভূতের মত কালো রংয়ের লোমওয়ালা কাবলী বিড়াল দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে দু'খণ্ড কাঁচের মত চোখ দুটো জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে।

কোথা থেকে এলো বিড়ালটা! এতক্ষণ তো কই চোখে পড়েনি।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তাড়া দিলাম—যাঃ যাঃ এই...

কিন্তু আশ্চর্য। নড়েও না সরেও না। কটমট্ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকেই যেন। পায়ের কাছ থেকে একটা ইট তুলে ছুঁড়ে মারলাম, কিন্তু বিড়ালটা যেন বেপরোয়া। নড়েও না সরেও না।

পা দিয়ে লাথি দিয়ে তাড়াবো বলে এগিয়ে গেলাম, বিড়ালটা সরে গিয়ে ডান দিকে দাঁড়াল। ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ দিক থেকে ডাইনে, সেখান থেকে সামনে, আবার পিছনে এমনি করে বিড়ালটা যেন কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে আমার আঘাত দেবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে লাগল। আমারও কেমন জিদ চেপে গেল।

তাড়াবোই বিড়ালটা! কিন্তু কিছুতেই তাকে যেন ধরতে বা ছুঁতে পারছি না। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সে যেন আমাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। মধ্য রাত্র। টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, একটা বিড়ালের সংগে আমি কসরৎ চালাতে লাগলাম।

ভুলে গেলাম যে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু আমারও তখন রোক চেপেছে বিড়ালটাকে তাড়াবোই! যত সেটা পালায় তত সেটাকে আমি মারবার চেষ্টা করি!

কতক্ষণ ঐভাবে বিড়ালটাকে তাড়া করে নিয়ে ফিরেছিলাম জানি না; অবশেষে এক সময় ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে গাড়ির সামনে মাটিতেই রাস্তার উপরে বসে পড়লাম।

ইতিমধ্যে কখন একসময় রাত পোহিয়ে গিয়েছে টের পাইনি। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় যেন এতক্ষণে খেয়াল হলো।

বিড়ালটা এতক্ষণ সামনেই কটমট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তে দেখি বিড়ালটা নেই।

একটা ইট তুলে ছুঁড়ে মারলাম

কৌতূহল হলো বিড়ালটা গেল কোথায়! উঠে দাঁড়িয়ে আশে পাশে তাকাতেই গাড়ির ঠিক পিছনে নজর পড়তেই থ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেলাম। গাড়ির পশ্চাতে ঠিক হাত দুই দূরে একটা মস্ত লোমওয়ালা কালো রংয়ের বিড়াল রাস্তার উপরে রক্ত মাখামাখি হ'য়ে পড়ে আছে। পেট ফেটে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গিয়েছে। সারাটা রাত্রির সমস্ত ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল।

সেই ঘটনার পর বোধ হয় দিন কুড়ি বাদে ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরছি—রাত্রেই! হঠাৎ সেই জায়গাটায় আসতেই সে রাত্রের কথা মনে পড়লো আর সংগে সংগে কানে এলো সেই ম্যাঁও! সে রাত্রে অবিশ্যি গাড়ি থামাইনি, তবে সারাটা পথ শুনেছি সেই ম্যাঁও—ম্যাঁও—ম্যাঁও!—

শরৎ / শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হল্‌দে পাখি
গেলো ডাকি—
খুকু—খুকু—
ভরল ভুবন—
শরৎ ভোরের
স্নেহটুকু!—
কোন সাথী সে
কাছে এসে
ডাকল—খোকা!—
উঠল ফুটি—
শিউলী রঙন—
থোকা—থোকা!—
শরৎ এলো
ঝলোমলো
সারা ভুবন।
দেখ্‌ছে সবাই
শরৎ ভোরের—
সোনার স্বপন।
নীল আকাশে
বনের কাছে
ধানের ক্ষেতে—
সোনার আসন—
শরৎ আসি
দিল পেতে।
সেই আসনে
খোকাখুকু
বস্‌ল হেসে।
শরৎ এলো—
নিখিল ধরায়—
ভালবেসে।

উড়ো মন

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ

ফটো শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী

ভরা দুপুর বেলা, যখন ছুড়ে মারে ঢেলা
আমড়া গাছের ডালে ডালে বাঁদরছানার খেলা।
মা বলবেন 'ঘুমোও' তখন, ঘুম কি চোখে আসে?
মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি লেপ্‌টে মায়ের পাশে।
ঘুমের আঠায় মায়ের যখন চোখদুটি যায় জুড়ে
গুটি গুটি উঠি আমি—মনটা চলে উড়ে।
নামবো নীচে? বাইরে যাবো? তার কি উপায় আছে?
ছিক্‌লিতে যে কুলুপ আঁটা। —চাবি মায়ের কাছে!
সারা বাড়ির বন্ধ সবই। ভাবছি আমি তাই
চিলেকোঠার জানলা ঠেলে উড়েই যদি যাই!

খুকুর সংসার

ফটো—শ্রীঅমিয় তরফদার

সিকিভাগ [illegible] সাঁওতালী। [illegible] সেই [illegible] উদ্দুর ছিটেফোঁটা মেশানো। দেবদেবী সেই কিংসাড় বঙা, হাড়াম বঙা, [illegible], লিটা, জমসিম বঙা। কিন্তু ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বড়ো হল সিঙে বঙা, তেমনি ভূড়্কদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বঙা।

সেই এল্লা বঙার কসম খেয়ে বুড়ো মিঞা-মাঝি বললে, "হুজুর থানা-হাকিম, মিছা বলবো নাই। থানাহাকিম আপুনি, সাজা দিবার হয় ল'টকে দে।"

লটকে দে। অর্থাৎ ফাঁসি দে।

শুনে হাসলেন অবিনাশবাবু। পাণ্ডে, সহায়, সিপাই কালী মণ্ডল।

আর হাসলেন অমিয়বাবু। বললেন, থানা-হাকিম! বেশ নামটি দিয়েছে কিন্তু।

দারোগা অবিনাশবাবু থানাহাকিম, আর জমাদার গোবিন্দ সহায় ছিল দারোগা। বন-পুলিশের দপ্তরে বসতেন বলে রেঞ্জার অমিয়বাবুর নাম ছিল জঙ্গল-সাহেব।

জঙ্গল-সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বসেই যথারীতি গল্পগুজব চলছিল। রেঞ্জার অমিয়বাবু, দারোগা অবিনাশবাবু, জমাদার গোবিন্দ সহায়, এফ-ও হৃদয়নাথ পাণ্ডে এবং আরো দু'চারজন চাপরাশী আর কনেস্টবল। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছিলো। অঝোর ধারায় বৃষ্টি তো নয় যেন আলকাতরার প্লাবন। গাছের পাতার খসখসানি, বৃষ্টির রিমঝিম আর বনফড়িঙের ঝিঁ ঝিঁ—এরই মাঝে হঠাৎ একসময় ঠুক ঠুক এসে হাজির হল বুড়ো মিঞামাঝি।

একমনে খৈনী টিপছিল জমাদার গোবিন্দ সহায়, মেঝেতে বসে বসে। তারই সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ো।—সেলাম দাগা সাহেব।

সরাসরি অবিনাশবাবুর কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হল না। শুধু গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা সামনে নামিয়ে রাখলো সে।

টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল বারান্দায়, তাই প্রথমটা বুঝতে পারেনি গোবিন্দ সহায়। ক্ষেতের খরমুজা দর্শনী এনেছে ভেবে বাঁ হাতে দুটো ফাঁপা তালি দিলে, তারপর খৈনি টেপা বন্ধ রেখে গামছাটা খুলেই আঁতকে উঠলো।—"আরে রাম রাম সিয়ারাম। এতো তিন শ' দো নম্বর কেস আছে।"

অমিয়বাবু কিংবা পাণ্ডে তো দূরের কথা, অবিনাশবাবুও আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর বললেন, এই বৃষ্টিবাদলের রাতে জ্বালালে দেখছি।

পরক্ষণে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে

চিনতে পারলেন [illegible]। [illegible] সোনাডির মিঞামাঝি না?"

—হাঁ থানাহাকিম। আপুনোই তো [illegible] দিতিস হুজুর, তা বেটারে আমিই [illegible] দিছি।

[illegible] জিজ্ঞেস করলেন, [illegible] তোর বেটা?"

—তারটা আসে নেখ না। [illegible]
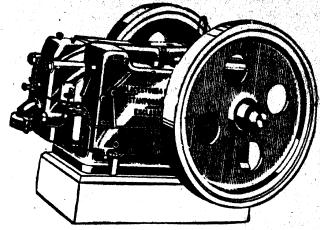
আমার বে'টা বুধন কিস্কু। দে হুজুর ল'টকে দে।

অবিনাশবাবু হাসলেন। —"বুড়ো হাকিমের কাছে বিচার হবে তবে তো; ফাঁসি দিয়ে দেব এখনই ? কিন্তু বুধন কে ? ডাকাত বুধন কি তোর ছেলে নাকি ?"

বুড়ো ঘাড় নাড়লে শুধু।—হাঁ।

অবিনাশবাবু গোবিন্দ সহায়কে বললেন, "বুড়োকে হাজতে রেখে ব্যবস্থা কর গোবিন্দ, মাথাটা এনেছে, ধড়টাও আনতে হবে তো।"

বুড়ো মিঞামাঝি বুঝলো কথাটা। বললে, "সে হুজুর সোনাডিতে আছে, বুড়া হ'য়েছি, মুর্দা আনবার তাকত্ কুথায় ? কিন্তুক হাজত দিবি কানে হুজুর, ল'টকে দে। বোঙারা স্বপন দিলেন বে'টারে কু'রবান দে; তো কু'রবান দিছি, এখুন ল'টকে দে।"

ছেলেকে খুন করেছে, সুতরাং ফাঁসি দিলেই যেন বুড়োর শান্তি।

কিন্তু অবিনাশবাবুর দুঃখ বুধন কিস্কুর গলায় ফাঁসির দড়িটা নিজেই তুলে দিতে পারলেন না।

গোবিন্দ সহায় জনকয়েক কনেস্টবল, সিপাই কালী মণ্ডল আর কোমরে দড়ি বাঁধা মিঞামাঝিকে নিয়ে চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকছে!"

অবিনাশবাবু হাসলেন। —"ব্যাপার ? ব্যাপার নয়, রীতিমত ইতিহাস।"

ইতিহাস সত্যিই।

তুড়ুক সাঁওতালদের গ্রাম সোনাডি। আর সে গাঁয়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল বুধন কিস্কু। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা তল্লাটের যত খুন-জখম ডাকাতি রাহাজানি সব কিছুর জন্যে লোকে দায়ী করতো বুধনকে। অথচ সাহস করে কেউ কিছু বলতো না। লোকটা যে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কার ছেলে কোন খবরই পাওয়া যেতো না। আর কি করেই বা পাওয়া যাবে। গাঁয়ের সাঁওতালরা বলতো, ও হুজুর ডাইনের মন্ত্র শিখেছে ঝুমেরা বিবির কাছে। মারাং বুরুর নাম করে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ নয়তো পাখি। হাওয়ায় নাকি উড়ে যেতে পারে বুধন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে।

আরেকজনের কথাও লোকে বলতো। সে হ'ল হরকরা নির্মল সিং। নির্মল সিংও নাকি মন্ত্র শিখেছিল ঝুমেরা বিবির মেয়ে আসমিনার কাছে, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ করে হাওয়ায় উড়ে যেতো সেও।

লাঠির মাথায় ঘুঙুর বাঁধা, পিঠে মেল-ব্যাগ নিয়ে ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি ছুটতো নির্মল সিং। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ আসতো সন্ধ্যের দিকে, আর মাঝে মাঝে টানাটানা চিৎকার।—স-র-কা-রী ডা-ক!

আবার ছুটতো নির্মল সিং, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম। পিঠের মেলব্যাগে থাকতো চিঠিপত্র, পার্সেল, টাকাকড়ি। শনিবারে শুধু মনি অর্ডারই নয়, সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাও জমা পাঠানো হত বড়ো ডাকঘরে।

ডাক হরকরার ওপর কেউ কোনদিন লোভের হাত বাড়ায় নি। কিন্তু হঠাৎ পরপর দুদিন নির্মল সিংয়ের ঘুঙুর বাজলো না। খবর এসে পৌঁছলো তৃতীয় দিনে।

রেঞ্জার অমিয়বাবু ভেবেছিলেন, লোকটা বুঝি বা এতদিনে অসুখে পড়লো।

কিন্তু অসুখ নয়, চিরনিদ্রা। সোনা-তুলসীর পারে তল্লাস করে পাওয়া গেল মেল-ব্যাগটা। হরকরার লাঠি আর মেলব্যাগ

[illegible] [illegible] পড়ে আছে, আর কাছেই [illegible] [illegible]।

না, নির্মল সিং নয়, আঠারো বিশ বছরের একটি পূর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ [illegible] গলা টিপে মেরেছে তাকে।

গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসামিনা। মায়ের মত মেয়েও ছিল ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিল মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিল, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে। তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।

কিন্তু আসমিনা মরলো কি করে?

বুড়োরা বললে, মা মেয়ে দু-ই ছিল ডাইন। মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংকে খেয়ে নিয়েছে বলে ঝুমরা বিবি মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে।

—তুরাতো হাসিস বাবুরা। ডাইন আছে কিনা পরখ দেখলি তো হাকিম? বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিল অবিনাশবাবুকে।

বুড়ো মিঞা মাঝি ছিল গাঁয়ের মাথা। বিঘে দুই তিন জমি ছিল বুড়োর। জনারের চাষ করতো।

তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন অবিনাশ-বাবু, সঙ্গে জমাদার গোবিন্দ সহায়, জন-কয়েক কনেস্টবল আর সিপাই কালী মণ্ডলকে নিয়ে।

বললেন, তোরা সকলে মিলে সাহায্য না করলে এ ডাকাত ব্যাটাকে ধরা যাবে না।

বুধন যে মিঞামাঝিরই ছেলে তা তো জানতেন না।

মিঞামাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা খাটিয়া পেতে দিলো বসবার জন্যে। তার-পর বললে, ঝুমরা বিবিটাই আসামী হুজুর, ডাইনটাকে ল'টকে দে দেখবি বুধন ভালো হয়ে যাবে।

অবিনাশবাবু বুঝলেন কাজ হবে না এভাবে। রেঞ্জার অমিয়বাবুকে এসে বললেন, কি করা যায় বলুন তো। লোকটার কোন হদিসই কেউ দিচ্ছে না। সবারই ভয় বুধনকে ধরিয়ে দিলে ডাইনে কলিজা খেয়ে নেবে তার।

সোনাডির লোকগুলোর ওপর নাকি বোঙাদের দৃষ্টি ছিলো আগে। তারপর এই ঝুমরা বিবি ডাইন হল। অন্ধকার রাতে মন্ত্র পড়ে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়ে যেতো ঝুমরা বিবি। একটা ঝাঁটা রেখে যেতো স্বামীর কাছে, আর মন্ত্রের ঘোরে ঝাঁটাটা জড়িয়ে শুয়ে সে ভাবতো ঝুমরা বিবিই বুঝিবা শুয়ে আছে। ঝুমরা তখন কুলোর ওপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বেরিয়ে যেতো।

গাঁয়ের অনেকে দেখেছে এ দৃশ্য, এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বলতো তারা।

সে এক ভয়ঙ্কর চেহারা। কপালে চক-চক করতো তেল সিঁদুর, হাতে প্রদীপ, ঝুমরার কালো পাথরের শরীর দেখে মনে হত যেন জোয়ান মরদের শক্তি তার হাতে। আর গর্ভিণ মেয়ের মত তার ভারী লাজ দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হতো তারই কলিজা মুঠোয় পুরে নিতো ঝুমরা। শুধু কি তাই, সব ডেরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ভায়ে ভায়ে ঝামেলার মন্ত্র পড়ে আসতো, বাপ বেটিতে পাপ লাগাতো, গোলার হুড়ুতে পোকা লাগিয়ে গাঁয়ের লোককে ভুখা মারতো।

বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিল, তখুন নিজের ছেলেকে কাটতে পারে বুড়োর কাছে না শুনলে বুঝবেন না অমিয়বাবু। ঠিগিয়া সাদী হওয়ার পর আধাজীবন কেটে যেতেও নাকি ছেলেপিলে হয়নি মিঞা-মাঝির। না বেটা, না বেটি। তারপর ছেলে দিয়েই মারা গেল মিঞামাঝির প্রথম বৌ।"

—তারপর?

—মা না থাকলে বাপের আদর পেয়ে যা হয়। বুধন কিন্তু চাষবাস ছেড়ে শিকার করে বেড়ায়। ছোট খাটো চুরি-জোচ্চুরি করে। তবু বাপ শক্ত হতে পারে না। শেষে ছেলে যখন 'জোয়ান হল,

মায়ের মত মেয়েও ছিল ডাইন

জানতাম না থানাহাকিম, সত্যি ডাইন বটেক, কি ঝুটো।"

—কি করে জানলি? সিপাই কালী মণ্ডল জিজ্ঞেস করেছিল।

মিঞামাঝি তার আধা মাকুন্দ নুরে হাত বুলিয়ে বলেছিল, "ডাইন দেখলে চুপ থাকতে হয় জঙ্গল-সাহেব। তো জানের বিচার যখন বললে ঝুমরা ডাইন, তখন গাঁয়ের সক্কলে বলে, আমরাও দেখেছি বটে।"

সেই ঝুমরা বিবির বশ হ'ল বুধন কিস্কু। বোঙাদের ধরম মানলো না, নিজেকে ভাসিয়ে দিলো পাপের গাড়ায়।

দারোগা অবিনাশবাবুরও চোখ ছল-ছল করে উঠেছিল অমিয়বাবুর কাছে সে কাহিনী বলতে বলতে।

বলেছিলেন, "কত দুঃখে যে মানুষ পঞ্চায়েৎ বললে, বিধবা ঝুমরা বিবির সঙ্গে বুধনের পীরিত হয়েছে। ভয় দেখিয়ে জরিমানা করে কোন কিছুতেই যখন কাজ হল না, তখন সবাই বললে ঝুমরা বিবি ডাইনী। ওকে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।"

অমিয়বাবু বললেন, "শুধু দুটো জিনিসই দেখছি ওদের জীবনে সত্যি, বোঙা আর ডাইনী।"

অবিনাশবাবু বললেন, "কিন্তু ডাইনী বললেই তো হবে না, জানের কাছে বিচার হলে তবে। ওঝার কাছে খাড়ি গুনিয়ে তারপর ধুনো সুপুরি ভাউনিচ নিয়ে যেতে হবে জানের কাছে।"

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় স্টেটমেণ্ট দিচ্ছিলো বুড়ো মিঞা-মাঝি। অবিনাশবাবুর কথা শুনে বললে,

"হাঁ হুজুর, জানে সব ঠিক ঠিক বললে, পরে বুন্দা চাইলে। বুন্দার টাকা দিলাম তো বললে বেটার মাথায় ডাইন ভর করেছে। তো পুছলাম ডাইন আছে কোন ওড়ায়? জান ঠিকানা বললে। তল্লাস করে ঝুমরা বিবি ডাইন হল তো গাঁয়ের লোক হুড়মদড়ম মার দিলে, বে-আব্রু করে ভাগায় দিলে মা বেটিরে।"

অগত্যা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ডেরা বাঁধলে ঝুমরা।

সেই ঝুমরা বিবির খোঁজে লোক পাঠালেন অবিনাশবাবু। কিন্তু পর পর তিন দিন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তার। শেষে বুধন কিস্কুর ডেড বডি আর বুড়ো মিঞা-মাঝিকে চালান করে দিতে হল বর-কাডিহিতে।

দিন কয়েক পরে ঝুমরা বিবি ফিরে যখন শুনলো বুড়ো মিঞামাঝি টাঙির কোপে কেটে ফেলেছে তার ছেলে বুধন কিস্কুকে, তখন কেঁদে গড়িয়ে পড়লো সে।

চোখের জল মুছে বললে, "লটকা হবে তো হুজুর ঐ বুড়াটার?"

অবিনাশবাবু স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন, "কেন বাবা, বুধন কে ছিল তোমার যে তার বাপকে লটকে দিতে চাও?"

ঝুমরা চোখের জল মুছে বললে, "হুজুর বুধনই বাঁচায় রাখছিল আমাদের। না হলে ভুখা মরতাম থানা-হাকিম।"

—তবে সতীঠাকরুন, মেয়ে যখন মরে পড়ে-ছিল সোনাতুলসীর পাড়ে, তখন কেন বুধন কিস্কুর নামে ডায়েরি লিখিয়ে-ছিলে?

সবটা হয়তো বুঝলো না ঝুমরা, তবু যেটুকু বুঝলো সেইটুকুতেই অপ্রতিভ হ'ল।

বললে, "সে হাকিম আনেক কথা।"

যত চোখের জল মোছে ঝুমরা, ততই জলে ভরে আসে তার চোখ।

গাঁয়ের লোক বিটলা করে গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, বুধন কিস্কু তার মন থেকে তাড়াতে পারে নি ঝুমরা বিবিকে।

অমিয়বাবু হেসে বললেন, "পীরিত বটে। ওর চেয়ে দশ বছরের বড়ো মাগীটা, তার সঙ্গে কিনা......"

অবিনাশবাবু হাসলেন।—যার সাথে যার মজে মন—

ফরেস্ট অফিসার পাণ্ডে বললে, "সাচ্ অবিনাশবাবু। আগে পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারে।"

তা এখানে জাত তো একই, তফাত যেটুকু তা শুধু বয়সের। তাছাড়া ডাকাত বুধন ছিল বলেই না ঝুমরা বিবি ভুখা মরে নি। মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে ও যখন ডেরা বাঁধলে তখন ওর না আছে জমি, না চাঁদি। আর পয়সা দিলেও কেউ এক কণা চাল বেচতো না ওকে। সেই সময় বুধন কখনো সখনো মাঝ রাতে একা হাজির হত। চাল ডাল সোনা দানা, লুঠের মাল খানিকটা এনে দিতো ঝুমরা বিবিকে। হাঁড়িয়া খেয়ে ঝুমরা বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো, আর উধাও হ'তো ভোর চমক দেবার আগেই।

সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে

হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঝুমরা।

বললে, "হাঁড়িয়া খেলেই মনের ভিতরটা বেয়াদপ হয়ে যায় থানাহাকিম। ভালো মানুষটা পাপী হয়ে যায়।"

অর্থাৎ মনে পাপ ঢোকে। বুধনের মনেও একদিন সেই পাপ ঢুকলো। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে এসে বুধন-ডাকু হাঁড়িয়া চাইলে। তারপর নেশা যখন জমে উঠছে, তখন হঠাৎ ঝুমরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। বললে, বেটিকে লিয়ে আয়।

—ডাকু নেশা ক'রলে হুজুর বাঘের মত তেজ হয়। ঝুমরা বিবি বললে।

অবিনাশবাবু বললেন, "আর তাই মেয়েকে এনে দিলি, কেমন?"

ঝুমরা বিবি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না।

—তারপর?

তারপর বুধন যখনই আসতো, হাঁড়িয়া চাইতো। আর হাঁড়িয়া খেয়ে রাত কাটাতো আসমিনার সংগে। শেষে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হ'লো। বললে, বেটিকে নিয়ে আয়।

অমিয়বাবু বললেন, "বাঃ বেশ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার তো।"

অমিয়বাবু হাসলেন। —তারপর? ডেকে আনলি আসমিনাকে?

ঝুমরা বিবি মুখ তুললো এতক্ষণে। বললে, "না হুজুর। আসমিনা সাঁঝের বেলায় সোনাতুলসী থেকে পানি আনতো। তো বেটি গাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙিটা লিয়ে চলে গেল বুধন। তারপর তো তুরাই জানিস হুজুর।" বলে কাঁদলে ঝুমরা, ঠিক সেদিন মেয়ের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে যেভাবে কেঁদেছিল।

সব শুনে অবিনাশবাবু বললেন, "তবে আবার বুধনের বাপটাকে লটকে দিতে চাস কেন? মরেছে ভালই হয়েছে।"

ঝুমরা বিবি চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, "ফাঁসি হবে?"

—পাগল হয়েছেন? হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন, বছর কয়েক জেল অবশ্য হবেই।

দিনকয়েক পরে বরকাডিহি থেকে ফিরে এসে বললেন, জেলই হল অমিয়বাবু, চার বছর। বুড়ো মিঞা মাঝি এমন স্টেটমেণ্ট দিলে যে, কোর্টশুদ্ধ লোকের চোখে জল এলো।

—কি বললে? উদগ্রীব হয়ে উঠলেন অমিয়বাবু।

—বললে, হুজুর জন্ম দিয়েছি আমি, জীবনও নিয়েছি আমি। এখন আইনে ফাঁসি দিতে হয় দে। যে ছেলেকে কোলেপিঠে করে আদর যত্নে মানুষ করেছি সে যখন ভালো হ'লো না, ডাকাতি রাহাজানি করে, মেয়েদের বেইজ্জৎ করে এস্লাবোঙার কাছে বেইমান হল তখন তাকে কেটে ফেলবো না তো মুর্গি বলি দিয়ে তার পুজো করবো!

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা ঠিকই।

ক্ষোভের হাসি হাসলেন অবিনাশবাবু। "ওর বেটার নাকি দোষ ছিল না, ডাইনীর বশ হয়েছিল। কিন্তু রায়ে জেল হয়েছে শুনে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল বুড়ো। ভাবলাম, ফাঁসি হবার জন্যে এত

আগ্রহ যার সে-লোক জেল হয়েছে বলে কাঁদে? জিজ্ঞেস করলাম তো বললে, হুজুর হিসাব ভুল হয়ে গেছে। ল'টকা না হ'লে বোঙারা খুশী হবেন নাই, বুধন ভালো হবে নাই।"

একটু চুপ করে থেকে অবিনাশবাবু বললেন, "বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে ছেলেকে খুন করে। কিন্তু ডাইনী ভোলেনি।"

পাণ্ডেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "বিশোয়াস্, অমিয়বাবু"

বিশ্বাস!

সত্যিই তাই। অদ্ভুত মানুষ এই তুড়ুক চাষীরা। একবার যা বিশ্বাস করে সারা জীবনেও তার নড়চড় হবে না, অমিয়বাবু বলতেন। বলতেন নতুন দারোগা সুধীনবাবুকে।

অবিনাশবাবু বরকার্ডিহিতেই বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁর জায়গায় এসেছিলেন সুধীনবাবু।

খুনজখম বা ডাকাতি রাহাজানির কেস এলেই বুধন কিস্কু আর বুড়ো মিঞামাঝির গল্প শোনাতেন অমিয়বাবু।

বলতেন, "সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড সুধীনবাবু। সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, বসে গল্প করছি আমরা, হঠাৎ সেই সময় ঠুক-ঠুক করে এসে হাজির হল বুড়ো মিঞামাঝি, গামছায় ছেলের কাটা মুণ্ডুটা বেঁধে নিয়ে। সে কি আজকের কথা, সে প্রায় তিন-চার বছর হল।"

সেদিনও এমনি কি একটা গল্প হচ্ছিল, হঠাৎ সিপাই কালী মণ্ডল ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "সোনাডির একটা গাছে গলায় দড়ি লাগিয়ে একজন বুড়ো ঝুলছে স্যার।

—আত্মহত্যা? সুধীনবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ স্যার, সুইসাইড কেস। কালী মণ্ডল বললে।

অমিয়বাবু, সুধীনবাবু, পাণ্ডে, সহায় সকলেই বেরিয়ে পড়লো। হাঁটুজল সোনাতুলসী পার হয়ে এসে দেখলে, ভিড় ভেঙে পড়েছে গাছটার কাছে।

একটা সিপাই গাছে উঠে দড়িটা কেটে দিলো, ঝুপ করে মাটিতে পড়লো মৃতদেহটা।

অমিয়বাবু ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। বুড়ো থুত্থুড়ে একটা লোক, মুখের চামড়া জিলজিলে হয়ে গেছে।

কে যেন বললে, "জঙ্গল-সাহেব, কয়েদ মকুব হয়েছিল তাই সোনাডিতে ফিরে এসেছিল বুড়ো মিঞামাঝি।"

আরেকজন কে বললে, "ডাইনটা মন্ত্র পড়ে বুড়োকে ল'টকে দিয়েছে হুজুর।"

শুধু ঝুমরা বিবি বললে, "না হুজুর, ডাইন নই আমি। বেটা বাপের কথা রাখে নাই হুজুর, তাই গলায় দড়ি দিয়েছে বুড়া। বেটা বুধন বলেছিলু জান বাঁচায় দিলে রাহাজানি করবে নাই।"

অমিয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, "কি বলছিস যা-তা।"

সিপাই কালী মণ্ডল বললে, "ঠিকই বলছে স্যার। গাঁয়ের লোকও বলছে, বুধন কিস্কু বেঁচে আছে।"

—বুধন কিস্কু বেঁচে আছে? বিস্মিত না হয়ে পারেন না অমিয়বাবু।

কালী মণ্ডল বললে, "তা না হলে এত রাহাজানি হয় এখনো? ডাইনীটা বলছিলো, কে একটা লোক নাকি থানায় খবর দিতে আসছিলো, তাকেই তিনশো দুই করে দিয়েছিল বুধন। অথচ গাঁয়ের চারদিকে তখন পুলিশ।"

—তারপর?

—তারপর বাপের কাছে মাঝরাত্তিরে গিয়ে বলেছিল, এবার জান বাঁচিয়ে পালাতে দাও, ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস দেখবো। তা স্যার, তুড়ুকই হোক্, সাঁওতালই হোক্, বাপের প্রাণ তো। সেই ডেড-বডিটাই বুধনের বলে চালিয়ে দিলে।

সুধীনবাবু অস্ফুটে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ!"

কালী মণ্ডল বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ো ভেবেছিল খুনের দায়ে ফাঁসি হবে ওর। আর ফাঁসি হলে তখন বাপের কলিজা বেটার বুকে এসে ঢুকবে। ডাইনী তখন ছেলেকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে না।"

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "অন্ধবিশ্বাস! এইজন্যেই উন্নতি হল না লোকগুলোর!"

কালী মণ্ডলও দীর্ঘশ্বাস ফেললে,—"যা বলেছেন স্যার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোকটা যখন ফিরলো, গাঁয়ের লোকদের নাকি চিনতেই পারেনি, একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল।"

—তাই নাকি? বিস্মিত হ'লেন সুধীনবাবু।

—হ্যাঁ স্যার। কালী মণ্ডলের চোখও যেন ছলছল করে উঠলো। বললে, "বুড়ো নাকি ছুটে বেড়াতো আর বলতো, ল'টকা হল নাই, হিসাব ভুল হ'য়ে গেছে। ফাঁসি হলেই যেন শান্তি পেতো বুড়ো।"

আর সেইজন্যেই হয়তো নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরলে।

কিন্তু সোনাডির তুড়ুকরা বললে, না হুজুর, বেটার কলিজা খে'য়ে মিঠা লেগেছিল ডাইনটার, তো বাপের কলিজাও খে'য়ে নিছে।

এ ঘটনার পর বহু দিন মাস বছর পার হয়ে গেছে। একরামপুরের থানা উঠে গেছে বরকাডিহিতে, বন-পুলিশের দপ্তরে এসেছে নতুন লোক। সবাই ভুলে গেছে ঝুমরা বিবিকে, বুড়ো মিঞামাঝিকে, ডাকাত বুধন কিস্কুকে। কিন্তু সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনও শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়—ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ সকলে দিনরাত নাচে-গায়, দোকানীদের সারি বসে মিঠাই মাণ্ডা, রঙিন কাচের জল-চুড়ির। আর ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞামাঝির নামে। এল্লা বোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা আর অন্যটা মিঞামাঝি—তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।

যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যেবারে 'মিঞামাঝি' মোরগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙার পুজো চলে সাত দিন ধরে। গাঁয়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু মিঞামাঝির সন্তানস্নেহের দিকটা চোখে পড়ে না ওদের। ছেলের জান বাঁচাবার জন্যে, ছেলেকে ভালো করবার জন্যে বাপ নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাবে—এই তো সাধারণ নীতি। এ ব্যাপারে বিস্মিত হবে কেন সোনাডির তুড়ুক চাষীরা।

আমি নিজেও দেখেছি এ মেলা, ঝুমরা বিবির মেলা। দেখেছি সোনাডির মোরগ লড়াই। এখন একে গল্প বলতে হয় গল্প বলুন, ইতিহাস বলতে হয়, ইতিহাস।

ছুটি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মীরার বাবা গণেশ দত্ত ছিলেন আমাদের জেলা স্কুলের মাস্টার। আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম, আমার বাবা ছিলেন জজ কোর্টের উকিল। ওখানে ছোট খাট একটু বাড়িও আমাদের ছিল। কিন্তু গণেশবাবুরা ছিলেন ভাড়াটে বাসায়। অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টেই ছিলেন। মীরা তাঁর মেজো মেয়ে। শামলা রঙ, দোহারা লম্বাটে গড়ন; মুখ চোখের শ্রী ছাঁদ ভালই। দেখলে পলক পড়ে না এমন অবশ্য নয়, আবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ারও দরকার হয় না। রাস্তার এপারে ওপারে সামনাসামনি বাড়ি হওয়ায় জানালা দিয়ে ওদের ঘর সংসারের অনেক দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ত। কখনো দেখতাম রুগ্না মায়ের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে মীরা, কখনো বাপের পিঠে তেল মালিস করছে, ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে ভাইদের, কোনদিন বা ছোট বোনকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়ে তার কান্না থামাচ্ছে—চোখে পড়ত। আবার এই সব কাজের এক ফাঁকে ওকে বইপত্র নিয়ে স্কুলে বেরোতেও দেখতাম। আর সে বইও দু'একখানা বই নয়, একরাশ বই হাতে ও ঘাড় গ‌ুঁজে পথ হাঁটত। পাড়ার বকাটে দু' একটি ছোকরা ঠাট্টা করে বলত—'ইস্, পল্লবিনী লতা একেবারে নুয়ে পড়েছে।'

মীরা কারো দিকে তাকাত না, পাড়ার কোন ছেলে আলাপ করতে চাইলে এড়িয়ে যেত। এইজন্যে অনেকেরই রাগ ছিল ওর উপর।

আমার মা কিন্তু বলতেন, 'মেয়েটির গুণ আছে রে। সংসারে এত কাজকর্ম করেও ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়। মেয়েটি পড়াশুনোয় ভাল।'

পড়াশুনোয় আমিও নেহাৎ খারাপ ছিলাম না। তবু মার মুখে অন্য একটি মেয়ের বিদ্যার প্রশংসা শুনে কেমন যেন আমার একটু হিংসে হত। হেসে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম 'ক'জনের মধ্যে সেকেন্ড হয় মা?'

মা বলতেন, 'যতজনই হোক্ দু'জনের চেয়ে বেশি ছাত্রী নিশ্চয়ই ওদের ক্লাসে আছে। কেন, ওর উপর তোর এত রাগ কিসের রে?' মা হাসতেন।

একটু রাগ ছিল বই কি। মীরা আমার সমবয়সী হয়েও আমার চেয়ে দু' ক্লাস নীচে পড়ে। সেই হিসেবে ওর একটু শ্রদ্ধা-মনোযোগ আকর্ষণের দাবি কি আমার নেই? মীরা আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যে আসে যায় তা আমি জানি। মার কাছ থেকে গোপনে গোপনে পাঁচ দশ টাকা ধার নেয়, আবার গোপনেই তা শোধ দিয়ে যায়। মা ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই বাড়িতে।

আমি একদিন বললাম, 'মীরা বড় অহংকারী, না মা?'

মা হেসে বললেন, 'নারে, মেয়েটি বড় লাজুক, আজকালকার মেয়েদের মত বেটাছেলের সঙ্গে ও বেশী মেলামেশা করতে জানে না।'

কিন্তু এই মীরাই ম্যাট্রিকুলেশনে সেবার ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে শহরের সবাইকে অবাক করে দিল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করতে শুরু করলেন, হ্যাঁ মেয়ে বটে একখানা গণেশ দত্তের। এ মেয়ে যে পরীক্ষায় ভাল করবে তা তাঁরা সবাই জানতেন।

রেজাল্ট বেরোবার পর গণেশবাবু মেয়েকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার বাবা-মাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'ও'দের প্রণাম কর।'

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। মীরা ও'দের প্রণাম সেরে উঠতেই গণেশবাবু আমাকেও ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেই উপরি পাওনা প্রণামটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন মা। এক সংগে মীরা আর তার বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ও কি? পরিমল মীরার চেয়ে ছ' মাসের ছোট। ওকে আবার প্রণাম কিসের। ছি ছি।'

ধমক খেয়ে মীরা একটু পিছিয়ে গেল।

"গণেশবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ও, পরিমল বুঝি বয়সে ছোট। কিন্তু তাতে কি ভালো বউঠান, পরিমল বামুনের ছেলে, মীরার চেয়ে কত বেশী উপরে পড়ে, কত বেশী বিদ্যেবুদ্ধি রাখে। সংসারে বয়সটাই তো আর সব নয়?'

সেইদিন মীরার সংগে আলাপ হয়ে গেল। ও বলল, আমার ইণ্টারমিডিয়েটের সব বই আর নোট-ফোটগুলি ওর চাই। আমিও তাই চাইছিলাম। চাইছিলাম, 'ও আমার কাছ থেকে বইপত্র সব চেয়ে নিক।

মীরা আমাদের কলেজে ভর্তি হল। তার বছর দুই আগে থেকে কলেজে কো-এডুকেশন চলছে। আমার ইচ্ছে ছিল বি এটা কলকাতায় এসেই পড়ি। কিন্তু বাবা মা ছাড়ছেন না। প্রফেসাররাও আমাকে আটকে রাখলেন। তাই বছর দুই মীরার সংগে একই কলেজে পড়বার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে ওর নাম ছড়াতে শুরু হয়েছে। শুধু ছাত্রদের কমন-রুমেই নয়, প্রফেসরদের ঘরেও ওকে নিয়ে আলোচনা হয়। কলেজ ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ওর প্রবন্ধ বেরোয়। সে রচনার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অধ্যাপক মহল মুখর হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু একটামাত্র অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে শোনা যায়। মীরা বড় অমিশুক। বই আর পড়াশুনো ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনে ওকে পাওয়া যায় না, কলেজের উৎসব-অনুষ্ঠানে ও গরহাজির থাকে। মীরা একেবারে গতানুগতিক অর্থে ভাল ছাত্রী।

আমি একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাল আমাদের থিয়েটারে এলে না কেন। সবাই যে তোমার নিন্দে করছে। বলছে দাম্ভিক আর অহংকারী।'

মীরার মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ পড়ল, আস্তে আস্তে বলল, কি করব বল। মায়ের মাথার অসুখ কাল যে খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমি ছাড়া মাকে যে কেউ সামলাতে পারে না।'

নানা রকম অসুখে ভুগে ভুগে মীরার মার মাথায় ছিট হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কথাটা মীরাদের বাড়ির কেউ প্রকাশ করতে চাইত না। মীরা সেদিনই আমাকে প্রথম সব খুলে বলল।

আই এতেও কয়েকটি লেটার আর স্কলারশিপ নিয়ে মীরা থার্ড ইয়ারে উঠল। আর আমি ফিলসফিতে একটি সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স জুটিয়ে কলকাতায় এসে ইউনি-ভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

ছুটি-ছাটায় যেতাম আমাদের শহরে। আর মীরার সুখ্যাতির কথা শুনতাম। সেবার এসে শুনলাম আমাদের প্রিন্সি-প্যালের সংগে মীরার বেশ একটু আলাপ হ'য়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগে শেলীর তুলনা করে মীরা কলেজ-ম্যাগাজিনে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। তাই নিয়ে দু-একজন প্রফেসরের আলোচনা শুনে প্রিন্সিপাল সতীকান্ত ঘোষাল সেটা দেখতে চান। প্রবন্ধটি পড়বার পর মীরাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওটা কি তোমার নিজের লেখা! কোত্থেকে টুকেছ তাই বল।'

মীরা নতমুখে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার
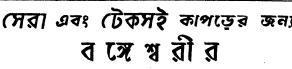
...কচার নোটের সাহায্য নিয়ে ওটা আমি নিজেই লিখেছি।'

প্রিন্সিপ্যাল স্থিরদৃষ্টিতে মীরার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা যাও। ক্লাসে যাও।'

এর পর মীরাকে আর একদিন ডেকে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ ওকে ভাল করে পড়াশুনো করে ইংরেজীতে একটি ভাল অনার্স নিয়ে বেরবার জন্যে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়েছেন।

খবরটা আমরা বেশ উপভোগ করলাম। কারণ অধ্যয়নে-অধ্যাপনায় সতীকান্ত ঘোষালের যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে তা আমরা ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর দশেক ধরে বিষয়, আশয়, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিকে তাঁর এমন নজর পড়েছিল যে, কলেজের দিকে মন দেওয়ার তাঁর অবসরও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। সতীকান্ত না আছেন হেন জায়গা নেই। জেলা বোর্ডের পলিটিকসে তিনি রয়েছেন, বেনামীতে কয়েকটি রাস্তা তৈরির কনট্রাক্ট নেওয়ার কাজের মধ্যেও তিনি আছেন। শহরের বাণী প্রেস'টি কিনে নিয়ে তিনি তাঁর স্বত্বাধিকারী হয়েছেন। খুব লাভ হচ্ছে প্রেসের ব্যবসায়। জুনিয়র প্রফেসর, এমন কি ছাত্রদের দিয়ে নোট লিখিয়ে তিনি নিজের নামে তা বাজারে চালাচ্ছেন, তাতেও বেশ পয়সা আসছে। কলকাতার দু-তিনটি নামজাদা প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শোনা যায়, সে সব কারবারে অংশও আছে তাঁর। এ ছাড়া ডুয়ার্সে চা-বাগানের শেয়ার আছে। মাঠে খামার জমির পরিমাণ তাঁর বেড়ে চলেছে। জলায় মাছের ব্যবসায়ে তাঁর টাকা খাটছে।

এই তো গেল সম্পত্তির কথা। এবার প্রতিপত্তির কথাটা বলি। শহরে প্রতি-পত্তিরও তাঁর তুলনা নেই। থানা পুলিস থেকে শুরু করে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। তিনি সবাইকে চেনেন। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাও কারো চিনতে বাকি নেই। লোকের উপকার আর অপকারের দু রকম ক্ষমতাই তিনি রাখেন। তাই শহর-সুদ্ধ লোকের তাঁর সম্বন্ধে এক চোখে শ্রদ্ধা, আর এক চোখে ভয়।"

শহরের অভিজাত পাড়া কলেজ রোডে তাঁর বড় দোতলা বসতবাড়ি। এছাড়া আরো খান দুই বাড়ি আছে। সেগুলি তিনি ভাড়া দিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছেলে শুভেন্দু শহরের সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল মৃত্যুঞ্জয় মুখুজ্জের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে নিজেও জজকোর্টে ওকালতি করছে। মেয়ে শুভ্রাকে বিয়ে দিয়েছেন ধনী জমিদারের ঘরে। জামাই নীলাম্বর এম বি পাশ করেছে। ডাক্তারিতে তেমন সুবিধে না হলেও তার ফার্মেসি বেশ জেঁকে উঠেছে। ওষুধ বিক্রি করে খুবই লাভ করছে নীলাম্বর চাটুজ্যে।

আর এই সব ধনসম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রে আছেন সতীকান্তের স্ত্রী হিরণপ্রভা। শোনা যায়, তিনিই স্বামীর এই বৈষয়িক উন্নতির মূলে। তাঁর বাবা ছিলেন গঞ্জের তেল-লবণের কারবারী। হিরণপ্রভা লেখা-পড়া বেশি শেখেননি। কিন্তু বিদ্যার অভাব রূপে আর বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করেছেন। তাঁকে দেখলে তাঁর কথাবার্তা শুনলে কিছুতেই মনে করবার জো নেই তিনি কম লেখাপড়া জানেন। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র তাঁর বেয়াইর মুশাবিদাকে হার মানায়।

কিন্তু এমন প্রভাবশালী সতীকান্তেরও যে শত্রু নেই তা নয়। তারা আড়ালে আবডালে বলাবলি করে, তাঁর সব ঐশ্বর্যই সহজ পথে আসেনি। অনেকখানি বাঁকাচোরা পথে ঘুরে এসেছে। তারা বলে সতী-কান্তের আর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে না থাকাই ভাল। কারণ পড়ানর দিকে তাঁর মোটেই মন নেই। রুটিনে সপ্তাহে দু-তিনটে অনার্স ক্লাশ তাঁর থাকে। তাও তিনি সমানে করেন না। প্রফেসর কুণ্ডু, কি প্রফেসর ধরের উপর বরাত দিয়ে অন্য কাজকর্মে তিনি সরে পড়েন। পড়ানর চেয়ে তাঁর অনেক বড় আর জরুরী কাজ আছে। কলেজে ইংরেজী অনার্সের ফল সবচেয়ে খারাপ হয়। ছেলেদের ভাগ্যে দু-একটা কোন বার জোটে, কোন বার জোটেও না। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কিছু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। বলে লাভ নেই। কারণ গভর্নিং বডি প্রিন্সিপ্যালের হাতের মুঠোয়। শোনা যায়, এই বেসরকারী কলেজের বেশির ভাগ অংশই সতীকান্ত কিনে রেখেছেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনা করবে কে।

পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে সতী-কান্তের। কানের কাছে চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। কিন্তু এখনো বেশ শক্ত জবরদস্ত চেহারা। রীতিমত লম্বা চওড়া। পুরু ঠোঁট, নাকটাও একটু চ্যাপটা। সুপুরুষ না হলেও স্বাস্থ্যবান পুরুষ।
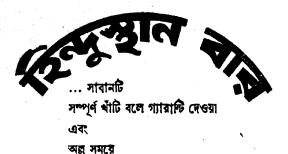
একটু যেন স্থূল সূক্ষ্ম বৈষয়িক ধরনের মুখ। দেখলে প্রফেসর বলে সত্যিই আজ-কাল আর তাঁকে মনে হয় না। মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার আকারেও বোধ হয় কিছু অদল-বদল হয়। যাই হোক, শহরে যে কয়েকজন লোক লেখাপড়া ভালবাসতেন সতীকান্তের উপর ভিতরে ভিতরে তাঁদের খুব শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁরা বলতেন, প্রিন্সিপ্যালের জীবনের ধারাই যখন বদলে গেছে ও'র জীবিকাটাও এবার বদলে নেওয়া উচিত।

তাই অনার্সের ছাত্রী মীরাকে ডেকে তাঁর উৎসাহ দেওয়ার কথা শুনে আমরা বিস্ময় আর কৌতুক বোধ করলাম।

তারপর মীরা একদিন প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে গিয়েও হাজির হল। কদিন ধরে তিনি কলেজে আসেননা! কেউ বলে তিনি অসুস্থ, কেউ বলে তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। এদিকে আর একজন ইংরেজীর প্রফেসারও ছুটিতে। অনার্স ক্লাসগুলি প্রায়ই বন্ধ যাচ্ছে। কোর্স শেষ হওয়ার কোন রকম লক্ষণ নেই, ক্লাসের আরো দুজন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মীরা গিয়ে হানা দিল প্রিন্সিপালের দরজায়। কিন্তু সেখানে লাঠি হাতে গোঁফওয়ালা দুজন দারোয়ান। দুদিন তারা হটিয়ে দিল মীরাদের। একদিন বলল বড়বাবু বাড়িতে নেই, আর একদিন বলল তাঁর বুখার হয়েছে। তৃতীয় দিনে সঙ্গীর কেউ যেতে চাইলনা। বলল, 'আমাদেরও মান সম্মান আছে। আমরা তো আর চাকরির উমেদার নই। বাংলা দেশে কলেজ আরো আছে। সেখানে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু মীরা একটু অন্য ধরনের মেয়ে তার জেদের ধরনটাও আলাদা। সে যখন সংকল্প করেছে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করবে, তখন যেমন করে হোক সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই। তাই সে তৃতীয় দিনে বিকেল বেলায় এসে উপস্থিত হল দারোয়ানদের অনুরোধ করে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখল 'শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমাদের অনার্স ক্লাশগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি —জনৈকা ছাত্রী।'

এরপর প্রিন্সিপ্যাল তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটি ঘর। সেখানে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল চুরুট টানছেন আর গম্ভীর ভাবে জরুরী একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছেন।

মীরা ঘরে ঢুকে ভীরু পায়ে [illegible] একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সতীকান্ত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে

একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে এই পেনসিলে লেখা চিরকুট পাঠিয়েছ তুমি?'

মীরা সবিনয়ে বলল—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের ক্লাশগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে।'

সতীকান্ত বললেন,—'সে সব দেখবার অন্য লোক আছে। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আছে, অন্য প্রফেসররা রয়েছে। তা নিয়ে তোমার কেন এত মাথাব্যথা, আমাকে এসব নিয়ে আর কোনদিন বিরক্ত করতে এসনা। সেই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম, যাও এবার।'

মীরা চলে আসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের ঘরের দরজার একটি পাট খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বই বোঝাই কয়েকটা কাঁচের আলমারি দেখা যাচ্ছে।

মীরা বললল 'আপনার লাইব্রেরিটা একটু দেখে যাব?'

সতীকান্ত এবার অবাক হলেন। এতখানি অপমান করবার পরও যে তার লাইব্রেরি দেখতে চায় সে কিরকমের মেয়ে। একটু নরম হয়ে বললেন,—'যাও দেখে এসো।'

মীরা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। ঘর ভরা আলমারি আর আলমারি ভরা বই, খোলা শেলফের মধ্যেও অনেক বই আছে। সাহিত্য ইতিহাস দর্শনে শেলফগুলি ঠাসা। কিন্তু কেউ কোন একখানা বইতে যে শিগগির হাত দিয়েছে তা মনে হয়না। দু' একখানা বই টেনে নিয়ে দেখল মীরা। ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মীরা আঁচল দিয়ে খানকয়েক বইয়ের ধুলো মুছতে লাগল। হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মীরা পিছন ফিরে দেখল, কখন সতীকান্ত এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। একটু দূরে থেকে তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টিতে আগের উগ্রভাব আর নেই। বরং কিসের একটা কোমলতা এসেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন,—'কি করছিলে।'

মীরা চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, —'কিছু না।'

তারপর দুখানা বই ঠিক জায়গায় রেখে দিল মীরা। তৃতীয়খানা রাখতে যেন তার মন সরেনা। সতীকান্ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন,—'বইটা তুমি নেবে? কি বই ওটা।'

মীরা তেমনি লজ্জিত স্বরে বলল—'আমাদের সিলেবাসের রোমিও-জুলিয়েট। মার্জিনে মার্জিনে চমৎকার সব নোট রয়েছে। অনেকদিন আগের পেনসিলের লেখা। তবু বেশ পড়া যায়।"

'কই দেখি।' সতীকান্ত এগিয়ে এসে মীরার হাত থেকে বইখানা তুলে নিয়ে দু-একটা পাতা উলটে পালটে দেখলেন। তারপর বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন,—'নাও।'

লজ্জিতভাবে বলল, 'কিছু না।'

হঠাৎ মীরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল,—'ওই বুঝি আপনার সার্টিফিকেট?'

তিনি বললেন—'হ্যাঁ।'

মীরার মনে হল তিনি একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

আলমারির মাথার উপরে উঁচুতে সতীকান্তের ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়ার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে তাঁর প্রথম যৌবনের একখানি ফটো। মীরার চোখে পড়ল দুখানাতেই মাকড়সার ঝুল পড়েছে। সতীকান্তও তা লক্ষ্য করলেন।

একটু বাদে মীরা বেরিয়ে আসছিল, সতীকান্ত বললেন,—'তোমার আরো যদি বইয়ের দরকার হয় পরে এসে নিয়ো। আর এর আগে যা বলেছি তার জন্য কিছু মনে কোরোনা। আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি।'

মীরা মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

সতীকান্ত বললেন,—'ভাল করে পড়াশুনো কর, রেজাল্ট খুব ভাল হওয়া চাই।'

মীরা বলল—'তার জন্যে আপনার সাহায্য দরকার।'

সতীকান্ত বললেন—'হুঁ।'

এই দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ আমি মীরার কাছ থেকে শুনেছি। ছুটি-ছাটায় শহরে এসে, সতীকান্তের পরিবর্তন কিছু কিছু চোখেও দেখলাম। অন্য কাজ কর্মের কিছু কিছু ভার তিনি কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে কলেজের উপর বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রায় নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, অন্য ক্লাসগুলিরও খোঁজখবর নেওয়ায় তাঁর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাঁর ভাষা আর ব্যবহার থেকে রূঢ়তা অনেকখানি কমেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, তিনি নিজেও ফের একটু একটু পড়াশুনো শুরু করেছেন। তাঁর ইজিচেয়ারটা আজকাল লাইব্রেরি ঘরেও মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক রাত অবধি সে ঘরে আলো জ্বলে। প্রিন্সিপ্যালের এই পরিবর্তনে সহকর্মীরা আর ছাত্রেরা সবাই খুশি হয়ে উঠল। এবার কলেজটার সত্যিই তবে উন্নতি হবে।

মীরার সংগে সতীকান্তের স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূর ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। মেয়ের বয়সী এই দরিদ্র মেয়েটির উপর প্রথমে স্বাভাবিক বাৎসল্যই বোধ করলেন হিরণপ্রভা। আরো যখন শুনলেন মেয়েটি ভাল ছাত্রী, ওকে দিয়ে তাঁর স্বামীর কলেজের সুনাম বৃদ্ধির আশা আছে, তখন মীরার উপর তাঁর আগ্রহ আরো বাড়ল। ইদানীং কলেজের দিক থেকে স্বামীর যশের ঘাটতি নজর এড়ায়নি হিরণপ্রভার। তিনি তাতে খুশি হননি। স্বামীর যশ সব দিক দিয়ে বেড়ে চলুক এই তাঁর কথা।

তিনি মীরাকে ডেকে বললেন,—'কি বল, একটা ফার্স্ট ক্লাস্ পাবে তো!'

মীরা লজ্জিত ভাবে সবিনয়ে বলল,—'পাবো একথা কি বলা যায়। আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

হিরণপ্রভা বললেন, 'চেষ্টা কর, খুব

ভাল করে চেষ্টা কর। ও'র মুখ রাখা চাই বুঝেছ?'

তারপর বললেন,—'তোমার নাকি বাড়িতে পড়াশুনোর অসুবিধা। আলাদা ঘরটর নেই, তা ছাড়া আরো কি সব গোলমাল টোলমালের কথা শুনেছি। ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেও পড়তে পার। এখানে তো ঘরের অভাব নেই। কত ঘর খালি পড়ে আছে।

মীরা বলল,—'সর্বাদন দরকার নেই। তবে আপনাদের লাইব্রেরিটা যদি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারি খুব ভাল হয়। কলেজের লাইব্রেরিতে ছেলেদের বড় ভিড়।'

হিরণপ্রভা মৃদু হেসে বললেন—'বেশ তুমি এখানেই এসে পড়ো।'

তাঁর অনুমতি পেয়ে মীরা মাঝে মাঝে আসতে লাগল প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে। সেই নিরালা লাইব্রেরি ঘরটি তার বড় ভাল লাগত। মনে হত এখানে যেন সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

সতীকান্তের মেয়ে শুভ্রা মাঝে মাঝে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসত। আলাপ করতে আসত পুত্রবধূ জয়ন্তী। কিন্তু হিরণপ্রভাই তাদের আগলে রাখতেন। তিনি বলতেন,—'না না, ওকে পড়তে দাও তোমরা ওর পড়াশুনোর ব্যাঘাত কোরোনা।'

শুভ্রা হেসে বলত,—'বাবা, কি কড়া পাহারা। মা, বাবার চেয়ে তুমি যদি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে আরো বেশী মানাত।'

মীরা ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেল, কলেজের বছর দশেকের ইতিহাসে তা কেউ পায়নি। অন্যান্য রেজাল্টও আগের চেয়ে কলেজের এবার বেশি ভাল হল।

মীরা কলকাতায় গিয়ে এম এ ক্লাসে ভর্তি হল। সাফল্যের আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারল না। বাসার অবস্থা খারাপ। মায়ের অসুখ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে, আর্থিক অবস্থাও ভাল হচ্ছে না। কয়েকটি অপোগণ্ড ভাইবোন। শুধু একটি মাত্র ভাই বড় হয়ে উঠেছে। সুধীর বি এ পড়ছে।

মীরা বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি না হয় না গেলাম। তোমাদের দেখা শোনা করবে কে।'

গণেশবাবু বললেন,—'সে যা হয় হবে। এত ভালো রেজাল্ট করে তুই পড়া ছেড়ে দিবি তাই কি হয়। তুই আমার বংশের রত্ন।'

মীরা পড়তে গেল কলকাতায়। বাবার কাছ থেকে তো কিছু নিত না। বরং সস্তা হস্টেলে থেকে কম খরচে চালাত। টুইশনের টাকা পাঠাত বাসায়।

নানা কাজে সতীকান্ত কলকাতায়

যেতেন। মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে আসতেন মীরাকে, আর কিনে দিতেন বই।

একদিন দেখা হয়ে গেল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। দেখি সতীকান্ত আর মীরা পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে। দুজনেই যেন ছাত্রছাত্রী। দুজনেরই হাতে বই। দুজনেরই মুখে গাম্ভীর্য, চোখে অধ্যয়নের স্পৃহা।

মীরা আমাকে দেখে উঠে এল, বলল 'ভাল আছ?'

বললাম, 'ভাল আর কই। এখনো বেকার। সেকেণ্ড ক্লাশ এম এর সহজে কি চাকরি হয়। তোমরা বুঝি মাঝে মাঝে আস এখানে?'

মীরা বলল,—'আমরা? ও প্রিন্সিপ্যালের কথা বলছ? হ্যাঁ, উনি কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে আসেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের উপর উনি একটা বই লিখছেন।'

বললাম—'ভালই তো।'

কর্মখালিতে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করতে করতে আমি আরামবাগ কলেজে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। মীরার রেজাল্ট এম এতে আশানুযায়ী হল না। হাই সেকেন্ড ক্লাশ পেল। কলকাতার কলেজে ওর চাকরি জুটেছিল। কিন্তু এই সময় ওর মা মারা গেলেন। ওকে যেতে হল আমাদের শহরে ফিরে। গণেশবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন,—'কাজ কি তোমার বাইরে থেকে। তুমি এই কলেজেই পড়াও। এখানে কলকাতার চেয়ে খরচ কম।' তাছাড়া তুমি তো এই কলেজেরই মেয়ে। এর উপর তোমার দরদ বেশি থাকবে।'

গণেশবাবুর তাই মত। তিনি মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চান না।

আরো বছর দুই কাটলো। এর মধ্যে গণেশবাবু মারা গেলেন, আর সুধীর বি, এ ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে কোর্টে পেশকারের চাকরি নিল। শোনা গেল সতীকান্ত বাবুর চেষ্টাতেই এই চাকরি হয়েছে।

সেবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আরো কিছু খবর শুনতে পেলাম। সতীকান্ত-বাবুর পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। প্রায় রোজই ঝগড়া ঝাঁটি হচ্ছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গেই তাঁর আর বনিবনাও হচ্ছে না।

মা'ই বললেন একথা।

জিজ্ঞেস করলাম—'কেন মা?'

মা বললেন, 'থাক বাপু, তোমার এসব নোংরা কথার মধ্যে থেকে কি দরকার।'

কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা'ই জানালেন এসবের মূলে আছে মীরা। ওর জন্যেই পরিবারে অশান্তি। কলেজে মীরাকে চাকরি দেওয়া হয় এতে গোড়া থেকেই হিরণপ্রভার অসম্মতি ছিল। স্বামীর সঙ্গে এই মেয়েটির অনুক্ষণ মেলামেশা তিনি আর পছন্দ করছেন না। সতীকান্ত বই লেখার নামে কি মীরাকে থিসিস লেখায় সাহায্য করার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় কলেজ লাইব্রেরিতে না হয় নিজের বাড়ির লাইব্রেরিতে কাটান। তাঁদের আলাপ আলোচনা যেন শেষ হতেই চায় না। সতী-কান্তের অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মেলা-মেশা নিয়ে নানা জায়গায় কথাও উঠেছে, তাও যেন তিনি গ্রাহ্যে আনতে চান না। আসলে লোকটি একগুঁয়ে, বেপরোয়া ধরনের। কিন্তু পুরুষের না হয় অমন একগুঁয়ে হলেও চলে। বিশেষ করে সতীকান্তের মত খ্যাতিমান শক্তিমান পুরুষের। কিন্তু মীরার আক্কেলখানা কিরকম। কুমারী মেয়ে, ও'র তো একটা লজ্জা সরম ভয় ভাবনা থাকা উচিত। এ ধরনের বদনাম রটা কি ভাল। আর মন ইচ্ছা করলে, একটু সাবধান হলেই, এড়িয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে কলেজে, যেখানে পুরুষে মেয়েতে এক সঙ্গে কাজ করে, ছেলেরা মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে, সেখানে একি কাণ্ড। মুখ তো কেউ কারো চেপে

রাখতে পারে না। তাই নানা জনে নানা কথা বলছে।

বললাম,—'মীরাকে ডেকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল না। ও একটু সাবধান হোক।'

মা বললেন—'ইশারা ইঙ্গিতে কি বলিনি? বেশী বলতে আমার লজ্জা করে বাপু। হাজার হলেও পেটের সন্তানের বয়সী।'

কিন্তু যাঁরা বলবার তাঁরা বিনা লজ্জা-সংকোচেই বললেন। মীরাকে একদিন খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন হিরণপ্রভা। তারপর প্রায় বিনা ভূমিকায় বললেন,—'তোমাকে এ কলেজের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল,—'কেন আমি কি দোষ করেছি।'

হিরণপ্রভা বললেন—'না তুমি দোষ করবে কেন, তুমি গুণের হাঁড়ি। এক মাসের মধ্যে তোমাকে কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল—'বেশ গভর্নিং বডি যদি বলেন—'

হিরণপ্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গভর্নিং বডি বলুক আর না বলুক, আমি বলছি, সেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ, সেই বডিকে দিয়েই আমি বলাব।'

মীরা বলল—'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

শুভেন্দু, শুভ্রা, জয়ন্তী পাশের ঘরেই ছিল। তারাও এবার হিরণপ্রভার সঙ্গে যোগ দিল—'এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। এক মাস নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে। অত বড় একজন মানী গুণী মানুষ। তুমি তাঁর নামে বদনাম রটাচ্ছ।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলল—'আমি বদনাম রটাচ্ছি!'

শুভেন্দু বলল,—তোমাকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর নামে বদনাম রটছে। এটা কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।'

মীরা বলল,—'সহ্য করতে তো আমি বলিনে।'

শুভ্রা বলল,—'বটে! তুমি ভেবেছ আমরা তোমার বলা না বলার অপেক্ষায় থাকব। দাদা যা বলল, আর একটি সপ্তাহ আমরা দেখব। তারপর—'

মীরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। অন্য কলেজে চাকরির জন্যে ও নিজেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু শুভেন্দুদের এই শাসানিতে মীরা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ওরও জেদ বেড়ে গেল। দেখা যাক কি করতে পারে ওরা।

এক সপ্তাহ নয়, সাত আট সপ্তাহই কাটল। এর মধ্যে গরমের ছুটিতে হিরণপ্রভা সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলেন সেই সঙ্গে। কিন্তু সতীকান্ত সপ্তাহ দুই কাটতে না কাটতেই চলে এলেন। সেখানে স্ত্রীর কড়া পাহারা তাঁর সহ্য হল না। হিরণপ্রভা বৈষয়িক অবৈষয়িক স্বামীর নামের সব চিঠিগুলি আগে নিজে খুলে দেখতেন। তাঁকে না দেখিয়ে সতীকান্ত কোন চিঠি ডাকে দিতে পারতেন না। তিনি প্রতিবাদ করলে ছেলেমেয়ে পুত্রবধূর সামনে মীরার কথা তুলে স্বামীকে তিনি অপমান করতেন। সপ্তাহ দুই বাদে সতীকান্ত তাই পালিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিনের গাড়িতে হিরণপ্রভা এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন,—'বিরহ আর সহ্য হচ্ছিল না, না? তোমার বিরহ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।'

নিজের লাইব্রেরি-ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন সতীকান্ত। বাইরে থেকে তালাচাবি পড়ল। হিরণপ্রভা জানলা দিয়ে মুখ

বাড়িয়ে বললেন,—'ওই ঘরে তার গায়ের গন্ধ আছে। বসে বসে শুকতে থাক।'

সতীকান্ত চেঁচিয়ে বললেন,—'আমার কলেজ খুলে গেছে যে, আমাকে কলেজে যেতে হবে না?'

হিরণপ্রভা বললেন,—'তাকে আগে কলেজ ছাড়াই, তারপর তোমাকে সেখানে পাঠাব।'

সতীকান্ত ভেবে পেলেন না তাঁর হাতের মুঠি এমন আলগা হয়ে গেল কি করে। কি করে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এমন ভাবে হস্তান্তরিত হল। ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর, বেয়ারা-দারোয়ান কেউ তাঁর পক্ষে নয়। সব হিরণপ্রভার। আর তাঁর চরিত্র সংশোধনের ভার সকলের হাতে।

গভর্নিং বডিকে হাত করলেন হিরণপ্রভা। তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিলে কলেজের দুর্নাম বেড়ে যাবে। প্রথমে মীরাকে পদত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করা হল। কিন্তু সে যে কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রাখবে তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করলেন। আর এখবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতীকান্তও রেজিগনেশন লেটার পাঠালেন। বললেন, শাস্তি একা কেন ভোগ করবে মীরা। তা তাঁরও প্রাপ্য। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করলেন না। কিন্তু সতীকান্ত এরপর থেকে আর কলেজে গেলেন না।

তাঁর এই ব্যবহারে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সতীকান্তকে কলেজে পাঠাবার জন্যে নানারকম চাপ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত বদলালেন না।

হাটে বাজারে শহরের প্রতিটি চায়ের দোকানে, বার-লাইব্রেরিতে এই একটি মাত্র আলোচনা ক'দিন ধরে চলতে লাগল, দুষ্টু ছেলেরা ছড়া কাটল, দেয়ালে দেয়ালে প্লাকার্ড পড়ল।

তারপর একদিন ভোরে উঠে শুনলাম, মীরাও নেই, সতীকান্তও নেই। দুইজনেই শহর ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথমে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু হিরণপ্রভা ছেলে আর জামাইকে সঙ্গে করে সেখানেও গেলেন। ফলে কলকাতা থেকেও পালালেন সতীকান্ত।

এরপর বছরখানেক বাদে মার সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলাপ হয়েছিল।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। শুনলাম কলেজে নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছেন ডক্টর চৌধুরী। সতীকান্তবাবুদের সেই হৈ চৈ এরই মধ্যে শান্ত হয়ে গেছে। মীরার ভাই সুধীর বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

কথায় কথায় মা বললেন,—'মেয়েটা খারাপ ঠিকই। কিন্তু যত খারাপ সবাই বলত তত খারাপ নয়।'

বললাম,—'কি রকম।'

মা বললেন,—'লোকে তো বলত মেয়েটা টাকার লোভেই—সতীকান্তবাবুর ধন সম্পত্তির লোভেই অমন একজন বুড়োকে—'

হেসে বললাম—'তা যে নয় তা কি করে জানা গেল।'

মা বললেন—'সতীকান্তবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হিরণপ্রভা আর শুভেন্দুর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। কিছু টাকা কলেজেও দিয়েছেন শুনলাম।'

আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম—'মা আমার উপনিষদের সেই কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান মনে পড়ছে। কাত্যায়নী রইলেন ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন সম্পদ নিয়ে। আর মৈত্রেয়ী বললেন যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।'

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রীর গল্পটা মার জানা ছিল। তিনি বললেন,—'কাত্যায়নী কে? হিরণপ্রভা?'

বললাম,—'তা ছাড়া আবার কে?'

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন—'না বাপু, তা না। মানুষকে অমন সরাসরিভাবে ভাগ কোরো না। প্রত্যেকের মধ্যেই একজন করে কাত্যায়নী আছে, আর একজন করে মৈত্রেয়ী।

'সেদিন হিরণদির অসুখের খবর শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। কিসের অসুখ? ডাক্তার বৈদ্য কি সে অসুখ ধরতে পারে? পারি আমরা। মেয়ে মানুষের সে অসুখ আমরা মেয়েমানুষেই বুঝি। হিরণদির সেই শরীর নেই, সেই রূপ নেই, যেন শুকিয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তাঁর সে কি কান্না। সবই আছে। কিন্তু একের বিহনে সব অন্ধকার।'

বলতে বলতে মায়ের চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল। হিরণপ্রভার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

একটু থেমে বললেন,—'আর ছেলেমেয়ে ছুটির দিকেই কি তাকান যায়। তারা উপরে খুব শক্ত ভাবই দেখাক, ভিতরটা তাদের পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে না? তাদের দুঃখে তাদের লজ্জাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। অত বড় মানী-গুণী বাপ। তিনি আজ থাকতেও নেই। তাদের সামনে বাপের কথা কেউ তুললে এমন ভাব হয় তাদের—।'

তারপর প্রায় বছর দশেক মীরার সঙ্গে আমাদের কারোরই কোন যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি ওরা ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, নানা কলেজে চাকরি করেছে। মাঝে মাঝে দু' একবার কলকাতায়ও যে বেড়াতে না এসেছে তা নয়। কিন্তু পরিচিত কারো সঙ্গেই দেখা করেনি।

কিন্তু এবার গরমের ছুটির মধ্যে হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছি সেগুলি ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে। ওরা এখন নাগপুরে স্থায়ীভাবে আছে। যদি কোন দিন আমি ওদিকে বেড়াতে যাই যেন দেখা-সাক্ষাৎ করি। তাহলে ওরা দুজনেই খুব খুশি হবে।

ছুটিতে কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবছিলাম। মীরার চিঠি পেয়ে ঠিক করলাম নাগপুরেই যাব; যদিও গরমটা ওখানে বেশি তা হোক।

প্রথমে এক মারাঠা বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। সেখান থেকে দেখা করতে গেলাম মীরার সঙ্গে।

শহরতলির অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা জন-বিরল অঞ্চল ওরা বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছে। বাংলো প্যাটার্নের পাটকিলে রঙের ছোট্ট একটু বাড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। সেখান থেকে পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে। বারান্দার নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মীরা ফুলের চাষ করেছে।

আমাকে দেখে মীরা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বলল,—'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসবে আশাই করিনি। বহুকাল চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয় না।'

সতীকান্তবাবুর বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলাম না। তিনি আগের মতই গম্ভীর আর রাশভারী রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন,—'ভালো আছ?'

আমি প্রণাম করে বললাম,—'হ্যাঁ, ভালোই আছি। আপনি?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—'ভালো।'

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো দেখলাম না। মীরার কাছে শুনলাম ব্লাড প্রেশারে খুব ভুগছেন। আর দেখলাম সতীকান্তবাবু অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন। সব চুল পাকা। দাঁতও বেশির ভাগই পড়ে গেছে। শরীরের সেই বাঁধুনি আর নেই। কি জানি রোগই হয়ত তাঁকে এমন অশক্ত করে তুলেছে।

সেই তুলনায় মীরার বয়স বেশি বেড়েছে বলে মনে হয় না। সে যেন তিরিশের নীচেই রয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই মীরা খুব কর্মঠ। তার সেই তৎপরতা যেন আরো বেড়েছে। সকালে কলেজে পড়ায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তার বেশির ভাগ সময় সতীকান্তবাবুর সেবা-শুশ্রূষায় কাটে। তিনিও ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন ছুটি নিয়েছেন।

মীরা আমাকে কিছুতেই মারাঠী বন্ধুর ওখানে ফিরে যেতে দিল না, বলল,—'তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ, আমাদের এখানেই থাকবে।'

বললাম,—'কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'মীরা হেসে বলল,—'অসুবিধে কিসের?'

দিন পনের ছিলাম ওদের সঙ্গে। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য। দুখানা তক্তপোষ। খান দুই-তিন সস্তা ইজিচেয়ার। দুখানা লিখবার ছোট টেবিল। সামনে দুখানা হাতলহীন চেয়ার। আর লম্বা লম্বা বইয়ের র‍্যাক। সতীকান্ত তার সেই আগের

লাইব্রেরির একখানা বইও নিয়ে আসতে পারেননি, কি আনেননি। কিন্তু এখানে ছোটখাট আর একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে।

খাওয়া দাওয়াও খুব অনাড়ম্বর। ডাল ভাত আর একটা তরকারি, সতীকান্তের জন্যে আধসেরখানেক দুধ। আমার জন্যে মীরা বিশেষ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল; আমি বাধা দিলাম।

একদিন বললাম,—'মীরা, এত কণ্ট করে আছ কেন। তোমার রোজগার তো খুব খারাপ নয়।'

মীরা বলল,—'পরের সম্পত্তি সবাই বড় দেখে।'

একটু বাদে ফের বলল,—'বেশি কিছু থাকে না পরিমল। ছোট ভাইবোনদের কিছু কিছু করে পাঠাতে হয়, ওরা তো এখনো সবাই যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সুধীর একা পেরে ওঠে না।'

বললাম,—'তুমি গরীবের মেয়ে। ছেলে-বেলা থেকেই তোমার না হয় এ সবে অভ্যেস আছে। কিন্তু ওর কণ্ট হয় না?'

মীরা বলল,—'না। ও'র ইচ্ছেমত এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু এত কৃচ্ছ্র কি ভাল মনে কর, সবাই যদি তোমার মত হয় জাতির ঐহিক সম্পদ বাড়বে কি ক'রে?'

মীরা হেসে বলল,—'সবাই আমার মত হবে কেন? আমিই শুধু আমার মত। তোমাকে বললাম তো এর চেয়ে বেশি ভাল অবস্থায় থাকবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যতই বল মানুষের মনের উপর বস্তুর প্রাধান্যতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। সম্পদ সৃষ্টির নামে মানুষ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর, বস্তুসর্বস্ব হবে—আর তাই যে সবচেয়ে ভাল, একথা কি ক'রে মানি। তোমার ইদানীংকার প্রবন্ধগুলিতেও এই তর্ক তুলেছ। তাই তোমাকে ডাকলাম।'

একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরলাম। অনেকখানি পাহাড়ী পথ পার হওয়ার পর ছোট একটি ঝরণা মিলল।

বললাম,—'এসো এখানে একটু বসা যাক।'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। ভারি নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা। আমাদের চারদিকে পাহাড়ের বলয়, যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

বললাম,—'মীরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মীরা আমার দিকে স্মিতমুখে তাকাল,—'করনা।'

বললাম,—'তুমি এমন কাজ করতে পারলে কি করে?'

মীরা হাসল,—'তোমার এতদিন বাদে এ কথা?'

'—এতদিন বাদে না, আমার অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে। তুমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলে না?'

মীরা হেসে বলল,—'মানুষ অবশ্য হাতের কাছে আরো দু' একজন ছিল।'

বললাম,—'ঠাট্টা রাখ। অমন একজন বুড়ো, তোমার সঙ্গে বয়সের যাঁর অত তফাত, যাঁর স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাতনী সব ছিল—। আমার একেক সময় মনে হয় বাইরের লোকের উৎপাতে তুমি বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছ।'

মীরা স্মিতমুখে বলল,—'তাই যদি হ'ত, তাহলে একাই পালাতাম, ওর সঙ্গে আসতাম না।'

বললাম,—'তুমি তাহলে ভালোবেসেই এসেছ?'

মীরা কোন জবাব দিল না।

বললাম,—'কিন্তু একি এক ধরনের বিকৃতি নয়, ব্যভিচার নয়, অন্যায় নয়?'

মীরা এই তিরস্কারের এবারও কোন জবাব দিল না। তেমনি হেসে চুপ করে রইল।

মায়ের কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। বললাম,—'তুমি একজন পারিবারিক মানুষকে তাঁর পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনেছ। তুমি একটি পরিবারকে অনাথ করেছ।'

মীরা এবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। অনুত্তেজ শান্ত সুরে বলল,—'ওকথা বলো না। তাঁর পারিবারিক বাঁধন ভিতরে ভিতরে অনেক দিন আগে থেকেই খুলে গিয়েছিল। চলে আসবার দিন শেষ রাত্রে তিনি যেভাবে আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তুমি যদি তাঁর সে মূর্তি দেখতে তাহলে আজ অন্য কথা বলতে। আমি তাঁর ডাকে চমকে উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হল যেন ভূত। তারপরে দেখলাম ভূত নয় জেল থেকে পালিয়ে আসা কয়েদী। তেমনি বেশ বাস, তেমনি মুখ চোখ। তিনি বললেন,—মীরা, আমাকে মুক্তি দাও। আমি বুঝতে পারলাম এ-শুধু পরিবারের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নয়, কামনার পীড়ন থেকেও মুক্তি। এ'কে মুক্তি দিতে হলে আগে বাঁধতে হবে।'

মীরা একটু থামল।

আমি বললাম,—'তারপর?'

মীরা বলল,—'তার আগের কথা একটু শুনে নাও। তার আগে এই কয়েক বছর ধরে কতবার তিনি আমার কাছে গেছেন, কত ছলে আমাকে কাছে ডেকেছেন; আর কত চেষ্টায় আসল বলবার কথাটাকে ঢেকে রেখেছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে না বলে পারা যায়। নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আমি তো না দেখেছি, এমন নয়। তবু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলতেই হল। প্রথমে একটা তীব্র ঘৃণা হল আমার, তারপর এক গভীর মায়ায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল। ভাবলাম এই আর্তকে আমার আশ্রয় দিতে হবে। যে

বটগাছ ভেঙে পড়ল, তাকে আমার তুলে ধরা চাই। আজ আমার দক্ষিণা দেওয়ার দিন এসেছে।'

আমি বললাম,—'শুধু দক্ষিণা, শুধু দাক্ষিণ্য?'

আমার কথা বোধ হয় মীরার কানে গেল না। কি ইচ্ছে করেই সে কানে তুলল না। মীরা আগের কথার জের টেনেই বলে চলল, —'তুমি বলছিলে পরিমল, আমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলাম না? পাওয়ার অবসর পেলাম কই। প্রথম থেকেই এক প্রবল প্রচণ্ড ভালোবাসাকে ঠেকাতে ঠেকাতে—'

আমি বাধা দিয়ে হেসে বললাম,—'এই বুঝি তোমার ঠেকাবার নমুনা?'

মীরা আমার দিকে তাকাল,—'তুমি কি ভেবেছ শুধু দুহাত দিয়েই ঠেকান যায়, আর কিছু দিয়ে ঠেকান যায় না?'

বললাম,—'তাহলে তুমি তাকে ঠকিয়েছ বলো।'

মীরা একটু হাসল,—'এবার বুঝি উতোর গাইতে শুরু করলে? ছিঃ, ঠকাব কেন। আমার যা সাধ্য আমি দিয়েছি, তিনিও তা প্রসন্ন মনে নিয়েছেন। তাছাড়া একসঙ্গে থাকতে থাকতে কত অদলবদল হয়, কত নতুন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে—'

এরপর সতীকান্তবাবুর কথা উঠল। বললাম,—'ও'র রোগটা কি? তোমার এত সেবাযত্নেও উনি সারছেন না কেন? তাছাড়া বড় তাড়াতাড়ি যেন বুড়িয়ে পড়েছেন। তরুণী ভার্যা তো মানুষকে আরো তরুণ করে তোলে।'

মীরা লজ্জা পেয়ে বলল,—'তুমি বড় দুষ্টু। হয়ত ততখানি তারুণ্য আমার মধ্যে নেই, যাতে জরাকে জয় করা যায়।'

একটু বাদে মীরা ফের কথা বলল। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া, মুখের কথায় বিষণ্ণতার স্বর।

মীরা বলল,—'তুমি ঠিকই ধরেছ। ও'র অসুখ শুধু দেহের নয়। উনি আজকাল বড় বেশী ভাবেন।'

'কি ভাবেন? যাদের ছেড়ে এসেছেন তাদের কথা কি ও'র মনে হয়?'

মীরা বলল,—'মনে হয় বই কি। সরাসরি চিঠিপত্র লিখতে পারেন না তাঁরাও কেউ লেখেন না। তবু অন্যভাবে তাঁদের খোঁজ-খবর আনান। তার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকেন। দেখ, বাইরে থেকে এক কথায়, একদিনে সব ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু ভিতর থেকে ছাড়তে হয় প্রতিদিনের চেষ্টায়।'

—'তোমার হিংসে হয় না?'

মীরা একটু হেসে বলল,—'হয় বই কি। তবে হিংসেয় একেবারে ফেটে মরিনে। কারণ তিনি শুধু তাঁদের জন্যেই ভাবেন না, আমার জন্যেও ভাবেন।'

—'তোমার জন্যে আবার কি ভাবনা?'

মীরা বলল, 'ভাবনা নেই? ভাবেন, আমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলেন! শুধু বিদ্যার সাধনায় কি মানুষের সব সাধ মেটে? মেয়েদের সব সাধ মেটে?

মীরা চোখ নামাল।

একটু বাদে আমি বললাম,—'তুমি কি তাহলে সুখী হওনি?'

মীরা এবার ফের মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হেসে বলল, 'আশ্চর্য, এতক্ষণ আলাপের পর তোমার কি এই মনে হচ্ছে, আমি সুখী হইনি, আমি দুঃখে আছি?' কথা শেষ ক'রে মীরা আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল।

আর তার সেই হাসি দেখতে দেখতে আমার নতুন করে মনে হল, সুখের আর এক অর্থ দুঃখ বহনের শক্তি।"

নির্বাচন

শ্রীনবগোপাল দাস

কাহিনীটা আপনারা অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু আপনাদের মিনতি করে বলছি, পাত্র, পাত্রী এবং স্থানগুলি বাদ দিলে আমার এই গল্পের মধ্যে মিথ্যা-ভাষণের এতটুকু ছায়াও আপনারা দেখতে পাবেন না।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই সেদিন কোন এক উপনির্বাচন-কেন্দ্রে, কংগ্রেসী দল এবং প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলের মধ্যে যুদ্ধের প্রায় শেষ অধ্যায়ে।

আমার মামা ছিলেন—তাঁর নামটা না হয় আপনাদের নাই বললাম—এই কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং অফিসার। সরকার বাহাদুর নির্বাচন পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় প্রথমে পেয়েছিলেন গত সাধারণ নির্বাচনের সময় এবং সেই অবধি প্রায় প্রত্যেক উপনির্বাচনেই তাঁর ডাক পড়ত। আমরা বলতাম, মামা, তোমার ত জর্জক্রস বা পরমবীরচক্র কিছুই মিললনা, তুমি অনুমতি দিলে আমরা—অর্থাৎ ভোটারেরা—সরকারের কাছে সম্মিলিত দাবি উপস্থাপিত করি যে তোমার মত প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য নতুন এক চক্র সৃষ্টি করা হোক। যে সরকার শ্রমিকদের সম্মিলিত দাবি এবং মালিকদের সংযুক্ত ভয় প্রদর্শন উপেক্ষা করতে পারেন না, সেই সরকার নিশ্চয়ই তাঁদের আসল প্রভু, সিংহাসনের পশ্চাতে ক্ষমতাধারীদের এই সামান্য অনুরোধটুকু ফেলে দিতে পারবেন না।

মামা কিন্তু ছিলেন সেই সেকেলে ধরনের রাজ-কর্মচারী। জীবনের তৃতীয় চতুর্থাংশ (অঙ্ক ক'ষে দেখলে ষষ্ঠ-সপ্তাংশ বললেই বোধহয় ঠিক হত) কাটিয়েছিলেন ইংরেজ আমলের দাসত্ব করে। তাই বোধ হয় "কাজের জন্যই কাজ করব" এই ছিল তাঁর জীবনের মূল নীতি। আমাদের নির্দেশ-উপদেশ কিছুই তাঁর মনঃপূত হয় নি। তিনি শুধু বলেছিলেন,—কোনও এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যদি কোন পুরস্কারের আশা না রেখে আমার মাতৃভূমির সম্মান রাখবার জন্য সুদূরে সুদানে হাবসী, মিশরীয় আর সুদানীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে যেতে পারেন, তবে আমি নগণ্য ...বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জন্মরাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এই কাজটুকু করতে পারব না?

মামার এই সাধু, প্রায় অপার্থিব এবং নিষ্কাম মনোভাব দেখে আমরা আর বেশীদূরে এগোতে সাহস পাইনি।

কাহিনী বলতে শুরু করেছিলাম, অবান্তর কতকগুলো কথার অনুবৃত্তি করে যদি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ক'রে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা ক'রে নেবেন। ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে, আরম্ভেরও আগে একটা উপক্রমণিকা রচনা করা আমাদের প্রাচীন নাট্যকারদের পদ্ধতি ছিল, আমার বাচালতার স্বপক্ষে শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

যেদিন এই কাহিনীর শুরু সেদিন একটা উপনির্বাচনের দিন। দুপুর কেটে গেছে। লোকজনের ভিড়ও একটু কমেছে, কিন্তু চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। বাইরে দুই পক্ষের লোক কাগজ পেন্সিল নিয়ে নানা জাতীয় অঙ্ক কষছেন এবং উভয়পক্ষই নবাগত ভোটারদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁদের "সেবক" প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী, বিপক্ষ দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া চরম মূর্খতার পরিচায়ক হ'বে। আমার বিবেকসম্পন্ন মাতুলমশায় একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন এবং ভাবছিলেন কি উপায়ে এই জাতীয় প্রোপাগ্যান্ডা বন্ধ করা যেতে পারে। তা'ছাড়া সারা দিনের একঘেয়ে ক্লান্তিও তাঁকে ধীরে ধীরে অভিভূত ক'রে তুলেছিল।

এমন সময় নির্বাচন-কেন্দ্রের দরজা খুলে প্রবেশ করল সুশ্রী সুবেশা একটি তরুণী। এই কেন্দ্রে মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনধিক বলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মেয়েদের ভোট দেবার পৃথক কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। বোধ হয় সাম্য এবং প্রগতির যুগে পৃথক ব্যবস্থার মত প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন নীতি বর্জন করার প্রথম এক্সপেরিমেণ্টটা কর্তৃপক্ষ এই নির্বাচন-কেন্দ্রেই চালু করতে চেয়েছিলেন।

আমার অভিজ্ঞ মামার হাত দিয়ে ইতিপূর্বে অনেক মেয়ে ভোটারই পার হয়ে গেছেন, একবার এক মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারের শেষমুহূর্তের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে মেয়েদের একটি

নির্বাচন-কেন্দ্রে তিনি সভাপতিত্বও করেছিলেন, কাজেই অপ্রতিভতার দুর্বলতা কোনদিনই তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। কিন্তু আজ এই আগন্তুকাকে দেখে তিনি নিজেরই অজ্ঞাতে বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

শুধু তিনি নন, কামরার মধ্যে যে কয়জন কর্মচারী এবং বিভিন্ন দলীয় এজেণ্ট ছিলেন তাঁরাও। মেয়েটিকে সুন্দরী হয়ত বলা চলে না। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী এবং কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা সহজ সপ্রতিভতা ছিল যে তার কমনীয় মুখখানা সুনির্বাচিত বেশভূষার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাকে তাকিয়ে দেখবার উপযুক্ত ক'রে তুলেছিল।

মেয়েটি তার পরিচয় দিল—শ্রীমতী সুনন্দা নন্দী, স্বামীর নাম শ্রীপরেশ নন্দী, —নং সন্তোষ দত্ত লেনে বাড়ি, বয়স একুশ, অন্তত ভোটার-তালিকা সেই কথাই বলে।

মামা শ্রীমতী নন্দীর হাতে একখানা ভোট-পত্র দিলেন এবং ইচ্ছা করেই যেন একটু সময় নিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কিভাবে ভোট দিতে হবে।

শ্রীমতী নন্দী ভোটপত্রখানা হাতে নিয়ে যে কামরায় ব্যালট্-বাক্স আছে, সেখানে ঢুকবে এমন সময় উপস্থিত এজেণ্টদের মধ্যে একজন যেন স্বপ্নোত্থিতের মত বলে উঠল, কি নাম বললেন?

মধুর কটাক্ষ করে শ্রীমতী উত্তর দিলে, সুনন্দা নন্দী।

—আর স্বামীর নাম ও ঠিকানা কি যেন বললেন?

সুনন্দা নন্দী পুনরায় স্বামীর নাম ও ঠিকানা বললে।

ভদ্রলোক আমার মামার সম্মুখে এসে উত্তেজিতভাবে বললে,—জুয়াচুরি, মশায়, জুয়াচুরি!......জুয়াচুরি বললে কম বলা হবে—দিনে দুপুরে ডাকাতি!

—কেন?......বিস্মিতভাবে মামা প্রশ্ন করলেন।

—কেন?......ঐ যে ঠিকানা উনি দিয়েছেন ও ত আমারই বাড়ি।

সুনন্দা দেবী এতটুকুও হঠল না। বললে, ঐ ঠিকানায় আপনি ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না বুঝি? ওখানে কটা ফ্ল্যাট আছে আপনি জানেন?

—জানি বই কি! আরও জানি যে, ঐ ঠিকানায় পরেশ নন্দী একজনই আছে এবং এই হতভাগ্যেরই নাম পরেশ নন্দী।

মামা ত অবাক! তাঁর সুদীর্ঘ নির্বাচন-অভিজ্ঞতার মধ্যে এই জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি কখনও হন নি!

একটু আমতা আমতা করে বললেন,—আপনার স্ত্রী ভোট দিতে এসেছেন, তাতে আপনি রাগ করছেন কেন?

—স্ত্রী? ইনি আমার স্ত্রী হতে যাবেন কেন? এ'কে আমি আদৌ চিনিনে!

এ আবার কি ব্যাপার? কুড়ি বৎসর ইংরেজ-প্রভুদের দাসত্ব করেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আমার মামার এই জাতীয় রসিকতা বরদাস্ত হয় না। একটু তিক্তভাবেই বললেন, আপনাদের ঘরোয়া ঝগড়া ইলেকশন বুথএ না আনলেই ভাল হয়, পরেশবাবু!

সুনন্দা এতক্ষণ নীরব ছিল। মামার তিরস্কারে ভরসা পেয়ে এবার বলল, আপনি ও'র কথায় কান দেবেন না, মেয়েদের ভোট দেওয়াটা উনি পছন্দ করেন না।

পরেশ নন্দী এবার আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল। সুনন্দাকে উদ্দেশ করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল,—দেখুন, আপনাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে, আপনি কার প্ররোচনায় এই প্রতারণা করতে এসেছেন? জানেন, আপনাকে আমরা এখখুনি পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি?

অপমানে সুনন্দার মুখ আরক্ত হয়ে এল। তার চোখের কোণে দু'এক ফোটা অশ্রুও বোধ হয় চক্ চক্ করে উঠল। সে মামার

দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল,—আপনার কাছে এর বিচার প্রার্থনা করি।

মামা শশব্যস্ত হয়ে বললেন,—নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ কি অন্যায় ব্যাপার বলুন ত! আচ্ছা, আপনাকে আর কেউ এখানে সনাক্ত করতে পারবে কি?

ব্রীড়াবনত মুখে সুনন্দা জবাব দিল,—সে ত জানিনে, সাধারণত বাড়ি থেকে বেরুবার উপায় ত আমার নেই, এখানে কে আর আমাকে চিনবেন, একমাত্র উনি ছাড়া!

মরিয়া হয়ে পরেশ নন্দী চিৎকার করে উঠল।—ওই সুন্দর মুখের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না, স্যার। ও আমার স্ত্রী নয়, আমার স্ত্রী বছরখানেক আগে মারা গেছেন।

এ আবার কি এক নতুন অধ্যায়ের অবতারণা! মামা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, তাহলে তাঁর নাম ভোটারের তালিকায় এল কি করে?

—কেন আসবে না, স্যার? তালিকা তৈরি হয়েছে দু'বছর আগে। তারপর কি আর আপনারা তালিকা চেক করে দেখেছেন? আপনাদের সরকারের যেমন বুদ্ধি, তেমনি কর্মপদ্ধতি!

মামার আর যে কোন দুর্বলতাই থাকুক না কেন, সরকারের নিন্দা শুনতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত নন। বললেন,—ওসব বাজে কথা বলবেন না, পরেশবাবু। দুমাস আগে সব জায়গায় নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি তালিকায় কোন ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে যে কেউ সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন, ভুল শোধরাবার অনুরোধ জানিয়ে। আপনি কোন দরখাস্ত করেছিলেন?

আমতা আমতা করে পরেশ বলল,—আজ্ঞে না স্যার।

—কেন? বেশ একটু রূঢ়ভাবেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন।

পরেশ কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। তার হয়ে অন্য দলের একজন এজেণ্ট বলল,—আপনি ত জানেনেই, স্যার, এরকম কত নোটিশই টাঙান হয়ে থাকে, সেদিকে কেউ কি কখনও নজর দেয় আমাদের দেশে? তাছাড়া, সবাই জানে, দরখাস্ত দিলেও কোন লাভ হয় না, শুধু একটা নতুন নথিতে ফাইল করা হয় মাত্র!

এর উত্তরে মামা তিক্তকণ্ঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সুনন্দা বলে উঠল, নির্বাচন-প্রার্থীদের এজেণ্টদের অপরাধ নেবেন না, তাঁদের আইন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—বিশেষ করে তাঁদের স্ত্রীদের সম্পর্কে!

অপমানে পরেশের মুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মামা হঠাৎ হো হো করে হেসে পরিস্থিতিটাকে অপেক্ষাকৃত লঘু এবং সরল করে দিলেন।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন ত?...... মামা প্রশ্ন করলেন।

ব্রীড়াবনত মুখে সুনন্দা বলল,—আপনাকে আগেই বলেছি, মেয়েদের ভোট দেওয়াটা উনি পছন্দ করেন না। তা ছাড়া উনি যে প্রার্থীর এজেণ্ট আমি তাঁকে সমর্থন করিনে, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। ওঁর ব্যবহার দেখে আমারও একটু জেদ চেপে গিয়েছিল, তাই আমি স্থির করেছিলাম যেমন করে হোক ভোট আমি দেবই। উনি যে আবার এখানেই উপস্থিত থাকবেন ভাবিনি, জানলে আমি হয়ত আসতাম না।

চিৎকার করে পরেশ নন্দী বলল,—সমস্ত মিথ্যে কথা, স্যার, আগাগোড়া বানানো......

খুব গম্ভীরভাবে মামা বললেন,—আপনি আর চেঁচামেচি করবেন না, পরেশবাবু। ভোট দেবার অধিকার হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার, তাতে বাধা দেবার স্পর্ধা যারা প্রকাশ করে, তাদের, জেল হয়ে যেতে পারে, জানেন?......সুনন্দা দেবী, আপনার পরিচয়ের সমর্থন হিসেবে কোন প্রকার প্রমাণ, খুব ছোটখাট প্রমাণও কি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন না?

এবার সুনন্দা হেসে উঠল, হাসি নয়, উচ্ছল কৌতুকের ঢেউ, যেন মেঘ অপসারণের পর রৌদ্র।

বলল, প্রমাণ আমি অনেকই দিতে পারি,

কিন্তু আমাকে ও'রই ঘরে যখন ফিরে যেতে হবে তখন ভোট আমি আর দিতে চাইনে। আজ একটা শিক্ষা হল।

বলে সে মামাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করে সোজা বার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরেশ নন্দীও তার পশ্চাদ্ধাবন করল।

মামা শুধু বললেন,—মেয়েটার কপালে আজ অনেক লাঞ্ছনা আছে!

এর একমাস পরের কথা। আমাদের সতীশ পাকড়াশীর তাসের আড্ডায় হঠাৎ মামার সঙ্গে দেখা। মামা কি যেন একটা গল্প বলছিলেন, আর সবাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মামা বললেন,—ওহে নবীন, সেই যে সুনন্দা নন্দী ভোট দিতে এসেছিল তোমার মনে আছে?

মনে আর নেই? আমিই ঐ কেন্দ্রে মামার একজন সহকারী ছিলাম!

মামা বললেন, সে এক বিরাট কাহিনী। আমি ত ছাই রসিয়ে বলতে পারিনে, তবে ব্যাপারটা মোটামুটি খুলে বলছি—

মামার মুখে শোনা গল্পটাকেই একটু ঘষে-মেজে বলছি।

নির্বাচন কেন্দ্র হতে বার হয়ে পরেশ নন্দী দেখল সুনন্দা দূরে অপেক্ষমান একটা গাড়ির দিকে দ্রুত-পদক্ষেপে ছুটছে। পরেশ নন্দী দৌড়তে দৌড়তে সুনন্দাকে ধরে ফেলল।

সুনন্দা ফিরে তাকাল। যতক্ষণ সে নির্বাচন-কেন্দ্রের কামরায় মামার সম্মুখে ছিল, সহজ অকুণ্ঠায় পরেশের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছে, কিন্তু রাস্তায় এখন সে নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করল। ভয়ের একটা ছায়া তার মুখে দেখা দিল।

পরেশ বলল,—দেখুন, এর একটা জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।

কাতরভাবে সুনন্দা বলল,—কেন আর আপনি আমাকে তিরস্কার করছেন? শেষ পর্যন্ত ভোট ত দেওয়া হল না!

—ভোট দিলে ত হাতে লোহার বালা পরতে হত সুনন্দা দেবী! অবশ্য ব্যাপারটা যতখানি গড়িয়েছে তাতে এখুনই আপনাকে পুলিশের হেফাজতে দেওয়া যায়!

সুনন্দা ভীতভাবে এদিকে ওদিকে তাকাল। পরেশ লক্ষ্য করল, অপেক্ষমান গাড়িতে দুজন লোক বসে আছে, সুনন্দার দৃষ্টি তাদের দিকে।

—আপনি বুঝি ঐ গাড়িতে এসেছিলেন? পরেশ প্রশ্ন করল।

কোন প্রকারে সুনন্দা জবাব দিল, হ্যাঁ।

—ওদের সঙ্গে ফিরে যেতে চান?

—না।

—তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আদেশের সুরে পরেশ বলল।

—আপনি আমকে পুলিশে দেবেন না ত? ...কাতর অনুনয়ে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল।

এবার পরেশ হাসল। বলল,—যে সব মেয়েরা ভয় পায় পুরুষেরা তাদের পুলিশে দেয় না। আসুন, ওদিক থেকে একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।

বলে দ্বিধাপ্রকাশের কোন প্রকার অবকাশ না দিয়ে সুনন্দাকে একপ্রকার টেনে নিয়ে পরেশ অপর ফুটপাথ হতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

কমল রেস্তরাঁয় বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পরেশ সুনন্দার কাহিনী শুনল।

—আমার আসল নামও সুনন্দা, তবে বিয়ে হয়নি। আমাদের উপাধি হচ্ছে বসু। বাড়িতে বুড়ো বাবা, ছোট বোন কলেজে, দুটি ভাই স্কুলে। মা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। আমি সবচেয়ে বড়, কাজেই সমস্ত বোঝা আমারই ঘাড়ে। আমি একটা অফিসে চাকুরি করি, কিন্তু যা পাই তাতে সংসারের খরচ কুলোয় না! তাই সুরজিৎ-বাবুদের পক্ষ থেকে কয়েকজন এসে যখন বললেন যে ছুটির দিনে আমি যদি আরেক-জনের হয়ে ভোট দিয়ে আসি তাহ'লে ওরা আমাকে নগদ পঁচিশটা টাকা দেবেন তখন আত্মসম্মান, নীতিবোধ সব চাপা দিয়ে আমাকে আসতে হল আপনাদের নির্বাচন-কেন্দ্রে!

—কিন্তু সুরজিৎবাবু যে ভয়ানকভাবে বামপন্থী!

সুনন্দা একটু হাসল। বলল,—দেখুন, পরেশবাবু, যারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখে না কে কোন পথে চলেছে, তারা শুধু দেখে আপাতদৃষ্টিতে কোন পথটা একটু বেশী সহজ এবং খাটো। আর আমার মত লোকেরা, যারা একটু অতিরিক্ত উপার্জনের চিন্তায় উদভ্রান্ত তারা পথের দিকেও তাকায় না, যেদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আফিম-খোরের মত সেই দিকেই চলতে থাকে!

পরেশ চুপ করে রইল। সুনন্দার কথা-গুলিতে তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সমবেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল।

সুনন্দা বলে চলল,—অবশ্য ভয় যে আমার করেনি এমন নয়। কিন্তু ও'রা সব রকম প্রতিবন্ধকের কথা ভেবে আমাকে এমনভাবে তালিম দিয়েছিলেন যে, নির্বাচন-কেন্দ্রে ঢুকবার আগে ভয় আমার একেবারে কেটে গিয়েছিল। তা ছাড়া, আমার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে যে, ঘটনার মুখোমুখি হলে আমার সুপ্ত সাহস ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। তাই আপনার প্রতিবাদ শুনে আমি এতটুকুও ঘাবড়ে যাইনি, বরং আমার জেদ চেপে গেল, আপনাকে মিথ্যাবাদী হেয় প্রতিপন্ন করতে। তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

সুনন্দার কথাগুলিতে যথার্থ অনুতাপের সুর বেজে উঠল।

পরেশ হেসে বলল, আপনাকে নিঃসংকোচে ক্ষমা করছি, কারণ ঘটনাটায় মাঝ থেকে আমারই লাভ হল বেশী!

—এর অর্থ? জিজ্ঞাসুভাবে সুনন্দা তাকাল।

—আজ যদি আপনি আমার পরিচয়ে না আসতেন তাহলে ত আমি আর আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতাম না এবং পরে এইভাবে চা খাবার সুযোগটুকু মিলত না!

সুনন্দা লজ্জিতভাবে ঘাড় নিচু করল।

একটু পরে সে প্রশ্ন করল, কিন্তু আপনি ওখানে কি করছিলেন, মিঃ নন্দী?

—ওঃ, আমার কথা ত আপনাকে বলাই হয়নি! আমার অবস্থা আপনার চেয়েও ভালো, অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ বেকার। সপ্তাহের ছয়টা দিন কাজের খোঁজে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াই, আর রবিবার বা ছুটির দিনটাতে বসে একটু সাহিত্যচর্চার চেষ্টা করি। তবে জানেন কি, বেকারদের লেখা কেউ নিতে চায় না, অন্তত পয়সা দিয়ে নয়। প্রকাশক সম্প্রদায়ের হয়ত একটা ধারণা আছে যে যাদের ট্যাঁকে পয়সা নেই তারা পয়সা রাখতে পারে না, অতএব তাদের পয়সা দেওয়াটাই অনুচিত। তাই এ পর্যন্ত গল্প বা প্রবন্ধ লিখে এক মাসের মাইনেও জোগাড় করতে পারিনি'!

—তাই বুঝি আপনিও অন্য কারো নাম ভাঁড়িয়ে ভোট দিতে এসেছিলেন? সকৌতুকে সুনন্দা প্রশ্ন করল।

—না, অতদূর যাইনি, অন্তত সাহস হয়নি। আমি ওখানে ছিলাম পবিত্রবাবুর একজন এজেন্টরূপে। প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্রে প্রার্থীরা এক একজন এজেন্ট রাখতে পারেন কিনা। এবং এর জন্যে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়।

—আপনি বুঝি কংগ্রেসী দলের লোক?

—আপাতত তাই বটে, কিন্তু সত্যি কথা
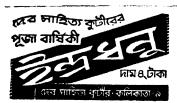
বলতে কি, আমিও আপনারই দলে, অর্থাৎ কোন দলেই আমি নেই। যে প্রথম এসে কিছু দেবে তাকেই ভোট দেব। তবে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মসম্মানসম্পন্ন লোক কিনা আমরা, তাই একবার কথা দিলে কথা ভাঙতে আজও আমাদের দ্বিধা হয়। কংগ্রেসী দলে কাজ শুরু করবার পর সুরজিৎবাবুর লোক আমার কাছেও এসেছিলেন অন্য রকমের সাহায্য নিতে, এবং পুরস্কারও দিতে চেয়েছিলেন মোটা রকমের, কিন্তু আমি রাজী হইনি। এটা কিন্তু গর্ব করে বলছি না। নিজের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হয়েই বলছি!

—পবিত্রবাবুর লোকও কিন্তু আমার কাছে এসেছিলেন, সুরজিৎবাবুর জন্য যা করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তাই করতে রাজী আছি কিনা জানতে।

—আপনি কি বললেন?

—বললাম, এ সব প্রতারণায় আমি বিশ্বাস করিনে!

—আপনি ত ভয়ানক লোক, সুনন্দা দেবী!

—কেন, আমাকে দেখে কি ভয়ানক মনে হয়? চটুলভাবে সুনন্দা বলল।

—তা মনে হয় না বটে, কিন্তু ঐজন্যই ত আপনাকে ভয়ানক বলছি। বাইরে আপনি এমন শান্ত, নিরীহ, অথচ যত রকমের দুরন্তপনা আপনার স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঘা' দিচ্ছে!

—নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন, পরেশবাবু। আপনি বেকার হতে পারেন, কিন্তু সংসারের কোন দায়িত্বই আপনাকে নিতে হয় না। বাড়িতে হয়ত মা-বোন আছেন, উপার্জনক্ষম বাবা বা দাদাও আছেন, আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর কতটুকুই বা হতে পারে? কিন্তু আমি? নিজের কথা ভাববার আগে আমাকে ভাবতে হয় আমার দুই ভাই এবং বোনটির কথা, আমার বুড়ো বাবার কথা। আজ যদি কয়েকটা অতিরিক্ত টাকা এদের কাছে তুলে ধরতে পারি তা হলে এদের মুখে যে হাসিটি ফুটে উঠবে তার বিনিময়ে আপনাদের এই তুচ্ছ আত্মসম্মানবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইব না আমি!

—তাহলে আপনি ভোটের জন্যে সুরজিৎবাবুদের দলে ভেড়েননি?

—না, নিছক বাঁচবার জন্যে।

রেস্তরাঁ থেকে পরেশ এবং সুনন্দা যখন বার হয়ে এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সুনন্দা একটা নমস্কার করে বলল, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আমাকে এখন বাড়ির দিকে ছুটতে হবে।

—আপনার সঙ্গে এইভাবে আলাপ হয়ে ভারী ভাল লাগল, সুনন্দা দেবী। আমার ঠিকানা ত আপনি আগে থেকেই জানেন, আপনার ঠিকানাটা এখন আমার জানা দরকার।

—এটা অবশ্য আপনি ন্যায়ত দাবি করতে পারেন। আমি আপনাদের পাশের পাড়ায় থাকি,—নং অক্রূর মুখার্জি লেন-এ।

—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে ত?

—নিশ্চয়ই। কেন হবে না? বলে সুনন্দা বিদায় নিল।

এর সাতদিন পরে অফিস ফেরতা সুনন্দা আবার এল কমল রেস্তরাঁয়, পরেশ সেখানে অপেক্ষা করছিল।

সুনন্দাকে দেখেই পরেশ পুলকিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে বলল, আসুন, সুনন্দা-দেবী। ভয় হচ্ছিল, বুঝি ফাঁকি দিলেন এবার।

—একবার একটু ঠকিয়েছিলাম বলে আমার সম্বন্ধে ভারী চমৎকার ধারণা করে নিয়েছেন দেখছি আপনি!

এবার শুধু চা নয়, তার সঙ্গে আহার্যও এল। সুনন্দা বলল, একি রাজসিক আয়োজন আপনি করছেন, পরেশবাবু?
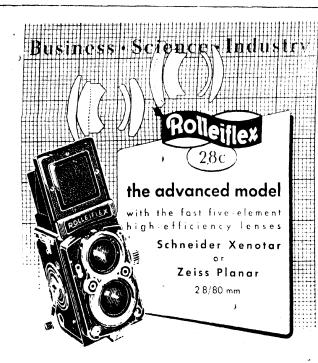
—সারাদিন সম্পাদক-মহলে ঘুরে ঘুরে আমার বেজায় খিদে পেয়ে গেছে, আর অফিসের একঘেয়ে খাটুনির পর আপনিও ভরপেট হয়ে আছেন বলে মনে হয় না!

সুনন্দা আর কোন প্রতিবাদ না করে সম্মুখে উপস্থাপিত খাদ্যের দিকে মনঃসংযোগ করল।

এর পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যে পরেশ সুনন্দার পরিবার, তার পরিবেশ, তার জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের খানিকটা পরিচয়ও সে সুনন্দার সম্মুখে উপস্থাপিত করল।

কথাবার্তা অনেকখানি সহজ, পরিচয় অনেকখানি নিবিড় হয়ে এল। তরল হাসি এবং সমধর্মী অনুবেদনার সহায়তার ব্যবধানের যবনিকা আরও পাতলা হয়ে গেল।

সুনন্দা প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কি কোন ছেলেপুলে রেখে গেছেন?

বিস্মিতভাবে পরেশ বলল, স্ত্রী? ছেলে-পুলে?

—বাঃ, ঐ যে সেদিন আপনি বললেন বছরখানেক আগে আপনার স্ত্রী মারা গেছেন, যা নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার মশায় আপনাকে কি বকুনিটাই না দিলেন, কেন আপনি নির্বাচন-তালিকা শোধরাবার জন্য কোন আবেদন পেশ করেন নি!

হো হো করে পরেশ হেসে উঠল। বলল, ওটার ইতিহাস বুঝি আপনাকে বলা হয়নি? তাহলে শুনুন। ভোটারের তালিকা কেমন করে তৈরি হয় বোধ হয় আপনি জানেন। হঠাৎ একদিন আমাদের পাড়ার এক ছোকরা এসে আমাকে বলল, পরেশদা, তুমি বিয়ে করেছ খবর ত আমাদের দেওনি—এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু! আমি ত অবাক, জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বিয়ে করেছি, কে তোকে বললে? সে জবাব দিল, কেন, কর্পোরেশনের অফিসে লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে, তাতে তোমার নাম যদিও নেই তোমার বউটির নাম দিব্যি আছে, বয়স লিখেছে একুশ, ঠিকানা এবং বানানে কোন ভুল নেই। আমি ত রাগে টং হয়ে তখখুনি ছুটলাম। পথে কংগ্রেসের এক চাঁই—আমাদেরই দূরসম্পর্কের কাকা হন—তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমার হন্তদন্ত অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। সব খুলে বললাম। একটু ভেবে তিনি বললেন, ওহে পরেশ, ভগবান এবং যাঁরা এই ভোটার-লিস্ট তৈরি করেন, তাঁরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত; যা হয়েছে তা ভালর জনাই হয়েছে নিশ্চয়। তাছাড়া ক্ষতিই বা এমন কি হয়েছে? ভোটারের সংখ্যা ত কমেনি, শুধু তোমার নামের বদলে তোমার স্ত্রীর নামটি উঠেছে। তা যদি তোমার মনটা নিতান্তই খুঁতখুঁত করে, তাহলে ঐ বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেল, সব দিক বজায় থাকবে।

—আপনি তাঁর উপদেশমত কাজ করেছেন আশা করি?

—ইচ্ছা হয়ত ছিল, কিন্তু সুযোগ এবং সুবিধে পেলাম কই? চাকুরির সন্ধানেই সময় কেটে যায়, কনে দেখব কখন?

পরেশের কথা বলবার ভঙ্গীটা এমন যে সুনন্দা না হেসে থাকতে পারল না।

—কিন্তু আপনি ত বেমালুম গল্প বানিয়ে বললেন যে, আপনার স্ত্রী মারা গেছেন এক বছর আগে!

—কি আর করব, সুনন্দা দেবী, আপনি যখন আমার স্ত্রীর পরিচয়ে উপস্থিত হলেন, তখন প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, একবারটি মনে হয়েছিল আমারই অপর সত্তা, মিঃ হাইড-এর মত কেউ, ডাঃ জেকিলের অজ্ঞাতে কাউকে বিয়ে করে বসেছেন হয়ত। তারপরই মনে হল, এসব আজগুবি ব্যাপার উপন্যাসেই সম্ভব, বাস্তব জীবনে নয়। তখন আপনাকে প্রতিবাদ করবার জন্য সোজা মুখ থেকে যা বেরিয়ে এল তাই বলে ফেললাম। ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে, জানেনই ত!

—বোঝা যাচ্ছে আপনি ভালই গল্প লিখতে পারেন। সম্পাদকেরা আপনার গল্প নেন না কেন বুঝতে পারি না।

—ভুল বলছেন, সুনন্দা দেবী। ও'রা গল্প নেন, তবে বিনা পারিশ্রমিকে।

আরও দশদিন পরের কথা। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই পরেশ এবং সুনন্দাকে একসঙ্গে দেখা গেছে, কখনও বা সেই কমল

রেস্তোরাঁয়, কখনও বা কোন চলচ্চিত্রগৃহে, কখনও বা গঙ্গার ধারে। দেবীত্বের শিখর হতে সুনন্দা বান্ধবীর পর্যায়ে নেমে এসেছে। সুনন্দাও ভাবছে, পরেশকে নাম ধরে ডাকাটাই বোধ হয় বেশী শোভন হবে।

গঙ্গার বুকে নোঙর বাঁধা জাহাজগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে পরেশ ডাকল, সুনন্দা!

সুপ্তোত্থিতের মত সুনন্দা বলল, উঁ, কিছু বলছ?

—বলছি এই যে, আর কতদিন তুমি এইভাবে একলা থাকবে? যদি অনুমতি দাও তোমার বাবার কাছে তোমার করকমলদুটি প্রার্থনা করি।

সুনন্দা ঘাড় নেড়ে জানাল যে, তার কোন আপত্তি নেই।

পরেশ-সুনন্দার কাহিনী আমরা মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনছিলাম। কাহিনী শেষ হবার পর ঘরের মধ্যে কেমন একটা নিস্তব্ধতা এসে যেন আশ্রয় গ্রহণ করল।

নিস্তব্ধতা ভাঙল আমাদের বন্ধু সংশয়-ভূষণ। বলল, সমস্ত গাঁজাখুরী গল্প!

মামা কিছু বললেন না, একটু হাসলেন মাত্র।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কিন্তু আগের ঘটনাটা যে সম্পূর্ণ সত্যি তার প্রমাণ আমি দিতে পারি, ইলেকশনের দিন আমি সেই কেন্দ্রেই ছিলাম।

সংশয়ভূষণ মোটেই হঠবার ছেলে নয়। অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গীতে বলল, ওটুকু সত্যি হতে পারে, কিন্তু বাকিটা নির্জলা মিথ্যে। ঐরকম ঘটনার পর কোন ভদ্রঘরের মেয়ে বাইরে মুখ দেখাতেই সাহস পাবে না। কোর্টশিপ করা ত দূরের কথা!

—কোর্টশিপ ত ওরা করতে চায়নি! বেশ একটু ধীরে ধীরেই মামা বললেন,—কোর্ট-শিপই ওদের পেছনে পেছনে ছুটে অবশেষে ওদের ধরে ফেলল। তাছাড়া তোমাদের বিশ্বাস না হয় এই দেখ বিয়ের নেমন্তন্ন-চিঠি। আজ দুজনে যুগলে এসে আমার বাড়িতে দিয়ে গেছে, বলেছে আমার জন্যেই নাকি ওদের বিয়েটা সম্ভব হয়েছে, আমি যদি জুডিশিয়াল মন নিয়ে বিচার না করে প্রথম থেকেই সুনন্দার আপীল ডিসমিস করে দিতাম, তাহলে পরেশ নিশ্চয়ই জবাব-দিহি আদায় করতে তার পশ্চাদ্ধাবন করত না!

নিমন্ত্রণের চিঠিখানা সংশয়ভূষণ গম্ভীর ভাবে উলটে পালটে দেখল। সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই—পরেশ নন্দী এবং সুনন্দা বসুর বিয়ে হবে সম্মুখের সোমবারে, সবান্ধবে যোগদান করবার অনুরোধ। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।

কাহিনীটা হয়ত এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ইতিহাসেরও পরিশিষ্ট থাকে, তাই আর দু-একটি খবর আপনাদের দেওয়া দরকার।।

প্রথম খবরটি হচ্ছে এই যে বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই পরেশ এবং সুনন্দার রাজ-নৈতিক আনুগত্য হঠাৎ কেমন ডিগবাজি খেয়ে গেল। যে সুনন্দাকে আমরা চিরকাল বামপন্থী বলে জানতাম, সে আজকাল পণ্ডিতজী এবং কংগ্রেস ছাড়া আর কোন কথাই বলে না। ওদিকে পরেশ আজকাল জয়প্রকাশ নারায়ণের ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে জয়প্রকাশকেও সে অতিরিক্ত সাবধানী এবং অহেতুকভাবে ভিত মনে করে, লাল নিশান উঁচিয়ে একটি বিশিষ্ট দলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে তার স্পৃহা জাগে। তার কারণ [illegible] আমার ডায়াগনোসিস এই—অনেক চেষ্টা করেও সে একটা চাকরির জোগাড় করতে পারেনি, তার ফলে তার গল্প এবং প্রবন্ধ গুলিও দিন দিন কেমন যেন র‍্যাডিক্যাল হয়ে উঠছে। ওদিকে সুনন্দা ঘরের এবং বাইরের দুই চাকরিই করছে।

দ্বিতীয় খবরটি এই যে, আমার মামা তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে বিনীতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার রূপে তিনি আর কাজ করবেন না এবং ব্রিটিশ ও কংগ্রেসী সরকারকে সুদীর্ঘকাল সেবা করার বিনিময়ে তিনি আশা করেন যে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জোর করে প[illegible] সম্মুখে টেনে আনা হবে না। পরোক্ষভাবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও দয়ামায়াহীন সরকার যদি তাঁকে আবার নির্বাচনের কাজে আহ্বান করেন, তাহলে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লাল নিশান উঁচিয়ে ড্যালহৌসী স্কোয়ারের জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে নিজের শেষ জীবনটা উৎসর্গ করবেন।

মামার এই ভয় প্রদর্শনে সরকার কতখানি বিচলিত হবেন জানি না, আমি কিন্তু লাল নিশান হাতে পথচারী আমার বিরল-কেশ স্ফীতোদর মামার চেহারাটা কল্পনা করে মনে মনে অনেকবার হেসেছি।

পার্ক রোডের সেই বাড়ি

বিমল কর
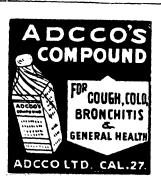
যদিও ঠিক তা নয়, তবু ও একা। বার্নপুরের পার্ক রোডের এই বাড়িতে চন্দনা নিঃসঙ্গ। এত নিরিবিলি নির্জনতা এখানে—এই পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় যে, সারাটা দিন পাখির ডাক শুনেছে চন্দনা, সারাটা দিন। আর সারা সকাল এবং দুপুর চড়ুইয়ের কিচির-মিচির। খড়কুটো ঠোঁটে চড়ুইগুলো ফুড়ুৎ করে ঘরে এসে ঢুকছে, চন্দনার ঘরেই, স্কাইলাইটের খুপরিতে তারা বাসা বাঁধবে। কিন্তু পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর ফিটফাট সাজানো ঘরে বাসা বাঁধা শক্ত। ঝুল-ঝাড়া বাঁশটা হাতে করে মালি ঘরে আসবে, বাহাদুর ফ্লোর ঝাঁট দিয়ে যাবে—যেন পালিশ ধরিয়ে দিয়ে যাবে সিমেন্টেও। আর তারপর, তখন সকাল আটটাই হোক, কি বেলা দশটা—কাঁচের দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে, জানলার সমস্ত শার্সি। অর্থাৎ, আলো আসবে, রোদ্দুর নয়; স্কাইলাইটের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে পাখির ডাক, কিন্তু চড়ুই নয়। মাসী আসবেন এমন সময় একবার। তাঁর ঘাসের চটিতে শব্দ ওঠে না, উঠবে না কোনদিনই। আসবেন, দাঁড়াবেন; ঘরের চারদিকে তাকাবেন, যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে নিচ্ছেন। ফ্যানের সুইচটা অন্ করে দিয়ে একটি চেয়ারে বসতেও পারেন, না-ও পারেন।

—তোর ঘরে সাফিশিয়েন্ট লাইট, চন্দনা। আমার ঘরটা সকালে তেমন আলোই পায় না। জিনিসপত্র বড় বেশী, আলমারিটা আর ড্রেসিং টেবিলটা যদি সরাতে পারতাম!

—সরাবেন! চন্দনা গ্রামার বই থেকে চোখ তুলে হাসবার চেষ্টা করলে। যদি এই হাসি এবং কথায় মাসী অন্তত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন এবং এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশানের আচমকা একটা প্রশ্ন করে না বসেন।

—সরাব? কোথায় সরাব! জায়গা কই, বল্? ড্রয়িংরুম আর ডাইনিংরুমে ওসব রাখা যায় না—রাখা চলে না। আর তোর এই ঘর—তাও তো অসুবিধে। না, এই বাংলোটায় বড় জায়গা কম।

মাসী যদি বসে থাকেন এবার উঠে দাঁড়াবেন এবং ফ্যানের সুইচ অফ্ করতে ভুলবেন না। ক' পা এগিয়ে এসে সোজা বাথরুমের দরজা খুলে দেবেন। আর খুলে দিয়েই সিঁটকে উঠবেন, 'ওপাশের দরজা বন্ধ কেন? ড্যাম্প—উঃ কী ড্যাম্প তোর বাথরুমে চন্দনা। বেসিনে এত দাগ কিসের, বাথটবের জল ছাড়া নেই! ন্যাস্টি, ন্যাস্টি মেয়ে কোথাকার! য়ু মাস্ট লার্ন অল দিস। নিটনেস শিখতে হয়। কি তুমি ডোমেস্টিক সায়েন্স পড়েছ? তোমাদের ম্যাট্রিকে কিছু শেখানো হয় না। কিছু না।'

চন্দনাও উঠে বাথরুমে এসে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি পাশের দরজাটা খুলে দিল। রোদে ভেসে গেল ঘর। গ্যারেজের সামনে ফুলগাছের তলায় জমাদার বসে বসে কলাই-করা মগে সম্ভবত চা খাচ্ছিল। তার পাশেই কুকুরটা শুয়ে।

—জমাদার!

—জী, মা! জমাদার ছুটে এল। মেমসাহেব বলার রেওয়াজ নেই এ বাড়িতে। তাই মা।

—সাফ কিয়াথা এহি গোসলখানা?

—বন্ধ থা দরওয়াজা।

—জলদি সাফ করো। আচ্ছাসে—।

মাসী নাক ঢেকে চলে গেলে চন্দনা পাশের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

এখন একটুক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক'পা হাঁটতে পারে ঘাসে, বালিতে। যদিও পায়ে তার বাথ-শিলপার—তবু এই মাটির ছোঁয়া সে পেতে পারে ইচ্ছে করলেই। কারণ কিছুক্ষণ আর মাসী তাকে ডাকবেন না, এদিকে আসবেন না। তিনি এখন স্নানে চলে গেলেন। স্নান করে যখন ফিরবেন তখন তাঁর গায়ে সাবানের মিষ্টি একটা গন্ধ ভুর ভুর করবে। চুলেও হেয়ার অয়েলের মৃদু সৌরভ। এবং তারপর পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি ভরে সেই আশ্চর্য সৌরভ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়বে। প্যানট্রি থেকে ভেসে আসবে খুটখাট শব্দ, ঘিয়ের গন্ধ কিংবা পায়েসের। অথবা চিকেন সুপের। মালি ডেটল জল স্প্রে করবে ঘরে ঘরে। বাগান থেকে নিজের হাতেই রঙ মিলিয়ে ফুল তুলবেন মাসী। ক'টি ফুল তাঁর ঠাকুরের পটের সামনে রুপোর ছোট্ট থালাটিতে রেখে দেবেন এবং ধূপ জ্বালিয়ে দেবেন, দামী ধূপ—যার গন্ধ মাসীর ঘর থেকে ড্রয়িংরুমে, ডাইনিং হলেও ভেসে আসবে, ভেসে যাবে বারান্দাতেও। তারপর বাকী ফুল ডাইনিং টেবিলে এবং ড্রইং-রুমের ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে তবে মাসী বসবেন।

বসবেন বারান্দায়, বেতের চেয়ারে—যে চেয়ারে বসে ব্রেকফাস্ট শেষ করে মেসোমশাই ফ্যাক্টরিতে চলে গেছেন। চন্দনাকেও পাশে বসতে হবে। যুগল ট্রে রেখে যাবে বেতের গোল টেবিলে। চা ঢেলে দেবে চন্দনা, রুটিতে মাখন লাগিয়ে দেবে; নয়ত কটা বিস্কুট পিরিচে ধরে দেবে। মাসী দেখবেন, চন্দনার কোন খুঁত টি-সার্ভ করার সময় ধরা পড়ে কি না। মাসীর চা, কিন্তু চন্দনার জন্যে এক পেয়ালা দুধ আর সন্দেশ।

পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় এসে ওর চা খাওয়া বন্ধ হয়েছে। মাসী বলেন, এটা মেসোমশাইয়ের নিষেধ। অত ডেলিকেট চেহারার মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে চা খারাপ। দুধ খাও; দুধ, ডিম। প্রোটিন খেলে ফ্যাট হবে। মেয়েদের পক্ষে ফ্যাট এসেনসিয়াল। ওটা ত' স্টোরেজ। বাচ্চা-কাচ্চা হলে শরীর ভেঙে পড়বে না।

এই সময় সাইকেলের ঘন্টি এবং সেই পিয়ন। সেলাম বাজিয়ে ডাক রেখে যায়। ডাকের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবার উপায় নেই চন্দনার, তা যতই কেননা দিদির চিঠির জন্যে মন ছটফট করুক। মাসী বলবেন, অত অধৈর্য কেন! চিঠি এলে বাড়িতেই এসেছে, পাবে ঠিক সময় মতন। এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে—যে কারণের জন্যে ডাকের দিকে তাকিয়ে থাকার উপায় নেই তার। মাসী ভাবেন, লজ্জা নেই তার ছিটে ফোঁটাও।

কাজেই অন্যদিকে—হয়ত বাগানের দিকে কিংবা কটা কাক যেখানে ঠোঁট ঠোকাঠুকি করছে সেইদিকে তাকিয়ে মুখ বুজে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকতে হয় চন্দনাকে। মাসী খাম ছেঁড়েন।

—সীতারা হাজারিবাগ যাচ্ছে এবার পুজোতে। মিঠুটা নাকি বড় দুষ্টু

হয়েছে! মাসী চিঠি পড়তে পড়তে আপন মনে হাসেন আর বলেন। চন্দনা মনে মনে ছটফট করতে থাকে। আর কি লিখেছে দিদি, আর কি আছে ওই চিঠিতে, পাইকপাড়ার সেই টিনের বাড়ির আর কি কি খবর? কার কার কথা। মাসী তখনও চিঠি পড়ে পড়ে হেসে উঠছেন, 'মিঠু পরিমলকে 'বুবু' বলে ডাকে—চাঁদকে বলে তাদ। শয়তান, শয়তান হবে মেয়েটা। বুঝলি চন্দনা, মিঠুটা ভীষণ পাজি হবে। কিন্তু এ ভাল নয়। ও বাড়ি ওদের বদলানো দরকার। টিনের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি। কচি মেয়ে নিয়ে ও বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে। তুই লিখে দে তো চন্দনা, সীতাকে লেখ—পরিমলকেও—আগামী মাসেই যেন বাড়ি বদলায়। আজই তুই লিখবি মনে করে, দুপুরেই। আমায় দেখিয়ে ফেলবি।' মাসী থামলেন এবং শেষ পর্যন্ত চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

চিঠিটা নিল চন্দনা। কিন্তু অভিমানে চোখে জল এসেছে। দিদির চিঠি, তাকে নয়, মাসীকে। মিঠুর কথা, কিন্তু তাকে ডেকে কেউ শোনাচ্ছে না—মাসীকে শোনাচ্ছে। আর আশ্চর্য লোক জামাইবাবু। চন্দনা বলে কাউকে যেন তিনি কোন কালেও চিনতেন না। কেউ নয় চন্দনা তাঁর। চার মাস আগে এক কলম চিঠি দিয়েছিলেন— তারপর ভুলে গেছেন।

যদি মনে করা যায় চোখের জল লুকোতে, তবে তাই; নয়তো এ সময় মাসী একটি পান খান বলেই চন্দনা আস্তে আস্তে উঠে ডাইনিং হলে এসে ঢোকে। কত কম খয়ের, কত কুচি কুচি করে সুপুরি এবং ক'টি পাতি-জর্দা দিলে মাসীর মুখের মতন পান হবে চন্দনার তা জানা হয়ে গেছে আজকাল। পান সাজার এই অবসরে, মনটাকে একটু ছড়িয়ে দেয় চন্দনা। পাইকপাড়ার মণীন্দ্র রোডের সেই মাঠকোটা বাড়ি। এতক্ষণ সে বাড়িতে রোদ পুরনো হয়ে গেল। কলতলায় এঁটো কাঁটা জমতে শুরু করেছে। শুদি আর হিমাংশুদা অফিস বেরুচ্ছেন—উমা হাঁস-ফাঁস করছে আশাদির মেয়ে সামলাতে। উঠোনে কাক নেমে এসেছে ভাঙা ডিমের খোলা ঠুকরোতে। দিদি বোধ হয় সেই এক চিলতে রান্নাঘরেই মিঠুকে কোলে নিয়ে চার দফায় চায়ের জল চড়াচ্ছে। আর জামাইবাবু নিশ্চয়ই দোতালার ঘরে খিল বন্ধ করে লেখায় মত্ত। তবু যদি লিখত। হয়ত সারা সকালে একটি পাতাও লেখেনি —চার দফা চা, এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হয়ে গেল। এরপর নাইতে নেমে, দিদির ওপর যত চোটপাট। অমনি মানুষ জামাইবাবু। বাইরে থেকে মনে হয় বড় শান্ত, নিরীহ, ঠোঁট বুঝি খুলতেই জানে না। কিন্তু চন্দনা জানে—বাড়িতে লোকটার জন্যে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়। শরীর নিয়ে সর্বক্ষণ খুঁতখুঁত. মাসীর চেয়ে এক কাঠি বেশী নোঙরা-বাতিক। তিন পরিবারের সেই বাড়িতে অত ঝকমকে থাকা কি চলে, অত সাফসুফ! জামাইবাবু তা বোঝেন না। আভা যদি আনাজ ফেলে, ত উমা ভাতের মাড়, দিদি চায়ের পাতা। আর এতেই ওটুকু বাড়ির নর্দমা ভরে উঠবে—জঞ্জালে। সেই জঞ্জাল ঠুকরোতে কাক আসবে, চড়ুই জুটবে। কখনো কখনো ছাগল অথবা কুকুরও ঢুকে পড়ে বাড়িতে। এ নিয়ে হৈ হৈ আছে। উমা। আভা, পূর্ণিমা আর দিদির হাসাহাসি আছে—দু কলি গান, দু'চারটে ঠাট্টা ইয়ার্কি'। কখনো সখনো উমা-আভার হুল্লোড় কিংবা ঝগড়া। চন্দনাও সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামত। একটা বেজে যাবার পরও কয়লা ভাঙত, শাড়ি সেমিজ কাচত কলতলায় বসে আর উঁচু গলায় উমার সঙ্গে স্কুলের কি কোন সিনেমার গল্প করত। ঝগড়াও।

পাইকপাড়ার মণীন্দ্র রোডের সেই তিন পরিবারের বাড়িতে ভিড় ছিল, জঞ্জাল ছিল, দুর্গন্ধ বেরুত মেথর রোজ না এলে—ঝগড়াঝাঁটি ছিল। আর সেখানে লণ্ঠন জ্বালাতে হত কেরোসিনে, তার শিষ উঠত, তেমন হাওয়া ছিল না নীচে, মশা ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে—তবু—তবু সে বাড়ি. চন্দনার মনে হয়, সেই পাইকপাড়ার বাড়িই বেশ ছিল। পার্ক রোডের এই সাত নম্বর বাংলোর চেয়ে সেখানেই যেন হাত পা ছড়িয়ে, মন এলিয়ে বেঁচে ছিল ও, বেশ ছিল।

আর এখানে—

পান সেজে মাসীর কাছে ফিরে আসতে যতটুকু সময় গেল তার মধ্যেই ডাক দেখা শেষ হয়েছে তাঁর। এবং মাসীর মুখ দেখেই চন্দনা বুঝে নিয়েছে আজকের ডাকে আবার একখানা চিঠি এসেছে।

গত দু মাস থেকে শুরু হয়েছে; প্রথমটায় তবু কখনো সখনো আসত, এখন প্রায় রোজই। যত আত্মীয়স্বজন আছে তাদের কলকাতা, বর্ধমান, দিল্লী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ,—সব জায়গা থেকে চিঠি আসতে শুরু হয়েছে। মাসীই বাধ্য করেছেন। বিয়েটা চুকিয়ে তিনি হাত পরিষ্কার করে ফেলতে চান। কেননা, তাঁর শরীর ইদানীং খারাপ যাচ্ছে ভীষণ। একটা আশঙ্কা এবং নিরাশা ভর করেছে তাঁর মনে। যতদিন আছেন, যত দায়িত্ব—এমন অনেক দায়িত্ব আছে যা তিনি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন—সব—সব ঠিকঠাক পালন করে যেতে চান। এখানে, এ বিষয়ে তিনি নিজের একটিমাত্র ছেলে এবং বোনঝি, ভাসুর পো, ভাসুর ঝির মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতে চান না। রাখেন নি কখনও।

এ বিষয়ে তাঁর গর্ব আছে। স্পষ্ট মুখে তিনি তা স্বীকার করেন। শিক্ষা এবং মনের ঔদার্যতায় এটা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়। শিক্ষা—ঠিক ঠিক পেলে, কি না হয় মানুষে। এম-এ পাশ করেছিলেন মাসী ফিলজফিতে। স্কুলের টিচারি করেছেন প্রথমে, পরে প্রফেসারি—শেষে বিয়ে। আর বিয়ে করেছেন যাঁকে—সেই স্বামীর গর্বে তিনি সতত গর্বিতা।

স্বামীর মনের উদার পটে তিনি যেন ডানা মেলে উড়ছেন একটি পাখির মতন। ঘুমিয়ে আছেন প্রগাঢ় প্রশান্ত আকাশের তলায়। মেসোমশাই যদি এতটা ভাল না হতেন, মাসীর ভাষায়, এত জেনারাস, জেণ্টল, সেলফ-স্যাক্রিফাইসিং—তা হলে মাসীর পক্ষেও হয়ত এমন নিঃস্বার্থ থাকা সম্ভব হত না। কাজেই মাসী সব সময় বলেন, সকলের কাছেই, শিক্ষা এবং ভাল পরিবেশে মানুষ সব হতে পারে। সব। এ বাড়িতে পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় তাই সব সময় তুমি পরিচ্ছন্নতা পাবে, শালীনতা এবং আচার-আচরণে শিষ্টতা। গোলমাল, কথা কাটাকাটি, খিলখিল হাসি কিম্বা চাঞ্চল্যের নামে চপলতার এখানে প্রশ্রয় নেই। এখানে শান্তি, এখানে চুপ, এখানে নিরিবিলি এবং একাকিত্ব।

তা বলে তোমার মনের স্বাধীনতায়—ঠিক যেখানে স্বাধীনতার প্রয়োজন সেখানে কেউ কখনো হাত দেবে না। মেসোমশাই মনের লিবার্টিতে হস্তক্ষেপ একেবারেই পছন্দ করেন না। বলতে গেলে একটা যুগ তিনি বিলেতে কাটিয়েছেন, এখনো স্নান করেন রাত্রে, শীতে-গ্রীষ্মে সর্বসময়। সব সময় ঠিক ঠিক বেশভূষা করে থাকেন। ডাইনিং টেবিলের ম্যানার্স এখনও পালন করে চলেছেন। এগুলো যেন তাঁর জীবনের অংগ, একটা লব্ধ অভ্যাস। এবং তা তিনি রক্ষা করবেন। তেমনি রক্ষা করবেন বিলেতের সেই লিবারেল আবহাওয়া। এটা তাঁর মনের আভিজাত্য এবং সুখ।

এর ফলে মাসীকেও কোন কোন বিষয়ে বড় বেশী উদার হতে হয়েছে। আর ডাকের একটা চিঠি এখন তিনি অনায়াসেই চন্দনার দিকে এগিয়ে দিতে পারেন।

—দিল্লী থেকে এসেছে। পড়—চিঠিটা।

অতঃপর মাসী পান মুখে দিয়ে, ঘাসের চটিতে শব্দ না তুলেই সোজা তরকারির বাগানে চলে যান। চন্দনা নীল রঙের খামটা হাতে করে একবার কেঁপে ওঠে। বুকটা ধুকধুক করে। আর কেন যেন অযথাই ক'বার চোখের পাতা পড়ে, দুটি চুল গালের কাছে উড়ে এসে শিরশিরিয়ে তোলে।

পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি দুপুরে গাছগাছালি-আড়াল-করা পুকুরের মত ছায়াময়। নিটোল স্তব্ধতায় ঘেরা। অনেক অন্তরাল পেরিয়ে তবে আলোর হাল্কা আভাটুকু ঘরে আসতে পারে। এখানে চোখের পাতা চাইতে কষ্ট নেই। কেমন একরকম ঠাণ্ডা ঘরের বাতাস। ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর। অতি মৃদু একটানা একটা শব্দ। যেন ঘরে একটা ভোমরা পাক দিয়ে দিয়ে উড়ছে। আর চন্দনার টেবিলে টাইম-পিসের টিক্ টিক্। ভারী পর্দার অতি মৃদু খসখস। নরম বিছানায় শুয়ে এলোমেলো হয়েও, এ ঘরে, এমন দুপুরে মনে হবে, চন্দনা বুঝি নেই। বকের পালকের মতন সাদা দেওয়ালের গায়ে যে ছায়া—স্কাইলাইটের ঝোলানো দড়ির মধ্যে যতটুকু কাঁপন—ততটুকু অস্তিত্ব ফিরে পেতেও চন্দনাকে বুকে বালিশ টেনে অনেক—অনেকক্ষণ ছটফট করতে হয়। তারপর সে গন্ধ পায়—নিজের মাথার বালিশেই গন্ধ-তেলের সুবাস একটু একটু করে নাকে যায়, ক্লোরোফিল দিয়ে দু-দফা দাঁত মাজার স্বাদটুকুও যেন জিভের স্বাদে ফিরে আসে। আর গলা বুক দিয়ে একটু বুঝি ট্যালকম পাউডারের ফিকে গন্ধ। নিজেকে ফিরে পেয়েও বালিশে মুখ গুঁজে থাকে চন্দনা। অন্ধকারেই মনটাকে আবার ছড়িয়ে দিতে পারে—সেই মন যা তার মাথার চুলের মতন একেবারে নিজস্ব, তার বুকের মতন সব-চোখের আড়াল করা। চিঠিটার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই সময় ভাবা চলে। দিল্লীর সেই চিঠির কথা। সেই ছেলেটির কথা। কি যেন নাম? বিকাশ, বিকাশ সেন। না, সেন নয়; সরকার। আগের ছেলেটি ছিল সেন; তার আগেরটি মজুমদার এবং তারও আগে ঘোষ, মিত্র, ধর, পাল, চৌধুরী—এমন কি এক মুখার্জীও এসে গেছে। ইণ্টার-কাস্টে আপত্তি ছিল না মাসীর। কিন্তু যাক্—যারা এসে চলে গেছে, তাদের জন্যে আজকের এই দুপুর নয়। আজকের দুপুরটুকু বিকাশ সরকারের। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে হয়ত শুধু আজকের দিনটিতেই সে বেঁচে থাকবে—একটি ঘরে, একজনের মনে। চন্দনা আঁচ করবার চেষ্টা করে ছেলেটি দেখতে কেমন হতে পারে। কার মতন! জামাইবাবুর মতন লম্বা, রোগা, আধ ময়লা? বিশ্রী—বিশ্রী হবে তা হ'লে। কেননা, চন্দনা নিজে বেশ ফরসা, এবং মাসী যাই বলুন বেশ পুরন্ত। সে লম্বা নয়, ঠিক বেঁটে যে তাও না। মাঝারি। গড়ন ভাল। হাত আর পা দুটি ত' আশ্চর্য সুন্দর তার। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে এসে প্রত্যহ মুখে, হাতে, পায়ে গ্লিসারিন দিতে হয়েছে। চটি পায়ে ঘুরতে হয়েছে সারা বাড়ি—কয়লা ভাঙতে হয়নি এবং শাড়ি, সেমিজ কাচতে হয়নি কখনো। কাজেই লুকনো সৌন্দর্যটুকু ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠছে দিন দিন। এখন, তার হাতে

এই বালা—আঙুলে এই আঙটি এবং গলায় ওই সরু হার খুব সুন্দর মানায়। পাইকপাড়ার বাড়িতে তার কিছু ছিল না। কাজেই মানাবার মতন সে সাজতে পারেনি। দিদির আটপৌরে শাড়ি পরেছে. যাতে কর্কশতাটুকু গায়ে ফুটেছে—রূপ ফোটে নি। বার্নপুরের পার্ক রোডের এই নিস্তব্ধ পুকুরে এতদিনে সব ফুটেছে। ঠিক পদ্মফুলের মতন। আর এই নির্জনতায় তার মনও পাপড়ি মেলছে। বিকাশ সরকারের খুঁটিনাটি তাই ও ভাবতে পারে; ভাবতে পারছে। মনে হয় ছেলেটি দেখতে ভালই হবে। অন্তত তাই হওয়া উচিত, যখন, যখন সে—অর্থাৎ বিকাশ সরকার জানাচ্ছে মিলিটারীতে চাকরি তার। মিলিটারীতে চাকরি হলেও, ভগবান বাঁচিয়েছেন, যুদ্ধের চাকরি নয়। যুদ্ধই বা এখন আর কোথায়! মাইনে আড়াইশো। আড়াইশো—এক সময়ে চন্দনার ধারণা ছিল, অনেক, অনেক টাকা। এখন আর সে ধারণা নেই। কলকাতায়—বালিগঞ্জে চন্দনার যে মাসতুতো দাদা থাকে এবং আর এক দিদি—তাদের—শুধু তাদের দুজনের জন্যেই মাসীকে মাসে নগদ দেড়শো টাকা বাড়িভাড়া গুণতে হয়। তারা মাসীর নিজের বলেই যে এত টাকা লাগে তা নয়, তার কমে হয় না, হতে পারে না। বিকাশ সরকারের আড়াইশো টাকায় কি হবে? কি করে চলবে? চন্দনা একটুক্ষণ ছটফট করলে। তারপর মনে হল, পাইকপাড়ায় জামাইবাবু শোওয়া শ' টাকা মাইনে পায় খবরের কাগজের বাজে চাকরিতে। তাদের ত চলছে। অবশ্য সে চলা যেন না চলাই। ধার করে, মাথা বিকিয়ে, দরকারে গয়নাগাটি বিক্রি করে। তবু দেখো—দিদি হাসিমুখে চালিয়ে যাচ্ছে, জামাইবাবুও নির্বিকার। তাই, যদিও আড়াইশো টাকা তেমন ভাল নয়, তবু ওতেই টেনে-টুনে চালাতে হবে। আর বিকাশকে, চন্দনা ঠিক করে ফেলল, কখনোই ও সিগারেটে টাকা উড়োতে দেবে না। তার চেয়ে তিনমাস অন্তর একটি করে পাঞ্জাবি—দামী কাপড়ের,—একটি করে ধুতি, তাঁতের ও কিনে দেবে। মাখন খাওয়াবে রোজ আর অন্তত এক কাপ করে খাঁটি দুধ।

বিকাশ সরকারকে পছন্দ করে—যেন দোকানে একটি শাড়ি পছন্দ করে ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে বন্ধ করে দাম চুকিয়ে পথে নামল। খুশী খুশী মন—কেউ দেখছে না, জানছে না কি আছে, কি ঐশ্বর্য আছে তার লুকনো, আজ, আজ এই দুপুরে।

চন্দনার ইচ্ছে ছিল না; তবু উঠতে হল। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিলে—

কান পেতে শুনছে সেই কথা

ডাইনিং হলে গেল—জল খেল এক গ্লাস। চুপি চুপি—কুঁচি সুপুরি দিলে মুখে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে বসল। বসল টেবিলের কিনারায় বুক লাগিয়ে। খাতা টেনে নিলে। টাস্কটা করতে হবে এইবার—এই নিরিবিলি দুপুরেও।

ট্রানস্লেশানের প্রথম লাইনে চোখ দিয়েই মনটা আবার পিছলে গেল—সরে গেল বই থেকে। 'দিল্লীর কুতুবমিনার একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ।' দিল্লী—দিল্লী—দিল্লী। চন্দনার মধ্যে আবার সেই শির-শির। বিকাশ সরকারই যেন একটি মিনার—চন্দনার মনে সেও যেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ। আজকের দুপুরের মতন সেই মিনারের নীচে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে, প্রত্যাশায়, স্বপ্নে সে সব ভুলে গেছে। ভুলে যেতে বসেছে। মেসোমশাই কখন যে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে চলে গেছেন ফ্যাক্টরিতে—চন্দনা জানতেও পারে নি। এই সময় তাঁকে এক গ্লাস ঘোল করে দিতে হচ্ছে ক'দিন। চন্দনা ভুলে গেছে ঘোল করে দিতে। হয়ত যুগলই আজ ঘোল করে দিয়েছে এবং মাসী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেউ আর তাকে ডাকে নি।

চন্দনা উঠে পড়ল। এই ছায়াভরা ঘরে, টাইমপিসের টিক টিক আর পাখার একটানা মৃদু আওয়াজে সে কিছুতেই ট্রানস্লেশানে মন বসাতে পারবে না। তার চেয়ে বারান্দাই ভাল। রোদে, পাখির কিচিরমিচিরে তবু—তবু বা মনটা বালিশের ওয়াড়ের মতন গন্ধ ছুঁয়ে থাকবে না।

বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বসল চন্দনা। সকালের সেই টেবিলে খাতা, ট্রানশ্লেসান বই সাজিয়ে। মেঘ মেঘ করেছে বাইরেও। হাওয়া ভিজে ভিজে। বারান্দায় পাতাবহরের টবগুলো থেকে কেমন একটা গন্ধ আসছে মাটির। বাগানে জবা গাছের ডাল-পাতা কাঁপছে, অপরাজিতার ডগায় কটি প্রজাপতি উড়ছে একভাবেই। একটি ঘুঘু এল, উড়ে বসল শিরীষ গাছের ডালে। মাঠে চড়ুই নেমেছে। ক'টি পায়রাও। শিমগাছের মাচায় কাক। একটা তিতিরও এসে জুটেছে এই দুপুরে, মেঘলা ছায়ায়।

পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর পিছন দিকের বাগানে ওরা এমনিভাবেই রোজ দুপুরে আসে। কিন্তু এমন সুন্দর মনে হয় না রোজ। কোন কোন দিন হয়, কখনো কখনো।

জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলে, কিম্বা দু পা এগিয়ে হাতে তালি দিলেই এক্ষুনি সব উড়ে যাবে। ফর ফর করে পাখা নেড়ে পালিয়ে যাবে। অন্যদিন হলে চন্দনা উড়িয়ে দিত, আজ আর দিল না। বরং মাঠ থেকে বারান্দায় উঠে এল চড়ুই দুটি। গালে হাত রেখে বসে বসে তাই দেখলে চন্দনা। যেন এটা আর পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি নয়—দিল্লীর লোদি রোডের কোন বাড়ি—যে বাড়িতে দুপুরে নিরিবিলি বসে কাক, চড়ুই, তিতির—সব ও দেখতে পারে—সকলকে ও কাছে আসতে দিতে পারে।

ভিজে হাওয়া ছিল এতক্ষণ—এবার বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটা। কাক ডেকে ডেকে উড়ে গেল, পাখার ঝাপটানিতে পালক খসিয়ে পায়রা দুটিও পলাতক। চড়ুই ক'টি ফুলগাছের পাতার আড়ালে ঠাঁই নিলে, তিতিরটা বুঝি অনেক আগেই চলে গেছে। মাঠ ফাঁকা।

সন্ধ্যের পর, চন্দনা যখন তার নিজের ঘরে টেবিলের কিনারায় বুক ছুঁইয়ে বসে, হিস্ট্রির পাতায় তার চোখ—তখন পাশের ডাইনিং রুমে কথা হচ্ছিল। দুই ঘরের মধ্যেকার ভারী পর্দাটা আধ-গোটানো। মাসীকে চন্দনা দেখতে পাচ্ছে না। মেসোমশাইকেও নয়। না দেখলেও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। মেসোমশাই দুধের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছেন। পাশের একটি চেয়ারে মাসী। আর মাসীই বলছেন—তাঁর কথা এমন ফাঁকা ঘরে বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। চন্দনা কান পেতে শুনছে সেই কথা।

—মিলিটারী স্টোরস অ্যাকাউন্টসের চাকরি, তার আর প্রসপেক্ট কি? মাসীর গলা।

—ঠিক জানি না। আছে বোধ হয় কিছু। মেসোমশাইয়ের মৃদু গলায় জবাব।

——আবার 'বোধ হয়' কেন! কি থাকতে পারে, ভাবো, ভেবে বলো। আমার ধারণা কিচ্ছু নেই। বড় জোর আড়াইশো থেকে তিনশ'!

—ওই রকমই হবে!

—অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও কী এমন! ইণ্টারমিডিয়েট পাশ। আই-এ পাশ ছেলে; চাকরি করে কি উন্নতি করতে পারে—তার চান্স কোথায়?

মেসোমশাই চুপ। খস্ করে একটা শব্দ হ'ল। চন্দনা বুঝতে পারলে তিনি সিগারেট ধরালেন। এবং এবার উঠে সোজা বারান্দায় গিয়ে পায়চারি শুরু করবেন।

—চন্দনার পছন্দ হয়েছে নাকি! জিজ্ঞেস করেছ? মেসোমশাই এইবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

—না, করিনি এখনো। আমার নিজের এতে মত নেই।

নেই। নেই। চন্দনা বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে দেওয়ালে তাকাল। ঘড়িতে এবং ক্যালেণ্ডারে। দেওয়ালে আর আলনায়। বিছানায়। কিছু নেই কোথাও আর সে নেই। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ির এই ঘরটি আবার শূন্যতায় ভরে গেছে। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি বারান্দা ছড়িয়ে ম্লান আলো। দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো। আর মাঠের ঘাসে—অন্ধকারে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ে চলেছে একটানা। খুব আস্তে করে মাসীই হয়ত রেডিয়ো খুলে দিয়েছেন, না ভালভের রেডিয়ো। যেন গুন গুন করে কেউ কাঁদছে—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। এবং সন্ধ্যা-বেলার ধূপ জ্বলেছে। মাসী জ্বালিয়েছেন। তার গন্ধ।

চন্দনা যেন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখছে—অসাড় একটি স্টেশনে তার গাড়ি থেমে গেছে। সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। চার পাশে অপরিচয়ের ঠাসবুনোন পর্দা। কেউ নেই, কেউ আসছে না, কারও পায়ের শব্দ নেই। শুধু একটানা ঝির ঝির বৃষ্টি।

রাত্রে খেতে বসে অনেক কষ্টে একটি মাছের টুকরো মুখে তুলেছিল চন্দনা। তারপর ওর প্লেটে মুরগীর চার টুকরো মাংসের সঙ্গে গলার নালি এক টুকরো পড়েছে।

—আমি ভেবে দেখলুম, আই-এ পাশ ছেলের অ্যাকাউণ্টসে কোন প্রসপেক্ট নেই। হওয়া অসম্ভব। না কি চন্দনা, কি বলো তুমি? তোমার কি মত?

মুখ নিচু করেছে চন্দনা। প্লেটের চার টুকরো মাংসের মধ্যে সেই গলার অংশটুকুই ওর চোখে পড়ছে কেবল এবং মনে হচ্ছে—বেশ ভালো করে ওই গলাটুকু কাটা হয়েছে এবং তাতে মশলা, ভাল ঘি, দেড় টাকা সেরের টম্যাটো সবই ঠিক ঠিক পড়েছে।

—না করে দি, কি বল্?

চন্দনা মুখ নিচু করে আস্তে—খুব আস্তে মাথা হেলাল।

বারোটা বেজে গেছে কখন। এখন বোধ হয় একটা। মশারির মধ্যে নরম বিছানায় শুয়ে চন্দনা। চোখ খুলে রেখেছে। এত ঘন অন্ধকারে—একা একা চোখ খোলা যায়। এই নিস্তব্ধতায় নিজের বুকে, গালে, চোখে নিজের হাত দেওয়া যায়। স্পর্শ করে নিজেকেই নিজে বোঝা যায়। বোঝানো যায়।

দিল্লীর মিনার ইতিহাস বইয়ের ছেঁড়া পাতার মতন উড়ে গেছে। বিকাশ সরকারের

জন্যে তিন মাস অন্তর পাঞ্জাবি আর তাঁতের শাড়ি কেনার সখটুকু আর তার হাতে নেই। এখন তার হাতে—হাতের পাশেই বালিশের কিনারায় বেডসুইচটা পড়ে আছে। শব্দ না করেও সে সুইচ টেপা যায় এবং মুহূর্তে এ ঘর আলো হয়ে উঠতে পারে। চন্দনা সেই আলোর মধ্যে ইচ্ছে করলেই শুয়ে থাকতে পারে। চাই কি এখন কলম টেনে সে একটা চিঠি লিখতে পারে উমাকে চুপি চুপি। ভাই উমা, চিঠি লিখছি তোকে—দিদিকে তুই বলিস আমায় যেন একবার নিয়ে যায় পাইকপাড়ার বাড়িতে। এখানে আমার ভাল লাগে না। কথা বলার কেউ নেই। একা শুই—একটি ঘরে। বড় ভয় করে।

ভয় সত্যিই করছে চন্দনার। অন্ধকারের জন্যে নয়। একলা শুয়ে আছে বলে যে, তাও না। তবু ভয়। এই ভয় বাইরের বৃষ্টির মতন ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে। নির্জনতার, নিস্তব্ধতার এই ভয় এবং আশ্চর্য কোন বেদনার। একাকিত্বের দুঃসহ মুহূর্তগুলির অবিরাম ঢেউ গুণে যাবার ক্লান্তি।

টাইমপিস টিক টিক করে বেজে চলেছে। বেজে চলবে। একটু সেণ্ট দিয়েছিল ব্লাউসের বুকে, সেই বিকেলে কাপড় ছাড়ার সময়—এখনো তার গন্ধ আছে—বালিশ তেমনি নরম, চুল তেমনি গন্ধতেলে মাখামাখি, কানের দুলটি ফুটছে, গলার হার বুকে-ব্লাউজে জড়িয়ে গেছে। ক ফোঁটা ঘাম কপালে গলায় জমে উঠেছে।

তবু ঘুমোতেই হবে চন্দনাকে। এবং ভোরে উঠতে হবে। যখন ফরসা হবে আকাশ। দরজা খুলে দিতে হবে বারান্দার। তখন বারান্দার কোণে কুকুরটা ঘুমোবে। কাক ডাকবে, মেহেদী বেড়ার ওপর চড়ুইগুলি এসে জুটবে সেই সকালেই। পাখির ডাক শুরু হয়ে যাবে তখন থেকেই।

পাখির ডাক শুনে শুনে বেলা বাড়বে চন্দনার—যতক্ষণ না মাসী ওঠেন। এবং তার আগেই চন্দনাকে পড়ার টেবিলে বসতে হবে। খড়-কুটো ঠোঁটে চড়ুইগুলো ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে ঢুকবে চন্দনার ঘরে, বাসা বাঁধার আয়োজন করতে।

কিন্তু পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর বিফাট সাজানো ঘরে বাসা বাঁধা সহজ নয়। ঝুল ঝাড়া বাঁশটা হাতে করে মালি এসে ঢুকবে। বেলা আটটাই হোক কি দশটাই হোক, কাঁচের দরজা, শার্সি বন্ধ হয়ে যাবে। আলো আসবে, রোদ্দুর নয়—পাখির ডাক ভেসে আসবে স্কাই-লাইটের ফাঁক একটু ফাঁক দিয়ে, চড়ুই নয়। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বাঁধার জায়গা নেই, মাঠঘাটের আলো আর ধুলোর আমন্ত্রণ নেই।

তাই, কালকের ডাকে কিম্বা পরশুর ডাকে আর এক কোনও দত্ত অথবা বসু কিম্বা দে-র চিঠি আসবে। মাসী সেটা পড়বেন। চন্দনা পাশে বসে থাকতে থাকতে উঠে আসবে পান সাজার ছুতো করে। এবং সন্ধ্যেবেলায় মাসী সারাদিনের খুঁটনো বিচারের পর রায় দেবেন।

চন্দনা জেনে ফেলেছে, অনেক গাছপাতা সরিয়ে—অনেক অন্তরাল অনেক ফিলটারেশানের পরও স্পেকট্রামের আভা নিয়ে যত-দিন না কেউ আসছে—কোন আলো, ততদিন পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে এই ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতায় তাকে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে হবে। এবং আরও নরম, আরও কোমল করতে হবে মুখ, হাত, পা—সাবানের ফেনা আর গ্লিসারিন মেখে। আর পাখির ডাক শুনে শুনে তার সকাল ও দুপুর কাটবে। কুল-কাটা বুকে নিয়ে রাত।

আধুনিক যুগে জীবনের ধারা আমূলে পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিবর্তন এসেছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বা তারও কিছু আগে থেকে। আমরা জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর, এরোপ্লেন ইত্যাদি দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা পেয়েছি, সেই সঙ্গে এসেছে টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, গ্রামোফোন-রেডিও, লাউড স্পীকার, টেলিভিশন। তার উপর বিদ্যুৎ-শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে মানুষ নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কতরকমের ব্যবস্থাই না করেছে।

কিন্তু এই সকল সুখ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতাও বেড়েছে, কারণ প্রতি পদে পদে সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করতে হয়েছে মানুষকে। আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার যুগে মানুষের অভাব-অনটনের মাত্রা বেড়ে দুশ্চিন্তার বোঝা যেন দিন দিন অধিকতর ভারী হচ্ছে।

যাঁর কিছু আছে তিনি ভাবছেন, আরও কিছু হলে ভাল হয় বা যা আছে সেইটুকু বজায় রাখতে (যেমন—চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি) আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তিকে যে পীড়ন (Stress) সহ্য করতে হয়, তার জের এসে পড়ে স্বাস্থ্যের উপর, বিশেষত যখন সেই পীড়ন বৎসরের পর বৎসর শরীর ও মনকে নিপীড়িত করে। এই সভ্যতার পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ শরীরকে ক্রমশ উপযোগী করবার চেষ্টা করে। ফলে কতকগুলি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিবিদ্ (ENDCRINOLOGIST) ডাঃ হানস্ সেলি এই রোগের নাম দিয়েছেন "অ্যাডাপটেশন্ সিনড্রোম", বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "অভিযোজনজনিত লক্ষণসমূহ"।

সভ্যতার পীড়নের উপযোগী করতে গিয়ে মানুষ অনিচ্ছাকৃত ও অজানিতভাবে শরীরের বিশেষ ক্ষতি করে। ফলে দেহের মধ্যে বহু রকমের দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগগুলির বিজ্ঞানসম্মত নাম হল "ডিজেনারেটিভ ডিজিজেস" বা "ভাঙ্গন রোগ"। এই ধ্বংসমূলক রোগের প্রধান ও প্রথম হল কয়েক প্রকারের ব্লাড প্রেসার রোগ (রক্তের চাপ), করোনারী থ্রম্বসিস্ (হঠাৎ হৃৎপিণ্ড বিকল হওয়া), সন্ন্যাস রোগ, বিভিন্ন প্রকার বাত রোগ, কয়েক প্রকার বৃক্কের রোগ (কিডনির রোগ), পাকস্থলীর ক্ষত, একপ্রকার গলগণ্ড (Thyrotoxicosis), বৃহৎ অন্ত্রের ক্ষত এবং কোলাজেন রোগ সকল।

কেবল শরীরের রোগ কেন, সভ্যতার পীড়নে মনের উপর যে চাপ পড়ে তার ফলে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে বহু প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি হয়। যেমন—উৎকণ্ঠার অবস্থা, আতঙ্ক অবস্থা, বিপরীতাবস্থা (CONVERSION STATES) নির্বেদ অবস্থা (Depression and Despondency States), মন হতে উৎপন্ন রোগাবস্থা (PSYCHOSOMATIC REACTION)। মন হতে উৎপন্ন দৈহিক প্রতিক্রিয়া জনিত শেষোক্ত বহু প্রকার রোগ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ও সাধারণ চিকিৎসকগণ বলেন যে, ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হয় প্রধানত মানসিক "পীড়ন" এবং আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রতিক্রিয়া হতে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে মন হতে উৎপন্ন দৈহিক প্রতিক্রিয়াজনিত রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিমতে প্রকাশ যে, তাঁদের রোগীদের মধ্যে শতকরা ১০ হতে ২০ জন ঐ সকল রোগে ভোগেন। ঐ সকলের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হল ঃ— ১। বুক ধড়ফড়ানি, ২। বুকের মধ্যে চাপ বোধ, ৩। বাঁ দিকে বুক ব্যথা, ৪। দমকা দাস্ত, ৫। পাকস্থলীর ক্ষত, ৬। ক্ষুধামান্দ্য, ৭। পেট ফাঁপা, ৮। আমবাত ও কয়েক প্রকারের চর্মরোগ, ৯। হাঁপানি, ১০। মাথা ঘোরা ও চোখে ধাঁধা দেখা ইত্যাদি আরও বহু প্রকারের রোগ যার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। এ ছাড়া "পীড়ন" জনিত মানসিক রোগের উল্লেখ ত আগেই করেছি। এই সকল রোগের উৎপত্তির কারণ কতখানি স্নায়বিক আর কতখানি শরীরের গ্রন্থি সকলের অন্তঃক্ষরণের (হর্মোন) অসাম্যের জন্য, তা এখনও ঠিক জানা যায়নি, তবে ডাঃ হানস্ সেলি যে এই পীড়নজনিত রোগের সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। ডাঃ সেলি ১৯৩৬ সন হতে কানাডার মনট্রিয়েল শহরে শরীর-বৃত্ত বিশেষত অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিরস সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি সহস্র সহস্র মূষিক, গিনিপিগ, বানর ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ারকে পীড়ন দিয়েছেন; যেমন অতি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজ দিনরাত শুনিয়ে কিংবা খুব গরম বা ঠাণ্ডায় বহুক্ষণ করে প্রত্যহ রেখে কিংবা বিশ্রাম না দিয়ে তাদের খাঁচায় অনবরত চলাফেরা করিয়ে
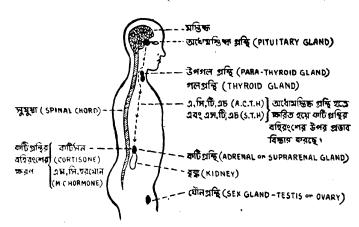
অথবা বিভিন্ন অন্তঃক্ষরিত-গ্রন্থিরস* শরীরের ইনজেকশন দিয়ে বা বহুবার হঠাৎ উত্তেজিত করে। কিছুকাল পরে ঐ প্রাণীদের শবব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন যে, পীড়নের দ্বারা তাদের শরীরে কিরূপ ভাঙ্গন ধরেছে। তিনি অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন, পীড়নের ফলে মানব-দেহেতেও এরূপ অভিযোজন প্রচেষ্টার ফলে ভাঙ্গন জনিত রোগ সঞ্চার হয়।

শরীরে কি পরিবর্তনের জন্য পীড়নের পর ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হয়, তিনি তারও বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন এবং তাঁর গবেষণার ফল যে সত্য তা প্রমাণিত হয়ে গেছে ১৯৪৯ সনে, যখন ডাঃ কেনডেল্ ও ডাঃ হেনচ্ বাত ও অন্যান্য কয়েকটি ভাঙ্গন-জনিত রোগের অত্যাশ্চর্য ফলপ্রসূ কর্টিসোন ও এ, সি, টি, এচ আবিষ্কার করে সেই বৎসরের চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ পান।

ডাঃ সেলি বলেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি পীড়নগ্রস্ত হয়, তখন তার শরীরের মধ্যে সতর্কতার প্রতিক্রিয়া (ALARM—REACTION) সৃষ্টি হয়। প্রথমে আসে চমক (SHOCK) এবং তখনই রক্তের চাপ হ্রাস পায়, শরীরের উত্তাপ কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কমে রক্তের লবণসমূহ এবং শর্করা। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যস্থিত সকল বাধাদানকারী শক্তির সঞ্চার হয়। সেই সময় মস্তিষ্কের শীর্ষদেশে অবস্থিত শরীরের সর্বপ্রধান গ্রন্থি—প্রণালীবিহীন অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি বেশী করে তার দু প্রকার অন্তঃক্ষরণ, এ, সি টি, এচ্ (A. C. T. H.—ADRENO - CORTICOTROPHIC HORMONE) এবং এস, টি এচ্ (S. T. H.—SOMATO-TROPHIC HORMONE) রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে বৃক্কের উপরে অবস্থিত এড্রিনাল বা কটি-গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। কটি-গ্রন্থি দুই অংশে বিভক্ত—মেডালা (MEDULLA) বা কেন্দ্রাংশ এবং কর্টেক্স (CORTEX) বা বহিরংশ। এড্রিনাল কর্টেক্স উত্তেজিত হওয়ার ফলে ঐ অংশের অন্তঃক্ষরণ কর্টিসন ও এম সি রস (M C HORMONE) রক্তের মধ্যে অধিক মাত্রায় ক্ষরিত হতে থাকে। ফলে চমকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। রক্তের চাপ, রক্তের লবণাংশ ও শর্করা এবং মেডালার অন্তঃক্ষরণে এড্রিনালিন রস বর্ধিত হয় এবং শরীরের উত্তাপ বাড়ে। এই অবস্থায় পীড়নের বিরুদ্ধে শরীর প্রাণপণ বাধা দেয়, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার পীড়ন ত ক্ষণস্থায়ী নয়, সেইজন্য বাধাদানকারী ক্ষমতা ক্রমশ অবসাদগ্রস্ত হয় এবং শরীরে অধিক মাত্রায় অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থির এস, সি, টি, এচ্ এবং কটি গ্রন্থির এম সি অন্তঃক্ষরণ রক্তের সঙ্গে চলাচল করে শরীরে ভাঙ্গন জনিত রোগের উৎপত্তির কারণ হয়। মনে রাখতে হবে পীড়ন বলতে ভয় বোঝায় না। পীড়ন বলতে সংঘাত (COMBAT) বোঝায়, যে সংঘাত নিয়ত কোনও বিরুদ্ধ অবস্থায় শরীরকে নিযুক্ত করে এবং সেই সংঘাতের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের কোন উপায়ও ঐ ব্যক্তির ক্ষমতার বাইরে। যার ফলে শরীরকে রুদ্ধ হতাশায় গুমরে মরতে হয়। আধুনিক সভ্যতায় এই পীড়নের উদাহরণের অভাব নেই।

একজন ডেলি প্যাসেঞ্জারের জীবন আলোচনা করা যাক। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাজারে যাওয়া এবং বাজার করে এসেই ছেলেমেয়েকে কিছুক্ষণ পড়ান এবং তারপর স্নান আহার সেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ট্রেন ধরা। ট্রেনে অনেক সময় তাঁকে ভাবতে হয় আফিসের কাজের কথা। আফিসের বহু প্রকার কাজ করে গৃহে ফেরার সময়ও সেই তাড়াতাড়ি। আফিসে শেষ মুহূর্ত অবধি কাজ, তারপর কোন রকমে ট্রেন ধরা। ট্রেনে ভিড়, ভাল করে বসার জায়গা মেলে না, অনেকদিনই দাঁড়িয়ে আসতে হয়। বাড়ি ফিরে এসে অনেকের বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। যদিবা কারও বিশ্রামের স্থান মেলে, তবু বাড়ির গোলমালের জন্য এবং পাশের বাড়ির রেডিওর উচ্চ তানের বা নীচের দোকান ঘরে লাউড স্পীকারের কর্কশ ধ্বনির জন্য স্নায়ুগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে শরীরের মধ্যে পীড়নের সৃষ্টি করে। তার উপর সকল সময়ই অর্থচিন্তা ও নানা সাংসারিক সমস্যা ত আছেই।

---

* অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ঐ গ্রন্থিগুলির কোনও প্রণালী না থাকায় এদের ক্ষরণ সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশের ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির—যেমন অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি, উপগলগ্রন্থি, গলগ্রন্থি, কটিগ্রন্থি, যৌনগ্রন্থি ইত্যাদির ক্ষরণের সমতার উপর ব্যক্তিত্ব (PERSONALITY) ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে। বহিঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলির প্রণালী থাকায় তাদের ক্ষরণ বাইরে কিংবা অন্ত্রের মধ্যে নিষ্কাষিত হয়, এরূপ গ্রন্থি হল,—স্বেদ গ্রন্থি, লালা গ্রন্থি, যকৃত, স্তন ইত্যাদি। আবার কোন কোনও গ্রন্থির বহিঃক্ষরণ ও অন্তঃক্ষরণ দুই আছে, যেমন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (PANCREAS)। এই বহিঃক্ষরণ প্রণালীর দ্বারা গ্রহণীতে প্রবেশ করে পরিপাক করায় ও অগ্ন্যাশয়ের দৈপিক অংশ হতে অন্তঃক্ষরণ সরাসরি রক্তে প্রবাহিত হয় এবং এই ক্ষরণের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়।

সর্বোপরি বেশির ভাগ সমস্যাই দূরীকরণের ক্ষমতার বাইরে। ফলে শরীর ও মন গুমরাতে থাকে এবং শরীরস্থ অন্তঃক্ষরণের অসমতার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে অসমতার সৃষ্টি হয়। এই অসম অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য শরীর নিজেকে উপযোগী করবার চেষ্টা করে এবং ফলে শরীরে ক্রমশ ভাঙন ধরে ও বহু প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। এই সকল রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় রোগগ্রস্তদের বার্ধক্যের পূর্বেই মৃত্যু হয়।

একশত কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য দেশে, দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ "পীড়ন" ছিল না। তখন জীবন-ধারা অনেক মন্থরগতিতে চলত। এত বেশী অভাব ও অনটনও ছিল না। আধুনিক সভ্যতার "পীড়নে"র চাপ পুরুষের উপরই বেশী পড়ে বলে পুরুষরাই অপেক্ষাকৃত বেশী "জেনারেল অ্যাডাপটেশন সিনড্রোমে" ভোগেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পঞ্চাশ বৎসরে হৃদরোগের জন্য মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত দ্বিগুণের অধিক বেড়েছে। এই বৃদ্ধির একটি কারণ "অ্যাডপটেশন সিনড্রোম"।

এই নিবন্ধ পাঠ করে অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে, "আমিও কি আধুনিক সভ্যতার পীড়ন জনিত কোনও রোগে ভুগছি নাকি?" খুব সম্ভব না, কারণ সভ্যতার পীড়নে যদি সকলেই রোগগ্রস্ত হতেন তবে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেত। পীড়নের দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু আরও অনেক কিছুর উপর পীড়ন-জনিত রোগ নির্ভর করে, যেমন বংশগত শারীরিক গঠন, বয়স, পূর্ব-বর্তী পীড়নের জের, খাদ্য ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা। অল্পবিস্তর পীড়নের চাপে অনেকের কার্য-ক্ষমতার স্ফুরণ হয়। ডাঃ সেলিই দেখিয়েছেন যে, পীড়নের প্রথম অবস্থায় দেহের মধ্যে সতর্কতামূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারপর আসে বাধা দানের ক্ষমতা এবং এই সময়ে শরীরের মধ্যে উপযোগিকরণ ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু বেশীদিন "পীড়ন" অবস্থার পর শরীরে অবসাদ জন্মায় এবং তখনই দেহের মধ্যে অভিযোজন ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পীড়ন বহুকাল স্থায়ী হলেই শরীরে ভাঙন ধরে।

এই ভাঙন নিবারণের কোন উপায় আছে কি? পীড়ন উৎপাদক পরিস্থিতি এড়িয়ে চললে ভাঙন জনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পরমায়ু বৃদ্ধি করা কি সম্ভব? আধুনিক সভ্যতার যুগে অনেকের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়।

ঔষধের দ্বারা কি ঐ সকল কিছু লাঘব করা যায়? হ্যাঁ, সম্প্রতি ১৯৫২-৫৩ সনের গবেষণার ফলে ডাঃ সেলি দেখিয়েছেন যে, যদিও শরীরে এ সি টি এচ এর আধিক্যের জন্য শরীরে ভাঙন ধরে তথাপি অন্য-দিকে যদি এস টি এচ এর আধিক্য হয় তবে শরীরের গঠনমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এস টি এচ এর মধ্যে কোষপুষ্টি রস (Growth Hormone) বিদ্যমান আছে এবং এস টি এচ শরীরকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এই এস টি

এচ এর যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা যথেষ্ট আছে এবং ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় এর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হবে। ইঁদুরের মধ্যে মানব যক্ষ্মা সঞ্চার করা খুবই কঠিন, কিন্তু এ সি টি এচ ইনজেকশন দেওয়ার পর ইঁদুরের শরীরে অতি সহজেই মানব-যক্ষ্মা সঞ্চারিত হয়। কারণ যক্ষ্মা নিবারণী ক্ষমতা শরীর থেকে একদম হ্রাস পায়। কিন্তু এই নিবারণী শক্তি আবার ফিরিয়ে আনা যায় যখন ঐ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত ইঁদুরগুলিকে এস টি এচ ইনজেকশন দেওয়া হয়।

এই গবেষণার ফল কতদূর ব্যবহারিক চিকিৎসায় কার্যকরী হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে ভাঙ্গনজনিত রোগ নিবারণে এস টি এচ এর অবদান যে অনেক পরিমাণে হবে সে কথা সুনিশ্চিত.

এ ছাড়া ডাঃ সেলি দেখিয়েছেন যে ভাঙ্গনজনিত রক্তচাপ বৃদ্ধি হলে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড নিয়মিত সেবন করলে ফল পাওয়া যায় এবং ঐ সঙ্গে সোডিয়াম ধাতু (সাধারণ লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড খুব বেশী মাত্রায় আছে) খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার না করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলেছি যে ঐ সকল রোগের নিশ্চিত ফলপ্রসূ কোন চিকিৎসা নেই। ভাঙ্গন জনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মনকে "পীড়ন"-সহনীয় করতে হবে এবং এটা খানিকটা সম্ভব হয় যদি মনকে প্রতিদিন জীবনসংগ্রামের চিন্তা থেকে খানিকক্ষণ রেহাই দিতে পারেন। যেমন—খেলাধুলা করে (অতিরিক্ত ক্লান্তিদায়ক খেলা নয়), খেয়ালী বৃত্তিতে (HOBBY) দিনের খানিকটা সময় কাটিয়ে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে, কিংবা ভগবৎ চিন্তা, উপাসনা করে। সম্ভব হলে বৎসরের মধ্যে ২।১ মাস স্থানান্তরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে শরীরের মধ্যে এ সি টি এচ এর প্রাধান্য কমে এস টি এচ এর অধিকতর সঞ্চার হয়ে ভাঙ্গনজনিত রোগ সঞ্চার নিবারণ করবে।

ডাঃ হান্স্ সেলির গবেষণার ফলাফল "অ্যাডাপটেশন সিনড্রোম" আমেরিকা ও ইউরোপের চিকিৎসকদের ও শরীরবৃত্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং চিকিৎসকগণের অতি পরিচিত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "দি প্রাকটিশনার" এর ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় কেবল পীড়ন সম্বন্ধেই আলোচিত হয়েছে। ঐ সংখ্যার প্রধান লেখক হলেন ডাঃ সেলি।

সুরথ ও সমাধির চিন্তাধারা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ। স্বারোচিষের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চৈত্র। এই চৈত্র বংশে সুরথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন এবং রাজোচিত সকল সদ্গুণেই ভূষিত ছিলেন। তাঁহার শৌর্য বীর্যেরও অভাব ছিল না। তথাপি তিনি রাজ্য হারাইলেন। শূকরভুক যবনগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিল। শত্রু কর্তৃক পরাস্ত হইয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, মাত্র স্বদেশের আধিপত্য তাঁহার করায়ত্ত রহিল। কিন্তু সেখানেও তিনি প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে দুর্বল দেখিয়া দুষ্ট অমাত্যগণ তাঁহার ধন ভাণ্ডার এবং হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি অপহরণ করিল। তখন সেই হৃতসর্বস্ব সুরথ মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বে আরোহণপূর্বক অতি দুর্গম বনে প্রস্থান করিলেন। সুরথ সেখানে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসের শান্তস্বভাব হিংস্র-পশু-সমাকীর্ণ মুনিশিষ্যোপশোভিত তপোবন দেখিতে পাইলেন। মেধস কর্তৃক অভ্যর্থিত রাজা সেই আশ্রমে ইতস্তত ভ্রমণ পূর্বক কিয়ৎ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই তপোবনেই সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে।

ধনবান সমাধি ধনলোভী পত্নী এবং পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কৃতঘ্ন অমাত্য ও স্বজন-বঞ্চিত, রাজ্যহারা এবং গৃহহারা, সমব্যথী সুরথ ও সমাধি পরস্পর বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুইজনের একই চিন্তা, রাজ্যের কথা এবং গৃহের কথা ভুলিতে পারিতেছেন না। মনের এই শোচনীয় দুরবস্থায় দুঃখিত চিত্তে তাঁহারা ঋষি শ্রেষ্ঠ মেধসের চরণোপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং অগ্রবর্তী হইয়া সুরথ মুনির নিকট আপনাদের মনোবেদনা নিবেদন করিলেন।

সুরথ বলিলেন, আমরা অজ্ঞান নই, তথাপি আমাদের এই মোহ কেন? মেধস উত্তর করিলেন, ইহা মহামায়ার প্রভাব, তাঁহার প্রভাবেই সমস্ত জীবের এই অবস্থা। সেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী মহামায়াই এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরমা বিদ্যারূপিনীই মুক্তির হেতুভূতা, আবার অবিদ্যারূপে তিনিই বন্ধনের কারণ, সেই সনাতনী সর্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী। সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন, এই মহামায়া কে? এই প্রশ্ন হইতেই দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর আবির্ভাব। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। চণ্ডীর অপর নাম দুর্গাসপ্তশতী অর্থাৎ এই দুর্গামাহাত্ম্য সাতশত শ্লোকে সম্পূর্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও অপর নাম সপ্তশতী, গীতায়ও সাতশত শ্লোক আছে। চণ্ডী ষট্‌সংবাদ নামেও অভিহিতা।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি সমগ্র মহাভারত পাঠে কতিপয় বিষয়ে সন্দিহান হন। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবসরাভাব দেখিয়া জৈমিনি মার্কণ্ডেয়ের নিকট গমন করেন। প্রশ্ন শুনিয়া মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমার সময় কম, তুমি বিন্ধ্যাচলে যাও, চারিজন মুনিপুত্র—পিতৃশাপে পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামে পক্ষিরূপে তথায় বাস করিতেছে। তপস্যার প্রভাবে তাহাদের পূর্বস্মৃতি লোপ পায় নাই। তাহারা মনুষ্যের মত বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পক্ষিচতুষ্টয় তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে। জৈমিনি বিন্ধ্যাচলে যান এবং পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট স্বীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হন। পক্ষিগণবর্ণিত দেবী মাহাত্ম্যই মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। মেধস, সুরথ ও সমাধি, মার্কণ্ডেয়, তাঁহার শিষ্য ভাগুরি, পক্ষিচতুষ্টয় ও জৈমিনি ইহাই ষট্‌সংবাদ। সুরথ ও সমাধির চিন্তাধারাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সুরথ চিন্তা করিতেছেন—"আমার পূর্ব পুরুষগণের পালিত আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত রাজধানী, আমার অসদ্‌বৃত্ত অমাত্যগণ কি ধর্মানুসারে পালন করিতেছে? আমার সেই সতত মদস্রাবী মহাবল হস্তী এবং তাহার পরিচালক আমার শত্রুগণের বশবর্তী হইয়া না জানি কিরূপ ভোজ্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাহারা আমার প্রসাদলব্ধ অর্থ, আহার্য প্রাপ্ত হইয়া নিত্য অনুগত ছিল, আজ নিশ্চয়ই তাহারা অন্য মহীপতিগণের সেবা করিতেছে। অতি দুঃখে সঞ্চিত আমার ধনভাণ্ডার দুষ্ট অমাত্যগণ অসম্যক ব্যয়ে সতত নষ্ট করিতেছে।"

এইরূপ চিন্তার মাঝখানে সমাধি আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, আপনার নাম কি? এখানে কেন আসিয়াছেন, আপনাকে শোকাকুল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিতেছি কেন?" সমাধি বলিলেন, "আমি জাতিতে বৈশ্য। আমার নাম সমাধি, ধনবানের গৃহে আমার জন্ম। আমার পত্নী এবং পুত্র ধন লোভে সমস্ত অর্থাদি আত্মসাৎ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে, আত্মীয় বন্ধুগণও আমাকে উপেক্ষা করিয়াছে। তাই আমি মনের দুঃখে বনে আসিয়াছি। বনে আসিয়া পত্নীর, পুত্রের, স্বজনাদির কুশল অকুশল কোন সংবাদ পাইতেছি না। তাহাদের গৃহে সম্প্রতি শুভাশুভ কি ঘটিতেছে, তাহারা কিভাবে দিন যাপন করিতেছে, পুত্রগণ সচ্চরিত্র আছে না অসচ্চরিত্র হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন, "ধনলুব্ধ স্ত্রী পুত্রেরা তো আপনাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তথাপি আপনি স্নেহের সহিত তাহাদের কথা চিন্তা করিতেছেন কেন?"

সমাধি বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, আমি নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছি না। ধন লোভে যাহারা পিতৃ স্নেহ, পতিপ্রেম ও বন্ধু প্রীতি বিস্মৃত হইয়া আমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, মন আমার তাহাদের প্রতিই অনুরক্ত রহিয়াছে। তাহাদের জন্যই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে, তাহাদের জন্যই বিচলিত হইয়াছি। সেই প্রীতিহীন স্বজনগণের প্রতি আমার মন কিছুতে কঠোর হইতে পারিতেছে না।"

সুরথ আপনার রাজধানীর কথা ভুলিতে পারিতেছেন না। হাতিটি সুরথের প্রিয় ছিল, তিনি তাহার পিঠে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বনে আসিয়া হাতির কথাও মনে পড়িতেছে। প্রসাদ-ধন-ভোজনে যাহারা অনুগত ছিল তাহারা এখন অপরের আনুগত্য করিতেছে, এই চিন্তায় রাজা উৎকণ্ঠিত। বিরাট ধনভাণ্ডার, অতি কষ্টেই যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন অপরের হস্তে অসদ্‌ব্যয়ে এবং অমিতব্যয়ে তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে, এই চিন্তায় তিনি কাতর। ইহা একজন বিত্তবান বিলাসীর বিগত স্মৃতির অলস রোমন্থন। ইহা মানুষের সুস্থচিন্তা নহে।

অর্জুনের চিন্তাধারা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। যে দুর্যোধন তাঁহাদিগকে অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়াছে, বনে পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত হয় নাই, সেখানেও অবমাননায় বহুরূপে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চাহিয়াছে, তাহার ক্রোড়ে বসাইতে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে,—সেই দুর্যোধনকে রণক্ষেত্রে পাইয়াও অর্জুন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। ভীষ্মদ্রোণকে রণক্ষেত্রে দেখিয়া ধর্মযুদ্ধে সঙ্কুচিত হইতেছেন। সুরথের শত্রু দূরে, অর্জুনের শত্রু সম্মুখে। সুরথ একাকী, অর্জুন সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সেনাপতি। সুরথের চিন্তায় রাজ্যোদ্ধারের ছায়ামাত্রও নাই। অর্জুন রাজ্যোদ্ধার চাহেন, তবে স্বজন এবং গুরুবর্গকে হত্যা করিয়া রাজ্যোদ্ধারের কামনা করেন না। সুরথ শত্রুগণের অজ্ঞাত স্থানে বনে অবস্থান করিতেছেন, অর্জুন শত্রু সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সুরথের দ্বন্দ্ব মাত্র অন্তরে, অর্জুনের অন্তরে বাহিরে সমান দ্বন্দ্ব। অর্জুনের পলায়নের পথ নাই, রণে বিমুখ হইলে অ-যশ তো আছেই, অদৃষ্টে আর কি ঘটিবে তাহারও স্থিরতা নাই, ক্রূরকর্মা দুর্যোধনের অকরণীয় কি আছে? অর্জুন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে গুরুরূপে পাইয়াছিলেন। সুরথও সজ্জনের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাই মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে "মহাভাগ"—পরম ভাগ্যবান বলিয়াছেন। মহর্ষি মেধসের কৃপায় সুরথ মহামায়ার মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছিলেন। মেধসের উপদেশে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাই তো পরজন্মে সূর্য-পুত্র সাবর্ণি মনুরূপে সুরথ অখণ্ড সাম্রাজ্যের,—চতুর্দশ ভুবনের আধিপত্য পাইয়াছিলেন।

সুরথের চিন্তা তাঁহার রাজধানী, প্রিয় হস্তী, প্রসাদভোজী স্বজন ও অর্থভাণ্ডার লইয়া আবর্তিত হইতেছে। সমাধির চিন্তার সামান্য স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি বিত্তবান বৈশ্য। জাতিতে বৈশ্য, আবার ধনীজনের বংশে জন্ম; সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্যের একটা ঐতিহ্য রহিয়াছে। বৈশ্য বিত্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু বিত্তের কথা দণ্ডের জন্যও তাঁহার চিত্তে স্থান পাইতেছে না। তাঁহার সর্বদা মনে হইতেছে তাহাদের কথা—যাহারা সেই বিত্ত লুণ্ঠন করিয়াছে, যাহারা বিত্ত লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এবং ইহারা অপর কেহ নহে ইহারা তাঁহার পত্নী, পুত্র ও অপরাপর আপনার জন। বৈশ্য বার বার ইহাদেরই কথা স্মরণ করিতেছেন। ইহাদের ভালমন্দের কথা ভাবিয়াই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বিষয়-চিন্তা হইতে সঙ্গ, আসঙ্গলিপ্সা হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ ক্রোধ হইতে সম্মোহ, তাহা হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধি-নাশ হইতে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈশ্যের এই মোহ তাহা হইতেও নিকৃষ্টতর কিছু। ইহা উদারতা নহে, অনুকম্পা নহে, ক্ষমাও নহে। তথাকথিত মমতার ছদ্ম আবরণে এই যে অন্যায়কে প্রশ্রয়দানের ক্ষুদ্র হৃদয়, দৌর্বল্য, ইহাও ক্লৈব্য।

সুরথের রাজ্য গিয়াছে। রাজ্য যাহারা কাড়িয়াছে, তিনি তাহাদের কথা চিন্তা করেন না। চিন্তা করেন রাজধানীর কথা, বাহনের কথা, ধনভাণ্ডারের কথা। সমাধি গৃহতাড়িত, লুণ্ঠিত-সর্বস্ব। কিন্তু তিনি গৃহের কথা, আপনার সর্বস্বের কথা চিন্তা করেন না। মমতার সহিত চিন্তা করেন, যাহারা তাঁহাকে গৃহহীন করিয়াছে, সর্বস্বহীন করিয়াছে, তাহাদের কথা। ইহার সঙ্গে অর্জুনের হৃদয় দৌর্বল্যের সম্বন্ধ আছে। অর্জুনের ক্ষেত্র বৃহত্তর, ইহাদের ক্ষেত্র স্বল্প পরিসর। তথ্যের দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলেও তত্ত্বের দিক দিয়া উভয়ত ঐক্য রহিয়াছে। গীতা এবং চণ্ডী যেমন একে অন্যের পরিপূরক গ্রন্থ, সুরথ, সমাধি এবং অর্জুনও তেমনই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ভগবৎ শরণাগতির দিক দিয়া যেমন, মানবের চিরন্তন চিন্তাধারার দিক দিয়াও তেমনই ইহার আলোচনার আবশ্যকতা আছে।

খাণ্ডব বিজয়ী অর্জুন, নিবাত কবচ সংহারকারী অর্জুন, বাহুযুদ্ধে পশুপতিকে পরিতুষ্টকারী অর্জুন,—এ হেন অর্জুন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে আসিয়া বলিয়া বসিলেন—"আমি যুদ্ধ করিব না।" শ্রীভগবান তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছেন। কি করিতে হইবে তাহার সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্মফলে
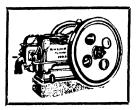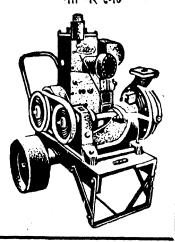
তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি যাহা কিছু করিবে, তোমার খাওয়া, শোওয়া, বসা, চলা সমস্ত আমাকেই অর্পণ কর। সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব ইত্যাদি।

চণ্ডীতে স্পষ্টত সেরূপ উপদেশ কিছু নাই। চণ্ডীর তিনটি চরিত্রে মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধ আখ্যান ভাগের মধ্যে, ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তবাবলির মধ্যে, দেবীর আবির্ভাব রহস্যে তাহা গূঢ়াহিত রহিয়াছে। দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি অপর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, তিনটি যুদ্ধের বিবরণই প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই সুরথ এবং সমাধির হৃদয়বেদন উপশমের রসায়ন আছে। যাঁহাকে দেখিলে হৃদয় গ্রন্থিভেদ হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, চণ্ডীতে সেই পরমা প্রকৃতিকে দেখিবার সংকেত অঙ্কিত রহিয়াছে। আচার্যগণ এইজন্য চণ্ডীর প্রথম চরিত্রের নামকরণ করিয়াছেন—ব্রহ্ম গ্রন্থিভেদ. দ্বিতীয় চরিত্রের নাম দিয়াছেন—বিষ্ণু গ্রন্থিভেদ এবং তৃতীয় চরিত্রের অভিধা দিয়াছেন—রুদ্র গ্রন্থিভেদ। এই গ্রন্থিত্রয়ের উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র বলিতেছেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি।"

গীতায় যেমন তিন ষটকে কর্ম ভক্তি জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইয়াছে, চণ্ডীরও তিনটি চরিতে তেমনই কর্ম ভক্তি জ্ঞানের ব্যাখ্যা আছে। আচার্যগণ এই তিনটি চরিতকে তিন ব্যাহৃতিরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম চরিতে "ভূ" এই ব্যাহৃতির ছন্দ গায়ত্রী, ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, তত্ত্ব অগ্নি। দ্বিতীয় চরিতে ব্যাহৃতি "ভুবঃ" ইহার ছন্দ উষ্ণিক, ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, তত্ত্ব বায়ু। তৃতীয় চরিতে ব্যাহৃতি "স্বঃ", ছন্দ অনুষ্টুপ, ঋষি রুদ্র, দেবতা মহাসরস্বতী, তত্ত্ব সূর্য।

একদিকে চণ্ডী, অপর দিকে গীতা, ইহারই মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। চণ্ডী এবং গীতার সমন্বয়ের আলোকেই শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিভাত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চণ্ডীতে সেই বিষ্ণুমায়া যোগমায়ার মাহাত্ম্যই পরিকীর্তিত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা, লীলার পোষণে এবং প্রসারে যাঁহারা একমাত্র সহায়,—সেই গোপীগণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জঙ্গম প্রতিমা। সুতরাং চণ্ডী এবং গীতার সাহায্য ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্যের মর্মোদ্ভেদ হয় না।

কালচক্র আবর্তিত হইতেছে। আজ যাহা ভবিষ্যৎ, আগামীকল্য তাহা বর্তমান, আজ যাহা বর্তমান, কল্য তাহা অতীত। সুতরাং কলা-কাষ্ঠ-মুহূর্ত দিয়া অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন কাল প্রবাহের পরিমাপ হয় না। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে চণ্ডী অতীত, গীতা বর্তমান এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভবিষ্যৎ। যাহা হইয়াছে তাহাই চণ্ডী, যাহা হইতেছে তাহাই গীতা, যাহা হইবে তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। অথচ এই তিনই নিত্য সত্য ত্রিকাল সত্য। পাত্রভেদে মানব জীবনে চণ্ডী গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আবির্ভাব ঘটিতেছে। ইহার পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা বাতুলতা। সংসারের মোহবন্ধ জীব আমরা। আমাদিগকে সুরথের—বিশেষ করিয়া সমাধির চিন্তাধারার অনুসরণে আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে। সাবধান হইতে হইবে। কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে হইবে—শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে। সর্বস্যার্তি-হরে দুর্গে নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

লবীথি

আলোকচিত্রী শ্রীনীরোদ রায়

TRADE
MARK

ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ক্রমবিকাশ

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

রতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নাট্য-আন্দোলনের ধারা পর্যালোচনা করলে একটা মস্ত নানাদৃশ্য চোখে পড়ে। থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি, এদেশের সর্বত্র তার পত্তন হয়েছে ইংরেজি শিক্ষার ভিতের ওপর। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে অভিনয় চতুঃষষ্ঠী কলার অন্যতম বলে পরিগণিত হলেও, ইংরেজ আধিপত্যের প্রাক্কালে তা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার সঙ্গে আজকের থিয়েটারের আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাই যদি বলি যে, পাদপ্রদীপের আহ্বান ভারতবাসীর অন্তর-প্রান্তে এসে পৌঁছেচে আধুনিকতার সাঁকো বেয়ে, তাহলে খুব ভুল হবে না।

বাঙলাদেশ ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসেছিল সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশী। তাই ইংরেজদের অনুকরণে থিয়েটারের গোড়াপত্তন হয় বাঙলারই পলিমাটিতে। বিদেশী শাসকরা অবশ্য নিজেদের অবসর বিনোদনের জন্য তাঁদেরই মাতৃভাষায় অভিনয়ের আয়োজন করতেন। তাই দেখেই এদেশের ইংরেজনবীশদের মনে বাঙলা থিয়েটারের সূত্রপাত।

বাঙালীর গোড়ার হাতে-খড়ি কিন্তু ইংরেজি নাটকের মাধ্যমেই। তার প্রধান কারণ বাঙলা নাটকের অভাব। থিয়েটারই নেই, তার উপযোগী নাটক হবে কোথা থেকে? প্রথমটায় তাই সেক্সপীয়ার ও তাঁর সধর্মীদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তার পর ডাক পড়ল সংস্কৃতবিদ্ পন্ডিতদের। বাছা বাছা সংস্কৃত নাটকের তর্জমা হতে লাগল বাংলা ভাষায়। কিন্তু তাতেও মন ভরল না। তখন এলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর "কুলীন কুলসর্বস্ব" নাটক নিয়ে। এই হল বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক।

অভিনয় ব্যবস্থাও এমনিভাবে ধাপে ধাপে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। প্রথমে হিন্দু কলেজের বার্ষিক উৎসবে বাঙালী ছেলেরা সেক্সপীয়ারের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে। তারই জের চলল তখনকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। তারপর ধনীর বিলাসকক্ষে তার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। এই সময়ে সকলকে চমকে দিলেন শ্যামবাজারের নবীন বসু তাঁর গৃহে "বিদ্যাসুন্দরে"র অভিনয় আয়োজন করে। **বাংলা ভাষায় এই অভিনয় হয়েছিল** এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়। যেমন, রাজসভা বসেছিল নাচঘরে এবং সুড়ঙ্গের দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাড়ির সংলগ্ন বাগানে। মঞ্চের ওপর দৃশ্য-পরিবর্তনের বদলে দর্শকদেরই স্থান-পরিবর্তন করতে হয়েছিল প্রতিটি দৃশ্যে।

দর্শনী নিয়ে প্রথম বাংলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন একজন রুশ প্রমোদ-ব্যবসায়ী—লেবেডফ্। এখন যেখানে লাল-বাজারের পুলিস দপ্তর, আগে তার নাম ছিল ডোমতলা। সেখানেই বসেছিল লেবেডফের থিয়েটার।

এ সব প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। বাঙলা দেশের কৃষ্টির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে এ সব ঘটনা লেখা থাকবে। তারপর পত্তন হল পেশাদারি থিয়েটারের—আজ থেকে ঠিক ৮২ বছর আগে। দীনবন্ধু মিত্রের "নীল-দর্পণ" নিয়ে এদেশের প্রথম পাবলিক থিয়েটার—ন্যাশনাল থিয়েটার—দরজা খুলল সর্বসাধারণের জন্যে।

সে দরজা আজও বন্ধ হয় নি। ন্যাশনাল থিয়েটার অবশ্য নেই,—তারপর অন্য অনেক
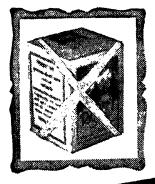
শরতের
আবাহনে
আরতী
স্নো
সকল আবহাওয়ার প্রসাধনী
আরতী প্রডাকটস্
কলিকাতা-৩৬

প্রতিষ্ঠান গড়েছে এবং ভেঙেগেছে,—কিন্তু নাট্যাভিনয়ের যে প্রবাহ সেদিন শুরু হয়েছিল, তা শুকিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সারা দেশে তার রসধারা ছড়িয়ে পড়েছে। এই ৮২ বছর ধরে বাঙলার পেশাদারি থিয়েটার নিয়মিতভাবে নাট্যসুধারস পরিবেশন করে আসছে নাট্যামোদীদের কাছে। সারা ভারতবর্ষে এমনটি আর কোথাও ঘটেনি। থিয়েটার গড়ে উঠেছে প্রায় সকল প্রদেশেই,—কোথাও বা তার শতবার্ষিকীও হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ের মত একাদিক্রমে এতদিন ধরে নিয়মিত অভিনয় করবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। বাঙালীর অন্যান্য সৃজনী-প্রতিভার সঙ্গে তার নাট্যখ্যাতিও তাই আজ সারা দেশের আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

বাঙলার থিয়েটার নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে দেশের মর্মস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সিনেমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তার গতিরোধ করতে পারে নি। এমন দিনও গেছে যখন শুধু কলকাতাতেই পাঁচটি সাধারণ রঙ্গালয় একসঙ্গে চলেছে— এবং ভালভাবেই। জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে থিয়েটারের সংখ্যা কমেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নাট্যামোদীদের আস্থা বাঙলা রঙ্গমঞ্চ হারায় নি। তার আধুনিকতম প্রমাণ—স্টারে "শ্যামলী" নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং নবসংস্কৃত রঙমহলের পুনরুদ্ভব। এই দুটি ঘটনাই বাঙলা রঙ্গালয়ের অফুরন্ত জীবনীশক্তির সঙ্কেত।

এতক্ষণ শুধু বাঙলা থিয়েটারের কথা

বলেছি। এইবার অন্যান্য প্রদেশের নাট্যশালার বিষয় আলোচনা করা যাক।

বাঙলাদেশের পরই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের নাট্যশালা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এদের পত্তন—মাত্র দু'একবছরের ব্যবধান এদের বয়সে। গোড়ার দিকে মারাঠী থিয়েটারের নাটক ছিল সঙ্গীতধর্মী। ক্রমে ক্রমে তার রূপান্তর হতে লাগল গদ্যের দিকে। বাঙলা নাট্যশালার মতই প্রথমে সেক্সপীয়ার ও অন্যান্য ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করে মারাঠী দর্শকের নাটকের ক্ষুধা মেটাতে হল। রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতে লাগল সঙ্গীতপন্থী ও গদ্যপন্থীদের মধ্যে নাটকের ধারা নিয়ে। অনেক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকও অনূদিত হয়ে এই দুই ধারার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ইন্ধন জোগাতে লাগল। কালক্রমে কিন্তু জয় হল গদ্যপন্থীদেরই। এর মূলে অবশ্য ছিল কয়েকজন শক্তিশালী মারাঠী নাট্যকারের আবির্ভাব।

গোড়ার যুগে মারাঠী নাটকের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হত পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে। তারপর ধীরে ধীরে সামাজিক কাহিনী বলা সুরু হল নাটকের মধ্যে। সমসাময়িক রাজনীতিও বাদ পড়ল না। লর্ড কার্জনের

আমলে 'কীচক বধ' নামক বাহ্যতঃ পৌরাণিক একটি নাটক মারাঠীভাষীদের মধ্যে এমন উত্তেজনার সঞ্চার করল যে, সরকারী আদেশে তার অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। বাঙলা দেশের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে মারাঠী থিয়েটারের অদ্ভুত মিল আছে।

গুজরাটী নাট্যশালার অগ্রগতিও অনুরূপ পথে হয়েছে। এক বিষয়ে কিন্তু মারাঠী-দের টেক্কা দিয়েছে গুজরাটীরা। দেশী নাটক-সমাজ নামে একটি গুজরাটী নাট্যসম্প্রদায় গত ৬০ বছর ধরে অভিনয় করে আসছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি বোম্বাই সহরে সপ্তাহে চারদিন করে অভিনয় করে। কলকাতার বাইরে এরকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

আর এক ব্যাপারেও বাঙলার সঙ্গে গুজরাটের নাট্য-আন্দোলনের তুলনা করা যায়। এখানকার মত বহু অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় গুজরাটী রঙ্গমঞ্চের সমৃদ্ধি সাধন করছে পরীক্ষামূলকভাবে নূতন ধরণের নাটকের অভিনয় করে।

আমেদাবাদে নটমণ্ডল নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নূতন নূতন অভিনয়শিল্পী গড়ে তোলা। এখানকার শিল্পীদের অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত মাসিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এবং তাঁদের দিয়ে নূতন ধরণের নাটক অভিনয় করান হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এদেশে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

হিন্দী এবং উর্দু নাটকের ঐতিহ্য এদের তুলনায় অনেক কম। পার্শী থিয়েটারের আমলে দৃশ্যপটের জাঁকজমক, সাজপোষাকের বাহার এবং নৃত্যগীতের বাহুল্যই ছিল এর প্রধান উপজীব্য। আগা হাসার কাশ্মিরী প্রমুখ কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারের আবির্ভাবে খানিকটা মোড় ঘুরেছিল এই ধারার, তবে নাট্যরচনায় মৌলিকত্ব এবং নূতন চিন্তাধারার অভাবে তাঁরা কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেন নি হিন্দুস্থানী রঙ্গমঞ্চে।

সম্প্রতি চিত্রাভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের পৃথ্বী থিয়েটার খানিকটা উৎসাহের সঞ্চার করতে পেরেছে হিন্দীভাষী জনসাধারণের মনে। বর্তমান সমস্যামূলক নাটক লিখিয়ে এবং আধুনিক রুচিসম্মতভাবে তাদের অভিনয় করে পৃথ্বী থিয়েটার সারা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জনসমর্থন লাভের এবং রসিকচিত্ত জয় করবার এইটেই হ'ল গোড়ার এবং শেষের কথা।

পূজায় সুন্দর উপহার
THE RAVALGAON SUGAR FARM
রাবলগাঁও
টাফী এবং স্বীটস্
চকলেট কোকোনাট স্লাইসেজ ● ফেন্সি এক্স্ট্রা স্ট্রং ● বেষ্ট মিল্ক টফি ● বেষ্ট সুইটস্ বয়েল্ড গুডস্ ● পার্ল ক্যান্ডি ইত্যাদি।
সোল এজেন্ট ঃ
মতিলাল গিরধারীলাল আঘারকর,
৪, মন্দির ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

আপনার প্রিয় চিত্রগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষায়!
চন্দ্রাবতী - ছবি - জহর - রবীন - সাবিত্রী
শম্ভু মিত্র - বীরেন ও নবাগতা রূপা অভিনীত
আর্ট সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া নিবেদিত
বিজ্ঞান ও বিধাতা
বুকিং কেন্দ্র—আর্ট সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়া
রক্সী সিনেমা বিল্ডিং ঃঃ কলিকাতা
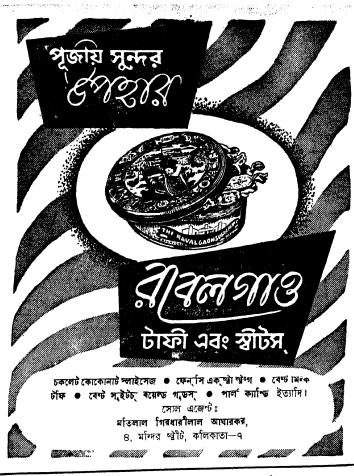
উন্নতির
আর এক ধাপ
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে "শ্রীদুর্গা" উন্নতির পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সম্প্রসারণের জন্য ক্রীত স্পিনিং ও উইভিং-এর যন্ত্রপাতি বসাবার কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে — ফলে "শ্রীদুর্গা"র সমৃদ্ধিও দিন দিনই বেড়ে চলছে।
শ্রীদুর্গা
কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ

সেন্সরের দৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায়

পঙ্কজ দত্ত

ইংরেজ রাজত্বে যা খুশি জিনিস যেমন খুশি রূপ দেবার অবাধ স্বাধীনতা না থাকায় দুঃখ যতো না ছিল তার চেয়ে বেশি সুবিধে ছিল ঐ দোহাইটাকে শিল্প-সাহিত্যোত্তীর্ণ ছবি তোলার অক্ষমতাকে ঢাকা দেবার সুযোগ বলে ধরে নেওয়ার। বাঁধা-বাঁধি এত রকমের ছিল এবং সাময়িক অবস্থা অনুসারে নতুন বাধা-নিষেধও যদেচ্ছ যেভাবে প্রযুক্ত হতো তাতে সুসংগত ভালো ছবি তৈরী না হওয়ার কারণটাই শুধু জানতে চাওয়া ছিল একটা বিড়ম্বনা। তাছাড়া সে-আমলে একই ছবির বিষয়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সেন্সর বোর্ড আলাদা আলাদা অর্থ করে বসতো। সে সময়ে কলকাতার সেন্সর হয়তো কোন একখানি ছবির প্রদর্শন অনুমোদন করেছে, কিন্তু দেখা গেল, বম্বে কি মাদ্রাজ কি পাঞ্জাব, অন্য এক সেন্সর বোর্ড তাদের এলাকায় সেই ছবিখানিই প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। "'৪২" ছবিখানি যখন হয়, তখন দেশ স্বাধীন হলেও কার্যত সেই পূর্বতন সেন্সর রীতিই বহাল ছিল। সে সময়ে দেখা গিয়েছিল, কলকাতার সেন্সর ছবিখানি অনুমোদন করতে না পারলেও বম্বের সেন্সর বোর্ড থেকে অনুমোদনপত্র নিয়ে ছবিখানি ভারতের আর সর্বত্র প্রদর্শিত হতে থাকে। এই সব অসম ব্যবস্থা দূর করার জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের তরফ থেকে ফরিয়াদ উঠলো। কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট একটা নতুন কোড প্রণয়ন করলেন; ঠিক হলো ভারতের কোন আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ড কোন ছবির প্রদর্শন অনুমোদন করলে তা ভারতময় সেই প্রথম অনুমোদনপত্রের জোরেই দেখানোতে কোন বাধা থাকবে না। সম্প্রতি অবশ্য ছবির প্রদর্শন ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় আইনের আওতা ছেড়ে রাজ্য আইনের হাতে এসে পড়েছে। অর্থাৎ এবার থেকে ছবি কেবলমাত্র সেন্সর করার কাজটাই রইলো কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের হাতে, কোথাও কোন ছবি দেখাতে দেওয়া-না-দেওয়ার মর্জি থাকছে রাজ্য সরকারগুলির হাতে। সুতরাং, আগেকার সেই গোলমাল—এক আঞ্চলিক সেন্সরের অনুমোদনের জোরে অন্য যে কোন রাজ্যে কোন ছবি দেখানোর অবাধ স্বাধীনতা প্রযোজকদের আর রইল না। অন্তত সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় "পশ্চিমবঙ্গ চিত্রগৃহ (নিয়ন্ত্রণ) আইন" পাশ করা নিয়ে বিতর্ককালে যেসব কথা হয়েছে, তা থেকে ও-রকম ধারণা হওয়া অবান্তর নয়। যাক, এটা অন্য কথা। এখানকার আলোচ্য হচ্ছে ছবি অনুমোদন করার অথবা অনুমোদনের যোগ্যতা অর্জনের নিরীখ বিচার করা।

বর্তমান ব্যবস্থায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের অধীনে তিনটি আঞ্চলিক শাখা। কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে। ছবি বিচারে সহায়তা করতে একটি নৈতিসূচক নীতি-মালা বা কোডও আছে আঞ্চলিক বোর্ড তিনটির নির্দেশস্বরূপ। ছবিতে কি-কি থাকতে দেওয়া হবেনা বা দেওয়া যায় না,

প্রেম-ভক্তিমূলক জীবনী-চিত্র, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের "জয়দেব"-এর নাম ভূমিকায় অসিতবরণ ও পদ্মাবতীর ভূমিকায় দেবযানী

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের
অন্ন নাহিক জুটে,
যা আছে মোদের, এনেছি সাজায়ে
জীর্ণ পর্ণপুটে,
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চির দারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে।
—রবীন্দ্রনাথ
সূরযমল নাগরমল
কলিকাতা।

...রেই এক ... । এই ... ...লা আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্য ... প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ...লা হয়েছে : ১। দর্শকদের নৈতিক ...ন নীচু করে দেবার সম্ভাবনা আছে, এমন ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে না; ২। কাহিনীতে যে দেশ ও লোকের কথা রূপায়িত, সেই দেশ ও লোকের জীবনের মান এমনভাবে প্রতিফলিত করা যেন না হয়, যা দর্শকদের ...তিকতাকে ব্যাহত করবে; ৩। প্রচলিত আইনকে এমনভাবে যেন বিদ্রূপ করা না হয় যাতে সেই আইন ভঙ্গের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক হতে পারে। এটা হলো প্রবর্তিত আইনের স্পষ্ট নির্দেশ। এই নির্দেশমত আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডগুলি কিভাবে ছবির বিচার করেন সেটা দেখবার বিষয়।

আইনে যে 'ধারা' 'উপধারা' সন্নিবেশিত রয়েছে, তা সাধারণভাবে দিশী ও বিদেশী সকল শ্রেণীর ছবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্তত বিদেশী ছবি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করা হবে এমন কোন কথা কোথাও নেই। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, বিদেশী ছবির বিচারে সেন্সর নিরন্তর নরম এবং আইন প্রয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত বা শিথিল। যে দেশের এবং যেখানকার লোকদের নিয়ে গল্প সেই দেশের ও সেই ব্যক্তিদের আচার আচরণ অনুযায়ী ছবির বিচার করা হয়। এই নির্দেশ অনুসারে চুম্বন, প্রায়নগ্ন পোশাক এবং এমন সমস্ত কথা ও আচরণ বিদেশী ছবিতে থাকতে দেওয়া হয়, যা আমাদের দেশের জীবনের সামাজিক ও নৈতিক মান অনুযায়ী অশিষ্ট ও অশ্লীল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় নিছক কল্পনারাজ্য নিয়ে, তখনই বিষম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে এদেশের প্রযোজকরা। আরব্য রজনীর দোহাই দিয়ে নিছক আদিরসাত্মক ছবি বিদেশ থেকে আসে প্রচুর এবং প্রায় সবই সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমোদন নিয়ে দেখানোও হয় অবাধে। সে সব ছবি ওদের দেশেও যেমন কল্পনারাজ্যের উপাখ্যান, তেমনি আমাদের কাছেও। অথচ এদেশের কেউ কল্পনার রূপকথায় বিদেশী ছবির অনুকরণে ওদের তুলনায় অতি সামান্য আদিরসাত্মক কিছু দেখালে সেন্সরের কাঁচি থেকে তার নিস্তার নেই। এ একটা বিসদৃশ ...রবৈষম্য, যার কোন যুক্তি পাওয়া যায় ... তাছাড়া এমন অজস্র উদাহরণও দেওয়া ...তে পারে, আমেরিকার মতো ...লতার মাত্রা সম্পর্কে অতি উদার ...ও যে-ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও ... অসমীচীন বলে মনে করেছে, ...মন ছবিও আমাদের সেন্সর সর্বসাধারণ্যে ...ধ প্রদর্শনে অনুমোদন করেছে। বিদেশী ...দিশী ছবির বিচার-ব্যাপারে বৈসাদৃশ্য ... অসঙ্গতির আর অন্ত নেই এবং এখন ... ইংরেজ আমলের চেয়েও উৎকট হয়ে
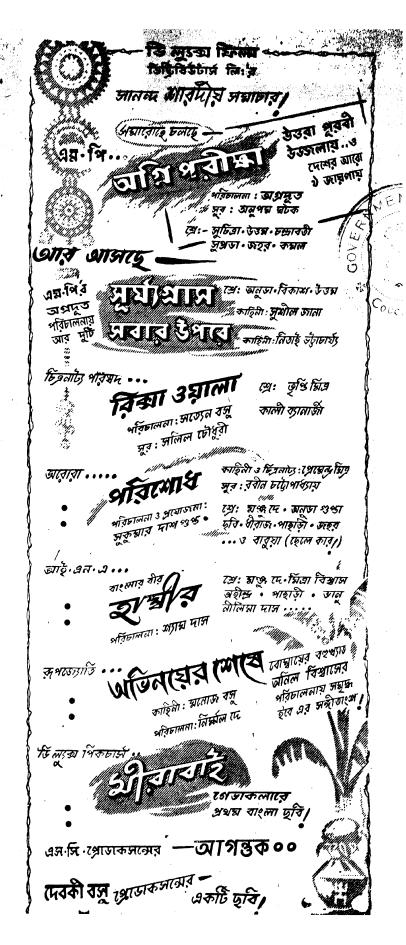
প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত "পরিশোধ" চিত্রে মঞ্জু দে ও অনুভা গুপ্তা

দিশী ও বিদেশী ছবি একই মানদণ্ডে বিচার করা হবে; কিন্তু কার্যত এই নির্দেশ প্রবর্তিত হবার পরও আগের বিচাররীতির কোন ব্যতিক্রমই দেখা যায় না।

অপরপক্ষে দিশী ছবির বিচারে কোন একটা নিরীখ বা আইন প্রবর্তিত কোড মেনে চলা তো দূরের কথা, আঞ্চলিক বোর্ডগুলি নিজেদের খেয়াল-খুশিমতই কাজ করে যাচ্ছে। ফলে চিত্র-নির্মাতারা মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছেন। হয়তো একখানি ছবিতে দেখা গেলো, বম্বের সেন্সর 'শালা' কথাটায় আপত্তি করেননি। এই দেখে কলকাতার কোন প্রযোজক তার ছবির কোন জায়গায় 'শালা' কথাটা হয়তো রেখেই দিলেন নিঃসংশয়ে, কিন্তু দেখা গেল, কলকাতার সেন্সর ও-শব্দটিতে আপত্তি জানিয়ে বসেছেন। বম্বের কোন ছবিতে হয়তো কামোদ্দীপক পোশাক ... কলকাতার কোন প্রযোজক তাঁর ছবিতে ঐরকম কিছু যুক্ত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল কলকাতায় সে অংশে সেন্সরের কাঁচি চলে গিয়েছে। আর সেন্সরের কাছে কখন কোন্ ছবির কোন্ অংশ যে আপত্তিকর হবে তা আজকাল বুঝে ওঠা মুশকিলও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত সেন্সরের কাছে যা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হচ্ছে আজকাল তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে।

হিন্দী "আনন্দমঠ" ছবিখানিতে দেখা যায়, সেন্সরের কাঁচি পড়েছে একটা অংশে, যেখানে দরবারে নাচগানের দৃশ্যে নবাব এক নর্তকীকে কোলের ওপরে ফেলে তার পিঠে গানের তাল দিতে থাকে। ঐ ছবিতেই সত্যানন্দের শিরে নবাবের এক সিপাহীর পদাঘাত করার অংশ বাদ দিতে হয়েছে। "তিন বাতি চার রাস্তা"তে নায়িকা কোকিলা বেতারে গান গেয়ে তার কৃতিত্ব

প্রকাশ করার পর ঘোষণা করা হয় "আবুসে কোকিলা হুস্তেমে দো বার গায়েঙ্গী"—এই ঘোষণাটি বাদ দিতে হয়েছে। "মদমস্ত" ছবিখানির সংলাপে "য়্যাসী কী ত্যায়সী" এবং 'কালি কালি কলকত্তাওয়ালী' কথা রাখতে দেওয়া হয়নি। "বিষবৃক্ষ"তে দেখা যায়, সেন্সর 'মাগী' ও 'শালা' শব্দ দুটিতে আপত্তি জানিয়েছেন; ওর বদলে ব্যবহার করতে দিয়েছেন যথাক্রমে 'বেটা' ও 'বেটি'। "ভোর হয়ে এলো"তে 'মাগী' এবং "মীমাংসা"-তে 'মাগী' এবং 'হারামজাদা' ও "নিষ্কৃতি"তে 'হারামজাদা' রাখতে দেওয়া হয়নি। "শ্বশুরবাড়ী"তেও 'মাগী' ও 'মাইরি' বাদ দিতে হয়েছে। পকেটমারের অপরের লুণ্ঠিত সামগ্রী এনে জড়ো করার একটা দৃশ্য "মাকড়সার জাল" থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে। "আগোশ" ছবিখানির এক জায়গায় সংলাপে ছিল ঃ 'আমার তো শুধু নেশার বোতলই চোখে পড়ে'। বম্বেতে মদ্য নিবারণ নীতি অনুযায়ী এ অংশ আপত্তিকর বলে বাংলাতে ওরকম কিছু ছাড়া পাবে তা হবার জো নেই। "কেরানীর জীবন"য়ে দেখা যায় থিয়েটার দলে পটলার গান 'জনি জনি জনি ওয়াকার' বাদ দিয়ে সে জায়গায় সিগারেটের মহিমা কীর্তন সংযোজিত করতে হয়েছে। 'মাটি ও মানুষ'এ অশ্বিধারা গাঁজার গুণকীর্তন রাখতে দেওয়া হয়নি। 'প্রেমিককে বাঁধতে চাই সোনার শৃংখলে'—"আগোশ" থেকে একথা বাদ দেওয়া হয়েছে। "ঘরবার" ছবিতে একটা কমিক দৃশ্য ছিল বাড়ীর সরকার গৃহদেবতার মন্দির থেকে গহনা চুরি করতে যাচ্ছে। সে সময়ে গৃহদেবতাকে উদ্দেশ করে তার উক্তি ঃ "ভগবান এ আমার বাড়ী নয়, ভগবান ক্ষমা করো, আমি অক্ষম, আমার যে এই ধান্দা, পাঁচ আনার পেঁড়া তোমায় পুজো দেবো, চলি"—এসব কথা কাটতে হয়েছে। 'বাইরে যাওয়ার চেয়ে, মরি তো বাঙলা দেশেই মরবো' কথাটায় আপত্তি হয়েছে "রিফিউজী" ছবিতে। 'কুত্তা' সম্বোধন "ঠোকর," "আবসর" ও "গুনাহ"র ক্ষেত্রে আপত্তি হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রতি কটাক্ষপাত স্বতঃই আপত্তিজনক। "রেল কা ডিব্বা" থেকে তাই নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বাদ দিতে হয় ঃ 'আপনারা যার স্ট্যাচুর (গান্ধীজী) জন্যে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করতে চাইছেন সে ব্যক্তি হিন্দুস্তানের দারিদ্র্য দেখে লংগুটি পরতেন, দু টুকরো খেজুর আর সামান্য ছাগ দুগ্ধে জীবন ধারণ করতেন—এই টাকাতেই নগ্ন অঙ্গ ঢাকা দেওয়া যায়, মুমূর্ষু গরীবদের বাঁচানো যায়, অনাথদের চোখের জল মুছে ফেলা যায়। পরিকল্পনা আমরা চাই না, চাই রুটি। আমাদের বুকের জখম মোটরযাত্রী মিনিস্টারদের চোখে পড়বে না। আজ যদি বাপু বেঁচে থাকতেন তাহলে জনসাধারণের গচ্ছিত টাকা এইভাবে নষ্ট হতে কি দেখতে পারতেন?" হরিলক্ষ্মী"তে দেখা যায় জমিদারের লোক যেখানে প্রজাকে জুতো প্রহার করছে তেমন দৃশ্য কেটে কমিয়ে দিতে হয়েছে। আবার "দো বিঘা জমীন" ছবিখানিতে "গরীবের ওপরে জুলুমই যদি না করলে তো জমিদার কিসের!"—এই বিদ্রূপ বাদ দিতে হয়েছে। ঐ ছবিতেই "জমিদারের শ্রাদ্ধ করছি" কথাটা সেন্সরের ভালো লাগেনি, তার বদলে দিতে হয়েছে "জমিদারের সেবা করছি।" ধনীদের প্রতি বা বিচারালয়ের প্রতি বক্রোক্তি সেন্সর সব সময়ে বরদাস্ত করেন না। "বাবলা"-তে স্বামী দিলীপ মোটর চাপা পড়ে মারা যাবার পর

স্ত্রী ভগবতীর খেদোক্তি : 'চাঁদির জোরে যে একটা জীবন্ত মানুষের ওপরে মৃত্যুর চাকা চালিয়ে গেল তার জরিমানা মাত্র দুশো টাকা!' ঐ মৃত্যুকেই উপলক্ষ করে ভগবতীকে কেদারের সান্ত্বনা উক্তিঃ "যে গাড়ীটায় দিলীপ চাপা পড়েছে সেটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাহলে গাড়ীর মালিক নিশ্চয়ই মস্ত ধনী লোক। গরীব লোকে বড়োলোকের গাড়ীর নীচে পড়লে সোজা স্বর্গে চলে যায়। তুমিও জেনো দিলীপের সেই সৌভাগ্যই হয়েছে। আদালত সত্যিই বড়ো দয়ালু।" এই ধরনের একটা ছেঁটে দেওয়া অংশ "শোভা"-তে পাওয়া যায়ঃ 'নোট ভর্তি গদীর ওপরে বসে অপরের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করা কি মুশকিল? মালদার খোদার ছোট ভাই যখন তখন তার ওপর হাত ওঠাতে কে পারে?' ইত্যাদি।

বিদেশী কোন রাষ্ট্র সম্পর্কে উক্তি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় সেন্সরকে। 'চীনের লোক আফিম খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে' এখন আর বলা চলবে না। "বাজ" ছবিখানির সংলাপ থেকে অমন উক্তি বাদ দিতে হয়েছে। ভারতীয় যুবক ইওরোপীয় নারীকে চুম্বন করছে সেদৃশ্য "ময়ূরপঙ্খ" থেকে বাদ দেওয়া হয়। দেবদাস একটা স্মৃতি গেঁথে রাখবার জন্য পার্বতীর কপালে আঘাত করে একটা দাগ এঁকে দিলে—বাঙলা ও হিন্দী "দেবদাস" ছবিতে তা নিয়ে আপত্তি হয়নি, কিন্তু গত বছর তামিল সংস্করণে ও দৃশ্য রাখতে দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি "বহুৎ দিন হুয়ে" ছবিখানিতে অনাথা চন্দ্রাকে পুরোহিতের স্ত্রী অন্ততঃ বার দশেক 'চুড়েল' বলে সম্বোধন করতে দেখা গেল। কিন্তু এর আগে "জীবন জ্যোতি" ছবিতে ও-শব্দটা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। স্বামী ঘরের একান্তে স্ত্রীর কোলে মুখ লুকোবে তাতেও সেন্সারের আপত্তি দেখা যায় "নিষ্কৃতি"-তে রমেশ আর শৈলর ক্ষেত্রে একটা দৃশ্যে।

সম্প্রতি "ভগৎ সিং" ছবিখানি নিয়ে এমন একটা আপত্তির ঢেউ উঠেছে যা লোকসভা পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছে। ভগৎ সিংয়ের জীবনী বিকৃত করার অভিযোগ এবং ভগৎ সিংয়ের সহচর ও সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত পর্যন্ত এই অভিযোগকারীদের অন্যতম। কিন্তু ছবিখানির প্রদর্শন বন্ধ করা যায়নি। এ বিষয়ে বেতার ও তথ্য মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার প্রশ্নের উত্তরে জানান যে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এমন কোন ধারা নেই যা প্রয়োগ করে ছবিখানির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা যায়। এইসঙ্গে কয়েক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে তোলা একখানি ছবি সম্পর্কে সেন্সরের আচরণের

কথা মনে পড়ে। সে ছবিতে বিবেকানন্দকে বিকৃত করা হয়নি মোটেই, বরং তাঁর আদর্শ প্রচারের সহায়কই ছিল। কিন্তু সেন্সর ছবিখানির অংশ বিশেষ কাটছাঁটের নির্দেশ দিয়ে প্রদর্শনের অনুমতি দিলেও বিবেকানন্দের নাম ব্যবহার নিষেধ করে দেন—ছবিখানি "স্বামীজী" নামে মুক্তি লাভ করে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সেন্সরের মতামত কিছুটা জানতে পারা যায় "আওলাদ" ছবিখানির কর্তিত একটু অংশ থেকে। ওতে এক জায়গায় সংলাপে ছিল "চার বরষ মে দো বচ্চে হোনে চাহিয়ে"; ওটা বাদ দেবার নির্দেশ হয়। আর এক জায়গায় ছিল "সাদী হুই কি বাচ্চা, হর সাল বাচ্চা!"—ওটাও ছাঁটাইয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ঐ ছবিতেই উপনায়ক ও আধুনিকা উপনায়িকার মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উচ্চারিত কতকগুলি গ্রন্থের নাম বাদ দিয়ে সংলাপ কেবলমাত্র 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং'য়ের মধ্যে নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বামীকে "ইতর

এই সংখ্যার অলংকরণ করিয়াছেন শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীঅন্নদা মুন্সী, শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত, শ্রীঅহিভূষণ মল্লিক, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ-দস্তিদার, শ্রীধীরেন বল, শ্রীপরিতোষ সেন, শ্রীবিমলেন্দু রায়চৌধুরী, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীরণেন আয়ন দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীশংকর নন্দী, শ্রীশিশির দত্ত, শ্রীসন্ধ্যা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসমীর সরকার ও শ্রীসুশীল সেন।

জানোয়ার" বলে গাল দেওয়া আটকে দেওয়া হয়েছে একখানি ছবিতে।

"গোলকুণ্ডা কা কয়েদী" নিয়ে মহা হৈচৈয়ের সৃষ্টি হয়। প্রযোজক প্রেমনাথ সেন্সরের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করেন; সম্প্রতি বম্বের বিচারপতি কাওয়াজী মামলা বাতিল করে দিয়েছেন। এর নায়ক বৃটিশ আমলে বিদ্রোহী সিপাই ছিল। তারপর এই স্বাধীন আমলে সেন্সর আপত্তি করে বাদ দিয়েছেন নায়ক ও এক মন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপ যেখানে মন্ত্রী বলছেনঃ 'আমরা ঠিক করেছি যে আপনার পুলিসের চাকরি হতে পারে না। একবার আপনি আপনার ডিউটি থেকে বিদ্রোহ করতে পেরেছেন কাজেই আবার আপনি তা পাবেন।' নায়ক জবাবে বললেঃ 'কিন্তু এখন তো আর বিদেশী রাজ্য নেই, এখন তো নিজেদের রাজত্ব।' মন্ত্রীঃ 'হ্যাঁ, সে তো সবই ঠিক কথা, কিন্তু আমরা পুলিস ও সৈন্যদলে এমন লোক রাখতে পারি না যে একবার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছে।' নায়কঃ 'কিন্তু

তার ওপর কি রকম জুলুম ও জবরদস্তি করা হয়েছে সেটা বিচার করুন।' এছাড়া ছবিখানি থেকে আর বাদ দেওয়া হয়েছে দুটো লাঠির মাঝে গলা চিপ্টে দেওয়ার একটা দৃশ্য; বরফের দুটো চাঁইয়ের মাঝখানে নায়ককে চিপ্টে শাস্তি দেওয়া; নায়কের খোলা বুকে জলন্ত সিগারেট চেপে ধরা, ইত্যাদি কতকগুলি বীভৎস ক্রূরতার ঘটনা। এখানে আবার সেন্সারের বৈসাদৃশ্যের কথা টেনে আনতে হয় "৪২" ছবিখানির উল্লেখ করে। ও ছবিতে নারীর ওপর নৃশংস অত্যাচারের যে দৃশ্য পাশ করে দেওয়া হয়েছে তার তুলনা দিশী-বিদেশী সব ছবির ক্ষেত্রেই বিরল।

এইভাবের আরও বহু উদাহরণ উধৃত করা যায়, যাতে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে সেন্সরের দৃষ্টিতে কোনটা ন্যায়, আর কখন কোনট অন্যায় হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, কোন্ অঞ্চলের সেন্সরের কাছে কি চলবে আর কি চলবে না তারও বৈষম্য ঘটে থাকে। যেমন দেখা যায় "চুড়েল" কথাটা নিয়ে। বম্বের সেন্সর বোর্ড "জীবন জ্যোতি"-তে ওটা আপত্তিকর মনে করলেন, কিন্তু মাদ্রাজের আঞ্চলিক বোর্ড "বহুৎ দিন হুয়ে"-তে কথাটা ব্যবহারে আপত্তি করেননি। বুকের বস্ত্রাঞ্চল বা ওড়নী খুলে পড়ার বা সরে যাওয়ার দৃশ্য তো বাঙলা হিন্দী যে কোন ছবিতে লাস্যময়ী নায়িকা থাকলেই দেখা যায়। এ নিয়েও সেন্সরের মতদ্বৈধতার অন্ত নেই। কোন ছবিতে হয়তো তেমন অংশ বাদ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়; ঠিক তার পরের ছবিতেই আবার দেখা গেল ওরকম দৃশ্য রয়েছে, অর্থাৎ সেন্সর আপত্তি করেননি। যৌবনোচ্ছল লাস্যময়ীর উন্নত বক্ষের ক্লোজআপ রাখা না-রাখাটাও দেখা যায় সেন্সরের যখন যেমন মর্জি তার ওপর নির্ভর করে। এমন বৈসাদৃশ্য বিদেশী ছবি অনুমোদনের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। "মোগাম্বো" বা "রিভার অফ নো রিটার্ন" ছবিতে যে রকম পাশবিক কামলিপ্সার উগ্র চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে ছবি দুখানি যে কোন্ বিচারে 'সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য' বলে সেন্সরের অনুমোদন লাভ করতে পারে, তা ভেবে পাওয়া যায় না। বিদেশী নাচ-গানের ছবির সাজপোশাকের কথা তোলা বাহুল্য; সেসব ছবিও "সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য" বলে নিয়মিতভাবেই অনুমোদিত হয়ে আসছে।

সেন্সরের এই বিভ্রমের কারণ নির্ণয় করে দেখা দরকার। ছবি সেন্সর হবার জন্য তিনচারজনের কমিটিকে দেখানো হয়; সব ছবির ক্ষেত্রে আবার একই ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিও থাকে না। হয়তো অনবরতই পরীক্ষক বদল হয় বলে, এক একজনের ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচি তার বিচারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হয়তো সেইজন্যেই এক কমিটির কাছে যা অন্যায় নয়, আর এক কমিটির কাছে সেই একই জিনিস অন্যায় বলে প্রতিপন্ন হয়। এতে বিচারের কোন নিরীখ থাকছে না, প্রযোজকরা পড়ছেন আরও বিভ্রমে। এটা অবশ্য লক্ষ্য করে দেখা যায় যে, সেন্সরের চোখে সাধারণতঃ যা অন্যায় বলে প্রতিপন্ন হয়ে কাঁচিতে পড়ে তা প্রায় ক্ষেত্রে ঠিকই হয়, কিন্তু তারতম্যেরও দৃষ্টান্ত এতো যে তা দেখে ঠিক কোন পথে চলতে হবে সেটা যেমন প্রযোজকদের কাছে একটা বিষম সমস্যা, তেমনি দর্শকদের পক্ষেও নৈতিকতার কোন একটা মান নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সম্পাদক—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য (ছুটীতে) অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। ১নং বর্মণ ষ্ট্রীটস্থ আনন্দ প্রেস

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী (প্রাচীন চিত্র)

অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী॥ —শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ মহালয়া • ১৩৬২ ॥

॥ মাতৃপূজা ॥

শারদোৎসব সমাগত। এক বৎসর পরে বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। মাকে পাইলেই আনন্দ। সুখে আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। শরতের আকাশ দুর্যোগের ঘনান্ধকারে আজ আচ্ছন্ন দেখিতেছি। দুর্গত-নরনারীর হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, অসহায় আর্তনাদ আমাদের চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। জাতির আজ মহাদুর্দিন। এমন দুর্দিনেই তো দুর্গতিহারিণী দুর্গার প্রয়োজন। দুঃখের দিনে আমরা মাকেই ডাকিব। মাতৃপূজার অকালবোধনে প্রবৃত্ত হইব। সন্তানের ডাকে মা আসিবেন। মায়ের পদভরে পৃথিবী কাঁপিবে, ভূধর টলিবে, সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। মাতৃভাবের সেই দীপ্ত চমকে প্রাণশক্তি চারিদিকে ঝলকে ঝলকে ছুটিবে। তাহার উদার প্রভাবে আমাদের জীবনের যত দৈন্য, যত কার্পণ্য সকল বিদূরিত হইবে; অষ্টপাশের বিমোচন ঘটিবে। সেই শুভ লগ্নের আভাসই আজ আমরা পাইতেছি। দিগন্তব্যাপ্ত আঁধারের মধ্যে আলোকের সমারোহে জাগিয়া উঠিতেছে সন্তানস্নেহের আকুল বিপুল আগ্রহে অগ্নিময়ী মায়ের বিগ্রহ। বিপ্লবিনী জননী। তিনি ভীমা, ভৈরবনাদিনী। এই তো মায়ের স্বভাব, সন্তানস্নেহের এমনই প্রভাব। আমাদের সর্বোপকার সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সদার্দ্রচিত্তা। মায়ের আর্ত, পীড়িত সন্তানের সেবাতেই মায়ের সেবা। এসো, আজ সব ভুলিয়া সেই সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া দেই। মাতৃমাধুর্যে ডুবিয়া গিয়া আমরা মায়ের প্রিয়কার্য সাধন করি। আমরা মায়ের ছেলে হই।

হিন্দু-মুসলমান

ক্ষিতিমোহন সেন

জ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা অনেকে শুনতে চাচ্ছেন। সুদীর্ঘ জীবন। তার কত-রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কোনটা বলি, কোনটা না বলি। বলবার অবসরই বা কতটুকু। কথায় আছে বাঁশবনে ডোম কানা। আমারও সেই অবস্থা।

জন্ম ও শিক্ষাজীবনের স্থান আমার কাশীতে। আমার পূর্বপুরুষের বাস ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে। যে গ্রামে তাঁদের বাস ছিল, সেখানে অনেক শিক্ষিত লোকের বসতি।

শিক্ষার দুটি ধারা তখন আমাদের দেশে চলে আসছিল। একটি ধারা ফারসী সাহিত্যের, অন্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের। ফারসীওয়ালাদের শিক্ষাদীক্ষা চলত মক্তবে। আর সংস্কৃতওয়ালাদের চলত টোলে চতুষ্পাঠীতে। অনেক সময়ে একই পরিবারের মধ্যে দুই ভাই দু'ধারার।

আমার বড়দার জন্ম দেশে হলেও তাঁর প্রথম শিক্ষা-দীক্ষার স্থান ছিল কাশীতে। কাশীর প্রধান ধারা সংস্কৃত। তবু কাশীতে ফারসী মক্তবী সাধনারও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র ছিল। কাশীর কাছে জৌনপুর শহরের ফারসী শিক্ষিতদের সর্বত্র সম্মান ছিল দেখা গেছে। জৌনপুর আসলে যবনপুরী। আমার দাদা ছিলেন ফারসী ধারার ভক্ত। তিনি ফারসীতে ভালরূপ শিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ মোটেই ছিল না। আর আমি ও আমার অন্য ভাইরা ছিলাম সংস্কৃতের ভক্ত। তখনকার দিনে ফারসী ধারার সম্বন্ধে আমি ছিলাম গোবিন্দদাস।

প্রায় ৬০ বছর পূর্বে কাশীতে বাস করেও, আমরা দেশে পূর্বপুরুষের বাসস্থানে এলাম। ঘরদুয়ার করে দেশের আড্ডাটা জমিয়ে তুললাম। যদিও কাশীধাম আমরা তখনও ছাড়িনি। কাজেই দেশে এসে যতদিন বাস করতাম, আমার গতিবিধি ছিল টোলে ও চতুষ্পাঠীতে, আর আমার দাদার কাছে আসর বসত ফারসী-ভক্তদের। অনেক মুসলমান সজ্জনও তাঁর আসরে আসা যাওয়া করতেন।

বাংলা পাঠশালা ও সংস্কৃত টোলের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য এই ছিল যে, বাংলা পাঠশালাতে ছাত্রদের মারধরটা খুবই চলিত ছিল। পাঠশালাওয়ালারা বলত, সেটা তারা পেয়েছে মক্তবের প্রভাবে। আর টোলে কোথাও মারধরের প্রথা ছিল না। শুধু আমাদের গ্রামে নয়। সারা ভারতবর্ষে টোলে চতুষ্পাঠীতে বা গুরুগৃহে কোথাও মারধরের চলন নেই।

কাশীতে দেখেছি কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক কোন গালিগালাজ (অপভাষণ) মুখেই আনতেন না। হঠাৎ যদি ক্রোধবশে কোন অপভাষণ তাঁর মুখে এসে যেত তবে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে, আচমনপূত হয়ে, তবে আবার পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হতেন। বাংলাদেশের টোলেও জীবনগত নানা বিশিষ্টতা ছিল। সেখানে গুরু ও গুরুপত্নীদের ছাত্রেরা মনে করতেন পিতামাতা।

টোলের সব বিবরণ শুনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এত খুশী হলেন যে, আমাকে আদেশ করলেন, টোলের জীবনের কথা লিখে দিতে। আমি তদনুসারে লিখেও ছিলাম। সে-লেখা মুদ্রিতও হয়েছিল। সে-লেখা তিনি ব্যবহারও করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সপ্তাহে। কাজেই আজ আর তা বিশেষ করে বলবার দরকার নেই।

শ'খানেক বছর আগে বিক্রমপুরে কালী শিরোমণি নামে বিখ্যাত এক স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ বিদ্যা।

তিনি সকলকে আপনি বলে কথা বলতেন। ছাত্রদেরও তিনি আপনি বলে সম্বোধন করতেন।

প্রধানত গুরুরা পাঠ দিতেন বৈকালে। আহার বিশ্রামের পরে। অর্থাৎ প্রায় দুটোর কাছাকাছি। একদিন কালী শিরোমণি মশায় টোলবাড়ির পিছন দিকে গাড়ু হাতে মুখ হাত ধুয়ে পড়াতে যাবেন, এমন সময়ে তিনি বাইরে থেকে শুনতে পেলেন, একটি ছাত্র অপর একটি ছাত্রকে অপভাষণে সম্বোধন করছেন। কালী শিরোমণি মশায় তো কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে পাঠ দিতেন না, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হলে চলতি পাঠও বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, "ক্রোধ হল চণ্ডাল, আমি এখন আর ব্রাহ্মণ নই। চণ্ডালের কি অধ্যাপনার অধিকার আছে? অতএব আজ এখানেই পাঠ স্থগিত থাকুক। কাল স্নান ও পূজাসন্ধ্যার পর আবার পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।"

যখন সেদিন তিনি ছাত্রের মুখে অপভাষণ শুনলেন তখন ম্রিয়মাণ হয়ে তিনি গাড়ু হাতেই চলতে চলতে পথে শায়িত একটি কুকুরকে দেখলেন। তিনি কুকুরকে অনুরোধ করে বললেন, "আপনি দয়া করে একটু সরে যান। আমাকে এই পথে এগিয়ে যেতে হবে।" শিরোমণি মশায়ের কণ্ঠস্বর শুনে ছাত্রের দল চকিত হয়ে দেখতে গেলেন যে, কার সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলছেন।

কুকুরকে লক্ষ্য করে এইরূপ ভদ্রকথা বলতে শুনে শিরোমণি মশায়কে তারা বললেন, "কুকুরকে আপনি কেন এমন সম্মান করে অনুরোধ জানাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "আমি যদি ওকে গালি দিই বা রূঢ় বাক্য বলি তবে তো কুকুরের কোন সাধ্য নেই যে প্রতিবাদ করে। শুধু আমারই মুখটি তাতে দূষিত হয়। সেইভাবে মুখ বার বার কলুষিত করলে একটা বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এমন অবস্থায় অসাবধান হলে মান্যজনকেও বদভ্যাসবশত হয়তো বাক্য দিয়ে অসম্মান করতে পারি।"

শিরোমণি মশায়ের কথা শুনে ছাত্রেরা নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পারলেন।

এই কাহিনী শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে, টোলের যুগে ছাত্রদের জীবন একটুও নীরস ছিল। সেই যুগে ছাত্রেরা কত আমোদ আহ্লাদই করতেন।

ছাত্রদের দলের সঙ্গে গুরুগৃহের চারদিকের গ্রামের ভারী মধুর সম্পর্ক ছিল। উৎসবে আনন্দে পড়ত ছাত্রদের ডাক। গ্রামে কেউ পীড়িত হলে সেবা করতে দৌড়তেন ছাত্রেরা। ঘরে আগুন লাগলে দৌড়তেন ছাত্রদের দল। কাছাকাছি চুরি-ডাকাতির খবর পেলে তখনই দৌড়ে যেতেন টোলের পড়ুয়ারা। ছাত্রদের অপকীর্তিও কিছু কিছু ছিল। নষ্টচন্দ্র উপলক্ষে টোলের পড়ুয়ারা গ্রামের গৃহস্থদের বাগানে নানা উপদ্রব করতেন। কখনও বা ফলমূল অপহরণ করতেন। কেউ তাঁদের বকতে গেলে বরং গ্রামবাসীরাই প্রতিবাদ করে বলতেন, "এরা তবে যাবে কোথায়? নিজেদের বাপ-মা ঘর-

বাড়ি ছেড়ে এসেছে, আমাদের ছাড়া এদের অত্যাচার করবার স্থানই বা কোথায়।”

একবার আমাদের গ্রামের পড়ুয়ারা নষ্ট-চন্দ্রা রাত্রে পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন গোয়াল গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে চুপি চুপি তাঁদের ঘরে সদ্য জাল দেওয়া গরম ক্ষীরের ভাণ্ড নিয়ে বাগানের দেবালয়ে বসে আর-এক স্থান হতে অপহরণ করা পাকা কাঁঠাল সেবন করতে শুরু করবেন, এমন সময়ে দেখা গেল, কে যেন অন্ধকারের মধ্যে আসছেন।

আসছিলেন স্বয়ং গোপ গৃহস্থটি দুইটি পাত্র হাতে নিয়ে। তিনি এসে বললেন, বাবা, গরম গরম ক্ষীরের শুধু কাঁঠাল হলেই ভাল জমবে না। এই পাত্রটিতে বাতাসা আর এই টিনে ভর্তি মুড়ি রইল। ভাল করে খাও। খাওয়া হলে ভাল জল দরকার হবে। তাও আমি এনে দিচ্ছি। পড়ুয়ারা খুবই লজ্জা পেলেন। খেলেন বটে, কিন্তু চুরি করার সুখটুকু উড়ে গেল। অবশ্য সকলেই এমন উদারভাবে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তবে এই কাহিনীতে প্রায় ৬০ বছর পূর্বেকার মোটামুটি একটি পল্লী-চিত্র পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, পাঠশালার আদর্শ ছিল মক্তব। মারধর থাকলেও সেখানে গ্রামজীবনের অনেক সবল আনন্দও ছিল। কাজেই টোল বা মক্তব সকল স্থানেরই যোগ ছিল গ্রামজীবনের সঙ্গে। কাজেই টোলে ও মক্তবে একটি সহৃদয়তার যোগ গ্রামে দেখা যেত। হিন্দুর উৎসবে ও পূজাপার্বণে মুসলমান প্রাকৃতজনেরাও রীতিমত যোগ দিতেন। সেই যুগে মুসলমানের মুখে রামায়ণ গানও শুনেছি। এখনও গাজীর পটওয়ালারা যেমন গাজীর গান করেন তেমন লক্ষ্মীরও গান গেয়ে বেড়ান। কবিগানে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ-কথা একেবারে কণ্ঠস্থ থাকা চাই। বছর পঞ্চাশেক আগের কথা। একবার ফরিদপুর জেলার মধ্যে ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত সদরদি গ্রামে যাই। সেখানে গিয়ে শুনলাম কাছে কোথায় কবিগান হবে। সেই গানে দেখলাম একপক্ষ মুসলমান, তিনি চাপান দিচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন হল—

বাপের বৈমাত্র ভাই, নিজের সোদর ভাই
বলতো দেখি আমরা সবে কোথা গেলে পাই।

প্রশ্নটি শুনেই আমার চক্ষু স্থির। আমি তো হদিসই পাচ্ছিলাম না। পরে বহু পণ্ডিতজনকেও এই প্রশ্নে ঘায়েল হতে দেখেছি। সেদিন যখন এই প্রশ্নটি শুনলাম, তখন ভাবলাম মহাভারতে এমন কথা কোথায় আছে। পরে মুসলমান কবিওয়ালাই তার উত্তর দিলেন, তাঁরা হলেন কর্ণ ও যুধিষ্ঠির।

স্কেচ — শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

কর্ণ হলেন সূর্যের পুত্র আর যুধিষ্ঠির হলেন যমের পুত্র। যম বা ধর্ম হলেন সূর্যের পুত্র। কাজেই কর্ণ হলেন বাপের বৈমাত্র ভাই। অথচ উভয়েই কুন্তীর ছেলে অর্থাৎ সহোদর ভাই। মালদহের গম্ভীরার গান বহু মুসলমানের মুখে শুনেছি। যোগীর গান ও ময়নামতীর কথা রচয়িতার অনেকে মুসলমান।

মালদহের কাছেই পূর্ণিয়া। সেই জেলায় মালদহের নিকটবর্তী দিল্লী দেওয়ানগঞ্জে স্বর্গীয় গৌর রায় মহাশয়ের আগ্রহে আমাকে একবার যেতে হয়। তাঁরা আমার জন্য বোলওয়াই গানের ব্যবস্থা করলেন। গায়করা শেরসাবাদী মুসলমান। অথচ গান করছেন হরগৌরীর।

কয় শতাব্দী আগের কথা, জায়স গ্রামবাসী মালিক মহম্মদ জায়সী যে অপূর্ব গ্রন্থ পদ্মাবতী লেখেন তা একটি বিখ্যাত রূপক কাব্য (এলিগরী)। তাতে দেখি, পদ্মাবতী হলেন জীবাত্মা আর পরমাত্মা হচ্ছেন রাজা ভীমসিংহ। দুর্বৃত্ত পাপপুরুষ পদ্মাবতীকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। সেই দুর্বৃত্তের নামই হল আলাউদ্দীন। আজকের দিনে শিক্ষিত সমাজে এইরূপ নামকরণ কিছুতেই চলত না।

মালিক মহম্মদ জায়সীর বহু মিত্র ছিলেন। তাঁরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান।

জায়স গ্রামটি অযোধ্যা প্রদেশের অন্তবর্তী। জায়সীর পদ্মাবতী আবধি অর্থাৎ অযোধ্যার ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পদ্মাবতী আমাদের যোগ শাস্ত্রে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পদ্মাবতী গ্রন্থখানা পড়তে গেলে মনে হয়, আমাদেরই কোন যোগীগুরু সত্য ও সাধনাকে উপলব্ধি করে এই গ্রন্থখানি লিখছেন। এই গ্রন্থখানি আরাকানের মাগুন ঠাকুরের আজ্ঞায় বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ করেন আলাওল। মাগুন ঠাকুর নামটা ব্রাহ্মণের মত হলেও তিনি ছিলেন মুসলমান।

জায়সী ছিলেন ফকির লোক। বিবাহ করেননি। মৃত্যুকালে তাঁর এক ব্রাহ্মণ বন্ধুকে বললেন, "তোমার ছেলেদের ডাক।" ছেলেরা এলেন। তাঁদের জায়সী বললেন, "আমি হলাম অকৃতদার ফকির। আমার নামের উপাধি মালিক। আমি মরে গেলে এই সংসারে মালিক নামে তো কেউ থাকবে না। তোমরা বন্ধুপুত্র, কাজেই আমার সন্তানের মত। তোমাদের বংশ হল বিখ্যাত কথকদের, তোমরা মালিক উপাধি গ্রহণ কর। কথকদের ব্যবসা বজায় রাখলে মালিকদের কণ্ঠে ভাব ও ভক্তির গান অপূর্ব সুরে ধ্বনিত হবে। কথক ব্যবসা ত্যাগ করলে সে তার কণ্ঠ হারাবে।"

যুক্তপ্রদেশে রায়পুরার ও হলদিয়ার ঠাকুরেরা বিখ্যাত কথক ও অপূর্ব সুকণ্ঠ। জায়সীর আশীর্বাদ এখনও তাঁদের বংশে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তাঁরা এখনও মালিক উপাধিতেই আত্মপরিচয় দেন।

আমাদের দেশেও উৎসবাদিতে এতদিন দেখেছি, হিন্দু মুসলমান উভয়েরই যোগ ছিল। দেবীর চালচিত্র এখনও অনেকস্থলে মুসলমান পটুয়ারাই রচনা করেন। দেবীর আগমনী গানের অতি উৎকৃষ্ট নমুনা মেলে গোলাম মৌলার গানে। গোলাম মৌলা বোধ হয় সওয়া শ কি দেড় শ বছর পূর্বেকার মানুষ। দেবী পূজার শেষ দিনের গানে যে সব বিদায়ী সঙ্গীত গাওয়া হয়, তারও বহু রচয়িতা মুসলমান। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত রচয়িতার একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে।

মণ্ডা মনোহরা জেলাপি রসকরা
সকলি তো বামনা বেটা খায় গো মা
(তবে) মইষটা কেন গড়াগড়ি যায় গো মা

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভাল ভাল জিনিসগুলো খেলেন। তবে বলির মহিষটা কেন বৃথা যায়। ব্রাহ্মণরা না হয় এটারও সদগতি করুন।

মুসলমানদের রসবোধও রীতিমত দেখা যায়। ঐ যে দাদার ফারসী আসরের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তাতে প্রায়ই আসতেন হাসকিরা গ্রামের মৌলবী মহফীজউদ্দীন। তাঁরা ঐ প্রদেশের মুসলমানদের ধর্মগুরু। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনই রসিক। তাঁদের মজলিশে যেমন চলত তামাক, তেমনই চলত ফারসী কবিতা ও হাস্যকৌতুক। দু-এক জন সংস্কৃতওয়ালাও আসতেন তামাক আর পাশা খেলার নেশায়। তার মধ্যে একজন হলেন গ্রাম-পুরোহিত চক্রবর্তী মশায়।

একদিন সকালবেলা দাদা ও মৌলবী সাহেব গল্প করছেন। দূরে দেখা গেল চক্রবর্তী মশায় পথ দিয়ে দ্রুতবেগে তাঁদের এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। মৌলবী সাহেব চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, "কোথায় যাচ্ছেন চক্রবর্তী মশায়। পালিয়ে পালিয়ে যান কেন, তামাক তৈয়ের।" চক্রবর্তী মশায়কে থামতে হল, আসতেও হল এবং তৈরী তামাকে টানও দিতে হল। তবে মেজাজটা একটু রুক্ষ। চক্রবর্তী মশায় বললেন, "আজ ব্রততিথি। বহু যজমান যজাতে হবে। ২টার আগে আজ বাড়ি ফেরা যাবে না, তার মধ্যে আপনারা ডাক দিলে আপনাদের আসরে যদি একবার বসি তবে আরও ঘণ্টা দুই নষ্ট হবে।" মৌলবী সাহেব বললেন, "আহা রাগ কেন করেন, একটু বসেই কেন যজাতে যান না।" চক্রবর্তী মশায় রেগে বললেন, "আমরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আপনা-দের মত তো আমার যবনাচার নয়। আমাকে না খেয়ে ততক্ষণ থাকতে হবে।" মৌলবী সাহেব বললেন, "কি মশাই কেন বৃথা জারী-জুরি করছেন? আপনিও যা আমিও তা। আপনাকে পুরোহিতও বলতে পারব না, আধাহিতও বলতে পারব না। আপনি খান কয়েকজন হিন্দু ব্যাকুব ঠকিয়ে। আর আমি খাই কয়েকজন মুসলমান ব্যাকুব ঠকিয়ে। ব্যবসা তো একই।" তখন চক্রবর্তী মশায়, "যান মশাই" বলে বসে পড়লেন। আর ঘণ্টা দুই কাটিয়ে উঠলেন। বোধ হয় সেদিন তাঁকে সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়ে খেতে বসতে হল।

হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও তীর্থ ও তীর্থদর্শন আছে। তাদেরও পাণ্ডা ও পুরোহিত আছে। তাদের ব্যবহারও ঠিক হিন্দু পাণ্ডাদেরই অনুরূপ। কথায় কথায় দাও দক্ষিণা। মক্কা যাইনি কিন্তু আজমের পাকপত্তন ও কসুর ভীট শরীফ প্রভৃতি বহু মুসলমান তীর্থ ঘুরে দেখেছি। হিন্দু মুসলমান তীর্থের একই কথা।

কয়েক বছর আগেকার কথা। শ্রী-নিকেতনে সমবায় ব্যাঙ্কের অধিবেশন। বহু হিন্দু মুসলমান সমাগত। কথা ছিল মধ্যাহ্নের পূর্বেই সভা শেষ হবে। বাড়ি গিয়েই সবাই খাবেন।

সভা শেষ হল না। বৈকালের জন্যও কিছু কাজ মুলতুবী রইল। মেম্বারদের খাবার ব্যবস্থা কী করা যায়? হিন্দুদের তো শ্রীনিকেতনের ছাত্রনিবাসে খাওয়ান যায়। মুসলমানেরা কি সেখানে খাবেন? মুসল-মান মেম্বাররা বললেন, "আমরা সেখানে ভাত খেতে পারব না, তবে ঘৃতপক্ক হলে খেতে পারি।"

চমকে উঠলাম। মুসলমানদেরও কি হিন্দু হতে পেরেছে? ভাত ডাল না খেলেও ঘৃতপক্ক হিন্দুদের চলে। তাতে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মতি আছে।

আন্নপক্কং পয়ঃপক্কং পক্কং কেবল বহ্নিনা।

তা তো হিন্দুশাস্ত্র। এ-শাস্ত্র মুসল-মানের হল কী করে? কোরানেও কি জাতি-বিচার পংক্তি-বিচার আছে?

খাদ্যাখাদ্যে বিচারই হল ধর্ম। সেই ধর্ম রান্নাঘরের হাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে। তবে তো মুসলমানরা কোরান ছেড়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্যেরই দলে ভিড়েছেন। তা হলে আর হিন্দু মুসলমানে তফাত কী?

এই আখ্যানের নায়ক জয়হরি হাজরা, নায়িকা বেতসী চাকলাদার, উপনায়ক উপনায়িকা গুটি-কতক জন্তু, যথা- একটি বিলাতী কুত্তা, একটি দেশী কুত্তী, একটি আরবী ঘোড়া এবং একটি ভারতীয় জেব্রা। লেডিজ ফার্স্ট--এই আধুনিক নীতি অনুসারে প্রথমে বেতসীর পরিচয় দেব, তার পর জয়হরির কথা বলব। জন্তুদের অবতারণা যথাস্থানে করলেই চলবে।

বেতসী বিলাতে জন্মেছিল, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পাঁচ বৎসর পরে। তার বাপ মা ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, সেজন্য মেয়ের নাম এলিজাবেথ রেখেছিলেন, সংক্ষেপে বেট্‌সি। কিন্তু সে নাম পরে বদলানো হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার সময় জাহাজে একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বেট্‌সির মাকে ডার্টি নিগার বলেছিল, তাতেই রেগে গিয়ে তিনি তখনই মেয়ের বেট্‌সি নাম বদলে বেতসী করলেন।

বেতসীর বাবা প্রতাপ চাকলাদার ধনীর সন্তান। এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাঁচ ছ বৎসর বাস করে কৃষি ও পশুপালন শিখেছিলেন। ফিরে এসে উলুবেড়ের কাছে তাঁর পৈতৃক জমিদারি হোগল-বেড়েতে তিন শ বিঘা জমির উপর ফুল ফল ফুলকপি বাঁধাকপি বীট গাজর টমাটো ইত্যাদির বাগান এবং বিস্তর গরু রেখে ডেয়ারি ফার্ম করলেন, তা ছাড়া ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগি হাঁস পুষে তারও ব্যবসা চালাতে লাগলেন। একটি উত্তম বাগানবাড়ি বানিয়ে সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সতরো বৎসর ধরে ব্যবসা ভালই চলল, লাভও প্রচুর হতে লাগল। তার পর প্রতাপ চাকলাদার মারা গেলেন।

বেতসীর মা অতসী মুশকিলে পড়লেন। স্বামীর হাতে গড়া অত বড় ব্যবসাটি চালাবার ভার কাকে দেবেন? তাঁর ছেলে নেই, একমাত্র সন্তান বেতসী। নায়েব হরকালী মাইতি কাজের লোক বটে, কিন্তু অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। স্থির করলেন সব বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। কিন্তু বেতসী বলল, কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি চালাব, বাবার কাছে সব শিখেছি। অতসী ভরসা পেলেন না, তবু মেয়ের জেদ দেখে ভাবলেন, দু বছর দেখাই যাক না, তার পর না হয় বেচে ফেলা যাবে। একটি উপযুক্ত জামাই যদি পাওয়া যায় তবে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু মেয়েটা যে বেয়াড়া, এত বয়েসেও তার কাণ্ডজ্ঞান হল না।

অতসী উঠে পড়ে জামাইএর খোঁজ করতে লাগলেন। মেয়েকে নিয়ে ঘন ঘন কলকাতায় গেলেন, পার্টি দিলেন বহু পরিবারের সঙ্গে মিশলেন, বাছা বাছা পাত্রদের হোগলবেড়েতে নিমন্ত্রণ করে আনালেন, কিন্তু কিছুই ফল হল না। প্রতাপ চাকলাদারের সম্পত্তির লোভে অনেক সুপাত্র আর কুপাত্র এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু বেতসীর সঙ্গে দু দিন মেশার পরেই সরে পড়ল। তার গড়ন ভাল, রং খুব ফরসা, কিন্তু মুখে লাবণ্যের একটু অভাব আছে। সে মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চড়ে তার তিন শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে, কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে। তার রূপ চিত্তাকর্ষক নয়, মেজাজও উগ্র, সেজন্যে তার মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেতসী বলল, তোমার জামাই না জুটল তো বড় বয়েই গেল, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না, বাবার ফার্ম একাই চালাব। কিন্তু অতসী দেখলেন, ফার্মের আয় আগের মতন হচ্ছে না। বেতসী তার মাকে আশ্বাস দিল--কোনও ভয় নেই, দু দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়হরি হাজরার নামটি সেকেলে কিন্তু সেজন্যে তার বাপ মাকে দায়ী করা যায় না, তার হরিভক্ত ঠাকুরদাদাই ওই

নাম রেখেছিলেন। জয়হরি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, লেখাপড়ায় খুব ভাল, একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলাত গিয়েছিল, সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে তিন বছর পরে ফিরে এল। এসেই আমেদাবাদের একটি বড় মিলে তার চাকরি জুটে গেল। দু বছর পরে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি ব্লীচিং অ্যান্ড ডাইং ফ্যাক্টরি খুলল। সে কারখানা খুব ভালই চলছিল, লাভও বেশ হচ্ছিল, তার পর এক দুর্ঘটনা হল। জয়হরির শিকারের শখ ছিল, গন্ডাল স্টেটের জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের আক্রমণে তার পা জখম হল। ঘা সারল, কিন্তু জয়হরি একটু খোঁড়া হয়ে গেল, হাঁটবার সময় তাকে লাঠিতে ভর দিতে হয়। এর কিছু আগে তার বাপ মা মারা গিয়েছিলেন। সে তার কারখানা ভাল দামে বেচে দিয়ে পৈতৃক পুরনো বাস্তুভিটা খাগড়াডাঙার চলে এল। এই গ্রামটি গোগলবেড়ের লাগাও।

জয়হরির অর্থলোভ নেই, বিবাহেরও ইচ্ছা নেই। সে হিসাব করে দেখেছে তার যা পুঁজি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্যা সে শিখেছে তার চর্চা একবারে ছাড়তে পারল না। খাগড়াডাঙার পুরনো ছোট বাড়িটা মেরামত করে বাসের উপযুক্ত করে নিল, এবং সেখানেই নানা রকম পরীক্ষা করে শখ মেটাতে লাগল। কিন্তু সুতো আর কাপড় ছোবানো নয়, জীবন্ত জন্তুর গায়ে রং ধরানো।

জয়হরির জমির একদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, আর তিন দিকে ধান খেত। রাস্তার দিকে সে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়েছে, আর সব দিকে ফণিমনসা বাগভেরেণ্ডা ইত্যাদির পুরনো বেড়াই আছে। তার বাড়ির সামনে এখন আর জঙ্গল নেই, সুন্দর একটি মাঠ হয়েছে, তার মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছ আছে। বাড়ির পিছন দিকে গোটাকতক চালা ঘর উঠেছে, তাতে তার পোষা জন্তু আর কয়েকজন চাকর থাকে। জয়হরি এখানে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল তার বাড়ির সামনের মাঠে হরেক রকম অদ্ভুত জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে দেখে যেতে লাগল।

বেতসীর কাছে খবর পেঁছুল, খাগড়াডাঙায় একজন খোঁড়া বাবু আজব চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, পয়সা লাগে না, কলকাতা থেকেও লোক দেখতে আসছে। বেতসীর একটু রাগ হল। চাকলাদার বংশ এই অঞ্চলের সব চেয়ে মান্য গণ্য জমিদার। একজন বাইরের লোক এসে চিড়িয়াখানা বানিয়েছে অথচ সেখানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে বেতসী আর তার মাকে অনুরোধ করা হয় নি কেন? বেতসী শুনেছে, লোকটার নাম জয়হরি হলেও সে নাকি বিলাত ফেরত, সুতরাং তাকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সকাল বেলা সে তার প্রকাণ্ড কুকুর প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়হরির জন্তুর বাগান দেখতে গেল।

তারের বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বেতসী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেরালের কাছে চারটে বেগনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রং হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতা বাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে [illegible] প্যাঁক প্যাঁক করছে।

বাড়ির ছাত থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে সবুজ নীল বেগনী রঙের পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল, যেন কেউ রামধনু কুচি কুচি করে আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেতসী উপর দিকে চেয়ে দেখছিল, এমন সময় তার কানে এল—নমস্কার, দয়া করে, ভিতরে আসবেন কি?

বেতসী মাথা নামিয়ে দেখল, একজন সুদর্শন যুবা বেড়ার ফটক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পায়জামা আর পঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা লাঠি। প্রতিনমস্কার করে বেতসী বলল, আপনিই জয়হরিবাবু? আমার কুকুর নিয়ে ভিতরে যেতে পারি কি?......থ্যাংক্‌স।

বেড়ার ভিতরের মাঠে এসে বেতসী বলল, অদ্ভুত সব জানোয়ার বানিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য কিছু আছে, না শুধুই ছেলেখেলা?

জয়হরি সহাস্যে বলল, আর্ট মাত্রই ছেলেখেলা। আমি এক নতুন রকমের আর্টের চর্চা করছি। লোকে কাগজ আর ক্যামবিসের উপর আঁকে, কাদা পাথর ধাতুর মূর্তি গড়ে। আমি তা না করে জীবন্ত প্রাণীর উপর রং লাগাচ্ছি। আমার মিডিয়ম আর টেকনিক একবারে নতুন।

—নীল ভেড়া, সবুজ বেরাল, ছাগলের গায়ে বাঘের ছাপ, একে আর্ট বলতে চান নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ। প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ হল নিকৃষ্ট আর্ট। যা আছে তার বৈচিত্র্য সাধন এবং তাকে আরও মনোরম করাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। সুকুমার রায় লিখেছেন—লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। কথাটা ঠাট্টা হলেও আর্টের মূল সূত্র এতেই আছে।

—আমি তা মনে করি না। শুনেছি আপনি সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে এসেছেন। এখানে সময় [illegible] না করে কোনও মিলে চাকরি নেন না কেন? জানোয়ারের গায়ে রং লাগানো একটা বদখেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

—সকলের দৃষ্টিতে বদখেয়াল নয়। আমাদের কলামন্ত্রী রঙ্‌বাহাদুর নাদান আমার কাজ দেখে খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, সোভিএট সরকারকে এক শ আটটি লাল ঘুঘু উপহার পাঠালে বড় ভাল হয়, তিনি নেহেরুজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন।

এই সময় বেতসীর পিছন দিকে এমন একটি ব্যাপার ঘটল যার ফল সুদূরপ্রসারী। একটি গোলাপী রঙের দেশী কুকুর জয়হরির কাছে আসছিল, তাকে দেখেই বোঝা যায় মাসখানিক আগে তার বাচ্চা হয়েছে। বেতসীর বিলিতী কুকুর প্রিন্স তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বিস্তর বিদেশী আর ভারতীয় কুক্কুরী দেখেছে, কিন্তু এমন পদ্মকোরকবর্ণা সারমেয়ী পূর্বে তার নজরে পড়ে নি। প্রিন্স বার কতক সেই গোলাপী কুত্তীকে প্রদক্ষিণ করে তার গা শুঁকল, তার পর আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল। তখন গোলাপী হঠাৎ ঘ্যাঁক করে প্রিন্সের পায়ে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। কেঁউ কেঁউ করতে করতে প্রিন্স বেতসীর কাছে এল।

অগ্নিমূর্তি হয়ে বেতসী বলল, একি কাণ্ড! আপনার নেড়ী কুত্তী আমার প্রিন্সকে কামড়ে দিল আর আপনি চুপ করে রইলেন!

জয়হরি বলল আপনি ভয় পাবেন না, আমার কুকুরটার শরীরে রোগ নেই। কুকুররা এমন কামড়াকামড়ি করে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না। আপনি অনুমতি দেন তো আপনার কুকুরের পায়ে একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে পারি।

—আপনার হাতুড়ে চিকিৎসা আমি চাই না। কেন

আপনার কুকুরকে রুখলেন না? কত বড় বংশে আমার এই আলসেশ্যানের জন্ম তা জানেন? প্রিন্সের বাপ ফ্রেডরিক দি গ্রেট, মা মারাইয়া তেরেজা। আপনার নেড়ী কুত্তী একে কামড়াবে আর আপনি হাঁ করে দেখবেন!

—ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে গেল, আগে টের পেলে আমি বাধা দিতাম। কিন্তু আসল দোষী আপনার কুকুর, ও কেন নেড়ী কুত্তীর কাছে গেল? উচ্চকুলোদ্ভব হলেও আপনার প্রিন্সের নজর ছোট। অনেক বোকা লোক পেণ্ট করা মেয়ে দেখলে ভুলে যায়। প্রিন্সও সেই রকম নেড়ী কুত্তীর গোলাপী রং দেখে ভুলেছে, জানে না যে ওটা কংগো রেডের রং।

—কাছে গেছে বলেই প্রিন্সকে কামড়াবে?

—আপনি একটু স্থির হয়ে ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি যদি হঠাৎ আপনাকে অপমান করতাম—খবরের কাগজে যাকে বলে শ্লীলতা হানি, তা হলে আপনি কি করতেন? চুপ করে সইতেন কি?

—আপনাকে লাথি মারতাম, হাতে চাবুক থাকলে আচ্ছা করে কষিয়ে দিতাম।

—ঠিক কথা, সে রকম করাই আপনার উচিত হত। নারী মাত্রেরই আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ হচ্ছে বীরাঙ্গনা সতী নারীর দেশ। সেই ট্রাডিশন এ দেশের কুত্তীদের মধ্যেও একটু থাকবে তা আর বিচিত্র কি।

—ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। আপনি ওই নেড়ীটাকে গুলি করে মারবেন কিনা বলুন। আর আমার প্রিন্সের যে ইনফেকশন হল তার ড্যামেজ কি দেবেন বলুন।

—মাপ করবেন মিস চাকলাদার, কুত্তীটার বা আমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। শুধু শুধু দণ্ড দেব কেন?

—বেশ। আমার উকিল আপনাকে চিঠি পাঠাবেন। আদালত আপনাকে রেহাই দেয় কিনা দেখব।

বাড়ি ফিরে এসে বেতসী স্থির হয়ে থাকতে পারল না, তখনই মোটরে চড়ে উলুবেড়ে গেল। সেখানকার উকিল বিষ্ণু বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা উত্তেজিত ভাষায় তড়বড় করে জানিয়ে বেতসী বলল, ওই জয়হরি হাজরাকে সাজা দিতেই হবে জেঠামশাই, যত টাকা লাগে খরচ করব।

বিষ্ণুবাবু বললেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তোমার কুকুরের রোগ হবার ভয় আছে তবে আজই ওকে কলকাতায় পাঠাও, বেলগাছিয়া হাসপাতালে অ্যাণ্টিরাবিজ ইনজেকশন দিয়ে দেবে। কিন্তু মকদ্দমার খেয়াল ছাড়। জয়হরির কুকুরটা যদি খেপা হত আর তোমার কুকুরকে রাস্তায় কামড়ে দিত তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তোমার কুকুর জয়হরির কম্পাউণ্ডে ঢুকে কামড় খেয়েছে, এতে কোনও ক্লেম আনা যায় না, মকদ্দমা করলে লোক হাসবে।

বিষ্ণুবাবু কিছুই করতে রাজী হলেন না। বেতসী তাঁর কাছ থেকে সোজা মহকুমা হাকিম অরুণ ঘোষের বাড়ি গেল। তাঁকে নিজের পরিচয় আর ব্যাপারটা জানিয়ে বলল,

এটুকু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন

সার, আপনাকে এর প্রতিকার করতেই হবে, আপনি পুলিসকে অর্ডার দিন। জয়হরির খেঁকী কুকুরটা ডেঞ্জারস, তাকে এখনই মারা দরকার। আর জয়হরি একটা বুজরুকে শারলাটান, নকল জানোয়ার বানিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জন্তুর গায়ে রং ধরানো তো একরকম ক্রুয়েলটিও বটে। তাকে অর্ডার করুন যেন তিন দিনের মধ্যে তার চিড়িয়াখানা ভেঙে দেয়।

অরুণ ঘোষ একটু হেসে বললেন, আচ্ছা, আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি যেন জয়হরিবাবুর কুকুরটার খবর রোজ নেওয়া হয়। হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ দেখলে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু জয়হরিবাবু যা করছেন তা তো বেআইনী নয়, সাধারণের অনিষ্টকরও নয়। তাঁকে তো আমি জব্দ করতে পারি না মিস চাকলাদার।

বেতসী অত্যন্ত রেগে গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, সে নিজেই জয়হরিকে সাজা দেবে। আগে একটা আলটিমেটম দেবে, তা যদি না শোনে তবে মার লাগাবে। লোকটা খোঁড়া, বেশী মারা ঠিক হবে না, এক ঘা চাবুক লাগালেই যথেষ্ট। জনকতক লোক যাতে জয়হরির নিগ্রহ দেখে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে জানুক যে বেতসী চাকলাদার নিজেই বজ্জাতকে শাসন করতে পারে।

বেতসী তার ধোবা নিমাই দাস আর সর্দার-মালী গগন মণ্ডলকে ডেকে আনিয়ে বলল, ওহে, কাল সকালে আটটার সময় তোমরা জয়হরি হাজরার চিড়িয়াখানার সামনে হাজির থেকো।

নিমাই বলল, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে দিদিসায়েব?

—কিছু করতে হবে না, শুধু একটা তামাশা দেখবে।

—যে আজ্ঞে, আমার ভাগনে নুটুকেও নিয়ে যাব।

গগন মণ্ডল বলল, আমার ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাব দিদিসায়েব।

পরদিন সকাল বেলা বেতসী তার আরবী ঘোড়ায় চড়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে জয়হরির মাঠের সামনে উপস্থিত হল। নিমাই ধোবা আর গগন মালী তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আগেই সেখানে হাজির ছিল।

জয়হরি বেড়ার ধারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তার ভেড়া আর ছাগলের পরস্পর ঢু মারা দেখছিল। বেতসীকে দেখে স্মিতমুখে বলল, গুড মর্নিং মিস চাকলাদার, আপনার প্রিন্স ভাল আছে তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেতসী বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার বাইরে আসুন।

ফটকের বাইরে এসে জয়হরি বলল, হুকুম করুন।

ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে বেতসী বলল, দেখুন জয়হরিবাবু, আপনাকে একটা আলটিমেটম দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চাইবেন কি না? আর সেই নেড়ী কুত্তীটাকে গুলি করবেন কি না? নিতান্ত যদি মায়া হয় তবে গঙ্গার ওপারে বিদায় করবেন কি না?

জয়হরি বলল, দুঃখপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি অকারণে আমার উপর চটেছেন তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে বা নেড়ী কুত্তীকে মারতে বা তাড়াতে পারব না।

চাবুক তুলে বেতসী বলল, তবে এই নিন।

বেতসীর চাবুক জয়হরির পিঠে পড়বার আগে একটু [illegible] একটা কদম গাছের আড়াল থেকে একটি জেব্রা বেরিয়ে এল, কিন্তু বেতসীর নজর সেদিকে ছিল না। এই ভারতীয় জন্তুটি আফ্রিকার জেব্রার চাইতে কিছু ছোট, পেট একটু বেশী মোটা, কিন্তু গায়ের রং আর ডোরা দাগে কোনও তফাত নেই। অচেনা জানোয়ার দেখে নিমাই ধোবার ভাগনে নুটু বলল, মামা, ওটা কি গো?

নিমাই বলল, চিনতে লারছিস? ও তো আমাদের সৈরভী রে, সেই যে গাধীটার মাজায় বাত ধরেছিল, বোঁচকা বইতে লারত, তাই তো জয়হরিবাবুকে দশ টাকায় বেচে দিনু। আহা, এখন ভাল খেয়ে আর জিরেন পেয়ে সৈরভীর কি রূপ হয়েছে দেখ! বাবু আবার চিত্তির বিচিত্তির করে বাহার বাড়িয়ে দিয়েছে।

সৈরভী তার পুরনো মনিবকে চিনতে পেরে খুশী হয়ে এগিয়ে আসছিল। বেতসীর চাবুক যখন জয়হরির পিঠে পড়বার উপক্রম করছে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈরভীর কণ্ঠ থেকে আনন্দধ্বনি নির্গত হল—ভুঁ-চী ভুঁ-চী। তার অদ্ভুত রূপ দেখে আর ডাক শুনে বেতসীর ঘোড়া সামনের দু পা তুলে চিঁ-হি-হি করে উঠল। বেতসী সামলাতে পারল না, ধুপ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে এলে বেতসী দেখল, একটা ছোট গেলাস তার মুখের কাছে ধরে জয়হরি বলছে, এটুকু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন।

ক্ষীণ স্বরে বেতসী প্রশ্ন করল, কি ওটা?

—বিষ নয়, ব্রাণ্ডি। খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—এখন দেখছেন না, একটু আগে দেখছিলেন বটে। আপনি যেন মহিষাসুর বধের জন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাহনটি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে আপনাকে ফেলে দিল। তাতেই আপনার একটু চোট লেগেছে। নিমাই আর গগনের বউ ধরাধরি করে আপনাকে আমার বাড়িতে এনে শুইয়েছে। ওকি করছেন? খবরদার ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার মায়ের কাছে লোক গেছে, ডাক্তার নাগকে আনবার জন্যে উলুবেড়েতে মোটর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এখনই এসে পড়বেন।

একটু পরে বেতসীর মা এসে পড়লেন। আরও কিছু পরে ডাক্তার নাগ তাঁর ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বেতসীকে পরীক্ষা করে বললেন, হাতে আর কোমরে চোট লেগেছে, ও কিছু নয়, চার-পাঁচ দিনে সেরে যাবে। ডান পায়ের ফিবিউলা ভেঙেছে—সামনের সরু হাড়টা।...হাঁ হাঁ জোড়া লাগবে বইকি। ভয় নেই, খোঁড়া হয়ে যাবেন না, কিছুদিন পরেই আগের মতন হাঁটতে পারবেন।...আরে না না, জয়হরিবাবুর মতন লাঠি নেবার দরকার হবে না। আজ কাঠ দিয়ে বেঁধে দেব, তিন-চার দিন পরে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাব, তার পর প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ লাগাব। দরকার হয় তো একজন নার্স পাঠাতে পারি।

বেতসী নিজের বাড়িতে এলে ডাক্তার তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় শুয়ে সে বিগত ঘটনাবলী ভাবতে লাগল।

নায়েব হরকালী মাইতি বহুদিনের পুরনো লোক। তাঁর স্ত্রী মাইতি-গিন্নী শয্যাগত বেতসীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসেন। বুড়ীর মুখের বাঁধন নেই, কিন্তু তাঁর এলোমেলো কথায় বেতসী চটে না বরং মজা পায়। পড়ে

যাবার দু সপ্তাহ পরে বেতসী অনেকটা ভাল বোধ করছে, বিছানা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসেছে।

মাইতি-গিন্নী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—সবই গেরোর ফের দিদিমণি, কপালের লিখন। ভদ্দর লোকের ছেলের ওপর কেনই বা তোমার রাগ হল, কেনই বা মেমসায়েবের মতন ঘোড়-সওয়ার হয়ে তাকে মারতে গেলে! তার তো কিছুই হল না, লাভের মধ্যে তুমি ঠ্যাং ভাঙলে।

বেতসী বলল, তুমি দেখো মাইতি-দিদি, আমি সেরে উঠে তাকে চাবুক মেরে জব্দ করি কি না।

—হা রে দিদিমণি, চাবুক মেরে কি বেটাছেলেকে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে ঢিট করবার দাবাই হল আলাদা।

—দাবাইটা তুমি জান নাকি?

—ওমা তা আর জানি না! সাড়ে তিন কুড়ি বয়েস হল, তিন কুড়ি বছর ধরে বুড়ো মাইতির কাঁধে চেপে রইছি। দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তার পর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি চোবানি খাওয়াবে। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই দিদিমণি, আগেই চাবুক মারতে গিয়েছিলে। তাই তো গাধা ডেকে উঠল, ঘোড়া ভড়কাল, তুমি পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে। জয়হরিবাবু মানুষটা তো মন্দ নয়, এখানে এসে তোমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে শুনতে কথাবার্তায় ভালই, তোমারই মতন বিলেত দেখা আছে, সেও খোঁড়া তুমিও খোঁড়া। বাধা তো কিছুই দেখছি না, কিন্তু তোমার মা যে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, অমন মার-মুখো খাণ্ডার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, কিন্তু তাই বলে জয়হরির মতন পাত্র তো হাতছাড়া করতে পারি না, আমার ভাইঝি বেবির সঙ্গে তার সম্বন্ধের চেষ্টা করব, দাদাকে লিখব বেবিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেন।

মাইতি-গিন্নী চলে যাবার পর বেতসীর মনে নানা রকম ভাবনা ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় হয়েছে, সে জখম হয়ে বাড়িতে আটকে আছে। ডাক্তারের মতন মিথ্যাবাদী দুটি নেই, এই সেদিন বলল এক মাস, আবার এখন বলছে তিন মাস। ওদিকে শত্রু হাসছে, তার নেড়ী কুত্তী আর গাধাটাও বোধ হয় হাসছে। জয়হরির আস্পর্ধা কম নয়, এখানে এসে খোঁজ নিয়ে মহত্ত্ব দেখাচ্ছে। বেবিকে বিয়ে করবেন? ইস, করলেই হল! বেতসী শত্রুকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, মাইতি-বুড়ীর দাবাই প্রয়োগ করবে। কূট যুদ্ধে শত্রুকে কাবু করে বশে আনাতেও তো বাহাদুরি আছে। জয়হরি গাধাকে জেব্রা বানিয়েছে, বেতসী কি জয়হরিকে ভেড়া বানাতে পারবে না? সারা রাত তার ঘুম হল না, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সকালে উঠেই বেতসী আরশিতে নিজের মুখখানা একবার দেখে নিল, তার পর মতি স্থির করে শত্রুর প্রতি তার প্রথম বোমা ছাড়ল, জয়হরিকে দু লাইন চিঠি লিখে পাঠাল — আপনার কুত্তী আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম, আপনাকেও করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।

নূতন কিছু ঘটিলে কিংবা ঘটিতে দেখিলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কারণ কী? আর, একটা কারণ না পাইলে আমাদের চিত্ত স্থির হয় না। কিন্তু কার্যের কারণ নির্ণয় অতিশয় কঠিন। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, "কারণ ব্যতীত কার্য নয় কদাচন"।

দ্রষ্টার জ্ঞান অনুসারে কারণ অনুমানের বহু প্রভেদ হয়। বালক যে-কারণ পাইলে তুষ্ট, বৃদ্ধ সে-কারণে তুষ্ট নহেন। বৃদ্ধ অনেক দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন।

জনশ্রুতির মূলে সত্য থাকিতে পারে, না-ও পারে। শৈশবে শুনিয়াছিলাম, পূর্বকালে আকাশ আরও নীচে ছিল। একদিন এক বুড়ী উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গেলে আকাশ মাথায় ঠেকিতে লাগিল, তখন সে আকাশকে ঝাঁটা মারে। আকাশ উপরে উঠিয়া গেল। তদবধি সেইখানেই আছে।

কিন্তু পরে বড় হইয়া দেখি, যেখানে যাই সেইখানেই আকাশ উঁচু, আর সেইখান হইতেই আকাশ ক্রমশ নিচু হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বাল্যকাল হইতে এইরূপ দেখিতেছি। এই কারণে আমাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। নূতন দেখিলেই হইত।

এই বৃহৎ কঠিন গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী প্রভৃতি লইয়া পৃথিবী এক-এক সময় নড়িয়া উঠে। ঘরের জানালা ঝন্ ঝন্ করে, পুকুরের জল এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে উঠে। এ-সবের কারণ কী?

বাসুকি নামে এক বৃহৎ সর্প পৃথিবীকে মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছে। যখন ক্লান্ত হয়, তখন তাহার মাথা নড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীও নড়িয়া উঠে। কেহ কেহ আর একটু যায়। এক বৃহৎ গজ বাসুকিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এক বৃহৎ কূর্ম গজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই কারণ-পরম্পরার উৎপত্তি জানি না। বাসুকি আসে কেন, তাহাও জানি না। কিন্তু কূর্মের আধার কী এবং তাহার আধার কী, আধারের আধার কী, এ প্রশ্ন কেহ করে না।

এইরূপ অসংখ্য কার্যের অসংখ্য কারণ। অধিকাংশ মানুষ অলস। যাহা হউক তাহারা একটা কারণ শুনিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই মানুষের এই জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই সে বনমানুষের অবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নত হইতেছে। সভ্য মানুষের জ্ঞান-পিপাসা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে আমাদের দৃষ্টির অগোচর, সেই পরমাণুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বহু লোকের জ্ঞান অতি সামান্য। তাহারা যাহা শোনে তাহাই বিশ্বাস করে।

অনেক বৎসর হইয়া গেল, আমি তখন কটকে ছিলাম, একদিন শুনিলাম মেদিনীপুর জিলায় গড়বেতা গ্রামে এক অসুরের একটা হাড় আছে। এক বন্ধু সেই অসুরের হাড়ের এক টুকরা আনাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে বলে, হাড় বেত্রাসুরের। সে-অঞ্চলে তেমন পাথর নাই। পাথরটা দেখিয়া বুঝিলাম, পূর্বকালের এক বৃহৎ তরু-স্কন্ধ শিলীভূত হইয়াছে। বোধহয় এককালে বেতগাছের গড় ছিল, সেই বেত্র এখানে বৃত্রাসুর হইয়াছে। কিন্তু অসুরের ভিন্ন এত বড় হাড় আর কিসের হইতে পারে?

এইরূপ স্থানে স্থানে অসুরের কীর্তি বিদ্যমান আছে। বর্ধমান হইতে আরামবাগের পথে উচালন নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে এক বৃহৎ দীঘি আছে। এই দীঘি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র, কালাদীঘি। সেই দীঘির ঘাটে একটা বৃহৎ পাথর আছে। এত বড় পাথর কে কোথা হইতে আনিল? কেহ জানে না। অসুর ভিন্ন আর কী হইতে পারে?

উচালনের মাইল খানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা অচেনা গাছ আছে। সে-দেশের কোন লোক তেমন গাছ দেখে নাই। তাহার নাম জানে না। এই গাছ সেখানে কে আনিল? নিশ্চয় ডাকিনী। দূরে যাইতে হইলে ডাকিনী একটা গাছে বসে, আর যে-দিকে ইচ্ছা গাছ চালাইতে পারে। সূর্যোদয় হইলেই ডাকিনী গাছ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সে-গাছ সেইখানেই থাকে। এমনি অচেনা গাছ আরও দু-একটা আছে। আমি যৌবনকালে এই উচালনের অচেনা গাছ দেখিয়াছিলাম। সে-গাছ এখনও সেখানে আছে কি না জানি না।

ডাকিনী অবিশ্বাস করিবার নহে। যে ডাকিনী সে-ই ডাইনী। শহরে ডাইনী দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু গ্রামে ছিল ও এখনও আছে। তাহাদের দেহ শীর্ণ, মুখ ও চোখ চক্‌চক্ করে। শিশুর প্রতি দৃষ্টি করিলে সে শুখাইয়া যায়। গ্রামে কেহ-কেহ শিশুকে জলপড়া খাওয়াইত। ঘটিতে জল রাখিয়া সেই জলের উপরে মন্ত্র পড়িয়া তিনবার ফুঁ দিয়া জলপড়া হইত। সকলে জলপড়া জানিতেন না, কোন কোন বৃদ্ধা জানিতেন। শিশুর মায়েদের নিকট তাঁহাদের সমাদর ছিল।

ভোজনকালে ক্ষুধিত ডাইনী কিংবা অন্য কোন লোকের দৃষ্টি পড়িলে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় না। এই কারণে আমাদের দেশের বিধি এই যে, ভোজনকালে পরিজন ব্যতীত অপর কেহ সেই স্থানে থাকিবে না।

কত স্থানে কত অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে, কেহ স্মরণ রাখে না। বহুকাল পূর্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার আমি গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে একদিন শুনিলাম, পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটা খেজুর গাছ রাত্রিকালে সোজা হইয়া উঠে, দিবাভাগে শুইয়া পড়ে। বহু লোকে দেখিতে যাইত, কত কী কারণ অনুমান করিত। দেবতার কর্ম ভিন্ন আর কী হইতে পারে? আমি বেলা ৯টার সময় সেই গাছ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন প্রায় শুইয়া আছে। গাছটা একটা ডোবার পাড়ে জন্মিয়াছে। এক-মানুষ লম্বা। স্বভাবত গাছটা ডোবার দিকে বাঁকিয়া ছিল। সোজা হইয়া থাকিত না। এখন দিবসে শুইয়া পড়ে, রাত্রে উঠে। প্রখর গ্রীষ্ম আর পাড়ের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, গাছটা মাটি হইতে যথেষ্ট রস পাইতেছে না। তাহার দেহ শিথিল হইয়া নুইয়া পড়ে। আর রাত্রিকালে যে রস পায় তাহাতে দাঁড়ায়। প্রথমত গাছটা লোকের পূজা পাইত। গাছে কোন দেবতার ভর হইয়াছে। কিছুদিন পরে সে-

গাছ শুইল, আর উঠিল না। তাহার পূজাও বন্ধ হইল।

এই এখানে বাঁকুড়ায় বছর দশ পূর্বে এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছিল। আমার বাড়ির উত্তর দিকে একটু দূরে অহল্যাবাঈ রোড। বড় রাস্তা। তাহার দুপাশে বট গাছ আর আশুত গাছ ছিল। এখনও অনেক আছে। বৈশাখ মাস, প্রখর গ্রীষ্ম। বেলা একটার সময় হঠাৎ মড় মড় শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। এক চাকর ছুটিয়া দেখিতে গেল। আসিয়া বলিল, "একটা আশুত গাছের কাঁচা ডাল হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। বাতাস নাই, জল নাই, কিছুই নাই। অনেক লোক জমা হয়েছে।" আমি ৪টার সময় দেখিতে গেলাম। তখনও অনেক লোক দেখিতেছিল। ডালে কোথাও ক্ষত-লক্ষণ নাই। নূতন পাতা গজাইতেছিল। যেখানে ভাঙিয়াছে সেখানে ব্যাস প্রায় নয়দশ ইঞ্চি। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া সেই লোকদের কথা শুনিতে লাগিলাম। ঈশ্বর পাত্র নামে এক গ্রাম্য ভদ্রলোক এক লোক সঙ্গে সেই পথে যাইতেছিলেন। লোক জমা দেখিয়া তিনিও আসিলেন। একবার আমার মুখপানে তাকাইলেন। আমি নির্বাক। তারপর বলিলেন, "আর দেখতে হবে না। বোঝা গেছে। যিনি এই বৃক্ষ আশ্রয় করে ছিলেন তিনি চলে গেলেন। জানিয়ে গেলেন। তা নইলে, দেখনা, ঠিক একটার সময় ভাঙে কেন? বারটা নয়, দুটা নয় ঠিক একটা। উপরের ডাল নয়, মাঝের ডাল নয়, ঠিক নীচের ডাল ভাঙে কেন? আর এই বৈশাখ মাস। চল হে, দেখতে হবে না। এই সে-বছর আমাদের গ্রামেও একটা আশুত গাছের ডাল হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল।"

স্কেচ — শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

আসল কথা, ডালটি নিজের ভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দুই জাতীয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। এক জাতির পাতা পানের মত চওড়া। তাহার অগ্র অতিশয় দীর্ঘ। ইহাই প্রকৃত অশ্বত্থ। অন্য জাতির পাতা তত চওড়া নয়, অগ্রও দীর্ঘ নয়। ইহা গজাশ্বত্থ। বাংলা নাম গয়াশ্বত্থ। ইহার কাঠ নরম। এই হেতু ইহা গর্জাপ্রয়। দুই অশ্বত্থই দূর হইতে দেখিলে এক প্রকার দেখায়। যে-গাছের ডাল ভাঙিয়াছিল সেটা এই গজাশ্বত্থ। প্রখর গ্রীষ্মে মৃত্তিকা শুষ্ক। আবশ্যক রস সঞ্চার হইতে পারে নাই। উপরের ডাল ঊর্ধ্বমুখী, মাঝের ডাল কিছু ঊর্ধ্বমুখী, নীচের ডাল তির্যক। ডালের গোড়াতেই ভাঙে নাই, গোড়া হইতে হাত দেড়েক দূরে ভাঙিয়াছিল। বেলা একটার সময় গ্রীষ্ম চরমও বটে।

কটকে থাকিতে থাকিতে একদিন শুনিলাম, জাজপুরে এক শিবের রং প্রহরে-প্রহরে পরিবর্তিত হয়। একদিন এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম। তিনি এই বর্ণ-পরিবর্তন বিশ্বাস করেন। তিনি আর-এক বিদ্বানের মুখেও এই কথা শুনিয়াছিলেন। বর্ণ পরিবর্তন হয়, লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নচেৎ কথা উঠিত না। কিন্তু কারণ কী? সেইখানেই সন্দেহ। দৈবাৎ আমার এক বন্ধু তৎকালে জাজপুরে ডেপুটি ছিলেন। এক পূজার ছুটিতে আমি জাজপুরে গেলাম। প্রাচীন নগর, বিরজা দেবীর ক্ষেত্র। তাঁহার অতি সুন্দর পুরাতন মন্দির আছে। উড়িষ্যায় অসংখ্য দেবালয়ে কোন্‌টায় কারুকার্য নাই?

আমি বৈকালে সন্ধ্যার একটু আগে সেই শিব দেখিতে গেলাম। আমরা যেমন ঘরে বাস করি, সেই রকম একটা ঘরে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বার দক্ষিণমুখ। দ্বারের সম্মুখে ফাঁকা। কোন চালা কি মন্দির কিছুই নাই। শিবের পাণ্ডা বলিলেন, ইঁহার দেহে নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ সকলেই

স্পর্শ করিতে পারে। আমিও স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখ ভাগ অতিশয় চিক্কণ। যেন দর্পণ। তখন প্রায় সন্ধ্যা। সম্মুখে দক্ষিণ দিকে শরতের আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ দেখা যাইতেছিল। আমি দেখিলাম সে-মেঘের ছায়া শিবের দেহে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আরও পরীক্ষার নিমিত্ত পান্ডাকে দীপ আনিতে বলিলাম। শিবের দেহের একটু দূরে দীপ ধরিলাম। দর্পণে যেমন ছায়া পড়ে এখানেও অবিকল সেইরূপে ছায়া দেখা গেল। আর সন্দেহ রহিল না, উন্মুক্ত আকাশের যখন যে-বর্ণ হয় শিবের দেহেও তার ছায়া পড়ে। মনে হয় যেন শিবলিঙ্গের বর্ণ পরিবর্তন হয়। মনে পড়িতেছে, সেই শিবের নাম অগ্নীশ্বর।

প্রশ্ন নানাবিধ। উত্তরও নানাবিধ হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দিতেছি।

চাটি শব্দের অর্থ প্রদীপ. যেমন ভিটামাটি চাটি করা, ভিটার মাটি প্রদীপ গড়িবার উপযুক্ত করা। অর্থাৎ ফেলিয়া রাখা। অতএব চাটিগাঁ প্রদীপের গাঁ। এই নামের কারণ কী?

পূর্বকালে চাটিগাঁ পরীর রাজ্য ছিল। সেখানে এক পরীর রানী সহচরীদিগকে লইয়া বাস করিত। মানুষ ছিল না। একদা এক ফকির সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে চাটিগাঁয়ের কূলে আসিয়া পড়িয়াছিল। এক পরী ফকিরকে ডাঙায় উঠিতে নিষেধ করিয়াছিল। ফকির বহু অনুনয় করিল, "আমি অল্প একটু ঠাঁই চাই। আমার প্রদীপের আলো যতদূর যায় ততটুকু।" পরীর রানী সম্মত হইলেন। সন্ধ্যা হইলে ফকির এক উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া তাহার চেরাগ জ্বালিয়া বসিল। পরীরা যেখানে যায় সেখান হইতেই প্রদীপের আলো দেখিতে পায়। সেখানে পরীদের আর থাকা চলিল না। সেই হইতেই গ্রামের নাম চাটিগাঁ।

ইহার প্রমাণ আছে। চাটিগাঁ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ শহরতলি, অত্যন্ত ঘন বসতি। আর একভাগ পাহাড়তলি। এই পাহাড়তলিতে অনেক ছোট মাটির পাহাড় আছে। একটির নাম পরীর পাহাড়। ইংরাজীতে বলে "Fairy hill"। দেখিতে সুন্দর। নৈবেদ্যের আকার। রাত্রিকালে দীপ জ্বালিলে পরীর বাসের যোগ্য মনে হইবে। পরীদের ডানা আছে। তাহারা পাখির মত বাতাসে ভাসিয়া যাইতে পারে। এখনকার পরীদিগকেও এক পাহাড় হইতে নামিতে কিংবা অন্য পাহাড়ে উঠিতে হইত না।

আমি একবার মাস দেড়েকের জন্য চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। সে-সময় এই কাহিনী শুনিলাম।

বোধ হয়, চাটিগাঁয়ের প্রকৃত নাম চট্টগ্রাম। রাঢ় দেশ হইতে অনেক বৈদ্য কায়স্থ চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবি ছিলেন। তাঁহারাই তাঁহাদের নূতন বসতিস্থানের নাম চট্টগ্রাম রাখিয়াছিলেন। চট্ট শব্দের অর্থ ছাত্র। চট্টোপাধ্যায় ছাত্রদের উপাধ্যায়।

গত ৩০ বৎসরের মধ্যে অলৌকিক কারণের প্রতি লোকের বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে। সূর্যগ্রহণ কী ভয়ংকর কান্ড বিবেচিত হইত। একটা মসীবর্ণ অসুরই হউক আর যাহাই হউক, প্রদীপ্ত সূর্যকে গিলিতে থাকে। লোকে ভীত হইয়া শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর ইত্যাদি বাজাইয়া তাড়াইতে লাগিত। কোথাও বা এই বিপৎপাত হইতে রক্ষার নিমিত্ত হরিনাম সংকীর্তন হইত। সে-সময় অন্নপাক হইত না, আহার হইত না। ভাতের হাঁড়ি ফেলা হইত। গ্রহণ ছাড়িলে স্নান দান করিয়া দেহ শুদ্ধ করা হইত। শুধু এ-দেশে নয়, সকল দেশের লোকই বিপৎপাতের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিত। কি জানি, যদি সে-সূর্য আবার প্রকাশিত না হয়।

এক বর্ষীয়সী মহিলা আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পিতৃবাস কলিকাতায়। শ্বশুরালয় কলিকাতায়। তিনি কলিকাতার যাবতীয় আচার যথারীতি পালন করিতেন। কবে গ্রহণ হইবে, কয়টা হইতে কয়টা পর্যন্ত স্থিতি ইত্যাদি পাঁজি দেখিয়া রাখিতেন। গ্রহণ আরম্ভ হইলেই তিনি শাঁখ বাজাইতেন। গ্রহণ-অন্তেও বাজাইতেন। আমরা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া গ্রহণ জানিতে পারিতাম। এখন সেখানে ঘন বসতি হইয়াছে, কিন্তু শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাই না। অদ্য বিদ্যালয়ের বালক বলিতেছে যে, চন্দ্র সূর্যকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনের নাম গ্রহণ।

এটি সামান্য কথা নয়। কত যুগ হইতে মানুষ গ্রহণ দেখিলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িত। এখন সেটা নগণ্য ব্যাপার হইয়াছে।

জ্ঞানের আলোকে অসংখ্য ভয়স্থান ভয়শূন্য হইয়াছে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে এখনকার লোকে নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসী দেখিতেছে, বিনা অশ্বে রথ ছুটিতেছে; চিত্রের মানুষ দৌড়াইতেছে; শূন্যে কথা কহিতেছে, গান গাহিতেছে; আরও কত কী দেখিতেছি, শুনিতেছি। গত ৮০।৮৫ বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া রোগে বঙ্গদেশ জর্জরিত ছিল। এখন ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইয়াছে। দেখিতেছি, কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে না। কত অসাধ্য রোগ সুসাধ্য হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে পায়ে হাঁটিত, এখন হাঁটে না। শূন্য-মার্গে মনে হয় যেন রেল পাতা রহিয়াছে। প্রত্যহ যাত্রী বায়ুযানে যাতায়াত করিতেছে। দুর্গাপুরে দামোদরে এড়ো বাঁধ দিয়া দশলক্ষ একর জমির জল সঞ্চয় হইয়াছে। দামোদর হইতে যে অপরিমিত তাড়িত শক্তি পাওয়া যাইবে তত শক্তি কিসে ব্যয় হইবে এখন সে-চিন্তা আসিয়াছে।

বিজ্ঞানের কৃপায় অনেক পাইয়াছি, কিন্তু অনেক হারাইয়াছি। সে-সবও চিন্তা করা উচিত। আর বাল্মীকির উদয় হইবে না, মেঘনাদবধও রচিত হইবে না। বর্তমানে কাহাকেও বেতালপঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন অথবা আরব্য উপন্যাস পড়িতে দেখি না। পুরাণ পাঠ হয় না। পুরাতন যাত্রাগান শুনিতে পাই না। লোকে গ্রামের পুরাতন উৎসব ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের বুদ্ধির তৎপরতা বাড়িয়াছে' অধর্মও বাড়িয়াছে।

বর্তমানে যত অসত্য ও চুরি চলিতেছে ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে ইহার সিকিও ছিল না। অভাবের তাড়নায় চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন বুঝিতে পারি। কিন্তু যখন দেখি ধনবান ও বুদ্ধিমান খাদ্যদ্রব্যে অখাদ্য মিশাইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, মিথ্যা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীর প্রাণ সংহার করিতেছে, তখন জিজ্ঞাসা করি, কারণ কী?

বিজ্ঞানের শত শত আবিষ্কারেও মানুষ সুখী হইয়াছে কি? আমেরিকায় ধনের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অনেকের জীবন দুর্বহ হইয়াছে, উত্তেজনার অভাবে কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। সেদিন কাগজে পড়িতেছিলাম, আমেরিকায় দুইশত জনের মধ্যে একজন পাগল। ফ্রান্সের তিনশত জনের মধ্যে একজন পাগল। সভ্যতার এ কী পরিণাম! মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় নাই। সে চায় শান্তি, সে চায় আনন্দ, সে চায় রস, বাঁশরীর সুমধুর স্বর। সভ্য মানব নিরন্তর কর্মে ব্যস্ত থাকিয়া ইহা অনুভব করিতে পারে না। সে মনে করে, প্রকৃতির ঈশ্বরত্ব পাইলে সুখী হইবে। সত্য কি?

প্রেয়সী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মজা! তুমি এখানেই বদলি হয়ে আসছ। এ একেবারে ধারণার অতীত। লিভ-ভেকেন্সি না নতুন পোস্টিং?

কবে আসছ? ফুল জয়েনিং টাইম এভেইল করবে নাকি? কী দরকার? ফার্নি-চার বাসনকোসন তো সব এখানে। একলা মানুষ, মালপত্র তো বেশী হবার কথা নয়। বাঁধাছাঁদা একবেলার ব্যাপার। তাই যত শিগগির সম্ভব চলে এস। হাতে জয়েনিং টাইম থাকে এখানেই কাটাবে শুয়ে বসে। না হয় বাড়ি খুঁজে। তখন কী তাড়াটাই গেল।

সম্প্রতি এ-বাড়িতেই উঠবে বাবা বলে দিলেন। তড়িঘড়ি বাড়ি যে পাবে এমন মনে হয় না। যদি কারু লিভ ভেকেন্সিতে এসে থাকো, সে নিজে সরলেও ফ্যামিলি সরাবে না। আর যদি নতুন পোস্টিং হয়, বাড়ি তো নয় আকাশকুসুম।

কবে আসছ টেলিগ্রাম করে জানিও। ইতি তোমার পুরবী।

এর বেশী চাঞ্চল্য নেই। একটা কী যেন ডাকনাম শুনেছিল, কুলু না বুলু, ঠিক মনে পড়ছে না। কুলুই হবে হয়তো। ইতিতে লিখলেই দিব্যি জানা যেত ঠিকঠাক। কিন্তু ইতিতে ডাকনাম লিখলে হালকা শোনাত নিশ্চয়ই, একটু বা অশালীন। তা ছাড়া ডাকনামমাত্রই বিচ্ছিরি।

ডাকনাম ডাকনাম। তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। একটু আদর-ভালোবাসার সুর মিশিয়ে ডাকার জন্যেই ডাকনাম। কুলু, নদীর কুলুকুলু। খুব রেগে উঠলে কুলি বলে কোন না ডেকেছে কেউ মাঝে মাঝে। তার বদলে পুরবী। কেমন যেন আঁটসাঁট জামাপরা, স্ট্র্যাপ বাঁধা জুতো পায়ে দেখতে।

নামের শেষে ফলাও করে পদবী ও ডিগ্রিটা যে লেখেনি তাই ঢের। তাহলে একেবারে কাঁধে নিশান নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মিছিলে।

না, দ্বিতীয়বার পড়ে আবিষ্কার করল সুখেন্দু, 'তোমার'টি আছে।

জামায় বোতামের ঘর আছে। দেয়ালে ঘুলঘুলি। কাঠের মধ্যে কোথাও একটু চিনির বাসা।

তৃতীয়বার পড়বার মতন নয়। রেখে দিল চিঠিটা।

আরো একটা আছে। নাজিরের চিঠি। বাসা একটা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। যার জায়গায় আপনি আসছেন, ভাড়াটে বাড়ি, তিনি ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন কিনা ঠিক করেননি। যদি নিয়ে যান এ-বাড়িতেই উঠতে পারবেন। নচেৎ অন্য বাড়ি দেখতে হবে। দেখছি। লোক লাগিয়েছি। দুচার দিনের মধ্যেই একটা হিল্লে করতে পারব আশা করি। সে কটা দিন এখানে, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার আত্মীয়ের বাসায়ই থাকতে পারবেন। নচেৎ যদি বলেন, ডাক-বাংলো ঠিক রাখব।

এটা বেশ উৎসাহদায়ক চিঠি। এতটা যেন আশা করা যেত না। স্বাধীনতার পর পরো-পকার করা উঠে গেছে। সবাই স্বাধীন। পিওন-চাপরাশিও স্বাধীন।

কী জানি কেন, আরেকবার পুরবীর চিঠিটা টেনে নিল সুখেন্দু। গোড়াতেই একটা মজার কথা লিখেছে না? তা ছাড়া এটা—টেলিগ্রাম করে জানাও কবে আসছ। এর মধ্যে নেই কি একটু ব্যাকুলতার সুর? কোমলতার সুর?

হাতের স্পর্শটা মনে পড়ল। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম আসছে না। কী করে আসে। পাশে যদি একজন ভদ্রমহিলা শুয়ে থাকেন, তাহলে শান্তি কই? জেগে থেকে অন্তত

সম্ভ্রমকে তো পাহারা দিতে হবে। তা ছাড়া ভদ্রভাবে কী বলে আরম্ভ করতে হয় কথা তাও জানা নেই।

অন্ধকার ঘরে ভাগ্যিস ফ্যানটা স্পার্ক দিচ্ছিল। একটু ভয়মেশানো সুরে সুখেন্দু তাই বলতে পারলঃ 'ফ্যানটা জ্বলে যাবে না তো?'

ফ্যান আবার কী করে জ্বলে। বলে ফেলেই একটু ঘাবড়েছিল। বিজ্ঞানের মেয়ে, খুব ঠিকঠাক কথা বলা দরকার।

তোমাদের বাড়ির ফ্যান তোমরাই জানো—এ অনায়াসে বলতে পারত পূরবী। তাহলে বলাটা বরং অনৈর্ব্যক্তিক হত। তা না বলে বললে, 'বন্ধ করে দিলে কেমন হয়?'

তোমার হাতের কাছেই সুইচ, দয়া করে একটু উঠে বন্ধ করে দাও না—এ বললে কি খুব অসমীচীন হত? বললে বরং একটু আপনঘেঁষা শোনাত। তার বদলে সুখেন্দু বললে, 'ওরে বাবা, বন্ধ করলে ঘুমুবো কী করে?'

ঘুমুনোই যখন উদ্দেশ্য, তখন কথা বলার কী দরকার? চুপ করে রইল পূরবী।

আবার একটা ঢিল ছুঁড়ল সুখেন্দু, 'কিছু হবে না তো?'

'কী আবার হবে!'

'ফ্যানটা পুরোনো।'

'অনেক দিন অয়েলিং হয়নি বোধ হয়।'

ফুলশয্যা না কণ্টকশয্যা। ঘরের মধ্যে এত ফুলফল থাকলে কি ঘুম আসে, না, কথা আসে। তবু সাহস করে পূরবীর ডান হাতটা টেনে নিল হাতের মধ্যে। বললে, 'কাল সকালেই তা হলে ফিরে যেতে হবে?'

'আমার বিকেলে গেলেও চলে।' পূরবী যেন খানিকটা সুতো ছাড়ল, 'আমার সোমবার জয়েনিং ডে, তবে প্রিন্সিপালকে বলে কয়ে—'

'আমারও তো সোমবার। আমার একেবারে নট নড়ন চড়ন। তোমাকে পোঁছে দিয়ে বিকেল নাগাদ বেরুতে না পারলে আমিও যে জয়েন করতে পারি না—'

এ সবই জানা কথা। আগের থেকেই ছক কাটা। সেসব জানা শোনা রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করছে। যেন আর কোনো মাঠ-ঘাট নেই নদী নির্জন নেই।

ভেবেছিল হাতখানি বুঝি সরিয়ে নেবে হাতের থেকে। নেয়নি। বেশ শক্ত হাত, খসখসে। বিজ্ঞানের ল্যেবরেটরিতে কাজকরা মেয়ে, হাত একটু কর্কশ হওয়াই তো উচিত। দরকার হলে সংসারের মাজাঘষাও করেছে হয়তো। তেমনটিই তো চেয়েছিল সুখেন্দু। কাজ করতে করতে কঠিন হওয়া হাত। যে হাতে রয়েছে দৃঢ় মুষ্টির ব্যক্তিত্ব। তুকতুকে মুচমুচে হাত দিয়ে সে কী করবে?

একটিমাত্র রাত। রাতের মত রাত। তার-পর কাল দিনের বেলা একত্র একটু জার্নি করার পর আবার ছাড়াছাড়ি। মাঝপথে পূরবীকে সদরে তার বাপের বাসায় পোঁছে দিয়ে সুখেন্দুকে আবার বেশ খানিকটা যেতে হবে উজিয়ে, ভিন শহরে। দুজনেরই চাকরির তাগিদে এই নির্মম ব্যবস্থা। নিয়মে একটু নির্মম না হলে জীবনে লাবণ্য থাকে না।

সুতরাং সোমবারই যে যার খুপরিতে গিয়ে ঢুকবে। পূরবী কলেজে, সুখেন্দু কোর্টে।

তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভেই বিয়ে সারা।

পরীক্ষা পাশের পর থেকেই পাত্রীদের ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, চাকরি পাবার পর তো একেবারে মুষলধারে। তবু ছাতা আড়াল দিয়েছিল এতদিন সুখেন্দু। বলেছিল, শিলাবৃষ্টি চাই।

একবার একথোকে টাকা নয়, মাসে মাসে টাকা, বছরে বছরে টাকা। টাকা মানেই আরো টাকা। অর্থাৎ চাকুরে মেয়ে চাই। ওসব টুং-টাং কেরানি মেয়ে নয়, বেশ খটখটে রোদালো মেয়ে। বছর পাঁচেক অপেক্ষা করার পর সন্ধান পেয়েছে পূরবীর। মেয়ে কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর। সেও ডগা লতিয়ে-লতিয়ে অনেক দিন আঁকুপাঁকু করেছে। রসিকে রসিক চেনে। আর যায় কোথা!

নমস্কার। কোনো ছলনার ছায়ায় বসে দেখা নয়, স্পষ্ট সভা করে মেয়ে দেখা।

বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি বলেই পূরবী আপত্তি করেনি। যখন প্রেমে পড়বার সুযোগ নেই, আর যখন বিয়ে করাটাও বিজ্ঞান-সম্মত, তা ছাড়া মেঘে মেঘে বেলাও যখন অনেক হয়ে গেছে, তখন গত্যন্তর কী। নমস্কার। নির্ভীক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে প্রতি-ধ্বনি করেছিল পূরবী।

এর আবার দেখবার কী আছে। তবু একবার চোখ বুলালো সুখেন্দু।

শামলা, রোগাটে, রুক্ষ, ঋজু। বেশ একটু গম্ভীর, কঠিন। দাঁড়ানো ও চলায় বেশ একটু স্পর্ধা। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের পায়ে চলা। সে স্পর্ধা যেন ঔদ্ধত্য নয়, দীপ্তি। টানা টানা চোখ ক্লান্তিতে ভরা। অনেক পড়া ও রাত জাগার ক্লান্তি। অনেক বা অবদমনের। কাঠে ফুল ফোটাতে পারাই তো ইন্দ্রজাল। শুষ্কে ঝরনা নিয়ে আসা। ধূসরে সবুজের সারল্য। একটি স্বাস্থ্যের ঘুমে ক্লান্তির অপসার।

একবাক্যে রাজি হয়ে গেল সুখেন্দু। একচক্ষে পূরবী।

'তুই শুধু চাকরি দেখলি। মাইনে কত বউয়ের?'

'মন্দ নয়, আন্দাজ করে নে। কিন্তু চাকরির চেয়ে বেশী কিছু দেখেছি।'

'রূপ?'

'হ্যাঁ, রূপই বলতে পারো। মেধা, বিদ্যা বা প্রতিভা কি রূপ নয়? তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তার কঠোর কর্মশক্তি এসব কি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে না? এসব কি নয় আস্বাদের উপযুক্ত?'

'তোর বউ চাকরি করবে এক শহরে, তুই আরেক শহরে, এ-বিয়েতে সুখ কী।'

'সুখকে বেশী কাছে ঘেঁষতে না দেওয়াই সুখ। একটু দূরে দূরেই তো ভালো, মন জায়গা পাবে ওড়বার।'

'তার চেয়ে বিয়ে না করে চিঠি ছাড়লেই চলে।'

'কেন, কলেজে ছুটিছাটা কম কি। বড় ছোট এটা ওটা তো লেগেই আছে। আমার কাছে আসবে সেসব ছুটিতে। শুধু ভাঁড়ার আর হেঁসেল না করে একটু লেবরেটরি ও স্টাডিসার্কেল করলে মন্দ কি।'

'কিন্তু কত দিন?'

আর কে বুঝত পূরবীর মর্যাদা। মার্কেণ্টাইল ফার্মের ছোকরারা খুব চটক-দার বটে, মাইনের দিক থেকে কিন্তু তারা বউ চায় না তো চায় বইয়ের মলাট। হাতে রাখার দিকে নজর নেই পাতে দেয়ার দিকে নজর। আর বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে ভাজে ঝিঙে বলে পটোল। তবু হাকিম মানুষ, যা হোক কিছু লেখাপড়া শিখেছে, লেখাপড়ার মান বুঝবে। রূপের জাদুর চেয়ে বিদ্যার জাদু যে কম নয়, এ যে মেনে নিল তাকে না পছন্দ করি কী করে! ঘোড়ায় চড়া রাজ-পুত্তুর কোথায় পাব, লোকটি ভালো হলেই যথেষ্ট।

'এতো বিয়ে নয়, চালুনি করে ঘোল বিলোনো।' এদিকে টিপ্পনি ঝাড়তে এল মেয়ে-বন্ধুনীর দল, 'বলি ঘর করবি কোথায়? তুই রইলি বামনুপাড়া আর ও রইল কায়েতটুলি।'

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে ছুটি ছাটার চর। তাই বলে বল এত কষ্টের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি? নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত জায়গাও তো একটা রাখতে হয় জীবনে।'

'কিন্তু বিয়েটাকেও তো সাকসেসফুল করতে হবে। একসঙ্গেই যদি থাকা না গেল, এ আশার পাশা খেলে লাভ কি।'

'আজকের দিনের বড় কথা হচ্ছে ট্যাক্ট, কৌশল। রাধিকা একটা ছেড়ে আরেকটা নিয়েছিল। আমাদের শ্যাম আর কুল দুইই রাখতে হবে। স্বামী আর চাকরি।'

'শ্যাম আর কুল সাপ আর নেউল। হয় চাকরি ছাড়ো নয় স্বামী ছাড়ো।'

যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল সুখেন্দু। আঙুল কটিও বিচ্ছিন্ন করে ধরেছিল

একটি একটি করে। এ পর্যন্তই শালীনতা, সুরুচি। এর বাইরেই গোলমাল। আর যাই হই যেন খেলো না হয়ে যাই। লঘুতার স্পর্শলেশ না থাকে।

দেয়ালের ঘড়িটাও বেআক্কেল। ওটার আবার কাজ নেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজে। এখন রাত বারোটা, বাজছে ঢং ঢং করে আটটা। যখন শেষ রাতে চারটি হবে তখন বারোটা আওয়াজ হবে।

একজন জেগে জেগে পাখার স্পার্ক দেখুক, ঘড়ির ঘণ্টা শুনুক আরেকজন।

ঘুম যাক শালীনতা বজায় থাক। সুখের চেয়ে শান্তি বড়। মনের চেয়ে মান। সবার উপরে ডিসিপ্লিন।

টেলিগ্রাম করে আর দরকার নেই, চিঠিই লিখল সুখেন্দু। লিখল, শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছুচ্ছি। নাজিরকে লিখল, যদি পারেন স্টেশনে লোক রাখবেন। আর ডাক বাংলোটাও রাখবেন হাতে।

কী বিপদ! শনিবার আসছে। আর দিন পেল না আসতে? পুরবী চোখে ধুধু দেখল। শনিবার যে আমাদের কলেজের ফাংশান!

এখন এ কথা জানাই কী করে? তার সময় কই? টেলিগ্রাম করে তো জানানো যায় না। প্লিজ কাম অন সানডে—

মেয়ের বিপদ বুঝলেন সুহৃদবাবু। বললেন, 'আমি নিজেই স্টেশনে যাবখন।'

নতুন মোটা হচ্ছেন তুষারকণা। বললেন, 'আমিও।'

মনে মনে চুল উড়িয়েছে আঁচল ফুলিয়েছে পুরবী

নিশ্চিন্ত হল পুরবী। বাবা মা হাজির থাকলেই নিয়ে আসতে পারবেন। নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে, কত দিন দেখা নেই। বিয়ের পর প্রায় তিন মাসের ফাঁক। মাঝে দুদিনের ছুটি গোটা দুই পড়েছিল যাতে পুরো রাত একটার বেশী হয় না। কিন্তু কে কার কাছে যায়? পুরবী যাবে? ছি ছি লোকে বলবে কী। সুখেন্দু যাবে? সম্ভ্রান্ততার গলায় দড়ি।

লিখেছে সুখেন্দু, সামনেই পুজোর ছুটি। তোমারও আমারও। তখন বেরিয়ে পড়ব দুজনে। তখন ভাব হবে।

মনে মনে চুল উড়িয়েছে আঁচল ফুলিয়েছে পুরবী। বেরিয়ে পড়ব। পাহাড়ে। সমুদ্রে। দুর্গমে। নির্জনে। শাল শিমুলের বনে। ঝরনার উৎসের কাছটিতে। ইনস্পেকশান বাঙলোয়। হোটেলে। লেকের উপর নৌকোয়। ট্রেনের কুপেতে।

কিন্তু তার আগেই এসে পড়েছে লগ্ন। একই মফঃস্বল শহরে দুজনের চাকরি। যার যার আলাদা ক্ষেত্রে কাজ করা, আবার একসঙ্গে থাকা। যেমনটি হবে বলে ভাবেনি অথচ হয়েছে। সর্ববিরোধভঞ্জন মীমাংসা।

মায়ের সঙ্গে থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করেছে পুরবী। দোতলার পাশের ঘরটাতেই থাকবে দুজনে। হল-ঘরটায় আয়না। না না, পাশের ছোট ঘরটাই ভালো।

মনে মনে ভাবলে বড় ঘরেই বেশী শালীনতা, ছোট ঘরেই হয়তো বেশী উত্তাপ বেশী নিভৃতি। মন দিয়ে সাজাল ঘর। কোথায় খাট কোথায় ড্রেসিং টেবিল কোথায় লম্বা আয়নাওয়ালা আলমারি কোথায় বা ডিভান। বিয়ের পাওয়া সমস্ত ফার্নিচার এখানে মেয়ের বাড়িতেই রয়ে গেছে। কোথায় নেবে মফঃস্বলের মহকুমায় যেখানে দুখানা কাঠাল কাঠের চেয়ার টেবিলেই চলে যায়। তাছাড়া জিনিসগুলো তো সুখেন্দুর একার নয়, দুজনের। অতএব যতক্ষণ দুজনের সংযুক্ত ঘর না হচ্ছে ততক্ষণ তেমনি থাক যেমনি আছে।

আদর ভরা হাতে ধুলো ঝেড়েছে পুরবী। আর কটা দিন থাক এখানে ঠাসাঠাসি করে, পরে এ শহরেই যখন বাড়ি পাবে—বাড়ি একটা কোন না পাবে তখন সমস্ত নিয়ে বসবে মেলে-ছড়িয়ে। কী মজা! এমনটি সচরাচর হয় না। প্যাকিঙের হ্যাঙ্গাম নেই, খোঁচাখুঁচির আঁচড় লাগবে না এতটুকু। সব নিটুট থাকবে। সব নিটুট আছে।

কিন্তু শনিবার কেন? পাঁজি দেখে যাত্রা নাকি? রাজকার্যে আবার পাঁজি কি! কবে জয়েন করতে হবে, শনিবারে বিশেষ কী মাহাত্ম্য কিছুই লেখে না! রবিবারটা বিশ্রাম করতে চায় বুঝি। বিশ্রামের ব্যবস্থা তো স্থায়ীই হয়েছে এবার। কী জানি কেমন-তরো লোক যেন বাপু। ফুলশয্যার রাতে হাতটা টেনে নিল একটু হাতের মধ্যে—ব্যস—তারপর যত সব আজেবাজে কথা। মেয়ে প্রেমেই পড়ুক বা এম-এই পড়ুক নেমে পড়তে পারে না, যদি কেউ নিজের থেকে তাকে না নামায়। শিষ্টতা বলে তো একটা জিনিস আছে।

কী রকম যেন ভারিক্কী ভিতু শ্রদ্ধেয়-

শ্রদ্ধেয় দেখতে। চিঠি দু-একখানা যা লিখেছে সম্বোধনে শূন্য, ফিল-আপ-দি-গ্যাপ করতে দিলে ছাত্রছাত্রীরা তাতে সবিনয় নিবেদন লিখত। এই দেখ না হালের চিঠিটা। কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই, আগ্রহ আনন্দ নেই। যেন আইনের ভাষায় স্থির ও সংযত একটা বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এখানে বদলি হয়ে আসছে এ খবর দিয়ে যে চিঠি লেখে—কত বড় সুখের খবর—তখনো এতটুকু আন্দোলন নেই। যেন একটা নাম জারির নোটিশ।

তবু তিন দিনের মুখে জোড়ে ফিরে এসে চলে যাবার সময় কী রকম ভাবে যেন চেয়েছিল পূরবীর দিকে। একটু হেসেও-ছিল বোধ হয়। বোকা বোকা মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। যেটুকু সমীচীন ঠিক সেইটুকু। মাগো, বুড়ো বয়সে কেউ যেন বিয়ে না করে, এতটুকু রাগদ্বেষ লোভ মোহ কিছু নেই। পূরবীর নিজেরও আছে নাকি? সেই বা কেমন করে তাকিয়েছিল শুনি? চোখ ছল ছল করে ছিল না কি, স্বামীর সঙ্গে যাবে কি যাবে না দ্বিধা করেছিল একবিন্দু? কী করে করবে বলো। রাত ফুরলেই কাল আবার কলেজ। তেমনি সুখেন্দুরও কাছারি।

যাক, আজ শনিবার, সব আজ চূড়ান্ত হয়ে যাবে। উপায় নেই, পূরবীকেই একটু আসতে হবে এগিয়ে। এ তার নিজের ডেরা নিজের গুহা। পারবে সে একটু উপর-চড়া হতে। সে শিক্ষয়িত্রী, তাকেই একটু নিতে হবে শিখিয়ে-পরিয়ে। প্রাবল্যের অভাব মেটাতে হবে ছলনার প্রাখর্যে। ফাংশান ভাঙতে ভাঙতে প্রায় নটা। কলেজেই তার-পর খাওয়া দাওয়া। একেবারে খেয়ে দেয়েই বাড়ি ফিরবে। ফাংশান ছেড়ে ফিষ্টি ছেড়ে আগে আগে পালানো দৃষ্টিকটু, অশালীন। কী ভাববে মেয়েরা, প্রোফেসররা। স্বামীর সঙ্গে মিলতে চলেছেন উন্মাদিনী। ছি ছি। না, আস্তে সুস্থে সিডিউল ঠিক রেখেই সে ফিরবে। বরং তৈরি হয়েই ফিরবে। নাচ ও নাটকের টাটকা হাওয়া গায়ে নিয়ে। যদি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ইতিমধ্যে তবে তো ভালোই। চমকে দেবে ঝলসে দেবে। ঘুমের মধ্যেই তো চমকে দেবার সুখ।

আহা, ঘুমুক একটু আগরাতে। গদির উপর খুব নরম আর পুরু করে বিছানা করা। ট্রেনের ধকলের পর নিক একটু বিশ্রাম করে।

বিকেলের দিকে সুহৃদবাবু বললেন গাঢ় মুখে, 'তোর প্রিন্সিপ্যালের এ কি কাণ্ড, মন্ত্রীকে ডেকেছে প্রিজাইড করতে।'

'তিনজনকে ডেকেছেন।'

'তিনজন?'

'হ্যাঁ, আজকাল তিনজন লাগে। এক সভাপতি, দুই প্রধান অতিথি, তিন উদ্বোধক।'

'বটে?'

'মন্ত্রী সভাপতি, সম্পাদক প্রধান অতিথি, সাহিত্যিক উদ্বোধক।'

'মন্ত্রী হলেই তো অসুবিধে হল।' চিন্তিত মুখে বললেন সুহৃদবাবু, 'আমার যে যেতে হয় তাহলে।'

'বেশ তো যাবে।' পূরবী হাসল।

'আর জানো না বুঝি, কুলু নিজেও একটা পার্ট নিয়েছে।' বললেন তুষারকণা, 'সেটা দেখবে না একটু?'

'সত্যিই তো, দেখব বৈ কি।' বললেন সুহৃদবাবু, 'তুমিও তাহলে চলো।'

ভদ্রলোকের তাহলে গতি কী হবে? যিনি আজ আসছেন সন্ধ্যার ট্রেনে?

সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে। তরুণ যাবে স্টেশনে। কি রে পারবি নে?

'খুব পারব।' ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, শার্টের কলার ফুলিয়ে অপার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে।

'চিনতে পারবি তো? মনে আছে চেহারা?'

'মনে না থাকলেও ধরন ধারণ দেখে ঠিক বার করতে পারব।' খুব চালের মাথায় তরুণ বললে।

'তবে আর ভাবনা কি, বলবি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নটার মধ্যেই আমরা ফিরব।' বললেন সুহৃদবাবু।

'ঘর-দোর বিছানা বাথরুম সব তৈরি।' তুষারকণা লেজুড় জুড়লেন: 'খেতে চাইলে বলা আছে ঠাকুরকে। বুঝলি? আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় না যেন দেখিস।'

সমস্তটা পথ ভাবতে ভাবতে আসছে সুখেন্দু। চারদিককার মাঠ ঘাটও ভালো লাগছে দেখতে। ধানখেত মেঠো পথ গরু বাছুর লোকজন। কোনো দিন খায় না, আজ ভালো লাগছে খুরিতে করে চা খেতে। কপট পোশাকে নয়, ঘরোয়া সরল পোশাকে দেখবে আজ পূরবীকে। মন্দ লাগবে না। গম্ভীরকে বিগলিত করবে, আড়ষ্টকে পরিমুক্ত। বেশ দেখতে লাগবে সেই অবতরণ। বিদুষী বিনতা হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রতীক্ষা থেকেই সব হবে।

সন্ধ্যের শেষে ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছল স্টেশনে।

দুটো পিওন এসেছে দেখছি।

'আমিও এসেছি।' ফুটফুটে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে।

'কে তুমি?'

খুব স্মার্ট শোনাবে মনে করে ছেলেটি বললে, 'আমি আপনার শালা, তরুণ।'

দু একটা শাড়ির স্তূপ বা শিখা বা ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মত সুখেন্দু বললে, 'আর কেউ আসেনি?'

'কী করে আসবে। দিদিদের কলেজে যে ফাংশান। অনেক সব হোমরা চোমরা এসেছে—' লিস্টি দিলে তরুণ: 'বাবা-মাকেও তাই যেতে হল।'

'তুমি গেলে না?'

'বা ওটা মেয়েদের কলেজ যে। বাবা-মা গেছে স্পেশাল ইনভিটেশনে। চলুন, গাড়ি ঠিক করে রেখেছি। এই তো মাল। দুটো সুটকেস আর এই হোলড-অল?'

পিওনরা হাত লাগাতে এল।

'ডাকবাংলো ঠিক আছে?' সুখেন্দু জিগগেস করলে।

'না হুজুর।'

'না?' বসে পড়ল সুখেন্দু: 'তবে গাছ-তলা?'

'না। বাড়িই পাওয়া গেছে।' পিওনদের একজন বললে।

এর মত পাওয়া আর কিছু হতে পারে না দুনিয়ায়, এমনি আনন্দে সুখেন্দু বললে, 'বাড়ি পাওয়া গেছে? কোন্ বাড়ি?'

'যাঁর জায়গায় আসছেন তিনি ফ্যামিলি নিয়েই দুপুরের ট্রেনে চলে গিয়েছেন। সেই বাড়িটাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢুকতে হবে। নইলে প্রাইভেট বাড়ি, কে কখন গাজুরি ঢুকে পড়ে ঠিক নেই। অবিশ্যি আজ রাত্তিরটা—'

'চলো চলো ঝটপট—'

'মালপত্র ফার্নিচার কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে দখল নিলেই তো চলবে।' তরুণ এগিয়ে এল: 'লোকজন লাগে পিওন দু একজনও থাকতে পারে, আমরাও না হয় পাঠিয়ে দেব দরকার হলে। কিন্তু আপনার যাবার কী দরকার! আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন। সবাই বলে দিয়েছেন,—কষ্ট হয়েছে কত ট্রেনে—'

ও সব কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনল না। মালপত্র চাপিয়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ির উপর চড়ে বসল সুখেন্দু।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সারা পথ এল সাইকেল করে। অনেক বোঝালো। এক রাত্রি কি খালি বাড়িটা রাখা যায় না কবজার মধ্যে? নিশ্চয়ই যায়। এত তাড়াহুড়ো করে রাতা-রাতি দখল নেওয়ার মাথা ব্যথা কী।

কত কাকুতি মিনতি করছে ছেলেটা, হেরে যাচ্ছে বাবা-মার কাছে দিদির কাছে, নাস্ত কার্য উদ্ধার করতে পারছে না, একটু বোধ হয় মায়া হল সুখেন্দুর। বললে, 'বাড়িটা কেমন দেখে আসতে ক্ষতি কি।'

'তা না হয় দেখুন। কিন্তু থাকা চলবে না। আমাদের ওখানে সব তৈরি হয়ে আছে। ঘর-দোর বিছানা বাথরুম চা-খাবার—'

বাড়ি দেখে সুখেন্দু একেবারে পুলকিত। বা, চমৎকার।

কানা গলির মধ্যে একটা বধির ইষ্টক-

পুজো। তার উপর এখন তো ছাড়াবাড়ি, ভূতের আস্তানা। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আবর্জনায় চারদিক ভরা। উনুন ভেঙে দিয়ে গেছে, গাছপালা একটাও আস্ত রাখেনি, ইলেকট্রিক বালবগুলো তো নেবেই একটা পেরেকও গাঁথা নেই দেয়ালে। আদালত থেকে পাওয়া নড়বড়ে কটা টেবিল চেয়ার শুধু পড়ে আছে।

'ঘরদোর একটু পরিষ্কার করে রাখা যেত না?'

'উনি এই তো গেলেন। তাছাড়া শুনেছিলাম আজ রাতটা—'

'একটা সুইপার ধরে নিয়ে এস।' প্রায় ধমকের সুরে সুখেন্দু বললে, 'আর কটা বালব। জলটল আছে তো? বালতি? মগ?'

'সব যোগাড় করে দিচ্ছি।' আর্দালি কখন সামিল হয়েছিল, উল্কাবেগে বেরিয়ে পড়ল।

'এইখানে থাকবেন নাকি?' তরুণ আবার এগিয়ে এলঃ 'পাগল না মাথা খারাপ!'

'নিজের বাড়ি পেলে আর কী চাই? স্বর্গের চেয়েও বড় পাওয়া এই বাড়ি পাওয়া।'

কিছুতেই ঘাড় সিধে করল না সুখেন্দু। ফিরিয়ে দিল তরুণকে। টেবিলের উপর জ্বলন্ত টর্চের মুখটা দরজার দিকে রেখে পিছনে অন্ধকারে চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

সাঁই-সাঁই করে সাইকেল চালিয়ে তরুণ এক দৌড়ে পৌঁছুলো এসে কলেজে। কী লজ্জা, নাস্ত কাজ উদ্ধার করতে পারল না!

একটা ভরা পিনকুশনের মত ভিড়। বাড়িতে বিশেষ অসুখ, য়্যাকসিডেণ্ট, এখুনি খবর দিতে হবে, এমনি অনেক বায়নাক্কার পর তরুণ ঢুকল হলের মধ্যে। সুহৃদবাবুর কানের কাছে মুখ রেখে বললে ফিসফিস করে, 'জামাইবাবু আমাদের বাড়িতে উঠল না।'

'সে কি? কোথায় উঠল?'

'বলছি, বাইরে এস।' কে কখন শুনে ফেলবে তরুণের তখন আরেক লজ্জা।

'এখুনি উঠব কী করে!' পাশের থেকে বললেন তুষারকণাঃ 'এই সিনেই তো কুলুর য়্যাপিয়ারেন্স। তুমি যাও, সব ব্যবস্থা করোগে।'

সুহৃদবাবু বাইরে এসে শুনলেন সব ব্যাপার। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ইলেকট্রিক বালব এসে গেছে। উপরের একটা ঘর হাত লাগিয়ে দুরস্ত করেছে সবাই। হোলডঅল খুলে মেঝেয় বিশীর্ণ একটা বিছানা পর্যন্ত করা হয়েছে। সামনের টেবিলে চায়ের পট-কাপও এসে গেছে সামনের দোকান থেকে।

'একি, তুমি এখানে উঠেছো কেন? চলো চলো,' সুহৃদবাবু একেবারে হাঁ হাঁ করে পড়লেনঃ 'কইরে গাড়ি ডাক।'

সমীচীন ভঙ্গিতে প্রণাম করল সুখেন্দু। বললে, 'বাড়িটা যখন পেয়ে গেছি ঢুকে পড়াই ঠিক মনে করলাম। স্বত্বের দশভাগের নয় ভাগই দখল।'

'বাড়ি কে নেয়? প্রিডিসেসরের বাড়ি সাকসেসরের হয়। নাজির কী করতে আছে? বাড়িওলা কে? কিচ্ছু ভয় নেই। এর চেয়েও ভালো বাড়ি ঢের যোগাড় হবে। তুমি চলো আমার ওখানে—' কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

সুখেন্দু হাত কচলালো। বললে, 'নিজের বাড়ি পেয়ে কায়েম হয়ে বসাই ভালো'। পরে যাবখন এক সময়। এখানেই তো পোস্টিং।'

অনেক অনুনয় করলেন সুহৃদবাবু। সুখেন্দু বিনয়ে পাথর হয়ে রইল।

সুহৃদবাবু ছুটলেন মেয়ে-কলেজে।

আলাদা রিক্সায় এবার স্ত্রীকে নিয়ে চললেন। তোমার কথায় যদি কিছু হয়।

কিছুই হল না। যত সাধ্যসাধনা আদর-সোহাগ সব ব্যর্থ হল। অশালীন অসঙ্গত কিছুই করছে বলছে না সুখেন্দু। প্রণামান্তর বললে, 'যখন একদা বাসা একটা করতেই হবে আর যখন ভাগ্যক্রমে আসতে-আসতেই পেয়ে গেছি, তখন আর সেটা ছাড়ি কেন?'

বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো বৃথা, রাগে গরগর করতে করতে বাড়ি ফিরলেন তুষারকণা। আলাদা রিক্সায় সুহৃদবাবু।

পুরবীর কাছে খবর গিয়েছে কলেজে। সে শুনে তো টং। মা-বাবার পর্যন্ত অনুরোধ রাখল না!

লেডি প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তুমি এবার চলে যাও।'

ঝলসে উঠল পুরবীঃ 'কোথায়?'

প্রিন্সিপ্যাল হাসলেনঃ 'তোমার নিজের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, আমার এতদিনকার নিজের বাড়ি। সে তো যাবই। তাড়াতাড়ি কি। খেয়েদেয়ে যাব।'

'না আগেই যাও। এই ফিস্টটা কোনো কাজের ফিস্ট নয়। শোনো, তুচ্ছ কারণে জীবনভোজ নষ্ট কোরো না। বিয়েটা সব ফাংশনের চেয়ে বড়ো ফাংশন। সেটাকে সাকসেসফুল করো—'

আত্মসম্মান খুইয়ে? ককখনো না। একটা খাস্তা লুচি ও আলুর দমের আস্ত একটা আলু মুখে পুরল পুরবী। পুরুষের খেলনা হতে আসিনি। দড়িধরা খেলনা হতে আসিনি। আসিনি বয়ে যেতে। এবার পুরল একটা রসগোল্লা। গালগলা ফুলিয়ে খেতে লাগল। কিসের দৈন্য কিসের ক্লেশ! সব শেষ হয়ে যাক। চাকরি আছে।

খেয়ে দেয়ে যেমন ফেরবার তেমনিই ফিরল পুরবী। তার নিজের বাড়ি, তার এতদিনকার নিজের বাড়ি। বাবা-মা কিচ্ছু বললেন না, বলবার কি বা আছে. কিন্তু তাঁরা যে অপমানিত হয়েছেন, অন্তত প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এ জ্বালায় জ্বলতে লাগল। যদি এখন একবার আসত চোখের সামনে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলত। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ছি ছি, বিকেলে কতগুলি ফুল আনিয়ে রেখেছিল, সেগুলি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। ডবল বিছানার বাড়তি বালিশ দুটো ছুঁড়ে ফেলল খাটের এক পাশে। শুয়ে পড়ল। আলো নেভাল না। ছি ছি, আলমারির আয়নায় শুয়ে শুয়ে দেখা যাচ্ছে নিজেকে। উঠে পড়ল এক ঝটকায়। একটা মোটা চাদর ঝুলিয়ে দিল আলমারির গায়ে, একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন বই হাতে নিয়ে শুলেই ঘুম আসে। ছি ছি, আজ ঘুমের ওষুধ খেলেও আসবে না। না আসুক, পরীক্ষার খাতা দেখব। ভাগ্যিস চাকরিটা ছিল, নইলে মা-বাবা হয়তো বলে-কয়ে গাড়িতে চড়িয়ে পাঠিয়ে দিত। স্বাধীন সমর্থ মেয়ের কাছে তাঁরা প্রতিকার চান। ছোটভাইটা পর্যন্ত এর সমুচিত উত্তরের প্রতীক্ষা করছে।

যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। যেন সাধন করে পাবার মতন কিছু নেই আমার মধ্যে। লেখাপড়া শিখিনি। দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি না। জীবিকার্জনের ক্ষমতা নেই।

তুষারকণা বলছেন, শুনতে পেল, 'টিফিন-কেরিয়ার করে খাবার পাঠিয়ে দিই।'

সুহৃদবাবু বললেন 'দাও। আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাই। ওদের কর্তব্য ওরা বুঝবে।'

কর্তব্য! আইনটা এখনো পাশ হয়নি, কর্তব্য হচ্ছে আদালতে গিয়ে নালিশ ঠোকা। আমি পারব না নিয়ে যেতে। তরুণকে বলেছিল, বোধহয় সে খেঁকিয়ে উঠেছে। হাকিম তো নয় হিটলার। ঘাড় একবার ত্যাড়া করেছে তো সিধে করে কার সাধ্য।

'না, ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি।'

'চা খাইয়েছ, এবার ভাত খাওয়াতে পারবে?' আর্দালীকে জিগগেস করল সুখেন্দু।

'সব খাওয়াতে পারব।' খুব ডাঁটের উপর বললে আর্দালি। 'মানে কাছেই ভালো হোটেল আছে।'

'এক প্লেট রাইসকারি নিয়ে এস। আর সিগারেট আনতে পারবে?'

'যা বলবেন তাই আনতে পারব।'

খাচ্ছে সুখেন্দু, শ্বশুরবাড়ির ঠাকুর টিফিনকেরিয়র নিয়ে হাজির।

'এ নিয়ে আর এখন কী হবে? দেখছ না খাওয়া প্রায় শেষ। এখানে বাড়তি লোক নেই যে সদ্ব্যবহার করবে। সুতরাং ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

খাবারটা অন্তত খেল কিনা তাই শোনবার জন্যে কান পেতে ছিল বুঝি পূরবী। শুনল খাবারও ফিরিয়ে দিয়েছে। যাক, সমস্ত সম্পর্ক—আহা, কী বা একটু হাতছোঁয়া সম্পর্ক—এইখানেই মুছে গেল। আলোটা নিভিয়ে দিল এতক্ষণে। এইবার শান্তিতে ঘুম আসবে নিশ্চয়ই, ছেলেবেলার স্কুলের ছবি প্রথম বয়সের কলেজের ছবি ভাবতে লাগল। কত বড় বিছানা! ছোট বোন ভূপালি পর্যন্ত আজ পাশে নেই। একা ঘরে ঘুমুনোর শান্তি কত দিন আসেনি জীবনে!

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরিয়ে মেঝের উপর পাতা হতভাগা বিছানাটার দিকে তাকাল সুখেন্দু। একেই বলে নিয়তি। প্ল্যাটফর্মে যে যাত্রী শোয় তার একটা আশা থাকে এক সময় না-এক সময় ট্রেন আসবে। এ কি আশাহীন বিছানা! এখানে কী করে ঘুমুবে, কোন দুঃখে, কার উপর রাগ করে! কত শৌখিন ঘরে পরিপাটি করে না জানি বিছানা হয়েছিল আজ! শুধু বিছানা! কত ফুল না জানি! শুধু ফুল! কত নম্রতা-কোমলতা না জানি! শুধু নম্রতা কোমলতা!

কোনো মানে হয় আর্দালীকে পাশের ঘরে নিয়ে শুয়ে! মেঝের উপর ইঁদুর—আরশুলার সহবাসী হয়ে? এখানে কি ঘুম আসবে, না ঘুমে সুখ আসবে? তার চেয়ে সোজা চলে যাই গোকুলে। পৌরুষে আঘাত লাগবে। তার চেয়ে মেঝেয় শুয়ে পিঠে আঘাত লাগারই বেশী সম্ভাবনা। বরং এই অবস্থায় এই ভূমিকায় গেলেই কিছুটা কথা বলার বিষয় পাওয়া যাবে। কিছু বা ব্যাখ্যা বক্তৃতার। আর বাদানুবাদের পরই তো রাগানুরাগ। খেলো দেখাবে, হালকা দেখাবে? দেখাক না, কে দেখছে! তার জন্যে হীরের আঙটির মত এমন একটা রাত জলে ফেলে দেবে?

দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায় এর মধ্যে? দরজা খুলে দেবে তো? ধাক্কা দেব। হল্লা করব। পৌরুষ প্রমাণ করব। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাব হরণ করে।

আর্দালীকে বললে, 'একটু হাওয়া খেয়ে আসি। যদি দেখ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরিনি ভাববে কোথাও গিয়েছি।'

কী রকম চোখে তাকাল আর্দালী। তার জন্যে বাইরে যাওয়া কেন? তাকে বললে নিজেই সে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে।

একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুখেন্দু। লাস্ট ট্রেন এই এল কলকাতা থেকে। এটাই আবার ছেড়ে যাবে এক্ষুনি।

'এসেছে, এসেছে।' বাড়ির ছেলেমেয়েরা, যারা তখনো ঘুমোয়নি, কোলাহল করে উঠল।

ওরে পূরবীকে খবর দে। দরজায় ধাক্কা মেরে জাগা। ঘর খুলে দিতে বল। শুধু আসেনি, এখানে থেকে যাবার জন্যে এসেছে।

কোথায় পূরবী? তার ঘর খোলা। অন্ধকার।

খোঁজ, খোঁজ, কোথাও চিহ্ন নেই। হাঁক ডাক কর, কোথাও সাড়া নেই। ছাদ বাথ-রুম খাটের তলা আলমারির আড়াল, সব ফক্কা। কেউ বললে, হস্টেলে ফিরে গিয়েছে বুঝি, কেউ বললে লাস্ট ট্রেনে কলকাতা গেল বোধ হয়।

এ যে পুলিশ কেস করে বসল। এ ঝক্কি কে নেয়! হাকিমের স্ত্রী ফেরার এ কি কেলেঙ্কারি! কেলেঙ্কারির চেয়েও ঝকমারি বেশী। চুপ করে থাকলেও তো চলবে না, কিছু একটা তদবির-তালাস করতে হবে। আর থানা পুলিশ করতে গেলেই তো ছোট কথা এসে পড়বে, স্বামী পছন্দ হয়নি, ছোকরা কারু সঙ্গে চম্পট দিয়েছে।

এ যে তর্পণেই গঙ্গা শুকোলো। খোঁজবার ওজুহাত করে কেটে পড়ল সুখেন্দু।

আর্দালীটা ভালো। আলো জ্বালিয়ে রয়েছে তার প্রতীক্ষায়।

উপরে উঠেই সুখেন্দু নেমে এল তরতর করে: 'এ সব কী! এ সব এনেছ কেন? এ সব তোমাকে কে আনতে বলেছে!'

'আমি কি জানি! নিজের থেকে এসেছেন।'

'নিজের থেকে এসেছেন?' সুখেন্দু হুড়হুড় করে উঠে গেল উপরে।

এসে দেখল, মেঝের উপর পাতা প্ল্যাট-ফর্মের বিছানায় কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে আছে পূরবী।

পৃথিবী আর কদিন!

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রলয় বর্ণনা করেছেন,—

অসীম জগৎ চরাচর
অবশেষে শ্রান্ত কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল আকুল আর্তস্বর
"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে বিশ্রান্ত কলেবর,
আমারে নূতন দেহ দাও।
গাও দেব, মরণ সংগীত।
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক-দিগন্তর।
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি অন্ত থরথর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া।
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল অসীম শূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।
মহা-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহাচিতানল।

মহাদেবকে জাগতে হবে না।

সূর্যের হাইড্রোজেন হিলিয়মে রূপান্তরিত হচ্ছে তাই সূর্যের এই তাপ। হাজার কোটি বছর পরে সূর্যের হাইড্রোজেন শেষ হবে, ফলে সূর্য নিবে যাবে। কিন্তু তার ঠিক আগে আর একটা ব্যাপার ঘটবে। হাইড্রোজেন সব শেষ হবার আগে সূর্য এখনকার চেয়ে হাজারগুণ বেশি তাপ ও আলো দিতে থাকবে, সেই তাপে পৃথিবীর সমস্ত জলবিন্দু বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, পৃথিবীতে জীবের কোন চিহ্ন থাকবে না।

কিন্তু সেও অনেক পরের কথা। আজ হতে পঞ্চাশ বছর পরে কি ঘটবে, সেই কথা আজ বলব।

কথাটা একটু গোড়া থেকে আরম্ভ করি। ১৮৯৪ সাল। পদার্থবিদ্যার অনেকগুলি চমকপ্রদ আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা তখন এই। একটি মৌলিক পদার্থ কতকগুলি অ্যাটমের সমষ্টি; সেই পদার্থের সব অ্যাটমগুলি সমান; বিভিন্ন মৌলিক-পদার্থের অ্যাটমগুলি বিভিন্ন; যখন রসায়নিক মিলন ঘটে তখন সেটা অ্যাটমগুলির মধ্যেই ঘটে থাকে। ওই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ড্যালটন কথাগুলি বলেছেন। আরও দেখা গিয়েছে অ্যাটমদের বাস্তব সত্তা আছে, তার আয়তন তার ওজন নির্ণীত হয়েছে। জানা গিয়েছে এক-একটি অ্যাটমের ব্যাস এক সেণ্টিমিটারের পাঁচ কোটি ভাগের একভাগ; একটি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ওজন দশমিক চব্বিশটা শূন্য ১৭ গ্রাম। এসব বলতে যে কি বুঝায় সাধারণ লোক তা কল্পনায়ও আনতে পারছে না। অথচ গাঁজা বলেও উড়িয়ে দিতে সাহস করছে না; কারণ হরেক রকম পরীক্ষায় ওসব যাচাই হয়ে গিয়েছে।

এই ১৮৯৪ সালে আমেরিকার ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক একদিন তাঁর ছাত্রদের ডেকে বললেন,—ওহে, তোমরা বিজ্ঞানের এই বিভাগে পড়তে এসে বড়ই ভুল করেছ; পদার্থবিদ্যায় যা কিছু আবিষ্কার হবার হয়ে গিয়েছে। এখন তোমরা বড় জোর এই করতে পার, যেটা দশমিকের তিন ঘর অবধি মাপা হয়েছে সেটাকে ঠেলে চার কি পাঁচ ঘর অবধি নিয়ে যেতে পার, আর কিছু নয়।

কিন্তু হবে তো হবে, এর ঠিক তিন চার বছরের মধ্যে এমন কতকগুলি আবিষ্কার হল যা শুধু পদার্থবিদ্যায় নয়, বিজ্ঞানের সকল ধারাতে বিপ্লব এনে ফেলল।

এর কয়েক বছর আগে হার্জ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন; মার্কনি তা কাজে লাগালেন; রন্‌ট্‌গেনের এক্‌স্‌-রশ্মি আবিষ্কারে মানুষের যেন তৃতীয় নেত্র খুলে গেল; বেকারেল দেখলেন, ইউরেনিয়ম ধাতু থেকে আপনা হতে সব সময়ই তেজ বেরচ্ছে; আর জে. জে. টমসন অ্যাটম থেকে পেলেন ইলেক্‌ট্রন।

ইলেক্‌ট্রন

অ্যাটম হল একটা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, এতদিন বিজ্ঞানীর এই ধারণা ছিল। এখন অ্যাটম থেকে বেরল ইলেক্‌ট্রন। এই সময়কার একটা কৌতুককর গল্প আছে। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনের এক ছাত্র কেলভিনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কি শুনেছেন অ্যাটমকে ভাঙা হয়েছে? কেল্‌ভিন উত্তর করলেন,—অ্যাটম ভাঙা! অসম্ভব! গ্রীক ভাষায় অ্যাটম মানে হল যা ভাঙা যায় না। ছাত্রটি কিছু উদ্ধত হলেও সুরসিক ছিল; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—গ্রীক জানার বিপদ ওই।

দেখা গেল, ইলেক্‌ট্রনরা নেগেটিভ তড়িত্যুক্ত। যে পদার্থ থেকে যে ভাবে তাদের নিষ্কাশিত করা হোক, তারা হুবহু এক। একটি ইলেক্‌ট্রনের ওজন বেরল। জানা গেল, সব চেয়ে হাল্‌কা যে হাইড্রোজেন অ্যাটম একটি ইলেক্‌ট্রনের ওজন তার সাড়ে আঠারোশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অ্যাটম থেকে ইলেক্‌ট্রন বের করে নেবার কতকগুলি উপায় অতি সহজ। একটি ধাতুকে বেশি গরম করলে তার থেকে ইলেকট্রন বেরতে থাকে; কোন কোন ধাতুর উপর আলো ফেললে তার থেকে ইলেক্‌ট্রন ছিটকে বেরয়।

একটি অ্যাটম একেবারে নিরীহ; কিন্তু তার থেকে পাওয়া ইলেক্‌ট্রনের নতুন ধর্ম যখন জানা গেল তখন বিজ্ঞানী তাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। তৈরি হল ভাল্‌ভ, তৈরি হল আলোকতড়িৎ কোষ। আজ বিজ্ঞান যে পৃথিবীর রূপ একেবারে বদলে দিয়েছে তা প্রধান ভাবে সম্পাদন করল এই ভাল্‌ভ আর আলোক-তড়িৎ কোষ। ভাল্‌ভের দৌলতে আমরা পেলুম রেডিও, আর আলোকতড়িৎ কোষ সৃষ্টি করল টকি, টেলিভিসন। ইলেক্‌ট্রন তার জয়পতাকা নিয়ে নানা দিকে অগ্রসর হল। রেডারের সৃষ্টি হল; শত্রু-পক্ষের চলন্ত বিমানের অবস্থিতি মুহূর্তে মধ্যে জানা গেল। কুয়াশা, বৃষ্টি, তুষারপাত ভেদ করতে দূরবীন অপারগ, রেডার সে সব বাধা দূর করে ওপারের সংবাদ দিল। ইলেক্‌ট্রনের আর একটা দান হল ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ। ইলেক্‌ট্রন

অণুবীক্ষণ একটা জিনিসকে দু'লক্ষগুণ বড়ো করে ধরল। প্রচণ্ড শক্তিশালী সাধারণ অণুবীক্ষণ দিয়ে যে সব জীবাণু দেখা যাচ্ছিল না ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে তারা ধরা পড়ল।

প্রোটন, নিউট্রন

তড়িৎশূন্যে অ্যাটম থেকে যখন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন বেরয় তখন অ্যাটমের আর এক অংশ থাকতেই হবে যা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। এখন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত এই অংশ অ্যাটমের মধ্যে কোথায় আছে? সঠিক সংবাদ পেতে হলে অ্যাটমের মধ্যে কাউকে পাঠাতে হবে, সে ভিতরে যাবে কিন্তু সেখানে আটকা পড়ে থাকবে না। মোটের উপর যে ছট্‌রা পাঠানো হবে সে অ্যাটমের মতো ক্ষুদ্র হবে, অথচ তাকে প্রচণ্ড বলশালী হতে হবে।

রাদারফোর্ড দেখলেন, প্রকৃতির রাজ্যে তো এই রকমের ছট্‌রা রয়েছে। রেডিয়ম বা ওই রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আপনা আপনি যে আল্‌ফা রশ্মি বেরচ্ছে তা হল পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ। এই আল্‌ফা-কণিকা সেকেণ্ডে কয়েক হাজার মাইল, এই রকম বেগে বেরয়। রাদারফোর্ড এই রকম ছট্‌রা পাঠিয়ে তাদের গতিপথ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ অ্যাটমের কেন্দ্রে আছে। এই বস্তুটুকু অতি অল্প পরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ, ইলেকট্রনেরা অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে, মাঝের জায়গা খালি। ইলেকট্রনের জুড়িদার এই পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত বস্তুর নাম দেওয়া হল প্রোটন।

১৯৩২ সালে আর এক মূল বস্তর সন্ধান মিলল। এর ওজন প্রোটনের মতো, কিন্তু এ মোটেই তড়িৎযুক্ত নয়। এর নাম দেওয়া হল নিউট্রন। একজোড় ইলেকট্রন প্রোট্রনের যে ওজন, দেখা গেল একটা নিউট্রনের ওজন প্রায় তাই, অল্প একটু বেশি। কিন্তু একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম তো একজোড় ইলেকট্রন-প্রোটন। হাইড্রোজেন অ্যাটমের তুলনায় নিউট্রন অত্যন্ত ছোট, এর ব্যাস হাইড্রোজেন অ্যাটমের ব্যাসের প্রায় লক্ষ ভাগের একভাগ। এত ছোট হওয়ায় একটা নিউট্রন সচ্ছিদ্র অ্যাটমের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারে। সেই জন্য নিউট্রনকে বোতলে ভরা যায় না; যদি তা সম্ভব হত তবে এক বোতল নিউট্রনের ওজন হত কয়েক কোটি টন।

অ্যাটমের গঠন

পদার্থ তো হল অ্যাটমের সমষ্টি, কিন্তু অ্যাটমরা মূল বস্তু নয়। বিশ্বে মূল বস্তু হল ওই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। তা ছাড়া পজিট্রন, মেসন, আর সম্ভবত নিউট্রিনো আছে। পজিট্রন, মেসন ক্ষণজীবী, এদের ছেড়ে দেওয়া যাক; নিউট্রিনো এখনও আছে খাতায় কলমে; আসলে হল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এই তিন বস্তু নিয়ে অ্যাটম তৈরি, বিশ্বের সব জিনিসই তৈরি।

একজন মানুষের দেহে ওই কটি জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু জিনিস-গুলির মধ্যে এত ফাঁক যে সেই সব ফাঁক দূর করে ওই জিনিসগুলিকেই যদি গায়ে গায়ে আনা সম্ভব হত, তবে দেহ বস্তুটিকে আর চোখে দেখা যেত না, শুধু অণুবীক্ষণে তা ধরা পড়ত। আর একটা হিসেব এই পৃথিবীর সমস্ত ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনগুলির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে তাদের এক করতে পারলে সবগুলিকে একটা থলির মধ্যে ভরা যায় যদিও সেই থলি কোনো মানুষের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তার ওজন হবে সমগ্র পৃথিবীর ওজন।

ধরে নেওয়া হল, একটা অ্যাটমের দুটো অংশ আছে, কেন্দ্রক ও বাহির। বাহিরে শুধু ইলেকট্রন আছে আর কেন্দ্রকে আছে প্রোটন ও নিউট্রন, অবশ্য হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে শুধু প্রোটন। কেন্দ্রকটি অটুট, কিছুতেই একে ভাঙা যায় না; আর প্রতি অ্যাটমের কেন্দ্রক হল সেই অ্যাটমের বৈশিষ্ট্য। যদি কেন্দ্রককে ভাঙা চলত তবে লোহাকে সহজে সোনা করা যেত, আর এ রকম সম্ভব হলে পৃথিবী একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু কেন্দ্রক ভাঙা কি একেবারেই অসম্ভব?

অ্যাটম ভাঙা

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড এক পরীক্ষা করলেন। আলফা-কণিকা নাইট্রোজেনের অ্যাটম ভাঙল, বেরল প্রোটন। বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে এই প্রথম অ্যাটম ভাঙা হল। কিন্তু এ পরীক্ষায় নাইট্রোজেন অ্যাটম সরাসরি দুভাগে বিভক্ত হল না, তার থেকে বেরিয়ে এল একখানা চোকলা—একটা প্রোটন।

একটা গোটা অ্যাটম সরাসরি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল যখন কক্‌ক্রফ্‌ট ও আলটনের পরীক্ষায় আট লক্ষ বিভবযুক্ত প্রোটন লিথিয়ম অ্যাটমকে আঘাত করল। কিন্তু এই পরীক্ষায় একটা সূক্ষ্ম হিসেব দেখে বিজ্ঞানী অতিমাত্রায় চমৎকৃত হলেন। পদার্থ অবিনশ্বর আর শক্তিরও হ্রাস বৃদ্ধি নেই, বিজ্ঞানী এই দুই সিদ্ধান্ত অনেকদিন ধরে মেনে এসেছেন, এর কোন ব্যতিক্রম কোথাও লক্ষ্য করেননি। ১৯০৫

চিত্র ১। প্রোটন লিথিয়মের কেন্দ্রককে আঘাত করল। দুটি হিলিয়মের কেন্দ্রক উৎপন্ন হয়ে প্রচণ্ড বেগে দুদিকে ছুটল

সালে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বললেন যে, পদার্থ ও শক্তি এক অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। শুধু এইটুকু বলা নয়, তিনি আঁক কষে ঠিক করলেন যে, এক গ্রাম পদার্থ, তা সে যে পদার্থই হোক, যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তবে তার থেকে শক্তি পাওয়া যাবে, ৯এর পর কুড়িটা শূন্য দিলে যা হয় তত আর্গ। কি প্রচণ্ড এই শক্তি! শুনে লোকে স্তম্ভিত হল। আইনস্টাইনের এ উক্তি বাস্তব জগতে প্রথম প্রমাণিত হল কক্‌ক্রফ্‌ট ও আলটনের পরীক্ষায়।

লিথিয়মের উপর যখন প্রোটন পড়ল তখন সমবেত ভর হল ৮·০২১৬। এরা দুটি হিলিয়ম অ্যাটমে পরিবর্তিত হল। হিলিয়ম অ্যাটম দুটির ভর হল ৮·০০৭৮। হিসেবে গরমিল হল; ·০১৮৩ ভর গেল কোথায়? পদার্থ শক্তির রূপ নিল। এই ·০১৮৩ ভরের লোপে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হবে আইনস্টাইনের হিসেব দিয়ে তা কষা হল। হিলিয়ম অ্যাটম দুটি জন্মেই দুদিকে ছুটল, আর মাপজোখে দেখা গেল

তাদের মিলিত শক্তি হিসেবের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে।

সবই হল বটে, কিন্তু খরচের অংক যে পাওনার উপরে উঠল।

আইসোটোপ

মোজলে মৌলিক পদার্থগুলিকে তাদের ভরের গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে গিয়ে

চিত্র ২। ফিসনে উদ্‌ভূত পদার্থদ্বয় ওজনে ইউরেনিয়মের চেয়ে কম হল। পদার্থের যেটুকু কমতি হল তা শক্তিতে রূপান্তরিত হল।

তাদের ক্রমিক সংখ্যা দেন ১, ২, ৩ ইত্যাদি। সংখ্যাগুলিকে বলা হল পদার্থদের অ্যাটম-অংক। অনাবিষ্কৃত কয়েকটি মৌলিক পদার্থের স্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরেনিয়মের অ্যাটম-অংক পড়ে গেল ৯২।

একটি অ্যাটমের বাইরে ঘুরছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের সংখ্যা সেই অ্যাটমের অ্যাটম-অংকের সমান। এই সংখ্যা ওই পদার্থের বর্ণালি, রাসায়নিক গুণাবলী স্থির করে, আর তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন অ্যাটমকে চিনি। কেন্দ্রকে আছে প্রোটন ও নিউট্রন, হাইড্রোজেনে শুধু প্রোটন। ভরের দিক দিয়ে দেখলে কেন্দ্রকই আসল, বাইরের ইলেকট্রনরা ফাউ। এখন বাইরের ইলেকট্রন ও ভিতরের প্রোটন সংখ্যা ঠিক রেখে একটায় নিউট্রনের সংখ্যা যদি আর একটার চেয়ে তফাত হয় তবে তাদের চেনা যাবে কি করে। রাসায়নিক গুণাবলী, বর্ণালি ঠিক থাকবে, শুধু ওজন তফাত হবে। এখন যখনই আমরা কোন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করি, জিনিসটা যতই ছোট হোক, তাতে বহু লক্ষ অ্যাটম থাকে, আমরা একটা গড় ফল পাই। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা হতে দেখা গেল যে, বহু মৌলিক পদার্থ একাধিক রকম অ্যাটমের সংমিশ্রণ। এদের বলা হয় আইসোটোপ। কয়েকটা উদাহরণ লওয়া যাক। ১৬ অক্সিজেনের সঙ্গে ১৮ ও ১৭ অ্যাটম ভারের অক্সিজেন মিশে আছে। ১-হাইড্রোজেনের সঙ্গে তার জুড়িদার ২-হাইড্রোজেনের সন্ধান মিলল। তা দিয়ে যে জল তৈরি হল তাকে বলা হয় ভারি জল। ২৩৮-ইউরেনিয়মের একটা আইসোটোপ হল ২৩৫-ইউরেনিয়ম। এই কথাটা আমরা মনে রেখে দেব।

অ্যাটম বোমা

১৯৩৯ সালে জানুয়ারির গোড়ায় হান ও স্ট্রাস্‌মান যখন ঘোষণা করলেন যে ইউরেনিয়ম কেন্দ্রক ভেঙে বেরিয়ম পাওয়া গেল, তখন তাঁদের ওই উক্তি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সচকিত করল। কিন্তু এতে এত সোরগোল পড়বার কারণটা কি হল! আসলে দেখা গেল, এই ভাঙনে কিছু পরিমাণ পদার্থ লুপ্ত হয়েছে, প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়েছে।

কিন্তু মূলে সমস্যার সমাধান হল কৈ? সেই তো দশ বিশ হাজার নিউট্রন ছাড়তে হবে, তার দুটো চারটে মাত্র কেন্দ্রককে ঘা দিয়ে শক্তি উৎপন্ন করবে, সেই তো

চিত্র ৩। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়মের ফিসন হল।

জমার অংককে খরচ ছাড়িয়ে যাবে। এ সমস্যারও সমাধান হল। জোলিও-কুরী বললেন,— বাইরে থেকে নিউট্রনের আঘাতে যখন কেন্দ্রক দ্বিখণ্ডিত হয়, তখন ওই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক নিউট্রন জন্মায়। ব্যস! প্রকৃতিতে যে প্রচণ্ড শক্তি এতকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে তাকে মুক্ত করবার চাবি-কাটিটা এই তো খুঁজে পাওয়া গেল! কড়ায় সামান্য একটু তেল দিয়ে ইলিশ মাছ ছেড়ে দিলে আর তেল দিতে হয় না, মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়। এখানেও প্রথমে বাইরে থেকে কিছু নিউট্রন দিয়ে কাজটা শুরু করে দাও, তারপর নিউট্রন জন্মাতে থাকবে, সেই নিউট্রনই কাজ করবে, নতুন করে নিউট্রন জুগিয়ে যেতে হবে না!

একটা হাঙ্গামার কথা এল। নিউট্রনের আঘাতে বিস্ফোরণ ঘটে ২৩৮-ইউরেনিয়মে নয়, ২৩৫-ইউরেনিয়মে। অনুপাতে এই ২৩৫-ইউরেনিয়ম খুবই কম, ২৩৮ থেকে একে পৃথক করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বহু ব্যয়সাপেক্ষ। বিজ্ঞানী এ হাঙ্গামা পোয়ালেন। জাপানে যে দুটি বোমা ফেলা হয়েছিল তাতে খরচ হয়েছিল ৬৭০ কোটি টাকা।

অ্যাটম বোমা পড়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। তখন বিজ্ঞানী চিন্তা করতে থাকলেন, ওই প্রচণ্ড শক্তিকে কিভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। মাঝে মাঝে অন্য ধাতুর পাত বসিয়ে নবজাত নিউট্রনের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হল। শক্তি আয়ত্তের মধ্যে এল।

সূর্যের এত তেজ কোথা থেকে আসছে? আগে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। সূর্যে উল্কা গিয়ে পড়ছে, সূর্য কোঁচকাচ্ছে, তারই ফলে সূর্যের তাপ। এই সব ভাবা হল। সে সব ধারণা চলে গিয়েছে। এখন মনে করা হয় যে, বস্তুর রূপান্তরে সূর্যের এই তেজ। হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়মে, কিছু পদার্থ

শক্তির রূপ নিচ্ছে। ছয়টি ধাপে এই প্রক্রিয়া চলেছে, এতে কার্বন ও নাইট্রোজেন অংশ গ্রহণ করছে, কিন্তু তাদের কমতি পড়ছে না।

হাইড্রোজেন বোমা

মূল কথাটা হল এই,—পদার্থের বিলোপ-সাধনে শক্তির উদ্ভব হবে। এখন পদার্থের লোপ হয় দুরকমের প্রক্রিয়ায়, অ্যাটম জুড়ে, আর অ্যাটম ভেঙে। ইংরাজিতে প্রথমটাকে বলে ফিউসন, আর দ্বিতীয়টাকে বলে ফিসন। সূর্যে হাইড্রোজেন-হাইড্রোজেনে ফিউসন হচ্ছে, এতে কিছুটা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে; আর ইউরেনিয়ম অ্যাটম বোমায় ইউরেনিয়ম অ্যাটম দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে, এতেও কিছু পরিমাণ পদার্থের বিলোপে শক্তির উৎপত্তি।

এখন সূর্যে যেভাবে ফিউসন হচ্ছে পৃথিবীতে কি সে উপায় অবলম্বন করা যায়? সূর্যের উষ্ণতা ওই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পৃথিবীতে আমরা সে উষ্ণতা পাব কোথা থেকে! কিন্তু একটা প্রক্রিয়ায় তো পাচ্ছি। ইউরেনিয়মের যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন উষ্ণতা সূর্যের উষ্ণতাকে ছাড়িয়ে যায়। বেশ, ওই বিস্ফোরণের কাছে হাইড্রোজেন রাখ, ওই উষ্ণতায় হাইড্রোজেন-হাইড্রোজেন মিলে হিলিয়ম অ্যাটম হবে, প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। অবশ্য সাধারণ হাইড্রোজেনে তা ঘটে না। ঘটে যে না তা দেখা গিয়েছে ১৯৪৫ সালে বিকিনিতে অ্যাটম বোমার পরীক্ষায়। সে পরীক্ষাটা হয় জলের মধ্যে, জলে তো হাইড্রোজেন রয়েছে, আর পৃথিবীর উপরিভাগে তিনভাগ জল। জলের হাইড্রোজেনকে যদি নিমেষে হিলিয়মে পরিবর্তিত করা সম্ভব হত, তবে সেদিন এক মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী বাষ্পে পরিণত হত। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন, সেদিন তা হয়নি। সাধারণ হাইড্রোজেনের বদলে হাইড্রোজেনের এক আইকোটোপ ব্যবহার করতে হবে, আর তা তৈরি করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ইউরেনিয়ম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে পার্থক্য এই, ইউরেনিয়ম বোমার বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রিত করা যায়, হাইড্রোজেন বোমায় তা যায় না, বিস্ফোরণ একেবারেই শেষ হয়। কাজে কাজেই হাইড্রোজেন বোমা কেবলমাত্র যুদ্ধেরই অস্ত্র। তা ছাড়া ইউরেনিয়ম বোমার একটা সন্ধি-আয়তন আছে যার বেশি বড়ো একে করা যায় না। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা যত ইচ্ছে বড়ো করা যায়।

পরিশেষ

একটা দেশের সুখসমৃদ্ধি বাড়াতে গেলে শক্তি চাই। প্রাচীন কাল থেকে গৃহপালিত পশুর শক্তি মানব কাজে লাগিয়ে আসছে; এখন তা কমে এসেছে, তবে তাকে একেবারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। উঁচু পর্বত থেকে নদী নামছে, তার শক্তিও মানব কাজে লাগাচ্ছে; আমাদের দেশে এ চেষ্টা এখন ভালো রকম চলেছে; কিন্তু এ শক্তি সীমাবদ্ধ। কয়লার শক্তি একটা বড়ো শক্তি। কিন্তু ভারতের কয়লার পুঁজি খুব বেশি নয়, আর নানারকম পরিকল্পনায় তাকে যে-হারে তোলা হবে তাতে আর পঞ্চাশ বছরে ভারতের কয়লা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, একথা শ্রীমান মেঘনাদ সাহা বলেছেন। বাকি রইল অ্যাটমীয় শক্তি। প্রচণ্ড এ-শক্তি, আর এর শেষ নেই। ইউরেনিয়ম থেকে, আর হয়ত থোরিয়ম থেকে শক্তি মিলছে। ইউরেনিয়ম ভারতে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু থোরিয়ম আছে প্রচুর। থোরিয়ম দিয়ে কি করে পদার্থের বিলোপসাধন করে শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে সে কৌশল আমরা আজও জানিনে, দু-একটা দেশের লোক হয়ত জানে। কিন্তু জানলেও বলবে না, কারণ আমাদের দেশে থোরিয়ম অফুরন্ত, আর আমরা বাইরে থোরিয়ম চালান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। নিজেদের চেষ্টায় ওই কৌশল আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে, আর এই পঞ্চাশ বছরে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করে কয়লার অভাব মিটিয়ে ফেলতে হবে।

আমাদের সরকার অ্যাটম বোমার বিরোধী। সুতরাং অ্যাটমীয় শক্তি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে, আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি বেড়ে যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই, সুখ-সমৃদ্ধি দিয়ে জীব কি তার দুঃখের বিনাশসাধন করতে পারবে। আমাদের দেশের প্রধান দর্শন ছয়টি, ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। প্রত্যেক দর্শনকারের মত এই যে ওই সব সুখসমৃদ্ধি দিয়ে জীব দুঃখের আক্রমণ এড়াতে পারে না। অথচ দুঃখনাশ জীবের একমাত্র ঈপ্সিত, দুঃখহানিই জীবের পরমপুরুষার্থ। সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায় উদ্ভাবন করেছে, এক এক দর্শনের উপায় এক এক রকমের। কিন্তু দর্শনকারদের নির্দিষ্ট কোন উপায়ই যে কাজের নয়, তার প্রমাণ এই যে, চেষ্টা করেও আজও কেউ দুঃখের হাত এড়াতে পারেনি। আমি এক উপায় ঠাউরেছি; পঞ্চাশ বছর পরে পৃথিবীবাসীকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেব। কি সে উপায় বলছি।

আপনারা কি বলছেন জানি। পঞ্চাশ বছর পরে আমি কি থাকব! একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়ে গেল, সন্ধ্যায় বিচিত্রা ভবনে অনেকে সমবেত হয়েছেন। শ্রীমান অনিলকুমার চন্দ বললেন,—গুরুদেব, এটা অমনি একরকম হয়ে গেল, শতবার্ষিকীটা আমরা খুব ঘটা করে করব। রবীন্দ্রনাথ বললেন,—বড় কষ্ট হচ্ছে, তদ্দিন আমি না হয় থাকলুম, কিন্তু তোরা কি থাকবি! আমি বলছি, পঞ্চাশ বছর পরে আপনারা অনেকে নাও থাকতে পারেন, কিন্তু আমি থাকবই। আমার বড়ো মামা ৪২ বছর পেনসন ভোগ করেছিলেন, ৬৬ বছর পেনসন পাওয়া কি এমন বড়ো কথা!

সে যাক, সেদিন আমি কি করব তাই বলছি। ততদিনে পদার্থ ভেঙে শক্তি আহরণ একটা সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সরকার না টের পায়, চুপিসাড়ে আমি দশটি একটু বড়ো গোছের হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে রাখব। তারপর একদিন সকালে চা-টা খেয়ে সেই দশটি বোমা নিয়ে এরোপ্লেন চড়ে উপরে উঠব। তারপর পৃথিবীর দশটি জায়গায় টুপ্‌টুপ্ করে বোমা ক'টি ফেলব। অচিরে পৃথিবীর সমস্ত জীব কৈবল্য লাভ করবে।

এইবার ভস্মীভূত জীবদেহের উপর এক গণ্ডূষ জল ফেলে বলব,—আব্রহ্মস্তম্ব-পর্যন্তং জগত্তৃপ্যতু। এখন বান্ধবাঃ অবান্ধবাঃ সকলের স্মৃতির উপর যবনিকা টেনে,

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বলতে বলতে পৃথিবী ছেড়ে উঠতে থাকব। প্লেনটিকে সোজা মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যাব। ততদিনে সে-পথ খোলা হয়ে যাবে। এখন থেকে আপনারা যতই খোসামোদ করুন না কেন, আপনাদের কাউকে সঙ্গে নেব না! তবে একজনকে নিতে হবে। কে বলুন তো? নাম বলব না। তিনি সেখানে ভুনিখিচুড়ি বানাবেন, তাই খাব আর দেখব, আড়াই শ কোটি মানবের বাসভূমি, ধনধান্যপুষ্পভরা আপনাদের এই সাধের বসুন্ধরা প্রাণীশূন্য উদ্ভিদশূন্য হয়ে, একেবারে নির্লিপ্তভাবে, ঠিক আগের মতো পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বলবেন,—প্লেনে তো জায়গা আছে, আরও দু'চারজনকে নিন না। স্থান নাই, স্থান নাই, ছোটো এ প্লেন। মনে করে দেখুন, আমাকে অনেকগুলি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিতে হবে, মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন নেই।

শেষ অবধি আপনি একটু হেসে বলবেন, —অত বয়সে আপনি কি এসব পেরে উঠবেন। আচ্ছা, আমি নাই পারলুম, আর অতদিন নাই বাঁচলুম, আর কেউ তো পারবে, আর পঞ্চাশ বছরের আগেও পারতে পারে! আপনার পৃথিবী বাঁচছে কিসে!

এক বান্ডিল কথা

প্রবোধকুমার সান্যাল

ছোটপিসির কথাবার্তা একটু যেন বাঁকা ধরনের। অল্প বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন, সেজন্য মেয়েদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি খুব সজাগ। মেয়েমহলের আসরে বসলে তাঁর গলাটাই সকলের বড় হয়ে ওঠে।

এলার সঙ্গে রণেন্দ্রর বিয়েটা পাকাপাকি হবার পর সেদিন ওদের প্রণয়-কাহিনীর কথাটাই উঠেছিল। ছোটপিসি বললেন, "কেই বা জানে, কতটুকুই বা জানে! কিন্তু একথা তোমরা ঠিক জেন, মেয়েরা যখন ভালবাসায় পড়ে, তারা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত হয়। এলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ তোমরা? কিচ্ছু ধরবার জো নেই, একেবারে লোহার সিন্দুক!"

মেজমাসি বললেন, "তা কেন বলছ। এই সেদিন দেখে এলুম কেমন হাসি-খুশী ভাব!"

"পেট থেকে কথা বার কর দিকি?"

মামী ছিলেন পাশেই। হাসিমুখে তিনি একটু ঘোমটা টেনে বললেন, "ওমা, মেয়েটা যে এম-এ পড়ছে গো, একটু চালাক চতুর হবে না?"

ছোটপিসি বললেন, "কিন্তু জেনে রেখ ধীরুর মা, একবার যে-মেয়ে আলগা দিয়েছে, তার আঁচল আর কাঁধে ওঠে না! পেটের কথা যদি কারো পেটে থাকে আমার আপত্তি নেই,—কিন্তু বিয়ের আগে ছেলেটাকে নিয়ে পথে-ঘাটে বেহায়াপনা,—এই বা তোমরা কেমন করে সইলে? আমার পেটের মেয়ে হলে জিব টেনে বার করতুম!"

দিদিমা এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন। এবার হাসিমুখে উঠে বসলেন। বললেন, "ভাগ্যি তোমার পেটে ছেলেমেয়ে হয়নি, মানু।"

সবাই একচোট হেসে উঠল। দিদিমা বললেন, "দুটো বেরাল-ছানা না হয় নিরিবিলি গিয়ে খেলাধুলো করে বেড়িয়েছে, তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?"

ছোটপিসি বললেন, "কিন্তু বিপদ আপদ ঘটে গেলে কি হত, মাসিমা?"

"তোমার কেবল ওই নিয়েই ভয়, মানু!" দিদিমা বললেন, "শুনছ না, আজকাল লেখাপড়া জানা ঘরে ছেলেপুলে হয় কম? তুমি লেখাপড়া শিখলে তুমিও এ নিয়ে মাথা ঘামাতে না!"

ছোটপিসি একেবারে গুম হয়ে গেলেন।

নন্দর মা বসে ছিল এক পাশে। সে ওখান থেকে বললে, "চেনা-জানা ঘর, দুই পক্ষের বন্ধুত্ব তিন পুরুষের। তার ওপর রূপেগুণে ছেলেমেয়ে দুটোর জুড়ি নেই। ওরা মন্দ কাজ করতে যাবেই বা কেন বল? এমন বিয়ে ক'জনের হয়?"

মেজমাসি বললেন, "তা সত্যি। রণেন বেরল ইনজিনিয়ারী পাস করে, আজ বাদে কাল বড় চাকরি পাবে। রূপে আর স্বাস্থ্যে একেবারে ময়ূর ছাড়া কার্তিক।"

মামী বললেন, "মেয়েও তাই, ঠাকুরঝি।"

দিদিমা বললেন, "বটেই ত, এমন বিয়ে হয় না কোথাও। দুইপক্ষে যেমন ভালবাসা তেমনি গলাগলি। এই ত আজই সকালে অবিনাশ নাচতে নাচতে এসে হাজির। এদিক থেকে উপেন গিয়েছিল সন্দেশের ঝুড়ি নিয়ে। দেশেদেশে সবাই হাত তুলে নাচছে। তুমি আর মন খারাপ করে থেক না মানু, কোমর বেঁধে শুভ কাজে লেগে যাও।"

ছোটপিসি বললেন, "তোমরা সবাই দল বেঁধে আমাকে তর্কে হারিয়ে দিলে। আমি কিন্তু ভালর জন্যেই বলছিলুম। কোমর বেঁধে লাগব বৈকি খুড়িমা,—তবে কিনা ঘোলা জল দেখলেই গঙ্গাজল বলে চেঁচিয়ে উঠিনে।"

ছোটপিসি উঠে সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

এত আলোচনা যে-বস্তু নিয়ে, তার চেয়ে পুরনো কাহিনী বোধ করি সংসারে আর কিছু নেই। দুটি সুপরিচিত পরিবারের দুটি তরুণ-তরুণীর দেখা-শোনা হয় আড়ালে আবডালে। মাথা ধরার ছুতোয় ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলা যায় সিনেমায় কিংবা মাঠে, কিংবা যাদবপুর আর দক্ষিণেশ্বরের দিকে, এবং রণেন তার কাছে গিয়ে পেঁছয় যথানির্দিষ্ট সময়ে। বাস-স্ট্যান্ডের ধারে একজন এসে দাঁড়ায় হাতঘড়ি দেখে, ভিন্ন ব্যক্তিও হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়। প্রণয়াসক্ত হলে মেয়েরা হয় চতুর, ছেলেরা অন্যমনস্ক। মিলনের কালে ছেলেরা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয় এবং মেয়েরা তখন অনেকটা আত্মবিস্মৃত। সেই আদি কাহিনী, সেই রণেন্দ্র আর এলা, নর এবং নারী। প্রেমের দায়ে ছোটে ছেলে, প্রাণের দায়ে ছোটে মেয়ে। অবশেষে নিবিড় রস ঘনিয়ে উঠলে আসে নীড় রচনার কথা। মেয়ে-পাখি ডিম পাড়বার জন্য বাসায় ঢুকতে চায় এবং মেয়ে-মানুষ বাসায় ঢোকবার জন্য কপালে সিঁদুর মাখতে চায়। গল্পটা অতি প্রাচীন।

কিন্তু প্রাচীন কাহিনী হলেও এখানে যেন একটু বিপরীত। বিয়েটা পাকাপাকি হবার আর দেরি নেই,—এলার মুখে চোখে তার খুশির আভা দেখা যায়; কিন্তু রণেন্দ্রর

মুখের চেহারায় এই সুসংবাদের সুদূর আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বন্ধু এবং আত্মীয় মহলে এ নিয়ে একটু বিস্ময়ের সঞ্চার আছে বৈকি। প্রণয় ঘটনার ব্যাপারে রণেনের মত এমন গাম্ভীর্য রক্ষা করলে আমোদ প্রমোদের মাত্রাটা যেন কমে যায়।

বিলেতী কোন্ ফটোগ্রাফারের দোকানে রণেনকে নিয়ে এলা একখানা ছবি তুলিয়েছিল,—কৌমার্যের সর্বশেষ প্রতীক্,—সেই ছবিখানা বুঝি ধরা পড়ে এলার একখানা পাঠ্যগ্রন্থের মলাটের মোড়কে। তাই নিয়ে কী উল্লাস এ-বাড়িতে আর ও-বাড়িতে। একেই ত এলা বাড়ির মধ্যে গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু ফটোখানা ধরা পড়ার পর এম-এ পড়া ছাত্রীকে নিয়ে বৌদিদি আর ছোড়দি যেন বাঁদরনাচ নাচাল। পছন্দসই একটি নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ কেনার জো নেই,—সবাই অমনি বলবে এটি উপহার পাওয়া! অ-পাঠ্য উপন্যাস হাতে নিয়েছ কি সর্বনাশ,—বলবে, এ বুঝি রিহার্সেল চলছে? যদি একবার হারমোনিয়মে হাত পড়েছে, অমনি ফরমাস,—একখানা রবিঠাকুর! ছাদে গিয়ে নিরিবিলি একটু দাঁড়ালেই,—ব্যস, পিছন থেকে বৌদিদি বলবে, ছাদে না এলে বুঝি পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হয় না, ঠাকুরঝি? পোস্ট-গ্রাজুয়েটে যাবার তাড়াতাড়িতে যদি চুল ফিরিয়ে নেবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয়,—আর রক্ষা নেই, ও-ঘর থেকে পাষণ্ড ছোড়দার গলায় গান উঠবে, 'অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী',—না কি ছাই-পাঁশ মনেও থাকে না।

চারিদিকে গোয়েন্দার প্রখর শাণিত দৃষ্টি।

এমনি একটা সময়ে রণেন্দ্র এসে দেখা দিল কোনো এক নির্দিষ্ট পথের কোণে। দূরের থেকে এলা এগিয়ে এল হাসিমুখে। কাছে এসে বললে, "তোমার কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন মিনিট দেরি হয়েছে আজ, আমি ওই মনোহারির দোকানে দাঁড়িয়ে চিরুনির দর করছিলুম, সময় কাটাতে হবে ত?"

রণেন বললে, "প্রসেশন্ যাচ্ছিল, তাই আমার বাসটা দেরি করল।"

এলা বললে, "এগিয়ে চল, দোকানদারটা হাঁ করে দেখছে। কী যে ছাই দেখে!"

রণেন মুখ টিপে বললে, "যা দেখলে মাথা ঘোরে তাই দেখছে!"

"থাম, অসভ্যতা কর না,—এস।"

ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলল সেইদিকে, যে-দিকটায় সচরাচর লোকজন আসে না। ওদের যেদিন দেখাশোনা হয়, তার পরের সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় ও স্থান নির্বাচন করে তবে ওরা বিদায় নেয়। কিন্তু মুশকিল এই, হেন অগম্য অঞ্চল নেই যে, এখনকার ছেলে এবং মেয়ে সেটি চেনে না। নিরিবিলি সাক্ষাৎকারের স্থান আজকাল বড়ই কম। যেখানে যাও, অগণ্য মানুষ। কোনো কোনো রেস্টুরেন্টে অবশ্য যাওয়া যায়, সেখানে পর্দা ফেলে দিয়ে পায়ে পা ঠেকিয়ে গল্প চলে বটে, কিন্তু কফি হাউসগুলো একেবারে অসম্ভব। বড় জোর থার্ড ইয়ার পর্যন্ত কফি হাউসে যাওয়া চলে, কিন্তু বি-এ পাস করার পর বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে ওখানে আর একত্রে ঢোকে না—কেন না যে-বিজ্ঞাপনটা মুখে মুখে চলে, ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক।

এলা বললে, "তা হলে যাবে কোথায়? লেকে যাওয়া অসম্ভব, ওখানে বিয়ের আগে যদি দুজনে ঢোকা যায়, তা হলে বিয়ে না করে আর বেরনো যায় না!"

রণেন খুব হেসে উঠল। পরে বললে, "তোমার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে? কথাটা কি সত্যি?"

এলা হাসিমুখে বললে, "কই, জানিনে ত? অনেক নির্বোধ আছে, যারা ভাব-আলাপ হবামাত্র বিয়ে করে বসে। বিয়ে মানে ত বিছানা, তার জন্য অত তাড়া কেন? শোনো, ওসব বাজে কথা যাক্! ছোটপিসির কাণ্ড শুনেছ? ওই যে গো মেয়েদের চরিত্র রক্ষার ইন্সপেক্টর! ওর মতলব কি জানো? শোনো বলি। সেদিন এসেছিল আমাদের ওখানে। ছোটপিসির এক ভাসুরপো বিয়ে করে নদীয়া জেলায়, তারা নাকি জমিদার। সেই বৌটার মাসতুতো ভাই তার বৌকে রেখে কোথায় যেন চলে গেছে, তার আর পাত্তা নেই!"

রণেন্দ্র বললে, "তুমি বুঝি আবার যত রাজ্যের বাজে গল্প ফেঁদে বসতে চাও?"

এলা রাগ করে বললে, "অমনি তোমার রাগ, কেমন? আমাদের ক্লাসের মালিনী চৌধুরী ঠিক তোমার মতন। একটু গল্প করতে জানে না। এমন গোমড়া মুখে থাকবে সারাদিন, কী বলব। কুলতলার জমিদারের ঘর থেকে মালিনীর সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। অমন সুন্দর মুখখানা, কিন্তু মুখের লাইনগুলো দেখে পাত্রপক্ষ বললে, 'এ মেয়ে খুব হাসিখুশী হবে না, —বুঝলেন ত', আমাদের পরিবার বড়, সেখানে পাত্রীর পক্ষে অসুবিধে হবে!' হ্যাঁ, সত্যি বলছি, মালিনীর গোমড়া মুখ দেখেই তারা চলে গেল। দাঁড়াও, সেই নদীয়া জেলার মাসতুতো ভাইয়ের বৌটার গল্পটা শোন এবার—"

রণেন মুখ টিপে বললে, "একটু সংক্ষেপে বল!"

থমকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এলা বললে, "ব্যস, অমনি তুমি অস্থির হয়ে উঠলে! ইনজিনিয়ারিং পাস করেছ। প্ল্যান কষে আর লোহালক্কড় ঘেঁটে তোমার রসকষ একেবারে শুকিয়ে গেছে। গেল বেস্পতিবার থেকে আজ পর্যন্ত কত গল্প জমিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে, আর তুমি কিছু শুনতে চাও না!"

রণেন বললে, "তোমাকে না বাড়িতে বলে, তুমি খুব গম্ভীর?"

এলা খিলখিলিয়ে উঠল, "বাড়ির লোক কোনোকালে জানে ছেলেমেয়েদের পরিচয়? কতটুকু জানে? কেমন করেই বা জানবে? এটা জেনে রেখ, সেদিন আর নেই! তাদের এক চেহারা ভিতরে, অন্য চেহারা বাইরে। বাড়ির লোক টের পায় কিছু? ইস্কুল পালিয়ে ছেলেরা যায় সিনেমায়, কলেজ পালিয়ে মেয়েরা যায় অ্যাড্ভেঞ্চারে। আমার ঠাকুমাকে তুমি ত দেখছ আজ কতদিন থেকে। ঠাকুমা বলেন, তাঁদের ছোট বেলায় সমস্ত দিন কলকাতায় ঘুরলে ভদ্রঘরের একটি মেয়েকেও পথেঘাটে কোথাও দেখা যেত না!"

এক পার্কের গেট-এর কাছে ওরা এসে হাজির হল। রণেন বললে, "ঢুকবে ভেতরে?"

এলা বললে, "অনেক লোক যে। খালি বেঞ্চি পাব?"

রণেন হাসল। বললে, "তুমি যে-ধরনের আলাপ চালাচ্ছ, তাতে আশে পাশে পাঁচজন শুনলেও ক্ষতি নেই।"

"ইস—", এলা বললে, "কী ন্যুরটিক্ তুমি! যদি একটু তোমার মন-মেজাজ খারাপ হয়, তুমি আর চাপতে পার না! এমন কুইক টেম্পার্ড মানুষ হয়? একটু সংযম শেখনি? বিয়ের পর এ-দোষ যদি তোমার না শোধরায়, তুমিই দুঃখ পাবে!"

রণেন বললে, "ঠিক বলেছ, এজন্যে বিয়ের কথা উঠলেই ভয় পাই!"

"মানে?" এলা তার দিকে তাকাল একবার।

রণেন পুনরায় বললে, "এস—ওই যে, একখানা বেঞ্চ খালি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বসবার আগে বলে রাখি, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তুমি যে রোজকার মতন আজে বাজে গল্প ফেঁদে বসবে, তা হবে না!"

ওরা ভিতরে ঢুকে এগিয়ে চলল। এলা বললে, "কী ভালগার তুমি, তাই ভাবছি! বাজে গল্প শুনতে চাও না—বেশ, কিন্তু আসল কাজটি কি তোমার শুনি?"

"তাই বলে এমন সন্ধ্যাটা তুমি মাটি করবে?"

"মাটি করব! তার মানে? ইউ রট্! তোমার চোখ কেবল ভাগাড়ের দিকে!

আই এ পড়া মেয়ের মতন তোমার কানে-কানে বুঝি রবিঠাকুর, কি শেলী আওড়াব? নাঃ তোমাকে নিয়ে অসম্ভব!"

এলা যেন ক্লান্তি বোধ করল।

রণেন ছাড়ল না। সহাস্যে বললে, "কিন্তু চুপ করে থাকলে অনেক ছেলে আর মেয়েকে বেশী মানায়, তা জান?"

"হ্যাঁ—ঠিক ওই তোমরা চাও।" এলা যেন পুনরায় দপ করে উঠল,—"কাঁচকড়ার পুতুল হলে তোমাদের ভারী সুবিধে। কথা কইবে না সে, অথচ তোমরা যেমন খুশি নাড়াচাড়া করতে পার।"

রণেন্দ্র চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, "আজ প্রায় তিন বছর হতে চলল আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু একদিনও তোমার কাছে,—মানে, ওই যাকে বলে—"

"কী?" এলা চোখ পাকাল, "ভালবাসার কথা বুঝি শুনতে চেয়েছিলে? ইস—তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই জানতুম, কিন্তু রুচিজ্ঞানও কি নেই? তুমি ত জান, প্রফেসর গুপ্ত আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না! আমি নাকি কথা বলতে নিয়ে থামতে জানিনে। উনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্য করবেন, আর সহ্য করতে হবে সবাইকে। তুমি সেই রকম কিছু কাব্য করতে চাও? সন্ধ্যেবেলা বেঞ্চিতে বসে কাব্য! তুমি মনে করেছ কী?"

"না—কিছু না।" রণেন্দ্র চুপ করে গেল। মুখখানায় তার একটা উত্তেজনার আভা খেলে আবার শান্ত হয়ে এল।

এলা কিন্তু চটেই গিয়েছিল। বললে, "সন্ধ্যেটাই মাটি তোমার জন্যে! আমি একালের মেয়ে তা জান? তোমার এ সব মনোবৃত্তি পঁচিশ বছর আগে চলত। তখনকার দিনে যাদের মনে রং ধরত, তাদের কথাও হত রঙিন। তুমি একালের ছেলে হলে হবে কি, মন পড়ে রয়েছে আদ্যিকালের দিকে। একালের ভালবাসাকে প্রেম বলে না, এ কি কোথাও শোননি?"

"তবে কী বলে?"

"সোজা কথায় যাকে বলে, বোঝাপড়া। মন-জানাজানির অঙ্ক যদি মিলে যায়,—সেই ত আসল কথা!"

রণেন্দ্র এদিক ওদিক তাকাল। এখানে ওখানে কেউ কেউ যে তাদেরকে লক্ষ্য করছে না, তা নয়। এলার সাজসজ্জাটা সাদামাটা, কিন্তু দেহলাবণ্যের আভায় কিছু মাদকতা আছে বৈ কি। এক হাতে তার সস্তা দামের দু'গাছা চুড়ি, অন্য হাতে দামী হাতঘড়ি। অলক্ষ্যে ওর দিকে তাকালে তরুণ রক্তে কেমন একটা বিপ্লব বাধে, কিন্তু এলার চেতনায় কোনো নাড়া খায় না।

হঠাৎ হেসে উঠল এলা! উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "এতক্ষণ কী ভাবছিলুম জান? আমাদের বাড়িতে কাজ করত, সেই গোপালকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে! ওর বোনের নাম টুনি। টুনি একটা ছেলেকে নিয়ে পালায় খড়্গপুরের ওদিকে। সেখানে বেশ থাকে দুজনে। ছেলেটা বুঝি রেলওয়েতে কাজ পেয়েছিল। একদিন ডিউটি থেকে ফিরে এসে ছেলেটা দেখে টুনি ঘরে নেই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ! শেষকালে টুনিকে পাওয়া গেল মাস

"হ্যাঁ, শুনছি বৈ কি। সেই যে আমার মতন একগুঁয়ে!"

"ওই দেখ, কী অন্যমনস্ক তুমি! আমি কিন্তু সেই ছেলেটার কথা তোমাকে শোনাতে বসিনি!" এলা বলে উঠল, "তার এক মাসি ছিল বর্ধমানে। এমন কোথাও শুনেছ, মেয়েছেলে হল মস্ত তালুকদার? সত্যি বলছি তোমাকে, তার মস্ত মস্ত খেত-খামার আর গরুবাছুর। দুর্ভিক্ষের বছরে সে নাকি একাই একশো জন লোককে রোজ খাওয়াত।"

রণেন বললে, "বেশ ত, অমন আদর্শ মাসির শেষ পরিণামটা কী প্রকার দাঁড়াল?"

সাড়ে তিন মিনিট দেরি হয়েছে

তিনেক পরে আরেকটা লোকের সঙ্গে। দুজনেই এখন দাবি করে, টুনি দুজনেরই বৌ। ঠিক এমনি কাণ্ড বাধিয়েছিল আমাদের পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ির একটা ছেলে! আমার বাবা গিয়ে কত সাবধান করে এসেছিলেন সেই ছেলেটার মামাকে। কিন্তু ছেলেটা ঠিক তোমার মতন,—ভীষণ একগুঁয়ে—"

রণেন্দ্র বসে বসে হাই তোলে।

এলা বলে, "আমার কথা বুঝি শুনছ না? বার বার হাই তুলছ যে?"

"আঃ", এলা বললে, "কথার মাঝখানে তুমি বড্ড বাধা দাও। এই তোমার দোষ। তুমি যদি মন্ত্রী হতে, তোমার চাকরি যেত। কান দিয়ে শুনবে সব সময়ে, একটি কথাও বলবে না। ও কি, হঠাৎ আমার পিঠের দিকে হাত ছড়ালে কেন? মতলব কী তোমার?"

"তোমাকে ছুঁয়ে থাকতে ভাল লাগছে।"

"মানে?"

এলার মুখ চোখের চেহারা দেখে রণেন আবার তার হাতখানা সরিয়ে নিল। এলা

বোধ হয় একটু ক্ষুব্ধই হয়েছিল রণেনের এবম্বিধ অসংযত আচরণে। সতর্ক করে দিয়ে এক সময় সে বললে, "এসব আবার কী? ছোঁবার দরকার হয় যদি কোনো-কালে, আমিই ছোঁব, তুমি কখনও একাজ কর না।"

রণেন আবার চুপ করে বসে রইল।

এলা বললে, "মাঝে মাঝে সব গুলিয়ে দিচ্ছ তুমি। আজ সকালেই বৌদিদি আমাকে খ্যাপাচ্ছিল তোমার নাম করে। তুমি নাকি লুকিয়ে আমার কাছে চিঠি পাঠাও—ছোট-পিসির কাছে ওরা শুনেছে। রোজ রোজ করে কী জান? ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ডেস্ক ঘাঁটে, নোটস-এর খাতাগুলো হাতড়ায়। তারপর নিরাশ হয়ে বলে, আমি নাকি পাথর-চাপা মেয়ে!"

রণেন্দ্র আবার তামাশা করে বসল, "পাথর কিনা জানিনে, তবে বরফের টুকরো বটে।"

বাঁকা চোখে এলা বলে, "আমি যদি বরফের টুকরো হই, তুমি পাশে বসে গরম হয়ে ওঠ কেন?"

"ওটা পুরুষ মানুষের স্বভাব। তবে এও বলে রাখি, বরফের পাশে থাকলে গরম জলও এক সময়ে বরফ হয়ে যায়।"

"বাজে উপমা দিয়ো না!" এলা বললে, "বড্ড সেকেলে তুমি! বিয়ের পর তুমি সুখী হবে—এ-ধারণা আমার ভেঙে যাচ্ছে। তোমার সরলতাই তোমার শত্রু, মনে রেখ। ভাল ছেলে হওয়া ভাল, যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, নৈলে তাকে বলে, জরদ্গব!"

"যাকগে।" রণেন বললে, "তোমার সেই নদীয়া জেলার মাসতুতো ভাইয়ের গল্পটা এবার আরম্ভ কর।"

"বা, এরই মধ্যে ভুলে মেরেছ?" এলা বললে, "তবে শোন আরেকবার। ছোট পিসির ভাসুর-পো, তারা হল সেই জমিদার!"

"তোমার গল্পের মূল প্রতিপাদ্যটা কীপ্রকার বল ত?"

"ওই দ্যাখো, তুমি ঠিক ছোড়দার মতন। শুনতে গেলে যে একটু ধৈর্যের দরকার, তা তোমাদের নেই! এই যেমন আমাদের ক্লাসের নৃপেন ঘোষ। যেই আমরা গল্প করতে বসি, সে ডেস্ক বাজায়। এগুলো কি অসভ্যতা নয়? নৃপেন মনে করে, আমি কিচ্ছু বুঝিনে। ও যে বোকা বলেই হাসছি, একথা বোঝে না—এমনি বোকা। তারপর শোন বলি ছোটপিসিমার সেই ভাসুরপোর মাসতুতো ভাইয়ের গল্পটা—"

এলা অনর্গলভাবে তার সেই কাহিনী আরম্ভ করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ রাত্রে রণেনকে যেতে হবে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। কতকগুলো কাগজপত্র আজকেই নাড়াচাড়া করা দরকার। স্কলারশিপের সেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না করলে চলবে না। অবশ্য সম্প্রতি একটি চাকরি সে পেয়ে যাচ্ছে। প্রথম আরম্ভে বেতনাদির পরিমাণটা নেহাত মন্দ নয়।

পাশে বসে এলা তার গল্প বলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রণেনের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে এক-একবার রণেনকে নাড়া দিচ্ছে। মাসতুতো জমিদারদের পুকুর-ঘাটের কাহিনী তখন বেশ জমে উঠেছে। এলার বক্তৃতার আদি অন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক হতে চলল, এলা থামছে না।

রণেনের বন্ধুর বাড়িতে খানচারেক বই এখনও পড়ে রয়েছে। কাল তাকে যেতে হবে বামনগাছির ওদিকে, ছোটবোন ডেকেছে। দিদিমা জানিয়ে রেখেছেন, তাঁর কোম্পানির কাগজগুলো কালই ট্রেজারি আপিসে নিয়ে যাওয়া চাই, ছয় মাসের সুদ পাওনা হয়েছে। সেজমামা আসছেন লখনউ থেকে, তাঁকে টেলিগ্রাম করতে হবে, বাবার জন্য তামাক আনবেন।

এলা থামছে না, তার গল্প চলছে তেমনি অনর্গল। রণেন শুনছে কিনা, সে খোঁজ অনেকক্ষণ অবধি নেয়নি। কিন্তু নদীয়া জেলা থেকে কখন যেন সে চলে গিয়েছে বর্ধমান হয়ে পাটনার ওদিকে। তারপর তার কাহিনী আবার এক সময় ফিরে এল কলকাতায় এবং দেখতে দেখতে পুনরায় গিয়ে ঢুকল পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে।

তিন বছর ধরে এলা গল্প বলছে। দেখা হলেই গল্প, আর কিচ্ছু নেই। সেই গল্পের দুরন্ত স্রোতে রণেন হাবুডুবু খায়। হোটেলে ঢুকলে গল্প, মাঠে গিয়ে বেড়ালে গল্প, সিনেমায় ছবি দেখতে গেলে কানের পাশে গল্পের ফিসফিসানি, পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালেও গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে গল্প। এলাদের ছোট-বেলা এক চাকর ছিল, তার নাম নানকু; সেজমাসির ফিটের ব্যামো; ঠাকুমার এক জাঁহাবাজ সতীন ছিল; দাদামশাইয়ের ছিল পাখি পোষার সখ; পাড়ার ইন্দুমিত্তির ডাক-সাইটে মাতাল; তাদের ক্লাসের মৈত্রেয়ী রায় নাকি সিনেমার ছবিতে নামবার চেষ্টা করছে; ছোড়দা নাকি ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরি নিচ্ছে; বড়দাদার পিসতুতো শ্যালীর নাকি যমজ সন্তান হয়েছে।

সন্ধ্যাটা মাটি হচ্ছে, কে বললে? গল্পের স্রোতে ভাসছে সন্ধ্যা। আকাশের দিকে এক সময় চোখ তুলে রণেন দেখল, এক-একটা তারকা এক-একটি গল্প। কিন্তু তারকা যে অগণ্য, ওদের শেষ নেই। তিন বছর ধরে গুনলেও তারকা শেষ হবে না। এবার এলার গল্পে এসে পৌঁছলেন রাঙাদিদি। তাঁর শ্বশুর-বাড়ি ছিল বাঁকুড়োয়। সেকালে জঙ্গল ছিল বাঁকুড়োর পশ্চিম সীমানায়—এলার বাবা বুঝি ছোটবেলায় সেই জঙ্গলে নেকড়ে বাঘ দেখে এসেছেন। রাঙাদিদির পরে এল এলাদের ক্লাসের বাণী সেনের মেজদা। মেজদার পকেটে একদিন এক মেয়ের চিঠি ধরা পড়ে। সেই মেয়েটি নাকি তোতলা। তোতলা হোক, মেয়ে ত! সে-মেয়ের নাকি কোথাও বিয়ে হয় না,—কেননা একটি পাও তার খোঁড়া। বীণা সেনের মেজদার গল্পে ক্লাস সুদ্ধ মেয়ে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে।

চলল আবার এলার গল্প।

বছরের পর বছর, মাসের পর মাস—এবং এই গত সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছে এলার এইসব গল্প। এই মেয়ের সঙ্গে রণেনের বিবাহ স্থির হয়ে এসেছে। পাকা দেখার নাকি আর বিলম্ব নেই।

মেয়েদের বহু গুণপনার মধ্যে স্বল্পভাষণ একটি বিশেষ কাম্য গুণ। কেন এটি কাম্য, এলা নাকি তার প্রমাণ। কিন্তু আগামী তিন বছরেও এলার এই এলোমেলো গল্প বলা এবং বাক্যস্রোত থামবে কিনা কে জানে। এর সঙ্গে বিয়ে, কিন্তু এর গল্প থামবে ত? এই অনর্গল বাক্যস্রোতে রণেনের বিবাহিত জীবন কোন অকূলে ভেসে যাবে, কিচ্ছু জানা যাচ্ছে না।

এলার গল্প চলছে। এবার সেই গল্পে এসেছে কোথাকার এক নতুনদিদি। একবারটি লুকিয়ে রণেন হাতঘড়িটা ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করতেই এলা বিরক্ত হয়ে উঠল, "ও কি হচ্ছে, আমার কাছে বসে থাকতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না?"

রণেন চমকে উঠল, "ওকি কথা, তোমার পাশে একটু বসব, এই আনন্দেই ত আসি! কিন্তু—"

"কিন্তু কী? তুমি ত হিপোক্রিট নও,—তা হলে সত্যি কথা বলতে গিয়ে থতিয়ে যাও কেন?"

রণেন বললে, "তোমার গল্প না থামলে কোন দরকারী কথা হয় না!"

"দরকারী কথা? কী শুনি?"

"এখন আর কিচ্ছু মনে নেই।" রণেন জবাব দেয়।

"বুঝেছি।" এলা বললে, "তুমি আমাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিতে চাও, তাই না?"

রণেন চুপ করে যায়। কিন্তু তার মনের চেহারাটা জানবার অবসর এলার নেই। এই কাছে আসা, এই পাশাপাশি বসা, পরিচিত লোকযাত্রার বাইরে এই একান্ত করে দুজনে মুখোমুখি দেখাশোনা—এর পিছনে পুরুষের যে আকুলতা, এলার চোখে সেটি পড়ে না।

হঠাৎ এক সময় এলা হেসে ওঠে। বলে, "তুমি একেবারে আমার বড় পিসেমশায়ের স্বভাবটি তুলে নিয়েছ। তাঁরও ঠিক এই অভ্যেস। আসরের মাঝখানে বসে যদি আর কেউ কথা বলতে থাকে, তাঁর সহ্য হয় না,—তিনি হঠাৎ একটা উড়ো কথা বলে বসবেন। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—যা হোক একটা কথা। তোমারও ঠিক তাই।"

রণেনের মনে কেমন একটা অসন্তোষের সঙ্গে অধীরতা এসেছিল। কিন্তু সংযত কণ্ঠে কেবল বললে, "আমায় ক্ষমা কর তুমি!"

শিক্ষিত মেয়ে, ক্ষমা করতে জানে বৈকি। তারপরেই আবার এলা নতুনদিদির উপাখ্যান এনে ফেলল। নতুনদিদির মস্ত অ্যাডভেনচার! নতুনদিদি গিয়েছিল প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। সেখানে সে এক দুষ্ট ব্যক্তির ছলনায় পড়ে। তারপর সেই কাহিনী ধীরে ধীরে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে থাকে।

রণেন আবার হাই তোলে। রণেন ভাবছিল তার পরবর্তী কালের জীবন। এলা তাকে গল্প শুনিয়ে চলেছে। কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। এলাকে ছেড়ে পালাবার জো নেই। সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল, এলা থামছে না। চলেছে বছরের পর বছর। সবাই জানল তারা সুখী দম্পতি, সবাই জানল এমন বিয়ে নাকি সচরাচর ঘটে না,—পরমাসুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী, রূপবান স্বাস্থ্যবান স্বামী। কেউ জানবে না, রণেনের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সে ভয়ত্রস্ত, ঘরে তার আনন্দ নেই, জীবনে তার সুখ নেই। তাকে চোরের মত কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে ঘরে. পালিয়ে বেড়াতে হবে বাইরে। সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধু কুটুম্ব ঈর্ষান্বিত,—এমন সার্থক বিবাহ দেশে দশে হয়নি, কিন্তু ঘরের ভিতরে রণেন শুধু জানবে, এমন শাস্তিও সে কখনও পায়নি।

হঠাৎ কথার মাঝখানেই রণেন বেঞ্চি ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল। তখনও ঝরঝরিয়ে এলার বাক্যস্রোত চলছে। রণেনকে উঠতে দেখে এলা থামল। বললে, "ওকি, সবেমাত্র নতুনদিদির সন্ধান পাওয়া গেল,—বাকিটা শুনবে না?"

রণেন বললে, "এমন চমৎকার গল্পটা আরেকটু আগে আরম্ভ করতে পারলে না তুমি? এবার যেতে হচ্ছে, উপায় নেই। রাত ন'টা বাজে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তুমি বলে যাচ্ছ।"

"তা হলে আরেকটু শোন!"

"আরেকটু!" মনোভাব দমন করে রণেন বললে, "পা ধরে গেছে! আমি দাঁড়াই, তুমি শেষ কর!"

এলা বললে, "কাল কখন দেখা হচ্ছে? একটুখানি গুছিয়ে বসলেই অমনি তুমি ব্যস্ত হয়ে ওঠ। দাঁড়াও, আগে বিয়ে হোক, তোমাকে একটুও কাছছাড়া হতে দেব না!"

কাষ্ঠ হাসি হেসে রণেন বললে, "খুব গল্প বলবে, কেমন?"

"সে আমার মনেই আছে, এখন কোনো
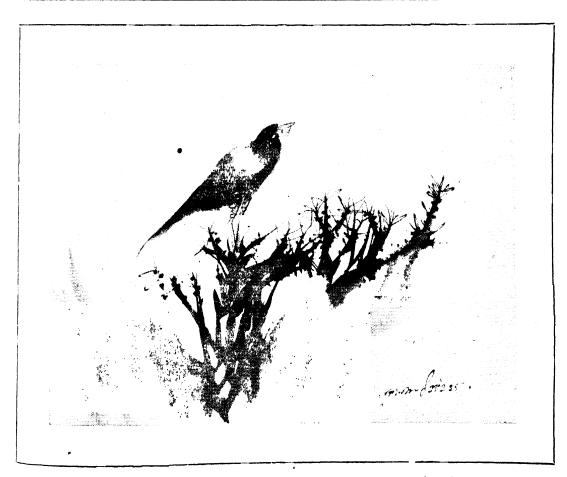
নিঃসঙ্গ শিল্পী ঃ শ্রীগোপাল ঘোষ

কথা বলব না।" হাসিমুখে এলা বললে, "এখন পালাচ্ছ, তখন না শুনে যাবে কোথা?"

"হুঁ! আচ্ছা, ওঠ এবার।" রণেন নিজেই অগ্রসর হল। আর কিছু নয়, সে অপরিসীম ক্লান্ত, আজকের মত সে পালাতে পারলে বাঁচে।

সমস্ত পথ ধরে কিন্তু এলার কথা চলতে লাগল। বাস-স্ট্যাণ্ডে প্রায় তিন মিনিট,—সেখানে এলা থামছে না। কখনও আসছে নতুন দিদি, কখনও বা আর কেউ। কিছু না হোক, ছোট-পিসিমা। বাসে উঠে কথা কইতে কইতে এক সময় এলা বললে, "কাল কখন আসছ? একটু সকাল সকাল এস। আমরা মাঠে গিয়ে গাছতলায় বসব। কেউ কোথাও থাকবে না, নিরিবিলি কথা বলব।"

রণেন বললে, "কাল দেখা হবে কেমন করে? আমাকে যে সারাদিন নানা কাজে থাকতে হবে!"

"আবার কথার অবাধ্য!" রেগে উঠল এলা, "আমি ছটফট করব, তাইতে বুঝি তোমার আমোদ? তা হলে কি পরশু?"

"না—একেবারে সেই শুক্রবারে। বুঝতে পারছ না, চারদিকে আমার কত কাজ জমেছে? কী করে আসি বল? শুক্রবার ঠিক চারটে, নেবুতলার মোড়ে!"

এলা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "কী করে যে আমার কাটবে এই কদিন, তাই ভাবছি! ওদিকে পাকাদেখার দিন এগিয়ে এল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি হৈ-চৈ লাগিয়েছে!"

রণেন মনে মনে ডরিয়ে উঠল। চারিদিকে পরিচিত মহল, সকলের মনে উদ্দীপনা। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওদের দুজনের দিকে। আসছে মাসে শাঁখ বাজবে।

বাসের মধ্যেই প্রবল স্রোতে বাক্যালাপ আরম্ভ করে দিয়েছে এলা। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বেমানান হচ্ছে কিনা তাও বিচার করে দেখছে না। একই সীটে বসেছে দুজনে পাশাপাশি। ক্লাস-মেট্ মালিনী চৌধুরীর গোমড়া মুখ নিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে এলার গল্প। রণেন কাঠ হয়ে বসে রয়েছে।

রাশি রাশি কথা, কথার বন্যা। দেহ, মন, ভালবাসা—এসব কিছু নেই, শুধু কথা। ভেসে যাচ্ছে বর্তমান, তলিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ,—ভ্রূক্ষেপ নেই, পঙ্গপালের মতো মনের আকাশ ছেয়ে শুধু আসছে কথার ঝাঁক। তিন বছর ধরে রণেন শুনছে অফুরন্ত অজস্র কথার পর কথা।

রণেন বার বার ঘড়ি দেখছে, এলা বার বার তাকে খোঁচা দিয়ে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছে। এমনি করে প্রায় এক ঘণ্টা কাল। তারপর এক সময় বাস এসে থামল একটি বিশেষ পথের মোড়ে। রণেন নিজেই উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে নামল। এলা নেমে এল তার ভবিষ্যৎ স্বামীর পিছু পিছু।

আবার পিছু নিয়েছে ভবিষ্যৎ গৃহ-লক্ষ্মী! নতুন একটা উপাখ্যান বলতে বলতে আসছে। রণেন আরো জোরে পা চালিয়ে দিল। দেখতে অশোভন, নইলে রণেন একদৌড়ে পালিয়ে যেত।

হন হন করে এলাও চলেছে পিছনে পিছনে। এলা বললে, "কী হচ্ছে, অত জোরে হাঁটছ কেন? আমি যা বলে যাচ্ছি শুনতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি।" রণেন ছুটতে ছুটতে জবাব দিল।

"শোন, এসব কিন্তু তোমার শোনা দরকার! বুঝেছ?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি,—কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি—"

এলাও প্রায় ছুটছে। ফিরবার পথে ওদের প্রায় প্রত্যহই এই দৃশ্য ঘটে। শেষ পর্যন্ত ওরা দুজনে ছুটতে থাকে। রাত হয়ে গেছে অনেক এই ছুতো, কিন্তু আসলে তা নয়। ছুটে পালানই হল সব-শেষের ঘটনা।

বাঁদিকে বেঁকে এলাকে যেতে হবে, রণেন যাবে সোজা। এলা পিছন দিক থেকে চেঁচিয়ে বললে, "শোনো শোনো তা হলে শুক্রবার, কেমন? ঠিক পাঁচটায়... নেবুতলার মোড়...শুনতে পাচ্ছ? অনেক কথা রইল কিন্তু......"

দূর থেকে রণেন জবাব দিয়ে গেল, "আচ্ছা...গুড বাই!"

হাসিখুশী মনে এলা চলতে লাগল ওদিকে। এদিকে এগিয়ে রণেন একবার থমকে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দুখানা পা তার অবসাদে যেন ভারাক্রান্ত!

* * *

মস্ত সুসংবাদ বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিন-চারখানা চিঠি এবং কতক-গুলি মূল্যবান কাগজপত্র এসেছে তার নামে। পরদিন সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে সে ছুটল সরকারী দপ্তরে এবং পরবর্তী দুদিন অবধি নিজের সমস্ত গোছগাছ করে নিল। বৃহস্পতিবার রাত্রে বাড়িতে সংবাদটি প্রকাশ করল। শুক্রবার মধ্যাহ্নে তাকে যেতে হচ্ছে বোম্বাই।

প্লেনের টিকিট তার কেনা হয়ে গেছে। কবে ফিরবে, ঠিক বলা যাচ্ছে না।

কাগজপত্রের আসল কথাটা সে আপাতত কারো কাছে ভাঙল না। বোম্বাই পৌঁছে সে জানাবে। তাকে যেতে হবে লণ্ডনের দিকে।

মল্লিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভ্র স্বপ্ন-বিস্তার নয়, ধুলো জঞ্জাল মেশানো খানিকটা ময়লা বালি ছড়ানো জায়গা।

সমুদ্রের সানন্দ দান নয়, মনে হয় পয়সা নিয়ে ফরমাশ মত কেউ বুঝি ঢেলে দিয়ে গেছে।

এই চৌপাটি।

সমুদ্রও আছে, যেন নীল অসীমতার নকল করা পরিহাস।

কিন্তু মনের ওপরেও শ্যাওলা ধরানো নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি যখন দুদণ্ডের জন্যে একটু থামে, মেঘলা আকাশের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও একটু হাঁফ ছাড়তে মানুষকে ওই-খানেই আসতে হয়। ওই ভিজে বালির ওপরেই বসতে হয় কাগজ কি রুমাল পেতে, আর অসংখ্য সমব্যথীদের মাঝখানে নিজের সংকীর্ণ স্বত্বটুকু বাঁচিয়ে হয় সমুদ্রের দিকে ফিরে তার বিষণ্ণ নিস্তেজ ঢেউ গুনতে, নয় উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে চার্নি রোডের রাস্তা পার করা পোলের ওপর দিয়ে অবিরাম জনস্রোত দেখতে হয়।

নেহাত অসম্ভব না হলে প্রতিদিন সায়াহ্নে এই যার নিয়মিত প্রকৃতি-বিলাস, নিজের প্রাদেশিক পোশাকে সজ্জিত থাকলে একদিন কেউ না কেউ তাকে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে চিরপরিচিত ভাষায় সম্বোধন করতেও পারে।

"শুনছেন মশাই, শুনছেন? আপনি ত বাঙালী?"

না-শোনার ভান করে বাঙালীত্ব অস্বীকার করা তখন বোধ হয় সম্ভব নয়। সুবিকাশের পক্ষে অন্তত সম্ভব হয়নি।

সে মুখ ফিরিয়ে সম্বোধককে দেখেছে এবং বিস্মিত হয়েছে। বাঙালীকে দেখে ঠিক যিনি চিনতে পারেন তাঁর নিজের চেহারা পোশাকে বাঙালীয়ানার পরিচয় কোথাও নেই। চৌপাটির এই ছত্রিশ জাতির ভিড়ে তাকে অনায়াসে লক্ষ্য না করে থাকা

যায়। তিনি যে বাঙালী হতে পারেন, এ-সন্দেহ মনে উদয়ও হয় না।

তিনি নিজেও সে-কথা জানেন ও তার জন্যে কিঞ্চিৎ গর্বও অনুভব করেন বোঝা গেল। সোনার ঝিলিক দেওয়া বাঁধানো দু'পাটি দাঁতই বার করে হেসে বলেছেন, "বাঙালী বলে চিনতে পারলেন না ত? কেউ পারে না মশাই। এই এত বছর এখানে আছি, গুজরাটীর সঙ্গে গুজরাটী, মারাঠীর সঙ্গে মারাঠী, আবার তামিলদের সঙ্গে তামিল। কিন্তু বাঙালী দেখলেই মনটা কেমন দুর্বল হয়ে যায় এখনো। গায়ে পড়েই আলাপ করে ফেলি!"

শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে এমনি করেই পরিচয়।

এবং তারপর মল্লিকার সঙ্গে।

সেই আশ্চর্য একমাত্র মল্লিকা, সকলের যৌবনের স্বপ্নে একবার না একবার যে অঞ্চল বুলিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রীপতিবাবুর মারফত মল্লিকার সাক্ষাৎ, অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এ যেন ফুটপাথে কেনা সস্তা ক্যালেণ্ডারের ছবি আঁটা পিচবোর্ডের ছেঁড়া মলাটের পেছনে মহাকবির ছন্দোবন্ধ কল্পনা!

প্রথম দিন সুবিকাশ একটু বিমূঢ় হয়ে গেছল।

চৌপাটিতে দিন দুই আপাতআকস্মিক-ভাবে দেখা শোনা হবার পরই শ্রীপতিবাবু বাড়িতে নিয়ে গেছলেন একরকম ধরেবেঁধে।

চেহারা পোশাকে শ্রীপতিবাবু যেমন অবাঙালী, বাস করবার পাড়া নির্বাচনেও তাই। বাঁধাধরা প্রাদেশিক পাড়ায় এ-শহরে সবাই আজকাল থাকবার সুযোগ পায় না। তবু শহরের যে অঞ্চলে শ্রীপতিবাবু তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন, নেহাত অকাজেও কোন বাঙালী বুঝি সেখানে যায় না। বোম্বাইয়ের সাবেকী মিল অঞ্চল। কাঠে ইঁটে জোড়াতালি দেওয়া শ্রীহীন জরাগ্রস্ত সব বাড়ি।

চটাওঠা পায়ের-ভারে-কাঁপা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে কটু একটা রাসায়নিক গন্ধ। নীচের তলায় কিসের একটা গুদোম হবে।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে উঠলেই বিস্ময়।

না, তখনো মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়নি। বিস্ময়, ঘরের সাজসজ্জা আসবাব দেখে।

শ্রীপতিবাবু যে শৌখিন লোক, তাঁর প্রৌঢ়ত্ব ঢাকবার সমস্ত প্রসাধন ও বেশভূষা দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু সে-শৌখিনতা যে মেকী নয়, বসবার ঘরটির সব কিছুতে তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। শ্রীপতিবাবুর রুচি উচুদরের এবং সে-রুচিকে প্রশ্রয় দেবার মত সঙ্গতিও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত পাড়ায় নিজেকে নির্বাসনের অর্থ কী?

সে-প্রশ্ন মনের মধ্যে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকার দেখা।

সব প্রশ্ন তখন বিহ্বলতায় নীরব।

এই মল্লিকা! সুবিকাশের মনে যা হয়েছিল তাকে সূক্ষ্মতম কবিতার ভাষা দিলেও বুঝি অপমান করা হয়।

এমন করে প্রথম দেখা যাদের জীবনে ঘটে তারা ঈর্ষার পাত্র কিনা সন্দেহ।

মল্লিকা সুন্দরী কি না, কী তার গায়ের রঙ, পরিচ্ছদের শ্রী, সুবিকাশ কিছুই বোধ-হয় দেখতে পায়নি। সে দেখেছিল নিজের মনের মল্লিকাকে।

রক্তমাংসের মল্লিকার চোখে যে অভ্যর্থনার বদলে ছিল রূঢ় কাঠিন্য তা সে লক্ষ্যও করেনি তাই।

শ্রীপতিবাবু পরিচয় করিয়ে দেননি। তিনি তখন নিজের কথাতেই মশগুল।

"পাড়াটা দেখে বেশ ভড়কে গিয়েছিলেন, কেমন? ভেবেছিলেন কোন্ বিদঘুটে বদমাশির আড্ডায় না নিয়ে এলাম। আরে মশাই, সত্যিকারের নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট এমন জায়গা পাব কোথায়! নির্বিবাদী শহর বলতে হয় ত বোম্বাই। এ-জায়গা আবার তার ওপর এক-কাঠি। আমি মরি কি বাঁচি যেমন খোঁজ রাখে না, তেমনি নাচি কি গান গাই তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই।"

মল্লিকা যেমন হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিল তেমনিই চলে যাচ্ছিল। শ্রীপতি এতক্ষণে যেন লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "ভালো-মন্দ ঘরে যা আছে নিয়ে এস মল্লিকা। দেশের লোক এসেছে বাড়িতে। নিন্দে যেন না করতে পারে।"

মল্লিকা একটু দাঁড়িয়ে কোন কিছু না বলেই চলে গিয়েছিল। শ্রীপতি তাঁর ঈষৎ কর্কশ গলায়, ঈষৎ কৃত্রিম ভঙ্গিতে কী-যে বলে চলেছিলেন, সুবিকাশ ভাল করে শুনতে পায়নি। শুধু অস্পষ্টভাবে তার প্রথম বুঝি সেদিন মনে হয়েছে, শ্রীপতিবাবুর কথা শুধু একটু কৃত্রিম নয়, কেমন একটু কপটতা মেশান।

প্রথম দিন আর কিছুই সে বোঝেনি। বোঝেনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। বুঝলে আকণ্ঠনিমগ্ন হবার আগে সে হয়ত নিজেকে সাবধান করবার একটু নিষ্ফল চেষ্টাও করত। যত ক্ষীণই হোক, তার সামাজিক বিবেকই তাকে বাধা দিত যথাসাধ্য।

কিন্তু বোঝা সহজ ছিল না তার পক্ষে। আচরণে, কথায়, কি সজ্জায়, কোন ইঙ্গিতও সে পায়নি।

মল্লিকা মাথায় ঘোমটা দেয় না, সিঁদুরও পরে না। শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে তার বয়সের তফাতও এমন যে, সত্যকার সম্পর্কটা অনুমান না করতে পারাটা অস্বাভাবিক নয়।

আর যাই ভাবুক, মল্লিকা শ্রীপতির স্ত্রী হতে পারে, সে কল্পনাও করেনি।

ভুল সেদিন ভাঙল অত্যন্ত রূঢ়ভাবে।

শ্রীপতি তার আফিসেই ফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলেন অফিস ফেরতা একবার যাবার জন্যে।

সিঁড়িতেই মল্লিকার সঙ্গে দেখা। সে নেমে আসতে গিয়ে সুবিকাশকে দেখে থেমে পড়েছিল। ওপরের ধাপে মল্লিকা, নীচে সুবিকাশ। পথ যেন আগলানো।

"উনি ত বাড়ি নেই!"—এ ক'দিনের পরিচয়ে মল্লিকার স্বল্প একটি দুটি কথায় যে নির্লিপ্ত স্বর শুনেছে তাই আর একটু কঠিন।

কিন্তু সে-কাঠিন্য তখন লক্ষ্যের বাইরে। সিঁড়িটা সব সময়েই অন্ধকার, সন্ধ্যার দিকে আরো। নইলে সুবিকাশের মুখের চেহারাটা মল্লিকার কাছে লুকোন থাকত না।

আবছা অন্ধকার তাকে বাঁচিয়েছে। কোন রকমে অর্ধস্ফুট স্বরে শ্রীপতির অনুরোধের কথাটা সে তাই জানাতে পারল।

মল্লিকা কয়েকটা মুহূর্ত তবু নীরব। তারপর 'আসুন' বলে সে ওপরে উঠে গেল। সুবিকাশ তার পেছনে একটা বিমূঢ় বিহ্বল যন্ত্রণা নিয়ে।

মল্লিকা দরজার তালাটা খুলল। অন্ধকারে চাবি লাগাতে একটু বিলম্ব। সিঁড়ির রাসায়নিক গন্ধ ছাপিয়ে মল্লিকার সান্নিধ্যের একটা উষ্ণ অবশ করা সুবাস।

মল্লিকার পিছু পিছু সুবিকাশ ঘরে ঢুকল। বোঝা গেল, সুবিকাশের আসার কথা সে জানে না। ঘরে তালা লাগিয়ে কোথায় বার হচ্ছিল।

"আমি না হয় এখন যাই। আপনি ত কোথায় বেরুচ্ছিলেন।" এতক্ষণে সুবিকাশের ভদ্রতাটুকু করবার শক্তি এল।

"না, বসুন।" মল্লিকার প্রায় আদেশ। কথাটা বলে সে ভেতরে চলে গেল।

বসল সুবিকাশ। যান্ত্রিক বসা। এখন শুধু শ্রীপতির জন্যে অপেক্ষা করা। মল্লিকা নেহাত প্রয়োজনে বা শ্রীপতির আহ্বানে ছাড়া তার সামনে এখনো পর্যন্ত আসেনি। আজও আসবার কোন প্রয়োজন নেই। কতক্ষণ শ্রীপতির জন্যে অপেক্ষা করবে বসে? অপেক্ষা করাই বা কেন? বসে থাকাটাই অসহ্য, বিশেষ এই

ঘরে, পাশের ঘরেই মল্লিকা আছে জেনে। পাশের ঘরে এবং অসীম সমুদ্রের ওপারে।

অপেক্ষা করতে কিন্তু বেশীক্ষণ হল না। মল্লিকাই এল বাইরে বেরুবার সাজটা বদলে।

এসে কাছেই বসল; অত্যন্ত বেশী কাছে।

শুধু পোশাক সে বদলায়নি, মুখের চেহারাতেও কী যেন একটা পরিবর্তন। কাঠিন্যের সঙ্গে একটু বিদ্রূপ হয়ত।

"আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি।"

উত্তর অনেক রকমের হয়, কিন্তু সুবিকাশ নীরব।

"কতদিন ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?" আলাপ নয়, জেরা যেন।

"বেশী দিন নয়। কতদিন, আপনিই ত জানেন!" সুবিকাশের মুখে একটু ক্লান্ত হাসি।

"না জানি না। বাইরের আলাপ ঘরে না পৌঁছোন পর্যন্ত জানব কী করে!" একটু থেমে মল্লিকা আবার বললে, "আপনি ত বড় চাকরি করেন শুনেছি। ঈর্ষা করবার মত কাজ। এখানে কি একলাই থাকেন?"

"হ্যাঁ। কী এ আলাপের অর্থ, সুবিকাশের পক্ষে বোঝা কঠিন।

বোঝা গেল একটু পরে।

"এত লোক থাকতে ওঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা একটু আশ্চর্য নয়?"

সুবিকাশ এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিতে পেরেছে বোধ হয়।

স্থির দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বললে, "বয়সের তফাতের কথা ভাবছেন?"

মল্লিকা চোখের দৃষ্টি ফেরাল, কিন্তু পলকের জন্যে। তারপরই সুবিকাশের দিকে অকম্পিত দৃষ্টিতে চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসে বললে, "না, বয়সের নয়, চরিত্রের।"

কোন উত্তর সুবিকাশের মুখে যোগাল না।

মল্লিকাই আবার বললে, "আপনি কে, কী আপনি করেন, আমরা জানি। এখানকার বাঙালীরা অনেকেই হয়ত জানে। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে কিছু কি আপনি জানেন? উনি আপনার জগতের লোকই নন। ওঁর সঙ্গে আপনার কোন মিল কোথাও নেই বন্ধুত্ব হবার মত।"

"বন্ধুত্ব কি মিল ধরেই হয়?" নেহাত কথার কথা।

মল্লিকাও তা অগ্রাহ্য করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা এ ক'দিনে ধরে দিয়েছেন?"

"ধার!" সুবিকাশ স্তম্ভিত।

"হ্যাঁ, ধার বলেই কত টাকা এ পর্যন্ত উনি নিয়েছেন?"

একটা অসহ্য স্তব্ধতা যেন হঠাৎ ঝনঝন করে চুরমার হয়ে গেল।

"নিইনি এখনো, তবে নেব বলেই অত করে ডেকে পাঠিয়েছি।"—মাথার টুপিটা খুলে গায়ের কোটটার সঙ্গে টাঙিয়ে রেখে, শ্রীপতি স্মিতমুখে কাছে এসে বসলেন। নির্বিকার মুখে হেসে বললেন, "মল্লিকা, আগে থাকতে বলে ভালই করেছ। দুদিনের আলাপ হতে-না-হতেই কী করে চেয়ে বসব ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম। যাক্, কথাটা যখন জেনেই ফেলেছ আমায় হতাশ যেন না হতে হয়। বড় ঠেকে গেছি। তোমার ত হাত ঝাড়লে পর্বত! হাজারটা টাকায় তাতে টোলও খাবে না।"

কিসে সুবিকাশ বিস্মিত? আপনি থেকে তুমি-তে আসায়, না, শ্রীপতি নিজের মুখে সেই ধার-ই চাওয়ায়!

বিস্মিত আরো বেশী মল্লিকার ব্যবহারে। মল্লিকা লজ্জাও পেল না, উঠেও গেল না। ঈষৎ হেসে বললে, "মোটে হাজার টাকা শুনে সুবিকাশবাবু বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছেন। একে ধার বললে অপমান করা হয়।"

সুবিকাশ টাকা দিয়েছে এবং সেই একবার নয়। কী একটা অস্পষ্ট জ্বালা মেটাবার জন্যেই তার এই নির্বিচার অকুণ্ঠ দেওয়া। সে জ্বালা কি মল্লিকারই বিরুদ্ধে? সুবিকাশ বোঝবার চেষ্টা করে না।

মল্লিকারও এখন ভিন্ন রূপ।

অন্তরঙ্গতা না হোক, সে কঠিন দুরত্ব আর নয়। শ্লেষের আভাস একটু থাক, কিন্তু সমাদরে স্নিগ্ধতাও বুঝি আছে।

সুবিকাশ নিয়মিতভাবেই সে-বাড়িতে আসে যায়। লোকের দৃষ্টি বিশেষ করে যেখানে পড়বার নয় এমন জায়গায় তিনজনকে একসঙ্গে কখনো কখনো দেখা যায়। কখনো শুধু দুজনকে।

কিন্তু পাশাপাশি গাড়িতে কি সিনেমার সীটে বসেও সুবিকাশ জানে, সে যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। মল্লিকা দূর নয়, কিন্তু অনন্ত অদৃশ্য ব্যবধান তেমনি আছে মাঝখানে। সে ব্যবধান ভেঙে ফেলবার কোন চেষ্টা সুবিকাশও করে না, অন্তত সজ্ঞানে ত নয়। সে বুঝি তার নিয়তি মেনে নিয়েছে।

কিন্তু জ্বালা বুঝি একেবারে যাবার নয়।

শ্রীপতি ক'দিন ধরেই জানাচ্ছেন, সামনের সপ্তাহেই তাঁদের বিয়ের তারিখের বাৎসরিক উৎসব। সুবিকাশ সেদিন যেন আসতে না ভোলে। বাইরের কেউ নয়, তিনজনে মিলেই যা-কিছু আনন্দ করা হবে।

সেদিন কথাটা আবার জানাতে মল্লিকা হঠাৎ সুবিকাশের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, "আচ্ছা, কী সেদিন আমাদের দেবেন বলুন ত?"

"আহা, দেবার কথা এর ভেতরে কোথা থেকে আসছে!" শ্রীপতি প্রতিবাদ করেছেন। "আমাদের উৎসব। ও আসবে, আনন্দ করবে, তাহলেই হল।"

"না তাহলে হল না। পাবার মত কিছু উপহার না পেলে উৎসব আমার ভালই লাগে না। সত্যি কী দেবেন বলুন ত?" মল্লিকার আগ্রহটা একটু অস্বাভাবিক।

সুবিকাশ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলেছে, "ঠিক যা দেওয়া উচিত, তাই দেব।"

উৎসবের দিন সুবিকাশ এসেছে যথাসময়েই। উপহারও এনেছে। শ্রীপতির জন্য সোনার রিস্ট-ব্যান্ডসমেত দামী সোনার ঘড়ি, মল্লিকার জন্যে একটা ছোট আংটি—বেশ ছোট।

শ্রীপতিবাবু সানন্দে ঘড়ি হাতে পরতে পরতে আপত্তি জানিয়েছেন, "দেখো দিকি, এত খরচ করবার কী দরকার ছিল! এই দামী ঘড়ি, তার ওপর সোনার ব্যান্ডটা না দিলে হত না! নাঃ, বড় চাকরিই কর, বুদ্ধিশুদ্ধি কোন কালে হবে না।"

তার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই ঘড়ি হাতে পরেই বিশেষ জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন আধ ঘণ্টায় ফেরবার নাম করে।

টেবিলের দুধারে দুজন। কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই।

মল্লিকাই প্রথম কথা বলেছে, "আপনার বিদ্রূপ আরো সূক্ষ্ম হবে আশা করেছিলাম।"

"বিদ্রূপ! সূক্ষ্ম হোক মোটা হোক বিদ্রূপ কোথায় দেখলেন?"

উত্তরে মল্লিকা একটু হেসেছে মাত্র।

"ওঃ, আপনি উপহার দুটোর কথা ভাবছেন, কিন্তু ওর মধ্যে বিদ্রূপ ত নেই। আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে ওঁর পাওনাই ত বরাবর বেশী।"

কথাটা সুবিকাশ যেদিকে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, তা যায়নি।

মল্লিকা মৃদু একটু হেসে বলেছে, "আপনার কী ধারণা বলুন ত? আমাদের এ-বিয়েটা একটা দুর্ঘটনা, যার জন্যে আমার ভাগ্য কি উনিই দায়ী? একটা অনাথ অসহায় মেয়ে হিসাবে আমায় ধরে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর উনি তার সুযোগ নিয়েছেন, এই বোধ হয় আপনি ভাবেন!"

"ঠিক তা হয়ত ভাবি না। কিন্তু এ-বিয়ে স্বাভাবিকও ত নয়।"

"না, নয়, কিন্তু এ-বিয়েতে ভাগ্যের হাতও নেই। আমি স্বেচ্ছায় ভালবেসে ও'কে বিয়ে করেছি।" মল্লিকার শেষ কথাগুলো যেমন শান্ত, তেমনি দৃঢ়।

"স্বেচ্ছায়! ভালবেসে!" সুবিকাশের স্বরে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসই যেন মল্লিকাকে হঠাৎ উত্তেজিত করে তুলেছে।

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে শক্ত হয়ত, কিন্তু প্রথম যৌবনে মেয়েদের মন কী থাকে আপনি জানেন না, তাই। অবশ্য ছবির নায়কের নামে নাচা মনের কথা বলছি না, মন বলে সত্যি কিছু পদার্থ যাদের থাকে, বলছি তাদের কথা। তারা শুধু রূপ দেখে না, গুণও হয়ত বোঝে না, কিন্তু নিজেদের বয়সী সাধারণ ছেলেদের তাদের মনে ধরে না। তাদের নেহাত হাল্কা কাঁচা জোলো লাগে। এসব মেয়েদের মনে মোহ ধরায় বিশেষত্ব শক্তি প্রতিভা। এরা স্বপ্ন দেখে আশ্চর্য পুরুষের, বয়স গুনে তাকে বিচার করে না।"

"সব বুঝলুম, কিন্তু আসলের নামে মেকীও ত মাত করে যায়।"

"নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু আমার বেলা সে-কথা আমি মানব কেমন করে? ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা রেকর্ড আপনি শুনছেন, সুর গিয়েছে হারিয়ে, স্বর গিয়েছে বুজে, দেখছেন শুধু একটা শুকনো খোলস। কিন্তু আমি অন্য কিছু দেখেছি, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি সেই আশ্চর্য সব কথা। আজ আর কী প্রমাণ আপনাকে তার দেব!" হতাশভাবে মল্লিকা ঘরটা একবার হাত নেড়ে দেখিয়েছে, "আছে শুধু এই ঘরটা। কিন্তু এই ঘরের সামান্য এই কটা জিনিসেও তার মনের যেটুকু রঙ লেগে আছে, তাতে তাকে কি একেবারে ফাঁকি বলে মনে হয়?"

মল্লিকা মুহূর্তের জন্যে চুপ করেছে। তারপর নিজেকেই যেন বিশ্বাস করাবার জন্য তীব্রস্বরে বলেছে, "না, মেকীতে আমি ভুলিনি। আশ্চর্য পুরুষকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম সকলের মতের বিরুদ্ধে, রূপ, বয়স কিছু না বিচার করে। তার জন্যেই সব কিছু আমি ছেড়ে এসেছি।"

মেয়েদের হৃদয়ের বিরুদ্ধে সব তর্ক নিষ্ফল, একথা সুবিকাশের তখুনি বোঝা উচিত ছিল। সে তা বোঝেনি। তাই আবার জের টানতে চেয়েছে কথার, "কিন্তু তারপর?"

"তারপর আর কী? —একটানা দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, বিদ্যুতের মত তলোয়ারও যাতে মরচে ধরে ভেঙে যায়। কিন্তু—" মল্লিকা নিজেকে এতক্ষণে শান্ত করে একটু হেসেই বলেছে, "দুর্ভাগ্যে মনের প্রথম ছাপ কি কখনো মোছে!"

স্কেচ — শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

মোছে বলেই মনে হয়েছে কিন্তু একদিন। অদৃশ্য অলক্ষ্য ব্যবধানও বুঝি ভেঙে পড়ে।

কিছুদিন ধরে শ্রীপতি যেন কেমন একটু অস্থির বিচলিত। সুবিকাশের অসময়ে আসা-যাওয়া নয়, কিন্তু আজকাল শ্রীপতিকে প্রায়ই পাওয়া যায় না। মল্লিকাও আবার কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠছে, কঠিন স্থির শুধু বাইরের চেহারায়, কিন্তু তার চোখে একটা গভীর অবসাদ অসতর্ক মুহূর্তে লুকোন থাকে না।

শ্রীপতি বা মল্লিকা কেউ সেদিন বাড়িতে নেই। নিয়মিত সময়েই এসে দরজায় তালা দেখে সুবিকাশ একটু বিস্মিত হয়েই ফিরে যাচ্ছিল। সিঁড়ির নীচেই মল্লিকার সঙ্গে দেখা।

"আসুন, অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?"

"না।"

আবার সেই কাঠের সিঁড়ির কটু গন্ধ! সেই সান্নিধ্যের সুবাস। কিন্তু আজ তার স্বাদ যেন আলাদা।

সুবিকাশ অফিস-ফেরতা সাধারণত এখানেই আসে। মল্লিকা আজ কিন্তু তার চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেল না। বসলও না কাছে।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, যা প্রায় বিরল হয়ে এসেছে আজকাল। যাহোক কিছু কথায় সুবিকাশ সেটা যখন ভাঙবে কি না ভাবছে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মল্লিকা বললে, "আমার কিছু টাকার দরকার।"

সুবিকাশ সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাল। এ-বাড়িতে টাকা সে অনেক দিয়েছে এ-পর্যন্ত, কিন্তু এই সামান্য কটা কথা এত তীব্র আঘাত দিতে পারে সে কখনো ভাবতে পারেনি। মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বের হল না।

মল্লিকা আবার বললে, "উনিই আজকালের মধ্যে হয়ত চাইতেন, তার আগে আমিই চাইলাম।"

"কিন্তু ও'র চাওয়ায় আপনার চাওয়ায় তফাত নেই কি?" সুবিকাশ এবার বলতে পারল তিক্ততা গোপন না করেই।

"আছে। আমি ফেরত দেব বলেই চাইছি।"

"ফেরত দেবেন? কেমন করে?"

"জানি না। কিন্তু সংকল্প তাই।"

"কিন্তু যার কাছে কিছুই কোনদিন ফেরত পাবার নয়, তার কাছে এই কটা টাকা ফেরত পাবার লোভ আমার নেই। টাকা আমি আপনাকে দিতে পারব না।"

"না, টাকা আমায় দিতেই হবে।" মল্লিকা যেন সমস্ত সংযম হারিয়ে অধীর ব্যাকুল হয়ে উঠল।

স্তব্ধ হয়ে গেল সুবিকাশ দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণায়। বেশ রূঢ়ভাবেই বললে, "অনেক কিছুই ত করেছেন। এই একটা জায়গায় সহধর্মিণী না হলে পারতেন না?"

এবার মল্লিকা নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সুবিকাশ উত্তেজিত। উঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকার সামনে গিয়ে আবার বললে, "কী জন্যে এ লজ্জা, এ অপমান আপনাকে সাধ করে নিতে হচ্ছে? হঠাৎ কেন এত টাকার আপনার দরকার?"

মল্লিকা আর মুখ ফেরালে না। স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "শুনুন, সত্য কথাটা তাহলে শুনুন। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

"চলে যেতে হবে!"

"হ্যাঁ, চলে নয়, পালিয়ে যেতে হবে বলাই উচিত, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সব কিছু বলবার মত মনের অবস্থা নয়, শুধু এইটুকু শুনে রাখুন যে, এমন একটা গ্লানির স্খলনের ইতিহাস ও'র পেছনে আছে, যা মুছে ফেলতে উনি পারেননি। মনে করুন, সেটা চুরি। মনে করুন, তার চেয়ে বেশী কিছু। তার জের আজো মেটেনি। হিংস্র অক্লান্তভাবে এখনো সন্ধান করে ফিরছে। তারই ভয়ে এইরকম পাড়ায় লুকিয়ে এসে থাকতে হয় আমাদের, পালিয়ে বেড়াতে হয় শিকারের পশুর মত।"

সুবিকাশের কাছে কথাগুলো হয়ত নতুন কিছু নয়। মনের গভীরে অনেক আগেই বুঝি জানত। তবু বিস্মিত কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত কাটল। সুবিকাশ তারপর ধীরে ধীরে বললে, "কিন্তু এ-দায় ত আপনার নয়। আপনাকে টাকা চাইতে হয় কেন এর জন্যে?"

"চাইতে হয় ও'কে মুক্তি দেব বলে। যত অসাধারণই একদিন হয়ে থাকি, আজ বুঝতে পারছি অনুরাগ বলে যাকে মনে করেছি, তার ষোল আনাই ছিল আমার অহংকার। আশা যার নেই তাকে ধন্য করবার অহংকার। কিন্তু ধন্য আমি ও'কে করিনি, করেছি শুধু বিড়ম্বিত। আমার জন্যেই ও'র জীবনে এত গ্লানি, এত কালি। আমার স্বপ্ন অক্ষুণ্ণ রাখবার করুণ ব্যর্থ চেষ্টাতেই ও'র প্রথম স্খলন শুরু। কিন্তু আর ও'কে অভিশপ্ত করে আমি রাখব না। আমার বিড়ম্বনা থেকে ও'কে মুক্তি দেব একেবারে। আর—আর আমি পারছি না এ-জীবন সইতে।"

ভেঙেপড়া এ-মল্লিকা, হৃদয়ের সমস্ত তার-ছেঁড়া চেতনার গভীর বিহ্বলতা।

সুবিকাশ হাতটা তার ধরে ফেলল। রক্তে আগুন ধরানো সেই উষ্ণ কোমলতার সুতীব্র অনুভূতি নিয়ে বললে, "মুক্তি দিতে আর নিতে কোথায় যাবে মল্লিকা! আসবে আমার কাছে? দেবে আমায় তোমাকে সব কিছু থেকে আড়াল করতে?"

"পারবে তুমি! পারবে আমায় নিয়ে যেতে?" কিন্তু তোমার ওই বাঁধানো রাস্তার জীবনে নয়। দূরে, সব কিছু থেকে দূরে, এখানকার কোনো ডাক যেখানে পৌঁছয় না। পারবে আমায় নিয়ে এমন সব কিছু ছেড়ে যেতে?"

মল্লিকার কোমল বাহুতে সুবিকাশের হাতের মুঠিটা শুধু আরো শক্ত হয়েছিল সেদিন।

ত্রুটিহীন সব ব্যবস্থাই হল ঝড়ের বেগে। যেদিন সকালে শ্রীপতিদের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক, তার আগের রাত্রেই সুবিকাশ আর মল্লিকাকে দেখা গেল দূরযাত্রী একটি ট্রেনের নির্জন একটি কামরায়।

জিনিসপত্র সব উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে খুব বেশী দেরি নেই।

সুবিকাশ উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লিকার দিকে তাকাল, "কী হয়েছে মল্লিকা? শরীর খারাপ লাগছে?"

মল্লিকা মধুর একটু হাসল, "না, মাথাটা হঠাৎ ধরেছে। কিছু নয় ট্রেন চললেই সেরে যাবে।"

কিন্তু সুবিকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, সঙ্গে ওষুধ কিছু নেই জেনে বেরিয়ে গেল ওষুধের চেষ্টায়, মল্লিকার মৃদু আপত্তি না শুনেই।

ওষুধ নিয়ে সুবিকাশ সময় থাকতেই ফিরল।

কামরায় মল্লিকা নেই।

এখনো কয়েক মিনিট ট্রেন ছাড়তে আছে।

সে কয়েক মিনিটও শেষ হয়ে এল।

মল্লিকার এখনও দেখা নেই। দেখা আর হবে না, তখনই সুবিকাশ বুঝেছিল।

মুহূর্তের একটা চাঞ্চল্য। সব কিছু যে হাতবাক্সে ছিল, সেটা?

হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে সীটের তলায়।

সেটা খুলে দেখবারও দরকার নেই, সুবিকাশ জানে। সব ঠিক আছে।

না, অত ছোট ফাঁকি মল্লিকা তাকে দেয়নি।

স্টেশন কাঁপিয়ে অজানা দূরের যাত্রী ট্রেনের হুইসিল বাজল।

॥ দুটি পাখি ॥

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

রম্য-রচনা

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
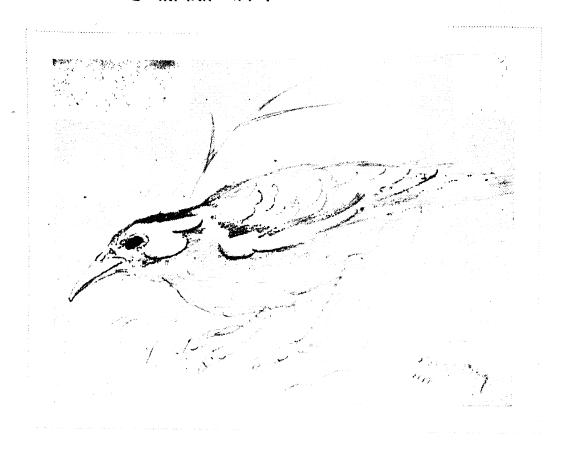
বাংলা সাহিত্যে 'রম্য-রচনা' কথাটা সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে। কথার পিছনে যে প্রত্যয়টি আছে, তাহা বিলাত হইতে আমদানী। ফরাসী 'belles-lettres' কথাটিরই বাংলা প্রতিশব্দ করা হইয়াছে 'রম্য-রচনা'।

বিলাতী একটা কথার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া যে এক জাতীয় রচনার পরিচয় দিতে হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে, এই ধরনের রচনা পূর্বে এ-দেশে চলিত ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে কোন কল্পনা করিতে পারেন নাই, Aristotle বা Longinus-এর এ-সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

রম্য-রচনার উৎপত্তি ও বিকাশ আধুনিক যুগেই ঘটিয়াছে, এক হিসাবে ইহাকে আধুনিক বিদগ্ধ মনের বিশিষ্ট প্রকাশ বলা যায়। পূর্বকালে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য প্রণীত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট নাটক এবং আখ্যায়িকাও রচিত হইয়াছে, কিন্তু এই জাতীয় রচনার কথা কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই, কারণ যে-প্রেরণা হইতে ইহার উদ্ভব তাহা প্রাচীনদের মনের আগোচর ছিল। য়ুরোপীয় রেনেসাঁর যুগের শেষের দিকে যখন উদ্দামতার স্রোতে ভাঁটা শুরু হয়, তখন জীবনপ্রবাহের কোলে কোলে যে উর্বর পলিমাটি জমিতে আরম্ভ করে, সেই মাটিতেই ইহার উদ্ভব! ইহার বীজ এখন দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং যে-দেশেই ইহার পক্ষে উপযুক্ত জল-হাওয়া বর্তমান, সেখানেই ইহার চাষ চলিতেছে। আলু ও কপির মত রম্য-রচনার চাষও যে এ-দেশে প্রচলিত হইয়াছে, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আজকাল এ-দেশের জল-হাওয়াও যে এই চাষের উপযোগী হইয়াছে এবং চাষের ফলে যে উপাদেয় ফসলও অনেক সময় পাওয়া যাইতেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই।

(২)

শুধু শব্দার্থ বিচার করিলে belles lettres-র মানে হয় 'সুন্দরী রচনা'। অবশ্য সুসাহিত্য মাত্রেই রচনাগুণে সুন্দর, রমণীয়ত্বই কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ইহা ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথা। কিন্তু সুসাহিত্য হইলেই belles-lettres আখ্যা দেওয়া হয় না, belles-lettres-র অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ ইহা যোগরূঢ় শব্দ। কাব্য, নাটক বা গল্প belles-lettres-র পরিধির মধ্যে পড়ে না। প্রবন্ধ, জীবন-চরিত, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, দিনলিপি, পত্রাবলী, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, সমালোচনা, এমন কি দার্শনিক আলোচনাও যদি রচনাগুণে রসোত্তীর্ণ হয়, তবে তাহাকে belles-lettres বা রম্য-রচনা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, রস-সৃষ্টি যে-জাতীয় রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যবহারিক রচনা বলিয়া মনে হয়, প্রয়োজনের তাগিদে বা সাংবাদিক উদ্দেশ্যে যাহার উদ্ভব, তাহাই রচনাগুণে রমণীয় হইয়া উঠিলে রম্য-রচনা বলিয়া পরিগণিত হয়। এ-জাতীয় রচনায় রচনা-শ্রীই একমাত্র গুণ, অন্য কিছু নহে। বস্তু বা বাচ্য বা ব্যঙ্গ্যার্থের উপর ইহার রমণীয়তা নির্ভর করে না। "বালভাষিতম্" অর্থগৌরবে বা অলঙ্কার-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ না হইলেও যেমন "অমৃতম্", রম্য-রচনাও তদ্রূপ। শিশুর নিজস্ব সুকুমার ব্যক্তিত্ব যেমন তাহার ভাষার রমণীয়ত্বের কারণ, রচয়িতার নিজস্ব সহৃদয়তা ও ব্যক্তিমাধুর্যই তদ্রূপ রম্য-রচনার সৌন্দর্যসাধক আকর্ষণ। শিশুর ভাষার রমণীয়ত্ব যেমন প্রকৃতিগত ও অযত্নপ্রসূত যথার্থ রম্য-রচনার রমণীয়ত্বও সেইরূপ নৈসর্গিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই জন্য রম্য-রচনার সৃষ্টি এত দুরূহ ও দুর্লভ। চেষ্টা ও চর্চা করিলে হয়ত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে কৃতিত্ব লাভ সম্ভব হইতে পারে, দস্যু রত্নাকরও মহাকবি হইতে পারে, কিন্তু রম্য-রচনায় সিদ্ধি "যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি", যে-প্রেরণা ও উপলব্ধি হইতে রম্য-রচনার সৃষ্টি, তাহা , অনন্যসাধারণ; কাব্য-প্রেরণাও তদপেক্ষা সুলভ। "অচিন পাখি"র মত ইহা "কমনে আসে যায়" তাহা বলা যায় না এবং আসিলেও তাহার "পায়ে মনোবেড়ি" দেওয়া বড়ই দুরূহ।

মানুষের ভাষা স্বভাবত রমণীয় হয় যখন মানুষ থাকে শিশু অর্থাৎ অপরিণত বয়স্ক; আর, সাহিত্যের ভাষা স্বভাব-রমণীয় হয় বা রম্য-রচনা সম্ভব হয়, যখন সাহিত্য হয় সুপরিণত। মানব-সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি কাব্য, ও চরম সৃষ্টি রম্য-রচনা।

(৩)

রম্য-রচনার স্বরূপ কী এবং কী কী তাহার উপাদান তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। বরং কী প্রকারের রচনা রম্য-রচনা নহে, তাহা বলা সহজ। একটা রূপকের সাহায্য লইলে বোধ হয় রম্য-রচনার স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

পুরাণে কথিত আছে যে, বিধাতার নিকট জনৈক দুর্দান্ত অসুর বর পাইয়াছিল যে, শুষ্ক বা আর্দ্র কোন অস্ত্রেরই সে বধ্য হইবে না। এই কারণে ইন্দ্র সমুদ্রফেনার মধ্যে তাঁহার বজ্রের শক্তি আরোপ করিয়া এই ফেনপুঞ্জ অসুরের গাত্রে নিক্ষেপ করেন এবং এই উপায়ে তাহার বধ সাধন করেন। সমুদ্রফেনা শুষ্ক বস্তু নহে, আর্দ্র বস্তুও নহে; বস্তু হিসাবে ইহা একান্ত লঘু, ইহার বস্তুত্ব কিছু নাই বলিলেই হয়। একটা শুভ্র সৌন্দর্য ইহার প্রধান আকর্ষণ, সময়ে সময়ে অবশ্য বহু বিচিত্র রঙের সমাবেশও ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। কিন্তু দেবরাজের হাতে পড়িলে এই ফেনাই বজ্রগর্ভ হইয়া উঠিতে পারে।

এই পৌরাণিক কাহিনীকে রম্য-রচনার রূপক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রম্য-রচনা যুক্তিমূলক নহে, আবেগমূলকও নহে; ইহার বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই হয়; আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বড়ই লঘু ও অসার বলিয়া মনে হয় এবং এই জন্যই কেহ কেহ মনে করেন

যে, রম্য-রচনা **কখনও মহৎ** সাহিত্য হইতে পারে না। একটা মৃদু হাস্য, একটা স্মিত প্রসন্ন ভাবই ইহার প্রধান আকর্ষণ। সময়ে সময়ে অবশ্য ইহাতে নানা ভাবের, নানা চিন্তার, নানা যুক্তি-তর্কের, নানা রসের আভাস ফুটিয়া উঠিতে প্যরে, কিন্তু তাহা আভাস মাত্র। তত্রাচ, নিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িলে রম্য-রচনা মহত্তম সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে। Lamb-এর ন্যায় অবাঙ্‌মনসোগোচর তাৎপর্যে গরীয়সী হইয়া উঠিতে পারে। Lamb-র ন্যায় লেখকের রম্য-রচনা সময়ে সময়ে যে উচ্চ গ্রামে পেঁছিয়াছে, কয়জন কবি বা ঔপন্যাসিক ততদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন?

ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শাস্ত্রকারেরা "নেতি নেতি" করিয়াই ব্রহ্মের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেক সময় ব্রহ্মের সম্পর্কে আপাত-বিরোধী লক্ষণাদিও নির্দেশ করিয়াছেন। রম্য-রচনার স্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে আমাদেরও এবম্বিধ ভাষা ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। রম্য-রচনা প্রবন্ধ নহে, গল্প নহে, গদ্যকবিতা নহে, ভাবোচ্ছ্বাস নহে, বক্তৃতা বা হিতোপদেশ নহে। অথচ প্রবন্ধ, গল্প, উচ্ছ্বাস, উপদেশ প্রভৃতি উপাদান হিসাবে ইহার মধ্যে থাকিতে পারে অথবা ইহার যে-কোন একটির রূপ ইহা পরিগ্রহ করিতে পারে। রম্য-রচনা এক হিসাবে লঘু, আর-এক হিসাবে গুরু। এক হিসাবে ইহা ক্ষণিক, আর-এক হিসাবে ইহা চিরন্তনী। ফল্গুধারার ন্যায় ইহা ক্ষীণতোয়া, অথচ অন্তঃসলিলা। অনেক সময় লঘু পরিহাস ইহার উপজীব্য বলিয়া মনে হইলেও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে যে, সেই পরিহাসের অন্তরালে রহিয়াছে সুগভীর অনুভূতি। আপাতত ইহাকে উচ্ছৃঙ্খল রচনা বলিয়া মনে হইলেও আসলে ইহার মধ্যে থাকে একটা সুদৃঢ় শৃঙ্খলা। ইহার কারিগরি নিতান্ত আনাড়ির কাজ মনে হইলেও বাস্তবিক ইহাতে থাকে চূড়ান্ত ওস্তাদি।

রম্য-রচনার আদর্শ হইতেছে বৈঠকী আলাপ, বিদগ্ধচিত্ত অভিজ্ঞ জনের সরস আলাপ। ইহার মধ্যে ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, অসাধারণ বা অলৌকিক কোন অনুভূতির অনুসরণ নাই, কোন সিদ্ধান্ত ভাঙিবার বা গড়িবার আগ্রহ নাই। সংসার-বিষবৃক্ষের শাখায় বসিয়া যিনি স্মিতমুখে বিষফল খাইতে খাইতে অপাঙ্গে একটু তাৎপর্যময় ইঙ্গিত প্রেরণ করিতে পারেন, তিনিই রম্য-রচনার অধিকারী। তাম্রকূটের ধূমের ন্যায় আলাপের ধূমে যিনি নিমগ্ন হইতে পারেন এবং এই ধূম-জালই যাঁহার কাছে হোমাগ্নিধূমের ন্যায় উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, তিনিই রম্য-রচনার অধিকারী। জীবনের সত্য ও জীবনের মিথ্যা যাঁহার কাছে এক হইয়া গিয়াছে এবং এই সত্য ও মিথ্যার তরঙ্গবহুল জীবনস্রোতে যিনি অবাধে আত্মসমর্পণ করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন, তিনিই রম্যরচনার অধিকারী।

(৪)

বাংলা সাহিত্য হইতে রম্য-রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করা সহজ নহে। বাংলায় উৎকৃষ্ট কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ এমন কি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটকও রচিত হইয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট পর্যায়ের বিশুদ্ধ রম্য-রচনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সন্দেহ হয় যে, বাঙালী চরিত্রের একটা দুর্বলতাই ইহার কারণ। যে-কারণে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট humour দুর্লভ, সেই কারণেই বাংলায় রম্য-রচনার বিশেষ উৎকর্ষ হয় নাই। আমরা ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কও করিতে পারি, ভাবের আবেগে গদ-গদ বা উন্মাদ হইতেও পারি, কিন্তু সহজভাবে গ্রহণ করিয়াই তাহার মধ্যে রমণীয়তার সন্ধান পাই না।

এই প্রসঙ্গে রম্য-রচনার কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ রাখা দরকার।

(ক) রম্য-রচনা কাব্য নহে। রম্য-রচনা গদ্যেই লেখা হয়, পদ্যে হয় না—এই রীতি একটা প্রথামাত্র নহে। কাব্যের আবেগ ও অনুভূতি রম্যরচনার প্রতিকূল। কাব্য হয়ত স্বর্লোকের বাণী, রম্য-রচনা ভূলোকের স্বগতোক্তি। কাব্যভূমির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে বিচরণ করে, রম্যরচনা একেবারেই ভূতল-চারিণী। রোম্যান্স সৃষ্টি রম্য-রচনার কাজ নহে। গদ্যকবিতা বা কাব্যধর্মী গদ্য-রচনাকে রম্য-রচনা বলা চলে না।

(খ) সরস প্রবন্ধ রম্য-রচনা নহে। প্রবন্ধ যুক্তিপ্রধান, উদ্দেশ্যমূলক রচনা। হাস্য-পরিহাস সহযোগে যুক্তির সমাবেশ করিলেই প্রবন্ধ রম্য-রচনা হইয়া দাঁড়ায় না। বার্নার্ড শ' এইজন্য কখনও রম্যরচনা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। "এ দেশে শিখতে পারি জীবনের মর্ম। হাতে আমি পাই যদি তোমার চাবুক"—এই জাতীয় মনোভাব রম্যরচনায় থাকে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু রম্য-রচনাকার হইতে পারেন না।

(গ) নাটক ও গল্প রম্য-রচনা নহে। নাটকাদির যাহা উপকরণ, তাহা রম্য-রচনাতেও থাকিতে পারে। কিন্তু নাটকীয় অনুভূতি ও মনোবৃত্তি রম্যরচনার পরিপন্থী। নাটকীয় সংলাপ, আর যাহাই হউক, বৈঠকী আলাপ নহে। বৈঠকখানা নাটক করিতে গেলে নাটকের মান থাকে না, বৈঠকখানারও জাতি থাকে না।

গল্পের সহিত রম্য-রচনার অনুভূতির কিছু কিছু মিল আছে। তবে রম্য-রচনা গল্প নয়, খোশ-গল্প। গল্পের আলোক হইল সূর্যালোকের প্রভা, আর রম্য-রচনার আলোক হইল মৃদু জ্যোৎস্নার আভা।

(ঘ) একটা স্মিত, প্রসন্ন ভাব রম্যরচনার অন্যতম উপাদান হইলেও চটুল রচনামাত্রেই রম্য-রচনা নহে। অনেক সময় চতুরনীতি, চপলরীতি রচনা দেখিলেই তাহা আমরা রম্য-রচনা বলিয়া ভুল করি। চটকদার রচনা আর সমঝদার রচনা এক বস্তু নহে। রচনা উদ্ভট হইলেই তাহা রম্য-রচনা হয় না। ন্যাকামি, পাকামি, ভাঁড়ামি কিংবা ভণ্ডামি কোনটাই রম্য-রচনার উপাদান নহে। কেবল উৎকেন্দ্রিক কল্পনা ও উন্মার্গ জল্পনা দিয়াই রম্যরচনার সৃষ্টি করা যায় না।

(৫)

রম্য-রচনার অনুশীলন বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার লক্ষণাদি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে এখনও এ-দেশে কোন স্থির মত গঠিত হয় নাই। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা যদি লেখক ও পাঠকের মনে না থাকে, তবে এই উপাদেয় রচনাপদ্ধতির উপযুক্ত বিকাশ সম্ভব হইবে না। রম্যরচনার শিল্প অতি সূক্ষ্ম ও দুরূহ, অতি সুনিপুণ ও সহৃদয় শিল্পী ভিন্ন কেহ এই জাতীয় রচনায় কৃতকার্য হইতে পারেন না। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীসরলাবালা সরকার

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তরণীর কর্ণধার হইবার ভার গ্রহণ না করিতেন, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হইত।
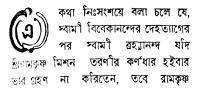
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই প্রতিষ্ঠানকে সংগঠন করিয়াছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। একটি শিশুতরুকে দিনে দিনে জলনিষেক ও পরিচর্যা করিয়া বাড়াইয়া তুলিবার মতই স্বামী ব্রহ্মানন্দ শিশু রামকৃষ্ণ মিশনকে দিনে দিনে পল্লবিত,—বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত দৃঢ়মূল এক মহান্ মহীরুহে রূপে বর্ধিত করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত তাঁহার সঙ্ঘ-পরিচালনী ক্ষমতা। একাধারে অপূর্ব ভালবাসা এবং অপরদিকে সঙ্ঘবাসিগণ যাহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনপথে লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতে পারেন, সে দিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি। মানুষের জীবনে পদে পদে কত ভুল কত ভ্রান্তি, আবার ভুল করিয়াই মানুষ ভ্রম সংশোধনের শক্তি লাভ করে, এই মহান্ সঙ্ঘ-পরিচালক সকল সময়েই তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং সেজন্যই তাঁহার পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের এমনভাবে সকল দিক দিয়া সার্থক হইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "রাজার একটা রাজ্য পরিচালন করিবার মত শক্তি আছে।" আবার শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবচক্ষে তাঁহাকে নৃত্যপর বালগোপালরূপে দেখিয়াছিলেন। এই দুই দিক দিয়াই তাঁহার জীবনের অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল। একদিক দিয়া তিনি প্রস্ফুটিত পদ্মদলে নৃত্যপর বালগোপালের মত নিজেও আনন্দময় এবং সকলেরই আনন্দদাতা। যেখানে যখন তিনি থাকিতেন, সেই স্থানটিই আনন্দ-প্রবাহে পরিপূর্ণ হইত, এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত সেই আনন্দের সংস্পর্শ লাভ করিত, এবং তাঁহার অভাবে মুহূর্তে সবই যেন ম্লান হইয়া যাইত।

আবার অপরদিকে গুরুতর সমস্যাও তিনি এমন সহজে সমাধান করিয়া দিতেন এবং এমনভাবে সকল বিরুদ্ধতার মধ্যেও অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন যে, কোন রাজ্যপরিচালক সম্রাটের পক্ষেও তাহা আদর্শ স্থানীয় ও শিক্ষণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনি 'মানসপুত্র' ছিলেন, একথা অবশ্য সকলেই জানেন। ঠাকুরের জীবনে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহা আগে হইতেই তাঁহার 'মা' অর্থাৎ জননী জগদম্বা ছবির মত তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিতেন।

স্বামী সারদানন্দ তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দক্ষিণেশ্বর কালী বাটীর উত্তরপার্শ্বে ইংরাজ রাজের বারুদ গুদাম আছে। কতকগুলি সিপাহী সেখানে নিয়ত পাহারা দিবার জন্য থাকে। ইহারা সকলে ঠাকুরকে নিরতিশয় ভক্তি করিত এবং কখন কখন তাঁহাকে তাহাদিগের বাসায় লইয়া যাইয়া ধর্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিয়াছেন, একদিন তাহারা প্রশ্ন করিল, 'সংসারে মানব কি ভাবে থাকিলে ধর্মলাভ করিবে?' অমনি দেখিতেছি একটি ঢেঁকির ছবি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। ঢেঁকিতে শস্য কোটা হইতেছে এবং যেন একজন সন্তর্পণে উহার গড়ে শস্যগুলি ঠেলিয়া দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম মা বুঝাইয়া দিতেছেন, ঐরূপ সতর্কভাবে সংসার করিতে হইবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের
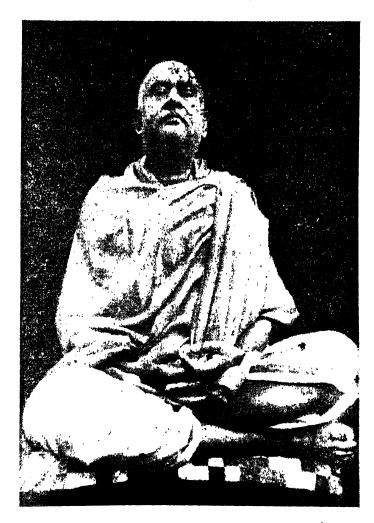
পূর্বেও ঠাকুর একটি ছবি দেখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে সে বিষয়ে যেরূপ লেখা হইয়াছে তাহা হইতেই এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"ঠাকুর বলিতেন, রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার ছেলে!' শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'সে কি? আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, 'সাধারণ সংসারী-ভাবের ছেলে নয়—তোমার ত্যাগী মানসপুত্র'।"

এই দৃশ্য দেখিবার অল্পদিন পরেই বালক রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসেন। যদিও তিনি তখন নিতান্ত বালক নহেন, তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ এবং তাঁহার অল্পদিন আগে বিবাহও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসিয়া তিনি যেন একেবারে শিশু হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন "ঠাকুর এক সময় আমাদের বলিয়াছিলেন, 'তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন চার বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মায়ের মত দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া কোলে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ী তো দূরের কথা, এখান হইতে কোথায়ও এক পা নড়িতে চাহিত না। তাহার বাপ পাছে এখানে আসিতে না দেয়, সেজন্য কত বলিয়া, বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম।"

ঠাকুরও সম্পূর্ণ মাতৃভাবে বিভাবিত হইয়া শিশুর মতই তাঁহাকে লালন করিতেন, আবার কখন কখনও শাসনও করিতেন।

রাখাল তখন একেবারে রামকৃষ্ণগত প্রাণ, এক নিমেষের জন্য দূরে থাকিতে পারেন না। পিতা বাড়ি লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিলেন, রাখাল পলাইয়া আসিলেন। আবার বাবা দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন, দূরে হইতে দেখিয়া ভয়ে কোথায় যে লুকাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন, ঠাকুর সে সময় আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি তোর? বাপ মা প্রত্যক্ষ দেবতা। বাপ এলে তাঁকে ভক্তি করে প্রণাম করবি, মায়ের ইচ্ছায় কি না হতে পারে?"

রাখালের তখন শিশুর যেমন হিংসা হয় সেই রকম ঠাকুরের অন্যের প্রতি টান দেখিলে তাঁহার উপর হিংসাও হইত, আবার মাঝে মাঝে দারুণ অভিমানও হইত। একবার অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং আর একবার যাইতে গিয়াও যাইতে পারেন নাই।

কিন্তু ধর্মের জন্য ব্যাকুলতাই ছিল সকলের মূলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সন্তানই ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ নির্দেশ পাইবেন, সেই আশায় ক্রমশ সকলে ঠাকুরের চরণতলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং এই ধর্মলাভের ব্যাকুলতাতেই তখনকার দিনে তরুণেরা ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিতেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালের আগে হইতেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বলিতে গেলে রাখাল সকল বিষয়েই নরেন্দ্রনাথের অনুবর্তী হইতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্র-নাথ যোগ দিলে রাখালও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

তখনকার দিনের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে একটি অপূর্ব ছবি আছে। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী ছিলেন, এবং ঠাকুর তাঁহার এই সব বালক সঙ্গীদের সঙ্গে অনেক সময় বয়স্যের মত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, ছেলেদের যাহাতে সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি পায় তাহা দেখা। ধর্মানুরাগী মাত্রকেই তিনি আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেন, এবং নিরভিমান ঠাকুর অনেক সময় আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মোপাসনার স্থানে উপস্থিত হইতেন। তখনকার ব্রাহ্মসমাজ যে তাঁহার অধ্যাত্ম প্রভাবে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডে "মণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসব" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদে কিভাবে স্বামী সারদানন্দের (শরৎ মহারাজের) সহিত ঠাকুরের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল তাহারই একটি বর্ণনা আছে। তাহা হইতে এখানে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কতকটা বুঝা যাইবে। "সন ১২৯১ সাল, ২১শে অগ্রহায়ণ, সোমবার ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে —২৬শে নবেম্বর।......তখন আমরা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করি,—ইহার পূর্বে দুই তিনবার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছি। ......সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল বলিয়া নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাই। সেইদিন নৌকায় বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত প্রথম পরিচয় হয়, তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন।"

ঠাকুরের ঘরে গিয়া তাঁহারা জানিলেন, ঠাকুর এখনই কলিকাতায় কোন একটি বাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে যোগ দিবার জন্য যাইবেন। শুনিয়া তাঁহারাও তথায় যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং সে বাড়ির ঠিকানা চাহিলেন। সেই সময় এক ছেলে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "ওরে, এদের ম[illegible] মল্লিকের বাড়ির নম্বরটা বলে দে তো" সেই ছেলেটিই বাবুরাম মহারাজ ও সন্ন্যা[illegible] জীবনে স্বামী প্রেমানন্দ।

এই ভাবে গুরুভ্রাতাদের ক্রমশ পরস্পরে[illegible] সহিত পরিচয় হয়।

মণিমোহন মল্লিকের বাড়ি, ৮১[illegible] চিৎপুর রোড, সিঁদুরিয়া পটি। সেখা[illegible] তাঁহারা পেঁছিয়া যাহা দেখিলেন তাহ[illegible] বর্ণনা "লীলাপ্রসঙ্গে" এইভাবে দেও[illegible] হইয়াছে—"বাটীর সম্মুখের রাস্ত[illegible] পেঁছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গে[illegible] রোল শোনা গেল। তখন কীর্তন আরম্[illegible] হইয়াছে বুঝিয়া আমরা দ্রুতপ[illegible] বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলা[illegible] তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরে [illegible] বাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে।.... সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে ভক্তিপূ[illegible] স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে পার্শ্বে কে আছে না আছে তাহা সংজ্ঞামাত্র নাই।.........

"ঘরের ভিতর অপূর্ব দৃশ্য! [illegible] আনন্দের বিশাল তরঙ্গ তথায় খরস্রো[illegible] প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে স[illegible] হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃ[illegible] করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচর[illegible] করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলে[illegible] মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন[illegible] দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রস[illegible] হইতেছেন, আবার কখনো বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য! তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্র-সাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই। ......নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখনো ধীরভাবে এবং কখনো বা দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ বিচ্ছুরিত করে ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক সেইরূপ। ......বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া

এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে উৎসারিত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বর দর্শনে, মৃদু বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্য লাভে, অলস অনুভূতিহীন মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য ও প্রেরণা প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেইক্ষণের জন্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ......সুকণ্ঠ আচার্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা-সহায়ে 'নাচ্‌রে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে'—সংগীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মসমাজে সে সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যেন এক প্রবল ভাবের বন্যা আনিয়াছিলেন। সেই ভাবের অনুভূতি তিনি ঠাকুরের সংসর্গে আসিয়া যে বিশেষভাবেই লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ঠাকুরও কীর্তনের শেষে প্রথমে মা জগদম্বা ও পরে যখন সকল সম্প্রদায়ের ভক্তমণ্ডলীকে প্রণাম নিবেদন করিতেন, তখন "আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম" বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানাইতেন।

নরেন্দ্রনাথও রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কয়েক মাস পরেই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ইহার পূর্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের সহিত রাখালের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'রাখাল বিবাহের পর হইতেই পড়াশুনা করিবার জন্য সিমলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে আমাদের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। রাখাল আমাদের বাড়ীতেই সর্বদা চলা বসা করিত। মনোমোহন দাদার বাড়ীতে রাত্রে শয়ন করা ছাড়িয়া ক্রমশঃ আমাদের বাড়ীতেই শয়ন করিতে লাগিল। সে যেন আমাদের বাড়ীর ছেলেই হইয়া গেল।"

সে সময় হোগলকুঁড়ের অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ের কুস্তি করিবার একটি আখড়া ছিল। সেখানে এবং কাঁশারিপাড়ার যোগেন পালের কুস্তির আখড়ায় রাখাল ও নরেন্দ্রনাথ কুস্তি করিতে যাইতেন।' আবার নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল জিমন্যাসিয়াম নামক জিমন্যাস্টিকের আখড়াতেও যাইতেন। এখন সেই জায়গায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। একদিন রাত্রে রাখাল ও নরেন্দ্রনাথ পাশাপাশি শুইয়া ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পিকক মার্চ বা ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণের কথা উঠিল। সেই রাত্রেই দুইজনে সম্মুখের দালানে গিয়া কে কতটা ঊর্ধ্বপদে বেড়াইতে পারেন, তাহার জন্য এক টাকা বাজি রাখিয়া মালকোচা মারিয়া তাঁহাদের ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ আরম্ভ হইল। ইহাতে যাহারা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছিলেন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহারা বকাবাক করিতে লাগিলেন।

ইহার পরই রাখালের একটা পরিবর্তন আসিল। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ি যখন শ্রীশ্রীঠাকুর আসিতেন, সেই সময় রাখাল আর সকলের সঙ্গে সেখানে একবার গিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার এমন মনের ভাব হইয়াছিল যে, সে ভাবকে একটা প্রবল আকর্ষণই বলা চলে। রাখালের দক্ষিণেশ্বর যাইবার ইহাই আগেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

রাখালের সঙ্গে ঠাকুরের যে অপূর্ব সম্বন্ধ তাহার পরিচয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনচরিত লেখকগণ বিস্তারিতভাবেই লিখিয়াছেন। রাখাল যেন শিশুসন্তান ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার গর্ভধারিণী জননী। কোন বিষয়েই ঠাকুরের নিকট তাঁহার সংকোচ ছিল না, এমন কি স্ত্রীর সম্বন্ধেও তিনি অক্লেশে বলিয়াছিলেন "আমার পরিবারের কি হবে?" —এই যে প্রশ্ন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, বালিকা পত্নীর উপর তাঁহার কতখানি ভালবাসা ছিল। শুধু স্ত্রীর উপরে নয়, ছেলের উপরেও তাঁহার যে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার পরবর্তী জীবনেও বুঝিতে পারা যায়।

স্ত্রী ও ছেলে? ঠাকুর বলিয়াছেন, "রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে, জানি, আর ও আসক্ত হবে না।" কিন্তু তিনিই রাখালকে বাড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, কিছুদিন সেখানে থাকিবার জন্য। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে রাখালের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সে যে আমার উপর সবই নির্ভর করেছিল। আমিই তাকে পাঠিয়ে দিতাম তার পরিবারের কাছে,—একটু ভোগ বাকী ছিল।"

রাখালের স্ত্রীর নাম বিশ্বেশ্বরী। চৌদ্দ বৎসর বয়সের অতি সরলা বালিকা, আবার স্বামীগতপ্রাণা। যে কয়টি দিন স্বামীর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, সেই কয়দিনই হইয়াছিল তাহার জীবনের পরম সম্বল। রাখাল যখন কিছুদিনের জন্য বাড়িতে ছিলেন, তখন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে।" আরও বলিয়াছিলেন, "একটি ছেলে বুঝি তার হবে।"

সেই সময়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত। ইহার পর আর রাখালের বাড়ি ফিরিবার প্রশ্নই উঠে না। তবুও একবার ঠাকুরের দেহান্তের পর কথা উঠিয়াছিল, "এই সব ছেলে এখন নিজের নিজের বাড়ি ফিরিয়া যাক।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

নরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ অনেকটা সহজ হইয়াছিল। তিনি মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার মন সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ছিল। কিন্তু রাখাল ঠিক সে রকম ছিলেন না, তাঁহার মন ছিল স্বভাবত প্রেমপ্রবণ। তিনি সকলের বেদনাই মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন এবং সকলের জনাই তাঁহার আন্তরিক সমবেদনা হইত। তিনি পূজায় পশুবলি দেওয়া অনুমোদন করিতে পারিতেন না এবং সম্ভবত তাঁহারই এই মনের ভাবের প্রভাবে মঠে পাঁঠা বলি দেওয়া উঠিয়া গিয়াছিল। অবশ্য শ্রীশ্রীমার পশু বলি অনভিমত বলিয়াই বলি বন্ধ করা হয়। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের পশুবলি একান্ত অনভিপ্রেত ছিল। তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারিতে প্রজাদের উপর যদি অযথা উৎপীড়ন করা হইত বালককালেও তাহা তাঁহার মনে আঘাত করিত। তাঁহার জ্যাঠা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে অর্থাৎ তাঁহার ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে তাঁহার জ্যাঠামহাশয় যখন গয়লাদের দই ও ক্ষীর সরবরাহ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন, তখন রাখাল তাঁহার জ্যাঠামহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "জ্যাঠামহাশয়, এ আপনার মা'র শ্রাদ্ধ হচ্ছে না গয়লাদের মার শ্রাদ্ধ হচ্ছে? বিনা দামে এত দই ক্ষীর দিতে গেলে বেচারীরা ফতুর হয়ে যাবে!" এক পাগলিনী ঠাকুরকে তাঁহার অসুখের সময় একবারটি দেখিবার জন্য কাশীপুরের বাগানে বারবার আসিত, এবং ঠাকুরের তরুণ ভক্তেরা তাঁহাকে বারবার তাড়াইয়া দিতেন। তখন রাখালের তাহার জন্যও মনে করুণা হইয়াছিল। এমন কি, অন্যায়কারীর উপরও তাঁহার অশেষ করুণা ছিল। তিনি বলিতেন, "অন্যায় কে না করে? আমরাই কি কম অন্যায় করি? ওঁ'র (ঠাকুরের) উপর কম উৎপাত করেছি? অহেতুক কৃপাসিন্ধু কি সবই সহ্য করে নেন নি? তা যদি না হত, তবে আমরা আজ কোথায় দাঁড়াতাম?"

কাশীপুরের বাগানেই রাখালের ছেলে হইবার সংবাদ আসিল। রাখালের শ্যালক মনোমোহন সেই সংবাদ আনিয়াছিলেন। ঠাকুর রাখালের ছেলে হইবার সংবাদ শুনিলেন। ইহার পর তিনি একদিন গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল ওরা আর সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ; পাঁকের ভেতর বাস করলেও তার গায়ে পাঁকের দাগটি পড়ে না।"

আমরা যদি নরেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও রাখালের ত্যাগের তুলনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি কি অতুলনীয় ত্যাগশক্তিই

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ছিল। আর সেই ত্যাগ-শক্তির উৎস ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর একান্ত ভালবাসা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ছিল না। বুদ্ধদেব পত্নী গোপা ও সদ্যোজাত পুত্র রাহুলকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন আর রাহুল তখন নিতান্ত শিশু, পিতার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও গৃহে ফিরিয়াছিলেন। ছেলের অন্নপ্রাশনও তিনি দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ছেলের উপর পুত্রস্নেহ বিশেষভাবেই হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাখাল স্বভাবতই স্নেহশীল এবং সেই স্নেহের বন্ধন ছেদন করা কতখানি কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাখালের বরানগর মঠের জীবন যে কি কঠোর তপস্যা, তাহার পরিমাণ করা যায় না। ঠাকুরের অন্তর্ধান হইয়াছে। তাঁহার যে প্রত্যক্ষ প্রেরণা তাঁহার তরুণ ভক্তগণের চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ভাবে ভগবৎপ্রেরণার ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিত তাহা হই এখন তাঁহার ভক্তবৃন্দ বঞ্চিত হইয়াছে কিন্তু আবার সংসারে ফিরিয়া যাওয়া তাহা সকলের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব বরানগরের এক ভাঙা বাড়ি, সেখানে ত্যাগ ছেলেরা একটু মাথা গুঁজিবার স্থা পাইয়াছে, কিন্তু আহারের কোন সম্বল নাই। রাখাল,—জমিদারের বড় ছেলে,—অ আদরে লালিত, কোনদিন কোন কষ্ট সহ করা,—এমনকি ক্ষুধা সহ্য করাও তাহা অভ্যাস নাই। দক্ষিণেশ্বরেও সে ছিল ঠাকুরে

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

আদরের দুলাল। ক্ষুধা হইলেই নিঃসংকোচে সে ঠাকুরকে বলিত, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" আর ঘরে কিছু না থাকিলে তাহাকে কি খাইতে দিবেন, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া ঠাকুর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। সেই রাখাল বরানগরের ভাঙা বাড়ির বাহিরের ছোট ঘরটিতে একটা মোটা-বুনুনী মাদুরের উপর পড়িয়া রহিল। কখনও বা স্থির নিশ্চল, আবার অনবরত ঠোঁট নড়িতেছে, জপ করিয়া চলিয়াছে, দুই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আবার যেন একেবারে ধ্যানমগ্ন। স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "অজাতশত্রু স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান" গ্রন্থে এই চিত্রটি আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন।

আর বেচারী বিশ্বেশ্বরী! "বিশ্বেশ্বরী রাখাল চলিয়া যাইবার পর হইতেই ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। স্নান করিতে হয় সেজন্য স্নান করিত, মাথার চুল রুক্ষ, তাহাতে তেল নাই। খাইতে হয় খাইতে বসিত, মেঝেতে শুইয়া থাকিত এবং অনবরত জপ করিত, মাঝে মাঝে ছেলেটির দিকে চাহিয়া থাকিত। যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াই প্রাণধারণ করিতেছিল।"

বরানগরে বিশ্বেশ্বরী অনবরত রাখালকে যেসব পত্র লিখিত, সে পত্রে হয়তো একটিবারের জন্য দেখা দিবার আকুল প্রার্থনাই থাকিত। কিন্তু রাখাল সে পত্র পড়িত না, মাদুরের নীচে গুঁজিয়া রাখিত। রাখালের পিতাও কখন কখনও বরানগর মঠে আসিতেন। কিন্তু রাখাল আর বাড়িতে ফিরিল না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দরূপে নূতন জন্মগ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে মনোমোহনকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের রাখাল মরে গেছে, আমাদের রাখাল বেঁচে আছে।"

বরাহনগরের মঠ তপোবনে পরিণত হইল। সেখানে তপস্যা ও সৎ আলোচনা, কীর্তন, জপ ও ধ্যান ইহাই তখন ছিল নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। আহার ও নিদ্রা যেন নিতান্ত অবান্তর ব্যাপার। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছাড়া অন্য সকলেই মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও নানা তীর্থ পর্যটন ও কঠোর তপস্যা করেন। তিনি কখনও পুরীধামে আবার কখনও বা বৃন্দাবনে, আবার কখনও অযোধ্যা, হরিদ্বার ও হৃষীকেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। পরিব্রাজক বা রমতাসাধুর ভাবে নিঃসম্বলে তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন।

এই সমস্ত তীর্থ তখন অত্যন্ত দুর্গম ছিল। হৃষীকেশ ও হরিদ্বার জঙ্গলে পূর্ণ এবং বুনো হাতি প্রভৃতি জন্তুর বাসভূমি ছিল। লছমন ঝোলায় তখন দড়ির পুল দিয়া নদী পার হইতে হইত। গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

এই ১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিখ্যাত বক্তৃতা দান করেন। সেখান হইতে স্বামীজীর যেসব পত্র এবং খবরের কাগজের কাটিং আসিত তাহা ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নামেই আসিত। সেইসব চিঠির মধ্যে বাংলা চিঠিগুলিতে 'নরেন' বলিয়া স্বাক্ষর থাকিত এবং স্বামীজীর সেই রহস্যপূর্ণ 'দণ্ডবৎ, লগুড়বৎ' কথাগুলিও থাকিত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভ্রাতার ভিতর যে কি অপূর্ব প্রেম-সম্বন্ধ ছিল, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী বিবেকানন্দ 'স্বামীজী' ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইতেন। যদিও স্বামীজী সকল সাধুরই উপাধি, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামীজী' বলিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকেই বুঝাইত এবং 'মহারাজ' বলিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই বুঝাইত।

স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে 'রাজা' বলিতেন। তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"And the other two Swamis, they were my 'gurubhies' who went to you last year at Junagad, one of them is our leader."

অর্থাৎ যে অপর দুইজন স্বামীজী গতবার জুনাগড়ে আপনার কাছে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার গুরুভাই এবং তাহার মধ্যে একজন আমাদের নেতা।" এই দুইজন ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজী সকল সময়ই এইভাবের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—রাজাই আমাদের রাজা।" এক পাশ্চাত্ত্য দেশীয় ভদ্রলোক বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"There is a dynamo working, and we are all under him."

এই কথাগুলি তাঁহার একেবারে মনের কথা ছিল। তিনি জানিতেন, 'রাজার' মত একান্ত সাধকই প্রকৃত কর্মী হইতে পারেন। কেননা, তিনি কর্মকে 'কর্ম' বলিয়া নহে, ভগবৎসেবা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "'রাজা'র Spirituality আঁকড়ে পাওয়া যায় না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "রাজার মহিমা কে বুঝবে? ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করেছেন, কাঁধে তুলেছেন, আদর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন।" তিনি একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বেলুড়ের মঠে নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যথারীতি যোড়শোপচারে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং ভোজনের সময় জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "রাজা, তোর আদর তিনিই জানতেন—আমরা কি জানি যে তোর আদর করবো?"

এখানে স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে লিখিত একখানি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার এই স্বহস্তলিখিত পত্রখানি সৌভাগ্যবশত পাওয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থলে হাতের লেখা অস্পষ্ট বলিয়া পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ পরিশ্রমও হইয়াছে। যাহাই হউক পত্রের কিছু অংশ এখানে দেওয়া হইল।

GOPAL LAL VILLA
Beneras Canton
12. Feb. 1902

My dear Margo—

Overjoyed to receive your letter. More so that you came with unimpaired will and recuperated health.

In a previous letter I have written you what little I had to suggest. I have no other instructions * * * * *

I recommend you none, not one—except Brahamananda. That old man's judgement never failed—mine always do. If you have to ask any advice or to get any body to do your business—Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else: With this my conscience is clear—do just as "mother" directs. I would help you if I could—but I am only a bundle of rags and with only one eye at that—but you have all my blessings—all and more if I had.

............Ever your loving father
Vivekananda.

আমেরিকা হইতে ফিরিবার পরই স্বামীজীর শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি কাশ্মীরে গিয়া অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করেন। তাহার পর যখন মঠে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, মঠে ফিরিয়াই তাঁহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তখন মঠ ও মিশনের সম্মুখে এত কাজের স্তূপ ও এত

সমস্যা যে, যে কোন কর্মীর তাহা ভাবিতেই ভয় হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার হাতেলেখা পাঁচখানি ডায়েরি আছে। সেই ডায়েরিতে তারিখ দিয়া দিয়া প্রত্যেক দিনের সমস্ত কার্যবিবরণ এবং বিভিন্ন হিসাবের আয় ও ব্যয়ের হিসাব লেখা আছে।

স্বামীজী শয্যাগত থাকিয়াও মঠ সম্বন্ধে ভাবনা ছাড়িতে পারেন নাই। ইহার আগেও তিনি একখানি চিঠিতে মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "আমার কেবল ভয় হয়, এখন তো একরকম খাড়া করা গেল। এরপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে আর কাজের প্রসার হয় তাই দিনরাত আমার চিন্তা।" তিনি মহারাজকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের ভারতবর্ষের একটি মহৎ দোষ এই যে, আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারি না। তাহার একটি কারণ এই যে, আমরা সংঘ পরিচালনে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে ক্ষমতার অংশ ভাগ করিয়া লইতে চাই না এবং আর একটি কারণ এই যে, আমাদের মৃত্যুর পর কি হইবে সে সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করি না।" স্বামীজী তাঁহাকে একথাও লিখিয়াছিলেন, "এমন মেশিনটি খাড়া কর যা আপনার গতিতে আপনি চলে যায়—যে মরে বা যে বাঁচে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। স্বামী নির্জ্ঞানানন্দের সহায়তায় মঠবাড়ি নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া মঠে প্রথম দুর্গোৎসব, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব, ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমাকে আনয়ন এবং সেই দিনই বাগবাজারে নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—এ সমস্ত ভারই স্বামী ব্রহ্মানন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুশৃঙ্খলার সহিত তাহা সম্পাদিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর স্বামীজীর দেহান্তের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, শৃঙ্খলা ও প্রসারের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল একাদিক্রমে মঠ ও মিশন অতি তৎপরতার সঙ্গে পরিচালনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দৃঢ়মূল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

অমানী এবং মানদ এই আনন্দময় মহাপুরুষের যাঁহারা সংসর্গে আসিয়াছেন, তাঁহারাই যেন এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ও সেবকগণ তাঁহার সঙ্গে যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ যেন এক আনন্দলোকে বাস করিতেছেন এইরূপই তাঁহাদের মনে হইত। তাঁহার শরীরের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্য বলিয়াছেন, "যখন আমরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতাম, তখন তাঁহার গায়ের বর্ণ চোখে পড়িত না,—চোখে পড়িত তাঁহার মাধুর্যঘন মূর্তি, দেখিতে পাইতাম তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতেও অপূর্ব আনন্দ, যে আনন্দ দৃষ্টির সঙ্গে নীরবে বর্ষিত হইতেছে। তখন মনে হইত,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ কী ওর,
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

কীর্তনের এই দুটি ছত্র।"

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার যে প্রেমসম্বন্ধ ছিল, তাহা অন্যের পক্ষে ঠিকভাবে ধারণা করা সম্ভব না হইলেও এটুকু বুঝিতে পারি, শিশুর যেমন মায়ের উপরে অসীম নির্ভর, সকল রাগ ও আবদার, স্বামীজী যখন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহারও ব্যবহারে সেই ভাবই প্রকাশ পাইত। অযথা তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার রাজাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কাঁদাইয়া দিতেন, আবার পর মুহূর্তেই ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইতেন। বারবার বলিতেন, "রাজা, তুই ছাড়া আর কে আমাকে সহ্য করবে? সবাই যদি আমাকে ত্যাগ করে, তা হ'লেও তুই কখনো আমাকে ত্যাগ করবিনে এ আমি জানি।"

ত্যাগ? ত্যাগ তো দূরের কথা, মহারাজ যে বিবেকানন্দগতপ্রাণ! দিবারাত্র তাঁহার ভাবনা কিসে রুগ্ন স্বামীজী একটু সুস্থ থাকিবেন। স্বামীজী একথা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি যখন শয্যাগত, তখনও তিনি উঠিয়া চলিয়া বেড়াইতে চাহিতেন, যাহাতে 'রাজার' মন প্রসন্ন হয়। গিরিশবাবু স্বামীজীর বিশেষ অসুস্থতার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন যে, স্বামীজী দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "একি? তোমার শুনলুম খুব অসুখ, আর তুমি উঠে নীচে নেমে এসেছ?"

স্বামীজী দুর্বল কণ্ঠে বলিলেন, "কি করি বল? শুয়ে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দেখি যে রাজা প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে, তাই আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। আমাকে উঠতে দেখলে যদি রাজার মুখে হাসি ফোটে।"

স্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জননীর উপর তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না। আমেরিকা হইতেই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যেমন অন্য সকল বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, সেইরকম বাড়িতে মায়ের কি কি প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে খোঁজ লইবার জন্যও তাঁহাকেই লিখিতেন

একদিন তাঁহার বাড়ির এক পুরানো ঝি স্বামীজীকে দেখিতে আসিয়াছিল। তখন স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। কেননা স্বামীজী তখন অত্যন্ত পীড়িত, প্রায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না। —মহারাজ সদাসর্বদা তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

ঝি-টি অনেকদিনের লোক, সে স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী দুইজনকেই ছেলেবেলায় নাম ধরিয়া ডাকিত। ঝি আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোথায়?" তখন মহারাজ উঁকি দিয়া দেখিলেন স্বামীজী ঘুমাইতেছেন। তিনি তাঁহাকে জাগাইলেন না। ঝিকে বলিলেন, "সে এখন ঘুমোচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া এবং সারারাত্রি অনিদ্রার পর একটুখানি নরেন ঘুমাইয়াছে জানিয়া ঝি চলিয়া গেল।

স্বামীজী যখন ঘুম হইতে উঠিয়া শুনিলেন ঝি আসিয়াছিল, তবু তাঁহাকে জাগানো হয় নাই, তখন তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন। রাগের মাথায় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া মহারাজকে গালি দিলেন এবং তাহার পর তখনই একখানি গাড়ি ডাকাইয়া সেই অসুস্থ শরীরেই সিমলায় নিজেদের বাড়ি চলিয়া গেলেন। স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জননী নিশ্চয়ই কোন বিশেষ দরকারে তাঁহার কাছে ঝিকে পাঠাইয়াছিলেন। তাই তিনি ব্যস্ত-ভাবে মায়ের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি ঝিকে আমার কাছে কেন পাঠিয়েছিলে?" মা আশ্চর্য হইয়া উত্তর দিলেন, "কই, আমি তো ঝিকে তোর কাছে পাঠাইনি।" তখন স্বামীজী ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটু আগে বলরামবাবুর বাড়িতে তুই আমার কাছে গিয়েছিলি। কেন গিয়েছিলি বল্ তো।" ঝি বলিল, "আমি ওদিকে গিয়েছিলাম, তাই ভাবলাম, নরেন তো বাগবাজারেই আছে, একবারটি দেখে যাই। তা তুমি ঘুমোচ্ছ শুনে আর না জাগিয়েই চলে এলাম।" এই কথা শুনিয়া স্বামীজীর মনে যে কি কষ্ট হইল বলা যায় না। "বেচারী রাজা, তাকে মিছিমিছি কিরকম কর্কশভাবে তিরস্কার করেছি, মা, তুমি এখনি তাকে আনতে একটা গাড়ি পাঠাও।" স্বামীজী এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, ফিরিয়া যাইবেন তখন সে ক্ষমতা নাই। জননী তাঁহার কথায় রাখালকে গাড়ি করিয়া তখনই একবার সেখানে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তার স্বামীজী তাঁহার আসিবার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "রাজা,

তুই বলেই আমার এত সহ্য করিস্। আর কেউ কি পারতো?" রাজামহারাজও স্বামীজী অসুস্থ শরীরে উত্তেজিতভাবে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ছিলেন। এখন তিনি প্রাণাধিক স্বামীজীকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, স্বার্থশূন্য সাংসারিকতার সম্পর্করহিত এক অপার্থিব ভালবাসা যেন তাঁহাতে মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তিনি যখন যেখানে যাইতেন সেই স্থানই আনন্দময় হইয়া উঠিত। এমন কি তাঁহার আগমন সংবাদেই "মহারাজ আসিতেছেন, মহারাজ আসিতে-ছেন" এই আনন্দে সূর্যোদয়ে পদ্মের দলে দলে বিকশিত হওয়ার মত মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের চিত্ত যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। তাঁহার পালিত নাগরী গাভীটি পর্যন্ত আনন্দে হাম্বা রব করিয়া তাঁহার গা ...টিত। আবার তিনি চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই যেন ম্লান হইয়া যাইত।

অদোষদর্শী এই মহাপুরুষ সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিতেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ...ল অসামান্য। যাহার পদস্খলন ঘটিয়াছে, ...নি জানিতেন কিভাবে সে আবার নিজের ...রিত্র সংশোধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাহাকে তিনি সেই পথে চলিবার ...যোগ ও প্রেরণা দিতেন। কোন আশ্রিত অপরাধীকে তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। ...নি ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠার পর বলিয়া-...লেন, "মিশনে যে কোনখানেই ঠাঁই পাবে ...সে যাতে আশ্রয়ের স্থান পায়, সেইজন্যই ...মার এই মঠের প্রতিষ্ঠা করা।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলি তিনি ঠিক ...রের ভাষাতেই গ্রথিত করিয়া প্রকাশ ...রিয়াছেন। তাঁহার উপদেশগুলিও ঠিক ...রের উপদেশের মতই সরল এবং মর্ম-স্পর্শী। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ...র্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামক পুস্তকে ...ই উপদেশের কিছু কিছু প্রকাশিত ...হইয়াছে। সেই উপদেশ হইতে এখানে ...মান্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মনকে দুই উপায়ে স্থির করতে হয়। ...থম কোন নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করা, ...তীয় ভাল ভাল বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। ...কে ভাল করে খাওয়ালে তবে সে ভাল ...বে দুধ দেয়, মনকেও সৎ চিন্তার খাদ্য ...তে হয়।

"মনকে আসক্তিমুক্ত না করতে পারলে ...তে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না।

"স্ট্রাগল স্ট্রাগল, যার স্ট্রাগল্ করবার ...ক্তি নেই সে তো মৃত। আগে স্ট্রাগল্ ...রপর শান্তি।

"অল্প বয়সই সাধনের সময়। তখন মন সরস থাকে, বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না। গুরুকৃপা কি আলসেমীতে হয়? খাটতে হবে। মনকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করবে, 'কি করলে?' মন যদি জবাব দেয় 'কিছুই করিনি' তবে লেগে পড়তে হবে। লাগ, লাগ, জপ করে যদি হয় জপ কর। ধ্যান করে হয় ধ্যান কর, আর বিচার করে হয় বিচার কর—তা না হয়তো তাঁর জন্য কাজ কর। একটা কিছু ধরে এগিয়ে যাও, প্রাণপণে লেগে যাও।

"কিছু কর—অন্ততঃ চার বৎসর ধরে করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তপস্যা ছাড়া কি সিদ্ধিলাভ হয়? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমেই ধ্বনি শুনেছিলেন, "তপঃ, তপঃ, তপঃ।" কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে?

"সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ—এই কথাটি যে বুঝেছে সেই তো প্রকৃত কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছে। যদি দুঃখের হাত এড়াতে চাও অন্যকে দুঃখ দিও না। সব রকম লোক নিয়ে থাকতে পারাই আসল থাকা। সব সহ্য করে যাবি, ঠাকুর বলতেন, 'যে সয় সেই রয়।' দ্যাখ্ না আমার কাছে কত রকমের লোক আসে, কেউ ভাল কেউ মন্দ। মন্দ লোক হলেই যদি দূর ছাই করি তবে সে যাবে কোথায়? ভালই হোক আর মন্দই হোক সে মানুষ তো?"

তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময়ের ছবিটি দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আনন্দময় মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণও আনন্দময়। তাঁহার শেষ অসুখের আগে হইতেই যেন এক আহ্বান তাঁহার প্রাণে আসিয়া বাজিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'ব্রজের রাখাল' বলিতেন। সেই ব্রজের রাখালের ব্রজে ফিরিয়া যাইবার একটি আহ্বান যেন একটি গানের মধ্য দিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাইপো রামলালদাদা ঢপওয়ালী সাজিয়া ঢপ কীর্তনের সুরে অতি সুন্দর গান গাহিতেন। তিনি বলরাম-মন্দিরে আসিয়াছেন মহারাজ তাঁহাকে সেইভাবে সখীবেশ সাজিয়া গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামলালদাদা বৃন্দা যেন শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে নিতে আসিয়াছেন সেইভাবে এই গানটি গাহিয়াছিলেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত,
ও তোর মন মানে তো থাকবি সেথা নইলে
আসবি দ্রুত।
আগে ছিল যমুনায় একহাঁটু জল
এখন যমুনা অতল (ব্রজগোপীর নয়ন জলে)
এখন হতে হ'লে পার সাঁতার দিতে হবে।
যদি বল, ব্রজে যেতে চরণেতে ধুলা লাগিবে,
(তা বলিলেও বলিতে পার)
(এখন যে রাজা হয়েছ)
(আগে রাখাল ছিলে, এখন যে রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ন নীরে
চরণ দুটি পাখালিবে।"

রামলালদাদা "আগে রাখাল ছিলে এখন যে রাজা হয়েছ" এই পদটিই আখর দিয়া বার বার গাহিয়াছিলেন।

ইহার পর মহারাজ এক গৃহস্থ ভক্তের অনুরোধে তাঁহার বাড়িতে ঠাকুরের চিত্র-স্থাপন উপলক্ষে তিনদিন থাকেন। ইহার পর আটপুর স্কুলের ভিত্তিস্থাপন এবং শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরের তিথিপূজার উৎসব শেষে কলিকাতায় ফিরিবার দিন ঠাকুরের মন্দির তৈরির জন্য যে নক্সাটি ছিল, সেটি আনাইয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন এবং বলিলেন, "স্বামীজীর সংকল্পিত এ কাজটি অসমাপ্তই রয়েছে।"

ইহার পর কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ি আসিয়া ১৩ই চৈত্র তারিখে তাঁহার দারুণ উদরাময় হইল। সংবাদ পাইয়া ডাক্তার কাঞ্জিলাল, বিপিনবিহারী ঘোষ ও দুর্গাপদ ঘোষ প্রভৃতি আসিলেন। কিন্তু উদরাময় কলেরায় পরিণত হইল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিও আসিয়াছিলেন। মহারাজ হাসিয়া বলিয়া-ছিলেন, "সবই যখন হল, হেকিমীটাই আর বাকী থাকে কেন?" আবার তাঁহাকে অন্য ঘরে সরানোর সময় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে! মরা হাতী লাখ টাকা!"

ইহার পর তন্ময়ভাবে যেন বিভোর হইয়া গেলেন। অস্ফুট স্বরে ক্রমাগত এইভাবের কথাই বলিয়াছিলেন, "আহাহা! ব্রহ্মসমুদ্র! ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেছি! এই যে—এই যে পূর্ণচন্দ্র! পূর্ণচন্দ্র রাম-কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল,—দে—দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ শুনেছিস্ নি? ওই যে, ওই যে, কৃষ্ণ এসেছ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ! আহাহা! কি সুন্দর! তোরা দেখতে পাচ্ছিস্ না। আমার কৃষ্ণ কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। দ্যাখ্, দ্যাখ্, আমার গায়ে হাত বোলাচ্ছে! আর বলছে আয় চলে আয়! এবারের খেলা শেষ হল।" ইহার পর মহারাজ আর কোন কথাই বলেন নাই।

২৭শে চৈত্র, সোমবার, মদনত্রয়োদশীর শেষে চতুর্দশীর প্রারম্ভ কাল, রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিত্যলোকে প্রয়াণ করেন।

রত্ন ও শ্রীমতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

মনের কথা বলবে যে, বলতে চাইলেই কি বলতে পারা যায়! যাকে বলবে তার মন থাকলে তো! দিন ক্ষণ অনুকূল হলে তো! প্রভাত কবে থেকে বলবে বলবে করছিল। রত্নকে—তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে। বলা ক্রমশ জরুরি হয়ে উঠছিল। কিন্তু ওকে ধরতে পারছিল না। যদিও একই কলেজের বিদ্যার্থী একই মেসের আবাসিক।

ও-ছেলেটি যেখানেই যায় সেখানেই ওকে ঘিরে একটি বন্ধুমণ্ডল গড়ে ওঠে। পশ্চিমের ওই বড় শহরটাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ওরা দু'জনে একসঙ্গে বি-এ পড়বে বলে প্রবাসী হয়েছিল ওখানে। কিন্তু দেখতে দেখতে দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় জনের জনতা হয়। ওখানকার ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে প্রভাতও তো একজন ছোটখাটো জঙ্গীলাট বনেছিল। তার চারদিকেও ঘুর ঘুর করত এক দল অনুগত ভক্ত। প্রভাতদা বলতে ওরা অজ্ঞান।

দু'জনের উপর দু'জনের অভিমান জমছিল। সেটার আর একটা নিগূঢ় কারণ ছিল। আই-এ পড়তে পড়তে বাংলাদেশের কোনো মফস্বল শহরে যখন তাদের প্রথম আলাপ তখন তারা ও তাদেরই মতো জনকয়েক মিলে একটি মণ্ডলী গড়ে। নাম দেয় ইংরেজীতেঃ "The Iconoclasts." সদস্যসংখ্যা সাতজনের বেশী হল না বলে লোকে বলত সাত ভাই চম্পা। তাদের ইস্তাহারে লেখা ছিল কাঠপাথরের প্রতিমা তো তারা ভাঙবেই, ভাঙবে যত রাজ্যের মিথ্যা সংস্কার মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। বাগ্মিতায় সব চেয়ে বড় বলে প্রভাতকেই দলপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। বন্ধুরা ডাকত কালাপাহাড় বলে। দেখতেও সে লম্বা চওড়া ভারিক্কি ও শামলা। কিন্তু ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দেবার পর থেকে লক্ষ্য করা গেল সে অন্যপ্রকার প্রতিমাপূজক হয়ে উঠেছে। সেলাম করছে নির্বিকারে। হুকুম মানছে নির্বিচারে। যখনি তার

ঘরে যাও দেখবে ইউনিফর্ম পাট করছে, বুট পালিশ করছে ভক্তিভরে। একটু হাত দিয়েছ কি তোমার দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন তুমি চণ্ডাল হয়ে বিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করেছ।

রত্ন ছিল সবরকম প্রতিমাপূজার বিরোধী। কেবল শাস্ত্রবাদীদের প্রতিমার নয়, শস্ত্রবাদীদের প্রতিমারও। তারই মণ্ডলীর পয়লা নম্বর প্রতিমাভঙ্গকারী কিনা রণদেবতার মূর্তিপূজক হয়ে উঠল। এই থেকে রত্নর অভিমান। আর প্রভাতের অভিমান রত্নর অপ্রত্যাশিত সাফল্য থেকে। কী রকম দুষ্টু দেখ! সমাজ সংস্কারের নাম করে বন্ধুদের সবাইকে ঘোড়দৌড় করিয়ে মারবে, আর নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় টেক্কা দেবে। রাতারাতি বিখ্যাত হবে। ওর দল গড়া একটা ভাঁওতা। এবার গড়ছে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়।

প্রভাত জানত পূর্ণিমা রাত্রে রত্ন কারো সঙ্গে মেশে না। তাকে একলা পাওয়া যায় সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে। বাঁধের ঢালু দিকটাতে গা মেলে দিয়ে কূল-ছাপানো জলে পা ভিজতে দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে আসমানের দিকে। এ-সুধা অপচয় করতে নেই, একে আকণ্ঠ পান করতে হয়। এমনি করে মানুষ অমৃত হয়। তাই রাত দশটা অবধি সে পড়ে থাকে একা। আহার নেই, নিদ্রা নেই, আহারনিদ্রার তাগিদ নেই।

এক পূর্ণিমার রাত্রে প্রভাত গিয়ে রত্নর পাশে চাদর পাতল। আটটা বাজে। নদীর ধার শূন্য। রত্ন তখন মগ্ন ছিল সৌন্দর্য অবগাহনে। বন্ধুকে কাছে পেয়ে প্রীত হল। তন্ময় হয়ে বলল, "ভাই প্রভাত, এ কোন রূপকথার রাজ্যে এলুম আমরা! জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটেছে। সমুখে দুধের সায়র। এটা কোন যুগ? আমরা কি খ্রীষ্টোত্তর বিংশ শতাব্দীতে? না খ্রীষ্টপূর্ব? আমি যেন কবেকার সেই রাজপুত্র আর তুমি যেন মন্ত্রিপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আমরা বেরিয়েছি, পেরিয়ে এসেছি দেশ আর কাল, ছাড়িয়ে এসেছি বাস্তব।"

মন্ত্রিপুত্র হতে প্রভাতের একটুও সম্মতি ছিল না, তবু সে মৌন হয়ে শুনতে লাগল।

"ভাই প্রভাত, পূর্ণিমার রাত্রে আমার মনে পড়ে যায় পূর্ণতার কথা। যে-পূর্ণতা এই বিশ্বসংসারের সমস্ত অপূর্ণতাকে আচ্ছন্ন করে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অন্যান্য দিন অপূর্ণতার সঙ্গে ঘর করি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হই। এই একটি দিন পূর্ণতার অভিসারে গৃহত্যাগ করি। তখন মনে হয় আমি পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় চলেছি। আমি আর বিদ্রোহী নই, আমি বিমুগ্ধ। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে থাকি, থাকতে থাকতে সহসা এক সময় অবগুণ্ঠন খুলে যায়। শুভদৃষ্টি হয় সুন্দরীর সঙ্গে। যে-সুন্দরী এ-বিশ্বের মর্মমূলে অধিষ্ঠিতা। তখন অনুভব করি আমি একা নই, আর একজন আছে, যাকে নিয়ে আমি পূর্ণ। তার সঙ্গে সহবাস করে আমিও সুন্দর হয়ে উঠি।"

রত্নর মুখে এসব কথা নতুন। প্রভাত কান পেতে রইল।

"এবার শুধু পূর্ণিমা নয়। তার সঙ্গে মিলেছে বসন্তের সেনা। কোকিলের কুহু, দখিনের বাতাস। ভাই প্রভাত, আমিও বসন্তের মতো এসেছি, বসন্তের মতো যাব। যেখানে যাব সেখানেও বসন্ত। আমাকে নিয়ে বসন্ত। আমিই বসন্ত। আমি বন্ধনহীন আত্মা। আমি ফ্রী স্পিরিট। উনিশ বিশ বছর মানবের দেশে বাস করতে করতে মানব হয়ে গেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিইনি। আমি স্বাধীন মানব। ফ্রী ম্যান।"

প্রভাত আড় চোখে রত্নর দিকে তাকায়। তার মুখে পূর্ণিমার আলো পড়ে তাকে আরো কমনীয় করেছে। চির কিশোর। ক্ষীণকায়। অনতিদীর্ঘ। অনতিগৌর।

"আমি স্বাধীন সত্তা। বন্ধন আমার জন্যে নয়। সেই আমি মানবের দেশে এসে কেবলি ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি। বেঁধেছি, বাঁধা পড়েছি। এ বাঁধন খুলতে গেলে লাগে। নিজে খুলতে পারিনে। মৃত্যু যদি খুলে দেয় কেঁদে আকুল হই। ভাই, একে মর্ত্যভূমি বললে মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ধরণী প্রেমভূমি। এখানে আমরা আসি ভালোবাসা দিতে ও নিতে। বৈষ্ণবরা বলে স্বয়ং ভগবান মানবরূপে এসেছিলেন প্রেম আস্বাদন করতে। এমন প্রেম আর কোথায় আছে! স্বর্গেও না, বৈকুণ্ঠেও না। সেইজন্যেই বুঝি এখান থেকে কেউ স্বেচ্ছায় চলে যেতে চায় না! যত দিন পারে মরণকে এড়ায়। প্রেম যদি না থাকত, না বাঁধত, মানুষ কি বাঁচতে চাইত। আমার অন্তরতম অভিলাষ কী, শুনবে? আমি হতে চাই সব স্বাধীন মানবের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষের মধ্যে প্রেমিকসত্তম।"

প্রভাত যেন এতক্ষণ এই সুযোগটির জন্যে ওত পেতে ছিল। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "ভাই রত্ন, আমি বার বার ভালোবাসিনি, একবারই বেসেছি। বার বার ভালোবাসা পাইনি, একবারই পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা শুনতে চাও তো বলি। যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়। তার মতো পরাধীন আর নেই। আর প্রেমের জ্বালা মরণজ্বালার চেয়ে কম কিসে! একটার তবু নির্বাণ আছে। অপরটা অনির্বাণ।"

প্রভাতের কণ্ঠস্বরে এমন একটা বেদনা ছিল যে রত্ন তার বন্ধুর উক্তির প্রত্যুক্তি করতে কুণ্ঠিত হল। শুধু বলল, "আমার প্রেমের অনুভূতি জ্বালাময় নয়।"

প্রভাত যেন এর জন্যে তৈরি ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর আমাকে দগ্ধ করছে আশাহীন এক প্যাশন।"

"প্যাশন!" চমকে উঠে সামলে নিল রত্ন। "তাই বলো।"

"কেন? প্যাশন কি প্রেম নয়?"

"তা কী করে হবে?"

"হাওয়া যে করে ঝড় হয়। জল যে করে মেঘ হয়। আলো যে করে আগুন হয়। প্রেম যখন গাঢ় হয় তখন তাকে বলি প্যাশন। গোড়াতে এমন ছিল না। হালে এমন হয়েছে।" এই বলে প্রভাত প্রস্তাব করল, "শুনবে?"

রত্ন সায় দিল। "শুনি।"

তখন প্রভাত শোনাল তার অকথিত কাহিনী।

রানু তার বাল্যসখী। পাশাপাশি বাড়ি। বয়সের তফাত বছর দুই। কতবার তারা বর বৌ খেলেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে এ-খেলা বড় হয়েও খেলবে। গুরুজন জানতেন। ভাবতেন এটা ছেলেমানুষি। এমন তো কত হয়। তাঁরা দেখেও দেখতেন না। মায়েরা পরস্পরকে বেহান বলে ডাকতেন। বড় হয়ে প্রভাত জেনেছে ওটা একপ্রকার শিষ্টাচার। তখন কিন্তু তার ধারণা ছিল কেউ কাউকে বেহান বলে ডাকলে ওরা সত্যি সত্যি বেহান হয়ে গেল, কেবল শুভকর্মটা বাকী। নাতজামাই নাতবৌ এসব যে রসের কথা এটাও তার মাথায় ঢুকত না। তার হোঁশ হল যখন তেরো বছরের রানুকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেওয়া হল। কেন? না রানুর কাপড়ে রক্তের ছোপ দেখা দিয়েছে। প্রভাত ধরে নিয়েছিল কোথাও কিছু কেটে গেছে। যা দুরন্ত মেয়ে! কিন্তু বৌদিদিরা তার প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স দেখে হেসে খুন। দূর বোকা, রানু যে এখন যুগ্যিমন্ত হয়েছে!

কাকে বলে যুগ্যিমন্ত, কী তার লক্ষণ, এসব ক্রমে ক্রমে

চার বোধগম্য হল। বেশ একটু ভয় পেয়েছিল সে। ষোলো ছর বয়সে ছেলের বাপ হলে তো তার বিয়েটা একটা অভিশাপ য়ে দাঁড়াবে। না। সে চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। দশ-নের একজন হতে। ব্রাহ্মদের কাছে লেখাপড়া শিখে সে াল্যবিবাহের বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিল। রানু কেন ব্রাহ্ম মারীদের মতো অপেক্ষা করবে না? কিন্তু রানুর গুরুজন া কল্পনা করতে পারেন না। মেয়ে দিন দিন অরক্ষণীয়া য়ে উঠছে। সময়ে বিয়ে না দিলে পরে হয়তো ওর বিয়েই বে না। প্রভাত যদি বিয়ে না করে? প্রভাতের আশায় বসে াকলে একটির পর একটি সৎপাত্র হাতছাড়া হবে। রানুর ছাট বোন টুনুও তত দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে থাকবে। সমাজ ক্ষমা করবে না।

রানু যখন যুগ্যিমন্ত হয় প্রভাত তখনো যোগ্য হয়নি, ুতরাং যা হবার তাই হল। কী করুণ মুখখানি রানুর। ী কাতর কান্না! যেন বিবাহে নয়, সহমরণে াচ্ছে। জোর করে নিয়ে যাচ্ছে সমাজ। ইলে কী জানি অমঙ্গল হবে! প্রভাত অসহায় চক্ষে দেখতে লাগল এ-দৃশ্য। সঙ্গে ঙ্গে তার ভিতরটা কঠিন হয়ে যেতে থাকল। স চোখের জল ফেলবে না। তাতে শক্তি য়। সে সমাজসংস্কারক হবে। াতে আর কোন মেয়ের অকালে বয়ে না হয়। ধরে বেঁধে বিয়ে না দওয়া হয়। ব্রাহ্মরাই আদর্শ।

কিন্তু রানু যখন শ্বশুরবাড়ি থকে বাপের বাড়ি এল তখন ার চেহারা দেখে প্রভাতের চাখের জল বাগ মানল না।

ধ্বস্ত বিধ্বস্ত ভিতরে ও বাইরে। সমাজসংস্কার দিয়ে তার ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগবে না, পোড়া জীবন সঞ্জীবিত হবে না। রানু কি বাঁচবে! কী করলে বাঁচবে! প্রভাতকে পাগল করে তুলল এ-চিন্তা। ততদিনে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তখন কলকাতা কংগ্রেসে সবে অসহযোগের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। লোকে ঠাওরাল মহাত্মা গান্ধীর ডাক শুনে প্রভাত গোলামখানা ত্যাগ করেছে। একটি বছর সে নানান জায়গায় ঘুরল। নানান কাজে। কিছু দিন জেলখানায় কাটাল। অবশেষে মনটাকে বাঁধল। ও-পথে ভারতের সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে, কিন্তু রানুর সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতেরও কি হবে! সন্দেহ।

কলেজে ফিরে গেল প্রভাত। এবার রত্নর সঙ্গে আলাপ। কালাপাহাড়ী দলের পত্তন হল। কত রকম কার্যকলাপ নিয়ে

সে-চোখে অন্তহীন নিরাশা

ব্যাপৃত রইল ওরা। কালাপাহাড় তো নামে। আসলে ডন কুইকসোট। রানুর সঙ্গে দেখা হয় না। তার স্বামীর বদলির চাকরি। প্রভাতের মনে হল তার নিজের দিক থেকে প্রেম নেই, নিবে গেছে। রানুর দিক থেকে যদি থাকে তবে প্রশ্রয়যোগ্য নয়। বছর তিনেক অদর্শনের পর সখীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার বাপের বাড়িতে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল প্রভাত, রানুর রূপ খুলে গেছে। কোনোদিন সে এমন সুশ্রী ছিল না। আরো অবাক হল যখন নিরীক্ষণ করল—সখীর নয়নকোণে প্যাশন।

প্রভাত বরাবর প্র্যাকটিকাল মানুষ। তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটোতে বসল। আর একটা দিনও নয়। কিন্তু খবরটা কেমন করে রানুর কানে পেঁছিল। সেও তৎক্ষণাৎ অসুখে পড়ল। শুনতে পেল প্রভাত, ও-বাড়ির রানুর ভয়ানক জ্বর। একবার দেখতে চায় তোকে। তা শুনে গেল দেখা দিতে। সখী তার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। সে-চোখে অন্তহীন নিরাশা। সেই সঙ্গে অনির্বাণ জ্বালা। প্রভাত কী যেন বলতে চায়। মুখ ফোটে না। চোখে চোখ রেখে রানুর কাছটিতে বসে থাকে সে। কত কাছে। তবু কত দূরে! যেন জন্মান্তরের ব্যবধান। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে টেলিগ্রাফ চলে। বিনাবাক্যে। সখী বলে, দেখছ তো আমাকে। তোমার কি কিছুই করবার নেই? প্রভাত বলে, এখন আমি কী করতে পারি! হয় খুব দেরি হয়ে গেছে, নয় এখনো সময় হয়নি। সখী বলে, তুমি তা হলে আশা দিচ্ছ! প্রভাত বলে, সে অর্থে নয়। সখী বলে, তাই যদি না হল তবে কেন বাঁচব? প্রভাত বলে, জীবনে আরো অনেক কাম্য আছে। এই কি সব! সখী বলে, তৃষ্ণার্তের কাছে পানীয়ই সব।

আশা নেই অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে, এইখানেই তো জ্বালা। এ-জ্বালা জ্বর হয়ে রানুকে দহন করছিল। ওষুধে কী করবে! তা বলে প্রভাত আশা দিতে পারে না সে-অর্থে। দিনকয়েক পরে রত্নর সঙ্গে দেখা করে বলল, তোমার না পশ্চিমে যাবার বড় শখ? চল, পশ্চিমেই যাই। না, ইউরোপে না। তার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করতে হয়। আপাতত বেহার। রত্ন রাজী হয়ে গেল। কানন, হৈম, গিরীন এরা পিছনে পড়ে রইল [illegible] সেই মফস্বল শহরে। ললিত আর নবনী কলকাতা চলে গেল। পশ্চিমে এসে প্রভাত মনে করেছিল রানুর ছোঁয়াচ এড়াতে পারবে। কিন্তু পরে উপলব্ধি করল সেও ভুগছে ঐ জ্বরে। যদিও থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না দেহতাপ।

প্রভাত বলিষ্ঠ পুরুষ। তার আদর্শ ফ্রী ম্যান নয়, স্ট্রং ম্যান। কিন্তু গত আট দশ মাস যাবৎ তার যাতনার বিরাম নেই। সেটাও সহ্য হত। কিন্তু ওদিকে রানুর অসুখ বেড়ে চলেছে। তার স্বামী পর্যন্ত অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন প্রভাতকে একবার যেতে।

যেতে কি তার পা ওঠে! পরের বাড়ি যে! রানু এখন পরকীয়া। যে হত তার নিজের বৌ তার সঙ্গে কথা বলতে হলে পরের কাছে প্রার্থী হতে হবে। দুটো গোপন কথা বলার জো নেই। কে কী ভাববে! চায় না প্রভাত জেল-কয়েদীর মতো অনুগ্রহ। কিন্তু যদি না যায়, যদি শেষ দেখা না হয় তা হলে রানু এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে চির আফসোস নিয়ে। অপূর্ণ তৃষ্ণার সঙ্গে চির আফসোস। কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি! বিস্বাদ হয়ে যাবে না প্রভাতের অবশিষ্ট জীবন! কোনো দিন কি সে সুখী হতে পারবে!

কিন্তু যদি যায়, যদি রানু প্রাণ পায়, যদি বার বার যেতে বলে তখন কি এই যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে না? একে পুষে রেখে কার কী সুখ? প্রভাত তার সখীর মরণকামনা করে না, কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে চায়। এই বয়সে যদি তার দুরারোগ্য ব্যাধি হয় তা হলে জীবনে কী ফল! সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। যদিও বাইরের ঠাট বজায় রেখেছে। সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে। শক্ত মানুষ হচ্ছে।

রত্ন কী বলে? প্রভাত যাবে কি যাবে না?

রত্ন অভিভূত হয়েছিল। কী বলবে? সে তো বিশ্বাস করে না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ। প্যাশন সম্বন্ধে তার প্রাণে ভয়। প্রেম বলতে সে বোঝে রস। যে রস হৃদয়জ।

"প্রভাত," রত্ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "তুমি যাও। তোমার না-যাওয়াটা অমানবিক হবে। গেলে দেখবে তুমি যা ভেবেছ তা নয়। প্যাশন নয়। বিরহ। মানুষ মানুষের জন্যে বিরহ বোধ করবে, এইটেই স্বাভাবিক। সামাজিক সম্পর্ক যাই হোক না কেন। আমিও তো বিরহ বোধ করি, একজনের জন্যে যিনি আমার কেউ নন সমাজের চোখে। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না। বিবাহ যদি বা হয় মিলন হবে না। এও তো আশাহীন। তা বলে প্যাশন নয়। প্যাশনকে বিরহে পরিণত করো, দেখবে আশাহীনতা সত্ত্বেও শান্তি পাবে। তবে একটা 'কিন্তু' আছে। আর কাউকে বিয়ে করতে পাবে না, যত দিন রানুর জন্যে বিরহবোধ থাকে।"

"হায়!" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল প্রভাত। "যদি অন্তর থেকে বলতে পারতুম ও কথা! রানু তো তবু কিছু পেয়েছে। আমি যে কিছুই পাইনি। কোনো আস্বাদ।"

"তা যদি বলো" রত্ন শরমে রঙিন হল, "মালাদি হয়তো কিছু পেয়ে থাকবেন। তিনি বিধবা। আমি পাইনি। পাবও না। তা বলে কি আমি সেইজন্যে আর কাউকে বিয়ে করব? আর কারো সঙ্গে সঙ্গত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবধি মিস্টিক। আর যা তা অধিকন্তু। সে যদি বরদা হয় তবে ওটা তার করুণা। ভগবানের করুণা। সব প্রেমই তো ভগবানের কাছ থেকে উৎসারিত, তাঁরই মধ্যে প্রবাহিত। তিনিই দাতা, গ্রহীতাও তিনিই। বৈষ্ণবরা বলে পরমাত্মা কৃষ্ণ জীবাত্মা রাধা। আমি বলি পরমাত্মা পুরুষরূপে কৃষ্ণ, নারীরূপে রাধা। জীবাত্মাও তাই।"

"কিন্তু ওই যে তোমার কথা—বিয়ে হবে না, বিয়ে যদি বা হয়, ইয়ে হবে না—ওর সঙ্গে তোমার খৃষ্টীয় মিস্টিক করুণাবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়া লীলাবাদের সঙ্গতি খুঁজে পাইনে, রত্ন। আমার অনুমান তোমার মধ্যে একটা কম্‌প্লেক্‌স কাজ করছে। যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক—ওটা কি পাতানো না সহজাত?"

"পাতানো।" রত্ন উত্তর দিল প্রশ্ন শেষ না হতেই।

"যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক পাতিয়েছ তাঁর সঙ্গে জায়া সম্পর্ক পাপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অমন তো কত হয়। মেয়েরা যাদের দাদা বলে ডাকে তাদের সঙ্গে বিয়ে হলে পরে ছোট বোনের অভিনয় করে কি? তোমার মালাদিও তোমার 'ওগো' হবেন। তখন দেখবে নারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাকৃতিক হবে।"

রত্ন এ-কথা শুনে ক্ষুব্ধ হল। তখন তাকে বর্ণনা করতে হল মালাদির আখ্যান।

ছেলেবেলায় একবারমাত্র তাঁকে দেখেছিল রথযাত্রার মেলায়।

একদিনেই খুব ভাব হয়ে যায়। তারপর গোরুর গাড়ি করে মালাদিরা রওনা হন এক দিকে, রত্নরা আরেক দিকে। ঐ ভিন্ গাঁয়ের দিদির সঙ্গে আর কোনো দিন সাক্ষাৎ হয়নি, হবার কথাও নয়, কারণ বিয়ের পর তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বর্মায় চলে যান। অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে। তখন তাঁর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। হাসি-খুশির সেই ফেনিল ঝরনা তখন করুণ রসের বিশীর্ণ মরুস্রোত। দুঃখিনী মেয়েকে নিয়ে মা বাপ তীর্থবাস করতে এসেছেন। চেনা লোক আর কেউ নেই। রত্নই অনাহূতভাবে সাহায্য করে। লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয়। নিজের মাসিকপত্র পড়তে দেয়।

বিষাদের প্রতিমা। মূর্তিমতী নিরাশা। রত্ন সমবেদনায় গলে যায়। কিন্তু মালাদির নিজের চোখে জল নেই। ফুরিয়ে গেছে ঝরতে ঝরতে। তিনি কাঁদেন না, কাঁদান। সমবেদনা যে কবে কেমন করে প্রেমে রূপান্তরিত হল রত্ন হিসাব রাখেনি। শুধু এইটুকু লক্ষ্য করেছে যে মালাদির উপর তার টান তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, দিনে দশবার নানা ছলে তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসছে। রাত্রেও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া চাই। যদিও সে প্রতিমা পূজো মানে না। প্রতিমা-ভঙ্গকারী। মালাদি কিন্তু জানতেন না, এখনো জানেন না যে রত্ন তাঁর প্রেমে পড়েছে। জানলে হয়তো দরজা বন্ধ করে দিতেন। তিনি সংস্কারবদ্ধ হিন্দু বিধবা। দ্বিতীয়বার বিবাহ তাঁর চক্ষে অসতীর লক্ষণ। রত্ন যদি কোনো দিন তাঁকে সংস্কারমুক্ত করতে পারে বই কাগজ পড়িয়ে, গল্প করে ও ভজিয়ে, তা হলে তিনি হয়তো দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে রাজী হবেন। কিন্তু আর সব সংস্কার কাটিয়ে উঠলেও একটি সংস্কার কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব, সমাজ যদি না বদলায়, নীতি যদি না উদার হয়। তাঁর মন থেকে কিছুতেই এটা মুছবে না যে তিনি যদি ধরা দেন তবে তিনি অশুচি, তবে তিনি অসতী। আর রত্নও তো বিবাহের জন্যে ব্যাকুল নয়। সে স্বাধীন থাকতে চায়। স্বাধীন অথচ সপ্রেম। বিবাহ যদি সে কোনো দিন করে তবে প্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যে, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। স্বাধীনতাকে খর্ব করে নয়। উভয় পক্ষেই থাকবে অপরিসীম স্বাধীনতা। তার মধ্যে বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও পড়ে। মালাদিকে একথা বোঝায় কে? রত্ন কোনোদিন পারবে না। যতদিন ভালোবাসতে মন যায় ভালোবাসবে, যতটুকু নিতে ইচ্ছুক থাকেন দেবে, যতটুকু দিতে ইচ্ছুক থাকেন নেবে। সে স্বাধীন নায়ক, তিনি স্বাধীনা নায়িকা। ফ্রী ম্যান। ফ্রী উম্যান। এই ভিত্তির উপর প্রেম যতদিন পারে দাঁড়াবে। আপাতত এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

প্রভাত অন্য কথা ভাবছিল। নিজের ভাবনার রেখা টেনে বলল, "মালাদি যদি তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি বহন করে সারা-জীবন অতিপাত করেন তবে তোমার দোষ নেই, কিন্তু তিনি যদি তোমার প্রেমের প্রতিদান দেন, যদি তোমাকে বিয়ে করেন তা হলে বাকীটুকু—শুনেছ, রত্ন—তাঁর করুণা নয়, তোমার পৌরুষ।"

রত্ন আরক্ত হয়ে জিব কাটল। "তার মানে কী? বলপ্রয়োগ?"

প্রভাত ব্যঙ্গ করল। "ওঃ! আমার মনে ছিল না যে তুমি অহিংসাবাদী।"

রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলল, "এ তোমার যুদ্ধক্ষেত্র নয়। এ হল প্রেমের রাজ্য।"

প্রভাত রঙ্গ করে বলল, "যুদ্ধে আর প্রেমে সব কিছুই ন্যায্য। ওটাও একপ্রকার যুদ্ধ।"

রত্ন কোণঠাসা হয়ে আর কী বলবে! ফস্ করে বলে বসল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম।"

প্রভাত দপ করে জ্বলে উঠল, "বলো কী! মেয়েদের মধ্যে প্যাশন নেই! ওটা আমারি দৃষ্টিভ্রম! রত্ন, তুমি কি জন্মান্ধ না চোখ তুলে কখনো মেয়েদের দিকে তাকাওনি! আচ্ছা, শোন তা হলে তোমাকে একটা গল্প বলি। সত্যি গল্প। এই তো সেদিনকার ঘটনা। এখনো চার মাস হয়নি। পুজোর বন্ধে দেখে এলুম স্বচক্ষে। তবু তুমি বলবে দৃষ্টিভ্রম!"
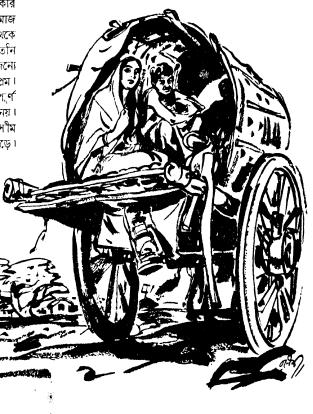
গোরুর গাড়ি করে মালাদিরা রওনা হন—

এই বলে সে শুরু করে দিল আরেক বয়ান।

পুজোর বন্ধে সে বিশ্রাম পায়নি। তাকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে নবগঠিত স্বরাজ্য পার্টির অনেকগুলো নির্বাচনী সভায়। এই পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাকে স্নেহ করেন। তাঁকে জিতিয়ে দিতে হবে। তাই তাঁর ডাক শুনে ছুটে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে।

বেগমপুরের মিটিং জমিদারবাবুদের চকমিলান বাড়িতে। ঠাকুরদালানের সামনের দরদালানে নেতারা। বাঁধানো উঠোনে শ্রোতারা। তিন পাশের বারান্দায় চিক। চিকের আড়ালে মহিলারা।

নেতাদের পিছনের সারিতে প্রভাত ছিল। তার হঠাৎ মনে হল বাঁ ধারের চিকের একটি কোণ যেন একটুখানি সরে গেছে। নজরে এল উঁকি মারছে একটি চোখ। সে-চোখ এত সুন্দর যে কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছা হয়, উদয় হয়েছে একটিমাত্র তারা। তখন গোধূলি লগ্ন। দীপ জ্বলেনি। অত বড় ভবনে ওই একটিমাত্র সন্ধ্যাদীপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার মনোযোগ ভঙ্গ হল প্রভাতের। এবার একটি নয়, একজোড়া চোখ। আরো খানিক পরে আস্ত একখানি মুখ। চাঁদের উপমা দিলে মামুলি শোনাবে। কিন্তু উদয় হয়েছে যেটি হোক একটি জ্যোতিষ্ক। আলো হয়ে গেছে দশ দিক। তারপর প্রভাত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করল চিকটা কেমন করে পিছনে চলে গেছে। সামনে বসে আছে উদিতা।

বয়স কত হবে? এই উনিশ বিশ। তন্বী। গৌরী। পরিধানে সাদা রেশমের শাড়ি। তার উপর সাদা ফুল তোলা। ঘোমটা খসে গেছে। ঘন কালো কেশ দু' গালে লতানো। হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। কোথাও আর কোনো অলঙ্কার নেই। এক হাতে ধরে আছে একটি রক্ত-গোলাপ। টকটকে লাল।

প্রভাত ভালো করে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। পাছে কেউ কিছু মনে করে। তবু একবার চুরি করে চেয়ে দেখল। অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী। কিন্তু বহ্নিশিখার মতো লেলিহান। কে জানে কোন যজ্ঞবেদীতে এর জন্ম! এই যাজ্ঞসেনীর! আধুনিক যুগের মহাভারতে প্রাচীন যুগের মহাভারতের এ-নারী কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে কে জানে! কাকে প্রেরণা জোগাবে! কোন ভীমার্জুনকে!

প্রভাতের বক্তৃতার সময় হল। সে যে বোকার মতো কী বলতে কী বলে গেল নিজেই জানে না। "মা জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" এও নাকি সেদিন সে বলেছে। বলতে বলতে একবার তার দৃষ্টি পড়ে তরুণীর দৃষ্টিপথে। সে চোখে কী প্যাশন! এমন প্যাশন আর কারো চোখে দেখেনি। রানুর চোখেও না। রানু এর কাছে কী! দাবানলের কাছে তুষানল!

সভাশেষে মেয়েটি চিকের আড়ালে লুকিয়ে গেল। যেমন মেঘের আড়ালে এই পূর্ণিমার চাঁদ। রেখে গেল সেই রক্ত-গোলাপটি। কে একজন এনে দিয়ে গেল সুভাষদাকে। প্রভাত শুনতে পেল, এই সেই শ্রীমতী যে মহাত্মা গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।

॥ দুই ॥

মাস ছ'সাত পরে।

রত্ন সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল। ক্ষান্তবর্ষণ বিদ্যুৎ চমকানো মেঘলা-দিন। বেলা ন'টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হল যখন হস্টেলের চাকর ল্যাংড়া লালজী এসে ঘরে ঘরে ডাক বিলি করে গেল। ততদিনে সে ও প্রভাত মেস থেকে হস্টেলে উঠে এসেছে। দু'জনেই দু'খানা সিঙ্গল-সীটওয়ালা ঘর পেয়েছে।

রত্ন ডাক নিয়ে দেখল তার নামে এসেছে একখানা "ভারতী" ও একখানা খাম। সাধারণত সে মাসিকপত্র পেলে সেখানাই আগে খোলে ও পড়ে। তারপর চিঠিপত্র। কিন্তু এই খামখানা ছিল নীল রঙের ও সুবাসিত। আর এর উপর ঠিকানা লেখা ছিল মেয়েলি হাতে। মাসিকপত্র ফেলে খামখানা খুলে দেখে- এ কী! এ কে!

বেগুনি রঙের কালি দিয়ে নীল রঙের কাগজের এক পিঠে রুল টানা লাইন ধরে লেখা। পাতার পর পাতা মেয়েলি হাতের অক্ষর। রত্ন বার বার উলটে পালটে দেখল। না, মালাদির চিঠি নয়। মালাদি সুগন্ধি ব্যবহার করেন না।

প্রিয় ভাই,

একটি অচেনা অজানা বোনের চিঠি হঠাৎ পেয়ে চমকে উঠবেন হয়তো। কিন্তু যার জন্যে এ চিঠি সে আপনার অচেনা নয়। যার কথায় লিখছি সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনার মণ্ডলীর সদস্য। সম্প্রতি আমার মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছে। আন্দাজ করুন দেখি প্রথম জনটি কে? আর দ্বিতীয় জনটি?

পারলেন না তো। আচ্ছা, আমিই তবে বলি। দ্বিতীয়টি ললিত। সে আমার ননদের দেওর। তার সঙ্গে আলাপ বেশী দিনের নয়। গোড়া থেকেই সে আপনার নাম করছে। আপনার আর প্রভাতদার। কিন্তু সুনাম নয়। আপনারা নাকি স্বার্থপরের মতো পশ্চিমে চলে গেছেন সরস্বতী পুজো করে লক্ষ্মীলাভ করতে। আপনাদের সব আদর্শবাদ নাকি বাক্যে। বুঝতে পারছি তার অভিমান হয়েছে। ছেলেটি আপনাদের দু'জনের পরম ভক্ত। এখনো তার বিশ্বাস সোনালীর জন্যে কেউ যদি কিছু করে তো সে রত্ন, সে প্রভাত।

এই দেখুন। প্রথম নামটিও বলে ফেলেছি। সোনালীকে কি মনে আছে আপনার? তিন বছর আগে যে-হতভাগিনীকে উদ্ধার করতে আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন, সাত ভাই চম্পার সেই পারুল বোনটি আজ কোথায়? একটিবার কি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না আপনার! বা আপনার বন্ধুবরের! হায়! সে বেচারির দুঃখে পাষাণও গলে যায়। পূর্বজন্মে কী মহাপাপ করেছিল! জ্যোতিদা আবার বলে, পূর্বজন্ম নেই, সব বানানো। আপনার কী মনে হয়? সব বানানো? তা হলে পরজন্মও নেই?

যা বলছিলুম। সোনালীকে সেই রাবণরা তাদের অশোকবনে লুকিয়ে রেখেছিল, তা তো জানেন। শত চেষ্টাতেও সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি। আপনাদের সৎ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। বছর আড়াই পরে ওরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে মুক্তি দেয়। তখন দেখা গেল বন্ধনের চেয়ে বন্ধনমোচনেই বেশী দুঃখ। বাগানবাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে সে যাবে কোন চুলোয়! বাপ মা দূর দূর করে দরজা বন্ধ করে দিল। একটু আশ্রয়ের জন্যে সে দ্বারে দ্বারে ঘুরল। কেউ দয়া করল না। যে-সব লোক রাজী হল তাদের অস্ফুট সর্ত অবিকল রাবণদেরই মতো। লঙ্কায় কি সকলেই রাবণ! সোনালী তা দেখে স্থির করল তপ্ত কটাহের চেয়ে জ্বলন্ত উনুন ভালো। বুঝতে পারলেন, না আরো খোলসা করতে হবে! সে সোজা বাড়িউলির কাছে গিয়ে ঘর ভাড়া করল, পুলিশের কাছে গিয়ে নাম লেখাল।

রত্নভাই, কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমি নারী হয়ে

জন্মেছি বলে লজ্জিত। আপনি পুরুষ হয়ে জন্মেছেন বলে লজ্জিত নন? কিন্তু এই লজ্জা যদি ক্রোধে পরিণত না হয় তা হলে কি সোনালীর মতো সোনার মেয়েদের কোনো প্রতিকার আছে! আমি তো অনেক আগে থেকেই অলঙ্কার ত্যাগ করেছি। ভাবছি এবার নতুন কী ত্যাগ করব? মাংস খাইনে। মাছ খাই। মাছ ছাড়লে কেমন হয়? অন্যায় চিরকাল জিতবে? কেউ পারবে না রুখতে?

ললিত বলছে আপনারা যদি চেষ্টা করেন সোনালীকে অস্থান থেকে উদ্ধার করে পাত্রস্থ করা এখনো সম্ভব। ও আশ্রমে যাবে না। হয় বিয়ে করবে, নয় যা করছে তাই করবে। ওরও তো আত্মসম্মান আছে। আমি এটা সমর্থন করি। নারীর বেলা অন্য ব্যবস্থা কেন? পুরুষের বেলা তো বিয়ে আটকায় না। ঐ যে বড় রাবণটা ওরও তো সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। সবাই জানে ওর কান্ড, অথচ একজনও অসহযোগ করবে না। সবংশে খাবে ও-বাড়ির ভোজ। রায়বাহাদুর নেমন্তন্ন করেছেন বলে কী রকম কৃতার্থ গদগদ ভাব! সমাজপতি যে! ওটিও পয়লা নম্বর ভন্ড। কত মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেছে। কার ছেলে সেটা দেখতে হবে তো! বড় রাবণ এখন পতিদেবতা হয়েছে, এর পরে সমাজপতি হবে। ছোট চলল কলকাতা। সেখানে ব্যবসা করবে। কে জানে কিসের ব্যবসা!

ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি? রত্নভাই, আমার তো মনে হয় আপনিই ওই পরমাসুন্দরী কন্যার উপযুক্ত বর। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। তাই অমন কথা লিখতে সাহস হল। ধৃষ্টতা মাফ করবেন। প্রভাতদার উপরেও আমার সমান নির্ভরতা। তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই। সোনালীর জন্যে তিনি যা করেছেন তা নিয়ে নতুন একখানা রামায়ণ লেখা যায়। শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নুয়ে আসে। তাঁকে আমার শত শত নমস্কার। তাঁকে আর আলাদা করে লিখলুম না। এ-চিঠি যদি দয়া করে তাঁকে দেখতে দেন কৃতজ্ঞ হব।

এবার আমার আত্মপরিচয় দিলুম না। যদি আপনার কাছে সাড়া পাই পরে ওসব হবে। সাড়া পাব তো? না পেলে কিছু মনে করব না। বুঝব আপনি ও আপনার বন্ধু অক্ষম। আজ তা হলে আসি। সোনালী দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। একটি একটি করে দিন যায়, আর একটু একটু করে তলিয়ে যায়। যা করবেন জল্দি করবেন। নয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে। উত্তরের জন্যে ডাকঘরে রোজ বিশ্বাসী লোক পাঠাব। নমস্কার, রত্নভাই। ইতি।

আপনার শরণার্থিনী
শ্রীমতী দেবী

রত্ন এ চিঠি পড়ে প্রথমে কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। চমক বলে চমক! পাতায় পাতায় চমক, পদে পদে চমক! তারপর রোমাঞ্চ বোধ করল। কানে এল কাঁকনের কন কন, আঁচলের খস খস। ঘ্রাণে এল এসেন্সের সুরভি। প্রাণে এল প্রথম পরিচয়ের চাঞ্চল্য।

তারপর বেদনায় ঢলে পড়ল। তিন বছর আগে যা ঘটেছিল তার স্মৃতিও বেদনাবহ। তার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে ছিল এত দিন। সোনালী বোনের প্রতি আর কোনো কর্তব্য নেই, যা কিছু করণীয় তা করা হয়ে গেছে। কোথাকার কে একজন শ্রীমতী দেবী আজ আদিখ্যেতা করে মনে করিয়ে দিচ্ছেন সে-সব ঘটনা। সোনালী চলেছে পতনের পথে। গড়াতে গড়াতে নীচে থেকে আরো নীচে। সিঁড়ির ধাপ থেকে পা ফস্কে গেলে যেমন হয়। পা ফস্কে গেছে স্বেচ্ছায় নয়, আকস্মিকভাবে নয়, অপরের ধর্ষণে। তার জের এখনো মিটল না। মোমেণ্টাম এখনো থামল না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল পাশের ঘরের ব্রিজনন্দন। রত্নকে তড়িতাহতের মতো পড়ে থাকতে দেখে তার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কী! খুব কি খারাপ খবর!" রত্ন কথা কইতে গিয়ে দেখল কথা আসছে না। মুখ না মন কোনটা অসাড় কে জানে! কিন্তু চিঠিখানা সে ক্ষিপ্র হাতে খামে পুরে সরিয়ে রাখল। আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয়। ব্রিজনন্দন অবশ্য বাংলা পড়তে জানে না। অপ্রতিভ হল উভয়েই।

কলেজের বেলা হয়ে গেছল। কোনো মতে কয়েকটা ঘণ্টা কাবার করে বিকেলের দিকে প্রভাতের সঙ্গে দেখা। ততক্ষণে রত্ন কতকটা সামলে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে লজ্জায় জড়সড়। বাইরে দিব্যি সপ্রতিভ ভাব। দুই বন্ধুতে কথাবার্তা শুরু হল।

"শুনেছ, ললিত আমাদের না বলে অন্য একটা মণ্ডলীতে ভিড়েছে?"

"তাই নাকি? কার কাছে শুনলে?"

"আজ একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছি। মেয়েলি হাতের লেখা।"

"বেনামী চিঠি! মেয়েলি হাতের! কী করে বুঝলে?"

"মেয়েলি হাতের তা দেখলেই বোঝা যায়। বেনামী এটা আমার অনুমান। ভদ্রমহিলার নাম হয়তো শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী কি শ্রীমতী নিভাননী দেবী। মাঝখানটা চেপে গিয়ে লিখেছেন শ্রীমতী দেবী।"

প্রভাত কৌতূহলী হয়ে বলল, "কই, দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল, "দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়। তোমাকে দেখতে দিতে বলেছেন। চলো, আমার ঘরে চলো।"

চিঠি পড়ে প্রভাত রত্নর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। "অভিনন্দন। স্বয়ং শ্রীমতী তোমাকে চিঠি লিখেছে। তুমি এমন কী বিখ্যাত! সে তোমার চেয়ে বহুগুণ বিখ্যাত। অথচ তুমি তার নামটাই জান না। জানবে কী করে? রাজনীতিক মহলে তো মেশ না। কেন, তোমাকে বলিনি তার নাম একদিন গঙ্গার ধারে? মাস ছ'সাত আগে একদিন পূর্ণিমার রাত্রে? সেই যে গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।"

রত্ন ভুলে গেছল। মনে পড়ল শুধু একটি চিত্রকণা। "সেই যাঁর চোখে প্যাশন?"

"সেই।" প্রভাত বলল রহস্যময় ভঙ্গীতে। যেন জুজুর ভয় দেখাচ্ছে।

"সেই।" রত্ন নেতিয়ে পড়ল শঙ্কায়, নিরাশায়।

প্রভাত চাপা গলায় বলল, "শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে কানে এসেছে আরো জবর খবর। কশ্চিৎ সন্ত্রাসবাদী উপদল শ্রীমতীকে হস্তিনীর মতো সামনে রেখে হস্তী সংগ্রহ করছে। দেখছি ললিতকে দলে টেনেছে, এর পর তোমাকেও টানবে। কোনখানে কার দুর্বলতা সেটা ওদের অজানা নয়, সেইখানেই ওদের আবেদন। তোমার দুর্বলতা তুমি নারীর অপমান শুনলে লাফ দিয়ে ওঠ। ডন কুইকসোটের মতো ছোট আর ছোটাও। তারপর তুমি খেলোয়াড়ের মতো বসে থাক আর আমি লাটুর মতো বন বন করে ঘুরি। প্রভাত শর্মা কারিৎ কর্মা। রত্ন বর্মা স্রেফ অকর্মা।"

রত্ন মাথায় হাত দিয়ে বসল। এর মধ্যে এত কথা আছে!

তার চেহারা দেখে প্রভাতের মায়া হল। "থাক, তোমাকে ও চিঠির জবাব দিতে হবে না। আমি দু'জনের হয়ে জবাব দেব। কী লিখব, শুনবে?"

রত্ন চোখ তুলে তাকাল। প্রভাত লিখবে শুনে আশ্বস্ত। কী লিখবে শুনতে উৎসুক।

"লিখব, ভদ্রে, আমরা তিন বছর আগে পরাজিত হয়েছি। আর নতুন করে লড়তে ইচ্ছা নেই। আপনি অপর সৈনিক সন্ধান করুন।"

রত্ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "বেশ, তাই হোক। তুমিই এ চিঠির উত্তর দিয়ো। তবে আমারও এক লাইন লেখা উচিত। না লিখলে অসৌজন্য হবে।"

"কী লিখতে চাও তুমি?"

"লিখব, দিদি, আপনার পত্রের উত্তর প্রভাত দিচ্ছে। ওটা আমারও উত্তর।"

প্রভাত তার রোমশ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "দিদি! দিদি কেন?"

"রত্নভাই বলে ডাকছেন যখন তখন নিশ্চয় বয়সে বড়।"

"দেখে তো তা মনে হয়নি তখন। খ্যাতিটা বয়সের অনুপাতে বেশী।"

রত্ন মনে মনে এই সংবাদটি জানতে চেয়েছিল। আর একটি সমাচার জানতে বাকী ছিল তার। তা না না না করে প্রশ্নটা তুলল। তুলতে গিয়ে রেঙে উঠল।

তার উত্তরে প্রভাত দুষ্টু হেসে বলল, "হাঁ। বিবাহিতা। লক্ষ্য করনি, 'ললিত আমার ননদের দেওর?' বিয়ে না হলে ননদ হয় কখনো?"

রত্নর খেয়াল ছিল না। অপ্রস্তুত হল।

তারপর প্রভাত বলল রীতিমতো গম্ভীর হয়ে, "রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না।"

রত্ন আশ্চর্য হল। "সে ভয় নেই। আমার মালা আছে। আমি মালা জপ করি। তা কি তুমি জান না?"

এদিকে ব্রিজনন্দন, বিদ্যাপতি, মকবুল আহ্‌মদ প্রভৃতি সতীর্থরা এসে হাজির খোঁজ নিতে। কী এমন খারাপ খবর যে রত্ন কাহিল হয়ে পড়েছে। ওদিকে প্রভাতেরও সময় হয়ে যাচ্ছিল ইউ টি সি'র। কথাটা তখনকার মতো তোলা রইল।

সে রাত্রে শুতে যাবার আগে রত্ন গেল প্রভাতের ঘরে। বলল, "ভেবে দেখলুম আমরা পরাজিত হইনি। কেন তা হলে পরাজয় স্বীকার করব? অন্য ভাবেও তো উত্তর দেওয়া যায়।"

প্রভাত কুচকাওয়াজের দরুন ক্লান্ত ছিল। বলল, "বেশ তো। তুমিই দিয়ো। ও কী চায় তা বুঝতে পেরেছ? ও চায় তুমিই সোনালীকে বিয়ে কর।"

"সোনালী যদি ভালোবাসত আমাকে আর আমি ভালোবাসতুম তাকে," রত্ন ঢোক গিলে বলল, "তা হলে বিয়ে করার কথা উঠত।"

"তা যখন নয় তখন কী করার কথা ওঠে? ও যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে কোথায় রাখতে তুমি? বোনের মতো নিজের বাড়িতে?"

"বাড়ি আমার নয়, আমার বাবার। তিনি রাজী হলে তো? না, ভাই। সে আশা নেই।" রত্ন আক্ষেপ করল।

"তা হলে নিজের বাড়ি যত দিন না হয়েছে তত দিন সবুর করতে হয়। তত দিন সোনালীকে ভরসা দিতে চাও, দিতে পারো। কিন্তু তুমি কি জানো ঠিক কত দিন পরে তোমার নিজের বাড়ি হবে? আর সে-বাড়িতে কার অধিকার বেশী বৌয়ের না বোনের? বৌ এলে বোনকে বিদায় করে দেবে না?"

রত্ন সম্পূর্ণ অপদস্থ হল। "সোনালী কি তা হলে ওইখানেই থাকবে?"

"অগত্যা। হিন্দু সমাজে থাকলে ওই তার ঋষিনির্দিষ্ট স্থান। মুসলমান বা খৃষ্টান হলে অন্য গতি ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ বলছি যে, সমাজে কি ওর কেউ আছে? ও তো সমাজের বাইরে। তা হলে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দিলে ক্ষতি কী? তবে বিয়েটা একটা সমাধান নয়। দেখছি তো রানুকে।"

রত্ন জিজ্ঞাসা করল, "রানু কেমন আছে, প্রভাত?"

"বেঁচে আছে। থাকবে যতদিন না আমার বিয়ে হয়েছে।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রভাত। "মানুষ বাঁচে আশায়। ওর ওই একটিমাত্র আশা যে আমি আইবুড় থাকব।"

"ও বাঁচবে না জেনেও কি তুমি বিয়ে করবে?"

"আমার তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়। আমি চাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।"

"তা বলে একটি নারীর জীবনের বিনিময়ে!" রত্ন অনুযোগ করল।

প্রভাত বলল ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে, "সেইজন্যেই তো বলি আমরা পরাজিত।"

"না। আমরা পরাজয় স্বীকার করব না।" রত্ন বলল দৃপ্ত স্বরে।

"তা হলে তুমিই বল রানুকে নিয়ে আমি কী করি।"

"রানু তোমাকে ভালোবাসে। তুমি রানুকে ভালোবাস। ভালোবাসার আইন আর বিয়ের আইন এ-দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসারেই মানুষ চলবে। সমাজ যদি মানুষের সমাজ হয়ে থাকে তবে সমাজও চলবে। ভালোবাসার আইন কী করতে বলে? বলে, রানুকে বাঁচাও। যা করলে ও বাঁচে তাই কর। ওর স্বামীকে বল ওকে ছাড়পত্র দিতে। তারপর ওকে নিয়ে সংসার পাত।"

"বিয়ে না করেও?"

"সম্ভব হলে বিয়ে করে। না হলে না করে।"

প্রভাত স্তম্ভিত হয়ে বলল, "রত্ন, ছি!"

রত্ন নিরস্ত হল না। বলে চলল, "পরাজয় বরণের চেয়ে লোকনিন্দা বরণ শ্রেয়। প্রভাত, তুমি যদি জীবনের প্রথম অধ্যায়ে পরাজয় মেনে নাও তা হলে তোমার ভাঙা মাজা জোড়া লাগবে না আর। পার্থিব সাফল্য নিয়ে তুমি করবে কী! তার চেয়ে স্পৃহণীয় মহৎ কর্মে বিফলতা। তেমন বিফলতা পরাজয় নয়।"

প্রভাতের স্বর কাঁপছিল আবেগে। "ভাই, তোমার যুক্তির জোর আমি মানি। কিন্তু আমার শক্তির দৌড় আমি জানি। আর রানুকে তো আমি চিনি। সে তার স্বামীটিকেও ছাড়বে না। স্বামী ছাড়পত্র দিলে সেই মুহূর্তেই মারা যাবে।"

রত্ন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ ঘা খেয়ে "য়্যাঁ" করে উঠল।

প্রভাত তাকে প্রবোধ দিল। "রত্ন, তুমি সরল মানুষ। জটিলকে সরল করে এনে সমাধান করতে চাও। যেমন করে অঙ্ক কষতে। জীবনে তা হয় না। জটিলকে জটিল রেখেই সমাধান খুঁজতে হবে। রানু যে আমাকে না পেলে বাঁচবে না এটা সত্য। তেমনি ওটাও সত্য যে সে যাঁর সঙ্গে মন্ত্র পড়েছে, অগ্নি সাক্ষী করে যাঁর হাত ধরেছে, যাঁর ঘরে ঘরণী হয়েছে, যাঁর স্বজনদের বৌমা বৌদি কাকিমা মামিমা হয়েছে

যাঁর সন্তানের মা হবে কে জানে কোন দিন," বলতে বলতে প্রভাতের গলা ধরে এল, "তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। ভালোবাসার আইন অনুসারে চলবে যে, ভালোবাসা কি তাঁদের দিক থেকে নেই, তাঁদের উপর নেই? আর সমাজ-ভয় তো মেয়েদেরই বেশী। পুরুষ দু'দিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়। নারী কি ঘরের বৌ ঘরে ফিরতে পারে!"

রত্ন কোথায় একটু সহানুভূতি দেখাবে, না রেগে আগুন হল। "ওসব সংসারী লোকের যুক্তি। প্রেমিক পুরুষের নয়। প্রেম অসাধ্য সাধনের সংকল্প নেয়। চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা সুযোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান।"

প্রভাত রুদ্ধশ্বাসে বলল, "একে তুমি সুযোগ বল, রত্ন! আমার মতো অভাগাকে ঈর্ষা কর তুমি! এমন দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয়।"

"ভাই প্রভাত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তুমি নারীর প্রেম পেয়েছ। আমি পাইনি। তুমি ধন্য। আমি নই। তোমার কপালে রাজটীকা। আমার কপালে ভাইফোঁটা। মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না। রানু তোমাকে তার বেশী দিয়েছে, আরো দেবে যদি তুমি তার প্রেমের মর্যাদা রাখ।"

প্রভাতের চোখ বুজে আসছিল ঘুমে। সে কী মনে করে বলল, "রত্ন, জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান? তার উপর আর কিছু নেই?"

রত্ন সকালবেলার উদ্দীপনায় তখনো উদ্দীপ্ত ছিল। বলল, "রাধার প্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। তার উপরে যদি কিছু থাকে, তবে তা সে-ই দেখতে পায় যে তত দূরে উঠেছে।"

তার পর সে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

॥ তিন ॥

কয়েকবার মুসাবিদা করার পর রত্নর উত্তর অবশেষে এই রূপ নিল।

অচেনা অজানা বোন,

বছর তিনেক আগে যে যন্ত্রণা আমাকে অধীর করে তুলেছিল আজ এত কাল পরে তার পুনরাবৃত্তি আমাকে দ্বিতীয়বার অস্থির করলেই কি আমি এক হাতে কিছু করতে পারব? সোনালীর কথা বলছি।

আপনি যা লিখেছেন তা আপনার যোগ্য হয়েছে। এই তো চাই। আমাদের মেয়েরা তাদেরই মতো আর কয়েকটি মেয়েকে বিপন্ন দেখে মুখ ফিরিয়ে না নিলে, ঘৃণা না করলে, সোনালীরা এমনভাবে নির্যাতিত হত না। তাদের বিয়ে হত, ঘর-সংসার হত, লোকে ভুলে যেত সাময়িক একটা দুর্ঘটনা। যেমন ভুলে যাবে বড় রাবণ ও ছোট রাবণের বেলা। যদিও তাদের শাস্তি উচিত ছিল। এমনি আমাদের সমাজ যে উদোর শাস্তি পড়ল বুধোর ঘাড়ে। ভুগতে হল সোনালীকে। রামায়ণের যুগেও যত দুর্ভোগ সীতারই। রাবণের আর কী এমন দুর্গতি হল? সে তো রামের হাতে মরে স্বর্গে গেল। শত্রু-রূপে সাধনা করলে ভগবানকে তিন জন্মে পাওয়া যায়। ভক্তরূপে সাত জন্মে। পুরুষ যাই করুক না কেন তার সাত খুন মাফ। যত নির্দোষ হোক না কেন সাজা কেবল নারীর বেলা। আমি কিন্তু অবাক হই ভেবে যে মেয়েরা কেন এটা মেনে নেয়, কেন নারীর পক্ষ নেয় না, কেন সীতার পক্ষ নিল না সেকালে, সোনালীর পক্ষ একালে? তার চেয়ে আরও অবাক হচ্ছি দেখে যে এ পোড়া দেশে এত যুগ পরে এমন একটি মহিলার অভ্যুদয় হয়েছে যিনি সোনালীর পক্ষে।

অচেনা অজানা বোন, কেন আপনি এলেন না তিন বছর আগে যখন আমাদের প্রেরণা দিতে কেউ ছিল না? এলেন যদি, তবে এত দেরিতে কেন? আমাদের মণ্ডলী ভেঙে যাবার সামিল। আমরা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছি। মতভেদ ও পথভেদ দেখা দিয়েছে। একজোট হয়ে আর আমরা কাজ করিনে। করতে পারিনে। প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, আমরা পরাজিত। আমরা নতুন করে লড়তে অনিচ্ছুক। আমি অবশ্য স্বীকার করব না যে আমরা পরাজিত। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধনা আছে। আমি যাকে ভালোবাসব তার ভালোবাসা পেলে তাকেই বিয়ে করব, যদি বিয়ের উপায় থাকে। কিংবা যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার ভালোবাসা পেলে সে-ই হবে আমার বধূ, যদি বিশেষ কোনো বাধা না থাকে। ভালো-বাসার আইন ও বিয়ের আইন এ-দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসরণ করব। একসঙ্গে থাকব। ভালো-বাসা যত দিন একসঙ্গে থাকা ততদিন। হয়তো আজীবন।

সোনালীকে আমি চোখেও দেখিনি। ভালোবাসা তো দূরের কথা। সে হয়তো আমার নামটাও শোনেনি। ভালোবাসা তো আরো সুদূর। এমন অবস্থায় বিয়ে করতে আমার সাধনায় বাধে। বিয়ে করলে পরে হয়তো একপ্রকার ভালোবাসা জন্মায়, কিন্তু সে-ভালোবাসা প্রেমিককে নয়, স্বামীকে। প্রেমিকাকে নয়, স্ত্রীকে। সে না হয়ে আর কেউ যদি স্বামী হত বা স্ত্রী হত তবে তাকেও ঠিক তেমনি নির্ধারিত মাপে ভালো-বাসা মেপে দেওয়া যেত। এক ছটাক এদিক ওদিক হত না। অর্থাৎ এ হল কর্তব্য হিসাবে ভালোবাসা। সংসারে এ-রকম ভালোবাসাই বেশী চলতি। সাধারণ লোক প্রায়ই ভাবে যে আগে তো বিয়েটা কোনো মতে হয়ে যাক, তারপর ভালোবাসা আপনি জন্মাবে। আশ্চর্য হচ্ছি, আপনিও এমন ধারা ভাবেন। আপনিও! আপনার মতো অসাধারণ নারীও!

বিপন্না কুমারীকে শত ভাবে সাহায্য করা যায়। কিন্তু জোর করে ভালোবাসা যায় না। জোর করে ভালোবাসা, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে হরণ করা এসব একই মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। জোর। জোর। জোর। জোরকে যারা নারীর ইচ্ছার উপর জিতিয়ে দেয় আমি তাদের কেউ নই। আমি বলি, জোর কিছুতেই জিতবে না, জোরকে কিছুতেই জিততে দেওয়া হবে না। সেই আমি কখনো জোর করে ভালোবাসতে পারি! জোর করে ভালোবাসা আদায় করতে পারি! না, বোন। তাতে বিপন্নাকে আরও বিপন্ন করা হয়। অন্য সমাধান খুঁজতে হবে। তিন বছর আগে আমরা অন্য সমাধান খুঁজেছিলুম।

এক দিন দুপুরবেলা কানন এসে খবর দেয় তার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বিবাহ-যোগ্যা রূপসী কন্যা সোনালীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেছে। আগের রাত্রে কীর্তন-মহোৎসব ছিল পাড়ার বড় বাড়িতে। যেমন প্রতি মাসে হয়। কীর্তন শুনতে সোনালীরা তিন বোন পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যায়। কীর্তনের শেষে সবাই ফিরল, ফিরল না শুধু একজন। হরির লুটের গোলমালে পাঁচশো লোকের ভিড়ে সোনালী লুট হয়ে গেল। কেউ টের পেল না। তারপর খোঁজ খোঁজ। সারারাত খুঁজে হারানিধি পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি বড় বাড়ির বাবুরাই সেইভাবে নারী সংগ্রহ করে কোথায় লুকিয়ে রাখে।

কাননের মুখে বৃত্তান্ত শুনে আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। গেলুম আমরা সোনালীর বাপের কাছে। লোকটি পাঠশালার পণ্ডিত। গরিব লোক। এমন ভিতু যে পুলিশেও খবর দেবে না, আদালতেও যাবে না, পঞ্চায়েৎও ডাকবে না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়! ও মেয়ের তো বিয়ে হবেই না, পাছে ওর ছোট বোনদেরও বিয়ে না হয়! আর সমাজটিও এমন যে পরিবার-সুদ্ধ সবাইকে পতিত করবে। আর রায়-বাহাদুর যদি শুনতে পান যে তাঁর ছেলে-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হলে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতে কতক্ষণ! মহাজনও তিনি, জমিদারও তিনি, উকিল মোক্তারের [illegible]

কর্মচারীদের চাঁদার ভাণ্ডারীও তিনি, নিম্নতর কর্মচারীদের বংশশের কাণ্ডারীও তিনি, পূজাপার্বণ কমিটির সভাপতিও তিনি, রাজপুরুষদের সভাসদও তিনি। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ!

প্রভাত একজন ঝানু ডিটেকটিভের মতো শহরের অন্ধিসন্ধি ঘুরে রাত্রে এক গাড়োয়ানের কাছে সন্ধান পেল যে বাবুদের বাগানবাড়িতে আগের রাত্রে একটি অল্প-বয়সী মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেয়েটি খুব কাঁদছিল। প্রভাত সেই লোকটির গাড়িতে করে শহরের দু মাইল দূরে সেই বাগানবাড়িতে যায় ও মালীদের সঙ্গে ভাব করে। ধর্মাধর্মজ্ঞান তাদেরও ছিল। অন্ধকারে পা টিপে টিপে মালীদের এক-জনের সঙ্গে প্রভাত বাগানবাড়ির বারান্দায় ওঠে, কাঁচের জানালা দিয়ে সোনালীকে দেখতে পায়। সে কাঁদছে, কেঁদে মিনতি করছে, আমাকে ছেড়ে দিন, বড় দাদাবাবু। আপনার পায়ে পড়ি, মেজ দাদাবাবু। তা নিয়ে হাসাহাসি পড়েছে ইয়ারবকশী মহলে। আরো কয়েকটি স্ত্রীলোক রয়েছে সেখানে। তারাও হাসছে।

থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করল প্রভাত। দারোগা বলল, বাপ কাকা যদি না আসে, নিকট আত্মীয় যদি না আসে, তা হলে কার কথায় আমরা কেস রুজু করব? বাইরের লোকের কথায়? তোমার মতলব কী, হে ছোকরা! কবে থেকে এমন সাধুপুরুষ বনলে! ওরা ভোগ করছে, তোমায় ভাগ দিচ্ছে না, এই তো তোমার প্রাণের কথা!

প্রভাত চলল উকিলের কাছে। ইনি একজন ত্যাগী ব্যক্তি। টাকার খাঁই নেই। বললেন, যাদের সঙ্গে ঝগড়া তারা লাখ টাকা খরচ করবে, বার-এর সেরা মাথাগুলো কিনে নেবে, সাক্ষী ভাঙিয়ে নেবে, ঘুষ দিয়ে লাল করে দেবে পুলিশকে। প্রথম তাস আমার হাতে, কিন্তু হাতের পাঁচ ওদের হাতে। সোনালীকে দিয়েই ওরা বলিয়ে নেবে যে সে কাউকেই সনাক্ত করতে পারবে না, কেউ তার আগে থেকে চেনা নয়।

তখন প্রভাত চলল নেতাদের কাছে। সঙ্গে আমরাও ছিলুম। তাঁরা বললেন, শয়তানী সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করার পর তার থানায় বা আদালতে যাওয়া দেশদ্রোহ। পঞ্চায়েৎ ডাকলে অপর পক্ষ আসবে না, সোনালীকে হাজির করবে না। দাঁড়াও, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হতে যাচ্ছে, ভারত উদ্ধার হলে তখন কি আর সোনালী উদ্ধার হবে না! গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে শুভদিনটিকে এগিয়ে দাও তোমরা। সোনালী অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না।

আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু প্রভাত ছাড়বে না। সে চলল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয়। সঙ্গে হৈম। ওর ইংরেজীর উচ্চারণ নিখুঁত। সাহেব বললেন, আমি আপনাদের উক্তির উপর নির্ভর করে সার্চ ওয়ারেণ্ট ইস্যু করছি। আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। অসহযোগ করেই তো দেশটা গেল। আশা করি আপনাদের বোনটিকে আপনারা আজকেই ফিরে পাবেন।

সাহেবের হুকুম। পুলিশের লোক তৎক্ষণাৎ রওনা হল। কিন্তু সোজা রাস্তায় গেল না। বাবুদের প্রকারান্তরে জানিয়ে রাখল যে তাদের পৌঁছতে যেটুকু দেরি হবে সেইটুকুই সোনালীকে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। হলও তাই। রিপোর্ট গেল যে বাগানবাড়িতে একটিও স্ত্রীলোক নেই, সোনালী নামে কোনো মেয়েকে দেখিয়ে দিতে পারেনি প্রভাত বা হৈম। ওদিকে রায়-বাহাদুর সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে মোলাকাত করে বললেন, আমি সদাচারী হিন্দু। আমার ওটা ভজনকুটীর। ওখানে স্ত্রীলোক আসবে কোন্ সূত্রে। পুলিশ ওখানে হানা দেওয়ায় আমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক লেগেছে। ওটা কংগ্রেসের কারসাজি। প্রভাত হৈম কংগ্রেসের এজেণ্ট। প্রভাত তো জেল খেটেছে। আমি আর এ প্রাণ রাখব না। একে তো আমি রায়বাহাদুর বলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। কোন দিন ও সার্চ ওয়ারেণ্ট পত্রিকায় ছাপা হবে।

সার্চ ওয়ারেণ্ট রদ হল। সাহেব প্রভাতকে হৈমকে দর্শন দিলেন না। ওদের পিছনে গুণ্ডা লাগল। কোন দিকে কোন প্রতিকার না পেয়ে প্রতিকারের আশা না দেখে আমরা নিবৃত্ত হলুম। প্রভাত বলে, ওটা পরাজয়। আমি বলি, বিফলতা। সোনালীর জন্যে হাতে কলমে কিছু করতে পারা গেল না বলে তখন থেকেই আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। এটা সব সময় খচখচ করে না। কিন্তু যখন করে তখন বড় ব্যথা দেয়। তখন বার বার জপ করি, force shall not win. কেবল সোনালীর বেলা নয়, যে কোনো মেয়ের বেলা। আমি হলুম স্বভাবত knight। আমার ব্রত হল lady বিপদে পড়লে তাঁকে বিপন্মুক্ত করা। কিন্তু সাধ্যে যদি না কুলোয়, সাধনায় যদি বাধে তা হলে আমি কী করি! ইতি।

আপনার রত্নভাই।

চিঠিখানা শেষ করে ডাকে দেবার আগে প্রভাতকে একবার দেখতে দিল রত্ন। প্রভাত বলল, "লিখেছ ভালোই, কিন্তু 'আমি পরাজিত' বা 'আমি অক্ষম' এই কথা ক'টি এড়াতে গিয়ে এ যা করছে এ তো এক প্রকার ইঙ্গিত যে সোনালী যদি তোমাকে ভালোবাসে তা হলে তাকে তুমি বি করবে। অবশ্য আরো একটা যদি আ যদি তুমিও তাকে ভালোবাসো। কি কার্যকালে দেখবে একটি প্রেমে-পড়া নারী প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ নয়। তার যদি সত্য হয় তোমাকে চুম্বকের ম টানবে। তুমি ভালো না বাসলেও তোমাকে ভালোবাসাবে। ভালোবাসা ছাড়বে। তখন দেখবে বিয়ে না করাট কাপুরুষতা। তখনি শুরু হবে তোম অনুশোচনা। বিয়ে করলেও পস্তাবে, করলেও পস্তাবে। আর যদি বিয়ে ক বিয়ে ভেঙে দাও সেটা হবে কাপুরুষতা চূড়ান্ত। অমানুষতা।"

রত্ন ভেবে বলল, "তা নয়। প্রশ্নটা এ রকম। একটি অনিচ্ছুক নারীর উপ জোর খাটানো হয়েছে। যারা খাটিয়ে তারাই জিতবে? সে হারবে? এ কথ হতে পারে? হওয়া উচিত কখনো আমরা যারা একালের নাইট তারা আ কী করতে? না। হারতে দেওয়া হবে ন সোনালীকে। তার মনোবল যাতে অটু থাকে সেজন্যে বিয়ের পথ খোলা আ বলতে হবে। খোলা রাখতে হবে। কোনে দিন কোনো অবস্থায় তাকে আমি বিয় করব না, কেন এ-কথা বলতে যাব? য অভাবিত তাও সময় সময় ঘটে। আমি শুধু লক্ষ্য রাখব যে আমার প্রেমের মান উচ্চ আছে। মালাদির খাতিরে না সোনালীর খাতিরে না, দুনিয়ার কারো খাতিরে আমি আমার প্রেমের মান খাটো করব না। তেমনি স্বাধীনতার মান।"

প্রভাত বলল, "বুঝেছি। কিন্তু জোর কি ওই একটি মেয়ের উপর খাটানো হয়েছে? জোর কি রানুর উপর খাটানো হয়নি? অং বং দুটো সংস্কৃত মন্ত্র পড়লেই কি সেটা ধর্মাচরণে পরিণত হয়? কিন্তু তার তুমি কী করছ, বল? কী করতে পারো? নাইট যদি আমরা তো কই আমাদের ঢাল তলোয়ার? ওহে নিধিরাম, তিন বছর আগে সাত ঘাটের জল খেয়েও তোমার শিক্ষা হয়নি? কবে হবে? আমার কথা যদি বল, আমি আর লড়তে যাচ্ছিনে। সোনালীর যা হয় হবে, রানুর যা হয় হবে। আমি কাউকে আশাও দেব না, কারো আশাভঙ্গও ঘটাব না। তোমাকেও বলে রাখছি, এখন থেকে তোমার যুদ্ধ তোমার। তুমি লড়বে, আমি পড়ব।"

আক্ষরিক অর্থে না হলেও প্রভাত সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে দুটি অভাগিনী নারী। একটি সমাজ

বিরুদ্ধভাবে ধর্ষিতা। অপরটি সমাজ-সম্মতভাবে।

"আচ্ছা।" বলে রত্ন প্রভাতের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিঠিখানা দিয়ে এল ডাকে। কাটকুট করল না। স্বীকার করল না যে সে পরাজিত বা অক্ষম। তার দরজা খোলা থাকল সব অপমানিতা নারীর জন্যে। কেউ বা সোনালীর মতো, কেউ বা রানুর মতো।

শ্রীমতীর চিঠি পাওয়ার পর থেকে শ্রীমতীকে চিঠি লিখে ডাকে দেওয়া পর্যন্ত এই কদিন রত্ন অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পায়নি। উত্তেজনা প্রশমিত হলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল যে আকস্মিক ব্যাঘাতে কী যেন একটা সুর হারিয়ে গেছে। কথা হারিয়ে গেলে কথা মনে পড়ে। সুর হারিয়ে গেলে তাকে ফিরে পাওয়া কঠিন। তাকে বিমূঢ় করল এ ক্ষতি।

প্রভাত যেমন তার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাপতি তেমনি নতুন বন্ধুদের মধ্যে। ঢেউ খেলানো বড় বড় চুল, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গোলগাল মানুষটি দিনরাত কাব্যচর্চায় বিভোর। তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত অল্পবয়সী আরেক জনকে। তার নাম অঞ্জন। স্বপ্নবিলাসী কবিপ্রকৃতির। এরা আর এদের মণ্ডলী রত্নকেই মধ্যমণিরূপে বরণ করেছিল। যাকে বলে বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী। এদের আলাপ-আলোচনা পার্থিব লাভালাভের নয়, সমাজ ভাঙাগড়ার নয়, দুর্বলকে রক্ষা করার নয়। এরা অমৃত আস্বাদন করে পরস্পরকে ভাগ দেয়। কে কী নতুন বই পড়েছে, নতুন ভাব আবিষ্কার করেছে, নতুন রস আহরণ করেছে, নতুন প্রেরণা পেয়েছে জানায় ও জানে। রত্ন এদের নিয়ে গঙ্গার ধারে আড্ডা দেয়। বৃষ্টি পড়লে বিদ্যাপতির ঘরে।

এটা জীবন থেকে পলায়ন নয়। এটাও জীবন। একে উপেক্ষা করে কেবল আঘাত সংঘাত নিয়ে মত্ত থাকলে সেই মত্ততার ফাঁক দিয়ে এমন কিছু হারিয়ে যায় যার জন্যে পরে আফসোস করতে হয়। জগতে মন্দ থাকবে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকবে, এই যদি হয় শেষ কথা তা হলে সৌন্দর্য হবে প্রথম ক্যাজুয়ালটি। সত্যও কি ক্যাজুয়ালটি হবে না? দ্বন্দ্বসর্বস্ব মন সত্য আর সৌন্দর্য উভয়কেই অবহেলা করবে, উপবাসে রাখবে।

শ্রীমতীর উপর রত্ন মনে মনে বিরক্ত হল। বেশ তো ছিল সে তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে। কেন তাকে পুরাতন মণ্ডলীর প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেওয়া? সোনালীর কথা মনে করিয়ে দেওয়া কেন? 'অক্ষম' বলে চ্যালেঞ্জ করা কেন?

হারানো সুর খুঁজে পাওয়া যায় না। মন বিরস হয়ে যায়।

"রত্ন, তোমার কী হয়েছে? অমন মনমরা কেন?" বিদ্যাপতি শুধায়।

"কী যেন একটা সুর ছিল, হারিয়ে গেছে, মিলছে না।"

"কী সুর?"

"গানের সুর নয়। কবিতার সুর নয়। জীবনের সুর।" রত্ন বোঝাতে পারে না।

"কী করে হারাল?"

"একখানা চিঠি পেয়ে ও তার জবাব দিতে গিয়ে।"

"ওঃ! সেই খারাপ খবর!" বিদ্যাপতি শোক ভেবে সান্ত্বনা দিতে গেল।

রত্ন তার ভ্রান্তি মোচন করল না। ভেঙে বলল না কী খবর। কে দিয়েছে।

সিন্ধুপ্রদেশ থেকে একজন বিখ্যাত সুধী এসেছিলেন। বিদ্যাপতি, অঞ্জন ও রত্ন তিনজনেই এঁর রচনা অনেক দিন থেকে পড়ে আসছিল, পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল। অন্তরে সৌন্দর্য না থাকলে যা হয় তা নিছক বাক্যযোজনা, কিন্তু এঁর প্রত্যেকটি বাক্য সুন্দর। মানুষটি সুন্দর কি না দেখতে তিনজনেরই কৌতূহল ছিল। গেল দেখতে।

তাদেরই মতো বিশ পঁচিশ জন শ্রোতা ও দর্শনার্থী তাঁর সামনে বসে ছিল মাটিতে। তিনিও মাটিতে। সকলের অনুরোধে তিনি কিছু বললেন। নীর ও ক্ষীর একসঙ্গে মিশে রয়েছে। হংস জানে কোনটা ক্ষীর। কেবল সেইটুকু বেছে নেয়। এই যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জানা এরই নাম জ্ঞান। এটি যাঁর আছে তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানীদের অপর নাম হংস। নীর হল তথ্য। ক্ষীর হল সত্য। এক রাশ তথ্য নিয়ে আমরা কী করব, যদি অন্তর্নিহিত সত্যটুকু দেখতে না পাই, চিনতে না পারি! ডিগ্রী পাব,

আমাকে ছেড়ে দিন...আপনার পায়ে পড়ি

'ডিগ্রী ভাঙিয়ে চাকরি পাব, চাকরি ভাঙিয়ে নিরাপদ জীবনযাত্রা পাব, এই যাদের ভাবনা তাদের সিদ্ধিও তাদৃশ। কিন্তু সত্য অত সহজে ধরা দেয় না, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মনে হয় জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।

ফেরবার পথে রত্ন বলল, "কই, দেখতে তো তেমন সুন্দর নয়!"

বিদ্যাপতি বলল, "রীতিমতো কদাকার।"

অঞ্জন বলল, "তোমরা নীর থেকে ক্ষীর নিতে জান না। চোখ দুটি মাঝে মাঝে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন চোখের ঝরোকা দিয়ে অন্তর উঁকি মারে।"

এ-কথা শুনে রত্ন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার মনে পড়ে গেল শ্রীমতীর চোখে প্রভাত কী লক্ষ্য করেছিল। প্রভাতের সাক্ষ্য যদি সত্য হয় তা হলে শ্রীমতীর চোখের ঝরোকা দিয়ে কিসের আভাস পাওয়া যায়?

"কি হে, কী ভাবছ?" প্রশ্ন করল বিদ্যাপতি।

"কিছু না।" উত্তর দিল রত্ন।

"বুঝতে পারছি তুমি নিরাশ হয়েছ। তা কী করবে, বল! কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।" অঞ্জন সহানুভূতি জানাল।

"তা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা।" কিন্তু কী কথা সে খুলে বলল না।

হস্টেলে পৌঁছে দেখল তার নামে চিঠি এসেছে। আবার সেই মেয়েলি হাতের। এবার আর অচেনা নয়। রত্ন তা দেখে প্রসন্ন হল না। চিঠিখানা ঠেলে সরিয়ে রাখল। খানকয়েক পোস্ট কার্ড ও পত্রিকা এসেছিল। সেগুলি পড়ল।

কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি তাকে সমস্তক্ষণ টানছিল। টানছিল সুগন্ধ দিয়ে, সুরূপ দিয়ে। টানছিল চুম্বকের মতো। না খুলে তার উপায় ছিল না ওই খাম।

প্রিয় রত্নভাই,

আমার চিঠির উত্তরে আপনি যা লিখেছেন তা আমার পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু আমি তো আমার জন্যে কিছু চাইনি। চেয়েছি সোনালীর জন্যে। তাকে আপনি কী দিলেন? একটি ভালো মেয়ে, ভালো ঘরের মেয়ে পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন গভীর থেকে গভীরে। আপনি তো উপদেশ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। পাঁকে নামবে কে? এ কি আমার কাজ!

ভীষণ রাগ হল আপনার উপর, প্রভাতদার উপর। পরে ভেবে দেখলুম আপনাদের দোষ কী! আপনারা তবু চেষ্টা করেছেন। আপনাদের উপর যদি ভীষণ রাগ করি, তবে যারা নিশ্চেষ্ট তাদের উপর কী করব! ভীষণতর রাগ? আর যারা শয়তান তাদের উপরে? মহিষমর্দনের সময় চণ্ডী যা করেছিলেন? জিঘাংসা? কিন্তু তাদের গায়ে আঁচড়টি দেয় কার সাধ্য! একখানা চিঠি লিখেও যে ক্রোধ জানাতে পারি সে সাহস আমার নেই।

আমি অসহায়, পরম অসহায়। আমাকেই কে বাঁচায় তার ঠিক নেই। আমি কাকে বাঁচাব! কিন্তু সে-কাহিনী আরেক দিন। তার আগে আপনাকে বলব রূপালীর গল্প। সেও আজ নয়। আজ আমার মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। কিন্তু শুনে আপনি হয়তো আবার পাশ কাটিয়ে যাবেন। আপনার দার্শনিকতায় আমি আবার অভিভূত হব। তার পর দেখব সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। জলে নামবে না কেউ। নিমজ্জমানকে কূলে বসে উপদেশ দেবে। তবু এক দিন শোনাব আপনাকে। আর কিছু না হোক চমৎকার একখানা চিঠি পাব আপনার। আমার পত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে একটি রত্ন।

আমার ক্রমে প্রত্যয় হচ্ছে প্রেমই এর একমাত্র সমাধান। একজন প্রবল পুরুষের প্রবল প্রেম ভিন্ন সোনালীকে পাঁক থেকে তোলার আর কোনো কার্যকর উপায় নেই। সাধারণ পুরুষের সাধারণ করুণা দিয়ে এ-সব সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু কোথায় সেই প্রবল পুরুষ? কোথায়ই বা তার প্রবল প্রেম? এই নিরস্তপাদপ দেশে যাদের দেখি তারা কাপুরুষ বা কিংপুরুষ। আর তাদের প্রেম? ঘেন্না ধরে গেছে তার উপর। প্রেম না শেম!

ললিতের মুখে যা শুনেছিলুম তার কতক সত্য। আপনি অনন্য। আপনার সঙ্গে চেনা হল, আপনাকে ভালো লাগল এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু মাছ আমাকে ছাড়তেই হল। পরশু আপনার চিঠি পেয়ে আমার মৎস্য-বাসনা লোপ পেয়েছে। আর খাইনি। ইতি।

আপনার শ্রীমতী বোন।

॥ চার ॥

শ্রীমতীর দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে রত্ন আগের মতো বিমূঢ় হল না, কিন্তু বেদনা বোধ করল তেমনি বা তার চেয়ে বেশী। এই মেয়েটি কে তা সে জানে না, কার কন্যা কার স্ত্রী কাদের আত্মীয়া প্রভাত তাকে এ-সব বলেনি। যেই হোক, আর একটি মেয়ের জন্যে কেউ কিছু করছে না দেখে মনের দুঃখে অশন ত্যাগ করল। আংশিকভাবে অবশ্য।

শ্রীমতী কি চায় যে সহানুভূ[illegible] রত্নও তাই করে? না শ্রীমতীর হচ্ছ[illegible] লজ্জিত হয়ে রত্ন সোনালী সম্বন্ধে [illegible] ভাবে?

স্বীকার না করলে কী হবে, তার অগোচরে সেও দরজা বন্ধ করে দি[illegible] পরাজিত বা অক্ষম বলে নয়, হৃদয়হী[illegible] তো নয়ই, সে জড়িয়ে পড়তে চায় না [illegible] আর মাস ছয়েক পরে তার বি-এ ফা[illegible] পরীক্ষার পরের দিনই সে বেরিয়ে [illegible] চায় বিশাল জগতে, যে-জগৎ বঙ্গোপ[illegible] বা আরব সাগরের দ্বারা পরিমিত নয়। যদি বোঝা না হত একসঙ্গে চলা আ[illegible] হত। তার সম্ভাবনা কোথায়! সোনা[illegible] কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর নাম কি বেরিয়ে পড়া!

তার পর পথে বেরিয়ে পড়া নিছক [illegible] প্রেমে নয়। একটা সুরের অন্বেষণে। [illegible] রাধা বাহির হয়েছিলেন বাঁশির সুর শু[illegible] রত্নর জীবনে এ-সুর এখনো স্পষ্ট হ[illegible] এ যে কিসের সুর, কোনখান থেকে আ[illegible] তাও অস্পষ্ট। তবু কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছে এ-সুর তাকে ঘরে থা[illegible] দেবে না, তাকে দেশের কাজ বা সমা[illegible] কাজ করতে দেবে না, তাকে ডাক [illegible] বাইরে ও অকাজে।

সেইজন্যে সোনালী সম্বন্ধে পুনর্বিবেচ[illegible] প্রস্তাব সে কানে তুলবে না। তা [illegible] বাকী থাকে শ্রীমতীর সঙ্গে সহানুভূ[illegible] বশত অশনত্যাগ। মৎস্যবর্জন।

সেদিন খেতে বসে সে বাবাজীকে ব[illegible] তার পাতে মাছ না দিতে। এখন থেকে মছলি খাবে না। বাবাজী তো মহা খুশ[illegible] রতনবাবু হিন্দুস্থানী বন জায়েঙ্গে।

কথাটা প্রভাতের কানে গেল। [illegible] বিকেলের দিকে রত্নর ঘরে গিয়ে জান[illegible] চাইল ব্যাপার কী? হঠাৎ মাছে অরু[illegible] কেন?

রত্ন তখন শ্রীমতীর চিঠিখানা তার দি[illegible] বাড়িয়ে দিল। উচ্চবাচ্য করল না।

"হা হা হো হো!" প্রভাত অট্টহা[illegible] হাসল। "বেরাল বলছে মাছ ছেড়ে দিয়েছি কে বিশ্বাস করবে এ কথা! বরং বেরা[illegible] ছাড়লেও ছাড়তে পারে মাছ, কিন্তু হিন্দু[illegible] ঘরের সধবা মাছ ছাড়বে, আর আমি একথ[illegible] বিশ্বাস করব এত বড় আহাম্মক আমি নই। সেদিন এক বুড়ী এক পয়সার শাকের দাম দু'পয়সা শুনে হাটের মাঝখানে বলেছিল, ক্যা বংগালী সমঝা! তেমনি আমিও বলতে চাই শ্রীমতীকে, আমাগো কি বাঙ্গাল সমঝেসেন।"

রত্ন হাসছে না, রাগছে, দেখে প্রভাতের খেয়াল হল যে সে প্রকারান্তরে শ্রীমতীকে মিথ্যাবাদী বলেছে। "আহা! আমি কি জানিনে যে ও সত্যনিষ্ঠ! ওর মতো ত্যাগী ক'জন আছে! আমার বক্তব্য শুধু এই যে হিন্দুর ঘরের বিধবা যা পারে সধবা তা পারে না। মাছ খাওয়া হল এয়োতির লক্ষণ। মৎস্যবর্জন অসম্ভব।"

"কিসে অতটা নিশ্চিত হলে?" রত্ন বলল কঠোর স্বরে। "হিন্দুর ঘরের সধবা কি সব অলঙ্কার খুলে দেয়, সোনাবাধানো শাঁখা ভিন্ন আর কিছু পরে না?"

"ছিল। নোয়া ছিল।" প্রভাত স্মরণ করে বলল, "তবে তা-ই যথেষ্ট নয়। বেগমপুরের ছোটতরফের আয় যদিও শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে তবু মরা হাতি লাখ টাকা। তিন পুরুষ আগে বাড়িতে ভাঙন ধরেছে। শরিকরা প্রায় সবাই চলে গেছে কলকাতায় বা সদরে। পাঁচিল ধসে পড়ছে, কাঠের ভিনিশিয়ান খসে পড়ছে, ইটের পাঁজর দেখা যায়, অশথ গাছ উঠছে পাঁজর ভেদ করে। তবু ছোটতরফ ওখান থেকে নড়বেন না। যখের ধন আগলাবেন। শোনা যায়, সিন্দুক ভরা মোহর, সব বাদশাহী আমলের। ওরা খানদানী রাজপুত বংশ। বাংলাদেশে এসেছিল শাহ সুজার সঙ্গে। তার পর থেকে বাঙালী হয়ে গেছে।"

হস্টেলে উঠে আসার আগে রত্ন ও প্রভাত যে-মেসে থাকত সেখানে রমেনদা বলে একজন আইনের ছাত্রও থাকতেন। মিষ্টভাষী স্নেহশীল প্রকৃতির যুবক। কনিষ্ঠদের সমীহ করেন সমবয়স্কদের মতোই। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আইন পড়ছেন, কিন্তু উকিল হিসাবে সফল হবেন বলে মনে হয় না। দয়ার শরীর। কোনো রকম প্রতিযোগিতার ভাব নেই স্বভাবে। সবাই তাঁকে ঠেলে এগিয়ে যায়। তিনি পড়ে থাকেন পিছনে। খেতে বসেন সকলের শেষে। যেদিন যা বেঁচে থাকে।

প্রভাত বলল, "চল, রমেনদার পরামর্শ নেওয়া যাক। সোনালীর জন্যে কী আমরা করতে পারি যার ফলে শ্রীমতীর মুখে মাছ রুচবে। রত্নর মুখেও।" দুষ্ট হাসি হাসল প্রভাত।

কত কাল পরে দেখা। রমেনদার চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের দু'পাশে বসালেন, কাঁধে হাত রাখলেন। কুশলপ্রশ্নের পর সাধারণ কথা-বার্তা। তার মাঝখানে প্রভাত গলা খাটো করে বলল, "রমেনদা, একটা গোপনীয় পরামর্শ ছিল।"

সোনালীর উপাখ্যান গোড়া থেকে শুনে রমেনদা বললেন, "সোনালী যদি বোষ্টমী হয়ে কোনো বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করত তা হলে আর কোথাও না হোক বৃন্দাবনে ওদের ঠাঁই হত। হিন্দুসমাজের সদর দরজায় কড়া পাহারা, কিন্তু খিড়কি দিয়ে হাতি-ঘোড়া পার হয়। কাশী বৃন্দাবন আমরা সৃষ্টি করেছি কেন? সোনালীদের জন্যেই। সেখানে ওরা হাফ গেরস্ত। ওদের ছেলেমেয়েরা এক পুরুষ বাদে ফুল গেরস্ত। হিন্দুসমাজের সমস্তটাই মনুশাসিত নয় হে। কতক অংশ মনুষ্যশাসিত। নইলে ও সমাজ এতদিন টিকত না।"

প্রভাত হাঁফ ছেড়ে বলল, "বাঁচা গেল।

রত্ন চুপ করল। রমেনদা বললেন, "বোষ্টম পাওয়া যাবে। তবে সোনালী হয়তো ওর সঙ্গে যাবে না। সুন্দরী যখন, তখন ও বিনামূল্যে বিকোবে না, চূড়ান্ত মূল্য দাবি করবে। পতিতা যত দিন হয়নি তত দিন ভয়ডর ছিল। একবার পড়লে পরে তখন ভয়ডর ভেঙে যায়। এখন কি ও সেই সোনালী আছে!"

ঘুরে ফিরে আবার একই জায়গায় পৌঁছনো গেল। কিছুই করবার নেই। দুই বন্ধু বিষণ্ণমুখে হস্টেলে ফিরল। সারা পথ নীরবে।

রতনবাবু হিন্দুস্থানী বন জায়েংগে

এখন প্রথম কাজ একটি বোষ্টম জোটানো। দ্বিতীয় কাজ একটা কণ্ঠীবদল ঘটানো। রমেনদা, আপনার সন্ধানে কোনো বোষ্টম আছে?"

রত্ন অনুযোগ করল, "কিন্তু যার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে কেন চোরের মতো খিড়কি দিয়ে ঢুকবে? সমাজকেই সদর দরজা খুলে দিতে হবে। কণ্ঠীবদল নয়, রীতিমতো বিবাহ। ঐ হাফ গেরস্ত কথাটা ভালো নয়।"

প্রভাত বলল, "কেন, কণ্ঠীবদল এমন কী খারাপ! তুমি তো বল, বিয়ে সম্ভব না হলে একসঙ্গে থাকাও ভালো। সেও তো হাফ গেরস্তালি।"

হাসি মশকরা ভুলে প্রভাত বলল করুণ স্বরে, "রত্ন, শ্রীমতীকে লিখো আজকের কথাবার্তার বিবরণ। ও কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে! তুমি মাছ ছাড়লে কি আমি বাদ যাব ভেবেছ! মাছ হয়তো ছাড়ব না, চা ছাড়তে পারি।"

শ্রীমতীকে চিঠি লিখতে খুব যে উৎসাহ ছিল তা নয়। একে তো নতুন কোনো সমাধানের ইশারা দিতে পারছে না, তার উপর শ্রীমতীকে ভিতরে ভিতরে তার ভয়। ভয় দু' কারণে। শ্রীমতীর চোখে প্যাশন। শ্রীমতী সন্ত্রাসবাদীদের হস্তিনী।

অপরপক্ষে হস্টেলের ঐ নারীবর্জিত জীবনে দূর থেকে যেটুকু রমণীয় পরশ

আপনা হতে মিলে যায় তার জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। তাকে অবজ্ঞা করতে নেই। মালাদি তো চিঠি লেখেন না, আর কেই বা লিখছে পারিবারিক মণ্ডলের বাইরে! তা ছাড়া রত্নর কপালে এরকম বার বার ঘটেছে যে সে অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। তারা তাকে বিশ্বাস করে এমন সব কথা বলেছে যা মেয়েরা মেয়েদেরই বলে, পুরুষদের বলে না। এই যে শ্রীমতী রুপালীর গল্প বলতে চায় এটা হয়তো সে আর কোনো পুরুষকে বলেনি। এসব মেয়েলি গল্প শুনতে তার নিজেরও ভালো লাগে। মেয়েদের প্রতি তার একটা নাড়ীর টান আছে।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে দিন কয়েক কাটল। যুক্তি দু'দিকেই সমান। লিখলে সুর কেটে যায়, না লিখলেও তাই। শেষে স্থির করে ফেলল লিখবে। সোনালীকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যাক সে বোষ্টম পেলে বোষ্টমী হয়ে কণ্ঠীবদল করতে রাজী কি না। রমেনদার পরামর্শটা পৌঁছে দেওয়া যাক তাকে।

রত্ন শ্রীমতীকে এবার যে চিঠি লিখল তার গোড়ার দিকে ছিল রমেনদার পরামর্শ। শেষের দিকে তার নিজের মতবাদ।

"স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনা নারীর স্বাধীনভাবে হয়েছে যে প্রেম তারই উপসংহার বিবাহ, যদি সম্ভব হয়। উপসংহারকে আমি উপক্রমণিকা করার পক্ষে নই। তাতে প্রেম ও স্বাধীনতা উভয়েরই অমর্যাদা হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি আমার মতবাদ জাহির করব না, রমেনদার খাতিরে সরে দাঁড়াব। সোনালীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে যদি রমেনদার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করে তাহলে আমিও সুখী হব। কেননা এই সমস্যার সমাধান না হলে আপনি যে হিন্দুর ঘরের সধবা হয়েও মৎস্যগ্রহণ করবেন না এটা আমার পক্ষেও সুখের কথা নয়। নয় বলেই আমিও মৎস্য-অনশন আরম্ভ করেছি।"

দেখতে দেখতে শ্রীমতীর চিঠি এল ফিরতি ডাকে। তেমনি নীল রঙের খাম, তেমনি সুবাসিত, তেমনি মেয়েলি হাতের লেখা। চিনতে বিলম্ব হয় না। খুলতেও না।

আমার প্রিয় রত্নভাই,

আপনার প্রীতির তুলনা কোথায়! আর কে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে আহার ত্যাগ করেছে! কিন্তু আপনাকে আমার মাথার দিব্যি, ওসব করবেন না। এ কী ছেলে-মানুষী বলুন দেখি! আমি যা করেছি তা ঝোঁকের মাথায় করিনি, অনেক দিন থেকে ভাবা ছিল যে এই কাজটি আমি করব, যদি ওই কাজটি কেউ না করে। শুধু সোনালীর সুরাহা হলে চলবে না। রুপালী বলে আর একটি মেয়ে আছে, তারও সুরাহা হওয়া চাই। কিন্তু আজ ও কথা নয়। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ডাক ধরতে হবে, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি এ চিঠি পান ও পত্রপাঠ মৎস্য-অনশন ভঙ্গ করেন। এখানে টেলিগ্রাফ নেই, নয়তো জরুরী তার পাঠাতুম।

রমেনদার পরামর্শ শিরোধার্য করলুম। সেই অনুসারে কাজ হবে। আপনার ও-সব মতবাদ শুনতেই ভালো। অনেক পড়েছি। বিশ্বাস হয় না যে এ-দেশে চোখে দেখব। অচ্ছা, ভাই, সোনালীর যা হবার তা হবে, এখন অন্য একটি বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি কি? দেশের স্বাধীনতা তো আর সবুর মানছে না। তার জন্যে কী করছেন, বলুন? গান্ধী ফেল। সি আর দাশও কাউন্সিলে গিয়ে শেষ। বুদ্ধদের দ্বারা কিছু হবে না। তরুণরাই ভরসা। রত্নভাই, আপনি কি ললিতের মতো যোগ দিতে পারেন না আমার মণ্ডলীতে? প্রভাতদাও? শুনেছি তিনি বেগমপুরে এসেছিলেন, আমাদের বাড়িতেই বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। আমার কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না কোন জন। ইতি।

আপনারই শ্রীমতী বোন।

এমন যে হবে তা তো প্রভাতের কাছে আগেই শুনেছিল। আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, তবু আশ্চর্য হল রত্ন। শ্রীমতী কি এই জন্যেই তার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে? সোনালীর ব্যাপারটা কি আলাপের ছল? চিঠিখানা প্রভাতকে দেখাতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। শ্রীমতী যেভাবে তাকে সম্বোধন করেছে, যেভাবে শেষ করেছে, প্রভাত দেখলে হো হো করে হাসবে। হয়তো খ্যাপাতে শুরু করবে।

সে রাত্রে ভোজ ছিল। পুজোর ছুটি আসন্ন। যে যার দেশে যাবে। তার আগে একটু আমোদ আহ্লাদ করতে চায়। খেতে খেতে প্রভাত বলল, "রত্নর পাতে মাছ দিচ্ছেন কেন? ও মাছ আমার পাতে দিন। আমি দু'জনের মাছ খাব।"

বাবাজী মুচকি হাসল। রত্ন বলল, "আমি দিতে বলেছি।"

প্রভাত বিদ্রুপ করল, "লোভ সম্বরণ করতে পারলে না বুঝি!"

রত্ন সে-বিদ্রুপ পরিপাক করল। কিন্তু ফাঁস করল না যে ওটা শ্রীমতীর মাথার দিব্যি। ভোজের পর কথাপ্রসঙ্গে বলল, "ভাই প্রভাত, শ্রীমতীর প্রস্তাব ওর মণ্ডলীতে আমরাও যোগ দিই ললিতের মতো। বুদ্ধদের দিয়ে কিছু হবে না। তরুণরাই ভরসা।"

"আমি জানতুম।" প্রভাত বলল এক গাল হেসে, "ঝুলি থেকে বেরাল একদিন বেরোবেই। কিন্তু শ্রীমতী দেখছি আস্তে আস্তে খেলিয়ে খেলিয়ে ইঁদুর ধরতে জানে না। ওর দাদারা বোধ হয় ওকে ঠিকমতো তালিম দেননি। হয়তো দাদারাই ওকে তাড়া দিচ্ছেন।"

"কিন্তু আমরা যে ও'দের কথামতো কাজ করব এ-নিশ্চয়তা ও'রা কার কাছে পেলেন?"

"তার জন্যে," প্রভাত বলল দোষীর মতো মুখ করে, "আমিই বোধ হয় দায়ী। স্বরাজ-পার্টির কর্মীদের সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি না করলে চলত। তখন কি ছাই জানতুম যে ও'রা বর্ণচোরা আম! তলে তলে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। ও'দের কাছে আইন-সভা একটা আচ্ছাদন। আমার কাছে রাষ্ট্র-নৈতিক বিবর্তনের একটা ধাপ।"

এর পরে রত্ন শ্রীমতীকে লিখল যে সে আবার মাছ খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তার তাতে একটুও রুচি নেই। মাছ দেখলেই তার মনে পড়ে যে তার শ্রীমতী-বোন আংশিক অনশনে। অমনি বিস্বাদ লাগে অশন। তার পর লিখল—

বিশুদ্ধ রাজনীতি আমার ভালো লাগে না। যাই হোক না কেন তার লক্ষ্য। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা খেলাফত বা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিকার। একদা আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা রাজনীতির অন্তরালে নৈরাজ্যবাদ। যে মতবাদ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে, রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে ভাবে। গান্ধীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলুম আমার কল্পনার নৈরাজ্যবাদীকে। যাঁর সংগ্রাম কেবল পরদেশী রাজশক্তিকে হঠাবার জন্যে নয়, তার সিংহাসনে সেই সব ক্ষমতার অধিকারী প্রজাশক্তিকে বসাবার জন্যে নয়। তিনি চান ভয়ের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় সৈন্য লাগবে না, পুলিশ লাগবে না, আদালত লাগবে না, কারাগার লাগবে না। লাগবে না আইনসভা বা পার্লামেণ্ট, উকিল বা কৌঁসুলি। তাঁর অসহযোগের প্রোগ্রাম এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে বিদেশী সরকার গেলে স্বদেশী সরকারকেও এর সম্মুখীন হতে হবে। তখন তার সরকারত্ব চলে যাবে, ফুটে বেরোবে মনুষ্যত্ব।

তার পর সরকার বললে দৃশ্যত মনে হয় সরকারী আমলা ও প্রতিষ্ঠান। আড়াল থেকে যাদের অদৃশ্য হস্ত রশি টানে ও পুতুল নাচায় কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। তারা হল বিদেশী ও স্বদেশী শোষক। ধনিক, বণিক, ভূম্যধিকারী, মালিক। তাদের

স্বার্থই যদি আড়ালে রয়ে গেল তা হলে আবার এল সেই ভয়ের শাসন। সেইজন্যে প্রেমের শাসনের প্রতীক চরকা। সকলেই হাত লাগাবে, গতর খাটাবে, কেউ পরাসক্ত হবে না। এর থেকে আসবে শোষণবিরতি। শোষণহীন সমাজ।

এত বড় একটা আদর্শ যাঁর তাঁর উপায়ও তো হবে আদর্শের সুরে বাঁধা। অহিংসা ভিন্ন আর কোন উপায়ে এসব হবে? আর অহিংসা কি এক দিনে হয়? তা হলে কেন বলব, গান্ধী ফেল?

পুজোর ছুটি এসে পড়ল। সবাই গোছ-গাছ করছে, রত্নও। বিকেলে কলকাতার ট্রেন। সকালের ডাকে এল শ্রীমতীর চিঠি। রত্নর হাতে সময় ছিল না। চিঠিটা পকেটে পুরল। তার পর দুপুরে খেতে বসে পকেট থেকে বার করে পরিবেশনের দেরি দেখে পড়তে লাগল। গান্ধীর বিরুদ্ধে লম্বা নালিশ। আসলে ওটা তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁদের আদর্শবাদ নাকি একটা মুখোশ। কেউ কাউন্সিল, কেউ জেলা বোর্ড, কেউ মিউনিসিপালিটি যেখানে যা পাচ্ছেন হাত করছেন। বলছেন দেশের স্বার্থে, আসলে নিজের স্বার্থে বা গোষ্ঠীর স্বার্থে। জ্যোতিদার মতো নির্বোধ বেশী নেই। বোকারাই শুধু চরকা নিয়ে পড়ে আছে।

তার পর ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করেছে, "আপনি যদি এমন অসাধারণ গান্ধীভক্ত তা হলে তাঁর অনুগামী হন না কেন? কলেজে পড়েন কী করতে? জানেন না ওটা গোলামখানা? দাস-মানসিকতার কারখানা ওটা। সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।"

চাবুকের মতো বাজল রত্নর পিঠে। এমন করে কেউ তাকে শাসন করেনি। গায়ের জ্বালায় জ্বলতে থাকল কিছুক্ষণ। খাওয়া সেরে বিদায় নিল বিদ্যাপতি, মকবুল প্রভৃতি বন্ধুদের কাছ থেকে। প্রভাত তার সহযাত্রী হবে কিউল পর্যন্ত। তার সঙ্গে এক্কায় উঠে বসল।

"কি হে, কী অত পড়ছিলে?" সুধাল প্রভাত। চোখে দুষ্টু হাসি।

"কিছু না। একখানা বাজে চিঠি।" রত্ন এড়িয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে রত্ন সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। কী উত্তর দেবে এই প্রশ্নের? যে-মেয়ে গান্ধীকে অলংকার খুলে দিয়ে নিরাভরণ হল তার মোহভঙ্গ হয়েছে সে জানতে চায় রত্ন কেন কিছু ত্যাগ করেনি, কেন মোহ পোষণ করছে। কলকাতায় পৌঁছে দুপুর-বেলা শুয়ে শুয়ে রত্ন এর একটা জবাব লিখল। রাত্রে ঘুম হয়নি বলে যদিও তার ঘুম পাচ্ছিল।—

কেন গান্ধীজীর অনুগামী হইনি? কলেজে পড়ছি কী করতে? শ্রীমতীবোন, আপনার মতো আমিও নিজেকে প্রশ্ন করেছি। করেছি অনেক বার। এক এক বার এক একটা উত্তর মুখে এসেছে। কাল থেকে আবার আত্মপরীক্ষা করছি। এবার যা মনে আসছে তাতে সব একাকার হয়ে গেছে।

গান্ধী যেখানে নৈরাজ্যবাদী আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে। চার বছরে এ-মিল অমিলে পরিণত হয়নি। সেইজন্যে আমি এখনো খদ্দর পরি। এটা একটা প্রতীক। কিন্তু এই ক' বছরে তাঁর সঙ্গে আমার অমিল দিন দিন পরিষ্কার হয়েছে। যেমন রাজ-নীতিকদের সঙ্গে। তার ফলে রাজনীতি থেকেই আমার মন উঠে গেছে।

রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বলপরীক্ষা অন্যান্য দেশে ঘটে গেছে। এদেশে এতকাল ঘটেনি, এই প্রথম ঘটছে। সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে প্রজাশক্তি ছিল না। এই যে বল-পরীক্ষা এটা গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস রূপ নিয়েছে। এ শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসে প্রথম।

কিন্তু কী শুনেছি! শুনেছি এটা নাকি ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের দ্বন্দ্ব। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। তার মানে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ। তলিয়ে দেখলে এক প্রজাশক্তির সঙ্গে আরেক প্রজা-শক্তির বিবাদ।

তার পর আর একটু এগিয়ে তাঁরা বলছেন এটা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ঝগড়া। পূর্ব হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম, কোনো দিন ওরা মিলবে না। কারণ একপক্ষ নাকি অধ্যাত্মবাদী, অপর পক্ষ জড়বাদী। এক পক্ষ দৈবী, অপর পক্ষ আসুরী। এক পক্ষ শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষ নিকৃষ্ট। কিপলিংকে ওলটালে যা হয়।

আরো শোনা যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতা একটা ব্যাধি, ইংরেজ নিজে ও রোগে ভুগছে, ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভারতকেও ভোগাচ্ছে। সুতরাং এটা আধুনিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ফিরে চল প্রাচীন সভ্যতায়। সেই প্রকৃত সভ্যতা। অপরটা ভদ্রবেশী অসভ্যতা।

তা হলে দেখছেন তো, বলপরীক্ষায় যদি রাজশক্তি হটে যায় তার পরে কী ঘটবে? ঘটবে আধুনিক যুগের থেকে প্রাচীন যুগে প্রত্যাবর্তন, পশ্চিমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে দেশে শত্রুতা। আমি বিশ্বাস করিনে যে পূবের সঙ্গে পশ্চিমের গভীর কোনো অমিল আছে বা মিলন কোনো কালে হবে না। আর আধুনিকের সহস্র দোষ থাকলেও সে আমার আপন যুগ, যেমন ভারত আমার আপন দেশ। তার দোষ-গুলোর সংশোধন করতে পারি, কিন্তু তাকে বর্জন করতে পারিনে। কেউ যদি উজান বেয়ে গঙ্গোত্রীতে ফিরে যেতে চায় দেখতে দেখতে তার দম ফুরিয়ে যাবে, তখন স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সাগরসঙ্গমে।

আর আমি মানতে চাইনে যে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বিরোধ হচ্ছে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের বা ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের বিরোধ। রাজশক্তির পিছনে যারা আছে তারাই সমগ্র ইংলণ্ড বা সমস্ত ইংরেজ নয়। এ-ভুল আমি কিছুতেই করব না, সুতরাং আমাকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে। কলেজে কেন এলুম? কারণ কলেজে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে আমার চিত্তের মিল আছে, যেমন মিল হাওয়ার সঙ্গে জানালার। কলেজে এসে আমি দাস হইনি, বরং আরো স্বাধীন হয়েছি। ইউরোপীয় সাহিত্যে ও দর্শনে মানব-মনের যে মুক্তি, ইউরোপের ইতিহাসে মানবাত্মার যে জয়যাত্রা আমরা যদি তার অংশ না নিই তবে আমরাই বঞ্চিত হব আমাদের উত্তরাধিকার থেকে, যে উত্তরাধিকার প্রত্যেক মানবসন্তানের।

তার কলকাতার চিঠিতে কুষ্টিয়ার ঠিকানা দিতে ভুলে গেছল। শ্রীমতীর চিঠি এল কলকাতা ঘুরে। পড়ল পিতার হাতে। নীল খাম, সুবাসিত, মেয়েলি হাতের লেখা, এসব দেখে মল্লিক মহাশয় জানতে চাইলেন কে লিখেছে। রত্ন ফাঁপরে পড়ল। চিঠি-খানার উপর কাটাকুটি ছিল, তাই বলতে পারল, "সম্পাদকের দপ্তর থেকে ঘুরেফিরে এসেছে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোনো পাঠক পাঠিকা।"

মা নেই, বড় বোনের বিয়ে হয়েছে, আর সব ভাইবোনেরা ছোট। সংসার দেখাশুনো করেন বিধবা জ্যাঠাইমা। ছাদের উপর এক-খানি করোগেট-ছাওয়া ঘর। সেখানে রত্নর আস্তানা। সমবয়সী বন্ধুজন এলে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে সেখানে উঠে যায়। নইলে আর কেউ বিরক্ত করে না। রত্ন যখন খুশি পড়ে, যখন খুশি লেখে, যখন খুশি শুয়ে শুয়ে ভাবে।

শ্রীমতীর চিঠিখানা ভারী ঠেকছিল। খুলে দেখল ছোটখাটো একখানা মহাভারত। এ-মহাভারতের পাণ্ডব কারা তা বোঝা যায় না, কিন্তু কৌরব হচ্ছে ইংরেজ। ক্লাইভ থেকে শুরু করে হাল আমলের লাট লীটন পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। সকলের সব দুষ্কৃতির জন্যে দায়ী রত্ন।

॥ পাঁচ ॥

যা হোক মহাভারত থেকে এটুকু উদ্ধার করা গেল যে শ্রীমতীর পিতৃকুলের এক পূর্বপুরুষ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষে প্রাণ দিয়েছিলেন। তারপর তার মাতুলানীর প্রপিতামহ সিপাহী যুদ্ধে—সিপাহীবিদ্রোহ বললে মানহানি হয়—ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর ফাঁসি হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ক্রোধ বংশানুক্রমিক।

ওর চোখের সেই প্যাশন কি তা হলে পলিটিক্যাল প্যাশন? রত্নর দৃষ্টি খুলে যায়। প্রভাতের কথায় এত দিন সে ওকে অযথা ভয় করে এসেছে। এদিকে ওর চিঠির সম্বোধনগুলো দিনকের দিন আবেগময় হয়ে উঠছে। "আমার প্রিয়তম ভাই" বলে আরম্ভ। "আপনারই শ্রীমতী" বলে শেষ। লিখেছে—

একটা দেশ আরেকটা দেশকে গায়ের জোরে দখল করে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটা জাতি আরেকটা জাতিকে ঘরে কয়েদ করে দোর জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। এর জন্যে আমি নিত্য জ্বলছি, রত্নভাই। আপনি কেন জ্বলেন না? আপনার শরীরে কি রক্ত নেই? আপনি কি মানুষ নন, প্রাণী নন, গাছ কি পাথর? না আপনি দেবতা?

আপনার কথা শুনে মনে হয় না যে পরাধীনতা বলে একটা জ্বালা আছে, যে জ্বালা মানুষকে অনবরত অস্থির করে তোলে, যে জ্বালার নিবৃত্তি না হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, নয়তো পাষাণ হয়ে যায়। পাষাণকে যদি অহিংস বলেন আমার আপত্তি নেই, অহিংসাবাদীরা পাষাণই বটে, যেমন জ্যোতিদা। কিন্তু তার চেয়ে আমার মতে পাগল হওয়া হিংস্র হওয়া ভালো। আগুন জ্বলছে যার বুকে তাকে নিবৃত্ত হতে বলা বৃথা। নিবৃত্তি চাই তার নয়, তার জ্বালার, তার পরাধীনতার।

ক্ষণকালের জন্যে সন্দেহ হল রত্নর, এ কোন পরাধীনতার কথা বলছে শ্রীমতী? যে পরাধীনতা ত্রিশ কোটি মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা, দেড়শো বছরব্যাপী, সে কি এমন তীব্র ভাবে বাজে? না এ তার ব্যক্তিগত পরাধীনতা, স্বল্পকালব্যাপী? কিন্তু কাজ কী অনুসন্ধিৎসু হয়ে? রত্ন তার নিজের জবাবদিহি লিখল—

বছর পাঁচেক আগে আমিও জ্বলেছি। জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাকেও একদিন জ্বালিয়েছিল। কিন্তু সেই তো আমার জীবনের একমাত্র জ্বালা নয়। মা যখন ছিলেন মার দুঃখ দেখে জ্বলেছি। সে-দুঃখ বাবার দেওয়া। পরে দিদির বিয়ের সময় বাবার দুঃখ দেখে জ্বলেছি। সে-দুঃখ বরপক্ষের দেওয়া। তুচ্ছ কারণে ওরা বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। কী ভাগ্যি কনেকে ফেলে রেখে যায়নি, নইলে অপমানে আত্মহত্যা করতে হত। বিয়েতে পণ দেবেন না বলে বাবার দুর্গতি। পণ দেবেন না, পণ নেবেন না, এই তাঁর পণ। কিন্তু যা তিনি বিয়েতে দিলেন না তা ওরা পরে মোচড় দিয়ে আদায় করে নিল দিদিকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে। পরিবারের ভিতরে ও বাইরে এমনি কত অপমান ও অত্যাচার সইতে হয়েছে আমাকে। একটা তো আপনারও জানা। সোনালীর ঘটনা। প্রত্যেক বার জ্বলেছি। জ্বলতে জ্বলতে যা হয়েছি তা একপ্রকার ডাইনামাইট। সব দিন ফাটে না, ফাটে এক দিন। যেদিন ফাটে সেদিন পাহাড় ফাটিয়ে দেয়।

জ্বলতে জ্বলতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে হাজার হাজার বছর এ-দেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়নি, বিরাট বিরাট পরিবর্তন বকেয়া রয়েছে। যারা একবার চাকার উপরে উঠে বসেছে তারা চাকাটাকে ঘুরতে দেয়নি, শাস্ত্র বানিয়ে সবাইকে বুঝ দিয়েছে যে তাদের ভাগ্য বদলাবার নয়। জন্মান্তরে ব্যক্তির ভাগ্য বদলাতে পারে, তার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা চলতে পারে; কিন্তু সমষ্টির ভাগ্য কোনকালেই বদলাবে না, সমষ্টিগত চেষ্টা বৃথা। যারা একবার চাকার নীচে পড়েছে তারা চিরকাল চাকার নীচেই থাকবে, কারণ পা হল নীচে, মাথা হল উপরে, এ যে স্বয়ং ব্রহ্মার শরীরতত্ত্ব! জনসাধারণ তো সমষ্টিগত ভাবে আশা ছেড়ে দিয়ে উদাম ছেড়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এমন সময় বাইরে থেকে একদল লোক এল, তারা ব্রহ্মা মানে না, তারা পতিতকে আশা দিল, ভীতকে অভয় দিল। লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু অধিকাংশ লোক এক শাস্ত্রের বদলে আরেক শাস্ত্র মানতে রাজী হল না, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধন শ্রেয়। ইংরেজ এসে আরেক দফা আশা দেয়। ধর্ম ছাড়তে বলে না, শহরে টেনে নিয়ে যায়, পূর্বপুরুষের পেশা ছাড়ায়, সংস্কার ছাড়ায়। লক্ষ লক্ষ লোক অভূতপূর্ব সুযোগ পায়, স্বাধীনতা পায়। সমষ্টিগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক গ্রামেই রয়ে যায়, বৃত্তি ছাড়ে না বরং না খেতে পেয়ে মরে।

চাকাটা যদি ঘুরে না গেল, অনড় হয়ে থাকল, তা হলে অধিকাংশ লোক যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকবে, স্বরাজ হবে শুধু চাকার উপরকার অংশটার জন্যে। এই অবস্থার পরিবর্তন কী করে হবে, শ্রীমতী বোন, আমরা যদি আরো গভীরভাবে না ভাবি, আরো গোড়াকার কাজ না করি? ইহজন্মে ইহলোকে সমষ্টিগত চেষ্টায় অধিকাংশের ভাগ্যপরিবর্তনের আশা দিতে হবে, ধর্ম না ছেড়ে, গ্রাম না ছেড়ে। ধর্ম থাকবে, অথচ তার মধ্যে থাকবে ধর্মান্তরের মুক্তি। গ্রাম থাকবে, অথচ তাতে থাকবে না জাতপাত অস্পৃশ্যতা টিকি পৈতে মনসা শীতলা গুরু পুরোহিত সাধুবাবা। ইসলামের অন্তঃসার, ইউরোপের মর্মবাণী অবিকৃতভাবে আত্মসাৎ করতে হবে। সাধারণত যা দেখি তা অস্বীকৃতি বা বিকৃতি। অসাধারণদের মধ্যেও এই দুর্বলতা লক্ষ্য করছি। এটা কাটিয়ে ওঠা চাই। জাতীয় স্বাধীনতা হবে বিপুলসংখ্যকের বিপুলতর মুক্তি, যে-মুক্তি বুদ্ধ অশোকের পর ছিল না এ দেশে। যার জন্যে বাইরের লোকের আসার দরকার ছিল। যার জন্যে জন্মানোর দরকার ছিল আপনার আমার ও আমাদের বয়সের তরুণ তরুণীর। আমরাও বাইরে থেকে এসেছি। এসেছি কোন সুদূর লোকান্তর থেকে কোন নতুন সমাধান নিয়ে যা এখনো আমাদের কাছেই অস্পষ্ট। চিন্তা করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, নিরীক্ষা করতে হবে, শুধু জ্বলে-পুড়ে মরলে তো হবে না। তবে, হাঁ, জ্বলাটাও আমাদের স্বধর্ম। আমরা নক্ষত্র ও নীহারিকা। আমরা এই পৃথিবীর মতো শীতল নই। আমরা জ্বলব, জ্বালাব, ভাঙব, চুরব, নতুন করে বানাব। কিন্তু নতুন নিগড় নয়, শাস্ত্র নয়। এক দাসত্বের বদলে আরেক দাসত্ব প্রবর্তন করা আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা স্বাধীন পুরুষ, স্বাধীনা নারী। ফ্রী ম্যান, ফ্রী উম্যান।

এ-চিঠি ডাকে দিয়ে রত্ন নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। ছিল তার আরো অনেক কথা বলবার, কিন্তু তা হলে আরেকখানা মহাভারত হয়ে যায়। মহাভারতের বিনিময়ে মহাভারত! রক্ষে করো! আকাশের দিকে তাকাবে কখন, ভরা নদীর রূপ দেখবে কখন, বাউল বোষ্টম ফকির দরবেশের সঙ্গে মিশবে কখন, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলবে কখন। তা ছাড়া তার ছিল পড়ার কাজ ও লেখার কাজ। আর যা সে কোনো দিন ফেলে রাখে না—চিন্তা ও ধ্যান।

ওদিকে মালাদির অনেক দিন খবর নেই। রত্ন চিঠি লিখে লিখে হদ্দ। চিঠিগুলো তাঁর হাতে পৌঁছয়, না আর কেউ বাজেয়াপ্ত করে, বলা যায় না। যে দেবী সাড়া দেন না রত্ন সকালে উঠে তাঁকে স্মরণ করে, রাত্রে শুতে যাবার সময় উপাসনা করে। এটা তার অভ্যাস। একদিন বাদ দিলে মনে হয় একনিষ্ঠতায় ছেদ পড়ল। তাকে একনিষ্ঠ থাকতেই হবে। কে জানে কত কাল! হয়তো চিরকাল!

রন্টু ও প্রভাত পশ্চিমে বছরের বেশির ভাগ কাটায় বলে সাত ভাই চম্পার সম্মিলন ঘটে ছুটির সময় তিনবার কি চারবার। তেমনি একটা বৈঠক আসন্ন হয়েছিল কাননের বাড়ি ঘোড়ামারায়। সেখানে এসে জুটবে প্রসাদপুর-নওগাঁ থেকে গিরীন, ইংরেজ বাজার থেকে প্রভাত, লালগোলা থেকে ললিত, নাটোর থেকে হৈম, ঈশ্বরদি থেকে নবনী। আর কুষ্টিয়া থেকে রন্টু। মণ্ডলীর কার্যকলাপে পরিচালনার অভাব ছিল। এক এক জনের অভিরুচি এক এক দিকে। এমন কেউ ছিল না যে তাদের সংহত করে নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় চালিত করবে। সর্বক্ষণ মেলামেশা করলে আপনা আপনি একটা ঐক্য আসে। কোনো একজনের নায়কত্ব না হলেও চলে। কিন্তু বছরে মাত্র দু'তিনবার মিলিত হলে শিথিলতা অনিবার্য। অথচ তার প্রতিকার নেই।

কাননকে বিহ্বল করেছে পশুপক্ষীর ব্যথা। যেমন করেছিল বাল্মীকিকে। এই অহিংসার দেশে পশুহত্যার পদ্ধতিটা অনাবশ্যক নিষ্ঠুর। চামড়াটা আস্ত পাবে ও বেচে বেশী দাম পাবে বলে প্রাণ নেবার আগেই ছাল ছাড়িয়ে নেয়। মাংস বেশী পাবে বলে মাথার যত কাছাকাছি পারে তত কাছাকাছি কাটে, একটু একটু করে কাটে, এক কোপে কাটলে পাছে মাথার সঙ্গে মাংস বেশী চলে যায়। পাখিদের যেভাবে ধরে, যেমন করে একসঙ্গে বেঁধে বা খাঁচায় পুরে চালান দেয়, জলটুকু খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারে তা দেখলে বাল্মীকি হয়তো গোটা দেশটাকেই অভিশাপ দিয়ে আর একটা শ্লোক রচনা করতেন।

গিরীনকে বিধুর করেছে বসন্তরোগী কলেরারোগীর পরিত্যক্ত অবস্থা ও নিঃসঙ্গ যাতনা। সে পড়াশুনা করবে কখন। যখনি সংবাদ পায় ছুটে যায় রোগীর পাশে, সেবার ভার নেয়, সঙ্গ দেয়। আই-এসসি পাশ তার এখনো হল না, পাশ করলে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু দিন দিন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার সহপাঠীরা মেডিক্যাল কলেজের এম-বি হতে চলল। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভাবছে একটা ওষুধের দোকান খুলবে, নইলে সংসার অচল হবে। সে বিয়ে করবে না। তা হলেও তার আশ্রিত অনেকগুলি।

হৈম উকিল হয়ে গরিবদের জিতিয়ে দেবে। যারা জিতবে তাদের কাছ থেকে ফী নেবে। যারা হারবে তারা ফ্রী। বিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সেটা গুরুজনের ইচ্ছায়। কিন্তু সে বহু সন্তানের জনক হবে না। সেখানে তো গুরুজনের ইচ্ছা খাটে না। তার সহধর্মিণীকে শিক্ষিতা করবে, দেশে মহিলা কর্মীর বড় অভাব। এই সর্তে সে বিয়ে করেছে।

ললিত তলে তলে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকেছে বলে গুজব। তবে তলিয়ে যেতে নারাজ। খেলোয়াড় মানুষ। খুব একটা উচ্চাঙ্গের খেলা খেলতে চায়। যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সরকারী মহলে পারিবারিক প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকবে, আবার দেশানুরাগী মহলে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার হানি হবে না।

নবনীর নিজের ইচ্ছা কবি ও মনীষী হতে, মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে। কিন্তু তার গুরুজনের ইচ্ছা তা নয়। ইতিমধ্যেই এক বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে তার শ্বশুর তাকে সওদাগরী আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। তার আগে বি-এ পাশটা করে রাখা ভালো। হাতের পাঁচ হিসাবে। যদি পুনর্মূষিক হয়! ইদানীং সে সাম্যবাদের পক্ষপাতী হয়েছে। কাননের যেমন পশু ও পাখি নবনীর তেমনি চাষী ও মজুর। কিন্তু যে-ভাষায় সে লেখে তা চাষী ও মজুরের নয়।

বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন পরে একজোট হওয়ার উত্তেজনা। তার উপর যাতায়াতের উত্তেজনা। রন্টু এই নিয়ে অন্যমনস্ক ছিল, এমন সময় এল শ্রীমতীর চিঠি। তার চিঠিতে প্রতি বারেই একটা না একটা চমক থাকে। এবারকার চমক 'আপনি'র জায়গায় 'তুমি'। সে যে কেবল 'তুমি' বলেছে তা-ই নয়, 'তুমি'র বিনিময়ে 'তুমি' না বললে রাগ করবে বলে শাসিয়েছে।

সত্যি, ভাই, তোমার 'পরে রাগ না করে পারিনে। যতবার তোমার চিঠি পেয়েছি ততবার রাগ করেছি। তোমার উত্তর যেমনটি হলে খুশি হতুম তেমনটি হয়নি। হয়েছে তার বিপরীত। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অপূর্ব। আমার চেনাশোনার মধ্যে তুমিই একমাত্র জন যাকে চিঠি লিখলে চিঠির উত্তর খুলতে হাত কাঁপে। আবার চিঠি না পেলে, পেতে দেরি হলে, প্রাণ কাঁপে।

রন্টু, তোমার চিঠি আমার চাইই চাই। আমি পড়ে আছি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অখ্যাত এক দ্বীপে। এখানে সভ্যতার আলো পৌঁছয় না। তোমার চিঠি যখন পাই তখন মনে হয় সভ্যতার আলো পেলুম কত দিন বাদে। জ্যোতিদা মাঝে মাঝে আসে। সেও বয়ে আনে আলো। নতুন বই দিয়ে যায় পড়তে। আর যারা আসে তাদের মধ্যে আগুন আছে, আলো নেই। আমি আগুন ভালোবাসি, কিন্তু আলো না হলে বাঁচিনে। তোমার মধ্যে, জ্যোতিদার মধ্যে, আগুনও আছে আলোও আছে। সেইজন্যে তোমাদের এত ঈর্ষা করি।

এবার তুমি যা লিখেছ তা আমাকে দোলা দিয়েছে। অত্যন্ত উন্মনা বোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ভেঙে পড়ছি। কেন, সেকথা বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। বলব এক দিন। তার আগে শোনাতে চাই রুপালী বলে একটি মেয়ের গল্প। আমার বান্ধবী। ও আমাকে বিশ্বাস করে যা বলেছে তা আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। দেখো, ভাই, কাউকে এসব বোলো না। ললিত জানে। সে জেনেছে আমার ননদের কাছ থেকে। রুপালী আমার ননদকেও বলেছিল কিনা।

তোমাকে লিখছি এই ভরসায় যে তুমি যেমন সোনালীর জন্যে চেষ্টা করেছিলে তেমনি রুপালীর জন্যে করবে। গান্ধীর উপর আমি বীতরাগ কেন, জানো? তাঁকেও আমি জানিয়েছিলুম। তিনি কিছু করলেন না। এমন উপদেশ দিলেন যা কোনো কাজের নয়। নেতাদের কেউ কেউ জানেন, তাঁদেরও সেই ধরনের উপদেশ। সমাজের শান্তি ও শৃংখলা তাঁদের কাছে এত বেশী মূল্যবান যে একটি বালিকার প্রতি যে-অন্যায় করা হয়েছে ও হচ্ছে তার কোনো সুস্থ শোভন প্রতিকার তাঁদের মাথায় আসে না।

রুপালীর কথা লিখব যে, কেমন করে আরম্ভ করব ভেবে পাইনে। এলোমেলো হবে। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যাবে। সেসব তুমি কল্পনা দিয়ে ভরে দিয়ো। ইচ্ছা করে অনেক কথা বাদ দিচ্ছি। সেসব পুরুষমানুষের কাছে বলা যায় না। তোমার যখন বিয়ে হবে তখন আপনি বুঝবে। না বুঝলে বৌদিকে বলবে বোঝাতে। আমার বৌদিকে। এখন তা হলে যা বলছি শোন।

রুপালী না বলে রুপসী বলতে পারতুম। ও মেয়ে দেখতে এত সুন্দর যে মেয়েরা পর্যন্ত ওর প্রেমে পড়ে যায়। পুরুষরা তো পতঙ্গের মতো পড়ে। ও কিন্তু সহজে কারো প্রেমে পড়বে না। ও চায় বীরপুরুষ। ও হবে বীরভোগ্যা। যার তার গলায় মালা দেবে না ও। দেবে স্বয়ংবর সভায় বীরত্বের পরিচয় দেখে। এমনি একটা আদর্শ বা স্বপ্ন নিয়ে ওর ছেলেবেলা

কেটেছিল। ওর বয়স যখন তেরো কি চোদ্দ তখন ওর দাদার এক বন্ধু এসেছিলেন ওদের বাড়ি বেড়াতে। কয়েক দিন ছিলেন। বীরের মতো চেহারা নয়, তবে সুমার্জিত মুখমণ্ডলে ভাবময় চাউনি। সরোদ বাজান। সে কী সরোদ! যেন শ্যামের বাঁশি। কোনো প্রেম চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে, কোনো প্রেম কানের ভিতর দিয়ে। এই সরোদিয়া ওর হৃদয় জয় করে নিল সেই কয়েকটি দিনে। প্রথম প্রেম এল হৃদয়ে।

মেয়ের ভাবান্তর মায়ের নজর এড়ায় না। তিনি জানতে চান, সে বলে। মা রাজী ছিলেন, বাপ নারাজ। ও জমিদারের ছেলে নয়, পড়াশুনাও তেমন করেনি যে বড় চাকরি পাবে বা বড় উকিল হবে। তা ছাড়া ভিন্ন জাত। সেইটেই সব চেয়ে বড় বাধা। রূপালী কিন্তু মানা মানবার মেয়ে নয়। চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকল জিতেশকে। লিখতে থাকল, আমাকে নিয়ে যাও, হরণ করে নিয়ে যাও অর্জুনের মতো। তার একখানা চিঠি কেমন করে দাদার হাতে পড়ে, দাদার হাত থেকে বাবার হাতে। তিনি তো অগ্নিশর্মা। যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। এখুনি যা।

পাহারা বসল। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ চলতে থাকল। ওর দারুণ আপত্তি। কিন্তু কে শুনেছে ওর কথা! এক বেলা উপোস করে দিনের পর দিন। কোনো ফল হয় না। ওর চেয়ে বয়সে দু'গুণ বড় এক দোজবরের সঙ্গে ওর ধরা দিয়ে। স্বয়ংবর নয়। বনেদী জমিদার বংশের বেঁটে মোটা আহ্লাদী দুলাল। বীরপুরুষ নয়। মাছ ধরা, শিকার, গান বাজনা, খেলা ধুলা সব একটু একটু জানে। লেখাপড়ায় দুটো পাশ। কিন্তু বিদ্বান বা গুণী নয়। চিরা-চরিত প্রথা অনুসারে বিয়ের আগে দেখা-সাক্ষাৎ বারণ। শুভদৃষ্টির সময় বরকে চাক্ষুষ করে রূপালীর চক্ষু স্থির! এ কোন ছদ্মবেশী ব্যাঙ রাজকুমার! রূপকথায় যেমন ব্যাঙ থেকে সহসা সুপুরুষ হল বাস্তবেও হবে না কি?

ফুলশয্যার রাত্রে রূপালী আশা করেছিল এই রূপান্তর। কত কাব্য, কত রোমান্স, কত সৌন্দর্য দিয়ে সূচিত হবে তার নব-জীবন। রজনীদীর্ঘ হবে পূর্বরাগ। মন পাবার তপস্যা চলবে দেহ পাবার আগে। কিন্তু যা হল তা অকথনীয়। সেও এক-প্রকার নারীধর্ষণ। পশু না হলে তেমন অভদ্র ইতর আচরণ কেউ করে না। বর্বর না হলে তেমন করে লজ্জা শরম বিসর্জন দেয় না। প্রথম অভিজ্ঞতা কোথায় সুধার মতো স্বাদু হবে, তা নয়, গরলের মতো বিস্বাদ! সেই কুৎসিত বীভৎস সঙ্গ থেকে সে দূরে সরে গিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এর পর আর নয়।

দ্বিতীয় বারের বার সে বাধা দিয়ে অনর্থ বাধায়, তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসে। অষ্টমঙ্গলার সময় যখন বাপের বাড়ি যায় তখন তার মা বাবা বুঝতে পারেন না কী হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন বিয়ে কোনো রকমে একবার হয়ে গেলে বাকিটুকু প্রকৃতির হাতে, প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাবেই, অন্যথা হবে না। কিন্তু রূপালীর ধারণা তার বিয়ে একটা মায়া, ফুলশয্যা একটা দুঃস্বপ্ন, সে বাপের বাড়িতে ছিল, বাপের বাড়িতেই রয়েছে এবং থাকবে। তার মা কাকিমারা তাকে যতই বোঝান যে মেয়ে-মানুষের আসল বাড়ি হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, স্বামী ভিন্ন ইহলোকে পরলোকে অন্য গতি নেই, মা না হলে জীবন বৃথা, মা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সে ততই অবুঝ হয়। সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না। নোয়া খুলে ফেলে। কুমারীর মতো থাকে।

বৎসরান্তে ওরা তাকে জোর করে রানী-নগরে দিয়ে যায়। এক গাছা দড়ি ও একটা কলসী দিতে ভুলে গেছল। সে-ভুল শোধরানোর উপায় ছিল না। দরকারও ছিল না। সে আবিষ্কার করল যে বাংলার সিংহাসন শূন্য থাকেনি। রানীনগরের রানী হয়েছেন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বিধবা দিদি। সম্বন্ধটা স্ত্রীবিয়োগের পূর্বে হতেই। স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও নাকি তাই। একই কারণে দ্বিতীয় বিবাহ এত দিন হয়নি। যারা শুনেতে পেয়েছে তারা মেয়ে দিতে রাজী হয়নি। তাতে কিছু অসুবিধা হয়নি। এ বাড়িতে ঐটেই নিয়ম। প্রায় প্রত্যেকটি পুরুষের একটি করে উপপত্নী আছে। সেটা বনেদিয়ানার অঙ্গ। না থাকলে পৌরুষে বাধে। তবে বিয়েটাও করা দরকার। নইলে সম্পত্তির অধিকারী কে হবে? বৈধ পুত্র চাই।

বৈধ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। সেইজন্যে রূপালীর পাণিগ্রহণ। তার কর্তব্য হচ্ছে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেওয়া। আর অপরার কর্তব্য শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। দু'-জনের দুই স্বতন্ত্র মণ্ডল। দু' সেট দাসী। ধর্মপত্নী বলে রূপালীরই সম্মান বেশী। কিন্তু নর্মপত্নী বলে সুধার আদর বেশী। মাঝখানে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাছে রূপালী শক পায়। পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রূপালী শক পায় পাবে। কেন সে অনর্থ বাধাতে গেল!

এর পরে তার খুব শক্ত অসুখ করে। তার মামা এসে তাকে ভাগলপুরে নিয়ে যান। যেখানে তার জন্ম। সেখানে বছর খানেক থেকে তার শরীর সারল। কিন্তু যার চিকিৎসায় সারল সে পড়ল সেই ডাক্তারের প্রেমে। এই প্রেমটাই সত্যিকার প্রথম প্রেম। আগেরটা ছেলেমানুষি। এবার তার মনে হল সে জেগেছে। ঘুম ভাঙা রাজকন্যার মতো। জেগেছে দেহে মনে আত্মায়। জেগেছে প্রতি রোমকূপে। প্রতি অঙ্গে। সে তার প্রিয়তমের কাছে প্রেম নিবেদন করল বিরলে। তিনি তার উত্তরে যা করলেন তা বিস্ময়কর। হঠাৎ একটি সুপাত্রী দেখে রাতারাতি বিয়ে করে ফেললেন। বেচারি রূপালী! তার সব আশা নির্মূলে হল। এবার সে হয়তো গঙ্গায় ডুবে মরত, যদি না আকাশ-গঙ্গার মতো নেমে আসত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। সেই আকাশগঙ্গার স্রোতে অনেকে ভেসে যায়। তার স্বামীও। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেপ্তারের হুমকি দেখান, তখন শ্বশুর মহাশয় পুত্রকে বিলেত পাঠিয়ে দেন ব্যারিস্টারি পড়তে। আর পুত্রবধূকে নিয়ে যান রানীনগর।

সেও স্রোতের টান এড়াতে পারল না, অলঙ্কার খুলে দিল গান্ধীজীকে যখন তিনি সদরে আসেন। ম্যাজিস্ট্রেট রাগ করে শ্বশুরের নাম কেটে দেন খাস মুলাকাতি লিস্ট থেকে। কিন্তু এটা তাঁর জয়ের হেতু হয় জেলা বোর্ড-নির্বাচনে। যার জন্যে এ জয় তাকে তিনি বহু পরিমাণে স্বাধীনতা দেন কর্মীদের সঙ্গে মিশতে। রূপালী যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। এখন তার ধ্যান হল ভারতের স্বরাজের মতো তার নিজের স্বরাজ। পরাধীনতার উপর তার ঘেন্না ধরে গেছে।

স্বামী ফিরলেন আড়াই বছর বাদে, ব্যারিস্টার না হয়ে। ভদ্রলোক সভ্যতা শিখেছেন। জোরজুলুম করেন না। আরাধনা করেন। রূপালীর এখন অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ইচ্ছা করলে সে এই মুহূর্তে সুধাকে দূর করে দিতে পারে। কিন্তু তা যদি সে করে তবে তাকেই নিতে হবে সুধার স্থান। যা সে হতে চায় না তাই হতে হবে। সন্তানবতী। তা হলে তার স্বাধীনতার কী হবে? অথচ আজ এখনি সে স্বাধীন হতেও পারছে না। এই নরকবাস সহ্য করতে হচ্ছে নিতান্ত নাচার হয়ে।

সংক্ষেপে এই হল সোনালীর বোন রূপালীর কাহিনী। সোনালীর বোন শুনে মনে কোরো না সত্যিকারের বোন। না পাতানো বোনও নয়। কেউ নয়। একটি অপমানিতা নারী, যার সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে একটি গভীর মিল আছে। উভয়েই ধর্ষিতা। তবে সোনালীর বেলা সেটা

মন্ত্রপূত নয়, সোনালীর বেলা ঢাক ঢোল পিটিয়ে লোকজন খাইয়ে আগুনে ঘি ঢেলে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে শালগ্রাম সাক্ষী করে অন্যায় করা হয়নি, করা হয়েছে একান্ত আদিম ভাবে। আর রূপালীর বেলা এটা মন্ত্রশুদ্ধ, শাস্ত্র-সম্মত, ধর্মনির্দিষ্ট অন্যায়। এর কাছে আত্মসমর্পণই পুণ্য, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই পাপ। যে যত বেশী আত্ম-সমর্পণ করবে সে তত বড় সতী। আত্ম-সমর্পণের দ্বারা যে যত বার মা হবে সে তত বড় দেবী। নারীত্বের পরাকাষ্ঠা অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অন্যায়-কারীর সন্তানের মাতৃত্ব। যেহেতু মন্ত্র-পড়া হয়েছে। নয়তো একই ব্যাপার অন্য নাম নিত। যেমন সোনালীর বেলা।

অন্যায়ের জয় হবে ভাবতেই পারে না রূপালী। সেই যে সে অলংকার ত্যাগ করেছে তার পরে আর ধারণ করেনি। কেবল দু'হাতে দু'গাছি শাঁখা, একগাছা লোহা। এই পর্যন্ত আপোস। লোকে মনে করে এটা দেশের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন। তা নয়। এটা ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহের অস্বীকৃতি। সে কারো অধিকৃতা নয়। সে অনধিকৃতা। এই তো সেদিন মাছ ছেড়ে দিল। বিধবার মতো। এটাও তার বিবাহের অস্বীকৃতি। এবার যা ঘটেছে তা বল-প্রয়োগ নয়, মানসিক নিষ্ঠুরতা। প্রতিবাদ তাকে করতেই হবে, যেভাবেই হোক। তা যদি না করে তবে নিজের উপর শ্রদ্ধা হারাবে। খাড়া থাকতে পারবে না, ভেঙে পড়বে। তার জীবনের গতি একটা চরম অবস্থার দিকে যাচ্ছে। রূপালী তাই ঘোরতর চিন্তিত। কী আছে তার বরাতে কে বলতে পারে! সে কি বাঁচবে! সে কি মরবে! সে কি জীবন্মৃতের মতো বেঁচে বর্তে থাকবে! দেখছে তো আরো নয়শো নিরনব্বুই জন মেয়েকে। কী তাদের বাঁচার ছিরি! প্রত্যেকেই মনে মনে জানে যে তার হাত পা বাঁধা, তার মুক্তির উপায় নেই. থাকলে পালাত, ধরা দিত না, মা হত না। তবু প্রত্যেকেই বলে এটা তার ধর্ম. পতি ভিন্ন সতীর আর কে আছে, অবাঞ্ছিত হলেও তারই সন্তান ধারণ করতে হবে. মনোনয়নের অবকাশ নেই।

ভাই রত্ন, এ-গল্প শুনে তোমার কেমন লাগল লিখো। আশা করি তুমিও বিধান দেবে না যে যা হয়ে গেছে তাকে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। আমি তো বলি, যা হয়ে গেছে তাকে নাকচ করা, তাকে না-হওয়ানোই শ্রেয়। অঙ্ক ভুল হলে সেলেট মুছে ফেলতে হয়, তেমনি বিয়ে ভুল হলে কী? সীমন্ত।

এ কোন ছদ্মবেশী—

॥ ছয় ॥

শ্রীমতী ওইখানেই ইতি করেননি। আরো কয়েক ছত্র লিখেছিল। সেগুলি আরো মারাত্মক। রত্ন এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ছিল এখন চঞ্চল হয়ে উঠল।

রূপালীকে আমি দেখেছি। ও মেয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী নয় যে বিদ্রোহ করার পর পায়ে লুটিয়ে পড়বে সতীন থাকতে প্রসাদ পাবার জন্যে, মা হওয়ার জন্যে। ওই মানুষ হবে তার সন্তানের জনক! ওই ব্যাঙ রাজকুমার, যে ব্যাঙ রয়ে গেল বিলেত থেকে ফিরেও! ছি ছি! তার সন্তান কি কম সাধের কম দুঃখের সন্তান! না, ভাই, ঋষি রবীন্দ্র-নাথের বাক্যও তার শিরোধার্য নয়। কোথায় যেন তিনি লিখেছেন নারী তো তার স্বামীকে বেছে নেয় না, মেনে নেয়। তা হলে তার সন্তানকে বেছে নেবে কেন? মেনে নেবে। মরি, মরি। কিবা যুক্তি! মেয়েরা যেদিন হয়কে নয় করতে শিখবে সেদিন এই ঋষি মশায়দের ত্রিকালদর্শিতায় অনাস্থা আসবে। এঁরা দেখবেন পুরুষ যা-ই করে তা-ই চূড়ান্ত নয়, নারী ইচ্ছা করলে তাকে উল্টে দিতে পারে। বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে! যে জন্যে হয়েছে সেটি হচ্ছে না। আত্মসমর্পণ এত সহজ নয়। দেশের সব মেয়ে যেদিন এই তান ধরবে সেদিন দু'তিনটে বিয়ে করেও কি ফল হবে কোনো!

ফল কথাটার নীচে একটা লাইন টেনে দিয়েছিল শ্রীমতী। রত্ন তা দেখে সিঁদুর হয়ে উঠল। বাপরে! কী ডানপিটে মেয়ে! রত্নর বুঝতে বাকী ছিল না যে রূপালী আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীমতী। গান্ধীকে অলংকার খুলে দেওয়া, মাছ ছেড়ে দেওয়া এই দুটি সঙ্কেত ওকে ধরা পাড়িয়ে দেয়। ও বোধ হয় জানত না যে রত্ন অলংকার খুলে দেওয়ার গল্প আগে থেকে জানত। কিন্তু মাছ ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটা তো ও নিজেই জানিয়েছিল।

যাক, রত্ন শ্রীমতীকে বুঝতে দিল না যে ও বুঝতে পেরেছে রূপালী কে। না বোঝার ভান করে গেল উত্তর দেবার সময়। শুধু তা-ই নয়, যা সে বুঝতে পেরেছিল তাও না বোঝার ভান করল—নরনারীর দাম্পত্য জীবনের যেসব রহস্য। এবার তাকে অনেক রেখে ঢেকে উত্তর লিখতে হল। কে জানে যদি অন্য কারো হাতে পড়ে! একটু গম্ভীর রাশভারী বঙ্কিম-

বঙ্কিম ভাব আনতে চেষ্টা করল তার লেখায়। একটু সংযত সতর্ক রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব। ভারতের অধ্যাত্ম সত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, দেবজীবন, মাতৃত্বের মহিমা ইত্যাদি সব ক'টা বুকনি ছিল তাতে। তার বক্তব্যর সার কথাঃ বর্ণমালায় তিনটে স আছে। স'। স'। স'।

তার তখন একমাত্র চিন্তা কেমন করে শ্রীমতীর হাত এড়াবে। স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্য কলহ কি সে কম দেখেছে! শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। এক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দেবার সময় তার মনে হল ভারতের মাটিতে এই একটি মেয়ে জন্মেছে যে অন্য রকম। এর মনোবল ধ্বংস করে একেও স্টীম রোলার দিয়ে সমভূম করে দেওয়া আর যার দ্বারা হয় হোক, তার দ্বারা হবে না। চিঠিখানা কার হাতে পড়বে সে-কথা ভেবে চিঠি লেখা ভণ্ডামি। পড়ে পড়বে তার স্বামী কিংবা শ্বশুরের হাতে। শাশুড়ী কিংবা ননদের হাতে। তা বলে সমাজরক্ষী সেজে সাজানো কথা লিখবে না। লিখবে স্পষ্ট কথা।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখলঃ

শ্রীমতী,

রূপোলী কে আমি জানি। সে অনন্যা। ভারতবর্ষে তাকে দেখব আশা করিনি। তার সংগ্রামের তুলনায় ভারতের সংগ্রাম কঠিন নয়। সে যদি জয়ী হয় ভারতও জয়ী হবে। শ্রীমতী, তুমিই আমার ভারত। যে ভারত স্বাধীন হবেই, শস্ত্রের কাছে বা শাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। যে ভারত বহু শতকের নির্মোক ত্যাগ করে নতুন হয়ে উঠেছে, মনে প্রাণে নতুন। যে ভারত পুরাণে ইতিহাসে ছিল না, এই প্রথম উদিত হল। শ্রীমতী, তুমিই সেই ভারত। তোমাকে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার বন্দনার ভাষা বন্দে মাতরম্ নয়।

যে পুরুষ নারীর মনোনয়ন পায়নি তার মতো হতভাগ্য কে আছে! পতি মনোনয়নের মধ্যেই সন্তান মনোনয়ন নিহিত। মনোনয়নের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মস্বত্ব। নারী কেন এর থেকে বঞ্চিত হবে? যারা তাকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের অধিকার মানে না। মানুষের চেয়ে বড় করে সমাজকে, শাস্ত্রকে। ফরমায়েসী সতীত্বকে, ফরমায়েসী মাতৃত্বকে। এসব যেন অর্ডারি মাল, অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। অর্ডার অনুসারে না মিললে জোরজুলুম খাটায়, শাস্ত্র থেকে পৌঁছয় শস্ত্রে। প্রেমের পথ এ নয়। প্রেম কখনো দাবি করে না। তাই প্রেমের মধ্যে দু'পক্ষের স্বাধীনতা নিহিত। স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম।

আজ আমার মন ভরা আছে। বিষাদে অথচ গৌরবে। আজ এই পর্যন্ত। কাল রাজশাহী যাচ্ছি। সাত ভাই চম্পার বৈঠকে। ইতি। তোমার বন্ধু রত্ন।

অনেক কথা বলার ছিল, বলতে পারত। কিন্তু সমস্যা তো কথা দিয়ে মিটবে না। চাই কাজ। যে-মেয়েটি একা সংগ্রাম করছে শত্রুপুরীতে মিত্রহীন হয়ে তার মনের জোর যাতে বজায় থাকে সেইজন্যে কথা যেটুকু বলতে হয় সেটুকু বলবে। কিন্তু তার জয়ের পক্ষে সে-ই যথেষ্ট নয়। চাই কাজ। রত্ন এর কী করতে পারে!

ভারতের জন্যেই বা কী করতে পারছে! বাইরে যাবার কথাই তো ভাবছে। সে কি শুধু ভারতবর্ষেরই সন্তান, সারা পৃথিবীর নয়? জন্মকালে কি সে সারা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়নি, কেবল ভারতের কোলে হয়েছে? মৃত্যু হলে কি সে সারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে না, কেবলমাত্র ভারত থেকে নেবে? তা হলে কেন আয়ু থাকতে দেশবিদেশ ঘুরে দেখবে না? কে জানে ক'বছর পরমায়ু! জীবনের বিশ বছর কাটল একটিমাত্র ভূখণ্ডে। আর কেন!

তার বাল্যসখা হীরু তাকে বড় ভালোবাসে। এমন দিন যায় না যেদিন দুজনের দেখা হয় না। হীরুর সর্বক্ষণ ভয় যে রত্নর ছুটি ফুরিয়ে আসছে, সে আবার অদর্শন হবে। তাকে চোখে চোখে রাখে, রাত দশটা না বাজা তক চোখের আড়াল করে না। সেই হীরু যখন শোনে যে রত্ন সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে দেশ দেশান্তরে যাবে তখন তার মনের অবস্থা শ্রাবণের মেঘের মতো বর্ষণ-উন্মুখ হয়। সে কথা বলতে পারে না, তার হয়ে কথা বলে তার বিবর্ণ মুখমণ্ডল, তার কাতর চাউনি। যখন বাণী ফিরে পায় তখন বলে, "হাঁ রে, রতন, তোর মা নেই বলে কি কেউ নেই যে তুই উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াবি বাউল দরবেশের মতো!"

রত্ন তার ভীরু বন্ধুটিকে ভয় দেখিয়ে বলে, "কেন? বাউল দরবেশ কি মন্দ? আমি এসেছি শুনলে ওরা রোজ আমাদের বাড়ি আসে, গান গায়, আনন্দলহরী বাজায়, আনন্দ করে। আর আমিও তো যাই ওদের আখড়ায়! দেখি ওদের জীবন। সম্বল বলতে কয়েক রকম কয়েকটা ঝোলা আর ভিক্ষাপাত্র আর ওই আনন্দলহরী। যখন এক আখড়া বাসি হয়ে গেল তখন আরেক আখড়ায় চলল। সঙ্গে হয়তো সঙ্গিনী। নয়তো সঙ্গিনীকে মুক্ত করে যায়, যাতে সে অপর সঙ্গী গ্রহণ করতে পারে। নিজেও মুক্ত হয়।"

হীরুর চোখ কপালে ওঠে। সে বকুনি দেয়, "ভদ্রলোকের ছেলে না তুই! তোর এসব ভালো লাগে! একটা মেয়ে, তার দশ বার দশজনের সঙ্গে মালাচন্দন হয়েছে, এও তো আমার জানা। তেমন একটি সঙ্গিনী যদি তোর কাঁধে চাপে তা হলে সে আর নামছে না, বাছাধন! তার হয়তো আগের পক্ষের সন্তানও আছে, পিতৃপরিত্যক্ত। সেটিও তোর পিঠের বোঝা হবে। তারপর তোরও কি নিজের একটি হবে না? সেটিকে কার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে যাবি? তোর বাপ তো দশরথের মতো মারা যাবেন পুত্রশোকে।"

রত্ন শিউরে উঠল। মারা যাবেন বাবা! পুত্রশোকে! সে কি তবে নিজের জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না? এ কী অত্যাচার! বলল, "হীরু, তুই তো জানিস আমি বাপের সম্পত্তি চাইনে। রামের মতো সিংহাসন ছেড়ে দিতে চাই ছোট ভাইকে।"

"সে তো আরো বড় শোক। বাপের প্রাণ কি তা সইতে পারে!" হীরু কেঁদে ফেলল।

রাজশাহী যাত্রার দিন এল। সব খবর দিয়ে রেখেছিল, তার ট্রেন যখন ঈশ্বরদি হয়ে যায় তখন নবনী ওঠে। নাটোরে অপেক্ষা করছিল হৈম। কোলাকুলির পর তিনজনে রাজশাহীর বাস ধরল। কতকাল পরে আবার এই পথ দিয়ে যাওয়া। সব নতুন লাগছিল। দু'ধারে তাকাতে তাকাতে গল্প গুজব করতে করতে চলল।

হৈম ছেলেটি মাথায় খাটো। মোমের পুতুলের মতো ফরসা ও নরম। রোজ সাবান মাখে এক ঘণ্টা ধরে, যদিও এমনিতেই ধবধবে। পোশাক পরিচ্ছদ ফিটফাট ছিমছাম। কথাবার্তায় চোস্ত। সব সময় তার মুখে খৈ ফুটছে। কিন্তু কখনো কারো মনে আঘাত দেয় না। সৌজন্য আর স্নেহ দিয়ে গড়া।

নবনীও গৌরবর্ণ। দোহারা গড়ন। দীঘল। তার মুখমণ্ডল সুশ্রী ও মার্জিত। কিন্তু প্রসাধনের জন্যে নয়, এমনি। তার আচরণে ধীরতা ও স্বভাবে সংযম। তার আয়ত নেত্রে বিষাদ মলিন গভীরতা। সৌম্য, শান্ত, প্রীতিকর তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে কাজের লোক নয়। একসঙ্গে বেড়াতে বেরোলে সে-ই সকলের পিছনে পড়ে থাকে।

বাস স্ট্যান্ডে কানন উপস্থিত ছিল। তার গোল মুখ হাসিতে খুশিতে আরো গোলগাল দেখাচ্ছিল। এই এক বছরে সে তালগাছের মতো বেড়েছে, চওড়াও হয়েছে কতকটা।

পশুদের দুঃখে কাতর বলে তার মুখে করুণ ক্লিষ্ট ভাব নেই, যেমন গিরীনের মুখে। মঙ্গোলিয়ান ধরনের চেহারা ও রং। হরদম সিগারেট ফুঁকছে। প্রাণোচ্ছল।

ওরা কাননের সঙ্গে তার কাকার বাসায় গিয়ে দেখে গিরীন কখন থেকে বসে আছে। লম্বা, রোগা, কালো, মুখে বসন্তের দাগ, ড্যাবড্যাবে চোখ। গায়ে একটা খদ্দরের আলখাল্লার মতো বেঢপ পাঞ্জাবি। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। পায়ে ক্যানভাসের জুতো, রং চটা, তালি দেওয়া। কতকটা সাধুসন্তের মতো দেখতে। প্রায় মৌনী।

কোলাকুলি কুশল বিনিময়ের পর ওরা চা খাচ্ছে, এমন সময় প্রভাত ও ললিত এসে জুটল। ললিত নামেই ললিত। মালকোঁচা মারা মজবুত জোয়ান, সব রকম খেলায় ওস্তাদ। লোহার মতো শক্ত ওর মাংসপেশী। চোখে চশমা, সেটার ভগ্ন দশা। বোধ হয় বল লেগে। বনেদী ঘরের ছেলে। ভদ্র। মজলিসী।

সাত ভাই চম্পায় সকলে সমবেত। এমন অর্ধোদয় যোগ অনেক দিন ঘটেনি। সাত-জনের বিছানা এক সঙ্গে পাতা হল। একখানা ফরাস, পাশাপাশি সাতটা বালিশ। খাওয়া দাওয়ার পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে কথা যেন ফুরোতে চায় না। রাত বারোটার পরে নবনী, হৈম ও গিরীন ঘুমিয়ে পড়ে। রাত একটার পরে কানন ও প্রভাত। জেগে থাকে ললিত ও রত্ন। দেয়ালের দিকে, এক টেরে।

রত্ন যেন এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল। বলল, "ভাই ললিত, তুমি তো জানো শ্রীমতী আমাকে চিঠি লেখে। কিন্তু এত বার চিঠি লেখালেখি হল, এখনো পরিচয় হল না। সে কে? কার কী হয়? বেগমপুর কোথায়?"

"ওঃ! কেউ তোমাকে এসব কথা জানায়নি! কী তা হলে এত লেখে!"

"সোনালী বলে একটি ধর্ষিতা মেয়ের কাহিনী। রুপালী বলে আরেকটির। ক্লাইভ থেকে লর্ড লীটন প্রমুখ ইংরেজের দুষ্কীর্তি। সন্ত্রাসের আবশ্যকতা। গান্ধীজীর ব্যর্থতা। ভালো কথা, ললিত, তুমি কি ওর সন্ত্রাসবাদী মণ্ডলীর সদস্য হয়েছ?"

ললিত যেন আকাশ থেকে পড়ল। "সন্ত্রাসবাদী! মণ্ডলী! কারা এসব রটায়! ওর মণ্ডলী বলতে কী বোঝায়, জানো? জনকয়েক দরদী বন্ধু ও আত্মীয়। দেশের মুক্তির নামে যারা ওর সঙ্গে দেখা করে, ওর মুক্তির কথা আলোচনা করে। দেশের মুক্তির নাম করলে ওর সঙ্গে মেলামেশা সহজ হয়, নইলে যা কড়া পর্দা! ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ শাসনের উপর বরাবর অপ্রসন্ন। ইংরেজী শিক্ষার উপর মুসলমানদের মতোই বিরূপ ছিল। এখনো দুটো একটা পাশ করলেই যথেষ্ট মনে করে। চাকরি তো করবে না।"

রত্ন থামিয়ে দিয়ে বলল, "শ্রীমতীর মুক্তি কার হাত থেকে? কেন?"

"তা হলে গোড়া থেকে বলতে হয়। রাত হয়েছে। শোবে না?"

"রাত হয়েছে বলেই তো সুবিধা। আর কেউ শুনতে পাবে না। বলো।"

তখন ললিত বলে গেল শ্রীমতীর ইতিবৃত্ত।

ওদের বাড়ি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। আগে পলাশীর কাছে ছিল। ওর বাবা জমিদারী থেকে যা পান তাতে কুলয় না। জজ কোর্টে ওকালতি করেন। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন, তার পর বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়াতেন। কলকাতায় পড়ত বড় ছেলে শ্রীশেষপ্রতাপ। সে একদিন তার বন্ধু অনুপকে নিয়ে এল অতিথিরূপে। অনুপ এখন একজন বিখ্যাত সরোদী। তখনি তার যশ ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু টাকার জন্যে তো বাজাত না। ঘরে টাকাও ছিল না। তা ছাড়া ও দত্ত। এরা সিংহ রায়। তাই শ্রীমতী যখন ওকে বিয়ে করবে বলে চিঠি লিখল তখন ওর বাবা অশেষপ্রতাপ ওর অন্যত্র বিয়ে দিলেন। বিয়ে যার সঙ্গে সে বেগমপুরের রাধামাধব ফৌজদারের পুত্র যশোমাধব। যার ছোট বোন সুশীলা ললিতের বৌদি। বেগমপুর কোথায়, রত্ন জানে না? লালবাগের নাম শুনেছ? তারই কাছাকাছি।

বিয়ের কিছু দিন পরে কী যে ঘটল স্বামী স্ত্রীতে, শ্রীমতী সোজা বলে বসল স্বামীর ঘর করবে না, ও নাকি স্বামীই নয়। বাপের বাড়ি গেল, ফিরতে চাইল না, ওরা জোর করে ফেরত পাঠাল। এক বছর পরে এসে দেখল যশোবাবু তাঁর প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীর বিধবা দিদি সুধাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর জননীর সেবিকা হবার জন্যে। শ্রীমতীর জন্যে অন্য মহল বরাদ্দ হয়েছে। তখন ও মেয়ের যা রাগ। থাকতেও পারছে না, ফিরতেও পারছে না। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, গঙ্গাস্নান বারণ হল। এর পরে ওর খুব অসুখ করে। সারে না। তখন ওরই ইচ্ছায় ওকে পাঠাতে হল ওর মামার বাড়ি ভাগলপুর। বাপের বাড়ি ও যাবে না। মামার নাম ময়ূরবাহন সিংহ, বিশিষ্ট রইস ও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেবেলাটা ভাগলপুরে কেটেছে। ওখানে গিয়ে অসুখ সারতে দেরি হল না, জন্মস্থানের জলহাওয়া মানুষকে খুব সাহায্য করে। শ্রীমতী ওখানে রয়েই গেল শরীর ফেরাবার নাম করে। এক বছর যায়, এমন সময় সে ওখানেও বাধিয়ে বসল এক কাণ্ড। এক ছোকরা ডাক্তার ও-বাড়িতে আসত যেত। তার সঙ্গে প্রেম। জানাজানি হতে যাচ্ছে, হলে প্র্যাকটিসটি মাটি, তাই ডাক্তার চোখ বুজে বিয়ে করে ফেলল আরেক জনকে। তখন শ্রীমতীর দশা হল রাই উন্মাদিনীর মতো।

তার মামা তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়তেন, যদি না রাধামাধববাবু অগ্রসর হয়ে তাকে বেগমপুর নিয়ে যেতেন। যশোবাবু হঠাৎ বিলেত চলে যান পুলিশের নজর এড়াতে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন। বিলিতী মদের বোতল ভেঙেছিলেন। সুধা শ্রীমতীর পা ধরে মাফ চায়, শ্রীমতীর মহল শ্রীমতীকে ছেড়ে দেয়, নিজে ঠাকুর-ঘরে আশ্রয় নেয়, রাতদিন প্রার্থনা করে যশোবাবুর মঙ্গলের জন্যে। এ হল সত্যিকারের প্রেম। যে যাই বলুক এ প্রেম নিছক কায়িক সুখ নয়। শ্রীমতী তার স্বামীকে কায়িক সুখ দিলে সুধাকে ও-সুখ দিতে হত না। সুধা সে-রকম মেয়েই নয়। দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ বরাবরই ছিল। সেটাকে রতির সম্বন্ধ হতে দিল কে? শ্রীমতী স্বয়ং!

যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ভুলে গেলেই হয়। শ্রীমতী কিছুতেই ভুলবে না। আড়াই বছর যশোবাবু বিলেতে ছিলেন। সেই সুযোগে শ্রীমতী রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান করে নিল। বহরমপুর গিয়ে অলঙ্কার খুলে দিল গান্ধী মহারাজকে। শ্বশুর মহাশয় তো হতবাক। তারপর শ্বশুরকে জিতিয়ে দিল জেলা বোর্ড নির্বাচনে। এক চালে বাজী মাত। শ্বশুর তার কাছে কৃতজ্ঞ। বাড়ির পর্দা বজায় রেখে বৌমাকে তিনি মেলামেশার স্বাধীনতা দিলেন কয়েকটি বাছা বাছা কর্মীর সঙ্গে। এরা আসে প্রকাশ্যে ভারত উদ্ধারের জন্যে। গোপনে শ্রীমতী উদ্ধারের জন্যে। কিছুতেই ও-মেয়ে স্বামীর ঘর করবে না। ললিতও এ-দলে ভিড়ে গেল যখন দেখল যে শ্রীমতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তা ছাড়া এটাও তো ঠিক যে সুধাকে যশোবাবু ত্যাগ করবেন না। বিলেত থেকে ফিরে তিনি সুধাকে নিয়ে আছেন, সুধাকে দিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে শ্রীমতীর জন্যে সেইটুকুই মজুত। উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে কোন স্ত্রী রাজী হয়! বিশেষত শ্রীমতীর মতো তেজী মেয়ে!

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ললিত ওকে সোনালীর কাহিনী বলেছিল। তার থেকে এল সাত ভাই চম্পার কথা। সেই সূত্রে রত্নর নাম করেছিল। ও যে রত্নকে চিঠি

লিখছে এটাও ললিতের জানা। রঞ্জুও শ্রীমতীর মণ্ডলীর সামিল হয়ে গেছে।

ঘুমে দুই বন্ধুর চোখের পাতা জুড়ে আসছিল, কিন্তু ঘুমের ঘোরকে অতিক্রম করছিল গল্পের ঘোর। আবার কবে কোথায় দেখা হবে, এমন সুযোগ মিলবে!

রঞ্জু জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীমতী কেন বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করে না, তার পরে কোনো রকমে স্বাবলম্বী হয় না?"

"ও'রা সাফ বলে দিয়েছেন সন্তান-সম্ভাবনার আগে ও'দের ওখানে না যেতে। গেলে মুখদর্শন করবেন না। পত্রপাঠ ফেরত পাঠাবেন।"

"তা হলে মামার বাড়ি? ভাগলপুরে?"

"সেখানে গেলে ডাক্তারটির মুখদর্শন করতে হবে। শ্রীমতীর তা অসহ্য।"

"তা হলে আর কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি? মাসী পিসী খুড়ী?"

"কেউ সাহস পায় না ওকে ডাকতে বা রাখতে। ও যেখানে যায় রোমান্স ওর সঙ্গে সঙ্গে যায়। ওর দোষ কী! ওর সৌন্দর্যের দোষ। যে দেখে সে মুগ্ধ হয়।"

রঞ্জু ক্লান্ত হয়ে বলে, "তা হলে কী উপায়? তোমরা ওর মণ্ডলীর সভ্যেরা কী বল?"

"ও যদি মনঃস্থির করতে পারত আমরা যা হয় একটা উপায় খুঁজে বার করতুম। কিন্তু ওর নিজের মতি স্থির নেই। মুক্ত হতেও বদ্ধপরিকর, কিন্তু মুক্তির জন্যে মূল্য কী দেবে, না আদৌ দেবে না, এই নিয়ে ওর অন্তহীন ভাবনা ও আমাদের অন্তহীন মাথাব্যথা।"

কথাটা পরিষ্কার হল না। খুলে বলতে হল।

স্বামী যত দিন দেশে ছিলেন না তত দিন কোনো সংকট ছিল না, সমস্যা যদিও ছিল। তাঁর ফিরে আসার পর থেকে সংকটের সৃষ্টি। দিন দিন সংকট ঘনিয়ে আসছে। শ্রীমতী আর কোথাও চলে যেতেও পারছে না, যাবার জায়গা নেই। অথচ একই বাড়িতে থাকতেও পারছে না। থাকলে চোখের উপর যা ঘটছে তা সহ্য করতে হয়। স্বামী রোজ শুতে যান সুধার ঘরে, শ্রীমতী সারা রাত একলাটি থাকে। তার কি রক্তমাংসের শরীর নয়? তার কি বাসনা কামনা নেই? বিশ বছর বয়সে কোন মেয়ের না থাকে? ডাক্তার তার তৃষ্ণা জাগিয়ে দিয়ে তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত করেছে। এখন কে দেবে তাকে এক ফোঁটা জল? স্বামীর দিকে তাকায়। জল নয়তো, পাঁক। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ শুয়ে শুয়ে দগ্ধ হয়।

আত্মসমর্পণের চিন্তা কখনো যে আসে না তা নয়। কিন্তু একে তো পরাজয় স্বীকার করতে হবে, তার উপর মা হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। ছেলেও তো হবে বাপের মতো দেখতে, তেমন স্বভাব পাবে। আর ওই বাড়ির পঙ্কিল পরিবেশে কি ছেলে মানুষ করা যায়? যে-বাড়ির বড় থেকে ছোট পর্যন্ত দাসী নিয়ে শোয়। একমাত্র যশোবাবুর উঁচু নজর। তিনি যার সঙ্গে শোন সে দাসী নয়, সমান শ্রেণীর মেয়ে। সে-ই আসল স্ত্রী। শ্রীমতী নয়। সে-ই তো আড়াই বছর ধরে বিরহে পুড়ল। একনিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি।

স্বামী যখন সুধার ঘরে যান তখন ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এটা ওর নিজের বর্ণনা। কিন্তু ওর ননদের বর্ণনা অন্য রকম। পরের দিন ও সুধাকে গালমন্দ দেয়, শাসায়। আবার কী মনে করে ওর ঘরে ডেকে এনে চুল বেঁধে দেয়, সাজায়, সাজিয়ে বাসরঘরে পাঠায়। সুধা যখন ওর চুল বেঁধে দেয়, ওকে সাজায়, তখন হাহুতাশ করে বলে, আমার মধু খেতে কোন্ ভ্রমর আসছে যে তোমার মতো আমি ফুল সাজব! সুধার মুখে এই বার্তা পেয়ে ভ্রমর যদি বা এল তো বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। যদি সম্মতি আছে ধরে নিয়ে বল খাটাতে যায় অমনি বলাৎকারের অপবাদ। যদি বল পরীক্ষায় না নেমে চুপি চুপি পালায় তা হলে কাপুরুষতার অপবাদ। লোকটাকে সারা রাত ঘরে আটকে রেখে ভোগান্তি দেবে এই বোধ হয় মতলব। আশা থাকলে ওই মানুষই প্রেমের কথায় মুখর হত, কুহু কুহু করত, কিন্তু যার অন্তে প্রত্যাখ্যান তার আদ্য আর কত মধুর হবে।

'মুক্তি', 'মুক্তি' করছে যে, কার হাত থেকে মুক্তি? ও ভদ্রলোক তো উপস্থিত তেমন কোনো দাবি করছেন না। পরে করতে পারেন বটে। বংশধর তাঁর চাই। তাঁর পিতামহী নাতির মুখ দেখবেন বলে বেঁচে আছেন, আর কত দিন বাঁচবেন! শ্রীমতী যদি মা হতে রাজী না হয়—সুধার তো হওয়া না হওয়া সমান অবান্তর—তা হলে আরেক বার বিয়ে করতে হবে। শ্রীমতী জানে যে এক দিন না এক দিন এ প্রস্তাব উঠবেই। তখন তার সংকট চরমে উঠবে। সে যদি মা হয় তা হলে তার মুক্তি সুদূরপরাহত। যদি না হয় তা হলে সে এমন মুক্তি পাবে যে শেষ কালে মুক্তির জ্বালায় অস্থির হয়ে বন্দিনী হতে চাইবে। যে-কোনো সর্তে রাজী হয়ে যাবে। সতীনের ময়লা সাফ করার সর্তেও। সতীনপুত্রকে জমিদারি ছেড়ে দেবার সর্তেও। শ্রীমতী যে মনঃস্থির করতে পারছে না এই তার কারণ।

বয়স্ক যাঁরা, প্রবীণ যাঁরা, যাঁদের সে ভক্তি করে তাঁরা—বিশেষত মহিলারা—তাকে এক-বাক্যে পরামর্শ দিচ্ছেন সময় থাকতে মিটমাট করতে। তার মানে, স্বামীকে স্বামীর অধিকার দিতে। উত্তরাধিকারীর গর্ভধারিণী হতে। এমন কি, সুধাও তাকে সেই পরামর্শ দেয়। সে যেদিন বলবে সুধা সেদিন সরে যাবে। সুধার বিষয়-বাড়ি আছে, সে অনাথিনী নয়, সে যে এখানে পড়ে আছে এর জন্যে তাকে লোকনিন্দা মাথায় নিতে হয়েছে। সময় থাকতে সেও চলে যেতে চায়। যার স্বামী তার কাছে দু'দিন বাদে ফিরে যাবেই। পর কখনো আপন হয়! সুধা বলে, তোর ধন তুই বুঝে নে। আমি আর কতকাল পরের ধনে পোদ্দার হব? ওদিকে যশোমাধব কিন্তু সুধার আঁচল ছাড়বেন না। সুধাকে তিনি সুধার মতো ভালোবাসেন। বলেন, আমাকে কার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে, সুধা? যার খায়, যার পরে, তার প্রতি ওর বিন্দুমাত্র কর্তব্য নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, তার বংশলোপ হলেও নির্বিকার। তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়স হল আমার, কোন দিন মরব তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু আঁটকুড়ো হয়ে মরব। এই যা দুঃখ।

রঞ্জু তন্দ্রাজড়িত স্বরে বলল, "তার পরে?"

ললিতেরও তন্দ্রা এসেছিল। বলল, "তার পরে আর কী? ভদ্রলোক এক ধার থেকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে যা পান তাই কিনে এনে নিবেদন করেন শ্রীমতীকে। কাবুলিওয়ালার মতো ধার দিয়ে যাচ্ছেন, ঋণের পরিমাণ সুদে আসলে বাড়ছে। শ্রীমতী জানে তার উদ্দেশ্য কী। কেন তিনি এমন সহিষ্ণু। একটি কড়া কথা মুখে আনেন না। যাকে বলে নিখুঁত ভদ্রলোক। হবে না কেন? কত বড় অভিজাত বংশ! শ্রীমতী জানে, এই ভদ্রতার বিনিময়ে কী দিতে হয়। জানে, কাঁপে, কাঁদে। এ তার সোনার শিকল। লোহার হলে এত দিনে কাটতে পারত।"

রঞ্জু একটু সামলে নিয়ে বলল, "আচ্ছা, ও এত রাগী কেন?"

"রাগবে না? দিন দিন নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ছে। মুক্তি চাই বললেই তো মুক্তি অমনি মেলে না। দাম দিতে হয়। কী দাম দিচ্ছে? এই প্রশ্নটা আমি ওকে বার বার করেছি। উত্তর দিতে পারেনি, রাগ করেছে। এখন আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম আমিই। অথচ সেই আমার সঙ্গেই আড়ি! আর তোমার সঙ্গে তো শুনি খুব জমে গেছে।"

রঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, "না, না তেমন কিছু নয়।"

"কেন? আমার বৌদি তো শত মুখে

তোমার প্রশংসা শুনেছেন। তোমার চিঠিও তাঁকে দেখানো হয়েছে। তোমার তারা এখন ঊর্ধ্ব গগনে। যেমন আমার ছিল এই কিছু দিন আগেও। যেই হক্ কথা বলতে শুরু করবে অমনি তোমার সঙ্গে পত্রালাপ যাবে বন্ধ হয়ে। ওর সব চেয়ে রাগ জ্যোতিদার উপর। অমন স্পষ্টবাদী অথচ দরদী বন্ধু ওর নেই।"

জ্যোতিদা সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা ছিল রত্নর। কিন্তু আর জেগে থাকতে পারছিল না। বলল, "আচ্ছা, ললিত, ঘুমিয়ে পড়া যাক।"

"আচ্ছা, ভাই।"

দু'মিনিটের মধ্যে ললিতের নাক ডাকল। কিন্তু রত্নর ঘুম অত সহজে এল না। সে এক এক করে মনে করতে লাগল শ্রীমতী কী লিখেছিল আর ললিত কী বলে গেল। কোথায় মিল, কোথায় অমিল। দু'জনের মধ্যে সে শ্রীমতীকেই বিশ্বাস করে বেশী। নারীর সত্যবাদিতায় তার স্বাভাবিক বিশ্বাস। আর শ্রীমতী হল নারীদের মধ্যে নারী। অমন নারী আর হয় না। কত বড় একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এক হাতে একলা।

"রত্ন, জেগে আছ না ঘুমিয়ে পড়েছ?" প্রভাত বলল রত্নকে চমকে দিয়ে।

"কে? প্রভাত? কতক্ষণ ঘুম ভেঙেছে?"

"ঘুম এলে তো? আমি সব শুনেছি।"

॥ সাত ॥

ভোর বেলা যাদের ঘুম ভাঙল তাদের হৈ হুল্লোড় শুনে বাদবাকী সকলের ঘুম ছুটে গেল। রত্ন আর একটু গড়াত, কিন্তু নবনী গান জুড়ে দিল—যদিও গান নয় ওটা।

"হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।"

চলল সবাই হৈ চৈ করে পদ্মা দেখতে। এক এক পেয়ালা চা খেয়ে। শরতের নদীতে বর্ষার নদীর মতো বেগ নেই। তবু তার প্রসার অনেক দূর। চেনা চর অদৃশ্য। অচেনা চর মাথা তুলছে। নৌকা চলেছে কত রকম পাল তুলে। স্টীমারের ধোঁয়া দেখা যায়।

বাঁধের এক জায়গায় ওরা আসন নিল। অতীতে সেই ছিল ওদের সন্ধ্যা বেলা বেড়ানোর সময় বসবার ঠাঁই। সেইখানে বসে সাত ভাই চম্পার তর্ক-বিতর্ক জল্পনা-কল্পনা গল্পসল্প চলত। এখন কেউ সেখানে বসে না। গিরীন তো ডুমুরের ফুল, কানন ও হৈম কচিৎ একসঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। আর সবাই তো বাইরে।

এর পরে ওরা শহর দেখতে গেল। পুরনো কলেজ, হস্টেল, মেস, মিউজিয়াম। অধ্যাপক ও সতীর্থদের সঙ্গেও দেখা করল। তারপর দুপুরে ফিরে স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিল। অতঃপর বৈঠক।

বৈঠকে প্রত্যেকেই বলল কোথায় ছিল কোথায় এসে পৌঁছেছে। ব্যক্তিগত জীবনের এক বছরের বিবর্তন। বর্তমান পরিস্থিতি। রত্ন যা বলল তার মর্ম ঃ

আর মাস ছয়েক পরে পরীক্ষা। তার পরে সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে শেলীর মতো দেশান্তরী হবে। ফিরে আসবে না তা নয়। কিন্তু ফিরতে দেরি হবে। হয়তো রামের বনবাসের মতো চোদ্দ বছর। বাইরে থেকে কাজ করার সুবিধা অনেক। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তো নিশ্চয়ই, সমাজের জীর্ণ সংস্কারের জন্যেও। এখানে মুখ খুললেই লোকে হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে। যেন আগুন ধরে গেল তাদের পচা খড়ের আটচালায়। ওখান থেকে সে যা খুশি লিখে উড়িয়ে দেবে। এক একটি চিন্তা উড়ে আসবে আগুনের ফুলকির মতো। তখন আগুনের কাজ আগুন করবে। সে নির্লিপ্ত।

কিন্তু এদিকে তার নিজের ভিতরেই এক দ্বৈতভাব লক্ষ্য করছে। ছিল বিদ্রোহী, এখনো তাই আছে, অধিকন্তু হয়েছে মিস্টিক। বিদ্রোহী চায় ওমর খৈয়ামের মতো এই বিশ্রী খাপছাড়া ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে এনে নির্মম-ভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে। অথচ মিস্টিকের চোখে মায়া-অঞ্জন আঁকা। ওই চোখ দিয়ে সে যা-ই দেখে তা-ই সুন্দর। কেন তা হলে ভাঙবে? কাকেই বা ভাঙবে? ভাঙনের চেয়ে সৃজন ভালো।

এই সব নয়। এক দিক থেকে যেমন সে বিদ্রোহী তথা মরমী তেমনি আরেক দিক থেকে লীলাবাদী তথা বীর। বীরত্ব বিনা জীবন অসার। সকলের কাছে সে বীরত্ব প্রত্যাশা করে, নিজের কাছে সব চাইতে বেশী। অথচ তার জীবনটা হবে তার লীলা। বাঁচতে চায় সে লীলাকুশলের মতো। মরবে যখন তখন যেন প্রত্যয় হয় যে লীলা করে গেল। যা কিছু করবে তা যেন সলীল হয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কিন্ত কঠিন কিছু না করতে পারলে সে বাঁচবে না।

এও সব নয়। সে ইতিহাসের রত্ন তথা চিরকালের রত্ন। বিবর্তনের শোভাযাত্রায় আর সকলের সঙ্গে সেও আছে, সেও পৃথিবীকে প্রত্যহ বদলে দিচ্ছে। অথচ সে স্বকালের ঊর্ধ্বে। তার কাছে যুগযুগান্তর কিছু নয়, লক্ষ লক্ষ বৎসর যেন কয়েকটি নিমেষ। তা হলে সে কেন ব্যস্ত হয় সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের জন্যে? এক দিন যা হল না অন্য দিন তা হবে। না হলেই বা তাতে কী? সে তো সূর্যের মতো নির্লিপ্ত।

এই কি সব? না। আরো আছে। সে কেন্দ্রাভিমুখ তথা কেন্দ্রাতিগ। সে সব দেশ দেখবে, সব মানুষের পরিচয় নেবে, সব বিদ্যা অধিগত করবে। অথচ সে কোথাও একঠাঁই ঘর বাঁধবে। বনস্পতির মতো শিকড় গাড়বে। অরণ্যে বা গ্রামে, যেখানে সভ্যতার হট্টগোল পৌঁছয় না। কোনো এক নারীর সঙ্গে, যে আলো হাওয়া আগুনের মতো এলিমেন্টাল। প্রকৃতির কন্যা, প্রকৃতির হাতে গড়া, অকৃত্রিম।

এও শেষ নয়। পরিশেষে সে স্বাধীন মানব তথা প্রেমিক পুরুষ। স্বাধীন যে সে তার স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কিছু চায় না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব বিসর্জন দেয়। প্রেমিক যে সে প্রেমিকার জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করতে পারলে বাঁচে। বিনিময়ে তার কোনো দাবি নেই। যদি কিছু পায় কৃতার্থ হয়। না পেলে নীরব থাকে।

এই যে দ্বৈতভাব এর থেকে তার পরিত্রাণ নেই। হয় সে একটা সামঞ্জস্যে পৌঁছবে নয় দোটানায় দুলবে। দোটানা আবার এক এক দিন এক এক রকম।

রত্নর আগে প্রভাত বলেছিল। পরে নবনী, হৈম, গিরীন, কানন একে একে তাদের বক্তব্য পেশ করল। বলল না শুধু ললিত। পরের দিন বলবে। সভাভঙ্গের পর সকলে গা তুলালে হৈম এসে রত্নকে জড়িয়ে ধরল। নবনী তার দিকে সস্নেহে তাকাল। কানন তার হাতে হাত মিলাল। গিরীন কী বলল শোনা গেল না, বোঝা গেল সে অভিভূত হয়েছে।

রাত্রে এক সময় প্রভাত বলল, "আমি তোমার এত কাছে থাকি। কই, এসব তো এত দিন শুনিনি? হাঁ, মিস্টিকের মতো কথা শুনেছি মনে পড়ছে।"

তখন রত্নর মনে পড়ে গেল রানুর প্রসঙ্গ। একান্তে সুধাল, "প্রভাত, রানুর খবর কী?"

প্রভাত স্নিগ্ধ হেসে বলল, "ভালো। রানু কি আর সে রানু আছে! মা হতে চলল।"

শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, রত্ন হকচকিয়ে গেল। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বলল, "দেখা হয়েছে?"

"হাঁ, এই তো সেদিন। খালাস হবার জন্যে বাপের বাড়ি এসেছে। মুখে স্বর্গীয় আভা। চিরন্তন মাতৃত্বের আলেখ্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। এই তো আমাদের

সনাতন ঐতিহ্যের কল্যাণী নারী।” প্রভাত যখন ভাবপ্রবণ হয় তখন দারুণ হয়।

রত্নর ভিতরকার মিস্টিক কোথায় তলিয়ে গেল, বিদ্রোহী মাথা তুলল। উষ্ণ হয়ে বলল, “যে কোনো ষাঁড়ের সঙ্গে যে কোনো বকনাকে জুটিয়ে দাও, দেখবে সনাতন মাতৃত্বের চিত্র। আমাদের পরম পূজনীয়া গোমাতা। কিন্তু এর মধ্যে নারীকে খুঁজলে পাবে না। নারীত্ব এর চেয়ে দুর্লভ। রানুর নারীত্ব বলতে কতটুকু অবশিষ্ট রইল, তাই বলো।”

প্রভাতও ব্যথা বোধ করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুর্তি। রানুর জন্যে তার কেরিয়ার মাটি হতে যাচ্ছিল, খুব বেঁচে গেছে। আর রানুও তো একটা অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেল। মৃত্যু ঘটত, তার বদলে মাতৃত্ব ঘটেছে। কোন্‌টা ভালো।

প্রভাত গদগদ স্বরে বলল, “ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। কে জানে রানুর গর্ভে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন! যাঁর জন্যে তারকবাবুর পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। আমরা তা জানতুম না, তাই বৃথা বিদ্রোহ করেছি।”

রত্ন প্রায় ক্ষেপে গেল। “বৃথা বিদ্রোহ করেছি? বৃথা? বৃথা? তোমাকেই যদি কনভিন্স করতে না পারলুম তো কাকে কনভিন্স করব? নবনীকে, হৈমকে? ললিতকে, কাননকে? গিরীনের আশা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। প্রভাত, তুমি আমাকে হতাশ করলে!”

“ভাই রত্ন, তুমি যা-ই বল না কেন মেয়েরা আদিকাল থেকে এই ভাবেই মা হয়ে এসেছে, এই ভাবেই হতে থাকবে। পঙ্ক থেকেই পঙ্কজ হয়। পদ্ধতিটাই পঙ্কিল। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে কি পদ্ধতির পঙ্কিলতা খণ্ডে যেত? মাতৃত্বটুকুনই সুন্দর। তার আগে যেটা যায় সেটা অসুন্দর। প্রেম দিয়ে তার শোধন হয় না। ওটা মনকে চোখ ঠারা।”

রত্ন কখনো একসঙ্গে এতগুলো অসার উক্তি শোনেনি। তাও প্রভাতের মতো মানুষের মুখে। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, “পদ্ধতিটা প্রেমিকের হাতে লীলা। তার আদি অন্ত সুন্দর। ফল যেমন সুন্দর ফুলও তেমনি, বরং ফুলের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ফলের চেয়েও বেশী। ফলের মধ্যে একটা ইউটিলিটির ভাব আছে, প্রয়োজনীয়তার। ফুলের মধ্যে বিশুদ্ধ বিউটি, অহেতুক সৌন্দর্য। নরনারীর মিলন নিয়ে কত কাব্য কত রোমান্স হয়েছে। মিলনের ফল নিয়ে তার ভগ্নাংশও নয়।”

প্রভাত ভুলল না। “তা সত্ত্বেও আমি বলব যে মিলন ব্যাপারটাই মলিন, অপরিষ্কার, অশুচি, অশ্লীল। একমাত্র পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব দিয়েই তার সার্থকতা। সেইটেই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে সে আমাদের প্রলুব্ধ করে, উৎকোচ দেয়। নির্বোধের মতো আমরা তাকে বলি প্রেম। প্রেমে ব্যর্থ হলে জীবন ব্যর্থ ভাবি। ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।”

রত্ন এমন বিমূঢ় হল যে তার মনে হল তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বলল, “ভাই প্রভাত, তোমার জীবন নিয়ে তুমি কী করবে তা তুমিই জানো। আমি কিন্তু স্থির করেছি যে প্রেমিক হব। সব দিন সব অবস্থায় প্রেমিক। বিবাহ করলেও প্রেমিক, না করলেও প্রেমিক। আমার যদি সন্তান হয় সে হবে প্রেমের সন্তান। তার জন্মরহস্য পঙ্কিল নয়, পরতে পরতে সুন্দর। এখানে উদ্দেশ্য ও উপায় এক। এমনভাবে এক যে কোনটা উদ্দেশ্য ও কোনটা উপায় তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্যে মনে হয় প্রেমই প্রেমের উদ্দেশ্য, একটা সম্পূর্ণ পদক্ষেপ। তার মধ্যে অপত্যকামনা নেই, যদি থাকে তো এমন গভীরভাবে নিহিত যে মনেরও অগোচর। পুত্রার্থে প্রেম না বলে প্রেমার্থে প্রেম বলব। তা হলেই ঠিক বলা হবে। নয়তো নারী হবে উৎপাদনের যন্ত্র, পুরুষ হবে উৎপাদনের যন্ত্রী। নরনারীর সম্বন্ধ হবে যন্ত্রযন্ত্রী সম্বন্ধ। তখন তার মূল্যায়ন হবে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে। আমি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। আমি এ খেলা খেলব না।”

“মালাদিকেই তোমার বিয়ে করা উচিত। কিন্তু তা যদি না হয় আর তোমার বাবা যদি তোমার বিয়ে দেন তুমি বৌ নিয়ে ঘর করবে না?”

“না। কিন্তু আমি জানি যে তিনি আমার বিয়ে দিতে যাবেন না। এ বিষয়ে তিনি আমার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। আমার বাবার মতো বাবা হয় না। আমার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেইজন্যে এত খারাপ লাগে যখন তাঁর কাছে কিছু লুকোই। এই তো সেদিন শ্রীমতীর চিঠি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে লিখেছে? বলতে বাধ্য হলুম, বোধ হয় মাসিকপত্রের কোনো পাঠক বা পাঠিকা। একই পাঠিকা তো বার বার লিখবে না, লিখলে সেটা সন্দেহের কথা। আজকাল রোজ ডাকঘরে হাজিরা দিই। চিঠি থাক বা না থাক। আমি শুধু ভাবছি আমার এই কদিনের অনুপস্থিতির অবকাশে যদি শ্রীমতীর চিঠি আসে, যদি বাবার হাতে পড়ে! ফিরে গিয়ে কী উত্তর দেব! মিথ্যা বলতে হবে তো! অনুমতি দাও তো কালকেই ফিরি।”

“তা কি হয়! কানন রাগ করবে যে। নবনী, হৈম এরা কী ভাববে! এদের স্নেহের দাবি তুচ্ছ নয়। আমাদের জীবনে প্রেম আসুক না আসুক, বন্ধুতা এসেছে। এ সংসারে বন্ধুতার মতো আর কী আছে! যাই বল না কেন, প্রেমের মধ্যে স্বার্থ আছে, পঙ্ক আছে। বন্ধুতাই নিঃস্বার্থ ও নির্মল। কিন্তু, রত্ন, শ্রীমতী তোমাকে এত ঘন ঘন চিঠি লেখে কেন? তুমিই বা কেন জবাব দিতে যাও? এক হাতে তালি বাজে না। জানো তো, ও মেয়ে অগ্নিসম্ভবা। ওর সঙ্গে আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না।”

রাত্রে আবার তেমনি সাত ভাই পাশাপাশি শুতে গেল। এবার প্রভাতের পাশে রত্ন, রত্নর পাশে ললিত। শ্রীমতীর প্রসঙ্গ অসমাপ্ত ছিল। খেই হাতে নিল রত্ন।

“তার পর, ললিত, কাল যা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লে। আচ্ছা, ওর জন্যে আমরা কিছু করতে পারিনে? আমরা সাত ভাই? এক কালে সোনালীর জন্যে কী না করেছি? অন্তত চেষ্টা? আর এও তো সোনালীর বোন রুপালী। এর উপরেও জোর খাটানো হয়েছে। মন্তর পড়লে কি যা অন্যায় তা ন্যায় হয়? না পাকা হয়?”

ললিত ভেবে বলল, “সেবারে আমি যে-কারণে ব্যর্থ হয়েছিলুম এবারেও হল সেই কারণে। সোনালীর বিয়ে দিতে পারা গেল না। শ্রীমতীরও নতুন করে বিয়ে দেওয়া যাবে না। কে ওকে বিয়ে করবে! করতে চাইলেও করবে কী করে? বিয়ে ভাঙার আইন থাকলে তো!”

তখন রত্ন বলল, “আন্দোলন করতে হবে। যেমন বিদ্যাসাগর করেছিলেন বিধবা বিবাহের জন্যে। কী বলো, প্রভাত? তুমি তো সমাজসংস্কারক।”

প্রভাত গম্ভীরভাবে বলল, “হিন্দু বিবাহ ভাঙবে না। হিন্দু সমাজই ভাঙবে। লোকে মুসলমান হবে, খ্রীষ্টান হবে, তা হলে যদি চৈতন্য হয়। না, তাতেও কি চৈতন্য হবে! এরা স্বেচ্ছায় কোনো রকম সংস্কার করবে না। করলে করবে গুঁতোর চোটে। সেই গুঁতোটা যে কী তাই আমি ভাবছি। স্বরাজ হলে তো এরা মনের সুখে অতীতে ফিরে যাবে, সংস্কার যেটুকু হয়েছে রদ করে দেবে।”

রত্ন মনে মনে জ্বলছিল। জ্বালার সঙ্গে বলল, “তা হলে শ্রীমতীকে তুমি কী করতে বলো? নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করতে? রানুর মতো গোমাতা হতে?”

এত ক্ষণে প্রভাত আত্মপ্রকাশ করল। বা ধরা পড়ে গেল। সে মনে মনে কাঁদছিল।

আবেগের সঙ্গে বলল, "না, ভাই, শ্রীমতী যেন রানুর মতো না হয়।"

রত্ন তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করল, "শ্রীমতী যেন রানুর মতো না হয়!"

প্রভাত আত্মসম্বরণ করে বলল, "বিয়ে ভাঙা ও আবার বিয়ে করা আমাদের জেনারেশনে হবার নয়। হলে পরের জেনারেশনে হবে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও। ওরা সংঘবদ্ধ হোক। বিলেতের সাফ্রেজেটদের মতো ওরা জানালা দরজা ভাঙুক। জেলে যাক। আবার ভাঙুক। গোটাকতক ঠাকুরদেবতা ভাঙতেও পারে। এমনি করতে করতে যদি কিছু হয়। শ্রীমতীকে বলো অগ্রণী হতে। ও কেন পুরুষদের নিয়ে মণ্ডলী করতে যায়? মেয়েদের নিয়ে মণ্ডলী করুক। তা হলে আমাদের কিছু করতে হয় না। যা করবার তা মেয়েরাই করবে দল বেঁধে। ওদেরও তো শিং আছে, তাই দিয়ে গুঁতোবে আর গুঁতোর চোটে অধিকার আদায় করবে।"

ওদিকে কানন কান পেতে শুনছিল। তার ঘুম আসছিল না। বিরতি দেখে সে মুখ খুলল। "মাফ করো, তোমাদের কথায় কথা বলছি। রানুটি কে আর শ্রীমতীটি কোন শ্রীমতী?"

দু'কথায় দু'জনের পরিচয় দিতে হল। দিল প্রভাত।

তখন কানন বলল, "আমারও রক্ত গরম হয়ে উঠছে হে। আমি বলি, দু'জনকে দুটো রিভলবার জোগাড় করে দেওয়া হোক।"

নবনী ও হৈম উসখুস করছিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল হৈম। ফড় ফড় করে বলে গেল, "চারদিকে ধরপাকড় চলছে। সুভাষ বোস গ্রেপ্তার। একটু বুঝেসুঝে কথা বলতে হয়। রাত বারোটার সময় রাজনীতি কেন?"

নবনী ফিসফিস করে বলল, "কি হে কানন, তুমি কি আমাদের ধরিয়ে দেবে নাকি?"

তখন সকলেই একদম চুপ মেরে গেল। ছুঁচ পড়লে শোনা যেত না।

অনেকক্ষণ পরে রত্ন বলল প্রভাতের কানে কানে, "প্রভাত।"

"কী?"

"শ্রীমতীর জন্যে আমরা কী করতে পারি?"

"আমরা কী করতে পারি! আমরা পরাজিত।"

"তা হলে শ্রীমতী যদি রানুর মতো হয়?"

"ও হো হো! কেন ও কথা মনে করিয়ে দিলে!" প্রভাত বলল কাঁদো কাঁদো সুরে। কাঁচা ক্ষতের গায়ে হাত দিলে যেমন হয় তেমনি ব্যথা লাগল তার মনে।

"তুমি তা হলে সুখী হওনি রানুর নবকলেবর দেখে?"

"সুখী হব? আমি কি পুরুষ নই? পুরুষের পক্ষে এত বড় অপমান আর আছে? মাই ফ্রেন্ড, আই হ্যাভ বীন রিজেকটেড।" বলতে বলতে প্রভাতের কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

খানিক পর সে ঝড়ের মতো শ্বসিত হয়ে হু হু করে বলে গেল, "নারী যদি পুরুষের জন্যে মরতে না পারল তা হলে তার প্রেমের মূল্য কী! রানু যদি মরে যেত আমি তাকে সারাজীবন সতীর মতো কাঁধে করে বেড়াতুম। মা হচ্ছে, বেশ। আমার কাঁধ থেকে নামুক। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। প্রেমে পড়ি, বিয়ে করি, আমারও ছেলেমেয়ে হোক।"

বেচারা প্রভাত! তাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। গিরীন এতক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ করল। স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "প্রভাত, শান্ত হও। এ প্রেম যাবে না। আমি হলে বিয়ের কথা ভাবতুম না। চিরকুমার হতুম।"

কানন কণ্ঠক্ষেপ করল, "কেন? তুমি তো এমনিতেই বিয়ে করবে না?"

গিরীন এর উত্তরে বলল, "এমনিতেই নয়। তোমাদের বলিনি, বন্যার উপলক্ষ জোটেনি, আমার জীবনও কতকটা প্রভাতের মতো। আমারও রানু ছিল, অন্যের সঙ্গে তারও বিয়ে হল, সেও অন্যের সন্তানের মা হল, কিন্তু মা হতে গিয়েই মারা গেল। তার স্বামী আবার বিয়ে করেছেন, কিন্তু আমি তো তার স্বামী নই যে অত সহজে ভুলে যাব।"

সকলে অভিভূত হয়েছিল, কেউ উচ্চবাচ্য করল না। তখন গিরীন নিজেই আবার বলল, "আর নারীও খেলনা নয় যে একটি গেলে আরেকটি নিয়ে ভোলা যায়।"

এটা বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করে বলা নয়, তবু সকলের মনে হল প্রভাতকে লক্ষ্য করে বলা। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। প্রভাত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, "শিশুও ভোলে না। কিন্তু কী করবে? শিশু যখন, খেলতে তো হবে। আমি একজনকে জানি যিনি যৌবনে চিরকুমার ছিলেন, বুড়ো বয়সে বিয়ে-পাগলা হয়ে কামড় দিলেন একটি বালিকাকে। অবশ্য মন্ত্র পড়ে।"

খোঁচাটা গিরীনের মর্মে বিঁধল। সে আবার মৌনব্রত নিল। তার সাড়া না পেয়ে প্রভাত একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আমি কোনো রকম ইঙ্গিত করিনি। আমার বক্তব্য অতি সরল। যে-বয়সের যেটা সেই বয়সে সেটা সেরে রাখাই সুবুদ্ধি।"

গিরীন তথাপি নীরব। হৈম বলল, "তা হলে, প্রভাত, তুমি কবে বিয়ে করছ, বলো। আমাদের দলটা একটু ভারী হবে। নবনীর আর আমার।"

নবনী বলল, "প্রভাতের পর কে?"

রাত বারোটার পরেও তাদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হল, উঠে বসল কানন। বলল, "চল, লটারি করি। প্রভাতের পর কে? 'কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি রাঘবারি।' তিনজনের নাম পাচ্ছি। ললিত, রত্ন, গিরীন। তার সঙ্গে নিজেরটা জুড়ে দিচ্ছি লজ্জাশরম ভুলে। চার টুকরো কাগজে চারটি নাম লিখছি। ভাঁজ করছি। এইখানে রাখছি। এখন কেউ একজন এগিয়ে এসে তুললে হয়। হৈম, তুমিই এসো।"

হৈম হাসতে হাসতে তুলল এক টুকরো কাগজ। ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল—কানন। প্রভাত বলল, "তা হলে, কানন, একসঙ্গেই ঝুলে পড়া যাবে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে।"

কানন বলল, "দূর! তা কি হয়! আমি মোটেই প্রস্তুত নই। এ লটারি ভুল। হৈম কেমন করে দেখে ফেলেছে আমার নাম। আমি আবার করছি। এবার নবনী তুলবে।"

এবার সে বাইরে গিয়ে নাম লিখে ভাঁজ করে নিয়ে এল। নবনীর হাতে উঠল—ললিত। তখন ললিত কবুল করল যে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। কোথায়? না যেমপুরে। যশোবাবুরই আরেক বোনের সঙ্গে। মেয়েটি দেখতে ভালোই, কিন্তু বড্ড কচি।

পরের দিন সত্যি সত্যি বাঘ এসে পড়ল। খোঁজ করল সাত সাতটি ছেলে কী করতে জড় হয়েছে একটি পড়ার ঘরে। কাননের কাকা রসিকতা করে বললেন, "যা করেছিল সোনালী হরণের পর। এরা উদ্যোগী হয়েছিল বলেই না উকিল মোক্তার পুলিশ পেশকার ইত্যাদির ঘরে সোনাটা রুপোটা এসেছিল। তা হলে ভাবুন, সার, এরা বাইরে থাকলে আপনাদের লাভ না জেলে ঢুকলে আপনাদের ফায়দা।"

পুলিশের লোক পিঠ ফেরাতে না ফেরাতে ললিত হাওয়া হয়ে গেল।

প্রভাত বলল, "ললিতটা উপর চালাক। যে-কোনো দিন ধরা পড়বে।"

রত্ন বিমর্ষ হয়ে বলল, "ও ধরা পড়লে ওর মৌচাকের মক্ষিরানী কি বাদ যাবেন!"

আড্ডা এর পর জমল না। গিরীন চলে গেল রোগী দেখতে। প্রভাতের কাজ ছিল

পূর্ণিমায়। নবনী ও হৈমর বাড়ির লোক উতলা হয়ে উঠেছিল ধরপাকড়ের খবর পড়ে। রত্নর মাথায় ঘুরছিল শ্রীমতীর চিঠি। তার অনুপস্থিতিতে ও চিঠি কার হাতে পড়বে কে জানে!

কানন আর কী করে! আবার বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এল। রুমাল নাড়ল। কথা রইল আবার বড় দিনের সময় মেলা যাবে। এবার শান্তিনিকেতনে।

পথে যেতে যেতে নবনী বলল, "রত্ন, তোমার ওই দেশান্তরী হওয়া চলবে না। তুমি গেলে মণ্ডলী ভেঙে যাবে। একতায় শক্তি, তা এইবার উপলব্ধি করলুম। তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি কে! কেই বা আমাকে গ্রাহ্য করে! কিন্তু দেখলে তো? পুলিশের দারোগাও আদাব জানিয়ে উৎসাহ দিয়ে গেল।"

হৈম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কবে সোনালীর জন্যে কীই বা করেছিলুম, এখনো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বুড়ো জমাদার পথে ঘাটে সেলাম করে। ওরা জানে যে কাজটা আমরা নিঃস্বার্থভাবে করেছিলুম। হেরে গিয়েও আমরা জিতে গেছি। কত লোকের হৃদয়ে ঠাঁই পেয়েছি। এ-উদ্দীপনা আমার জীবনপথের পাথেয়।"

রত্ন আনন্দে বেদনায় আপ্লুত হয়ে বলল, "হৈম, প্রভাত যদি তোমার এ-কথাটা শুনে যেতে পারত! বেচারা নিশ্চিত জেনে বসে আছে যে আমরা পরাজিত। কাল রাত্রেও বলছিল, শ্রীমতীর জন্যে আমরা কী করতে পারি! আমরা পরাজিত।"

"ভাববার কথা। শ্রীমতীর জন্যে আমরা কী করতে পারি?" হৈমর জিজ্ঞাসা।

"শ্রীমতী কী চায়?" নবনীর প্রশ্ন।

রত্ন ভেবে বলল, "ললিত শ্রীমতীকে আমাদের সাতজনেরই পরিচয় দিয়েছে। তোমাদের নাম তার অজানা নয়। তোমরা তো কাছাকাছি থাক। চিঠি লিখে দিন ফেলে দেখা করে আসতে পারো। তখন তার মুখেই শুনবে সে কী চায়, তার জন্যে কী করতে হবে।"

॥ আট ॥

রত্ন বাড়ি ফিরে দেখল চিঠি জমেছে ঠিক, কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি নেই। অবিশ্বাস্য! ছোট বোন শীলাকে সুধাল আর কোনো চিঠি ছিল কি না। আরেকটু খুলে বলল, নীল রঙের খাম, মেয়েলি হাতের লেখা। শীলা বলতে পারল না, শুধু একটু মুখ টিপে টিপে হাসল।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, লজ্জা করে। ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে জানল সত্যি তেমন কোনো চিঠি আসেনি। তখন হাতের পাখির দিকে মন দিল। চিঠি ছিল বিদ্যাপতির। তার সঙ্গে গোঁজা অঞ্জনের তোলা ফোটো। সিঞ্চলে সূর্যোদয়।

জগতে এমন অপূর্ব সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে ঘটবে এর সঙ্গে শুভদৃষ্টি! জানতে চেয়েছে বিদ্যাপতি। তা হলে অধিকাংশ মানুষের জন্যে সৌন্দর্য পরিবেশনের কী ব্যবস্থা? তারা কি অল্পে সন্তুষ্ট হবে? তারা কি নিম্ন অধিকারী? মনটা বিরস হয়ে যায় যখন ভাবে হিমালয়ও থাকবে, হিমালয়ে সূর্যোদয়ও থাকবে, কিন্তু দেখতে আসবে অতি সামান্য সংখ্যক লোক। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের বাসনা নেই, যাদের বাসনা আছে তাদের ক্ষমতা নেই, অধিকাংশ মানুষের কোনোটাই নেই, তারা জানে না তারা কী হারাচ্ছে। সৌন্দর্য অপচিত হচ্ছে একদিকে। অন্য দিকে অপচিত হচ্ছে জীবন। এই দ্বিবিধ অপচয়ের কী প্রতিকার? রত্ন কী বলে?

রত্নর মন চলে যায় সুদূর হিমালয় অঞ্চলে। যেখানে চিরন্তন তুষার সুনীল আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি শিবির রচনা করেছে। নীলিমার বিরুদ্ধে শুভ্রতা। কেউ কাউকে হটাতে পারছে না। দ্বন্দ্বের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। এরই মাঝখানে হঠাৎ কোনখান থেকে এসে উদয় হয় সূর্য। বর্ণ-ঝরনার দিগন্তব্যাপী প্লাবন বয়ে যায়। যেমন তার সহস্র সহস্র যোজন জোড়া বিস্তার তেমনি তার ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা। এ মহিমা অতুল, অসীম।

রত্ন লেখে, অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ জীবন কাটবে এসব দুর্লভ সৌন্দর্যের থেকে দূরে কোনো নিভৃত পল্লীতে যেখান থেকে ছুটি পাওয়া দুরূহ, ছুটি পেলেও পাথেয় জোটানো শক্ত। তবু যেখানেই তারা থাকুক সৌন্দর্যের কোলেই তাদের অস্তিত্ব। চোখ মেলে যেদিকেই তারা তাকাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সে-সৌন্দর্য সুলভ বলে কম দুর্লভ নয়। এ-জগতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি পাওয়া দুর্লভ। যা পাইনি তার জন্যে উদ্বাহু হয়ে যা পাচ্ছি তাকে যেন অনাদর না করি। অতি পরিচয় থেকে এক প্রকার অবজ্ঞা আসে। তার ফলে আমরা বিস্মৃত হই যে অতি পরিচিতও অপরিচিত। কত সৌন্দর্য রয়েছে তার মধ্যে তা এখনো অজানা। ইচ্ছা করলে একটা ছোট গ্রামে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েও মানুষ নিত্য নতুন সৌন্দর্যের দ্বারা আয়ুষ্কাল ভরিয়ে নিতে পারে।

বিদ্যাপতিকে চিঠি লিখতে লিখতে রত্ন ভুলে গেল যে সে আরেকটা মণ্ডলীর অন্যতম প্রবর্তক। কালাপাহাড় মণ্ডলীর দু'নম্বর কালাপাহাড়। তখনকার মতো সে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিদ্যাপতি, অঞ্জন তার নিকটতর।

তার এই দুই গোষ্ঠী বা দুই কুল এত দিন যথেষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে তৃতীয় একদল মানুষের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। ললিতের কথায় সে শ্রীমতীর মণ্ডলীর সামিল হয়ে গেছে। তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, শ্রীমতীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

অবশেষে এল তার চিঠি। নাড়াচাড়া করে রত্ন বুঝতে পারল পুলিশের নেক নজর পড়েছে। রত্ন সন্দেহভাজন বলে নয়, শ্রীমতী পলিটিকাল সাসপেক্ট বলে। সেটা অযথা নয়। প্রায় প্রতি চিঠিতেই দু'চার লাইন রাজনীতি থাকবেই। এবারেও ছিল। এই যে চার দিকে ধরপাকড় চলেছে সে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। তার পর লিখে-ছিল—

কাল রাত্রে যখন বিছানায় গেলুম তখন আমার বয়স ছিল উনিশ। আজ সকালে জেগে দেখি বয়স এক বছর বেড়ে গেছে। মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল। লোকে বলে কুড়িতে বুড়ী। আমি এখন তাই। জন্মদিন বলে আনন্দ করব কী! করবার কী আছে! একটা বাজে ব্যর্থ জীবন। তাও বুড়িয়ে যাচ্ছে। ফুল ফুটছে না, কুড়িতে শুকিয়ে যাচ্ছে। জানি আমার বিলেতফের্তা প্রোপ্রাইটার—বিলেতফের্তাকে আমি স্বামী না বলে প্রোপ্রাইটার বলি—এক রাশ উপহার দেবেন। সেটা তাঁর পাঁচ বছরের স্বত্বস্বামিত্ব মৌরসি মোকররি করতে। উপহার দেবেন তাঁর পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, ভগিনীগণ আত্মীয়স্বজন। ভেট আসবে প্রজাদের ঘর থেকে। ফুলের তোড়া দিয়ে যাবে দেশকর্মীরা। জ্যোতিদা পাঠাবে আনকোরা কোনো বই। আমি জানি ওরা সকলে দীর্ঘজীবন চায়। তবু ওই দীর্ঘজীবন নিয়ে খুশী হবার কী আছে!

দুপুরে এল একজনের চিঠি। আমার জন্মদিনের সেরা উপহার। ও যদি আর কিছু না লিখে শুধু আমার নাম ধরে ডাকত যদি শুধু বলত "তোমার বন্ধু রত্ন" তা হলেও আমার জন্মদিন সার্থক হত। কিন্তু ও বলছে আমি অনন্যা। ও বলছে ও আমাকে ভারতবর্ষে দেখবে আশা করেনি। আমিই ওর ভারত, এমন কথাও লিখেছে! এসব কথা শুনলে কার না ইচ্ছা করে বাঁচতে! বাঁচতে বাঁচতে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী হতে। এক বছর পরে এমনি একখানি

চিঠি লিখো, রত্ন। তা হলে আমার বিশ্বাস হবে যে আমার জীবন ব্যর্থ নয়, আমি মনের সুখে দীর্ঘজীবী হতে পারি। সেই-সঙ্গে তোমারও বেঁচে থাকা চাই। আমি যখন একশো বছরের থুত্থুড়ে বুড়ী হব তখন আমার বয়সের গাছ পাথরও থাকবে না, থাকবে কেবল একজন। সে কে? যার চোখে আমি অনন্যা।

রত্ন, তুমি আমাকে যা দিলে তার বদলে আমি তোমাকে কীই বা দিতে পারি, প্রিয়! যা কিছু দেখছি সব পরের, মায় আমিও। নিজেই তো আমি পরকীয়। হঠাৎ মনে হল তোমার হাতে আমি রাখী বাঁধলে কেমন হয়! রাখী আমার ভাণ্ডারে ছিল। আমারই হাতে তৈরি। তার মধ্যে যেটি আমার সব চেয়ে প্রিয় সেটি তোমার জন্যে পাঠালুম। মনে মনে পরিয়ে দিলুম তোমাকে। জানো তো হুমায়ুন বাদশাকে এক রাজপুত রানী এমনি একটি রাখী পাঠিয়েছিলেন। সেই সূত্রে হুমায়ুন হলেন তাঁর রাখীবন্ধ ভাই, যদিও কেউ কাউকে কোনো দিন দেখেন নি, দেখলেন না জীবনে। রত্ন, তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই, আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। কোনো দিন আমাদের দেখা হয়নি। হবেও না বোধ হয়। তুমি অদর্শন, আমি অদর্শনা। তবু তোমার আমার এ-বন্ধন চির দিনের। আর কারো সঙ্গে এ-সম্বন্ধ পাতাইনি।

কিন্তু এর একটি তাৎপর্য আছে। বোন যদি কখনো বিপদে পড়ে ভাই তাকে সর্বস্ব পণ করে উদ্ধার করবে। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি আমার রাখী নিয়ো না। আমি কিছু মনে করব না। কেনই বা তুমি আমার বিপদের দিন নিজেকে বিপন্ন করবে? না, প্রিয়। তেমন কোনো অনুরোধ করব না। আমি তো কই তোমার বিপদের ক্ষণে আপনাকে বিপন্ন করার অঙ্গীকার দিচ্ছিনে। রাখীবন্ধ বোনেরা দিত না। সেই রাজপুত রানী দেননি। তবে আমি তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষিণী হব। তার বেশী আর কী হতে পারি! মেয়েরা তার বেশী পারে না। তাদের হাত পা বাঁধা। কিন্তু মুক্তি যদি কোনো দিন পাই, অবিকল পুরুষদের মতো স্বাধীন হই, তখন তোমার বিপদের মুহূর্তে আমিও বিপদ বরণ করব। এ হল আশা। অঙ্গীকার নয়। দিন দিন আমার বিশ্বাস কমে আসছে আমার মুক্তি সম্বন্ধে। সাত পাকের পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়ছি। এ যে কী যন্ত্রণা তুমি কী বুঝবে! তুমি তো সহজেই মুক্ত।

তার পর, রত্ন, এ কী করেছ বল দেখি! রুপালীকে ভেবেছ আমি! লজ্জায় মরি! রুপালী তোমার কাছে সমাধান প্রত্যাশা করছে। তাকে এখন কী বোঝাই! তোমার মতে তার কী করা উচিত? তুমি তাকে কী করতে পরামর্শ দাও? যা শুনেছ তার চেয়ে বেশী শুনতে চাও তো তাও শোনাব। কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ো।

তোমার সঙ্গে কথা কি ফুরোবার। তার আগে হয়তো রাত ফুরোবে। আজ এই পর্যন্ত। তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলুম। দেরি করলে দুঃখ পাব। চোখে দেখতে পায় না বলেই অন্ধ কানে শুনতে চায় অত বেশী। তোমার চিঠি পাওয়া যেন তোমার কথা শোনা। চিঠি নয় তো, বাঁশি। কথা নয় তো, সুর। ইতি। তোমার গোরী।

পদ্মার বুকের উপর দিয়ে যেন একখানা স্টীমার চলে গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে ফুলতে ফুলতে ফেটে পড়ছে, আছড়ে পড়ছে তটের গায়ে। লুটিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে নদীর পাড়। তেমনি এই চিঠি। রত্ন তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বালিশে বুক চেপে। দু'হাত জোড় করে মাথাটাকে বেড়ি মতো ধরল। কত রকম ভাব উঠছে, ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভাঙন লাগছে, মাতন তবু থামছে না।

অনেকক্ষণ পরে রত্ন মুখ তুলে চেয়ে দেখল—রাখী। চিঠির সঙ্গেই ছিল, নজরেও পড়েছিল, কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সুন্দর রাঙা রাখী। লাল সুতোর সঙ্গে হলুদ সুতো। রুপালী জরির কাজ। সবুজ রেশমের ফুল। কেউ কখনো তাকে এমন মূল্যবান রাখী পরায়নি। মেয়েদের হাত থেকে রাখী নেওয়া এই প্রথম।

রত্ন কি এই রাখী নেবে, না ফেরত দেবে?

রাজপুত রানীরা যখন রাখী পাঠায় তখন সে-রাখী প্রত্যাখ্যান করলেও সংকট, না করলেও সংকট। প্রত্যাখ্যান করতে শিভ্যালরিতে বাধে। বীরধর্মে কলঙ্ক লাগে। রানীর অমর্যাদা। নারীর অসম্মান। আবার গ্রহণ করাও তো কম দুঃসাহস নয়। কবে কেমন করে তার বিপদ ঘটবে, যার হাত থেকে বিপদ সে কত বড় প্রবল শত্রু কে জানে! অনির্দেশ্য অপরিমেয় বিপদের জন্যে আগে থাকতে আত্মনিবেদন করা কি মুখের কথা! নিজের স্বার্থ অবহেলা করে নিজের

প্রাণ তুচ্ছ করে পরের স্বার্থ পাহারা দেওয়া, পরের প্রাণ ও মান রক্ষা করা কি সহজ। বিশেষত যখন কেউ কাউকে চোখেও দেখেনি, দেখবেও না।

তার মনে পড়ল যে গৌড় দেশের শাসকের বিদ্রোহ দমন করতে এসে হুমায়ুন পেয়েছিলেন এমনি একটি রাখী রাজস্থানের কোন এক রানীর কাছ থেকে। অচেনা অদেখা বোন তাঁকে রাখীবন্ধ ভাই বলে ডেকেছেন। সাড়া না দিয়ে যারা পারে তারা পারে, কিন্তু হুমায়ুন বাদশাহ অন্য ধাতুতে গড়া। রাখী তো তিনি রাখলেনই, কিছু দিন পরে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে রানীর রাজ্য রক্ষার জন্যে লড়তে গেলেন। যার সঙ্গে লড়লেন সে তাঁর শত্রু নয়। তার সঙ্গে লড়াই করা রাজনীতি নয়। তবু তাঁকে করতে হল রণ। কারণ তিনি যে রাখীবন্ধ ভাই। পরেও কি রানীর সঙ্গে দেখা হল? না, জীবনে কোনো দিন নয়।

রত্নর ভিতরে একজন মধ্যযুগের নাইট ছিল, একজন হুমায়ুন বাদশা, নির্বোধের একশেষ, যে নিজের সাম্রাজ্য রাখতে পারল না, দেশ থেকে বিতাড়িত হল। ওই রাখী রাখতে গিয়ে হয়তো তার সর্বস্ব যাবে, অথচ ও রাখী ফেরত দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রাখী যদি আদৌ তার কাছে না আসত তা হলেই সে নিষ্কৃতি পেত। কিন্তু একবার যখন এসেছে তার কাছে তখন কি তার নিস্তার আছে! তাকে ও রাখী রাখতেই হবে। তার পর যদি কোনো বিপদের সঙ্কেত আসে হুমায়ুনের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হবে।

রাখীটিকে রত্ন যত্ন করে ডান হাতে বাঁধল। মনে করল যেন সে নয়, শ্রীমতী বাঁধছে। শ্রীমতী? না, শ্রীমতী নয়, গোরী। কী মিষ্টি নাম! গোরী! রত্ন মনে মনে ডাকল, গোরী! গোরী! গোরী! বার বার ডেকেও সাধ মিটল না। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, অধর ছাড়িতে নাহি পারে।" তেমনি গোরী নামে।

ঘরের দরজা খোলা ছিল। হীরু ঢুকে বলল, "কি রে, কী হচ্ছে? অমন করে শুয়ে আছিস কেন? তোর হাতে ওটা কী? রাখীর মতো মনে হচ্ছে, না?"

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল লজ্জায়। হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজে পেল না।

"এই কার্তিক মাসে রাখী কে পাঠাল? আরে এ যে চমৎকার কাজ করা!" রত্ন চুপ করে থাকল। শ্রীমতীর কথা সে তার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলেনি, বললে ও হয়তো বকবে। পরের ঘরের বৌঝির সঙ্গে এত ফষ্টিনষ্টি কেন? ও কি তোর সত্যিকার বোন। সত্যিকার বোন হলে কি ভাইকে "প্রিয়" বলত?

রত্নর পরম ভাগ্য হীরু তার চিঠি পড়তে চায় না। চাইল না। কে লিখেছে তাও জিজ্ঞাসা করে না। করল না। কৌশলে রাখীটা খুলে চিঠিখানার সঙ্গে জড়িয়ে বালিশের তলায় চাপা দিল। তার পর চিত হয়ে শুয়ে হীরুর সঙ্গে গল্প করল। হীরুকে ভুলিয়ে দিল রাখীর প্রসঙ্গ। হীরুও আর ও নিয়ে খোঁচাখুঁচি করল না।

একশো বার যা নিয়ে ওদের কথাবার্তা হয়েছে আবার তা-ই নিয়ে বাক্যালাপ। কেন দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া? হীরু তো কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতা পর্যন্ত যায়নি, যেতে চায় না। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, লাজুক চেহারা, একটুতেই ভয় পায়। কলকাতা গেলে যদি গুন্ডার হাতে পড়ে। গুন্ডা নাকি ওখানকার অলিতে গলিতে। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক। বাপ রে বাপ রে বাপ! ওসব জায়গায় গেলে কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে। কলেজে পড়তে হলে রাজশাহী বা কৃষ্ণনগর বা কলকাতা যেতে হবে, সেই ভয়ে পড়াশুনাই দিল ছেড়ে। চাকরি করছে। সামান্য রোজগার। উন্নতির আশা নেই। অল্পে সুখী, শখ বলতে একটু গানবাজনা শেখা, সাধ বলতে নিজস্ব একখানা সেতার কি এসরাজ কেনা। আর স্বপ্ন বলতে একটি বিয়ে। তাও ডানাকাটা পরী বা রাজকন্যা নয়। হীরুর সে-রকম কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। সে চায় কল্যাণী বধূ। যে গুরুজনের সেবা করবে, তুলসীতলায় সাঁজ জ্বালবে, লক্ষ্মীবারে আলপনা দেবে। ঘরগেরস্তালি যার হাতে তুলে দিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে এ বেলা আপিস আর ও-বেলা আসর নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে।

রত্ন প্রায়ই এ-বিষয়ে তর্ক করত, হীরুকে ক্ষেপিয়ে দিত। সেদিন কতকটা উদাসীনের মতো কাল, "আর হয়েছে আমার বিদেশ যাওয়া। ইটালী, সুইটজারলন্ড, সেখানেই থাকি না কেন কখন কার কী বিপদ ঘটবে, অমনি ছুটে আসতে হবে কাজ ফেলে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।"

হীরু বিমূঢ় হল। বলল, "এ কী অলক্ষুণে কথা! হঠাৎ এ-কথা কেন! বিপদ তো যে-কোনো দিন যে-কোনো লোকের ঘটতে পারে। ওঃ বুঝেছি। সেদিন রাজা দশরথের পুত্রশোকের উপমা দিয়েছিলুম। বাপের দশা ভেবে মন কেমন করছে। ঠিক।"

রত্ন মাথা নাড়ল। তা দেখে হীরু আরো বিমূঢ় হল। "তবে কার বিপদ!"

তখন রত্ন একটু একটু করে ভেঙে বলল, "ওই যে রাখী দেখলি না ও রাখী যে আমাকে পরিয়েছে তার যদি কোনো দিন কোনো বিপদ আপদ হয় তা হলে আমাকে আমার সব কাজ ফেলে ছুটে যেতে হবে তাকে রক্ষা করতে। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন।"

"য়্যাঁ! তুই বলিস কী!" হীরু ভীরু মানুষ। আতকে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "তা তুই পরতে গেলি কেন! কে এসেছিল পরাতে এই অকালের রাখী? আমি কি তাকে চিনি? কে লোকটা? আমি যদি জানতুম আরো আগে এসে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতুম। ইয়ার্কি পেয়েছে! ভালো মানুষ পেয়ে কী-একটা গছিয়ে দিয়েছে!"

রত্ন তাকে শান্ত হতে বলল। এমনিতেই সে শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষটি। কিন্তু যা শুনেছে তা এমন রোমাঞ্চকর যে সে যতই ভাবছে ততই অশান্ত হয়ে উঠছে।

তখন রত্ন বলল, "ওটা ডাকে এসেছে। যার কাছ থেকে এসেছে সে—"

"সে কে?" হীরুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বিস্ময়ে আতঙ্কে।

"সে একটি মেয়ে!" রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে।

"মেয়ে?" হীরু স্তম্ভিত হল। তার মনে হল সে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে। রত্নর পাশে খাটের উপর শুয়ে পড়ল। "সত্যি?"

"সত্যি। কিন্তু কাউকে এ-কথা বলিসনে। রাখীটা না নিলেই হত। নিয়ে হয়ত ভুল করলুম। কিন্তু নিয়েছি যে তুই তার সাক্ষী। তুই না এলে হয়তো এক দুর্বল মুহূর্তে খুলে রেখে বলতুম আমি তো রাখী পরিনি। পিছু হটতুম। তুই এসে আমাকে বাঁচালি। এবার আর আমি পেছোতে পারিনে। পরেছি। সত্য করেছি।"

হীরু তখনো প্রকৃতিস্থ হয়নি। চকিতের মতো বলল, "সত্য করেছিস?"

"তুই তার সাক্ষী।"

"আমি—আমি তার সাক্ষী?" সে তখনো সম্মোহিত।

"কিন্তু বলিসনে কাউকে। দশরথ শুনলে মূর্চ্ছা যেতে পারেন।"

হীরু কথা দিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে অভিনয়ের মতো অলীক লাগছিল। জানতে চাইল, "মেয়েটি কে রে? কী হয়েছে ওর?"

"সে-সব বলা বারণ। তাতে ওর বিপদ বাড়বে। ফলে আমারও বিপদ।" রত্ন কোনো মতে তার বাল্যবন্ধুকে নিরস্ত করল।

॥ নয় ॥

সেদিন শুতে যাবার সময় রাখীটি আবার হাতে বাঁধল রত্ন। এবার কী জানি কেন তার মনে হতে থাকল রাখী তো সে নিজে বাঁধেনি, বেঁধেছে গোরী, বেঁধেছে দূর থেকে অদৃশ্য হাত দিয়ে। পরবে কি পরবে না, এ-প্রশ্ন ওঠে না। খুলবে কি খুলবে না, এইটেই প্রশ্ন। ইচ্ছা করলে রত্ন খুলে রাখতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না যে গোরী তাকে রাখী পরিয়ে দেয়নি। "না" বলবার আগেই রাখী পরান হয়ে গেছে।

রাত্রে বার বার ঘুম ভেঙে গেল। তাই তো! রাখী এল কার হাত থেকে তার হাতে! কে পরাল! আজ তো রাখীপূর্ণিমা নয়। পূর্ণিমাই নয়। তা হলেও পূর্ণতার ভাব মনে আসে। যে-পূর্ণতা সব অপূর্ণতার অন্তরে রয়েছে, বাইরে রয়েছে, ছাড়িয়ে রয়েছে, ছাপিয়ে রয়েছে। রত্ন ঘুমিয়ে পড়ে সেই পূর্ণতার কোলে। শিশুর মতো পরম আশ্বাসভরে।

রাত থাকতে উঠে চিঠি লিখতে বসল শ্রীমতীকে।

গোরী,

তোমাকে এই নতুন নামে ডাকতে কী যে ভালো লাগছে! গোরী! রাখীবন্ধ বহিন। তোমার জন্মদিন গেল। জানলে কিছু একটা পাঠাতুম। অন্তত আমার শুভকামনা। আজ শুধু সেইটুকু পাঠাচ্ছি। এ-কামনা বিলম্বিত হলেও আন্তরিক। গোরী! রাখীবন্ধ বহিন! তোমার জন্মদিন অনেক-অনেক বার ঘুরে আসুক।

দীর্ঘজীবনকে তোমার এত ভয় কিসের! আমার কথা যদি বল, আমার ভয়ও নেই লোভও নেই। আমি বিশ্বাস করিনে যে এই একমাত্র জীবন বা এর পরে শূন্য। আমি পূর্ণতা-বাদী। পূর্ণ থেকে এসেছি, পূর্ণতে আছি, যাব যখন পূর্ণতে যাব। জীবনের অন্তে জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সুতরাং এ-জীবন দীর্ঘ হলেও ভালো হ্রস্ব হলেও ভালো। আজকেই যদি শেষ হয় তা হলেও আমার খেদ নেই, কারণ আজকেই আবার আরম্ভ।

দশ বছর যখন আমার বয়স তখনো আমার মনে হয়েছে, যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি, আমি ধন্য, আমি পূর্ণ। এত ভালোবাসা আমার ভাগ্যে মিলেছে, এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য যে মরে গেলেও আমার কোনো আফসোস থাকবে না। পনেরো বছর বয়সেও আমার এই অনুভূতি ছিল। বিশ বছরেও এই। গোরী, এমনি একটি জন্মদিন আমার জীবনে এসেছে মাস ছয়েক আগে। সেদিন আমি এই কথাই ভেবেছি যে আমার ভাগ্যে যা মিলেছে তা প্রভূত, যা মেলেনি তার জন্যে আফসোস নেই। ইতিমধ্যে তুমি এলে। যা মেলালে তা অপূর্ব।

তারপর, গোরী, এ কী করলে! বিধাতার কাছে আমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিনি। আমার প্রার্থনা ছিল, আমাকে কর স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে স্বাধীনতম। তার উত্তর কি এই রাখী? এই বন্ধন কি আমাকে দেশ-দেশান্তর থেকে টেনে আনবে না, যদি কখনো তোমার কোনো বিপদ ঘটে? ভগবান না করুন। আজ থেকে আমার অন্যতম প্রার্থনা গোরী যেন কোনো দিন বিপদে না পড়ে। একমাত্র এইভাবেই আমি স্বাধীন থাকতে

অমন করে শুয়ে আছিস কেন?
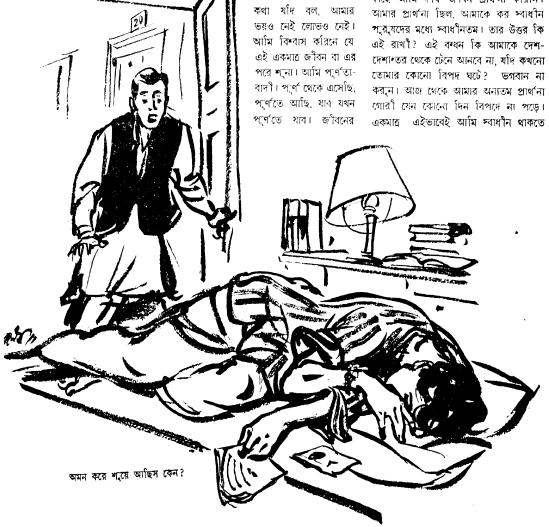
পারি। অবশ্য ইচ্ছা করলে রাখীটা আমি খুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি হুমায়ুন বাদশার চেয়ে, মধ্য-যুগের নাইটদের চেয়ে খাটো হয়ে যাই। জানি আমার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, ধনবল নেই, বাহুবল নেই। আমার পক্ষে ও'দের সমান হতে যাওয়া মূঢ়তা। তবু এ-কালের এক রাজপুত রানী যে আমাকে হুমায়ুনের মতো ভাবতে পেরেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। "তুমি মোরে করেছ সম্রাট।"

গোরী, কী দেখে তুমি আমাকে এ গুরু-দায়িত্বে বরণ করলে? আমি যে খুঁজে পাইনে আমার মধ্যে এমন কোনো মহত্ত্ব। একদিন তুমি আবিষ্কার করবে যে ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম। যেদিন আমাকে চাক্ষুষ করবে সেদিন তোমার ভ্রম ঘুচবে। গায়ে জোর নেই। অস্ত্র ধরতে জানিনে। অত্যন্ত সাধারণ আমার চেহারা। বীর পুরুষ বলতে যা বোঝায় আমি কি তাই? তোমাকে প্রতারণা করে তোমার রাখী ধারণ করা কি উচিত? সজ্ঞানে তোমাকে আমি প্রতারণা করিনি। অজ্ঞানে করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। যখনি তোমার মনে হবে রাখীটা অপাত্রে দেওয়া হয়েছে তখনি আমাকে লিখো, আমি ফিরিয়ে দেব। যা আমার নয় তা নিতে আমার স্বভাবের বাধা। এ কি সত্যি আমার? জানিনে। শুধু জানি যে এ অমূল্য। এ আমার রক্ষাকবচ।

রূপালীর সমস্যার সমাধান? আমি কি সবজান্তা? আমি যা বলব তা কি অভ্রান্ত? তা কি তোমার পছন্দ হবে? তবে শোন। রূপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে। উদ্ধার করতে হবে তার হৃত স্বাধীনতা, তার মানবিক জন্মস্বত্ব। একদিক থেকে দেখলে দুর্ভাগ্য সোনালীর বেশী, রূপালীর কম। অপর দিক থেকে দেখলে রূপালীর বেশী, সোনালীর কম। সোনালী স্বাধীন, সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে। রূপালী স্বাধীন নয়, সে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তার হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জীবনান্ত কাল অবধি।

এই যে একজনের হয়ে আরেক জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিয়ে সেটাকে একজনের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এ-স্বাধীনতা ঈশ্বরদত্ত। রূপালীর স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি বিদ্রোহের স্বাধীনতা। রাজা-মাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা প্রজামাত্রের আছে। প্রভুমাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার স্বাধীনতা দাসমাত্রেরই আছে। এ হল স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার স্বাধীনতা। রূপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে।

কিন্তু হতে চাইবে কি সে। হতে চাইলে দাম দিতে চাইবে কি! কেমন করে জানব! আমি তো অন্তর্যামী নই। ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, বংশগৌরব, নিরাপত্তা, এর কোনটিবা তুচ্ছ! কোনটিবা ত্যাগ করা সহজ! কিন্তু ত্যাগ না করলে মুক্তি কোথায়! রূপালীকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। চাই বললেই পাওয়া যায় না। দাম দিতে হয়। স্বাধীনতার দাম সোনা-রুপার চেয়ে, সামাজিক মর্যাদার চেয়ে, বংশ-গৌরবের চেয়ে, নিরাপত্তার চেয়ে বেশী। এসব কথা রূপালীকে বোঝায় কে! আমি তো পারব না। গোরী, তোমারি এ কাজ।

সোনালীর সমস্যা এক হিসাবে অত কঠিন নয়। ভাগ্যে থাকলে সে তার মনের মানুষ পাবে। সে-মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকে তবে সোনালীর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনা স্বল্প। কিন্তু রূপালীর ভাগ্যে তেমন মানুষ মিললেও সোনার শিকলের বাধা দুস্তর। আইনের বাধা তো আছেই।

যাক, এসব ভাবনা ভেবে মাথা ঘামানোর অবসর আমার কোথায়! আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। এবার ফিরে গিয়ে পড়া-শুনায় মন বসাতে হবে। আর তিন মাস বাদে পরীক্ষা। আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পর আর পড়ছিনে। পড়তে পড়তে যদি জীবন ভোর হয়ে যায় তবে বাঁচব কখন! দেখব কখন!

চিঠি লিখতে লিখতে রাত ভোর হয়ে গেছে। বাইরে বৈষ্ণবীর প্রভাতী গান শুনতে পাচ্ছি। ও থেমে থেমে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে টহল দিচ্ছে। রোজ এই করে। এক মাস ধরে করবে। ওই আমার কল্পনার স্বাধীনা নারী। ওর কোনো বাঁধন নেই। সাথী আছে, সে কিন্তু প্রভু নয়। স্বয়ং ভগবানকেও সে প্রভু ভাবে না। তিনিও কি প্রভু হতে চান! তিনি কান্ত!

গোরী, এখন তা হলে আসি। চতুরীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। স্বাধীনাকে দেখলে আমি অপূর্ব প্রেরণা পাই। জানতে চাই কী আছে ওর মধ্যে। রূপ তো নেই, তবে কী? রস? শিখতে হবে রস কাকে বলে।

আমার অজস্র শুভকামনা জেনো। প্রীতি। ইতি। তোমার রাখীবন্ধ ভাই, রত্ন।

চিঠি লিখে রত্নর মনটা হালকা হয়ে গেল। বিপদকে দূর থেকে যত ভয়ঙ্কর মনে হয় বিপদ আসলে তত ভয়ঙ্কর নয়। তা যদি হত মানুষ এত রকম দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে এসে সভ্যতার মুখ দেখত না, মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ত। দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করতে জানলে মানুষের হার নেই। মানবাত্মা অদম্য।

তার উল্লাস, তার গর্ব এই যে গোরী আর কাউকে রাখী পাঠায়নি, পাঠিয়েছে একমাত্র তাকেই। ডাক পড়ে অনেকের, বেছে নেওয়া হয় অল্প কয়েকজনকে। এ-ক্ষেত্রে মাত্র একজনকে বেছে নিয়েছে নিয়তি। কী জানি কোন দুরূহ কর্মের জন্যে! মনোনয়ন পেয়েছে রত্ন। একমাত্র রত্ন। গৌরবে তার মাথা উঁচু হয়ে গেছে।

সকলের কাছ থেকে সে এটা গোপন রাখতে চায়। অনাবশ্যক নম্রতার সঙ্গে কথা বলে। জানে তার উচ্চতা বেড়ে গেছে, তবু এমন ভাব দেখায় যেন সে লজ্জায় নতশির। শুধু উচ্চতা নয়, দায়িত্ব বেড়ে গেছে। কী এক দুর্জ্ঞেয় গুরুভার তার উপর ন্যস্ত!

চিঠিখানা ডাকে দিতে না দিতেই আরেক-খানা হাজির। সাধারণ খাম, যা ডাকঘরে কিনতে পাওয়া যায়। তার ভিতরে একসারসাইজের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতা। দ্রুত হস্তাক্ষরে কী লিখেছে শ্রীমতী?

রত্ন,

এ-চিঠি পড়া হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবে। ললিত গ্রেপ্তার। খুব সম্ভব মান্ডালের পথে। ছোট ননদের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল। ললিতের ইচ্ছা নয়, সেই-জন্যে কি সে স্বেচ্ছায় ধরা পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল? ও ছেলের মনের তল পাওয়া ভার। ও বোধ হয় আরেকজনকে ভালোবাসে। কাকে, বলব? না, থাক। এই সব হতাশ প্রেমিকদের জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু এদিকে যে আমি মুশকিলে পড়লুম। ছোট ননদের বিয়ে না হলে এরা আমাকেই দোষী করবে। সাবু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে আর আমার উপর ঠোঁট ফোলাচ্ছে। যার জন্যে করি চুরি সে-ই বলে চোর। সত্যি, কৃতজ্ঞতা বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। বিয়ের সম্বন্ধ করে-ছিল কে? সে আমিই। নইলে ও বাড়িতে এক মেয়ে দেবার করুণ অভিজ্ঞতার পর আরেক মেয়ে দিতে কেউ এতদিন চেষ্টা করেনি। এখন আমার প্রোপ্রাইটর পর্যন্ত আফসোস করছেন আর আমার দিকে সজল চোখে তাকাচ্ছেন।

আচ্ছা, আমি এখন কী করতে পারি! ললিত যদি পুলিশকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাঙ্কেতিক লিপি পাচার করে ও ধরা পড়ে, আমার কী করবার আছে। আমি অত কাঁচা মেয়ে নই। আমি বলছি আমি এর মধ্যে নেই। তবু প্রোপ্রাইটর সজল চোখে তাকাবেন। তাঁর বিশ্বাস আমি এর মধ্যে আছি। শুনেছি পুলিশ-সাহেবকে বিরাট ডালি পাঠান হয়ে গেছে। তাঁর অধীনস্থদের যাঁর যেমন মর্যাদা তাঁকে

তেমন নজরানা দিতে সদরে ম্যানেজারবাবু গেছেন। যাতে এ-বাড়িতে খানাতল্লাসি না হয়। বা আমাকেও গ্রেপ্তার না করে। আমি তো তৈরি, কিন্তু আমাকে ধরছে কে! আমি যে যমেরও অরুচি।

রত্ন, যদিও তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই তা হলেও তোমার কাছ থেকে আগাম বিদায় নিয়ে রাখছি। লিখতে যদি দেয় জেল থেকে চিঠি লিখব। ভালো কথা, আমার রাখীসুদ্ধ চিঠি কি তোমার হাতে পড়েনি? পুলিশে আটক করেছে নিশ্চয়। কত কথা লিখেছিলুম তাতে! আর কি সময় আছে লেখবার! এ চিঠি যার মারফত যাচ্ছে সে এই মুহূর্তে সদরে রওনা হচ্ছে। সেখান থেকে ডাকে ছাড়বে। ডাকঘরের খামে। ভালোবাসা রইল চিরকালের জন্যে। ইতি—তোমারই গোরী।

একেই বলে বিপদ। রত্ন শিউরে উঠল। ললিত, যাকে সেদিন রাজশাহীতে দেখে এল, সে এখন হাজতে কি কোথায় ভগবান জানেন। গোরী, যার চিঠি এইমাত্র পেল, সে এতক্ষণে জেনানা ফাটকে কি কোথায় দেবতারাও জানেন না।

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল ভাবনায়। টেলিগ্রাম করলে হয়। কিন্তু কাকে করবে? গোরীকে, না তার প্রোপ্রাইটরকে? কোন ঠিকানায় করবে? টেলিগ্রাম যদি পুলিশের খপ্পরে পড়ে তা হলে সেও তো সন্দেহ-ভাজন হবে। একই দলের একজন বলে তাকেও তো ধরতে পারে। তা বলে সেই ভয়ে পেছিয়ে যাওয়াও তো রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাজে না। কী গেরো!

তার মনে পড়ল যে খবরের কাগজে যাদের নাম বেরিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমতীর নাম নেই। গ্রেপ্তার হলে তার মতো বিখ্যাত মহিলার নাম নিশ্চয় কাগজে উঠত। ছবিও ছাপা হত। অত বড় একটা খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। ললিত না হয় নগণ্য ছাত্র, শ্রীমতী যে বেগমপুরের ছোটতরফের জমিদারবধূ।

রত্ন আরো কয়েকখানা খবরের কাগজ খুঁজে পেতে পড়ল। একখানার এক কোণে গ্রেপ্তারীদের তালিকায় ললিতানন্দ বর্মণের নাম ছিল। রত্ন লক্ষ করে বিমর্ষ হল। বেচারা ললিত! সেদিন হাওয়া হয়ে গিয়েও নিস্তার পেল না। ফাঁদ পাতা ছিল, আটকে গেল। কিন্তু মাণ্ডালে কেন যাবে? এমন কী গণ্যমান্য বিপ্লবী!

এরপর প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া রত্নর কাজ হল। যদি শ্রীমতীর নাম থাকে। ছবি বেরোয়। দেখতেও সাধ যায় ওকে।

যাওয়ার দিন এসে পড়ল। রত্ন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে এমন সময় এল চিঠি। আবার সেই নীল খাম। ভিতরে সেই নীল রঙের কাগজ। রত্ন আশ্বস্ত হল। যাক, বিপদ কেটে গেছে। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

চিঠিখানা খুলতে-না-খুলতে ঝুপ করে একখানা ফোটো খসে পড়ল। ছোট একটা স্ন্যাপশট! দেখি, দেখি। রত্ন তুলে নিয়ে দেখল—না, স্ন্যাপশট নয়। বড় সাইজের ফোটো থেকে কাটা একটি বাস্ট। সম্ভবত গ্রুপ-ফোটো থেকে। আরো যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মালুম হয় বিয়ের সময়কার ফোটো থেকে।

এই গোরী! রত্ন অশেষ কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। কই, প্রভাতের বর্ণনার সঙ্গে তো মেলে না! মিলবে কী করে! ও যে চোদ্দ পনেরো বছরের নবোঢ়া। ব্রীড়ায় নতমুখী। নিষ্পাপ নিরীহ। বিষম একটা আঘাত পেয়ে বিষাদময়ী। সচকিত সশঙ্ক।

তবু কী সুন্দর! কলিকা বয়সে এই! ফুটলে কি রূপের অবধি থাকবে! রত্নকে আরো আনন্দ দিল তার আবিষ্কার যে কোথাও ফ্যাশনের পূর্বলক্ষণ নেই।

শ্রীমতী লিখেছিল ঃ

সুখবর দিচ্ছি। ললিত ছাড়া পেয়েছে। তবে একটা সর্ত আছে। অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে। এটা আমার প্রোপ্রাইটরের কারসাজি। ললিতের বাবা এখন এমন কৃতজ্ঞ যে কাল দিন ফেললে কালকেই ছেলের বিয়ে দেন। তা যাক, বিয়ের দেরি আছে। তোমাদের সবাইকে বিয়েতে আসতে হবে বরযাত্রী হয়ে। সাত ভাই চম্পার সাত জনকেই একসঙ্গে দেখতে চাই। বিশেষ করে একজনকে। রত্ন, তোমার ওজর আপত্তি শুনব না। জানো তো, আমার বন্দী জীবন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে করতে পাব না। কিন্তু বিয়েবাড়ির হৈ-চৈয়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাবেই। বর যখন আসবে তখন তার এক পাশে তুমি থাকবে। বর যেখানে বসবে তার এক পাশে তুমি বসবে। তোমাকে আমি চিনে নেবই। নারীর সহজাত দৃষ্টি দিয়ে।

কিন্তু তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে? সন্দেহ। পুরুষের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ভাবলুম তোমাকে আমার একখানা ফোটো পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। তা দেখে চিনবে। কিন্তু ফোটো খুঁজতে গিয়ে দেখি কোনোখানাই আমার পছন্দ হয় না। বুড়ো বয়সের ফোটো দেখে তোমারই বা কোন সুখ! দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি। গড়ন যখন আমার রজনীগন্ধার মতো ছিল, বরনও ছিল তেমনি, তখনকার একটি ফোটোর একাংশ পাঠাচ্ছি। কাউকে দিয়ো না। কাছে রেখো। ও বয়স তো আর ফিরবে না। বিয়েতে এসো কিন্তু। না এলে নিরাশ হব।

তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছলে যে আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। এখন তুমি শুনে নিশ্চিন্ত হতে পার আমাকে ধরবে না। আমি কিন্তু একটুও খুশী নই। কেন আমাকে ধরবে না? আমি এমন কী অপদার্থ! আমি কি দেশের জন্যে কম করেছি! প্রকৃত ব্যাপার কী, জানো? চুপি চুপি বলছি। ওরা সব খবর রাখে। আমাকে ধরবে বলে সব ঠিক করে রেখেছিল। মান্ডালে চালান দিত। কি আন্দামান। কিন্তু কোন দেবতাকে কী দিয়ে তুষ্ট করতে হয়—কাকে বেলপাতা কাকে তুলসী—এ-বিদ্যা আমাদের ম্যানেজার মশায়ের নখদর্পণে। লোকটা তান্ত্রিক সাধক। সত্তর বছর বয়স হল। কী উজ্জ্বল তাঁর চোখ! ম্যানেজার জানতেন যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডালি নেবেন না, রাগ করে গালি দেবেন। তাঁকে দিতে হয় নবাবী আমলের ছবি। সাহেবের ছবির সঞ্চয় চমৎকার। সব বাড়ি থেকে একখানা আধখানা গেছে। এ-বাড়ির কর্তা মহা কঞ্জুস। এত দিন এ-বাড়ি থেকে ছবি যায়নি। এবার একসঙ্গে খান দুই গেল। আলিবর্দি খাঁর রাজসভার ছবি।

অতএব আমি গ্রেপ্তারের অযোগ্য। ম্যাজিস্ট্রেট নাকি আমাদের বাড়ি চা খেতে আসবেন। আমি তাঁর মেয়ের বয়সী। আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করবেন। তিনি আমার হিতৈষী। নিয়ম হচ্ছে তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা মোটা চাদরের পর্দা খাটান হবে। তিনি কথা কইবেন, আমি শুনব। তার পর আমি কথা কইব, তিনি শুনবেন। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। কী অত্যাচার, বল দেখি। এসব নিয়ম যদি এখনো মানতে হয় তবে স্বাধীনতা কিসের জন্যে ও কার জন্যে? ইংরেজই বা এসবের প্রশ্রয় দেয় কেন? ও বোধ হয় ভাবছে যে মাঝখানে যদি পর্দা না থাকে আমি হয়তো ওকে গুলী করে বসব। আমার নামে অনেক বাজে কথা শুনেছে নিশ্চয়।

দূর হোক, মন ভালো নেই। বন্দিনী যদি হতে হয় রাজবন্দিনী হতুম। দেশসুদ্ধ লোক সুখ্যাতি করত। দেশটাও মুক্ত হত। আমিও। গৌরবে অবশিষ্ট জীবন অতি-

বাহিত হত। না হয় কারাগারেই প্রাণ যেত। সেও কত বড় একটা ভাগ্য! তা তো হবার নয়। পচতে হবে এই অন্তঃপুরের অন্ধকূপে। কূপমণ্ডূক হয়ে। ব্যাঙ রাজকুমারের সঙ্গে। সাধ আহ্লাদ বলতে আমার ওই মণ্ডলী। ধরপাকড়ের ফলে মণ্ডলী এখন বিপর্যস্ত। ললিতের নাম করলুম। অন্যান্যদের নাম করা বারণ। ওরা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। বাইরে আছে একমাত্র জ্যোতিদা। সে হল গান্ধী-পন্থী। কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত উদার-প্রকৃতির যুবক। সে-ই আমার অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ।

তার পর, রত্ন, তুমি তা হলে আমার রাখীবন্ধন স্বীকার করলে? আমার বড় ভয় ছিল তুমি হয়তো রাখী ফিরিয়ে দেবে। দিলে আমি কী করতুম, বলো! অবলা নারী আমি। সংসারে আমার আপনার বলতে কে আছে! মা বাবা তো সাফ বলে দিয়েছেন যে মা না হলে তাঁদের বাড়ি যাওয়া বারণ। দাদা তো সেই ব্যাপারটার পর থেকে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। পাঁচ বছর হল বাক্‌সম্পর্ক নেই। দিদিরা হিংসুটে। তাদের ধারণা আমি তাদের বরদের জাদু করব বলে মোহিনী রূপ ধরে এসেছি। ছোট বোনটা আমার অনুগত ছিল। কিন্তু তার বর তাকে চোখে চোখে রেখেছে, পাছে আমার মতো বকে যায়। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সকলের মনোভাব মোটের উপর একই রকম। পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে, এত দিন কেন মা হইনি! মা না হলে নারী নিরাপদ নয়। তাকে দিয়ে অন্যের ক্ষতি হতে পারে, অন্যের দ্বারা তার সর্বনাশ হতে পারে। তার স্বামী আবার বিয়ে করতে পারে। বিয়ের সর্তই যেন মা হওয়া। আমি যেন সর্তভঙ্গ করেছি। তার পর মা হতে পারলে কত বড় একটা নিশ্চিন্তি। স্বামী তাড়িয়ে দিলে ছেলে পালবে, স্বামী মারা গেলে ছেলে সহায় হবে, ছেলেই নারীর জীবন-বীমা। সকাল সকাল মা হয়ে রাখাটা বুড়ো বয়সের অন্নসংস্থান।

সন্তু আমার ছোট ভাই, আমাকে ভক্তি করে। তার মতে আমিই ঠিক। সে বেঁচে থাকুক। আপদে বিপদে সে-ই একমাত্র ভরসা। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। বলে, "সেজদি, আমি বড় হলেই তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব। কটা দিন সবুর কর।" ছেলেমানুষ, ও কী বুঝবে কেন আমি সবুর করতে পারিনে। তুমি ওর চেয়ে বড়। তুমিও কি বোঝ! শুনে অভিমান করলে তো?

রূপালীর কথা যা বলেছ তা মানি। তাকে স্বাধীনা হতে হবে সব আগে। কিন্তু মরে যাই তোমার রুচি দেখে। স্বাধীনা নারীর আদর্শ হল কোথাকার এক বোষ্টমী! তোমার চিঠি পাবার পরমুহূর্তে থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি এই নিয়ে। এখন বুঝলে তো কেন আমার মন ভালো নেই? ওসব মেয়ের সংসর্গ ছাড়ো। ওরা ডাকিনী। তোমার সর্বনাশ করবে এক দিন। আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। তোমাকে রক্ষা করা আমারই কর্তব্য। কী করে রক্ষা করব এত দূরে থেকে! যদি তুমি আমার কথা না শোন। রত্ন, তোমার যদি আমার উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে তুমি চতুরীর দিকে আর তাকাবে না, ওর চাতুরীতে ভুলবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

॥ দশ ॥

গোরী যে গ্রেপ্তার হয়নি, ললিত যে ছাড়া পেয়েছে, এ-দুটি খবর রত্নকে তৃপ্তি দিল। তবে ললিতের বিয়ের কথায় সে একটুও খুশী হতে পারল না। যাকে ভালোবাসে না তাকে বিয়ে করবে, নিজে জ্বলবে, আরেক জনকে জ্বালাবে—কে জানে, হয়তো আরো একজনকে। কী দরকার ছিল এর! জেল থেকে বেরিয়ে আসা কি এতই জরুরী।

রত্ন লক্ষ্য করেছিল শ্রীমতী এবার গোরী বলে স্বাক্ষর করেনি, করেছে শ্রীমতী বলে। এবার ভালোবাসা জানায়নি, জানিয়েছে শুভকামনা। রত্ন যে ওসব চায় বা আশা করে তা নয়। বরং ওসব দেখে বিরত বোধ করে। ওর চেয়ে এই ভালো। এই সহজ বন্ধুত্ব। তবু তার মনের কোণে কাঁটা খচখচ করে। কিসের কাঁটা? গোরী অনুমোদন করে না চতুরীর প্রতি তার মনোভাব, তার সপ্রশংস দৃষ্টি। গোরী সন্দেহ করে চতুরীকে।

বৈষ্ণবী যে স্বাধীনা এই সরল সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকতে হবে, এ কী বাদশাহী ফারমান! রাখীবন্ধ ভাই মানে কি আঁখিবন্ধ ভাই! চতুরীকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। বয়সে অনেক বড়। কাছেই কোনখানে ওর আখড়া। কিন্তু এক আখড়ায় ও বেশী দিন থাকবে না, মাঝে মাঝে অদর্শন হয়ে যাবে, এক বছর কি দু বছর বাদে ফিরবে। ইদানীং রত্ন নিজে প্রবাসে থাকে, চতুরীর খোঁজখবর রাখে না, দৈবাৎ দেখা হয়। ও যেমনটি ছিল তেমনিটি আছে, ওর বয়স বাড়েনি দশ বছর ধরে। এদিকে রত্ন আর ছোট ছেলেটি নয়। কত বড় হয়েছে। এক-কালে যা শুনে হাঁ করে থাকত এখন তা শুনলে নাক কান লাল হয়ে যায়, লুকোতে ইচ্ছা করে। "কই, আমার মনোচোরা কই গো? আমার নাগর কোথায়?"

রূপসী নয়। রসবতী। হাবে ভাবে চলনে বলনে কটাক্ষে রসের ঝরনা ঝরছে। কেমন চূড়া করে কেশ বাঁধে। অর্ধেক আকর্ষণ ঐ কেশে। বাকীটা সুমধুর স্বরে। রসালাপে। কটি বাউল বোষ্টম পার করেছে সেই জানে। জ্যাঠাইমা তা নিয়ে টিপ্পনি কাটেন। সে তাতে অপ্রতিভ হয় না। বলে "মধু থাকলে ভ্রমর আসে। ফুলের অপরাধ কী!"

কই, কখনো তো মনে হয়নি যে সে ডাকিনী। তার একখানা ভালো কাপড় কি গয়না নেই, বাক্স কি তৈজস নেই, জমি নেই, বাড়ি নেই, সেসব দিকে নজর নেই। ডাকিনী হলে কি সে গুছিয়ে নিত না? এমন কারো নাম শোনা যায় না যার কাছ থেকে সে কখনো টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়েছে বা আর কোনো উপহার। যেদিন যেটুকু দরকার—চাল কি ডাল কি তেল কি নুন—সেইটুকু তার ভিক্ষা। তার বদলে সে যা দিয়ে থাকে তা বহুগুণ মূল্যবান। তার গান শুনতে পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে। কান ভরে ভিক্ষা নিয়ে যায় তার কাছ থেকে।

শ্রীমতীর দুখানা চিঠির জবাব বাকী, কিন্তু রত্নর হাতে সময় ছিল না। সে তার আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। হীরু চলল তার সঙ্গে স্টেশন অবধি। পথের জন্যে কিছু সন্দেশ দিয়ে গেল।

কলকাতায় মাসিকপত্র মহলে ঘোরাঘুরি করে দিন দুই কাটল। নবনী ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছল। সেই হল তার পাণ্ডা। রত্নর নাম কেউ কেউ শুনেছিলেন, কিন্তু নবনীর মুখ চিনতেন অনেকেই। সে-মুখ একটি প্রিয়দর্শন সৌম্য সুজনের।

নবনী ললিতের বিয়েতে বরযাত্রী হবে। সে চায় রত্নও যেন হয়। এ-রকম একটা বিয়েতে যোগ দিতে অরুচি নেই নবনীর। জন্ম মৃত্যু বিবাহ, এর উপর কি কারো হাত আছে! রত্ন তার সঙ্গে তর্ক করতে পারত, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সোজাসুজি বলল, "আমার টেস্ট আসন্ন। এতদিন ফাঁকি দিয়েছি। এখন যদি না পড়ি ধরা পড়ে যাব।"

কলকাতা ছাড়ার মুখে ললিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই ক'সপ্তাহে সে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। রত্ন তার বিয়েতে বরযাত্রী হবে সে ধরে নিয়েছিল। আর-সবাই হচ্ছে। এমন কি প্রভাতও। ম্রিয়মাণ হল যখন শুনল রত্ন আসতে পারবে না, তাকে মাফ করতে হবে।

"অন্য কোনো সময় আমি তোমার বাড়ি

অতিথি হব, ললিত। বৌভাতটা আমার খাতিরে আরেক বার কোরো।" রত্ন বলল।

"আর বিয়েটা?"

"না, বিয়েটা আরেক বার করে কাজ নেই। কিন্তু আদৌ করছ কেন তাই বুঝতে পারিনে। যেখানে প্রেম নেই সেখানে কিসের জন্যে বিয়ে? জেলের বাইরে আসার জন্যে? ছি ছি! এত রাজভয় তোমার!"

ললিত মুখ হাঁড়ি করে বলল, "লোকে সেরকম ভাববে। কিন্তু ঠিক তা নয়। শ্রীমতী তোমাকে কী লিখেছে জানিনে, এটা তারই নির্বন্ধ। এটা এড়াবার জন্যেই আমি ফন্দি করে বন্দী হয়েছিলুম। অবশ্য ফন্দিটা কয়েক মাস ধরে চলছিল। আমি তো বিয়ে করতে চাইনি, ভালোবাসতেই চেয়েছি।"

রত্নর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কাকে?"

"শ্রীমতী তোমাকে জানায়নি?"

"না তো।"

"তুমি আন্দাজ করনি?"

"না। কখনো আমার মনে হয়নি।"

ললিত তার কানে কানে বলল, "মক্ষি-রানীকে।"

রত্নর মুখখানা হঠাৎ ছাই হয়ে গেল। তার বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকল। ললিত ভালোবাসে শ্রীমতীকে। রত্নর তাতে কী!

"ওঃ! তাই নাকি!" রত্ন কোনোমতে সামলে নিল।

"জানি তেমন ভালোবাসা পাপ।" ললিত সখেদে বলল। "সেইজন্যে আমি চির-কালের মতো সরে যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শ্রীমতী তা হবে দেবে না। ছোট ননদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আপন করে নেবে। নির্বন্ধটা ওরই। স্বয়ং যশোবাবু ওর তাড়া খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে সাত ঘাটের জল খেলেন। তাঁর সাধ্য-সাধনা সফল হল দেখে আমার পিতাঠাকুর কৃতজ্ঞ হয়ে মত দিলেন। এখন আমার উদ্ধার নেই এই নতুন বন্দিশালা থেকে। ভাই রত্ন, আমি কেন যে ওর মণ্ডলীকে যোগ দিয়েছিলুম!"

রত্ন ললিতের জন্যে দুঃখিত হল। কিন্তু তার বিবাহ সমর্থন করতে পারল না। কিছুতেই বরযাত্রী হতে রাজী হল না। তবে শুভকামনা জানাল। ওটা বন্ধুকৃত্য। তার পর সে স্বয়ং ললিতের গোপন কথাটি জেনে নিল, কিন্তু ওকে জানতে দিল না যে শ্রীমতী তার কাছে গোরী বলে পরিচয় দিয়েছে, রাখী পাঠিয়েছে, ফোটো পাঠিয়েছে।

পশ্চিমে ফিরে গিয়ে দেখল প্রভাত তার আগেই ফিরেছে ও পড়াশুনায় ডুব দিয়ে মৌনীবাবা বনেছে। ললিতের বিয়েতে যাচ্ছে কি না প্রশ্ন করায় প্রভাত এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে লিখল, "না।" লিখে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল। বিচিত্র ব্যাপার! রত্ন হেসে ফেলল। তখন প্রভাত আবার লিখল, "খুশবন্ত সিং দারুণ পড়ছে।" অর্থাৎ তার প্রতিযোগী তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

রত্নর সঙ্গে যার প্রতিযোগিতা সে বিদ্যাপতি। সে যদি দারুণ পড়ত বাধ্য হয়ে রত্নকেও মৌনীবাবা সাজতে হত। সৌভাগ্যের বিষয় সে রত্নর প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে, চ্যালেঞ্জ করেনি। তাতে দুজনেরই সুবিধা। কাউকে বেশী খাটতে হয় না। তা হলেও প্রথম শ্রেণীটা তো পেতে হবে। সেটা অনায়াসলভ্য নয়।

অঞ্জন একরাশ ফোটো তুলে এনেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার। এভারেস্টের। হিমালয়ের অন্যান্য দৃশ্যের। বিদ্যাপতি সেসব আলোকচিত্রের বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনা দিয়ে রত্নকে বিমুগ্ধ করে রাখল। রত্ন তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। তার মনে হতে থাকল সেও তাদের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গেলে ভালো করত। যায়নি বলে আফসোস হল তার।

পরে যখন নির্জন কক্ষে একা শুতে গেল তখন তার স্মরণ হল যে সেও তো একখানি ফোটো সঙ্গে করে এনেছে। কাউকে দেখাবার মতো নয়, তবু তন্ময় হয়ে দেখবার মতো। তাদের জিত নয়, তারই জিত। নারীর সৌন্দর্যের কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিষ্প্রভ।

একটু স্থির হয়ে বসার পর রত্ন শ্রীমতীকে চিঠি লিখল। এতদিন কেন লেখেনি তার কৈফিয়ত দিয়ে তার পর ললিতের বিয়েতে কেন যাবে না তার জন্যে জবাবদিহি করল। আশ্বাস্ত প্রকাশ করল গোরী রাজবন্দিনী হয়নি বলে। এক বন্ধন কাটাতে পারছে না বলে আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাওয়া মূঢ়তা। ওটা যেন তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিতে যাওয়া। তারপর লিখল—

গোরী, তোমার কিশোর বয়সের ওই ফোটোখানি পাওয়া আমার জীবনের একটি অনুপম অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি আমার কানে গুনগুনিয়ে উঠছে। সেটিও শরৎকালের অনুভূতি। "আমার নয়নভুলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!" এদিকে যে শরৎ শেষ হয়ে এল সে-খেয়াল নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের সামঞ্জস্য হচ্ছে না। অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, "আমার নয়নভুলানো এলে।"

মানুষের যতগুলো বয়স আছে তার মধ্যে কৈশোর শ্রেষ্ঠ। "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।" মনে পড়ে যায় আমার হারানো কৈশোর। ফিরে যেতে ইচ্ছা করে সে-বয়সে। হায়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাতটি বছর পেরিয়ে যেতে পারিনে! মুখে চোখে আনতে পারিনে সে-লাবণ্য, সে-লালিত্য। সেদিনের সেই আধো আলো আধো ছায়া অস্পষ্ট অস্ফুট মন আজ কোথায়! পিছন ফিরে তাকাতে স্পৃহা নেই। জানি সেসব আজ রূপকথা। "এক যে ছিল রাজা" যেমন, তেমনি "এক যে ছিল কিশোর।"

আমার কৈশোরকে আমি তোমার আলোক-চিত্রে পুনরাবিষ্কার করলুম। আর আবিষ্কার করলুম তোমার কৈশোরকে। রূপ তোমাকে ভগবান দিয়েছেন, আমাকে দেননি। ওই স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ কি এখনো তেমনি আছে? জ্যোৎস্নার মতো রূপ? গোরী, তোমাকে দেখতে আমার কি অনিচ্ছা! কিন্তু সম্ভব নয়। আমি ব্যস্ত! আর আপনাকে দেখাতে আমার কুণ্ঠা। আমি চিরদিনই লাজুক। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই। ছেলেদের সামনেই বেরোতে লজ্জা। মেয়েদের সামনে তো আরো। আমাকে আমার নিভৃত পরিবেশে না দেখলে চেনা যায় না। হাটের মাঝখানে যাকে তুমি চিনবে সে আমি নয়, আমার স্বনামা কোনো ব্যক্তি। গোরী, জানো তো সেই রাজপুত রানীর সঙ্গে হুমায়ুন বাদশার কোনো দিন চোখের দেখা ঘটেনি। আমাদের বেলাই বা কেন ঘটবে?

যার দিকে তাকাতে বারণ করেছ তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হবেও না। পরীক্ষার পর যদি আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি তা হলে কি আর কোনো দিন দেখা হবে জীবনে? কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুযোগ আছে। রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই? আমার যদি কাউকে ভালো লাগে তার দিকে আমি তাকাতে পারব না? তা হলে সুরদাসের মতো দু'চোখ বিঁধে অন্ধ করে দিলে হয়! না চোখে ঠুলি পরা কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো? প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যের মতো নারীর বিচিত্র রূপ মানুষমাত্রেরই দর্শনীয়। আমি কি মানুষ নই? রূপ দিয়ে কি আমি আমার দু'চোখ ভরে নিতে পারব না? রস দিয়ে আমার অন্তর? তবে কেনই বা জন্ম নিলুম এ-লোকে? কেনই বা থাকব?

ধনসম্পদ আমি চাইনে। সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই। আমার ঐশ্বর্য আমার ভিতরে। কিন্তু এই ভিতরটাকে ক্রমাগত ভরিয়ে নিতে হয়। চোখ দিয়ে কান দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে

ধ্যান দিয়ে ভরিয়ে নিলেই আমি ঐশ্বর্য-বান। নইলে আমি নিঃস্ব। নিঃস্বের কাছে তুমিই বা কী পাবে, গোরী! সেইজন্যে বলি, আমাকে চোখ বুজে থাকতে মাথার দিব্যি দিয়ো না। চোখ কান খোলা না রাখলে আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাবে, যেমন শুকিয়ে যায় পুষ্করিণী উৎসমুখ রুদ্ধ হলে।

চতুরী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখবে ভেবেছিল। লিখল না রত্ন। চিঠিখানা শেষ করে দিল সহানুভূতির সুরে। সহানুভূতি গোরীর নির্বান্ধব দশার জন্যে। বাপ মা ভাই বোন কেউ তার সহায় নয়। সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয়তা। কে একজন জ্যোতিদা তার একমাত্র নির্ভর। তাঁকে ধন্যবাদ। রাজনীতি প্রসঙ্গে রত্ন একটি কথাও বলল না। তার নিজের মন তখন রাজনীতিবিমুখ। তা বলে স্বাধীনতাবিমুখ নয়।

প্রিন্সিপাল একদিন কমিশনারকে হস্টেল দেখতে নিয়ে এলেন। ইনি একটি প্রবন্ধ লিখতে দিলেন আবাসিকদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে হবে হস্টেল ওয়ার্ডেন-এর সাক্ষাতে। যে প্রথম হবে সে পুরস্কার পাবে। রত্ন প্রথম হল। প্রিন্সিপাল তাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন সে কী চায়। টাকা না বই? রত্ন বলল, বই। কী বই? রত্ন নাম দিল এমন সব বইয়ের যা শ্রীমতীকে উপহার দেওয়া যায়। সব ইংরেজী বই যদিও। বই যেদিন হাতে এল রত্নর সে কী ফুর্তি! বিদ্যাপতিরা কেড়ে নিতে চায়, সে ছুঁতে দেবে না। তারা বুঝতে পারে না, কেন। নতুন বই দেখলে সে নিজেই তো কেড়ে নিয়ে পড়ে মকবুলের কাছ থেকে, অতীনের কাছ থেকে। ওই দুই গ্রন্থরসিক সব চেয়ে তাজা বই কেনে।

বইগুলো গোরীকে পাঠিয়ে চমকে দেবার মতলব ছিল রত্নর। ডাকঘরে গিয়ে পার্সেল করে এল। পার্সেলের ভিতরে ছোট এক-খানা চিঠি লিখে জানাল যে প্রবন্ধ লেখার সময় সে মানত করেছিল মা সরস্বতীর কাছে, পুরস্কার পেলে পুরস্কারের বই একজনকে পাঠাবে। বইগুলো যে-ভাষায় রচিত সে-ভাষা স্বয়ং মা সরস্বতীর অজানা। তা হলেও তার আশা আছে গোরী এসব বই বুঝবে, না বুঝলে জ্যোতিদার কাছ থেকে বুঝে নেবে।

ইতিমধ্যে গোরীর চিঠি এল। বই পাবার আগে লিখেছিল এ চিঠি। সাবুর বিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এক দণ্ড ফুরসত পাচ্ছে না। এক রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছে। কলমের কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় পেনসিল দিয়ে। জন্মদিনে তোলা ফোটো এনলার্জ করা হয়ে এসেছে। একখানা প্রিন্ট আলাদা ডাকে পাঠাচ্ছে। ভালো ওঠেনি। চেহারাও তো খারাপ হয়ে গেছে। হবে না? খাঁচার পাখির কি রঙের বাহার থাকে।

রত্ন, আমার রূপের দেদার সুখ্যাতি শুনেছি, কিন্তু তোমার মুখে যা শুনলুম তা একজন জহুরীর অভিমত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে সুখ্যাতিটা আমার এখনকার পাওনা নয়। যখনকার পাওনা তখন যদি তুমি থাকতে। তোমাকে আমার এখনকার ফোটো পাঠাতে আমার সাহস হয়নি, হত না, কিন্তু ওই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার রূপ কি এখনো জ্যোৎস্নার মতো আছে, ওই জিজ্ঞাসার উত্তর আর কী ভাবে দিতে পারি?

তুমি আসছ না জেনে রাগ করেছি। খবরটা আমি প্রথমে পাই ললিতের কাছে কলকাতায়। হাঁ, কলকাতা যেতে হয়েছিল সাবুর জন্যে গয়না পছন্দ করতে। মাসীর বাড়ি উঠেছিলুম। তুমি যদি আর একটা দিন দেরি করতে তা হলে কলকাতায় দেখা হতে পারত। তা হলে আমার ক্ষোভ থাকত না। ললিতের উচিত ছিল তোমাকে বলা যে আমি কলকাতায় পৌঁছব একদিন পরে। ও বোধ হয় তোমাকে হিংসা করে। আমি যাদের ভালোবাসি ও তাদের দেখতে পারে না। জ্যোতিদার উপর ওর অন্ধ বিদ্বেষ। কিন্তু এমন করে আমাকে নিরাশ করা ওর অন্যায় হয়েছে।

ভালো কথা, তুমি নাকি এ-কথা বলেছ যে তুমি এ-বিবাহ সমর্থন কর না। কেন, মশায়? ললিত সাবুকে ভালোবাসে না বলে? কিন্তু সাবু তো ললিতকে ভালো-বাসে। সে-ই বা কী করে আর কাউকে বিয়ে করবে? না সারাজীবন আইবুড় থাকবে? মেয়েদের দিকটা তোমরা দেখবে না, বুঝবে না, ভাববে না। আমি যা করেছি সাবুর মঙ্গলের জন্যে করেছি। ললিতেরও মঙ্গলের জন্যে। সাবুর মতো বৌ পেলে ও বর্তে যাবে। ভালোও বাসবে, তুমি দেখবে।

প্রভাত নাকি প্রথমে বলেছিল আসবে। পরে কার কাছে শুনতে পায় মেয়েটির বয়স তেরো বছর। বাল্যবিবাহে সে যোগ দেবে না। সে সমাজ-সংস্কারক। তুমি ও প্রভাত দেখছি এক ছাঁচে ঢালা। সামান্য একটা মূলনীতির জন্যে বন্ধুর বিয়ে বয়কট করবে। কানন হৈম নবনী তোমাদের মতো গোঁয়ার নয়। তারা তিনজনেই আসবে। পারে তো গিরীনকেও ধরে আনবে। তারও আশীর্বাদ আছে। নেই কেবল তোমাদের দুজনের। ভাবতে এত খারাপ লাগে।

রত্নর ইচ্ছা করছিল এ-চিঠি প্রভাতকে পড়ে শোনাতে। কিন্তু কাজ কী ওর সময় নষ্ট করে! ঘটনার গতি কি বদলাবে! ললিত যে তার মক্ষিরানীর জালে জড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়! প্রভাত যদি জানতে চায় ফোটো কিসের জন্যে? যদি দেখতে চায় কেমন ফোটো?

ফোটো এল আলাদা ডাকে। রেজিস্ট্রি হয়ে। রত্ন তখন কলেজে। খুলে দেখল না, পাছে আর কেউ দেখতে পায় ও খেপিয়ে মারে। চারটের পর ঘরে গিয়েও কি নিরিবিলি পাবার জো আছে? একজন না একজন আসবেই আড্ডা দিতে কিংবা পড়াশুনার কথা পাড়তে। সন্ধ্যাবেলা বইপত্র নিয়ে বসতে হয়। প্রিফেক্ট ঘুরে বেড়ান। সুপারিন্টেনডেন্ট টহল দেন।

রাত্রে শুতে যাবার সময় দরজায় খিল দিয়ে ফোটোখানা টেবিল ল্যাম্পের সামনে তুলে ধরল রত্ন। পোস্টকার্ড সাইজ। একাকিনী শ্রীমতী। একটি বৃহৎ ফুলের তোড়া বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে। দেশী ও বিলিতী নানা জাতের নানা রঙের ফুল। ও ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আরো দুটি ফুল! যৌবনের ফুল। ঘন কালো চুল কিন্তু সাদা ঢাকাই শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকছে না, ফুটে বেরোচ্ছে। ছুটে আসছে সামনের দিকে সমুদ্রের লহরীর মতো। মাথার কাপড় তোলা। ঘোমটার ভান নেই। মুখে ব্রীড়া-জড়ানো হাসি। সে-হাসি চাউনিতেও। চাউনিতে আরো কিছু আছে— মাদকতা, মদিরতা, বিলোলতা, বিদ্যুৎ, বহ্নি। প্রভাত হলে বলত, প্যাশন। রত্ন বলবে, জাদু। এ-নয়নে জাদু আছে।

অলঙ্কার বলতে দু হাতে দু গাছি সোনাবাঁধানো শাঁখা, বাঁ হাতে নোয়া ও শৌখিন রিস্ট ওয়াচ। নিরাভরণ হয়ে তার রূপ আরো খুলেছে। কৈশোরে যা ছিল স্নিগ্ধ কমনীয়, যৌবনাগমে তা তীব্র রমণীয়। যে ছিল রজনীগন্ধা সে হয়েছে কেতকী। তখনকার বয়সের লালিত্য নেই, লাবণ্য নেই, তার জায়গায় এসেছে প্রাণোচ্ছলতা, প্রখরতা। ভরা নদীর খর ধারা। নিরীহতা নেই, তার জায়গা নিয়েছে তপ্ততা। কিন্তু প্রসাধন বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষিত হয়। যেন কোন উদাসিনী রাজকন্যা।

আট ন'মাস আগে রত্ন কি জানত যে এ-জগতে শ্রীমতী বলে কেউ আছে, যাকে দেখতে এ-রকম? প্রভাতের মুখে তার নাম ও বর্ণনা শুনে চমক লেগেছিল। সেই

সঙ্গে ভয়। তাজ্জব ব্যাপার! শ্রীমতীকে রত্ন চোখেও দেখেনি, দেখবে বলে মনে হয় না। তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই, এমন কোনো সূত্র নেই যে-সূত্র ধরে আলাপ পরিচয় হয়। কোথায় শ্রীমতী আর কোথায় রত্ন! মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। তবু ভয় একজনকে অপরজনের। সেই আট ন'মাস আগে গঙ্গার ধারে প্রথম শ্রাবণে। এ যেন রাম না জন্মাতে রামায়ণ!

কেন ভয়! রত্ন আত্মবিশ্লেষণ করেছিল। ভয় প্রভাতবর্ণিত প্যাশনকে ও রত্নকল্পিত বয়সকে। কিন্তু বয়সে তো মালাদিও বড়। তাঁর বেলা ভয় নেই কেন? দুর্বোধ্য প্রহেলিকা! প্রহেলিকার উত্তর কি এই যে মালাদির সঙ্গে রত্নর সম্পর্ক নিরাপদ? তা যদি হয় তবে শ্রীমতীর সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই নেই তার, সেটা আরো নিরাপদ। রত্ন কল্পনাই করেনি যে শ্রীমতী তাকে একদিন চিঠি লিখবে, তার চিঠি পাবে, দুজনের একপ্রকার যোগাযোগ ঘটবে। প্রাচীনপন্থী হলে এর একটা মীমাংসা পাওয়া যেত। প্রাক্তন। পূর্বজন্ম। নিয়তি! কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদ এর কী ব্যাখ্যা দেবে? অবচেতন বলে একটা কথা সবে চলতি হতে শুরু করেছে। অবচেতনকে আসরে নামালে যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়। যেমন করে হোক রত্নর সচেতন মনের আড়ালে আভাস পৌঁছেছিল যে শ্রীমতী তার জীবনে আসবে, নিঃসম্পর্কীয়া হয়ে থাকবে না, কিন্তু সচেতন মন এটা জানত না। যুক্তিবাদী মন এটা মানত না।

ইতিমধ্যে বয়সের ভয়টা ভেঙেছে। শ্রীমতীই ছোট। আর শ্রীমতী নয়, গোরী। এই তো এবারেও গোরী বলে নাম সই করেছে। কিন্তু প্যাশনের ভয়? প্রথম ফোটোতে প্যাশনের বিন্দুবিসর্গ ছিল না। দ্বিতীয় ফোটোতে যা আছে তা প্যাশনের নয়, জাদুর সম্মোহন। ওই তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ারের কাঁধে ডান হাতটি রেখে। বাঁ হাত বুকে চেপে। ফুল দিয়ে ফুল ঢেকে। একটি শ্বেতপদ্ম আর সব দৃশ্যমান পুষ্পকে নিষ্প্রভ করেছে। ওটি যেন গোরীর অন্তরের শুভ্রতা। তার জীবনের কুৎসিত অভিজ্ঞতা যেন ওই পদ্মপত্রের জল।

একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ রত্নর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। আছে, প্যাশন আছে। কিন্তু নয়নে নয়, অধরে। আর ওষ্ঠে। রত্ন অবাক হল, শঙ্কিত হল, আরক্ত হল। তাড়াতাড়ি ফোটোখানা বাক্স-বন্দী করে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাণপণে জপ করতে থাকল, মালাদি, মালাদি। এই তার মালা জপ। ধীরে ধীরে তার মানসচক্ষে ফুটে উঠল মালাদির মুখ। সে মুখে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আছে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যভাব। তিনি যেন কোন স্বর্গদূত বা এঞ্জেল। যাঁর দেহ বলতে কিছু নেই। দ্যুতি যেন মূর্তি ধরে নেমে এসেছে ভক্ত উপাসকের ভয় ভঞ্জনের জন্যে। রত্ন নিশ্চিন্ত হল।

॥ এগারো ॥

মালাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষ বার গত বড়দিনের সময় কাশীধামে। রত্ন যাচ্ছিল একটা দলের সঙ্গে আগ্রা দিল্লী লখনউ বেড়াতে। পথে কাশীতে একদিন থামতে হয়েছিল। শুনেছিল মালাদির মা তাকে নিয়ে কাশীবাস করছেন। বাবা কলকাতায়। দলের কাছ থেকে এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে মালাদিকে দেখতে যায় রত্ন। দেখে মালাদি শয্যাশায়ী। তাকে পাশে বসিয়ে গল্প করলেন। সহজে উঠতে দিলেন না। না খাইয়ে ছাড়লেন না। কিন্তু নিজে মুখে দিলেন না কিছু। ডাক্তারের নিষেধ।

প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাশ করে মালাদির মন গেল কলেজে পড়তে। পুরী থেকে তিনি কলকাতা যান, সেখানে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু মাসে দশ দিনের বেশী হাজিরা দিতে পারেন না, শরীরে সয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকলে পিঠ ব্যথা করে, কোমর ব্যথা করে। ঘাড়ে ব্যথা ধরে। কলেজে পড়ার সাধ তাঁকে বিসর্জন দিতে হল। কিন্তু পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেননি। প্রাইভেট ইণ্টারমিডিয়েট দিতে চান। এর জন্যে কলকাতায় না থাকলেও চলে। তীর্থস্থানে থাকলে অন্তরে শান্তি পান। পুরীতে তো অনেক দিন কেটেছে, আর কেন? এবার তাই কাশীতে অবস্থান।

কিন্তু এখানেও শরীর টিকছে না। খোলামেলা জায়গা তো নয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাহলেও শান্তি আছে। বিশ্বনাথের মন্দিরে বা দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলে শান্তিতে মন ভরে যায়। চলে আসতে ইচ্ছে করে না। কাশীতেই থাকতে হবে আরো কিছুকাল, এইখান থেকেই প্রাইভেট পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে হবে। ভালো একজন টিউটর চাই কিন্তু তেমন লোক অনেক দিন সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। যে-ই আসে সে-ই ধরে নেয় যে, মালাদির বুদ্ধি কম, তাঁকে বকাঝকা শুরু করে দেয়। তা তো নয়। অকালবৈধব্যের দুঃসহ আঘাতে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, অতি কষ্টে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরছে। স্মৃতি এখনো দুর্বল। ভালো টিউটর হবে সহানুভূতিশীল, ধৈর্যবান, ধীর। টাকা খরচ করলেই তেমন লোক মেলে না। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়।

মালাদির মনে হচ্ছে তেমন মানুষ একজন আছেন, তিনি পেশাদার টিউটর নন। তাঁর খুশি হলে তিনি পড়িয়ে যান, ইতিমধ্যে দুটি একটি ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছেন, বেতন নেননি। ভদ্রলোক বাংলাদেশে এম. এ পাশ করার পর অন্তরীণ হন বা অন্তরীণ হবার পর এম. এ পাশ করেন। তারপরে দিল্লীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করেন। তারপরে বম্বেতে গিয়ে জ্যোতিষী হন। এইসব করতে করতে তাঁর বয়স হল বত্রিশ কি তেত্রিশ। এর পরে চলে আসেন কাশীতে। এখানে থিওসফি চর্চা করেন। অকৃতদার।

বিনা বেতনের টিউটরকে বাড়িতে আসতে দিতে মালাদির মা সঙ্কোচ বোধ করেন, মালাদিও বুঝতে পারেন কেন এ সঙ্কোচ। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন প্রতিবেশী হিসাবে। বলেন, কাশী কেবল হিন্দুদের নয় বৌদ্ধদেরও পুণ্যক্ষেত্র। সারনাথ কাশীর উপকণ্ঠ। বৌদ্ধ জাতকের অধিকাংশ কাহিনীর কেন্দ্রস্থল বারাণসী। এখানে দুই ধর্মের জলস্রোত মিলেছে। হিন্দু ধর্মের বরুণা ও বৌদ্ধ ধর্মের অসী। থিওসফিস্টরা দুই চোখ মেলে দুই ধর্মের মহত্ত্ব দেখবেন বলে এখানে শাখা স্থাপন করেছেন।

মালাদিকে সেদিন মিসেস ব্রাউনিংয়ের মতো লাগছিল। তেমনি রুগ্‌ণ দুর্বল ক্ষীণকায় অথচ স্বর্গীয় আভায় ভাস্বর। মানুষ তো নয়, দীপশিখা। মোমের মতো শরীর মোমবাতির মতো ক্ষীয়মাণ। কিন্তু আত্মায় এতটুকু দীনতা নেই, গ্লানি নেই। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে নিজেকে পবিত্র মনে হয়। পাগলের মতো আর একটা খেয়াল মাথায় চাপে। ব্রাউনিংয়ের মতো ইচ্ছা করে এই এলিজাবেথ ব্যারেটকে লুট করে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে। তাহলে দুজনেরই পূর্ণ বিকাশ হবে। মালাদিও বাঁচবেন, রত্নও সৃষ্টিতৎপর হবে। কিন্তু এলিজাবেথ রাজী ছিলেন, মালাদি নারাজ। না, তেমন কিছু হবার নয়। অন্তত রত্নর দ্বারা হবে না। হলে হতে পারে ঐ থিওসফিস্টের দ্বারা। রত্ন অনুমান করতে পেরেছিল যে মালাদির হৃদয়ে রঙ ধরেছে, কিন্তু তাঁর সংস্কার তাঁকে তা জানতে দিচ্ছে না। জেনেছেন তাঁর মা। এই কারণে সঙ্কোচ।

রত্ন মালাদিকে উৎসাহ দিল টিউটরের কাছে পড়তে, সম্ভব হলে ঐ ভদ্রলোকের কাছেই। টাকা নেবেন না টিউটর হিসাবে,

কিন্তু এ-দেনা অন্য ভাবেও তো শোধ করা যায়।

"কী ভাবে? কী ভাবে?" মালাদি ব্যগ্র হয়ে শুধালেন।

"ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে।" রত্ন রহস্যময়ভাবে বলল।

"যেমন?"

"যেমন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার খরচা বাবদ। তোমার অসুখ কি হোমিওপ্যাথি না হলে সারবে!"

মালাদি যেন অন্ধকারে আলো পেলেন। সুর নামিয়ে বললেন, "মাকে এখন এ-কথা কে বোঝায়! মা কি বুঝবেন!"

"আচ্ছা, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব। মালাদি, তুমি সেরে ওঠ।"

পাশের ঘরে মাসিমা ছিলেন। রত্ন তাঁকে বোঝাতে গেল। তিনি বললেন, "ও কি বাঁচবে রে! কেন আমাকে স্তোক দিচ্ছিস, রতন!" বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

"ওকে বাঁচাতেই হবে। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে।" রত্ন জোর দিয়ে বলল।

কথাবার্তার মাঝখানে যাঁর কথা হচ্ছিল তিনি এসে পড়লেন। সুগঠিত সবলদেহ টেকো-মাথা হাসিখুশি মানুষটি। প্রথম আলাপেই রত্নর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যেন অনেক দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। রত্নর হাতে সময় ছিল না, তাকে টাঙ্গাওয়ালার ডাক শুনে তর তর করে নেমে যেতে হল।

তারপর থেকে মালাদির আর কোনো খবর নেই। দু তিনখানা চিঠি লিখে জবাব পায়নি বলে আর চিঠি লেখেনি। চৈতীবাবু তাঁর টিউটর হয়েছেন কি না জানে না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কি না জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। বার বার চিঠি লিখতে তার হাত ওঠে না।

তা ছাড়া রত্নর জীবন-পরিকল্পনায় মালাদির স্থান পূর্ববৎ ছিল না। তাঁর সঙ্গ তার ভালো লাগে এখনো। তাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু তাঁকে সারিয়ে তোলার দায় নিতে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিরুচি নেই। সে স্বাধীন বিহঙ্গের মতো দেশে দেশে উড়বে। সামনের দশ বছর এই তার প্ল্যান। মালাদিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গতি তার নেই। অবশ্য তাঁরও অনিচ্ছা। দশ বছর পরে সে হয়তো কোনো এক দুর্গম গ্রামে গিয়ে শিকড় খুঁজবে। সেখানে তার সাথী হবে কোনো এক মাটির মেয়ে। চাষানী কি মেঝেন। নিটোল স্বাস্থ্যবতী, কর্মক্ষম, সন্তানবহনপটু। মালাদি না-মঞ্জুর।

কিন্তু এ হল অনেক দূরের কথা। এই মুহূর্তে মালাদির সঙ্গে সম্পর্ক কাটানোর ভাবনা ভাবতে পারা যায় না। এখনো তিনি তার হৃদয় জুড়ে রয়েছেন। এটা তার সাধনার পক্ষে আবশ্যক। একলব্যের মতো সে একজনকে সম্মুখে রেখে পূজা করতে করতেই প্রেমশিক্ষা করবে। প্রেমিক হবে। শুধু স্বাধীন হয়েই তার তৃপ্তি নেই। সে যুগপৎ স্বাধীন ও প্রেমিক হবে। মালাদি তার প্রেমগুরু।

যারা পূজা করে তারা নিষ্কাম নয়, তারা ফলাকাঙ্ক্ষী। রত্ন কিন্তু মালাদির কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না! দিন দিন তার প্রেম শুদ্ধ হচ্ছে। বাসনা কামনা থেকে শুদ্ধ। সে দিতে চায়, নিতে চায় না। সে শিক্ষা-নবীশ। যারা শিক্ষানবীশ তারা গুরুদক্ষিণা দেয়। পরিবর্তে তাদের কোনোরূপে দক্ষিণা পাবার কথা নয়। তারা যদি কিছু পায় তবে তার নাম দাক্ষিণ্য। মালাদি যদি খুশী হয়ে সঙ্গ দেন তবে রত্ন খুশী হয়ে সঙ্গ পাবে। তাও স্থূল অর্থে নয়। এখনো কেউ কারো গায়ে হাত দেয়নি। সেবাচ্ছলেও না।

শেষবার দেখার পর প্রায় এক বছর হতে চলল। এই এক বছরে রত্ন গভীরভাবে ভেবেছে। মালাদির জীবনে যদি অত বড় একটা ট্র্যাজেডি না ঘটত তাহলে কি রত্ন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত? তাঁকে ভালোবাসত? শোকের আগুন তাঁকে দগ্ধ করেছে, তাঁকে শুদ্ধ করেছে। অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের মতো তিনি সুবর্ণ। নইলে তাঁর মধ্যে এমন কী আছে যা রত্নকে কাছে টানতে পারে! তাঁর পরম সম্বল তাঁর ঐ শোক। শোক যদি তাঁর জীবনে না আসত তাহলে তিনি এমন মহিমময়ী হতেন না। তাঁর আধ্যাত্মিকতা শোকনির্ভর, শোকজ। এর মূল ভিতরে নয়, বাইরে। তবে এ-মূল এত দিনে ভিতরে চলে গেছে। এই কয় বছরে।

সহজাত আধ্যাত্মিকতা নয়, শোকলব্ধ আধ্যাত্মিকতা। প্রভেদটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছিল। তাই প্রেমও ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। যতখানি দেওয়া যেত ততখানি দিতে কুণ্ঠিত। প্রেমের সাধনায় দানকুণ্ঠতা এলে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। রত্ন উপলব্ধি করল, সে মালাদির বেলা দানকুণ্ঠ হতে চলেছে। আগে নিতে চাইত না, কিন্তু দিতে চাইত। এখন নিতেও চায় না, দিতেও চায় না। দেওয়া নেওয়া বাদ দিলে যদি প্রেম থাকে তবে প্রেম আছে। কিন্তু কত কাল থাকবে? এ কি প্রেম? না এ ভক্তি?

প্রেম হোক, ভক্তি হোক, যেটাই হোক, যত স্বল্পকালীন হোক, এখনো এর প্রভাব নিবিড়। দুঃখশোক যার জীবনে আসে তাকে একপ্রকার আকর্ষণশক্তি দেয়। সে-শক্তি অপরকে চুম্বকের মতো টানে। মালাদি রূপবতী নন। কেউ তাঁকে সুন্দরী বলে ভ্রম করবে না। তবে ফরসাকেও তো লোকে সুন্দর বলে। মালাদি ফরসা ও ফ্যাকাশে। তাঁর মুখের গড়নটি হাতির দাঁতের কাজের মতো খোদাই করা। রত্নকে মুগ্ধ করে তাঁর পক্ষ্ম। তাঁর ভ্রূ-লতা। তাঁর ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকার অপার্থিব দ্যুতি। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর শোকস্তব্ধ মহিমা। তাঁর দুঃখদগ্ধ বরন। রামায়ণের সেই ক্রৌঞ্চ-বধূ যেন মানবদেহ নিয়ে এসেছে। দেহ নিয়ে এসেছে, অথচ বিদেহী। মালাদির সঙ্গে থাকলে দেহচেতনা থাকে না।

মোটের উপর এটা একটা মিস্টিক সম্বন্ধ। দুজনের মধ্যে মনের মিল বা মতের মিল নেই। কায়িক আকর্ষণ নেই। জীবনের পথও এক নয়। তা সত্ত্বেও রত্নর হৃদয়ে মালাদির আসন এখনো সুপ্রতিষ্ঠ। রাত্রে শুতে যাবার সময় মালাদিকে মনে পড়বেই। যদিও ক্ষণিকের জন্যে। যেখানেই হোক মালাদি আছেন। তাঁর অস্তিত্ব অদৃশ্য থেকে রশ্মি বিকিরণ করছে। আলো আসছে কালো ভেদ করে। সে আলো আর কারো জন্যে নয়, যে ভালোবাসে তার জন্যে। রত্ন এখনো তাঁকে ভালোবাসে। পূজা করে। কিন্তু ব্রাউনিংয়ের মতো নয়। তার এলিজাবেথ ব্যারেটকে সে কোলে তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালাবে না। এই রোগিণীর সেবা করার মতো ধৈর্য আর দরদ তার নেই। এই শোকাকুলা নারীর ক্রৌঞ্চশোক তাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। চৈতীবাবু বা আর কেউ যদি তাঁর ভার নেন তাহলে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। মিস্টিক সম্বন্ধ থেকে মুক্তি নয়, সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি। দুঃখিনীর দুঃখ দূর করা তার অসাধ্য।

গৌরীর জন্মদিনের সেই নতুন ফোটো-খানা দ্বিতীয়বার খুলে দেখতে সাহস ছিল না রত্নর। প্রভাতকে দেখাবে কী! ফোটোর কথা বিলকুল গোপন করে প্রভাতের ঘরে গিয়ে বলল, "ললিতের বিয়েতে আর সবাই যাচ্ছে। যাচ্ছিনে কেবল তুমি আর আমি। লোকে যদি ঠাওরায় যে আমরা বন্ধু হয়ে বন্ধুর বিয়ে বয়কট করছি তা হলে লোকের দোষ কী!"

প্রভাত ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঘুরে বসল। রত্নর কাছ থেকে শ্রীমতীর বক্তব্য জেনে এক টুকরো কাগজে লিখল, "ভাই ললিত, সমর্থন না থাকার অর্থ আশীর্বাদ না থাকা নয়। রত্নর ও আমার আন্তরিক ইচ্ছা সাবিত্রী ও তুমি চিরসুখী ও চিরায়ু হও।"

পরামর্শ করে তারা দুজনে মিলে এক-জোড়া ইয়ারিং কিনে উপহার পাঠাল বৌভাত উপলক্ষে। সোনার উপর রঙিন পাথর বসানো। সেই সঙ্গে ঐ চিঠিখানা গুঁজে

দিল। রত্নও স্বাক্ষর করল ওতে। প্রভাতের ইঙ্গিতে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে।

রত্নর স্থির বিশ্বাস, প্রেম বিনা হয়তো চিরায়ু হওয়া যায়, কিন্তু চিরসুখী হওয়া যায় না। যেখানে প্রেম নেই সেখানে সত্যি-কারের সুখও থাকে না। থাকে যা তাকে সুখ না বলে সুখাভাস বলা সংগত। যার অন্য নাম সোয়াস্তি।

কিন্তু বিয়ের পরেও তো প্রেম জন্মাতে পারে। না, রত্ন স্বীকার করে না যে জীবন-ব্যাপী একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে সত্যি-কারের অনুরাগ সঞ্চার হতে পারে। বিয়ের পর যা জন্মায় তাকে প্রেমাভাস বলা ভালো। যার অন্য নাম মায়ামমতা।

যা বিশ্বাস করে না, যা স্বীকার করে না, অপরের জবানিতে তাই লিখতে হল তাকে। কিন্তু না লিখলে উল্টো বিপত্তি হত। ললিত মনে করত রত্ন তার সুখ চায় না, যদিও আর সকলে চায়। বন্ধুপত্নী সাবিত্রীও পরে ভুল বুঝত। অন্যে পরে কা কথা! শ্রীমতী স্বয়ং রাগ করত।

অবশেষে এল তার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র। ছোট্ট এক রত্তি কাগজে পেনসিলের আঁচড়। বিয়েবাড়ির গোলমালের মধ্যে লেখা।

প্রিয়তম রত্ন,

মনে বড় অভিমান ছিল তুমি এলে না। তার বদলে এল তোমার রাশীকৃত আদর। এসব বই পড়ে বুঝতে পারি এত বিদ্যে কি আমার আছে! বুঝে নিতে হলে তোমার কাছেই বুঝে নেব। আর কারো কাছে নয়। কে জানে কবে তেমন সুদিন হবে। সবই মাধবের ইচ্ছা। একটা কথা আমি খুব মানি। যে যার সে তার। নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার।

আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।
ইতি—তোমার আদরিণী গোরী।

খামের ভিতরে একমুঠো গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিল। রত্ন সযত্নে তুলে রাখল একটি কাচের পাত্রে। তাতে জল ভরে দিল। জলের উপর ভাসতে লাগল পাপড়িগুলি। একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ভরতে লাগল ঘর। বই হাতে করে বসে উপভোগ করতে লাগল রত্ন। মোগল উদ্যানে অধ্যয়ননিরত হুমায়ুন বাদশার মতো।

চিঠিখানিও সুগন্ধ হয়েছিল। অন্তরে বাইরে সুগন্ধ। এতটুকু চিঠি, কিন্তু এত সুগন্ধ! এত সুগন্ধ নিয়ে কী করবে রত্ন! কোথায় রাখবে! একে তো পাত্রে ভরে রাখা যায় না। এ যে ঘর ভরবে। বাক্সয় বন্ধ করে রাখলেও কি এ বন্দী থাকবে! রত্ন নিরুপায় হয়ে বুকে চেপে ধরল ও চিঠি। কেউ দেখে ফেললে কী মনে করত!

এ কী লিখেছে গোরী! এ যে ভয়ঙ্কর

যাঁর কথা হচ্ছিল তিনি এসে পড়লেন

কথা! এমন কথা তো রাজপুত রানী লেখেননি মোগল বাদশাকে। রাখীবন্ধ বহিন হলে লিখত না রাখীবন্ধ ভাইকে। "যে যার সে তার।" এর মানে কী? "নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার।" এর অর্থ?

রত্নর বুক দুলছিল ঝোড়ো হাওয়ায় খেয়া নৌকার মতো। মন-মাঝি বলছিল, সামাল সামাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছিল। শোঁ শোঁ করছিল বাতাস। চিঠিখানি বুকে চেপে ধরার পরিণাম এই। বুক থেকে কলিজার মতো ছিঁড়ে বাক্সয় বন্ধ করেও কি পরিত্রাণ আছে! বুক তেমনি তোলপাড় হতে থাকল।

মৃগনাভি বুকে নিয়ে মৃগ যেমন অন্ধ হয়ে গন্ধ খুঁজে বেড়ায় রত্নও তেমনি দিশাহারা হয়ে দিন কাটায়। গোরী যা লিখেছে তার মানে কী? তার অর্থ? সহজ বুদ্ধিতে তো বোঝা যায় গোরী রত্নর, রত্ন গোরীর, নইলে রত্নর পাশে দাঁড়ানোর অধিকার থাকে না গোরীর। কিন্তু সহজবুদ্ধি এখানে পরাস্ত। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। গোরী জানে। রত্ন জানে না।

তা হলে কি সে চিঠি লিখে জানতে চাইবে কী ব্যাখ্যা? না, না। তার লজ্জা করে। সব চেয়ে ভালো ও কথা ভুলে যাওয়া। ও কথা কেউ লেখেনি, ওটা না লেখারই সামিল। যদি লিখেও থাকে তবু বিশেষ কিছু মনে করে লেখেনি। লিখতে লিখতে মানুষ কত কী লেখে! বলতে বলতে কত কী বলে! সব কথা ধরতে নেই।

রত্ন ক্রমে শান্ত হল। গোরী একটি খেয়ালী মেয়ে। যখন যা খেয়াল হয় তখন তা বলে বসে। না ভেবে না চিন্তে। বিয়েবাড়ির হট্টগোলে ওর মাথার ঠিক নেই। হঠাৎ এক রাশ বই পেয়ে যা মাথায় এসেছে তাই লিখে ফেলেছে, হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে। হলুদ লেগে আছে চিরকুটখানায়।

রত্ন ও-চিঠির উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতো কিছু ছিলও না। গোলাপের সেই পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেলে সেগুলোকে খামে পুরে বাক্সয় তুলে রাখল।

রত্ন ভেবেছিল বিয়ের গোলমাল মিটলে গোরী আবার চিঠি লিখবে, কিন্তু ললিতের বিয়ের পর প্রথম চিঠি যার কাছ থেকে এল

সে গোরী নয়, কানন। সে লিখেছিল আলাদা একটা ঘরে সাত ভাই চম্পার ও শ্রীমতীর মণ্ডলীর সভ্যদের আহারের আয়োজন হয়েছিল। নাম জানাজানির পর আলাপ আলোচনা চলে। শ্রীমতী বসেছিল পর্দার আড়ালে। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছিল কে কী খাচ্ছে না, ফেলে রাখছে। কে কী খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে, সঙ্কোচে আরেকটুখানি চেয়ে নিতে পারছে না। জ্যোতিদাকে ডেকে বলছিল, "নবনীবাবু পোলাও মুখে দিচ্ছেন না কেন।" পরিবেশককে নির্দেশ করছিল, "হৈমবাবুর পাতে মালপোয়া দাও।" সকলের হাত ধোওয়া হয়ে গেলে পরে সোনার তবক মোড়া পান দিতে ঘরে ঢুকল শ্রীমতী নিজে। সে-সময় প্রত্যেকের সঙ্গে দুটি একটি কথা হল। কাননকে নবনীকে হৈমকে বলল আবার বড়দিনের ছুটিতে আসতে। শান্তিনিকেতনের বৈঠকের কথা শুনে বলল, "রবিবাবু তো দক্ষিণ আমেরিকায়। শান্তিনিকেতনে কেন?"

কাননের চিঠিতে শ্রীমতীর একটা উচ্ছ্বাস-ভরা বর্ণনা ছিল। সেই সঙ্গে তার স্বামী যশোমাধববাবুরও। সত্যিকারের অভিজাত ভদ্রলোক। বিলেতফেরত ও প্রগতিশীল। কাননদের সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে গোলাপ কুঁড়ির বোকে স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন বোতামের গর্তে। সিগার অফার করলেন। ড্রিঙ্ক অফার করলেন। যশোবাবুর পিতা ফৌজদার মশাই কন্যা সম্প্রদানে নিযুক্ত। জ্যোতিদার পিতা মুস্তফী মশাই সব দেখাশুনা করছিলেন। ইনি ছোট তরফের ম্যানেজার। সত্তর বছর বয়স, কিন্তু একটিও চুল পাকেনি, একটিও দাঁত পড়েনি, কেবল গোঁফ জোড়াটি পাকা। শোনা যায় ইনি বীরাচারী তান্ত্রিক। যশোবাবু পর্যন্ত এঁকে ডরান। হাঁকডাক নেই, নীরব প্রকৃতির লোক, কিন্তু যাঁর দিকে তাকান সে-ই তটস্থ হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

অথচ সাহেবসুবোর কাছে ল্যাজ নাড়তেও ইনি অদ্বিতীয়। রাধামাধববাবুর অভিমানে বাধে। যশোমাধব তো রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন। ইনি না হলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে "মি লর্ড" ও পুলিশ সাহেবকে "ইওর অনার" বলবে কে! সাহেবরা যেখানে বসে ধূমপান ও সুরাপান করছিলেন কানন তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় রাজ-প্রতিনিধিকে ইনি "ইওর ডটার" সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন। শুনে মনে হল কন্যারত্ন কাছে কোথাও সমুপস্থিত। পরে বোঝা গেল "ইওর ডটার" আর কেউ নয়, শ্রীমতী। কী করে বোঝা গেল? যশোবাবুকে পাকড়াও করে এনে সাহেবলোকের টেবিলে বসিয়ে দেবার সময় মুস্তফী মশাই বললেন, "মি লর্ড, ইওর সান-ইন-ল।"

কানন ছেলেটি বরাবর সেণ্টিমেণ্টাল। গদগদ হয়ে লিখেছে, "ভাই রত্ন, এতদিন আমাদের সাত ভাই চম্পা ছিল, কিন্তু পারুল বোন ছিল না। সেইজন্যে সাতটি ফুল সাতটা দিকে ভেসে যাচ্ছিল। সাত ভাই চম্পার কেন্দ্র ছিল না। এতদিন পরে আমাদের পারুল বোন এসেছে। সেই আমাদের একসূত্রে গাঁথবে। পারুল বোন থাকতে ছিটকে পড়ার হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। সাত ভাই চম্পার সংকট কেটে গেছে। রাজশাহীতে কোনো নিষ্পত্তি হতে পারল না বলে শান্তিনিকেতনে মেলার সময় মেলার কথা ছিল। এখন তো আপনা হতেই একটা নিষ্পত্তি মিলে গেল। আর তবে শান্তিনিকেতন যাওয়া কেন? বেগমপুরই এখন সাত ভাই চম্পার কেন্দ্রস্থলী।"

রত্ন চিন্তা করে দেখল সাত ভাই চম্পার আদর্শগত বাঁধুনি কবে আলগা হয়ে গেছে। ভিতর থেকে তাদের ঐক্য দিতে পারে তেমন কোনো মূলনীতি নেই। বাইরে থেকে যদি একত্র করতে হয় তা হলে পারুল বোন বলে একজনকে আবিষ্কার করতে হবে। তারপর পারুল বোনের উপর সে-ভার দিতে হবে। পারুল যেখানে যেতে বলবে সেখানে যেতে হবে। সে যদি বলে বেগমপুর তবে বেগমপুর। যদি বলে কলকাতা তবে কলকাতা। কেন্দ্র এখানে স্থানমাহাত্ম্যের দ্বারা নির্ধারিত নয়, সাতজনের সুবিধার দ্বারা নির্বাচিত নয়। পারুল বোনের মনোনয়নের দ্বারা স্থিরীকৃত।

কাননকে রত্ন জানতে দিল না শ্রীমতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় এসে ঠেকেছে। শুধু বলল শ্রীমতী যদি পারুল বোন হয়ে সাত ভাইকে একত্র করতে রাজী হয় তা হলে সে সুখী হবে। নীতির বদলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করা প্রাণশক্তির পরিচায়ক নয়। সাত ভাই চম্পা ঝরে যাবেই। কিন্তু সামনের বড়-দিনের সময় ঝরে না গিয়ে আরো কয়েক বছর পরে ঝরবে। যথালাভ। সাত ভাই চম্পার গোষ্ঠীগত জীবনে পারুল বোনের আবির্ভাব আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

কিন্তু বেগমপুরে যাবে কি না এ-বিষয়ে কথা দিল না রত্ন। শান্তিনিকেতনের প্রস্তাব এসেছিল আসলে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। বিদ্যাপতি, অঞ্জন এরা পুজোর বন্ধে দার্জিলিং যাবার সিদ্ধান্ত যখন নেয় তখন বড়দিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে যাবে বলে রত্নকে জানায়। সেইজন্যে রাজ-শাহীর বৈঠকে সাত ভাই চম্পার কাছে শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ তুলেছিল রত্ন। সম্মতি পেয়েছিল সকলের। শান্তিনিকেতন যাওয়া হয়তো সাত ভাই চম্পার পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, বেগমপুর হয়তো আরো আবশ্যক। কিন্তু সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে শান্তিনিকেতন যাত্রাই রত্নর পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

এ-কথা শুনলে কানন অভিমান করবে, নবনী, হৈম, ললিত এরাও। রত্নর যে আরো একটা মণ্ডলী আছে শ্রীমতী এখনো জানে না। জানলে তারও অভিমান জন্মাবে। গায়ে পড়ে জানাবার দরকারও নেই এখন। কথাটা অন্য ভাবেও বলা যায়। শান্তি-নিকেতন বেগমপুরের মতো দূরে নয়, পরীক্ষার আগে দু'তিন দিনের বেশী সময়ও দেওয়া যায় না।

॥ বারো ॥

দিন কয়েক পরে গোরীর চিঠি এল। সেও ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। তার পরে আক্ষেপ করেছিল যে, কিছুই তার মনের মতো হল না। তার মন ভয়ানক খারাপ। শরীরও শ্রান্ত। আর বইতে পারছে না। এখন বোধ হচ্ছে এ বিয়ে না দিলেই ভালো হত।

কাউকে বলিনি, তোমাকেও না। নিজের কাছেও নিজের মনের কথা গোপন রেখেছি। এ-কথা এত গোপনীয় যে লিখতে [illegible] উঠছে না, রাজ্যের লজ্জা এসে হাত চেপে ধরছে। তুমি ভাববে, গোরীটা কী নির্লজ্জ! কিন্তু আজ আমাকে লিখতেই হবে। লিখলেই মন খারাপি দূর হবে।

ললিতের বিয়ের জন্যে এত যে খেপেছিলুম এর অন্যান্য কারণ থাকলেও এইটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় কারণ যে ললিতের বিয়েতে তার বন্ধুরাও আসবে ও তাদের মধ্যে তুমিও থাকবে। আমি কল্পনাই করিনি যে তোমার পরীক্ষার পড়া আছে ও সেই অজুহাতে তুমি অনুপস্থিত থাকবে। না, ভাবতেই পারিনি যে তুমি সমর্থন করবে না, সেটাও তোমার না আসার কৈফিয়ত হবে।

বরযাত্রীরা যখন এল তখনো আমার মন বলছিল তুমি এসেছ, শেষ মুহূর্তে মত বদলেছ। কোন জন তুমি তাও আন্দাজে ঠিক করেছিলুম। রেগে উঠছিলুম একটু বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে! জ্যোতিদাকে সাধলুম, যাও না, দেখে এসো রত্ন এসেছে কি না। এসে থাকলে ওকে বোলো আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। আমার দূত গিয়ে ওকে ডেকে আনবে। তুমিই হবে আমার দূত।

কী দুঃখ! কী লজ্জা! ও রত্ন নয়। রত্ন আসেনি। উৎসবের সব আলো আমার চোখে নিবে গেল। অর্থহীন উৎসব। সাবুর বর

এল, আমার বর এল না। আমি কেন আনন্দ করব!

নেহাত ওরা তোমার বন্ধু, ওদের আপ্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হলে তুমি ব্যথা পাবে, সেইজন্যে তোমার বন্ধুদের ডাকিয়ে আলাদা একখানা ঘরে বসিয়ে খাওয়ালুম, আমার বন্ধুরাও বসল একসঙ্গে খেতে। পরে এক সময় ওদের সঙ্গে আলাপ হল অল্পক্ষণের জন্যে। খাসা লাগল কাননকে হৈমকে নবনীকে। গিরীন ছিল না। ওদের বলেছি বড়দিনের ছুটিতে বেগমপুরে আসতে। শান্তিনিকেতনে কে আছে যে যাবে! কবি তো দক্ষিণ আমেরিকায়।

এবার তোমার কোনো অজুহাত খাটবে না। শান্তিনিকেতনে গেলে পরীক্ষার ক্ষতি হবে না, বেগমপুরে এলে ক্ষতি হবে, এ যুক্তি অচল।

আরো অনেক কথা লেখার পর গৌরী শেষ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে লিখেছিল এমন একটি কথা যা কাউকে বলবার নয়, যা রত্নকেই বলছে বিশ্বাস করে, রত্ন যেন বিশ্বাস রাখে।

সাধু শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে। আমার ভাবনা ও ভয় ছিল যে ওর ফুলশয্যার অভিজ্ঞতাও আমারই মতো গ্লানিকর ও বেদনাময় হবে। নর মাত্রেই নরপশু। ব্যতিক্রমে হয়তো একজন কি দুজন। ললিত যদি ব্যতিক্রম না হয়, সাধু কি আমাকে ক্ষমা করবে! আমি কি আমার মাকে ক্ষমা করেছি! বলতে গেলে আমিই ও বেচারিকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিলুম।

এখন আমি হেসে গড়িয়ে পড়ছি। হাসতে হাসতে মারা যাব। বাঘ বলে যাকে মনে হয়েছিল সেটা একটা ভেড়া। রাতের পর রাত কাটল, সাহস তার কোনো দিন হল না। সাধু অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এ নিয়ে বেচারি শরমে সঙ্কোচে অর্ধমৃত। মেয়ে-মহলে যেই শোনে সেই দুকথা শুনিয়ে দেয়। হাসি ঠাট্টা তবু সহ্য হয়, কিন্তু মানুষের মুখে মৌমাছির মতো হুল আছে যে! মেয়েমানুষের মুখে বিশেষ করে।

এখন ললিতকে কানে কানে কে এ-কথা বলবে? তুমি? না তোমার কোনো বন্ধু? তোমার সঙ্গে ওর কবে দেখা হবে জানিনে। দেখা হলে বোলো। কিন্তু শতং বদ, মা লিখ। নবনী বা হৈম বা কানন বা প্রভাত কেউ যেন টের পায় না। গিরীনকে আমি ধরিনে। ও বোধ হয় কোনো দেবতা। সেবাধর্ম নিয়ে আছে।

সত্যি এক দিকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আরেক দিক দিয়ে চিন্তিত। ললিত যদি এ বৌ নিয়ে ঘর না করে লোকে আমাকেই দুষবে। বিয়েটা তো আমারই দেওয়া। না দিলেই ভালো হত। এ পাগলামি কেন করতে গেলুম? নিজে জ্বলছি বলে কি সবাইকে জ্বালাতে হবে? তাতে কি নিজের জ্বালা কিছু কমবে? সাধুর দিকে তাকালে ভারী একটা মমতা জাগে। ওর দাদার উপর আমার রাগ আছে, তার জন্যে কি ও দায়ী!

আমার মনে হয়, ললিতের এটা সাময়িক বৈরাগ্য। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার ভাবি, আমার মা বাবাও তো ঠিক এই রকম ধরে নিয়েছিলেন যে, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার ওটা সাময়িক বিরাগ। কই সব ঠিক হয়ে তো গেল না। বিরাগ বলো, বৈরাগ্য বলো, আমার বেলা এটা সাময়িক নয়, এটা চূড়ান্ত। ললিতের বেলা যদি তাই হয়? বেচারি সাধু!

যাক, এ-সমস্যা আমারই সৃষ্টি। তোমাকে সমাধান করতে বলব না। তোমার পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষায় তোমার মান থাকলে আমারও মান থাকে। বলতে গেলে আমারও পরীক্ষা। তোমার মান গেলে আমাকেও হতমান হতে হবে। তোমার জন্যে আমি কত জনের কাছে কত না বড়াই করেছি। তারা হাসাহাসি করেছে, আমি রাগারাগি করেছি। তাদেরই জিত হবে, যদি তুমি পরীক্ষায় খারাপ কর। সেইজন্যে আমি আবদার ধরব না যে তোমাকে বড়দিনের সময় কাননদের সঙ্গে আসতেই হবে, রত্ন।

তা বলে তোমাকে চোখে না দেখে আমি

কত কাল প্রাণ ধরব, প্রিয়তম। তুমি আছ, আমি আছি, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। এ কী অভিশাপ? কে এমন অভিশাপ দিল! পূর্বজন্মে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলুম। বোধ হয় ইন্দ্রসভায়। শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে এসেছি। কেউ কারো দেখা পাচ্ছিনে। এমনি করেই কি জীবনটা কেটে যাবে? বিশ বছর গেল, আর ক'টা দিনের জীবন। যখনি ভাবি যে, দেখা হয়তো এ জীবনে হবে না, চার চোখ এক হবে না, তখনি অসহায়ের মতো মুষড়ে পড়ি। মনে হয়, আর বেশী দিন বাঁচব না। আমাদের মিলন এ-লোকে নয়।

পাখি হলে উড়ে গিয়ে এই রাত্রেই দেখে আসতুম তোমাকে। কিন্তু পাখি হলেও তো খাঁচার পাখি হতুম। তোমার মতো বনের পাখি তো নয়। এক দিন না এক দিন তোমাকেই আসতে হবে খাঁচার পাখির কাছে। সে-দিন কত দূরে কে বলতে পারে! আর এক দণ্ডও মন টিকছে না এখানে। তোমার কি একটুও সাধ যায় না আমাকে দেখতে! আমি কি এতই কুৎসিত! কই আমার জন্মদিনের ফোটো পেয়ে কেমন লাগল লিখলে না কেন? অবশ্য তার জন্যে আমি কিছু মনে করিনি। জানি ও ফোটো ভালো ওঠেনি। যা তা হয়েছে। খরচ করে তো সদর থেকে ফোটোগ্রাফার আনাবে না। গাঁয়ের এক ছোকরাকে দিয়ে তোলানো হয়েছে। এর নাম স্বদেশী ব্রত। কলকাতা গেলে এবার সাহেববাড়ি গিয়ে ফোটো তোলাব ও তোমাকে পাঠাব। যার কর্ম তারে সাজে। সাহেবরা জানে কেমন করে ফোটো তুললে দোষ ঢাকা পড়ে, গুণ প্রকাশ পায়। তবে টাকাটা বিদেশে চালান যায়। সেটা কিন্তু আফসোসের বিষয়। শাসনও করবে, আবার শোষণও করবে!

এরপর গোরী তার স্বভাবমতো রাজনীতি চর্চা করেছিল। রত্ন ওখানটা চোখ বুলিয়ে গেল। অশেষ ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি ইতি করা হয়েছে। ইতির পরে লিখেছে, "তোমার অভিমানিনী গোরী।"

রত্ন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার বুকের স্পন্দন থেমে এল। এ কি সত্য! এ কি কখনো সম্ভব যে, একটি মেয়ে তাকে ভালোবেসেছে! তাকে! যাকে কোনো মেয়েই কোনো দিন ভালোবাসল না! মালাদিও না। ছেলেবেলায় তার খেলার সাথীদের কেউ কেউ তাকে বর বলে বরণ করেছিল—সে তো নারীর প্রেম নয়, শিশুর কল্পনা। স্নেহ-প্রীতি অবশ্য অঝোর ধারায় পেয়েছে। সে তো প্রেম নয়।

নারীর প্রেম এল তার জীবনে। একটি মেয়ে মুখ ফুটে বলল "আমার বর।" এ মেয়ে ছেলেবেলার খেলার সাথী নয়। যৌবনেই এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সব প্রেমেই তো ভগবানের দান। এ-প্রেমও তাই। তিনি নারীরূপে গোরী হয়ে ভালোবেসেছেন। তাঁর ভালোবাসা মাথায় করে নিতে হয়। রত্ন মাথা পেতে নিল। দুই হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়াল। মাথা নোয়াল।

কিন্তু গোরীর প্রেমের প্রতিদান দেবে কী করে! সে যে মালাদিকে ভালোবেসেছে। সে-ভালোবাসা এখনো অনির্বাণ। তার সাধ্য নেই যে সে একই সময়ে দুটি নারীকে ভালোবাসে। মানুষের হৃদয়ে একাধিকের স্থান নেই, থাকলে তার মধ্যে বড় ছোট আছে। মালাদিকে ছোট করা যায় না, বাদ দেওয়া তো যায়ই না।

গোরীর জন্যে রত্নর মন কেমন করতে লাগল। চিরদুঃখিনী আবার দুঃখ পাবে, যখন শুনবে যে রত্নর প্রেম অন্যত্র ন্যস্ত। তারা দুজনে শাপভ্রষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, হলে হয়তো এক দিন মিলত, এ-লোকে না হোক লোকান্তরে। মিলনের আশা কোথায় যে আশায় আশায় থাকবে! তারা কেন তা হলে দেখা করবে। কিসের মোহে করবে! গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হওয়া শ্রেয় নয় কি?

এ কী জটিলতা! গোরী ভালোবাসে রত্নকে, রত্ন ভালোবাসে মালাদিকে, মালাদি ভালোবাসেন তাঁর স্বর্গীয় স্বামীকে। রত্নকে তো নয়। এ জটিল গ্রন্থি মোচন করবে কে? শাপমোচনের চেয়েও এটা শক্ত। হৃদয়কে যদি বাধ্য করতে পারা যেত তা হলে হয়তো একটা উপায় ছিল। হৃদয়কে হুকুম দিত মালাদিকে ছেড়ে গোরীকে ভালোবাসতে। তা তো হয় না।

রত্নর হল হরিষে বিষাদ। নারীর প্রেম এল জীবনে, অন্তরে প্রচ্ছন্ন উল্লাস ও গর্ব। যে সে নারী নয়, শ্রীমতী। নারীশিরোমণি। কিন্তু প্রেমের প্রতিদান দিতে পারছে না সে। দিতে গেলে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। ছলনা সে করবে না, যা থাক কপালে। শ্রীমতী হয়তো দুঃখ পাবে। দুঃখ পেয়ে ফিরিয়ে নেবে প্রেম। তবু সেও ভালো, ছলনা ভালো নয়। রত্ন মিথ্যাচারী হবে না।

বিচিত্র মানুষের মন। গোরী যে বিবাহিতা বা গোরীর যে প্যাশন আছে, এসব গণনা কোথায় ধোঁয়া হয়ে গেল। একবারও ভাবনার কারণ হল না। মালাদির প্রতি প্রেম যদি তার হৃদয় জুড়ে না থাকত তা হলে সে সানন্দে গোরীর ভালোবাসার উত্তরে গোরীকে ভালোবাসা দিত। গোরীর জন্যে তার দুঃখ হয়। নিজের জন্যেও। তার মতো হতভাগ্য কে আছে। নারীর প্রেম অবশেষে এল তার জীবনে, কিন্তু সে তার প্রতিদান দিতে পারল না। বিশ বছর যার জন্যে অপেক্ষা সে এল, কিন্তু বৃথা এল। হায়, এল যদি তো বছর দুই আগে এল না কেন! এখন যে হৃদয় খালি নেই। হৃদয় কি চাইবামাত্র খালি হয়! অপেক্ষা করতে হবে যত দিন না আপনি খালি হয়েছে।

রত্ন গোরীকে চিঠি লিখল। তিনখানা চিঠির একখানা জবাব। অন্যান্য কথার পর ধীরে ধীরে এল আসল কথায়।

যে পুরুষ বিশ বছর হল পৃথিবীতে এসেছে, কখনো কোনো পৃথিবীর মেয়ের মুখে "প্রিয়" সম্বোধন শোনেনি, যে কেবল ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পায়নি, তাকে তুমি কোনখান থেকে এসে "প্রিয়তম" বলে ডাকলে। বাউলের করোয়াতে চাল বা পয়সা না দিয়ে মোহর ফেলে দিলে। মোহর না মানিক!

গোরী, আমি ধন্য। আমার মতো ধনী কে! তুমি যদি যে-কোনো একটি মেয়ে হতে তা হলেও আমি ধন্য হতুম। ধনী হতুম। কিন্তু তুমি যে-কোনো নও। তুমি অনন্যা। তুমি নারীকুলের রানী। তোমার তুলনা নেই। তুমি নারীদের মধ্যে নারী। রাধার পর তোমার মতো মেয়ে ভারতের মাটিতে জন্মায়নি। অন্তত আমার তো জানা নেই। দেবী দেখতে দেখতে আমার চোখে অরুচি ধরেছে। এই প্রথম একটি মেয়ে দেখছি যে দেবী নয়। যে সামান্য মানবী নয়। যে রাধা।

এর পর যা বলব তা কি তুমি সইতে পারবে? যদি না বলি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ হবে। তুমি আমার মুঠোয় মোহর ভরে দিলে—মোহর না মানিক? তোমার মতো দাতার সঙ্গে যদি আমি ছলনা করি, তবে আমার মতো অকৃতজ্ঞ কে! গোরী আমি যদি প্রতিদান দিতে না পারি, তার কারণ আমি স্বাধীন নই। "স্বাধীন নই" এ-কথা কবুল করতে আমার মনে লাগছে, কেননা আমার তো ধারণা ছিল আমি স্বাধীন। আমার সাধনা ছিল তাই। প্রভাত একবার বলেছিল, "যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়, তার মতো পরাধীন আর নেই।" তখন আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা অযথা নয়।

অনুমান করতে পেরেছ বোধ হয় যে, আমার হৃদয় দেওয়া হয়ে গেছে। যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি কিন্তু জানেন না যে আমি তাঁকে ভালোবাসি। দু' বছর কেটে

গেল। তবু তিনি অসাড়। অবশ্য জানলেও সাড়া দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর মৃত স্বামীর অনুচিন্তায় বিভোর। আমি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে অনিচ্ছুক। কীই বা আছে আমার যা দিয়ে আমি তাঁর স্বামীর অভাব পূরণ করতে পারি! তার পর আমি তো চলার পথে। আমার পথের সাথী হতে আমি তাঁকে ডাকব না। এ-পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। তাঁর কষ্ট হবে। তা ছাড়া তিনি সাধারণত অসুস্থ। আমি যদি সেবায় রত থাকি আমার পথ চলা হয় না।

তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে দেবতার মতো পূজো করি। তিনি যদি কোনো দিন সাড়া দেন আমার সব পরিকল্পনা বদলে যাবে। আশা আমার দিন দিন কমে আসছে। নেই লেও চলে। তবু আমাকে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে। এ আমার অন্তরের নির্দেশ। কী করি, বল! আমি যে পরাধীন। আমার প্রেম আমাকে যেমন পরাধীন করেছে তোমার বিয়েও তোমাকে তেমন পরাধীন করেনি। বিয়ে তো জোর করে দেওয়া হয়েছে, মন তা মেনে নেয়নি। তুমি আমার চেয়েও স্বাধীন। প্রেমে পড়ার মৌলিক স্বাধীনতা মন্ত্র পড়ে কেড়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা থাকে না, যত দিন না হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। হয়তো একদিন আমার হৃদয় মালাদির পায়ে বাঁধা থাকবে না। বন্ধনমুক্ত হবে। সেদিন আমি নতুন করে প্রেমে পড়তে পারব।

কিন্তু সেদিন কবে তার কোনো ধারণা নেই আমার। তোমাকে তত দিন বসিয়ে রাখব না। অনির্দিষ্ট কাল অনিশ্চিতের আশায় কেনই বা তুমি বসে থাকবে পথিক মানুষের দ্বারে, ফকির মানুষের দ্বারে! তোমার মতো রানীর কি তা শোভা পায়! তোমার দাক্ষিণ্য পেলে কত পুরুষ প্রেমে পড়বে, কত পতঙ্গ আগুনে পুড়বে। তোমার কি ভক্তের অকুলান! গোরী, তুমি আর আমি শাপভ্রষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকা হলে আমাদের জীবনের গতি অন্য রকম হত তোমারও বিয়ে হত না, আমারও স্বাধীনতা থাকত। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে ভাবতে, কিন্তু এ-দুঃখ ভগবানের দেওয়া। এ আমাদের নিয়তি। আমার অন্তরের ইচ্ছা এই যে তুমি আমার মতো অক্ষমের প্রেমে না পড়ে কাননের মতো একজনের প্রেমে পড়। তা হলেই আমি সুখী হব।

আমি তোমার রাখীবন্ধ ভাই। তুমি আমার রাখীবন্ধ বহিন। এই সম্পর্ক বহাল থাক। আর কোনো সম্পর্কে কাজ কী!

এর পর গোরীর নতুন ফোটোর প্রসঙ্গ ও রূপের প্রশংসা। রূপ কখনো একই রকম থাকে না। দিনে দিনে বদলায়। কৈশোরের গোরী আর যৌবনের গোরী একই মানুষ হলেও রূপ তাদের একই রূপ নয়। জ্যোৎস্নার কমনীয়তা থেকে উষার রমণীয়তা পরিবর্তন-সূত্রে এসেছে। সেও যেমন সুন্দর ছিল এও তেমনি সুন্দর। সৌন্দর্যের কমতি কোথায় যে ফোটোগ্রাফার দোষী হবে! তবে এ-কথাও ঠিক যে এখনকার এই সৌন্দর্য রত্নর রক্ত-মাংসে ভয় জাগিয়ে দেয়। সে তাকাতে পারে না, দু' হাতে চোখ ঢাকে। এমনিতেই সে মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। যে-ভয় তার সত্তায় সে কি ফোটোকেও নিরাপদ জ্ঞান করে! বিশেষ করে গোরীর বেলা সে চিত্রার্পিতকেও প্রত্যক্ষের মতো ডরায়।

গোরী, আমাকে তুমি বেগমপুর গিয়ে তোমার সম্মুখীন হতে বোলো না। না, না, না। প্রথম ফোটো পেয়ে যেটুকু সাহস বোধ করছিলুম দ্বিতীয় ফোটো পেয়ে সেটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। আমার বীরত্ব যা-কিছু তা কাগজে কলমে। আসলে আমি ভীরু। আমার রক্তে মাংসে ভয়। তোমাকে দেখলেই আমি এমন দৌড় দেব যে তুমি অবাক হয়ে ভাববে, লোকটা কি পাগল! না খ্যাপা!

পর্দা-প্রথার বিরুদ্ধে এত যে লড়লুম সে শুধু একটা মূলনীতির জন্যে। পর্দার বাইরে যারা এসেছে তাদের স্বাধীনতা আমাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু রূপ তাদের কেমন তা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলব আমি তো মুখ তুলে চেয়ে দেখিনি। দেবর লক্ষ্মণের মতো আমি তাদের পাদ-বন্দনা করেছি। আমি যে সার্বজনীন দেবর। বেগমপুরে গেলে আমি তোমার চরণ ধ্যান করব, এই যদি তোমার মনের বাসনা হয় তবে বল, আমি অকুতোভয় হব। তা হলে কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাকে দেবর সম্বন্ধ পাতাতে হয়, গোরী।

আমি বলি তুমি কাননদের ডাকো, তাদের নিয়ে বৈঠক কর। কানন চায় তোমাকে সাত ভাই চম্পার পারুল বোন করতে। তা হলে তুমি আমাদেরই একজন হও/ আমরাও তোমাকে পেয়ে একটা কেন্দ্র পাই। কেন্দ্র থাকলে একদিন আমিও গিয়ে জুটব। তবে এত শিগগির নয়। আগে আমার ভয় ভেঙে যাক। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শঙ্কাহীন হোক। তার পর আমাদের দেখা হবে যেখানে তুমি বলবে। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছিনে তুমি আমাকে কী ভাবে নেবে। শেষের চিঠিতে যা লিখেছ তা পড়ে আমার প্রাণ উড়ে গেছে। "বর!" পরিহাস নয় তো! "দেবর" লিখতে গিয়ে "দে" পড়ে যায়নি তো!

জানি, তুমি দুঃখ পাবে, তবু তোমাকে সব কথা খুলে বলাই ভালো। এর ফলে তোমার আমার সম্বন্ধ পায়ের তলার মাটির মতো স্থির হবে। প্রেমের চেয়ে স্নেহ প্রীতি বন্ধুতা কোনোটাই ছোট নয়। সত্যিকার ভাইও সত্যিকার প্রেমিকের মতো বড়। সাত ভাই চম্পা যদি হয় তোমার সত্যিকারের সাত ভাই তবে তুমি নির্ভর করবার মতো সাত সাতটি আত্মীয় পাবে। তোমার ওই স্বজনপরিত্যক্ত অসহায় ভাবটা কেটে যাবে। তোমার স্বাধীনতা অনায়াসসাধ্য হবে। গোরী, ভুলে যেয়ো না যে তোমার পক্ষে স্বাধীনতাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন। প্রেম তার পরের কথা। এত দিন আমি তাই জানতুম। এখন লক্ষ করছি তুমি পরের কথাটাকে আগে টেনে আনছ। তাতে তোমার দুঃখ কেবল বাড়বে।

এর পর রত্ন ললিতের প্রসঙ্গে এল। ললিতকে তার বিবাহিত জীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নিয়ে কিছু বলা যেমন অশোভন তেমনি অসমীচীন। অনধিকার চর্চার পরিণাম মিত্রভেদ। ললিতের বিবাহ সমর্থন করেনি বলে একেই তো মনোমালিন্যের কারণ রয়েছে। তার উপর আর অপরাধ চাপালে উটের পিঠে শেষ কুটো হবে।

জীবনে এত বড় গুরুত্বসম্পন্ন লিপি লেখেনি। চিঠিখানা বার বার পড়ে রত্ন নিশ্চিত হল যে লিখে ঠিকই করেছে, না লিখলে ভুল করত। গোরী যদি দুঃখ পায় তবে অধিকতর দুঃখের হাত থেকে বাঁচবে। আর রত্ন বাঁচবে অশান্তির হাত থেকে। বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়তে তার বন্ধু প্রভাত তাকে নিষেধ করেছিল। প্রভাতই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে শ্রীমতীর মধ্যে প্যাশন আছে। এসব উপেক্ষা করতে সে হয়তো রাজী হত, যদি মালাদির প্রতি তার আনুগত্য না থাকত। তিনি দ্রোণ, সে একলব্য, এখনো তার সাধনার প্রয়োজনে তাঁর মূর্তি পূজা করতে হয়। পরে হয়তো প্রয়োজন থাকবে না, তখন তার হৃদয় খালি হবে। আপাতত শ্রীমতীর জন্যে স্থানাভাব।

চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে রত্ন গঙ্গার ধারে গিয়ে গা মেলে দিল। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে তার মনে হচ্ছিল তার জীবনের সব সংকট কেটে গেছে তার অন্তরে পরম শান্তি। সে ভালোবেসেই তৃপ্ত, ভালোবাসার প্রতিদান চায় না। নারীকে সে দূর থেকে ধ্যান করবে। পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সঙ্গলাভ নাই বা ঘটল। মালাদি আর কারো সঙ্গে সুখী হোন। সে স্বাধীন থেকে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াক।

মাস কয়েক যেতে না যেতে এ কী হল! প্রেম এল তার দ্বারে অনাহূতের মতো। যার প্রেম সে সামান্য মানবী নয়, নারী-কুলোত্তমা। সবাইকে ডাক ছেড়ে জানাতে ইচ্ছা করে, শুভস্তু বিশ্বে। কিন্তু আনন্দের পরের ধাপ যে অশান্তি। নতুন এক সঙ্কট, যার পার দেখা যায় না।

কানে বাজতে থাকল, ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। যে যার সে তার।

॥ তেরো ॥

বড়দিনের বেশী দেরি ছিল না। শান্তি-নিকেতনে যাওয়াই স্থির হল। নেতা পাওয়া গেল সলিল রত্নকে। তার বাবা ওখানকার অধ্যাপক। সলিল অভয় দিল, জায়গার জন্যে ভাবতে হবে না। তবে মেলার তিনটে দিন বাদ দিলে ভালো হয়। বিদ্যাপতি, অঞ্জন এরা সলিলের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিল। রত্ন বলল, "উত্তম।"

ওদিকে কানন, নবনী ওরা বেগমপুর যাবে বলে মনঃস্থির করেছিল। রত্ন ও প্রভাতকে লেখায় এরা অসামর্থ্য জানিয়েছিল। রত্ন বলেছিল, "একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে দু'তিন দিনের জন্যে শান্তিনিকেতন যাওয়া সোজা, পথে গাড়ি বদল করতে হয় না। আর কোথায় বেগমপুর তা মানচিত্রেই নেই। এখান থেকে হাওড়া, ওখান থেকে শেয়ালদা, সেখান থেকে লালবাগ, তার পরে গোরুর গাড়ি বা পালকি। সময়ের যেন কোনো সীমা নেই! তবু যদি সদলবলে যাওয়া যেত।"

দেখতে দেখতে গোরীর চিঠি এসে পড়ল। খুলতে রত্নর ভরসা হচ্ছিল না। গোরী নিশ্চয় রাগ করেছে। রাগ করাই স্বাভাবিক। চিঠি খুলতেই ছিটকে পড়ল আরো এক-খানি ফোটো। ছোট একটা স্ন্যাপশট। গোরী দু' হাতে মুখ রেখে ভাবছে। মাথায় কাপড় নেই। অবিন্যস্ত চুল কালো স্রোতের মতো দু' কূল ভাসিয়ে নিচ্ছে।

প্রিয়তমেষু,

তুমি যদি ভেবে থাকো যে সহজে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে তবে সেটা তোমার ভুল। তুমি যা লিখেছ তা আমার অপ্রত্যাশিত নয়। বিশ বছর বয়সের একজন যুবা পুরুষ আর কখনো কারো প্রেমে পড়েনি এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করতুম না। আমার কাছে যারা সাধু সাজে তাদেরকেই আমি বেশী সন্দেহ করি।

আমি যেসব কান্ড করেছি তার তুলনায় তুমি কীই বা করেছ! আমার তো মনে হয় তুমি কিছুই করনি। তোমার চিঠি পড়ে আমি মনে মনে হেসেছি। দেবী বলে যাকে পূজা করছ তারও ভোগ চাই। এমন কোন দেবতা আছে যাকে ভোগ দিতে হয় না! তোমার মালাদির জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারিকে সারা জীবন দেবী সেজে অসাড় হয়ে থাকতে হবে। সাড়া দিলেই যে তুমি আঁতকে উঠবে! ভাববে, এ তো দেবী নয়! পূজা বন্ধ করে দেবে।

দুঃখ হয় তোমার জন্যেও। একটা অহেতুক আশায় তুমি মরীচিকার পিছনে ছুটেছ। মরীচিকা ধরে তোমার কী হবে! সে তো জল নয় যে অঙ্গ জুড়াবে। মরীচিকা ধরা দেয় না, দিতে পারে না। তোমার দৌড়ানোই সার।

তুমি তোমার প্রাণের কথা রেখে ঢেকে বলনি। স্পষ্ট করে বলেছ। এবার আমার পালা। আমিও খুলে বলছি। রাগ কোরো না। তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই হতে রাজী হয়েছিলে। আমিও খুশী হয়েছিলুম তোমার রাখীবন্ধ বহিন হয়ে। পরে বুঝতে পারলুম ওর মধ্যে সত্য নেই। সত্যের খাতিরে ও সম্বন্ধ বাতিল করতে হল। আমাদের সম্বন্ধ ভাই-বোনের নয়, বন্ধু বন্ধুনীর নয়। স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার নয়। তবে কিসের? একটু একটু করে আমার প্রত্যয় হল যে তুমি আমার কানু, আমি তোমার রাই। তা না হলে এমন হবে কেন যে দেখা নেই, চেনা নেই, চিঠিতে চিঠিতে ভাব! সে-ভাব কত নিবিড়। তুমি যে আমার, এই তার প্রমাণ। আর আমি যে তোমার, এ তুমি আজ না মানলেও কাল জানবে। আমরা একসঙ্গেই পৃথিবীতে এসেছি, একই বছর। মাসটা বা দিনটা যদিও এক নয়। হঠাৎ মনে হতে পারে আমরা যমজ। তা নয়। আমরা যুগল। রাধা আর কৃষ্ণ ওরাও একবয়সী ছিল। মাত্র পনের দিনের তফাত।

রত্ন, আমার কাছে যা জাগ্রত সত্য তোমার কাছে কেন তা নয়? তোমার হৃদয় কী বলে? একবার জিজ্ঞাসা করেছ? মালা-দিকে কবে ভালোবাসতে। সেটা এখন ইতিহাস। একদা রত্ন বলে একটি ছেলে মালা বলে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল। সে-ভালোবাসা একদা সত্য ছিল। ইতি-মধ্যে কর্পূরের মতো উবে গেছে। রেখে গেছে একটুখানি সৌরভ। বড় মধুর সৌরভ। কিন্তু সর্বসম্ভাবনাবর্জিত। সে-ভালোবাসার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। থাকলে এত দিনে বোঝা যেত। তুমি অভ্যাসচালিতের মতো ওঁকে ভালোবেসে যাচ্ছ। আমার শাশুড়ী যেমন মালা-ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে মালা গড়ান। দীক্ষা নিয়েছেন। তাই যন্ত্রের মতো মালা জপতে হয়। তোমারও ওটা একপ্রকার দীক্ষা। মালা তোমার জপমালা। ভেবে দেখো।

তোমার চিঠি যেদিন আসে সেদিন আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিই। বলি আমার মাথা ধরেছে। শুয়ে শুয়ে তোমার চিঠি পড়ি। একটু একটু করে পড়ি। ফুরিয়ে যাবে বলে আধখানা হাতে রাখি, রাত্রে বার করি। আমার তো আর কোনো শয্যাসাথী নেই। তোমার চিঠিই আমার শয্যাসাথী। বুকে রাখি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি। কোথায় না রাখি! তুমি কি জানো যে তোমার চিঠি দিনের বেলাও আমার সঙ্গী হয়, ব্লাউজের ভিতরে। স্নানের ঘরেও তোমার চিঠি খুলে পড়ি। সেই-জন্যে সেখানে আমার অত দেরি হয়। রত্ন, তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়। আগে হাত পুড়েছে বলে জানি এর নাম আগুন। এ আমার জ্বলন্ত সত্য।

প্রিয়তম, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করনি। আমিও তোমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করব না। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয় নয়, এই তৃতীয়। এটা শ্রেষ্ঠ। আমার নিজের দিক থেকে বলছি। অন্য দিক থেকে যদি বলি, তুমি বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হবে। বলবে, গোরী বাড়িয়ে বলছে। কত লোক যে এ-অভাগিনীর প্রেমে পড়েছে তার হিসাব রাখিনি। তাদের একজনকে তুমি চেনো। সে তোমার প্রিয় বন্ধু ললিত। ছেলেটি ভালো। তাকে আমার ভালোও লাগে। কিন্তু ভালোবাসা অন্য জিনিস। যার প্রতিদান দিতে পারব না তা কেন নেব? কত দিন নেব? বাধ্য-বাধকতা জন্মাতে পারে। এসব বিবেচনা করে আমি ললিতের সঙ্গে সাবুর বিয়ের সম্বন্ধ করি। সাবু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রেমে পড়ার মতো বয়স হয়নি তার। তবু ললিতের উপর তার টান লক্ষ্য করেছি। ললিত বেচারা হতাশ প্রেমিক হয়ে জেলে যাবে কেন? বিয়ে থা করে সংসারী হোক। এই ভেবেই তার বিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখনো তার মন বসেনি। উড়ু উড়ু করছে।

এই যেমন ললিতের কথা বললুম তেমনি আরেক জনের কথা বলি। সে জ্যোতিদা। তোমার যেমন মালাদির প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও ভক্তি, জ্যোতিদার তেমনি আমার প্রতি অনুরক্তি। কী চোখে যে দেখেছে আমাকে, শত প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও আমার দিকেই ঝুঁকবে, আর কারো দিকে নয়। কত বার কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, বিয়ের সম্বন্ধ করেছি, কিন্তু ভবী কিছুতেই ভুলবে না। আমার মঙ্গলের জন্যে তার মতো কেউ চিন্তিত নয়। স্বার্থ কাকে বলে জানে না। দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছে। বড়লোকের ছেলে, থাকে গরিব-

দের পাড়ায়, গরিবদের সঙ্গে। নিজের পরিশ্রমে যতটুকু হয় ততটুকুতেই চালায়। পরের পরিশ্রম নেবে না, পরশ্রমজীবী হবে না। দেবতা যদি কেউ থাকে তবে জ্যোতি-দা। তার প্রেম দেবতার প্রেম। আমার মতো অযোগ্য পাত্রে তার প্রেমের অপচয় হচ্ছে দেখে ভীষণ দুঃখ হয়। কী করি! আমি যে তাকে ভালোবাসতে পারিনে। সে আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু প্রেমিকের প্রাপ্য তাকে আমি দেব না। এ কি দয়াদাক্ষিণ্যের বস্তু!

দুটি উদাহরণ দিলুম। আরো দিতে পারতুম। বেশীর ভাগই রূপমুগ্ধ তরুণ। কিন্তু শুধু তরুণ নয়, প্রৌঢ়ও আছে, এমন কি বৃদ্ধও আছে। বিশ্রী লাগে তাদের আর্তি দেখে। পর্দার বাইরে কতটুকুই বা বেরোই! তার পরিণাম এই। পর্দা উঠে গেলে আমার মতো মেয়েদেরই ভুগতে হবে। তবু তো আমি গয়না গায়ে দিইনে, ফ্যাশনের ধার ধারিনে। অশোকবনে সীতার মতো থাকি। নিই যেটুকু না নিলে নয়। দিই যেটুকু না দিলে নয়।

আচ্ছা, ভাই, তুমি কি বলতে পারো? আমি তো কাউকে ভয় করিনে। তবে আমাকে লোকে ভয় করে কেন? কী আছে আমার মধ্যে যা দেখে তুমিও ভয় পেয়ে গেছ? ভয় পেয়ে বেসুরো গাইতে শুরু করেছ? "আমি পরাধীন, আমি অক্ষম" —তোমার মুখে এ কী বিপরীত উক্তি! নিজেই যদি পরাধীন হলে স্বাধীন করবে কাকে? আমি যে কত আশা করেছি তুমি আমাকে স্বাধীন করবে। তোমার চিঠিপত্রে যে অদম্য স্বাধীনতার সুর ছিল তা কি একখানা ফোটো দেখেই নেতিয়ে পড়ল! তা হলে আর একখানা ফোটো পাঠাই। এটা দেখে যদি তোমার ভয় ভাঙে।

সত্যি, তোমার ভয় ভাঙানো দরকার। ফোটো দেখেই যদি ভয় পাও তবে চোখে দেখলে মূর্ছা যাবে। কাজ নেই তোমার বেগমপুর এসে। তোমার বন্ধুরা আবার আসছে। এবার একটু অবকাশ পাব তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। তাদের পারুল বোন হতে আমি রাজী। কিন্তু তোমার পারুল বোন হতে নয়। তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। এখন তাদের কাছে প্রকাশ করব না। পরে তারাও জানবে। প্রেম কখনো ছাপা থাকে না। জানবে সকলেই। আমার প্রোপ্রাইটরও জানবেন। কপালে দুঃখ আছে। আমি তার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছি। এই যে আমি গয়না পরিনে, মাছ খাইনে, নাচার না হলে কিছু নিইনে বা দিইনে, আমার এটা দুঃখবরণের প্রস্তুতি। আমার লক্ষ্যের অভিমুখে আমি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছি। ভয় আমার নেই। কিন্তু ভাবনা আছে। আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। আমার যে সঙ্গী নেই। চারদিকে লোকজন থাকার নাম সঙ্গী থাকা নয়। আমি একটি পক্ষিণী। আমার পক্ষীটি কই? যাকে বলে জুড়ি।

রত্ন, তুমি কি আমার জুড়ি হবে না? সঙ্গী হবে না? পরীক্ষার পর তুমি যদি কোথাও চলে যাও আমি কি সইতে পারব! আমি কি প্রাণে বাঁচব! স্বাধীনতা নিয়ে আমি করব কী! হৃদয় যদি শুকিয়ে যায়, অঙ্গ যদি না জুড়ায়, মন যদি না ভরে, আত্মা যদি সাযুজ্য না পায় তবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা? যা হোক, স্বাধীনতার ব্যবস্থাও হচ্ছে। জ্যোতিদা বেলগাঁও কংগ্রেসে যাচ্ছে। ফিরে এলে বুঝতে পারা যাবে নতুন কোনো সত্যাগ্রহ আন্দোলন হবে কি না। হলে আমি তাতে ঝাঁপ দেব, ঝাঁপ দিয়ে স্বাধীন হব। তোমার সাহায্য নিতে হবে না। তুমি কিন্তু ভারতের বাইরে যেয়ো না। কাছাকাছি থেকো। চিঠি লিখো।

ছিটকে পড়ল আরো একখানি ফোটো

ভালো কথা, তোমার চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় তুমি যে কেবল দেবীপূজক তাই নয়। তুমি নারীপূজক। নারীকে পূজা কর বলেই কি এত ভয় কর?

এর পর আরো কিছু লিখে গোরী সেদিনকার মতো ইতি করেছিল। ইতির পরে যোগ করেছিল "তোমার অনুরাগিণী গোরী।"

রত্নর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই দুঃখিনী মেয়েটির জন্যে কী'ই বা করতে পারে একা একটি তরুণ! এক হাতে ক'দিন লড়তে পারে সমাজের সঙ্গে, বড়লোকের সঙ্গে! বোধ হয় আইনের সঙ্গেও। রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে গোরী যদি মুক্তি পেতে পারে তো সেই সব চেয়ে ভালো।

চিঠির শেষের দিকে যে নারীপূজার উল্লেখ ছিল রত্নকে তা স্মরণ করিয়ে দিল বহুকাল পূর্বের কথা। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে সে ঋষির মতো ভক্তি করত। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেত, তন্ময় হয়ে তাঁর উপদেশ শুনত। তিনিই একদিন বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বর বুঝিনে, পরকাল বুঝিনে। দেবদেবী মানিনে। বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও তিনটি উপাস্য দেবতা আছেন, তাঁরাই আমার ট্রিনিটি বা ত্রয়ী। আমার বাবা, আমার মা, আর আমার স্ত্রী!" রত্ন তা শুনে চমৎকৃত হয়েছিল। প্রথম দ্বিতীয়ের জন্যে নয়, তৃতীয়ের জন্যে। "আমার স্ত্রী!"

কথাটা রত্নর মনে গাঁথা রইল। সে তো ধর্মবিশ্বাসে ট্রিনিটারিয়ান বা ত্রিসত্ত্ববাদী নয়। সে ইউনিটারিয়ান। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্য বচন থেকে সে প্রথম দ্বিতীয়কে বাদ দিল। রাখল শুধু তৃতীয়কে। "আমার স্ত্রী।" রত্নর আবার "স্ত্রী" শব্দটি পছন্দ হয় না। তাতে শ্রদ্ধার ভাব যথেষ্ট নেই। তাই রত্ন ওখানে বসিয়ে দিল "আমার নারী।"

এই তার নারীপূজার ইতিহাস। ইতিহাসের আরেক অধ্যায় তার মনে পড়ছিল। মাঘোৎসবের দিন সান্ধ্য উপাসনার পর রত্ন ও প্রভাত দুই বন্ধু ব্রাহ্ম সমাজ থেকে ফিরছিল। অভিভূত ভাব তখনো কাটেনি। প্রভাত বলল, "ভাই রত্ন, তুমি তো জানো ছেলেবেলা থেকে আমি ব্রাহ্মদের হাতে গড়া। মনে প্রাণে আমিও তাদের একজন। তা হলে দীক্ষা নিইনে কেন? গুরুজন রাগ করবেন এই যা অন্তরায়। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমিও যদি দীক্ষা নাও দুজনের গুরুজনের রাগ অর্ধেক হয়ে যায়।"

রত্ন বলল, "ভাই প্রভাত, ছেলেবেলা থেকে না হলেও বড় হয়ে অবধি আমিও তাদের একজন। কিন্তু কেমন করে বলব যে, কেবল তাদেরই একজন? গির্জায় যখন যাই তখন বলতে সাধ যায়, আমিও তোমাদের একজন। মসজিদের আজান যখন শুনি তখন বলতে ইচ্ছা করে, আমিও তোমাদের একজন। আর বাড়ির পূজাপার্বণ যখন দেখি তখন মনে মনে বলি, দেবদেবী মানিনে বিগ্রহ মানিনে, তবু আমিও তোমাদের একজন। আমার মতো লোকের কি দীক্ষা নেওয়া উচিত?"

প্রভাত বলল, "ব্রাহ্মদের একজন হতে চাই বলে দীক্ষা নিতে চাই, তা নয়। ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাস করি, এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করার মধ্যে সৎসাহস আছে।"

রত্ন বলল, "বিশ্বাস করা এক। দীক্ষা নেওয়া আরেক। দীক্ষা যদি নিতে হয়, তবে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে আমরা কি শুধুমাত্র নিরাকারবাদী, না ঈশ্বরকে পিতা বলে উপাসনা করার পক্ষপাতী? আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি সাকারবাদে বিশ্বাস হারিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিনে ঈশ্বরকে পিতা কেন বলব, মাতা বলব না কেন।"

"ব্রাহ্মরাও মাতা বলে উপাসনা করেন।"

"প্রেমিক বলে?"

"রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়নি?"

"প্রেমিকা বলে?"

প্রভাত চমকে উঠল। "কী বলে? কী বলে?"

রত্ন পুনরুক্তি করল, "ঈশ্বরকে প্রেমিকা বলে উপাসনা করা যায় না?"

প্রভাত চলতে চলতে থেমে গিয়ে রত্নর দিকে কঠোরভাবে তাকাল। বলল, "এটা কি তর্কের খাতিরে তর্ক? না ঈশ্বর নিয়ে কৌতুক?"

রত্ন তেমনি নিরীহভাবে বলল, "না, ভাই। এটা আমার উপলব্ধি। ছেলেবেলা থেকে বৈষ্ণব পরিবেশে মানুষ হয়েছি। ওদের পরমাত্মা কৃষ্ণ, জীবাত্মা রাধা। আমি তো স্বভাববিদ্রোহী। আমি বলি, উল্টোটা কেন হবে না? জীবাত্মা কৃষ্ণ, পরমাত্মা রাধা।"

প্রভাত চলতে চলতে বলল, "শুনেছি সুফীরা ওরকম ভাবে। কিন্তু ওটা ভালো নয়। ভগবানকে নারী ভাবা!"

"কেন? ভগবানকে নারী ভাবা কি নতুন কথা? রামকৃষ্ণ কি ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করেননি? মা কি নারী নন?"

"তা বলে প্রেমিকা ভাবা! ওতে ভগবানকে নিচু করা হয়।"

"প্রেমিক ভাবলে নিচু করা হয় না, প্রেমিকা ভাবলে নিচু করা হয়?"

প্রভাত গলা খাটো করে বলল, "স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ তাতে স্ত্রী নিচু নয় তো কী? পণ্ডিত মশাই কী বলেছিলেন মনে নেই? তুমি তর্ক করছিলে। তোমাকে জব্দ করার জন্যে ক্লাসের সকলের সামনে রসের কথাটা কী করে উচ্চারণ করেন? ক্লাসের পরে আমাকে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, প্রভাত, রত্নকে বলবে বিয়ের পর বৌকে শুধাতে, কে উপরে কে নীচে? তা শুনে তুমি লাফাতে লাগলে। লাইব্রেরিতে গিয়ে বায়োলজির বই ঘাঁটতে লাগলে পণ্ডিত মশাইয়ের মুখের মতো জবাব দিতে।"

রত্ন আফসোস করে বলল, "হায়, হায়! তখন যদি আমার জয়দেব পড়া থাকত! পণ্ডিত মশাইকে আমি তাঁর নিজের অস্ত্রে পরাস্ত করতুম।"

"ভারতচন্দ্রও কি পড়া ছিল না?" প্রভাত
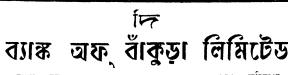
বক্রোক্তি করল। "বায়োলজি তো ঘাঁটলে। পেলে কি এমন কোনো প্রাণীর নাম যাদের স্ত্রীরা নীচে নয়?"

রত্ন খেপে গিয়ে বলল, "দাঁড়াও, আমি মহাজন পদাবলী নতুন করে লিখব। তাতে রাধা বলতে বোঝাবে পরমাত্মা, কৃষ্ণ বলতে জীবাত্মা।"

ইতিহাস এইখানেই শেষ হয়নি। পরের বছর আগ্রা দেখতে গিয়ে তাজমহলের থেকে দৃষ্টি সরে না রত্নর। সেইবারেই বেনারসে মালাদির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

তাজমহল থেকে নড়বে না রত্ন। অধ্যাপক সরকার তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। আগ্রায় আরো কত কী দ্রষ্টব্য আছে। সময় সংক্ষেপ। ধমক দিলেন শিষ্যকে। ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে যা দেখেছে যথেষ্ট। টুরিস্টরা তো তার চেয়েও কম দেখে ফিরে যায়। ঘড়ি ধরে নাওয়া, ঘড়ি ধরে খাওয়া, ঘড়ি ধরে দ্রষ্টব্য দেখা, এসব যদি না পারে, তবে অধ্যাপক সরকারের নেতৃত্বে পরিক্রমণ করে কেন?

রত্ন ভাবছিল সেও তার নারীর জন্যে তাজমহল গড়বে। কিন্তু মৃত্যুর পরে নয়, পূর্বে। শা জাহানের ওইটুকু ভুল হয়েছিল। মমতাজ বেঁচে থাকতেই তাজমহল তৈরি করা উচিত ছিল। তা হলে প্রিয়ার পূজার মন্দির হত, প্রাণহীন দেহের আধার হত না।

রত্ন তাজমহল বানাবে। কিন্তু মর্মর পাথর দিয়ে নয়। বাণী দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে। তার প্রেম হবে সৃষ্টিলীলায় সার্থক। সেই তার পূজা। একাধারে নারীকে ও নারীরূপী পরমাত্মাকে। তখনো সে যুগল মিলনের স্বপ্ন দেখেনি। কাকে নিয়ে দেখবে? মালাদিকে? না, তার ভয় করে। আর কাউকে? না, তার ভয় করে।

কেমন করে হোক, সমবয়সিনী নারী-মাত্রের প্রতি তার এক প্রকার ভয় জন্মেছিল। বয়সে খুব বড় বা খুব ছোট না হলে তার পক্ষে সহজ ব্যবহার করাটাই কঠিন ছিল। সেইজন্যে সে একটু দূরত্ব পছন্দ করত। গোরীর সঙ্গে চিঠিপত্রে যেসব কথা হয়, মুখে সেসব হওয়ার জো ছিল না। দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে দিলে সে উঠে পালাত। মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিলেও কি তার মুখ ফুটত? না বোধ হয়।

গোরীর চিঠির যখন উত্তর দেবার সময় এল তখন রত্ন তার নারীপূজার ইতিহাস লেখনীমুখে বিবৃত করল। কিছু গোপন করল না। কিছু বাড়িয়ে বলল না। লিখল—"গোরী, না দেখে না চিনে যার সঙ্গে তুমি তোমার জীবন জড়াতে চাও, সে-লোকটা কেমন চরিত্রের লোক, কেমন প্রকৃতির, শুনলে তো সব? কী বিশ্বাস করে, জানলে তো? এখন মন থেকে ঝেড়ে ফেল ও খেয়াল। তাকেই বরণ করবে যার সঙ্গে তোমার গভীর সামঞ্জস্য। সে-জন আমি নয়। তোমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করতেই আমি অস্বচ্ছন্দ বোধ করব। তা ছাড়া আমি দেখতে ভালো নই। তোমার মতো রূপসীর সঙ্গে আমাকে মানাবে কেন? রাজহাঁসের জুড়ি কি পাতিহাঁস। সবুর কর, একদিন না একদিন তোমার জুড়ি মিলবে। স্বাধীনতা অর্জন কর আগে, প্রথম জিনিসটি প্রথমে। সাত ভাই চম্পার আমরা সাতজন হয়তো তোমার স্বাধীনতা অর্জনে সহায় হতে পারি। একা আমি নই, আর ছ'জনের মতো আমিও। তবে রাজনীতির ঘর্ষণে যদি তোমার বন্ধন ক্ষয়ে যায়, সেও ভালো। সেই ভালো।"

গোরীর নতুন ফোটো পেয়ে রত্নর যা মনে হয়েছিল তাও লিখেছিল রত্ন। ললিতের বিয়ে দিয়ে হাতে কাজ নেই, হাত খালি। সন্ত্রাসবাদের জোয়ারটাতেও ভাঁটা পড়েছে। গোরী তাই ভাবছে, এর পরে কী! গান্ধী কি দেশকে ডাক দেবেন ঝাঁপ দিতে সংগ্রামে! না দিলে সময় কাটে কী করে! সুতো কেটে! তাতে আস্থা নেই!

গোরীকে সে তার দেওয়া বইগুলো পড়ে দেখতে বলেছিল। ইবসেন, বার্নার্ড শ, রম্যাঁ রলাঁ, এলেন কেই, ভার্জিনিয়া উল্ফ্। আশুবোধ্য নয়, কিন্তু চেষ্টা করলে এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়। বিয়ে না হয়ে থাকলে গোরী কলেজে পড়ত। বিদ্যাচর্চাই তখন তার পক্ষে স্বাভাবিক হত। বিদ্যাচর্চা না করলে মন কেমন করে স্বাধীন হবে, সংস্কারমুক্ত হবে? আর মনটাই যদি না স্বাধীন হল, তবে শুধু কায়িক স্বাধীনতা নিয়ে সে করবে কী! কোনো এক বণ্ডকের দ্বারা সর্বস্বান্ত হবে। অবশ্য কায়িক স্বাধীনতা তা বলে তুচ্ছ নয়। সেটা প্রাণি-মাত্রেরই জন্মস্বত্ব। মানুষের তো নিশ্চয়ই। সুতরাং মেয়েমানুষেরও। মেয়েদের যদি মানুষ বলে গনতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনুশীলন চাই। পড়তে হবে, শিখতে হবে, ভাবতে হবে, ভুল ভ্রান্তি এড়াতে হবে। ললিতের বিয়েটা ভুল।

"গোরী, পরের জীবনে হস্তক্ষেপ করতে যেয়ো না। হলই বা সে তোমার বন্ধু বা তোমার ননদ। এর বিয়ে দিতে হবে, ওর বিয়ে দিতে হবে, এ-চিন্তা যাদের মনে তারা পরের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করবে কোন ন্যায় অনুসারে! পরের স্বাধীনতায় শ্রদ্ধা না থাকলে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, রক্ষা করা যায় না। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেও আমি এই ন্যায়ের ফাঁকি লক্ষ করেছি। এরা নারীকে স্বাধীনতা দেবে না, শূদ্রকে স্বাধীনতা দেবে না, পুত্র-কন্যাকে স্বাধীনতা দেবে না অথচ নিজেদের জন্যে দাবি করবে স্বাধীনতা। তেমনি তুমিও। কী করে ভিতর থেকে বল পাবে, যদি বলের প্রধান সর্তটাই ভঙ্গ কর! গোরী, কেউ তোমাকে স্বাধীন করে দিতে পারবে না, তুমি যদি তোমার নিজের বল খুইয়ে বসে থাক। আন্দোলনে ঝাঁপ দিতেও তো জোর লাগে। কোথায় পাবে সে জোর!

॥ চোদ্দ ॥

রত্ন নিজে সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে শান্তি-নিকেতন চলল, কিন্তু সাত ভাই চম্পাকে নির্দেশ দিল বেগমপুর যেতে। নবনী কানন হৈম গিরীন ললিতকে লিখল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা স্থানকেন্দ্রিক না হয়ে নীতিকেন্দ্রিক হতে। কয়েকটি মূলনীতি না মানলে সাত ভাই চম্পার অস্তিত্ব নিরর্থক। সেগুলি কী কী, তা নতুন করে স্থির করা হোক একসঙ্গে বসে বেগমপুরে। রত্নর নিজের সিদ্ধান্ত এই যে অতীতের সম্মোহন সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে না উঠলে ভারতের ভবিষ্যৎ নেই। স্থবিরের আবার ভবিষ্যৎ কী! ভবিষ্যৎ হচ্ছে তরুণের। অথবা শিশুর। যেসব সভ্যতা জীর্ণ হয়েছে তাদের সসম্মানে জাদুঘরে স্থান দিতে হবে। জীর্ণসংস্কার পণ্ডশ্রম।

কথাগুলি বেশ। কিন্তু শুনছে কে! বড়দিনের বন্ধে আবার আসবে বলে শ্রীমতীকে যারা আশা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র কানন তার প্রতিশ্রুতি রাখল। একটিমাত্র কোকিলকে নিয়ে বসন্তকাল হয় না। শ্রীমতীর আশাভঙ্গ হল। মূলনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কী! বৈঠকখানায় যশো-বাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ও অন্দর থেকে ডাক এলে শ্রীমতীর সঙ্গে গল্প করে কাননের দিন কাটে। দু'জনের কাছেই সে সমান সমাদর পায়। যশোবাবুর তো সে এক দেশলাইয়ের ইয়ার। সে-ভদ্রলোক স্বয়ং ধরিয়ে দেন তার সিগারেট। আর শ্রীমতী তার পরিপাটি আহারের সময় নিজে পাশে বসে পাখা করে। মানা মানে না।

মাধবের মতো কাননও আর কিছু দিন পরে ও-বাড়ির গৃহদেবতা বনে যেত, কিন্তু একদিন তার আসন টলল। বেলগাঁও থেকে খবর এল গান্ধীজীর ইচ্ছা নয় অদূর ভবিষ্যতে কোনোরূপ গণ-আন্দোলন করা। তাঁর কাছে যারা ফাইটিং প্রোগ্রাম দাবি করেছিল তাদের মাথায় তিনি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন। ফাইটিং প্রোগ্রাম চাও তো আগে বিদেশী বস্ত্র বয়কট কর। মিলের কাপড় নয়, মিলের সুতো দিয়ে তৈরি তাঁতের কাপড় নয়, হাতে কাটা সুতোর তাঁতে

বোনা খদ্দর পর। চার আনা দিয়ে সদস্য না হয়ে সুতো কেটে সদস্য হও।

আহ্লাদে অধীর হয়ে কানন বলে ফেলল, "সাবাস, গান্ধী! এই তো চাই।"

ভেবেছিল শ্রীমতীও সায় দেবে। কিন্তু ওর ভাবভংগী দেখে মনে হল ও মাথায় বাড়ি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছে। বেল পাকলে কাকের কী! বেলগাঁও কংগ্রেস রণ-ছোড় হলে বেগমপুরের শ্রীমতীর কী! কানন গালে হাত দিয়ে বসল।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীমতী যা বলল তার মর্ম এই। দুষ্টু বুড়ো বেনিয়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওর অলংকারগুলি নিয়েছে। গণসত্যাগ্রহ করবার নাম নেই। বারদোলি সত্যাগ্রহ চৌরীচৌরার অজুহাতে স্থগিত রাখায় ও স্তম্ভিত হয়েছিল, তবু ওর বিশ্বাস ছিল যে, গণ-আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। এখন সে-বিশ্বাস চূর্ণ হল। না, সে-ক্ষমতা গান্ধীজীর নেই। ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে তিনি বেকায়দায় পড়েছেন। ভানুমতীর খেল জমছে না। ডুগডুগি বাজালে কী হবে!

কানন একটু মৃদু প্রতিবাদের মতো করেছিল। শ্রীমতী দপ করে জ্বলে উঠেছিল। "তুমি কী বুঝবে আমার ব্যথা! তোমার তো সর্বস্ব যায়নি!"

তারপর ধীরে ধীরে কানন শুনতে পেল শ্রীমতীর মর্মবেদনার হেতু। মুক্তি না পেলে সে বাঁচবে না। কেমন করে পাবে, যদি না গণ-আন্দোলনে ঝাঁপ দেয়? কিন্তু গণ-আন্দোলন হলে তো ঝাঁপ দেবে? সন্ত্রাস-বাদেও সে আর মুক্তির হাতছানি দেখছে না। বিদেশী বসন বয়কট করে খাদি পরে সুতো কেটে কি সে আপনাকে মুক্ত করতে পারবে? বৃথা স্বপ্ন!

কানন তাকে নতুন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি। যশোবাবুর মতো নিখুঁত ভদ্রলোকের সংগে কেন যে তার বনছে না কাননের কাছে এটা এক দুর্ভেদ্য রহস্য। সুযোগ পেলে সে দুজনের মাঝখানে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে। সেই ভালো। নয়তো অত বড় একটা খানদানী বংশে কলংক লাগবে। শ্রীমতী কিন্তু মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, "কানন ভাই, চাঁদের উল্টো পিঠ কেউ দেখতে পায় না। তুমিও পাওনি। ও শুধু চাঁদের বৌ দেখে।"

বেগমপুর থেকে ফিরে কানন চিঠি লিখেছিল রত্নকে। মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে বলেছিল, "মানুষের জন্যেই মূলনীতি। মানুষ যদি দুঃখ পায় তা হলে তার দুঃখ কিসে দূর হয় সে-কথা না ভেবে কতকগুলো শুষ্ক অনুশাসন নিয়ে কী হবে? ভাই রত্ন, পারুল বোন যাতে সুখী হয় তার উপায় অন্বেষণ কর। দেখে শুনে মনে হয় ও তোমার দিকেই চেয়ে আছে সূর্যমুখীর মতো। সাত দিন ছিলুম, এমন দিন যায়নি যেদিন তোমার নাম কথায় কথায় ওঠেনি। আর কারো নাম দিনান্তে একবারও নয়। তোমার সম্বন্ধে ওর গভীর জিজ্ঞাসা। আমরা সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করি জেনে ও পরম তৃপ্তি পেল। আমাকে বিশেষ করে বলেছে, তোমাকে যেন একবার আমি বেগমপুর বা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দেখাই। ও দেখতে চায়। কবে তোমার সময় হবে? পরীক্ষার পরে বোধ হয়।"

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কাননের চিঠির সংগে একই ডাকে গৌরীর চিঠি পেয়েছিল রত্ন। তাতেও কতকটা এই ধরনের কথা ছিল। কিন্তু দেখা হওয়া আরো জরুরী বলা হয়েছিল। গৌরী আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক নয়। কেন অপেক্ষা করবে? কার ভরসায়? গান্ধীজী তো গণ-আন্দোলন পরিচালনের অযোগ্য।

গৌরীর বুক ভেঙে গেছে। সে আর রাজনীতি করবে না। রাজনীতির ভাবনা মনে আনবে না। গত নির্বাচনে শ্বশুর মহাশয়কে দাঁড় করিয়েছিল, তাঁর জন্যে নিজে ভোট ভিক্ষায় নেমেছিল। ওটা অবশ্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। স্বরাজ্য পার্টি দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের আচ্ছাদন করা। ফলে শ্বশুর মহাশয় তাকে বহু পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুরপুত্রের পায়ে আত্মসমর্পণের শংকা তো অতীত হয়নি। সেইটেই স্বাধীনতার কষ্টিপাথর।

"প্রিয় আমার, আমি যে সব আশা সব ভরসা হারিয়ে ফেলেছি। আমি কি তাহলে হেরে যাব? হার মানব?

প্রথম বয়সে আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করেছিলুম। তাতে আন্তরিকতা ছিল না। যে জগতে এসেছি তার পরিচয় না নিয়ে অকালে বিদায় নিতে পা সরে না। আমি বাঁচতেই চাই। আমার যে সব দেখা সব শেখা সব পাওয়াই বাকী। আমার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অশান্ত অতৃপ্ত কামনা। এ নিয়ে আমি যাব কোথায়!

আমাকে বাঁচতেই হবে। মরে যাবার মতো মনের জোরও নেই। তা বলে কি আমি অনন্তকাল জ্বলব! জ্বলতে পারে কেউ! দগ্ধ হতে হতে আমার যৌবন গেল। জীবনও যাবে? হৃদয়ভরা দাহ নিয়ে আমার রূপ কত কাল থাকবে?

ভাবতে পারিনে, প্রিয়। আমার মনে হচ্ছে আমি আবার অসুখে পড়ব। একটা কোনো শক্ত অসুখে। সুখ না থাকলে অসুখ তো করবেই। যেমন তোমার মালাদির করেছে। কে জানে হয়তো আমার অসুখ করলে তুমি আমাকে দেখতে আসবে। হয়তো অস্ত-মুখী শশিকলার মতো মিলিয়ে যাচ্ছি দেখলে ভালোবাসবে।

রত্ন, পরিত্রাণের পন্থা জান তো বলো। জানা জরুরী। সবুর সইবে না। এমন কিছু ঘটে যাবে যার জন্যে সারা জীবন পশতাতে হবে। তোমার তপোভংগ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ওদিকে তোমার পরীক্ষা। এদিকে আমারও তো পরীক্ষা। তুমি পাশ করবে, আমি ফেল করব, এই কি আমাদের নিয়তি?

একযাত্রায় পৃথক ফল? তুমি আর আমি কোন অদৃশ্য লোক থেকে একই সময় যাত্রা করে এ-জগতে পৌঁছেছি। তুমি কিছু আগে। আমি কিছু পরে। কেন তবে তোমার আমার ভিন্ন নিয়তি হবে? কোথায় তবে বিধাতার ন্যায় বিচার?

কাননকে বলেছি তোমাকে যেমন করে হোক নিয়ে আসতে, যেখানেই হোক তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে।

বেগমপুরে না হোক কলকাতায়। কবে তোমার সুবিধা ওকে লিখো, আমাকেও জানিয়ো। সত্যি আমি খুব বিপন্ন। কিন্তু
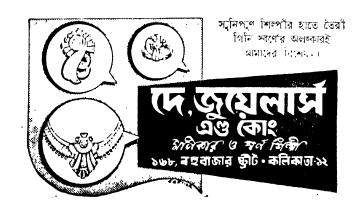
চিঠিতে তোমাকে বোঝাতে পারব না, অপরের মুখেও না।

আসবে কি তুমি? সত্যি আসবে? এলে বড় ভাল হত। একটু বল পেতুম তোমাকে দেখে। কী বিষম দুর্বল লাগছে আমার! অসুখের পূর্বাবস্থা নয় তো?"

শান্তিনিকেতনের ভাবলোকে কয়েক দিন বাস করে রত্ন বাস্তব সংসার থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসেও তার সংসার-চেতনা হয়নি, শান্তিনিকেতনের ঘোর ভাঙতে চায় না। কিন্তু কাননের ও গৌরীর চিঠি দু'খানি তাকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আনল।

শান্তিনিকেতনে যে কয় দিন ছিল বস্তুলোকের ঊর্ধ্বে রূপলোকে ছিল। সেখানে সুন্দরের রাজত্ব। "যে যায় সে গান গেয়ে যায় সব পেয়েছির দেশে," দিনে রাতে সকালে সাঁঝে যখন যার খুশি গান গেয়ে উঠছে। কত রকম গান। সব রবীন্দ্রনাথের রচনা। কী অপূর্ব তার সুর, তার ব্যঞ্জনা, তার অনুরণন! সাঁওতাল মেয়েরা সার বেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের নিজেদের মতো করে। এক ঝাঁক বুনো পাখি আর কি। সাঁওতাল ছেলের বাঁশি বাজাচ্ছে আপন মনে। ছবি আঁকছে পটুয়োরা পথের ধারে বা মাঠের মাঝখানে। খোলা আকাশের তলে। বাইরে থেকে আকাশকে ওরা লুট করে নেবে, লুট করে নেবে প্রকৃতিকে। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে বাস্তুকলার উপর লক্ষ্য রেখে। শালবীথি গড়ে উঠছে।

মেলার পর ছুটি হয়ে গেছে। অধিকাংশই বেরিয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো বিদেশে। তাঁর আবার বিদেশ কী! সবই তাঁর স্বদেশ। বসুধা কুটুম্ব। ইউরোপ থেকে, ভারতের অপর প্রান্ত থেকে ছাত্র ও অধ্যাপক এসেছিলেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আলাপ হল। বিদ্যাপতি এ-কাজে আগুয়ান। যাই হোক একটা কিছু বলে শুরু করে দিলেই হল। রত্ন দু'বার ভাবে। অঞ্জন তো মুখচোরা। তবে ওর ঐ ক্যামেরাটি সবাইকে আপনার করে নিতে জানে।

কয়েকটি আদর্শবাদী বাঙালীর ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। সলিল ব্রহ্মার কৃপায় মেয়েদের সঙ্গেও। শান্তিনিকেতন এইজন্য এত ভাল লাগে। এখানে শুধু ছেলেদের কলেজ ছেলেদের হস্টেল নয়। নারীবর্জিত নয় এখানকার জীবন। বেশ একটুখানি ব্যবধান রেখে এরা দেখতে পায় ওদের, ওরা কথা কইতে পায় এদের সঙ্গে। বিদ্যাপতি তো এমন রাজ্য ছেড়ে পাদমেকং ন গচ্ছামি। সলিল তাকে খ্যাপায়। সলিলের বোনদের সঙ্গে চা খেয়ে গল্পগুজব করে সৌন্দর্যবাদীদের স্বর্গ হইতে বিদায়ের জন্যে ত্বরা ছিল না। তিন দিনের জন্যে এসে আট দিন থাকা গেল শিশুদের খালি ডরমিটরিতে।

আহা, সেই বৈকুণ্ঠবাসের পর কোথায় তার স্মৃতির সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, তা নয়। মুক্তির উপায় অন্বেষণ কর। সবুর সইছে না। জরুরী। নইলে অসুখ করবে। শক্ত অসুখ। মালাদির মতো শুকিয়ে যাবে গৌরী। মালাখানির মতো।

কেন এমন হয় যে রত্ন যত বার চায় সৌন্দর্য দিয়ে তার চেতনা ভরতে অসুন্দর তত বার এসে তার ধ্যান ভেঙে দেয়! চেতনা জুড়ে বসে! নিষ্ঠুর বাস্তব তাকে শান্তি দেয় না।

রত্ন যখন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে তখন হস্টেলের বেড়ার বাইরে করবীর ঝাড়ে গিয়ে অর্ধশয়ান হয়। কবিত্ব করে বলে "করবীকুঞ্জ।" সেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে যায় না। এক বিদ্যাপতি বুঝতে পারে যে কিছু একটা হয়েছে, কাছে এসে সহানুভূতি জানায়।

সেদিন বিদ্যাপতি বলল, "কি হে, অমন মনমরা হয়ে ভাবছ কী? যাদের ফেলে এসেছ তাদের কথা? 'কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা, মঞ্জুলিকা, মঞ্জরিণী ঝঙ্কারিত কত।' আবার কবে শান্তিনিকেতনে যাওয়া হচ্ছে আমাদের? বসন্ত উৎসবের সময় গেলে কেমন হয়? পরীক্ষার পরে?"

তিন বন্ধু এরই মধ্যে দর্জির কাছে ঢোলা পায়জামার ফরমাস দিয়ে এসেছিল। বাবরি রাখবে বলে নাপিতকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। বাকী থাকে তিনজনের তিনটি দাড়ি। বিদ্যাপতি বলে একালের মেয়েরা দাড়ি কেউ বরদাস্ত করে না। তার থেকে বুঝতে হবে, দাড়ি পুরুষোচিত নয়। ওটা কুসংস্কার। অঞ্জন বলে, দাড়ি বাদ দিলে গুরুদেবের গুরুত্ব বারো আনা কমে যায়। ওই সব মেয়েরাই তাঁকে দাড়ি বয়ে বেড়াতে বাধ্য করবে। রত্ন বলে বিয়ের আগে রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল এ যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে তা হলেই দাড়ি রাখা যাবে, নয়তো বিয়ের পরে কর্ত্রীর অনুমতি পেলে। আপাতত সেফটি রেজর অপরিহার্য।

"ওঃ! তুমি দেখছি শান্তিনিকেতনে হৃদয় হারিয়েছ! হারামণি খুঁজতে যেতে চাও। নিজের ভাবনা আমার উপর আরোপ করছ।" রত্ন পরিহাস করতে গেল, কিন্তু পরিহাসের সুর বাজল না। ধরা গলায় বলল, "ভাই বিদ্যাপতি, একসঙ্গে যে ক'টা দিন আছি একত্রবাসের মাধুরী দিয়ে পেয়ালা ভরে নিই এস। এর পরে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! আমার জীবনের একটা
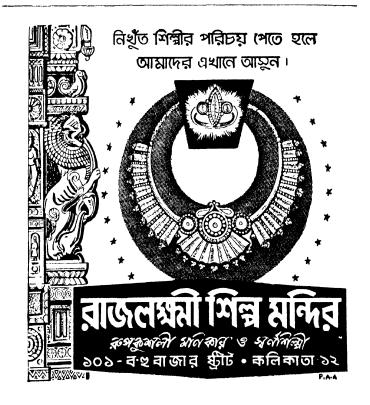
অধ্যায় তো শেষ হয়ে এল। সমাপ্তির হাওয়া গায়ে লাগছে।"

"কেন? তুমি এম-এ পড়বে না?"

"না। তোমাকে প্রথম হবার সুযোগ দিয়ে আমি অপসরণ করব।"

বিদ্যাপতি খুশী না হয়ে ক্ষুন্ন হল। বলল, "কোথায় যাবে? শান্তিনিকেতন?"

রত্ন হেসে বলল, "না, ওখানে আমার হারামণি নেই। আমি লিখতে লিখতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাব। লেখার উপার্জনে একজনের সংসার চলে যাবে।"

"আরেকজন এলে?" বিদ্যাপতি কৌতূহলী হল।

"আমার জীবনের প্যাটার্ন স্থির হয়ে গেছে। আমি যত দূর পারি একাকী উড়ব। সঙ্গিনী যদি কেউ হয় সেও পাশাপাশি উড়বে। নীড় বাঁধার কথা ওঠে না।"

বিদ্যাপতি সলজ্জভাবে শুধাল, "সন্তান হলে?"

"হবে না।"

বিদ্যাপতি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলল, "তার মানে কী? ব্রহ্মচর্য?"

রত্ন রেগে উঠে বলল, "আন্দাজ কর।"

বিদ্যাপতি ঘেমে উঠে বলল, "ওসব এদেশে চলবে না। অমন মেয়েই বা কোথায় এ-দেশে! তা ছাড়া ওটা নারীত্বের আদর্শ নয়। নারী মা হবে।"

রত্ন এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তর্ক পেলে সে আর কিছু চায় না। বলল, "ওসব চলে এসেছে চিরকাল সব দেশে। এ-দেশেও। তুমি খোঁজ রাখ না। অমন মেয়েও আছে বৈকি। আমি যখন আছি তখন সেও আছে কোথাও। নইলে জোড় মিলবে কী করে? ভগবান আমাদের জোড়ে জোড়ে পাঠান। আর ঐ যে নারীত্বের আদর্শের কথা বললে ওটা দাড়িত্বের মতোই সেকেলে রেওয়াজ। চিরন্তন নয়। একালের মেয়েরা একালের ছেলেদের সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক করবে নারীত্বের আদর্শ কী হবে আর পৌরুষের আদর্শ কী হলে ভালো হয়। বুড়োবুড়ীরা কেন আমাদের কথায় কথা কইতে আসে।"

বিদ্যাপতি মাতৃত্ব সম্বন্ধে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, রত্ন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "পুরুষ বাপ হতে রাজী হলে তবে তো নারী মা হবে! আমি এ-বয়সে নারাজ। দশ বারো বছর পরে হয়তো সন্তানকামনা জাগবে আমারও। তার আগে আমি নীড় বাঁধব না।"

"রত্ন, তুমি বড় স্বার্থপর।" মন্তব্য করল বিদ্যাপতি। সে মনে আঘাত পেয়েছিল।

"হয়তো তাই।" রত্ন চুপ করল। বিদ্যাপতি উঠে গেল। রাত হল।

রত্ন ভাবছিল শ্রীমতীর কথা। ভেবে পাচ্ছিল না শুধুমাত্র দেখা হলে কোন সমস্যার সমাধান হবে। অন্ধের সঙ্গে অন্ধের দেখা হলে অমনি পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তির উপায় চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে সময় লাগে। তা ছাড়া পরীক্ষাটাও ছেলেখেলা নয়। বিদ্যাপতিকে ভুলিয়ে রাখলে প্রথম হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু পরীক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়া অসম্ভব। খাটতে হবে। কিন্তু কবে?

ললিত আছে, জ্যোতিদা আছে, ওরা কেন সংকটের দিন সহায় হয় না? কেন ডাক পড়ে রত্নকে? রত্নর এক এক সময় সন্দেহ হয় যে গৌরীর ভালোবাসা একটা ভান। ওর আসল উদ্দেশ্য রত্নকে দিয়ে কার্যোদ্ধার। রত্ন ওকে স্বাধীন করে দেবে, যেমন গান্ধী করে দেবেন ভারতকে। এইজন্যেই রত্নকে ওর দরকার। কাজের বেলা কাজী। কাজ ফুরালে পাজী। এ প্রেম প্রয়োজনাত্মক। প্রয়োজন মিটলেই বিদায় নমস্কার। বিশুদ্ধ প্রেম হলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ হত না। এ প্রেম অশুদ্ধ।

কিন্তু রাখী বেঁধেছে যে! রাখীবন্ধ ভাইয়ের দায়িত্ব এড়ান যায় না। গৌরী তার রাখীবন্ধ বহিন। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে কর্তব্য আছে। না করলে অপরাধ হবে। পরীক্ষা তার তুলনায় তুচ্ছ।

রত্ন যখন কাননের চিঠির উত্তর দিল তখন লিখল, "একটা গান আছে, শুনেছ? বাউলরা গায়। দেহতত্ত্বের গান। 'কাম-রূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।' তেমনি বেলগাঁওয়ে কী হয়েছে বেগমপুরে হাহাকার। আমি তো এর কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাইনে। গান্ধীজী গণ-আন্দোলন করবেন না বলে শ্রীমতীর বুক ভেঙে গেছে। আন্দোলনে নামলে দু'তিন বছর জেল হত, হলে বড় সুখের কথা হত। হয়নি বলে বুকের ব্যথা। কানন, তুমি তোমার পারুল বোনকে হাতে নাও। তুমি তো কাছাকাছি থাক, তোমার পাস কোর্সের পরীক্ষার অত চাপও নেই। আবার ওর সঙ্গে দেখা কর। আমাকে আপাতত মাফ করতে হবে। তবে যদি সত্যি কোনো বিপদ ঘটে তবে আমি সব সময় প্রস্তুত।"

আর গৌরীর চিঠির উত্তরে লিখল—

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কোথায় একটু শান্তিতে পড়াশুনা করব, তা নয়। হঠাৎ তোমার এই বম্‌শেল। ব্যাপার কী, বল তো। দুটো মাস সবুর সয় না। গণ-আন্দোলন হলেও তো অনির্দিষ্ট কাল ধৈর্য ধরতে। প্রস্তাব পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায় না।

তা ছাড়া এই বা কেমন কথা যে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুমি তোমার নিজের স্বাধীনতার গাঁটছড়া বাঁধবে। দেশ যদি স্বাধীন না হয় তুমি কি তা বলে স্বাধীন হবে না! অপর পক্ষে দেশ স্বাধীন হলেই যে তুমিও রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাবে তা নয়। হিন্দু বিবাহ থেকে নিষ্কৃতি কি অত সহজ! আইন বদলাতে হবে, তার আগে মানুষের মন বদলান চাই। সময় লাগবে, শক্তি লাগবে, সংঘাত লাগতেও পারে। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে নিজের স্বাধীনতার প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে অকারণে দুঃখের পরিমাণ বাড়িয়ো না। দেশের কাজ করতে চাও কর। জ্যোতিদা যেমন করছেন নিষ্কাম ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুক্তির চেষ্টা কর।

গৌরী, আমার চিঠির কড়া সুর থেকে আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অসুখের সম্ভাবনায় আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন। তোমার আশা করি কোনো বিপদ ঘটবে না। ভগবান না করুন। যদি তেমন কিছু ঘটে, আমি তোমার রাখীবন্ধ ভাই, নিশ্চয় যা পারি করব। পরীক্ষা না হয় না হবে। কিন্তু তুমি একটু সুবোধ হলে বিপদও ঘটে না, পরীক্ষাও মাঠে মারা যায় না।

শান্তিনিকেতনে কত মেয়ে দেখলুম, কিন্তু তোমার সমান কেউ নয়। তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছিল। ভাবছিলুম গৌরী যদি এখানে পড়ার সুযোগ পেত এদের সবাইকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিত। কী রূপে, কী গুণে।

এর পর সে শান্তিনিকেতনের একটা বর্ণনা দিয়েছিল, গৌরী যাতে দেশভ্রমণের স্বাদ পায়। লিখেছিল শান্তিনিকেতন একটা তৈরি জিনিস নয়, শান্তিনিকেতন একটা ধ্যান। যারা ওখানে মিলেছে তারা সৃষ্টি করছে ধ্যানের ইশারা ধরে। একশো বছর পরে লোকে দেখবে কী মূর্তি নিল। কিন্তু ধ্যানভ্রষ্ট হলে কী থাকবে? প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ।

কলেজে হাজিরা দেবার বালাই ছিল না। টেস্ট চুকে গেছে। শীতের নরম রৌদ্রে পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর দপ্তর পেতে বসে রত্ন। সকাল থেকে সন্ধ্যা। সেইখানে গিয়ে তার কাছে পড়া বুঝে নেয় তার সতীর্থেরা। তারা কেউ তার প্রতিযোগী নয়। হলে তো সে বর্তে যায়। তা হলে আরো জোরসে পড়ে। আরো এগিয়ে যায়। তার ঢিলেঢালা ভাবের জন্যে দায়ী তাদের ঢিলেঢালা ভাব।

ওদিকে মৌনীবাবা ঘরে খিল দিয়ে ঘোর-তর তপস্যায় রত। প্রভাতকে বিরক্ত করে এমন সাহস একজনেরও ছিল না। রত্নরও না। দুই বন্ধুর মাঝখানে বহু যোজন ব্যবধান। কতকাল যে ভাব-বিনিময় হয়নি। আর কবে হবে! পরীক্ষার পরে কে কোথায় চলে যাবে। রত্নর দুঃখ হয় ভাবতে যে

পরীক্ষার দিন যতই নিকট হচ্ছে বিদায়ের দিন ততই ঘনিয়ে আসছে।

গোরীর চিঠি এল সপ্তাহ না ঘুরতে। সে লিখেছিল—

আমার যে কী বিপদ তোমাকে জানাতে পারব না। প্রকাশ করা অসম্ভব। কেন তা হলে তোমাকে দেখা করতে বলে তোমার পরীক্ষার ক্ষতি করি! দেখা হলে সুখী হব, স্বর্গ হাতে পাব। আমার মনের জোর বেড়ে যাবে। কিন্তু বলতে পারব না তোমাকে কোনখানে কাঁটা খচখচ করছে। তুমি যে অনুমান করে নেবে সে-বুদ্ধি তোমার নেই। ক'জন পুরুষের আছে! এসব মেয়েলী ব্যাপার। মেয়েদের খুলে বলতে হয় না। তারা আপনি বোঝে।

একটু সামলে নিয়েছি। তোমার কথাই ঠিক। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আমার স্বাধীনতার কী সম্পর্ক! অথচ তিন বছর কাল এই রাস্তায় ভেবেছি। এখন আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলে আর-কিছুর সঙ্গে যোগ স্থাপন করা দরকার বোধ করি। নইলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বলে দুর্বল।

সেই আর-কিছুর নাম প্রেম। আমার পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয়। এ না হলে আমি বাঁচব না। বাঁচলে তবে তো স্বাধীন হব। প্রিয়তম, আমাকে ভালোবাসতে দিও। ভালোবাসা পাই বা না পাই ভালো-বাসিছি, এটুকু হলেও আমি বাঁচব। এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি, এটুকুও আমার জীবনকাঠি।

॥ পনেরো ॥

এর পর থেকে এক দিন অন্তর এক দিন গোরীর চিঠি আসতে থাকল। রত্নর উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করে না। যখন খুশি তখন লেখে। তার কোনো দাবি নেই। রত্নকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে মুক্তির উপায় চিন্তা থেকে। রত্নরও ক্রমে প্রত্যয় হল যে গোরী তাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চায় না। সে অপর একজনের স্বাধীনতার বাহন নয়। সে স্বাধীন সত্তা। তখন সে গোরীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করল। রস আস্বাদন করল। গোরীর প্রেম রাধার প্রেমের মতো শুদ্ধ প্রেম। নিকষিত হেম।

সেও রোজ কয়েক লাইন লিখে রাখে। ডায়েরির মতো। দু'এক দিন অন্তর খামে ভরে ডাকে দেয়। তার জীবনদর্শন এই সময় একটা নতুন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। এত দিন সে এক চোখে সুন্দর এক চোখে অসুন্দর দেখে এসেছে। এক চোখে ভালো এক চোখে মন্দ। এক চোখে সত্য এক চোখে অসত্য। এই যে দ্বৈত দৃষ্টি এর বদলে আসছিল অদ্বৈত দৃষ্টি। যাই দেখে তাই সত্য, তাই শিব, তাই সুন্দর। সমস্তটাই সত্য শিব সুন্দর। তার নবলব্ধ অদ্বৈত বা অখণ্ড দৃষ্টির কথা সে লিপিবদ্ধ করে গোরীকে পাঠিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে অঞ্জনকে বলে। বিদ্যাপতি তার কাছে বড় আসে না।

গোরীর চিঠিতে রসের কথাই বেশী থাকে। সে তার হৃদয় উজাড় করে প্রণয় বর্ষণ করে। সাড়া না দিলেও ক্ষান্ত হয় না। রত্নর কাছে এ-অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত অপূর্ব। সে মনে মনে অভিভূত হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিদান দেয় না। দিতে পারে না। মালাদির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন আছে। কিন্তু সেই প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন দিন দিন জড়িয়ে যাচ্ছিল যে গোরী কি কেবল দিয়েই যেতে থাকবে, পাবে না এক ফোঁটা? পেলে দোষ কী? ক্ষতি কার? কে তার হাত ধরে বলছে, গোরীকে দিয়ো না, দিয়ো না? গোরীকে দিলে আমি যে পাইনে। আমার কম পড়ে।

বেলগাঁও থেকে ফিরে জ্যোতিদা গোরীর স্বাধীনতার ভার নিয়েছিল। তার সমাধান রীতিমতো বৈপ্লবিক। সে বলে গোরী যদি সত্যিকারের স্বাধীনতা চায় তবে তাকে শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর একজন হতে হবে। শ্রমিক মেয়েরা খেটে খায়, স্বামীর উপর নির্ভর করে না। স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা যত দিন তত দিন একসঙ্গে থাকে। বনিবনার অভাব হলে স্বামীর ভাত খায় না। ভাত না খেলে বাঁধন আপনি খুলে যায়। তারপর নতুন লোকের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ পাতায়। এইটেই যথার্থ সুনীতি। বসে বসে স্বামীর অন্ন ধ্বংস করা ও স্বামীর অনাচার সহ্য করা সুনীতি নয়।

তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃত নীতিবোধ তাদের নেই। তারা এক দল সঙ্ঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ দস্যু। তাদের নীতিও দস্যুনীতি। শাস্ত্রও দস্যুশাস্ত্র।

অলক্ষিতে কখন এক সময় জ্যোতিদার প্রতি রত্ন ভক্তিমান হয়েছিল। যদিও কোনো দিন তাকে দেখেনি। তার এই পন্থা সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। সে নিজেও তো তার জীবনের তৃতীয় দশকে মাটির মেয়ের সঙ্গে মাটিতে শিকড় নিতে চায়। জ্যোতিদাকে মনে হল তার সমানধর্মা। গোরী যদি জ্যোতিদার নীতি মেনে নেয় তা হলে গোরী হবে তার সমানধর্মিণী। সে অসাধারণ মেয়ে। সাধারণ সমাধান তার জন্যে নয়। এই সমাধানই তার মতো মেয়ের উপযুক্ত। রত্ন লিখল, "স্বাধীনতার জন্যে শ্রেণী ত্যাগ করতে কষ্ট হবে, কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে জ্যোতিদা সব সময় তোমার পিছনে থাকবেন। তা ছাড়া তোমার রাখীবন্ধ ভাই তো রইলই। সাত ভাই চম্পাও তোমার সহায়।"

গোরী কিন্তু নারাজ। সে অনেক রকম ত্যাগ করেছে ও করবে। ত্যাগে তার কুণ্ঠা নেই। কিন্তু শ্রমে তার অরুচি। কায়িক শ্রমে। হাতে কড়া পড়বে, পায়ের পাতা ফাটবে, গায়ের চামড়ায় খড়ি উঠবে। রং কালো হয়ে যাবে। কেই বা তখন তাকে ভালোবাসবে! যে-স্বাধীনতার শেষে ভালোবাসা নেই সে-স্বাধীনতা তার কোন কাজে লাগবে! সে তার প্রিয় পুরুষের ঘরণী হতেই চেয়েছিল, স্বাধীনা হতে চায়নি। ঘরণীই হবে, যদি তার প্রিয়তম পুরুষকে পায়। ঘরণী হয়ে ঘরের কাজ করবে, দরকার হলে আপিসের। কিন্তু চাষানী বা মজুরনীর কাজ তাকে দিয়ে হবে না। নাই বা হল স্বাধীনা। স্বাধীনতার জন্যে কতকদূরে যেতে সে ইচ্ছুক। কিন্তু অত দূরে যেতে অনিচ্ছুক। হত যদি প্রেমের জন্যে যাওয়া তা হলে সে আরো অনেক দূর যেত। অনেক, অনেক দূর। রত্ন চাষী হলে সেও তখন চাষানী হত, রত্নকে আর কোনো চাষানীর হাতে ছেড়ে দিত না। রত্ন যদি কালো ভালোবাসত সেও কালো হত, গোরী হত না।

জ্যোতিদা প্রথম প্রথম শ্রদ্ধা করত না রত্নকে। বলত, "ইনটেলেকচুয়াল তো বড় কম দেখলুম না। ইনিও তাঁদের একজন। ছাল ছাড়ালেই নিজ রূপে বেরিয়ে পড়ে। হাড়ে হাড়ে পারিবারিক স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ।" পরে তার মন একটু ভিজল। তখন বলল, "ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্বার্থ, শ্রেণীগতভাবে স্বার্থবান, এই লোকগুলোই সবচেয়ে বিপজ্জনক। ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে এদেরই প্রভাব সবচেয়ে বেশী।" ইদানীং তার মন আরো নরম হয়েছে। বলছে, "রত্নকে আমি ইনটেলেকচুয়ালের কোঠায় ফেলে ভুল করেছিলুম। ওকে শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ নয়। কোনো লেবেল ওর গায়ে আঁটা যায় না। ও যেন পদ্মপাতায় জল। এই আছে, এই নেই। শ্রেণীর পদ্মপাতায় কেউ ওকে ধরে রাখতে পারবে না।" রত্ন তার সমাধান সমর্থন করেছে শুনে জ্যোতিদা পরম সুখী হয়েছে। আর কেউ সমর্থন

করেনি, কাননও না, ললিতও না, গোরীর মণ্ডলীর সদস্যরাও না।

রত্নর কথামতো কানন আবার বেগমপুর গেছল। এবার জ্যোতিদার সঙ্গে তার দেখা হয়। জ্যোতিদা বেলগাঁও থেকে ফিরেছিল। ওর মনটাও মেঘলা, তবে মুখে হাসি মশকরা লেগে আছে। কানন জ্যোতিদার আশ্রমে রাত্রিবাস করে, বেলগাঁওয়ের বৃত্তান্ত শোনে। গোরীর মুক্তির উপায় পর্যালোচনা করে। কেউ কারো সঙ্গে একমত হতে পারে না। কিন্তু দুজনায় খুব ভাব হয়ে যায়। কাননের কাছে জ্যোতিদা রত্নর খোঁজখবর নিয়েছিল। কানন বলেছিল, "রত্ন আমার বাল্যবন্ধু। অসহযোগের আগে থেকেই ওদের বাড়িতে বিলিতী কাপড় বন্ধ। এমন কি দিশী মিলের কাপড়ও। ওরা তাঁতের কাপড় পরত, গান্ধীজীর শিক্ষায় খদ্দর ধরল। ওর বাবা সরকারী চাকরি করলে কী হয়, গোঁড়া স্বদেশী। চরকাও কিছুদিন চালিয়েছিলেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। রত্নও এক কালে সুতো কাটত। এখন কাটে না।" এমনি অনেক তথ্য, যা সাত ভাই চম্পার মধ্যে একমাত্র কানন জানত। জ্যোতিদা জেনে রাখল।

জ্যোতিদা লোকটি সুপুরুষ। চওড়া বুক, ক্ষীণমধ্য, বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কোথাও বেশী মাংস নেই। রোদে জলে বাতাসে তার দেহ 'সীজন' করা সেগুন কাঠ। কম খায়, কিন্তু যা খায় তা খাদ্যবিজ্ঞানসিদ্ধ, অতএব অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ। কটিবস্ত্র পরা কট্টর স্বদেশী, কিন্তু চীনা বাদাম আর বিলিতী বেগুনের যম। সোয়া বীনের চাষ করছে, লেটাস লাগিয়েছে, মুরগীও পুষেছে। ইংরেজী বই কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়ে। আধুনিক সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। রাজনীতি-প্রসঙ্গে কথা বলতে চায় না। তবে গান্ধীনীতি বুঝিয়ে দেয়।

কানন রত্নকে চিঠি লিখে বলেছিল কলকাতায় কবে আসবে সময়মতো জানতে পেলে জ্যোতিদাকে নিয়ে সেও কলকাতা যাবে। তিনজনে মিলে মাথা খাটাবে। গোরী থাকলে আরো ভালো হত, চারজনে মিলে মাথা খাটাত, কিন্তু সেটা কলকাতা বা বেগমপুর কোনোখানেই সম্ভব নয়। সর্বত্র পাহারা। দেয়ালেরও কান আছে।

ললিতকে গোরী ডেকে পাঠিয়েছিল। সে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না। নতুন জামাই হয়ে নিজেকে খেলো করতেও নারাজ। একবার শুধু এক বেলার জন্যে এসেছিল। বলে গেল, "আমাকে বিয়ে করতে হুকুম করা হয়েছিল, আমি বিয়ে করেছি। ব্যস্। ঐখানেই ফুলস্টপ। ভালোবাসতে হবে এমন তো কোনো কথা ছিল না। বংশরক্ষা বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সেসব যথাকালে। সাবুর চেয়ে আমার চেয়ে যারা দেড় গুণ বড় তারা আগে দৃষ্টান্ত দেখাক।" ললিত এখন এমন প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে যে, গোরীর স্বাধীনতার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই ক'দিনের মধ্যে অন্য রকম হয়ে গেছে। তার মনে কেমন একটা খটকা বেধেছে। গোরী তো যশোবাবুকে একটুও ভালোবাসে না, ছাড়তে পারলেই বাঁচে। কেন তবে যশোবাবুর বোনের জন্যে এত দরদ? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। গোরী গোপন করছে।

গোরী দুঃখ করে লিখেছিল, "সাত ভাই চম্পার উপর নির্ভর করতে বলেছ যে, সাত ভাই চম্পা কোথায়! প্রভাত আসবে না, তুমি আসবে না, গিরীন আসবে না, নবনী ও হৈম আসেনি। ললিতের সঙ্গে আড়ি। একমাত্র কাননকেই মাঝে মাঝে দেখি। সেই আমার এক ভাই চম্পা। তারই আমি এক বোন পারুল।"

অনুযোগটা অযথা নয়। এর উত্তরে রত্নর কিছু বলবার ছিল না। সে কাননকে একটা দিন দিয়ে বলল কলকাতায় সেদিন যেন তিনজনের দেখা হয়। কাননের, তার ও জ্যোতিদার। নবনীদের ডেকে কাজ নেই। গোরীকেও আসতে হবে না।

বিদ্যাপতির সঙ্গে রত্নর বোঝপড়া হয়ে গেল। বিদ্যাপতি বলল, "যে নারী মা হয়নি তাকে আমি পরিপূর্ণ নারী ভাবতে পারিনে। যে পুরুষ তাকে পরিপূর্ণতার সুযোগ দেয়নি তারই দোষ নয় কি?"

রত্ন বলল, "এমনও তো হতে পারে যে পুরুষ প্রস্তুত, নারী প্রস্তুত নয়।"

"তবে নারীরই দোষ।"

"এমনও তো হতে পারে যে এক পক্ষ অপর পক্ষের অমনোনীত। তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছায় সামাজিক অর্থে বিবাহিত। হার্দিক অর্থে অবিবাহিত।"

বিদ্যাপতি ভেবে বলল, "আচ্ছা, দোষ না হয় কারো নয়, কিন্তু এটা তো মানবে যে নারী যত দিন মা না হয়েছে তত দিন অপরিপূর্ণ?"

রত্ন বলল, "তা কেমন করে মানব? কেউ বন্ধ্যা, কেউ অকালবিধবা, কেউ চিরকুমারী।

তা বলে কি এরা নারী হিসাবে অন্যের তুলনায় কোনো অংশে হীন? যারা সব রকমে নিকৃষ্ট তারা কোনো মতে একবার মা হতে পেরেছে বলে কি এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? বিদ্যাপতি, নারীর পরিপূর্ণতার আদর্শ এক নয়, একাধিক। সবাইকে এক ছাঁচে ঢালার কথা পুরুষের বেলা খাটে না। পরিপূর্ণ পুরুষ বলে যাঁদের জানি তাঁদের কেউ কেউ নিঃসন্তান, কেউ কেউ অসহবাসী। নারীর বেলা কি অন্য নিয়ম?"

"মানবে কি না বল, মাতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে, পিতৃত্বের তা নেই?" বিদ্যাপতি জেরা করল।

"আমিও তো বলতে পারি যে, পিতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে, মাতৃত্বের তা নেই। কিন্তু পরিপূর্ণতার জন্যে পিতা হতেই হবে এমন কোনো বিধান আমি মানব না। তবে আমিও স্বীকার করছি যে প্রেমের সাধনার ওটিও একটি ধাপ, অকারণে উপেক্ষণীয় নয়।" রত্ন যোগ করল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা ভাগ্যের এলাকায় পড়ে। সন্তান চাইলেও হয় না। না চাইলেও হয়। পরিপূর্ণতাকে ভাগ্য-নির্ভর ভাবা ঠিক নয়। সৌন্দর্যও ভাগ্য-নিরপেক্ষ। নারীমাত্রেই, পুরুষমাত্রেই স্বমহিমায় পরিপূর্ণ সুন্দর হতে পারে।"

অবশেষে এল সেই মাঘী পূর্ণিমার রাত, যে রাতে রত্ন পেয়েছিল শ্রীমতীর প্রথম পরিচয় প্রভাতের মুখে। এক বছর আগে।

সেই পূর্ণিমা, সেই পূর্ণতা, সেই সৌন্দর্য, সেই বসন্তের পূর্বাভাস। উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়ায় রত্ন, যেদিকে দু'চোখ যায়। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে, মাঠের বুকের উপর দিয়ে, পায়ে চলার পথ ধরে। ক'টা বাজল হোঁশ নেই। কোন যুগ, কোন শতাব্দী খেয়াল নেই। রূপকথার জগতে এসে পড়েছে। সে জগৎ এ জগৎ নয়।

গোরী তাকে একখানি অপরূপ চিঠি লিখেছে। চিঠির প্রত্যেকটি কথা তার মনে গাঁথা।

রত্ন, আমার তো প্রত্যয় হয় না যে, তোমাকে আমি কোনো দিন চোখে দেখতে পাব। তুমি আমার চোখের আড়ালে আড়ালেই রয়ে গেলে এ জন্মের মতো। এ যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা কেমন করে তোমাকে বোঝাব! তুমি আছ, আমি আছি, কীই বা এমন দূরত্ব! ইচ্ছা থাকলে যে-কোনো দিন দেখা হতে পারত। তবু হয় না। হবেও না। যদি না আমি সব দড়াদড়ি কাটিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাই একদিন না বলে কয়ে। খবর না দিয়ে। আমাকে। ভাববে কে এ! চিনিনে তো একে! ছেলেদের হস্টেলে মেয়ে এল কোন ফাঁক দিয়ে! তোমার বিশ্বাস হবে না যে আমি গোরী তোমাকে দেখতে এসেছি। না দেখে থাকতে পারিনি বলে। বাড়ি ফেরার পথ খোলা রাখিনি। ফিরলে কেউ আমাকে নেবে না। যেখানে যত আত্মীয় আছে সকলের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তুমিই আমার একমাত্র গতি। আমাকে ঘরে নিতে হবে তোমাকেই। তোমার সেই হস্টেলে। তা কী করে হবে! ওরা হতে দেবে কেন! তুমি ফাঁপরে পড়বে। কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি যে গোরী। জানতে পাবে তৎক্ষণে আমার নাম।

আমার হাত ধরে তুমি বেরিয়ে পড়বে হস্টেল ছেড়ে কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে সংসার ছেড়ে সমাজ ছেড়ে। বেরিয়ে পড়বে যে দিকে দু'চোখ যায়। হাত ধরে চলবে, হাত ছেড়ে দেবে না। সব ছাড়বে, হাত ছাড়বে না। আমার হাত তোমার হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। মাঝখানে পাহাড় এলেও না, পাথার এলেও না। মানুষ এলে তো নয়ই। মরণ এলেও না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দেবে না, আমি তোমার হাত ছেড়ে দেব না, আমাদের দুজনের হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। যদি মরি তা হলেও না। যদি বাঁচি তা হলেও না। প্রিয়তম, তুমি আমারি জন্যে। আমি তোমারি জন্যে। দু'জনে দু'জনেরি জন্যে। এ কি তুমি জানো না?

ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে রত্ন যখন হস্টেলে ফিরল তখন শোবার ঘণ্টা পড়ছে। আর একটু দেরি হলেই গেট বন্ধ হয়ে যেত। ঘরের তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে রত্ন লক্ষ্য করল মেজের উপর এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল, "তোমার ঘরে তালা দেখে তোমার খাবার আমার ঘরে দিয়ে গেছে। এসো। —প্রভাত।"

খেতে ইচ্ছা ছিল না, তবু প্রভাত তাকে প্রত্যাশা করছে বলে রত্ন চলল প্রভাতের ঘরে। কাপড়চোপড় না ছেড়েই। হাতমুখ না ধুয়েই। বলল, "ভাই প্রভাত, আজ আমার মন ভরে রয়েছে। পেট না ভরলেও চলে। আমি খাব না।"

সে চলে যাচ্ছিল, প্রভাত মৌনভঙ্গ করে তাকে বসতে বলল। "সারা রাত না খেয়ে থাকবে? তা কি কখনো হয়? একটু কিছু মুখে দাও।"

অনেক দিন পরে রত্ন প্রভাতের কণ্ঠস্বর শুনল। অগত্যা বসতে হল। কিন্তু মাঘের শীতে আধঘণ্টা বাইরে পড়ে থেকে খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে। চাপাটি

"প্রভাত, ভাই, পারো তো এক পেয়ালা কোকো কি কফি খাওয়াও।"

প্রভাতকে রাত জাগতে হয়। পরীক্ষার জন্যে পড়তে। কফি তার রাত জাগানিয়া। হাতের কাছে একটা থার্মোফ্লাস্কে ভরা থাকে। তার থেকে পেয়ালায় ঢেলে রত্নকে দিল, নিজে নিল। খান দুই বিস্কুট সহযোগে।

খেতে খেতে বলল, "রত্ন, তোমার চেহারা থেকে তো মালুম হয় না যে মন ভরে রয়েছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঝোড়ো কাকের মতো উস্কোখুস্কো। ঢলঢলে খদ্দরের পায়জামা খোঁচ লেগে ছেঁড়া। জরির নাগরা ধুলোকাদামাখা। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ!"

এর উত্তরে রত্ন বলল, "বাতিটা চোখে লাগছে। বল তো নিবিয়ে দিই, ঘরে চাঁদের আলো আসুক। ধন্যবাদ। ভাই প্রভাত, এটা কোন রাত তোমার মনে আছে?"

"ত্রয়োদশী বোধ হয়।"

"দূর! পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমা। এক বছর আগে এই রাতে যার পরিচয় দিয়েছিলে সে এক দিন আমার জীবনে এল। অভাবনীয়! তার পর থেকে অভাবনীয়ের জন্যে যেন অন্ত নেই! পদে পদে চমক, ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়! ভাই প্রভাত, বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, আমা হেন মানুষকেও একজন ভালোবেসেছে। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইনি, আমল দিইনি, উড়িয়ে দিয়েছি। কাননকে সামনে ঠেলে দিয়েছি যাতে ভালোবাসার পাত্রান্তর হয়। ধরা দিইনি, এড়িয়ে গেছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি। নিজের প্রতিভার উপর আমার আস্থা ছিল, কিন্তু পৌরুষের উপর ভরসা ছিল না। এখন মনে হচ্ছে আমি পুরুষ। নইলে শ্রীমতীর মতো মেয়ে আমার প্রেমে পড়ত না। তার প্রেম আমার পৌরুষের প্রথম অভিজ্ঞান।"

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। প্রশ্ন করল, "তারপর তুমিও কি ওর প্রেমে পড়েছ?"

রত্ন শরমে রক্তিম হল, কিন্তু তার মুখে ছায়া পড়েছিল। তাই দেখা গেল না। সামলে নিয়ে বলল, "আজ এত দিন পরে মনে হচ্ছে আমিও প্রেমে পড়েছি ওর।"

এর পর রত্ন ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল তার নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণ।

"তুমি তো জানো আমি মালাদির উপাসনা করতুম। তিনিই আমার ভগবান। বা ভগবান আমার কাছে তাঁরই রূপ ধরে এসেছিলেন। মালাদির প্রতি অনুগত থেকে শ্রীমতীকে কী করে ভালোবাসতে

তাকিয়ে রইল চন্দ্রাহতের মতো

পারি? সেইজন্যে আমি প্রাণপণে মালা জপ করেছি। শ্রীমতীর ফোটোগুলো একবারের বেশী দেখিনি। প্রতি রাত্রে মালাদির ধ্যান করেছি। কাল রাত্রেও। আজ মনে হচ্ছে ওটা আমার পক্ষে দ্বিচারিতা হবে। মালাদি এখন অতীতের সামিল। শ্রীমতী আমার বর্তমান। আমার ভবিষ্যৎ। ভগবান আমার কাছে গোরী রূপ ধরে এসেছেন।"

প্রভাত শুধাল, "গোরী বুঝি ওর ডাক নাম?"

"হাঁ, বেহারেই ওর জন্ম। মাতুলালয়ে।"

প্রভাত আর একটু কফি ঢেলে রত্নকে দিল, নিজে নিল। "তার পর?"

"তার পর তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে প্যাশনের। বলেছিলে, শ্রীমতীর চোখে কী প্যাশন! আমি তো ভয়ে ওর দিকে তাকাতেই চাইনি। দেখলুম চোখে নয়, ঠোঁটে। ফোটো দেখেই প্রাণপণে দৌড় দিয়েছি। আমার যা শরীর আর আমার যে স্বভাব, আমার পক্ষে ঠান্ডা মেয়েই ভালো। গরম মেয়েকে আমি সুখী করতে পারব না। ও আমাকে ছাড়বে কিংবা মারবে। দুটোই আমার কাছে ভয়াবহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিতে হল যে আমি পুরুষ, আমি সম্মুখীন হব। জ্বলতে হয় জ্বলব, তুমি যেমন জ্বলছ। আজ আমার ভয় ভেঙে গেছে প্যাশনের।"

প্রভাত হতভম্ব হয়ে বলল, "তার পর?"

"তার পর যে-মেয়ে বয়সে বড় তাকে আমি দিদির মতো সমীহ করি, শ্রদ্ধা করি। তার সঙ্গে মোটেই স্বাধীন ও সহজ বোধ করিনে। তার কাছে তটস্থ হয়ে থাকি।

তার গায়ে হাত দিতে সাহস পাব না, গায়ে হাত দিলে মনে হবে পবিত্রকে অপবিত্র করলুম। পূজা কি তা হলে চিরকাল দূরে থেকে হবে? দূরত্ব থাকলে সাযুজ্য হয় কখনো? আমার যা ধর্মমত তাতে পূজা বলতে সব কিছুই বোঝায়। তার আদিতে বিরহতাপ, অন্তে পূর্ণ মিলন। এর মধ্যে অপবিত্রতা নেই। কিন্তু এমনি আমার সংস্কার যে বয়সে বড় হলে গোরীকেও আমি মালাদির মতো বরাবর পরিহার করতুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট।"

প্রভাত রসভঙ্গ করে বলল, "তা হলেও তুমি বয়সে বড় নও। তোমার বয়স বাড়ছে না। বরং দিন দিন কমছে। তুমি যেমন আনপ্র্যাক্‌টিক্যাল ছিলে তার চেয়েও বেশী হয়েছ। তুমি ধরে নিচ্ছ যে শ্রীমতী তার স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পাবে, তোমার মতো গরিবকে বিয়ে করবে। অসম্ভব! অবাস্তব! অকল্পনীয়! অঘটনীয়! যাও শুয়ে পড়ো গে। কাল সকালে ভুলে যাবে আজ রাত্রের পাগলামি। আমিও আজ দেরি করব না। তুমি আমার মাথা ধরিয়ে দিলে।"

ঘরে ফিরে গিয়ে রত্ন কাপড় ছাড়ল, পরিষ্কার হল, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। তারপর বাক্স খুলে গোরীর ফোটোগুলি বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখল ও গোলাপের শুকনো পাপড়ি বিছানায় ছড়িয়ে দিল। লিখতে বসল চিঠি তার প্রিয়তমাকে।

এক বছর পরে সেই রাতটি আবার এল যে রাতে তুমি এলে আমার চেতনায়। তোমাকে কি লিখেছি কোনোদিন প্রভাত আমার কাছে তোমার কী পরিচয় দিয়েছিল? গোরী, সেই রাতটি থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। নিজের ভালোবাসা নিজের কাছেই গোপন ছিল, ধরা পড়ল আজ রাতে। আজকেই আমি হাতে নাতে ধরে ফেলেছি সেই চোরকে যে এক বছর হল সিঁদ কাটতে কাটতে আমার যথাসর্বস্ব চুরি করেছে। মালাদির প্রতি আনুগত্য তার মধ্যে পড়ে।

প্রেম, তোমার মতো প্রিয় আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্বকীয়া। আমি তোমার স্বকীয়। যে যার সে তার। কবে আমাদের দেখা হবে, আদৌ হবে কি না, এ নিয়ে আমি ভাবিনে। হলে অভাবিত রূপে হবে। যেমন করে হল আমাদের চেনা, আমাদের ভাব, আমাদের ভালোবাসা।

চিঠি লেখা শেষ না হতেই বাতি নিবে গেল। হস্টেলের নিয়ম। অমনি এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকল। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটল। রত্ন জানালার ধারে গিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রাহতের মতো। মনে হল গোরী চেয়ে আছে তার দিকে। এই প্রথম সে শোবার আগে মালবিকার ধ্যান করল না। ধ্যান করল শ্রীমতীর।

প্রভাতের কাছে একটু আগে যা চাপা ছিল এখন আর তা চাপা রইল না। উল্লাস। সব শঙ্কা, সব জ্বালা, সব আফসোস ছাপিয়ে উঠে বাজতে থাকল উল্লাসের রাগিণী। উল্লাসের তালে তালে প্রতি অঙ্গের প্রতি পরমাণুর নাচন শুরু হল। মাতন লাগল শোণিতে শিরায় স্নায়ুতে। কোথায় ঘুম! খালি পেটে কফি পড়লে যা হয়। রত্ন একবার শোয়, একবার ওঠে, একবার পায়চারি করে। হঠাৎ কী মনে করে সে মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে। বার বার মাথা ঠোকিয়ে প্রণতি পাঠায় কে জানে কোন দেবতাকে! কস্মৈ দেবায়!

বলে, "মধুর, তুমি অনেক দিয়েছ, অশেষ দিয়েছ। নাও, নাও, কী নেবে নাও। নারী রূপে। গোরী রূপে।"

কবি কামিনী রায়

নির্ঝরিণী সরকার

সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব সাহিত্যিকা আপন আপন দেশে স্বনাম-খ্যাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কবি কামিনী রায় তাঁদের অন্যতমা ছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের প্রথম লেখা "আলো ও ছায়া" নামে একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দান করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। "আলো ও ছায়া"র পরে কামিনী রায় আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু "আলো ও ছায়া"র স্থান কোনটিই অধিকার করতে পারেনি। "আলো ও ছায়া" কাব্যগ্রন্থখানি বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করেছিল। কবি কামিনী রায়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠকাব্যগ্রন্থ "আলো ও ছায়া" ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কবি ভীরু পাদক্ষেপে প্রথম প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি পুস্তকরচয়িত্রী হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, "প্রথম জীবনে কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতই আপনার নিভৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য আমার নাম ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, আমার কোন পিতৃবন্ধু, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট "আলো ও ছায়া"র পাণ্ডুলিপি লইয়া যান।"

প্রথম লিখিত এই কবিতা-পুস্তকখানিকে জনসমাজে উপস্থিত করা সম্বন্ধে কবির মন যখন দ্বিধায় আন্দোলিত হচ্ছিল, তখন সেই যুগের কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। হেমচন্দ্রকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। কেবল কবিত্বের জন্য নয়, তাঁর মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আকর্ষণেও কুমারী কামিনী সেনের তাঁর প্রতি এক মানসিক আত্মীয়তার অনুভূতি ছিল। তিনি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, "রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রীতি, নারী জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, নিন্দনীয় দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ, এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।"

তিনি হেমচন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত।"

হেমচন্দ্র ছিলেন তখনকার যুগের কবি-সম্রাট। কামিনী সেনের মত অখ্যাতাকে তিনি কি সমর্থন করবেন? এ চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু হেমচন্দ্র এই কবিতাগুলিকে শুধু সমর্থনই নয়, সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, সেই অভিমত মামুলী প্রশংসাবাণী নয়, অন্তরের মুগ্ধভাবের সরল অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি। হেমচন্দ্র বলেছেন যে, "এই কবিতাগুলি আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে,

স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ বাংলা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।" তিনি আরও বলেছেন, "কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। আর বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" কবি কামিনী রায় কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে নিজে যা লিখেছিলেন, এখানে সংক্ষেপে তার কিছু তুলে দিলাম, "আমার হৃদয় তাঁর প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, তাঁর বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁর কবিতা বাল্যে আমায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁর কবিতা পড়িয়া তাঁকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি।" ২০ বৎসর পরে "আলো ও ছায়া"র পঞ্চম সংস্করণ ১৯০৯ সনে প্রকাশিত হয় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়। হেমচন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন না।

> "বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার
> লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু ঢালে গীতধার
> ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্রপাখী,
> সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি'
> তব স্নেহপত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
> লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ, প্রাণ।
> তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্বাদ তব
> সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
> বিংশতি বরষ ধরি সেই গীত হার
> আজ লোকান্তর হতে তাই উপহার
> লহ এ ভক্তের হাতে;—আজ মনে হয়
> তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা নয়;
> বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
> ভকতি চন্দন লিপ্ত নব সুবাসিত
> পাবে তুমি আশা এই। আছে আশা আর,
> পেঁছে ধরণীর বার্তা মৃত্যুর ওপার।"

বাস্তবিক "আলো ও ছায়া" বইখানি পাঠকসমাজে যে কতদূর আদর পেয়েছে, এই বইয়ের সংস্করণ দেখলেই তা বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় কবিতার বইয়ের এতগুলি সংস্করণ খুব কমই আশা করা যায়, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য তার মধ্যে ব্যতিক্রম।

কবি কামিনী রায়ের কবিতার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই, তাঁর প্রায় প্রত্যেক কবিতাই ভাষার সৌন্দর্যে গভীর ও উচ্চ ভাবরাশির দ্বারা পূর্ণ। সর্বত্রই মানব-কল্যাণ, সমাজের ও নারীজাতির উন্নতি সাধন, স্বদেশের প্রতি জ্বলন্ত ভালবাসা পরিস্ফুট হয়েছে এবং সেগুলি যেন পরম নম্রতায় ভগবানের পদ-প্রান্তে একান্তভাবে নিবেদিত।

শোকবিহ্বলা জননীর পুত্রশোকের যে উৎস "অশোক সঙ্গীত" বইটির সুরের ভিতর দিয়ে ঝঙ্কৃত হয়েছে, তাতেও আমরা ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা ও আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাসই দেখতে পাই।

সন্তানের মৃত্যুদিনে কবি পরলোকগত পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"নহে শুধু মৃত্যুদিন, বাছারে আমার,
মোদের এ ঘর হতে পুণ্যতর লোকে
যেদিন জনম পেলে, জীবনেতে নব,
সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু উপহার
দিব তোরে, আর্দ্র করি আমাদের শোকে,
হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।"

কবির কবিতাগুলির ভিতর যে বিশেষ সুরটি সর্বত্র ঝঙ্কৃত হয়েছে, সেটি জীবন-দর্শনের সুর। মানব-জীবন আলো ও অন্ধকারময়। কখনও মনে হয়

"আঁধারের কীটাণু আমরা
দু দণ্ড আঁধারে করি খেলা
অন্ধকারে ভেঙ্গে যায় হাট
জীবন ও মরণের মেলা।"

কিন্তু সত্যই কি তাই? কবি পরক্ষণে অনুভব করেছেন যে, জীবন অন্ধকার নয়, অন্ধকার ভেদ করে কত না আলোক মানব-জীবনে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠেছে

"জীবনের অসংখ্য প্রদীপ
এক মহাচন্দ্রাতপ তলে
এক মহাদিবাকর করে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে জ্বলে।"

এই আলোকে আত্মসমর্পণই যেন অন্ধকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনে একটি মাত্র মহা-জিজ্ঞাসা প্রতিদিন উদ্যত হয়ে আছে। সে জিজ্ঞাসা

"জীবন কিসের তরে কেঁদে জিজ্ঞাসিছে প্রাণ?"
"জীবন মরণ একই মতন
ধরি এ জীবন কিসের তরে?"

দিবানিশি মনে সেই এক প্রশ্ন

"নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?"

এই জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ কবির অন্তর্দৃষ্টি সেই পথটিই খুঁজে বার করেছে, যে-পথে মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সে-পথ কার্যক্ষেত্রে।

"কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া
সমর অঙ্গন সংসার এই
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।"

মাঙ্গলিক কবিতাটিতে যে অনুভূতির রূপ রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলে, প্রেমে পূরে প্রাণ
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।"

কবি কামিনী রায়ের কবিতায় সর্বত্র এই অনুভূতিরই প্রকাশ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

তিনি অনুভব করেছেন

"নিদ্রিত বিপন্ন পার্শ্বে জেগে থাকে যারা
ত্রিকালক ভবেশের ত্রিনয়ন দিয়া
তাদের নয়নে ছুটে আলোকের ধারা।"

কবি কামিনী রায়ের কবিতার ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের সুখ-দুঃখ-জ্বালার জটিলতায় জড়িত মৃত্যুভয়াতুর মানব-জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক জীবনের সন্ধান পাই, যে জীবন মহামহিমময়, যে জীবন ছোট ছোট সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করে, এমন এক আনন্দের সন্ধান পেয়েছে যা কখনও ম্লান হয় না। কবি লংফেলো তাঁর "জীবনস্রোত" কবিতায় এই জীবনেরই জয়-গান করেছেন। পরার্থে দুঃখ বরণে যে অপূর্ব আনন্দ লাভ হয়, কবির কবিতায় ছোট ছোট ছত্রে যেন তা মূর্তি ধারণ করেছে।

কবি কামিনী রায় উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বছরেই বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। "আলো ও ছায়া" বইখানি ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সনে স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহিত জীবনে তিনি সুখী, সুগৃহিণী এবং সন্তানবৎসলা জননী ছিলেন। কবি কামিনী রায়ের পিতা চণ্ডী-চরণ সেন তখনকার দিনে সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য ও স্ত্রীজাতির নানারকম কল্যাণবিধানের জন্য তিনি অনেক ত্যাগস্বীকার ও চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ও চরিত্র গঠনের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বকালে তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থাকা সত্ত্বেও পরাধীন দেশের দুর্গতিতে সর্বদাই অশ্রুজল বর্ষণ করেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে কামিনী রায় তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর কবি প্রতিভার উপর দু ব্যক্তির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন কবির পিতৃদেব স্বনামখ্যাত চণ্ডীচরণ সেন। আট বৎসর বয়সে কামিনী রায় প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। বালিকার রচনাকৌশলে ও প্রতিভায় প্রীত হয়ে পিতা তাকে কৃত্তি-বাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত উপহার দেন। নিজের বাড়িতে তিনি তাঁর প্রত্যেক সন্তানকেই ছোটবেলায় রামায়ণ ও মহাভারত—এই বই দুখানি কিনে পড়তে দিয়েছিলেন। এই বই দুখানির প্রতি তাঁর আশ্চর্য ভালবাসা ছিল। কামিনী রায় লিখিত "শ্রাদ্ধিকী" বইখানিতে তাঁর পিতার প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন--সেইটি পাঠ করলে জানা যায় যে, তাঁর পিতা তাঁর চরিত্রগঠনের কতদূর সহায় ছিলেন।

তিনি লিখেছেন, "তার জ্যেষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার তিনি সম্পূর্ণ স্বহস্তে রাখিয়া-ছিলেন। যে কারণেই হউক, তাঁহার অন্য কোন সন্তানের এই সৌভাগ্য হয় নাই। প্রাতঃকালে উপাসনাদি সমাপন করিয়া নিকটে ডাকিতেন এবং নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল একখানি খাতাতে উদ্ধৃত করাইতেন ও তাহার অর্থ বলিয়া দিতেন।

"প্রধানতঃ বাইবেল ও কনওয়ে সেক্রেড এ্যান্‌থলজী নামক পুস্তকে সংগৃহীত নানাদেশের ধর্ম ও নীতি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বাক্যাবলী এইরূপে শিক্ষা দিতেন। এতদ্ভিন্ন মর্নিং এণ্ড ইভনিং মেডিটেশন নামক পুস্তক হইতে একটি [illegible] কবিতা বা ধর্মসংগীত মুখস্থ বলাইতেন। স্কুলে গিয়া পাছে আমার রুচি ও অভ্যাস তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হয়, এই ভয়ে যেন সর্বদা ভীত ছিলেন। এই কয়েকদিন সাজ-সজ্জা ও বিলাসিতা, বাহিরের সভ্যতা ও আড়ম্বরের বিরুদ্ধে কথায় যতদূর সাবধান করা যায় তাহা করিতে ত্রুটি করেন নাই।"

কবির "পৌরাণিকী" তিনটি কবিতায় গ্রথিত একখানি ছোট বই। কিন্তু এই তিনটি কবিতার প্রত্যেকটিই অতুলনীয় ভাব-সম্পদে পূর্ণ। গুরু দ্রোণাচার্যের দুটি বিভিন্ন দিক 'একলব্য' ও 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ' কবিতায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলি অতুলনীয়; নারীদের লেখায় এরকম মহৎ ভাবপূর্ণ অভিব্যক্তি সত্যই বিস্ময়কর। সব কবিতা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শেষ একটি কবিতা দিয়ে কবি-প্রতিভাকে প্রণতি জানাচ্ছি। এই কবিতাটিতে কবি ভালবাসার প্রকৃতস্বরূপ কি, তাঁর লেখনী-তুলিকা দ্বারা সেই চিত্র এঁকেছেন।

"আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দুধারে সংযম বেলা ঊর্ধ্বে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদী তলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত কামনাভরে ঊর্ধ্বদিকে চাওয়া;
পবিত্র পরশে যার মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়।"

শান্তি ভাল

জীবনানন্দ দাশ
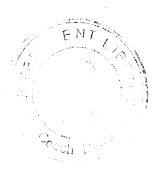
গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়
অন্ধকারে পাখি শরীর ছেড়ে দিতে শেখে
অবাধগতি ঢিলের মতন ঘাস পাথরের পানে;—
তেম্নি আলো অন্ধকারের মরণ জীবনের
মোহানা থেকে তোমাকে ভালবেসে
শান্তি ভাল; শান্তি ভাল, উড়েছি আমি ঢের।

অনেক পথ চলা হল — তবুও আমি আজো
পেয়েছি যা, চেয়েছি সেই চক্রবালের রেখা?
সাত আট বছর পরে আবার বনচ্ছবির সাথে
শীত সামাজিক রাত্তিরে আজ দেখা।
জীবন আমার সমাহিত অনেক দিনের থেকে;
নদী মাঠে ঘাসে শিশির-বিন্দুতে উৎসুক
হয়ে হৃদয় সফলতায় দিন বা রাত্রি এলে
বলেছে ঃ এই স্পষ্ট শান্ত প্রবাহ আসুক।

নারীরা আসে, হারিয়ে যায় — ধীর জগতের সাথে
জেগে থেকে পেয়েছি আমি নিয়মস্থিরতা
কিছু ভাষা পৃথিবীকে দেবার — বাকি সবই
নিহিত হয়ে বসে থেকে গ্রহণ করার কথা
নদী শিশির সূর্য বৃক্ষ থেকে;
চারিদিকে আকাশ ভরে হয়েছে উদয়
সকল কালের বার্তাবহ নক্ষত্রদের আভা
ব্যর্থ হয়ে তবুও মানবগল্প স্নিগ্ধ হয়।

মূর্তি

অজিত দত্ত

তীক্ষ্ণধার যন্ত্র দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর ভাস্কর
অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ খণ্ডগুলি ভেঙে ভেঙে ফেলে।
কাল যা সংলগ্ন ছিল সত্তায় তা আজ অবহেলে
বিচ্ছিন্ন করে সে। যত তুচ্ছ হোক, হোক অবান্তর,
তবু যারে জীবনের অংশ জেনে করি সমাদর
সবি খসে পড়ে যায়। ধন্য মানি যার স্পর্শ পেলে,
সেখানেও অস্ত্র হেনে ভাস্কর নির্দয় খেলা খেলে;
আর্তনাদে ভরে ওঠে ক্লিষ্ট প্রাণ আঘাত-জর্জর।

কোনো একদিন এই ভাঙাগড়া হবে অবসান,
পাথরের খণ্ডটুকু সেদিন রবে না নিরাকৃতি,
কৌতূহলী চোখে দেবে না জানি কী মূর্তিরূপে দেখা।
সেদিন জগতে আমি খণ্ডিত, আহত, ক্লিষ্ট, একা,
এ ক্রন্দনে রবে শুধু আমার সামান্য পরিচিতি,
রুক্ষ সে প্রস্তরখণ্ডে কী ছিল তা কে নেবে সন্ধান?

অভিশাপ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

একটি জীবন ঘিরে পৃথিবীর যত অভিশাপ
বজ্ররোষে যেন ভেঙে পড়ে
হয়তো সামান্য আশা তাই নিয়ে সে আবার গড়ে,
মনোময় জগতের স্বপ্নময় নীড়ের উত্তাপ
সেথায় বিছায়ে দেয় বিশ্রামের কোমল শয়নে;
জেগে থাকে ব্যাকুল অন্তরে
প্রাণের অমূল্য ধন ফিরে পাবে কতক্ষণ পরে;
পরিশ্রান্ত দেহমন, অশ্রুভারাক্রান্ত দু'নয়নে।

স্বপ্ন দেখে দিবাভাগে রাত্রে সেই স্বপ্ন শংকাতুর
অকস্মাৎ ভেঙে ভেঙে যায়,
কখন প্রভাত এসে দাঁড়াবে রাতের কিনারায়
তন্দ্রাহীন জাগরণে সে-প্রতীক্ষা বিয়োগ-বিধুর।

একটি জীবন ঘিরে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার
অন্ধকার ভিতরে বাহিরে;
বর্ষণমুখর রাত্রি, বুক ভাসে তপ্ত অশ্রুনীরে
মেঘজলে নিবিড়ের অভিশপ্ত করুণ ঝংকার।

মধ্যরাত্রে ঝড় এল, হা হা করে মরুভূ-প্রান্তর
ছিন্নভিন্ন প্রাণের বন্ধন,
নির্মম আঘাতে তার মর্মভেদী উঠেছে ক্রন্দন
নিরাশার অন্ধকারে অন্তরে বাহিরে আভ্যন্তরে।

নিরপরাধের শাস্তি আড়ম্বর তাই এত তার
বিচারের তাই প্রহসন,
অন্ধ বিধাতার হাতে মৃত্যু একমাত্র আকর্ষণ
নাহি কোনো অভিযোগ, নাহি কোনো আশা সান্ত্বনার।

এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে

বিষ্ণু দে

সে-গ্রাম একান্ত চেনা, থেকে থেকে মন চলে যায়।
সেখানে এখন বুঝি পলাশের আগুনের কাল,
মহুয়ার রিক্ত বন প্রাণ পায় গোছা গোছা ফুলে;
এখন সেখানে জানি কী সবুজ শালের ডাঙায়!
সেখানে পালায় মন, হাওয়া কাঁপে আমের বউলে,
গলিতে গলিতে শ্বাস রুদ্ধ করে আসন্ন কাঁঠাল।

শহরের মন যায় থেকে থেকে ছোটো সেই গ্রামে,
থেকে থেকে মনে আসে রূপরসগন্ধে বসুন্ধরা,
মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদিঘি, টিলা সারসার,
যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পসরা,
যেখানে মানুষ বাঁচে নিতান্তই কড়িকেনা দামে,
একবেলা ভাত পেলে ভাবে সেও সৌভাগ্য অপার—

তবু বাঁচে গিঁটে গিঁটে মৃত্যুহীন রক্তিম পলাশ।

রূপসী পৃথিবী আর চেনাশোনা লোক সেই গ্রামে—
সৌন্দর্যে ব্যথায় তীব্র স্মৃতি হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।
শান্তি নেই জীবনের এ-বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে॥

বন্ধুবরেষু

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আর কত মাংস চাও, দূরবন্ধু, ক্ষুধা কত বল!
বারবার পঞ্চশর হেনে তুমি করলে বিকল-ও,
তবু দয়াহীন!
আমার দেহের পাত্রে কবিতার স্নেহ-মেদ-পেশী
নেই আর বেশী,
তবু কি তোমার দ্বারে শুধে দিয়ে যেতে হবে সবটুকু ঋণ,
যে-ঋণের বিন্দুপরিমাণ
তুমি-আমি এ-জীবনে কোনো বীজে, বাষ্পে, মাপে পাইনি আঘ্রাণ:
কোনো ঋতু-ফুলে বা পলাশে
আমের মুকুলে, পদ্মে, অশোকে, কিংশুকে কিংবা ঘাসে
হাঁটিনি কখনো সপ্তপদ।
রাখিতে সমুদ্র নদনদী আর হ্রদ

আমার প্রতীক।

বল, বন্ধু, শর্তভিষা এ-মনকে চিনে তুমি ঠিক
ডাক আজ প্রথম উৎসবে!
আমার ভিখারী-ভাণ্ড, জান তুমি, কিসে পূর্ণ হবে?
বল জান, তারপর দিও স্নেহ-প্রেম,
ধনুর্বাণ, যা-কিছু বা ভাব শুভ মনে,
সুবর্ণ বা হেম
আমি হাত পেতে নেব এখানে নির্জনে॥

জানলা

হরপ্রসাদ মিত্র

দেয়ালে বেঁধেছে চোখ—
জানলাটা খুলে দাও।
তারপর—
আমার তো পাখা নেই।
পাখিটাকে ডেকে বলি
—তারপর?

ওরা ডেকে চলে যায়—
মেঘ-পাখি-আলো যায়,
বেলা যায়!
সোনার কলমে রোজ কবিতা লিখেই যায় সন্ধ্যা।
আকাশ-কাগজে সোনা,—
শেষ ত্বরা ফুটে ওঠে যাত্রীর।
আমার তো পাখা নেই।
আমি বুঝি ছায়া চাই রাত্রির!

ক্ষয়-ক্ষোভ-ভয়-লাজ—
আঁধার আড়ালে চোখ বেঁধে যায়।
কী হবে মিথ্যে ঘরে
হাজার বাতির আলো পুড়িয়ে?
ওগো তুমি জাগ, জাগ,
চল একা—চল একা!
তারপর—
জানলাটা খুলে দাও!

সজারু

শ্রীকৃষ্ণধন দে

পাখি নই, তবু মোরে বিজ্ঞানীরা পাখি বলে ডাকে,
ডানার বদলে মোর সুচালু কণ্টকে দেহ ঢাকে।
বিবরে আমার বাসা, উড়িবার নাহি ত কাঙাল,
আমার চলার পথে বিহগেরা দূরে সরে থাকে।

আমারি কণ্টকে বাঁধি এলায়িত শিথিল কবরী
সাঁওতাল-রমণীরা ঘাটে আসে ভরিতে গাগরী,
সাঁঝ নামে মৌ-বনে, জ্যোছনায় ভরে যায় পথ,
তরুণ দলের সাথে ফেরে তারা বাজায়ে বাঁশরী।

বিজ্ঞানী শোনায় কানে কোন্ দূরে অতীতের কথা
দেখিয়াছি আমি না-কি আদিম যুগের তরুলতা;
সৃজন-আশীষ লভি ছিল যারা আদি-স্থলচর,
তারি মাঝে আমি শুধু কণ্টকে-আবৃত কলেবর।

কেটে গেছে কত যুগ, পৃথিবী ছেড়েছে জীর্ণবাস,
আমি শুধু আজো আছি বুকে ধরি লুপ্ত ইতিহাস!

জাতক

দিনেশ দাস

ভাদ্র আর আশ্বিনের মাঝামাঝি
সে এক আশ্চর্য দিন, একটি সোনালী-নীলরেখা!
গেরুয়া গঙ্গার কাছাকাছি
ঝোপের আড়ালে এক বুনো-প্রজাপতির পাখায়
আছে কি আমার নাম লেখা?
দেখেছি, নিয়েছি ঠিক চিনে
ভাদ্রের সংক্রান্তি শেষে প্রথম আশ্বিনে।

আকাশে নির্মল মেঘ। পথের ওপরে
ঝিরঝিরে জলের জুঁই ঝরে ঝরে পড়ে;
হঠাৎ চাঁপার কলি আলোর আঙুল এসে
জলটুকু মুছে নিল শেষে ঃ
কে যেন টাঙিয়ে দিল পুজোর গরদখানি আকাশের তারে,
যেখানে আমার নাম খুঁজি বারে বারে।

নতুন ঘাসের মত মা'র বুকে নিঃসাড়ে গজানো
সেই সব দিনগুলি কোথা আছে জানো?
অনেক ঘুরেছে তারা হেস্টিংসের পাশে, বেলভেডিয়ারে—
তারপরে কোন্ ফাঁকে সরে গেল নিঃশব্দ ছায়ার মত,
কতদূরে কোনখানে বলত? বলত?
চল্লিশ বছর আগে
প্রথম ভোরের মত একটি শিশুর চোখ মেলা,
হাসির গিনিতে গড়া কান্নার মুক্তোয় গাঁথা সেই ছেলেবেলা,
কোথায় হারিয়ে গেল রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে—
সময়ের কোন বালুচরে!

ভাদ্রের সংক্রান্তি দিন সেই ঃ
সেই চেনাপথে হাঁটি, মনে হয় নেই নেই নেই কিছু নেই,
হঠাৎ আকাশ থেকে একফালি ভোরের নির্মল নীল
এনে দিল কবেকার ভোরের বয়স সাবলীল।
চেয়ে দেখি আছে,
কৃষ্ণচূড়ার গাছে
অবোধ আনন্দ যত ঠিক লেখা আছে,
আমার বেদনা যত প্রাচীন শিরীষে
আছে আছে সব আছে সবখানে মিশে।

হাওয়া

অরুণকুমার সরকার

পুরনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজে হয়ে আছে
দিল্লীর সুদূরে, কেউ বোম্বায়ের সমুদ্রের কাছে।

কলকাতার অন্ধকারে হাঁক ছাড়ি ঃ এখানে এস হে
ফিরে এস আমাদের যৌবনের যুবতীর মোহে।

দিল্লীর ব্যস্ততা আর বোম্বায়ের নাভিশ্বাস নিয়ে
দু'লাইন চিঠি আসে যথারীতি ইনিয়ে বিনিয়ে

আর যে সময় নেই, এই কথা, বড় খাঁটি কথা।
ও হাওয়া, ব্যাকুল হাওয়া, কেন তোর বকুনি অযথা!

তোমারই আধারে

মণীন্দ্র রায়

এমনি অদম্য আশা নিয়ে
ভোর না হতেই ঘরে শিশু জেগে বিছানায় খেলে
রাত্রির আশ্রয় ছেড়ে পাখি ওড়ে আকাশে আবার,
কাঁচা রোদে গাছে গাছে পাতা ঝলকে ওঠে।
তুমি এলে, সুরে সুরে মরানদী যেন
ভরে ওঠে কানায় কানায়—
ঘাটে বাঁধা মন তাই পালতোলা নৌকোর মত
টান-টান আবেগের ঢেউ ভেঙে আজ
নতুন দিগন্তে জন্ম নেয়।
সমস্ত ইচ্ছার তন্ত্রী গান হয়ে বাজে।

ধন্যবাদ জানাব কি? কৃতজ্ঞতা, হাসি?
কখনো ফুলের চারা রৌদ্রের আকাশে
রঙের আরতি ছাড়া অন্য কোনো কথা
জানায় কি? কখনো কৃষক
ভাল করে চাষ ছাড়া দিতে পারে অন্য সার্থকতা
বৈশাখের প্রথম বর্ষণে?
আমারও এ-মন তেমনি কাজের মেলায়
তুমি যা দিয়েছ তারই সুস্থ পুনর্বসতির দিনে
স্বপ্নের শৃঙ্খলা ফিরে চায়।

আমার সকল কীর্তি, সামান্য সে, তোমারই আধারে
জ্বলুক রাত্রির চৌমাথায়॥

ধূসর দেয়ালি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার ধূসর দেয়ালি
খেয়ালী পাতা, ছিন্নভিন্ন হালখাতা
দেয়ালে অস্পষ্ট মুখের হেঁয়ালি।

পেলাম না ট্রেনে-ট্রেনে মৌমাছির ধ্যানে
ভুলে-যাওয়া মুখের রেখা
চকিত চাহনির বুকে-জোয়ার-আনা বাঁকা
যুগল ভুরু।
মন-ভ্রমরের চোখ
একটি ভঙ্গিমা—তাকায় অপলক।

দেবদারুর পাতা দক্ষিণের বাতাস-উৎসবে মর্মরিত
সেই ক্রমশ দূরে-সরে-যাওয়া মুখ—মনের পর্দায় অভিনীত
ভুলে-যাওয়া নায়কের মত।

তাই তোমার ধূসর দেয়ালি
বুঝি খানিক পেলাম। অনেকটাই পেলাম না। দূরে মহীরুহ
জোনাকি জ্বলছে। পাখিরা ফিরছে আধো-অন্ধকার বাসায়
অন্ধকারে-অন্ধকারে ঘরে ফেরার সমারোহ
পেলাম না। এলাম না।
তোমার ধূসর দেয়ালি কিসের বার্তাবহ?

একটি সন্ধ্যা

গোপাল ভৌমিক

সে এক সন্ধ্যার কথা
বন্ধ্যা হয়ে যে ডুবেছে জলে:
হিমছায়া অন্ধকারে মাধবীর তলে
হরিণীর মত ভীরু দুই চোখ তুলে
কী যেন বলতে চেয়ে
নত করে নিয়েছিলে মুখ—
মনে পড়ে আনত চিবুক
দুই হাতে ধরে আমি বলেছি তখন ঃ
'মেলে দাও, মেলে দাও সূর্যমুখী মন।'

নাওনি সে উপদেশ ঃ
ব্রীড়া ও সঙ্কোচে তাই মৃত্যুর সংশ্লেষ
পেয়েছে ও সন্ধ্যামণি-মন:
কত সন্ধ্যা, কত দিন-রাত্রির স্বপন
তারপর ব্যর্থ হল অকর্ষিত মাঠে।
সে-মন্ত্র ভুলেছি, তাই মনের কপাটে
আজও খিল আঁটা—
ভগ্নাংশের ভগ্নস্তূপে শুধু স্মৃতি সাঁটা।

আজও সন্ধ্যা আসে জানি
মাধবীর তলে
হিমঘন ছায়ার কম্বলে
জড়িয়ে সকল দেহ তার ঃ
আজও নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথার
অভিনয় কর যদি
সে-সন্ধ্যার পাব না সাক্ষাৎ—
স্থান কাল পাত্রে আজ অনেক তফাত।

পারাপার

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এপারেও ক্লান্তি জমে অন্য পারে উদ্যোগ অচেনা,
এপারে ধূসর সন্ধ্যা ওপারে কি সূর্যস্নাত ভোর?
এপারে ঋণের বোঝা ওপারেই মিটবে সে-দেনা,
এপারে স্বপ্নের শেষ ওপার কি আশ্বাসে বিভোর?
যুগের সঞ্চিত ধুলো উড়ে যায় ঝড়ের বাতাসে,
তুমি, আমি সকলেই সময়ের থাকি পদানত:
ভিত্তি টলে এইপারে, ওপারে কি তৃণাঙ্কুর হাসে,
এপারে বিষের ক্রিয়া ওপার কি সুবাসে আনত?

তোমারো দু'চোখে ক্লান্তি বারংবার উদ্যোগের শেষে
হৃদয়ে গভীর কালো, তারি ফাঁকে চকিত ইশারা;
এপার ওপার মিলে আনবে কি বিদেশে স্বদেশে
দুইটি বাহুর মিল, আলিঙ্গন স্ফীত বুকজোড়া!
এপারে-ওপারে সেতু বাঁধবার উদ্যোগ নিখিলে,
তোমার-আমার গ্রন্থি দৃঢ়তর হবে সেই মিলে॥

নতুন বাড়ি-ঘর

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

বাকী ছিল একখানি প্লট,
সেখানেও হয়েছে প্রকট
ইঁট-কাঠ-জানালার সাঁর;
পুরো হল এ-গলির দু-ডজন বাড়ি
এ-পাড়ার পাথরের প্রাণ
আর ত হবেনা ঠাঁই সর্বপ্রমাণ।

অনেক বছর আছে জাগি
এ পাড়ার এক অনুরাগী
গত কত বসন্তের দিন গুনি গুনি
ভাড়া করা জানালার কেটে গেছে অনেক ফাল্গুনী।

খোলার কুটির আর খুপরীর চালা,
ভেঙে ফেলে শুরু হল পালা;
খানা-ডোবা হয়েছে ভরাট দিন দিন,
জমি হল সবুজ মসৃণ।
নতুন মানুষ এল—দশগুণ দিল তার দাম
পথঘাট হল ছিমছাম।
ঘর ভেঙে হল কত ঘর,
খাঁটাল বস্তির হল কত রূপান্তর—

আজ তার পরিচয় নাই বা নিলেন—
বেলতলা-ঝাউতলা-মউতলা লেন!
মন বলে ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস—
আমি জানি এ-পথের কাঁচা ইতিহাস।
আমি এর অনুরাগী, তাই—
আমার হবে না আর ঠাঁই!

এই শরৎ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

অসহ্য এই শরৎ,
দুঃসহ এর স্বপ্ন—
এই সোনার রোদ্রে
বুকের ভেতর কেমন করে, কেমন করে!

সারারাত
নীল আগুন জ্বলে আকাশে—
গনগনে তারার আগুন,
স্বপ্নের মত শিউলি ঝরে, শিশির ঝরে—
সবুজ ফড়িং হাঁটে ঘাসে-পাতায় ঃ
দূরে শালবনে মেঘেরা বেড়ায়
আর,
আচমকা চাঁদ ওঠে কখনও
রক্তকরবীর বনে!
কি রাত, কি ঘুম-ভাঙানো রাত!

আরো আশ্চর্য ভোর আসে।
অশান্ত জলপ্রপাতের মত
বাতাসে পাখিদের গান;
উষার লালচেলিতে আগুন লাগে—
কি মাধুরী জলে-স্থলে!
ধূসর অন্ধকারের মত নদীস্রোতে,
দেবদারুর দীর্ঘরহস্যে
যেখানে স্বপ্নের মত নির্জনতা!
প্রাচীন শিলালিপির মত নিস্তব্ধতা।

কোথাও আছে কি কোন রূপকথার নগরী!
সোনার ধোঁয়া-ওড়া দুপুরে
ময়ূরকণ্ঠী-ডানা চিল ছড়ায়
কি বিষণ্ণ মরু-ব্যাকুলতা!
মূর্খ হিজিবিজির মত
কি অবোধ শূন্যতা ঝরে দিগন্তে!
যেখানে দুধবরন কাশের মেয়েরা নাচে
পলিনেশীয় সুন্দরীদের মত
নাচের দোলায় ফুলে-ওঠা ঘাসের ঘাঘরা,
যেখানে দ্বীপের গন্ধ, পাহাড়ের ইশারা,
সমুদ্রের গান।
কি দিন, কি ঘুম-মাখানো দিন!

এই শরৎ,
এই অসহ্য স্বপ্নের শরৎ—
একে আমি সহ্য করতে পারি না।

আজও দোশরা আশ্বিন!

এই দুরন্ত-দুস্তর নীল দিন
এতটুকু ওঠে কি দুলে
কারও বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে!

নির্ণয়

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এক দিন ছিল—
তোমার একটি কথা আমার জীবন।
সে কথা খুঁজিতে গিয়ে ধরেছি আকাশ ঃ
যেখানে ঝড়ের বীজ, এলোমেলো উন্মাদ সফরে
মেঘেরা পালায় কিংবা বসন্ত বাতাস,
যেন অন্যমন,
হলুদ ফাল্গুনী আভা বিষন্ন কবরে
বুকে তুলে নিল।

সেই কথা এ কি?
যার খোঁজে পৃথিবীকে চষে ফেলে দেখি
অতল রহস্য-মূলে বিস্ময় কোথায়?
যার ছোঁওয়া লেগে মাটি নদী ফোলে, আর
ভিজে গাছ সংবিৎ হারায়,
নীল হাওয়া ঝরে পড়ে গুচ্ছে গুচ্ছে লঘু ফুলভার!

না কি সেই কথা যার ভঙ্গিময় কটির শোভায়
কেঁপে ওঠে সহস্রায়ু যৌবন অধীর?
পুরনো যে ক্ষত, যার ইতিহাস করুণ-বধির?
কত কত দিন আগে শোনা শ্বেত হাসির মর্মর
ছায়া ফেলে পঙ্কিল ডোবায়!
অনন্ত স্মৃতির ক্লেদ ঃ দেহ মন হৃদয় জর্জর।

তারপর একদিন সঠিক বুঝেছি ঃ
কথা সে তোমার নয়, আমারই বোধন
জীবনের গানে। শুধু অস্ফুট ব্যথায়
বিভ্রম বিলাসে লীলা গাঁথা হয় কথার কথায়।
পৃথিবী নির্জন নয় যেখানেতে তুমি
লবণাক্ত তিমিরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপেতে
বসে আছ ঃ অকপোল-কল্পিতায় চুমি,
সান্ধ্য সিঁদুরের রাগে গাঢ় হয় কুঙ্কুম টিপেতে।

এবার বুঝেছি—
তোমার চরম কথা আমারই তো মুখে আর চোখে
গানে আর কাজে শুধু ফুটে ওঠে আপনার ঝোঁকে।
বাকিটা ভুলেছি ঃ

মনেও থাকে না
কি যেন তোমার কথা চেনা-অচেনা।

জীবন-জিজ্ঞাসা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন হৃদয়লীন যে-সব ইচ্ছার
কোরক ছিল নীরব বুকে সে কার পূচ্ছায়
জাগল আজ জানাল দাবি, শুধাল তারা—কই?
আরেক মন বোঝাল, 'ওরা গেছে জনমসই।
এখন শুধু আঁধার-তলে বাঁধার ক্রন্দন!
পঙ্ককেই করলে পুঁজি ছেড়ে কি চন্দন?'
তখন বলি, 'আমি যে চাই বাঁচার মত আলো।'
শারদ মেঘ বলে, 'তা ভালবাসায় তুমি জ্বাল—'

অতীত বলে প্রতীত যারা
আসলে তারা যায় না কোনোদিন
আবার আসে; আসেই আসে ফিরে।
'আকাশে শোনো কিসের স্বর—'
একথা বলে চাঁচায় আশ্বিন
শুভ্র দূর মেঘের মন্দিরে!

'নিজেকে দাও ছড়িয়ে তুমি, ছড়াও তুমি ফের,
প্রসার কর অন্তরের অবরোধের ঘের:
জীবন ভালবাসতে শেখ, বাসতে জান ভাল
আবার ফিরে সকলি পাবে হারানো যত আলো।'
এ-কথা বলে স্তব্ধ হল শুভ্র মেঘলীন
ভালবাসায় ফিরে আসার অধীর আশ্বিন।

মহাস্ত্র

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

গগনে-পবনে দিকে-দিগন্তে দূরে
তৃণে-অরণ্যে শ্যামলে-হরিতে মেঘে—
যে-সোনা লুকিয়ে থেকেও কত যে ঝরে!
অতল-গর্ভে লালিত জ্যোতির জ্যোতি!

কালের ললাট জ্বলে তারি উদ্ভাসে,
আকাশের রঙে তারি উচ্ছ্বাস কাঁপে—
জ্বলে সে-আগুন মর্ম-অতল-তলে
হৃদয়ে হৃদয়, সাগরে সাগর মেশে।

অণুতে প্রদীপ, সলিলে বহ্নি-মায়া
অগোচর সেই জড়ের গহন জ্যোতি—
সুচির-সাধক তারি সুধা-মন্থনে
আদি হিরণ্যে বিদীর্ণ করে এ কী!

অণুবজ্রের প্রলয় অট্টরোলে
অনাদি সোনার তনুতে রক্তলেখা—
ধ্যান-সম্পদ লভে কোন্ পরিণাম?
সৃষ্টি হারায়? আদি হিরণ্য জ্বলে?

সাড়া

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আশ্বিনের আকাশতলে তোমায় কী যে বলেছিলাম
গিয়েছ তুমি ভুলে,
নিরঞ্জন মেঘের থেকে নিরভিমান আলোর ঝুরি
নামিয়ে দিয়ে তোমার শ্রুতিমূলে
বলেছিলাম, 'রাত্রি ছাড়া ভুবনে নেই অন্য কিছু আর;
যেটুকু আজো শুক্লা আছে, বিবর্ণবিভার,
প্রতীয়মান ঢেউয়ের মত বালির সাদাখাড়ি;
এখানে যদি ত্রিলোকদীপ না জেবলে দিতে পারি,
পাতাল থেকে মুক্ত করে না আনি ভোগবতী,
উপর থেকে অমরাস্রোত না আনি আমি যদি
উপর দিকে না নিতে পারি মন্দাকিনী ধারা,
আমার হাতে দিয়োনা আর দিয়োনা তুমি সাড়া।'

বছর ঘুরে আবার আমি এসেছি আশ্বিনে,
নিখিল ঘুরে এসেছি, দেখি, তেমনি তুমি আজো
উন্মীলনী নদীর মত অশ্রু মেলে আছ,
যে-নদী এই পৃথিবী নামে নিঃস্ব গ্রামখানি
মায়ের মত মাধুরী ঢালা জলের রিনিরিনে
ভরবে বলে শুনিয়ে ফেরে সান্ত্বনার বাণীঃ
'ত্রিলোকদীপ জবালিয়ে সে যে তোদের নেবে জিনে।'

ত্রিলোকদীপ জবালিনি আমি, পারিনি জেবলে দিতে,
শূন্য হাতে এসেছি আজ তোমার গ্রামটিতে,
আমার হাতে তোমার হাত করুণা হয়ে লোটে,
নিলাজ আমি, কাঁদিনি তবু, নিবিড় সংকটে
মরিনি, শুধু বলেছি, 'ওগো আমার গ্লানি ঢাকো,
তুমি এবার আমার প্রাণে প্রতিশ্রুতি রাখো।
অক্ষমের অতল ক্ষতি অন্বেষণে মুছে
এবার তবে তুমিই আন ত্রিলোকদীপ খুঁজে;
একলা আমি রইব জেগে বাদলঘন রাতে,
আসবে তুমি প্রতীক্ষার শেফালিফোটা প্রাতে,
তখন যেন আমার সেই তীব্র অনুতাপে
অরুণাচল সিক্ত হয়, অস্তাচল কাঁপে;

মরবে এসে আমার হাত তোমার দুই হাতে।।'

সূর্যমুখী

উৎপলকুমার বসু

অন্ধকার কোটরে রুগ্‌ণ মাটি গান গায় ঃ
"জাদুকর পত্র দিয়েছে, সে আমার অংগপ্রত্যংগে
লীলায়িত হবে,
সে আমার কোরককে লুকিয়ে থাকবে সূর্যের আলো পাবার
বাসনা হয়ে।"

অন্ধকার উদ্যত কৃপাণ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে
কোটরের দ্বারে,
ভয়ে ভয়ে সূর্য সরে যায় দূর-দূরান্তে
ধূম্রচূড় শিখরের অন্তরালে।

অকস্মাৎ ভোরের চড়ুই
রুগ্‌ণ মাটির কানে কানে বলে, "আমি দয়িতের পত্র এনেছি।"
রুগ্‌ণ মাটি গান গায়, "সে আমার অংগপ্রত্যংগে
লীলায়িত হবে,
সে আমার কোরককে লুকিয়ে থাকবে সূর্যের আলো পাবার
বাসনা হয়ে।"

তারপর যখন স্তিমিত আলোয়
বিপুল শূন্যতা থেকে সন্ধ্যার হাওয়া ভেসে আসে,
সূর্য বিদায় নেবার আগে একমুহূর্ত দ্বিধা করে,
তখন রুগ্‌ণ মাটির বাসনা অকস্মাৎ
সূর্যমুখী হয়ে জবলে ওঠে।

তোমার মুখ

সুশীলকুমার গুপ্ত

তোমার আশ্চর্য মুখ এত দেখি তবুও হৃদয়
কখনো হয় না তৃপ্ত। সে-মুখের দুর্নিবার টানে
কতবার আসি যাই, ভালবাসি; ভুলি তার ধ্যানে
জীবনের লাভ-ক্ষতি, ব্যথা-গ্লানি, অশ্রুর সঞ্চয়।

আকাশ দেখায় মুখ সপ্তর্ষি-চাঁদের দীপ হাতে
স্তব্ধ রাত্রে। মেঘে মেঘে বিদ্যুতের আঁচড়ে মুখের
অপূর্ব ভাস্কর্য ফোটে। বিহংগের ডানার আঘাতে
মুখাবগুণ্ঠন খোলে। আঁকে মুখ জোনাকি বনের।

সে-মুখের শোভা হাসে ভোরের জবার গরিমায়,
সন্ধ্যামালতীর রূপে, গাঢ় নীল নদীর ডানায়,
গোধূলির রঙে মেঘে, ছায়াপথে নক্ষত্রের ভিড়ে,
বনের মুকুরে, ছায়া-রৌদ্র-জ্যোৎস্না-কুয়াশা-শিশিরে।

সে-মুখের কাব্য লিখি, আনন্দ-আশ্বাসে বাঁধি বুক;
আমি আছি আর আছে সেই মুখ গভীর, উৎসুক।

পটভূমি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি জীবনের বিস্তৃত পটভূমি
পেয়েছ. পাবেও; ন্যায় অন্যায় নিয়ে
ছুঁই-ছুঁই-নীতিবোধ
ছোঁবে না তোমাকে, তোমার কণ্ঠরোধ
করবে কে? বাঁচ তুমি
আপনারই মেধা-বর্মকে গায়ে দিয়ে
আনন্দ-উজ্জ্বলা।

নেই অনুতাপ, আদর্শ-বিক্ষেপ;
শ্রদ্ধাও কর শতদোষে দোষীকেও;
সুস্থ মনের স্মৃতি তাই উৎপলা,
তোমার,—সহজ প্রতিটি পদক্ষেপ;—
করেনি ধূসর দৃষ্টিকে অবলেপ;
নানা গতিপথে ছেড়ে দাও প্রেমকেও।

জটিল তোমার জীবনাদর্শ, জানি।
অননুভূত কী প্রজ্ঞায় ধরা দেবে—
এই পরিবেশ, পথঘাট, স্থানকাল?
ক্ষীণ-পরিসর, তবু অখণ্ড, মানি
এ-জীবন, চলে তোমাকেই ভেবে ভেবে।

রূঢ় অভিঘাতে ঘৃণার সুনীল ঢেউ
এ-তীর সইবে, বইবে না আর কেউ।
তোমার আকাশ-বিসর্পী প্রেম নেবে
এ-হৃদয়—তাই তরঙ্গ-উত্তাল।

স্বগত

মানস রায়চৌধুরী

পাব না জেনেই পথে পা বাড়াই, কেননা না-পাওয়া
আমারি তো সহজাত। কতটুকু পেয়েছি কখন,
গোপন বাসনা নিয়ে পথ চলি, বৃথা অন্বেষণ—
তৃপ্তির অমেয় সুধা ছড়ায় না যৌবনের হাওয়া।

বিকেলে মুখর আলো। পথের উতল উৎসবে
নিজেকে মেলাই নাকো। মনের সুচির অনুভবে
তীব্র সুর বিচ্ছেদের, ঘরে বসে চিৎকার শুনি
—কে কোথায় জয়ী হল, এ-সংসারে কে কতটা গুণী।

দেওয়ালে সন্ধার ছায়া, এখনো আসে না আহ্বান—
কেউ শুনবে না তবু অন্ধকারে ভেসে যায় গান।

ভীরুর প্রার্থনা

আনন্দ বাগচী

ছায়াভীরু সিঁড়িটার স্তব্ধ বুকে পা ফেলে পা ফেলে
কোথায় পালাবে তুমি অন্ধকারে, বুকের ইজেলে
লুকিয়ে পুরনো ছবি, বেদনার পরমায়ু সুর,
কালের পুতুল তুমি পায়ে বাঁধা মৃত্যুর নূপুর।

ভালবাসা দুঃখময়, তোমার ভেজান দরজা ঠেলে
কেউ আসবে না, বোকা, কেউ কি নিজের কাজ ফেলে
খেয়ালের কথা রাখে? শুধু তোর পথে কাঁদে ধূলি,
ঘাসের চপ্পলে লাগে বিকেলের রোদ্দুরের তুলি!

ওপারেতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা, উপন্যাসে
দূরের অধ্যায় খোলা, এ-পারেতে কে আসে কে আসে
প্রতীক্ষার স্তব্ধ ছায়া। তোমার আশ্চর্য তাস-ঘরে
ব্যথার ভোমরা এল কী গুনগুনিয়ে, ভয় করে।

আমি ত অসংখ্যবার ভীরু, তাই তুমি তাকে বোলো
কেউ এল, কেউ গেল, চোখের জলের শব্দ হল॥

কবিতা—সমুদ্র দেখার আগে

শান্তিকুমার ঘোষ

আ এই সমুদ্র—কোন উপমা পেয়েছে খুঁজে হৃদয় আমার:
অতলান্ত অনুরাগ উঠেছে উচ্ছ্বিত হয়ে ভেঙে বার বার
মানবিক পৃথিবীর ঘন আলিঙ্গনে—মুঠো মুঠো চূর্ণ মণি
শিল্প গাথাগান রেখে জীবনের তটে। কান পেতে শুধু শুনি
পৃথিবীর ঐকতান—অশ্রু-হাসি ফেনা-ফুল বুদ্বুদ মালায়
শতরঙ্গ কাহিনীর গভীর উদাত্ত সুর তরঙ্গ-দোলায়।
বিপুল জঙ্গম বেগ—মুহুর্মুহু রূপান্তর, সৃষ্টির উল্লাস,
আদিম প্রকৃতি সেই প্রত্যয় প্রমিতি প্রজ্ঞা ব্যাপ্ত প্রতিভাস।

খান্ খান্ করে ফের বিশাল পাহাড়-ঢেউ ইঞ্জিন গর্জনে
নাবিকের চোখ চলে নীল দ্বীপ আবিষ্কারে: অনেক গহনে
রশি-ধরে-নেমে-আসা ডুবুরীর চোখে দোলে আশ্চর্য বিতান,—
উদ্ভিদ অতলে ফেরে চিত্রিত সোনালী মাছ: দুরন্ত সন্ধান
জলজগতের ছায়া হিংসা ভয় জেনে তবু কঠিন প্রহারে
অণুকেও চূর্ণ করে অক্ষরেখা দ্রাঘিমায় বাঁধে চারিধারে।
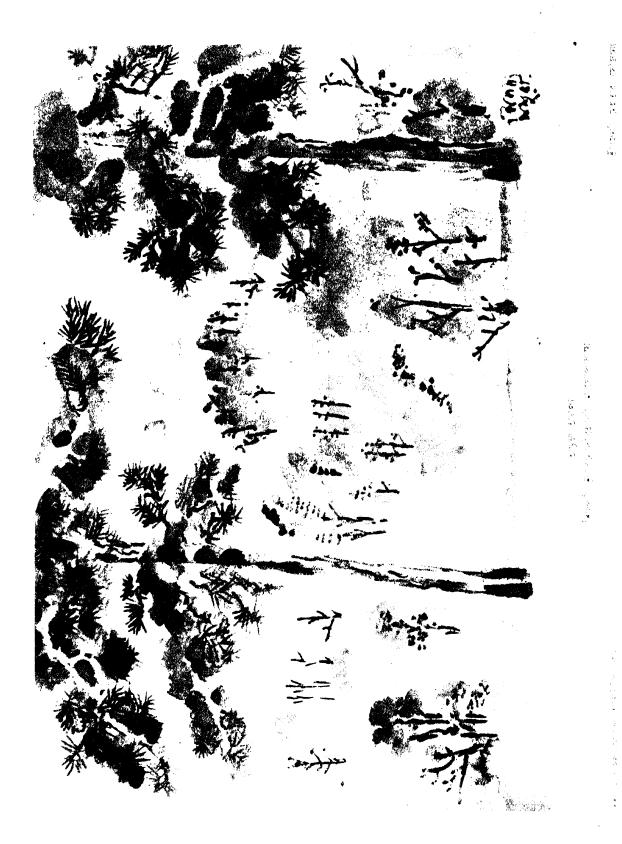
দালতে দায়রা মামলা চলছিল। মামলার সবে প্রারম্ভ।

অশোক-স্তম্ভখচিত প্রতীকের নীচেই বিচারকের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। অচঞ্চল, স্থির, নিরাসক্ত মুখ, চোখের দৃষ্টি অপলক। সে-দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত, কিন্ত কোন কিছুর উপর নিবদ্ধ নয়। সামনেই কোর্টরুমের ডান দিকের প্রশস্ত দরজাটির ওপাশে বারান্দায় মানুষের আনাগোনা। বারান্দার নীচে কোর্ট-কম্পাউণ্ডের মধ্যে শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রিমিঝিমি বর্ষণ বা দেবদারু গাছটির পত্রপল্লব বর্ষণসিক্ত বাতাসের আলোড়ন, সব কিছু ঘষা কাচের ওপারের ছবির মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা আকার আছে, জীবন-স্পন্দনের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার আবেদন নেই; বন্ধ জানালার ঘষা কাচের ঠেকায় ওপারেই ফুরিয়ে গেছে। সরকারী উকিল প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে মামলাটির আনুপূর্বিক বিবরণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি মনের পটভূমিতে সেই ঘটনাগুলিকে পরের পর তুলি দিয়ে এঁকে এঁকে চলেছিল। ক্বচিৎ কখনও সামনের টেবিলের উপর প্রসারিত তাঁর ডান হাত-খানিতে ধরা পেন্সিলটি ঘুরে-ঘুরে উঠছিল অথবা অত্যন্ত মৃদু আঘাতে আঘাত করছিল। তাও খুব জোর মিনিট খানেকের জন্য।

প্রবীণ গম্ভীর মানুষ। বয়স ষাটের নীচেই। গৌরবর্ণ সুপুরুষ, সবল কর্মঠ দেহ, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নভাবে কামানো গৌরবর্ণ মুখে নাকের দুপাশে দুটি এবং চওড়া কপালে সারি সারি কয়েকটি রেখা তাঁর সারা অবয়বে যেন একটি ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। লোকে, বিশেষ করে উকিলেরা—যাঁরা তাঁর চাকরি-জীবনের ইতিহাসের কথা জানেন—বলেন, অতিমাত্রায় চিন্তার ফল এ-দুটি। মুনসেফ থেকে জ্ঞানেন্দ্রবাবু আজ জজ হয়েছেন, সে অনেকেই হয়, কিন্তু তাঁর জীবনে লেখা যত রায় আপিলের অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে, এত আর কারুর হয়েছে বলে তাঁরা জানেন না। রায় লিখতে এত চিন্তা করতে কাউকে তাঁরা দেখেননি।

জ্ঞানবাবুর আরদালী বলে, “রাত্রি বারোটা তো সাহেবের রাত নটা হুজুর। রাত্রি দুটোর সময়ে ঘুম ভেঙে বাইরে উঠে, তা মাসে পাঁচ সাতদিন সাহেবের সাড়া পাই।

এক একদিন চটির সাড়া ওঠে। উ'কি মেরে দেখেছি, পিছনে হাত দুটো মুঠো বে'ধে সামনের দিকে ঝ'ুকে ঘুরছেন; মধ্যে মধ্যে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ ওঠে, বাথরুমে মাথা ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসেন। তা কখনও চাকর-বাকরদের ডাকেন না। বলেন, সারাদিন খেটে রাত্রে না-ঘুমুলে ওরা পারবে কেন? মানুষ তো!"

আরদালীই বলে, "মাঝে মাঝে মেমসাহেব ঝগড়া শুরু করে দেন। বলেন, 'দুনিয়ার সবাই মানুষ। রাত্রে ঘুম না-হলে কারুরই চলে না। চলে শুনেছি এক ভগবানের। তা জানতাম না যে, জজিয়তি আর ভগবান-গিরিতে তফাত নেই।' তারপর বলেন, 'তাই বা কেন? আমার বাবাও জজ ছিলেন।'"

আরদালী বলে, "এক একদিন সাহেব শুধু বলেন, প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ! মেম-সাহেব রেগে চলে যান। এক একদিন সাহেব হাসেন। সে-দিন রায় লেখা তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। মেমসাহেবও তা বুঝতে পারেন; বেশী করে ঝগড়া করেন। বলেন, 'মুনসেফ থেকে তো জজ হয়েছ। ছেলে নেই, পুলে নেই। আর কেন? আর কী হবে? হাই-কোর্টের জজ, না সুপ্রীম কোর্টের জজ? ওঃ! এখনও আকাঙ্ক্ষা গেল না?'"

আরদালী বলে, "সাহেব সে-দিন বলেন, 'নাঃ। আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। ঠিক সময়ে রিটায়ার করব এবং তারপর সেই ফার্স্ট বুকের নির্দেশ মেনে চলব। গেট আপ অ্যাট ফাইভ, গো টু বেড অ্যাট নাইন। তা-ই বা কেন, এইট। সকালে উঠে মর্নিং ওয়াক করব; তারপর থলে নিয়ে বাজার যাব। বিকেলে মার্কেটে গিয়ে তোমার বরাতমত উল-সুতো কিনে আনব। এবং বাড়িতে তুমি ক্রমাগত বকবে, আমি শুনব। কিন্তু যতদিন চাকরিতে আছি, ততদিন এ থেকে পরিত্রাণ আমার নেই।' বলতে বলতে সাহেব হাসেন সে এক ধরনের হাসি। এই সে-দিন সায়েব বললেন, 'হাইকোর্টে রায় টিকবে কি না-টিকবে সে আর আমি ভাবিনে। ভাবি, নিজে আজ যা' রায় দেব, দু মাস কি ছ মাস কি ছ বছর পরে নিজেই না সে-রায় ভুল হয়েছে বলে নিজের ওপর স্ট্রিকচার দি। ভগবান-গিরির সঙ্গে জজ-গিরির তুলনা করলে—'"

আরদালী বলে, "মেমসাহেব সাহেবের কথার উপরে কথা কয়ে ওঠেন। সাহেবকে বেশ খোঁচা দিয়ে বলেন, 'না, তা বললাম কখন? বললাম তো আমার বাবাও জজ ছিলেন; তাঁর তো এমন দেখিনি। আরও অনেক জজ আছেন, তাঁদেরও এমন জানি না। বললাম, তোমার জজিয়তি আর ভগবান-গিরিতে তফাত নেই।'"

আরদালীটি অল্পবয়সী, ম্যাট্রিক পাশ। সাহেব-মেমের কথাবার্তার সূক্ষ্ম খোঁচখাঁচ-গুলিও বেশ লক্ষ্য করে। সে বলে, "সাহেব চোখ দুটি বন্ধ করে বেশ মিষ্টি হেসে *দেন। বলেন, 'তাই। আমার জজিয়তি আর ভগবান-গিরির কথাই হল। আমি অবিশ্যি ভগবানে বিশ্বাস ঠিক করিনে, সে তুমি জান, তবু তুলনা যখন করলে তখন ভগবান-গিরির যে-সব বর্ণনা তোমরা কর,—ভাল ভাল কেতাবে আছে—সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভগবান-গিরির চেয়েও কঠিন।* কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে মালিক কেউ নাই; সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যাট। করুণা করতে তাঁর বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন। পাপপুণ্যের ব্যালান্স শীট তৈরি করে পুণ্য বেশী হলে পাপগুলোর চার্জশীট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করতে পারেন। মানুষ জজ তো তা পারে না। আমি তো পারিই না।'"

অক্ষরে-অক্ষরে সত্য কথাগুলি। নিজের সম্পর্কে দম্ভপ্রকাশ করেননি জ্ঞানেন্দ্রবাবু। তিনি পারেন না। দু বছর আগে এ-জেলায় এসে যে-অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, সে-কথা তিনি নিজে ভুলতে পারেননি। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, এস্ পি, সিভিল সার্জেন প্রভৃতি পদস্থ কর্ম-চারীরা, এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেও সে-দিন তাঁর কাছে প্রত্যা-খ্যাত হয়েছিলেন। তবে একটা কথা। তাতে দুঃখ তাঁরা পেয়েছিলেন কিন্তু অপমানবোধ কেউ করেননি। বরং মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করেছিলেন তাঁরা, তাঁর প্রতি তাঁদের সম্ভ্রম বেড়ে গিয়েছিল।

সেও দায ... ার
অপরা ... র
বল ... সেও
সাক্ষী
...র ছেলে
হয়েছিল।
সে আপত্তি
আবার তুই
ব আমি
অন্ধ,

হয়তো বা উন্মত্ত। সে শোনেনি। উপদেশ অনুরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর হল বিরোধ। বিরোধের পরিণতি হল বিচ্ছেদে। মা-মরা নাতি দুটিকে নিজের কাছে রেখে নিজের সম্পত্তি দশ বিঘা জমির তিন বিঘা ছেলেকে দিয়ে ছেলেকে পৃথক করে দিয়ে-ছিল। বলেছিল, ওই নিয়ে তুই দূরে হ। গোয়াল-ঘরটাও দিলাম, ওইখানে গিয়ে থাক। এ বাড়ি আমার, ঢুকিসনি, আমার ধর্ম চঞ্চল হবেন। মৃত্যুর সময়েও আমার মুখে জল তুই দিসনে, মুখাগ্নিও করতে পাবিনে শ্রাদ্ধও না। ভগবান যদি আজ আমার চোখ দুটি নেন, তবে আমি বাঁচি। তোরে মু আমাকে আর দেখতে হয় না। পরের দি রাত্রে বাপ খুন হল। *গরমের সময়, দাওয়ার* উপর একদিকে শুয়ে ছিল বৃদ্ধ, অন্যদিকে *নাতি দুটিকে নিয়ে শুয়ে ছিল বৃদ্ধা। গভীর রাত্রে কুড়ুল দিয়ে কেউ বৃদ্ধের মাথাটা দু ফাঁক করে দিয়ে গেল। একটা চিৎকার শব্দে* ধড়মড় করে বৃদ্ধা উঠে বসে হত্যাকারীকে ছুটে উঠোন পার হয়ে ছুটে চলে যেতে দেখে চিনেছিল যে, সে তার ছেলে। মাথায় কোপ একটা নয়, দুটো। একটা কোপ, বোধ করি প্রথমটা, পড়েছিল এক পাশে; দ্বিতীয়টা ঠিক মাঝখানে। মা সাক্ষী দিলে, আবছা অন্ধকার তখন, চাঁদ সদ্য ডুবছে, তার মধ্যে পালিয়ে গেল লোকটি, তাকে সে স্পষ্ট দেখেছে। সে তার ছেলে। আসামী ভা উকিল দিয়েছিল। বাপের দানপত্র ক দেওয়া সব জমিটা হাজার টাকায় বিক্রি ব্যবস্থা করে ফৌজদারীতে জেলার সব থে ভাল উকিলকে নিযুক্ত করেছিল। উকি জেরা করতে বাকী রাখেননি। মায়ের শু এক কথা। "বাবা—"

উকিল সুযোগ পেয়ে ধমক দিয়ে উ ছিলেন, "না। বাবা নয়! বাবা-টাবা ন বল, হুজুর।"

মা বলেছিল, "হুজুর, মায়ের কি ছে চিনতে ভুল হয়? আমি যে চল্লিশ বছর মা। দুপুর বেলা মাঠ থেকে ফিরে এ ওর পিঠে আমি রোজ তেল মা দিয়েছি।"

উকিল বলেছিলেন, "ছেলের স তোমার অনেক দিনের ঝগড়া। আজ বছর ঝগড়া। ছেলের বিয়ে হওয়া থে ছেলের সঙ্গে তোমার মনোমালি তোমাদের ঝগড়া হত। বল সত্যি কি ন

মা বলেছিল, "তা খানিক সত্যি কিন্তু সে মনোমালিন্য নয় হুজুর। পরিবার-পরিবার বাই ছিল, তাই বকাবকি হত। সে বকাবকিই, কিছু নয়।"

উকিল বলেছিলেন, "না। আমি

সেই আক্রোশে তুমি বলছ তুমি চিনতে পেরেছ। নইলে আসলে তুমি চিনতে পারনি।"

মা বলেছিল, "চিনতে আমি পেরেছি হুজুর। আক্রোশও আমার নাই। ও আমার নিজের ছেলে। ধর্মের মুখ তাকিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে হুজুর। আমি মিছে কথা বললে ও হয় তো এখানে খালাস পাবে। কিন্তু পরকালে কী হবে ওর? মরতে একদিন হবেই। আমিই বা কী বলব ওর বাপের কাছে? আমি সত্যিই বলছি। হুজুর বিচার করে খালাস দিলে ভগবান ওকে খালাস দেবেন, সাজা দিলে সেই সাজাতেই ওর পাপের দণ্ড হয়ে যাবে; নরকে ওকে যেতে হবে না।"

জুরিরা একবাক্যে বলেছিলেন, "আসামী দোষী।"

জ্ঞানবাবু জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিলেন, "জুরিদের নির্ধারণ আমি গ্রহণ করছি।" কিন্তু সেই মুহূর্তেই দণ্ডাদেশ ঘোষণা করতে পারেননি। দণ্ডাদেশ পরে ঘোষণা করবেন বলে উঠে গিয়েছিলেন। এরপর তিনদিন সে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব! তিনটি রাত্রি তিনি একবারের জন্য ঘুমোননি। কাগজ কলম নিয়ে রায়ের সবটাই প্রায় লিখে ফেলে ওই দণ্ডাদেশের কয়েক লাইন অসমাপ্ত রেখে অবিশ্রান্ত পদচারণ করেছিলেন। এদিকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মহলে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। জ্ঞানবাবুর এই বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কথা তাঁদের কানে পৌঁছুতে বাকি থাকেনি। সিভিল সার্জেন এসেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন এস-পি। এস-ডি-ও যিনি, তিনিও এসেছিলেন। নতুন জজসাহেব শেষে কি ফাঁসির হুকুম দেবেন? এঁদের যে উপস্থিত থেকে দণ্ডাদেশকে কাজে পরিণত করতে হবে!

ভোরবেলা, আবছা অন্ধকারের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চটাকে দেখে অদ্ভুত মনে হবে। মৃত্যুপুরীর হঠাৎ খুলে-যাওয়া দরজার মত মনে হবে। মনে হবে, দরজাটার চারিপাশের কাঠগুলো থেকে কপাট-জোড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে মৃত্যুর গ্রাসের মত। তারপর দূর থেকে হয় তো হতভাগ্যের কাতর আর্তনাদ উঠবে। হয় তো ঝুলিয়ে তুলে নিয়ে আসবে একটা হাড় আর মাংসের বিহ্বল বোঝাকে। ওঃ! তারপর দণ্ডাদেশ পড়তে হবে। দণ্ডিত হতভাগ্যের মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দেবে। ওঃ!

সিভিল সার্জেন বলেছিলেন, "এ জেলে আজ তিরিশ বছর ফাঁসি হয়নি। গ্যালোজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। মধ্যে আছে একটা

টিবি। সব নতুন করে তৈরি করতে হবে।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বিচলিত হয়েছিলেন। "না-না। ফাঁসি কেন? অন্য কিছু। ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ! একটা মানুষকে—হাতে পায়ে বেঁধে—ওঃ! টেরিবল্! হরিবল্!"

পরামর্শ করে ওঁরা এসেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর কুঠিতে। ইঙ্গিতে অনুরোধও জানিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু বলেছিলেন, "তিনদিন আমি ঘুমুইনি। শুধু ভেবেছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন, "আমি শুনেছি। মানুষকে ডেথ সেণ্টেন্স দেওয়ার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য আর কিছু হয় না।"

জ্ঞানবাবু বললেন, "আমার স্ত্রীও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু কী করব আমি? মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোন দণ্ড নেই এ-কেসে। অন্য দণ্ড হয় না। অন্তত ওর মা যা বলেছে, তারপর। মৃত্যুদণ্ডই ওকে নিতে হবে। ইয়েস। আজ সকালেই রায় আমি লিখে শেষ করেছি। ডেথ সেণ্টেন্স ইজ দি ওনলি সেণ্টেন্স, এ ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারি না আমি। ইয়েস! আই কাণ্ট!"

সারাটা কর্মজীবন জ্ঞানবাবুর এই এক ধারায় চলে আসছে।

সরকারী উকিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘটনা বর্ণনা করে চলেছিলেন। খোলা দরজার পথে যে-লোকটির স্থির দৃষ্টি বাইরের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে দৃষ্টির সঙ্গে কোন দূরে চলে গিয়েছে মানুষটির মন, ঘটনার বর্ণনায় কোন অসঙ্গতি ঘটলে মুহূর্তে সেই মানুষটি চকিত হয়ে ঘুরে তাকাবেন, ভ্রূ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন, "হোয়াট? কী বললেন মিঃ মিত্র?"

আজও প্রশ্ন করলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, "হোয়াট? কী বলছেন মিঃ মিত্র? ছোট ভাই খগেন্দ্র ঘোষ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বড় ভাইকে,—আসামী নগেনকে? আসামী ডেকে নিয়ে যায়নি খগেনকে?"

"ইয়েস, ইয়োর অনার! ছোট ভাই খগেনই ডেকেছিল।"

"দ্যাটস অল রাইট। গো-অন প্লীজ!"

সরকারী উকিল অবিনাশবাবু প্রবীণ এবং বিচক্ষণ উকিল। মামলার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে তৈরী হয়ে এসেছেন। তাঁর ঠোঁটে একটি অতিসূক্ষ্ম হাস্যরেখা ফুটে উঠল। জ্ঞানবাবুর মত তীক্ষ্নদৃষ্টি মেধাবী জজকে তাঁর চাতুর্যে একটুখানি চঞ্চল করে তুলবেন। একটানা বন্যার মুখে, তটভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত ছোট একটি বা দুটি গাছের ভাঙা ডালকে প্রখর স্রোতে ডুবিয়ে এবং ভাসিয়ে নিয়ে নদী যেমন নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত বেগে বয়ে চলে যায়, তেমনি ভাবেই তিনি বলে গেলেন, "ইয়েস ইয়োর অনার! নগেনেরই আসবার কথা। কথাও তাই ছিল। কিন্তু সে আসেনি। এইটিই হল আসামীর সুচিন্তিত পরিকল্পনার অতি সূক্ষ্ম চাতুর্য। অন্যদিকে এই অতিচতুরতাই তার উদ্দেশ্যকে ধরিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত সহজে ধরিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত সহজেই এ-তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। অবশ্য আর-একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে; কিন্তু তাতেও ওই একই সত্যে উপনীত হই আমরা। ইয়োর

অনার, সমস্ত বিষয়টি যথার্থ পটভূমির উপর উপস্থাপিত করে চিন্তা করে দেখতে হবে। পটভূমিটি কী? পটভূমি হল—বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের একটি স্বল্পবিত্ত চাষীর সংসার। সুবল ঘোষ একজন চাষী। আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর আগের চাষীদের একজন। তখনকার দিনের ধর্মবিশ্বাসে সামাজিক বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই বিচিত্র প্রকৃতির। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রথমটায় এই বালক অত্যন্ত দুর্দান্ত। বাপ একমাত্র ছেলেকে অনেক আশা পোষণ করে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিল। সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও ছেলেকে মানুষের মত মানুষ, ভদ্র শিক্ষিত মানুষ, তৈরি করবার সাধকে সে খর্ব করেনি। কয়েকমাইল দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বোর্ডিংয়ে রেখেছিল। ইস্কুলের রেকর্ডে আমরা পাই, ছেলেটি আরও কতকগুলি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশে ইস্কুলে প্রায় নিত্যশাসনের পাত্র হয়ে ওঠে এবং দুবছর পরেই ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। তার কারণ কী জানেন? তার কারণ চৌর্যাপরাধ এবং হত্যা; মানুষ নয়—জন্তু। বোর্ডিংয়ের কাছেই ছিল একজন ছাগল-ভেড়া ব্যবসায়ীর খামার এবং গোয়াল। এই গোয়াল থেকে নিয়মিতভাবে—দু-চার দিন পর পর—ছাগল ভেড়া অদৃশ্য হত। কোন চিহ্ন পাওয়া যেত না। রক্তের দাগ না, কোন রকমের চিৎকার শোনা যেত না, কোন হিংস্র জানোয়ারেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত অনেক সতর্ক চেষ্টার পর ধরা পড়ল এই দলের একটি ছোট ছেলে। সে স্বীকার করলে, এ কাজ তাদের। তারা এই ছাগল ভেড়া চুরি করে গভীর রাত্রে রান্না করে ফিস্ট করত। বিচিত্রভাবে অপহরণ করত এই বালক। এই আসামী নগেন ঘোষ। কয়েকটি গোপন প্রবেশ-পথ সে করে রেখেছিল। একটি জানালাকে এমনভাবে খুলে রেখেছিল যে, কেউ দেখে ধরতে পারত না, জানালাটি টানলেই খুলে আসে। সে ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেটিকে সামনে পেত, সেইটিকেই মুহূর্তে গলা টিপে ধরত, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে ঘুরিয়ে দিত। এতে সে প্রায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিল। এবং এই কারণের জন্যই হেডমাস্টার তাকে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বাপ এর জন্য অত্যন্ত মর্মাহত হয়। এবং ছেলেকে কঠিন তিরস্কার করে। তারা বৈষ্ণব, এই অপরাধ তাদের পক্ষে মহাপাপ, সেই পাপের জন্য ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করায়। ছেলে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে। বারো বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসে। তখন তার বয়স প্রায় আটাশ উনত্রিশ। ইয়োর অনার, সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে আসে। তখন এই যে ক্ষুদ্র শান্ত চাষীর সংসারটি, সে-সংসারে পরিবর্তনশীল কালের স্রোতে অনেক ভাঙন ভেঙেছে এবং অনেক নূতন গঠনও গড়ে উঠেছে। নগেনের মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার ভগ্নী বিধবা হয়েছে, বাপ সুবল ঘোষ বংশলোপের ভয়ে আবার বিবাহ করেছে, এবং একটি শিশুপুত্র রেখে সে-পত্নীটিও পরলোকগমন করেছে। সুবল ঘোষ তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শিশুপুত্রটিকে মানুষ করছে সুবলের বিধবা কন্যা, আসামী নগেনের সহোদরা।

"সুবল হারানো ছেলেকে পেয়ে আনন্দে অধীর হল। এবং তার অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে উঠল। বললে, 'তুই এ-বেশ ছাড়!'

"নগেন বললে, 'না।'

"বাপ বললে, 'ওরে তুই হবি সন্ন্যাসী; হয়তো নিজে পাবি পরমার্থ, মোক্ষ। কিন্তু এই আমাদের পিতিপুরুষের ভিটে, এই ঘোষ বংশ? ভেসে যাবে?'

"নগেন বললে, 'ওই তো খগেন রয়েছে।'

"সুবল বললে, 'ছ বছরের ছেলে, ও বড় হবে, মানুষ হবে, ততদিনে মানুষ-অভাবে ঘর পড়বে, দোর ছাড়বে; জমিজেরাত ক্ষুদকুঁড়ো দশজনে আত্মসাৎ করে পথের ভিখিরী করে দেবে। ওই বিধবা যুবতী ঘোষ বংশের মেয়ে—তোর মায়ের পেটের বোন—ওর অবস্থা কী হবে ভাব? মন্দটাই ভাব!'

"নগেন বললে, 'বেশ, খগেনকে বড় করে ওর বিয়ে দিয়ে ঘরসংসার পাতিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি রইলাম। কিন্তু আর কিছু আমাকে বল না।'"

পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর হাতের কাগজগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোর্টের দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন। পাঁচটার দিকে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। টেবিলের উপর কাগজ-ঢাকা কাচের গ্লাসটি তুলে খানিকটা জল খেয়ে আবার আরম্ভ করলেন, "ইয়োর অনার, মানুষের মধ্যেই জীবনশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। জড়ের মধ্যে যে-শক্তি অন্ধ দুর্বার, জন্তুর মধ্যে যে-শক্তি প্রবৃত্তির আবেগেই পরিচালিত, মানুষের মধ্যে সেই শক্তি মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে। জন্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না; সার্কাসের জানোয়ারকে অনেক শাসন করে অনেক মাদক খাইয়েও তার সামনে চাবুক এবং বন্দুক উদ্যত রাখতে হয়। মানুষেরই একমাত্র পরিবর্তন আছে, তার প্রকৃতি পাল্টায়। ঘাতে-প্রতিঘাতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, নানা কার্য-কারণে তার প্রকৃতির শুধু পরিবর্তনই হয় না, সেই পরিবর্তনের মধ্যে মহত্তর প্রকাশে প্রকাশিত করতে চায় নিজেকে এইটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রের নিয়ম। অবশ্য বিপরীত দিকের গতিও দেখা যায়, কিন্তু সে দেখা যায় স্বল্পক্ষেত্রে।"

জ্ঞানবাবুর গম্ভীর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। অবিনাশবাবু চতুর ব্যক্তি। অসাধারণ কৌশলী। এইমাত্র যে-কথাগুলি তিনি বললেন, সে-গুলি তাঁর অর্থাৎ জ্ঞানবাবুর কথা। কিছুদিন আগে এখানকার লাইব্রেরিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই কথাগুলিই বলেছিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, "তৎকালীন আচার-আচরণ কাজকর্ম সম্পর্কে যে প্রমাণ আমরা পাই, তাতে আমি স্বীকার করি যে, আসামী নগেনের প্রকৃতির একটি

পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সে-পরিবর্তন সৎ ও শুদ্ধ পরিবর্তন। তার বারো বৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের ইতিবৃত্ত আমরা জানি না কিন্তু পরবর্তীকালের নগেনকে দেখে বলতে হবে, এই অজ্ঞাতকালে সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ এবং তীর্থ ইত্যাদি ভ্রমণের ফল নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর। না-হলে, অর্থাৎ সেই বর্বর পাষণ্ডতা তার মধ্যে সক্রিয় থাকলে, সে অনায়াসেই তার বাপের মৃত্যুর পর ছ-বছরের বালক খগেনকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে পারত। তার পরিবর্তে সে এই সৎভাইকে ভালবেসে বুকে তুলে নিলে। শুধু তাই নয়, বাপের মৃত্যুর কিছুদিন পর বিধবা মা মারা যায়। তারপর এই নগেনই একাধারে মা এবং বাপ দুইয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করে। ছেলেটি দেখতে ছিল অত্যন্ত সুন্দর। নগেন খগেনকে খগেন বলে ডাকত না, ডাকত গোপাল বলে। টোপরের মত কোঁকড়া একমাথা চুল, কাঁচা কাঁচা রঙ, বড় বড় চোখ। ছেলেটি সত্যিই দেখতে গোপালের মত ছিল।"

একটু থেমে হেসে অবিনাশবাবু বললেন, "এক্সকিউজ মি ইওর অনার, আমি এ-ক্ষেত্রে একটু কাব্য করে ফেলেছি। বাট আই অ্যাম নট আউট অব মাই বাউন্ডস, ইয়োর অনার। কারণ—"

জ্ঞানবাবু বললেন, "একটু সংক্ষেপ করুন।"

অবিনাশবাবু বললেন, "এই মামলাটি অতি বিচিত্র ধরনের, ইয়োর অনার। আমার মনে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং তার বিশ্লেষণ ভিন্ন আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পারব না। আসামী নিজে স্বীকার করেছে যে, নৌকো উল্টে নদীর মধ্যে দুজনে জলে ডুবে গিয়েছিল। ছোট ভাই সাঁতার ভাল জানত না, সে বড়ভাইকে জড়িয়ে ধরে, বড় ভাই আসামী নগেন সেই অবস্থায় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য আত্মরক্ষার জান্তব প্রকৃতির তাড়নায় তার গলার নলি টিপে ধরে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে উঠে কোন রকমে এসে নদীর বাঁকের মুখে চড়ায় ওঠে। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায় ওই চড়ায়, আরও খানিকটা নীচে। মৃত খগেনের শবব্যবচ্ছেদের যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতেও দেখেছি খগেনের গলায় কণ্ঠনালীর দুই পাশে কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। ডাক্তার বলেন, নখের দ্বারাই এ ক্ষতচিহ্ন হয়েছে। এবং শবের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেছে অতি অল্প; জলে ডুবে মৃত্যু হলে আরও অনেক বেশী পরিমাণে জল পাওয়া যেত। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ-মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরোধের ফলে, এবং কণ্ঠনালী প্রচণ্ড-শক্তিতে টিপে ধরার জন্য মৃতের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। এখন এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য, আসামী নগেন মানসিক কোন অবস্থায় খগেনের গলা টিপে ধরেছিল। সেই মানসিক অবস্থার অভ্রান্ত স্বরূপ নির্ণয়ের উপরই অভ্রান্ত বিচার নির্ভর করছে। সামান্যমাত্র ভ্রান্তিতে বিচারের পবিত্রতা মহিমা কলঙ্কিত হতে পারে, নষ্ট হতে পারে। আমরা নির্দোষ একটি অতি সাধারণ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে মানবিক জ্ঞান হারিয়ে আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির অধীন হওয়ার জন্য তাকে ভুল করে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার ভ্রম করতে পারি। আবার বিপরীত ভুলের বশে অতি-সুচতুর অতিকুটিল ষড়যন্ত্র ভেদ করতে না-পেরে নিষ্ঠুরতম পাপের পাপীকে মুক্তি দিয়ে মানব-সমাজের চরমতম অকল্যাণ করতে পারি। ইয়োর অনার, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ সংসারে অনেক আছে, কিন্তু মনুষ্যচর্মাবৃত নরঘাতী পশু বা বিষধরের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সিংহচর্মের আবরণ টেনে খুলে দিলেই সমাজ নিরাপদ হয়, সমাজে কৌতুকের সৃষ্টি হয়; মনুষ্যচর্মাবৃত পশু বা সরীসৃপের মনুষ্যচর্মের আবরণ মুক্ত করলে মানুষের সমাজ আতঙ্কিত হয়; তখন সমাজকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে সমাজেরই উপরে। এই কারণেই আমাকে অতীতকাল থেকে এ-পর্যন্ত এই আসামীর জীবন ও কৃতকর্মগুলি বিশদ-ভাবে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। ধর্মাধিকরণে বিচারক মানুষ হয়েও মানুষের উর্ধ্বে অবস্থান করেন, স্থূলে প্রমাণপ্রয়োগসম্মত বিচার করার চেয়েও তাঁর বড় দায়িত্ব আছে; স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।"

কোর্টের বাইরে কম্পাউন্ডের ওদিক থেকে পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। কোর্টরুমের ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজতে দু'মিনিট বাকী।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন, "কাল এগারটা পর্যন্ত মামলা মুলতুবী রইল।" একবার তাকিয়ে দেখলেন আসামীর দিকে। সবল সুস্থদেহ নগেন ঘোষ, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি লোকটির। এবং লোকটির মুখ যেন পাথরে গড়া। কোন ভাবের অভিব্যক্তি নাই।

লোকটি থানা থেকে এস-ডি-ও কোর্ট এবং এখান পর্যন্ত স্বীকার করে একই কথা বলে আসছে। নৌকোতে নদী পার হবার সময় বাতাস একটু জোর ছিল; মাঝ নদী পার হয়েই বাতাস আরও জোর হয়ে উঠেছিল, খগেন সাঁতার প্রায় জানত না, সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, নগেন হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে তাকে বলে, ভয় কী? খগেন মুহূর্তে নৌকোর ওপাশ থেকে এপাশে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকোখানা যায় উল্টে। জলের মধ্যে খগেন তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। তারা ডুবতে থাকে। প্রথমটা সে তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যত চেষ্টা করছে, ততই সে নগেনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, জল খাচ্ছিল সে, হঠাৎ খগেনের গলায় তার হাত পড়ে। সে তার গলাটা টিপে ধরে। খগেন তাকে ছেড়ে দেয়। সে জানে না, খগেন তাতেই মরেছে কি না। কিনারায় এসে উঠে কিছুক্ষণ সে শুয়ে ছিল সেখানে। তারপর কোনরকমে উঠে বাড়ি আসে। মাঝ রাত্রে তার শরীর সুস্থ হলে মনে হয়, খগেন হয়তো মরে গেছে। হয়তো গলা টিপে ধরাতেই সে মরে গিয়েছে। সকালে উঠে সে থানায় যায়। এজাহার করে। এর সাজা কী সে তা জানে না। ভগবান জানেন। যা সাজা হয় জজসাহেব দিন, সে তাই নেবে।

ভগবান জানেন! হায় হতভাগ্য! নিজে কী করেছে তা নিজে জানে না। ভগবানকে সাক্ষী মানে। কিন্তু ভগবান তো সাক্ষী দেন না। অথচ ডিভাইন জাস্টিস!

॥ দুই ॥

ডিভাইন জাস্টিস।

ডিভাইন জাস্টিস কথাটা তিনি নিজে ব্যবহার করেন। তিনি শিখেছিলেন তাঁর গুরু সুরমার বাবা জাস্টিস চ্যাটার্জির

কাছে। ডিভাইন জাস্টিস! ভগবান সাক্ষী দেন না, বিচারও করেন না, কিন্তু ভগবানের বিচারের আদর্শ একটা আছে, মানুষ পেয়েছে। ডিভাইন জাস্টিস! ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে বার বার তিনি মৃদু স্বরে উচ্চারণ করে চলেছিলেন, ডিভাইন জাস্টিস, ডিভাইন জাস্টিস। ডিভাইন জাস্টিস।

স্ত্রী সুরমা দেবী কুঠির হাতার বাগানের মধ্যে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে বই পড়ছিলেন। সারা দিনের বাদলার পর ঘণ্টাখানেক আগে মেঘ কেটে আকাশ নির্মল হয়েছে, রোদ উঠেছে। সে-রৌদ্রের শোভার তুলনা নাই। ঝলমল করছে সুস্নাত সুশ্যামল পৃথিবী। সম্মুখে পশ্চিম দিগন্ত অবারিত। কুঠিটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা টিলার উপর। এর ওপাশে পশ্চিম দিকে বসতি নেই, মাইল দুয়েক পর্যন্ত অন্য কোন গ্রাম বা জঙ্গল পর্যন্ত নেই, লাল কাঁকুরে প্রান্তরের মধ্যে তিন চারটে অশ্বত্থ গাছ আর একটা তাল গাছ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রান্তরটার মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা পাহাড়িয়া নদী। ভরা বর্ষায় নদীটা এখন কানায় কানায় ভরে উঠে বয়ে যাচ্ছে। তারই ওপাশে অবাধ প্রান্তরের দিগন্তের মাথায় সিঁদুরের মত টকটকে রাঙা অস্তগামী সূর্য। রৌদ্রের মধ্যে লালচে আভা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আরদালী নেমে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন গাড়ির মধ্যে। আরদালী মৃদুস্বরে ডাকলে, "হুজুর!"

চমক ভাঙল জ্ঞানেন্দ্রবাবুর। "ও!" বলে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন।

সুরমা দেবী হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "শিগগির পোশাক ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এস।"

"চা তৈরি করে ফেলেছ?"

হেসেই সুরমা দেবী বললেন, "চা জুড়িয়ে গেলে আবার নতুন তৈরি করলেই চলবে। কিন্তু কেমন সন্ধ্যার শোভা হয়েছে দেখেছ? এ চলে গেলে আর ফিরবে না।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু একটু হাসলেন। সুরমার জীবন একভাবেই গেল চিরদিন। সুরমা তাঁর থেকে দশ বছরের ছোট। পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি, তবে কাছে পৌঁছেছে। এখনও জীবনে কাব্য ওর গেল না। প্রথম বয়সে সুরমা কবিতা লিখত। সুরমার জন্যে তিনিও কবিতা লিখেছেন। জজিয়তি দপ্তরে তাঁর কবিত্ব পাথর-চাপা ঘাসের মত মরে গেছে, কিন্তু সুরমার জীবনে বারোমেসে ফুল ফোটানো গাছের মত কাব্যরুচি এবং কবিকর্ম নিরন্তর ফুটেই চলেছে, ফুটেই চলেছে! বারোমেসে ফুল ফোটানো সেই গাছের মতই সুরমার জীবন, যাতে শুধু ফুলই ফোটে, ফল ধরে না। সুরমা নিঃসন্তান। তাঁর মুখের হাসিটুকু ক্ষীণ রেখায় লেগেই রইল, তিনি চলে গেলেন বাংলোর ভিতর।

সুরমা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে। অপরূপ শোভা হয়েছে। মনের মধ্যে গান গুনগুন করছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সামনের দেওয়ালে চোখ পড়ে ব্রোমাইড এনলার্জ করা একখানা ফটোগ্রাফ। সদ্যবিবাহিতা তরুণী সুরমার ছবি। লাবণ্য-ঢলঢল মুখ, মদির-দৃষ্টি দুটি আয়ত চোখ, গলায় মুক্তোর কলারটি সুরমাকে অপরূপ করে তুলেছে। সে-আমলে এত বহুবিচিত্র রঙিন শাড়ির রেওয়াজ ছিল না, পাওয়াও যেত না, সুরমার পরনে সাদা জমিতে অল্প-কাজ-করা একখানি ঢাকাই শাড়ি। আর অন্য কোন রকম শাড়িতে সুরমাকে বোধ করি বেশী সুন্দর দেখাত না। এই বেশেই সুরমাকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন। দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিরিশ বছর হয়ে গেল, তবুও সে-দিনের সে-ছবি তাঁর মনের চিত্রপটে ম্লান হয়নি। চাকরির তখন প্রথম। থার্ড মুনসেফ হয়ে ছোট্ট জেলাটির সদর শহরে এসে চার্জ নিয়েছেন মাস দুয়েক। সে-দিন কোর্ট থেকে ফিরে বাইসিক্লে চাপা অবস্থাতেই বাসার দরজায় ডিস্ট্রিক্ট জজের ব্রুহাম গাড়িটা দেখে বিস্মিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। জজ সাহেবের গাড়ি? জজ সাহেবের আরদালী বাইরের ফালি-রোয়াকটায় বসে খইনি টিপছিল। বাইসিক্ল থেকে নেমে মুনসেফ তরুণ জ্ঞানেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে এসেছে?"

আরদালী মুনসেফকে চিনত। সেলাম করে সে বলেছিল, "মিসিবাবা!"

মিসিবাবা! জজসাহেবের মেয়ে? জজসাহেবের মেয়ের কথা তিনি শুনেছেন এখানে এসে। মেয়েটি কলেজে পড়ে। মফস্বল শহরের তরুণ উকিলরা তার কথা নিয়ে অনেক চর্চা করে থাকে। জজসাহেব ব্রাহ্ম। চর্চার এও একটা কারণ।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু এসেই একদিন জজসাহেবের কুঠিতে গিয়ে তাঁকে সম্ভ্রম এবং অভিবাদন জানিয়ে এসেছেন। সে-দিন মিসেস চ্যাটার্জি বা মিস চ্যাটার্জিকে দেখতে পাননি। মিঃ চ্যাটার্জি এটা পছন্দ করতেন না। চাকরি-জীবনের সামাজিকতায় স্ত্রী-কন্যাকে টানতে তিনি ভালবাসতেন না। সেই জজসাহেবের কন্যা এসেছেন তার বাড়িতে? তিনি বাড়ি ঢুকবেন কি ঢুকবেন না, ঠিক করতে পারছিলেন না। হয়তো জজসাহেবের প্রগতিশীলা কন্যা সুমতির কাছে এসেছেন পর্দানিবারণী বা পণপ্রথা-নিবারণী সভার বা কোন সাহায্য-সমিতির ব্যাপার ট্যাপার নিয়ে। সুমতি তাঁর প্রথমা পত্নী।

প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রবাবু বাঁ দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ওদিকের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ঠিক মাঝখানে একখানা কাপড়ের পর্দা-ঢাকা একখানা ছবি। ওটা সুমতির ছবি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। হতভাগিনী সুমতি! জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে দুটি আক্ষেপভরা সকাতর ওঃ-ওঃ শব্দ যেন আপনি বেরিয়ে এল। তিনি দ্রুতপদে এ-ঘর অতিক্রম করে পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।

আঃ বলে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। মর্মান্তিক মৃত্যু সুমতির। শার্টটা খুলছিলেন তিনি, আঙুলের ডগাটা নিজের পিঠের উপর পড়ল। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন। পিঠের উপরটার চামড়া অসমতল, বন্ধুর। ঘাড় হেঁট করে বুকের দিকে তাকালেন। বুকের উপরেও একটা ক্ষতচিহ্ন। হাত বুলিয়ে দেখলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষতচিহ্নটার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বা হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করছিলেন। গোটা পিঠটা জুড়ে রয়েছে। ওঃ! এখনও স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। বিশ বৎসর হয়ে গেল, তবু সারল না। কোট শার্ট গেঞ্জির নীচে ঢাকা থাকে। অতর্কিতে কোন রকম চাপ পড়লেই তিনি চমকে ওঠেন। কন-কন করে ওঠে। সুমতিকে শেষটায় চিনবার উপায় ছিল না। তিনি শুনেছেন। তবে কল্পনা করতে পারেন। তিনি তখন অজ্ঞান; বোধ করি
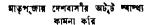
একবার যেন দেখেছিলেন! বায়েকের জন্য জ্ঞান হরেছিল।

পোশাকের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথ-রুমের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চৌকির উপর বসে হাতে মুখে জল দিলেন। সাবানদানি থেকে সাবানটা তুলে নিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সারা বাথ-রুমটা একটা লালচে আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের ছটা। চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্র-বাবু, হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে তিনি ফিরে তাকালেন পাশের জানালাটার দিকে। ছটাটা ওই দিক থেকেই এসেছে। জানালাটার ঘষা কাচগুলি আগুনের রক্তচ্ছটায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। একটা নিদারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চিৎকার করে উঠলেন তিনি। একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ভাষা নেই; শুধু রব।

জানালাটার ঠিক ওধারেই খানিকটা, বোধ করি আট দশ ফুট, খোলা জায়গার পরই কুঠির বাবুর্চিখানা। বাবুর্চিখানায় বাবুর্চি ওমলেট ভাজছিল। ওমলেট ভাজবার পাত্রটা সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ঘি ঢালতেই সেটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, এবং বিভ্রান্ত পাচকের হাত থেকে ঘিয়ের পাত্রটাও পড়ে গেছে। আগুন একটু বেশীই হয়েছিল। তারই ছটা গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঘষা কাচের জানালায়।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে খালি গায়ে খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে কী চীৎকার। ভয়ার্ত একটা ও-ও-ও-শব্দ শুধু। সুরমা দেবী ছুটে এসে তাঁকে ধরে উৎকণ্ঠিত চিৎকারে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? কী হল! ওগো! ওগো!"

থরথর করে কাঁপছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। কিন্তু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, দুরন্ত ভয়ের মধ্যেও তাঁর ধীমত্তা প্রাণপণে, ঝড়ের সঙ্গে বনস্পতি-শীর্ষের মত, লড়াই করে অবনমিত অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বাংলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টির চেহারা বদলাল, প্রশ্নাতুর হয়ে উঠল। বললেন, "আগুন। কিন্তু—।"

অর্থাৎ তিনি খুঁজছিলেন, যে-আগুনকে দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠতে দেখলেন তিনি এক মিনিট আগে, সে-আগুন কই? কী হল!

সুরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "আগুন? কোথায়?"

আত্মগত ভাবেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রশ্ন

ছুটে বেরিয়ে এলেন

করলেন, "কী হল?" পরক্ষণেই ডাকলেন, "বয়!"

বয় এসে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে বললে, "একটু ক্ষণ জ্বলেছিল, তারপরই নিভে গিয়েছে।"

জ্ঞানবাবু বললেন, "এমন অসাবধান কেন? ঘরে আগুন লাগতে পারত!"

বয় সবিনয়ে বললে, "টিনের চাল—!"

"লোকটার নিজের কাপড়ে চোপড়ে লাগতে পারত।" স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "ওকে জবাব দিয়ে দাও!" বলেই হন হন করে বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরমা দেবী কোন উত্তর দিলেন না। স্বামীর পিঠজোড়া ক্ষতচিহ্নের দিকে চেয়ে রইলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা তাঁর মনে পড়ল। হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় কাত হয়ে শুয়ে আছেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, সারা পিঠটা তাঁর পুড়ে গিয়েছে। বুকের দিকেও খানিকটা পুড়েছে। ঘরে আগুন লেগেছিল রাত্রে। মফস্বল শহরে খড়ো বাংলো-বাড়ি, শীতকাল, দরজা জানালা শক্ত করে বন্ধ ছিল। খড়ের চালের আগুন প্রথম খানিকটা বোধ হয় বেশ উত্তাপের আরাম দিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চারিদিক ধরে উঠেছে। দরজা খুলে বের হতে হতে সামনের চালটা খসে নীচে পড়ে যায়। সুমতি, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর প্রথম স্ত্রী, জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তার হাত ধরে আনছিলেন, সুমতি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তিনি ছিটকে খোলা জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়েন। সুমতির সর্বাঙ্গ পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। ওঃ, কী দৃশ্য!

ওঃ! ওঃ! ওঃ! সুরমা দেবীও চোখ বুঁজে শিউরে উঠলেন।

কী মিষ্টি চেহারা কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। উঃ। সুমতিকে মনে পড়ছে। শ্যাম বর্ণ, একপিঠ কালো চুল, বড় বড় দুটি চোখ, একটু মোটাসোটা নরম-নরম গড়ন; মুক্তোর পাঁতির মত সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে সুমতির গালে টোল পড়ত। এবং দুজনের মধ্যে অনির্বচনীয় ভালবাসা ছিল। অফিসার মহলে এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। হওয়ারই কথা। ব্রাহ্ম বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জজসাহেবের কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে সামান্য থার্ড মুনসেফের স্ত্রী—গ্রাম্য জমিদার-কন্যা অর্ধশিক্ষিতা সুমতির সঙ্গে এত মাখামাখি, এত প্রেম কিসের? শেষ পর্যন্ত সত্য কথা প্রকাশ করতে হয়েছিল; সুমতি তার পিসতুতো বোন; জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি মুনসেফ জ্ঞানেন্দ্র ঘোষালের স্ত্রীর মামা। সুমতির মায়ের সহোদর ভাই। কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্ম হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল। কোন সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষের মধ্যে। অরবিন্দবাবু বিলেত গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচার বিভাগে চাকরি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে খবর না-রাখাই স্বাভাবিক। পিতৃপক্ষও রাখতেন না। রাখেননি। বরং এই ছেলেটির নাম তাঁরা সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন সে-কালের সামাজিক কলঙ্ক ও লজ্জার বিচিত্র কারণে। এ-পরিচয় প্রকাশ হলে সে-কালে সামাজিক আদান-প্রদান কঠিন হয়ে পড়ত। সুমতি তার মায়ের কাছে মামার নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি ব্রাহ্ম হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, এই পর্যন্ত। তার মা বিয়ের সময় বারবার করে বলে দিয়েছিলেন, মামার কথা যেন গল্প করিসনে। কী জানি, কে কী ভাবে নেবে! সুরমা অবশ্য গল্প শুনেছিল, [illegible] মামার কাছে। ইদানীং জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে ব্র্যান্ডি পান করে মায়ের জন্য কাঁদতেন। বলতেন, "মাই মাদার ওয়াজ এ গডেস! আর কী সুন্দর তিনি ছিলেন! সাক্ষাৎ মাতৃদেবতা! যেন সাক্ষাৎ আমার বাংলাদেশ! শ্যাম বর্ণ, একপিঠ ঘন কালো চুল, বড় বড় চোখ মুখে মিষ্টি হাসি, নরম-নরম গড়ন—আহা—হা!"

সুমতির চেহারা ছিল ঠিক তাঁর মত, নিজের মায়ের মত। সেই দেখেই হল পরিচয়। ওই মফস্বল শহরে সুমতিরা মাস দুয়েক এসেছে তখন।

সবজজের বাড়িতে ছোট একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। সুরমা, সুরমার মা এবং বাবা বাইরের আসরে বসে ছিলেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেবরাও সস্ত্রীক বসে ছিলেন, পাশে একটু তফাত রেখে বসে ছিলেন ডেপুটি, সবডেপুটি, মুনসেফের দল। তাঁদের গৃহিণীদের আসর হয়েছিল ভিতরে; এই আসরের মাঝখানের পথ দিয়েই তাঁরা ভিতরে যাচ্ছিলেন। সুমতিও চলে গিয়েছিল। সুরমার বাবা কথা বলছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তিনি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি আত্মসম্বরণ করে আবার কথা বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু
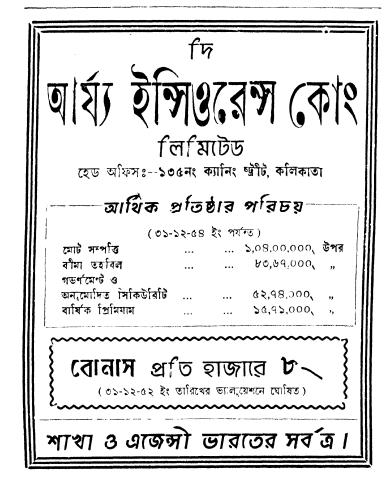
সেই ক্ষণিকের বিস্ময়-বিমূঢ়তা অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। সুরমার মারও চোখ এড়ায়নি। কিছুক্ষণ পর তিনি কথা সেরে গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবে গেলেন। সুরমার মা আর আত্মসম্বরণ করতে পারেননি, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, "কী ব্যাপার বল তো?"

"অ্যাঁ—?" চমকে উঠেছিলেন সুরমার বাবা।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হঠাৎ কী হল তোমার? তখন এমন ভাবে চমকে উঠলে? আবারও যেন এমন তন্ময় হয়ে ভাবছ!"

"কতকাল পর হঠাৎ যেন মাকে দেখলাম।" একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি সাহেব কথাটা বলেছিলেন। "অবিকল আমার মা। অবিকল! তফাত, এ-মেয়েটি একটু মডার্ন।"

"কে? কী বলছ তুমি?"

"লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে একটি মেয়ে তখন বাড়ির ভিতর গেল, দেখেছ? শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়! অবিকল আমার মা! ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম!"

এর উত্তরে সুরমার মা কী বলবেন, চুপ করেই ছিলেন। চ্যাটার্জি সাহেবও কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে মৃদু স্বরে বলেছিলেন, "একটু খোঁজ নিতে পার? কে কে এ মেয়েটি? সহজেই বের করতে পারবে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছে, ভারী নরম চেহারা, কচি পাতার মত শ্যাম বর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়। দেখনা? দেখবে?"

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি সুরমার মা। এবং সহজেই সুমতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন, "এখানে নতুন থার্ড মুনসেফ এসেছেন, মিস্টার ঘোষাল, তাঁর স্ত্রী।"

"থার্ড মুনসেফের স্ত্রী?" একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "অবিকল আমার মা। মেয়েটির সিঁথি'র ঠিক মুখে—ঠিক আমার এই কপালে যেমন একটা চুলের ঘূর্ণি আছে—তেমনি একটা ঘূর্ণি আছে। আমার মায়ের ছিল।"

পরের দিন বিকেল বেলা সুরমা গাড়ি করে থার্ড মুনসেফের বাড়ি গিয়েছেন। সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে চ্যাটার্জি সাহেব মদ্য পান করে মায়ের জন্য হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। সুরমার মার খুব মত ছিল না, কিন্তু প্রৌঢ় বাপের এই ছেলেমানুষের মত মা মা দেখে বেদনা অনুভব করেছিল, না-গিয়ে পারেনি।"

সুমতি অবাক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল প্রথমটা। খোদ জজসাহেবের মেয়ে এসেছেন, কলেজে-পড়া আধুনিকা মেয়ে! যে-মেয়ে সমাজে সভায় তাদের থেকে অনেক তফাতে এবং উঁচুতে বসে, সে নিজে এসেছে তাদের বাড়ি!

সুরমা গোপন করেনি; সে হেসে বলেছিল, আপনি নাকি অবিকল আমার ঠাকুরমার মত দেখতে। এমন কি আপনার সিঁথির সামনের চুলের এই ঘূর্ণিটা পর্যন্ত। আমার বাবার মধ্যে আবার একটি ইটারন্যাল চাইল্ড—মানে চিরন্তন খোকা আছে। মায়ের নাম করে প্রায় কাঁদেন। কাল সে হাউ হাউ করে কান্না। তাই এসেছি, আপনার সঙ্গে ঠাকুমা পাতাতে।"

সুমতি স্থির দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

সুরমা হেসে বলেছিল, "অবাক হচ্ছেন? অবাক হবার কথাই বটে। কিন্তু আপনার বাপের বাড়ি কোথায় বলুন তো? আপনার মামারা কি চাটুজ্যে? আপনি সেখানকার কার মত দেখতে?"

এর উত্তরে আসল সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে বিলম্ব হয়নি। সুমতি ছিল অবিকল তার দিদিমার মত দেখতে। দিদিমা তার জন্মের পরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, নইলে লোকে বলত, তিনিই ফিরে এসে সুমতি হয়ে জন্মেছেন এবং ধর্মান্তর-গ্রহণ-করা অরবিন্দ চ্যাটার্জি জজসাহেবের সঙ্গে এই দেখা হওয়াটি একটি বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হত; লোকে বলত জজসাহেব-ছেলের সমাদর পাবার জন্যই ফিরে এসেছেন তিনি। এ-সব কথা সুমতি বলেনি, বলেছিল সুরমা। সুমতি খুব হেসেছিল, খুব হাসতে পারত সে। ঠিক এই সময়েই বাসার বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন থার্ড মুনসেফবাবু। দরজায় জজসাহেবের আর-দালী এবং বুহামটি দেখে হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত। সারাটা দিন মুনসেফী কোর্টে রেন্ট-সুট আর মনি-সুটের জট ছাড়িয়ে কলম পিষে হয়রান হয়ে মাইল তিনেক পায়ে হেঁটে চায়ের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত হয়ে ফিরে দেখেন, 'রোড ক্লোজড', গৃহপ্রবেশের পথ রুদ্ধ।

* * *

সুরমা দাঁড়িয়েই ছিলেন সেই থেকে।

পাঞ্জাবি পায়জামা পরে রবারের স্লিপার পায়ে আত্মস্থ জ্ঞানেন্দ্রবাবু কখন ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সুরমা তা জানতে পারেননি। আজকের এই ঘটনাটাকে উপলক্ষ্য করে অতীত কালের স্মৃতিকথাগুলি ভিড় করে এসে তার মনের মধ্যে যেন স্বপ্নের খেলা জুড়ে দিয়েছিল। সুমতির মৃত্যু-স্মৃতির বেদনা সত্ত্বেও অতীত স্মৃতির মধ্যে নিজের জীবনের রঙিন দিনের প্রতিবিম্ব পড়ে আছে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, তাঁর চোখ মুখ এখনও যেন কেমন থমথম করছে। তাঁকে দেখে সুরমা কঠিন বাস্তবের মধ্যে সচেতন হয়ে উঠলেন: স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "ডাক্তারকে একবার খবর দেব?"

"ডাক্তার?" একটু চকিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। "কেন?"

"তুমি অত্যন্ত আপসেট হয়ে গেছ। নিজে বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না। এখনও পর্যন্ত—।"

পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতখানি ধরে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "নাঃ। ঠিক আছি আমি।"

"না। তুমি তোমার আজকের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না। আগুন নিয়ে তোমার ভয় আছে। একটুতেই চমকে ওঠ, কিন্তু এমন তো হয় না। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর এ-ভাবে পরিশ্রম—"

বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, "নাঃ আমি ঠিক আছি। আজকের ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক।"

"আগুনটা কি খুব বেশী জ্বলে উঠে-ছিল?"

"তা উঠেছিল। বাথরুমের জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেকশনে ঘরটা একে-বারে রাঙা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্যাট ইজ নট অল।"

"তবে? আর কী?"

"বস বলছি। সামনে এস, পিছনে থাকলে কি কথা বলা হয়?"

সুরমা সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। ও'দের দুজনের পিছনে বাবুর্চি চায়ের ট্রে এবং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সাহেব এবং মেমসাহেবের এই হাত-ধরাধরির অবস্থার মধ্যে সামনে আসতে পারছিল না, সে এবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি নামিয়ে দিল।

সুরমা বললেন, "যাও তুমি, আমি ঠিক করে নিচ্ছি সব।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "ইয়ে দফে তুমাহারা

কসুর মাফ কিয়া গয়া, লেকেন দুসরা দফে নেহি হোগা। হুঁসিয়ার হোনা চাহিয়ে। তুমাহারা লুংগামে আগ লাগা যাতা তো কেয়া হোতা? আঁঃ?"

সেলাম করে সে চলে গেল।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "আজকের ঘটনাগুলো আগাগোড়াই আমাকে একটু—কী বলব—একটু—একটু, চঞ্চল ঠিক না, ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। এখানে এসেই তোমাকে দেখলাম, গুনগুন করে গান গাইছ, রক্তসন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। সেই পুরনো কবি-কবি ভাব! পুরনো শুকনো মাটিতে নতুন বর্ষার জল পড়লে সেও খানিকটা সরস হয়ে ওঠে। মনটা ঠিক তা-ই হয়ে উঠেছিল। ঘরে ঢুকেই ওদিকের দরজার মাথায় তোমার সেই ছবিটা—দ্যাট রিমাইণ্ডেড মি—সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিলে। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল সুমতিকে। সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে রোজই পিঠের পোড়া চামড়ায় হাত পড়ে। আজও পড়েছিল। কিন্তু আজ মনে পড়ছিল সেই আগুনের কথা। ঠিক এই সাইকোলজিক্যাল মোমেণ্টে বাইরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমার মনে হল—আমাকে ঠিক তেড়ে আসছে।"

চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন সুরমা। মৃদুস্বরে বললেন, "তবু বলব আজ ব্যাপারটা যেন কেমন। আগুনকে ভয় তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু—।"

আগুনকে ভয় তাঁর স্বাভাবিক, অতর্কিত আগুন দেখলে চকিত হয়ে ওঠেন, খড়ের ঘরে শুতে পারেন না, রাত্রে বালিশের তলায় দেশলাই পর্যন্ত রাখেন না। সিগারেট পর্যন্ত খান না তিনি। বাড়ির মধ্যে পেট্রোল কেরোসিনের টিন রাখেন না। কখনও খোলা জায়গায় ফায়ার-ওয়ার্কস দেখতে যান না। কিন্তু আজ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ভয়ে।

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোধ করি সমস্ত ঘটনাটাকে হাল্কা করে দেবার অভিপ্রায়েই বললেন, "সমস্তটার জন্য রেসপনসিব্‌ল তুমি।"

"আমি?"

"তুমি। কবি হলে বলতাম, 'এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে সেদিনের পরিমল।' বললাম তো—আজকের তোমাকে দেখে প্রথম দিনের দেখা তোমাকে মনে পড়ে গেল। এবং সব গোলমাল করে দিলে! জজসাহেবের কলেজে পড়া তরুণী মেয়েটি সেদিন যেমন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আজও মাথাটা সেই রকম ঘুরে গেল!"

হেসে ফেললেন সুরমা দেবী।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "ওঃ সেদিন যা সম্বোধনটা করেছিলে! ভ্যাবাকান্ত!"

এবার সশব্দে হেসে উঠলেন সুরমা। বললেন, "বলবে না? নিজের বাড়ির দোরে এসে বাড়িতে জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে এসেছে শুনে এম-এ বি-এল তরুণ যুবক পেট-জ্বালা-করা ক্ষিধে নিয়ে মুখ চুন করে ফিরে যাচ্ছেন। গাঁইয়া কোথাকার।"

হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "দেখ, শাস্ত্রে আছে পরমানন্দ মাধবের কৃপায় বোবার কথা ফোটে, পঙ্গুও তাঁর ইচ্ছায় তেনজিং-হিলারি হতে পারে। কিন্তু মুখরা কলেজে-পড়া ছলনাময়ীর ভ্রূভঙ্গিতে সপ্রতিভ পুরুষ অপ্রতিভ হয়, বাচাল বোবা হয়, স্পোর্টসম্যান, কলেজের লেফট-উইংয়ের পা অবশ হয়ে যায়, এটা শাস্ত্রে নেই। অথচ শাস্ত্রবাক্যের চেয়ে এটা বেশী সত্য। বোধ করি হামেশাই ঘটে থাকে। ওঃ সে কী কথা! কথা নয় বাক্যবাণ।"

সেদিন বাড়ির দোর থেকে মুখ চুন করে সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন থার্ড ম্যানেজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কী করবেন? জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে, কোথায় কি খুঁত ধরে মেজাজ খারাপ করবে, কে জানে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময়েই সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে সুরমাই আবির্ভূত হয়েছিল; এবং দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিল, "ও মশায়! শুনুন। আপনি ভ্যাবাকান্তের মত নিজের বাড়ির দোর থেকে ফিরে যাচ্ছেন কেন? আসুন—আসুন। ভিতরে আসুন। আমি মানুষ, এবং অবলা। আমাকে এত ভয়!"

তরুণ জ্ঞানেন্দ্রনাথের মধ্যে তখন আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল না।

সুমতি সুরমার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলেছিল, "এস। সুরমা আমার মামাতো বোন। ওর বাবা আমার সেই মামা, যিনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে—।"

বাকীটা উহাই রেখেছিল সুমতি।

"কী আশ্চর্য!"

একমাত্র ওই কথাটিই সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

সুরমা বলেছিল, "ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। কিন্তু রাগ করেননি তো? ভ্যাবাকান্ত বলেছি।"

সুমতি বলেছিল, "শালীতে ওর চেয়েও খারাপ ঠাট্টা করে।"

এতক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা ভাল কথা খুঁজে পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "শ্যালিকার ঠাট্টা কখনও খারাপ লাগে না। মহাভারতে অর্জুনের প্রণাম-বাণ চুম্বন-বাণের কথা পড়েছ তো? বাণ—একেবারে শানানো ঝকঝকে লোহার ফলা-বসানো তীর—সে-তীর এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ত, একেবারে কপালে এসে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে যেত। শ্যালিকার ঠাট্টা তাই। ওদের কথাগুলো অন্যের কাছে শানানো বিষানো মনে হলেও ভগ্নীপতিদের কানের কাছে পুষ্পবাণ হয়ে ওঠে। তার উপর ও'র মত শ্যালিকা।"

সুমতি চা করতে-করতে মুহূর্তে মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। কুঞ্চিত দুটি ভ্রূর নীচে সে-দৃষ্টি ছিল তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বলেছিল, "কী কথার শ্রী তোমার! ও তোমাকে পুষ্পবাণ মারতে যাবে কেন? পুষ্পবাণ কাকে বলে? কী মনে করবে সুরমা?"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঘরের পরিমণ্ডল অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

কথাটা দুজনেরই মনে পড়ে গেল। অতীত কথার সরস স্মৃতি স্মরণ করে যে-আনন্দ-মুখরতা সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মত ফুটে ফুটে উঠছিল, তার উপর একখানা মেঘ নেমে এল। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। একটু পর সুরমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "আর একটু চা নেবে না?"

"না।"

স্থিরদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'না' বলেই তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। পিছনের দিকে হাত দুটি মুড়ে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতার ওপাশে একটা রাখাল একটা গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! সুমতি তাঁকে ওর চেয়েও নিষ্ঠুর তাড়নায় তাড়িত করেছে। ওঃ! গরু-মহিষের দালালরা ডগায় ছুঁচ বা আলপিন-গোঁজা লাঠির খোঁচায় যেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে! সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! সে-যন্ত্রণায় জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, সব বিশ্বাস। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছেন তিনি সুমতির কাছে, ধর্মের নামে শপথ করেছেন। সুমতি মানেনি। দিনের মাথায় দু-তিন বার বলত, "বল, ভগবানের দিব্যি করে বল। বল, ধর্মের মুখ চেয়ে বল!" তিনি বলেছেন। তার শপথ নিয়ে বললে বলেছে, "আমি মরলে তোমার কী আসে যায়? সে তো ভালোই হবে!"

ওই প্রথম দিন থেকেই সন্দেহ করেছিল সুমতি।

অরবিন্দ চ্যাটার্জির মত উদার লোককেও সে কটু কথা বলত। নিজের মায়ের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চ্যাটার্জি সাহেবের স্নেহের আর পরিসীমা ছিল না। সুমতিকে দিয়ে থুয়ে তাঁর আর আশ মিটত না। সুমতির স্বামী তাঁর জামাই বলে জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর উপরেও ছিল তাঁর গভীর স্নেহ। তাঁর জীবনের উন্নতির পথ তিনিই করে দিয়েছিলেন। রায় লেখার পদ্ধতি, বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কৌশল, তিনিই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। তাও সহ্য হত না সুমতির। সে বলত, "মুখে ছাই বিচার শেখানোর মুখে! শেখার মুখে! যে একটা মেয়ের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারে, সে তো অধার্মিক। যে অধার্মিক, সে বিচার করবে কী। ধর্ম নইলে বিচার হয়? আর সেই লোকের কাছে বিচার শেখা!"

চ্যাটার্জি সাহেবই বলতেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। ব্রহ্মব্রহ্ম ও-সবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেইজন্যে আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, পৌঁছুতে চেষ্টা করি। একটা পবিত্র একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ।"

তখন ভারতবর্ষে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৩০ সনের অব্যবহিত পূর্বে। বলেছিলেন, "গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে। আমি তা পারিনি। মদ না-খেয়ে আমি থাকতে পারিনে। আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় আমি করিনে। করব না। ওইটেই প্রথম শিক্ষা। বিচার-বিভাগে আমি ওটা প্র্যাকটিসের সৌভাগ্য পেয়েছি। সেইজন্যে রায় লিখবার সময় আমি সেইরকম রায় লিখতে চেষ্টা করি, লিখি, যাকে বলা যায় ধর্মের বিচার। ডিভাইন জাস্টিস।"

ডিভাইন জাস্টিস, কথাটা তাঁর কথা।

"হুজুর!"

চকিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবু ফিরে তাকালেন। বেয়ারা ডাকছে।

"এ-দিকে কাল রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছিল হুজুর। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।"

মুখ তুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। সন্ধ্যে হয়ে গেছে! শুধু তাই নয়, আবার আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। দূরে দিগ্বলয়ে গ্রামের বনরেখার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে, প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ক্রমশ গাঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বাংলোর দিকে চাইলেন, আলো জ্বলে উঠেছে সেখানে। সুরমাও বাগানে নেই, সে কখন উঠে চলে গিয়েছে বাংলোর ভিতরে। নিঃশব্দেই চলে গেছে।

॥ তিন ॥

সুরমা ঘরের জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন অতীত কথা। সুমতির পুড়ে মরার কথা মনে পড়লেই সুরমার মনে হয়, সন্দেহের আগুনে, ঈর্ষার আগুনেই সে পুড়ে মরেছে। ওটা যেন তার জীবনের বিচিত্র অমোঘ পরিণাম। প্রথম দিন থেকেই সে সন্দেহ করেছিল। কৌতুক অনুভব করেছিল সুরমা। ভাল-বাসা হয়তো অন্ধ। ভালবাসায় কাকে ভালবাসছি, কেন ভালবাসছি, এ প্রশ্নই জাগে না। তবু বিলেত-ফেরত জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ের এটুকু বোধ ছিল যে, বিবাহিত গোঁড়া হিন্দুঘরের ছেলে, পদবীতে থার্ড মুনসেফের প্রেমে পড়ার চেয়ে হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুধু সুমতির বর বলেই সে তার সঙ্গে হাস্যকৌতুকের সঙ্গে কথা বলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুপুরুষ, বিদ্বান, কিন্তু তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার মত সংযম তার ছিল।

তার জন্য বিলেতফেরত সমাজের কৃতী যুবকেরা তৃষ্ণার্তও ছিল। শুধু কৌতুকের খেলা খেলতে গিয়ে বিচিত্রভাবে এই হয়ে গেল। সুমতির সন্দেহ এবং ঈর্ষা দেখে সে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে খেলা খেলতে গিয়েছিল; সুমতির ঈর্ষায় সে হাসত। সুমতিকে দেখিয়ে সে জ্ঞানবাবুর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার অভিনয় করত। সুমতি জ্বলত। বেচারা থার্ড মুনসেফ একদিকে বিহ্বল হত, অন্যদিকে বিব্রত হত। সুরমা হাসত। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে কবিতায় চিঠি লিখত জ্ঞানবাবুকে; ইচ্ছে করেই লিখত দুষ্টুমি করে। সুমতিকে সে ভালবাসত। তার বাবা সুমতিকে ভালবাসতেন, সেও ভালবাসত। অনুগ্রহের সঙ্গে স্নেহ মিশিয়ে যে বস্তু, সে-বস্তুর দাতা হওয়ার মত তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। ছোট ছেলেকে রাগিয়ে যেমন ভাল লাগে তেমনি ভাল লাগত সুমতিকে জ্বালাতন করতে। বছর দেড়েকের বড়ই ছিল সুমতি, কিন্তু আচরণে সুরমাই ছিল বড়। তার সঙ্গে এই ভ্যাবাকান্ত হিন্দু জামাইবাবুটিকে বিদ্রূপ করে কৌতুকের আনন্দ অনুভব করত। প্রথম কবিতা তার আজও মনে আছে। সুমতির পত্রেই লিখেছিল, "জামাইবাবুকে বলিস—

সুমতি তোমার পত্নী, দুর্মতি শ্যালিকা
টোবাকো পাইপ আমি, সুমতি কলিকা
পবিত্র হুঁকোর, তাহে নাই নিকোটিন।
সুমতি গরদ ধুতি, আমি টাই-পিন।
পিনের স্বধর্ম খোঁচা, নিকোটিনে কাশি;
ধন্যবাদ, সহিয়াছ মুখে মেখে হাসি।"

উত্তরে সুমতির পত্রের নীচেই দু' ছত্র কবিতা এসেছিল।

"ধন্যবাদে কাজ নাই অন্যবাদে সাধ
অর্থাৎ মার্জনা দেবী হলে অপরাধ।"

হঠাৎ অঘটন ঘটল। পরপর দুটি। একখানা বিখ্যাত ইংরেজী কাগজে একটা প্রবন্ধ বের হল, "একটি অহিংস সিংহ ও তার শাবকগণ!" গান্ধীজীকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ। একটি সিংহ হয়তো অভ্যাসে সাধনায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি ধরে নেওয়া যায়, তার শাবকেরাও তাদের স্বভাবধর্ম হিংসা না নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করবে, বা রক্তের প্রতি তাদের অরুচি জন্মাবে? প্রবন্ধের ভাষা যেমন জোরালো, যুক্তি তেমনি ক্ষুরধার। বুদ্ধের কাল থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের নজির তুলে এই কথাই বলেছেন লেখক, অহিংসার সাধনা অন্যান্য ধর্মের সাধনার মত ব্যক্তিগত জীবনেই সফল হতে পারে। রাষ্ট্রে এই বাদকে প্রয়োগ করার মত অযৌক্তিক আর কিছু হয় না। এমন কি, সম্প্রদায়গত-ভাবেও এ-বাদ সফল হয় নি, হতে পারে না। প্রবন্ধটি কয়েকদিনের জন্য সোরগোল তুলেছিল। সুরমা পড়েছিল সে-প্রবন্ধ। দিনকয়েক পরে তার বাবা তাকে লিখলেন, "এ প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্র লিখেছে। আমাকে অবশ্য দেখিয়েছিল। ভাল লিখেছে, পড়ে দেখিস।" সুরমা বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিল। সুমতির মুখচোরা কার্তিকটি তো বেশ। এর কিছুদিন পরেই আর এক বিস্ময়। হঠাৎ সেদিন কলেজ-হস্টেলে নতুন এক-খানা টেনিস র‍্যাকেট হাতে দেখা করতে এলেন সুমতির পতি! টেনিস র‍্যাকেট! হাসি পেয়েছিল সুরমার। উচ্চপদের দণ্ড। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অনেক বিনিদ্র রাত্রি অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় ভাল ফল করে একটি বড় চাকরি পেয়েছে, তার দায়ে অফিসিয়ালদের ক্লাবে চাঁদা তো গুনতেই হচ্ছে, এর উপর এতগুলি টাকা খরচ করে টেনিস র‍্যাকেট কিনে বেচারাকে একদা হয়তো পা পিছলে পড়ে ঠ্যাঙখানি ভাঙতে হবে। হেসে সে বলেছিল, "খেলতে জানেন, না হাতেখড়ি নেবেন?"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, "শেখাবেন?"

"পারিনে তা নয়। কিন্তু গুরুদক্ষিণা কী দেবেন?"

"বলুন কী দিতে হবে? বুঝে দেখি।"

"আপনার ওই কার্তিকী ঢঙের গোঁফ-জোড়াটি কামিয়ে ফেলতে হবে।"

হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রাজী।"

তারপর আলোচনাটা ঘুরে গিয়েছিল প্রবন্ধ নিয়ে। সুরমা আক্রমণ করেছিল তাঁকে; তীব্র আক্রমণ! জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুধুই হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "অনেক তীব্র গাল খাওয়ার পর আপনার মিষ্টিমুখের গাল খেয়ে ভারী ভাল লাগল। জ্বালা জুড়িয়ে গেল।"

পুজো ছিল সেবার কার্তিক মাসে। পুজোর ছুটিতে বাবা সেবার দিন পনের দার্জিলিংয়ে কাটিয়েই কর্মস্থলে ফিরে-ছিলেন। সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি শহরটি শরৎকাল থেকে কয়েকমাস মনোরম হয়ে ওঠে। ফিরেই সুরমা শুনেছিল, সুমতিরা পুজোর ছুটিতে দেশে যায় নি, এখানেই আছে, সুমতিরই অসুখ করে-ছিল। সুমতি তখন পথ্য পেয়েছে, কিন্তু দুর্বল। চ্যাটার্জি সাহেব পুজোর তত্ত্ব, কাপড়চোপড়, মিষ্টি নিয়ে নিজে গিয়ে-ছিলেন ওদের বাড়ি, সঙ্গে সুরমাও গিয়ে-ছিল। আসবার সময় সুরমা জ্ঞানেন্দ্র-নাথকে বলে এসেছিল, "বিকেলে যাবেন। আজ টেনিসে হাতেখড়ি দিয়ে দেব।"

চ্যাটার্জি সাহেব নিজে ভাল খেলতেন। এককালে স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলেন। সুরমা ছেলেবেলা থেকে খেলে খেলায় নাম করে-ছিল। সে দিন চ্যাটার্জি সাহেব খেলতে আসেননি। সুরমা জ্ঞানেন্দ্রকে নিয়ে একা একা খেলতে নেমে নিজে প্রথম সার্ভ করে বলটার ফেরত-মার দেখে চমকে উঠেছিল। সে-বল ফিরিয়ে মারতে পারেনি। জ্ঞানেন্দ্রের মার পাকা খেলোয়াড়ের মার! সুরমা হেরে গিয়েছিল।

খেলার শেষে সে বলেছিল, "আপনি অত্যন্ত শ্রুড লোক। তার চেয়েও বেশী, কপট লোক আপনি। ডেঞ্জারাস ম্যান!"

"কেন? কী করলাম?"

"থাকেন যেন কত নিরীহ লোক, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, অথচ—।"

"তাহলে গোঁফ জোড়াটা থাকল আমার?"

ওই খেলার ফাঁকেই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হল সে। সুমতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তার উপর। গ্রাহ্য করেনি সুরমা। বরং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার উপর। চরম হয়ে গেল ওখানকার টেনিস কম্পিটিশনের সময়। বড়দিনের সময় সুরমা গিয়ে কম্পিটিশনে যোগ দিলে, পার্টনার নিলে জ্ঞানেন্দ্রকে। ফাইন্যালের দিন খেলা জিতে দুজনে ফটো তুলতে গিয়েছিল। ফটো তুলবার আগে জ্ঞানেন্দ্র বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে ফটো তুলব, গোঁফটা কামাব না?" ওই খেলার অবসরেই 'আপনি' ঘুচে পরস্পরের কাছে তারা তখন 'তুমি' হয়ে গেছে।

সুরমা হেসে উঠেছিল। এবং সে-দিন জ্ঞানেন্দ্র যখন তাদের কুঠি থেকে বিদায় নেয় তখন নিজের একগোছা চুল কেটে একটি খামে পুরে তার হাতে দিয়ে বলে-ছিল, "আমি দিলাম, আমার দক্ষিণা! কিন্তু আর না। আর আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করব না, তুমিও কর না। সুমতি সহ্য করতে পারছে না। আজ আমাকে সে স্পষ্ট বলেছে, তুই আমার সর্বনাশ করলি!"

সুরমা উঠে এসে দাঁড়ালেন একখানা পুরনো ফটোর সামনে। ওই টেনিস ফাইন্যাল জেতার পর তোলানো ফটোখানার

সামনে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ফোকাসের সময় তারা ক্যামেরার দিকেই তাকিয়েছিল কিন্তু ঠিক ছবি নেবার সময়টিতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপিখানা নেই, সেখানা ঈর্ষাতুরা সুমতি আগুনের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল।

ঈর্ষাতুরা সুমতি। আশ্চর্য কঠিন ক্রুর ঈর্ষা। পরলোক, প্রেতবাদ, এ-সবে সুরমা বিশ্বাস করে না, কিন্তু এ-বিশ্বাস তার হয়েছে, মানুষের প্রকৃতির বিষই হোক আর অমৃতই হোক, যেটাই তার স্বভাব-ধর্ম সেটা তার মানুষের মৃত্যুতেও মরে না, সেটা থাকে, ক্রিয়া করে যায়। সুমতির ঈর্ষা আজও ক্রিয়া করে চলেছে; জীবনের আনন্দের মুহূর্তে অকস্মাৎ ব্যাধির আক্রমণের মত আক্রমণ করে। তার কাঁধের উপর একখানা ভারী হাত এসে স্থাপিত হল। গাঢ় স্নেহের আভাস তার মধ্যে, কিন্তু হাতখানা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। স্বামী এসে হাত রেখেছেন, রবারের চটি পরে সতরঞ্চির উপর দিয়ে এসেছেন; চিন্তামগ্নতার মধ্যে মৃদু শব্দ যে-টুকু উঠেছে, তা সুরমার কানে যায়নি।

"অকারণ নিজেকে পীড়িত কর না।" ধীর মৃদু স্বরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, "পরের দুঃখের জন্যে যে কাঁদতে পারে, সে মহৎ; কিন্তু অকারণ অপরাধের পীড়নে নিজেকে পীড়ন করার নাম দুর্বলতা। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। এস।"

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সুরমা, স্বামীর মুখের দিকে তাকাবামাত্র চোখ দুটি ফেটে মুহূর্তে জলে ভরে টলমল করে উঠল।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁকে মৃদু আকর্ষণে কাছে টেনে এনে অনুচ্চ গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমি বলছি, তোমার কোন অপরাধ নেই, আমারও নেই। না। অপরাধ সমস্ত তার! হ্যাঁ তার! উই ডিড নাথিং ইমমরাল, নাথিং ইললিগ্যাল; তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিকার আমার ছিল। সেই অধিকারের সীমানা কোনদিন অন্যায়ভাবে অতিক্রম আমরা করিনি। বিবাহের দায়ে অপর কোন নারীর সঙ্গে পুরুষের বা কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীরও অধিকার খর্ব হয় না। আমারও হয়নি। তোমারও হয়নি। তা ছাড়াও একথাই সত্য যে, বিবাহ করেও যদি অন্য কাউকে ভালই বাসে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, এবং তার মধ্যে যদি দুর্নীতির বা অন্যায়ের স্পর্শ না থাকে, তবে তাতেও কোন অপরাধ হয় না। সে ধর্মের বিচারালয়েই বল বা যে-কোন দেশের মানুষের বিচারালয়েই বল, সেখানে সিদ্ধান্ত—নির্দোষ! জড়িমাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠের দৃঢ় উচ্চারণে উচ্চারিত সিদ্ধান্ত! দুর্বলতাই একমাত্র অপরাধ, যার জন্য প্রাণ অভিশাপ দেয় আত্মাকে।"

স্থির দৃষ্টিতে অভিভূতের মত সুরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিল। জ্ঞানেন্দ্রবাবুরও দৃষ্টি স্থির! তিনি তাকিয়ে ছিলেন একটু মুখ তুলে ঘরখানার কোণের ছাদের অংশের দিকে, যেন ওইখানে ওই আবছায়ার মধ্যে দেওয়ালের গায়ে কোন মহাশাস্ত্রের একটি পাতা ফুটে উঠেছে, এবং তিনি তাই পড়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে।

"চল, বাইরে চল, বেড়াতে যাব।"

সুরমা এটা জানত। এইবার তিনি বাইরে যেতে বলবেন। যাবেন। অনেকটা দূর ঘুরে আসবেন। আগে সারা রাত ঘুরেছেন, ক্লাবে গিয়েছেন, মদ্যপান করেছেন। রাত্রে আলো জেলে টেনিস খেলেছেন দুজনে। এখন এমনভাবে সুমতিকে মনে পড়ে কম। এবার বোধ হয় দু বছর পরে এমনভাবে মনে পড়ল। সোজা পথে তো সুমতিকে তাঁরা আসতে দেন না; সুমতির কথা কোনক্রমে উঠলে দুজনেই অন্য কথায় গিয়ে পড়েন। আজ সে দীর্ঘ দিন পরে ঘুরপথে এসেছে, বাথরুমের জানালা দিয়ে ওই আগুনের ছটার সঙ্গে মিশে অশরীরিণী ঈর্ষাতুরা এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ি চলল। শ্রাবণ-রাত্রিতে আবার মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নতুন অ্যাসফল্টের সমতল সরল পথ। শহর পার হয়ে নদীটার উপর নতুন ব্যারেজের পাশে তৈরী ব্রিজ পার হয়ে শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। শাল বনে বর্ষার বাতাসে মাতামাতি চলেছে। নতুন পাতায় পাতায় ঝরঝর শব্দ চলেছে একটানা। পথের পাশে পাশে কেয়ার ঝাড়। সেখানে কেয়া ফুল ফুটেছে। ভিজে অ্যাসফল্টের রাস্তার বুকে হেডলাইটের তীব্র আলোর প্রতিচ্ছটা পড়েছে; মধ্যে মধ্যে শালগাছের গায়ে আলো পড়ছে; অদ্ভুত লাগছে।

গাড়ি চলেছে। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে উঠল। চারিপাশে আকাশ থেকে ঘন কাল মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে মাটিতে নেমেছে মনে হচ্ছে। মেঘ নয়, ওগুলি পাহাড়; অরণ্যভূম এবং পার্বত্য ভূম এক হয়ে গেল এখান থেকে। অ্যাসফল্টের রাস্তা এইবার সর্পিল গতি নিচ্ছে; এঁকে বেঁকে চলেছে। কোথাও প্রবল একটা ঝরঝর শব্দ উঠছে, একটানা শব্দ; দিঙমণ্ডল ব্যাপ্ত করা প্রচণ্ড উল্লাসের একটা বাজনা যেন বেজে চলেছে; পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরছে। গাড়ির মধ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ঘোষাল সাহেব তার হাতের মধ্যে সুরমার একখানি হাত নিয়ে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে দু-চারটি কথা। কাটা কাটা, পারম্পর্যহীন।

"এটা সেই বনটা নয়? যেখানে গলগলে ফুলের গাছ দেখেছিলাম?"

"এই তো বাঁ পাশে; পেরিয়ে এলাম।"

তারপর আবার দুজনে স্তব্ধ। গলগলে ফুলের সোনার মত রঙ। ফুল তুলে সুরমাকে দিয়েছিলেন; সুরমা একটি ফুল খোঁপায় পরেছিল। ঘোষাল সাহেবের হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছিল; অন্তরে আবেগ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুরমা একটি অস্ফুট কাতর শব্দ করে উঠল।

"উঃ!"

"কী হল?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন স্বামী।

মৃদুস্বরে সুরমা শুধু বললে, "আংটি।"

"লেগেছে?" বলেই হেসে ঘোষাল সাহেব হাত ছেড়ে দিলেন, আঙুলের আংটির জন্যে হাতের চাপে বড্ড লাগে।

"না।" অন্ধকারের মধ্যেই অল্প একটু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। না, ছেড়ে দিতে তিনি চান না।

আবার স্তব্ধ দুজনে। মনের গুমোট অন্ধকার কেটে গিয়েছে, তাই যেন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে আজ। তাঁরা তারই মধ্যে প্রশান্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ঝরনার শব্দটা এল। অকস্মাৎ

এল। একটা চড়াই অতিক্রম করে আবার ঢালের মুখে বাঁক ফিরতেই শব্দটা শতধারায় বেজে উঠল। চমকে উঠলেন সুরমা।

"কিসের শব্দ?"

"ঝরনার। বর্ষার জলের ঢল নেমেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।" স্বপ্নাতুর হাসি ফুটে উঠল ঘোষাল সাহেবের মুখে। সুরমা উৎসুক হয়ে জানালার কাছে মুখ রাখলেন, যদি দেখা যায়!

ঘোষাল সাহেব চোখ বুজে মৃদু স্বরে আবৃত্তি করলেন,

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে
দিব তালি।"

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, "এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর।" তারপর বললেন, "প্রাণ গান গাইছে। লাইফ ফোর্স! যেখানে জীবন যত দুর্বার, সেখানে গান তত উচ্চ। সব প্রাণেরই কামনা বিশ্বগ্রাসী, তাই তার দাবি—'নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখম্।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কিন্তু যার যতখানি শক্তি তার এক কণা বেশী পাবার অধিকার কারও নাই। নেচারস জাজমেণ্ট! কোথাও নদী পাহাড় কেটে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও স্তব্ধ হয়ে খানিকটা জলার সৃষ্টি করে পাহাড়ের পায়ের তলায় পড়ে আছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। বড় জোর ব্রহ্মা-কমণ্ডলু, মানস সরোবর।

অকস্মাৎ সুরমা দেবী সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন, "কটা বাজল?"

শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি! দর্শন-তত্ত্বের মধ্যে ঘোষাল সাহেব ঢুকলে আর ওঁর নাগাল পাবেন না তিনি। মনে হবে, এই ঝরনাটার ঠিক উল্টো গতিতে তিনি পাহাড়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠে চলেছেন, আর তিনি সমতলে অসহায়ের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্রমশ যেন চেনা মানুষটা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একথা বললে আগে বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে তার দিকে তাকিয়ে বলতেন, "তাহলে ইন্সিওরেন্স পলিসি, গবর্নমেণ্ট পেপার আর শেয়ার স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে এস। তাই নিয়ে কথা বলি। অথবা আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করে দাও। গিভ মি ড্রিঙ্ক। হেঁটে নামতে দেরি লাগবে অনেক। তার চেয়ে স্খলিত চরণে গড় গড় করে গড়িয়ে এসে পড়ব তোমার কাছে।" হা-হা করে হাসতেন। সে-হাসি সুরমা সহ্য করতে পারতেন না।

মদও খেতেন, পরিমাণ পরিমাপ কিছু মানতেন না। এখন মদ আর খান না। মহাত্মার মৃত্যুদিনে মদ ছেড়েছেন, আর ছোঁননি। শুধু মদই নয়, মাছ মাংস পর্যন্ত ছেড়েছেন। এখন আর হা-হা করে হাসেনও না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন, চোখ বন্ধ করে থাকেন। এখন কৌশল করে সহজ করতে হয়, সমতলে নামাতে হয় তাঁকে। অন্য কোন কর্তব্য বা দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন।

আজ নিজেই হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, চশমাটার পাওয়ার পাল্টাতে হবে। দেখ তো!"

চোখ বুজেই জ্ঞানেন্দ্র ঘোষাল বললেন, "গাড়ির ঘড়িটা দেখ না।"

"ও মা! এগারটা বেজে গেছে!"

"বাজুক না।"

"না। তোমার সেসন্স্ চলছে।"

অর্থাৎ দেরি করে কোর্টে গেলেও চলবে না, শরীর খারাপ হলে বিশ্রামও নেওয়া যাবে না।

"ও!" একটা নিশ্বাস ফেলে চোখ চেয়ে সোজা হয়ে বসলেন ঘোষাল সাহেব। সেসন্স্! —গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।"

জটিল বিচার্য ঘটনা। নৌকো উল্টে গিয়েছিল। নৌকো ডুবেছিল ছোট ভাইয়ের দোষে। তারা জলমগ্ন হয়েছিল। ছোট ভাই আঁকড়ে ধরেছিল বড় ভাইকে। বড় ভাই ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারেনি। শেষে ছোট ভাইয়ের গলায় তার হাত পড়েছিল। এবং—। সে-স্বীকার সে করেছে। কিন্তু—।

আসামীকে মনে পড়ল তাঁর!

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

॥ চার ॥

ডকের মধ্যে আসামী দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক কালকের ভঙ্গিতে। বয়স অনুমান করা যায় না, তবে পরিপূর্ণ যৌবনের সবল স্বাস্থ্যের চিহ্ন তার সর্বদেহে। আহারের পুষ্টিতে নধর দেহ নয়, উপযুক্ত আহার এবং পরিশ্রমে সুদৃঢ় পেশীর ছন্দে ছন্দে গড়ে উঠেছে দেহখানি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, জন্মকাল থেকেই দেহের উপাদানের সচ্ছলতা নিয়ে জন্মেছে। মাথায় একটু খাটো। তাম্রাভ রঙ। মুখখানা দেখে মুখের ঠিক আসল গড়ন বোঝা যায় না, দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকার জন্য মাথার চুল বড় হয়েছে, মুখে দাড়ি-গোঁফ জন্মেছে। অবশ্য আগের কালের মত রুক্ষতা নেই চুলে, আজকাল তেল পায় জেলখানার অধিবাসীরা। তবুও দাড়ি-গোঁফ-চুল বিশৃঙ্খল; হতভাগ্যের বিভ্রান্ত মনের আভাস যেন ফুটে রয়েছে ওর মধ্যে; অঙ্গারগর্ভ মাটির উপরের রুক্ষতার মত। নাকটা স্থূল; চোখ দুটি বড়, তাতে নিষ্ঠুরতার আভাস। পরনে সাদা মোটা কাপড়ের বহির্বাস, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক।

নগেন ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিল। পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর গতকালকার বক্তব্যের সূত্রটি ধরে আরম্ভ করলেন, "ইয়োর অনার, আমার বক্তব্যে অগ্রসর হবার পূর্বে আপনাকে আর একবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব। তাতে আছে, জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হলে মানুষের পাকস্থলীতে যে-পরিমাণ জল পাওয়া যায়, মৃতের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেলেও তার চেয়ে পরিমাণে অনেক কম। অর্থাৎ জলমগ্ন হওয়ার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু এক্ষেত্রে হয়নি। অথচ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। এবং শবদেহেও সেই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। মৃতের কণ্ঠনালীতে সুস্পষ্ট পাঁচটি নখক্ষতের চিহ্ন। বাঁদিকে একটি, ডানদিকে চারটি। মানুষের হাতের লক্ষণ। আসামী নগেন থানায় এবং নিম্ন আদালতে স্বীকার করেছে, খগেন জলমগ্ন অবস্থায় তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, সেও ডুবে যাচ্ছিল, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। সে তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থায় কোনক্রমে তার ডান হাতটা সে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সেই হাত পড়ে খগেনের কণ্ঠনালীতে। সে কণ্ঠনালী টিপে ধরে। খগেন ছেড়ে দেয় বা সর্বদেহের সঙ্গে তার হাত শিথিল হয়ে এলিয়ে যায়। তখন সে ভেসে ওঠে। সে একথা অস্বীকার করে না। এখন দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক, কণ্ঠনালী টিপে ধরার ফলে খগেনের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেড়ে দেয় বা এলিয়ে পড়ে, বা মৃত্যুর কিছু পূর্বে মৃতকল্প অচেতন অবস্থায় সে এলিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মৃত্যু এই কারণে এই আসামীর দ্বারাই ঘটেছে।

"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েও দুটি বিষয়ের বিচার আছে। জটিল, অত্যন্ত জটিল। দুটি বিষয়ের একটি হল, আসামী আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে মানবিক সকল চৈতন্য এবং চেতনা হারিয়ে এমন ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জান্তব চেতনার পক্ষে অতি স্বাভাবিক প্রেরণায় মৃত খগেনের গলা টিপে ধরেছিল, অথবা তার পূর্বেই তার মানবিক কূটবুদ্ধি, [illegible] ক্রূরতা ও জীবনের অভ্যস্ত পাপপরায়ণতা এই সুযোগে চকিতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। যেমন নির্জনে অসহায় অবস্থায় নারী দেখলে ব্যভিচারীর পাশব প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, লুঠেরার লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি জাগে, এমন

কি বিশ্বাসভাজন অসহায় বন্ধুকেও বন্ধু হত্যা করে, তেমনি ভাবে তেমনি প্রবৃত্তি ও প্রেরণায় এই ব্যক্তি এই কাজ করেছে। বিচার্য বিষয় সেইটুকু; ওই জলমগ্ন অবস্থায় আসামীর মনের স্বরূপ। এ নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন; অতি জটিল বিষয়। এর কোন সাক্ষী নাই। আসামী বলে, সে জানে না। এবং এও বলে যে, সে যদি হত্যা করে থাকে তবে সে মৃত্যু-শাস্তিই চায়। আসামী বৈষ্ণব, এই বিচারাধীন অবস্থাতেও সে তিলক-ফোঁটা কাটে দেখতে পাচ্ছি। সে এক সময় গৃহত্যাগ করেছিল বৈরাগ্যবশে, জীবহত্যা করে কুলধর্ম লঙ্ঘনের জন্য অনুতাপবশে। বারো বৎসর পর ফিরে এসে এই সৎভাইকে বুকে তুলে নিয়েছিল সুগভীর স্নেহের বশে। সেই ভাইকে সেই কুড়ি বৎসরের যুবাতে পরিণত করে তুলেছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে অবশ্যই মনে হবে এবং এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হব যে, আসামী যখন ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন তার মধ্যে মৌলিক জীবনের আত্মরক্ষার জান্তব চেতনা ছাড়া মানবিক জ্ঞান বা চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। সে-ক্ষেত্রে যে অপরাধ সে করেছে, সে অপরাধ অনেক লঘু, এমন কি তাকে নিরপরাধ বলা যায়।"

বিচারক জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার তাকালেন আসামীর দিকে। মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তাঁর নিজের মতই ভাবলেশহীন মুখ। তিনি জানেন, এ-সময় তাঁর মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হয় না। নিরাসক্তের মত শুনে যান। একটু তফাত রয়েছে। আসামীর দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস রয়েছে। বিশ্লেষণের ধারা তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। বিহ্বলতার মধ্যেও ওই বিস্ময় তাকে সচেতন করে রেখেছে।

অবিনাশবাবু বলছিলেন, "কিন্তু যদি এই ব্যক্তি আকস্মিক সুযোগে, লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজের-হাতে-মানুষ-করা ভাইকে হত্যা করে থাকে তবে সে নৃশংসতম ব্যক্তি। এবং সে তাই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে একথা অসম্ভব বলে মনে হবে। যে লোক ছাগল মারার অনুতাপে লজ্জায় সন্ন্যাসী হয়েছিল, যে ভাইকে বুকে করে মানুষ করেছে, যার কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় কণ্ঠী, যে ব্যক্তি ও-অঞ্চলে খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সে কি এ-কাজ করতে পারে? এক্ষেত্রে আমার দুটি কথা। প্রথম কথা মানুষের শৈশব-বাল্যের অভ্যাস, তার জন্মগত প্রকৃতি অবচেতনের মধ্যে স্থায়ী অধিকারে অবস্থান করে। সে মরে না, চাপা থাকে। এবং মানব-জীবন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অহরহ পরিবর্তনশীল। সে

গাড়ি চলল...শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে

একবারই পাল্টায় না, বারবার পাল্টায়। নিত্য অহরহ পরিবর্তনের মধ্যেও বিপরীত-মুখী পরিবর্তনকেই আমি পাল্টানো বলছি। গৃহধর্ম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। হঠাৎ দেখা যায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আবার দেখা যায় সেই সন্ন্যাসীই গৈরিক ছেড়ে গৃহধর্ম করছে, মামলা মোকদ্দমা বিষয় নিয়ে বিবাদ সাধারণ সংসারীর চেয়ে শতগুণ আসক্তি এবং কুটিলতার সঙ্গে করছে। যে-মানুষ পত্নীবিয়োগে বিরহের মহাকাব্য লেখে, সেই মানুষ কয়েক বৎসর পর বিবাহ করে প্রেমের কবিতা লেখে।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন, "সংক্ষেপ করুন অবিনাশবাবু। বি ব্রীফ প্লীজ!"

"ইয়েস, ইয়োর অনার, আমার আর সামান্য বক্তব্যই আছে। সেটুকু হল এই। এই আসামী নগেনের আবার একটি পরিবর্তন হয়েছিল। আমরা তার পরিচয় বা প্রমাণ পাই। সে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হবার ব্যবস্থা করছিল এই ঘটনার সময়। কিন্তু এহ বাহ্য। অভ্যন্তরে ছিল দি ইণ্টারন্যাল স্ট্রাগল্।"

"হোয়াট?" ভ্রূ কুঞ্চিত করে সজাগ হয়ে ফিরে তাকালেন বিচারক।

"সেই সনাতন ত্রয়ীর বিরোধ, ইয়োর অনার। দুটি নারী একটি পুরুষ—"

"দুটি নারী একটি পুরুষ—?"

"এক্ষেত্রে দুটি পুরুষ একটি নারী, ইয়োর অনার।"

"ইয়েস?"

অবিনাশবাবু বললেন, "নারীটি একটি লীলাময়ী।"

"লীলাময়ী? ইউ মিন এ মডার্ন গার্ল?"

"না, ইয়োর অনার, মেয়েটি একটি লাস্যময়ী। তারও চেয়ে বেশী, স্বৈরিণী। এ হার্লট। ওই গ্রামেরই একটি দরিদ্র শ্রম-জীবীর কন্যা। নগেন এবং খগেনের বাপের আমল থেকে ঐ মেয়েটির বাপ-মায়ের নানা কর্মসূত্রে হৃদ্যতা ছিল। চাষের সময় মেয়েটির মা-বাপ ওদের চাষে খাটত। শেষের দিকে কয়েক বৎসর যখন নগেন-খগেনের বাপ শেষ শয্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, তখন স্থায়ীভাবে কৃষানের কাজও করেছে। মেয়েটির মায়ের ওদের বাড়িতে নিত্য যাওয়া আসা ছিল, বাড়ি ঝাঁট দেওয়ার কাজ করত, ওদের বাড়ির ধান সেদ্ধ ও ধান ভানার কাজে নিযুক্ত ছিল। তখন থেকেই ওই মেয়েটি, চাঁপা, এদের বাড়ি আসত। এই খগেনের সে সমবয়সী, দু এক বছরের বড়; খগেনের সঙ্গে সে খেলা করত। পরে চাঁপার বিবাহ হয়, শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। তখন সে বালিকা। তারপর এই ঘটনার দু বছর আগে বিধবা হয়ে সে ফিরে আসে। সে তার স্বামীর বাড়িতেই এই স্বৈরিণী-স্বভাব অর্জন করেছিল, এবং যতদূর মনে হয়, জন্মগতভাবেই সে ওই প্রকৃতির ছিল। এবং অতি সহজেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এই প্রিয়দর্শন তরুণ ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছিল। তারপর আকৃষ্ট হল বড় ভাই। এই চাঁপা মেয়েটিই এ মামলার প্রধান সাক্ষী। আসামী নগেন প্রথমটা এই তরুণ-তরুণীর মধ্যে সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। ভাইকে সে এই চাঁপার মোহ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত করবার জন্যই চেষ্টা করেছিল। মেয়েটিকেও অনুরোধ করেছিল প্রতিনিবৃত্ত হতে।"

হেসে অবিনাশবাবু বললেন, "সাধু-জনোচিত অনেক ধর্মোপদেশ দিত তখন। তারপর—।" আবার হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন, "সাধুর খোলস তার জীবন থেকে খসে পড়ে গেল। সে তার দিকে আকৃষ্ট হল এবং উন্মত্ত হয়ে উঠল। চাঁপার কাছে সে বিবাহ-প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সাময়িকভাবে চাঁপাও তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছোট ভাই মৃত খগেন তখন বড় ভাইকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। কারণ সন্ন্যাসী হয়ে বড় ভাই যখন গৃহত্যাগ করেছিল, এবং বাপের মৃত্যুশয্যায় স্বমুখে বলেছিল যে, গৃহধর্ম সে করবে না, ছোট ভাইকে মানুষ করে দিয়েই সে আবার চলে যাবে, তখন পৈতৃক বিষয়-আশয়ের উপর তার কোন অধিকার নাই। সমস্তর মালিক সে একা। ভ্রাতৃ-বিরোধের একটি জটের সঙ্গে আর একটি জট যুক্ত হয়ে রূঢ়তর এবং কঠিনতর হয়ে উঠল। তার পরিণতিতে এই ঘটনা। শেষ পর্যন্ত গ্রামের পঞ্চজনের মীমাংসায় স্থির হয় যে, নগেন বাপের কাছে যা-ই মুখে বলে থাকে, তার যখন কোন লিখিত-পঠিত কিছু নাই এবং বাপ যখন নিজে একথা বলেনি যে, তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী খগেন হবে, তখন নগেন অবশ্যই সম্পত্তির অংশ পাবে। খানিকটা জমি মাপ করে ভাগ করবার জন্যই দুই ভাই নদীর অপর পারে গিয়েছিল। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। একটি বন্ধুর সঙ্গে মিলে ভাগে খগেনের একটি পান-বিড়ির দোকান ছিল। সে সেই দোকানেই থাকত। সে-দিন কথা ছিল, নগেন এসে খগেনকে ডাকবে এবং দুই ভাই ওপারে যাবে। কিন্তু নগেন আসে না, দেরি হয়। তখন খগেনই এসে নগেনকে ডাকে। নগেনের মনের মধ্যে তখন এই প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে বলেই আমার বিশ্বাস। একটা দ্বন্দ্ব তখন শুরু হয়েছে। এই সুযোগে যদি কাঁটা সরাতে পারি তবে মন্দ কী? আবার ভয়-মায়া-মমতা, তারাও স্বাভাবিকভাবে বাধা দিচ্ছিল এই ক্ষেত্রে। খগেনের দোকানের অংশীদার বন্ধু বলে, খগেন তাকে দোকানে রেখে নগেনকে ডাকতে যায়। নগেন এল না দেখে সে বিরক্ত হয়েছিল। অভিমানে রাগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ-গ্রামেই সে আর থাকবে না। বিষয় ভাগ করে নিয়ে, সব বেচে দিয়ে, সে যত শিগগির হয় চলে যাবে অন্যত্র। সে-ই বলে, দোকান পর্যন্ত এসেও নগেন বলেছিল, 'থাক না আজ। আমার শরীরটা আজ ভাল নাই।' এবং এও বলেছিল, 'বিকেলটা আজ ভাল নয়, বৃহস্পতির বার-বেলা; তার উপর কেমন গুমোট রয়েছে। চৈত্রের শেষ। বাতাস টাতাস উঠলে তোকে নিয়ে মুশকিল হবে।'

"খগেন ভাল সাঁতার জানত না। জলকে সে ভয় করত। কিন্তু সে-দিন সে বলছিল, 'না। আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখব না। ওই জমিটায় আল দিতে পারলেই সাত-খানা দড়ির শেষখানা কেটে যাবে। আজ শেষ করতেই হবে।'

"দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নগেন বলেছিল, 'তবে চল।'

"এর মধ্যে ইঙ্গিতটি যেন স্পষ্ট। তার বর্বর-প্রবৃত্তির কাছে সে তখন অসহায়। দীর্ঘনিশ্বাসটি তারই চিহ্ন! এর পরবর্তী ঘটনা, যা এর পূর্বে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, তাই ঘটেছে। জলমগ্ন অবস্থার সুযোগে বর্বর-প্রবৃত্তির তাড়নায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছে সে।"

ওদিকে বাইরে পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। কোর্টের ঘড়িটা ও থেকে দুমিনিট স্লো।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু উঠে পড়লেন।

॥ পাঁচ ॥

খাস-কামরায় এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

শরীর আজ অত্যন্ত অবসন্ন। কালকের রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ফলে সারা দেহখানা ভারী হয়ে উঠেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের কপালে হাত বুলিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি।

আরদালী টেবিল পেতে দিয়ে গেল। মৃদু শব্দে চোখ বুজেই অনুমান করলেন তিনি। চোখ বুজেই বললেন, "শুধু টোস্ট আর কফি। আর কিছু না।"

সকাল বেলা উঠে থেকেই এটা অনুভব করছেন। সুরমার তীক্ষ্ন দৃষ্টি; সেও লক্ষ্য করেছে। বলেছিল, "শরীরটা যে তোমার খারাপ হল!"

তিনি স্বীকার করেননি। বলেছিলেন "নাঃ। শরীর ঠিক আছে। তবে রাত্রি-জাগরণের একটা ছাপ তো পড়বেই। তা

ছাড়া কালকের বিকেলের ওইটে। স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।”

বলেই তিনি ফাইল নিয়ে বসেছিলেন। সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গিয়েছিলেন। ফাইল খোলার অর্থই হল, ‘বাইরে যাও তুমি।’ কিন্তু না-গিয়েই বা উপায় কী? স্বামীর এ-কর্তব্যের গুরুত্ব সুরমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? সে বিচারকের কন্যা, বিচারকের স্ত্রী এবং নিজে সে শিক্ষিতা মেয়ে।

ফাইলের কাজের আকর্ষণ ছিল না, তাগিদও ছিল না। আসলে গত রাত্রির সেই চিন্তার স্রোত তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে অবরুদ্ধ জলস্রোতের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। প্রকৃতির ধর্ম, তার অমোঘ নির্দেশ। লাইফ ফোর্স, প্রাণশক্তির জীবন-সঙ্গীত শুনেছিলেন কাল ওই ঝরনার কলরোলের মধ্যে। সে এক বিন্দুই হোক আর বিপুল বিশালই হোক, আকাঙ্ক্ষা তার বিশ্বগ্রাসী। কিন্তু শক্তির পরিমাণ যেখানে যতটুকু, পাওনার পরিমাণ তার ততটুকুতেই নির্দিষ্ট। তার এক কণা বেশী নয়। ব্রহ্মা-কমণ্ডলুর স্বল্প পরিমাণ, হয়তো একসের বা পাঁচপো জল, গোমুখী থেকে সমগ্র আর্যাবর্ত ভাসিয়ে গঙ্গাসাগরে এসে মিশেছে তার বিষ্ণুচরণ থেকে উদ্ভব মহিমার পুণ্যে, সুমতির মুখে এই কথা শুনে তিনি হাসতেন। সুমতি রাগ করত, তাঁকে বলত অধার্মিক, অবিশ্বাসী। হিমালয়ের মাথার তুষার-প্রাচীর তাকে দেখিয়েও এ-কথা বোঝাতে পারেননি। অবুঝ শক্তি ঠিক সুমতির মতই দাবি করে, সে-দাবি পূর্ণ হয় না। বেদনার মধ্যেই তার বিলুপ্তি ঘটে। জানোয়ার চিৎকার করে জানিয়ে যায়; মানুষ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে, অভিশাপ দেয়। অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক ধর্মকে পিছনে ফেলে মানুষ একটা নিজের ধর্ম আবিষ্কার করেছে। বিচিত্র তার ধর্ম। বিস্ময়কর! মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও তৃষ্ণার্ত মানুষ নিজের মুখের সামনে তুলে-ধরা জলের পাত্র অন্য তৃষ্ণার্তের মুখে তুলে দিয়ে বলে, ‘দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।’ লক্ষ লক্ষ এমনি ঘটনা ঘটছে। নিত্য ঘটছে, অহরহ ঘটছে। কিন্তু এ-মহাসত্যকে কে অস্বীকার করবে যে, যে মরণোন্মুখ তৃষ্ণার্ত মুখের জল অন্যকে দিয়েছিল, তার তৃষ্ণার যন্ত্রণার আর অবধি ছিল না। ওখানে প্রকৃতির ধর্ম অমোঘ। লঙ্ঘন করা যায় না। মানুষের জীবনে ওই তো দ্বন্দ্ব, ওই তো সংগ্রাম; ওইখানেই তো তার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। প্রকৃতি-ধর্মের দেওয়া শাস্তি!

ফিরবার পথে এই সময়টাতেই গাড়িখানা নদীর উপর নতুন তৈরী ব্যারাজ পার হচ্ছিল। ব্যারাজটা দেখেই মনে হয়েছিল ওই ব্যারাজটার ওপাশ থেকে স্রোতোধারা জমে উঠে কী চাপেই না ব্যারাজটাকে ঠেলছে! ব্যারাজটার গাঁথনির সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছে।

উঃ, সমস্ত জীবনটার সর্বাঙ্গ এমনি চাড়ে চৌচির হয়ে ফেটে যেতে চায়।

আরদালী ট্রে এনে নামিয়ে দিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন, “কফি বানাও।” ছুরি কাঁটা সরিয়ে রেখে হাত দিয়েই টোস্ট তুলে নিলেন। আজ সকাল থেকেই প্রায় অনাহারে আছেন। ক্ষিধে ছিল না। রাত্রে ফিরে এসে খেতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপরও ঘণ্টা খানেক জেগে বসেই ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন। চিন্তা একবার জাগলে তার থেকে মুক্তি নেই। এ-দেশের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, চিন্তা অনির্বাণ চিতার মত। সে দহন করে। উপমাটি চমৎকার। তবু তাঁর খুব ভাল লাগে না। চিতা তিনি বলেন না। প্রাণই বহ্নি, বস্তুজগতের ঘটনাগুলি তার সমিধ, চিন্তা তার শিখা। চিন্তাই তো চৈতন্যকে প্রকাশ করে, চৈতন্য ওই শিখার দীপ্তি-জ্যোতি। আপন প্রভায় বিশ্বরহস্যকে প্রকাশিত করে আপনাকে সপ্রকাশ করে। যাঁরা গুহায় বসে তপস্যা করেন, তাঁদের আহার সম্পর্কে উদাসীনতার মর্মটা উপলব্ধি করেন তিনি। রাত্রি-জাগরণের ফলে শরীর কি খুব অসুস্থ হয়েছিল তাঁর? না, তা হয়নি। অবশ্য খানিকটা ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন, সমস্ত রাত্রি পাতলা ঘুমের মধ্যেও এই চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরেছে। সকাল বেলাতেই সে-চিন্তা ধূমায়িত অবস্থা থেকে আবার জ্বলে উঠেছে। তারই মধ্যে এত মগ্ন ছিলেন যে, খেতে ইচ্ছে হয়নি। টোস্ট খেতে ভাল লাগছে। টোস্ট তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বলে নয়, সেই কলেজ-জীবন থেকে। প্রথম মুনসেফী জীবনে সকাল-বিকেল বাড়িতে টোস্টের ব্যবস্থা অনেক কষ্ট করেও করতে পারেননি তিনি। সুমতি কিছুতেই পছন্দ করতে পারত না। সে চাইত লুচি তরকারি; তরকারির মধ্যে আলুর দম। তা-ই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুরমা সুমতির এই রুচিবাতিকের নাম দিয়েছিল টোস্টোফোবিয়া। এই উপলক্ষ্যে করেও সে সুমতিকে অনেক খেপিয়েছে। তাঁদের দুজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করে তাঁকে দিত টোস্ট, ডিম, কেক, চা; সুমতিকে দিত নিমকি কচুরি মিষ্টি। সুমতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হত, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারত না। মধ্যে মধ্যে স্যান্ডউইচ তৈরি করে আরদালীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত। লিখে দিত, ‘চিকেন স্যান্ডউইচ পাঠালাম জামাইবাবুর জন্যে। চিকেন হল মুরগীর বাচ্চা। ছোঁয়া নাড়া বাঁচাবার জন্যে জানালাম।’ সুমতি সেগুলি না নিয়ে পারত না, কিন্তু নিয়ে সেগুলি ফেলে দিত। শেষের দিকে এত ক্রুদ্ধ হত সে যে, ক্রোধ সম্বরণের উপায় না-পেয়ে সে শুচিতার দোহাই দিয়ে শীতের সন্ধ্যায় স্নান করত।

বেচারী সুরমা। এই সব নিয়ে তার মনে একটা গোপন গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। সুমতির মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ নয়, তবু তার মনে গ্লানি, কেন সে এগুলি করেছিল। কেন তাকে কষ্ট দিয়েছিল? হয় তো সুমতি এবং তাঁর মধ্যে সে এসে না দাঁড়ালে সুমতির এই শোচনীয় পরিণাম হত না। আংশিকভাবে কথাটা সত্য। সুমতির মনের ঈর্ষার আগুন সে সেদিন রাত্রে বাইরে জ্বালিয়ে অগ্নিকাণ্ডটাকে ডেকে এনেছিল। সত্যই তার মনের আগুন ওই টেনিস ফাইনালের দিন তোলা ফটোগ্রাফখানায় ধরে বাইরে বাস্তবে জ্বলে উঠেছিল। ফটোগ্রাফার দোকানী ফটোগ্রাফখানা যথারীতি মাউন্ট করে প্যাকেট বেঁধে তিনখানা তাঁর বাড়িতে আর তিনখানা জজ সাহেবের কুঠিতে সুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজে তখন কোর্টে। তিনি এবং সুরমা দুজনের কেউই জানতেন না যে, ছবিতে তাঁরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে চেয়ে ফেলেছেন। চোখের দৃষ্টিতে গাঢ় অনুরাগের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। জানলে নিশ্চয় সাবধান হতেন। ফটোগ্রাফারকে বাড়িতে ফটো পাঠাতে বারণ করতেন; হয় তো ও-ছবি বাড়িতে ঢোকাতেন না কোন দিন। জীবনের ভালবাসার দুর্দম বেগকে তিনি ওই নদীটার ব্যারাজের মত শক্ত বাঁধে বেঁধেছিলেন। যেদিকে তাঁর প্রকৃতির নির্দেশে গতিপথ, সুরমার দুই-বাহুর দুই তটের মধ্য দিয়ে ছুটতে তাকে দেননি। জীবনের সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছিল, চৌচির হয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু সে-বন্ধনকে এতটুকু শিথিল তিনি করেন নি। নাথিং ইমমরাল, নাথিং ইললিগাল! নীতির বিচারে, দেশাচার আইন সব কিছুর বিচারে তিনি নিরপরাধ, নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু সে-কথা সুমতি বিশ্বাস করেনি। করতে সে চায়নি। তিনি বাড়ি ফিরতেই সুমতি ছবি ক'খানা সামনে ফেলে দিয়ে অগ্ন্যুদ্গারের পূর্বমুহূর্তের আগ্নেয়-গিরির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ছবি ক'খানা দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন।

সুমতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে উঠেছিল, "লজ্জা লাগছে তোমার? লজ্জা তোমার আছে? নির্লজ্জ, চরিত্রহীন—"

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "সুমতি!" তার মধ্যে তাকে সাবধান করে দেওয়ার ব্যঞ্জনা ছিল।

সুমতি তা গ্রাহ্য করেনি। সে সমান চিৎকারে বলে উঠেছিল, "ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখ, দেখ কোন্ পরিচয় তার মধ্যে লেখা আছে।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বন্ধুত্বের। আর ম্যাচ জেতার আনন্দের।"

"কিসের?"

"বন্ধুত্বের।"

"বন্ধুত্বের? মেয়ের ছেলের বন্ধুত্ব? তার কী নাম?"

"বন্ধুত্ব।"

"না। ভালবাসা।"

"বন্ধুত্বও ভালবাসা। সে বুঝবার সামর্থ্য তোমার নাই। তুমি সন্দেহে অন্ধ হয়ে গেছ। ইতরতার শেষ ধাপে তুমি নেমে গেছ।"

"তুমি শেষ ধাপের পর যে পাপের পাঁক, সেই পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছ। তুমি চরিত্রহীন, তুমি ইতরের চেয়েও ইতর। অনন্ত নরকে তোমার স্থান হবে না।"

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত তিনিও বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। উদ্যত ক্রোধ এবং ক্ষোভকে সম্বরণ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি বেঁচেছিলেন। বাইসিক্লে চেপে তিনি শহরের এক দূর প্রান্তে গিয়ে বসে ছিলেন। চিন্তাই করেছিলেন, চিন্তার শিখার দীপ্তিতে নিজের অন্তর তন্ন তন্ন করে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খুঁজে দেখেছিলেন। নাথিং ইমমর‍্যাল, নাথিং ইর্‌লিগাল। কোন দুর্নীতি না, কোন পাপ না। বন্ধুত্ব। গাঢ়তম বন্ধুত্ব। সে-কথা তিনি স্বীকার করবেন। আরও ভাল করে দেখেছিলেন। না, তার থেকে কিছু বেশী; সুরমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে! আছে! না! পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাই,—না-পাওয়ার জন্য অন্তরে ফল্গুর মত বেদনার একটি ধারা বয়ে যাচ্ছে শুধু। সে-ধারা বন্যার প্রবাহে কোন কূল ভেঙেচুরে দেবার জন্য উদ্যত নয়; নিঃশব্দে জীবনের গভীরে অশ্রুর উৎস হয়ে আবর্তিত হচ্ছে।

চিন্তার দীপ্তিকে প্রসারিত করেছিলেন ন্যায় এবং নীতির বিধান-লেখা শিলালিপির উপর। অসীম অধ্যবসায় এবং আরও ধীরতার সঙ্গে পাঠোদ্ধার করেছিলেন। কোন সমাজ, কোন রাষ্ট্র, কোন ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি; কোন ব্যাকরণের কোন বিশেষ শব্দার্থ গ্রহণ করেননি। এবং পাঠ করে নিঃসংশয় হয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এতটা রাত্রি! জানুয়ারির প্রথম সময়টা, রাত্রি পৌনে দশটা! আপিস থেকে বেরিয়েছিলেন পাঁচটায়। বাড়ি থেকে বোধ হয় ছটায় বেরিয়ে এসেছেন। পৌনে দশটা। প্রায় চার ঘণ্টা শুধু ভেবেছেন। সিগারেট পর্যন্ত খাননি। তখন তিনি সিগারেট খেতেন।

শান্ত চিত্তে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন; ক্রোধ অসহিষ্ণুতা সমস্ত কিছুকে কঠিন সংযমে সংযত করেছিলেন। সুমতি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। বাইসিক্ল তুলে রাখবার জন্য আরদালীকে ডেকে পাননি। চাকরটাও ছিল না। ঠাকুর! ঠাকুরেরও সাড়া পাননি। ভেবেছিলেন, সকলেই বোধ হয় তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছে! মনটা ছি ছি করে উঠেছিল। কাল লোকে বলবে কী। সন্ধান যেখানে করতে যাবে সেখানে সকলেই চকিত হয়ে উঠবে। তবুও কোন কথা বলেননি। নিঃশব্দে পোশাক ছেড়ে, মুখ হাত ধুয়ে, ফিরে এসে বসেছিলেন। সুমতি ঠিক একভাবেই শুয়ে ছিল, অনড় হয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, "আমাকে খুঁজতে তো এদের সকলকে পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

এবার সুমতি উত্তর দিয়েছিল, "খুঁজতে কেউ যায়নি। কারণ তুমি কোথায় গেছ, সে-কথা অনুমান করতে কারুর তো কষ্ট হয় না। ওদের আজ আমি ছুটি দিয়েছি। বাজারে যাত্রা হচ্ছে, ওরা যাত্রা শুনতে গেছে।"

তারপরই উঠে সে বসেছিল। বলেছিল, "আমি ইচ্ছে করেই ছুটি দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।"

চোখ দুটো সুমতির লাল হয়ে উঠেছিল। কেঁদেছিল। মমতায় তাঁর অন্তরটা টন টন করে উঠেছিল। তিনি অকৃত্রিম গাঢ় স্নেহের আবেগেই বলেছিলেন, "তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ সুমতি। একটা কথা তুমি বুঝছ না—"

"আমি সব বুঝি। তোমার মত পণ্ডিত আমি নই। সেই অধার্মিক বাপমায়ের আদুরে মেয়ের মত লেখাপড়ার ঢঙ আমি না জানি, কিন্তু সব আমি বুঝি।"

ধীর কণ্ঠেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "না। বোঝ না।"

"বুঝি না? তুমি সুরমাকে ভালবাস না?"

"বাসি। বন্ধু বন্ধুকে যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসি।"

"বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু! মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। বল, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, ওর সঙ্গ তোমার যত ভাল লাগে, আমার সঙ্গ তোমার তেমনি ভাল লাগে?"

"এর উত্তরে একটা কথাই বলি, একটু ধীরভাবে বুঝে দেখ তোমার আমার সঙ্গ জীবনে জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে, শত বন্ধনে জড়িয়ে আছে। সুরমার সঙ্গের একটা সময় আছে এবং সেটা অবসরসাপেক্ষ। খেলার মাঠে, আলোচনার আসরে তার সঙ্গে আমার সঙ্গ।"

"হ্যাঁ তাই বলছি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধনে তুমি কাঁটার শয্যায় শুয়ে থাক, সাপের পাকে জড়িয়ে থাক! ওর সঙ্গেই তোমার যত আনন্দ, যত অমৃত-স্পর্শ!"

একটি ক্ষীণ করুণ হাস্যরেখা প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথের মুখে ফুটে উঠল। আনন্দ এবং অমৃত-স্পর্শ শব্দ দুটি তাঁর নিজের। সুমতি দুটি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল। তিনি তখন ক্ষুধার্ত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া তাঁর চৈতন্যকে জেলখানার বেত্রদণ্ড পাওয়া আসামীর মত নিষ্করুণ আঘাত হেনে চলেছে। বেত্রাঘাত-জর্জর কয়েদীরা কয়েক ঘা বেত্রাঘাতের পর ভেঙে পড়ে। তাঁর চৈতন্যও তাই পড়েছিল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও তিনি পারেননি। আপনাকে তিনি আর প্রসন্নতার কাচের আবরণে স্নিগ্ধ এবং নিরাপদ করে প্রকাশ করতে পারেননি। কাচের আবরণটা ফেটে চুরমার হয়ে গিয়ে সত্যের আগুন লকলকে আগুনের মত আত্মপ্রকাশ করেছিল। নগ্ন সত্য, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। তিনি বলেছিলেন, "তুমি যে কথা দুটো বললে, ও উচ্চারণ করতে আমার জিভে বাধে। ওর বদলে আমি বলছি আনন্দ আর অমৃতস্পর্শ। হ্যাঁ, তা আমি পাই। সত্যকে অস্বীকার আমি করব না। কিন্তু কেন পাই, তুমি বলতে পার? তুমি কেন তা দিতে পার না?"

"তুমি ভ্রষ্টচরিত্র বলে পারি না। আর ভ্রষ্টচরিত্র বলেই তুমি ওর কাছে আনন্দ পাও। মাতালরা যেমন মদকে সুধা বলে।"

"আমি যদি মাতালই হই সুমতি, মদকেই যদি আমার সুধা বলে মনে হয়, তবে আমাকে ঘৃণা কর, আমাকে মুক্তি দাও।"

"ভারী মজা হয় তা হলে, না?"

"শোন সুমতি। আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি ভেঙে দিচ্ছ। তার উপর আমি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। তোমাকে শেষ কথা বলে দি। তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে সামাজিক বিধানে। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার ভরণ-পোষণ করব, তোমাকে রক্ষা করব, আমার উপার্জন আমার সম্পদ তোমাকে দোব। আমার গৃহে তুমি হবে গৃহিণী। আমার সব তোমার। সংসারে যা বস্তু, যা বাস্তব, যা হাতে তুলে দেওয়া যাও, তার উপর তোমার অধিকার, তা আমি দিতে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে তা দিয়েছি। এক বিন্দু প্রতারণা করিনি। কোন অনাচার করিনি।"

"করনি?"

"না।"

"ভালবাস না তুমি সুরমাকে? এতবড় মিথ্যা তুমি শপথ করে বলতে পার?

"না। মিথ্যা আমি বলব না। তার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি বলতে পার, ভালবাসার আকার কেমন? তাকে হাতে ছোঁয়া যায়? তাকে কি হাতে তুলে দেওয়া যায়? দিতে পার? তোমার অকপট ভালবাসা আমার হাতে তুলে দিতে পার?"

এবার বিস্মিত হয়েছিল সুমতি। এক মুহূর্তে উত্তর দিতে পারেনি। মুহূর্ত খানেক স্তব্ধ থেকে বলেছিল, "হেঁয়ালি করে আসল কথাটাকে চাপা দিতে চাও। কিন্তু তা দিতে দেব না।"

"হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আমি করছি না। সুমতি, ভালবাসা দেওয়ার বস্তু নয়, নেওয়ার বস্তু। কেউ কাউকে ভালবেসে পাগল হয়। তার মহিমাটা যে-ভালবাসে তার নয়; যাকে ভালবাসে মহিমা তার। সুরমার মহিমা আছে, সে হয় তো তুমি দেখতে পাওনা, আমি পাই, তাই আমি তাকে প্রকৃতির নিয়মে ভালবেসেছি।"

"লজ্জা করছে না তোমার। মুখে বাধছে না?" চিৎকার করে উঠেছিল সুমতি।

"না।" সবল কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি।

"মুখ তোমার খসে যাবে।"

"না। যাবে না।" হেসে বলেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

"ধর্ম যদি থাকে, তবে নিশ্চয় যাবে। ধর্ম সাক্ষী করে—"

বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, "তোমার অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম আমার ধর্ম নয় সুমতি। আমার ধর্মকে আমি জানি। ধর্ম সাক্ষী করে তোমাকে যে-যে শপথ করে গ্রহণ করেছি, তার সবগুলি আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি, লঙ্ঘন করিনি। লঙ্ঘন করব না। ভবিষ্যতে আরও কঠোরভাবে পালন করব। এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাব। সুরমার কাছ থেকে অনেক দূরে।"

"কিন্তু মন?"

"সে তো বলেছি, সে নিজে দেওয়া যায় না। যার নেবার শক্তি আছে, সে নেয়। ওখানে মানুষের বিধান খাটে না। ও প্রকৃতির বিধান। যতটুকু তোমার ও-বস্তু নেবার শক্তি, তার এককণা বেশী পাবে না। তবে হ্যাঁ, এটুকু মানুষ পারে, মনের ঘরের হাহাকারকে লোহার দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখতে পারে। তা রেখেও সে হাসতে পারে, কর্তব্য করতে পারে, বাঁচতে পারে। তাই করব আমি। আমাকে তুমি খোঁচা মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত করো না।"

সুমতি এ-কথার আর উত্তর খুঁজে পায়নি। অকস্মাৎ পাগলের মত উঠে টেবিলের উপরে রাখা ফাইলগুলি ঠেলে সরিয়ে, কতক নীচে ফেলে, তছনছ করে দিয়েছিল। তিনি তার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, "কী হচ্ছে?"

"কোথায় সে ফটো?"

"ফটো কী হবে?"

"পোড়াব আমি।"

"না।"

"না নয়। নিশ্চয় পোড়াব আমি।"

"না।"

"দেবে না?"

"না। ও ফটো আমি ঘরে রাখব না, কিন্তু পোড়াতে আমি দেব না।"

সুমতি মাথা কুটতে শুরু করেছিল। "দেবে না? দেবে না?"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ড্রয়ার থেকে ফটো কখানা বের করে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু ফটো কখানাই নয়, চুলের গুচ্ছ পোরা খামটাও। রাগে আত্মহারা সুমতি সেটা খুলে দেখেনি। গোছা সমেত নিয়ে গিয়ে উনোনে পুরে দিয়েছিল।

তাঁরও আর সহ্যের শক্তি ছিল না। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। শুধু চেয়েছিলেন সব কিছু ভুলে যেতে। তিনি আলমারি খুলে বের করেছিলেন ব্র্যান্ডির বোতল। তখন তিনি খেতে ধরেছেন। নিয়মিত খেতেন, খানিকটা ফ্যাশন, খানিকটা পরিশ্রম লাঘবের জন্য। সে-দিন অনিয়মিত পান করে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলেন।

সুমতির অন্তরের আগুন তখন বাইরে জ্বলেছে। সে তখন উন্মত্ত। শুধু ওই কখানা ফটো উনোনে গুঁজেই সে ক্ষান্ত হয়নি, আরও কয়েকখানা বাঁধানো ছবি ছিল সুরমার, সে-কখানাকেও পেড়ে আছড়ে কাচ ভেঙে ছবিগুলোকে আগুনে গুঁজে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল গুঁজে সুরমার চিঠিগুলো। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বেলে ফিরে এসে সেও শুয়ে পড়েছিল। ওই আগুন লেগেছিল চালে। সুমতির অন্তরের আগুন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। বনস্পতির শাখায় শাখায় পত্রে পল্লবে ফুলে ফলে যে তেজশক্তি করে সৃষ্টি-সমারোহ, সেই তেজই পরস্পরের সংঘর্ষের পথ দিয়ে আগুন হয়ে বের হয়ে প্রথম লাগে শুকনো পাতায়, তারপর জ্বালায় বনস্পতিকে; তার সঙ্গে সারা বনকে ধ্বংস করে। অঙ্গার আর ভস্মে হয় পরিণতি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পুড়ে ছাই হয়েও সুমতি নিষ্কৃতি দেয়নি।

বাইরে ঢং ঢং শব্দে দুটোর ঘণ্টা বাজল। কাফর কাপটা তাঁর হাতেই ছিল। নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। নামিয়ে রাখলেন এতক্ষণে।

আরদালী এসে এজলাসে যাবার দরজার পর্দা তুলে ধরে দাঁড়াল। জুরির উকিল আগেই এসে বসেছেন আপন আপন আসনে।

॥ ছয় ॥

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন, আচ্ছন্নের মত অবস্থায়। পৃথিবীর সব কিছু তার দৃষ্টি-মন-চৈতন্যের গোচর থেকে সরে গেছে। কোন কিছু নেই। চোখের সম্মুখে ভাসছে আসামীর মূর্তি। কানের মধ্যে বাজছে দুই পক্ষের উকিলের যুক্তি। মনের মধ্যে রয়েছে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ থেকে রচনা-করা পট। আর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে আসামীর কথাগুলি। আসামী দায়রা বিচারে একটি ছাড়া কথা বলে না; এ আসামী বলেছে।

থানা থেকে শুরু করে এই বিচার পর্যন্ত একই কথা বলে আসছে। "হুজুর, আমি জানি না আমি দোষী কি নির্দোষ। ভগবান জানেন, আর হুজুর বিচার করে বলবেন।" কথা তো শুধু কথা নয়। কণ্ঠস্বরের সকরুণ অসহায় অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টির সেই অসহায় বিহ্বলতা, তার হাত জোড় করে নিবেদনের সেই অকপট ভঙ্গি, সব মিলিয়ে সে একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর চৈতন্যের উপর।

তাঁর সমস্ত চৈতন্যকে যেন সচকিত করে দিচ্ছে; ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের উপর তীব্র আলোর ছটা এবং উত্তাপের স্পর্শে জেগে উঠে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। ওই লোকটির সেই চরম সংকট-মুহূর্তের অবস্থার কথা

তাঁকে কল্পনা করতে হবে না। এ-অবস্থার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। তিনি ভুক্তভোগী।

মাথার উপর গোটা ঘরের চালটায় আগুন ধরেছে। ধোঁয়ায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। ঘরের আলো নিভে গেছে। আগুনের ছটায় রাঙা ধোঁয়া শুধু। তার সঙ্গে উত্তাপ। মাথার মধ্যে মদের নেশার ঘোর এবং যন্ত্রণা। মৃত্যু যেন অগ্নিমুখী হয়ে গিলতে আসছিল তাকে এবং সুমতিকে। সুমতি শুয়ে ছিল মেঝের উপর। সে বিহ্বলের মত চিৎকার করছিল।

তিনি তার মধ্যেও নিজেকে সংযত করে সাহস এনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে সব ঢেকে আসছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তারই মধ্যে তিনি গিয়ে সুমতির হাত ধরে বলেছিলেন, "এস, শিগগির এস।"

সুমতি আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর হাত।

কোথায় দরজা? কোন দিকে?

সুমতি দরজায় খিল এবং উপরে নীচে দুটো ছিটকিনি দিয়ে শুয়েছিল। তিনি জানেন, তার ভয় ছিল, যদি রাত্রে সন্তর্পণে দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে যান!

তবুও ধৈর্য হারাননি তিনি। একে একে ছিটকিনি খিল খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। সেখানে নিশ্বাস সহজ হয়েছিল, কিন্তু গোটা বারান্দার চালটা তখন পুড়ে খসে পড়ছে। একটা দিক পড়েছে, মাঝখানটা পড়ছে। সুমতি চিৎকার করে উঠল, ভারী বোঝার মত মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়লেন। মুহূর্তে খসে পড়ল এক রাশি জ্বলন্ত খড়। সে কী যন্ত্রণা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেল এক মহাঅগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। তবু তিনি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাধা পড়ল! হাতটা কোথা আটকেছে! ওঃ, সুমতি ধরে আছে! মুহূর্তে তিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে কোন রকমে দাওয়ার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে এসে খোলা উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এ-অবস্থা কল্পনা ঠিক করা যায় না। ভুক্তভোগী বলে তিনি বুঝতে পারছেন।

তিনি জানেন। তিনি জানেন।

সরাসরি তিনি তাঁর আপিস ঘরে গিয়ে বসলেন। আচ্ছন্নের মত। চোখে শূন্য দৃষ্টি, চেতনা অতল চিন্তার গভীরতম তলে মগ্ন। 'ঈশ্বর জানেন। আর হুজুর বিচার করে বলবেন।' আশ্চর্য, লোকটা একবার বলে না, 'আমি নির্দোষ।'

ডিফেন্সের উকিল আত্মরক্ষার অধিকারের মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। জীবনের জন্মগত প্রথম অধিকার, জন্মস্বত্ব বাঁচবার অধিকার। সেকশন এইট্টি-ওয়ানের নজির তুলেছেন। কিন্তু সেকশন এইট্টি-ওয়ান ওকে জলমগ্ন অবস্থাতেও গলা টিপে ধরবার অধিকার দেয় নি। আসামীর উকিল সুকৌশলে ওর অংশটুকু তুলে ধরেছে জুরিদের সামনে।

"A and B, swimming in the sea after a ship-wreck, get hold of a plank not large enough to support both; A pushes B, who is drowned. This in the opinion of Sir James Stephen is not a crime......"

এর পরও একটু আছে। স্যার জেমস স্টীফেন আরও বলেছেন,

"......as thereby A does B no direct bodily harm but leaves him to his chance of another plank."

এ-সেকশন তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদাই করা আছে।

সুমতির হাতখানাই শুধু তিনি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, কোন আঘাত তিনি করেননি। সুমতির দেহে একটা ক্ষতচিহ্ন অবশ্য ছিল; সে নিয়তির পরিহাস, তার স্বকর্মের ফল, পায়ের তলায় একটা দীর্ঘ কাচের ফলা আমূল ঢুকে বিঁধে ছিল। বাঁধানো ফটো ভেঙেছিল সে নিজেই, সেই কাচের টুকরো! ওই কাচের টুকরো বিঁধে যাওয়াতেই অমন ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। সুমতির বিধিলিপি। তার বাঁচবার সকল দিকটা নিয়তি যেন নীরন্ধ্র করে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তিনি অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের ঘরে ঢুকলেন। পদক্ষেপ বিহ্বল, একবার কার্পেটে জুতোর ডগাটা বেধে গেল। গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরখানার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার দেওয়ালটার সামনে। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো সুমতির-ছবিখানা-ঢেকে-ঝোলানো আবরণটা সরিয়ে দিলেন। বেশ বড় আকারের অয়েল পেণ্টিং। ছবিখানার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

সে কি অভিযোগ করছে?

তিনি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন?

"তুমি এ-ঘরে?" বাইরে থেকে বলতে বলতেই ঘরে ঢুকে সুরমা স্বামীকে সুমতির ছবির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ফিরে তাকালেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। তারপর সুরমার দিকে এগিয়ে এলেন।

সুরমা এগিয়ে গেলেন ছবিটার দিকে। পর্দাটা টেনে ঢেকে দেবেন।

"থাক। খোলা থাক। ওকে ক'দিন বারবার মনে পড়ছে। আজ বহুবার। ওকে দেখব। থাক খোলা! খোলাই থাকবে ওটা।"

"তুমি আজ কোর্টে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?"

"কে বললে?"

"আরদালী বলছিল, পাবলিক প্রসিকিউটারের সওয়ালের সময় তোমার নাকি মাথা ঘুরে উঠেছিল, উঠে গিয়ে মাথায় জল নিয়েছে।"

"হ্যাঁ।" একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। বিচিত্র সে হাসি। বিষণ্ণতার মধ্যে যে এমন প্রসন্নতা থাকতে পারে, এ সুরমা কখন দেখেননি।

অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীর উকিলের সওয়ালের পর তার জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি গভীর আত্মমগ্নতার মধ্যে ডুবে ছিলেন। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত বসে ছিলেন তিনি, চোখের তারা দুটি পর্যন্ত স্থির; কাচের চোখের মত মনে হচ্ছিল। ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাসে শুধু তাঁর গাউনের প্রান্তগুলি কাঁপছিল, দুলছিল। তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন ওই শ্বাসরোধী অবস্থার স্বরূপ। আঙ্কিক নিয়মে অন্ধ বস্তুশক্তির নিপীড়ন। অঙ্কের নিয়মে একদিকে তার শক্তি ঘনীভূত হয়, অন্যদিকে জীবনের সংগ্রাম-শক্তি, সহ্যশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। তার শেষ মুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে—সে চরম মুহূর্ত—শেষ চেষ্টা তখন তার। পুঞ্জ পুঞ্জ শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। নির্মল প্রাণদায়িনী বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়। সকল স্মৃতি, ধারণা, বিচারবুদ্ধি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আসে। অকস্মাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে যেমন আলোর শিখা বেড়ে উঠে লণ্ঠনের ফানুষে কালির প্রলেপ লেপে তার জ্যোতির চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করে দিয়ে নিজেও নিভে যায়; ঠিক তেমনি হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে খসে পড়ে জ্বলন্ত খড়ের রাশি, একসঙ্গে শত বন্ধনে বাঁধা একটা নিরেট অগ্নি-প্রাচীরের মত। আসামী ঠিক বলেছে সে-সময়ের মনের কথা স্মরণ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম। হতভাগ্য আসামী জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর বন্ধনে বেঁধেছিল তার ভাই। ঘন জলের মধ্যে গভীরে নেমে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ তাঁর কানে এল অবিনাশবাবুর কথা।

পাবলিক প্রসিকিউটার বলছিলেন সেকশন এইট্টি ওয়ানের অনুল্লিখিত অংশটির কথা। আসামী খগেনের গলা টিপে ধরে তাকে আঘাত করেছে, শ্বাস রোধ করে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে, নিজেই বেঁচেছে খগেনকে বাঁচবার অবকাশ দেয় নি।

"ইয়োর অনার, তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। আমার পণ্ডিত বন্ধু সেকশন এইট্টি ওয়ানের একটি নজিরের অর্ধাংশের উল্লেখ করেছেন মাত্র। সে-অর্ধাংশের কথা আমি বলেছি। এই সেকসন এইট্টি ওয়ানেই আর একটি নজিরের উল্লেখ আমি করব। ভগ্নপোত তিনজন নাবিক, অকূল সমুদ্রে ভেলায় ভাসছিল। দুজন প্রৌঢ়, একজন কিশোর। অকূল দিগন্তহীন সমুদ্র, তার উপর ক্ষুধা। ক্ষুধা সেই নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতম রূপ নিয়ে দেখা দিল, যে-রূপকে আমরা সেই আদিম উন্মাদিনী শক্তি মনে করি। 'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।' যার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন মাথা নত করে। সেই অবস্থায় তারা লটারি করে ওই কিশোরটিকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে বাঁচে। তারা উদ্ধার পায়। পরে বিচার হয়। সে-বিচারে আসামীদের উকিল জীবনের এই আদিম আইনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, বিচারককে মনে রাখতে হবে, তারা তখন মানুষের সভ্যতার আইনের চেয়েও প্রবলতর আইনের দ্বারা পরিচালিত।

"কিন্তু সেখানে বিচারক বলেছেন, আত্ম-রক্ষা যেমন মানুষের সহজ প্রবৃত্তি, সাধারণ ধর্ম, তেমনি আত্মত্যাগ, পরার্থে আত্ম-বিসর্জনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মহত্তর ধর্ম। ইয়োর অনার, যে প্রকৃতি বস্তু-জগতে অন্ধ নিয়মে পরিচালিত, জন্তু-জীবনে বর্বর, হিংস্র, কুটিল আত্মপরতন্ত্রতায় প্রকাশ, মানুষের জীবনে তারই প্রকাশ দয়াধর্মে, প্রেমধর্মে—আত্মবলিদানের মহৎ এবং বিচিত্র প্রেরণায়। জন্তুর মা সন্তানকে ভক্ষণ করে। মানুষের মা আক্রমণোদ্যত সাপের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে সে-দংশন নিজে বুক পেতে নেয়। কোথায় থাকে তার আত্ম-রক্ষার ওই জান্তব দীনতা হীনতা? মা যদি সন্তানকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, পিতা যদি তাই করে মহত্তম মানব-ধর্ম বিসর্জন দেয়, সবল যদি দুর্বলকে রক্ষা না করে, তবে এই মানুষের সমাজে আর পশুর সমাজে প্রভেদ কোথায়? মানুষের সমাজ আদি যুগ থেকে অনেক পথ চলে এসেছে, এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ আর সাধনাসাপেক্ষ নয়, সহজাত রক্তের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে তার। আমাদের পুরাণে আছে, মহর্ষি মাণ্ডব্য বালককালে একটি ফড়িংকে কাঁটা ফুটিয়ে খেলা করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁকে বিনা অপরাধে রাজকর্মচারীর ভ্রমে শূলে বিদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি ধর্মকে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন অপরাধে এই দণ্ড তাঁকে নিতে হল? তখন ধর্ম ওই বাল্যবয়সের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—এই ধর্মের বিচার। ইয়োর অনার, এই মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কল্পনা, এদেশে—"

ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সমস্ত কোর্ট-রুমটা যেন পাক খেতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে মনে পড়েছিল—দীর্ঘদিন আগের কথা। তিনি হাসপাতালে পড়ে আছেন, বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; নিদারুণ যন্ত্রণা দেহে মনে। সুরমার বাবা তাঁকে বলেছিলেন, "কী করবে তুমি? কী করতে পারতে? হয় তো সুমতির সঙ্গে একসঙ্গে পুড়ে মরতে পারতে! কী হত তাতে?"

আজ আসামীকে লক্ষ্য করে অবিনাশবাবু যখন এই প্রশ্নগুলি করে গেলেন, তখন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরে একটা কম্পন বয়ে গেল। তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন নুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে এক মিনিটের জন্য, বোধ করি তারও চেয়ে কম সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথা তুলে বসে বলেছিলেন, "মিঃ মিত্রী, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। ফাইভ মিনিট্স প্লীজ।" তিনি খাস কামরায় চলে গিয়ে বাথরুমে কলের নীচে মাথা পেতে দিয়ে কল খুলে দিয়েছিলেন। চার মিনিট পরেই আবার এসে আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন, "ইয়েস, গো অন প্লীজ!—ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের কল্পনা—।"

অবিনাশবাবু আশ্চর্য ধীমত্তার সঙ্গে তাঁর সওয়াল করেছেন। সমস্ত আদালত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সওয়াল শেষের পরও মিনিটখানেক কোর্টরুমে সূচীপতন-শব্দ শোনা যাবার মত স্তব্ধতা থমথম করছিল।

আসামী চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেও সকলের মনে ধ্বনিত হচ্ছিল, "আসামী যদি একটি নারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্নেহ মমতা, তার সুদীর্ঘ দিনের সন্ন্যাসধর্ম বিসর্জন দিতে উদ্যত না হত, তবে আমি বলতাম—জলের মধ্যে সে যখন ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন শুধু মাত্র জান্তব আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই সে একাজ করেছিল, কোন আক্রোশ ছিল না তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। তার প্রতি করুণাই হত। কিন্তু—এখানে তার আক্রোশ ছিল।"

আর ধ্বনিত হচ্ছিল, "আইনই শেষ কথা নয়। পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়ম যেমন অমোঘ, মানুষের চৈতন্যের মহৎ প্রেরণাও তেমনই অমোঘ। তার চেয়েও সে বলবতী, তেজঃশক্তিতে প্রদীপ্ত, জান্তব প্রকৃতির তমসাকে নাশ করতেই তার সৃষ্টি! ভাই ভাইকে, বড়ভাই ছোটভাইকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেনি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেছে। এ হত্যা কলঙ্কজনক; নিষ্ঠুরতম পাপ মানুষের সমাজে।"

জুরীরা একবাক্যে আসামীকে দোষী ঘোষণা করেছে।

আসামীও বোধ হয় অবিনাশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুবা বিচিত্র তার মন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল, "হুজুরদের জয় হোক! খগেনের কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা থেকে আমি বাঁচলাম।"

জুরিদের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন। রায় দিয়েছেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন। ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই অস্বাভাবিক আসামীর প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে ঘটনা সংঘটনের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির করুণা পাবার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছেন।

কোর্ট থেকে এসে সরাসরি ঘরে ঢুকে আপিসে বসেছিলেন।

সুমতির কাছে মুখ দেখাতে কি তাঁর লজ্জা আছে? আছে?

না-থাকলে তার ছবিখানা পর্দায় ঢাকা কেন?

কেন?

আজ দীর্ঘকাল পর অকস্মাৎ তিনি পলাতক আত্মগোপনকারীর দুর্বিষহ অবস্থা অনুভব করছেন। তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। করছেন। বিচারকের কাছে আত্ম-সমর্পণ করছেন।

সুমতির ছবির কাছে তাই তিনি গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সুরমা এসে দাঁড়াল। তিনি ফিরলেন।

সারা সন্ধ্যাটা চিন্তামগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন হাতার মধ্যে।

সুরমা অসহায়ের মত বসে রইলেন তাঁর দিকে চেয়ে।

মাণ্ডব্য ধর্মের বিধান পরিবর্তন করে এসেছিলেন, পাঁচ বছর পর্যন্ত কোন অপরাধের জন্য মানুষ দায়ী হবে না। এখন সে-বয়স বেড়ে হয়েছে সাত বছর। এখনও কি মানুষের চৈতন্য সাত বছরের গণ্ডী পার হয়নি? এখনও কি আদিম প্রকৃতির অন্ধ নিয়মের প্রভাবের কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা কাটাবার মত বল সঞ্চয় করেনি?

করেছে। তিনি সুরমাকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সুমতির প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। প্রকৃতির আবেগে বারেকের জন্যও মুখে বলেননি, তোমাকে আমি ভালবাসি। মনে-না-পাওয়ার বেদনা ছিল, সে-বেদনাও তিনি বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে গোপনতম অন্তরেও আত্মপ্রকাশ করতে দেননি।

সন্ধ্যার পর আবার এসে বসেছিলেন আপিস-রুমে। সুরমাকে বলেছিলেন, "আজ আমাকে ডেকো না। রায়ের কথাটা ভাবছি এখনও। ভাবতে দাও আমাকে। অপরাধের পরিমাণটা নির্ধারণ করতে দাও আমাকে।"

চোখ দুটির দৃষ্টি তাঁর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

আবার এসে দাঁড়ালেন সুমতির ছবির সামনে। ভাল আলো এসে পড়ছে না, দেখা যাচ্ছে না ভাল। তিনি ডাকলেন, "বয়।"

"নামা ছবিখানাকে। রাখ ওই চেয়ারের উপর।"

পরিপূর্ণ আলোর সামনে রেখে—তার দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন।

বল তোমার অভিযোগ

"বল তোমার অভিযোগ! বল! তোমাকে আমার মন ভালবাসা দিইনি? —স্বীকার করি না। দিয়েছিলাম—পেয়েছিলে—যতটুকু তোমার পাবার শক্তি ততটুকুই পেয়েছিলে। তার বেশী কেউ পায় না। প্রাপ্যের অতিরিক্ত যা পায়, যা দেওয়া যায়, তার নাম করুণা দয়া—ভালোবাসা নয়। সুরমাকে ভালবেসেছিলাম? বেসেছিলাম। সে বাসিয়েছিল, সে তার প্রাপ্য পেয়েছিল। কিন্তু সে দেওয়া নেওয়া মনে-মনে হয়েছিল, বাক্যে প্রকাশ পায়নি, আচরণে প্রকট হয়নি। তুমিই অকারণ সন্দেহে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিকে অভিশাপ দিয়েছিলে। তোমার ঈর্ষার আগুনেই তুমি বাইরে লাগিয়ে তাতেই পুড়েছ, আমাকেও পোড়াতে চেয়েছিলে। —আমি নির্দোষ—আমি—। কী? কী বলছ? আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারিনি? না, পারিনি! অপরাধ স্বীকার করছি। নিজের জীবন বিপন্ন করেও পারিনি। কী বলব? কী? তোমার সঙ্গে পুড়তে পারতাম? তোমার জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারতাম? হ্যাঁ, তা পারতাম। কী? পৃথিবীর মানুষের চৈতন্য অনেক দিন সাত বছর পার হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে। নিশ্চয় হয়েছে, তাইতো অপরাধ স্বীকার করছি।"

মাথাটি নীরবে নত করে টেবিলের উপর রাখলেন তিনি।

আবার মাথা তুললেন। "কী? কী বলছ? আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে বলছ? বলছ, নিয়তি আগুনের বেড়াকে ছিদ্রহীন করে তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, শুধু একটি ছিদ্রপথ ছিল আমার হাতখানি? আকুল আগ্রহে, পরম বিশ্বাসে সেই পথে হাত বাড়িয়ে ধরেছিলে, আমি হাত ছাড়িয়ে—সেই পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছি? —দিয়েছি। দিয়েছি! দিয়েছি! আমি অপরাধী। হ্যাঁ আমি অপরাধী।"

তাঁর অন্তরলোকে চৈতন্য যেন পূর্ণচন্দ্রের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছে। আদি-অন্তহীন মনের আকাশে কত মুখ ভেসে উঠেছে অসংখ্য তারার মত। কাদের? যাদের বিচার তিনি করেছেন। বিচার দেখতে এসেছে তারা। রায় শুনবে। ডিভাইন জাস্টিস। ডিভাইন জাজমেণ্ট। মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু সংযত করলেন নিজেকে।

কাল তিনি আত্মসমর্পণ করবেন সর্বসমক্ষে, প্রকাশ্য আদালতে। কিন্তু তার আগে সুরমার কাছে।

—সুরমা!

স্বাদেশিকতার উন্মেষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মরা যখন শিশু ছিলাম তখন বাড়ির বারান্দার পাটাতনের সঙ্গে টাঙানো একটা বড় ঝুড়ি দেখিতাম। বড়দের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহাতে 'ডাক-সাজ' রহিয়াছে। 'ডাক-সাজ' পদার্থটা কী, কৈশোরে পদার্পণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। দুর্গাপূজার পূর্বে দুর্গা-প্রতিমার গহনা, মুকুট, চাল প্রভৃতির জন্য বিলাতী উপকরণ আসিত, তাহার দ্বারা 'ডাক-সাজ' তৈরি হইত। বাড়ির কর্তা-ব্যক্তিদের কেহ কেহ খুলনা, যশোহর, এমনকি কলিকাতা পর্যন্ত যাইয়া এই 'ডাক-সাজ' কিনিয়া আনিতেন। পরে আরও শুনি, স্বদেশীর আমলে এই 'ডাক-সাজ' আনা বন্ধ হইয়াছে, মাতা দুর্গা সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সহ সনাতন দেশী রঙের সজ্জায়ই বেশ তৃপ্তি পাইতেছেন!

এই প্রসঙ্গটি উত্থাপনের একটি কারণ আছে। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থকেই বলিয়াছিলেন, শুধু গৃহসজ্জায়, আসবাবপত্রে, পোশাক-পরিচ্ছদে নহে, পূজার্চনায়ও বিলাতী দ্রব্য মৌরসী স্বত্ব করিয়া বসিয়াছে! তিনি তখন ইহার প্রতিকারের একটি উপায়ও বাতলাইয়া দেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! তখন ভারত-বাসীমাত্রেই যে দেশমাতার সেবায় পরাঙ্মুখ ছিলেন তাহা নহে, তবে এইরূপ 'পরদেশী' সজ্জা পরিত্যাগ করিতে যতখানি মনোবল দরকার তাহার বড়ই অভাব ছিল। ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। নকলের চাকচিক্যে আমরা তখন আসল হারাইতে বসিয়াছি। বিলাতী 'ডাক-সাজ' পর্যন্ত মায়ের অঙ্গে চড়িয়া-ছিল!

কিন্তু ঐ সময়ে বা উহার কিছু পূর্ব হইতেই আমাদের, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানীদের মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষের কার্যত প্রচেষ্টা শুরু হয়। মনীষিগণ ভারতবাসীদের জাতিগতভাবে একসূত্রে গাঁথিবার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু স্বাদেশিকতা যে জাতীয়তার ভিত্তি, এ বিষয়টির দিকে প্রথমে তেমন নজর পড়ে নাই। নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মেলা বা জাতীয় মেলা স্বদেশীয় ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, মৃত বা মৃতপ্রায় নিত্য-প্রয়োজনীয় শিল্প ও শিল্প-যন্ত্র চরখা-তাঁত প্রভৃতি, কৃষি ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি, জাতীয় ব্যায়াম ও তৎসঙ্গে শরীরচর্চার সাজ-সরঞ্জাম সংস্কার ও সংশোধন, পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃ প্রচারে রত হয়। আজ যে আমরা পুরোপুরি 'স্বদেশী' হইতে প্রয়াসী হইতেছি তাহার মূল নিহিত রহিয়াছে এই মেলার কয়েক বৎসর ব্যাপী অবিশ্রাম কার্যকলাপের মধ্যে। মনীষী রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয়ই মেলার ভাবাদর্শ পূর্বে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ভোলানাথ চন্দ্র যে-উপায় আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহাও এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের ভিতর দিয়াই তিনি স্বাদেশিকতাকে সর্বাগ্রে সার্থক করিতে বলিলেন। আমরা বিলাতী জিনিসকে 'প্রীতি' করিয়াছি বলিয়াই তো তা গৃহাভ্যন্তরে এবং পূজামণ্ডপে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে। এই প্রীতির ভাব মনেপ্রাণে বর্জন করিতে হইবে; তখনই দেখা যাইবে বিলাতী জিনিস আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার জন্য রাজদ্বারে, আইন-সভায় বা বিচার-আদালতে যাইবার প্রয়োজন নাই। ভোলানাথ এই মনোভাবের নাম দিয়া-ছিলেন 'ম্যরাল হস্টিলিটি' বা 'নৈতিক শত্রুতা'। ইহা ১৮৭৬ সনের কথা, তখনও কানিংহাম বয়কটের দৌরাত্ম্যকে ব্যঙ্গ করিয়া বর্জন অর্থে 'বয়কট' কথাটি চালু হয় নাই। ঐ সময় ঢাকায় তন্তুবায়গণও স্থির করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা বিলাতী সুতা ব্যবহার করিবেন না।

সকল নীতির মূলাধার এবং সর্বকর্মের নিয়ামক রাষ্ট্রশক্তি। বাংলাদেশের মনীষিগণ সপ্তম দশকেই রাজনীতির উপর তাই বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। 'স্বদেশী'র পরিপন্থী যাহা কিছু, তাহার বিরুদ্ধেও লড়িতে তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে ইতি-পূর্বেই একাধিক কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা উত্তরোত্তর কাপড়ের বাজারে নিজেদের মাল চালাইতেছিল। বিলাতী বস্ত্রশিল্প ভারতের কাপড়ের বাজার যে একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার পথে এসব তো কম বিঘ্ন নয়। বিলাতের কল-মালিকরা জোট বাঁধিয়া ভারত-সচিবের নিকট আবেদন করে যাহাতে বিলাতী বস্ত্রের উপর হইতে ভারত গবর্নমেণ্ট শুল্ক তুলিয়া লন। বশংবদ ভারত-সচিব তাহাই করিলেন, অর্থাৎ, ভারত সরকারকে আদেশ দিয়া এই শুল্ক একেবারে তুলিয়া লইলেন। ইহা লইয়া কলিকাতার ভারতসভা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন। সরকার পূর্ব আদেশ কতকটা সংশোধন করিয়া লইতেও পরে বাধ্য হন। এই সময়কার একটি ব্যাপার বড়ই কৌতুককর। বিলাতের কাপড়ের মালিকরা পূর্বে আর একটি ধুয়া তুলিয়া-ছিল। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে রবিবারও ছুটি নাই, রবিবার পুণ্য-দিন—'সাবাথ ডে', এই দিনে কাজ! একথা ভারত-সচিবের কানে উঠিলে তিনি হুকুম দিলেন, ভারত-বর্ষের কাপড়ের কলেও রবিবার ছুটি থাকিবে। একজন পার্লামেণ্ট-সদস্য তখন বেশ বলিয়াছিলেন—রবিবার পুণ্য দিন, ঐদিন কাজ করিতে নাই এসব বাজে কথা! ভারতের কলে উৎপন্ন কাপড় বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার যে সামান্য সুবিধাটুকুও পাইবে ইহা সেখানকার কল-মালিকরা সহ্য করিতে পারে নাই।

কিন্তু স্বদেশী মনোভাবকে আত্মগত ও বস্তুগত করিয়া তুলিতে হইলে শুধু সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিলেই তো চলিবে না। এদেশে কল-কারখানা অধিক সংখ্যায় স্থাপন করিতে হইবে, স্বদেশী মাল বাজারে যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে সেদিকেও নজর রাখিতে হইবে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান-শিক্ষার এমনভাবে প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে উহাকে কল-কারখানার কাজে লাগানো যায়। এদিকে অষ্টম দশকের প্রথমে নেতা ও মনীষীদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক কসরতেরই আয়োজন চলিয়াছে। বঙ্গদেশের একজন ভূতত্ত্ববিদ, সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের পদস্থ কর্মী হইয়াও এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে শুরু করেন।

পূর্বেই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৯৬ সনে অধ্যক্ষতা লাভের পর হইতেই 'আর্ট গ্যালারি' বা কলাশালায় ভারতীয় চিত্র সংগ্রহে তিনি ব্রতী হন। এতদিন ইউরোপীয় চিত্রই বহু অর্থ মূল্যে ক্রয় করা হইতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে ভারতীয় চিত্র সংগ্রহ করাইলেন। আর ১৯০৪-৫ সনে ইউরোপীয় চিত্র সমুদয় নীলামে চড়াইয়া কলাশালাটিকে সম্পূর্ণ 'ভারতীয়' করায় খুব সৎসাহসের পরিচয় দিলেন। ঐ সময় হইতে 'আর্ট গ্যালারি' 'জাতীয় কলাশালা'য় পরিণত হইল। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কারু-শিল্প যে তাঁহার হস্তে বিস্তর সমাদর লাভ করে এবং তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাদর করিতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয় তাহার আভাস ইতিপূর্বেই দিয়াছি।

কোহিনূর সিল্কেই তাঁর রূপ খোলে

দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে 'গুরু' বলিয়া মানিতেন। হ্যাভেলের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে শিল্পে তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। প্রথমে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অংকন অভ্যাস করেন। হ্যাভেল ও অন্যান্য শিল্পীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি প্রাচ্য রীতিতে অংকন শুরু করেন। ইহা হইতেই ভারতীয় চিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। হ্যাভেলের আগ্রহাতিশয্যে অবনীন্দ্রনাথ একেবারে আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিলেন। সোনায় সোহাগা। উভয়ের তুলি-স্পর্শে ভারতীয় চিত্র পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। সিস্টার নিবেদিতা নবপদ্ধতির চিত্রাবলীর ব্যাখ্যায় লেখনী ধারণ করিলেন। কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণ 'স্বদেশী' হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী-সমাজ' বক্তৃতা (২২শে ও ৩১শে জুলাই, ১৯০৪) বাঙালী জাতিকে এক নূতন পথের সন্ধান দিল। বিদেশমুখী না হইয়া আমরা যাহাতে স্বদেশমুখী হইতে পারি তাহারই নির্দেশ পাই ইহার মধ্যে। পল্লীসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। বিদেশী রাজের মুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা দানে, ত্যাগে, সেবায় পল্লীবাসীর শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্পে যথোপযুক্ত প্রকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ রাজদ্বারে না গিয়া সালিশী দ্বারাই মিটাইয়া লওয়া যায়। পরমুখাপেক্ষী হওয়ায় পল্লী উজাড় হইতে চলিয়াছে, ইহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমরা আত্মনির্ভর শক্তিরই অনুশীলন করিতে থাকিব। ফলে একদিকে যেমন আত্মপ্রত্যয় বাড়িবে অন্যদিকে তেমনি পল্লীসমাজ সত্যিকার 'স্বদেশী' হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ আলোচনায় যোগদান করেন এবং বক্তাকে অভিনন্দন জানাইয়া স্বদেশবাসীকেও আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দেন।

এইরূপে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু মেলা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে-সমুদয় বিভাগে কার্য আরম্ভ করিয়াছিল এই সময়ের মধ্যে তাহা কার্যে রূপায়িত করার নানা আয়োজন চলে। স্বদেশী আন্দোলন যে অল্প সময়ের ভিতর অতখানি ব্যাপ্তি ও সার্থকতা লাভ করে তাহার মূলে রহিয়াছে এই প্রকার প্রস্তুতি।

আমি মফস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থীদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুকে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি—"

"বাঃ। তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হবে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্ট্যুম আছে?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভালো কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভরতি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও অবিলম্বে একটি সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেনের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে-কস্ট্যুম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

"আর কিছু নেই?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয় প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচ রকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই?"

"আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট এ মিনিট—"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল।

কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভালো নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। সম্মুখে নানাবর্ণের কস্ট্যুম স্তূপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই?"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হয়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের চাই। কাইন্ডলি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্। আলাদা প্যাকেট করে রেখে দিচ্ছি—"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পরমুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই।"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া

পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন।"

"কোন্ বড় সাহেব?"

"দোকানের। চলুন না—"

একটু অবাক হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না শোনাই যাক, কী বলে।"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমাদের পোশাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হল না বুঝি?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়ছে?"

"চোদ্দ আনা—"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জেসিকো সেলাম দেও।"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চোদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এ'দের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ও'দের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশ-মেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলা-টেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাশ করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

২

সাঁতারের পোশাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোশাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোশাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি শাড়ি গামছা ছিট। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার', সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সহযোগে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্তি আর এক ভদ্রলোকের সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মডারেটেরা ভাল, না এক্স্‌ট্রিমিস্টরা ভাল, এই আলোচনাই করিতে লাগিলেন।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম

পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোন ঔষধ কিনিতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোশাক খুঁজছি—।" বুঝাইয়া বলিলাম।

"ও, বুঝেছি। কাগজে টাইট্‌ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোকরা ছুকরিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হবে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু দুলাল-চাঁদ আসছেন—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক—"

আর আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই দুলালচাঁদ, বসুন, বসুন—"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আমি উপবেশন করিলাম এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোশাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, হয়েছে—গফুর, গফুর, ও গফুর—"

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গি-পরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো। যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোশাক পেয়ে যাবেন—"

"করিয়ে দেবেন বলছেন?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভালো কাপড়ের করিয়ে দেব। কলকাতায় এমনটি পাবেন না।—"

"কী কাপড়ের—"

"সে দেখবেন তখন।"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না। গফুর দর্জির ঘরে গিয়া মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতারণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন—"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর দর্জি পাশের

এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো।

একটা গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন। টেঁকে রেখেছি, এইবার কলটা চালিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে—"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খসখসে গোছের।

গফুর বলিল, "ছাতার কাপড়। বাবু বললেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যাণ্টটা একটু আঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল। একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামী লোক, গরিবের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে—"

৩

সাঁতারের পোশাক সম্পর্কে একটি বিলাতী দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগনের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতি-যোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। সুইমিং কস্ট্যুম না হলে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেলে কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময়ে থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্ট্যুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না, তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়—"

"বেংকট বাবা কে—"

"মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

"কী করে আনিয়ে দিয়েছিলেন—"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার-পর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতূহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকায় ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোশাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোশাক নিয়ে কী হবে—!"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীজাতি

••• সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার •••

চীন কোন সভ্যতাই নারী-জাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দেয় নাই। গ্রীক রোমক এবং ভারতীয় সভ্যতায় সমস্ত শ্রেণীর পুরুষেরও সমান অধিকার ছিল না। প্রাক্-বর্ণাশ্রম বৈদিক যুগে পশুপালক ও যাযাবর আর্য সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ছিল। বহু পুরুষ ঋষির মত নারীরাও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাও হয়ত অল্প ছিল না। কিন্তু বেদের বহু অংশ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং পুরুষ-প্রাধান্য প্রবর্তিত হইবার পর ইঁহাদের নামও বিলুপ্ত হইয়াছে। মাত্র মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রার নাম রহিয়াছে। মানবসভ্যতা যখন কৃষি ও কুটির-শিল্পে নামিয়া আসিল, তখন বৃত্তিবৈচিত্র্য দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম দ্বারা মানব-সমাজকে চারভাগে ভাগ করিবার ব্যবস্থা হইল। ভারতে পাকাপাকিভাবে জন্মগত চারি শ্রেণীর কোনকালে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। রাজা ও যোদ্ধা ক্ষত্রিয়শ্রেণী, প্রভু ও বিশেষ সুবিধাভোগী। পুরোহিত ও শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ অধিকাংশ সময় তাহার সহায়ক, তবে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৈরী। তিন চার হাজার বর্ষব্যাপী এই সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বনিয়াদ ছিল—স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার হীনতার উপর। অধ্যাত্ম সাধনা ও শাস্ত্র-চর্চায় নারী ও শূদ্রের অধিকার ছিল না, কেন না তাহাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল না। এই ব্যবস্থা রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ মানিয়া লইলেও, এবং সাধারণভাবে নারী ও শূদ্র সমাজের দাস হইলেও, ব্যক্তিগতভাবে অনেক মনস্বিনী নারী পুরুষের শাস্ত্র-সংস্কারের বিরুদ্ধতা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং অধ্যাত্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। স্ত্রী-শূদ্রের উপর অত্যাচার যখন চরমে উঠিয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণসহায় রাজচক্রবর্তী সম্রাটগণের শোষণ ও শাসন বহু মানবের পীড়ার কারণ হইয়াছিল, সেই সময় ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। বুদ্ধের মতবাদ প্রায় ৫ শতাব্দী মুষ্টিমেয় বুদ্ধি-জীবী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রতিকূল ক্ষত্রিয় রাজশক্তি এমন সর্বজনীন সাম্যের ধর্ম প্রচারের প্রধান বাধা। কিন্তু সম্রাট অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় বাধা দূর হইল। সমগ্র উত্তর ভারতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নামে অন্যান্য সকলের সহিত স্ত্রী শূদ্র সমান অধিকার পাইল। প্রায় সহস্র বৎসর উত্তর ভারতে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও নারীর সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কালের মধ্যে বহু সুপণ্ডিতা সঙ্ঘনায়িকা, ধর্মপ্রচারিকা নারী সমাজে পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। লৌকিক শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষায় নারী সমান অধিকার ভোগ করিলেও, পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতা অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এই কারণেই সে-কালের প্রগতিশীলা নারীদের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ছিল না।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এবং বর্ণের ভিত্তিতে চারি বর্ণে বিভক্ত নহে, বহু শাখায় বিভক্ত হিন্দু সমাজের গোড়াপত্তন হয়। বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজশক্তির আশ্রয়ে জনগণকে স্ব স্ব মতে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণের মতবাদ এবং পুরাণসমূহের নির্দেশ, এই দুইয়ের মিলিত অভিযান বৌদ্ধ-ধর্মকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিল বটে, কিন্তু এই হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষে বাহির হইতে আগত যবন শক হূনদের দিগ্বিজয়ের আঘাতে ভারতের শতধাবিচ্ছিন্ন রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। নূতন করিয়া সমাজের পুনর্গঠন ও বিন্যাস কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির সহায়তা ছাড়া হয় না। ব্রাহ্মণশক্তি তথাপি অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই দোর্দণ্ড-প্রতাপ ইসলাম রাজশক্তি ভারতে প্রবেশ করিল। পূর্বপূর্ব বিজয়ী জাতিগুলি যেমনভাবে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল, এই নূতন ধর্মসম্প্রদায় ও রাজশক্তি তাহা করিল না। ইসলামীয় সভ্যতা ও প্রচারশীল ধর্মের সম্মুখে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অগ্রগতি বন্ধ হইল। ইসলাম নারীস্বাধীনতার বিরোধী। হিন্দু নারীরা পুনরায় গৃহকোণে ফিরিয়া গেল। নূতন স্মৃতিকারেরা এবং ব্যবস্থাদাতারা নারীর অধিকার সঙ্কুচিত করিলেন। সন্ন্যাসী ধর্ম-প্রবর্তকেরা নানা উদ্ভট শ্লোক রচনা করিয়া জনসাধারণ ও শিষ্যবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন, নারী আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের বাধা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অনধিকারী। বাংলায় পাঠান ও মোগলযুগে স্মার্তপণ্ডিত-দের মতে নারী মাত্রেই শূদ্র। ব্রাহ্মণীর উপবীত নাই, অতএব ওঙ্কার উচ্চারণ ও শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। বলা বাহুল্য শাস্ত্র ও পুরুষের দাপটে নারী-জাতির পক্ষে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবে গত চার শতাব্দীতে এই বিধান অমান্য করিয়া বহু তেজস্বিনী নারী কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাস পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া পুরুষদের বাদে আহ্বান করিয়াছেন।

তারপর আসিল ব্রিটিশ যুগ। ব্রিটিশ শাসন গোড়ার দিকে ধর্ম ও সামাজিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিল না। দীর্ঘ আট শতাব্দীর ক্লেদ, পঙ্ক ও আবর্জনা লইয়া ছত্রভঙ্গ, বহুধাবিভক্ত, নানা উপধর্ম ও সম্প্রদায়ে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিল তখন স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-প্রধানেরা ধর্ম ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই আন্দোলনের কেন্দ্র হইল কলিকাতা নগরী। শিক্ষিত বাঙালীদের এক অংশ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা পান করিয়া স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল, আর-এক অংশ প্রাচীন ও নূতনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নব্য হিন্দু আন্দোলনরূপে দানা বাঁধিয়া উঠিল। স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ হিন্দু, ব্রাহ্ম সকলেই দিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, রামমোহনের সতীদাহ নিবারণের পর ভারতব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত নারী-জাতির হীনতা মোচন ও তাহাদের যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার যে উদ্যম আমরা দেখিয়াছি, তাহা সমগ্র সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক দুর্গতিই তাহার প্রধান কারণ।

স্বদেশী ও বিদেশী বিবিধ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যখন কলিকাতার শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় আলোড়িত, সেই সময় কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ভবতারিণীর মন্দিরে এক পাগল পূজারী মহাতপস্যায় আত্মসমাহিত। ভারতের সর্ববিধ পারমার্থিক সাধনার ভাবঘন মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সামাজিক নির্বুদ্ধিতা ও অর্থহীন লোকাচারের এক তীব্র প্রতিবাদ। পদদলিত, অপমানিত নারীজাতির প্রতি এমন অপার করুণা ও শ্রদ্ধা অতীতে এক বুদ্ধদেব ছাড়া ভারত আর দেখে নাই। দীনদরিদ্র এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি এত প্রীতিও অন্যত্র দুর্লভ। নাগরিক সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত, হুগলী জেলার পল্লী কামারপুকুরে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই গতানুগতিক প্রথা, নিয়ম লোকাচারে অভ্যস্ত। সদাচারী চাটুজ্যেবংশের সন্তান গদাধর ইহার মধ্যে এক ব্যতিক্রম। আট বৎসর বয়সের বালক নির্মল নীলাকাশে হংস বলাকা দেখিয়া অপরূপের ধ্যানে ভাব-সমাধিস্থ! সুবর্ণবণিক, শাঁখারি, গোপ, কর্মকার, কৃষক পরিবারে ইঁহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। অন্যান্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের মত তাঁহার শুচিবাই নাই। ধর্মপ্রাণা নারী, যে জাতির হোক তিনিই গদাধরের জননী, ভগ্নী। কেহ পাগল বলিয়া ক্ষমা করে, কেহ সরল বলিয়া সহিয়া যায়, কেহ মধুর বচন ও ধর্মসঙ্গীতে গলিয়া যায়!

ক্রমে উপনয়নের দিন আসিল। মুণ্ডিত-মস্তক বাল-ব্রহ্মচারী গদাধর বাঁকিয়া বসিল, সে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ করিবে ধনী-কামারনীর হাত হইতে। সমবেত ব্রাহ্মণ-সমাজ স্তম্ভিত, কুলীন ব্রাহ্মণপুত্রের এ কি অসঙ্গত লৌকিক আচারবিরোধী জিদ্‌। কান্ত কোমল গদাধর কঠোর, তাঁহার দিব্যজ্যোতি-উদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া ‘সমাজ’ মাথা নত করিল। আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে জননী ধনী নবযুগের নূতন ঠাকুরের ভিক্ষাপাত্রে তণ্ডুল তুলিয়া দিলেন। এইখানেই শেষ নহে। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ গদাধর জিদ ধরিল যে, তাহার ভিক্ষামাতা ধনীর গৃহে অন্নগ্রহণ করিবে। সংস্কার ও লোকাচার-ভয়ে শঙ্কিতা নারী ব্রাহ্মণকে পক্কান্ন দিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে আপস হইল—ধনীমাতা ঠাকুরের হাতে রন্ধিত শাক প্রদান করিলেন। গদাধরের কী আনন্দ! জন্মগত জাতির সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বালক গদাধর মনুষ্যত্বকে সম্মান দিল, উপেক্ষিতা নারীকে মর্যাদা দিল।

ইহা একটা বালকোচিত আকর্ষণবশত ছেলেখেলা নয়—ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎ সাধনার ইঙ্গিত। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কলিকাতায় টোল ছিল, বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী কনিষ্ঠকে তিনি কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। এই সময় জানবাজারের তেজস্বিনী ও ধর্মপ্রাণা রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করিয়া ভবতারিণী বিগ্রহ স্থাপনের বাসনা করিলেন। কৈবর্ত বংশীয়া রানীর নামে মন্দির উৎসর্গ করিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন না। তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহা পরম পাতক। একজন পণ্ডিত ভিন্নমত অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিতে রাজী হইলেন না। ভ্রাতা গদাধরকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন। ক্রমে পূজো-পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এবং তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানহীন গদাধর হইলেন মায়ের পূজারী। জবা-বিল্বদলের বাহ্য-পূজা নহে, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিবার সাধনা। মাতা ও পুত্রের সাধন-সমর। চরাচর-পরিব্যাপ্ত মহাশক্তির নিগূঢ় পরিচয়লাভের আকুতি। সাধক সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই সিদ্ধিলাভের পরও তিনি লৌকিক সাধনাকে অবহেলা করিলেন না। গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধনা করিতে হইবে। কোথায় গুরু! অন্যান্য অনেককে উপেক্ষা করিয়া তিনি স্ত্রী-গুরু গ্রহণ করিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে তান্ত্রিক সাধনার আনুষ্ঠানিক সর্বপ্রকার স্তর শিক্ষা দিলেন এবং সাধক আর-একবার স্বীয় অনুভূতির সত্যতা অনুভব করিলেন।

বাল্যকালে তিনি এক পঞ্চবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সকল মত, সকল পথের সাধনায় আত্মসমাহিত রামকৃষ্ণ বহুদিন ভুলিয়া ছিলেন। এইবার মনে পড়িল সহধর্মিণীর কথা। এই দিব্য সাধনা তাঁহাকেও দিতে হইবে। সরলা গ্রাম্য বালিকা লোকমুখে শুনিয়াছে, তাহার স্বামী পাগল। দক্ষিণেশ্বরে দুইজনেই মুখোমুখী হইল। এমন স্বামী কার! কী আদর, কী যত্ন, কী শ্রদ্ধা। স্বামী-স্ত্রী গুরু-শিষ্যা হইলেন। সাধন চলিল, তারপর একদিন ষোড়শী পত্নীকে বেদীতে বসাইয়া পাগল পূজারী আবার ভবতারিণীর পূজায় মাতিলেন। সর্বশেষে দক্ষিণা দিলেন—নিজের সর্বসাধনার ফল। এ-রাজ্যে প্রবেশের অনধিকারী আমরা—আমাদের ভাষা এখানে মূক, আমাদের অনুভূতির এখানে প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসী যিনি স্বীয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের
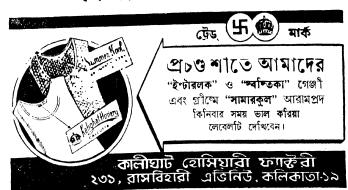
কামকাঞ্চন বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই—অন্যান্য আচার্যদের মত ধর্মপত্নীকে বর্জন করিলেন না। ভগবান বুদ্ধদেব যেমনভাবে স্বীয় ধর্মপত্নী যশোধরাকে ভিক্ষুণীর চীর দিয়া মহা-উপসম্পদা দান করিয়াছিলেন, সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ধর্মপত্নীকে ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পালয়িত্রী জননীর পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অতীতের কোন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় নারীকে ঘৃণা করাটাই একটা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক মানসিক অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীর সহিত লৌকিক ব্যবহার করেন নাই এবং বিশেষ-ক্ষেত্রে নরনারীকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জগদ্ধিতায় কাজ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, এই ছল ধরিয়া অনেকে প্রচার করিয়াছেন, নারীজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কেবল সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রযোজ্য। বিবাহিত গৃহস্থের উহা আদর্শ নহে। ঠাকুর সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর শিষ্যকেই সমান মর্যাদা দিতেন। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য এবং সন্ন্যাসিনী শিষ্যারা আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে সমান অধিকারী। মধ্যযুগীয় অধিকারবাদকে তিনি প্রথমেই বর্জন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্বিশেষে তাঁহার সকল শিষ্য ও শিষ্যাকে প্রণব বা ওঙ্কার সহ মন্ত্র-দীক্ষা দিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা নারীকে ঘৃণা বা পরিহার না করিয়া মাতা ও কন্যাবৎ দেখিবে—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ। এই ধারাই শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে চলিয়া আসিতেছে। * * * স্ত্রী-শিক্ষায়, বৈবাহিক আদান প্রদানের গণ্ডীর প্রসারে, অসবর্ণ বিবাহে, বিধবা বিবাহে ইঁহারাই অগ্রণী। একথা মনে রাখিতে হইবে। রামকৃষ্ণ কোন বিশেষ সামাজিক নিয়ম, প্রথা বা লোকাচারের সংস্কারক নহেন, স্বামী বিবেকানন্দও ভাসা ভাসা ধরনের কোন সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী হন নাই। তিনি ছিলেন আমূল পরিবর্তন পন্থী। বিদ্যাসাগরের পর নির্যাতিতা নারীজাতির পক্ষ হইতে বিবেকানন্দের মত কয়জন সামাজিক কুরীতির নিন্দা করিয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যা শ্রীশ্রীগৌরীমাতা ও বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতার সাধনা আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াছি। নারী-জাতিকে শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান, বিজ্ঞানে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য কী একনিষ্ঠ সাধনা! ইঁহারা অধ্যাত্মসাধনায় আত্ম-সমাহিতা হইয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু গুরুশক্তির নির্দেশে মাতৃজাতির উদ্ধারের ব্রত ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা জাতীয় আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগ হইতে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণভক্ত পরিবারের বহু মহিলা রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নারীজাতির কল্যাণের জন্য স্থাপিত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, ভক্তগণ সকলেই এই কাজে উৎসাহ দিয়াছেন এবং দিয়া থাকেন। মূঢ় নির্বোধ ও গতানুগতিক পন্থীরাই নারী-জাতিকে পুরুষের সহিত তুলনায় হীন ও অনেক ক্ষেত্রে অনধিকারী বলিয়া মনে করে। রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর সকলেই উদার এবং সামাজিক সুবিচারের পক্ষ-পাতী, এমন কথা আমি বলি না। রক্ষণশীলতারূপ মহাব্যাধি এবং লোকাচার-রূপ অপদেবতার উপাসক সর্বত্র যেমন আছে, রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতেও আছে। কিন্তু যাহারা বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী বাণী অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছে, তাহারা নারী জাতিকে হীন ভাবিতেই পারে না। নারীজাতির উন্নতি ও মুক্তি ব্যতীত ভারতের মুক্তি নাই—একথা যিনি বলিয়াছেন, তাঁহারই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।

[শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সৌজন্যে]

অবচেতন

প্রমথনাথ বিশী

এতদিনে সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ করা যাইতে পারে। কাহিনী বলিতে সাধারণত অবাস্তব ও অলৌকিক কিছু বোঝায়। যে-বিবরণ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা আমার পরিচিত এক ব্যক্তির স্বচক্ষে দৃষ্ট, তবু কাহিনী ছাড়া আর কোন শব্দ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কে বিশ্বাস করিবে, কে না করিবে, সে-চিন্তা আর করিব না, ঐ চিন্তা করিয়াই কাহিনীটি এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন শ-বাবুর মৃত্যু হওয়ায় কাহিনী প্রকাশের মূল প্রতিবন্ধক দূর হইয়াছে।

আমি নিজে শ-বাবুর মুখে গল্পটি বহুবার শুনিয়াছি। তাহার প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের আশায় দুইজনে মিলিয়া ঘটনার উপরে যুক্তি ও বিচারের আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিয়াছি, যত রকমে সম্ভব তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়াছি, ব্যাপারটা অবচেতন মনের লীলা, না অতিপ্রাকৃতের খেলা, না কেবলি চোখের মরীচিকা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমবার শুনিয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, আজও তেমনি হতবুদ্ধি আছি। বরঞ্চ সে-ভাবটা যেন আরও বাড়িয়াছে। অসম্ভবের রঙ কালক্রমে ফিকা হইয়া আসে, কিন্তু ইহার রঙ ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছে। তাহার উপরে শ-বাবুর মৃত্যুতে এ-বিষয়ে আলোচনা করিবার সঙ্গীরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে একাকী মনে মনে ঘটনাকে ওলটপালট করিয়া দেখি, যথা পূর্বং তথা পরম্, কোন তল পাই না।

অবশেষে এক সময়ে শ-বাবুকে বলিয়াছিলাম, "বিচার বিশ্লেষণ থাকুক, আমার অবচেতন থিওরি আর আপনার অতিপ্রাকৃত থিওরিও থাকুক, এক কাজ করুন, ঘটনার বিবরণ লিখে ফেলুন।"

আমার কথা শুনিয়া শ-বাবু বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কী সর্বনাশ! তাহলে লোকে মনে করবে আমি গাঁজা ভাঙ খাই।"

"সে-ভয় করলে সাহিত্যিকদের ব্যবসা বন্ধ করতে হয়।"

"আমি তো সাহিত্যিক নই।"

"সেই জনাই তো লোকে সহজে বিশ্বাস করবে। কাহিনী রচনা করে লোক ভোলানো তো আপনার পেশা নয়।"

"না মশায়, ও অনুরোধ করবেন না। যার রহস্য নিজেই উদ্ধার করতে পারলাম না সে-বস্তু আমি পাঠকদের ঘাড়ে চাপাতে চাইনে।"

প্রথম দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল। তারপর দিনে দিনে বারে বারে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহার মন অনুকূল করিয়া আনিলাম, আর অবশেষে ঘটনাটির বিবরণ তিনি লিখিয়া ফেলিলেন। আমি শুনিয়া বলিলাম "চমৎকার হয়েছে। কে বলল আপনি সাহিত্যিক নন।"

"আপনিই প্রথম বললেন যে, আমি লিখতে পারি।"

"সে-কথা জানিনে। তবে এ-ঘটনা এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এর উপরে সাহিত্যিক ছলাকলা আরোপিত হলে ঘটনার স্বাভাবিক ভয়াবহতা ক্ষুণ্ণ হত ছাড়া বাড়ত না। এবারে এক কাজ করুন, রচনাটি কোন কাগজে পাঠিয়ে দিন।"

"খেপেছেন নাকি?"

"ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি এই যে লোকে গাঁজাখোর ভাববে।"

ভাবিলাম আজ আর বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই, অনুরোধ করিয়া করিয়া যখন লিখাইতে পারিয়াছি, তখন একদিন ছাপাইতে রাজি করাইতেও পারিব।

কিছুদিন ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া ছিল, শ-বাবু কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপরে ফিরিয়া আসিয়া একদিন রচনাটি হাতে করিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "নিন, এটা আপনার কাছে রেখে দিন।"

বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, "হঠাৎ?"

"কোন দিন মরে যাই, কেউ জানতেও পাবে না।"

"আপনি তো কাউকে জানাতে চান না। তা ছাড়া হঠাৎ মরতেই বা যাবেন কেন?"

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বটে। তবে কি জানেন, লেখাটা আপনার কাছেই থাকুক, আপনার উৎসাহেই লিখেছিলাম কিনা।"

ভাবিলাম, হাতে যখন আসিল, এখন ছাপিতে পারিব। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া কৃত্রিম বৈরাগ্যের সহিত বলিলাম, "থাকুক, কিন্তু সর্ত কী?"

"আমি জীবিত থাকতে প্রকাশ করবেন না, মরবার পরে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আপনার রইল।"

তারপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটি অনুরোধ, রচনার বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ হলে আপনি তাতে যোগ দেবেন না, বলবেন যে, লেখকের নিষেধ আছে।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু মৃত্যুর কথা এত ভাবছেন কেন?"

"নিকটতম প্রতিবেশী সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।"

"আচ্ছা, আপনি সচেতন থাকুন, আমি আপনার সর্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকলাম।"

এই বলিয়া লেখাটি হাতবাক্সের তলায় সযত্নে রাখিয়া দিলাম।

হঠাৎ নিকটতম প্রতিবেশী শ-বাবুকে স্মরণ করিলেন। শ-বাবুর মৃত্যু একেবারেই অপ্রত্যাশিত; তাঁহার কোন রোগও হয় নাই, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, আর বয়সও পঞ্চাশের নীচে। অকালমৃত্যুর শোচনীয়তায় ঘটনাটি প্রতিভাত হইল। তখন তাঁহার কথা মনে পড়িল, মৃত্যুর সম্ভাব্যতার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন, মৃত্যুর কোন বয়স নাই।

এবারে রচনাটি প্রকাশের পক্ষে আর কোন বাধা নাই, কাজেই সেটি কাগজে পাঠাইয়া দিতেছি। বলা অনাবশ্যক হইলেও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রচনার একটি অক্ষরও আমি অদল বদল করি নাই, কিংবা একটি কমা-সেমিকোলোনও বসাই নাই, যেমন ছিল অবিকল তেমনি আছে। কেবল শ-বাবু রচনার নাম দিয়া যান নাই, একটি নাম দরকার, তাই নামটি আমি বসাইয়া দিলাম, অবচেতন। শ-বাবুর সর্তানুযায়ী বাদানুবাদে নামিতে আমি অপারগ; যাঁহার খুশি বিশ্বাস করিবেন, যাঁহার খুশি নয় অন্যথা করিবেন; স্বয়ং লেখক এখন সমস্ত প্রশ্নের অতীত, আর তাঁহারই অনুরোধে আমারও এখন মুখ বন্ধ।

* * * *

বড়জামদা থেকে রওনা হয়ে ডিভিশনাল রেঞ্জার মিঃ শ্রীবাস্তব আর আমি একদিন দুপুরে বেলা থলকোবাদ ফরেস্ট বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বেয়ারা বারান্দায় দু'খানা চৌকি বের করে দিল, আমরা বসলে সে চা আনতে গেল।

মিঃ শ্রীবাস্তব আরম্ভ করলেন, "জানেন মিঃ রায়, সারান্দা ফরেস্টের মধ্যে এই বাংলোটাই সব চেয়ে উঁচুতে, প্রায় আড়াই হাজার ফুট হবে।"

"কেন, এর চেয়ে উঁচু পাহাড় কি আর নেই?"

"থাকলেও সেখানে বাংলো নেই।"

তারপরে তিনি আবার শুরু করলেন, "প্রায় বছর কুড়ি আগে পার্কার নামে এক-জন রেঞ্জার ছিল, লোকটার সুন্দর দৃশ্যের উপরে খুব টান ছিল, তাই বেছে বেছে সুন্দর জায়গাতে সে ফরেস্ট-বাংলো তৈরি করিয়েছে। ছোটনাগরা, আঙ্কুয়া সমস্তই মনোরম স্থান, কিন্তু এই থলকোবাদের কাছে কেউ নয়।"

শ্রীবাস্তব লোকটি খুব মিশুক আর গল্প-বিলাসী। আমি গল্প করতে পারি জেনে আমার মত সামান্য ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। যখনি 'টুরে' বের হন, আমার ছুটি থাকলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

আমি বললাম, "এ-জায়গা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু সুন্দর তো কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনও। আমার এ-জায়গা কেন ভাল লাগছে জানেন?"

"কেন শুনি।"

"এ জায়গাটির মধ্যে একটি প্রচণ্ড ভয়াবহতা আছে।"

"ভয়াবহতা না থাকলে সৌন্দর্য দীর্ঘকাল মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। ক্ষুদ্র সৌন্দর্য চোখ ভোলায়, মহৎ সৌন্দর্য মন ভোলায়।"

আমি বললাম, "যেমন সমুদ্র আর হিমালয়।"

"আর যেমন এই থলকোবাদ পাহাড়।"

আমি বললাম, "তা বটে, এই দেখুন ঘড়িতে এখন একটার বেশী নয়, কিন্তু রোদের তেজ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচটা বাজে।"

"পাঁচটা যখন সত্যি বাজবে, তখন ঘোর অন্ধকার হবে।"

"আচ্ছা—ঐ যে অনেক দূরে ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে একটা সাদা রেখার মত দেখা যাচ্ছে, ওটা কি নদী নাকি?"

"কোয়েল নদী, ঘণ্টা খানেক আগে পার হয়ে এসেছি।"

এমন সময়ে বেয়ারা এসে জানাল যে, খানা তৈরি হয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে মিঃ শ্রীবাস্তব বললেন, "মিঃ রায়, আপনি একটু বিশ্রাম করুন; কিছু সরকারী কাজ বাকি আছে, আমি সেরে নিই। বড় জোর ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"বেশ আপনি কাজ করুন, আমি চার দিকটা একটু ঘুরে দেখি।"

"কিন্তু মশায়, খুব দূরে যাবেন না, পথ ভুল হলে বিপদে পড়বেন।"

"না না, দূরে যাব কেন, তা ছাড়া তিনটের মধ্যেই ফিরব।"

"নিশ্চয়, অন্ধকার হলেই বাঘভালুক বের হয়।"

"ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।"

"ওকি, আবার ঝোলা কাঁধে করেন কেন?"

আমি হেসে বললাম, "দুর্লভ ফুলের নমুনা সংগ্রহ করবার এক বাতিক আছে আমার, যন্ত্রপাতি আছে ঝুলিতে।"

"আচ্ছা আসুন, দুর্লভ ফুলের অভাব হবে না, কিন্তু খুব সাবধান।"

মোটরের চওড়া পথ ছেড়ে পায়ে চলা শুঁড়ি-পথ দিয়ে নামবার চেষ্টা করছি, হাতে আছে একটা লাঠি।

এমন সময়ে বুধন সিং সেলাম করে দাঁড়াল। বুধন সিং বাংলোর রক্ষক।

"কি ধার যা রহে হেঁ সাহাব?"

আমার আবার রাষ্ট্রভাষা ভাল আসে না, যাই হোক তবু যতটুকু পারি গুছিয়ে বললাম, "ঘুমনে কো।"

"ঘুমনে কো লায়েক জায়গা হ্যায় খাস, লেকিন উধার মৎ যাইয়ে হুজুর।"

বলে সে একটা দিক দেখিয়ে দিল। আর-দশটা জায়গা থেকে কোন প্রভেদ বুঝলাম না।

কেন নিষেধ করছে, বাঘভালুক আছে না আর কিছু হবে, আর-কিছু হবেই বা-কী, এ-সব সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা প্রকাশ করবার মত রাষ্ট্রভাষার পুঁজি আমার নেই, কাজেই সংক্ষেপে বললাম, "ঠিক হ্যায়, উধার নেহি যায় গা!"

শুঁড়ি-পথ দিয়ে সাবধানে নামছি, কখনো গাছের ডাল ধরে, কখনো লাঠিতে ভর দিয়ে, কিন্তু মনটার মধ্যে বুধন সিং-এর নিষেধ-বাক্য পাক খেয়ে মরছে, 'উধর মৎ যাইয়ে সাহেব।'

প্রত্যেকটি শাল গাছ জাহাজের মাস্তুল হবার যোগ্য, বনস্পতি একেই বলে। মাটি

থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে কাণ্ডের গায়ে কোথাও শাখাপ্রশাখা নেই, সরল সমান্তরাল বালিচহ্নগুলোতে বহু বর্ষার, বহু বর্ষণের শ্যামলতা। এমন শত শত হাজার হাজার বনস্পতি। বনের বারো আনাই শাল। তাছাড়া আছে পিয়াশাল, ধ, কেঁদ, মহুয়া, অর্জুন, আর আছে দুর্ভেদ্য পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়। সব কাঁধে কাঁধে মিলে এমন ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক স্থানেই রোদ মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, সব একটানা ছায়া, ভেজা স্যাঁতসেঁতে। সব সুদ্ধ মিলে সরীসৃপের শীতস্পর্শ সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে রোদের কুচি সেই সরীসৃপের গায়েরই রঙের বাহার। কিছুক্ষণ এসব জায়গায় থাকবার পরেই অতলে তলিয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি জন্মায়, যেন ঐ আদিম অতিকায় সরীসৃপ-টার জঠরে তলিয়ে গেছি, মনে হয় যে বিশ্বজগৎ নেই, কিন্তু আমি তবু আছি।

এ-সব বনের মস্ত একটা সুবিধা যে, তলাটা বেশ পরিষ্কার, যেদিকে খুশি যাওয়া যায়। যাচ্ছিও তাই। ইতিমধ্যেই ফুলের নমুনায় কাঁধের থলিটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। যত ফুল তত প্রজাপতি। সমস্তই অজ্ঞাত, অপরিচিত; উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা এদের খবর রাখে না। এত রঙও আছে ফুলের, এত ঢঙও আছে প্রজাপতির পাখার। আর যখন দুয়ে মেলে, মরি মরি, হেন কবি নেই, হেন চিত্রী নেই, যাদের তুলি-কলম সে-সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে। কখনো ফুলগুলোকে মনে হয় প্রজাপতির ঝাঁক, কখনো প্রজাপতির ঝাঁককে মনে হয় ফুলের স্তবক। ফুল তুলছি তো তুলছিই, বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই, মনের সাধ আর মেটে না। বেলা অনেকটা গড়িয়েছে, শরীর যে পরিশ্রান্ত হয়েছে তা প্রথম জানিয়ে দিল আমার পা দুটো, হঠাৎ তারা অবস্থান-ধর্মঘট ঘোষণা করল। অগত্যা একখানা কালো পাথরের উপরে একটা শাল গাছের তলায় বসতে বাধ্য হলাম। সম্মুখে একটা আগাছার শাখায় একটা অজানা ফুলের উপরে বসে অজানা একটা মস্ত প্রজাপতি দোল খাচ্ছে। ফুলটা তুলবার ইচ্ছা হলেও উঠবার শক্তি আর হল না। চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মনটা হঠাৎ দোল খেয়ে উঠল ঐ প্রজাপতির মত অতীতকালের দীর্ঘশ্বাসে। আর ফুলটা! ফুলও ছিল।

আজকে আমি বিহারের এক গ্রাম্য স্কুলের মাস্টার। কিন্তু এ-পরিণাম কি দশ বছর আগেও কেউ কল্পনা করেছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সব পরীক্ষাগুলো পাকা ঘোড়ার মত যখন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শত্রুমিত্র, আত্মীয়-পর সকলেই কল্পনা করেছিল যে, সিভিল সার্ভিসের নিরাপদ আস্তাবলে আমার যাত্রার স্পৃহণীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে। ঘটতও তাই। এমন সময়ে ভাগ্যের শনিগ্রহের মত আমার অদৃষ্টাকাশে উদিত হল সুতপা। তার শাড়ির রাঙা পাড়ের রক্ত-বেষ্টনী, তার খোপার রক্তকরবীর রক্তিম ঈক্ষণ, তার লজ্জারুণ কপোলের ভাব-বলাকাবিন্যাস, তার রক্ত-অধরপুটে চুম্বনের অর্ধস্ফুট কুঁড়িটি, সব মিলে কি বলব, আমি তো কবি নই, কাজেই কবির কথা ধার করে নিয়ে প্রকাশ করি

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তাহার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

সর্বনাশ বটে! রইল পড়ে আমার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া, রইল পড়ে আমার সিভিলিয়ানী স্বর্গ, রইল পড়ে আমার ভবিষ্যৎ। আমার একমাত্র তপস্যা হল সুতপার প্রসন্নতা অর্জন।

সুতপার মন আমার উপর প্রসন্ন ছিল না, একথা বলে তার ও আমার প্রতি অবিচার করতে চাইনে। হয়তো সেই প্রসন্নতার পূর্বরাগ পরিণয়ের ভাস্বরতায় একদিন পরিণত হত। কিন্তু সংসারটা এমন কত 'হলে-হতে-পারতর' ছিন্ন সুতো দিয়েই না সেলাই করা। অভিজ্ঞতার অর্থই হচ্ছে আশার সীমান্তোপলব্ধি। তারপরে একদিন বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে সুতপার বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র। আমিও সেদিন রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জারের বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে রওনা হয়ে এলাম এখন যেখানে ইস্কুল মাস্টারি করছি সেখানে।

আবার একদিন শত্রু-মিত্র আত্মীয়-পর অবাক হয়ে গেল, বলল, ছেলেটার ভবিষ্যৎ ছিল, কিন্তু নিজের দোষে তা খোয়ালে। আসল ব্যাপার জানল না। তাই কেউ বলল, ছোকরাকে মার্কসিজমের ভূতে পেয়েছে, চলল গণদেবতার সেবা করতে। কেউ বলল, গান্ধী গান্ধী করেই গোল্লায় গেল, গেল গাঁওমে সেবা করতে, তাও কিনা আবার বিহারী ভূতদের গাঁও। সবাই জানে তারা অভ্রান্ত। এমনি করেই মানুষের বিচার হয়।

* * * *

সুতপা বলল, "ঐ ফুলটা কী সুন্দর!"

"বেশ তো দেখো না কাছে গিয়ে।" কাছে যেতেই প্রজাপতিটা উড়ে গেল। সে অপ্রতিভ, আমি হেসে উঠলাম।

রাগের ও লজ্জার রাঙা পাড়টানা কালো দৃষ্টির গোটা দুই প্রজাপতি নিক্ষেপ করে সুতপা বলল, "তুমি ভারী দুষ্টু।"

"কেন, প্রজাপতিকে ফুল করতে পারিনি বলে? তা স্বীকার করছি, ও-কাজ আমার অসাধ্য।"

"আগে বলনি কেন?"

"বলবার আর সময় দিলে কই?"

"এমন বোকা বনলাম!"

"যা গোড়া থেকেই আছ, তা নতুন করে আর বনবে কীভাবে।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা অসম্ভব।"

"শোনো, রাগ করোনা, আমার কী মনে হয় জানো? ঐ প্রজাপতিগুলোও ফুল, কেবল ওদের গাছ গিয়েছে হারিয়ে, আর ওরা তাই কেবলি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।"

"যেমন তুমি! গাছ খুঁজে পেলে কি?"

"গাছ কী বলে জানিনে, আমার মন তো বলছে পেয়েছি।"

"আর ঐ ফুলগুলো প্রজাপতি, নয়?"

"হাঁ, গাছ পেয়ে গিয়েছে বলে আর নড়তে চাইছে না।"

"যদি ভুল গাছ হয়?"

"সংসারে অনেক সময় ভুলকেও সয়ে নিতে হয়, মানুষ তো ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়।"

"ইস্, আমি হলে ভুলের বোঁটা ছিড়ে উধাও হয়ে যেতাম।"

* * * *

এসব অনেকদিন আগেকার কথাবার্তা। কার্যত দেখা গেল আমার কথাই ঠিক, ভুলকেই সয়ে নিল সুতপা, বোঁটা ছিড়ে উধাও হয়ে গেল না। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, শেষ পর্যন্ত বোঁটার বাঁধন তার পক্ষে ভুল হয়নি। ঐ কথাটা ভাবতে আমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগে বটে কিন্তু আত্মসম্ভ্রম তো তারও আছে, ভুল হলেই বা স্বীকার করবে কেন সে!

একি, এ যে ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে মাত্র চারটা, কিন্তু এ যে সন্ধ্যার ছায়া। শ্রীবাস্তব তো বলেই দিয়েছিলেন যে এখানে পাঁচটায় বাঘ-ভালুক-বেরনো সন্ধ্যা নামে। ইস্, অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সুতপার কথায় আমার কালজ্ঞান ও কাণ্ড-জ্ঞান কিছুই থাকে না।

লাঠি ও থলি নিয়ে উঠে পড়লাম আর দ্রুত চলতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা চলবার পরে হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা অতিকায় বনস্পতি কদম গাছ দেখে। কই যাওয়ার সময়ে তো এটাকে দেখিনি। তবে কি পথ ভুল হল। গহন বনের মধ্যে একবার ঐ ধারণা মাথায়

জন্মালেই সর্বনাশ! লিভিংস্টোন, স্ট্যানলিরও পথ ভুল হবেই।

একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সম্মুখে, একবার পিছনে চলতে চলতে যখন একটা মুখর ঝরনার ধারে এসে পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যা ও পথশ্রান্তি দুইকেই স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুঝলাম আজ সম্মুখে সর্বনাশ ও রাত্রি।

পথ যখন হারিয়েছি তখন সামনে পিছনে দুই-ই সমান। কাজেই ঝরনাটা পার হলাম। ঝরনা পার হতেই একটি নাতিবৃহৎ উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। চারদিক উঁচু-নিচু পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর ঐ ঝরনার নিত্যধ্বনিত হুড়হুড় দুড়দুড় শব্দ যেন উপত্যকার একটিমাত্র দরজায় নিরন্তর হুড়কো টেনে দিচ্ছে। উপত্যকাটায় ঢুকতেই সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল, গায়ে কাঁটা দিল। এ-কয় বছর এ-অঞ্চলে বনে পাহাড়ে আমি কম ঘুরিনি, মাঝে মাঝে পথ হারাতেও হয়েছে, কিন্তু ঠিক এ-রকম অকারণ ভীতির অনুভূতি এই প্রথম। তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এসেছে, চরাচরের অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ ঝরনার কল-ধ্বনি যেন শিকল নামিয়ে দিয়ে তল মাপবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, সন্ধ্যার সময়েই বাঘ-ভালুক হাতি বের হয় জল পান করতে, যাবে তারা ঐ ঝরনায়। পার হবার সময়ে ওর ধারে এক জায়গায় সহস্র নখের আর পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল। ভাবলাম রাতটা একটা গাছে উঠে কাটাতে হবে। এমন অভিজ্ঞতা একেবারে নূতন নয়। আগে দু'একবার বনের মধ্যে গাছে চড়ে রাত কাটিয়েছি। একটা শক্ত উঁচু গাছের সন্ধানে চোখ যখন ব্যস্ত, দেখতে পেলাম অদূরে উঁচু একটা বস্তু। কাছে গিয়ে দেখি অভাবিত সৌভাগ্য। কাঠের মোটা মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, প্রাচীরও কাঠের, ছাদও তাই। এ-রকম বন্য ঘর আমার পরিচিত। বড় বড় কাঠের ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে তৈরি করে রাখে, পথ হারিয়ে গেলে বা মধ্যপথে রাত হয়ে গেলে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে। মনটা খুশী হল, যাক্, রাত্রিটা আর গাছে চড়ে কাটাতে হবে না। থলিতে টর্চ ছিল, বন ভ্রমণের কালে সর্বদাই একটা টর্চ আমার সঙ্গে থাকে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরটা দেখলাম। আর-দশটা বন্য ঘরের মতই তবে দীর্ঘকাল যে এখানে কেউ রাত্রিযাপন করেছে তা মনে হল না। ভিতরে ঢুকে পড়লাম, খানকতক তক্তা সাজানো, বসে শুয়ে রাত্রি কাটানো যায়, দরজার ফাঁকটা বন্ধ করবার জন্যে কাছেই পড়ে রয়েছে আর খানকতক ছোট বড় কাঠের টুকরো। আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে দরজার ফাঁকটা যথাসম্ভব বন্ধ করে দিলাম কাঠের টুকরো সাজিয়ে। সবটা বন্ধ হল না, উপরে অবশেষে খানেক ফাঁক রইল, ভিতরে কাঠের তক্তার উপরে বসলে বাইরের দৃশ্য বেশ চোখে পড়ে। শীতকাল, তাই সাপখোপের ভয় ছিল না। ভাবলাম রাতটা নিরাপদে কাটবে।

শক্ত নিরাবরণ কাঠের তক্তার উপরে বসলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে করলাম গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিতে যেন বসে আছি। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের তরল অন্ধকার, অরণ্য ও পাহাড়ের জমাট অন্ধকার, গোটা দুই তারার ফুটকি চোখে পড়ছে, তবে এ রেলগাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, এই যা প্রভেদ।

একটু স্থির হয়ে বসতেই নিজের অবস্থা মনে পড়ল, আর রাগ হল নিজের উপরেই। কী দরকার ছিল থলকোবাদ বাংলোয় আসবার, কী দরকার ছিল বাংলো থেকে একাকী বের হবার। শ্রীবাস্তব না জানি কত ভাবছে, আর বুধন সিং তো স্পষ্টই নিষেধ করেছিল। কিন্তু এই উপত্যকাটাই কি তার উদ্দিষ্ট—'উধার'? উপত্যকায় ঢুকতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, মনে পড়ল, মনে পড়ায় আবার গা ছম ছম ক'রে উঠল।

গহন অরণ্যে একাকী রাত যে না কাটিয়েছে তাকে সে-অভিজ্ঞতা বোঝানো যাবে না। দিনের বেলায় যে-বন নিস্তব্ধ, রাতে সেখানে যে কতরকম শব্দ ওঠে, দিনের বেলায় যে-বন নির্জন, রাতে সেখানে যে কী ঠাসাঠাসি, এ-সব রহস্য বলে বোঝাবার নয়। একবার বাইরে টর্চের আলো ফেললাম, অনন্ত কালোর পর্দা একটুখানি ফাঁক হল। বেবাক শূন্য, ধারে কাছে কোথাও গাছপালা নেই। শূন্যতা যে কত গুরুভার, এই রকম স্থানে এই রকম সময়ে বুঝতে পারা যায়।

* * * *

"সুতপা, আজ তোমার ঠোঁট দু'খানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

"বাঃ, দোষ করলে তুমি, আর রাগ আমার উপরে।"

"বাঃ রে, আমি কোথায় দোষ করলাম।"

"ঠিক তুমি নও, তোমার ঠোঁট দুটি। ও একই কথা।"

"তারই বা কী দোষ?"

"নইলে অমন সুন্দর দেখাতে গেল কেন?"

"তাতে দোষটা কিসের শুনি।"

"অপরকে প্রলুব্ধ করছে, abetment, আইনে সেটাও দণ্ডনীয়।"

"তোমার যত বাজে কথা।"

"ঠিক, সে-দোষ স্বীকার করছি, এবারে কাজে নামা যাক্।"

হঠাৎ আমার মুখ নত হয়ে পড়ল তার ঈষদুন্নত অধরোষ্ঠের দিকে। অর্ধস্ফুট গোলাপের কুঁড়িটা যখন উচ্ছিন্ন হবে, ঠিক তার পূর্বমুহূর্তে দু'জন দু'দিকে ছিটকে সরে গেলাম। ফিটন গাড়িখানা পাথরে হুঁচোট খেয়েছে। নলের রাজহংস দময়ন্তীর কাছে এসেই ফিরে গেল, হল না হাতে পত্র সমর্পণ। দময়ন্তীর মুখমণ্ডলে একসঙ্গে পর পর আশাভঙ্গ, উল্লাস, নৈরাশ্য, আত্মধিক্কার প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের সা রে গা মা গেল খেলে।

"নাঃ, তোমাকে আর বিশ্বাস নেই গাড়িতে কি করতে কী করে বসবে।"

"এসো তবে বাড়ি বাঁধি।"

সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

* * * *

এমন সময়ে বিকট একটা গর্জন উঠল অনভিজ্ঞে শুনলে ভাববে গাধা ডাকছে। যা ডাকছে তা হচ্ছে বুনো হাতি এবং তা অদূরেই। আর ওরা যে দল বেঁধে ছাড়া নড়ে না একথা কে না জানে। ওরা চলেছে ঝরনায় জলপান করতে।

হাতির ডাক থেমে যেতেই বন আবার দ্বিগুণ নির্জন হল, শোনা গেল টুং টুং ধ্বনি, গোরুর গলার ঘণ্টায় যেমন আওয়াজ ওঠে। ও এক রকম পাহাড়ী পাখি ডাকছে।

ক্রমে সারা দিনের ক্লান্তিতে ঘুম পেতে লাগল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরায় যেমন অনেকবার ঘুমিয়েছি।

* * * *

অচেনা গাছে অচেনা ফুল। গাছটি সুন্দর, কিন্তু ফুলের বোধকরি তুলনা হয় না। অর্ধবিকশিত ফুলটির অর্ধোন্মোচিত পাঁপড়িগুলোর কী রঙ, কী ভঙ্গিমা, আর মৃদু সূক্ষ্ম সুগন্ধই বা কত। সুস্ফুট ফুলে মহিমা আছে, কুঁড়িতে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু অর্ধস্ফুট ফুলের রহস্য হার মানিয়েছে আর সবকিছুকে। যতই হাত বাড়াই ফুলটি সরে যায়, বাতাসের এ কেমন লীলা। আর এমনতর মেজাজী ফুলও তো দেখিনি। একটু বেশী চেষ্টা করে যাই হাত বাড়িয়েছি, অমনি—

"গাড়ির মধ্যে এসব কী হচ্ছে?"

"তুমি আবার ফুল সেজেছিলে কেন?"

"ফুল সেজেছিলাম? সে আবার কী।"

"মনে হচ্ছিল, তুমি একটা গাছ হয়ে

গিয়েছে, আর তোমার ঠোঁটে ফুটে রয়েছে একটা অচেনা সুন্দর ফুল।"

"একটা কথা সত্যি করে বলবে? আমাকে সত্যিই কি খুব সুন্দর লাগে তোমার?"

দুই ফুসফুসে এক আকাশ বাতাস টেনে নিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "সুন্দর, সুন্দর, তুমি অপূর্ব সুন্দর।"

সেই প্রচণ্ড চেষ্টায় ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম কাঠের আসনের উপরে। চিৎকার বোধহয় সত্যিই করেছিলাম, প্রতিধ্বনির শেষ রেশটুকু তখনো মিলিয়ে যায়নি, সমস্ত অরণ্য বোধ করি চকিত চমকিত হয়ে উঠেছিল অতৃপ্ত প্রণয়ীর ব্যর্থ কামনার নিষ্ফল উল্লাসের অদম্য ক্রন্দনে। বুকের মধ্যে একটা দুর্দম জ্বালা, দুর্মদ ক্ষুধা, দুস্তর আকাঙ্ক্ষা তোলপাড় করতে লাগল। মনে হল, আমার আত্মার সেই অসহ্য উত্তাপে চরাচর সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই ব্যর্থ বাসনার দুর্বার বহ্নি তীক্ষ্ণ সূচীমুখে সমস্ত অরণ্যকে বিদ্ধ করছে আর আমার অন্তর থেকে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-জ্বালা নিষ্কাশিত হয়ে সমগ্র আকাশটাকে ভিতরে ভিতরে তাপিয়ে তুলেছে। যে-অরণ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর যে-অরণ্যে জেগে উঠলাম, এ দুই যেন ভিন্ন স্থান।

আলো জেলে ঘড়ি দেখলাম। কেবল দশটা। মনটা দমে গেল। এখনো অন্তত আট ঘণ্টা এই গুমটিতে চুপ করে বসে থাকতে হবে।

একটা সিগারেট ধরালাম। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই উঠে দাঁড়ালাম, আর দরজার কাছে এসে দাড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। এটা কী হল? আবার ভাল করে তাকালাম। সত্যিই তো, এ কী, এ কেমন হল? সমুখের মাঠ ফাঁকা ছিল, এখন গাছপালায় একেবারে ভর্তি। ব্যাপার কি? বাইরে টর্চের ছটা ফেললাম। না, সমস্ত ঠিক আছে, মাঠ ফাঁকা, আমার চোখেরই ভুল। কিন্তু যেমনি আলো নিভিয়েছি অমনি মুহূর্তে সমস্ত মাঠখানা ঠাসাঠাসি ভর্তি হয়ে গেল গাছপালায়। আবার আলো ফেললাম, না, মাঠ ফাঁকা। আলো নিভোতেই মাঠ উঠল ভরে। এ যেন আমার সঙ্গে আর বনের অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা। লোকালয়ে বসে এ-কাহিনী পড়লে কী মনে হবে জানি না, কিন্তু সেই আদিম অরণ্যের কোলে আদিম অন্ধকারে একাকী বসে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সেই মাঘ মাসের শীতেও আমার কপালে ঘাম দেখা দিল।

ভাবলাম পড়ে মরুকগে, মাঠের মত মাঠ থাকুক, আমার চিন্তার কারণ কী, আমি তো আছি ঘরের মধ্যে। এমন সময়ে আর-এক কাণ্ড ঘটল। ঐ গাছপালাগুলোর মধ্যে ঝড় উঠল। ডালপালার এমন মাতামাতি, গাছ-পালার এমন হুটোপুটি আর কখনো দেখিনি, অথচ চরাচর নিঃশব্দ। চারদিক এমন নিস্তব্ধ যে হাতঘড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভাবলাম ঝড় এখনি ঘরটার উপরে এসে পড়বে। কিন্তু ঝড় ঘরটার কাছেও

উধার মৎ যাইয়ে হুজুর

এল না। আলোর ছটা ফেললাম। কোথায় বা ঝড়, কোথায় বা গাছপালা, ফাঁকা মাঠ নীরব, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। আলো নিভতেই আবার ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বাললাম, তার শিখাটি এতটুকু কম্পিত হল না, অথচ দশ গজ দূরেই মহাপ্রলয় চলছে। এবারে আতঙ্ক শুরু হল। জীবনে কখনো না কখনো সকলেই ভয় পেয়েছে, কিন্তু এ-আতঙ্কের প্রকৃতি বোঝাতে পারব না। এক-বার মনে হল বুধন সিং "ওদিকে" যেতে নিষেধ করেছিল, আমি কি তবে পথ ভুলে তার নিষিদ্ধ "ওদিকে" এসে পড়েছি? অবশ্য কেন নিষেধ করেছিল তা বলেনি। আবার মনে পড়ল, এ-অঞ্চলের কোন কোন লোকের মুখে শুনেছি যে, বনের মধ্যে এক আধটা জায়গা আছে ভারী "খারাপ"। প্রথমে ভাবতাম জন্তু-জানোয়ারের ভয়ের জন্যই "খারাপ"। একবার এক বুড়োকে চেপে ধরায় সে বলেছিল যে, এই সব জায়গায় নানা-রকম "অদ্ভুত" কাণ্ড ঘটে। কী "অদ্ভুত" সে বলতে পারল না। এখন মনে হল সে জানত, কেবল ইচ্ছে করেই বলেনি। ভাবলাম বাইরে যা খুশি ঘটুক, আমার ঘরটির উপরে যতক্ষণ না হামলা হচ্ছে আমার ক্ষতি কী?

তারপরে ভাবলাম বাইরের দিকে আর তাকাব না, তা হলেই ভয়ের কারণ কেটে যাবে। কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব? কৌতূহল ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারতে লাগল, ভয় পাব জেনেও তাকাতে বাধ্য হলাম। সেই ঝড়, সেই মাতামাতি, কিন্তু আমার উপরে কোন প্রভাব নেই। যেন ছবির ঝড়, ছবির মাতামাতি। যেন ঐ ভূখণ্ড আর আমার কুটির ভিন্ন জগতের বস্তু। দুয়ের ভাষা ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে চলাচলের পথ বন্ধ—তাই ওর প্রভাব এখানে এসে পৌঁছচ্ছে না। এ-সব কথা ঠিক তখন মনে হয়েছিল, না পরে মনে হয়েছে, এখন বলতে পারব না,

কারণ তখন যে-দৃশ্য দেখেছিলাম এক ঝাপসা কাচের মধ্য দিয়ে, এখন তা আরো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

এবারে মনে হল হঠাৎ উপত্যকাখানা নানা প্রাণীর চলাফেরায় সচল হয়ে উঠেছে। তবে কি বাঘ-ভালুক বের হল নাকি? ঐ সব শ্বাপদের সম্ভাবনায় সাধারণত মানুষের মন খুশী হয় না সত্য, কিন্তু আমি কেমন যেন হাল্কা বোধ করলাম। মনে হল, ওরা যতই ভয়ঙ্কর জীব হোক না, তবু ওরা আমার মতই রক্ত-মাংসের জীব, ওরা পার্থিব, ওরা যে আমার আপন জন! এই অপার্থিব বিভীষিকার চেয়ে ওরা ঢের বেশী কাম্য। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম যে, আজ অদৃষ্ট এমান অকরুণ যে, সে-সান্ত্বনাটুকুও আমার ভাগ্যে নেই। ওরা তো বাঘ ভালুক নয়, তার চেয়ে আকারে অনেক বৃহৎ। হাতি? না, হাতিও নয়, কারণ এদের আকৃতি কোন প্রাণীর সঙ্গে মেলে না। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় যে-সব জন্তুর ছবি বইয়ে দেখা যায়, এরা যেন সেই সব বিস্মৃত জগতের বিচিত্র জন্তু। কিন্তু ঐ ঝড়ের মত এরাও নীরব। ঐ নিঃশব্দ ঝড়ের লুটোপুটির মধ্যে এরা নিঃশব্দে ছুটোছুটি করতে লাগল। আলোর ছটা ফেলে যে পরীক্ষা করব, সে-শক্তিও আর ছিল না। মনটা তখনো সম্পূর্ণ বিকল হয়নি। একবার মনে হল সবটাই তো একটা দুঃস্বপ্ন নয়? তা কী করে হবে? এই তো জেগে আছি, চোখে পলক পড়ছে, হাতে সিগারেট। না, স্বপ্ন নয়।

মনে হল কোন রুদ্ধ কারাগারের লোহার দরজা খুলে গিয়েছে, আর অতল নিতল থেকে উঠে আসছে দলে দলে সেই সব চিন্তা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষার অর্ধসমাপ্ত অস্পষ্ট মূর্তি জাগ্রত চৈতন্য যাদের পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার সুযোগ পায়নি।

এমন সময়ে মনে হল, উপরের ঐ বিরাট কালো আকাশখানা কুমোরের প্রকাণ্ড চাকের মত হঠাৎ বোঁ করে একবার ঘুরে উঠল, আর তারপরেই ঘুরতে ঘুরতে ভীম বেগে নীচে নামতে লাগল, দিগন্তের অস্পষ্ট পাহাড়গুলো তরঙ্গিত হতে লাগল, আর মাঝখানের ঐ উপত্যকায় অলৌকিক ঝড়ের ও জানোয়ারের মাতামাতি তো চলেইছে। আর সমস্ত কিছুকে চরম ভয়াবহতার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে অপার্থিব একটা নিঃশব্দতা। মহামেরুর, মহাশূন্যের বা মৃত্যুর পরের নিঃশব্দতা হয়তো এই রকম।

এমন সময়ে একটা আর্ত কাতর বেদনার বহ্নিময় চিৎকার কোন্ অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার মনের মধ্যে আমূলে নিহিত হল। জাগ্রত অবস্থারও নানা স্তর আছে, সেই প্রচণ্ড সংঘাতে আমি যেন জাগরণের সৌধচূড়া থেকে একেবারে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলাম! এ কার চিৎকার? নারীকণ্ঠ? কোথায়? এখানে? কে? অনেকগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে ছুটে চলে গেল ঝড়ের মুখের বিপন্ন হাঁসের সারির মত। তাদের পক্ষ-বিধূনন ভাল করে না মিলোতেই সেই অপার্থিব ভূখণ্ডের কোন্ নেপথ্য থেকে ছুটে চলে এল ব্যাঘ্রভয়ভীতা বিপন্না হরিণীর মত ধাবমানা এক নারীমূর্তি। সেই নিঃশব্দের জগতে তার কাতর কণ্ঠ যেন শব্দের বিদ্যুৎ, সেই অপার্থিব কালোর মধ্যে বিস্রস্তবসন তার শুভ্র কমনীয় তনু ঝড়ের বেগে চালিত অসম্পূর্ণ একটি চন্দ্রকলা। আবার আর্ত কণ্ঠস্বর। ওগো, এ-কণ্ঠস্বর আমার জন্ম-জন্মান্ত জানে, এ-কণ্ঠস্বরে আমি সহস্র মৃত্যুর সমাধি থেকে জেগে উঠব, ঐ রমণীয়, কমনীয়, স্পৃহণীয় তনু লক্ষ জনতার মধ্যেও আমি চিনে নিতে ভুল করব না। এ যে সুতপা। ঐ আর্ত কণ্ঠের অগ্নিময় স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে পূর্ণ সম্বিতে ফিরে এলাম। সুতপা! সুতপা!

দরজার তক্তাগুলো খুলে ফেলবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখলাম অতিকায় একটা মনুষ্যমূর্তি—দুর্ভাগ্যের মত তাড়া করে আসছে। তবে ওরই কাছে থেকে পালাচ্ছে সুতপা।

দরজার তক্তাগুলো সরানো হয়ে গিয়েছিল, ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। সুতপা! সুতপা!

ঐ যে দূরে ছুটে চলেছে সে জ্যোৎস্না-লেখার মত, ঐ যে পিছনে ছুটে চলেছে অতিকায় মূর্তি রাহুটার মত। আর সবার পিছনে, অনেক পিছনে আমি।

প্রাণপণে ছুটেছি, খানাখন্দ, উঁচুনিচু, পাথর ঢিবি ডিঙিয়ে, তবু ধরতে পারি কই। ঐ অতিকায় দানবটাকে ধরতে পারলেই বা কী করতে পারতাম। কিন্তু সে কথা কি তখন ভেবেছিলাম। আর কিছু না পারি, নিজের দেহ দিয়ে ওর পথরোধ করে পড়ে থাকব, সুতপা সময় পাবে পালাবার। দৌড়, দৌড়, আরো জোরে, আরো, আরো। এক-একবার কাছে এসে পড়ি দানবটার, দেখতে পাই ওর উলঙ্গ, বীভৎস, রোমশ দেহ, আবার যায় এগিয়ে। লোকটা সচেতন হয়ে উঠেছে যে, আমি পিছনে তাড়া করেছি। হঠাৎ এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সে ধরে ফেলল সুতপার কোমর, আর অনায়াসে তাকে শূন্যে তুলে নিল। তারপরে আর এক লাফে অন্তর্হিত হল এক ঝোপের আড়ালে। আমিও প্রাণপণে গতি বাড়িয়ে দিয়ে যখন পৌঁছলাম সেখানে, দেখলাম স্খলিতবসনা, সমুদ্রফেনসুকুমারতনু সুতপা মূর্ছিতপ্রায়, আর ঐ অতিকায় নর-দানবটা তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে লোকটা মুখে তুলে চাইল আমার দিকে। সেই বাসনাপঙ্কিল অধরোষ্ঠ, কামনাকুটিল মুখমণ্ডল, সেই লুব্ধ-লোলুপ রসনা, আর সেই অতি ক্ষুধার্ত, কামার্ত, অন্তর্জ্বালা-দীপ্যমান দুই চক্ষু। আমি চমকে উঠলাম, এ যে আমার মুখ! আয়তনে আমার চেয়ে অনেক বড়, শক্তিতে আমার চেয়ে অনেক প্রবল, কিন্তু এ যে আমারই এক অবিকল প্রতিকৃতি তাতে আর সন্দেহ নেই। মাথা ঘুরে উঠল, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম, কিন্তু তার আগে দেখতে পেলাম ঐ বীভৎস মুখ নত হয়ে পড়ল সুতপার অধরোষ্ঠের উপরে, আর সবলে ছিন্ন করে নিল অর্ধস্ফুট রক্ত-গোলাপের সেই স্পর্শভীরু কুঁড়িটি।

যখন জ্ঞান হয়, দেখি ভোরের আলোয় পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীবাস্তব, পাশে বুধন সিং।

পূর্বাপর হঠাৎ স্মরণে এল না; শুধালাম, এখানে কেমন করে এলাম।

শ্রীবাস্তব বললেন, "সে-সব পরে হবে, এখন চুপ করে থাকুন।"

শ্রীবাস্তবের আদেশে চাপরাশিরা একখানা স্ট্রেচারের মত বানিয়ে ফেলল, আর আমাকে তার উপরে শুইয়ে দিয়ে সকলে মিলে সযত্নে বহন করে নিয়ে চলল—থলকোবাদ ডাক-বাংলোয়।

আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল আমার মূর্ছার সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগ আছে সুতপার। কিন্তু কী যোগ, কী বিবরণ কিছুই মনে পড়ল না, মনটা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এমন সময় কানে এল, বুধন সিং চাপা গলায় শ্রীবাস্তবকে বলছে, "সাহাব কো ইধার আনা হাম মানা কর দিয়ে থে।"

প্রপাত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সময় সেই সন্ধ্যা ছটায়, তবু ল' কলেজের ক্লাসে দেড়টার পরে আর থাকতে পারল না চিন্ময়। মনে হচ্ছিল দপ্ দপ্ করছে রগের দুপাশে, হাতের নাড়ীতে মৃদু জ্বরের দ্রুতলয় উত্তেজনা। বসে ছিল ঠিক একটা পাখার নীচেই, তা সত্ত্বেও পাঞ্জাবির কাঁধটা ভিজে উঠছিল ঘামে। শেষ পর্যন্ত একেবারে প্রোফেসরের চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে এল সে।

উতরোল হাওয়া বইছে বাইরে ইউনিভার্সিটির লনে। মাথার একগুচ্ছ চুল হঠাৎ উড়ে পড়ল চশমার উপর—কতগুলো বিসর্পিল কালো কালো রেখায় একবারের জন্যে অস্বচ্ছ হয়ে গেল দৃষ্টি। কোনো দূর অরণ্যের ধ্বনির মত মাথার উপরে শোনা গেল পত্রমর্মর। আশুতোষ মিউজিয়মের গায়ে দাঁড় করানো বাসুদেব-মূর্তিটা একবার নড়ে উঠল যেন।

চোখের সামনে থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল চিন্ময়। মাথার উপরে পাতার শব্দে বুকপকেট থেকে খামখানাও যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে। অথবা ভীরু একটা চাপা কণ্ঠস্বরের মত শোনা যাচ্ছে সেই তিনটে লাইন, যা বার বার পড়ে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে চিন্ময়ের।

আজ সন্ধ্যে ছ-টায় চাঁদপাল ঘাটের ট্রাম-স্টপটার সামনে দয়া করে একটু দাঁড়াবেন। আমি আসব। দরকারী কথা আছে। ছায়া।

মনে মনে লাইন কটা গুঞ্জন করতে করতে চিন্ময় হাঁটতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। একটা পঁয়ত্রিশ। আরও প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। কী করে কাটবে এতক্ষণ—কী করে এতখানি অসহ্য সময় পার হওয়া যাবে?

আপাতত মেস। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকা। আর চুপ করে ভাবা, হঠাৎ ছায়া এ-চিঠি তাকে লিখতে গেল কেন।

সত্যি, কেন ছায়া এই চিঠি লিখল তাকে।

দুপুরের নির্জন নিঃশব্দ মেসে, তিন-তলার সিংগল-সীটেড ঘরে, বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চিন্ময় সেই কথাটাই ভাবতে চেষ্টা করল। এমন কী তার বলবার আছে যার জন্যে চিন্ময়কে সে ডেকে পাঠিয়েছে সন্ধ্যা ছটার সময়—চাঁদপাল ঘাটের ট্রাম-স্টপের সামনে?

সকালে চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই একটা তীক্ষ্ণ অস্বস্তিতে জর্জরিত হচ্ছে চিন্ময়। কী চায় ছায়া? মুক্তি? বলতে চায়, আমার জীবনে আর একজন মানুষ অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করে আছে, তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না? বলবে বাংলা দেশে অনেক সুপাত্রী জুটবে আপনার জন্যে, শুধু আমায় আপনি দয়া করুন?

অথবা—

অথবা আর কী হতে পারে? চারদিন আগে, মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যার ছায়া ছড়ানো করুণ মুখের আবছা আভাস মাত্র মনে করতে পারে চিন্ময়, যার হাতের আংটির পোখরাজ পাথরটা মাত্র বারকয়েকের জন্যে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত আলোতে, সেই ছায়াসঙ্গিনীর মত মেয়েটি কেন হঠাৎ এই প্রগলভ চিঠির আশ্রয় নিয়েছে?

চারদিন আগে রবিবারের ছুটি ছিল। সকালবেলা নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজটা পড়বার সময়েও একবার এসে হানা দিয়েছিল বলাইদা।

"এই, ভালো চা আর গরম জিলিপি আনা এক ঠোঙা।"

"তা আনাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ পাড়ার রোয়াকের মায়া ছেড়ে এখানে এসে জুটলে যে?"

"কী করব?" চিন্ময়ের সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলাইদা বললে, "কাল রাত্রেও রমাপ্রসাদবাবু এসেছিলেন। বললেন, তুমি আর একবার ওকে মনে করিয়ে দিয়ো বলাই। এ-কালের ছেলে, কখন আবার ভুলে যায়—"

চিন্ময় হাসল। "একালের ছেলেদের স্মৃতিশক্তির বালাই নেই, এ-ধারণা কী করে জন্মাল রমাপ্রসাদ বাবুর? কিন্তু সত্যি বলাইদা, আমার কেমন উৎসাহ হচ্ছে না।"

বলাইদা ভুরু কোঁচকাল। "পাকামো হচ্ছে নাকি? আজ তিন মাস ধরে সারা কলকাতায় তোমার জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি, আর এখন বলা হচ্ছে উৎসাহ পাচ্ছি না?"

"বিয়ে করতে আপত্তি নেই, কিন্তু মেয়ে দেখাটাই—"

একটানে সিগারেটের আধখানা শেষ করলে বলাইদা। "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ, এ-যুগে এরকম বর্বরতা আর সহ্য হয় না, একটি মেয়েকে গোরু-ছাগলের মত—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওসব লেকচার ছেড়ে দে। না দেখে একটা কালো-কোলো হাবাগোবা মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে সেটা আগে বললেই হত। পাঁচ মিনিটে কনে জুটিয়ে দিতুম, এসব ঝকমারি আমাকে পোয়াতে হত না।"

চিন্ময় বললে, "না-না, জীবে দয়া করবার ঔদার্য আমার নেই। শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী সবাই চায়—আমিও চাই। শুধু বলছিলুম এভাবে মেয়ে দেখতে যাওয়াটা—"

বলাইদা বললে, "তুই একটা ছাগল। এত টুইশন করলি, ডজনখানেক স্কুল-কলেজের মেয়ে পড়ালি, তার মধ্যে থেকে একটা প্রেম-ট্রেমের ব্যবস্থা করে নিতে পারলিনে? তা হলে তো এসব ঝামেলা করতে হত না। নে, এখন চটপট চা আর জিলিপি আনতে দে। আর মনে রাখিস, ঠিক চারটের সময় আমি আসব, তুই জামা-কাপড় পরে রেডি হয়ে থাকবি।"

অতএব যেতেই হল চক্রবেড়েতে। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে চারটেয়।

হলদে রঙের পুরনো দোতলা বাড়ি। সামনে হাত পাঁচ ছয় খানিকটা চতুষ্কোণ জমি, একটা জীর্ণ চেহারার ইউক্যালিপটাস এক গুচ্ছ শীর্ণ পাতার অঞ্জলি তুলে বেমানান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বাড়িটাকে আচমকা কেমন শ্রান্ত, কেমন অবসন্ন মনে হয়!

রমাপ্রসাদবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন। অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন বাইরের ঘরে। পুরনো ফার্নিচার, পুরনো ফোটো, বিলিতী তেল-কোম্পানির রংচঙে ক্যালেন্ডার, তক্তপোষের উপরে পাতা সুজনিটায় ইস্ত্রির মরচে ধরা দাগ একটা। শুধু কোনাভাঙা দুটো কাচের ফুলদানি থাকলেই যেন সম্পূর্ণ হত সবটা।

তারপর সব সেইরকম। সেই দরজার পর্দার ওপার থেকে কয়েকটি পা আর শাড়ির প্রান্ত, চুড়ির আওয়াজ আর চাপা ফিসফিসানি, একটি আট-ন বছরের মেয়ের পর্দা সরিয়ে একবারের জন্যে মুখটি বাড়িয়ে দেওয়া, আর রমাপ্রসাদবাবুর একটানা বলে যাওয়া : মেয়েটি আমার দেখতে শুনতে ভালোই, রান্না-সেলাই সবই জানে, তবে লেখাপড়া বেশীদূর করেনি—ম্যাট্রিকের আগে টাইফয়েড হয়েছিল—

সব সেই রকম। সেই সিঙাড়া-লেডিকেনি-সন্দেশের খাবারের প্লেট। মেয়ে দেখতে এলে কী কী খাবার সাজিয়ে দিতে হয়, মিঠাইওয়ালাদের পর্যন্ত মুখস্থ আছে সেটা। সেই সঙ্গে সবিনয় অনুরোধ : না, না—ও আর ফেলে রাখবেন না, দুটি তো মিষ্টি, সামান্য ব্যবস্থা—

পুরনো ফোটো, পুরনো ফার্নিচার, পুরনো ঘড়ির শব্দ আর পুরনো সামাজিকতার ভিতরে চিন্ময় যখন ক্রমশই স্তিমিত হয়ে উঠছিল, তখন দু-হাতে দু-পেয়ালা চা নিয়ে ছায়া ঘরে ঢুকল।

এ-পর্যন্ত সব জ্যামিতির নিয়মে চলছিল, কিন্তু ইউক্লিডের থিয়োরেম এইবারে হোঁচট খেল একটা। এই ঘরে, এমনি পুরনো নীতি-নিয়মের ভিতরে মেয়েটি এমন আকস্মিক-ভাবে দেখা দিল যে, চমকে উঠল চিন্ময়। যেন বটতলার রামায়ণের ভিতর থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল অবনীন্দ্রনাথের একখানা ছবি।

কী ছিল মেয়েটির চেহারায়? চিন্ময় আজও সে কথা জানে না। ভোরের তারার মত আলো-অন্ধকারে জড়ানো চোখ, হালকা মেঘে ছাওয়া জ্যোৎস্নার মত শরীর, ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ কান্নার মত কী একটা মাখানো।

একবার রমাপ্রসাদবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল চিন্ময়। বাহুল্যহীন বেঁটে খাটো চেহারা, মোটা মোটা হাতের আঙুলে, পলা-বসানো রুপোর আংটি একটা, মোটা নাকের তলায় সযত্নে কাঁচি ছাঁটা গোঁফ। এঁরই মেয়ে! ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

বলাইদা কী দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করল, ভালো করে শুনতেও পেল না চিন্ময়। মাত্র কয়েক পলক দেখার রঙে মনকে রাঙিয়ে নিয়ে বসে রইল স্বপ্ন বিহ্বলের মত।

দশ-পনেরো-বিশ মিনিট। বলাইদার বেসুরো গলায় ঘোর কেটে গেল। "আজ আমরা তবে উঠি।"

আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে এল চিন্ময়। শুধু একবারের জন্যে মাথা তুলে দেখল ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। পড়ন্ত দিনের ছাইরঙ লালচে আকাশের দিকে একগুচ্ছ শীর্ণ পাতার অঞ্জলি। খেয়ালের মত তার মনে হল, ওই গাছটার কী যেন একটা মানে আছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে, কিছুটা বোঝা যাচ্ছে না।

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলাইদা বললে, "কেমন দেখলি?"

"ভাল লাগল। আমি রাজী আছি।"

"হুঁ!"—বলাইদা একবার তাকাল চিন্ময়ের চোখের দিকে, সেই পুরনো নিয়মেই হয়তো কোনো একটা রসিকতা করতে চাইল, কিন্তু তারপরেই আর কথা খুঁজে পেল না। বলাইদাও কি ওই ইউক্যালিপটাস গাছটাকে দেখতে পেয়েছে? সেও কি একটা মানে বুঝতে চাইছে মনে মনে?

সেই ছায়া তাকে চিঠি লিখেছে। সেই মেয়েটি।

সেদিন ছায়ার মতই পা জড়িয়ে জড়িয়ে ঢুকেছিল ঘরে। থেমে-যাওয়া সেতারের ঝঙ্কারের মত কী একটা বয়ে এনেছিল নিজের সঙ্গে। সেই ছায়া কী কথা তাকে বলতে চায়! ফিকে নীল একটুকরো কাগজে মাত্র তিনটি সংক্ষিপ্ত লাইনে কোন্ আশ্চর্য সংবাদের সংকেত লুকিয়ে রেখেছে?

চিন্ময় উঠে বসল। সাড়ে তিনটে। বাইরে ক্ষুরের ফলা রোদ এখনও। রাস্তায় হাঁপিয়ে চলা ট্রাম-বাসের ম্যারাথন রেস। ফুটপাথ ঘেঁষে পড়ে থাকা পিচ-জ্বালানো কদাকার গাড়িটা থেকে উগ্র বিস্বাদ গন্ধ। ওপাশের বাড়িটার তেতলার কার্নিশে একটা দুঃসাহসী সাদা-কালো বেরালের থাবা চেটে চেটে প্রসাধনের চেষ্টা।

চিন্ময় থাকতে পারল না। জামা চড়িয়ে, চটিটা পায়ে টেনে আবার নেমে এল রাস্তায়। উঠে পড়ল চৌরঙ্গির ট্রামে। আর একবার ইচ্ছে হল, পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে পড়ে নেয়। কিন্তু দরকার ছিল না, নির্ভুল-ভাবে লেখাটা মুখস্থ হয়ে গেছে।

চৌরঙ্গির একটা চায়ের দোকানে খানিকটা সময় কাটল। আরো খানিক সময় কাটল বইয়ের স্টলে এলোমেলো পাতা উল্টে। তারপর ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে পায়ে হেঁটে চাঁদপাল ঘাটের কাছে যখন পেঁছুল, তখন সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি!

আরো—আরো আধঘণ্টা।

রেল লাইনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখল নোঙর-ফেলা নিথর জাহাজগুলোকে। দেখল গঙ্গার স্রোতে ভেসে ভেসে গাংশালিকের খেলা আর ফেরি-লঞ্চের আনাগোনা। তারপর হাতের ঘড়িতে যখন ছটা বাজতে দশ মিনিট, সেই তখন এসে দাঁড়াল ট্রাম-স্টপের সামনে। এতক্ষণে মাথার দু'ধারে রগ দুটো আবার দপ দপ করতে শুরু হয়েছে, হাতের নাড়ীতে আবার উত্তেজিত জ্বরের স্পন্দন।

ছায়া এল ছ'টার তিন মিনিট আগেই।

চিন্ময় ভেবেছিল, হয়তো চিনতে পারবে না। হয়তো আভাসের মত যাকে দেখেছে, এই মুহূর্তে তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হবে। আর ছায়াই কি দেখেছে তাকে? তার দিকে চোখ তুলেই কি তাকিয়েছে একটি বারের জন্যেও?

তবু দু-জনেই দু-জনকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গেই।

সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, জড়তা নেই।

আশ্চর্য স্বাভাবিক গলায় ছায়া বললে, "অনেকক্ষণ এসেছেন?"

হার স্বীকার করল না চিন্ময়। মিথ্যে কথাই বললে।

"মিনিট পাঁচেক।"

"কোনো কাজের ক্ষতি হয়নি আপনার?"

"না, কিছু না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ছায়া। সেই পুরনো ঘরটার মতই আলো-অন্ধকার এখানে। আরো নিবিড়—আরো সংকেতিত। খানিকটা চেনা যায়, অনেকটা চেনা যায় না।

উত্তেজনায় টান টান স্নায়ু। প্রত্যেকটা মুহূর্তে খরমুখ। চিন্ময় সইতে পারল না।

"কেন ডেকেছিলেন আমাকে?"

ছায়া মুখ তুলল। আধবোজা চোখ মেলে ভাল করে তাকাল কিনা বোঝা গেল না।

"চলুন, বসি কোথাও।"

"ইডেন গার্ডেনে?"

"ঘাটের জেটিতেই চলুন।"

চিন্ময় বুঝল। একেবারে একান্ত হতে চায় না। ইডেন-গার্ডেনের ঘন ঘাসের নির্জনতায় নয়, এক আধজন কাছাকাছি থাকুক, নিভৃতির ভিতরেও থাকুক লৌকিক সৌজন্য।

"তাই চলুন তবে।"

বেঞ্চিগুলোতে জায়গা ছিল না। জেটির বাঁ দিকে নিচু পণ্টুনের উপর যেখানে জোড়া-অজগরের মত দুটো জলের পাইপ এসে নেমেছে, পায়ে পায়ে দুজনে এগিয়ে গেল সেখানেই।

"এখানে কোথায় বসবেন?" চিন্ময় প্রশ্ন করল।

"কাঠের উপরেই বসা যাক।" খানিক দূরে নোঙর ফেলা দুটো জাহাজের ভূতুড়ে গম্ভীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছায়া বললে, "আপনার অসুবিধে হবে না?"

"না।"

দুজনে বসল। এপারে আলো, ওপারে আলো, মাঝখানে কালো গঙ্গা। ডানদিকে অনেক দূরে হাওড়া-ব্রিজের বৈদ্যুতিক সরল রেখা। যেন একটা তারার বল্লম দিয়ে এপার-ওপার গেঁথে রেখেছে কেউ।

ছায়াই শুরু করল। এবং বিনা ভূমিকাতেই।

"ক্ষমা করবেন। আমার নাম ছায়া নয়।"

চিন্ময় চমকে উঠল। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

"কী বলছেন?"

"আমার নাম ছায়া নয়। বন্দনা।"

নির্বোধের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল চিন্ময়। বললে, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

বন্দনা আস্তে আস্তে বললে, "বোঝাটা কিছু শক্ত নয়। আপনি ছায়াকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছায়া কালো, ছায়া কুৎসিত। তার কপালে একটা ধবলের দাগ। তাই ছায়ার ভূমিকায় আমাকেই অভিনয় করতে হয়েছে!"

গঙ্গার কালো জলে একটা স্টিমারের কর্কশ বাঁশি বাজল, কয়েকটা লাল-নীল আলো ভেসে চলল কাঁপতে কাঁপতে। চিন্ময়ের মনে হল, পণ্টুনটাও কাঁপছে তার সঙ্গে সঙ্গে, দুলছে ওপারের আলোগুলো, হাওড়া ব্রিজের তারার বল্লমটা থেকে-থেকে বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত।

একটা অস্ফুট শব্দ করল চিন্ময়।

"গল্পের মত মনে হচ্ছে, তাই না?" বন্দনার গলাটা যেন গঙ্গার ওপার থেকে শুনতে পেল চিন্ময়, "আমাকে দেখিয়ে ওঁরা ছায়ার সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করছিলেন।"

চিন্ময় নড়ে উঠল।

"আপনি ঠাট্টা করছেন তো?"

"ঠাট্টা করবার মত পরিচয় কি আপনার সঙ্গে আছে আমার?" শীতল নিষ্প্রাণ স্বরে বন্দনা জবাব দিলে।

সত্যিই, সে-পরিচয় নয় বন্দনার সঙ্গে। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে দেখেছিল। তাও কয়েকবার চোরের মতো তাকিয়েছিল সভয়ে। না, বন্দনা ঠাট্টা করছে না।

গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়াতেও চিন্ময় ঘামতে লাগল।

"কিন্তু বিয়ের সময়ই তো ধরা পড়বে সব। তখন যদি—"

"উঠে আসেন বাসর থেকে?" চিন্ময়ের কথাটা বন্দনাই কুড়িয়ে নিলে, "পাড়ার ছেলেদের আপনি চেনেননি চিন্ময়বাবু। আপনি কি আশা করেন যে, কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে বিপদে ফেলে আপনি পালিয়ে আসবেন, আর তারা আদর করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবে আপনাকে?"

দাঁতে দাঁত চেপে খানিক নিথর হয়ে রইল চিন্ময়। হঠাৎ নিজের ডান হাতে একটা বন্য বর্বর শক্তি যেন অনুভব করল সে। ম্লান আলোয় এক ফোঁটা শিশিরের মত পোখরাজের আংটিটা জ্বলছে বন্দনার আঙুলে, ইচ্ছে করলে ওই আঙুলটা সুদ্ধ বন্দনার ছোট মুঠোটাকে এক্ষুনি সে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে।

পায়ে পায়ে দুজনে এগিয়ে গেল
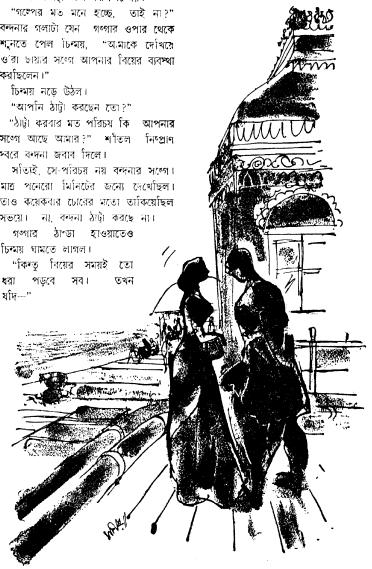
হিংস্র কিছু না করে কেবল কপালের ঘামই মুছে ফেলল চিন্ময়। শুকনোভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু আপনি কেন এ-কাজ করতে গেলেন? আপনি কি ও'দের আত্মীয়া?"

প্রশ্নটার জন্যে বন্দনা অপেক্ষা করছিল। আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো দেখা গেল না, তারা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

"সে-কথা থাক। না-ই বা শুনলেন।"

"অভিনয় করেছিলেন, ভালোই করেছিলেন।" চিন্ময় বিষাদ-হাসি হাসল, "কিন্তু এ-কথাগুলো কেন বলতে এলেন আমাকে? এটুকু অনুগ্রহ করার কী দরকার ছিল?"

আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়াল বন্দনা।

"আজ আমি যাই চিন্ময়বাবু।"

আবার সর্বাঙ্গে সেই ক্রুদ্ধ হিংস্রতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল চিন্ময়ের। দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"জবাব দিলেন না?"

"কী হবে জবাব দিয়ে? আপনি বুঝবেন না।" যাবার জন্যে পা বাড়াল বন্দনা।

চিন্ময়ের অবাধ্য হাতটা এবারে আর শাসন মানল না। নগ্ন নির্লজ্জ ক্রোধে বন্দনার মুঠোটা চেপে ধরল মুহূর্তের মধ্যে। থর থর করে বন্দনা কেঁপে উঠল একবার, তারপরেই পাথর হয়ে গেল।

"কী করছেন আপনি? পাগল হয়ে গেলেন?"

হাত ছেড়ে দিলে চিন্ময়, কিন্তু তার চোখ দুটো বুনো জন্তুর মতো জ্বলছে তখন।

"চুলোয় যাক ছায়া—অধঃপাতে যাক। আপনি আমায় বিয়ে করতে পারেন?"

এর জন্যেও কি প্রতীক্ষা করছিল বন্দনা? সে-ই জানে। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললে, "আমি কে, আমার কী পরিচয়—আপনি জানেন?"

"জানবার দরকার নেই। বিয়ে করবেন আমাকে?"

কোথা থেকে চলন্ত স্টিমারের একটা দীর্ঘ রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়ল বন্দনার মুখে। সেই ভোরের তারার মত ম্লান আচ্ছন্ন তার চোখ, ঠোঁটের কোণে সেই বিষণ্ণতার মায়া মাখানো।

বন্দনা আস্তে আস্তে বললে, "না।"

হাওড়ার ব্রিজ একটা তারার বল্লমের মত গঙ্গার এপার-ওপারকে গেঁথে রেখেছে। জাহাজ দুটো দাঁড়িয়ে আছে অবাস্তব ফ্যাণ্টাসির মত। দু-দিকের এত আলোর ভিতরে গঙ্গার জলটা কী অবিশ্বাস্য রকমের কালো।

চিন্ময় বললে, "আচ্ছা, আপনি যান। যে-উপকারটুকু করলেন অনেক ধন্যবাদ সেজন্যে।"

তবু যাওয়ার আগে বন্দনা আরো কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে রইল। কী একটা বলতে গিয়ে বারকয়েক কাঁপতে লাগল তার ঠোঁট।

"আশা করি, রমাপ্রসাদবাবুকে—"

"আমি জানি," বন্দনার উপস্থিতি এবার অসহ্য মনে হতে লাগল চিন্ময়ের, "আপনাকে বলতে হবে না। আপনি যান—"

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বন্দনা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিন্ময় এবার ধপ করে হিম-শীতল একটা পাইপের উপরেই বসে পড়ল। সারাদিনের উত্তেজনার টানটা ছিঁড়ে গেছে—শরীরে একটা গুরুভার অবসাদ নেমে এসেছে। ভুতুরে জাহাজ দুটোর দিকে বিমর্ষ দৃষ্টি ফেলে বসে রইল সে, পাইপের মুখ থেকে ঝির ঝির করে জল নেমে এসে তার জুতোর তলাটা একটু একটু করে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ছ বছর পরে আবার মেয়ে দেখতে যেতে হল চিন্ময়কে। মুনসেফির নমিনেশন পাওয়ার পরে। এবার রাঁচিতে। কিন্তু জাল-জুয়াচুরির কোনো ভয় ছিল না। মেয়ের বাপ বড় দরের সরকারী চাকুরে। হাজারীবাগ রোডে প্রকাণ্ড বাংলো। হাল-আমলের ড্রয়িং রুমে অত্যন্ত নিঃসংকোচ-ভাবেই মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটি। টি পট্ থেকে চা ঢেলে দিলে মৃন্ময়ের পেয়ালায়, রাঁচীর আবহাওয়া নিয়ে গল্প করল, গান শোনাল অর্গ্যান বাজিয়ে।

এবার বলাইদা নয়, অন্য দুটি বন্ধু ছিল সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়ে লঘু ঈর্ষাভরা গলায় ব্যোমকেশ বললে, "তুই ভাগ্যবান রে!"

চিন্ময় মৃদু হাসল, "তাই মনে হচ্ছে আপাতত। তবে শেষ পর্যন্ত জাল না হলেই বাঁচা যায়।"

বন্ধুরা ভেঙে পড়ল অট্টহাসিতে, "সেই বন্দনা? না—না, এবার আর সে-ভাবনা নেই।"

চাঁদপাল ঘাটের সেই সন্ধ্যাটা সহজে ভুলতে পারা যায়নি। একটা সূক্ষ্ম বেদনা থেকে থেকে মনের মধ্যে বেজে উঠত, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে গল্পটা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে চিন্ময়। ক্রমেই ব্যাপারটা কৌতুকের রূপ নিলে।

চেনা-জানা কেউ কনে দেখতে গেলেই একজন আর-একজনকে সাবধান করে দেয়: জাল কিনা ভাল করে যাচাই করে নিয়ো হে! সব মেয়েই তো বন্দনা নয় যে, আগ বাড়িয়ে এসে উপকার করে যাবে!

খুশিতে চঞ্চল হয়ে এগিয়ে চলল তিনজন। ফাল্গুন মাসের চমৎকার সকাল। মিষ্টি ঠাণ্ডা—মিষ্টি রোদ—ঝিলমিল পাতা আর পাখির ডাক।

অমল বললে, "কথা তো একরকম দিয়েই এলি দেখছি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্ময় বললে, "কী আর করা যায়। মা আল্টিমেটাম্ দিয়েছেন। আসছে বোশেখ মাসের মধ্যে বিয়ে না করলে তীর্থযাত্রায় বেরুবেন। সে যাক, আজই ফিরবি নাকি কলকাতায়?"

ব্যোমকেশ গালের পাশ থেকে পাইপ্‌টা বের করে আনল। "এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? থেকে যাই আর একটা দিন। চল্, আজ বেরিয়ে আসি হুড্রু থেকে।"

"হুড্রু? বারদশেক দেখেছি—পুরনো হয়ে গেছে।"

ব্যোমকেশ বললে, "ইডিয়ট! হুড্রু কখনো পুরনো হয় না। ওর যে কী-একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে, যখনি দেখি, তখনি মনে হয় এভারনিউ! চল্—গাড়ির জোগাড় করি।"

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে বেরুল ট্যাক্সি নিয়ে।

হুড্রুতে যখন গাড়ি পৌঁছুল তখন মনটা যেন দশ বছর পেছিয়ে গেছে ওদের।

ব্যোমকেশ বললে, "হাউ লাভ্লি!"

অমল বললে, "দূর—একা একা এসে ভাল লাগে না এখানে। সঙ্গে ফিয়াঁসী না থাকলে কেমন ফিকে ফিকে লাগে যেন।

ব্যোমকেশ পাইপটা গালের একপাশে ঠেলে দিলে। তারপর চোখের একটা ভঙ্গি করে বলল, "দেয়ার ইজ্ এ চান্স ফর ইউ। পারো তো পিক্-আপ করে নাও না!"

চিন্ময় আর অমল তাকিয়ে দেখল। ছোট বড় পাথরের মধ্য দিয়ে টাল্ খেতে খেতে সুবর্ণরেখার রূপালি জল যেখানে এসে নীচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়েছে, ঠিক প্রায় তারই কাছাকাছি নিথর হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। মগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে ওধারের কালো পাহাড় আর কালো জঙ্গলের দিকে।

চিন্ময়ের পা দুটো যেন পাথরের মধ্যে আটকে গেল। তৎক্ষণাৎ আবছা স্বরে চিন্ময় বললে, বন্দনা! বন্দনা! ব্যোমকেশের মুখ থেকে টপ করে পাইপটা নীচে পড়ে গেল। যেন সামনে সাপে ফণা তুলেছে এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল অমল।

পাইপটা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যোমকেশ বললে, "চল্—আলাপ করি।"

এতক্ষণের খুশিটা দপ করে নিবে গেছে একটা দমকা হাওয়ায়। আবার দপ দপ করছে কপালের রগগুলো। দুবছর আগেকার চাঁদপাল ঘাটের সন্ধ্যাটা ফিরে এসেছে, ডান হাতে ছট্‌ফট্ করছে সেই বন্য হিংস্র শক্তিটা।

ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেদিন অত সহজেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না বন্দনাকে। অনেক নিদ্রাহীন রাত্রে দুঃসহ অন্তর্জ্বালায় সে-কথা ভেবেছে চিন্ময়, মনে হয়েছে একটা নিষ্ঠুর কঠিন কিছু তার করা উচিত ছিল সেদিন। শক্ত মুখে চিন্ময় বললে, "না।"

"পুরনো আলাপটা ঝালিয়ে নিবি না?" অমল হাসল, "আবার পাত্রী দেখতে এসেছিস সে-খবরটা দিবিনে ওকে?"

"দরকার নেই। চল্ নীচে নামি—"

বন্ধুরা কিছু একটা বুঝল, রসিকতা করতে গিয়ে সেদিনের বলাইদার মতই থমকে গেল ব্যোমকেশ। নামতে শুরু করল তিনজন।

কিন্তু হাত কয়েক নেমেই থমকে দাঁড়াল চিন্ময়।

"তোরা ঘুরে আয়। আমি উপরেই রইলাম।"

ব্যোমকেশ আর অমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। নেমে গেল নিঃশব্দে।

চিন্ময় যখন ফিরে এল, তখনো সেই ভাবেই মগ্ন হয়ে বসে আছে বন্দনা। যেন স্বপ্ন দেখছে। পায়ে পায়ে চিন্ময় এগিয়ে গেল।

"শুনুন?"

হুড্রুর তীব্র গর্জনের মধ্যেও ডাকটা শুনতে পেল বন্দনা। ফিরে তাকাল চিন্ময়ের দিকে।

"চিনতে পারেন?" কঠিন মুখে আবার প্রশ্ন করল চিন্ময়।

"পারি বইকি।" বন্দনা শ্রান্ত হাসি হাসল, "আপনি ভোলবার নন। কিন্তু এখানে আপনাকে আশা করতে পারিনি।"

বিনা নিমন্ত্রণেই পাশের পাথরটার উপরে বসে পড়ল চিন্ময়। বললে, "রাঁচিতে মেয়ে দেখতে এসেছিলাম। চমৎকার পাত্রী। তা ছাড়া এবার আর ডুপ্লিকেটের ভয় নেই।"

"নেই নাকি?" বন্দনা তেমনি ক্লান্তভাবে হাসল, "যাক, খুশী হলাম।"

চিন্ময় আশ্চর্য হল। কথাটার একটা প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল, ভেবেছিল অন্তত একবারের জন্যেও চকিত হয়ে উঠবে বন্দনা, অন্তত অপমানের এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠবে গালে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। একখণ্ড পাথরের মতই নিরুত্তাপ বন্দনা।

কেমন যেন কুঁকড়ে গেল চিন্ময়, হঠাৎ অত্যন্ত ইতর মনে হল নিজেকে। একটা ঢোঁক গিলে বললে, "আপনি এখানে যে?"

বন্দনা বললে, "দুটি পাতালের সঙ্গী জুটিয়েছি, পালিয়েছি তাদের সঙ্গে। বলছে বম্বেতে নিয়ে গিয়ে ফিল্মে নামাবে, আপাতত দেখছি রাঁচীতে এনে হাজির করেছে। তারপরে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না।"

মাথার উপর একটা শক্ত পাথর দিয়ে যেন ঘা মারল কেউ। আকস্মিক যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে গেল চিন্ময়। "পাগল হয়ে গেছেন আপনি?" সেদিন যে-কথা বন্দনা জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ ঠিক সেই প্রশ্নই বেরিয়ে এল চিন্ময়ের মুখ দিয়ে।

একটা ছোট নুড়ি তুলে নিয়ে একরাশ ফেনিল জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে বন্দনা।

"কী করব বলুন? বাবা কালো, মা কুৎসিত—হঠাৎ কোত্থেকে জন্ম হল আমার।" বন্দনার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, "বাবা কদর্য সন্দেহ করলেন মাকে। সে-সন্দেহ আরো বীভৎস হয়ে উঠল যখন পর পর ছায়া আর কমলা জন্মাল বাবার ঠিকে মিল দিয়ে। শেষ পর্যন্ত মাকে আত্মহত্যাই করতে হল, আর বাবা তাঁর সমস্ত প্রতিশোধ নিলেন আমার উপর। লেখাপড়া শেখালেন না—যারা দু-একজন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল জঘন্য অশ্লীল চিঠি লিখে ভাংচি দিলেন তাদের। তারপর থেকে বাবার দুটি খাঁটি কন্যার জন্যে আমাকে সিটিং দিতে হয়েছে। ছায়া, কমলা দুজনকেই পার করেছেন বাবা। যদিও ছায়ার স্বামী দু'দিন পরেই ছায়াকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, তবু তো কন্যাদায় উদ্ধার হয়েছে ওঁর!"

চিন্ময় স্থবিরের মত বসে রইল। রক্তে যে উত্তাপ জেগেছিল, তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর। এখন মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বইছে, একটা তীক্ষ্ণ আকস্মিক শীতে জমে যেতে চাইছে আঙুল-গুলো।

"লেখাপড়া শিখিনি, তবু একটা প্রাইমারী স্কুলে অ-আ ক-খর চাকরি জুটিয়েছিলাম। বাবার একখানা বেনামী চিঠিতেই সে-চাকরি গেল। ফিল্মে নামতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শুনে দেখার আড়ষ্ট ভূমিকাটাই অভ্যাস আছে—চলল না। নার্স হতে গেলাম —সেখানেও বাবা কী মন্ত্র পড়লেন, তাড়িয়ে দিলে আমাকে। শুধু অধঃপাতের দরজাই দরাজ ছিল সব সময়ে, কিন্তু মা-র যন্ত্রণা-ভরা মুখ ভুলতে পারিনি তখন। কিন্তু আর থাকা গেল না। মা বেঁচে থাকতেই বাবা নতুন সংসার করেছিলেন, দ্বিতীয়-পক্ষের ট্যারা মেয়ে কেয়া পনেরোয় পা দিয়েছে—। আবার আমায় কেয়ার পার্ট শুরু করতে হবে। তাই পাড়ার দুটো নাম-করা ছেলের সঙ্গেই পালাতে হল শেষ পর্যন্ত।"

মেরুদণ্ডের মধ্যে ঠাণ্ডা স্রোতটা বরফ হয়ে গেছে চিন্ময়ের। কন্‌কনে শীতে দাঁত-গুলো ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে। চিন্ময় অস্পষ্ট গলায় বললে, "তারা কোথায়?"

"নীচে নেমেছে প্রায় তিন ঘণ্টা আগে। সঙ্গে ফ্লাস্ক ছিল। এখন মনে হচ্ছে মদ ছিল তাতে। পায়ে একটা ব্যথার জন্যে আমি নামতে পারিনি, আপাতত বেঁচে গেছি ওদের হাত থেকে। কিন্তু আজ না হোক কাল আছে, কালের পরে পরশু আছে— ওরা তা জানে।"

বন্দনা উঠে দাঁড়াল। চিন্ময় বন্দনার দিকে তাকাল—কিন্তু মুখটা দেখতে পেল না। হঠাৎ যেন ওর মাথাটা মুছে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে একটা মুণ্ডহীন শরীর, একটা বীভৎস কবন্ধ!

আকস্মিক অর্থহীন ভয়ে তীব্র চিৎকার করল চিন্ময়। সেই চিৎকারে বন্দনা চমকে পিছিয়ে গেল, সেখান থেকে পিছলে পড়ল আরো দু হাত দূরে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার টলে পড়তে গেল সেখানে—যেখানে একরাশ ফেনিল জল সোজা নীচের বিপুল শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়েছে!

চকিতে দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে চিন্ময়ের, রক্তের মধ্যে হঠাৎ বরফ-গলানো সূর্য জ্বলে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে শুনল প্রপাতের রাক্ষস-গর্জন, দেখতে পেল বন্দনার চোখে-মুখে মৃত্যুর আসন্নতা।

প্রাণপণ শক্তিতে দুহাত বাড়িয়ে অনিবার্য রসাতল থেকে বন্দনাকে টেনে আনল চিন্ময়। প্রায় মূর্ছিত বন্দনাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, "আপনি আমার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। আজকেই।"

কাল বেলা, আখের খেত দেখিতে গিয়াছি। "কাজলী" আখ, চাষীরা বলে কাজলীমা। কালো রঙের আখ, খুব মোটা নয়, তবে লম্বা হইত। এই আখ লাগাইবার দিনে চাষ দেওয়া তৈরী জমিতে গিয়া মনিবকে দুই চারিটি আখ ফেলিয়া জমির উপর খানিকটা গড়াগড়ি দিতে হইত। ভিজানো ছোলা, ভিজানো আতপ চাউল, আর গুড় কৃষাণকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইত। কাজলীর সঙ্গে আর একটা আখ ছিল "কুড়ি"। মোটা, রসালো, কিন্তু খুব লম্বা নয়। এ-সব আখ এখন নাই।

গিয়া দেখিলাম কৃষাণ দুইজন ঘাস তুলিতেছে। পুরানো কৃষাণ, প্রায় সতের আঠার বৎসর আমাদেরই বাড়িতে চাষ করিতেছে। একজন মাখন বাগদী, অন্যজন বেলোয়ার মুচি। আমার তখন কতই বা বয়স, আর চাষের কীই বা বুঝি! তবু বলিলাম, "ওঃ এত ঘাস!" বেলোয়ার বলিল, "এ ঘাস তো মরে না। এ যে ভগবানের ছিষ্টি।" মাখন বলিল, "তোর যেমন কথা, ছিষ্টি তো সবই ভগবানের।" বেলোয়ার বলিল, "তু কি জানিস, এ-বিন্দাবনের কান্ড। ঠাকুরকে নব লক্ষ ধেনুপাল চরাতে হত কিনা। এখন, রোজ এত ঘাস পাবে কোথা। তাই এই মুথো ঘাস ছিষ্টি করেছিলেন। বিন্দাবনে এ-বেলা ও-বেলা বাড়ত। তা এই কলিকালেও তু দেখ, এবেলা ছিঁড়ে দে, গরুতে খাক, কাল সকালে ঠিক যে কে সেই। দেখিলাম ঘাস তাহারা মুলসুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতেছে। শুধু বেলোয়ার নয়, গ্রামের বাগদী মুচি ডোম হাড়িদের অনেকেই এই রকমের ঠাকুর-দেবতাদের লইয়া কথা জানিত। বেলোয়ার মাঠে কাজ করিতে করিতে এবং কোন কোনদিন বাড়িতে সন্ধ্যার পর আমাকে অনেক কাহিনী শুনাইত। পরবর্তীকালে বহু পুরাণ তন্ত্র পাঠ করিয়াছি। কিন্তু মুথোঘাসের জন্ম-রহস্যের সন্ধান পাই নাই। তবে মাথাটা ছিঁড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি, মুথা ঘাস শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে।

কিছু-কম প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। সে-সময় আমাদের গ্রামাঞ্চলে কথকতার খুব চলতি ছিল। কথকঠাকুর গ্রামে আসিলে গৃহস্থেরা পালা করিয়া কথকতা দিতেন। কেহ তিন দিন, কেহ পাঁচ দিন, কেহ সাত দিন—যার যেমন মতি। এ-সব কাজ অবস্থার উপর নির্ভর করিত না। গ্রামের তাঁতির মেয়ে দেয়াশিনী ও তুলসী দুই বোন, পরের ঘরে ধান ভানিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহারা কথকতা দিয়াছে, শ্রীক্ষেত্র ঘুরিয়া আসিয়াছে। বারব্রতে জ্ঞাতি-দের খাওয়াইয়াছে, ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছে। এখন তো গ্রাম হইতে ঢেঁকিই উঠিয়া গেল। আমাদের গ্রামের পাশেই দুইটা ধান-ভানা কল আসিয়াছে। কথক ঠাকুরের দক্ষিণা ছিল এক টাকা। খুব বেশী তো দুই টাকা। কেহ নিজে রাঁধিয়া খাইতেন, কেহ ব্রাহ্মণ-বাড়িতে খাইতেন, শূদ্রেরা সিধা দিত। গ্রামের লোক নিজের বাড়িতে, কেহ বা চণ্ডীমণ্ডপে, গ্রামের বারোয়ারীতলায় কথকতা দিতেন, গ্রামের নরনারী নিমন্ত্রিত হইতেন।

কুড়মিঠার ভট্টাচার্য-বংশই গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামদন-গোপাল বিগ্রহ আজিও পূজিত হইতেছেন। বাড়িতে চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় শত বৎসর পূর্বে চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে। মাতামহের সহোদর হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য একজন খ্যাত-নামা অধ্যাপক ছিলেন। মাতামহের দুই পুত্র যৌবনেই দেহরক্ষা করেন। হরিনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে রামতারণ অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার জীবৎ কালেই তিনি লোকান্তরিত হইলে চতুষ্পাঠী বন্ধ হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী প্রায় পনের-কুড়িখানি গ্রাম ভট্টাচার্য-বাড়ির বিধি-বিধান মানিয়া চলিত। ভট্টাচার্য-বংশের বাড়বাড়ন্ত ছিল খুব। ইঁহারা নিজেরাই একটা পুকুর কাটিয়া লইয়াছিলেন। খাত গভীর হইয়াছে, সেই গভীর গর্ত হইতে ভট্টাচার্য-যুবকগণ কোদালে মাটি তুলিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিতেছেন। মাটি গিয়া একটা পালকির উপর পড়িল। জমিদারের পালকির উপর মাটি ছুঁড়িয়া ফেলে, এত সাহস কার। ঝালরদার পালকিতে মাটি? বরকন্দাজ গিয়া দুই তিনজনকে ধরিয়া আনিল। জমিদারের বিশ্বাস হইল না। তিনি নামিয়া নিজের চোখে মাটি ফেলা দেখিলেন। পুষ্করিণী নিষ্কর হইয়া গেল। খুষ্টীকুড়ির মুসলমান জমিদার কুলতোড় কুটুম্ব-বাড়ি যাইতে-ছিলেন। ভট্টাচার্য বংশে একজন এখনও আছেন, পুষ্করিণী কিন্তু অন্যের হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ চাকুরিজীবী ছিলেন। শ্রীকন্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জে পুলিশে চাকুরি করিতেন। খুড়তুতো ভ্রাতা গুরুদাস সিউড়ীর প্রসিদ্ধ উকিল দ্বারিকানাথ চক্রবর্তীর জমিদারির নায়েব ছিলেন। ইনি সোনার ঢেঁক দেখাইবার জন্য উকিল মহাশয়ের এক জামাতাকে গ্রামে লইয়া আসেন। মনিব-জামাতাকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের পর সন্ধ্যায় সূত্রধর-কন্যা সোনামণির গৃহে লইয়া গিয়া বলেন, "কই সোনা, তোর ঢেঁকি দেখি।" সোনা জিভ কাটিয়া পলাইয়া গেল। গুরুদাস দেখাইলেন, "এই দেখুন সোনার ঢেঁকি। সোনার ঘর, সোনার দুয়ার, এ সবই তো সোনার।" জামাতা বাবাজীবন সিউড়ী ফিরিয়া শ্বশুর মহাশয়কে সমস্ত জানাইলে দ্বারিকানাথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। উকিল-কন্যা গুরুদাসকে আদর করিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইয়াছিলেন।

বাঁড়ুজোরাই শহরের হালচাল গ্রামে বহিয়া আনিতেন। কোন প্রসঙ্গ কার্যকরী করিতে হইলে শ্রীকণ্ঠ বলিতেন, "আন্দোলন কর।" গ্রামে ইঁহাদেরই পূর্বপুরুষ প্রথম দুর্গা-পূজা আনেন। ইঁহাদের বাড়িতে শ্রীধর শালগ্রাম নিত্যপূজিত হইতেন, ব্রাহ্মণবাড়ি বলিয়া অন্নভোগাদির ব্যবস্থা ছিল। ইঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপ মাটির ঘর হইলেও তাহাতে কাঠের কারুকার্য এত সুন্দর ছিল যে, এ-তল্লাটে তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একবার দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ শ্রীকণ্ঠ, গুরুদাস কাহার বাড়িতে খাইবেন মীমাংসা না হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অগ্র-পশ্চাৎ দুই পাশেই পাতা দেওয়া হইয়া-ছিল। দুই দিকের পাতাতেই মায়ের প্রসাদ, সুতরাং সকলেই কিছু কিছু মুখে তুলিয়াছিলেন। আজ আর কিছুই নাই। শ্রীধর অন্তর্হিত হইয়াছেন। দুর্গোৎসব লুপ্ত হইয়াছে। একজন বংশধর কিন্তু আছেন।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে পরেশনাথ রায় নিজ নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার স্ত্রী ভাগীরথী ঠাকুরানী দুর্গাপূজা আনেন। পরেশনাথের ভাগিনেয় রামসুন্দর বাঁকুড়া জেলা হইতে আসিয়া মামার সম্পত্তির মালিক হন। লোকে তাঁহাকে রায়-বাড়ির ভাগিনা-রায় বলিত। ক্রমে রামসুন্দরও রায় উপাধি লিখিতে থাকেন। রামসুন্দরের তিন

পুত্রের মধ্যে ত্রৈলোক্য রায় এবং গয়ারাম রায় গ্রামের বাঁধিষ্ণু ব্যক্তি হইয়াছিলেন। গয়ারাম, যেমন শৌখিন তেমনই ভোজনপটু ছিলেন। তিনি হয় পালকি নয় ঘোড়া ভিন্ন পথ চলিতেন না। প্রচুর গুড় দুধ এবং আধ সের মাছ তাঁহার নিত্য আহার্য ছিল। আমের সময় কাঁচ আমের "গুড় অম্বল" ভারী পছন্দ করিতেন। রামসুন্দর এবং গয়ারামও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গয়ারাম ও ত্রৈলোক্য রায় ছোটখাট একটা মৌজা পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। গয়ারামের পুত্র ছিল না। জ্যেষ্ঠ পূর্ণানন্দ রায়ের বংশধরেরা পূজাদি চালাইতেছেন। ত্রৈলোক্য রায়ের এক পুত্রের দৌহিত্র-বংশ আছে।

লাউসেন পাল গ্রামের আর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইঁহারা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। তাই দুর্গোৎসব আনিয়া পাল মহাশয় কুমড়া বলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি তসরের ব্যবসায় করিতেন। গ্রামে অনেক তাঁতির বাস ছিল। কেহ সুতা বুনিত, কেহ তসর বুনিত। ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া কানুরাম সৌ সেই সমস্ত সুতার গড়া ও তসরের থান লাউসেন পালের মধ্যস্থতায় লইয়া সুরুলের সাহেবের কুঠিতে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। সুরুলের কুঠিতে একবার চুরি হয়। চোরের উপর বাটপাড় করিয়া কানুরাম অবস্থা ফিরাইয়া ফেলে। এবং কুড়ুমিঠাতেই বাস করে। কানুরাম সৌর পুত্র ক্ষুদিরাম চৌধুরী। ইহার আঠার গণ্ডা ধানের মড়াই ছিল। ইহারও ঘোড়া ছিল, পালকি ছিল, সামান্য পত্তনী আদায় ছিল। ইহার সরস্বতী পূজায় খুব ধুম হইত। শ্রীধর ঠাকুর, চাকর যোগী প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত কবিওয়ালারা ইহার পূজায় গান করিতে আসিত। ইহাদেরই বাড়িতে সরস্বতী পূজায় ছেলেবেলায় রামায়ণ গান শুনিয়াছিলাম। ইহাদের ছয় পুরুষ চলিতেছে।

গ্রামে মনসাদেবী আছেন, নাম বুড়ি-ঠাকরুন। তিনটি মনসার বাড়ি (ঘট) তিন ভগিনী। দশহরা এবং চৈত্র মাসের বার্ষিক পূজায় মনসামঙ্গল গান হইত। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে গ্রামের ষোলআনা মিলিয়া মায়ের পূজা করিত। বহুদিন পূর্বের কথা—প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর গত হইয়া গেল- গ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে। মায়ের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূজা হোম বলিদান ও ভোগের পর সন্ধ্যায় রাধাবল্লভ কর্মকার মনসামঙ্গল গান করিতেছে। মনসার বেদীর নিকট ধূপ দিতে গিয়া কে একজন বাহিরে আসিয়া বলিল, "মা ঘামিতেছেন। তিন ভগিনীর মধ্যবর্তিনী মায়ের ঘট হইতে তৈলাক্ত সিন্দুরের প্রলেপ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে।" তিন চারিজন ভিতরে গিয়া পাখা করিতে লাগিল। রাধাবল্লভ তখনই তখনই গান বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল, "কেন শ্রীঅঙ্গ ঘামিল"। হঠাৎ আমারই সমবয়সী ভট্টাচার্য-বাড়ির লোকনাথ মায়ের মন্দিরের দাওয়া হইতে নীচে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। লোকে বলিল, মা ভর করিয়াছেন। চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া মুখুজ্যে বাড়ির (ইঁহারাই মনসার সেবাইত ছিলেন) মধ্যম ঠাকরুন গলায় কাপড় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুই ঘামছিস কেন, তোর কী হল তাই বল?" লোকনাথ বলিল, "তোদের ভয় নাই। কাল থেকে কলেরা ভাল হয়ে যাবে। আমি সব অমঙ্গল তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। বড্ড পরিশ্রম হয়েছে, একটু বাতাস কর।" লোকনাথের বয়স তখন নয় বৎসর। আর একবার মধ্যম ঠাকরুনের সাত বৎসরের মেয়ে মাখনমণি মায়ের মন্দির ঝাঁট দিতে আসিয়া অচেতন হইয়া পড়ে। সংবাদ পাইয়া ঠাকরুন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কী হল তোর?" মাখনমণি বলিল, "আমি আজ তিন দিন উপোস আছি। ধর্মরাজের এঁঠো নৈবিদ্যি দিয়ে আমার পুজো হয়।" শিবরাম ভট্টাচার্য পূজা করিতেছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন এই তিন দিন তিনি ধর্মরাজ পূজার পর নৈবেদ্য লইয়া মনসা পূজা করিয়াছেন। তাহার পর হইতে একই রেকাবির নৈবেদ্যে পৃথক পৃথক ভাগ থাকে।

গ্রামে ধর্মরাজ আছেন, নাম "বুড়ো রায়"। ভট্টাচার্য-বংশের কে একজন নিকটবর্তী কোপাই নদীর তীরে ঘাস আনিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়া স্নানের পর আহ্নিক করিতে বসিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন, "আমি ঘাসের ঝুড়ির মধ্যে আছি। আমাকে বাহির কর।" ঘাস ঝাড়িয়া দেখা গেল, এক ধর্মরাজ শিলা। শিলাটি রামাই পণ্ডিতের ধর্ম-পুরাণোক্ত লক্ষণযুক্ত। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইল। সেই অবধি তিনি গ্রামে আছেন। আষাঢ়ের পূর্ণিমায় তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল। তাই ঐদিন তাঁহার বার্ষিক পূজা হয়। গ্রামে ধর্মরাজ আছেন, কিন্তু ধর্মমঙ্গল গান কখনো শুনি নাই। এ-অঞ্চলে ধর্মমঙ্গলের চলন নাই।

পাশের গ্রাম কড়ডাঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজায় তিনদিন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা হইত। এখানে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি নিয়মিত আসিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কমলাকান্তও কয়েক বৎসর এখানে গান করিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ়ত্বের পরেও নীলকণ্ঠের কণ্ঠে যেন সুধা ঝরিত। আসরে মুসলমান শ্রোতার সংখ্যাও বড় কম হইত না। কিন্তু কণ্ঠ মহাশয় আসরে দাঁড়াইলে সমস্ত নরনারীই নীরব হইয়া যাইত। আসরে ব্যাতক্রম কিছু দেখিলেই নীলকণ্ঠ গান বাঁধিয়া তাহাকে স্বাভাবিক করিয়া আনিতেন। গানে অনুরোধ, অনুযোগ, তিরস্কার ফুটিয়া উঠিত। কণ্ঠের শিষ্যগণের মধ্যে হিতলাল গোস্বামী এবং গদাধর দাসের নাম বহুবিখ্যাত। গদাধর বীরভূম জেলার অধিবাসী। তিনি একবার কণ্ঠের দল ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য নিজেই যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামে একবার তাহার যাত্রা হইয়াছিল। আমাদের পাঠশালার গুরু-মহাশয় কেদারনাথ পাল এই উপলক্ষে একটা কবিতা লিখিয়া ধর্মরাজতলায় আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাহার দুই ছত্র মনে আছে—

ইটণ্ডা খড়া নিবাসী নাম গদাধর।
হৃষ্টচিত্তে করিবেন সঙ্গীত বিস্তর॥

গদাধর পুনরায় কণ্ঠের দলে যোগ দিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের শিষ্য বীরভূম বামনা নিবাসী যোগীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় সুগায়ক ছিলেন। নিকটবর্তী গ্রাম মঙ্গলাডিহির রাসের মেলায় তাহার যাত্রাদলের বাঁধা আসর ছিল।

সে-কালের বিখ্যাত কীর্তনীয়া রসিক দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস, প্রেমদাস পাশের গ্রাম বাতিকার, মঙ্গলডিহিতে মাঝে মাঝে আসিতেন। কড়ডাঙ্গ গ্রামে নবরাত্রি শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন উপলক্ষে অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় নয় দিন কীর্তন গান করিয়াছিলেন। পায়র গ্রামের কীর্তনীয়া অক্ষয় দাস এবং ইলাম বাজারের কেশব চক্রবর্তী এ-অঞ্চলের আটপৌরে গায়ক ছিলেন। কেশবের কুড়ুমিঠা গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ইঁহাদের গান কতবার শুনিয়াছি।

সে-কালে গ্রামের জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় গান ছিল কবি এবং ঝুমরী গান। দুই দলেই নামকরা গায়ক গায়িকা থাকিত। এ-কালে মুন্সী গুমানি, দেবেন দাস, লম্বোদর চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিগানে নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তখনকার দিনে পুরানো ধারাই চলিতেছিল। মধু গরাঞী এবং মাধব হাড়ির তখন খুব নাম। গ্রামে কেহ বাড়াবাড়ি ঝগড়া করিলে লোকে বলিত মধো মাধার পাল্লা লাগিয়াছে। মধুর গান শুনিয়াছি। পরে তারণ মড়লের নাম হয়। ফকির বাউড়ী, অবিনাশ দাস, রাখাল বাগদী, রাখাল হাড়ি, যৌবনে ইহাদের গান অনেক শুনিয়াছি। ঝুমরীর দলে মেয়েরাই গাহিত। এই দলের দুই

একজন গায়িকা কবির দলের ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা দিবার স্পর্ধা রাখিত। একবার একটি দলের গান শুনিয়াছিলাম। দলে চার পাঁচটি মেয়ে, ভাল চেহারা, গলাও ভাল। তার মধ্যে একটির বয়স নেহাত কাঁচা। কচি পাতার মত গায়ের রং, সুন্দর গড়ন, গলাও তেমনই মিষ্টি। এই রূপসী কিশোরী গৃহস্থবধূরূপে পবিত্র জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

গ্রামে দলাদলি ছিল; কিন্তু মামলা মোকদ্দমা প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। বাকী খাজনার মামলা, দাদন তমসুকের মামলা,—ক্বচিৎ এক আধটা স্বত্বের মামলার জন্য লোকে আদালতে যাইত। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাকে লোকে ভয় করিত। ধর্মরাজ পূজায় দুই দলে সং দিত। দলাদলি করিয়া এ-পাড়ায় কবি ও-পাড়ায় ঝুমরী হইত। এক পাড়ায় চব্বিশ প্রহর দেখিয়া অন্য পাড়ার লোক নবরাত্রি হরি-সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিত। সে আজ কতকালের কথা। আমাদের গ্রামে সুবর্ণ বণিকদের সঙ্গে স্বর্ণকারদের একবার তুমুল দলাদলি লাগিয়াছিল। স্যাঁকরাদের বাড়ির এক ছোকরা পোদ্দার-পুকুরে স্নান করিতে গিয়া হাত পা ছুড়িয়া এমনভাবে সাঁতার কাটে যে, মালিকের গায়ে জলের ছিটা লাগে। পুকুরের মালিক জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছিল। চটিয়া উঠিয়া বলে, "যা যা নিজে পুকুর কেটে সেখানে সাঁতার দেগা যা।" ছোকরা গুম্ হইয়া বাড়ি চলিয়া আসে। বাড়ির লোকে শুনিয়া তো রাগিয়া লাল। বলিতে লাগিল, "সকলেই কি পুকুর দিতে পারে, না সকলের বাড়িতেই ঢেঁকি থাকে।" (বাড়িতে ঢেঁকি থাকা গৃহস্থের আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল।) স্বর্ণকাররা সকলেই শুনিল। পোদ্দারদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিল, এদিকে নূতন পুষ্করিণী খননের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। স্বর্ণকারগণ যথাসাধ্য শ্রম দিয়া ও সামান্য অর্থ দিয়া সাহায্য করিল। অল্প দিনেই পুষ্করিণী খনন এবং শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠাকার্যও সমাপ্ত হইল। যতদিন এই দুইটি কাজ শেষ না হইয়াছিল, স্বর্ণকার-যুবক বাড়িতে তোলা জলে স্নান করিত। এই ছোট স্যাঁকরা-পুকুর গ্রামে আছে, কিন্তু স্বর্ণকারদের অধিকারে নাই।

গ্রামে পুষ্করিণী খননের আর একটা কাহিনী আছে। এক ধনবান তাম্বুলী ছিলেন, উপাধি নায়ক। তাঁহার বংশধরগণ দুমকা রসিদপুরে বাস করিতেছেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি দুমকায় যাতায়াত করিতেন। গরুর পিঠে ছালা চাপাইয়া মাল আনা-নেওয়া চলিত। তাঁহার ছালার গরুর ঘণ্টার শব্দ নাকি এক ক্রোশ দূর হইতে শোনা যাইত। প্রায় আধ ক্রোশ জুড়িয়া ছালার গরু চলিত। গ্রামে জলকষ্ট দেখিয়া তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের উপর একটি পুকুর কাটাইবার ভার দেন। কাজ শেষ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামে আসিয়া দেখেন, পুকুরের পরিমাণ মাত্র ষোল বিঘা। তিনি তো রাগিয়াই অস্থির। সে-পুকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন না, এবং দুঃখে ক্ষোভে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পুকুর না প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্ন গ্রহণও করিবেন না। শুনিয়াছি, এক বিঘা পরিমাণ একটি ছোট জলহরি এক রাত্রির মধ্যে কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই যে গিয়াছিলেন, আর তিনি গ্রামে আসেন নাই। অপ্রতিষ্ঠিত নায়কপুকুর এবং প্রতিষ্ঠিত নায়ক-গড়্যে আজিও সেই নাম-না-জানা মহাপুরুষের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

গ্রামের আর তিনজন নামকরা লোক ঠাকুরদাস বায়েন, বলাই বায়েন এবং আপাল ডোম। ঠাকুরদাস ও বলাই সালিশের লোক, ষোল আনার মজলিসে তাহাদের ডাক পড়িত। বলাইয়ের হাতা-মুঠা চিকিৎসায় লোকের অনেক ব্যারাম ভাল হইত। তাহার নাড়ীজ্ঞান ছিল অভিজ্ঞ কবিরাজের মত। এক ব্রাহ্মণ যুবকের অন্যায় কাজের বিচারের জন্য গ্রামে পঞ্চায়েৎ বসে। মজলিসে ঠাকুরদাসও ছিল, কী একটা কথা বলায় কোন ব্রাহ্মণ নাকি বলেন, "বামুনের ব্যাপারে মুচি কথা বলে কোন্ সাহসে।" ঠাকুরদাস উত্তর করে, "মুচি তো আর সাধ করে হই নাই দাদাঠাকুর। ঐ ছোট ঠাকুরের মতন কাজ করে তবে তো মুচি হয়ে জন্মেচি।"

আপাল খুব করিৎকর্মা লোক ছিল। কাহারো বাড়িতে আসিয়া হয়তো বলিল, "দ্যান তো মা-ঠাকরুন কুড়োলটা। কাঠ কেটে আবার দিয়ে যাচ্চি।" সন্ধ্যায় ফিরিয়া বলিয়া গেল, "মা ঠাকরুন, যে রোদ গো, তিষেতে (তিয়াসে) ছাতি ফেটে যায়, কুড়োলটো বাঁধা রেখে টুক্‌চে মদ খেয়ে অ্যালাম। বাবা ঠাকুরকে বোলো, চার আনা পয়সা দিয়ে দেলোরা থেকে যেন ছাড়িয়ে আনে।" তখনকার দিনে প্রচুর পচুইয়ের সঙ্গে পরিমাণমত মুড়ি কলাই ভাজা দু আনাতেই যথেষ্ট পাওয়া যাইত। বলা বাহুল্য, আপাল ছাঁদা বাঁধিয়া বাড়ির জন্যও কিছু আনিতে ভুলিত না। এবং দেলোরা গ্রাম কুড়মিঠা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ।

মুসলমানের মহরম-পর্ব নিকটবর্তী মোল্লা-পাড়ার তাজিয়া আমাদের দুয়ার হইয়া কুড়মিঠায় আসিত। বাজনার শব্দে আমার এক মামা বাহির হইয়া আসিতেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে লাঠি খেলিয়া সরবত খাইবার জন্য ছোট এক কলসী গুড় উপহার দিয়া বিদায় লইতেন। অস্পৃশ্যতার কড়া-কড়ি কোন কালেই ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধও কস্মিনকালে ছিল না। খুষ্ঠীকুড়ির মুসলমান জমিদার শুভদিনক্ষণ দেখিবার জন্য ভট্টাচার্যদের লইয়া যাইতেন ও মাঝে মাঝে পালে পর্বে সিধাও পাঠাইতেন। সিধা শূদ্রেরাও পাঠাইতেন। নবান্নে, অন্নপ্রাশনে, বিবাহের আইবুড়ভাতে ভট্টাচার্য-বাড়ি হইতে মদনগোপালের প্রসাদ লইয়া যাইতেন। প্রথাটার অবশেষ এখনো আছে।

গ্রামে চারিখানি দুর্গা প্রতিমার পূজা হইত। ব্রাহ্মণদের দুইখানি, তাঁতিদের এক-খানি, আর স্বর্ণকারদের একখানি। নায়ক-পুষ্করিণীতে নবপত্রিকা স্নান এবং গ্রামের উত্তর দিকের ব্রাহ্মণ-পুষ্করিণীতে পত্রিকা বিসর্জন ও প্রতিমা বিজয়ার প্রথা আজও আছে। কিন্তু বর্তমানে প্রতিমা মাত্র একখানি, রায়বাড়ির। মহাষ্টমী-মহানবমী-সন্ধির বলিদান হইত আগে বাড়ুজ্যেদের বাড়িতে, তাহার পর রায়বাড়ি। অতঃপর তাঁতিদের প্রতিমার সামনে পৃথক তরবারীতে কুমড়া বলি দিয়া পরে স্বর্ণ-কারদের বাড়িতে বলির নিয়ম ছিল। এই বলিদানের পর সমবেত জনতা অশ্লীল গান গাহিয়া তাঁতিপাড়ার বটতলা (শিবতলা) পর্যন্ত অগ্রসর হইত। পাড়ায় পাড়ায় খেউড় গাহিবার জন্য হাড়ি মুচি ডোম বাগদী পুরুষদের সে কি উৎসাহ, সে-কি উল্লাস। অনেক স্থানেই এই প্রথা ছিল, এখনো কোথাও কোথাও আছে। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি শ্রীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সেও এই গান ধরাইয়া দিতেছেন। পুরানো দিনের প্রথা বলিয়া লোকে সহজে ইহা ছাড়িতে চাহে না। কালিকা-পুরাণে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের পর অশ্লীল নৃত্য-গীতের নির্দেশ আছে।

সিদ্ধ শিকারী 'কান্তি চৌধুরীর একটি কাহিনী আপনাদের শুনাইতেছি।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন ঃ

বায়োস্কোপের ফোটো তোলে, তাকে বলে শুটিং। সার্থক নাম। বন্দুকের গুলীতে মানুষ একবারে মরে যায়। ফোটোতে একবার উঠে গেলে আর নামতে পারে না, তিলে তিলে ঝুলে ঝুলে মরতে হয়। আর ফোটোও ত এখন আর সে-ফোটো নেই—হাঁটাচলা কথাবার্তা নাচগান, সবই উঠে যাচ্ছে ফোটোতে; হাড়-পাঁজরা ফুড়ে নাড়িভুঁড়ির ভেতরে কোথায় কী হচ্ছে তাও রেহাই পাচ্ছে না। কবে হয়ত শুনব মনের কথা আর চিন্তার ছবি উঠে যাবে ক্যামেরায়। আমি তাই মরে গেলেও ফোটো তুলতে দিই না কখনও, কে জানে কার মনে কী কু রয়েছে।

একবারের কথা বলি।

খুলনা জেলার দক্ষিণ জুড়ে সুন্দরবন, তার গায়ে গায়ে লোকালয়। সুন্দরবন আবাদ করে সে-লোকালয়ের পত্তন, তাই তার নামই হয়েছে আবাদ। জঙ্গলে আর মানুষে সেখানে দিবারাত্রি লড়াই—মানুষ ক্রমাগত জঙ্গলকে ঠেলে পিছনে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; জঙ্গলও আবার ফাঁক পেলেই ধাঁধাঁ করে বেড়ে চলে আসছে, আবাদকে আবার গহন বন করে ফেলছে। জঙ্গলের সেই আক্রমণের অগ্রগামী স্কাউট হচ্ছে বাঘেরা। বন যখন এগিয়ে আসে, তার আগে আগে বাঘেরা এসে লোকালয় শূন্য করে দেয়।

চাকরি করা বছর কয়েক হয়েছে তখন। শিকারের নেশাও জমজমাট হয়ে ধরেছে, ছুটিছাটা পেলেই বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এমনি এক ছুটিতে খুলনায় গিয়ে দাখিল হলাম।

ছোট্ট শহর, কিন্তু ভারী ঝকঝকে তকতকে। আর শহর হিসেবে বাড়িঘর বেশ বড় বড়, হঠাৎ দেখলে রীতিমত সমৃদ্ধ-লোকদের দেশ বলে মনে হয়। আমি যে-বাড়িতে উঠেছি, সে ত রীতিমত একটা রাজবাড়িমার্কা কাণ্ড।

গিয়েছি, কোন্ পথে কীভাবে গেলে আবাদ অঞ্চলে পৌঁছনোর সুবিধে তার খোঁজখবর নিচ্ছি, এমন সময় সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে হাজির হল। এ-বাড়ির এক ছেলে উকিল, সতীনবাবু নাম, তিনি খবর দিলেন, "বন্দুকে শান দিয়ে তৈরি হোন, নৌকো খুঁজতে হবে না আর, নৌকোই আপনাকে খুঁজছে।"

কী ব্যাপার? না এস-ডি-ও সাহেবের শখ হয়েছে বাঘ মারতে যাবেন; শহরে তাই দল জোটানো হচ্ছে। প্রফুল্লবাবু বলে একজন, উকিল, তাঁর উপরে ভার পড়েছে যোগ্য সঙ্গী যোগাড় করবার। প্রফুল্লবাবু বার-লাইব্রেরিতে বলছিলেন, ইনি আমার নাম করে এসেছেন। প্রফুল্লবাবু এই এলেন বলে।

শুনে চক্ষুঃস্থির। বাঘটাঘ মারতে যাই, সে এক কথা। কিন্তু মফস্বলের ক্ষুদে হাকিম, সে সাংঘাতিক চিজ। কোথা থেকে কী ঘটে যাবে, শেষে যদি বাঘ মারতে এস-ডি-ও মেরে বসি, তখন?

বললাম, "করেছেন কি মশায়। শিকারে যাব, নিজের ইচ্ছে-খুশি। সায়েব-সুবোর ল্যাজ ধরে যাওয়া মানে ত সেই ল্যাজ চুলকোতেই দিন কাবার। শিকার করব কখন?"

সতীনবাবু বললেন, "কেন, শিকারের বাধাটা কোথায়?"

বললাম, "কোথায় যে, সে বলে বোঝাব কী করে।"

বলতে বলতেই প্রফুল্লবাবু এসে হাজির হলেন। আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোটই হবেন; ছোটখাট মানুষটি, চোখে মুখে বুদ্ধি যেন ফুড়ে বেরুচ্ছে। বললেন, "কী বোঝাবেন?"

সতীনবাবু বললেন, "দেখত। খালি বলছেন, এস-ডি-ও'র সঙ্গে ভিড়ে শিকারে গেলে নাকি শিকার হবে না।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "কেন, এস-ডি-ও'র অপরাধ? এস-ডি-ও'কে দেখেই কি ভাবছেন বাঘগুলো সব পটাপট পড়ে পড়ে মরে যাবে, আপনার জন্যে একটাও বাকি থাকবে না? আমাদের তেমন এস-ডি-ও নন। বেশ ভাল চেহারা।"

আমি বললাম, "চেহারার কথা বলছিনে। চেহারা সুন্দর-কুচ্ছিত বুঝুক বাঘেরা, যারা খেতে আসবে। আমি ভাবছি মেজাজ।

প্রফুল্লবাবু বললেন, "আরে না না মশায়। আগে থেকে ঘাবড়ে যান, বাঘ মারবেন কী করে তাহলে।"

আমি বললাম, "বাঘ দেখে ঘাবড়াইনে আমি কিন্তু নাকছাটা সয় না আমার। আমাকে বাদ দিন আপনারা।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "আহা, সুবিধেটা দেখছেন না? সায়েব যাচ্ছেন, লঞ্চ যাবে, খাবার দাবার, কোথায় থাকব কোথায় শোব কিছুমাত্র ভাবতে হবে না; আর লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত এত যাবে যে, তার কোলাহলে তিন মাইলের ভেতরে বাঘ ত বাঘ বেজিরও দেখা পাবেন না, আঁচড়-কামড় খাবারও ভয় থাকবে না। এ হল বুঝলেন না, বাঘের মনে বাঘও বেঁচে রইল, আমরাও যে যার প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম, অথচ মাঝখান দিয়ে শিকারটিও দিব্যি করা হয়ে গেল। যাব না বললে হচ্ছে না স্যর, যেতে আপনাকে হলই।"

বললাম, "আপনিই বা এত করে লেগেছেন কেন বলুন। যেমন অহিংস শিকারে আমার ভক্তি নেই।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "আচ্ছা, ভক্তি আপনার থাকবার দরকার কী। আপনার উপরে আমাদের থাকলেই হল।"

বললাম, "কিন্তু আমি না গেলে কী হয়?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "না গেলে আপনার কিছু হয় না, কিন্তু গেলে আমাদের বেশ কিছু হয়। অন্তত আমার তো বটেই।"

বললাম, "তার মানে?"

"মানে, ব্যাপারটা বুঝুন। এস-ডি-ও সায়েব, মানে সায়েব নয়, একদম কালো বাঙালী, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। সেইজন্যেই সায়েবিআনাটা অতি প্রচন্ড। দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, সদ্য আমদানী, তাঁকে চমকে দেবার জন্যে শিকারে যাওয়া। নইলে বুঝতে পারেন না, শিকারে যাব বলে কেউ বার-লাইব্রেরিতে সঙ্গী খোঁজে?"

আমি বললাম, "বেশ ত, আপনাদেরই বা যাবার মামলাটা কী?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "সে বুঝবেন না, আপনি উকিল হননি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আমরা যা যাবার ত যাবই—সেজন্যে ঘাবড়াই না, বাঘেও উকিল খায় না শুনেছি। কিন্তু ডি-এম্ ঘাবড়ে যাচ্ছেন। আমাকে ডেকে বললেন, রায়, গোঁ যখন ধরেছে ও যাবেই; আমিই বা ঠেকাই কী বলে। কিন্তু বাঘের পেটে গেলে আমাকে গবরমেণ্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। সেইটে পার ত সামলাও।"

"অতএব?"

"অতএব আমি সামলাচ্ছি। দলবল খুব জোটাচ্ছি যেন হৈ-চৈ-এর ঠেলায় বাঘ ধারেকাছেও না ঘেঁষে। তবু বোঝেন ত, বনের জন্তু, তার মতিগতিকে পুরো বিশ্বেস নেই। দুম করে যদি এসে দেখা দেয়, আমাদের তো বোঝেনই মুরোদ, আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাই। আর না বলবেন না ভাই, আমাদের রক্ষে করুন।"

বললাম, "বেশ যাব।"

লঞ্চে চাপতে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। অফিসার বেশী নয়, যা আছে দু'চারজন সেও নেহাত চ্যাংড়ার দল, কারণ নিজের চেয়ে সিনিয়র কাউকে সঙ্গী নিলে সর্দারিটা জমবে না। কিন্তু বার লাইব্রেরির মনে হল একটা আস্ত কলোনিই বসে গেছে লঞ্চে। কিছু না হবে তো জনতিরিশের উপর লোক পার্টিতে; তার কম করেও বাইশ জনই উকিল। কামান-বন্দুকে বিশেষ ধরা-ছোঁয়া যে অভ্যাস আছে কারও এমন মনে হল না, তবে দামী দামী বন্দুকে বেশ খানকতকই চলেছে। প্রফুল্লবাবুকে চুপি চুপি বললাম, "ও মশায়, এ-যে গোটা বারই তুলে নিয়ে এসেছেন দেখছি। মামলা মোকদ্দমা কিছু হবে না কাল?"

প্রফুল্লবাবু জিভ কেটে বললেন, "বলেন কি। এই কজনে বার খালি হয়ে যাবে, খুলনার বদনাম করতে চান আপনি?"

বললাম, "বেশ। কিন্তু আমরা তো হাজির, যাঁর জন্যে এত কান্ড, শ্যামরায় কই?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "আসবে আসবে, যথাকালে আসবে।"

আসতে লাগুন, ততক্ষণ আমাদের আড্ডা জমে গেল। অনেক লোক, অনেক রকম মুড়, তবু সবারই দেখলার হৈ চৈ করবার বুদ্ধিটা প্রচুর। প্রফুল্লবাবু গুণী লোক; বাঘ মারি না-মারি, আড্ডা মারবার ব্যাঘাত না হয়, তার ব্যবস্থাটি বেশ গুছিয়ে করেছেন।

সন্ধ্যে হব হব, এমন সময় এস-ডি-ও এলেন। না জেনে বলে ফেলেছি, তবু অভ্যাসের জোর, মিছে কথা বেরোয়নি মুখ থেকে—শ্যামরায়ই বটেন। কালো তো কালো, ছাঁকা ভূষাকালি, তার ওপর বেদম হোঁতকা। শুধু চেহারায় নয়, বুদ্ধিতেও। এসেই এমন একটা ভাব ধারণ করলেন যেন বিশ্ব-সুদ্ধ সবাই তাঁর খানসামা আর বেয়ারা; আর তিনি যে বাঘ মারতে চলেছেন, সেটা নেহাতই আমাদের পাপ উদ্ধার করতে। লঞ্চের সারেং খালাসীকে ত ধমকে উলটে দিলেন, উকিলরা সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে চলতে লাগলেন, আমি গতিক বুঝে বাইরে ঝুঁকে নদী দেখতে বসে গেলাম, হাতাহাতি একটা এক্ষুনি না হয়ে যায়।

কিন্তু অসহ্য হল একটা ব্যাপার। স্ত্রী সঙ্গে এসেছিলেন, পতি দেবতাকে জয়যাত্রায় রওয়ানা করে দিতে। চমৎকার মেয়েটি, হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়ন। চোখের কোণে অদ্ভুত একটি দুষ্টু হাসি লেগেই রয়েছে। দুজনের বয়সের ফারাক অনেক—কর্তার বয়স চল্লিশের ধারে, এঁর বয়স মনে হল কুড়ি পেরোয়নি। মুখে চোখে সারাক্ষণ এমন একটা ঝিকমিক খেলছে, সুন্দর না কুৎসিত সে-কথা মনেই হয় না, শুধু ইচ্ছে করে আর একবার দেখে নিই মুখখানা, আর যদি না দেখি!

এসেছে স্বামীর সঙ্গে, অন্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, কে জানে হয়ত কর্তার অতটা পছন্দও নয়। তার সঙ্গেও খুব বেশী বলছে তাও নয়; তবু যেন সব-সুদ্ধ একটা অ্যাটমোস্ফিয়ার গড়ে তুললে দুমিনিটে।

অবশ্য থাকলও না বেশীক্ষণ, মিনিট পাঁচ-সাত জোর। এদিক ওদিক ঘুরে দেখল, কেবিনে যেখানে রাজশয্যে পাতা সেটাকে একটু দেখল টিপেটুপে সব ঠিক আছে কিনা, তারপরই ফিরে চলল, লঞ্চ এবার ছাড়বে।

নামবার মুখে, খুব নরম গলায় চুপি-চুপি বলল, "শোন, শিকার হয়ে গেলেই সোজা ফিরে আসবে কিন্তু। আর, ঠান্ডা লাগিয়ো না।"

এস-ডি-ও হঠাৎ কড়া গলায় ধমকে উঠলেন, "হয়েছে হয়েছে যাও, মেলা জ্যাঠামো কোরো না।"

আমরা চমকে উঠলাম—এ কি অসভ্য! যাকে বলা তার কিন্তু দেখলাম মুখখানা একটুও ম্লান হল না, মিষ্টি হাসিটুকুকে আরও একটু মিষ্টি করে, ভুরু তুলে বললে, "বাপরে।"

তারপর হেঁট হয়ে এক প্রণাম করে খুটখুট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। হাই-হীল তোলা জুতোর দিকে তাকিয়ে আমার খালি মনে হতে লাগল, মানাচ্ছে না মানাচ্ছে না, এ মেয়ের পায়ে থাকবে আলতা আর পাঁইজোড়।

কিন্তু আমি ভাবলে হবে কি, এস-ডি-ওর বৌ হয়েছে যখন বাপমায়ের বরাত গুণে, হাই-হীল তার কপাল থেকে খসায় কে।

একটু পরেই লঞ্চ ছাড়ল। মস্ত বড় লঞ্চ, জায়গার কমতি নেই। এস-ডি-ও তাঁর ছোট কেবিনের বিছানায় গিয়ে সেঁধুলেন। আমরা কেউ-বা বড় কেবিনে, কেউ-বা ফ্রন্ট-ডেকে যার যেমন খুশি গড়াগড়ি খেলাম। সারা রাত ধরে লঞ্চ চলবে, ভোরের কাছাকাছি গিয়ে আবাদে পেঁছবে।

সে অপূর্ব যাত্রা। দুপুর রাত, অন্ধকার আকাশে শুধু তারারা লঞ্চের সংগে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। নিস্তব্ধ নদী, নিস্তব্ধ আকাশবাতাস, শুধু লঞ্চের ঝকঝক শব্দ, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ তার বাঁশির আওয়াজ। আধ ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শুনি ভোঁ করে বাঁশি বাজছে—লঞ্চ বাঁক ঘুরবে, বা সামনে নৌকো পড়েছে। বাঁশি থামতেই যেন আবার সব আরও বেশী করে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, চাকার শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসতে থাকে। যেন সে নতুন করে শুরু হল।

বারবার করে জেগে আর ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে উঠে রাত কাটতে লাগল। তাকে না বলে ঘুম, না বলে জাগা; অদ্ভুত এক অবস্থা। শেষটা চটেমটে ধুত্তোর বলে উঠে বসলাম।

সংগে সংগে পাশ থেকে আওয়াজ হল, "ও কি হল, ও মশায়।"

বললাম, "ঘুমোননি?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "কেন, জেগে ওঠা কি আপনার মনোপোলি?"

বললাম, "তা নয় বটে। বেশ, উঠুন জেগে।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "কিন্তু রাত জেগে ভেবেই বা কী করবেন। শুয়ে পড়ুন। এখনও রাত আছে।"

বললাম "রাত জেগে ভাবছি কে বললে?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "আমিই বললাম। কী ভাবছেন তাও বলতে পারি।"

"কী?"

"মুক্তোর মালা তো? ও অমন পড়ে। আমার মেয়ে থাকলে আমিও বর্তে যেতুম। কিন্তু এ-সব কথা বলতে নেই, অনেক লোকের অনেক কান। নিন, ঘুমোন।"

বললাম "তা বটে। কিন্তু ভাবছি, এত উতলা হবার কোন হেতুই ছিল না আপনাদের। এ যা মাল, বাঘে খাবে না। যদি-বা ভুলে খেয়ে ফেলে, গলা চুলকে উগরে দেবে। ডি-এম এত ঘাবড়ালেন কেন?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "ডি-এম বলেই নয়। ওকে খায় খাক, কিন্তু উনি যে আরেকজনের মাছ-খাবার টিকিট সেটা ভুলে গেলেন?"

বললাম, "ভুলিনি। ভেরি গুড, ঘুমোনোই যাক।"

ভোর না হতে হতে লঞ্চ নোঙ্গর ফেলল, এসে গেছি। হৈ হৈ করে সব জেগে উঠল। তারপর হাতমুখ ধুয়ে চা-পাঁউরুটি ঠুসে বুটপট্টি চড়িয়ে ডাঙায় নামতে বেলা আটটা। তার আগে নামাও উচিত নয়, দিবালোকে বাঘের ভয় কম।

সেজেগুজে এক এক করে সব সিঁড়ি বয়ে নেমে আসছে, এস-ডি-ও সায়েব গোড়াতেই নেমেছেন, প্রফুল্লবাবু নামলেন প্রায় সবার শেষে। তাঁর হাতে বন্দুকটন্দুক নেই, আছে শুধু এক বাইনোকুলার, আর গলায় ঝুলছে ঠুলিভরা এক ক্যামেরা।

বললাম, "ওকি মশায়, এই বেশে আপনি বাঘ মারতে যাবেন নাকি।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "বাঘ মারতে যাব কে বললে। মারামারি কাণ্ডের মধ্যে আমি নেই, আমি সিভিল সাইড। তবে হ্যাঁ, বাঘে যদি আমাকে মারতে চায়, সে আলাদা কথা।"

এস-ডি-ও বললেন, "তবুও অস্ত্র কিছু একটা থাকা ভাল।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "কিছু দরকার নেই। আমি স্যার রেকর্ড কীপার। রিপোর্টারকে জার্মানরাও মারে না শুনেছি।"

ডাঙায় নেমে এস-ডি-ও সবাইকে লাইন করে দাঁড় করালেন। তারপর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিকল সেনাপতির পোজে একখানা জুতসই রকম বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ঠিক কেমন কেমন করে চলতে হবে, কোন অবস্থায় কী করতে হবে। সবাই নিঃশব্দে পা ফেলে চলবে, বাঘ দেখলে যেন কেউ ভয় না পায়, শব্দসাড়া না করে, নিজের বুদ্ধিমত গুলী ছুঁড়ে না বসে। সে যা ছুঁড়বার-টুড়বার তিনিই ছুঁড়বেন।

সেতো বটেই। প্রফুল্লবাবু ওর মধ্যে এক ফাঁকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু স্যার, বাঘ যদি এস-ডি-ও বলে চিনতে না পারে?"

সেকথা অবশ্য এস-ডি-ও'র কানে গেল না। শুধু তাঁর গোলগোল চোখদুটো একবার কটকটে হয়ে উঠল, প্রফুল্লবাবুর মুখের ওপর একটিবার ঘুরে এসেই আবার অন্যদিকে ফিরে রইল।

আধ ঘণ্টাটাক হেঁটে বন পেলাম।

চলেছি। মাথার ওপরে ডালপালার ঘন জাল, চারপাশে অফুরন্ত গাছের গুঁড়ি, পায়ের তলায় কখনও ঝুনো মাটি, কখনও নরম কাদা, আর তার মধ্যে সর্বত্র মাথা তুলে আছে সুঁদরি গাছের শুলো। হোঁচট আর টক্কর খেতে খেতে প্রাণ শেষ, আর বেঁটে শুলোর ওপর হঠাৎ পা পড়ে গেলে পিছলে পা মচকাবার যোগাড়।

আর সে চলেছি ত চলেইছি। বাঘ যে কোথায় তার আর হদিস নেই। সামনে যাচ্ছেন এস-ডি-ও। তাঁর রীতিমত বীরবেশ, ঝকমকে পোশাক, মসমসে জুতো, ঝকঝকে

ঠাণ্ডা লাগিয়ো না

বন্দুক—এলাহী কাণ্ড। তাঁর ঠিক পিছনেই প্রফুল্লবাবু আর আমি। প্রফুল্লবাবুর তো বলেছি, সেই বাইনোকুলার আর ক্যামেরা সম্বল। আমার, যা অভ্যেস, বন্দুক আর কুকরি। সঙ্গীরা চলেছেন দুইধারে ছড়িয়ে, যাকে বলে অর্ধ-চন্দ্র বা ফ্যান-ফর্মেশন, তাই করে।

কিন্তু আটটায় নেমেছি, দশটা বেজে গেল, এগারোটাও বাজতে যায়, বাঘ কই। হাঁটা তো নয় সে, নেচে-নেচে চলা, তার কসরতে ইতিমধ্যেই ক্ষিদে পেয়ে গেছে আমার। সায়েবেরও বুঝতে পারছি অবস্থা কাহিল। কিন্তু মুখে সেকথা ব্যক্ত করতে পারছেন না। মানের দায়।

অবস্থা দেখে করুণা হল। মনে মনে ডেকে বললাম, হে মা কালী, জীবে দয়া কর, বাঘ-ভাল্লুক না হোক নিদেন হরিণ-টরিণও একটা জুটিয়ে দাও।

মা দয়া করলেন। এগোচ্ছি, সামনে মস্ত-বড় এক বাইন গাছের গুঁড়ি, হাত বারো-চোদ্দ তার বেড়, তাকে ঘিরতে গিয়েই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এক হরিণ। বিরাট দেহ, ডালপালাওয়ালা বিরাট শিং, সারা গায়ে তেল পিছলে পড়ছে, অমন হামেশা দেখা যায় না। দল থেকে ছিটকে পড়েছে কি করে, একটু যেন ভড়কে গেছে হঠাৎ, আমাদের দিকে পিছন ফেরা, চোখ আর কান খাড়া করে দূরে কী যেন একটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

হরিণ আমাদের দেখতে পায়নি, এস-ডি-ও'ও হরিণকে দেখেননি। প্রফুল্লবাবু খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন, দুই আঙুলে এস-ডি-ও'র কোটের লেজুড় আলগোছে টেনে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "স্যর!"

সঙ্গে সঙ্গে বিষম ব্যাপার। এস-ডি-ও 'ও ম্মাগো' বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, হাতের বন্দুক দুম করে আওয়াজ হয়ে গেল। গুলীটা ভাগ্যিস গিয়ে লাগল খানিক দূরে একটা গাছের ডালে, তার একখানা কচি ডাল ভেঙে ঝুলে পড়ল, হরিণ চমকে গিয়ে চোঁচা দৌড় মারলে। চারদিক থেকে সবাই কী হল কী হল বলে ছুটে এল।

সবাই মিলে হৈ চৈ আর কুশল প্রশ্ন করে যখন খানিক চাঙ্গা করে তুলল তাঁকে, এস-ডি-ও ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ইট ওয়াজ এ গ্রেট টাইগার।"

প্রতিবাদ করা মানে ঝামেলা বাড়ানো। সে-ভুল কেউই করলে না, খুব করে মাথা নেড়ে বললে, "আলবৎ জরুর গ্রেট টাইগারের ব্যাটা গ্রেট টাইগার।"

তারপর তর্ক উঠল, সে ব্যাটা গ্রেট টাইগার অমন লাফ মেরে পালিয়ে গেল কেন। তার কি উচিত ছিল না, ভদ্রভাবে এসে বুক পেতে দিয়ে বলা, আই বেগ টু রিমেন, স্যর, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেণ্ট। গুলী ঝাড়ুন?

এস-ডি-ও ততক্ষণে প্রায় সুস্থ হয়ে গেছেন। বললেন, "দ্যাট ওয়াজ ড্যামড্ ডিসকোর্টিয়াস!"

প্রফুল্লবাবু সবিনয়ে বললেন, "ওর কি দোষ স্যর। আপনার নিজেরই মনে রইল না আপনি এস-ডি-ও, ওটা ত বনের পশু।"

এস-ডি-ও কথা কইলেন না, আবার তেমনি কটকট করে তাকালেন।

আমি দেখলাম, বাধে বুঝি একটা। তাড়াতাড়ি বললাম, "এখানে সময় নষ্ট করে কী লাভ? ওকে ফলো করলে হত না?"

এস-ডি-ও বললেন, "দ্যাটস রাইট। কিন্তু ফলো করা হবে কী করে?"

আমি বললাম, "সে শক্ত নয়। মাটি নরম আছে, পাঞ্জা পাওয়া যাবে।"

এক মিনিট দু মিনিট আলোচনা চলল, তারপর স্থির হল ফলো করাই হবে। আসল কথা, অন্য সবাই জেনে গেছে ওটা হরিণ, বাঘ নয়। এস-ডি-ওর বদ্ধ ধারণা বাঘ, কিন্তু তাই বলে ভয় পেলে ত মানইজ্জত সব যায়। কাজেই বুক যতই কাঁপুক, মুখে বললেন, "ইয়েস, চলুন। কিন্তু বলছিলাম, একটু টিফিন করে নিলে হত না?"

সেই শেষ ভরসা, টিফিন করতে যদি বসে যাই, বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের পথ চেয়ে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না, দূরে চলে যাবে।

আমি বললাম, "তাই হয় কখনও? একে বলে হট-স্পুর, দেরি করলে ততক্ষণে বাঘ কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। চলুন সবাই।"

আবার চললাম। এবার আমি সবার আগে, আমার পাশে প্রফুল্লবাবু। অন্যরা খানিকটা পেছনে, এস-ডি-ওকে মাঝখানে রেখে ঘিরে নিয়ে চলেছেন। এস-ডি-ও বন্দুকের টোটা খুলে নিয়েছেন, আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি ভরা বন্দুক হাতে করে চলতে নেই, হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বাঘ যদি পেয়েই যাই, তখন বন্দুক ভরারও সময় মিলবে।

হরিণের স্বভাব, ভয় পেলে তারা একেবারে অনেকখানি ছোটে না। একদৌড়ে খানিকটা চলে গিয়ে, থেমে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করে বিপদ কোনদিকে, কোনদিকে পালাতে হবে।

এর আবার দেখা পেতেও তাই দেরি হল না। শ দুয়েক হাত এগিয়ে দেখি, দূরে একটা গাছের পাশ দিয়ে তার গায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে ইশারা করলাম, করে পাশের দিকে একটু ঘুরে যেতেই হরিণ পুরোপুরি নজরে এসে পড়ল।

আগেই বলেছি, অমন নধরকান্তি অথচ অমন বিশাল চেহারার হরিণ সুন্দরবনেও বেশী মেলে না। চিতল হরিণ, অথচ আকারে যেন সে বারশিঙাকেও ছাড়িয়ে যায়। আর দাঁড়াবারই কী ভঙ্গি তার, বুকটা চিতিয়ে ফোলানো, মস্তবড় গাছের মত ছড়ানো শিং, ঘাড়টা একটু বাঁকানো একদিকে, ভয়ে উত্তেজনায় নাকের ডগা আর কানের পাতা থিরথির করে কাঁপছে। তার চোখ আমাদের দিকে নয়, এবারও সে অন্য দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করছে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

আমার হাতে বন্দুক তৈরি, কিন্তু তাকে মারতে হাত ওঠে না। ভাবছি, আমি পারব না, ওরা চায় তো মারুক। প্রফুল্লবাবু পাশ থেকে আবার হাত টিপে দিলেন, একটু দাঁড়ান। বলে, নিঃশব্দে ক্যামেরা তুলে সই করলেন। সত্যি কথা, অমন জিনিসের ছবি না তুললে ক্যামেরা থাকাই মিথ্যে।

আধ মিনিট জোর, প্রফুল্লবাবু ক্যামেরার চাবি টিপতে যাচ্ছেন, এমন সময় পলকের মধ্যে কাণ্ড ঘটে গেল। হরিণ হঠাৎ শিউরে উঠল, তারপর লাফ মেরে সামনে সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই যম তার ওপরে এসে পড়েছে।

হলদে আর কালোয় মেশানো ঝকঝকে একখানা কম্বল যেন আচমকা উড়ে এসে তার গায়ে পড়ল। এমন হঠাৎ এল যে, কোনদিক থেকে এল সেটা আমাদেরও ঠাহর হল না। সুন্দরবনের আসল রয়াল বেঙ্গল, তার ঝাঁপ—চোখে না দেখলে সে বস্তু বলে বোঝানো যায় না। পলক ফেলতে না ফেলতে দেখলাম, হরিণ হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে গেছে, বাঘ তার উপরে। হরিণের গলা থেকে একবারমাত্র একটা করুণ আর্তনাদের আধখানা বেরিয়ে আসতে আসতেই তক্ষুনি থমকে থেমে গেল। আমি যেন ভাল করে টেরই পেলাম না কাণ্ডটা কী হচ্ছে। কলের মতন বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিলাম, হরিণের কান্না আর আমার বন্দুকের আওয়াজ একসঙ্গে মিলে গেল। বাঘের গলা থেকে একটা অবজ্ঞা গোঙরানি আওয়াজ বেরুল একবার। তার পরই সেও হরিণের গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে তার ওপাশে গিয়ে পড়ল। হরিণের দেহের আড়াল থেকে তার ল্যাজের ডগাটা বার দুই বেঁকে বেঁকে উঁচু হয়ে উঠল সাপের মতন, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। সব শেষ।

সবাই দৌড়ে এসে গেছে, তাদের থামতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম। বাঘকে

বিশ্বাস নেই, মরে গিয়েও বেঁচে ওঠে। কাছে গিয়ে একেবারে তার মুখের ভেতরে বন্দুকের নল পুরে দিয়ে আর এক ফায়ার। ব্যস, নিশ্চিন্ত। যদিও দেখছিলাম তার দরকার নেই, আগের গুলীতেই তার হার্ট ফেড়ে দিয়ে গেছে।

ততক্ষণে সবাই এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য—সুন্দরবনের দুই বাসিন্দা, দুই চিরশত্রু, একজন সে-বনের সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক, আর একজন তার ভীষণতার প্রত্যক্ষ মূর্তি। এদের মধ্যে দেখা হয় একমাত্র মৃত্যুর ঘটকালিতে; সেই মৃত্যুরই কোলে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে, যেন কতকালের বন্ধু। হরিণ কাৎ হয়ে আছে, তার পাগুলো ছড়ানো। ঘাড়টা উল্টে গেছে, ঘাড়ের উপরে একটা ভয়ানক ক্ষত, বাঘের এক কামড়ে তার গর্দানটা প্রায় অর্ধেক নেমে গেছে। চোখের কোণে জলের ধারা, ঘাড় বয়ে গলা বয়ে রক্তের স্রোত নেমেছে।

বাঘ শুয়েছে প্রায় তার সঙ্গে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে, তার মুখ তখনও হাঁ করা, মাথার খুলির খানিকটা উড়ে গেছে শেষের গুলীটাতে। মাথা থেকে বুক থেকে তারও অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, পাশাপাশি শুয়ে এই দুই চিরশত্রুর রক্তের ধারা দুটি দুদিক থেকে গড়িয়ে এসে একই সঙ্গে মিলে একটা প্রায় দহ সৃষ্টি করে ফেলেছে মাঝখানটাতে।

এক মিনিট দু'মিনিট কেউ কথা কইলে না, শুধু চেয়েই রইল। তারপর এস ডি-ও বললেন, "দ্যাট ওয়াজ গ্র্যান্ড।"

তখনও সবারই মুখ ফ্যাকাশে। হাত পা কাঁপছে, গলার আওয়াজ কাঁপছে। না হয়ে পারে না। মৃত্যুর এমন ভীষণ আবির্ভাব দেখে মানুষের মন কাঁপবেই।

অনেকক্ষণ পরে এস-ডি-ও বললেন, "তোল এ-দুটোকে, লঞ্চে ফিরে যাই।"

চাপরাশিরা এগিয়ে এল। প্রফুল্লবাবু বললেন, "একটু সবুর, স্যার; একটা শট নিয়ে নিই।" বলে ক্যামেরা তুলে একটু দূরে সরে গেলেন।

একজন বললেন, "সঙ্গে কেউ দাঁড়াবে না?" আর একজন বললেন, "দাঁড়াবে বৈকি। কান্তিবাবু কই গেলেন, আসুন।"

আমি বললাম, "মাপ করুন ভাই, আমি ওরকম তুলি না।"

উকিলবাবুরা বললেন, "স্যার কই, স্যার এগিয়ে আসুন।"

এস-ডি-ও এগিয়ে গেলেন। একজন বললেন, "এদের টেনে একটু সাজিয়ে নিলে হত না?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "তা হবে না। যেভাবে এরা নিজেরা পড়েছে, ঠিক তেমনি ছবিটিই তুলতে হবে। এরা ঠিক এমনি থাকবে, আপনারা ঘিরে দাঁড়ান।"

উকিলরা জনকতক বললেন, স্যার, আপনি চলে আসুন, বাঘের পাশে দাঁড়াবেন।"

এস-ডি-ও দু'একবার 'থাক থাক, আমি কেন' বললেন, এমন বলতে হয়। তারপর এগিয়ে গেলেন। স্বয়ং তিনি হাজির, অন্য আর দাঁড়াবার এক্তিয়ারই কার বল? বাঘ আর হরিণের মাঝখানটাতে তিনি দাঁড়াবেন, বন্দুক হাতে, বাঘের গায়ের উপরে একটা পা রেখে, বীর শিকারীদের যেমনটা দস্তুর। অন্যরা তাঁর পিছনদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াবেন।

আমার ও পোষায় না, আমি দূরে সরে রইলাম। প্রফুল্লবাবু পর পর কয়েকটা শট্ নিয়ে নিলেন। তারপর বাঘ আর হরিণকে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে লঞ্চে ফিরে আসা গেল। হরিণের শিং আর ছাল খুলে নিয়ে মাংসটা খালাসীদের দিয়ে দেওয়া হল। রান্নার কথা উঠেছিল একবার, কিন্তু দেখা গেল বাঘের মারা মাংস খেতে অনেকেরই প্রবল আপত্তি। বাঘকে লঞ্চে আস্তই তুলে নেওয়া হল। তারপর আর দেরি না করে লঞ্চ ছাড়া হল। খুলনায় এসে যখন লঞ্চ ভিড়ল, রাত তখন দুটো।

পরের দিন সারাদিন শহরে দারুণ হৈ-চৈ। এস-ডি-ও সায়েব প্রকাণ্ড বাঘ মেরে এনেছেন। শহরসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে দেখতে। একবার বাঘকে দেখছে, একবার এস-ডি-ওকে। তাঁকে অবশ্য সারাক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তবু তাঁর বাড়ির আর এজলাসের চারপাশে দিনভর লোকারণ্য—মানুষটাকে নাই হল, তার বাড়িটাকে দেখাও কি কম কথা।

সেদিন তো এই করে কাটল। বিপদ বাধল পরদিন।

আমরা বলিলাম, "কী বিপদ, বলুন।" কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বলছি দাঁড়া, দম নিতে দে।

পরদিন সকাল বেলা খবর এল, এস-ডি-ও'র বাড়িতে পার্টি, সন্ধ্যাবেলা। বাঘ মারা গেছে, এস-ডি-ও খাওয়াবেন সবাইকে। গিয়ে দেখি, শিকারের সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত আছেনই, অন্য লোকও আছেন কম নয়।

অনেক লোক, পেল্লায় আয়োজন, খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত দশটা। অতিথিরা প্রায় সবই চলে গেছেন তখন, শিকারের দলেরও অনেকেই খসে পড়েছেন। বাকী শুধু কয়েকজন আমরা, আমরাও উঠব উঠব করছি। এমন সময় প্রফুল্লবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। অবাক হয়ে বললাম, "আবার যে?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "এর জন্যেই তো চলে গেলাম তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে দিলে।" বলে বড় একটা খাম বার করলেন।

সেই ছবি, ছেপে আনা হয়েছে। অনেক-গুলোই ছোট্ট প্রিন্ট, একখানা মাত্র এনলার্জ করা। সেখানা এস-ডি-ও'র স্ত্রীর হাতে দিলেন, অন্যগুলো আমরা হাতে হাতে তুলে নিলাম।

ভদ্রমহিলা ছবিটাকে খুব নিরীক্ষণ করে দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে সেই দুষ্টু হাসি ঝিলিক মেরে গেল। খুব নিরীহ সুরে বললেন, "হরিণটাকে ত মেরেছ বুঝলাম, বাঘটা মরল কী হয়ে, হরিণের গুঁতোয়?"

অবাক হয়ে ভাবলাম, বলে কী!

তারপর হাতের ছবির দিকে তাকালাম। ও হরি! এস-ডি-ও'র ছবি উঠেছে, হরিণের উপরে পা রেখে। মানে বাঘের গায়ের ওপর পা রাখা সাহসে কুলোয়নি তাঁর। তাই সবাই যখন রেডি হয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছে, তিনিও চট্ করে বাঘের উপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে হরিণের ওপরে পা তুলে দিয়েছেন—আলগোছে, যেন কেউ দেখে না ফেলে।

তারপর অবিশ্যি আর সেখানে থাকা যায় না, কারণ তখন যা-সব কাণ্ড হবে সে নেহাতই পারিবারিক। আমরা চটপট উঠে পড়লাম।

পরদিন প্রফুল্লবাবুকে বললাম, "ও ব্যাপারটা কি আপনার তখন লক্ষ্য হয়েছিল?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "ওই দেখেই ত অতগুলো শট নিলাম, ফসকে না যায়।"

আলালের ঘরের দুলাল

শ্রীকালিদাস রায়

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারিচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) রচিত চিত্রোপন্যাস —বঙ্গ সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। সংস্কৃত পন্ডিতদের রচিত সন্ধি-সমাস-সমাকীর্ণ ভাষায় বিরক্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত। ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গলায় প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতানুগ ভাষা বলিতে তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদির ভাষা বুঝিয়াছেন। এই ভাষাকে তিনি নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল বা নির্জীব ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভূদেব বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষা নিশ্চয়ই তাঁহার লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে-ভাষাকেও তিনি স্বাভাবিক মনে করিয়া উল্লাস প্রকাশ করেন নাই। আলালী ভাষাকেই তিনি স্বাভাবিক ও জীবনশক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া এত উল্লসিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

আলালী এই ভাষা লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—এই ভাষার ক্রিয়াপদগুলি কিন্তু সবই সাধুভাষার। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রিয়াপদের উপর জোর দেন নাই। বাক্যগুলিতে সংস্কৃত শব্দের বদলে চলতি শব্দের বহুল প্রয়োগের জন্যই এবং বাংলা চলতি গতের (Idiom) বহুল সন্নিবেশের জন্যই তিনি ইহাকে প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন। "বাঞ্ছারাম বহুৎ ফন্দী, ফিকির, ফেরেব্বা করিয়া ফ্যাঁ ফ্যাঁ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" 'করিয়া' ও 'বেড়াইতে লাগিলেন' এই ক্রিয়া দুইটিকে উপেক্ষা করিলে এই ভাষাই ত আসল চলতি ভাষা। আলালী ভাষার ক্রিয়াপদ আর সংস্কৃতানুগ ভাষার ক্রিয়াপদও এক নয়। পন্ডিতী ভাষার ক্রিয়াপদ 'কর্ণগোচর হইল', 'পরলোকগমন করিলেন', 'অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইল'। আর আলালী ভাষার ক্রিয়াপদ, 'শোনা গেল', 'মরিলেন', 'অস্ত গেল'। আলালী ভাষা চলতি ভাষা বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ শিক্ষিত লোকের মুখের কথা নয়। কলিকাতা অঞ্চলের বৈঠকী বা মজলিসী ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত, ইংরাজি, ফারসী, গ্রাম্য সকল রকমের শব্দই আছে।

বর্তমান যুগের চলতি ভাষায় এই সবেরই মিশ্রণ আছে। আলালের ঘরের দুলালকে বর্তমান যুগের ভাষা তৈরির একটা বিরাট কারখানা বলা যাইতে পারে। এই ভাষা টেকচাঁদের পুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ অনুগামী। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "যতটুকু বলিবার আছে সবটুকুই বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" টেকচাঁদ ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। হুতোম অশ্লীলকেও ছাড়েন নাই, তাহা ছাড়া হুতোম রঙ্গরসিকতা করার জন্য কলিকাতার ইতর লোকের ভাষাই বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন—বঙ্কিম হুতোমী ভাষাকে সমর্থন করেন নাই।

টেকচাঁদের ভাষায় এমন অনেক চলতি শব্দ ছিল, যেগুলি কলিকাতার বৈঠকী সমাজেই প্রচলিত ছিল সেগুলি সাধারণ বাঙালীর অজ্ঞাত। সেগুলি এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। "আমার দেখতা কত বেটা টেঁপাগোঁজা নড়েভোলা, টোরে বাঁধা বালতি-পোতা কারবারের হেঁপায় আণ্ডিল হইয়া গেল।"

এখনকার পাঠকগণ এ-ভাষা বুঝিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার যতই গুণগান করুন, তাঁহার পক্ষে এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা আভিজাত্যে বাধিয়াছে। তিনি আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া যখন আফিমখোর কমলাকান্ত সাজিয়াছেন—তখন তিনি বরং অনেকটা আলালী ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বরং টেকচাঁদের অনুবর্তী। অবশ্য তিনি ফারসী ও গ্রাম্য শব্দ যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াছেন। বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতার বৈঠকী ভাষা অর্থাৎ আলালী ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার লোক হইলেও আলালী ভাষার অনুসরণ করিতে পারেন নাই—বঙ্কিমের মত তাঁহারও আভিজাত্যে বাধিয়াছে। আলালী ভাষা যে-সকল চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক সে-সকল চরিত্র সৃষ্টিও ইঁহাদের দুইজনের আভিজাত্য-বোধের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার ক্রিয়াপদগুলিই চলতি—বাক্যে সংস্কৃত শব্দেরই বাহুল্য। আলালের ঠিক বিপরীত ধারা। চলতি শব্দের প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিকতা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। কলিকাতার জামাতা বীরবল বরং টেকচাঁদের অনেকটা অনুবর্তী। আলালী ভাষাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুরুচিসম্মত করিয়া লইয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বীরবলের চেয়ে অনেক বেশী আগাইয়া গিয়াছেন টেকচাঁদের ভাষার দিকে। বীরবলের পর বাংলার চলতি ভাষা বিদেশী শব্দে ভরিয়া উঠিতেছে। সংস্কৃত শব্দ বর্জনের প্রয়াস দিন দিন বাড়িতেছে।

মোটের উপর বর্তমান চলতি বাংলা ভাষা টেকচাঁদের কাছে যতটা ঋণী, ততো অন্য কাহারও কাছে নয়। বঙ্কিমের উক্তি "শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল" একেবারেই অত্যুক্তি নয়।

টেকচাঁদ এই ভাষা চালাইবেন বলিয়া তদুপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়াছিলেন, কি বিষয়-বস্তুর জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল জানি না। তবে মনে হয় বাহনের জন্য বাহ্য নয়, বাহ্যের জন্যই বাহন আসিয়াছে, যেমন যমের মহিষ, শিবের ষাঁড়। ষষ্ঠীর রাজহংস আর সরস্বতীর বিড়াল বাহন তো হইতে পারে না। সেকালের বাবুরামদের দুলালগুলির জীবন-চরিত রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এমন চমৎকার বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করা চলে না। বাবুরামদের ঘরে ঘরে ছিল মোতিলাল। মোতিলালের অধঃপতনের ইতিহাস সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা চলে না। শুধু মোতিলাল নয়, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ আছে, বিশেষ করিয়া ঠকচাচা

আছে, বাঞ্ছারাম আছে, আশেপাশে আরো অনেকেই আছে, তাহাদের আচরণ ও ভাষণ তাহাদের চারিপাশের ভাষাই সঙ্গে আনিয়াছে।

এ-ভাষায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এ-ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া হয় নাই। একেবারে যেন রেকর্ডে তোলা ভাষা। আলালের ঘরের দুলালে সাহেব আছে, ফিরিঙ্গি আছে, মুসলমান মামলাবাজ আছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আছে, চরিত্রহীন মূর্খ নিষ্কর্মা বিলাসীবাবুর মোসাহেবরা আছে, আবার সু-শিক্ষিত লোকও ২।৩ জন আছে। সকলেই আপন আপন ভাষা লইয়া আসিয়াছে। ইহাদের সকলের ভাষা মিশিয়াই ত আসল বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আলালী ভাষাই নানাজনের লেখার মধ্য দিয়া আজকালকার কথা-সাহিত্য ও রম্যরচনার লেখকদের লেখনীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই তো গেল ভাষার উৎসের কথা। সাহিত্যিক উৎস সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বস্তুতান্ত্রিক কথা-সাহিত্যের উৎসও আলাল।

দুর্গেশনন্দিনী বাংলা ভাষায় প্রথম রমন্যাস বা রোমান্স, আলালের ঘরের দুলালই প্রথম উপন্যাস। ইহাকে অনেকে সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলিয়া চিত্রোপন্যাস বলেন, কেহ কেহ নকশা বলেন। ইহাকে সম্পূর্ণ উপন্যাস না বলিলে নূতন ধরনের কথা-সাহিত্য বলিতে হয়। ইহা হইতেই বাংলা ভাষার উপন্যাসের সূত্রপাত বলিতে হয়। বর্তমান যুগের উপন্যাসের বহু অঙ্গের প্রাথমিক রূপ ইহাতে বর্তমান। ইহার চরিত্রসৃষ্টি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপন্যাসের উপযোগী। ঠকচাচার চরিত্রাঙ্কনে লেখক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি কল্পনা-শক্তি ও কলাচাতুর্য দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের পটভূমিকা ও পরিবেশও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপযোগী। সে-কালের কলিকাতা শহর ও তাহার উপকণ্ঠ, সাহেব কাজীর আদালত, নীলকরদের উপদ্রব, সে-কালের বিদ্যালয় ও শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা, যাতায়াতের মন্থর ব্যবস্থা, সে-কালের সদাগরী অফিস—সমস্ত মিলিয়া গ্রন্থে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সে-কালের বিবাহ সভা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তর্কসভা, ধনীদের মজলিস, কৌলীন্যের উপদ্রব, জমিদারী সেরেস্তা—সমস্ত মিলাইয়া একটি সামাজিক পরিবেশ রচিত হইয়াছে। সেকালের গতানুগতিক নৈতিক আদর্শ ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে রূপান্তরিত নৈতিক আদর্শের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ পুস্তকখানিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। দুর্নীতি-দূষিত পরিবেশের সহিত প্রধান চরিত্রগুলির বেশ সামঞ্জস্য আছে। এরূপ পরিবেশে যেরূপ চরিত্রের উদ্ভব ও সমাবেশ স্বাভাবিক—সেইরূপ চরিত্রই চিত্রিত করা হইয়াছে। ভাষা, পরিবেশ ও চরিত্রের এইরূপ শোভন সামঞ্জস্য ও সৌষম্য খুব সুলভ নহে। সে-কালের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অঙ্কনের জন্য বাবুরামকে প্রথমে ফৌজদারী আদালতের উৎকোচগ্রাহী শ্বেতাঙ্গপদলেহী কর্মচারী—পরে চাটুকার-বেষ্টিত জমিদার, কুলীন ব্রাহ্মণ, নির্বোধ অন্ধ বাৎসল্য-স্নেহমুগ্ধ পিতারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এইরূপ চরিত্রের অনিবার্য পরিণতি দেখানো হইয়াছে। বাবুরাম মুচিরাম গুড়েরই মাসতুতো ভাই, তবে মুচিরাম বাবুরামের চেয়ে ঢের বেশী চতুর। কাজেই পরিণতি একরূপ হয় নাই।

সে-কালের নারী-জাতির অসহায়তার চিত্র পাওয়া যায় বাবুরামের পত্নীদ্বয় ও তাহার অভাগিনী কন্যাদের জীবনে। বাবুরামের গৃহিণীর বৎসলতার প্রসঙ্গে কিছু মনস্তত্ত্বও আসিয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা অভিজাত চরিত্র লইয়া রমন্যাস ও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সামাজিক জীবনে শিক্ষায় ও নৈতিক বিচারে যাহাদের স্থান নিম্নে তাহাদের জীবন-কথা লইয়া টেকচাঁদই প্রথম কথা-সাহিত্য রচনা করেন। আজকালকার কথা-সাহিত্যে এবিষয়ে টেকচাঁদের Realistic ধারাই ত চলিতেছে—বঙ্কিম রমেশের তো কথাই নাই, রবীন্দ্র-নাথের আভিজাতিক ধারাও তো আজ অনুসৃত হইতেছে না।

চরিত্রগুলিকে রক্তে মাংসে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য কেবল যে তাহাদের আচরণ ও মুখের ভাষণের উপরই নির্ভর করিলে চলে না, তাহাদের পরিবেশ ও আবেষ্টনকে যথাযথ রূপ দান করিতে হয়, তাহা লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। আদালত-গৃহের বর্ণনা, শ্রাদ্ধ-সভার বর্ণনা, পাওনাদার ও মোসাহেব পরিবেষ্টিত জমিদারের বৈঠকখানার বর্ণনা, কাশী-তীর্থের ঘাটবাটের বর্ণনা, জেলখানার বর্ণনা, পাঠশালার বর্ণনা ইত্যাদি চরিত্র-গুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইগুলি গুম্ফপর অলস অলঙ্কারমাত্র নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, শ্লেষ ব্যঙ্গ রঙ্গ রসে পরিষিক্ত লঘুতরল রচনাভঙ্গী টেকচাঁদের গ্রন্থকে অসামান্য সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। এমন চমৎকার সরস রচনাভঙ্গী অনেক বড় কথা-সাহিত্যিকেরও নাই।

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ উপন্যাস হিসাবে সার্থকতা লাভের বাধা—নৈতিক উদ্দেশ্য-মূলক উপসংহৃতি—didactic conclusion, ইহা anticlimax-এর সৃষ্টি করিয়াছে। তবে এ কথাও বলিতে হয়—এইরূপ একটা উদ্দেশ্য আগাগোড়া প্রাধান্য লাভ করে নাই।

বরদাবাবু বা বেণীবাবুর চরিত্র আজকালকার বিচারে অস্বাভাবিক এবং জোর করিয়া অনুপ্রবিষ্ঠ মনে হইলেও সেকালের নব-প্রলুব্ধ নৈতিক আদর্শের বিচারে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এইরূপ চরিত্র দুর্নীতি-দূষিত পরিবেশের মধ্যে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করিবার জন্য একেবারে প্রয়োজন ছিল না, তাহাও বলা যায় না। এইরূপ চরিত্র নানাভাবে পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এইরূপ চরিত্রের অবতারণায় আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেও সুনীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্বে ভার-সাম্য রক্ষার জন্য বোধ হয় লেখক ঐরূপ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। সত্যই ত পৃথিবীটায় কেবল বাবুরাম, ঠকচাচা, মোতিলাল ও বাঞ্ছারামের রাজত্বই ত নয়,—২।৪ জন বেণীবাবু, বরদাপ্রসাদ, রামলালও ত আজও আছে।

আর্টের দিক হইতে আর একটা দোষ ধরা যাইতে পারে—অনেক স্থলে অতিরিক্ত Emphasis দেওয়া হইয়াছে। ঠকচাচার ঠকামিতে বা বাঞ্ছারামের ফন্দী ফিকিরে যদি অতিরিক্ত নাই ধরা হয়, মোতিলালের উপদ্রবে যে একটু বেশী রঙ চড়ানো হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নানা শ্রেণীর দুলালের বেল্লিকপনা এক দুলালেই দেখানো হইয়াছে। লেখক এ-বিষয়ে অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠ হইলে বর্ণনা কদর্য হইয়া পড়িত। এ-বিষয়ে লেখক এ-যুগের বহু লেখকের তুলনায় সংযমেরই পরিচয় দিয়াছেন।

সুশিক্ষা, সুনীতি, আত্মসংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে স্থলে-স্থলে উপদেশ ও বক্তৃতা আছে—সেগুলি যথাযোগ্য চরিত্রের মুখেই বসানো হইয়াছে—প্রসঙ্গক্রমে এইগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলিকে অস্বাভাবিক মনে হয় না।

সামান্য সামান্য ত্রুটি থাকিলেও এই গ্রন্থখানি যে বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ—এই গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যে, ভাবে ভাষায় ও ভঙ্গীতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

অভিসারিণী

সুশীল রায়

একটা চমৎকার রোমান্স যে জমে উঠেছে, এতে আর সন্দেহ নেই। রাস্তার ধারের রেস্তোরায় ছেলেরা চায়ের বাটি মুখ থেকে নামিয়ে ঠিক এই সময়টা চেয়ে থাকে সামনের সরু গলিটার দিকে।

ঠিক। ঐ এসেছে সে। হাতে একটা ঝকঝকে বটুয়া, ছিমছাম করে শাড়িটা পেঁচিয়ে পরা, মাথায় কাপড় দেওয়ার ভঙ্গীতে শাড়ির চওড়া পাড়ের কিছুটা খোঁপার উপর আলগোছে রাখা। রুপোর ঝুমকো-কাঁটা দিয়ে বাঁধা ওই পরিচ্ছন্ন খোঁপা, তার উপর গ্যাসের আলো পড়ে ঝকমক করছে—মনে হচ্ছে ওই সুন্দর চুলে পা জড়িয়ে গেছে বুঝি কয়েকটা জোনাকির, তারাই জ্বলছে দপদপ করে।

প্রবল আনন্দে টেবিল চাপড়ায় রেস্তোরাঁর ছেলেরা। শব্দটা কানে যায় অপর্ণা সোমের। এই সশব্দ উল্লাসের মানেও আঁচ করে সে, কিন্তু ফিরে তাকায় না।

গলিটা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই সদাশিব মেস্-হাউস। অন্ধকার সিঁড়িতে সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে অপর্ণা সোম উঠে যায় উপরে।

হৃষীকেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করছিল। ঠান্ডা পাওয়ারের বাল্ব লাগানো টেবিল-ল্যাম্প চৌকির কিনারে রেখে বুকে বালিশ দিয়ে পড়ছিল হৃষীকেশ।

ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ। অনিমেষবাবু তাঁর বাল্যকালে—সম্ভবত তখন ক্লাস সেভনে পড়েন—এই উপদেশটা শুনেছিলেন রজনী পণ্ডিতমশায়ের কাছে। সেই থেকে কথাটা তাঁর মর্মে গেঁথে আছে। ছাত্রদের তিনি এই এক উপদেশ ছাড়া অন্য কোনো উপদেশ দেন না। সদাশিব মেস-হাউসের তিনতলার এই নিরিবিলি ঘরে বসে হৃষীকেশ যেন অধ্যয়নের নামে তপস্যা করে চলেছে।

সেই তপস্যা ভঙ্গ করতে আসে অপর্ণা সোম।

এই কথা যদি অনিমেষবাবুর কানে কোনো রকমে যায়, তাহলে রক্ষে নেই হৃষীকেশের।

চোখ থেকে চশমা খুলে বইয়ের পাতার উপর রেখে বই বন্ধ করে হৃষীকেশ সোজা হয়ে বসল।

অপর্ণা দুই হাতে বালিশ থাবা দিয়ে দিয়ে সমান করতে করতে বলল, কী অবস্থা করেছ বালিশের।

হৃষীকেশ বলল, বেশ করেছি। রোজ এসে এসে এই-যে আমাকে ডিসটার্ব করছ—

—তাই কী?

—পরীক্ষা এসে গেল না? বাবা যদি জানতে পারেন, তাহলে রক্ষে নেই।

অপর্ণা বলল, না থাকল। চল, খোলা হাওয়ায় চল। মুনিঋষিরা তপস্যা করতেন তপোবনে, সেখানে যেমন আলো তেমনি বাতাস। তোমার মত এরকম বন্ধ ঘরে অন্ধকারে দম বন্ধ করে নয়। এস, বাইরে এস।

সদাশিব মেস-হাউসে বাস করে চাকরেরা। পড়ুয়ার মধ্যে একমাত্র হৃষীকেশ। একতলায় রান্নাঘর, দোতলায় দশটা ঘর, আর তেতলায় এই একটাই। ঠিক ঘর নয় এটা, বলা চলে চিলেকোঠা। একেবারে নিরিবিলি এই ঘরটা হৃষীকেশের পছন্দসই হয়েছে। আর, বলতে কি, অপর্ণারও।

ছায়া-ছায়া এই সন্ধ্যায় এই ঘরের সামনের প্রশস্ত ছাতটা যেন এইরকম একটা যুগল-মূর্তির নীরব বিচরণের জন্যেই তৈরি করেছে এই বাড়ির আর্কিটেক্ট। লোকটার রুচি না থাকলেও রসবোধ ছিল। জবর-জঙ্গ প্যাটার্নের বাড়ি হলে হবে কি, তার উপর ছাতটা কিন্তু মনোরম।

চুলের বোঝা ঝুলে পড়েছিল চোখের উপর, অপর্ণা তার হাতের পাঁচটি আঙুল দিয়ে চিরুনির মত করে হৃষীকেশের মাথার চুল আঁচড়ে দিয়ে গেল, তপস্যা যদি মন দিয়ে করতে চাও, তবে জট রাখ। কেন, ঘরে কি চিরুনি নেই?

ঘাড়ের উপর দিয়ে অপর্ণার দিকে চেয়ে হৃষীকেশ বলল, যার ঘরে স্ত্রী নেই, তার আবার চুলের শোভা দিয়ে দরকার কি।

—হয়েছে রসিকতা। অপর্ণা হৃষীকেশের হাত ধরে টানল, বলল, এস, ছাতে চল।

ছাতে এল দুজনে। ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল দুজনে। যেন, অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু সব কথা একসঙ্গে বলা যাচ্ছে না। ঠিক কোন্ কথাটা দিয়ে কথা আরম্ভ করা যেতে পারে দুজনেই মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কথাটা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বলল, আকাশটা যে এত প্রকাণ্ড, নীচের রাস্তা

থেকে তা বোঝা যায় না। আর, অন্ধকারটাই-বা কী সুন্দর।

হঠাৎ হৃষীকেশের হাত চেপে ধরে অপর্ণা বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না তোমাকে ছেড়ে।

হৃষীকেশ অপর্ণার হাতে চাপ দিয়ে বলল, আমারই কি ইচ্ছে করছে তোমাকে ছেড়ে দিতে?

—আচ্ছা, যখন তুমি একা-একা পড়াশুনো কর, তখন মনে হয় না আমার কথা?

পাল্টা প্রশ্ন করল হৃষীকেশ, তোমার মনে হয় আমার কথা?

অপর্ণা বলল, জানিনে। আমার পড়াশুনো তো আর তপ নয়, ওর নাম মনরক্ষা। গুরুজনের ইচ্ছেকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে কলেজ করছি আর কলেজের বই বয়ে বেড়াচ্ছি। পড়াশুনো যা হচ্ছে তা আমিই জানি। তোমার পরীক্ষা শেষ হবে কবে বলো।

পরীক্ষার কি আর শেষ আছে? হৃষীকেশ দার্শনিকতার ভান করে বলল, সারাটা জীবনই তো পরীক্ষা দিয়ে ভরা। এই মুহূর্তে এইখানে দাঁড়িয়ে কি আমরা দুজনে জীবনের দুরূহ পরীক্ষা দিচ্ছিনে?

অপর্ণা হৃষীকেশের কাঁধে আলগোছে হাত দিয়ে ঘা দিয়ে বলল, যাও। তোমার ফাজলামো ভালো লাগছে না আমার।

হেসে উঠল হৃষীকেশ। বলল, ওই দেখ, ওই বাড়িগুলোর জানলায়-জানলায় দরজায়-দরজায় আলো জ্বলছে। কী সুখের জীবন ওদের। ওরা আমাদের মত ভীরুও নয় ভিতুও নয়। ওরা নিজেদের এভাবে লুকিয়ে রাখেনি আমাদের মত এই অন্ধকারের আড়ালে।

অপর্ণা তেতে ওঠার মত করে বলল, লম্বা বক্তৃতা তো শুনেছি মশায়। কিন্তু ওই অন্ধকার থেকে আলোয় আসা হচ্ছে কবে?

—হবে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

অপর্ণা হেসে উঠল, বলল, কিন্তু বেশী সবুর করলে মেওয়া যে শুকিয়ে যায়। সে হুঁশ আছে?

অপর্ণার কথা শুনে হৃষীকেশও হেসে উঠল, বলল, আর তো মাত্র তিনটে মাস। তারপর এই মেস্‌এর বেশ ছেড়ে নতুন বেশ পরব। এই নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে যাব। তখন আর পরোয়া কি। বাবা তখন তুলে নেবেন এই রেস্‌ট্রিকশন।

—কিন্তু এই তিনটে মাস কম কথা নয়, মশায়। এই রাস্তা দিয়ে আসা এক সংকট। রেস্তোরাঁর ছেলেরা টেবিলে তবলা বাজাতে আরম্ভ করেছে।

হৃষীকেশ বলল, তাই নাকি, ফাজিল ছেলের দল। এর পর আমরা দুজনে ওই তবলার সঙ্গে ডুয়েট গাইতে আরম্ভ করব। কি বল?

অপর্ণা কিছু বলল না।

দুনিয়ার কাকপক্ষীকে না জানিয়ে রোজ এই সময় সদাশিব মেস-হাউসে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যায় অপর্ণা। কিছুক্ষণ ছাতে পায়চারি করে, হৃষীকেশের বই গুছিয়ে দেয়, কাপড় কুঁচিয়ে রাখে। এবং হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রণয়পিপাসাও একটু মিটিয়ে নেয়।

হৃষীকেশ বলে, আমি তপস্বী। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। সে-খেয়াল আছে?

অপর্ণা বলে, আছে। মুনিঋষিদেরও ধ্যান ভঙ্গ করে অপ্সরা। আমি অপ্সরা না হতে পারি, অপর্ণা তো নিশ্চয়।

—নিশ্চয়। হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে ওঠে হৃষীকেশ, বলে, সত্যিই তুমি অপ্সরা।

অপলক চোখে হৃষীকেশ অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, সত্যি, কী রূপ তোমার!

অপর্ণা বলে, হয়েছে। ঠাট্টা করতে হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ চলি।

—বাড়িতে গিয়ে কী বলবে?

—বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। মিথ্যে কথা বলা হবে না, তুমি কি আমার বন্ধু নও?

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় হৃষীকেশ। ফিরে আসতে গিয়ে আবার সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে বলে, কাল আসছ তো।

—হ্যাঁ।

অপর্ণা নেমে যায়।

দোতলার চাকরে-বাবুদের মধ্যে ইতি-মধ্যেই কেউ কেউ ফিরে আসেন। বুড়ো বিহারীবাবু এদের কথা শুনে মজা পান, গলা খাঁখারি দিয়ে ওঠেন দোতলার বারান্দা থেকে। তাঁর রুমমেট দিগিন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন, ওহে দিগিন ভায়া, মেসবাড়ি যে তীর্থ হয়ে গেল, আমরা যে পুণ্যাত্মা হয়ে গেলাম সবাই।

নীচে অপর্ণার কানে, উপরে হৃষীকেশের কানে এই কথা পৌঁছয়। ব্যঙ্গটা তারা বোঝে। কিন্তু জবাব দিয়ে হবে কী। তিন-মাসের মধ্যে আরো অনেকগুলো দিন

চল, খোলা হাওয়ায় চল

তো কেটে গেছে ইতিমধ্যে। বাকি ক-টা দিন কেটে গেলেই এ-সব তামাশার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে তারা। সেই শুভদিনের জন্যেই এখন তাদের তপস্যা, সেইদিন তাদের জীবনে এসে যাবে সুপ্রভাত, এবং ঘটবে নতুন গৃহপ্রবেশ।

রেস্তোরাঁর ছেলেদের চায়ের কাপে তুফান ওঠে। ওদের মধ্যে অতি উৎসাহী দুজন ফলো করেছে অপর্ণাকে। ব্যাপারটা ভালো করে জানার জন্যে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই।

দিগ্বিজয় করে এসে যেন মনোরঞ্জন ঢুকল চা-খানায়, বলল, পরকীয়া হে পরকীয়া। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। স্পষ্ট দেখে ফেললাম আজ।

জমে উঠেছে রস, মনোরঞ্জন তাই কড়া করে চা দেবার ফরমাশ করে নিজের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল, বলল, আজব শহর কলকাতা, কত কাণ্ডই না হচ্ছে, কতটুকু আর জানি হে আমরা।

ওর সঙ্গী ছিল বীরেন, সেও মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। বলল, মডার্ন রাধা। অভিসারে আসা হয় রোজ। সেজে-গুজে সিঁদুরের টিপটি পরে। বেহায়াপনার আর শেষ নেই।

পরের দিনও অর্পণা দুরু-দুরু বুকে সদাশিব মেস-হাউসের গলি দিয়ে ঢুকে পড়ল। পিছনে চায়ের দোকানে প্রচণ্ড হল্লা বেজে উঠল। পা-দুটো একটু কেঁপেই গেল অপর্ণার।

এর পর দিন থেকে সদাশিব মেস্-হাউসে আর পদার্পণ করেনি অপর্ণা সোম।

কিন্তু দেখা হওয়া চাই তাদের, দেখা না হলে চলে না। এটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে, একদিন দেখা হবে না ভাবলেই যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শুধু অপর্ণার নয়, হৃষীকেশেরও।

চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টান্টশিপ পরীক্ষা হৃষীকেশের। অনিমেষবাবু সারাজীবন ইস্কুলমাস্টারি করে পরিশ্রান্ত ও জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। লেখাপড়ার উপর তাঁর শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ না করলে জীবনে কোনো মহৎ কাজে সাফল্যলাভ হয় না—একথা তাঁর অন্তরেরই কথা, কিন্তু, হৃষীকেশ পর-পর প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করার পর অনিমেষবাবুর মনের মধ্যে আর-একটা উপসর্গ দেখা দিল। টাকা। টাকার উপর আকর্ষণ।

কয়েকটা বিয়ের প্রস্তাব আসার পর থেকেই অনিমেষবাবুর মনের পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রথম দিকে তিনি চুপচাপ থাকতেন, তারপর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন প্রথম কথাই বললেন, কী রকম খরচ করবেন? যৌতুক চাইনে, কিন্তু বিয়ের খরচ তো আছে।

চাঁদ ধরতে অনেক বামন এসেছিলেন গোড়ার দিকে—অনেক গরিব কনের-বাপ। অনিমেষবাবুর দাবির কথা শুনে তাঁরা আর আসেন না।

চাঁদপুরে সামান্য জমি-জমা ছিল। ইস্কুল মাস্টারি করে সংসার চালিয়ে যেটুকু জমি-জমা হতে পারে, তার পরিমাণ এর চেয়ে বেশী না। তারপর সে-সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে নাকতলায় একটু জমি পেয়েছেন, সেখানে টিনের শেড তোলা হয়েছে একটা। ঘর একটাই—একটু বড়, সামনে লম্বা ফালি বারান্দা।

এই বারান্দার টুলে বসেই অনিমেষবাবু তাঁর ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কথা-বার্তা বলেন। ভিতরের ঘরে বসে পড়াশুনো করে হৃষীকেশ। এইসব কথা শুনতে শুনতে তার মন এক-এক সময় উদাস হয়ে যায়।

যাদবেন্দ্র ঘোষ যুদ্ধের মধ্যে বিস্তর টাকা কামিয়েছেন। কয়েক লাখ নাকি। তাঁর মেয়ে দেখতেও সুন্দর না, পড়া-শুনোও করেনি। টাকার চাপ দিয়ে এই মেয়ে পার করার জন্যে তিনি এলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর চলিয়াত পুত্রবধূ অম্বা।

মেয়ের বিবরণ শুনে ছবি দেখে অনিমেষবাবু বললেন, খরচপত্র করবেন কেমন?

—যা আপনি চাইবেন, তাই দেব।

খুব তেজী টাইপের লোক অনিমেষ, খুব রাগীও। বাড়ির লোক সব-সময় সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু তাঁর মেজাজ সম্বন্ধে সকলে ওয়াকিবহাল নয়, যাদব ঘোষ বললেন, আপনার দাবি কী?

—মেয়ে লেখাপড়ায় কতদূর?

—ক্লাস ফাইভ।

টাকার দিকে যেমন, লেখাপড়ার দিকেও তেমনি ঝোঁক অনিমেষের। শিক্ষিত ছেলের উপযুক্ত শিক্ষিত মেয়ে চান তিনি। অনিমেষবাবু হেসে বললেন, তবে তো কথা বলে লাভ নেই।

চালিয়াত পুত্রবধূ অম্বা মাঝখান থেকে কথা বলল। বলল, লেখাপড়ার ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়া যাবে। বাড়ি বদলান, যা ফার্নিচার দেওয়া হবে তা রাখবেন কোথায়।

তপ্ত হয়ে উঠলেন অনিমেষ সোম। বললেন, ইডিয়ট।

টুল ছেড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে হৃষীকেশকে বললেন, ওদের চলে যেতে বল শিগ্গির। ননসেন্স।

কথাটা হৃষীকেশকেই যেন বলা হল, কিন্তু আসলে বলা হল ওদের। ওরা আর দেরি করল না, চলে গেল।

বাব্বা। কী দাবি। মেয়ে কলেজে-পড়াও চাই, এক আণ্ডিল টাকাও চাই। —এই ধরনের আলোচনা হয় আশপাশের বাড়িতে। —একটা ছেলে নিয়েই এত অহংকার, ঘরে মেয়ে নেই লোকটা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

অনিমেষবাবু একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তাঁর কানে এ-কথা গেলে তিনি লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেন, এ-ভয়ও আছে প্রতিবেশীদের। তাই তারা যা আলোচনা করে তা নেহাতই চাপা গলায়।

অপর্ণা হৃষীকেশের কাছে যাওয়া বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু দেখা হয় তাদের রোজই। রোজ কথা হয়ে থাকে পরের দিন দেখা হবে কখন ও কোথায়, অপর্ণা তার কলেজের রুটিন দেখে দেখার সময় ঠিক করে দেয়। সেই অনুসারে হৃষীকেশ এসে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট জায়গায়—ল্যান্সডাউন রোড আর যতীন দাস রোডের মোড়ে। সেখান থেকে তারা গুটিগুটি হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় দুপুর বেলায় ফাঁকা লেকে। জলের কিনারে ঘাসের উপর বসে তারা। সুস্পষ্ট আলোয় জলের মধ্যে নিজেদের যুগল ছায়া দেখে পুলকিত হয়।

এদিকে পুলকিত হয় তারা, আর গাছের আড়াল থেকে এই মনোহর দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পাশের রাস্তার রেস্তোরাঁর ছেলের দল। গ্রে হাউণ্ডকেও হার মানিয়েছে তারা। তারা এই রোমান্সের গন্ধে ঠিক শিকার খুঁজে বের করেছে।

অপর্ণা বলল, কত উপদ্রব যে সহ্য করছি তোমার জন্যে। এর পরিণাম কী কে জানে।

হৃষীকেশ বলল, পরিণাম তো রমণীয়ই মনে হচ্ছে। বিনা ঝুঁকিতে এই দ্বিপ্রহর-প্রণয় করা যাচ্ছে, সান্ধ্য-প্রণয় করা গিয়েছে; এর পর নববধূটির মত প্রবেশ করবে আমাদের নাকতলার নতুন ঘরে। শুনছি বাবা নাকি নতুন ঘর তুলছেন একটা।

অপর্ণা বলল, বাবার কাছে বুঝি আর যাওয়া হয়নি এর মধ্যে?

—সময় কই? হৃষীকেশ হেসে উঠে বলল, ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ, এ কথা কি বাবা জানেন না? আমি তপস্যায় মশগুল না? আমি ছাত্র নই?

অপর্ণা বলল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—ওখানে স্থানাভাব। আমার পড়াশুনোয় বিঘ্ন হবে ব'লে বাবা নিজে দেখে মেস্ বাছাই করে ঘর ঠিক করে আমাকে

সেখানে নির্বাসন দিয়ে গেছেন। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করি কী করে।

অপর্ণা বলল, থাক্। অত কঠিন বাংলায় আর কথা বলতে হবে না। কিন্তু, কি রকম অপবাদ রটছে জান? ওদিকে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কারা যেন। উঁহু, তাকিয়ো না পিছনে। আমরা যেন দেখিইনি ওদের।

হৃষীকেশ এক টুকরো ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, বয়ে গেছে অপবাদে। আর ক'টা দিন তো, চুকে যাক পরীক্ষা, দেখে নেব।

মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে সিটি বাজাচ্ছে ছেলেরা। চেঁচিয়ে বলছে, সব দেখেছি। বাড়ি চিনি। সব বলে দেব।

অপর্ণা ফিস করে বলল, শুনছ?

—হুঁ। চুপ করে থাকো।

বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক না। পরীক্ষার আর বিশেষ দেরিও নেই। তার উপর, এই পরীক্ষার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ বাঁধা। আর, অনেকে নির্ভর করে আছে তারই উপর।

তারা উঠল, ছোট লোকের কাছে এসে দুদিকে যাত্রা করল তারা।

পিছন থেকে কারা-যেন বলছে, শুনতে পেল অপর্ণা, বলছে, সুন্দর পরকীয়া। বলে দেব বৌদি, সব কথা বলে দেব দাদাকে।

আচ্ছা ফাজিল তো। দ্রুত পায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল অপর্ণার।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সামনের ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডার, পান-বিড়ির দোকানের খদ্দেররা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু দেখা নেই হৃষীকেশের।

ঘণ্টাখানেকের উপর বই বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও হৃষীকেশের দেখা না পেয়ে একটু বিরক্ত হয়েই অপর্ণা বাসায় চলে গেল—বিপিন পাল রোডে।

মা বললেন, এত ক্লান্ত দেখছি কেন রে?

—মাথা ধরেছে।

—তবে শুয়ে থাক। বিশ্রাম কর।

অপর্ণা বলল, কিন্তু একবার বেরতে হবে আমাকে।

—এক্ষুনি?

—না। দেরি আছে।

—তাহলে সন্ধ্যের পর যাস্। ট্রামবাসে না গিয়ে উনি ফিরলে গাড়িটা নিয়ে যাস্।

অপর্ণা বলল, গাড়ির কোনো দরকার হবে না।

কপালে ও সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যার একটু পরে অপর্ণা পদব্রজেই বেরিয়ে পড়ল। চায়ের দোকানের দিকে না চেয়ে সে সোজা ঢুকে পড়ল গলির মধ্যে। উদ্বেগে ও আতঙ্কে সে তর্ তর্ করে সিঁড়ে ভেঙে উপরে উঠে ঘরে উঁকি দিল, দেখল, নাকে রুমাল দিয়ে বালিশে পিঠ দিয়ে হৃষীকেশ বসে আছে বই-এ চোখ দিয়ে।

অপর্ণা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বলল, ব্যাপার কী?

সোজা হয়ে বসে হৃষীকেশ বলল, ঠিক জানতাম আসবে। বেজায় সর্দি হয়েছে।

অপর্ণা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, বড় সস্তা হয়ে গিয়েছি আমি, তাই না? দুপুরে দেড় ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলে, এতে তোমার সম্মান বাড়ল? আমি কি তোমার কেউ না?

—কী আশ্চর্য। চটে গেলে কেন? বেজায় সর্দি হয়েছে। সারাটা দিন হাঁচছি।

অপর্ণা বলল, তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। থাক্, আমি আর আসব না।

হৃষীকেশ বাধা দেবার বা পথ রুখে দাঁড়াবার আগেই অপর্ণা তর্-তর্ করে নেমে চলে গেল।

নিজের মনেই হৃষীকেশ বলল, বেজায় চটেছে।

দোতলা থেকে বিহারীবাবুর প্রবল কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। বুড়ো হলে হবে কি, জীবনে উৎসাহ আর আমেজ তাঁর আছে।

হৃষীকেশ তাঁর ঘরে ঢুকে হাঁচতে লাগল। হাঁচতে গিয়ে ভুলেই গেল সে তার কর্তব্যের কথা। ছুটে গিয়ে অপর্ণাকে যদি পৌঁছে দিয়ে আসত তাহলে মেয়েটির মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হত হয়তো। কিন্তু সে খেয়ালই হল না হৃষীকেশের। নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে সে মনে-মনে বলতে লাগল, বড় সেন্টিমেন্টাল আর বড় সেন্সিটিভ ওই মেয়েরা।

আর যে যাই বলুক, অপর্ণার এই অভিমানকে অসংগত বলবে না কোনো মেয়ে। এটুকু সে জানে। এটা তার কেবল অভিমান নয়, এটা তার অপমানও। এত বাধা, এত বিঘ্ন, এত ব্যঙ্গ, এত পরিহাস উপেক্ষা করে সে যার জন্যে সব লজ্জা আর সংকোচ জলাঞ্জলি দিয়েছে, তার কাছ থেকেই অপর্ণা পেল এই উপেক্ষা। এটা কম আঘাত নয় অপর্ণার। সে পণ করল, না ডাকলে সে আর যাবে না।

অরবিন্দ বসু উপরে উঠে এসে বললেন, শুনছ?

অপর্ণার মা আলমারি থেকে কী-যেন বের করছিলেন, তালা থেকে চাবিটা বের করে কাঁধে চাবির তোড়া ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলতে লাগলেন, কী ব্যাপার বলো তো। দুটো লোক এসেছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কোথায়, ঠিকানা কী ইত্যাদি বেশ অমায়িকভাবে জিজ্ঞাসা করল। সব বললাম। তারপর ভিন্ন মূর্তি ধরে অপর্ণার নামে যা-তা বলে গেল।

—কী বলল? ব্যগ্রভাবে বললেন মা।

—ও নাকি কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। লেকে বসে, গল্প করে—এইসব আর কি।

মা বললেন, মিথ্যে কথা। বাজে কথা। কলেজে যায়, কলেজ থেকে আসে।

বাবা বললেন, কী জানি। ওসব ওরা বলতেই-বা এল কেন।

—উকিলি ব্যবসা করছ। কত শত্রু তোমার, কতজনকে মামলায় হারিয়েছে। তাদেরই চক্রান্ত হবে।

অরবিন্দ বসু একটু চিন্তান্বিত হলেন, কিন্তু আর কিছু বললেন না।

এত টাকা ঢেলে, ছেলের বাবার সব দাবি এবং সমস্ত রকমের আব্দার পূরণ করে মেয়ের বিয়ে দিলেন তিনি। ছেলেটো খুব ভালো—এই একমাত্র আকর্ষণ। সেই ছেলের পড়াশুনার এবং ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে দেবার দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি। এত ঝক্কি আর

ঝামেলা পুইয়ে যদি এইরকম দুঃসংবাদ শুনতে হয় তাহলে সহ্য করা সত্যিই মুশকিল।

অরবিন্দবাবু কয়েকদিন ধরে ভাবলেন মেয়েকে একথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক কি না। কিন্তু কিছু স্থির করে উঠতে পারলেন না। এমন সময় একদিন নতুন করে খবর এল তাঁর কাছে।

অরবিন্দ বসু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উপরে উঠে এসে বললেন, শুনছ?

মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, কী? কেন?

—অপুর শ্বশুর এসেছেন।

—তাই নাকি? খাবার-দাবার জোগাড় করি তাহলে। বেয়াই এসেছেন।

—দাঁড়াও। অরবিন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, উনিও আবার ওই খবর নিয়ে এসেছেন।

—কী খবর?

—কেন খোঁচাচ্ছ বলো তো? চিঠি দেখালেন আমাকে। উড়ো চিঠি পেয়েছেন।

—মিথ্যে কথা। বানানো কথা।

মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল এদের। কী করা কর্তব্য, কী বলা উচিত—কিছুই ঠিক করতে পারল না কেউ।

অরবিন্দবাবু নীচে নেমে গিয়ে দেখেন বেয়াই চলে গেছেন। এমন রাগী আর এমন তেজী লোক সচরাচর দেখা যায় না। তার উপর ভদ্রতারও লেশ নেই।

এর পর দুই পরিবারের মধ্যে অনেক দেখাদেখি ও অনেক চিঠি লেখালেখি হল, কিন্তু রফা হল না কিছু।

অপর্ণা শুনেছে সব কথা, তবু সে অটল আছে। তার মা কী-যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, অপর্ণা বলেছে, ঠিক আছে।

এত অপবাদ, এত অশান্তি, তবু বলে, ঠিক আছে? এতটুকু পরিতাপ নেই, এতটুকু আক্ষেপ নেই?

—না, কিছু নেই। আমি বুঝে নেব। অপর্ণার ওই এক কথা।

মেয়ের পেট থেকে কোনো কথা বের করতে পারলেন না মা। তাই, লজ্জার কথা হলেও, অপর্ণার বৌদিকে লাগালেন ওর পিছনে। বৌদির জেরার উত্তর দিতে দিতে সব স্বীকার করে ফেলল অপর্ণা। অন্যায় সে কিছু করেনি, সে যেত হৃষীকেশের কাছে, সে ঘুরেছে হৃষীকেশের সঙ্গে। মেস্ থেকে হৃষীকেশ অনেক চিঠি লিখেছে, বার বার যেতে বলেছে। তারপর যাওয়া শুরু করেছে সে।

—ও, এই কাণ্ড। ডুবে-ডুবে জল খাওয়া? বৌদি অপর্ণার চিবুক আঙুল দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন।

বিপিন পাল রোডের বাড়ির হাওয়া পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু নাকতলার বাড়ির হাওয়া এখনো ভারী।

হৃষীকেশের পরীক্ষা হয়ে গেছে। নির্বাসন তার শেষ। তার কানে এই কথা যখন প্রথম গেল তখন দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তার, আর গরম হয়ে উঠল দুই কান। কোনো কথা বলতে পারল না সে।

নাকতলার আবহাওয়া স্বাভাবিক না হলেও বিপিন পাল রোড এখন একেবারে শান্ত।

মা বললেন, যত-সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড, আর অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। পরীক্ষা যেন দুনিয়ায় আর কেউ দেয় না। বিয়ে হবে, কিন্তু ছেলে-বৌ-এর দেখা হবে না। মুনি-ঋষিরা যেন তপস্যা করে না, আর তাদের ঘরে যেন বৌ থাকে না। মহাভারত খুঁজে দেখ-না, এন্তার বৌ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঋষিরা। তাদের তপ তাই বুঝি পণ্ড হয়ে গেছে। যা চাইল ওরা, তাতেই রাজী হয়ে গেলে তুমি। আর, রাজীই যদি হলে ক' মাস দেরি করে পরীক্ষার পর বিয়ে দিলেই হত।

অরবিন্দবাবু মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন, হত না। বেজায় টাকার খাঁই। আরো ভালো অফার পেলেই অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিতেন। ছেলেটা যে জুয়েল, এটা তো দেখতে হবে।

—দেখ গিয়ে তুমি। এবার তো ঋষির পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এস। ওরা সুখ থাক্, তবেই হল।

পরদিনই অরবিন্দবাবু যাবেন ঠিক করলেন। রবিবার আছে। আদালত নেই।

ছেলের বৌ শোভাকে আর অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। নাকতলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন অনিমেষ সোম।

—কী সমাচার?

অরবিন্দবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, এলাম। অপর্ণাকে নিয়ে এসেছি। ঋষি নেই?

—আছে।

অভ্যর্থনা বড় ঠাণ্ডা রকমের হল। কিন্তু তাতে ক্ষুণ্ণ হলেও কিছু প্রকাশ করলেন না অরবিন্দ বসু। হাসতে হাসতে তিনি বেয়াইকে মজার গল্পটা বললেন।

অনিমেষ হাসিতে যোগ দিলেন না, ডাকলেন, ঋষি। হৃষীকেশ।

শোভা অপর্ণাকে নিয়ে নেমে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, ডেকে আনি ওকে?

অপর্ণা বলল, দাঁড়াও।

অনিমেষবাবু হৃষীকেশকে কী সব কথা যেন বললেন, বললেন, এসব সত্যি নাকি হে?

হৃষীকেশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল, আমি জানিনে।

শোভা এগিয়ে গেল, হৃষীকেশকে ডাকল, সঙ্গে করে নিয়ে এসে নতুন-তৈরি করা ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। এইখানে অপর্ণাদের জীবনের নতুন সুপ্রভাতের ও নতুন গৃহ-প্রবেশের স্বপ্ন তারা দেখেছিল একদিন।

অপর্ণা সলজ্জভাবে বলল, সব শুনেছ?

—কী?

—অপবাদের কথা?

দুই চোখ লাল ও দুই কান গরম হয়ে উঠল হৃষীকেশের। বলল, শুনেছি।

—কার জন্যে এ অপবাদ?

—আমি জানিনে।

শোভার কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অপর্ণা। তার পায়ের নীচে থেকে মাটি যেন সরে যেতে লাগল।

ঠাকুরমার ঝুলি

বিকালের দিকে এখনও যেদিন মেঘে মেঘে আকাশ কালো হয়ে আসে, নিরুপমার কাজের শেষ থাকে না। কোমরে ব্যথা, তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে কষ্ট, তবু কোনমতে দালানে এসে বসেন, উবু হয়েই বঁড়ির থালাটা সরিয়ে রাখেন এক কোণে, জোরে জোরে ডাকতে থাকেন, "বৌমা, ও বৌমা, কাপড়গুলো তুলে ফেল, এখুনি যে সব ভিজে তাল হয়ে যাবে।"

ভিতর থেকে সাড়া আসে, যাই মা, তবু বুঝি অরুণার বেরিয়ে আসতে দু'চার মিনিট দেরি হয়। অসহিষ্ণু নিরুপমা গজগজ করেন, আবার ডাকেন, "বৌমা, তোমার চুলবাঁধা কি এখনও শেষ হল না। আজ না হয় পাতা একটু কম ঘটা করে কাটলে বাছা।"

ঘরের মধ্যে অরুণা ছটফট করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, না পেরে বলে, "ছাড়ো, ছাড়ো, মা ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলেন, শুনছ না। শাড়িগুলো সব জবজবে হয়ে যাবে যে।"

অনিল বলে, "যাক। ভিজে শাড়িতেও তোমাকে নেহাত মন্দ দেখাবে না।"

"অসুখ করলে?"

"ওষুধ আছে।"

সন্তোষকুমার ঘোষ

আঁচলে গাল মুছতে মুছতে অরুণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। নিরুপমা রাগ করে বলেন, "পাতা কাটা হল।"

অরুণা অপ্রতিভ কিন্তু সহজ গলায় বলে, "মা যেন কী, কিছু দেখতে পান না। আমি কি পাতা কেটে চুল বাঁধি? জট পড়েছিল, তাই মাথায় চিরুনিটা একটু বুলিয়ে এলাম। নইলে উকুন হবে, আপনার ছেলে বলেছে।"

"নাও, এবার কাপড়গুলো তুলে ফেল দেখি। খোকা অফিস থেকে ফিরেছে, অথচ লিলি এখনও কলেজ থেকে এল না? লেখাপড়া শিখে মেয়ের দিনদিন বিবেচনা যেন বাড়ছে। ঝি বিলুকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে কখন, এখনও যে আসে না।"

অরুণা বলে, "আসবে, আসবে, আপনি একটুতেই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

প্রায় সংগে সংগে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর একটি শিশুর গলা শোনা যায়। ঝুপঝুপ করে তখনই বৃষ্টি নামে, রেলিংটা একেবারে ভিজে যায়, দালানেও ছাঁট আসে, নিরুপমা সরে দেয়াল ঘেঁষে বসেন। ছোট দু'টি হাত পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে নুয়ে পড়ে একটি কচি মুখ আবদার করে, "দিদা, ছড়া বল।" "কোন্ ছড়া?" "বিষ্টির।"

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে,
চাল দেব মেপে।"

"এটা না, অন্যটা। শিবঠাকুরের বিয়েটা।"

"বেশ তো, সেটাই বলছি, গলাটা তো আগে ছাড়। ফাঁস দিয়ে মারবি নাকি। ...টাপুরটুপুর নদেয় এল বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান...."

"আর এক কন্যে, দিদা?"

ছড়া ভুলে দিদা তখন অন্য কথা ভাবছেন। গলিতে জল একহাঁটু হল, মেয়েটা এখনও ফেরেনি?"

লিলি এল, একেবারে ভিজে পায়রাটি হয়ে, স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া, শাড়ি খাতা বই শপশপে, বিনুনি খুলে বুকের কাছে এলানো, তবু মুখে গুনগুন একটা গানের সুর।

নিরুপমা চেঁচিয়ে বললেন, "রাত দু'পহর অবধি কলেজ তোমার?"

মার সামনে লজ্জা নেই, শাড়ির প্রান্তটা একটু তুলে নিংড়ে নিল লিলি, ভিজে আঁচল দিয়েই একবার ঘষে নিল মাথা। হাসতে হাসতে বলল, "মার এখন আর সময়েরও হুঁশ নেই, রাত কোথায়, এখন তো মোটে ছ'টা। টিউটোরিয়াল ক্লাশ ছিল শেষ পিরিয়ডে, করব না?"

কঠিন সুরে নিরুপমা বললেন, "যাও, আগে জামাকাপড় ছেড়ে এস গিয়ে, তার পর তোমার টিউটোরিয়ালের বিহিত করছি। কলেজ থেকে ছাড়িয়ে আনলে তোমার শিক্ষা হবে।"

একটা কথাও যেন লিলির কানে গেল না, হাসতে হাসতে সে ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া টেনে টেনে ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাঁসের পালক জলে ভিজল না।

বিলু সরে গিয়ে হাত পেতে রেলিং-চোয়ানো জল ধরছিল, লিলি চলে যেতেই সে ছুটে এসে ভিজে হাতে দিদার গাল চেপে ধরল। "একটা গলপো বল।"

"কী বলব, সব তো শুনেছিস, আমার ঝুলিতে আর কিছু নেই।"

"কেন বেঙ্গমাবেঙ্গমী?"

"আবার শুনতে হবে?" ফের শুরু করতে হল, "নিঝুমে দুপুর, ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়ে এসেছেন রাজপুত্তুর, বটগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন, চোখে ঢুলুনিও এসেছে। সেই বটগাছে বাসা বেঁধেছে বেঙ্গমাবেঙ্গমী—কাল দুপুরে কিন্তু আমার দশটা পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

ঝি এসে সমুখে দাঁড়াল। "কর্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন, মা। বাতের ব্যথাটা নাকি বেড়েছে, মালিশ করে দিতে হবে।"

"বেড়েছে নাকি, বাড়বে না? যা বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। এবার ছাড় বিলু, ঘরে যাই, তোর দাদু ডাকছে।"

"তুমি দাদুকে বেশী ভালোবাসো। আমি জানি।"

"না না, তোকে। হল তো। এবার সর দেখি।"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আসেন একেবারে ভিতরের ঘরে, সেখানে এখনও আলো জ্বলেনি। বিছানায় শোয়া একটা পাঁজরসার শরীর থেকে-থেকে খুকখুক করে কাশছে, মালিশের শিশিটা অন্ধকারেই খুঁজে নিয়ে নিরুপমা তার পাশে বসেন।

"খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"খুব না, এই পিঠের কাছটায়। তুমি একেবারে খেয়ে এসেছ তো।"

"এখনই? তোমার খাবার দিয়ে গেছে?"

"আমি আজ কিছু খাব না।"

"একেবারে কিছু না, সোক হয়। একটুখানি দুধ খেতেই হবে।"

কখন আপনা থেকেই বৃষ্টি থামে, গলিতে ফের লোকজন চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যায়। পাশের ঘরে হৈচৈ হুল্লোড়, বোধহয় মেজ ছেলে সুব্রত বাড়ি ফিরেছে, এতক্ষণে বাবুর দেশোদ্ধার সারা হল। ফিরেই খুনসুটি লাগিয়েছে বোন-বৌদির সঙ্গে। বড় ছেলে অনিল বুঝি ক্লাবে যায়নি, আজ অনেক রাত অবধি ওরা তাস খেলবে। এ-আসরে নিরুপমা যান না, দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই চলে আসেন। বড়দার পার্টনার লিলি, সুব্রত বসে বৌদির সঙ্গে। তাছাড়া টুয়েণ্টিনাইন খেলা নিরুপমা বোঝেনও না। আগে তাস খেলতেন বটে, কিন্তু বিন্তির ওদিকে এগোতে পারেন নি। ওদের খেলায় বাজিও আছে। যাদের কালো সেট হবে তারা শনিবার সিনেমা দেখাবে। সুব্রত যদিও এক পয়সা দেবে না, সব যাবে বৌদির বাক্স থেকে। লিলির ভরসা বড়দা।

সত্যেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুক ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকছে। বিছানা থেকে উঠে নিরুপমা বাইরে এলেন। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ এখন টলটলে, এখানে ওখানে তারাও ফুটেছে, বুটিদার একখানা নীলাম্বরী যেন ভিজে হাওয়ায় শুকোতে দেওয়া। বিলুরও কোন সাড়াশব্দ নেই, ঝির কোলেই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিনা কে জানে। আরও একটি দিন শেষ হয়ে এল।

শেষ। কথাটা যেন ধ্বনিরূপ নিয়ে বারবার বাজল নিরুপমার কানে। পিছনে চাইলেন, ঘর অন্ধকার, একটি সুষুপ্ত মানুষের নাকের নিয়মিত ঘর্ঘর ছাড়া শব্দটুকু নেই। গায়ে কাঁটা দিল, অবলম্বনের জন্যে রেলিংটা চেপে ধরলেন। এই প্রথম নয়, আরও অনেক দিন গায়ে কাঁটা দিয়েছে, তার মধ্যে আজ বিশেষ একটি দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন অবশ্য কাঁটা ভয়ে দেয়নি, দিয়েছিল ভাবনায়। চল্লিশ পেরিয়ে আসার কয়েক বছর পরের সেই আষাঢ়ের রাত্রি আবার যেন ফিরে এল। সমস্ত রাত চোখের দু' পাতা এক করতে পারেননি, বিছানায় ছটফট করছেন। আলো জেলে ক্যালেণ্ডারটা দেখেছেন, ফের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু ঘুমোননি। হিসাব যদি নির্ভুল হয়, আর মনে যে ভাবনা ঢুকেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে ছি ছি, সকলের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, আরেক ছেলেও বড়, কলেজে পড়ে, মেয়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে একটি দুটি পাকা চুল প্রায়ই খুঁজে পান, কী লজ্জা।

পরদিন সকালে তাঁর চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। রুক্ষ মূর্তি, সারা কপালে সিঁদুর লেপা, চোখের কোলে কালি। বাথরুমে ঘটিঘটি জল ঢেলেও যেন সে-কালি মোছেনি, অকারণে মেয়েকে মেরেছেন, ঝিকে ধমকেছেন, বৌকে ঠেস দেওয়া কথা শুনিয়েছেন। আসল রাগ যার উপরে, যাকে প্রাণ খুলে গাল পাড়লে সব জ্বালা জুড়োত, সে তখন টুরে, মফঃস্বলে। তার করলে লোক-জানাজানি হবে, তাই নিরুপমা পত্রপাঠ চলে আসতে গোপনে চিঠি লিখে দিলেন।

সত্যেনবাবু চার দিনের মাথায় ফিরে এলেন।

প্রথমেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, "কার অসুখ রে।"

"কই, কারো তো না।"

"তবে যে তোর মা আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দিলে। কত কাজ ফেলে আমাকে চলে আসতে হয়েছে ভাব দেখি।"

লিলি চোখ বড় করে বলেছিল, "মা তোমাকে চিঠি দিয়েছিল বুঝি বাবা? কই, আমাদের তো কিছু জানায়নি?"

বোঝার উপর শাকের আঁটির মত ভাবনার উপর লজ্জা চাপল। কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটা আরও কী বেফাঁস কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে নিরুপমা তাড়াতাড়ি কড়া

গলায় বললেন, "লিলি, তুই কাজে যা। তুমি এদিকে একবার এসো তো।"

সব শুনে সত্যেনবাবুরও মুখ শুকিয়ে গেল। ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, "তুমি ঠিক জানো, তোমার ভুল হয়নি?"

পূর্ণিমার নিশিপালন, একাদশীর জো, কোনো তিথির হিসাবে এতটুকু যার গোলমাল হয় না, তার এতবড় ব্যাপারটায় ভুল হবে? চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে নিরুপমা বললেন, "ভুল হলে তো বেঁচে যেতাম, কিন্তু আমার আর একটুও সন্দেহ নেই যে।"

"তাই তো," বলে মাথা চুলকে সত্যেনবাবু সেখান থেকে সরে পড়লেন।

রাত্রে দেখা হতে ফের বললেন, "তবে তো একজন ডাক্তার এনে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিতে হয়।"

যেমন বিবেচনা তেমন কথা! পাশ ফিরে নিরুপমা বললেন, "বৌ, মেয়ে, ছেলেদের সামনে? সবাই জিজ্ঞাসা করবে কী হয়েছে। আমি মরে গেলেও নয়।"

"তবে তুমিই একবার চেম্বারে চল।"

"হাঙ্গামা তাতেও কম নয়। কোথায় যাচ্ছি বলে বেরোব? কেউ যদি সঙ্গে যেতে চায় তা হলে?"

আরও একটা উপায় স্থির হল। সবাইকে বলবেন কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছেন। কালীঘাটের নামে লিলি নাক সিঁটকাল, বৌ ঠোঁট বাঁকাল। কেউ সঙ্গ নিল না।

কালো পর্দাটানা, চড়া আলো জ্বালানো ডাক্তারখানার সেই ছোট কামরাটির কথা মনে পড়লে আজও শরীর শিউরে ওঠে। কত জেরা, নির্লজ্জ, কণ্টকিত মিনিটের পর মিনিট আর যেন কাটে না। তালু অবধি জিভ শুকিয়ে গেল, কলিজার গতি কি এত দ্রুত, হাতুড়ি কি এর চেয়েও জোরে পড়ে। এত নোনা জল কি থাকে মানুষের দেহে, নইলে এই ঘাম কোথা থেকে এল।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলেছেন, "আপনি এখানেই একটু বসুন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে একটা দু'টো কথা বলে আসি।"

পর্দা টানাই রইল, তবু উৎকর্ণ নিরুপমা এপাশে দাঁড়িয়ে ওপাশের কথা পরিষ্কার শুনতে পেলেন। ডাক্তারবাবুর গলাঃ যত সব বাজে ভয় আপনাদের, আরে না না মশায়, ওসব কিছু না, আমি খুব যত্ন নিয়েই পরীক্ষা করেছি। কত বয়স হল আপনার মিসেসের,...আই সী। সিসটেম আদারওয়াইজ ভালো? তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই...। এখানে ডাক্তারবাবু বুঝি গলা নামিয়ে মুখটা সত্যেনবাবুর কানের একেবারে কাছে নিয়ে গেলেন, একেবারে শেষের দু'টি কথা মোটে নিরুপমার কানে এলঃ যান মশাই, আর কোনো ভয়ই নেই আপনাদের, একেবারে নিরঙ্কুশ। তবে জীবনের একটা পরিচ্ছেদ ফুরিয়ে এসেছে, মনে রাখবেন, এটা তারই সূচনা।

ফেরবার পথে ট্যাক্সিতে বসে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন সত্যেনবাবু। "দেখলে তো, মিছিমিছি আমাকে কী বকাটাই না বকলে, কী হয়রানটাই না করালে। মফস্বল থেকে সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হল, তারপর কালীঘাটের নাম করে ডাক্তারের বাড়ি," হো হো করে হাসছিলেন সত্যেনবাবু, হাসতে হাসতেই বলছিলেন, "এবার সত্যিই কিন্তু একদিন গঙ্গাস্নান করতে হবে, কালীঘাটে পুজো দিতে হবে। দেখছ না গিন্নী, এতদিনে আমরা বুড়ো হতে চললাম। এখন ক'বছর গঙ্গায় নাওয়া আর তিলক কাটা চলুক, তারপর দু'জনে মিলে কাশীবাসী হওয়া যাবে।"

সামনের দু'টো দাঁত পড়ে গেছে, সত্যেনবাবু তখনও হাসছিলেন, নিরুপমা হঠাৎ তীব্র গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন, "চুপ করো।"

সত্যেনবাবু অবাক হয়েছিলেন, অপ্রস্তুত ভাব সামলে উঠতেই ফের হেসে নিচু সুরে বলেছিলেন, "তবে এখন কিছুদিনের জন্যে কিন্তু আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত, ডাক্তার বলল শোননি?"

"তুমি চুপ করলে?" এবার এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিরুপমা যে, ড্রাইভার চমকে ফিরে চাইল, সত্যেনবাবু বাকী পথটা আর একটা কথাও বলতে ভরসা পেলেন না।

'আর ভয় নেই'—ডাক্তারের এই আশ্বাস তারপর থেকে কতবার যে নিরুপমা নিজেকে অস্ফুট স্বরে শুনিয়েছেন ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্য, মন খুশিতে নেচে ওঠেনি। দুপুরে সবাই ঘুমোলে ছোট একটা হাত-আয়না নিয়ে বসেছেন, দেখে দেখে খুঁটে খুঁটে পাকা চুল তুলেছেন, ওপর ওপর কালোর নীচে এত সাদা চুল লুকিয়ে ছিল? মুখের চামড়া এখানে ওখানে টেনে টেনে দেখেছেন, এই দাগটা কোথা থেকে এল, আগে তো ছিল না। কপালের এই রেখা? নাকি ভুল দেখছেন, চোখ দু'টিও তাঁর গেছে। একে একে সব যাবে, চোখ যাবে কান যাবে একদিন বলার ক্ষমতাও। মৃত্যু এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে, এরা সব তার চর। তারই প্রথম পরোয়ানা পৌঁছে গেছে দেহে। একটি অধ্যায় শেষ হয়ে এসেছে, ডাক্তার বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা বলল কেন, আর ভয় নেই? কী নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

একটি সুখের চিরতরে ইতি হতে চলেছে, সব সুখেরই একে একে ইতি হবে। ছোট ছোট মৃত্যুর বিন্দু দিয়ে একটি সম্পূর্ণ অবসানের সরসী তৈরি হবে। সেই সরসীতে যতদিন ডুবে মরতে না পারছেন ততদিন কী করবেন নিরুপমা। পলিতকেশ, গলিতনখদন্ত হয়ে বেঁচে থাকবেন? আর ভয় নেই, কী মিথ্যুক ডাক্তার। ভয় তো এখনই বেশী। সেদিনের আর দেরি নেই, যখন নিরুপমা নিজেকে আয়নায় দেখে ভয় পাবেন, চিনতে চাইবেন না বা পারবেন না।

হাত-আয়নাটার কাচ ঝাপসা হয়ে এল, চমকে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন নিরুপমা, ফোঁটা ফোঁটা জলে কখন ভিজে গেছে, একটুও টের পাননি? বিস্বাদ একটা অনুভূতি সারা শরীর তিতো করে দিয়েছে। হায়রে, এর চেয়ে সেই ভাবনাটা সত্য হল না কেন। লিলিতে চৌদ্দ বছর আগে যার ইতি হয়ে গেছে, এতদিন পরে পুনশ্চ দিয়ে ফের সেটার শুরু হলে লজ্জা পেতেন ঠিক। কিন্তু জীবনের এখনও পরমায়ু আছে এই আশ্বাসও পেতেন। লজ্জা তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। হাতের মুঠি কঠিন হল নিরুপমার, ঝুঁকে পড়ে শক্ত কাচে কপালটা ঘষতে ঘষতে বারবার প্রার্থনা করলেন, ডাক্তারের পরীক্ষা যেন ভুল হয়, যে-ভয় করেছিলেন সেটাই যেন সত্যি হয়ে ওঠে।

কেমন যেন হয়ে গেলেন নিরুপমা। নিজেও টের পেতেন বদলে যাচ্ছেন। একা একাই কখনও চোখের পাতা ভিজে গেছে, কখনো ফিক ফিক করে হেসেছেন। ঘুমের ঘোরে কতবার যে মুখ নখের টানে ক্ষত করেছেন হিসাব নেই। ছেলেরা বলত, মা, তোমার কি কোন অসুখ করেছে। মাথা নেড়ে নিরুপমা বলতেন, না না। এত জোর দিয়ে বলতেন যে, যারা শুনত তারা চমকে উঠত।

আর বকতেন লিলিকে। ভাল লাগত না অরুণাকেও, কিন্তু সে পরের মেয়ে, বেশী কিছু বলতে ভরসা পেতেন না। লিলি যেন দু' চোখের বিষ হয়েছিল। এমন করে চুল বেঁধেছিস কেন, এই শাড়িটা পরলি কেন, জামার হাতা এত ছোট করে কেন ছেঁটেছিস—ছুতোর কখনও অভাব হত না। আবার, লিলি তাঁর পাশেই তো শুত, কোন কোন দিন মাঝ রাত্রে উঠে তাকে অপলক চোখে দেখতেন নিরুপমা। একটি শরীর ধীরে ধীরে ভরে উঠছে, একটি মেয়ে দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠছে, দেখেও যেন তৃপ্তি

হত না, ওর গায়ে হাত দিয়ে পরিপূর্ণ একটি বুকের শ্বাসপতনের ছন্দ অনুভব করতে চাইতেন। কোন দিন হয়ত লিলি জেগে উঠেছে, মাকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে তাঁকেই জড়িয়ে ধরেছে, "কী মা, কী।" "কিছু না," নিরুপমা বলেছেন, "তুই ঘুমো।"

সেই সময়ে কিছু দিনের জন্যে লিলিকে কি হিংসে করতে শুরু করেছিলেন নিরুপমা, আপন মেয়েকে? কে জানে।

তাস খেলা ফেলে ওরা এখন দল বেঁধে খেতে আসছে, নিরুপমা টের পেলেন। তাড়াতাড়ি সরে গেলেন এক কোণে। আজ আর তিনি কিছু খাবেন না, কেমন একটা চোঁয়া ঢেকুর উঠছে বিকাল থেকে। সত্যেনবাবুর জন্যে শুধু একটু গরম দুধ দিয়ে যেতে বলে দেবেন ঝিকে।

মনে নেই কবে থেকে সেই পাগলামির ভাবটা কেটে গেছে, সন্ধি করেছেন নিজের সঙ্গে। ভেবেছিলেন সমুখে বন্ধ গলি, গলির শেষে দু হাত প্রসারিত করে মৃত্যু দাঁড়িয়ে, কাছে গেলেই টেনে নেবে। এগিয়ে দেখেছেন গলি বন্ধ নয়, ওখানে মাত্র একটা বাঁক, মোড় ফিরতেই আরেকটা দিগন্ত খুলে গেছে। ঠিক কবে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন খেয়াল নেই, অরুণা যেদিন কলতলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, সেদিন থেকেই কি। ছেলেরা ডাক্তার ডাকতে ছুটল, সত্যেনবাবু অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন, কিন্তু নিরুপমা ঘাবড়াননি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা কী। অরুণাকে ধরে ধরে আনলেন কলতলা থেকে, বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মুখচোখ মুছিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে জেরা করে জানলেন, যা অনুমান করেছেন তা-ই ঠিক। একটা দাঁত পড়ে গেছে, তবু ফোকলা মাড়ি বের করে হাসতে আটকাল না। বহুদিন পরে সেই প্রথম।

নিরুপমা সেদিন থেকেই কাঁথা শেলাই করতে আরম্ভ করলেন। একটা নতুন কাজ জুটল।

আরেকটা কাজ বাড়ল আরও বছরখানেক বাদে, যেদিন সত্যেনবাবু মফস্বল থেকে বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া, অরুণা কোলের ছেলে বিলুকে সামলাতেই হিমসিম, নিরুপমার নিজেরও শরীর ভালো না, তবু মালিশের শিশি হাতে তাঁকেই সত্যেনবাবুর বিছানার পাশে গিয়ে বসতে হল।

সেই শয্যা, কিন্তু নতুন সম্পর্ক। তাঁকে নাওয়ানো, সময়মত আহার জোগানো,—একান্তভাবে তাঁরই উপর নির্ভরশীল অসহায় অসমর্থ মানুষটিকে নতুনভাবে ভালবাসতে শুরু করলেন। ছেলেদের পিতৃভক্তি তখন দায়িত্ব পালনের নামান্তরমাত্র, তরুণী মেয়ে প্রহরে প্রহরে পোশাক-বদলেই মশগুল। হঠাৎ যেন নিরুপমা টের পেলেন তিনি ছাড়া স্বামীর আপন জন কেউ নেই। তাঁরই কি আর কেউ আছে। আশ্চর্য, দুঃখ হল না, কান্না এল না।

তারপর বিলু একটু একটু করে বড় হয়েছে, মুখে একটি দুটি করে কথা ফুটেছে, চলতে শিখছে; শুনে, দেখে নিজেই যেন খুশিতে শিশু হয়ে গেছেন নিরুপমা! সবাইকে ডেকে দেখিয়েছেন তার মাতালের মত টলতে টলতে চলা, ধপাস করে পড়া। কেঁদে উঠলে কোলে তুলে থামিয়েছেন। আধো আধো বুলি শুনে হাততালি দিয়ে হেসেছেন। ভুলে যাওয়া ছড়াগুলো ফের মুখস্ত করতে হয়েছে, বিলুকে শোনাবেন। উপন্যাস পড়া ফেলে আরেকবার পড়ে নিয়েছেন ঠাকুরমার ঝুলি।

"মা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? খাওয়া হয়ে গেছে?"

ছেলেরা উপরে উঠে এসেছে। নিরুপমা বললেন, "আজ কিছু খাব না রে, শরীর ভালো নেই। ঝিকে বলে দে তো, বিলুকে আমার কাছে দিয়ে যাক। আজ বাদলার দিন, বিছানা ভেজাবে, ঠাসঠাস মার খেয়ে সারারাত চেঁচাবে, ওর মায়ের যা মেজাজ। বিলু আমার কাছেই শোবে।"

ঘরে ফিরে গিয়ে নিরুপমা মেঝেয় বিছানা করে নিলেন। ঝি প্রথমে সত্যেনবাবুর জন্যে দুধ, পরে বিলুকে শুইয়ে দিয়ে গেল। খানিক পরে লিলিও এসে গড়িয়ে পড়ল আরেক পাশে। নিরুপমা ধমক দিয়ে বললেন, "জামাটা আলগা করে শো, গরমে মরে যাবি যে।"

কুন্ঠিত লিলি ঘুমের ঘোরেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আমার অসুবিধে হবে না।"

"আহা, মার কাছেও মেয়ের লজ্জা," বলে নিরুপমা আরেকবার ধমক দিলেন, কিন্তু আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

জেগে উঠে দুধটুকু খেয়ে সত্যেনবাবু আবার শুয়ে পড়েছিলেন, নিরুপমা মৃদুস্বরে বললেন, "এখন কেমন আছ। ব্যথাটা কমেছে?"

"পায়ের কাছটাতে কনকন করছে এখনও," সত্যেনবাবু কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললেন, "একটু টিপে দেবে?"

নিজের চোখ ঘুমে ভরে এসেছিল, তবু মালিশের শিশি নিয়ে নিরুপমাকে উঠতে হল। সত্যেনবাবুর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসলেন। একটু পরেই ডেকে উঠে নাক ঘুমের গভীরতা ঘোষণা করল।

হঠাৎ নিরুপমা টের পেলেন, বিলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বপ্ন দেখেছে হয়ত। তাড়াতাড়ি উঠে তার পাশে গিয়ে বসলেন। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে থাবড়াতে থাকলেন, "ঘুম আয়, ঘুম আয়, নিম গাছের পাতা। দুই দুয়োরে পড়ে আছে দুটো বাঘের মাথা।" জড়িতস্বরে বিলু বললে, "এটা না, তিন কন্যেটা।"

"বেশ তবে তিন কন্যেটাই শোন।" নিরুপমা ফের শুরু করলেন, "......তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান। আরেক কন্যে——"

চোখ ঢুলুঢুলু অবসাদে শরীর ভারী, বিলুর ছোট মাথাটিকেও কোলে রাখতে পারছেন না। এত ক্লান্তি, তবু কী এক আশ্চর্য সুখের স্বাদ যেন দেহের কণায় কণায় ছড়িয়ে গিয়ে এখন সত্তাকেও ছেয়ে ফেলেছে। একটি সুখের ইতি হয়ে গেল বলে নিরুপমা একদিন কেঁদেছিলেন, তখনও এই সুখের ঠিকানা জানতেন না। সেদিন বোঝেননি, সারার পরেও শুরু আছে। যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।

গবান্ শংকরাচার্য একটি বেদবাক্যের ("দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে") অন্তর্গত দেবাসুর-পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দেবাঃ... শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ স্বাভাবিকাস্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব॥" অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে ও সমাজে নিত্য দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে—দেব বলিতে শাস্ত্রশাসনে পরিমার্জিত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল এবং অসুর বলিতে ঐ ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তিসকল, যাহা শাস্ত্রমার্জিত না হইয়া স্বভাবের প্রেরণায় তমোগুণাত্মক হইয়া থাকে। শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠানের এই চিরকল্পিত বিনিয়োগফল ভারতবর্ষে চিরপরিচিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক-গোষ্ঠী অধুনা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ মন্থন করিতেছেন—গুরুশিষ্যের নিয়মে নহে, পরন্তু স্বেচ্ছানুসারে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনর্থ নিবারণ বা পরমার্থ সিদ্ধি নহে, পরন্তু তথাকথিত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা। ঔপনিষদিক অনর্থ বা পরমার্থ ইতিহাসে গবেষণীয় নহে। তদ্দ্গ্রন্থ হইতে তৎকালীন সমাজের চিত্র অংকিত করাই তাঁহাদের পরমার্থ। শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, বিশেষ করিয়া ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে সমাজে তাহা যথাযথ পালিত হইলে অনর্থ নিবারণ ও পরমার্থ সিদ্ধি হইয়া দেবাসুর সংগ্রামে দেবপক্ষের জয়লাভের আশা শাস্ত্রকারগণ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিকগণের দায়িত্ব অনেক গুরুতর—তাঁহারা দেবাসুর দ্বন্দ্বকে নিয়মিত করিয়া সমাজে শৃংখলা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই কৃতিত্বপূর্ণ কার্য বঙ্গদেশের সামাজিকগণ কী ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার চিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে অপ্রাপ্য। মূলেই তাঁহাদের শাস্ত্রকারগণের সহিত বহুলাংশে বিরোধ ঘটে এবং শাস্ত্র অপেক্ষা সমাজ বড়—এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও স্থলবিশেষে শাস্ত্রবিধি উল্লংঘন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য অদ্যাপি সম্যক্ গবেষিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কেবল একটি উদাহরণ দিতেছি। বিবাহবিষয়ক সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থে কোন কোন আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, যাঁহাদের সহিত "সম্বন্ধ উত্তরে না"—অর্থাৎ এককথায় যাঁহারা "স্বজনা", যথা "পঞ্চমী কন্যা"। ঐতিহাসিকগণ কেবল শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রমাণবলে যদি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, ভারতবর্ষে কুত্রাপি উচ্চ শ্রেণীতে স্বজনাবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের মারাত্মক ভ্রম হইবে। বঙ্গদেশেই মধ্যযুগে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বজনা-বিবাহ শাস্ত্র উল্লংঘন করিয়া বহুতর স্থলে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ বাংলা দেশের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট মিথিলা জনপদে স্বজনাবিবাহ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যায়। প্রায় ১৩০০ খৃষ্টাব্দে মিথিলার একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত "স্মৃতিসার" গ্রন্থ রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় হরিনাথ স্বয়ং এক বিস্ময়কর অশাস্ত্রীয় বিবাহ করিয়াছিলেন (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, পৃঃ ১৬—১৭)। ইহাতে মিথিলায় প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালীন মিথিলাধিপতি কর্ণাটবংশীয় হরিসিংহদেব এইরূপ অশাস্ত্রীয় বিবাহ ভবিষ্যতে যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য ১২৪৮ শকাব্দে "পঞ্জীকার" নামে এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা পঞ্জী-প্রবন্ধ নামক গ্রন্থে সমস্ত ব্রাহ্মণ বংশের বংশাবলী এবং প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন এবং প্রত্যেক বিবাহ সম্বন্ধে এই পঞ্জীকার প্রদত্ত "অস্বজনপত্র" আবশ্যক হয়। অদ্যাপি মিথিলায় এই নিয়মে বিবাহ হইয়া থাকে এবং আদি পঞ্জীকার "রঘুদেব ঝা" হইতে বিবাহাদির চরম ব্যবস্থাপক পঞ্জীকার শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ফলে গত ৬০০ বৎসর মধ্যে মিথিলার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে একটিও স্বজনাবিবাহ হয় নাই—মৈথিলদের এই কঠোর নিয়মানু-বর্তিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং তাঁহাদের সংকলিত বিরাট পঞ্জীগ্রন্থ-সমূহ উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণরূপে গ্রহণীয়। দুঃখের বিষয়, একদিকে পঞ্জীকার শ্রেণী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বিলোপের ভয়ে এই সকল গ্রন্থ গোপন করিয়া রাখেন, প্রায় কাহাকেও দেখিতে দেন না এবং অপর দিকে আধুনিক ঐতিহাসিক গোষ্ঠী পারিবারিক ইতিহাসের এই সকল অমূল্য উপকরণ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জীসমূহ আকারে বিপুল কিন্তু রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ, বঙ্গদেশে বিবাহে স্বজনানির্ণয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-দের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, ঘটকদের হস্তে নহে। ঘটকেরা কেবল কৌলীন্য-মর্যাদার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—তন্মধ্যে পারিবারিক ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপকরণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য হইল, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ উল্লংঘন করিয়া জানিয়া শুনিয়া অনেক অশাস্ত্রীয় স্বজনাবিবাহ সম্ভ্রান্ত গৃহেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে—সমাজে তাহা নিন্দিত হইয়াছে, কিন্তু মৈথিলদের ন্যায় কঠোরভাবে রহিত হয় নাই। আমরা কুলপঞ্জীতে বহুতর স্বজনাবিবাহের উল্লেখ পাইয়াছি। নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি এখানে সংকলিত হইল।

(১) খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন চট্টবংশীয় "চৈতল" চন্দ্রশেখর বিদ্যালংকারের বিস্তৃত বংশধারা বাংলার বহু স্থানে বিদ্যমান আছে। তাঁহার এক পৌত্র (রামনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তীর পুত্র) রামগোপাল স্বয়ং বিবাহ করেন তাঁহার পিতার সাক্ষাৎ মাতুলভগ্নীর কন্যাকে যথা, কুমুদ ন্যায়বাগীশ (কাঞ্জারি, বাৎসাগোত্র)—তৎপুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—তৎকন্যা (=মথুরেশ মুখোপাধ্যায়)—তৎকন্যা (পত্নী)। কুমুদ ন্যায়বাগীশের কন্যা (=চৈতল চন্দ্রশেখর) তৎপুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য

চক্রবর্তী—তৎপুত্র রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় (পতি)॥ এস্থলে শাস্ত্রমতে সম্বন্ধ নিষিদ্ধ, অথচ শাস্ত্রব্যবসায়ী বিখ্যাত ভট্টাচার্যের পুত্রের সহিত নবদ্বীপাধিপতির গুরু-বংশীয় দিগন্তবিশ্রুতকীর্তি সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যের দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল। ঘটনাটি প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। ঘটকেরা কুলপঞ্জীতে কেবল 'স্বজনাদোষঃ' বলিয়া মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। মিথিলাতে এইরূপ "স্বজনাসম্বন্ধ চাণ্ডালিনী" কন্যার সহিত বিবাহ অভাবনীয়।

ঐ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ই পরে উক্ত বিবাহজাত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন পিসতুত ভাইয়ের পুত্রের হস্তে। যথা, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের পুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী—তৎপুত্র রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়—তৎকন্যা নন্দরানী (পত্নী)। চন্দ্রশেখরের কন্যা (—কৃষ্ণবল্লভ মুখোপাধ্যায়) —তৎপুত্র রামনারায়ণ—তৎপুত্র দুর্গারাম (পতি)। এস্থলেও শাস্ত্রমতে বিবাহ অসিদ্ধ হয় এবং ঘটকের গ্রন্থে কেবল "অত্র বিপর্যায়ঃ স্বজনা চ মহতী" বলিয়া দোষকীর্তন আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল। উভয় বংশের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন সাগরদিয়া বন্দ্যঘটীবংশীয় "রাজা" রঘু-রামের পুত্র "রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর" সন্তান-গণ রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বয়ং তাঁহার পুত্র ব্রজমোহনকে স্বজনাবিবাহ করাইয়াছিলেন। যথা, জয়রাম চক্রবর্তী—তৎপুত্র "রাজা" রঘুরাম—তৎপুত্র রামপ্রসাদ —তৎপুত্র ব্রজমোহন (পতি)। জয়রাম চক্রবর্তীর পুত্র কেশবরাম—তৎপুত্র রাজা-মণি—তৎকন্যা (—কন্দর্প মুখোপাধ্যায়) —তৎকন্যাত্রয় (পত্নী)॥ কন্দর্পের পত্নী সম্পর্কে ব্রজমোহনের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-ভগ্নী ছিলেন এবং কন্দর্পের তিন কন্যা তাঁহার ভাগিনেয়ী ও ব্রজমোহন তাঁহাদের মাতুল। এই অশাস্ত্রীয় বিবাহের বর্ণনা করিয়া ঘটকেরা নানাভাবে লিখিয়া গিয়াছেন —"মহতী স্বজনা মামা-ভাগিনীত্যাশ্চর্যং", "বহতী স্বজনা কদর্যঃ", "অত্র স্বজনা গর্হিতঃ" ইত্যাদি।

কন্দর্পের এক পুত্র শ্রীকান্তের হস্তে রামপ্রসাদের এক কন্যা (সম্পর্কে শ্রীকান্তের মাসী) সমর্পিতা হইয়াছিল—ইহাও শাস্ত্র-বিগর্হিত। ব্রজমোহনের কোন কন্যাসন্তান ছিল না—এক "কুশময়ী" কন্যা তিনি ঐ কন্দর্প-পুত্র শ্রীকান্তের হস্তেই অর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। এইভাবে এক বাড়িতেই তিনটা স্বজনাবিবাহ হইয়া-ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই সকল বিবাহের কাল।

(৩) শিষ্টসমাজে মাতুলবংশের কন্যাগ্রহণ সাত পুরুষ অতিক্রান্ত হইলেও প্রায় নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। মনুভাষ্যকার মেধাতিথি মাতুলগোত্রে পর্যন্ত বিবাহ নিষেধক বসিষ্ঠ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন "মাতুলস্য সুতাং চৈব মাতৃগোত্রাং তথৈব চ।" (মনু ৩।৫) বস্তুত মাতামহ সপিণ্ডের কন্যাগ্রহণ কুত্রাপি প্রচলিত নাই। কিন্তু ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন ভ্রাতৃদ্বয় রমণ ঠাকুর ও রাজবল্লভ ঠাকুর একযোগে কন্যাদান করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের "সপিণ্ড" জ্ঞাতি গোবিন্দ ঠাকুরের দৌহিত্র (সাগরদিয়ার রামেশ্বর চক্রবর্তীর পুত্র) রঘুদেবের হস্তে। অর্থাৎ রঘুদেব সাক্ষাৎ মাতুলবংশের কন্যা গ্রহণ করিলেন সাত পুরুষ অতিক্রম না করিয়াই। ঘটকগ্রন্থে উল্লিখিত "স্বজনাদোষশ্চ" বিশ্রুতকীর্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের সামাজিক মর্যাদার কিছুই হানি করিতে পারে নাই।

উক্ত রঘুদেবের "সহোদর" ভ্রাতা (অর্থাৎ গোবিন্দঠাকুরের অপর দৌহিত্র) লক্ষ্মণ তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামনাথের সহিত একযোগে মুখবংশীয় রঘুনাথ ঠাকুরের কন্যাগ্রহণ করেন। ইহা আরও ঘনিষ্ঠ স্বজনা; মাতুলবংশে পাঁচ পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। যথা, রামাচার্য—তৎপুত্র রাঘবেন্দ্র —তৎপুত্র নীলকণ্ঠ—তৎপুত্র রঘুনাথ—তৎ-কন্যা (পত্নী)। রামাচার্যের অপর পুত্র বিশ্বেশ্বর — তৎপুত্র গোবিন্দ — তাঁহার দৌহিত্র লক্ষ্মণ (পতি)।

(৪) খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন হরিরাম গাঙ্গুলীর পুত্র আত্মারাম স্বজনা-বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহে হরিরাম গাঙ্গুলী স্বয়ং বরকর্তা হইয়া গিয়াছিলেন। বর-কন্যার সম্পর্ক এইরূপঃ —দিণ্ডীবংশীয় ভবানীদাস চক্রবর্তীর দৌহিত্র কৃষ্ণজীবন (ধনো-চট্টবংশীয়)— তৎপুত্র রামনাথ—তৎকন্যা (পত্নী)। ভবানী-দাসের ভ্রাতা রামনাথের দৌহিত্র আত্মারাম (পতি)।

বরের মাতামহ এবং কন্যার পিতামহের মাতামহ সহোদর ভ্রাতা—"অতঃ স্বজনা"। উভয়বংশে (চট্ট এবং গাঙ্গুলী) বহুপুরুষ ধরিয়াই আদান-প্রদান চলিয়াছিল। আত্মা-রাম গাঙ্গুলীর এক কন্যা "সুভদ্রা"কে রামনাথের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ বিবাহ করেন। কিন্তু সুভদ্রা ছিল চন্দ্রনারায়ণের মাতার নাম এবং মাতৃনাম্নী কন্যাবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রবিধানে মাতৃনাম্নী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবৎ ভরণ করিতে হয়! চন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(৫) সর্বানন্দী মেলের বিখ্যাত কুলীন আড়িয়াদহ-নিবাসী রাম তর্কবাগীশের বংশধর সীতারাম (নামান্তর শোভারাম) ঘোষাল তাঁহার তিন কন্যার বিবাহই শাস্ত্র-লঙ্ঘন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম কন্যার বিবাহ হয় অবসথী চট্টবংশীয় গোপালপুত্র গৌরীকান্তের সহিত—গৌরীকান্ত ছিলেন রাম তর্কবাগীশের এক পৌত্র কাশীশ্বরের দৌহিত্র, আর সীতারাম ছিলেন রাম তর্ক-বাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। সীতারামের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় অবসথী চট্টবংশীয় হরেকৃষ্ণের সহিত এবং হরেকৃষ্ণ ছিলেন রাম তর্কবাগীশের অপর এক পৌত্র শ্রীরাম পঞ্চাননের দৌহিত্র। সীতারামের তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয় চট্টবংশীয় পূর্বোক্ত গোপালের অপর পুত্র নিমাইর সহিত। উভয়ের সম্পর্ক এইরূপঃ—

মুকুন্দপ্রসাদ চৌধুরী (মণ্ডলঘাটের জমিদার)—তৎপুত্র রতিরামের দৌহিত্র সীতারাম ঘোষাল—তৎকন্যা (পত্নী)। মুকুন্দপ্রসাদের অপর পুত্র ভগবানের দৌহিত্র গোপাল চট্ট—তৎপুত্র নিমাই (পতি)।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এইরূপ শত শত স্বজনাবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা দিকদর্শনস্বরূপ সমাজের নেতৃস্থানীয় পাঁচটি কুলীন বংশ হইতে পাঁচটি ঘটনা সংকলন করিয়া দিলাম। এত ব্যাপকভাবে যে শাস্ত্রনির্দেশের উল্লঙ্ঘন রাঢ়ীয় সমাজে বিবাহ-ব্যাপারে ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কুলপঞ্জীর নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদেরও অজ্ঞাত ছিল। এই ব্যাপকতার উদাহরণ স্বরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতীব ধর্মনিষ্ঠ অনুষ্ঠানপরায়ণ পণ্ডিত-গৃহে সংঘটিত একটি স্বজনাবিবাহের উল্লেখমাত্র করিয়া উপসংহার করিতেছি (ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত, পৃঃ ৩৫২)।

এই শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনের ফল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শোচনীয়, সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। লক্ষ্য করা আবশ্যক, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ প্রকাশ্যে অনুমোদন না করিলেও তত্তদ্-বংশের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে পশ্চাৎ-পদ হন নাই। শাস্ত্রীয় শাসনের কঠোরতা মধ্যদেশাদি সভ্যতার আকর-ভূমিতে চির-প্রচলিত এবং তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে বঙ্গদেশে এই কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছিল মনে করার সংগত কারণ আছে।

মৎস্যগন্ধা

শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

চর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গতবারের মত এবারও আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার জল দারুণ বাড়তে শুরু করল। মাঠ ময়দান আগেই তলিয়েছিল। এবার জল এগুতে এগুতে খালের মাঠের সবগুলি পৈঠা ছাড়িয়ে মল্লিকদের বাঁশ-বাগানের আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আইনুদ্দিন শেখের উঠানের ওপর এসে দাঁড়াল। প্রথমে পা'য়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে, তারপর জল গিরা পর্যন্ত উঠল। তাই দেখে আইনুদ্দিনের আট বছরের মেয়ে ময়নার ভারী ফুর্তি। সে ছোট ছোট দুখানি হাতে তালি দিতে দিতে বলল, "দেখছনি বাজান, কি মজা।"

ময়নার দু' হাতে দুটি লাল কাঁচের চুড়ি। শুক্রবারদিন ভাঙ্গার হাট থেকে কিনে এনেছে আইনুদ্দিন, মনোহারী দোকান থেকে এনেছে লাল ফিতে। তাই দিয়ে কাল বিকেলে ময়নার বিনুনী বেঁধে দিয়েছে জোবেদা। ভারী সতর্ক মেয়ে। পুরো একটি রাত গেছে। তবু সে-বিনুনীর একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। কিন্তু চুলগুলি কেমন যেন কটা কটা হয়েছে। ভাল তেল এনে দিতে হবে। মনে মনে ভাবল আইনুদ্দিন। জোবেদা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, তাকে ডেকে বলল, "মাইয়ার চুল যে রাঙ্গা রাঙ্গা হইয়া রইল, তা দেখছনি?"

জোবেদা মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, "হবে না? নিজের চুল যেমন শেজারের কাঁটার মত খাড়া খাড়া, মাইয়ার চুলও সেইরকম হবে।"

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে জোবেদার। নাক চোখ কি গায়ের রঙের চেয়ে চুলের গর্বই তার বেশী। গোছে ভারী, লম্বায় বড়, রঙও তেমনি মিশমিশে। সেই চুলের সৌন্দর্য আরও বাড়াবার জন্যে হাট থেকে দামী গন্ধতেল এনে দেয় আইনুদ্দিন। কিন্তু তেল যেন দিনদিনই আগুন হচ্ছে।

আইনুদ্দিন বলল, "হ, সেইজন্যেই কিনা। আমার ঘরের ক্যাশবতী নিজের চুল লইয়াই অস্থির। মাইয়ার চুলের দিকে চাওয়ার সময় আছে নাকি তার।"

ময়না দাম্পত্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, "বাজান, তুমি কেবল মার সাথেই কথা কও। আমার কথা মোটেই শোন না। আমি আর তোমার সাথে কথা কব না।"

আইনুদ্দিন হেসে মেয়েকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, "কও কও, কী কথা কও।"

ময়না বলল, "পানি বাইয়া বাইয়া আমাগো উঠানে আইছে দেখছ নি বাজান। নাওয়ার জন্যে আর খালের ঘাটে যাইতে হবে না। গাঙ আসবে বাড়ির ওপর, আমরা সবাই মিলা ঝাপুর ঝুপুর কইরা নাব।"

শুধু মুখেই নয়, ময়না বাপের হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে সেই শুকনো বারান্দার উপরে একবার উঠে একবার বসে স্নানের ভঙ্গি দেখাতে লাগল।

কিন্তু আইনুদ্দিন বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "অত ফুর্তি করিস নারে ময়না, অত ফুর্তি করিস না। পানি যদি এইভাবে বাড়তেই থাকে, মাইনষের ঘর-দুয়ার এবারও ভাইসা যাবে। ধান পান সব তলাবে। প্যাটে আর দানা পড়বে না, পানি খাইয়াই থাকতে হবে।"

জোবেদা ঝাঁট দিতে দিতে ঘর থেকে বারান্দায় নামল। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, "আইচ্ছা তুমি কেমন ধারার মানুষ কও দেখি। মাইনষের হাসি-খুশি দেখতে পার না। ওই এক ফোটা মাইয়া,

তারেও তুমি শাপ শাপান্ত করতেছ। ভাসে দ্যাশ ভাসবে। দশজনের যে গতি আমাগোও সেই গতি হবে। মরবার আগেই ডরে মইরা থাকব নাকি? ইন্দুরের গর্তে ঢোকব?"

কলকেটা হুঁকোর উপর দিয়ে আইনুদ্দিন তামাক টানতে টানতে মন্তব্য করল, "ইন্দুরের গর্ত আর নাই বিবি। সেখানে আগেই পানি ঢুইকা রইছে।"

জোবেদা রাগ করে বলল, "থাউক গিয়া।" তারপর মেয়েকে কাছে ডেকে নিয়ে মধুর প্রশ্রয়ের সুরে বলল, "আয় ময়না, আমার কাছে আয়। ঝাপুর ঝুপুর কইর‍্যা নাইবি। তারপর কী করবি।"

বাপকে ছেড়ে ময়না এবার মায়ের পিঠের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, হেসে বলল, "নাইয়া ধুইয়া খাব।"

"কী খাবি।"

"পিয়াইজ-বটি আর কুমড়া দিয়া ইচা মাছের ছালোন।"

"তারপর?"

"উঠানে তো আমার গলাপানি হবে মা; বাজান ঘাটের নাও ঘরের খামের সাথে আইসা বান্দবে। খাইয়া লইয়া সেই নায়ে বইসা বইসা তুমি আর আমি আঁচাব, ফুত ফুত কইরা পানি ফেলব। না মা?"

বলতে বলতে ময়না খিল খিল করে হেসে উঠল।

জোবেদাও হেসে বলল, "শোন, তোমার মাইয়ার কথা শোন।"

বছর তিরিশেক বয়স হয়েছে আইনুদ্দিনের। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুখে কালো চাপদাড়ি। তাতে মানুষটিকে আরো বেশী গম্ভীর দেখায়। স্ত্রী আর মেয়ের হাঁসি দেখে আইনুদ্দিনও একটু হাসল। তারপর হুঁকোটা বেড়ায় ঝুলিয়ে রেখে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সবরকম কাজই জানে আইনুদ্দিন, সবরকমের কাজই করতে হয়। ক্ষেতে কখনো কিষাণ খাটে, কখনো কামলা ঘরামির কজ করে, জুটে গেলে কাঠ চেলা আর মাটি কাটার কাজেও লেগে যায়।

কিন্তু বর্ষার বাড়াবাড়িকে ময়না আর তার মা যেভাবে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়াপড়শীরা তা জানাতে পারল না। এক আঙুল দু আঙুল করে রোজ জল বাড়তে লাগল। তারপর চার আঙুল, ছ আঙুল। তারপর সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে জলে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উঠোনে কোমর জল, ঘরেও হাঁটু অবধি ডুবে যায়। বর্ষা নয়, বন্যা। গতবারের চেয়ে এবার দেড় গুণ বেশী। গাঁয়ের বাঁশের ঝাড় উজাড় হয়ে গেল। সবাই কাঁচা বাঁশ কেটে কেটে ঘরের মধ্যে মাচা বাঁধছে। বাড়ির উপর আর এক শরিক আছে আইনুদ্দিনের। ভাইপো মৈনুদ্দিন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। বিধবা মা আছে, বউ আছে। অন্য সময় চাচা ভাইপোর মধ্যে বনিবনাও হয় না। বাড়ির সীমানা নিয়ে, বাঁশের পাতা, গাছের ডাল নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। কিন্তু এখন দুজনে মিলে দুই ঘরেরই মাচা বাঁধল।

ময়না জল ভাঙে আর ঘারে ঘারে বাপের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, "বাজান, কী কর।"

আইনুদ্দিন রূঢ় স্বরে জবাব দেয়, "আমার মাথা করি। সর্ব্বনাশী, হাইসা হাইসা কারে তুই ডাইকা আনলি, সব যে ভাইসা গেল।"

মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নেয় জোবেদা, স্বামীর দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বলে, "ওয়ারে গাইলাও ক্যান, ওয়ার কী দোষ।"

মায়ের কোলে উঠেও ময়নার চোখ ছল ছল করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, "মা, এত পানি আইল কোত্থিকা।"

আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখের জল মুছাতে মুছাতে জোবেদা বলে, "কান্দিস না ময়না, কান্দিস না।"

বাপ-মায়ের অনাদরে, আর পেটের খিদেয় মেয়ের চোখে জল আসে, এইটুকুই জোবেদা জানে। কিন্তু বন্যার এই রাশ রাশ জল কোত্থেকে আসে তা সে কী করে বলবে।

কতদূরে গাঙ। গোসল করে কলসী ভরে জল নিয়ে আসতে আসতে সারা বছর কাঁখ ভেঙে যেতে চায় জোবেদার। নাইতে গিয়ে ঘাটে গরু আর মানুষের ভিড় দেখে কাজিদের শনের ভিটার কাছে ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর ঘাট নিরালা হলে জলে যখন নামে, তখন জল আর জল থাকে না, কাদা হয়ে যায়। গা মাথা ভেজে কি ভেজে না, কোনরকমে দুটি ডুব দিয়ে বাড়ি চলে আসে জোবেদা। খরার সময় যে গাঙ রাঁধবার জন্যে এক কলসী পানি দিতে পারে না, বর্ষার সময় সে সব ভাসিয়ে দিতে আসে কেন, তা ময়নার মা কী করে জানবে।

ময়না যা বলেছিল, তাই হয়েছে। পুরনো ছোট ডিঙিখানা আজকাল বারান্দার খুঁটির সঙ্গেই বেঁধে রাখে আইনুদ্দিন। বেড়া যদি না থাকত তাহলে ঘরের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে নেওয়া যেত। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর ওঠে। বেয়ে বেয়ে ওঠে সবচেয়ে উঁচু আমগাছটার মগ ডালে।

ময়না বলে, "কী দেখ বাজান?"

জোবেদা শঙ্কিত হয়ে বলে, "ওখানে ওঠছ ক্যানে? পইড়া মরবা, পইড়া মরবা। নামো শিগ্গির।"

আইনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলে, "থাম মাগী, দেইখা লই।"

তালগাছের মাথায় উঠে চেয়ে চেয়ে বন্যার রূপ দেখে আইনুদ্দিন। কোথাও এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। সব জলে জলাকার, সব একাকার হয়ে গেছে। কইডুবি, সাইমুসাদি, তালকান্দি, চরকান্দি, চাঁদের কান্দির সঙ্গে তাদের পুব-সদরদি, পশ্চিম সদরদিও জলের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। ডুবে গেছে বাইশ সদরদির মৌজা। আর মানুষ সেই ডুবন্ত পৃথিবীতে ভেসে

বেড়াচ্ছে। ঘরের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ঘরের চালে, গাছের ডালে, ডিঙতে ডিঙিতে, তালগাছের ডোঙায়, কলাগাছের ভেলায়। মাছের মত জলচর হয়ে রয়েছে বাইশ সদরদির হিন্দু-মুসলমান। বামুন কায়েত, ধোপা নাপিত, সাহা নমঃশূদ্র, জেলা আর মোল্লারা। মাছেরও জাত আছে কিন্তু জলে ডোবা মানুষের জাত নেই।

স্ত্রীর ধমকে চমক ভাঙল আইনুদ্দিনের।

জোবেদা চেঁচিয়ে বলল. "গাছে উইঠা বইসা থাকলেই হবে নাকি। নাইমা আস। শিগগির। মাইয়াডা সে শুগাইয়া মরল। দানাপানি কিছু দেবানা ওয়ারে!"

আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল আইনুদ্দিন। বউ আর মেয়ের খোরাকের জোগাড়ে বেরোতে হবে বটে। নিজের পেটও ক্ষিদেয় জ্বলছে। কাঠা কয়েক ধান যা গোলায় তুলেছিল, বর্ষা শুরু হতে না হতে তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে দিন আনা দিন খাওয়া। কিন্তু এখন আনবে কোত্থেকে। কাজ দেবে কে। পাকিস্থান হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে অবস্থাপন্ন প্রায় সব হিন্দুই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। যাদের হাতে দুটো পয়সা ছিল, তাদের প্রায় কেউ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, পাটের দর নেই, দুধ মাছের দর পড়ে গেছে। আইনুদ্দিনের মত নিরক্ষর কামলা কিষাণকে কাজ দেবে কে। তারপর এই ভরা বর্ষা, আর সর্বনাশা বন্যা।

তবু ডিঙি নৌকো নিয়ে খোরাকের সন্ধানে বেরোল আইনুদ্দিন। কাজের সন্ধানে চলল। সারা গ্রাম জলে ভাসছে। মুসলমান আর নমঃশূদ্র পাড়ার অবস্থা সব-চেয়ে খারাপ। কেউ বা ঘরের মধ্যে জ্বরে ভুগছে, কারো বা ঘরই ভেঙে পড়েছে। ধোপাদের খাল দিয়ে এগোতে এগোতে আরো কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আইনুদ্দিনের। রায়েদের বর্গাদার ইয়াসিন মিঞা, ঘরামি বলাই মন্ডল আর আইনুদ্দিনের মতই কামলা ছদন বদন দুই ভাই ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছে। আইনুদ্দিন দেখেই বুঝতে পারল, তারাও কাজের বদলে খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ইয়াসিন বলল, "কি আনু শেখ, কাজকর্ম কিছু জোটল?"

আইনুদ্দিন হতাশভাবে বলল, "না কাজ আর কই।"

বলাই বলল, "ঘর কোন বেটার আস্তা নাই। কিন্তু ঘরামি লাগাবে না কেউ।"

ছদন বলল, "লাগাইয়া কী করবে? ঘর আইজ সারাবা, কাইল আবার হেইলা পড়বে। তাছাড়া পয়সা কই মাইনষের?"

ইয়াসিন বলল, "দুনিয়ায় আর কোন কাজ নাই। কেবল এক কাজ আছে। চাওতো নিশানা দিতে পারি।"

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। "কী কাজ। কোথায়! কার বাড়িতে কওনা মেঞা?"

ইয়াসিন বলল, "এই দরিয়ার পানি সেচতে আরম্ভ কর। কাজের অভাব কী।"

সবাই রাগ করল। বে-আক্কেল ইয়াসিনের কোন কান্ডজ্ঞান নেই। এত দুঃখ-ধান্দার মধ্যেও ওর রঙ্গরস যায়না।

রায়বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি ঘুরে ঘুরে সের দুই চাল শেষ পর্যন্ত জোগাড় করল আইনুদ্দিন। ললিত মিস্ত্রীর কাছ থেকে টাকাও ধার করে আনল গোটা তিনেক। নৌকো বিক্রি করে মিস্ত্রী বছর দুই ধরে বেশ লাভ করছে।

অর্ধেক চাল ভবিষ্যতের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক সিদ্ধ করল জোবেদা। দিন কাটল। মাচার উপরে রাত্রির অন্ধকার নামল। হ্যারিকেন একটি আছে। কিন্তু জ্বলে না। কী করে যেন জল ঢুকেছে তার মধ্যে। তেলের জোগাড় হয়নি।"

ময়না বলল, "অন্ধকারে আমার ভয় করে মা।"

জোবেদা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ভয় কিরে পাগলী। তুইতো আমার বুকের মধ্যে আছিস। আমার দিল-জান। সাপ আসুক, বাঘ আসুক, আমার জান না নিয়া তোরে কেউ ছুঁইতে পারবে না।"

আইনুদ্দিনও মেয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "ভয় কি। কাইলই বাজার থিকা তেল নিয়া আসব। সারা রাইত বাতি জ্বালাইয়া রাখব ঘরে।"

পরদিন ভোরে উঠে আইনুদ্দিন ফের কাজের চেষ্টায় বেরোচ্ছে, গাঁয়ের এম ই স্কুলের মাস্টার গোপাল সা আর ইসমাইল সিকদার এসে হাজির। উঠানের উপর দিয়ে বৈঠা বাইতে বাইতে আইনুদ্দিনের ঘরের কাছে নৌকো ভিড়াল তারা। বড় নৌকোয় শুধু তারা দুজনই নেই, পাড়ার আরো লোকজন আছে।

আইনুদ্দিন বলল, "ব্যাপার কী মাস্টার মশায়।"
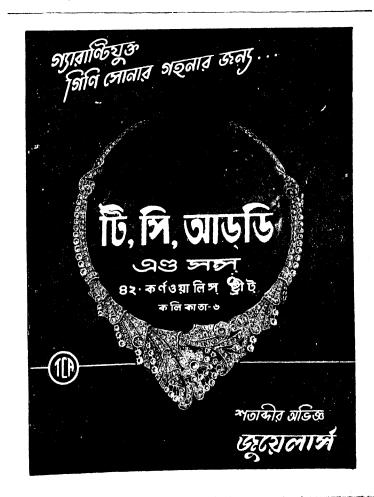
গোপাল মাস্টার বলল, "তৈরি হইয়া লও। যাইতে হবে আমাগো সাথে।"

আইনুদ্দিন অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

ইসমাইল সিকদার বিরক্ত হয়ে বলল, "অত জেরা-ফেরার দরকার কি। যা কইতেছি তাই কর। যাইতে হবে অনেক জাগায়। থানার বড় দারোগার কাছে যাব, সার্কেল অফিসারের কাছে যাব, আদালতের মুনসেফের কাছেও যাব আমরা। দরগায় দরগায় সিন্নি মানতে হবে। যে পীর এখন দোয়া করে।"

ব্যাপারটা আইনুদ্দিনকে ওরা আরো ভাল করে বুঝিয়ে বলল। গ্রামের লোকজন নিয়ে সরকারী সাহায্যের জন্যে দরবার করতে যাচ্ছে তারা। ধান নেই, চাল নেই, নুন নেই, তেল নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, গাঁয়ের গরিব লোক বাঁচে কী করে! একথা সরকারী লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে সাহায্যের দাবি করতে হবে। তার জন্যে জনবল দরকার। দুজন একজনের কাজ নয়। যত বেশী পারে, নৌকো বোঝাই করে ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার লোকজন নিয়ে হাজির হবে শহরে। কিছু-না-কিছু সাহায্য মিলবেই। শোনা যায়, চণ্ডীদাসদির লোকেরা নাকি এইভাবে গিয়ে ধান আর কাপড় আদায় করেছে।

শুনে আইনুদ্দিন উল্লসিত হয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে মাস্টার মৌলবীদের সঙ্গে। এর আবার আপত্তি করবার কী আছে? তাছাড়া এত লোকজন দেখে মনে ভারী বল এল আইনুদ্দিনের। তাহলে সত্যিই দরিয়া সেচবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এরা। সবাই মিলে জোট বাঁধলে, সব মিলে একসঙ্গে বৈঠা চালালে বন্যার জল না কমাতে পারলেও এই দুঃখের দরিয়া তারা পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই পারবে। আধময়লা আধাভেজা জামাটা গায়ে দিয়ে তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে চেপে প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে চলল আইনুদ্দিন। নৌকোয় উঠবার আগে মেয়েকে আর একবার ডেকে বলল, "চললাম মা, সাবধান হইয়া থাইকো।"

ময়না বলল, "বাজান, আমার সেই ফিতা জলে ভাইসা গেছে। আমার জন্যে রাঙ্গা ফিতা আইনো।"

"আইচ্ছা।"

"আর গন্ধ তেল। মাথায় মাখব।"

"আইচ্ছা।"

"আর এক সের কেরোসিনও মনে কইরা আইনো বাজান। আমি কিন্তু আইজ আর অন্ধকারে থাকতে পারব না।"

আইনুদ্দিন এবার হেসে বলল, "সব আনব। তোমার জন্যে ভাঙ্গার বাজারখান সুদ্দা নিয়া আসব মা।"

নিজের ছোট্ট ডিঙিখানা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল ঘরের খুঁটির সঙ্গে। তালা-চাবি আর লাগাল না। দেখবার জন্যে জোবেদাই তো আছে। বড় নৌকোয় উঠে বৈঠা হাতে নিল আইনুদ্দিন। ভাইপো মৈনুদ্দিন বলল, "আমিও আয়ি চাচা।" সেও চলল সঙ্গে। যতগুলি মানুষ প্রায়, ততগুলি বৈঠা। যেন বাইচের নৌকো চলেছে, বন্যার সঙ্গে বাইচ। কে বলবে গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষ অভুক্ত অর্ধভুক্ত রয়েছে কদিন ধরে। কে বলবে এদের গায়ে জোর নেই, মনে জোর নেই। এতগুলি বৈঠার ঝপাত-ঝপ শব্দ শুনে, এত বড় নৌকোখানাকে তীরের মত ছুটে চলতে দেখে কারো তা সাধ্য আছে বলবার? ঘাটে ঘাটে আরো লোক উঠল, আশেপাশে পিছনে আরো নৌকো ছুটল। খাল ছাড়িয়ে নদীতে পড়ল নৌকো। কুমারের এপার ওপার সব একাকার হয়ে গেছে। নদী নয়, যেন সমুদ্র। স্রোত উজান বাতাস উজান। তবু সেই উজানের বিরুদ্ধে ছুটে চলল নৌকো।

শহরও জলে তলানো। কালীবাড়িতে জল, মসজিদ বাড়িতে জল, থানায় জল, কাছারিতে জল। দোকানপাট স্কুল আদালত সব জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। দলের মুখপাত্র ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার সহজে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারল না। অফিসারেরা বজরায় করে বন্যা দেখতে বেরিয়েছেন, গ্রাম গ্রামান্তরে লোকজনের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে গেছেন। ফিরে আসতে আসতে বেলা তিনটে বাজল। দারোগা সাহেব গোপাল আর ইসমাইলের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনলেন এবং উপর থেকে যে সাহায্য আসছে, সে আশার বাণীও শোনালেন। দু একদিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট এদিকটা দেখতে আসবেন। তখন নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা হবে। হাতে হাতে তিনি আর কী দিতে পারেন? তাঁর সাধ্য কি। সব ওপরওয়ালার হাত।

লোকজনের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মাতব্বররা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের শান্ত করল। নৌকোয় উঠে ফের সবাই বৈঠা হাতে নিল। আগেকার মত উৎসাহ আর কারো মনে নেই। জোর নেই হাতের বৈঠায়। পেটে খিদে, বুকে জ্বালা, দেহমন অবসন্ন। বেলা পড়ে এসেছে। মাথার উপরের সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। হাতের বৈঠা পড়ে কি পড়ে না। আশ্চর্য বাৎসল্য আইনুদ্দিনের, এরই মধ্যে সে জল ভেঙে ভেঙে শহর খুঁজে খুঁজে চুলের ফিতা, গন্ধতেল, আর কেরোসিন তেল জোগাড় করে এনেছে। পাছে লোকে দেখে ঠাট্টা করে, তাই ছাতার তলায় লুকিয়ে রেখেছে জিনিসগুলি। তবু কারো কারো চোখে পড়ল। এবং এই নিয়ে টিকাটিপ্পনিও কাটল কেউ কেউ। কিন্তু তারা তো জানে না এই মেয়ে আইনুদ্দিনের কী, আগে পিছে আরো দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল তাদের। একটি জ্বরে, আর একটি কলেরায় শেষ হয়েছে। এখন ওই ময়নাই সব। একজন নয়, তিনজনের আদর ও একা ভোগ করে।

ঘাটে ঘাটে—ঘাটে ঘাটে নয়, ঘরে ঘরে, এখন ঘরই ঘাট—ঘরে ঘরে লোক নামিয়ে দিতে দিতে নৌকো প্রায় খালি হয়ে গেল। খালের ভিতর দিয়ে, সিকদার আর কাজী বাড়ির মাঝখান দিয়ে আইনুদ্দিনদের বাড়ির সীমানায় নৌকো এসে লাগতে-না-লাগতেই ভিতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। আরো দু' একখানা ডিঙি এগিয়ে এল বড় নৌকোখানার কাছে।

আইনুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বলল, "ব্যাপারডা কী। কান্দে কেডা। কী হইছে ছদন?"

ছদন ধরাগলায় বলল, "কিছু হয় নাই। আইস, ভিতরে আইস মেঞা ভাই।"

আইনুদ্দিন বলল, "কিছু হয় নাই তো আমার উঠানের ওপর অমন হাট মেলছে ক্যান। এত গোলমাল এত লোকজন কিসের।"

আর গোপন রাখা গেল না। নিজের চোখেই সব দেখতে পেল আইনুদ্দিন। তার সেই ডিঙিখানায় ময়নাকে শুয়ে রাখা হয়েছে। চোখ দুটি বোজা। ঠোঁট দুটি নীলচে। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে! চারদিকে লোকের ভিড়। মাচা থেকে ঘরের মেঝেয় জলের

মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে জোবেদা। সিকদারদের বড় বিবি, করিমের মা, দুজনেই তাকে টানাটানি করছে। কিন্তু কেউ তুলতে পারছে না।

ছদন শেখের মুখে ঘটনাটা সবাই শুনতে পেল। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে মাচার উপরে মাদুর পেতে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ছিল জোবেদা। কাল রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি। তাই শুতে-না-শুতেই চোখ ভেঙে কালঘুম এসেছিল। কখন যে ময়না কোলের কাছ থেকে উঠে গেছে সে জানতেও পারেনি। ঘরের মধ্যে মাচার ওপর দিনের পর দিন বসে থেকে থেকে ময়নারও হাঁপ ধরে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে সে ডিঙিতে উঠে বসেছিল। বেশিক্ষণ সেখানেও বসে থাকতে ভাল লাগেনি। দড়ির বাঁধন খুলে লগি ঠেলে উঠান-সমুদ্রের এপার-ওপার হবার চেষ্টা করেছিল ময়না। কিন্তু খোঁচ দিয়ে বোধ হয় টাল সামলাতে পারেনি।

মৈনুদ্দিনের বউ লালবানুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় জোবেদার। "গেল গেল, ও চাচী, তোমার মাইয়া ডুইবা গেল। ধর ধর, সব্বনাশ হইল।"

ভর দুপুর। ধারে কাছে পুরুষ ছেলে কেউ ছিল না। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই সাহায্যের আবেদনের জন্যে শহরে গেছে। ছদন-বদনরা কাজের চেষ্টায় গিয়েছিল দক্ষিণ-পাড়ার দিকে। এসে দেখে এই কান্ড। মৈনুদ্দিনের মা বউ আর জোবেদা তিনজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। কিন্তু সহজে খুঁজে পায়নি, তাড়াতাড়ি তুলতে পারেনি। যখন তুলেছে, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। গাঁয়ের শ্যাম ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল ছদন শেখ। তিনি এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা টরিক্ষা করে শেষে জবাব দিয়ে গেছেন। এখন আর কারো কিছু করবার নেই।

আইনুদ্দিন ফের ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিল। ধরে রাখল জোর করে।

ইয়াসিন বলল, "আর ডাক্তার-বৈদ্যের কাছে দৌড়াইয়া কী হবে মেঞা। এখন বউডারে সামলাও, খোদার নাম কর।"

আইনুদ্দিন রুখে উঠল, "খবরদার! সে শালার নাম আমার কাছে কেউ কইরো না। তোমরা। কইরো না কইয়া দিলাম।"

শোকার্ত বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ বাদে প্রতিবেশীরা প্রায় সবাই বিদায় নিল। ইয়াসিন আর ছদন শেখ রয়ে গেল শেষ কাজ করবার জন্যে। কিন্তু জোবেদা কিছুতেই ছাড়বে না মেয়েকে। সে জোর করে ময়নাকে ডিঙি থেকে তুলে মাচার উপরে শুইয়ে দিল। উপুড় হয়ে আগলে রইল তাকে।

নিতে পারবা না... কাইড়া নিতে পারবা না

"নিতে পারবা না। কেউ আমার দিলজানরে আমার কাছ থিকা কাইড়া নিতে পারবা না তোমরা।"

ইয়াসিন বলল, "যে যাবার সে তো চইলা গেছে বউ। এখন রইছে কেবল মাটিটুকু। মাটিরে মাটির সাথে মিশা থাকতে দাও। মাটির নীচে শান্তিতে ঘুমাইয়া থাউক তোমার ময়না।"

জোবেদা প্রতিবাদ করে উঠল, "মিছা কথা, মিছা কথা কইতেছ তোমরা। এই জলের দেশে মাটি কোথায় পাবা যে মাটির নীচে শোয়াবা আমার জানরে। তোমরা ওয়ারে জলে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যে আইছ। তা আমি দিতে দিমু না। যে পানি আমার এমন সব্বনাশ করল তারে দিমু না আমি। দুইটা দিন সবুর কর। পইচা গইলা আমি আগে মাটি হই। সেই মাটি দিয়া ঢাইকো আমার জানরে, তবু পানিতে দিয়ো না।"

ছদন বলল, "কাইন্দা আর কি করবা বউ, খোদারে ডাক।"

জোবেদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "না খোদা, তোমারে আর ডাকব না, তুমি নাই, তুমি নাই। বানের জলে ধুইয়া গেছ, ভাইসা গেছ, তলাইয়া গেছ তুমি।"

অবুঝ মার বুক থেকে ইয়াসিনরা শেষ পর্যন্ত ময়নার মৃতদেহকে জোর করে কেড়ে নিল। সাদা কাপড় জড়িয়ে নৌকোয় তুলল তাকে। খান তিনেক কোদাল নিল সঙ্গে। ভিটে ঘাটায় যদি কোথাও এক ফোঁটা মাটি পাওয়া যায়। নৌকোয় করে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত সারাগ্রাম ঘুরে বেড়াল। না, কোথাও একফোঁটা শুকনো মাটি নেই। নদীর ধারে কালী খোলায় হিন্দুদের শ্মশানের উপর গলাজল। মাঠের ধারে মুসলমানের কবরখানা অনেক আগেই তলিয়েছে। তাছাড়া কত উঁচু উঁচু জংলা ভিটা ছিল। সব ডুবেছে। বাইশ সদরদির এত বড় মৌজায় এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। অন্ধকারে শেষ পর্যন্ত কুমারের স্রোতে ময়নাকে ছেড়ে দিয়ে এল তারা।

নদীর জলে আইনুদ্দিনের চোখের জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। আইনুদ্দিন বলল, "যাও দিলজান, মাটির দেশে যাও। আমি তোমার মাটির ব্যবস্থা করতে পারলাম না। নিজের মাটি তুমি নিজেই খুঁইজা নিও।"

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল আইনুদ্দিন। সংজ্ঞা হারিয়ে জোবেদা তখনও ঘরের মেঝেয় জলের মধ্যে পড়ে আছে। পাঁজাকোলে করে তাকে তুলে নিল আইনুদ্দিন। শাড়ি বদলে দিল, কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে দিল চুলের রাশ। জেগে উঠল জোবেদা। সারারাত স্বামী-স্ত্রী সেই অন্ধকারে বাঁশের মাচার উপর স্তব্ধ হয়ে জেগে রইল। আজ আর তাদের মাঝখানে কেউ নেই। আজ ঘরে কেরোসিন তেল আছে, হ্যারিকেন আছে, দিয়াশলাই আছে, কিন্তু আলো জ্বালবার প্রয়োজন নেই কারো।

জল আরো বাড়তে লাগল। তারপরে শুরু হল বৃষ্টি। অবিরাম বৃষ্টি। কদিনের

মধ্যে লোকের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল। মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়ল ঘরগুলি। আইনুদ্দিনদের খালের ঘাট দিয়ে রোজই একটা দুটো করে গরু ছাগল ভেসে যেতে লাগল। মনে হল কোন কোনটা একেবারে মরেনি। জীবন্ত অবস্থাতেই ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আইনুদ্দিন নির্বিকার।

তারপর শুধু গরুছাগল, কুকুর বিড়াল নয়, কলেরায় দু' একজন করে মানুষও মারা যেতে লাগল। আইনুদ্দিনেরই বন্ধু জোয়ান রহমৎ কাজী মারা গেল হঠাৎ। তার বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। পাড়া-পড়শীরা অনেকেই ছুটে গেল। কিন্তু আইনুদ্দিন আর জোবেদা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। দুনিয়ার কোন ঘটনাই আর তাদের টলাতে পারে না।

আবার দেখা গেল, ইসমাইল আর গোপাল মাস্টারের নৌকো। ছাত্রদের নিয়ে, গাঁয়ের যুবকদের নিয়ে তারা নিজেরাই এবার এক সেবা-সমিতি খুলেছে। সচ্ছল সম্পন্ন গৃহস্থদের কাছ থেকে টাকা চাল আর পুরনো কাপড় চেয়ে নিয়ে গরীবদের বিলাচ্ছে। সেই নৌকোয় বৈঠা ধরবার জন্যে আইনুদ্দিনকেও তারা ডাকতে এল। টাকা পয়সা দিয়ে তো সাহায্য করতে পারবে না। গায়ে খাটতে পারবে। তাই খাটুক দশজনের জন্যে। কিন্তু আইনুদ্দিন বলল, "না মাস্টার আর না। তোমাগো নায়ে আর ওঠব না আমি। তোমাগো চক্রান্তে পইড়া আমার সব গেছে।"

গোপাল মাস্টার অনেক করে বুঝাল, "তোমারই পাড়া-পড়শী ভাইবন্ধুরা কষ্ট পাইতেছে আইনুদ্দিন। না খাইয়া, যা তা খাইয়া, রোগে ভুইগা ভুইগা মরতেছে।"

আইনুদ্দিন নিস্পৃহ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "মরুক গিয়া। দুনিয়ায় মরবার জন্যেই তো সব আইছে। মানুষ মরবে এ আর এমন বেশী কথা কী।"

হুঁকো হাতে আইনুদ্দিন ফের ঘরের মাচার উপরে গিয়ে বসল। এ-মাচাও মচমচ করতে শুরু করেছে। এ-মাচাও ভাঙল বলে। তার ঘরখানাও হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে। যদি পড়ে, আইনুদ্দিন আর নতুন করে ঘর বাঁধবে না। বন্যার জল তাকে আর জোবেদাকে যেখানে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে-পথে ময়না গেছে, সেই পথেই যাবে তারা। বানের জলে স্নেহমমতা, দয়া-মায়া ক্ষুধার যন্ত্রণা, শোকের জ্বালা, কিছুই আর বাকি থাকবে না। সবভাসানী সব ভাসাবে।

পরদিনও অশ্রান্ত বৃষ্টি। সারাদিন আইনুদ্দিন আর বাইরে যেতে পারল না। বাইরে যাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছাও হল না। এই জলবৃষ্টির মধ্যে কে আর তাকে কাজ দেবে, কে দেবে খয়রাত। ঘরে অল্প যা একমুঠ চাল ছিল তার সঙ্গে কচু আর শাপলা মিশিয়ে সিদ্ধ করল জোবেদা। কোন রকমে দুগ্রাস মুখে দিয়ে জড়সড় হয়ে দুজনে পড়ে রইল মাচার উপর। যেভাবে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, আর উল্টোপাল্টা বাতাস বইছে সঙ্গে সঙ্গে, তাতে ঘর ভেঙে পড়বার আগেই আকাশটা সুদ্ধ চালের উপর ধ্বসে পড়বে। আজ প্রলয় হবে পৃথিবীর। কেউ রক্ষা পাবে না। রক্ষা পেতে চায়ই বা কে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে একজন স্ত্রীলোকের গলা শোনা গেল, "ও আনু মেঞা, ও জোবেদা বিবি, দুয়ার খোল, দুয়ার খোল। বাচাও বাচাও।"

প্রথমে মনে হল আইনুদ্দিন ভুল শুনছে। এই জলবৃষ্টির মধ্যে কে আসবে তাদের দুয়ারে। আসবেই বা কী করে। চারদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল। জনমানুষ কেউ আছে নাকি সংসারে যে আসবে।

আইনুদ্দিন বলল, "শুইয়া থাক জোবেদা, ও আমাগো কানের ভুল, মনের ভুল।"

কিন্তু জোবেদা বলল, "না দেইখা আসি। মাইনষের গলা শোনলাম, এখন গোংরানি শোনতেছি, কাতরানি শোনতেছি। দেইখা আসি কেডা অমন করে।"

জল ভাঙতে ভাঙতে দোর খুলল জোবেদা। তাদের বারান্দায় এক হাঁটু জলের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক বসে বসে কাতরাচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে জোবেদা তাকে চিনতে পেরে বলল, "ওমা, এযে সদু মিঞার পরিবার সাকিনা।"

সাকিনা কাতর স্বরে বলল, "হ দিদি আমিই। আমারে ধইরা তোল, মইরা গেলাম আমি।"

আইনুদ্দিনও এবার উঠে দাঁড়াল। আলো জ্বালল ঘরে। তাকে দেখে মুখ নিচু করল সাকিনা। তবু আইনুদ্দিন সবই বুঝতে পারল। ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে মাস ছয়েক আগে সদু মিঞার জেল হয়েছে। তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এতদিন বাড়িতে বাড়িতে ধান ভেনে খাচ্ছিল। এই বর্ষার ক' মাসে খুবই বিপাকে পড়েছে। তার ঘরে কোমর অবধি জল। দেখবার শোনবার কেউ নেই। এতদিন সে কী করে টিঁকে আছে তাই আশ্চর্য।

জোবেদা তাকে হাত ধরে তুলে আনল, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যথা ওঠছে নাকি?"

সাকিনা বলল, "হ।"

জোবেদা বলল, "ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। এই অবস্থায় আইলা কেমনে।"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল সাকিনার। আস্তে আস্তে বলল, "জানের দায়ে আসছি দিদি। ডোঙা ছিল ঘরের কোনায়। তাই বাইয়া বাইয়া আসছি। না আইসা করব কি। ঘরখান আইজ হেইলা পড়ল। ভয় করতে লাগল একলা একলা।"

জোবেদা বলল, "আমার এখনও ভয় করতেছে। কী সাহস তোমার। ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। আইস, ঘরের মধ্যে আইস, মাচার ওপর আইস।"

সাকিনাকে জায়গা করে দিয়ে নিজে বারান্দায় এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল আইনুদ্দিন। বাইরে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে, বাতাসের শব্দের সঙ্গে গর্ভিণী নারীর গোঙানির শব্দ পাল্লা দিয়ে চলল। তারপর শেষরাত্রির দিকে জোবেদা তাকে ডেকে বলল, "আইস, ঘরে আইস এবার।"

এখন আর গোঙানি নয়, স্পষ্ট শিশুর কান্না শুনতে পেল আইনুদ্দিন।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কী হইল?"

জোবেদা জবাব দিল, "মাইয়া।"

রক্তমাখা পুরনো শাড়ি আর আইনুদ্দিনের ছেঁড়া লুঙ্গির মধ্যে শুয়ে শিশুটি তখনো কাঁদছে। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আইনুদ্দিন ফের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর ভোর সময় বেড়ায় ঝোলানো বাঁশের চোঙা থেকে তামাক নেওয়ার জন্যে আবার এল ঘরে। তখন সাকিনার জ্ঞান ফিরেছে।

চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জোবেদাকে দেখে তার হাতখানা চেপে ধরল সাকিনা, তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "তাজা আছে দিদি?"

জোবেদা হাসিমুখে বলল, "হ বুইন, তাজাই আছে। তোমার কষ্টের ফল ফলছে। খোদার দোয়া।"

সাকিনা বলল, "তোমাগোও দোয়া। কী হইছে? ছাওয়াল না মাইয়া?"

জোবেদা আস্তে আস্তে বলল, "মাইয়া।"

বলে স্তব্ধ হয়ে রইল জোবেদা।

সাকিনা হঠাৎ আরো জোরে হাত চেপে ধরল তার, বলল, "দুঃখ কইরো না দিদি। বানের জলে সে-ই আবার ভাইসা আইছে। এ তোমাগো সেই ময়না।"

দাই আর প্রসূতী দুজনের চোখেই জলের ধারা নামল।

জোবেদা মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলল, "না বুইন, না, সেই সব্বনাশীর নাম আর না, আর না।"

আইনুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল, "না না, তার নাম আর না, আর না।"

কিন্তু বুকের ভিতর থেকে প্রাণপাখি নিজের পুরনো নাম ধরে কেবলই ডাকতে লাগল, "ময়না, ময়না, ময়না।"

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুশীলকুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজের যে সকল প্রতিভাবান ছাত্র নূতন যুগান্তকারী শিক্ষার প্রেরণায় বাঙালীর ভাব-জীবনে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ডফ সাহেবের প্রভাবে প্রথম জীবনেই তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া গোঁড়া খৃষ্টান হিসাবে গোঁড়া হিন্দুসমাজের সহিত সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন। তথাপি সেই সময়ের বহু লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও কার্যাবলীর দ্বারা এই তেজস্বী স্বদেশবৎসল পুরুষ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা আজ ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্ধ্বে, গত যুগের ভাব ও চিন্তার অন্যতম নিয়ামক হিসাবে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়াছে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে তারিখে বেচু চাটুয্যে স্ট্রীট ও গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সন্নিকটে স্থিত মাতামহ রামজয় চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের আলয়ে, দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে কৃষ্ণমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম; জ্যেষ্ঠ ভুবনমোহন, কনিষ্ঠ কালীমোহন। জীবনকৃষ্ণের আদি বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগনা বারুইপুরের নিকটবর্তী নবগ্রামে (১)। রামজয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রামজয়ের ছিল পৌরোহিত্যবৃত্তি এবং তৎকাল-প্রসিদ্ধ ধনী, কলিকাতা জোড়াসাঁকোনিবাসী, সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইলেও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না।

ছয় বৎসর বয়সে (১৮১৯ সনে) কৃষ্ণমোহনের বিদ্যারম্ভ হয় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক কালীতলাতে স্থাপিত সেণ্ট্রাল ভার্নাকুলার স্কুল নামক বিদ্যালয়ে। স্কুল সোসাইটির সেক্রেটারিদ্বয় ছিলেন ডেভিড হেয়ার (David Hare) ও রাজা রাধাকান্ত দেব (২); কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন হেয়ার সাহেব। তিনি অল্পদিনের মধ্যে বালক কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত (১৮২২) কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরে তন্নামপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে) লইয়া যান। সেখান হইতে মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৃষ্ণ-

মোহনকে হেয়ার সাহেব ১৮২৪ সনে বিনা-বেতনে উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে প্রেরণ করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত হেয়ার সাহেবের উল্লেখ করিয়া বহু বৎসর পরে ১লা জুন ১৮৪৯ সনে হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত হেয়ার স্মৃতিসভায় কৃষ্ণমোহন সগর্বে বলিয়াছিলেনঃ

At the age of six I became *his* boy—an honour which I continued to enjoy as any other friend now present in his hall :

১৮২৯ সনে ১লা নভেম্বর শিক্ষা সমাপন করিয়া ষোল বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। কলেজ ত্যাগের সময় হাওড়ার রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা (বয়স মাত্র ছয় বৎসর) বিন্দুবাসিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইতিমধ্যে কলেজের নবশিক্ষার প্রভাব কৃষ্ণমোহনের জীবনের উপর গভীরভাবে পড়িয়াছিল। দেশবাসীদেরই আগ্রহে, অর্থে ও পরিচালনায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের জন্য ২০শে জানুয়ারি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নামে হিন্দু হইলেও এই কলেজ ভাবে, গৌরবে ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে অ-হিন্দু মনোবৃত্তির প্রশ্রয়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল—অন্তত প্রথম যুগে ইহাই হইয়াছিল এই কলেজের বিজাতীয় শিক্ষার ফল। বিশেষত ১৮২৬ হইতে ১৮৩১ সন পর্যন্ত এই কলেজের যুক্তিবাদী মাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় তৎকালের শিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাব-জীবন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই বিপরীতধর্মী আদর্শের সংঘর্ষে, বিক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। ডিরোজিওর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চিন্তার বিকাশ; কিন্তু ইহার ফলে হইয়াছিল একদিকে নূতনের উপর সীমাহীন ও অবিবেকী নির্ভরতা, অন্যদিকে পুরাতনের প্রতি অন্ধ ও দৃঢ়মূল বিদ্বেষ। এই দুই অন্তরায়ের মধ্যে পড়িয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বয় তৎকালে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে যেমন নূতন শিক্ষায় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ নিজেদের 'সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু' বলিয়া পরিচয় দিতেন, অন্যদিকে তেমনই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধর্মসভা, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে যাহা কিছু প্রাচীন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিত। ইঁহাদের মধ্যবর্তী ছিল প্রথমে সাধারণভাবে রামমোহন রায়ের ও পরে বিশিষ্টভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী সম্প্রদায়, যাহা ছিল সংস্কারপন্থী ও যুক্তি দ্বারা ধর্মসমন্বয়প্রয়াসী। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষা ও

---

(১) H. Das (Bengal Past and Present, 1929, Vol. XXXVII, p. 134) বলিয়াছেন—দক্ষিণেশ্বরে।

(২) "It was in the Central Vernacular School of the late School Society, of which he (Radhakanta Deb) was secretary conjointly with Mr. David Hare that I received my early education". (Speech at the Memorial Meeting on Raja Radhakanta Deb Bahadur). স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে।

ইংরেজী বুদ্ধির পক্ষপাতী হইলেও হিন্দু কলেজী দলের চরম মনোবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ রামমোহন রায় সমর্থন করিতেন না; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ, খৃষ্টের উপদেশাবলীর উপযোগিতা প্রভৃতি মতবাদ তাঁহাকে হিন্দু সমাজের বিরোধী ও খৃষ্টান পাদরী সমাজের পক্ষপাতী করিয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য, যেমন হিন্দুধর্মের প্রতি তেমনই খৃষ্টধর্মের প্রতিও কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি নব্য-বঙ্গের বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট; কিন্তু কলেজী শিক্ষার ফলে যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া, প্রবীণ ও প্রতিপত্তিশালী রামমোহনের আনুকূল্যে, গোলদীঘি ও হেদুয়া পুষ্করিণীর সংলগ্ন হিন্দুপল্লী ও কলেজ মহলে আস্তানা স্থাপন করিলেন পাদরী ডফ (Duff) ও ডিল্‌ট্রি (Dealtry), যাঁহাদের সকল কর্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকের মনোভাব।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, নূতন শিক্ষার ফলে গতানুগতিকতার মোহভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তখনও পূর্ণ জাগরণ হয় নাই। দিগ্‌ভ্রান্ত হইলেও নব্যবঙ্গের প্রাণশক্তি ছিল অক্ষুণ্ণ ও উদ্দাম; তাই সদ্যঃপ্রবুদ্ধ আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেখা যায় তীব্র অসন্তোষ, অন্ধ অসহিষ্ণুতা, বাদ-প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। আধ্যাত্মিক সংকটে কেহ সমাজ-সংরক্ষণ, কেহ সমাজ-সংস্কার; কেহ ধর্মান্তরগ্রহণ, কেহ পুরাতন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যান; কেহ অন্ধবিশ্বাস, কেহ বা নিছক নাস্তিকের মনোভাব—এইরূপ নানা লোকে নানা পন্থা অবলম্বন করিল। চারিদিকেই দেখা দিয়াছিল পথ খুঁজিয়া লইবার উৎকণ্ঠা। ইহাই ছিল এই যুগের লক্ষণ এবং প্রথম জীবনে, অতি অল্প বয়সে কৃষ্ণমোহনও এই যুগধর্মের বশবর্তী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না। ১৮২৯ সনে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে যখন নব্যবঙ্গের একাডেমিক এসোসিয়েশন (Academic Association) প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পূর্বেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু ডিরোজিওর প্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই এবং কলেজের বাহিরে, ডিরোজিওর গৃহে এই অসাধারণ শিক্ষকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ডিরোজিওর অকালমৃত্যুর সময়ে (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩১), কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তিনিও শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং পরে পেরেণ্টাল একাডেমি (Parental Academy) নামক বিদ্যালয়ে যে স্মৃতি-সভা হইয়াছিল, তাহার তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত নব্যবঙ্গের ভাবপ্রকাশের জন্য কোনও সাময়িক পত্রিকা ছিল না। ১৮৩১ সনে প্রকাশিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রিফর্মার (Reformer) নামক সাময়িক পত্রটি নামানুযায়ী সংস্কারপন্থী ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের সব কিছুর বিরোধিতা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য ১৮৩১ সনের ১৭ই মে তারিখে কৃষ্ণমোহন এনকোয়ারার (Enquirer) নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন। (৩) ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সংকীর্ণ রীতিনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। কিন্তু কেবল লেখার মধ্যে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষ্ণমোহন প্রাচীন রীতিনীতির বিধিনিষেধ মানিতেন না। খাদ্যাখাদ্যেরও বিচার ছিল না। একদিন নব্যবঙ্গের চাপল্যের ফলে কৃষ্ণমোহনের কোন প্রতিবেশীর গৃহে একখণ্ড গোমাংস বা গো-হাড় নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ওই অঞ্চলের সমাজনেতারা কৃষ্ণমোহনকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ দিলেন। তিনি এই আদেশ মানিতে রাজি হইলেন না। ফলে তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিয়া হিন্দুপল্লীতে স্থানের অভাবে (৪) কোন ইউরোপীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

তরুণ বয়সে আত্মীয়স্বজনের সহিত এই বিচ্ছেদ তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে ১৮৩১ সনের

(৩) এই পত্রিকার পুরাতন ফাইল এখন পাওয়া যায় না। ইহার শেষ সংখ্যা বাহির হয় ১৮ই জুন ১৮৩৫ সনে। প্রথম সংখ্যায় নাকি আড়ম্বর করিয়া বলা হইয়াছিল:
Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness!

(৪) কৃষ্ণমোহন এই উৎপীড়ন সম্বন্ধে তাঁহার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে উক্তা ছিল the bigot's rage and the fanatic's fulminations!—India Review (1843) পত্রিকায় কৃষ্ণমোহনের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উপকরণ তিনি স্বয়ং যোগাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রথম জীবনের (বিশেষত তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণের) কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

নভেম্বর মাসে কৃষ্ণমোহন The Persecuted নামে ইংরেজীতে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রকাশিত করিয়া গোঁড়া হিন্দু সমাজের ভণ্ডামি, দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপবহুল অভিযান করিলেন। এই নাটকটি এখন পাওয়া যায় না; কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে পাদরী লালবিহারী দে লিখিয়াছেন :

Deeming the columns of his paper not wide enough for the exercise of his satirical powers, he published a drama, which he named "The Persecuted", and in which he showed, with much wit and sarcasm, that those members of the Hindu Community who passed for orthodox were in reality hypocrites, and that, in truth, there was no such thing as caste. (৫)

ইহার পর কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তর গ্রহণের পথ সুগম হইল। ইতিমধ্যে ১৮৩০ সনে স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ কলিকাতায় আগমন করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষোভের সুযোগ লইয়া তিনি কলেজের সন্নিকটে, ঠিক কলেজ-স্কোয়ারের দক্ষিণে, আপন বাসভবনে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ওল্ড মিশন চার্চের পাদরী (Archdeacon) টমাস ডিল্‌ট্রি (১৭৮৪-১৮৬১), যাঁহার প্ররোচনায় পরে (১৮৪৩ সনে) মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হেয়ার প্রমুখ কলেজের কর্তৃপক্ষেরা এবং তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতারা মিশনরীদের অভিপ্রায় পছন্দ করিলেন না; এবং একটি বক্তৃতার পর পাদরী সাহেবের বাকী বক্তৃতাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণমোহন ডফ সাহেবের সহিত পরিচিত হইলেন। যুবক কৃষ্ণমোহন তখন ছিলেন জিজ্ঞাসু (Enquirer) নিছক যুক্তিবাদী এবং ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাসী; কিন্তু ডফ সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। ডফ সাহেবও উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগী হইয়া ১৮৩২ সনের ১৭ই অক্টোবর তারিখে ডফের গৃহে তৎকর্তৃক উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। (৬) ডফ সাহেব ছিলেন স্কচ চার্চের সম্প্রদায়ভুক্ত; দীক্ষা গ্রহণের পর স্বাধীনচেতা কৃষ্ণমোহন উক্ত চার্চের মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। সেই জন্য ডফ কর্তৃক দীক্ষিত হইলেও কৃষ্ণ-মোহন অবশেষে চার্চ অফ ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইলেন (৭)।

কলেজ পরিত্যাগের পর কৃষ্ণমোহন হেয়ার সাহেবের পটলডাঙা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁহাকে এই পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর (১৮৩৩ সনে) তিনি চার্চ মিশনারী সোসাইটির মির্জাপুর ইংরেজী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন (১৮৩৬ সন) পর্যন্ত। এই সময় হইতে নবগৃহীত ধর্মের প্রচারের জন্য তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দেখা যায়। ১৮৩৩ সনে ছোটনাগপুর চাইবাসা স্কুলের ছাত্র ব্রজনাথ ঘোষকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য ফুসলাইয়া পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিবার বাবদে তিনি কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হন; এবং বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের (Sir Edward Ryan) বিচারে বালকটিকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা হইতে লোকে যে তাঁহাকে 'ঘরমজানো কেষ্টো' এই শ্লেষব্যঞ্জক নামে অভিহিত করিত তাহা বিচিত্র নহে। ইহার পর কিছুদিন কৃষ্ণমোহন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া (১৮৩৫ সনে) চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট প্যাটন (J. H. Paton) সাহেবের সাহায্যে নিজ স্ত্রীকে পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে পাদরী পদে অভিষিক্ত হইয়া ১৮৩৮ সনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনকে বিশপস কলেজের গির্জায় দীক্ষিত করেন। অতঃপর কৃষ্ণমোহনের জীবন, কার্যে ভাষণে ও রচনায় খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

১৮৩৬ সনে পাদরী ডিলট্রির সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপ্‌স কলেজে বৃত্তিলাভ করিয়া প্রিন্সিপাল ডক্টর মিল (W. H. Mill) সাহেবের নিকট খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব (Christian Theology) এবং গ্রীক লাতিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় তিনি সমীপবর্তী সংস্কৃত কলেজে (স্থাপিত ১৮২৪) সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; পরে বিশপ্‌স কলেজে প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনে পুনরায় রত হন। ২রা জুন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের সংলগ্ন গির্জায় বিশপ উইলসন কর্তৃক কৃষ্ণমোহন পাদরী (Deacon) পদে দীক্ষিত হইলেন।

কিন্তু পাদরীর কাজ করিবার জন্য তাঁহার কোন নির্দিষ্ট গির্জা ছিল না। স্থির হইল, হিন্দু কলেজের সীমানায় একটি গির্জা নির্মিত হইবে; কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষদের বিরোধিতায় তাহা হইল না। তাহার

---

(৫) Recollections of Alexander Duff, London 1879.

পৃঃ ৩১। লালবিহারী দের মতে গোমাংস নিক্ষেপ ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল আগস্ট ১৮৩১ সনে।

(৬) ডফ সাহেব তাঁহার India and India Missions (Edinburg 1839, pp. 652-54) গ্রন্থে ইহার একটি নিজস্ব বিবরণ দিয়াছেন।

(৭) এই মতপরিবর্তন লইয়া India Review পত্রিকায় বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

পরিবর্তে হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রস্তাবিত গির্জা এক বৎসরের মধ্যে ক্রাইস্ট চার্চ এই নামে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ সনে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কৃষ্ণমোহন ইহার আচার্য পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৫২ সন পর্যন্ত তের বৎসর অধিষ্ঠিত হইলেন। এখানে বরাবর বাংলা ভাষায় প্রার্থনাদি করিতেন। তাঁহার উপদেশগুলি ১৮৪০ সনে উপদেশ কথা (৮) এই নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাইবেলের বিভিন্ন বাক্যাংশ অবলম্বন করিয়া বারটি উপদেশ বা sermon আছে, যাহাতে খৃীষ্টধর্মের যাথার্থ্য ও মহিমা বিবৃত করা হইয়াছে। ভূমিকায় বলা হইয়াছে, পরলোকগত রামমোহন রায়ের বেদান্ত বিষয়ক রচনাগুলি এবং তত্ত্ববোধিনী সভার তৎপরতা (৯) খৃীষ্টধর্ম প্রচারের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেকস্থলে হিন্দু শাস্ত্রাদি বিশ্বাস্য নয় এইরূপ দেখান হইয়াছে!

এই সময় ডফ প্রভৃতি (১০) শ্বেতাঙ্গ পাদরীদের প্ররোচনায় কৃষ্ণমোহন প্রমুখ দেশীয় পাদরীগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজেও আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া হইল। এই আন্দোলনের ইতিহাস এখানে বিবৃত করা এখন নিষ্প্রয়োজন; শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, কেবল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও বক্তৃতা দ্বারা খৃীষ্টধর্ম প্রচার নয়, হিন্দু ধর্মের অযথা নিন্দা ও হিন্দু সন্তানগণকে খৃীষ্টান করিবারও প্রবল চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের সহায়তায় হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সনে পাদরী ডিলট্রি কর্তৃক খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং কৃষ্ণমোহন স্বয়ং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ১০ই জুলাই ১৮৫১ সনে দীক্ষিত করেন। পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁহার দীক্ষাগুরু কৃষ্ণমোহনের প্রথমা কন্যা কমলমণির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে খৃীষ্টধর্ম প্রচারকদের যে খুব সাফল্য লাভ হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। ১৮৬৩ সন পর্যন্ত হিন্দু পল্লীর মধ্যে বসিয়াও ডফ সাহেব মাত্র তেরটি শিক্ষিত যুবককে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে কৃষ্ণমোহন ও পরে লালবিহারী দে ছাড়া কেহই তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণমোহন ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কতকগুলি খৃীষ্টানী পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যথা, ১৮৪২ সনে রচিত একটি বাংলা Catechism বা 'তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোত্তর'; 'ধর্মপোষক বক্তৃতা' or a sermon preached in Christ Church, Calcutta 1947; মহাত্মা জান মিয়ুর দ্বারা...রচিতা ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রধারা or The Course of Divine Revelation ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে এগুলি বিস্মৃতপ্রায় এবং ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল সাম্প্রদায়িক রচনার মধ্যে একটি বাদানুবাদমূলক পুস্তিকা কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা হইতেছে—সত্যস্থাপন ও মিথ্যানাশন। অর্থাৎ মিয়ুর সাহেবের রচিত মতপরীক্ষা নামক গ্রন্থের শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন দ্বারা যে উত্তর প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এবং শ্রীযুৎ কাশীনাথ বসুর পুস্তকের প্রত্যুত্তর॥ ইহা ইংরেজী (১১) ও বাংলায় রচিত (পৃষ্ঠাসংখ্যা xvi+34)। তর্কপঞ্চাননের পুস্তিকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; সেইজন্য ইহার বহুল প্রচার হয় নাই। কিন্তু বাগবাজারনিবাসী কাশীনাথ বসু বাংলায় ও অসংযত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; সুতরাং পুস্তকদ্বয়ের উত্তর আবশ্যক হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণমোহন ইংরেজী ও বাংলাতে Dialogues on the Hindu Philosophy (১৮৬১) বা ষড়দর্শন সংবাদ (১৮৬৭) এবং ইংরেজীতে The Arian Witness (১৮৭৫) নামে দুইখানি বৃহত্তর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, যাহার পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল খৃীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিতেছি।

খৃীষ্টধর্মে কৃষ্ণমোহনের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি কেবল সংকীর্ণমনা পাদরী ছিলেন না। ধর্ম ছাড়াও শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে ও দেশের কল্যাণকর নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ও উদ্যমের অভাব ছিল না। তাঁহার জীবনের এই দিকটি আলোচনা না করিলে তাঁহার কর্মকীর্তির বিবরণ সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ হইবে না।

১৮৪৬ হইতে ১৮৫১ সন পর্যন্ত তের খণ্ডে এ-পিঠ ও-পিঠ ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল (১২) তাঁহার বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৩) বা Encyclopeadia Bengalensis. প্রথম 'কাণ্ড'-এর বাংলা 'মঙ্গলাচরণ'-এ এই রচনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ

"গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বর্ণনা করা বহুদিবসাবধি আমার অভিপ্রেত ছিল। (১৪) বাল্যাবস্থাবধি আমার বাসনা ছিল যে স্বদেশীয়বর্গের সুশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিব। পরে খৃীষ্টীয় ধর্মের অবলম্বনে সে বাসনা আরও দৃঢ় ও পবিত্রীকৃত হয়।......তাহাতে বিষাদপূর্বক বুঝিলাম যে পুরাবৃত্ত ও যথার্থ ঘটনায় অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সত্যপথে লোকের বুদ্ধি চেষ্টায় এমত ব্যাঘাত জন্মিতেছে যে মিথ্যা জ্ঞানের শৃঙ্খল হইতে কোনক্রমে মুক্ত হইতে পারে না।......বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয়

---

(৮) সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাবে প্রচারিতা উপদেশ কথা গৌড়ীয় ভাষয়া শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েন ভগবৎ খৃীষ্টমণ্ডল্যাঃ পুরোহিতেন রচিতাঃ অধ্যক্ষস্য পাঠশালায়া যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিতা অষ্টোদিভিঃ পুস্তকবিক্রেতৃভির্বিক্রীতাঃ স্যুঃ শকাব্দ ১৭৬২ খৃীষ্টীয় শকে ১৮৪০—পৃষ্ঠাসংখ্যা vi+212+সংশোধনপত্র ২ পৃষ্ঠা ইংরেজী ভূমিকায় Cornwallis Square. May 1840 এইরূপ নির্দেশ আছে।

(৯) তত্ত্ববোধিনী সভা ও তৎপরিচালিত পত্রিকার ইহাই আপত্তি ও আন্দোলনের বিষয় ছিল যে, পাদরীগণ তাঁহাদের অবৈতনিক স্কুলগুলিকে খৃীষ্টানী শিক্ষার ও খৃীষ্টান করিবার কেন্দ্র করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দু নেতারাও অনুরূপ অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রযত্নে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ১লা মার্চ ১৮৪৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই ছিল বিবাদের মূল; এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (পৃঃ ১৫২-৫৬) দ্রষ্টব্য। পরে হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক, কৈলাসচন্দ্র বসু, খৃীষ্টান হইলে (১৮৪৮ সনে) এই আন্দোলন বৃদ্ধি পায়।

(১০) ডফ সাহেব ১৮৬৩ সনে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

(১১) **Truth defended and Error exposed. Strictures upon Hara Chandra Tarkapanchanan's Answer to Mr. Muir's Mataparikshа, and upon Babu Kashinatha Bosu's Tract on Hinduism and Christianity by the Rev. K. M. Banerjee, Minister of Christ Church, Cornwallis Square, Calcutta: Printed at Bishop's College Press: Ostell and Lepage, British Library 1841.**

(১২) কেবল বাংলাতেও ছাপা হইয়াছিল।

(১৩) বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ক রচনা শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীতা।

(১৪) পড়িবার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত অংশে ছেদ প্রভৃতি বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রযুক্ত হইল।
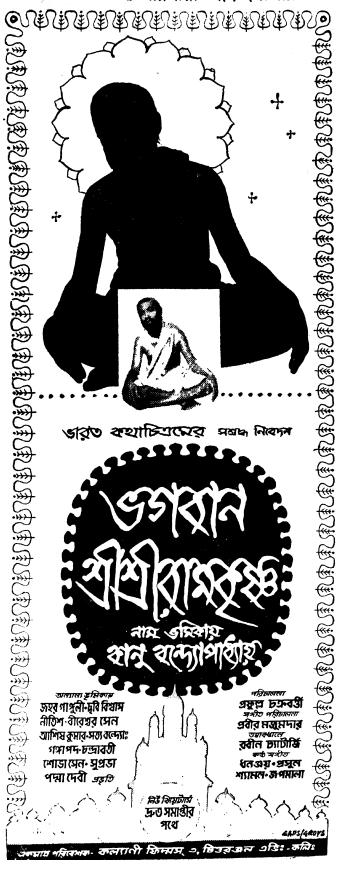
ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ-বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে।......কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে। অতএব অসাধ্য-জ্ঞান করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত বিরত ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া (১৫) উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্রপরিমাপ জ্যোতিষাদি শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তারপূর্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। যে ২ গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি।...... আমার অভিপ্রায় এই যে...সকলের হৃদ্বোধক কথা ব্যবহার করিব, তথাচ রচনার মাধুর্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে ত্রুটি করিব না। কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতর বোধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিব না। জ্যোতিষ পদার্থ ও নীতিবিদ্যাতে অনেক পারিভাষিক শব্দ ও তর্ক আছে, এজন্য তাহা অবশ্য কিঞ্চিৎ কঠিন হইবে; কিন্তু ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা সহজ করিতে যঙ্গ করিব।"

বিদ্যাকল্পদ্রুমের তের 'কাণ্ড' তারিখ অনুযায়ী এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল:

১৮৪৬

(ক) রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত ১ খণ্ড রোমনগরের নির্মাণাবধি গ্রাকসম্বরের মৃত্যু পর্যন্ত ইউত্রোপিয়াস্ লাটিন গ্রন্থকারকের ব্যাখ্যা। কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৭। The History of Rome Part I Freely translated from [John Clarke's version of] Eutropius and interspersed with additional matter from various sources—

'মঙ্গলাচরণে' ১৪ই মাঘ শক ১৭৬৭, Calcutta 26th January 1846 এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১—১৪০।

(খ) ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ খণ্ড Elements of Geometry Part I 1846. [দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ দ্রষ্টব্য]

(গ) বিবিধ বিষয়ক পাঠ ১ খণ্ড।

---

(১৫) Council of Education তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়াছিল, এবং গবর্নমেণ্ট প্রত্যেক খণ্ডের ৫০০ কপি বাংলা দেশের স্কুলের জন্য খরিদ করিবার আদেশ দেন।

কলিকাতা লালদীঘি ইত্যাদি......ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৮– Miscellaneous Readings or Detached Pieces on Various Subjects, adapted to the comprehension of the Natives of Bengal—Part I Calcutta: Ostell and Lepage, and P.S. D'Rozario and Co. 1846.

ইহাতে আছে প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর বিবরণ (of the Earth) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহাসিক কথা (Narrative and Historical)—যথা, হেরোদোতস প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিক লেখক হইতে নির্বাচিত ইতিহাসকথা, মহাভারত হইতে গান্ধারীর বিলাপ, রামায়ণ হইতে রাম ও ভরতের কথা এবং কালিদাস সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী।

(ঘ) রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত ২য় খন্ড। ১৮৪৬।

১৮৪৭

(ঙ) জীবনবৃত্তান্ত ১ খন্ড যুধিষ্ঠির, কংফুছে, প্লেতো, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড এবং সুলতান মামুদের চরিত্র। কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেন্স সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৮– Biography Part I containing the lives of Yudhisthira [original contribution], Confucius [from Du Halde's description of the empire of China], Plato [from Stanley's Hist. of Philosophy], Vicramaditya [original contribution], Alfred [from Turner's History of the Anglo-Saxons], and Sultan Mahmud [from Elphinstone's History of India]. Calcutta: Ostell and Lepage, and P. S. D'Rozario and Co. 1847. পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৮।

(চ) ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত। রলিন্স এন্সেণ্ট হিস্টরি এবং এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেন্স সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৮।

The History of Ancient Egypt. From Rollin and the Encyclopaedia Brittanica. Calcutta: Ostel and Lepage, and D'Rozario and Co. 1847. পৃষ্ঠাসংখ্যা ১—১৬৯। পুস্তকটি তিনভাগে বিভক্ত—(/০) ইজিপ্ত দেশের বর্ণন (পৃঃ ১—৩৪) (৵০) মিসরদেশীয় লোকের রীতি-নীতি বর্ণন (পৃঃ ৩৫—৭৯)—এই দুই অংশ রলিন হইতে, (৶০) ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত (পৃঃ ৭৯—১৬৯)—Encyclopaedia Britt. হইতে।

(ছ) বিবিধ বিষয়ক পাঠ ২য় খন্ড। Miscellaneous Readings, Part II। টাইটেল পেজে বর্ণনা পূর্বের মত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৮।—তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা, (/০) গল্প ও নীতিকথা (Moral Tales and Legends)—কালযবন, সগর, কালিদাস, পান্ডবদের পতন, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, হস্তী ও অন্ধদের গল্প ইত্যাদি, (৵০) পুরাবৃত্ত বিষয়ক কথা (Historical)—Arnold হইতে হানিবলের বৃত্তান্ত, (৶০) ভ্রমণকারিদের বৃত্তান্ত (Voyages and Travels)—নানা আকরগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

১৮৪৮

(জ) ভূগোল বৃত্তান্ত প্রথম ভাগ কলিকাতা সমাচার যন্ত্রে মুদ্রিত ইত্যাদি পূর্বের মত। ইং ১৮৪৮ শক ১৭৬৯। **Geography. Part I. Containing a description of Asia and Europe. Compiled from Murray's Encyclopaedia of Geography, Molte Brun's Geography, and other works. Calcutta:** etc., as before. 1848.

(ঝ) ক্ষেত্রতত্ত্ব ২য় খন্ড। Elements of Geometry Part II. 1848. এই পুস্তকের দুই খন্ডের অবলম্বন ছিল—First to sixth books of Euclid by John Playfair, with additions by William Wallace, to which is prefixed an extract from Lord Brougham's essay on the objects etc., of science, and a short compendium of algebraic rules from Whewell's Mechanical Euclid, and a selection from Bland's Geometrical problems. and the Lilavati of Bhaskaracharya.

১৮৪৯

(ঞ) নীতিবোধক ইতিহাস। রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার নামক গল্প। সমাচার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৪৯ শক ১৭৭০। Moral Tales, containing the King's Messengers by Rev. W. Adams M.A. And The Reward of Honesty by Maria Edgeworth. Adapted for the use of young readers in Bengal. Calcutta: etc., as before. Printed by Rajkissen Banerjea at the Samachar Chandrika Press, 10, Bechoo Chatterjee's Street, Calcutta 1849.

১৮৫০

(ট-ঠ) চিত্তোৎকর্ষবিধান প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। কলিকাতা বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীযুত হরিহর সান্যাল কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৫০ শক ১৭৭১। The Improvement of the Mind containing Remarks and Rules for the Attainment and Communication of Useful Knowledge by Isaac Watts D.D. Adapted for the use of young Readers in Bengal. Vols I-II. Calcutta: R. C. Lepage and Co. an P. S. D'Rozario and Co. 1850. Printed by Harihar Sandel, Encyclopaedia Press, No. 148 Cornwallis Street, Calcutta.

১৮৫১

(ড) জীবনবৃত্তান্ত। ২ খণ্ড লাইব্রেরি অব ইউসফুল নলেজ নামক গ্রন্থাবলী হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত। গালিলিওর চরিত্র কলিকাতা বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীযুত মনোমোহন দাস কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৫১ শক ১৭৭২। **The Life of Galileo Abridged from The Library of Useful Knowledge. Encyclopaedia Press, No. 148 Cornwallis Street, Calcutta 1857.** যে ইংরেজী জীবনবৃত্তান্ত হইতে বর্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত তাহার লেখক ছিলেন "John Drinkwater Bethune, the late President of the Council of Education." ভূমিকায় এই শিক্ষাব্রতী Bethune (বীটন) সাহেবের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে এই গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত আশয় ও জনশিক্ষার্থে সংকলয়িতার অধ্যবসায় ও সদিচ্ছা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইবে। ইতিমধ্যে ১৮৫০ সনে ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে কৃষ্ণমোহন 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে সংবাদ ছাড়া নূতন গ্রন্থের বিবরণ ও সাহিত্যাদি প্রকরণ থাকিত। মাসিক মূল্য চারি আনা মাত্র। কিন্তু পত্রিকাটি এগার মাস চলিবার পর ২রা আগস্ট ১৮৫১ সনে বন্ধ হইয়া যায়। মার্শমান সাহেবের বিলাত গমনের পর কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণমোহন 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' পত্রের সম্পাদনা করেন। ইতিপূর্বে ১৮৪২ সনে তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির উদ্যোগে প্রকাশিত ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং ১৮৪৪ সন হইতে প্রারব্ধ ইংরেজী 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রেরও (১৬) কৃষ্ণমোহন নাকি লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহিতও বোধহয় তাঁহার যোগ ছিল; কারণ, ২রা বৈশাখ ১২৫৪ সালের প্রভাকরে লিখিত হইয়াছেঃ "বিবিধবিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি স্নেহবশতঃ ইহার সৌভাগ্য বর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।"

নব্যবঙ্গের কল্যাণকামী ডেভিড হেয়ার মহোদয়কে শ্বেতাঙ্গ পাদরীরা দেখিতে পারিতেন না (১৭), কিন্তু স্বাধীনচেতা কৃষ্ণমোহন হেয়ার সাহেবের নিকট তাঁহার ঋণ

---

(১৬) শেষোক্ত পত্রিকায় তিনি নাকি **The Kulin Brahmin of Bengal,** Hindu Caste ও Sanskrit Poetry এই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

(১৭) ইহা উল্লেখযোগ্য, হেয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন না এবং হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত পাদরীদের অভিপ্রায়ে বাধাদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর পাদরীগণ খ্রীষ্টীয় গোরস্থানে তাঁহার দেহ সমাহিত করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে, তাঁহার কর্মক্ষেত্রের নিকটে তাঁহার দেহরক্ষা ও স্মৃতি-স্তম্ভের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; এবং বাৎসরিক হেয়ার স্মৃতিসভায় প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া হেয়ারের স্মৃতিকল্পে যে প্রাইজ ফন্ড গঠিত হয় তিনি তাহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এইরূপ বিপরীতপক্ষীয় হইলেও রাধাকান্ত দেবকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্মরণীয় বীটন (Bethune) সাহেবের মৃত্যুর পর (১৩ই আগস্ট ১৮৫১) ১১ই ডিসেম্বর যে বীটন সোসাইটি স্থাপিত হইল, তাহাতে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ও ইংরেজ মিলিত হইয়া শিক্ষা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহন ইহার সদস্য হইয়া, ২৮শে নভেম্বর ১৮৬৭ সনে ইহার সভাপতি পদে বৃত্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন; এবং ইহার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ (১৮) ও আলোচনায় নিয়মিত-ভাবে যোগদান করিতেন।

(১৮) ফেব্রুয়ারী ১৩ই ১৮৬৮ সনে এখানে পঠিত The Proper Place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education সেই বৎসরেই কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন ক্রাইস্ট চার্চের আচার্যপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই বৎসরই বিশপ্স কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে তিনি নিযুক্ত হইলেন, এবং ষোল বৎসর ১৮৬৮ সন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে সেনেটের ও পরে সিন্ডিকেটের সদস্য এবং আর্টস্ ফ্যাকাল্টির ডীন বা সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহুমুখী পান্ডিত্যের সমাদরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৮৭৬ L.L.D. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল; সেই বৎসর তাঁহার সহিত অন্য যে দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উক্ত উপাধি লাভ করেন, তাঁহারা হইতেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মনিয়র উইলিয়াম্স। বিশপ্স কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি যে অবসর পাইতেন তাহার অধিকাংশ নিয়োজিত হইত প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠার্থীদের জন্য তিনি কুমারসম্ভব (প্রথম সাত সর্গ) ও ভট্টিকাব্য (প্রথম পাঁচ সর্গ) ১৮৬৭ সনে এবং রঘুবংশ (প্রথম নয় সর্গ) ১৮৭৪ সনে ইংরেজী টীকা-টিপ্পনীর সহিত প্রকাশিত করেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির Bibliotheca Indica নামক গ্রন্থমালায় তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১৯) (১৮৬২) ও নারদপঞ্চরাত্র (১৮৬৫) সম্পাদিত করেন। ১৮৭০ সনে শঙ্করভাষ্যের সহিত ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ করেন (২০)। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের দুই অধ্যায়, ভূমিকা ও ব্যাখ্যার সহিত, ১৮৭৫ সনে তিনি প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে ১৮৬৪ সনের ৪ঠা জুলাই বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে Honorary Member বা বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রানুশীলনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশগত ঐতিহ্যের অনুসরণ তিনি এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার প্রমাণ দেখা যায় প্রবীণ বয়সে লিখিত তাঁহার দুই-খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে, যাহাতে তিনি হিন্দু দর্শন ও প্রাচীন আর্য ঐতিহ্যের আলোচনা করিয়াছেন খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া। প্রথম গ্রন্থটি হইতেছে ইংরেজীতে লিখিত Dialogues on the Hindu Philosophy (জুন ১৮৬১) (২১), যাহা পরে (১৮৬২) বাংলায় ষড়্দর্শন সংবাদ (২২) নামে প্রকাশিত

(১৯) ইহা পূর্বে 'পুরাণসংগ্রহ' পর্যায়ে দেব-নাগরী অক্ষরে ইংরেজী অনুবাদ সহিত ১৮৫১ সনে তিনি প্রকাশিত করেন।

(২০) A Biographical Sketch of Rev. K. M. Banerjea by Ramchandra Ghosh, Calcutta 1893, p. 90.

(২১) Dialogues on the Hindu Philosophy, comprising the Nyaya, the Sankhya, the Vedant; to which is added a discussion of the authority of the Vedas, by Rev. K. M. Banerjea, Second Professor of Bishop's College, Calcutta. William and Norgate: London 1861. Pages XIX + 420.

(২২) Dialogues on the Hindu Philosophy Freely rendered into Bengali with certain modifications By Rev. K. M. Banerjea, Second Professor of Bishop's College, Member of the Board of Examiners, Fort William Honorary Member, Royal Asiatic Society, London. ষড়্দর্শন সংবাদ। সত্যমেব জয়তে। Calcutta: Thacker Spink and Co. 1867—পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২৬। পুস্তকটি দশটি সংবাদ বা dialoguge-এ সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (Blumhardt, Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum, London 1886, p. 54).

হইয়াছিল। ইহাতে বিবিধ দর্শন ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাল্পনিক ব্যাখ্যাতৃবৃন্দের কথোপকথন ও তর্কচ্ছলে, ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের এবং বৈদিক বৌদ্ধ ও ভাগবত ধর্মাদির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সবিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এ আলোচনা নিরপেক্ষ নয়; কারণ, গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে ভারতীয় দর্শন ও বেদাদিশাস্ত্র ঈশ্বরাদিষ্ট বা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, অতএব প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। গ্রন্থের শেষ সিদ্ধান্ত হইতেছে (পৃঃ ৪৯৪-৫২৬): "সত্য মুদ্রা বাইবেল শাস্ত্র। উহাতে এমত নিরপেক্ষ প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা লেখকদিগের ঐশ্বরিক উপদিষ্টতা উপপন্ন হয়, এবং উহার তাৎপর্যও এমত উৎকৃষ্ট যে তৎসহকারে বিশুদ্ধ ধর্মের উন্নতি সম্ভবে।" এই সময় বাংলা দেশে শাস্ত্রচর্চার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে (পৃঃ ৫১): "এক্ষণে আমাদের সকলেরি চমৎকার ব্যবহার হইয়াছে। ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সূত্র প্রায় কেহই পড়ে না। ভাষাপরিচ্ছেদ ও বেদান্তসার আমাদের মূলগ্রন্থ হইয়াছে। গৌতমসূত্র কেহ কেহ পড়ে বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রপাঠক অতি বিরল। আর কণাদ কপিল পতঞ্জলি ও জৈমিনির সূত্র পাঠ করা দূরে থাকুক অনেকে তাহা কখনও চক্ষুতে দেখেও নাই। তথাপি আমরা এ সকল বিষয়ে তর্ক করিতে বিরত হই না।" আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী সম্বন্ধে বিদ্রূপ করা হইয়াছে (পৃঃ ৪৬২): "তরুণ বাবুটি রামমোহন রায়ের শিষ্য কিন্তু উহার প্রমাদ সাহস রামমোহন রায়কেও অতিক্রম করিয়াছে।" পরে—"তদীয় আদ্যগুরু রামমোহন রায় শ্রুতি স্মৃতি সর্বশাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে তদনুচরেরা ক্রমশঃ স্মৃতি পুরাণ ব্রহ্মশাস্ত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সহজ জ্ঞানকেই কেবল শিরোধার্য করিলেন।" হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রাদিতে কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্য অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাঁহার পুস্তকটি একদেশদর্শী খ্রীষ্টান মনোভাব লইয়া রচিত বলিয়া নির্ভরযোগ্য হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক The Arian Witness দেশে ও বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। টাইটেল-পেজে যে বিস্তৃত পরিচয় আছে তাহা হইতে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে ধারণা হইবে: The Arian **Witness: or the Testimony of Arian Scriptures in corroboration of Biblical History and the Rudiments of Christian Doctrine, including dissertations on the Original Home and early Adventures** of Indo-Asians. (২৩)

পূর্বোক্ত রচনার মত এই পুস্তকটিরও অভিপ্রায় ছিল দ্বিবিধ—ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক (historical and theological)। আর্যদের আদি বাসস্থান ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হয়ত আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের আলোকে গ্রহণযোগ্য হইবে না; কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক আলোচনা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না। আর্যজাতির প্রাচীন ঐতিহ্য, উপাখ্যান, ও বৃত্তান্ত হইতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাইবেলে যাহা স্পষ্ট অভিব্যক্ত তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে আর্যদের প্রাচীন বেদাদিগ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রজাপতির আত্মোৎসর্গের পূর্বে হইতেই সূচিত হইয়াছে যীশু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ। এইরূপ খ্রীষ্টধর্মের প্রামাণিকতার নিদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্যদিগের ভাব ও চিন্তায় নিহিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, অশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত এই সকল প্রস্তাব সমর্থিত হইলেও নিরপেক্ষ বিচারের অভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। ২৮শে জুলাই ১৮৭৭ সনের Academy পত্রিকায় এই গ্রন্থের প্রতিকূল সমালোচনা হওয়াতে কৃষ্ণমোহন পরিপূরকস্বরূপ লিখিয়াছিলেন **Two Essays as Supplements to the Arian Witness (1880; pp. Vii + 79).**

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের পত্নীবিয়োগ হয়। পর বৎসর তিনি শিবপুর বিশপ্স কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। **Society for the Propagation of the** Gospel নামক প্রতিষ্ঠান হইতে পেন্সন পাইয়া তিনি আর্থিক কষ্টে পড়েন নাই। এই সময় হইতে তাঁহার কর্মক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তার লাভ করে। বীটন সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা বিস্তার ও বিদ্যানুশীলনের প্রতিষ্ঠান ছাড়া, কৃষ্ণমোহন ১৮৭৬ সনে নবগঠিত কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্য (কমিশনর) নির্বাচিত হইয়া (২৪) ১৮৮৫ সনের ৩১শে মার্চ

---

(২৩) Published by Thacker Spink and Co., Calcutta and Trubner Co. 57 and 59 Ludgate Hill, London 1875. ভূমিকায় Ballygunje December 15, 1875 এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে।

(২৪) এই নিয়োগ হইয়াছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে (দুর্গাদাস লাহিড়ী, আদর্শ চরিত কৃষ্ণমোহন, ১২৯২=১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ), পৃঃ ৩২।

পর্যন্ত জনসেবায় মনোনিবেশ করেন। নানাবিধ রাজনীতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন, কারণ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ভারতবাসীর অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োজন একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। বহুপূর্বে ২০শে এপ্রিল ১৮৪৩ সনে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটিতে তিনি যোগদান করেন; কিন্তু তখন রাজনীতির দিকে তাঁহার মন ছিল না। এখন ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত শিশির-কুমার ঘোষের ইন্ডিয়ান লীগের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন; এবং পরে ১৮৭৬ সনে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও তিনি সভাপতি পদ অধিকার করেন। সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর আন্দোলনে তিনি অবতীর্ণ হন, এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পক্ককেশ পাদরী (২৫) সকলেরই নিকট সম্মান লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ইঁহার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণমোহনের চরিত্রের নির্ভীক দৃঢ়তা ও স্বদেশবৎসলতা সম্বন্ধে A Nation in the Making গ্রন্থে (পৃঃ ৬২) বলিয়াছেনঃ

A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associa●d with the Indian League and became president of the Indian Association ... He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruit to our ranks. Never was there a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was such amiability combined with such strength and firmness.

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সি-আই-ই (C. I. E.) উপাধি লাভ করেন; কিন্তু সেই বৎসর ১১ই মে তারিখে তিনি ৭নং চৌরিঙ্গী লেন ভবনে দেহত্যাগ করেন। বিশপ্স কলেজের সীমানায়, তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহার মৃত পত্নীর কবরের পার্শ্বে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

ইহাই হইল সংক্ষেপে কৃষ্ণমোহনের কর্ম-কীর্তির বিবরণ। ডিরোজিওর প্রভাবে আসিয়া তিনি যে আজীবন আপন ধারণানুযায়ী "সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু" ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইলেও, খ্রীষ্টধর্ম সত্য বলিয়া তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাই তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন; শুধু ইংরেজী শিক্ষার বিকৃত রুচিতে বা হুজুগে পড়িয়া নয়; এবং এ সম্বন্ধে তিনি অনেক পড়াশুনাও করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের ও সমাজের গোঁড়ামি, দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আঘাত দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মূলে ছিল এই নবজাগ্রত অনুভব। যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এই তেজস্বী দৃঢ়চেতা পুরুষ তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইতেন না, এবং স্বকীয় মত প্রকাশ করিতে ভয় করিতেন না। তথাপি ইহা উল্লেখযোগ্য, হিন্দুসভার নেতা রাধাকান্ত দেবের সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল না; এবং গোঁড়া খ্রীষ্টান না হইলেও হেয়ার সাহেব তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধেও, স্কচ Presbyterian ধর্মমত বাইবেল-প্রোক্ত উপদেশের অনুযায়ী নয়, এই বিশ্বাসে তিনি স্বীয় দীক্ষাগুরু ডফ সাহেবের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া, স্বেচ্ছায় চার্চ অফ ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ পাদরীদের বর্ণবিভেদ-প্রবণতা তিনি কোনও দিন অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা মূর্তিপূজক; একটি পুস্তিকায় ইঁহাদেরও মতবাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণমোহন যে কেবল শক্তিসম্পন্ন ইংরেজী লেখক ছিলেন তাহা নয়, বহু বর্ষ ধরিয়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষারও চর্চা করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও কৃষ্ণমোহনের বাংলা রচনায় ইংরেজী বাক্যরীতির ছাপ ছিল না বলিলেই হয়; বরং ইহা সংস্কৃতঘেঁষাই ছিল। মিশনরী বাংলার যুগও তখন অতীত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের বাংলা রচনা-রীতি ছিল সরল, অনাড়ম্বর, অথচ উন্নত; কিন্তু তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল গুরুতর জ্ঞানবিজ্ঞান অথবা ধর্ম লইয়া বাদানুবাদ; সেইজন্য তাঁহার লেখাগুলি ঠিক সাহিত্যিক রচনার সরস পর্যায়ে পড়ে না। বাংলা লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন আর একটি কারণে—তাঁহার লেখা ছিল বৈশিষ্ট্যবর্জিত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত বিদ্যাকল্পদ্রুমের ভাষা ছাড়িয়া দিলেও, প্রবীণ বয়সে ১৮৬৭ সনে যখন তিনি তাঁহার ষড়দর্শন সংবাদ রচনা করেন, তখন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও দীনবন্ধু মিত্রের অধিকাংশ পুস্তক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ও কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) বাঙালী পাঠকের গোচরে আসিয়াছিল; কিন্তু রচনা-রীতির দিক দিয়া ষড়দর্শন সংবাদে সেই তুলনায় কোনও উন্নতি দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, বিদ্যাকল্পদ্রুম ভিন্ন তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখাই উগ্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

কিন্তু আজ আমরা কৃষ্ণমোহনকে কেবল খ্রীষ্টধর্মানুরাগী পাদরী বলিয়া স্মরণ করিব না। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহার মন ছিল বাঙালীর মন। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির কল্যাণ কামনা ছিল তাঁহার প্রেরণার নিগূঢ় উৎস। নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় তাঁহার অধিকার ছিল অসামান্য, এবং ইহা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, নিজের আন্তরিক ধারণার অনুযায়ী, ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে। হয়ত তাঁহার ধারণায় ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু স্বদেশবৎসলতায় কোনও ত্রুটি ছিল না। গত যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

(২৫) কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাকে the hoary-headed padre বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাহারা নীল জল। আঃ বাতাস, অত জোরে কেন, খাতার পাতা ফরফরিয়ে ওড়ে, লিখতে পারি না যে! সমুদ্র শান্ত। খুব বড় এক দিঘির উপরে সাঁতার কেটে চলেছি যেন। দোলাচ্ছে আমাদের কোলের শিশুর মত, জাহাজ কেমন ছোট্ট বয়সের দোলনা হয়ে গেছে। হাজার মাইল থেকে বাতাস ছুটে এসে মোলাকাত করছে, খেলা করছে আর এই দেখুন, খেপাচ্ছে। কখানা ডেকচেয়ার খালি পড়ে আছে—বাতাস কাঁপিয়ে নাচাচ্ছে সেগুলো। যাও না বাপু, ওধারে নাচিয়ে এসো, দেখি মুরোদ কতদূর! পাহাড় চাপা আছে ঐসব চেয়ারে। এক এক মহিলা। ডাঙায় যা ছিলেন, জলে এসে, মালুম হচ্ছে, ডবল ফেঁপে উঠেছেন। খাবার-টেবিলে সবগুলো পদ একনাগাড়ে অর্ডার দিয়ে যান—প্রায় কিছু বাদ দেন না। পয়সার বস্তু নিষ্ফলে যাবে না তো! এক-একটা বই মুখে দিয়ে আছেন ও'রা—স্বল্প মূল্যের সাধারণ ক্রাইম নবেল। চোখের সামনে অবাধ সমুদ্র, আর অপরূপ রৌদ্র। দিগন্তের এখানে-সেখানে মেঘ ছড়ানো। মেঘ নড়ে না—প্রায় আমাদেরই মতন। নানান সাজে সেজে গা এলিয়ে আছে। বরফের পাহাড়, কিংবা পেঁজা তুলো গাদা হয়ে আছে। তার পাশে লাল পাথরের প্রকান্ড দুর্গ—ভাঙাচোরা, সর্ব অঙ্গ জুড়ে প্রাচীনতার চিহ্ন। রাজপুতানায় ট্রেনে যেতে যেতে হামেশাই যেমনটা চোখে পড়ে। কিন্তু দেখাই এসব কাকে? ও'রা পণ করেছেন, কোন-কিছু চেয়ে দেখবেন না। দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাজে ঝামেলা পাছে মনে ঢুকে পড়ে। গোয়েন্দা উপন্যাসের ঠুলি পরে পরম সাবধানে আছেন।

কমলানেবু পকেটে উ'চু হয়ে আছে। ব্রেকফাস্টে ফল দেয়। ছাঁদা বাঁধা পুরনো অভ্যাস। ছেলেবেলা ভোজ খেতে গিয়ে পেটে আর ধরছে না—হাত বাড়িয়ে দিই, সন্দেশগুলো দাও দিকি, বাড়ি গিয়ে আয়েস করে খাওয়া যাবে। সেই লোক আমি। টেবিল থেকে বেমালুম পকেটে ফেলেছিলাম, লাঞ্চের পরে ডেক-চেয়ারে আলসে শুয়ে শুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছু'ড়ে দিচ্ছি জলে—

খবরদার!

গডউইন এসে হাত এ'টে ধরল। বে'টে মোটা চতুষ্কোণ চেহারা। সার্জেণ্ট গডউইন—এই নাম দেখেছি যাত্রীর লিস্টে। খটখট খটখট ভারী বুটের আওয়াজ তুলে উপর নীচে পাক দিয়ে বেড়ায়। খাওয়ার পরে এই ভরদুপুরেও বিরাম নেই। নেবু সুদ্ধ আমার হাতখানা যেন ছোঁ মেরে ধরে ফেলল।

খবরদার, খোসা জলে ফেলো না। সিগারেটের টুকরোও না পড়ে যেন জলে! হো-হো করে উদ্দাম মিলিটারি হাসি হেসে পাশের চেয়ার দখল করে বসল।

জাহাজটা এস এস অর্থাৎ স্টিম শিপ নয়—এম ভি—মোটর ভেসল। শৌখিন চেহারা, রাজহংসের মতো সাদা রং, ধোঁয়া নেই, বদখত আওয়াজ নয়। জাহাজ কি বাড়ি ভুল হয়ে যায়। ঘুম ভাঙার পর কয়েক মিনিট তো মনেই পড়ে না আমার।

গডউইন বলে, লড়াইয়ে ইনি বিষম জখম হয়েছিলেন। অল্পের জন্য বে'চে গেলেন মানোয়ারির বহর এসে পড়ায়। আজকের এই বাবুয়ানার মধ্যে সে ক্ষতের এতটুকু দাগ নেই। শোন, নিয়মগুলো জেনে বুঝে রাখ, যদি কখনো তেমনি দিন আসে। সিগারেটের টুকরো কি নেবুর খোসা ফেলবে না সমুদ্রের জলে। সাবমেরিন হয়তো ঘাপটি মেরে আছে, ঐ থেকে জাহাজের নিশানা টের পেয়ে যাবে। রাত্রিবেলা আলো জ্বালবে না কখনো ডেকের উপর, সিগারেট খাবে না। দুশমনের নজর বড্ড ধারালো।

হেসে উঠে অত হাওয়ার মধ্যেই একটু হাতের আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরাল। এ সিগারেট জাহাজে ভারি সস্তা, ডাঙায় বিষম দাম। পাবেন না সহজে—ডাঙার ট্যাঁকে অত বিলাসিতার ভর সয় না।

লড়াইয়ের সময় জাহাজের ছিল মেটে রং। পোর্টহোলের মুখটাও আলকাতরা মাখিয়ে কালো করে দিয়েছিল। কালো পর্দা ঝুলত চারতলার ডেকে, যেখানে কাপ্তেন ও চীফ অফিসার আছেন। তেতলা—দোতলাতেও প্রায় ঐ ব্যবস্থা। দিনমানে এদিক-ওদিক দেখেশুনে ঘণ্টাখানেক শুধু পোর্টহোল খুলে দিত জাহাজের বন্দরে খানিক বাইরের হাওয়া ঢুকিয়ে নেবার জন্য। তখনই সব বন্ধ। বলা তো যায় না,—

কখন টর্পেডো এসে পড়ে! সমুদ্রে আমরা লুকোচুরি খেলে বেড়াতাম। এমনি হাসি-হল্লা আর রাত্রিবেলার অত আলো, ঈশ্বর, ভাবতে পারতাম তখন কেউ?

আধেক-খাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলতে লাগল, তবু কিন্তু নজরে পড়ে গেলাম। ইউবোট জখম করে পালাল। বহর পিছনে ছিল, তাই পালিয়ে গেল—নয়তো একেবারে শেষ করত। জন কুড়িক ঘায়েল হয়েছিল। পুরোপুরি মরেনি হয়তো সবাই, কিন্তু বাছাবাছির সময় কোথা? কুড়িটাকে জল-সই করে এবং কিছু মালপত্তোর ছুঁড়ে ফেলে জাহাজ হালকা করা হল। নয়তো যায় তলিয়ে সব সুদ্ধ—

লড়াই করে করে লোকটার মায়ামমতা নেই। যেন বইয়ে পড়া কোন সেকালের গল্প বলছে। এক জায়গায় বসা ধাতে সয় না, এইটুকুতে হাঁপিয়ে পড়েছে—তড়াক করে উঠে খটাখট বুট বাজিয়ে আবার সে চলল।

কেবিনবয় ভোলানাথ—ভোলা মিঞা, নোয়াখালি জেলার বাসিন্দা। ডি-লাক্স কেবিনের যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও ডেকে ডেকে কাছে বসাই, তাতে সে একেবারে বর্তে গেছে। ফাঁক পেলে কাছেপিঠে ঘুরঘুর করে, একটা কথা জিজ্ঞাসা না করতে বিশ কথার গল্প ফেঁদে বসে। ছ-মাস জাহাজের বাস, তারপর তিনমাস বাড়িতে বসে থাকা। বউ-ছেলেপেলে আর ঘরসংসার সামলানো—সে যে কী বখেড়া, আপনি বুঝতে পারবেন না সাহেব (যেহেতু সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী, কৃষ্ণবর্ণ এবং ধুতির পোশাক সত্ত্বেও সুনিশ্চিত সাহেব)। ডাঙার উপরে চেনাজানা বাস, গাঁয়ের বাইরে গেলেই গোলকধাঁধা। আসলে আমরা দরিয়ার জীব—নজর ফেলেই বলে দেবো, কোন জায়গা দিয়ে কত নটে যাচ্ছি। গোলা মেরে জাহাজ জখম করে দিয়ে গেল, সে হুজুর একবেলারও পথ নয় এখান থেকে। ও বেটার শোনা গল্প, ও কোথায় তখন? আমি ছিলাম। আমি চোখের উপর দেখেছি। ম্যানহোলের ফাঁক দিয়ে মরা-আধমরা লস্করগুলোকে দরিয়ায় পাচার করল। আমারই চোখের উপরে।

ব্যাপারি জাহাজ, মাল বওয়াবয়ি করে—এদিকটায় লড়াইয়ের ডামাডোল নেই, তেমন, নিরুদ্বেগে চলেছে। কাপ্তেন রবার্টস্ ঝানু লোক, জাহাজি কাজ ওদের তিনপুরুষ ধরে। সে রাত্রে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছে, ঠিক যেন দিনমান। ব্রিজের উপর ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে, মুখ তার কঠিন হয়ে উঠল। অভিজ্ঞ সন্ধানী দৃষ্টি ঠিকই সন্দেহ করেছে। চীফ-অফিসার ও চীফ-ইঞ্জিনীয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে এলো সেখানে। তাই বটে, ইউবোট—

গোলা এসে পড়ে। বিষম এক টাল খেয়ে জাহাজ সামলে নিল। হাতিয়ার নেই, লড়বার কথাই ওঠে না। ইউবোট থেকে হুকুম আসে, বন্ধ করো ইঞ্জিন—। কিন্তু রসদপত্র দুশমনের হাতে তুলে দেওয়া যায় কী করে? খুব বেশি তো সাড়ে তেরো নট ছুটতে পারে এ জাহাজ। আর ইউ-বোট কমপক্ষে ষোল। ইঞ্জিনঘরে চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নিজে ঢুকে পড়ল। চোদ্দ নট তুলেছে। সাড়ে-চোদ্দ। গতিবেগে থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। হল না, পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। গোলার ঘায়ে, কি জানি, সাইরেন-যন্ত্রের চোঙ এক জায়গায় বিগড়ে গেল। একটানা বেজেই চলেছে। সে আওয়াজ বন্ধ করবার জো নেই। নিশুতি সমুদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম আর্ত-ধ্বনি। টলমল করতে করতে জাহাজ আস্তে আস্তে জলতলে নেমে যাচ্ছে। আর দু একটা তোপ পড়লে রক্ষা ছিল না, কিন্তু কাছাকাছি ধোঁয়া দেখে ইউবোট সাঁ করে সরে পড়ল। লাইফবোট নামিয়ে জ্যান্ত মানুষ সরানো হচ্ছে, বাতিল মাল-পত্র ও মড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভার কমানো হলো জাহাজের—

ভোলা মিঞা বলে, চোখে পানি এসে যায় সেদিনের কথা মনে পড়লে। জায়গাটা এই কাছেপিঠে কোথাও। এইখানটায় নয়, এমন কথাও হলপ করে বলতে পারি নে। দরিয়ায় সঠিক নিশানা কে করবে হুজুর?

ভোঁ-ও-ও—করে একটা জোর ভোঁপু! একটুখানি থেমে সাতটা ব্লাস্ট পর পর। তাই তো, ঘড়িতে পাঁচটাই এখন। লাইফ-জ্যাকেট পরে ফেল তাড়াতাড়ি। গিয়ে দাঁড়াও তোমার যে লাইফবোট তৈরি রয়েছে। নোটিশ-বোর্ড দেখ, তোমার বোট দু-নম্বরের। চলে যাও। কাপ্টেন নেমে আসবে, চীফ অফিসার এসে রোল-কল করবে। এটা মহড়া। সত্যি সত্যি জাহাজ-

ডুবি হলে হুড়োহুড়ি না করে যাতে কেউ। চরম সময়ে শান্তভাবে নিজ নিজ জায়গা নেবে।
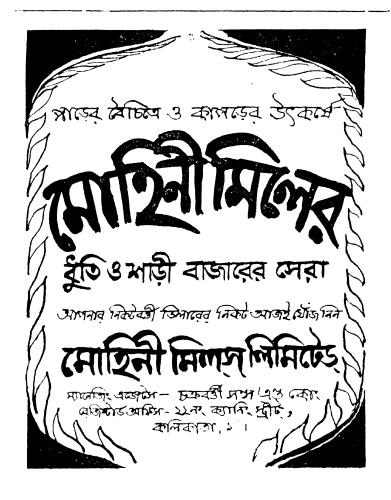
লাইফবোটের পাশে মেয়েপুরুষ গিয়ে লাইনবন্দি দাঁড়াল। খালাসিরা অবধি। এ মতে সকলের নিমন্ত্রণ। অর্থাৎ মোটামুটি স্বীকার করা হল, পঞ্জরের নিচে প্রাণ নামক মূল্যবান বস্তুর অধিকারী সকলেই। জেন স্টার্নালের কামরা ঠিক আমার সামনে। ব্রাউন ছোকরার সঙ্গে আজ সকালে বিষম একচোট হয়ে গেছে। কমবয়সি ঝিকমিকে মেয়ে প্রসাধনে অতএব সময় কিছু নেবেই। ব্রাউন অতশত বোঝেনি। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়ে গেছে, বাইরে পায়চারি করছে সে অনেকক্ষণ। ওরা এক টেবিলে বসে, সমুদ্রের হাওয়া ক্ষিদেটাও খুব বাড়িয়ে দিয়েছে সম্ভবত। না পেরে শেষটা তাগিদ লাগাল, হল তোমার? কতক্ষণ চলবে রে বাপু! ভেতরে বিষম এক দাবড়ি। সেইখানে চুকে গেলেও ছিল ভাল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা রীতিমত সঙিন হচ্ছে। লাঞ্চের সময় ঠাহর করলাম, ব্রাউন একা একা আনমনা ভাবে সুপ খাচ্ছে, জেন ওদিককার এক ফাঁকা টেবিলে। সেই জেন আর ব্রাউনকে দিয়েছে একই লাইফবোটে— চীফ অফিসারের রসিকতা কিনা বুঝলাম না। পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়েছে—তা বিষম রেগে আছে, ব্রাউন বাঁদিকের সমুদ্র দেখছে তো জেন ডানদিকের মানুষজন। ঐ ওইটেই শ্রীমতী গর্ডন। সে মেয়েও কিছু অতিরিক্ত বয়সের নয়। তার এক বাচ্চা, বাচ্চা নিয়ে মোমবাসায় স্বামীর কাছে যাচ্ছে। বিষম মুশকিল—নিজে লাইফবেল্ট পরেছে, বাচ্চা নিয়ে কি করে এখন! ওরই কোলে নিয়ে নেবে, কিন্তু ঢোকেও না তো! বেল্টের খোলে দুটো প্রাণীর কেমন করে জায়গা হয়। শ্রীমতী তার উপরে কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাসছে সে মৃদু-মৃদু—লাজুক অপ্রতিভ ধরনের হাসি। জাহাজের সব-চেয়ে স্ফূর্তিবাজ মেয়েটা, দেখুন দেখুন, মা হয়েছে কেমন! নতুন মায়ের আনাড়ি-পনা। আর সত্যি সত্যি ঝড়ের মুখে পড়ে যদি জাহাজ—এবং ভেঁপু বেজে ওঠে সাইরেন......ভয়াল সমুদ্র আক্রোশে আছড়ে পড়ে ডেকের উপর, যন্ত্রের গর্জন স্তিমিত হয়ে আসে, মাঝ সমুদ্রের নিঃসহায় তরণী মাথা-ভাঙাভাঙি করে এদিক-ওদিক, ঝড়ের মুখে এইটুকু মা দামাল বাচ্চা কেমন করে সামলাবে?

তেতলায় স্মোকিং-রুম। সন্ধ্যার পরে আজ আলোর বড় বাহার। নাচ হবে। যেন মহাব্যস্ত। কেবিনের দরজা হাঁ-হাঁ করছে, দরজার প্রান্ত হুকে আটকে উঁচু হয়ে আছে —দৃকপাত নেই। ভারি ব্যস্ত সাজ-গোজ নিয়ে। সারাদিন ধরে ঐ তার সব চেয়ে বড় কাজ, আর এখন তো মোক্ষম অবস্থা। আয়নার সামনে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়াচ্ছে—এই তো আর এক নৃত্য। ঘষামাজা করছে কমনীয় কোমল অঙ্গ—বিশেষ করে পোশাকের বাইরে যতটা অনাবৃত থাকবে। কাত হচ্ছে কখনো—এপাশ-ওপাশ হয়ে দেখছে নিজেকে আয়নায়। দেখবার মতোই চেহারা একখানা রচনা করল বটে এতক্ষণ ধরে।

জাজ বাজনা বেজে উঠল। উপর-নিচে নানা কেবিন থেকে ছুটেছে স্মোকিং-রুমে। নানা নদীখাল ছুটেছে উল্লাসের বিপুল

সমুদ্রে। বিদ্যুতের আলো আরও জোরালো হয়ে উঠল। ঝাড়ের পরকলায় রঙ-বেরঙের আলো ছিটকে পড়ে, নাচের আসরেও তেমনি নানান রঙের লহর।

শুতে গিয়ে ভয়-ভয় করছে। এই কেবিনের মধ্যে বিষ খেয়ে মরেছিল নাকি এক জোড়া। গল্পটা শোনাল—আবার কে? জাহাজের ত্রিকালদর্শী ভুষণ্ডী কাক মিঞা ভোলানাথ। দুটিতে বাইরে আসত না বড়-একটা। ফুসফুস-গুজগুজ অনবরত। খানাঘরে বেছে নিয়েছিল কোণের একটা টেবিল। মেনু পাওয়ামাত্র গোটা চার পাঁচ কোর্সের চটপট নাম বলে দিত। প্লেটে পড়তে না পড়তে গোগ্রাসে সমস্ত গিলত। যেমন মেয়েটা তেমনি ছেলেটা। খাওয়া নয় তো, গর্ত বোজানো। কোন গতিকে দায় সেরে আবার কেবিনের গহ্বরে ঢোকা। ঢুকে পড়ে কাজটা কি? এ ওর দিকে চেয়ে থাকবে কেবল। ভোলানাথ বলল, মাঝে-সাঝে হুজুর যখনই ঢুকেছি, দু-খাটে দু-জন মুখো-মুখি তাকিয়ে আছে। কথাবার্তা নেই, একেবারে চুপচাপ। দেশ বিদেশে কত ঘুরেছি, কত রকমের মানুষ দেখেছি— কিন্তু এ জোড়ার মতন কেউ নয়। শুয়ে শুয়ে আশা মেটে না, দিনরাত্রি এত শুয়ে থাকতে পারে মানুষ! তারপর একে-বারেই ঘুমিয়ে পড়ল একদিন। এবং যা নিয়ম, জোড়া ধরে ফেলে দিল দরিয়ার জলে। কোথায় বাড়ি, কি মতলবে এসে-ছিল, কি দুঃখে মরে গেল—কোন খবর জানি নে। কর্তারা জানতে পারেন, আমাদের কে বলতে যাচ্ছে?

সেই কেবিনে আছি, তাদেরই একখানা খাটে। সব আলো নেবাইনি একেবারে। শিয়রের সবুজ আলোটা জ্বলছে। অনেক রাত্রে শুনি, দরজায় ঠকঠক করছে।

কে?

জবাব নেই। জাহাজে বিছানা দেয় বড্ড বেশি নরম। শুয়ে সুখ নেই, বিছানায় গিলে খায় যেন। অথবা জাহাজেরই মতন কেবিনের খোলে এই ভেসে রয়েছি। শোওয়া নয়, চিৎসাঁতার। মৃদু হাতে ওদিকে দুয়োর নাড়ছে কেবলই। যে আঙুলের ছোঁওয়া, মনে হল, চাঁপার কলির মতন। বললাম, কে তুমি? ভিতরে চলে এসো।

জবাব দেয় না, থামবেও না। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। মানুষ কোথা? বাতাস। ঘুমন্ত সমুদ্রের উপর বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে, টোকা দিচ্ছে এসে আমার দরজায়। ডাকছে, এসো গো—বাইরে এসো।

ইঞ্জিনের ফিসফিসানি, আর জলের ক্ষীণ কল্লোল। পিছন দিকে অনেক দূরে, একটা আলো দেখা যায়। আলো একবার এই নিচু হয়ে সমুদ্রে ডুব দিল, তখনই আবার আকাশের দিকে ছুটল হাউই হয়ে। একটা তো নয় আলো—দুটো। দুই আলো পালা করে উঠানামা করছে। কারা তোমরা রাত্রিবেলা অকূলযাত্রীদের আলো দেখাচ্ছ?

এক ছবি মনে আসে। ঘরে চাল বাড়ন্ত। আট আনা পয়সার জোগাড় হয়েছে, কিন্তু চাল আনবার মানুষ জোটে না। শীতলাতলায় দীননাথের বাড়ি। ব্যাপারি মানুষ, সেখানে ঠিক চাল মিলবে। আট আনায় সের ছয়েক তো বটেই। কিন্তু ছোট্ট মানুষ যে আমি—একলা যেতে ভয় করে। মা এগিয়ে এসে আলো ধরলেন বাঁশতলার মোড়ে। জেঠাইমা পাশে। ঘুরঘুট্টি-আঁধার বাঁশবনে আলো ঝিলমিলিয়ে উঠল। আজকে কোথায় তাঁরা? ঐ তারালোকের রাজ্যে? বাহির-সমুদ্রে পড়বার মুখে দীপ ধরে দাঁড়িয়েছেন। সে-কালের দুই সখী। মা আর জেঠাইমা। রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে আছি। হাওয়ায় পর্দা নড়ছে খড়খড় করে। গা ছমছম করে—আবছা আঁধারে অনেক মানুষের আনাগোনা। আমার চারিদিকে অগুন্তি মানুষ। সমুদ্রে যত মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিল, উঠে উঠে জড় হচ্ছে। সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছে—দড়ির সিঁড়ি, পাইলট উঠে আসবে বলে বন্দরের মুখে যে সিঁড়ি নামিয়ে দেয়। চোখে দেখা যাচ্ছে না সিঁড়ি, কিন্তু অনুভূতির বাইরে নয়। ভরে গেছে সমস্ত ডেক। ডেক-চেয়ারগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে—অন্ধকারে, আয়েশ করে বসবে। তাদের পুরনো জায়গা। তাদের কামরায় নতুনেরা জমিয়ে বসেছে, তাদের চেনে না কেউ। একদিন ওদেরই ছিল এই জাহাজ, পুরনো লগ বুকে নাম পড়ে দেখুনগে। এই আমা-দেরই মতো—গ্রামের বাড়ি গিয়ে দেখেছি, হাল আমলের ছেলেরা অবাক চোখে চায়। কোথা হতে এলো লোকটা, কি চায়? হায় রে, আমার আপন জায়গা থেকে একেবারে বেদখল করে দিয়েছে। ঠিক সেই ব্যাপার।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ঐ প্রেতলোকের ভিড়ের ভিতর। হাসছেন আপনারা, ঘরে বসে অনেকেই অমন হেসে থাকেন। কিন্তু নিঃসীম জলের উপর রাত দুপুরে এখন আর এক জগৎ। কিবা পণ্ডিত কিবা মূর্খ, কিবা ধলা কিবা কালা, এখানে এসে বাছবিচার নেই। এই ধরুন, পান-সিতে পা ছড়িয়ে বসে সুন্দরবনের মাঝি-মাল্লার কাছে যা সমস্ত শুনেছি, এখানে জাহাজের আগুনমুখো স্কচ সাহেবের মুখেও প্রায় তাই। চোখে-দেখা জিনিস—বিজ্ঞানের হিসাবপত্র অত গভীর অবধি পৌঁছয় না।

অনেক রাত্রে শান্ত সমুদ্রে ঝড়বাতাস তিলেক মাত্র নেই, হঠাৎ দেখবেন, জাহাজের একদিকে তরঙ্গ উথলে উঠল। জল উঁচু হয়ে উঠছে—উঁচু, আরও উঁচু, সর্বনাশ, ডেকের উপর গড়িয়ে পড়বে নাকি? ডুবিয়ে ভাসিয়ে, একাকার করে দেবে?

দুষ্টামি ওটা, সাগরকন্যাদের কৌতুক। কৌতুকী মেয়ের দল উঁচু হয়ে উঠে জলের উপরের নগরটায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পোর্টহোলের ফুটো দিয়ে দেখছে মানুষ-গুলোর কাণ্ডকারখানা। চিড়িয়াখানার খাঁচার গরাদে দিয়ে জানোয়ার দেখা আর কি! জলের অবগুণ্ঠন লজ্জাবতীদের মাথার উপরে, সমুদ্র-জল ফেঁপে ফুলে উঠেছে তাই দেখতে পাচ্ছেন। লীলাখেলা অব-সানের পর খিলখিল করে ছলছল করে হাসতে হাসতে আবার তারা পাতালের ঘর-বাড়িতে চলে যাবে। উত্তাল সাগর দিঘির মতন হবে আবার।

রাত্রে যেদিন ঝড় উঠবে, কান পেতে থাকবেন তো খানিক। আশ্চর্য এক গান শুনবেন। দুড়ুম-দাড়াম করে জল আছড়াচ্ছে জাহাজের গায়ে, প্রপেলার পাগল হয়ে মাথা কুটছে। সেই গর্জমান তরঙ্গ, আতঙ্কিত জাহাজ, হাজার হাজার ক্রোশ থেকে ছুটে-আসা নির্বাধগতি মহাঝড়—তারই মধ্যে মিলিত কণ্ঠের সুরঝঙ্কার, মধুর এক মৃত্যু-সঙ্গীত। কোথায় উৎসব পড়ে গেছে, গান গেয়ে আবাহন করছে ডুবন্ত জাহাজের অতিথিদের। ঢেউয়ের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে যখন তলিয়ে যাচ্ছেন, শত শত কোমল বাহু উদ্যত হয়ে আছে—সমাদরে বুকে নেবার জন্য। এখানে এত অন্ধকার, ঐ রাজ্যে প্রভাতের আলো। এখানে মৃত্যু, ওখানে নবীন জন্মলগ্ন।

হঠাৎ দেখি, চাঁদ উঠে গেল। ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, আকাশে উঠে এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নিঃসীম জল, আকাশের চাঁদ আর এই জাহাজ। আর দূরের সেই যুগল আলো উঠানামা করছে সমুদ্রের মধ্যে। ভারি আশ্চর্য!

অগুন্তি ডেক-চেয়ার পাশাপাশি। সন্ধ্যায় সমস্ত ভর্তি ছিল, ঘুরে ঘুরে একটু বসবার জায়গা পাইনে। এখন খালি। হাওয়ায় ফরফর করে চেয়ারের কাপড় উলটেপালটে দিচ্ছে। ছাতে-লাগানো বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে শূন্য চেয়ারগুলোর উপর। যেমন ভেঙে-যাওয়া রাজ-দরবারে ঝাড়লণ্ঠন ম্লান আলো ছড়ায়।

শ্রীমতী গর্ডন আসছে স্মোকিং-রুমের দিক থেকে। আলোর নিচে দিয়ে আসছে, তখন স্পষ্ট দেখলাম। মুখের রং টকটকে লাল, পা টলছে। বাচ্চা ঘুমিয়ে গেছে, মা আর নেই—বার থেকে ফিরছে শ্রীমতী। নিচের ডেকে আবছা জ্যোৎস্নায় একটি-দুটি খালাসি আনাগোনা করছে। নিঃশব্দ গতি। ভুল ভাঙল—জাহাজ যত নিষুপ্ত ভেবেছি—তা নয়, জেগে আছে কেউ কেউ। আরে কে তুমি—শেখ ভোলানাথ যে!

দূরের আলোর দিকে আঙুল তুলে ভোলা মিঞা বলল, লাইট হাউস ওখানে—ডুবো পাহাড় আছে, তারই নিশানা। জাহাজ ঢেউয়ে উঠানামা করছে—মনে হচ্ছে দুই আলো নিয়ে লুকোলুকি খেলছে।

ভোলানাথ, ঘুমোও নি?

ডিউটিতে ছিলাম, ছাড় পেয়ে এখন যাচ্ছি। সকাল না হতেই ধোয়ামোছায় লাগতে হবে আবার। সালাম!

মাতা বসুমতী মাঝ-সমুদ্রে একটুকু মাথা তুলে আলো দেখাচ্ছেন ভাসমান সন্তানদের। পথ না হারায়, অপথে-কুপথে ঘুরে মারা না পড়ে। নজর পড়ল কোণের দিকটায়। সাহেব-মেম পাশাপাশি মত্ত হয়ে সমুদ্র দেখছে। কাছে—আরও কাছে—দুই মাথা এক হল যে একেবারে, এর বাহু ওর কাঁধে এলিয়ে আছে। বুঝতে পারিনি, অজান্তে এসে পড়েছি একেবারে সামনে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! জেন আর ব্রাউন। যাকগে, টের পায়নি। তাকাল না মুখ তুলে। তাকাবার অবস্থাই নেই, চোখ-কান এখন অকর্মণ্য হয়ে গেছে।

স্লিপার আমার পায়ে। তলায় রবার দেওয়া, শব্দ হয় না। টিপি টিপি ফিরে এলাম। খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম আবার। চাদরটা টেনে দিলাম গায়ে। সোয়াস্তি পাইনে, দরজা খট খট করছে। দরজাটাই ঐরকম—কবজা ঢিলে হয়ে গেছে। অথচ মনে হবে, দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে কে ভিতরে আসবার জন্য।

নিবারটা উৎসবের দিন। এ-দিনে বিকেলবেলাও রান্নাঘরের চালে ধোঁয়া দেখা যায়। গোসাঁইদের বড়োবাড়ির বাগানে খেলতে খেলতে এই ধূম্রকুণ্ডলী চোখে পড়ায় চমকে উঠল পিতু।

আরে, আজ শনিবার!

সকালে ঠাকুমা বলেছিল বটে! মনেই নেই। হাতের ধুলো ঝেড়ে পিতু বলে, "আর খেলব না ভাই! বাড়ি যাই।"

সঙ্গিনী লাবণ্য মিনতি-বচনে বলে ওঠে, "একখুনি যাসনে ভাই, নকীখিটি! আর-এক দান খেলে যা।"

পিতু বান্ধবীর মিনতিতে ঈষৎ নরম হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। বিবেচনা করে অনুরোধ রাখা সম্ভব কিনা। নাঃ, বেলা পড়ে এসেছে, কে জানে আকাশ কখন চারিদিকে সোনা ঢেলে দিয়েছে।

"না রে না, আজ বাবা আসবে। যাই ভাই।"

লাবি ঠোঁট উল্টে বলে, "বাবা আসবে বলে অমন করিস কেন রে? একলা তোরই বাবা আসবে নাকি? আমারও তো আজ বাবা আসবে। আমি তোর মতন অমন ছুটছি?"

পিতু বোধ করি এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিপন্নভাবে বলে, "তোর বাবা যে বুড়ো!"

"এই অসভ্য মেয়ে!" লাবু চোখ পাকিয়ে বলে, "আমার বাবাকে বুড়ো বললি? এই বুদ্ধি হচ্ছে? বাবা না তোর জ্যেঠামশাই হয়? রোস, তোর মাকে বলে দিচ্ছি গিয়ে।"

যদিও লাবু এবং পিতু অভিন্নহৃদয়া, তবু কেউ কারো অপরাধ অগ্রাহ্য করতে রাজী নয়! অবশ্য জ্যেঠামশাই জাতীয় ব্যক্তিকে বুড়ো বলা অপরাধের মধ্যে গণ্য কিনা, এ নিয়ে তর্ক তোলে না পিতু, ম্লান মুখে বলে, "বলে দিসনি ভাই, তোর দুটি পায়ে পড়ছি। দোষ হয় জানি না, পাকা চুল দেখি, তাই—বলে দিবি না তো?"

ক্ষমাময়ী লাবি আশ্বাসের সুরে বলে, "আচ্ছা বেশ বলে দেব না। তার বদলে আর এক দান খেল।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে রে, বাবা আসবার আগে মুখ হাত ধুয়ে ফরসা জামা পরে নিতে হবে তো?"

লাবি হেসে উঠে বলে, "বাবাঃ বাবাঃ! বাবা যেন আর কারুর থাকে না। একলা তোরই আছে। বাবা আসবে খেলব না, বাবা আসবে সাজব, বাবা কি কুটুম?"

পিতু এবং লাবুর মধ্যে বয়সের তারতম্য না থাকলেও বলাই বাহুল্য বুদ্ধির তারতম্য আছে। পিতু বান্ধবীর উপহাসবাক্যে বিব্রত হয়ে গিয়ে বলে বসে, "বাঃ, কুটুম হবে কেন? ছেঁড়া জামা পরে থাকলে যে বাবা বুঝতে পারবে আমরা গরিব।"

এরপরও লাবুর হাস্যের ফোয়ারা নিষ্ক্রিয় থাকবে, এমন আশা করা চলে না। অদম্য হাসির ফোয়ারায় বান্ধবীকে প্রায় নাকানি-চোবানি খাইয়ে লাবি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "উঃ বাবাঃ! কী নেকি রে তুই! তোরা গরিব, আর তোর বাবা বুঝি খুব বড়লোক? তোর বাবা গরিব বলেই তো তোরাও গরিব।"

পিতু আরক্ত মুখে বলে, "ঈশ! ককখনো বাবা গরিব নয়। দেখিস গিয়ে। কী ফরসা জামা! কত জিনিস আনে!"

লাবি মুচকি হেসে সুরে সুর মিলিয়ে বলে, "তোর মার গায়ে কত গয়না!"

লাবির বয়েস আট, তাতে কিছু এসে যায় না। কথা শিখে অবধি পাকা কথাই কইতে শিখেছে লাবি। মা পিসিমার অসতর্কতায় এমন অনেক মেয়েই শেখে।

গয়নার কথায় পিতুর পরাজয়।

ও অভিমানভরে বলে, "বেশ বেশ আমরা গরিব। হল তো?"

"ও বাবা, মেয়ের আবার রাগ হল। আচ্ছা বাবা ঘাট মানছি! কাল খেলতে আসবি তো?"

"এলে যে মা বকে!"

রবিবারে পিতু মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ পিতুর মা পছন্দ করে না, সে-তথ্য লাবির জানা, তাই এই প্রশ্ন।

অবশ্য উত্তরটাও জানা ছিল লাবির, তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, "ওই তো মুশকিলের

গোড়া। রবিবার এলেই যেন হাড় জবলে যায় আমার।"

পিতু বিস্ফারিত চক্ষে বলে, "রবিবার এলে হাড় জবলে যায়? বাবা এলে ভাল লাগে না তোর?"

"নাঃ! মোটেই না। এসে আমায় কী রাজা করে দেয় শুনি? এসে তো খালি মার সঙ্গে গপপো করে, আর তাসের আড্ডায় ছোটে। আমার লাভের মধ্যে খালি বকুনি। দেখবে, কি বকবে! কলকাতায় থাকে তাই রক্ষে!"

"আমার বাবা বকে না।"

হৃতগৌরব ফিরে পায় পিতু!

লাবি বান্ধবীর পিতৃগর্বে আঘাত হানে না। গম্ভীরভাবে বলে, "হ্যাঁ। পঙ্কজকাকা লোক ভাল। যা বাবা, তুই বাড়ি যা। শেষে আবার মার কাছে মুখনাড়া খাবি!"

আট বছরের লাবি বর্ষীয়সীর ভংগীতে নিজের পথ দেখে!

অবিশ্বাসের কিছু নেই। 'বালিকা' বলে যাদের অগ্রাহ্য করা হয় অনেক সময় তাদের সম্মেলন-সভায় কান পাতলেই এ-চৈতন্য সঞ্চার হয়, অগ্রাহ্যের যোগ্য তারা নয়।

পিতুর মত মেয়েরাই বরং ব্যতিক্রম!

চোরের মত বেড়ার দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখে পিতু। নাঃ, বাবার আবির্ভাবের ঘোষণা কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। অতএব নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়া যায়। অতঃপর দুচার খাবলা জল হাতে মুখে রগড়ে জামাটা বদলে চুলে চিরুনির দুটো টানের ওয়াস্তা। আর পিতুকে পায় কে!

বালতি-ঘটির ব্যাপারটা যথাসাধ্য নিঃশব্দ রাখবার চেষ্টা করেও কিন্তু ফল হয় না। জলে ঘটি ডোবানোর ছোট্ট শব্দটুকুও রান্না-ঘরে অবস্থিত মানুষটির কান এড়ায় না।

"পিতু!"

ভর্ৎসনার সুর বাজে ঘর থেকে।

"খেলা ফুরোচ্ছিল না বুঝি? চট করে মুখ ধুয়ে নাও। চৌকির উপর জামা আছে!"

যাক, অল্পের উপর দিয়ে গেছে! কৃতজ্ঞ পিতু এক মুহূর্তে করণীয় কর্তব্য সেরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, "আজ কী রাঁধবে গো ঠাকুমা?"

ঠাকুমা মুখ তুলে সহাস্য উত্তর দেন, "তুই-ই বল, তোরই তো ব্যাটা আসছে!"

"ধ্যাৎ!"

ঘরে ঢুকে পড়ে উবু হয়ে বসে পিতু। বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলে, "কচুরি করছ মা?"

কচুরি করার কারণটা মধুর লজ্জার! মনোরমার মুখে একটু চাপা হাসি খেলে যায়। উত্তর ঠাকুরমাই দেন, "হ্যাঁরে! তোর বাবা যে কচুরি খেতে বড্ড ভালবাসে। অবিশ্যি ওদের মেসে কতো খায়দায়, খাওয়ার অভাব কিছু নেই, তবু ঘরের জিনিস বলে কথা! রোজের রোজ একটু করে তেল জমিয়ে জমিয়ে—"

মনোরমা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলে, "থাক্ মা, ওসব কথা। ছেলেমানুষ বলেটলে ফেলবে।"

ঠাকুমা অপ্রতিভ অবস্থা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলেন, "পিতু আমার তেমন মেয়ে নয়, খুব বুদ্ধিদার আছে। কি বলিস পিতু?"

পিতু সলজ্জ হাসি হাসে।

মনোরমা বলে, "ভাজা তো হচ্ছে, তোর ভাগের দুখানা খেয়ে নে!"

রসনায় জল সঞ্চার হয়, তবু দুর্দমনীয় বাসনা দমন করে পিতু তাচ্ছিল্যভরে বলে, "এখন খিদে পায়নি। বাবার সঙ্গে খাব।"

"সঙ্গে তো খাবি, সামনে বসে হ্যাংলার মত হাত চাটবি তো?" মনোরমা হাসে।

নাঃ, পিতুর সেই একদিনের অসতর্কতার কাহিনী কেউ আর ভুলে যেতে রাজী নয়।

পিতু আরক্ত মুখে বলে, "ঈশ! রোজ যেন তাই করি! সে তো শুধু একদিন।"

মনোরমা হাসির সঙ্গে বলে, "আর আজ কী করবি? বলবি, 'কচুরি কী জিনিস ঠাকুমা? ও কী রকম খেতে ঠাকুমা?' তাই তো?"

ঠাকুমা বিপন্ন নাতনীকে রক্ষা করেন। কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বৌকে বলেন, "তোমার খালি ওকে খ্যাপানোর তাল্! ও আমার তেমনি বোকা না কি? হুঃ! কী বলবি রে পিতু?"

পিতু পৃষ্ঠবলের ভরসায় সোৎসাহে বলে, "কী বলব? বলব কচুরি তো পেরায়ই খাই, ঠাকুমা নিত্যি করে। কচুরি খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি ধরে গেছে বাবা, তুমি ভাল করে খাও!"

মনোরমা হেসে ফেলে বলে, "অত কথা বলতে হবে না তোকে, রক্ষে কর। সামনে বসে হাত পাত না চাটলেই হল!"

পিতু লুব্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, আজকের এই উৎসবের সুবর্ণ সুযোগে অপ্রত্যাশিত কোনো ভোজ্য বস্তু চোখে পড়ে যায় কি না! এরকম পড়ে মাঝে মাঝে।

যেমন সেদিন পড়ে গিয়েছিল। নারকোলের মালার মধ্যে এতটি নারকোলকোরা। পিতু চায়নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, "ওটা কী ঠাকুমা?"

তাতেই ঠাকুমা এতটা তুলে নিয়ে পিতুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

নাঃ নারকোল-কোরা আজ নেই, একটা বাটিতে গোটাকতক ছোলাভিজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, যা কাঁচা খাওয়া চলে।

"ছোলাভিজে কী হবে ঠাকুমা?"

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বলে, "কী আবার হবে, রান্না হবে। খিদে পেয়েছে, যা খাবার কথা, খা না বাপু।"

ঠাকুমা নাতনীকে বোঝেন।

তিনি তিরস্কার করেন বৌকে, "খিদে পেয়েছে, সে কথা তো ও তোমায় বলতে আসেনি বাছা! সবতাতে তাড়া দাও কেন? ছোলাভিজে দিয়ে লাউ রাঁধব রে পিতু। লাবিদের গাছের লাউ আধখানা দিয়ে গেল লাবির পিসি। দিব্যি কচি, তোর বাবা রুটি দিয়ে লাউঘণ্ট ভালোবাসে। নে, দুটো চিবো ততক্ষণ।"

ঠাকুমা দু'টি ছোলাভিজে তুলে নিয়ে নাতনীর দিকে এগিয়ে দেন।

কিন্তু পিতু সহজে হাত বাড়াবে না। ওর বুঝি মান নেই? আড়চোখে শুধু মার দিকে তাকায়।

"হয়েছে, আর লজ্জায় কাজ নেই—" মনোরমা হেসে ফেলে একটিপ নুন নিয়ে বলে, "নে নুন দিয়ে ভাল লাগবে। রান্নাঘরে কেন? বাইরে গিয়ে বসগে না।"

এটা একটা সঙ্কেত।

'বসগে না' মানেই 'দেখগে না'।

'বাবা আসা' দেখাও যে মস্ত একটা আমোদ!

একবার ঠাকমা ছিল না, গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল ত্রিবেণীতে, সেবারে পিতু আর মা দুজনে দেখেছিল বেড়ার দরজার কাছে এক ঘণ্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে।

"বাবা! বাবা! বাবা! বাবা এসেছে, বাবা!"

রান্নাঘরের মধ্যে মনোরমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এগারো বারো বছর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তবু ওঠে।

পঙ্কজ হাসতে হাসতে আর মেয়ের কথার নকল করতে করতে ঢোকে, "বাবা! বাবা! বাবা!......দেখো বাবু ম্যাজিক দেখো. পিতুরানীর বাবা দেখো।...চা'র চার পয়সা টিকেট বাবু, চার চার পয়সা টিকেট!"

এই রকম ফুর্তিবাজ লোক পঙ্কজ। সব কথাতেই ওর হাসি।

এরপরও বাবার পিঠ ধরে ঝুলে পড়বে না, এত ধৈর্য পিতুর নেই।

"এই হল আদিখ্যেতা শুরু!" মনোরমা বেরিয়ে এসে চাপা ধমক দেয়, "মানুষটা তেতে পুড়ে এল, তাকে একটু স্থির হতে দে?"

পিতু কিন্তু আর এখন মাকে ভয় করে না।

করে না দু' কারণে। প্রথম তো বিরাট সহায়—বাবা কাছে। দ্বিতীয়ত মা'র মুখে চোখে যে চাপা হাসির বিদ্যুৎ-ব্যঞ্জনা, সেটুকু পিতুর চোখ এড়ায়নি।

এ-মাকে যেন ভয় না করলেও চলে।

মহামায়ার শুদ্ধাচার পাড়াবিখ্যাত।

রেলের কাপড়েচোপড়ে জলের পাত্র স্পর্শ করা চলে না। মনোরমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে পঙ্কজকে হাত মুখ ধোবার জল ঢেলে দেয়।

পঙ্কজ মুচকে হেসে খাটো গলায় বলে, "তৃষ্ণার জলকে আটকে রেখে, পা ধোবার জল দিয়ে পুণ্য নেই।"

মনোরমা তেমনি ভঙ্গীতে বলে, "হয়েছে, খুব হয়েছে। এবার মেয়ে বড় হচ্ছে, কথাবার্তা সামলাতে শেখো।"

"মেয়ে? ঢের দেরি আছে বড় হতে।"

বলে অদূরবর্তিনী কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায় পঙ্কজ।

"সেই তো আরো জ্বালা! একখুনি হয়তো মাকে জিজ্ঞেস করতে ছুটবে 'ঠাকুমা, তেষ্টার জল মানে কী?'"

হেসে ওঠে দুজনেই!

মুখ ধুতে এত দেরি......পিতু ভাবে।

মনোরমা বলে, "আবার সেই রাশ করে জিনিস এনেছ? তোমার যেন বাজে খরচ করা এক বাতিক। এইটুকু তো সংসার, এত কে খায় বল তো? গেলবারের আনা পাঁপর তো সবই রয়েছে, আবার পাঁপর এনেছ!"

পঙ্কজ গম্ভীর মুখে বলে, "তা তোমরা যদি না খাও, আর আনব না!"

"এই দেখ মুশকিল! কত খাব! তরি-তরকারির জ্বালায় এটা ওটা খাবার জো আছে?"

"এত দিচ্ছে কে? আর কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত করনি তো?"

হাসতে থাকে পঙ্কজ!

"এইবার তাই করব ভাবছি। যা অসভ্য হয়ে যাচ্ছ দিনদিন। ঘর করার অযোগ্য!"

মহামায়া হাঁক পাড়েন, "অ পঙ্কজ, মুখ ধোওয়া হল? কচুরি ক'খানা যে পান্তো হয়ে গেল! জলটল খেয়ে গপ্‌পো করিসনা বাছা!"

"হল তো?" বলে স্বামীর দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ হেনে দ্রুতপদে সরে গেল মনোরমা।

পঙ্কজ দাওয়ায় উঠে চা জলখাবার খেতে বসল।

খেতে দেওয়ার ভার মহামায়ার নিজের হাতে।

বৌ দিলেও তাঁর তৃপ্তি হয় না!

ওদের ধরন ধারণ জানতে তো আর বাকী নেই মহামায়ার! হয়তো খাওয়ার সময়ই এমন হাসাহাসি জুড়ে দেবে যে, যে খাবে সে টের পাবে না, কী খেলাম, যে দেবে সে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে 'কেমন খেলে?'

বহু যত্নে বহু চেষ্টায় 'প্রাণ কুটে' তৈরী জিনিসের এমন অপব্যয় সহ্য হয় না মহামায়ার। তিনি কাছে বসে খাওয়াবেন, কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করবেন, আর-একটু নেবার জন্যে সাধ্য সাধনা করবেন, তবে তো তৃপ্তি!

মাছটা মহামায়া ছোঁন না, রবিবার দিন মাছ আসে, মনোরমাই রাঁধে! মহামায়া দাঁড়িয়ে

পরিবেশন করান। একদিন থলশে মাছের টক দিতে ভুলে গিয়েছিল মনোরমা, সেই অপরাধে তাকে ন ভুতো ন ভবিষ্যতি করেছিলেন মহামায়া। এমনিতে তিনি বৌয়ের প্রতি স্নেহশীলাই, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে নয়।

পঙ্কজ জুত করে বসে বলে, "কচুরি আর আলু-মরিচ? দি গ্র্যান্ড! আজকের জলযোগটি যে রীতিমত রাজসই!"

মহামায়া বিগলিত স্নেহে বলেন, "কচুরি তো নামেই! কপাল-গুণে আজকেই ঘিটা গেছে ফুরিয়ে। তেলেই ভাজলাম। বলি গরম গরম খাবে, মন্দ লাগবে না।"

"মন্দ?" পঙ্কজ এক কামড় খেয়ে চরম পরিতৃপ্তির স্বরে বলে, "হুঃ! তেলেভাজারই তো তার বেশী গো মা! এই তো আমাদের মেসে কড়া কড়া ঘি উড়িয়ে রাঁধছে, পারুক দিকিনি একদিন এমন একখানা দি গ্র্যান্ড কচুরি ভাজতে! সত্যি বলতে মা, ক'দিন থেকেই তেলেভাজা ছোলার ডালের কচুরি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।"

মহামায়ার চোখের জল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। কষ্টে বলেন, "ওরে সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—মায়ের প্রাণ! কথায় আছে—'ছেলে হাঁকে এপারে, মা কাঁদে ওপারে!' নদীর ওপার থেকে মায়ের প্রাণ কাঁদে!"

অতঃপর কাঁসিতে অবস্থিত বাকী কচুরিগুলি ছেলের পাতে পড়তে বিলম্ব হয় না।

এবার পঙ্কজের রাগের পালা।

"ব্যস ব্যস! সবগুলো ঢেলে দিলে? নাঃ তোমাদের কাছে ভাল বলবার জো নেই! এই আট ন'খানা আমি এখন খাব?"

"কেন খাবি না? রাতের রুটি কম করছি!"

"আর তোমরা খাবে না? দু'-খানাও তো রাখতে হয়?"

"বৌমার ভাগ ঘরে আছে, পিতুকে দিয়ে দিয়েছি, আবার কার জন্যে রাখব? আমি কি রাতে ডালের জিনিস খাই?"

পঙ্কজ ক্ষুব্ধভাবে বলে, "ছি ছি! তাহলে আজ করলে কেন? কাল সকালে করলেই হত।"

মহামায়া সস্নেহ হাস্যে বলেন, "শোন কথা! ভারী তো পদাথ জিনিস, দু'খানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার মা খেল না হ্যানো হল না! আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন-তখনই তো খাবার করছে। এই আজই বলছিল, 'মা, দশমীর দিন আপনাকে পেট ভরে ডালপুরী খাওয়াব!' খাবার করা বৌমার এক বাতিক!"

"হ্যাঁ! তোমার বৌ নইলে আর এত গুণের কে হবে! হ্যাঁরে পিতু, রোজ খাস কচুরি ডালপুরী?"

"রোজ!"

পিতু যেন একটা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে তাকায়! কোথায় সেই দুর্লভ বস্তু? দৈনন্দিন ভাত আর রুটিকে কেন্দ্র করে যে দু-একটি বাহুল্য বস্তুর দর্শন মেলে, সে হচ্ছে কচুর শাক, ওলের ডাঁটা, অথবা পাড়ার লোকের প্রীতি-উপহার—লাউটা কুমড়োটা! বাবা আলু আনে, সে-আলুর প্রায় সবক'টিই তো তোলা থাকে পরবর্তী শনি-রবিবারের জন্যে! তাতে অবশ্য পিতু দুঃখিত নয়। শনি-রবিবার উৎসবের দিন, পিতুও জানে!

কিন্তু এত কথা ভাবতে এক সেকেন্ডের বেশী সময় লাগে না। পিতু ঢোক গিলে বলে, "রোজ নয়, পেরায় পেরায় খাই!"

অবোধ পিতু মিথ্যা বলবে না, এটা নিশ্চিত। পঙ্কজ পুলকিত বিস্ময়ে বলে, "আশ্চর্য! তোমরা এত কম খরচে কেমন চমৎকার করে সংসার চালাও! আর আমাদের মেসে! হুঃ!"

মহামায়া সন্দিগ্ধভাবে বলেন, "তবে যে বলিস, তোদের খাওয়া দাওয়া খুব ভাল!"

"আহা, তেমনি পয়সাটাও তো ভাল গো! তোমাদের তিনজনের যা খরচ না হয়, আমার একার তাই খরচ!"

"ষাট্ ষাট্ তা হোক! পুরুষ বেটাছেলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়। তার একটু দরকার বৈকি!"

পিতু মহোৎসাহে বলে, "এখানে যে সব জিনিস সস্তা বাবা! তোমাদের কলকেতার মত তো না! আমরা কত খাই! ঠাকুমা তো নিত্যি পায়েস রাঁধে, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করে! কাল আবার রাঁধবে ঠাকুমা?"

মহামায়া ভাঁড়ারের চিনির কথা স্মরণ করে ইতস্তত করে বলেন, "দেখি! গয়লা মুখপোড়া যদি ভাল দুধ দেয় তবেই! জলঢালা দুধ হলে করছি না।"

পঙ্কজ গেলাসের জলটা সব শেষ করে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বলে, "খুব জল ঢালে বুঝি?"

নিছক্ গোয়ালার নিন্দে করতে মহামায়ার বোধ করি বিবেকে একটু বাধে। কারণ গোয়ালাটা অবিবেকী নয়। তার কাছে নানা বর্ণের দুধ মেলে! মহামায়া যদি টাকায় আড়াই সের দুধের খদ্দের হন, দুধের রং নীল না হয়ে উপায় কোথা?

ছেলের কথাকে তাই এড়িয়ে গিয়ে মহামায়া বলেন, "বাড়তি নিতে চাইলেই ঢালবে। সব তো খদ্দের-ঘর বাঁধা! এক ছটাক দুধ পড়তে পায় না। কী দেশের কী অবস্থাই হয়েছে!"

অতঃপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটে!

দেশের পুরনো দিনের আলোচনা চলে। যে-আলোচনায় বর্তমানহীন ভবিষ্যৎহীন হতাশ জীবনের সবচেয়ে আনন্দ!

হৃতসর্বস্ব জাতি অতীত গৌরবের গাথা গায়, অভাবগ্রস্ত মানুষ অতীত সচ্ছলতার গল্পে বিভোর হয়!

"পিতু! পান নিয়ে যা!"

ঘর থেকে মনোরমার ডাক আসে।

দু খিলি পান মেয়ের হাতে দিয়ে মনোরমা চাপা ভর্ৎসনার সুরে বলে, "পায়েস টায়েস অত কথা বানাতে কে বলেছে তোমায়?"

পিতু অপরাধীভাবে মাথা হেঁট করে।

মা ঠাকমা, দু'জনকেই বাবার সামনে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে দেখে ও ভাবে, এ বুঝি ভারী এক মজার খেলা।

মনোরমাও অবশ্য মিথ্যাচারের জন্য মেয়েকে বেশী তিরস্কারের জোর পায় না। তাই ক্ষমার সুরে বলে, "আচ্ছা যাও, পানটা দাও গে! বেশী আজে বাজে কথা বোলো না! পড়া দেখে নাওগে না একটু! লেখাপড়া শিখতে হবে না? আর এই এক মানুষ!

মেয়েটাকে পড়ানো যে একটা কর্তব্য, সে জ্ঞান নেই!"

লেখাপড়া না কচুপোড়া!

লেখাপড়া শিখতে দায় পড়েছে পিতুর! বাবার সঙ্গে কত ভাল ভাল গল্প হবে এখন, তা নয় লেখাপড়া! ছিঃ!

পঙ্কজেরও অবশ্য পিতৃকর্তব্য পালনে বিশেষ গা দেখা যায় না! পিতা-পুত্রীতে গল্পই চলে।

তা সে-গল্পেও শূন্যে স্বর্গ রচনা! বলা যেতে পারে গল্পের শিরোনামা হচ্ছে "যখন অনেক টাকা হবে!"

লটারিতে টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত, তারিখটাই যা এখনো জানা যাচ্ছে না। সে যাক্, টাকাটা কীভাবে খরচ করা হবে সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। বাপে মেয়েতে সেই কথাই হয়।

জামা কাপড়, খাওয়াদাওয়া, খেলনা পুতুল, ঠাকুরমার ঠাকুরঘরের রুপোর সিংহাসন সোনার 'ঝারা', মনোরমার গাদা গাদা গয়না, পঙ্কজের হাতঘড়ি আর চশমা, এ-সমস্ত ব্যাপারেই পিতা কন্যায় একমত। মতের বৈষম্য একটি ব্যাপারে।

পঙ্কজের ইচ্ছে সকলে মিলে কলকাতায় চলে যাওয়া, পিতুর তাতে দারুণ অনিচ্ছে। এই বাড়ি, এই গ্রাম, লাবি আর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরা, গোসাঁইদের পোড়াবাড়ির ইঁটের স্তূপ সরিয়ে অতকষ্টে তৈরি খেলা-ঘর, উঠোনের আমড়াগাছের ডালে বাঁধা দোলনা, এই সমস্ত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না পিতু।

পঙ্কজ অফিসের কথা তুলে কলকাতার সপক্ষে যুক্তি দেখায়; পিতু ভটচাজ জ্যেঠার ছেলের উদাহরণ দেয়। যে-ছেলেটি ডাক্তার হয়ে নিত্য দু'বেলা কলকাতায় যাবার জন্য মোটর কিনেছে। 'যখন অনেক টাকা হবে' তখন গাড়ি কিনতেই বা বাধা কী!

কথার মাঝখানে পিতু বলে বসে, "বাবা, তুমি গরিব লোক?"

পঙ্কজ মুহূর্তের জন্য থতমত খায়, পরক্ষণেই হা হা করে হেসে উঠে বলে, "কে বলেছে এ-কথা?"

বাবার হাসিতে পিতু বুকে বল পায়! তাই অগ্রাহ্যের সুরে বলে "আবার কে! ঐ লাবি!"

"লাবি না হাবি!" পঙ্কজ লাবি সম্বন্ধে ঐ মন্তব্যটি করে নিজের বুকের উপর একটা থাবড়া মেরে বলে, "আমার মতন বড়লোক এ-গাঁয়ে কেউ নেই, বুঝলি? কেউ না।"

এ হেন ঘোষণায় পিতু বেশ একটু অবাক হয়ে বাপের দিকে তাকায়। কথাটায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া শক্ত, অথচ বাবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঘোষণার সপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে! আবার হাসিটাও কেমন যেন রহস্য রহস্য!

সন্দেহ মোচনার্থে পিতু বলে, "তা হলে তোমার জুতো ছেঁড়া কেন?"

"জুতো!"

জুতোর ছেঁড়াটুকু চোখে পড়ে গেছে মেয়েটার! জামা কাপড়ের মত জুতোকে অল্পে ভদ্রচেহারা দেওয়া যায় না।

তবু তো আঁধার ঘেঁষে রোয়াকের নীচে রেখে দিয়েছে জুতোটাকে।

কিন্তু মেয়ের কাছে তো কথায় হারবে না পঙ্কজ, তাই অম্লানবদনে বলে, "জুতো ছেঁড়া কেন তাই জিজ্ঞেস করছিস? নতুন জুতো কিনব কখন? দোকানে যাবার সময় আছে? এই তো শনিবার হলেই এখানে? শনি-রবি দুটো দিন গেল। অন্যদিন আপিস! কখন কিনব? টাকা পকেটে নিয়ে তো ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

শুনে পিতু অবাক!

সময় নেই!

পৃথিবীতে কত সময়! অগাধ অফুরন্ত! দিনের উন্মোচন আর রাত্রির অবতরণে আবর্তিত হতে হতে চলেছে বিরতিহীন একটানা এক সময়ের স্রোত। অনন্তকাল-ব্যাপী সেই তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দিন আর রাত্রিগুলো! ভটচাজ-জ্যাঠা উদয়াস্ত তামাক খাচ্ছেন আর হুঁকো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চৌধুরী-দাদু চব্বিশঘণ্টা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে আছেন, লাবুর পিসি এক ফালি লাউ কি কুমড়ো উপহারের ছুতোয় পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোন ছুটোছুটি নেই। সব স্তিমিত! সব নিস্তরঙ্গ।

অথচ বেচারা বাবা!

সময়ের অভাবে টাকা পকেটে নিয়ে ছেঁড়া জুতো পরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে!

এরা যেন অভিনব এক শব্দ গঠনের খেলা শিখেছে। সে-খেলায় সবাই মশগুল! প্রথমে কে এই খেলা আবিষ্কার করেছিল সে এখন বলা শক্ত। পঙ্কজ? মহামায়া-মনোরমা? নাঃ, সে কারো মনে নেই। তবু কেউ ভেঙে দেবে না খেলা। খেলা ভেঙে দিলেই হঠাৎ একেবারে গরিব হয়ে যাবে ওরা। সে-দারিদ্র্যের উপর তখন আর কোনো আবরু থাকবে না।

তা হলে মহামায়ার ভাঁড়ারের 'হঠাৎ ঘি ফুরিয়ে যাওয়া'র রহস্য যাবে ভেঙে। পঙ্কজের 'সময় অভাবে'র গল্প ফুরিয়ে যাবে।

শুনে পিতু অবাক

তার চেয়ে এই ভাল!

এই মধুর মিথ্যার জাল!

কাজেই পঙ্কজ অনায়াসেই মহোৎসাহে শুরু করে, "শুধু জুতো? সময়ের অভাবে কত জিনিস হয়ে উঠছে না জানিস? টাক পড়ে যাচ্ছে, একটা ভাল তেল কেনা হচ্ছে না। তোর মা এত সোয়েটার বুনতে জানে, তবু পশম কেনা হচ্ছে না। আর তোর তো কত জিনিসেরই দরকার তার ঠিকই নেই। সে সব কিছু হচ্ছে না। শুধু সময়ের অভাবে।"

শিশুর কাছে মিথ্যা ভাষণে পঙ্কজের বিবেক আহত হয় না। 'সময়ের অভাব', এ-কথা কি মিথ্যা? সময়ের অভাবেই তো কিছু হচ্ছে না।

তবু 'সময়' একদিন আসবেই, এ পঙ্কজের স্থির বিশ্বাস।

'অসাচ্ছল্য', 'অনটন' এ যেন নেহাতই সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র! ও ঠিক হয়ে যাবে। যখন সময় আসবে তখন শুরু হবে সত্যকার জীবন। যে-জীবনের প্রতিটি ছবি পঙ্কজের মুখস্থ।

টাকা পকেটে করে বেড়ানো? সেও মিথ্যা নয়। পকেটটা জামায় নেই, আছে মনে। এই যা!

বাবার কথায় হৃষ্ট পিতু হঠাৎ আপনমনে ভেঙচানির সুরে বলে ওঠে, "লাবি না হাবি!"

হো হো করে হেসে ওঠে পঙ্কজ!

হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমা এসে দাঁড়ায়।

রান্না সাঙ্গ হয়েছে, মহামায়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যাহ্নিকে বসলেন। এবার মনোরমাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীর কাছে বসতে পারে।

"এত হাসি কিসের শুনি।"

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, "যারা বসে না আমরা তাদের কিছু বলি না। এই পিতু, খবরদার! বলবি না কেন হাসছিস।"

"এই বসলাম! হল তো?"

পঙ্কজ আরো গম্ভীর মুখে বলে, "তার আগে বলতে হবে তুমি কেন হাসছ! কেউ তো তোমাকে কোনো রহস্য-কাহিনী বলেনি। এসে বসলে, আর হাসতে লাগলে। এর মানে?"

"কোথায় আবার হাসছি? হাঁরে পিতু, হাসছি আমি?" মনোরমা রীতিমত গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে।

পিতু মার মুখের দিকে তাকায়!

উজ্জ্বল-শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার ঠিক সামনাসামনিই বসেছে মনোরমা, তার ঈষৎ আনত মুখের রেখায় রেখায় আলোর আভা।

কিন্তু এ-আভা কি শুধুই হ্যারিকেনের আলোর? হ্যারিকেনের আলো লাগা মার মুখ তো আরো অনেক সময় দেখেছে পিতু। বাবা যেদিন আসে না সেদিন সন্ধ্যাবেলা বই পড়ার সময়, কিংবা পিতুকে পড়ানোর সময়! সে শুধুই বাইরে থেকে গিয়ে পড়া আলো, ভিতর থেকে ঠিকরে উঠছে, এমন আলো তো নয়! এ যেন অজানিত, এ যেন অলৌকিক!

পঙ্কজ মেয়ের অবাক-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে "শোনো, পিতুর হাবি বন্ধু লাবি বলেছে, পিতুর বাবা গরিব! কথাটা হাসির যোগ্য কি না?"

"তা আবার নয়!" আলোয় ঝলসে ওঠে মনোরমা, "গরিব কি বল? সম্রাট!"

"এই শুনলি তো পিতু? বলিনি আমি? বলিনি, আমার চেয়ে বড়লোক এ-গাঁয়ে আর নেই?"

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে পিতু! আশ্চর্য অবাক কথা। বাবার মুখেও সেই একই আলোর উদ্ভাসন!

পিতুর মনে হয়, এদের এই সাধারণ কথা-গুলো যেন সাধারণ নয়। হাসিটা তো নয়ই। এই কৌতুকভরা মুখের রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো অন্য কিছু! যা পিতুর বুদ্ধির বাইরে।

তবু কী অপূর্ব! কী সুন্দর! আনন্দে হঠাৎ চোখে জল এসে যায় পিতুর।

এখন যদি লাবিকে ডেকে এনে দেখাতে পারত! এখন দেখলে পিতুর মার গায়ে গয়না নেই বলে ঠাট্টা করবার সাধ্য হত লাবির? গয়না আছে কি না, মনে পড়ত?

মহর্ষি বাল্মীকি ও কবি শ্রীমধুসূদন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

দেবতাত্মা হিমাদ্রি ধ্যানস্তব্ধ দেবাদিদেবের ন্যায় আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া রহিয়াছে আর তাহার জটাজাল হইতে পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা উৎসারিত হইয়া চিরদিন ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে। হিমালয় হইতে গঙ্গার ধারার মতই মহর্ষি বাল্মীকির বিশাল হৃদয় হইতে রামায়ণী কথার ধারা প্রবাহিত হইয়া নরলোককে পবিত্র করিতেছে। রামায়ণী কথা চিরদিন মানুষের তৃষ্ণা-কলুষ-হারিণী। পৃথিবীতে কত মহা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি যে অমর মহাকাব্যের রচয়িতা, তাহা আপন গৌরবে আজও অম্লান। বাল্মীকি সৌন্দর্য-স্রষ্টা ও ক্রান্তদর্শী, তাই তিনি যথার্থ কবি, তিনি 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা' বলিয়াছেন, তাই তিনি মহাকবি, তাঁহার মহাকাব্য অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় কত কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়া রসিকজনের মনোরঞ্জন করিতেছে, শ্রীমধুসূদনের ভাষায় 'মহর্ষি বাল্মীকির পদচিহ্ন ধ্যান করিয়া কত কবি যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন', তাই তিনি কবিগুরু। শ্রীমধুসূদন মেঘনাদ-বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে এই কবি-গুরুর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়াছেন—

'নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'।

বিদ্রোহী কবি শ্রীমধুসূদন অবশ্য নানা দেশের নানা কবির কাব্যোদ্যান হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন, দেশ-বিদেশ হইতে রমণীয় কুসুমরাজি আহরণ করিয়া নূতন মাল্য গ্রথিত করিয়াছেন, কেননা, তিনি 'অপূর্ব-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বা 'নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির' অধিকারী ছিলেন আর এই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির সঙ্গে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ঘটিয়াছিল মণিকাঞ্চন সংযোগ। কিন্তু মধুসূদনের গৌরব সম্পূর্ণ অম্লান রাখিয়াও আমরা এ-কথা বলিতে পারি যে, তিনি আর্ষ রামায়ণ শুধু আত্মসাৎ করেন নাই, তাঁহার অনেক অভিনব ভাব-কল্পনার বীজ তিনি এই মহাকাব্যের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের অনেকেই যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে মনে সন্দেহ জাগে আর্ষ রামায়ণের সঙ্গে তাঁহাদের গভীর পরিচয় আছে কি না। কেহ কেহ বাল্মীকি-রামায়ণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া যে তুলনা করিয়াছেন, তাহাও বিভ্রান্তিকর। তাই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

মধুসূদনের কবি-কল্পনা যে কোন কোন ক্ষেত্রে রামায়ণের দুই একটি শ্লোকের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন, মধুসূদন গ্রীক নিয়তিবাদের সূত্রে তাঁহার মহাকাব্য গ্রথিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে দেখিতে পাই, রাবণ সমুদ্রে সেতু বন্ধনের মধ্যে নিয়তির অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছেন। সাগরকে সম্বোধন করিয়া রাবণের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির (কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ ইত্যাদি) মধ্যে দেখিতে পাই, রাবণ নিয়তি বা বিধির অমোঘ নির্দেশ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু ভীরুর মত নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সেতু বন্ধনের মধ্যে আর্ষ রামায়ণের রাবণও সুস্পষ্টভাবে এই বিধাতার হস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রামচন্দ্র সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে লঙ্কেশ্বর রাবণ শুক ও সারণ নামক মন্ত্রিদ্বয়কে বলিতেছেন—

'ন দৃষ্টং ন শ্রুতং চাপি সাগরে সেতুবন্ধনম্।
নূনমস্মদ্বিনাশায় বিধিনা দোঃ প্রসারিতঃ'॥
(যুদ্ধকাণ্ড ১।৩)

সমুদ্রে সেতুবন্ধন কেহ কখনও দর্শন করে নাই বা ইহার কথা কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই; নিশ্চয় বিধি আমাদের বিনাশের জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধে চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের সেই উক্তি স্মরণ করুন—

'বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা
মম, কহিনু তোমারে'।

স্বর্ণলঙ্কার সীমাহীন ঐশ্বর্য এবং রাবণের সুমহান বীর্য, দুর্জয় পৌরুষ ও প্রবল প্রতাপ মধুসূদনের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, বিদ্রোহী কবির চোখে রাবণ মহিমমণ্ডিত পুরুষ। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির হস্তে এই সমুন্নতশীর্ষ পুরুষের পরাজয়ই মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু। ঊর্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণের দিব্যাস্ত্রলাভ, মহামায়ার অনুগ্রহে বিভীষণের সহিত তাঁহার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ ও নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ—এ-সকলও দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই লীলা। মেঘনাদবধে বিভীষণ স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্বেষী, বিশ্বাসহন্তা, রক্ষঃকুলকালি, ইন্দ্রজিৎ কর্বুরগৌরবরবি, তিনি আপন দৃপ্ত পৌরুষে ও তারুণ্যের উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্যে নিয়তিকে উপেক্ষা করেন। মধুসূদনের লিপিকুশলতার গুণে প্রত্যেকটি রাক্ষস-চরিত্র রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্যে মানব-জীবনে নিষ্ঠুর নিয়তির-লীলা দেখিয়া আমরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। মেঘনাদবধের সর্বত্রই যেন আমরা ক্ষুব্ধ সাগরের গর্জন ও সীমাহীন রিক্ত হাহাকার শুনিতে পাই। প্রাক্-মধুসূদন যুগে আমরা বাংলার কাব্যে শুনিয়াছি ঝরনার নূপুর-ধ্বনি অথবা শীর্ণকায়া তটিনীর কুলুকুলু ধ্বনি, মধুসূদন আমাদিগকে শুনাইলেন অনন্ত সাগরের গম্ভীর গর্জন ও মর্মবিদারী ক্রন্দন, আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ, স্তম্ভিত হইয়া সেই অশ্রুতপূর্ব উদাত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

মধুসূদনের ভাব-কল্পনার মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব সম্পর্কে এ-যুগের পাঠক দ্বিধাহীন, নিঃসংশয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-যুগে যাঁহারা মেঘনাদবধের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা অনেকেই মহর্ষি বাল্মীকির অমর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত নহেন। তাই তাঁহারা মনে করেন, রামায়ণের রাবণ বুঝি দশাস্য বিংশতিভুজ কিম্ভূত-কিমাকার ভয়ঙ্করদর্শন রাক্ষসমাত্র, বাল্মীকির অঙ্কিত রাক্ষস-চরিত্র বুঝি মানবীয় উপাদানের অভাবে কোথাও আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে না, মহর্ষি বুঝি বিভীষণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া কোথাও তাঁহার স্বজাতিদ্রোহিতার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত করেন নাই, আর মেঘনাদকে

তিনি বুঝি শুধু মায়াবী, কপট যোদ্ধারূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণ সম্পর্কে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার জন্য মধুসূদনের সমালোচকগণ হয়তো অনেক পরিমাণে দায়ী।

রাবণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই রামায়ণের অনেক স্থলে 'মহাত্মা রাবণ' কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে। হনুমান রাবণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—অহো কি সীমাহীন ঐশ্বর্য, কি দুর্জয় পৌরুষ, কি দুর্ধর্ষ পরাক্রম! ইনি যদি পাপে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ত্রিলোকের অধীশ্বর হইতে পারিতেন। মেঘনাদবধে আমরা রাবণ ও প্রমীলার মুখে 'ভিখারী রাঘব' কথাটি শুনিতে পাই। প্রমীলার চরিত্র অবশ্য শ্রীমধুসূদনের অপূর্ব সৃষ্টি, কিন্তু আর্ষ রামায়ণে লঙ্কেশ্বর রাবণের মুখেও অনেক স্থলে এই কথাটি শুনিতে পাই। ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাম ও লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন 'মিথ্যা প্রব্রজিতৌ' বা কপট সন্ন্যাসী (যুদ্ধকান্ড, ১১।৫১)। লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধের পর আমরা রাবণের মুখে যে বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে পাই, তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মভেদী। রাবণের বিলাপের মধ্যে তাঁহার স্নেহ-বৎসল পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় রহিয়াছে—

'যৌবরাজং চ লঙ্কাং চ রাক্ষসৈশ্বর্যমেব চ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্যাঞ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্যাণি কার্যাণি বিপরীতং হি বর্ততে'॥
(যুদ্ধকান্ড, ৭৩।১৫—১৬)

হা রাক্ষস মেঘনাদ, তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, ঐশ্বর্য, জনক-জননী ও ভার্যাকে (মেঘনাদ-পত্নীর উল্লেখ এই একটিবার মাত্র আমরা পাই), পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় প্রস্থান করিলে?

হে বীর, আমি যমালয়ে গমন করিলে আমার প্রেতকার্য তোমার করণীয় ছিল, কিন্তু আজ আমাকেই কিনা তোমার প্রেতকার্য করিতে হইতেছে।

অবশ্য মেঘনাদবধের নবম সর্গে মেঘনাদের চিতার নিকট রাবণের বিলাপ আরও করুণ, আরও মর্মভেদী। মেঘনাদের চিতায় প্রমীলার চিতারোহণে আছে প্রেমের বীর্যের পরাকাষ্ঠা।

রাবণকে মাতামহ মাল্যবান, সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ, ভ্রাতা বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ সকলেই হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু রাবণ যেন কালপ্রেরিত হইয়াই রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। রাম-রাবণের যুদ্ধ মহর্ষি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের প্রচন্ড মহিমা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অবশ্য, পরবর্তীকালে রাবণ প্রতিকূলভাবে ভগবদারাধনার দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির সমগোত্রীয় হইয়াছেন, কিন্তু সে-কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

রামায়ণে রাক্ষস মাত্রেই দুর্বৃত্ত নহেন, ধর্মপথগামী নিশাচর অনেক রহিয়াছেন। রাক্ষস-রমণীগণের মধ্যে মধুরভাষিণী সীতার পরম হিতৈষিণী সরমাকে আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, বৃদ্ধা ত্রিজটাও আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। শ্রীমধুসূদন সীতা ও সরমার কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয়ের চরিত্র-মাধুর্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মায়াবী হইয়াও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সম্মুখ-সংগ্রামে তিনি অপরাজেয়। সত্য বটে, তিনি মায়া অবলম্বনে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করেন, মায়াসীতা বধ করিয়া স্বয়ং হনুমানের মনেও বিভ্রান্তি উৎপাদন করেন, কিন্তু যেখানে তিনি লক্ষ্মণের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেখানে বহুক্ষণ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল, কেননা

'উভৌ পরম দুর্ধর্ষাবতুলৌ পরমতেজ সৌ।
যুযুধাতে মহাবীরো ব্যাঘ্রকেশরিণাবিব'॥
(যুদ্ধকান্ড, ৬৮।৩১)
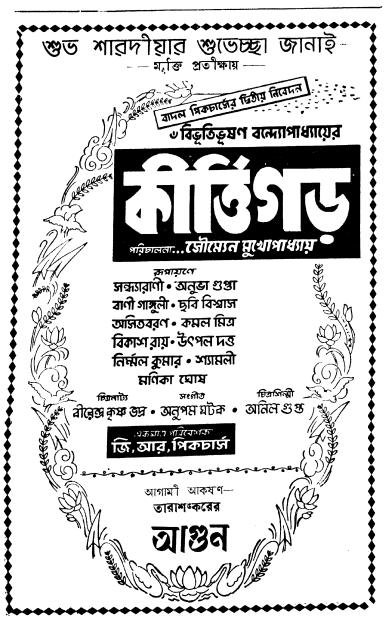
তাঁহারা উভয়েই পরম দুর্ধর্ষ, উভয়েই পরমতেজস্বী, সেই মহাবীরদ্বয় ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মেঘনাদ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, কিন্তু তাঁহার আত্মশ্লাঘা আপন পৌরুষ সম্পর্কে অস্ত্র-কুশলী যোদ্ধার সচেতনতা মাত্র। লক্ষ্মণের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মেঘনাদ যখন নিহত হইলেন তখন

'শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুঃ সমরে গতজীবিতঃ'॥

(যুদ্ধ কাণ্ড, ৭১।৫০)

যুদ্ধে প্রাণহীন সেই মহাবাহু শান্ত-রশ্মি রবি ও নির্বাপণপ্রাপ্ত পাবকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

শ্রীমধুসূদনের 'কর্বুরগৌরবরবি চির-রাহুগ্রাসে' অথবা 'লঙ্কার পঙ্কজরবি গেল অস্তাচলে' মহর্ষি বাল্মীকির 'শান্তরশ্মি-রিবাদিত্যঃ' কথারই প্রতিধ্বনি।

আর্ষ রামায়ণে বিভীষণ একটি বিশিষ্ট চরিত্র। রাবণকে সৎপথে প্রবর্তিত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যখন তিনি ব্যর্থকাম হইলেন, যখন তিনি রাবণ কর্তৃক অবমানিত ও পদাঘাতে জর্জরিত হইলেন, তখন পরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাঘবপক্ষে যোগদান করিলেন। ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি পরপক্ষকে আশ্রয় করিয়া স্বজাতিদ্রোহী হইলেন। তাই বিভীষণের চরিত্রে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, রাবণ-বধের পর তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মর্মভেদী। বিভীষণ স্বহস্তে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি সহায় না হইলে লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজিতের নিধন সম্ভবপর হইত না। তিনি বলিয়াছেন—

'অযুক্তং নিধনে কামং পুত্রস্য যতিতুং ময়া।
ন তু মে রামতুষ্ট্যর্থমকার্য্যং ভুবি বিদ্যতে॥
ঘৃণামপাস্য রামার্থে হনিষ্যে ভ্রাতুরাত্মজম্।
প্রহর্তুকামস্য তু মে বৈক্লব্যং জায়তে মহৎ'॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৭০। ১৫, ১৭)

পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনে যত্নবান হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়, তথাপি রামচন্দ্রের সন্তোষবিধানের জন্য আমার অকার্য কিছুই নাই।

দয়া বিসর্জন দিয়া রামচন্দ্রের জন্য ভ্রাতৃ-পুত্রকে বধ করিব, কিন্তু মেঘনাদকে প্রহার করিতে গেলেই আমি ভয়ানক বিহ্বল হইয়া পড়ি।

আর্ষ রামায়ণে দেখিতে পাই, রণদুর্মদ ইন্দ্রজিতের হোম-সমাপ্তির পূর্বেই লক্ষ্মণ যখন তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিয়া-ছিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সঙ্গে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের তিরস্কার-বাক্য মধুসূদন প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, মধুসূদনের মেঘনাদ এ-অবস্থায়ও পিতৃব্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের মেঘনাদ কোথাও পিতৃব্যের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

বিভীষণ মেঘনাদকে বলিয়াছেন—

'ন জ্ঞাতিত্বং ন ভ্রাতৃত্বং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌহার্দ্যং ন ধর্মো ধর্মদূষক॥
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচ পরাশ্রয়ঃ॥

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো
নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর
এব চ'॥
(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭।১২—১৫)

হে ধর্মদূষক দুর্বুদ্ধে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, সৌহার্দ্য, ধর্ম কিছুই তোমার নিকট আদরণীয় হইল না।

হে দুর্মতে, তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয় হইয়াছ, যেহেতু তুমি স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিতেছ।

স্বজনের সঙ্গে বসতি ও অধম শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ, ইহাদের মধ্যে যে কত পার্থক্য, তাহা তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

শত্রু যদি গুণবান এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তথাপি গুণহীন স্বজনই শ্রেয়; পর চিরদিনই পর থাকে, সে কখনও আপন হইতে পারে না।

মেঘনাদবধে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উক্তি—

'ধর্মপথগামী
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা'।

মেঘনাদবধে বিভীষণের চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নাই, সে আপনাকে ধর্মপথগামী বলিয়া জানে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসহন্তা, রক্ষঃকুল-কলঙ্ক। কিন্তু রামায়ণে বিভীষণ-চরিত্র জটিলতর। রাবণবধের পর শোকাকুল বিভীষণ বিলাপ করিতেছেন—

'বীর বিক্রান্তবিখ্যাত যুদ্ধে সর্বাস্ত্রকোবিদ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষে হা হতো ভুবি॥
নিঃক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজৌ
চন্দনভূষিতৌ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চসা'॥
(যুদ্ধকাণ্ড, ৯৪। ১১—১২)

হায়, বিখ্যাত পরাক্রমশালী বীর, যুদ্ধে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ তুমি, মহার্ঘ শয্যায় শয়নের যোগ্য তুমি, তুমি কেন আজ চন্দনভূষিত নিশ্চেষ্ট দীর্ঘ বাহুদ্বয় (এখানে 'বাহুদ্বয়' কথাটি লক্ষণীয়) নিক্ষেপ করিয়া ধরাশায়ী হইয়াছ? ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল মুকুট তোমার মস্তক হইতে স্খলিত হইয়াছে।

নিহত ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া বিভীষণ বলিয়াছেন—'আদিত্য যেন আজ ভূমিতে পতিত হইল, চন্দ্রমা যেন অন্ধকারে মগ্ন হইল, দীপ্ত বহ্নিশিখা যেন শত ঘটের জলে সিক্ত হইয়া প্রশান্ত হইল'। বিভীষণের মুখে আমরা শুনিতে পাই, রাবণ ছিলেন আহিতাগ্নি, মহাতপা, বেদান্তের পারগামী। স্বয়ং রামচন্দ্রও রাবণের গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, বাল্মীকির রাবণ কি মহামহিমান্বিত পুরুষ নহেন?

অনেক সময়, মধুসূদন প্রয়োজনের অনুরোধে রামায়ণের কোন কোন উক্তি বিভিন্ন পাত্রের মুখে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যে-সময়ে রামচন্দ্র ও রাবণের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে, সেই সময়ে বাল্মীকির রামচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিতে পাই—

'অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং
প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ যূথপাঃ'।
(যুদ্ধকাণ্ড, ৮২।১০)

হে যূথপতিগণ, এই মুহূর্তে তোমাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা অচিরেই পৃথিবী অরাবণ বা অরাম (রাবণশূন্য বা রামশূন্য) দেখিতে পাইবে।

মেঘনাদবধে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই লঙ্কেশ্বর রাবণের মুখে। বীরবাহু বধের পর ক্ষুব্ধ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প করিয়া বলিতেছেন—

'সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ,
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি,
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি'।

রামায়ণে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বলিয়াছিলেন—

'অন্তর্ধান গতেনাবাং যৎ ত্বয়া ছলিতৌ রণে।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ শূরনিষেবিতঃ'॥

তুমি যে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছ, এ-পথ তস্করের যোগ্য, বীরের যোগ্য নহে।

মেঘনাদবধে লক্ষ্মণ যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে আঘাত করিতে উদ্যত, তখন মেঘনাদ বলিয়াছিলেন—নিরস্ত্রকে আঘাত করা কি ক্ষাত্রধর্ম? 'বল মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা'?

আমরা বলিয়াছি, শ্রীমধুসূদন দেশ-বিদেশের কাব্যোদ্যান হইতে মধু চয়ন করিয়া এক অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মধুচক্র নির্মাণের গৌরব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রাপ্য। কিন্তু শুধু মধুক্রম-নির্মিতির কৃতিত্ব নয়, মধু আহরণের যে শক্তি তাঁহার ছিল, তাহাও অনন্য-দুর্লভ। বিদেশী কাব্যগ্রন্থের মত বাল্মীকির রামায়ণও তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে বাল্মীকির অনুগামী হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গৌরব বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। আত্ম-শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্তফুলবনমধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

নারী যে রত্ন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলার মতই এ-রত্ন ধারণ করলে, উত্থান সন্দেহজনক, কিন্তু পতন প্রায় অনিবার্য।

কথাটা আমার নয়, একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর কাছে শোনা। সুধীরবাবু আবার কার কাছে শুনে স্রেফ নিজের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়েছিলেন বলতে পারি না।

সুধীরবাবু অবশ্য কথাটা বলেছিলেন তাঁর কথামৃতের দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেদিন বলেছিলেন, সে-দিনটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু ভেবেছিলাম, এ-গল্প আমি কোনদিন লিখব না। এলাহাবাদ থেকে সুজাতা মল্লিক আমার গল্প সম্পর্কে কটাক্ষ করে চিঠি না লিখলে এ-গল্প আমি সত্যিই লিখতাম না। নিছক প্রেমের গল্প আমি কেন লিখি না, তার জবাবে সুধীরবাবুর গল্পটাই বলতে হয়। অথচ এমনই মুশকিল, যাদের নিয়ে গল্প লিখলে আপনারা বিরক্ত হন, সুধীরবাবুর গল্পটা তাদেরই নিয়ে।

কালী মণ্ডল কিন্তু বলেছিল, "ও স্যার, সব মেয়েমানুষই এক। নাম আর পোশাক বদলে, আপনার শহুরে মেয়ে বানিয়ে দিলেও অন্যায় হবে না। ভাববেন না এ শুধু জংলা মেয়েদের কীর্তি।"

থানা-হাকিম সুধীরবাবু হেসে বলেছিলেন, "সেইজন্যেই তো বলি, নারী হল নরকের দ্বারী।"

"দ্বারী নয় স্যার, গাড়ি বলুন। গড়গড় করে নিয়ে গিয়ে পেঁৗছে দেবে নরকের দরজায়।"

সোনাতুলসী নদীর ওপারে সোনাড়ি। এই সোনাড়ি গাঁয়ের ধুলন টুডুর গল্প শুনেছিলাম দারোগা সুধীরবাবুর কাছে।

ধুলন টুডুর গল্প নয়, আসলে ময়না কিস্কুর গল্প।

শুনেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কারণ এটুকু জানতাম যে, সুধীরবাবুর মত নারীবিদ্বেষী আর দ্বিতীয়টি নেই। উনি বলতেন, জ্ঞানবৃক্ষের আপেল খাওয়ার পর থেকেই নাকি স্বর্গের সঙ্গে আড়ি তাদের।

আপত্তি করে বলতাম, "এ আপনার বাড়াবাড়ি। সব মেয়েই কি এক?"

সুধীরবাবু হেসে বলতেন, "তা ঠিক। কটা মেয়ে আর দেখেছি আমরা, দু'একজন নিশ্চয়ই ভাল আছে। তবে মুশকিল হয় কি জানো..."

বলে থামতেন সুধীরবাবু, আর আমরা উদগ্রীব হয়ে তাকাতাম তাঁর মুখের দিকে। বেশ বুঝতাম, একটা-না-একটা গল্প বলার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছেন সুধীরবাবু।

সেদিনও এমনিভাবে নারীচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে সুধীরবাবু হঠাৎ

বললেন, "মুশকিল কি জানো, সব মেয়েদের তো আমরা ঠিক আগে থেকে চিনতে পারি না। এই যেমন ময়না কিস্কু।"

"সে আবার কে?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নিজেরই দাবনার উপর ফটাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তারপর হাতটা চোখের সামনে ধরে বললেন, "মশা তো নয়, যেন এক একটা চড়ুই পাখি বোলতার হুল্ ধার নিয়ে এসে জুটেছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। একরামপুর জঙ্গলের মশা একমাত্র একরামপুরেই দেখেছি। শুধু মশা নয়, বৃষ্টিও। যে-বৃষ্টির আভাস পেয়ে নোয়াকে নৌকো বানাতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে তখন।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ একটা একটানা শব্দ শুধু।

আর রাতও তখন অনেক। সিপাইকুঠি তখন ঘুমে নিঃঝুম। বারান্দায় শুধু আমরা চারটি প্রাণী। আমি, সুধীরবাবু, কালী-মণ্ডল, আর হৃদয় পাণ্ডে। চারিদিক অন্ধকার আর বারান্দায় একটা টিমটিমে লণ্ঠন ঘিরে একরাশ বাদলা পোকা।

যে ক'বছর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি

করতে হয়েছিল, সে-সময়টুকুর মধ্যে নানা নেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু একরাম-রের মত জঙ্গল আর একটি দেখিনি। জানালার গরাদ ধরে ভালুকে উঁকি মারে, চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র, রাস্তায় হুড্-খোলা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছ কি বনশুয়রের পাল তাড়া করে আসবে।

এ-হেন জঙ্গলের মাঝখানে একটা পাহাড়ের ঢালুতে সোনাতুলসী নদীর পারে বিঘে কয়েক জনারের খেত নিয়ে যে সোনাড়ি গ্রাম সে-গ্রামের লোকগুলোও ছিল বুনো।

সুধীরবাবু বললেন, "খুনজখম তখন হামেশাই লেগে থাকত।"

একটু থেমে বললেন, "খাওয়াদাওয়া সেরে সবে শুতে যাব, বাইরে হল্লা শুনে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, দুটো মরদ আর একটা মেয়ে।

"জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার!

"উত্তর না দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলে মেয়েটা। ধমক দিতে তবে চুপ করল।

"খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করে বুঝলাম একটা খুনোখুনি হয়ে গেছে।

"সঙ্গের মরদ দুটো একসঙ্গে বলে উঠল, 'থানা-হাকিম, এ-মেয়েটা হল ভুখন কিস্কুর বৌ ময়না কিস্কু।'"

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তারপর?"

সুধীরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "খানিক পরেই সোনাড়ির জনকয়েক লোক তো ধুলন টুডুকে ধরে নিয়ে এসে হাজির হল। আর ময়না কিস্কু মেয়েটার সে কী কান্না।"

অবনীবাবু জুড়ে দিলেন, "কাঁদবে না? ভুখন তো ওর স্বামী, খুনীটা ধরা পড়েছে বলে তো আর স্বামীর শোক ভুলতে পারে না?"

সুধীরবাবু বললেন, "হুঁ। কিন্তু থানায় কাজ করে করে ওসব মনের খবর আর রাখবার সময় থাকে কই। আমার তখন রাগ হল সোনাড়ি গাঁটার ওপরেই। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, অন্ধকার রাত। কোথায় দিব্যি আরামে ঘুমোব, তা নয়, চল কাদাজল ঠেঙিয়ে।"

বললাম, "তা আপনাদের পুলিশের চাকরিতে এ-সব তো হামেশাই লেগে আছে।"

সুধীরবাবু হাসলেন। "যা বলেছ। খুন জখম কি কম দেখেছি এ-জীবনে। কিন্তু এমন কেস হাতে এসেছে খুব কম। গিয়ে দেখলাম ঘরের মেঝেতে ভুখনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে কাটা ছাগলের মত, আর পাশে একটা টাঙিগ।

"গাঁয়ের সর্দার কদম মানকি খুলে বললে সব। বললে, 'হুজুর, ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে জানাল যে, তার স্বামীকে টাঙিগর এক কোপে সাবাড় করে দিয়েছে ধুলন টুডু।'"

সুধীরবাবু গল্প বলতে বলতে থামলেন হঠাৎ। বাইরে তখনও ঝমঝম বৃষ্টি আর অন্ধকার। সিপাই কালী মণ্ডল চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বললে, "সেদিনের কথা মনে পড়লে স্যার এখনো হাত পা শিউরে ওঠে। আর মাগীটাও কী কান্নাই না কাঁদছিল।"

"ব্যাপারটা কী?" উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু জানালেন ইতিহাসটা। বললেন, "ময়নাই দেখিয়ে দিল চালটা, যে-জায়গাটা ফুটো করে ধুলন পালিয়েছিল। দেখলাম, সত্যি তাই, ঘরের চাল ফুটো করে পালানোই বটে।

"ময়নাও কান্না থামিয়ে বললে, 'হুজুর, খুনীটা যেই ভুখনের কাঁধে টাঙিগর কোপ ঝেরেছে অমনি কপাট বন্ধ করে আগল তুলে দিয়ে কদম মানকির কাছে ছুটে গেলাম।
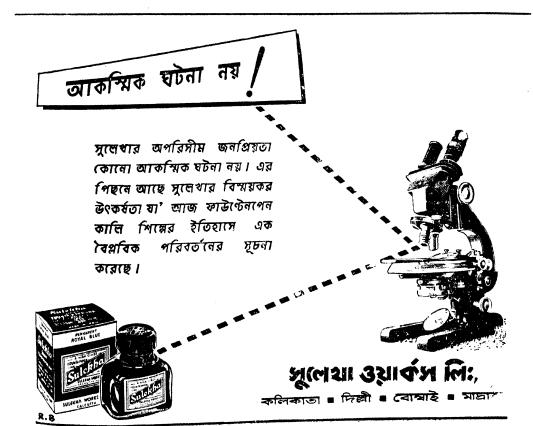
ভাবলাম ডাকুটাকে হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু ফিরে এসে যখন গাঁয়ের লোক কপাট খুলল তখন দেখি ধুলন খুনীটা নেই, শুধু দেয়ালের গায়ে রক্ত মাখা পায়ের দাগ।'"

কালী মণ্ডল বললে, "কিন্তু পালাবে কোথায়, গাঁয়ের লোকই খোঁজাখুঁজি করে ধরে আনল ওকে।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলাম সুধীর-বাবুর দিকে চোখ তুলে।

সুধীরবাবু হাসলেন। "ময়না বললে সব। হরকরার কাজ করত ভুখন, নির্মল সিং মারা যাওয়ার পর ভুখন হয়েছিল রানার। সোনাডি থেকে বরকাডিহি মেল পৌঁছে দেওয়াই ছিল ওর কাজ। তা সেদিন রাত্তিরে ভুখনের লাঠির ডগায় ঘুঙুর বাজতে বাজতে সোনাতুলসী নদীটার ওপারে মিলিয়ে যেতেই ময়না কপাট বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় নাকি হঠাৎ ধুলন এসে জাপটে ধরলে ওকে, জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর চাটাইয়ে এনে ফেলল ওকে।"

কালী মণ্ডল সুধীরবাবুর পিছনে গিয়ে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর টিপ্পনি কাটল, "আমি হুজুরের শুনে কিন্তু সেদিন দোষ দিইনি ধুলনকে। ময়না বেটিকে দেখেননি তো আপনি। পনেরো বছরের একটা ডাগর মেয়ে তখন ময়নার, ওর নিজের বয়েস তিরিশের কম নয়, কিন্তু অমন আঁটোসাঁটো গড়ন আপনি দেখেননি।"

সুধীরবাবু হেসে বললেন, "তা কালী যা বলছে ঠিকই। ভেনাসের মূর্তিতে গোলা খয়ের লেপে দিলে যেমনটি হয়।"

বললাম, "বর্ণনা রাখুন। আসল কেসটা কী?"

"কেস ঘোরালো না হলে আর বলছি কেন? ময়না যা বললে, বুঝলাম ধুলন একটা লম্পট। ময়নার ওপর চোখ ছিল তার অনেকদিন থেকেই। সুযোগ পেয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, এমন সময় ময়নার চিৎকার শুনে ভুখন হঠাৎ ফিরে এল।"

অবনীবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "একেই নিয়তি বলে। ওসময় কি কেউ মানুষ থাকে, পশুরও অধম হয়ে ওঠে। বাধা পেয়ে তাই ভুখনের টাঙ্গিটাই কেড়ে নিয়ে যদি কোপ বসিয়ে দেয় ধুলন তো দোষ দেবার কী আছে।"

সুধীরবাবুও সায় দিলেন। "আমরাও তাই দেখলাম। খুনীটাকে যত প্রশ্ন করি একটা কথারও জবাব দেয় না। চুপচাপ উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে শুধু। মুহূর্তের ভুলে খুন করে বসলে কী হবে, বেশ বোঝা গেল, লোকটা অনুশোচনায় দগ্ধে মরছে। তাই ধুলনের ফাঁসি হোক আমি চাইনি। শ'খানেক টাকাও যদি দিত তো বাঁচিয়ে দিতাম। কিন্তু ও-কটা টাকাও কেউ দিল না ওর হয়ে। তখন দিলাম চালান করে।"

"তারপর?"

"তারপর মামলায় ফাঁসি হল ওর।"

একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম অবনী-বাবুর। বললাম, "খুনীর ফাঁসি হল, তার জন্যেও দুঃখ হচ্ছে আপনার?"

শুনে সুধীরবাবু হাসলেন আবার।

বললেন, "সাক্ষী প্রমাণের ঝঞ্ঝাটও বাটাই বাঁচিয়ে দিলে, জজের কাছে স্বীকার করলে সব। বললে, 'হাঁ হুজুর, আমিই কেটেছি ভুখনকে।' বললাম না, নারী হল নরকের দ্বারী। তোমরা তো বিশ্বাস করবে না।"

বললাম, "বেশ লোক আপনি। এ-ব্যাপারে ময়নার দোষটা কী? বেচারীর আঁটসাঁট চেহারা ছিল এই বুঝি অপরাধ ওর?"

"আরে ছো।" হাসলেন সুধীরবাবু, "আমি কি তা ভেবেছিলাম নাকি? ধুলনের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।"

কালী মণ্ডল সামনে এসে বসল আবার। বললে, "ময়নার ডাগর মেয়েটা হঠাৎ এসে হাজির না হলে তো আর মনেই পড়ত না ওদের। কী বলেন হুজুর।"

সুধীরবাবু ঘাড় নাড়লেন। "তা ঠিক। মেয়েটা হঠাৎ একদিন কাঁদতে কাঁদতে এল বলেই মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাঁদছিস কেন রে বেটি?'
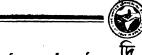
"তা মেয়েটা বললে, 'হুজুর তুই হুকুম দে, মানিকর ওড়ায় থাকব আমি, ময়নাকে আমার ডর করে, ও ডাইনী।'"

সুধীরবাবু বললেন, "শুনে তো আমরা থ। মাকে ভয় পায় মেয়ে, মাকে ডাইনী বলে, এ আবার কোন দিশী কথা। জিজ্ঞেস করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

"তখন মেয়েটা বললে সব। বললে, 'হুজুর, ময়নার সঙ্গে সাথ ছিল ধুলনের।'

"'সাথ ছিল, বলিসনি তো এতদিন?'

"'ডাইনীর ডরে বলতে পারিনি হুজুর।' কাঁদতে কাঁদতে বললে মেয়েটা।

"বললে, 'ভুখন মেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেই হুজুর আমাকে গিতিওড়ার ঘুমঘরে পাঠিয়ে দিত ময়না।'

"'তারপর?'

"'আমার কেমন সন্দেহ লাগত হুজুর। তা একদিন মাঝপথ থেকে ফিরে এসে দেখি ধুলনের সঙ্গে বসে গল্প করছে তোদের ময়না। তারপর থেকে রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম হুজুর, ধুলন আর ময়নাকে। ভাল লাগত না আমার, অথচ কিছু বলতেও সাহস হত না। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না হুজুর, তোদের ভুখনকে বলে দিলাম সব।'

"তারপর?'

"'তোদের ভুখন কিন্তু কিছুই বলল না হুজুর, চুপ করে রইল। তারপর রোজের মত সেদিনও মেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমি গিতিওড়ায় না গিয়ে লুকিয়ে রইলাম, ধুলন কখন আসে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, ধুলন নয় হুজুর, ভুখনই ফিরে এসেছে।' শুনতে পেলাম ভুখন বলছে, এই টাঙ্গি রইল পাশে। আসুক ধুলন, তোর চোখের সামনেই তাকে টাঙ্গির এক কোপে শেষ করব।'

"'তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার শুনলাম হুজুর। উঁকি মেরে দেখি ময়নার হাতে টাঙ্গি আর ভুখনের মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। দেখে, গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে, ছুটে পালাতেও পারলাম না। এমন সময় ধুলন এসে হাজির হল রোজকার মত।'"

রুদ্ধশ্বাসে সুধীরবাবুর গল্প শুনছিলাম। বললাম, "সে কি সুধীরবাবু, ধুলন খুন করেনি? আর ওরই ফাঁসি হয়ে গেল?"

সুধীরবাবু হাসলেন। "তখন তো জানতাম না, আর ব্যাটা নিজেই যে স্বীকার করলে সব।"

বললাম, "কিন্তু স্বীকার করল কেন?"

সুধীরবাবু বললেন, "ময়নার মেয়েটাও তা বুঝতে পারেনি। শুধু বললে, ধুলনকে ফিসফিস করে কী সব বলেছিল ময়না। দেখিয়েছিল ভুখনের কাটা শরীরটা। আঁতকে উঠেছিল ধুলন, বলে উঠেছিল, 'তুই খুন করেছিস ময়না, নিজের স্বামীকে খুন করেছিস?'

"আর তা শুনে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে ধুলনের দিকে তাকিয়ে থেকে ময়না বলেছিল 'তোর জন্যেই খুন করেছি ধুলন, তোকে বাঁচাবার জন্যেই খুন করেছি।'

"কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সোনাতুলসীর জলে ভাসিয়ে দিতে রাজী হয়নি ধুলন। বলেছিল, 'না না, এ-কাজ আমি পারব না।'

"আর তা শুনে হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেই কপাট বন্ধ করে চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়েছিল ময়না।"

বলে হাসলেন সুধীরবাবু। বললেন, "প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে। ধুলন যখন বুঝল খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে, তখন চাল ফুটো করে পালাবার পথ দেখলে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর সেটাকেই আমরা ভাবলাম প্রমাণ।"

বললাম, "কিন্তু জজের কাছে স্বীকার করল কেন ধুলন? সত্য কথাটা বললে হয়ত ছাড়া পেত। নয় কি?"

সুধীরবাবু চুপ করে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী জানি। তবে, কেন স্বীকার করল জিজ্ঞেস করছ? স্বীকার করল হয়ত এইজন্যে যে ধুলন সত্যিই ভালবাসত ময়নাকে।"

অবোধ্য ঠেকল কথাটা, তাই সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালাম সুধীরবাবুর মুখের দিকে।

সুধীরবাবু মাথা নিচু করে রইলেন। মাথা নিচু করে বললেন, "যাকে সত্যিই ভালবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায় তখন মৃত্যু কামনা করাই তো স্বাভাবিক।"

বললাম "তা সত্যি।"

বললাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস হল না। না, সেদিনও বিশ্বাস হয় নি, আজও বিশ্বাস করি না সুধীরবাবুর গল্প, ময়না কিস্কুর গল্প।

আর এ-গল্প যদি সত্যি হয়, আপনারা যতই পত্রাঘাত করুন, প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে কোনদিনই আমি প্রেমের গল্প লিখব না।

কিন্তু আপনাদের কী মনে হয়? সত্যি হতে পারে এ-গল্প?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোড়ার কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় দেশে তেমন উৎসাহের সঞ্চার হয়নি। তখন পরি-ল্পনার ব্যাপারটা এদেশে নতুন ছিল, ছাড়া পরিকল্পনার ফলে দেশের উন্নতি বে কি হবে না সে-বিষয়েও লোকের েদহ ঘোচেনি। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক রিকল্পনায় জনসাধারণের প্রচুর আগ্রহ খা যাচ্ছে। আমরা পরিকল্পনার বিষয়ে ধু যে অনেকখানি অভ্যস্ত হয়েছি তাই য়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেক ফলও দেখতে পেয়েছি। তার মধ্যে খাদ্য-স্যের অবস্থার উন্নতির কথা সকলেই নুভব করছেন—তা নতুন করে বলার পেক্ষা রাখে না। তা ছাড়াও নানা জায়গায় স্তাঘাট হচ্ছে, হাসপাতাল হচ্ছে, কমিউ-টি সেণ্টার হচ্ছে—এ-সবের ফলে পরি-পনা সম্বন্ধে দেশের লোকের ঔৎসুক্য গরিত হয়েছে। এখন লোকে ভাবছে, রিকল্পনার মারফত সত্যই দেশের উন্নতি ওয়া সম্ভব। সেইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক রিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের লোক মাথা মাতে শুরু করেছে। এটা বাস্তবিকই লক্ষণ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কথা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন হয়ে-ল তখন তা একটা বিরাট জিনিস বলে নে হলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার াশে মনে হবে প্রথম পরিকল্পনাটি খুব শী কিছু ছিল না। কথাটা সত্য, কারণ র উদ্দেশ্য খুব বড় ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও উচ্চ ছিল না। অবশ্য তাতে তার গুরুত্ব টুও কমে না। যে বাড়ি একেবারে পড়ে য়েছে, প্রথমেই তার ভিত না গড়ে যদি দ গড়তে যাওয়া যায় সেটা নিশ্চয়ই ভবুদ্ধির পরিচয় নয়। অথচ যতক্ষণ না দ পর্যন্ত বাড়ি ওঠে ততক্ষণ লোককে খাবার মত বাড়ি হয় না। কিন্তু তা বলে তের গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে রবেন না, কারণ সেইটিই হল একেবারে ড়ার কথা। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনায় দি কেবল ভিত গড়ার চেষ্টাই হয়ে থাকে, তে মনভোলানো চটকের সন্ধান না পাওয়া লেও তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর এই ড়ার কথাটাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-ল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

সে-কথাটা পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষও খুলে লেছিলেন। তাঁরা প্রথমেই বলেছিলেন াদের পরিকল্পনার শেষে জনসাধারণ যুদ্ধ-পূর্ব যুগের অবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জনসাধারণের জীবনধারণের মান যেরকম ছিল ফের সেই-রকম হবে—তার বেশী কিছু হবে না। আপাতত এটুকু উন্নতি উন্নতি বলে মনেই হয় না—মনে হয় এ তো শুধু ক্ষতিপূরণ করা। কিন্তু যদি মনে করা যায় যুদ্ধের সময় কী রকম ক্ষতি হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে ক্রমাগতই জনসংখ্যা বাড়ছে তা হলে কাজটা আর অত সহজসাধ্য মনে হবে না।

বস্তুত পরিকল্পনাকারীরা সে-অবস্থায় এর চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে ভরসা করেননি। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, ইংলণ্ডে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ উন্নতির জন্য লগ্নি হয়েছে, আমেরিকায় ১৩ হতে ১৬%। কিন্তু যে-সব অনগ্রসর দেশ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হতে চেয়েছে, সেখানে লগ্নির হার আরও অনেক বেশী। যেমন জাপানে এক সময় ১২% হতে ১৭%। যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ডে ২০% হতে ২৫%। রুশিয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার সময়ে ২৫% হতে ৩৩%—১৯২৮ হতে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত দশবছরের হিসেব ধরলে ২০% তো বটেই, হয়তো তার চেয়ে কিছু বেশীই! তাই দেখে আমাদেরও মনে হতে পারে আমরাও ঐ রকম বেশী টাকা লগ্নি করে দ্রুতগতিতে উন্নতি করি না কেন। কিন্তু সাধ থাকলেই সাধ্য থাকবে এমন কথা নয়। যদি জাতির আয়ের মধ্যে সঞ্চয় বেশী না থাকে এবং সেই সঞ্চয় কাজে লাগাবার মত মানবিক এবং বস্তুগত শক্তি না থাকে তা হলে উন্নতি সম্ভব হয় না। আমাদের বহু মানুষ আছে, কিন্তু তাদের কাজে লাগাতে গেলে কিছুটা মূলধন চাই-ই—অথচ আমাদের সঞ্চয় বেশী নেই। সেইজন্য প্রত্যেক অনুন্নত দেশই যে-সমস্যায় পড়ে আমরাও সেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। অর্থাৎ আমাদের সমস্যা, শুধু যে সঞ্চয় আছে তার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহারই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন সঞ্চয় সৃষ্টি করাও। এক-সঙ্গে দুদিক চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়।'

এই সব ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছিলেন যে, তাঁরা জাতীয় আয়ের ৫% হতে ৬½% অংশই উন্নতির জন্য লগ্নি করবেন। তারপর যদি লগ্নির হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বাড়িয়ে যাওয়া যায় (যেমন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১১%, তারপর ২০%) তা হলে দেখা যাবে ১৯৭৭ সন নাগাত মাথাপিছু আয় ডবল হয়ে যাবে এবং ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় জীবন-ধারণের মান শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে। লক্ষ্য করবার কথা, পরে লগ্নির হার বাড়ালেও প্রথম পাঁচবছরে সে-হার ৫% হতে ৬½% বেশী হওয়া সম্ভব হয় নি। তাতেই পরিকল্পনায় লগ্নিকৃত মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২০৬৯ কোটি টাকা এবং তাতেও ঘাটতির পরিমাণ ছিল কম নয়।

সুতরাং ঐ পরিকল্পনার প্রথম কথা ছিল যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া। তার দ্বিতীয় কথা ছিল, লগ্নির হার, অর্থাৎ পরিকল্পনার সাইজ, খুব বড় না করা। এ থেকে আরও দুটি কথা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে।

প্রত্যেক অনগ্রসর দেশেরই যেমন একটা সমস্যা হল সঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লগ্নির অভাব, তেমনি তার চেয়েও বড় সমস্যা হল বেকার-সমস্যা। দেশের লোকে ঠিকমত কাজ খুঁজে পায় না। বেকার তো কোটি কোটি—এমন কি যারা কার্যান্তর না পেয়ে কোন-রকমে জমির উপর নির্ভর করে পড়ে আছে তাদেরও তাতে পেট ভরে না—সেও বেকারই বলতে হবে। একেবারে বেকার না হলেও অর্ধ-বেকার। ইংরেজীতে যাকে বলে disguised unemployment অথবা under-employment, পুরো বেকারির চেয়ে বস্তুত এই সমস্যাটাই আমাদের মত দেশে অনেক বেশী ভয়াবহ। সেইজন্য শুধু সঞ্চয় বাড়া বা উৎপাদন বাড়াই আমাদের দেশের উন্নতির চরম কথা নয়। আমরা খুব উন্নত ধরনের কলকব্জা বসাতে পারি, যাতে লোক মোটেই লাগে না অথচ অনেক বেশী উৎপাদন হয়। তাতে আমাদের উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু বেকার সমস্যাও বাড়বে। সামাজিক কল্যাণই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়,
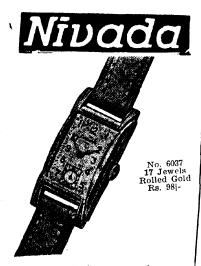
তা হলে এই রকম কলকব্জায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বেশী উৎপাদন অথবা বেশী সামাজিক কল্যাণ—এ দুটি আদর্শে সংঘাত বাধা বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের মত দেশে যদি আমরা প্রথমটির স্বার্থে দ্বিতীয়টিকে অবহেলা করি তা হলে পরিকল্পনার মূলে উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সেইজন্য কর্মসংস্থানের উপরই সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা যখন করা হয়েছিল, তখন জিনিসপত্রের এত নিদারুণ অভাব ছিল যে, কর্মসংস্থানের উপর এতখানি ঝোঁক দেওয়া তো সম্ভব হয়ইনি, বরং এ-কথাও সম্ভবত বলা চলে, উৎপাদনের উপর ঝোঁকই কর্মসংস্থানের আদর্শকে সময় সময় খাটো করেছে। তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে-অবস্থায় উৎপাদন না বাড়িয়ে যদি কর্মসংস্থানের উপর গোড়াতেই ঝোঁক পড়ে যায়, তা হলে লোকের হাতে টাকা আসবে অথচ বাজারে জিনিস থাকবে না—ফলে আমরা ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির বিষবৃত্তে পড়ে যাব। পরে আলোচনা করব, এইখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য।

চতুর্থত, প্রথম পরিকল্পনার এই দৃষ্টিভঙ্গী ও পটভূমিকা হতে সহজেই বোঝা যায়, তার প্রধানতম ঝোঁক পড়বে কৃষির উপর। রাতারাতি শিল্পপ্রধান দেশ হয়ে ওঠা যে একেবারে অসম্ভব তা বলি না—রাশিয়া তার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে—কিন্তু আমাদের প্রথম পরিকল্পনার মেজাজ ও আবহাওয়ায় তা মোটেই সম্ভব ছিল না। আসলে আমাদের গতি ছিল ঠায়ে, লয় ছিল ধীর,—আমরা অত কষ্ট স্বীকার করে দ্রুতগতিতে এগোতে বোধ হয় রাজী ছিলাম না। বস্তুত খুব দ্রুতগতিতে এগোতে হলে তার আনুষঙ্গিক অনেক ব্যবস্থার প্রয়োজন। যা স্বল্প সঞ্চয় আছে তার সবটাই হয়তো লগ্নি করতে হবে উৎপাদক পণ্যের (Producer's goods) জন্য, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয়তো প্রায় বন্ধ করে রাখতে হবে, লোকের হাতে যে টাকা আসবে তা নির্মমভাবে কেড়ে না নিলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে, সঞ্চয় ও লগ্নি বাড়াবার জন্য দেশের সমস্ত সঞ্চয়ও নির্মমভাবে সংগ্রহ করতে হবে,—তাতে কোথায়ও অসন্তোষ দেখা দিলে বজ্রমুষ্টিতে তা দমন করতে হবে। এ আদর্শ ভাল কি মন্দ তা নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে, কিন্তু সে-আলোচনা এ-প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। আমাদের ধরে নিতে হবে, ভালই হক আর মন্দই হক ভারতবর্ষ এ-আদর্শ গ্রহণ করেনি, তাই সে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে রাজী নয়, ব্যক্তির অধিকার হরণ করেনি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবসাও চালাতে দিচ্ছে। এখন এই অবস্থা চলতে দিলে, এই আদর্শে বিশ্বাস করলে, তার মূল্যও দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের একসঙ্গে অনেক দিক বাঁচিয়ে অনেক দিক সামলে কিছুটা ধীরে চলতেই হবে। এ-অবস্থায় একেবারেই প্রথম ধাপে দেশকে শিল্পপ্রধান করবার চেষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম ধাপে কৃষিকেই ভাল এবং সচ্ছল করে তুলতে হবে। বাস্তবিক বিভিন্নদিকে যে-পরিমাণ টাকা প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল তা হতে এই ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোট টাকার ১৭% টাকা বরাদ্দ হয়েছিল কৃষি ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে, সেচে ৮.১%, সর্বার্থসাধক সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুতে ১২.৯%, শক্তি উৎপাদনে ৬.১%, যানবাহন ও পথঘাটে ২৪.০%, শিল্পে ৮.৪%, সমাজ সেবায় ১৬.৪%, পুনর্বাসনে ৪.১%, অন্যান্য ২.৫%। প্রথম তিনটিকে যদি কৃষি এবং তার আনুষঙ্গিক খরচ ধরে নেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে কৃষি খাতে মোট ব্যয়ের ৩৮% খরচ হয়েছিল, অথচ শিল্পে মাত্র ৮.৪%। এ হতেই ঝোঁকটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই

সমস্ত ঝোঁক একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফলের উপরই। সুতরাং খুব সংক্ষেপে এখন সেইদিকটি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল

এখন হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে, গোড়ায় যা আশা করা গিয়েছিল, জাতীয় আয় তার চেয়ে বেশী বেড়েছে—এই পাঁচ বছরে শতকরা ১৫% বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সনের দামে মাথাপিছু উৎপাদনের মূল্য ১৯৫০-৫১ সনে ছিল ২৪৬·৩ টাকা, ঐ দামেই ১৯৫৩-৫৪ সনে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৬·৫ টাকা। এ থেকেই অগ্রগতির একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

বিশেষ বিশেষ দিকে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে। সরকারের তরফ থেকে যে হিসেব প্রকাশিত হয়েছে, তা হতে দেখা যায়, মাথাপিছু তণ্ডুলজাতীয় জিনিসের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সনে ছিল ১৩ আউন্স, ১৯৫৩-৫৪ সনে তা ১৫ আউন্স। ডাল ছোলা ইত্যাদি এখনও আশানুরূপ বাড়েনি, মাথাপিছু ২·৫ আউন্স রয়েছে, যদিচ স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে তা ৩ আউন্স হওয়া দরকার। দুধ ঘি মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি এখনও অনেক বাড়া দরকার। মাথাপিছু কাপড় এখন যুদ্ধপূর্ব যুগের মত ১৫ গজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিচ তা আরও বাড়া দরকার। টেক্সটাইল এনকোয়্যারি কমিটি বলেন, মাথাপিছু তা অন্তত ১৮ গজ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। নীচে কতকগুলি জিনিস বাড়ার হিসেব অধ্যাপক মহলানবিশের পুস্তিকা হতে উদ্ধৃত করছিঃ—

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আগামী বছরের আনুমানিক হিসেব যে মিথ্যা হবে না, তা গত কয়েক বছরের হিসেব দেখলেই বোঝা যায়। দেখা যাচ্ছে, আমরা মোটামুটি বেশ অগ্রগতি করেছি। তার অর্থ নয়, সকলেরই অভাব মিটেছে, সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা হয়েছে। হয়তো অনেকের কষ্ট বেড়েছেও। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশের অবস্থা ধরলে দেখা যাবে, আমরা অনেক দিকে শক্তিসঞ্চয় করেছি। সুতরাং আমরা এখন অনেক দিকে অন্তত কিছুটা ভাবতে পারি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঝোঁক কোনদিকে?

বস্তুত দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় এসব নানাদিকে চিন্তা হচ্ছেও। সকলেই বলেছেন, এবার পরিকল্পনার আকার বড় করতে হবে, প্রকারও বদলাতে হবে এবং উন্নতি দ্রুততর করতে হবে। তার সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা হয়েছে যা প্রথম পরিকল্পনায় ছিল না। যেমন, এবার বলা হয়েছে, পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে পূর্ণতর নিয়োগ-ব্যবস্থা এবং অধিকতর কর্মসংস্থান। এ বিষয়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অর্থ-মন্ত্রী দেশমুখ এবং পরিকল্পনা-মন্ত্রী নন্দ প্রভৃতি সবাই বলেন, যদি কিছু অদল বদল করতে হয় তা বরং অন্যদিকে করা হক, কিন্তু এমন যেন কিছু না করা হয়, যাতে ১·২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান কমে। ওটুকু অন্তত রাখতেই হবে। তার কারণ আছে, সে-কথা পরে আলোচ্য। সব বিষয় ভেবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মত প্রকাশ করেছেন যে, বরং পরিকল্পনার আয়তন আরও বাড়ান হক। প্রথম পরি-কল্পনায় এ-দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল না, এতখানি সাহসও ছিল না। দ্বিতীয় কথা, এবারকার

জিনিস	মাপের হিসেব	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬ (অনুমান)
তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য	১০ লক্ষ টন	৪১.৭	৫৬
ছোলা ডাল ইত্যাদি	,,	৮.৩	১০
মোট খাদ্য	,,	৫০.০	৬৬
তুলা	১০ লক্ষ গাঁট	২.৯	৪.২
পাট	,,	৩.৩	৫.০
তুলাজাত দ্রব্যাদি (টেক্সটাইল)	১০ লক্ষ গজ	৩৭১৮	৫০০০
খাদি ও তাঁত	,,	৭৪২	১৬০০
গরম কাপড়	১০ লক্ষ পাউণ্ড	১৮	২০
বিদ্যুৎ	১০ লক্ষ কিলোওয়াট	২.৩	৩.৫
কয়লা	১০ লক্ষ টন	৩২	৩৭.
ইস্পাত	,,	১.১	১.৩
সিমেণ্ট	,,	২.৭	৪.৬

পরিকল্পনায় শিল্পের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বেশী। মোট ৫৬০০ কোটি টাকার শতকরা ১৭·১% অংশ যাবে কৃষি সেচ বন্যা নিবারণ ও কমিউনিটি প্রোজেক্টে (৯৫০ কোটি); শতকরা ৮·৯% (৫০০ কোটি) যাবে বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি উৎপাদনে; শতকরা ১৬.১% (৯০০ কোটি) যাবে রাস্তাঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থার জন্য; শতকরা ২৫% (১৪০০ কোটি) যাবে শিল্প ও খনি; নানাবিধ ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ২৪.০% (১৩৫০ কোটি); এবং বিবিধ খাতে ৮·৯% (৫০০ কোটি); মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এর সঙ্গে সম্প্রতি ২০০ কোটি যোগ করার কথা হচ্ছে। এ হতেই দেখা যায় গেলবারের তুলনায় টাকার অঙ্ক কৃষিতে কম না হলেও এবার কৃষির উপর ঝোঁকটাই সর্বপ্রধান নয়। শিল্পের উপর ঝোঁকটাই সর্বপ্রধান।

প্রথম পরিকল্পনা ছিল ২০৬৯ কোটি টাকার। এবার পরিকল্পনা, এখন পর্যন্ত হয়েছে ৫৬০০ কোটি টাকার। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত দিক হল ৩৪০০ কোটি টাকার, আর প্রাইভেট সেক্টর হল ২২০০ কোটি টাকার। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি প্রথম পরিকল্পনার মোটামুটি ডবলের কিছু কম। সব দিকেই এবার প্রায় দ্বিগুণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বে বলেছি, প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছিল শতকরা ১৫%। এবার জাতীয় আয় পাঁচ বছরে শতকরা ২৫% হতে ২৭% ভাগ বাড়াবার চেষ্টা করা হবে, অর্থাৎ বছরে শতকরা ৫%। শিল্পে দ্রুত অগ্রসর না হয়েই আমরা প্রথম পরিকল্পনার কালে প্রতিবছর শতকরা ৩% জাতীয় আয় বাড়াতে পেরেছি। শিল্পে অগ্রসর হতে থাকলে বছরে জাতীয় আয় শতকরা ৫% বাড়া কিছুই কঠিন হবে না। সেইজন্য পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ২৫% হতে ২৭% বাড়বে এ-আশা মোটেই অসংগত নয়। কিন্তু সে-হিসেবে জাতীয় আয়ের কত অংশ লগ্নি করতে হবে? হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, এর জন্য জাতীয় আয়ের অন্তত ১১% অংশ শেষ পর্যন্ত লগ্নি করতে হবে। পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন দেশ কী পরিমাণ লগ্নি করে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছে। রুশিয়ায় তো এক সময় জাতীয় আয়ের একচতুর্থাংশ হতে একতৃতীয়াংশ লগ্নি হয়েছিল। তার তুলনায় শতকরা ১১% তো বেশী কিছু নয়। তা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনায় লগ্নির হার গোড়ায় ৫% থেকে শেষকালে ৭% হবে মনে হয়। সে জায়গায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দিকে ৭% হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত ১১% লগ্নির হারও এমন কিছু বেশী নয়। তা ছাড়া কর্ম সংস্থানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা একেবারে নেহাত অপরিহার্য। পরিকল্পনায় আন্দাজ করা হয়েছে, ৯০ লক্ষ হতে শুরু করে সওয়া কোটি পর্যন্ত লোকের কর্ম-সংস্থান হবে। এ বেশী কিছু নয়। এই পাঁচ বছরে নতুন কর্মক্ষম যত লোক হবে তার চেয়ে এই সংখ্যা সামান্য বেশী মাত্র—খুব বেশী নয়। তার উপর শ্রীগুলজারীলাল নন্দের মতে দেশে এখন বেকার আছে ৩০ লাখ—আমাদের মতে এই সংখ্যা অনেক বেশী হবে। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় সওয়া কোটি লোকের কর্মসংস্থান বেশী

কিছু নয়। এখন যা হিসেব করা হচ্ছে তাতে কর্মসংস্থানের প্যাটার্ন হবে এই রকমঃ—

১। কৃষি ও আনুষঙ্গিক জীবিকা	১৫ লাখ
২। খনি ও ফ্যাক্টরি	১৭ লাখ
৩। কুটীরশিল্প ও বাড়িঘর নির্মাণ	৩০ লাখ
৪। যানবাহন, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স	৪ লাখ
৫। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা ও পূর্বব্যতিরিক্ত যানবাহন ব্যবস্থা	২০ লাখ
৬। চাকরি ইত্যাদি	২৪ লাখ
	১১০ লাখ

পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, এ পরিমাণ কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। তাঁদের যুক্তিটা এই রকমঃ—যেমন, খনিতে এখন মোটামুটি ৮ লাখ লোক নিযুক্ত আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আশা করা যাচ্ছে খনিজ উৎপাদন শতকরা ৫০% বাড়বে—অতএব তাতে ৩ হতে ৪ লাখ বাড়তি লোক লাগবে। ফ্যাকটরি শিল্পে ১৯৫০-৫১ সনে মোটামুটি ৩০ লাখ লোক নিযুক্ত ছিল তার মধ্যে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে ২৪ লাখ। এখন আশা করা যাচ্ছে, ফ্যাকটরি-উৎপন্ন ভোগ্য-দ্রব্য বাড়বে শতকরা ২০%, বাকী ভারী জিনিস বাড়বে শতকরা ১৫০% হতে ১৭৫%। এ হতে আশা করা যায় এতে ১২ হতে ১৪ লাখ বাড়তি লোক লাগবে। তা হলেই শিল্প ও ফ্যাকটরি জড়িয়ে ১৭ লাখ বাড়তি লোকের কর্মনিয়োগ হবে। এইভাবে হিসেবগুলি জোড়া হয়েছে।

এইবারই আসল পরিকল্পনার শুরু

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিকল্পনার এইসব আকার প্রকার তুলনা করলেই এখন তফাতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত বলা চলে, প্রথম পরিকল্পনা ছিল মেরামতী কারবার, ভিত গড়ার ব্যাপার। তখন কতবড় বাড়ি উঠবে, তার কী নকশা হবে এ-সব কথা ভাবার সময় আসেনি। কিন্তু এখন সে সময় এসেছে। বস্তুত এখনও যদি আমরা ভীরু পদক্ষেপে চলি, সাহস করে কষ্টস্বীকার করে একটু দ্রুত-গতিতে চলবার চেষ্টা না করি, কেবল ঠুকঠাক মেরামতের কাজেই ব্যস্ত থাকি, তা হলে আমরা দুটি বিপদের সম্মুখীন হব। প্রথমত আমাদের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। যদিও তার বৃদ্ধির হার খুব বেশী নয়, তবু তার পরিমাণ অতিবৃহৎ। সেই সঙ্গে সমস্যাও স্বভাবতই বাড়ছে। সুতরাং আমাদের মুশকিল যে-গতিতে বাড়ছে আসান যদি তার চেয়ে দ্রুততর না হয় তা হলে আমাদের অবস্থার শেষ পর্যন্ত উন্নতি হবে না। আমাদের সমস্যার চেয়ে সমাধান দ্রুততর ও বৃহত্তর হওয়া দরকার। কিন্তু শুধু অর্থনীতির কথাই নয়। সেই সঙ্গে, দ্বিতীয়ত রাজনীতি অর্থাৎ লোকের মেজাজের কথাও ভাবতে হবে। এমন হতে পারে যে, আমরা এমন একটা পরিকল্পনা করলাম যা সমস্যার আগে আগে কথঞ্চিৎ চলেছে বটে, কিন্তু তা অতি সামান্য এবং তাতে জনসাধারণের মোটামুটি অবস্থা ফিরতে, ধরা যাক, পঞ্চাশ বছর লাগবে। সে পরিকল্পনা সম্বন্ধে অর্থনৈতিক দিক থেকে হয়তো বলার কিছুই নেই, কিন্তু তাতে কি জনসাধারণ স্থির থাকতে পারবে? তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে না? আর তা যদি যায় তা হলে রাজনৈতিক তরঙ্গ অর্থনীতির কূলকে প্লাবিত করে দেবে—প্ল্যান যতই ভাল হক না কেন, তা কাজে পরিণত করার অবসর মিলবে না। কোন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রই জনসাধারণের এই আশা আকাঙ্ক্ষার

তীব্রতাকে অস্বীকার করতে পারে না—করলে চীনের চিয়াঙ্ রাজত্বের অবস্থা হবে। তাঁদেরও কৈফিয়ত ছিল, তাঁরাও ভূমি-সংস্কার ইত্যাদি করছেন, যদিচ তা কাজে

হয়নি। সুতরাং এইবার যখন আমরা খানিকটা ভিত রচনা করেছি, তখন এই সব কথা আমাদের ভাববার সময়ও হয়েছে, প্রয়োজনও হয়েছে। পূর্বে যে সব আলোচনা করেছি তা হতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এসব দিকে নজর পড়েছে। প্রথমত প্ল্যানের আকার বড় হয়েছে, লগ্নির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝোঁক পড়েছে কর্ম-বিনিয়োগের উপর। তৃতীয়ত, এই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপে এবার ঝোঁক পড়েছে শিল্প ও বিদ্যুতের উপর।

অনুন্নত দেশের বিশেষ সমস্যা

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা প্রসঙ্গতই এসে পড়ে। অনুন্নত দেশগুলির কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। দু'একটির উল্লেখ করি। (১) উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ততখানি দরকার হয় না, যতখানি অনুন্নত দেশে হয় আমাদের দেশে জনসাধারণের সহযোগিত সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আমাদে যথেষ্ট টাকা নেই যে কেবল capita intensive যন্ত্রপাতি নিয়েই কাজ চালি দেব, ততখানি লোকবলের প্রয়োজন হবে ন আর তা ছাড়া সে-টাকা যদি থাকত তাহলেও শেষ পর্যন্ত কোনও দেশই জ সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অগ্রস হতে পারে না, আমাদের মত বিরাট এ অনুন্নত দেশ তো নয়ই। সেই জন্য অ দেশে যে-প্রয়োজন এতটা বেশী হয় আমাদের দেশে তা হবে—অর্থাৎ সামাজি বদল এবং অর্থনৈতিক উন্নতি দুই-ই এ সঙ্গে করতে হবে। একটি ছাড়া অপরা হওয়া সম্ভবই নয়।

(২) তার উপর ভারতবর্ষের আর একা বিশেষ সমস্যা আছে। যে সব অনুন্নত দে এই রকম দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তারা একেবারে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে গায়ে জোরে শ্রেণী সমস্যার সমাধান করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। বলতে গেলে দুই পাখি নয়, তিন পাখি। শুধু সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে ও অর্থনৈতিক উন্নতির দ্রুত ব্যবস্থা করতে পেরেছে তাই নয় জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্তীকরণের প্রবর্তন করে আরও একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। প্রত্যেক অনুন্নত দেশেই প্রধানতম সমস্যা হল পর্যাপ্ত সঙ্গতির অভাব। যেটুকু সঙ্গতি আছে সেটুকুর সবটা না হোক, যত বেশী লগ্নি হবে তত তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। ব্যক্তির হাতেই যদি সেই সঙ্গতির অধিকাংশ থাকে, তা হলে তারা দেশের উন্নতির জন্য নিজেরা অযথা কষ্ট স্বীকার করতে যাবে কেন? নিজেরা মোটর গাড়ি কিনবে না, ভাল বাড়ি করবে না, সাবান মাখবে না, এমন কি দাড়ি রেখে ক্ষুরের পয়সা বাঁচাবে, আর সেইভাবে বাঁচানো পয়সা তারা লগ্নি করবে সিন্দ্রির কারখানার জন্য বা দামোদর উপত্যকার জন্য —এত দায় তাদের পড়েনি। অথচ সেই সঙ্গতি যদি রাষ্ট্রের হাতে থাকে তা হলে স্বতই রাষ্ট্র প্রয়োজনমত লগ্নি করতে দ্বিধা করবে না। কাযেই যে-সব দেশ সঙ্গতি রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলেছে এবং ব্যক্তির জীবন কঠিন নিয়ন্ত্রণে বেঁধে বলতে পেরেছে, প্রয়োজন হলে তোমাদের সাবান দেব না, ক্ষুর দেব না, কিন্তু ট্র্যাক্টর ফ্যাক্টরি গড়ে দেব, সার তৈরি বাড়িয়ে দেব, তারা এদিকের সমস্যাটাও ঐভাবে সমাধান করতে পেরেছে। রাশিয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্টালিনের রিপোর্টগুলি পড়লে এ রকম আবহাওয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়াও একটি কথা আছে। অনুন্নত দেশগুলির আর একটা বিশেষত্ব হল তার

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবটা টাকাকড়ি লেন-দেনের আওতায় আসে না—অর্থাৎ সবটা monetised নয়। চাষীরা তাদের উৎপন্ন ফসলের সব অংশ তো বিক্রি করে না, খাজনা ইত্যাদির জন্য যা দরকার তাই বিক্রি করে, বাকীটা নিজের প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়, সে-অংশটা টাকাকড়ির হিসেবে বা লেনদেনের আওতায় আসেই না। যে-সব দেশের গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোই monetised, সেখানে অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল, এমন কি উন্নতি, ঘটানোও কতকটা সহজ। আর্থিক কলকৌশলেই তা হতে পারে। সরকার চাষীদের ঋণ দিলেন. তারা ট্রাক্টরের অর্ডার দিলে, ট্রাক্টর ফ্যাকটরি হুড় হুড় করে চলতে লাগল, তাদের লাভের টাকার বখরা পেল শ্রমিকরা, তারা বেশী বেশী ভোগ্যবস্তু কিনতে লাগল, সেই সব ভোগ্যবস্তুর কলকারখানা বেশী বেশী চলতে লাগল, এই সব ফ্যাক্টরি আবার তাদের লাভের অংশ ব্যাঙ্কে জমা রাখল, ব্যাঙ্ক আবার সেই টাকা বিভিন্ন কাজকারবারে লগ্নি করল—চাকা ভন্ ভন্ করে ঘুরতে লাগল। কিন্তু যে সব দেশ monetised নয় সে-সব দেশে ঐ কৌশল পুরোপুরি চলবে না। টাকার বোতাম টিপলে তার প্রবাহ অনেক জায়গায় পৌঁছবেই না। সেখানে আরও প্রত্যক্ষ সংযোগ, প্রত্যক্ষ উৎসাহ, প্রত্যক্ষ পরিচালনা চাই। সমস্ত জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণে বাঁধা হলে এ কাজ সহজেই হয়, কারণ সেখানে প্রেরণা জোগাবে টাকা নয়, স্ট্যাখানো-ভাইটেরা। মুনাফাই যে কর্মের মূল প্রেরণা এই কথাটাই সেখানে বদলে গিয়েছে যে!

ভারতবর্ষ এ পথে যায়নি। তা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে কথা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু ভালই হক আর মন্দই হক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ভারতবর্ষ এ পথে যায়নি। সে চলেছে এক মঝামঝি নিকায় অবলম্বন করে। সে অনেক জিনিস রাষ্ট্রায়ত্ত করছে, কিন্তু তার পরিপূরক হিসেবে প্রাইভেট সেকটরও বজায় রেখেছে। সে অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবার জন্য প্রয়োজন মত বিধিব্যবস্থা করছে. কিন্তু তাও জন-সাধারণের সার্থক সহযোগিতায়, সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে হুকুমের জোরে নয়। এ বড় কঠিন কাজ। ইংলণ্ডের মত সচেতন সহযোগিতাপ্রিয় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ হলে এ কাজ অনেক সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট অশিক্ষিত দেশে, চাতকবৃত্তির দেশে, এই কাজ সহজ নয়। সমষ্টির মঙ্গল সাধন করব, অথচ ব্যষ্টিকে মূল্য দেব। এ কাজ সহজ নয়। সত্যকারের সফল হলে এ এক নতুন আদর্শ রচিত হবে। গান্ধীজী রাষ্ট্রকে যে ভয় করতেন এবং সকলের উপরে ব্যক্তিকে মূল্য দিতেন সেই আদর্শ সফল হবে, যা অসহিষ্ণু জীর্ণ দীর্ণ প্রাচ্যদেশে সফল হয়নি—কারণ এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যে সব অনুন্নত দেশ দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে (যেমন রুশিয়া বা চীন) তারা সর্বাত্মক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতেই মোটামুটি তুলে দিয়েছে, আর যারা তা করে নি (যেমন ইরান, প্যাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া) তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি দূরে থাক স্বাধীনতার পর এখন পর্যন্ত সংবিধানই রচনা করতে পারেনি বা প্রথম সাধারণ নির্বাচনই করতে পারেনি অথবা রাজনৈতিক মারামারিতেই ডুবে রয়েছে। এই পটভূমিকায় বলতেই হবে ভারতবর্ষ এক নতুন পথ রচনা করবার চেষ্টা করছে। তা সফল হলে এক নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে এ পথ কঠিনতর। অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির যে সমস্যা সে সবগুলি তো ভারতবর্ষেরও আছে, তার সঙ্গে এই আর একটি বিশেষ সমস্যা যুক্ত হয়েছে।

(৩) পূর্বের আলোচনা হতেই অনুন্নত দেশগুলির আর একটা সমস্যা স্পষ্ট হয়। উন্নত দেশগুলিতে সঙ্গতি যথেষ্ট, সেই সঙ্গতির পূর্ণ ব্যবহার করলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সেই জন্য ওদেশের শাস্ত্রে বেকারতত্ত্ব আলোচনায় অনেককাল পর্যন্ত সাময়িক বেকারি ছাড়া অন্য কোনও বেকারির কথা ভাবাই হত না। এখনও ওদেশের পূর্ণ নিয়োগের যে সব তত্ত্ব হচ্ছে
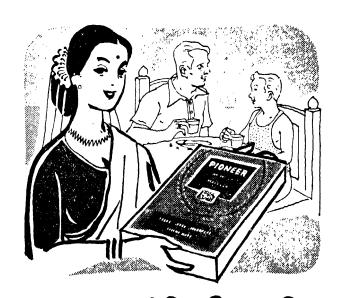
তার মোদ্দা কথাটা হল জাতীয় সঞ্চয়ের পূর্ণমাত্রায় লগ্নি কিভাবে হতে পারে। অর্থাৎ জাতীয় সঞ্চয়ের পূর্ণতম ও সুষ্ঠুতম লগ্নি হলেই সমস্যা মিটে যাবে। আমাদের সমস্যা কিন্তু তা নয়। আমাদের সংগতি এত অল্প যে, তার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করলেও সমস্যা মিটবে না। আমাদের আরও সংগতি বৃদ্ধি করতে হবে। সেইজন্য আমাদের সমস্যা দ্বিবিধ। একদিকে বর্তমান সংগতির পূর্ণতম নিয়োগ তো করতেই হবে, অপর দিকে নতুন সংগতিও সৃষ্টি করতে হবে। কাজটা সহজ নয়। সংসারে কর্তাকে প্রতিদিনের চাল ডাল নুন তেলের বাজার খরচও (অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু) যোগাতে হবে, আবার বসতবাড়ি মেরামতও করতে হবে, ঘরও বাড়াতে হবে (অর্থাৎ Producer's goods) এবং সেই সঙ্গে মেয়েজামাইয়ের জন্য নতুন বাড়িও করে দিতে হবে (নতুন সঞ্চয় বা সংগতি বৃদ্ধি)। অথচ হাতে টাকা অতি সামান্য। এ কাজ করতে গেলে দুরূহ চেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠতম কলা-কৌশল দরকার। সে কথা পরে বলছি।

(৪) কিন্তু নতুন সঞ্চয়ের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চলতি লগ্নির মধ্যেও সমস্যা কম নয়। উন্নত দেশগুলি বহুকাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার সময় পেয়েছিল। সেজন্য তাদের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথমে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্প গড়ে উঠেছে, তারপর সেই থেকে টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তারা ক্রমে ক্যাপিটাল গুডসের শিল্প গড়েছে। আমাদের তা উপায় নেই। আমাদের দুটো দিকই একসঙ্গে করতে হবে। সেদিন পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছেন ভারী জিনিস তৈরী না করতে পারলে স্বাধীনতাই থাকবে না। মোটর-গাড়ি বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে যদি বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, তা হলে স্বাধীনতা বজায় থাকবে কি করে? স্টালিনও তাঁর পার্টি রিপোর্টগুলিতে এই কথাই রুশিয়াকেও বারবার বলেছিলেন। সে হিসেবে আমাদের দেশে ইতিহাসের ধারা ওলটাতে হবে। প্রথমেই ক্যাপিটাল গুডস তৈরির দিকে ঝোঁক দিতে হবে এবং উপরন্তু সেই দিকেই ঝোঁক বেশী দিতে হবে। অথচ অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্য কম হয়ে গেলে মূল্যবৃদ্ধি হবে, তা-ও আবার আমরা সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ দিয়ে সমাধান করতে চাচ্ছি না। এই সব সমস্যা আমাদের রয়েছে।

(৫) এছাড়া আরও একটি সমস্যা আছে। আমাদের দেশের অবস্থা এত জীর্ণ এবং অসহায়, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য এত বেশী যে, সব টাকা কেবল অর্থনৈতিক কারবারে লগ্নি করলেই হবে না। অর্থাৎ চাল-ডাল কেনাই শুধু নয়, বাড়ি মেরামতই শুধু নয়, মেয়ে-জামাইয়ের জন্য নতুন বাড়ি করে দেওয়াই শুধু নয়, তার সঙ্গে ডাক্তার-বদ্যির খরচ আছে, ইস্কুল-কলেজের খরচও আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সোশ্যাল সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্বল্প সংগতির মধ্যে তারও ব্যবস্থা চাই।

(৬) এই থেকে আরও একটা সমস্যার কথা উঠে পড়ে—যা বিশেষ করে অনুন্নত দেশেই প্রবল। জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে জন্মহারের একটা মোটামুটি সম্বন্ধ আছে—মান যতই বাড়ে, জন্মহারও ততই কমে। কিন্তু তা কমে অনেকদিন পরে,—অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান হঠাৎ বাড়লেই তা কমে না, বরং বাড়ে। আমাদের এখানে এই কারণে জন্মহার তো কমবে না, বরং বাড়তেও পারে। অন্যদিকে উন্নততর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার কমবে। পশ্চিম বাংলায় দেখা গিয়েছে, মৃত্যুহার হাজারকরা উনিশ থেকে হাজারকরা দশে এসে দাঁড়িয়েছে গত কয়েক বছরে। অথচ জন্মহার হাজারকরা সম্ভবত ৩৭ই রয়েছে। ফলে এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। চীনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখা দিয়েছে। তার অর্থ, প্ল্যানের আকার এবং চেষ্টার তীব্রতা আরও বাড়াতে হবে, তা না হলে যেটুকু উন্নতি হবে, দ্রুত জন-

সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তা ক্ষয় পেয়ে যাবে—শেষ পর্যন্ত খতিয়ে দেখলে উন্নতি হবে না।

অনুন্নত দেশে এইসব কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। এখন দেখা যাক, আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এসব সমাধানের কী চেষ্টা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানের কলকৌশল

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল না। সুখের বিষয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এসব সমস্যা খুব তীক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে এবং আমরা যে রাজনৈতিক কাঠামো মেনে নিয়েছি এবং আমাদের মোটামুটি যা সম্পদ আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ-বিষয়ে এখনও মতৈক্য হয়নি, কারণ এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক মহলানবিশ যা বলছেন, অর্থনীতিবিদেরা ঠিক সে কথা বলছেন না—আবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অন্য কথা বলছেন। যাই হোক, সেই সব তর্কের সামান্য কিছুটা আলোচনা এখানে প্রয়োজন, কারণ তা না হলে আমাদের কলকৌশলের স্বরূপটা বোঝা যাবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কথাটা কী? তার প্রথম উদ্দেশ্য হল জাতির দ্রুততর উন্নতি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষ করে বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়, পূর্ণতর কর্ম-নিয়োগ। চতুর্থ এবং বোধ হয় সবচেয়ে দরকারী হল সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে চতুর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে তো কোনও তর্কই নেই। প্রথম উদ্দেশ্যটি নিয়ে তর্ক আছে। অধ্যাপক শেনয় বলছেন, এত বড় প্ল্যান চলবে না, আকার ছোট করা দরকার, তা না হলে লোকের কষ্ট হবে। ডাঃ রায়ও বলছেন, আর ট্যাক্স চাপানো চলবে না, বিশেষত যখন আজকাল ভোটের মালিক প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক লোক। এ নিয়ে দীর্ঘ বিচার করতে গেলে প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পূর্বে যে সব কারণ ইঙ্গিত করেছি, তা হতেই স্পষ্ট হয় যে, পরিকল্পনার আকার কমানো তো চলেই না, বরং দরকার হলে বাড়াতে হবে। যারা নতুন কার্যক্ষম হয়ে উঠবে, তাদের কাজ যুগিয়ে বর্তমানে যারা বেকার তাদের কিছু অংশকেও যদি কাজ দেওয়া না যায়, তাহলে দেশের কি উন্নতি হবে? আর যদি দেশের উন্নতি না হয়, বেকারি বাড়তে থাকে, তা হলে কেবল ট্যাক্স না চাপিয়েই লোকের মনোহরণ করা যাবে, ভোট মিলবে? আসলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতেই হবে এবং তার জন্য দরকারমত করও বসাতে ভয় পেলে চলবে না। কারণ যে-কর হতে দেশের উন্নতি হয় না সে-কর করই নয়। বিশেষত যখন কল্যাণ-রাষ্ট্রে কর সম্বন্ধে কালিদাসের সেই কথাই প্রযোজ্য—"সহস্র-গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ"—রবি মৃত্তিকা থেকে রস গ্রহণ করেন সহস্রগুণ করে ফিরিয়ে দেবার জন্য (এই বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেওয়ারই পারিভাষিক নাম multiplier বলা চলে)। তা ছাড়া পূর্বে যে হিসেব দিয়েছি তা হতে দেখা যাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসেবগুলি অসংগত নয়। প্রথম পরিকল্পনার গোড়ায় অনুমান ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% হতে ৬½% লগ্নি হবে। কাজের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তা হতে কম লগ্নি তো হয়ইনি, বরং কিছু বেশীই হয়েছে। এখন ধরা হয়েছে ৭% হতে ১১% পর্যন্ত লগ্নি হবে। এ এমন কিছু বেশী নয়। অন্য দেশের তুলনায় তো বেশী নয়ই। সুতরাং পরি-কল্পনার আকার কমাবার কোনও প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়।

কিন্তু তা হলেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা উৎপাদনের দিকে বেশী ঝোঁক দেব, অথবা কর্মসংস্থানের দিকে? কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বড় বড় কলকব্জা বসিয়ে উৎপাদন হয়তো খুব বেশীই করা যায়, কিন্তু বেকারিও বাড়ে। আমাদের উৎপাদনও চাই, অথচ কর্মসংস্থানও চাই। এই দুই উদ্দেশ্য মেলাব কী করে?

এইখানে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মত খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। তাঁর মতে নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে খুব তীক্ষ্ম যুক্তিও আছে। প্রথমে তার মতটা সংক্ষেপে বলি। অধ্যাপক মহলা-নবিশ বলছেন, বৃহৎ শিল্প তো বাড়াতেই হবে, তাতে লোকের হাতে টাকাও আসবে, আর যদি তার উপযুক্ত ভোগ্যদ্রব্য বাজারে

না আসে তা হলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হবে। এই ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ, অধ্যাপক মহলানবিশের মতে, আনতে হবে কুটির শিল্প ও হস্তচালিত শিল্প হতে। তাতে শুধু যে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটবে তাই নয়, অনেক কাজও সৃষ্টি হবে। এইভাবে একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। কিন্তু এর সফলতার জন্য দরকার, যতদিন পর্যন্ত বেকারি দূর না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ফ্যাক্টরিতে ভোগ্যদ্রব্য, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, উৎপাদন হতে দেওয়া হবে না। হস্তচালিত শিল্পের জিনিসের দাম সাধারণত বেশী হয়; অধ্যাপক মহলানবিশের প্রস্তাব, ফ্যাক্টরি-উৎপন্ন জিনিসের উপরও কর বসিয়ে তার দাম চড়িয়ে দেওয়া হোক। এই হল তাঁর মোটামুটি বক্তব্য।

এই মতের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর বক্তব্য হল মোট তিন-চারটিঃ—(১) কুটির শিল্প ও হস্তচালিত শিল্পে উৎপন্ন জিনিস সাধারণত খারাপ অথচ চড়াদামের হয়—তাতে সাধারণ লোকেরও মন উঠবে না। (২) চাষীদের নিকট হতে জিনিস পেতে গেলে তাদের পছন্দসই জিনিস না দিলে হবে না—ও সব জিনিস সে-রকম নয়, আর ক্যাপিটাল গুড়সের বিনিময়েও চাষীরা জিনিস ছাড়বে না। সেইজন্য তাঁর মতে এখন দরকার (১) কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি; (২) অধিকতর ভোগ্যবস্তু উৎপাদন; (৩) ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের যে-সব ফ্যাক্টরি আছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার।

এই তর্কের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান পরিসরে হওয়া সম্ভব নয়। তবু দু'একটা কথা ভাবা যেতে পারে। অধ্যাপক মহলানবিশের কথার পিছনে দুটি যুক্তি আছে। তার প্রথমটি হল, একই সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের জন্যও ফ্যাক্টরি গড়ব ভোগ্যবস্তুর জন্যও ফ্যাক্টরি গড়ব এত সঙ্গতি আমাদের কোথায়? সুতরাং তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হল, যখন অত সঙ্গতি নেই অথচ অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে কুটির শিল্পে কর্মনিয়োগ অনেক বেশী হয় ততদিন ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ফ্যাক্টরিতে বন্ধ রেখে কুটির শিল্পে চালালে উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারে। আর দামের কথা? কেন, সে-সময় তো অন্যদিকে আর্থিক লগ্নির ফলে দেশের লোকের হাতে টাকা আসবে। তা হলে তারা একটু চড়া দরে জিনিস কিনতে মোটেই কষ্ট পাবে না। বরং তাতে টাকার বাড়তির ফলে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হয় তার খানিকটা নিরোধ হবে। তা ছাড়া চিরকালের জন্য তো এ-ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যতদিন না বেকারি ঘোচে কেবল ততদিন এই ব্যবস্থা চলুক, তা হতে হতে ইতিমধ্যে দেশের সঙ্গতিও বৃদ্ধি পাবে, দেশময় বিদ্যুৎ শক্তি হয়ে যাবে, তখন কুটির শিল্পগুলিকে বিদ্যুৎ-চালিত

ছোট ছোট কারখানায় পরিণত করলেই তো হবে। আর পছন্দের কথা? কেন, যুদ্ধের সময় লোক ভাল জিনিস না পেয়ে এইসব জিনিস কি অনায়াসে গ্রহণ করেনি?

বলা বাহুল্য এই যুক্তি ডাঃ রায়ের অধিকাংশ আপত্তিকেই খণ্ডন করে। আর তা ছাড়া অধ্যাপক মহলানবিশের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে ডাঃ রায় আবার এমন কতকগুলি দিকে ঝোঁক দিয়েছেন যা হতে অনেক তর্ক উঠে পড়ে। তাঁর বক্তব্য হতে মনে হয়, তিনি যেমন করভার চাপানোর বিরোধী—তিনি মনে করেন শ্রমদান ও স্বেচ্ছাদান হতেই সে-কাজ হবে—তেমনি তাঁর ঝোঁক হল ভোগ্যদ্রব্যের মান ও পরিমাণ বাড়ানোর উপর। কিন্তু এ হতেই অনেক প্রশ্ন ওঠে। এ-কথা ধ্রুব সত্য যে, শেষ পর্যন্ত বৃহৎ ও বুনিয়াদী শিল্প না হলে জাতির উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না—কোন দেশেই তা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডেও না, সাম্যবাদী রুশিয়াতে না। সে অবস্থায় আমরা যদি ভোগ্যবস্তুর উপরই ঝোঁক দিই তা হলে কি আমাদের সব সম্পদ, চলতি ভাষায়, খেয়ে পরে উড়িয়ে দেওয়া হবে না? বর্তমান সুখের জন্য কি আমরা ভবিষ্যৎকে বলি দেব? বস্তুত, ভোগ্যদ্রব্য কি এই টানাটানির বাজারে ঠিক ততটুকুই উৎপন্ন হওয়া উচিত নয় যেটুকু না হলে আমাদের ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না এবং যেটুকু না থাকলে বাজারে ইনফ্লেশন দেখা দেবে? আর তা ছাড়া আমরা যদি কেবল সমাজসেবার দিকেই ঝোঁক দিই—পশ্চিম বাংলায় বরাবরই তাই দেওয়া হচ্ছে—এবং সেই সঙ্গে আর্থিক উন্নতির দিকে কম ঝোঁক দিই, তা হলে আমরা তো কেবলই জনসংখ্যা বাড়িয়ে যাব অথচ তাদের অন্নবস্ত্রের কোনও সংস্থান করতে পারব না। তাতেও কি শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কল্যাণ হবে? কাজেই এদিকটাও যেমন দরকার, তেমনই ওদিকটাও দরকার—এবং হয়তো একটু বেশী দরকার, সে-কথা ভুললে চলবে না। আর কাজের ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ও তা ভোলেননি। তর্কের সময় তিনি যাই বলুন না কেন, এবার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলায় বৃহৎ শিল্পের উপর যথেষ্ট ঝোঁক পড়েছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, অধ্যাপক মহলানবিশের যথেষ্ট তীক্ষ্ণ যুক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই মনে হবে একেবারে কুটির শিল্পের যুগে ফিরে যাওয়া বোধহয় পশ্চাদপসরণ হবে। বস্তুত অধ্যাপক মহলানবিশও তা বলেননি। তাঁর পুস্তিকা এবং তারপর ১৪।১।৫৫ তারিখে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতা হতেও বোঝা যায় যে, এটাকে তিনি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই বলেছেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—As unemployment is brought under control and as the supply of electricity increases, as our machine-building industry develops and as we have a bigger supply of steel, we should manufacture motors and small machines in larger numbers; and give these to the artisans working in the small and household industries.... our aim should be to increase the productivity in the small and household industries as much as possible through the use of cheap electricity and machine of the most modern type made in India. এইভাবে নতুন চেহারার ছোট শিল্পগুলি একবার গড়ে উঠলে তখন তা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করবে। তাঁর মতে I believe in India, the small-scale and household industries can and should enjoy an important and enduring position. দেখা যাচ্ছে এতদিন গান্ধীজী যে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির কথা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে বলে আসতেন ঠিক সে-জিনিস

না হলেও অন্য যুক্তিতে আধুনিক অর্থনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রায় সেই এক-জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছেন।

অর্থনীতিজ্ঞরা এ-বিষয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তাঁরা এত চুলচেরা তর্কের মধ্যে না গেলেও তাঁরাও মোটামুটি বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিরই সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের মতে ফ্যাক্টরি-উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য বাড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা হওয়া অবশ্যই উচিত (এইখানে অধ্যাপক মহলানবিশের মত অন্য), কিন্তু আপাতত তা খুব বাড়া সম্ভব মনে হয় না। তবু কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প দিয়েই সব ভোগ্যবস্তুর দাবি মেটানো যাবে এ-কথাও তাঁরা মনে করেন না। সেইজন্য ফ্যাক্টরি শিল্পে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন একেবারে বন্ধ করার পক্ষপাতী তাঁরা নন।

ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এঁদের সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের তফাত খুব বেশী নয়। দুজনেই চাচ্ছেন বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি স্থগিত হক এবং শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিদ্যুৎ-চালিত গ্রামাঞ্চলের ছোট শিল্প আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্থায়ী লক্ষণ হয়ে থাক। তবে একজন তার জন্য গোড়ায় খুব কড়াকড়ি করতে চান অপরেরা ততখানি চান না। আমাদের সঙ্গতি কত এবং কোথায় কী শিল্প হবে, কত তাড়াতাড়ি ইস্পাত আর বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তার আর একটু খুঁটিনাটি হিসাব হলেই হয়তো এ-বিরোধ মিটে যাবে, কেন না দুয়েরই ঝোঁক মোটামুটি একদিকে। বস্তুত এ ছাড়া আমাদের উপায়ও নেই। বিকেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা এখানে আর করতে চাই না—তা সকলেই মোটামুটি জানেন। আজ ইংলণ্ডের মত প্রচণ্ড কেন্দ্রীভূত দেশও লণ্ডন ও আনুষঙ্গিক শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব কমিয়ে কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাচ্ছে। আমাদের দেশে তো কথাই নেই। গ্রাম থেকে সব লোক শহরে এনে ফেলব, প্রচণ্ড খরচে শহর গড়ে তুলব, অথচ অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে না থাকবে জীবিকা না থাকবে স্বাস্থ্য,—এমন অবস্থা আমাদের দেশে ভাববাদসম্মত তো নয়, নিছক বস্তুবাদসম্মতও নয়—তাতে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোই টিকতে পারে না। সেইজন্য এখন আর বলা চলে না যে, বৃহৎ শিল্প কেবল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে থাক আর আমরা ঝোঁক দিই কৃষির উপরে—কারণ তাহলে আমরা কোনদিনই উন্নতির পথে দৃঢ়পদক্ষেপে চলতে পারব না।

আর্থিক সংস্থান

পরিশেষে পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থান কিভাবে হবে, তারই উল্লেখমাত্র করে প্রবন্ধ শেষ করি, যদিচ এ-বিষয়েও অনেক তর্ক আছে এবং সুদীর্ঘ আলোচনার অবসর আছে। করভার বসালে তা আবার বিভিন্ন খরচের মারফত দেশের লোকের হাতে ফিরে গিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি না, করলেও কোন শ্রেণীর করবে, ঘাটতি করে টাকা খরচ করলে (ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং) ইন্‌ফ্লেশন হবে কিনা, বহির্বাণিজ্য কতটা বাড়তে পারে, যাতে আমরা প্রয়োজনমত অন্য দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারব, আমাদের ব্যালান্স অব পেমেণ্টস কী হবে, ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন এসে পড়ে। সেসব প্রশ্নের আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে যাবে। হিসেব করে দেখা গেছে, এই পাঁচ বছরে প্ল্যানে খরচ হবে সরকারী খাতে ৪৩০০ কোটি, আর তার বাইরে সরকারের অন্যান্য খরচ ৪৫০০ কোটি—একুনে ৮৮০০ কোটি টাকা। তার হিসেব দাঁড়াচ্ছে এইরকম:—

খরচ	কোটি টাকা
(ক) পরিকল্পনার জন্য	৪৩০০
(খ) তার বাইরে খরচ	৪৫০০
	৮৮০০
জমা	
(ক) বিভিন্ন রেভিনিউ খাতে	৫২০০
(খ) রেলওয়ে হতে	২০০
(গ) জনসাধারণের নিকট ঋণ	১০০০
	৬৪০০
ঘাটতি	২৪০০

এর মধ্যে বোধ হয় ৪০০ কোটি টাকা অন্য দেশের সাহায্য পাওয়া যাবে। তাহলে বাকী রইল ২০০০ কোটি। তার মধ্যে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং ১০০০ হতে ১২০০ কোটির বেশী করা সম্ভব নয়। তাহলে বাকী থাকে ৮০০ কোটি টাকা। তা আসবে নূতন কর হতে—তা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। তাতে জনসাধারণের কষ্ট আছে নিশ্চয়ই, তবে সেই কর যদি সুষ্ঠুভাবে খরচ হয়, ভাল পরিকল্পনায় হয়, দেশের লোকের হাতে আবার টাকা বাড়াবার অস্ত্র হয়, তাহলে তাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

উপসংহার

পরিকল্পনার এই মোটামুটি আলোচনা হতে যে জিনিস স্পষ্ট হয়, সেটা হল এই যে, (১) প্রথম পরিকল্পনায় আমরা ভিত্তি রচনা করেছি, এইবারই আমাদের আসল পরিকল্পনা শুরু। (২) দুঃসাহসিক পথে আমাদের যাত্রা, কারণ আমরা প্রচলিত পথ ছেড়ে এক তৃতীয় পথ 'উদ্ভাবন করতে চলেছি। (৩) তার জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার জনসাধারণের সহযোগিতা। এটা মুখের বুলি নয়, কেননা নিয়ন্ত্রণ করব না অথচ নিয়ন্ত্রণের ফল চাইব, সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করব না অথচ এই অনুন্নত দেশে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ঠিকমত লগ্নি হতে থাকবে—এইরকম ব্যাপার জনসাধারণের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও সজীব সহযোগিতা ছাড়া হয় না।

গিন্নীমা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্টেশনের বাইরে এসে দেখি যান-বাহন কিছুই আসেনি। তা হলে যা আশঙ্কা করেছিলাম, টেলিগ্রামটা নিশ্চয় পৌঁছয়নি। যা জায়গা দেখছি, ভাড়াটে যান-বাহনের প্রশ্নই আসে না। একটি মাত্র ছই দেওয়া গোরুর গাড়ি দূরে একটা বাদাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল—বাড়ির গাড়িই তবু না হয় জিজ্ঞেস করে দেখা যেত, কিন্তু আমি যতক্ষণে বেরিয়ে এসেছি ততক্ষণে সেটা বাদামতলা ছেড়ে রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গেছে।

ঝাড়া তিনটি ক্রোশ পাড়াগাঁয়ে কাঁচা রাস্তা, কী করব চিন্তা করছি, এমন সময় গোরুর গাড়িটা আরও খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একটি চাষাভুষো গোছের লোক সামনের দিক থেকে নেমে সরাসরি আমার কাছে এসে জানাল যে, গিন্নীমা আমায় ডাকছেন।

একটু বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "গিন্নীমা!...আমি তো...তিনি বোধ হয় কিছু ভুল করেছেন...আমি তো থাকি না এদিকে।"

বিনীত উত্তর হল, "আজ্ঞে, ভুল নয়। তিনি আপনাকে ডেকেচেন, আস্তেজ্জে হোক আমার সঙ্গে।"

গাড়িটা একটু তেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কাছে আসতে আরও যেন একটু জড়সড় হয়ে পড়তে হল। 'গিন্নীমা' গোছের কেউ নেই, একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে ছইয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে, পাশে একটি বছর তিনেকের শিশুকন্যা। মেয়েটি কপালের আধাআধি পর্যন্ত মাথার কাপড়টা নামিয়ে বসে ছিল, আমি সামনে হতে আরও অল্প একটু টেনে দিয়ে, মুখটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়েও নিয়ে বলল, "রঘু, জিজ্ঞেস কর, ব্রাহ্মণ?"

বললাম, "হ্যাঁ মা, ব্রাহ্মণই আমি। তুমি আমাকেই ডেকেছ? ভুল করনি তো?"

মেয়েটি মাথাটা ঝুঁকিয়ে যুক্তকর বার তিনেক কপালে ঠেকিয়ে প্রণামটুকু সেরে নিলে, তারপর সেই রকম একটু তেরছা ভাবেই উত্তর করলে, "রঘু, বল, আমি ভুল করে ডাকিনি। মনে হচ্ছে যেন ওঁর গাড়ি আসবার কথা ছিল, আসেনি। কোথা যাবেন উনি?"

বললাম, "আমি যাব গোঁসাই পাঁচঘরা মা। হ্যাঁ, গাড়ি আসবার কথা, তা আসেনি। টেলিগ্রাম করেছিলাম, পায়নি বোধ হয় সময়ে। আর একটু দেখি।"

"হুঁ, এদিকে টেলিগেরাপ!......রঘু, বল, কপালে দন্ড লেখা ছিল সে তো হয়ে গেছে, আর কেন? আমরাও ঐদিকেই যাচ্ছি, উঠে আসুন।"

সঙ্কোচটা খুবই স্বাভাবিক, সেটা কিন্তু খাটলও না, টেঁকতেও পেলে না। ইতস্তত করছি দেখে মুখটা ঘুরিয়ে একটু সোজা-সুজিই রঘুর দিকে চেয়ে বলল, "হ্যাঁ রঘু, মেয়ের সঙ্গে যাবেন তাতে অত ভাবছেন কী?...সাধন, তুমি নেমে জোয়ালটা চেপে ধর, উনি উঠছেন। জুতো ছেড়েই উঠুন, রঘু কম্বলের নীচে রেখে দিচ্ছে।...কাতু, একটু সরে এস তো মা, দাদু বসবেন।"

এত সহজ কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গিটুকুও এত স্বচ্ছন্দ যে, দ্বিধা সঙ্কোচের আর কিছু থাকতে পেল না। আমি উঠে গিয়ে ছইয়ের শেষের দিকটায় সামনাসামনি হয়ে বসে পড়লাম। এরপর চুপ করে থাকাটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে; আমিই প্রশ্ন করলাম, "কোথায় যাবে মা তোমরা? এই গাড়িতেই নামলে? কিন্তু কই, দেখলাম না তো নামতে তোমাদের।"

"পোড়া কপাল! গাড়ির থেকে নামব কেন? দেখুন না, আপনার যেমন দুর্ভোগ আমারও ঠিক তেমনি। আপনি নেমে দেখেন গাড়ি নেই, আমি এসে দেখি যাঁদের জন্যে এতটা পথ ঘুরে গাড়ি নিয়ে আসা তাঁরাই আসেননি! নিগ্রহটা কম হল?—বলুন না আপনি।"

আর রঘুকে মাঝে রেখে নয়, বেশ সোজা-সুজিই আমার মুখের উপর চোখ দুটো তুলে। মেয়েটি গায়ে লুটিয়ে পড়ায় মাথার কাপড়ে যে একটু টান পড়ল, ডানহাত দিয়ে শুধু সেটুকু ঠিক করে নিলে।

অনেকগুলিই প্রশ্ন আসে মনে। আমি সব ছেড়ে শুধু সহানুভূতির কথাটাই বললাম, "নিগ্রহ নয়? এই জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ মাথায় করে। কচি মেয়েটা সঙ্গে...তোমারই বা কী এমন বয়স মা? ছেলেমানুষই তো।"

শেষের মন্তব্যটুকু যে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার কারণ সঙ্কোচের একেবারে বালাই নেই; এবং হয়তো এও যে গিন্নীমা বলে পরিচয়টা মনের মধ্যে একটি কৌতুক-প্রশ্নের রূপ নিয়ে থাকবে। মেয়েটিও যে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলে সেটাও নিশ্চয় ঐ কথাটুকু নিয়েই—তাতে এই রকমই মনে হল, তার বয়স নিয়ে একটা যেন গভীর রহস্য রয়েছে এবং তা চারিদিকেই বিভ্রম ঘটাচ্ছে; শেষে এই আমিও বাদ গেলাম না।

একটু ম্লান হেসেই বলল, "আমার কথা বাদ দিন। ছেলেমানুষটি থেকে গেলেই তো বাঁচতাম জ্যেঠামশাই, তা হতে পাচ্ছে কই।"

ও-প্রসঙ্গটা ঐখানেই শেষ করে দিয়ে মুখটি আবার গম্ভীর করে নিলে। বললে, "আমি খোকার কথাও ধরিনে। তার কি বয়েস, সে কি বোঝে বলুন?...মা-অন্তপ্রাণ, তা এখন যা নতুন হুজুগে মেতে রয়েছে তাতে মায়ের প্রাণটা ধড়ে আছে কি না আছে তা কি মনে থাকে? কোন কালেই করে থাকে নি তো ওর দোষ কি বলুন। কিন্তু তোমরা তো অতগুলো বিজ্ঞ মানুষ রয়েছ, অন্তত ভাব তো নিজেদের খুব বিজ্ঞ, তা যখন দেখলে এ-গাড়িতে পাঠাতে পারলে না, তখন একটা লোক দিয়ে বলে পাঠাতে তো হয়। জান, এই রকম ব্যবস্থা রয়েছে, একটা মানুষ হন্তদন্ত হয়ে ইস্টিশানে ছুটে আসবে। তার মনের অবস্থাটা তো বোঝা উচিত।"

কী রকম খোকা, বিজ্ঞমানুষই বা কারা, কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় কী মন্তব্য করি? আমি অনির্দিষ্টভাবেই বললাম, "ভুল হয়েছে বৈকি।"

"ভুল নয় জ্যেঠামশাই, এ আপনি লিখে রাখুন। এ ইচ্ছে করে আটকে রাখা।"

"তা হলে তো খুবই অন্যায়..."

"অন্যায় এই প্রথম নাকি? একটি একটি করে যদি ফিরিস্তি ধরে দিই তো দেখবেন একখানি মহাভারত। আসল কথা এঁরা কুটুম কুটুম করে যতই নাচুন, কুটুম ভাল হয়নি। ভালো কুটুমের এই ব্যাভার! বলুন না জ্যেঠামশাই।"

বললাম, "বে-আক্কেলপনা বৈকি।"

"তা আমিও হটবার পাত্রী নই। ইস্টিশনে বসিয়ে রেখে এলাম। ঘণ্টা খানেক পরেই ওদিককার গাড়ি আসছে, যান গিয়ে নিয়ে আসুন। ছেলে আমি আটকে রাখতে

দোব না। এদের বাবা বলে, নতুন কুটুম্ব, গিয়ে তাদের সঙ্গে এই নিয়ে বচসা করব? বললাম, বচসাই বা করতে যাবে কেন খোকা? সেবার অষ্টমঙ্গলের সময় অমন বিঘ্নিটা হয়ে গেল, এবার একবার মা-মঙ্গলচণ্ডীর তলাটা না দেখিয়ে ব্যাটা-বৌ ঘরে তুলব না, এ-কথাটা তো ও'রা জানেন। পষ্ট পষ্ট করে লিখে দিয়েছি—নিজের হাতে লিখেছি আমি—গাড়ি নিয়ে আমরা আসব, ইস্টিশনে ওদের নামিয়ে ওদিক থেকে ওদিকেই রৈনেতে চলে যাব, ভোগ রেঁধে, মার পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরব।...এসে দেখি না ছেলে-বৌ না একটা লোক যে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কী। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গাড়ি, দুটো ইস্টিশান, দূরেও নয়, বসিয়ে রেখে চলে এলাম।...এর মধ্যে বচসার তো আমি কিছু দেখছি না।......তবে হ্যাঁ, আমি থাকলে ওরই মধ্যে দুটো কথা শুনিয়ে আসতুম। তা তুমি যা মানুষ, পারবেও না, তার দরকারও নেই।"

রঘু সাধন-গাড়োয়ানের পাশাপাশি বসে গল্প করছিল, মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, "সতীন-খাই'তে একবার নামা হবে তো গিন্নীমা?"

"ওমা, নামতে হবে না? তুমি সব জেনে-শুনে এমন এক একটা বোকার মতন কথা বলে দাও বাছা। সতীন খাই'এর ঢিবিতে আগে একবার মাথা না ঠেকিয়ে রৈনেতে গেলে মা পুজোই নেন না বলে। আর সত্যিই কিনা রৈনেতে যেমন মার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল পড়েছিল, সতীন খাইতে তেমনি ছিটকে পড়েছিল। আঙুলের একটু নখ। তা নখ বলে তো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায় না। সতী-দেহের কতবড় অমর্য্যাদা হল তাতো ভেবে দেখো না। আর, হ্যাঁ রঘু......"

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে একটু অপ্রতিভ হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। হাসলে চোখে জল এসে যায়, চাপবার জন্যে বোধ হয় আরও একটু বেশী করেই বেরিয়েছে, মুছে নিয়ে বললে, "বলি হ্যাঁ রঘু, তোমার তো জানা উচিত বাছা, এদিককার লোক, তার ওপর বয়েসও হয়েছে; কথাটা কি সতীন খাই?"

রঘু একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, "তবে কি গিন্নীমা? আমরা তো তাই জানি।......কি গো সাধন ভাই, সতীন খাই-ই নয়?"

সাধন উত্তর করল, "আমরা তো তা-ই বলে এয়েচি। সতীন খাকীও বলে।"

"খুব কাজ করে এসেছ।" একটু হেসে ওদের কথাটুকু বলে আমার দিকে চেয়ে বললে, "কী গেরো দেখুন! সতীর নখ পড়েছিল তাই থেকে সতী-নখা; ও'রা সেটিকে তোড়ে দিয়ে সতীনখাই করেছেন, আবার সতীন খাকী! কী জ্বালা বাবা!"

হাসিটা আবার একটু ছলকে উঠতে চোখটা মুছে নিলে। তারপর আবার সেই ভারিক্কি গিন্নীটি—

"তা সতীন খাই-ই হোক আর সতীন খাকীই হোক, তুমি একটু চালিয়ে চল সাধন। রৈনেতে পৌঁছুতে যার নাম দুপুর। ভাবছি সতী-নখার দুধ পুকুরে চানটুকুও সেরে নোব, যাতে সেখানে গিয়েই ভোগটা চাড়িয়ে দিতে পারি। অর্জুন আর ঝিকে বলাই আছে, তারা সোজা পথে ওদিক দিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। এদিকে তোমাদের কর্ত্তাবাবুর গাড়ি ঘণ্টা তিনেক পরেই রৈনেতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে আবার গাড়িটা ফেরত দিতে হবে ও'দের নিয়ে আসতে।"

আমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। সমস্যাটা যেভাবে উদয় হয়েছিল, এদিককার পরিচয়ে আরও পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা না হয়ে আরও যেন জটীল হয়ে উঠেছে। এদিকে যতক্ষণ রঘু আর সাধনের সঙ্গে কথা কইছিল ততক্ষণে আমি আরও ভাল করে মেয়েটিকে দেখলাম। একটু তফাত থেকে ছইয়ের মধ্যে তখন একটু যেন রোগা রোগা ছিপছিপে মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু তা নয়; বরং শরীরটা অল্প একটু ভারীর দিকেই। গয়নাগাঁটিরও একটু বাহুল্য আছে, আর ভারীভারী। তারপর এই কথাবার্তা, স্বামীর উপর আধিপত্য, বেহাই-বাড়ি যাওয়ার জন্য স্টেশনে বসিয়ে এসেছে, ছেলে বৌ নিয়ে সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা, বুড়ো বুড়ো চাকরদের উপর সহজ মাতব্বরী,

নিগ্রহটা কম হল?

সব মিলিয়ে 'গিন্নীমা' কথাটার মধ্যে আর ততটা গরমিল বোধ হচ্ছে না। কিন্তু আসল সমস্যাটাই তো মিটছে না—খোকার বিয়ে।

অঙ্ক নিয়ে আমার মনে মনে একটি কসরত চলছে। প্রথম দেখায় যে-বয়সটি ফেলেছিলাম—ষোল সতের, সব মিলিয়ে সেটাকে কুড়ি-একুশ করতেও রাজী আছি। সত্য না হলেও খুব বেমানান হবে না। কিন্তু তা হলেও খোকার বিয়ে আসে কোথা থেকে? এই মেয়েটি বোধ হয় কোলের, বছর তিনেক হলে আরও বছর দুয়েক ধরা ভাল প্রথম সন্তানের জন্যে। কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে অজ পাড়াগা, এসব জায়গায় বাল্য-বিবাহের সঙ্গে কৈশোর-মাতৃত্ব বিরল নয়, আরও গোটা দুই বছর ধরা যায় তাকে টেনেটুনে; কিন্তু তাতেও তো খোকার বয়স বছর সাতেকের বেশী হয় না। এর মধ্যেই বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডীর দোরে মাথা খোঁড়া। কিন্তু হয়েছে তো তাই নিঃসন্দেহ। আমাদের বিবেকে বড় যেন বাধে। তাইতেই বোধ হয় আমার চিন্তাকুল দৃষ্টিতে একটা বেদনার ছাপ পড়ে থাকবে। মেয়েটি ওদের দুজনের সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছিল। কী কথা, এদিকে ভাল করে কানেও যাচ্ছিল না, বোধ হয় আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেই বলল, "জ্যেঠামশাই ভাবছেন—মেয়ে এত ব্যাজার কেন? ব্যাজার হই কি সাধে? ও'দের একটু আক্কেলের অভাব। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কী রকম আতান্তর দেখুন না! সামলাতে তো আমি একাই, কেউ তো দুটো পরামর্শ দিয়েও উপকার করতে আসবে না জ্যেঠামশাই।"

কথাটা পাড়বার একটা সুবিধা হল। দেখি

না রহস্যটুকু যদি মেটে। একটু হেসে বললাম, "তোমারই তো ভুল হয়েছে মা।"

একটু সচকিতই হয়ে উঠল, প্রশ্ন করল, "কিসে জ্যেঠামশাই?"

বললাম, "যেমন দেখছি—চারদিকের ঝক্কিটা তোমাকে একাই বইতে হয়। এমনই যখন অবস্থা তখন তুমি এর উপর এত তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিতে গেলে কেন? ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না, তাইতেই তো এই রকম গোলমালটা দাঁড়িয়েছে।"

বেশ গিন্নীর মতই নড়েচড়ে আরও একটু ভারিক্কী হয়ে বসল, বলল, "ছেলে যে আমার ছেলেমানুষ একথা একশবার স্বীকার করব। আপনি দেখেননি, শিশু বললেও হয়। বিয়েও যে আমি দিয়েছি তা এক হিসেবে জোর করেই, কারুরই কি মত ছিল? কিন্তু না দিয়েই বা কী করি বলুন? বিয়ে নিয়ে এক শুনেছি কবে কে এক সর্দার গোলমাল বাধিয়ে হৈচৈ তুলেছিল, তারপর আবার শুনছি এখন নাকি শিগগির এক আইন হচ্ছে যাতে ছেলেদের বয়েস আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে; কেউ বলছে পঁচিশ, কেউ কেউ আবার বলছে বিয়ের পর মেয়ে যদি টের পায় ছেলের বয়েস তিরিশের চেয়ে একদিনও কম তো ইচ্ছে করলে তাকে নাকি ছেড়ে চলে যেতে পারে। ডাইভোস, না কি বলে, সে-যুগের মেয়ে আমরা অতশত জানিও তো না—মেমসায়েব-দের মধ্যে নাকি চলন আছে আর নিত্যিই হচ্ছে। তা হলেই বুঝুন জ্যেঠামশাই, ছেলেকে দামড়া করে রেখে তো হিঁদুর ঘরে এই অনাচার ডেকে আনতে পারিনে। সবাই আমায় দুষছে, কিন্তু সব শুনলেন তো, এখন আপনিই বিচার করে বলুন কোনখানটায় দোষের হয়েছে আমার।"

কম্বলের উপর নখের একটা টান দিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

চমৎকার লাগছে। দু'ধারে টানা মাঠ, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের রাস্তাটা গেছে চলে। কাঁচা রাস্তা, তার উপর যানবাহন চলাচলের অল্পতার জন্য বেশির ভাগই সবুজ ঘাসে ঢাকা। মাঠের পরে ঘন সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে গোলপাতায় ছাওয়া বাড়ি-ঘর, উপরে এ মুড়ো ও-মুড়ো স্বচ্ছ নীল আকাশ চারি-দিক দিয়ে এসেছে নেমে। এখানে সময় আছে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। এটা দিল্লীর আইন কানুনের জায়গা নয়। এখানে নবীনা এই যে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে প্রাচীনার ভাষা আর ভঙ্গিতে প্রাচীন জীবন-সংহিতার জয়গান করে যাচ্ছে, এইটেই যেন সহজ আর মানানসই।

তবু একটু যে খুঁতখুঁতোনি লেগে ছিল মনের মধ্যে, সতীনখার পরিবেশের মধ্যে এসে সেটুকুও কেটে গেল। জায়গাটা বিশেষ কিছু নয়। ঘনশাখা-পল্লবিত একটি পুরাতন পাকুর গাছের গোড়ায় আগাগোড়া সিঁদুর লেপা একটি মাটির ঢিপি, তারই মধ্যে সতী-চরণের বাম কনিষ্ঠার নাকি নখ-কণিকা। পাশের পুষ্করিণীটি বড় না হলেও স্বচ্ছ, এদিককার মাটিটা সাদাটে বলে জলটাও একটু শ্বেতাভ। তাই থেকেই দুধপুকুর।

এইখানে আমি গুটি চার নব দম্পতির সাক্ষাৎ পেলাম। বেশ বোঝা যায়, সারদা আইনের সময় দেশে যে একটা আলোড়ন হয়েছিল, হিন্দু কোড বিলের হিড়িকে সম্প্রতি এসব অঞ্চলে তার একটা পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে ভালোরকমই। চারটি দম্পতিই শিশু দম্পতি বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সব চেয়ে যেটি বড় তার বরের বয়স নয় এবং কনের বয়স ছয়ের বেশি হবে না। সুতরাং সাত বছরের খোকা আর তার বধূকে এদের মধ্যে কল্পনায় দাঁড় করিয়ে নিতে আমার বেগ পেতে হল না। মনে এক ধরনের স্বস্তি পাওয়ায় সবটুকু আরও যেন উপভোগ্যই হয়ে আসতে লাগল।

সতী-নখায় খানিকটা সময় গেল। এখানে স্নানটা সেরে নিতে হল। রৈনেতে আমায় আটকে যেতে হবে, পুজো দেখে, প্রসাদ পেয়ে তবে আমার ছুটি। ঠিক করেছিলাম স্নানটা ওখানেই সারব। কিন্তু তাতে দুস্তর বাধা আছে। মেয়েটি চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, "ওমা, তা বুঝি জানেন না! আপনি জানবেনই বা কোথা থেকে?—এদিককার লোক নয় তো। রৈনেয় আপনি আর সব করুন, কিন্তু নাওয়া চলবে না! মা মঙ্গলচণ্ডীর ঐরকম আদেশ যে!......বুঝলেন না? সতী-নখার ঢিবি হল কতকটা আপনার শ্রীক্ষেত্রে যেতে সাক্ষীগোপালের মতন। এই আমি রৈনেয় যাচ্ছি, এই আমি চান করে শুদ্ধ হলুম দুধপুকুরে, এই আমি মায়ের নখে সিঁদুর

দিলুম। তারপরে আপনি গিয়ে রৈনের পুজো দিতে পাবেন, নৈলে পুজো আপনার নিচ্ছে কে? কত বার যে মা কত লোককে স্বপ্ন দিয়েছেন—পুজো তো করলি, তা সতী-নখার ঢিবিকে সাক্ষী মেনে এসে-ছিস?......তখন আবার যাও, দুধপুকুরে চান করো, ঢিপিতে সিঁদুর ছোঁওয়াও, রৈনেতে আবার ধন্না দাও, এই তখন গিয়ে মা পুজো নেবেন। ঐ যে বললুম—সতী-নখা হল রৈনের সাক্ষীগোপাল।"

কি রকম একটা কৌতূহল হতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ওদিকটা হয়ে এসেছ?—শ্রীক্ষেত্রের কথা বলছি।"

"তা হয়ে এসেছি বৈকি। জীবন হচ্ছে পদ্মপত্রে জলবিন্দু, গড়িয়ে পড়লেই হল,

তার ওপর আবার অম্বুবাচী রয়েছে, কবে আছে কবে নেই। তীর্থগুলি সব একবার করে সেরে রেখেছে। সংসারে যতদিন মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে হবে, তাতো হবেই, ছাড়ান নেই তো, তবু ভাবলে ওদিককার পথটা তো খোলা থাক। ......একবার করে বুড়ি-ছোঁওয়া করে এসেছে, তারপর অদৃষ্টে থাকে, ওঁদের দয়া হয়, আবার তখন যাবে..."

পাকুর-গাছ তলায় জায়গা পরিষ্কার করে খেতে দেওয়া হয়েছে কলাপাতায়। চিঁড়ে, দই, আম, ঘরে তৈরী কাঁচাগোল্লা। আমাতে কাতুতে একজায়গায়, একটু তফাতে রথু আর সাধন। ওদের গিন্নীমা পরিবেশন সেরে একধারে বসে সতী-নথা আর রৈনের পুরাণ শুনিয়ে যাচ্ছে।

ও অবশ্য খেলে না কিছু। প্রশ্নটা করতে একটু শিউরে উঠে আমার অপরিসীম অজ্ঞতায় প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল, "ওমা, আমায় যে মায়ের ভোগ রাঁধতে হবে, জেঠামশাই। শুধু আজ নয়, কাল থেকে উপোস, ভোগ মুখে দিয়ে পারণ, তার আগে জলবিন্দু নয়। দেখতেই যেন কিছু না, এখানে একটা সিঁদুর-মাখানো মাটির ঢিবি, ওখানেও বলতে গেলে তাই, কিন্তু পুজো যে বড্ড কঠিন জেঠামশাই, একটু এদিক-ওদিক হলেই স্বপন। অষ্টমঙ্গলার পর অমন বিঘ্নিটা হয়ে গেল; বললুম, বুক চিরে রক্ত দিয়ে আসব মা স্থানে গিয়ে। অপরাধ নিও না। ...এখন আশীর্বাদ করুন যেন মুখ রাখেন মা..."

এখান থেকে রৈনে বেশী দূর নয়, আধ ক্রোশটাক পথ। এইটুকু পথ সমস্ত অন্তর দিয়ে রসটুকুকে নিংড়ে নিতে নিতে চলেছি।...একটি নূতন সংসার আমার; পথে পেয়ে পথেই হারাতে হবে বলে মনটি পাওয়ার সুখের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় আতুর হয়ে উঠেছে। ভাই-ঝি—সে আমায় এমন নিঃশেষভাবে আমার পূর্ব-জীবন থেকে এই জীবনে টেনে নিয়েছে যে, সমাজ-অঙ্গে কোথায় কী ত্রুটি হচ্ছে তা নিয়ে আমার মন আর মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়। নাতনী কাতুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। এবার কিশোর-দম্পতিবেশে আমার নাতি-নাতবৌকে দেখব, তার জন্য আমার মনটা যে শুধু প্রস্তুত তাই নয়, কতকটা যেন উদগ্র হয়ে উঠেছে। এখন এই ভয় হচ্ছে—যদি কোন কারণে তারা না-ই এসে পড়তে পারে!

না, মা মঙ্গলচণ্ডী আমায় অতটা নিরাশ করবেন না। তবে...

যাক, ওটা নৈরাশ্য, কি স্বস্তি, কি সব মিলিয়ে অন্য কিছু তা যখন ঠিকভাবে বুঝতেই পারা গেল না, তখন যা হল তাই বলে দিয়ে খালাস হই—

রৈনের যাত্রীদের থাকবার জন্যে কিছু মেটে ঘর আছে। একটু আড়াল থেকে আমাদের গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে একটি যুবক—যেন অপেক্ষাই করছিল—উল্লসিতভাবে দাওয়া থেকে এক-রকম লাফিয়েই ছুটে এল।

"গিন্নীমা...এসে গেলে!"

সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাড়া পড়ে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে জনতিনেক লোক কলরব
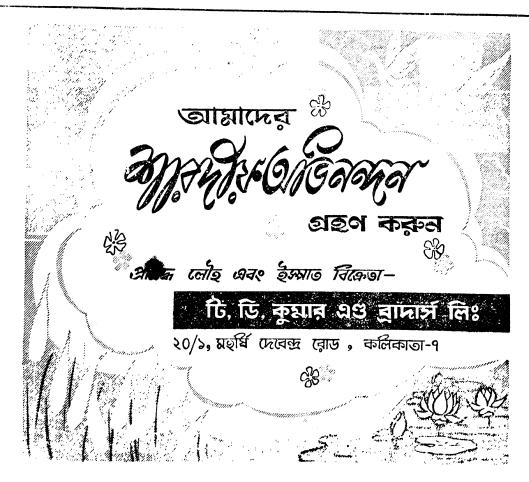
করতে করতে এল বেরিয়ে; কাতু গাড়ির উপর থেকেই 'দাদা গো!' বলে বুকের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে, 'খোকা, তুই!' বলে

ওদের মা অবাক-অনড় হয়েই একটু চেয়ে রইল, তারপর উল্লসিতভাবে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বলল, "তুই কখন এসে বসে আছিস খোকা? বেয়াই-বেয়ান বেয়াক্কেলেপনা করে পাঠালে না ভেবে আমি যে কত্তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলুম!"

ছেলেটি কিছু উত্তর দিল না, শুধু মুঠি দুটো মুখে চেপে একটা যেন দুষ্টুমির হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল। মেয়েটি একটু চেয়েই রইল, বোঝবার চেষ্টা করছে, তারপর তার চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাতে কৌতুক আছে, মায়ের প্রশ্রয় আছে, তার সংগে যেন টেনে-আনা রাগ-অভিমানও আছে মায়ের। বলল, "হ্যাঁরে খোকা, এখনও তোর সেই ছেলেমানুষি নুকোচুরি গেল না! কিনা, এল না মনে করে এসে দেখব আগেই কখন এসে বসে আছে ছেলে। কী দুর্ভাবনার ঝড় যে যায় বয়ে মাথার ওপর দিয়ে একবার ভেবে দেখিস না তো!"

তবু হাসির ছোঁয়াচ লেগে হাসিই আবার ফিরে আসছিল, কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ যেন মিলিয়ে গিয়ে আতঙ্ক উঠল ফুটে।

"তা, হ্যাঁরে—বৌমা? পাঠালে না তাঁকে?"

ছেলেটিকে অবাক হয়েই দেখছি আমি। কম করে ধরলেও বছর সতেরোর নীচে হয় না। বেশ সবল, সুস্থ, অজ পাড়াগাঁয়ের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে; দূর শহরে পড়তে গেলে যে একটা অর্ধ-স্বচ্ছ চাকচিক্য আসে, দেহে-পরিচ্ছদে, সেটা সুস্পষ্ট। প্রকৃতিটা চঞ্চল, একটু কৌতুক-প্রবণতা যেন ছলকে ছলকে উঠছে। বোনকে বুকে চেপে বলল, "পাঠাবে না! কার হুকুম সেটা দেখতে হবে না! গর্দানার ভয় নেই!"

"আচ্ছা, হয়েছে; হুকুম তো সবই মেনে রাজা করছেন আমায়! তা......কই?"

একটি বছর তেরো চোদ্দর চেলি-পরা মেয়ে আধাঘোমটা দিয়ে চৌকাঠের কাছে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ছেলেটি সেই দিকে চেয়ে বলল, একটা জড়ভরত কাপড়ের পুঁটলি বো করেছ—ঐ তো, যতটুকু ক্ষমতা আছে বেরিয়ে এসেছে।"

বধূটি ওরই মধ্যে একটু ত্বরান্বিত হয়ে নেমে এল, সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়েই হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে-জিভে ঠেকাল।

দেখাদেখি ছেলেটিও বোনকে নামিয়ে হেঁট হতে হতে বলল, "এই দেখ! আমার বাপু মনেই ছিল না, এত ফুর্তি হচ্ছে কদিন পরে তোমায় দেখে গিন্নীমা!"

"হয়েছে, হয়েছে। না, ওঁর তো মোটেই ফুর্তি হয় নি!...কি গো ভালোমানুষের মেয়ে, বল না।"

দুজনের চিবুকে চারটি আঙুল ঠেকিয়ে চুম্বন নিল। ছেলেটি শিউরে উঠল। বলল "ওর ফুর্তি! শাশুড়ীর হাঁকডাকের কথা শুনেই আদ্ধেক হয়ে গেছে!

হো-হো করে হেসে উঠল আর সবাই। বধূটি একটু গুটিয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। মেয়েটি ঘুরে ছইয়ের দিকে চেয়ে বলল, "শুনুন জ্যাঠামশাই, নাতির কথা!..."

সংগে সংগেই চকিত হয়ে উঠে বলল "দ্যাখো, ভুলেই গেছলুম!...তোদের নতুন দাদু খোকা! কী চমৎকার যে মানুষ!... নেমে আসুন না জ্যাঠামশাই, পায়ের ধুলো নিক ব্রাহ্মণের।"

● পাছে বাধা পায়, আমি ইচ্ছা ... পিছনে ছইয়ের দেয়াল ঘেঁষে একটু ... হয়ে বসেছিলুম।...না, আর বয়সটা ... কুড়ি-একশ করবার দরকার নেই, সতের ... ষোল-সতের বছরের একটি মা আর সতের আঠার বছরের তার ছেলে।

অবশ্য হাসিমুখেই নেমে এলুম নীচে। কিন্তু কিসে যে আমার মনটা ছলছল করছে, হাসিতে কি অশ্রুতে, তাতো ঠিক বুঝতে পারছি না। জীবনে এমন নিখুঁত কিছু-একটা দেখছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু একটা অপরিসীম ট্র্যাজেডিও যেন লুকনো রয়েছে এর একটা জায়গায়।

তীয় উৎসব দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নরনারীকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

এই উৎসব আমাদের অন্তরে অপূর্ব একটা আনন্দের সাড়া গাইয়া তোলে, সাময়িকভাবে যাবতীয় দুঃখদুর্দশার স্মৃতি মন তে মুছিয়া যায়।

কিন্তু সর্বজনীন এই আনন্দের দিনে আমাদের সেই হতভাগ্য ইহাঁদের কথা মুহূর্তের জন্যও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যাহারা নিত্য রোগক্লিষ্ট বলিয়া এই উৎসবে আমাদের পার্শ্বে সিয়া আজ দাঁড়াইতে পারিল না। বিশেষ করিয়া, মারাত্মক যক্ষ্মা-গে যাহারা শয্যাশায়ী, তাহাদের সেই ম্লান-বিষণ্ণ মুখগুলি যেন মাদের চোখে ভাসিয়া ওঠে। আমরা যেন মনে রাখি, প্রাণঘাতী রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা বর্তমানে এক ঠন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই করাল রোগটি দিনে দিনে কী ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে, মরা সকলেই তাহা জানি। প্রতি বৎসর সহস্র-সহস্র নরনারী ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে যুবক ছে, বৃদ্ধ আছে, শিশুও রহিয়াছে। প্রতিরোধ ও নিরাময়ের শববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর হাজার জার মানুষকে অকালে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে তেছে। শুধু তাহাই নহে। তাহাদের রোগ—আত্মীয়স্বজন, বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া ভয়াবহ স্থার সৃষ্টি করিতেছে।

যক্ষ্মাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধে সকল কে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করা ব্যতীত উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আমি যক্ষ্মা-আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের মাননীয়তার কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। যক্ষ্মা ন একটি ব্যাধি যে উহা হইতে নিরাময় হইলেই নিষ্কৃতি পাওয়া য় না। স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করার আগে অধিকাংশ গীকে নির্দিষ্টকাল নিয়মনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতে হয়। ইহা করা অত্যাবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে একটি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছি।

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তায় ও পরামর্শে উপনিবেশের জন্য ৪৪৮ একর পরিমিত একটি উপযুক্ত স্থানও নির্বাচন করা হইয়াছে। সময়মত রোগীরা যাহাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সাহায্যাদি পাইতে পারে, সেজন্য একটি সরকারী টি বি হাস-পাতালের সংলগ্ন স্থানেই এই উপনিবেশটি গড়িয়া উঠিবে। সেখানে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সমন্বিত ছোট বড় অনেকগুলি কক্ষ থাকিবে। রোগীদের আরাম-আয়াসের নানাবিধ আয়োজন থাকিবে। আর থাকিবে হালকা ধরনের কাজের ব্যবস্থা।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা যাইতেছে। শেষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে আনুমানিক প'য়ত্রিশ লক্ষে।

এই বিষয়ে মুখ্যত আমরা সহৃদয় জনসাধারণের উদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আমি একান্তভাবে আশা করি এই মহান উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিবেন। কাজের বিরাটত্ব ও পরিকল্পনাটি আশু কার্যকরী করার আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের কাছে আমার আকুল আবেদন—যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করুন। সাহায্যের পরিমাণে কিছুই আসে যায় না। সম্মিলিত প্রয়াসে এই পরি-কল্পনা সার্থক করিয়া তুলুন।

প্রসঙ্গত সবিনয়ে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে, আনন্দ-উৎসব বাবদ বিভিন্ন পূজা সমিতি পৃথকভাবে যে-অর্থ বরাদ্দ করিয়া রাখেন—তাহার সামান্য অংশও যদি এই ভাণ্ডারে তাঁহারা দান করেন, তাহা হইলে আমাদের পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপ-দান ত্বরান্বিত হইয়া উঠিবে, আপনাদের সাহায্যের দানে আজিকার উৎসব হইতে বঞ্চিত ক্ষয়রোগাক্রান্ত শত শত নিরাশ্বাস হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইবে, তাহারা নবজীবনের আশ্বাস পাইবে।

(স্বাঃ) হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়,
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

হারবান সিংয়ের গল্প

— প্রভাত দেবসরকার —

দিন ধরে কেসটা সাহেবের টেবিল থেকে কেবলই ফেরত আসছে।

সাহেব কী যে চাইছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। 'দিপক' করে করে মুখে ব্যথা ধরে গেছে মণীন্দ্রর।

আচ্ছা সাহেব, বোঝালে বোঝে না! সেই এক কথা, আর একবার ভাল করে দেখ।

একবার নয়, অনেকবার দেখেছে মণীন্দ্র, আর দেখবার কিছু নেই। অনেক হাত ফিরে তার হাতে এসেছে কেসটা, অনেক চোখে অনেক বার দেখা হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ।

কেসটা আবার ফিরে আসতে বেয়ারাটার উপরেই চটে উঠল মণীন্দ্র, "কেয়া খেল! হুঁয়া রাখতা কাহে?"

আবার কোথায় রাখবে, বেয়ারা বুঝতে পারে না। সহেবের ঘর থেকে যা 'কেস' আসে তা তো বরাবর ঐ ট্রেতেই সে রাখে! আজ আবার কী ব্যবস্থা?

সমঝে মণীন্দ্র বললে, "আচ্ছা, রাখো।"

বেয়ারা বাবুর দিকে আড় চোখে চেয়ে চলে গেল। কদিনই সে লক্ষ্য করছে, বাবুর মেজাজটা কেমন কেমন-কেমন। সাহেবের ঘর থেকে কোন কাগজপত্তর ফিরে এলেই লাফিয়ে ওঠেন, নয়া ঘোড়ার মত ব্যবহার করেন। চোখ চেয়ে কিছু দেখবেন না!

মণীন্দ্র দেখে গিয়েছে, যেমনটি ফাইল গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি ফিরে এসেছে। লাল ফিতের গেরোটা পর্যন্ত খোলা হয়নি!

না, এ সাহেবকে নিয়ে পারা যাবে না! কোথা থেকে এক পাঞ্জাবী ধরে এনেছে, মাথায় ডাণ্ডা মারলেও বুঝবে না, নিজের গোঁ নিয়ে থাকবে! অথচ এত ক্লিয়ার কেস, সবাই এক কথা বলছে, উনি কিছুতে রাজী হবেন না! বিদ্যে জাহির করা চাই!

বেশ, করুক না নিজে যা খুশি—মুরোদ বোঝা যাবে! তা নয় সাবঅর্ডিনেটদের ছুঁয়ে রাখছেন। যদি কিছু হয়, সবাইকে ঝোলাবেন!

এদিকে রগড়া-রগড়ি করে কেসটাই যে 'ডিলে' হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। রিমাইণ্ডার এলে বুঝবেন!

কী ভেবে কেস ফাইলটা একবার তুলে নিয়ে তক্ষুনি সরিয়ে রেখে দিলে মণীন্দ্র। দরকার নেই, যেমন আছে তেমনি থাক, সক্কাল থেকে মাথা গরম করে লাভ নেই। যা হয় বিকেলের দিকে দেখে নোট দিয়ে ছেড়ে দেবে। দেখা যাক, উনি কত দিন ফেরত পাঠাতে পারেন! তেঁদড়ামি সে-ও করতে জানে।

কিন্তু না, লোকটা কদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে। কে বুঝিয়েছে, মণীন্দ্রকে দেখলেই জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন মণীন্দ্র ইচ্ছে করছে না বলেই তার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে না। মণীন্দ্রই টেনে রেখেছে, ঘোরাচ্ছে, ভোগাচ্ছে!

কী জ্বালাতন! আজও লোকটা ছুটির পর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে! এক-মুখ দাড়ি, ছ' ফুট লম্বা, আধ ময়লা কোরতায় অদ্ভুত দীন দেখায় লোকটিকে! যেন একটা প্রকাণ্ড ডাল ভেঙে পড়ে আছে রাস্তার ধারে, পাতা ঝরেছে, রস শুকিয়ে গেছে!

হারবান সিং! নামটা মণীন্দ্রর মুখস্থ হয়ে গেছে। ১০২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি রেজিমেণ্ট, কেয়ার অ্যাডভান্স বেস পোস্ট অফিস, নয়া দিল্লী! হোম অ্যাডরেসটা কাগজ-পত্তর পাঁচ হাত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে! শেষ বছর তিন চার আগে অ্যাকুইট্যান্স রোলে দস্তখত করে মাহিনা আগাম নিয়েছিল হারবান সিং—একশ একত্রিশ টাকা। হারবান

সিং, ১১৪৫০৩!—কপিইং পেনসিলে তেড়া-বেঁকা সই, অস্পষ্ট!

রেজিমেণ্টাল নম্বর না হলে কে জানে হারবান, কে জানে ভগৎ, কে জানে বটুক—সব এক। অ্যালটমেণ্টের টাকা বিশ বাঁও জলে! ফিল্ড ব্যাটারি একটুখানি নাকি? মানুষের নামের কী মূল্য আছে। সংখ্যা দিয়ে সংখ্যার পরিমাপ সেখানে। কে কে নয়, কত কত!

ছুটি নিয়ে সেই যে বাড়ি গিয়েছিল হারবান, আর ফেরেনি ব্যারাকে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেছে। হারবান ডেজার্টার! যথারীতি হুলিয়া বেরল, জেলায় গ্রামে পুলিশ গেল অ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট নিয়ে। কিন্তু কোথায় হারবান? পাঞ্জাবের কোন এক অখ্যাত গ্রামে চাল-চুলোহীন একটা মাটির ঢিলা দেখিয়ে গাঁয়ের লোক বললে, কোই পাত্তা নেই হারবানের!

ছেলে-মেয়ে বউ, কেউ নেই?

গাঁয়ের লোক পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে। সে-পাট কবে শেষ হয়ে গেছে। বউ পালিয়েছে হারবানের!

হঠাৎ মণীন্দ্রর মনে হল চোখের সামনেটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, ধু ধু রুক্ষ প্রান্তরে কী যেন একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, মরুবালিতে আচ্ছন্ন দিগন্ত। হারবান সিংয়ের চোখ দুটো নিমেষ-হারা! গামবুটে পা পুঁতে যাচ্ছে বালিতে—লোকটি ক্লান্ত পদে চলেছে, চলেছে। কোথায়, কে জানে।

বেয়ারার ডাকে সম্বিত ফিরে আসে মণীন্দ্রর। কোর্ট মার্শাল, অ্যাটেসটেশন, ডিসিপ্লিন। ফাইলটার উপর কালো কালির কালশিটে দাগ যেন দগ্ দগ্ করছে।

"সাহেব সেলাম দিয়া!" বেয়ারা বললে।

সেলামের গুঁতোয় অস্থির! মাথায় বেটার গোবর পোরা, একটু যদি বুদ্ধি খেলাবে। কেবল সই করতে জানে!

মণীন্দ্র ভেবে পেলে না, কোন্ কেসে তার ডাক পড়ল। গোলমেলে যা ছিল তা তো ঐ ফিরে এসেছে পুনর্বিবেচনার জন্য। হারবান সিংয়ের ফাইনাল সেটেলমেণ্ট! এফ-এস-এ! ১০২ ফিল্ড ব্যাটারি রেজিমেণ্টের ১১৪৫০৩ গানারের হিসাব-নিকাশ!

হারবানের কেসটা একপাশে সরিয়ে রাখলে মণীন্দ্র, যেমন বাঁধা আছে তেমনি! থাক পড়ে, কার কী!

কৌতুক করে সাহেব কার্তার সিং বললে, "এটা আবার কি! যত ইণ্ট্রিকেট কেস তোমার কাছে আসে মিস্টার!"

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বোঝালে মণীন্দ্র, "কিছু না, অ্যাডজাস্টমেণ্টের ব্যাপার! লেজারে টাকাটা কণ্ট্রা ক্রেডিট হবে!"

কার্তার সিং কট্ কট্ করে চেয়ে দেখল মণীন্দ্রর মুখের উপর। ছোকরা বলে কি! যত ঝঞ্ঝাট জোটায়!

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক জান? টাকাটা তো কর্পোরাল খরচ করেছিল, আবার ক্রেডিট কেন?"

মণীন্দ্র বললে, "খরচটা ভুলে ওর ঘাড়ে পড়েছে, অ্যাকচুয়ালি—"

কার্তার সিং আর বুঝতে চাইলে না, ঝট্ করে সই করে দিলে।

মনে মনে মণীন্দ্র হাসলে যেন, কত বোঝেন সাহেব!

একবার ইচ্ছে করল, সাহেবকে জিজ্ঞেস করে হারবান সিংয়ের কেসটা আবার ফেরত পাঠালেন কেন। সই করে দিতে আপত্তিটা আবার কি! আনডিউ ডিলে হয়ে যাচ্ছে। লোকটা হয়রান হচ্ছে। আপনারই জাত ভাই!

আসল কথা সাহেব বললে, "কেস্ টেস্ আজ আর পাঠিও না! আমি একটু বেরব।"

সেকশানের মধ্যে এই বাঙালী কর্মচারীটিকেই ভয়—কোন কাগজ ধরে রাখতে জানে না, অফিস সুদ্ধ সবাইকে বুড়ো আঙুলে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে!

মণীন্দ্র মাথা নাড়লে। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। এ তো কার্তার সিংয়েরই পে-অ্যাকাউণ্টস্ আপিস! আদার র‍্যাঙ্কস! বিরাট সৈন্য-বাহিনীর চালুনিতে আটা ছেলে ছিবড়ে পড়ে থাকার মত। বেশির ভাগ পেট-ভাতা, আর বিশ পঁচিশ টাকা মাসিক। কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে জমা হয় রানিং লেজরে, ছুটি নিলে আগাম মেলে! ঝাড়ুদার, জমাদার, স্যাপার্স, মাইনার্স, গানার, ধোবা, নাপিত আরো কত কে, ঐ আদার র‍্যাঙ্কস্!

তাহলে আজ হল না। না হোক, তার কি! চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি। কার্তার সিং যদি হারবান সিংয়ের কথা না শোনে, মণীন্দ্র বসু কী করতে পারে মাঝখানে পড়ে। গৌরী সেনের টাকায় গরিবগুলোরই জ্বালা!

লোকটার সাহস বেড়েছে। গেট ছেড়ে আজকাল সোজা অপিসে চলে আসে, তদ্বির করে, "কী হল বাবু আমার কেস্‌টা!"

সিটের কাছে লোকটাকে দেখে মণীন্দ্র মনে মনে চটে উঠল। এখনি বিনিয়ে বিনিয়ে কৈফিয়ত চাইবে। তাছাড়া কদাকার অমন একটা লোককে দেখতে আর ভাল লাগে না। দাড়িগুলো সব পেকে গেছে, কোর্তা কামিজ ময়লা চিট হয়ে গেছে, কদাকার মূর্তি!

মণীন্দ্র খেয়াল করলে না, গুম হয়ে এসে চেয়ারে বসল। অখণ্ড মনোযোগে কাগজ-পত্তর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল।

লোকটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—১০২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারির একদা-গানার হারবান সিং। সৈন্যবাহিনীতে যা কিছু তার পাওনা মিটিয়ে নিতে চায়। সম্পর্কহীন কাটা-সৈনিক হারবান সিং। নন্-এফেকটিভ!

বুঝি বার দুই কাছে আসবার চেষ্টা করলে লোকটা। মণীন্দ্র দেখেও দেখলে না। নিজের কাজে ডুবে রইল, যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য।

ধীরে লোকটি ডাকলে, "আইজি বাবুজি!"

কপট ঔদাসীন্য ত্যাগ করে একেবারে ফেটে পড়ল মণীন্দ্র, "কেয়া? হিঁয়া কাহে! কেয়া মাংতা?"

লোকটি চুপ করে গেল! বাবু ঠিক এমন তো ছিল না, দুদিন আগেও। বড় সমব্যথী বলে মনে হয়েছিল বাঙালী বাবুটিকে!

কেসটা চাপা আছে, ধরা আছে। মিথ্যে কী বলবে লোকটাকে রোজ-রোজ? স্তোক বাক্য!

মণীন্দ্র কিছুটা মোলায়েম করে বললে, "সর্দারজী, কাহে ব্যস্ত হোতা। ঠিক হো জায়েগা, মুল্লুক জায়েগা!"

যেন কৈফিয়ত চাইলে লোকটি। "কভ্-ভ্?"

আবার মনীন্দ্র চটে উঠল, "অত পাঁজি-পুঁথি নেই জান্‌তা। যর হোগা, তব্। সরকারী কাম কিসিকো মর্জিসে নেই হোতা!"

লোকটি আর কিছু বললে না, পিছন ফিরে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে চলে গেল

সরকারী কাজ আপন মর্জিতে যখন হবার হবে। বললেও হবে, না বললেও হবে।

সেই ছবিটা মনে পড়ল মণীন্দ্রর, প্রথম কেস্ হিস্ট্রি পড়ে। যে-ছবি চোখের উপর ভেসে উঠেছিল লোকটার সম্বন্ধে।—হারবান সিং মিরাটের কোন্ এক শহরে ভিক্ষে করতে করতে হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলে এককালে সে ছিল সৈনিক। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল কুচকাওয়াজ, লেফ্ট্ রাইট! রাস্তার লোক জড় হয়ে গেছে ভিখারী হারবান সিংয়ের নবতর কার্যকলাপে। লোকটার পাগলামি আরো বাড়ল!

মিরাটের অনেকে সাক্ষী দিয়েছিল, হারবান সিং যখন-তখন মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করত, স্যালুট দিত, একটা খেটে লাঠি নিয়ে বন্দুকের কায়দায় ওঠাত, নামাত, চাপড়াত, নিশানা ঠিক করত, 'ফায়ার ফায়ার' বলে চিৎকার করে সামনে ছুটে যেত।

সেই লোক এখন দিব্যি সুস্থ হয়ে গেছে, দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ঘর সংসার আশা করছে। সুইট হোমের স্বপ্ন দেখছে!

সত্যিকারের পাগল! মনে মনে মণীন্দ্র বুঝি বিদ্রূপ করে ওঠে। ফাইনাল সেটেল্-মেন্টের টাকা নিয়ে কোথায় যাবে তার নেই ঠিক, কেবল তাড়া! কে আছে তোর? পুলিশ রিপোর্টটা শুনিয়ে দিলে হত।

তবু কোথায় যেন বেদনা বোধ করে মণীন্দ্র। পারলে এখনই সে একটা ব্যবস্থা করে দিত। কর্তার সিংয়ের সর্দারি সহ্য করত না! ঘেন্না ধরে গেছে সরকারী অপিসের কাজের উপর। নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার উপায় নেই, মালগাড়ির মত গড়িয়ে গড়িয়ে চল কেবল।

না, না, মণীন্দ্র আর দেরি করবে না। কেস্টা আজই ডিস্পোজাল দেবে। সাহেবের উপর রাগ করে ও বেচারির দেরি করিয়ে লাভ কী? ওর অপরাধ কী? যত শিগগির পারে দেশে ফিরে যাক, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গিয়ে নবজীবন লাভ করুক হারবান সিং।

অনেকটা অনুতপ্ত চিত্তে অপরাধ স্বীকারের মত ফাইলটা কাছে টেনে নিলে মণীন্দ্র! হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে হারবান সিংয়ের পক্ষে মত দেবে। কর্তার সিংয়ের আর না-করবার পথ রাখবে না। আবশ্যক হলে ফাইট করবে! সাহে[illegible] হয়েছে বলে যা-তা করবে!

কিন্তু এ কি, ফাইল খুলে মণীন্দ্র অবা[illegible] হয়ে গেল! এত জল্পনার শে[illegible] হয়েছে-সাহেব কেস্ সই করে ফেরত পাঠিয়েছেন লাল পেন্সিলের আঁচড়ে পেমেন্টের ম[illegible] দিয়েছেন, মে বি পেড্!

ছি, ছি, লোকটাকে আজ শুধু শুধু ঘুরিয়ে দিলে! একটু কষ্ট করলে শু[illegible] সংবাদটা দিতে পারত! কত খুশী হ[illegible] হারবান সিং!

হিসাব করে দেখলে মণীন্দ্র, ঠিক বাইশ দিন লাগল কেস্টা ফয়সালা হতে। অ্যাকাউন্টস্ আপিস-ই দেরি করিয়ে দিলে, না হলে ডিপো আপিস থেকে কবে নিষ্পত্তি হয়ে এসেছিল, ফাইনাল সেটেল্মেন্টের অর্ডার হয়ে গিয়েছিল। হারবান সিংয়ের কন্ভিকশন নাকচ হয়ে গিয়েছিল! ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কোর্টমার্শালের রায় উল্টে দিয়েছিলেন—

বিগত উনিশ শ' উনপঞ্চাশের নই সেপ্টেম্বর এক মাসের ছুটি এবং আগাম মাইনা নিয়ে হারবান সিং (১১৪৫০৩, গানার, ১০২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট) দেশে রওনা হয়। আগ্রা ক্যান্টন্মেন্ট থেকে তুফান মেলে সে দিল্লী যায়। সেখান থেকে ট্রেন বদল করে যথারীতি পাঞ্জাব মেলে ওঠে! সাক্ষীসাবুদে প্রকাশ, যথাসময়ে সে দেশেও পৌঁছায়। কিন্তু ছুটি ফুরতে সে আর ক্যাম্পে ফিরে আসেনি। বিনা খবরে প্রায় ছ'মাস কেটে গেল। লোকটা বাঁচল কি মরল কি পালাল,

কোন সংবাদই নেই। দেশের ঠিকানায় চিঠি কেবলি 'নট ফাউণ্ড' হয়ে ফেরত আসতে লাগল। পলাতক বলে সিভিল পুলিশের উপর মিলিটারী পুলিশ অনুসন্ধানের ভার দিলে। বহু খোঁজ-খবর এবং তত্ত্ব-তল্লাসের পর সিভিল পুলিশ মিরাটের এক শহরে হারবান সিংকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশকে এড়াবার জন্যে হারবান পাগল সেজে বেড়াত।

কোর্টমার্শালের 'ফাইণ্ডিংস্' এইমত। সুতরাং একজন ক্যাপ্টেন, দু'জন মেজর এবং ...িয়া কম্যাণ্ডর একমত হয়ে হারবান সিংকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁরা আরও মন্তব্য করেন—হারবান সিং শুধু পলাতকই নয়, সৈন্যবাহিনীর পক্ষে মন্দ দৃষ্টান্তস্বরূপ। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় সাজা হওয়াই বিধেয়! সব কিছুর উপরে সৈন্যবাহিনীর ডিসিপ্লিন, মোরেল! হারবান সিং শৃঙ্খলাভঙ্গকারী!

কিন্তু হারবান সিংয়ের পক্ষে আপিল ...য় ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের নিকট। আত্মপক্ষ সমর্থনে হারবান সিং বলে, পুলিশ তাকে ধরেনি, সে-ই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঘটনা যা ঘটেছিল তা এইমত বিবৃত করছে। হুজুর বিবেচনা করে দেখবেন। কোন অপরাধ সে করেনি।

দেশে ফেরবার পথে তার একমাত্র কন্যা মীনাক্ষীর জন্যে দু'চোখে যা দেখেছে সে ...ই কিনেছে। খেলনা, খাবার, শালোয়ার, ...পাট্টা, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা, আরো ...কি! অনেক করে আশা-আনন্দ নিয়ে দেশে ফিরছিল চার বছর পরে। ঐ ...য়ের মুখ চেয়ে কাশ্মীর যুদ্ধের অনেক ...গুলিকে সে এড়িয়ে গেছে, সৈনিক ...মৃত্যুকে ভয় করেছে। ন' বছরের ...ড়কী এখন কত বড় হয়েছে! মীনা, ...াক্ষী, মীনারানী!

কিন্তু বৃথা, সব আশা তার চুরমার হয়ে ...। মীনাক্ষী তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে ...! হয়তো বীর যোদ্ধা বাপের উপর সে ...মান করেছে। অমৃৎ বাঈ বললে, দুষমন ...গ মিনাকে ধরেছিল। বাপ্‌জী বাপ্‌জী ...শেষে তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল!

...র শুনে স্তব্ধ হয়ে মাটির ঘরের ...য় হারবান সিং কতক্ষণ চুপ করে ...ছিল। তারপর আর তার কিছু খেয়াল ...। কত দিন, কত মাস, কত বছর তারপর কেটে গেছে সে জানে না। শোকে-...থ অধীর হয়ে সে কী করেছে তার কী ...ব দেবে! বোধহয় এটুকু সে স্পষ্ট

স্তব্ধ হয়ে...বসে ছিল

করে বলতে পারে, সে তার মৃত কন্যার অনুসন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে পাগলের মত। তার স্মরণ আছে, প্রথমেই তার চাকরিটার উপর রাগ হয়েছিল, মনে মনে শপথ করেছিল জীবনে সে আর নকরি করবে না! মিলিটারিতে চাকরির জন্যেই তার এই খোয়ার!

হঠাৎ একদিন চলন্ত ট্রেনের কামরায় তার মেয়েকে যেন সে দেখতে পেল। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক! মীনা! মীনা! বলে ছুটতে ছুটতে সে এগিয়ে গেল ট্রেনের কামরার দিকে। তারপর যখন তার জ্ঞান হল তখন সে রেল হাসপাতালে, কপালে হাতে-পায়ে পুরু ব্যাণ্ডেজ, অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়।

আশ্চর্য, এত শারীরিক কষ্টেও তার সব মনে পড়ল—অতীত বর্তমান! মনে হল, এতদিন যেন সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে, মাথা নেই মুণ্ডু নেই। লোকে বলে, সে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা দেশে ফিরে যায়। বিনা টিকিটে রেলে চড়ার জন্যে ক'বার তার ফাটক হয়। পথে তার অনেক দেরি হয়ে যায়। কিন্তু গাঁয়ে তাকে কেউ আর সুস্থ বলে মেনে নিতে পারেনি। কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখলে সবাই। তার স্ত্রী পর্যন্ত যেন ভয় পেয়ে গেল তার আগমনে। হারবান সিং ভূত হয়ে ফিরে এসেছে!
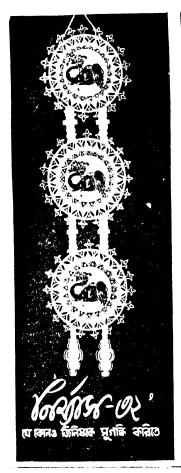
মাত্র ক'দিন ছিল সে দেশে, তারপর একদিন ভোরের বেলা কাউকে কিছু না বলে চার মাইল পথ হেঁটে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে বলে, সে সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে, তাকে চালান দেওয়া হোক। সে সৈন্যবাহিনীতেই ফিরে যেতে চায়! সুস্থ হয়ে আত্মীয়-স্বজনের অনাদরে, সন্দেহে অবজ্ঞায় সে বাস করতে পারবে না। সে সৈনিক, স্নেহ-মায়া-দয়া-প্রেমের সে ধার ধারে না! নেই-ও তার কিছু......

ফাইল থেকে মুখ তুলে মণীন্দ্র চেয়ে দেখলে, ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে, বাইরে বুঝি মেঘ করেছে!

না, সন্ধ্যেই হয়ে গেছে। সহকর্মীরা কখন চলে গেছে, কেবল তার জন্যেই আপিস খোলা আছে এখনো। বাঙালী বাবুটি বড় কাজের লোক!

ফাইলটা বেঁধে বন্ধ করতে করতে মণীন্দ্র মনে মনে অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল। আগাগোড়া ব্যাপারটা এখন তার সাজান-গোছান মনে হচ্ছে। কোর্টমার্শালের রায়-ই ঠিক ছিল, লোকটা ধড়িবাজ, মিথ্যেবাদী, অপরাধ স্খালনের জন্যেই গল্পটা বানিয়েছে! আসলে সৈনিক-জীবন ওর পছন্দ নয়।

সাহেব এগ্রি না করে ঠিকই করছিল। শেষ পর্যন্ত তিনিও ঢললেন! জাতভাই, না করে উপায় আছে! লোকটা সবাইকে আচ্ছা ধোঁকা দিয়েছে। পাঞ্জাবী বুদ্ধি কম নয়!

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গট আপ্! একবার বলছে মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, আবার বলছে স্নেহ-মায়া-মমতার সে ধার ধারে না! কোনটা সত্যি? কোর্ট-মার্শাল ঠিকই ধরেছিল চালাকিটা! পাগল সাজা সহজ কি না! জেল ফাটকে পাগলামি বেরিয়ে যেত! খুব ভুল হল।

দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে হঠাৎ কলটা বুঝি বিগড়ে গেল। উল্টে ঘুরে চাবিটা ঘুরতে চায় না। বার কতক তালাটা চেপে ধরে মণীন্দ্র ঝাঁকানি দিলে। চাবিটা ঘুরে গেল সহজভাবে আগের মত।

দেওলালী ব্যারাক আপিসের টালির চালাটার সামনে মণীন্দ্র খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেশ থেকে অনেক দূরে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়ে সে চলে এসেছে। হঠাৎ তাদের কথা মনে হতে মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল মণীন্দ্রর। অপ্রকৃতিস্থ সে?

কে জানে কেন এমন হয়। হারবান সিংয়ের গল্পের সংগে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাই বা কে বলতে পারে!

শুভেচ্ছা

সৌমিত্র

ছবি এঁকেছেন :

মলাট-শিল্পী :

কিশোর।
একা।

নিচে সমুদ্র গর্জাচ্ছে। পিছনে বিশাল বন। মেঘের গায়ে, বনের গায়ে, ঢেউয়ের গায়ে সোনালী রং মেখে, রেখে রেখে রোদ আস্তে শাদা হতে চাইছে।

যদ্দুর দেখা যায়, তীরের বালি চিক্ মিক্ চিক্ ঝিক্ মিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ করছে। উড়ছে গায়ের চাদর হাওয়ায় দু'পাশে কিশোরের, আর তার হাতের শাঁখে, আর তার সেই-শুধু রেশমী চাদরে, রোদ ঠিকরে ঝলকে ঝলকে উঠছে।

বন বালি আর সমুদ্র। হু হু হো হো হাওয়া। ঢেউয়ের হৈ হৈ নাচ। আকাশ আকাশ আকাশ। আর কিছুই নেই। সেই ছেলেটি কেবল। হাসছে মুখের কোণে।

কী সাহসী!

হাসি রেখে, হাতটা দুলিয়ে সে শাঁখ তুলে নিলে।

বাতাস ভরে গেল সুরে। অনেক দূর অবধি।

আবার বাজাল।

আরও বাজাচ্ছে। সমুদ্রে পাখী উড়ল। বনে উড়ল। কিছু না আর। শুধু বাজাচ্ছে।

কেন, কেউ জানে না।

২

পা বাড়িয়ে এবার, চলছে সে শাঁখ বাজিয়ে। সমুদ্রের ধার দিয়ে, সে বনটা ছাড়িয়ে গেল। আর একটা ছোট বন। সেটাও ছাড়াল। চলল আরেকটা বনের পাশে পাশে।

হঠাৎ থামল।

পিছনে আসছে কে।

কিশোর। লাল পোষাক। জোরে এগিয়ে এসে বললে—তুমি আমাকে ডাকছ?

চেয়ে—

কে তুমি ভাই? সুধালে শঙ্খকিশোর।

আমাকে চেন না?—উঁচু হয়ে লাল বললে—বাবার কাছে শুনেছি, আমার দেশ সব দেশ জয় করেছে। আমরা খুব ভাল বীর সবার। তবুও, আমরা চাই, সবার মাথা নিচু করে রাখা।

মাথা হেলিয়ে, শঙ্খকিশোর বললে—কেন তা রাখতে চাইবে?

আরও একটু উঁচু হয়ে লাল বললে—চাইব না? আমরা যে বড়!

জানি! জানি! তাইতো ভাই ডেকেছি। বলে শঙ্খকিশোর বললে—এস, এগিয়ে চল।

৩

শাঁখ আবার বাজতে থাকল। ছোট ছোট পাহাড়। সেগুলো পেরিয়ে এলে একটা লম্বা পাহাড়। সেটাও পেরুলে, একটা বড় পাহাড়ের কাছাকাছি।

আসতেই শাঁখ থামল।

থামল দুজনে।

—কে?

নীল পোষাক কিশোর পাশ থেকে এসে বললে—ডাকছ তুমি আমাকে?

শঙ্খ সুধালে—কে ভাই তুমি?

নীল বললে—চেন না বুঝি? কাকার কাছে শুনেছি, আমার দেশ সব দেশ জয় করবে। সব দেশে ছড়িয়ে যাবে আমাদের জিনিষ আর আমরা লুটব টাকা।

হেলিয়ে মাথা শঙ্খ বললে—কেন, বল তো?

আমরা যে ধনী—বললে নীল—আরও ধনী হব!

জানি! জানি! তাইতো ভাই ডাকলেম। বলে' শঙ্খকিশোর বললে—এস ভাই, চলি এগিয়ে।

লাল পোষাক, শুধু চেয়েই ছিল।

চলল আবার।

৪

শাঁখ এবার আরও একটু জোরে বেজে চলেছে। পাহাড়টা দূরে রেখে এলে, একটা নিবিড় বন সুরু হল। ওদের সাড়া পেয়ে দু' চারটে বনের পশু সড়ড় সড়ড় করে ঝোপে ঝাড়ে পালিয়ে গেল।

থামল ওরা হঠাৎ—

কি?

কালো পোষাক কিশোর, হঠাৎ তেমনি থেমে বললে—আমাকে ডাকছ তুমি?

ভাই তুমি কে?—সুধায় শঙ্খ।

চিনলে না তো?—কালো বললে—মামার কাছে শুনেছি, আমার দেশ এখন যা-ই থাক, আমরা সব শিখে টিখে বড় হলে, আমার দেশেরও চলবে রথের চাকা।

মাথা দুলিয়ে বললে শঙ্খ—কি হবে তা হলে?

হবে না?—কালো বললে—আমরাও সমান বড় হব।

জানি! জানি! ডাকলেম তাই-ই যে, ভাই!—বলে' বললে শঙ্খকিশোর—চল ভাই সামনে।

৫

ঘন ঘন বাজছে শাঁখ এসে একটা প্রকাণ্ড নদীর ধারে।

নদীটে পার হতে হবে।

তর্ তর্ তর্ ছুটছে নদীর জল ছল কল কল ছল রব। অনেক দূরের ওপারে ধু ধু দেখা যায় আসছে একটা নৌকো পাল তুলে।

ক'জনে থামল—

কে?

শাদা পোষাক কিশোর এসে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালে—ডাকলে আমাকে... ভাই?

শঙ্খ সুধায়—কে, ভাই?

চিনবে? আমি তোমাদের চিনি। —বলছে শাদা—যখনি চিনতে চাইবে, চিনবে তক্ষুণি। আর তোমাদের মনও হবে ভালোবাসামাখা।

মাথা নামিয়ে শঙ্খ বললে—কেমন করে! বল তো?

আরো ঘেঁষে শাদা বললে—খুব ছেলেবেলাতেই, মা তো বলেই রেখেছেন সব কিশোর কিশোরী এক।

তাই-ই তো ডাকছি ভাই তোমায়!—বললে শঙ্খ—জানি! জানি! জানি!

আর কিশোরেরা বড় বড় চোখে, শুধু ভাবতে লাগল।

৬

বাজল শাঁখ।
ওপার থেকে নৌকো ভিড়ল পালের পাখা নিয়ে এসে।
সবাইকে ওপারে নিয়ে যাবে।
নৌকো এনেছে—সবুজ পোষাক কিশোরী।

ক'জনে অবাক!—এত বড় এই নদীতে, তুমি নৌকো বেয়ে আন, বোন!

আমিই আনি কি না!—বললে সবুজ—শাঁখ শুনে বুঝলুম ওপারে কেউ ভাই এসেছে। তাই নিতে এলুম।
নৌকোয় সবাইকে তুলে নিয়ে, পাল তুলে দিয়ে, নৌকো ছাড়লে ডান দিকে, সবুজ।

৭

শাঁখ বাজছে এক ঘাটে এসে ওপারে।
পাড়ে উঠেছে সবাই।
সবুজ পাতায় ফুলে ফলে কী সুন্দর দেশ! সবার চোখ জুড়িয়ে গেল।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে রাজধানীর পথ। পূবে আর পশ্চিমে পথ গেছে পাশের দেশে দেশে।

দাঁড়িয়ে সবুজ বললে—চল ভাই এই চওড়া পথে, সভা রাজধানীতে। তোমরা যাবে।

বললে শঙ্খ এবার শাঁখটা হাতে রেখে—যাবে ভাই তোমরা, কেন এসেছি, এইবারে তা জেনে নিও।

লাল নীল কালো সুধালে—কেন ডাকলে?

এস দেখবে—শঙ্খ শাঁখটা একটু তুলে বললে…এস।

চলেছে সবুজের আগে। তা'পর শঙ্খ, লাল নীল কালো শাদা।

কিশোরেরা দেখছে চারদিক।
আগেও বাজছে শাঁখ, আর দুধারে পাখীর গান।

সব শেষে এল রাজধানীর সীমানা।
পৌঁছতেই, বিরাট তোরণ, তার উপরে জোড়া পতাকা উড়ছে পৎ পৎ পৎ পৎ।
দাঁড়াল কপাল রুমালে ঢেকে কিশোরেরা উপরের দিকে চেয়ে।

জানো ভাই?—বললে সবুজ—গড়েছে এই তোরণ কিশোর-কিশোরীদের দল। হচ্ছে এখানে মহাসভা এবার যত মাঠ জুড়ে সবুজ সামিয়ানার তলে। ভারতের সুন্দর নানা দেশ—

ভারত!—বললে লাল নীল কালো—জানতেম তো!—সেই দেশ!

হাঁ ভাই—বলে হেসে সবুজ—সেই ভারতের সব দেশের কিশোর-কিশোরীদের আজ সবুজ পোষাক। এসেছে আর আসছে তারা গাঁ সহর বন পাহাড় সবখান থেকে এখানে, তাদের মনে নেই ছোট বড়, সব তারা সমান—যেমন তাদের পোষাক সবুজ। কিশোর বয়সেই এখানে তারা এবারে জানবে—কে সত্যি মানুষ, কে সত্যি বড়। ধনী করতে হবে সবাইকে ধনী, বিদ্বান শেখাবে হাজার হাজারকে, বলবান বলবান করে তুলবে যত জনকে, বড়র করতে হবে আর-সবাইকে বড়, যে মানুষ সে গড়বে আরো মানুষ, সবাই সবাইকে করবে জয়, কেউ আর হেরে যাবে না, সবারি জিৎ! সব দেশ ভরে যাবে তাদের নিজেদের সব-কিছুতে, কেউ দুঃখী থাকবে না সবাই হবে সুখী দেশে দেশে—এমনি করে সারা পৃথিবীতে। সব তোমরা বুঝে নেবে…চল, ভিতরে দেখ এসে, এই নতুনের দিনে আমরা এবারে কী করেছি আরো যে কী করব! বলে সবুজ সুধালে আস্তে—ভাই তোমরা?

নিজের হাতের কব্জি ধরে খুশিতে লাল বললে—বোন সবুজ, আমি ইউরোপ।

নীল বললে—বোন সবুজ, আমেরিকা আমি।
কালো বললে—সবুজ, বোন, আমি আফ্রিকা।
বললে শাদা, হেসে—বোন, আমি তো এশিয়া।

লাল নীল কালো সুধালে—আর বোন, তুমি?

সবুজ শাড়ীর আঁচল জড়ানো আঙুল সবুজ বললে—আমি? ভারতের আমি এই বাংলা, তোমাদের চিরসবুজ বোন।

রুমাল তিনটে উড়িয়ে মহাখুশিতে তিন কিশোর বললে—বাংলা!—শুনেছিলাম—এসে দেখলেম আজ, সবুজ বোন, তোমারি জয়!

আঙুলের আঁচল ছেড়ে দিয়ে কিশোরদের এগিয়ে নিতে নিতে—সবুজ বললে—এস সবাই এমন হই ভাই যাতে যত দেশের সবারি হোক জয়!

*

*　　*

আর?—

সভায় শাঁখ তখন বেজায় জোরে বাজছে। অগুন্তি কিশোরী-কিশোরের যেন সবুজ সমুদ্রের ঢেউ খেলছে সভায়। নতুন কারা

নৌকো এনেছে—সবুজ পোষাক কিশোরী
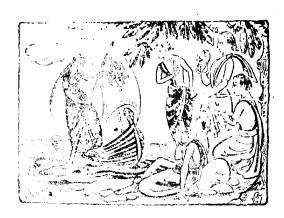
আসছে দেখে—কতক এল তাড়াতাড়ি তাদের নিতে। লাল নীলেরা মিলে গেল সভার সঙ্গে আনন্দের লহরী তুলে। মনে হল যেন পৃথিবী এসেছে বাংলায় আর বাংলার আলো ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীতে।

সভার গান সুরু হয়ে শেষ হল শেষে সবুজ সামিয়ানার উড়ন্ত ঝালরগুলোকেও বাঁশী বানিয়ে—আর দিনের আলো বাতাস দিকে দিকে কাঁপিয়ে দিয়ে।

কিন্তু?—
—কোথায়—
শঙ্খকিশোর?

তার শাঁখ তো বাজছে না! বাজছে কিশোরীদের হাতের শাঁখ আর কিশোরদের জয়রব!

শরতের সকল জাগানো সোনালীতে মিশে গেছে সে কিশোর, শাঁখ যে বাজিয়েছিল, আর সভার মাঝখানের বেদীতে রয়েছে সেই শাঁখ, তাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে শুধু, সোনালী অক্ষরে লেখা—

বিশ্বকিশোর

তখন সব দেশের কিশোরীকিশোর মহাসভা সুরু হয়েছে জগতের—বাংলায়।

দুই ভাই

সুখলতা রাও

ছেলেটির নাম 'বালকৃষ্ণ', কিন্তু তাকে ডাকত সবাই 'বালা' বলে। বয়স তার বছর দশ। 'বুড়ো' ছিল তার ছোট ভাই, নেহাৎ ছোট, ভাল করে কথা ফোটেনি। তাদের মা-বাবা ছিলেন না। বালা আর বুড়ো থাকত তাদের মাসীর কাছে। মাসীরও এরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটছিল। মাসী, গ্রামের লোকের বাড়িতে ধান ভেনে, গম পিষে, মুগ ভেজে যা রোজগার করত তাতেই খাওয়া পরা এক রকম চলে যেত। নদীর ধারে একটি ছোট, কুঁড়েতে থাকত তিন জনে। বালার ভারী সখ ছিল ঘুড়ি ওড়াবার। লাল, নীল, সবুজ নানা রকম ঘুড়ি কিনে এনে ওড়াত সে। বুড়ো সব খেলাতেই থাকত তার সঙ্গে। বালা যখন ঘুড়ি ওড়াত, বুড়ো চেয়ে চেয়ে আনন্দে হাততালি দিত। ঘুড়িগুলোকে বোধ হয় সে মনে করত পাখি। তাই সে ঘুড়িকে বলত 'পাত্তী'। 'পাখি' কথা তার মুখ দিয়ে আসত না। বালাকে বুড়ো ডাকত 'বান্না'। কিন্তু এমন সুখের দিন রইল না।

বর্ষাকালে নদীতে বন্যা আসত, সেইজন্য নদীর পাড়ে পাথর আর মাটি দিয়ে গাঁথা উঁচু বাঁধ ছিল। একবার বর্ষার সময়ে নদীতে ভয়ানক জল এল। নদী ফুলে উঠে বাঁধের কানায় কানায় এসে ঠেকল। গ্রামের মানুষরা অনেকেই ঘর ছেড়ে ভিজতে ভিজতে বাঁধের উপরে আশ্রয় নিল। রাত দুপুরে নদীর বাঁধ এক জায়গায় গেল ভেঙে, আর সেইখান দিয়ে হুড় হুড় করে জল ঢুকে, ভাসিয়ে নিয়ে চলল গাঁয়ের পথঘাট, দোকানপাট, গরীবদের কুঁড়ে-ঘর। যারা বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা 'হায় হায়' করতে লাগল, কিন্তু নামতে পারল না।

নদীর ধারেই ত ছিল বালাদের কুঁড়ে। অত রাতে তারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। যখন কল্ কল্ শব্দে জল ঢুকল ঘরের ভিতর, তখন মাসীর ডাকে ভাঙল তাদের ঘুম। মাসী তাদের টেনে নিয়ে বাইরে এল। তারপর, একটা পেয়ারা গাছে উঠে, তাদের ঠেলে তুলে দিল ঘরের চালের উপর। কিন্তু নিজে আর উঠতে পারল না। জলের তোড়ে গাছটা ভেঙে পড়ে মাসীকে নিয়ে স্রোতের টানে গেল ভেসে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত বালা বুঝতেই পারল না যে, ভয়ানক বিপদে পড়ল তারা। বুড়োর ডাকে তার হুঁশ হল। বুড়ো তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। ভাইকে সামলাতে সামলাতে, ঘরের চালও উঠল কেঁপে, মড়্ মড়্ শব্দে বাঁশগুলো ফাঁক হয়ে গেল, আর পট্ পট্ করে দড়িগুলো গেল ছিঁড়ে। চালাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলল জলের স্রোত। কোনও রকমে চালের খড় আঁকড়ে ধরে, এক হাতে বুড়োকে চেপে ধরে বালা নিজেকে সামলে নিল। একটু নড়লে-চড়লেই দুজনে পড়ে যাবার যোগাড়। বালা নিজের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে বুড়োকে শক্ত করে বাঁধল চালের বাঁশের সঙ্গে, পাছে গড়িয়ে পড়ে যায়। সে ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা রাত দুটিতে ভেসে চলল। ক্রমে বালার চোখও ঢুলে এল ঘুমে। হঠাৎ কিসের গায়ে চালাটা খেল ধাক্কা, আর বালা গড়িয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে। হাবুডুবু খেতে খেতে যখন সে মাথা জাগাল, দেখল ঘুমন্ত বুড়োকে কোলে নিয়ে চালা কোথায় ভেসে যাচ্ছে!

পরদিন সকালে এক গাঁয়ের লোকেরা দেখতে পেল, একটি ছেলে অজ্ঞান হয়ে জলের ধারে পড়ে আছে। তারা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে তুলল একটা ঘরে। দুপুরের দিকে একটু জ্ঞান হল বালার। সে চারদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বুড়োর ভেসে যাওয়ার ছবি মনে পড়তেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল সে। গ্রামের মেয়েরা দু-একজন তার কাছে বসেছিল। তারা তার গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি হয়েছে?" "কেন কাঁদছ?" বালা কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল, "আমার ভাই ভেসে গেছে নদীতে। তোমরা কেউ কি তাকে দেখেছ।" তারা কেউই দেখেনি তাকে।

দুদিন সেই গ্রামে বিশ্রাম করে একটু সুস্থ বোধ হতেই বালা বেরোল তার ভাই-এর খোঁজে। সে ঠিক করল, নদীর ধারে ধারে যত গ্রাম আছে সবখানে খুঁজে খুঁজে যাবে। তারপর এক সন্ধ্যাবেলা পেঁছিল সে একটা বড় গ্রামে। সেখানে একজনদের ঘরের দাওয়ায় গুটিকতক লোক বসে দাবা খেলছিল। বালা তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনও ছোট ছেলেকে বানের জলে ভেসে যেতে তারা দেখেছে কি না। তারা বলল, দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে, ভিন্ গাঁয়ের একজন চাষা একটি ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছিল নদী থেকে। তারা ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তারা নাকি শহরে চালের ব্যবসা করে।

এবার বালা চলল শহরে হেঁটে হেঁটে। কত গ্রাম পার হয়ে গেল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করল ভাই-এর কথা, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। শহরে পেঁছে সমস্ত মুদীর দোকানে খোঁজ করতে লাগল সে, কোন্ চাষা একটি ছোট ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছে। দোকানীরা বলল, "অনেক চাষা আমাদের চাল যোগায়, তাদের কেউ হতে পারে। কিন্তু তারা ত এখন আসবে না, আরও মাস দুই পরে আসবে। পুজোর সময়েও বাইরে থেকে অনেক লোক আসে এখানে। তখন খোঁজ করে দেখো।" একজন বলল, "ততদিন এখানেই থেকে যাও না কেন? আমাদের দোকানে তোমাকে কাজ দিতে পারি।" তাতে রাজি হয়ে গেল বালা। তার নিজেরও ত খাওয়া পরা চলা চাই। ঘুরে ঘুরে আর কতদিন কাটাবে।

ক্রমে এসে পড়ল পুজো। গাঁয়ের লোক যেন ভেঙে পড়ল শহরে। আর পড়বে নাই বা কেন? কত রকম দেখবার জিনিস তৈরি হয়েছে। ঠাকুরগুলি কি সুন্দর তৈরি করেছে এরা। মাঝে মাঝে আবার মাটির পুতুল সাজিয়ে পুরাণের গল্প ফেঁদেছে। কোথাও পার্বতী বাড়ি যাবার অনুমতি চাইছেন মহাদেবের কাছে, কোথাও রাজা হরিশ্চন্দ্র, কোথাও আবার ব্যাধেরা শিকার করছে। বন-জঙ্গলও তৈরি হয়েছে। মেয়েরা অনেক এসেছে ছোট ছেলেপিলে নিয়ে। মোটর গাড়ি দেখা তাদের অভ্যাস নেই, এত ভিড়ও দেখেনি কখনও। তাই আঁচলে আঁচলে গেরো বেঁধে সারি দিয়ে চলেছে সকলে। সামনের জন যেদিকে যায়, সেই দিকে চলে সবাই, হরিণের পালের মত। মোটর ড্রাইভার-

ঘুড়ি দেখে বালা দাঁড়িয়ে গেল, বেশী করে তার মনে পড়ে গেল ভাইকে

র এ এক বিপদ। হঠাৎ উল্টো দিক দিয়ে
স পড়ে মেয়ের দল, তাদের লাইন শেষ না
ওয়া পর্যন্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়।
বচেয়ে বেশী ভিড় যেখানে তৈরি হয়েছে
াঁক কোটা'। উঁচু কাঠের বেদীর উপরে
য় মানুষের মত বড় বড় মাটির পুতুল—
ড় ঢেঁকিতে চাল কুটছে, কেউ বাটনা বাটছে,
ান বুড়ি নাতীকে কোলে নিয়ে নাচাচ্ছে।
কলের হাত পা মাথা নড়ছে। শেষকালে,
ঠের পাটার নীচ থেকে 'ঘাঁউ ঘাঁউ' করে
রিয়ে আসছে একটা বাঘের মাথা। বেদীর
ে মানুষ বসে, দড়ি দিয়ে টেনে হাত-পা
ড়ায় পুতুলদের। সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও বলা
—ধান কোটা হল, মশলা বাটা হল, বুড়ি
ীকে ঠাট্টা করল—, এই রকম।

যেখানেই ছোট ছেলে দেখে, বালা কাছে
য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু
ড়াকে কোথাও দেখতে পায়না। পুজো
ষ হল, বাইরে থেকে যারা এসেছিল সবাই
ল গেল যে যার বাড়ি। বালা নিরাশ হয়ে
পচাপ নিজের কাজ করে।

তারপর শীতের গোড়ায় হল এক মেলা।
তি বছর শহরে এই মেলা বসে। সেখানেও
ী আছে। নদীর ধারের প্রকাণ্ড মাঠে
ার আগেই মেলা আরম্ভ হল। আলো-
তে, দোকানপাট, লোকে লোকারণ্য। কত
ম জিনিসের কত যে দোকান তার ঠিক
। কাঠের খেলনা, মাটির খেলনা, চীনা-
টির পুতুল, শিংএর জিনিস, পাথরের
নিস, আরও কত কী! খাবারের দোকানও
নেক হয়েছে। সেখানে এক-একটা পান্তুয়া
য়েছে মশলা-বাটা নোড়ার মত বড়! এই
ড়ের মধ্যে বালা ঘুরে ঘুরে দোকান দেখছে,
র বুড়োকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায়
? এত লোকের ভিতর কি আর খুঁজে
র করা সম্ভব? রকম রকম খেলনা রয়েছে,
দিকে তার মন নেই। এক দোকানে মাটির
ড়া, গরু-বাছুর, ময়না-টিয়া পাখির পিছনে,
ালে টাঙান আছে কতগুলো রঙচঙে ঘুড়ি।
ড়ি দেখে বালা দাঁড়িয়ে গেল, বেশী করে
র মনে পড়ে গেল ভাইকে। ছলছল
খে সে বেরিয়ে আসছে, তখন ঠেলাঠেলি
র সেই দোকানে ঢুকল নতুন একদল লোক।
ঠাৎ তাদের ভিতর থেকে কচি গলায় কে
চিয়ে উঠল 'পাতী' 'পাতী'! বালা থমকে
ড়াল, তারপর ছুটে ঢুকে পড়ল সেই ভিড়ের
ধ্যে, আর একেবারে কোলে টেনে নিল
ড়াকে। যার কোলে সে ছিল, সে 'হাঁ-হাঁ'
রে উঠল। কিন্তু বুড়া বালার গলা এমন
রে আঁকড়ে ধরেছে যে তাকে আর ছাড়ান
য়না। তখন সব জানাজানি হয়ে গেল।
লা তাদের কাছ থেকে শুনল, একজন চাষা
দীর ধারে চালার উপরে বুড়াকে অজ্ঞান
বস্থায় কুড়িয়ে পেয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে
য়। [illegible] আর তার স্ত্রী বুড়াকে মানুষ
রেছে। তা[illegible] নিয়ে এসেছে তাকে মেলা
খাতে। প্রথম[illegible] প্রথম বুড়া খুবই কাঁদত
নো 'বান[illegible] বলে। কিন্তু ক্রমে কান্না
লে গেল, বেশ[illegible]শি হয়েই রইল তাদের
ছে।

সেদিন সেই [illegible] এ দুটি ভাই যে
নন্দ পেয়েছিল, [illegible] তুলনা কোথায়?

স্বর্গ ও স্বর্গের চেয়েও বড়

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

গরীব বামুনের ছেলে কৌশিক। বুড়ো বাপমায়ের একমাত্র ছেলে। কিন্তু কৌশিক তাঁদের দিকে না চেয়ে তাঁদের ফেলে কোথায় চলে গেলেন।

পালিয়ে গিয়ে তিনি বনের মধ্যে এক সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সাধু ছিলেন মহাপণ্ডিত, তার উপর তাঁর যোগবলও ছিল যথেষ্ট। কৌশিক সেই আশ্রমে থেকে নানা শাস্ত্র পড়লেন। শেষে যোগ শিখে সিদ্ধাইও লাভ করলেন। তারপর তার আর সে বনে থাকতে ইচ্ছা হলো না।

ঘুরতে ঘুরতে কৌশিক একদিন এক গাছতলায় বিশ্রাম করতে বসেছেন, হঠাৎ গাছের উপর থেকে একটা পাখি তাঁর মাথায় কতকগুলো নোংরা জিনিস ফেলল। ভীষণ রাগে কৌশিক চোখ তুলে পাখিটার দিকে চাইতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, আর সেই আগুনে পুড়ে পাখিটা ভস্ম হয়ে গেল।

নিজের এই কেরামতীতে কৌশিক অহংকারে ফুলে উঠলেন। তিনি ভাবলেন—বাঃ রে! তাঁর সিদ্ধাইর গুণে তিনি তো ইচ্ছা করলেই পৃথিবীতে প্রলয় ঘটাতে পারেন!

এরপর তিনি এক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন,—"কে আছ, গৃহস্থরা? আমি অতিথি এসেছি।"

তাঁর কথা শুনে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আদর যত্ন করে তাঁকে বসিয়ে বললেন, "আপনি বিশ্রাম করুন। আমার স্বামীর সেবা করার সময় হয়েছে। তা সেরে এসেই আপনার সেবার ব্যবস্থা করছি।"

স্ত্রীলোকটির দেরী হচ্ছে দেখে কৌশিক অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীলোকটি ফিরে এসে কৌশিককে সেবার কথা বলতেই চোখ

স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করে বললেন

লাল করে তিনি বললেন, "অতিথি নারায়ণ, তুম না জানে। গৃহস্থ সেই অতিথিকে বসিয়ে রেখে ঘরের কাজ সারতে যায়, অদ্ভুত ব্যাপার।"

স্ত্রীলোকটি হাতজোড় করে বললেন, "আমার দেরী হয়েছে বটে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। স্বামীর সেবা করা আমার নিত্যকার ব্রত। সেই সেবার সময় হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার শুয়ে শোবার ব্যবস্থা না করে আসতে পারিনি।"

দেরীর কারণ শুনে কৌশিক ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন—"ওঃ! অতিথি সেবার চমৎকার ব্যবস্থাই বটে! গৃহস্থ নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে উপোষী অতিথিকে মনে করে! কিন্তু আজকের অতিথিটি কে তা হয়তো জানা নেই। এই মুহূর্তে তা জানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।" রাগে কৌশিকের চোখ দিয়ে আগুনের ঝলক বের হচ্ছিল।

স্ত্রীলোকটি হেসে কৌশিককে বললেন, "শান্ত হউন, বাবা। আমি জানি আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান, পরম পণ্ডিত, তার উপর সিদ্ধযোগী। আপনার চোখের তেজে গাছের পাখি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু আপনাকে আমি ভুলে যাইনি। আমি উপোষীই আছি। স্বামীর সেবার পর তাঁর পাতের প্রসাদই আমি পেয়ে থাকি। আপনার সেবার আগে সে প্রসাদও আমি মুখে দিইনি। আমার স্বামীর শরীর অপটু, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সময়মতই করতে হয়। তিনি আপনার কথা জানেনও না।"

কৌশিক শুনে অবাক হয়ে ভাবলেন, তাঁর এত পরিচয় স্ত্রীলোকটিই বা জানলো কি করে? মনের কৌতূহলে তিনি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না। "আপনি কে? আমার এত খবরই বা আপনি জানেন কি করে?

"স্ত্রীর পরিচয় স্বামীর সম্পর্কে"—স্ত্রীলোকটি বলতে লাগলেন,—"আর আপনার খবরও আমার অজানা নেই স্বামীর আশীর্বাদে। তাঁর সেই আশীর্বাদের লোভেই আমার প্রত্যেক দিনের প্রধান কর্তব্য স্বামীর সেবা করা। সে সেবাও সময়মত করাই আমার ধর্ম।"

স্ত্রীলোকটির যত্নে কৌশিকের সেবার কোন ত্রুটি হলো না। কৌশিক বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বলেন, "দেখুন, শুধু পুঁথিপত্তর ঘেঁটে আর সিদ্ধাই পেয়ে আসল কিছু হয় না। মানুষের ধর্ম কর্তব্য করে। সে কর্তব্যের পরিচয় চান তো, আপনি মিথিলায় যান। সেখানে এক ব্যাধ আছেন, লোকে তাঁকে বলে 'ধর্মব্যাধ'। তাঁর কাছে গেলে আপনি অনেক কিছুই দেখতে-শুনতে পাবেন। তাতে আপনার উপকারও হবে।"

স্ত্রীলোকটির কথার হেঁয়ালী বুঝতে না পেরেও মনের কৌতূহলে কৌশিক মিথিলায় চললেন। সেখানে গিয়ে ধর্মব্যাধের সন্ধান করতে করতে বাজারের মধ্যে এক মাংসের দোকানের কাছে উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ সেই দোকানে বসে মাংস বেচছিলেন। দূর থেকে কৌশিককে আসতে দেখেই তাঁর নিকটে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আসুন। আমি এখানকার কাজ সেরে নিয়েই আপনার সেবার ব্যবস্থা করছি।" এই বলে ধর্মব্যাধ তাঁকে আদর করে বসতে দিলেন।

এ কি কাণ্ড! তিনি কি ধর্মব্যাধের চেনা, না, তার আমার খবর তাঁর আগেরই জানা! ভারী আশ্চর্য হয়ে কৌশিক বসে বসে ধর্মব্যাধকে দেখতে লাগলেন।

দোকানের কাজ সেরে ধর্মব্যাধ কৌশিককে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে যত্ন করে তাঁকে বসিয়ে বললেন, "আপনি বিশ্রাম করুন। আমার বাপমায়ের সেবার সময় হয়ে গিয়েছে। বাজার থেকে এসে আমাকে আগেই তা করতে হয়। আমি তাঁদের সেবা করে এসেই আপনার সেবার ব্যবস্থা করছি।"

এ পর্যন্ত ধর্মব্যাধের সঙ্গে কৌশিকের কোন কথাবার্তাই হয়নি, ধর্মব্যাধও কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। খাওয়া-দাওয়ার পর মনের কৌতূহলে আর চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি ধর্মব্যাধকে বললেন, "দেখুন একটা কথা আমি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছিনে। আমি কে, কার কাছ, কেন এসেছি—কিছুই বলিনি, আপনিও জানতে চাননি। অথচ আপনি যেন সবই জানেন—এমন ভাবেই আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন! এর রহস্যের কারণ তো আমি বুঝছিনে।"

ধর্মব্যাধ হেসে বললেন, "আপনি মহাপণ্ডিত, তার উপর সিদ্ধযোগী, আমি তা জানি। আর এক সতীলক্ষ্মীর কথায় আপনি এখানে এসেছেন, তা-ও আমার অজানা নয়। আপনি যার খোঁজে এসেছেন আমিই সেই ব্যাধ, দয়া করে লোকে বলে—ধর্মব্যাধ। কেন বলে, জানিনে। তবে আমি আমার ধর্ম জানি আমার বাপ-মাকে, আর আমার সকল কাজের সেরা কাজ বুঝি তাঁদের সেবা করা। বাপ-মায়ের আশীর্বাদেই আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি আর আপনার আসার উদ্দেশ্যও জানি।"

'বাপ-মায়ের আশীর্বাদে!' কথাটা শুনে কৌশিকের মনে কি খটকা জেগে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আশীর্বাদে কি মানুষ অন্তর্যামী হয় নাকি? যেমন দেখছি আপনাকে, আর সতীলক্ষ্মীটিকে, যাঁর কথায় আমি মিথিলায় এসেছি। কিন্তু সেই সতীলক্ষ্মী তো বাপমায়ের সেবা করেন না, করেন স্বামীর সেবা।"

ব্যাধ হেসে বললেন, "ও একই কথা। স্বামীর ঘরে এসে স্ত্রীলোকের বাপ-মায়ের সেবা করার সুযোগ কই? তার উপর স্বামী-স্ত্রী নিজেরাও তো একসময়ে হয়ে ওঠেন বাপ-মা। আমি একদিকে বাপ-মায়ের সেবার সুযোগ পাচ্ছি ঘরে বসে, অন্যদিকে বাইরে বাপ-দাদার ব্যবসা চালিয়ে আমাকে বংশের কর্তব্যও করতে হচ্ছে। ব্যাধের ঘরে জন্মেছি, সে ব্যবসা তো চালাতে হবেই। তাও তো কর্তব্য। অবশ্য সে কর্তব্য করতে গিয়ে আমি নিজের হাতে প্রাণীহিংসা করতে পারি না। আমার বাইরের এই যে ধর্ম তার উপরেই রয়েছে আমার সকল ধর্মের সার ধর্ম—বাপ-মায়ের সেবা করা। বাইরের কাজ সেরে পরে এসেই আমার তাই সে ধর্ম পালন করতে হয়। তা না করে জল গ্রহণ করারও উপায় নেই। আপনি মহাপণ্ডিত, শাস্ত্রের কথা তো আপনার অজানা নেই—বাপই স্বর্গ আর মা স্বর্গের চেয়েও বড়। দেবতারা স্বর্গের মাটিতে পা রেখেই অন্তর্যামী হয়েছেন, আর মানুষ সেই স্বর্গের সন্ধান যাদের মধ্যে পান, সেই বাপ-মায়ের আশীর্বাদে দিব্যচক্ষু পাবেন, সে আর আশ্চর্য কি!"

বাপ-মায়ের সেবা মানুষের ধর্ম—ধর্মব্যাধের মুখে এই কথা শুনতে শুনতে কৌশিকের মন তোলপাড়। তিনি মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলেন।

ধর্মব্যাধ যেন দিব্যচক্ষুতে তাঁর ভাবনা দেখতে পেলেন। এবার স্পষ্ট করেই বললেন, "আপনি মাথা হেঁট করে ভাবছেন কি অত? বাপ-মায়ের কথা ভাবছেন? তাঁদের কথা কি আপনার মনে আছে? আপনার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা দুজনেই অন্ধ হয়ে গেছেন।

এতদিন পরে সত্যিই কৌশিকের বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ছিল। তাঁরা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন শুনে তাঁর প্রাণ হাহাকার করে উঠল।

মুখ তুলে তিনি ধর্মব্যাধকে বললেন, "আমি চিনেছি। আপনি কে। সাক্ষাৎ ধর্ম। আমাকে আপনি ধর্মের পথ দেখিয়ে দিলেন। আমি চললুম আমার বাপ-মায়েরই কাছে ফিরে। আশীর্বাদ করুন, এখন থেকে তাঁদের সেবা করেই যেন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

ছবির পেঁচা-জ্যান্ত হলো | বিমল দাস

এখানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে যে-পেঁচাটা ছবির মত চুপটি করে বসে আছে, ইচ্ছে করলে তোমরা ঐ পেঁচাটিকে জ্যান্ত পেঁচা করতে পার। কেমন ক'রে জান? প্রথমে পেঁচার চোখের সাদা জায়গাটা আর পায়ের নোখ ক'টা সাদা লাইন বরাবর সমান ক'রে কেটে নেবে। তারপর পেঁচার মাথার ওপরের আর পায়ের নীচের লম্বা সাদা লাইন দুটো, ব্লেড দিয়ে চিরে নেবে। পাশে যে মইয়ের মতো লাল-সাদা নক্সাটা দেখছ... এর পর ঐটার দুপাশ ধরে লম্বা মইটার সবটা কেটে নাও—নিয়ে পেঁচার পায়ের তলার সাদা ফাঁকটার মধ্যে গলিয়ে, সিঁড়িটা ছবির পেঁচা... নিয়ে নিয়ে মাথার সাদা ফাঁকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এখন যদি ঐ সিঁড়িটা জোরে জোরে মাথার দিকে ওঠাও নীচের দিকে নামাও—দেখবে ছবির পেঁচা জ্যান্ত পেঁচা হয়ে গেছে। ওর চোখ খুলছে, বুজছে। পায়ের নোখ ঢুকছে, বেরুচ্ছে।

বজ্রবাহুর সিংহল বিজয়

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বাঙালী বীর বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কথা সকলেরই প্রায় জানা। ন্তু বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের প্রায় হাজার বছর পরে, বজ্রবাহু জনার্দন গিয়ে হল বিজয় করেন। সে কাহিনীটি আজ া।

বহুকাল আগে চলনবিল বলে অতি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল রাজসাহীর কাছে। এই হ্রদের র দিকে ছিল শিখাই সান্যালের খুব বড় দারী। সামসুদ্দিন ছিলেন তখন গৌড়ের শা। শিখাই সান্যালও মারা গেলেন, গৌড় শাও মারা গেলেন। গৌড় বাদশার ছেলে ন খুব ছোট। তার বিমাতার আরো সব ছিল ছোট। রাজ্য দেখবার ভার লো শিখাই সান্যালের ছেলের ছেলে কংস-র উপর। কংসরাম ছিলেন ফৌজদার আর ভাবী যোদ্ধা। তিনি এ ধরনের কর্তৃত্ব েন যে, সবাই তাঁকে বলতো গৌড়ের বাদশা। শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব নিয়ে গণ্ডগোল লো গৌড়বাদশার ছেলেদের মধ্যে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা কংসরামের অমন কর্তৃত্ব সইবে কেন! চক্রান্ত হতে লাগলো। দরে, অর্থাৎ এ-দিকে, ও-দিকে চতুর্দিকে সব তৈরী হতে লাগলো। সম্ভাবনা উপর চড়াও হবে। কংসরাম চিন্তা করলেন। চিন্তা করে, তাঁর ছেলে কে ডেকে পাঠালেন। এই জনার্দনের ... এই বজ্রবাহুর পরিচয় তাঁর নামও হল বজ্রবাহু, কাজেও তিনি । বজ্রবাহু ছিলেন মহাবীর, মহাসাহসী, অশেষ গুণশালী, এবং ছিলেন এক আকর্ষণীয় পুরুষ।

বাহুকে ডেকে পাঠিয়ে কংসরাম বললেন,— সৈন্য দিচ্ছি, তুমি সাঁসানা গিয়ে হারিয়ে দিয়ে এসো। পারবে?"

বাহু বললেন, "আপনার হুকুম হলে পারবো।"

তারপর তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চললেন করতে। শত্রু সৈন্যদের হারিয়ে তো তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে এলেন। বিক্রম দেখে কংসরাম তাঁকে উপাধি দিলেন বাহু।

ই সময় আর এক ব্যাপার ঘটলো। ব্রহ্ম-র রাজা আরাকান রাজ্য আক্রমণ করে জয় নিলেন। বজ্রবাহুকে পাঠানো হলো রাজার বিরুদ্ধে। বজ্রবাহু গেলেন ত্রিশ র সেনা নিয়ে। গিয়ে যুদ্ধ করে রাজাকে হারিয়ে দিয়ে আরাকান রাজ্য উদ্ধার দিলেন। আরাকান রাজার কৃতজ্ঞতার নেই।

ব্রহ্ম রাজা আবার ও-দিক থেকে এসে রাজ্যে ঢুকে পড়লেন, আর রাজ্যের অংশ দখল করে নিলেন। বজ্রবাহু চললেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। ব্রহ্মরাজকে দিয়ে, সব আবার দখল করে নিলেন। রাজারও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

বজ্রবাহুর বল-বিক্রম, যুদ্ধ কৌশল, সাহস ও বুদ্ধি এ রকমের ছিল যে, সকলেই তাঁর কাছে পরাজিত হোত।

তিনি ফিরে এলে পর তাঁকে পাটনার নবাব করে বিহারে পাঠানো হলো।

কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হলো। গৌড় বাদশাহের ছেলে এখন বেশ বড় হয়েছে। সে আর কংসরামের আধিপত্য সহ্য করতে না পেরে তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল।

পিতৃহত্যার দুঃসংবাদ পেয়েই বজ্রবাহু বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গৌড় আক্রমণ করতে ছুটে এলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ সন্ধির প্রস্তাব করল। তিনি সন্ধি করতে সম্মত নন। বিরুদ্ধ পক্ষ তখন চক্রান্ত করে কতকগুলো চিঠি তৈরি করলে, আর সে সব চিঠি বুদ্ধি করে বজ্রবাহুর কাছে পাঠালো। চিঠিগুলো পড়ে তিনি তো অবাক। তাতে আছে যে, তাঁর নিজেরও অনেক সেনা বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছে। ব্যাপার খুব গুরুতর। তিনি অনেকটা হতাশ হলেন। কি করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। শেষে আরো বেশী হতাশ হয়ে,

সমুদ্রের জলে গিয়ে ঠিকরে পড়ল

নিজের মাত্র তিনশত অনুচর নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রথমে গিয়ে পৌঁছলেন আরাকান দেশে। আরাকানের রাজা তাঁকে পেয়ে কি আনন্দ! পরম সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। আলাপের পর বললেন, "আপনার সাহায্যে আমি রাজ্য পেয়েছি ফিরে। এখন আমি আপনাকে সাহায্য করবো গৌড় নিতে। আপনি নির্ভয়ে এখানে থাকুন, আর একটা তৈরী হোন।

ত্রিপুরার রাজাকে বলে পাঠালেন যে, তিনিও বজ্রবাহুকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন, গৌড় আক্রমণে। গৌড় আক্রমণের আয়োজন সব আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু এই সময় আরাকানের জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন বাংলাদেশে বজ্রবাহু জনার্দনের ভাগ্য ভাল দাঁড়াবে না। তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে হবে। সিংহলে যদি যান সেখানে সব রকমের উন্নতি হবে—বিশেষ সৌভাগ্যের উদয় হবে।

এই গণনার ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন উল্টে গেল। আরাকান রাজারও মন যেন বিগড়ে।

বজ্রবাহু বললেন, "না, এখানে আমি থাকবো না। এ দেশেই থাকবো না।"

"কোথায় যাবেন?"

"উড়িষ্যায়।"

"বেশ, তাই যান। কিন্তু কি করে যাবেন? জাহাজ কই?"

"সেই হলো চিন্তার কথা!"

"বেশ আমি জাহাজ ঠিক করে দোব।" এই কথা বলে আরাকান-রাজ উঠে গেলেন। উঠে গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

পরের দিন জাহাজের ব্যবস্থা হলো। সঙ্গে চললো তিন শ' অনুচর, এবং ত্রিশজন সদ্-ব্রাহ্মণ। জাহাজে গিয়ে সবাই উঠলেন।

জাহাজ চললো। কিছু দূরে গিয়েই সর্দার নাবিক এগিয়ে এসে সদম্ভে বললে, "দেখ, এই মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ডুবিয়ে তোমাদের মেরে ফেলবো।"

"মেরে ফেলবে? কেন?"

"তোমরা যে বিদেশী।"

"আমার সঙ্গে পারবে?" এই বলেই যে লোকটা কথা বলছিল, তাকে বজ্রবাহু মারলেন এক ধাক্কা। সে সমুদ্রের জলে গিয়ে ঠিকরে পড়লো। অন্য নাবিকেরা তখন হতভম্ব।

বজ্রবাহু তাঁর কয়েকজন অনুচরকে লাগিয়ে রাখলেন নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে, আর ... তাদের কাজ তদারক করতে। নিজেও ... রইলেন তাদের সঙ্গে।

তারপর জাহাজ চললো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। জাহাজখানা ক্রমাগত গিয়ে গিয়ে যে জায়গায় ঠেকলো, সেটা উড়িষ্যা নয়।

বজ্রবাহু বললেন, "এ কোথায় এলুম? এ কোন্ দেশে? এ কি উড়িষ্যা?"

অনুমানে জানা গেল এদেশ হল সিংহল। এখানের লোকেরা সব বুদ্ধদেবের উপাসক।

জ্যোতিষীর কথা তাঁর স্মরণ হলো। সিংহলে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তাই কি তিনি পাকেচক্রে এখানে—এই সিংহলেই এসে পড়লেন! তিনি নির্বাক হয়ে খানিকক্ষণ জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি প্রবীণ, তিনি এসে বললেন, "এই হল বিধিচক্র। ভাগ্য আমাদের সকলকে সিংহলে এনে ফেলেছে। চলুন, এবার অবতরণ করা যাক্।"

লোকজন নিয়ে বজ্রবাহু নামলেন জাহাজ থেকে। নেমেই দেখেন, সে রাজ্যে মহা বিভ্রাট, বিষম গণ্ডগোল। চারপক্ষের বিবাদ চলছে, রাজসিংহাসন নিয়ে। একটি পক্ষ ছিল দুর্বল। এই দুর্বলপক্ষ এসে বজ্রবাহুর দলে ভিড়ে গেল। আর সে জায়গায় অনেক যমিস্ বসে দিল।

যুদ্ধ হলো। মহাবীর বজ্রবাহু প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করলেন, অন্য তিন দলকে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে দিয়ে তাদের নিজের অধীনে আনলেন। তারপর নিজে হলেন সিংহলের সর্বেসর্বা— রাজাধিরাজ।

বিজয় সিংহের পর বজ্রবাহু জনার্দন সিংহল বিজয় করে সিংহলের হলেন একছত্র রাজা।

ছত্রভঙ্গ (নাটিকা)

শ্রীসুনির্মল বসু

(শহুরে বিষ্টু ও গেঁয়ো কেষ্ট একসঙ্গে পথ চলছে।)

বিষ্টু

কেষ্ট ওরে, কষ্ট করে কল্‌কাতাতে এলি,
সাবধানেতে চলিস্ পথে চক্ষু দুটি মেলি।
পথের মাঝে হাজার গাড়ী, ট্রাম-মোটরের মেলা,
চাকার তলে পড়লে পরে বুঝবি তখন ঠেলা!
সোজা তখন হাসপাতালে, কিম্বা শ্মশান-ঘাটে,
কল্‌কাতাতে আনাড়ীদের নিত্যি ফাঁড়া কাটে।

কেষ্ট

ছোঃ, রেখে দে, মাত্‌বরি তোর,
নইকো আমি বোকা,
সত্যি কি আর বেকুব আমি, অবুঝ গেঁয়ো খোকা।
আমার ঘটে বুদ্ধি আছে, হুম বাবা তা বলি,
ফুট্‌পাথরে হন্‌হনিয়ে বুক ফুলিয়ে চলি।
চক্ষু আমার সজাগ থাকে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরে,—
দয়া করে উপদেশটা দিস্‌না এখন মোরে।

বিষ্টু

ফুট্‌পাথে তো চলাই উচিত, সবাই তাতে চলে,
দ্যাখ না সবাই এধার ওধার চলছে দলে দলে।
হর্দম এই ফুটপাথেতে ভদ্র-ইতর ঠাসা,
মুটে, মজুর, মুদ্দাফরাস, মেথর ধাঙড়, চাষা
তাদের মাঝে চলতে গিয়েও গুলিয়ে যে যায় মাথা,
আজব বড় কলিকালের শহর কলিকাতা।

(কেষ্ট তার ছাতাটা হাতে নিয়ে লাঠির মত খুব হেলিয়ে দুলিয়ে যাচ্ছে,—এমন সময় লাগলো একজন পথিকের ভুঁড়িতে খোঁচা।)

ভুঁড়িওলা

বিট্‌লে কে রে, মারলি খোঁচা নধর ভুঁড়িটাতে,
চলতে নাহি জানিস্, তবু চলিস ছাতা হাতে?

(টান মেরে ছাতাটা কেড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে সোজা চলে গেল।)

কেষ্ট

আ-হা-হা, নতুন কেনা আমার ছাতা এটা,
ইচ্ছা করে ঠ্যাটা ব্যাটায় করতে ছাতা পেটা।

(ছাতাটা তুলে ধুলো ঝেড়ে বগলদাবায় নিল।)

বিষ্টু

ছাতাটা তোর সামলে চলিস্ ফুটপাথেরই মাঝে,
কোথায় কখন বিপদ ঘটে বলতে পারি না যে।

কেষ্ট

হু, রেখে দে—

(এমন সময় কেষ্টর বগলের ছাতার খোঁচা লাগলো এক কানা ভদ্রলোকের অপর চোখে।)

কানা ভদ্রলোক

—উঃ হুঃ হু—কেরে বাঁদর ওঁছা,
একটি চোখই সচল ছিল, মারলি তাতে খোঁচা।
হাড়-হাভাতে, হ্যাংলা-হুতোম, চোখ যে
আমার গয়া—

বিষ্টু

ওর হয়ে ভাই চাইছি ক্ষমা, এবার করুন দয়া।

(ভদ্রলোক চোখ রগড়াতে রগড়াতে চলে গেল।)

দেখলি কেমন ঘটলো ফ্যাসাদ, কেলেঙ্কারি বড়,
ভীড়ের মাঝে সামলে চলা, ব্যাপার গুরুতর।

কেষ্ট

বগল থেকে এবার ছাতা রাখছি আমার কাঁধে—
চোখ চেয়ে কেউ পথ হাঁটে না, বেহদ্দ কি সাধে?

(এমন সময় কেষ্টর কাঁধের ছাতার বাঁকা হাতলে একজন লম্বা দাড়ীওলা লোকের গলা আটকে গেল। সে পিছনে পিছনে আসছিল।)

দাড়ীওলা

কে বাবাজী, হ্যাঁচকা টানে সারলে আমার দফা,
গলায় আমার আচ্ছা করে আঁকুশি দিলে তোফা,

(কেষ্টর কাঁধের ছাতা কেড়ে নিয়ে)

দাঁড়া, দাঁড়া, দেখাই মজা, বে-আক্কেলে কে রে?
ছাতাটা তোর করব ছাতু পিঠের উপর মেরে।

বিষ্টু

দোহাই দাদা ওর হয়ে ভাই চাইছি ক্ষমা আজি,

(দাড়ীওলা চলে গেল।)

কেষ্ট

শহুরে এই লোকগুলি হয় হতচ্ছাড়া পাজি।
পথ চলতে কেউ জানে না, সব খেয়েছে গুলে
এবার আমি রাখব ছাতা মাথার উপর খুলে।

(ছাতা খুলে চলল)

বিষ্টু

ঝড় জল নাই, রোদ্দুর নাই, এখন বেলা শেষে
মাথার ছাতা দেখলে পরে সরবে লোকে হেসে।

কেষ্ট

হাসুক যত বিটলেগুলো—থোড়াই কেয়ার করি—
আমার ছাতা বইব আমি যেমন ইচ্ছা ধরি।

(কয়েকটি ছেলে ফুটবল খেলে বগলে বল নিয়ে হল্লা করতে করতে ফিরছে।)

একটি ছেলে

ছাতা খুলে চলছে কে রে,—বৃষ্টিহারা দিনে—
সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড দেখে হেসেই যে মরি চিনে।

(একটি ছেলে এগিয়ে এসে পিছন থেকে পটাং করে ছাতাটা বন্ধ করে দিল। চোটেমোটে কেষ্ট আবার ছাতাটা খুলল, আর একটি ছেলে আবার ছাতা বন্ধ করে দিল।)

কেষ্ট

আমার ছাতা বন্ধ করিস, কে রে ছোঁড়াগুলো
একবারটি ধরতে পেলে, ধুনবো পিঠে তুলো।
ছত্রভঙ্গ করব তোদের—দেখাই মজা দাঁড়া
ছাতা-পেটা করব তোদের—ওরে লক্ষ্মীছাড়া

(আর একটি ছেলে এগিয়ে এসে তার ফুটবলটা ছুঁড়লো ছাতার উপর—ছাতাটা ফস্কে রাস্তায় ছটকে পড়লো—এমন সময় একটা মোটর চলে গেল ছাতার উপর দিয়ে। ছাতাটা ভেঙে চেপটে একাকার। ছেলের দলের হাসি।)

কেষ্ট (মাথায় হাত দিয়ে)

হায়-হায়-হায়, আমার ছাতা, নতুন কেনা ছাতা,
চেপটে দিলে লেপটে ধুলোয়, হায়রে কলিকাতা!

ছেলের দল

হো-হো-হো, ছাতার শোকে লোকটা বুঝি মোলো,
ছত্রভঙ্গ করতে নিজের ছত্র-ভঙ্গ হোলো।

বিষ্টু

কেষ্টচরণ, নিজের দোষেই পড়েছ সংকটে,
সাবধানেতে চল্লে পথে বিপদ নাহি ঘটে।

যবনিকা

স্বাধীনতার সাজা

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

ময়দানে স্বাধীনতা উৎসবের সময়ে ব্যায়ামে যোগদান করে ফিরে এসে বিচ্ছু সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাচ্ছে স্বাধীনতা কি মূল্য।

ঝিকে বোঝাচ্ছে, চাকরকে বোঝাচ্ছে, মাকে পিসিকে—ভালো করে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে।

—এই ধরোনা কেন, দেশ যখন স্বাধীন হ তখন সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসে ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন, তাই ভারতবর্ষে লোকই দেশকে শাসন করছে। সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে ত? এই আমা কথাই ধরো না কেন, সব সময় তোমরা বলে এই এটা করিস নি, সেটা করিস নি, এখানে যাসনে, ওখানে যাসনে! বৃষ্টিতে ভিজিস ন রাত করে বাড়ি ফিরিস নি! আচ্ছা, আমাকে তোমরা স্বাধীনতা দিয়ে দাও না কেন?

বিচ্ছুর কথা সবাই শোনে, আর মুচ মুচকি হাসে। সত্যি কথাই ত! কি অবিচার বিচ্ছুর স্বাধীনতা নেই!

বাড়ির পুরনো চাকর রামদীন শুধো হ্যাঁগো বিচ্ছুবাবু, তোমার স্বাধীনতা কবে হবে

গোটা বাড়িতে একমাত্র রামদীনই যা দ দিয়ে ওর কথাবার্তা শোনে!

বিচ্ছু আবার বোঝাতে শুরু করে, আচ্ছা তুমিই বলো না রামদীনদা, স্বাধীনতা না পেলে

একটা মানুষ কখনো বড় হতে পারে? ওই যে ইস্কুলে কবিতা মুখস্ত করি,

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বলো, কে পরিবে পায়রে
কে পরিবে পায়?"

রামদীন মাথা নাড়ে আর বলে, ঠিক কথা।

বিচ্ছু তার মনের দুঃখ জানিয়ে বলে, কবে যে একা একা গড়ের মাঠে খেলা দেখতে যাবো, বৃষ্টিতে ভিজে ম্যাচ দেখবো, ট্রামে-বাসে চেপে নিজের জিনিস নিজে কিনে নিয়ে আসবো, অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে কিংবা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লে কেউ বকবে না......সেই কথাই শুধু আপন মনে ভাবি।

রামদীন এইবার ওকে বোঝায়, হবে, হবে, আর একটু হাতে পায়ে বড়ো হও, তাহলেই একা একা সব কিছু নিজের হাতে করতে পারবে।

কিন্তু বিচ্ছুর মনের খুঁত খুঁত ভাব যায় না। সবাইকার কাছে সে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ায়—তার স্বাধীনতা আর হল না।

বিচ্ছুর স্বাধীনতা নিয়ে সারা বাড়ির লোক খুব মজা পায়। ঠাট্টার সুরে বলে, আহা বেচারীর বড় কষ্ট! কবে যে বিচ্ছু স্বাধীনতা পাবে—আমরা সেই জন্যে দিন গুণছি!

অবশেষে সারা বাড়ির এই মজার কথাটা বিচ্ছুর জ্যাঠামশায়ের কানে গেল। তিনি একদিন ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, শোনো বিচ্ছু, তোমার দুঃখের কাহিনী আমি শুনেছি। তাই ঠিক করেছি—আসছে কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তোমায় স্বাধীনতা দেবো। যেমন খুশি তুমি সারাটা দিন কাটাও।

জ্যাঠামশায়ের শেষ কথাটা শোনবার মতো ধৈর্য বিচ্ছুর ছিল না। সে শুধু জানতে পেরেছে যে একটা দিনের জন্যে সে স্বাধীনতা পেয়েছে। ব্যস! আর কিছু জানবার দরকার নেই। একেবারে তিড়িং লাফ শুরু হয়ে গেল।

কি মজা! কাল সকালে তার চারধারে আর গণ্ডীদের বেড়া নেই! কাল সকালে সে কি খাবে, না গলা ছেড়ে গান গাইবে, না মাথা দিয়ে হাঁটতে শুরু করবে—ভালো করে ঠিক করতে পারে না।

অতি আনন্দে রাত্তিরে তার ভালো করে ঘুমই হল না। সে সারা রাত টুকরো টুকরো, ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন দেখতে লাগলো। কখনো স্বপ্ন দেখলো সাঁতরে সে গঙ্গা পার হচ্ছে, কখনো দেখলো ঝমাঝম্ বৃষ্টির মধ্যে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় সে একাই রাশি রাশি গোল ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিপক্ষের গোল পোস্টের ভিতর; এক একটা মজাদার স্বপ্ন দেখে—আর তার ঘুম ভেঙে যায়!

এইভাবে সারাটা রাত এক দারুণ উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কাটলো। এই একটু ঘুমুচ্ছে, আবার স্বপ্ন দেখে জেগে উঠছে! সব স্বপ্নেরই হিরো বিচ্ছু স্বয়ং। পরদিন সকালবেলা চোখ কচলে উঠেই মনে হল যে, তার পায়ের শেকল একেবারে খুলে গেছে! যেখানে খুশি আজ সে যেতে পারবে।

যে কাজটা করা ওর একেবারে বারণ সেইটেই বিচ্ছু আজ সক্কলের আগে করল। মানে, ওর ছোট কাকার ছোট বাইকটা চুপি চুপি বের করে নিয়ে এলো। কলকাতার পথে বাইক চালানো ওর একেবারে নিষেধ। ও সেই কাজটাই আগে বেছে নিলে। ওর বিশেষ বন্ধু হচ্ছে মলয়। বিচ্ছু আগে মলয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল আর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজাতে লাগলো।

বাইরের ঘরে বসে মলয়ের বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওকে দেখেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুংকার দিয়ে বললেন—হুঁ! সক্কালবেলাই আড্ডা! মলয় এখন পড়াশোনা করছে। যাও, বাড়ি যাও—

স্বাধীনতা পেয়েই এই ধমক খেয়ে বিচ্ছুর মনমেজাজ ভারী বিগড়ে গেল। ভেবেছিল, ছোট কাকুর বাইকে চেপে ক্লাশের সব বন্ধুদের বাড়ি টহল দিয়ে বেড়াবে। কিন্তু মলয়দের বাড়ি গিয়ে সে যা অভ্যর্থনা পেলো, তাতে তার সব উৎসাহই একেবারে কর্পূরের মতো উপে গেল!

সদর রাস্তায় নেমে সে বাইকটাকে একেবারে বন্ বন্ করে চালিয়ে দিলে। এবার আর কোনো বন্ধুর বাড়ি না। হারা-উদ্দেশ্যে সে ঘুরে বেড়াবে কলকাতার বিভিন্ন রাজপথে, গঙ্গার ধারে আর গড়ের মাঠের চারধারে চক্কর দিয়ে।

এ রাস্তা দিয়ে চলছে, ও রাস্তা দিয়ে চলছে। একটা চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশের নির্দেশ না মেনে বাইক চালিয়ে যেতে পাহারাওলার

সদর রাস্তায় নেমে বাইকটাকে বন্ বন্ করে চালিয়ে দিলে।

গালাগাল খেলো। শেষকালে বয়েস নিতান্ত কম বলে দয়া করে ছেড়ে দিলে তাকে।

এতে বিচ্ছুর মন একেবারে ভেঙে গেল। তাইত! স্বাধীনতা পেয়ে যা খুশি করবে, না নয়—কিনা—পদে পদে শুধু গালাগাল খাচ্ছে।

আরো জোরে বাইক চালিয়ে দিলে বিচ্ছু। শিস দিয়ে বাইক চালিয়ে যেতে লাগলো।

আরো জোরে—আরো জোরে—চালিয়ে দিয়েছে দু চাকার গাড়ি। আনন্দে সে চোখ বুজলো।

হঠাৎ উল্টো দিক থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল।

—ওরে খোকা, পাগলা কুকুর আসছে, পালা, পালা! বহু লোকের চিৎকার একসঙ্গে।

কিন্তু বিচ্ছু একেবারে হকচকিয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে ব্রেক কসতে ভুললো।

পড়বি ত পড় একেবারে বাইকসুদ্ধ—সেই পাগলা কুকুরের ঘাড়ের উপর। কুকুরটাও একটা ভীষণ চিৎকার করে বিচ্ছুর পায়ে কামড় বসিয়ে দিলে। ভয়ে, আতঙ্কে আর যন্ত্রণায় বিচ্ছু ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বিচ্ছুর জ্যাঠামশায়ের এক বন্ধু ওইখান দিয়ে বাজার করে ফিরছিলেন। তিনি ভিড় ঠেলে ছুটে এলেন। তারপর বিচ্ছুকে চিনতে পেরে একটা ট্যাক্সি ডেকে একেবারে সোজা হাসপাতালে। সেখান থেকেই টেলিফোন করে দিলেন বিচ্ছুর জ্যাঠামশাইকে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এসে হাজির হলো বিচ্ছুর জ্যাঠামশাই, বাবা, কাকার দল, ঠাকুর, পিসিমা, মা, রামদীন অবধি।

জ্ঞান হতে বিচ্ছু শুধোলে, আমি কোথায়?

জ্যাঠামশাই রসিকতা করে উত্তর দিলেন, তুমি যে স্বাধীনতা উৎসব করছ। আরো স্বাধীনতা কি চাই?

বিচ্ছু খানিকটা চুপ করে রইল। তারপর বললে,—না জ্যাঠামশাই, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তোমরা আমার ভালোর জন্যেই আটকে রাখতে চাও। মিছিমিছি আজ আমি মলয়ের বাবার বকুনি খেলাম, পাহারাওলার দাঁতমুখ খিঁচুনি সহ্য করলাম, শেষকালে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাসপাতালে এলাম!

জ্যাঠামশাই মুখ টটকে উত্তর দিলেন,—তাতেও তোমার খাওয়া শেষ হয় নি বাপু। এইবার এক মাস ধরে ডাক্তারের ইনজেকসন খাও!

বিচ্ছু ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলে—স্বাধীনতার যে এত সাজা তা কে আগে জানতো!

এত দুঃখের মধ্যেও বাড়ির লোকেরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠল!

তবু ভালো, বিচ্ছুর শিক্ষা হয়েছে।

কয়েরের ছড়া

শ্রীআদিত্য গঙ্গোপাধ্যায়

আয়, আয়, আম্মা
থামা দেখি কান্না।
মা আসবে যখনি
দেবে কড়া বকুনি।
পাখনা মেলে পাখি
যায় যে তোরে ডাকি।
কাটুম্ কাটুম্ কুট্।
কাঠ বিড়ালীর ছুট্।
ফড়ুৎ ফড়ুৎ উড়ে
যায় রে পাখি দূরে।
আনবে ওরা কি?
সাতটা জোনাকী!
আম্মা থামা কান্না।
আর না রে, আর না।

গুপ্তধন

আমার বন্ধু জগাই কি অলস। পড়াশুনো সে রকম একটা ভাল আসে না বটে কিন্তু কি চমৎকার মাউথ অরগান বাজায়। আর টিফিনের সময় আমাকে কতদিন আলু-কাবলি খাওয়ায়। তাছাড়া দুটো কান নাচাতে পারে, জিভ দিয়ে নাকের ডগা ছুঁতে পারে। তবে পড়াশুনায়, সত্যি কথা বলতে কি, বেজায় খারাপ। সেদিন ইতিহাস ক্লাশে সাজাহানের বাবার নামও বলতে পারল না, আবার ছেলের নামও বলতে পারল না। অবিনাশবাবু ত চটে কাঁই, ক্লাশ সুদ্ধু ছেলের সামনে ওকে যা নয় তাই বললেন, আর ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনি জানি একটা কিছু হয়েছে।

বাড়ি যাবার পথে আমাকে বললে—"পড়াশুনো ছেড়ে দেব ভাবছি।" আমি বললাম—"তবে কি বড় হয়ে গোরু চরাবি?" জগাই কাষ্ঠ হেসে বললে "তোরও যেমন বুদ্ধি। শুনলি, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।" আমি একেবারে থ'। বলে কি! আমার ত' ধারণা ছিল, যেখানকার যত গুপ্তধন লোকরা সমস্ত এতদিনে খুঁজে বের করেছে।

জগাই বললে, "আমাদের ঐ বাড়িটা কি আজকের মনে করিস্ নাকি? কম সে কম ওর বয়স এক শ' বছর। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহি বিদ্রোহের আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আপিস থেকে বুদ্ধি করে টাকা সরিয়ে ওটাকে আগাগোড়া তৈরি করে ফেলেছিলেন।"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে জগাই বললে, কাল চিলকোঠার পুরনো বাক্স প্যাটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ও'র ডায়েরি খুঁজে পেয়েছি। তাতে যে-সব কথা লেখা আছে সে-সব শুনলে তোর চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে, দাঁত কপাটি লেগে যাবে। ওরই মধ্যে গুপ্তধনের কথাটাও আছে। সাধে কি আর কোথায় কোন্ কালে কে কার ছেলে ছিল কি বাবা ছিল তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। আমাকে ত' আর আপিসে চাকরি করতে হবে না।"

আরেকটু থেমে জগাই হঠাৎ বললে, "কিন্তু ভাই, তোকে একটু সাহায্য করতে হ'বে। আমাদের বাড়িটা জানিস্ই ত'। দিনের বেলায় যে বা গুপ্তধনটা খুঁজে বেরও করি, ঐসব জ্ঞাতিগুলোর জ্বালায় তাতে আমার আর হাত দিতে হ'বে না। অমনি আমাকে পড়ার ঘরে বসিয়ে দিয়ে নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে নেবে। ... রাতে কাজ হাসিল করতে হবে। আজ আর মাঠের পর আসিস একবার, শনিবার ত, আজ রাতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু ভাই সত্যি ত' আমার যা ভূতের ভয়, তোকে সঙ্গে থাকতে হবে।" কি করি বলো, আমার ... ফ্রেণ্ড। তাছাড়া গুপ্তধন পাওয়া গেলে আমাকেও একটু ভাগ দেবে বললে। গেলাম ... মাঠের পর। চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে ... ছাদে উঠে মোম বাতি জেলে ঠাকুরদার ... ডায়েরি পড়লাম।

কি কাণ্ড। হলদে তুলোট কাগজে, সবুজ কালি দিয়ে কি সব হিজিবিজি লেখা, না আছে তা'র বানানের মাথামুণ্ডু, না যায় তার অর্দ্ধেক বোঝা। কিন্তু গুপ্তধনের কথাটা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

পড়ে মনে হ'ল বুড়োর দুটি বাবাজীবন অর্থাৎ ঘরজামাই ছিলেন; দুটিই যেন সাক্ষাৎ রত্ন। সারাদিন খাই খাই আর মখমলের বিছানায় টেনে ঘুম। ওদের গিলে করা পিরান আর কিংখাবের জুতো আর অম্বুরী তামাক জুগিয়ে জুগিয়ে বুড়ো নাকাল। এদেরই হাত

গুপ্তধনের কথাটা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

থেকে "পরম রত্ন" অর্থাৎ কি না ঐ গুপ্তধন না লুকিয়ে বুড়োর নিস্তার ছিল না। যে-ই সুবিধে পাবে অমনি সেটি হাতাবে। অথচ বাড়িতে রোজ পণ্ডিত আসে, কিন্তু পড়াশুনো তাকে তোলা।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা লিখছেন, "চখ্খু হইতে নিদ্রা ঘুচিয়েছে। উহারা সৌখীনতায় ডুবিআ দিনে দিনে রসাতলে যাইতেছে। উহাদের চিত্তে বড় লোভ জাগিয়াছে। সর্বদা পরম রত্নের উপর দৃষ্টি, যেন উহাকে বাগাইতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়। উহা একবার হস্তগত করিলে নিঃসন্দেহ জুয়া খেলিয়া সর্বস্ব ফুঁকিয়া দিবে।"

তার পরের দুটো পাতায় দুধ না কি যেন পড়ে ধেবড়ে গেছে, কিছু পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু তারপরের পাতায় স্পষ্ট করে লেখা "অগত্যা নিরুপায় হইয়া পরম রত্ন গুম্ করিয়াছি। গৃহিণীরও ও-দিকে দুর্বলতা। মহা অশান্তি করিতেছেন। আমারো ভোলা মন, সেই কারণে গুপ্তস্থানের এই নক্সা রাখিতে বাধ্য হইলাম। সুখের বিষয় বাবাজীবনদিগকে মাধব পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সখ্খম হইয়াছি।" ব্যস্ ঐখানেই ডায়েরি শেষ। তারপরেই বোধ হয় আনন্দের চোটে বুড়ো ম'ল আর গুপ্তধনের কথাও কেউ জানতে পারল না। জগাই বললে "এ ডায়েরি বুড়ো চিলছাদের কার্ণিশের নীচে গুঁজে রেখেছিল, কাল আমি এটাকে খুঁজে বের করেছি, আজই পরম রত্ন খুঁজে বের করতে হ'বে। তারপরে পড়াশুনো ছেড়ে দেব। তাই আজ আর মিছিমিছি হোমটাস্কগুলো টুকি নি।"

নক্সাটা জলের মত ... । বাবাজীবনদের হাতে পড়লেই সর্বনাশ হয়েছিল। এক নিমেষে পরম-রত্ন খুঁজে বের করে জুয়ো খেলে ফুঁকে দিত। নক্সায় আঁকা ওদের পুকুর ধারে বুড়ো বটগাছ। তার বরাবর উত্তরে বারো হাত একটা রেখা, তার বরাবর পুবে আবার ... হাত। সেইখানে একটা ক্রশ্ আঁকা। অথ... কিনা ঐখানেই!

জগাই কোত্থেকে একটা শাবল, একটা মাপবার ফিতে আর একটা টর্চ এনে রেখেছিল। গেলাম পুকুরের পাড়ে। সূর্য ডুবলেই জগাইটা এমনি ভূতের ভয় যে, একটু একটু বিরক্ত লাগছিল। আরে তোরই ঠাকুরদার ঠাকুরদা গুপ্তধন লুকিয়েছে, তোর ভয় করলে চলবে কেন! তা নয়, দূরে শেয়ালের ডাক শুনে ভয় পাচ্ছে, বটগাছের ডাল থেকে শেকড় ঝুলছে দেখে ভয় কিচ্ কিচ্ করে উঠছে, আর টর্চের আলোতে বটগাছের ডালের ছায়া দেখে ত আরেকটু হ'লেই ভির্মি যাচ্ছিল।

যাই হোক, অনেক কষ্টে মাপজোক করে জায়গাটা পাওয়া গেল! তারপর আমি টর্চ ধরে ওকে বললাম "এবার খুঁড়ে দেখ্।" ও শাবল দিয়ে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে আটদশ কোপ দিয়েই বিরাট এক গর্ত্ত বানিয়ে ফেলল। তারপর ঠং করে একটা শব্দ হতেই আমার খুব ফূর্তি লাগল। কিন্তু জগাইটা দু হাতে মুখ ঢেকে বলল, "যদি ডালা খুলতেই ওর মধ্যে থেকে কিছু উঠে বসে!".

শেষটা ওকে ঠেলে সরিয়ে, ওর হাতে টর্চ দিয়ে, আমিই একটা এক হাত লম্বা, আধ হাত চওড়া তামার বাক্স টেনে বের করলাম। তার তালাটালা ভেঙে গেছে। ঢাকনিটা

টর্চের আলোতে দেখলাম...!

খুলে ফেললাম। ভাবলাম হীরে, মণি, মুক্তোর উপর আলো পড়ে নিশ্চয় চোখ ঝলসে যাবে।

টর্চের আলোতে দেখলাম বাক্সের নীচে এক প্যাকেট পুরনো হাতে আঁকা তাস পড়ে রয়েছে। তাদের পিঠের উপর বড় করে লেখা "পরমরত্ন।" তার নীচে ছোট্ট করে লেখা "প্লেইং-কার্ডস্"।

জগাই আস্তে আস্তে টর্চ নামিয়ে রেখে বললে, "সোমবারের হোম টাস্কগুলো লিখে দিতে ভুলিস্ না।"

বীর ভেলু থাম্পি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

১৮০০ খৃষ্টাব্দের কথা। ভারতের ছোট একটি দেশীয় রাজ্য—ত্রিবাঙ্কুরে তখন ভয়ানক অরাজকতা চলেছে। রাজ্যের শাসন-কর্তা মহারাজা শ্রীবলরাম বর্মার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রধান-মন্ত্রী জয়নাথন নাম্বুদিরি প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে চলেছেন। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন তারা বিদ্রোহ করল। প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার দাবীও জানাল। মহারাজা সে দাবী উপেক্ষা করতে পারলেন না। নাম্বুদিরির পরিবর্তে বিদ্রোহী নেতা চম্পক রমন পিল্লাই দেওয়ান হলেন আর ভেলু থাম্পি হলেন বাণিজ্য সচিব। পিল্লাইয়ের মৃত্যুর পর থাম্পিই দেওয়ান হলেন।

তখনকার দিনে ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছিলেন, ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভেলু থাম্পি তাঁদেরই একজন। সেই কাহিনীই বলছি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য ঐ সব রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের সঙ্গেও তাঁদের স্থায়ী বন্ধুত্বে ও সহযোগিতার চুক্তি সই করা হলো—১৮০৫ সালে। চুক্তির পরে কিছুদিন দুপক্ষই বেশ মানিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানীকে দেয় নজরানার টাকা বাকী পড়ায় এবং তা দিতে গাফিলতি করায় দেওয়ানের সঙ্গে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল কলিন মেকলের (বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেকলে সাহেবের আত্মীয়) সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হল। প্রজাকে না খাইয়ে কোম্পানীকে টাকা দেওয়া উচিত নয় বলেই দেওয়ান মনে করলেন। ফলে অনেক টাকা বাকী পড়ে গেল। দুই পক্ষে কিছুদিন ধরে মন-কষাকষি চলল। দম্ভী ইংরেজ রেসিডেণ্ট শেষে দেওয়ানকেই পদত্যাগ ক'রে কালিকটে গিয়ে বাস করবার জন্য আদেশ দিলেন। রেসিডেণ্টের এই বাড়াবাড়ি দুর্বলচরিত্র মহারাজাও সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দেওয়ানকে পদত্যাগ করতে না দিয়ে রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ করলেন। কিন্তু কোন প্রতিকার হলো না। রেগে গিয়ে মেকলে সাহেব দেওয়ানকে নানাভাবে বিব্রত করতে লাগলেন।

সাহেবের অত্যাচার চরমে এসে পৌঁছল। মেকলেকে তথা ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্য ভেলু থাম্পি ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ করে থাম্পি মেকলে সাহেবকে জানিয়ে দিলেন যে, ২৯শে ডিসেম্বর তিনি কালিকটে চলে যেতে রাজী আছেন। খবর শুনে মেকলে সাহেব খুব খুশী হল। কিন্তু সে খুশী ভাব বেশীক্ষণ রইল না। ২৮শে ডিসেম্বর রাত দুটোর সময় একদল ত্রিবাঙ্কুরী সৈন্য মেকলে সাহেবের কুঠিতে চড়াও হলো, কিন্তু তিনি গুপ্ত পথে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ জাহাজে আশ্রয় নিলেন।

রেসিডেণ্টের পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে থাম্পি অত্যন্ত হতাশ হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। প্রিয় জন্মভূমির নামে দেশের লোককে আহ্বান করলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। তাঁর ডাকে ছোট বড় সবাই সাড়া দিল। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মেতে উঠলো সবাই। সংগে সংগে লড়াই শুরু হল। কিন্তু শিক্ষিত সৈন্যের সংগে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? পর পর তিনটি যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হল, কিন্তু তবু থাম্পি নিরাশ হলেন না। সমস্ত শক্তি একত্র করে ইংরেজের বুকে আঘাত হানবার জন্য সমবেত হলেন পশ্চিম ঘাটের আরামবলী গিরিবর্ত্মে। কিন্তু জয়লক্ষ্মী বিমুখ—পরাজয় তাঁকে বরণ করতে হল। আর কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য সৈন্যদল পাঠানো হল এবং ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণাও করা হলো।

রাজধানীতে এসে তিনি মহারাজার সংগে দেখা করলেন এবং এই বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব ওর কাঁধে দিয়ে দেশকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। তারপর ভাই

ভেলু থাম্পি

পদ্মভান থাম্পিকে নিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু লুকিয়ে থাকা অসম্ভব।

সেদিন তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এক দেবী-মন্দিরে। ওরা কি করে খবর পেয়ে মন্দির ঘিরে ফেলেছে। পালাবার আর কোন পথ নেই। উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে আত্মহত্যাই ভালো মনে করলেন তিনি। তাই নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রাণ বেরোলো না তাতে। এমন বীর ভাইয়ের ঐ দুরবস্থা দেখে পদ্মভানের দু চোখ বেয়ে জল নামলো। তারপর ভায়ের অনুরোধে ভাইকে সেই যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য এক কোপে কেটে ফেললেন তাঁর গলাটা। মৃত্যু এসে টেনে নিল ভারতের একটি বীর সন্তানকে।

এক যে ছিল রাজপুত্তুর

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অনেক দিন আগে এক রাজার এক সুন্দর ছেলে হয়েছিল। একেই রাজ রাজড়াদের লোকে একটু অকারণে খোশামোদ করে—তার ওপর রাজপুত্র ছিলেন সত্যিই খু সুন্দর দেখতে। সুতরাং জ্ঞান হয়ে পর্য রাজপুত্র শুনতে লাগলেন যে, তাঁর মত সুন্দ মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। এ দেশে সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা এমন একটি সুন্দর মানু সৃষ্টি করেছেন।

শুনতে শুনতে—রাজপুত্রেরও তাই বিশ্বা হল। তার মনে একটু অহঙ্কারও এল সেজন্য আর—সুন্দর চেহারাকে আরও সুন্দর করা তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। কেবলই সাজ-গো করেন। ভাল ভাল পোশাকের দিকে ঝোঁক—রাজকার্য শেখার দিকে একেবারেই মন নেই তাছাড়া বাকী মানুষগুলোকে—আশ পাশে যার থাকত—তাদের বড়ই অবজ্ঞা করতেন। কুৎসি মানুষ দেখলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন

দেখে দেখে রাজার বড় মন খারাপ হয়ে গেল একটিই ছেলে তাঁর, একদিন ওকে সিংহাসনে বসতে হবে। সে যদি এখন থেকে রাজকাজে মন না দেয় তাহলে চলবে কি করে? তাছাড় মানুষ হয়ে মানুষকে অবজ্ঞা করা—এও অমার্জনীয় অপরাধ।

অবশেষে রাজা তাঁর গুরুদেবের শরণাপ হলেন। 'গুরুদেব, আপনিই একটা উপা করুন। নইলে সব যায়!'

গুরুদেব সব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখছি কি করতে পারি।'

একদিন রাজপুত্র মৃগয়া করতে গেছেন ফেরবার পথে দেখেন বনের মধ্যে ওঁর পথে ধারে রাজগুরু বসে বসে একমনে একটি মড়া মাথার খুলি দেখছেন। কবেকার খুলি—চামড়া মাংস সব উঠে গেছে, শুধু হাড়টা আছে। রাজপুত্র ত হেসেই আকুল, 'ও কি করছেন গুরুদেব? একটা নোংরা মড়া খুলির ভিতর অত কি দেখছেন?'

গুরুদেব বললেন, 'দেখ না বাবা, বড় সমস্যা পড়েছি। এই খুলিটা যার—সে কেমন দেখতে ছিল, সুন্দর না কুৎসিত, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। সুন্দর হলে যত্ন করে বাড়ি নিয়ে যা আর কুৎসিত লোকের হলে ফেলে রেখে যাব এই ইচ্ছা। তা তুমি ত বাবা নিজে একজ সুন্দর পুরুষ—দ্যাখো ত তুমি কিছু বুঝতে পারো কিনা!'

এতদিন পরে রাজপুত্রের জ্ঞানচক্ষু খুলল তিনি বুঝলেন যে, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এ রূপ। মরবার পরও যা থাকে তা হচ্ছে গুণ ভাল কাজ করলে সেই কথাটাই লোকের মু মুখে কীর্তিত হতে থাকে।

তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়ে বললেন, 'ক্ষ করবেন গুরুদেব, ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।'

আর কখনও তিনি রূপের অহঙ্কার প্রক করেন নি—এর পর থেকে বাপের নির্দেশ প্রজাপালনেই মন দিয়েছিলেন।

ঝগড়া

দু জনে খুব ঝগড়া লেগেছে। বকাবকি, ভেংচি কাটা, ভেঙ্গানো, খেয়ে কাঁদোকাটি শুরু। কারা ঝগড়া করছে?

কারা আবার! রবি আর লালটু। হ্যাঁ, ওরা ভাই আর বোন, মোটে দেড় বছরের ছোট বড়।

ব্যাপারটা ঘটলো লালটুর ইঞ্জিন আর রবির বাদশা-পুতুলটা নিয়ে। রবি বললে,—তোর ইঞ্জিনটা মোটেই ভালো নয়, আমার পুতুলটার জামা কাপড় দেখলেই ভালো লাগে—বেশী দেখতেও হয় না।

লালটু বললে,— ইস্, তোর পুতুল থির হয়ে থাকে, আর আমার ইঞ্জিন দম দিলেই চোঁ-চোঁ করে ছুটতে থাকে। জামা কাপড় ঝলমল করলেই তো হবে না, সেজেগুজে বসে থাকলেও চলবে না; কাজ দিতে হবে।

রবি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো,—আহা, ঝরঝড়ে ইঞ্জিন তাই নিয়ে কাজ দেবে—রং চটে গেছে। ছাই, পচা।

এবার তেড়ে এলো লালটু—দেখ রবি, এমন মারবো যে, আর ঝগড়া করতে পারবি না।

মারবি বৈকি, দেখনা মেরে। সত্যিকথা বলেছি কিনা বুঝতে পারছিস তাই রাগ দেখাচ্ছিস।

—দেবো পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলে—লালটু ধমকে উঠলো।

—হ্যাঁ দেবে বৈ কি! এইটি—দু হাতের বুড়ো আঙুল দুটো লালটুর মুখের কাছে ধরে রবি বলে উঠলো।

এবার পড়লো রবির পিঠে গুম করে একটা কীল।

—কি আমায় মারা হচ্ছে—রবি তার ধারালো নখ দিয়ে খিমচে দিল লালটুকে।

হাত ছাড়িয়ে লালটু বাদশা পুতুলটাকে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়লে। দূরে কাঁচের আলমারী ভরা বই ছিল তাতে গিয়ে লাগলো, কাঁচে ফাটল ধরলো আর আর্তনাদ করে বাদশা মাটিতে পড়লো, চিনে মাটির মাথাটা ফেটে গেল।

বাদশার ঐ অবস্থা দেখে রবি মরিয়া হয়ে ছুটলো। দু'হাতে ইঞ্জিনটাকে তুলে নিয়ে গায়ের সব শক্তি দিয়ে ছুঁড়লো। শব্দ করে ইঞ্জিন মাটিতে পরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এর পরের অধ্যায় হলো ঘুসোঘুসি, আর মায়ের আবির্ভাব এবং দু'জনের কান আর চুল ধরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দু' কোণে দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

দু'জনের সে কী অবস্থা। লালটুর হাত জ্বালা করছে, আর রবির পিঠ ব্যথা করছে। রবি ফোঁপাচ্ছে আর লালটু গজরাচ্ছে।

ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। মা দু-চারবার, এখান দিয়ে আনাগোনা করেছেন কিন্তু ফিরেও তাকাননি। মুখ দেখে মনে হয় যেন 'থাক এমনি হয়ে—যেমন দুষ্টুমী করো, বোঝ এইবার'।

এদিকে লালটু আর রবি দু'জনেরই রাগ পড়ে এসেছে। রবি ভাবছে—দাদার সঙ্গে ঝগড়া না করলেই হতো, বাদশা-পুতুলটা ভাঙলো যে তাই রাগ হলো। আড়চোখে একবার মাথাফাটা বাদশার দিকে চেয়ে রবি ভাবলো—মাথাটা জুড়ে নেওয়া যেতো, কেন রেগে গেলুম, ওর ইঞ্জিনটাও ভেঙ্গে গেল—কেন যে রাগ হলো ছাই!

লালটুও ভাবছে—রবির আদরের পুতুলটা না ভাঙলেই হতো। বেচারীর সখের জিনিস, বন্ধু-বান্ধবকেও হাত দিতে দেয় না, আর সেটাকেই ওভাবে ছুঁড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। বড্ড রাগ হয়ে গেল তখন, যাকগে আমার স্কুলের বাক্সে টিফিনের যে জমা পয়সা আছে তা দিয়ে ওকে আজই একটা পুতুল এনে দেবো। কত পয়সা আছে তা ঠিক হিসেব নেই, যদি কম হয় কালু যখন ও-বাড়ি থেকে খেলতে আসবে ওর কাছে চাইবো। আবার পয়সা জমলে ওকে দিয়ে দেবো।

রবি হাই তুললো—নাঃ, যাহোক করে দাদার একটা ইঞ্জিন কিনতে হবেই। কিন্তু পয়সা কোথায় পাই? বেচারীর সখের ইঞ্জিন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কেউ যেন

দুজনের কান আর চুল ধরে......

হাত না দেয় একথা স্কুলে যাবার সময় রবিকেই সে বলে যায় আর রবিই সেটার এমন দশা করলো। হঠাৎ রবির মনে পড়লো; দু' মাস আগে তার জন্মদিনে হঠাৎ সতী মাসীমা এসে পড়েছিলেন, তিনি জানতেন না যে রবির জন্মদিন, তাই কিছু আনেননি। তাঁর সুন্দর ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট রবিকে দিয়ে বলেছিলেন,—'তুমি এটা দিয়ে পুতুল কিনো'। রবি তো সেটা মার কাছে রেখেছে আরো টাকা জমলে সে রচনার মত মস্ত একটা পুতুল কিনবে তাই। ইস্ রচনার পুতুলটা ঠিক মানুষের মত, পাশের বাড়ির রত্না আর পুতুলটা একই যেন। রত্না কথা কয় ও কথা বলে না—এই যা তফাৎ। কিন্তু যাকগে পুতুলে ওর দরকার নেই, তার চেয়ে ঐ টাকায় দাদার একটা ইঞ্জিন আসুক। আজই বিকেলে সে মাকে বলবে আর দাদাকে সঙ্গে করেই কিনতে যাবে।

লালটু ভাবছে—মা যখনই বললেন, যাও স্নান করগে, আমি আগে কালুর কাছে চলে যাবো। পয়সা নিয়ে পুতুল এনে রবিকে দিয়ে তবে চান করতে যাবো। ঐ তো ট্রাম রাস্তার ওপরেই দোকান, কতটুকু সময়ই বা লাগবে।

মা একবার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। দু ভাই বোন পিটপিট করে মায়ের দিকে তাকালো। যেন বলতে চায়, 'আমরা আর ঝগড়া করবো না'।

লালটু আর রবি দু'জনেই ভাবছে—একবার ছাড়পত্র পেলেই হয়।

লালটু যখন ভাবছে—রবির পুতুলটা কি রকম হবে—বাদশা-পুতুলের চেয়ে আরো ভাল পোশাক থাকবে, আর রবি তখন ভাবছে, দাদার নতুন ইঞ্জিন তো আনবেই, একটা লাইনও সে নিশ্চয় আনবে; দাদা অবাক হয়ে যাবে।

চাকর হরি এসে বললে,—যাও দাদাবাবু, দিদিমণি, শীগ্‌গীর চান কর গে, মা বলছেন, জানো তো মা রেগে আছেন?

ছাড়া পেয়েই দু'জনে ঘুরে দাঁড়ালো, ভাবছে কি করবে। লালটু ভাবছে দোকানে যাবে কিনা আর রবি ভাবছে পাঁচটা টাকা আগে চাইবে কি না। কিন্তু মার থমথমে মুখের চেহারার কথা ভেবে কেউ এগোতে সাহস করলো না।

স্নান করে যখন দু'জনে খেতে বসেছে কারুর মুখে কথা নেই। মা দুধের বাটি দুটো নামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন,—ভাত খেয়ে যে যার শোবার জায়গায় চলে যাবে, একটা ছুটির দিন, সকাল থেকে মারামারি হচ্ছে। সারাদিন ঘুমোবে, বিকেলে সব দেখা যাবে।

মায়ের গলার আওয়াজ শুনে কারুর আর বাইরে যেতে বা কিছু বলতে সাহস হলো না। খাওয়া শেষে যে যার শোবার জায়গায় চলে গেল।

হরি ডাকছে—ওঠো না গো দাদাবাবু, দিদিমণি, মা যে ডাকছেন, সবাই খাবার খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, বিকেল যে শেষ হয়ে গেল, খাবে কখন—খেলতে যাবে কখন?

চোখ রগড়ে দু'জন উঠে মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গেল। বাবা মা আর সবচেয়ে ছোট্ট ভাই টুটুল টেবিলে বসে আছে। চা খেতে খেতে বাবা মা গল্প করছেন। ওদের দু'জনের খাবার আর দুধ দেওয়া হয়েছে, আর টেবিলের মাঝখানে মস্ত বড় একটা ঝকঝকে ইঞ্জিন লাইনের উপর বসান—বুকের কাছে একটা বড় হেড্‌লাইট। সুইচ টিপলে জ্বলবে। আর রচনার যে রকম পুতুলের জন্য রবি সতী মাসীমার দেওয়া টাকা রেখে দিয়েছিল ঠিক সেই রকম মস্ত বড় ঝলমলে পোশাক পরা একটা পুতুল ইঞ্জিনের পাশে শুয়ে আছে। তার পোশাক আর গয়না দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

বাবা বললেন,—এ দুটো তোমাদের দু'জনের জন্য এসেছে, নিয়ে যাও।

মা বললেন,—তার আগে খাবার খেয়ে নাও।

লালটু আর রবি দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামালো।

সেদিন বিকেলে ছাতের উপর লালটুর মস্ত ঝকঝকে ইঞ্জিনের উপর রবির নতুন বড় পুতুল উঠে বসলো। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর ইঞ্জিন শব্দ করে চলতে লাগলো।

কত দেশ ঘুরবে কে জানে॥

জাদুর খেলা

জাদুকর এ. সি. সরকার

একটা সুতোকে কেটে আবার তা জুড়ে দেবার খেলাটা সত্যিই খুব বিস্ময়কর। সব রকম পরিবেশেই দেখানো যায় এই খেলাটাকে, তবে খাওয়ার টেবিলে 'টেবিল ট্রিক' হিসাবে এর জুড়ি মেলা ভার।

'স্ট্র' চেনো কি? সরবৎ খাবার সুবিধের জন্যে যে নল বা সরু সরু টিউব ব্যবহার করা

হয় এগুলোকেই বলে 'স্ট্র'। এ খেলাটার জন্যে দরকার হবে ঐ স্ট্র একখানা। জাদুকর এক-গাছা সরু গুলীসুতো গলিয়ে দেন ঐ স্ট্র ক'টোর ভেতর দিয়ে। স্ট্রর দুই প্রান্ত দিয়েই কিছুটা করে বাড়তি সুতো বেরিয়ে থাকে। এর পরে যাদুকর ঐ স্ট্রটার মাঝখানটা ভেঙে দেন ঠিক ইংরাজী 'V' অক্ষরের আকারে আর একটা কাঁচি দিয়ে স্ট্রটাকে কেটে দুখানা করেন ঠিক কোণের কাছটাতে। স্বভাবতঃই সুতোটাও কেটে দুখানা হয়ে যায় এর ফলে। কিন্তু জাদুকর তার মন্ত্র (?) পড়ে যেই মাত্র সুতোটাকে টেনে বের করেন দেখা যায় ঐ সুতো রয়েছে অক্ষত—কাটা তো দূরের কথা কোন আঘাতই লাগেনি তাতে। এ কি অবাক কাণ্ড নয়?

শোনো এবার খেলাটার মূল কৌশল। এই খেলাটায় যা কিছু কারসাজি তা হচ্ছে ঐ স্ট্রটার মধ্যে। একটা ধারালো ব্লেড দিয়ে স্ট্রটার ঠিক মাঝখানে একপাশে লম্বা লম্বি ভাবে চিরে রাখতে হয় ২ ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি অংশ। পরে স্ট্রটা ভেঙে 'V'র মতন করার সময়ে হতে হয় খুব সাবধান। কারণ এই চেরা অংশটা তখন থাকা চাই কোণের দিকে। এর পরে ভাঁজ করা স্ট্রটাকে বাঁ হাতে এমন ভাবে ধরতে হবে যেন কোণের ভেতরের অংশ হাতের আঙুলে ঢাকা থাকে বেশির ভাগটাই। জাদুকর কৌশলে এইবার সুতোর দুটো মাথা ধরে জোরে টান দিলেই স্ট্রর চেরা অংশ দিয়ে হাতের আড়ালে বেরিয়ে আসবে সুতোর মাঝখানটা—একটা আঙুলের আড়ালেও এখন রাখা যাবে এই সুতোর মাঝখানটাকে ঢেকে। ভাঁজ করা স্ট্রর কোণের মাঝখানে এখন যদি কাঁচি বসিয়ে দিয়ে দুখানা করে দেওয়া যায়, তবে সুতোটা থাকে অক্ষত।

কারণ চেরা অংশ দিয়ে তখন তা নেমে আছে কাঁচির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কাটা হয়ে যাবার পরে টেনে বের করে নিলে তাই সুতোটাকে পাওয়া যায় অক্ষত অবস্থায়। ভালভাবে অভ্যাস করে দেখাতে পারলে এ খেলা দিয়ে বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করা যেতে পারে দর্শকমহলে।

ঘুম পাড়ানো গান

জগদানন্দ বাজপেয়ী

ঘুম আয় ঘুম আয়
আধো আলো আবছায়
আয় নেমে মধু পায়
আঁখিতে,
নীরব নিঝুম রাতে
স্বপন তুলিকা হাতে
রাঙা ছবি আঁখি পাতে
আঁকিতে।
কোথায় ঘুমের পরী,
ধুপছায়া শাড়ি পরি
এসো ছায়াপথ ধরি
নামিয়া,
হোথা মণি মরকতে
খচিত চাঁদীর রথে
চাঁদ আছে নভপথে
থামিয়া।
থেমে গেছে কোলাহল,
জোছনা জোয়ার জল
তাও বুঝি কলকল
বহে না,
নীরব হয়েছে হোথা
পাপিয়ার মুখরতা,
বায়ু কানে কানে কথা
কহে না।
কাননে কুসুম কলি
ঘুমেতে পড়েছে ঢলি
গুন্ গুন্ গান অলি
ভুলেছে,
ঘুম পাড়ানীয়া বেশে
নীল যবনিকা এসে
নিখিল শিয়র দেশে
দুলেছে।
সবাই ঘুমায় ওই
মোর চোখে ঘুম কই!
আমি শুধু চেয়ে রই
জাগি গো,
ঘুম আয় আয় ঘুম
নিঃসীম নিঝঝুম,
ঘুম পাড়ানীয়া চুম
মাগি গো।

কি না হয় চেষ্টায়

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ির দাওয়ায় বসে দুই গুলিখোর
একজন গুরু আর একজন শিষ্য।
গুরু বলে, "বড় রোদ, এই সবে ভোর।"
চেলা বলে—"হবেই তো কালটা যে গ্রীষ্ম।"

গুরু বলে, "ওরে তুই কত বড়ো চেলা
মতলব কর দেখি বেশ ভেবে চিন্তে।
বাড়িটার চাঁদি ফাটে রোদে সারা বেলা
মাথাটা বাঁচাবি তার কিসে সারা দিনটে!"

পিট্ পিট্ ক'রে চোখ চেলা বলে,—"ছাতা
যত বড়ো মাথা হোক খুল্লেই রক্ষে।
তোমার এ বাড়িটার ছাতটাই মাথা
বড়ো ছাতা হ'লেই তো হবে তার পক্ষে!"

চোখ বুজে গুরু বলে—"বোকা তুই বড়ো
কেষ্টারে বরাবরই র'য়ে গেলি মুখ্যু।
দেহটাই দিনে দিনে হ'লো বড়ো-সড়ো
কপালে র'য়েছে তোর চিরদিন দুঃখু।

"কত বড়ো ছাতা চাই বাড়ি ঢাকা দিতে,
ভেবেছিস কত টাকা হবে তার মূল্য?
ছায়াতে বাড়িটা যদি পারি ঠেলে নিতে
সস্তায় কিস্তি কি আছে তার তুল্য!"

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে থেকে সারা বেলা
সন্ধ্যায় গুরু বলে—"দেখলি রে কেষ্টা?
রোদ থেকে সরিয়েছি পিঠে মেরে ঠেলা,
কি না পারে লোকে বল, করে যদি চেষ্টা!"

[illegible] মায়ের [illegible]

[illegible]

[illegible] নতুন [illegible]
[illegible] বছরের [illegible] নিয়েঃ
[illegible] আমি, [illegible] তুমি কেন
[illegible] দাও না [illegible] আর কেন
[illegible] হয় না [illegible] মাঝে মাঝে?
পুতুলই নেই—[illegible] তাই খেলতে পারে
না যে—
[illegible] বাবা মায়ের পুতুল আনবে বলো তুমি',
তাই না শুনে বলেন বাবা তখন তারে চুমিঃ
'একটি পুতুল আছেই তো তাঁর—কী হবে আর
দিয়ে?
সারা দিন তো কতো খেলাই খেলেন তাকে
নিয়ে'।
'কক্ষণো না—মিথ্যে কথা—সারাটা দিন মা যে
ব্যস্ত থাকে এটা সেটা নানান রকম কাজে,
কখন তুমি খেলতে দেখো? পুতুলই নেই তার—
থাকলে পরে আমিই বুঝি দেখতুম না আর!'
তাই না শুনে হাসেন বাবা—বলেন,
'আছে-আছে'।
'তবু বলছো—আচ্ছা আমি যাচ্ছি মায়ের কাছেঃ'
ছোট্ট তুতু কৌতুহলের মস্ত বোঝা ঘাড়ে
মায়ের কাছে দৌড়ে গেল সটান একেবারে।
সব শুনে মা বলেন হেসে, 'বাপীর কথা ঠিকই,
কিন্তু সেটা বুঝাই তোকে কেমনে বলদিকি!
নিত্যি আমি পুতুল খেলি কাজের ফাঁকে ফাঁকে,
নাওয়াই, খাওয়াই, সাজাই, পরাই, গল্প বলি
তাকে।
এই যে আমি মা হয়েছি—অমনি সে কি ওরে?
পুতুল খেলাই খেলবো বলে সারা জীবন ভরে।
মা হলে আর কাজ কী থাকে—পুতুল খেলা
ছাড়া?
এই কথাটি জানেন ব'লেই মা হয়েছেন মা-রা',
এই বলে মা হাসতে থাকেন। তুতুল বলে ওঠে,
'কক্ষণো না—তোমার কোন পুতুলই নেই
মোটে!'

তখন তুতুর চিবুক ধরে মা হেসে কন, 'নেই?
একেবারে জ্যান্ত পুতুল—এই তো-সে তো এই—
তুতুল আমার পুতুল ছাড়া কী?'
মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে পাঁচ বছরের তুতুল
বলে, 'ছিঃ'!

আমার বয়স তখন এই বছর কি সাত, আর বঙ্কাদার নয় কি দশ। কিন্তু নয় হলে কি হবে, সেই বয়সে বঙ্কাদার মাথায় ছিল নব্বই বছরের বুড়োর বুদ্ধি। বঙ্কাদার মাথা থেকে এক-একটা পরিকল্পনা বেরুতো, আর তার আড়ম্বরে এবং চমৎকারত্বে আমরা অবাক ব'নে যেতুম।

সেবার শ্রাবণ মাসে জটে-খুড়োর সাধের প্যায়রা গাছে কাশীর প্যায়রায় যখন পাক ধরলো, তখন একদিন দুপুরবেলা বঙ্কাদা থামকা এসে পাণ্ডাতচালে বলে চল্‌লো, "দ্যাখ্ গণ্টে, অনেক ভেবে দেখলুম যে, মানুষকে যদি কোন রকমে গেছো-ব্যাঙ করে দেওয়া যায়, তবে বেশ হয়, না রে?"

আমি একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এবং মতলবও দিলাম যে, বাড়ির সবচেয়ে ছোট খোকাটাকে এখন থেকে চেষ্টা করলে ঠিক ব্যাঙ বানানো যেতে পারে। কোন রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে বঙ্কাদা শুধু বললে, "চলে আয় সিধে। দেখাবখ'ন কি করি!"

আমি সুবোধ বালকের মতন সেই স্তব্ধ দুপুরে বঙ্কাদার পিছু পিছু গোয়াল ঘরে গিয়ে উঠলুম। পালা দেওয়া খড়ের গাদা, ঘুঁটের ঝুড়ি আর ভিজে শ্যাওলা থেকে গোয়াল ঘরে কি রকম একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছিল। গরুটা ঘরের একপাশে শুয়ে শুয়ে বুড়ো-মানুষদের মতন যেন পান চিবুচ্ছিল। আমাদের দেখেও না-দেখার মতনই পড়ে রইলো সে। বঙ্কাদা আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে ইসারা করলে। আমি গোয়ালের ঘোলাটে আঁধার কোণে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম, আর বঙ্কাদা খড়ের গাদার মধ্যে ডুবে গেলো।

মিনিট-খানেক সব চুপচাপ। খালি বুঝতে পারছিলাম যে, সেই রাশিকৃত খড়ের তলায় একটা ভয়ংকর লড়াই চলছে। যাহোক, একটু বাদেই বঙ্কাদার মাথাটা খড়ের গাদার ওপর ভেসে উঠলো। তারপর বাঘের বাচ্চার মতন সারা গায়ে-মাথায় খড়কুটো নিয়ে বঙ্কাদা খড়ের পাঁজা ভেঙেই পথ করে বেরিয়ে এলো। আমি দেখলাম বঙ্কাদার হাতে ধুলোপড়া একটা পুরনো গোলগোছের বালতি ঝুলছে।

খড়-সমুদ্রে ডুব দিয়ে বঙ্কাদা কি অমূল্য মাণিক সংগ্রহ করে আনলে, তা দেখবার জন্য আমি বালতিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। নাকের মধ্যে ভক্ করে একটা তেলচিটে গন্ধ এসে লাগলো। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম যে, বালতির মধ্যে প্রায় পৌণে এক বালতি সবুজ রঙ। তার ওপর একটা ঘন সর পড়ে আছে, আর তার থেকেই ঐ-রকম বিশ্রী তেলের গন্ধ উঠছে।

আমি বঙ্কাদার দিকে চোখ তুলে চাইলাম। দেখলাম যে, বঙ্কাদার চোখেমুখে একটা বেশ বেরালে হাসি ভাসছে।

বঙ্কাদার হাতটা পিছনে থাকার জন্য তার হাতে যে রাজমিস্ত্রীদের মতন চুনকাম করার একটা বুরুশ ঝুলছিল, এতক্ষণ তা লক্ষ্য করি নি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, "জামা খোল্" বলেই বঙ্কাদা বোঁক করে সেই বুরুশটা বালতির মধ্যে ডুবিয়ে এক প্যাঁক ঘুরিয়ে দিলে; আর সঙ্গে সঙ্গে রঙের সরটা সরে গিয়ে একটা তেল চপ্‌চুপে সবুজে রঙ বালতির মধ্যে ছলাৎ করে ডেকে উঠলো।

একটি [illegible] ব্যাঙের বৃত্তান্ত [illegible]

নিতান্ত অপরাধীর মতন মুখোয় ঢোক গি[illegible] জিগ্‌গেস করলাম, "এ্যাঁ?"

বঙ্কাদা ধমকে উঠলো, "এ্যাঁ এ্যাঁ কর[illegible] কি! সাট-সাট জামা খুলে ফ্যাল্।"

বঙ্কাদার সেই আদেশ শুনে আমার ভ[illegible] মনে হতে লাগলো যে, বঙ্কাদার বিরুদ্ধে প্র[illegible] বিদ্রোহ ঘোষণা করা দরকার। কিন্তু গ[illegible] স্বর-যন্ত্রটা মনে হলো পক্ষাঘাতে একেবারে অ[illegible] হয়ে গেছে। শুধু গলার ধুকধুকিটা বার ক[illegible] ওঠা নামা করাতে বুঝলাম যে, 'না, ঠিক আ[illegible]

বঙ্কাদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা অনুমান করতে পেরে, অভয় দিয়ে বোঝা[illegible] শুরু করলে, "আরে তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন তো? তুই কি আর এখন মানুষ থাক[illegible] তোকে এখুনি এমন গেছো-ব্যাঙ বানিয়ে দে[illegible] যে, মানুষ তো মানুষ—জন্তু-জানোয়ারেরা পর্য[illegible] তোকে দেখতে পাবে না। জানিস না—গে[illegible] ব্যাঙ, গঙ্গা-ফড়িং এদের গায়ের রঙই তো এ[illegible] আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। ভগবান সবুজ পা[illegible] আড়ালে এদের সবাইকে লুকিয়ে রাখেন। [illegible] ওদের দেখতে পায় না। নে তুই রেডি হয়ে [illegible]

শেষ পর্যন্ত নিতান্ত আত্মরক্ষার্থেই আ[illegible] পরিচ্ছদ পাল্টাবার জন্য তৈরী হতে হ[illegible] বঙ্কাদা আমায় নব-কলেবর দান করবার [illegible] পাকা রাজমিস্ত্রীর মতন ঘন ঘন পোঁ[illegible] ডুবিয়ে রঙ পরীক্ষা করতে লাগলো। তা[illegible] আমার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ [illegible] থেকে, রঙ সুদ্ধু পোঁচড়াটা ধড়াস্ করে [illegible] থেকে বুক পর্যন্ত টেনে দিলে। বুকটা আ[illegible] ভীরু পায়রার মতন ধুক্‌ধুক্ করে উঠ[illegible] শিল্পী বঙ্কাদা ওসব গ্রাহ্যই করলে না। [illegible] টানে বঙ্কাদা তার জ্যান্ত ক্যান্‌ভাসে রঙ চড়[illegible] লাগলো।

বঙ্কাদার পাকা হাতের পোঁচড়ার টানে আ[illegible] সর্বাঙ্গ যতই সবুজে হয়ে উঠতে লাগ[illegible]

"গেলি তুই কোথায় রে?"

বঙ্কাদা ততই বলতে লাগলো যে, প্রতি মুহূর্তে আমি একটি আস্ত গেছো-ব্যা[illegible] রূপান্তরিত হয়ে চলেছি, তবে আমি খালি সে[illegible] বুঝতে পারছি না।

বঙ্কাদার মতন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতো আমার ছি[illegible] না, তাই ব্যাপারটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল[illegible] না যে, সত্যিই আমি মানুষ আছি কি গেছো ব্যাঙ বনে গেছি? তবে আরশোলার ঠ্যাং[illegible]

মতন পোঁচড়ায় [illegible] খাওয়া খড়ের [illegible] গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো, [illegible] মতনই আমার দেহটা কেমন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগলো। পেটের ওপর পোঁচড়া বোলাতেই আমি বলে উঠলুম, "বঙ্কাদা, ভুঁড়িটা কুট কুট্ কুট্ করছে। রঙে কি লাল পিঁপড়ে আছে?"

বঙ্কাদা বললে, "কথা বলিস না। ব্যাঙেদের ভুঁড়ি থাকে না। তাছাড়া পিঁপড়েতে ব্যাঙ খায় না, ব্যাঙই পিঁপড়ে খায়।"

আমি চুপ করে গেলাম। বঙ্কাদা হুকুম করলে, "হাত তোল।"

আমি নদের নিমায়ের মতন 'হরি বলে বাহু তুলে' দাঁড়িয়ে পড়লাম। বঙ্কাদা আমার বাহু-মূলে, বগলে পোঁচড়া চালাতে লাগলো। আর আমি পাক দেওয়া স্ক্রুর মতন "উম্-ম্-ম্!" করতে করতে বেঁকে যেতে লাগলাম।

আঙুলের ফাঁকে, কানের কোণে, পায়ের পাতায় রঙ লাগিয়ে বঙ্কাদা বলে উঠলো "চোখ বোজ!"

আমি মৃদু আপত্তি জানালাম। বঙ্কাদা গর্জে উঠলো, "সব ভণ্ডুল করে দিবি তুই; ব্যাঙের কি সাদা চোখ থাকে? চোখ টিপে, মুখ বুজে দাঁড়া।"

শুধু চোখ-মুখ কেন, বঙ্কাদার হুকুমে আমি নাক-কান সুদ্ধু—সব ফুটোগুলো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বঙ্কাদা পোঁচড়াটা ছপাৎ করে আমার নাক আর মুখের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে দিয়ে হাত ঘুরুতে লাগলো। রঙের গন্ধে আমার বন্ধ করা দম, এবার একেবারে বন্ধ হবার যোগাড় হলো। আমি "উফ্-ফ-ফ ফু!" করেই মুখ খুলে ফেললাম।

বঙ্কাদা "হাঁ-হাঁ বন্ধ কর, বন্ধ কর!" বলে গালে পোঁচড়ার আর এক পোঁচ মেরে এমন চেঁচিয়ে উঠলো যে, আমার মনে হলো যেন বেচারায় সর্বনাশ হয়ে গেলো। আমি ভয়েমরে আবার চোখ-মুখ দুইই বুজে ফেললাম। বঙ্কাদা পোঁচড়টা বাকী রঙে ডুবিয়ে আমার সমস্ত শরীরটায় রঙ বুলিয়ে একটু থামলো। আমিও সেই অবসরে চোখদুটো একটু খুলে, ব্যাঙের মতনই পিট্-পিটিয়ে বঙ্কাদার দিকে তাকালাম দেখি কি যে, বঙ্কাদা আমার সার্টটায় হাত মুছতে মুছতে তার সৃষ্টির দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

সার্টের কথা তোলার আগেই, বঙ্কাদা গদগদ স্বরে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "মণ্টে, তুই কোথায় রে?"

আমি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলাম, "কেন, তোমার ঠিক চোখের সামনে!"

বঙ্কাদা তখন নিজের সৃষ্টিতে নিজেই মোহিত। বলে উঠলো, "তোকে দেখতে পাচ্ছি না রে মণ্টে, তুই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিস?"

আমার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। মাথার ওপর একটা হাত তুলে জানান দিলাম, "বঙ্কাদা, এইতো আমি ঠিক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না?"

"না রে!" বঙ্কাদা বলে উঠলো, "তোর কথা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তোকে দেখতে পাচ্ছি না। তুই একদম ব্যাঙ বনে গেছিস রে! রাঙগী গাইটাও তোকে দেখতে পাচ্ছে না।"

বঙ্কাদার কথাটা পরীক্ষা করার জন্য রাঙগীর [illegible] কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। [illegible] [illegible] করে [illegible] তার [illegible] সুস্পষ্ট নাড়ালুমও। কিন্তু আমাকে দেখে ভ্রূক্ষেপও করলো না সে। আগের মতন পরম আনন্দে জাবর কাটতে লাগলো। আমার মনে হলো, সত্যিই তাহলে আমি ব্যাঙ বনে গেছি। নব কলেবর পাওয়ার আনন্দে বলে উঠলুম, "হ্যাঁ বঙ্কাদা, ঠিক! আমি ব্যাঙ বনে গেছি। রাঙগীটাও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।"

বঙ্কাদা সঙ্গে সঙ্গে বললে, "তবে জটে খুড়োর পাঁচিলের সেই কাশীর প্যায়রা খাবি তো চল।"

বঙ্কাদার আহ্বানে আমি মহানন্দে এগিয়ে চললাম। গোয়াল ঘরের পেছনে ছোট মাঠটা পেরিয়ে একটা ঘাস ঝোপের ওপারে জটে-খুড়োর নিষিদ্ধ পেয়ারা গাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বঙ্কাদা। চাপাগলায় বাতলাতে লাগলো, "বেড়ার ওপর পা দিয়ে সোজা উঠে যাবি গাছে। তারপর গোটা দশেক প্যায়রা ইদিকে! যাঃ! কেউ তোকে দেখতে পাবে না।"

অসীম উৎসাহে আমি ঘাসবনে ঢুকে

"ওরে বাবারে পুড়ে মলুম রে"

পড়লাম। হাত পাঁচেক দূরে কয়েকটা শালিখ চরে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখে তারা মোটেই ভয় পেল না বা কিচকিচ্ করে ডেকে উঠলো না। ফড়ফড়িয়ে উড়েও গেল না। আমি যে আর দৃশ্যমান প্রাণী নই, সে সম্বন্ধে একরকম পরম নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। লাফাতে লাফাতে খুড়োর সেই নিষিদ্ধ এবং লোভনীয় কাশীর প্যায়রা গাছে উঠে বসলুম।

বেশী উঁচুতে উঠতে হলো না। হাতের কাছেই গোটা তিনেক বেশ ঘিয়ে রঙের পেয়ারা পেয়ে পটাপট্ ছিঁড়ে ফেললাম এবং একটাতে কামড় বসিয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

গাছের ওপর থেকে জটেখুড়োর বাড়ির অন্দরটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। দেখলুম আশেপাশে জটেখুড়োর পাহারাদার গোজরা কেউ কোথাও নেই। শুধু নসেরাম ঘরের দাওয়ায় বসে খবর-কাগজের ঘুড়ি তৈরি করছে আর মাঝে মাঝে গাছের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলছে। রসাল পেয়ারার রসে মশগুল হয়ে আমার মনে হলো যে, নসেকে কিরকম ফাঁকি দিয়েছি তা জানাবার জন্য আমার একটা কিছু করা উচিত। আমি নাকের সঙ্গে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা [illegible] দিয়ে, [illegible] আঙুল নেড়ে [illegible] লাগলাম। হাত ফস্কে একটা পেয়ারা [illegible] পড়ে ঠক্ করে উঠলো। [illegible] চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "বাবা, [illegible] গাছে একটা বাঁদর এসেছে!"

"ক্যা রে—ক্যা রে!" করে জটেখুড়ো [illegible] হাতে নসের পিছু পিছু গাছের গোড়ায় [illegible] করে এলো। আমি আরও দুটো পেয়ারা ছিঁড়ে চুপ করে পাতার আড়ালে বসে নসের নির্বুদ্ধিতা উপভোগ করতে লাগলাম এবং নিজের মনেই বলতে লাগলাম, "হা রে মূঢ়, এখনও ব্যাঙ আর বাঁদরের তফাৎ চিনলি না!"

জটেখুড়ো গাছের কাছে এসে ওপর দিকে তাকিয়েই হুঁকোয় ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ টান দিয়ে বলে উঠলো, "এ্যাই মণ্টে, ওখান বসে তুই কি করছিস র‍্যা?"

জটেখুড়োর গলা শুনেই আমার মশগুলি ভাবটা মিইয়ে গেলো। বুকের ভিতরটাও টিপ্ টিপ্ করে উঠলো। ভাবলাম, "জটেখুড়ো কি ভগবান, যে, আমার ব্যাঙজন্ম দেখেও আমাকে ঠিক চিনে ফেললে! বঙ্কাদার সৃষ্টি কি তবে মিথ্যে?"

নসেও তার বাবার দেখাদেখি বলে উঠলো, "দ্যাখো বাবা, আবার রঙ মেখে মুখপোড়া-বাঁদর সেজে আমাদের প্যায়রা চুরি করতে এসেছে!"

আমি বঙ্কাদার ওপর বিশ্বাস রেখে বলে উঠলাম, "আমাকে দেখতে পাচ্ছিস নসে? আমি তো গেছো-ব্যাঙ হয়ে গেছি!"

জটেখুড়ো একটা লগা দিয়ে আমাকে এক খোঁচা মেরে বললে, "নেমে আয় শিগ্গির! গেছোমি তোর বের করছি হারামজাদা!"

নসে পরম উৎসাহে তার বাবার হাতের লগাটা নিয়ে আমার গলায় বসিয়ে টানতে টানতে বলতে লাগলো, "নেমে আয় মুখপোড়া হনুমান—নেমে আয়। তোর মুখে আজ চুনকালি মাখিয়ে বাড়ি দিয়ে আসবো।"

এবার আমার স্পষ্টই বোধ হলো যে, গেছো-ব্যাঙ সেজে গাছের ওপর বসে থাকা বৃথা। বঙ্কাদা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমার মনুষ্যদেহ ঘোচাতে পারে নি।

আঁকশীর টানে হিড় হিড় করে আমি গাছ থেকে নামতে লাগলাম। নসের নির্মম ব্যবহারে আমি অতি সহজেই সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম। একটা প্রচণ্ড রাগে আমার সর্ব-শরীর জ্বলে উঠলো। আমি হাতের অবশিষ্ট পেয়ারা ক'টা নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলাম। দুটো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো। তৃতীয়টা ঠাঁই করে গিয়ে জটেখুড়োর কল্কে উল্টে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আগুন সমেত সেই জ্বলন্ত কল্কে খটাং করে গিয়ে নসের মাথায় মুখে কেতরে পড়ে লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিলো। নসের মাথার বড় বড় চুলের মধ্যে টিকের আগুন ঢুকে যতই ছ্যাঁকা দিতে লাগলো, নসে ততই "ওরে বাবারে, পুড়ে মলুম রে!" বলে মাটিতে বসে দু'হাতে চুল ছেঁড়া শুরু করে দিলে। আর নসের বাবা, জটেখুড়ো "কি হলো রে, বাপধন নসে রে!" বলেই উবুড় হয়ে নসের পোড়া চুলে হুঁকোর জল ঢালতে লাগলেন। আমিও সেই অবসরে গাছ থেকে ঘাসবনে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

ছুটির আহ্বান

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এক্টু বেলাতেই দুলুর ঘুম ভাঙলো। শরতের সোনালি রোদ জানালা দিয়ে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের সোনা-ছড়ানো রোদ্দুরের দিকে চেয়ে খুশিতে ভরে উঠলো দুলুর মন। এসে গেছে—পুজোর ছুটি এসে গেছে! আর কটা দিন মাত্র। ব্যস্, তারপরেই ও সোজা পাড়ি দেবে আসামের চা-বাগানে—বাবা মা, আর কমলির কাছে।

খুশি-ভরা চোখে দুলু তাকালো পড়ার টেবিলের উপরকার দেয়ালে। ছোট এক টুকরো কাগজে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে মোটা মোটা করে লেখা রয়েছে: ৮

বিছানা থেকে এক লাফে উঠে পেরেকে আটকানো কাগজের টুকরোটা একটানে ছিঁড়ে ফেললো। তার নীচে রয়েছে একই সাইজের আরেক টুকরো কাগজ। তাতেও লাল-নীল পেন্সিলে মোটা মোটা করে লেখা রয়েছে: ৭। শুধু তাই নয়, একই সাইজের কাগজের টুকরো পরপর সাজানো রয়েছে আরো অনেকগুলো। আর তাতে পর পর লেখা আছে ৬, ৫ থেকে একেবারে ১ পর্যন্ত।

কাগজের টুকরো ছিলো আরো অনেকগুলো। ৩০ থেকে আরম্ভ করে ১ পর্যন্ত পরপর লিখে পেরেক দিয়ে দেয়ালের সংগে সেগুলোকে আটকে দিয়েছিলো দুলু। পুজোর ছুটির ঠিক তিরিশ দিন আগে থেকে সে এই ব্যবস্থাটা করেছে। তারপর রোজ সকালে একখানি করে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে ঢালে খানিকটা দাঁতের মাজনের গুঁড়ো। খুশি-ভরা চোখে একবার তাকিয়ে দেখে দেয়ালে—তিরিশ দিনের বদলে পুজোর ছুটির আর আছে উনত্রিশ দিন বাকি! দুখানি কচি ঠোঁটে খেলে যায় হাসির ঢেউ। তর্জনী দিয়ে দাঁতের গোড়া ঘষতে ঘষতে দুলু কলতলার দিকে পা বাড়ায়।

এমনি করে ত্রিশ—উনত্রিশ—আটাশ করতে করতে আজ কাগজের টুকরোর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৭-এ। আর মোটে সাতটা দিন। তারপরই পুজোর ছুটি। তারপরই লম্বা পাড়ি। দুখানি কচি ঠোঁটে খেলে গেলো হাসির ঢেউ। ৮ নম্বর কাগজের টুকরোতে মাজনের গুঁড়ো ঢেলে কলতলার দিকে পা বাড়িয়ে দিলো।

*   *   *   *

দুলুর বাবা হরনাথবাবু আসামের এক চা-বাগানে কেরানির কাজ করেন। স্ত্রী আর ছোট মেয়ে কমলিকে নিয়ে তিনি সেখানেই থাকেন। কিন্তু সেখানে কোন স্কুল নেই। তাই দুলু কলকাতায় তার পিসেমশার তপন-মোহন বাবুর বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ে। গত তিন বছর যাবৎ ও কলকাতায় আছে। গরমের ছুটিতে, পুজোর সময় আর বার্ষিক পরীক্ষার শেষে ও চা-বাগানে বাবা-মার কাছে যায়। চা-বাগানের বড়বাবুর একটি ছেলে কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। দুলু ফি বার তার সংগেই চা-বাগানে যাতায়াত করে। তবে যদি কোন ছুটিতে সে চা-বাগানে না যায়, তাহলে হরনাথবাবু নিজেই এসে ওকে নিয়ে যান।

কলেজের ছেলেটি এবার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, সামনে টেস্ট পরীক্ষা বলে এবার সে পুজোর ছুটিতে চা-বাগানে যাবে না। তাই হরনাথবাবু চিঠিতে দুলুকে জানিয়েছেন যে, মহালয়ার দিনই তিনি কলকাতা পৌঁছবেন দুলুকে চা-বাগানে নিয়ে যেতে। সেই থেকে দুলু দিন গুনছে—কবে স্কুল ছুটি হবে,—কবে মহালয়া আসবে!

চিঠি আসবার আগে দুলুদের চা-বাগানের বাড়িতে অবশ্য একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিলো।

ছোট বোন মিত্রা শুধালো......

দুলু সে-কথা জানে না। কলেজের ছেলেটি এবার পুজোয় চা-বাগানে বাবার কাছে আসবে না, আপিসে বড়বাবুর কাছে এই খবরটি শুনে হরনাথবাবু সেদিন চিন্তিত মনেই বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রীকে কাছে ডেকে বললেন: দেখো, বড়ই মুস্কিল হলো। বড়বাবুর ছেলেটি তো এবার পুজোয় এখানে আসবে না লিখেছে। আমারও বড্ডো হাত টানাটানি যাচ্ছে। এখন দুলুকে আনবার কি ব্যবস্থা যে হবে, তাই হয়েছে সমস্যা।

সব কথা শুনে দুলুর মা বললেন: সে কি গো? দুলু-সোনা আমার পুজোয় আসতে পাবে না? তাহলে যে বাছা আমার—

আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না। ব্যথায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। দুই চোখ বেয়ে নামলো জলধারা।

হরনাথবাবু বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন: আহা-হা, তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি বলেছি, দুলুকে আনব না? নিশ্চয় আনব। তুমি ভেবো না। ব্যবস্থা একটা হবেই।

পরের দিনই তিনি দুলুকে চিঠি লিখে দিলেন, মহালয়ার দিন নিজেই পৌঁছবেন কলকাতা, তাকে আনতে।

*   *   *

এই ছোট্ট ঘটনাটি দুলু জানে না। জানবার কথাও নয়। খুশিতে নাচতে নাচতে সে কলতলায় হাজির হলো। সেখানে তখন ভিড় জমিয়েছে পিসতুতো ভাই-বোনেরা। স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গেছে। সামনে পুজোর ছুটি। পড়াশুনোর তাড়া নেই। মনের আনন্দে সবাই মিলে কলতলায় গুলতানি জমিয়েছে।

দুলুকে দেখে সীতাংশু বলে উঠলো: দুলুর যে দেখছি খুশিতে মাটিতে পা পড়ছে না। বলি, আজ ক' নম্বর হলো?

শেষবারের মতো মাজনের গুঁড়োগুলো আঙুলে তুলে নিয়ে দুলু কাগজের উল্টো দিকটা সীতাংশুর দিকে তুলে ধরলো।

সীতাংশু বললো: এটাতো আট নম্বর তাহলে আর সাতদিন বাকি, কি বলিস্?

ছোট ভাই অরুণাংশু বললো: দুলুদা'র কি কপাল বল্‌তো! ফি ছুটিতে কেমন রেলগাড়ি চড়ে বাড়িতে যায়-আসে। আর আমাদের কপালে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর এই কলকাতা আর কলকাতা।

দুলু বললো: আচ্ছা অরুণ, তুমিও কেন চলো না এবার চা-বাগানে মার কাছে?

অরুণাংশু বললো: ওরে বাপ্‌রে! সে কি হবার জো আছে। কথা তুললেই বাবা আর মা হৈ হৈ করে উঠবেন। বলবেন: চা-বাগানে ম্যালেরিয়ার রাজ্যে যাওয়া চলবে না।

এমন ভাবে অংগভংগী করে অরুণাংশু কথাগুলো বললো যে সবাই হেসে উঠলো।

রান্নাঘর থেকে মা হাঁক দিলেন: তোমরা সব চট্‌পট এসে পড়ো। জল-খাবার তৈরি।

জল-খাবারের পাট সেরে আবার সবাই জমায়েত হলো পড়ার ঘরে। লেখাপড়া এখন ক'দিনের জন্য শিকেয় উঠেছে। ঝকঝকে আকাশের সোনা-সোনা রোদ্দুরে সকলেরই মনে লেগেছে উদাসী হাওয়া। পথের স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে ওদের ঘর-কুনো চোখে। দুলুর

সত্যি এসেছে বাবার চিঠি

বিচিত্র পথ ভ্রমণের কাহিনী শুনতে শুনতে ওরা মসগুল হয়ে উঠলো।

ছোট বোন মিত্রা শুধালো: আচ্ছা দুলুদা, রেল স্টেশন থেকে তোমাদের চা-বাগান, তো ছ' মাইল দূরে। সেই রাস্তাটা তোমরা কে ঘোড়ায় টানা কি গাড়িতে যাও, বলো না?

দুলু মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললো: তাকে

বলে ট্রলী। ষ্টেশন থেকে চা-বাগান পর্যন্ত সরু লাইন পাতা আছে। সেই লাইনে ট্রলী চলে। ঘোড়ায় টানে। [illegible] ট্রলীতে চড়ে চা-বাগানে যেতে আমার যে কী ভালোই লাগে। ষ্টেশনের এলাকা পেরিয়েই দিগন্ত-জোড়া মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে একটা কুলি ধাওড়া। সেখানে ছোট ছোট দীপগুলো জবলে জোনাকির আলোর মতো। রাত তখন আর কতো—হয়তো আটটা কি সাড়ে আটটা। কিন্তু পল্লীগ্রামের মাঠে তখনই সব চুপচাপ নিঝুম হয়ে যায়। ঘোড়ার পায়ের শব্দের তালে গড় গড় করে এগিয়ে চলে ট্রলী। মাঠ পেরিয়ে ক্রমে শুরু হয় চা-বাগানের এলাকা। দুই পাশে ছোট ছোট ঝাঁকড়া চায়ের গাছগুলো আবছা আলো-আঁধারে ওৎ-পাতা সৈন্যের মতো সার বেঁধে বসে থাকে। তাদের মাঝে মাঝে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে গোলমোহর গাছগুলো: যেন সঙগীনধারী পাহারাওলা সব। আকাশে হাজার তারার মেলা। ওরা যেন হাজার দীপ জবালিয়ে আমাকেই ডাকে ওদের দেশে। তারপর এক সময় পেঁাছে যাই বাড়িতে। মা এগিয়ে আসেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে। প্রণাম করে দাঁড়াতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ছোট্ট কমলিটা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তুলতে মা বলেন: ওঠ্ কমলি —ওঠ্, দেখছিস্ না দাদাভাই বাড়ি এসেছে—

দুলুর গল্প শেষ না হতেই—বাইরে পিওনের হাঁক শোনা গেলো: চিঠ্-ঠি—

এ-ডাক দুলুর বড় পরিচিত। রোজ সকালে এরই জন্যে সে উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। কখন পিওন তার চেনাগলায় ডাকবে: চিঠ্-ঠি—। দুলু ছুটে যাবে সদরে। কখনও চিঠি পাবে চা-বাগানের ডাক-ঘরের ছাপ-মারা। বাবার চিঠি বা মার চিঠি। আনন্দে উজ্জবল হয়ে ওঠে দুলুর মুখ। কখনো বা চিঠি আসে অন্যের নামে। পিশেমশায় কি পিশিমার। দুলুর আশাউজ্জবল মুখখানা সহসা কালো হয়ে যায়। পরের দিনের জন্যে আবার সে অপেক্ষা করে থাকে।

চিঠ্-ঠি—ডাক শুনেই দুলু ছুটলো সদরে। হয়তো বাবার চিঠি এসেছে। পাছে দুলু অকারণে মন খারাপ করে, তাই হয়তো আবার জানিয়েছেন তাঁর রওনা হবার তারিখ।

সত্যি এসেছে বাবার চিঠি। দুলুর চোখ-মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। বাইরের সোনা রোদ্দুরের ছোপ লাগলো যেন ওর চোখ-মুখে। কাঁপা-হাতে দুলু খামখানা খুলে ফেললো সদরে দাঁড়িয়েই।

চিঠি লিখেছেন হরনাথবাবু। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছেন:

বাবা দুলুসোনা, তোমাকে আনতে যাবার দিন-কাল সব ঠিক ছিলো। হঠাৎ [illegible] রাতে তোমার মা কি স্বপন [illegible] দুলু-দুলু বলে চিৎকার করে উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দুদিন পরে আজ জ্ঞান ফিরে এসেছে। চিন্তার কোন কারণ নাই। চা-বাগানের ডাক্তারের পরামর্শ মতো শহরের বড় ডাক্তারকে আনা হয়েছিলো। তিনি অভয় দিয়ে গেছেন।

এমনিতেই হাত-টানাটানি চলছিলো। তার উপর তোমার মার অসুখে অনেকগুলো টাকা ব্যয় হয়ে গেলো। তাই এ সময় তোমাকে আনতে যেতে পারলাম না। তুমি মনে দুঃখ করো না। মন দিয়ে পড়াশুনো করো। বার্ষিক পরীক্ষার পরে আমি নিজে গিয়ে তোমাকে অবশ্যই নিয়ে আসব। এবার পুজোটা পিশিমার কাছেই কাটাও।

আমরা সকলে ভাল আছি।

চিঠি হাতে করে দুলু সদরেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। চিঠির অক্ষরগুলো যেন ওর চোখের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো।

চিঠির থেকে চোখ ফিরিয়ে দুলু বাইরে তাকালো। ঝক্‌ঝকে আকাশে সোনা রোদ নয়, যেন তার রক্তের ছিটে ছড়ানো।

সার্কাস

শৈলেন ঘোষ

ঝুনুর ভারী আনন্দ। ছোট্‌কাকু সার্কাস দেখতে নিয়ে যাবে।

ক'দিন হল একটা সার্কাস পার্টি এসেছে। কি যেন নাম! কি গ্র্যান্ড-সার্কাস। দূর ছাই! নাম-টাম অত মনে থাকে না। ঝুনুদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা মস্ত মাঠ আছে। সেই মাঠটা ঘিরেছে। তার ওপর ইয়া পেল্লাই এক তাঁবু খাটিয়েছে। এ-ধার থেকে ও-ধার অবধি লম্বা মালার মত লাল নীল আলো দিয়ে সাজিয়েছে। নিভছে-জ্বলছে। একটা দাঁত্য চাকা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তার মধ্যে লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙের আলোর খেলা। রাত-দিন মাইক বাজছে। রাত্তিরবেলাটা একেবারে দিনের মত! ঝুনুদের ছাত থেকে সব দেখা যায়!

ঝুনু আগে কক্ষণো সার্কাস দেখেনি। শুনেছে সার্কাসে নাকি জন্তু-জানোয়াররা খেলা দেখায় মানুষদের সঙ্গে। বাঘ-সিংহি-হাতি-উট-জিরাফ! কে জানে বাবা তা কেমনতর! বাঘ-সিংহি ঝুনু আগেই দেখেছে। সেবার যে চিড়িয়াখানায় গেছলো। কিন্তু সেতো দেখেছে খাঁচার মধ্যে পোরা। কি গাঁক গাঁক করে ডাক রে বাবা! তাদের তো খেলা দেখেনি কোনদিন।

সার্কাস দেখতে যাবার আগে ঝুনু খুব খুশী। কিন্তু সার্কাস থেকে ফিরে অবধি ওর মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে গেছে। কিচ্ছুটি ভালো লাগে না। কি যেন ভাবে।

সেই যে টাট্টু ঘোড়াটা দু'পা তুলে নাচ দেখালে—তার কথা ঝুনু ভাবে না। জিরাফের ঘাড়ের ওপর পুঁচকে বাঁদরটার নাচের কথা—ঝুনু ভাবে না। ভালুক-ছানা দু'পা দিয়ে, খাড়া দাঁড়িয়ে একচাকার সাইকেল চালালো—সে কথা ঝুনু ভাবে না। বাঘ-সিংহির ঘাড়ে চেপে ছাগল-ভেড়া পিরামিডের খেলা দেখালো—সে কথাও ঝুনু ভাবে না। লম্বা একটা তারের ওপর মেমসাহেবের ছাতা নিয়ে নাচ—তার কথাও ঝুনু ভাবে না। তবে? ঝুনু ভাবে—বাচ্চা হাতির পিঠে সেই যে ছেলেটি খেলা দেখালো—সেই ছেলেটির কথা। সেই যে হাতির শুঁড় ধরে পিঠের ওপর চাপলো, দাঁতের ওপর বসলো, শুঁড়ে চেপে আকাশবাগে উঠলো, শুঁড় ছেড়ে পিঠের ওপর ডিগবাজী খেয়ে পড়লো—এক-সঙ্গে একটা-দুটো-তিনটে ডিগবাজী! তার-পর চারদিক থেকে হাততালির কি ধুম!

ভারী মিষ্টি ছেলেটি। ঝুনু যেমন ছোট্ট মেয়েটি—একেবারে অতটুকু। কি সুন্দর ঝল্‌মলে পোশাক তার! মাথায় পালকের টুপি—আঁট করে বাঁধা। জামাটা সিল্কের। লাল মত। ঠিক লাল নয়—একটু গোলাপী। জাঙিয়াটা আকাশী নীল—আঁটসাঁট। পা দুটো আগা-গোড়া সাদা মোজা দিয়ে ঢাকা। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল কিন্তু!

হাতির পিঠের ওপর অনেকক্ষণ ধরে সে খেলা দেখালে। ঝুনু কি তার খেলা দেখছিল? ঝুনু তার মুখের দিকে আন্‌মনে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। আহা! অমনিকরে ঘাড় বেঁকিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে ডিগবাজী খেয়ে খেলা দেখাতে তার না-জানি কত কষ্ট হচ্ছে! হাতিটা শুঁড় দিয়ে তার পিটটা চিপে আকাশের দিকে তুলে চারপাশে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। ও তখন পা দুটো সোজা করে, বুকটা চিতিয়ে, হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে রইল—ঠিক একটা উড়ো জাহাজ। ঝুনু ভয়ে চোখ বুজে ফেললে!

চোখ খুলতে ঝুনুর হঠাৎ কেমন চমক লাগলো। ছেলেটা খেলা দেখাতে দেখাতে তারই দিকে তাকাচ্ছে না? হাঁ, তাইতো। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার তাকাচ্ছে যে! আহা! বড্ড ঘেমে গেছে। বড্ডক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ঝুনু বাড়ি এসে ওর কথাই ভাবছিল। কি যেন বলতে চাইছিল সে? কে জানে কি কথা! ওর সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়!

ঝুনু ভাবেনি ছেলেটার সঙ্গে এমনি করে আচম্‌কা দেখা হবে। সেদিন ঝুনু বাড়ির সামনের মাঠটায় খেলা করছিল। হঠাৎ নজরে পড়লো—তাকে একটা ছেলে ঠায় দেখছে। জামাটা, প্যাণ্টটা তার কেমন যেন ময়লা-ছেঁড়া। ঝুনু মুখ ঘুরিয়ে নিলে। খানিকপর আবার তাকালো! তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঝুনু কি ভাবলো। এগিয়ে গেল তার দিকে! ওমা! এযে সেই ছেলেটা—সেই যে সার্কাসে হাতির

ঠিক একটা উড়ো জাহাজ

পিঠে খেলা দেখিয়েছিল! কই আজ তো তার গায়ে তেমন ঝল্‌মলে জামা নেই! কি বিচ্ছিরি ময়লা প্যাণ্ট, ছেঁড়া জামা!

'শোনো, শোনো' ঝুনু ডাকলো তাকে। 'তুমি সার্কাসে খেলা দেখাও, না?'

ছেলেটা ঘাড় নাড়লো।

'তা এখানে এলে কেমন করে?'

'এমনি বেড়াতে বেড়াতে। কাল যে আমাদের সার্কাস শেষ হয়ে গেছে। আমরা চলে যাব কিনা—তাই।'

ঝুনু আর একবার ভালো করে তার দিকে তাকালো। চোখ দুটো সত্যি কি মিষ্টি!

'তা তোমার সেই ঝল্‌মলে জামা-প্যাণ্ট, সেগুলো পরনি যে বড়!'

'বারে! ওগুলো কি সব সময়ে পরবার? যখন খেলা দেখাই—তখন পরি।'

ঝুনু কি ভাবলো একটু। আবার ওর দিকে তাকালে। ভালো করে দেখলে আগাগোড়া। জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলবে? সত্যি করে? খেলা দেখাতে খুব কষ্ট হয়—না?'

হঠাৎ ছেলেটার চোখ দুটো কেমন ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো।

ঝুনু ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। হাত ধরে বললে, 'আমি ঠিক জানি তোমার খুব কষ্ট হয়। তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও না কেন?'

এবার ছেলেটার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়লো। বললে, 'মা তো আমার নেই। আমার কেউ নেই। আমি একা। একা একা সারাদিন ধরে আমি সার্কাসে কাজ করি। সকালে উঠে আমি হাতি-ঘোড়া-উটদের খাওয়াই, ওদের চান করাই, বিকেলে খেলা দেখাই। তোমাদের মত সার্কাসে আমার তো বন্ধু নেই। আমার ভারী ইচ্ছে করে তোমাদের সঙ্গে খেলা করতে। হাতির সঙ্গে, হাতির পিঠে আর খেলতে ভালো লাগে না।'

দুঃখে ঝুনুর বুকটা ভরে যায়। বললে 'আমার কাছে, আমাদের বাড়িতে থাকবে তুমি? মাকে বলব। চলো না আমার সঙ্গে?'

ছেলেটা কি ভাবলো। বললে, 'না থাক। আজ আমি যাই। কাল আসব। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।'

'ঠিক বলছ কাল আসবে? আমি মাকে বলব কিন্তু, তুমি আমার কাছে থাকবে। আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে, খেলা করবে। এসো কিন্তু!'

ছেলেটা ঘাড় নাড়লে। তারপর চলে গেল। একটুখানি গেছে—ঝুনু ডাকলো, 'শোনো—' ছেলেটা ঘাড় ফেরালে। কাছে এলো। 'আমাদের বাড়িটাতো দেখলে না। ঐ যে সবুজ দরজাওলা বাড়ি—ঐটা। জানলার ধারে ঝুনু বলে ডাকবে—আমার নাম ঝুনু। তোমার নাম বললে না তো?'

'আমার নাম বাচ্চা।'

বাচ্চা চলে গেল।

পরের দিন সকাল থেকে ঝুনু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। এই-আসে এই-আসে করে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো, বাচ্চা এলো না। দাদার কাছ থেকে বাচ্চার জন্যে একটা লাট্টু চেয়ে রেখেছে, একটা একতেল ঘুড়ি লাটাই-সুতো। বাচ্চাকে দেবে। ওমা! তবু বাচ্চা এলো না।

হঠাৎ বড় রাস্তার ওপর থেকে ইংরিজি-বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে না? ঠিক সেই রকম শব্দ সেই সার্কাসে যেমন বাজছিল? ঝুনু বাজনা শুনে ছুট্টে গেল। কি ব্যাপার! ওমা! সার্কাস পার্টি যে ফিরে যাচ্ছে! গাড়ি চেপে আগে আগে, বাজনার দল বাজিয়ে বাজিয়ে চলেছে—আর পিছুন পিছুন বাঘের খাঁচায় বাঘ চলেছে, উট চলেছে, ভালুক চলেছে, হাতি চলেছে সার দিয়ে! ঐতো ঐ হাতিটার পিঠে চেপে বাচ্চা খেলা দেখিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চা কই? উঃ কত লোক! কে কাকে দেখবে? ঐ ভিড়ে কি বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যায়?

সার্কাস পার্টি চলে গেল। ঝুনু ফিরে এলো। দাদার লাট্টু বাক্সে রেখে দিলে। ঘুড়িটা দেওয়ালের পেরেকে আটকে রাখলে। ভাবলে, বাচ্চা কি আর আসবে? ও হয়তো আর এক-দেশে হাতির পিঠে খেলা দেখাতে চলে গেল!

কাঠের ঘোড়া

শ্রীদক্ষিণা বসু

একটি বিদেশী ঘটনা।

খবরের কাগজের ছোটদের পাতায় একটা নতুন 'আলোচনা' চলছে ক'হপ্তা ধরে।

ছোটদের কার কি কামনা এবং সে কামনা পূরণ করার জন্যে কে কি রকম ভাবে তৈরি হবার প্ল্যান করছে, এই হলো আলোচনার বিষয়।

বিষয়টা তাক লাগবার মতই এবং এ নিয়ে সত্যি সত্যি বেশ একটা আলোড়ন পড়ে যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে। শুধু ছোট-দেরইবা কেন, বাপ-মা, দাদা-দিদির মধ্যেও।

ক'হপ্তা ধরেই কচিকাঁচাদের এক একটি জবাবের সঙ্গে তাদের এক একটি করে ছবিও প্রকাশ করা হচ্ছে ঐ পাতায়। কাগজখানা নিয়ে তাই রীতিমতো টানাটানি।

নানা রকম জবাব আসে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। এক এক সময় সম্পাদক মশাই হো হো করে হেসেই ফেলেন। আবার গুরু গম্ভীরও হয়ে ওঠেন সময় সময়।

ছোটদের চাওয়া, তার কি সীমা পরিসীমা আছে কিছু? তাই কারুর কারুর সেই চাওয়ার বহর দেখে হাসি পাওয়া স্বাভাবিক। অসম্ভব বেশি আর অসম্ভব কম, এ দুরকমের চাওয়াটাই তাদের দিক থেকে বিশেষ করে সম্ভব ও শোভন এবং এদুটোই হাসির ব্যাপার।

কিন্তু ঠিক ঠিক মতো করে চাওয়া এবং সে চাওয়া যে আন্তরিক তা যদি কোন ছোট ছেলে বা মেয়ের জবাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হলে সম্পাদক মশাইকে ভাবতে হবে বৈকি!

এরকম ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব বেশি হয় না বটে, কিন্তু এরাই তো শেষ পর্যন্ত দেশের গৌরব হয়ে দাঁড়ায়। আর এদের খুঁজে বার করে দেশবাসীর সামনে যাঁরা উপস্থিত করেন সে সব সম্পাদকের কৃতিত্বও বড়ো কম নয়।

এমনি একটি ছোট্ট ছেলের আকাঙ্ক্ষার কথা আর তার ফটো ছেপে ছোট-বড়ো সকল মহলের পাঠকের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি করেন সম্পাদক মশাই।

ছেলেটির নাম পল। মাত্র ছ' বছর বয়েস। রোগে ভুগে ভুগে বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে সে। দুরারোগ্য রোগ। ক্যান্সার। সহজে যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে, তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তবু তার মনে কতো আশা!

রোগশয্যা থেকেই পল চিঠি পাঠিয়েছে সম্পাদকের দপ্তরে। তাতে বড়ো বড়ো ছাড়া ছাড়া অক্ষরে লিখে জানিয়েছে তার মনের ইচ্ছে এবং সে ইচ্ছেকে সে কীভাবে রূপ দিতে চায় তার সুন্দর একটি পরিকল্পনা। নিজের একখানা ফটোও সে দিয়েছে তার চিঠির সঙ্গে সম্পাদকের নির্দেশ মতো।

কিন্তু তার ঐ গোটা গোটা লেখা চিঠি কি ছাপা হতে পারে কখনো? তাছাড়া যে রোগা পটকা চেহারা তার। এ-চেহারার ফটো কোনও কাগজেই ছাপতে পারে না।—দিনের পর দিন এমনি ধারা ভাবতে থাকে পল।

এদিকে সম্পাদক মশাই কিন্তু ভাবছেন অন্যরকম। পলের চিঠি ও তার ফটো তাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে। এতোটুকু বয়েসের ছেলের কাছ থেকে তিনি এমন সুন্দর কল্পনা আশা করতে পারেননি। ভারী মিষ্টি আর লাজুক মুখখান ছেলেটির। পলের এই ফটো ও তার জবাবকে কীভাবে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যাবে। চিন্তা করছিলেন সম্পাদক।

একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হলো ছোটদের পাতায়। চলতি আলোচনাটি শেষ হবে ঐ তারিখে এবং সেদিনই এ আলোচনার সবচেয়ে ভালো উত্তর ও সবচেয়ে ছোট্ট উত্তর-দাতার ফটো প্রকাশ করা হবে, একথা বিশেষ-ভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো।

এতোদিন ধরে যারা এ ফিচারে যোগ দিয়েছে, যাদের জবাব আর ফটো কাগজে বেরিয়েছে এতোদিন ধরে, তাদের প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল যে হয়তো তার জবাবই সবচেয়ে ভালো বলে মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু একী, এক ঘোষণাতেই সম্পাদক মশাই তাদের সকলকে বাতিল করে দিলেন! তাদের অনেকের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায় এ নিয়ে। এমন কি অনেক অভিভাবকদের মধ্যেও। সবচেয়ে ছোট্ট প্রতিযোগীর বয়েস কতো হতে পারে এবং এতো জবাবের পর তার উত্তর এমন কী অভিনব হতে পারে তা নিয়েও চলতে থাকে গবেষণা। নির্দিষ্ট তারিখটির জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব!

পলও অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করে। তার আশা ফলে যায়। তার গোটা গোটা লেখা দেখে সম্পাদক মশাই হয়তো তার চিঠি না পড়েই ফেলে দেবেন, তার রোগা পট্‌কা চেহারার ফটোর দিকে হয়তো ভালো করে তাকিয়েও দেখবেন না, পলের এসব ভাবনাগুলো যে কতো মিথ্যে; নির্দিষ্ট দিনের কাগজখানা হাতে পেয়েই সে তা বুঝতে পারে। সম্পাদকরা যে, দেশের ছেলেমেয়েদের কতো ভালোবাসেন, তাদের কাছে কতো বেশি যে তাঁদের আশা, তাও এবার পলের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

কাগজখানা আসতেই উঠে বসে পল। ছোটদের পাতা খুলতেই চোখে পড়ে তার নিজের ছবি। যে ছবি সে পাঠিয়েছিল তার চেয়ে যেন অনেক ভালো দেখাচ্ছে তাকে খবরের কাগজের পাতায়। সম্পাদক মশাই হয়তো বেশি ভালো করেই ছাপিয়ে দিয়ে থাকবেন তার সেই রোগা পটকা চেহারার ফটোখানা। আনন্দের আর সীমা নেই তার। সেই গোটা গোটা ছাড়া ছাড়া অক্ষরে লেখা তার সেই চিঠিখানাই কী সুন্দর ভাবে ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। খুশিতে নেচে ওঠে পলের মন। সে ভুলে যায় তার অসুখের কথা।

> পল নিজেই তার নিজের লেখা চিঠি পড়তে থাকে। যে চিঠিতে সে ভয়ে ভয়ে লিখেছিল—রাষ্ট্রপতিই দেশের সবচেয়ে সম্মানিত লোক। সেই পদলাভের সম্মান কার না পেতে ইচ্ছে হয়! কিন্তু সে সম্মানের অধিকারী হতে হলে কেমন লোক হতে হয় তা আমি ভালো করে জানবো কী করে তাঁর সঙ্গে নিজে কথা বলার সুযোগ না পেলে? তাই রাষ্ট্রপতিকে দেখা ও তাঁর সঙ্গে বসে আলাপ করার সুযোগ পাওয়াই আমার মনের সবচেয়ে বড়ো কামনা। কিন্তু আমি যে খুব অসুস্থ। শয্যাশায়ী।

এইটুকু লিখেই পল তার নাম আর ঠিকানা দিয়ে শেষ করেছে চিঠি।

রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি কী ভাবে যেন পড়ে যায় পলের এ চিঠিখানার দিকে। তিনি ঐ দিনই ঐ খবরের কাগজের একটি কাটিং সযত্নে পুরে রাখেন তাঁর পকেটে। পলের অসুস্থতায় একটু বিচলিত হয়ে ওঠেন যেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি আদর করতে থাকেন 'পল'কে

পরেরদিন রবিবার। প্রার্থনার দিন। প্রার্থনায় যোগ দিতে গীর্জায় যাবেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এতো ফুল আর ফলের ঝুড়ির আয়োজন কিসের? আশ্চর্য বোধ করে সবাই। অনেকে ভাবে হয়তো আজ রাষ্ট্রপতি অসুস্থ বুড়ি শাশুড়িকে দেখে আসবেন ফিরতি পথে। প্রার্থনা শেষে রাষ্ট্রপতির গাড়ি ছেড়ে দিলে সে ধারণাটাই পাকা বলে মনে হয় সবার। এমন কি উপস্থিত খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও। রাষ্ট্রপতির বুড়ি শাশুড়ির বাড়ির দিকেই গাড়ি ছুটে চলে। বিরাট সে গাড়ি। তার পিছু পিছু আরো কয়খানি গাড়িও ছুটে যায়। তবে একটা জায়গায় এসে পিছনের গাড়িগুলো সবই থেমে থাকে সামনের গাড়ি থেকে ইঙ্গিত পেয়ে।

শহর থেকে দূরে। প্রায় পাড়াগাঁই বলা চলে। ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ির সামনে বিরাট একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই বাড়ির লোকজন সব হতভম্ব হয়ে যায় যেন।

সাধারণ পোশাকে বেরিয়ে আসেন যিনি গাড়ির ভেতর থেকে তাঁকে খুবই পরিচিত লোক বলেই মনে হয় সবার। কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে ভরসা পায়না মুখ ফুটে। রাষ্ট্রপতিও আত্ম-গোপন করেই কথা বলেন। জিজ্ঞাসা করেন, এ বাড়িতেই পল থাকে কি না।

—'হ্যাঁ, সে এবাড়িরই ছেলে।'—উত্তরে বলেন পলের বুড়ো ঠাকুরমা।

—'তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।' আগন্তুক জানান।

—সে যে খুব অসুস্থ!

—'কোথায় আছে সে?'— এই প্রশ্নের পর আর কথা না বাড়িয়ে বৃদ্ধা পথ দেখিয়ে ভদ্র-লোককে ডেকে নিয়ে যান পলের ঘরে।

পল অপরিচিত এক ভদ্রলোককে এভাবে তার ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে যায় একটু। তারপর আবার আর একজন এসে এক ঝুড়ি ফল ও গোছা গোছা ফুল এনে সাজিয়ে রেখে যায় ঘরে। কী ব্যাপার। নমস্কার জানিয়ে পল জিজ্ঞেস করে আগন্তুককে,—'কে আপনি।'

রাষ্ট্রপতির বাড়ি থেকে এসেছি আমি।— আগন্তুক উত্তর দেন।

—তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন এসব?

—হ্যাঁ, তোমার অসুখের কথা শুনে তিনি তোমায় এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি ভালো হয়ে উঠলে তোমায় নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়িতে। তুমি যে দেখা করতে চেয়েছিলে তার সঙ্গে।— এই বলে খবরের কাগজের কাটিংটা দেখান তিনি।

—"হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি হতে হলে কেমন লোক হতে হয় তা জানার জন্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে আমার।"—পল বলে।

—"তাই নাকি! তা হলে আজইতো তোমার আলাপ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।"—এই বলে পলকে চুমু খেয়ে আদর করেন রাষ্ট্রপতি।

আপনিই রাষ্ট্রপতি তা হলে! অপলক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতির দিকে তাকিয়ে থাকে পল!

—"হ্যাঁ।"—এই ছোট্ট উত্তরটুকু দিয়েই চুপ করে যান রাষ্ট্রপতি। পল কী বলে তা শোনবার জন্যেই তাঁর আগ্রহ।

"রাষ্ট্রপতি হতে হলে সবাইকে খুব ভালো-বাসতে হয় বুঝি!"

—নিশ্চয়, দেশকে আর দেশের সব লোককে ভালোবাসতে না পারলে তারা তোমায় রাষ্ট্রপতি করবে কেন? ভালোবাসা দিয়ে দেশবাসীর মন জয় করতে পারলেই তো তারা একদিন না একদিন তোমায় রাষ্ট্রপতির সম্মান দেবে।

—"ও, আপনিও তা হলে সবাইকেই বুঝি খুব ভালো বাসেন! তাই আমায় দেখতে এসেছেন আমার অসুখের কথা শুনে। তাই না!" —পলের রোগা মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে এই কথা বলতে গিয়ে।

আর রাষ্ট্রপতিও 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়!' বলে একেবারে জড়িয়ে ধরে আদর করেন পলকে।

এরপর রাষ্ট্রপতি বিদায় নিয়ে গেলে পলের মনটা খারাপ লাগে কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু তাঁকে কি আর মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকার উপায় আছে?

পরদিনই বিরাট একটা লালচে রঙের কাঠের ঘোড়া উপহার আসে পলের নামে রাষ্ট্রপতির ভবন থেকে।

ফটো—রেবন্ত ঘোষ

নিখরচার গাড়ি — শ্রীবিমল ঘোষ

আসবে বুঝি আমার বাড়ি?
কোথায় পাবে মোটর গাড়ি?
গাড়ির ভাড়া—নেইকো হাতে?
কিইবা এলো গেলো তাতে!

কাকুর জুতো মস্ত বড়ো,
সটান গিয়ে তাইতে চড়ো।
ফিতে দুটো লাগাম কোরে
হাঁকাও গাড়ি খুব সে জোরে
চললে গাড়ি রাস্তা ফাঁকা,
বুট পালিশের কৌটো চাকা
নিখরচায় মজার গাড়ি
চড়ে এসো আমার বাড়ি
ভাবছো, এসব বলছি কি যে!
সত্যি দেখো, চড়ছি নিজে।
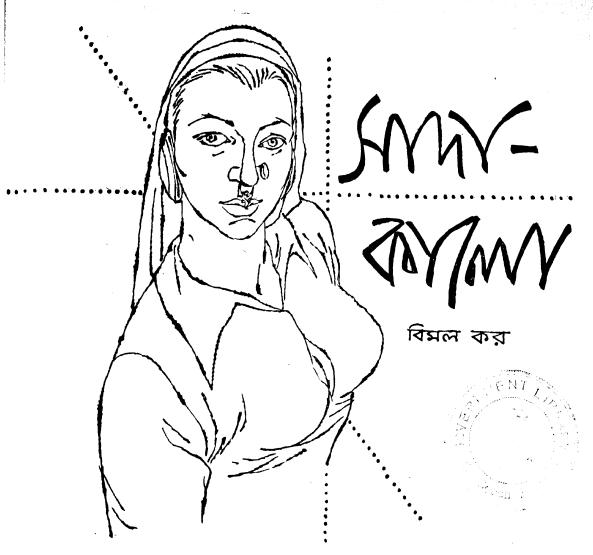
কালো চিকন দেহে ঢেউ খেলিয়ে গা ঢলিয়ে হীরামণি খিল খিল করে হাসছিল। সুখমণির গায়েই যেন টলে পড়বে। কুচি কুচি পাথর-সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছিল হীরামণির, গলার ভাঁজে পুঁতির মালাটা কাঁপছিল।

সুখমণিও হাসছে। তবে অমনভাবে হীরামণির মতন সাপ-কিলবিল গা করে নয়। গাল-গলা বেঁকিয়ে, ঠেরিয়ে ঠেরিয়ে।

আর রাগ যত গাঁদরি। বেঁটে পুরুষ্টু শরীরটা গোঁজার মত শক্ত করে দপ্‌দপে চোখে তাকিয়ে ছিল, নাক ঠোঁট কুঁচকে। ঘেন্নায়, বিরক্তিতে।

যাকে নিয়ে এই হাসাহাসি, রাগ-বিরাগ, তার কিন্তু গ্রাহ্যই নেই, কে হাসল কে চটল। হীরামণির দিকে এক নজর তাকিয়ে পাকিরদোমের সামনে দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল শুকনা।

পাতির খালি টুকরিগুলো তুলে নিয়ে পিঠে ঝুলোতে ঝুলোতে, পটিটা কপালের উপর টেনে হীরামণি আর সুখমণি চলতে লাগল। দু-পা পিছন পিছন গাঁদরি।

হীরামণি, সুখমণি কি গাঁদরি, কারোই জানতে বাকি নেই, শুকনাকে আজ ঠাস করে চড়িয়ে দিয়েছে ফুলমায়া মেলায়। পাতি তুলতে তুলতে ফুলমায়া জল খেতে গিয়েছিল। শুকনার কাজ জল দেওয়া মেলায় মেলায়, চৌপলে, পানি খাওয়ানো। সে মুন্সী, কি দফাদার নয়—নেহাতই পানিওয়ালা। ভার বয়ে দু-টিন জল শিরীষ গাছের তলায় নিয়ে বসে থাকে। মেলার কাছেই। জল খেতে সামনে এলে জল দাও মগে করে।

ফুলমায়াকে জল দিতে গিয়ে নাক মুখ চুল গলা বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল রসিকতা করে। ফুলমায়া জলের তোড়ে বিষম লেগে কেশে হাঁপিয়ে একশা। ফুলমায়াও অবশ্য রসিকতাটা ঠাওর করে নিয়ে প্রথম প্রথম হাসছিল আর গালাগাল দিচ্ছিল। পরে যখন গায়ের ভিজে জামাটা দেখাচ্ছে আর চোখ পাকিয়ে কটাক্ষ করছে, শুকনা টপ্ করে হাত বাড়িয়ে ওর বুক ছুঁতে গিয়েছিল। ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে ফুলমায়া মেলায় ফিরে এসেছে তখন। আচ্ছা হয়েছে, সাদা রঙ সাদা মুখ সাদা বুকের উপর কুত্তার মত লোভ শুকনার।

হীরামণি মজা পেয়ে হাসছিল, দৃশ্যটা মনে করে। সুখমণি হাসছিল উচিত শিক্ষাই শুকনা পেয়েছে দেখে, বিদ্রুপ করেই। কিন্তু গাঁদরি গোজের মতন শক্ত আর কঠিন হয়ে ছিল অসহ্য ঘৃণায় আর অপমানে।

অপমানটা ওর একার কিংবা হীরামণি সুখমণিরই নয় শুধু—পুরুষদেরও। ভাবনাথ, ধরমপাল, ছোলা, টুংলুরও। ওদের সবার, সকলেরই, যাদের রং কালো।

ফ্লমায়াদের রং সাদা। চুনের মত সাদা নয়, দুধের মতনও না—তবু সাদাই, হল্দ-হল্দ সাদা, গার্দারি বলে অড়হর ডালের দানার মতন, রুগী বেড়ালের চোখের ঘোলাটে হল্দের মতন।

এরা—হীরামণি, গার্দারি, টুংলুরা—মদেশিয়া। চা-বাগানের মদেশিয়া কুলি। রাঁচি, ছোটনাগপুর, লোহরডঙা ইতি উতি থেকে এসেছে। রং কালো, কুচকুচে কালো; লম্বা গড়ন, গায়ের চামড়া, মাংস মুখটুখ একটু চকচকে, গা-গতর পাথরের মতন শক্ত। আচার বিচার, ভাব-ভাষাও আলাদা। সাজপোশাকও। ওদের বসতি একসঙ্গে, আলাদা চৌহদ্দিতে। চা-বাগানের বাবুরা বলবে, মদেশিয়া কুলি-লাইন।

আর ফ্লমায়ারা পাহাড়ী। ওদের বলে পাহাড়ী কুলি। নেপাল, ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে ঠকরে ঠকরে এখানে এসে জুটেছে। বেঁটে বেঁটে চেহারা, কী মরদ কী মেয়ে, টাট্টু ঘোড়ার মত গাট্টাগোট্টা গড়ন, নাক বসা, চোখ খুদে খুদে, পাতায় ঢাকা প্রায়, চ্যাপ্টা মুখ, কট্‌কটে গালের হাড়, রুক্ষ রুক্ষ। রং সাদা, হল্দ সাদা, রং-করা মাখনের মতন। আচার-বিচার, ভাব-ভাষা এদেরও আলাদা। বসতিও তফাত করে। বাবুরা বলে পাহাড়ী কুলি-লাইন।

মদেশিয়া সর্দার মদেশিয়া কুলিকামিন নিয়ে আলাদা চৌপলে মেলায় পাতি তোলায়, পাহাড়ী সর্দার পাহাড়ী কুলি-কামিন নিয়ে অন্য চৌপলে, অন্য মেলায়। তবু কখনো কখনো পাতি তোলার কাজে এক হয়ে যেতে হয়, তেলজলে এক হওয়ার মতন। অন্তত মরদে মরদে—মেয়েতে মেয়েতে। আজ যেমন হয়েছিল। হপ্তা ভোর এখন হয়তো তাই হবে—হীরামণি সোনামণি, গার্দারিদের পাশে পাশে ফুলমায়া, বচনমায়া, দিলমায়ারা পাতি তুলবে। আর শুকনা পানি খাওয়াবে।

আগে মদেশিয়ার হাতে পাহাড়ীরা পানি খেতে চাইত না, মদেশিয়ারাও পাহাড়ীদের হাতে। এখন খায়। পানি, পান, নেশা—চল হয়ে গেছে।

তা হোক চল। তা বলে মদেশিয়া শুকনার চোখে কালো রং, কালো গা, কালো বুক—কিছুই না, যা-কিছু ওই ফুলমায়াদের সাদা গায়ে! এমন চোখের চল এখনও হয়নি। দুটো একটা ছুটকো-ছাটকা এ-বাগান সে-বাগানের কেলেঙ্কারি কেউ কেউ জানে। সবাই নয়। মেয়ে বাছতে হয়, কালো রঙের মেয়ে বাছো।

পাতিগুদোম থেকে বেরিয়ে কারখানার ফটকের বাইরে এসে গজ গজ করছিল গার্দারি। পাথর ছড়ানো ভিজে ভিজে পথ দিয়ে যেতে যেতে বলছিল, "ওটা শিয়াল, ওই শুকনাটা। মরদ নাকি আবার ও। মদেশিয়া মরদরা চড়চাপাটি হজম করার লোক নয়। টুঁটি টিপে জিব বের করিয়ে দিত সঙ্গে-সঙ্গেই।"

কিন্তু কথাটা তা নয়, অতো ছোট নয়, হাসি-তামাসারও নয়। শুকনা কুত্তার মতন সাদা গায়ের রস চাটতে গিয়েছিল। পাহাড়ী মেয়েটা ওর জিবে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে, সমস্ত মদেশিয়াদেরই গায়।

হীরামণি বললে, "শুকনা হাটে ডিম-সাবান কিনেছে, কালো টুপি। চেকনাই চড়াবে।"

সুখমণি ব্যঙ্গ করে জবাব দিল, মানস-চক্ষে শুকনার বিরাট তালিমারা নীল হাফ প্যান্টটা দেখতে দেখতে, "কানাটা আগে তালি বদলাক, চেকনাই পরে।"

খাকর গাছের তলায় কার যেন মুরগী পালিয়ে এসে কুটো খুঁটছিল। গার্দারি তালি দিয়ে মুরগীটাকে উড়িয়ে দিতে দিতে বললে, "শুকনাটা মুরগী, ও জবাই হবে একদিন।"

কারখানা থেকে গলাভাঙা ভোঁক্ ভোঁক্ সিটিটা এতক্ষণে বেজে উঠল। পিছনে দলে দলে মদেশিয়া আর পাহাড়ী কুলি-কামিন, পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে, ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসছে। দু-একজন পুরুষের হাতে কলমছুরি, ফড়ুয়া। এক আধজন বা খালি হাতেই। সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে পাম্প ঘরের মেকানিকবাবু চোঁ চোঁ চলে গেল।

গাছপালা কেটে কুটে ডালপালা বোঝাই করে একটা বয়েল গাড়ি আসছিল সামনে দিয়ে। ক্যাচ ক্যাচ শব্দ উঠছে চাকায়। পিছনে একরাশ পায়ের শব্দ আর বিচিত্র গুঞ্জন। ঝাপসা বিকেল। বাতাস ভিজে ভিজে। গাছে গাছে ছায়াছায়ালি পথ। লতাপাতার বুনো গন্ধ। শিরীষের পাতা

ঝরে পড়ছে, ঝাঁকড়া-মাথা পানিশাজের ডালে বুনো পাখি চিকির চিক্ ডাক তুলে পাখা ঝাপটাচ্ছে পাতার অন্ধকারে।

গাঁদরি একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল ফুলমায়ার দল আসছে কি না। হ্যাঁ, আসছে। তবে সে-দলে ফুলমায়া নেই। শুকনাকেও দেখতে পেল না গাঁদরি কোথাও।

হীরামণিরা ক'পা এগিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গ ধরতে একটু ছুটেই গেল গাঁদরি। হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে কী বললে যেন। মনে হল বলছে, কানাটা এখনও হেঁদিয়ে মরছে পাতিগুদোম আর রঙঘরে।

কথাটা কিছু মিথ্যে বলেনি গাঁদরি। ফুলমায়াকে কোথায় না খুঁজেছে শুকনা! পাতিগুদোম, ঘানিঘর, রঙঘর, শুকলাই —মায় দাবাইঘরে পর্যন্ত। ঘানিঘর কি রঙঘরে যাবার কথা নয় ফুলমায়ার, বা অন্য কোথাও। তার সীমানা পাতিগুদোম পর্যন্ত। অবশ্য দাবাইঘরে যেতে পারত ফুলমায়া ওষুধ নিতে। তাও যায়নি।

গেল কোথায় ফুলমায়া? অবাক হচ্ছিল শুকনা। ছুটির সিটি বাজতে না বাজতেই একেবারে হাওয়া।

কারখানা থেকে বেরিয়ে এল শুকনা সবার শেষে। কাউকেই আর যখন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না। শেষ দলটাও ইঞ্জিন-ঘরের সামনে দিয়ে মোড় ফিরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।

এক সার বাবু-কুঠি ডাইনে রেখে সোজা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল শুক্না। বাঁয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একটানা বাগান। এ-বাগানের পাতি এখনও তোলা হয়নি। পাতিটাও ভাল না।

হনহনিয়ে হাঁটছিল শুকনা। বাবু-কুঠি ছাড়িয়ে উঁচু-নিচু মাঠ, মাঠের শেষে সুপুরি বাগান। বাগান পেরিয়ে ছোট সাহেবের কুঠি। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সাদা রঙ চড়ানো। ফুলবাগান আর বিজলী বাতি। বাজা কলে বাজনা বাজে, গান হয়।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে শুকনা অনেক-খানি পথ পার হয়ে এল। গাছগাছালির অন্ধকারে কাঁচা রাস্তাটা চোখে দিশা লাগিয়ে দিচ্ছে। চাঁদের আলো ফিনফিনে, ছায়াই বেশী। কাঁচা পাতির বুনো গন্ধ বাতাসে।

ফুলমায়ার কথাই ভাবছিল শুকনা। মেয়েটা তার চোখে নেশা লাগিয়ে দিয়েছে। শুঁড়িখানার নেশার চেয়েও জোর নেশা, জবর নেশা। এক কুড়ি আর দু' বছর বয়স হয়েছে শুকনার। ইতি উতি সে কম ঘোরেনি। কাঠচেরাই কলে কাজ করেছে, পাতি তুলেছে অন্য বাগানে, সাহেবকুঠিতে মালির সঙ্গে মাটি কুপিয়েছে, মাল তুলেছে লরিতে, মোট বয়েছে হাটে-হাটে—মেয়ে সে কম দেখেনি। কিন্তু ফুল-মায়ার মতন এমন আর নয়। মেয়েটার চেহারায় যেন আঠা লাগান আছে, টান ধরে। দুলগাই সমান উঁচু, পাশাপাশি দাঁড়ালে শুকনার বুকের উপর মাথা উঠবে না। কাঠের মতন খটখটে শক্ত নয়, আঁটসাঁট নরম নরম গা-গতর। কবুতরের মতন। মুখ-চোখের রোশনাই আলাদা। সাহেব-কুঠির নানীদের মতন সাদা; সাদা মুখ, সাদা গা, সাদা হাত এই ফুলমায়ার।

ফুলমায়াদের এই গায়ের রঙের উপর শুকনার ভীষণ এক ঝোঁক। আজ বলে নয়, অনেক দিন থেকেই। নিজের জাতের কালচে-রঙ চেহারাগুলো মোটেই ভাল লাগে না শুকনার। নয়ত যামিনী, হীরামণি, সুখমণির লিকলিকে লতার মতন হেলান-ফেলান ঢঙঢাঙ ওর মন্দ লাগে না। কাকের মতন রঙেই সব খেয়েছে ওদের। চেহারায় টান নেই, নেশা নেই। তা ছাড়া শুকনা খানিকটা সভ্যভব্য। ইতি উতি চরকি মেরেছে গতর খাটাতে। গির্জে ঘরে গেছে। এখনও যায় বাগানের সেই টুকচা মতন ছোট্ট গির্জাটাতে। মর্দেশিয়াদের ন্যাংটো ন্যাংটো বেশভূষাও মোটেই বরদাস্ত হয় না শুকনার। মরদরা শুধু লেংটি পরে—বড়-জোর একটা গামছা তার উপর, আর মাদ্দি-গুলো খসখসে এক পাক কাপড়া। কালো গা বুক হাত, পা বেবাক খোলা। ভাল

লাগে না শুকনার এসব। পাহাড়ীদের কাছে নিজেদের একেবারে জংলী মনে হয়। ওদের মরদদের পোশাক আশাক ভালই। মেয়েদের আরও ভাল। নোমাল, কাপড়া, কুর্তি, চুলো। গলায় আসলি সোনার কন্ঠি, আর কানে হাতে সুনু, কলি, চুড়। শুকনা বেহুঁশ হয়ে দেখে, লোভ সামলাতে পারে না, একে তাকে ডেকে ডেকে কথা বলে, কংকট খাওয়ায়, হাসাহাসি করে। ফুলমায়ার

পিছু পিছু বাগানের লরি চেপে বারো মাইল দূরের হাটে গিয়েছিল গতবার। হাটের দিনে ফুলমায়ার সেই সাজ আজও শুকনার চোখে লেগে আছে। সবুজ নোমাল মাথায়, গায়ের কুর্তি'টা টকটকে লাল, ফেটি কাপড়াটা ফিনফিনে পাতি পাতি আঁকা, পায়ে জুতি। ফুলমায়া কণ্ঠি দুলিয়েছিল গলায়, হাতে চুড়, কানে সুন। আর মুখটা তার ধপ্-ধপ্ করছিল, আঁট বুকটা চিতিয়ে ছিল। হাটের বাজারে ফুলমায়া একটা নীল চশমা কিনল, ফটো তুলল। ফটোর পয়সা দিয়েছে শুকনা। বারো আনা। একদিনের প্রায় গোটা হাজরিটাই। কী খুশী ফুলমায়া। ঘণ্টা-খানেক ধরে সেই ভিজে ভিজে ফটোটায় ফুঁ দিয়েছে, আর বার বার হেসেছে খিল খিল করে। তারপর কুর্তি'র তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে শুকনা মাঠ শেষ করে হাওয়াগাড়ির সড়কের কাছাকাছি পেঁৗছে গেছে যখন, হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পিছু তাকাল। আশে পাশে। ঝাপসা চাঁদের আলোয় ঠিক ঠাওর করতে পারল না কে ডাকছে।

রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামতেই টুনিগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ফুলমায়া।

সামনে এসে দাঁড়াতেই কলকলিয়ে হাসল ফুলমায়া। টুকরিটা নামিয়ে রেখেছে মাটিতে। সোজা পিঠে দাঁড়িয়ে, কোমর বুক টান করে।

ফুলমায়ার হাতটা খপ করে ধরে ফেলল শুকনা।

টানল তো টানল, তাতে যেন কিছু আসে যায় না ফুলমায়ার।

বিড়ি চাইল ফুলমায়া। শুকনা বিড়ি দিল। বিড়ি ধরিয়ে বুক ভর্তি করে ধোঁয়া গিলতে লাগল ফুলমায়া।

"টুকরি ফেলে কোথায় পালিয়েছিলি তুই? তোকে ঘর ঘর খুঁজলাম। এখানে কেন একলা তুই; এই মাঠে, ফাঁকায়?" শুকনা শুধোচ্ছিল।

নাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে তাকাল ফুলমায়া। মুচকি মুচকি হাসি। "তুই আসবি বলে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম রে ছোঁড়া!"

শুকনা বিশ্বাস করলে না। বিশ্বাস করার মতন কথাই নয় এটা। সন্দিগ্ধ চোখে এ-পাশ ও-পাশ দেখতে লাগল।

টুনিগাছের বড় বড় পাতার তলায় চাঁদের আলো ঝিলিমিলি কেটেছে। মাঠ ভরে ভিজে ভিজে জোৎস্না। ক'টা জোনাকি উড়ছে এদিক ওদিক। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

শুকনা এই থমথমে মাঠে, ফুলমায়াকে একা একা পেয়ে আর সামলাতে পারছিল না। চোখ জ্বলছিল বুক জ্বলছিল, হাত দুটো কঠিন হয়ে আসছিল।

শুকনাকে ঠেলে দিল ফুলমায়া। "[illegible]ার সরম নেই হতভাগা। মেলায় গালে চড়িয়েছি, এবার নাক কামড়ে দেব, কান ছিঁড়ে দেব। যা—যা—পালা। ওই দেখ, পঞ্চবীর। দেখতে পেলে ভোজালি বসিয়ে দেবে।" ফুলমায়া বলছিল আর হাসছিল।

পঞ্চবীর। শুকলাই ঘরের সেই জোয়ান পাহাড়ীটা। পাহাড়ী কুত্তার মতন চেহারা। কোথায় সে? শুকনা ভালো করে ঠাওর করে করে চারপাশ দেখছিল। টুনিগাছের তলায় আলো-ঝিলমিল ছায়ায় ফুলমায়ার টুকরিটা পড়ে আছে। পঞ্চবীরকে দেখতে পেল না শুকনা।

শুকনা ভিতু নয়। তবে মদেশিয়াদের মতন রক্তও ওর গরম নয়। একটু যেন ভাবল। তার ঝাড়া হাত-পা—কিছু নেই কাছে। পঞ্চবীর যদি ভোজালি তোলে, শুকনা ঠেকা দিতেও পারবে না।

একটুক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে, শুকনা ফুলমায়াকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে

ল। বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে
তার দিকে এগিয়ে চলল।
চলতে চলতে শুনছিল, শুনতে পাচ্ছিল,
লেমায়া কলকলিয়ে হাসছে। ফাঁকা মাঠে
সিটা ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চবীরের উপর
াক্রোশটা এতক্ষণে দপ করে মাথায় চড়ল।

দলবাহাদুরের মেয়ে ফুলমায়া। ফুল-
ায়ার যত বয়স, বিশ সাল হবে প্রায়, দল-
াহাদুর এই বাগানে। জোয়ান বয়সে
সেছিল, এখন প্রায় বুড়ো। একটা হাতে
ক্ষাঘাত, চোখ দুটো প্রায় অন্ধই হয়ে
ছে। নদীর রাস্তায় এগুতে পাহাড়ী
লিদের যে লাইন—তারই একটাতে থাকে।
াঠের পাতলা তক্তা আর পাতা-ছাওয়া ঘর।
ম্পানির দেওয়া খানিকটা জমি, জনার
ার ডাল ফলায়, শাকসবজি সেই জমিতে।
একটা গরু আছে খয়েরী রঙের। গোঁ-ধরা
াই। লোক দেখলে গুঁতোতে ছোটে।
ার ফুলমায়ার রোজগার। মেয়ের রোজ-
ারটা শুঁড়িখানার মদ গিলতে শেষ হয়ে
ায়। নেশায় সারাটা দিন যেন ঘুমিয়ে
াকে দলবাহাদুর।

ফুলমায়ার বিয়ে হয়েছিল প্রথমে তেজ-
াহাদুরের সঙ্গে। দুশো টাকা পেয়েছিল
লমায়ার বাবা দলবাহাদুর। টাকাটা
ুরিয়ে গেল মদের নেশায়, গরু কিনতে।
ায়ের কাছে টাকা নিতে যায়। এই নিয়ে
গড়া। তেজবাহাদুরের সঙ্গে। ফুলমায়াকে
রের দফায় স্বামী নিতে হল।
হল ভক্তিমতী হল পতিব্রতা। পতিব্রতা
য়েও ফুলমায়া রেহাই পেল না।
র দফা স্বামী পাল্টে হল
তিতা। এখন আবার বাপের কাছে।
ুলমায়ার যা চেহারা, তাতে পাহাড়ী
জায়ানগুলো লেলিয়ে থাকে। বিয়ে
দি করতেই যা এগোয় না। চার দফা
ামী পাল্টেছে মেয়েটা। পতিতার পর আর
কানো বিশেষণ নেই তাদের সমাজে। পাঁচ
ফার স্বামী হতে কেউ আর তাই এগুতে
য় না। দলবাহাদুর বেঁচে আছে। আবার
গড়া বাধবে, স্বামী পাল্টাবে ফুলমায়া।
বয়েসাদিতে কাজ নেই, ফুর্তিফার্তা করতে
লে এক আধটা টাকা খসালেই হবে। ফুল-
ায়া তাতে বড় একটা অরাজী নয়।

আজকাল তাও বন্ধ হয়েছে। ফুলমায়াকে
াস্তাঘাটে ধরাই মুশকিল। একদিকে
পঞ্চবীর, আগলে আগলে চলেছে যেন।
জোড় বাঁধা দড়িতে। পঞ্চবীর না থাকলে
অন্য একটা মদেশিয়া কুলি—শুকনা।

পঞ্চবীর সঙ্গে থাকলে কেউ কোনো কথা
বলে না। সাহস পায় না। নিজেদের জাত
তো, পাহাড়ী। বাঁধুক জোড়। ঈর্ষা
ঈর্ষা লাগে যা। নয়ত দোষ কি!

ডাক দিয়ে নিয়ে গেল নদীতে

কিন্তু শুকনার সঙ্গে দেখতে পেলে
পাহাড়ী ছোঁড়াগুলো যেন লেলান কুকুরের
মতন পিছু তাড়া করে। গালাগাল দেয়,
ঢিল ছোঁড়ে, তালি দিয়ে হাসে। মদেশিয়ারা
থু থু করে। শুকনাকে তারা বাতিল
করেছে যেন। কেউ ডাকে না, কথাও বলে
না প্রায়।

শুকনার কোনো কিছুতেই গ্রাহ্য নেই।
ফুলমায়ার জন্যে ইজ্জত, জাত—সব যেন
বিলিয়ে দিয়ে বসে আছে। আরও পারে—
ফুলমায়া যদি চায়।

কিন্তু ফুলমায়া যে ঠিক কী চায়—
শুকনা বুঝতে পারে না। কতবার অন্ধকারে
লুকিয়ে কুলি-লাইন থেকে পরের মুরগী
ধরে দিয়েছে শুঁড়িখানা থেকে মদ এনে
সাদাশিগাছের ঝোপে বসে খাইয়েছে, পান,
বিড়ি হামেশাই, রোজগারের পয়সা দিয়েছে
গাঁট থেকে, হাট বাজার থেকে গালার কলি,
পাথরের মালা।

তবু ফুলমায়ার মতিগতি ধরতে পারে না
শুকনা।

সেদিন নিজের থেকেই ডাক দিয়ে নিয়ে
গেল নদীতে। রবিবারের দিন। গুদোম
কারখানা সব ছুটি। বলে মাছ ধরব। মাছ
নয় পোকা।

সারা দুপুর ডিহা নদীর ছলছল জলের
পাশে পাথরে পাথরে কাটল। ঘোলাটে জল
চলকাচ্ছিল ডিহার। শন্ শন্ হাওয়া
বইছিল। ইমলি, সাদশি, খাকর, লামপাতি
গাছের ছায়ায় ছায়ায় ফুলমায়া ছুটছিল,
বালিতে লুটোপুটি খেয়ে গড়াচ্ছিল। আর
ঝলক তোলা হাসি, কলকল হাসি—
হাসছিল। ডিহার জল ছোড়াছুড়ি করে
দুপুরটাও কেটে গেল।

বিকেলে আর নদী নয়, পথ। গাছ-
গাছালির মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ।
বাঁশের ঝোপ, পানিশাজের ঝোপ। বুনো
পাখি উড়ছে, দূরে বাগানের হাতি চলেছে
কোথাও, ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজছে তার গলায়।
বুনো ফুল। বুনো গন্ধ। বেশ সতেজ
গন্ধ। বাগানের চা-পাতির নয়।

পাতির গন্ধ শুঁকে শুঁকে যেন ঘেন্না ধরে গেছে শুকনার।

ফুলমায়া শুকনার হাত ধরে হাঁটছিল। গা ঘষছিল মাঝে মাঝে। গা টলিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিল।

বললে ফুলমায়া, "জেঠা এবার মরবে। দু দশ দিনের মধ্যে। তোকে সাদি করব। এই শুকনা, বুঝলি।"

বুকের রক্ত ছলাত করে উঠল শুকনার। কুচকুচে কালো মুখে এক ঝলক রোদ এসে লেগেছে। বাঁ-গালের লম্বা কাটা দাগটা খানিক যেন কুঁচকে উঠেছে। ফুলকি ঝরছে চোখে।

"এ-বাগানে নয়। তোর বাপ মরলে এ-বাগান থেকে আমরা পালাব ফুলমায়া। বাগানে আর নয়। অন্য কোথাও কাজ খুঁজব। চা-বাগান একটা নরক।" ফুলমায়ার কোমর জড়িয়ে গলগল করে বলছিল শুকনা।

খানিক পরে হঠাৎ তার খেয়াল হল, "তা হলে পঞ্চবীর?"

"পঞ্চবীর?" ফুলমায়া কেমন এক ভঙ্গি করে ফিক্ ফিক্ হাসলে। চেপে চেপে। পরিহাস করেই যেন। বীরই বটে। শুকলাই ঘরে ফুলমায়ার সঙ্গে সেদিন রঙ্গ রসিকতা করছিল খুব। ছোট সাহেব হঠাৎ সে-ঘরে এসে পড়ে। তারপর আর কি? পঞ্চবীরের পিছনে জুতোর দু ঠোক্কর। জালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল পঞ্চবীর।

"আর তুই?"

"হাসছিলাম রে, হাসছিলাম।" ফুলমায়া বেআব্রু হয়ে হাসছিল।

"পঞ্চবীর সেই থেকে চটেছে। আসে না আর আমার কাছে। বচনমায়া এখন উঠতি ছুকরি। নতুন পানি পাওয়া পাতিগাছের মত। পঞ্চবীর তার কাছে ঘুরছে ফিরছে।"

ফুলমায়া ছুটে ছুটে হাঁটছিল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। সন্ধে হয় হয়।

বলছিল, পাহাড়ী মেয়েটা সাফসুফ কথা বলছিল, "মদখোর বাপটা মরলেই হয়। আমার ভাবনা কী। তলব আছে আর পাতি-পয়সা। ঘি দুধ খাব আর আসল সোনার কণ্ঠি পরব গলায়। বুঝলি শুকনা। তোর কামাই তুই খাস।"

শুকনা এ-সব কথা কিছুই শুনতে পাচে না। পঞ্চবীর ছোট সাহেবের জুতোর **ঠোক্কর খেয়েছে, দৃশ্যটা মনে মনে** দেখবার **চেষ্টা করছে শুকনা, আর খুব খুশী** হচ্ছে **—খুব। আক্রোশটা যেন ছোট** সাহেবের **জুতোর ঠোক্করেই মিটিয়ে নিচ্ছে ও।**

ফুলমায়া যেন দিন গুনে বলেছিল। পাঁচদিনের মাথায় দলবাহাদুর সত্যিই মারা গেল। গেল ত গেল। ফুলমায়া কাঁদল না। একটা দিন পাতি তুলতে গেল না। পরের দিন থেকে আবার যে কে সেই। পাতির মরসুম—সের পিছু তিন পয়সা। পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে, ছেঁড়া ছাতিটা মাথায় দিয়ে ফুলমায়া চৌপল আর মেলায় মেলায় ঘুরল।

শুকনার সঙ্গে বাগানে আর দেখা হয় না। শুকনা পানি দেয় এক চৌপলে, ফুলমায়া পাতি তোলে অন্য চৌপলে।

ছুটির ভোঁয়ে দেখা। ফুলমায়াকে দেখতে-না-দেখতেই কোথায় যেন মিলিয়ে যায় বেশির ভাগ দিন।

কোথায় যায় ফুলমায়া?

শুকনা আবার একদিন ধরল তাকে সেই ছোটসাহেবের কুঠি পেরিয়ে টুনিগাছের তলায়। খুব নেশা করেছিল ফুলমায়া। নেশা করে ভিজে মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। কুর্তিটুর্তিতে কাদা জল, এখান-ওখান ছিঁড়েছে। ফালি কাপড়টা পর্যন্ত।

ফুলমায়াকে কাঁধে তুলে তার ঘরে পৌঁছে দিল শুকনা।

ফেরার পথে পঞ্চবীরের সঙ্গে দেখা। বাজারের সামনে পানের দোকানে পাহাড়ী কুত্তাটা দাঁড়িয়ে ছিল চকচকে চোখ নিয়ে। শুকনাকে দেখে পানের পিক ফেললে মাটিতে।

সবই দেখল শুকনা। বললে না কিছু। ছোটসাহেবের জুতোর ঠোক্কর খেয়েও শালার গরম কমেনি। না কমুক। ফুল-মায়ার ঘর ছেড়েছে, একদিন বাগানও ছাড়তে হবে।

পরের দিন ফুলমায়ার সঙ্গে দেখা। বাগানেই। এক ফাঁকে বাগানের ঢালু জমিতে পাতির আর শিরীষ গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল দুজনে। ফুলমায়া আর শুকনা।

"তোর মতলবটা কী রে ফুলমায়া? বাপ মরল। মাস কাটল। পাতির মরসুমও শেষ। বাগান ছাড়বি, না পচবি এখানে? এক ঘর, এক খাটিয়া করবি, না করবি না?"

ফুলমায়া হেসে গড়িয়ে পড়ল কথা শুনে। থ্যাবড়া নাক, গোল চোখে রোদের ঝিলিক তুলে শুকনার কোমর পেঁচিয়ে ধরল হাতে।
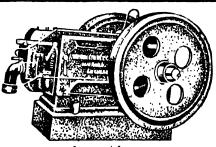
"কাল পাতির পয়সা পাব। চল না কেন কালই পালাই বাগান ছেড়ে।" ফুলমায়া সোহাগ জড়িয়ে বলছিল।

"কাল?"

"ডর লাগছে? কীসের মরদ তবে তুই?"

শুকনার আপত্তি কি? কাল পরশু কি এক মাস এক বছরের আগে পিছুতে তার কিছু আসে যায় না। এ-বাগানে তার টান নেই কোথাও। ফুলমায়া বাদে। ফুলমায়া যদি আজ যেতে চায়, আজ, কাল যেতে চায়, কালই।

শুকনা রাজী।

"তবে কাল আঁধারি হলে আসিস।"

মাথা ঝাঁকাল শুকনা।

তৈরী থাকবে ফুলমায়া—তার ঘরে।

সত্যিই তৈরী ছিল ফুলমায়া। শুকনা বেড়া টপকে ঘরে এসে ঢুকেছে। রাস্তা জুড়ে সেই গরুটা শুয়ে ছিল। থমথমে অন্ধকার। শুকনা খুশীই হচ্ছিল। সাত মাইল পথ হাঁটতে হবে—বাগানে বাগানে, ঝোপে ঝাড়ে। তারপর রেল স্টেশন।

দড়ির খাটিয়ায় গা এলিয়ে বসে ছিল ফুলমায়া। কাঠের গোঁজে ডিবে জ্বলছে। সারা ঘরে কংকটের গন্ধ।

শুকনা ঘরের মধ্যে গা গলিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুলমায়া সত্যিই তৈরী হয়ে বসে আছে। একবার এক খেল এসেছিল বাগানে। বাত্তির খেল। নাচ দেখেছিল শুকনারা সেই খেলে। অনেকটা সেই নাচওয়ালীর মতন। মাথায় লাল নোমাল। গলায় সোনার কণ্ঠি। কুরতিটা চাঁদির মতন ঝিকমিক করছে। ফালি কাপড়টা সবুজ। সুন, কলি, চুড়ি—। ফুলমায়া আগুনের মতন জ্বলছে।

শুকনার লোভ হচ্ছিল, ফুলমায়াকে ঘানিঘরের পাতি পেষাইয়ের মতন পেষাই করে ফেলে।

"চল।" শুকনা দু-পা এগিয়ে এসে ডাকল।

ফুলমায়া উঠল না। চোখের ইশারায় চুপ করতে বললে।

চুপ তো চুপ শুকনা দাঁড়িয়ে।

খস্ খস্ আওয়াজ বাইরে। শুকনা একটু সরে গেল। তাকাল।

পঞ্চবীর এসে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী কুত্তাটা। লাল চোখ। থ্যাবড়া গোল মুখটা লোহার মত কঠিন আর কালো।

পঞ্চবীর ভোজালি বের করছিল।

শুকনা অর্ধস্ফুট একটা শব্দ করে পাশে তাকাতেই কাঠ কাটা কুড়ুল পেল হাতের কাছে। খপ করে তুলে নিল।

মুখোমুখি দুজন। পঞ্চবীর আর শুকনা। পাহাড়ী আর মদেশিয়া। সাদা আর কালো।

পঞ্চবীর সাপের মত চোখ নিয়ে দেখছিল, ভোজালিটা কালোটার গায়ে কোন্ মাংসের মধ্যে গেঁথে দেবে।

আর শুকনা তাগ করছিল কুড়ুলের ফালাটা ওই সাদা শুয়ারের বাচ্চাটার মাথায় না ঘাড়ের পাশে বসিয়ে দেবে।

এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল দুজনে। বাইরে আর একটা শব্দ। পায়ের শব্দ। জোর জোর। ভারী। ছোট-সাহেবের বাবুর্চি মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

ফুলমায়া চোখের পলকে উঠে পড়ল। কলকলিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে যেন উড়েই গেল। মুরগীর মতন। ছোট-সাহেবের বাবুর্চি যেতে যেতে বলছিল, "সাহেব-কুঠিতে তোর জিন্দগী ভোর খানা পরনা!"

ছোটসাহেবের জন্যে ফুলমায়া বাকী জীবনটা তো দিয়েই রেখেছে। ফুলমায়া হাসছিল। বাইরে লামপাতির ডালে ডালে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছিল।

আর ঘরে তখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পঞ্চবীর আর শুকনা। পাহাড়ী আর মদেশিয়া। হলুদ সাদা গায়ের রঙ এক-জনের, অন্যজনের কুচকুচে কালো।

মুরগীটাকে মাঝ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আরও বেশী ফরসা আর লালচে যে, আরও বেশী তাগদ যার।

ছোটসাহেবের কুঠির কাছে টুনিগাছের তলায় ফুলমায়াকে কতবার দেখেছে শুকনা —তার হিসেব এখন আর করছে না ও। পাহাড়ীটাকেই দেখছে।

এর ভোজালি, ওর কুড়ুল।

আর ঘরের ডিবেটা জ্বলছে।

পঙ্গু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ক্রাচদুটো দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে শান্তনু খুব সাবধানে চেয়ারে বসল। এখান থেকে ওয়ার্ডরোবের উপর রাখা ঘড়িটা বেশ দেখা যাচ্ছে। নটা বেজে কুড়ি। অশোকা নীচে নেমেছে ঠিক সাতটায়। তার মানে দুঘণ্টা কুড়ি মিনিট সে গল্প করছে স্কাউণ্ড্রেল অসিত করের সঙ্গে।

শান্তনু বিরক্তিতে ভ্রু কোঁচকাল। অসিতের সঙ্গে তার নিজের পরিচয় বিশ বছরেরও বেশী। স্কুল থেকে শুধু একসঙ্গে পড়েনি, দিনের পর দিন বসেছে পাশাপাশি। বাড়ি থেকে আনা টিফিন ভাগ করে খেয়েছে। একই সঙ্গে ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় গিয়েছে। একটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি নয়। নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে অসিত। সুখদুঃখের অংশীদার।

কলেজ থেকে পাশ করে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়লেও দেখাশোনা ঠিক হয়েছে। শনিবার শনিবার এসেছে অসিত। গল্প করেছে শান্তনু আর অশোকার সঙ্গে। স্টুডিয়োর রংদার সব গল্প। সিনেমা-আকাশের উঠতি তারকাদের কথা, কিংবা পড়তি ধূমকেতুর কাহিনী।

কেলিংটন কোম্পানির আড়াই শো টাকা মাইনের কেরানী শান্তনুর এসব শুনতে খুব ভাল লাগত। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার গল্প। আভিজাত্যের স্তবকে মোড়া বিলাসের অজস্র উপকরণ জড়ানো জীবন।

তখনও কিন্তু শান্তনু কল্পনাও করতে পারেনি, বেনোজল একদিন ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের সব কিছু টেনে নিয়ে ফেলবে বাইরে। সেলুলয়েডের আগুনে ওর সাজানো সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বরাত শান্তনুর।

অফিস ফেরত। ট্রামের হাতলটা ঠিকই ধরেছিল কিন্তু পা'টা কেমন পিছলে গেল। হৈ চৈ চিৎকার। তীব্র একটা যন্ত্রণা। তারপর প্রগাঢ় অন্ধকার। শান্তনুর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হল হাসপাতালে। শিয়রে অসিত। পায়ের কাছে অশোকা। একটু একটু করে সব শুনল। দুটো হাঁটুই বাদ। সারাটা জীবন চলাফেরা করতে হবে ক্রাচ বগলে।

মুহূর্তের জন্য শান্তনুর কাছে পৃথিবী বিবর্ণ ঠেকল। আলো নেই, বাতাস নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকার। নিশ্বাস নেওয়া দুষ্কর।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু সবই সহজ হয়ে এল। প্রথম প্রথম চুপচাপ বিছানায় চিত। কষ্টে এপাশ ওপাশ। তারপর ক্রাচ এল। দু বগলে দুটো। পৃথিবীর আয়তন সীমিত হল গোটা দুয়েক ঘরে।

ভদ্র অফিস। মাস ছয়েক বসিয়ে মাইনে

দিল, তারপর অক্ষমতা জানিয়ে নোটিস। সংগে তিন মাসের মাইনে বাবদ চেক। চেয়ারে পিঠ রেখে চুপচাপ শান্তনু বসে রইল। এ-নোটিশে শুধু ওর কর্মবিরতিই ঘোষিত হয়নি, পৃথিবীতে ওর আর কোন প্রয়োজন নেই, কর্মব্যস্ত সংসারে ও যে অবান্তর এমন একটা অলিখিত ঘোষণাও রয়েছে।

সেদিন বিকেলে অসিত কর এল। স্টুডিয়ো ফেরত মাঝে মাঝে যেমন আসে।

অশোকা রান্নাঘরে। অসিত সোজাসুজি বসবার ঘরে ঢুকেই অবাক।

"কি হে, চুপচাপ বসে যে?"

শান্তনু চিঠি আর চেক অসিতের দিকে এগিয়ে দিল। একবার চোখ বুলিয়েই অসিত সশব্দে হেসে উঠল। "এ তো ভালোই হল। বিশ্ব নিখিল পেয়ে গেলে দু বিঘার পরিবর্তে।"

ব্যথা-ছলছল দুটো চোখ তুলে চাইল শান্তনু। অসিত ওর দুঃখ বুঝবে না। কেউ বুঝবে না।

কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, অসিতই বুঝল। মাস খানেকের মধ্যেই সংসার অচল। টাকা নিঃশেষ, তারপর হাত পড়ল গয়নায়। হার আর কানবালা। বিয়েতে পাওয়া কঙ্কন-জোড়া।

খাটের একপাশে বসে অসিত সব দেখল। এভাবে কতদিন চলবে? গয়না তো অফুরন্ত নয়?

তা নয়, কিন্তু উপায়ই বা কী? এমন নয় যে কিছুদিন পরে কিছু একটা জুটে যাবে শান্তনুর। বিপর্যয়ের মেঘ কেটে যাবে। ফিরে আসবে আলো-ঝলমল দিন।

তাই শান্তনু হাসল, গয়না অফুরন্ত নয়, কিন্তু দুঃখ অফুরন্ত। কোনদিন কিছু হবে এমন আশাও নেই।

তা নেই। বগলে ক্রাচ দিয়ে ভিড় ঠেলে অফিস করবে অসিত, এমন মিথ্যা আশা না করাই ভাল। ঘরে বসে রোজগার করবে সে-রকম বিদ্যাই বা কী জানা আছে।

উপায়!

উপায়ের পথ অসিতই বাতলাল। শান্তনু অচল, তা বলে অশোকা তো আর ঠুঁটো নয়। কোলের উপর হাত রেখে বসে থাকবে চুপচাপ? চোখের সামনে দেখবে গোটা সংসারের অপমৃত্যু?

অশোকা? শান্তনু চমকে উঠল। খাটে হেলান দিয়ে রাখা ক্রাচদুটো সশব্দে পড়ে গেল মাটিতে।

সেজেগুজে চাকরি করতে যাবে এমন লেখাপড়া তো শেখেনি অশোকা। বাড়ি বাড়ি শাড়ি-ব্লাউজ ফিরি করে বেড়াবে। উল কিনে সোয়েটার বুনবে ঘরে বসে। নতুন নতুন প্যাটার্ন। তারপর দোকানে দোকানে জমা দিয়ে আসবে।

"উহুঁ", অসিত ঘাড় নাড়ল, "এ-সব কাজে আর কী টাকা আসবে। মেহনতই সার। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার সামিল। তা নয়।"

ভাল করে চেয়ারে বসে অসিত কথাটা বলল। অশোকার চেহারা বেমানান নয়। চটক আছে চোখমুখের। ফিল্মে ছোট-খাটো পার্ট করার মতন এলেমও আছে। অন্তত অসিতের তাই মনে হয়েছে।

ট্রামের তলায় পড়ার ঠিক আগের অবস্থা। তেমনি অসহ্য যন্ত্রণা। শান্তনু মুখ চোখ কুঁচকে ফেলল। দু হাঁটুতে নয়, এবার যন্ত্রণা বুক জুড়ে।

এতদিন গায়ের গয়না নিয়ে দাঁড়িয়েছে পোদ্দারের দোকানে, এবার নিজে দাঁড়াবে দশজনের সামনে মুখে রং মেখে। তার চেয়ে পাখা টাঙাবার হুকের সঙ্গে পরনের ধুতি জড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়েও তো ঝুলে পড়তে পারে শান্তনু। সব কষ্টের অবসান। সমস্ত দুঃখের ইতি।
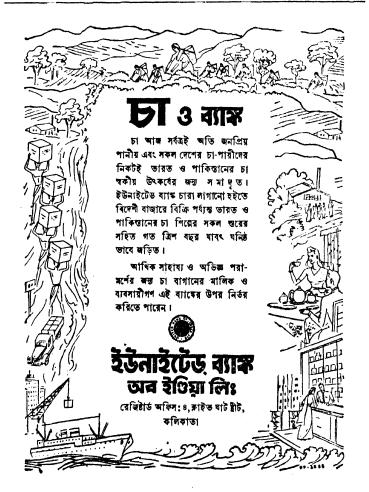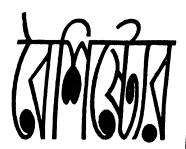
পাইপের ধোঁয়ায় প্রথমে অসিতের সমস্ত মুখটা দেখা গেল না। অস্পষ্ট কাঠামো। প্রশস্ত কপাল, দৃঢ় চিবুক, ভারী গালের কিছুটা। জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে অসিত। গলির মোড়ে মোড়ে পোস্টার। বড় বড় অক্ষরে অসিত করের নাম। সহকারী পরিচালক। শহরের গলি ঘুঁজি থেকে আনকোরা নতুন মানুষ টেনে এনে সেলুলয়েডে তাকে নতুন রূপ দেওয়া। বুনো মাধবীলতাকে মেজে ঘষে চন্দ্রমল্লিকা সাজানো।

মুখ তুলতেই শান্তনুর চোখাচোখি হয়ে গেল অশোকার সঙ্গে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ম্লান বিষণ্ণ মূর্তি। নিজে শান্তনু গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে পারে, পঙ্গুর জীবনের আর কী দাম? কিন্তু তা বলে কী অধিকার আছে ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দরী একজন নারীকে পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করার?

"কি বৌদি, আপনার কী মত?" অসিত সোজাসুজি চাইল অশোকার দিকে।

বিব্রত হল অশোকা। আঁচল দিয়ে কপালের ঘামের মুক্তো মুছে নিয়ে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মুখে।

"আমার আবার কি মত? তোমরা যা বলবে তাই হবে।" কথা শেষ করে অশোকা শান্তনুর দিকে মুখ ফেরাল। শান্তনুর মতেই বুঝি চলবে অশোকা! দুর্বল হৃতশক্তি একটা মানুষের হাতে তুলে দেবে সংসারের হাল। ঝড় ঝাপটা সব সামলে নিরাপদ উপকূলে তরী ভিড়াবে, এমন একটা আশা পোষণ করে।

সেদিন আর কোন কথা হল না। এক সময়ে টেবিল থেকে ফেল্ট-হ্যাট উঠিয়ে নিয়ে অসিত বেরিয়ে গেল।

কথা হল তার পরের দিন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শান্তনুই কথা পাড়ল। "অসিতের কথাটা চিন্তা করছিলাম রাত্রে শুয়ে শুয়ে। ভেবে কিন্তু কোন কূল-কিনারা পেলাম না।"

"এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী।" খুব নরম গলায় অশোকা উচ্চারণ করল কথাগুলো। একটি কথাও কিন্তু শান্তনুর ক[illegible] এড়াল না।

চমকে শান্তনু মুখ তুলল। জানলার পাশে হেলান দিয়ে অশোকা বসে আছে। তেরছা রোদের টুকরো দুটো চোখে, গালের পাশে। কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। মন ঠিক করে ফেলেছে বুঝি অশোকা। আনাড়ী মাঝির হাত থেকে বৈঠা টেনে নেবে নিজের হাতে।

"তুমি তো কোনদিন করনি এ-সব। এত লোকের মাঝখানে ওভাবে অভিনয় করতে খুবই অসুবিধা হবে।" খুব নিস্তেজ গলা শান্তনুর। স্বরে অনুনয়ের মিশেল।

"তুমিও তো এমন করে কোনদিন হাঁটনি ক্রাচ বগলে দিয়ে। অসুবিধা যদি প্রথম প্রথম একটু হয়ই, তো কাটিয়ে উঠতে বেশী সময় নেবে না।"

শান্তনুকে নয়, অশোকা যেন বলছে ভোরের রোদকে, কিংবা রাজপথের চলমান জনস্রোতকে।

কোলের উপর রাখা ক্রাচটার উপর শান্তনু আলগোছে হাত বোলাল। অসীম মমতায়। অগ্নি সাক্ষ্য রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। অশোকার সব ভার নেবার অঙ্গীকার। ধর্মচ্যুত হয়েছে শান্তনু। ব্রতভঙ্গ হয়েছে। অশোকাকে বাধা দেবার আর তার মুখ নেই।

"অসিত আজ আসবে নাকি?" শান্তনু ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, বেলা বারোটা নাগাদ আসার কথা।"

বারোটার অনেক আগেই এল অসিত। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, অশোকার চুড়ির আওয়াজ, সব শান্তনুর কানে এল। প্রাণপণ শক্তিতে বালিশ আঁকড়ে শান্তনু ঘুমোবার ভান করল।

পর্দা সরিয়ে দুজনে এসে চৌকাঠে দাঁড়াল। অসিত আর অশোকা। মনে মনে খুব ইচ্ছা হল শান্তনুর, চোখ খুলে একবার দেখবে কেমন করে নিজেকে অশোকা সাজিয়েছে। বেছে বেছে কোন রংয়ের শাড়িটা সে পরেছে। কত রং মেখেছে মুখে আর গালে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মান আহুতি দেবার অপচেষ্টা।

চোখ খুলতে যেতেই অশোকার গলার আওয়াজ কানে এল, "ভেবেছিলাম প্রথমদিন প্রণাম করে যাব, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"প্রণাম?" অসিতের ভারী কণ্ঠস্বর।

হয় তো অসিত বলতে চেয়েছিল, পায়ের বালাই যার নেই তাকে প্রণিপাত!

কিন্তু আর কোন কথা নয়। পর্দা টেনে দেওয়ার শব্দ। সিঁড়িতে ক্রমবিলীয়মান পায়ের আওয়াজ।

সাবধানে ক্রাচদুটো বগলে দিয়ে শান্তনু উঠে পড়ল। গিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে। স্পষ্ট দেখা যায় সামনের রাস্তার ফালি। কোথা থেকে একটা মোটর জোগাড় করেছে অসিত।

খুব কুণ্ঠিত গতি অশোকার। পায়ে পায়ে অনেক লজ্জা, অনেক সঙ্কোচ যেন পার হয়ে চলেছে। বিলাস নয়, প্রাণধারণের প্রচেষ্টা। নিজে বাঁচা নয়, আরো একটা মানুষকে বাঁচানো।

খুব ভাল লাগল শান্তনুর। এ জড়তা-টুকু যেন কোনদিন না কাটিয়ে উঠতে পারে অশোকা। স্ত্রীর উপার্জনের কদন্নে রুচি নেই শান্তনুর। শালীনতা আর শুচিতার বিনিময়ে এ বাড়তি অন্নে তার লোভ নেই। অসিত যাই কিছু বোঝাক, শিল্পধর্মের গোড়ার কথা, শিল্পীর মালিন্যহীন জীবন, কিন্তু বন্ধুদের কাছে শান্তনু অনেক শুনেছে। সেলুলয়েডে নিজেদের ছায়া ফোটাতে কায়ার কৌলীন্য ঘোচাতে হয়েছে অনেক শিল্পীকে।

নিজের মনকে নিজেই শান্তনু বোঝালে। সকলেই যে এমন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। নিজের পবিত্রতা বজায় রেখে ধাপে ধাপে যশের শিখরে উঠেছে এমন চিত্রাভিনেত্রীও কম নেই। তাদেরই একজন হোক অশোকা। সংসার বাঁচাতে এ-পথে পা বাড়িয়েছে এ-চিন্তা যেন সব সময়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

ক্রাচ দুটোর ভর দিয়ে আবার শান্তনু বিছানায় ফিরে এল। অশোকা যেন ওর বাড়তি ক্রাচ। আর এক অবলম্বন।

মাস কয়েক পরে অশোকা নিজেই বলল। শান্তনু দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেটে টান দিচ্ছিল। অশোকা পাশে এসে দাঁড়াল।

"জানো, আজ আমাদের প্রজেকশন।"

"প্রজেকশন?"

"হ্যাঁ, এ-পর্যন্ত যেটুকু ছবি তোলা হয়েছে, সেটুকু দেখানো হবে স্টুডিয়োর প্রজেকশন-রুমে। ভুলচুক যদি কিছু হয়ে থাকে, বদলানো যাবে।"

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে শান্তনু টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। হাসল মনে মনে। সব ভুলচুক কি ঠিক করা যায়। কত ভুলের জের সারাটা জীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হয়। সামান্য একটু ভুলে দুটো পা-ই শান্তনুর বরবাদ হয়ে গেল। তেমনি সংসার চালানোর জন্য এ-পথে পা বাড়ানোই হয়তো ভুল হয়েছে অশোকার। সে-ভুল সংশোধন করার পথ অবশ্য এখনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু অশোকা কি রাজী হবে তাতে।

"আজ তাড়াতাড়ি চান করে নেবে। বারোটার মধ্যে রওনা হতে হবে।"

নড়ে চড়ে শান্তনু সোজা হয়ে বসল। দুচোখে বিস্ময়ের ঝিলিক।

"আমি? আমি কোথায় যাব?"

"বা রে", অশোকা মিষ্টি হাসল, "আমার প্রথম বইয়ের প্রজেকশান তুমি দেখতে যাবে না?"

তার মানে? সংসারের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে অশোকা, সেটাই বুঝি দেখাতে চায়? দেখাতে চায়, শান্তনুর জন্য কতটা নীচে নামতে হয়েছে অশোকাকে?

"কিন্তু আমাকে আবার কেন?" শান্তনু আমতা আমতা করল। কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে সাবধানে ওকে চলাফেরা করতে হয়। উঁচু-নিচু জায়গা অদ্ভুত কসরত করে পার হতে হয়। আশপাশের মানুষদের মনে দরদ জাগবে হয় তো, সমবেদনার ছিটে। মুখে আহা না বললেও, মনে মনে দুঃখ করবে। অশোকা দেবীর খোঁড়া স্বামী। অক্ষম, পঙ্গু। তাই তো অশোকা দেবীকে এ-পথে আসতে হয়েছে। পর্দার ঝলমলে মায়ার প্রলোভনে নয়, সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাতে। শান্তনুর উপর ব্যথা জাগা মানেই, ধাপে ধাপে তুলে ধরা অশোকাকে। সাধারণ অভিনেত্রী নয় অশোকা, দারিদ্র্য দূর করার দুর্বার সাধনা নিয়ে এ-পথে পা বাড়িয়েছে। সেইজন্যই বুঝি শান্তনুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার জন্য এত চেষ্টা।

"অসিতবাবু সাড়ে এগারোটার মধ্যেই আসবেন। একটুও দেরি কর না। কোথাও

আজ আমাদের প্রজেকশন

তো বেরনো সম্ভব হয় না, চলই না আমাদের সঙ্গে।"

অসিত সাড়ে এগারোটা নয়, এসে হাজির হল পৌনে এগারোটার মধ্যেই। তার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে জামা-কাপড় পরে শান্তনু তৈরি। অশোকা যত্ন করে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। রুমালে এসেন্সের ছিটে। ধুতি কুঁচিয়ে দিয়েছে বসে বসে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শান্তনুর ভালই লেগেছে।

একটা ইংরেজী গানের কলি শিশ দিতে দিতে অসিত সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। শান্তনুকে দেখেই শিশ থামিয়ে বলল, "দ্যাট্‌স লাইক এ গুড বয়। সেজে গুজে একেবারে তৈরী।"

শান্তনু ম্লান হাসল, "কিন্তু তোমাদের ও গতির রাজত্বে আমার মতন পঙ্গুকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন বল তো?"

সিগারেটের টিন টেবিলের উপর রেখে অসিত উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। পাড়া কাঁপিয়ে।

"বেশ বলেছ হে কথাটা। গতির রাজ্য। ওখানে বাড়তি একটা পা থাকলেই যেন ভাল হয়। ফিল্মের ফিতে যেমন ছুটছে, তেমনি জোরে ছুটছি আমরা।"

"তাইতো বলছি, আমাকে ওখানে কেন?"

কী একটা বলতে গিয়েই অসিত থেমে গেল। হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, "দাঁড়াও, বৌদিকে একবার তাড়া দিয়ে আসি।"

"প্রোজেকশন শুরু তো বারোটায়।" স্টুডিয়ো-জগতের ভাষা ব্যবহার করতে পারার আনন্দে খুব খুশী খুশী দেখাল শান্তনুকে।

"হ্যাঁ, তার আগে আমাকে ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে যেতে হবে একবার। আধ-ঘণ্টার মতন সময় লাগবে।"

অসিত ঘরের মধ্যে ঢুকল না, চৌকাঠে দাঁড়িয়েই অশোকাকে তাড়া দিল, "একটু তাড়াতাড়ি করে। এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

অশোকা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু ভিতর থেকে শাড়ির খসখস শোনা গেল, অলঙ্কারের শব্দ।

অসিত আবার ফিরে এসে বসল শান্তনুর মুখোমুখি। কথা বেশী হল না। পকেট থেকে নোট বই বের করে অসিত কী সব লিখল। থুতনিতে হাত দিয়ে ভাবল কয়েক মিনিট। ব্যস্ত লোক, কাজের অন্ত নেই।

"আমার হয়ে গেছে।"

আচমকা গলার আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল। অসিত আর শান্তনু। কিন্তু সাজপোশাকের ঘটা দেখে শান্তনু আবার চমকাল। সাদা সিফন, হালকা প্রসাধন আর স্বল্প আভরণে চমৎকার সজ্জা।

খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে শান্তনুকে নামানো হল। একদিকে অসিত, অন্যদিকে অশোকা। নামতে নামতে কথাটা শান্তনুর মনে হল। শুধু চলাফেরাই নয়, বাঁচবার জন্যও এই দুজনের সাহায্যের উপরই নির্ভর করতে হবে শান্তনুকে। দিনের পর দিন।

শান্তনু যা আশা করেছিল তার কিছুই হল না। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। ওদের গাড়ি থামতে কেউ ছুটে এল না। কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে কেউ ওর দিকে ফিরেও চাইল না। প্রজেকশন রুমের সামনে লোকের জটলা। দু-একজন নমস্কার করল অসিতকে। কুশল প্রশ্ন করল। দু-একজন মুচকি হাসল অশোকার দিকে ফিরে, ব্যস ওই পর্যন্ত।

অশোকা আর শান্তনু বসল পাশাপাশি। অসিত অন্য জায়গায়। আলো নিভে আসতেই অশোকার উত্তপ্ত সান্নিধ্য শান্তনু নতুন করে অনুভব করল। চুলের গন্ধ, নতুন শাড়ির খসখস, রুমালের মদির সুরভি। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে অশোকাকে স্পর্শ করতে গিয়েই বাধা পেল। এবারে হাত ঠেকে গেল। কঠিন, নির্মম কাঠের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কোলের উপর দুটো হাত জড় করে শান্তনু বসে রইল।

এমন কিছু বড় পার্ট নয় অশোকার। প্রথমদিকে কলসি কাঁখে ঘাট থেকে জল আনা। মাঝপথে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়ার একটা কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দেওয়া, তারপর প্রায় শেষের দিকে নায়িকার বিয়ের সময় তাকে সাজিয়ে দেওয়া। সেখানে সমবয়সী কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে হাল্কা পরিহাস। আগে থেকে অশোকা বলে না রাখলে হয়তো দেখতেই পেত না শান্তনু। হঠাৎ কখন মুছে যেত চোখের সামনে থেকে।

অভিনয়ের ভাল মন্দ অত খুঁটিয়ে শান্তনু দেখল না। পার্টটা ছোট, এতেই খুশিতে তার মন ভরে গেল। দরকার নেই নায়িকার পার্ট করে। নায়কের অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাসি কান্নার খেলা দেখালে শান্তনুর বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠত। তার চেয়ে এই ভাল।

কাঁধের উপর হাত ঠেকতেই শান্তনু চমকে উঠল। ফিরে দেখল অসিত কখন পিছনে এসে বসেছে।

"কেমন দেখছ?"

"ভালই তো।"

"আরে এ আর কি দেখছ। প্রথম বই বলে সাহস করে বড় পার্ট দিইনি বৌদিকে।

এর পরের বইটাতে দেখো একবার। 'রাঙাকমল'এ কি রকম চান্স দিই।"

"নায়িকার পার্ট?" আচমকা শান্তনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কথাটা। অসিত কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। ইতস্তত ভাবটা সামলে নিয়ে বলল, "না, মানে নায়িকার পার্ট ঠিক নয়, তবে উপনায়িকা বলতে পারো।"

আর কথা হল না। ছবি শেষ হতে সকলে বাইরে বেরিয়ে এল। এবারেও শান্তনুর দু পাশে অশোকা আর অসিত।

মোটরে উঠতে যাবার মুখেই অসিত থেমে গেল। একটু দূরে একটা জটলা। একটি লোককে ঘিরে বেশ ভিড়।

"এক মিনিট।" অসিত দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

এক মিনিট নয়, অসিত ফিরল প্রায় মিনিট বিশেক বাদে, সঙ্গে সৌম্য চেহারার এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক।

"তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই শান্তনু, ইনিই ধনরাজ নাহাটা, আমাদের প্রডিউসার।"

মোটরের গায়ে হেলান দিয়ে শান্তনু দাঁড়িয়ে ছিল, সাবধানে সরে এসে দু হাত তুলে নমস্কার করল।

"এ'র কথা তো বলেছি আপনাকে। ইনিই অশোকা দেবীর স্বামী।"

"হুঁ হুঁ," ধনরাজ সবেগে ঘাড় নাড়ল, "এ'র কথা আমি আগে ভি শুনিয়েছে। এ'র দুঃখ দূর করার জন্যই অশোকা দেবী এ-লাইনে নামিয়ে পড়িয়েছেন। তাই না অশোকা দেবী?"

অশোকা মাথা নিচু করে হাসল। চটি দিয়ে পথের কাঁকর সরাল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে বলল, "ধনরাজজী, প্রজেকশন কেমন দেখলেন বলুন? ভালো লাগল আমার পার্ট?"

ধনরাজের দুটো চোখ চকচক করে উঠল, পরিপুষ্ট গালে রক্তের ছিটে। মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসাতে বসাতে বলল, "বই তো ভালোই হইয়েছে, এখোন পাবলিক কিভাবে নেয় দেখি। সবই নসিবের খেলা। লেকিন, আপনার পার্ট বেশ হইয়েছে। চলন, কোথাবার্তা সব ঠিক।"

ধনরাজ আর-একবার পরিতৃপ্তির হাসি ফোটাল মুখে। উত্তরে অসিত আর অশোকা দুজনেই মুখের ভাঁজে চরিতার্থ হওয়ার আমেজ আনল।

বাইরের জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য আলাদা আলাদা দেবতা আছেন, কিন্তু স্টুডিয়ো জগতে প্রডিউসার একাধারে সব।

ধনরাজ পিছন ফিরতেই অসিত মোটরের দরজা খুলে দাঁড়াল, "তোমরা যাও শান্তনু, আমি একটু কাজ সেরে পরে ফিরব।"

গাড়ির মধ্যে আবার শান্তনু আর অশোকা পাশাপাশি। বাতাসে অশোকার শাড়ির আঁচল শান্তনুর কাটা পা দুটোর উপর। মোড় ঘুরবার সময়ে গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি।

"জানো অশোকা?" শান্তনু অশোকার দিকে ঘুরে বসবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কোথায় অশোকা। গালে একটা হাত রেখে একমনে কি ভাবছে। সাড় নেই।

"অশোকা!" শান্তনু গলা চড়াল।

"হুঁ," চমকে সরে বসল অশোকা, শাড়ির আঁচল হাতে জড়াতে জড়াতে বলল "কিছু বললে?"

"কী ভাবছিলে?" অশোকার একটা হাত শান্তনু নিজের হাতে তুলে নিল। চনচনে রোদ। চারপাশে পথচলতি লোকের অভাব নেই। এমন সময় কী কাণ্ড শুরু করেছে শান্তনু। স্ত্রী ভাল অভিনয় করেছে পর্দায়, সেই আনন্দে বুঝি আর জ্ঞান নেই। খুব আস্তে অশোকা শান্তনুর হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

"কী ভাবছিলাম, জানো?" খুশি-ঝলমল মুখে অশোকা বলতে শুরু করল, "ভাবছিলাম কবে সেদিন আসবে যেদিন আমাদের বাড়িতে ডিরেক্টারের ভিড় লেগে যাবে। আমার নাম আর ছবি দেখলে মানুষ জমাট হয়ে দাঁড়াবে সিনেমার দরজায়। প্রডিউসর ব্ল্যাংক চেক ধরবে আমার সামনে।"

রাস্তার গলা পিচ যেন কে আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিল। মিইয়ে এল রোদের তেজ। শান্তনুর মনে হল, দিনদুপুরে বুঝি রাত্রি নামল চোখের সামনে।

একটু পরেই বোধ হয় অশোকা নিজের ভুল বুঝতে পারল। গাঢ় করল গলার স্বর। শান্তনুর দিকে হেলে পড়ে বলল, "অনেক টাকা পাওয়া মানেই তোমায় অনেক সুখে রাখা। ওষুধপত্র, ফলপাকুড়, তোমার জন্য কীই বা আমি করতে পারছি।"

গলার আওয়াজে মনে হল, অশোকার চোখের কোণে বুঝি জলই জমা হয়েছে। সত্যি সত্যিই অশোকা আঁচল তুলল চোখের সামনে।

আশ্চর্য হয়ে গেল শান্তনু। আগামী দিনের অভিনয়-নৈপুণ্যের কিছুটা অশোকা বুঝি এখনই দেখাবার চেষ্টা করছে! তালিম দিচ্ছে ভবিষ্যতের জনপ্রিয়া নায়িকা।

দুটো হাত বুকে জড় করে শান্তনু চুপচাপ বসে রইল। একটি কথাও না, একবার ফিরেও চাইল না অশোকার দিকে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতে শান্তনু কসরত করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। অশোকার সাহায্য ছাড়াই। ড্রাইভার এগিয়ে আসতে তাকে হাত নেড়ে বারণ করল। কাউকে দরকার নেই। রেলিং আর ক্রাচে ভর দিয়ে ঠিক উঠতে পারবে শান্তনু। আর আচমকা পড়ে গেলে তো তার নতুন করে পা ভাঙবার ভয় নেই।

তারপরে আরো দু-একবার প্রজেকশন দেখার আমন্ত্রণ এসেছে। শান্তনু এড়িয়ে গেছে ছল ছুতো করে। শরীর খারাপ, কোমরে ব্যথা। অশোকা আর অসিত দুজনের কেউই তেমন জোর দেয়নি। তবু অসিত যাও-বা দু-এক বার বলেছে মুখ ফুটে, অশোকা বারণ করেছে।

"কি দরকার অসুস্থ লোককে টানাহেঁচড়া [illegible]রার। প্রোজেকশন আর কী দেখবে।"

প্রজেকশন দেখায়নি বটে শান্তনুকে, কিন্তু বাড়ি বয়ে অশোকা 'স্টীল' বয়ে [illegible]নেছে। হরেক রকমের ভঙ্গী, বিভিন্ন [illegible]াশাকে।

"এ-পোশাকে কেমন মানিয়েছে বল তো?" [illegible]কটা ছবি শান্তনুর সামনে তুলে ধরেছে। [illegible]লমলে শাড়ি পরা, খোঁপায় ফুলের মালা, [illegible]ছে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ছবি।

শান্তনু উত্তর দেয়নি। এ-কথাও [illegible]লেনি, অভিনেত্রীর পোশাকে একটুও [illegible]নায় না অশোকাকে। ভুল করেছে অশোকা। [illegible]ব ভুল করেছে। তুলসীতলার নিরুত্তেজ [illegible]ন্ত দীপশিখা থেকে আগুন ধার নিয়ে [illegible]শাল জ্বালিয়েছে। একটু এদিক ওদিক [illegible]লে ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সে-[illegible]য়ালও বুঝি নেই।

মাঝে মাঝে শান্তনুর মনে হয়েছে, বুঝিয়ে [illegible]লবে অশোকাকে। সামনাসামনি বসিয়ে [illegible]জের মনের কথা। এসব ছেড়ে দিক [illegible]শোকা। সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের ভাল। তার চেয়ে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে শান্তনু ক্লাশ খুলবে বাইরের ঘরে। ওঠা হাঁটার বালাই নেই, চুপচাপ বসে বসে পড়ানো। তা শান্তনু খুব পারবে। কিন্তু কখন বলবে অশোকাকে। দিনে রাতে তার একটুও সময় নেই। হরদম লোক আসছে গাড়িতে। পায়ে হেঁটে, মোটরে চড়ে। অবস্থা যে ফিরেছে সেটা উপরের ঘরে বসে বসেই শান্তনু টের পায়।

বেলজিয়ান কাচ আঁটা নতুন আলমারি, পুরনো আলনা বরবাদ করে পালিশ-চকচকে আলনা। এতদিন মাটিতে আসন পেতেই ওরা খেত, এখন কালো লম্বা টেবিল পড়ল ঘরের মাঝখানে। অবশ্য অশোকার সঙ্গে খাওয়ার ভাগ্য আর হয়ে ওঠে না। সকাল নটার মধ্যেই অশোকা বেরিয়ে যায়; ফেরে যখন, শান্তনু তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ছুটির দিনও কিছু-না-কিছু কাজ থাকে অশোকার। আজ পার্টি, কাল ডিরেক্টরের বাড়ি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আর একদিন কোন সিনেমায়।

কিন্তু এতে আপত্তি করার শান্তনুর কী থাকতে পারে? শান্তনুর সেবাযত্নের কোন ত্রুটি না হয়, সেজন্য দিনরাতের পুরো চাকর একটা রেখেছে। সব সময় শান্তনুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। বিকেলের দিকে ধরে ধরে বাইরের দাওয়ায় পাতা বেতের চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসাবে। স্নান করান, খাওয়ান সমস্ত করবে।

তা ছাড়া, পড়তে ভালবাসে শান্তনু। অফিসে কাজ করবার সময় অফিসের লাইব্রেরি থেকে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে শান্তনু বই নিয়ে আসত। বই হাতের কাছে পেলে বউয়ের কথা আর মনে থাকত না।

সেই জন্যই প্রত্যেক সপ্তাহে অশোকা ঝকঝকে তকতকে নতুন নতুন বই নিয়ে আসে। ইংরেজী বাংলা দুইই। কত পড়বে পড়ুক শান্তনু। কিন্তু আশ্চর্য, বইতেও শান্তনুর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কোনটার অর্ধেক, কোনটার দু পাতা, কোন বইটা হাতে ধরে ছুঁয়েও দেখেনি একবার। প্রথম প্রথম বইগুলো বিছানায় ছড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকত। কান পেতে শুনত নীচের ঘর থেকে ভেসে আসা কলহাস্যের শব্দ। কিছুদিন পরে, বই দেখলেই চটে উঠত। বইয়ের গোছা সব তুলে রাখল আলমারির মাথায়। পুরনো কাগজ চাপা দিয়ে দিল। চলতে ফিরতে চোখে না পড়ে।

"কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট কর বই কিনে?" শান্তনু একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল অশোকাকে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভ্রুর মাঝখানে খুব সাবধানে টিপ আঁকছিল অশোকা, শান্তনুর কথায় হাত কেঁপে গেল। অশোকা ঘুরে দাঁড়াল। দু চোখে বিরক্তির ছিটে।

শান্তনুর মনে হল অশোকাও বোধ হয় স্পষ্টই বলবে, যে পয়সাটা নষ্ট করি সেটা আমারই রোজগারে। কৈফিয়ত তলব করার তুমি কে?

কিন্তু এসব অশোকা কিছু বলল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শান্তনুকে দেখলে। পরিচর্যার জন্য চাকর রয়েছে, সমস্ত সময় রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে, অথচ এমন চেহারা হয়েছে কেন তার? উস্কো খুস্কো চুল, চোখের নীচে কালির পোঁচ সব ছাড়িয়ে কেমন অসহায় ভঙ্গী।

ঠোঁট কামড়ে অশোকা সামলে নিল নিজেকে। বলল, "কিন্তু এক সময়ে বই তো খুব ভালই বাসতে তুমি? বই পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতে।"

সে আর-এক যুগে। তখন সমস্ত পৃথিবী শান্তনুর আয়ত্তে ছিল। স্বাধীন নবাবী আমল। নিজের পায়ে সে চলাফেরা করত, জীবনধারণ করত নিজের উপার্জনে। তখনকার ভাল লাগার সঙ্গে আজকের ভাল লাগার সম্পর্ক থাকতে পারে না।

অশোকাও কি ঠিক আছে আগের মতন? আগে যা ভালবাসত আজও তাই ভালবাসে?

শান্তনুর চিন্তার জাল ছিঁড়ে কুটিকুটি। অশোকা আরো এগিয়ে খাটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। শান্তনুর খুব কাছে।

"কত করে বললাম প্রজেকশন দেখতে চল, সিনেমার প্রিভিউতে চল, ভিড় নেই নির্ঝঞ্ঝাটে বসে দেখতে পারবে, তা তুমি ঠুঁটো হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবে, আমি কী করব?"

"ঠুঁটো মানুষ ঠুঁটো হয়ে বসবে না?" পরিহাসতরল গলায় শুরু করলেও শেষ দিকে শান্তনুর গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল।

অশোকা আর দাঁড়াল না। নীচে মোটরের শব্দ। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

সেদিন হঠাৎ সুকুমার এসে হাজির। অফিসের বন্ধু। বহুদিন দেখা সাক্ষাত নেই। হাসপাতালে কয়েকদিন গিয়েছিল। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকার সময় বাড়িতেও এসেছে কয়েকদিন। তারপরে আর সুযোগ-সুবিধা হয়নি। নিজের সংসার নিয়েই সবাই বিব্রত। পরের খোঁজ খবর নেবার অবসর কোথায়।

শান্তনু বিছানায় কাত হয়ে শুয়েছিল, পিছনে জুতোর আওয়াজ হতে মুখ ফেরাল। "কে অসিত?"

কোন উত্তর না পেয়ে শান্তনু ঘুরে বসল।

না অসিত নয়, সুকুমার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ঘরের সাজসজ্জা, আসবাবপত্র।

"না, বাজারে যা গুজব তা মিথ্যে নয় দেখছি।"

"কী গুজব হে?"

"এই তোমার স্ত্রী বেশ দু পয়সা রোজগার করছেন। বাড়ির ভোল ফিরিয়ে ফেলেছ। ছি, ছি, ছি, তুমি মানুষ না কী হে?"

কথা শেষ করে সুকুমার সামনের চেয়ারে এসে বসল। সুকুমার ঠিক এই ধরনের লোক। কারো মুখ চেয়ে কথা বলে না। কালোকে কালোই বলে, ইনিয়ে বিনিয়ে
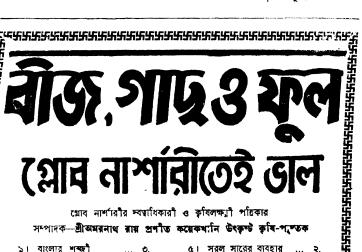
জ্জ্বল শ্যাম বলার চেষ্টা করে না। ওর থায় কে কী মনে করল, সে-কথা ভাবেও া একবার।

বেশ বুঝতে পারল শান্তনু, এই কথাগুলো বলবে বলেই সুকুমার আজ এসেছে।

"আর উপায় কি বল। আমি তো এই অবস্থায় পড়ে আছি। তবু যা-হোক করে শোকা চালাচ্ছে সংসার।"

"গলায় দড়ি তোমার।" সুকুমার চেঁচিয়ে ঠল। বাজার থেকে বেত কিনে এনে বসে সে ঝুড়ি সাজি তৈরি করলেও তো পার। সে বসে কাজ, তাতে পায়ের দরকার হয় া। আমায় খবর পাঠিও, তোমার ঝুড়ি াজি আমি দোকানে দিয়ে আসব। স্ত্রী হচ্ছে অর্ধাঙ্গিণী, নিজের যেটুকু অঙ্গ খুইয়েছ তো সামান্যই। অর্ধ অঙ্গ যে খোয়াতে সেছ সে-খেয়াল আছে?"

অনেকক্ষণ শান্তনু চুপচাপ বসে রইল। আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গেল। এ-কথা শুধু সুকুমারেরই নয়, এ যে ওর নিজেরও কথা। কতদিন ভেবেছে ন শক্ত করে সোজাসুজি অশোকাকে বলবে। এভাবে প্রাণধারণের গ্লানির বোঝা আর বইতে পারছে না শান্তনু, ওকে অশোকা মুক্তি দিক।

"দুটো পা'ই না হয় গেছে, তা বলে দুটো চোখের মাথাও কি খেয়ে বসে আছ? আমি তো তোমার স্ত্রীর বই কটা দেখেছি, ওই তো ক'লাইনের পার্ট, তাতে ঘরদোরের চেহারা যে এমন করা যায় না, এটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি নিশ্চয় রাখ। তা ছাড়া—" সুকুমার একটু দম নিল। পকেট থেকে ভাঁজ করা রুমাল বের করে মুছে নিল ঘাড় আর কপাল, তারপর বলল, "মানে, আমি তোমার হিতৈষী বলেই বলছি, দিন কতক আগেও দেখলাম গড়ের মাঠে তোমার স্ত্রী বসে রয়েছেন, গোটা তিনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পাছে চোখোচোখি হয়ে যায়, এই ভয়ে আমি আর পালাবার পথ পাই না।"

বালিশে হেলান দিয়ে শান্তনু শুয়ে পড়ল।

"তুমি শক্ত হও শান্তনু, না হলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার ঠিক নেই।" উঠতে উঠতে সুকুমার বলল, "এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করেই যাই তোমার সঙ্গে।"

সুকুমার রাস্তায় পা দেবার পর শান্তনুর খেয়াল হল। এতদিন পরে এল সুকুমার, এক কাপ চা অন্তত খাওয়ান উচিত ছিল।

সুকুমারের কথাগুলো ভাবতে লাগল শান্তনু। একটু রূঢ়, কিন্তু অন্যায় তো নয়। বন্ধুবান্ধব তো আসবেই সাবধান করতে, নয়তো উটকো মানুষের আর কি দরদ। মনে মনে শান্তনু হিসাব করল। ইদানীং খাওয়া-দাওয়াই শুধু ভাল হচ্ছে তা নয়, রোজই কোন একটা দামী জিনিস হাতে করে অশোকা বাড়ি ফিরছে। অসিতের

মুখেই শান্তনু শুনেছে অনেকবার। ছোট-খাটো পার্ট করে অশোকা। অল্প কথার। কিন্তু তাতে এ-বৈভব সৃষ্টি কি সম্ভব? তবে?

অন্যদিন এতক্ষণে শান্তনু ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক রাতে ফেরে অশোকা। প্রায় দিনই খায় না বাড়িতে। আজ কিন্তু জানলার ধারে চেয়ার নিয়ে শান্তনু ঠায় বসে রইল। একটার পর একটা সিগারেট। গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। শান্তনু মন ঠিক করে নিল। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই।

মোটরের শব্দ হতেই শান্তনু উঁকি দিয়ে দেখল। অসিত আর অশোকা। অসিতের কোটের ফ্ল্যাপে লাল টকটকে ফুলটা গ্যাসের আলোয় আরো লাল মনে হল। হাসির শব্দ। দু-একটা টুকরো কথা। বাড়ির নীচে অবধি অসিত পৌঁছে দিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। হালকা গানের কলি। খুশিতে টলমল করছে অশোকা।

ক্রাচ দুটো দু পাশে নিয়ে শান্তনু ঠিক হয়ে বসল। চৌকাঠে পা দিয়েই অশোকা চমকে উঠল। কেউটে যেন ছোবল তুলেছে বুক বরাবর। তারপরই অশোকা সামলে নিল নিজেকে, "একি, এখনও ঘুমোওনি তুমি?"

কিছু বলল না শান্তনু। আর কত ঘুমোবে। চোখের সামনে তার সব কিছু হারিয়ে যাবে একে একে, আর দু চোখে ঘুমের নীল বিষ মাখিয়ে চুপচাপ সে পড়ে থাকবে মুখ বুজে!

অশোকার আপাদমস্তক শান্তনু নিরীক্ষণ করল। অসিতের কোটের ফুল অশোকার চুলে। দু চোখে আনন্দের ঝিলিক, দু গালে ধার করা লালিমা।

একটু একটু করে, থেমে থেমে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে শান্তনু সব বলল। এতদিনের পুঞ্জিত আক্রোশ উজাড় করে দিল। পঙ্গু স্বামীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কোন অতলে নামছে অশোকা? সুখস্বাচ্ছন্দ্য ক্রয় করছে কিসের বিনিময়ে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিল অশোকা। প্রজেকশন না শুটিং?

আবির ছড়িয়ে গেল অশোকার মুখে। দু চোখে আগুনের ফুলকি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শান্তনুর কথা শেষ হতে পায়ে-পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

"তোমার মতন লোকের কাছ থেকে এর বেশী আমি আশাও করিনি। তোমার কথার উত্তর দিয়ে নিজেকে ছোট করতে চাই না। আজ কেন রাত হল সেটা অন্তত শোন। অসিতবাবুর সঙ্গে সার্জন মরিসের কাছে গিয়েছিলাম। ক'দিনই ঘুরছিলাম, কিছুতেই আর যোগাযোগ হয়ে উঠছিল না।"

একটু থামল অশোকা। বেতের হাতব্যাগ খুলে মাঝারী গোছের একটা শিশি বের করে সামনের টেবিলে রাখল।

"এটা মালিশ করতে বলেছেন। নার্ভ-গুলো সতেজ হবে। মাসখানেক পর তোমাকে নিয়ে যেতে হবে একবার। চামড়া-ঢাকা নকল পা লাগিয়ে দেখা চেষ্টা করবেন। সেটা হয়ে গেলে কাঁধে ভর একটু অবশ্য দিতে হবে, কিন্তু অনেক সহজ ভাবে তুমি চলাফেরা করতে পারবে।"

সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নেওয়ার ভঙ্গীতে শান্তনু হাত বাড়িয়ে মালিশের শিশি টেনে নিল। ঝুঁকে পড়ে নেবার সময় খুব হাল্কা একটা গন্ধ। মুখ তুলেই অশোকার লালচে দুটি চোখের উপর দৃষ্টি পড়ল। ঠিক বোঝা গেল না। নেশায়, না স্বামীর মঙ্গল-চিন্তায়, সে-কথা ভাববার অবসর নেই শান্তনুর।

দু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মালিশের শিশিটা শান্তনু দেখতে লাগল। পীতাভ তরল পদার্থ। স্নায়ুতন্ত্রী সতেজ হবে, পরিপুষ্ট উপশিরা, তারপর একদিন নকল জোড়া পায়ের উপর ভর দিয়ে শান্তনু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ সুকুমারের কথাটা মনে হল। সহধর্মিণী অর্ধ অঙ্গের সামিল। তিলে তিলে নষ্ট হচ্ছে সে-দিকে চোখ নেই শান্তনুর। নিজের পুষ্টি সাধনের জন্য এমন ক্ষতি শান্তনু খুব সহ্য করতে পারবে। পঙ্গু শান্তনুর কাছে অশোকা একটা বাড়তি ক্রাচ মাত্র। তার বেশী নয়। কাঠের ক্রাচ আর চামড়ার নিজস্ব পায়ে আকাশ পাতাল তফাত।

শ্রমজীবনী

শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

ঈশ্বরবাদ—পাশ্চাত্ত্য মত

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

পাশ্চাত্ত্য মত বলিতে এই প্রবন্ধে খ্রীষ্টীয় মতই বুঝিতে হইবে। ঐ মত বহু শাখা-শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটি শাখা প্রধান: কটি রোমান ক্যাথলিক, অপরটি প্রাটেস্টাণ্ট। প্রথমটি অতি প্রাচীন, বতীয়টি উহারই কোনও কোনও বিশ্বাস আচারের প্রতিবাদরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে ভূত। এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইতেছে, াহাতে উভয় মতের দার্শনিকদিগের বিশেষ নৈক্য নাই। ইহা নিশ্চয়ই হিন্দুর অপাঠ্য য়, বরং আশা করি, অবিশেষজ্ঞ পাঠক াতে শিখিবার ও ভাবিবার বস্তু কিছু কছু পাইবেন।

ইংরেজী ভাষায় ঈশ্বরবাদ বোধক দুইটি ব্দ খুব প্রচলিত; একটি ডীজম্ Deism), অন্যটি থীজম্ (Theism)। ভয়ের মর্ম পরস্পরবিসদৃশ, যদিও অবশ্য ুইই আস্তিক্যবাদ। প্রথম মতে বলা হয়, শ্বর আছেন এবং তিনি প্রাকৃতিক নয়মাবলী দ্বারা জগৎ পরিচালন করেন, হাই স্বীকার্য। তিনি কোনও ব্যক্তি নহেন বং দিব্যবোধসঞ্চার (inspiration) দ্বারা অন্য কোনও অতিপ্রাকৃত উপায়ে ভক্ত-ণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। এই মতে শ্বর প্রকৃতির নিয়ামক-মাত্র বলিয়া ইহাকে াকৃতিক ধর্ম (natural religion)ও বলা য়। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে নাস্তিক; এই তবাদীরাও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু আস্তিক, র্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

দ্বিতীয় মতে, ঈশ্বর আছেন ত বটেই এবং কৃতির নিয়ামকও বটেন; তদুপরি তিনি লৌকিকভাবে সাধকগণের নিকট আত্ম-কাশ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ম্বন্ধও রক্ষা করেন। এই শেষোক্ত লক্ষণ ুইটি অবশ্য বিশ্বাসের উপরই বেশী তিষ্ঠিত, যাহার মূল হইতেছে শাস্ত্র, জ্জনের অনুভূতিমূলক উপদেশ ও াত্মানুভূতি। উহা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের বয় নয় ইহাও স্বীকৃত।

ঈশ্বরবাদের মূলতত্ত্ব হইতেছে, ঈশ্বর াদিকারণ, সর্বকারণের কারণ। এইজন্য তিনি চির সৎ অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বে কোনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। এই নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বই তাঁহাকে সৃষ্ট জগৎ হইতে একান্তরূপে পৃথক করিয়াছে। সৃষ্ট জগৎ সকারণ ও অনিত্য—ইহা দেখাও যায় এবং অনুমানও করা যায়।

ঈশ্বর সকল খণ্ড সত্তার ঊর্ধ্বে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি কোন দিকেই সীমা-বন্ধ নহেন, কেননা, যাহা সীমাবদ্ধ, তাহা সীমার বাহিরে অসৎ অর্থাৎ নাই। সর্বদা সর্বত্র সৎ ঈশ্বর কোথাও অসৎ হইতে পারেন না। সীমাতীত বলিয়া ঈশ্বর পূর্ণ এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান কেহ নাই, অধিক কে হইবে?

ঈশ্বর ভূতাত্মক (material) নহেন বলিয়া ভূতাংশসমষ্টি (Composed of material parts) হইতে পারেন না। কেননা, ভূত জড় বলিয়া তাহার একজন সংযোজন-কর্তার প্রয়োজন। সেরূপ সংযোজন-কর্তা আছেন বলিলে তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর হয়েন। ঈশ্বরের সত্তা আত্মিক (spiritual) এবং তিনি নিরবয়ব (simple)। তাঁহার প্রকৃতি ও সত্তা একই বস্তু। সসীম বস্তুতে ইহা হয় না, কেননা, কতকগুলি সসীম বস্তুর প্রকৃতি এক হইলেও ব্যষ্টিরূপে তাহাদের পার্থক্য থাকিবেই।

সত্তা এবং ক্রিয়া, সত্তা এবং গুণ বা দ্রব্য ও ধর্ম, স্বভাব ও সম্ভাব্য ভাব (potentiality) ইহাদের মধ্যে যে ভেদ, তাহা ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। তবে যে লোকে ঈশ্বরের শক্তি, গুণ, ক্রিয়া, ইত্যাদি বলিয়া থাকে, তাহা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলে, অসমপ্রদর্শিতা হইতে অভেদে ভেদ কল্পনা করে। কিন্তু এইরূপ ভেদবিদ্ধা দৃষ্টিও ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইলে উহা তাঁহার নিরবয়ব নিষ্কল সত্তায় মিশিয়া যায় এবং তখন আর ভেদবোধ থাকে না।

ঈশ্বরে সত্তা ও সম্ভাব্যতায় পার্থক্য নাই বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ—তিনি অপরিণামী, তাঁহার কোনওরূপ পরিণাম বা পরিবর্তন সম্ভব নহে। পরিবর্তন থাকিলে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধিও থাকে, তাহা পূর্ণতার বিসংবাদী। পূর্ণ ঈশ্বরে কোনও পরিবর্তন বা ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিতেই পারে না। পরিণাম নাই বলিয়া পূর্বাপর ভাবও নাই।

ঈশ্বর অসীম বলিয়া সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি সনাতন, অর্থাৎ কালে উৎপন্ন নহেন। সেরূপ হইলে তিনি আদি কারণ এবং কারণের কারণ হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবে যে জ্ঞান, শক্তি ও অন্যান্য গুণ আছে, তাহা অবশ্যই ঈশ্বরে আছে, কেননা, কার্যে যাহা আছে, কারণে তাহা থাকাই সম্ভব। তবে ঐ সকল গুণ তাঁহাতে পূর্ণভাবে ও নিত্যভাবে আছে। তাঁহাতে ক্রিয়া এবং তাহার ফল দুই-ই আছে।

ঈশ্বর কোনও বাহ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন বলিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বা রুচি হইতেই সকল সৃষ্টি করেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বর জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সত্তাবিশেষ বলিয়া একজন ব্যক্তি (Person) এবং প্রাণবান্, অর্থাৎ সজীব ব্যক্তি। সজীব বলিবার হেতু এই যে, তিনি তাঁহার ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম দুই-ই, যাহা জীবনহীন কিছু সম্বন্ধে বলা চলে না। এইরূপে তিনি আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। তাঁহার আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপ্রীতি উভয়ই প্রচুর, অর্থাৎ অসীম, উহা বাহ্য কোনও অবস্থা দ্বারা পূরণীয় নয়।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বকারণরূপে আপনাকে জানেন বলিয়া সকল সৃষ্ট বস্তু ও সকল ঘটনা তাঁহার জ্ঞানগোচর। আমরা যাহা স্বাধীন ইচ্ছাবশে করি বলিয়া মনে করি, তাহাও তাঁহার পূর্ব হইতে বিদিত, নতুবা তাঁহার জ্ঞান কালে ও ক্রমান্বয়ে পূর্ণ হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাঁহাতে পরিণাম ও অপূর্ণতা আসিয়া পড়ে।

ঈশ্বর সর্বশক্তি। অবশ্য এই সর্বশক্তিত্বে যাহা ন্যায়মতে অসঙ্গত, তাহা বর্জন করিতে হইবে। যেমন বলা হয়, ঈশ্বর একই ক্ষণে একটি দরজাকে খুলিতে ও বন্ধ করিতে

পারেন কিনা? অবশ্য পারেন না-ই বলিতে হয়; উহা ন্যায়মতে অসংগত। এইরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ অযোগ্যতা দ্বারা তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না।

সৃষ্টি বা সত্তাদান ঈশ্বরের ক্ষমতার অন্তর্গত। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহার নিজ সত্তা হইতে, অর্থাৎ স্বাত্মভূত বস্তু হইতে করিলে তাহা তাঁহার ন্যায় অসীম, ভূতাত্মতাবর্জিত ও আত্মিক বস্তু হইত। সেরূপ যখন নয়, তখন বুঝিতে হইবে ভৌতিক সত্তা (substance) ঐশ্বরিক সত্তা হইতে পৃথক। আবার যদি সেই সৃষ্টি এরূপ কোনও নিত্য বর্তমান দ্রব্য (যথা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনসম্মত পরমাণু) হইতে হইত, যাহা ঈশ্বর স্বীয় প্রয়োজনের সাধন অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান-রূপে পাইয়া নিজ ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিয়াছেন, বা তাহাতে আকার দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বকারণের কারণত্ব ব্যাহত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, তিনি শূন্য হইতেই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাতে খণ্ড সত্তা দান করিয়াছেন এবং ঐ দ্রব্যগুলি ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্যবস্তু-রূপেই আছে (ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকে একমেবা-দ্বিতীয়ম্ বলা চলে না। খ্রীষ্টীয় মতে ঈশ্বর অদ্বিতীয় বলার অর্থ এই যে, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ও একমেবাদ্বিতীয়মের অর্থ ঐরূপ বুঝিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মতের শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি এবং বৌদ্ধ সর্বশূন্য-বাদও এক নহে। বেদান্তের মায়াও শূন্য নয়, মায়িক সৃষ্টিও সত্য নয়)। এই সকল খণ্ড সত্তায় তিনি যে সকল রূপ দান করিয়াছেন, তাহার আদর্শ তাঁহার মনেই আছে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের মধ্যে নানাত্ব (multiplicity) নাই এবং ঐ রূপগুলি নানাবিধ, তখন মনে করিতে হইবে, ঈশ্বরের মনে ঐ রূপগুলি যেভাবে আছে, আর আমাদের মন বাহিরে তাহার যেভাবে অনুকরণ করে, তাহাতে পার্থক্য আছে। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে আমরা তৎসমুদয় ঈশ্বরের অলৌকিক সত্তার বিভিন্ন প্রকাশরূপেই দেখি।

ঈশ্বর পবিত্র, কল্যাণময় ও ন্যায়বান্। তিনি অকল্যাণ অর্থাৎ কাহারও অনিষ্ট-জনক কিছু করিতেই পারেন না, কেননা, কল্যাণেই স্থিরবস্তুর পূর্ণতা, অকল্যাণ অপূর্ণ, খণ্ড। যদিও মনে হয়, জগতে তিনি বহু অহিত, অশুভ, অরিষ্টেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদয় বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তিনি নৈতিক (moral). অশুভ বা পাপ ইচ্ছা করিতেই পারেন না, তাহাতে তাঁহার পুণ্যময়তা (পবিত্রতা) ব্যাহত হয়। লোক-সকলকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া তাহাদের মধ্যে তিনি ঐগুলির একটা স্থান দিয়াছেন মাত্র। লোকে স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কর্ম করুক, ইহাতে বাধা দেওয়া, তিনি ন্যায়-পরায়ণ, কল্যাণময়, পুণ্যময় হইয়াও অবশ্য কর্তব্য মনে করেন না। এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলা যায়, তবে তাহাতে প্রবন্ধ অনাবশ্যকরূপে বড় হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রধানত স্বীয় মহিমা ব্যক্ত করিবার জন্যই ঈশ্বর স্বীয় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য হইতে সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে ইহাও অনুমান করিতে হয় যে, যাহাদিগের নিকট তিনি স্বকীয় মহিমা ব্যক্ত করিবেন, তাহা-দিগকে প্রথমত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব এবং জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের অধিকারী হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, তাহাদিগকে সুখানুভবের যোগ্যতা-সম্পন্নও হইতে হইবে। কেননা, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেমই অনুত্তম সুখের মূল। অতএব জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, জীবের প্রতি ভালবাসাই ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

[প্রধানত অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্ প্রণীত Varieties of Religious Experience নামক পুস্তক অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত]

তৃষ্ণার জল — আলোকচিত্রী শ্রীসুনীল জানা

চীনের নারী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অক্টোবর মাসের (১৯৫৪) ৪ঠা তারিখে আমরা নয়া চীনের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলাম। হংকংএর সীমান্তবর্তী লউ থেকে আমরা পায়ে হেঁটে একটি ছোট নদীর উপরের কাঠের সাঁকো পার হয়ে সামসুনে পৌঁছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একদল প্রতিনিধি।

নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মিঃ সাই উং-পিং এবং মাদাম লিন পি-মিং সামসুন স্টেশনে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এঁরা দুজনেই এসেছিলেন পিকিং হতে। আমাদের তত্ত্বাবধানের ভারও এঁরাই গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যার দিকে আমরা ক্যাণ্টনে ট্রেন থেকে নামলাম। সাউথ চায়না জার্নালের সহযোগী সম্পাদক এবং স্থানীয় সাংবাদিকগণের একটি দল স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ক্যাণ্টনে পার্ল নদীর তীরবর্তী একটি চৌদ্দ তলা হোটেলে আমাদের রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা হোটেলের এগার তলায় একটি কোণের ঘর দখল করলাম। এই ঘরের পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুদিক থেকেই নদীর সমগ্র রূপটি আমাদের চোখে পড়ত। চীনে আমার এই প্রথম রাত্রি এবং এই রাত্রিতে পার্ল নদীর রূপ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধ নিশীথের রহস্যময় অবগুণ্ঠন পরে চিরপুরাতন পার্ল নদী আমার সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নানা রঙের অসংখ্য আলোকের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত এই নদীটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, মণি-মুক্তায় সজ্জিত একটি চীনা তরুণী যেন অভিসারে চলেছে এবং লজ্জায় প্রতি-পদেই একবার করে থেমে থেমে আলোকজ্জ্বল স্বচ্ছ জলে নিজের রূপ দেখে নিচ্ছে।

পরের দিন সকালে আমরা ক্যাণ্টনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান দেখলাম। এক জায়গায় আমরা ৭২ জন শহীদের সমাধিক্ষেত্র দেখলাম। ১৯১১ সনে মাঞ্চু-রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব হয়েছিল, এই ৭২ জন শহীদ সেই বিপ্লবে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই সমাধিক্ষেত্রের কাছেই পিপলস স্টেডিয়াম এবং পিপলস্ মিউজিয়াম। স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। আমরা ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের স্মৃতিসৌধও দেখলাম। এইটিও ১৯১১ সনের বিপ্লবের পরে নির্মিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধের ভিতরে রঙিন টালির কাজ এবং প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত ছবি খুব সুন্দর হয়েছে। হলে পাঁচ হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন হলেন চীনা জাতির জনক। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চীনের সব শহরেই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ডাঃ সান ইয়াৎ সেন

চীনা জননী

কিংবা তাঁর পত্নী মাদাম সান ইয়াৎ সেনকে চীনের কোথাও এই নামে বিশেষ কেউ চেনে না। চুং সান এবং সু চিং-লিং এই নামেই তাঁরা দুজন চীনের সর্বত্র পরিচিত।

বিকেলে আমরা সাউথ চায়না জার্নালের অফিস দেখতে গেলাম। আমারই অনুরোধে পার্ল নদীবক্ষে আমাদের জন্য নৌবিহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার পুনার সহযাত্রী বন্ধুবর সানেকে এতকাল সুলেখক এবং সুদক্ষ শব্দপ্রয়োগ-কৌশলী বলেই জেনে এসেছি। চীনে সংবাদপত্র সংপাদনের খরচ কী রকম পড়ে—এই সব জটিল হিসাব নিকাশ সম্পর্কে তিনি যখন আবার তাঁর অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিতে শুরু করলেন তখন নৌবিহারের সাধ বিসর্জন দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হতাশ হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

মধ্য রাত্রিতে আমাদের পিকিং রওনা হবার কথা। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আমরা একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় দরজায় করাঘাত হল। আমি দরজা খুলে দেখি একটি তরুণী ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি সুন্দর ইংরেজীতে বললেন, পার্ল নদীবক্ষে আমাকে নৌবিহারে নিয়ে যাবার জন্য মিঃ হো উন তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি একবার তরুণীর দিকে এবং তারপর নীচে নদীর দিকে তাকালাম। কাল রাত্রিতে নদী যেভাবে বয়ে চলেছিল আজও সে সেইভাবেই বয়ে চলেছে; কিন্তু আলো ছায়ার রহস্যময় খেলায় তার গতিটিকে আজ যেন আরও মোহময়ী বলে মনে হল। রাত্রির রূপও শান্ত সুন্দর। আমার এই সম্মুখবর্তিনী তরুণীর রূপও এমনই যে, যখন যেখানেই যান না কেন, তিনি নিঃসন্দেহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এত রাত্রিতে এই সুন্দরীর সাহচর্যে নদীতে নৌভ্রমণ করতে যাওয়া ঠিক হবে কি না তা আমি ভেবে দেখলাম। কিছুক্ষণ দ্বিধা দ্বন্দ্বে কাটাবার পর আমার সংকোচ বোধ হল। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আমি বিশ্রাম করতে পারলেই সুখী হব।"

চীনে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী সফরের পর ১১ই নবেম্বর বেলা আড়াইটার সময় আমাদের ট্রেন পুনরায় ক্যান্টন স্টেশনে প্রবেশ করল। আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি তরুণী আমাদের ট্রেনের কামরায় প্রবেশ করলেন। সানে আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মেয়েটিই সেদিন তোমাকে নৌভ্রমণে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, নয় কি?" সানে ঠিক কথাই বলেছিলেন। পুরাতন পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমি তাঁকে সম্ভাষণ করলাম। মেয়েটিও উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ আমরা পুরনো বন্ধুই বটে।"

চীনের গ্রামীণ কন্যা

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম মেয়েটি সাংবাদিক নন, দোভাষী। ১১ই নবেম্বরই আমাদের চীনের মাটিতে অবস্থানের শেষ দিন। পরের দিন সকালেই আমাদের চীন ছেড়ে হংকং যাওয়ার কথা। রাত্রি আটটার সময় আমরা ক্যান্টনে আমাদের শেষ বিদায়-ভোজ খেলাম। ভোজসভায় অনেক স্থানীয় সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন; আর ছিলেন একদল দোভাষীসহ পিকিং থেকে আগত আমাদের নিত্যসহচর এবং পথপ্রদর্শক মিঃ ওয়া চ্যাং। এই দোভাষীর দলে পূর্বোক্ত মেয়েটিও ছিলেন। বিদায় দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটি সব সময়ই করুণ। অতিথি এবং নিমন্ত্রণকর্তা—এই দু দলই বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথা অনুযায়ী ভোজ-সভায় অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হল। চীনের দোভাষীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বললাম, "এই দোভাষীরা চীনের জন-সাধারণের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটানর কাজে অনেকে সাহায্য করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের অনেকের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আর কোনও কারণে না হলেও শুধু এই কারণে চীনের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ অটুট থাকবে।"

এই বিদায়-ভোজসভায় দিল্লীর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র শ্রীযুক্ত মানকেকার একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন; কিন্তু দোভাষী চীনা ভাষায় ভাল করে বক্তৃতার অনুবাদ করতে না পারায় অমন সুন্দর বক্তৃতাটি মাঠে মারা গেল।

মহিলা দোভাষীটি পি টি আই-এর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রনের পাশে বসেছিলেন। শ্রীযুক্ত রাম-

চন্দ্রনও চীনের মেয়েদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে একটি বক্তৃতা করলেন।

চীনের মেয়েদের অগ্রগতি বিস্ময়কর এবং তাদের কার্যকলাপের উল্লেখ না করলে নয়া চীন সম্পর্কে কোনও বিবরণই সম্পূর্ণ হয় না। আজকাল জনসেবার ক্ষেত্রে চীনের মেয়েরা যে-রকম সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন, আর কোথাও মেয়েরা তেমন সক্রিয় বলে আমার জানা নেই। চীন রাষ্ট্রের 'প্রথম মহিলা' (First lady of the State) ব'লে কিছু নেই এবং স্বামীর পদমর্যাদার গৌরবে স্ত্রী গরবিণী হতে পারেন না। মাও সে তুং-এর স্ত্রীও স্বামীর পদগৌরবের অংশভাগিনী নন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে সম্মানিত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পিকিংএ যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল সেই ভোজসভায় মাদাম মাও সে তুং এবং মাদাম চৌ এন-লাই—এই দুজনের কাউকে দেখা যায়নি। কিন্তু মাদাম সান ইয়াৎ সেন, মাদাম চু তে এবং মাদাম লিও সাও-চি এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। নিজেদের ব্যক্তিগত গুণে তাঁরা যে মর্যাদার অধিকারিণী হয়েছেন তার ফলেই এ সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশেই নারীকে কোমলাঙ্গী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে আমরা নারীকে দেবীর আসনে বসিয়েছি; কিন্তু আমাদের দেশে কোন মেয়ে রাস্তায় বের হলে ভক্তবৃন্দ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে কষ্ট পান। কিন্তু চীনের তরুণ-তরুণীদের বেলায় এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

প্রাচীন চীনে মেয়েদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। একটি পুরান প্রবাদে বলা হয়েছে যে, বিবাহিত স্ত্রী আর কেনা ঘোড়া এ দুয়ের অবস্থাই একরকম। ঘোড়া কিনলে আপনি যেমন যখন খুশি চাবুক লাগাতে পারেন, স্ত্রীর প্রতিও আপনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করতে পারেন। আগে বাপ মায়েরাই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিতেন। অল্পবয়সেই মেয়েদের বিবাহের জন্য বাগদান করা হত। পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেয় এই ছিল বিবাহের মূল ভিত্তি। স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুসরণ করবে, স্বামীর জন্য জীবন বিসর্জন দেবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না—এই ছিল প্রাচীন চীনের আদর্শ। উপপত্নী রাখার ব্যবস্থা আইন-অনুমোদিত ছিল। একজন লোক একাধিক পরিবারে দত্তকপুত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারত এবং আমাদের দেশের কুলীনদের মত এক ব্যক্তি যতগুলি খুশি ততগুলি বিবাহ করে এই সব পরিবারের বংশরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত। বাড়িতে স্বামী নির্বিচারে স্ত্রীকে প্রহার করত এবং শ্বশুর-শাশুড়ীরাও নানাভাবে বধূকে নির্যাতন করত। স্ত্রীর উপর এইরূপ নির্যাতন চলত বলে পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি থাকত না এবং এর ফলে পরিণামে জাতির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হত।

কিন্তু ১৯৫০ সনের মে মাসে যে নূতন বিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হয়েছে, তার ফলে নারীর প্রতি পুরুষের এই চিরাচরিত ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চীনের বিপ্লবে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের মত বিবাহ সংক্রান্ত এই নূতন আইনও একটি সক্রিয় শক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম দুটি ধারাতেই বিবাহ সংক্রান্ত এই নূতন আইনের মূলসূত্র সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে—

১নং ধারা—সামন্ত যুগীয় বিবাহ পদ্ধতি স্বৈরাচার এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এবং

নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এই বিবাহ-পদ্ধতি শিশুদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন। সুতরাং এই বিবাহ-পদ্ধতির অবসান করা হল। বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিগণের স্বাধীন ইচ্ছা, এক-বিবাহের আদর্শ এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর আইন-সম্মত স্বার্থরক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে নূতন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সেই বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্তিত করা হল।

২নং ধারা—বহু বিবাহ, উপপত্নী রাখা, শিশুকালে বাগ্দান, বিধবার পুনর্বিবাহে বাধাদান, বিবাহের সময় জুলুম করে টাকা-পয়সা এবং উপহার আদায় নিষিদ্ধ করা হল।

আমার মনে হয় যে, এই বিবাহ-বিধি প্রবর্তন করে চীন এমন একটি জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী উদ্ভাবন করেছে, যার ফলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমভাবে তাদের সাধারণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। চীনের গণ-সরকার নারীদের সমাজসেবার সর্বক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। এর ফলে স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা সমান-ভাবে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ, উৎসাহ ও সুবিধা পাচ্ছে। সমাজ-সেবার নানা ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা ক্রমেই বেশী পরিমাণে অগ্রণী হচ্ছে। এইভাবে নারীদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁরা নিজেদের স্বাধীন সত্তা আবিষ্কার করছে। স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিবাহ যাতে সফল হতে পারে, তার জন্যে এই সব সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

নয়াচীনে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার ফলে তাদের সহজভাবে চলাফেরা করা সম্ভব হয়েছে। নারী-পুরুষের সাম্য, উভয়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে মেলামেশা এবং একটি আদর্শ সামাজিক শিষ্টাচারের নীতি উভয়কেই পরস্পরের উপযুক্ত সঙ্গী হবার সুযোগ এনে দিয়েছে; ফলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সহজ ও সুন্দর হয়েছে। একবার ক্যাণ্টনে নৈশ পান-ভোজনের পর একজন অতিথি একটি তরুণী দোভাষীর প্রতি কিঞ্চিৎ অশোভন আচরণ করছিলেন। তরুণীটি কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে তাঁকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলে গেলেন যে, তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আছেন, কাজেই তাঁর পক্ষে এখন শুয়ে পড়াই ভাল। চীনা নারী সতীত্বের আদর্শ মেনে চলে; কিন্তু তা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করে না। চীনা নারীর প্রকৃতিতেও এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে দুর্বৃত্ত পুরুষ তার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করে।

জীবনের সঙ্গিনীকে বেছে নেবার সময় চীনা যুবক আর তার সামাজিক পদ-মর্যাদা কিংবা অর্থের কথা চিন্তা করে না। যাকে সে ভালবাসে, তাকেই সে পত্নী বলে গ্রহণ করে।

প্রেম যে-বিবাহের ভিত্তি, শুধু যদি সেই বিবাহ নীতিসঙ্গত বলে গণ্য হয়, তাহলে যে বিবাহিত জীবনে প্রেম টি‌ঁকে আছে, একমাত্র সেই বিবাহিত জীবনকেই নীতিসঙ্গত বলে মনে করা উচিত। কাজেই বিবাহের নূতন আইনে এই কথা বলা হয়েছে যে, স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়, তখনই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবে। যদি স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে শুধু একজন বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য জিদ করতে থাকে, তাহলে স্থানীয় জিলা গবর্নমেণ্ট এবং বিচারালয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে চেষ্টা করবেন; যদি তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির সময় এই সব বিচারালয় জনসাধারণের, বিশেষ করে নারী-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিয়ে থাকেন।

যে সমস্ত দম্পতি তাদের মাতাপিতার আজ্ঞায়—অর্থাৎ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার
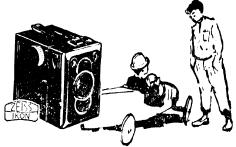
প্রেরণায় নয়—বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, অনেক সময় সেই সব দম্পতিকে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।

২২শে অক্টোবর আমরা পিকিং-এ একটি গণ-আদালতে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই আদালতে বিবাহ সংক্রান্ত একটি মামলার আপীলের শুনানী হচ্ছিল। বিচারক ছিলেন তিনজন। দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। নয়াচীনে বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে গণ-আদালত প্রতিষ্ঠাও একটি নূতন পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা।

নয়াচীনে বিচার-ব্যবস্থা শুধু অল্প ব্যয়-সাধ্যই নয়, বিচারকার্য খুব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। আদালত থেকে আইন-ব্যবসায়ীদের বিদায় দেওয়া হয়েছে: কারণ তাঁদের কাজের কোনও মূল্য নেই। চীনে আইন খুব সহজ এবং সরল করা হয়েছে। বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে আইনে সাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং Equity-র উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আগে আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁদের অনেককেই বিচারক পদে এবং অনেককে 'জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষক'-এর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। যাঁরা শেষোক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আদালতকে মামলা বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেন। এ ছাড়া অবশ্য অন্য যে-কোনও লোকই আদালতে উপস্থিত হয়ে আদালতকে সত্য-নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারেন।

এই মামলায় আমরা দেখলাম যে, তিনজন বিচারকই উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং তাঁরা এই মামলার বিচার করলে বাদী কিংবা প্রতিবাদী এই দুপক্ষের কারও কোনও আপত্তি আছে কি না, তা জানতে চাইলেন। উভয় পক্ষই সম্মতি জানাবার পর আদালতের কাজ শুরু হল।

মামলার বিবরণে জানা গেল যে, বাদীর বয়স ২৫ বৎসর; ১১ বৎসর আগে তার চেয়ে তিন বছরের বড় একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের এক মাস পরেই সে কাজের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং তার পরে আর তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৯৪৯ সনে সে ফিরে এসে দু মাস বাড়িতে ছিল। তার পর তাদের একটি সন্তান হয়। স্বামী এবং স্ত্রীকে জেরা করে জানা যায় যে, (বিচারকগণ নিজেরাই প্রধানত এই জেরা করেছিলেন) এই দু মাসের মধ্যে তাদের মধ্যে কয়েকটি ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল। ১৯৫২ সনে স্ত্রী পিকিংএ এসে স্বামীকে খুঁজে বের করে। তার পর কিছুকাল একসঙ্গে থাকার পর স্বামীটি তার স্ত্রী এবং শিশুটিকে পুনরায় গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

স্ত্রীর কাছ থেকে আরও জানা গেল যে, এই সময়ও স্বামী প্রায়ই বাড়িতে থাকত না। অবশেষে *স্বামীই স্ত্রীর নিকট বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব করে; কিন্তু স্ত্রী এই প্রস্তাবে রাজী হয় না।* স্ত্রীর বক্তব্য এই যে, স্বামী বরাবরই পরিবার প্রতিপালন করতে অবহেলা করেছে। স্ত্রী দাসীবৃত্তি করে স্বামীর বৃদ্ধা মাতা এবং নিজের শিশু-সন্তানের ভরণ পোষণ করেছে। স্বামী এখন একটি কারখানায় ভাল কাজ পেয়েছে এবং সেই কারখানার একজন সহকর্মিণীর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছে বলে সে এখন তাকে (স্ত্রীকে) ত্যাগ করতে চায়।

স্বামীটি প্রথমে তাদের এলাকার গণ-আদালতে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিল। তার বক্তব্য এই যে, তার স্ত্রী তার চেয়ে বয়সে বড়, কথাবার্তায় অবাধ্য এবং তার বাপ-মা জোর করে এই বিয়ে দিয়েছিল। অবাধ্যতা এবং অসদাচরণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে গণ-আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন এবং স্বামী-স্ত্রীকে সদ্ভাবে থাকার আদেশ দেন। কিন্তু আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে স্বামী এই আপীল দায়ের করে। মামলার শুনানীর সময় আমাদের সহানুভূতি স্বভাবতই স্ত্রীর প্রতি পড়েছিল।

আমরা আরও জানতে পারলাম যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার জন্য স্ত্রীকেও স্বামীর কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষসমর্থনের জন্য স্বামীরই একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আদালতে হাজির ছিল। তার বক্তব্য এই যে, এই মামলায় তার বন্ধুর আচরণ ন্যায় এবং নীতিসঙ্গত নয়।

যারা প্রেম এবং বিবাহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়, নয়াচীনের এই নূতন বিবাহের আইন তাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়। শিক্ষা এবং সহানুভূতি দিয়ে প্রেমবঞ্চিত স্বামী বা স্ত্রীর মনোভাব সংশোধন করবার চেষ্টা করা হয়। বিবাহিত জীবনকে সুখী করে তোলাই এই আইনের চরম লক্ষ্য।

সবুজ চুড়ি

শান্তি দেবী

বর্ষার ঘন বর্ষণে গাছপালা তাদের গ্রীষ্মের ধূলিমাখা গেরুয়া আস্তরণ ছেড়ে যেন পান্নার পোশাক পরে ঝকমক করছে। শুকনো ডালে এসেছে কচি পাতার প্লাবন। মাঠে ঘাটে ঘাসেরা দিয়েছে সবুজ গালিচা বিছিয়ে। পাখির শিসে খুশির আমেজ। উত্তর প্রদেশের প্রখর গ্রীষ্মে ভাজা ভাজা মানুষের দেহ-জ্বালা যেন বর্ষার প্রলেপে শীতল হয়েছে। মনে লেগেছে আনন্দের দোলা। গুড়িয়া তেওহার এসে পড়েছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা নিজেদের ঘরে দোলনা টাঙিয়েছে। যারা বস্তিতে বাস করে, তারা টাঙিয়েছে মহল্লায়। দোলনায় দুলবে সব বয়সের মেয়েরা, কখনও কখনও ছেলে মেয়ে মিলে। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে দোলবার প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ওরই মধ্যে গলাগলি করে নানা রকমের বাদলের গান হবে। তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলাখেলা, পিয়ার বিরহ, অথবা আদি-রসের ছোঁয়াছুয়িও বাদ যাবে না। আবার গলা ছেড়ে ঝগড়াও হবে, কে কতটুকু বেশী দুলে নিল বলে। তবু তেওহার তেওহারই। তার আয়োজন শুরু হয়েছে, তার রঙে মন রাঙিয়েছে সবাই।

যারা শ্বশুর-বাড়ির অনুমতি পেয়েছে, সে-সব মেয়েরা বাপের বাড়ি এসেছে। হাতভরা হরা অর্থাৎ সবুজ চুড়ি নেবে মা-বাবার কাছ থেকে আর নেবে হরা রঙে ছোপান শাড়ি। প্রকৃতির সঙ্গে আজ প্রতিযোগিতা চলেছে হরা রং নিয়ে। মাঠের সবুজ, বনের সবুজ, মনের সবুজ, চুড়ির সবুজ আর শাড়ির সবুজে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে আজ। ছোট বোনেরা সারা বছরের পুরনো পুতুল ভেঙে গঙ্গায় ভাসিয়ে বড় ভায়েদের কাছে বায়না ধরেছে নতুন পুতুলের। এই ত আসল গুড়িয়া। গুড়িয়া (পুতুল) না কিনে দিলে আবার গুড়িয়ার পরব কিসের!

মেলা বসবে গুড়িয়ার এখানে ওখানে, ছোট ছেলেমেয়েরা কিনবে পুতুল, বেলুন, বাঁশি। তরুণীরা কিনবে কাঁচের চুড়ি, কাঁটা, রঙিন ফিতে, আরও কত কি! সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে বর্ষীয়সী মেয়েরা। অনেকটা যেন বাংলা দেশের রথের মেলার মত।

বাবুলালের মেহরারু (বৌ) মুনিয়ারও মেলায় যাবার বড় শখ। শখ ত হয় আরও কত রকমের, কিন্তু দুবেলা যাদের পেটভরে রুটি জোটে না, তাদের শখের কথা শুনলে কেমন যেন বেয়াদপি মনে হয়। কিন্তু তাই বলে এই শাওনের ঘন বর্ষায় যখন সবুজে চারদিক ঝলমল করছে, মহল্লায় আর-সব মেয়ে বৌরা সবুজ চুড়ি পরেছে, কেউ কেউ শাড়িও রাঙিয়েছে সবুজ রঙে, তখন মুনিয়ার যদি শখ হয় হাত ভরে সবুজ চুড়ি পরবার, দোলনায় দুলে দুলে গান গাইবার, পড়শীদের সঙ্গে গিয়ে মেলা দেখবার, তা কি সত্যি খুব বেয়াদপ শখ?

বাবুলাল আজ বলে গেছে যে, সে আজ তার চুড়ি কেনবার পয়সা রোজগার না করে ঘরে ফিরবে না। কিন্তু সকাল থেকে যে-রকম বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পারবে কি বাবুলাল তার কথা রাখতে? যাই হক পয়সা তো কিছু চাই-ই চাই। আনতে হবে আটা, বেশী কিছু না হলেও ডাল, তেল, নুন। আর সেগুলো বানাবার জন্যে কাঠ। আজকাল কাঠের দোকানদারদের পোয়া বার। ভিজে কাঠ ওজনে ভারী হয়, কথায় ভুলিয়ে সেই কাঠ শুকনো বলে বিক্রি করে, বাড়ি এসে বৌ-ঝিরা চোখের জলে সারা হয়ে যায় চুলো ধরাতে। এক ঘণ্টার রান্না খতম হতে লাগে তিন ঘণ্টা, মরদগুলো রেগে সারা হয় খিদের জ্বালায়। ওদেরই বা দোষ কী? সেই সাতসকালে শুকনো বাসী রুটি নুন দিয়ে দাঁতে কেটে বেরোয় রোজগারের ধান্দায়, ফিরে এসে যদি তৈরী খানা না পায়, তবে রাগ হবে না? যত মেয়ে মার খায় মরদের হাতে, তার বেশির ভাগ খায় এই খাওয়া নিয়ে।

দুপুরে বৃষ্টিটা একটু ধরে এল। মুনিয়া ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের কাছ থেকে বুকটা সরিয়ে নিয়ে তাকে শুইয়ে দিল সন্তর্পণে। তারপর ঘরের টুকিটাকি

হরা রঙে শাড়িও রাঙিয়েছে কত জন, ঝুলনা টাঙানো হয়েছে মহল্লায়, আজ বাদে কাল সবাই মেলায় যাবে, ফুল আর বাতাসা চড়াতে হবে শংকরজীকে, তখনও তুই বলবি, কামাই নেই, পয়সা নেই। মহল্লার মেয়েগুলো ঠাট্টা করে—”

বাবুলাল বিড়িটা শক্ত করে ধরে বলে, “কে ঠাট্টা করে, কোন্ শা—”

মুনিয়া বাধা দিয়ে বলে, “শুধু শুধু পরের মেয়েদের গাল দিও না, তারা আর এমন কী বলেছে? সত্যি কথা বলবে না? তুমি তো কুড়েমির জন্যে রোজগার করতে পার না।”

“এই কথা বলেছে বুঝি তারা?” বাবুলাল হাসল একটু তিতো হাসি। “তারা কি দেখেছে যে, বাবুলাল মুচি এই বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় রাস্তায় হেঁকে বেড়িয়েছে; বলেছে বাবুদের মিনতি করে, জুতো সারাও বাবুরা, নিদেন পালিশ করাও চারটে পয়সা দিয়ে। তা কোন শালার বাবু একজোড়া জুতাও ঠেকাল না। মহাদেও বলছিল, ‘আজকাল বাবুরা জুতায় পালিশ লাগায় নিজের হাতে।’ ওতো ভদ্দর বাড়িতে নোকরি করেছে কিনা, জানে সব।”

এবার মুনিয়া কাছে সরে আসে বাবুলালের, বলে, “কিন্তু বছরে একবার তেওহারের দিন হরা চুড়ি দিবি না আমায়? সব মেয়েরাই যে পরেছে।”

বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বাবুলাল মুনিয়াকে সবলে জড়িয়ে ধরল। তারপর কাঁপা গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, “কাল আমি তোকে হরা চুড়ি কিনে দেবই দেব; যদি না দিই, তবে আমি হারামী—”

মুনিয়া তাড়াতাড়ি বাবুলালের মুখের উপর হাত চাপা দিল, মাথাটা বাবুলালের বুকের উপর চেপে ধরে না-বলা কথায় বলল, “থাক, থাক, অমন প্রতিজ্ঞা আর করতে হবে না, আমি বিশ্বাস করেছি।”

বাইরে বর্ষার মাতন লেগেছে, হাওয়া বইছে এলোমেলো, খোলার চাল কাঁপছে থেকে থেকে, আর ঘরের মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠেছে অন্ধকার রাত।

পরের দিন মুনিয়া ঘুম থেকে উঠে দেখল, আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ হয়ত রোদ উঠবে! ওমা। ঘরের আদমীটা গেল কোথায়? এত সকালেই বেরিয়ে গেছে নাকি? মুনিয়া খুঁজে দেখল তার ঝোলাও নেই, সামদানও নেই। তাহলে বাবুলাল আজ তার কথা রাখবে। কিন্তু সকাল সকাল বেরুবে বলেই যে মুনিয়া দুখানা বাসী রুটি রেখেছিল তার জন্যে। ঢাকা খুলে দেখে রুটি বাবুলাল ছোঁয়ওনি। কী জেদী লোকটা! তা বলে মুনিয়া কি তাকে না খেয়ে দেয়ে বেরুতে বলেছে নাকি? আকাশের দিকে চেয়ে মুনিয়া ঘড়া নিয়ে চলল রাস্তার কলে জল আনতে। দেরি করলে লম্বা লাইন হবে, দেবতার কা মেজাজ, আবার ঘিরে এলেই হল।

কিন্তু দেবতা আজ প্রসন্ন! সুরয নারান সকালেই সিংহাসনে বসেছেন ঝলমল করে। তিন-চারদিন বৃষ্টি-বাদলের পর এমন রোদে খুশিতে উপচে উঠল মহল্লার সবাই। ঝুলনায় ভিড় জমে গেল সাত-সকালেই। মুনিয়া জল নিয়ে এসে চৌকা বরতন করে ছেলেকে দুধ দিতে দিতে খুশিতে গান গেয়ে উঠল—

সখিরে মে তো বাদ্‌রি দেখ ডরি
চার ঘটা চার ওর সে আয়ী
কালী, পিলী, লাল হরী,
আপনে পিয়াকী মে বাট সোহাতী
আঙন মে খাড়ি খাড়ি।

দুপুর হতে না হতেই বাবুলাল এল একগাদা জিনিসপত্তর নিয়ে, সঙ্গে চুড়িওয়ালী। চাল, আটা, অড়হর কী ডাল, আধীছটাক দেশী ঘি, নুন, তেল, একটু আধটু মশলা, আর এনেছে এক পোয়া মাংস। “আজ ভাল করে খেতে হবে, বুঝলি মুনিয়া”, বলতে বলতে জিনিস-গুলো দাওয়ায় সাজিয়ে রাখে বাবুলাল। মুনিয়া বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে যায়। চোখ দুটো বড় বড় করে সে একবার জিনিসগুলোর দিকে আর একবার বাবু-লালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। চমক ভাঙে তার চুড়িওয়ালীর কথায়, “কই, কোথায় মেহরারু, ভেইয়া? চুড়ি পরতে বল, আমি ত আরও পাঁচ জায়গায় যাব।”

ব্যস্ত হয়ে বলে বাবুলাল, “আরে মুনিয়া, তুই এখনও খাড়ি হয়ে কী দেখছিস? এসব পরে হবে'খন, চুড়ি পরে নে তো আগে। আমি সেই কোন্ রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এলাম চুড়িওয়ালীকে।”

মুচকি হেসে বলে চুড়িওয়ালী মুনিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে, “বহুত দরদী আদমি পাকড়েছো ভেইয়া, আমাকে সেই বড় রাস্তা থেকে পাকড়াও করে এনেছে।”

রাত্তিরে মুনিয়া ভাত রুটি আর কালিয়া বানাল, ডাল আটা আর কিছু চাল রাখল পরদিনের জন্যে। খাওয়ার পর বাবুলাল বলল, “বড় বড়িয়া বানিয়েছিস মুনিয়া কালিয়াটা, কতদিন পরে কালিয়া খেলাম।”

স্বামীর পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মুনিয়ার মন খুশিতে ভরে ওঠে, চুড়িপরা হাত দুখানা ঘুরিয়ে বলে, “তবু তো মশলা-পাতি তেমন ছিল না, যদি একটু আদা আর দু কোয়া রসুন পেতাম, তবে বুঝতিস মুনিয়ার রান্নার হাত কেমন!”

বাবুলাল কথা না বলে হাসে।

রাত্তিরে মুনিয়াকে ক-আনা পয়সা দিয়ে বাবুলাল বলে, “কাল যে তোর বাতাসা আর মালা চড়াতে হবে শঙ্করজীকে, নে এই পয়সা ক-আনা রাখ।”

মুনিয়া অবাক! না চাইতে বাবুলালের এসব খেয়াল কই আগে তো কখনও দেখেনি মুনিয়া। আনন্দও হল তার বাবুলালের পরিবর্তন দেখে, আদমিটা তার নেহাত খারাপ নয় তাহলে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে মুনিয়া আদর করে ঘুম পাড়ায়, বাবুলাল তামাক সাজে কলকেয়।

পরদিন বাবুলাল মুনিয়াকে বলে, "রে মুনিয়া, আছে নাকি কালকের বাসীটাসি কিছু? দে, আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে।"

মুনিয়া রাস্তার কলে যাচ্ছিল বালতি নিয়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, "তোর যত অদ্ভুত খেয়াল। যেদিন ঘরে দানা থাকে না, সেদিন তুই বেরোস দুপুর বেলায় আর আজ ঘরে খাবার আছে, আজ সাত-সকালেই কাম তোর পালিয়ে যাচ্ছে।" বাবুলাল কোন উত্তর দেয় না, শুধু ধুলিটা গোছায় মনোযোগ দিয়ে।

বিদেশিনী — শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

কাজকাম করতে করতে মুনিয়া বারবার হাতভরা চুড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তার হাত দুখানা! শাড়ি একখানাও আস্ত নেই, নইলে শাড়িও আজ সে সবুজ রঙে রাঙিয়ে নিত। শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া ত আর রঙালেই ঝকমকে শাড়ি হয়ে যাবে না। কাজ সেরে মুনিয়া স্নান করে বাতাসা কিনে নিয়ে এল, তারপর অনেকগুলো ছেঁড়া খোঁড়া পোঁটলা-পুঁটলির তলা থেকে তার রঙচটা টিনের বাক্সটা টেনে বের করল। মায়ের দেওয়া রেশমী শাড়িখানা সে তুলে রেখেছিল যত্ন করে, আর পায়ের সেই চারগাছা লচ্ছা। ছিল তো কত কী। পায়ের আটগাছা লচ্ছা, গলার হাঁসুলি, হাতের কড়া, আর কোমরের করধনী। বাবুলালের বীমারিতে গেল কিছু, কিছু গেল পেট চালাতে। সেগুলো আর ছাড়ান হল না আজও। মুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলে শাড়িখানা তুলে ধরল। রেশমী শাড়ি, তার জায়গায় জায়গায় পোকায় কেটেছে। কাটুক, তবু গুছিয়ে পরলে চলে যাবে, শাড়িখানার জেল্লা এখনও খতম হয়নি। তারপর ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো সরিয়ে লচ্ছা চারগাছা বের করতে গেল, কিন্তু সেই ন্যাকড়াগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই বাক্সে। লচ্ছা তার কী হল! বাবুলাল অনেকদিন আগে একবার চেয়েছিল লচ্ছা কখানা, সে তখন বলেছিল যে, তার মার বড় ঠেকা বলে সে নিয়ে গেছে লচ্ছা, গিরোয়া রেখেছে, ছাড়িয়ে দিয়ে যাবে শিগগিরই। তারপর কথা উঠলেই বাবুলাল তার মা-বাপকে গাল দিয়েছে লচ্ছার জন্যে, মুনিয়া কিন্তু মুখ খোলেনি। নাঙ্গা পায়ে থেকেছে, তবু লচ্ছা বের করে পরেনি কখনও। ভেবেছে তেওহার টেওহার হলে বের করে পরবে তখন। তা হলে?

এমন সময় পাড়ার রুকমনী এল সেজেগুজে। "চল মুনিয়া। যাবি না পুজো দিতে? পুজো দিয়ে ঝুলনায়, তারপর সাঁঝের বেলায় মেলায়, কী বলিস?" তারপর মুনিয়ার মৌনী ভাব লক্ষ্য না করেই হেসে বলে, "আসছিলাম ওই লালা মহাজনের দোকানের ওখান দিয়ে, বুড়ো বলে কি জানিস? বাবু ভেইয়া তার কাছে যে লচ্ছা গিরোয়া রেখেছে, তার জন্যে নাকি ও দু টাকা বেশী দিয়েছে। বলে, 'বছরকার দিনে বৌটার হাতে চুড়ি নেই, পরনে কাপড় নেই, দিলাম দু টাকা বেশীই বাবুলালকে, আর দিই ত সবাইকেই, কিন্তু মনে রাখে কজন? শালারা সব নেমকহারাম।' বড় মায়া কিপটের, আমরা আর বুঝি না, বুড়ো বিয়াজ থেকে ওর চারগুণ উশুল করে নেবে।" হঠাৎ মুনিয়ার দিকে চেয়ে থমকে যায় রুকমনী, মুনিয়ার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

বাধা দিয়ে মুনিয়া বলে, "তুই যা রুকমনিয়া, আমি পরে যাব।" তারপর রুকমনীকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয় তার মুখের উপর।

ঘরের পিছনের রাস্তায় তখন মেয়েরা গাইতে গাইতে চলেছে—

সাত সহেলী চালা সঙ্গে
ঝুলো পৈ চলকে ঝুলনা

কিছুক্ষণ পর মুনিয়া বের হয় দরজা খুলে। চোখ দুটো তার লাল হয়ে গেছে, মুখখানা থমথম করছে আকাশের মেঘের মত। উঠানের ওপাশে কখানা ইঁট গাদা করা ছিল। মুনিয়া গিয়ে সেখানে বসল উবু হয়ে। তারপর একখানা ইঁটের উপর হাত রেখে আর একখানা ইঁট দিয়ে সবুজ চুড়ির গোছা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভাঙল একটা একটা করে। কাঁচ ফুটে রক্ত বের হল। হাতে ছিটে ছিটে। সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই, আঘাত তাকে করতেই হবে, থর থর কাঁপা ঠোঁটটাকে সে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে সজোরে।

সাহিত্য ও ধর্ম

রথীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আজ ইংলণ্ডের কাব্য-পাঠক এলিয়ট রোম্যান ক্যাথলিক কি প্রটেস্টাণ্ট এই বিচার করেন না। সেইরূপে সমস্ত ইউরোপে কি তাবৎ খৃষ্টান-সংসারে গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্য পেগান-সৃষ্ট সাহিত্য বলিয়া বর্জিত হয় নাই। বরং খৃষ্টান জগতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া আদৃত।

পৃথিবীর সব সাহিত্যই ধর্মসম্ভূত, জাতির ধর্ম-সংস্কার হইতে উৎপন্ন। এই ধর্মের সূতিকাগার ত্যাগ করিয়া সাহিত্য যখন স্বাধীন গতিতে বর্ধিত হয় তখনও ইহা জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ধারক। এই অর্থে সাহিত্য সকল অবস্থায়ই ধর্মের সহিত সংপৃক্ত। এবং যে-সাহিত্য জাতির স্বধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন বা উহার বিরোধী তাহা অ-সাহিত্য; জাতির আত্মিক জীবনের মানস সরোবরে তাহার স্থান নাই।

আমরা সাহিত্যের সঙ্গে জাতিত্ব ও ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের উল্লেখ করিলাম, দেখিলাম উহাদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য শোণিত-সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু আমাদের এই সরল প্রস্তাবের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন। প্রথম প্রশ্ন হইল, জাতিত্বের সঙ্গে ধর্মের কী সম্বন্ধ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সাহিত্য যখন এইরূপে জাতি ও ধর্মের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিকাশ লাভ করে তখন ইহার সার্বভৌমতা-গুণ কী ভাবে এবং কোথা হইতে আসে? মুসলমানকৃত বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন দুইটির আলোচনা অপরিহার্য।

ইউরোপে কি প্রতীচ্যের প্রায় সবদেশেই দেখি একজাতি একধর্ম। সমস্ত ইংরেজই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের মধ্যে হয়ত মুষ্টিমেয় লোক বৌদ্ধ, ইসলাম কি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা কেহ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত, কেহ প্রটেস্টাণ্ট, এবং কেহ হয়ত বা নিরীশ্বর-বাদী। কিন্তু ইহাতে ইংরেজের জাতিত্ব খণ্ডিত বা ক্ষীণ হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, সমস্ত কর্ম ও চিন্তায় ইংরেজের একজাতিত্ব পরিস্ফুট। ঐতিহাসিক কারণে নানা জাতির রক্তের মিশ্রণে ইংরেজ জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এখন সকল ইংরেজই ইংরেজ, কাহার শরীরে ড্যানিশ রক্ত প্রবাহিত বা কাহার পূর্বপুরুষ নরম্যান, এই প্রশ্ন একান্ত নৃতত্ত্বের প্রশ্ন; ইহার সঙ্গে ইংরেজের জাতিত্বের কোন সম্পর্ক নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্য কথা। প্রাচীনকালে অনার্য-অধ্যুষিত সিন্ধু-তীরে আর্যেরা আসিল, অনার্যদের এক অর্থে পরাভূত করিল এবং আর-এক অর্থে তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইল। বৈদিক সভ্যতা একটি জাতির সভ্যতা। এই সভ্যতা পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল, দক্ষিণে দ্রাবিড় জাতি আর্যধর্ম গ্রহণ করিয়া আর্যজন-গোষ্ঠীভুক্ত হইল। নৃতত্ত্বের দিক হইতে দ্রাবিড়রা আর্য জাতি হইতে পৃথক; কিন্তু ধর্ম ও কৃষ্টির প্রভাবে সেই পৃথকত্ব অগ্রাহ্য। আবার আর্য-সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম প্রভৃতি উদ্ভূত হইল। মনে রাখিতে হইবে, এই নূতন ধর্মসমূহ বিদেশ হইতে আসে নাই, কোন বিদেশী শক্তি আর্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া এই ধর্ম তাহাদের উপর চাপাইয়া দেয় নাই। তাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষ যেমন হইয়াছে তেমন আবার দুই ধর্মের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক কোন ক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানে ভারতের একজাতিত্ব বিনষ্ট হয় নাই।

কিন্তু ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ভিন্ন। এই ধর্ম এদেশে আসিয়াছে অশ্বপৃষ্ঠে, তলোয়ার হাতে এবং ইহা এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রথম যুগে ইহা একান্তভাবে বিজেতার ধর্ম, এক অজ্ঞাত দেশের অপরিচিত ধর্ম। পরবর্তী যুগে ইহা ভারতীয় রাজশক্তির ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভারতের জাতীয় ধর্ম বলিয়া গণ্য হয় নাই। পাঠান আমলের হিন্দু উপনিষদ বা গীতার পাশে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রাখিলেও সেখানে কোরান রাখে নাই। যাহাদের মন্দিরের ঐশ্বর্য দিয়া গজনির হর্ম্যরাজী নির্মিত হইয়াছিল তাহারা ইসলামকে একটি মহৎ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারিল না। তৈমুরলং বলিয়াছিলেন, তাঁহার হিন্দুস্থানে আসিবার মূলে উদ্দেশ্য দুইটি—কাফের নিধন ও লুটতরাজ। এই দেশ ও ইহার ভাষার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা এত প্রবল যে, তিনি এখানে বসবাস করিবার কথা চিন্তাও করিতে পারিতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য: "আমরা যদি এই দেশে কিছুকাল অবস্থান করি, আমাদের সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্য হারাইয়া নিতান্ত ক্ষীণপ্রাণ হইয়া পড়িবে এবং তাহারা ক্রমে হিন্দুর ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে।" পাঠান আমলে মুসলমান রাজশক্তি বিজিতের ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া মুসলমান তাহার মিনার নির্মাণ করিল—ইহা ছাড়া দুই ধর্ম রাজশক্তির সহায়তায় অন্য কোনভাবে মিলিত হইল না।

কিন্তু ইতিহাসের গতি বহুমুখী ও বিচিত্র। তাই লক্ষ্য করি, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদেশী শাসককুলের বিদ্বেষ ও ঔদাসীন্য সত্ত্বেও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেই সিন্ধু-পাঞ্জাবের মুসলমান কবি আর্যভাষার অপভ্রংশে কাব্যরচনায় তৎপর। অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দুর ভাষা গ্রহণ করিবে, তৈমুরলঙের এই আশঙ্কার বেশ কিছু পূর্বেই উত্তর আর্যাবর্তের মুসলমান আর্যভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে শুরু করিয়াছে। মুলতানের মুসলমান কবি অবদুর রহমানের অপভ্রংশ কাব্য "সংনেয় রাসয়" ইহার

প্রমাণ। এবং এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই পাঞ্জাবে সুফী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। সুফী কবি শেখ ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জের একটি গান শিখদের আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। তরাইনের যুদ্ধের পূর্বে উত্তর ভারতের ছয়জন চারণ কবির মধ্যে তিনজনই মুসলমান এবং যদিও ইঁহাদের রচিত কাব্যের কোন অংশ আজ পর্যন্ত উদ্ধার হয় নাই, ইঁহারা যে তৎকালের প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেখিতেছি পাঠান আমলে রাজশক্তির হিন্দু-বিদ্বেষ সত্ত্বেও উত্তর ভারতে হিন্দু সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এবং হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে মুসলমান বিজয়ের ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্পষ্ট। হিন্দুর মন্দির ও গ্রন্থশালা মুসলমান কর্তৃক বিনষ্ট হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন বিঘ্নিত হইল, পণ্ডিত সমাজও কিছুটা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিদেশী শক্তির এই বিষম উৎপীড়নের একটি সুফল প্রাকৃত ভাষার পুষ্টি ও বিস্তার। অবশ্য মুসলমানের এই হিন্দু-বিদ্বেষ উত্তর-পশ্চিম ভারতের জানপদ ভাষাসমূহের অভ্যুত্থানের একমাত্র কি প্রধান কারণ বলিয়া ধরিতে পারি না। যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রেনেসাঁর একটি কারণ ক্যাথলিক ধর্ম-সংস্থাগুলির বিলোপসাধন সেইরূপ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে আধুনিক আর্যভাষার উৎপত্তির একটি কারণ মুসলমানের হিন্দু-পীড়ন।

এই পাঠান আমলে ভারতবর্ষে মূলত দুই জাতির বাস—রাজার জাতি মুসলমান এবং সাধারণ প্রজাকুল হিন্দু। ইহাদের ধর্ম ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন এবং আচার, ব্যবহার, নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব। তবে একটি বিষয়ে ইহারা এক—ইহাদের এখন একই দেশে বসবাস। এখন প্রশ্ন হইল, একদেশে বহুকাল একত্রে বাস করিয়া ইহারা ক্রমে একজাতিতে পরিণত হইয়াছে কিনা? আমাদের উত্তর হইতে পারিত, কোন কোন সময়ে জনসমাজের বিশেষ পর্যায়ে নানা অবস্থার আনুকূল্যে ইহারা একজাতিত্ব অর্জন করিয়াছে, কিন্তু কোনদিনই সমস্ত দেশ পুরাপুরিভাবে একজাতিত্ব লাভ করে নাই। মধ্যযুগের সাধক কবি কবীর মুসলমান তাঁতীর পালিত পুত্র, সুফী ধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, দুই ধর্মের সার্থক সমন্বয়ে বিশ্বাসী। কিন্তু যে-কবির বিশ্বাস

তুরুক তেল, হিন্দু ফলিতা, দিয়না
বরনে লাগি।
বীচ মহলমৈ বরৈ আরতী রীঝৈ
সাহিব রাগী॥

(মুসলমান তেল, হিন্দু পলিতা, তাহা দিয়া দীপ জ্বালা হইয়াছে এবং মন্দিরে প্রেমিক প্রভুর আরতি চলিয়াছে।) তিনি সিকন্দার লোদী দ্বারা নিপীড়িত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন। যদি শুধু ধর্মান্ধ রাজশক্তিই তাঁহাকে তুচ্ছ করিত তাহা হইলেও এই ধর্ম-সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে নিতান্ত ব্যর্থ বলিতাম না। কবীরের সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যরাও তাঁহাকে বুঝিল না। আমী নদীর তীরে হিন্দু ও মুসলমান দ্বারা পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত কবীরের মঠ দুইটির মধ্যে প্রাচীরটিই ইহার সাক্ষী।

এখানে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতে আর্যরা যেরূপ অনার্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি জাতি ধর্ম ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্গে সেই একাত্মকরণ সহজ ছিল না। যে ঐক্যসাধন সভ্যতার প্রথম অবস্থায় সহজ তাহা প্রাপ্তবয়স্ক ধর্ম বা সংস্কৃতির মধ্যে সহজ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন সিন্ধু প্রদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হিন্দু-ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম, দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়া এক বিশিষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালের তুর্কী আক্রমণের সময় দুই ধর্মই দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর। ইহাদের একত্বসাধন এক বৃহৎ সমস্যা। কিন্তু ধর্মগত ঐক্য ব্যতিরেকেও এক ধরনের একজাতিত্ব সম্ভব। যেখানে এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম, সেখানে জাতীয় ঐক্য দৃঢ়, সভ্যতা শক্তিশালী। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মে যেখানে এই ধর্মগত ঐক্য অসম্ভব সেখানে ঐক্যের অবশিষ্ট উপাদানগুলি দিয়াই জাতীয়তা গড়িবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই অবশিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে একটি সাহিত্য। কিন্তু এখানে জাতির ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। ভাষা, সাহিত্য তথা এক স্থূল অর্থে সংস্কৃতিগত ঐক্য সংঘটনের জন্য একাধিক ধর্মের এক সমন্বিত রূপ একান্ত আবশ্যক না হইলেও ঐ ধর্মগুলির মধ্যে এক সৌহার্দ্য অপরিহার্য। কারণ যেখানে ধর্ম-বিদ্বেষ প্রবল সেখানে এক-ভাষা ও এক-সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। এবং যেখানে দুই ধর্ম-সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি অবিদ্বিষ্ট সেখানে ক্রমে তাহাদের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক আবার নানা অবস্থার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়তায় পর্যবসিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিতে পারে। সুতরাং যেখানে দেখিব মুসলমান হিন্দুর ভাষায় দুই সম্প্রদায়ের পাঠকের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে সাধারণত বুঝিব লেখকের হিন্দুর প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, সেখানে বুঝিব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যসমাজে প্রবেশ করে নাই। মুসলমান আমলে ভারতবর্ষের রাজভাষা ফারসী। ইসলাম ধর্মের ভাষা আরবী, বিজেতৃ রাজশক্তির জাতভাষা তুর্কী। কিন্তু মুসলমান রাজদরবারে তুর্কীভাষার প্রচলন ছিল না। ফারসীকেই রাজকার্য ও সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। বাবরের আত্মজীবনীখানিই মুঘল আমলের তুর্কী সাহিত্যের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সুতরাং মুঘল যুগে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় যে দরবারী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তাহা ফারসী ভাষায় লিখিত এবং বহুলাংশে ফারসী সাহিত্যের প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই যুগের ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত পাঠান যুগ হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংস্পর্শের ফলে আর্যভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের

প্রয়োগ, দ্বিতীয়ত, মুসলমান কর্তৃক আর্য-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি। সিকান্দার লোদীর আমলেই দেখি হিন্দী সাধন-সঙ্গীতে আরবী ও ফারসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ অনেক গান আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের কবিতায় আর্য শব্দের কিছু প্রক্ষেপ বর্তমান। এবং এই পথেই ক্রমে উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ ভাষা গড়িয়া ওঠে। আর আমাদের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে মুসলমান কবির আর্য ভাষায় কাব্য-রচনা। অবদুর রহমানের অপভ্রংশ কাব্য ও ফরিদুদ্দীনের গানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "সিন্ধু-পঞ্জাবে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনায় অগ্রণী ছিলেন মুসলমানরাই।" এইরূপ অনুমানের পক্ষে যুক্তির অভাব নাই। এইভাবে মুসলমান আমলে কোন কোন সময়ে, কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন জনসমাজের মধ্যে দুই সম্প্রদায় লইয়া একটি সাহিত্য-সমাজ জন্মলাভ করিয়াছে। এবং এই ভাষাগত ও সাহিত্যগত ঐক্যের ভিত্তি একপ্রকারের ধর্মীয় উদারতা। তবে হিন্দু ও মুসলমানের এই যৌথ সাহিত্য রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। আকবরের পূর্বে কোন মুসলমান রাজা হিন্দু ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। সিকান্দার লোদী আহমেদ খাঁ নামে এক অভিজাত বংশের মুসলমানকে তাহার হিন্দু প্রীতির জন্য শাস্তি দিয়াছিলেন। পাঠান-রাজের এই হিন্দু-বিদ্বেষের কয়েকটি বিশেষ কারণ এখানে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম কারণ—হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম-জাগরণ; ভিন্নধর্মাবলম্বী বিদেশী শক্তি বিজিত জাতির ধর্মের এই পুনরভ্যুত্থানে স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করিলেন। দ্বিতীয় কারণ, বহু মুসলমান হিন্দুধর্মের ভক্তিরসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহাও অবশ্য মুসলমানরাজের কাছে নিতান্ত অনভিপ্রেত। আর তৃতীয় কথা, যে সমস্ত হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বের ধর্মের অনেক ভাব রীতিনীতি ইসলামের মধ্যে লইয়া আসিলেন। অর্থাৎ দুই ধর্ম এক আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া যে এক যৌথ সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা পাঠান রাজশক্তি পরম অকল্যাণের সূচনা বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি এমন সরল নয় যে, মুসলমান সম্রাট হিন্দুকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেই দুই ধর্মের সমন্বয় বা সৌহার্দ্য সাধিত হইবে। রাজা বা তাঁহার

সুষুপ্তি শিল্পী শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কয়েকটি চিন্তাশীল পারিষদ হিন্দুর ধর্ম সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে উদারতা দেখাইলেই যে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির পথ নির্মিত হয় না, তাহা আকবরের মহত্ত্বের ঐতিহাসিক ব্যর্থতা দেখিয়াই বুঝিতে পারি। আকবর হিন্দুধর্মের মর্মগ্রহণ করিলেন, হিন্দুকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ মুসলমানের জন্য ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইলেন, হিন্দু কবি, পণ্ডিত প্রভৃতিকে নানাভাবে উৎসাহ দিলেন, হিন্দু রমণী বিবাহ করিলেন, রাজ্যে গোবধ বারণ করিলেন, দুই ধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া নূতন ধর্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার সভার আবুল ফজল ও ফৈজী পাণ্ডিত্যে ও চিন্তাশীলতায় ও ঔদার্যে অসাধারণ। কিন্তু আকবরের একজাতিত্বের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। বাদাউনী প্রভৃতি গোঁড়া মুসলমান ফৈজী ও আবুলফজলকে একরকম স্বধর্মত্যাগী মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। রাজা বীরবল সম্রাটের উদার নীতির সহায়ক ছিলেন, তারিখ-ই-বাদাউনীতে তিনি দাসীপুত্র বলিয়া অভিহিত। আকবরের এই উদারনীতির নিষ্ফলতা সমসাময়িক পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিরা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই উদার চরিত্রের লোক ছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভেদবুদ্ধি দূর হয় নাই এবং এই মহৎ প্রচেষ্টার অসার্থকতা অনেকের মনে গভীর দুঃখ ও নিরাশার সঞ্চার করিয়াছিল। বীরবলের মৃত্যু সম্বন্ধে রচিত কেশবদাসের শ্লোকটির কথা এইঃ "ভেদের ভেরী প্রবলভাবে বাজিতেছে। কলি কুকর্ম করিয়া বড় কৌতুক লাভ করিতেছে। কিন্তু বহু দরিদ্র লোকের দরবারে বীরবল যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার নামের দামামা বাজিতেছে।"

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম মুসলমান-রাজের হিন্দু-বিদ্বেষে হিন্দুধর্ম নূতন প্রাণ পাইল, কিন্তু মুসলমানরাজের হিন্দু-প্রীতিতে দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় বা আত্মীয়তা হইল না। এখন প্রশ্ন হইল, ভারতীয় জীবনের কোন্ অংশে কী অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান একমন, একপ্রাণ হইয়া এক-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিল? আমা-

জননী আলোকচিত্রী শ্রীনেপাল মুখোপাধ্যায়
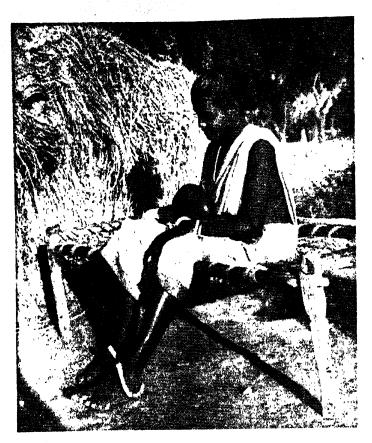
দের উত্তর—প্রধানত দুই ক্ষেত্রে। প্রথম, সাধারণ জনের ধর্মবুদ্ধিতে ও ভক্তি-সাহিত্যে এবং প্রেম-গাথায়। এই ভক্তির ক্ষেত্রে তত্ত্বগত অনৈক্যের প্রশ্ন উঠে না, দার্শনিক বিচারের প্রশ্ন উঠে না। ইহার প্রাণ চিত্তের সহজ ধর্মভাব, ইহার কথা হৃদয়ের কথা। ইহা রাজদরবারের সামগ্রী নয়, কোন সুচিন্তিত ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টার ফল নয় এবং ইহা শহরবাসী পণ্ডিতের দার্শনিক মন হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহার সুর যেন উঠিতেছে গ্রাম্য জীবনের রৌদ্র বাতাস হইতে, ইহার কথার মধ্যে শুনিতে পাই কোন দূরগামী কৃষ্ণমেঘের নিকট মানুষের গোপন প্রসঙ্গ। এই কৃষ্ণমেঘ যেমন হিন্দুর, তেমন মুসলমানের, এই প্রসঙ্গও যেমন হিন্দুর, তেমন মুসলমানের। ইহা কোন লিখিত শাস্ত্রের অনুশাসনে আবদ্ধ নয় এবং কোন মন্ত্রতন্ত্রেরও অপেক্ষা রাখে না।

এই সাহিত্যের আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার উদ্ভবের প্রধান কারণগুলি কী, দেখিয়া লইতে চাই। (১) গ্রামদেশের বহু মুসলমান পূর্বে হিন্দু ছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াও হিন্দুধর্মের ভাব ও কল্পনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে পারে নাই। (২) গ্রামদেশে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজেতৃ-বিজিত সম্পর্ক তত প্রকট হয় নাই। (৩) সেখানে মৌলবী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সংকীর্ণ মনোবৃত্তির প্রভাবও অতি পরিমিত। (৪) অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন সংযোগের ফলে গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (৫) এই সান্নিধ্য তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সমধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। (৬) মধ্যযুগের হিন্দু সাধকের ভক্তিবাদ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক মুসলমানকে আকৃষ্ট করিয়াছে। (৭) জানপদ হিন্দুসমাজের অন্ত্যজগণ আবার উচ্চবর্ণের হিন্দুর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া সুফীবাদের উদার প্রেমধর্মে আশ্রয় খুঁজিয়াছে। নাথপন্থী, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব-সহজিয়ার সাধনার ও সুফী-সাধনার মধ্যে এক মৌলিক ঐক্য বর্তমান। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের ভক্তি-সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের ত্রিবেণী-সঙ্গম সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য:

"এই সদ্ধর্মীরা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল; ইসলামের সামাজিক উদারতা ও সাম্য ইঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বহু-সংখ্যক নরনারী ইসলামের ভুজাশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিল। বঙ্গের এক বৃহৎ জনসাধারণ গোঁড়া হিন্দু-সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া সেই কঠোর গণ্ডীর বাহিরে যে সাধনা করিতেছিল, ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহা ছাড়ে নাই। সুফী-গুরুগণ তাহাদিগকে অনেক নূতন তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন এবং তাহারাও ইসলামকে এদেশের উপযোগী করিয়া নূতন গড়ন দিতে ছাড়ে নাই। এই লেনদেনের কারবারে সুফী মত বঙ্গদেশে এক অপরূপভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।"

মুসলমানকৃত হিন্দী বা বাংলা সাহিত্যের মানসভূমি এই শাস্ত্রনিরপেক্ষ উদার ভক্তিবাদ। নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় সাহিত্যের এই উৎস স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নাই।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনায়, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের সন্ত সাহিত্যে, কতখানি সুফীবাদ ও কতখানি হিন্দুর ভাগবত-ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এবং বাংলা বাউল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ-সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া সুফীবাদ প্রভৃতি কীভাবে মিশ্রিত হইয়া উদার মরমী ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও একান্তভাবে পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা, কারণ চিত্তের যে সহজ ধর্ম শাস্ত্রকে একরকম প্রত্যাখ্যান করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোচনায় শাস্ত্রকথা অবান্তর। কবীর বা মদন বাউলের প্রেমতত্ত্ব হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাপ্রসূত নয় কারণ ইঁহারা বিচারশীল শাস্ত্র-ব্যাখ্যার পথে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সন্ধান করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক ঐক্যানৈক্যের প্রশ্ন লইয়া ইঁহারা কখনও ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের একমাত্র প্রতিবাদ প্রাণহীন শাস্ত্রভারাক্রান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে।

যাগযজ্ঞ ও নানা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও আচার যে চিত্তের স্বাভাবিক ধর্মবোধকে বিনষ্ট করে, তাহাও দেখি ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রষ্টারাই বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম যে একান্তভাবে হৃদয়ের সংবাদ, শুধু শাস্ত্রপাঠে যে ইহা অর্জন করা যায় না, মধ্যযুগের সাধনার এই মূল তত্ত্বের সন্ধান পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে:

হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি
হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

(হৃদয় দিয়াই সেই সত্যকে উপলব্ধি করা যায়, হৃদয়েই সত্যের অধিষ্ঠান।)

যাঁহারা শাস্ত্রের সংকীর্ণ কূপে পড়িয়া মানুষের ধর্মের সহজ স্ফূরণ ও গতিকে অস্বীকার করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই যেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেনঃ

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ স্বাদুমুদুম্বরম।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যোন তন্দ্রয়তে চরন্
চরৈবেতি চরৈবেতি।

(চলাই মধু, চলাই সুস্বাদু ফল। চাহিয়া দেখ সূর্যের আলোক চলিতে চলিতে কখনও ক্লান্ত হয় না।)

সন্তকবির বা সুফীধর্মীর যে উদার মানবধর্ম তাহার তত্ত্বও গীতা ও ভাগবতে নিহিতঃ

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা
আভীর শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ॥ ভাগবত

(এই ধর্মে কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস সবারই সমান অধিকার।)

কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতির ধর্মবোধ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রভারমুক্ত। হিন্দু ও মুসলমানের শুষ্ক আচারনিষ্ঠায় ইঁহারা প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পান নাই। কবীর বলিয়াছেনঃ

জো খোদায় মসজিদ্ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কোহুকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কে হেরা॥

(খোদার অধিষ্ঠান যদি মাত্র মসজিদেই হইবে, তাহা হইলে বাকী জগৎ কাহার? রাম যদি কেবল তীর্থে ও মূর্তিতেই থাকিবেন, তাহা হইলে এই বাহির বিশ্ব কে দেখিবে?)

অনুরূপ ভাব লইয়া দাদু বলিলেনঃ

না হম হিংদু হোহিংগে না হম মুসলমান।
ষটদর্শন মেং হম নহীং হম রাতি রহিমান॥

আমি হিন্দুও হইতে চাহি না, মুসলমানও হইতে চাহি না, ষড়দর্শনের পথও আমার নয়; আমি চাহি দয়াময়কে।)

রজ্জবের বিশ্বাসঃ

হিন্দু পাতি হিন্দু খুসি তুরুক তুকী মাঁহি।
রজ্জব আশিক এক হৈ তিনকে দোনো নাহীং॥

(হিন্দু হিন্দুধর্ম লইয়া খুশী, তুর্কী তাহার ধর্মে খুশী, রজ্জব বলে, প্রেমময়ের কাছে কোন পক্ষপাত নাই।)

দ্বাদশ শতাব্দীতে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সন্দেশ রাসকের কবি অবদর রহমানের ধর্মও এই মানবতার ধর্মঃ

রয়নায়রধর গিরি তরুবরাই
গয়নং গনং মি রিকথাই
জেনজ্জ সকল সিরিয়ং
সো বুহয়ন বো সিবং দেউ॥

(হে ভদ্রজন, যিনি রত্নাকর-ধরা-গিরি-তরুবর ও আকাশের নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাদের কল্যাণবিধান করুন।)

রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব প্রভৃতির ভক্তিধর্মের প্রসঙ্গেই বাঙলার বাউল সম্প্রদায় ও বাউল সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সন্ত কবিদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রানুগ ধর্মাচরণ পরম ভক্তের নিকট অগ্রাহ্য। বাঙলার বৈষ্ণব সহজিয়ার তত্ত্বও ইহাই—এই শাস্ত্রানুগ ধর্মই চৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত "বৈধী ধর্ম"ঃ

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥

ভক্তের নিকট এই বৈধী 'ভক্তি' অন্তঃসার-শূন্য। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে বলা হইলঃ

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।

অমৃত রত্নাবলীতে পাইঃ

বিধিপথ পরিত্যজ রাগানুগা হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।
বৈধী কর্ম যারা করে পুণ্যচয় সদা করে
পুণ্যে হয় সুখের উদয়॥
সে সুখ অতি তুচ্ছ হয় কোনই কাজের নয়
সোনার শৃঙ্খল যেন হয়॥

এই রাগাত্মিকা ভক্তি শাস্ত্রনিরপেক্ষ এবং সেইজন্য ইহা যেমন হিন্দুর তেমন মুসলমানের। এই ধর্ম ভূমিষ্ঠ হইয়াছে গ্রামদেশে, প্রাকৃত জনের মধ্যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অনুশাসন সেখানে পৌঁছায় নাই। জোলার পালিতপুত্র কবীর বলিয়াছিলেন—আমি সবার নীচে বলিয়াই সত্যকে পাই (উঁচে পানী না টিকে নীচে হী ঠহরায়)। এবং এই শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার কথা—পঢ়ি পঢ়িত পথর ভয়া লিখি লিখি ভয়া জো ঈংট।

বাঙলার বাউলও শাস্ত্রের নীরস পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর কর ভাই॥

সুফীদের প্রেম-ব্যাকুলতা এই মূল প্রেরণাকেই পুষ্ট করিয়াছে। "বাউল" শব্দ "ব্যাকুল" বা "বাতুল" শব্দের বিকৃতি। এই শব্দের দ্যোতনা, পাগল বা খ্যাপা। বাউল শাস্ত্র মানে না—আচার অনুষ্ঠানে তাহার অনাস্থা। তাহার ভগবান তাহার দেহের মধ্যে—ডাকলে কথা কয়ঃ

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে
মানুষ হাওয়ার সনে রয়
দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিল। কিন্তু তাহারা শাস্ত্রবচনের ধার ধারিত না বলিয়া তাহাদের সাধনার কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক রূপ নাই। মদন বাউল ছিলেন মুসলমান; কিন্তু তাঁহার গুরু ঈশান ছিলেন যোগী। বাউল লালন ফকিরের জন্ম হিন্দু পরিবারে, কিন্তু তাঁহার গুরু ছিলেন মুসলমান ফকির সিরাজ সাঁই। লালনের ধর্মও সহজ মানুষের ধর্মঃ—

এই মানুষে আছয়ে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে-ধন
পারলাম না চিনতে।

এই তত্ত্বের সূচনা দেখি অথর্ব বেদেঃ—"যাঁহারা মানুষের মধ্যে পরমেশ্বরকে পাইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন।" এবং এই কথাই আবার শুনি মহাভারতের শান্তিপর্বে—

"ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"

(মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।) চণ্ডীদাস যখন বলিলেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই", তখন তিনি এই সত্যই প্রচার করিলেন।

দরজাটা ভেজানো ছিল। সজোরে ধাক্কা দিতেই পাল্লা দুখানা সশব্দে পাশের দেওয়ালের উপর আছড়ে পড়ল। পাগলের মত ঘরে ঢুকল জয়ন্ত। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ বসে গেছে—দুপাশের রগের শিরা ফুলে উঠেছে। "বিকাশদা সর্বনাশ হয়েছে—দিদি পুড়ে গেছে।" বলেই বিকাশের খাটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় মুখ গুঁজে জয়ন্ত উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগটা চাপবার চেষ্টা করল।

সবে ভোর হয়েছে—বিকাশ ত লাল আগুনের মত টকটকে আকাশটার দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ। সেই আগুনের খবর এনে দিলে জয়ন্ত। বুঝতে পারেনি বিকাশ, প্রভাতের ভগ্নদূত জয়ন্ত কী খবর নিয়ে এল। তার সোনালী চুলগুলোর উপর লাল আলো পড়েছে, দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। কী বললে যেন? রুনী পুড়ে গেছে? বিকাশও বোধ হয় আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঐ ছেলেটার অদ্ভুত কান্নার দিকে চেয়ে থেমে গেল। না—না—বিকাশের অশোভন আচরণ মানায় না। জয়ন্ত কাঁদছে—রুনীর ভাই জয়ন্ত, সে ত কাঁদবেই—কিন্তু রুনীর জন্য বিকাশ?...

ঠোঁটে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই জ্বালালে বিকাশ। কাঠিটা নিভে গেল, আর একটা কাঠি ঘষতে গিয়ে ভেঙে গেল। তৃতীয় কাঠির জ্বলন্ত মুখটা মুখের কাছে এনে দেখলে তার হাতটা কাঁপছে। সিগারেটের একটা পাশের দিকে আগুন ধরল। জ্বলন্ত কাঠিটা মুখের আরও একটু কাছে সরিয়ে আনল বিকাশ—তারপর সেটা সরিয়ে নিল। পুড়ে গেছে রুনী।

গলার স্বরটাকে গুছিয়ে নিয়েছে বিকাশ। শান্তভাবে জয়ন্তর মাথার উপর হাত রেখে বলল, "কিসে পুড়ল রে জয়ন্ত!" সাবাস বিকাশ! গলা একটুও কাঁপেনি—নিস্পৃহ নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। মনে হল চায়ে চুমুক দিতে দিতে সানফ্রানসিসকোর রাস্তায় একটা মোটর-অ্যাক্সিডেন্টের খবর পড়ছে বিকাশ। জয়ন্ত বিছানা থেকে মুখ তুলে বিকাশের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে অস্থির কণ্ঠে বলল, "শিগগির চল বিকাশদা, তুমি না গেলে দিদি বাঁচবে না।"

বিকাশ উঠল—তেমনি পাথরের মত গলায় বললে, "তুই যা জয়ন্ত, আমি যাচ্ছি।"

অনন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
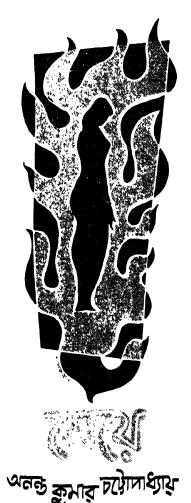
জয়ন্ত তার জলভরা চোখদুটো বিকাশের নিস্পৃহ মুখের দিকে তুলে ধরল। নিবিড় ঘৃণা ঘনিয়ে এল তার দু'চোখে। এই বিকাশদা! এই বিকাশদাকে সে ভালবাসত, এই বিকাশদার সঙ্গে দিদির...। যেমন ছুটে সে ঘরে ঢুকেছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল।

পূর্বদিকের লালটা কেটে গেছে—একটু চিকচিকে রোদ্দুর। রুনী কি আত্মহত্যা করল? অসহনীয় জীবনের গুরুভার বোধ হয় আর বইতে পারল না রুনী, তিল তিল করে তুষানলে পোড়ার চেয়ে বেছে নিল এই নির্বাণের পথ। আশ্চর্য! খাটের যে-জায়গার উপর মুখ গুঁজে জয়ন্ত একটু আগে কেঁদে গেছে, বিকাশ সেইখানটায় মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

বিকাশ চমকে উঠে দাঁড়াল। ছি-ছি-ছি—মেয়েদের মত কাঁদতে পারল বিকাশ।

জয়ন্তের দিদি এখনও মরেনি, এখন চেষ্টা করলে বিকাশ নাকি তাকে বাঁচা[ইতে] পারে। কে জানে, জয়ন্তকে পাঠিয়ে দি[য়ে] তার উদ্ধত পিতাই বুঝি এই ভি[ক্ষা] চেয়েছে। কবচকুণ্ডল দেবার পর কর্ণে[র] ইতিহাস নেই—সে দান ত হয়ে গেছে আ[জ] তিনবছর হল। তারপরেও বিকাশ বেঁ[চে] আছে। ডাক্তারি পাশ করেছে, সদ্য হাউস সার্জনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, বিকা[শ] বাইরের আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে—মরা মনের সমাধিকে কেন্দ্র করে ইমারত গড়বে! তার পর? 'তার পর'—প্রশ্ন করতে অনেকদিন ভুলে গেছে বিকাশ রুনীর বিয়ের রাত্রেও করেছিল, তার পর আর করেনি। 'তার পর'-এর কথা ভাববার অবকাশও দেয়নি মনকে। আজ অনেক অনেক দিন পরে রুনী, না রুনীর ভাই জয়ন্ত সেই খেইটুকু ধরিয়ে দিয়ে গেল। কেন এমন কাজ করলে রুনী, মৃত্যুকে আহ্বান করে গ্রহণ করায় গৌরব নেই। এ কথা ত তোমায় কতদিন বলেছি। বিকাশের গলাটা আবার কিট্‌কিট্‌ করছে। কিন্তু একি! কোথায় যেন একটুকরো আনন্দ মনে পড়ছে, ছোটবেলায় ছাইগাদার মধ্যে একটা টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল বিকাশ। যুদ্ধপূর্বকালের স্কুলমাস্টারের ছেলে বিকাশ। কোন আনন্দ, বিশেষ করে অপ্রত্যাশিত আনন্দের মুহূর্তে বিকাশের সেই ঘটনাটাই প্রথম মনে পড়ে—রোদ লেগে চক্‌চক্‌ করে উঠছিল টাকাটা।

ট্রাউজার পরে বুশশার্টটা গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে গেল বিকাশ। রুনীকে বাঁচাবে। কতটা পুড়েছে, কিভাবে পুড়েছে কিছুই জানে না বিকাশ। তবু তাকে বাঁচাবে। তারপর ঐ বিকৃত দেহটা নিয়ে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় বিকাশ তা গ্রহণ করবে। দেহ চায়নি বিকাশ, দেহাতীতকে চেয়েছিল। আবার ধাক্কা খেল বিকাশ। এই কি তার গোপন আনন্দ-উৎসবেব সূত্র। নিজেকে মহনীয় করবার এ কি দীন চেষ্টা—একজনের সর্বনাশের মূল্যে নিজেকে ঐশ্বর্যবান করবার লজ্জায় বিকাশ যেন মরমে মরে গেল।

রুনীদের বাড়ির সামনে আসতেই অ্যাম্বুলেন্সখানা বেরিয়ে গেল। বিকাশ যেন বেঁচে গেল। ঐ বাড়িটার মধ্যে আবার তাকে ঢুকতে হবে, একথা এই চরম মুহূর্তেও তাকে সঙ্কুচিত করছিল। সোজা ট্যাক্সি

নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের আগেই হাসপাতালে এসে পৌঁছল।

আউটডোর স্টাফ ওকে সম্বর্ধনা করতে উঠে থমকে দাঁড়াল। যে-মুখটাকে বিকাশ এখনও দেখেনি—তারা সবাই তা দেখছে। ওদের মুখের উৎসুক প্রশ্ন অনুধাবন করে বিকাশ হাসবার চেষ্টা করে বললে, "বার্ন-কেস, আমার আত্মীয়া। পিছনে অ্যাম্বুলেন্স আসছে।"

আত্মীয়া! বলতে পেরেছে বিকাশ। কেমন যেন ভাল লাগল তার নিজের কানেই। "মিস্ গোস্বামী, আপনি তৈরী হয়ে নিন। আর অলোক, তুমি আমাকে সাহায্য করবে—ওষুধপত্র কী আছে দেখি?"

দৃঢ় পদক্ষেপে বিকাশ এগিয়ে গেল আলমারির কাছে—তারপর একখানা কাগজ টেনে খস খস করে কয়েকটা ওষুধের নাম লিখে হাঁক দিল, "শিউপূজন, দৌড়ে যাবি, সেন ফার্মাসী থেকে এগুলো নিয়ে আয়, আমার নিজের দরকার বলবি।" পাশের ঘরে ঢুকে গেল বিকাশ। শান্তভাবে নিজের জামা খুলে অ্যাপ্রন পরে নিলে, অ্যাণ্টি-সেপটিক সাবান আর লোশন দিয়ে খুব সাবধানে কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিলে।

অ্যাম্বুলেন্স বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকাশের বুকখানা একবার, একবারই মাত্র কেঁপে উঠেছিল, সেটা অ্যাম্বুলেন্সটার স্টার্ট ছাড়ার শব্দে। ওর মনে হয়েছিল, রুনীর শবদেহটা বোধহয় ওরা নামিয়ে আনলে—কেমন একধরনের বিহ্বলতা...। কিন্তু তার পরের আধ ঘণ্টা অপূর্ব সাহসের পরিচয় দিলে বিকাশ, ওর সহকর্মীরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

আর এই আধঘণ্টায় বিকাশের চেতনায় বিকাশ নিজেই ছিল না—রুনী ত নয়ই। ডাক্তারেরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের চিকিৎসা করেন না, কারণ একটু দুর্বলতা, একটু সংশয়ভরা ভীতি, মনে হয় যেন ভুল হচ্ছে। কিন্তু রুনী কি তার আত্মীয়? না না—খাতায় তার নাম লেখান হয়েছে মিসেস রেণুকা মজুমদার, C/o. শ্রীব্যোম-কেশ মজুমদার, রিলেশন—স্বামী। আর তার কুমারী নাম ছিল রেণুকা হাজরা। কোন জায়গায় এতটুকু মিল নেই। তবে কেন পারবে না সে? সত্যিই পেরেছে—অত্যন্ত নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজ করে ইনজেক্‌শন দিয়ে দিয়েছে। সব চেয়ে পুড়েছে রুনীর মুখ, রক্তাভ লাল ফুলো ফুলো চোখদুটো। তবে কি—? না, ওকথা ভাববে না বিকাশ।

কেবিনে পাঠিয়ে দিয়ে—স্পেশাল নার্সিং-এর ব্যবস্থা করে বিকাশ জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে আবার সিগারেট ধরালে। ও জানে, এক্ষুনি বেরুলেই রুনীর বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে, সেই স্বার্থপর মানুষটা, যদি পৃথিবীর একটা লোককে ঘৃণা করে বিকাশ—সে ওই রুনীর বাপকে। আরো দেখা হতে পারে ব্যোম-কেশের সঙ্গে। তার সামনেও আজ যেতে চায় না বিকাশ।

মিস্ গোস্বামী এসে দাঁড়াল। বললে, "ডক্টর, বাইরে পেশেণ্টের আত্মীয়রা অপেক্ষা করছেন, কী বলব?" বিকাশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিস গোস্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। আরো একটি মেয়ে ত? কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি? গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, "আমি ভেতরে আছি ও'রা জানেন?"

"না-বোধ হয়।" নার্স জবাব দিলে।

"তাহলে বলে দিন, কেস্ সিরিয়স, ভালমন্দের কথা নিশ্চয় করে এখন কিছু বলা যায় না।" নার্সকে বেরিয়ে যেতে দেখে ডাক দিলে, "আর শুনুন, আমার নাম জিজ্ঞেস না করলে বলবার দরকার নেই।"

বিকাশ বুশ-শার্টটা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। একটা পৈশাচিক আনন্দ। হ্যাঁ, ভাবুক বুড়োটা। রুনীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী মানুষটিকে নিশ্চিন্ত আশ্বাস নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না বিকাশ। তবু মনটার কোথায় যেন খচখচ করছে। মনে হচ্ছে এমন করে ডাক্তারেরা রোগীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে না—এটা ঠিক রীতি
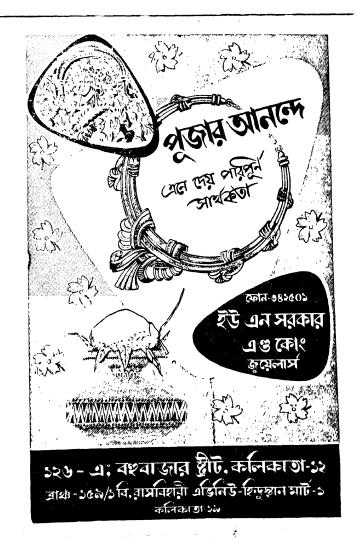
নয়। সত্যই ভালমন্দের দুটো দিক বিকাশ ভেবেছে কি? কিন্তু বিকাশ ভাববেই বা কেন? সে ত ভাবতেই চেয়েছিল, সে অধিকার পেল কৈ? এখন ভাবুক ব্যোমকেশ।

"—বিকাশবাবু।" সামনেই দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ। যেন সবেমাত্র সেনেটে লটকান নিজের অকৃতকার্যতার কলঙ্কের খবর নিয়ে দীর্ঘ-পথ হেঁটে এসেছে, এমনি তার চেহারা। ব্যোমকেশকে ঈর্ষা করেছিল বিকাশ, বিদ্বেষ ছিল তার মনে। উদ্ধতভাবে তার দিকে চাইতে গিয়ে দেখলে মমতায় ওর মনটা ভরে উঠেছে। বেচারা ব্যোমকেশ, তিন বছর ধরে রুনীকে পেয়েও সর্বহারা। দেবতা কোন-দিনই ছিল না, আজ মন্দির ভেঙে পড়ল। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ব্যোমকেশের কাঁধের উপর হাত রাখলে, "ভয় কি, রুনী সেরে উঠবে।" এই ত ডাক্তারের মত কথা, এই কথাটা এতক্ষণ পরে বলতে পেরে বিকাশ যেন স্বস্তি পেল। ব্যোমকেশ শিশুর মত বিহ্বল অথচ কৃতজ্ঞ চোখ তুলে ওর দিকে চাইলে। তার ঠোঁটটা কাঁপছে, অনেক চেষ্টায় কান্নাটা যেন ঠেকিয়ে রেখেছে।
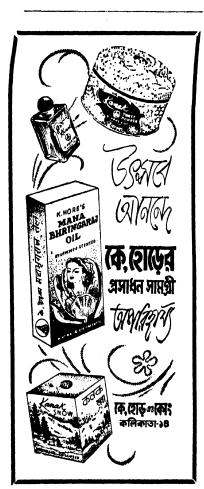
"কী হয়েছিল বলুন ত?" বিকাশ সহজ-ভাবে প্রশ্ন করলে। আরো বলতে ইচ্ছে করছিল, "ঝগড়া করেছিলেন? কত দিনের মনোমালিন্য? কোন দিন কি রুনীকে পেয়েছিলেন?" কিন্তু অশোভন প্রশ্ন করে কী করে।

"স্পিরিট ল্যাম্প ফেটে......"

এত দুঃখেও হাসি পেল বিকাশের। ব্যোমকেশ যেন পুলিশের কাছে রিপোর্ট লেখাচ্ছে। রুনীর বাবা বুড়ো ঝানু ডেপুটি, এত বিপদেও মাথা হারায়নি, ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে বলে দিয়েছে। তা ছাড়া ব্যোমকেশ বলবেই বা কী করে, তিন বছর যে-মেয়ের সঙ্গে ঘর করলে তাকে তিনদিনের জন্যও পায়নি, এ করুণ লজ্জার কথা নিজের কাছেই স্বীকার করা যায় না—কেমন করে আর-একজনের কাছে বলবে।

বিকাশ যেন আদর করেই ব্যোমকেশের পিঠের উপর হাত রেখে বললে, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে? এখন বাড়ি যান। রুনীকে মরফিয়া দেওয়া হয়েছে—জ্ঞান হতে অনেক দেরি। আমি বলছি রুনী সেরে উঠবে—নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।" অপূর্ব দৃঢ়তা বিকাশের কণ্ঠে।

তিন দিন তিন রাত্রি পরে রুনীর জ্ঞান হল। প্রথম জ্ঞান হতেই সে বিকাশের নাম করেছে—তাকেই খুঁজেছে, নার্স বলে গেল। বিকাশের বুকখানা কুচি কুচি হয়ে যাচ্ছিল—তবু নিস্পৃহ অনাড়ম্বর মুখ করে শুনলে—যেন কিছুই নয়। এই তিন দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় হাসপাতালে কাটিয়েছে—আধুনিকতম পত্রপত্রিকা পড়েছে, পোড়ার অবশ্যম্ভাবী বিকৃতি কী করে রোধ করা যায়, সে বিষয়ে যদি কিছু জানা যায়। অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আর কাটিয়েছে রুনীর শয্যার পাশে নার্সকে সাহায্য করে। রুনীকে রুনী বলেই মনে হয়নি, তার অসহায় নারীদেহটাকে নারীদেহ বলেই ভাবেনি বিকাশ—দর্জি যেমন ব্লাউজ বা বক্ষবাস তৈরি করবার সময় নারীদেহের কথা ভাবে না। রুনীর জ্ঞান হয়েছে শুনে রুনীকে মনে পড়ল। বিকাশ কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছে। ছুটে যাওয়াই ওর উচিত ছিল, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ, ডাক্তার ত সে! কিন্তু পারল না—রুনী তাকে খুঁজছে এ-কথা জেনেও পারল না।

অলোক রিপোর্ট নিয়ে এল। বিকাশ হাতের উপর কপাল রেখে মুখ নিচু করে ব্যবস্থাপত্র লিখলে। রোগীর চার্ট পরীক্ষা করলে, প্রয়োজনীয় অদল-বদল করলে ব্যবস্থাপত্রের। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল। এ-কদিন রোজই ওদের বাড়ি সকলের সঙ্গে রুনীর শয্যাপার্শ্বে তা দেখা হয়েছে—অনাত্মীয় বিচক্ষণ ডাক্তারের মত তাদের আশা ভরসা ও উপদেশ দিয়েছে—আজ তাদের কারো সামনে বিকাশ যেতে চাইলে না। চাইলে না নয়, পারলে না।

* * *

বেলা দেড়টার সময় চোরের মত সন্তর্পণে হাসপাতালে এল বিকাশ—পিছনের পথ দিয়ে লঘুপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে রুনীর কেবিনের দরজার পাশে দাঁড়াল ওর বুকটা ঢিবঢিব করছে—ডাক্তারের নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ পদশব্দ আজ ওর পায়ের তলায় জেগে ওঠেনি। দরওয়ান ওয়ার্ডার কুলি মেথর দাই—সকলকে ভয় করছে বিকাশের—সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনক্রমে উঠে এসেছে। এ-সময়টা হাসপাতালটা ঝিমিয়ে আসে—প্রায়ই লোকজন থাকে না। সকাল থেকে ভুলতে পারেনি বিকাশ যে রুনী জ্ঞান হয়ে তাকে ডেকেছিল তবু হাত তুলে পর্দা তুলতে পারছে না বিকাশ। আজ ডাক্তার আসেনি, এসেছে বিকাশ, তার রুনীর সঙ্গে দেখা করতে—গোপনে। আত্মহত্যার এই অপচেষ্টার কারণ-টুকু জেনে নেবে। হয়ত ওর হাতটা ধরে বলবে, "কেন, কেন আমায় বাঁচালে, আর বাঁচালেই যদি......।" মনে পড়ল হাতটা পোড়েনি রুনীর, আর পোড়েনি গলা থেকে কোমর পর্যন্ত।—আশ্চর্য!

বিকাশ পর্দাটা তুলে থমকে দাঁড়াল, যেন ভিতর থেকে এক ঝলক আগুন এসে ওর মুখটা পুড়িয়ে দিলে। টুলের উপর বসে আছে ব্যোমকেশ। রুনীর বুকের উপর আলতোভাবে মাথাটা নুয়ে পড়েছে, আর রুনী তার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বিকাশ এমনি স্পর্শ—এমনি হাত বুলনোর অর্থ জানে, শেষ বিচ্ছেদের অশ্রুসিক্ত ক্ষণে বিকাশও অমনি রুনীর বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিল, আর রুনীও অমনি করে তার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জল-ভরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, "যেখানেই যাই না কেন, রুনী তোমার, রুনী তোমার, রুনী তোমার।"

মেডিক্যাল কলেজের গুডইফ স্কলার—অ্যানাটমি ও ফিজিওলজিতে রেকর্ড মার্ক পাওয়া বোকা বিকাশ ডাক্তার সেই কথা বিশ্বাস করে এসেছে তিন বছর।

পর্দা ছেড়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অনেক কষ্টে নীচে নেমে এসে একটা ট্যাক্সি নিলে।

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত আছে, সীতা দেবীর উদ্ধার-মানসে লঙ্কা গমনের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র যখন সাগর বন্ধন করেন, তখন সেতুবন্ধের কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক বানরদলের সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রাণী কাঠবিড়ালও অংশ গ্রহণ করেছিল। দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের বুকে সেতু বন্ধন এক বিরাট ব্যাপার! সেই বিরাট কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালের আবার কী ভূমিকা গ্রহণের অবকাশ আছে? পাঠকের এ-কৌতূহল নিবৃত্ত করতে কবি বলেছেন—

অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে॥

বীর হনুমান বড় বড় পাথর বয়ে এনে সাগরের বুকে ফেলছেন। নির্মীয়মান সেতুর উপর যাতায়াত করার সময় চারিদিকে কাঠবিড়ালদের ছুটোছুটি করতে দেখে তাঁর বিরক্তি হল, আপদ ভেবে তাদের টেনে ফেলে দিলেন। কাঠবিড়ালের দল যখন কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে হনুমানের এই আচরণের কথা জানাল তখন—

হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাঠবিড়ালের কেন কর অপমান॥
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবনকুমার॥

ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালের কাজের আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ হলেন শ্রীরামচন্দ্র, পরম স্নেহে তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন—

সদয় হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত॥

করুণাবতার রামচন্দ্রের শ্রীহস্তের পাঁচটি আঙুলের ছাপ কাঠবিড়ালের পিঠে অঙ্কিত হয়ে গেল চিরদিনের মত, আজও নাকি কাঠবিড়ালের পিঠে সেই ছাপই আমরা দেখতে পাই।

এ-হেন কাঠবিড়ালের সঙ্গে আমাদের ছোট বড় সকলেরই পরিচয় আছে। মাঠে ময়দানে গাছের উপর এই ক্ষুদে প্রাণীটিকে লাফালাফি করতে, ছুটে পালিয়ে যেতে কে না দেখেছে! কিন্তু লাফালাফি ছুটোছুটি করা ছাড়া বাতাসে বেশ খানিকটা ভেসে বেড়াতেও পারে এক শ্রেণীর কাঠবিড়াল। অবশ্য আমাদের দেশে এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যেহেতু এদেশ তাদের আবাসস্থল নয়। শূন্যবিহারী কাঠবিড়ালের আবাস হচ্ছে এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়। এ-সব জায়গাতে যে একই রকমের শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল দেখতে পাওয়া যায় তা-ও নয়। তাদের মধ্যে আকার ও বর্ণগত পার্থক্য আছে কিছু কিছু, তবে শূন্যে ভেসে বেড়াবার ধরনটা সকলের প্রায় একই রকমের।

'শূন্যবিহারী' বিশেষণটি এ-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে যদিও, প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালরা পাখির মত শূন্যে ঠিক বিচরণ করতে পারে না। যা তারা পারে তা হল শূন্যে খানিকটা দূরত্ব ভেসে বেড়ানো, ইংরেজীতে যাকে বলে 'গ্লাইড' করা। ৫০ গজ দূরত্ব পর্যন্ত এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালরা যে ভেসে বেড়াতে পারে, তার নজির লিপিবদ্ধ আছে।

পাখিরা শূন্যে উড়ে বেড়ায় তাদের ডানার সাহায্যে, শূন্যবিহারী কাঠবিড়ালের ডানাসদৃশ কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। তা হলে তারা শূন্যে ভেসে বেড়ায় কী করে? শূন্যে ভেসে বেড়াবার জন্যে তাদের একরকম বিশেষ প্রত্যঙ্গ আছে, ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 'গ্লাইডিং মেমব্রেন' অর্থাৎ

উড়ন্ত কাঠবিড়াল
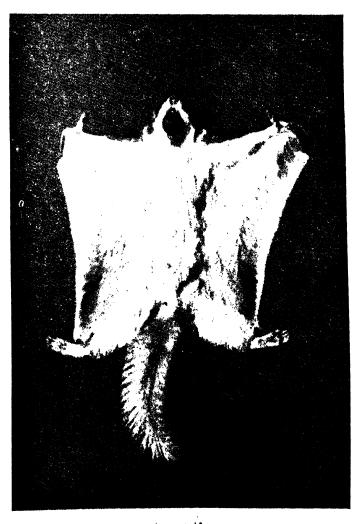
উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাদের সামনের ও পিছনের পা দু'টি সংযুক্ত থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ ভাসমান অবস্থায় নয়) এই প্রত্যঙ্গটিকে দেখলে মনে হয়, ক্ষুদে কাঠবিড়ালের দেহের উপর যেন একটা ঢলঢলে ওভারকোট ঝুলছে।

শূন্যেবিহারী কাঠবিড়ালের শূন্যে ভেসে বেড়াবার কৌশলটি অপরূপ। শূন্যে বিহারের আগে তারা প্রথমে একটা উঁচু জায়গা খুঁজে নেয়। তার শীর্ষদেশে উঠে তারা শূন্যে লাফ দেয়। তারপর হাত-পা (সামনের পা দুটিকে যদি হাত বলে ধরি) ও উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে ক্ষুদে গ্লাইডারের মত তারা ভাসতে থাকে। হাত-পা তুলে বা নামিয়ে তারা শূন্যবিহার নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের লম্বা লেজটিও বোধ হয় এ-কাজে কিছু অংশ গ্রহণ করে। লেজটি যে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং উপরদিকে উঠতেও সাহায্য করে। ভাসমান অবস্থায় মাঝপথে শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল তার ইচ্ছামাফিক ডান ব বাঁ দিকে ফিরতে পারে।

যখন অবতরণের (তারা সাধারণত গাছ বা অন্য কোনো উঁচু বস্তুর উপর অবতরণ করে) সময় হয়, তখন গতি কমাবার জন্যে তারা প্রথমে উপরদিকে একটু উঠে যায় তারপর লম্বা হাত-পাগুলোকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয় যাতে নামবার ধাক্কাটা সামলানো যায়। হাত-পায়ের নখের সাহায্যে অবতরণ-ক্ষেত্রকে আঁকড়ে ধরেও তারা গতি অনেকখানি কমিয়ে নেয়।

পৃথিবীর সর্বত্র শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল যে পাওয়া যায় না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে তাদের আবাসস্থল সেখানেও তাদের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া ভার। এমন কি, যেসব অঞ্চলে তারা বসবাস করে সেখানকার অনেক লোকই তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে পারে না। এর কারণ হল, এই ক্ষুদ্র জীবটি হচ্ছে অসূর্যম্পশ্যা—দিনের আলো এদের সহ্য হয় না। দিনের আলো নিভে গেলে চারিদিকে আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে, তখনই এরা বার হয় বাসা ছেড়ে। এ-হেন নিশাচর জীবকে চাক্ষুষ দেখতে পাবার সুযোগ তাই অতি অল্প লোকেরই ঘটে এবং বনের মধ্যে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় আরও অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে।

রাত্রি জেগে যাঁরা এদের মুক্ত জীবনের ধরনধারণ পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়, শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল সাধারণত গাছেই বাস করে। গাছের ফাঁপা কোটরের মধ্যে তারা বাসা বাঁধে। যেখানে গাছের ফোকর মেলে না, সেখানে উঁচু কোনো আশ্রয়স্থলে তারা বাসা তৈরি করে। কখন কখনও মানুষের বাড়িতে উঁচু কার্নিসে পাখির বাসায় বা বাক্সে তারা আশ্রয় নেয়।

শূন্যবিহারী কাঠবিড়ালের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানা জাতীয় বাদাম। কখন কখনও কালোজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি ফলও তারা খায়। তবে প্রায় সবরকম শাকসবজির প্রতিই তাদের কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা দেখা যায়, যদিও মাঝেমধ্যে দু-এক টুকরো গাছের পাতা, ঘাস বা গাঁজর তারা খায়। বন্য জীবনে তারা ফড়িং, প্রজাপতি, মথ, কাঠফোঁপরা ইত্যাদি পোকামাকড় খেয়ে আমিষের স্বাদ গ্রহণ করে।

শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল নানা আকারের ও নানা বর্ণের হয়ে থাকে, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। উত্তর আমেরিকায় যে ধরনের কাঠবিড়াল দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দেহের ওজন হয় সাধারণত সাড়ে তিন আউন্স। মাথাসমেত দেহ হচ্ছে
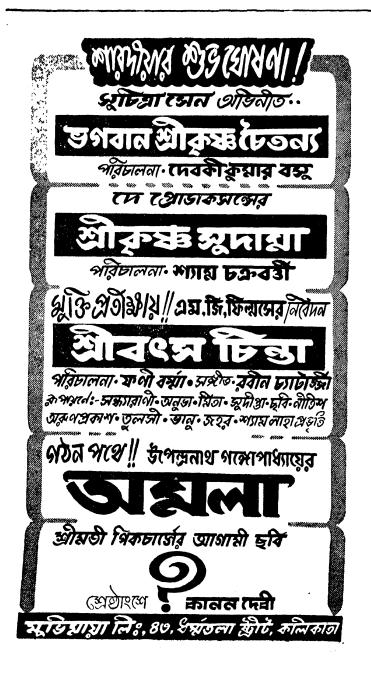
৫ ইঞ্চি লম্বা এবং লেজ হচ্ছে প্রায় ৪ ইঞ্চি। দেহের রং লালচে ধূসর থেকে আরম্ভ করে গাঢ় ধূসর বা স্লেট রঙের মত হতে দেখা যায়। মাথা, শরীর এবং উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গের নীচের দিকটা সাদা, শুধু ধারের দিকটা ফিকে গেরুয়া রঙের।

এদের দেহের লোম পাতলা ও নরম। চোখ দুটি বেশ বড়। লেজ চ্যাপ্টা এবং দেখতে অনেকটা পাখির পালকের মত। হাত-পা দুটি খুব লম্বা, তবে বাহ্যদৃষ্টিতে তা বোঝা যায় না; কারণ দেহের ঢলঢলে বিরাট চামড়া ও উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তা ঢাকা পড়ে যায়। এদের হাত-পা এত শক্ত মজবুত যে কখন কখনও একটা আঙুলে ভর দিয়ে এরা ঝুলে থাকে। প্রত্যেক কব্জিতে একটি করে সরু তরুণাস্থি আছে। যখন বাহু প্রসারিত হয় তখন এটি বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এইভাবে হাতের ঠিক পশ্চাৎ দিকে উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গকে বিস্তৃত করে।

এই ক্ষুদে প্রাণীটি যখন বসে থাকে, তখন তাকে দেখলে খুব মোটাসোটা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন সে সামনের দিকে বাহু দুটিকে ও পিছন দিকে পা দুটিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে এবং উড্ডয়ন-প্রত্যঙ্গ মেলে দেয়, তখন বোঝা যায় এদের দেহের গড়ন কত শীর্ণ ও সূক্ষ্ম।

শূন্যবিহারী কাঠবিড়াল সহজেই মানুষের পোষ মানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের ন্যাশনাল জুওলজিকাল পার্কের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ আর্নেস্ট ওয়াকার দুটি শূন্যবিহারী কাঠবিড়ালকে শিশুকাল থেকে লালন-পালন করেন। তাদের মধ্যে একটি ছিল পুরুষ এবং অপরটি স্ত্রী। পুরুষটির তিনি নাম দেন ব্রাদার এবং স্ত্রীটিকে বলতেন বিউটিফুল। তাদের স্বভাব-আচরণ সম্বন্ধে তিনি একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবন্ধ করেছেন।

মিঃ ওয়াকার বলেন, মানুষের সঙ্গে এদের ভাব যখন জমে যায় তখন প্রভু বা সঙ্গীর নির্দেশমত এরা দূরে থেকে লাফিয়ে তার কাছে আসে। মিঃ ওয়াকার পোষা কাঠবিড়াল দুটিকে নিয়ে এভাবে খেলা করতেন। তিনি হাত চাপড়ে যে-জায়গায় তাদের লাফিয়ে আসবার জন্যে সংকেত করতেন, তারা বাতাসে ভাসতে ভাসতে ঠিক সেই জায়গায় এসে নামত। ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশের সাহায্যে তিনি তাদের এরূপ শূন্যবিহারের বহু মনোরম ফটো তোলেন।

মানুষের সঙ্গে এদের যতক্ষণ না মিতালি হয়, ততক্ষণ তাকে দেখলে এরা সাধারণত কোনো রকম শব্দ করে না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যখন ভাব হয়ে যায়, তখন পরিচিত জনকে দেখলে এরা মৃদু চক্‌চক্‌ শব্দের দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করে। কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে তীব্র চক্‌চক্‌ শব্দ করতে থাকে। ভয় পেলে বা বিপদ উপলব্ধি করলে এরা জোরে আর্তনাদ করে ওঠে। রেগে গেলে পা ঠুকতে থাকে।

কাঠবিড়াল-যুগল মিঃ ওয়াকারের কাছে সাত মাস থাকবার পর মাদী কাঠবিড়ালটি গর্ভবতী হয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ হয়। যখন তিনি দেখলেন যে, সে তার আটটি স্তনের চারধার থেকে লোম ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে তখন এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। এর ১১ দিন পরে বিউটিফুল দুটি সন্তান প্রসব করল। জন্মকালে বাচ্চা দুটির গায়ে কোনো লোম ছিল না; রং পাঁশুটে ধরনের, চোখ একেবারে বোজা এবং প্রত্যেকের ওজন মাত্র ৮৮ গ্রেন।

সন্তানের প্রতি কাঠবিড়ালী-মা'র স্নেহ অপরিসীম। যতদিন পর্যন্ত না বাচ্চারা তাদের 'আঁতুড়ঘর' থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসার মত শক্ত-সমর্থ হয়েছিল, ততদিন বিউটিফুল তার বাচ্চাদের ছেড়ে কোথাও নড়ত না।

মিঃ ওয়াকার বাচ্চাদের জন্মকাল থেকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ তাদের ওজন নেন, ফটো তোলেন এবং বিবরণ লিপিবন্ধ করেন। তিন দিন বয়সে বাচ্চাদের পিঠের চামড়ায় রঙে সবুজের আভা দেখা যায় এবং লোম গজাতে আরম্ভ করে। পনের দিনের মধ্যে দেহের রঙ ধূসর বর্ণ ধারণ করল। পিঠে লোম যত বাড়তে লাগল গায়ের রঙ ক্রমশ ফিকে হয়ে এল এবং দেহের নিম্নাংশ ঘন ও লম্বা সাদা লোমে ভরে গেল। পঁচিশ দিনের দিন তাদের চোখ ফুটল।

বাচ্চাদের বৃদ্ধি হয় খুব আস্তে আস্তে। ৪৬ দিন পর্যন্ত কাঠবিড়ালী-মা তাদের চোখে চোখে রেখে লালন করে ও স্তনের দুধ পান করায়। বাচ্চারা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত কাঠবিড়ালী-মা বাচ্চাদের জনককে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, কাছে এলে তাকে তাড়া করে। ৬৮ দিনে যখন বাচ্চারা পূর্ণবয়স্ক ও স্বাবলম্বী হয় তখন এই বাধা অপসারিত হয়ে যায় এবং জনক-জননী ও বাচ্চারা সবাই একত্রে মিলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জানায়।

বৈজ্ঞানিকের তপস্যা

শ্রীজীতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মিছিল হানা দিয়েছে বরুণ-দেবতার অন্দর-মহলে, মাটির মানুষ ডানা না থাকলেও যোগ দিয়েছে সেই পরিক্রমায় যেখানে সুনীল অম্বরে 'মেঘের কোলে কোলে যায় যে চলে বকের পাঁতি'। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির শেষ সীমানা বলে কিছু চিহ্নিত করা নেই, তাই বৈজ্ঞানিক অভিযানেরও সমাপ্তি হচ্ছে না। পৃথিবী জয় করবার পর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে গ্রহ-উপগ্রহে। বিজ্ঞানের পরিকল্পনা আজ ডানা মেলেছে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে, জল মাটি ও বায়ুর পরিধির বহু ঊর্ধ্বে সেই নিঃসীম শূন্যে হংস বলাকা যার নাগাল পাবে না কোন দিনও।

১৯৪৪ খৃীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জার্মানির আবিষ্কৃত ভি-২ রকেট ১০২ মাইল ঊর্ধ্বে উঠেছিল। দু বছর পরে ১৯৪৬ খৃীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর রকেটের পাল্লা পৌঁছেছিল ১১৪ মাইল ঊর্ধ্বে। তারপর গেল আরও দু' বছর, একটা রকেটের নাকের ডগায় আর একটা রকেট জুড়ে দিয়ে ১৯৪৯ খৃীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মানুষের তৈরী অস্ত্র আকাশের বুক চিরে উঠে গেল ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বে। এই ক্রমবর্ধমান সাফল্য থেকে জানা গেল যে, এরূপ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে মানুষ রকেটকে আরও ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হবে। তবে রকেট জাতীয় জিনিসকে শুধু ঊর্ধ্বে উঠিয়ে দিলেই বা কী লাভ হবে, যদি সে মাটির টানে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে? কিন্তু কই, চাঁদ ত অভিকর্ষের টানে পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়ে না? কিসের জোরে সে ভেসে বেড়ায় শূন্যমার্গে, ঘোরা-ফেরা করে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে?

একখণ্ড সুতোর ডগায় একটা ঢিল বেঁধে নিয়ে তাকে ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে দিলে সে নেমে আসে, কিন্তু সুতোর টানে ঢিলকে জোরে ঘুরোতে থাকলে সে আর পড়ে যায় না, চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। চলমান বস্তু কোন বিশেষ রকম আকর্ষণের পাল্লায় পড়লে সে এমনি ঘূর্ণমান হয়ে শূন্যদেশে নিরবলম্ব অবস্থায় টিকে থাকতে পারে। বেগ ও আকর্ষণের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটলে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনি নিয়মের অধীন হয়েই পৃথিবী তথা গ্রহবর্গ পরিক্রমা করছে সূর্যকে, চাঁদ ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর চারদিকে। তবে মনে রাখতে হবে, এমনি প্রদক্ষিণ করবার জন্য বেগটা দরকার খুব বেশী এবং আকর্ষণের পরিমাণের উপর তার মাত্রা নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার জন্য পৃথিবীকে ঘুরতে হচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় ৬৬০০০ মাইল বেগে।

হিসাব করে দেখা গেছে, ১০৭৫ মাইল ঊর্ধ্বে উঠলে কোন বস্তুর উপর অভিকর্ষের টান যতটা থাকবে তাতে তখন তার গতিপথ ভূগোলকের সমকেন্দ্রিক বৃত্তপথে নিবদ্ধ হয়ে যদি তার বেগ ঘণ্টায় ১৫৮০০ মাইল হয় তবে সে আর পৃথিবীতে নেমে আসবে না, চাঁদের মত সেও উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে আরম্ভ করবে। এই সম্ভাবনা বা স্বপ্নই আজ 'পরশপাথর সন্ধানী খ্যাপা'কে আবার নতুন করে খেপিয়ে তুলেছে। খ্যাপার এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে কি? হেসে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই, কালির আঁচড়ে কাগজের পাতায় হিসাবের অঙ্ক বসিয়ে এটাকে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। তাই এই প্রচেষ্টায় পরিকল্পনাও খাড়া করা হচ্ছে অনেক রকম।

১০৭৫ মাইল ঊর্ধ্বে মানুষের হাতে গড়া যে উপগ্রহের প্রতিষ্ঠা হবে, কারও কারও পরিকল্পনায় তার চেহারাটা হবে মোটর গাড়ির চাকার মত। চাকার ব্যাস হবে ২৫০ ফুট। চাকার টায়ার হবে ফাঁপা, বাতাস ভরতি, আচ্ছাদিত হবে নাইলনে। এর ভিতরেই বাস করবে উপগ্রহের অধিবাসীরা। খণ্ড খণ্ড করে তৈরি করে রকেটের সাহায্যে একে যথাপ্রয়োজন বেগসম্বলিত অবস্থায় ঊর্ধ্বাকাশে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রকেট-যন্ত্রের রহস্য হাওয়াই বাজীর কথা চিন্তা করলে জানা যাবে। হাওয়াই বাজীর বারুদে আগুন দিলে স্বল্পকাল মধ্যে প্রভূত গ্যাস উৎপন্ন হয়, প্রচণ্ড চাপে সে নীচের ফুটো দিয়ে বেগে বেরিয়ে আসে এবং তারই প্রতিক্রিয়া বা ধাক্কায় হাওয়াই পায় ঊর্ধ্ব-গতি। হাওয়াই ছোট জিনিস, সেজন্য সামান্য বিস্ফোরক বা বারুদ হলেই তার কাজ চলে কিন্তু রকেটকে ঊর্ধ্বে পাঠাবার জন্য প্রয়োজন হবে প্রচণ্ড শক্তির এবং খুবই স্বল্পকালের মধ্যেই তার কার্যকারিতা সমাধা করে দিতে হবে। ২০০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠছে যে ভি-২ রকেট, তাতে মাত্র ৬৫ সেকেণ্ড কাল বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। এই অবসরে সে উঠে যায় বিশ মাইল এবং এই সময়ে যে ধাক্কাটা তাকে দেওয়া যায় তাতে তার বেগ হয় সেকেণ্ডে এক মাইল। এই বেগ নিয়েই সে বাকী ১৮০ মাইল উঠে যায় যে-পর্যন্ত না অভিকর্ষের টানে তার ঊর্ধ্বমুখী গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী গতি ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে দেওয়া যায় তবে তাকে আরও উপরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। উপরে উঠবার সংগে সংগে রকেটকে একটু একটু করে বাঁকিয়ে দিলে এমন হতে পারে যে, কোন একটা অবস্থায় এর গতিপথ অনুভূমিক অর্থাৎ পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠের সংগে এক-কেন্দ্রিক বৃত্তে পরিণত হবে। এই বৃত্তাকার পথে চলবার সময় যদি তার প্রয়োজনানুযায়ী গতি থাকে তবে এমন হতে পারে যে, রকেটটি আর ঊর্ধ্বেও উঠবে না বা নীচেও নামবে না। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে থাকবে। উপযুক্ত গতি ও উচ্চতা কী পরিমাণ হবে তা পূর্বেও বলা হয়েছে। ১০৭৫ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়ে দিলে তাকে প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে চার মাইল গতি দিতে হবে, এবং তখন তার গতিপথকে অনুভূমিক করে দিতে পারলে সে ঘূর্ণমান হবে।

এই পরিকল্পনা সফল করতে হলে প্রয়োজন হবে বিরাট আকাশচুম্বী রকেটের, যেটা বহন করবে উপযুক্ত পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য এবং স্বীয় গুরুভার দেহ ছাড়াও ত্রিশ চল্লিশ টন ভারী সাজসরঞ্জামাদি, যা থেকে তৈরি করা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ। এই রকেটের ভিতরে থাকবে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ যারা প্রত্যেকটি এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রকেট। কল্পনা করা যেতে পারে, ৬৫ ফুট চৌকো ভূমি জুড়ে রয়েছে ২৬৫ ফুট উঁচু একটি বিরাট স্তম্ভ যার ওজন সাত হাজার টন। এই স্তম্ভের তিনটি খণ্ড। সর্বনিম্নের অংশ লেজ, তারপর দেহকাণ্ড, তারপর মস্তক। মস্তকের অংশেই থাকবে উপগ্রহ তৈরির সরঞ্জাম ও কুশলী কর্মিবৃন্দ। সমুদ্রতীরবর্তী কোন

স্থানে একে স্থাপন করতে হবে কেননা প্রথমে খানিকটা সমুদ্রাঞ্চলের উপর দিয়েই একে চালাতে হবে।

লেজের অংশে থাকবে ৫১টি রকেট-মোটর। এগুলো চলবে নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রাজিন নামক তরল বিস্ফোরকের সাহায্যে। বিস্ফোরণ আরম্ভ হবার দেড় মিনিটের মধ্যেই এর ভিতরকার ৫২৫০ টন বিস্ফোরক নিঃশেষিত হয়ে যাবে। রকেটটি প্রচণ্ড গর্জন তুলে প্রথম সেকেণ্ডে পনর ফুট উঠে যাবে, কিন্তু পরবর্তী দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই ঊর্ধ্বাকাশে মেঘের রাজ্যে বিলীন হয়ে যাবে। রকেটের মধ্যেই যথাসময়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে চালু করবার জন্য নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় এবং সময়ানুগ যন্ত্র থাকবে। দেড় মিনিট পরে যখন লেজের অংশের বিস্ফোরক দ্রব্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন আর রকেট খাড়া উঠছে না, ২০ ডিগ্রী কোণে কাত হয়ে সে চলেছে। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত সময়ে হাল ঘুরিয়ে এর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই অবস্থায় প্রায় ২৫ মাইল ঊর্ধ্বে উঠবার পর এর বেগ হবে ঘণ্টায় ৫২৫৬ মাইল (সেকেণ্ডে ১·৪৬ মাইল)। এই সময়ে লেজের অংশ আপনিই খুলে পড়ে যাবে এবং তাতে রকেটের ওজন শতকরা ৭৫ ভাগ কমে যাবে। রকেটের গতিপথ ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হবার জন্য ধীরে ধীরে বেঁকে যেতে থাকবে।

দ্বিতীয় রকেটটি এবার সক্রিয় হবে এবং তারই ধাক্কায় রকেট-যান পরবর্তী ১২৪ সেকেণ্ডে ৪০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠবে এবং যাত্রা-স্থল থেকে পৃথিবীর উপর দিয়ে মাপলে তার অবস্থান ৩৩২ মাইল দূরে সরে এসেছে দেখা যাবে। এই সময়ে রকেটের বেগ হবে ঘণ্টায় ১৪,৩৬৪ মাইল। এবারে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ দেহকাণ্ডও খসে যাবে। এই অংশে ছিল ৩৪টি মোটর, ৭৭০ টন বিস্ফোরক। লেজের অংশ ও দেহকাণ্ড বিমুক্ত হবার পর এদের সঙ্গে সংযুক্ত লোহার জালে তৈরী প্যারাসুট যথাকালে খুলে যাবে। এরই সাহায্যে খণ্ডিত অংশগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠে নেমে আসবে। লক্ষ্য করতে হবে এগুলো যেন সমুদ্রের উপরে এসে নামে। এদিকে দৃষ্টি রেখেই রকেটের যাত্রারম্ভের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

দেহকাণ্ড খসে যাবার পর কেবল মাথাটুকু চলতে থাকবে। এতে রয়েছে পাঁচটি রকেট মোটর ও ৯০ টন বিস্ফোরক। এই বিস্ফোরকের খানিকটা রেখে দিতে হবে ফেরতি পথের রসদ হিসাবে। দেহমুক্ত অবস্থায় আরও ৮৪ সেকেণ্ড চলবার পর মাথাটুকুর বা রকেটযানের গতি হবে ঘণ্টায় ১৮,৪৬৮ মাইল এবং তখন সে থাকবে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬৩·৩ মাইল ঊর্ধ্বে। এই সময়ে মোটর বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায় এটি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১০৭৫ মাইল ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। এখানেই এর ঊর্ধ্বগমনের সমাপ্তি হবে। কিন্তু পৃথিবীর টানে এরই মধ্যে এর বেগ কমে গিয়ে ঘণ্টায় ১৪,৭৭০ মাইলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল হওয়া দরকার। সেজন্য আরও পনর সেকেণ্ড রকেট মোটর চালিয়ে গতিবেগ ঐ পরিমাণ করে নেওয়া হবে। এবারে রকেটযানের গতিপথ পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠের সঙ্গে এককেন্দ্রিক বৃত্তে এসে মিলেছে এবং তদুপরি পৃথিবীর টানের পরিমাণের সঙ্গে রকেটের গতির এমন সমন্বয় হয়ে গেছে যাতে এটা আর ওঠানামা করবে না, মানুষের তৈরী চাঁদ হয়ে পৃথিবীকে পরিক্রমা করবে। দুই ঘণ্টায় একবার করে যাত্রাক্ষণ থেকে শুরু করে ৫৬ মিনিট পরে রকেট এখানে এসে পৌঁছে গেছে। এর ভিতরে যন্ত্র চালু ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট।

এই মহাশূন্যের ঘাটিতে এসে এবারে কর্মীরা সব কাজে লেগে যাবে—উপগ্রহকে গড়ে তুলতে হবে। ত্রিশ চল্লিশ টন মাল-মশলা নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কোথায়? কেন, মহাশূন্যেই তাদের ছেড়ে দিতে হবে। শূন্যে ফেলে দিলেও তারা রকেটযানের সঙ্গেই ঘুরতে থাকবে। রকেটে অবস্থিত লোকজন ও সকল জিনিস একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। ওরা প্রত্যেকে ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বেগে ঘুরছে। কিন্তু ওদের সে-বিষয়ে কোন উপলব্ধি থাকবে না। আমরা কি পৃথিবীতে বসে টের পাই যে, আমরা ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল বেগে সূর্যকে পরিক্রমা করছি? কর্মীরা সব রকেট যান থেকে বেরিয়ে এলেও রকেটযানের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকবে—মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায়। এদের সব বিশেষভাবে তৈরী পোশাক পরা থাকবে, তাতে থাকবে অক্সিজেন সরবরাহ করার যন্ত্র। মূল আশ্রয়-স্থল রকেটযান ছেড়ে এদিক সেদিক চলাফেরা করবার জন্য এদের সঙ্গে ছোট ছোট রকেট-মোটর থাকবে। যে-দিকে রকেট ছুড়বে এরা তার বিপরীত দিকে চলতে সক্ষম হবে। তবে যাতে রকেটযান ছেড়ে এরা বেশী দূরে গিয়ে না পড়ে সেজন্য প্রত্যেককেই এক একটি দড়ি দিয়ে রকেটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের যে অংশগুলি পৃথিবী থেকে তৈরী করে নিয়ে আসা হয়েছে, কর্মীরা সব সেগুলোকে জুড়তে লেগে যাবে। এদের কাজ চলবে নিঃশব্দে কারণ বায়ুশূন্য দেশে শব্দ-চলাচল হবার উপায় নেই। তবে রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে এরা কথাবার্তা আদান প্রদান করবে। এরা কাজ করবে অনায়াসেই কারণ খুব ভারী জিনিসও সেখানে হালকা মনে হবে। ধীরে ধীরে এরা উপগ্রহটি গড়ে তুলবার পর তাকে বাসোপযোগী করে নেবে। ইতিমধ্যে আরও সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করবার জন্য রকেট যানকে আরও কয়েকবার ফেরত পাঠাবে পৃথিবীতে এবং হয়ত সেই সঙ্গে নিজেরাও কেউ কেউ ফিরে আসবে।

পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্য রকেট-যানের মোটর বিপরীত দিকে চালিয়ে এর গতি কিছুটা (ঘণ্টায় ১০৭০ মাইল) কমিয়ে দিতে হবে এবং তা হলেই রকেটযান চক্রাকারে নেমে আসতে থাকবে এবং ৫১

পরিকল্পিত রকেট

পুজোর বাজার —

পুজো সেল!
জুতার দোকান
SALE
সেল
পূজায় বিরাট আয়োজন!
শাড়ী. ধুতি. জামা
CINEMA
পুজো বোনাস চাই
WORKER'S UNION
কিহে! পুজোয় বাড়ী যাচ্ছ নাকি?
TAILORS
MANAGER
পুজোর চাঁদা চাই—
চাঁদা
চাঁদা দিন
মিলন ক্লাব
দিদি, পুজোয় আমরা পুরী বেড়াতে যাচ্ছি!
-Prakash

মিনিটে পৃথিবীর ৫০ মাইল ঊর্ধ্বে এসে হাজির হবে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এসে পৃথিবীতে নেমে পড়বে, যেমন করে নামে এরোপ্লেন।

প্রয়োজনমত তিনটি খণ্ড, যার দুটি আগেই নেমে এসেছে, একত্র জুড়ে আবার মহাশূন্যের ঘাটিতে পাঠান যাবে। এমনি করে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে যাতায়াত করা চলবে।

উপগ্রহটি বাসোপযোগী করবার জন্য এর ভিতরে নানা রকম ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হয়েছে, এর চেহারাটা হবে মোটরগাড়ির চাকার মতন। টায়ারে যেমন বাতাস ভরতি থাকে তেমনি এতে বাতাস ভরা থাকবে—উপগ্রহের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলের। এই বাতাসের সাহায্যেই অধিবাসীরা যখন উপগ্রহের ভিতরে থাকবে ততক্ষণ শ্বাসকার্য চালাবে। অবশ্য এই বায়ুমণ্ডল কিছুকাল পরে পরে বদলিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধ করবার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। মানুষ যেমন সবমেরিনে বাস করে তেমনি বাস করবে এই উপগ্রহের অধিবাসীরা।

আমাদের পৃথিবীর সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় অভিকর্ষের প্রভাবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহে কৃত্রিম অভিকর্ষের টান সৃষ্টি করতে হবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে অভিকর্ষের প্রভাব কিরূপ? কোন জিনিস ছেড়ে দিলে সে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়, আমরা বলি ওটা নীচে পড়ে। কৃত্রিম উপগ্রহেও এমনি একটা টান সৃষ্টি করা যেতে পারে। চক্রাকৃতি উপগ্রহটিকে চক্রের অক্ষের উপরে উপযুক্ত বেগ দিয়ে ঘূর্ণমান করে দিলেই ভিতরকার সব কিছু অপকেন্দ্র বলের প্রভাবে পড়বে এবং তারা সবাই নিরবলম্ব অবস্থায় চাকার কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ছুটে যেতে চাইবে। চক্রের ভিতরে কোন লোক মাথা কেন্দ্রের দিকে রেখে দাঁড়ালে তার পা থাকবে বাইরের পরিধির উপর। কোন জিনিস হাত থেকে ছেড়ে দিলে তা তখন তার পায়ের কাছেই এসে পড়বে এবং তার মনে হবে জিনিসটা উপর থেকে নীচে পড়ে গেল। চক্রাকৃতি উপগ্রহের ভিতরে বসে তার মনে হবে সে যেন পৃথিবীতেই বসে আছে।

উপযুক্ত বেগে উপগ্রহটিকে ঘুরিয়ে দিলেই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে অভিকর্ষের জন্য যে প্রতিক্রিয়া অনুভব করি তা সবই এখানে পাওয়া যাবে। যে-জিনিস যেমন ভারী লাগে পৃথিবীতে, সেখানেও উপগ্রহের ভিতরে বসে তাকে তেমনি মনে হবে।

সূর্যরশ্মি থেকে কৃত্রিম উপগ্রহবাসীরা সংগ্রহ করবে প্রয়োজনীয় তাপ ও যন্ত্রাদি চালাবার শক্তি। উপগ্রহটি থাকবে বায়ুশূন্য দেশে, কাজেই তাপ সঞ্চরণের দিক থেকে তার অবস্থাটা হবে থার্মোফ্লাস্কের মতন। উপরকার আবরণ সাদা এবং রং করে দিলে সূর্য থেকে খুব কম তাপ শোষিত হবে। তাপ শোষণ করবার জন্য স্থানে স্থানে কালো রং করে দেওয়া যাবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী তাপ শোষিত হবার পর কালো জায়গাগুলোকে সাদা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেই তাপ বিকিরিত হয়ে যাবে না। এভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া আরও নানা রকম ব্যবস্থা করতে হবে উপগ্রহকে মনুষ্যবাসোপযোগী করে রাখবার জন্য। পানীয় ও খাদ্যসম্ভার, অক্সিজেন উৎপাদনের সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহ করবার জন্য পৃথিবী থেকে মাঝে মাঝে রকেটযান পাঠাতে হবে। মহাশূন্যে রকেটযানের বন্দর গড়ে উঠবে। সেখান থেকে বায়ুনিরোধক ক্ষুদ্র যানে চড়ে উপগ্রহের ভিতরে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা থাকবে।

প্রকৃত অভিযান আরম্ভ করবার পূর্বে বহু বছর ধরে পরীক্ষা-কার্য চালাতে হবে। ছোট ছোট রকেট উপগ্রহের পরিকল্পিত কক্ষে প্রথমে পাঠান হবে। সেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবস্থায় পৃথিবীতে খবর আসবে। এই প্রকার খবর সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা রকেটযানের বাস্তব রূপের পরিকল্পনা করতে সমর্থ হবেন। প্রথমবারের অভিযান করবার মোটামুটি ব্যয় চারশ কোটি ডলার হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। এই ব্যয় পরমাণু বোমা তৈরি করতে প্রথমে যে ব্যয় করা হয়েছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণের বেশী নয়। অবশ্য সকল ব্যবস্থা চালু হবার পর এক একবার রকেট-যান পাঠাতে ১০ লক্ষ ডলারের বেশী ব্যয় হবে না বলে অনুমান করা হচ্ছে। এত সব অর্থব্যয়ের হিসাব সাধারণ মানুষের কাছে আজগুবী মনে হলেও একথা সত্যি যে একমাত্র মার্কিন মুলুকেই যুদ্ধের সরঞ্জাম বাবদ কোরিয়ার যুদ্ধের সূচনার পর থেকে এর চেয়ে বহু গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। একটি আধুনিক যাত্রীবাহী এরোপ্লেনের দামও দশ লক্ষ ডলারের কম হবে না।

শূন্যদেশস্থ ঘাটিতে বসে নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণের অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। এই ঘাটি থেকে গ্রহান্তরে বা চন্দ্রমণ্ডলে যাওয়া সহজ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শক্তিশালী দূরবীন, ক্যামেরা ও র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠেও পর্যবেক্ষণ চালানো চলবে। সারাদিনে পৃথিবী যতক্ষণ একপাক ঘুরছে, সেই সময়ের মধ্যে উপগ্রহটি পৃথিবীকে দ্বাদশবার প্রদক্ষিণ করবে। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে তা মহাশূন্যের আসন থেকে সর্বদাই জানা যাবে। যেমন করে এরোপ্লেনে চড়ে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, এই ব্যবস্থায় তার চেয়ে ভাল পর্যবেক্ষণ চালানো যাবে। মহাশূন্যে সর্বপ্রথম যে-জাতি ঘাটি করতে সমর্থ হবে, রণোন্মাদনায় মত্ত হলে পৃথিবীকে সে সহজেই ধ্বংস করে ফেলতে পারবে।

বিশ্বামিত্রের নতুন স্বর্গ শেষ পর্যন্ত তার দম্ভই চূর্ণ করেছিল, বিশ্বের কোন কল্যাণ করতে পারেনি। কলির বিশ্বামিত্র পরিশেষে নিজেকে বিশ্ব-অমিত্র বলে প্রতিপন্ন না করলেই বিশ্বমানবের বাঁচোয়া।

শারদীয় শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন
ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
EVEREADY
TRADE MARK
"এভারেডী" টর্চ ও ব্যাটারী
প্রস্তুতকারক

NCC 619

ভারত-আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা

রেজাউল করীম

ভারতবর্ষের সঙ্গে আরব জগতের সম্পর্ক অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিমরা যে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে ভারতে এসেছিল, সেটার পিছনে ছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি—পরদেশে রাজ্য বিস্তারের লালসা। কিন্তু তারও বহু পূর্বে ভারতের সঙ্গে আরব জগতের একটা সাংস্কৃতিক যোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভারতবর্ষ ও আরবের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, বাণিজ্যই ছিল তার প্রধান বাহন। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। ভারতবর্ষে যে একটি উচ্চাঙ্গের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, সে-খবর আরবরা জানতেন। বৌদ্ধ যুগে প্যালেস্টাইনে ও সিরিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। যিশু খৃীষ্টের আবির্ভাবের সময় সে-সব অঞ্চলে বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল, ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং ইসলামের আবির্ভাবের যুগে প্রাথমিক মুসলমানরা যে ভারতের কথা, ভারতের সভ্যতার কথা জানতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম যুগের মুসলমানরা ভারতের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখতেন। কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদ একবার তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, "আমি হিন্দু দেশ থেকে শীতল বাতাস অনুভব করছি।" এর দ্বারা তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে ভারত সভ্য দেশ, আর ভারতবাসী আল্লাহের প্রতি বিশ্বাসী। আরও কথিত আছে যে, হজরতের সময় দুজন ভারতবাসী পণ্ডিত আরবে এসেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম 'রতন'। পণ্ডিত রতন হজরতের বহু মূল্যবান বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেই সংগৃহীত বাণী এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার সংগৃহীত বাণী-পুস্তকের নাম "রাতানিয়াৎ"।

ইবনে আলি হাতেম হজরত আলির নিকট আর-একটা কথা জেনেছিলেন যে, ভারতের উপত্যকা এমন এক সুন্দর জায়গায় অবস্থিত, যেখানে হজরত আদম স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসবার কালে প্রথম পদার্পণ করেন। আর মক্কার উপত্যকা সেই দেশ যেখানে হজরত ইব্রাহিমের স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই দুইটি দেশই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। মৌলানা গোলাম আলি আজাদ অপর একটি হাদিসের উল্লেখ করেছেন। সে হাদিসটি ইবনে আব্বাসের দ্বারা কথিত : "পয়গম্বর হজরত আদম স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণকালে একটা স্বর্গের চারাগাছ সঙ্গে এনেছিলেন। সে চারাগাছ ভারতের মাটিতেই বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। আর পয়গম্বর হজরত মুসার বিখ্যাত 'আসা' বা যষ্ঠিদণ্ড এই বৃক্ষের শাখাতেই তৈরি করেন। 'সহি মুসলিম' নামক হাদিসে আবু হোরেরার কথিত একটি উক্তি আছে যে, হজরত মহম্মদ কতকগুলি নদীর নাম করেন, যেগুলি স্বর্গে অবস্থিত। এগুলির মধ্যে একটি নদী ভারতের নদী। গোলাম আলি আজাদ আরও বলেন যে, কোরআনের মধ্যে "তুবা, সনদাস, আলবাই" এই শব্দগুলি সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন। পরবর্তী যুগের কতকগুলি মুসলিম লেখক একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, পয়গম্বর হজরত নুহের সময় যখন মহাপ্লাবন হয়, তখন তিনি একটি জাহাজের উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাপ্লাবনের পর সেই জাহাজটি ভারতেও এসেছিল। এবং নুহের দু-একটি সন্তান ভারতবর্ষেই বসবাস আরম্ভ করেন। অন্য একটি হাদিসে আছে যে, ভারতবর্ষেও একজন পয়গম্বর (তত্ত্ববাহক) এসেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর নাম কান (Kan), কানেশ, কানধা অথবা কানাহিল (Kanayhl)। এই সব উক্তি থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আরবের প্রাথমিক মুসলমানদের নিকট ভারত অপরিচিত ছিল না। তাঁরা ভারতবর্ষকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলির একটা উক্তি থেকে জানা যায় যে, যে দেশে সর্বপ্রথম স্বর্গীয় গ্রন্থ রচিত হয়, সে-দেশ ভারতবর্ষ। তিনি আরও বলেন যে, ভারত থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর বলেন : ভারতের নদনদীগুলি মুক্তার মত, তার পাহাড়গুলি পদ্মরাগ মণির মত। আর তার বৃক্ষগুলি সুগন্ধি দ্রব্যের মত। তবুও তিনি ভারত আক্রমণের বিরোধী। কারণ তাঁর মতে ভারতবর্ষ এমন দেশ, যেখানে ধর্ম বিষয়ে উদারতা আছে। ইসলামের অনুবর্তীরা ভারতে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মচর্চা করতে পারে।

উম্মিয়া বংশের রাজত্বকালেও ভারতের সঙ্গে আরবের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ানের সময় বাসরার অর্থ ও রাজস্ব বিভাগে কয়েকজন ভারতবাসী চাকরি করতেন। এঁরা মুদ্রা তৈরির কাজে সাহায্য করতেন। খলিফা মারিয়া সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি সিরিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ করে আন্তিওকে কতকগুলি ভারতীয় হিন্দুকে দিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তার কারণ, তাঁর ধারণা ছিল, এই সব হিন্দুদের প্রভাবে দেশের প্রভূত উন্নতি হবে। হাজ্জাজ অত্যাচারী শাসক হলেও ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কাশগড়ে ভারতীয়দের একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। "কালো চোখ ও জলপাই রঙ"-এর হিন্দুরা খলিফাদের সময় প্রত্যেক নগরে আদর আপ্যায়ন পেত। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির খাতির ছিল সর্বত্র।

আব্বাসীয় বংশের খলিফা আল্‌মনসুর ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি একটি অনুবাদ-বিভাগ খুলেছিলেন। এই বিভাগ থেকে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করা হয়েছিল। খলিফা হারুনর রশিদের সময় এবং তার পর খলিফা মামুনের শাসনকালে

সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও লেবাননের খ্রীষ্টান মঠ থেকে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সে-গুলির অনুবাদের ব্যবস্থা হয়। তুর্কিস্থানের বোখারা থেকে বৌদ্ধ-গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করা হয়েছিল। বৌদ্ধ মঠ থেকে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হলে সেগুলিও আরবীতে অনুদিত হয়েছিল। এই সময় খ্রীষ্টান ও ইহুদী ব্যতীত আরও অনেক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পণ্ডিতেরা বাগদাদে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা রাজ-দরবারে সম্মানিত হতেন। তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার রাজ-দরবার থেকেই দেওয়া হত। তৎকালীন খলিফারা বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ভারতের বহু পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ দিয়েছিলেন। খলিফা হারুনর রশিদের সময় বারমাক পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করবার জন্য আরবদের উৎসাহ দিতেন। প্রথম যুগের আব্বাসীয় খলিফাগণের দরবারে হিন্দু চিকিৎসক, বৈদ্য ও বৈজ্ঞানিকরা সাদরে অভ্যর্থিত হতেন। হিন্দু চিকিৎসক মাণিক ও আরব চিকিৎসক সালেহ্ সে-যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একবার খলিফা হারুনর রশিদ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন মাণিক তাঁকে আরোগ্য করেন। আর একজন ভারতীয় চিকিৎসকের নাম ধান। বাগদাদের বারমাক হাসপাতালের তিনিই ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। বাগদাদের অন্যান্য হাসপাতালে আরও অনেক ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদে সাহায্য করতেন। চিকিৎসক মাণিক ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের অনুবাদে সহায়তা করতেন। এই গ্রন্থের আরবী নাম "সিন্দ ও হিন্দ"। পণ্ডিত কঙ্ক বাগদাদের দরবারে প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় নীতি ও উপদেশমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "পঞ্চতন্ত্র" যখন আরবী ভাষায় অনুবাদ হল, তখন তার সমাদর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। পঞ্চতন্ত্রের আরবী নাম "কালিলা ও দামনা"। এই গ্রন্থের আরবী অনুবাদ থেকে ইউ-

রোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়। এর ফারসী নাম "আনওয়ার সোহেলী।"

সে-যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইসমাইল ভারতবর্ষে এসেছিলেন কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখবার জন্য। ২৮০ হিজরীতে আহমদ কাফি দরলানী ভারতবর্ষে আসেন জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্যে। তিনি কেবল জ্যোতিষ ও গণিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, সেই সঙ্গে আরও অনেক বিষয় শিখে ফেললেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম সুধীদের আগ্রহ কেবল বাগদাদের দরবারেই আবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সে-যুগের মুসলমান সমাজের মধ্যে এত আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী সমগ্র আরব জগতে তাদের আলোচনা হত এবং সেগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একদল আরবী ঐতিহাসিক, সুধী, পণ্ডিত, ভৌগোলিক, পরিব্রাজক নানা পথ দিয়ে ভারত পরিভ্রমণ করতে আসেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেকে এ-সম্পর্কে নানা গ্রন্থ লিখেছেন।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত আলবেরুনীর নাম করা যেতে পারে। তাঁর সময় আরব জগতের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে যেমন গ্রীক দর্শন পড়বার আগ্রহ জন্মেছিল, সেইরূপ তাঁরা ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান-গ্রন্থগুলিকে আরবীতে ভাষান্তরিত করতে উৎসাহ বোধ করতেন। মনীষী আলবেরুনীর পূর্বেই ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের কিছু ধারণা ছিল। জ্ঞানের পিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আরও তথ্য জানতে চাইলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থাদি তাঁরা পড়লেন। সেগুলির সমালোচনাও করলেন। আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ্ সারকাস্তি একটি ছোট পুস্তিকা প্রচার করলেন। তাতে তিনি সংস্কৃত 'সিদ্ধান্ত'এর সমালোচনা করলেন। কতকস্থানে ব্রহ্মগুপ্তের ভুল দেখিয়ে দিলেন। অমনি আর একজন সমালোচক দেখিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত ঠিকই লিখেছেন। স্পেনের ইব্‌নেসঈদ আর একখানা গ্রন্থ রচনা করলেন। তাতে তিনিও

যে কোন পরিবেশেই
বাংলা ও বাঙ্গালীর
বিশিষ্ট রুচিমাফিক তৈরী
বলেই মণীন্দ্র মিলের ধুতি এত
আদরের। যে কোন পরিবেশের উপযোগী এই কাপড়গুলি
বিশেষ টেকসই অথচ দামে খুব সস্তা। আপনার নিকটবর্তী
দোকানে মিলের নাম করলেই
পাবেন·
মনীন্দ্র মিলের ধূতি
মনীন্দ্র
মিলস্ লিমিটেড
পি-৪৯, বি. কে. পাল এভেন্যু,
কলিকাতা—৬
মিলস্—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ জেলা।

দেখিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত ভুল করেননি ভুল বুঝিয়েছেন আব্দুল্লাহ্ নিজেই। একদল আরব পণ্ডিত ভারত ভ্রমণ করেছিলেন ও নিজচক্ষে ভারতবর্ষকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে ভারত থেকেও একদল হিন্দু পণ্ডিত বাগদাদ এসেছিলেন। এঁরা উভয়েই আরব ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। উভয় অঞ্চলের জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদানের ফলে আরবের বিজ্ঞান-সাধনা অনেক যে উন্নত ধরনের হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভারত ও আরবদের মধ্যে আদান-প্রদানের বিনিময়ে একটা ঐক্যসূত্রও স্থাপিত হয়েছিল। আরব সভ্যতার উপর গ্রীক প্রভাবের মতই ভারতীয় প্রভাব গভীর ছাপ রেখে গেছে। গণিত শাস্ত্রের দশমিক বিধি আরবগণ যে ভারত থেকেই শিখেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরবগণ ভারতবর্ষ থেকে যাকিছু শিখেছিলেন তাকে তাঁরা একেবারে নূতন রূপ দিয়েছিলেন এবং নূতন পোশাকে সজ্জিত করেছিলেন। আর তাই আরবদের মধ্যবর্তিতায় ইউরোপে নীত হয়েছিল।

হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলিফা মামুন বাগদাদে একটি ধর্মসভার ব্যবস্থা করেন। কতকটা ভারত-সম্রাট আকবরের মত। তাতে সকল ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আহূত হতেন। তাঁরা স্বাধীনভাবে ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতেন। সেখানে কোনও প্রকার অনুদারতার স্থান ছিল না। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকগণ যদি এই ব্যবস্থাকে চালু রাখতেন, তা হলে অন্ধ গোঁড়ামি তাঁদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করত না। আর তাহলে অত শীঘ্র তাঁদের পতনও হত না। একটা কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আব্বাসীয় খলিফাগণের সময় যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত ভারতের অপর দেশের ব্যাপার নিয়ে সেরূপ আলোচনা হত না। তা যদি হত, তবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারত বহু পূর্বে পৃথিবীর মিলন-কেন্দ্র হয়ে পড়ত। ভারত-আক্রমণকারী মুসলিমদের তারা অনায়াসে নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারত। যেমনভাবে গ্রীকসভ্যতা গোটা রোমকে গ্রাস করতে পেরেছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং তার কুফল ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবেই ভোগ করতে হয়েছে।

(২)

পরবর্তী যুগে যখন ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বহু হিন্দু সুধী মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা আরম্ভ করলেন। খলিফা হারুনর

রশীদের সময় ভারতের একজন রাজা বাগদাদের খলিফার কাছে একটি তত্ত্বজ্ঞানী মুসলিম দার্শনিক প্রার্থনা করে পত্র দেন। এই ভারতীয় রাজা এমন লোক চাইলেন যিনি তাঁকে ইসলাম সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন।

২৮০ হিজরীতে অন্য একটি ভারতীয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদ করা হল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসুদী বলেন যে, ক্যাম্বের রাজা ধর্মালোচনা করতে ভালবাসতেন। তিনি মসুদীর সঙ্গে পত্রালাপ ও ভাবের আদান-প্রদান করতেন। গুজরাটের হিন্দু রাজারা সর্বপ্রকারে ইসলামকে শ্রদ্ধা করতেন। এবং তিনি স্বীয় রাজ্যের মুসলমানদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। গুজরাটের বল্লভ রাজবংশীয় শাসকগণ আরবদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন। বুজরুগ বিন্ শাহরিয়ার নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে আসেন। তিনি তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে লেখেন, "ভারতের হিন্দু শাসকগণ সর্বত্র মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। সিংহলের বৌদ্ধরাও মুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন।" এর বহু পূর্বে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় বৌদ্ধ শাসকরা আরবে দু'জন দূত প্রেরণ করেন। এঁরা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ স্বদেশে প্রেরণ করেন। এই দু'জন দূতের মধ্যে একজন ফেরার পথে দেহত্যাগ করেন। অপরজন নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বলেন যে, খলিফা সাদাসিদেভাবে জীবন যাপন করেন। পর্যটক বুজরুগ বিন সাহরিয়ার আরও বলেন যে, কাশ্মীরের অন্তর্গত আলোরের রাজা নিজের মাতৃভাষায় সমগ্র কোরআন গ্রন্থখানি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। শাহরিয়ার অন্যত্র বলেছেন যে, তিনি যখন ইরাকের সাইরাফ বন্দর পরিদর্শন করেন, তখন সেখানে তিনি বহু গুজরাটি ও মুলতানী হিন্দু বণিকের সন্ধান পান। আরবগণ এদের নিমন্ত্রণ করত। তাঁদের খাদ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হত। এইসব হিন্দু বণিক যেভাবে আরবী কথ্য ভাষায় কথা বলত, তাতে মনে হত না যে, তারা ভিন্ন দেশের লোক। সে-সময় হিন্দু-মুসলমানের পোশাকের মধ্যেও বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। বিজয়ের প্রথম মুহূর্তে বহু লুঠতরাজ হয়েছিল। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি দেশের শাসনভার স্থানীয় লোকের হাতে অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিন্ধুর হিন্দুরা নিজেদের ধর্মমতে উপাসনার অধিকার দাবি করল। বিন কাসেম এ-কথা তাঁর উপরিওয়ালা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের গোচর করলেন। তার উত্তরে হাজ্জাজ লিখলেন যে, হিন্দুদের তাদের নিজের শাস্ত্রানুসারে তাদের দেব-দেবীকে আরাধনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া গেল। কারো ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তারা যেমন ইচ্ছা সেইভাবে নিজেদের জীবন যাপন করবে। ব্রাহ্মণগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে যে সম্মান ও ভক্তি পেতেন, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তারা উৎপন্ন শস্যের যে অংশ পেতেন তাতেও কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তাঁদের মন্দির নির্মাণে কোন বাধা দেওয়া চলবে না। মোটের উপর বিনকাসিম উদারভাবে শাসন করতেন।

আল্ আস্‌তাখ্‌রি দশম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ভূগোল সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর একটি পুস্তকে সিন্ধু দেশের একটি মানচিত্র দেওয়া আছে। তিনি বলেন যে, আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রথার মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বেশ একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। অপর একজন ঐতিহাসিক আলজাহিজ লিখেছেন: সে-যুগের হিন্দুরা গণিত, চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অন্য দেশে থেকে অনেক বেশী জ্ঞান রাখত। তারা শিল্পে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কনে, স্থাপত্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এদের নিকট থেকেই আমরা "কালিলা ও দামনা"র মত অতি মূল্যবান গ্রন্থ পেয়েছি। হিন্দুদের বেশ বিচারবুদ্ধি আছে। এরা সাহসী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে। ধ্যান করার রীতির তারাই উদ্ভাবক।

ইয়াকুবী আর একজন আরব পরিব্রাজক। তিনি বলেন, "হিন্দুগণ বুদ্ধি ও চিন্তায় অপরাপর জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাদের গণনা অন্য দেশের জ্যোতিষী থেকে নির্ভুল। 'সিদ্ধান্ত' একটা প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থই প্রমাণ করে যে, তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। এই গ্রন্থ দ্বারা গ্রীক ও পারসিকরা বহু উপকৃত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ।"

আজ উর্দু হিন্দী সমস্যা নিয়ে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সে-যুগে সেরূপ কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। দেশপ্রচলিত হিন্দী ভাষাকেই সে যুগের মুসলমানরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বহু মুসলমান শাসক, কবি ও শিল্পী ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বুঝাপড়ার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সে যুগের বহু মুসলমান আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে ভারতের সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে প্রচার করেছিলেন। সেইদিক দিয়ে আলবেরুনীর সাধনা অনেকটা সার্থক হয়েছিল। সেজন্য তাঁর এদেশের ভাষা শিখবার দরকার হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা তিনি অনায়াসে শিখে ফেলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে আটজন হিন্দী কবি যশ অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হচ্ছেন মুসলিম। মমুদ, কুতুবআলি, আকরম এবং ফয়েজ। তা ছাড়া আমির খুসরু, আব্দুর রহিম, খানখানান, দাউদ, মালিক মহম্মদ জইস—এঁরাও হিন্দী সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁরা সাধক কবীর ও তাঁর পুত্র মুস্নাকামালের নিকট অনেকভাবে ঋণী। কুতুবান, জান্‌জাহান, ওসমান, শেখনবী, নুর-মহম্মদ কাসিম—এঁদের কবিতা ও রচনার দ্বারাও হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। রহিম খাঁর নীতিমূলক কবিতা তুলসীদাসের 'দোঁহা' অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। হিন্দী সাহিত্যে কাদির, ডাহীর ও মোবারক উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। হিন্দী কবি রাস খাঁ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি চমৎকার ভাষায় শ্রীশ্যাম ও গোপিনীদের নামে বহু গান রচনা করেছেন এবং তা নিজেই গাইতেন।

আল্‌বেরুনীর 'ভারত বিবরণ' ভারত ও আরবের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ও ঐক্য স্থাপনের পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আরবের বহু মুসলিম পশ্চিম উপকূলে আসেন। মালাবারে তাদের প্রভাব দ্রুত বেড়ে উঠল। এই সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত

আছে যে, নবম শতাব্দীতে মালাবার রাজবংশের শেষ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আরবে বসবাস আরম্ভ করেন। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কয়েকজন আরবকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁরা আরব ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কালিকটের জামোরিন আরব বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আরব বণিকরা তার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় তাঁকে সাহায্য করত। সে সময় হিন্দুরা সাধারণত সমুদ্রযাত্রা করত না। সুতরাং তিনি আরব নাবিকদের সাহায্যে তাঁর নৌ-বিভাগটি গড়ে তোলেন।

মধ্যযুগে কয়েকজন সাধকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের প্রভাবে উদার ধর্মমত দ্রুত প্রসারলাভ করে। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবানন্দ, নিম্বার্ক প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ উদার ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও মিলন সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের চিন্তা ও আদর্শ ইসলামের সাম্যের আদর্শের অনুরূপ। তাঁদের সাধনায় গোঁড়াধর্মের প্রভাব ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর ধর্মসমন্বয়ের যে ধারা প্রবাহিত করলেন, তা সারা দেশকে প্লাবিত করে দিল। এঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলে এদেশে কোনদিন সাম্প্রদায়িক কোলাহল আত্মপ্রকাশ করত না। কীভাবে ভারতের আদর্শের সঙ্গে আরবের আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ দিব। সুফী সাধকদের আদর্শ হচ্ছে 'ফানা ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহের মধ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মবিলোপ করা। এই আদর্শটি বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' আদর্শের অনুরূপ। অজ্ঞাতসারে নির্বাণের আদর্শই সুফীদের মধ্যে প্রবেশ করে, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। শরীয়ৎ মেনে চলে এমন কোন মুসলমান বলবে না যে, 'আমিই খোদা'। অথচ আরবের বিখ্যাত সাধক মহর্ষি মনসুর ভাবের আবেগে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আনাল্‌হক্' অর্থাৎ 'আমিই খোদা'। তার সময় বেদান্তের 'সোহহং' আদর্শই সমধিকভাবে আরবে প্রচারিত হয়েছিল। নতুবা কোন মুসলমানই 'আমিই খোদা' একথা বলতে সাহসী হত না। আর ঐ কথা মনসুর বলেছিলেন বলে তাঁকে কাজীর আদেশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সুফীগণ 'জিকর' করেন, তাও ভারতের যোগপ্রথা থেকে গৃহীত। এইভাবে ধীরে ধীরে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয় হয়ে আসছিল। বস্তুত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে আরবের ক্ষতি তো হয়ই নি বরং বহু বিষয়ে উপকার হয়েছে। ভারতবর্ষ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তারা বিদেশী হয়ে থাকেনি। এদেশের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেলেন। যদি ইউরোপীয় শক্তি ভারত-প্রবেশের কোন পথ ও সুযোগ না পেত, তা হলে হয়ত শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানগণ একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়া করে নিত। হয়ত তারা সবাই 'এক দেহে লীন' হয়ে যেত। উপসংহারে এইটুকু বলব যে, আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আবার সুযোগ এসেছে যখন সব ভেদাভেদ দূর করে সকলকে মিলন ঐক্য সংহতি ও সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ভারতবর্ষ বরাবর বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সাধনা করেছে। আজও সেই সাধনা করতে হবে।

পাশ্চাত্ত্য শিল্পে ভারতের প্রভাব

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রায়শ শোনা যায়, আমাদের দেশে আর্টের যাহা কিছু ভাল, তাহা পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। পশ্চিমের শিক্ষকদের অনুসরণ করিয়া আমরাও অনেক সময় বলিয়া থাকি, আমাদের স্বদেশে আর্ট নামধেয় কিছু নাই, সবই ইউরোপের সম্পত্তি, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইউরোপ হইতে ধার করা, শিল্প-বিজ্ঞান অর্থাৎ পারস্পেকটিভ শেড্‌লাইট অ্যানাটমি শুধু ইউরোপ হইতেই শেখা যায়, আমাদের দেশে উহা অজ্ঞাত। সকলের আরও বিশ্বাস, তৈলচিত্রের টেকনিক ইউরোপ আবিষ্কার করিয়াছে, আমাদের প্রাচীনকালে উহা জানা ছিল না। আমরা যদি ভারতের শিল্পের ইতিহাস, শিল্প-শাস্ত্র, প্রাচীন সাহিত্য অনুধাবন করি, তবে জানিতে পারিব, ঐ সকল উক্তি ভ্রান্ত, আমাদের দেশে ইউরোপের বহু পূর্বেই সকল শিল্পরীতি, শিল্প-বিজ্ঞান ও তৈল-চিত্র জন্ম লইয়াছে।

আমরা ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা অজন্তা ও বাঘের চমৎকার উদাহরণ হইতে জানি, দেড় হাজার বৎসর পরে মাইকেল এঞ্জেলোর কাজে সেই আদর্শে পাশ্চাত্ত্য জগৎ পৌঁছিয়াছে। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞেরাও এই অভিমত পোষণ করেন।

ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া চিত্র উৎপাদন করিয়াছে, অজন্তা তাহার সমগ্র সৃষ্টির শতাংশ হইবে কিনা সন্দেহ। সকল চিত্রের উদাহরণ ধ্বংস হইয়াছে, কারণ ভারতের আবহাওয়ার গুণে তাহা টিকিতে পারে না। স্থায়ী প্রস্তরের উপর ছাড়া বহু চিত্র কাষ্ঠ, কার্পাস ও সিল্কের উপর হইয়াছে, তাহা দীর্ঘকাল টিকিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিল্পের উদাহরণ

এই অবস্থায় আমাদের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থরাজির উপর নির্ভর করিতে হয়। উহাতে প্রায়ই স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-কলার উল্লেখ পাওয়া যায়। শিল্প-শাস্ত্রও অসংখ্য, তাহাতে উন্নততর শিল্পনীতি ও শিল্পবিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহা হইতে বোঝা যায়, আমাদের শাস্ত্রকারগণের শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও গবেষণা ছিল। তাঁহাদের সকল প্রকার বিজ্ঞান জানা ছিল।

চিত্র যে নানা প্রকারের ছিল, প্রাচীন সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থান, মন্দির, প্রাসাদ, সাধারণের ভবন, ব্যক্তিগত বাসগৃহ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রীতির চিত্রের নির্দেশ আছে। পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা শিল্পশাস্ত্র বিষ্ণু-ধর্মোত্তর চারি প্রকার চিত্রের নির্দেশ দিয়াছে। যথাঃ সত্য (আইডিয়ালাইজড্, আদর্শ রচনা), বৈনিক (রোম্যাণ্টিক), নাগর (জানরে, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র), মিশ্র (মিশ্রিত রীতি)। ইহা ছাড়াও হয়ত আরও বিভিন্ন শিল্পরীতি থাকিতে পারে। শেড্-লাইট, পারস্পেকটিভ, ফোরকার্টেনিং-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে। পারস্পেক্টিভ পরিপ্রেক্ষণ, ফোরকার্টেনিং ক্ষয়বৃদ্ধি মডেলের আদর্শ অনুসারে চিত্রিত করা, কর্তন। ইংরেজী ও সংস্কৃত পরিভাষা একই অর্থদ্যোতক।

সাধারণত এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, ভারতীয় চিত্র আইডিয়ালাইজড্ অর্থাৎ মনের কল্পনায় গড়া, যাহার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্বন্ধ নাই। সংস্কৃত পুরাণ, নাটক, উপন্যাস যদি অনুধাবন করি, তবে দেখিতে পাইব, ভারতীয়েরা অতি প্রাচীনকালে জীবন্ত (লাইফ লাইক) মূর্তি ও প্রতিকৃতি গড়িয়াছে। প্রতিকৃতি-অঙ্কন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের কাছে প্রবল আকর্ষণের বস্তু ছিল, জনগণও উহা খুব পছন্দ করিতেন। শুধু ব্যবসায়ী শিল্পীরা নহে, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়েরাও প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন করিতেন। সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, প্রতিকৃতি-অঙ্কন কেমন উচ্চস্তরের বাস্তব আদর্শে পৌঁছিয়াছে।

হর্ষবর্ধন রচিত নাগানন্দ নাটকে দেখিতে পাই, রাজবংশীয় জীমূতবাহন নিপুণ প্রতিকৃতি-চিত্রকর ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণয়িনী সুন্দরী মলয়াবতীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন। চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া মলয়াবতীর সহচরী এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ইহাকে চিত্র বল কেন? ইহা দর্পণে প্রতিফলিত ছায়া।" এই মন্তব্য আমাদের লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করাইবে, শিল্প জীবনেরই দর্পণ। শুধু ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্য নাটকাদিতে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের সুন্দর উল্লেখ পাই না, খৃষ্টীয় যুগের হাজার বৎসর পূর্বেও, এমন কি, মহাভারতে অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি-অঙ্কনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা পাওয়া যাইবে ঊষা-অনিরুদ্ধ সংবাদে। রাজকুমারী ঊষা স্বপ্নে এক সুদর্শন যুবককে দেখিয়া-ছিলেন। তিনি তাহার সহচরী চিত্রলেখাকে স্বপ্নের কথা বলেন। চিত্রলেখা নিপুণ চিত্রকর ছিলেন। চিত্রলেখা যাঁহাদের জানিতেন, স্মরণ হইতে তাঁহাদের প্রতিকৃতি আঁকিলেন; দেবতা, রাজকুমার, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আঁকিলেন। উহার মধ্যে ঊষা তাঁহার স্বপ্নের যুবককে চিনিতে পারিলেন; তিনি অনিরুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। তারপর ঊষার সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহ হইল।

প্রাচীন ভারতে তৈলচিত্র

জৈন সাহিত্যে আরও আশ্চর্যজনক উদাহরণ আছে। উহা হইতে জানা যায়, এমন কি মহাবীরের সময়েও তৈল-চিত্রের জ্ঞান ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্লেমিশ চিত্রকর ভ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয় তৈলচিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা সত্য নহে। জৈন কাহিনী যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আমাদের মানিতে হইবে, ইউরোপে তৈলচিত্র প্রচলন হওয়ার দুই হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতে তৈলচিত্রের জ্ঞান ছিল। তৈলচিত্র লইয়া যে-কাহিনী, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক, সম্পূর্ণ নিম্নে দিলাম।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের কালে মগধের রাজধানী রাজগৃহে শ্রেণিক নামে এক নৃপতি ছিলেন। রানী নন্দার গর্ভে তাঁহার অভয়কুমার নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতা অভয়কুমারকে মন্ত্রিত্বের পদ দিয়া-

ছিলেন। বৈশালীর রাজার নাম ছিল চেতক। তাঁহার দুই সুন্দরী কন্যা ছিলেন। সুজ্যেষ্ঠা ও চেলনা। শ্রেণিক কন্যাদ্বয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া কন্যার পিতা কর্তৃক অপমানিত হইলেন।

বিবাহ ব্যাপারে হতাশ হইয়া শ্রেণিক মন্ত্রীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অভয়কুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছয় মাসের মধ্যে কন্যাদ্বয়কে পিতার নিকট আনিয়া দিবেন। তারপর অভয়কুমার বৈশালীতে চলিয়া গেলেন এবং ধনশেঠ নাম গ্রহণপূর্বক রাজপ্রাসাদের নিকট একটি দোকান খুলিলেন। দোকানে স্বল্পমূল্যের দ্রব্যাদি রাখিলেন এবং ক্রেতাদের আকর্ষণ করিবার জন্য দোকানে পিতার একটি তৈলচিত্র ঝুলাইয়া রাখিলেন। প্রাসাদের দাসীরা দ্রব্যাদি কিনিতে আসিত। তাহাদের মারফত সুজেষ্ঠা ও চেলনার নিকট তৈলচিত্রের খবর পৌঁছিল। তাঁহারা চিত্রটি দেখিতে চাহিলেন। দাসীরা অন্তঃপুরে চিত্রটি আনিলে, কন্যাদ্বয় শ্রেণিকের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। তাঁহাদের পলায়নের জন্য একটা পন্থা স্থিরীকৃত হইল, বাহির হইতে কন্যাদ্বয়ের বাসস্থান অন্তঃপুর পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়া হইল। দুই ভগ্নী সুড়ঙ্গপথে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, শ্রেণিক সুড়ঙ্গমুখে রথ লইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ সুজ্যেষ্ঠার মনে পড়িল, তিনি গহনার পেটিকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; কনিষ্ঠা ভগ্নীকে রথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্তঃপুরে পেটিকা আনিতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন, শ্রেণিক চেলনাকে লইয়া দ্রুত বেগে রথ লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। সুজ্যেষ্ঠা পড়িয়া রহিলেন; চেলনা শ্রেণিকের প্রিয় মহিষী হইয়াছিলেন।

জৈন শাস্ত্রমতে প্রথম নৃপতি হইলেন ঋষভদেব, তিনি জৈনধর্মে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ নামে পরিচিত। ঋষভদেব মনুষ্যদের প্রথম গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন এবং চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেন,

"Rsavadeva taught them art of building huts and the art of painting for adorning the rooms. He then taught them the art of weaving cloth."

কালিদাসের নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র ও শকুন্তলায় চিত্তাকর্ষক প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের

উদাহরণ আছে। প্রথম শকুন্তকে দেখি, রাজা অগ্নিমিত্র চিত্রশালায় সুন্দরী মালবিকার মূর্তি দেখিয়া প্রেমমুগ্ধ হন। শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ক প্রতিকৃতি লইয়া। দুষ্মন্ত যখন বিরহ কাতর, তখন মনের খেদ দূর করিবার জন্য শকুন্তলার চিত্র আঁকিয়াছিলেন। পশ্চাদভাগে বাস্তবধর্মী মনোহর স্থানচিত্র আছে; শেড্‌লাইট এবং মডেলিং নিপুণ-ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই চিত্রটিও ছিল তৈলচিত্র। শ্লোকের মধ্যে একটি কথা আছে "স্নিগ্ধ প্রভবাচ্চিরম্", ইহার অর্থ কি? সংস্কৃত স্নিগ্ধ শব্দের অর্থ হইল তৈলযুক্ত (স্নেহ—তেল)। ছবিটি তেলরঙা হওয়ার জন্য স্থায়ী। কালিদাসের মূল শ্লোকটি উদ্ধৃত করা গেলঃ

যদ্ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা
তথাপি তস্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্।
তথাহি—
অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা,
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভবাচ্চিরম্
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥

(চিত্রপটে যে যে বিষয় সম্যক চিত্রিত না হয়, চিত্রকরেরা তাহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে, তথাপি প্রিয়তমার লাবণ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এই চিত্রফলকে অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রফলক সমতল বটে, কিন্তু তথাপি স্তনদ্বয় উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ উচ্চ-নীচ বলিয়া বোধ হইতেছে; তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিগুণ হেতু অঙ্গের শোভা বা কোমলতা যেন স্থায়িরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, প্রিয়তমা আমার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কী বলিতে উদ্যত হইয়াছেন।)

পালি ভাষায় লেখা সিংহলের ইতিহাস মহাবংশে রঙের সঙ্গে তেল মাখাইবার কথা উল্লেখ আছে। উহা হইতে জানি, অশোক যে বোধিবৃক্ষের শাখা সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন, শাখা ছিন্ন করার পূর্বে, সিন্দুর তেলের সঙ্গে মিশাইয়া শাখায় একটি বৃত্তাকার চিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল, চিহ্নিত স্থান ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে।

এই তিনটি উদাহরণ হইতে কি স্থির করিতে পারি না যে, ইউরোপের বহু পূর্বেই ভারতে রঙের সঙ্গে তেল মিশ্রিত করার পদ্ধতি জানা ছিল?

মহাভারতের দ্রোণপর্বে একটি সুন্দর চিত্রের বর্ণনা আছে, উহা ফরাসীর অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ শতাব্দীর ওয়ার পিকচারের কথা স্মরণ করাইবে। শ্লোকটি এইঃ

এবং হয়শ্চ নাগাশ্চ যোধাশ্চ ভরতর্ষভ
যুদ্ধাদ্বিরম্য সুষুপুঃ শ্রমেণ মহতান্বিতাঃ॥
তত্তথা নিদ্রয়া মগ্নবোধ মন্বপদ্বলম্।
কুশলৈঃ শিল্পিভির্ন্যস্তং পটে চিত্রমিবাদ্ভুতম্॥

(মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১৫৮ অধ্যায়, শ্লোক ৪২—৪৩। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত)

(ভরতশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া এইভাবে নিদ্রিত হইল। নিদ্রামগ্ন ও চৈতন্যহীন সেই সৈন্যেরা ক্রমে সেই ভাবে শয়ন করিল। তখন চিত্রনিপুণ চিত্রক কর্তৃক পটে চিত্রিত অদ্ভুত চিত্রের ন্যায় তাহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল।)

বাইজান্টাইন শিল্প

এখন ইউরোপে আসা যাক। দেখই ভারতীয় আদর্শ কীভাবে ইউরোপীয় শিল্পে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি, ষোড় শতাব্দীতে মাইকেল এঞ্জেলোর আবির্ভাবে (১৪৭৫—১৫৬৪) পূর্বে অজন্ত (১০০—৬৪২) ও বাঘের (৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দ আদর্শে পোঁছাইতে সক্ষম হয় নাই বিখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক উই ডুরাণ্ট মনে করেন, অজন্তার শি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কাজ হই সূক্ষ্মতর ও গভীরতর। গ্রীক ও রোম মূর্তি আবিষ্কারের ফলে ইইরেনে উদ্ভব হয়; উহার পূর্বে পর্য ইটালীয় শিল্প মধ্যযুগীয় বাইজান্টা ও গথিক শিল্পের ক্রমপরিণতি ছিল। মধ্যযুগীয় গথিক ও বাইজানটাইন শি নিশ্চয়ই প্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। উক্তি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা য বাইজানটাইন শিল্পের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপলে; উহা ইউরোপ এশিয়ার সীমায় অবস্থিত বলিয়া এ আন্তর্জাতিক নগর ছিল। নিশ্চয়ই এশি শিল্পীরা বাইজানটাইন সম্রাটদের (৩৯ ১৪৫৫) অধীনে কর্ম করার জন্য করিয়াছেন। পূর্বে গ্রীক ও রো শিল্পীরা এমনি করিয়া তক্ষশীলায় সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্ম করার আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রচেষ্টায় গা শিল্পের জন্ম হইয়াছিল। বাইজান গির্জার স্থাপত্য, ম্যুরাল পেণ্টিং, প চিত্রাঙ্কন, নানাবিধ কারুকর্ম, ধাতু, দন্ত, কাষ্ঠ, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির প্রাচ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। বাইজান গির্জার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেণ্ট সে ৫৩২ হইতে ৫৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাস্টিনিয়ান কর্তৃক নির্মিত। স্থাপত্যের অলংকরণে এবং মোজেইক এশিয়াটিক জমকালো ভাব আছে। সোফিয়ার স্থপতিদের নাম আমরা ত্রাল্লেস নিবাসী আন্থেনিয়াস এবং মি এর ইসোডোরাম। উভয়েই এশিয়া "Ce nest sans doubt pa Pantheon de Rome, mais d'e asiatiques que sensoirirent architects de saint Sophie" (Re Apollo, P. 98)

অর্থাৎ ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই, সেণ্ট সাফিয়ার স্থপতিরা রোমের প্যান্থিয়ন দ্বারা প্রভাবিত হন নাই, কিন্তু এশিয়াটিক গর্জা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

ইটালীর শিল্প

ইটালীর বিখ্যাত শিল্পী জ্যাত্তোকে (১২৭৬—১৩৫৭) ফাদার অফ ইউ-রোপীয়ান পেণ্টিং বলা হয়। তাঁহার গুরু চিমাবুদ্ (১২৪০—১৩০২) ফ্লোরেন্সে ঔপনিবেশিক বাইজান্‌টাইন শিল্পীদের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যাত্তোর অঙ্কন-শৈলী এবং অনুভূতি উভয়েই অজন্তার আমেজ দেখা যায়। আমরা কি কল্পনা করিতে পারি না, বাই-জান্‌টাইন আর্টের মাধ্যমে অজন্তার শৈলী জ্যাত্তোর ফ্রেস্কোতে পেণছিয়ছে? ফিওসোলের ফ্রা এঞ্জেলিকো (১৩৮৭—১৪৬৫) জ্যাত্তোর শিষ্য, তিনি গুরুর শিক্ষা অব্যাহত রাখিয়াছেন। বোত্তিচেল্লির (১৪৪৫—১৫১০) অনুভূতিশীল এবং সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন প্রাচ্য আদর্শসম্ভূত, তাঁহার হস্তের ভঙ্গীসমূহ ভারতীয় হস্তের মুদ্রাকে স্মরণ করাইবে। ভিনিসিয়ান শিল্পী যথা বেল্লিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজে অজন্তার ইশারা পাওয়া যাইবে। ভিনিসের বিখ্যাত বাইনজান্‌টাইন গির্জা সেণ্ট মার্ক-এর (১১০০) স্থাপত্যের জমকালো অলংকরণ নিঃসন্দেহে ভারতীয় আদর্শ হইতে লওয়া হইয়াছে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কনস্টাণ্টিনোপল আন্তর্জাতিক নগর ছিল, তেমনি ভিনিস ছিল আন্তর্জাতিক বন্দর। গুজরাটের তীরের সঙ্গে বহুকাল তাহার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহা অসম্ভব নহে, ভিনিসের পথে ভারতীয় শিল্প ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে। উইল ডুরাণ্ট বলেন, "ভিনিস, জেনোয়া এবং অন্যান্য নগরের ঐশ্বর্য ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বর্ধিত হইয়াছে। গ্রীকরা যে ইটালীতে পুঁথি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা রেনেসাঁর অধিক কারণ এই ব্যবসা-বাণিজ্যের হেতু অর্থলাভ।" ভারতীয় অর্থ যদি ইটালীর রেনেসাঁকে পুষ্ট করিয়া থাকে, তবে ভারতীয় শিল্প কি তাহা একেবারেই করে নাই?

রোমানাস্ক এবং গথিক শিল্প

ফ্রান্সে ও স্পেনে রোমানাস্ক (১১শ—১৩শ খৃীষ্টাব্দ) এবং গথিক ভাস্কর্য বর্ধিত হইয়াছে, উহাতে ভারতের সৌম্য ভাস্কর্যের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। যে-কোন কলারসিক এই সাদৃশ্যে বিস্মিত হইবেন। বিখ্যাত ফরাসী শিল্প-সমালোচক রেনে গ্রুসে গান্ধার-শিল্পের সহিত উহার সাদৃশ্য স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার কোন প্রভাব অস্বীকার করেন। তাঁহার যুক্তি এই, উহাদের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস অনুধাবন করি, তবে কি উহার মধ্যে কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইব না?

রোমান বাণিজ্য

আমরা জানি, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের দক্ষিণ উপকূলের বাণিজ্য

ছিল। গোদাবরীর তীরে অবস্থিত অমরাবতী স্তূপের নিকট অনেক রোমান স্বর্ণমুদ্রা মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। উইল ডুরাণ্টের মত অনুসারে বলা যায়, ইটালীর রেনেসাঁর গৌরব ভারতীয় বাণিজ্যের অর্থ দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে; তেমন বলা যাইতে পারে, অমরাবতী স্তূপ রোমান স্বর্ণের অভিব্যক্তি। স্তূপের কয়েকটি বা-রিলিফে গ্রেকো-রোমান প্রভাব লক্ষিত হয়, উহা রোমান বাণিজ্য প্রচেষ্টা আরও প্রমাণিত করে। কোন রোমান বাণিজ্য-পোত হয়ত গ্রেকো-রোমান শিল্পের কিছু উদাহরণ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাই অমরাবতীর শিল্পীরা অনুকরণ করিয়াছেন। চালান কি শুধু এক পক্ষেই হইয়াছে? আমাদের কল্পনা করিতে বাধা কি, রোমান বাণিজ্যপোত কিছু ভারতীয় শিল্পের উদাহরণ নিজেদের দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; উহা রোমানাস্ক ও গথিক গির্জার আদর্শ হইয়াছে? ইউরোপীয় ভাস্কর্য বৌদ্ধ ভারতের সমগোত্রভুক্ত হইলেও তাহার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই, উহা একাকীই এবং স্বাধীন-ভাবে বর্ধিত হইয়াছে, রেনে গ্রুসের এই থিওরি দাঁড়াইতে পারে না। হ্যাভেল সাহেব এবং সিস্টার নিবেদিতা মনে করেন ইউরোপের মধ্য যুগের ক্যাথিড্রাল ভারতের বৌদ্ধ চৈত্য হইতে অনুকৃত করা হইয়াছে।

রোমানরা ভারতে শুধু কি মসলিন সিল্ক ও মশলা ক্রয় করিতে আসিয়াছে? তাহারা কি কিছু শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে নাই, ভারতীয় শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই?

স্যার মোর্টিমার হুইলার বলেন, "রোমের কর্মপ্রচেষ্টা এবং বাণিজ্য যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা উপদ্বীপের (ভারতের) সংস্কৃতিতে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। উহাকে এখানে সেখানে একটা বাহ্য ছাপ দিয়াছে, কিন্তু বিন্ধ্যর দক্ষিণে তাহা স্বদেশীয় পর্যাপ্ত গাঁথুনির উপর জোড়কলম বই আর কিছু নয়।

"দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরীর নিকটে আরিকামেদুতে ইণ্ডো-রোমান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল, টুকরা টাকরা রোমান আমফোরা, আরেটিন থালা এবং প্রদীপ মৃত্তিকা অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে।"

স্যার মোর্টিমার একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, পম্পিয়াইতে একটি কুশান ক্ষুদ্র মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; তিনি বলেন : "পশ্চিমে এই প্রকার দ্রব্যাদির নিদর্শন কম, খুবই কম, উহার কারণ ঐগুলি অস্থায়ী পদার্থে নির্মিত। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী এই দুর্লভ দ্রব্যটি হস্তিদন্ত নির্মিত লক্ষ্মীর মূর্তি। লক্ষ্মী হইল ভারতের সৌভাগ্য ও সম্পর্কের দেবী, পম্পিয়াইতে উহা পাওয়া গিয়াছে, কাজেই সেখানে উহা ৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আসিয়াছে। ইহা ভারতীয় শিল্পের মনোহর কারুকার্য; সাধারণভাবে বলা যায়, কিন্তু নিশ্চিত করিয়া নহে, ইহা কুশান শিল্পের সহিত যুক্ত এবং বুরিগানার পথে ভারত হইতে বাহিয়ে আসিয়াছে।

"যবনদের প্রতি এবং তাহাদের বাজারের প্রতি ভারতের যে ঔৎসুক্য, সে সম্বন্ধে আর কিছু বলার দরকার নাই।"

ইতিহাস হইতে জানি, কনস্টান্টিনোপলে বাইজানটাইন ভাস্কর ও মোজেইক চিত্রকরেরা মূর্তিভঙ্গকারীদের (Iconoclasts) উৎপাতে পীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করেন এবং ফ্রান্সের সম্রাট শারল্যমানের দরবারে (৭৬৮—৮১৪) এই—লা-চ্যাপেলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা ফ্রান্সের শিল্পে প্রাচ্যের আমেজ লাগাইতে পারেন।

ক্রুসেড

ছয়টি ক্রুসেডের কালে পশ্চিম ইউরোপের জাতিসকল প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসে (১০৯৫—১২২৮)। তাঁহাদের যুদ্ধের ক্ষেত্র প্যালেস্টাইন। সেখানে নিশ্চয়ই ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন ও ভারতীয় শিল্পী ছিল; ক্রুসেডারদের পক্ষে এই সকল নিদর্শনের আদর্শ নিজেদের দেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব এবং ক্রুসেডারদের মারফতও রোমানস্ক ও গথিক শিল্প ভারত দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে।

ইহা আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইতিহাসের সকল ছাত্রই জানেন যে, আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে।

রাশিয়া ও তুর্কী চেঙ্গিস খান
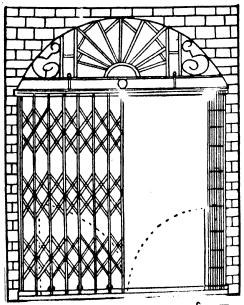
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রাশিয়াকে এশিয়ার অংশ মনে করা হইত। রাশিয়ার প্রাচীন গির্জার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা (১০৩৭), উহা প্রাচীন রাজধানী কিয়েভে অবস্থিত। উহার অদ্ভুত বাল্ব আকারের গম্বুজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপে অজ্ঞাত এই রীতি এশিয়াটিক। প্রাচীন গির্জার ফ্রেস্কো-পেণ্টিং এবং কাঠের পাটার উপর আঁকা আইকন পেণ্টিং ভারতবর্ষ অথবা মধ্য এশিয়ার শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতাই বর্ধিত হইয়াছে। রাশিয়াতে যে ভারতীয় সংস্কৃতি পৌঁছিয়াছে, তাহার দুইটি পথ থাকিতে পারেঃ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কনস্টাণ্টিনোপল একটি প্রবেশদ্বার। ইহাও খুব সম্ভব হইতে পারে, তুর্কী চেঙ্গিস খানের (১১৬২—১২২৭) সঙ্গে মধ্য এশিয়ার শিল্প রাশিয়াতে প্রবেশ করিয়াছে' শুধু শিল্পের প্রভাব নহে, রক্তের বিনিময়ও হইয়াছে, উভয় জাতির মধ্যে বহুল পরিমাণে বিবাহ হইয়াছে, রাশিয়ার রক্তে তুর্কী রক্ত প্রবেশ করিয়াছে। চেঙ্গিস খান বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, চীনা সমুদ্র হইতে রাশিয়ার ভলগা নদীর তীর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নানাবিধ শিল্পী নিশ্চয়ই তুর্কী সম্রাটকে রাশিয়া অভিযানে অনুসরণ করিয়াছে। আমরা প্রাচ্যের ইতিহাসে দেখি, যুদ্ধকালেও দরবারী শিল্পীদের সম্রাটকে অনুসরণ করিতে হয়।

রোটাণ্ডা ও খোটানের শিল্প

মধ্য এশিয়ায় অভিযানকারী স্যার অরেল স্টাইন মনে করেন, মধ্য যুগের ইউরোপে রোটাণ্ডা নামে যে গোলাকৃতি গির্জা আছে তাহার স্থাপত্য-রীতির উদ্ভব হইয়াছে বৌদ্ধ মন্দির হইতে; মধ্য এশিয়ার খোটানের মরুভূমিতে তিনি এরূপ গোলাকৃতি বৌদ্ধ মন্দির (চতুর্থ শতাব্দী) আবিষ্কার করিয়াছেন। মধ্য যুগীয় ইউরোপের সঙ্গে

খোটানের সোজাসুজি যোগ না থাকিলেও ইহা সম্ভব হইয়াছে।

হ্যাভেল সাহেবের অভিমত

হ্যাভেল সাহেব মনে করেন, ইউরোপীয় শিল্পে যে ভারতের প্রভাব আছে, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তবে জগতের শিল্পের ইতিহাসে ইহা এক চিত্তাকর্ষক বস্তু হইবে।

"ভারতীয় বৌদ্ধ নির্মাতাদের কাজে যে রোমান্টিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা গথিক শিল্পে পাওয়া যাইবে এবং গথিক শিল্প হইল ইন্দো-এরিয়ানদের পশ্চিমের কারুশিল্পীদিগকে দান। মানুষের হাতে তৈরী কাজের মধ্যে কার্লির চৈত্যগৃহ তাহার জমকালো কাজের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পূজা-স্থানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচিত।

"সদ্ধর্ম কি করিয়া ভারত হইতে চীন এবং তথা হইতে কোরিয়া ও জাপানে প্রবেশ করিল, তাহা অনুধাবন করা সহজ; কিন্তু কি করিয়া কার্লি ও অজন্তার শিল্প পশ্চিম এশিয়ায় গমন করিল এবং তথা হইতে গেল ইউরোপে এবং ফ্রান্সের গৌরবান্বিত ক্যাথিড্রালে তাহা পুষ্পিত হইল? এই আশ্চর্যজনক ইতিহাস এখনও লেখা বাকী আছে।

"ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইয়াছে এশিয়ার যাযাবর দলের সঙ্গে যেসব কারুশিল্পী ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দ্বারা; উহা খৃষ্টীয় যুগের আরম্ভ হইতে শুরু হইয়াছে এবং আংশিকভাবে হইয়াছে ক্রুসেডারদের দ্বারা, ক্রুসেডের সুদীর্ঘ অভিযানের কালে পাশ্চাত্ত্য জগৎ প্রাচ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে। ইহা সুনিশ্চিত যে, শিল্পের ক্ষেত্রে বহু পূর্বেই পূর্ব-পশ্চিমের মিলন হইয়াছে, আবার যখন আর্টের তীব্র আবেগ আসিবে, ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনক্ষেত্র একই হইবে।"

আধুনিক ফরাসী শিল্প

এই প্রবন্ধে আধুনিক ফরাসী-শিল্পের উপর ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছু বলি নাই, কিছু বলার দরকার। আমার মনে হয়, সকল আধুনিক শিল্পীর মধ্যে পল গোগ্যাঁর কাজে (১৮৪৯—১৯০৩) ভারতীয় প্রভাব অধিক প্রকট। তিনি যদি অজন্তার চিত্র দেখিতেন, তবে হয়ত উৎসাহে ও প্রশংসায় পাগল হইয়া যাইতেন; এবং তদ্দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইতেন; উভয়ের মধ্যে নীতির সাদৃশ্য আছে। গোগ্যাঁর দুই হাজার বৎসর পূর্বে অজন্তা গোগ্যাঁর শিল্পনীতি প্রবলতরভাবে এবং সুন্দরতরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানি, তিনি অজন্তার খবর না জানিলেও কাম্বোডিয়ান (৮০০—১৩০০) ভাস্কর্যের খবর রাখিতেন ও তাহার কদর করিতেন; কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর-ভাটের বা-রিলিফ অজন্তা ফ্রেস্কোর প্রস্তরে অনুবাদ বই কিছু নয়। এই তালিকায় সম-

সাময়িক শিল্পী অ্যাঁরি মাতিস (১৮৬৯—১৯৫৪) এবং পাবলো পিকাসোর (জন্ম ১৮৮১) নাম যোগ করা যায়; তবে উভয় শিল্পী ভারতীয় ক্লাসিক্যাল আর্ট দ্বারা প্রভাবিত হন নাই, ভারতীয় লোকশিল্প দ্বারা (ফোক আর্ট) অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।
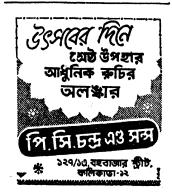
গোগ্যাঁ লিখিয়াছেন, "সব সময় তোমার সামনে পারশিয়ান, কাম্বোডিয়ান এবং অল্প [illegible] রাখিবে।"

আমরা ভারতীয়েরা অধুনা মাতিস, পাবলো পিকাসো ও অন্যান্য আধুনিক ফরাসী শিল্পীদের লইয়া বড় বেশী মাতামাতি করি, কিন্তু আমরা জানি না, মাতিসের ভারতীয় শিল্পের উপর কত শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধা যদি আমাদের থাকিত! আমি শুনিয়াছি, পিরিস নামে এক সিংহলী যুবক ইংলণ্ডে শিল্পের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্যারিসে গিয়াছিলেন মাতিসের শিক্ষানবিশ হইতে; মাতিস তরুণ সিংহলী শিল্পীকে উপদেশ দিলেন, "আমার কাছে এসেছ কেন, দেশে ফিরে যাও, there is great art in India, তোমাকে তোমার দেশের আর্ট দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া তাঁহার সংগ্রহের কতগুলি ভারতীয় পটচিত্র দেখাইলেন।

ভারতীয়ভাবাপন্ন যাঁহারা, সেইসব ভাস্করদের মধ্যে নাম করা যায় রোদ্যাঁ (১৮৪০—১৯১৭), দেগা (১৮৩৪—১৯১৭), বুর্দেল, মেইলল (মৃত্যু ১৯২৯), ইংরেজ হেনরী মুর এবং পল ম্যানশিপ। রোদ্যাঁ দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ নটরাজের মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

ইংরেজ ভাস্কর হেনরী মুর সম্বন্ধে এক গল্প শুনিয়াছি বিলাত-ফেরত এক বাঙালী শিল্পীর কাছে। তিনি গিয়াছিলেন লণ্ডনে মুরের স্টুডিও দেখিতে। সেখানে দেখিলেন, কালীঘাটের কতগুলি মাটির পুতুল। তিনি ভাস্কর্যে হয়ত ভারতীয় পুতুলের ধাঁচ আনিবার চেষ্টা করেন।

ফরাসী শিল্পসমালোচক এলিফর বুর্দেল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, (Modern Art P. 468) "Bourdelle, the only artist today to possess the instinct of symbolism, it is expressed in a language which is not always his own, wandering in its inner torment, from Gothik to Michael Angelo, from Ingress and from Carpeanx to Rodin, from Assyrians to the Hindoos."

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, "...an art (i.e. Indian) already accepted by artists and acclaimed by its influence upon the work of such artists as Rodin, Degas and Maillob."

সাদা মেঘের ভেলা

আলোকচিত্রী শ্রীনীরোদ রায়

॥ আলোক-তৃষা ॥

আলোকচিত্রী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

॥ দূরের পাহাড় ॥

আলোকচিত্রী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বিচিত্র জীবনকথা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

স্বর্গত কিশোরীলাল সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি যে শুধু ব্যবহার-জীবিরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্যও তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি কম ছিল না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর ল প্রফেসার" ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "হিন্দু সিস্টেম অব রিলিজাস সায়েন্স", "হিন্দু সিস্টেম অব মরাল সায়েন্স", "হিন্দু সিস্টেম অব সেল্ফ-কালচার", "এ ডাইং রেস, হাউ ডাইং?" ইত্যাদি গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ ম্যাক্সমুলারের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ভারত-বিশ্রুত সাংবাদিক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠা সহোদরা লীলাবতী ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী। কিশোরীলালের পৈতৃক বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার বেলেকান্দি থানার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামে। তাঁহার পিতা সীতানাথ সরকার ছিলেন ওই অঞ্চলের একজন পরোপকারী প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বনিয়াদী কায়স্থ জমিদার। সরকার-বংশের গৃহ-দেবতা হইলেন মদন-গোপাল এবং ইঁহাদের জমিদারী সেই বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি।

মনীষী কিশোরীলালের জননী পুণ্য-শীলা রাসসুন্দরীর অপূর্ব জীবন-কাহিনী হইতে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব। সেই সকল ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইলে কিংবা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন-কথাও জানা আবশ্যক।

স্বামী-কুলের মত তাঁহার পিতৃকুলও প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রাস-সুন্দরীর পিত্রালয় পাবনা জেলার পোতা-জিয়া গ্রামে। দয়ামাধব হইলেন পিতৃ-বংশের গৃহ-দেবতা এবং ইঁহাদেরও ভূসম্পত্তি সেই বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরেও দয়ামাধবের বিগ্রহ স্বস্থানে রহিয়াছেন এবং সেবা-পূজা যথারীতি চলিতেছে। হিন্দুর ধর্মজীবন গঠনে স্বগৃহের দেব-বিগ্রহ কিভাবে ও কি পরিমাণে সাহায্য করেন, তাহার সম্যক পরিচয় এই সাধ্বী মহিলার জীবন হইতেও মিলিবে। তাঁহার কালে অভিজাত বংশের মেয়েদের পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইবার রেওয়াজ ছিল না; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে ইহা নিন্দনীয়ই ছিল। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রাসসুন্দরী বিবাহের পর একাধিক সন্তানের জননী হইয়াও স্বামী-গৃহে কাহারও সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। সচরাচর পড়া ও লেখা শিখিবার ব্যাপারে ঐ দুইটি কাজই এক সঙ্গে অর্থাৎ সমতালে চলে। কিন্তু তাঁহার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। "চৈতন্য-ভাগবত" পাঠের ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহাকে পড়িতে শিখিবার জন্য প্রেরণা দেয়। প্রথমে তিনি যখন পড়িতে শিখিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। তাঁহার প্রথম সন্তান বিপিন সে সময় তালপাতায় লেখা শিখিতেছিলেন। পড়িতে শিখিয়াই তিনি সর্বপ্রথম "চৈতন্য-ভাগবত" পাঠ করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তাঁহার স্বামীগৃহে যে সমুদয় ধর্মগ্রন্থ ছিল, গার্হস্থ্য জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সেইগুলি তিনি পাঠ করিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ইত্যাদি।

২

এতগুলি পুস্তকের পাঠ সমাপ্ত করিয়াও রাসসুন্দরী লিখিতে শিখিলেন না। এইভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া যাইবার পর তাঁহার সপ্তম পুত্র কিশোরী-লালের অনুরোধে তাঁহাকে প্রৌঢ় বয়সে বালিকার মত দোয়াত, কালি, কলম, কাগজাদি লইয়া লেখা শিখিবার কাজে মনোযোগী হইতে হইল। কত কষ্টে যে তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, সেই কাহিনী তাঁহার আত্মচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে মনে হয়,—তিনি যেন ব্রত-চারিণীর ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লইয়া বাণীর আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার আরাধনা নিষ্ফল হয় নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার স্বলিখিত বর্ণনা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"......কিন্তু লেখার বিষয়ে আমি কখন মনোযোগ করি নাই, এজন্য লিখিতেও জানি না, মধ্যে মধ্যে এই কথাটি আমার মনে বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইত। আমি সর্বদা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া রোদন করিতাম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে সকল বিষয়ে প্রায় এক মত ভালই রাখিয়াছ। সংসারের বিষয়ে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক, আমাকে তাহা তুমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সকলই দিয়াছ। কিন্তু এই কথাটি আমার মনে ভারী আক্ষেপের বিষয় যে, আমি লিখিতে জানি না। তুমি আমাকে লিখিতে শিখাও। পরমেশ্বরের নিকট দিবারাত্র এই বলিয়া কাঁদিতাম। এই অবস্থায় আমার অনেক দিবস গত হইয়াছে। আমি যে আর লিখিতে শিখিব, আমার মনে এমন ভরসাও ছিল না।

"পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দৈবাৎ এক দিবস আমার সপ্তম পুত্র কিশোরীলাল বলিল, মা! আমরা যে পত্র লিখিয়া থাকি, তাহার উত্তর পাই না কেন? আমি বলিলাম, আমি পড়িতে পারি, এজন্য তোমাদের পত্র পড়িয়া থাকি। আমি তো লিখিতে জানি না, সেজন্য উত্তর দেওয়া হয় না। তখন সে বলিল, মা! ও কথা আমি শুনি না, মায়ের পত্রের উত্তর না পাইলে কি বিদেশে থাকা যায়। পত্রের উত্তর দিতেই হইবে। এই বলিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, কালি সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়া সে কলিকাতায় পড়িতে চলিল। আমি বড় বিপদেই পড়িলাম, আমি মোটেই লিখিতে পারি না, কেমন করিয়াই বা লিখিব। আমি যে একটু একটু পড়িতে পারি, তাহা হাতে লিখিতে পারি না। তবে যদি অনেক চেষ্টায় দুই এক অক্ষর যেমন তেমন করিয়া লেখা যায়, সংসারের কাজের জন্য লিখিতে অবকাশ পাওয়া যায় না। ছেলেও বার বার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছে, উত্তর না দিলেই চলিবে না। আমি ভাবিতে

লাগিলাম কি করিব, এ কি দায়, আমার যে বিষম সংকট হইল।

"এই প্রকার ভাবিতেছি; ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস কর্তাটির সান্নিপাতিকের পীড়া হইয়া চক্ষের পীড়া হইয়া উঠিল। তখন ঐ চক্ষের চিকিৎসা করিতে কর্তাটি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলেন। সে সংগে আমাকেও যাইতে হইল। আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের বিষয়কর্মের স্থান কাঁঠালপোতা, আমাদের সেই বাসাতে থাকা হইল। সেই স্থানে আমাদিগের ছয় মাস থাকিতেও হইল। তখন বাটীর অপেক্ষা আমার কাজের অনেক লাঘব হইল। সেই অবকাশে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আমার হস্তগত হইল।

"আমার লেখাপড়া বড় সহজ কষ্টে হয় নাই, যাকে বলে কষ্ট। সে লেখাপড়ার কথা আমার মনে উদয় হইলে ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। আমাকে যেন পরমেশ্বর নিজ হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। নতুবা এমন অবস্থায় লেখাপড়া কোনমতে সম্ভবে না। যাহা হউক আমি যে এক আধটি অক্ষর শিখিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার পরম সৌভাগ্য। বোধ হয়, এরূপ একটু না জানিলে আমি তো সম্পূর্ণ পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। এ নিজস্ব পরমেশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি! তিনি আমার প্রতি এত দয়া করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। আর দিবারাত্র সম্পদে-বিপদে আমার সংগে সংগে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।"......

৩

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে এই স্মরণীয়া মহিলার স্বাভাবিক প্রতিভা এবং পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার পরিচয় কিয়ৎপরিমাণে মিলিবে। তিনি লেখাপড়া এমন সুন্দরভাবেই শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শিক্ষিতা ও বিদগ্ধা মহিলাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বাংলা গদ্যে ও পদ্যে তিনি লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "আমার

জীবন" বাংলা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে সরল প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাঁহার জীবন-কথা লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আরম্ভে রহিয়াছে স্বরচিত ভক্তিমূলক সুন্দর একটি কবিতা কিংবা সংগীত। কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত। "আমার জীবন" পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালে। এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি তৃতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত হইল।

এই পুণ্যবতী করুণাময়ী আদর্শ হিন্দু নারীর জন্ম ১২১৬ সালের চৈত্র মাসে। তিনি ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার আত্মচরিত "আমার জীবন" লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের ৬০ বৎসর পর্যন্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেনঃ—

"আমার জীবন-চরিত দ্বিতীয় ভাগ এই পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকিল। আমার জীবনান্ত হইলে আমার বংশের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি আমার শেষ ভাগ লিখিবেন।

"এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, লেখায় ঘৃণা করিও না। অধিক লেখা বাহুল্য।"......

তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সরলতা উদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধ রচনায় কতকগুলি উপাদান সংগ্রহের জন্য রাসসুন্দরীর পৌত্রী (কিশোরীলালের দুহিতা ও মহাত্মা শিশির-কুমারের ভাগিনেয়ী) বাংলা সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা-বালা সরকারের সহিত আমার পত্রালাপ হয়। তাঁহার পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"আমার ঠাকুরমা স্বর্গীয়া রাসসুন্দরীর জীবন এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই অতি আশ্চর্য, যাহা সাধারণের জীবনে সম্ভব হয় না। ইহার একমাত্র কারণ যে, জীবন্ত ভগবৎ-প্রেমে তাঁহার সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ ছিল।......

"১৩০৭ অথবা ১৩০৮ সালে কার্তিকের শেষে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার ৯১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, সেই সময়েও তিনি কর্মক্ষম ছিলেন। জ্যোৎস্নার আলোতেও তিনি তখন লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। তাঁহার চস্‌মার প্রয়োজন হয় নাই। সজ্ঞানে নবদ্বীপের গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগের সময় তাঁহার অনুমতি লইয়াই তাঁহাকে তীরস্থ করা হয় এবং অন্তর্জলির সময় গঙ্গায় নামানো হয়।"...

৪

"আমার জীবন"-এর ভূমিকা লিখিয়াছেন স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ভূমিকায় গ্রন্থ ও গ্রন্থ-রচয়িত্রীর যে সুন্দর পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভূমিকাই নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

"এ গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা; শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্সিলের দাগে গ্রন্থকলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুতঃ ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে, যে গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া না শেষ করিয়া থাকা যায় না।

"ইঁহার আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হয় ইনি একজন আদর্শ-রমণী। যেমন গৃহ-কর্মে নিপুণা, তেমনি ধর্মপ্রাণ ও ভগবদভক্ত। শৈশবে ইনি অতিশয় ভীরুস্বভাব ছিলেন। সেই সময়ে ইঁহার জননী, ইঁহার ভয় নিবারণার্থ ইঁহাকে একটি অভয় মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি, সেই অভয় মন্ত্রটি অক্ষয় কবচরূপে তাঁহাকে চিরজীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন,—ভয় হইলেই দয়ামাধবকে ডাকিও।' শোকে, তাপে, ভয়ে, বিপদে, এই মন্ত্রটিই তাঁহার সান্ত্বনা দান করিয়াছে। আজকাল "ধর্ম-শিক্ষা ধর্মশিক্ষা" করিয়া খুব একটা হৈ চৈ উঠিয়াছে; আসল কথা, মা শিশুর সুকুমার হৃদয়ে শৈশবে ধর্মের বীজ রোপণ করিলে যেরূপ সুফল হয়, পরে শত শত ধর্মগ্রন্থ পাঠেও তাহা হয় না। ইঁহার জীবনের আর

একটি বিশেষত্ব—লেখাপড়া শিখিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।

"লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার কালে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি আপনার যত্নে, বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপিপাসাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে উত্তেজিত করে। নভেল নাটক পড়িতে পারিবেন বলিয়া নহে—পুঁথি পড়িতে পারিবেন বলিয়া—"চৈতন্য ভাগবত" পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ।

"ইঁহার ধর্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্যবসিত নহে, ইঁহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের দেশে ঈশ্বরের নামে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঠিক পৌত্তলিকতা বলা যায় না; তাহা ঈশ্বরের স্মারক চিহ্ন মাত্র। তাহাতে পৌত্তলিকতার সংকীর্ণ ভাব নাই। খৃষ্টানেরা হিন্দুকে যেভাবে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, হিন্দুর পৌত্তলিকতা সে ভাবের নহে। লেখিকার জননী লেখিকাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতেই এই কথা প্রতিপন্ন হইবে।

"আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্বস্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন। সেই পরমেশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলে তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন; এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোকে যে পরমেশ্বর, পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদিকর্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

"ইহা হইতে উন্নততর ঈশ্বরের কল্পনা আর কি হইতে পারে? এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক; এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।"

৫

রাসসুন্দরী যখন নিরক্ষরা ছিলেন এবং "চৈতন্য ভাগবত" পুস্তক চোখেও দেখে নাই, তখন একদিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নাবস্থায় সেই গ্রন্থ পাঠ করেন এবং প

দিবস সেই বাঞ্ছিত গ্রন্থ "চৈতন্য ভাগবত" তাঁহার হস্তগত হইল। সেই কাহিনী তাঁহার আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

..."কেবল দিবারাত্রি পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখা-পড়া শিখাও, আমি নিতান্তই শিখিব। তুমি যদি না শিখাও, তবে আর কে শিখাইবে। এইরূপে মনে মনে সর্বদা বলিতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়।

"এক দিবস আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি—আমি যেন চৈতন্য ভাগবত পুস্তকখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছি। আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন আমার শরীর মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল! আমি জাগিয়াও চোক বুজিয়া বারবার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। এই প্রকার আহ্লাদে আমার শরীর মন পরিতুষ্ট হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য! এ চৈতন্য ভাগবত পুস্তক আমি কখন দেখি নাই এবং আমি ইহা চিনিও না, তথাপি স্বপ্নাবেশে সেই পুস্তক আমি পাঠ করিলাম। আমি মোটে কিছুই লিখিতে পড়িতে পারি না, তাহাতে ইহা ভারী পুস্তক। এ পুস্তক যে আমি পড়িব, ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমি যে স্বপ্নে এ পুস্তক পড়িলাম, ইহাতে আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমার জীবন সফল হইল। আমি পরমেশ্বরের নিকটে সমস্ত দিনই বলিয়া থাকি, আমাকে লেখা-পড়া শিখাও, পুঁথি পড়িব। সেইজন্য পরমেশ্বর লেখা-পড়া না শিখাইয়াই স্বপ্নে পুঁথি পড়িতে ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা আমার বড় আহ্লাদের বিষয়, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার জন্ম ধন্য, পরমেশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ভাবিয়া ভারী প্রফুল্লচিত্তে থাকিলাম।

"আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, শুনিয়াছি, এই বাটীতে অনেক পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্যভাগবত পুস্তকও থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু থাকা না থাকা আমার পক্ষে সমান কথা। আমি কিছু লেখা-পড়া জানি না, সুতরাং পুঁথি চিনিতেও পারিব না, এই ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! আমি কল্য স্বপ্নে যে পুস্তকখানি পড়িয়াছি, তুমি ঐ পুস্তকখানি আমাকে চিনাইয়া দাও। ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি আমাকে দিতেই হইবে, তুমি না দিলে আর কাহাকে বলিব। আমি এই প্রকার মনে মনে বলিতেছি, আর পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি।

"আহা কি আশ্চর্য! দয়াময়ের কি অপরূপ
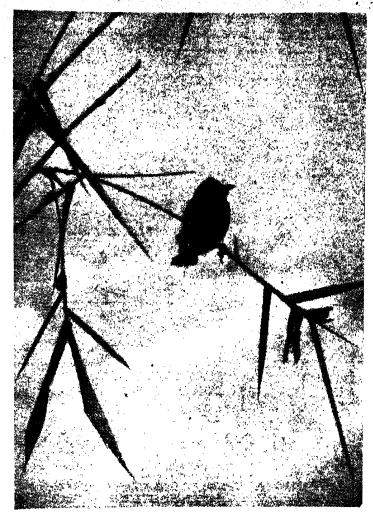
আশ্রয়-শাখা — আলোকচিত্রী শ্রীরেবন্ত ঘোষ

দয়ার প্রভাব! আমি যেমন মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম, অমনি তিনি শুনিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন আমার বড় ছেলেটি আট বৎসর বয়স্ক। আমি পাকের ঘরে পাক করিতেছি, ইতিমধ্যে কর্তা আসিয়া ঐ ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন! আমার চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি এখানে থাকিল, আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও এই বলিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি ওখানে রাখিয়া, তিনি বাহির বাটীতে গেলেন।

"আমি পাকের ঘরে থাকিয়া ঐ কথাটি শুনিলাম। তখন আমার মনে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বলা যায় না। আমি অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, সেই চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি বিদ্যমান। আমি ভারি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, পরমেশ্বর! তুমি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছ। এই বলিয়া আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। এখনকার পুস্তক সকল যে প্রকার, সেকালে এ প্রকার পুস্তক ছিল না। সে সকল পুস্তকে কাঠের আড়িয়া লাগান থাকিত। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র ছবি আঁকাইয়া রাখিত। আমিতো লিখিতে পড়িতে জানি না, কিরূপে ঐ পুস্তক চিনিব? আমি কেবল ঐ চিত্র পুত্তলিকা দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম।"

ভূতের অর্থাৎ ghost-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা রকমের মতামত আছে। কেহ কেহ উহার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন

না; আবার যাঁহারা ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। রাসসুন্দরী একদা দিবাভাগে যে ভূত দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই কাহিনী তাঁহার আত্মচরিত ("আমার জীবন") হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

প্রকাশ্য ভূত দৃষ্টি

"লোকে বলে ভূত নাই, ভূত আবার কেমন! আমিও তাহাই ভাবিতাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যথার্থই ভূত আছে। এক দিবস আমি বেলা প্রহর খানেকের সময় স্নান করিতে যাইতেছি। আমাদের বাটীর দক্ষিণ দিকে একটা বাগান আছে। সেই বাগানে প্রবীণ প্রবীণ তেঁতুল গাছ আছে। আমি স্নান করিতে যাইব, ইতিমধ্যে ঐ বাগানের মধ্যে গিয়া সেই তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছি। ঐ তেঁতুল গাছের সম্মুখে একটা বাবলা গাছ আছে; সেই গাছের একটা ডাল একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। সে স্থানে অধিক জঙ্গল নাই, দুই একটা ছোট ছোট গাছ আছে মাত্র। দিবাভাগে আমি যেমন ঐ গাছের দিকে তাকাইয়াছি, অমনি দেখিলাম, সেই গাছের হেলিয়া-পড়া ডালখানির উপরে একটা কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। সে কুকুরটাকে যেন ঠিক মানুষের মত দেখাইতেছে। ঐ গাছের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া কুকুরটার পেটটা রহিয়াছে। আর ঐ গাছের দুই দিকে কুকুরটার হাত-পাগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ঐ হাত-পায় বেশ রাঙ্গা শাঁখা ঝলমল করিতেছে। আমি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া, একদৃষ্টে ঐ কুকুরের পানে চাহিয়া রহিলাম। আর আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখিতেছি। গাছের উপরে কুকুর শুইয়া রহিয়াছে, ইহাইতো আশ্চর্য, আবার কুকুরের হাতে শাঁখা ঝলমল করিতেছে। কুকুরের হাতে শঙ্খ, এমন আশ্চর্য ব্যাপার কাহার কখনও দেখা দূরে থাকুক, কেহ শুনেও নাই। আমি ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত একদৃষ্টে সেই কুকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। কুকুরটা একভাবে রহিয়াছে, আমি বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। আর আমি মনের মধ্যে ভাবিতে লাগিলাম যে এমন আশ্চর্য কাণ্ডটা আমি একা দেখিলাম, অন্য কেহই দেখিল না। এই ভাবিয়া আমি একবার পিছের দিকে পলক খানেক ফিরিয়া চাহিয়াছি, অমনি ফিরিয়া দেখিলাম, আর কিছুই নাই। তখন আমি সেই গাছের নীচে যাইয়া পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, সে কুকুরটা ত নাই। সে সময়ে সে স্থানে সেটা ভিন্ন অন্য পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দিবাভাগে আমি বেশ স্পষ্টরূপে দেখিলাম, এত বড় কুকুরটা চক্ষের পলকে কোথা মিশাইয়া গেল, গাছের পাতাটাও নড়িল না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুই না দেখিয়া আমি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। সকলের নিকট ঐ কুকুরের বিবরণ সমুদয় বলিলাম। শুনিয়া কেহ বলিলেন সেটা ভূত, কেহ বলিলেন মিছা কথা, ধাঁদা দেখিয়াছ, কেহ বলিলেন এ কথা কখন মিথ্যা হইবেক না, সেটা ভূতই যথার্থ। এই প্রকার সকলে বলিতে লাগিল। যাহা হউক, আমি যাহা দেখিয়াছি, বাস্তবিক সেটা ভূত, তাহার সন্দেহ নাই।"

৬

মহীয়সী মহিলা রাসসুন্দরীর জীবনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা তাঁহার আত্মচরিত "আমার জীবন" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ—

স্বপ্ন-বিবরণ

"পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সমুদয় ভাবিয়া দেখিলে, বোধ হয়, যেন সকলি স্বপ্ন। বাস্তবিক স্বপ্নে লোকে নানাপ্রকার আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া থাকে। যখন জাগিয়া দেখে, তখন কিছুই নাই। সেইপ্রকার পৃথিবীতে যত কিছু দেখা যায়, দেখিতে দেখিতেই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলি স্বপ্ন-তুল্য বোধ হয়। তন্মধ্যে এই একটি কথা আছে, স্বপ্ন দুই প্রকার, জাগ্রত স্বপ্ন, আর নিদ্রিত স্বপ্ন। এক দিবস রাত্রিযোগে জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছেন, যে তাহার পুত্র নিমাঞীচাঁদ যেন মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশেই নিমাঞী নিমাঞী

বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ঐ স্বপ্নে তিনি যে প্রকার দেখিয়াছিলেন, বাস্তবিক সেই সমুদয় ঘটনা সত্য হইল।

"সূর্যবংশীয় রাজা দশরথসুত ভরত যখন তাঁহার মাতুলালয়ে ছিলেন, তখন রামচন্দ্র বনগমন করাতে রাজা দশরথ সেই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণও যান। বস্তুতঃ রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাম-লক্ষ্মণ সীতা তিনজনই বনবাসে গিয়াছেন। আর অযোধ্যার সকল লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। ভরত মাতুলালয়ে থাকিয়া নিদ্রাবেশে এই সকল স্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জাগিয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য! ভরতের স্বপ্নে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রাতে উঠিয়া শুনিলেন, সেই প্রকার সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

"একদা সেইরূপ আশ্চর্য একটি স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছিলাম। তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি! আমার ২১ বর্ষ বয়স্ক তৃতীয় পুত্র প্যারীলাল বহরমপুর কলেজে পড়িত। আমি বাটী আছি। আমার সেই ছেলেটি বহরমপুরে পড়িতে গিয়াছে। সে সেই স্থানেই আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস নিদ্রাবেশে আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, যেন আমার প্যারীলাল কাহিল হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, এককালে যেন আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, যেন আমিও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে পরে দেখিলাম, তাহার যেন মৃত্যু হইল। তখন তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। আমি যেন সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু আমার শরীর মন স্বপ্নাবেশেই ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ হইয়া পড়িল। আমি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে আবার দেখিলাম, যেন আমার প্যারীলালকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দাহ করিতে লাগিল। আমি যেন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আছি। অগ্নির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। তখন আমার প্রাণ কি পর্যন্ত যে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে যেন, আমি ঐ চিতার অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, কিন্তু তাহা পারিতেছি না। দাহনের পরে দেখিলাম, সকলে যেন চিতার সংস্কার করিয়া বাটীতে চলিয়া গেল। আমি যেন সেই স্থানে গঙ্গার চরের উপরে পড়িয়া প্যারীলাল! প্যারীলাল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি, আর কাঁদিতেছি।

"কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, একখানা ছোট নৌকা যেন গঙ্গার মধ্য দিয়া আসিতেছে। সে নৌকাখানার উপর ছৈ টৈ কিছু নাই। একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর একজন লোক ঐ নৌকাখানা বাহিয়া আসিতেছে; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে একবার তাকাইয়া দেখি, যেন, আমারি প্যারীলাল নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আছে! এতক্ষণ আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, আমার চক্ষের জলে সকল গা যেন কাদাময় হইয়া গিয়াছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যে পারে এতক্ষণ ছিলাম, এক্ষণে যেন সে পারে নাই, আমি যেন গঙ্গার ওপারে গিয়াছি। ঐ নৌকাখানাও যেন গঙ্গা পার হইয়া আসিতেছে। আমি ঐ নৌকার উপরে আমার প্যারীলালকে দেখিয়া কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা একমুখে বলা দুষ্কর। আমার শরীরে যেন কত বল হইল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, প্যারীলাল বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমি যেন পাগলিনীর প্রায় হইয়াছি। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ নৌকা আসিয়া কূলে লাগিল। তখন আমি আমার প্যারীলালকে দেখিয়া পূর্বের ঐ সকল কথা স্মরণ করিয়া কতপ্রকার খেদোক্তি করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার প্যারীলাল যেন আমাকে অত্যন্ত বিপদে পতিত দেখিয়া মহাদুঃখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি যেন সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে প্যারি আয় রে! বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু প্যারীলাল তাহাতে কোন উত্তর দিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে গঙ্গার চরের উপরে আমার নিকটে আসিয়া অতি মলিন বদনে মৃদুস্বরে বলিল, মা পুথী শুনিবেন? আমি আমার প্যারী-লালের মুখের কথা শুনিয়া এবং আমার প্যারী জীবিত আছে দেখিয়া যেন এক-কালে স্বর্গের চন্দ্র হাতে পাইলাম। ঐ স্বপ্নাবেশেই আমি মহা পুলকিত মনে উঠিয়া প্যারীলালকে কোলে ঝাপটিয়া ধরিয়া বলিলাম, কোথা পুথী হইতেছে,

চল, আমি শুনিব। প্যারীলাল বলিল, তবে আমার সংগে চলুন, এই বলিয়া প্যারীলাল আমার আগে আগে যাইতে লাগিল। আমি তাহার পাছে পাছে চলিলাম। এইপ্রকার যাইতে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে যেন একটা রাজার বাড়ী দেখা যাইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে যাইয়া সেই বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সে বাটীতে দেখিলাম, কত উত্তম উত্তম দালান ও কোঠা রহিয়াছে। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র দ্রব্য সকল ঝলমল করিতেছে। আর একটি সুদৃশ্য দালান দেখিলাম। সেই দালানটির মধ্যে উত্তম একখানি সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার চতুর্দিকে কত লোক যে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। বাস্তবিক সেটা যেন বিচারালয়, এইপ্রকার আমার বোধ হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, প্যারীলাল আমাকে একবার মাত্র বলিয়াছিল, মা পুথী শুনিবেন, আমার সংগে চলুন। এই কথাটি ভিন্ন আমাকে আর কিছুই বলে নাই। আমি প্যারীলালকে পাইয়া যেন কত হারান ধন পাইলাম। এই প্রকারে সংপরোনাস্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া প্যারীলালের সংগে সংগে চলিলাম। তখন প্যারীলাল আমাকে সেই আঙিগনাতে রাখিয়া, দালানের মধ্যে ঐ সিংহাসনের উপরে উঠিয়া বসিল। আমার পানে আর একবারও ফিরিয়া তাকাইল না। তখন আমি যেন সেই দালানের সম্মুখে আঙিগনাতে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি, আর প্যারীলাল আইস বলিয়া ডাকিতেছে। আমি যে স্থানে আঙিগনাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, সেই স্থান হইতে আমি প্যারীলালকে বেশ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি যে এত কাঁদিতেছি, আর এতপ্রকার খেদ করিতেছি, প্যারীলাল তাহাতে কিছুই উত্তর দিতেছে না।

"আমি এই প্রকার স্বপন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিলাম। আমি জাগিয়াও যেন নিদ্রাবেশে স্বপ্নে কাঁদিতেছি। জাগিয়াও আমার শরীরে যেন সেই প্রকার ভাব রহিয়াছে। ঐ স্বপ্নে আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, জাগিয়া দেখি যে, আমার চক্ষের জলে কাপড় এবং বিছানা সকল ভিজিয়া গিয়াছে। আর আমি মুখে কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার মনঃপ্রাণ এমনি অস্থির এবং ব্যাকুল হইয়াছে, যেন আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে। তখন আমি মনে মনে আমার মনকে কত প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, আমার মন কিছুতেই শান্ত হইল না। পরে আমি সেই তারিখটি লিখিয়া রাখিলাম।

"তখন আমার ঐ প্রকার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া বহরমপুরে লোক পাঠাইয়া সংবাদ আনীত হইল। আমি স্বপ্নে প্যারীলালের মৃত্যুর বিষয়টি যে প্রকার দেখিয়াছিলাম, অবিকল সেই প্রকার সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই দিবসে, সেই সময়ে, সেই প্রকার অবস্থায় আমার প্যারীলালের মৃত্যু হইয়াছে। কি আশ্চর্য! আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিয়া, কুস্বপ্ন বলিয়া যাহা মুখে বলিতে পারি নাই, বাস্তবিক তাহা প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া গিয়াছে।"

মনের অলৌকিকতা

"ওরে আমার মন! তুমি কি সত্যই আমার মন, আমার সর্বস্ব তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া একবার আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হই, আবার বিষাদে অঙ্গ জর্জর হইয়া যায়। তুমি কি আমার শত্রু কি মিত্র তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। মন! তুমি আমার মন মুখে বলি বটে, কিন্তু কর্মের দ্বারা দেখিতে পাই, তোমার অসীম শক্তি, তুমি পলকে এই পৃথিবী পর্যটন করিয়া আসিয়া থাক, তোমার সংগে অন্য কাহার তুলনা হয় না।

"বাস্তবিক আমাদের মন কি আশ্চর্য বস্তু! এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই দেখা যায় না। এক দিবস আমার মনের মধ্যে অতি আশ্চর্য একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেই ঘটনাটি বিশেষ করিয়া বলিতে হইল।

অন্তরে স্পষ্ট দর্শন

"ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামে আমাদের বাটী। আর ঐ জেলার মতালকে বেলেকান্দি থানা আছে। রামদিয়া হইতে বেলেকান্দি থানা প্রহরখানেকের পথ অন্তর। এক দিবস আমার বড় ছেলে বিপিনবিহারী কোন কার্যোপলক্ষে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই বেলেকান্দি থানায় গিয়াছে। আমি রামদিয়ায় বাটীতে আছি। আমি

আলোকচিত্রী শ্রী ডি সোনা

বালুকা-বেলায়

বাটীতে থাকিয়া দেখিতেছি। এ সকল স্বপন দেখিতেছি তাহা নহে, জাগিয়া আছি, রাত্রি হয় নাই। প্রাতঃকালে দণ্ড চারি বেলার সময়ে মনের মধ্যে দেখিলাম, যেন বিপিন ঐ বেলেকান্দির থানার নিকটে গিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যেন এককালে মূর্ছিতপ্রায় হইল। ইহা দেখিয়া গ্রামের নিকটবর্তী লোকেরা আসিয়া বিপিনকে ঘিরিল।

"বিপিনের ঐ বিপদ দেখিয়া বাল-বৃদ্ধ সকল লোক হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, আর কেহ বা বুকে সান, কেহ বা মুখে জল, কেহ বা বাতাস করিতে লাগিল। আমি বাটীতে এই সমুদয় ঘটনা বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে লাগিলাম, আমি এক একবার আমার মনকে ধমকাইয়া বলিতে লাগিলাম, ছি ছি মন! তুমি এমন অমঙ্গলের কথা বলিও না! বিপিন ঘোড়া হইতে পড়িবে কেন? আমার বিপিন ভালই আছে। আমার মনকে আমি নানা-প্রকারে বুঝাইতে লাগিলাম। মনকে বারণ করিয়াই বা কি হইতে পারে, শুধু মন ত বলিতেছে না, আমি মনের মধ্যে ঐ সকল ঘটনা যে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। কেবল মন কেন, লোকেও যেন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, আমিও সেই প্রকার সমুদয় ব্যাপার দেখিতেছি। সে স্থানে যত লোক রহিয়াছে, আমি আমার মনের মধ্যে সে সকলের সঙ্গেই বিপিনকে সেই অবস্থায় দেখিতেছি।

"এই প্রকার দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, কয়েকজন লোক বিপিনকে ধরিয়া থানার ভিতরে লইয়া গেল। ঐ থানার ভিতরে লইয়া একখানা কেদারার উপর বসাইল। বিপিন এমন কাতর হইয়াছে যে, সে কেদারাতে বসিতে পারিল না। তখন একটি ছোট ঘরের মধ্যে লইয়া শোয়াইয়া রাখিল। আমি দিবাভাগে বাটীতে সমুদয় সংসারের কাজ করিতেছি, আর আমার মনের মধ্যে এই প্রকার ঘটনাগুলো জাজ্জ্বল্যমান দেখিতেছি। এই সকল দেখিয়া অন্তঃকরণ ভারী ব্যাকুল হইল। তখন আমি আমার মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলাম। আজি আমার মন কেন এমন অমঙ্গলের কথা বলিতেছে। শুনিয়া কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন তোমার মন আজি কি বলিতেছে। তখন আমি বলিলাম, বিপিন যেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া অতিশয় কাতর হইয়াছে, আমার মনের মধ্যে আমি এই প্রকার দেখিতেছি। আমার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, তুমি মনের মধ্যে যাহা ভাবিতেছ, তাহাই দেখিতেছ, বিপিন কুশলে আছে, কোন চিন্তা নাই। ইঁহাদিগের এই সকল সান্ত্বনাবাক্যে আমার মন কোনমতে সান্ত্বনা মানিল না। পরে ক্রমে ক্রমে যত বেলা শেষ হইতে লাগিল, তত দেখিতে লাগিলাম, বিপিনকে যেন ঐ ঘোড়ার উপরে বসাইয়া দুই দিকে দুইজন লোক ধরিয়া রহিল, বিপিন ঘোড়ার উপরে বসিতে পারিল না। পরে দেখিলাম, একজন লোক পাল্কী খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু পাল্কী না পাইয়া একজন বলবান লোক বিপিনকে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতে লাগিল। আমি উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সকল পথ দেখিতে দেখিতে আইলাম। এই প্রকার আমি মনের মধ্যে দেখিতে লাগিলাম। এ রাত্রি নহে দিবস, স্বপ্নও নহে, আমি জাগিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছি।

"এই প্রকারে আমার মনে ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেটি শারীরিক কুশলে বাটীতে পোঁছিলেই বাঁচি। এই প্রকার দেখিতে দেখিতেই রাত্রি হইল। তখন আমি বিষণ্ণ-বদনে গৃহের দ্বারে বসিয়া রহিলাম। উহারা বাটীর নিকটে যখন আইল, উহা-দিগকে দেখিয়া কুক্কুরগুলো ডাকিয়া উঠিল। তখন পর্যন্ত আমি দেখিতেছি। পরে যখন বাহির বাটী হইতে বাটীর মধ্যে বিপিনকে কোলে করিয়া আনিল, তখন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। এমন কি ওসকল কথা আমার একবারেই বিস্মৃতি হইয়া গেল। আমি সমুদয় কথা ভুলিয়া গেলাম।

"ইতিমধ্যে ঐ লোক বিপিনকে পাথালি-কোলা করিয়া বাটীর মধ্যে আঙিনাতে আসিয়া বলিল, কোথায় রাখিব? তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, ও কি আনিল?

[ছে]লেদের সঙ্গে এক ছোঁড়া খানসামা গিয়া-[ছি]ল। সে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। [আ]মি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কিরে! [তো]রা কি আনিয়াছে? সে বলিল, মা [ঠা]কুরাণী! উহার কোলে বড়বাবু। আমি [ব]ললাম, বড়বাবু আবার কোলে উঠিয়াছে [কে]ন? আমাদের বড়বাবু ঘোড়ার উপর [হই]তে পড়িয়া মাজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। [ঘো]ড়াতে উঠিতে পারিলেন না, এবং পাল্কীও [পা]ওয়া গেল না, এজন্য তাঁকে সরদার কোলে [ক]রিয়া আনিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি [দে]খিতে গেলাম। ঘরে বিছানা করিয়াছিল, [বি]পিন দ্বার হইতে ছেছুড়ি দিয়া আসিয়া [শু]ইয়া পড়িল। তখন আমি গিয়া বিপিনের [নি]কটে বসিলাম। তখন অন্যান্য অনেক [লো]ক আসিল, এবং বাটীর সকলে মহাব্যস্ত [হ]ইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিপিনের সঙ্গে যত লোক ছিল, তাহারা [স]কলে বলিতে লাগিল, এবং বিপিন নিজেই [আ]দ্য অন্ত সকল কথা বলিল। সকলে শুনিয়া [ম]হা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথা সত্যই সফল হইয়াছে, বিপিনের মুখে শুনিয়া অবাক্ হইলাম। কি আশ্চর্য! আমি সকল দিবস মনের মধ্যে যে যে ঘটনা দেখিয়াছি, বিপিন প্রত্যক্ষে সে সমুদয় কথা বলিতেছে।

বিপিন যে প্রকারে ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়াছিল, যে প্রকারে ঐ গ্রামের লোক বিপিনের বিপদ দেখিয়া হাহাকার শব্দে চতুর্দিকে ঘিরিয়া সুস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, যে প্রকারে থানার ভিতরে লইয়া গিয়া এক ছোট ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার আমি যেরূপ দেখিয়া-ছিলাম, বিপিনও তাহাই বলিল। ফলতঃ আমি সমস্ত দিবস মনের মধ্যে যে সকল কাণ্ড দেখিয়াছিলাম, সেইপ্রকার সমুদয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, প্রত্যক্ষে শুনিলাম। এই ব্যাপার আমি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি, কি আশ্চর্য! এই কথাটি মনে ভাবিয়া আনন্দ-রসে আমার চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। আমার চক্ষের জল দেখিয়া সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ঐ সকল লোক মনে করিল, আমি ছেলের জন্য কাঁদিতেছি। বাস্তবিক সে কান্না আমার ছেলের জন্য নহে, পরমেশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া কাঁদিতেছি। রাত্রি নহে দিবস, স্বপ্ন নয় আমি জাগিয়া রহিয়াছি; তবে আমি কি প্রকারে বাটীতে থাকিয়া সকল ঘটনা জাজ্বল্যমান দেখিলাম; ইহার পর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে, পরে ছেলের কষ্ট দেখিয়া বিষাদে অঙ্গ জর্জর হইল। সে যাহা হউক, আমার মনের ভাব-গতিক দেখিয়া আপনি বিস্ময় মানিলাম।"

"আমি আর একটি আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়াছি। সে কথাটিও তবে বলি।

মৃত্যু-কল্পনা

"এই পৃথিবীতে যত লোক দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর নামে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। লোকে না বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর আশংকায় সর্বদা শংকিত থাকে। মৃত্যুতে যে কিছু-মাত্র ভয় নাই, আমি তাহা বিলক্ষণরূপে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। আমি তাহা এ জন্মে আর ভুলিব না।

"এক দিবস আমার জ্বর হইয়া নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িয়াছি। এমন কাহিল হইয়াছি যে, এককালে আমার যেন আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি একখান চৌকীর উপর শুইয়া রহিয়াছি। ইতিমধ্যে আমার এককালে শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, আমি খাটের উপর হইতে নীচে নামিয়া শুই। কিন্তু হাত পা এমন অবশ হইয়াছে যে, আমি কত প্রকার চেষ্টা পাইলাম, কোন মতে নাড়িতে পারিলাম না। আমি কিছুমাত্র অজ্ঞান হই নাই। আমার মনের মধ্যে সকল কথা জুটিতেছে, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার জিহ্বা এককালে অবশ। তখন আমার সকল ছেলেই প্রায় ছোট ছোট, কেবল দুটি ছেলে একটু বড়। সেই দুইটি ছেলে আমার দুই পাশে বসিয়া মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, আর কাঁদিতেছে। আমি অজ্ঞান হই নাই, একবার ভাবিতেছি, ছেলেরা কাঁদিতেছে, আমি উত্তর দিই না কেন? কিন্তু আমার জিহ্বা অবশ হইয়াছে, কথা কহিতে পারিলাম না। মনে মনে সকল কথাই বলিতেছি, কিন্তু কাজে কিছুই হইতেছে না। আমি দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে খাটের উপর শুইয়াছিলাম, চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, ঘরদ্বার সকল লালবর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার কিছুক্ষণ পরে আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সকলই একেবারে অন্ধকারময় হইল। তখন আমি চক্ষু বড় বড় করিয়া তাকাইলাম, সকলে গেল গেল বলিয়া আমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। ঐ সময়ে আমার কি প্রকার হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি সকল লোককে বেশ দেখিতে লাগিলাম। আমাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতেছে, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। আমার দুই চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা পর্যন্ত আমি দেখিতেছি। আমাকে যখন ঘর হইতে বাহিরে আনিল, তখন আমার মাথাটা উহাদিগের হাত হইতে ঝুলিয়া পড়িল। তখন সেই স্থানে আর একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সেই লোকটি তাড়াতাড়ি গিয়া দুই হাত দিয়া আমার মাথাটা ধরিল, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। পরে আমাকে লইয়া আঙ্গিনার মাটীতে শোয়াইল। কি আশ্চর্য! আমি আপনি মরিয়াছি, আবার আপনি কি প্রকারে সকল দেখিতেছি। তখন আমার চতুর্দিকে বেড়িয়া সকলে মহাশব্দ করিয়া কান্না আরম্ভ করিল। আমার বড় ছেলেটি আমার এক পাশে বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহাকে ধরিয়া তাহার পিসী কাঁদিতে লাগিল। আমার আর ছেলেগুলি কাঁদিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা ছোট ছোট, তাহাদিগকে লোকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে। বাটীর কর্তাটি ঘরের দ্বারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মোলো না কি, তবে যাক। আর ঐ আঙ্গনাপোরা লোক, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে। আমাকে ঐ আঙ্গিনাতে মাটীতে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। ঐ বাটীর গোমস্তা ঠাকুর হরিমোহর সিক্‌দার কখনও ঐ বাটীর মধ্যে আসতেন না, এবং আমিও তাহাকে দেখি নাই। সেই ঠাকুরটি তখন আমার এক পাশে বসিয়া একবার মাথায় হাত দিয় দেখিতেছেন, একবার বুকে হাত, একবা মুখে হাত দিয়া নাড়িতেছেন, আ কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হ হায় কি হইল, মা আমাদের ছে গেলেন। ঐ প্রকারে তিনিও কাঁদিতে-ছেন। আর কর্তাটি হরিমোহন বলিয়া এক একবার ডাকিতেছেন, আর তাহার চক্ষে দর দর করিয়া জল পড়িতেছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। কি আশ্চর্য! সকল ঘটনাই আমি দেখিতেছি, আর আমার নিজের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহাও আমি দেখিতেছি। আমার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তথাপি আমি এই সকল ব্যাপার স্পষ্ট দেখিতেছি। তখন জ্ঞান হইতেছে, যে আমি ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি, আমার জন্য সকলে এত কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু সেটি পারিতেছি না। কি জন্য যে পারিতেছি না, তাহাও বুঝিতে পারি না। এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ কাল গ হইল। বস্তুতঃ আমার যে কি হইয়া হ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

"অনন্তর আমার চৈতন্য হইল। তখন বোধ হইল, আমি যেন নিদ্রা হইতে জাগিলাম, আমার শরীর বেশ সবল হইল, আমি মুখেও কথা কহিতে পারিলাম, হাত-পাগুলাও বশ হইল। আমি দেখিলাম, মাটিতে শুইয়া আছি। তখন বলিলাম, আমাকে বাহিরে আনিয়াছ কেন? আমার মুখের কথা শুনিয়া এবং আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে ভারী গরম হইয়াছিল, এজন্য তোমাকে বাহিরে বাতাসে আন হইয়াছে; এই বলিয়া সকলে আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরে ঘরে লইয়া গেল। যে যাহা হউক, আমি আপনি মরিয়া আপনি এ প্রকার সমুদয় ঘটনা কেমন করিয়া দেখিলাম। কি আশ্চর্য! আমি আপনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি। বাস্তবিক আমার নিকটে এ বিষয়টি বড় আশ্চর্যজনক! কিন্তু লোকের নিকট বলিতে আমার কিছু লজ্জা বোধ হয়। কেহ পাছে মনে করেন, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, এ মিথ্যা কথা। বাস্তবিক আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি যাহা সত্য দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম।"

নৈষধচরিত

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

হাকাব্য নৈষধচরিত সম্বন্ধে বলিতে চাই। এই মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি শ্রীহর্ষ এক অদ্বিতীয় শক্তির অধিকারী, সাহিত্য ও সমগ্র দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার সমকক্ষ লোক জগতে অল্পই জন্মিয়াছেন। রাজসভায় বিচারার্থী হইয়া ইনি দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সভা হইতে জিজ্ঞাসা আসিল—কোন্ বিষয়ে আপনি পণ্ডিত?

শ্রীহর্ষ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

সাহিত্যে সুকুমার বস্তুনি দৃঢ় ন্যায়গ্রহ গ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশ কর্কশে ময়ি সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাহস্তু মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈ রাস্তৃতা
ভূমি র্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তুল্যা রতি র্যোষিতাম্।

অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয় কোমল। তর্কশাস্ত্র অতি কঠিন। সরস্বতী উভয় বিষয়েই আমাতে সমানভাবে বিলাস করেন। পতি মনোমত হইলে, বিছানা কোমল ও শুভ্র চাদরে ঢাকা হউক অথবা কুশসূচী কণ্টকিত হউক, রমণীরা সমান আনন্দই পায়।

অন্যত্র আশ্রয়দাতা রাজার বর্ণনায় ইনিই বলিয়াছিলেন—

গোবিন্দ নন্দনতয়াচ বপুঃশ্রিয়া চ
মাহস্মিন্নৃপে কুরুত কামধিয়ং তরুণ্যঃ।
অস্ত্রী করোতি জগতাং বিজয়ে স্মরঃ স্ত্রী
রস্ত্রী জনঃ পুনরনেন বিধীয়তে স্ত্রী॥

(হে যুবতীগণ, এই রাজা গোবিন্দের নন্দন এবং অনুপম শরীর-সৌন্দর্যের অধিকারী বলিয়া ইঁহাকে কাম বলিয়া ভুল করিও না। কারণ ইঁহাতে ও কামে পার্থক্য অত্যধিক। কাম জগৎ জয় করিতে স্ত্রীদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন; আর ইনি অস্ত্রধারী বিপক্ষ পুরুষদিগকে স্ত্রীলোক করিয়া ফেলেন। কাম—প্রদ্যুম্ন—গোবিন্দ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। রাজা জয়ন্ত (অথবা জয়চ্চন্দ্র) গোবিন্দ রাজার পৌত্র, এজন্য তাঁহার আনন্দবর্ধক।)

এই মহাকবি কাশ্মীরী, কান্যকুব্জদেশীয় অথবা বাঙালী, তাহা এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বাঙালী হইলেও ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বলিয়া ইঁহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা আমার নাই। সেঞ্চুরী (Century) চর্চা আমার অধিকারবহির্ভূত। তবে ইনি ১০—১১শ খ্রীষ্ট শতাব্দীর লোক হইতে পারেন।

আজকাল এদেশে কালিদাস-জয়ন্তী, মেঘদূত-জয়ন্তীর ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এই মহাকাব্য সম্যক্ পড়া থাকিলে নৈষধ-জয়ন্তী বা শ্রীহর্ষ-জয়ন্তীর উৎসবেও মাতামাতি চলিত। নৈষধ এতই উৎকৃষ্ট কাব্য।

দুঃখের বিষয়, মেঘদূত-জয়ন্তীকারীরা অনেকেই আসল মেঘদূতের অর্থ বোঝেন না। তাই ইঁহাদের উক্ত জয়ন্তী অনুষ্ঠান মেঘদূতের অপমান বলিয়াই মনে হয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে শ্রীহর্ষ-জয়ন্তী না হওয়া ভালই। প্রাচীন আলংকারিক ভামহ বলিয়াছেন—

ন তচ্ছাস্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন যন্ডবতি কাব্যাঙ্গ মহোভারো মহান্ কবেঃ॥

অর্থাৎ, এককথায় কবি জাগতিক সর্ব-বিদ্যার আশ্রয় হইবেন। মানস সৃষ্টিতে ত তিনিই দ্বিতীয় প্রজাপতি।

বর্তমান কাল বিজ্ঞানের যুগ। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, নৈষধ কাব্যে বিজ্ঞানের কথা কি পাই।

চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে কবিরা নানা কল্পনা করিয়াছেন। জ্যোতিষীদের মতে উহা কতকগুলি গর্ত মাত্র। এই তত্ত্ব শ্রীহর্ষের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

হৃতে সারমিবেন্দু মণ্ডলং দময়ন্তী বদনায় বেধসা
কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে ধৃতগম্ভীর খনী-খনীলিম॥

(চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে গর্ত আছে ঠিকই। তবে ঐ গর্ত স্বাভাবিক নয়; উহা বিধাতার নখের আঁচড়ে উৎপন্ন। আঁচড়াইবার উদ্দেশ্য দময়ন্তীর মুখের জন্য চন্দ্র হইতে সৌন্দর্য আকর্ষণ।) স্বাভাবিক বস্তুতে এই কারণ কল্পনাই কবির উৎপ্রেক্ষা।

বিজ্ঞানীর মতে, চন্দ্রের কিরণ স্বাভাবিক নয়, উহা সূর্য হইতে ধার করা। শ্রীহর্ষ একটি উপমায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

রথাদসৌ সারথিনা সনাথাদ্
রাজাহবতীর্যাশু পুরং বিবেশ।
নির্গম্য বিম্বাদিব ভানবীয়াৎ
সৌধাকরং মণ্ডল মংশুসঙ্ঘঃ॥
৬ষ্ঠ সর্গ, ৭ম শ্লোক

মেঘমণ্ডলে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছামত বৃষ্টি করা সম্ভব, এই নবাবিষ্কৃত তথ্য শ্রীহর্ষও জানিতেন—

বাতোর্মিদোলন চলদ্দল মণ্ডলাগ্র-
ভিন্নাভ্রমণ্ডল গলজ্জল জাতসেকঃ।
স্তম্বঃ কুশস্য ভবিতাহম্বর চুম্বিচূড়-
শ্চিত্রায় তত্র তব নেত্র নিপীয়মানঃ॥
৫৭।১১ সর্গ

এই শ্লোক হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীহর্ষের সময়ে বিমান অর্থাৎ আকাশে উড়িবার যান তৈয়ার হইত। ভোজদেবের সমরাঙ্গণসূত্রে উহার ফরমুলা পাওয়া গিয়াছে। কবি ইচ্ছা করিলে মেঘ ভাঙিতে ব্যোমযানের সাহায্য লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে কুশদ্বীপের অসাধারণ্য প্রকাশ পায় না। তাই ঐজন্য তিনি মেঘস্পর্শী কুশের কল্পনা করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। তিনি উহারও পথ দেখাইয়াছেন।

দেবগণ নলের রূপ ধারণ করিয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় চলিলেন। ভাষায় জন্য ধরা পড়িবার ভয়ে তাঁহারা সশঙ্ক। আসিয়া দেখিলেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজারা পরস্পর আলাপের জন্য সংস্কৃত ভাষার শরণাপন্ন হইয়াছেন। দেবতারা নিজের ভাষায় আলাপ করিয়া নির্ভয়ে দলে মিশিয়া গেলেন। তাই কবি বলিয়াছেন—

অন্যোন্য ভাষানববোধভীতেঃ
সংস্কৃত্রিমাভির্ব্যবহার বৎসু।
দিগ্ভ্যঃ সমেতেষু নৃপেষু তেষু
সৌবর্গ বর্গো ন জনৈরচিহ্নি॥
৩৪।১০ম সর্গ

নৈষধচরিত হইতে কবির জ্যোতিষ বিদ্যার সামান্য পরিচয় দিলাম। এইরূপ আরও অনেক পরিচয় খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। কবির অন্যান্য বস্তুবিদ্যাও বিপুল। রস সৃষ্টির যে অপূর্ব পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, নিপুণ পাঠকই তাহা বুঝিতে সমর্থ; অন্যকে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। সমস্ত দিক বিচার করিলে মনে হয়, মহাভারতের পরে সংস্কৃত ভাষায় নৈষধচরিতের মত নানাবিধ তথ্যসম্বলিত কাব্য আর রচিত হয় নাই।

কোন এক অলংকার গ্রন্থের টীকায় পড়িয়াছিলাম—কাশ্মীরে শতসর্গাত্মক নৈষধ-চরিতের পুঁথি আছে। উহা কাহার রচিত? এককালে কাশ্মীরে যাইয়া উহা অনুসন্ধান করিবার বাসনা বলবতী ছিল। এখন আর সে আশা নাই। ঐ সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলাম, তাহাও বিস্মৃত হইয়াছি। যদি কোন অনুসন্ধিৎসু উহা আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে একটি মহৎ কার্য সাধিত হইবে। ঐ শতসর্গ কাব্য নিশ্চয়ই এই শ্রীহর্ষের রচিত নহে। কারণ তিনি দ্বাবিংশ সর্গের শেষে গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন।

চলচ্চিত্রের রাজ্যে একটা কিছু সাফল্য লাভ করলে তাকে অনুসরণ করার যেমন হিড়িক পড়ে যায়, এমন আর কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এর অনেক রকমের দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরা যায়।

"পথের পাঁচালী" ছবিখানির পৌনে ষোল আনা অংশই মুক্তাকাশের নীচে প্রকৃতির কোলে বহির্দৃশ্যে তোলা। ছবিখানি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ফলে এখন যাঁরা ছবি তৈরী করতে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই ঐভাবে স্টুডিওর বাইরে অকৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে ছবি তোলায় ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু যে নিষ্ঠা, শিল্পবোধ এবং সর্বোপরি বিভূতিভূষণের রচনা-সঞ্জাত প্রেরণা "পথের পাঁচালী"-র চিত্ররূপদাতাদের সাফল্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে সেটা যে কোত্থেকে আসবে তা তাঁরা ভেবে দেখছেন না। ছবি বাইরে তুললেই "পথের পাঁচালী" হয়ে দাঁড়াবে এ ত বড় উদ্ভট ধারণা!

তেমনি উল্লেখ করা যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনকথা নিয়ে তোলা ছবির। "রানী রাসমণি" ছবিখানির সাফল্যের অনেকটা হেতু ছিল ওর মধ্যেকার রামকৃষ্ণের অংশ, যা ছবিখানির প্রায় সম্পূর্ণ শেষার্ধকে দখল করে রেখেছিল। এই দেখেই একদল প্রযোজকের ধারণা হয়েছে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ছবিতে দেখালেই তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এর পর "ঠাকুর রামকৃষ্ণ", "সারদামণি", "মহামানব" ইত্যাদি নাম নিয়ে খানকয়েক ছবি তোলা আরম্ভ হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী রামকৃষ্ণের চরিত্র রূপায়িত করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। একই লোকের জীবনকথা হলেও, ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও প্রকৃতির রামকৃষ্ণ দেখা দেবেন। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। তা ছাড়া রামকৃষ্ণ-জীবনী হলেই তা জনপ্রিয় হবে, তারই বা ঠিক কি? তা যদি হত তা হলে "রাসমণি"-তে যে দুজন রাসমণি ও রামকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করে সর্বজনের অকুণ্ঠ স্তুতি লাভ করেছিলেন, তারপর তাঁরা সেই দুজনেই মঞ্চে "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" পরিবেশন করে আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হলেন না কেন?

আগে "নতুন বৌ" নামে একখানি ছবি হয়েছিল। জনপ্রিয়তা অর্জন না করলেও, "বৌ" কথাটায় একটা আকর্ষণ বোধ করেছেন অনেক প্রযোজক, তাই ছবি হয়েছে "বড় বৌ" "মেজ বৌ", "ছোট বৌ", "কালো বৌ", "চাঁপাডাঙার বৌ" এবং শেষ পর্যন্ত "আমার বৌ"-ও।

ছবিখানির নাম ছিল "মরণের পরে"। বিজ্ঞাপনে ছবির নামটা বড় করে দিয়ে ছোট্ট অক্ষরে প্রশ্ন যোগ করে দেওয়া হল "—সবই কি শেষ?" পরেই "জ্যোতিষী" ছবিখানির প্রচারে দেখা গেল নামটির পাশে যোগ করে দেওয়া হয়েছে "পণ্ডিত না ৪২০?" যেই "চাঁপাডাঙার বৌ" অমনি সুর মিলিয়ে ঘোষিত হয়ে গেল "বাণীচকের রাধা"।

"মা ও ছেলে" ছবিখানির প্রচারে বুলি ছিল ৬৫জন তারকা সমন্বিত ছবি। "মা ও ছেলে" জনপ্রিয়তা অর্জন করতেই প্রযোজকের বোধহয় বিশ্বাস হল যে, অতজন তারকা থাকাতেই ছবিখানি সাফল্য অর্জন করেছে। তাই তিনি পরবর্তী ছবি "রাজপথ"-এর ক্ষেত্রে প্রচার করছেন ১০১জন তারকার সমন্বয় হয়েছে বলে।

আগে কলকাতার সাহেবী হোটেলগুলির বিজ্ঞাপনে থাকত, খানার সঙ্গে সঙ্গীত-নৃত্য পরিবেশনেরও ব্যবস্থা আছে। ওরই মধ্যে একটি হোটেল তার বিজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিত যে, ভাল খানাই শুধু তারা পরিবেশন করে, সঙ্গীত-নৃত্য নয়। ঠিক এই ধরনের মনোবৃত্তি কিন্তু চিত্রজগতে বিরল। এখানে একজন তাঁর ছবির ক্ষেত্রে যদি প্রচার করেন যে, দশজন তারকা তার ছবিতে রয়েছে, আর একজন জাহির করবেন

চারুচিত্রের প্রযোজনায় নির্মিত শরৎচন্দ্রের "পরেশ"-এর দুটি চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার

ত্রিশজন আছে বলে, অপর কেউ এর চেয়ে বেশী সংখ্যার নাম ঘোষণা করে বড়াই করবেন। "ঢুলি" শুধু গানের জন্যই সাফল্য লাভ করেছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ততোধিক সংগীতসম্ভারে ভরিয়ে ছবির পর ছবি হল, কিন্তু "ঢুলি" ছাড়া তাদের কারই বা নাম মনে আছে আজ? গান নেই একখানিও, এমন ছবি তৈরী হয়েছে, যেমন "মেজ বৌ"। কিন্তু গান ছাড়াও যে আবেগময় ছবি হয় সে-কথাটা ত কই প্রচারে বলে দিয়ে বৈশিষ্ট্য দাবি করার সাহস হল না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, গান না থাকাটা বোধহয় ছবির দুর্বলতার লক্ষণ বলে ধারণা করা হয়েছে।

আরও অনেক রকমের অনুসরণপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের কাহিনী হলেই তা নিয়ে জনপ্রিয় ছবি করা যায় এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় আজ এমন হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে কোনটারই ছবি হতে বাকি বিশেষ আর নেই। কোন কোন রচনার বার বার চিত্ররূপও তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন "দেবদাস", "পল্লীসমাজ", "বড়দিদি", "পণ্ডিতমশাই" ইত্যাদি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনা হওয়া সত্ত্বেও ছবি জনপ্রিয় হতে পারেনি, এমন দৃষ্টান্তেরও ত অভাব নেই। হালফিলে "পথের পাঁচালী" সাফল্য-লাভ করতেই বিভূতিভূষণের অন্যান্য রচনার উপরে অনেকের নজর পড়েছে। "আদর্শ হিন্দু হোটেল" আগেই মঞ্চে সাফল্য অর্জন করেছিল, এবারে তার চিত্ররূপ দানের উদ্যোগ হয়েছে। এর আবার ঠিক উলটো ব্যাপারও আছে। কোন নামকরা সাহিত্যসৃষ্টি ছবিতে হয়ত তেমন কিছু হয়ে উঠতে পারল না বলেই সেই লেখকের অন্যান্য রচনাও ছবি হবার যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়ে যায়।

অভিনয়শিল্পীদের নিয়েও অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই চলেন। উত্তমকুমার ও সুমিত্রা সেন একসঙ্গে অভিনয় করেছেন এমন ছবি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। একখানি নয়, এমন কয়েকখানি ছবিই পাওয়া যায়। ফলে চিত্রনির্মাতারা ধরেই নিয়েছেন যে, ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে নামাতে পারলে সে-ছবির সাফল্য অব্যর্থ। কিন্তু এমনও একেবারে দুর্লভ নয় যে, ওঁরা দুজনেই আছেন, কিন্তু সে-ছবি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আবার এও দেখা গিয়েছে, ওঁদের একজন কেউ রয়েছেন কোন ছবিতে, সে-ছবি জনপ্রিয় হয়েছে, বা একজন থাকতেও জনপ্রিয় হয়নি। নবাগতা কাবেরী বসু "রাইকমল"-য়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী ছবি "দেবী মালিনী" সে-সাফল্য অর্জন করতে পারল না। এমনও বহুবার দেখা গিয়েছে, নামকরা ও ক্ষমতাবান বহু শিল্পীকেই একই ছবিতে নামান হয়েছে, কিন্তু সে-ছবি মোটেই জমেনি, আবার তেমন নামকরা কোন শিল্পীই বা জনপ্রিয় শিল্পী না থাকতেও ছবি সাফল্যে ফেটে পড়েছে। "পথের পাঁচালী"ই তো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এম সি প্রডাকসন্সের "সাগরিকা"-তে জহর গাঙ্গুলী, যমুনা সিংহ ও সুচিত্রা সেন

এই যে একটার সাফল্যের অনুসরণ করে আরেকটিতে সেই রকম কিছু করতে যাওয়ার ঝোঁক এর দ্বারা এই সত্যই উদ্ঘাটিত হচ্ছে যে, চলচ্চিত্র জগতের কাছে সাফল্য অর্জনের মন্ত্রটা অনবগত; তাই এইভাবে হাতড়ে বেড়ান। অথবা যে-পরিমাণ জ্ঞান বিদ্যা, অভিজ্ঞতা থাকলে সাফল্যকে অর্জন করে নিয়ে আসা যায়, তা অধিকাংশ চিত্রনির্মাতার ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। আন্দাজের ওপরেই তাঁরা চলেছেন।

মুক্তাকাশের নীচে ছবি তুললেই সাফল্য অর্জন করা যায় না। একবার একজনের জীবনী সাফল্যমণ্ডিত চিত্র হতে পেরেছে বলেই বার বার তাঁর জীবন-চিত্র তুললেই সফল হওয়া যাবে এমন কোন মানে নেই। কোন জনপ্রিয় ছবির নাম অনুকরণ করে ছবি তুললেই সে-ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলা যায় না। অভিনয়শিল্পী বেশী থাকলেই সাফল্যের সম্ভাবনা পাকা হয়ে যায় না। গান থাকলেই ছবির জনপ্রিয়তা নির্ধারিত হয়ে যায় না। শরৎচন্দ্রের কাহিনী বা অন্য কারও অতি জনপ্রিয় রচনা হলেই জনপ্রিয়তা নিশ্চিত হয়ে ওঠে না। কিংবা খুব জনপ্রিয় তারকা ভূমিকাতে রাখতে পারলেই জন-প্রিয়তা অর্জন অবধারিত—এও খাঁটি কথা নয়। ছবির সাফল্যের পিছনে অনেক রকমের অনেক কারণই থাকে। কোন একটি বিশেষ কারণের জন্য, অথবা কোন কারও রচনা বলেই, কিংবা কোন বিশেষ শিল্পীর সমাবেশেই ছবির সাফল্য রচিত হয়ে যায় না। ছবিকে জনপ্রিয়তায় সফল করে তুলতে আর সবের চেয়ে দরকার প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং সাহিত্য ও শিল্প-চেতনা। এই হচ্ছে পরিচালকের হাতিয়ার। কারণ ছবির বাঁচা ও ডোবার জন্য দায়ী পরিচালকই। এই হাতিয়ার অবলম্বন করে পরিচালকের লক্ষ্য যদি থাকে মানুষের মনের নিবিড়ে পৌঁছবার দিকে তা হলেই সাফল্যের পথটার হদিশ পাওয়া যায়। আসলে বোধশক্তিটাই হচ্ছে বড় কথা। ভাল লোকের লেখা জনপ্রিয় রচনা হলেই সবকিছু পাওয়া গেল না, সে-রচনাকে ভালভাবে পরিবেশন করার বোধ থাকা দরকার।

এই সংখ্যার অলংকরণ করিয়াছেন শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ও সি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ-দস্তিদার, শ্রীচুনি দত্তগুপ্ত, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন বল, শ্রীবিমল দাস, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীরণেন আয়ন দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীশঙ্কর নন্দী ও শ্রীসমীর সরকার।

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর স্কেচ কয়খানি শ্রীইন্দুলেখা ঘোষ ও শ্রীঅজিত-কুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটস্থ আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুক্তি প্রতিক্ষায়
এ. ভি. এম. প্রোডাক্সন্স্
চুরী চুরী
ভূমিকায়
নার্গিস • রাজ কাপুর
জনি ওয়কার • প্রাণ
ডেভিড • রাজমেহ্‌রা
রাজা সুলোচনা •
সঙ্গীত
শঙ্কর জয়কিষন
সংলাপ
আগা জনি কাশ্মিরী
গীতি রচনা :—
হজরত্ ও শৈলেন্দ্র
পরিচালনা
অনন্ত ঠাকুর
AVM
বসন্ত পিকচার্স :—
হাতিমতাই
পরিচালনা
হমি ওয়াদিয়া
পূর্ণ
রঙ্গিন চিত্র
ভূমিকায়
সাকিলা • জয় রাজ
শেখ.
প্রকাশ পিকচার্স
পাটরাণী
পরিচালনা
বিজয় ভট
সঙ্গীত
শঙ্কর ও জয়কিষন
ভূমিকায় :—
প্রদীপ কুমার • বৈজয়ন্তিমালা
ওম প্রকাশ • জীবন
পরিবেশক বিলমোরিয়া এণ্ড লালজী
১১. এ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট. কলিকাতা . ফো: ২৩-১৫৭২

শ্রীশ্রীদুর্গা

(ওড়িশার প্রাচীন পট)

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

শারদীয়া

আনন্দবাজার পত্রিকা

মহালয়া ১৩৬৩

মাতৃপূজা

বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। দেখিয়াছ কি মায়ের রূপ? দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণী আমাদের জননী। তিনি সিংহ-বাহিনী। তাঁহার দক্ষিণে সর্বসৌভাগ্যময়ী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী। তাঁহার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্তিকেয়। মহিষমর্দিনী মায়ের এমন মূর্তি কোথায় ছিল, কে আনিল? বস্তুত মাতৃরূপের এমন প্রকাশ এবং বিলাসের মূলে তাঁহার মাধুর্য-বীর্যই রহিয়াছে। সর্বদেবময়ী দেবী—এই রূপই দেবতারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ঋষিগণ সর্বযজ্ঞ বিধানে মায়ের এই রূপ সন্দর্শনেরই কামনা করেন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীস্বরূপে মায়ের খেলা। সেই খেলাই প্রেমমাধুর্যে মিলিয়া মিশিয়া বাঙালীর অঙ্গনে এই রূপের মেলা। বেদপ্রতিপাদ্য সর্বসাধ্যশিরোমণি জননী উমা—হৈমবতীস্বরূপে বাঙালীর ঘরে ধরা দিয়াছেন। একাধারে মা ও মেয়ে হইয়া আসিয়াছেন।

মহাশক্তিরূপিণী যে মায়ের অঙ্গুলিচালনে, যাঁহার অপাঙ্গ ঈক্ষণে, যে দেবীর ভ্রূভঙ্গ-লীলায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংসাধিত হইতেছে, তিনিই আজ বাঙালীর ঘরে আসিতেছেন। তিনিই আমাদের আদর চাহিতেছেন। সন্তানের সেবাতেই জননীর সেবা। এস আমরা সকলে মিলিয়া এক হই, এক হইয়া সেই সেবায় নিজদিগকে উৎসর্গ করি। এস এই সঙ্কল্প করি যে, আমরা মায়ের দুঃখ দূর করিব। মায়ের সন্তানদিগকে আমরা ভালবাসিব। মাতৃপূজার মঙ্গল-শঙ্খ দিকে দিকে বাজিয়া উঠুক। আমাদের মাতৃপূজা সার্থকতা লাভ করুক।

বাউলদের মহোৎসব। অনেক সময়ে দেখেছি, লোকে বাউল-বোষ্টম একই অর্থে ব্যবহার করেন। বাউল-বোষ্টম উভয়ের কিছু কিছু অনুষ্ঠান এক হলেও তার অর্থ একেবারে ভিন্ন। বাউলদের কৃপাতেই তা জেনেছি।

বোষ্টমদেরও গান কীর্তন রয়েছে, বাউলদেরও আছে। কিন্তু উভয়েরই আখরগত এত প্রভেদ যে, তাদের মর্ম বুঝতে একটুও মুশকিল হয় না। তবে কোনো কোনো বাউলগানে যথেষ্ট বৈষ্ণব প্রভাব দেখতে পাই। আর কোনো কোনো বৈষ্ণব গানেও বাউল ভাব দীপ্যমান। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণব ভাবের মহাগ্রন্থ হলেও তাতে প্রচুর বাউল ভাবও দেখা যায়।

সাধারণত যেসব গানে বাচ্যার্থ হতে ব্যঙ্গার্থ বেশী, তাকেই অনেকে বাউল মনে করেন। আর বাচ্যার্থ বেশী হলে তাকে বলেন বৈষ্ণব পদ। কিন্তু তা ছাড়াও বাউলদের নিজস্ব এমন পরিচয় আছে, যা দেখলে বাউল বোষ্টম ভেদ বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না।

বলরাম দাস একজন বৈষ্ণব পদ-রচয়িতা। কিন্তু তাঁর মর্মস্থল বাউল ভাবে পূর্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করলেও তিনি সর্বত্র বৈষ্ণব পদ্ধতি অর্থাৎ নখশিখ বর্ণনা করেননি। তাই তাঁর একটি বিখ্যাত পদ—

আমার হিয়ার ভিতর হইতে
(এরে) কে কৈল বাহির
তাই বলরাম-চিত কভু নহে স্থির।

এতে নখশিখ বর্ণনা একেবারেই নেই। এই পদটি একেবারে বাউল ভাবে ভরপুর। অনুকূল ভাব দেখে বাউলরা এই পদের মধ্যে এমন আখর দিয়েছেন যে, পদটি একেবারে বাউলদের নিজস্ব হয়ে গেছে। যথা—

যুগে যুগে হেরেছি এই রূপ
হেরেছি জনমে জনমে
আমার অন্তরে অন্তরে এই রূপ

এই আখরের পর যে-আখর আসছে তা আরো চমৎকার। যথা—

যখন অন্তরে আছিল এই রূপ
ছিল নয়ন পিয়াসী
এখন নয়ন পেয়েছে এই রূপ
এখন অন্তর উদাসী।

এতেও কুলোল না, তারপরেও দেখছি আরো ঘনীভূত বাউল ভাব।—

বাহিরে অন্তরে কাঁদে
অন্তরে বাহির
তাই বলরাম-চিত
কভু নহে স্থির।

এবার আখরগুলো নিয়ে দেখা গেল একেবারে পরিপূর্ণ বাউলিয়া পদ।

বাউলদের বিষয়ে পূর্বে আমার কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। আর থাকলেও কাশীর মত শহরে তা পাওয়ার উপায় কী হতে পারে তা জানা ছিল না। কাশীতে নিতাই বলে একজন ভক্তের পরিচয় পেলাম। পক্ষাঘাত রোগে তার দুই পা অক্ষম ছিল। কিন্তু অপূর্ব তাঁর কণ্ঠের সুর।

দেশে থাকতে তাঁর জমিদার তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন। তারপর যখন তিনি পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়লেন তখন জমিদারই তাঁকে পথ বাতলে দিলেন।

জমিদারের তরফ থেকে কাশীতে নিত্য সেবাব্রতের অনুষ্ঠান চলত। যারা অসহায় তাদের বঞ্চিত করে জন কয়েক শক্ত লোক সেই অর্থ লুটেপুটে খেত। জমিদার নিতাইকে ডেকে বললেন, "ভাই, তুমি আমার জমিদারির মানুষ। দুঃখের দিনে আমার কাছে তোমার দাবি চলতে পারে। তোমরা ত ঠাকুর-ঠোকর মান না। তবে তুমি যদি কাশীতে আমাদের নিত্যসেবার একটু খোঁজখবর কর, তাহলে সত্যিকার কয়েকজন অক্ষম অসহায় লোকের অন্নচিন্তা দূর হয়। আর তুমি নিজে প্রসাদ মনে না করলেও নিত্য চারটি অন্ন সেখানে পেতে পার।"

নিতাই বললেন, "প্রসাদ আমি মানব না কেন? ভগবান নিত্য যে অন্ন আমাদের পাঠিয়ে দেন তা সবই ত প্রসাদ।"

চারটি অন্ন ঠাকুরবাড়ি হতে পান। রাত্রে অন্নের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তবে তাঁর কণ্ঠের গান শুনে কেউ যদি রাত্রে চারটি অন্ন দিতেন সে-কথা স্বতন্ত্র।

আমার মা একদিন নিতাইয়ের গান শুনে বললেন, "বাবা, আমাকে নিত্য একটি-দুটি গান শুনিও, তোমার রাত্রের অন্নের ব্যবস্থা এখানেই রইল।"

নিতাইয়ের সঙ্গে আমার সেই সূত্রে আলাপ। বাউলদের বিষয়ে আমার আদি গুরু তিনিই।

নিতাইয়ের নির্দেশে আমি বাংলা দেশে অনেক জায়গায় এমন সব বাউল দেখেছি যাদের মর্ম আমার জানবার আর কোনো উপায় ছিল না। সেই সব কথা আজ থাক। তবে আমি নিতাইয়ের কাছে এমন কতগুলো জায়গার সন্ধান পেলাম, যেখানে বাউলদের বিশেষ বিশেষ সময়ে যাওয়া-আসা চলত। তেমন একটি স্থান বীরভূমে কেন্দুলী বা কেন্দুবিল্ব।

সে-সময়ে সত্যিই কেন্দুলীতে ভাল ভাল সমর্থ সাধকদের আসা-যাওয়া ছিল। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটল। তাঁর নাম নিত্যানন্দ দাস। চেতলা গ্রামের ফণীমোহন তাঁর গুরু।

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে ১লা মাঘ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কেন্দুলী যেতাম। শান্তিনিকেতনে যখন এলাম, তখন কেন্দুলী যাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল। তার পূর্বে কাশী থেকে যেতে হলে পাণ্ডবেশ্বরে নামতে হত। এইভাবে কয়েক বছর গেল।

১৯০৮ সনে গ্রীষ্মের ছুটির পর শান্তি-নিকেতনের কাজে যোগ দিলাম। ১৯০৯ সনে কেন্দুলী হয়ে এলাম। নিত্যানন্দ দাসের মারফতে তখন সেখানকার মোহন্ত আমাকে বেশ যত্ন খাতির করতেন। দুইদিন কেন্দুলী যাতায়াতে কাটিয়ে শান্তি-নিকেতনে ফিরলাম। সবাই চেপে ধরলেন, "ঠাকুরদা, এই দুই দিন কোথায় কাটিয়ে এলেন?" আশ্রমে সকলে আমাকে ঠাকুরদা বলেই ডাকতেন।

… ঠাকুরের

পিতা দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের গরুর গাড়ি-বোঝাই-গান-লেখেওয়ালা আত্মবন্দির কাছে কেন্দুলীর খবর পেলেন।

১৯১০।১১ সন। কেন্দুলী যাবার ব্যবস্থা করেছি। রাত্রে খেয়ে গাড়িতে উঠব, দুইদিন কেন্দুলীতে কাটিয়ে রাতারাতি শান্তিনিকেতনে ফিরব। রাত্রে রওনা হলাম। ভোর সময়ে কেন্দুলীর কাছাকাছি পায়ের গ্রামে ভোর হয়েছে দেখে গরুর গাড়ি থামাতে বললাম। দাঁতন হাতে করে গাড়ি হতে নামলাম। নামতে গিয়ে দেখি আমার গাড়ির পিছনে আরো কয়েকখানা গরুর গাড়ি। তাতে সব শান্তিনিকেতনের বন্ধুরা আসছেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেপালচন্দ্র রায়, অন্নদাবাবু, অজিত চক্রবর্তী, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল প্রভৃতি সব বন্ধুর দল। তাঁদের মধ্যে এক অন্নদাবাবু ও কাশীনাথ দেবল ছাড়া সবাই এখন পরলোকে। যথাকালে দলবলসহ কেন্দুলীতে গেলাম। মোহন্ত আমার জন্য যে ঘরটুকু রেখেছিলেন সেটুকুর পরিবর্তে একটু বড় জায়গা দিলেন। কিন্তু সর্ত রইল তাঁর আতিথ্য নিতে হবে। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে মাথায় তেল দিয়ে অজয় নদে স্নান করতে বের হওয়া গেল। পথে দেখলাম বাবা নিত্যানন্দ দাসের বাউলিয়া মহোৎসবের গান চলেছে। আমার দলকে বললাম, "চলুন ওদিক দিয়ে যাই।"

রাত্রিতে গোযানে ভাল ঘুম হয়নি, তাই সবাই অগত্যা রাজী হয়ে চললেন আমার সঙ্গে। গান চলেছে—

জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমে ভিখারী
দ্বারে দ্বারে মাগ প্রেম নয়নেতে বারি।

গানের আরম্ভ শুনেই সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা শহরের লোক, ভাল ভাল ধর্মসংগীত জানেন। তবে এমন সাহসের সঙ্গে ভগবানকে সম্বোধন করায় ওঁরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। ক্রমে গান এগোতে লাগল।

কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড
কোথায় সিংহাসন।
(আজ) দেখি কাঙ্গালের সবার মাঝে
পেতেছ আসন॥

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

(আজ) কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড ধুলাতে লুটিয়ে
(দেখি) পাতকীর চরণরেণু লোটে তোমার পায়ে।

বন্ধুর দল বিস্ময়ে বোবা বনে গেলেন।

পরের দিন বাউলদের যে মহোৎসব হল, তার গান আরো চমৎকার। তার ভাবটা এই যে, প্রভু আজ সবার অলক্ষ্যে অন্নোৎসবে দীনদুঃখী ভক্তদের সঙ্গে খেতে বসেছেন।

প্রতি দুই জন ভুক্ত
মধ্যে ভুক্ত তুমি।
তবে তো উৎসব হবে,
এ ভোজন-ভূমি॥

আর মধ্যে মধ্যে আরো বিস্ময়ের কথা।

পঞ্চামৃত রস,
দেখহ প্রভুর করুণা।
প্রভু কৃপা মূর্তিমান,
প্রতি অন্নকণা
সবে নমস্কার করি।

পরদিন সন্ধ্যায় নিত্যানন্দ দাসের কাছে গিয়ে বললাম, "বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও।" তিনি বুঝলেন। বললেম, "কালকের উৎসবের পর সবাই ক্লান্ত। দেখি তাজা কণ্ঠের গান শোনাতে পারি কিনা।"

পাওয়া গেল। একটি যুবক বাউল সেদিনই এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে বলতে

কাঁটা-ফুল

শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

[illegible] বললেন যে, [illegible] এতেবারে [illegible] বললেন, "বাবা হরিদাস, তুমি গলা দিয়ে ত হাঁটি নাই। গান গাইলেই হবে, নাচবার দরকার নেই।"

তাঁকে গাইতে হল। কয়েকটি গানের পর কে একজন বললে, "বাবা, শুধু গলা কেন, সকলে অঙ্গ দিয়ে গান কর না।" বাউল হরিদাস কখন যে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ধরেছেন তা ধরতেই পারলাম না।

বাউল হরিদাস তৃষ্ণার্ত হয়ে একটু জল চাইলেন। গরম জল দেওয়া হল, চা নয়। তখন বিস্ময়ে মুগ্ধ নেপালবাবু হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার গানগুলো ত পাকারঙের, তবে আলখাল্লাটা গেরুয়া করনি কেন? এটা কেন সাদা রইল।"

হরিদাস জল খাওয়া ভুলে গেলেন। উঠে নৃত্যের সঙ্গে গাইতে লাগলেন—

ভিতরে রস না হইলে কি
বাইরে কি রে রং ধরে?
[illegible] কি [illegible]
বাইরে তাকে রং করে।

এমন চমৎকার জবাব পেয়েও নেপালবাবু তখনই আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার গুরু কে?"

বাউল গাইলেন—

গুরু বলে কারে
প্রণাম করবি মন
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু
গুরু অগণন
গুরু যে তোর বরণ-ডালা
গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা
যে ঝরায় দুনয়ন।

শান্তিনিকেতনের দলের আর-একজন প্রশ্ন করলেন, "কবে তোমার দীক্ষা হয়েছে?"

এর জবাবে হরিদাস আবার গান ধরলেন,—

যেদিন জনম সেদিন আমি
দীক্ষা পেয়েছি।
[illegible]
[illegible] পেয়েছি।
[illegible] চলে না যে
একটি প্রাণের [illegible]।
এই কথাতে [illegible]
[illegible]
(আর) [illegible] পেয়েছি [illegible] পেয়েছি
পরান পেয়েছি।
[illegible] সাথে সাথে [illegible]
শিক্ষা [illegible]।

এর পর আমাদের আর বলবার কী থাকতে পারে? একজন প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের সাধন ভজন কীরকম?" তখনই হরিদাস গান ধরলেন,—

ওরে কাজলে আর [illegible] কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিলল খ্যাপা
(তবে তারে) সাধন ভজন ক'দিন রাখে।

উৎসব হয়ে গেল, কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি আজো আমার অন্তরের মধ্যে পরম দীপ্ত এবং পরম তৃপ্তিতে জাগ্রত রয়েছে।

দুই আর দুই — শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

বটেশ্বরের অবদান

পরশুরাম

বটেশ্বর সিকদার একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অর্থাৎ পেশাদার লেখক। যাঁদের লেখা ছাড়া অন্য কর্ম নেই তাঁদের প্রায় অর্থাভাব দেখা যায়, কিন্তু বটেশ্বর ধনী লোক। এই ব্যতিক্রমের কারণ—তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, শুধু বড় বড় উপন্যাস লেখেন; দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের মতন ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে প্রতিভার অপচয় করেন না। তাঁর কোনও উপন্যাস সাত শ পৃষ্ঠার কম নয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বুভুক্ষু পাঠক-পাঠিকারা তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন এবং পরবর্তী রচনার জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করেন। সম্প্রতি তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালবেলা বটেশ্বর তাঁর সাধনকক্ষে বসে লিখছেন এবং মাঝে মাঝে একটি বড় টিপট থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় একটি অচেনা যুবক ঘরে এসে তাঁকে নমস্কার করে বলল, আমার নাম প্রিয়ব্রত রায়, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন কি?

আগন্তুকের বয়স প্রায় ত্রিশ, সুশ্রী চেহারা, সজ্জায় দারিদ্র্যের লক্ষণ নেই, পারিপাট্যও নেই। বটেশ্বর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বস। নতুন পত্রিকা বার করছ, তার জন্যে আমার লেখা চাও, এই তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কল্পতরু নই, যে চাইবে তাকেই লেখা দিতে পারি না। একটা আশীর্বাণী যদি চাও তো দিতে পারি, দশ টাকা লাগবে।

প্রিয়ব্রত বলল, আজ্ঞে, লেখার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি নি, শুধু একটি কথা জানতে এসেছি। 'প্রগামিনী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে আপনার যে গল্পটি বার হচ্ছে তা শেষ হতে আর ক মাস লাগবে দয়া করে বলবেন কি?

—আরও ছ-সাত মাস লাগবে। কেন বল তো? কেমন লাগছে লেখাটা?

—অতি চমৎকার, সব চরিত্র যেন জীবন্ত। বড় কৌতূহল হচ্ছে তাই জানতে এসেছি—গল্পের নায়িকা ওই অলকা মেয়েটি যে টি-বি স্যানিটোরিয়মে আছে, সে সেরে উঠবে তো?

প্রিয়ব্রতর আগ্রহ দেখে বটেশ্বর খুশী হলেন। একটু হেসে বললেন, তা তোমাকে বলব কেন? প্লট আগেই ফাঁস করে দিলে রচনার রসভঙ্গ হয়।

হাত জোড় করে প্রিয়ব্রত বলল, সার, দয়া করে অলকাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

—তোমার তো বড় অদ্ভুত আবদার হে! গল্পের নায়িকার জন্যে এত ভাবনা কেন? লোকে মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই চায়, তোমার ফরমাশ মতন আমি লিখতে পারি না। মিলনান্ত চাও তো আমার 'কাড়াকাড়ি', 'জেঠামা' এই সব পড়তে পার।

প্রিয়ব্রত করুণ স্বরে বলল, দয়া করুন সার।

—তুমি একটি আস্ত পাগল। এখন যাও, আমার ঢের কাজ। অলকার জন্যে মাথা খারাপ না করে নিজের চিকিৎসা করাও গে, নিশ্চয় তোমার মনের রোগ আছে।

প্রিয়ব্রত বিষণ্ণমুখে মাথা নিচু করে [illegible] আস্তে ঘর থেকে চলে গেল।

রাত সাড়ে নটার সময় বটেশ্বর খেতে যাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার ধরে বললেন, কাকে চান? ...হাঁ, আমিই বটেশ্বর। আপনি কে?

উত্তর এল—নমস্কার। আমি ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে, আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকার আছে। কাল সকালে আটটার সময় যদি যাই আপনার অসুবিধা হবে না তো?

বটেশ্বর বললেন, না না, আপনি আসতে পারেন। কি দরকার বলুন তো?

—সাক্ষাতেই সব বলব সার। আচ্ছা, নমস্কার।

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যের নাম বটেশ্বর শুনেছেন। [illegible]

[illegible] বয়স বেশী নয়, খুব [illegible]

[illegible] ডাক্তার এসে বললেন, গুড [illegible] আমি নষ্ট করব না, দশ মিনিটের [illegible]। [illegible] কি আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা! [illegible] কে থাকে কে যায় [illegible] যে [illegible] [illegible], দেশ সুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে গেছে! [illegible] [illegible]কের বনফুল প্রবোধ সান্যাল সবাইকে [illegible] [illegible] মশাই।

[illegible] [illegible] বললেন, আপনার তো খুব প্র্যাকটিস [illegible], আমার লেখা পড়বার সময় পান কি করে?

—[illegible] [illegible] নিতে হয় স্যর, না পড়লে যে চলে না। [illegible] এই গল্পটির কথা শুনি, আমাদের মেডিক্যাল ক্লাবে [illegible]। সেদিন একটি বৃদ্ধ লোকের হার্নিয়া অপারেশন করছি, অ্যানিসথেটিকের ঝোঁকে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—কি খাসা মেয়ে অলকা, জিতা রহো অলকা!। আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুর দল তো আপনার অলকার জন্যে খেপে উঠেছে। ধন্য আপনি। সকলেই বলে, এখনকার সাহিত্যসম্রাট হচ্ছেন বটেশ্বর সিকদার, তাঁর কাছে দামোদর মুলকর গল্প-সরস্বতী দাঁড়াতেই পারেন না। এখন আমার নিবেদনটি জানাই। আমার বন্ধুবর্গের তরফ থেকে অনুরোধ করতে এসেছি—অলকা মেয়েটিকে চটপট সারিয়ে দিন, সবাই তার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্যানিটোরিয়ম থেকে বেশ সুস্থ করে ফিরিয়ে আনুন। একবার খুবো কিওর চাই, বুঝলেন? তার স্বামী হেমন্তর অবস্থা তো বেশ ভালই, অলকাকে নিয়ে সে সিমলা কি উটকামণ্ড চলে যাক, সেখানে তিনটি মাস কাটিয়ে বেশ মোটাসোটা করে ঘরে নিয়ে আসুক।

—বটেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, তা তো হবার জো নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি, আমার এই রচনাটি যে ট্রাজেডি। অলকা বাঁচবে না।

—বলেন কি মশাই, আলবত বাঁচবে। আধুনিক চিকিৎসায় টি-বি রোগী শতকরা নব্বুইজন সেরে ওঠে। অলকার ভাল ট্রিটমেন্ট করান, পি-এ-এস, আইসোনায়াজাইড, স্ট্রেপ্টো-মাইসিন এই সব ওষুধ দিন। বলেন তো আমার বন্ধু ডাক্তার বড়ালের সঙ্গে একটা কনসলটেশনের ব্যবস্থা করি।

বটেশ্বর বিব্রত হয়ে পড়লেন। কাল এক পাগল এসে-ছিল, আজ আর এক বড় পাগলের কবলে তিনি পড়েছেন। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার গুণগ্রাহী লোক, এঁকে ধমক দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়া চলে না। এঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর নিরর্থক উপদেশ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বটেশ্বর মনে করলেন, গল্পের পরিণামটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, অলকা সত্যিকারের মানুষ নয়, আমার উপন্যাসের নায়িকা। তাকে বাঁচালে আমার প্লটটি মাটি হবে। অলকা মরবে, তার দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে, ওই যে মেয়েটি পাঁচটি বৎসর হেমন্তর জন্য প্রতীক্ষা করেছে।

টেবিলে কিল মেরে সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, অ্যাবসর্ড, তা হতেই পারে না। অলকার স্বামী হল তার হকের ধন, অন্য মেয়ে তাকে কেড়ে নেবে কেন?

—শর্বরীর কথাটাও ভেবে দেখুন ডাক্তার চ্যাটার্জি। রূপে গুণে বিদ্যায় স্বাস্থ্যে সে অলকার চাইতে ভাল। এত বৎসর প্রতীক্ষার পর হেমন্তকে না পেলে তার বুক যে ফেটে যাবে!

—ফাটলেই হল! বুক অত সহজে ফাটে না মশাই, খুব শক্ত টিশুতে তৈরী। হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস অ্যামিনোফাইলিন থেলিন এই সব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] দিলেন, তাকে [illegible] [illegible] [illegible] দিন, তিনি তাকে নার্সিং শেখাবার [illegible] [illegible]।

—[illegible] আমার [illegible] পড়ে [illegible] হয়েছেন, [illegible] [illegible] [illegible] মনে করেছেন, এ আমার পক্ষে [illegible] [illegible]। কিন্তু একটু স্থির হয়ে লেখকের সংকটও বিবেচনা করবেন। [illegible] [illegible] দু রকম [illegible] আমাদের [illegible]। ভগবান [illegible] দেন, দুঃখ দেন, মানুষকে রক্ষা করেন, আবার মারেনও। তিনি মিলন-বিরহ নিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন। আমরা [illegible] ভগবানেরই অনুসরণ করি। লোকে নিজে শোক [illegible] চায় না, কিন্তু ট্রাজেডি বেশ উপভোগ করে। সেই জন্যেই তো মহাকবিরা সীতা, অজমহিষী ইন্দুমতী, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন। ভগবান সব সময় দয়া করেন না, আমরাও করি না।

—কি বলছেন মশাই, ভগবানের নকল করবেন এতদূর আস্পর্ধা! ভগবান নাচার, সব সময় দয়া করলে তাঁর চলে না, তা বোঝেন? ইঁদুরকে যদি দয়া করেন তো বেড়াল উপোস করবে। মাছ মুরগি পাঁঠা ভেড়াকে দয়া করলে আপনার আমার পেটই ভরবে না। তিনি যখন মানুষকে দয়া করেন তখন মাইক্রোব ধ্বংস হয়, আবার মাইক্রোবকে দয়া করলে মানুষ মরে। নিজের হাত-পা বাঁধা বলেই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন—আমার হয়ে তোরাই যৎটা পারিস দয়া করবি, মনে রাখিস অহিংসাই পরম ধর্ম। গল্প লিখছেন বলেই আপনি মানুষ খুন করবেন এ কি রকম কথা! সেকালে বাল্মীকি কালিদাস শেকস্পীয়ার কি লিখে-ছিলেন তা ভুলে যান। এটা হল গান্ধীজীর যুগ, বিয়োগান্ত রচনা একদম চলবে না। যারা ট্রাজেডি লেখে আর তা পড়তে ভালবাসে তারা মরবিড, প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুর। মানুষের তো দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আবার মনগড়া দুঃখের কাহিনী চাপাবেন কেন? আনন্দের গল্প লিখুন, মানুষকে আর কাঁদাবেন না, শুধু হাসাবেন। আপনাদের ভাবনা কি, কলমের আঁচড়েই তো সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন। অলকাকে বাঁচাতেই হবে, বুঝলেন সিকদার মশাই? শারলক হোমসকে কোনান ডয়েল মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু পাঠকদের ধমক খেয়ে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আপনিই বা বাঁচাবেন না কেন?

উত্যক্ত হয়ে বটেশ্বর বললেন, মাপ করবেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমরা লে-ম্যান লেখকরা তো আপনাদের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করি না, আপনারাই বা লেখকদের হুকুম করবেন কেন? অনধিকার চর্চা কোনও পক্ষেই ভাল নয়।

সঞ্জীব ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি অনধিকার চর্চা করি না, ডাক্তারের কাজ প্রাণরক্ষা, আপনি খুন করতে যাচ্ছেন তাতে আপত্তি জানানো আমার কর্তব্য। বেশ, যা খুশি করুন, আপনার পরম ভক্ত দু লাখ পাঠক আর চার লাখ পাঠিকা চটে গিয়ে আপনাকে শাপ দেবে, আপনার এই কুকর্মের ফল পরলোকে ভুগতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, এখনকার ছোকরারা ভাল নয়। আচ্ছা, চললুম। যদি হাড়টাড় ভাঙে তো খবর দেবেন। নমস্কার।

সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরের মন খারাপ করে দিয়ে চলে গেলেন। গতকাল সকালে যে ছোকরা এসেছিল—প্রিয়ব্রত রায়—সে পাগল হলেও শান্তশিষ্ট। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার দুর্দান্ত উন্মাদ। শুধু উন্মাদ নয়, মনে হয় ফাজিল বকাটে আর মাতালও বটে। এমন লোকের চিকিৎসায় পসার হল

ফুলের স্বর্গ — আলোক চিত্রী শ্রীসন্তোষ দেবদাস

কি করে? যাই হক, পাগলদের কথায় বটেশ্বর কর্ণপাত করবেন না, তাঁর সংকল্পিত প্লট কিছুতেই বদলাবেন না। কিন্তু সঞ্জীব ডাক্তার ভয় দেখিয়ে গেছে, সাবধানে থাকতে হবে।

তিন দিন পরের কথা। বিকালবেলা দোতলার বারান্দায় বসে বটেশ্বর চুরুট টানছেন। তাঁর বাতের বেদনাটা বেড়ে উঠেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠায় কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গৃহিণী কাশীপুরে তাঁর ছোট বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বটেশ্বরের কোথাও যাবার জো নেই, কথা কইবার লোকও নেই। তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের কেউ যদি এখন এসে পড়েন তো তিনি খুশী হন।

চাকর এসে খবর দিল, একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। বটেশ্বর বললেন, এখানে নিয়ে আয়।

একটি সুবেশা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে তাঁর কাছে এল, একটু মোটা হলেও বেশ সুন্দরী বটে। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ে হাত দিলে বটেশ্বর বললেন, থাক থাক, ওই হয়েছে। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—চিনতে পারছেন না? আমি কদম্বানিলা চ্যাটার্জি, সিনেমার ছবিতে আমাকে দেখেন নি? মধ্যগগনের তারকা না হলেও আমাকে সবাই উদীয়মানা মনে করে।

—বেশ বেশ। সিনেমা বড় একটা দেখি নে, খবরও বিশেষ রাখি না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন ওই চেয়ারটায়।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না সার।

কদম্বানিলা পান চিবুতে চিবুতে কথা বলছিল, সেই বেয়াদবি দেখে বটেশ্বর একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির নম্র ব্যবহারে তাঁর বিরাগ কেটে গেল, ভাবলেন, আমার সামনে সিগারেট ফুঁকছে না এই ঢের। প্রশ্ন করলেন, কদম্বানিলা তো ছদ্মনাম, তোমার আসল নামটি কি?

—তা যে বলতে নেই সার। সন্ন্যাসী আর সিনেমা-তারার পূর্বনাম জানানো বারণ, গুরুর নিষেধ থাকে কি না। কদম্বানিলা বলতে যদি অসুবিধে হয় তো আপনি কদু বলবেন।

—উঁহু, কদু চলবে না, পুরো নামটাই বলব। এখন কি দরকারে এসেছ তা বল।

[illegible] করে পাদ পাদপদ্মের [illegible] গল্প আপনি লিখছেন [illegible] এই [illegible] ক্রেজ বেড়েছে! সবাই [illegible] বড় সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত আর [illegible] আমি একটা প্রস্তাব এনেছি. বিজনেস প্রোপোজাল। এই [illegible] ভারি অতি চমৎকার হবে। লালা নেমুচাঁদ [illegible] পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। আপনার [illegible] পার্ট আমিই নেব। দেবকী বোস কি ওঁর [illegible] লোককে ডিরেকশনের ভার দেওয়া হবে। তা [illegible] দশ টাকা কি আরও বেশী লালাজী আপনাকে দেবেন, আমাকেও মন্দ দেবেন না। এখন আপনি রাজী হলেই হয়।

খুশী হয়ে বটেশ্বর বললেন, তা আমার আর আপত্তি কি. তুমি নায়িকা সাজলে খুব ভালই হবে। কিন্তু গল্পটি শেষ হতে এখনও তো ছ-সাত মাস লাগবে।

—তার জন্যে ভাববেন না দাদু। আমারও এখন অনেক এনগেজমেন্ট, সাত মাস আমি বোম্বাইএ ব্যস্ত থাকব, নেমুচাঁদজীও থাকবেন। তিনি এখন শুধু আপনার মতটি জানতে চান, পাকা কথাবার্তা সাত মাস পরেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আপনি আর কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন।

—না না, তা কেন দেব।

—আপনি দেখে নেবেন, আমার অভিনয় কি ওআণ্ডারফুল হবে, আপনার ওই অলকাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কিনা। উঃ, ছবির শেষে অলকা যখন বেশ মোটা সোটা হয়ে তার তিন মাসের খোকাটিকে নিয়ে পর্দায় দেখা দেবে তখন হাততালিতে হাউস একেবারে ফেটে পড়বে, আর আপনি উপস্থিত থাকলে লোকে আপনাকে কাঁধে তুলে নাচবে।

বটেশ্বর ক্লান্ত হয়ে বললেন, এই মাটি করলে, সব শেয়ালের এক রা! আমাকে পাগল না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। শোন কদম্বানিলা, আমার গল্পটি বিয়োগান্ত, অলকা মরবে, দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে।

চমকে উঠে চোখ কপালে তুলে কদম্বানিলা বলল, অ্যাঁ, অলকাকে মারবেন! তবে আমি ওতে নেই, ও আমি পারব না।

—নিশ্চয় পারবে, ট্রাজেডির নায়িকা সেজেও তো চমৎকার অভিনয় করা যায়।

—[illegible] হতেই পারে না, মরতে আমি মোটেই রাজী নই, অলকা সেজেও নয়। আপনি সব মাটি করে দিলেন দাদু, মিছেই এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। তা হলে চললুম গল্পসরস্বতী দামোদর নশকরের সঙ্গেই কথা বলি গিয়ে, তাঁর 'মানস-মরালী' উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে, তার নায়িকা মঞ্জুলার পার্টটিও আমার বেশ পছন্দ।

বটেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিন কতক আগে একটা গণ্ডমূর্খ সমালোচক লিখেছিল—দামোদর নশকরের গল্প যুগচেতনা সমাজচেতনা যৌনচেতনায় পরিপূর্ণ, বটেশ্বর সিকদারের রচনা একেবারে অচেতন, শুধু চর্বিতচর্বণ। এই সমালোচনা পড়ার পর থেকে দামোদরের নাম শুনলে বটেশ্বর খেপে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললেন খবরদার ওটার কাছে যেয়ো না। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, দু দিন সময় আমাকে দাও, ভেবে দেখি অলকাকে বাঁচিয়ে গল্পটি মিলনান্ত করা চলে কিনা।

—ভাববার যে [illegible] নেই দাদু। [illegible] বোম্বাই চলে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই একটা [illegible] করে নেমুচাঁদজীকে জানাতে হবে।

গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে বটেশ্বর বললেন, আচ্ছা আচ্ছা অলকাকে বাঁচিয়েই রাখব, শর্বরীই না হয় মরবে। অন্য কারও কাছে তোমাকে যেতে হবে না। জান কদম্বানিলা, আমরা গল্পলিখিয়েরা হচ্ছি সর্বশক্তিমান, কলমের খোঁচায় নরককে স্বর্গ করতে পারি।

কদম্বানিলা উৎফুল্ল হয়ে বলল, থ্যাংক ইউ দাদু, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা! দিন পায়ের ধুলো। গল্পটি কিন্তু বেশ ভাল করে শেষ করতে হবে, শেষ দৃশ্যে ছেলে কোলে করে অলকার আসা চাই। এখন চললুম, নেমুচাঁদজীকে সুখবরটা দিইগে।

—

বটেশ্বর সিকদার প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, তাঁর গল্প 'কে থাকে কে যায়' মিলনান্তরূপেই সমাপ্ত হল। কিন্তু আট মাস হতে চলল, কদম্বানিলার দেখা নেই কেন? তার ঠিকানাটাও জানেন না যে চিঠি লিখে খবর দেবেন।

সকাল বেলা বটেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে বসে নিবিষ্ট হয়ে একটি নূতন গল্প লিখছেন—'মন নিয়ে ছিনিমিনি।' সহসা একটা চেনা গলার আওয়াজ তাঁর কানে এল—আসতে পারি সিকদার মশাই?

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিছনে প্রিয়ব্রত রায় এবং একটি অচেনা মেয়ে। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, গুড মর্নিং সার। ওঃ আপনার সেই গল্পটিকে একেবারে মহত্তম অবদান বানিয়েছেন মশাই! একে নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন—প্রিয়ব্রত রায়, যাকে আপনি পাগল বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দেখুন আপনার অলকা, আপনি যার প্রাণরক্ষা করেছেন।

বটেশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে অলকা একটি পাতলা কাগজে মোড়া বড় কৌটো রাখল। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন. আপনার জন্যে অলকা নিজের হাতে ছানার মালপো করে এনেছে, খাবেন সার।

হতভম্ব হয়ে বটেশ্বর বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

—এটা হল আপনার গল্পের সত্যিকার উপসংহার। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন।—এই অলকা হচ্ছে প্রিয়ব্রতর স্ত্রী, আমার শালী—মানে আমার স্ত্রীর মাসতুতো বোন। অলকা বছর খানিক স্যানিটোরিয়মে ছিল, বেশ সেরেও উঠেছিল, কুক্ষণে এর হাতে এল 'প্রগামিনী' পত্রিকা। আপনার গল্প পড়তে পড়তে এর মাথায় এক বেয়াড়া ধারণা এল—গল্পের অলকা যদি বাঁচে তবেই আমি বাঁচব, সে যদি মরে তবে আমিও মরব। আমরা অনেক বোঝালুম, ওসব রাবিশ গল্প পড়ে মাথা খারাপ ক'রো না, তুমি তো সেরেই উঠছ। কিন্তু অলকার বদখেয়াল কিছুতেই দূর হল না, রেগুলার অবসেশন। অগত্যা ওর স্বামী এই প্রিয়ব্রত আপনার দ্বারস্থ হল, আপনি ওকে পাগল বলে হাঁকিয়ে দিলেন। তার পর আমি এসে আপনাকে একটি সারগর্ভ লেকচার দিলুম, আপনি তো চটেই উঠলেন। তখন আমার স্ত্রী বলল, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না, যত সব অকম্মার ধাড়ী, আমিই যাচ্ছি, দেখি বুড়োকে বাগ মানাতে পারি কিনা। সে আপনার সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল

আগমবাগীশ ভট্টাচার্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

এ কটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হওয়া প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। "তন্ত্রসার"রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য বাংলাদেশে এইরূপ একজন ভাগ্যবান ক্ষণজন্মা পুরুষ। এই গ্রন্থের প্রচার পূর্বে বাংলাদেশে এত ব্যাপকভাবে হইয়াছিল যে, সেকথা প্রায় কেহই সম্যক্ অবগত নহেন। চাটিগ্রামের পূর্ব প্রান্ত হইতে বীরভূম-বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে ৫।১০ খানা সংস্কৃত পুঁথি থাকিলে তন্মধ্যে একখণ্ড "তন্ত্রসার" থাকিবেই। এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে এ যাবৎ যাহা কিছু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই অল্পবিস্তর ভ্রান্তিপূর্ণ। গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লিখিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থ হইতেই সাবধানে তথ্য সংগ্রহ করা সর্বাগ্রে কর্তব্য এবং তৎপর তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস আলোচনীয়। বর্তমানে এই দ্বিবিধ কার্যই প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে। সংস্কৃত গ্রন্থ এখন প্রায় অপাঠ্য এবং উচ্চশিক্ষিত পুত্র পিতার নামই বিশুদ্ধভাবে জানেন না, একস্থলে ইহা আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি। সুতরাং বাঙালী এখন ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ ও পরিহার করিয়া কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য।

আমরা বিভিন্ন স্থানে তন্ত্রসারের শতাধিক পুঁথি দেখিয়াছি—তন্মধ্যে কোন দুইটি পুঁথির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নাই। এত পাঠভেদ ও বিকৃতি গ্রন্থমধ্যে সাধিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণানন্দের প্রকৃত রচনা উদ্ধার করা অতীব কষ্টকর। বটতলা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থটির যে-সকল মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাই সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত নহে—বঙ্গবাসী-মুদ্রিত ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত সংস্করণটি সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও আদর্শ পুঁথির প্রাচুর্য না থাকায় তাহাও সর্বাংশে কৃষ্ণানন্দের রচনা বলিয়া ধরা যায় না। আমরা চাটিগ্রাম হইতে ১৬০১ শকাব্দে ("রূপাম্বরষড়িন্দৌ") লিখিত একটি তন্ত্রসার সংগ্রহ করি—তাহাতে "শবচনী মন্ত্রাঃ", "মগদেশ্বরী মন্ত্রাঃ" ও মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক বিক্রমকেশরী রাজার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাহা নিশ্চিতই কৃষ্ণানন্দের রচনা নহে। মুদ্রিত গ্রন্থেরও পঙ্‌ক্তি কিরূপ বিভ্রান্তিকর হইতে পারে তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের এক স্থলে (পৃ ১৫৫) পূর্ণানন্দ-রচিত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং আর এক স্থলে (পৃ ৪৮৯) পূর্ণানন্দের মত নামোল্লেখপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। সম্পাদক স্বর্গত তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ংই শেষোক্ত স্থলটি মুদ্রাকরপ্রমাদ বলিয়া ভূমিকায় (পৃ ৯) বিশেষ ত্রুটি স্বীকার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দের নাম উল্লেখ কোথাও করেন নাই, ইহা পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত, যদিও প্রথমোক্ত স্থলটি তর্করত্ন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বস্তুত তন্ত্রসারের অপর কোন মুদ্রিত সংস্করণে এবং আমাদের পরীক্ষিত কোন পুঁথিতে পূর্ণানন্দের বা তদ্রচিত গ্রন্থের নাম নাই। কিন্তু এ বিষয়ে একজন প্রথিতনামা লেখক জানিয়া-শুনিয়া একটি জাজ্বল্যমান অসত্যভাষণ করিয়াছেন যে, "বঙ্গবাসী প্রকাশিত তন্ত্রসার-সম্পাদনায় ব্যবহৃত সমস্ত অখণ্ড পুঁথিতেই" পূর্ণানন্দের ঐ উল্লেখ আছে!!! অর্থাৎ তর্করত্ন মহাশয় সাবধানে পুঁথি দেখিয়া যে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক!!

বাংলায় চিরন্তন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কৃষ্ণানন্দ মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন। মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন এবং কৃষ্ণানন্দ চারিজন একসঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন। একটি ঘটক-কারিকার শেষে চারিজনের সমকালীনতা সূচিত হইয়াছে—

> পুঁতি কুলচন্দ্র ভণে, আবার কি দেখবে।
> নিমু, রঘু, রঘু, কৃষ্ণ হৃদি রাখবে॥
>
> (সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩য় সং., পৃঃ ৬৯৪)

কোলব্রুক সাহেব ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দায়ভাগের ভূমিকায় [illegible] সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন।

"and studied at the same time with three other disciples of the same preceptor, who likewise have acquired celebrity, viz. Siromani, Crishnananda and Chaitanya" (Dayabhaga, Preface, p. XIV).

একমতে চৈতন্য ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত অংশানুসারে কৃষ্ণানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ ২০৫):—

> যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
> সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
> শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
> কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
>
> (চৈ-ভা, আ-৬ষ্ঠ অ)

মহাপ্রভুর কোন গ্রন্থ নাই। সার্বভৌম ও শিরোমণির গ্রন্থাদি বিশ্লেষণ করিয়া মহাপ্রভুঘটিত এই প্রবাদের অমূলকতা আমরা প্রমাণিত করিয়াছি (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা পৃ ৯৩-৯৫)। শিরোমণি মহাপ্রভুর এক পুরুষ পূর্ববর্তী ছিলেন। কৃষ্ণানন্দের গ্রন্থ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবাদটির অপর এক অংশের অমূলকতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু গ্রন্থের বিশ্লেষণে নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম করিতে হয়। তন্ত্রসার খুলিয়াই নজরে পড়ে "নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং—"। কেহ লিখিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণানন্দের কুলদেবতা ছিলেন পরে তিনি শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন" (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ ২০৯)। অপর একজন লিখিলেন—"কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ছিলেন" (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৪, পৃ ৩৮২)!! উভয়ই প্রমাদোক্তি। তন্ত্রসারে কোন কোন প্রকরণে পৃথক পৃথক নমস্কারশ্লোক দৃষ্ট হয়—ভুবনেশ্বরী, বাগীশ্বরী, গণপতি, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী প্রভৃতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রকরণে কোন মঙ্গলশ্লোক নাই এবং শ্যামাপ্রকরণে স্বরচিত শ্লোকের পরিবর্তে বিশেষ করিয়া ছয়টি শ্লোক ভৈরবতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণানন্দের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার এবং স্বকীয় ইষ্টদেবতার প্রতি স্মরস উভয়ই সূচিত হয়। প্রচলিত শ্যামামূর্তির প্রবর্তনকারী বলিয়া তিন শতাব্দী ধরিয়া বাংলার ঘরে ঘরে আগমবাগীশের নাম কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। আর তিনি হইয়া গেলেন বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত! তন্ত্রসারের শেষ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল—গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য তাহাতে প্রকটিত হইয়াছে।

আমাদের পরীক্ষিত [illegible] পুঁথিতেই শ্লোকটি আছে :—

বেদার্থসার্থবিপরীতবিলোকনেন,
প্রায়ো [illegible] অম্ব।
[illegible]
সোঢ়ান্ [illegible] তব পাদযুগেষু মাতঃ॥

[হে মাতঃ, তোমার পদযুগলে প্রার্থনা করি—বৈদিক অর্থসমূহের প্রতি বিপরীত দৃষ্টিবশতঃ তোমার অর্চনা প্রায় লোপ পাইয়াছে দেখিয়া তাহার নিগূঢ় রহস্য বিষয় করিয়া লিখিলাম, তজ্জন্য যে বহু দোষ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর।]

লক্ষ্য করা আবশ্যক, এই শ্লোকে কৃষ্ণানন্দ তাঁহার অন্তরের দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন এবং তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিকে বেদসম্মত বলিয়াছেন। এখানে বেদবাহ্য বৌদ্ধপ্রভাবকেই কৃষ্ণানন্দ বিপরীত দৃষ্টি বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের অনুকরণে পরে রচিত হইয়াছিল, ইহা প্রামাণিক কথা নহে—তন্ত্রসারে যে-সকল মূল তন্ত্র ও নিবন্ধের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে একটিও বৌদ্ধতন্ত্র নাই। তবে ন্যায়দর্শনের ক্রমবিকাশের ন্যায় তান্ত্রিক পদ্ধতির কোন কোন অংশ বৌদ্ধপ্রভাববর্জিত নহে। আমরা দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। তন্ত্রসারে একটি "মঞ্জুঘোষ"-প্রকরণ আছে এবং তাহার আরম্ভে একটি মঙ্গলশ্লোকও আছে :—

জাড্যোর্ঘাতিমিরধ্বংসী সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীমঞ্জুঘোষো জয়তাং সাধকানাং সুখাবহঃ॥

এই প্রকরণ প্রাচীনতম পুঁথিতেও বিদ্যমান আছে (সাহিত্য পরিষদের ১৫৫৪ শকাব্দের পুঁথি, ৫২-৫৪ পত্র)। ইহা আমরা সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আগমোত্তর, কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র ও ভৈরবতন্ত্র হইতে পদ্ধতি সংকলিত হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে :—

নন্দাদেবার্চনং স্নানং প্রণবোচ্চারণং ন তু।
রাত্রিবাসো ন মুণ্ডেত ন শুচিঃ স্যাৎ কদাচন॥

তৃতীয়টিতে আছে (অনুবাদ করা হইল না)—

আহারোঽস্য নগ্নং বক্ষো নৈবেদ্যং চক্ষুর্যোর্মলং।
মুত্রৈঃ পাদ্যং দদেত্তস্য গন্ধো বিট্‌খদিরোদ্ভবঃ॥

মঞ্জুঘোষ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দেবতা—হিন্দুতন্ত্রে তাঁহার অন্তর্ভাব ও পরিণতি অতীব বিচিত্র। আমরা গুরুতাব্যবসায়ী এক পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহার অনেক শিষ্য মঞ্জুঘোষ-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। একজন প্রসিদ্ধ "সাধু" এবং সম্প্রতি স্বর্গগত একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী মঞ্জুঘোষের উপাসক ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। উভয়েই ক্ষমতাশালী ছিলেন।

শাক্তপ্রধান বঙ্গদেশের অধিকাংশ বংশেরই কুলদেবতা কালী অথবা তারা। কৃষ্ণানন্দ বীরতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তারা বিদ্যার ঋষি "অক্ষোভ্য" ("অক্ষোভ্য ঋষিরেতস্যাঃ") এবং ধ্যানেও আছে—[illegible] (বৌদ্ধ [illegible] অক্ষোভ্য দ্বারা ভূষিত)। আমাদের [illegible] ১৫০২ শকাব্দের পুঁথিতে একটি পাদটীকা আছে—"অক্ষোভ্যো দেবী মূর্ধনি ত্রিমূর্তিনাগরূপধৃক্"। [illegible] অক্ষোভ্য হইল পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। [illegible] পূর্ববর্তী মৈথিল "তন্ত্রকৌমুদী" [illegible] তারাপ্রকরণে "মহাচীনক্রমাৎ নীলা তারাং ত্রিভবতারিণীং" এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—"মহাচীনো দেশবিশেষস্তত্র বৌদ্ধা নিবসন্তি, তে যেনাচারেণ তামারাধয়ন্তি তেন শীঘ্রফলদেতি ভাবঃ" (অস্মদীয় পুঁথির ৫৬।১ পত্র)। কিন্তু ধ্যানের পদটির ব্যাখ্যা এইরূপ "অক্ষোভ্যেতি — অবিনাশিচন্দ্রকলাভূষিতা-মিত্যর্থঃ। যদ্বা জটাবেষ্টনমক্ষোভ্যো বাসুকিস্তদ্‌যুক্তামিত্যর্থঃ। দেবীগুরুরক্ষোভ্য ইত্যপি কশ্চিৎ।" (৫৭।১ পত্র)। বাংলার বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ তারাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন—পূর্ণানন্দ, তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ, গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য প্রভৃতি। তাঁহাদের তন্ত্রনিবন্ধ অদ্যাপি বঙ্গদেশে সাদরে অধীত হয়। শক্তিপূজা মূলত সুপ্রাচীন বৈদিক প্রস্থান—বৌদ্ধপ্রভাব সত্ত্বেও তাহার মূল তত্ত্ব ও সাফল্য অম্লান রহিয়াছে। একজন প্রথিতনামা মনীষী বলিতেন, তান্ত্রিক দীক্ষা নেওয়ার অর্থ বৌদ্ধ হইয়া যাওয়া। ইহা বস্তুত একদেশদর্শীর অভিমত।

তন্ত্রসার গ্রন্থ জনপ্রিয় হওয়ার কারণ দুইটি। ইহাতে সকল দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রমাণসহকারে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং "ভারতীর রাজধানী" নবদ্বীপে রচিত হওয়ায় অতিদ্রুত সর্বত্র প্রচারিত হয়। মাদ্রাজের Mackenzie Collection-এ দুইটি মাত্র বঙ্গাক্ষর পুঁথি আছে—একটি তন্ত্রসার অপরটি ধ্রুবানন্দের কুলপঞ্জী (Wilson's Cat., 1828, Pt. I, p. 136)। একসময়ে বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল। প্রসিদ্ধ তন্ত্র-নিবন্ধকার পূর্ণানন্দ পরমহংসের বংশে মৈমনসিংহ জিলার কাটিহালি গ্রামে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে কল্যাণ ভট্টাচার্যের তন্ত্রের টোলে "তন্ত্রসার" গ্রন্থ ২১ বার অধীত হইয়াছিল, প্রবাদ আছে। পূর্ণানন্দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পরিবর্তে পূর্ণানন্দ-গৃহেই তন্ত্রসারের অধ্যাপনা এক অপূর্ব ঘটনা বটে। এই অসামান্য সাফল্যের ফলেই গ্রন্থটির মধ্যে অত্যধিক পাঠান্তর ঢুকিয়াছে এবং পূর্বতন বহুতর নিবন্ধ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থপ্রচারের সহিত কৃষ্ণানন্দের সিদ্ধিবৃত্তান্তও সর্বত্র প্রচারিত হয় ও তান্ত্রিক সাধকগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। ইহার একটি উৎকৃষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন [illegible]

[illegible]

কৃষ্ণানন্দের উপাধি ছিল "বাগীশ"। [illegible] ১৫৫৪ শকাব্দের প্রাচীনতম [illegible] [illegible] (১৩৪৪ খৃ. অব্দ) [illegible] শাস্ত্রব্যবসায় ধরা যাইত না, প্রধানত 'স্মার্তবাগীশ', 'আগমবাগীশ' প্রভৃতি বিশিষ্ট পদপ্রয়োগে তাহা সূচিত হইত। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল পঞ্চানন 'তন্ত্রদীপিকা'য় আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"আগমবাগীশ-পৌত্রেণ"। কিন্তু তন্ত্রসারে শুদ্ধ "বাগীশ" উপাধিই দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন পুঁথির শেষে একটি শ্লোকও দৃষ্ট হয় :—

শ্রীকৃষ্ণানন্দ বাগীশ ভট্টাচার্যস্য সংগ্রহঃ।
দৃষ্ট্বানধীত শাস্ত্রাণি ধীরাধ্যাপয় শাম্প্রতম্॥

শ্লোকটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তৎকালে তন্ত্রশাস্ত্রের পৃথক অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। বাংলার গুরুতাব্যবসায়ী বংশসমূহের শীর্ষস্থানীয় বেলপুকুরের ঠাকুরদের আদিপুরুষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ "রত্নগর্ভ সার্বভৌম" একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং বিক্রমপুরের চাঁদ রায়-কেদার রায়ের গুরু ছিলেন বলিয়া "গোস্বামী ভট্টাচার্য" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দুইটি নিবন্ধ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—শ্যামার্চনচন্দ্রিকা ও ক্রমচন্দ্রিকা। বাংলার তন্ত্রচর্চার ইতিহাসে রত্নগর্ভের গ্রন্থদ্বয় আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এই "গৌড় মহাগমিক" শ্যামার্চনচন্দ্রিকার শেষে লিখিয়াছেন :—

স্বর্ণগ্রাম-কৃতোষ্টিনা সুরসরিত্তীরাদি তীর্থে ক্বচিৎ
নানা পীঠমপীহ বদ্ধবিদিতং গত্বানুভূয়াপি চ।
নানা তন্ত্রমতানি বাদিনিবহৈঃ সিদ্ধান্তকণ্ঠী রবৈঃ
নির্ণীয় ব্যবসায়িনা বিলিখিতঃ সারং কুলার্থং ময়া॥

[স্বর্ণগ্রাম নিবাসী তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবসায়ী আমি "কুল" প্রতিষ্ঠার জন্য গঙ্গাতীরাদি তীর্থ ও নানা প্রসিদ্ধ পীঠস্থানে যাইয়া এবং সাক্ষাৎ মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনে সিংহসদৃশ বাদিসমূহ দ্বারা নানা তন্ত্রমত নির্ণয় করিয়া এই সারগ্রন্থ লিখিলাম।]

স্বর্ণগ্রাম বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন গ্রাম, বহুপূর্বে নদীমগ্ন—প্রসিদ্ধ সোনারগাঁ পরগনা নহে। রত্নগর্ভের পরিচিত "সিংহ-সদৃশ বাদিপুরুষদের প্রধান ছিলেন "বাগীশ ভট্টাচার্য" অর্থাৎ তন্ত্রসারকার কৃষ্ণানন্দ। কারণ, ক্রমচন্দ্রিকার শেষে রত্নগর্ভ লিখিয়াছেন :—

বিলোড্য শাস্ত্রাণি বিচার্য যত্নতো
বাগীশভট্টাদিভিরাগমজ্ঞৈঃ।
তথাবধূতোদয় ভানু মিশ্র
মতং ময়াপ্যস্য কৃতেন জ্ঞেয়ং॥

[illegible] অন্তর্নিবন্ধের
[illegible] এতদনুসারে
[illegible] অভ্যুদয়কাল
[illegible] নির্ণীত
[illegible]
[illegible] হইতে
[illegible] মহাপ্রভুর
[illegible] ছিলেন।

[illegible] বচন উদ্ধৃত
[illegible] হইল "মন্ত্র
[illegible] লিখিত আছে ঃ—
[illegible]—

"[illegible] লিখিতাবিনয়ঃ [illegible] নির্মলেৎ।
[illegible] ॥"

[illegible] মুদ্রিত গ্রন্থে বা কোন কোন পুঁথিতে নাই—আমাদের পুঁথিতে (৫।২ পত্র) এবং অপর কতিপয় পুঁথিতে আছে। মৈথিল মহাঠক্কুর দেবনাথ তর্কপঞ্চানন ৪০০ লক্ষ্মণাব্দে ("অব্দে লক্ষ্মণসেনীয়া বিয়দ্‌ব্যোমিলক্ষিতে") অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রকৌমুদী রচনা করেন এবং তন্মধ্যে (১২।১ পত্র) [illegible] শ্লোকটি পাওয়া যায়। এই দেবনাথই বার্ধক্যে কোচবিহারের অধিপতি মহারাজ নরনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৫৫৪—৮৭ খ্রীঃ) সভায় "তন্ত্রকৌমুদী" রচনা করেন। আসামী অগ্রছালে লিখিত ইহার মৈথিলাক্ষর একটি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে—তাহার শেষে লিখিত "শক ১৪৮৬" (১৫৬৪—৫ খ্রীঃ) গ্রন্থের রচনাকাল বটে। কৃষ্ণানন্দ দুই স্থলে ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে পাওয়া যায় (বঙ্গবাসী সং পৃ ৩৭৪)ঃ—"প্রক্রমাদিতি তন্ত্রকৌমুদীকারঃ"। তন্ত্রকৌমুদীর সুন্দরী পটলে বস্তুতই আছে—"লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ামেব প্রক্রমাৎ" (১৪।১ পত্র)। তন্ত্রসারের শেষভাগে শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপার্চায় বারাহীতন্ত্রোক্ত একটি গদ্য বচন আছে—বঙ্গবাসী সংস্করণে (পৃ ৮৮৯ পাদটীকা) তৎস্থলে "মন্ত্রকৌমুদ্যাং" (পাঠান্তর "তন্ত্রকৌমুদ্যাং") লিখিত আছে। বস্তুত বচনটি অবিকল তন্ত্রকৌমুদী হইতেই (৩৭।২ পত্র) উদ্ধৃত বটে। এতদনুসারে তন্ত্রসারের রচনাকাল ১৫৮০—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দমধ্যে নির্ণীত হয়।

কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। এবিষয়ে পূর্বোক্ত রত্নগর্ভের সমকালীনতা ছাড়া অপর প্রমাণও আছে। গৌরীকান্ত সার্বভৌম নামে উত্তরবঙ্গের একজন "দিগ্‌গজ" নৈয়ায়িক ছিলেন (বঙ্গে নবন্যায়-চর্চা পৃ ২৭৭—৭৮)—জীবৎকাল প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। তদ্রচিত "আনন্দলহরী-তরি" নামক টীকায় [illegible] এবং তন্ত্রসার-ধৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (১৯ শ্লোকের টীকা, পুনার পুঁথি ১২।২ পত্র)। গৌরীকান্ত নবদ্বীপের [illegible] ছিলেন এবং পঠদ্দশায় আগমবাগীশের [illegible] পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

কৃষ্ণানন্দ "[illegible]" "[illegible] মৈত্রের" কাশ্যপগোত্র রূপ অর্থাৎ অকুলীন। তিনি লাহিড়ীবংশের কুলীন মহানৈয়ায়িক প্রগল্ভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্রের কনিষ্ঠ পৌত্র গোবিন্দের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিয়া তাঁহার কুলভঙ্গ করেন (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা পৃ ২৫৪)। প্রগল্ভ বাসুদেব সার্বভৌমের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রায় ১৪৫০—৭০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থরচনা করেন। তাঁহার সর্ব-কনিষ্ঠ প্রপৌত্রের শ্বশুর আগমবাগীশের অভ্যুদয়কাল সুতরাং প্রায় ১০০ বৎসর পরে অবধারিত হয় এবং কিছুতেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যায় না। বুঝা যায় তিনি বেশ পরিণত বয়সেই তন্ত্রসার রচনা করিয়াছিলেন।

এই কালনির্ণয় তাঁহার অধস্তন বংশধারা দ্বারাও সম্যক্ সমর্থিত হয়। কৃষ্ণানন্দের চারি পুত্র—তৃতীয় পুত্র হরিনাথের সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি রাজসাহী অঞ্চলে সাঁতৈরের রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যান। ইহা নাটোর রাজবংশের উৎপত্তির পূর্বে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল। মধুসূদনের বৃদ্ধ প্রপৌত্রই সুপ্রসিদ্ধ প্রাণতোষিণীগ্রন্থকার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার (মধুসূদন—কালিদাস—রঘুনাথ—কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ — রামতোষণ)। মুদ্রিত গ্রন্থে কিছু কিছু ভুল আছে—মূল কুলপঞ্জী দেখিয়া সংশোধিত হইল। রামতোষণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দধামের রাজা ঈশানচন্দ্রের সভায় "বিশ্ববিজয়ী" পদবী লাভ করেন (প্রায় ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রাণতোষিণীর আদিকাণ্ডের শেষে (৪১।১ পত্রে) এই কথা লিখিত আছে। রামতোষণের অতি প্রাচীন বয়সে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণতোষিণী রচিত ও মুদ্রিত হয়। প্রায় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ধরিয়া কৃষ্ণানন্দের জন্ম ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নির্ণয় করা যায়।

তন্ত্রসারের দুইটি "পরিশোধিত" সংস্করণের পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। একটি সুপ্রাচীন "অমৃতানন্দভৈরব"-কৃত ["পরি-শোধ্য যথান্যায়ং তন্ত্রসারং তনোত্যমুং"]—আমাদের পরীক্ষিত পুঁথির লিপিকাল ১৬১২ শকাব্দ। অপরটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে বিখ্যাত স্মৃতিবর নানাগ্রন্থরচয়িতা রামানন্দতীর্থস্বামিকৃত। এশিয়াটিক সোসা-ইটিতে [illegible] (II A 48) [illegible] একটি [illegible]—"ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ [illegible] তন্ত্রসারে শ্রীরামা-নন্দ তীর্থ[illegible]" (পৃ ৫১১)। বস্তুত প্রত্যেক বিষয়েই টিপ্পনী [illegible] সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। এইরূপ একটি টিপ্পনীতেই [illegible] ছিল এবং বঙ্গবাসী সংস্করণে প্রমাদবশত মূলে পাঠরূপে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল (পৃ ৪৮৯)। আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, ঐ সংস্করণে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উল্লেখও (পৃ ১৫৫) অবিকল এই রামানন্দের সংগ্রহ হইতে (পৃ ৯৩) গৃহীত হয়।

তন্ত্রসারের এক একটি সন্দর্ভ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। এই অপার সমুদ্রসদৃশ গ্রন্থে যে অগণিত রত্নরাজি নিহিত আছে তাহার মধ্যে একটি মাত্র বিচিত্র রত্নের বিবৃতি দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। বঙ্গদেশে শ্রীবিদ্যার উপাসক অত্যন্ত বিরল, কিন্তু তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং তন্মধ্যে একটি অনুষ্ঠানবহুল "শ্রীবিদ্যা-বিশেষপদ্ধতি" আছে। অন্য কোন নিবন্ধে এত বাহুল্য দৃষ্ট হয় না—তন্ত্রকৌমুদীর সুন্দরী-পটল এত বিস্তৃত নহে। এই পদ্ধতানুসারে অণিমাদিসিদ্ধির পূজার অঙ্গস্বরূপ যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের পূজা বিহিত হইয়াছে। যথা,

অণিমাসিদ্ধির পূজায় "চার্ব্বাকদর্শনায়" নমঃ।
লঘিমাসিদ্ধির পূজায় "বৌদ্ধদর্শনায়" নমঃ।
মহিমাসিদ্ধির পূজায় "জিনেন্দ্রদর্শনায়" নমঃ।
ঈশিত্বাদিসিদ্ধির পূজায় "সাংখ্যমীমাংসান্যায়-দর্শনেভ্যো" নমঃ।
বশিত্বাদিসিদ্ধির পূজায় "ব্রাহ্মবৈদ্যকদর্শনাভ্যাং" নমঃ।
প্রাকাম্যসিদ্ধির পূজায় "সৌরদর্শনায়" নমঃ।
ভুক্তিসিদ্ধির পূজায় "বৈষ্ণবদর্শনায়" নমঃ।
ইচ্ছাসিদ্ধির পূজায় "শাক্তদর্শনায়" নমঃ।
মোক্ষসিদ্ধির পূজায় "শৈবদর্শনায়" নমঃ।

এই অত্যদ্ভুত দর্শনপূজার বিধান তন্ত্রসারের প্রাচীনতম (১৫৫৪ শকাব্দে অনুলিখিত) পুঁথিতে পাওয়া যায় (২১—২৩ পত্র)। সুতরাং ইহা কৃষ্ণানন্দের রচনা সন্দেহ নাই। চার্বাক হইতে শেষ পর্যন্ত মোট দর্শন সংখ্যা ১২। নবরত্নেশ্বর নামক তন্ত্র হইতে কৃষ্ণানন্দ যে-বচন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ষড়্দর্শনের নাম আছে—বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত। আস্তিক-নাস্তিকনিরপেক্ষ এই দর্শনমালার নাম-নির্দেশে ও পূজাবিধানে তন্ত্রশাস্ত্রের যে নিগূঢ় রহস্য অন্তর্নিহিত আছে তাহার মূল ও তত্ত্ব গবেষণীয়।

কাঁটাপথ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভায়ে ঝগড়া।

এমনিতে মিল-মিশ ছিল; যেই বাপ বিষয় রেখে গেল, লেগে গেল লাঠালাঠি।

গাঁয়ের মাতব্বর এল সালিশ করতে। বিষয়-আশয় ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নাও, হ্যাংগাম চুকে যাক।

কথাটা ভাল। যার যার তার তার।

ঘটিবাটি বাসনকোসন গরু-লাঙল সব ভাগ হল। দাগ প্লট ধরে জমিজমা। কিন্তু পুকুর? এজমালি পুকুরটা। কী করে ভাগ হবে?

একজনকে গোটা পুকুরটা দিয়ে আরেক-জনকে জমি দিয়ে ভরিয়ে দাও। কিছুতেই রাজী হয় না কেউ। পুকুর ছাড়তে কেউ রাজী নয়। দুজনেরই পুকুর চাই।

তাহলে এজমালিতে ভোগ কর।

কী সর্বনাশ! এজমালিই যদি থাকব, তবে তোমাকে ডেকেছি কেন? মাতব্বরের দুহাত ধরে দুজনে টানাটানি করতে লাগল। আশমান-জমিন পুকুর-পাহাড় সব ভাগ করে দিতে হবে।

তাহলে এক কাজ কর। দা আর দড়ি নিয়ে এস। আর দুটো খুঁটি কাট।

পুকুরে নামল মাতব্বর। মাঝবরাবর দিয়ে এগুতে লাগল, দা দিয়ে জল কেটে কেটে। বললে, "এ ভাগটা তোর, ও ভাগটা ওর। জল যখন কাটা হল তখনই পুকুর ভাগ হয়ে গেল। এবার দড়ি ফেলে সীমানা ঠিক করে দি।" দড়ির এক মাথা এ-পাড়ের খুঁটিতে, আরেক মাথা ওপারের।

বা, দিব্যি ভাগ হয়ে গেল পুকুর। দু ভাই মহাখুশী।

মাছের দল যেমন-কে-তেমন থলবল থলবল করতে লাগল। দড়ির তলা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল এপার-ওপার।

পাকিস্তান থেকে আসে শুপুরি, মার্কিনী মনোহারী, আর ভারত থেকে চলে যায় চাল, কাপড়, তেল, চিনি, কলকব্জা, মশলাপাতি।

জল কেটে পুকুর ভাগ করে দিয়েছে মাতব্বর।

কোথায় যে লাইন পড়েছে, সেই অদৃশ্য কল্পনার সুতো, কে বলবে। সেই ঝোপ-জংগল, সেই বনবাদাড়, সেই মাঠপথ, সে খাল-বিল। তবু বলে এ-দেশ তোমার না ও-দেশ তোমার। রাইপদ ত দেখে সে একই মাটির চেহারা, একই আকাশের রঙ কতক্ষণ ধরে যে হাঁটছে খেয়াল নেই হাঁটতে হাঁটতে কখন হঠাৎ শুনতে পাবে হয়ত একটা মাঠের মাঝখানে কিংবা কো একটা পথের বাঁক নিতে, এই তার আপ দেশ আরম্ভ হল, তার নিশ্চিন্তের দেশ তার সম্মানের দেশ।

"পথ পাচ্ছি না কেন বলতে পার? সঙ্গের একটা লোককে জিগগেস করে রাইপদ।

"এখনো বেলা আছে কিনা, অসুবি হচ্ছে।" সঙ্গের লোকটা বললে। "যে আঁধার নামবে, রাত হবে, টর্চ হাতে বেরি পড়বে চোরাকারবারীর দল, তোমাকে হা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এ-অঞ্চ রাত্তেই পথ জাগে, দিনের বেলাই ধু ধু।"

হক ঘুরপথ, কিন্তু এসব রাতজাগি পাখি পাখালি, যেটুকু বা দিনের আলো আয়

যেটুকু বা গাছের ছায়া, এসব কি আর কম? মুখের কথা বললেই কি কেউ পর হয়?

"পা চালাও হে—" দলের লোকটা হেঁকে উঠল।

হ্যাঁ, পা চালাও, বলে উঠল আমগাছালি, জল-মাটি, মেঘ-বাতাস। পালাও, পালাও, আমরা তোমার কেউ নই। তুমি চলে যাও তোমার নিশ্চিন্তের দেশে, তোমার সম্মানের দেশে।

যতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে না পারছ, কিসের তোমার ক্ষেত-নদী, কিসের তোমার ফুল-ফসল। যতক্ষণ শান্তিতে ঘুম না আসে মাটিকে মায়ের আঁচল বলে ভাববে কী করে?

প্রথমে এসে উঠেছিল শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে। কারু কোনো এলাকা নেই, আব্রু নেই, ঝাড়-দারোয়ান নেই, ছাইয়ের গাদার একপাশে বেরালছানার মত। তারপর জায়গা পেয়েছে ক্যাম্প-কলোনিতে। ডোল পাচ্ছে বটে কিন্তু কাজ জুটছে না। কাঠ-টিন-বাঁশের দরমা-প্যাঁচ দিয়ে তৈরী একটা গর্ত পেয়েছে, কিন্তু আব্রু নেই ঝড়-জল রোখে, রোগব্যাধির মুখোমুখি হয়। দু দুটো ছেলেমেয়ে মরেছে ভুগে ভুগে।

"দেশে ফিরে একবার চেষ্টা করে দেখ না, বাড়িঘর বেচে আসতে পার কিনা।" বললে ঠাকুরদাদাই।

সেই আমাদের অন্তিমের ঘর। নিটুট চালবেড়া।

যদি কিছু দাম পাও। তা দিয়ে যদি একখানা বাড়ি জুটাতে পার এখানে। ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে অকর্মণ্য করে ফেলছে। যদি তখন কাজ জোগাড় করতে আগ্রহ হয়। কাজ করবার ইচ্ছে হয় কার? যে জানে, ক্লান্ত হবার পর আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ঘর যার একটা কাঠ-টিনের হিজি-বিজি, শুতে গেলে যার পা টান করবার জায়গা নেই, তার কাজ করবার স্পৃহা হবে কোত্থেকে? কোলকুঁজো হয়ে বস, হাঁটু দুমড়ে শোও। থাক শুয়ে-বসে। আর ডোল নাও। ডোল না পেলে মিছিল কর।

অনেক দৌড়ঝাঁপ কসরত করে পৌঁছল বাড়িতে।

বাড়ি? বল, কী বলব বাড়ি ছাড়া?

গাঁতায় চাষ-করত যে ছলিম শেখ, সেই দখল করে আছে। তুমিই কিনে নাও না বাড়িখানা। বলি, দর দেবে কত?

নাকের পাশে এক ডেলা মাংস ফুলিয়ে হাসল ছলিম শেখ। চলেই যখন গিয়েছ দেশ ছেড়ে, তখন আর বাড়ির মায়া কেন? ও ত আমার অমনিই হয়ে গিয়েছে।

আগ বাড়িয়ে গিয়েছিল দু-তিনজন মোড়ল-মুন্সির বাড়ি। বললে, "কবালা করে নাও কিছু দাম দিয়ে, তারপর স্বত্বের জোরে বেদখল কর ছলিমকে।"

লেখাপড়ার অনেক হ্যাঙ্গামা। যে যেমন পেয়েছ তাই নিয়েই শান্তিতে থাক।

আমি আবার কী পেলাম?

তোমার নিশ্চিন্তের দেশ, তোমার সম্মানের দেশ।

দোরে দোরে ঘুরল রাইপদ, সকলের মুখেই ঐ এক কথা। তা ছাড়া কবালা করেই বা লাভ কী। টাকা কি নিতে পারবে ট্যাঁকে গুঁজে? সে আরো কষ্ট। ছেলেকে যমে নিলে তবু সয়, চোরে নিলে সয় না।

তবে খালি হাতে ফিরে যাব?

না, তিনখানা মাদুর কিনে চলেছে।

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে চট বিছিয়ে শোয়া চলে না। কখানা মাদুর পেলে ভাল হয়। একখানা বাড়তি হলে পাততে পারে সামনের মাটিটুকুতে। সেই তার দাওয়া, সেই তার উঠোন।

"কী হে, চলেছ যে হন হন করে। বলি বগলের তলায় ও কী?" মাদুর ধরে কে টান মারল পিছন থেকে।

নিশ্চিন্তের দেশে কখন পৌঁছে গিয়েছে রাইপদ, কিন্তু পিছনে এখনো রয়েছে সাপের কিলবিলি। সাপ সব দেশেই সাপ। সর্বত্রই ওদের সমান ফণা, সমান ছোবল।

"তিনখানা মাদুর।" পিছন ফিরল রাইপদ।

"ডিউটি না দিয়ে চলেছ কোথায়?" কাস্টমের পিওন বলরাম চোখ পাকাল।

"এর আবার ডিউটি কী! এ ত আমি ব্যবসা করতে যাচ্ছি না। নিজের ব্যবহারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি—"

"যার জন্যে নিয়ে যাও, ডিউটি লাগবে।"

গলা ঝাপসা করল রাইপদ। "কত?"

চারদিকে তাকাল একবার বলরাম। বললে, "ছ আনা।" বলে চোখে একটা ঝিলিক মারল।

সেই এক ঝিলিকেই ডিউটি তার সঠিক চেহারা নিলে।

এ পর্যন্ত অনেক গুনাগার দিতে দিতে এসেছে। আর বিপদ বাড়িয়ে লাভ কী। দিয়ে দিই ছ আনা।

পকেটে একটা পাকিস্তানী আধুলি। সেটাকে তবে ভাঙিয়ে দাও।

"আমি আছি।" মুকুন্দ এগিয়ে এল। "আমি টাকা ভাঙাই। এই আমার ব্যবসা। তোমারে এই আধুলি থেকে পিওনকে ছ আনা দেবে? বেশ, তাহলে বাকি দু আনা আমার।"

"তোমার কেন?"

"আমার বাটা।"

তাও ত ঠিক। তাহলে আর আধুলির মায়া করে লাভ কী? তোমরা দুজনেই তবে নাও ভাগ করে।

"তা কী করে হয়?" মুকুন্দ টানল হাত ধরে, "আমি কেন দিতে যাব পিওনকে? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি দেবে। আমার সাফ ব্যবসা। আমি শুধু টাকা ভাঙাই। বাটার লেনদেন করি।"

আধুলির বিনিময়ে ছ আনা পয়সা, তিনটি দু আনি, মুকুন্দ দিল রাইপদকে।

আবার তাই, তিনটি দু আনিই রাইপদ দিয়ে দিল বলরামকে। বাবা, বাঁচো মাদুর। বাড়ি যাই। শুকনো বিছানায় শুই গিয়ে. গোল হয়ে।

কিন্তু, ও কী, ওখানে ঐ দাঁড়িয়ে কে?

আগে বুঝতে পারেনি বলরাম। একটা হাফশার্টপরা যুবক সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের উপর। এমনি কত লোকই ত কত ফিকিরে আনাগোনা করে এ-অঞ্চলে। তাদেরই কেউ হবে হয় ত। লক্ষ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু সে না চিনলেও আউটপোস্টের মেজবাবু ঠিক চিনেছে। কোত্থেকে ছুটে এসে মেজবাবু হঠাৎ সেই সাইকেলধারীকে ঠকাত করে এক সেলাম ঠুকে বসল।

বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল বলরামের। তাড়াতাড়ি দু আনি তিনটে ফিরিয়ে দিতে গেল রাইপদকে।

"কেন, কী হল?"

"না, বাবা, দরকার নেই।" রাইপদর হাতের মধ্যে জোর করে গুঁজে দিল বলরাম। চোখের কোনায় ছোট্ট আরেকটি ঝিলিক মেরে বললে, "এখন ত ফিরিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে।"

মুকুন্দ হাসতে লাগল দাঁত দেখিয়ে।

একটা মুহূর্তের ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ। শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পিনাকী। ছদ্মবেশে মহকুমার পুলিশের মাথাল।

"কী হচ্ছে? দেখে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। ইনস্পেক্টরবাবু, য়্যারেস্ট করুন।"

প্রায় কেঁদে ফেলল রাইপদ। কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, কত ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে, কত দুঃখকষ্ট। তারপর তিনখানি কাটিঘাসের মাদুর নিয়ে চলেছি বাড়িতে। ভিক্ষে করে আনিনি, কিনে এনেছি। তারপরে এই জুলুম। গোদের উপরে আবার এই বিষফোঁড়া।

"না, না, তোমার দোষ কী। দোষ এই পিওনটার। পিওনটা ঘুষ নিয়েছে।"

"বা, ঘুষ নিলুম কোথায়?" হাঁ করে রইল বলরাম। "ওর আধুলির চেঞ্জ ওকে ফিরিয়ে দিলুম মাত্র।"

"আধুলির চেঞ্জ?" গর্জে উঠল পিনাকী। "আমি সব দেখেছি। তুমিও এবার দেখবে।" মেজবাবুকে উদ্দেশ করে বললে, "ওর, তোমার নাম কী, রাইপদর একটা স্টেটমেন্ট নিন, কেস স্টার্ট করে দিন।"

"বা, এ কী করে ঘুষ নেওয়া হল?" বলরাম এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল,

শুধু নিলুম ত আমার কাছে পয়সা কোথায় ? ওর পয়সা ত ওর হাতে—"

"পরে ফিরিয়ে দিলে কি হয় ! তার আগেই অপরাধ হয়ে গেছে। গোবধ হয়ে গেছে, তারপর জুতো তৈরি করে দিলে কিছু হবার নয়।" এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পিনাকী। "কিন্তু কে কে দেখেছে ? সাক্ষী কোথায় ?"

দুটো ছোকরা এগিয়ে এল। একজন চায়ের দোকানের বয়, আরেকজন পথচলতি লোক, এসেছিল ব্যবসার তদারকে।

একজন সম্ভ্রান্ত কেউ জোটে না ?

মেজবাবু আরেকজনকে নিয়ে এল। ইনি ডাক্তার। গাঁয়ের ডাক্তার। হাতুড়ে।

তা হক। চিকিৎসা যখন করে, তখন নিশ্চয়ই সম্মানিত।

আমরা সবাই দেখেছি।

"আপনি সব তবে ব্যবস্থা করুন।" ইনস্পেক্টরকে হুকুম করে সাইকেলে বেরিয়ে গেল পিনাকী।

রাইপদকে কাগজ-কলম এনে দেওয়া হল।

"লিখতে পার ?"

"ধরে বেঁধে নামটা সই করতে পারি। আপনিই লিখে নিন।"

লম্বা বিবৃতি দিতে বসল। কী কষ্টে আছে, কী তার ঘরদোরের চেহারা, কিবা তার রুজিরোজগারের দৈন্য, এই সব পাঁচ কাহন। লোনের টাকা কী করে মেরে দিয়েছে দালালে, কাজ দেবে বলে কে ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছে বউয়ের গায়ের শেষ গয়নাটুকু, তারই ফিরিস্তি—

"এ-সব মহাভারত লিখে কী হবে ?" মেজবাবু বিরক্ত হয়ে উঠল "ঘটনা যা ঘটেছে শুধু সেইটুকু বল।"

"বলছি, তারপরে এই উৎপাত। দ'কে হাতি পড়লে বকেও ঠোকর মারে। কেউ টানছে জমি ধরে, কেউ টানছে ঘরের বেড়া ধরে, আর ইনি টানছেন মাদুর ধরে।"

সব পষ্টাপষ্টি বলল রাইপদ। অনেক সয়েছি জুলুম, আর নয়।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি।" বললে পালান, চায়ের দোকানের ছোকরা।

"দিব্যি হাত পাতল, হাত গুটোল।" বললে দাশরথি, ব্যবসার খাতিরে যে আনাগোনা করে।

"দিব্যি চোখ ঠারল।" বললে ডাক্তার।

"আর আমার হাতে এই জলজ্যান্ত প্রমাণ।" মুকুন্দ এগিয়ে এল। বললে, "সেই বাটার দুআনি।"

"তবে এবার সব থানায় চলুন।"

"আবার থানায় কেন ?"

"সেখান থেকেই ত তদন্তের শুরু হবে। প্রথম এত্তেলা হবে। হবে আসামীদের জবানবন্দি।"

সাক্ষীদের নিয়ে রাইপদকে নিয়ে মেজবাবু বাসএ করে থানায় এল। কে কী দেখেছ সাক্ষীরা, এবার বল সব বিস্তং করে।

"আমার মাদুর কখানা ?"

"ও ত আলামত হয়ে গেল। মামলায় একজিবিট হবে।"

"মাদুর কখানা বাড়ি নিয়ে যেতে পাব না ?"

"আগে মামলার নিষ্পত্তি হক, তারপরে। আর ঐ দুআনি তিনটেও দিয়ে দাও। কোন্ তিনটে দুআনি ঘুষ নিয়েছিল তাও মার্ক করে রাখতে হবে।"

"বা, ও ত এখন আমার নিজের হাতে, নিজের পকেটে।"

"তা হক, মামলায় দেখাতে হবে তো। ঘোড়া নেই চাবুক চলতে পারে, পয়সা নেই ঘুষের মামলা চলতে পারে না।"

ছ আনা পয়সাও গেল।

শূন্য হাতে ফিরল রাইপদ।

"কে ?" ছায়া দেখে চমকে উঠল ঠাকুরদাসী।

"ফিরেছি।"

"কিছু আনতে পারলে ?" ঠাকুরদাসী উছলে উঠল।

"শুধু কপাল, শুধু কপাল এনেছি সঙ্গে।"

শুধু কপাল, শুধু কপাল এনেছি সঙ্গে

যেটুকু বা গাছের ছায়া, এসব কি তার পর? মুখের কথা বললেই কি কেউ পর হয়?

"পা চালাও হে—" সঙ্গের লোকটা হেঁকে উঠল।

হ্যাঁ, পা চালাও, বলে উঠল গাছগাছালি, জল-মাটি, মেঘ-বাতাস। পালাও, পালাও, আমরা তোমার কেউ নই। তুমি চলে যাও তোমায় নিশ্চিন্তের দেশে, তোমার সম্মানের দেশে।

যতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে না পারছ, কিসের তোমার ক্ষেত-নদী, কিসের তোমার ফল-ফসল। যতক্ষণ শান্তিতে ঘুম না আসে মাটিকে মায়ের আঁচল বলে ভাববে কী করে?

প্রথমে এসে উঠেছিল শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে। কারু কোনো এলাকা নেই, আব্রু নেই, ঝাড়-টার্কানি নেই, ছাইয়ের গাদায় একপাল বেরালছানার মত। তারপর জায়গা পেয়েছে ক্যাম্প-কলোনিতে। ডোল পাচ্ছে বটে, কিন্তু কাজ জুটছে না। কাঠ-টিন বাঁশের খোরপ্যাঁচ দিয়ে তৈরী একটা গর্ত পেয়েছে, কিন্তু সাধ্য নেই ঝড়-জল রোখে, রোগব্যাধির মুখোমুখি হয়। দু দুটো ছেলেমেয়ে মরেছে ভুগে ভুগে।

"দেশে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ না, বাড়িঘর বেচে আসতে পার কিনা।" বললে ঠাকুরদাসী।

সেই আমাদের আস্তমস্ত ঘর। নিটুট চালবেড়া।

যদি কিছু দাম পাও। তা দিয়ে যদি একখানা বাড়ি তুলতে পার এখানে। ভিক্ষে দিয়ে নিয়ে অকর্মণ্য করে ফেলছে। যদি তখন কাজ জোগাড় করতে আগ্রহ হয়। কাজ করবার ইচ্ছে হয় কার? যে জানে, ক্লান্ত হবার পর আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ঘর যার একটা কাঠ-টিনের হিজি-বিজি, শুতে গেলে যার পা টান করবার জায়গা নেই, তার কাজ করবার স্পৃহা হবে কোত্থেকে? কোলকুঁজো হয়ে বস, হাঁটু দুমড়ে শোও। থাক শুয়ে-বসে। আর ডোল নাও। ডোল না পেলে মিছিল কর।

অনেক দৌড়ঝাঁপ কসরত করে পৌঁছল বাড়িতে।

বাড়ি? বল, কী বলব বাড়ি ছাড়া?

গাঁয়ের চাষ-করত যে ছলিম শেখ, সেই দখল করে আছে। তুমিই কিনে নাও না বাড়িখানা। বলি, দর দেবে কত?

নাকের পাশে এক ডেলা মাংস ফুলিয়ে হাসল ছলিম শেখ। চলেই যখন গিয়েছ দেশ ছেড়ে, তখন আর বাড়ির মায়া কেন? ও ত আমার অমনিই হয়ে গিয়েছে।

আগ বাড়িয়ে গিয়েছিল দু-তিনজন মোড়ল-মুন্সির বাড়ি। বললে, "কবালা করে নাও কিছু দাম দিয়ে, তারপর স্বত্বের জোরে বেদখল কর ছলিমকে।"

লেখাপড়ায় অনেক হ্যাঙ্গামা। যে যেমন পেয়েছ তাই নিয়েই শান্তিতে থাক।

আমি আবার কী পেলাম?

তোমার নিশ্চিন্তের দেশ, তোমার সম্মানের দেশ।

দোরে দোরে ঘুরল রাইপদ, সকলের মুখেই ঐ এক কথা। তা ছাড়া কবালা করেই বা লাভ কী। টাকা কি নিতে পারবে ট্যাঁকে গুঁজে? সে আরো কষ্ট। ছেলেকে যমে নিলে তবু সয়, চোরে নিলে সয় না।

তবে খালি হাতে ফিরে যাব?

না, তিনখানা মাদুর কিনে চলেছে।

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে চট বিছিয়ে শোয়া চলে না। কখানা মাদুর পেলে ভাল হয়। একখানা বাড়তি হলে পাততে পারে সামনের মাটিটুকুতে। সেই তার দাওয়া, সেই তার উঠোন।

"কী হে, চলেছ যে হন হন করে। বলি বগলের তলায় ও কী?" মাদুর ধরে কে টান মারল পিছন থেকে।

নিশ্চিন্তের দেশে কখন পৌঁছে গিয়েছে রাইপদ, কিন্তু পিছনে এখনো রয়েছে সাপের কিলবিলি। সাপ সব দেশেই সাপ। সর্বত্রই ওদের সমান ফণা, সমান ছোবল।

"তিনখানা মাদুর।" পিছন ফিরল রাইপদ।

"ডিউটি না দিয়ে চলেছ কোথায়?" কাস্টমের পিওন বলরাম চোখ পাকাল।

"এর আবার ডিউটি কী! এ ত আমি ব্যবসা করতে যাচ্ছি না। নিজের ব্যবহারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি—"

"যার জন্যে নিয়ে যাও, ডিউটি লাগবে।"

গলা ঝাপসা করল রাইপদ। "কত?"

চারদিকে তাকাল একবার বলরাম। বললে, "ছ আনা।" বলে চোখে একটা ঝিলিক মারল।

সেই এক ঝিলিকেই ডিউটি তার সঠিক চেহারা নিলে।

এ পর্যন্ত অনেক গুনাগার দিতে দিতে এসেছে। আর বিপদ বাড়িয়ে লাভ কী। দিয়ে দিই ছ আনা।

পকেটে একটা পাকিস্তানী আধুলি। সেটাকে তবে ভাঙিয়ে দাও।

"আমি আছি।" মুকুন্দ এগিয়ে এল। "আমি টাকা ভাঙাই। এই আমার ব্যবসা। তোমার এই আধুলি থেকে পিওনকে ছ আনা দেবে? বেশ, তাহলে বাকি দু আনা আমার।"

"তোমার কেন?"

"আমার বাটা।"

তাও ত ঠিক। তাহলে আর আধুলির মায়া করে লাভ কী? তোমরা দুজনেই তবে নাও ভাগ করে।

"তা কী করে হয়?" মুকুন্দ টানল হাত ধরে, "আমি কেন দিতে যাব পিওনকে? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি দেবে। আমার সাফ ব্যবসা। আমি শুধু টাকা ভাঙাই। বাটার লেনদেন করি।"

আধুলির বিনিময়ে ছ আনা পয়সা, তিনটি দু আনি, মুকুন্দ দিল রাইপদকে।

আবার তাই, তিনটি দু আনিই রাইপদ দিয়ে দিল বলরামকে। বাবা, ছাড়ো মাদুর। বাড়ি যাই। শুকনো বিছানায় শুই গিয়ে গোল হয়ে।

কিন্তু, ও কী, ওখানে ঐ দাঁড়িয়ে কে?

আগে বুঝতে পারেনি বলরাম। একটা হাফশার্টপরা যুবক সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের উপর। এমনি কত লোকই ত কত ফিকিরে আনাগোনা করে এ-অঞ্চলে। তাদেরই কেউ হবে হয় ত। লক্ষ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু সে না চিনলেও আউটপোস্টের মেজবাবু ঠিক চিনেছে। কোত্থেকে ছুটে এসে মেজবাবু হঠাৎ সেই সাইকেলধারীকে ঠকাত করে এক সেলাম ঠুকে বসল।

বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল বলরামের। তাড়াতাড়ি দু আনি তিনটে ফিরিয়ে দিতে গেল রাইপদকে।

"কেন, কী হল?"

"না, বাবা, দরকার নেই।" রাইপদর হাতের মধ্যে জোর করে গুঁজে দিল বলরাম। চোখের কোনায় ছোট্ট আরেকটি ঝিলিক মেরে বললে, "এখন ত ফিরিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে।"

মুকুন্দ হাসতে লাগল দাঁত দেখিয়ে।

একটা মুহূর্তের ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ। শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পিনাকী। ছদ্মবেশে মহকুমার পুলিশের মাথাল।

"কী হচ্ছে? দেখে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। ইনস্পেক্টরবাবু, য়্যারেস্ট করুন।"

প্রায় কেঁদে ফেলল রাইপদ। কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, কত ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে, কত দুঃখকষ্ট। তারপর তিন-খানি কাটিঘাসের মাদুর নিয়ে চলেছি বাড়িতে। ভিক্ষে করে আনিনি, কিনে এনেছি। তারপরে এই জুলুম। গোদের উপরে আবার এই বিষফোঁড়া।

"না, না, তোমার দোষ কী। দোষ এই পিওনটার। পিওনটা ঘুষ নিয়েছে।"

"বা, ঘুষ নিলুম কোথায়?" হাঁ করে রইল বলরাম। "ওর আধুলির চেঞ্জ ওকে ফিরিয়ে দিলুম মাত্র।"

"আধুলির চেঞ্জ?" গর্জে উঠল পিনাকী। "আমি সব দেখেছি। তুমিও এবার দেখবে।" মেজবাবুকে উদ্দেশ করে বললে, "ওর, তোমার নাম কী, রাইপদর একটা স্টেটমেন্ট নিন, কেস স্টার্ট করে দিন।"

"বা, এ কী করে ঘুষ নেওয়া হল?" বলরাম এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল,

"ঘুষ নিলুম ত আমার কাছে পয়সা কোথায়? ওর পয়সা ত ওর হাতে—"

"পরে ফিরিয়ে দিলে কি হয়! তার আগেই অপরাধ হয়ে গেছে। গোবধ হয়ে গেছে, তারপর জুতো তৈরি করে দিলে কিছু হবার নয়।" এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পিনাকী। "কিন্তু কে কে দেখেছে? সাক্ষী কোথায়?"

দুটো ছোকরা এগিয়ে এল। একজন চায়ের দোকানের বয়, আরেকজন পথচলতি লোক, এসেছিল ব্যবসার তদারকে।

একজন সম্ভ্রান্ত কেউ জোটে না?

মেজবাবু আরেকজনকে নিয়ে এল। ইনি ডাক্তার। গাঁয়ের ডাক্তার। হাতুড়ে।

তা হক। চিকিৎসা যখন করে, তখন নিশ্চয়ই সম্মানিত।

আমরা সবাই দেখেছি।

"আপনি সব তবে ব্যবস্থা করুন।" ইনস্পেক্টরকে হুকুম করে সাইকেলে বেরিয়ে গেল পিনাকী।

রাইপদকে কাগজ-কলম এনে দেওয়া হল। "লিখতে পার?"

"ধরে বেঁধে নামটা সই করতে পারি। আপনিই লিখে নিন।"

লম্বা বিবৃতি দিতে বসল। কী কষ্টে আছে, কী তার ঘরদোরের চেহারা, কিবা তার রুজিরোজগারের দৈন্য, এই সব পাঁচ কাহন। লোনের টাকা কী করে মেরে দিয়েছে দালালে, কাজ দেবে বলে কে ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছে বউয়ের গায়ের শেষ গয়নাটুকু, তারই ফিরিস্তি—

"এ-সব মহাভারত লিখে কী হবে?" মেজবাবু বিরক্ত হয়ে উঠল 'ঘটনা যা ঘটেছে শুধু সেইটুকু বল।"

"বলছি, তারপরে এই উৎপাত। দ'কে হাতি পড়লে বকেও ঠোকর মারে। কেউ টানছে জমি ধরে, কেউ টানছে ঘরের বেড়া ধরে, আর ইনি টানছেন মাদুর ধরে।"

সব পষ্টাপষ্টি বলল রাইপদ। অনেক সয়েছি জুলুম, আর নয়।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি।" বললে পালান, চায়ের দোকানের ছোকরা।

"দিব্যি হাত পাতল, হাত গুটোল।" বললে দাশরথি, ব্যবসার খাতিরে যে আনাগোনা করে।

"দিব্যি চোখ ঠারল।" বললে ডাক্তার।

"আর আমার হাতে এই জলজ্যান্ত প্রমাণ।" মুকুন্দ এগিয়ে এল। বললে, "সেই বাটার দুআনি।"

"তবে এবার সব থানায় চলুন।'

"আবার থানায় কেন?"

"সেখান থেকেই ত তদন্তের শুরু হবে। প্রথম এজেলা হবে। হবে আসামীদের জবানবন্দি।"

সাক্ষীদের নিয়ে রাইপদকে নিয়ে মেজবাবু বাস্‌এ করে থানায় এল। কে কী দেখেছ সাক্ষীরা, এবার বল সব বিস্তং করে।

"আমার মাদুর কখানা?"

"ও ত আলামত হয়ে গেল। মামলায় একজিবিট হবে।"

"মাদুর কখানা বাড়ি নিয়ে যেতে পাব না?"

"আগে মামলার নিষ্পত্তি হক, তারপরে। আর ঐ দুআনি তিনটেও দিয়ে দাও। কোন্ তিনটে দুআনি ঘুষ নিয়েছিল তাও মার্ক করে রাখতে হবে।"

"বা, ও ত এখন আমার নিজের হাতে, নিজের পকেটে।"

"তা হক, মামলায় দেখাতে হবে ত। ঘোড়া নেই চাবুক চলতে পারে, পয়সা নেই ঘুষের মামলা চলতে পারে না।'

ছ আনা পয়সাও গেল।

শূন্য হাতে ফিরল রাইপদ।

"কে?" ছায়া দেখে চমকে উঠল ঠাকুরদাসী।

"ফিরেছি।"

"কিছু আনতে পারলে?" ঠাকুরদাসী উছলে উঠল।

"শুধু কপাল, শুধু কপাল এনেছি সঙ্গে।"

শুধু কপাল, শুধু কপাল এনেছি সঙ্গে

"যাক, ফিরেছে যে এই আমার ঢের। বস, জিরোও।" একটুখানি চট বিছিয়ে দিল। কী একটা কাজের পিছু খাওয়া কাজ্জ-করতে বললে, "পরে শুনছি তোমার কথা।"

একটু তামাক খেতে ইচ্ছে করছে। সে বিস্তৃত সরঞ্জাম কোথায়? কোথায় সেই বিস্তৃত আলস্য? একটা বিড়ি ধরাল রাইপদ।

কিন্তু বিশ্রাম করবার কি সময় আছে? চল, ওঠ, সাক্ষী দিতে হবে ঘুষের মামলায়।

এ আবার আরেক উৎপাত। দেখ দেখি আর রাজ্যে লোক পেল না আসামী ধরতে। শেষকালে একটা ছ আনা পয়সার ঘুষখোর। একটা নিরীহ গরিব পিওনের ভাতে হাত। কত রাজ্য লোপাট হয়ে গেল, কত পাহাড় ধসল, সমুদ্র শুকোল, সেদিকে নজর নেই, ধরতে ধর কিনা একটা চুনোপুঁটি।

দেখিয়ে দাও না, চোখে পড়ুক না কোথায় রুইকাতলা, দেখ না ধরি কিনা। কিন্তু চোখে যা পড়েছে তাই বা মুছে ফেলি কী করে? ছোট কাঁটাটাও ত তুলে ফেলতে হয়। পিনাকী সবাইকে বুঝিয়ে দিল। আগুনে হাত দিলে কাঁচ ছেলেরও হাত পোড়ে। আইনে হাত দিলে গরিবগুর্বোরও রেহাই নেই। একটা বাড়ি বা দোকানের সিঁদ-চুরির কিনারা করতে পারিনি বলে হাতের কাছে সামান্য একটা পকেটমার পেলে ধরব না?

তা ছাড়া ছোঁড়া তীর ফেরে না। যখন ধরেছি, অপরাধ সপ্রমাণ করতেই হবে। তোমরা চল সব সদরে। রাহাখরচ পাবে, পাবে জলখাবার।

"আমি ঘুষ দিইনি।" হলফান জবান-বন্দি করল রাইপদ।

সে কি কথা? জোঁকের মুখে নুন পড়েছে এমনি গুটিয়ে গেল পিনাকী।

"না। সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম। বলছি শুনুন। আধুলিটা ভাঙাতে দিয়েছিলাম মুকুন্দের হাতে। দু আনা বাটা রেখে ছ আনা পয়সা ওর ফেরত দেওয়ার কথা। পয়সাটা ভুল করে আমার হাতে না দিয়ে, দিয়ে দিল বলরামের হাতে। বলরাম সৎ লোক, সেই পয়সা, আমার পয়সাই আমাকে ফেরত দিল। পুলিশসাহেব মনে করলেন বুঝি একটা ঘুষের কান্ড হয়ে গেল। অক্ষশুলো আবার পাখি, খই আবার জলপান, ছ আনা আবার ঘুষ।"

"তবে ঐ যে দরখাস্ত লিখেছ, ঘুষ নিয়েছে বলরাম।"

"কী বলেছি আর কী লিখেছেন দারোগাবাবু, তা কী করে বলব।"

মুকুন্দকে ডাক।

"চোখের দোষে সব হলদে দেখেছেন সাহেব।" বললে মুকুন্দ। "বলরাম ঘুষ নেবে কেন? আমি টাকা-ভাঙা লেনদেন করি। ও ত আমার এলেকা। আমার পয়সা রাইপদে, রাইপদের পয়সা বলরামে, বলরামের পয়সা আমাতে, আমার পয়সা রাইপদে এমনি একটা চক্কর চলছিল—" কী রকম একটা তালগোল পাকিয়ে দিল।

"তবে এই যে জবানবন্দি দিয়েছ দারোগাবাবুর কাছে?"

"আমাদের আবার জবানবন্দি! চাটজুতোর আবার ফিতে! কী বলেছি আর কী লিখেছে তার ঠিক কী।"

পালানকে ডাক।

"তুমি তখন চা দিচ্ছিলে না?"

"সেই চায়ের পয়সার দাম দিতে গিয়েই ত রাইপদ আধুলি ভাঙাল মুকুন্দের থেকে—নইলে আধুলি ভাঙাবার কী দরকার! রাইপদ বলল বলরামকে, দেখ ত খুচরো-গুলো ঠিক আছে কিনা, চলবে কিনা—"

"আর তুমি দাশরথি?"

"আমার দোকানই বা কোথায়, ঘটনার জায়গাই বা কোথায়। দেখব কি, মাঝখানে একটা তেঁতুল গাছ। আমি কিছু দেখিনি।"

"আর তুমি ডাক্তার?"

"জল জোলাপ আর জোচ্চুরি এই তিন নিয়ে ডাক্তারি করছি। আমার আবার ঘুষ কী।"

একমাত্র সাক্ষী পিনাকী। মুখ ম্লান করে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।

আমি দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। যেমন সব কিছুকে দেখছি চোখের উপর, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যেমন দেখে। তাতে এতটুকু ভুল নেই। ঘুষ ঘুষ, তাতে ছ আনা ছ টাকা নেই। অপরাধী অপরাধী, তাতে গরিব-বড়লোক নেই। স্পষ্ট লিখিত জবান-বন্দি করেছে রাইপদ। পড়ে শোনাবার পর নিজের হাতে দস্তখত করেছে।

করুক। কী বলতে কী শুনেছ কী লিখেছ তার ঠিক কী। তুমি একাই ঠিক দেখলে, আর এতগুলি লোক ভুল দেখল, এ-স্পর্ধার ভিত্তি কোথায়? আধুলি ভাঙাবার পয়সাকেই তুমি ঘুষ দেখেছ।

খালাস হয়ে গেল বলরাম।

কে জানে আমিও ভুল দেখেছি কিনা। মনে মনে বিচার করতে বসল পিনাকী। কিন্তু চোখের কোণে ঐ যে ছোট্ট কটাক্ষ, ঐ যে সঙ্কেতের ঝিলিক, সে কি কখনো ভুল হতে পারে?

"এবার পাব আমার মাদুর তিনখানা? সেই তিনটি দু আনি?" রাইপদ হাত জোড় করল।

"না, এখনো তার দেরি আছে। মালখানার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। লাগবে আরো কাঠখড়।" মেজবাবু হটিয়ে দিল।

আদালতের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে রাইপদ। পাশে এসে দাঁড়াল বলরাম।

"এই দুটো টাকা তুমি নাও।" রাইপদর হাতের মধ্যে দুখানা একটাকার নোট গুঁজে দিল বলরাম।

জ্বলজ্বল করে তাকাল রাইপদ। বললে, "কী, ঘুষ?"

"কথার গুণে তরি কথার গুণে মরি।" হাসল বলরাম, বললে, "ঘুষ নয়, বকশিস।"

দূর থেকে সব দেখছে পিনাকী।

রাইপদর চোখ পড়ল। এবার ঝিলিক ওর চোখে। টাকাটা বলরামকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "না, এ ভিক্ষে। এ ঘুষের চেয়েও অধম।"

কে জানে, এও হয়ত, সমস্তই হয়ত পিনাকীর ভুল দেখা। কিন্তু চোখের সামনে জ্বলছে যে একটি সংকেতের ঝিলিক, একটি কটাক্ষের টুকরো, তার আর ভুল কী।

পাকতিলক

সুবোধ ঘোষ

রের মাঝখানে বেশ লম্বা-চওড়া অথচ বেশ বেঁটে একটা তক্তাপোষ, তার উপর নক্সাদার পুরু বনাতের ফরাশ পাতা। ছোট বড় চারটে তাকিয়া। দেয়ালে মস্ত বড় রঙীন ছবি—আদম ও ইভ। ছবির চওড়া ফ্রেম সোনালী গিল্টি করা। মস্ত বড় একটা দেয়াল ঘড়ি টিক টিক করে। হারমনিয়মটা বাক্সে বন্ধ করা হয়েছে, শুধু এসরাজটা তখনো ফরাশের উপর পড়ে আছে, গেলাপ পরানো হয়নি।

ফরাশের এক কিনারায় বসে মেঝের উপর পা নামিয়ে দিয়ে কোলের উপর একটা গল্পের বই রেখে, হেঁট-মাথা হয়ে বেশ মন দিয়ে পড়ছে মানসী, তাই ঘরের বাইরে থেকে ওর মুখটা ঠিক দেখা যায় না। উপরে একটা রঙীন বেলোয়াড়ী ঝাড় দোলে। সে-কেলে সেই বেলোয়ারী এখন একেবারে ঠাণ্ডা; তার মাঝখানে শুধু গরম হয়ে একেলে বিদ্যুতের একজোড়া আলোর গোলক জ্বলছে। তাই দেখা যায় মানসীর পাউডার ছড়ানো ঘাড়ের সঙ্গে সেঁটে সরু একটি সোনার হার চিকচিক করছে, আর খোঁপার মাঝখানে একটা রুপোর প্রজাপতি।

রাস্তার ফুটপাথ ঘেঁষে এই ঘর। জানালায় পর্দা আছে। ফুটপাথের লোকের

ভিড় সেই পর্দায় সব সময় অস্পষ্ট ছায়া নাচিয়ে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু উঁকি-ঝুঁকির ছায়াগুলিকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। মানসীও বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, অনেকক্ষণ ধরে একটা উঁকি-ঝুঁকির ছায়া জানালার পর্দায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে সরে যায়, আবার ফিরে আসে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে মুখ তোলে মানসী। সদরের দরজাটা কি বন্ধ আছে? কিংবা ভেজানো? না, একেবারে খোলা?

উঠে দাঁড়ায় মানসী। দু'পা এগিয়ে যেতে না যেতেই মচ-মচ্ জুতোর শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। সর্বনাশ! বুকের ভিতরটা থর থর করে ওঠে। সদরের দরজা তাহলে খোলা ছিল!

মানসীর বুকের এই থরথর ভয় এক অদ্ভুত ভয়। নিজের প্রাণের জন্য নয়, পরের প্রাণের জন্য। শুধু আজ নয়, এই দশবছরের মধ্যে কতবার যে এই ভয় মানসীর বুক কাঁপিয়েছে, তার হিসাব মানসীও গুণে বলতে পারবে না। এখনি একটা কাণ্ড হবে। বড় বিশ্রী, বড় হিংস্র সেই কাণ্ড। আবার শুনতে হবে সেই সব চিৎকার আর হুঙ্কার। দেখতে হবে সেই দৃশ্য, ঘুসি লাথি কিল আর চড়ের মাতামাতি। কিংবা লাঠি লোহার রড আর সোডার বোতলের দাপাদাপি।

যা ভেবেছিল মানসী, বোধ হয় তা নয়। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী যেন তার বুকের থরথরানিটাকেই মনে মনে সান্ত্বনা দেয়, না ভয় করবার কিছু নেই। ভদ্রলোক বোধহয় ভুল করেননি। নিশ্চয় বড়দার চেনা মানুষ।

ভদ্রলোক বেশ সৌখীন, অন্তত সাজ-পোষাক দেখে তাই মনে হয়। জুতো থেকে শুরু করে হাতের আংটি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পর্যন্ত সবই ঝকঝকে। বউদির কাছে গল্প শুনেছে মানসী, তাঁর মামাতো ভাই খুব সৌখীন। মানসী জানে, বউদির মামাতো ভাই-এর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, এই ভদ্রলোকের বয়সও যে তাই মনে হয়। বউদির মামাতো ভাই-এর চেহারাটি বেশ, এই ভদ্রলোকও তো বেশ। এমন ভাল চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। চোখের চশমা হাতে নিয়ে চশমার কাচ মুছছেন ভদ্রলোক।

চশমা পরে নিয়ে মানসীর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোকের সেই ঝকঝকে চেহারা যেন এক নতুন খুশির আলোকে আরও চমক দিয়ে ওঠে। দরজার কপাটে এক হাত রেখে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক—তুমি এই ঘরে কতদিন?

বুকের ভিতরে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিয়ে মানসীর ভয়টা যেন রক্তমাখা হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই, ভুল করেছে এই ভদ্রলোক, এই লোকটা; ওর রুমাল থেকে কড়া সুগন্ধ, আর নিশ্বাস থেকে কড়া নেশার দুর্গন্ধ ভুর-ভুর করে উড়ছে। এই বাড়িকে নরকের একটা বাড়ি বলে মনে করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ভদ্রলোকের মত দেখতে ঐ লোকটা।

বড় রাস্তা থেকে বের হয়ে একটা ছোট রাস্তা সোজা বেশ কিছুদূর এসে এখানে সরু হয়ে আর এঁকেবেঁকে এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। ঠিক এখানেই এসে ভদ্রপাড়াটা শেষ হয়েছে, আর অভদ্র পাড়াটা শুরু হয়েছে। মানসীদের বাড়ি, তার পর থেকেই সরু পথের শুরু, মাঝে শুধু ছোট একটা পানের দোকান। সেই সরু পথের দুধারে বড়-বড় বাড়ির যত ফরাস-পাতা আর তাকিয়া-গড়ানো ঘরে লম্পটের ফুর্তি বাসা বেঁধে জীবন যাপন করে। ঠোঁটে রং মেখে আর বাহারে সাজে সেজে প্রতি ঘরের দরজা ও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যাদের চোখ পথের দিকে তাকিয়ে ওৎ পেতে থাকে, তাদের ছায়া মানসীদের এই বাড়ির দেয়ালের গা ছুঁয়েই ফেলতো, যদি মাঝখানে ঐ পানের দোকানটা না থাকতো।

মানসীদের বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়ালে সরু-পথের ঐ পৃথিবীর রহস্যগুলিকে যেমন চোখে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি শুনতেও পাওয়া যায়। ফুলের ফেরিওয়ালা চাঁপার তোড়া আর বেল-জুঁইয়ের মালা হেঁকে বেড়ায়। ব্যস্তভাবে রিক্সা ছুটে যায়, আরোহীর মুণ্ডু নেশার ঝোঁকে কাত হয়ে দোলে আর কাঁপে। এখানে-ওখানে, রকের কোণে বসে আর ল্যাম্প-পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে দালালেরা বিড়ি টানে। কখনো ঘুঙুরের ঝনন্ ঝনন্, আবার কখনো বা মাতালের চিৎকার এই রাস্তার আলো আঁধার আর ধোঁয়া-ভরা বাতাসের বুকে আচমকা বেজে ওঠে। যেমন নিত্য রাতের আকাশে তারা দেখতে হয়, নিত্য ভোরে পাখির ডাক শুনতে হয়, তেমনি সরু পথের এইসব রূপ আর শব্দকে নিত্য দেখে আসছে আর শুনে আসছে মানসী। চোখ-সহা আর কান-সহা হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, পানের দোকানের কাছে শিয়ালের মত চোখ করে ঐ যে দালালের দল বসে আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞেসা করলেই ভুল করতো না এই লোকটা। ওরাই বলে দিত, খুব সাবধান বাবুমশাই, ওটা হলো প্রাইভেট বাড়ি, ওখানে ভদ্রলোক থাকে। অনেকেই বাড়িটার মনুষ্যত্ব অনুমান করে নিতে পারে না বলেই তো এই ভুল করে, এবং তারপর সেই সব ভয়ানক কাণ্ড হয়।

কিন্তু মানসীর মুখ দেখেও কি মানসীর মনুষ্যত্বটা ওরা অনুমান করতে পারে না? পারে না নিশ্চয়। ওদের চোখের এই ভুলে মানসীর মনের গায়েও জ্বালা জ্বলেছে অনেক। কিন্তু আর বোধহয় জ্বলে না। গা-সহা হয়ে গিয়েছে। হয় ওদের চোখে ভুল আছে, নয় মানসীর মুখে ভুল আছে।

এই বাড়ি হলো সেই ভয়ানক, গম্ভীর ভানু মিত্রের বাড়ি; মানসীর বড়দাদা ভানু মিত্র। তিনি আছেন বলেই বোধহয় ঐ অভদ্র সরু-রাস্তার কোন পাপের আহ্লাদ এই ভদ্রপাড়ার পথে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবার সাহস পায় না। যা-কিছু ভুল আর যা-কিছু গণ্ডগোল, তার সবই এই বাড়ি পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারে না। ভানু মিত্রের ভয়ানক শাসন লোহার রডের মার মেরে সব ভুল শায়েস্তা করে দেয়। ভুলগুলি হাত-জোড় করে, ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরে, মাপ চেয়ে আর নাক-মুখের রক্ত মুছতে মুছতে ছুটে পালিয়ে যায়।

দেখলে মনে হবে, বাড়িটা যেন এক-কালের বেশ বড় বনেদিপনার ছোট এক ফালি অবশেষে। পুরণো বনেদিপনার একটা চুণখসা ফ্যাকাসে স্মৃতির মত দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, ভোঁতা কার্নিশ আর মোটা একটা থাম। থামটার গায়ে অজস্র সিঁদুর হলুদ আর চন্দনের, এবং গোবরেরও ছোট ছোট থেবড়ানো ফোঁটার দাগ শুকিয়ে লেগে আছে। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে ভেজা কাপড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকবার আগেই এই থামের গায়ে তিলক-কাটা কপাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ভানু মিত্র।

বয়স হয়েছে ভানু মিত্রের, মাথার চুল যতখানি সাদা, ততখানি কাঁচা। পঞ্চান্ন বছর বয়সে যতখানি গম্ভীর হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি গম্ভীর। ঘরে যত-ক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ আদুড় গা। হাটে-বাজারে আর বেড়াতে যাবার সময় চীনে কোট। চাকরি-বাকরি করতে লজ্জা পান, করেন না। তিনপুরুষের সেই বনেদী সম্মানের ধারা ভানু মিত্রও নষ্ট করে দিতে পারেন নি। কিছু টাকাপয়সা আছে নিশ্চয়, কিন্তু তেমন কিছু নয় বোধহয়, নইলে এত-দিনে একমাত্র বোন মানসীর বিয়েটাও চুকিয়ে দিতে পারতেন। বয়স তো কম নয় মানসীর। পাড়ার মেয়েরা জানে, এবং আত্মীয়-কুটুম্বরাও বলে, মানসীর বয়স ত্রিশ পার হয়ে একত্রিশে পড়েছে, কিংবা আরও একটু বেশি হতে পারে, কম তো নয়ই।

কিন্তু মানসীর বিয়েব জন্য চেষ্টার দিক দিয়ে কোন ফাঁকি রেখেছেন, আর কোন ত্রুটি করেছেন, এই নিন্দা ভানু মিত্রের শত্রু কালাচাঁদবাবুও করেন না। বরং খুব বেশি চেষ্টা করেন বলেই তো নীচের ঐ ঘরটিকে

একটু দাঁড়িয়ে রাখতে হয়, ফরাশ পাততে হয়, আর মানসীকেও প্রায়ই এই ঘরের ভিতরে এসে এসরাজ বাজাতে হয়। পাত্র-পক্ষ পাত্রী দেখতে আসেন। খড়দহ থেকে যারা মানসীকে দেখতে এসেছিল, তারা এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেল।

মাসের মধ্যে দুটি সপ্তাহ বাদ যায় কিনা সন্দেহ, পাত্রপক্ষের চোখের সামনে এসে মানসীকে দাঁড়াতে না হয়। যতদূর পারা যায়, স্নো আর পাউডারে মুখটাকে ঘষে মেজে ঝকঝকে ক'রে, সবচেয়ে বেশি জম-জমাট রং-এর জামদানি শাড়ি অনেক কায়দা করে গায়ে জড়িয়ে পাত্রপক্ষের চোখের সামনে বসেও থাকতে হয়। সেই সব চোখের মধ্যে স্বয়ং পাত্রেরও চোখ জ্বলজ্বল করে। মানসীর চেহারাটাকে পছন্দ করে ফেলতে কারও চোখে একটুও দেরী হয় না। শুধু এসরাজ বাজিয়ে রেহাই পায় না মানসী, গানও গাইতে হয়। হাতের কাছে হারমনিয়ম টেনে নেয়। চা খান আর পান চিবোন পাত্র-পক্ষের ভদ্রলোকেরা; সিগারেটের ধোঁয়াও ওড়ে। ঠোঁটে হাসি চোখে খুশি, মুখে নানা ফরমাইশ কীর্তনটা থাক, এইবার একটা আধুনিক গান গাও শুনি।

কখনো আধ-ঘণ্টা, এবং কখনো বা দেড়-ঘণ্টা ধরে এইরকমই একটা সুন্দর মুখ-দেখার আনন্দের কাছে বসে পাত্র আর পাত্র-পক্ষ বিদায় নেন। এবং তার ক'দিন পরেই গম্ভীর ভানু মিত্রের মুখে সেই একই কথা ঘড়ঘড় করে বাজে। —না, হলো না, দরে পোষালো না। বড় বেশি দাবি।

আর, মাসের মধ্যে তিনটে সপ্তাহও যায় কি না সন্দেহ, এই বাড়ির জানালার পর্দায় আর-এক রকমের পছন্দের ছায়া উঁকিঝুঁকি দিয়ে উসখুস না করে গিয়েছে। চীনে কোট গায়ে ভানু মিত্রের শক্ত পাথরের মত মূর্তিটা ঐ মোটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঘের মত গর্জে উঠেছে—সাবধান। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি রে হতভাগা।

তাছাড়া, মাঝে মাঝে এই লোকটারই মত ভুল করে কোন হতভাগা সদর খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে মানসী, আর ভানু মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে উপরতলার ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসেছেন, হাতে মোটা লোহার রড।

কোন চঞ্চলতা নেই, একেবারে শান্ত কঠোর ও গম্ভীর ভানু মিত্র সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে চাপা-স্বরে বলেন—বটকেষ্ট আছ না কি?

—হ্যাঁ, জ্যেঠামশাই।

—শয়তান ঢুকেছে, লোক ডাকতে হয়। ব্যস্, তারপর আর একটি মিনিটও দেরী হয়নি। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে শয়তানের মাতাল মুখের হাসি যখন আরও টলমল করে ওঠে, ঠিক তখনই শয়তানের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ে সোডার বোতলের প্রচণ্ড এক বাড়ি। রোগা আর ষণ্ডা নানা চেহারার ছোট একটা ভিড় ছুটে এসে শয়তানকে ঘিরে ধরে। কারও হাতে হকি স্টিক, কারও হাতে চাবুকও থাকে।

ভানু মিত্র শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আর একবার হাঁক দেন—মেরে বেহুঁস করে দাও, তাহলেই হুঁস হবে।

তারপর, চড় ঘুসি লাথি চাবুক আর হকিস্টিকের একটা আক্রোশ যেন উৎসবে মেতে ওঠে। হঠাৎ ভয়ে আধমরা, আর মার খেয়ে আরও ভীত সেই সয়তানের আর্ত মুখটা ভুল বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—মাপ করুন মশাই, ছেড়ে দিন দাদা! ওঃ, দিব্যি করছি স্যার! এই ভুল আর কখনো হবে না।

—কেন এমন ভুল হয়? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন ভানু মিত্র। —দেখতে পাও না কেন যে, এই পানের দোকানের পর থেকে সয়তানদের ঐ নরকপাড়া শুরু?

ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরবার জন্য ঝুঁকে পড়ে আর হাত বাড়ায় সয়তান। ভানু মিত্র শান্তভাবে শেষ নির্দেশ উচ্চারণ করেন—এইবার বের ক'রে দাও।

উপরের ঘরে উঠে যাবার আগে ভানু মিত্র যেন নিজের মনে তাঁর জীবনের সব-চেয়ে কঠিন একটি বিশ্বাসের মন্ত্র আস্তে আস্তে বলেন—চরিত্তির যার নেই, তার মরে যাওয়া ভাল, তাকে মেরে ফেলাও ভাল।

আজ দশ বছর ধরে এই একই কথা শুনে আসছে মানসী। খুব সত্যি কথা, ভানু মিত্রের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এই জনাই তো মানসীর ভয়। আজ এই মুহূর্তে সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা ঐ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই ভয়েই মানসীর বুক কাঁপছে। এখনি একবার চেঁচিয়ে উঠতে হবে, এবং সেই মুহূর্তে নেমে আসবেন বড়দা, হাতে লোহার রড। তারপর...।

হঠাৎ যেন মানসীর ভয়ের কাঁপুনিটাই একটু মৃদু হয়ে যায়। বড়দা এখন বাড়িতে নেই, হরিসভায় গান শুনতে গিয়েছেন।

লোকটা বলে—গান-টান ভাল আসে তো, না শুধু লোক টানবার জন্যে মিছিমিছি হাতের কাছে একটা এসরাজ গড়িয়ে রেখেছ?

—আপনি চলে যান। চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

—তার মানে? কারও বাঁধা হয়ে আছ নাকি? না, কারও কাছ থেকে বায়না নিয়ে রিজার্ভ হয়ে আছ?

মানসী বলে—আপনি খুব ভুল করেছেন, ভুল করে ভয়ানক অন্যায় করেছেন; এটা ভদ্র-লোকের বাড়ি।

—অ্যাঁ? চমকে ওঠে লোকটা। একটা লাফ দিয়ে দু'পা পিছনে সরে যায়। রুমাল দিয়ে চোখ মোছে আর বিড় বিড় করে—তাই তো, ছিঃ, এ কি কাণ্ড হলো? সত্যিই ভুল হয়েছে, ভয়ানক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনি মাপ করুন। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

চলে যেতে থাকে লোকটা। ঘরের দরজা থেকে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে ছোট্ট সরু বারান্দার উপর দিয়ে সদরের দরজার দিকে চলে যায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে কর্কশ স্বরে ডাক দেয় মানসী—শুনছেন।

থমকে দাঁড়ায় লোকটা, পিছন ফিরে তাকায়। মানসী বলে—এই যে, আপনার কি-সব যাচ্ছেতাই নোংরামি এখানে পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে যান।

সেণ্ট-মাখা রুমালটা, আর একটা চাঁপার তোড়া পড়ে আছে ঘরের দরজার চৌকাঠের কাছে। নেশাড়ে লম্পটের শিথিল হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছে কতগুলি আবর্জনা।

লোকটা বলে—ওগুলি লাথি মেরে সরিয়ে দিন। এমন কিছু দামী জিনিস নয় যে, তুলে নিয়ে যেতে হবে।

আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী—না, পারবো না। পা দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে। এখ্খুনি তুলে নিয়ে যান।

ফিরে আসে লোকটা। আর সেই দুটি নোংরা আবর্জনা, একটা সেণ্ট-মাখা রুমাল আর একটা চাঁপার তোড়া তুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

আবার ব্যস্তভাবে চলেই যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ভানু মিত্রের বোনের মনটাও যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে লোহার রডের মত দুলে ওঠে।—খুব বেঁচে গেলেন আপনি।

—তার মানে?

—তার মানে, এই ভদ্রপাড়ার ভিড়ের হাতে পড়লে যে হাত-পা ধরে মাপ না চাওয়া পর্যন্ত রেহাই পাবেন না।

—আমি কারও কাছে মাপ চাই না। জীবনে শুধু এই একবার মাপ চেয়েছি, আপনার কাছে।

মানসীর রুক্ষ গলার স্বর হঠাৎ যেন বড় বেশি নরম হয়ে যায়।—আমি না হয় মনে মনে মাপ করে দিলাম, কিন্তু ধরতে পারলে এই ভদ্রপাড়ার ভিড় আপনাকে মেরেই ফেলবে।

—মরে যাবার আগে আমিও যে কয়েকটাকে মেরে রেখে যাব।

সাংঘাতিক, কী কড়া মেজাজ! জীবনের এই দশার জন্য একটুও লজ্জা নেই, ভয়ানক এক অহংকারের সাপের মত ফোঁস করে

কথা ভুলেছে লোকটা। কি আশ্চর্য, লোকটা যেন এই ভদ্রপাড়ার যত ঘেন্না রাগ আর আক্রোশগুলিকে তুচ্ছ করার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানসীর গলার স্বর হঠাৎ ভীরু হয়ে যায়—আপনাকে অপমান করার জন্য আমি এসব কথা বলছি না। আপনার ভালর জন্যই বলছি।

লোকটা আশ্চর্য হয়ে যায়—আমার ভাল?

অজানা অচেনা একটা লোক, ঐ সরু রাস্তায় যত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা যতসব পাপের রং-মাখানো ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ফুর্তির দাম দরাদরি করে, বেহায়া গলার গান আর মাতাল পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শোনে, সেই লোকটার জীবনের ভালর জন্য এ কেমন মায়ামাখানো কথা হঠাৎ বলে ফেলেছে মানসী।

লোকটাও এইবার যেন মানসীর মুখের একটা কথা শোনবার লোভে লোভী হয়ে আস্তে আস্তে বলে—আপনি যেন কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন!

—হ্যাঁ, বলছিলাম...। বলতে গিয়েই থামে, তারপরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানসী বলে—ঐ বাজে রাস্তায় আর যাবেন না।

আগেই মুখ ফিরিয়েছিল মানসী; এইবার কথাটা বলে ফেলেই চোখ বন্ধ করে। নিথর হয়ে শুধু দেয়াল ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শোনে। সামান্য একটা অনুরোধের কথা লজ্জার মাথা খেয়ে বলে দিতে পেরেছে মানসী। এইবার চলে যাক লোকটা। যেন আর কোন প্রশ্ন না করে; মচমচ জুতোর শব্দ সদরের দরজা পার হয়ে বাইরের পৃথিবীর ঐ হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দের মধ্যে মিলিয়ে যাক। হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সদরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসবে মানসী।

কিন্তু কোন শব্দ হয় না। বুঝতে পারে মানসী, এখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বোধ হয় সেইরকমই বেহায়ার মত আবার দু চোখ অপলক করে মানসীর খোঁপার প্রজাপতি দেখছে। কী বিশ্রী অস্বস্তি। মানসীর সারা শরীরটা শিউরে উঠতে থাকে।

—আপনি ভাল কথাই বলছেন। দেখি, আপনার কথা যদি রাখতে পারি।

কেউ যেন অনেক দূরে স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে কথা বলছে। লোকটা চলে যাচ্ছে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় মানসী, দেখতে পায়, লোকটাই মুখ ফিরিয়ে সদরের দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শক্ত আর অহংকেরে চেহারাটা যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছছে লোকটা। বোধ হয় এতক্ষণে লুকিয়ে দেখার একটা সুযোগ হয় বলেই বেশ ভাল করে লোকটাকে দেখতে পায় মানসী। রাশভারি শক্ত চেহারার মানুষ না ছাই। নিতান্তই একটা ছেলেমানুষের অভিমানী চেহারা যেন ক্লান্ত হয়ে, কে জানে এই পৃথিবীর কার উপর রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখের কাছে শাড়ির আঁচল টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মানসী; আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে দেখতে থাকে, বেশ তো সুন্দর আর দিব্যি শান্ত একটা কাঁচা মুখ। মানুষটা নিজের বাড়িতে তো এই রকমই ক্লান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, লোহার রড নিয়ে কেউ ওকে মেরে ফেলতে ছুটে আসে না।

চাঁপা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে। নাকে কাপড় চেপে সরে যেতে ভুলে গিয়েছে মানসী। ঐ অজানা অচেনা মানুষটার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে, হেঁটে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। মানসী বলে—আর এখানে সময় নষ্ট করবেন না, বাইরে গিয়ে একটা রিকসা করে বাড়ি চলে যান।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন।

—কিসের আশ্চর্য? ইচ্ছা করে নয়, চেষ্টাও করেনি মানসী, প্রশ্নটা যেন মানসীর মুখ থেকে নিজের আবেগে ছুটে বের হয়ে গিয়েছে।

লোকটার চোখ দুটোও বোধহয় এই কঠিন প্রশ্নের চমক সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে না। এই প্রশ্নের কতরকমই তো উত্তর হতে পারে, কে জানে কোনটা সত্য। মানসীর মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, মানসীকে আরও কয়েকটা কথা বলতে মনটা আকুল হয়ে ওঠে; নিজের জীবনের একটা রাক্ষুসে পরিচয়কে মানসীর চোখের [illegible] ধরা পড়িয়ে দিয়েছে, তবু মানসী তারই জীবনের ভালর জন্য ভেবে ফেলেছে; তাই আশ্চর্য হয়েছে মানুষটা। এর মধ্যে কোনটা সত্য, একশবার মুখ খুলে দিলেই তো মানসীর জীবন একটা শর্ত পেয়ে যায়।

কি যেন ভাবছে লোকটা। লোকটার মনের ভাবনাগুলি বোধ হয় আবার ভুল করে একটা ভিন্ন জগতের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভয় পেয়েছে বোধ হয়; চলে যাবার জন্য উসখুস করছে লোকটার পা দুটো। মনে হয় মানসীর, এইবার সত্যিই আতঙ্কিতের মত থর থর করে উঠেছে ভদ্রলোকের ঐ ক্লান্ত ও উদাস মুখটা।

মানসী বলে—আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না।

—কেন বলুন তো? কেন ক্ষতি করবেন না? আমি তো আপনাকেই অপমান করেছি। লোকটার কথাগুলি যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে ছটফট করছে।

হেসে ফেলে মানসী—সে তো ভুল করে, ইচ্ছে করে তো নয়।

—আপনি সত্যিই সেটা বিশ্বাস করেছেন?

—করেছি।

—তাহলে আমার আর কোন দুঃখ নেই।

বলতে বলতে লোকটাও হেসে ফেলে। যেন এতক্ষণ ধরে বুকের ভিতর কতগুলি কালো ধোঁয়া জমাট হয়েছিল, মানসীর হাসির এক ছোঁয়াতেই সেই জমাট ধোঁয়া ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে বের হয়ে গিয়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে সারা মুখ, হাসিটাও ঐ মুখে কী সুন্দর মানিয়েছে।

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটাও হঠাৎ যেন চাঁপার গন্ধের মত ফুরফুর করে উড়তে শুরু করেছে। দেখতে থাকে মানসী, ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন; এই বাড়িটার পুরনো ইঁট-কাঠের রূপ দেখে কি-যেন ভাবছেন। ব্যাধের ফাঁদের মত যে-বাড়িটা এই সরু পথের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে আর যত ভুলের জানোয়ারকে বাগে পেলেই ঘায়েল করে, সেই বাড়িটাই ভদ্রলোককে কী সুন্দর নির্ভয়ের উপহার দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে। বোধ হয় এই বিস্ময় সহ্য করছেন। যেন কতকাল এই বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে, স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে বারান্দার উপর পায়চারী করছেন।

লোকটা হাসতে হাসতে বলে—কি অদ্ভুত ব্যাপার। ধরুন, এই আমিই যদি সকাল বেলা আপনার বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা করতে আসতুম, তবে এই আপনিই আমাকে অনায়াসে বসতে বলতেন, এমন কি এক গেলাস জলও খেতে দিতেন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মানসী—জল খাবেন?

লোকটা বলে—দিন, জল খেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাই।

ঘরের ভিতর থেকে গেলাসে করে জল আনে মানসী, দরজার কাছে দাঁড়ায়। আর, দরজার চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস হাতে তুলে নেয় লোকটা। মানসীও অনায়াসে একটা অচেনা মানুষের বেআইনী পিপাসাকে শান্ত করার জন্য তার হাতে জলের গেলাস তুলে দিতে পারে।

জল খেয়েই হাঁপ ছাড়ে লোকটা—এই ভাল।

মানসী—কি?

—এই যে, আমি আপনার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জল খেলাম, আর আপনি দরজার ওপারে থেকে জল দিলেন। এই যথেষ্ট।

গম্ভীর হয় মানসী—আপনাকে ঘরের ভিতরে এসে জল খেতে বলবো, এত সাহস আমার নেই।

কোন উত্তর দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা। ওর চোখ দুটো যেন নতুন পিপাসায় আর্ত হয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের শান্তিজল খুঁজছে। মাথা হেঁট করে, মুখ নামিয়ে নেয় মানসী। লোকটা বলে—সে সাহস থাকলেও আপনার কোন ক্ষতি হতো না।

মানসীর গলার স্বর জ্বলে ওঠে—একি বলছেন আপনি? ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই?

—আছে, তফাৎ হলো একটি চৌকাঠ।

হেসে ফেলে মানসীর গম্ভীর মুখ। অচেনা মানুষটাও হাসে।

—যাই এবার। কিন্তু যাই-যাই করে লোকটা যায় না।—চলে যান এবার, মানসীও এই ছোট্ট একটা কথা মুখ খুলে বলে দিতে পারে না। এই ঘরের অন্তরাত্মাটাই যেন ক্ষণস্বপ্নের ছলনায় ভুলে গিয়েছে যে, হরিসভার গান শুনে সেই ভয়ানক ভানু মিত্রের এখন বাড়ি ফিরে আসার সময় হয়েছে।

—তার চেয়ে বরং বলুন, আমার ও আপনার মধ্যে অনেক তফাৎ। হঠাৎ বলে ওঠে লোকটা, আর বলতে গিয়ে চোখের দুকোণে যেন একটা খোঁচা-লাগা আঘাতের ছায়া জ্বলো হয়ে ওঠে।

উত্তর দিতে গিয়ে মানসীও অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন এই ঘরের দশ বছরের ইতিহাস ভয়ানক একটা ঘৃণা হয়ে মানসীর বুকের ভিতর শিউরে উঠেছে।—কোন তফাৎ নেই।

—আমি বাজে লোক, ঐ সব পথের ঘরে ঘরে গিয়ে গান শুনি।

—আমি বাজে মেয়ে, আমার ঘরে লোকের পর লোক এসে গান শুনে যায়।

—কখখনো না, হতে পারে না। আমাকে এই ভয়ানক মিথ্যা বিশ্বাস করতে বলবেন না। চেঁচিয়ে-ওঠে লোকটা। লোকটার মেজাজ যেন হঠাৎ আবার পাগল হয়ে গিয়েছে।

মানসীর চোখ দুটোও যেন এক অদ্ভুত বিস্ময়ের মায়ায় ছলছল করে ওঠে।—একি করছেন আপনি?

—হ্যাঁ, আমি যা বিশ্বাস করেছি তাই বিশ্বাস করতে দাও। যদি ভুল বুঝে থাকি, ভুল বুঝেই চলে যেতে দাও। দয়া করে

অপরিচয় — শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

বরং একটা মিথ্যে কথা বল লক্ষ্মীটি, কোন সত্যি কথা বলে আমার ভুল ভেঙে দিও না।

—কি বিশ্বাস করেছেন আপনি?

—তুমি আমাকে ঘেন্না করনি, বরং আমাকে...।

সদর দরজার কাছে খটখট খড়মের শব্দ, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ।

—সর্বনাশ! আঁচল তুলে চোখ ঢাকে মানসী।—আমি ভুল করে আপনার সর্বনাশ করলাম। মানসীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা রক্তমাখা ভয়ের শিহর পাঁজর ছিঁড়ে ঠেলে উঠতে থাকে।

—অ্যাঁ? কে? এ কে রে মানসী? কাছেই এসে থমকে দাঁড়ান, আর অচেনা লোকটার মুখের দিকে তাঁর গম্ভীর মুখের ঘৃণা ও বাঘা চোখের আক্রোশ হানতে থাকেন ভয়ানক ভানু মিত্র।

লোকটা যে সত্যিই কেউ নয়। কি উত্তর দেবে মানসী? উত্তর নেই। উত্তর হয় না, কিন্তু উত্তর দিতে এক মুহূর্তও দেরী করলে চলবে না। দেরী করা সাজে না। তাহলে এই ভদ্রপাড়ার সব মনুষ্যত্বই যে ঘৃণায় শিউরে উঠবে, আর পানের দোকানের পাশ থেকে দালালেরা ছুটে এসে হেসে ফেলবে। চীৎকার করে উঠবে পৃথিবীটা—ভানু মিত্রের বোন ঘরে লোক ঢুকিয়েছে। খিল-খিল করে হেসে উঠবে ঐ সব রাস্তার দুধারে ঠোঁট-রাঙানো যত পয়সার দাসী ফূর্তিবিহারিণীর দল।—ঘরে বাবু বসিয়েছে ভানু মিত্রের বোন।

মানসী বলে—জানি না।

ছোট্ট একটা কথা, সত্য কথা, কিন্তু কী দুঃসহ সত্য কথা! দম বন্ধ করে কথাটা বলতে গিয়েই মানসীর চোখের কোণে ছলাক করে ওঠে বিচিত্র এক বেদনার জল।

—তাই বল। দাঁতে দাঁত চাপলেন ভানু মিত্র। তারপরেই এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি-কোঠার অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে আবার বের হয়ে এলেন। হাতে লোহার রড।

সত্যি কথাই বলেছিল লোকটা। লোকটা নির্বিকার। ভানু মিত্রের লোহার রডের দিকে যেন ভ্রূক্ষেপও করতে চায় না। লোকটা কি সত্যিই এই ভদ্র পৃথিবীর যত শাসিত গর্জন মার আর আস্ফালনের সঙ্গে মারামারি করে মরে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু মরে যাবার আগে, কিংবা রক্তমাখা মাথা আর নাকমুখ নিয়ে চলে যাবার আগে, অথবা পুলিশের হাতে চালান হবার আগে জেনে যেতে পারবে না লোকটা, ভানু মিত্রের বোন

তার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, কথাটাকে মুখ খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি না। জানি না কেন, লোকটার মানসী এই লোকটাকেই চাপা করুণের সঙ্গে যেন এক এক সম্পূর্ণ রকম মুখে বলতে ভাল লেগেছে মানসীর।

লোকটাও যেন এই কথাটা সব ভুলে গিয়ে মানসীর অদ্ভুত অর্থহীন কান্নার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে যেন বিহ্বল হয়ে রয়েছে। কিংবা সেই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছে।

লোহার রড তুলেছেন ভানু মিত্র—এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি, এই কাণ্ডজ্ঞান নেই কেন, এত লম্বা?

—বাবা! চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

ভানু মিত্র কটমট করে তাকান—কি?

—উনি ভুল বুঝেছেন, মাপ চেয়েছেন।

—ভুল বুঝবার আগেই মাপ চায় কেন? খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে যে।

—ওঁকে দিন বাবা।

—তুই এখানে দাঁড়িয়ে অবলাপনা করিস না মানসী। কেন রে না। কিছু শিক্ষে না দিলে এর আক্কেল হবে না।

লোহার রড ফেলে দিয়ে পায়ের খড়ম হাতে তুলে নেন ভানু মিত্র। মানসী ছুটে এসে হাত চেপে ধরে—না।

ভানু মিত্র—কিসের না?

মানসীকে আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ভানু মিত্র—না, বেটার কপালটাকে অন্তত একটু দাগিয়ে দিতে হবে, নইলে......।

লোকটারই দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে মানসী চেঁচিয়ে ওঠে—আঃ, দাঁড়িয়ে দেখছেন কি আপনি? চলে যেতে পারেন না? লজ্জা করে না আপনার?

লোকটা নির্ভয় নির্লজ্জতার একটা পাথর যেন। নড়ে না, একটা কথাও বলে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভানু মিত্রের এই ভয়ানক হিংস্র আস্ফালনকে একটা তামাসা মনে করে শুধু চুপ হয়ে দেখছে। কিংবা ওর সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

দাঁত কড়মড় করেন ভানু মিত্র—চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্কেল, একটুও লজ্জা নেই, ভয় নেই।

—কিসের ভয়? এতক্ষণে আস্তে একটা কথা বলে লোকটা।

ভানু মিত্রের বাঘা-চোখ ধকধক করে।—প্রাণের ভয় রে হতচ্ছাড়া।

—না, সে-ভয় করি না।

—ভেবেছিস আমি একা? এই ভদ্রপাড়ার সব লোক এসে যে তোকে ছিঁড়ে মেরে ফেলবে রে চরিত্রহীন কুকুর।

—মরবার আগে আমিও দু চারটেকে মেরে ফেলবো।

—অ্যাঁ? চমকে তিন পা পিছিয়ে যান ভয়ংকর ভানু মিত্র।—এটা যে সত্যিই একটা বেপরোয়া ক্ষেপা কুকুর।

—আপনিই বা কি কম ক্ষেপা?

গর্জন করেন ভানু মিত্র—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা? কিসে আর কিসে? তুমি মদ খেয়েছ, আমি মদ খাই না। তোমার আর আমার মধ্যে তফাৎ নেই?

—আছে।

—কিসের তফাৎ সে জ্ঞান আছে কি?

—আছে। শুধু একটা গেলাসের তফাৎ।

চলে যেতে থাকে লোকটা। ভানু মিত্র হুংকার ছাড়েন—রসিকতা। আচ্ছা! এপথে আর একবার এস যেন। ধর্ম ও অধর্মের তফাৎটা বুঝিয়ে দেব।

লোকটা বলে—খুব বুঝেছি। তফাৎ তো ঐ একটা খড়ম। আপনার হাতে আছে, আমার হাতে নেই।

বলতে বলতে চলে গেল লোকটা। ভানু মিত্র আবার হুংকার দেবার আগেই ছুটে গিয়ে সদরের দরজা বন্ধ করে দেয় মানসী।

লোকটা তাহলে কথা রেখেছে। মানসীর ছোট একটা অনুরোধের কথা। কত সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, কত রাত গভীর হয়, এই পথের উপর দিয়ে কত রিক্সায় চড়ে কত উল্লাসের চেহারা ছুটে চলে যায়, সরু রাস্তার দুই পাশে ঐ নেশা, ফূর্তি, ঘুঙুর আর মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে দরাদরির এক রহস্যের দিকে। কিন্তু এই অফুরান লালসার মিছিলের মধ্যে সেই মানুষটাকে আজও দেখা গেল না। মানসীর কথা রেখেছে লোকটা, ভাবতে আশ্চর্য লাগে মানসীর।

পঞ্জিকা দেখে এক একটি সুদিনে আর শুভক্ষণে নতুন নতুন পাত্রপক্ষেরও মিছিল এসে যথারীতি মানসীর ঘরে এই ফরাশ পাতা তক্তাপোষের উপর বসে। মানসীও যথারীতি সাজে, পাত্রের ও পাত্রপক্ষের চোখের সামনে এসে বসে। তারপর গান গেয়ে চলে যায়।

শুধু যখন সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, তখন ঐ বাইরের গানের ভিতরে চাপা মানসীর মনটা একেবারে অভদ্র হয়ে যায়। আলো

নিভিয়ে দেয় মানসী। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। আর পথের ঐ সব অমানুষের মিছিলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মনের ভিতরে লুকিয়ে একটা আক্ষেপ যেন মানসীর জীবনটাকেই ঠাট্টা করতে থাকে। যে মানুষটাকে ঐ পাপের পথ থেকে সরে যাবার জন্য গালভরা ভদ্র অনুরোধ শুনিয়েছিলে, আজ সেই মানুষটাকেই ঐ পথের ভিড়ের মধ্যে দেখতে চাও কেন? দেখতে পেলে কি ঘেন্নায় শিউরে উঠবে না মন?

না, একটুও না। তবু তো তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। মানসীর চোখের জ্বালাগুলিই যেন কটকট করে ঐ ঠাট্টার উত্তর দেয়। আরও শক্ত হয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

রাগ হয় লোকটার উপর। বেশ তো নিজে চট করে এই পথের ঘেন্না থেকে সরে গিয়ে ভাল হয়ে গেল, আর মানসীকে এই পথের ঘেন্নার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেল। কি ভয়ানক, এ যে ঠিক সরু রাস্তার ঐ ওদেরই মত জীবন। একটা ভাল মানুষকে এই কুপথে দেখবার আশায় ধ্যান করছে মানসীর প্রাণ।

এই ঘরের ফরাশ তাকিয়া ছবি আর এসরাজও যে ঐ ওদেরই মত অভিশপ্ত জীবনের আসবাব। কিন্তু দশ বছর ধরে এই ঘর আর এই আসবাব মানসীর চেহারাটাকে পৃথিবীর চোখে পছন্দ করাতে চেষ্টা করেও পছন্দ করাতে পারেনি। পঞ্জিকা-দেখা শুভক্ষণের বাবুরাও তো মুখ দেখে মনুষ্যত্ব বুঝতে পারেন না।

ভানু মিত্রের বোনের জীবনটা ঘরের বার হয়েই গিয়েছে। তবে আর দেরি করে লাভ কি? কেরোসিন ঢেলে এই ঘরটাকে ভিজিয়ে দিয়ে তারপর হেসে হেসে আগুনের একটি ফুলকি ছেড়ে দিলে কেমন হয়? তারপর চুপ করে দাউ-দাউ আগুনের জ্বালার মধ্যে শুয়ে পড়লে কেমন হয়?

মাথাভরা জ্বালা নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয় মানসী: পাগল রোগীর মত গুর্জি নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরতলার দিকে দৌড়ে উঠতে থাকে। নিজেরই হাতের একটা সর্বনেশে প্রতিজ্ঞার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মানসী।

বিশ্রী একটা শব্দ করে কেরোসিনের টিনটা মানসীর হাত ফসকে মেজের উপর পড়ে গিয়ে আরও জোরে বিশ্রী শব্দ করে ওঠে।

চেঁচিয়ে ওঠেন ভানু মিত্র—ঐ অন্ধকার ঘরের ভেতর কি করছিস মানসী? শিগগির শুনে যা! হো হো হো...... তোর কপাল, তোর সৌভাগ্য রে মানসী...... হো হো হো... শুভ সংবাদ শুনে যা মানসী।

খনিগর্ভে — আলোকচিত্রী শ্রীসুনীল ঘোষ

বড়দা হাসছেন, বাড়িটা যেন প্রেতের হাসি হাসছে। শুভ সংবাদ এসেছে, কোন ভদ্রলোকের মনে হয় তো দয়া হয়েছে; পছন্দ হয়েছে, আর হয়তো টাকার দাবীও করেননি। কিন্তু এই দয়াকে যে ঘেন্না করতেই আজ ভাল লাগছে মানসীর। জানেন না বড়দা, পৃথিবীর কোন ভদ্রলোকের ডাক শোনবার জন্য মানসীর মনে আজ এক ফোঁটা আগ্রহও আর নেই।

বউদিও কলকল করে হেসে উঠেছেন—শিগগির শুনে যাও মানসী। এসে বরের ফটো দেখে যাও।

বউদিও উঠে আসেন, আর মানসীকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা ফটো মানসীর হাতে গুঁজে দেন।

—এ কার ফটো? থরথর করে কাঁপে মানসীর হাত।

ভানু মিত্র বলেন—এ হলো ভূপতিদার ছেলে রমেশ। ভূপতিদা হলেন তোর বউদির শীতলমামার ভায়রা। শীতলমামার মেয়ে নীরজাদিকে চিনিস মানসী।

বউদি বলেন—খুব চেনে, মানসী। মানসীকে কত ভালবাসেন নীরজাদি।

ভানু মিত্র বলেন—ঐ, নীরজাদিই তোর ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমিও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাত্র ফটো দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। কোন দাবী-দাওয়া নেই।

বউদি হেসে হেসে দুলতে থাকেন—মানসীর ফটোটিও বোধ হয় এখন বরের হাতে এইরকমই থরথর কাঁপছে।

ভানু মিত্র বললেন—পাইকপাড়া গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কী চমৎকার একখানা বাড়ি। ভূপতিদা তো এখন আর নেই, এক ছেলে রমেশই এখন সব সম্পত্তির মালিক। রমেশও কি কম চমৎকার? যেমন সুন্দর চেহারাটি, তেমনই সুন্দর চরিত্রটি।

বউদি কলকল করেন—ফটো আর একটু ভাল করে দেখ মানসী, এমন চেহারা জীবনে দেখনি।

—দেখেছি। বলতে গিয়ে মানসীর গলার রুক্ষ স্বর যেন কটকট করে কাউকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

চমকে ওঠেন ভানু মিত্র—কি? কি দেখেছিস? কবে দেখেছিস?

মানসীর চোখ জ্বলে—সেই বাজে লোকটা ঠিক এইরকম দেখতে।

হো হো হো! আরও জোরে হাসতে গিয়ে ভানু মিত্রের গলার ভিতরে হাসিটা আটক হয়ে ঘড়ঘড় করে।—হ্যাঁ, আনকাটা, প্রায় সেইরকমই, হুবহু, সেই বাজে লোকটারই মত চেহারা বটে। কিন্তু কিসের

সঙ্গে মিত্রের তুলনা করছিল মানসী? অর্থাৎ তার দাদাকে?

[illegible] ওঠে [illegible] অকারণটা কি?

ছুপলে যায় ভানুমিত্রের বাঁকা চোখ।—অকারণটা হলো...অন্য একটা অকারণ এই যে...।

বৌদি বোধ হয় মিত্রের মনের আহ্লাদে [illegible] হঠাৎ [illegible] ওঠেন—অকাৎ হলো একটি [illegible]।

ভানু মিত্রের মুখটা কুঁচকে যায়, টেনে টেনে হাসতে চেষ্টা করেন। আর মানসী চুপ করে দাঁড়িয়ে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের শিহরণে যেন দুটি [illegible] কালো চোখের ঝিকিমিকি দিয়ে [illegible] মনে মনে ভাবে, এমন অসম্ভবও সম্ভব হলো! মানুষটা তাহলে এতদিন ধরে আড়ালে আড়ালে আরও অনেক উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। সব জেনেছে। মানসীর জীবনটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

ভানুমিত্র বলেন—বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। সতরই মাঘ, রাত নটা পঞ্চাশ।

মানসীর খোঁপার মধ্যে প্রজাপতি যেন পাখা নেড়েছে। মানসীর সারা মুখ জুড়ে চমকে কেঁপে ওঠে অদ্ভুত এক লালচে লাজুক, আভা।

ভানুমিত্র বলেন—বিয়ের সব খরচ পাত্রপক্ষ দিচ্ছে। আমি টাকা ফিরিয়ে এসেছি।

মানসীর চোখের কোণে ছলাক্ করে জেগে ওঠে আরও অদ্ভুত এক সজল বিস্ময়। লোকটা যে সত্যিই মানসীকে একেবারে মানে-প্রাণে কিনে নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

ভানুমিত্র বলেন—তুই মিছিমিছি আর কোন সন্দেহ করিস না মানসী।

চোখের উপর যেন হিংস্র এক ঠাট্টার ঢিল এসে লেগেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী—তার মানে?

ভানু মিত্র বলেন—তার মানে...তার মানে এই যে, রমেশের এই ফটোটা কোন বাজে লোকের ফটো বলে সন্দেহ করিস না।

—এ বিয়ে হতে পারে না বড়দা। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

—কেন কেমন জেদ? বিড়বিড় করেন ভানু মিত্র।—পৃথিবীতে কি ঠিক একরকমের চেহারার দুজন মানুষ হয় না? কত হয়।

মানসী বলে—সেই জন্যই তো বলছি, এই বিয়ে হতে পারে না।

ভানুমিত্রের লোহার মত শক্ত চেহারার রক্ত যেন হঠাৎ দুমড়ে গিয়ে কুঁজো হয়ে যায়।—এ আবার কেমন কথা হলো।

কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মানসী। অদ্ভুত এক সন্দেহে পাগলের মত দুড়দাড় করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে থাকে।

—তোমার পাগল ননদের কাণ্ড দেখলে? বলতে বলতে ব্যস্তভাবে নড়বড় করে উঠে দাঁড়ান ভানু মিত্র।—রাজি হতেই হবে, রাজি না করিয়ে ছাড়ছি না, এ যে আমার মান-সম্মানের প্রশ্ন।

—মানসী...মানসী! চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এসেই চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান ভানু মিত্র। বাইরের ফরাস-পাতা ঘরে আলো জ্বলছে। জ্বলুক। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে মানসী?

উঁকি দিতে গিয়েই পা টিপে টিপে পিছনে সরে আসেন ভানু মিত্র, এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কতগুলি ছায়ার ভিড় দেখে আরও জোরে চমকে ওঠেন।—অ্যাঁ? আরে কী সৌভাগ্য। আসুন আসুন।

—কি ব্যাপার মিত্তির মশাই? এদিকে-ওদিকে কি-রকমের একটা কথা শুনছি যে?

ভানু মিত্র বলেন—হেঁ হেঁ হেঁ... আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে...ঠিকই শুনেছেন।

—এই মাত্র আপনার ঐ ঘরের ভেতরে গিয়ে বাইরের কেউ যেন গিয়ে বসলো মনে হলো।

ভানু মিত্র উৎফুল্ল স্বরে বলেন—পাত্র পাত্র। পাইকপাড়ার ভূপতি ঘোষের ছেলে রমেশ। পাত্র নিজেই পাকা-দেখা দেখতে এসেছে।

ভদ্রলোকদের বিস্মিত ভিড়টা চোখ বড়-বড় করে চলে যাবার জন্য তৈরী হতেই ভানু মিত্র বলেন—আপনারা কে কি মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি মনে করি দাশুবাবু, চরিত্রই হলো মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি। সৎপথে থাকলে জীবনে একটা অদ্ভুত শক্তি এসে যায় কালীবাবু, কারও কাছে মাথা নীচু করতে হয় না। মাধাইবাবু নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, মান-সম্মান বজায় রেখে চলাই হলো জীবনের আনন্দ। কিন্তু অনেকেই বুঝতে বড় ভুল করে কালাচাঁদবাবু, আপনি বোধ হয় আজও বুঝতে পারেন নি যে, পাপ আর পুণ্যের মধ্যে ঠিক তফাৎটা, কি?

কালাচাঁদবাবু হাঁ করে তাকান।—ঐ তো তফাৎ, মাত্র একটা পানের দোকান!

সপ্তপদী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছ ফুট লম্বা মানুষটি। হয়ত ইঞ্চি দুয়েক বেশীই হবে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে লোকটি শীর্ণদেহ। কিন্তু দুর্বল বা জীর্ণদেহ নয়। কালো রঙ, বাংলা দেশের কালো রঙ; মাজা কালো। বড় বড় দুটি বিষণ্ণ-দৃষ্টি চোখ। বিষণ্ণতা ছাড়াও কিছু আছে; যা দেখে মনে হয়, লোকটির মন বাইরে থাকলে অনেক দূরে আছে, ভিতরে থাকলে অন্তরের গভীরতম গভীরে মগ্ন।

পাগলা পাদরী। এই নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত এ-অঞ্চলে। অঞ্চলের লোকের দোষ নেই, এর চেয়ে ভালভাবে লোকটির স্বরূপ ব্যক্ত করা বোধ হয় যায় না। পরনে পাদরীর পোশাক, কিন্তু সে-পোশাক গেরুয়ায় ছোপানো। এ-অঞ্চলের কোন গির্জার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নন। কোন ধর্মও প্রচার করেন না। শুধু চিকিৎসা করে বেড়ান। পাগলা পাদরী খুব ভাল ডাক্তার। এবং বাইসিক্লে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, পথের দুপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, "কী, কেমন আছ সব? ভাল ত?" সঙ্গে সঙ্গে মুখভরা মিষ্ট হাসি উপচে পড়ে।

"হ্যাঁ বাবা, ভাল আছি।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ভাল। ভাল থাক।"

কারুর বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে সে পাগলা পাদরীর প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়েই থাকে। কতক্ষণে কখন শোনা যাবে বাইসিক্লের ঘণ্টা, কখন দেখা যাবে সাইক্লের উপর গেরুয়া পোশাক পরা পাদরীকে। দেখলেই হাত তুলে আগে থেকেই বলে, "বাবাসাহেব।"

ছ ফুট লম্বা মানুষটি বাইসিক্ল থেকে মাটির উপর পা নামিয়ে দেন; নামতে হয় না। "কী খবর? কার কী হল?"

"জ্বর।"

"কার?"

"আমার ছেলের।"

"চল। দেখি।"

দেখেন, দেখে বাইসিক্লের পিছনে বাঁধা

ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ দেন। প্রয়োজন হলে বলেন, "আমার ওখানে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এস।" লিখে দেন কাগজে। বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে-রাস্তাটা—পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এ-দিক ও-দিক থেকে কয়েকটা রাস্তাই মিলেছে, তারই ধারে তাঁর মিশন, বা আশ্রম।

শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। বীরাবতী-শিলাবতী-দারুকেশ্বর, বীরাই-শিলাই-দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি একটা বিশেষ প্রস্থের আয়তনে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এরই দুধারে আবার বাংলার কোমল ভূমির প্রসার। সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম, শস্যক্ষেত্র।

উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য-ভূমের রেশ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভাগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মত ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল-মহলগুলি ইতিহাসবিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শালজঙ্গলঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রামগুলি, সেগুলিতে প্রাচীন আমলের সেই মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউড়ী, বাগদী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদেরই মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর-ভারতের ক্ষত্রীরা। সিংহ, রায় প্রভৃতিরা। কয়েকখানা গ্রামের পরে পরে এমনই এক-একটি পরিবার আজ এক-একটি বিরস্মান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। লেগেই আছে মামলা মকদ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী। ঘোর কালো রঙের পীতচক্ষু অভাবশীর্ণ অর্ধনগ্ন মূক মানুষগুলির মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্রপ্রকৃতির মানুষগুলি বিচিত্রভাবে মিশে রয়েছে। এক একটি ক্ষত্রীবাড়ির নাম আজ রাজবাড়ি। রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল, মাটির উঠান, জীর্ণ খড়ের চাল; রাজার পরনে ময়লা জীর্ণ কাপড়, খোলা গা, বসে বিড়ি খান অথবা হুঁকো টানেন; পরস্পরের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কাটু ভাষায় কলহ করেন। রানী-রাজকন্যা নিজেদের হাতেই রান্নাবান্না করেন, নিজেরাই কাঁখে বয়ে জল আনেন, ধানও মেলে দেন পায়ে-পায়ে। উঠান নিকানো, বাসন মাজা, এ-সব এখনও ওই কালো রঙের মানুষদের বাড়ির মেয়েরা করে। পুরুষেরা জমি চষে, গরু চরায়, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-আধ ঘর দলপতি বা নায়েক বাগদীর বাস আজও আছে। দলপতি, নায়েক এদের উপাধি। এরা এককালে ক্ষত্রী সামন্তদের অধীনে ছিল যোদ্ধা সর্দার। সামন্তদের দেওয়া নিষ্কর জঙ্গল মহলে জঙ্গলে ঘেরা গ্রামের মধ্যে আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং অনুচর-দের নিয়ে মদ্যে মাংসে, মোটা লাল চালের ভাতে, দুর্দান্ত সাহসে, শিকারে; আর সন্ধ্যায় মাদলের সঙ্গে নাচে গানে জীবন যাপন করত। পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাল থেকে এদের কথা আর প্রবাদ বা কাহিনী নয়, ইতিহাস। মোগলদের শেষ আমলে, মারাঠা অভিযানের সময় এরা রীতিমত লড়াই করেছে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে গাছের উপর চড়ে তীর ছুঁড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরেছে। তাড়া খেয়ে বাস-বসতি ফেলে নিবিড় জঙ্গলে লুকিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় কোম্পানির ফৌজের সঙ্গেও খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। সামন্ত রাজারা আনুগত্য স্বীকার করার পরও এরা এই সর্দারেরা লড়াই করেছে।

বাগদী সর্দার গোবর্ধন দলপতি যে লড়াই করেছিল, কোম্পানির দপ্তরে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে। গোবর্ধন দলপতি নিজের অধিকারের সীমানা রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, কোম্পানির সীমানা কেড়ে নিয়ে দখল করেছিল; তার বাইরে এসে দিনে-দুপুরে গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে জ্বালিয়ে, গ্রামের রাস্তায় মানুষের মাথা কেটে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এদেরই এক আধ ঘরের দেখা আজও মেলে।

সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে। ওসব গ্রামেও বাগদী, বাউড়ী, মেটে, মাল আছে, তাদেরও চেহারা যেন কিছু আলাদা। রক্তের উত্তাপ এবং ঘনত্বেও বোধ হয় তফাত আছে।

শালবনে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এদের আজও অরণ্য হাতছানি দিয়ে ডাকে। শালের সঙ্গে আছে পলাশ আর মহুয়া। পলাশ ফুলের গুঁড়ো দিয়ে আজও কাপড় রঙ করে এরা; মহুয়া থেকে মদ চোলাই করে। মধ্যে মধ্যে আবগারি পুলিশ হানা দেয়—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধরতে পারে না; বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে কোথায় যে ঘাটি সে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। ধরা ক্বচিৎ পড়ে। ধরা পড়ে জেল খাটে, কিন্তু সে ওদের কাছে বিশেষ কিছু না। মধ্যে মধ্যে শিকারে বের হয়। অবশ্য সাঁওতালেরা এ-ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু এরাও বের হয়ে পড়ে। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভালুক মেরে বিপুল উল্লাস। বিশেষ করে বরা-ভালুকের উৎপাত হলে মেতে ওঠে এরা। কখনও কখনও বাঘও আসে। তার সঙ্গে লড়াই দেবার মত সাহসের সে-দুর্দান্তপনা আজ আর লোপ হয় নেই। বাঘ এলে স্থানীয় বন্দুকওয়ালা শিকারীবাবুদের খবর দেয়। থানা মারফত বিষ্ণুপুর শহরে কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর পাঠায়। প্রায় দুশো বৎসর ধরে নিরন্তর শাসনে এবং সুকৌশল শোষণে এদের জীবনে সব গর্বই প্রায় চলে গেছে, কিন্তু সাহসে-উল্লাসে খুব খর্ব হয়নি। শুধু, আজ বাঘ এলে তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য টাঙ্গি-বল্লম-ধনুক-কাঁড় নিয়ে উন্মত্ত আনন্দে আর বেরিয়ে যেতে চায় না। জীবনের মূল্য যখন বাড়েনি, তখন এটুকু ভয় তাতে সন্দেহ কী?

এদের মধ্যেই থাকেন এই পাগলা পাদরী।

শালবনের ধারে লালমাটির উপর একখানি ছোট গ্রাম। পাশ দিয়েই চলে গেছে পুরীর পাকা সড়ক। মাইল খানেক উত্তর-পশ্চিমে মোরার গ্রামে ওয়েসলিয়ান চার্চের দোতলা বাড়িটা। নিতান্তই ছোট নগণ্য একখানি গ্রাম। শালবন এখানটায় বিশীর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত। গ্রামখানারও বাইরে—শালবন যেখান থেকে জমাট বেঁধেছে, সেইখানে—ছোট একখানি বাংলো বাড়ি; খান তিনেক ঘর। এইটেই তাঁর আস্তানা। সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা পাখি, দুটি গরু, এবং একটি দম্পতি। যোসেফ আর সিন্ধু। যোসেফরা অনেককাল আগে ক্রিশ্চান হয়েছে। যোসেফলাস সিং। সিন্ধু মাঝিদের মেয়ে। সে ক্রিশ্চান নয়। বিবাহও ওদের হয়নি। দুজনে দুজনকে ভালবেসে ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে চলে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে পাগলা পাদরীর কাছে। যোসেফ খানিকটা ইংরিজী জানে; পাগলা পাদরী তাকে কম্পাউণ্ডারি শিখিয়েছেন, সে কম্পাউণ্ডারি করে আর ছেলেদের পাঠশালায় পণ্ডিতি করে। সিন্ধু পাখিগুলির পরিচর্যা করে। এবং বাংলোর গৃহিণীও সে, রান্নাবান্না ভাঁড়ার তারই হাতে। আরও একটি সাঁওতাল মেয়ে আছে নাম ঝুমকি মেঝান। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের আশ্চর্য স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। এমন সরল দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

পাগলা পাদরী ওকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। ঝুমকির বিয়ে হয়েছিল তিনবার। তিন স্বামীই অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর সকলের সন্দেহ হয়, ঝুমকি ডাইনী। সাঁওতালদের সমাজপতিরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ওকে। পাগলা পাদরী খবর পেয়ে বাইসিক্ল চড়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে ওকে উদ্ধার করে এনেছেন। ওই গ্রামের সাঁওতাল কর্তাকে তিনি চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। আরও অনেকেরই চিকিৎসা করেছেন। পাগলা পাদরীর কথা তারা ঠেলতে পারেনি।

পাগলা পাদরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কখনও ঝুমকি কোন সাঁওতাল গ্রামে যাবে না। সে তাঁর বাড়িতে থাকবে; গরুর সেবা করবে, গাছপালা লাগাবে।

"উকে কেরেস্তান করবি না ত বাবা-সাহেব?"

"না।" তারপর হেসে বলেছিলেন, "আমি কি কিরিস্তান মাঝি?"

বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দার বলেছিল, "কে জানে? ই বুলে তু কিরিস্তান বটিস; আবার কিরিস্তানরা বুলে—কিরিস্তান লয়; তুর জাতই নাই। তু জানিস তু কী বটিস।"

পাগলা পাদরী হা-হা করে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "উরা ঠিক বলে মাঝি, জাত আমার নাই। তবে মানুষ ত বটি। তুইও মানুষ আমিও মানুষ। ওই মেয়েটাও মানুষ।"

"তু মানুষ বটে। উ লয়। উ ডাইনী বটে।"

"আমি ত চিকিৎসা করে তোর এত বড় ভূতে-পাওয়া ব্যামোটা সারালম,—তু বল! উকেও আমি ডাইনী থেকে সারাব রে।"

"লারবি। তবে তু বলছিস নিয়ে যাবি, নিয়ে যা।"

সেই অবধি ঝুমকিও থাকে এখানে। গরুর সেবা করে, বাংলোতে গাছপালা লাগায়। রাস্তায় ঘাটে বাংলোর সীমানার বাইরে কদাচিৎ বের হয়। সাঁওতাল পুরুষ মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে ছুটে গিয়ে লুকোয়, যেখানে হক। তারা যদি আবার বলে, সে তাদের খেয়েছে।

পাগলা পাদরীর ঘরেই হয়ত ঢুকে পড়ে। পাগল মানুষটি হয়ত চোখ বন্ধ করে খোলা ডেক-চেয়ারে বসে থাকেন, সন্তর্পিত পদক্ষেপের শব্দ কানে আসতেই প্রশ্ন করেন, "কে?"

ফিসফিস করে শঙ্কিত ভঙ্গিতে সে অন্ধকার কোণ থেকে বা আলমারির পাশ থেকে উত্তর দেয়, "মেন এয়াং—বাবাসাহেব। ঝুমকি!"

বাবাসাহেব মুখ তুলে তার দিকে তাকান, কৃষ্ণাঙ্গী অরণ্যনারীর সাদা জলজলে চোখের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছ জলতলের নাড়াখাওয়া শ্যাওলার দলের মত ওই দৃষ্টির মধ্যে ওর ভয়ে-কাঁপা অন্তরকে দেখতে পান। প্রশ্ন করেন, "ভয় পেয়েছিস! বাইরে মাঝিরা এসেছে বুঝি?"

সে তার দীর্ঘ সবল হাতখানি অন্য এক দিকে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে, "অঁ-হঁ, আন-পরম্।" অর্থাৎ, না-না, এই দিকে। এই দিকে।

বাইরে আসেনি, ওইদিকে তারা যাচ্ছে।

বাবাসাহেব অভয় দিয়ে বাইরে আসেন। [illegible] বুক, [illegible] সঙ্গে [illegible] কে [illegible] করেন

সাধারণত এই জেলার চলিত বাংলাতেই কথা বলেন। কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এখানকার লোক নন। তারা কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, "হাঁ বাবাসাহেব, আমাদের কথাবার্তা বাকবাচালি এমন করে কী করে শিখলেক গো আপুনি?"

সাহেব প্রসন্ন প্রাণখোলা হাসিতে উতলা বাতাসে শালগাছের মত দুলে ওঠেন; বলেন, "তুমাদিগে যি ভালবাসলম হে! সেই মন্তরে শিখে লিলম। হঁ!"

তারপর আবার বলেন, "তুমি বল ক্যানে, যাকে তুমি ভালবাস, তার মুখ দেখে তুমি তার পরাণের সুখ-দুখ বুঝতে পার কি না? পা-র ত। পরাণের কথাটি মুখ দেখে বুঝা যায়, আর মুখের কথা কানে শুনে শিখা যাবেক, ইটা আর বেশী কথা কী? অঁা?"

একেবারে সুর স্বর উচ্চারণ সব যেন এক তারে বাঁধা।

প্রশ্নকর্তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তার সারা অন্তর উপলব্ধিতে আপ্লুত হয়ে যায়, আপন মনেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, ঠিক কথা। ঠিক কথা!

তবে তার ইংরিজী শুনে ভদ্রসমাজের অনেকে সন্দেহ করেন, লোকটি মান্দ্রাজী বা দক্ষিণ ভারতীয়।

নামও—রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী।

চেহারাতেও মিল খুঁজে পায়। ছ ফুট লম্বা, মোটা হাড়, মেদবর্জিত মানুষটি, কালো মাজা রঙ, ঘন কালো মোটা ধরনের চুল। দক্ষিণের লোকদের মতই বড় বড় চোখ।

দৃষ্টি অবশ্য বিচিত্র, সে বোধ করি ব্যক্তিগত। বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন। বর্ষণক্লান্ত স্বল্পমেঘাবৃত শান্ত স্নিগ্ধ আকাশের মত। ভিতরের নীলাভা মেঘের পাতলা আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার মতই বিষণ্ণ দৃষ্টির মধ্যে প্রসন্নতার আভাস ফুটে থাকে। সব থেকে ভাল লাগে মানুষটি হাসলে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফের আবরণের মধ্য থেকে যখন সুন্দর সুগঠিত দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে হাসির প্রসন্নতায়, তখন আশপাশের মানুষগুলির মনের ভিতরটাতেও যেন সেই প্রসন্নতার ছটা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সন।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগ একটা সাইক্লোনের মত সারা দেশটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেশ সমাজ ঘর ভেঙেচুরে পড়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরছে ঝড়ে ঝটকা-খাওয়া পশুপক্ষীর মত। হাহাকার উঠেছে চারদিকে। দেশ জুড়ে স্বাধীনতা-আন্দোলন সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম-ফেণী-গৌহাটী-ডিগবয়-ডিমাপুর-কোহিমার পরে উখরা-পানাগড়-পিয়ারাডোবা-বাসুদেবপুর-খড়্গপুর-মেদিনীপুর নিয়ে যুদ্ধের ঘাঁটির সে এক বিচিত্র বেষ্টনী। একটার সঙ্গে অন্যটার পিচঢালা সুগঠিত পথের যোগাযোগে একটা বিস্তীর্ণ বিরাট ভূখণ্ডব্যাপী মাকড়শার জাল।

গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার, শহরে শহরে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ভিক্ষুকদের সকরুণ কাতর প্রার্থনা, "একটু ফ্যান! এক মুঠো এঁটোকাঁটা। মা গো! মা!"

দোকানে চালের বদলে খুদ। তার সঙ্গে বালি ধুলো কাঁকর।

এরই মধ্যে চলে মিলিটারি কনভয়। জীপ-ট্যাঙ্ক-ওয়েপনকেরিয়ার, আরও হরেক রকমের বিচিত্রগঠন অটোমোবিল। মাথার উপরে ওড়ে ইংরেজ আর অ্যামেরিকানদের যুদ্ধের প্লেন। গাড়িগুলোতে বোঝাই হয়ে চলে ইংরেজ এবং অ্যামেরিকান পল্টন। তার সঙ্গে নিগ্রো কাফ্রী। যাবার সময় পথের ধারে মাঠে নেমেপড়া এ-দেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ক্ষুধার্তদের উপর কমলালেবুর খোসা, চিবানো কোওয়া ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিৎকার করে ডেকেও যায়, হে—। হাতছানি দিয়েও ডাকে।

হি-হি করে হাসে।

কেউ-কেউ আবার টাকা আধুলি ছুঁড়ে দেয়। ওরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর উপর। শুকনো মাটির ধুলো ওড়ে। ওদের সর্বাঙ্গে লাগে। বিদেশী সৈনিকদের ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক শব্দে মুখর হয়ে ওঠে।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায় দল বেঁধে মার্কিন সেপাই জীপে চড়ে চলেছে। সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে, অথবা কলরব করছে প্রমত্ত হয়ে। ঠিক মাঝখানে শহর থেকে সংগ্রহ করা একটা কি দুটো নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী। কড়া বিলিতী মদের নেশায় স্খলিতবাসা, অবশদেহ। ঢুলছে বা ঢুলছে, ওদেরই অট্টহাসির সঙ্গে প্রমত্ত উন্মাদে হেসে সুর মেলাতে চাচ্ছে। পথে-ঘাটে যুবতী মেয়ের দেখা পেলেই ডাকে—হ্যালো হনি! মাই হনি!

পিয়ারাডোবায় একটা এরোপ্লেনের আড্ডা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুরে ছোট একটা। মোরারে ওয়েসলিয়ান চার্চের বাংলোটার সামনে পুরীর রাস্তা আর স্থানীয় একটা রাস্তার মিশবার জায়গাটার পাশেই শালজঙ্গলের কোল ঘেঁষে প্রান্তরটা। খুঁড়ে বড় বড় পেট্রোল-ট্যাঙ্ক বসেছে। এখান থেকে পাইপ-লাইন চলে গেছে বাসুদেবপুর পিয়ারাডোবা পর্যন্ত। মুখোমুখি [illegible] চ্যালিরে [illegible]

গড়ে তুলেছে বিচিত্র সামরিক ঘাঁটি। জন-মানবের হাতের মারাত্মকীর অস্ত্র। পিয়ারা-ডোবা স্টেশন থেকে সাইডিং এসেছে। বড় বড় ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে প্রমত্ত বিদেশী সৈনিকের দল। মার্কিন সৈন্যদের পকেটে নোটের তাড়া। সঙ্গে প্রচুর টিনবন্দী খাদ্য। বিস্কুট রুটি। সাইডিংয়ের পাশে, স্টেশনের রেল লাইনের পাশে—টিনের ছড়াছড়ি নয়—টিনের গাদা।

হতভাগ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধনগ্ন মানুষেরা টিন কুড়িয়ে নিয়ে যায়, চেটে চেটে খায়। দিনরাত্রি আকাশ মুখরিত করে বম্বার ফাইটারগুলো মাথার উপর ঘুরছে। কোনটা নামছে, কোনটা উঠছে।

সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। ঠুলি পরানো, কিন্তু তবু তার ছটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আস্তাঘরে বাজনা বাজে, নাচ হয়। হো-হো শব্দে উল্লাসধ্বনি ওঠে। ঝিল্লিমুখর শালবনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার চমকে ওঠে। বোধ করি প্রায় দুশো বছর আগের সামন্ত রাজাদের আমলে পাইকদের মশালের আলো, মাদলের বাজনা, হা-রা-রা ধ্বনি-তাণ্ডবের পর বনভূমির অন্ধকার এইভাবে আর চমকায়নি। বর্গীদের আমলের পর বনভূমির গ্রামগুলি এমনভাবে আর সভয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে পড়েনি। গ্রামগুলি পাকা রাস্তা থেকে দূরে-দূরে। বনের ভিতরের দিকে। সেখানে তারা অন্ধকারের মধ্যে শোনে, পাকা রাস্তার উপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে মোটর চলছেই, চলছেই।

*   *   *

পাগলা পাদরী সরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন। পাকা রাস্তা থেকে আরও দূরে, জঙ্গলের মধ্যে। তিনি যে গ্রামখানায় ছিলেন, সেই গ্রামখানাকেই সরিয়ে দিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী জঙ্গলের ভিতরের পায়ে-চলা পথ ধরে বাইসিক্লে চড়ে এসে ওঠেন পাকা রাস্তায়। মোরামের মোড় থেকে অনেকটা তফাতে, বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে এসে। বুধবার শনিবার তিনি ওন্দায় যান। ওখানকার লেপার অ্যাসাইলামে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করেন। পুরী থেকে এই অঞ্চলটায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কুষ্ঠ-অন্ধত্ব এ-অঞ্চলের অভিশাপের মত। সপ্তাহে দুদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভোরবেলা উঠে চলে যান, ফেরেন বিকেল বেলা। আষাঢ়ের প্রথম। কৃষ্ণস্বামী বিকেল বেলা ফিরছিলেন। তাঁর বিচিত্র পরিচ্ছদের উপর মাথায় একটা দেশী টোকা। চোখে একটা গগলস। বৃষ্টি তখনও নামেনি। আষাঢ়ের দীর্ঘতম দিনে পৃথিবীর নিকটতম সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী যেন ঝলসাচ্ছে। চষা মাঠের উপর গরম বাতাসে ধুলো উড়ছে।

বাবাসাহেব তাঁর অভ্যস্ত গতিতে বাইসিক্ল চালিয়ে চলেছেন। গোটা রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে একটা পাশ ধরেই চলেছেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে আসে মিলিটারী ট্রাকগুলি, মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় অথবা হিসেবের ভুলে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ধাক্কা মারে পথের পাশের গাছের গুঁড়িতে। ভেঙে উল্টে যায় গাড়ি; চালক আরোহীর আর্তনাদ শোনা যায়। কখনও পথ ছেড়ে গিয়ে পড়ে মাঠের উপর। দু-চারখানা উল্টে যায়, আরোহীরা ছিটকে পড়ে। আঘাত কম হলে উঠে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে হো-হো করে হাসে। দু-চারখানার চালক আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্টীয়ারিং ধরে চষা মাঠের উপর দিয়ে কিছু-দূর চালিয়ে গিয়ে গতিবেগ সম্বরণ করে ব্রেক কষে। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ভাষায় একটা অশ্লীলতম গালাগালি উচ্চারণ করে। অকারণে। আশ্চর্য, ঈশ্বরের নাম করে না।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়, ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে, সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের কালে, পাইক বিদ্রোহের সময় কি এমনই হয়েছিল দেশের অবস্থা? মানুষ কি এমনি করেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল? অন্তরের সঞ্চয় তার এত ক্ষীণ এবং ক্ষণজীবী?

হায় বুদ্ধ! হায় ক্রাইস্ট! হায় ঈশ্বরের পুত্র!

এ-দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত, হৃতসর্বস্ব, শিক্ষায়-বঞ্চিত এই মানুষগুলির তবু ত দোহাই আছে। ভাবীকালের মানুষের কাছে রেহাই আছে। কিন্তু ওই বিদেশী সৈনিক-গুলি! এদের চেয়েও ওরা হতভাগ্য। মৃত্যু-ভয়ে অধীর। অসহায়। অহরহ দুরন্ত ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওরা আকণ্ঠ মদ্যপান করে জীবন নিয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, গাছে ধাক্কা খেয়ে মরছে। গাড়ি উল্টে পড়ে চেপ্টে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে পথের মধ্যে যা পাচ্ছে ভোগ করবার, তা-ই ভোগ করে যাচ্ছে। কোথায় শিক্ষা, কোথায় সভ্যতা, কোথায় জীবন-গৌরব?

হায় ক্রাইস্ট!

ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তোমার মৃত্যুই সত্য। রেসারেকশন কল্পনা। মানুষের রচনা করা মিথ্যা আশ্বাস!

হায় বুদ্ধ! হায় চৈতন্য!

চৈতন্যদেব এই পথে পুরী থেকে গয়া গিয়েছিলেন। খোলে-করতালে ঈশ্বরের নামে মুখরিত হয়েছিল এ-সব অঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব দেবতারাও মিথ্যা। পারলে না রক্ষা করতে মানুষকে। রাজা গোপালদেবের বেগার মিথ্যে। নাম করার কোন ফল হয়নি। আত্মরক্ষার শক্তি না থাক, ওদের মত প্রচণ্ড বর্বর শক্তিকে ঠেকাবার মত শক্তি মানুষের না থাক, আত্মাকে রক্ষা করার শক্তিও তারা পেলে না। জপের মালার ঝুলিটা নেহাতই ছেঁড়া নেকড়ার ঝুলি।

সামনেই লেবেল ক্রসিং। বাইসিক্ল থেকে কৃষ্ণস্বামী নামিয়ে দিলেন তাঁর পা দুটো। ছ ফুট লম্বা মানুষটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। ক্রসিংয়ের পাশেই গেটম্যানের বাসা।

কৃষ্ণস্বামীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বাস্তবে ফিরে এলেন। এই জীবন। এ-জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নিজের কাজ করতে হবে।

"বংশী! বংশী হে—!"

খুলে গেল গেটম্যানের ঘরের দরজা। বেরিয়ে এল গেটম্যান রামচরণ। "বাবা-সাহেব!"

"হুঁ। বংশী কই?"

বংশী রামচরণের ছেলে। বংশীর কুষ্ঠ হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা। কৃষ্ণস্বামীই যাওয়া আসার পথে ছেলেটির মুখের চেহারা দেখে ধরেছেন। অনেক বুঝিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী করিয়েছেন। এ-রোগের ইনজেকশনে বড় যন্ত্রণা হয়। বংশী অধিকাংশ দিন পালায়। কৃষ্ণস্বামী বংশীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসেন। কোনদিন একটা পুতুল। কোন-দিন একটা ছবি। কোনদিন কিছু খাবার। কোনদিন কিছু। আজও বংশী পালিয়েছে। রামচরণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখেও ছেলের সন্ধান পেলে না। সে তারস্বরে ডেকে উঠল—"হ—বং—শী হে—। বং—শী—হে—।"

কৃষ্ণস্বামী বাইসিক্লটি গেটম্যানের ঘরের দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে, দাওয়ার উপর উঠে দাঁড়ালেন। রামচরণের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে একটা মোড়া পেতে দিলে। কৃষ্ণ-স্বামী মোড়ায় বসে তাঁর আলখাল্লার মত জামাটার পকেট থেকে বের করলেন একটি বাঁশি। বললেন, "এইটো বাজিয়ে ডাক হে! হুঁ। বাঁশির ডাক শুনলে কাছে পিঠে থাকলে আখুনি বেঁরায়ে আসবেক।"

তার আগেই কিন্তু সামনে রাস্তার ধারের একটা আমগাছের উপর থেকে ঝপ করে বংশী লাফিয়ে পড়ল। "আসছেক গো, আসছেক গো! সেই গো বাবা, সেই বটেক গো!"

কৌতূহলের তীব্রতায় তার ঈষৎস্ফীত মুখখানা যেন থমথম করছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

"কে? কে আসছেক হে বংশীবদন?" হেসে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণস্বামী। "আমি তুমার লেগ্যা কেমন বাঁশি এনেছি দেখ হে! বংশীবদনের লেগ্যা বংশী।"

বংশীর মন কিন্তু বাঁশিতে ভুলল না। তার স্থির জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামনের রাস্তার দিকে। দূরে একটা বাঁক, সেই বাঁকের মাথায়। সে বোধ হয় বাবাকেই বললে, "সেই মেয়াছেল্যাটা গ! সেই মাথায় টকটকে রাঙা ফেটা বাঁধা! গাছের শিরডগাল থেকে আমি দেখ্যাছি। ঝড়ের পারা গাড়িটা আসছেক, আর রাঙা ফেটা বাঁধা সি বসে রইছেক। রোদ লেগ্যা ঝকমকো ঝকমকো করছেক। হু। উই—উই—উই।"

দূরে বাঁকের মাথায় জীপের গর্জন তখন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সত্যই একখানা জীপ আসছে। সত্যই পিছনের পড়ন্ত রোদে কারও মাথার গাঢ় লাল টুপি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রামচরণ বললে, "দেখলম অনেক বাবা-সাহেব। কিন্তুক এমন মেয়্যাছেল্যা আমরা দেখি নাই বাবার কালে। মেমসাহেব গো!"

হাসলেন কৃষ্ণস্বামী। ধুতি চাদর আর চটির দেশের শুধু ধুতিসম্বল দরিদ্র রামচরণ এবং বালক বংশীবদনের মন কোন বিচিত্রবাসিনী বিদেশিনীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। জীপখানা সত্যই ঝড়ের বেগেই আসছে। মেয়েটা—হ্যাঁ, এরা বলেছে ওটি মেয়ে—লাল টুপি পরা মেয়েটি যেন দুলছে, টলছে। এপাশ থেকে ওপাশ। জীপের সামনে চালকের পাশেই বসে টলছে। মনে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গিনী। পাশে চালক বলিষ্ঠদেহ একজন শ্বেতাঙ্গ। গায়ে শুধু গেঞ্জি, মাথায় টুপিটা আছে, অফিসারের টুপি। স্পীড কমিয়ে বাঁক নিয়ে লেবেল-ক্রসিংটা পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা। কিছুদূরে গিয়ে কিন্তু ব্রেক কষে দাঁড়াল। মেয়েটা ঝাঁকুনিতে টলে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। সামনের ড্যাশ-বোর্ডে উপুড় হয়ে পড়ে কোনক্রমে আঁকড়ে ধরলে একটা রড। আবার পিছু হটতে লাগল গাড়িটা। এসে দাঁড়াল রামচরণের বাড়ির সামনে। শ্বেতাঙ্গটি নামল।

তার ট্রাউজারের কাপড়ের চিক্কণতা দেখে কৃষ্ণস্বামী বুঝতে পারলেন, অ্যামেরিকান অফিসার।

"হে—ম্যান! ওয়াটার। ওয়াটার! পানি!"

জড়িত কণ্ঠে, আদেশের সুরে মেয়েটি বললে, "পানি লাও! ই—উ! ইউ! শুনতা নেহি!"

কৃষ্ণস্বামী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের গগল্সটা খুলে দাওয়া থেকে নেমে এসে জীপের কাছে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেন। বিচিত্র-বেশিনীই বটে। পরনে পাশ্চাত্যের আধুনিকতম ফ্যাশনের লাল রঙের লম্বা পেণ্টালুন বা স্ল্যাক্স, গায়ে হাফ-হাতা টেনিস-কলার মিহি সিল্কের ব্লাউস, মাথায় রাঙা টকটকে সিল্কের কাপড়ের লম্বা ফালির শিরোভূষণ। আশ্চর্যভাবে লালসা উদ্রেক করা মোহিনী বেশ। তেমনি যেন নির্লজ্জ!

অ্যামেরিকানটি তাঁর সামনে এসে পেণ্টালুনের পকেট থেকে একখানা নোট বের করে সামনে ধরে বললে, "ডোণ্ট য়ু আণ্ডার্স্টাণ্ড, ম্যান? ওয়াটার, পানি—পানি—"

মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ইউ সোয়াইন!"

অ্যামেরিকানটি এবার ধমক দিয়ে উঠল, "ইউ বিচ, স্টপ, আই সে—ইউ স্টপ!"

কৃষ্ণস্বামী হেসে পরিষ্কার ইংরিজীতে বললেন, "প্লিজ, প্লিজ ডোণ্ট অ্যাবিউজ হার লাইক দ্যাট, শী ইজ ইল।"

"নাথিং। ইউ ডোণ্ট নো ম্যান, একটা গোটা বোতল ওই কুত্তিটা ঢক ঢক করে গিলেছে। মাতাল হয়েছে। জল দাও। ভেবেছিলাম রাস্তার ধারে পুকুর পেলে ওকে চুবিয়ে ওর নেশা ছুটিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ি দেখে দাঁড়ালাম। মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। নেশা, কেবল নেশা।"

কৃষ্ণস্বামী বললেন, "অফিসার, আমি একজন ডাক্তার। আমি দেখতে পাচ্ছি, ও অসুস্থ। আমি বলছি তুমি ওকে নামাও। ওর এক্ষুনি শুশ্রূষার দরকার। আমার কল-ব্যাগে ওষুধ আছে। এক দাগ ওষুধও দিতে চাই। বিশ্বাস কর আমাকে, আমি মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার।"

বলতে বলতে মেয়েটি ঢলে পড়ল গদির উপর।

কৃষ্ণস্বামী তাঁর দীর্ঘ দুটি বাহু প্রসারিত করে তাকে তুলে নিলেন। বললেন, "রামচরণ, তোমার খাটিয়াটা। পেড়ে দাও।"

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, "অফিসার, প্লীজ, ওর এই মাথার বাঁধনটা কাপড়ের ফালিটা খুলে দাও।"

হাত বাড়িয়ে একটু ঝাঁকি দিয়েই মাথার কাপড়ের ফালিটা টেনে খুলে ফেলে দিল অফিসারটি। আশ্চর্য ঘন কাল একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ল।

কৃষ্ণস্বামী সযত্নে তাকে শুইয়ে দিলেন খাটিয়ার উপর।

অনেক শুশ্রূষার পর মেয়েটির চেতনা হল। এক দাগ ওষুধও তাকে খাইয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী। চেতনা হবার আগে হড়হড় করে বেশ খানিকটা বমি করলে মেয়েটি। তার গায়ের জামাটা ভেসে গেল। খানিকটা কৃষ্ণস্বামীর হাতে জামায় লাগল। দুর্গন্ধ জায়গাটার বায়ুস্তর যেন দূষিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণস্বামী সযত্নে সব ধুয়ে মুছিয়ে দিলেন। অফিসারটি নির্লিপ্তের মত বসে বসে দেখলে, আর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে কথা বলছিল। সবই প্রশ্ন। যেন থেকে থেকে হঠাৎ মনে উঠছিল। পারম্পর্যহীন। একটা প্রশ্নের সঙ্গে আর-একটার কোন সম্পর্ক নেই।

চৈতন্যহীন মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়েছিল; তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,

"Isn't she beautiful Fine eyes and eyelids—isn't it? Hey, what do you say?"

কৃষ্ণস্বামী শুশ্রূষা করতে করতেই বললেন, "Yes; she has got a sweet face."

সত্য, মেয়েটির রূপ আছে, এবং রূপে আশ্চর্য মোহও আছে। বিশেষ করে মাথার চুল ঘন কালো আর অপরূপ সুন্দর চোখ ও চোখের পাতা। চোখের পাতার রোমগুলি সুদীর্ঘ। সুন্দর আয়ত চোখ দুটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

আবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "Is it anything very serious?"

কৃষ্ণস্বামী বললেন, "হতে পারত। নেশার উপরে এই গরমে হিটস্ট্রোক হতে পারত। অবশ্য এখনও আশঙ্কা যায়নি।"

আবার কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন হল, "তুমি বললে, তুমি একজন ডক্টর! কোয়ালিফায়েড মেডিক্যালম্যান। মনেও হচ্ছে তাই। কিন্তু এরকম পোশাক কেন তোমার?"

"আমি একজন সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের নানান রকম পোশাক আছে। কিন্তু এই রঙটা হল সবার রঙ।"

"Can you tell fortune?"

"No."

"শুধু ডাক্তার?"

"হ্যাঁ, আর সন্ন্যাসী।"

আবার কিছুক্ষণ পর অফিসারটি বললে, "বলতে পার এই ধরনের মেয়ে তোমাদের দেশে কত আছে? স্ট্রেঞ্জ গার্ল।" আপন মনেই বলতে লাগল, "ওর সঙ্গে আমার দেখা পুরীতে। অন দ্য সী-বীচ। স্ট্রেঞ্জ গার্ল! এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। আশ্চর্য বন্য! কী হাসতে পারে! কী প্রচণ্ড রাগে। কী মদ খায়!" সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললে, "সেই থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছে।" আবার বললে, "She is a sport কিন্তু বড় wild."

কৃষ্ণস্বামী বললে "জ্ঞান হচ্ছে। তোমার কাছে আর এক মদ আছে? She needs—"

মেয়েটি মদ খেয়ে মুখ একটু বিকৃত করে

বললে, "ওয়াটার—প্লীজ! ওয়াটার। ঠাণ্ডা জল।"

মুখে জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। মেয়েটি আবার হাঁ করলে। আবার জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। তারপর চোখের নীচে আঙুল রেখে হেসে বললেন, "Let me look at your eyes. Look at my face.

মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল, তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে উঠল দৃষ্টি।

অ্যামেরিকান অফিসারটি বললে, "হে—ডোণ্ট—; ও সব করো না। ডু-ই হিয়ার?" তারপর বললে, "হঠাৎ চিৎকার করে, হঠাৎ মেরে বসে। হিস্টিরিয়ার মত!"

ততক্ষণে কিন্তু মেয়েটা ধড়মড় করে উঠে বসেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "You blackie—leave me—; ছেড়ে দাও আমাকে—কালা আদমী কোথাকার।"

অফিসারটিও চিৎকার করে উঠল, "শাট আপ ইউ বিচ! শাট আপ আই সে।"

কৃষ্ণস্বামী হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে মেয়েটির কপালে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি অসুস্থ। আমি ডাক্তার। আমার কথা তোমার শোনা উচিত। আর একটুক্ষণ শুয়ে থাক তুমি। সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আমি জানি। তুমি এই বড়িটা খেয়ে ফেল। প্লীজ! পীস অ্যাণ্ড বি স্টিল।"

লাগাটা খুলতে খুলতে আবৃত্তির সুর এসে বলে গেলেন, "Patience, you young rose-lipped maid—patience, please;—"

অফিসারটি হেসে উঠল; "হে ডক্—you are a poet—আঁ—দ্যাটস ফাইন।"

মেয়েটি চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে, তার মসৃণ ললাটে কয়েকটি রেখা জেগে উঠেছে।

"নাও, খেয়ে ফেল!"

বড়িটা খেয়ে মেয়েটি উঠে বসল। "এ স্মোক প্লীজ!" হাত বাড়িয়ে দিলে। নেল-পালিশ লাগানো আঙুলের ডগায় নিকোটিনের দাগ। অফিসারটি সোৎসাহে বলে উঠল, "Now she is O. K. এই নাও। Get up my honey."

তারপর কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে বললে, "ও ঠিক হয়ে গেছে, ডক, ও-কে। আমরা এবার যাব। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এই নাও।"

খান দুয়েক দশ টাকার নোট বের করে ধরলে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, "অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ কর আমাকে। এই আমার ধর্ম। এই আমার ঈশ্বরোপাসনা। ক্রাইস্টের নামে তোমাকে অনুরোধ করছি।"

॥ তিন ॥

ঝুমকি এসে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে লাল সিং আর সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, "সিং, বাবাসাহেবের কী হইছে গ!"

লাল সিং আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন দূরে গর্জমান উড়ো জাহাজের সন্ধান করছিল। ঝুমকির কথায় সে ফিরে তাকালে, "কী হইছে?"

"বিড় বিড় করে কী বুলছে, মন্তরটন্তর বুলছে। শুনলম আমি। ভয়ে পালায়ে এলম। চা দিতে লারলম। তুরা দে গা যা। বাবারে!"

মন্ত্রটন্ত্রের মত কিছু শুনলে ঝুমকির ভয় করে। মনে হয় হয়ত তাকেই ডাইনী ভেবে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। দিনের বেলা হলে সে পালিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। চুপ করে বসে থাকে, ঝোপের ভিতরের খরগোশ শজারুর মত। অনেকক্ষণ কেটে গেলে ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসে। তখন গুন-গুনিয়ে গান করে। তারপর উঠে আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে লালসিং কৃষ্ণস্বামীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, মধ্যে মধ্যে বাবাসাহেব বাইবেলের সার্মন আপন মনে বলে যান। সে আপনার কপালে গায়ে প্রথামত আঙুল ঠেকিয়ে 'আমেন' বলে।

সত্যই বাবাসাহেব ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে বাইবেল বলে যাচ্ছেন। বাইবেল নয়, কৃষ্ণস্বামী আবৃত্তি করছিলেন,

"It is the cause—it is the cause my soul—
Let me not name it to you, you chaste stars—
It is the cause.
Yet I'll not shed her blood,
Nor scar that whiter skin of her's than snow."

শেক্সপীয়রের ওথেলো থেকে আবৃত্তি করছেন কৃষ্ণস্বামী। আজ রামচরণের বাসা থেকেই ওথেলো মনে পড়ে গেছে। ওই মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে ওথেলোর কথা সত্ত ব্যবহার করেছেন।

"Let me look at your eyes. Look at my face." "Peace and be still."

এ সবই ওথেলো নাটকের সংলাপ।

"Patience, you young rose-lipped maid—"

—এরও খানিকটা অংশ তাই। অ্যামেরিকান অফিসারটির এসব বুঝবার কথা নয়। খাদা-মদা-নারী-হুল্লোড়-যুদ্ধাস্ত্র, এ ছাড়া এসব বুঝলে যুদ্ধ চলে না। অবশ্য কিছু কিছু উচ্চস্তরের লোক আছে। হয় ত অনেক কবি কলম ছেড়ে কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে রাইফেল কাঁধে এসেছে, কিন্তু তারা ক'জন? তারা অন্তত এমনি ভাবে মেয়েটিকে ঘাড়ে নিয়ে বেড়াত না। কিন্তু রিনা ব্রাউনও ধরতে পারলে না। শব্দগুলি কানে ঢুকল কিন্তু স্মৃতির ঘরের দরজা খুলল না। আশ্চর্য!

না। আশ্চর্য বা কিসে? মদের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার স্মৃতি, বুদ্ধি, বোধ হয় সমস্ত সত্তাকে।

চায়ের কাপটি নামিয়ে দিয়ে লাল সিং নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফাদার ঈশ্বরকে ডাকছেন।

রিনা ব্রাউনের কাছে একদিন ঈশ্বরও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তখন কালাচাঁদ ঈশ্বর মানত না।

কালাচাঁদ নয়, কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণ ইন্দু। পল্লী-গ্রামের ছেলে। কালো হিলহিলে লম্বা, বড় বড় চোখ, কপাল পর্যন্ত পুরু ঘন চুল, মুখে চোখে পল্লীর সারল্য। পল্লীর কর্কশতায় ঈষৎ মলিন। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণবন্ত, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। পল্লী-গ্রামের নামকরা কামারের গড়া খাঁটি ইস্পাতের দায়ের মত। ধারালো তীক্ষ্ণ অনমনীয় দৃঢ়; কিন্তু শান-পালিশে ঘষামাজা নয়, একটু ময়লা।

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান বৈদ্যবংশের সন্তান। কিন্তু সে-খ্যাতি তখন অস্তোন্মুখে। প্রপিতামহ এবং তাঁদেরও পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য। আয়ুর্বেদের প্রসার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। তিনি আয়ুর্বেদে মন না দিয়ে মন দিয়েছিলেন চাষবাস ও ধর্মকর্মে। একমাত্র ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন এই বাসনা। গ্রাম্য ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কালাচাঁদ আই এসসি পড়তে এল কলকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। আই এসসি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবে। সামান্য কৌতুকে হা-হা করে হাসে, দুড় দুড় করে সিঁড়ি ভেঙে নামে, ক্লাসের শতকরা আশিটি ছেলের মাথার উপরে হিলহিলে লম্বা কালা-চাঁদের মাথাটা প্রায় ছ ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠে থাকে। অশুদ্ধ গ্রাম্য-উচ্চারণে অসংকোচে কথা বলে। অফুরন্ত কৌতূহল। অহরহই প্রশ্ন—কী? কী? কী? ক্যানে? ক্যানে? ক্যানে? তার সঙ্গে গ্রাম্য সুরের টান। শহরের ছেলেরা হাসে। কিন্তু সে-সব কালাচাঁদ গ্রাহ্য করে না। সেও হাসে। কখনও কখনও গ্রামে বসে শেখা পুরনো ব্যঙ্গকথা বলে শোধ নিতে চেষ্টা করে।

বলে, "তোমরা যে আমাকে আব বল হে! তাহলে মামাকে কী বল?"

হঠাৎ কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল। তখনও সেণ্টজেভিয়ার্সের পুরনো বাড়ি। কলেজের দক্ষিণে প্রশস্ত খেলার মাঠ। সে-মাঠে টিফিনের সময় কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলে। সবই কলকাতার ইস্কুলের

আর একটুক্ষণ শুয়ে থাক তুমি। সুস্থ হয়ে উঠবে
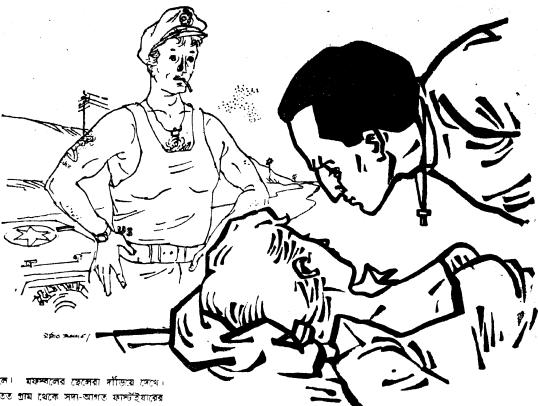
ছেলে। মফস্বলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখে। অন্তত গ্রাম থেকে সদ্য-আগত ফার্স্টইয়ারের ছেলেরা নামতে সাহস করে না। খেলোয়াড়-দের সংখ্যা বাইশে আবদ্ধ থাকে না। বাইশ ছাড়িয়ে যায়। কয়েকদিন দেখে, বোধ করি মাস দেড়েক পরে, আগস্ট মাস তখন, কালাচাঁদ বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গ্রাউণ্ডের ধারে দাঁড়াল। গোল-লাইনের ধারে। টিপিটিপি বৃষ্টিতে পিছল মাঠ। খেলোয়াড়েরা বল মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে পাঁকাল মাছের মত চলে যাচ্ছে। হো-হো শব্দে হাসিতে ভেঙে পড়ছে দর্শক ছেলেরা। একটা সিক্সইয়ার্ড শট। গোল-কীপার বলটি ঠিক জায়গায় রেখে সরে এল। ফুলব্যাক বল কিক করতে গিয়ে পা তুলে পিছলে পড়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। মুহূর্তে কালাচাঁদ পায়ের জুতো খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে বলটা কিক করে দিল। নিপুণ খেলোয়াড়ের শক্তিশালী শট, বলটা উঁচু হয়ে গিয়ে পড়ল সেণ্টার লাইন পার হয়ে ওধারের হাফব্যাক লাইনের সামনে।

"কে হে ছেলেটা? কে হে?" খোঁজ পড়ে গেল। কলেজ টীমের ক্যাপ্টেন, থার্ড ইয়ারের আশু দাস এগিয়ে এল। "কী নাম? কোথায় খেলেছ? কোন পজিশনে খেল? ম্যাচ খেলেছ?"

"হ্যাঁ, অনেক ম্যাচ খেলেছি। 'এতগুলোন' মেডেল পেয়েছি। সিউড়ি, বর্ধমান, কাঞ্চন-তলা, শান্তিনিকেতনে ম্যাচ খেলেছি। পাঁচ-খানা বেস্ট প্লেয়ারের মেডেল আছে। লেফট আউটে 'খেলাই'। কর্নার কিকে বল গোলে ঢুকিয়ে দোব। ফুলব্যাকেও খেলতে পারি। লেফট ব্যাক। সেণ্টারেও 'খেলিয়েছি'। গোলেও পারি। দেন ক্যানে একটা কর্নার কিক, করে দেখিয়ে দি। দেবেন?"

"আন ত হে বলটা। আন ত!"

কর্নার কিকে সত্যই বলটা গোলে ঢুকে গেল। একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বলটা গোলের সামনে সিক্সইয়ার্ড সীমানার ভিতরে এসে বেঁকে গিয়ে একেবারে কোণ ঘেঁষে গোলে ঢুকে যেত। এটা কালাচাঁদের পা আবিষ্কার করেছিল।

কালাচাঁদকে লেফট আউটে খেলতেও দেওয়া হল। হিলহিলে লম্বা কালাচাঁদ লম্বা পায়ে বল নিয়ে ছুটল। সে-ছোটা তীরের মত। একেবারে ওপারে লাইনের ধার থেকে বল মারলে। পড়ল গোলের সামনে। নিজে পা পিছলে পড়লও কয়েক বার। লোকে হাসলে। কিন্তু কালাচাঁদ সে শুনতেই পেলে না, দেখতেই পেলে না। হঠাৎ এক সময় বেগে এসে সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বললে, "একটা গোলে ঢোকাতে পারলেন না? আমাকে খেলাতে দেবেন সেণ্টারে?"

কালাচাঁদ সেণ্টার-ফরওয়ার্ডে এসেই বল ধরে একটু উপরে তুলে গোলকীপারের হাতেই যেন ফেলে দিলে। গোলকীপার বল ধরবার জন্য হাত বাড়াল, কালাচাঁদ লাফ দিয়ে বল মাথায় নিয়ে পড়ল গোলকীপারের উপর। পড়ল দুজনেই। বল গোলে ঢুকে গেল।

দ্বিতীয়বারে গোলকীপার তাকে মারলে। লাগল নাকে। কালাচাঁদ পড়ে গেল। নাক থেকে রক্ত পড়ে জামাটা ভেসে গেল।

মিনিট কয়েক মুহ্যমান হয়ে রইল, তার পরই উঠে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলো রক্ত এবং কাদামাখা হাতেই সরিয়ে দিয়ে গ্রাউণ্ডের ভিতর নেমে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন দাস তাকে হাতে ধরে বললেন, "না, আজ আর নয়। ঘরে ঘরে মারামারি করে না।" কালাচাঁদ আশ্চর্য ছেলে। সে হেসে ফেললে। বললে, "কী করে জানলেন আমি মারা-মারি করব?"

হেসে ক্যাপ্টেন বললেন, "আমরাও ত খেলি।"

কালাচাঁদ বললে, "তা বটে।"

কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল কলেজে সেই দিনই। কিন্তু ওখানেই তার খ্যাতির শেষ নয়। কিছু দিন, বোধ হয় মাসখানেক পরেই বাংলার অধ্যাপক ক্লাসে ঢোকাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বাঙালী অধ্যাপক, সাহিত্যরসিক,

সাহিত্যিক। ক্লাসের মধ্যে কে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে। সদ্য-খ্যাতি-পাওয়া কালাচাঁদ আঙ্গুরে দুর্দান্ত ছেলের মত দুই ক্লাসের মাঝখানটিতে হঠাৎ ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। পিছনে একটু কথা ছিল। ক্লাসের রোল নম্বর ওয়ান, মোল্লালীর কোন মুসলমান নেতার ছেলে—হালিম; ক্লাসে দুর্দান্তপনা করে। দুটি পিরিয়ডের মাঝখানে উঠে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ায়। অধ্যাপকদের নকল করে ভেঙায়। যা খুশি তাই বকে। বোর্ডের খড়ি দিয়ে কার্টুন আঁকতে চেষ্টা করে। একটা ক্লাউনের মত। ছেলেরা হাসে। হঠাৎ সেদিন বাংলার ক্লাসে কালাচাঁদ উঠে এসে দাঁড়াল। বাংলার ক্লাসে হালিম নেই, সে বাংলা পড়ে না। কালাচাঁদ বাংলা কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলে,

"আজি এ প্রভাতে—প্রভাত বিহগ—
কি গান গাইলরে।
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে—
ভাসিয়া আইলরে।"

তারপর বললে, "শোন বন্ধুগণ, বয়েজ—বয়েজ—মাই ফ্রেণ্ডস্—কমরেডস—!"

কমরেড শব্দটা তখন এসেছে। উনিশশ আটাশ উনত্রিশ সন।

"আমি কবিতা আবৃত্তি করছি শোন। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।"

কণ্ঠস্বর তার ভাল ছিল না। তার উপর বয়সের গাঢ়তা কণ্ঠস্বরে তখন সদ্য সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। গলাটা তখন ভাঙা ভাঙা, খানিকটা চেরা-চেরা। কিন্তু সে-সব তার খেয়ালও নেই, গ্রাহ্যও করে না। সব কিছুতে একটা বিশেষ শক্তিতে সে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে, ওই সঞ্চিত জলরাশির নিম্নগ গতিবেগের মত, প্রতিটি জলবিন্দুর শক্তি প্রয়োগের মত ওর দেহ মন দুয়েরই প্রতি অণুপরমাণু যে-কর্ম সে করে তাতেই তন্ময় হয়ে যায়। থরথর করে গলার স্বর কাঁপতে লাগল। বিদ্যুৎ-শক্তির মত সকল শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হল সে-আবেগ।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর।"

কণ্ঠস্বর তার উচ্চ হতে লাগল। আবেগ যেন পুঞ্জীভূত মেঘের মত আবর্তিত হয়ে চলল। আগাগোড়া মুখস্থ কবিতাটি আবৃত্তি করে শেষ স্তবকে এল।

'কি জানি কি হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

* * *

ওরে চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর—
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর।"

সংগেই সে লাফিয়ে ডায়াস থেকে নেমে এসে ক্লাসের বন্ধ দরজায় দুম-দুম শব্দে কিল ঘুষি মারতে শুরু করে দিলে। ছেলেরাও হাইবেঞ্চে চাপড় মারতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, "দ্যাটস নট দি ওয়ে, দ্যাটস নট দি ওয়ে মাই ফ্রেণ্ডস। ঝরনার জলের কারাগার ভাঙার ধারা আর মানব-হৃদয়ের পক্ষে রুদ্ধ পথের বাধা ভাঙার ধারা এক নয়। কিন্তু তুমি ত আবৃত্তি ভাল কর কালাচাঁদ!"

কালাচাঁদ আর একদফা খ্যাতি লাভ করলে।

সেবার ইণ্টার-কলেজিয়েট আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠানও হল। বাংলা এবং সংস্কৃত প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করলে। প্রাইজ পেলে না। কিন্তু সংস্কৃত আবৃত্তিতে সে প্রশংসা অর্জন করলে। কণ্ঠস্বর তার সব চেয়ে বড় বাধা হয়েছিল, নইলে হয়ত পেত। উচ্চারণের জন্যেও তার নম্বর কম হয়ে গেল।

খেলার মাঠ থেকে কলেজ পর্যন্ত, ওদিকে নামজাদা রেস্টুরেণ্ট থেকে হোস্টেল পর্যন্ত কালাচাঁদের কণ্ঠস্বরে, গতিবেগে বায়ুস্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল হল। ও বললে, অন্য কলেজে চলে যাবে। কলেজ টীমের ক্যাপ্টেন রেকটরকে বলে ওকে প্রমোশন দেওয়ালেন। রেকটর ডেকে বললেন, "তোমাকে সাবধান হতে হবে কালাচাঁদ। তুমি ত dull ছেলে নও।"

সেদিন কালাচাঁদের মনে পড়েছিল তার বাবাকে এবং মাকে।

স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তার বাবা। পূজা আর অর্চনা নিয়ে থাকেন। মুখে চোখে, আচারে-আচরণে একটি যেন কী আছে। যাতে তাঁর কাছে গেলেই বিমর্ষ হয়ে যেতে হয়। বোধ হয় একটি প্রচ্ছন্ন লজ্জার অনুশোচনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। মুখে কিছু বলেন না। শুধু গৃহদেবতার দোরে প্রণাম করবার সময় আশে-পাশে কেউ না থাকলে বলেন, "আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা কর প্রভু! তোমার ভোগ কমাতে হয়েছে, পূজার সমারোহ কমাতে হয়েছে—এ দুঃখ আমি তোমাকে ছাড়া কাকে বলব?"

মা তার প্রসন্নময়ী। মা তার কল্পতরু। যে যখন যা চেয়েছে, তাই তিনি তাকে যুগিয়েছেন। যে যা চায়, সে তা পাবেই, সে-বিশ্বাস তার মা তাকে দিয়েছেন। তার শক্তিও তিনি তাকে দিয়েছেন। অফুরন্ত দুধ ছিল তাঁর স্তনভাণ্ডে, অফুরন্ত স্নেহ ছিল তাঁর বুকে, আর ছিল মনে অফুরন্ত আশা। অবাধ এবং অগাধ ছিল তাঁর প্রশ্রয়।

তার মা তাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে সাঁতার জানতেন। যে পুকুরে স্নান করতেন সে-পুকুরে পদ্ম ফুটত। সে রোজ আব্দার ধরত ফুলের জন্য। মা তুলে এনে দিতেন। কিছু দিন পর বলেছিলেন, "তুই সাঁতার শেখ, শিখে তুলে আন, আমি পারব না।" সাঁতার শেখার আতঙ্কে কয়েক দিন সে আর পদ্মের কথা তোলেনি। দিন কয়েক পর মা নিজেই একদিন গামছ-কোমর বেঁধে ঘড়াটা ভাসিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, "আয়। পদ্ম তুলবি।"

সে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। আসবার সময় বারকয়েক ঘড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "এটা ধর।"।

তারপর সে-ই তাঁকে নিত্য এনে দিত পদ্মফুল গৃহদেবতার পূজার জন্য।

মা তার কাছে শুয়ে গল্প করতেন ভবিষ্যতের। "মস্ত বড় ডাক্তার হবি। বিলেত যাবি। জার্মানি যাবি। মস্ত বাড়ি করবি, গাড়ি কিনবি। দাসদাসী।"

ঐশ্বর্যের গল্প করে যেতেন। অত্যন্ত সহজ মানুষ ছিলেন। দান-ধ্যান-দয়া স্বার্থ-ত্যাগ এসব ছিল তাঁর কাছে নিজের ভোগের পরে। নিজে রোজকার করে আগে নিজে খাব, তারপর অন্যের কথা।

সে বলত, "বিলেত গেলে জাত যাবে না?"

"আজকাল আর সেদিন নেই। তবে যায় যাবে। জাত নিয়ে কি তোর বাবার মত ধুয়ে ধুয়ে খাবি?"

"বাবা মত দেবে না।"

"তুই চলে যাবি। আমরা না হয় আলাদাই থাকব। বৃন্দাবনটন চলে যাব। তুই ত বড় হবি!"

ফেল হয়ে তবে সেদিন তাদের কথা মনে পড়েছিল।

এবং সে মনে পড়াটা আর ভোলেনি সে। অন্তত আই এস্সি পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ভোলেনি। ফার্স্ট ডিভিশনে আই এস্সি পাশ করেছিল সে।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল।

এখানে সে কালাচাঁদ গুপ্ত নয়, কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত। আই এস্সি পরীক্ষা দেবার আগেই কোর্ট মারফত এফিডেভিট করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে, নাম পাল্টে নিয়েছিল সে।

সেণ্টজেভিয়াসের ফাদার রেক্টর তার পড়াশোনায় উন্নতি দেখে তার উপর খুশিই ছিলেন।

তিনি হেসে বলেছিলেন, "What's in a name—কালাচাঁদ?"

কালাচাঁদও হেসে বলেছিল, "কালাচাঁদ is black moon, and কৃষ্ণেন্দু means the same—the black moon. I have changed the word only, not the meaning. I am the same old black moon, Father."

বাবাকে, মাকেও তাই লিখেছিল।

বাবা উত্তর দেননি, মা উত্তর দিয়েছিলেন, "বেশ করিয়াছ। তাহাতে আমরা মনে কিছু করি নাই।"

কিন্তু কলেজে-কলেজে তার কালাচাদ নাম তখন তার নিজের মতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাতে সে দমেনি। কেউ কালা-চাঁদ বলে ডাকলেই বলত, "not কালাচাঁদ—I am কৃষ্ণেন্দু—। কল মি কৃষ্ণেন্দু প্লীজ।"

এইখানেই রিনা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচয়। সেও ওই কালাচাঁদ নাম নিয়ে। রিনা ব্রাউন কলেজের চীফ নার্স মেট্রন—পলি ব্রাউনের সৎ মেয়ে। পলির স্বামী জিমি ব্রাউনের প্রথম পক্ষের মেয়ে। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার্সের মধ্যে মিসেস ব্রাউনের বাসা। রিনার বয়স তখন পনের-ষোল। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি তখনও কিশোরী। কিন্তু তখন থেকেই অপরূপ মোহময়ী। গায়ের রঙ সাদা হলেও বাঙলাদেশের একটি শ্যামলিমার আভাস তাতে স্পষ্ট। সব চেয়ে মোহকর মেয়েটার চুল। ছোট কপাল ঢেকে এমন অপর্যাপ্ত পুরু ঘন কাল চুল দেখা যায় না। তৈল-হীন রুক্ষতার মধ্যেও তার কাল-শোভা ক্ষুণ্ণ হত না, ধূসরতার আভাস ফুটত না। কপালের উপর ঘন কাল চুলের সন্তারের সঙ্গে এখানকার লালপ্রান্তরের প্রান্তে ঘন শালবনের শোভার যেন মিল আছে। কৃষ্ণকুন্তলার চেয়ে অরণ্যকুন্তলার ম... বললেই যেন ওর উপমা শোভনতর করে বলা হয়। তেমনি দুটি মোটা কালো ভুরু—কপালের মধ্যস্থল থেকে যেন আকর্ণ বিস্তৃত। কাঁচা বাঁশের মোটা ধনুকের মত। অনুরূপ সুন্দর আয়ত দুটি চোখ—তাকে সুন্দরতর করেছে তার চোখের পাতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি। ফুলের কেশরের মত দীর্ঘ। মনে হয় জন্ম থেকেই চোখের পাতায় কাজল-রেখা আর স্বপ্নালুতা মেখে নিয়ে মেয়েটি জন্মেছে। রিনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দেখা যেত। সে-সময়টাতে তখনকার দিনের মিলিটারী মেডিক্যাল স্টুডেন্টসদের সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসত, ঠিক তার কিছুক্ষণ পর, বোধ হয় দশ মিনিট পর। মিলিটারী ছেলের দল প্রায় সব বেরিয়ে চলে যেত। থাকত শুধু জন ক্রেটন, মিলিটারী স্টুডেন্টসদের সেণ্টার হাফ। মারপিটে সিদ্ধহস্ত জনি গুণ্ডা।

জন ক্রেটন। যুদ্ধবিভাগের নামকরা আই এম এস অফিসারের ছেলে। দুঁদে অফিসার, দুর্দান্ত মাতাল, নামকরা শিকারী, ভাল নাচিয়ে, মারামারিতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ছিল। লোকে বলে যেখানে চার্লস ক্রেটন থাকত, সে-ক্যাণ্টনমেণ্টে অফিসারেরা সন্ত্রস্ত থাকত। ঝড়ো হাওয়ার মত ঘরসংসার ভেঙে দিলেই ছিল তার উল্লাস। তার এই দুর্দান্তপনা মেয়েদের পক্ষে ছিল একটা আকর্ষণ। এই আকর্ষণে একদা নাকি পলি ব্রাউনও—থন মিস পলি মরিসন—পড়েছিল। কিন্তু ক্রেটন তখন বিবাহিত। স্ত্রী ছিল ইংলণ্ডে। জন তখন শিশু। পলি মরিসন ভগ্নহৃদয়ে মিলিটারী বিভাগের কাজ ছেড়ে এসে কাজ নিয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। ক্রেটন সাহেব দুর্দান্ত হলেও পাষণ্ড ছিল না। কলকাতায় কাজ পেতে সে সাহায্য করেছিল। কয়েকটা বড় হাসপাতাল, যেগুলি ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি ঘুরে সে মেডিক্যাল কলেজে এসে কাজ নিয়েছিল। তখনও সে মিস পলি। এখানে থাকতেই সে মিসেস ব্রাউন হয়েছে। রিনা তখন দশ বছরের মেয়ে। জেমস আর রিনাকে নিয়ে পলি ব্রাউন সংসারে ডুবে ক্রেটনকে একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ গত বছর জন ক্রেটন এসে ভর্তি হল মেডিক্যাল কলেজে। মিসেস পলি ব্রাউনের কাছে এসে একখানা চিঠি দিয়ে বললে, "মেজর চার্লস ক্রেটন অব দি কিংস ওন রেজিমেণ্ট, আপনার কি তাকে মনে আছে?"

"মেজর চার্লস ক্রেটন, ডিয়ার চার্লি?"

জন হেসে বলেছিল, "আমি তাঁর ছেলে।"

"তুমি তার ছেলে?"

"হ্যাঁ, এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে এসেছি।"

বিস্মিত হয়েছিল পলি ব্রাউন। মেজর চার্লস ক্রেটনের ছেলে হোম না পড়ে এখানে পড়বে ডাক্তারি। আই এম ডি হবে? চার বছরে চিকিৎসাশাস্ত্র শেষ! নরুনে চালিয়ে এদেশের হাতুড়েরা ফোঁড়া কাটে। ওরা ভোঁতা ছুরি চালিয়ে তার চেয়ে ভাল কাটতে পারে না। আই এম ডির ব্যবহারের জন্য ধারালো ছুরির বদলে ভোঁতা ছুরির ব্যবস্থা। ওদের কখনও ব্রিটিশ আইরিশ রেজিমেণ্টে চাকরি হবে না। কালা সিপাহীর রেজি-মেণ্টের মেডিক্যাল অফিসার হবে।

বিস্ময়ের অবধি ছিল না পলি ব্রাউনের। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে পলি ব্রাউন নিজেই বলেছিল, "স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ লাক! কী বলব লাক ছাড়া?"

মেজর ক্রেটনের জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিচিত্র অদৃষ্টই বটে। পাঁচ বছর আগের কথা। ক্রেটন ছিল সি-পিতে একটা বড় ক্যাণ্টনমেণ্টে। তখন তার স্ত্রী-পুত্র এখানে এসেছে। ক্রেটন ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে। স্ত্রী আসার জন্য অফিসার-দের সমাজে ঘোরাফেরায় পদক্ষেপ সংযত করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ক্রেটনের স্ত্রী মার্গারেটও ছিল শক্ত মেয়ে। সাহসে দৈহিক শক্তিতে দুইয়েই ছিল ক্রেটনের উপযুক্ত স্ত্রী। ক্রেটন সমাজ ছেড়ে মধ্যভারতের জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেছিল শিকারের সন্ধানে। শিকারের সন্ধানে বনে ঘুরবার সময় আরণ্য জাতির নারীদের উপভোগের পথটা বেছে নিয়েছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে মার্গারেট তার আভাস পেলে। সে একটা রাইফেল নিয়ে শিকারে তার সঙ্গিনী হল। শেষবারে ঘটল বিচিত্র ঘটনা।

ক্রেটন সেই ধরনের লোক, যারা কোন কথা রেখে ঢেকে বলে না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে নয়, জীবনের কোন ঘটনাই তার কাছে লজ্জার হেতু নয়। পলি ব্রাউনকে লিখেছে, "পলি, ঘটনাটা আশ্চর্য। আমার মন আমাকে ঠকালে, না এটা নিয়তির খেলা, কি আমার কর্মফলের পরিণতি, আজও ভেবে পাই না। সে এক গম্ভীর বনে একটা গ্রামে আড্ডা নিয়েছিলাম। মার্গো সঙ্গে। একজোড়া বাঘের আড্ডা কাছেই। গ্রামে এসে একটি আশ্চর্য বুনো যুবতীকে দেখলাম। মন আমার বাঘের চেয়ে ওর দিকেই বেশী ঝুঁকল। কিন্তু মার্গারেট সঙ্গে। যাই হক, মাচা বেঁধে দ্বিতীয় দিন রাত্রে একটাকে মারলাম। একটা পালাল। মরল মোটা সেটা বাঘ। পালাল বাঘিনীটা। তিন দিন আর পেলাম না তাকে। কিন্তু তার পায়ের ছাপ আশ্চর্যভাবে চারিদিকে দেখলাম। যেন সামনের দিকে না এসে পিছনের দিকে সে ঘুরেছে ফিরেছে। গ্রামের সর্দার বললে, "ফিরে যাও সাহেব, এ বাঘিনী ভয়ঙ্কর। এ তোমার পিছু নিয়েছে।" দিনের বেলা কথা হচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা জড় হয়েছে। তাদের মধ্যে কিন্তু সেই বুনো আশ্চর্য মাদকতাময়ী মেয়েটি। সকলকে লুকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। তুমি সে-কালের চার্লিকে জানতে। এ বিষয়ে সে ছিল নিপুণ শিল্পী। চার্লস ক্রেটন কি বাঘিনী পিছু নিয়েছে বলে ওই বুনো মদিরা পান না করে আসতে পারে? মার্গারেট ঠিক বোঝেনি, কিন্তু ভয় সে পেয়েছিল, 'ফিরে চল।' আমি বলেছিলাম, 'আজকের দিনটা দেখে যাব।' ঠিক এই সময়টিতেই বাঘিনী ঠিক গ্রাম-প্রান্তে দেখা দিয়ে একটা গর্জনে আমাকে নিয়তির নিমন্ত্রণ জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হল মেয়েটার সঙ্গে। সেও নিমন্ত্রণ জানালে হেসে। আমি তাকে বললাম, 'রাত্রে আজ শিকারে যাব না, গভীর রাতে আসব।' মার্গারেটকে বললাম, 'শরীর খারাপ, মাচায় যাওয়া আজ ঠিক হবে না।' থাকলাম [illegible]। [illegible] বুনোদেরই প্রধানের একখানা ঘর। মদ খেয়েছিলাম। মার্গারেটকেও খাইয়ে-ছিলাম। [illegible] ঘুম পাড়িয়ে [illegible]। [illegible] ছিল। হঠাৎ খুটখাট শব্দ শুনলাম। কান পেতে থাকলাম। আমি শিকারী। আমি জানোয়ারের পায়ের শব্দ চিনি। [illegible] চার্লি ক্রেটন আমি [illegible] [illegible] শব্দ [illegible]। এ পায়ের শব্দ সেই বুনো মেয়ের। দরজা খুললাম

সন্তর্পণে। ফাঁক করে দেখলাম। চাঁদ ছিল আকাশে। বনের মধ্যে জ্যোৎস্না। আশ্চর্য তার রূপ। ঘন সবুজের ঘেরের মধ্যে সে শুভ্রতার তুলনা খুঁজে পাইনা। তার মধ্যে দেখলাম সে মেয়েকে। ভুল আমি দেখিনি। বুকের ভিতর রক্ত ছলাৎ করে উঠল। আমি বেরিয়ে গেলাম। শিস দিলাম। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় কে? ঠিক এই মুহূর্তে বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। পিছন থেকে বাঘিনী লাফ দিয়ে পড়ল আমার উপর। একটু সরতে পেরেছিলাম, তবু সে আমার ডান কাঁধের উপর পড়ল। সেই মুহূর্তে শুনলাম মার্গারেটের চিৎকার। তার পর মুহূর্তে শুনলাম বন্দুকের শব্দ। পর পর দুটো শব্দ। আবার বাঘের গর্জন। তারপর মনে নেই। জ্ঞান হল হাসপাতালে দীর্ঘদিন পর। ডান হাতখানা কেটে ফেলতে হয়েছে। ডান কানটা নেই। ডান পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। তাতেও জোর নেই। বাঘিনী মার্গারেটকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মরেছিল। দুটো গুলিই লেগেছিল তার বুকে পেটে। মরবার সময় গড়াগড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল আমার উপরেই। আলিঙ্গন করেছিল। আরও মজার কথা কি জান? সেই বুনো গ্রামে ওই মেয়েটার সন্ধান কেউ আমাকে দিতে পারেনি। আমি খোঁজ করেছিলাম। তারা বলে, 'কই এমন মেয়ে ত গাঁয়ে নেই!' আজও আমি ভাবি কি জান? ওই মেয়েটা কি প্রথম থেকেই আমার মদবিহ্বল মস্তিষ্ক এবং আমার নারীলোলুপ চিত্তের ভ্রান্তি? অলীক কল্পনা? যাই হক, আজ আমি বিকলাঙ্গ অসহায়, সামান্য পেনশনের উপর নির্ভরশীল সামান্য ব্যক্তি। জনিকে ইংলন্ডে পাঠিয়ে পড়াবার সামর্থ্য নেই। ও কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। আমি জানি তুমি ওখানকার মেট্রন। জনিকে একটু দেখো।"

ভগবানের নাম উচ্চারণ করে পলি ব্রাউন গায়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকেছিল। "হে ভগবান! পুয়োর চার্লি শয়তানের হাতে পড়েছিল। কিন্তু তুমি বস জন। তুমি মেজর চার্লস ক্রেটনের ছেলে। মেজর ক্রেটন এক সময় আমার বস্ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে অবারিত রইল। যখন খুশি আসবে।"

আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্বামী জেমস ব্রাউনের সঙ্গে। জেমস ব্রাউন এক সময় মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকত। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ জমিদারী কোম্পানিতে কাজ করতেন জেমসের বাবা। সেখানে পাহাড় জঙ্গল কিনে ব্যবসা করতেন। জেমস ব্রাউনও সেই ব্যবসা করত। ব্যবসা ফেল পড়ার পর ইনসলভেন্সি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মেয়ে রিনাকে নিয়ে। তারপর দেখা হয় পলি মরিসনের সঙ্গে। সে আজ চার বছরের কথা।

"রিনা বড় ভাল মেয়ে।"

ডবল বেণী ঝুলিয়ে রিনা বসে মিষ্ট হাসি হেসেছিল।

"ওর বাবা ঠিক করেছিল, ওকে কনভেন্টে রেখে শেষ পর্যন্ত 'নান' করে তুলবে। জিমির ধর্মকর্ম বাতিক। কনভেন্টে রেখেও-ছিল। আমি নিয়ে এসেছি জোর করে। দেখ ত কী মিষ্টি স্বভাব মিষ্টি চেহারা।"

সেই মিষ্টি স্বভাবের রিনা ব্রাউন ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, "ইউ ব্ল্যাক কালাচান্ড! ইউ হিদেন!"

কৃষ্ণেন্দু কলেজের ভিতর খেলার মাঠে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে বিজয়ী বীরের মত এসে সবে নেমেছে, ছেলেরা তাকে উল্লাস-কলরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। রিনা ব্রাউন ওদের ফ্ল্যাট থেকে রাগে ফুলতে ফুলতে নেমে এসে গ্রাউন্ডের ভিতরেও খানিকটা ঢুকে চিৎকার করে ডেকেছিল, "ইউ ব্ল্যাক কালাচান্ড! ইউ হিদেন!"

ওর পিছনে পিছনে এসেছিল ওর আয়া। একটি কটা এদেশী মেয়ে। মাথার চুল-গুলি পেকে গিয়েছে। মোটা ভুরু। অদ্ভুত লাগত তাকে দেখে। আর অদ্ভুত ছিল চোখের দৃষ্টি। সর্বদাই যেন আতঙ্কে বিস্ফারিত এবং পলক পড়ত না। সে পিছন থেকে চিৎকার করছিল—"রিনা, রিনা, রিনা, রিনা! নহি। নহি। নহি!"

রিনা থামেনি। সে পা ঠুকে বলেছিল, "ইউ, শুনতে পাও না তুমি?"

কালাচাঁদ তার কাছে এসে বলেছিল, "বর্ষার ভিজে কাদার উপর এমন করে পা ঠুকো না। তোমার এমন স্কার্টটা কাদার ছিটেতে ভরে গেল।"

সত্যিই তাই গিয়েছিল। ছেলেরা হেসে উঠেছিল। রিনার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সেই হাসির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে। কথার উত্তর খুঁজেও পায়নি, সরাসরি সে অভিযোগ করে বলেছিল, "কেন তুমি জনিকে এমন করে মেরেছ? হোয়াই? ইউ ব্রুট।"

সে উত্তর দেবার আগেই কলেজ টীমের ফুলব্যাক বসন্ত বলেছিল, "ওর মাথার ব্যান্ডেজটা দেখছ না? জনিই মেরেছিল ওকে আগে।"

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "আমার দাগদস্তা নেই মিস ব্রাউন, থাকলেও সে এসে জনিকে এ-প্রশ্ন করত না। সে জানে, লড়াই আরম্ভ হলে যার জোর বেশী, তার আঘাতটা জোরাল হবেই। কাঁচকেরা চিরকাল ভীমের হাতে মরে।"

ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠেছিল। ওই আয়া মেয়েটি হঠাৎ হাত জোড় করে কৃষ্ণেন্দুকে পরিষ্কার বাংলায় বলেছিল, "হে বাবা। দয়-(দোহাই) তুমার পিঁ... পুরুষের, হেই ভালমানুষের ছেল্যা, আ... হাতজোড় করছি। ঘাট মানছি। উ... কিছু বল নাই। হেই বাবা!"

মেয়েটা বাঙালী! সেই বিস্ময়েই স... ছেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রিনা এ... অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। চিৎকা... করে বলেছিল, "ইউ উইল বি পানিশড, গ... উইল পানিশ ইউ!"

কলেজের ভিতরের খেলার মাঠে খেলা... অধিকার নিয়ে সাধারণ ছাত্র আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলিটারী ছাত্রদের ঝগড়া, মারপি... কলেজের ইতিহাসে লেখা আছে। তার জের মেটেনি তখনও। সেই জের চলেছে খেলার মাঠে। গতকাল দুই দলের ম্যাচে জনিই শুরু করে মারপিট! বুটের সুযোগ ... ওদের চিরদিনের। তার উপরে জনি মার-পিটে সিদ্ধহস্ত। বেচারা জনি, কৃষ্ণেন্দুকে জানত না। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ছ'ফুট লম্বা চেহারাখানা দেখে একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া গত দু বছরে কালাচাঁদের খেলার খ্যাতির উপরেও শ্রদ্ধা করে মারবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথমেই সেণ্টার-হাফ জনি বুটের লাথি মেরে জখম করেছিল এদের সেণ্টার-ফরওয়ার্ডকে। বেচারার ডান হাঁটুর নী-কাপ জখম হয়। উঠল বটে, কিন্তু তখন ছুটবার ক্ষমতা গিয়েছে। তার পরই এদের সেণ্টার-হাফের পায়ের বুড়ো আঙুল ফাটিয়ে দিলে। রেফারি তাকে সাবধান করে দিলেন। জনি সরে এসে রেফারিকে গাল দিলে "সন অব এ বিচ" বলে। কথাটা কানে গেল কৃষ্ণেন্দুর। সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে নিজের জায়গায় দিয়ে সে এল সেণ্টার ফরওয়ার্ডে, দাঁড়াল জনির মুখোমুখি।

জনি হেসে বললে, "কালাচান্ড, দ্যাটস অলরাইট।"

কথাটা শেষ হতে না হতে বল এসে পড়ল দুজনের মধ্যে। জনি বুট ঝাড়লে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে। কালাচাঁদ সুকৌশলে হাঁটু বাঁচিয়ে জনির উৎক্ষিপ্ত পায়ের তলার দিকে ঝাড়লে কিক। ছ'ফুট লম্বা মানুষের শক্ত বাঁশের মত পায়ের কিক। চিত হয়ে পড়ে গেল জনি।

কিছুক্ষণ পরই জনি মারলে ওকে মাথায়। মাথাটা ফেটে গেল। রক্ত ঝরল। রক্তমাখা বড় চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু মিনিট দুয়েক পরেই ছুটল। বল ধরলে। জনি প্রাণপণে ছুটে এসে রুখলে। বল তখন কৃষ্ণেন্দু ইনসমানকে দিয়ে সামনে ছুটেছে। উঁচু বল এসে পড়ছে। জনি কৃষ্ণেন্দু সামনাসামনি। দুজনেই হেড দিতে লাফাল। কৃষ্ণেন্দু হেড দিলে, জনি পড়ল মাটির উপর কাতর আর্তনাদ করে; পেট চেপে ধরে। পড়ে...

শুয়ে পড়ল, তারপর অজ্ঞান। তুলে নিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। হাসপাতালে আছে আজও। পেটের অন্ত্রে আঘাত লেগেছে। এর পর কৃষ্ণেন্দু হ্যাটট্রিক করেছে।

রিনা ব্রাউন তার জন্যে তাকে বলে গেল, "গড উইল পানিশ ইউ।"

কৃষ্ণেন্দু উত্তর দিয়েছিল, উত্তর দিতে একটু দেরি হয়েছিল ওই আয়াটির মুখের আকুতিভরা বাংলা কথা শুনে। বিস্মিত হয়ে আধ মিনিট দেরি হয়েছিল, চিৎকার করেই সে বলেছিল, "হ্যালো মিস, হ্যালো। [illegible] আস্ক ইওর গড— । তোমার ভগবানকে বল—আমার সামনে আবির্ভূত হতে। কিংবা আমাকে তাঁর সামনে হাজির করতে। জান, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমার একটা পরম লাভ হবে। আমি তাঁকে দেখতে পাব। তার জন্যে দরকার [illegible] ত বল, তোমার জনিকে আবার গুঁতো [illegible]।"

রিনা ব্রাউন! তোমার ঈশ্বরকে আমি [illegible] রিনা ব্রাউন। কিন্তু আশ্চর্য! [illegible] অপরাধে অপরাধিনী আদিম আরণ্য [illegible] এই ঝুমরির মধ্যেও তাকে দেখেছি। [illegible] সিন্ধু, লাল সিং, এদের মধ্যেও [illegible]। তোমার সঙ্গী ওই মরণ- [illegible] মদ্যপানবিভোর অ্যামেরিকান [illegible] মধ্যেও তাঁকে দেখলাম, তিনি [illegible] যে প্রাণ নেবে তার মধ্যে [illegible] যে প্রাণ দেবে বলে [illegible] তার মধ্যে তাঁকে দেখলাম। কিন্তু [illegible] মধ্যে দেখলাম না, বিনা ব্রাউন।

"[illegible]!" ঘরে ঢুকল সিন্ধু।

"কে? সিন্ধু?"

"হঁ বাবাসাহেব। চা দিয়ে গেল, খেলে [illegible] কত হইছেক—খিদ্যা কি তুমার [illegible] না বাবাসাহেব?"

"আমার রুটি ঢাকা দিয়ে রেখ্যা দাও সিন্ধু। ইয়ার পর যখুন হোক খাব।"

"উঁহ। আপুনি খেয়ে লাও—তবে [illegible] যাব।"

"না সিন্ধু! আজ আমাকে ছাড়ান দাও [illegible]।"

"শরীর কি ভাল নাই বাবা?"

"শরীর ভাল আছে বেটী। মন ভাল [illegible]।" বলেই উঠে পড়লেন কৃষ্ণস্বামী। [illegible] থেকে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বারান্দা থেকে নামলেন খোলা উঠানে।

[illegible] পাশে বর্ষার ঘনশ্যাম শালবনে জ্যোৎস্নার আভা প্রতিফলিত হয়েছে। [illegible] দিগন্ত পর্যন্ত বনের মাথায় মাথায় [illegible] পড়েছে। নিঃশব্দ নয়, নিস্তব্ধও নয়। [illegible] যেন থমথম করছে। গাছে গাছে [illegible] পরিপুষ্ট হচ্ছে। কাল সকালে ফুটবে। পরশু যারা ফুটবে তারা বাড়ছে। আজ সকালে যারা ফুটেছিল, তাদের গন্ধ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে। মাটির গভীর অন্ধকারে মূলে পচন রস পান করছে কৃমির মত লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্মাগ্র মুখ বিস্তার করে। অবিরাম চলছে বিচিত্র জীবন-তপস্যা। পঙ্করস পুষ্প হয়ে ফুটছে।

রিনা ব্রাউন মদ খেয়ে হয়ত নাচছে বা চিৎকার করছে, হয়ত অ্যামেরিকান অফিসারের সঙ্গে বিকৃত লালসায় উন্মত্ত ব্যভিচারে নিজেকে ক্ষয় করছে। বস্তুজগতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকেরা বলে সেটা আকস্মিক ঘটনা। তা থেকেই জেগেছিল প্রাণ। সেই প্রাণের জাগরণেই ঈশ্বরের তপস্যার হোমকুণ্ড জ্বলছে। অনন্ত প্রাণের সমিধের আহুতি চলেছে তাতে। প্রাণ তেজ হল। তুমি তাতে কালি হয়ে ঝরে পড়লে, রিনা ব্রাউন! এমন কী করে হল?

এগিয়ে চললেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর আশ্রমের সীমানা পার হয়ে বনের দিকে চললেন। বনের মধ্যে গাছেরা যেন কথা বলছে। বাতাসে, পাতায় পাতায় সাড়া জেগেছে, সুর জেগেছে। সারাটা দিন ওরা মানুষের জীবজন্তুর প্রাণের খাদ্য অক্সিজেনের ভাগ নিয়েছে। এইবার অক্সিজেন দিচ্ছে। তুমি দিনরাত্রি কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করছ, সারা দিনরাত্রি কার্বন ডায়োক্সাইডই দিচ্ছ। লয়ের মধ্যেও বিচিত্র সূক্ষ্ম স্থিতি আছে। তোমার মধ্যে শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয় শুধু ক্ষয়।

"বাবাসাহেব! ফাদার!"

বাংলোর দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যোসেফলাল সিং ডাকছে। তিনি বনের দিকে চলেছেন, তাই শঙ্কিত হয়েছে। বনে জানোয়ার আছে। বুনো শুয়োর আছে। মধ্যে মধ্যে চিতা আসে। সেই ভয়ে তাঁকে [illegible] বলছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় কৃষ্ণস্বামী বললেন, "বেশী ভিতরে আমি যাব না যোসেফ।"

"না, বাবাসাহেব, গাঁ থেকে লোক এসেছে, ফাদার।"

লোক! তা হলে কারও বাড়িতে অসুখ, বিপদ! ফিরলেন কৃষ্ণস্বামী। বারান্দায় বসে আছে; একক্রোশ দূরের একখানি ছোট গ্রাম থেকে এসেছে। কৃষ্ণস্বামীর চেনা সবাই। এ যে বুড়ো শরণ লায়েক!

"কী হল লায়েক। এত রাতে?"

"কী হবেক? বি[illegible]দ! তা লইলে তুমার কাছে আসব ক্যানে এত রেতে!"

"কার অসুখ? কই জানিনা ত কিছু?"

"জানবা কী? এই আমার ছেল্যাটার বড় বিটিটো। পেথম পোয়াতি বটেক। সেই দুপুর থেকে বেথা উঠেছে। দাইটো এই রেতে বলে, 'আমি খালাস করতে লারব লায়েক; গতিক মন্দ বটেক লাগছে। তুমি বাবা 'বাবাসাহেবকে খবর দাও।' মেয়্যাটো গোঙাইছে বাবা। শুনতে পারা যেছে না। যেতে একবার হবেক বাবা।"

"হবে বই কি।" কৃষ্ণস্বামী দ্রুতপদে উঠে গেলেন ঘরের ভিতরে। ডাকলেন, "যোসেফ! তুমিও চল। যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যাগটা গুছিয়ে লাও হে। তোমরা আলো আন নাই লায়েক?"

"না গো বাবা, [illegible] কুথাকে পাব গো। একটো কানাকুজো হারিকেন আছে—তা সিটো দিলম ঘরে। [illegible] আকাশে জ্যোৎস্না রইছে—ঠিক চলে যাব।"

"আমাদের একটা হ্যারিকেন নাও লাল সিং। Blessed is he that cometh in the name of the Lord. চল লায়েক।" থাক রিনার কথা। রিনা মৃত। তাঁর কাছে সে মৃত।

॥ চার ॥

"Woe unto you," রিনা তাকে লিখেছিল একদিন। শেষ চিঠি তার। "কৃষ্ণেন্দু, তুমি আমার কাছে মৃত। Dead to me."

পরদিন সকালে শরণ লায়েকের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন কৃষ্ণস্বামী। প্রায় সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরণের নাতনীকে প্রসব করিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ভোরের শালবনে এখনও রাত্রিচরদের আনাগোনা স্তব্ধ হয়নি। পাখিরাও বাসা ছাড়েনি। কলরব শুরু করেছে শুধু। ফুলেরাও সবে ফুটছে। মাথার উপরে আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে, বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলোতে চলেছে। আর পাক খাচ্ছে [illegible] সরালি হাঁস। ভোরের বাতাস [illegible] বড় ভাল লাগছে। সাইকেলটা থাকলে বড় ভাল হত। ফিরতে ফিরতে ওই কথাটা মনে পড়ল। মনে পড়েছে কাল রাত্রেই। কিন্তু এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল। অন্য কোন চিন্তার অবকাশ ছিল না।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু রিনাকে ভালবেসেছিল। রিনাও ভালবেসেছিল। আশ্চর্যভাবে দুজনের বিরোধের মধ্যে সেতু গড়ে উঠেছিল। ভাবলে আজও মনে হয় পরমাশ্চর্য! রিনা ওকে দেখলেই বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলত, "হুঁউ হিদেন!"

কৃষ্ণেন্দু তখন ধর্ম ঈশ্বর কিছুই মানে না, তা হিদেনইজম্। ম্যাটার আর মাইণ্ডের সংজ্ঞাকে মেনে নিয়ে সে নূতন যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু তাকে হিদেন বললে, তার গায়ে লাগত। মেয়েটার উপর একটা শোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আবেগে ঘুরে বেড়াত। সামান্য সুযোগে বিচিত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসত। ঘটনাটার

মাসখানেক পরে, সেপ্টেম্বরের শেষে, মেডিকেল কলেজের ওদের টীম জিতে নিয়ে এল কলেজ কম্পিটিশনের সব থেকে বড় শীল্ডটা। সেবারকার খেলায় কৃষ্ণেন্দুই ছিল সব চেয়ে ভাল প্লেয়ার। মেট্রন পলি ব্রাউনের ভারী শখ ছিল খেলা দেখার। কলেজের টীমের খেলা থাকলে সেই অজুহাত নিয়ে সে ঠিক গিয়ে তার শখের হাতপাখা নিয়ে সামনেই চেয়ারে বসত। পাশে থাকত রিনা। কৃষ্ণেন্দু যেন রিনার উপরে শোধ তুলবার জনাই এমন উন্মাদের মত দুর্দান্ত বিক্রমে খেলত। রিনা সত্য সত্যাই রাগত। কৃষ্ণেন্দুকে হিদেন বলার ঝোঁক তার বাড়তে লাগল। শীল্ড জিতে কলেজে এসে সেদিন ছেলেরা কৃষ্ণেন্দুকে কাঁধে নিয়ে নাচছিল। রিনা বেরিয়ে এল বারান্দায়। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুর কি মনে হল, সে, রিনা হিদেন বলে সম্বোধন করবার আগেই চিৎকার করে বলে উঠল, "জয় কালী!" সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। রিনা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল।

এর পর, রিনাকে দেখলেই কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে উঠত, "জয় কালী!"

রিনাও বলত, "হিদেন!" প্রথম দিন হতভম্ব হয়ে ঘরে ঢুকলেও পরে আর হতভম্ব হত না রিনা।

মাস কয়েক পর বড়দিনের সময় মিলিটারী স্টুডেণ্টদের সোস্যাল ফাংশন হল। তার মধ্যে ছিল কয়েকটা সিলেক্টেড সীন। একটি সীন ছিল "ওথেলো" থেকে। ওথেলো আর ডেসডিমোনা। "It is the Cause—it is the Cause—my soul" দিয়ে আরম্ভ। ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্য। জন ক্রেটন করেছিল ওথেলো, এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রিনা করেছিল ডেসডিমোনার অংশে অভিনয়। ক্রেটনের ওথেলো ভাল হয়নি, কিন্তু চেহারা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য এবং বিশেষ করে সহজ অভিনয়ের জন্য রিনার অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু দেখেছিল সেই অভিনয়। এর পর কী তার খেয়াল হল, সে ওথেলো নাটকের ওই দৃশ্যটা মুখস্থ করে ফেললে এবং যখন তখন "It is the Cause, it is the Cause" বলে সন্সিলকিটুকু আবৃত্তি শুরু করে দিত। রিনা তিক্ত হয়ে এরপর কৃষ্ণেন্দুর সামনে বের হওয়া ছেড়ে দিলে। তবুও কৃষ্ণেন্দু শূন্য বারান্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করত, "It is the Cause, it is the Cause."

এর পর সব কিছু উল্টে গেল। নাটকীয় ভাবে নয়—অত্যন্ত সাধারণ ভাবে—স্বচ্ছন্দ গতিতে। আগে সেই পরিবর্তনের সময় কৃষ্ণেন্দুর কাছে বিস্ময়কর বলে অবশ্যই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ—।

বনপথে চলতে চলতে প্রসন্ন ম্লান হাসি ফুটে উঠল কৃষ্ণস্বামীর মুখে। কিসের বিস্ময়, কোথায় বিস্ময়ের কারণ? মানুষের মধ্যে প্রাণ-ধর্মের এই ত স্বভাব। এই ত ঈশ্বরের তপস্যা মানুষের দেহের বেদীতে। গুণের আসরে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা যেমন তার স্বভাব, প্রতিযোগিতার পর গুণগ্রাহিতাও তার তেমনি প্রকৃতি-ধর্ম।

পরের বছর ফুটবলের সময়। ইণ্টার-ভার্সিটি শীল্ড কম্পিটিশনে মেডিক্যাল কলেজের টীম যাবার কথা ঠিক হল। আই এম ডি এবং এম বি কোর্সের ছেলেদের মিলিত একটি টীম। ক্রেটন এবং কৃষ্ণেন্দু দুজনেই নির্বাচিত হল। সিলেকশন হওয়ার পরই দুজনের দেখা হল সিঁড়িতে। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যালো!" দুজনেই একসঙ্গে হাত বাড়ালে, পরস্পরের হাত চেপে ধরলে। দুজনেই বললে, "তুমি থাকলে আমি ভাবি না।"

টুর্নামেণ্টে ওরা ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল, ফাইনালে হারল। খেলাটা হয়েছিল বম্বেতে। ফিরে যখন এল, তখন ওরা দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

ক্রেটনই ওকে নিয়ে গিয়েছিল পলি ব্রাউনের বাড়ি। পলি ব্রাউন ভারী খুশী হয়েছিল। এই দুর্দান্ত ছেলেটির কলেজে সর্বজনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হত। এবং কলেজের সর্বজন থেকে সেও আলাদা নয়। সে তাকে সম্বর্ধনা করে বলেছিল, "Othello, the turbulent Moor." তারপরেই হেসে বলেছিল, "It is the Cause, it is the Cause, তুমি ওটা বেশ বল। আমার ভাল লাগে। কিন্তু রিনাকে চটাবার জন্য কেন বল? You naughty boy."

রিনা তখন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। ক্রেটন বলেছিল, "Let bygones be bygones. Shake hands you two, and be friends."

কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, "আমি ক্ষমা চাইছি।"

রিনা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুর হাত চেপে ধরে বলেছিল, "We are friends."

আলাপের মধ্যে হঠাৎ পলি ব্রাউন এসে বলেছিল, "ওটা তুমি একবার আবৃত্তি কর। It is the Cause, it is the Cause. ওইটে। সত্যিই ওটা তুমি ভাল কর। তোমার হোর্স ভয়েসে and—and—you can put lively emotion in it."

রিনা বলেছিল, "And—" বলেই চুপ করেছিল।

ক্রেটন জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী?"

রিনা হেসে বলেছিল, "তোমার থেকে অনেকটা বেশী ওথেলোর মত। Tall—more Moorlike, isn't it?"

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "কিন্তু তোমার চেয়ে ভাল ডেসডিমোনা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার মনে হয় perfect."

ক্রেটন বলেছিল, "তা হলে তোমরা দুজনে গোটা সীনটা কর। Let us enjoy and make the memory of the first meeting unforgettable. থাক চিরস্মরণীয় হয়ে আজকের এই পরিচয়ের স্মৃতি।"

জেমস ব্রাউন একবার এসেই চলে গিয়েছিল। লোকটা অদ্ভুত। অদ্ভুত ঠিক নয়, ও সেই সব ইংরেজদের একজন, যারা এদেশের এক একজন ছোটখাট লাট-সাহেব। কালা মানুষদের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না। এবং গোঁড়া কৃশ্চান হিসেবে হিদেনদের ছুঁলে হাত ধোয়। নিঃস্ব, তাই নিঃশব্দে থাকে।

রিনা ব্রাউন সাহেবের ঘরের দিকে তাকিয়েই আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ক্রেটন ব্রাউনের কাছে গিয়ে অনুমতি আদায় করে এনেছিল। ব্রাউন সাহেব প্রশ্ন করেছিল, "শুধু ভাল ছেলে, কলেজে পড়ে? না ভাল ঘরের ছেলে?"

ক্রেটন বলেছিল, "Both."

"তা হলে অবশ্য অনুমতি দিতে পারি। উঁচু জাত! ওদের মধ্যে?"

"হ্যাঁ। He is a Goopta. We have so many Gooptas amongst our professors."

"Yes, yes. I know. Gooptas I know. Yes."

অনুমতি দিয়েছিল ব্রাউন সাহেব।

ওরা গোটা সীনটাই আবৃত্তি করেছিল। একটা কাণ্ড ঘটেছিল শেষের দিকে। ডেসডিমোনাকে হত্যা করবার সময় সে যখন 'It is too late' বলে তার গলা টিপে ধরার অভিনয় করছে, রিনা যখন 'Oh Lord Lord Lord' বলে কাতর চিৎকার করছে, তখন সেই মুহূর্তে সেই আয়াটি 'রিনা রিনা' বলে আর্তনাদ করে ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল।

চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। রিনা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, রিনা সান্ত্বনা দিয়েছিল পরিষ্কার মেদিনীপুর-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের খাস বাংলা ভাষায়।

"মিছা-মিছা: ই সব মিছামিছি: ই সব থিয়াটারের বক্তৃতা!"

ও ঘর থেকে জেমস ব্রাউন এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। ভয়ার্ত পশুর মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে-মেয়েটা স্তব্ধ মূক হয়ে গিয়েছিল।

"নিকালো, ই ঘরসে নিকালো, ইউ বিচ, গেট আউট!" ব্রাউন ফেটে পড়েছিল রাগে।

কৃষ্ণেন্দু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। মেয়েটাকে রিনা হাত ধরে তুলে ঘর থেকে ও ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পলি ব্রাউন সামলেছিল জেমস ব্রাউনকে।

ক্রেটন হেসে বলেছিলল কৃষ্ণেন্দুকে, "দ্যাট নেটিভ ওম্যান রিনাকে এক মাস বয়স থেকে মানুষ করেছে। অত্যন্ত ভালবাসে। রিনাও অপছন্দ করে না। বাট, ইউ সি, হি ডাজ নট লাইক ইট। মিস্টার ব্রাউন অকৃতজ্ঞ নন, তিনি ওকে তাড়িয়ে দিতে চান না; দেনওনি। কিন্তু ওই মায়ের মত ভালবাসতে চায়, নিজের মেয়ের মত দেখতে চায়, সে উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ইউ নো, মিস্টার ব্রাউন ইজ এ পাক্কা সাহিব। শুধু তাই নয়, ব্রাউন একজন গোঁড়া ক্রীশ্চানও বটে।"

রিনার সে-ছবি এখনও মনে আছে। একবার তাকাচ্ছিল যে পথে ওই মমতায় অন্ধ মূক পশুর মত তার ধাত্রী চলে গেছে সেই পথে, আবার তাকাচ্ছিল বাপের ঘরের দিকে। হঠাৎ সে একসময় ঘর থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

পলি ব্রাউন ফিরে এসে কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত গুপ্টা। তুমি এটা মনে রেখো না। তুমি জান না। মেয়েটা বড় আনক্লীন ইন মাইন্ড। এবং কিছুটা আউট অব মাইন্ড। পাগল খানিকটা। রিনা ঘুমোয় আর ও ভুক-ভাক করে। খুব খুশী হয়েছি। আর কী সুন্দর আবৃত্তি করলে তুমি। আবারও এস। প্লিজ। প্লিজ, ডু কাম।"

* * *

ক্রেটনের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্কটাই ছিল গায়ের জোরের ব্যাপার নিয়ে। ওদের হোস্টেলে গিয়েই পাঞ্জা কষা থেকে শুরু হত। ঘরে ঢুকেই হাতখানা বাড়িয়ে বলত, "কাম অন্।"

তারপর নানান রকমের প্রতিযোগিতা চলত। এবং যেটি বিস্ময়কর মনে হত ক্রেটনের কাছে, সেইটি সে পলি ব্রাউনের বাড়িতে কৃষ্ণেন্দুকে টেনে নিয়ে গিয়ে করিয়ে তবে ছাড়ত।

শুকনো নারকেল শুধু হাতের জোরে ছাড়িয়ে মাথায় ঠুকে ভেঙে খাওয়া দেখে রিনা ব্রাউন কৃষ্ণেন্দুর মাথা টিপে দেখে প্রশ্ন করেছিল, "পাথর?"

"না। কাটলে রক্ত পড়ে।" হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দু।

একদিন পঞ্চাশটা সিদ্ধ ডিম খাওয়ার পরিচয়ও দিয়ে আসতে হল ব্রাউনদের বাড়িতে।

এরই মধ্যে কখন যে রিনা এবং সে বান্ধবী এবং বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল, তার সঠিক দিনটি নির্ণয় করা কঠিন। তবে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল এই বন্ধুত্ব, হঠাৎ কোন এক-দিনের আকস্মিক ঘটনার ফলে বা এক-দিনের আকস্মিক কোন আবেগের উচ্ছ্বাসে নয়। অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছন্দভাবে ও গতিতে। এই ফুল ফোটার মত।

হ্যাঁ, ফুল ফোটার মত। ফুল যদিন ফোটে, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেও তার বর্ণ-গন্ধের ঘোষণা কাউকে ডাক দেয় না। যখন ফোটে, তখন তার বর্ণশোভা গন্ধের নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি করেই পরস্পরকে ওরা জানলে একদিন।

ক্রেটন দু বছর ফেল করে যখন পাশ করে বের হল, তখন কৃষ্ণেন্দুর সিক্সথ্ ইয়ার। এবং সে তখন শুধু খেলার আসরেই খ্যাতিমান নয়, শুধু দুর্দান্তপনাতেই সর্ব-জনপরিচিত নয়, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তার জীবন-দীপ্তি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। চিকিৎসার কয়েকটা পদ্ধতিতে তখনই সে পাকা চিকিৎসকের মত নিপুণ হয়েছে। কলেরায় স্যালাইন ইনজেকশন এবং ইন্ট্রা-ভেনাস ইনজেকশনে সে পটুত্ব অর্জন করেছে। সে পটুত্ব এমন যে, কলেরা কেসের কলে নাম করা ডাক্তারেরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ইনজেকশন সে-ই দেয়। ডাক্তার উপস্থিত থাকেন। তাতে তার উপার্জন হয়। সালভারসন ইনজেকশন দেবার জন্য ও তখন সে সদ্য পাশ করা বন্ধু ডাক্তারের নামে একটি চেম্বার খুলেই বসেছে। এতে ক্রেটন তাকে সাহায্য করেছিল অনেক। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মহলে ওকে পরিচিত করে দিয়েছিল। ক্রেটন ওকে তখন স্যুট পরা ধরিয়েছে। ধুতিকামিজ-পরা ডাক্তারের কাছে এরা আসতে চায় না। অর্থের অভাব হত না। নিজেই রোজগার করত।

ক্রেটন পাশ করলে। ওদের পাশ করলেই চাকরি। নূতন চাকরি নিয়ে চলে যাবে। মিলিটারী স্টুডেন্টরা বিদায়ী দলকে অভি-নন্দন জানালে। ক্রেটনের উদ্যোগেই ওথেলোর সেই দৃশ্যটি অভিনীত হল। তারই প্রস্তাবে কৃষ্ণেন্দু ওথেলো, ডেসডিমোনা রিনা।

ওই অভিনয়ের মধ্যেই কৃষ্ণেন্দু আবেগ-প্রখর চাপা গলায় যখন ঘুমন্ত ডেসডিমোনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "I will smell thee on the tree"—তখনই সে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে কালা আদমি, অভিনয়ে ক্রেটনের আগ্রহে ওথেলোর পার্ট পেয়ে থাকলেও ডেসডিমোনা রিনা ব্রাউনকে চুম্বনের অধিকার ওর ছিল না। আত্মহারা আবেগ সত্ত্বেও ওখানটায় সম্বরণ করলে নিজেকে, কিন্তু—

"So sweet was ne'er so fatal. I must weep.
But they are cruel teers. This sorrow's heavenly."

বলতে বলতে তার বড় বড় চোখ দুটি থেকে জলের ধারা নেমে এল। কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে আসছিল, কোনও রকমে সে শেষ করলে,

"It strikes where it doth love. She wakes."

রিনা ব্রাউন চোখ বুজেও অনুভব করছিল সেই আবেগের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখলে কৃষ্ণেন্দুর চোখে জলের ধারা। সে অভিভূত হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সে অনুভব করলে আরও কিছু। প্রখর স্পষ্ট হয়ত নয়, তবু অন্ধকারের মত বর্ণহীন নয়। কুয়াশার মধ্যে বর্ণের আভাসের মত।

রিনা কৃষ্ণেন্দুকে পরে বলেছিল কথাটা। রিনা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিল না, কৃষ্ণেন্দুই জুগিয়ে দিয়েছিল। "তুমি বলছ অন্ধকার কেটে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে রামধনুর রঙের আভাসের মত? জান ত কালো কোন রঙ নয়, কালো হল রঙের অভাব, বর্ণশূন্যতা।"

রিনা বলেছিল, "দ্যাটস ইট।" বলেছিল, "তারপর তুমি যখন বললে, Think of thy sins, আমি বললাম—They are loves I bear to you, সেই মুহূর্তে আমারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।"

অভিনয়ের শেষে কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলেই চলে গিয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেনি। সাতদিন! শুধু তাই নয়, কৃষ্ণেন্দু কেমন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে লেখা বাবার চিঠিখানা বারবার পড়ত আর ভাবত। বাবা কলকাতায় এসেছিলেন হঠাৎ। এক মাসের উপর সে চিঠি দেয়নি। চিন্তিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল। ওদের গ্রামের হরিবিলাস বসু, কলকাতায় থাকেন, তিনি দেশে গিয়ে বলেছিলেন, "ছেলে যে সায়েব হয়ে গেল শ্যামসুন্দরকাকা। কোটপ্যাণ্ট পরে সায়েব-মেমের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেস্টুরেণ্টে এক টেবিলে বসে খাচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম!"

বাবা পরদিনই কলকাতায় এসে ধর্মতলার চেম্বারে উঠেছিলেন। ওই ঠিকানাই ইদানীং ব্যবহার করত মেসের ঠিকানার পরিবর্তে। গোলমাল হত না।

কৃষ্ণেন্দু তখন চেম্বারে একটি ফিরিঙ্গী মেয়েকে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দিচ্ছে, তার সঙ্গের আর একটি মেয়ে বাইরে বসে আছে। আর দুটি রোগী অপেক্ষা করছে। সবই সালভারসনের কেস। এদিক দিয়ে এদের মানসিকতা বৈজ্ঞানিক। ওরা লজ্জা করে না। এসে সোজাসুজি বলে, "ওয়েল ডক, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এবং সন্দেহের কারণও আছে যে, আমার খারাপ অসুখ হয়েছে। দেখ ত অনুগ্রহ করে।" এবং চিকিৎসা সুশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়।

চেম্বার থেকে মেয়েটির ইনজেকশন শেষ

ঘর থেকে বেরিয়েই সে বাবাকে দেখেছিল।

"বাবা!"

"হ্যাঁ। এক মাসের উপর আটত্রিশ দিন চিঠি দাওনি। চিন্তিত হয়ে এসেছি।"

"আমি ত চিঠি দিয়েছি।"

"আমরা ত পাই নি।"

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, একখানা পত্র লিখে ডাকে দেবার জন্য। চেম্বারে ঢুকে ব্লটিং প্যাডটা তুলে চিঠিখানা বের করেছিল। অপরাধীর মতই চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, "কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, ফেলা হয়নি।"

বাবা হেসেছিলেন। ও সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করে প্রশ্ন করেছিলেন, "এরা সব?"

"রোগী।"

"রোগী? তুমি—?"

"একজন ডাক্তার বন্ধু চিকিৎসা করেন এখানে। তাঁকে সাহায্য করি। আপনার আশীর্বাদে আমি পাশ-করা ডাক্তারদের চেয়ে ভাল ইনজেকশন দি।"

এই সময়ে এসেছিল ক্রেটন এবং রিনা। "হ্যালো ম্যান—"

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি তার বাবার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, "ক্রেটন, ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনি আমার বন্ধু। আমাদের কলেজেই পড়েন, জন ক্রেটন, আর ইনি রিনা ব্রাউন। বন্ধু আমার।"

"গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান।" ক্রেটন সত্যিই খুশী হয়ে বেশ সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছিল।

রিনা একদৃষ্টে তাঁকে দেখেছিল।

বাবা আর থাকেননি চলে গিয়েছিলেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন কালীঘাটে। তিনি চলে গেলে রিনা বলেছিল, "হি ইজ এ ট্রু হিন্দু, এ টিপিক্যাল ব্রাহ্মিন। আমার ভারী ভাল লাগল। কী মিষ্টি কথা। অ্যান্ড ইউ, টারবুলেন্ট ম্যান, এ রাস্কাল, হিজ সন!"

হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু।

পরদিন হাওড়া স্টেশনে সে বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল। বাবা কথা কমই বলেন, ট্রেনে চড়ে একটি কথাও বলেননি। ট্রেন ছাড়বার সময় শুধু বলেছিলেন, "সাবধানে চল।"

হাসি পেয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। সাবধানে চলতে হবে? কাকে? তাকে? বাড়ি গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন বাবা। লিখেছিলেন, "ইচ্ছা ছিল আসিবার সময় তোমার সম্মুখেই সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আসি। কিন্তু 'সাবধানে চলিবে' এই কথা ছাড়া কোন কথাই বলিতে পারি নাই। পত্রেও সকল কথা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াও লিখিতে কেমন যেন বাধা অনুভব করিতেছি। তোমার মাকেও এসব কথা বলিতে পারিতেছি না। তাহা হইতে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। মনে হইতেছে, উচিত হইবে না। তুমি উপযুক্ত পুত্র। বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যখন সুখ্যাতি পাইতেছ, তখন কী করিয়া মন্দ বলিব? কিন্তু তবু বলিতেছি, আমার ভাল লাগিল না। মনে হইতেছে, ভাল হইবে না। যেন বড় বেশী আগাই যাইতেছ। আমাদের শাস্ত্রে বলে, উপনয়নের সময় তিন পায়ের বেশী অগ্রসর হইতে নাই। তাহাতে আর ফিরিবার উপায় থাকে না। আমার মনে হইতেছে, তিন পায়ের বেশীই অগ্রসর হইয়াছ তুমি। অপর দিকে বলে, সাত পা একসঙ্গে পথ হাঁটিলে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম, কলিকাতায় তুমি অনেক পা অনেকের সঙ্গে হাঁটিয়াছ। সাত পা কিনা জানি না। সপ্তপদ পূর্ণ না হইয়া থাকিলে আর আগাইও না। গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন।"

চিঠি পেয়েও কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল। বাবার অমূলক আশংকায় না হেসে করবে কী? কিন্তু এই ঘটনার, অর্থাৎ স্টেশনের বিদায়-

রিনা ব্রাউন চোখ বুজেও অনুভব করছিল সেই আবেগের স্পর্শ

উৎসব উপলক্ষ্যে ওথেলোর অভিনয়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে নিজের যে প্রকাশ তার নিজের কাছে ঘটল, তারপর চিঠিখানা খুলে নরবার না-পড়ে সে পারেনি। নিজেই হিসেব করেছিল, ক পা সে ছেড়ে এসেছে, ক পা এগিয়েছে রিনার সঙ্গে?

ইস্কুল এক পা, সেণ্ট জেভিয়ার্স এক পা, মেডিকেল কলেজ এক পা। তিন পা হয়ে গেছে। সে জানে, উপনয়নের সময় দু পায়ের পর শেষ পা ফেলার সময় পিতা বা উপনয়নদাতাই পাখানি ধরে পিছিয়ে দেন। ঘরে সংসারী হয়ে আবদ্ধ হয়, সেই অবস্থাতেই জীবন কেটে যায়। মানুষের প্রাণ বদ্ধ জলার মত বাষ্প হয়ে পুনর্জন্মের জলধারা হয়ে ঝরে প্রবাহের কামনা করে। সে যদি নদীর স্রোতের গতি পেয়ে থাকে, তবে তার খেদ নেই। সত্যই সে অনেকদূর চলে এসেছে। তাকে রক্ষা করবার জন্য গোবিন্দের প্রয়োজন নেই। গোবিন্দের নাগালের বাইরে সে।

সে ত গোবিন্দকে মানে না! বিজ্ঞানের রোশনাই তার সম্মুখে নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

আর রিনার সঙ্গে? কত পদ? কত পদ বল?

না আর হাঁটা হবে না ও পথে। রিনা জনের মনোনীতা বধূ। ক্রেটন তার বন্ধু। সে রিনাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলে। রিনাই চিঠি লিখলে। ও তার জবাব দিলে, "জনি ছিল, জনির সঙ্গে যেতাম। জনি চলে গেছে। আমার মনের পরীক্ষাও বটে। জনি ফিরে এলে যাব। আমার দোষ নিয়ো না।"

* * *

"বাবাসাহেব!"

"কে?" থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

"ই সকালে পয়দলে কুথাকে যাবেন গো? সাইকেল কী হল?"

কোন গ্রাম থেকে মাথায় কলসী এবং পাটের শাকের বোঝা নিয়ে কয়েকজন লায়েক চলেছে বিষ্ণুপুরের দিকে।

পথ ভুল হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। বনের মধ্যে পথ-ভুল একটা সাধারণ ব্যাপার।

নিজের আস্তানার পথ ফেলে অনেকটা চলে এসেছেন। বন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বন শেষ হলেই একেবারে বিষ্ণুপুরের প্রান্তভাগে উঠবেন। একেবারে যমুনা বাঁধের কাছাকাছি।

থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

ফিরবেন এখান থেকে। না।

একবার যাবেন লাল-বাঁধের ধারে। লাল-বাঁধের পাড়ের উপর সেই পাথরখানাকে স্পর্শ করে যাবেন, যেখানার উপর রামকৃষ্ণ পরমহংস বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

মনের মধ্যে অবাধ্য স্মৃতির পীড়ন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মুছে যাক, অতীত কালের সব স্মৃতি মুছে যাক। পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়; ওই বৈরাগীশ্রেষ্ঠের আসনখানার স্পর্শে তাঁর মন বৈরাগ্যে ভরে উঠুক। গেরুয়ার ছোপে রামধনুর সাত রং নিঃশেষে ঢেকে থাক।

॥ পাঁচ ॥

মহাপুরুষের স্পর্শ মহাপুরুষের সঙ্গেই চলে যায়। অন্তত বস্তুজগতে থাকে না। বস্তুজগতের ধরে রাখবার শক্তি নেই, থাকলে মিশরের ফারাওদের মামিদের কল্যাণেই পুরনো মিশর বেঁচে থাকত। বুদ্ধের অস্থির উপর স্তূপের কল্যাণে ভারতবর্ষে সকল দুঃখ দূরে যেত। ঈশ্বরের পুত্রের আবির্ভাবের পর প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে মিলে ইয়োরোপ জুড়ে এক অপরূপ প্রেমের রাজ্য গড়ে উঠত।

থাকে মহাপুরুষের বাণী। মানুষের মনে মনে বয়ে চলে, নদীর মত। কিন্তু মনে যখন তৃষ্ণা জাগে, মরুভূমি হয়ে ওঠে মন, তখন সে-নদীর স্রোতও শুকিয়ে যায়। শুষে নিয়ে উত্তপ্ত বালুর চড়ার মত হা-হা করে।

মন ঠিক তেমনিভাবে প্রখর তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। কোনক্রমেই কৃষ্ণস্বামী রিনা ব্রাউনের কথা ভুলতে পারছেন না। কী করে পারবেন? সেই রিনাকে এই রিনা দেখে ভুলবেন কী করে?

বিষ্ণুপুরের লাল-বাঁধের ধারে পাথর-খানিকে ছুঁয়ে বসেই ভাবছিলেন কৃষ্ণস্বামী।

মনে পড়ছে রিনার সেই মূর্তিমতী সান্ত্বনার মত মূর্তি। দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষের ঘেরের মধ্যে জলভরা বড়বড় চোখ দুটি। সজল চোখে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ইউ আর হার্টলেস, ইউ আর হার্টলেস কৃষ্ণেণ্ডু। আই ডিড নট নো। নেভার থট ইট ইভ্ন!"

হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দুর মা। কৃষ্ণেন্দু টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি সেরে কামানো মাথা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিল। বন্ধুরা জানত। কিন্তু রিনাকে বলে যাবার কথা মনে হয়নি। কয়েক মাসে খানিকটা দূরেই চলে এসেছিল সে। ডাক্তার সে। একালের ডাক্তারিতে মনস্তত্ত্বও পড়তে হয়। একনাগাড়ে নব্বুই দিন মনকে বেঁধে রাখলে, দূরে সরিয়ে রাখলে মনের আকর্ষণের সূত্র ক্ষীণ-জীর্ণ হয়। সে-দিনের পর সে সংকল্প করে তা-ই করেছিল। রিনা ক্রেটনের মনোনীতা। তার বাবা-মা আছেন। পলি ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হত, নিত্যই তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু কম। ফেরার পর তার কামানো মাথা দেখে পলি ব্রাউন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, "কী হয়েছে কৃষ্ণেণ্ডু? এনি মিস্‌হ্যাপ?"

"আমার মা—।"

"মারা গেছেন? বাবা-মা মারা গেলে তোমরা মাথা কামাও!"

"হ্যাঁ মিসেস ব্রাউন। আমার মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। আমি দেখতেও পাইনি।"

পলি ব্রাউন পরমাত্মীয়ার মতই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। সন্ধ্যায় সে ধর্মতলার চেম্বারে বন্ধুর সঙ্গে বসে আছে, এল রিনা। চোখে জল নিয়ে সে তাকে তিরস্কার করে অনুযোগ জানালে, "তুমি হৃদয়হীন কৃষ্ণেন্দু। আমি জানতাম না। ভাবিনি কখনও!"

"বস রিনা!"

"না। এই কটা কথাই বলতে এসেছিলাম!"

তার হাত ধরে তাকে আটকে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি।"

বসেছিল রিনা। সেদিন শুধু তার মায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সত্য-সত্যই কেঁদেছিল। রিনা বিদায় নিয়ে উঠলে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "আজকের কথা আমার মনে অক্ষয় হয়ে রইল রিনা। তোমার পবিত্র হৃদয় স্বর্গের মত। তার স্পর্শে আমার মন জুড়িয়ে গেল।"

একটু হাসি ফুটে উঠেছিল রিনার মুখে। বেদনায় ম্লান, কিন্তু শান্ত। বলেছিল, "সত্যি মায়ের স্নেহ আমি কখনও পাইনি কৃষ্ণেন্দু। মামি পলি আমাকে ভালবাসে, কিন্তু তার চেয়েও গাঢ় ভালবাসার স্বাদ পাই আমি কুন্তীর কাছে। ভাবি, ও শুধু আমাকে মানুষ করেছে। আমার আয়া। তা হলে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহের স্বাদ কেমন?"

রিনা চলে গেলে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে ছিল কৃষ্ণেন্দু।

আবার রিনার সঙ্গে যোগসূত্র নতুন হয়ে উঠল। সূত্রটা সুতো ছিল না, কালের সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসে জীর্ণ হয়ে যাবার মত উপাদানে তৈরী ছিল না। ওটা ছিল সোনার মত ধাতু থেকে গড়া, হাজার বছর পরেও মাটির তলা থেকে ওঠা সোনার আভরণের মত হাজার বছর আগের দুটি হৃদয়ের যোগাযোগের সাক্ষ্য দেবে।

খাঁটী সোনা। কোন খাদ ছিল না।

আবার হঠাৎ একদিন। সে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডে ঢুকছে, কুন্তী—রিনার আয়া—ছুটে এসে তাকে বললে, "ডাক্তারবাবু!"

অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি এমন যেন কথা কয়। বুকের ভিতরে রাগ হক, হিংসা হক, ভয় হক, আতঙ্ক হক, সে

যেন আপনার রক্ত দিয়ে স্পষ্ট ফুটে বের হয়। কুন্তীর চোখে সেদিন আতঙ্ক আর আকুতি।

কৃষ্ণেন্দু তখন সদ্য পাশ করেছে। হাউস-সার্জেন হয়ে রয়েছে। তার কল্পনা সে বিলেত যাবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই টাকা সে সংগ্রহ করতে পারবে। কলেরার চিকিৎসায় স্যালাইন ইনজেকশনে এরই মধ্যে তার খ্যাতি অনেক এবং সাহস তার অপার। সে দিক দিয়ে তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত। পাশ যতদিন করেনি, ততদিন অন্য ডাক্তারের পিছনে পিছনে যেতে হত। এবার সে একলা যাবার অধিকার অর্জন করেছে। এবং এ-দেশের বড়লোকের বাড়িতে দুষ্ট খাবারের আজও অবাধ প্রবেশাধিকার এবং গপেগপে খাবার প্রবৃত্তি তাদের প্রচণ্ড। কলকাতা শহরে মাছির অভাব নেই। ভ্যাকসিনও নেয় না। ওদের বাড়িতে মোটা টাকা উপার্জনের পথও তার অনিবার্য। ধর্মতলার চেম্বার ছাড়াও চিৎপুর অঞ্চলে একটা চেম্বার করবে। সালভারসন ইনজেকশনেও সে নাম করেছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা লজ্জা না করে চিকিৎসা করায়। এ-অঞ্চলে লজ্জা করে যারা অতি সংগোপনে চিকিৎসা করাবে, তাদের জন্য চেম্বার। এখানে চার টাকার জায়গায় আট টাকা ফী করবে।

কুন্তীর মুখেচোখের অবস্থা দেখে সে ভয় পেয়েছিল, "কী কুন্তী?"

কুন্তী সভয়ে চোখ বড় বড় করে বলেছিল, "রিনা কাঁদছে ডাক্তারবাবু।"

"কাঁদছে?"

"ফুলে ফুলে কাঁদছে। সকাল থেকে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"জানি না, জনি সাহেবের বাবার কাছ থেকে কী চিঠি এসেছে, সাহেবের কাছে।"

"চল, আমি যাচ্ছি।"

একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে রিনা বলেছিল, "আমি কী করব কৃষ্ণেন্দু?" আবার সে ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছিল।

জনির বাবা চার্লস ক্রেটন চিঠি লিখেছে ব্রাউন সাহেবকে। "আপনার চিঠি জন পেয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সত্যকারের একজন ইংরেজ এবং ক্রীশ্চান; আমিও তাই। জনিও সেই শিক্ষাই পেয়েছে। এ-বিষয়ে সে যখন আপনাকে চিঠি লিখতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই আপনার চিঠি সে পায়। জন যে-কথা আপনাদের জানাতে চেয়েছিল, সে-কথা আমিই জানাই। যাচাই না হলে প্রেমের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না। আপনার মেয়ে রিনার সঙ্গে বন্ধুত্বকে সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। আপনারাও বোধ হয় করে-ছিলেন। জন এখানে এসে চাকরি নিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে। কর্নেল রেমন্ড আমার পুরনো বন্ধু। পলি তাঁকে জানে। তার মেয়ে এমিলি। এমিলি রেমন্ড অত্যন্ত ভাল এবং সুন্দরী মেয়ে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছে এবং শীঘ্রই তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হবে। এ গার্ল ইন ডিসট্রেস ইজ এ সেক্রেড থিং; আপনার মেয়ে রিনা দুঃখ পেলে তার জন্য আমার গভীর সহানুভূতি রইল। সময়ে সবই সেরে যাবে।"

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ক্রেটন সম্পর্কে মনে একটা আঘাত পেয়েছিল। একটা দুরন্ত ক্ষোভ জেগে উঠেছিল তার। সে আজ এখানে থাকলে—। সে খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার বাড়িগুলোর মাথার উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে-ছিল। ক্রেটন এমন পাষণ্ড!

"আই গেভ হিম মাই এভরিথিং কৃষ্ণেন্দু!" রিনা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল এবার।

"রিনা। কেঁদো না। রিনা। Look at me in my face—Rina!"

রিনা তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। মৃদু বিষণ্ন হেসে বলেছিল, "তুমি বাদ আজ আমাকে ওথেলোর মত গলা টিপে মেরে ফেলতে পার কৃষ্ণেন্দু!"

এক মুহূর্তে কী হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাঁধকে টলতে টলতে হেলে ঢলে সশব্দে ভেঙে ভূমিসাৎ হতে কেউ দেখেছে? ঠিক তেমনিভাবে সব বাধা বন্ধ ভেঙে পড়ে গেল আর উন্মত্ত জলস্রোতের মত জীবনের সকল আবেগ জলস্রোতের মত জীবনের সকল আবেগ যেন মুহূর্তে মুক্তিলাভ করল। "রিনা-রিনা-আমি তোমাকে ভালবাসি" কথা কটি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে উন্মাদের মত রিনার বুকের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

"Rina, I love you, আমি তোমাকে ভালবাসি রিনা। রিনা! My love, আমার সব। রিনা! আমি তোমাকে ভালবাসি!"

মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে রিনা শুধু বলেছিল, "কৃষ্ণেন্দু! My Krisnendu!"

"আমি তোমাকে ভালবাসি রিনা!"

"আমিও তোমাকে ভালবাসি!"

পরস্পরের মুখের উপর মুখ রেখে দীর্ঘক্ষণ তারা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল এরপর। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "আমি দেরি করতে চাই না। যত শিগগির হয় বিয়ে করতে চাই। কাল এসে আমি তোমার বাবা মাকে বলব।"

পরের দিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে বলেছিল ব্রাউন সাহেবকে।

ব্রাউন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ইউ সি মিস্টার গুপ্টা, আমি একজন ইংরেজ। তার চেয়েও বেশী, আমি একজন ক্রিশ্চান। আমার মেয়ে রিনা অবশ্য একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তার মধ্যে কিছুটা এদেশের রক্ত আছে, কিন্তু সেও ক্রিশ্চান। আজকালকার দিনের মত তিন আইনে রেজেস্ট্রি করে বিয়েতে আমি রাজী নই। সেও হবে না। সে আমার চেয়েও বেশী ক্রিশ্চান। তোমাকে আমি জানি। তুমি কৃতী মানুষ। সাহসী এবং সৎ লোক। বিয়েতে আমার অমত নেই, কিন্তু তোমাকে ক্রিশ্চান হতে হবে।"

ক্রিশ্চান হতে হবে? স্তম্ভিত হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু! এতটা ভাবে নাই সে।

"ভেবে দেখ, ইয়ং ম্যান! কাল এসে উত্তর দিয়ো। কাল না পার কয়েকদিন পর।"

কৃষ্ণেন্দু মাথা হেঁট ক'রে ভাবতে ভাবতে ফিরছিল। রিনার ঘরের দোরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। রিনার দরজা বন্ধ ছিল। সে ডেকেছিল, "রিনা!"

ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে রিনা উত্তর দিয়েছিল, "তুমি যাও, তুমি যাও। আমি ভাবিনি। আমি এ-কথা ভাবিনি।"

"রিনা।"

"না! না! না!"

সে চলে এসেছিল। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে ছিল কুন্তী। সে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলেছিল, "রিনা মরে যাবেক --ডাক্তার বাবা—রিনা মরে যাবেক।"

পৃথিবী ঘুরছিল। আকাশ-মাটি, ঘর-বাড়ি, মানুষ—সব যেন পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটা অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছিল তার মন। সব শূন্য, সব শূন্য। রিনা ছাড়া আজ আর সে পৃথিবীতে বাঁচবার কল্পনা করতে পারে না। ধর্ম? ধর্ম ত সে মানে না। সত্যই মানে না। ঈশ্বরও মানে না। সে মানে নূতন কালের নূতন সত্যকে। ঈশ্বর নেই, এই সত্যই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য। Truth is God—সত্যই যদি ভগবান হয়, তা হলে সব ধর্মই আজ সমান মিথ্যা তার কাছে। তবু একটাকে অবলম্বন করে থাকতে হয়েছে তাকে। সে মানে না, তবু তাকে লোকে বলে হিন্দু, বৈদ্য। তাকে কাগজে লিখতে হয়, ফর্ম পূর্ণ করতে হয় ওই বলে। আজ রিনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। তার জন্য সে হবে, ক্রিশ্চানই হবে। তার বাবা—!

বুকের ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠল। বাবা! তার বাবা! বাবা কি এটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারবেন না? ক্রিশ্চান হয়েও কি সে তাঁর সন্তান থাকতে পারবে না? তাঁর ধর্ম নিয়ে তিনি থাকবেন। তাঁর আচার আচরণ সমস্ত কিছুকে সে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি করবে। সে ত কোন ধর্মের আচরণের মধ্যে নিজের জীবন-সত্যকে সন্ধান করবে না, সে সন্ধান করবে তার ধর্ম এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, চিকিৎসক জীবনের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। তবে কিসের বিরোধ, কিসের সংঘর্ষ হবে সে ক্রিশ্চান ধর্ম নামে গ্রহণ করার জন্য? দূরান্তরেই সে থাকে, বাবা থাকেন গ্রামে। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাকে তাঁর প্রয়োজন কতটুকুর? সেবার? সেবা সে করবে। তিনি ছোঁবেন না, তাকে ছোঁবেন না, রিনাকে ছোঁবেন না। কেন ছোঁবেন না? কেন?

অর্ধোন্মাদের মত সে বেরিয়ে এল। তার অন্তর থেকে দেহের অণু পরমাণু চিৎকার করছিল, "রিনা--রিনা—রিনা।" রিনাকে ভিন্ন সে বাঁচতে পারে না। এ তার দেহলালসা নয়। সে বারবার পরীক্ষা করেছে। তার চেয়ে বেশী কিছু। অনেক বেশী।

হাসপাতাল থেকে শরীর অসুস্থ বলে সে জিনিস নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল। বাড়ি এসে দাঁড়াল বাবার সামনে।

"তুমি হঠাৎ!" বাবা চমকে উঠলেন।

"আপনার কাছে এসেছি। অনুমতি চাইতে এসেছি। আমি একটি ক্রিশ্চান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।"

বাবা চমকে উঠলেন না। চিৎকার করলেন না। তার মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমত শান্তভাবেই বললেন, "এ আমি জানতাম।"

বাবার পা দুটো ধরে উপুড় হয়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দু উন্মাদের মত বলেছিল, "আপনি বলুন।"

বাবা বলেছিলেন, "তুমি উন্মাদ। নইলে বাবার পায়ে ধরে লজ্জাহীন হয়ে এ-কথা বলতে পারতে না।"

"তাকে ভিন্ন আমি বাঁচব না।"

"তুমি মরে গেলেও আমি আত্মহত্যা করব, এ-কথা আমি বললে মিথ্যা কথা বলা হবে কৃষ্ণেন্দু। আত্মহত্যা আমি করব না, কষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু বাঁচব, ভগবানের নাম করে বাঁচব।"

সে চিৎকার করে উঠেছিল, "বাবা!"

বাবা শান্ত স্বরে বলেছিলেন, "উত্তর আমি দিয়েছি কৃষ্ণেন্দু। ওই মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার কাছে তুমি মৃত, মেয়েটিকে পেয়ে মরে গেলেও তাই। আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'আর এগিয়ো না।' তুমি শোন-নি। তার সঙ্গে জীবনের আগুন সাক্ষী করে সাত পা যদি হেঁটে থাক, তা হলে তোমার উপায় কী?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসে তিনি গোবিন্দ স্মরণ করেছিলেন। আর কথা বলেননি, উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণেন্দু যেমন উন্মাদের মত গিয়েছিল তেমনি উন্মাদের মতই ফিরে চলে এসেছিল। একেবারে স্টেশনে। কলকাতার পথে মাঝখানে নেমে পড়েছিল। সারাটা রাত বসেছিল প্ল্যাটফর্মের উপর। ভোর রাত্রে আবার ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরেছিল।

এসে রিনার চিঠি পেয়েছিল, "না—না—না। এ তুমি করো না। কৃষ্ণেন্দু, আমি নির্মতি করছি। আমি আসানসোল যাচ্ছি। যাচ্ছি রেভারেণ্ড আরনেস্টের কাছে। তার কাছে শান্তি আছে। শান্তির জন্যে যাচ্ছি আমি। রিনা।"

কৃষ্ণেন্দু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রিনাকে তাকে পেতে হবে। জীবনের যে-কোন মূল্যে রিনাকে তার চাই। ধর্ম-জাতি-কর্ম-প্রতিষ্ঠা—সব, সব দিতে পারে সে। রিনা জানে না, রেভারেণ্ড আরনেস্ট তাকে শান্তি দিতে পারবেন না। পারেন না। তার ধর্মও পারে না। শান্তি-সুখ-আনন্দ-তৃপ্তি—সব আছে তার তাকে পাওয়ার মধ্যে। জীবনের [illegible] জীবনের শান্তি যেমন

ভোগের মধ্যে বস্তুর মধ্যে নেই—তেমনি জীবনকে ছেড়ে দিয়ে আদর্শবাদের বা ধর্মের আচার আচরণ মন্ত্র জপ ত্যাগ বা কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যেও নেই। শুধু কায়ার মধ্যেও নেই, কায়া বাদ দিয়ে মায়ার মধ্যেও নেই। কায়া-মায়া-মাখামাখি এই জীবন! জীবনের কাম্য যদি কোথাও থাকে তবে সে জীবনের মধ্যেই আছে। রিনা, তুমি যা চাও তা আমার মধ্যে, আমি যা চাই তা তোমার মধ্যে। রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্বাদ মন মাধুর্য স্নেহ প্রেম সান্ত্বনা, এই তো জীবনের কামনা। এ আছে জীবনের মধ্যেই। আর কোথাও নাই—আর কোথাই নাই।

সে বেরিয়ে পড়েছিল আবার। আর দেরি নয়। একবার গিয়েছিল সে ব্রাউনের কাছে, পলির কাছে। "আমি ক্রিশ্চান হওয়া ঠিক করেছি মিস্টার ব্রাউন।"

ব্রাউন কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর উঠে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, "আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি গুপ্টা!"

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "আশা করি রিনার সঙ্গে বিয়েতে আর কোন অমত থাকবে না আপনার?"

"নিশ্চয় না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেব।"

"ঠিক আছে। আজই আমি যাচ্ছি চার্চে।"

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, যদি বল।"

"আমি খুব উপকৃত হব, মিস্টার ব্রাউন।"

ব্রাউনের সাহায্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত সহজে হয়ে গিয়েছিল। ধর্মান্তর গ্রহণের পর ব্রাউন বলেছিল, "ইউ রান আপ টু রিনা। ব্রিং হার ব্যাক।"

পলি বলেছিল, "সে কাঁদতে কাঁদতে গেছে। ফিরে আসুক সে হাসিমুখে।"

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, "কাল যাব।"

ফিরে গিয়েছিল তার বাসায়। তার আগের দিন সে নতুন বাসা করেছে ধর্ম-তলায়। রিনাকে নিয়ে সংসার পাতবার মত বাসা। যেখানে ছিল, ক্রীশ্চান হবার পর আর সেখানে থাকতে চায়নি। নিষ্ঠুর-ভাবে আঘাত দেবে প্রতিবেশীরা। মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। ধর্ম যদি ঈশ্বর দেয়, তবে এমন অনুদার কেন? প্রেমহীন করে কেন মানুষকে? এক মুহূর্তে এত-কালের প্রীতি স্নেহ সব মুছে গেল? ঈশ্বর কি প্রেমহীন, প্রীতিহীন, স্নেহহীন। সে কি বিদ্বেষপরায়ণ? সে কি আঘাত করে? মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম সে মানে না। ঈশ্বরকে সে নেই বলেই ধ্রুব জানে। তবু হিন্দুধর্ম ছেড়ে ক্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে [illegible]

সারাটা রাত বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে রইল। নিউ টেস্টামেণ্টখানা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। মন লাগল না। রিনার ছবি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল, ঘুম ভাঙল সকালে। মন তখন আবার উৎসাহে ভরে উঠেছে। সারা রাত রিনার সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে। সে উঠল। আসানসোল। আসানসোল যাবে সে। রিনা। সকালের রোদ যেন সোনার ঝলক বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী সোনা হয়ে যাবে রিনাকে পেয়ে।

পৃথিবী মাটির। পৃথিবী কঠিন। সূর্যের আলো সোনা নয়, বড় উত্তপ্ত। মানুষের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ তার আত্ম-প্রবঞ্চনায়। নিজেকে নিজে সে যত বঞ্চনা করেছে তার চেয়ে বেশী বঞ্চনা আর কেউ করেনি। অলীককে সত্য বলে ধারণা করে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে মুখ থুবড়ে পড়ে হাহাকার করে মরে। সেই অলীকের মোহে সোনাকে বলে মাটি। মুখের খাদ্য ঠেলে দিয়ে উপবাসে নিজেকে পীড়িত করে।

রিনার সে-দৃষ্টি, সেই স্তম্ভিত-বিস্ময়-ভরা মুখ আজও তার মনে পড়ে।

সে আসানসোলে এসে রিনাকে সামনেই পেয়েছিল। রেভারেণ্ড আরনেস্টের বাংলোর সামনে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্রুঞ্চেন্দু উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে ডেকেছিল দূরে থেকে, "রিনা! রিনা!"

রিনা চমকে উঠেছিল। অস্ফুট স্বরে বলেছিল, "ক্রুঞ্চেন্দু!"

"হ্যাঁ রিনা। আমি কাল ব্যাপটাইজ্‌ড হয়েছি। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আর কোন বাধা নেই। তুমি আমার। ইউ আর মাইন!"

রিনার বিচিত্র রূপান্তর ঘটতে লাগল। ক্রুঞ্চেন্দু তার হাত ধরতে গিয়ে থমকে গেল। রিনা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে, তার মুখের উপর নিবদ্ধ, তবু যেন সে তাকে দেখছে না, যৌবনমাধুর্যে অপরূপ তার মুখখানিতে কী লেখা যেন ফুটছে: কপালে, ভ্রূতে, দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ রেখায় মনের স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে আরও দুর্বোধ্য কিছু যেন ফুটে উঠছে। তার মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা এবং আশ্চর্য আরও কিছু। মহিমা? হ্যাঁ তাই।

ধীরে ধীরে রিনা বলেছিল, "তুমি ক্রীশ্চান হয়েছ? আমার জন্য?"

"হ্যাঁ, রিনা।"

"তোমার ধর্ম তোমার ঈশ্বরকে তুমি ত্যাগ করেছ? আমার জন্য?"

"রিনা, কী বলছ?"

"তুমি বুঝতে পারছ না?"

"পারছি। আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি রিনা।"

"Life is mortal. জীবন নশ্বর। একদিন তা যাবেই। অসংখ্য জীবন অহরহ যাচ্ছে ক্রুঞ্চেন্দু, ইচ্ছে করে মানুষ মরছে, বিষ খাচ্ছে, গলায় দাঁড় দিচ্ছে। মানুষ মানুষকে মেরে নিজে মরছে। ক্রুঞ্চেন্দু, সেদিন এখান থেকে কিছু দূরে হাজারি-বাগে একজন বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাতে মরেছে। জন ক্লেটনও হয়ত কোন যুদ্ধে গুলীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবে। বাধ্য হয়ে দেবে। এমন জীবন দেওয়াটা নেশার ধর্ম ক্রুঞ্চেন্দু। আমার প্রভু জীবন দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য। তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে ক্রুঞ্চেন্দু। ফর এ গার্ল? ফর দিজ আইজ অব মাইন হুইচ ইউ সো অ্যাডোর—"

ক্রুঞ্চেন্দু প্রথমটায় বিচলিত হয়ে গিয়েছিল রিনার এই আকস্মিক আক্রমণে। এ-রিনাকে সে এই প্রথম দেখেছে। ধর্মান্ধতায় উগ্র, উন্মাদ! সে নিজেকে সংবরণ করে এবার বাধা দিয়ে বলেছিল, "ডোণ্ট বি সিলি, রিনা।"

"সিলি?" প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল রিনা।

দৃঢ়স্বরে ক্রুঞ্চেন্দুও বলেছিল, "ইয়েস। সিলি। কারণ কোন একটা ধর্মকে মানুষ অবলম্বন করে রিনা ওই ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানবধর্মে উপনীত হবার জন্যে। ওই ধর্মের গোঁড়ামি আর বন্ধনের মধ্যে বন্দীর মত বাঁধা থাকবার জন্য নয়।"

"ইয়েস। মানি। শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারি না। না পারি, এটুকু বলতে পারি যে, যারা ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, তারা একজন মানুষকে পাবার জন্য সে-তপস্যা করে না। তপস্যা করে সব মানুষকে আপন-জন বলে পেতে। একটি নারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না ক্রুঞ্চেন্দু, সকল জনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ঢেলে দেয়। ঈশ্বর বড় পবিত্র, বড় মূল্যবান। তাঁকে তুমি পরিত্যাগ করলে ক্রুঞ্চেন্দু? আমার জন্যে? না। না।"

"কী বলছ তুমি রিনা?"

রিনা আবার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"রিনা!"

রিনা বললে, "না, আমার জন্যে নয়। যে সৌন্দর্য তুমি ভালবাস সেই সৌন্দর্যময়ী একটি নারীর জন্য।" কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল এবার।

ব্যাকুল হয়ে ক্রুঞ্চেন্দু তার হাত ধরে বললে, "রিনা—"

"ছেড়ে দাও। Leave me. Dont touch me. Please—please."

"রিনা।"

নিরুচ্ছ্বাস কান্না কাঁদতে কাঁদতে রিনা বললে, "তুমি ভয়ংকর, ক্রুঞ্চেন্দু, তুমি ভয়ঙ্কর। একটি নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার। ক্রুঞ্চেন্দু, আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তাহলে তাদের কাউকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে আসবে, সেদিন আমাকেও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মত। ঈশ্বর, যে ঈশ্বরকে তোমার একান্ত আপনার বলে এতদিন জেনে এসেছ, ভালবেসেছ—। ওঃ! তুমি যাও! তুমি যাও! আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু না। বিবাহ করতে আমি পারব না। তুমি ভয়ংকর!"

পাথর হয়ে গেল ক্রুঞ্চেন্দু! স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রিনা কথা কটা বলেই বাংলোর ভিতরে চলে গিয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ পাদরী। তিনি বোধ হয় দুজনের কথার মধ্যে আসতে চাননি। তিনি এবার নেমে এলেন।

"ইয়ং ম্যান!"

"গুড মর্নিং, ফাদার।"

"গুড মর্নিং। বসবে—বিশ্রাম করবে?"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার! অনেক ধন্যবাদ! তার প্রয়োজন নেই। আমি নেক্সট ট্রেন ধরতে চাই।"

বেরিয়ে চলে এসেছিল সে।

সেই রিনা ব্রাউন। যে এর পর বুকে ঝুলিয়েছিল ক্রস আর যার একমাত্র পাঠ্য হয়েছিল হোলি বাইবেল, সেই রিনা ব্রাউন। যে রিনা ব্রাউন সারা জীবন অবিবাহিত থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই রিনা ব্রাউন।

সে উন্মাদিনীর মত মদ আর ব্যাভিচারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। অ্যামেরিকান অফিসারের জীবনের সাধ-মিটিয়ে-নেওয়া উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে। স্মৃতিও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওথেলোর কথাও তার মন থেকে মুছে গেছে। বললেও মনে পড়ে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে সহ্য করতে না-পারার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তিক্ত দৃষ্টির মধ্যে।

আর কৃষ্ণেন্দু? সে কৃষ্ণস্বামী হয়ে এই বন্য অঞ্চলে রোগীর চিকিৎসা এবং কুষ্ঠ-রোগীর সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। রিনা বলেছিল, বিশেষ ধর্মকে অতিক্রম করে মানুষে নির্বিশেষ মানবধর্মে পৌঁছে মানুষ একজনের জন্য নয়, একটি নারীকে বা একটি পুরুষকে পাবার জন্য নয়, সকল মানুষকে আপনার বলে পাবার জন্য।"

শুধু রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত সে নয়। সে ক্রীশ্চান, সে ভারতীয় সন্ন্যাসী। সে রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী। যে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার জন্য রিনা তাকে জয় করেছিল, সেই ঈশ্বরকে তাকে পেতে হবে। তাকে সে খুঁজেছে। তার সন্ধান সে পেয়েছে।

মানুষের বস্তুময় দেহের মধ্যে তাঁকে তিনি তপস্যারত দেখেছেন।

চিৎবিভ্রান্তিকর মহাসত্তা। বিরাট মহা-সত্তায় উপনীত হবে মানুষ। শুদ্ধ পবিত্র মমতায় কোমল, সত্যে নির্মল, প্রেমে পরিশুদ্ধ, অহিংস। এই যুদ্ধের মধ্যেও সে তপস্যাকে ডুবিয়ে নিঃশেষ করতে পারেনি। তামসীর মত সে তাকে গ্রাস করতে গিয়েও পারছে না।

বিচিত্র বিস্ময় এই যে, তাকে সেই ঈশ্বরসন্ধানী দেখেই সেই রিনা আজ ভয় পেলে; সঙ্কুচিত হয়ে গেল, হিংস্র হয়ে উঠল মানুষ দেখে সরীসৃপের মত।

আশ্চর্য, সেই নির্মল আলোকসন্ধানী রিনা, আজ এই যুদ্ধের মধ্যে যে উন্মাদিনী তামসী নিজেকে প্রকট করেছে, যে গ্রাস করতে চায় সমস্ত তপস্যাকে, হত্যা করতে চায় ঈশ্বরকে, সেই তামসীর সে ক্রীতদাসী ক্রীড়াসঙ্গিনী, প্রেতিনী। হয়ত বা তারই প্রতীক। হে ভগবান! Oh God!

রিনা—হঠাৎ জীপের গর্জনে তার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। জীপ! তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জীপের সঙ্গে রিনার অস্তিত্ব যেন মনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে মেঘগর্জনের মত। তিনি উঠে পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়ল জোড়া বাংলো মন্দিরের মাথায় মিলিটারী পোশাক-পরা কারা ঘুরছে, দেখছে বাইনা-কুলার দিয়ে। প্রমোদভ্রমণ আর উল্লাস, উচ্ছৃঙ্খলতা আর উন্মত্ততা। তামসী রিনা সঙ্গে আছে। নিশ্চয়। ভয়ার্তের মত কৃষ্ণস্বামী উঠলেন। পাকা রাস্তায় নয়। মাঠে মাঠে এসে বনের পথ ধরে।

॥ ছয় ॥

বনের ভিতর দিয়ে চলেছিলেন কৃষ্ণ-স্বামী। দ্রুতপদেই চলেছিলেন। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। রোগীরা এসে বসে আছে। অসুস্থ মানুষ। তার ভগবান। Blessed are the poor in spirit ; for theirs is the Kingdom of Heaven. তারাই ভক্ত। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। ভক্তের হৃদয়ে আমি বাস করি। ওরা অশিক্ষার মধ্যেও ভগবানকে

ভর্তি করে। অন্ধকারের মধ্যে বাস করেও ওরা আলো চায়। ওরা জীবনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না। আলোর অভাবেই আলো আলো বলে কাঁদে। ওদের মধ্যে ঈশ্বরের তপস্যা আছে।

বনে কোন্ ফুল ফুটেছে। গন্ধ উঠছে। পাখিরা কলকল করছে। সূর্য আজ মেঘের আড়ালে ঢাকা। বনভূমি বর্ষণের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। প্রতিটি পাতার মধ্যে কৃষ্ণস্বামী অনুভব করছেন উদ্ভিদ-প্রাণের ব্যাকুল প্রত্যাশা।

"Hallo, do ye hear? Hallo?"

চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। নারী-কণ্ঠস্বর, রিনা ব্রাউনের গলা। এই বনের মধ্যে? এই সকালে? এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণস্বামী দেখলেন, রিনা ব্রাউন বনের ভিতরে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা একক বড় শালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে একটা ফ্লাস্ক; হাতে সিগারেট। সেই পোশাক।

কৃষ্ণস্বামী শুধু বললেন, "Yes?"

"Come hear, sit down. Have a drink, a smoke."

"I don't drink, I don't smoke. Thank you."

এবার চিৎকার করে উঠল রিনা, "কৃষ্ণেন্দু!"

হেসে কৃষ্ণস্বামী বললেন, "আমার রোগী বসে আছে রিনা—আমি যাই। আমাকে ক্ষমা কর।" তারপর আবার বললেন, "তুমি চিনেছ রিনা? কাল ভেবেছিলাম তোমার স্মৃতিও ভ্রংশ হয়ে গেছে।"

"গেছে। অনেক গেছে। কিন্তু ওথেলো ভুলিনি। 'Let me look at your eyes, look in my face' বলে আমার দিকে যখনই তাকালে, তোমার দৃষ্টি আমি তখনই চিনলাম। কিন্তু—।"

সিগারেট টানতে লাগল রিনা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ওর হাত আঙুল কাঁপছে।

"আমি যাই রিনা।"

"তুমি এখানে কী করছ? এ কী পোশাক? এ কী চেহারা?"

"আমি ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী, রিনা। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীতে যা করে তাই করছি। ঈশ্বরকে খুঁজছি। অবশ্য মানুষের সেবার মধ্যে। আমি ডাক্তার, ওদের রোগে চিকিৎসা করি। কিন্তু মূল চিকিৎসা, কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা।"

রিনার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিনা বললে, "জীবনটাকে নষ্ট করলে কৃষ্ণেন্দু। I am the cause, I am the cause—"

"না। জীবন আমার নষ্ট হয়নি।"

"I am glad."

"আমি যাই। গুড বাই।"

"এক মিনিট। আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে না?"

"না। তোমার কথা তোমার রূপের মধ্যেই প্রকাশ রিনা। কী জিজ্ঞাসা করব?"

"ঈশ্বর নেই কৃষ্ণেন্দু। আমি তোমাকে ভুল বলেছিলাম। দুঃখ দিয়েছিলাম। ঈশ্বর নেই।"

উঠে দাঁড়াল রিনা ব্রাউন। আমি বলছি, "ঈশ্বর নেই। নাথিং ইজ সিন—পাপ নেই, পুণ্য নেই, ঈশ্বর নেই।"

কণ্ঠস্বর তার তীব্র হয়ে উঠল।

"তুমি এ সব ছাড় কৃষ্ণেন্দু। জীবনকে নষ্ট কর না। ফিরে যাও। নতুন জীবন আরম্ভ কর।"

"তোমার সঙ্গে?"

হি-হি করে হেসে উঠল রিনা ব্রাউন। তীব্র তীক্ষ্ণ বীভৎস হাসি। হাসি থামিয়ে বললে, "আমার দাম অনেক কৃষ্ণেন্দু। তোমার দাম আমার কাছে সেদিনের চেয়েও কম। সেদিন ভয় করে বলেছিলাম। আজ করুণা হচ্ছে। হার্মলেস, ডোসাইল, ওয়ার্থলেস, ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ধানী তুমি, নির্বোধ তুমি, মূর্খ, তুমি আমার ঘৃণার পাত্রও নও, করুণার পাত্র।"

কৃষ্ণস্বামী আর কথা বললেন না, এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে রূঢ় চিৎকার করে উঠল রিনা ব্রাউন, "শোন, শোন আমার কথা। শোন। ইউ মাস্ট লীভ দিস প্লেস। এখানে থাকতে তুমি পাবে না। চলে যাও। অনেক দূরে।"

কৃষ্ণস্বামী ঘুরে দাঁড়ালেন।

রিনার এমন তীব্র উগ্র মূর্তি তিনি কখনও দেখেননি। তার দীর্ঘ ঘন কালো নেত্ররোমের স্বপ্নালু বেষ্টনীর মধ্যে আয়ত কালো চোখ যে এমন জ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা তাঁর কল্পনাতীত। চোখ দুটো তার জ্বলছে। ধক ধক করছে।

রিনা বললে, "তোমার ওই বাংলোটা আমার চাই। আমি এখানে থাকব। অনেক দিন থাকব। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইউ মাস্ট। না হলে আমি ওদের লেলিয়ে দেব। ওরা তোমাকে, ওরা কেন, আমিই তোমাকে গুলী করে মারব।"

কৃষ্ণস্বামী কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে আবার চলতে শুরু করলেন। আর পিছন ফিরলেন না। ভীত তিনি হলেন। নিজের জন্য নয়। ওই ঝুমকির জন্য। সিন্ধুর জন্যও বটে।

রিনা ব্রাউন প্রেতিনীর মত গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে। হয়তো ফ্লাস্ক খুলে মদ খাচ্ছে। অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হল না তাঁর।

* * *

ঠিক করলেন, ঝুমকি আর সিন্ধু গ্রামের ভিতরে গিয়ে থাকবে। লাল সিং ওদের আগলাবে। সেও যাবে। তিনি থাকবেন একা।

তাঁর ভয় নেই। ভয় কৃষ্ণেন্দুর কোন কালে ছিল না। কৃষ্ণস্বামী হয়ে তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন কেন? আসুক মৃত্যু। অন্যায়কে প্রতিরোধ করে তিনি মরবেন। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের ভয়ে তিনি পালাবেন?

রাত্রি তখন নটা। তিনি বসে ছিলেন। প্রতিটি জীপের বা মোটরের শব্দে একটু সজাগ হয়ে উঠছিলেন। মধ্যে মধ্যে এক-একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। আকাশ বর্ষার মেঘে ভরেছে। আজ, হয়ত আজই বর্ষা নামবে। দিগন্তে মৃদু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তিনি ওকথা ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন নিষ্কলুষ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি রিনার কথা। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের

কথা। প্রেতিনী নয়, সাক্ষাৎ তামসী আজ রিনা ব্রাউন।

রাত্রি তামসী নয়। রাত্রির অন্ধকারে জীবনের মধ্য থেকেই তামসী বেরিয়ে আসে। বস্তুজগতে, স্থান-জগতে ক্ষোভের কারণ না থাকলে, অনিয়ম না ঘটলে সে জাগে না। ক্ষোভ মিটলেই সে শান্ত হয়, স্থিত হয়। জীবনের মধ্যেই সে সদা-জাগ্রত, চেতনার মধ্যে অহরহ সে সক্রিয়। সুপ্তির মধ্যে সে দুঃস্বপ্ন, অবসর-বিশ্রামের মধ্যে সে কুটিল কল্পনা। শান্তির পথে, সুখের পথে, চৈতন্যের পথে মানুষকে এগুতে সে দেবে না। নিষ্ঠুর আক্রোশে পিছন থেকে অজগরের মত আকর্ষণ করছে। গ্রাস করতে চাইছে। একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে গ্রাস না করে ক্ষান্ত হবে না।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তন্দ্রা এসেছিল কৃষ্ণস্বামীর। টর্চের আলোয় তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি উঠে বসলেন।

"কে?"

দূরে দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই ক্ষণিক আলোতেই দেখলেন, হ্যাঁ, সেই বটে। দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে। একটু একটু টলছে। রিনা ব্রাউন উত্তর দিল, "আমি। তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছ দেখছি!"

"আছি। শুধু তোমার নয়, তোমার সঙ্গে আরও লোকের প্রতীক্ষা করছিলাম। যারা আমাকে ভয় দেখাবে। এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে। আমি বুঝতে পেরেছি, এ-বাড়িতে যত প্রয়োজন তোমার না থাক, আমাকে তাড়ানো তার চেয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন। তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না। কিন্তু কেন?"

একখানা চেয়ারে বসে রিনা বললে, "ইউ মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। তোমাকে যেতে হবে।"

"নো। আই মাস্ট নট গো। ঈশ্বরের সাধনায় আমি এখানে শপথ নিয়ে এসেছি—"

"স্টপ।" চিৎকার করে উঠল রিনা। আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে সে বললে, "সব মিথ্যে। ঈশ্বর নাই। কোনদিন ছিল কি না জানি না। থাকলে সে মৃত। মানুষ তাকে মেরে ফেলেছে। আমার দিকে দেখ। আমি তাকে মেরেছি। আদিম যুগের মানুষের মত তার শবটাকে মামির মত আঁকড়ে থেকো না। যা মৃত তা বাঁচে না।"

"তুমি আজ যা-ই হয়ে থাক রিনা, তুমি ক্রীশ্চান।"

"না, না, না। আমি ক্রীশ্চান নই।"

"রিনা!"

"কোনদিন ছিলাম না। আমার ক্রস, আমার বাইবেল আমি ফেলে দিয়েছি। কোনদিন আমি ব্যাপ-টাইজড হইনি। দীক্ষা আমার বাবা নিতে দেয়নি। কোন ধর্মই আমার নেই। বাবা জেমস ব্রাউন ইংরেজ, ধর্মে ক্রীশ্চান, অত্যাচারী জমিদার। আমার মা, হিদেন, হিন্দুদের মধ্যেও বন্য অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে। লালসা চরিতার্থ করবার জন্য বাবা তাকে উপপত্নী হিসেবে রেখেছিল, তাকে কিনেছিল। আমি তাদের জারজ সন্তান। কৃষ্ণেন্দু, সেই আয়া, সেই কুন্তী আমার মা।"

বিদ্যুৎচমকের মেঘগর্জনটা ঠিক এই মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়ে উঠল রিনার কথার প্রতিধ্বনির মত। কৃষ্ণেন্দু বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোন কথা, একটা বিস্ময়সূচক মর্মান্তিক ধ্বনিও বের হল না। রিনা হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা মদ খেয়ে বললে, "আরও শুনবে? আরও অনেক আছে। আমার ওই মা কুন্তী, সে হল, মেদিনীপুরে যেখানে ব্রাউনের জমিদারি ছিল, সেখানকার জঙ্গল-মহলের পুরনো এক ছত্রী ইজারাদারের রক্ষিতা এমনি এক বুনো মেয়ের গর্ভজাত মেয়ে। ইজারাদারের রক্ষিতা ছিল এক ব্রাহ্মণের ব্যভিচারের ফল। আরও শুনবে? কালো মেয়েদের রক্তের সঙ্গে অনেক ফরসা রঙের মিল হয়েছিল। শেষ সাদা ইংরেজের রঙ। সবটা প্রকাশ পেল আমার মধ্যে। কালো চুল, বড় বড় চোখের পাতা, সাদা রঙ। গেছে। অনেক গেছে। কিন্তু ওথেলো ভুলিনি

রক্ত-রূপে আমার যাই হক, আমার কি কোন ধর্ম আছে, আমার কি কোন ঈশ্বর আছে? ঈশ্বরের, ধর্মের আমি জীবন্ত সমাধি। মৃত ঈশ্বর আমার মধ্যে পচছে। গন্ধ উঠছে।"

রিনা স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

কৃষ্ণস্বামীর মনে হল চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন, "তুমি কাঁদছ?"

"কাঁদছি? Look," সে টর্চটা জেলে নিজের মুখের উপর ধরলে। না, রিনা কাঁদেনি। চোখ দুটি তার নেশায় আরক্ত, দৃষ্টি তার অসহনীয় তীব্র।

"চোখের জল আমার অনেক দিন শুকিয়ে গেছে। মরুভূমি হয়ে গেছে। অনেক কেঁদে কেঁদে জল শেষ হয়ে গেছে।"

ধীরে ধীরে রিনা বললে, "সব তোমার জন্যে। কৃষ্ণেন্দু, you are the cause, you are the cause, আজ তোমার নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করেই বলছি, you are the cause." একটু হাসলে রিনা। বোধ করি ওথেলোর এই দৃশ্যটির অভিনয়ের সুখস্মৃতি খানিকটা মাধুর্যের সঞ্চার করলে ক্ষণিকের জন্য।

"তোমার মত ভালবাসার জনকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি ঈশ্বরকে, ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর না বলে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি ভাবছি, আমার নিজকে না দিয়ে সে দিন আমার ঈশ্বর, আমার ধর্ম, সব বোধ হয় তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি সব কেড়ে নিয়ে এসেছিলে আমার অজ্ঞাতসারে।"

আবার একটু স্তব্ধ থেকে বললে, আসানসোল থেকে ফিরে এলাম। ঈশ্বর এবং ধর্মকে আমি এত ভালবাসতাম কৃষ্ণেন্দু যে, অন্তর হাহাকার করলেও আমি কাঁদিনি। সংকল্প করেছিলাম, সারাটা জীবন 'নান' হয়ে কাটিয়ে দেব। ব্রাউন সাহেব—তাকে বাবা বলতে আমার ঘৃণা হয় কৃষ্ণেন্দু—সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে। সে কই? আমি তাকে বললাম, 'আমি তাকে প্রত্যাখান করেছি।' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? সে ক্রীশ্চান হয়েছে, তুমি জান না, সে তোমাকে বলে নি?' বললাম, 'বলেছে।' জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে?' আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, সব বললাম। কৃষ্ণেন্দু, এক মুহূর্তে তার মুখোশ খুলে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'বাস্টার্ড—বিচ।' তারপর অনর্গল কুৎসিত, অশ্লীল গালাগাল। বললে, 'ক্রীশ্চান? তুই ক্রীশ্চান? ডু ইউ নো, হিদেন-ওই কুন্তী, হিদেনদের চেয়েও ঘৃণিত ও। একে পরপর তিন জেনারেশন বাস্টার্ড, ওই তোর মা।' বললে, 'জীবনে মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে এত বড় ভুল করালে। তোর সাদা রঙ দেখে আমি ভুলে গেলাম। তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

একটা সিগারেট ধরালে রিনা। তারপর আবার কথা বলতে গিয়েই থমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, "ইট্‌জ রেনিং। বৃষ্টি এল।" হেসে বললে, "কুন্তী মা আমার বলত, জল আইচে গ!"

কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কৃষ্ণস্বামীর কপালে হাতে এসে পড়ল। দূরান্তরে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে। আসছে বর্ষার বর্ষণ। মৃদুমন্দ নৈঋতী হাওয়া বইছে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, "ভিতরে চল রিনা।"

"ঘরের ভিতর? চল। কিন্তু তাতেই বা কী দরকার। আমি চলে যাই। শুধু বলে যাই, তোমাকে বলেছি, আবার বলছি, এখান থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। ইউ মাস্ট।"

"সে হবে রিনা। কিন্তু এই বৃষ্টিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবে?"

"ভিজতে ভিজতে চলে যাব। দুর্যোগ আমি ভালবাসি কৃষ্ণেন্দু। আগে ঝড়-জল এলে ভয় করতাম। এখন আনন্দ পাই। আই ফিয়ার নো ডার্কনেস, আই ফিয়ার নো স্টর্ম, আই ফিয়ার নো থাণ্ডার, লেট মি গো। বাট ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস।"

"না। বস।"

ঘরের মধ্যে এসে স্তিমিত লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করে দিলেন কৃষ্ণস্বামী।

"নো।" বলে রিনা এসে আলোটা কমিয়ে, নিভিয়ে দিল। পলতেটা পড়ে গেল। "অন্ধকার—অন্ধকার ভাল। জান, ব্রাউনের কাছে সব কথা শুনে তিনদিন আমি অন্ধকারে পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আলো জ্বালিনি। নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় হত আমার। আমার সঙ্গে সমানে কাঁদত আমার মা। কুন্তী। ব্রাউনকে আমি ঘৃণা করি; কুন্তীকে ঘৃণা করতে পারিনি। হতভাগিনী। ব্রাউনের ভয়ে, ভয়ার্ত মূক জন্তুর মত সারাজীবন আমার আয়া হয়ে থেকেছে, কোনদিন আমাকে মেয়ে বলে একবিন্দু স্নেহ শ্রদ্ধা আমার কাছে চাইতে পারেনি। অন্ধকারে দুজনে কাঁদতাম। নিজের কলঙ্কের ভয়ে—আমার মাতৃ-পরিচয়ের অমর্যাদা পাছে তাকে স্পর্শ করে, আমাকে স্পর্শ করে, তার লজ্জায়—সে আমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিতও করেনি। আমাকে নার্সারিতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের তখনও রূপ-যৌবন ছিল। সে-রূপে নাকি এক বন্য মোহ ছিল। সে-মোহ আশ্চর্য। আমার চুলে চোখে চোখের পাতায় তার পরিচয় আছে। তাকেও সে তাড়ায়নি। তাকে সে কিনেছিল। ভোগ করছে, বর্বরের মত। ক্রীশ্চান! ক্রায়েস্ট! সন অব গড! তিনি ছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। রোমান ইম্পিরিয়লিস্টরা মেরেছিল তাঁকে। লোকের বিশ্বাস, তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। হয়ে থাকলেও ইম্পিরিয়লিস্টরা এখনও মরেনি। তারা তাঁকে ক্রুশে নিত্য বিঁধে মারছে।"

হাসলে রিনা। হেসে বললে, "এরা কিন্তু একটা জায়গায় মহৎ। ক্লেটন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই খাঁটি ইংরেজ জমিদার তার আভিজাত্য বজায় রেখে আমার সব বৃত্তান্ত তাকে জানিয়েছিল। ক্লেটনের বাবা ধন্যবাদ জানিয়েছিল ব্রাউনকে। তুমি হিদেন বলে তোমাকে সত্য বলার প্রয়োজনও মনে করেনি। আমি ক্রীশ্চান নই, তবু তোমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত না করে আমার সঙ্গে বিয়েতে মত দেয়নি। আমি হিদেনের গর্ভজাত মেয়ে, আমাকে বাইবেল আর ক্রস দিয়েছিল খেলার ছলে।"

বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষণ নেমেছে। চারি পাশের সুদীর্ঘ বিশাল শালবনের পল্লবে ধারাপতনের শব্দে শব্দময় মেঘ-মল্লার বেজে উঠেছে। বিচিত্র উচ্চ ঝর ঝর এক সংগীত। পৃথিবীর অন্য সব শব্দ ডুবে গিয়েছে। এমন কি, জীপ কি মোটরের শব্দও ভাল শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রিনা উঠে দাঁড়াল। একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললে, "কী সুন্দর রাত্রি। মনে হচ্ছে, নিখিলজগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।"

কৃষ্ণস্বামী স্তব্ধ হয়ে রিনার কাহিনী শুনে সেই স্তব্ধ হয়েই বসেছিলেন। বেদনায় করুণায় তাঁর অন্তর মুহ্যমান হয়ে গেছে। বাইরের ওই সজল বাতাসের প্রবাহের মত হায় হায় করে সারা হয়ে গেল। এমনি করেই কাঁদছে। হে ভগবান, তুমি ওর অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হও। ওর অন্তরের কবরখানা বিদীর্ণ করে জেগে ওঠ। তোমার স্পর্শে কুষ্ঠরোগীর নিরাময় হওয়ার মতই কঠিন আঘাতে বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরকে সুস্থ সুন্দর করে তোল। সুন্দর রিনা, এখনও সুন্দর। এখনও সেই মাধুরী তার সর্বাঙ্গে, এখনও তার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মঘেরা আয়ত কালো চোখ দুটি মানস সরোবরের মত স্বচ্ছ গভীর। আকাশের প্রতিবিম্বে এখনও সে নীলাভা প্রতি-ফলনের শক্তি হারায়নি। মেঘ তুমি কাটিয়ে দাও, অপসারিত কর। হে ঈশ্বর!

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তিনি বললেন,

"রিনা, ঈশ্বরের সমাধি বারবার রচনা করবার চেষ্টা করেছে, ঈশ্বরের বিপরীত শক্তি। আলো আর কালো। ভাল আর মন্দ। কিন্তু বারবার মন্দ হেরেছে, ভাল জিতেছে। ঈশ্বর সে-সমাধি বিদীর্ণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। হায় রিনা, অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, অনেক বেদনা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তখন দূরে চলে গেছি। আমি জানলে এ-দুঃখ তোমাকে পেতে দিতাম না। বলতাম—জীবন, সে ঈশ্বরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জীবনেই ভগবান কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, ভালবাসেন, নিজেকে নিজে বলি দেন, বিশ্বের কাছে বিলিয়ে দেন, মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ। মানুষের মধ্যে জীবন, সে যেখান থেকেই উদ্ভূত হক, সে সমান পবিত্র। ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই ক্রীশ্চান নেই, হিদেন নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই! গোত্র কুল ইতিহাস পরিচয় থাক-না-থাক মানুষ সমান পবিত্র, তার মধ্যে ঈশ্বর সমান মহিমায় আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তোমাকে নিয়ে আমি মহা আনন্দে এই তপস্যা করতাম।"

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "যে ঈশ্বরকে তুমি সমাধিস্থ করেছ বলছ, তিনি আবার উঠবেন। তুমি শান্ত হও।"

"ডোণ্ট টাচ মি প্লিজ। ডোণ্ট। ডোণ্ট, কৃষ্ণেন্দু! আমাকে স্পর্শ করো না।" চিৎকার করে উঠল রিনা। সে যেন আর্তনাদ।

"Peace and be still, রিনা।" ওথেলো মনে পড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরে স্বপ্নাবেশের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণস্বামী।

কিন্তু রিনা অধীর কণ্ঠে বললে, "শান্তি আমার নেই। স্থির আমি হতে পারব না। কৃষ্ণেন্দু। তুমি জান না : ও সবের কোন কিছুতেই আমার আর অধিকার নেই। আমার ভিতরটা পচে গেছে। শয়তান আমাকে অধিকার করেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আমি পারি না। দুর্দান্ত ক্রোধে আমার অন্তর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগে ওঠে শরীরে। আমি কাঁদতে পারি না। আমি ব্রাউনের উপর রাগে আক্রোশে বেরিয়ে এসেছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম ক্রস, ফেলে দিয়েছিলাম বাইবেল; পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম জঘন্য পল্লীতে। সঙ্গে আমার মা। সে এই রাত্রির মত। অন্ধকার মূক। পাপ কর, পুণ্য কর, কোন কিছুতে প্রতিবাদ নেই শাসন নেই, বরং নীরব প্রশ্রয় আছে; কালো কাপড়ের কালো সর্বাঙ্গে ঘের দিয়ে ঢেকে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। জীবন আরম্ভ করলাম রিপন স্ট্রীট অঞ্চলে। নাইট ডেনের জীবন। ফিটনের কোচম্যান, ডেনের বয়েরা যার পরিচালক। সেখান থেকে হোটেলে গিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে এই যুদ্ধের মধ্যে। দেহ বিক্রি করে বেড়াচ্ছি। ওরা বেঁধে রেখেছে আমাকে।"

"রিনা!" শিউরে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী।

"না। দোষ কাউকে দেব না। সব আমার, আমার কর্মফল। আমার অন্তর মরে গিয়েছে কৃষ্ণেন্দু, সেখানে তুমি কবরে চাপা পড়েছ, ঈশ্বর পড়েছে, ঈশ্বরের পুত্র পড়েছে, আমি নিজে হাতে দিয়েছি চাপা।"

"রিনা।" হাতখানি টেনে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

"আমাকে চাও তুমি? প্রেম নয়। দেহ দিতে পারি আমি। প্রাণ নেই, মন নেই। মন গেছে। প্রেমও নেই। চাও তুমি?"

হাত ছেড়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, "ভগবান তোমাকে দয়া করুন—"

"নো! নো! নো! ও নাম কর না।"

"মৃত্যুকে তোমার ভয় কী?"

"ভয় নয়, ঘৃণা। শোন কৃষ্ণেন্দু, তুমি এখানে থাকতে আমি স্বস্তি পাব না। তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে। তুমি যাও। কৃষ্ণেন্দু! না হলে হয়ত আমি তোমাকে গুলি করে মারব। কিম্বা ওরা মারবে। ওরা যদি জানতে পারে—তোমার জন্যে আমি চলে যাব, তা হলে ওরা ক্ষমা করবে না।"

কৃষ্ণস্বামী অন্ধকারের মধ্যেই, যেখানে দেওয়ালে ক্রুসবিদ্ধ যিশুর একটি মূর্তি টাঙানো ছিল সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন : হে অবিনশ্বর। নিজেকে প্রকাশ কর তুমি।

"কৃষ্ণেন্দু, তুমি যাবে কি না বল।"

"না।"

"না?"

"না।"

"অন্যত্র গিয়ে তুমি তোমার কাজ কর। আমার বিঘ্ন কর না।"

"না।"

"কেন? কিসের জন্য? আমার জন্য? আমার দেহ চাও?"

কানে আঙুল দিলেন কৃষ্ণস্বামী বললেন, "না। তোমার দেহ নিয়ে কী করব? যেনাহং নামৃতস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্।" সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিলেন। "কী হবে ওতে?"

"তবে কেন? কিসের জন্য?" চিৎকার করে উঠল রিনা।"

"To be crucified again."

বলতে বলতেই রিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তিনি জ্বাললেন, ছটাটা গিয়ে পড়ল ক্রুশেবিদ্ধ যিশুর মূর্তির উপর।

পর মুহূর্তেই রিনা ক্ষিপ্রবেগে কী টেনে বের করলে। পিস্তল। পিস্তলটা তুলে গুলি করলে। মূর্তিটা ভেঙে পড়ে গেল।

রিনা বেরিয়ে চলে গেল কক্ষচ্যুত উল্কার মত।—বাইরে থেকে শুনতে পেলেন, "কাল তুমি যাবে। You must or you die."

আশ্চর্য। পরদিন থেকে আর রিনাকে দেখা গেল না।

কতদিন কৃষ্ণস্বামী গেলেন পিয়ারো-ডোবা; কতদিন মোরাদের রাস্তার তেমাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কতদিন রামচরণের ঘটকে অপ্রয়োজনে বসে রইলেন। কত জীপ গেল। কত বিলাসিনী গেল। কিন্তু রিনা নেই তাদের মধ্যে।

রামচরণ, রামচরণের ছেলে বললে, "সি মেমটো কোথা গেল বাবাসাহেব?"

কৃষ্ণস্বামী কী বলবেন?

বলেন, "কে জানে।"

কে জানে? সে কোথায়? কোন দূরান্তরে দূরবিস্তৃত যুদ্ধের সীমানায় রিনা তামসী উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছে। কে জানে?

॥ সাত ॥

পৃথিবী শুধু জল আর মাটি নয়। সমুদ্র বন পাহাড়—এর মধ্যেই পৃথিবীর সীমানা শেষ নয়। তার একটা ঊর্ধ্বলোক আছে। আকাশে মাধ্যাকর্ষণ যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ততদূর তার সীমানা। আবার মাটির বুকের ভিতর অন্ধকার গহ্বরেও তার একটা অধোলোক আছে। গাছের মূল থাকে মাটির নীচে, ফুল ফোটে আকাশে। পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। আকাশে উঠে আরও আরও উপরে উঠতে চায়। কিন্তু তার নীড় মাটির বুকে আটকানো গাছের ডালে, সেখানে তাকে নামতে হয়। সরীসৃপ থাকে মাটির বুকের অন্ধকার গহ্বরে; তাকে উঠে আসতে হয় মাটির উপরে, বায়ুর জন্য, আহারের জন্য, আলোর জন্য।

কৃষ্ণস্বামীর মন বিহঙ্গের মত আকাশ-বিহারী। আলো, আরও আলোর জন্য সে ডানা মেলেছে। রিনা ব্রাউনই একদিন সেই পাখা-মেলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। আশ্চর্য মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের শক্তি, বাবা জেমস ব্রাউনের আঘাতে সেই রিনা ব্রাউন অন্ধকার গহ্বরে সরীসৃপ হয়ে গেল। তার বাল্যজীবনে পুরাণে পড়েছিল একজন রাজা কার অভিশাপে অজগর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল কাজলহারার। কাজলহারা ঠিক রিনার মত স্ফটিকে গড়া মেয়ে, তার সতীন তাকে জাদুদণ্ডের প্রহারে সাপিনীতে পরিণত করেছিল। ব্রাউন ঘৃণার অমর্যাদার দণ্ড দিয়ে আঘাত করে তাকে ঠিক সাপিনীই করে দিয়েছে।

কিন্তু পাখিকেও মাটির বুকে নামতে হয়। সরীসৃপকেও মাটির উপরে আসতে হয়। হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

টাই যেন হয়েছিল। কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে রিনা ব্রাউনের এই জীবনের দেখাটা ঠিক যেন তাই। অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপরূপিণী রিনা বিহঙ্গ কৃষ্ণস্বামীর নীচে এসে বিষ-নিশ্বাসে গর্জন করে তাকে শাসিয়ে চলে গেল। আর দেখা হল না।

কৃষ্ণস্বামী কয়েকদিন অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপের জন্য প্রতীক্ষা করলেন, কিন্তু সে আর এল না। কোথায় কোন দূরে নূতন অন্ধকার বিহারের সন্ধানে সে চলে গেছে। কৃষ্ণস্বামী পক্ষ বিস্তার করে দিলেন আকাশে। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে উঠবেন তিনি। রিনা তার পথে গেছে, তিনি তাঁর পথে চলবেন। শুধু মাঝে মাঝে আকাশচারী বিহঙ্গের মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মত, রিনার কথা মনে পড়লে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের কাছে তার মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গল কর প্রভু। রিনার চিত্তকে সুস্থ কর, শান্ত কর। কুষ্ঠরোগী এসেছিল তোমার কাছে, তুমি তাকে স্পর্শ করেছিলে। সে নবজীবন লাভ করেছিল। তেমনি করে রিনার চিত্তকে সুস্থ কর। বল, "Be thou clean." আবার কিছুক্ষণ পর রিনার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। অসময়ে বাইসিক্ল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।

"কেমন আছ হে তোমরা সব? আঁ? মহাশয়রা গো!"

"ভাল কোথা বাবাসাহেব? খুদ খেঁয়ে আর বাঁচে মানুষ! প্যাটের ব্যামো ধরে গেল। ছেল্যা মেয়্যা ছা-ছিগুড়ি সব—সব।"

"দেখছি, দেখছি এস ডি ওকে বলে দেখছি।"

"কেরাচিনি তেল আর কাপড়ের কথা বলবা বাবা।"

"বলব। কিন্তুক এখনই কারুখে হাতটাত দেখতে হবে নাই ত?"

"ছুরুক-ছারুক অসুখ, ই আর কী দেখবেন গো?"

"ওই বাচ্ছাটার পিঠে উ দাগটো কিসের বটে হে? দেখি-দেখি?"

হঠাৎ চোখে পড়েছে একটি ছেলের পিঠে ঘাড়ের কাছে একটি বিবর্ণ সাদা দাগ। "দেখিরে খোকা, ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, শুন শুন।"

"যা ক্যানেরে, হারামজাদা বজ্জাত—! দেখা ক্যানে?"

দেখে শুনে বলেন "তাই ত হে মহাশয়, কেমন পারা লাগছেক যেন গো! ইয়াকে ত দেখাতে হয়। নিয়ে যেয়ো ক্যানে, আমার ... ..."

মনে মনে চিন্তিত হন, বেদনা অনুভব করেন। ভুলে যান অন্য সব কিছু।

নিজের মাইক্রসকোপ কৃষ্ণস্বামীর গোড়া থেকেই আছে। ছাত্রজীবনে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার আওতায় থেকে প্র্যাকটিস করতেন, তখন থেকেই আছে। কম দামে জোগাড় করে দিয়েছিল ক্লেটন। কারবারটা চোরাই মালের, সে জেনেই কৃষ্ণেন্দু কিনেছিল। তখন সে ছাত্র-আমলের কৃষ্ণেন্দু। দ্বিধা তার হয়নি। ওটা দিয়ে যখন কাজ করেন কৃষ্ণস্বামী, তখন ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করেন মাকে-বাবাকে। মা তাঁর সমস্ত গহনাই দিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দুকে। পাশ করেছে কৃষ্ণেন্দু। এই গহনার মধ্যে বালাজোড়াটি বউকে দেবে এবং বাকী গহনার টাকায় সে ডিসপেনসারি করবে। শ্রাদ্ধের পর তার বাবা সেগুলি সব তার হাতেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ধর। তোমার মা তোমাকেই দিয়ে গিয়েছে, তোমার কাছেই রাখ। তোমাকে পড়িয়ে আমার হাত এখন খালি। অভাবের মধ্যে কোথায় কী করে বসব।"

তখনকার কৃষ্ণেন্দু ছিল মায়ের গোপাল। সংসারের সব জিনিসে ছিল তারই অগ্র-অধিকার! সে নিতেই জানত, দিতে জানত না। শেখেনি। প্রথম দিতে শিখল রিনার হাতে নিজেকে দিয়ে।

থাক রিনার কথা। তার মঙ্গল হক। তার কথা ভাবতে ভাবতে সময়ে সময়ে মনে হয়, রিনা তাকে নিজেকে দেয়নি, তার বদলে ফিরিয়ে দেবার সময় তার ঈশ্বরকে দিয়ে নিজে কাঙাল হয়ে গেছে। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। হে ঈশ্বর, তার জীবনের কবরখানাকে জীবন্ময় করে তুলে তুমি নূতন করে জাগ। মানুষের প্রাণশক্তির শুভবুদ্ধি, তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকার আলো, ঈশ্বর, তুমি জাগ্রত হও। তোমার হাতে রিনাকে সমর্পণ করে কৃষ্ণস্বামী নিশ্চিন্ত।

রিনা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। মন থেকে সরে যায়।

কৃষ্ণস্বামীর বাবার কথা মনে পড়ে। স্বল্পবাক, নির্লিপ্ত মানুষ। আশ্চর্য কঠিন। এক কথায় কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিলেন, "যাও। প্রয়োজন নেই তোমাকে।" বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন ঠাকুর নিয়ে। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করেছিলেন। কিছু টাকা এবং ঠাকুরটি মঠে দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনে সামান্য টাকাই খরচ করেছিলেন। বাকী তের হাজার কয়েক শো ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, উকিলকে বলেছিলেন, কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ করে টাকাটা দিতে। সেটাও কৃষ্ণস্বামী পেয়েছেন। ... ... আশ্রম। কিন্তু এভাবে চলবে। এখানেই একটা যেন কুষ্ঠরোগীর ডিসপেনসারি করে তুললেন কৃষ্ণস্বামী।

লাল সিং সিন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। "বাবা-সাহেব! ইতো ভাল হছে নাই।"

কৃষ্ণস্বামী হাসেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন, "তোমাদের ভয় করছে—লাল সিং?

লাল সিং মৌন থেকেই জানায়, হ্যাঁ লাগছে।

সিন্ধু স্পষ্ট বলে, "হ্যাঁ বাবাসাহেব। মহাব্যাধিকে ভয় কার নাই বলেন? হ্যাঁ—আপনকার নাই বটে। তা আপনার পুণ্য আছে, আমাদের তা নাই। কী করব কন?"

বর্বরা ঝুমকি ভয় করে না। ঘৃণা করে। বলে, "বড়া খারাপ বাসায়। গন্ধো কি! উঃ। আর কি হয়ে যায়—হ্যাক থু!"

মধ্যে মধ্যে সেই অ্যামেরিকান মিলিটারী অফিসারটি আসে। এখন আর "হে ম্যান" বলে না, বলে, "ওয়েল রেভরেণ্ড!"

মধ্যে মধ্যে সে রিনার খবরের কথা তোলে। বলে, "শুনলাম আসাম ফ্রণ্টে ঘুরছে। ঠিক ত বলা যায় না। তবে অনেকটা মেজে সেই ডেয়ার-ডেভিল মেয়েটার সঙ্গে।"

"আসাম?"

"ইয়েস। গোহাটি—শিলং। চিটাগং। জাস্ট লাইক হার, লাইক এ শুটিংস্টার।" মধ্যে মধ্যে ঝুমকিকে দেখে নির্লজ্জভাবে হাসে। ইঙ্গিত করে।

কৃষ্ণস্বামী মনে করিয়ে দেন, "এটি আসলে একটি চার্চ মিস্টার অফিসার!"

সামনে যুদ্ধ। মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা যাদের, তারা যত উদ্দাম তত ভীরু। ঈশ্বরের রোষকে ভয় না করে পারে না। অন্তত ঘাঁটাতে চায় না ঈশ্বরকে। গায়ে ক্রস এঁকে সরে যায়।

কৃষ্ণস্বামী হঠাৎ লাল সিংকে একদিন বললেন বছর খানেক পর, "লাল সিং, আমার শরীরটা বড় খারাপ মনে হচ্ছে, আমি কিছু দিন বাইরে যাচ্ছি।"

"কোথা যাবেন বাবাসাহেব? আপনি না থাকলে ইখানে আমরা কী করে থাকব?"

"পনের কুড়ি দিন। তার বেশী নয়। তোমরা গ্রামের মধ্যে যেমন থাক থাকবে।"

পঁচিশ দিন পর ফিরে এলেন কৃষ্ণস্বামী। শরীর সারেনি, বরং শীর্ণ হয়েছে। সিন্ধু বললে, "শরীর যে খারাপ কর্যা এলেন বাবাসাহেব!"

"অনেক ঘুরেছি সিন্ধু! অনেক কাল ইখানেই থেকে থেকে মনটা হাঁপায়ে ছিল। ছাড়া পেয়ে খুব ঘুরলম। সেই একবারে যুদ্ধের লাগালাগি জাগাতে। শিলং গোহাটি, ইখান-সিখান। ঘুরে ঘুরে শরীর খারাপ হবে বইকি! তবে হাঁ, মনটা ভাল হইছে।"

চট্টগ্রাম থেকে গোহাটি পর্যন্ত যুদ্ধের লাইনের স্থানগুলির খবর তিনি নিয়েছেন। হ্যাঁ, খবর পেয়েছেন। ঠিক এমনি একটি ... ...

কয়ে গৌহাটি থেকে শিলংয়ের পাহাড়ের পথে একটা খদে ফেলে দিয়েছিল।

সম্ভবত কোন নিষ্ঠুর সৈনিক ঃ রিনার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। পোস্ট মর্টেমে জানা গেছে, তার পেটে ছিল মদ, আর জানা গেছে যে, হতভাগিনী কদর্য ব্যাধিগ্রস্তা ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়েছেন কৃষ্ণস্বামী। রিনা তার জীবনের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে গেছে, অথবা নিষ্ঠুর মূল্য দিয়ে এই উল্কা-জীবনের দেনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে গেছে। পুলিশ বিভাগ তার কোন পরিচয় পায়নি। কৃষ্ণস্বামীকেই তারা প্রশ্ন করেছিল, "জানতেন না কি একে?"

"না।"

'না' জবাব দিয়েই কৃষ্ণস্বামী চলে এসেছেন। এইবার—হে ঈশ্বর—তোমার সেবায় আমাকে মগ্ন করে দাও। সেই সংকল্প নিয়েই ফিরেছেন। কলকাতা থেকে অনেক কষ্টে ওষুধপাতিও কিনে এনেছেন। সেগুলো সেই দিনই সাজিয়ে ফেললেন।

পরের দিন সকালে ঝুমকি এসে দাঁড়াল। "বাবাসাহেব।"

"কী?"

"লাল সিং কাল রেতে চলে গৈছে।

"চলে গৈছে? সে কি? কোথা গৈছে?"

"কে জানে? সি উয়ারা জানে। বুললে, কুঠ নিয়ে কারবার করে সাহেবের কুঠ হল, আবার থাকে? চল সিন্ধু পালায়ে বাঁচি।"

"কী বললে? কার কুঠ হয়েছে?"

"ক্যানে, তুর হয়েছে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে? কয়েক মুহূর্ত পরে তার বুদ্ধি সক্রিয় হল। "কোথায়? কই?"

নিজের আঙুলগুলি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। ছোট আয়না দেওয়ালে টাঙানো ছিল, সেখানার সামনে দাঁড়ালেন। কই? কোথায়?

ঝুমকি বললে, "উঁ হু। উঁ হু! যেমন দাগ দেখে তু বুলিস—কুঠের লক্ষণ ইটা, তেমনি চাকা-পারা দাগ একটো হইছে যে তুর। পিছা দিকে। তু দেখবি কী করে?"

"কোথায়?"

কৃষ্ণস্বামীর জামাটা তুলে পিঠের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ঝুমকি বললে, "এই যি। এইটো! কি বেটে ইটো? অঁ?"

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি যেন খানিকটা অবশ হয়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন তিনি। এর জন্য প্রস্তুত তিনি ছিলেন না, এর সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়। তবু যখন সত্য সত্য এল, তখন সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে; বড় কষ্ট হচ্ছে। হয়েছে। ঝুমকি যেখানটায় আঙুল দিয়েছে সেখানটার সাড় নেই, ঝুমকির আঙুলের স্পর্শ তিনি বুঝতে পারছেন না।

রিনা! রিনার জন্য! কোন কিছুই যেন মনের মধ্যে ধরা পড়েনি। মন ওইদিকে এমনই ব্যগ্র ছিল যে, অন্য দিকের সব কিছুই চোখের উপর দিয়েই তাঁর অলক্ষ্যে চলে গেছে।

মস্তিষ্কের মধ্যে কোষে কোষে বেদনার আবেগ ভূগর্ভবদ্ধ আগুনের মত ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। কৃষ্ণস্বামী পাহাড়ের মত তাকে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন। কাঁপতে দেবেন না। ফাটতে দেবেন না। আগুন ধরিত্রীগর্ভে প্রাণের উত্তাপে পরিণত হক। প্রাণকোষে-কোষে সে-আগুন সহস্র প্রদীপ-শিখার মত জ্বলে উঠুক আনন্দ-দীপালিতে, ভগবানের আরতিতে।

অনেকক্ষণ পর তিনি আত্মস্থ হয়ে বললেন, "আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি ঝুমকি।"

বাঁকুড়ায় নূতন কী বলবে? বলবে, ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। অনিবার্য এসেছে। এরপর? কোথায় যাবেন, কী করবেন?

হ্যাঁ, এসেছে। কার্যকারণের পরিণাম! কৃষ্ণস্বামীকে তিরস্কারও শুনতে হল। এইভাবে সংঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেষ্টার বাইরে একক চেষ্টা করার অনিবার্য পরিণাম!

চুপ করেই গেলেন কৃষ্ণস্বামী। শুধু একটি হাস্যরেখা ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

Lord, I cry unto thee: make haste unto me.

"চিন্তার খুব কারণ আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আর ত এইভাবে লোকের চিকিৎসা করে বেড়ান ঠিক হবে না আপনার।"

"নিশ্চয়। এ তাঁর নির্দেশ। আসতে আসতে ভেবেছি আমি। আমি চলে যাব। কুম্ভকোণম লেপার অ্যাসাইলামে। সেখানে আমার চিকিৎসাও হবে, আমি ডাক্তার হিসেবে কিছু কাজও করতে পারব।"

"God be with you."

মান্দ্রাজ উপকূলে কুম্ভকোণম কুষ্ঠাশ্রম। বিরাট কুষ্ঠাশ্রম। নিপীড়িত ভগবানের সেবায়তন। আজ মনে পড়ল রিনা ব্রাউনকে। স্ফটিকে গড়া মূর্তির মত পবিত্র কুমারী রিনা ব্রাউন, আসানসোলের চার্চইয়ার্ডে তাকে প্রত্যাখান করার সময় তার ঈশ্বর বিশ্বাসকে, তার ঈশ্বরকে কি এই পথে পেতে নির্দেশ দিয়েছিল? না। এই পথ তিনি নিজে বেছে নিয়েছেন।

Set a watch, oh Lord, before my mouth: Keep the door of my lips.

একটা ক্ষুব্ধ বাক্যও যেন কৃষ্ণস্বামী উচ্চারণ না করে।

চল কুম্ভকোণম। শেষ আশ্রয়।

* * * * *

সত্যের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নাই; Truth is stranger than fiction; সত্যে মৃত মানুষও বাঁচে, কল্পনার কাহিনীতে বাঁচালে অবিশ্বাস্য হয়। বাস্তব জগতে বস্তু থেকে প্রাণ কালোর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সীমানা অতিক্রম করবার জন্য যুগ যুগ ধরে ছুটেছে, সম্মুখে দিগন্তে আলোর রাজ্য উজ্জ্বল মহিমায় আহ্বান জানাচ্ছে, তবু মানুষের কানের কাছে অবিশ্বাসী বুদ্ধি কূট তর্কে মুখর হয়ে বলছে, আলো নয়, আলেয়া। আলো মিথ্যা, কালোই সত্য। অমৃত কল্পনা, মৃত্যুই সত্য।

আরও আট মাস পর।

কুম্ভকোণম সেবায়তনে সেদিন ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছেন কৃষ্ণস্বামী। এইখানেই তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সব চেয়ে কঠিন রোগের রোগীদের তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর নিজের চিকিৎসাও হয়। রোগ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়ে—এতদিনে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। নাকের পেটি ঈষৎ স্ফীত হয়েছে; মুখে, কপালে, গালে, অসুস্থ রক্তাভ মসৃণতা দেখা দিয়েছে; কানের পেটি দুটিও ফুলেছে। হাতের আঙুল ঠিক ফোলেনি, তবে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের মত দেখায়। প্রথমদিকে দ্রুতবেগেই বেড়েছিল। এখন রোগের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

এদিকে কালের পটভূমিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। স্বাধীন হচ্ছে ভারতবর্ষ। বিভক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। কৃষ্ণস্বামী দেখেন, আর নিত্য বলেন, এ জয় তোমারই জয়! মানুষের মধ্যে সত্যের তপস্যাই তুমি। তোমারই জয়!

ক্লান্ত দৃষ্টিতে নিজের ঘরে খোলা দুয়ারের পথে তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একজন ডাক্তার এসে বললেন, "রেভরেণ্ড, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বলেছি তোমার শরীর অসুস্থ, কিন্তু তিনি বললেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, এবং বললেন, 'বলবেন, আমার নাম জনি, জন ক্রেটন!' "

"জন ক্রেটন! বিস্ময়ে চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী! জন ক্রেটন সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই লেপার অ্যাসাইলামে? কই? কোথায়?"

অকস্মাৎ ঘরগুলো দুলতে লাগল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। সামনের [illegible]-পালা আকাশ আলো সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে! জ্যোতির্লোকে কোন বিস্ফোরণ হচ্ছে। কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন, "রিনা!"

জন ক্রেটনের পাশে রিনা। রিনা ক্রেটন। ক্রেটনের স্ত্রী।

"হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দু। আমি। আমাকে দেখে তোমার বিস্ময়ের কথাই বটে। কিন্তু তুমি, তুমি আমাকে আশ্চর্যভাবে অশরীরীর মত অনুসরণ করে আমাকে অহরহ ডেকেছ। Come back, come back, ফিরে এস, ফিরে এস বলে ডেকেছ। ফিরতে চাইলাম। পালিয়ে গেলাম ও এলাকা ছেড়ে। কিন্তু কে আমাকে হাত বাড়িয়ে দেবে; কার হাত ধরে আমি আবার মানুষের হৃদয়ের রাজ্যে প্রবেশ করব। তোমার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু পারিনি। ভয়ে পারিনি। আমি গুলী করে—"

চুপ করে গেল রিনা। বোধ করি উচ্চারণ করতে পারলে না সে-কথা।

কৃষ্ণস্বামীর বিস্ময় কেটে আসছে।

রিনা বললে, "তুমি বলেছিলে, মানুষের অন্তরে ভগবানের পুত্রকে তার মন্দ বুদ্ধি নিত্য ক্রুশবিদ্ধ করে, নিত্য তিনি নবজীবনে জেগে ওঠেন। অনুভব করলাম এ সত্য। কিন্তু তবু তোমার সামনে যেতে পারলাম না। তোমার সেই ভয়ঙ্কর কথা আমার কানে বাজত। তুমি বলেছিলে, 'আমি এখানে থাকব to be crucified again. তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সেইন্ট, তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে কলুষিত করতে পারি তোমাকে? কিন্তু—।"

চোখ দিয়ে রিনার জল গড়িয়ে এল।

জন ক্রেটনও যেন সেই কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু জনি নয়। অথবা কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণেন্দু নন। জন ক্রেটনও তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রমভরে কথা বলছে। অবশ্য ক্রেটনও আর সে-ক্রেটন নয়। সে পরিণত বয়স্ক মানুষ। পোড় খাওয়া মানুষ। অনেক দুঃখ পেয়েছে। প্রথম স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করে চলে গেছে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চলের বন্দীশিবিরে কাটিয়েছে! আজও তার দেহ শীর্ণ। ভিতরে বাহিরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রেটনের কানের পাশে গুলীর দাগ। কপালে সারি-সারি রেখা দেখা দিয়েছে। কণ্ঠস্বর তার শান্ত।

ক্রেটন বললে, "যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম। মুক্তি পেয়ে ফিরে কিছু দিন পর গেলাম কাশ্মীর। শরীরটা একটু সুস্থ হবে। মনে ক্লান্তির সীমা নেই। হঠাৎ কাশ্মীরে দেখলাম রিনাকে। ঝড়ে ডানাভাঙা বোবা হয়ে যাওয়া পাখি দেখেছ কৃষ্ণেন্দু?"

হেসে ক্রেটন বললে, "তোমাকে কৃষ্ণেন্দু বলতে বাধছে রেভারেণ্ড। তুমি সত্যই পবিত্র।"

কৃষ্ণস্বামী বললেন, "একমাত্র ভগবানই পবিত্র ক্রেটন। যারা জীবনের বেদনাকে তাঁর পায়ে ঢেলে দেবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের উপর তাঁর আলো পড়েই তাদের পবিত্র মনে হয়। নইলে আমরাও মানুষ ক্রেটন।"

তারপর বললেন, "তারপর বল। আমি ধারণা করেছিলাম, রিনা বেঁচে নেই। এমনি খবর পেয়ে আমি শিলং গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে সব বিবরণ শুনে ধারণা হয়েছিল, সে রিনাই বটে। মেয়েটিকে খুন করে খদে ফেলে দিয়েছিল।"

রিনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "কত খদে, কত জঙ্গলে, এমন কত হতভাগিনীর জীবন শেষ হয়েছে, দেহ শকুন শেয়ালে খেয়েছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসেব নেই। আমারও যেত কৃষ্ণেন্দু, যদি সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হত, যদি তোমার স্মৃতি আমার পিছনে দেবদূতের মত অহরহ না ফিরত—তবে আমারও ওই হত। আমি ওখান থেকে পালিয়ে লুকোতে চেয়েছিলাম। ওদের নাগালের বাইরে দূরে দূরান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আসাম শিলং চিটাগংএ তখন যারা ছিল, তারা উন্মাদ। সমস্ত জীবনের ক্ষুধা পুঞ্জীভূত করে তখন তারা রাক্ষসের মত। ওদিকে আমি যাইনি। আমি চলে গিয়েছিলাম সিমলার দিকে। সেখান থেকে কত জায়গা। শুধু মদ খেতাম। আমি তখন কখনও মরে বাঁচতে চাই, কখনও আবার দারুণ ক্ষোভে উল্কার মত ছুটতে চাই। কতবার, you know তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে, আমি ওয়ার-জোনের দিকে অর্ধেক পথ গিয়ে হঠাৎ ফিরে পালিয়ে এসেছি। কাশ্মীরে তখন আমি অর্ধমৃত, মাতাল হয়ে পড়ে আছি একটা নির্জন জায়গায়, দুটো জানোয়ার আমার সঙ্গ নিয়েছিল।"

সন্ধ্যার পর তারা ফিরতে বাধ্য হল। রিনা তখন প্রায় অজ্ঞান, আর শুধু বিড় বিড় করে বকছে আপন মনে। তারা শবের কাছে আনন্দ পায়নি, তাকে ফেলে চলে যাবার সময় তাকে লাথি মারছিল। ক্রেটন আসছিল সেই পথে। সে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। অফিসারস্ ব্যাজ দেখে তারা পালায়। ক্রেটন দেখে শিউরে ওঠে।

রিনা! রিনা! হ্যাঁ, এই ত রিনা।

সে ডেকেছিল, "রিনা, রিনা।"

রিনা বিড়বিড় করে বকেই গিয়েছিল। ওরা যা বুঝতে পারেনি—ক্রেটনের তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। রিনা বকছিল, "It is the cause, it is the cause my soul."

আর সন্দেহ থাকেনি, এই রিনা ব্রাউন! রিনাকে সে কাঁধে করেই প্রায় তুলে এনেছিল। বারবার কানে কানে বলেছিল, "রিনা মাই ডার্লিং, রিনা মাই লাভ, রিনা মাই এঞ্জেল! I love you. আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

রিনা প্রথমটা বিশ্বাস করেনি।

ক্রেটন রিনাকে বলেছিল নিজের কাহিনী, তারপর বলেছিল, "প্রথম যৌবনের সে আমি দুঃখের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়; যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। আমি তোমাকে এইটুকু বলি রিনা, try me, পরীক্ষা করে দেখ আমাকে।"

রিনা বললে, "কী করব? তোমার পাশে দাঁড়াবার মত শক্তি আমার তখন নাই। আমি ওকেই বিশ্বাস করলাম। এবং সে তা প্রমাণ করলে। সে ভালবাসাকে প্রমাণ করলে। দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলে কৃষ্ণেন্দু, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে, সেটা এল ওর মধ্য দিয়ে। তুমি সেইন্ট কৃষ্ণেন্দু! তুমি সেইন্ট!"

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আমার দুঃখ রইল, তোমার এই অবস্থায় তোমার সেবা করতে পারলাম না।"

কৃষ্ণস্বামী সামনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থেকেই বললেন, "এই হয়ত আমার পুরস্কার রিনা। এই দিয়েই তিনি আমার সব অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত করে দিলেন!"

এবার হাসলেন, হেসে বললেন, "দেখ, আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, একসঙ্গে সাত পা হাঁটলে মিত্রতা হয়। আমাদের বিয়েতে স্বামী-স্ত্রীতে অগ্নি সাক্ষী করে, সাত পা এক সঙ্গে পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু যখন ভগবানকে খোঁজে মানুষ, তখন সে একা, কারুর সঙ্গেই সাত পা হাঁটা যায় না। বন্ধুর সঙ্গেও না। একা। সে-পথে বিচিত্রভাবে আসে আশীর্বাদ, অভিশাপ! এবং—। সাত পা এক সঙ্গে না-হাঁটলে সংসারের আনন্দে ফেরা যায় না। তোমরা হেঁটেছ, দোর খুলেছে। সুখে তোমাদের সংসার ভরে যাক। আমার যাত্রা। Alone! আমি সুখী।"

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

ক্রেটন সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, "আমরা আবার আসব। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি না। রিনাকে নিয়ে এখানেই ঘর বাঁধব। বারবার আসব।"

"এখানে থাকবে তোমরা? তা হলে—তা হলে আমি একটা অনুরোধ করব। রিনা তুমি আমার আশ্রম জান। সেখানে ঝুমকি বলে একটি অনাথা মেয়ে আছে—তাকে তোমাদের সংসারে নিও। আচ্ছা। আর নয়। জন, ইউ আর এ মেডিক্যাল-ম্যান; চলে যাও, আর না; গুড বাঈ! গুড বাঈ! কেঁদো না রিনা; নো-নো-নো। আমি দেখতে চাই তুমি হাসছ। Look in my face. দেখ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু কি আছে? গুড বাঈ! গুড বাঈ! গুড বাঈ!"

দীর্ঘ হাতখানি তুলে দীর্ঘকায় পুরুষটি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

বৈষ্ণব-সাধনায় দেবী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

ষ্ণব সাধনায় দেবী দুর্গার অনুধ্যান সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। দুর্গা বৈষ্ণব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিতে ইহা বোঝায় যে, বৈষ্ণব-মন্ত্রের ভাব বা অর্থটি দুর্গার অধিকারে। বস্তুত তাঁহার কৃপা না হইলে মন্ত্রচৈতন্য বা মন্ত্রের সাধনায় বাগর্থের প্রতিপত্তি ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মন সদাসর্বদা নানারূপ দৈন্য ও কার্পণ্যে অভিভূত। মনকে এই অবস্থা হইতে ত্রাণ করাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। নিত্য অভাবের রাজ্য হইতে স্থায়ী ভাবে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠ করাই মন্ত্রের লক্ষ্য। বৈষ্ণবাচার্য জীব-গোস্বামী মহারাজ বিষয়টি সমধিক পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ত্রের যিনি দেবতা তিনি বিশ্বাত্মা। তাঁহাকে আপন করিয়া দেওয়া অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে সমাত্ম-সম্পর্ক প্রতিপাদন করাতেই মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি বা বীর্য নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু সাধনার পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ নহে, সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা। কারণ এই পথে আগাইতে গেলে কতকগুলি সংস্কার আমাদের মনকে জড়াইয়া ফেলে। ইহার ফলে মন্ত্রের দেবতাকে সমাত্ম-সম্পর্কে পাইবার মত আগ্রহ আমাদের মনে উদ্দীপিত হয় না। দেবতার সঙ্গে আমাদের আত্মসম্বন্ধটি মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মন্ত্রলিঙ্গ বস্তুটি এই যে, দেবতার অস্ত্র, আয়ুধ যানবাহন এইগুলির দিকেই আমাদের নজর গিয়া পড়ে। আমরা সেইগুলির সাহায্যে নিজেদের কতকগুলি স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন মিটাইয়া লইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়ি। বস্তুত দেবতাকে আমরা চাই না—জড় সুখ কিংবা স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতির নামে প্রকারান্তরে তাহার কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম সংস্করণের সাহায্যে নিজ প্রয়োজন পূরণ করাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সাধনার মুখ্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

বস্তুত মন্ত্রদেবতার অস্ত্রাদি জড়বস্তু নহে, সেগুলিও চিন্ময় অর্থাৎ আমাদের মনকে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার কৃপাশক্তিরই সেগুলি অভিব্যক্তি। কিন্তু মন্ত্রদেবতার আদরের স্পর্শ আমরা অন্তরে পাই না বলিয়া এইগুলি আমাদিগকে বিকারের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই অবস্থায় সোনা ছাড়িয়া আঁচলে গেরো দেওয়াই আমাদের পক্ষে সার হয়।

সাধনার পথে ইহাই প্রধান সংকট। এই-ভাবে অসত্য এবং অনিত্যের আকর্ষণে প্রেম ছাড়িয়া মন কামের রাজ্যে গিয়া পড়ে। বৈষ্ণব সাধনার এই সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে দেবীর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। ফলত মন্ত্রানুশীলনের পথে মাতৃভাবনায় অন্তরে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হইয়া থাকে। কারণ, মা আদরের মূর্তি—জড়ত্ব, পরন্তু মায়ের সম্পর্কে চিত্তকে আড়ষ্ট করে না। মাকে পাইলে ভয়-ভাবনা দূরে হইয়া যায় এবং মন-প্রাণ জাগিয়া উঠে। মায়ের মুখের হাসিটি দেখিলে কামের চিন্তা অপসৃত হয় এবং প্রেমের খেলা অন্তরে দোলা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষাৎ সম্পর্কে অন্তরে প্রেমের স্পর্শ না পাইলে দেহ-সম্পর্কিত স্বার্থবিচার দূর হয় না এবং দেহাভিমান অপসৃত না হইলে বিশ্বাত্ম দেবতার সঙ্গে সমাত্ম-সম্পর্ক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দেহাভিমানী যাহারা তাহারা বিষয়ের দিকে ছুটিবেই, কারণ প্রাণের সাড়া তাহারা সেইখানেই পায়। একমাত্র মাতৃ-ভাবনাই জড় মনের এই স্তরে প্রাণধর্মে জীবন্তরূপে সাড়া দিতে পারে। মায়ের চিন্তা করিলেই জড়বিকারের ক্ষেত্রে প্রেমের সাড়া অন্তরে পাওয়া যায়। নারদ পঞ্চরাত্রে—এই জন্য দেবীদুর্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপে তাঁহার অনুধ্যান চিত্তে আসিয়া লাগিলে দৈন্য দূর হয়। মায়ের স্তন্যের আস্বাদ পাইলে বিষয়-ক্ষুধা মিটিয়া যায়। দেবী সমগ্র জগৎ দোহন করিয়া সাধককে দুগ্ধধারা দানে পরিপুষ্ট করেন। সাধক দেবীর এমন কৃপা লাভ করিয়াই বিশ্বাত্ম-দেবতার সমাত্ম-সম্পর্ক অধিগত হইবার মত মনের বলিষ্ঠতা লাভ করেন। ফলত দেবীর এই আদর না পাইলে উদরের চিন্তাই অন্তর জুড়িয়া বসে। যত রকমের কাম-বিকার—এই উদর হইতেই সকলের সঞ্চার। মন্ত্রদেবতার আত্মসম্পর্ক সে অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয় না।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর, এই মন্ত্র মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রের সাধনায় সর্বাবস্থায় সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ইহা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব রসানুভাবনার বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমৎ নরহরি ঠাকুর স্বরচিত 'ভক্তি-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুকে এই মহামন্ত্রের ঋষি, মহাপ্রভুকে সমাত্মস্বরূপে দেবতা এবং আদ্যা শক্তিকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ এবং এই মন্ত্রেই তাঁহার কীর্তন-বিলাস লীলার পরিস্ফূর্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের এমন প্রকাশ এবং বিলাস মহামন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যাশক্তির কৃপা ব্যতীত ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতি রাজ্যে শক্তি এবং শক্তিমান অভেদবস্তু। কৃপাময় যিনি কৃপাশক্তি ছাড়িয়া তাঁহার প্রকাশ এবং বিলাস সম্ভব নহে। জীবের সহিত বিশ্বাত্ম দেবতার সমাত্ম-সম্পর্কে সমুজ্জ্বল রস-বিগ্রহ মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। মাতৃভাবানু-ভাবনার পথে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধির ধারাটি প্রভু নিজের লীলাতেই প্রকট করিয়াছেন। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের ভবনে তাঁহার এই প্রেম-লীলার দিব্যতত্ত্ব পরম মহিমায় লাবণ্য বিস্তার করে। চৈতন্য-লীলার বেদব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে এই লীলা নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

> "চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণবক্রন্দন
> অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন
> মাতাপাত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ
> এইমত সবারে দিলেন পুত্রভাব।
> মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া
> স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া।
> কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়ণী
> আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী
> সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা
> আমি পিতা পিতামহ, আমি ধাতা মাতা"।

আচার্যরত্নের গৃহে মহাপ্রভুর মাতৃভাব আবির্ভাবে প্রভুর পার্ষদগণের শ্রীমুখে সপ্তশতী চণ্ডীর স্তোত্রসমূহের তাৎপর্য এবং মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর মাতৃভাবে এই লীলা অপেক্ষাকৃত গুপ্ত, কারণ দিব্যধামে বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ সমাজেই এই

লীলাটি প্রকটিত হয়। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার শুধু অন্তরঙ্গজনের জন্য নয়। এই লীলায় তিনি পরম বদান্য। সকলের জন্য তিনি এবার প্রেমের লাবণ্য ছড়াইয়াছেন, সকলকে আত্ম সম্বন্ধে জড়াইয়াছেন। তিনি আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিখাইয়াছেন।

বৈষ্ণব সাধনায় মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবী দুর্গা "গুণাতীত মাতৃরূপা", তিনি অসিপাশিনী নহেন—সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী। প্রকৃতির জড়বিকারে প্রত্যক্ষীভূতা শক্তির ধ্বংস-লীলাটি দেবীর নাই। তিনি যোগমায়া—তিনি সংসারের বন্ধনের হেতু নহেন। মহামায়া তামসী। মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী যোগমায়া কৃষ্ণের ভগিনী। তিনি একানংশা। সংসার-বন্ধন হেতুভূতা মহামায়া সেই দেবীর আবরিকাশক্তি।

শাক্ত সাধকগণের মতে কিন্তু মা যিনি তাঁহার কোন আবরণ নাই। সকলভাবেই সন্তানের প্রতি তাঁহার বেদনা, তিনি সর্বাবস্থায় সন্তানের আপনা। 'মায়ের আদরটি বুঝিতে পারিলেই তিনি 'জগৎ এতৎ-চরাচরং'। তন্ত্র বলেন, এক মহাভাবেরই খেলা জগতের সর্বত্র চলিতেছে, উপাধি সম্পর্কেই ভেদভাব। উপাধি-বোধ বিলীন হইলে ভাবভেদও বিলীন হইবে। মা কোন উপাধি মানেন না। প্রকৃতপক্ষে মায়ের মাতৃলীলার অনুধ্যানে ডুবিলে আমাদের গুণলিঙ্গ বিদূরিত হইবে এবং দিব্যজীবনে আমরা মায়ের সঙ্গ পাইব।

ফলত বিশ্বপ্রকৃতিতে ধ্বংসের আমরা যে মূর্তি দেখিতেছি, আমরা মুখের জোরে উড়াইয়া দিলেই তাহা সরিয়া যাইবে না এবং রঙ্গময় আনন্দময় শ্রীগোবিন্দকে আমরা পাইব না। বৈষ্ণব সাধক শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস স্বরচিত মনঃ-শিক্ষায় আমাদের এই ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> কহিছ গোপীর ধর্ম,
> কি বুঝ তাহার মর্ম।
> স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে
> দেখিয়া পাইছ সুখ
> প্রকৃতি বাঘিনীমুখ,
> সর্বাঙ্গ সহিত যাহা গিলে।

বাস্তবিকপক্ষে কাম-প্রবৃত্তির নিম্নস্তরে আমরা পতিত রহিয়াছি। প্রেমের আমরা কি বুঝিব? "কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর।" এরূপ অবস্থায় মাতৃভাবনাই আমাদিগকে আশ্রয় করিতে হইবে; কারণ, কাম জয় করিবার তাহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। মায়ের কৃপায় প্রকৃত কামের বন্ধন কাটিতে পারিলে তবে তো অপ্রাকৃত কাম, বৃন্দাবন ধাম? বিশ্বগ্রাসী আমাদের ক্ষুধা, এরূপ অবস্থায় প্রেমানন্দ-সুধা আমাদের জুটিবে কেন? ফলত আমাদের জড়-জীবনের এই স্তরে মায়ের আদরে আমাদের মনের বিকার কাটাইতে হইবে, তাঁহার স্তন্যধারায় ক্ষুধা মিটাইতে হইবে। সপ্তশতী চণ্ডীর স্তুতি-গীতিতে মনকে পরিমুগ্ধ করিয়া "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু" মায়ের এমন মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জন্মকর্মে প্রেমধর্মের সাধনার এই পরম তাৎপর্য প্রকটিত হইয়াছে। সেই সত্য উপলব্ধি করিয়া দেবী দুর্গার চরণে আমরা যেন প্রণত হইতে পারি। তিনি যদি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন তবেই শ্রীকৃষ্ণে আমাদের রতিমতি জন্মিতে পারে, প্রভুর শ্রীমুখেরই এই বাণী। আমাদের জীবনে এই বাণী সত্য হউক—দেবীর চরণে এই প্রার্থনা।

রঘুবীর রাউত

বনফুল

জমিদারি-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয়নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে-আইনের সঙ্গে ইংরেজের আইনের গরমিল হলেও চিন্তিত হন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হয়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পৌঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁঠাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুস খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরিবকে নিয়ে টানা-টানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর (লোকে গোপনে তাকে মাহুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণ-গোচর করল। রাউত মশায় ভ্রুকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিশের লোক, হট করে ঘাঁটাতে চাই না; কিন্তু বেশী যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আজ সকালে আমি থানায় গিয়েছিলাম। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন, বললে, 'আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার। যদি ইচ্ছে করি ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি ওঁকে। ওঁকে মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।'"

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সাতদিন পরে রাউত মশায় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

"রাবণ মিশির—"

"জী হুজুর!"

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে দাঁড়াল।

"দারোগা সাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস। যদি আসতে না চায়, ধরে নিয়ে এস।"

"যো হুকুম।"

মিনিট দশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

"থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধ ওকে। আগে প্যান্ট কোট গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেল।"

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, "আপনি সম্রাটের প্রতি-নিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যেসব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এসব করেন তাহলে বাঘ কিম্বা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—"

রাবণ মিশির একটা হান্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারোগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটা চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছন

দিকের পাঁদাড়ে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।"

টেলিগ্রাম করলেন পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। লিখলেন, "এখানকার দারোগা একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করেছে বলে গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী ছিলেন। যা করতেন নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাঁচের ভিতর যেতে চাইতেন না। বলতেন, "আইন? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া যায় কখনও? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে!" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হননি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। সুতরাং আইন ভঙ্গের অপরাধে আসামী হতে হত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন তারই গল্প এবার বলব।

॥ ২ ॥

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যাপ্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখাননি বিশেষ। স্কুল কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাকে মোটামুটি বাংলা ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যাপ্রসাদ যখন সাবালক হল তখন তাকে তিনি আলাদা বাড়িও করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারির একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীন-ভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্ত-বয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিত প্রকার হল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি খোরা প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এর সঙ্গে মাছ মাংস ডিম থাকলে আরও ভাল হয়। গামা, গোবর, কিক্কর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হলে ভাল খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে ফেললে। মুশকিল হল মাছ-মাংস নিয়ে। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভাল মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপুজোর ব্যবস্থা করে ফেললে। রোজ পাঁঠা কাটা হতে লাগল। তার মহালে বড় দিঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তার পালোয়ানেরা রোজ ছিপ ফেলে বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্তত সের পাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ সে একা ত নয়, গোটা পাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। পয়সা খরচ করলে সবই হয়।

গান-বাজনার ওস্তাদ নূর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে। বললেন, সেতার যখন বাজে তখন একটি অপরূপ নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাঈয়ের সতরঞ্চের উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে, তাহলেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তাহলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নূর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখনউ থেকে তাঁর বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপরও চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো

তেল মাথায় ওকে। বলে না কি মাসাজ্ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে দুটো আড়াইটের সময়। মাছ মাংস রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্যে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসব্জি লাগিয়েছে। হাঁস পুষছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে দেয়ে শোয় একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দীঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনেছি।"

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

॥ ৩ ॥

এর পরই শুরু হল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে দাবি করলেন যে মৃত্যুর পূর্বে সুমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনত অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে একটা মহাল দখল করে বসে আছে এবং অপব্যয় করে সম্পত্তি নষ্ট করছে। আদালত থেকে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ, অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ারীলাল চনচনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি করেছে। এইভাবে নানা ছুতোয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশাই অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে, তাহলে তার যা অবস্থা হয় অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হল।

সে প্রথমটা ভাবলে যে, জ্যেঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমায় জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মকদ্দমাটা হচ্ছিল সেটা শেষ হয়নি। লোয়ার কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ, হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো, চুল উসকো-খুসকো—"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যাপ্রসাদ নতমস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা?"

"ডীড অব গিফ্‌ট। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্তত করে মাথা চুলকে তারপরে বলল, "তাহলে মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল।"

"তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয় সম্পত্তি কী করে রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হয়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে ত শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হবে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে চলে গেল।

হিমালয় দর্শন

নতুন জায়গায় এসেছি, এখনো দিক ঠিক করে উঠতে পারি না। চারদিক এমন তরুতে শ্যামল, শাদ্বলে কোমল, দিকে দিকে প্রসারিত এমন স্তূপস্তরের নিস্তব্ধ ওঠা-পড়া, সমস্ত ভূখণ্ড যেন নিরন্তর তরঙ্গিত হচ্ছে, প্রত্যেক কোণে কোণে উঁচুতে-নিচুতে অফুরন্ত বিস্ময়ের বাসা।

"ও কী দেখছেন?"

"পাহাড়টা।"

"ওটা পাটকাই গিরিমালা।"

"কোন দিক?"

"পূব।"

"আমি ভেবেছিলাম পশ্চিম।"

"এখনো দিক্ ঠিক হয়নি আপনার।"

তারপরে সে বলল, "এখানে চারদিকেই পাহাড়।"

"ওদিকটা যেন ফাঁকা।"

"ওদিকেই ত সবচেয়ে মহৎ বিস্ময় মেঘ কেটে গেলে দেখতে পাওয়া যায় হিমালয়।"

"হিমালয়?"

"নগাধিরাজ। জটায়ুর মত দুই পাখা ছড়িয়ে দিয়ে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে আছেন।"

"কী আশ্চর্য।"

একা একা ঘুরে বেড়াই, পাহাড়ে উঠি, উপত্যকায় নামি, মাঠের মধ্যে দেখতে পাই বকের মত দাঁড়িয়ে আছে তেল শোষণ করে কুকবার লোহার ত্রিকোণগুলো। পাখির ডাক আর ফুলের গন্ধের টানাপোড়েনে বোনা রঙিন মুহূর্তগুলো ভেসে ভেসে যায় দিগ্‌বালাদের চুম্বনের মত। মন ভরে ওঠে, তবু সম্পূর্ণ ভরে না, হিমালয় দর্শনের আশা মনের আনাচে কানাচে ঘুরতে থাকে।

সেদিন সকালে পাহাড়ের মাথায় উঠেছি চারদিকে দৃষ্টিপথ অবারিত। ঐ ত পাটকাই গিরিমালা, ঐ ত বনের প্রান্ত, যা একটানা চলে গিয়েছে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত। ঐ ত অপরিচিত রেখা-তরঙ্গ। ঐ ত হিমালয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম "আজ মেঘ কেটে গিয়েছে বটে।"

চোখ আর ফিরতে চায় না, দুদিকে ছড়িয়ে গেছে গিরিচূড়ার পাখনা। অফুরন্ত, অনিঃশেষ। দৃষ্টি ওর সঙ্গে ছুটে পাল্লা দিতে পারবে কেন? পাখনা মেলা গরুড় উড়েছে সুধার সন্ধানে। চোখ আজ ধন্য হল।

পিছন দিকে শব্দ হল। "কী দেখছেন তন্ময় হয়ে?"

"হিমালয়।"

"হিমালয়? কিন্তু ওটা যে দক্ষিণ দিক।"

"দক্ষিণ দিক!"

"হাঁ, আপনার এখনও দিক ঠিক হয়নি। ঐ দেখুন উত্তর দিকটা এখনও মেঘে জমাট।"

আমি তার সে-দিকে চাইলাম না, নীরবে নেমে এলাম পাহাড় থেকে।

সে বলল, "আজ খুব ঠকেছেন।"

তার কথার জবাব দিলাম না। ভাবলাম ঠকেছি! সত্যি কি ঠকেছি? আমি তার মত নিঃসংশয় নই।

সিগারেট-কেস

নদীগুলো পাহাড় থেকে নেমেই হুড়বড় করে ছুটেছে, কে কার আগে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়বে। ভাল করে কাপড় গায়ে দেবারও সময় পায়নি, ঢেউয়ে সব এলো-মেলো। ডিহিং, টিরাপ, কত নদীই না পার হলাম। কটারই বা নাম জানি, হয়ত সব-গুলোর আবার নামও নেই। ডান-বরাবর পাটকাই গিরিমালা, পাহাড়ী বাঁশ ও মহী-রুহ হলক গাছে ঘনসন্নিবিষ্ট। কোথাও বা লাল পথ উঠেছে গা বেয়ে, তার প্রান্তে পাহাড়ের থাকের উপর বাড়িঘর, পাহাড়ী কয়লার অগভীর খাদের সীমানা। ক্রমে রেল-পথের শেষ চিহ্নটুকু পড়ে রইল পিছনে। আমাদের মোটর ছুটেছে স্টিলওয়েল সড়ক ধরে। বাঁয়ে বন কেটে, গাছ পুড়িয়ে জমি তৈয়ার করা হচ্ছে, নূতন গ্রাম বসবে। ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে মাঠ, মাঝখানে ফৌজী সড়ক, আমাদের মোটর ছুটেছে সেই পথ বেয়ে।

অনেক দূরে এসে পড়েছি, পাহাড়টা কাছিয়ে এসেছে, সম্মুখেই সীমান্তসূচক রেখা, ঠিক আকাশের পশ্চিমে শুরু হয়ে গিয়েছে মেঘলা রঙের পরীক্ষা। সীমান্ত ও দিনান্ত দুটোই অদূরে। বন্ধু বললেন, "এবার নামা যাক।"

দুখানা মোটর খালি করে নামলাম। ফৌজী সড়কের বাঁদিকের জমিতে সকলে গিয়ে বসলাম। মেয়েরা লাগল চায়ের উদ্যোগে। আনল কাঠকুটো কুড়িয়ে, একটু-খানি মাটি আলগা করে দিয়ে খান দুই পাথর সাজিয়ে চাপিয়ে দিল কেটলিটা, জ্বালিয়ে দিল আগুন।

অন্য কাজ না থাকায় ছড়ির ডগা দিয়ে ঐ আলগা মাটি খোঁচাতে লাগলাম আমি। এমন সময়ে চকচক করে উঠল একটা পদার্থ, কৌতূহলে টেনে নিলাম কাছে। না এমন কিছু নয়, নিকেল সিগারেট-কেসের একটা ভগ্নাংশ। বন্ধু বলেছিলেন, যুদ্ধকালে এখানে স্টিলওয়েল সড়কের পাশে ভারতের সীমান্তে ছিল মার্কিন ফৌজের প্রকাণ্ড শিবির। এখান থেকেই তারা যাত্রা করেছিল বর্মার দিকে। বুঝলাম, সিগারেট-কেসের ভগ্নাংশ ভগ্নশিবিরের চিহ্ন। অবহেলায় ফেলে দিতে যাব, চোখে পড়ল খোদাই-করা অক্ষর, "Bob with love, Alice!" ফেলে দেওয়া আর হল না। চারটি শব্দে সংহত ইলিয়াডের কাহিনী। রবার্ট, এলিস, কে তারা? কী তাদের পরিচয়? এলিস কোথায় কে জানে! রবার্টের ইতিহাস হয়ত কোথাও আছে ফৌজী দপ্তরের নগণ্য একটা বিবৃতিতে। কিন্তু যা নিশ্চয় করে আছে তা ঐ একজনের প্রতি অপরের প্রেম "Bob with love, Alice!" যুদ্ধের রক্ত-বন্যাতেও ভাসিয়ে নিতে পারেনি ঐ ভাঙা খাপটুকু! ভাঙা ভেলায় ভাসমান বেহুলার ছবিটি মনে পড়ল। কিন্তু ভাঙল কেন?

মোটর ছুটেছে, সবাই ফিরে চলেছি। এমন সময় চোখে পড়ল আকাশের প্রান্তে শুক্ল চাঁদের ভাঙা ভেলায় জ্বলজ্বল সন্ধ্যাতারা। মন বলে উঠল, "Bob with love, Alice!" অজ্ঞাতসারে হাতটা পকেটে ঢুকে অনুভব করল, ভাঙা টুকরোটা যথাস্থানেই আছে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান—আমি নাম না বুঝি?"

আক্রোশ অধমেরই উপর। দরজা খুলে বসে পড়লেন গা ঘেঁষে। হাতে সেই সর্বক্ষণের লাল বটুয়া। সযত্নে সেটা কোলের উপর নিয়ে নড়েচড়ে গ্যাঁট হয়ে বসলেন।

খাঁটি নাম বলব না। ধরে নিন কৃষ্ণা দেবী। কৃষ্ণা নামে আরও অবশ্যই চটে যাবেন তিনি, সুবর্ণা বা জ্যোৎস্না বললে পছন্দসই হয়। সেই চেষ্টাই করেন অহরহ। ঐ যে লাল বটুয়া দেখলেন, ওর মধ্যে বিবিধ চূর্ণ ও প্রলেপের কৌটো। আমাদের গাঁয়ের জানকী কবিরাজ পোঁটলায় করে ঠিক এমনি মলম-মালিশ বয়ে বয়ে বেড়ান। বিদেশে এত ঘোরাঘুরির মধ্যে কৃষ্ণা দেবী একটু ফাঁক পেয়েছেন কি বসে গেলেন নিজ দেহে রং-মেরামতের কর্মে।

আমার দিকে মহিলার কিঞ্চিৎ অধিক নেকনজর। আজ্ঞে না, গোলমেলে কিছু ভাববেন না। কৃষ্ণাননের উপর তিনি সাদা পাফ বুলোন; আমার ঠিক উল্টো ব্যাপার—সাদা কাগজের উপর কালির দাগ বুলোই। পাশে বসে দায় চুকল না, ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখেন। "লিখছেন এখন? কি লিখলেন, পড়ুন না। ইংরেজী করতে হবে না, বাংলাতেই বলুন; বাংলাও বুঝতে পারি আমি।" একদিন একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসলেন, "আপনার বইয়ে থাকব ত আমি? দেখবেন, বাদ পড়ে না যাই।"

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে রাজা ব্রুস বইয়ে চিরজীবী হয়ে থাকতে পারেন, কৃষ্ণা দেবীই বা তবে কোন দোষ করলেন? রাজা জীবনে ব্রুস সাতবার মাত্র লড়াইয়ে হেরে-ছিলেন, আর ইনি দেখতে পাচ্ছি দিনরাত্তির চব্বিশ ঘণ্টার বার চব্বিশেক অন্তত হারছেনই। তবু দমেন না। আরে মশায়, ঈশ্বর মেরে রেখেছেন, মানুষের মুখবাদ তাগত কী? সিকি ইঞ্চি বোধ করি পাউডার ক্রিমের প্রলেপ পড়ে গেছে দেহচর্মের উপর, তবু তারও ভিতর থেকে কালো রং কট-কট করে ফুঁড়ে বেরোয়। একদিন এক কাণ্ড হল, তাইতে আরও বেশী করে জানলাম। চোখ করকর করছে, জল ঝরছে বিস্তর। কী হয়েছে? চিলের মতন কৃষ্ণা উড়ে এসে পড়লেন। "দেখি, দেখি—ইস, চোখ ডলে ডলে লাল করে ফেলেছেন, তাকান দিকি আমার দিকে ভাল করে।" নিরিখ করে দেখে বললেন, "পোকা ঢুকেছে চোখের ভিতর, কোণের দিকে লেপটে আছে, ফুঃ-ফুঃ-ফুঃ—।" পোকা বের করবার চেষ্টায় আমার অবস্থা আরও মারাত্মক হল। যত তিনি ফুঁ দিচ্ছেন, মুখের পাউডার ঝুর-ঝুর করে এসে পড়ছে। কেয়াফুল ফোটে বর্ষাকালে, সেই ফুটন্ত কেয়া আপনার গায়ে আছড়ালে যেমন রেণুতে রেণুতে ঢেকে যায়, অবিকল তাই। পোকা বেরিয়ে গেলেই বা কী, কৃষ্ণার মুখের পাউডারেই দুটো চোখ অন্ধ হবার সামিল। সেই তখন ভদ্রমহিলার অধ্যবসায়ের খানিকটা পরিমাপ পাওয়া গেল।

যাকগে, গুণের ব্যাখ্যান থাকুক এখন, সেই গুণময়ীকে পাশে নিয়েই ত চলেছি। পৃথিবীর ছাত পামির, তারই পায়ের গোড়ায় নতুন শহর। সন্ধ্যা হব-হব, পপলারের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। ছোট দুয়োর-জানলা। নিচু-ছাত, দু-চারটে সেকেলে বাড়ি, তারই মাঝে মাঝে আকাশ-ছোঁয়া একালের কংক্রিটের ইমারত উঠছে। আজ রাতে চলে যাব, শেষবার এই দেখে শুনে বেড়াচ্ছি। তরুণী মেয়ে পাশে বসে একমনে নিজ কর্মে ব্যস্ত—বাইরে তাকানোর ফুরসত নেই, ছোট্ট একটু আয়না ধরে বিম্বাধরে লিপস্টিক বুলোচ্ছেন। মিউ-জিয়ামে এসে মোটর থামল, তখনও কাজ চলছে। চোখ না তুলে মাকিনুয়ে বলেন, "ফেলে যাবেন না—দাঁড়ান।"

এইসব তল্লাটে অন্তত একটা কারণে বেড়াতে আসবেন, কার্পেটের কাজ দেখবার জন্য। চার হাত বাই তিন হাত জায়গার মধ্যে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সমেত গোটা শহর। সমস্ত হাতের বুনানি, তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন।

ঘুরতে ঘুরতে সময়ের খেয়াল ছিল না। ঘড়ি দেখে চমকে উঠি। যদ্দুর হয়েছে, আর নয়। এ-জন্মের মত এই শেষ। কমলি নেহি ছোড়েগা, ফিরতি মুখেও কৃষ্ণা দেবী যথারীতি পাশে আমার। সহসা আপ্যায়িত করে উঠলেন, "দোকান ঘুরে চলুন একটু, গোটা দুই জিনিস কিনব।"

কী জিনিস, বুঝেছেন ত? আর মেয়ে-লোকের পছন্দের ব্যাপার—দু-এক মিনিটে হবার নয়। ক্ষমতা থাকলে না-না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতাম। কিন্তু মোটরগাড়ি আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়—আমাদের তিন-চার জনের জন্য দিয়েছে এক-একটা গাড়ি। আমি অনিচ্ছা দেখালে উনিই সোজাসুজি হুকুম করবেন ড্রাইভারকে। এখন ত মরিয়া। অন্ন বিহনে তবু এঁদের চলে,

এক জোড়া — আলোকচিত্রী শ্রীশংকর ঘোষাল

কিন্তু বটুয়া খালি হয়ে গেলে মাথায় বজ্রপতন হয়।

অবশেষে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, দলের সবাই এক সংগে রে-রে করে উঠল। "এত শিগগির কেন, আর দশ মিনিট পরে এলেই ত হত! আমরা চলে যেতাম, রাজত্ব করতে এখানে একা একা।"

তাতে অবশ্য এমন-কিছু অসুবিধা ছিল না। আপনারা বিরিয়ানি খেয়ে থাকেন, তারই আদিস্থান। হিমালয় পেরিয়ে নানান অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শেষটা বাংলা মুলুকে পেশীছেছে। সাত নকলে আসল খাস্ত—আসলের স্বাদ কোথায় পাবেন আপনারা? সেইসব বাদশাহী খাদ্য খেয়ে খেয়ে মশগুল হয়ে আছি। ভুলই করেছি সত্যি। দশ মিনিট আগে যদি পেশীছতাম, আর-এক দফা বিরিয়ানি ঠেসে রওনা হওয়া যেত। দশটা মিনিট পরে এলে রাজত্বের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ত অন্ততপক্ষে। কিন্তু গেরো খারাপ, ভুঁয়ে পা দিতে না দিতেই বলে, "উঠুন—উঠে পড়ুন আবার, সময় নেই।"

খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক, ঘরে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসব, তারও ফুরসত দেয় না।

হুশ করে এক দৌড়ে এরোড্রোমে এনে ফেলল। প্লেনের ভিতরটা লম্বা এক বাক্স। সেই বাক্সে ঢুকে দুয়োর এঁটে দিয়ে চক্ষের পলকে আকাশে উঠে পড়লাম। পেটের মধ্যে আলোড়ন উঠেছে। তবে এই এক ভরসা, প্লেনের ভিতর আয়োজন থাকে, আর কিছু না হক, স্যাণ্ডউইচ ও আঙুর-আপেল যাচ্ছে কোথা?

তারপরে, ও হরি, সুস্থির হয়ে বসে যাবতীয় খবরবাদ নিয়ে দেখি, হোস্টেসের ভাঁড়ে মা ভবানী। দু-এক কাপ চা-কফি হতে পারে বড়-জোর। রাতের খাওয়া সমাধা করে সকলে এসেছেন, এখন শুধু আলো নিভিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়বার কথা। সকালবেলা নামব মধ্য-এশিয়ার এক শহরের কিনারে। প্রাতরাশ সেখানে। অকারণে খাদ্য তুলে আনেননি তাই এঁরা। সকলের দেখাদেখি আমিও কম্বল মুড়ি দিলাম। কৃষ্ণা দেবী পিছন দিকে, তিন-চার সারির ব্যবধানে। পাছে পাশের জায়গা দখল করেন আমিই তাই আগেভাগে গোঁফদাড়ি ও লোহার বালা সমন্বিত সুজন সিংয়ের পাশ জুড়ে বসেছি। কিন্তু ঘুম জমে কই?...... জামবাটি ভরতি করে মা মুগের অঙ্কুর, ভিজে-ছোলা ও আখের চিনি দিয়েছেন, গবাগব মুখগহ্বরে চালান করছি...এমন সব মনোরম স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে জেগে উঠছি। সব আরোহীই ঘুমে অচেতন। আলো নিভিয়ে দিয়েছে, এয়ার-হোস্টেসের ডান পাশে শুধু একটা কম-জোরী আলো জোনাকির মতন। বই পড়ছে সে একমনে। ঘুমন্ত নভোলোকের একটিমাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছিনে। মেশিন চালিয়ে দিয়ে তারাও ঢুলছে কিংবা কী করছে, কেবা জানে?

তারপরে এক সময় আর কিছু জানিনে। অনেক নীচে মৃত্তিকার দেশে আরল সাগর ঢেউয়ের বাহু ছুঁড়ছে বোখারা-সমরখন্দ দীপ দেখাচ্ছে—কিছু জানিনে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে আবার একটু যেন সাড় হল। স্বপ্ন দেখছি, এবারে ভোজন নয়—বয়সে ছোট্ট হয়ে গিয়ে নাগরদোলায় দুলছি। নীলপুজোর মেলায় ভদ্রার তীরে বাঁশতলা সাফ-সাফাই করে নাগরদোলা বসিয়েছে, মোক্ষম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায় চড়ে যেন! ঘুম ভেঙে চোখ মেললাম। সত্যি ত, কী বিষম দোলানি! হু-হু করে প্লেন নামছে! জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি, কুয়াশায় আকাশ-ভুবন মুছে গিয়েছে। সকাল সাতটায় ত আমাদের নামবার কথা। ঘড়ি দেখলাম, সোয়া-তিনটে। তবে? যা ভেবেছিলাম হয়ত বা তাই, ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে। কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামসে নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের মত প্লেন ভুঁয়ে পড়ছে। পরমায়ু মিনিট পাঁচেক বড় জোর—তারপর হাড়ে মাসে সব সুদ্ধ তালগোল হয়ে আছি।

চেঁচাবার ইচ্ছে, কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না। ঘস্‌স্‌ করে আওয়াজ হেনকালে, ভূমির গায়ে প্লেন লাগবার সময় যেমনটি হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায়নি, ধীরে সুস্থে নামিয়ে এনেছে। জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। অন্ধকারে যতদূর ঠাহর হয়, দিকহীন তেপান্তরের মাঠ। সারবন্দী আলো দেখা যায় মাঠের প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এল, কথা ছিল না এমন ত! থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে সেই আলোর সারির ভিতর এসে পড়ল। দৌড়চ্ছে—আর দেখলাম যে-আলো পার হয়েছি, সেগুলো নিভছে সঙ্গে সঙ্গে,

সামনের দিকে নতুন আলোর সারি জ্বলে উঠেছে।

থামল প্লেন অবশেষে। থেমে দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে। দরজা খুলে দিল। "নামুন, নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মানুষগুলি নেমে যান শুধু।" সিঁড়ির নীচে লণ্ঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ জাতীয় অন্য ধরনের কেরোসিনের বাতি।

হুড়মুড় করে নামছে সকলে। আমার ভো আছে? সিটের উপর বটুয়া ফেলে কৃষ্ণা দেবী বাঁ হাত বাড়িয়ে ওভারকোটের কলার ধরে ফেললেন, "আমি একলা পড়ে রইব বুঝি?" কথা শুনুন একবার, স্বদেশ থেকে আমি যেন ওঁর রক্ষী হবার চুক্তিপত্র লিখে দিয়ে রওনা হয়েছি! বলছেন আর পাশবাক্সে পাউডার বুলানো শেষ করছেন। রাত্রিবেলা অজানা অন্ধকার মাঠে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারা ওঁর রূপ দেখবার জন্য চোখ মেলে বসে রয়েছে, তা ত জানিনে।

সর্বশেষ আমরা দু-জন। এবং লণ্ঠনধারী ওদের একটি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতে সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে। অনেক দূরে—দু ফার্লং ত হবেই—একটা জোরালো আলো দেখা যাচ্ছে। প্যাচপেচে কাদা, বরফ গলে জল জমে আছে এখানে-ওখানে। তারই মধ্যে জুতো ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছি। মোজা ভিজে গেছে। শীত ঐ ভিজে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনিয়ে ব্রহ্মতালু অবধি গিয়ে পৌঁছচ্ছে। যাচ্ছি কোথায় গো? দোভাষীরা এগিয়ে গেছে। লণ্ঠনধারী এ-লোক ইংরেজী জানে না, জিজ্ঞাসা করলে হাসে শুধু ফিকফিক করে।

অবশেষে পৌঁছনো গেল আলোর ধারে। হ্যাজাক জাতীয় কেরোসিনের আলো। প্লেন নামবার সময় সারবন্দী যে ডায়নামোর আলো জ্বলছিল সে-সমস্ত নিভে গেছে এখন। নিঃসীম মাঠ অন্ধকারে হাড়-কাঁপানো শীতে থমথম করছে। তার মাঝখানে খান চার-পাঁচ ঘর নিয়ে এতটুকু এই অফিস। কত গল্প শুনেছি মধ্য-এশিয়ার এই স্তেপ-অঞ্চলের। ক্যারাভান বিশ্রাম নিচ্ছে এমনি কোন রাত্রিবেলা—দিগন্তে খটাখট আওয়াজ, দুর্দান্ত যাযাবরের দল হামলা দিয়ে এসে পড়ল। মালপত্র নিয়ে ঘোড়ার খুর বাজিয়ে পলকের মধ্যে আবার তারা উধাও—পড়ে রইল রক্তের স্রোত আর মৃতদেহ আর ভারমুক্ত উটগুলো। সেই জায়গায় আমরা। লড়াইয়ের সময় হাসপাতাল বানিয়েছিল এখানে, এয়ার-ফিল্ড বানিয়েছিল কাজ-চালান গোছের। হাসপাতাল চালু নেই, এয়ার-ফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেদায়ে যদি

বিম্বাধরে লিপস্টিক বুলোচ্ছেন

কাজে আসে। এই আজকে যেমন। সমস্ত শোনা গেল এবার। অত কুয়াশায় উড়তে ভরসা করল না—শ দেড়েক মাইল ঘুরে এখানে এনে নামাল বাকী রাতটুকু লেপ-কম্বলের নীচে আরামে ঘুমুবেন বলে। অদূরে হাসপাতাল-বাড়িতে পঞ্চাশটা বিছানা পেতে রেখেছে। ত্রিরিশ জন মানুষ, গড়ে দেড়টা করে শয্যা নিয়ে আরামে গড়িয়ে পড়ুন গে।

কিন্তু খালি পেটে ঘুম হবে না ত, আর কী বন্দোবস্ত? আর সকলের হয়ে গেছে, দুজন মাত্র—আমি আর ঐ যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দোভাষী চুক-চুক করে, "দৈবাৎ এসে পড়া এখানে। এয়ার-ফিল্ডের লোকজন সব চলে গেছে। সকাল বেলার আগে ত উপায় দেখছিনে।"

সহসা যেন ঐশীপ্রেরিত বাণী কানে এল, "দেখা যাক আমি কী করতে পারি। দু-চারটে বিস্কুট আর এক কাপ কোকো হয়ত হবে।"

বলছে, হাঁ, দেবকন্যাই বটে। ধবধবে রং, নাক-মুখ চোখা-চোখা, আর দশটা স্লাভ মেয়ের মত থ্যাবড়া গড়নের নয়। দোভাষী হেসে বলল, "ডাক্তার মানুষ—তা উনি পারতে পারেন। কিছু না হক, রোগীর পথ্যও ত আছে!"

এমনিভাবে ফটকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝেছি—ডাক্তার। প্যাসেঞ্জাররা এসে ঢোকে, আর তাদের আপাদ-মস্তক সতর্ক চোখে নিরীক্ষণ করে। অত উঁচু দিয়ে আসতে নিদেনপক্ষে মাথাঘোরাও হবে না কারো? এয়ার-অফিস যত ছোট হক, ওষুধপত্র ডাক্তার ও একজন-দুজন নার্স থাকবেই। নার্স-ডাক্তারের কাজ মেয়েদের প্রায় একচেটিয়া। রোগীরাও পছন্দ করে। রোগ দেখার জন্য একবার বা কপালে হাত রাখল, কোমল হাতে হাঁ করিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আলো ফেলতে লাগল মুখের ভিতর। রোগ না থাকলেও এহেন ডাক্তারের রোগী হয়ে শুয়ে পড়তে মন হয় কিনা বলুন। তাড়াতাড়ি রোগ সারান মুশকিল বরঞ্চ এমনি সব ডাক্তারের হাতে।

আর সকলে শুতে চলে গেলেন। ডাক্তার এক লহমা ভিতরে গিয়ে কোকোর বন্দোবস্ত করে এল। এসে কাছ ঘেঁষে বসল। বারবার তাকাচ্ছে আমার দিকে। এসে অবধি এই ব্যাপার লক্ষ্য করছি। দোভাষীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, মুখ ফিরিয়ে দেখি, তাকিয়ে রয়েছে ডাক্তার একদৃষ্টে। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। কী দেখছে এত করে? প্রেমে পড়বার সন্দেহ করিনে। সে-বয়স পার হয়ে গেছে, আর ভগবানও রূপে রঙে মেরে রেখেছেন। ডাক্তার মানুষ— কোনরকম শক্ত

রোগের লক্ষণ পাচ্ছনি ত চেহারার মধ্যে? হঠাৎ প্রশ্ন করল, "সময় কত?"

বললাম, "ভারত থেকে আসছি। ম্যালেরিয়াটা কিছু বেশী আমাদের অঞ্চলটায়।"

চালাক মেয়ে, একটু যেন লাল হয়ে উঠল। তা বলে কী হবে! দেয়ালের গায়ে চোখের সামনে ঘড়ি—সময় জিজ্ঞাসার মানেই হল আলাপ-সালাপ জমানো। বলছি, তিরিশজন এসেছি এই দলে। তোমাদের দেশ দেখছি। বড় ভাল তোমরা, বড্ড আতিথেয়তা।

এত কথার পরে আর সঙ্কোচ থাকে না। উসখুস করছিল, বুঝতে পারছি; এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলল, "ভারতে এমনি সুন্দর বুঝি সকলে?"

অবাক হয়ে তাকাই। কার কথা বলছে? আছি ত আমি আর কৃষ্ণা দেবী, বিধাতা উভয়কেই মেরে রেখেছেন। সেই বিধাতার সঙ্গে কৃষ্ণা দেবীর আড়াআড়ি বিদিকস্তু রং একটুকু ফ্যাকাশে করবার চেষ্টায় দিবারাত্রি লেগে আছেন। আর আমি গোড়া থেকেই হাল ছেড়ে আছি। কাকে এর মধ্যে সুন্দর দেখল? মাথা নিশ্চয় খারাপ, অন্ততপক্ষে চোখ খারাপ ডাক্তার-মেয়েটার।

নিশ্বাস ফেলে বলছে, "দেখ, এই জায়গার কাজটা ইচ্ছে করেই আমি নিয়েছি। গরম আবহাওয়া আর কড়া রোদে খানিকটা যদি জেল্লা খোলে! কিছু হয় না। ভারতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারতাম যদি কিছুদিন, এই যেমন তোমরা এদেশে এসেছ—"

কোকো-বিস্কুট এসে পড়ল। কৃষ্ণাও বসে পড়লেন টেবিলটার ওধারে। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার একবার আমার দিকে একবার কৃষ্ণা দেবীর দিকে তাকায়। মৃদু স্বরে বলে, "ভারতে একটা ব্যাপার দেখছি, মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা বেশী সুন্দর। অন্য সব দেশে একেবারে উল্টো। গরম দেশে মেয়েদের রং খোলতাই হয় না বুঝি?"

যত আস্তে বলুক, কৃষ্ণা দেবীর কানে গেছে। মনে মনে গর্জাচ্ছিলেন, বিস্ফোরণ হল কোকো খেয়ে যখন শোবার বাড়ির দিকে চলেছি। "আস্পর্ধা বোঝ। থ্যাবড়া মুখ, নাক-চোখ আছে কি নেই, রং একটু সাদা—সেই দেমাকে ফেটে ফেটে পড়ছে। ঠাট্টা করল কি রকম আমাদের!"

আমারও সেই অনুমান। ঠাট্টা ছাড়া অন্য কী হতে পারে? এয়ার-অফিসে আলোর নীচে সত্যি সত্যি আজ রূপ খুলেছিল কৃষ্ণা দেবীর; ঘষামাজা করে দিব্যি দাঁড় করিয়েছেন। রাত্রিবেলা ফাঁকিজুকি ধরা পড়ে না, ঐটেই যেন আদি রং ও'র। আর আমার বর্ণ, আয়নায় দেখলাম, আরো বেশী ঘন হয়েছে সারাদিনের ধকলে। অথচ কৃষ্ণার চেয়ে আমায় বেশী তারিফ করল। ঠাট্টা ছাড়া আর কী হতে পারে?

কৃষ্ণা বলছেন, "আমাদের মেয়েদের জানেন না—বড্ড পাজি আমরা। অন্য মেয়ে আমরা দু-চোখে দেখতে পারিনে। মুখের উপর তাই কুচ্ছো করল। এই অসভ্য দেশে মানুষ আসে! নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় এমন জাতের মুখে।"

সকালবেলা বিষম কাণ্ড। হুলস্থুলে কৃষ্ণা দেবীকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে, বাথরুমের কাছে পা হড়কে গিয়ে একেবারে অজ্ঞান। সকলে বিব্রত। বিরক্তও বটে। না খেয়ে খেয়ে তন্বী হন, রক্ত কমে গিয়ে রূপের আভা খোলে। শরীরে পদার্থ থাকতে দিয়েছেন কি এ'রা কিছু? তা যা করবার ঘরে বসে করলেই কেউ কিছু বলতে যায় না, বিদেশ-বিভুঁয়ে বেরুনো কেন? একের জন্য সকলের অসুবিধা। বলছেও কেউ-কেউ, হাসপাতালে রেখে চলে যাই আমরা। আরাম হলে এরা পাঠিয়ে দেবে।

এহেন ধাপধাড়া জায়গায় দৈবাৎ মওকা মিলল ত ডাক্তার আর দেরি করে! নার্স ও ওষুধপত্র সহ এসে পড়েছে। মাঠের মধ্যে রাজসূয় ব্যাপার জমিয়ে তুলল। আহা, কষ্ট হচ্ছে আজ কৃষ্ণা দেবীকে দেখে। মেজেয় পড়ে ছিলেন, ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিয়েছে। বিস্রস্ত চুলের বোঝা, মর্দিত চোখ, চোখের নীচে কালিমা। সকালে প্রসাধনের সময় হয়ে ওঠেনি, অকৃত্রিম কটকটে রং বেরিয়ে পড়েছে। এতদিন এক সঙ্গে ঘুরে আমরাও কখনো ওই বস্তুর আঁচ পাইনি। ছাতার কাপড় কি মাথার চুলের সঙ্গে খানিকটা তুলনা চলে। ভাগ্যিস চেতনা নেই, এই চেহারা কোন গতিকে আয়নায় দেখলে ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করবেন।

ডাক্তার ইনজেকশন দিল একটা। অভয় দিচ্ছে, "এক্ষুনি সামলে উঠবেন—ভাবনার কিছু নেই। আটটার মধ্যেই আপনাদের প্লেন ছাড়তে পারবে।"

বলছে, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাচ্ছে কৃষ্ণা দেবীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। আমার কাছে এসে বলে, "কী চমৎকার কালো রে! ভুল বলেছিলাম, পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর তোমাদের মেয়েরা। রাতে কেরোসিনের আলোয় কেমন সাদা-সাদা ঠেকছিল। আচ্ছা এমন মিশকালো রং কেমন করে হয় বল দিকি—"

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, "একটু কালো হবার জন্য কী না করছি। ইচ্ছে করে এই মরুভূমি জায়গায় বদলি হয়ে আছি। ঠিক দুপুরবেলা রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পুরো বছর ধরে এমনি চলছে। গায়ে শ্বেতকুষ্ঠ হয়েছে, যেন কোন রকম চিকিৎসা নেই। এত করছি, কিছুতে কিছু হয় না।"

কান্নায় ভেঙে পড়ে ডাক্তার-মেয়েটি। কৃষ্ণা দেবী ওদিকে চোখ মেলেছেন। ইনজেকশনের ক্রিয়া হয়েছে অতএব। উঠে বসলেন। সোরগোল পড়ে গেল, রওনা হবার তবে আর বাধা নেই। লাল বটুয়া সেই থেকে মেজেয় পড়ে আছে, কৃষ্ণা দেবী ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মানুষগুলো এখানকার সত্যি ভাল, খাসা দেশ। কদ্দিন আছি আমরা বলুন ত? বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে ভাল করে দেখতে হবে কিন্তু।"

অসিধারা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

॥ ১ ॥

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। গান্ধার-রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তি। বাক্‌শ্রী ইরা বসে আছেন সন্ন্যাসিনীর পদ্মাসনে—এক হাতে উদ্যত বরাভয়। ঘরের হালকা নীলিম আলোতে দুটি আয়ত চোখ যেন প্রসন্ন করুণায় টলমল করছে।

সামনে ফরাশে বসে একটি মেয়ে মুদিত চোখে বেহাগের বিস্তার করে চলেছিল। অস্পষ্ট নীলচে আলোয়, চন্দন-ধূপের মৃদু কুয়াশায়, তানপুরার উপরে রাখা আঙুলের শিথিল সঞ্চালনে আর পরনের ফিকে গোলাপী শাড়িতে তাকেও যেন ওই সরস্বতীর মূর্তির মতই মনে হচ্ছিল। দুর্গাশঙ্কর তার দিকে একবার তাকালেন, পরক্ষণেই চোখ আবার ছবিটির উপরে গিয়ে পড়ল।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—
নীল বসনে তনু ঢাকিয়াছে আধা—"

বেহাগের সুরবিকীর্ণ এক স্বপ্নের পথ বেয়ে শ্রীমতী চলেছেন অভিসারে। রাত্রির কালিন্দী নিকষ কালো, তমালবন তিমিরস্তব্ধ। কষ্টিপাথরে সোনার রেখার মত পায়ের নূপুরের দীপ্তি। কঙ্কনের ভীরু গুঞ্জন। মহাজন-পদাবলীর তালে তালে রাধার বুকের স্পন্দন।

এই ঘর এখন দূরের বৃন্দাবন। কান পেতে থাকলে শোনা যায় যমুনার কলধ্বনি, তমাল-বীথির নিশীথ-মর্মর। সব কিছু এখন স্বপ্নাবিলীন। কিন্তু কতক্ষণ? সুর থেমে যাবে, গান থেমে যাবে। তারপর জীবন।

সেই জীবন মনে পড়িয়ে দেবে, কত সহজে সুর কেটে যায়। যখন কাটে, আর জোড়া লাগে না।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—"

চন্দন-ধূপের গন্ধ মিলিয়ে যাবে, ওই নীল আলোটাও এক সময়ে একটা ফুলের মত অন্ধকারের স্রোত বেয়ে ভেসে চলে যাবে। তানপুরাটা পড়ে থাকবে ফরাশের এক কোনায়। যে মেয়েটি গান গেয়ে চলেছে, সে উঠে যাবে অনেকক্ষণ

আগেই। তখন মনে পড়বে। মনে পড়বে তাকেই—গান্ধার-আর্টে সরস্বতীর মূর্তিখানা এঁকে যে তাঁকে উপহার দিয়েছিল।

দুর্গাশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন। আজ, চল্লিশ বছর পরে সব কেমন এলোমেলো লাগে। ছেলেবেলার একটা দিন—সোনালী রোদ-ঝলকানো একটি দুপুর। বয়েস তখন বার থেকে তের। যখন ওই রোদ এসে রক্তে মিশে যায়, যখন বুকের ভিতর শিরীষের পাতা কাঁপে, যখন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একটু দূরে আতা গাছে চুপ করে বসে থাকা-পাখিটার গলার রঙ। সেই বয়েসে, সেই দুপুরে, সেই রোদ আর ছায়া-কাঁপা মন নিয়ে, সেই পাখির রঙ-দেখা চোখ নিয়ে একটা সবুজ পাতার উপরে খানিকটা দুধবরন ভেরেন্ডার আঠা কুড়িয়ে নেওয়া; তারপর চোর-কাঁটার একটা ডাঁটা, আর তারও পরে কয়েকটা ছোট বুদ্বুদ। তাতে নিজের মুখের ছায়া, সূর্যের সাতটা রঙ, ভবিষ্যৎ!

রঙিন বুদ্বুদ। সূর্যের সাতটা রঙ, নিজের মুখের একটু-খানি ছায়া। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোথায় মিলিয়ে যায়। চল্লিশ বছর ত পার হয়ে গেল সেই দিনগুলোর পরে। এখনো খুঁজছেন দুর্গাশঙ্কর। কোথায় মিলিয়ে যায় তারা? একটিকেও ত আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না। ওই গান্ধার-রীতিতে ছবিটি যে এঁকেছিল, তাকেও না!

"ওস্তাদজী!"

চোখদুটো বুজে এসেছিল—ঘুমিয়ে পড়ছিলেন নাকি? দুর্গাশঙ্কর তাকালেন।

"আমি উঠি আজ।"

সেই মেয়েটি। সুপ্রিয়া। বেহাগের সুর থেমে গেছে। তানপুরা নামিয়ে রেখেছে পাশে। বৃন্দাবন, শাল-তমাল, কালিন্দী, শ্রীমতীর অভিসার। আর একটা বুদ্বুদ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।

"এস।"

একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "আজ থাক তুমি এখানে। সারা রাত গান শোনাও আমাকে।" কিন্তু কিছুতেই সে-কথা বলা চলে না। মেয়েটির দু চোখে আশ্চর্য সরলতা, গভীর বিশ্বাস। যেখানে বিশ্বাস বেশী, সেখানে অবিশ্বাস আসে আরো সহজে। শ্রদ্ধাটা রঙিন কাঁচের পুতুল, চকমক ঝকঝক করে, যখন ভাঙে তখন একেবারেই ভাঙে, শুধু কতগুলো ধারালো খণ্ডাংশ ছড়িয়ে থাকে রক্তাক্ত করবার জন্যে।

দুর্গাশঙ্কর আবার বললেন, "এস।"

পাশ থেকে শ্রীনিকেতনের কাজ-করা ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলে সুপ্রিয়া। কোথায় যেন একটা অর্থহীন খোঁচা লাগল দুর্গা-শঙ্করের। ব্যাগটার ভিতরে হয়ত কিছু পয়সা, এক টুকরো ছোট রুমাল, একটা চাবির রিং, হয়ত দু-একটা চিঠিপত্র। জীবন। ট্রামগাড়ি। কলকাতা। কোথাও একটা লীলাকমল ছিল কোনদিন। এখনই তার ছেঁড়া পাপড়িগুলো হাওয়ায় উড়ে গেল—উড়ে গেল বেহাগের শেষ মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর সিঁড়িতে। সিঁড়ির কার্পেটে ওর চটির শব্দ শোনা গেল না। শুধু শাড়ির একটু খস্‌খস্‌ আর কয়েকটা চুড়ির গুঞ্জন। তারও পরে কাঁকরের উপর কয়েকটা তীক্ষ্ম আওয়াজ—গেট খোলবার একটা আর্তনাদ—

আর শুনতে পেলেন না দুর্গাশঙ্কর। মাথার উপর দিয়ে একখানা এরোপ্লেন গেল।

পথে পা দিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল সুপ্রিয়া। মাথার উপর দিয়ে একখানা এরোপ্লেন যাচ্ছে। কয়েকটা লাল-নীল আলো। জোনাকির মত জ্বলছে নিভছে।

সুপ্রিয়া কখনো প্লেনে চাপেনি। ভারী কৌতূহল হয় মধ্যে মধ্যে। শুধু ভয় হয় ক্র্যাশকে। তা-ও কোনো রোম্যাণ্টিক্ ঘুমন্ত মৃতদেহ নয়। আগুনে পোড়া কদাকার পিণ্ড একটা। উঃ—ভাবাই যায় না!

উত্তর-পূবের আকাশ বেয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা। দমদম এয়ারপোর্ট বোধ হয় ওদিকেই। সুপ্রিয়া চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল। সাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে রাস্তা পেরিয়ে।

আর কে? নিঃসন্দেহে অতীশ।

মনের খুশিটাকে একটুখানি ভ্রূকুটিতে বদলে নিলে সুপ্রিয়া। একটা মোটর এসে পড়তে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেল অতীশ, তারপর গাড়িটা বেরিয়ে যেতে ছুঁড়ে দিলে হাতের সিগারেটটা। গাড়ির হাওয়ায় ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে সিগারেটটা এগিয়ে গেল অনেকখানি।

অতীশ সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তার আলোটা ঝিকমিক করতে লাগল চশমার রোলড গোল্ডের ফ্রেমের উপর। বিনা ভূমিকাতেই অতীশ বললে, "চল—এগিয়ে দিই।"

"এই জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলে?" ভ্রূতে শাসনের রেখা ফুটল সুপ্রিয়ার।

"কখনো না।"

"নিশ্চয়। আমার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। ওই বকুল-গাছটার তলাতে।"

দুজনে চলতে শুরু করেছে ট্রাম-লাইনের দিকে। হাওয়ায় হেমন্তের শিশিরের গন্ধ। কোথা থেকে নব-জাতকের কান্না। রাত এখন নটার কাছাকাছি।

অতীশ বললে, "আমি কারো জন্যে বকুল-গাছতলায় দাঁড়াইনি। টুইশন সেরে ফিরছিলাম। দেখা হওয়াটা অ্যাক্সিডেণ্ট।"

"আশ্চর্য অ্যাক্সিডেণ্ট বাস্তবিক।" সুপ্রিয়া হেসে উঠল, "সপ্তাহে তিনদিন।"

"তিনদিনই টুইশন থাকতে পারে।"

"আমি কোনোদিন আটটায় বেরুই, কখনও সাড়ে আটটায়, কখনো নটায়। তোমার পড়ানোরও কি কোনো নিয়ম নেই?"

"অনিয়ম জিনিসটা তোমার একচেটে নয় সুপ্রিয়া।"

চলতে চলতে সুপ্রিয়া একবার তাকিয়ে দেখল অতীশের দিকে। চশমার ফ্রেম, কাঁচ আর পথের আলো অপূর্ব জ্যোতির্ময় করে তুলেছে অতীশের চোখ।

"বরাবর শুনে আসছি অতীশ আমাদের মুখচোরা ভাল

ছেলে—পড়ার বই ছাড়া আর কিছু জানে না। এখন দেখছি তারও মুখে কথা ফুটেছে।"

"কৃতিত্বটা আমার নয়—" সেই জ্যোতির্ময় চোখ মেলে অতীশ বললে, "কথা যে ফুটিয়েছে, তারই।"

"কে সে?"

"সামনে বলব না। অহঙ্কার হবে।"

"খুব হয়েছে। সায়েন্স কলেজে এই গুনের রিসার্চই বুঝি চলছে আজকাল?"

"সাবধান—ওটা আচার্য রায়ের কলেজ।" অতীশ হেসে উঠল, "ওখানে এসব চাপল্য মুখে আনতে নেই—মনেও না। আর এটুকু ট্রেনিঙের জন্যে হরিশ মুখুজ্যে রোডই যথেষ্ট। কষ্ট করে অত দূরে যাবার দরকার নেই।"

পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা ডবল-ডেকার মোড় ঘুরল। দৈত্যের মত অদ্ভুত কালো গাড়িটা, জানলার কাচগুলো যেন হিংস্রতায় ঝকঝক করছে। খানিকটা তপ্ত গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আলোচনার খেই হারিয়ে গেল।

সামনে ঘাসের কালো মখমলের ভিতর দিয়ে রুপোলী ট্রাম-লাইন। জমাট হয়ে থাকা গাছের সারি। তীব্র নীল আলোর ঝলক ছড়িয়ে একটা ট্রাম চলে গেল। মোড় ঘুরল আর-একটা ডবল-ডেকার। উলটো দিকে।

ট্রাম-স্টপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রিয়া।

"এখান থেকেই উঠবে?" ক্ষুণ্ণ হয়ে অতীশ জানতে চাইল।

"এইখানেই গাড়ি থামে।" ঠোঁট টিপে সুপ্রিয়া হাসল, "ট্রাম কোম্পানির তাই নিয়ম। মাথার উপর তাকালেই দেখতে পাবে। লেখা আছেঃ এখানে সকল ডাউন গাড়ি—"

"ধন্যবাদ—উপকৃত হলাম।" অতীশ আর একটা সিগারেট ধরাল, "কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল, আর একটু হেঁটে গেলে হয় না?"

"সেই হরিশ মুখার্জি পর্যন্ত?"

"না—না, তা কেন! এই আর একটুখানি—মানে সামনের রাসবিহারীর মোড়—"

"সেখান থেকে আর একটু গেলে কালীঘাট ডিপো, আরো দু পা এগোলে হাজরার মোড়—"

"সত্যি বলছি। আজ সে-সব করব না। চল—আর একটু হাঁটি।"

সুপ্রিয়া হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল, "কিন্তু বাড়িতে আমাকে যে কৈফিয়ত দিতে হয়—জান?"

"আমি সঙ্গে থাকলে দিতে হবে না। ভাল ছেলে হিসেবে আমার খ্যাতি আছে।"

"এ-ভাবে বকুলতলায় দাঁড়াতে থাকলে সে-খ্যাতি বেশী-দিন টিঁকবে না।" সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল, "পাড়ার ছেলেদেরও চোখ আছে। তারা সায়েন্স কলেজের রিসার্চ-স্কলারকে খাতির করবে না।"

"বকুলতলা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। যে-কেউ দাঁড়াতে পারে।"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল বুকের ভিতরে।

"তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বল ত অতীশ? আমার কী কাজে তুমি লাগবে?"

"রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জবাব দিতে পারি। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

"ঠাট্টা নয়।" সুপ্রিয়ার বুকের ভিতর ব্যথার রেশটা টনটন করে বাজতে লাগল, "তবলা ধরতে জান না যে আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে। গান জান না যে তোমার কাছ থেকে কিছু শিখে নেব। কবিতা লিখতে পার না যে তোমার গানে আমি সুর দেব। সত্যি, তোমাকে নিয়ে আমি কী করব অতীশ?"

অতীশ যেন এতক্ষণ পরে হোঁচট খেল একটা। দু বছর ধরে এই একটা কথাই অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সুপ্রিয়া। কী কাজে লাগবে অতীশ? সুপ্রিয়ার জীবনে তার ভূমিকা কতটুকু?

অথচ আশ্চর্য, এক সুপ্রিয়া ছাড়া আর কোনো মেয়েই কি এমন একটা প্রশ্ন তুলতে পারত? কী কাজে লাগবে অতীশ? এম-এস্‌সির নামজাদা ছাত্র, দু দিন পরে ডি-এস্‌সি, হয়ত একটা ফরেন স্কলারশিপ, তারপরে বড় চাকরি। এর পরে আর কী চাই? এর বেশী কোন মেয়ে আর কামনা করতে পারে?

কিন্তু সুপ্রিয়া পারে। গানের চাইতে বড় তার জীবনে আর কিছু নেই। তার গানের জগতে ডি-এস্‌সি'র ডিগ্রির জায়গা বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কনভোকেশনের মধ্যমণি সেখানে কেউ নয়! বিরাট গানের জলসায় হয়ত একেবারে পিছনের সারির টিকিট কিনবে অতীশ, স্টেজের উপরে বসে-থাকা সুপ্রিয়াকে সেখান থেকে ভাল করে দেখতেও পাওয়া যায় না! সেখানে সুপ্রিয়ার পাশে বসে যে সঙ্গত করবে সে হয়ত নিজের নামটা কোনোমতে সই করতে পারে, যে সারেঙ্গি বাজিয়ে চলবে তাকে হয়ত এখনো টিপসই করতে হয়।

পায়ের তলায় ঘাসের কালো মখমল শিশিরে ভিজে উঠছে। অতীশ সিগারেটটা ফেলে দিলে। সম্পূর্ণ খেতে পারল না।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল। "অমনি গম্ভীর হয়ে গেলে?"

"গম্ভীর কেন?" আরো জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অতীশ, "আমি হাল ছাড়ব না। কালকেই নাড়া বাঁধব কোনো বড় ওস্তাদের কাছে!"

কথাটার জের টানা চলত, আরো খানিকটা হালকা কৌতুকের জলতরঙ্গ বাজান যেত। কিন্তু বাজল না। হাওয়াটা থমথম করতে লাগল। দুজনের ভিতর দিয়ে একটা নদীর স্রোতের মত বয়ে চলল ট্রাম-বাস-মোটর আর মানুষের শব্দ।

অতীশ তবুও সত্যিই হাল ছাড়ল না।

"তোমার গুরুদেব কী বলেন তোমার সম্পর্কে? দুর্গাশঙ্করবাবু?"

"কী আর বলবেন?"

"তোমার গান শেখা শেষ হতে আর কত দেরি?"

"গুরুদেব নিজেই বলেন, তাঁরও এখন পর্যন্ত কিছুই শেখা হয়নি।"

"উঃ—কী বিদ্যাই বেছে নিয়েছ। সারাজীবন ক্রমাগত হাহাকার করতে হবে!"

আর একটা পুরনো পরিচিত ঠাট্টা। হাহাকার। গলা-সাধার নামান্তর।

কিন্তু কোনো ঠাট্টাই জমল না। পায়ের নীচে হেমন্তের ভিজে ঘাস। সুপ্রিয়ার চটিটা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে।

রাসবিহারীরী মোড়টাকে কে যেন দয়া করে সামনে এগিয়ে দিলে খানিকটা। নইলে এর পরে হয়ত কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠত। একটা অনুতাপের লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সুপ্রিয়া। অতীশকে সে আঘাত দিতে চায় না। আর চায় না বলেই তীক্ষ্ণধার সত্যটা থেকে-থেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বেরিয়ে আসে।

সুপ্রিয়া বললে, "ট্রাম আসছে।"

ট্রাম এল। অনেক দূরের স্টেজের মত অনেকগুলো আলো তুলে নিলে সুপ্রিয়াকে। তারপর অতীশকে ছাড়িয়ে—রাসবিহারীর মোড়কে ছাড়িয়ে অনেকখানি সামনে এগিয়ে চলে গেল।

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনে গোটা কয়েক সিনেমার পোস্টার। কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া রঙ।

ট্রামের জানলা দিয়ে একবার গলা বাড়িয়ে দেখল সুপ্রিয়া। অতীশকে দেখতে পেল না। একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে ভাবল, কালকেও অতীশ আসবে, ঠিক অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে বকুল-গাছটার তলায়। সুপ্রিয়ার খারাপ লাগবে। কিন্তু অতীশ না এলে আরো খারাপ লাগবে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠল অতীশ। তার সামনে নিঃশব্দে কে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়েও অতীশ চমকে তিন পা সরে গেল। হাতটা কুষ্ঠরোগীর—খানিক বীভৎস বিকৃত ঘা দগদগ করছে সেখানে।

॥ ২ ॥

"নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় সোমবার আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত—"

চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, পারল না। ছাব্বিশ বছরের পুরনো পঞ্জিকার মধ্যে দাদুর এই চিঠিখানা আজও বেঁচে আছে। কাগজটা হলদে হয়ে গেছে, জোলো হয়ে গেছে কষ-কালির রঙ, তবু শেষ পর্যন্ত পড়া যায়, প্রত্যেকটা অক্ষর পড়তে পারা যায় নির্ভুল-ভাবে। মুক্তোর মত হাতের লেখা ছিল দাদুর।

হরিপদ কে, কান্তি জানে না। কেন এই চিঠিটা তাকে পাঠান হয়নি, তা-ও জানে না কান্তি। কিন্তু ১২ই আষাঢ় ইন্দুমতীর বিয়েটায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। ইন্দুমতী তার মা।

কান্তি দাঁত দিয়ে একবার নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরল। পুরনো হলদে কাগজ, কষ-কালির লেখাটা ফিকে হয়ে গেছে। তবু আনন্দে আর আশ্বাসে দাদুর সইটা যেন এখনো জ্বল-জ্বল করছেঃ "শ্রীতারাকুমার দেবশর্মণঃ—"

দাদুর হাত-বাক্সে প্রসাদী-পদাবলীর একখানা পুরনো বই খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেছে এই পঞ্জিকা, তার মধ্যে এই চিঠিখানা। একটা মড়ার হাড় যেন উঠে এসেছে হাতে। কিন্তু এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেই কি সব মুছে যাবে? মুছে যাবে ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই ১২ই আষাঢ়, সেই বিয়েটা, আর কান্তির নিজের অস্তিত্ব?

আঠার বছর বয়েসে একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল কান্তি। ওই বয়সে আত্মহত্যা করবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, আর থাকে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আবেগ। কান্তি সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চুপ করে বসে ছিল গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকরভরা ভাঙা কুঠরিটার পাশে, পুরনো ঝাঁকড়া বটগাছটার কালিগোলা ছায়ার তলায়। কালপুরুষের খড়্গ কাঁপছিল গঙ্গার কালিগোলা জলে, ওপারের একটা জ্বলন্ত চিতা থেকে এপারেও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল মড়াপোড়ার গন্ধ, পায়ের কাছে হাওয়ায় দুলছিল ছেঁড়া সিল্কের টুকরোর মত একটা সাপের খোলস, আর কান্তি ভেবেছিল আত্ম-হত্যার কথা।

ফিরে এসেছিল অনেক রাতে, একটু দূরেই বিশ্রী গলায় একটা কুকুর কেঁদে ওঠবার পরে। সহজেই সেদিন মরে যেতে পারত কান্তি। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে। হয়ত ওই সাপের ফোকরগুলোতে আঙুল গলিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু কুকুরটার কান্না শুনে কেন যেন মনে হয়েছিল, আজ থাক। আর একদিন হবে।

আরো সাত বছর কেটেছে তার পরে। গানের সুরে ডুব দিয়েছে কান্তি—গঙ্গার জলে আর ডোবা হল না। কিন্তু সত্যিই সাপের বিষ আছে তার রক্তে। কেউটের নয়, চন্দ্র-বোড়ার বিষ। একবারে ফুরিয়ে যায় না, তিলে তিলে পচিয়ে মারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, সত্যি সত্যিই মরে গেছে কান্তি। ওই গানের স্রোতে যে এখনো ভেসে চলেছে, সে রক্তমাংসের জীবিত দেহ নয়, লখিন্দরের গলিত শব।

বারে বারে যেমন হয়, আজও তেমনি দাদুর চিঠিখানাকে পুরনো পঞ্জিকার মধ্যে আবার ভাঁজ করে রেখে দিলে কান্তি। উঠে এসে চুপ করে বসল খাটের কোনায়, জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। মা কীর্তন শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত বারটার আগে নয়। এখন সে একেবারে একা। নিজের কাছে সে নিজে ছাড়া আর কেউ নেই।

রাত্রির আকাশ থেকে যেন একটা সুর ভেসে এল। দরবারী কানাড়া। দাদুর চিঠিটাকে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা কোষে কোষে অনুভব করতে করতে, সূচিকাভরণের মত কতগুলো তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার বিন্দুকে আস্বাদন করতে করতে তবুও কান্তি একবার হাত বাড়াল তানপুরার দিকে। কেমন ঠান্ডা আর কঠিন মনে হল যন্ত্রটাকে, কান্তির হাত ফিরে এল। বেহালাটার কথা মনে হল। না—ওটাও থাক।

জানালার গরাদের নীচে কাঠটার উপরে কান্তি মাথাটা নামিয়ে রাখল। বাইরে থেকে খানিক ঠান্ডা হাওয়া এসে চুলের মধ্যে খেলে যেতে লাগল। কপালে ব্যথা লাগছিল, তবুও মাথা সে তুলতে পারল না। অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে মাথা—যেন কয়েক মণ লোহা জমাট বেঁধেছে সেখানে।

জেগে জেগে কান্তি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল সাতাশ বছর আগেকার।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি ভাল করে। ইস্কুলের হেডপণ্ডিত তারাকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন গঙ্গাস্নান করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছিলেন। অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছিল তাঁর খড়মের শব্দ—তাঁর মন্ত্রপাঠের সুর।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তারাকুমার। তাঁরই রোয়াকের উপরে চুপ করে বসে আছে একজন বিদেশী মানুষ। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। সুঠাম, সুন্দর চেহারা, দেখলে মনে হয় বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ছেলে। কিন্তু জামাকাপড় তার ছেঁড়া, মুখে-চোখে অসুস্থ ক্লান্তির ছাপ। স্পষ্ট বোঝা যায়, কিছুদিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি, রাত্রে ঘুমোতে পায়নি।

"কে তুমি?"

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তারাকুমারের পায়ে।

"আমার নাম শান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। আমি বিদেশী।"

তারাকুমার বললেন, "বিদেশী সে ত দেখতেই পাচ্ছি। বাড়ি কোথায়?"

"বর্ধমান জেলায়। শান্তিপুরে।"

"এখানে কেন?"

"মা-বাপ নেই—আত্মীয়েরা সম্পত্তির লোভে খুন করতে চেয়েছিল। তাই চলে আসতে হল দেশ ছেড়ে। ভাগ্যের সন্ধানে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গিয়েছিল, তাই একটুখানি বসেছিলাম আপনার দাওয়ায়। অপরাধ নেবেন না—আমি এখুনি চলে যাব। একটু জিরিয়েই।"

তারাকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন শান্তিভূষণের মুখের দিকে। অনুমানে ভুল হয়নি তাঁর। অন্তত দুদিন এর খাওয়া হয়নি; চোখের লালচে রঙ বলে দিচ্ছে, অন্তত তিন রাত চোখের পাতা বন্ধ হয়নি তার।

বললেন, "যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। সকালবেলাতেই ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি এসেছ দুটি খেয়ে যেয়ো।"

শান্তিভূষণের লাল চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। বললে, "পকেটে পয়সা ছিল না—রাস্তার ধারের ক্ষেত থেকে কয়েকটা আক ভেঙে খাওয়া ছাড়া পরশু থেকে কিছু আমার জোটেনি। আপনি আমায় বাঁচালেন।"

আদর করে অতিথিকে অন্দরে নিয়ে গেলেন তারাকুমার। মা-মরা একমাত্র মেয়ে কিশোরী ইন্দুমতী অতিথির জন্যে হাত-মুখ ধোবার জল আর গামছা এগিয়ে দিলে।

খেতে বসে সব শুনলেন তারাকুমার। শান্তিভূষণ একেবারে মূর্খ নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে—উপাধি আছে কাব্যতীর্থ। চেহারাটি সুন্দর। কথাবার্তা চাল-চলন বড় ঘরের মত।

খেয়ে উঠে তামাক ধরিয়ে তারাকুমার বললেন, "চলেছ কোথায়? কলকাতায়?"

"তাই ত ভাবছি।"

"হেঁটেই যাবে?"

"পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে এসেছি, এ পনেরো মাইলও পারব।"

"তা পারবে।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন তারাকুমার, তারপর বললেন, "কলকাতায় গেলেই কি চাকরি পাবে?"

"জানি না। চেষ্টা করে দেখব।"

"জানাশুনো কেউ আছে?"

"দেশের দু-চারজন নানা অফিসে কাজ করে। তাদের ধরব।"

"হুঁ।"—তারাকুমার কলকেটা উবুড় করে রাখলেন। "কলকাতায় চাকরি করবার একটা আলাদা লোভ আছে বটে। তবে এখানেও একটা ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের স্কুলে টাকা চল্লিশেকের একটা চাকরি খালি আছে।"

"এখানে?"

"থাকতে পার আমার বাড়িতে। আমার ছেলে নেই। তোমারও শুনলাম কেউ নেই। যদি ইচ্ছে কর আমার ছেলের মতই থাকতে পার এখানে।"

এর পরে আর কথা জোগায়নি শান্তিভূষণের। একেবারে তারাকুমারের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল সে।

চাকরি হয়ে গেল সেই দিনই। আর কাজ বাড়ল ইন্দুমতীর। একজনের জায়গায় দুজনকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। দুজনের চাদর ভাঁজ করে দিতে হয়, কাচতে হয় জামা-কাপড়।

ভদ্র, নম্র মানুষ শান্তিভূষণ। ইন্দুমতীর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না কোনোদিন।

দিন কয়েক বাদেই হেডমাস্টার তারাকুমারকে ডাকলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা আছে পণ্ডিতমশাই। শান্তিভূষণ সম্পর্কে।"

শান্তিভূষণ সম্পর্কে? কেমন ঘাবড়ে গেলেন তারাকুমার। সেকালের ইংরেজী জানা কড়া মেজাজী হেডমাস্টার। এমনিতে মাটির মানুষ—কিন্তু অন্যায় দেখলে দুর্বাসা। তখন তাঁর হাতে কারো নিস্তার নেই। ছাত্রের নয়—মাস্টারেরও না।

শুকনো গলায় তারাকুমার বললেন, "কী হয়েছে শান্তিভূষণের? পড়াতে পারছে না?"

"পারছে না মানে?" হেডমাস্টার বললেন, "চমৎকার পড়ায়। আরো আশ্চর্য কী জানেন পণ্ডিতমশাই—ওকে শুধু ম্যাট্রিক পাশ বলে মনেই হয় না। বি-এ পাশের চাইতেও ভাল ইংরেজী লেখে। বিদ্যে ভাঁড়ায়নি ত পণ্ডিতমশাই?"

গর্বে ফুলে উঠে তারাকুমার বললেন, "বিদ্যে কেউ কখনো ভাঁড়ায় না স্যার। বরং বাড়িয়ে বলে।"

"তা বটে।" হেডমাস্টার মাথা নাড়লেন: "রাইট ইউ আর। কিন্তু ছেলেটি মশাই হীরের টুকরো। ভারী খুশী হয়েছি ওর কাজ দেখে। ম্যাট্রিক পাশ, আমি ভাবছি ওকে ওপরের ক্লাসে ইংরেজী পড়াতে দেব।"

হাওয়ার উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলেন তারাকুমার। ডেকে বললেন, "শুনেছিস ইন্দু, হেডমাস্টার আজ আমাদের শান্তির কত প্রশংসা করলেন। বললেন, এমন টীচার তাঁর স্কুলে আর দুটি নেই!"

মাথা নিচু করে, অল্প একটু হেসে ইন্দুমতী রান্নাঘরে চলে গেল।

সেই থেকে তারাকুমার ভাবতে শুরু করলেন। ছ মাস ধরে ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত কথাটা খুলে বললেন শান্তিভূষণকে।

একবারের জন্যে চমকে উঠল শান্তিভূষণ—একবারের জন্যে মুখের রঙ বদলে গেল তার।

"কিন্তু আমি ত—"

তারাকুমার বাধা দিলেন, "তোমায় কিছু বলতে হবে না। ছেলের মত কাছে রয়েছ—ছেলের দায়িত্বও তোমায় দিয়ে যেতে চাই। শুধু বল আমার ইন্দুকে তোমার পছন্দ হয় কিনা।"

কী একটা কাজে সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুমতী। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। একবারের জন্যে চোখ তুলে শান্তিভূষণ দেখল ডুরে শাড়ির উপর ভ্রমরকালো একরাশ এলোচুল, স্থলপদ্মের মত দুখানি পা।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্তিভূষণ বললে, "পছন্দের কথা কী বলছেন, ইন্দুকে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।"

উদ্ভাসিত হয়ে তারাকুমার বললেন, "আমি জানতাম। আমার মেয়েকে কিছুতেই তুমি অপছন্দ করতে পারবে না।"

"কিন্তু—" আর একবার কী বলতে গিয়েও বলতে পারল না শান্তিভূষণ।

"কিন্তুর আর কিছু নেই।" উৎসাহিত হয়ে তারাকুমার বললেন, "তা হলে ত কথা হয়েই গেল। অবশ্য তোমার একটা ঠিকুজী পেলে ভাল হত। কিন্তু না পেলেও ক্ষতি নেই, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি সমস্ত সুলক্ষণ আছে তোমার ভেতরে। দেখি হাতখানা—"

ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিলে শান্তিভূষণ।

"বাঃ,—সুন্দর হাত। উজ্জ্বল বৃহস্পতি। দীর্ঘায়ু যোগ—অর্থভাগ্য আছে। আঙুল দেখে বোঝা যাচ্ছে দেবগণ। রাজযোটক হবে।"

আর একবার শান্তিভূষণের মুখ থেকে সব রক্ত সরে গিয়েছিল—কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর শান্তিভূষণ বলেছিল, "বেশ, তাই হবে। আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি করব।"

ঠিক হতে লাগল আরো মাসখানেক। তারপরেই তারাকুমার কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলেন।

"নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত বর্ধমান জিলার শক্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় প্রতাপভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শান্তিভূষণের শুভ-বিবাহ—"

চিঠি হয়ত শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি হরিপদর কাছে। কিন্তু বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব ওই ১২ই আষাঢ়েই।

আরো এক বছর কাটল তারপরে। রাজযোটকই বটে। মাটিতে নয়—যেন আকাশে পা ফেলে চলতে লাগলেন তারাকুমার। ইন্দুমতীর মুখ দেখে বুঝতে পারতেন যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন।

স্বপ্ন ভাঙল একদিন ভোরবেলায়। ইন্দুমতীই এনে দিল সে-চিঠি। তারাকুমারের সামনে সেটা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা। সারা দিন সে-দরজা আর খোলেনি।

চিঠিতে লেখা ছিলঃ

"আমার আর থাকবর উপায় নেই। কেমন সন্দেহ হচ্ছে পুলিশে আমার খবর পেয়েছে। আমার হাত দেখে আপনি বুঝতে পারেননি। আমি খুনী—পলাতক আসামী। আপনার কাছে আশ্রয় পেয়ে ভেবেছিলাম যে, এখানেই জীবনটা কাটিয়ে যাব। কিন্তু সে আর হল না। আপনাদের সামনে দিয়ে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে, সে-অপমান আমার সইবে না। বিশেষ করে ইন্দুকে অত বড় আঘাত আমি দিতে পারব না। বুঝতেই পারছেন, আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার নাম-ধাম কী তা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার কন্যা আপনি ব্রাহ্মণের হাতেই সম্প্রদান করেছিলেন। জানি না, আমার শেষ পরিণাম কী। হয়ত ফাঁসিকাঠে, নইলে দ্বীপান্তরে। কারণ, ধরা আমি একদিন পড়বই। তবু আশা আছে—একদিন আমি ফিরব। আপনি আমায় সন্তান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই দাবিতেই ক্ষমা চাইতে ফিরে আসব আপনার কাছে।"

পুলিশ অবশ্য এল না, শান্তিভূষণও ফিরে আসেনি আর। কিন্তু তার চলে যাওয়ার চার মাস পরে কান্তিভূষণের জন্ম হল। কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। মিলিয়েই নাম রেখেছিলেন তারাকুমার। অজ্ঞাত-পরিচয়ের লজ্জা দিয়ে কান্তিকে তিনি পৃথিবীর সামনে ছোট করতে চাননি।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকেনি। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে। যতদিন তারাকুমার বেঁচে ছিলেন, প্রাণপণে আড়াল দিয়ে রেখেছিলেন কান্তিকে। তাঁর আড়াল সরে গেলে কান্তি জানতে পারল। তার আগেই কুশ-পুত্তলী পুড়িয়ে মা বৈধব্য নিয়েছিলেন।

কান্তি জানতে পেরেছে সাত বছর আগে, তার আঠার বছর বয়েসের সময়। তারপরে গঙ্গাযাত্রীদের সেই গোখরো সাপের ফোকরভরা ঘর, সেই পুরনো বটের ডাকিনী ছায়া, সেই কালি-ঢালা কালপুরুষের খড়্গ-কাঁপা গঙ্গার স্রোত, ওপারে চিতার আলো, আত্মহত্যার রোমন্থন, তারপরে মনে হওয়াঃ আজ থাক।

আজ থাক। সাত বছর থেকে মনে হচ্ছে, আজ থাক। তা ছাড়া কান্তি কেমন করে ভুলবে তার কথা—সেই মেয়েটির কথা, সুপ্রিয়া যার নাম?

চমকে কান্তি জানলার কাঠ থেকে মাথা তুলল। কয়েকটা নারকেল গাছের ওপারে মজুমদারদের সাদা বাড়িটা দেখা যায়।

আলো জ্বলছে তার তেতলার ঘরে। সুপ্রিয়ার ঘরে। সুপ্রিয়া এসেছে নাকি কলকাতা থেকে?

না—সুপ্রিয়া নয়। তার পাশের ঘর। সুপ্রিয়ার বিধবা পিসিমা থাকেন ও-ঘরে।

কান্তি উঠে বসল। সুপ্রিয়া। তার চাইতে বছর চারেকের ছোট—ছেলেবেলার খেলার সাথী।

আঠার বছর বয়েসে গঙ্গার ধার থেকে উঠে কান্তি বাড়ি ফেরেনি। গিয়েছিল সুপ্রিয়ার কাছে। সুপ্রিয়া পরীক্ষার পড়া পড়ছিল—কান্তি সোজা গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।

পাড়াগাঁয়ের পরিচয়—কেউ বাধা দেয়নি। শুধু সুপ্রিয়ার মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কান্তি যে! এত রাতে?"

যা হক একটা জবাব দিয়ে কান্তি উঠে গিয়েছিল উপরে।

চৌদ্দ বছরের সুপ্রিয়া কী বুঝেছিল সে-ই জানে। বড় বড় চোখ ফেলে শুনেছিল সব কথা। এগিয়ে এসে হাত রেখেছিল কান্তির চুলের উপর। বলেছিল, "তোমার কেউ না থাক, আমি আছি।"

"চিরদিন থাকবে?"

"চিরদিন।"

কান্তি বুঝতে পারে কেন সে আত্মহত্যা করেনি এতদিন। তার পরিচয় নেই—সে খুনীর সন্তান—হত্যাকারীর রক্তে তার জন্ম, তবু সে বেঁচে থেকেছে ওই একটি কথায়—একটি শক্তিতে।

"চিরদিন। চিরদিন আমি তোমার জন্যে থাকব।"

কলকাতার কলেজে পড়তে গেল সুপ্রিয়া। যাওয়ার সময় কান্তির চোখ জলে টলটল করে উঠেছিল।

"আমি ম্যাট্রিক ফেল। তুমি কলেজে পড়তে যাচ্ছ। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে গেলাম।"

সুপ্রিয়া সস্নেহে কান্তির কপালে একটা টোকা দিয়ে বলেছিল, "আর তুমি যে গানে এম-এ পাশ করে বসে আছ। তবলায় পিএইচ-ডি। সেখানে ত তোমাকে আমি কোনোদিন ছুঁতে পারব না।"

সান্ত্বনা দিয়ে গেল—না মনের কথা? তবু সেই থেকে গানের জোর নিয়েই দাঁড়াতে চেয়েছে কান্তি। ভোরের অন্ধকারে হয়ত তবলা নিয়ে বসেছে, বাজনা শেষ করেছে—সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে। বিদ্যার ঐশ্বর্য নিয়ে যতই এগিয়ে যাক সুপ্রিয়া, গুণের জোরে তার কাছে পৌঁছতে হবে কান্তিকে।

তারপর আরো এগিয়ে গেছে সুপ্রিয়া। বি-এ পাশ করে একটা স্কুলে মাস্টারি নিয়েছে—আর তার গান শেখা চলছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে। আজকাল দেশে আসবার সময়ই

"বাঃ,—সুন্দর হাত। উজ্জ্বল বৃহস্পতি।"

পার না। কলকাতায় গিয়ে দু-একবার দেখা করেছিল কান্তি, কিন্তু লোকের ভিড়ে ভারী দূরের মনে হয় সুপ্রিয়াকে। মনে হয়, নিজের পরিচয়হীন জীবন নিয়ে তার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে না। সেখানে অনেক মানুষ, যারা দেশের সেরা জ্ঞানী গুণীর দল, যাদের গলা উঁচু করে বলবার মত বংশ-পরিচয় আছে. সংসারে গ্লানি নিয়ে যাদের অন্ধকারের আড়াল খুঁজে বেড়াতে হয় না।

তবু সুপ্রিয়া যখন আসে—যখন এই গ্রামের একান্ত গণ্ডিটুকুর মধ্যে ফিরে আসে, তখন কান্তির মনে হয় এখনো তার আশা আছে। আজও কাছে গিয়ে বসলে কখনো কখনো সুপ্রিয়া তার হাত নিজের হাতের ভিতরে টেনে নেয়। বলে, "এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন কান্তিদা?"

"তপস্যা করছি তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে।" একটু চুপ করে থেকে সুপ্রিয়া জবাব দেয়, "আমি এমন কিছু দুর্মূল্য নই কান্তিদা যে, তার জন্যে তুমি এমনভাবে শরীর নষ্ট করবে। তুমি বড় ওস্তাদ হও, গুণী হয়ে ওঠ, সারা দেশের মানুষ চিনে নিক তোমাকে। কিন্তু আমার জন্যে কোনো দাম তুমি দিচ্ছ, এ-কথা শুনলে আমার লজ্জাই বেড়ে ওঠে কান্তিদা।"

"নইলে তোমার যোগ্য হব কী করে?"

"আমার যোগ্য! আমি কতটুকু? কত বড় পৃথিবী রয়েছে তোমার জন্যে। সেই পৃথিবীতেই তোমার প্রতিষ্ঠা হক কান্তিদা।"

কান্তি খুশী হবে কিনা বুঝতে পারে না। এড়িয়ে যেতে চায়? জীবনে জায়গা দিতে পারবে না জেনেই কি ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় পৃথিবীর ভিতরে? নিজের ঘরের দরজা খুলে বরণ করে নিতে পারবে না, সেই জন্যেই কি সভায় বসিয়ে দিতে চায় সকলের মাঝখানে?

কান্তি উঠে বসল। বাইরে রাত বাড়ছে। সুপ্রিয়ার ঘরের জানলাটা অন্ধকার। কলকাতা থেকে ফেরেনি সুপ্রিয়া।

একটা রিকশা এসে থামল দোরগোড়ায়। মা ফিরেছেন। কড়াটা নড়ে ওঠবার আগেই দরজা খুলে দেবার জন্যে কান্তি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

আজ সমস্ত রাত ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বার বার মনে হবে, সুপ্রিয়া আসেনি।

॥ ৩ ॥

হরিশ মুখার্জি রোডে সুপ্রিয়ার কাকা অমিয় মজুমদারের বাড়ি।

অবশ্য ভাড়াটে বাড়ি। মাঝারি ধরনের অ্যাডভোকেট অমিয় মজুমদার এখন পর্যন্ত বাড়ি করে উঠতে পারেননি, কেবল গলফ ক্লাব রোডে কাঠা পাঁচেক জমি সংগ্রহ করে রেখেছেন। একবার বাড়ির জন্যে অনেকখানি তোড়জোড় আরম্ভও করে দিয়েছিলেন, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, জমির দর বাড়ছে। তখন অমিয় মজুমদারের মনে হল, পাঁচ গুণ বেশী দামে জমিটাকে বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। অতএব জমি বেচে সেই পাঁচগুণ লাভ করবেন না বাড়ি করবেন, এখনো এই দো-টানার মধ্যে তাঁর দিন কাটছে।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটিও মন্দ নয়। তেতলা, ভাড়া একশোর নীচেই। প্রায় ত্রিশ বছর আছেন—যুদ্ধের বাজারে ভাড়া গোটাকুড়িক টাকা বাড়িয়েছে বাড়িওলা। অমিয় মজুমদার আপত্তি করেননি। বারখানা ঘর, পুব-দক্ষিণে খোলা, সামনে পার্ক, তিনি ছেড়ে দিলে কম করে সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার হবে বাড়িওলার।

সুপ্রিয়া কাকার কাছেই থাকে।

অমিয় মজুমদার এই ভাইঝিটিকে বিশেষ ভালবাসেন। তাঁরও এককালে গান-বাজনার শখ ছিল, ওকালতির চাপে সেটা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। তাঁর ছেলেমেয়েরাও গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে উঠুক, এ ছিল তাঁর মনাগত বাসনা। কিন্তু বড় ছেলে হল হকি খেলোয়ার। মেজোটি হল এমন অসাধারণ ভাল ছেলে যে গান-বাজনা দূরে থাক, থিয়েটার সিনেমায় পর্যন্ত তার রুচি নেই, এখনো বি-এ পাশ করেনি, এর মধ্যে মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটেছে আর কেওড়াতলায় কোন্ এক বাবা কালিকানন্দের আশ্রমে যোগ দিয়ে কোরাসে কালীর মালসী গাইছে। অমিয় মজুমদার সেটাকে কিছুতেই গান বলে স্বীকার করতে রাজী নন। ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ে, রবীন্দ্র-সংগীত শিখছে। অমিয়বাবুর ঠিক ক্ল্যাসিকাল নইলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

একমাত্র মেয়ে রেবার গানের গলা নেই, তাকে সেতার শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিনে এনেছেন দুশো টাকা দামের এক তরফদার সেতার। আজ তিন বছর ধরে রেবা সেতার শিখছে। কেমন শিখছে শোনবার জন্যে কৌতূহল হয়েছিল একবার। কিন্তু মিনিট দুই শুনেই বুঝতে পারলেন দুশো টাকার সেতারটা না কিনলেই চলত। রেবা লোককে শোনাবার মত একটা যন্ত্রই বাজাতে পারে—সে হল গ্রামোফোন।

অমিয় মজুমদার সেদিন হিংস্রভাবে সারা রাত মোটা মোটা আইনের বই পড়েছেন, পড়েছেন অসংখ্য জটিল চীটিং কেসের বিবরণ। এত জিনিস সংসারে থাকতে বেছে বেছে ও-গুলো যে কেন পড়তে গেলেন, তার উত্তর একমাত্র তিনিই জানেন। সারা পৃথিবীটাই অসঙ্গতভাবে তাঁকে ঠকিয়েছে, হয়ত এমনি কিছু একটাই তাঁর মনে হয়ে থাকবে। স্ত্রী শোবার কথা বলতে এসেছিলেন, গোটা দুই ধমক দিয়েছেন তাঁকে, মাঝ রাত্রে একটুকরো দাম্পত্য কলহ হয়ে গেছে।

"গান কোত্থেকে হবে? মামাবাড়ির দিকটাও তো দেখতে হয়।"

"আমার বাপের বাড়ির বদনাম কর না।" স্ত্রী চটে উঠেছেন, "আমার দাদা—"

"জানি, জানি, আই-এ-এস। তোমার বাবা এম-আর-সি-পি। তোমার ছোট ভাই ডি-এসসি। ইচ্ছে করলে আরো অনেক বলতে পার। কিন্তু গানের দিক থেকে সব একেবারে গন্ধর্ববংশাবতংস! গলার আওয়াজ শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সুরকে ধ্বংস করবার জন্যে এদের আসুরিক

আবির্ভাব। তোমার ছেলেমেয়েরাই সেদিক থেকে মামাবাড়ির রাস্তা ধরেছে।"

স্ত্রী রাগ করে চলে এসেছেন। রাত দুটো পর্যন্ত কল চালিয়ে খামোখা ডজন দুই বালিশের ওয়াড় সেলাই করেছেন—কোনো দরকার ছিল না।

তাই সুপ্রিয়া কলকাতায় পড়তে এলে ভারী খুশি হয়েছেন অমিয় মজুমদার।

"অসুরের দেশে সুরের লক্ষ্মীর আবির্ভাব হল।"

ব্যাপারটায় সব চাইতে বেশী হিংসা হবার কথা ছিল সুপ্রিয়ার সমবয়সী রেবার। কিন্তু অমিয়বাবুর চাইতেও রেবা নিজে অনেক ভাল করে জানত যে, সেতার-টেতার তাকে দিয়ে হবে না। একবার কলেজের সোস্যালে বাজাতে গিয়েই সেটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল।

তাই সুপ্রিয়া আসবার কয়েকদিন পরেই রেবা বলেছিল, "কিছু যদি মনে না করিস, তোকে একটা প্রেজেন্ট করতে চাই সুপ্রিয়া।"

"প্রেজেন্ট করবি—তাতে মনে করতে যাব কেন? এ ত খুশী হওয়ার খবর।"

"নিবি তা হলে?"

"নির্ঘাৎ।"

"তবে নিয়ে নে। ভোম্বল হালদারকে।"

"ভোম্বল হালদার।" সুপ্রিয়া হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, "সে আবার কে? তা ছাড়া পৃথিবীতে এত ভাল ভাল জিনিস নেবার থাকতে ও-রকম বিশ্রী নামওলা একটা লোককে নিতেই বা গেলাম কেন?"

"নামটা বিশ্রী বটে—" রেবা গম্ভীর হয়ে বললে, "লোকটা নিদারুণ গুণী। পঁয়ত্রিশটা মেডেল আছে। নামজাদা সেতারী। আমাকে সেতার শেখান। আঙুল টনটন করে, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জো হয়, তবু ছাড়তে চান না। তুই ওঁকে নে। মনের মত শিষ্যা পেলে উনিও খুশী হবেন, আমারও হাড়ে বাতাস লাগবে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ ভাই। একেবারে মনের কথা বলছি তোকে। সেই সঙ্গে আমার সেতারটাও দিয়ে দেব তোকে। ফাউ।"

রেবার আন্তরিকতায় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু উপহারটা নেওয়া সম্ভব হল না সুপ্রিয়ার। তবে নিদারুণ ভাব হয়ে গেছে দুজনের। সুপ্রিয়া যেবার বি-এ পাশ করল ডিসটিংশনে সেবারে চমৎকারভাবে ফেল্ করল রেবা। অমিয় মজুমদার একটা কথাও বললেন না, ঘরে গিয়ে আবার চীটিং কেসের বিবরণ নিয়ে বসলেন। আর ভাবতে লাগলেন, আইনের এখনো অনেক অ্যামেন্ড্মেন্ট্ দরকার, সব রকম চীটিং এর আওতায় পড়ে না।

শুধু স্ত্রীকে একবার গম্ভীর গলায় বললেন, "আই-এ-এস্, এম-আর-সি-পি, ডি-এস্‌সি মামাবাড়ি কী বলে?"

স্ত্রী বললেন, "সব কৃতিত্বটুকু মামাবাড়িকেই দিচ্ছ কেন? বাপের বাড়িও কিছু পেতে পারে।"

"বাপের বাড়ি!" উত্তেজিত হয়ে অমিয়বাবু বললেন, "বাপের বাড়িতে কেউ কখনো ফেল করেনি। তারা আই-এ-এস হয়নি বটে, কিন্তু পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। তারা—"

রেবা এই পর্যন্ত শুনেই চলে এসেছিল। সোজা সুপ্রিয়ার ঘরে।

আশ্চর্য মেয়েটা। রেবার জন্যে সমবেদনায় সুপ্রিয়া যখন ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে, তখন হাসির ঝঙ্কারে সমস্ত ঘরখানা রেবা ভরে তুলল।

"সত্যি—বাবা-মার ঝগড়া দারুণ ইনটারেসটিং। ফাইন—আর্টিস্টিক ব্যাপার।"

"ফেল করে তোর দুঃখ হচ্ছে না রেবা?"

"বিন্দুমাত্র নয়। পাশ করলেই দুঃখিত হতাম ইউনিভার্সিটির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।" রেবা সুপ্রিয়ার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল, "আসল কথা কী, জানিস? বাবার উচিত এবারে আমার বিয়ে দেওয়া।"

"ছিঃ ছিঃ।" সুপ্রিয়া লাল হয়ে উঠল, "তোর লজ্জা করছে না এসব বলতে?"

"তার চাইতেও লজ্জা হচ্ছে বাবার টাকা আর ভোম্বলদার পরিশ্রম নষ্ট হচ্ছে বলে। তোকে সত্যি কথা বলি, ভাই। আমি খুব ভাল গিন্নী হতে পারব।"

"বটে?"

"তুই দেখিস। এমন ভাল বাজারের হিসেব রাখব যে, চাকরে একটা পয়সা সরাতে পারবে না। কোর্টে যাওয়ার সময় কর্তা দেখবেন তাঁর কোট-ট্রাউজারের একটা বোতামে গোলমাল নেই। গয়লা জোলো দুধ দিয়ে পার পাবে না। ধোপা যদি একটা জিনিসও খুইয়েছে, তা হলে আমার হাতে তার নিস্তার নেই। ছেঁড়া মোজা সেলাই করার ব্যাপারে আমার অ্যাচিভ-মেন্ট দেখে পাড়ার ঝানু গিন্নীদেরও তাক লেগে যাবে।"

সুপ্রিয়া হেসে উঠল।

"হাসির কথা নয়, খুব সিরিয়াসলি বলছি। পৃথিবীতে সব কাজ করবার জন্যে সবাই আসে না। একদল মেয়ে জন্মায় গিন্নী হবার জন্যে, আর একদল জন্মায় না-হওয়ার জন্যে। আমি প্রথম দলের। বাবা সেটা বোঝেন না—তাই এখনো আমার বিয়ে দিচ্ছেন না।"

"বলিস ত আমি বাবাকে জানাতে পারি।"

"আমার আপত্তি নেই। তবে জানিস ত, বাবা উকিল মানুষ। সোজা জিনিসটাকে ঠিক উলটো দিক থেকে দেখবেন। নির্ঘাৎ মনে করবেন আসলে বিয়ের ইচ্ছাটা তোরই; নিজে বলতে পারিসনে, তাই আমার ওপরে চাপাচ্ছিস। আর বিকেলেই দেখবি প্রসপেকটিভ্ বর আর তাদের বাবা-দাদাদের পায়ের ধুলো পড়তে শুরু হয়েছে।"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "ভালই ত। আমিও বিয়ে করে ফেলব।"

"উঁহু—সে হবে না।" রেবা মাথা নাড়ল।

"কেন হবে না? আমিও তো গিন্নী হতে পারি।"

"না। যারা গিন্নী না হওয়ার জন্যেই জন্মায়—তুই সেই দলের।"

"বলিস কী! আমার কোনো আশা নেই?"

রেবা হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারল না। কী মনে করে কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "আমার কী মনে হয়, জানিস? তোকে সবাই খুঁজবে, কিন্তু তুই কাউকে চাইতে পারবি না। তোর কাছে অনেকে আসবে, কিন্তু তোর মনে হবে, তারা সবাই যেন এক-একটা টুকরো। সকলকে মিলিয়ে একজন মানুষকে তুই পেতে চাইবি, কিন্তু সেই মানুষটি তোর জীবনে কোনোদিন ধরা দেবে না।"

কী মনে করে একসঙ্গে এতগুলো কথা রেবা এমন করে সাজিয়ে বলে গেল সে-ই জানে। হয়ত বলার জন্যেই বলা, হয়ত এমনি ভারী ভারী কথা বললে নিজের কানেই শুনতে ভাল লাগে—তাই বলা। কিন্তু এই মুহূর্তে একবারের জন্যে সুপ্রিয়ার মুখের সমস্ত রক্ত সরে গেল, একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। এক মুহূর্তে। ঘরের বাতাসটা হঠাৎ থমথম করতে লাগল।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অভিশাপ দিচ্ছিস?"

"না—দুশ্চিন্তা হচ্ছে।" রেবার মুখে ছায়া নেমে এল, "সত্যি বলছি, তোর সম্বন্ধে প্রায়ই এমনি একটা ভয় আমার মনে ভেসে ওঠে। ভাবি, তোর নামের সঙ্গে জীবনেরও কোথাও একটা মিল আছে। তুই প্রিয়াই বটে—কিন্তু কোনো জীবনেই বুঝি তুই স্থির হয়ে থাকতে পারবি না—ঘর বাঁধতে পারবি না কোথাও।"

আবার সেই থমথমে আবহাওয়া। জানলার বাইরে পার্কের পাশে পাম গাছের পাতা কাঁপছে। যেন একটা কংকালের আঙুলে হাতছানি দিচ্ছে বাইরে থেকে।

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "একটা কথার জবাব দিবি?"

"বল।"

"জীবনে ক'জন মানুষকে আজ পর্যন্ত তোর ভাল লেগেছে?"

সুপ্রিয়ার শঙ্খের মত সাদা মুখখানা পাথরের মূর্তির কয়েকটা কঠিন রেখায় স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সুপ্রিয়া বললে, "আজ এ-সব কথা থাক—বড় মাথা ধরেছে।"

দুর্গাশংকরের ওখান থেকে ফিরে নিজের ঘরে কাপড় বদলাচ্ছিল সুপ্রিয়া। উত্তেজিত-ভাবে রেবা এসে উপস্থিত হল।

"জানিস—আজ কে এসেছিল তোর খোঁজে?"

"কে?"

"লখনউয়ের দীপেন বোস।"

"দীপেন বোস!"

"বাঃ—চিনতে পারিসনি? তোর বাবা যখন লখনউয়ে থাকতেন—তখন ওঁরা নাকি তোদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। খুব পরিচয় ছিল নাকি তোদের সঙ্গে। চিনতে পারিসনি?"

সুপ্রিয়া ক্লান্ত হাসি হাসল, "চিনব না কেন? অত বড় গাইয়ে, ওঁর 'আয়ি রে গগনমে কারী বদরিয়া' তো সারা ভারতবর্ষের লোকে গুনগুন করে। তা দীপেনদা কলকাতায় কেন?"

"কী একটা কনফারেন্সে এসেছেন। নর্থ ক্যালকাটায়।"

"বুঝেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম বটে। কিন্তু দীপেনদার নাম ত চোখে পড়েনি। উঠেছেন কোথায়?"

"পার্ক সার্কাসে। ঠিকানা রেখে গেছেন। তবে কাল সকালে নিজেই আসবেন আবার।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেন বোস। জীবনে আর এক গ্রন্থি।

"একদিন আমাদের এখানে গান গাইতে বলিস না! অত বড় গাইয়ে। বাবা ওঁদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা মীটিঙে গেছেন, দীপেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনলে ত লাফিয়ে উঠবেন। তোর সঙ্গে এত পরিচয়, বললে গাইবেন না এখানে?"

"বলে দেখব।"

রেবা চলে গেল। আয়নার সামনে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর এক গ্রন্থি। আশ্চর্য, দীপেন বোসের এখনো তাকে মনে আছে!

ম্যাট্রিকের পর। বাবা লখনউয়ে পোস্টেড। ওঁর চাকরিটা বড় গোলমেলে—ছ মাস এখানে ছ মাস ওখানে। তাই বাবা বাইরে বাসা করেন না, ওরা দেশেই থাকে। কিন্তু সুপ্রিয়া যেবার পরীক্ষা দিল সেবার হঠাৎ শক্ত অসুখে পড়লেন বাবা। মা-র সঙ্গে লখনউয়ে গেল সুপ্রিয়া।

দুখানা ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। পাশের বাড়িতেই দীপেন বোসেরা থাকত।

থাকত বলেই সে-যাত্রা রক্ষা। তারাই দেখাশোনা সেবাযত্ন করেছিল। নইলে ওরা গিয়ে বাবাকে হয়ত দেখতেই পেত না। আর সব চাইতে বেশী সেবা করত দীপেন বোস। রাত জেগে হাওয়া করত, ওষুধ খাওয়াত ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মাঝরাতে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনত।

বাবার অসুখ সারল এক মাসেই। এর মধ্যেই দুই পরিবারের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একদিন দীপেন বললে, "শুনলাম, তুমি গান গাইতে পার সুপ্রিয়া। শোনাও আমাকে।"

"আপনাকে? আপনি এত বড় গাইয়ে—"

"বড় গাইয়ে হলেই ছোট গাইয়ের গান শুনতে নেই এমন কথা শাস্ত্রে লেখে না। তানপুরো চলবে?"

"চলবে।"

"নাও তবে—"

গাইতেই হল অগত্যা। মীরার ভজন। গ্রামের ওস্তাদ সারদা দাসের সব চেয়ে প্রিয় গানটি।

দীপেন সংগত করছিল। গান শেষ হলে কিছুক্ষণ দুটো উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়ার দিকে। পনের বছরের কিশোরী। শঙ্খের মত শাদা রঙ। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো একটু লালচে। কিন্তু তাই বলে চোখদুটো পিঙ্গল নয়—গভীর কালো। পরনে সাদা জরিপাড়ের শাড়ি। ঠিক সরস্বতীর মূর্তির মত মনে হচ্ছিল।

দীপেন বললে, "গলায় গান নিয়েই জন্মেছ তুমি। কোনো ভাবনা নেই তোমার।"

সেই শুরু। শেষ পর্যন্ত :

"যদি বলি, তোমাকেই আমার সব চেয়ে বেশী দরকার?"

দু পা সরে গেল সুপ্রিয়া। দীপেনের ঘর। বাইরে মাঝরাতের মত দুপুর। ঘরে আর কেউ ছিল না। দীপেনের চোখে মাতলামির রঙ মাখানো।

"কী বলছেন আপনি?"

"তুমি চলে এস আমার কাছে।"

"কেমন করে আসব?"

"গানের ভেতর দিয়ে। আমার যা আছে সব দেব তোমাকে। আরো যা পাব—তা-ও এনে দেব।"

"এসব কী কথা দীপেনদা?"

"আমাকে বিয়ে কর তুমি। আমার গানে তুমি প্রেরণা হও। তোমার ছোঁয়ায় আমার সুর আরো সুন্দর হয়ে উঠুক। সুপ্রিয়া—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।"

সুপ্রিয়া কাঁপতে লাগল। দীপেনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে এল তার :

"কিন্তু তা কী করে হয় দীপেনদা? আপনার যে স্ত্রী আছে।"

"স্ত্রী আছে, কিন্তু সঙ্গিনী নেই। গান আছে, কিন্তু গানের লক্ষ্মী নেই। সেই জায়গা তুমি নাও।"

"বাবা রাজী হবেন না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি—"

"বেশ ত, আমি অপেক্ষা করব। তুমি সাবালিকা হয়ে ওঠ। তখন আর কোথাও কোনো বাধা থাকবে না। আমাকে কথা দাও সুপ্রিয়া—"

ঠিক এই সময় বাড়ির চাকর কয়েকটা চিঠিপত্র নিয়ে এসেছিল। যেন চকিতের ভিতরে একটা কঠিন জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল

সুপ্রিয়ার, মুক্তি পেয়েছিল ভয়াবহ একটা সম্মোহনের গ্রাস থেকে।

"আচ্ছা—ভেবে বলব—"

সুপ্রিয়া ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল একরকম। চাকরটা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে, যেন কী একটা বুঝতে চাইছিল। আর চলে যেতে যেতেও সুপ্রিয়া অনুভব করছিল, দুটো উত্তপ্ত জ্বলন্ত চোখ পিছন থেকে সমানে তাকে অনুসরণ করে আসছে।

দু-দিন পরেই তারা ফিরে এসেছিল দেশে।

দীপেনের খান তিনেক চিঠি এসেছিল তারপরে। মা'র নামে। ওদের কুশল জানতে চেয়েছিল। অবশ্য তার ভিতরে গোটা কয়েক লাইন ছিল সুপ্রিয়ার জন্যেও।

"কেমন আছ? গান শেখা চলছে ত ভাল? আমাকে চিঠি লেখ না কেন?"

মা সেগুলো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়া কোনো জবাব দেয়নি। জবাব দেবার সাহস ছিল না তার।

পাঁচ বছর পরে দীপেন বোস এসেছে কলকাতায়। তার খবর জানতে চায়। কী খবর চায় দীপেন বোস—কী বলবে তাকে? সেই মাতলামি-ভরা দুপুরটার কথা কি এখনো সে ভুলে যায়নি? এখনো কি সেদিনের সেই নেশাটা তার মাথার ভিতরে জমাট বেঁধে আছে? আজও কি দীপেন বোস তাকে আবার বলবে, "আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এখন ত তুমি বড় হয়ে গেছ আর কোথাও ত কোনো বাধা নেই।"

সুপ্রিয়া পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, আজ একটা চিঠি লিখবে কান্তিকে। আর মনে মনে অনেকগুলো কথা সাজিয়ে রাখবে অতীশের জন্যে। কাল যখন বকুলতলায় এসে অতীশ অপেক্ষা করবে তার জন্যে, তখন সেই সব কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেবে তাকে।

কিন্তু আজ আর কিছু হবে না, কিছুই না। সারা রাত চোখের সামনে একটা ছায়া দুলবে আজ। দীপেন বোসের ছায়া। লখনউ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সেই বিরাট ছায়াটা একটা বিশাল কালো রাত্রির মত জমাট বাঁধতে থাকবে—তার ভিতরে কান্তি আর অতীশের মুখ কোথায় হারিয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

অতীশ মেসে ফিরে এল।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড় থেকে কাঁকুলিয়া পর্যন্ত হেঁটে এসেছে—অনেকখানি রাস্তা। ট্রামে বাসে চড়েনি, নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই চাইছিল কিছুক্ষণ।

সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় কলেজের বার্ষিক উৎসবে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল অতীশ।

"আপনি এত ভাল গান গাইতে পারেন। নিজেকে কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন?"

সুপ্রিয়ার হয়ে জবাব দিয়েছিল সেকেন্ড ইয়ারের কেকা রায়।

"খোঁজার কাজ ত আপনার। সেই জন্যেই ত আমরা আপনাকে ভোট দিয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারি করেছি।"

"ঠিক কথা। আমি লজ্জিত।" কলেজের রত্ন, বি এস-সি অনার্সের সেরা ছাত্র সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আত্মপ্রকাশ যখন একবার করেছেন, তখন আর আত্মগোপন করতে পারবেন না। সরস্বতী পুজোর ফাংশনেও কিন্তু আপনাকে গাইতে হবে—বায়না দিয়ে রাখলাম।"

জীবনের সবচেয়ে পুরনো গল্পটা আবার নতুন করে শুরু হল।

আরো তিন বছর কেটে গেল এর মধ্যে। অতীশ এম এস-সি পাশ করে রিসার্চ করছে, সুপ্রিয়া বি-এ পাশ করে নিয়েছে স্কুল-মাস্টারি আর গান শেখার কাজ।

অতীশ বলেছিল, "এম-এ পড়লে না কেন?"

"কী হবে পড়ে?"

"সে কী কথা। তা হলে বি-এ পাশ করলে কেন?"

"ওটুকু প্রসাধন বলতে পার। ভদ্র-সমাজে বেরুতে গেলে নিজের ওপর যেটুকু কারুকাজ করে নিতে হয়, ঠিক তাই। ও ছাড়া ও ডিগ্রিটার আর কোনো অর্থ নেই আমার কাছে।"

"কিন্তু স্কুল-মাস্টারি তো নিয়েছ। চাকরিই যদি করতে হয়, তা হলে এম-এটা কি আরো বেশী দরকার নয়?"

"সর্বনাশ। এর পরে তুমি হয়ত আমায় বি-টিও পাশ করতে বলবে। অর্থাৎ একেবারে আপাদ-মস্তক মাস্টারির ছাপ নিজের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না!"

"তা হলে কী চাও তুমি?"

"গান শিখতে। চাকরি করছি কেবল হাত-খরচার জন্যে, ও নিয়ে আমার বাবার ওপরে চাপ দিতে ইচ্ছে করে না। যেদিন শেখা হয়ে যাবে, সেদিন আর এত সহজে আমায় দেখতে পাবে না।"

"কোথায় যাবে?"

"সারা হিন্দুস্থানে। তামাম গুণী-জ্ঞানীর দরবারে।"

"সেখানে আমি যেতে পারব না?"

"সাধ্য কী! তোমার সোনার মেডেলগুলো সেখানে অচল। প্রকাণ্ড আসরে আমি গাইব, সেরা ওস্তাদেরা সঙ্গত করবে, সমজদারদের মাথা দুলবে, থেকে থেকে উঠবে ঃ আহা-হা—সাবাস-সাবাস। সামনে ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলবে ঘন ঘন। কুড়ি টাকার টিকেটও হয়ত তুমি কিনতে পারবে না।"

"কুড়ি টাকার টিকেটও না?"

"না। যাদের মস্ত ব্যবসা, অনেক টাকা, অনেক বড় বড় মোটরগাড়ি, তারা আগে থেকেই সব সীট বুক করে রাখবে। তুমি বরং রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাইকে আমার গান শুনতে পাবে। দেখতে পাবে না আমার পায়ের কাছে এসে পড়ছে বড় বড় ফুলের তোড়া, আর হাতে পাঁচ-সাতটা হীরের আংটিপরা বড়লোকের দল কী ভাবে আমাকে স্তুতি করে বলছে ঃ আপনার গান শুনে দিল্ ভারী খোস্ হল। অ্যায়সা মিঠা গানা কোখোনো হামি শুনেনি।"

অতীশ হাসবার চেষ্টা করেছিল, "ততদিনে ব্যবসা করে আমিও তো বড়লোক হতে পারি। আমিও তো গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে বলতে পারিঃ বড় খাসা গেয়েছেন—শুনে বড় খুশ্ হলাম!"

"হবে না—সে আশা নেই। ল্যাবরেটরিই তোমার মাথা খেয়েছে। তুমি বড় জোর একটা প্রোফেসর হবে। আর এ-কথা তুমি নিজেও নিশ্চয় জান যে, মিউজিক কনফারেন্সের টিকেট প্রোফেসারের মাইনের সীমানা থেকে অনেকখানি দূরে থাকে।"

কথাগুলো সেদিন হালকাই ছিল। কিন্তু আজ আর নয়। একরাশ মেঘের স্তূপ ঘনিয়ে আসছে মনের উপর। এই মাঝে মাঝে দেখাশুনো, বকুলতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি এগিয়ে দেওয়া, এক আধদিন সিনেমায় যাওয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশে এক-আধটা ছেঁড়া-ছেঁড়া সন্ধ্যা, এর বেশী আর কী পাবে অতীশ? কতখানিই বা পাবে?

মেসের ঘরে বসে অতীশ ভাবতে লাগল। পাশের সীটের ছেলেটি এবারে এম-এস-সি পরীক্ষার্থী, ঘাড় গুঁজে বসে আছে বইয়ের ভিতরে। ওর চশমার পাওয়ার মাইনাস সেভেন। পাশ করবার আগেই চোখ দুটো যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঠিক কথাই বলেছে সুপ্রিয়া। কী হবে পড়ে? এ-পথ ওর জন্যে নয়।

"চাকরি করার কথা ভাবতেই আমার বিশ্রী লাগে।" সুপ্রিয়া বলেছিল।

"এমন কথা বলছ এ-যুগের মেয়ে হয়ে?"

"এ-যুগের মেয়ে বলেই ত বলছি। জীবনে এত ঐশ্বর্য আছে, এত রূপ আছে, এত গান আছে। সেগুলো সব ফেলে দিয়ে কত দুঃখে মেয়েরা চাকরি করতে আসে, সে কি তুমি জান? আজ তোমরা আর তাদের ভালবাসার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে পার না, আশ্রয় দিতে পার না, সেই দুঃখেই ত তারা এমন করে বাইরে বেরিয়ে আসে।"

তর্ক করা চলত। সে-তর্কে সুপ্রিয়া জিততে পারত না। কিন্তু অতীশ কথা বাড়াল না। কী হবে বাড়িয়ে? সুপ্রিয়া নিজের কথা বলছে। ওর আশার কথা, ওর বিশ্বাসের কথা।

অতীশ জানে না কী হবে। সুপ্রিয়া সত্যিই চলে যাবে কাছ থেকে। বলেছে, আর দু-বছর। দু-বছর পরেই বেরিয়ে পড়বে। যাবে পুনা—যাবে বোম্বাই—তারপর দক্ষিণ-ভারত। কত শেখবার আছে। সারা ভারতবর্ষে গানের তীর্থ—গীতশ্রীর দেবালয়। সেই তীর্থে তীর্থে প্রদক্ষিণ করতে হবে তাকে, প্রণাম করতে হবে কত বিশ্বনাথের দেউলে, কত মহাকাল-মন্দিরে, কত কাঞ্চীভরমের জ্ঞানবাপী—গোপুরমে। কত গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে তার।

তার পথ সেই সারা ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে আছে। তার গান ছড়িয়ে আছে রাজপুতানার বিশাল মরুভূমিতে, আরব-সমুদ্রের কল-গর্জনে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের ত্রি-সমুদ্রের সংগম-রাগিণীতে। সেখানে কোথায় অতীশ, কতটুকু অতীশ!

শুধু একদিন সুপ্রিয়া বলেছিল, "যেখানে যাই, যতদূরেই যাই, তোমাকে আমি কখনো ভুলব না। যদি আর কাউকে নিয়ে কখনো ঘর বাঁধি—আমার বুকের ভেতরে তুমিই জুড়ে থাকবে।"

"সে ত আর একজনকে ঠকানো হবে সুপ্রিয়া।"

"সংসারে মানুষ [illegible] সব সময়েই এ-ওকে ঠকিয়ে চলেছে [illegible]। কেউ কম, কেউ বেশী। সবাই যা [illegible] তার জন্যে আমার লজ্জা নেই। যে পকেট মারে আর যে ব্যাংক লুঠ করায়, পাপের দিক থেকে তারা দুজনেই সমান।"

"এ-যুক্তি ভাল নয় সুপ্রিয়া। লোকে একে ইম্‌মর‍্যাল বলবে।"

"বলুক। পৃথিবীতে অনেক ভাল কথা আছে অতীশ, তার সবগুলো কেউ কোনো-দিন নিতে পারেনি। আমার দিক থেকেও নয় খানিকটা ফাঁক থেকেই গেল। যতদিন বাঁচব, আমি তোমাকেই ভালোবাসব অতীশ। আর একটা কথা বলি। যদি কখনো আমার সব চাইতে বড় দুর্দিন আসে, যদি তোমার কাছে আমি আশ্রয়ের জন্যে এসে দাঁড়াই, সেদিন তুমি ত আমায় ফিরিয়ে দেবে না?"

"তোমাকে ফিরিয়ে দেব সুপ্রিয়া? এ-কথা ভাবতে পারলে?"

"অতীশ, তুমিও মানুষ। ধর, তখন তুমি বিয়ে করেছ, তোমার সংসার হয়েছে। সেই সময় আমি যদি তোমার কাছে এসে বলি, আজ থেকে আমি তোমার কাছেই থাকব, তখন—"

"তোমার জন্যে আমি সব পারব সুপ্রিয়া। সকলকে ছেড়ে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে চলে যাব।"

"কথাটা নাটকীয় অতীশ। তবু শুনতে ভাল লাগছে। তা ছাড়া জীবনের সব মিষ্টি কথাই তো মিথ্যে কথা। সত্যের নিষ্ঠুরতার ওপরে ওইটুকু রঙের আবরণ। কিন্তু আমি মনে রাখব।"

অতীশ একটা নিশ্বাস ফেলল। পাশের সীটে ছেলেটি ঘাড় গুঁজে সমানে পড়ে চলেছে। চোখে মাইনাস সেভেন পাওয়ারের চশমা। পিঠটা উটের কুঁজের মত বেঁকে রয়েছে।

কী হবে পড়ে?

বাইরে হাওয়া উঠল। একটু দূরের শিরীষ গাছটার পাতায় মর্মর। রাজপুতনার মরুভূমি, বোম্বাইয়ের সমুদ্রতট, দক্ষিণা-পথের গ্র্যানিট পাথরে সমুদ্রের গান।

সুপ্রিয়ার গান।

॥ ৫ ॥

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে নিজের ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসে ছিল দীপেন বোস।

গীতা কাউর এসে ঢুকল। দীর্ঘচ্ছন্দা পাঞ্জাবী মেয়ে। সিল্কের সালোয়ার-পাঞ্জাবিতে গাঢ় লাল রঙের কয়েকটা ফুল। গলা জড়িয়ে নীল ওড়না।

"কী পাগলামি করছ দীপেন? প্লীজ—নো মোর।"

"হোয়াই? কেন আর না?" লাল টকটকে চোখ দীপেনের। বললে, "ইট্‌স নট্ ইয়োর বন্থে। আই হ্যাভ্ এভ্‌রি রাইট্ টু—"

"প্লীজ দীপেন—তোমার লিভার ভাল নয়।"

"মরে যাব বলছ? মরতেই ত চাই।"

দু-পা এগিয়ে গীতা কাউর বোতলটা কেড়ে নিলে। মাতালের কুৎসিত হাসি হেসে উঠল দীপেন।

"বাঁচতে দেবে না—আবার মরবার সুখ-টুকুও কেড়ে নিতে চাও?

বোতলটা নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল দীপেন, কিন্তু পারল না। হুড়মুড় করে টলে পড়ে গেল মেঝের উপর। গীতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে, তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

সকালে উঠেই একরাশ নোট নিয়ে বসে ছিল অতীশ। একটা জটিল ক্যাল-কুলেশনের জট খুলছে না কিছুতেই। অথচ এর রেজাল্টের উপর কাজের অনেকখানিই নির্ভর করছে।

সামনে চা ছিল এবং সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। সেটাতে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল দেশলাইয়ে কাঠি নেই।

সব দিক থেকেই বিরক্তির মাত্রাটা যেন চরম। পাশের সীটের মনোযোগী ছাত্রটির দিকে অতীশ একবার তাকাল। যদিও ও আদর্শ ভাল ছেলে—সিগারেট কেন, সুপুরির কুচিও চিবোয় না—তবু ওর বালিসের নীচে ঘোড়ার মুখ আঁকা একটা দেশলাই আছে, অতীশ জানে। কখনো কখনো অনেক রাতে ও মোমবাতি জ্বেলে পড়াশোনা করে।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ওর কাছে দেশলাই চাইবে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগেই দরজার গোড়ায় দেখা দিল মন্দিরা।

"আসতে পারি?"

"কী আশ্চর্য—আপনি!"—তটস্থ হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে গেল অতীশ। হাতের ধাক্কা লেগে খানিকটা ঠাণ্ডা চা ছলকে গেল অংকটার উপরে। ওপাশের সীট থেকে পড়ুয়া ছাত্র শ্যামলাল তার কড়া পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে ভ্রূকুটি হানল।

মন্দিরা ঘরে পা দিয়ে বললে, "বিরক্ত করলাম?"

"কিছুমাত্র নয়। আসুন।"

মন্দিরা এসে অতীশের বিছানার উপরে বসল। অতীশের একবার মনে হল, খবরের কাগজ দিয়ে বালিশ দুটোকে ঢেকে দিতে পারলে মন্দ হত না। ভারী নোংরা হয়ে গেছে ওয়াড়গুলো।

"কাজ করছিলেন?"

"করতে বাধ্য হচ্ছিলাম।" অতীশ হাসল।

"ভারী অন্যায় হল তা হলে।"

"একেবারেই না। আমাকে বাঁচালেন। ভাবছিলাম, সব ফেলে নিজেই উঠে পড়ব। কিন্তু এখন অন্তত একটা কৈফিয়তের সুযোগ রইল বিবেকের কাছে। আপনার অনারে অংকটাকে ছুটি দিয়েছি।"

"তার মানে আমাকেই অপরাধী করলেন শেষ পর্যন্ত।"

"ওই দেখুন!" হাতের সিগারেটটা ঠোঁটের কোনায় ছুঁয়ে, তারপরে দেশলাই নেই সে-কথা মনে করে, অতীশ সেটাকে নামিয়ে রাখল। বললে, "আপনাদের কাছে সিন্‌সিয়ার হওয়ারও জো নেই। আপনারা কেবল সাজান মিথ্যে-কথা শুনতেই ভাল-বাসেন।"

শ্যামলাল ছটফট করে উঠল। পরে চশমার মধ্য থেকে একটা বিস্বাদ দৃষ্টি ফেলল অতীশের দিকে। তারপর দুখানা মোটা মোটা বই তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্দিরা কিছু একটা অনুমান করল। সংকুচিত হয়ে বললে, "উনি বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।"

"বিরক্ত নয়—ব্যথিত হয়েছেন।" বলেই অতীশ শ্যামলালের বালিসের তলা থেকে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়ার মুখ আঁকা দেশলাইটা সংগ্রহ করল।

"ব্যথিত কেন? পড়ার বাধা হল বলে?"

"শুধু তাই নয়। পড়াটাকে ও তপস্যা বলে মনে করে। সেই তপস্যার ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব ঘটলে ওর ব্রতভঙ্গ হয়।"

"ছিঃ—ছিঃ—আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন?"

"কিচ্ছু ভাববেন না।" সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা আবার শ্যামলালের বালিসের তলায় চালান করে দিয়ে অতীশ বললে, "ওর চিত্তশুদ্ধির জায়গা আছে। সেখানেই গেছে।"

"সে আবার কোথায়?"

"তেতলার ওপরে—চিলেকোঠায়। সেখানে ঘুঁটের স্তূপ আছে। তারই ওপরে গিয়ে বসবে শ্যামলাল। শরীর পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর শান্ত চিত্তে কেমিস্ট্রির রসে তলিয়ে যাবে।"

মন্দিরা শব্দ করে হেসে উঠল।

"আপনি ওঁকে প্রায়ই বিরক্ত করেন বলে মনে হয়।"

"আমি?" অতীশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, "নিজের চারদিকে ওর এমন শক্ত খোলা আছে যে, পৃথিবীর কেউ ওকে বিরক্ত করতে পারবে না। তেমন অসুবিধে বুঝলে ও নিজেকেই গুটিয়ে নেবে তার মধ্যে। আমার সম্পর্কে ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। ওর ধারণা আমি ফাঁকি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছি—রিসার্চ করি না, ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াই।"

"নিদারুণ ভাল ছেলে!" মন্দিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "দিন না আলাপ করিয়ে। আমি কেমিস্ট্রিতে বড্ড কাঁচা। একটু দেখেটেখে নেব ওঁর কাছ থেকে।"

"তার মানে ওই ঘুঁটের ঘরেই ওকে পাকাপাকি নির্বাসিত করতে চান? ও কি আর ওখান থেকে নামবে তা হলে? লাভের মধ্যে বিছেটিছের কামড় খেয়ে একটা কলেঙ্কারি করে বসবে।"

মন্দিরা আবার হেসে উঠল। "আপনি সাংঘাতিক। কিন্তু একটা কথার জবাব দিন ত? আমাদের বাড়িতে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন কেন?"

"সময় পাই না।"

"থীসিসের জন্যে?"

"খানিকটা। প্রায়ই ল্যাবরেটরি থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়।"

"রবিবার?"

"ঘুমুতে চেষ্টা করি।"

"সারাদিন?"

"ইচ্ছেটা তাই থাকে বটে, তবে পেরে ওঠা হয় না।" অতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "অবিমিশ্র সুখ বলে সংসারে কিছু নেই জানেন তো? প্রায়ই শ্যামলালের আর একটি সীরিয়াস বন্ধু এসে জোটে—দুজনে মিলে কেমিস্ট্রি নিয়ে নিদারুণ চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।"

"তখন বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয়—এই ত? তা সে-সময় আমাদের ওখানে চলে এলেই পারেন।"

"ঘুমুবার জন্যে?"

মন্দিরা বললে, "নাঃ—আপনি হোপলেস। ও-সব থাক। যা বলতে এসেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।"

"কেন আসছি?"

"ছোড়দা কেম্‌ব্রিজ থেকে ট্রাইপস নিয়ে ফিরেছে—শুনেছেন আশা করি। আজকে রিসেপ্‌শন আছে তার।"

একটু চুপ করে রইল অতীশ। বললে, "আচ্ছা, চেষ্টা করব।"

"কোনো কাজ আছে?"

"একটুখানি।"

মন্দিরার মুখে অল্প একটু ছায়া পড়ল। "কাজটা জরুরী?"

"খানিকটা।"

"আসতে পারি?"

"ও।" মন্দিরা হাতের ব্যাগটার কারু-কার্যের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চামড়ায় খোদাই-করা নটরাজের মূর্তি। আঙুলের ঘামে ফিকে হয়ে এসেছে।

"তা হলে আসছেন না?"

"বললাম ত চেষ্টা করব।"

এতক্ষণের লঘু আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। একটা শিথিল ক্লান্তিতে অতীশ যেন পীড়িত বোধ করল, এতক্ষণের প্রগলভতাগুলোকে অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে হল। আর মন্দিরার মনে হল, সকাল-বেলাতেই তার এভাবে এখানে চলে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না—একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই চলত।

"বেশ, চেষ্টা করবেন।" মন্দিরা উঠে দাঁড়াল, "তা হলে আসি আজ।"

"এক্ষুনি চললেন?"

"হ্যাঁ—আমাকে আরো কয়েক জায়গায় বলে যেতে হবে।"

মন্দিরা বেরিয়ে গেল। ওকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে হত—অতীশ একবার ভাবল। কিন্তু কী লাভ হত তাতে? অপরাধের মাত্রা এতটুকুও কমত না।

দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র। কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই! এক বছর আগেই মন্দিরার চোখ দেখে অতীশ তা বুঝতে পেরেছে। আর সেই থেকেই যাতায়াতের মাত্রা সে কমিয়ে দিয়েছে ও-বাড়িতে।

অবশ্য সুপ্রিয়া না থাকলে অন্য কথা ছিল।

মন্দিরাকে ঠিক খারাপ লাগে তা নয়। অন্তত দুটি ঘণ্টা চমৎকার কাটতে পারে ওর সঙ্গে। অজস্র কথা বলা যায়, উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করা চলে। কখনো একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার মুহূর্ত এলে, কিংবা একটা গভীরতা এসে মনকে জড়িয়ে ধরলে, চুপ করে বসে থাকা যায় ওর পাশে। যে এক-একটা আশ্চর্য একান্ত দুঃখ কাউকে বলা চলে না, কাউকে বোঝানো যায় না, হয়ত সে-কথাও বলা যায় ওকে। এমনকি, মন্দিরার একখানা হাত নিজের হাতেও টেনে নেওয়া যায়; তার মধ্যে বিশ্বাস থাকে, বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি থাকে।

অতীশ থামতে পারে ওখানেই। মন্দিরার বিয়ের দিনে সে খুশী হয়ে পরিবেশনের কাজে নেমে পড়তে পারে, শুভদৃষ্টির সময় মন্দিরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে সে বলতে পারে, "চোখ মেলে তাকাও, দ্যাখো তোমার পছন্দ হয় কিনা।" ট্রেনে তুলে দিয়ে বলে আসতে পারে, "মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ো, একেবারে ভুলে যেয়ো না।"

কিন্তু অতীশ জানে, মন্দিরা তা পারে না। মেয়েদের মনের সমুদ্রে যে-ঢেউ ওঠে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না রেখার সীমানাতে। পুরুষ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে: কিছু স্নেহে, কিছু প্রেমে, কিছু বন্ধুত্বে। কিন্তু মেয়েরা বয়ে চলে একটি ধারায়, একমাত্র খাতে। নিজেকে তারা টুকরো টুকরো করে দিতে জানে না। যা দেয়, তা একসঙ্গে, একবারেই।

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

এ-ধরনের কথা অনেক শুনেছে অতীশ। হাসি পায়। ইয়োরোপের মেয়েদের কথা ঠিক জানে না। হয়ত একটার পর একটা যুদ্ধে, চারদিকের ঘূর্ণির আঘাতে আঘাতে, তারা প্রেম আর বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছে। কিন্তু এই দেশে, যেখানে একটুখানি কৌতুকের ছোঁয়ায় মেয়েদের গালে রঙ ধরে, ভারী হয়ে নেমে আসে চোখের পাতা, একটু পরিচয় আর একটু নিঃসঙ্গতার অবকাশ ঘটলে যেখানে গলার স্বর জড়িয়ে আসে, সেখানে—

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

সেই বন্ধুত্বের পরিণামে বিয়ের সানাই, নইলে রেজিস্ট্রেশন অফিসের এগ্রিমেন্ট ফর্ম। আর নইলে পরীক্ষায় ফেল করা, মাসখানেক উদাস হয়ে বসে থাকা, নিতান্তই গদ্য-সর্বস্বের হাতে কাব্যচর্চার ভয়ংকর প্রয়াস, দিনকয়েক দাড়ি রাখা। একজনকে চটে-মটে নোলোক-পরা একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে দেখেছিল, আর একজন বেসুরো বেহালা বাজিয়ে পাড়ার লোককে ঝালাপালা করে তুলেছিল।

অতীশ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। একটা ছোট কাঁটা এসে বিঁধছে কোথা থেকে। মন্দিরার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে বেশ হত। ওর কাছে মন খুলে বলা যেত সুপ্রিয়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউকে রেখার ওপারে থামিয়ে রাখা চলে না।

কিন্তু সত্যিই কি থামিয়ে রাখা চলে না?

সুপ্রিয়া বলেছিল, "একটা সত্যি কথা বলব?"

"বল।"

"কষ্ট পাবে না?"

"সেটা তুমিই জান। কিন্তু কষ্ট যদি সত্যিই পাই, তা হলে না-ই বা বললে। দু-একটা মিথ্যে কথাই না হয় বানিয়ে বল, শুনে খুশী হতে চেষ্টা করব।"

"ঠাট্টা নয়।" গড়ের মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার বটগাছের দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, তা তুমি জান।"

"এইটেই তোমার সত্যি কথা? তা হলে আরো অনেকবার করে বল। আমার যত কষ্টই হক, আমি প্রত্যেকবারই রীতিমত মন দিয়ে শুনব।"

"না—তা নয়।" সুপ্রিয়ার চোখ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, "আমি আর একজনকেও ভালবাসি।"

চমক লাগল। তবু হার মানল না অতীশ। বেদনার উপর দিয়ে বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। "রানীর ভাণ্ডারে অনেক আছে; অনেককেই সে দু-হাতে দান করতে পারে।"

"তোমার হিংসে হচ্ছে না?"

"অত বড় মিথ্যে কথা বলি কী করে? আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে ফাঁক না থাকলেই হল।"

"ফাঁক ত থেকেই গেল। সম্পূর্ণ তোমায় দিতে পারছি না—অর্ধেক। রাগ করলে ত?"

অতীশ একটা ঝকঝকে চকচকে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। সুপ্রিয়ার মনের আধখানা আর-একজন অধিকার করে আছে, সেজন্যে অতীশ এত-টুকুও আঘাত পাবে না, মনের এত বড় শক্তি তার নেই।

"রাগ করছি না। কিন্তু আমার এই অংশীদারটি কে, তাকে চিনতে পারছি না।"

"চিনতে পারবে না। সে কলকাতায় থাকে না। দুঃখ পেয়ো না অতীশ, তোমাকে সত্যি কথা বলি। আমার কী মনে হয় জান? আমি আরো—আরো অনেককে ভালবাসতে পারি। কাউকে রূপের জন্যে, কাউকে গানের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে। সব ঐশ্বর্য একজনের মধ্যে নেই। আমি সকলের কাছ থেকেই নিতে পারি। পারি না অতীশ?"

অতীশ নিশ্বাস ফেলল।

"ঠিক জানি না। তবে ও'নীলের এমনি একটা নাটক পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।"

"যারা বই লেখে তারা বানিয়ে লেখে না। একটা সত্যকে জীবন থেকেই আশ্রয় করে।" সুপ্রিয়া বলে চলল, "বড় জোর একটু রঙ বুলিয়ে দেয়, যা ঘটা উচিত তাকে ঘটিয়ে দেয়, যে-সুযোগগুলোর জোড় মেলেনি তাদের জুড়ে দেয় একসঙ্গে।"

আজকে যে-কথা ভাবছে, সেই কথাই বলেছিল অতীশ, "কিন্তু ওদের মেয়েরা—"

"হয়ত আলাদা। কিন্তু অতীশ, আমিও বোধ হয় একটু আলাদা। আমার চেনা-শোনা কারো সঙ্গে আমার মেলে না। তুমি ত জান, কলেজে পড়বার সময় অনেকের সঙ্গে আমি মিশেছি। তাদের কেউ-কেউ অসভ্যতার চেষ্টা করেছে, কেউ-কেউ করুণ চিঠি লিখেছে, কেউ বলেছে, আমাকে না হলে তার সব কিছু মিথ্যে হয়ে যাবে। যারা নোংরা তাদের কথা বলছি না, কিন্তু বাকী সকলের কথাই আমি ভেবে দেখেছি। একজন আমাকে এক তাড়া ফুল দিয়েছিল, আমি এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছি। কবিতার বই উপহার পেয়েছি, আমার

শেল্‌ফে আছে তারা। আমি কাউকে আঘাত দিইনি অতীশ, শুধু সত্যি কথাই বলেছি। বলেছিঃ আমার এখনো সময় হয়নি।"

"জানি।"

"না-জানার ত কথা নয়।" সুপ্রিয়া হেসেছিল, "কলেজে আমার সুনাম ছিল না। বলত ফ্লার্ট। কিন্তু আমি ত কাউকে ঠকাইনি অতীশ। খুঁজেছি। তারপর তুমি এলে। তখনো আমি কাউকে সরাইনি—আপনি সরে গেল সবাই। অথচ ওদের আমি ভুলিনি।"

"সবাইকে ভালবেসেছ?"

"না—না।" সুপ্রিয়া বলেছিল, "সে-ভয় নেই। মাত্র আর একজনকে। ছেলেবেলা থেকেই। তবু সম্পূর্ণ নয়—বাকীটুকু ছিল তোমার জন্যে। এখন ভয় করে অতীশ। হয়ত আবার কেউ আসবে। তোমাদের মাঝখানে সে-ও ভাগ বসাবে।"

অতীশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল এবার। এতক্ষণে যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। সেটাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতীশ বলেছিল, "হয়ত সে-ই তোমার সম্পূর্ণ মানুষ। সেদিন আমরা দু-জন আর থাকব না।"

"সে হতে পারে না। আর-একজনের কথা থাক কিন্তু তুমি তুমিই। সেখানে আর কেউ নেই, কেউ আসতে পারবে না। তা ছাড়া জীবনে যদি সবচেয়ে বড় দুঃখ কখনো পাই, তা হলে তোমার কাছেই আমাকে ছুটে আসতে হবে। আমি জানি, তুমি সেদিন আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

বড় রাস্তায় একটা মোটর বার দুই সিম-ফ্যায়ার করল। অতীশ সজাগ হয়ে উঠল। একটু আগেই সামনে বসে ছিল মন্দিরা। কিন্তু সুপ্রিয়া যা পারে মন্দিরা তা পারে না। অতীশও নয়।

বারান্দায় চটির রুক্ষ শব্দ। শ্যামলাল ফিরে এল। ধপ করে বই দুটো ফেলল টেবিলের উপর, চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল সশব্দে।

ক্যালকুলেশনটা এ-বেলা কিছুতেই মিলবে না। অতীশ ডাকল, "শ্যামবাবু?"

শ্যামলাল গম্ভীর গলায় বললে, "বলুন।"

"একটা ভাল টুইশন করবেন? শ-খানেক টাকা দেবে মাসে?"

কৌতূহলী হয়ে শ্যামলাল ফিরে তাকাল।

"কোথায়? কী পড়ে?"

"বি এস-সি। একটি মেয়ে। একটু আগেই যাকে দেখেছেন।"

শ্যামলাল দপ্‌ করে নিভে গেল। অতীশের চোখের উপর একটা কর্কশ দৃষ্টি ফেলে আরো গম্ভীর গলায় বললে, "না। ছাত্রী আমি পড়াই না।"

অতীশ বিষণ্ণ হয়ে রইল। রাজী হলে ভাল করত শ্যামলাল। আরো ভাল করত মন্দিরাকে ভালবাসলে। জীবনে ঠকত না। কিন্তু সে-কথা শ্যামলালকে বোঝাবার কোনো আশাই নেই।

॥ ২ ॥

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটাকে ছাড়িয়ে একবার হেঁটে চলে গেল কান্তি। পার্কের কোনায় একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এক খিলি পান কিনল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হলদে বাড়িটার দিকে। জানলাগুলোতে নীল পর্দা হাওয়ায় ফেঁপে উঠছে: কিন্তু একটা পর্দা সরিয়েও সুপ্রিয়া একবারের জন্যে বাইরে চেয়ে দেখল না।

দেশে থাকতে মজুমদার-বাড়িতে যেতে কোনো অসুবিধে নেই। অবারিত দরজা। একতলায়, দোতলায়, তেতলায়। কিন্তু এখানে তা নয়। প্রথমত এ-বাড়ির কেউ তাকে ভাল করে চেনে না—অথচ তার পরিচয়ের অন্ধকার দিকটা গাল-গল্পের মত শোনা আছে তাদের। সে গিয়ে দাঁড়ানোর সংগে সঙ্গে সবাই তীক্ষ্ণ কৌতূহলভরা চোখে তাকে লক্ষ্য করবে, তার মুখের মধ্যে খুঁজবে পঁচিশ বছর আগে সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যাওয়া বুদ্‌বুদ শশিভূষণকে। একটা নিঃশব্দ কোলাহল যেন সে শুনতে পাবে চারদিকেঃ "এই নাকি কান্তি? তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র? আরে—মনে নেই আমাদের গাঁয়ের হেডপণ্ডিত মশাইকে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই সে—যার জামাই ছিল খুনী আসামী। ইস—কী দুর্ভাগ্য ছেলেটার! ওর বাপ যে কে তা-ই ও জানে না।"

পানের দোকানের আয়নার দিকে একবার নিজের মুখের ছায়া দেখল কান্তি। নিজের চেহারা কেমন কান্তি ঠিক বলতে পারে না, তবে লোকে বলে দেখতে সে ভাল। কিন্তু বাইরের চেহারা যাই হক, ভিতরে ভিতরে তার অসংখ্য জীবাণু, তিলে তিলে ওরা তাকে কেটে কেটে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে বিষাক্ত রক্ত থেকে তার জন্ম, তাই আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আনছে তার মৃত্যুকে।

কিছুই দরকার ছিল না কান্তির। তারা-কুমার তর্করত্নের বিষয়সম্পত্তি নয়—রূপ নয়, গান নয়, কিছুই না। শুধু পরিচয়—বংশধারা। আর ওই পরিচয়টুকু নেই বলেই কারো কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারে না, জানাতে পারে না নিজের দাবি, কেবল মুখ লুকিয়ে পালিয়ে থাকবার জন্যে একটা অন্ধকার কোণ খুঁজে বেড়ায়।

শুধু সুপ্রিয়া আশা দিয়েছে। শুধু সুপ্রিয়াই বলেছে, "আর কেউ তোমার না থাক, আমি আছি।"

কান্তি আবার ঘুরে হলদে বাড়িটার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। জানলার নীল পর্দাগুলো হাওয়ায় পালের মত ফুলে ফুলে উঠছে। অথচ পর্দা সরিয়ে কেউ একবার বাইরে তাকিয়ে দেখছে না। কেউ না।

পার্কের ভিতরে কয়েকটা নোংরা ছেলে মার্বেল খেলছে। ওদেরও একটা পরিচয় আছে নিশ্চয়।

"তোর বাপের নাম কী?"

অত্যন্ত সহজে স্পষ্ট গলায় বলতে পারবে, "কালু মেথর।"

আর কান্তি? কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সেদিন অন্ধকার গংগার ধারে, কেউটের ফোকরভরা গংগাযাত্রীদের সেই ঘরটার কাছে, বটগাছের অন্ধকার ছায়ার তলায় কেউ কোথাও ছিল না। অনায়াসে মুছে যেত। কেউ বাধা দিতে পারত না।

একটা মোটরের হর্ন। কান্তি চমকে ফিরে তাকাল। একখানা কালো রঙের গাড়ি। হলদে বাড়িটার সামনে গিয়েই গাড়িটা দাঁড়াল। সাদা আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি পরা, নাগরা পায়ে এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, এই পার্কেই। কান্তি ভাবল।

রেবা এসে খবর দিলে, দীপেনবাবু এসেছেন।

একবারের জন্যে রক্ত দোল খেয়ে উঠল সুপ্রিয়ার, মুহূর্তের দ্বিধা জাগল মনে। তারপরে সহজ গলায় বললে, "চল্‌—যাচ্ছি।"

রেবা হেসে বললে, "ভদ্রলোক বাবার পাল্লায় পড়েছেন। দুজন মক্কেল ছিল, তাদের বিদায় করে দিয়ে বাবা চেপে ধরেছেন দীপেনবাবুকে। এক্ষুনি সংগীতরত্নাকর নিয়ে পড়বেন। তুই চল্‌—ভদ্রলোককে উদ্ধার করবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেবা বললে, "তুই কিন্তু ওঁকে আমাদের এখানে গানের কথা বলবি।"

"কেন—তুইও ত বলতে পারিস।"

"না ভাই, আমার ভারী লজ্জা করবে।"

রেবা আন্দাজে ভুল করেনি। অমিয়বাবু সত্যিই শুরু করে, দিয়েছিলেন।

"বাংলা দেশ থেকে গান প্রায় উঠে গেল মশাই। সত্যিকারের গাইয়ে আঙুলে গোনা যায়। ছিল বিষ্ণুপুর—তা-ও যাবার দশা। এখন আধুনিক গানের পালা। গান গাইছে না ছড়া কাটছে বোঝাই মুশকিল।"

দীপেন ভদ্রতা করে বললে, "হিন্দীরও ওই দশা। সিনেমার গানের উৎপাতে আর কান পাতা যায় না।"

অমিয়বাবু আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "আধুনিক গান, সিনেমার গান,

সব এক। বাংলা গানের আমি একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেলেছি—জানেন? এক ছড়া মালা নিয়েই যা কিছু গণ্ডগোল। হয় দিয়েছিলে, নইলে দাওনি। হয় আকাশে চাঁদ ছিল, নইলে ছিল না। বালুচরে ঘর বাঁধা হয়েছিল, সেটা ঝড়ে উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধির ব্যাপার, তাতে খানিক ফুল ছড়িয়ে দিলেই আপদ মিটে গেল।"

দীপেন শব্দ করে হেসে উঠল।

"তা হলে আধুনিক গান আপনি মন দিয়ে শোনেন দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে চর্চা না করলে ত এমন ফর্মুলা আবিষ্কার করা যায় না!"

সুপ্রিয়াকে নিয়ে রেবা ঘরে ঢুকল।

দীপেন চোখের দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ বুলিয়ে নিলে সুপ্রিয়ার উপরে।

"এই যে সুপ্রিয়া—অনেক বড় হয়ে গেছ দেখছি।"

সুপ্রিয়া হাসল, "বড় হওয়ার ত কথাই। কিন্তু আপনি ভাল আছেন ত?"

দীপেনের লালচে চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল একবারের জন্যে।

"হ্যাঁ—ভাল আছি বইকি। যতদিন গলায় গান থাকবে, ততদিন খারাপ থাকবার কোনো কারণ নেই।"

"ঠিক বলেছেন।" অমিয়বাবু মাথা নাড়লেন, "গানই ত গায়কের অস্তিত্ব।"

দীপেনের প্রায় মুখোমুখি বসে সুপ্রিয়া দেখতে লাগল। পাঁচ বছরে সত্যিই বয়েস বেড়েছে দীপেনের। কপালে কতগুলি রেখা পড়েছে, কালির গাঢ় দাগ ধরেছে চোখের কোনায়, কানের দু পাশে কয়েকটা রুপালী চুল চিকচিক করে উঠছে।

অমিয়বাবু বললেন, "রেবা, একটু চা—"

দীপেন হাত জোড় করলে, "মাপ করবেন। চা আমি বেশী খাই না। সকালে দু পেয়ালা হয়েছে—আর চলবে না।"

"একটু মিষ্টি—"

"না—না—কিছু না।"

অমিয়বাবু ক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, "একেবারে শুধু মুখে—"

"শুধু মুখে কেন? একটা পান খাওয়ান—তা হলেই হবে।"

রেবা ছুটে ভিতরে চলে গেল। সুপ্রিয়া দেখতে লাগল দীপেনকে। দীপেনের বয়েস কত হবে এখন,—চল্লিশ? কিন্তু তার চাইতেও যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে চেহারা। শুধু রগের পাকা চুলেই নয়, সমস্ত মুখে ক্লান্তির ছায়া নেমেছে। শুধু চোখদুটো তেমনিভাবে ঝকঝক করছে এখনো। আরো অশান্ত, আরো উগ্র।

দীপেন বললে, "এখনো গানের চর্চা চলছে ত সুপ্রিয়া?"

জবাব অমিয়বাবুই দিলেন, "চলছে বইকি। সঙ্গীত-সরস্বতীকে ওই ত ধরে রেখেছে এ-বাড়িতে। গান শিখছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে।"

"দুর্গাশঙ্কর?" দীপেন মাথা নাড়ল, "হুঁ—গুণী লোক। তবে কিছু করতে পারলেন না। আজকাল ও-ভাবে ঘরে বসে থাকলে কিছু হয় না। চিনতে চায় না কেউ।"

"কিন্তু সাধনা ত নীরবেই করা ভাল দীপেনদা।"

দীপেন শুকনো হাসি হাসল, "ওটা পুরোনো থিয়োরি। আজকালকার সাধুদের দেখতে পাও না? তপস্যা তাঁরা কোথায় করেন কে জানে, কিন্তু শহরে তাঁদের বড় বড় আশ্রম আছে, আর আছে দলে দলে শিষ্য। প্রভুর মহিমাকে তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারপরে প্রচার করতে থাকে।"

রেবা একটা ছোট রুপোর প্লেটে করে পান নিয়ে এল। তারপর মুখ নামাল সুপ্রিয়ার কানের কাছে।

সুপ্রিয়া হাসল। বললে, "দীপেনদা, আমাদের রেবার একটা অনুরোধ আছে।"

"বেশ ত—বল।"

"আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনার কি কোনো বিশেষ কাজ আছে?"

"না-তেমন কিছু নেই। কনফারেন্স কাল থেকে শুরু।"

"তাহলে আসুন এখানে। রেবা আপনাকে রান্না করে খাওয়াবে।"

পেছন থেকে রেবা একটা চিমটি কাটল।

দীপেন বললে, "সে ত ভাল প্রস্তাব। চমৎকার কথা।"

অমিয়বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলেন। "কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। রেবাই আমার কাজটা করে দিয়েছে। সত্যিই তবে আসছেন আপনি? ভারী খুশী হব।"

সুপ্রিয়া বললে, "কিন্তু একটা সর্ত আছে। গান শোনাতে হবে।"

"আচ্ছা—তা-ও গাইব। তুমি?"

"আপনার আসরে গান গাইব এমন স্পর্ধা নেই। তবে রেবা সেতার শোনাবে এখন।"

"উনি বুঝি সেতার বাজান? বাঃ, চমৎকার।"

রেবা পালিয়ে গেল ঘর থেকে। অমিয়বাবু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন "না, না,—সে কিছু নয়। এমন কিছু বাজাতে পারেনা এখনো, সবে শিখছে।"

"শিখছি আমরা সকলেই—" কথাটাকে দার্শনিকভাবে ঘুরিয়ে নিলে দীপেন, "এ-জিনিস শেখার কোনো শেষ নেই। সারাজীবন চর্চা করেও এর কিছুই পাওয়া যায় না।" পানের সঙ্গে খানিকটা জর্দা তুলে নিয়ে দীপেন বললে, "কিন্তু আমি এখন উঠব অমিয়বাবু। সুপ্রিয়াকেও একটু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"বেশ ত বেশ ত।" সহজভাবে কথাটা বলেও অমিয়বাবু দ্বিধাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন, "কিন্তু স্কুল নেই তোমার?"

সুপ্রিয়া বলতে যাচ্ছিল "আছে", কিন্তু সত্যি কথাই বেরিয়ে এল মুখ থেকে, "না, আজকে ফাউনডেশন ডে। ছুটি আছে।"

দীপেনের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। "ভেরি গুড। একটু চল আমার সঙ্গে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে—সাহায্য করবে।" মনের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুপ্রিয়া। কিন্তু দীপেনের এই সহজ ভঙ্গিটার সামনে কিছুতেই "না" বলতে পারল না। শুধু বিপন্নভাবে বললে, "আমি কেনাকাটায় কী সাহায্য করব আপনাকে?"

"তুমিই পারবে। মেয়েদের পছন্দ ভাল। চল।"

যেন একটা অনিবার্য কঠিন আকর্ষণে সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে একরাশ প্রতিবাদ নিয়েও মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসির রেখা।

"আচ্ছা—চলুন।"

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল দীপেন। "এখন দশটা। ঠিক সাড়ে এগারটায় পৌঁছে দেব তোমাকে?"

"আর সন্ধ্যেবেলার ব্যাপারটা?" অমিয়বাবু ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন।

"সাতটায় আসব। আচ্ছা, আপাতত চলি তা হলে, নমস্কার। এস সুপ্রিয়া।"

কান্তি বসে ছিল পার্কের ভিতরে। এক চোখ ছিল ছেলেদের মার্বেল খেলার উপর, আর এক চোখ ছিল হলদে বাড়িটার দিকে। এমন সময় আবার সেই কালো মোটরটার গর্জন শোনা গেল।

কান্তি দেখল, সেই গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোকের ঠিক পাশে বসেছে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াই। আরো ভাল করে দেখবার আগেই গাড়িটা দ্রুত বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে।

পিছনের সীটেই বসতে চেয়েছিল সুপ্রিয়া। দীপেন বললে, "না, না, পাশে। গল্প করতে করতে যাব।"

আশ্চর্য সহজ ভঙ্গি দীপেনের, আর সহজ হওয়াটাই তার শক্তি। সুপ্রিয়া আপত্তি করতে পারল না। মিনিট দেড়েক চুপচাপ। বাঁক নিয়ে গাড়ি আশু মুখুজ্যে রোডে এসে পড়ল।

"কোথায় যাবেন?"

"নিউ মার্কেট।" দীপেন মুখ ফেরাল, "জান ত—কলকাতার পথঘাট আমার ভাল করে চেনা নেই। যাঁর গাড়ি তিনি সোফার দিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। কিন্তু আমার আত্ম-মর্যাদায় বাধল। ভাবলাম, গাইড যদি নিতেই হয়, তোমাকেই সঙ্গে করে নেব।"

খুব সহজ কথাটা। কিন্তু অস্বস্তি লাগল সুপ্রিয়ার। পাঁচ বছর আগেকার সেই দুপুরটাকে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। না বেরুলেই হত দীপেনের সঙ্গে। যে কোনো একটা ছুতো করে এড়িয়ে যাওয়া চলত।

দীপেন বলল, "কলকাতায় আসবার আগে তোমার মাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁর কাছেই পেলাম তোমার ঠিকানা।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু আমার একটা চিঠিরও তুমি জবাব দাওনি।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। বলবার কিছু নেই।

গাড়ি এগিয়ে চলছিল চৌরঙ্গির দিকে। লাল আলোর সংকেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আমি জানি। এড়াতে চেয়েছিলে আমাকে। ভেবেছিলে সেদিনের জের আর টানতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর সুপ্রিয়া, এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি। একদিনের জন্যেও না।"

সুপ্রিয়া অবিশ্বাস করল না। সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটি আর নেই। এই পাঁচ বছরে জীবনকে অনেকখানি দেখেছে, অনেকখানি চিনেছে সে। বহু মানুষের মুখ থেকে শুনেছে, "তোমাকে ভুলব না—কোনোদিন ভুলবনা।" প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত না, কিন্তু ভারী ক্লান্তি বোধ হয় আজকাল। এত অসংখ্য মানুষ তাকে মনে রাখে, মনে রাখবে। কিন্তু সুপ্রিয়া কজনকে মনে রাখতে পারবে?

দীপেন বললে, "জান ত, আমি গান গেয়ে বেড়াই। আর আমরা হচ্ছি সেই আগুন, যারা খুব সহজেই পতঙ্গের দলকে টেনে আনতে পারে। আমিও অনেক দেখেছি। আমার গান শুনে কতজনের চোখ গভীর হয়ে এসেছে, কতজনকে গান শেখাতে চেয়েছি, কিন্তু তারা গান যতটা শিখেছে তার চাইতেও অনেক বেশী করে তাকিয়ে থেকেছে আমার মুখের দিকে। কেউ কেউ পোড়েনি এমন মিথ্যে কথাও বলতে পারি না। কিন্তু এমন একজন কাউকে পেলাম না, যার কাছে আমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারি।"

গাড়ি এগিয়ে চলছে। প্রথম শীতের উজ্জ্বল সোনালী রোদ জ্বলছে পথের উপর। ময়দানের মাঠের ঘন ঘাস এখনো যেন ভাল করে শুকোয়নি, এখনো তারা শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, "বৌদি কেমন আছেন দীপেনদা?"

দীপেনের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল। উইন্ডস্ক্রীনের উপর থেকে যেন খানিকটা রোদ ঠিকরে ওর চোখের উপরে এসে পড়ল। দীপেন বললে, "ভাল।"

"তাঁকে কেন সঙ্গে করে আনলেন না কলকাতায়?"

"এমনি। দরকার বোধ হয়নি।"

"আপনি কিন্তু ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন দীপেনদা!" সুপ্রিয়া মৃদু গলায় বললে। অনেকক্ষণ ধরেই তার মনে হয়েছিল, এমনি কোন একটা আঘাত করা উচিত দীপেনকে, তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত।

সামনের দুখানা গাড়িকে ওভারটেক করে তীর বেগে বেরিয়ে গেল দীপেন। একজন সাইকেলযাত্রী একটুর জন্যে চাপা পড়ল না।

"এ কী করছেন? সাবধান হয়ে চালান।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুপ্রিয়া।

"সাবধান জীবনে কখনো হইনি। আজও হবার দরকার দেখি না।" দীপেন নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

সুপ্রিয়া ক্লান্ত গলায় বললে, "অ্যাক্সিডেন্ট করে রোম্যান্টিক হতে হয়ত আপনার ভাল লাগে, কিন্তু আমার ঠিক ওটা ধাতে সয় না। একটু সাবধান হয়ে ড্রাইভ করুন।"

দীপেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অল রাইট—আই অ্যাম সরি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা আলোচনাকে বাঁধ ভেঙে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিল দীপেন, কিন্তু সুপ্রিয়া যেন তার উপরে একটা পাথরের বাধা এনে ফেলেছে। গাড়ির চাকার তলায় উজ্জ্বল সোনালী রোদে ভরা পথটা পিছলে পিছলে সরে যেতে লাগল। সুপ্রিয়া দেখতে পেল, শুধু কানের পাশেই নয়, দীপেনের সারা মাথাতেই ধূসরতার ছায়া নেমে এসেছে।

আরো খানিক পরে দীপেন বললে, "ডান দিকেই ত মার্কেট?"

"হাঁ—এইটেই লিন্ডসে স্ট্রীট।"

কেনাকাটার বিশেষ কিছু ছিল না। এক-জোড়া মোজা, দুটো গেঞ্জি, খান দুই সাবান। তারপরে কিছু ফুল।

"তোমাকে দিলাম ফুলগুলো।"

"আচ্ছা দিন।"

ঘড়ি দেখে দীপেন বললে, "আরো কিছু সময় আছে হাতে। চল, চা খাই কোথাও।"

"একটু আগেই যে বললেন চা আর খাবেন না এ-বেলা?"

"খাওয়ার জন্যে নয়। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব।"

"বেশ, চলুন।"

একটা নিরালা চায়ের দোকানে ঢুকল দুজন।

"কী খাবে?"

সুপ্রিয়া বললে, "কিছু না। আপনার ইচ্ছে হলে খান।"

দীপেন ম্লানভাবে হাসল, "আমার খাওয়ার পথে কিছু বাধা আছে। জান ত, খুব সংযত হয়ে চলিনি এতদিন। লিভারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।"

বয় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। দীপেন বললে, একটা চা, একটা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ!"

বয় চলে গেলে সুপ্রিয়া বললে, "খুব বেশী ড্রিংক করেন নাকি আজকাল?"

"রোজ নয়। তবে মধ্যে মধ্যে এক-এক দিন। হঠাৎ মনে হয় সংসারে আমি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে কোথাও আমার কেউ নেই, কেউ আমার দুঃখ বুঝবে না। তেমনি এক-একটা দিনে হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলি।"

"কিন্তু এ-দুঃখ কেন আপনার? সবই ত আপনি পেয়েছেন। টাকা, সম্মান, যা-কিছু মানুষে চায় কিছুরই ত অভাব নেই আপনার।"

"শুধু একটা জিনিসই পাইনি সুপ্রিয়া। ভালবাসা।"

"কেন পাননি? ভালবেসেই বৌদিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন।"

"ভুল করেছিলাম সুপ্রিয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যাকে আমি চেয়েছিলাম এ সে নয়। যে আমার গানের ইন্‌স্পিরেশন, যে আমার সুর, আমার স্বপ্ন যাকে নিয়ে গড়ে উঠবে—তাকে আমি পাইনি।"

"কে সে?" মৃদু হাসি দেখা দিল সুপ্রিয়ার ঠোঁটের কোণে, "আমি?"

"তুমি কি তা বিশ্বাস কর না?"

বয় চা আর অরেঞ্জ-স্কোয়াশ নিয়ে এল, একটা অপ্রীতিকর উত্তর দেবার দায়িত্ব থেকে অন্তত এই মুহূর্তে মুক্তি পেল সুপ্রিয়া। বয় চলে যাওয়ার পরে চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এই ধরনের ওমর-খায়েমদের দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। কেউ একটা নতুন কিছু বলুক, আরও গভীর কোন বেদনা, মানুষের মর্মচারী আরো কোন একটা আশ্চর্য যন্ত্রণাকে আবিষ্কার করুক কেউ, সেই নিবিড় নিঃশব্দ সঞ্চারী ব্যথা সুরে সুরে অসংখ্য প্রদীপের দীপান্বিতা জ্বালিয়ে দিক, তার আলো আকাশের তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে দূরতম দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়ে যাক। কিন্তু এ-ও যেন বাঁধা ছকে চলছে। সেই মদের গ্লাসের আগুন ঢেলে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষে দাহন করা, দিনের পর দিন একটু একটু করে আত্মহত্যার বিলাসিতা,

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে সুপ্রিয়া?"

স্বপ্ন-সাকীর জন্যে কান্নার আত্মরতি। সব পুরনো, সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।

"চিত দহে বিনু সেঁইয়া—"

জীবনের অর্ধেক বেদনাই ত কৃত্রিম। তাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই, মানুষ তাদের সৃষ্টি করে নেয়। যে-যন্ত্রণার অনুভূতি নেই তাকে প্রাণপণে অনুভব করবার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সত্য করে তোলে। নিউরোসিস। জীবনের আধখানাই নিউরোসিস। গ্লাস থেকে স্ট্রটা তুলে নিয়ে অনামনস্কভাবে সেটাকে ভাঁজ করছিল দীপেন। তারপর বললে, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে সুপ্রিয়া?"

পাঁচ বছরের অনেক পোড়খাওয়া, অনেক রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পথচলা সুপ্রিয়া আজকে আর এতটুকুও দোল খেল না। সোজা চোখ মেলে ধরল দীপেনের দিকে। নিঃসংকুচিত স্পষ্টতায়।

"আমাকে বিয়ে করতে চান?"

দীপেন থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

"না, তা বলছি না। এমনি চল। তুমি সঙ্গে থাকলেই আমি খুশী হব।"

"কোথায় যাব?"

"বম্বে।"

"কী করব গিয়ে?"

"আমি ভাবছি, বম্বেতে গিয়ে গানের স্কুল করব একটা। দু-একটা সিনেমা কোম্পানিও ডাকাডাকি করছে, সেখানেও কাজ হবে। তোমার সাহায্য চাই।"

"আমি কী সাহায্য করব? আমি কতটুকু জানি গানের?"

"তুমি শিখবে। আমি শেখাব। তা ছাড়া বড় বড় ওস্তাদ আছেন ওখানে, গুরু চাও ত তাঁদের পাবে। যদি নিজেকে গড়ে তুলতে চাও, যদি সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে চেনাতে চাও নিজেকে, দেশময় ছড়িয়ে দিতে চাও তোমার গানের সুর, তা হলে ওই ত তোমার জায়গা সুপ্রিয়া। কলকাতায় বসে দুর্গাশঙ্করের কাছ থেকে হয়ত তুমি কিছু পাবে। কিন্তু তোমার গুরুর মতই তুমি তলিয়ে থাকবে অন্ধকারে। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না।"

সুপ্রিয়ার বুকে এক ঝলক রক্ত আছড়ে পড়ল। বোম্বাই। তাই বটে—বড় বড় গুণীর জায়গা সেখানে। মন্ত্র নিতে চাও—অঞ্জলি ভরে নিয়ে যাও। ঠিক কথা। নিজেকে চেনাতে হলে কলকাতার এই গণ্ডিটুকুর মধ্যেই ত পড়ে থাকলে চলবে না, আরো বড় জগতের মধ্যে পা বাড়াতে হবে, আরো বড় জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।

গলার স্বরে স্বপ্নের রেশ মিশিয়ে দীপেন বলতে লাগল "বোম্বাই আছে, বরোদা আছে, পুনা আছে। সময় করে বেরিয়ে পড়—একটু এগিয়ে গেলেই দক্ষিণ ভারত। কর্ণাটকী পণ্ডিতের দেশ। হাজার বছর আগেকার মত আজও মৃদঙ্গের তালে তালে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী মূর্ত ধরে সেখানে। যাবে সুপ্রিয়া—যাবে আমার সঙ্গে?"

আশ্চর্য, সুপ্রিয়ার মনের কথা, তার রাত-জাগা কল্পনার কথা, তার এতদিনের আশা-স্বপ্নের এত খবর কোথা থেকে জানল দীপেন? এ যেন তারই স্বগতোক্তি-গুলো দীপেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

"কিন্তু—" চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলেছিল সুপ্রিয়া, চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল।

"আমাকে ভয় কর না।" দীপেনের চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল, "যা আমি কিছুতেই পাব না, তার জন্য কোন অন্যায় দাবি তুলব না তোমার কাছে। শুধু তুমি বড় হও, সার্থক হয়ে ওঠ। এর বেশী আমি আর কিছুই চাই না।"

"কিন্তু, আমি বড় হলে আপনার কী লাভ?"

"তোমাকে ভালবাসি, সেইটুকুই লাভ। যাবে সুপ্রিয়া? আমি কিন্তু আসছে মাসেই বেরোচ্ছি। বোম্বাই, বরোদা, পুনা, মহীশূর, তাঞ্জোর—"

উগ্র একটা ভয়ঙ্কর নেশা সাপের মত জড়িয়ে ধরছে সুপ্রিয়াকে। আরব সমুদ্র ডাক দিচ্ছে, ডাক পাঠাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের নারিকেল-বীথির মর্মর। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। আরো পাঁচ মিনিট এমনভাবে

লোভানি দিতে থাকলে সুপ্রিয়া আর ধরে রাখতে পারবে না নিজেকে। বলবে "চলুন— এখুনি চলুন। আমি তৈরি হয়েই আছি।"

কিন্তু সে পাঁচ মিনিট আর সময় দিল না সুপ্রিয়া। খানিকটা গরম চা গিলে ফেলল প্রাণপণে। কপালে একরাশ ঘাম জমে উঠেছিল, শাড়ির আঁচলে সেটা মুছে ফেলে বললে, "এবারে ওঠা যাক দীপেনদা। একটা কাজ আছে আমার, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ।"

॥ ৩ ॥

কান্তি একটা ট্রামে চেপে বসল।

কাল রাত্রেও তার কলকাতায় আসবার কোন কল্পনা ছিল না। কিন্তু কী যে হয় এক-একদিন, কিছুতেই ঘুমুতে পারল না। খোলা জানলা দিয়ে মজুমদার-বাড়ির তেতলাটা আবছায়া অন্ধকারে চোখে পড়তে লাগল বার বার। খালি মনে হতে লাগল, অনেকদিন সে সুপ্রিয়াকে দেখেনি। অন্তত দূরে থেকেও একবার তাকে দেখতে না পেলে কিছুতেই থাকতে পারবে না কান্তি, কোন কাজে মন বসাতে পারবে না।

বিনিদ্র রাতের পরে আরো অসহ্য লাগতে লাগল সকালটা. একটা আগুনের চাকা ঘুরতে লাগল মাথার ভিতরে। একবার কলকাতায় যেতেই হবে তাকে। কিন্তু কী বলা যাবে মা-কে।

এমন সময় কাগজে মিউজিক্যাল কনফারেন্সের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। উপলক্ষ পাওয়া গেল একটা।

"মা, কাল থেকে মিউজিক কনফারেন্স আছে কলকাতায়। আমি যাচ্ছি আজ। দিন তিনেক থাকব ওখানে।"

মা তরকারি কুটছিলেন। চোখ তুলে বললেন, "কনফারেন্স ত কাল। আজই যাবি কেন?"

"নইলে টিকেট পাব না।"

ঘটনা নতুন নয়। গত বছরও গিয়েছিল কান্তি। মা বাধা দিলেন না।

ছোট একটি সুটকেশ আর ছোট বিছানা নিয়ে কান্তি হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিংয়ে এসে উঠল। তারপর সেখান থেকে হরিশ মুখার্জি রোডে। আধঘণ্টা ধরে বাড়ির সামনে পায়চারি করে বেড়াল। তবু হলদে বাড়িটার জানালাগুলো থেকে হাওয়ায় ফাঁপা একটা নীলপর্দা সরল না একবারের জন্যেও, একবারের জন্যেও বেরিয়ে এল না সুপ্রিয়ার মুখ।

"কান্তিদা—তুমি এখানে? বাইরে ঘুরছ কেন? এস, এস—"

সুপ্রিয়া ডাকল না। একটা কালো মোটর বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা কে আর-একজন নিয়ে গেল সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়া তাকে দেখতে পেল না।

অনেক বড় কলকাতা। অনেক মানুষ, অনেক পথ। সেই মানুষের ঢেউ কান্তির কাছ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে সুপ্রিয়াকে। এখানে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসীম কুণ্ঠা আর দ্বিধা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, চোখের সামনে কালো মোটরটা বেরিয়ে যায় নিষ্ঠুর উপেক্ষায়। এ গ্রামের মজুমদার-বাড়ি নয় যেখানে ছোট্ট একটুখানি বাগানের পথ পেরিয়েই পৌঁছে যাওয়া চলে, সোজা উঠে যাওয়া যায় সুপ্রিয়ার ঘরে: "কী পড়ছ অত? আর দরকার নেই ওসব, এস একটু গল্প করি।"

অনেক দূরে সুপ্রিয়া। অনেক মানুষের ঢেউ দুজনের মাঝখানে।

কিন্তু কান্তি ত আশা ছাড়তে পারে না। সুপ্রিয়াকে ছাড়া তার কিছুতেই চলবে না। তার কাছ থেকে পাওয়া ওই আশ্বাসটুকুর জোরেই ত এতদিন বেঁচে থেকেছে কান্তি —এমনভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় তবলার তপস্যা করেছে।

"আমি গান গাইব, তুমি না হলে সে-গানের সঙ্গে সংগত করবে কে?"

ট্রাম এগিয়ে চলল। জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে রইল কান্তি। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল চোখে মুখে। শুধু সংগী? শুধু সান্ত্বনা?

কান্তি অনেক ভেবে দেখেছে। না, শুধু ওইটুকুতেই তার চলবে না। এই বিশাল কলকাতা। এত মানুষ, এত পথ, কালো রঙের মোটরটা। আর অপেক্ষা করা চলে না। আজকে তার কথা সুপ্রিয়াকে বলতেই হবে স্পষ্ট করে।

আজকেই। সন্ধ্যায় আবার চেষ্টা করবে কান্তি। সুপ্রিয়া তাকে আশা দিয়েছিল। সেই জোরেই দাঁড়াতে হবে কান্তিকে। না— আর দেরি করা চলবে না।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গিয়েও কান্তি ঢুকতে সাহস পেল না।

একটা জোরালো আলো জেলে দেওয়া হয়েছে হলদে বাড়িটার সামনে। আরো সাত-আটখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কালো মোটরখানাও আছে কিনা কান্তি বুঝতে পারল না।

পার্কের মধ্যেও একদল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টিও বাড়িটার দিকেই।

বুকের মধ্যে একবার ধক করে উঠল কান্তির। একটা কোন সমারোহ চলেছে ওখানে। কিন্তু উপলক্ষটা কিসের? কারো বিয়ে? সুপ্রিয়ার?

কান্তি ঢুকতে পারল না। সেই একদল লোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

"কী হচ্ছে মশাই ও-বাড়িতে?"

"গান হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস গাইছে।"

"আঃ, চুপ করুন, শুনতে দিন।"

লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস। নামটা শুনেছে বই কি কান্তি। সুপ্রিয়ার মুখেও শুনেছে। গান শুনেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে।

কান্তি গিয়ে বসতে পারত গানের আসরে। অমিয় মজুমদারের বাড়িতে কেউ তাকে বাধা দিত না। অন্তত সুপ্রিয়া ছিল ওখানে। তবু বাইরে রবাহুতের মতই দাঁড়িয়ে রইল সে। সাত-আটখানা মোটর সামনে রইল প্রাচীরের মত, ভিতর থেকে গানের সুর লহরে লহরে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীপেন বোস খেয়াল গাইছিল।

॥ ৪ ॥

ঠিক সাড়ে আটটার সময় আজো অতীশ সেই বকুল-গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

নকল জ্যোৎস্নাঝরানো আলোর সারি। বকুলের পাতা কাঁপিয়ে হাওয়া চলেছে। অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। সুপ্রিয়ার আসবার সময় হয়েছে।

রাস্তার ওপরে দুর্গাশঙ্করের ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ করা জানলার ফিকে লাল কাচের মধ্য দিয়ে অপরূপ দেখাচ্ছে আলোর রঙ।

দুর্গাশঙ্করের দু-তিনজন ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে চলে গেল একে-একে। রাস্তার ওপাশ থেকে অতীশ দেখতে লাগল। ওদের সে চেনে, আজ তিনমাস ধরে দেখছে নিয়মিত। কিন্তু সুপ্রিয়া কোথায়?

প্রতীক্ষা ক্রমে অধৈর্যে পরিণত হতে লাগল। আর-একটা সিগারেট শেষ করলে অতীশ, আরো একটা। এখনো আসছে না কেন সুপ্রিয়া, কেন দেরি করছে এত?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছে। একটা হতাশ ক্লান্তি একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে মনকে। সুপ্রিয়া কি আজকে গান শিখতে আসেনি? ওর কি অসুখ করেছে?

কেমন ফিকে, কেমন বিস্বাদ মনে হতে লাগল সব। আশা নেই, তবু দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। সামনে দিয়ে মোটর আসা-যাওয়া করতে লাগল, অতীশ গুনে দেখল বত্রিশখানা। মোট সাতখানা ডবল-ডেকার গেল, দুখানা লরি। তবু সুপ্রিয়া এল না।

তারপর ফিকে লাল কাচের ওপরে সেই অপরূপ আলোটা দপ করে নিবে গেল।

পাথরের মত ভারী পা নিয়ে ট্রাম-লাইনের দিকে এগোল অতীশ। সারাটা দিন। অজস্র কাজ—ল্যাবরেটরি, ক্যালকুলেশন। তাদের

ভিতরে এই সময়টুকু যেন একটা আবহ-সংগীতের মত বাজতে থাকে। শুধু কয়েক মিনিটের জন্য সুপ্রিয়াকে কাছে পাওয়া—কয়েকটা কথা, ট্রামে তুলে দেওয়া—তারপর তার কথাই ভাবতে ভাবতে কাঁকুলিয়া রোডের মেসে ফিরে আসা।

অতীশ জানে এর কোনো পরিণাম নেই। সুপ্রিয়া একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। ভুলে যেতেও দেরি হবে না। ভদ্রতা করে বলেছে, 'জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখের সময় তোমার কাছেই চলে আসব'। কিন্তু অতীশ জানে, সে-প্রয়োজন কোনোদিনই ঘটবে না সুপ্রিয়ার। নিজেকে সে এতটুকু গোপন করেনি; তার মন অন্য মেয়েদের মত নয়; অনেককে ভালবাসতে পারে সে। তার অনেক আছে। দু হাতে সে যতই দান করে যাক, তার ঐশ্বর্য কোনোদিন ফুরোবার নয়।

অতীশও তাদের মধ্যে একজন। ক'দিন মনে থাকবে—কতক্ষণ?

তবু এমনি করে আসা, এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। সারাদিনের পর এইটুকুই পাওয়া, সারাটা রাত্রির জন্যে এইটুকুই স্বপ্নের সঞ্চয়। কতদিন এ-ভাবে চলবে অতীশ জানে না, কবে বিশাল ভারতবর্ষের সংগীতের তীর্থে তীর্থে সুপ্রিয়ার ডাক আসবে তাও জানে না। কিন্তু যতদিন সে-সময় না আসে, ততদিন এই মুহূর্তটিই সত্য হয়ে থাকুক। তারপর—

ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে অতীশ তিক্ত-ভাবে চিন্তা করতে লাগল, একবার গেলেও হত মন্দিরার ওখানে। কিন্তু এখন আর সময় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ক্লান্ত পা নিয়ে অতীশ মেসে ফিরে এল। যথানিয়মে প্রকাণ্ড মোটা একটা বইয়ের মধ্যে তলিয়ে ছিল শ্যামলাল। ওকে দেখে মুখ তুলল।

"কালকের সেই মেয়েটি দু-বার এসে আপনাকে খুঁজে গেছেন।"

তার মানে, মন্দিরা এসেছিল। এখনো কি একবার যাওয়া যায় ওদের বাড়িতে? না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। জামাটা খুলে অতীশ বিছানার উপরে বসে পড়ল। সমস্ত মনটা বিস্বাদ লাগছে। সারা শরীরে একটা শিথিল ক্লান্তি। আজ রাতে অনেক কাজ করবার ছিল। কিন্তু কিছুই হবে না।

শ্যামলাল হঠাৎ বললে, "আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম অতীশবাবু।"

"কী কথা?"

"সেই টুইশন।" শ্যামলালের মুখখানা অদ্ভুত রকমের লালচে লাগল, "শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েই গেলাম।"

অসীম বিস্ময়ে নিজের শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে গেল অতীশ। বিভ্রান্ত চোখে তাকাল শ্যামলালের দিকে।

"তার মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না ত।"

শ্যামলাল একটা ঢোঁক গিলল, "মানে, উনি যখন সেকেণ্ড টাইম এলেন, মানে প্রায় আটটার সময়, তখন ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ও'কে। আমি উঠে যাচ্ছিলাম, আমাকে ডেকে বললেন, 'এক'গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? ভারী তেষ্টা পেয়েছে।' কী আর করি। জল দিতে হল।"

বিস্ফারিত চোখে অতীশ চেয়ে রইল। শ্যামলাল মন্দিরাকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে, অথচ তার আগে অজ্ঞান হয়ে পড়েনি। শ্যামলালের উপর সে অনেকখানি অবিচার করেছিল বলে মনে হচ্ছে।

"হুঁ। তারপর?"

নববধূর মত লজ্জিত ভঙ্গিতে শ্যামলাল বলতে লাগল, "তারপরে উনি বললেন, 'মিনিট দশেক বসতে চাই—আপনার কোনো আপত্তি আছে?' আমি আর আপত্তি করি কী করে? চুপচাপ বসেই বা থাকা যায় কী করে? শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বুঝি অতীশবাবুকে টুইশনের কথা বলেছিলেন? কেমিস্ট্রির জন্যে?' শুনে উনি বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-বলেছিলাম বটে। আপনি পড়াবেন?' আমি না করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত রাজীই হয়ে গেলাম।"

অতীশ কৌতুক বোধ করল, আশ্চর্য হল তার চাইতেও বেশী। শ্যামলালের জন্যে নয়, মন্দিরার জন্যে।

"বেশ করেছেন। মেয়েটি ভাল।"

শ্যামলাল উৎসাহিতভাবে বললে, "আমারও তাই মনে হল।"

আরো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল শ্যামলালের, নতুন টুইশনটার আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চালাতে চাইছিল খুব সম্ভব। কিন্তু আজ অতীশের পালা। মনে হল, কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার, শ্যামলালকে সে সইতে পারছে না। কোথায় যেন আজ ক্রমাগতই হার হচ্ছে তার।

অতীশ ছাদে উঠে এল। চিলেকোঠায় ঢুকে ঘুঁটের স্তূপের উপরে বসল না শ্যামলালের মত, ছাদের রেলিং ধরে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে। অন্ধকার গাছের সার—আলোজ্বলা জানালা—রেডিয়োর গান—শিশুর কান্না।

কেন এল না সুপ্রিয়া?

শরীর ভাল নেই? না মহাভারতের গীত-তীর্থের ডাক তার কানে এসে পৌঁছেছে?

শোবার আগে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল সুপ্রিয়া। রেবা ঘরে এল।

"বেশ গাইলেন দীপেনবাবু—না?"

"হুঁ।"

"কী মিষ্টি গলা। এখনো যেন কানে বাজছে।"

সুপ্রিয়া হঠাৎ মুখ ফেরাল।

"আচ্ছা—রেবা?"

"কী?"

"হঠাৎ যদি আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই, কী হয় তা হলে?"

রেবা চমকে উঠল, "তার মানে? এ আবার কিরকম ঠাট্টা?"

"ঠাট্টা নয়। সত্যিই ভাবছি কথাটা। আমি পালাব এখান থেকে।"

রেবা বললে, "হঠাৎ এমন বেয়াড়া শখ হতে গেল কেন? কিসের জন্যে পালাবি?"

"সারা জীবন ধরে যাকে খুঁজছি, তার জন্যে।"

"এ যে কাব্যের মত শোনাচ্ছে। কাউকে ভালবেসে চলে যাবি নাকি তার সঙ্গে?"

"না—ঠিক উলটো," চিরুনি নামিয়ে রেখে সুপ্রিয়া বললে, "যাদের ভালবাসি, তাদের কাছ থেকেই আমাকে চলে যেতে হবে। নইলে যা আমি চাইছি তা কোনোদিনই পাব না। ওই ভালবাসাই আমার পথ আটকে রাখবে।"

"ভালবাসাই ত সব চেয়ে বড় জিনিস সুপ্রিয়া। তার চাইতেও বড় তুই কী পাবি?"

"আমার গানকে।"

রেবা কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বুঝতে পেরেছি। সেই গানের জন্যেই তুই চলে যেতে চাস?"

"ঠিক ধরেছিস। মনে কর রাতে সকলের চোখ এড়িয়ে যদি পালিয়ে যাই—"

রেবা ভয়ংকরভাবে শিউরে উঠল, "সে কি!"

"ভয় নেই, আজ নয়। কিন্তু হয়ত খুব শিগগিরই।" আঙুলের ডগায় খানিকটা ক্রীম নিয়ে সুপ্রিয়া মুখের উপরে ঘষতে লাগল, "কিন্তু সত্যিই যদি চলে যাই, লোকে আমায় ভুল বুঝবে ত?"

"বোঝাই ত স্বাভাবিক।"

"যারা আমায় ভালবাসে?"

"তারাও ভুল বুঝবে। কিন্তু," রেবা গম্ভীর হয়ে উঠল, "কিন্তু খ্যাপামি করবার আগে একটা কথা তোকে মনে করিয়ে দেব সুপ্রিয়া। তোর রূপ আছে—এ-কথা ভুলিসনি। আর এ-কথাও ভুলিসনি যে, ভারতবর্ষে যত তীর্থই থাকুক, এখানকার মানুষগুলো এখনো সাধু-সন্তে পরিণত হয়নি। একটি সুন্দরী একা মেয়ের পক্ষে এখনো এ-দেশ নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা ভেবে দেখব।" সুপ্রিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা—তুই শুতে যা ভাই। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

রেবা চলে যাচ্ছিল, দোরগোড়ায় গিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল।

"তোর রূপ আছে, এ-কথাটা কম করে বলেছিলাম। তুই আগুন। মানুষের কথা

ছেড়ে দিচ্ছি, দেবতাকেও তুই জ্বালিয়ে তুলতে পারিস। এক কলকাতাই ত যথেষ্ট, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড করতে চাইছিস কেন?"

রেবা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আয়নার ভিতরে নিজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়া। "আগুন? এ-কথাটাও নতুন বলেনি রেবা। আরো দু-একজনের মুখেও তা শুনতে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন করে রেবা মনে করিয়ে দিল কেন? ওর মধ্যে কি কোন ইংগিত আছে তার, একটা আঘাত কোথাও?

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

বাইরের ঘরে বসে একটা কী যেন সেলাই করছিল রেবা। পাশে রাখা রেডিয়োটায় নিচু পর্দায় পদাবলী কীর্তন চলছিল, রেবা গুনগুন করছিল তার সংগেঃ

"আমি কানু-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু
তিল-তুলসী দিয়া—"

"আসব?"

চকিত হয়ে রেবা রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে, "আসুন।"

ঘরে ঢুকল অতীশ।

"অতীশবাবু। এত রাতে।"

"এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, একবার খবর নিতে এলাম।"

"ভালই হল। বসুন।" রেবার চোখের কোনায় একটুখানি কৌতুক ছলছল করে বয়ে গেল, "কিন্তু বাবা নেই বাড়িতে, সুপ্রিয়াও না। ও'রা পুবালি সিনেমায় মিউজিক কনফারেন্সে গেছেন।"

"ও।" অতীশ পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছে ফেলল।

"এই ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ ঘেমে গেছেন দেখছি। অনেকটা হেঁটে এলেন বোধ হয়?"

"না—এমন বিশেষ কিছু নয়।" অতীশ জবাব দিলে। কিন্তু এখানে আসবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, এই ঘরে বসে থাকবারও কোন অর্থ হয় না আর। যা জানবার, নিঃশেষে জানা হয়ে গেছে। আজকেও যখন বকুলতলায় দাঁড়িয়ে সে অধৈর্য প্রতীক্ষা করছিল, ঘন ঘন দেখছিল ঘড়ির দিকে, দুর্গাশংকরের জানলার আরক্তিম আলোটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল চোখে, তখন সুপ্রিয়ার মনের সামনে সে কোথাও ছিল না, সুপ্রিয়া তখন গিয়ে বসে ছিল সারা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণীদের দরবারে। তাকে ঘিরে রেখেছিল সুরের ইন্দ্রজাল, তার চোখের সামনে একটির পর একটি রাগ-রাগিনীর জ্যোতির্ময় বিকাশ ঘটছিল। সেখানে অতীশ কোথাও ছিল না।

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়বার কথা ভেবেছিল অতীশ, কিন্তু মন এত সহজেই হার মানতে চাইল না। অন্তত এত সহজেই রেবার কাছে ধরা দেবার কোন অর্থ হয় না। নিজের অসীম ক্লান্তি আর একরাশ হতাশাকে জোর করে চেপে রেখে অতীশ বললে, "আপনি গেলেন না গান শুনতে?"

"আমার শরীরটা ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর হয়েছে একটু। তা ছাড়া সত্যি কথাই বলি আপনাকে।" রেবা হাসল, "ও-সব উঁচুদরের গান বেশিক্ষণ আমার বরদাস্ত হয় না। কেমন মাথা ধরে যায়।"

"বলেন কী!" প্রাণপণ শক্তিতে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল অতীশ, "আপনিও ত শুনেছি গানের চর্চা করে থাকেন। এ-কথা আপনার মুখে ত ঠিক মানায় না।"

"গান নয়, সেতার। কিন্তু যা শিক্ষালাভ হচ্ছে তা সেতারই জানে আর জানেন আমার গুরুজী। ও-কথা বলে আমায় আবার লজ্জা দেবেন না। সে থাক। কিন্তু আপনার রিসার্চের খবর কী?"

"চলছে একরকম।"

"থীসিস দিচ্ছেন কবে?"

"আরো মাস তিনেক পরে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? আমাদের মত অপদার্থ যা করে। অর্থাৎ প্রোফেসারির চেষ্টা করব।" অতীশ বিমর্ষ হাসি হাসল। কিন্তু অতীশের চোখের ক্লান্তি লক্ষ্য করেছে রেবা। অনুভব করছে, জোর করে কথা বলছে অতীশ। অনেকদিন পরে এসেছে, তাই কোনোমতে সেরে নিচ্ছে ভদ্রতার পালা।

হঠাৎ রেবার মনে পড়ল কাল রাতের কথা। সুপ্রিয়া বলছিলঃ 'আমি যদি হঠাৎ কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই—'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে রেবা বললে, "এবার একটা বিয়ে করুন না অতীশবাবু।"

অতীশ চমকে উঠল। কিন্তু সামলে নিলে সংগে সংগেই।

"বিয়ে ত করতেই চাই।" কৃত্রিম সপ্রতিভতায় অতীশ বললে, "কিন্তু পাত্রী কোথায় পাই বলুন?"

"আপনার জন্যে পাত্রীর অভাব! একবার মুখ ফুটে কথাটা বলুন, দরজার গোড়ায় পুরো এক মাইল একটা লাইন পড়ে যাবে। কিন্তু এ সব বিনয় থাক। পাত্রী ত ঠিক করাই আছে আপনার।"

অতীশ ঘেমে উঠল। রেবা হয়ত জানে। কিন্তু কতটুকু জানে? রুমাল দিয়ে আর-একবার মুখ মুছল অতীশ, হাত কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

"কোথায় আর পাত্রী ঠিক করা আছে? আপনারা ত কেউ চেষ্টা করছেন না আমার জন্যে।" অতীশ হাসল। কিন্তু রেবা হাসল না। বিষণ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অতীশের দিকে।

"আপনি সুপ্রিয়াকে বিয়ে করুন।"

অতীশের মুখে যেন আঘাত এসে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল রুমালটা। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে অতীশ শুকনো গলায় বললে, "ঘটকালির জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু সুপ্রিয়া রাজী হবে কেন?"

"কারণ সুপ্রিয়া আপনাকে ভালবাসে।"

অতীশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নতুন কথা নয়। সুপ্রিয়া নিজেই বলেছে অনেকবার, "অতীশ, তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় আমার গান। সেখানে যদি তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে না পার—তা হলে তোমাকে নিয়ে আমার কেমন করে চলবে?"

অতীশ আর আত্মগোপনের চেষ্টা করল না। তাকিয়ে তাকিয়ে পায়ের সামনে মেজেতে মোজেইকের কারু-কাজ দেখতে লাগল, কান পেতে শুনতে লাগল ঘড়ির শব্দ। তারপরে মুখ তুলল।

"ভাল হয়ত বাসে। কিন্তু বিয়ে আমাকে সে করবে না।"

"কেন করবে না?"

"আমার চাইতে অনেক বড় জিনিসের জন্যে তার সাধনা।"

রেবা হাসল, "আমি জানি। অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু একটা কথা ও বুঝতে পারে না যে, নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে জীবনে ও কিছুই পাবে না। ওর ও-সব পাগলামিতে কান দেবেন না অতীশবাবু।"

"কী করব তবে?"

"জোর করবেন।" রেবার গলা শক্ত হয়ে উঠল, "পুরুষমানুষের সত্যিকারের শক্তির পরিচয় পালোয়ানিতে নয়, এইখানেই। আপনি জোর করে বলুন।"

"সব কিছুই কি জোরের উপরে চলে?"

"সব চলে না, অনেকগুলো চলে। এও তার মধ্যে একটা। সুপ্রিয়া আপনাকে ভালবাসে, আপনি সুপ্রিয়াকে ভালবাসেন। তা সত্ত্বেও কেন ওকে এগিয়ে দিচ্ছেন ভুলের দিকে? কেন জোর করে ফিরিয়ে আনছেন না?"

আবার কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল অতীশ। কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে, কিন্তু মোছবার চেষ্টা করল না।

"ভুল করেছে কী করে বলব?" চোখ না তুলেই অতীশ বললে, "ও শিল্পী।"

"না, ও মেয়ে। সেই পরিচয়টাই আগে। জেদের ওপরে এই সত্যি কথাটাকেই ও

স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু বুঝবে অনেক দুঃখ পাওয়ার পরে। আপনি জেনে-শুনেও কেন সেই দুঃখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ওকে?"

অতীশ চুপ করে রইল। সমস্ত জিনিসটাকেই বড় বেশী সহজ করে নিয়েছে রেবা, বিচার করে নিয়েছে নিজের মত করে। কিন্তু সুপ্রিয়াকে আরো ভাল করে জানে অতীশ। প্রেমের সঙ্গে গানের বিরোধ নেই সুপ্রিয়ার, বিরোধ আছে তার বন্ধনের সঙ্গে। প্রেম তার জীবনে অনেক আসবে, বারে বারে আসবে। তার মধ্যে অতীশও আছে। কিন্তু একমাত্র নয়। কাউকে জীবনে না জড়িয়েও সুপ্রিয়া নিজের মধুচক্রটি ভরে নিতে পারবে। অনেকের অর্ঘ্যকে কুড়িয়ে নিয়ে সে তাদের সুরের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, তার গানের দীপান্বিতায় তারা প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।

অতীশ ক্ষীণভাবে হাসল। "ঠিক জানি না। আর দুঃখের বোধও হয়ত সকলের এক নয়। হয়ত নিজের মত করেই সুখী হতে পারে সুপ্রিয়া।"

"মানলাম। কিন্তু আপনি?" তীরের মত একটা সোজা প্রশ্ন রেবা ছুড়ে দিলে অতীশের দিকে, "আপনার দিকটা? ওকে ছেড়ে দেওয়াটা আপনি সইতে পারবেন? খালি ওর কথাই ভাবছেন, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন একবার?"

বিবর্ণ হয়ে গেল অতীশের মুখ। এত-দিন ধরে প্রাণপণে নিজেকেই ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছে। ভাবতে চেয়েছে, যে-ক'দিন সুপ্রিয়া তার কাছে থাকতে চায় থাকুক। যত-দিন সুপ্রিয়ার ভাল লাগে, ততদিন সে ওর মনটাকে সঙ্গ দিয়ে যাক। যেদিন সুপ্রিয়া সব কিছু নিজের হাতে সাঙ্গ করে দেবে, সেদিন সেও জানবে, সমস্ত ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু বলবার নেই, করবার নেই, ভাববার নেই।

আর তার মন? তার দিনগুলো? তার নিঃসঙ্গ দুপুর, তার বিবর্ণ সন্ধ্যা, তার ঘুমভাঙার রাত? কেমন করে কাটবে? জীবনে এমন কোন অপরূপ আনন্দ আছে, কোন আশ্চর্য বিস্ময় আছে, কোন অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, যা এই সমুদ্রবিশাল শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে? ডি-এস্‌সি? সম্মান? ভদ্র রকমের অধ্যাপনা? এক একটা অসহ্য মুহূর্তে আর্ত কান্নার মত অতীশের মনে হয়েছে, কিছুই না, কিছুই না। একটা অতলস্পর্শ গভীর খাদের উপর এরা মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এত বড় ফাঁকিটার উপরে তারা যেন আরো কঠিন, আরো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

বাইরে হাওয়া উঠল। পার্কে পামের পাতায় মর্মর। রেডিয়োতে বাঁশির সুর। ঘরের ঘড়িটা স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে সময়ের হৃৎপিণ্ডের মত নিজের অস্তিত্ব জানাচ্ছে।

প্রশ্নটা অতীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রেবাও বসে রইল চুপ করে। সেও জানে, এত সহজেই অতীশ এর উত্তর দিতে পারবে না।

অতীশ সহজ হতে চেষ্টা করল। কৃত্রিম সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, "আমি আমার কাজ নিয়ে থাকতে চেষ্টা করব। আচ্ছা, উঠি আজ। রাত হয়ে গেছে, আর আপনাকে বিরত করব না।"

রেবা বাধা দিল না, বিদায়-সম্ভাষণও জানাল না। ক্লিষ্ট ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিঃশব্দেই। অতীশ আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে গেল।

সেলাইটা আবার তুলে নিতে গিয়ে ছুঁচ ফুটে গেল আঙুলে। চুনির বিন্দুর মত এক ফোঁটা রক্ত দেখা দিল। রেবা দেখতে লাগল সেটাকে। একটা গভীর সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে রেবার মনে হল, অতীশ তাকে কেন ভালবাসল না? সে নিজের সব কিছু দিত অতীশকে, তার সমস্ত উজাড় করে দিত, কোথাও বাকী রাখত না। কিন্তু রামধনুর রঙে যার চোখ ভরে রয়েছে, মাটির ফুলকে সে দেখবে কেমন করে?

মৃদু নিশ্বাস ফেলল রেবা। জীবন। তার সমস্ত সুতোগুলোই ছেঁড়া, কোথাও জোড়া লাগে না।

আর অতীশ হেঁটে চলল পথ দিয়ে।

মেসে ফিরবে? সেই ঘরে? আবার জটিল একরাশ অঙ্ক নিয়ে বসবে? পারবে না, কিছুতেই মন বসবে না আজকে। খালি মনে হতে থাকবে একটা অন্ধকূপের দেওয়াল তার চারদিকে, তার ভিতরে সে নিরুপায় বন্দী। একটা সন্ধ্যার কয়েকটা মিনিট ব্যর্থ হয়ে গেলে সব এমন মিথ্যে হয়ে যায়, এ-কথা এতদিন কেন বুঝতে পারেনি অতীশ?

রোমান্টিক? বিজ্ঞানের ছাত্র নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে বারবার। কিন্তু মনকে সে বিচার দিয়ে বশ মানাতে পারেনি। একা চলতে চলতে অতীশের মনে হল, এই বেদনাকে সেই নিন্দে করতে পারে, এমন যন্ত্রণা যার জীবনে কখনো আসেনি, যার একটি সন্ধ্যার প্রত্যাশা এমনভাবে কখনো ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

সামনে পথ। আলো, মানুষ, গাড়ি, শব্দ। সব যেন এলোমেলো প্রলাপ। কী অর্থহীন, কী বিরাট ফাঁকি দিয়ে গড়া!

তার চাইতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা যাক ময়দানের দিকে। তারপর সামনে একরাশ অন্ধকার ভিজে ঘাস, আর আকাশভরা প্রথম শীতের বিষণ্ণ তারা।

সেই ভাল।

॥ ২ ॥

পথে মানুষের ভিড়। টিকেট কেটে যারা ভিতরে ঢুকতে পায়নি, সেই রবাহুতের দল তাকিয়ে আছে উর্ধ্বমুখে। য়্যাম্প্লিফায়ারের দিকে। ওরই ভিতর দিয়ে কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় গানের আর বাজনার সুধাবণ্টন হচ্ছে। ঝরে পড়ছে রাগ-রাগিনীর ঝরনা।

ভিতরে যারা অনেক টাকা দিয়ে টিকেট কেটে বসেছে, তারা হয়ত গানের ফাঁকে ফাঁকে পান খাচ্ছে কেউ কেউ। হয়ত তাদের দু-একজন এ ওর কানে কানে কথা কইছে। হয়ত ওরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ। কিন্তু বাইরে যে রবাহুতের দল তখন থেকে অধীর প্রতীক্ষা করছে, দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, বসে আছে রকের উপর, কিংবা ফুটপাথেই বসেছে ময়লা চাদর কিংবা গামছা বিছিয়ে, তারা এতটুকুও ফাঁক যেতে দিচ্ছে না। তালের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথা নড়ছে, সমের মুখে 'আহা-আহা' করে উঠছে। পথ চলতি ট্রাম-বাস-গাড়ির শব্দে যখন বিঘ্ন ঘটছে, তখন বিরক্ত ভ্রূকুটি দেখা দিচ্ছে তাদের মুখে।

ওস্তাদ জালিলুদ্দিনের সরোদ থামল। বহু দূরের থেকে বয়ে আসা বিপুল একটা সুরের ঢেউ যেন চূড়ান্ত কলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে খান খান হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বালির মধ্যে। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল জনতা। য়্যাম্প্লি-ফায়ারে যখন কর্কশ হাততালির বেসুরো ঐকতান উঠল, তখন বাইরের কেউ একটু শব্দ পর্যন্ত করল না।

আর একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কান্তিভূষণ। সেও টিকেট পায়নি।

য়্যাম্প্লিফায়ারে রুক্ষ গলার ঘোষণা। প্রথমে হিন্দীতে, তারপরে বাংলায়।

"এতক্ষণ মহীশূর দরবারের ওস্তাদ জালিলুদ্দিন খাঁ আপনাদের সরোদ শোনালেন। এবার খেয়াল গেয়ে শোনাবেন লখনউয়ের দীপেন বসু।"

কান্তি নড়ে উঠল একবার। দীপেন বসু। কোথাও একটা কিছু বুঝতে পেরেছে সে। কাল রাত্রেও সে এমনি পার্কে বসে খেয়াল শুনেছে সেই হলদে বাড়িটার সামনে। সকলের অভ্যর্থনা কুড়িয়ে, স্মিত হাসিতে দীপেন যখন নিজের গাড়িতে উঠেছে, তখনো বসে বসে দেখেছে কান্তি। রাত তখন এগারটার কাছাকাছি হয়েছিল, সে ছাড়া পার্কে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।

আরো মনে পড়েছে কান্তির। কাল সকালে যার মোটরে চড়ে সুপ্রিয়া তার পাশ দিয়ে, তাকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল, সে-ও দীপেন বসু ছাড়া আর কেউ নয়।

দীপেন বসু। মনে মনে কিছু একটা যোগফল টানতে চাইল কান্তি, পারল না। একটা নিশ্চিত ধারণা যত বেশী করে এগিয়ে আসতে চাইছিল, তত বেশী করেই কান্তি দূরে ঠেলে দিতে চাইছিল তাকে। নিজের এত বড় সাংঘাতিক ক্ষতিকে, এমন ভয়ঙ্কর

সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে পারছিল না কিছুতেই।

য়্যামপ্লিফায়ারে তবলার টুংটাং। কে সংগত করছে? নামটা বলা উচিত ছিল, ভুলে গেছে। ভারী মিষ্টি হাত। কে বাজাচ্ছে? কাশীর পণ্ডিত লালতাপ্রসাদ? খুব সম্ভব।

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দুখানা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ছুটে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে। শব্দের ঝড়টা যখন শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে মিলিয়ে গেল, তখন দীপেন বোসের গান শুরু হয়েছে।

"গাগরী ভরনে যাঁউ"—

এ গান কালও শুনেছে কান্তি। আজকে আরো দরাজ, আরো উজ্জ্বল, আরো বিকশিত। সমজদারের দরবারে গুণীর গলা আপনিই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ভাল লাগার একটা বিপুল উচ্ছ্বাসকে টেনে এনে মগ্ন হয়ে যেতে চাইল কান্তি, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ পেরে উঠল না। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ হয়ে রয়েছে, কপালের দুটো রগ টনটন করছে, কাল ঠাণ্ডায় রাত এগারটা পর্যন্ত বসে থেকে শরীরে দেখা দিয়েছে খানিকটা জ্বরের উত্তাপ, এই স্থূল সত্য-গুলোকে সে কিছুতেই ভুলতে পারল না।

"ননদিয়া, গাগরী ভরনে যাঁউ—"

সাতটি সুরের লহর খেলছে—লকলকিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মত। অমিয় মজুম-দারের পাশে বসে এক দৃষ্টিতে দীপেনের দিকে তাকিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। উৎকর্ণ আসরের ভিতরে, উঁচু মঞ্চের উপর এই মুহূর্তে বসেছে দীপেন। এখন সে স্বমহিম, সে সম্রাট। এতগুলি মানুষের চোখ এখন একান্তভাবে তারই উপরে; এখন তারই সুরের দোলায় দোলায় দুলে উঠছে এতগুলি রক্তোদ্বেল হৃৎপিণ্ড, এতগুলি চোখকে সেই ভুলছে স্বপ্নরসায়িত করে, এই মুহূর্তে এতগুলি মনকে নিয়ে সে যা খুশি তা-ই করতে পারে।

সম্রাট বই কি!

কাল সকালের কথা মনে পড়ল। সে আর একজন। তার চোখের কোনায় লালচে আভা, রাত্রির নেশার ঘোর তার কাটেনি, চোখের কোলে কোলে তার কালির পোঁচ পড়েছে। রগের দুপাশে চুল সাদা হয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে গালের চামড়া। ভাল-বেসে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল, অথচ জীবনের কোথাও এতটুকু স্বীকৃতির সম্মান দেয়নি তাকে। সব মিলিয়ে কেমন ক্লেদাক্ত মনে হয়েছিল। তারপরে চা খেতে গিয়ে সেই প্রস্তাব, মহাকাল-তীর্থের সেই ধ্রুপদী মৃদঙ্গের ধ্বনি, সেই কর্ণাটকী রাগ, একটা অসহ্য আকর্ষণ পাঠিয়েছিল বুকের প্রতিটি রক্ত-নাড়ীতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছিল সুপ্রিয়া। দুর্বার আকর্ষণের উপরে কোথা থেকে মেঘের ছায়া যেন নেমে এসেছিল।

ভেবেছিল সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু রাত্রেই সব এলোমেলো করে দিলে দীপেন। গান শোনাল। আবার চঞ্চলতা, আবার মৃদঙ্গের বোল; আকাশ-ছোঁয়া বিরাট গম্ভীর মন্দিরের বিশাল চত্বরের উপর পড়ল দক্ষিণী নাচের পদক্ষেপ। অনেকক্ষণ ধরে যেন একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল রেবাকে, "আচ্ছা, আমি যদি কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে চলে যাই, কেমন হয় তা হলে?"

কলকাতায় কিছু নেই, তা নয়। দুর্গা-শঙ্কর রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখে জ্বালা

ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল

নেই, তাঁর দৃষ্টি স্তিমিত, ধ্যানের মধ্যে সমাহিত। দুর্গাশঙ্করের দেওয়ালে গান্ধার-রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর গান শুনতে শুনতে, আবছা নীল আলোটার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, 'কুমার-সম্ভব'। কিন্তু শঙ্করের লাস্যলীলাকে নয়। এ সেই শঙ্কর, কস্তুরীবাসিত অলকনন্দার শীকর-বাহী বাতাস যাঁকে ঘিরে ঘিরে মুগ্ধ ভক্তের মত প্রদক্ষিণ করছে, যিনি মীলিত ত্রিনেত্রে অজিনাশ্রিত, দেবদারু[illegible] ছায়ামণ্ডপে শিলাবেদীতে যাঁর অন্তশ্চর মরুৎগুচ্ছ স্থির-স্তব্ধ, দুর্গাশঙ্করের গানে তাঁরই প্রমূর্তি মগ্ন করে, মাতাল করে দেয় না।

আর আজকে এ কী গান ধরেছে দীপেন? এ কাল সকালের সেই বিশৃঙ্খল মানুষটা নয়, কাল রাতে যে গানের মোহচ্ছন্দ বিস্তার করেছিল সে-ও নয়। এ আর একজন। যাকে সুপ্রিয়া কখনো দেখেনি, যার কাছে পৌঁছুতে হলে মাটিতে পা দিয়ে যাওয়া চলে না, যেতে হয় ঊর্ধ্বমুখী একটা জ্যোতিঃপথের অনুসরণ করে। সুরের সম্রাট আজ আকাশে বিছিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গীতের সিংহাসন। আর সেখান থেকে যেন এক-একটি করে সোনার পদ্মের পর্ণ পৃথিবীতে ঝরে ঝরে পড়ছে।

সেই স্বর্ণপর্ণের অভিষেকে শঙ্করের জাগরণ। কিন্তু দেবদারু-কুঞ্জের সেই ধ্যানশ্রী নয়। আকাশ-ছোঁয়া দক্ষিণী মন্দিরের চূড়া কত দূরে যে এখন উঠে গেছে, ছাড়িয়ে গেছে কোন্ সপ্তর্ষিলোক, পিতৃলোক, তা কেউ জানে না। গ্রানিট্ পাথরে গড়া মন্দিরের চত্বর এখন পৃথিবীর চতুঃসীমা পার হয়ে গেছে, পার হয়েছে সপ্ত সমুদ্র, প্রসারিত হয়েছে অনন্তে। এখন সমুদ্র হয়েছে মৃদঙ্গ, নক্ষত্রে নক্ষত্রে করতাল বাজছে, অরণ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় বাজছে সারেঙ্গীর সুর। এখন নটরাজ শুরু করেছেন তাঁর তাণ্ডব, তাঁকে ঘিরে ঘিরে ঘূর্ণপাক খাচ্ছে কোটি সূর্যের কোটি কোটি সপ্তশিখার বিচিত্রবর্ণ অলাতচক্র। এ যেন সৃষ্টির সেই আদি নৃত্য, যা একদিন পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছিল; এ যেন সৃষ্টির সেই শেষ নৃত্য, যার শেষ পদক্ষেপে বস্তু-পৃথিবী রেণু রেণু হয়ে জ্যোতির নীহারিকায় মিলিয়ে যাবে।

সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে দীপেন থামল।

অনেকখানি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল সুপ্রিয়া। ফিরে এল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের করতালির অট্টরোল কথার উচ্ছ্বাস, চিনেবাদামের খোলা ভাঙবার শব্দ, চায়ের পেয়ালা। যে নক্ষত্র-জগৎ মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁচেছিল, আবার তা সরে চলে গেছে দূর-দূরান্তে।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে থেকে

অমিয় মজুমদার বললেন, "লোকটা কেন ম্যাজিক জানে।"

সুপ্রিয়ার হঠাৎ কেমন ক্লান্তি লাগতে লাগল। উগ্র, ভয়ঙ্কর নেশার পরে শিরা-ছেঁড়া অবসাদের মন্থর।

"কাকাবাবু, আমি বাড়ি যাব।"

"সে কী! এখুনি?"

"আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।"

অমিয়বাবু ক্ষুন্ন হয়ে বললেন, "চল তবে। কিন্তু জমেছিল বেশ।"

"আপনি বসুন না।" সুপ্রিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "আমি যাই।"

"একা?" অমিয়বাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "রাত ত দশটা বেজে গেছে।"

"একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।"

অমিয়বাবু আবার দ্বিধাভরে বললেন, "আচ্ছা, সাবধানে যাস।"

একবারের জন্যে তাঁর মনে হল, হয়ত মেয়েটাকে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। এভাবে একা ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল না। কিন্তু গানের এমন জমাট আসরের প্রলোভন ওটুকু দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিলে। তারপরে ভাবলেন, কলেজে পড়েছে, স্কুলে পড়ায়, এটুকু স্বাধীনতা ওদের দেওয়া যেতে পারে।

মাইক্রোফোনে ধ্বনিত হল ভারতবর্ষের সেরা ওস্তাদের তবলা-লহরার বার্তা। অমিয় মজুমদার উৎকর্ণ হয়ে বসলেন। আর সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল হল থেকে।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"

পাশ থেকে কে জিজ্ঞেস করল। সুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখল, শীর্ণ কালো চেহারার একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, ময়লা শার্টের উপরে বিবর্ণ কোট পরা।

সুপ্রিয়া বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়ল।

"আপনার টিকেটটা আমাকে দেবেন?" একটা মিনতির মত শোনাল ভদ্রলোকের স্বর।

"ওটা দু দিনের জন্যে। স্পেশ্যাল কার্ড।"

"ওঃ!"

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন। তারপর আবার গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন পাশের পার্কের রেলিঙের গায়ে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়ে চলল ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে।

"সুপ্রিয়া!"

চকিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সুপ্রিয়া। অতীশ? আজ সারাদিন ধরে অতীশের কথাটা থেকে-থেকে তাকে বিষণ্ণ করেছে, মনে পড়েছে, আজও সন্ধ্যায় দুর্গাশঙ্করের বাড়ির উলটো দিকে বকুলতলায় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে অতীশ। সুপ্রিয়া খুশির চমকে ফিরে তাকাল।

কান্তি।

"কান্তি—তুমি!"

দুটো জ্বলজ্বলে চোখে সুপ্রিয়াকে লেহন করতে করতে কান্তি বললে, "কেন, আমার কি আসতে নেই তোমাদের কলকাতায়?"

"গান শুনতে এসেছিলে? কিন্তু তোমাকে ত ভেতরে দেখতে পেলুম না।"

"টিকেট পাইনি।"

সুপ্রিয়া নিজের ব্যাগ খুলল। বের করে আনল ফিকে গোলাপী রঙের স্পেশ্যাল কার্ডটা।

"এইটে নিয়ে ভেতরে যাও। কালকেও চলবে। আমার আর দরকার হবে না।"

"কার্ড থাক।" তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে কান্তি বললে, "তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।"

সুপ্রিয়া হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "কিন্তু রাত দশটা বেজে গেছে। আমাকে আবার ফিরতে হবে সেই ভবানীপুরে। তুমি বরং কাল সকালে আমাদের বাড়িতে যেয়ো কান্তি।"

মুখের উপরে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে পড়ল কান্তির। কালকের সকাল, পথ দিয়ে একটানা পায়চারি, কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা হলদে বাড়িটার নীল পর্দা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে; তারপর সন্ধ্যা, সামনে একরাশ নানা রঙের মোটর যেন একটার পর একটা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে; আর আজ এই রাত দশটা পর্যন্ত—

দাঁতে দাঁত চাপল কান্তি। মাথার রগগুলো দপদপ করছে। সর্বাঙ্গে জ্বরের উত্তেজনা। টেম্পারেচারটা একটু বেড়েছে হয়ত। এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিত। ফিরে যাওয়া উচিত নিজের বোর্ডিঙে, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা উচিত ছারপোকা-কণ্টকিত ঠান্ডা বিছানাটার উপরে; আর শুয়ে-শুয়ে ভাবা, নিজের এক-একটা আঙুলকে ছুরি দিয়ে কাটলে যন্ত্রণাটা কেমন লাগে?

কিন্তু কান্তি পারল না। বললে, "বেশীক্ষণ তোমার সময় নেব না। মাত্র দশ মিনিট আমায় দিতে পারবে? তারপরে আমিই তোমায় ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

নিজের কানেই নির্লজ্জের মত ঠেকল কথাটা।

সুপ্রিয়া একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলল।

"পাশের চায়ের দোকানটায় বসবে?"

"থাক—কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। যেতে যেতেই কথা হবে।"

কান্তি আবার দাঁতে দাঁত চাপল। অর্থাৎ এতটুকু নিভৃতি দেবে না সুপ্রিয়া। একেবারে একান্ত করে পাওয়ার সুযোগ দেবে না কিছুক্ষণের জন্যেও। তার একেবারে নিজের কথাটাকেও বলতে হবে বহুজনের বিশৃংখল বেসুরো শব্দের মধ্যে। কৌতূহলী অসহ্য ভিড়ের ভিতর।

একটা আহত গর্জনকে নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়ে কান্তি বললে, "বেশ।"

কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া! এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাঁটুর জোড়গুলো পর্যন্ত যেন খুলে আসছে, মাথার মধ্যে চাকার মত ঘুরছে কী একটা, মুখের ভিতরটা অদ্ভুত তেতো হয়ে গেছে। তবু কান্তি আচ্ছন্নের মত সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। মনে পড়ে গেল, পাঁচ বছর আগে এমনি একটা শারীরিক অসুস্থ যন্ত্রণার দিনে তার দিকে তাকিয়ে করুণায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার চোখ, নিজের কোল পেতে দিয়ে বলেছিল, "একটুখানি শুয়ে থাক লক্ষ্মী ছেলের মত।" দু হাতে সুপ্রিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল কান্তি, সুপ্রিয়া তার চুলে মায়ের মত আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল।

আজকে নিজের শরীরটাকে জগদ্দল পাথরের মত টানতে টানতে কান্তি সুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তুমি ভাল আছ কান্তি? উঠেছ কোথায়?"

"উঠেছি শেয়ালদার একটা বোর্ডিঙে। ভালই আছি।"

"কাকিমা?"

"ভালই আছেন।"

"তোমার গান?"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা রূঢ় জবাব আসতে চাইছিল, কিন্তু কান্তি নিজেকে সামলে নিলে।

"চলছে একরকম।" তারপর চাপা গোটা-কয়েক দ্রুত নিশ্বাস ফেলে কান্তি বললে, "কিন্তু আর বেশী দিন চলবে না। এবার তোমাকে আমার দরকার। তুমি ত জান, তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি।"

সুপ্রিয়া শ্রান্ত চোখে কান্তির দিকে চাইল, "আমি ত আছিই তোমার জন্যে।"

"না, নেই।" কান্তির ঠোঁটের কোনা কাঁপতে লাগল, "সকলের ভেতরে তোমার এক টুকরো আমি পেতে চাই না। আমি এবার সম্পূর্ণ করে নিতে চাই তোমাকে। একেবারে আমার জন্যেই। যেখানে আমার কোনো ভাগীদার থাকবে না।"

সুপ্রিয়া একটুখানি থামল। সামনের একটা জ্বলজ্বলে নিয়ন আলোর লেখার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "কিন্তু আমার সবটুকু ত একা তোমাকে দিতে পারব না কান্তি। অন্য লোকও আছে, তারা দাবি ছাড়বে কেন?"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু কান্তি হাসল না। চোখ থেকে এক ঝলক আগুন ঠিকরে পড়ল তার।

"ওসব থাক সুপ্রিয়া। আজ স্পষ্ট কথাই

বলতে এসেছি তোমাকে। কবে বিয়ে হবে আমাদের?"

"বিয়ে!" সুপ্রিয়া এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে গেল।

কান্তি বললে, "হ্যাঁ, বিয়ে। কবে বিয়ে করবে আমাকে?"

আর লঘুতা চলবে না। কান্তির স্বরের জ্বালা অনুভব করল সুপ্রিয়া, দেখতে পেলে তার চোখের আগুন। শান্ত কঠিন গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আমাকে বিয়ে করা তোমার দরকার?"

"শুধু দরকার নয়!" কান্তি হিংস্রভাবে বললে, "পারলে আজকেই—এই মুহূর্তে।"

"ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কতকগুলো সর্ত আছে আমার।"

"বল কী সর্ত।"

"আমি হয়ত আরো দু-একজনকে ভালবাসব। তুমি আমাকে সবটাই পাবে, কিন্তু আমার মনের খানিকটা থাকবে তাদের জন্যেও। তারা আমার কাছে আসবে যাবে। সইতে পারবে সেটা?"

হাতের আঙুলগুলো কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে, কান্তি প্রাণপণে মুঠো করে ধরল। চাপা গলায় বললে, "চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করা নয়, কথা দিতে হবে। তা ছাড়া আমার খরচ অনেক, তুমি চালাতে পারবে কান্তি?"

চলতে চলতে নুড়িতে হোঁচট খাওয়ার মত প্রশ্নটা এসে আঘাত করল।

"আমার যা আছে সে ত তুমি জানই।"

"ওতে চলবে না কান্তি। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে বসে তোমার ঘর-সংসার দেখব, রান্না-বান্না করব, ছেলে মানুষ করব, আর সময়-সুযোগ পেলে এক-আধদিন তানপুরো নিয়ে বসব, সে আমার সইবে না। তুমি ত জান, আমি বিলাসী। আমি শৌখিন হয়ে, সুন্দর হয়ে থাকতে চাই। শহরের জীবন নইলে আমার একদিনও চলবে না। তোমার রান্নাঘরের হাঁড়িতে কিংবা জামায় বোতাম লাগানোর কাজে একদিনও তুমি আমায় আশা কর না। আমি বড় বড় ওস্তাদের কাছে গান শিখব। শিখতে যাব বোম্বাইয়ে, বরোদায়, মাদ্রাজে। হাজার হাজার টাকা আমার জন্যে তোমার খরচ করতে হবে। যদি কখনো ভাল গাইয়ে হতে পারি—" সুপ্রিয়া একবারের জন্যে থামল, "তা হলে নানা জায়গায় আমার ডাক আসবে, আমি গাইতে যাব। তখন তুমি আমায় বাধা দিতে পারবে না। রাজী আছ কান্তি?"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতরটা তার হাপরের মত ওঠা-পড়া করছে।

"তার মানে আমায় লাখোপতি হতে বলছ সুপ্রিয়া।"

"সে আমি জানি না। লাখোপতি কোটিপতির খবর তুমিই রাখবে। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমার এই খরচের দায় তোমার নিতে হবে কান্তি। আমাকে শুধু নিজের ঘরে রাখতে পারবে না, বাইরে ছেড়ে দিতে হবে। পারবে ত?"

এর চাইতে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান এমন নগ্ন ভাষায় আর করা চলে না। কান্তির একবারের জন্যে মনে হল, রুক্ষ, কর্কশ হাতে সে সুপ্রিয়ার মুখটা চেপে ধরে। তারপর আদিম যুগের হিংস্র মানুষের মত তাকে কেড়ে নিয়ে চলে যায় এখান থেকে।

সুপ্রিয়া শীতল হাসি হাসল। তাই বলছিলাম কান্তি, কেন তুমি সম্পূর্ণ করে আমাকে চাও? তোমাকে যা দেবার আমি দিয়েছি। আর কেউ যদি আমাকে নিয়েও যায়, তা হলেও তোমার যেটুকু পাওনা তা থেকে তুমি ঠকবে না। তাইতেই খুশী থাক কান্তি। আমাকে সবটা পেতে গিয়ে কেন তুমি এত বড় দায় তুলে নিতে চাও?"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো পাথর হয়ে গেছে।

"তা হলে আগে বড়লোক হতে চেষ্টা করব। টাকার যোগ্যতা নিয়েই পৌঁছব তোমার কাছে।"

সুপ্রিয়া একবার তাকাল। শীতল কঠিন মুখের উপর একটুখানি সমবেদনার দীপ্তি ঝলকে গেল।

"টাকা জিনিসটাকে অত ছোট করে দেখ না কান্তি। দারিদ্র্যটা মানুষের গৌরব নয়, তার লজ্জা। অভাবের জ্বালায় মানুষ যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থ এই নয় যে, সারা দুনিয়াকে তারা গরিব করে দেবে। সকলেরই বড়লোক হওয়ার দরকার আছে বলে কয়েকজন অতি-বড়লোকের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই।"

কান্তি শুনতে পাচ্ছিল না। চোখের সামনে কুয়াশার মত কী খানিকটা ঘনিয়ে আসছে যেন।

সামনে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। একখানা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়া।

"সব চেয়ে বড় কথা, আমি শিল্পী। যারা বলে অভাব আর দুঃখের মধ্যেই শিল্পের আসল বিকাশ, তারা মিথ্যে কথা রটায়, অক্ষমতার উপরে আত্মবঞ্চনার প্রলেপ এঁকে দেয়। কিন্তু কান্তি, আমি সেভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব না। আমাকে বড় হতে হবে, আমাকে ভাল করে গান শিখতে হবে; যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিলাসিতা তার মধ্যে দিয়ে আমার মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। আমার অনেক টাকা চাই কান্তি, হাজার হাজার টাকা।"

"বুঝলাম।"

ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে পা বাড়িয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তাই বলছি কান্তি, এসবে কী দরকার? আমার যেটুকু তোমায় দিয়েছি, তার সবটুকুই তোমার, তার ভিতরে এতটুকু ফাঁকি নেই।" ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে বাইরে গলাটা একটু বাড়িয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসল, "পাগলামি ছেড়ে দাও কান্তি। বোর্ডিঙে ফিরে গিয়ে বেশ করে একটা ঘুম লাগাও আজ। তারপর কাল সকালে এস আমাদের ওখানে। রবিবার আছে, চা খাব এক সঙ্গে, গল্প করব অনেকক্ষণ।"

কান্তি জবাব দিল না।

ট্যাক্সির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে কান্তির হাতে একটা চাপ দিলে সুপ্রিয়া। চমকে উঠল তারপরেই।

"কী, জ্বর হয়েছে নাকি তোমার?"

একটা ঠাণ্ডা সাপের ছোঁয়ায় যেন চমকে উঠল কান্তি। ঝট করে তিন পা সরে গিয়ে বললে, "না, কিছু না।" তারপরে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে।

সুপ্রিয়ার মনে হল, ওকে ফিরে ডাকা উচিত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্যভাবে বললে, "কোথায় যাবেন?"

নিশ্বাস চেপে নিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "ভবানীপুর।"

তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র, কোন এক খুনীর ছেলে—যে-খুনীর ছদ্মনাম শান্তিভূষণ—উত্তরাধিকারসূত্রে সে দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে পাড়াগাঁয়ে একখানা পুরনো দোতলা বাড়ি, একশো বিঘে ধানী জমি, একটা পুকুর, পোস্ট অফিসের বইতে সবশুদ্ধ বার শ টাকা। মোটের ওপর বেঁচে থাকা চলে। কিন্তু হাজার টাকা—লক্ষ টাকা—

ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যা, তাও পাশ করতে পারেনি। তবলায় আর গানে অনেকদিন আগে ওকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি দিয়েছিল সুপ্রিয়া, কিন্তু কান্তি জানে, সারা দেশের গুণীদের দরবারে এখনো তার পিছনের সারিতে বসবারও যোগ্যতা আসেনি। সেখানেও কেউ তাকে টাকার তোড়া নিয়ে ডেকে পাঠাবে না ঠাকুর ওংকারনাথের মত, হীরাবাঈ বরোদেকারের মত, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর মত। রেশমী রুমাল বাঁধা মোহর তার পায়ের কাছে উড়ে পড়বে না রাজদরবার থেকে।

তা হলে কী করতে পারে কান্তিভূষণ?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত একটা বাসে উঠে বসে সে ভাবতে লাগল: কী করতে পারে?

চুরি ডাকাতি। বাটপাড়ি। খুন। আর একটা কাজ পারে। আঠার বছর বয়েসে গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকর ভরা ঘরটার পাশে বসে যে-কথা সে ভেবেছিল। আত্মহত্যা করতে পারে।

জীবনে সেদিন যে-গ্রন্থিটুকু ছিল, আজ সেটা ছিঁড়ে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। আজকে আর কোনো মোহ নেই। একটা কথাও ঠাট্টা করে বলেনি সুপ্রিয়া। বলেছে শীতল, কঠোর, নিষ্ঠুর ভাষায়। তার

ভিতরে আত্মবঞ্চনার এতটুকু রন্ধ্র নেই কোথাও।

"টিকেট?"

কণ্ডাক্টরের গলা। লোহার বালাপরা একখানা প্রসারিত রোমশ হাত।

"কোথায় যাবে বাস?"

"শ্যামবাজার।"

একটা এক টাকার নোট বের করে দিয়ে কান্তি বললে, "শ্যামবাজারের টিকেটই দাও।"

হাতে একটা টিকেট পড়ল, সেই সঙ্গে একরাশ খুচরো। কান্তি একসঙ্গে সবগুলো পকেটে ফেলল।

পাশে কাবুলীওলা বসেছে একজন। কালো জাব্বাজোব্বা থেকে উৎকট গন্ধ। কান্তি বাইরে তাকিয়ে রইল। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। কুয়াশা মাখা চোখের সামনে কিছুই সে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোর ঝড় বয়ে চলেছে বাইরের পৃথিবীতে।

সেই সিনেমা হাউসটা। একবারের জন্যে তার পাশে এসে বাসটা দাঁড়াল। নানা রঙের আলোর মাদক আহ্বান। পথে, ফুটপাথে প্রবাহিত জনতা। ফ্ল্যাম্পিলফায়ার থেকে বেলা-তরঙ্গ ঝরছে, দ্রুত লয়ে চলছে সিম্ধ সীমের হাত। মনে হচ্ছে রাজপুতানার পাথুরে পথ দিয়ে ছুটে চলেছে একদল সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার। ঘোড়ার খুরে খুরে আগুন যেন ঠিকরে পড়ছে।

কান্তি চোখ বুজল।

বাস আবার চলেছে। চোখের সামনে আলোর ঝড়। থেকে থেকে বাসটার থেমে দাঁড়ান। নানা রকমের মুখ। পাশ থেকে কখন নেমে গেছে কাবুলীওয়ালা। সামনের সীটে শ্যামলী একটি মেয়ে এসে বসেছে। ফাঁপানো বার্বার ধরনের চুল, তা থেকে লাইম-জুসের মত কী একটা গন্ধ।

কিন্তু এভাবেও আর বসে থাকা চলে না। শরীরে জ্বালার স্রোতটা সাপের বিষের মত বয়ে যাচ্ছে। কোথায় চলেছে কান্তি? শ্যামবাজার? কেন যাবে? কী আছে সেখানে? কিসের আকর্ষণ?

কান্তি নেমে পড়ল। পা দুটো আর বইছে না। মনে পড়ে গেল গঙ্গাযাত্রীদের ঘরের পাশে সেই অন্ধকার বিশাল বটগাছটা, যার তলায় এক টুকরো ছেঁড়া সিলকের কাপড়ের মত সাপের খোলস উড়ছে। ওপারে একটা চিতা জ্বলছে, তারও পিছনে উদ্যত ভূতুড়ে হাতের মত কলের গোটা দুই অন্ধকার চিমনি।

সেইখানে ফিরে যেতে পারলে হত। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকা যেত ফাটল-ধরা ঠাণ্ডা ঘাটলাটার উপরে। তারপরে—

কিন্তু সে এখনো অনেক দূর। আজকে আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই।

অতএব আবার সেই শেয়ালদার বোর্ডিং। ঠাণ্ডা বিছানা। ছারপোকার শরশয্যা। কালকের মত আজও পাশের সীটের মোটা ভদ্রলোকের একটানা জান্তব নাকের ডাক। কিন্তু সেইখানেই ফিরে যেতে হবে।

রাস্তা পেরিয়ে কান্তি ওপারের ট্রাম-স্টপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা পোস্ট ধরে।

কতক্ষণ সময় গেল? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট? একখানাও গাড়ি আসছে না কেন?

পেছন থেকে কে আলগা ভাবে স্পর্শ করলে তাকে। শীর্ণ, শীতল আঙুল। চকিত হয়ে কান্তি ফিরে তাকাল।

কালো একটি কদাকার মেয়ে। পরনে সস্তা ছিটের শাড়ি। চোখে কাজল। মুখে পাউডারের প্রলেপ। কোটরে বসা নিষ্প্রভ চোখের মধ্য থেকে কটাক্ষ বর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, "আসবে?"

কান্তি তাকিয়ে রইল।

"এস না।" মৃদু বিষণ্ণ মিনতি। আজকের সন্ধ্যাটা ওর ফাঁকাই গেছে খুব সম্ভব।

কান্তি তেমনি চেয়ে রইল আরো কিছু-ক্ষণ। পিছনে খোলার ঘরের সারি।

কী ভেবে কান্তি বললে, "বেশ, চল।"

আসল কথা, সে আর দাঁড়াতে পারছে না। একটা কোথাও বসা দরকার, একটু জিরানো চাই। হাত-পা ভেঙে আসছে। কিন্তু তাই বলে এদের ঘরে? গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠা একটা অসহ্য ঘৃণার আবেগকে নিজের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত করে নিলে কান্তি। তার কিসের বিচার, কিসের সংকোচ? সে খুনী শান্তি-ভূষণের ছেলে। কান্তি আরো জানে, খুনী, শয়তান, সমাজের আবর্জনাদের জায়গা এদেরই ঘরে। পৃথিবীর যত পলাতক মানুষের এরাই কেদাক্ত আশ্রয়।

মেয়েটি আবার চাপা ত্রস্ত গলায় বললে, "দেরি কর না, পুলিশ এসে পড়বে।"

একটা অন্ধকার নোংরা গলি দিয়ে, পায়ের তলায় জলকাদা মাড়িয়ে কান্তি খোলার ঘরে এসে ঢুকল। মেঝেতে একটা ময়লা বিছানা, ঘরে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো।

মেয়েটি বললে, "বস।"

আর একবার কান্তির শরীর শিরশিরিয়ে উঠল, আবার খানিকটা বমির বেগ ঠেলে এল গলার কাছে। এক লাফে ছুটে যেতে চাইল বাইরে। কিন্তু পা দুটো তার ঠকঠক করে কাঁপছে। বিছানাটার উপরে সে ধপ করে বসে পড়ল।

মেয়েটি এইবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল তাকে। কদাকার মুখে হেসে বললে, "কখনো এর-আগে আসনি—না?"

"না।"

"নতুন যে সে বুঝতেই পারছি। বস, ভাল করে বস।"

বসা নয়, শুয়ে পড়া দরকার। মেরুদণ্ডটা যেন হাজার টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তবু কান্তি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"অমন করে চেয়ে আছ কেন?" মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, "শরীর ভাল নেই তোমার?"

"সে থাক। তুমি গান জান?"

"জানি কিছু কিছু। কিন্তু সে গান কি তোমার ভাল লাগবে?"

পাশের ঘর থেকে মাতালের চিৎকার উঠল, একটি মেয়ে হেসে উঠল ডাকিনীর মত খলখল গলায়। কান্তির দু হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করল।

"খুব ভাল লাগবে। তুমি গান শোনাও।"

বিছানার এক কোনায় ছোট একটা খেলো হার্মোনিয়ম। মেয়েটি হার্মোনিয়ম নিয়ে বসল। খানিকটা উৎকট যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুল কিছুক্ষণ, তারপর ভাঙা বেসুরো গলায় অমার্জিত উচ্চারণে মেয়েটি হিন্দী সিনেমার চটুল গান ধরল একখানা। আর সেই সঙ্গে হিন্দী ছবির নায়িকার মতই কোটরে-বসা চোখের ভিতর দিয়ে কান্তির দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপের করুণ চেষ্টা করতে লাগল।

শুনতে শুনতে আবার কান্তির চোখ বুজে এল। চারদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা। শুধু আকাশ। সামনে, পিছনে, পায়ের নীচে। এই গান নয়, দীপেন যেন খেয়াল গাইছে। তার সুর যেন একরাশ জোনাকি হয়ে ঘিরে ধরছে তাকে। তার চারদিকে সুরের বিন্দু রূপ নিয়েছে আগুনের কণায়। "ননদিয়া, গাগরী ভরনে যাউ—"

মাঝপথেই গান বন্ধ করে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি।

"ও টগরদি, ও টগরদি, শিগগির এস! এ যে মূর্চ্ছো গেল গো! এ কী বিপদে পড়লাম! টগরদি—টগরদি—"

॥ ৩ ॥

নাচ শেষ করে গীতা কাউর যখন পার্ক স্ট্রীটের বাসায় ফিরে এল, রাত তখন প্রায় দুটো।

চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। শ্রান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে গীতা দেখল দীপেনের ঘরে আলো জ্বলছে। গীতা আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা ভেজানোই ছিল, খুলে গেল।

"তুমি ত এগারটায় ফিরেছ দীপেন। শোওনি এখনো?"

"ঘুম আসছে না।"

গীতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার তাকাল। টেবিলে হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস।

"বসে বসে ড্রিংক করছিলে?"

"অল্প। আজ মাতাল হইনি, দেখছ ত? একটুখানি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। তাই সামান্য—"

গীতা বললে, "তুমি ত জান দীপেন, সামান্যও তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। জেনে শুনে তবু কেন খাও?"

"কেন খাব না?"

"তোমার বেঁচে থাকার দরকার আছে বলে।"

দীপেন হেসে উঠল, "কার কাছে?"

"দেশের কাছে।"

"দেশ আমার কে? তার জন্যে জোর করে বেঁচে থাকতে হবে, এমন প্রতিশ্রুতি আমি দেইনি।"

গীতা নিজের ঘরে যাওয়ার কথা ভাবছিল, কিন্তু গেল না। বসে পড়ল সামনের চেয়ারটাতে। দীপেনের মুখোমুখি।

"তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে পারি দীপেন?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তোমাদের এই ধরনের রোমান্স কবে কাটবে বলতে পার?"

"কিসের রোমান্স?" গীতার গলার স্বরের রূঢ়তায় দীপেন ভুরু কোঁচকাল, "কী বলছ তুমি?"

"আজও তোমাদের সংস্কার, মদ খেয়ে লিভার পচাতে না পারলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এখনো তোমরা মনে কর, বীভৎস রকম নেশা না করলে তোমাদের ইনস্পিরেশন আসে না। অথচ এই মদের জন্যেই তোমরা ফুটতে না ফুটতে মরে যাও, অর নেশার ফাঁস পরিয়ে একটু একটু করে হত্যা কর নিজের শিল্পকে। ওমর খৈয়ামের স্বপ্নটা ছেড়ে দাও দীপেন, ওটা মধ্যযুগের ব্যাপার।"

দীপেন ব্যঙ্গের হাসি হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে, তারপর বললে, "মাঝরাতে তুমি কি আমাকে প্রহিবিশনের গুণগান শোনাতে এসেছ গীতা? লেকচার?"

"লেকচার নয় দীপেন। নিজেই ভেবে দেখ, এই মদের জন্যে কতগুলো প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে দেশে।"

"আমিও না হয় মহাজনদের পথ ধরেই এগিয়ে চলব গীতা। সেইটেই কি ভাল নয়?"

"ওটা একটা চমৎকার ডায়লগ্ দীপেন, তার বেশী কিছু নয়। কথা দিয়ে অনেক ফাঁকিকে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাই বলেই এরা সত্য হয়ে ওঠে না। তুমি মদ ছেড়ে দাও। একান্ত ছাড়তে না পার, একটা মাত্রা রাখ। 'সজনি ভরু দে পেয়ালা'য় রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু বমির মধ্যে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাক, তখন সে-দৃশ্য দেখে সজনী খুশী হয় না।"

"আজ তোমাকে ভারী উত্তেজিত মনে হচ্ছে গীতা।" দীপেন মুখের সিগারেটের ধোঁয়া রিং করতে লাগল, "খুব ভাল নেচে এসেছ বোধ হয়।"

"ঠাট্টা নয় দীপেন। তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।"

"মদ ছেড়ে কী নিয়ে থাকব?"

"গান নিয়ে।"

"তা হলে গানের উৎসও আমার শুকিয়ে যাবে।"

"যাবে না দীপেন। তুমি ত জান, শাস্ত্রে গানকে তপস্যা বলা হয়েছে। মাতলামি দিয়ে আর যাই হক, তপস্যা হয় না। অমৃতসরে আমি এক গায়ককে দেখেছি। সোনার মন্দিরে তিনি গান গাইতেন, গাইতেন গুরু নানকের ভজন। কিছু মনে কর না, তোমাদের দেশের অনেক নামজাদা ওস্তাদ তাঁর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নন। কোনো নেশা, কোনো অসংযম তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রায় নব্বই বছর বয়েসে তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি বাইশ বছরের জোরালো গলায় গান গেয়েছিলেন।"

"সকলে এক নয় গীতা।"

"খুব বেশী তফাতও নয় দীপেন। সংযম জিনিসটা একজনের আসে আর একজনের আসে না, এ-কথাটা অসংযমের সাফাই। তোমরা গানের জন্যে মদ খাও না, মদের তলায় তলিয়ে দিয়েছ গানটাকে।"

দীপেন আবার ভুরু কোঁচকাল। "তুমি নিজে এ-রসে বঞ্চিত, তাই বুঝতে পারছ না গীতা। যদি একবার—"

"একবার?" গীতা অদ্ভুত ধরনে হাসল, "একবার নয়, অনেকবারই আমি খেয়ে দেখেছি দীপেন। একটা সময় গেছে, যখন আমিও দিনের পর দিন নেশার মধ্যে ডুবে থেকেছি।"

তুমি ত জান দীপেন, সামান্যও তোমার পক্ষে বিপজ্জনক

"তুমি!" দীপেন সকৌতুকে বললে, "তোমারও চলত নাকি এ-সব? আমি ত ভেবেছিলাম, তুমি বরাবরের গুড্ গার্ল।"

"গুড্ গার্ল!" গীতা শীর্ণভাবে হাসল, "তাই ছিলাম বটে এককালে। যখন লাহোরে আমার বাবা ব্যবসা করতেন, যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরে বাঈজী হতে হল। স্কুলে নাচতে শিখে-ছিলাম, সেই নাচের মোড় ফিরল অন্যদিকে। তখন আর এক অন্ধকারের জীবন। সে-অন্ধকারে তোমার মত আমিও মদের বোতলকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম।"

দীপেন আশ্চর্য হল। "হঠাৎ এ-পরিবর্তন কেন? কলেজ থেকে একেবারে বাঈজী?"

গীতার মুখের উপর ছায়া নামল, ঘন আর গাঢ় হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। জানলা দিয়ে একবার বাইরে চেয়ে দেখল গীতা। রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড ম্যানসন-বাড়িটা রাত্রির সমুদ্রে একখানা জাহাজের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে; মাথার উপরে আকাশে একটা তারাও নেই, স্তরে স্তরে মেঘ এসে জমেছে সেখানে।

গীতা বললে, "সে আরো অনেকের মত পুরনো গল্প দীপেন। দাঙ্গা বাধল, রক্তের পিচকারি ছুটল লাহোরের রাস্তায়। সেই রক্ত মেখে জানোয়ারের দল নেচে বেড়াতে লাগল। বাবাকে খুন করল রাস্তায়, মা-কে আমাদের চোখের সামনে বীভৎসভাবে টুকরো টুকরো করল। তারপর আমাদের দু বোনকে চুল ধরে টেনে একটা ভ্যানে উঠিয়ে নিলে।"

গীতা একটু চুপ করল, মৃদু গলায় আবার বলতে আরম্ভ করল, "ফিরে এলাম দেড় বছর পরে, পাকিস্তান হয়ে গেলে। পালিয়ে এলাম। এই দেড় বছর কীভাবে কেটেছে সে আর বলে লাভ নেই। ভ্যানে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পরে আমার বোনকে আর দেখতে পাইনি, দেড় বছরে কোনো সন্ধানও পাইনি তার। একাই ভেসে এলাম অমৃতসরে। সরকারী আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আর-একজন চোস্ত সাহেবী চেহারার ইংরেজী-ওলা লোক বিয়ে করবে বলে এনে ভিড়িয়ে দিলে বাঈজীর আখড়ায়।"

দীপেনের সিগারেট আঙুলের পাশে এসে জ্বলছিল। জানলা গলিয়ে সে বাইরে ছুঁড়ে দিলে। গীতা বলে চলল, "কিন্তু তার মধ্যে তখন আর বিশেষ কিছু গ্লানি ছিল না দীপেন। চূড়ান্ত অপমানে জ্বলে গিয়ে-ছিলাম অনেক আগেই, দ্বিধা খুব বেশী ছিল না আর। এতদিন জানতাম, ধুলোতেই পড়ে আছি; এখন দেখলাম আমার পায়ের ধুলোয় লুটিয়ে পড়বার জন্যেও অনেকে আছে। নাচতে জানতাম, আরো ভাল করে শিখলাম। শিখলাম, কেমন করে মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, কেমন করে বুনো জানোয়ারদের কুকুরের মত বশ করা চলে। যারা আমায় চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম এখন আমার চোখের দিকে তাকানোর শক্তিও তাদের নেই।"

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আই য়্যাম অ-ফুলি সরি, গীতা।"

"তুমি দুঃখিত হয়ে কী করবে দীপেন।" গীতা হাসল, "সেদিন নিজের সম্পর্কেও বোধ হয় কোনো দুঃখের চেতনা আমার ছিল না। তবু এক-একদিন পুরনো স্মৃতিটা জেগে উঠত। মনে পড়ত: গুরুদ্বারে গান হচ্ছে, বাবা বসে আছেন চুপ করে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেখতে পেতাম, বিকেল-বেলা আমাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট লনটিতে আমি আর আমার বোন ব্যাডমিন্টন খেলছি। আর মনে পড়ত আমাদের কলেজ: গেট পেরিয়ে লাল সুরকির পথ, দু ধারে রাশি রাশি ফুল—আর, আর আমাদের ইংরেজীর জুনিয়র প্রফেসার সোহনলালকে। কতদিন দেখেছি, দোতলার প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সোহনলাল, আমি কখন কলেজে আসব তাই দেখবার জন্যে।"

দীপেন আর একবার হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে নিলে। বললে, "তুমি তাঁকে ভালবাসতে?"

"ষোল বছরের মনের খবর ঠিক জানি না দীপেন, বোধ হয় বাসতাম। তিনি যে বাসতেন, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। হয়ত পরে আমাদের বিয়েও হয়ে যেত।"

গীতা থামল। আকাশে কালো মেঘ। রাত্রির সমুদ্রে নোঙর ফেলা জাহাজের মত নিরাট ম্যানশনটা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপেন বললে, "সোহনলাল বেঁচে আছেন?"

"আছেন। দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রফেসর তিনি।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলে?"

"তাঁকে দুঃখ দেবার জন্যে?" গীতা বললে, "তিনি ত কোনো অন্যায় করেননি, মিথ্যে তাঁকে দণ্ড দেব কেন? সে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। বাঈজী-জীবনের এক একটা অবসরে যেদিন এ-সব কথা মনে পড়ত, মনে পড়ত সোহনলালকে, সেদিন নিয়ে বসতাম মদের বোতল। যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়েছি, ততক্ষণ ছাড়িনি। কিন্তু কী লাভ হল দীপেন? যাকে ভুলতে চেয়েছি, মদ খেলে দেখেছি আরো বেশী করে তাকে মনে পড়ে। যে-যন্ত্রণা এমনিতে অস্পষ্ট হয়ে থাকে, সেটা টনটনিয়ে ওঠে অসহ্যভাবে। আর নেশা কেটে গেলে আরো বারোক ঘণ্টা অবসাদের মধ্যে সেই স্মৃতিটাই বিষের মত জ্বলে, অথচ শরীরে মনে কোথাও এমন এতটুকু উদ্যম থাকে না যে তাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিই।"

দীপেন গীতার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো ঝাপসা, জল এসেছে অল্প অল্প। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই গীতা বলে চলল, "মদ ছেড়ে দিলাম। ফিরে এলাম অনেকখানি স্বাভাবিক জীবনে। নাচকে জাতে তুললাম, শিখলাম ভরত-নাট্যম্। নাম আমার ছড়িয়ে পড়ল, তোমরা আমাকে চিনলে। অবশ্য গীতা কাউরকেই চিনলে, কলেজের খাতায় যে-নাম ছিল, সে-নামে নয়।"

"গীতা তোমার আসল নাম নয়?"

"না। কিন্তু আগের নামটাই ত এখন নকল, সে-পরিচয় ত আমার কোথাও নেই। তবু আমি আর এখন এতটুকুও দুঃখ করি না দীপেন। জীবনে যে-পথ দিয়েই তুমি যাও, সেখানেই তোমার কিছু না কিছু করবার আছে। মাটিতে অনেক পোড়ো জমি থাকতে পারে দীপেন, কিন্তু জীবনে নেই; ইচ্ছে করলে সব জায়গাতেই তুমি ফুল ফোটাতে পার, ফল ধরাতে পার। তুমি মাঝে মাঝে বল, যা চেয়েছিলে পাওনি, তাই তোমাকে এমনি করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু তোমার চাইতেও মদের মধ্যে ডুবে যাওয়ার অনেক বেশী অধিকার আমার ছিল। তবু আমি দেখেছি, কিছুই ফুরোয় না, কিছুই শেষ হয় না। যে-কোনোদিন তুমি আরম্ভ করতে পার, যে-কোনো জায়গা থেকেই আরম্ভ করতে পার। আমি শিল্পী, আমি আলাদা—এমনি কতগুলো গালভারী কথা বলে আত্মহত্যার মধ্যে হয়ত কিছু রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলো ভারী খেলো জিনিস। মরার চাইতেও যে বেঁচে থাকাটা অনেক বড় আর্ট, সেইটে প্রমাণ করাই যে-কোনো শিল্পীর সবচাইতে মহৎ কাজ।"

গীতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সালোয়ারের ওড়নায় মুছে ফেলল চোখ দুটো। "চার বছর আগে তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল দীপেন। কখনো কখনো ভাবি, হয়ত ভালও বেসে ফেলছি। কিন্তু আমি যখন মরে গিয়েও বেঁচে উঠতে চাই, তখন তোমরা বেঁচে থেকেও মরে যেতে চাও। আর এই জন্যেই ভারী ঘৃণা হয় তোমাদের উপরে। জীবনের দাম যে দিতে জানে না—সে আর্টিস্টই নয়।"

গীতা এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। অপ্রতিভ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"ছিঃ ছিঃ—এ যে রাত প্রায় তিনটে বাজে! নিজেও শুইনি, তোমাকেও শুতে দিলাম না। হ্যাভ্ এ গুড্ রেস্ট্। আর, প্লীজ, ওই মদের বোতল-টোতলগুলো এখন সরাও সামনে থেকে।"

গীতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ

নিস্তব্ধ হয়ে রইল দীপেন, আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। গীতা কি সত্যি কথা বললে, না আর-একটা গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে গেল এতক্ষণ?

বাইরে কালো আকাশে গুরগুর করে মেঘ ডাকল। এখনি বৃষ্টি আসবে। দীপেন আবার মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে সরিয়ে নিলে। গীতার কাহিনী শুনেছে এতক্ষণ, উপদেশও শুনেছে, কিন্তু মনের ভিতরে তারা যে গভীর করে কোথাও আঁচড় কেটেছে তা নয়। এই নিথর রাত্রে গীতাকে কাছে পেয়ে তার ভাল লাগছিল, ভাল লাগছিল গল্প শুনতে। কিন্তু গল্প গল্পই। তার কতকটা জীবন থেকে নকল করা, কতকটা জীবনের ফাঁকা ঘর পূরণ করা। ওগুলো শুনে নেবার জন্যে, মেনে নেবার জন্যে নয়। মানতে গেলে তার জন্যে অনেক ভাল লোকের আরো অনেক ভাল ভাল কথাই আছে, সেজন্যে গীতা কাউকে কোনো দরকার নেই।

তবু দীপেন বোস জানলা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল। নিথর জাহাজের মত কালো বাড়িটার উপর দিয়ে লাল বিদ্যুৎ চমকে গেল, আর আবার তার মনে পড়ল সুপ্রিয়াকে।

॥ ৪ ॥

রেবা জল খেতে উঠেছিল। তার মনে হল বারান্দায় কার ছায়া নড়ছে।

"কে ওখানে?"

"আমি সুপ্রিয়া।"

"এত রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেন রে?"

"হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছে না। তাই অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছি একটু।"

শিরশিরে ঠান্ডা। গায়ে আঁচল টেনে বেরিয়ে এল রেবা। আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। সেই দিকে তাকিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিয়া।

রেবা পাশে এসে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় দুটো জ্যোতির্ময় চোখের মত সুপ্রিয়ার চশমা ঝলকে উঠল আর একবার।

"কী হয়েছে তোর?"

"কিছু হয়নি। বললাম ত, ঘুম আসছে না।"

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "রোগটা নতুন। এর আগে কখনো দেখিনি। কাল পর্যন্তও একবার ঘুমুলে ঢাক না বাজিয়ে তোকে জাগান যেত না।"

সুপ্রিয়া ক্ষীণ রেখায় হাসল। "দিন বদলায়। মনও। কালকে আমি যা ছিলাম আজ তা নাও থাকতে পারি। কিন্তু তাকিয়ে দেখ ভাই, কী সুন্দর মেঘ জমেছে আকাশে। মেঘরাগ গাইতে ইচ্ছে করছে আমার। বিশাল ঐরাবতে চড়ে আসছেন মেঘরাগ, পিছনে রাগিণীরা চলেছে সার বেঁধে, কেউ মাথার ওপরে ধরেছে চামর-ছত্র—"

রেবা বাধা দিলে, "মেঘরাগের কথা থাক। কিন্তু তোর কোন্ রাগ সেইটে বল।"

"আমি?" সুপ্রিয়া আবার হাসল, "আমি বোধ হয় সোহিনী। ঝিলমিল করছে অষ্টমীর জ্যোৎস্না। ছলছল করছে জল—"

"এই রাত তিনটের সময় উঠে তুই কাব্য করছিস নাকি?"

"সত্যি বলছি ভাই, দীপেনবাবু নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন আজ। কী গানই গাইলেন! মনে হল, নটরাজের ডমরু শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম তাঁর পায়ের নীচে সুরের সমুদ্রে তুফান উঠেছে। আর ভাল লাগছে না ভাই।"

"ওস্তাদ দুর্গাশংকরের কাছ থেকে কিছুই পাসনি?"

"উনি কেবল মগ্ন করে রাখেন, দোলা দিতে পারেন না। উনি যোগমগ্ন শংকরের সাধনা করেন। আমি তাঁর লাস্যরূপকে চাই, চাই তাঁর তান্ডবকে। এতে আমার মন ভরছে না।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ চলে যেতে হবে। বহুত দূর যা-না হায় ভেইয়া, বহুত দূর যা-না হায়—"

রেবা গম্ভীর হয়ে গেল। একটা সুস্পষ্ট বিরক্তিতে ভরে উঠল মন।

"তুই কি সত্যিই যেতে চাস নাকি?"

"অন্তত এই মুহূর্তে তাই ত মনে হচ্ছে। সত্যি বলছি তোকে, আমি ঘরছাড়ার বাঁশি শুনেছি।"

"লোকে কী বলবে?"

সুপ্রিয়া সহজ গলায় বললে, "খুব খারাপ বলবে, অন্তত তোর মুখে তাই শুনেছি। তবে সেজন্যে এর আগেও আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এখনো নেই।"

"মা-বাবা—আমরা?"

"তোরা হয়ত পরে আর আমার মুখদর্শন করবি না। কিন্তু যদি গীতলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাই, তোদের মুখ আমি উজ্জ্বল করে তুলব, এ-গ্যারান্টি দিচ্ছি। আর সে আমি পারব, সে-বিশ্বাস আমার আছে।"

একটা দমকা হাওয়া উঠল, ঠান্ডায় কেঁপে উঠল রেবা। তারপরেই আকাশে আর একটা লাল মেঘের চমক। বৃষ্টি নেমে এল ঝিরঝিরিয়ে। আঁচলটাকে আরো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে রেবা বললে, "একটা স্পষ্ট কথা বলব—রাগ করবি না?"

সুপ্রিয়া গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি ধরেছিল। থেমে বললে, "এর পরে অনেক স্পষ্ট কথাই হয়ত বলবে অনেকে, অনেক নিন্দা, অনেক ধিক্কার শুনতে হবে দিনের পর দিন। তোকে দিয়েই সেটা শুরু হক, আমার আপত্তি নেই।"

রেবা রাগ করে বললে, "শেষ রাত্তে এই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কাব্যচর্চা করতে আমার আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আমি শুধু একটা কথা বলব। অতীশকে অত করে নাচানোর কী দরকার ছিল এই চার বছর ধরে?"

কথাটা কঠিন আর নিষ্ঠুর। সুপ্রিয়া আঘাত পেল। বললে, "আমি তাকে নাচাইনি।"

"নাচাসনি? যদি বিয়ে না-ই করবি, তবে এতদিন কেন আশা দিয়ে রেখেছিলি তাকে।"

"বিয়ে করবার কথা ত কোনোদিন ভাবিনি। তাকে ভালবেসেছি, এই পর্যন্ত।"

"যাকে ভালবেসেছিস, তাকেই বিয়ে করবি, এই ত স্বাভাবিক।"

ঝিরঝির করে মৃদু ছন্দে বৃষ্টি পড়ছে, যেন সেতারের ঝংকার বেজে চলেছে। বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "সকলের জন্যে যেটা স্বাভাবিক, সেটা আমার জন্যে নয়। আমি অতীশকে ভালবেসেছি, কান্তিকে ভালবেসেছি, আরো অনেককে ভালবেসেছি। দেখেছি, আমার অনেক আছে, অনেককে দিয়েও তা ফুরোয় না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। আমার মনের ভেতরে জায়গাটা অনেক বেশী চওড়া, সেখানে কারো স্থানাভাব ঘটবে না। কাউকে ভালবাসব রূপের জন্যে, কাউকে গুণের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে—"

"থাক—থাক।" রেবার ধৈর্যচ্যুতি হল, "যদি একজনের মধ্যেই সব পাওয়া যায়?"

"তা হলে সব তাকে তুলে দেব। কিন্তু জীবনে সে-সুযোগ কখনো যে আসবে এমন ভরসা হয় না ভাই। এ রকম তিলোত্তম মানুষ কবির কল্পনায় থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে হয় না। এক একজন এক-একটা পারফেকশনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, কিন্তু সবগুলো এক সঙ্গে মিলিয়ে পাওয়া যায় না।"

"তা হলে তুই বিয়ে করবি কাকে?"

"আমার গানকে। আমি তাকেই ডাক দিয়ে বলব:

লহ লহো তুলে লহ নীরব বীণাখানি,
তোমার নন্দন-নিকুঞ্জ হতে
সুর দেহ তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর—"

রেবা তীক্ষ্ণ গলায় বললে, "আর অতীশ?"

"তাকে আমি কখনো ঠকাইনি। বলেছি, গানের ডাক যখনি আসবে, তখনই আমার ছুটি। সেইটুকু সে মেনে নিয়েছিল অনেক আগেই। তাই আমি যখন চলে যাব, তখন

সেই বাওয়াটাকে অতীশই নিতে পারবে সব-চাইতে সহজে।"

রেবার আরো বেশী শীত করছিল। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে রেবা বললে, "তুই কি ভাবছিস, মানুষের মনের সামনে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলা চলে, আর এগোতে হবে না, ব্যাস, এইখানেই থাক? অতীশ কত বড় দুঃখ পাবে সে-কথা বুঝতে পারছিস তুই?"

সুপ্রিয়া বললে, "দুঃখ যদি পায়, সে-দায়িত্ব তারই। আমি তাকে কখনো ভুল বোঝবার সুযোগ দিইনি। আজ কান্তিকেও আমার বিশ্রী রকমের আঘাত দিতে হয়েছে।" সুপ্রিয়ার স্বর বিষণ্ণ হয়ে এল, "বেচারার বোধ হয় জ্বর এসেছিল, তার মধ্যেই এক-রাশ অপ্রীতিকর কথা শোনাতে হল তাকে। কী করব, কোনো উপায় ছিল না আমার। আজ এতক্ষণ কান্তির মুখটাই মনে পড়ছিল আমার। তাই কাল যেটা তোকে হালকা-ভাবে বলেছিলাম, আজ সেটাকেই সত্য করে নেবার কথা ভাবছি। কান্তির জন্যে দুঃখ হচ্ছে, অতীশ জড়িয়ে ফেলছে আমাকে। সম্পূর্ণ বাঁধা পড়বার আগে সেইজন্যেই আমাকে ছুটে পালাতে হবে।"

বৃষ্টিটা নেমেছে জোরালো হয়ে। বারান্দায় জলের ছাট আসছে। রেবা রেলিঙের কাছ থেকে সরে এসে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "তোর কপালে বিস্তর দুঃখ আছে, তুই মরবি।"

"মরব?" সুপ্রিয়া হাসল, "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব। সত্যি, অতীশকে কার হাতে দিয়ে যাই? তুই নিবি?"

রেবা দরজায় পা দিয়েছিল। সেখান থেকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ফেলে বললে, "চেষ্টা করব।" তারপরেই ভিতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিলে দরজাটা।

সেই ঠাণ্ডার মধ্যে, সেই বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়া। আরো অনেকক্ষণ। কান্তি একটা কাঁটা রেখে গেছে বুকের ভিতর, ওর জন্যে মায়া হয়। কিন্তু কষ্টটা বোধ হয় হবে অতীশের জন্যেই। এক-একটা সন্ধ্যায় যখন কার্জন পার্কে পাশাপাশি বসতে ইচ্ছে করবে, তখন অতীশ ছাড়া কে সঙ্গ দেবে আর? দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে হাতে হাত রেখে বালি ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকা, একটা চলন্ত ট্রেনের এক ঝলক আলোয় মনটাকে অকারণে দুলিয়ে দেওয়া, তখন অতীশকে ছাড়া কী করে চলবে সুপ্রিয়ার?

কিন্তু আপাতত বাইরে এই বৃষ্টি। আকাশজোড়া বীণ বাজছে মেঘরাগে, তার উপরে বিদ্যুতের আঙুল নেচে নেচে চলেছে, সমস্ত পৃথিবী এখন স্বপ্নমূর্ছিত, এর মধ্যে কোথায় অতীশ? এই সুর সে কোথায় পাবে?

এ দিতে পারে দীপেন। আর পারেন সেই সব সঙ্গীতগুরুর দল, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে যাঁরা অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অতীশ পারবে না।

"কিরে, কতক্ষণ ঘুমোবি আর?"

কাল রাতেই রেবা ভেবেছিল সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে। শেষের রসিকতাটা অনেকক্ষণ ধরে তার সারা গায়ে যেন বিছুটির জ্বালার মত জ্বলছিল। শুধু কথা বন্ধও নয়, সাতদিন মুখদর্শন উচিত নয় ওর।

অতীশকে কি সত্যিই নিতে পারে না রেবা? এতই কি শক্ত কাজটা? রেবার মনে হয়েছিল সেও দেখবে একবার চেষ্টা করে, হিংসের জ্বালা ধরিয়ে দেবে সুপ্রিয়ার বুকে। অতীশ হয়ত সুলভ নয়, তাই বলে একান্তই কি দুর্লভ? প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে একবার নেমে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু রেবা সুপ্রিয়া নয়। আগুন নিয়ে খেলা করতে তার উৎসাহ হয় না। মনের দিক থেকেও সে রক্ষণশীল। বিয়ের ব্যাপারটা বাবার দায়িত্ব, তার নয়। যেখানে যাবে, নিজের মত করে গড়ে নেবে ঘর। স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে। অতীশের বোঝা সে বইতে পারবে না। তার স্বামী একদিন অন্য কাউকে ভাল-বেসেছিল, এটা কিছুতেই, কোনোমতেই সইতে পারবে না রেবা। সে যাকে পাবে, তার কাছে সে-ই প্রথম প্রেম, প্রথম আবিষ্কার, প্রথম পদ্ম আর প্রথম সূর্যোদয়।

অতীশের কথা থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে সুপ্রিয়া!

বেলা নটা পর্যন্ত চটে বসে ছিল রেবা, কিন্তু তারপরে আর পারল না। নিজের প্রকাণ্ড সেতারটা নিয়ে অনেকক্ষণ যা খুশি বাজাল, অমিয় মজুমদার বার কয়েক ভ্রূকুটি করে নেমে গেলেন নীচে। পড়ুয়া ছোট ভাইটি এসে সকাতরে জানাল, "কী করছিস ছোটদি, পড়তে দিবি না?"

"কেন রে! এত চমৎকার বাজাচ্ছি, তোর ত আরো বেশী কনসেণ্ট্রেশন আসা উচিত।"

"সত্যি বলছি, একটু থাম। কানে তালা ধরে গেল।"

"তালা ধরে গেল!" রেবা ঝংকার দিয়ে উঠল, "বেরসিক, ভুত! রবিবার অত পড়া কিসের রে? যা না, কোথাও ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা দেখে আয়। রাতদিন পড়ে পড়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিস, চোখ দুটো প্রায় অন্ধ হওয়ার জো। কী হবে অমন যাচ্ছে-তাই ভাবে পড়াশোনা করে?"

এবার মিনতি শোনা গেল, "ছোটদি—"

"বেরো এখান থেকে।" রেবা চিৎকার করে বললে, "তোর যেমন পড়া, আমারও তেমনি রেওয়াজ। তুই রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে পড়বি, অথচ আমি একটুখানি সেতার নিয়ে বসতে পারব না, আবদার নাকি? দূর হ বলছি—"

কিন্তু এত গোলমালেও সুপ্রিয়ার ঘুম ভাঙল না।

বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুল যখন শেষ পর্যন্ত টনটন করতে লাগল, তখন সেতার ছাড়ল রেবা। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনো কেন ঘুম থেকে উঠছে না সুপ্রিয়া? সকাল অবধিই কি দাঁড়িয়ে ছিল নাকি বারান্দায়?

রেবা এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। খিল দেওয়া ছিল না, খুলে গেল। একটা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে মুখের উপর একখানা হাত রেখে ঘুমুচ্ছে সুপ্রিয়া। বালিশের উপর দিয়ে মেঘের মত চুল নেমে এসেছে অনেকখানি।

কিছুক্ষণ ক্লান্ত ঘুমন্ত সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে রেবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এত শান্ত, এত কোমল মেয়েটার রূপ। মনে হয়, যেন চেলি-চন্দনে সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্যেই জন্মেছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে একটা পায়ের পাতা বেরিয়ে এসেছে। যেখান দিয়ে হেঁটে যাবে, লক্ষ্মীর পায়ের লেখা আঁকা পড়বে সেখানে। তবু কেন মনটা ওর এমনি অশান্ত? যখন হাতের কাছে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অর্ঘ্য এসে পড়েছে, তখন কিসের জন্যে ছুটে যেতে চাইছে আলেয়ার সন্ধানে?

"কিরে, তুই কি এ বেলা আর উঠবি না ঘুম থেকে?"

সুপ্রিয়া চোখ মেলল।

"সারা রাতই কি বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলি কাল?"

সুপ্রিয়া উঠে বসল। চোখ কচলাল দু হাতে।

"বেলা ক'টা এখন?"

"দশটা।"

"দশটা!" বিদ্যুৎ-চমকের মত সুপ্রিয়ার একটা কথা মনে পড়ল, "কান্তি আসেনি?"

"না, কেউ আসেনি।"

সুপ্রিয়া চিন্তিত গলায় বললে, "কিন্তু আসা ত উচিত ছিল। আমি চা খেতে ডেকেছিলাম ওকে।"

এতক্ষণ মনের মধ্যে একটা করুণা সঞ্চারিত হচ্ছিল রেবার, কিন্তু সুপ্রিয়ার কথা শোনবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেটা। তিক্ত বিরক্তিতে রেবা দপ করে জ্বলে উঠল।

"রাস্তায় অপমান করে বাড়িতে চা

তার আগেই একটা কালো মোটর পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল

খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে কোনো ভদ্রলোক আসে না।"

রেবা বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয়া আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল বিছানার উপরে। আজ বিকেলে একবার খোঁজ নিতে হবে কান্তির। শেয়ালদার কাছে একটা বোর্ডিঙে এর আগে আরো দু-তিনবার সে উঠেছে, সুপ্রিয়া তার ঠিকানাটা জানে। আর একবার খবর নিতে হবে অতীশেরও। দু দিন অতীশ দুর্গা-শঙ্করের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছে, নিশ্চয় রাগ করেছে সে।

কাল রাত নটার পরে অতীশ যে খোঁজ করতে এসেছিল, বিরক্তিতে সে-কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিল রেবা!

সারাটা দিন একটা মানসিক অস্থিরতা নিয়ে সুপ্রিয়া কান্তির জন্যে অপেক্ষা করল। রেবা প্রায় অসহযোগ করে আছে, ভাল করে কথাবার্তাই হল না তার সঙ্গে।

শুধু কান্তির জন্যেও নয়। অতীশের জন্যে আরো খারাপ লাগছে।

"আমি ত তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না সুপ্রিয়া।" অতীশ বলেছিল।

"চেয়ো না। যদি জোর করে চাও, যেটুকু আছে তাকেই ফাঁপিয়ে দিতে হবে জল-মেশানো দুধের মত। তাতে করে তোমাকেও ঠকান হবে, আমি নিজেও শান্তি পাব না।"

ট্রাম-লাইনের তেলতেলে কালো ঘাস-গুলোর দিকে চোখ রেখে অতীশ বলেছিল, "জানি। তবু যে-কদিন কাছে আছ, একটুখানি চোখের দেখা দেখতে দিয়ো। তোমাকে সারাদিন একবার দেখতে পেলেও আমি কাজ করবার দ্বিগুণ উৎসাহ পাব।"

"আর যখন আমি থাকব না?"

"তখনকার কথা তখন ভাবব, এখন নয়। তুমি যেন সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকেই অদর্শনের রিহার্সাল দিতে শুরু কর না। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

কিন্তু কথা রাখেনি সুপ্রিয়া। আজ দু দিন অতীশ তার দেখা পায়নি। নিজের ভিতরে একটা অপরাধবোধ পীড়ন করছে তাকে। যদি গান না থাকত, যদি গীতময় ভারতবর্ষ এমনি করে সহস্র বাহু বাড়িয়ে তাকে হাতছানি না দিত, তাহলে জীবনের নিশ্চিত পরিণাম সে পেয়েছিল বইকি অতীশের মধ্যে! অতীশের বুকের ভিতরে মাথা গুঁজে সুপ্রিয়া বলতে পারত, আমি ধন্য, আর আমার চাইবার মত কিছুই নেই।

অতীশ ভালবাসে, কান্তিও ভালবাসে। কিন্তু কান্তি খালি আশ্রয় চায় তার কাছে। নিজের ক্ষত নিয়ে, অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তার কাছে আসে সান্ত্বনার জন্যে। আর অতীশ আসে আশ্রয় দিতে। তার চোখের দিকে তাকালে সুপ্রিয়ার মনে হয়, প্রেম নয়, আরো গভীর, আরো শান্ত সমুদ্রবিশাল স্নেহ সেখানে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তলিয়ে যেতে পারে সুপ্রিয়া।

আজ বিকেলে খোঁজ নিতে হবে। দু-জনেরই।

সারাটা দুপুর প্রায় ছটফট করে কাটল। বিকেলে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় অমিয় মজুমদার ডাকলেন।

"কিরে, চলেছিস কোথায়?"

মুখের সামনে যে মিথ্যেটা বেরিয়ে এল, সেইটেকেই অবলীলাক্রমে বলে ফেলল সুপ্রিয়া।

"একটা চায়ের নেমন্তন্ন আছে, সেখানেই যাব।"

"ফিরবি কখন?"

"একটু দেরি হবে। গানের ব্যাপারও আছে।"

"সেকি কথা!" অমিয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, "জলসায় যাবি না?"

"সময় পেলে চলে যাব ওখান থেকে। দেরি হলে বাড়িতে ফিরে আসব।"

অমিয় মজুমদার বিস্ময়বোধ করলেন। গান-পাগলা মেয়েটার এত বড় জলসা সম্পর্কে এমন উদাসীনতা তাঁর কেমন অশোভন বোধ হতে লাগল। মনে হল, সুপ্রিয়া কাজটা ঠিক করছে না।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, "আমি সময় পেলেই ওখানে চলে যাব কাকা।"

কিন্তু তার কান্তির কাছে যাওয়া হল না, অতীশের কাছেও না। তার আগেই একটা কালো মোটর পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল সামনে। দীপেন বোস।

"কোথায় চলেছ?"

"একটা কাজে।"

"ওঠ গাড়িতে।"

"গাড়িতে আবার কেন?"

"তোমায় লিফ্‌ট দেব।"

"আমি এমনিতেই যেতে পারব। আপনি বরং বাড়িতে যান, কাকার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কাকার সঙ্গে ত দেখা করতে আসিনি—" দীপেন বোস হাসল, "এসেছি তোমার কাছেই। তোমাকেই আমার দরকার ছিল। পেয়ে গেছি, ব্যস, আর ভাবনা নেই। উঠে পড়—"

"কিন্তু—"

দীপেন বোস আর বলতে দিলে না। গাড়ির দরজা খুলে বললে, "উঠে পড়।"

কাল রাত্রের সেই সম্রাট। জ্যোতির্লোকের সিংহাসনে স্বমহিমায় সমাসীন। গানের সুরে সুরে নটরাজ জেগে উঠছেন, আকাশে ঘন কালো মেঘে মেঘে উঠছে তাঁর বিপুল নাচের মৃদঙ্গ-ধ্বনি। সুপ্রিয়া সম্রাটের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারল না, উঠে বসল গাড়িতেই।

কান্তি নয়, অতীশ নয়, দীপেন ছাড়া আর কেউ নয়। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেকক্ষণ আর অনেক মাইল গাড়ি চালাল দীপেন। অনেক কথার গুঞ্জন বাজল সুপ্রিয়ার কানে। তারপরে সন্ধ্যা হলে চৌরিঙ্গির একটা হোটেল। দীপেনের হাতে হুইস্কির গ্লাস। আর একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ সামনে নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসে রইল সুপ্রিয়া। রক্তে ঝড় তুলে ওয়াল্জ-রুম্বা ফক্সট্রটের উল্লাস চলতে লাগল।

রাত নটার সময় অমিয় মজুমদার দেখলেন তাঁর পাশে এসে বসেছে সুপ্রিয়া। আর মাইক্রোফোনে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করছে, "লখনউয়ের দীপেন বসু এইবার আপনাদের কাছে ঠুংরি পরিবেশন করছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন ওস্তাদ দ্বারিক দাস। ইনি প্রথমে গাইছেন—"

চতুর্থ অধ্যায়

॥ ১ ॥

"ডি-এস্সি হয়ে গেল আপনার?" প্রসন্ন মুখে শ্যামলাল বললে, "কাগজে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য লোক আপনি, কিছুই ত বলেননি এতদিন। দিব্যি চেপে রেখেছিলেন সব।"

দাড়ি কামাতে কামাতে অতীশ বললে, "ব্যাপারটা এমন প্রলয়ঙ্কর কোনো কীর্তি নয় যে, ঢাকে ঢোলে ঘোষণা করতে হবে। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রত্যেক বছরই কয়েক ডজন করে ছেলে ডি-এস্সি হয়ে বেরিয়ে আসে।"

"আপনি কোনো জিনিসকেই সিরিয়াসলি নেন না।" শ্যামলাল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "আমরা হলে—"

"আপনিও হবেন।" অতীশ সান্ত্বনা দিলে।

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "কই আর হয়! বি-এস্সির আগে কম খেটেছি? বললে, বিশ্বাস করবেন না, উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পড়তাম ডেলি। তবুও একটা মাঝারি সেকেণ্ড ক্লাশ, তার বেশী কিছু হল না।"

"এম-এস্সিতে পুষিয়ে নেবেন।"

"চেষ্টা তো করছি। কিন্তু কী জানেন—" শ্যামলাল গলার স্বরটা অন্তরঙ্গতায় নামিয়ে আনল, "শুধু পড়ে হয় না। আরো কতগুলো সিক্রেট কোথাও আছে নিশ্চয়। সেগুলো বুঝতে পারলে কাজ হত।"

মুখের উপর সাবানের ফেনার এক বিপুল স্ফীতি তৈরি করে আধবোজা চোখে অতীশ বললে, "লুব্রিকেশন পেপার।"

"লুব্রিকেশন পেপার!" শ্যামলাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কোনো স্পেশ্যাল পেপার বুঝি? কই, কখনো জানতুম না ত। কেমিস্ট্রিতে?"

অতীশ বললে, "উঁহু, ইউনিভার্সাল।"

শ্যামলাল হাঁ করে রইল, "বুঝতে পারলাম না।"

"বুঝতে পারলেন না?" ফেনার স্তূপের মধ্যে ক্ষুর বসিয়ে অতীশ বললে, "তেল-মশাই, তেল।"

"অ—ঠাট্টা করছিলেন।" শ্যামলাল ব্যাজার হয়ে বললে, "শ্যামলাল ঘটক ও-সব তেল-ফেলের মধ্যে নেই। পাশ করি, ফেল করি, নিজের জোরেই করব। আমার যদি চেষ্টা থাকে, কেন আমি ফার্স্ট ক্লাস পাব না, বলুন?"

"নিশ্চয়। এরই নাম পুরুষকার।"

শ্যামলাল চিন্তিত মুখে বসে রইল খানিকক্ষণ। বললে, "আপনার আর ভাবনা কী, বেশ কাজ গুছিয়ে নিলেন। ফার্স্ট ক্লাস, তায় ডি-এস্সি, এর পরে মোটা মাইনের চাকরি।" একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস পড়ল, "আমি যদি ফিজিক্সের ছাত্র হতাম, ভারী সুবিধে হত তাহলে। আপনার নোট-টোটগুলো পাওয়া যেত।"

এ-ক্ষেত্রে সহানুভূতি জানিয়ে লাভ নেই। অতীশ এক মনে জুল্পির তলা চাঁছতে লাগল।

বাইরে একটা দেওয়াল-ঘড়ি টং টং করে উঠল।

শ্যামলাল চমকে বললে, "এই যাঃ, সাতটা! আমাকে যে এক্ষুনি বেরুতে হবে।"

"সে কী মশাই! পড়া ছেড়ে?"

শ্যামলাল বললে, "বা-রে, আপনিই ত টুইশন জুটিয়ে দিলেন। পড়াতে হবে না?"

"ওঃ—বালিগঞ্জ প্লেসে?" অতীশ একবার কৌতুকভরা চোখ তুলে তাকাল, "তা কালও একবার সেখানে গিয়েছিলেন না? উইকে তিন দিন পড়ানোর কথা ছিল, আপনি ত দেখছি রোজই পড়াচ্ছেন আজকাল।"

কথা নেই বার্তা নেই, ফরসা শ্যামলাল লাল হয়ে গেল হঠাৎ।

অতীশ ছোট্ট করে খোঁচা দিল আর একটা, "মাইনেও কিছু বেশী পাচ্ছেন ত?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "না, তা ঠিক নয়। মানে ওর টেস্ট আসছে কিনা—"

"ওর কার? মন্দিরার?"

শ্যামলাল আবার একটা ঢোক গিলে বলল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন্দিরার। মানে, ওর টেস্টের আর দেরি নেই কিনা—"

সরস গলায় অতীশ বললে, "ও। তা পড়ছে কেমন?"

"মেয়েটি বেশ ইনটেলিজেণ্ট।" শ্যামলালকে কেমন স্নিগ্ধ মনে হল, "কখনো কখনো এমন এক-একটা কোশ্চেন করে যে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাই।"

"খুব ভাল।"

শ্যামলাল হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাল, "সাতটা পাঁচ। নাঃ—আর দেরি করা উচিত নয়।"

ভাঙা কাপের মধ্যে বুরুশটা ধুতে ধুতে আড়চোখে অতীশ লক্ষ্য করতে লাগল। ব্র্যাকেট থেকে একটা পাঞ্জাবি পরে নিলে শ্যামলাল, সেটা আদ্দির। এর আগে ওকে বালিশের ওয়াড়ের মত মোটা লংক্লথের জামা ছাড়া পরতে দেখা যায়নি। জামা পরে আরো মিনিট তিনেক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও চুলটাকে কায়দা করতে চেষ্টা করল। এ-অভ্যাসও ওর কখনো ছিল না। অতীশ লক্ষ্য করে দেখল, শ্যামলালের পণ্ডশ্রম করছে। বিধাতা বাম, খাড়া খাড়া চুলগুলো হাজার চেষ্টাতেও বাগ মানানোর নয়।

তারপর সবচাইতে আশ্চর্য কাণ্ড করল শ্যামলাল। জুতোটা সশব্দে [illegible] ব্রাশ করে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

অতীশ নিজের বিছানায় এসে বসল। সমস্ত লক্ষণই নির্ভুলভাবে মিলে যাচ্ছে, কোথাও কোনো গোলমাল নেই। মন্দিরা নামটা এখন তার কাছে গোপন কথার মত, সহজে উচ্চারণ করতে চায় না, বলে "ও"। টুইশনের আগ্রহটা দিনের পর দিন শ্যামলালের পক্ষ থেকেই বেড়ে চলেছে, নিজের পড়ার সময়টা অর্ধেক খরচ হচ্ছে মন্দিরার জন্যে। আর-সবচাইতে বড় কথা, পড়াশুনোয় মন্দিরা ইনটেলিজেণ্ট এটা বলবার জন্যে অনেকখানি গুণমুগ্ধ হওয়া দরকার, ঠিক সাধারণ বুদ্ধির কাজ নয়। তা ছাড়া আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথার চুল, এরা ত সব আছেই।

অতীশ হাসল। লক্ষণ পরিষ্কার! হুবহু মিলে যাচ্ছে সব দিক থেকে।

এর নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্রনাথ থাকলে বলতেন। কিংবা আনাতোল ফ্রাঁস। ওপাশের দেওয়ালে যত্ন করে খান তিনেক ছবি টাঙিয়ে রেখেছে শ্যামলাল। একখানা সরস্বতীর, একখানা স্বনামধন্য চিরকুমার রাসায়নিকের, আর একখানা পৃথিবীখ্যাত সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর। এই ত্রিমূর্তিই

কিছুদিন পর্যন্ত উপাস্য ছিল শ্যামলালের। এখন অবশ্য চতুর্থজনের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তার ছবি শ্যামলাল দেওয়ালে টাঙায়নি, টাঙিয়েছে নিজের বুকের মধ্যে।

সুতরাং ছাদ আর ঘুঁটের ঘরটা আপাতত বেকার। অবশ্য অতীশ ইচ্ছে করলে জায়গা নিতে পারে সেখানে।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে ত শ্যামলাল? মল্লিক সাহেবের নজরটা একটু উপর দিকে, তার সম্পর্কে কিছুটা প্রশ্রয় সত্ত্বেও তিনি যে ডি-এসসি পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন, তা অতীশ জানে; তাঁর ছেলে, তাঁর জামাই, তাঁর বন্ধুবান্ধব, সব কিছু নিয়ে স্বভাবতই মল্লিক সাহেব একটু ঊর্ধ্বচারী।

"বুঝলে অতীশ, কাল রোটারি ক্লাবে আমার বক্তৃতা ছিল। ইট্ ওজ্ এ ব্রিলিয়াণ্ট য়্যাটেনডেন্স্। আমার সাবজেক্ট ছিল, সোস্যালিজম্—দি ইউটোপিয়া। দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েশন হল।"

অতীশকে বলতে হয়, "আজ্ঞে সে ত হবেই।"

"বাই দি ওয়ে, শশাঙ্কের চিঠি এসেছে। আরে—শশাঙ্ক, আমার বড় জামাই! এখন ইউনেস্কোতে রয়েছে। মাইনেটা অবশ্য মন্দ দেয় না, তবু আমার মনে হয়, ওর মত ক্যালিবারের ছেলের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল।"

শশাঙ্ক ইউনেস্কোতে কত বড় চাকরি করে, কত টাকাই বা সে মাইনে পায় এবং কোন্ অসাধারণ ক্যালিবার নিয়ে উন্নতির কোন চরম শিখরে সে উঠতে পারত, এ-সব না জেনেও অতীশ মাথা নাড়েঃ "ঠিকই বলেছেন।"

"শুভেন লিখেছে, লণ্ডনে এবার খুব শীত পড়েছে। আরে বাপু, লণ্ডনে কম শীত আর পড়ে কবে? আমি যতবার গেছি—প্রত্যেকবারেই শীতের চোটে মনে হয়েছে, মাই গড্—ইটস্ হেল্! নতুন গেছে কি না, তাই ওর আরো বেশী খারাপ লাগছে। মৃদু মন্দ হাসেন মল্লিক সাহেব।"

অতীশ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, "ঠিক বলেছেন।"

"বাই বল, ফলের রস খেতে গেলে স্ট্রবেরির। এখানে যে-সব ফ্রুট পাওয়া যায়—"

তারা যে কোনো কাজেরই নয়, অতীশকে সে-কথা অনেকবার স্বীকার করতে হয়েছে।

সেইখানেই মাথা গলিয়েছে শ্যামলাল। জীবনে যে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চায়নি, কেউ সামনে এসে এক-আধটা কথা কইলে যে একগলা ঘেমে উঠেছে, সে গিয়ে পড়েছে এমন বাড়িতে, যেখানে ছেলেমেয়ের মেলামেশা দিনের আলোর মত সহজ। সে-আলোয় চোখে ধাঁধা লেগেছে শ্যামলালের, আর পত্রপাঠ মন্দিরার প্রেমে পড়েছে।

ডি-এসসি হওয়ার পরে অতীশ যেখানে কিছু কৌলীন্য পেয়েছে, তা ছাড়া দূরআত্মীয়তার সূত্রে ছেলেবেলা থেকে আসা-যাওয়া করলেও আজো যেখানে অতীশ অন্তরঙ্গ হতে পারল না ভাল করে, সেখানে এই খাড়া চুলের জাল ছেলে শ্যামলাল? দন্তস্ফুট করতে পারবে?

তা ছাড়া মন্দিরা। অতীশ যদি ভুল বুঝে না থাকে, তা হলে বছর খানেক ধরে মন্দিরার চোখে যে-আলো সে দেখেছে, তা কি আবার নতুন করে জ্বলবে শ্যামলালের জন্যে? সুপ্রিয়া যদি না থাকত—

অতীশ চকিত হয়ে উঠল। সুপ্রিয়া যদি না থাকত। কিন্তু সুপ্রিয়া ত থেকেও নেই। সেই সকলকে না জানিয়ে চলে-যাওয়ার পরে মাস তিনেক আগে মাত্র এক টুকরো চিঠি এসেছিল তার।

"খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। দেখা করবার সময় ছিল না। রাগ কর না। কবে কলকাতায় ফিরব জানি না। যেদিন ফিরব, সেদিন আমার প্রথম গান শোনাব তোমাকেই।"

সেই প্রথম গান শোনবার আশাতেই কি বসে থাকবে অতীশ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পরে বছর?

মল্লিক সাহেব হয়ত এইবারে রাজী হয়ে যেতেন। হয়ত মন্দিরাকে পেলে জীবনে সেই সহজ দিকটা অন্তত আসত, যেখানে নিজের দৈনন্দিনতাকে নিয়ে বিব্রত হতে হয় না। কিন্তু সেখানে সে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছে শ্যামলালকে। দাঁড় করিয়েছে নিজের হাতেই। শেষ পর্যন্ত হয়ত ধোপে টিঁকবে না। কিন্তু শ্যামলালের চোখের সেই অদম্য জ্বালাটার আঁচ যেন এরই মধ্যে এসে গায়ে লাগল অতীশের।

শ্যামলালকে বোধ হয় সাবধান করে দেওয়া উচিত।

দেরি হয়ে গেল নাকি? অতীশের নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। আরো কিছুদিন পরে সুপ্রিয়াকে একটুখানি ভুলে যেতে পারলে হয়ত মন্দিরাকে বিয়ে করাও অসম্ভব নয় তার। কিন্তু সে যদি বিয়ে না-ও করে, তা হলেই কি কোনো আশা আছে শ্যামলালের? ধরা যাক, মন্দিরার চোখের আলোও হয়ত বদলাবে। কিন্তু মল্লিক সাহেব?

মল্লিক সাহেব শ্যামলালের জুতোটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। সেটা মচমচ করছিল।

ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে শ্যামলাল পড়ার ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মল্লিক সাহেব ডাকলেন, "ওহে, শোন।"

শ্যামলাল থমকে দাঁড়াল। এই মানুষটি সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক আছে তার।

এই চার মাসে বার চারেক কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং প্রত্যেকবারই সে চেষ্টা করেছে কত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারে তাঁর সামনে থেকে।

মল্লিক সাহেব খবরের কাগজটা ভাঁজ করে সামনের টেবিলে রাখলেন।

"আজ তোমার এ-বেলা আসবার কথা ছিল নাকি?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঘামতে লাগল, "কাল অবশ্য—"

"বুঝেছি, বলে গিয়েছিলে। কিন্তু বেবি ত নেই। গেছে দমদম এয়ারপোর্টে। কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছিল, ওর এক মাসিমা আসছেন অ্যামেরিকা থেকে, তাঁর স্বামী সেখানে এমব্যাসিতে কাজ করেন। বেবি তাঁকে রিসিভ করতে গেছে।"

পাংশু মুখে শ্যামলাল বললে, "আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।"

"বোস না, এত ব্যস্ত কেন? একটু গল্প করি, এস।"

শ্যামলাল চলে যেতে পারল না। নিরুপায়ভাবে সসংকোচে মল্লিক সাহেবের মুখোমুখি বসে পড়ল।

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

"আগে ঢাকায় ছিল।" শীর্ণ স্বরে শ্যামলাল বললে, "এখন পুরুলিয়ায়।"

"ওঃ। সেখানে কী করেন তোমার বাবা?"

"গালার ব্যবসা।"

"শেল্যাক? মন্দ নয়। কত হয় বছরে?"

"আজ্ঞে আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"খালি বুক-ওয়ার্ম, না? কজন ভাই-বোন তোমরা?"

শ্যামলাল বললে, "আজ্ঞে দশ।"

"মাই গড্! দশ! ওয়ান-টেন্থ অব কুরুবংশ!"

প্রায় মাটিতে মিশে গেল শ্যামলাল। মল্লিক সাহেবের ঘৃণাভরা দৃষ্টির সামনে তার মনে হল, তার গালার ব্যবসায়ী বাপের মত এমন একটা অশালীন লোক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই।

মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার বাবা যত টাকাই রোজগার করুন, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" তাঁর অভিজ্ঞ চোখ আর-একবার ঘুরে গেল শ্যামলালের মচমচ-করা জুতোর উপর, তার ছোট ছোট খাড়া খাড়া চুলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অযত্নলালিত মুখের উপর।

শ্যামলালের ধৈর্যচ্যুতি হল। মল্লিক সাহেবের চোখজোড়া যেন 'এক্স-রে'র মত দেখছে তাকে। শুধু উপরের দিকটাই নয়, একেবারে তার অস্থি-মাংস ভেদ করে চলেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে শ্যামলাল বললে, "আজ আমি আসি।"

"এস।"

পথে বেরিয়ে নিজের উপর কেমন একটা অশ্রদ্ধা হল শ্যামলালের। তার গালার ব্যবসায়ী বাবা, যিনি ন হাতী কাপড় পরেন এবং হুঁকোয় করে তামাক খান, যাঁর নামে ইংরেজী চিঠি এলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়; তার ভাইবোনদের দল, যারা সকালবেলা মুড়ি দিয়ে জিলিপি খায় আর তার লাল শাড়ি পরা মা, যিনি বছরে একবার সিনেমা দেখেন কি দেখেন না আর ভাদ্রমাসে থালা বোঝাই করে তালের বড়া ভাজেন, তাদের সকলের উপর একটা তিক্ত বিদ্বেষে শ্যামলালের মন কালো হয়ে উঠল।

গোড়া থেকেই সব ভুল হয়ে গেছে। আবার আরম্ভ করতে হবে নতুনভাবে। কিন্তু পন্থাটা জানা নেই। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলাল। প্রকাণ্ড আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। নিজেকে যেন বিশ্রী একটা ক্যারিকেচারের মত দেখাতে লাগল।

স্কুলে পড়া না পেরে জীবনে একবার মাত্র কেঁদেছিল শ্যামলাল। আজকে তেমনি-ভাবে হঠাৎ তার কান্না পেতে লাগল।

॥ ২ ॥

"তুই কী করে বেড়াচ্ছিস বাবা? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

রুক্ষ নিষ্ঠুর গলায় কান্তি বললে, "সব তোমার না বুঝলেও চলবে মা। আমি যা করছি, করতে দাও।"

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা শিউরে উঠলেন। অদ্ভুত দেখাচ্ছে কান্তির চোখ। বন্য একটা উগ্রতা দপদপ করছে সেখানে, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, কয়েকটা সর্পিল রেখার কুঞ্চন পড়েছে কপালে।

মা'র বুকের ভিতরে ধ্বক করে উঠল। একটা হাতুড়ি দিয়ে কে যেন ঘা মারল সেখানে। তিনি যেন দেখতে পেলেন শান্তিভূষণকে, সে-শান্তিভূষণ স্কুলের নিরীহ মাস্টা[illegible], তাঁর নিরুত্তাপ প্রায়-নির্বাক স্বামীও নয়; যে শান্তিভূষণ খুনী, দু হাতে মানুষের রক্ত মেখে যে পালিয়ে এসেছিল।

মা-র মুখে যেন বোবা ধরল। গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল একটা।

"কান্তি।"

"আমি এক্ষুনি কলকাতায় যাচ্ছি।"

"এই তিন মাস ধরে তুই পাগলের মত ছুটোছুটি করছিস কলকাতায়। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যাচ্ছিস—"

"আমি তবলার টুইশানি করি ওখানে।"

"কিন্তু বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে—"

"দরকার পড়লেই নিতে হয়—" কান্তি বেরিয়ে চলে গেল।

কী আর করতে পারেন মা? জীবনে অনেক কান্নাই কেঁদেছেন, শেষ কান্না হয়ত বাকী আছে এখনো। প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছে কান্তি। উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল চেহারা, ভাল করে কথা বলে না, কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে চিৎকার করে বীভৎস ভাবে। চরম আঘাতও হেনেছে একদিন।

"কে তোমার ছেলে? কার জন্যে কাঁদছ? আমি খুনীর ছেলে, গোখরোর বাচ্ছা। এ ত তুমি জানতেই যে, আমিও একদিন ছোবল মারব। কেন বড় করে তুলেছিলে? কেন বিষ খাওয়াওনি ছেলেবেলাতেই, কেন আঁতুড়েই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলনি?"

সেদিন সারারাত মা জেগে বসেছিলেন যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে। আর টের পেয়েছিলেন কান্তিও ঘুমোয়নি তাঁর মত অস্থিরভাবে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে যেন।

আজকেও মা নিথর হয়েই বসে রইলেন। অতীতটা ধূসর, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই অন্ধকার বেয়ে কোথায় যে নেমে যাচ্ছেন তিনি জানেন না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন উঠোনের দিকে, দেখতে লাগলেন পেয়ারা গাছটার তলায় কখন পড়েছে একটা মরা পাখির ছানা, তাকে ঘিরে ধরেছে একদল লাল পিঁপড়ে।

সামনে কড়াইতে চাপানো তরকারিটা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

আর কান্তি প্রায় ছুটে এল স্টেশনে, এক মিনিট দেরি হলেই গাড়ি ফেল হত।

বেলা এগারটার গাড়ি। ডেলি প্যাসে-ঞ্জারের ভিড় নেই, একটা লম্বা শূন্যপ্রায় কামরার এক কোণে কাঠে হেলান দিয়ে বসল। চলন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনটে দীর্ঘ মাসও যেন ছুটে যেতে লাগল।

সেই মেয়েটা। তার নাম আঙুর।

রাস্তায় টেনে ফেলে দিতে পারত, দেয়নি। উলটে মাথায় জল দিয়েছে, পাখা করেছে সারারাত। ভোরবেলা যখন জ্বরটা ছেড়ে গেল তার, উঠে বসতে পারল, তখন তার মনে হচ্ছিল সে স্বপ্ন দেখছে। এ কোথায় সে, কার বিছানায়? কে এই কালো কদাকার মেয়েটা, বিড়িতে পোড়া পুরু পুরু ঠোঁট নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে, "কে গা তুমি? আচ্ছা বিপদেই ফেলেছিলে আমাকে। চা খাবে?"

চা কান্তি খায়নি, খাওয়ার প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু মনে পড়েছে কাল রাতের কথা, সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুর শীতল হাসি: "অনেক টাকা দরকার আমার। সে তুমি কোথায় পাবে কান্তি? তার চাইতে—"

কান্তি উঠে পড়েছে। মনিব্যাগ খুলে যা পেয়েছে, ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েটার বিছানার উপরে। টলতে টলতে চলে এসেছে বাইরে, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়েছে, ফিরে এসেছে বোর্ডিঙে।

দুটো দিন পড়ে থেকেছে নিজের ঘরে। খতিয়ে দেখেছে নিজেকে। ফুরিয়ে গেছে কান্তিভূষণ, আর তার কিছুই করবার নেই। আট বছর আগে যা পেরে ওঠেনি, এইবারে তার সে-কাজ করবার সময় এসেছে।

গ্রামে ফিরে এল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন। "আজ সাতদিন তোর খবর নেই, আমি কেঁদে মরি। কী করছিলি তুই? একি চেহারা হয়েছে তোর?"

"জ্বর হয়েছিল।" সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে কান্তি।

আবার সেই গঙ্গার ধার। সেই কালো রাত্রি। সেই পুরনো ঘরটা, যেখানে অসংখ্য গঙ্গাযাত্রী মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঘরঘরে গলায় শ্বাস টেনেছে। সেই ভুতুড়ে বটগাছ, কেউটের গর্ত, আর ওপারে দুটো চিতা জ্বলছিল পাশাপাশি।

তবু এবারেও হল না। বেঁচে থাকাও একটা অভ্যাস, কিছুতেই তার উপরে সহজে ছেদ টেনে দেওয়া যায় না। খানিক পরে কান্তির মনে হল, আশে পাশে দু-একটা কী যেন বটের ঝরাপাতার উপর নড়ে বেড়াচ্ছে। বুকের ভিতর ভয়ের একটা বরফঠাণ্ডা হাত যেন বাড়িয়ে দিলে কেউ। কান্তিভূষণ পালিয়ে এল।

পরের দিন বিকেলের ট্রেনে সে এল কলকাতায়।

মনে পড়ল, একজন তার অপরিচ্ছন্ন বিছানায় সারারাত তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, পাখার বাতাস করেছিল মাথায়, হাত বুলিয়ে দিয়েছিল আস্তে আস্তে। সে-ও আর একটি মেয়ে। বেশী টাকা সে চায় না, তার দাবি সামান্য। তারই কাছে অনা[illegible] মাতালের জন্যে, লম্পটের জন্যে, খুনীর জন্যে, খুনীর সন্তানের জন্যে।

কান্তিভূষণ সেইখানেই এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার মুখে আরো অনেকে ছিল আশে পাশে। রঙিন শাড়ি, পুরু পাউডারের প্রসাধন, জীবন্ত প্রেতিনীর একদল বিগ্রহ। এক রকম কুৎসিত, এক রকম ক্ষুধার্ত মুখ, এক রকম তীক্ষ্ণ হাসি, এক কর্কশ কণ্ঠস্বর।

"কিগো—কাকে চাই?"

"আঙুরকে।"

"ওলো আঙুর তোর লোক এসেছে—"

একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে এল আঙুর। তারপরেই চমকে উঠল।

"তুমি।"

"হ্যাঁ, আবার আসতে হল। কিন্তু ভয় নেই, এবার জ্বর নিয়ে আসিনি।"

আঙুর হেসে বললে, "এস।"

সেই ঘর, সেই ময়লা বিছানা, সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ। কিন্তু আজ কান্তি মন স্থির করেই এসেছিল।

"তোমার গান শুনতে এলাম।"

"আমার আর গান। আমি কি গাইতে পারি?"

"বেশ পার। তুমি গান গাও, আমি ওগত করব। বাঁয়া-তবলা আছে?"

আঙুর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখল ান্তকে। বললে, "এনে দিচ্ছি।"

পাশের ঘর থেকে বাঁয়া-তবলা নিয়ে এল াঙুর।

বেসুরো গানের সঙ্গে সাধ্যমত বাজাচ্ছিল ান্তি, এমন সময় দোরগোড়ায় কালো চাড়ে লোকটা এসে দাঁড়াল। গলায় রুমাল াঁধা, ঘাড়টা প্রায় চাঁদির কাছ পর্যন্ত ছাঁটা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল খানিকক্ষণ। গান ায়, তবলা। মাথা নাড়তে লাগল সমজদারের ত। তারপর গানটা শেষ হলে বললে, করছ কী ওস্তাদ? এমন বিদ্যে খরচ করছ ওই পেত্নীর গানের সঙ্গে ঠেকো দিয়ে?"

আঙুর বিশ্রী ভাষায় তাকে গাল দিয়ে উঠল।

অতিরিক্ত পান খাওয়া এক রাশ লাল দাঁত ের করে বুনো জন্তুর মত হাসল লোকটা: "আমার ওপর চট আর যাই কর, আমি সাফ কথা বলব। ওহে ওস্তাদ, একবারটি াইরে এস দেখি।"

লোকটার নাম জগু। বাজে কথা সত্যিই বলে না, কাজের লোক।

"বাজাতে চাও ত চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"বড়বাজার। নামদার বাঈজী আছে, ভাল সংগতী চায়। মোটা মাইনে দেবে। যাবে?"

"কত মাইনে দেবে?"

"সে তোমার খুশী করার ওপরে। ভাবনা নেই দাদা, গুণী লোক আমি চিনি। তুমি ঠিক কাজ বাগিয়ে নিতে পারবে। যদি চাও ত চল আমার সঙ্গে।"

কান্তি বেরিয়ে পড়ল তখনি। তার সব সমান। তবে বাজাতে হলে একটু সমঝ-দারের জায়গাই ভাল।

বাঈজীর নাম মুনিয়া। বড়বাজারের এক গলির ভিতরে এক প্রকাণ্ড বাড়ির দোতলায় দেখা পাওয়া গেল তার।

কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া মেঝে। ভেল-ভেটের তাকিয়া ছড়ান চারদিকে। একরাশ বাজনা, ঘুঙুর ইতস্তত। পরনে দামী বেনারসী শাড়ি। গা-ভরা গয়না, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে পানের রঙ, নাকে জ্বলজ্বলে হীরার ফুল। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বাটা থেকে রুপোর তবকে মোড়া পান খাচ্ছিল।

"মুনিয়া বাঈ, সংগতী খুঁজছিলে, এই এনে দিলাম।"

পানের রসে রাঙান ঠোঁট আর নাকে হীরের ফুলপরা বাঈজী কালো তরল চোখ তুলে তাকাল। মোহিনী হাসি দেখা দিল মুখে। মধু-ছড়ান গলায় সম্ভাষণ করলে, "নমস্তে।"

সন্দেহ নেই, বাঈজী রূপসী। বয়েস ত্রিশ পেরিয়ে ভাটার টান ধরলেও এখনও প্রখর। কান্তি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"বৈঠিয়ে।"

আবার সেই মধুমাখা সম্ভাষণ। ছড়ান পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ভব্য হয়ে বসল বাঈজী। একটা তাকিয়ে ঠেলে দিয়ে বললে, "বৈঠিয়ে বাবুজী।"

কান্তি বসল। ঘরের তীব্র উজ্জ্বল আলোয় চোখ যেন জ্বলে যেতে লাগল। উগ্র আতরের গন্ধ এসে ক্লোরোফর্মের মত সারা শরীরে ঘোর ছড়িয়ে দিতে লাগল।

"পান?"

বাটাটা এগিয়ে এল।

"পান আমি খাই না।"

"মিঠা সরবত?"

"না।"

"বীয়ার?"

"না।"

"তবে চা আনাই? মশলা দেওয়া চা?"

"আমার কিছুই দরকার নেই।"

জগু বললে, "বাবু ভদ্দরলোক, ইয়ার নয়। তুমি সংগতী চেয়েছিলে, তাই এনেছি। আদর-যত্ন পরে হবে বাঈ, এখন একটু বাজিয়ে দেখে নাও।"

বাঈজী আবার মধুর্ ি করে হাসল, "বহুৎ অচ্ছী বাত।"

একটু পরেই তৈরি হয়ে এল বাঈজী। পরে এল পেশোয়াজ, পায়ে ঘুঙুর। কোথা থেকে এসে দেখা দিল সারেঙ্গিওয়ালা। জগু, আড়ষ্ট [illegible] কান্তির কাঁধে চাপ দিলে একটা

সোনার কাজ-করা লাল পেশোয়াজ ঘুরতে লাগল আগুনের চাকার মত

"লেগে যাও ওস্তাদ"

তবলা বাঁয়া টেনে নিলে কান্তি।

ঘুঙুরের ঝঙ্কার উঠল। বাঈজীর তিরিশ-পেরনো শরীর হঠাৎ যেন সাপের মত লিকলিকে হয়ে গেল। মনে হল এক-রাশ বিদ্যুৎ খেলতে লাগল ঘরের মধ্যে। সোনার কাজ-করা লাল পেশোয়াজ ঘুরতে লাগল আগুনের চাকার মত। থেকে থেকে "আহা" "আহা" করে উঠতে লাগল সারেঙ্গিওয়ালা। ঘুঙুরের ঝঙ্কার, আগুনের ঘূর্ণি, বিদ্যুতের ঝলক আর দমকে দমকে ছড়িয়ে পড়া তীব্র আতরের গন্ধ যেন কান্তির রক্তের মধ্যে এক-একটা করে তীরের মত ছুটে যেতে লাগল। দুটো হাত বাঁয়া-তবলার উপরে নেচে চলল ঝড়ের তালে।

পেশোয়াজের ঘূর্ণি থামিয়ে বাঈজী বললে, "সাবাস!"

সারেঙ্গিওয়ালা মাথা নাড়ল : "হাঁ—হাত বহুত মিঠা হ্যায় ইনকো।"

কান্তি বাহাল হল। এখন মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে।

চোখ মেলে তাকাল কান্তি: ট্রেন লিলুয়া ছেড়েছে। মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে এখন। এর চাইতে ভাল পরিণাম কী আর হতে পারে তার? সমাজের কাছে এর চাইতে কতটুকু বেশী মর্যাদা পেতে পারে খুনী শান্তিভূষণের ছেলে?

মদ এখনো ধরেনি কান্তি, এখনো হার মানতে পারেনি ততখানি। তবু, কখনো কখনো, মুনিয়া বাঈজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর যখন আগুনের কণা ঝরে পড়তে থাকে, নেশায় জড়ান চোখ নিয়ে কোনো শেঠজী হীরের আংটি বসান আঙুলে ভেলভেটের তাকিয়ায় ভুল তাল দিতে থাকে, তখন কান্তিরও নেশা ধরে। শান্তিভূষণের নেশা: একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর কিছু করবার নেশা। তবলার উপর আঙুল-গুলো লোহার আংটার মত শক্ত হয়ে যায়।

টাকা। এই লোকটার মত অনেক টাকা যদি তার থাকত!

একটা অসতর্ক মুহূর্তে মনের গোপন কথাটা শুনেছিল জগু। অতিরিক্ত পান-খাওয়া দাঁতগুলো থেকে রক্ত-জমাট হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, "টাকা চাই ইয়ার? সে ত ছড়ানই রয়েছে, নিতে পারলেই হয়।"

কান্তির চোখ ধক করে উঠেছিল। "তাই নাকি? কোথায় পাওয়া যায়?"

কান্তির কাঁধে গোটা কয়েক থাবড়া দিয়ে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল জগু। "একদিন চল আমার সঙ্গে—ব্যাংকে।"

"ব্যাংক!"

"হাঁ—ব্যাংকে। কে অনেকগুলো টাকা তুলছে, চোখ রাখতে হবে তার দিকে। যখন টাকাগুলো নিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সে গুনে দেখছে, তখনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে, 'গির গিয়া, আপকো নোট গির গিয়া।' মাথা নামিয়ে যেই নোট খুঁজতে যাবে, অমনি খপ করে তুলে নাও টাকাগুলো। আমরা সব এধার-ওধার দাঁড়িয়ে থাকব। হাতে হাতে পাচার হয়ে যাবে টাকা।" জগুর পান-খাওয়া দাঁতগুলো জন্তুর মত দেখাতে লাগল। "তোমাকে ধরে হয়ত কিছু মার লাগাবে, থানাতেও নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু টাকা কাছে না পেলে কিছুই করতে পারবে না। রাজী আছ দোস্ত?"

আতঙ্কে চমকে কান্তি বলেছিল, "না।"

কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই, সে-কথা কে আর বেশী করে জানে তার নিজের চাইতে। আজ ত এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে শান্তিভূষণের সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। চুরি, ডাকাতি, খুন—সব কিছুরই সহজাত অধিকার নিয়ে সে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছে। কালো অন্ধকার রাত্রির সরীসৃপ গলিগুলো সৃষ্টি হয়েছে তাদের মত মানুষের জন্যেই। তাদেরই মুঠোর জন্যে পৃথিবীর সমস্ত চকচকে বাঁকা ছুরিতে শান পড়েছে। নিশীথের নির্জন গঙ্গার উপর দিয়ে দাঁড় টেনে টেনে যে ছায়ার মত নৌকোটা বে-আইনী আফিং আর চোরাই পিস্তল নিয়ে আসছে, তা একান্তভাবে ওদেরই প্রয়োজনে। কোনো এক অপরিচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত সকালে ডাস্টবিনের মধ্যে যে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেল, তার গলায় ওদেরই আঙুলের দাগ!

পারে। শান্তিভূষণের রক্তে যাদের জন্ম, তারা সবই পারে। তবু কান্তিভূষণের যে বাধে, সে খানিকটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিভূষণের মত সাহস তার নেই।

তবু একদিন সে-ও পারবে। এক-একদিন উদ্দাম রাত্রে মুনিয়া বাঈজীর নাচ যখন সংযমের শেষ সীমাকে পার হয়ে চলে যায়, সেদিন কান্তিভূষণও পারবে। এখন কেবল অপেক্ষার কাল, কেবল প্রস্তুতির পর্ব।

ট্রেন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। চারদিকে নেমে এল একটা গম্ভীর কালো ছায়া। যেন ওই ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এসে প্রবেশ করল কোনো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পরিণামের মধ্যে, যার হাত থেকে তার মুক্তি নেই!

॥ ৩ ॥

বাড়িটা মালাবার হিলসের ওপর। জানলা দিয়ে রাত্রির আরব সমুদ্র আর মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। বহু দূরে ট্রেন্বের বিদ্যুৎবিন্দু। জেটি থেকে একটা জাহাজের গম্ভীরমন্দ্র আত্মঘোষণা।

গীতা ঘরে ঢুকে বলল, "দীপেন আসেনি?"

সুপ্রিয়া বলল, "না। কী কাজে গেছে রাওয়ের ওখানে।"

গীতা ভ্রূকুটি করলে, "রাওয়ের ওখানে কাজ ত বোঝাই যাচ্ছে। এখানে এমনিতে প্রহিবিশন, ড্রিঙ্ক করতে ত সুবিধে হয় না। তাই রাওয়ের মত কয়েকজনই মাতালদের আশা-ভরসা।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেনের মদ খাওয়া নিয়ে সে গীতার মত বিচলিত হয় না।

গীতা আস্তে আস্তে বললে, "যে-ভাবে চলেছে, তাতে আর বছর পাঁচেক বেঁচে থাকবে। তার বেশী নয়।"

সুপ্রিয়া চমকে উঠল, "সে কী কথা!"

গীতা সামনের সোফাটায় বসে পড়ল। "তুমি জান না? ওর লিভার বেশ কিছু-দিন থেকেই ত ওকে ট্রাবল দিচ্ছে। ডাক্তারেরা ওকে সাবধান করে দিয়েছে অনেকবার। দিন কয়েক ভয় পেয়ে সামলে থাকে, তারপরেই আবার আরম্ভ করে দেয়। মরবে, আর দেরি নেই।"

সুপ্রিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। "কিন্তু তুমি ত ওকে বাঁচাতে পার গীতা।"

"আমি?" গীতা আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকাল, "আমার কথা শুনবে কেন? আমি চেষ্টা করছি চার বছর থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।"

"তুমি ত ওকে ভালবাস।"

গীতা হাসল, "তা হতে পারে। কিন্তু ও আমাকে ভালবাসে না।"

"তা হলে এই দু বছর ধরে—"

"এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, এই ত?" গীতা বললে, "তাতে কী আসে যায়! আমি ওকে ভালবাসি, তাই কাছে থাকতে চাই। ওর সঙ্গীর দরকার হয়, তাই আমাকে অভ্যাস করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওর মনের ওপর রাশ টানতে পারি, এমন জোর আমি কোথায় পাব? সে পার তুমিই।"

"আমি!"

গীতা বললে, "কারণ ও তোমাকেই ভালবাসে।"

সুপ্রিয়া বিস্বাদ হাসি হাসল। এই তিন মাসের মধ্যে দীপেন ও-কথাটা তাকে অনেক-বারই বলেছে। খানিকটা বিশ্বাস করে সুপ্রিয়া, খানিকটা করে না। দীপেনের মনে হয়ত খানিকটা রঙ লাগিয়ে রেখেছে সুপ্রিয়া, কিন্তু সে কেবল একাই নয়। আরও অনেকে এসেছে সেখানে, আরও অনেকেই আসবে।

অবশ্য দীপেনকে সেজন্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঠিক এই রকম কথা সে নিজেই কি বহুবার বলেনি অতীশের কাছে, বলেনি কান্তিকে? আমার মনের ভিতরে অনেক বেশী জায়গা আছে, মাত্র একজনকে দিয়ে সে-জায়গা ভরবে না। আমি আরো বহু মানুষকে ডেকে আনতে পারি সেখানে। তাই বলে হিংসা কর না। তোমার যেটুকু পাওনা আছে, সে তুমি পাবে। তোমার জন্যে যেটুকু মন আমি আলাদা করে রেখেছি, সে কেবল তোমারই একার।

খুব ভাল কথা। অতীশ যেমন সে-কথা মেনে নিয়েছে বিষণ্ণ শান্ত মুখে, যেমন সে-কথা দাঁতে দাঁতে চেপে মেনে নিয়েছে কান্তি, তেমনি সহজভাবেই সুপ্রিয়ারও স্বীকার করে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন এখন বাধে সুপ্রিয়ার। নেশায় লাল টকটকে চোখ মেলে দীপেন যখন বলে, "তোমার জন্যেই আমি এতদিন অপেক্ষা করে বসেছিলাম " তখন মনের ভিতর কেমন কুঁকড়ে যায় তার। দীপেন তাকে ভালবাসবে, সারা ভারতবর্ষের অত বড় নামজাদা গায়ক সরস্বতীর ধ্যান করতে গিয়ে বুকের ভিতরে দেখতে পাবে তারই মুখ, তাকেই কল্পনা করে দীপেনের গানের সুর নির্ঝরিত হবে সহস্র বেণীতে, এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী আছে সুপ্রিয়ার? তবু কখনো কখনো দীপেনের হাত যখন তার হাতে এসে পড়ে, তখন ঠিক ঈর্ষার সঙ্গে কোথা থেকে একটা ক্লেদাক্ত অস্বস্তি তাকে সংকুচিত করে ফেলতে থাকে।

গীতার কথায় চকিত হয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

"জান সুপ্রিয়া, দীপেন কতবার বলেছে আমাকে। বলেছে, জীবনে অনেক মেয়েই এসেছে, কিন্তু ওই একটি মেয়ের জন্যেই আমি প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন। আমার গানের সব চাইতে দুর্লভ সম্পদ যেখানে, তার সোনার চাবিটি সে-ই নিয়ে আসবে। সে এলেই আমি বেঁচে উঠব, নেশা ছেড়ে দেব, গানের তপস্যায় বসব সন্ন্যাসীর মত। আমার চোখের সামনে থাকবে তারই বিগ্রহ। সেদিন আর তোমায় বলতে হবে না গীতা, নিজের হাতেই আমি মদের বোতল আছড়ে ভেঙে ফেলব।'"

সুপ্রিয়া বললে, "তুমি কি ভাবছ আমিই সেই মেয়ে?"

"দীপেন তোমার নাম করেছিল আমার কাছে। এবার কলকাতায় যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল, গান গাইতে কলকাতায় যাচ্ছি না, আনতে যাচ্ছি আমার গীত-লক্ষ্মীকে। নিয়েও এল তোমাকে। এবার ত তোমার সময় হয়েছে সুপ্রিয়া, এখন ত তুমি ওকে ফেরাতে পার এই আত্মহত্যার পথ থেকে।"

সুপ্রিয়া নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার। দীপেনের কথা কানে ভাসছে: "শুধু কাছে থাকবে, শুধু চোখে দেখব, এইটুকুতেই আমার সান্ত্বনা কোথায়। তোমায় আরো বেশী করে চাই।"

আরো বেশী? সে-বেশির অর্থ বুঝতে দেরি হয়নি। দীপেনের রক্তাভ চোখে সেই জ্বালা—যা আদিম, যা উলঙ্গ, যা আরণ্যক। সে চাওয়ার দাবি সুরের সাধনা থেকে আসেনি, এসেছে নির্লজ্জ ক্ষুধা থেকে। তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে দেউলিয়া হতে রাজি নয় সুপ্রিয়া। দীপেনকে সম্পূর্ণ করে না চেনা পর্যন্ত, নিজের সাধনার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত, এবং শান্ত-নিশ্চিন্ত পরিণামে সমাজের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে এত সহজেই সে শূন্য করে দিতে পারবে না।

"তুমি ওকে ফেরাও। এখনো ফেরাও।" গীতার গলায় একটা আর্ত অনুরোধ।

দেহের দাম দিয়ে? একটা বিস্বাদ হাসি আবার ভেসে উঠল সুপ্রিয়ার ঠোঁটের কোনায়। শুধু ওইটুকু? কেবল অতটুকুর জন্যেই সব কিছু আটকে আছে দীপেনের? কী করে বিশ্বাস করবে সুপ্রিয়া? কলেজ-জীবনের অমরেশ্বরকে মনে পড়ল। তার জন্যে খাতার পর খাতা কবিতা লিখেছিল অমরেশ্বর, তাতে বলেছিল, আমি সমুদ্র, তুমি চাঁদ; দূরে থেকে আমার বুকে জোয়ার জাগিয়ো, তাতেই আমি চরিতার্থ হয়ে থাকব। কিন্তু অমন সমুদ্রের মত বিশাল রোমান্স মুহূর্তে কুশ্রী লোলুপতায় পরিণত হয়েছিল গড়ের মাঠের দূরান্তে রাত্রি-গম্ভীর একটা গাছের ছায়ায়। সুপ্রিয়া কেবল প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়েছিল অমরেশ্বরকে। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল অমরেশ্বর। তারপর হাত ধরে তাকে উঠিয়ে বসিয়েছিল সুপ্রিয়াই। বলেছিল, "খুব হয়েছে—এবার বাড়ি ফিরে চলুন।"

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অমরেশ্বর। শরীরের না মনের যন্ত্রণায়, সুপ্রিয়া জানে না। সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পায়নি।

তবু আশা ছিল, ওটা ক্ষণিক দুর্বলতা, সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু সেই থেকে দূরে সরে গেল অমরেশ্বর। সুপ্রিয়া যেচে গেছে তার কাছে, একদিন ডেকেও নিয়ে গিয়েছিল একটা চায়ের দোকানে, কিন্তু অমরেশ্বর আর ভাল করে তাকাতেও পারেনি তার দিকে। ছাইয়ের মত নেভা চোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে মাটির দিকে, একটা কথা বলতে গিয়ে তিনবার ঢোক গিলেছে, তারপর খানিকটা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ঠোঁট পুড়িয়ে কান্না নষ্ট করে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই পালিয়ে গেছে সামনে থেকে।

দীপেনের এত কল্পনা, এত স্বপ্নের শেষও কি ওইখানেই? জোর করে কিছুই বলা যায় না। পৃথিবী সম্পর্কে অমরেশ্বর তার চোখ খুলে দিয়েছে। তার সম্পর্কে দীপেনের এতদিনের প্রতীক্ষা কেবল কি ওইটুকুর জন্যেই সমাপ্তি পাচ্ছে না? তা হলে অমরেশ্বরের সঙ্গে দীপেনের তফাত কোথায়? তা হলে কিসের জন্যে সে কলকাতা থেকে চলে এল এতদূরে?

আর এ-কথাই কি জোর করে বলতে পারে সুপ্রিয়া যে, এর পরেই দীপেনের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না? একরাশ কাদা মাখিয়ে তার স্বপ্নলক্ষ্মীকে সে সমুদ্রে বিসর্জন দেবে না?

গীতা আবার ওকে চকিত করে তুলল।

"কথা বলছ না যে?"

"কী বলব?"

"দীপেন সম্পর্কে তোমার কি কিছুই করবার নেই?"

সুপ্রিয়া ম্লানমুখে বললে, "আমার সম্পর্কেই ওর করবার ছিল বেশী।"

গীতা বললে, "তাতে ত ত্রুটি হয়নি। এখানকার সেরা ওস্তাদ পণ্ডিতজীর কাছে ও তোমার গান শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যাতে টাকার দিক থেকে তোমার ওর কাছে হাত পাততে না হয়, তার জন্যে ওর ছবিতে তোমার প্লে-ব্যাকের বন্দোবস্ত করেছে। তুমি যা স্বপ্ন দেখেছিলে তা ত ও পূর্ণ করে দিয়েছে। তুমি কিছু করবে না সুপ্রিয়া?"

"চেষ্টা করব।"

গীতার চোখ ধক্ ধক্ করে উঠল, "তোমার আরো একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল ওর ওপরে।"

কৃতজ্ঞতা? সুপ্রিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করল। এমন কথা ত ছিল না। সে যে জীবনকে অনেক বেশী বিস্তীর্ণ, অনেকখানি বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই; সে চেয়েছিল ভারতবর্ষের গীতি-তীর্থে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে, চেয়েছিল সুরের তীর্থ-সলিলে নিজের পূর্ণকুম্ভটি সাজিয়ে নিতে। কিন্তু তার জন্যে ত দীপেনের কাছেই একান্তভাবে এসে প্রার্থনা জানায়নি। দীপেন উপযাচক হয়েই এসেছে তার কাছে, হাত পেতেছে ভিক্ষার্থীর মত, বলেছে, "দয়া কর আমাকে। আজ এতদিন ধরে তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম। আমার সব গান এখনো কুঁড়ি হয়েই আছে, তারা ফুটতে পারছে না। তুমি এস, তাদের ফুটিয়ে দাও, আমার মনের মালঞ্চকে ভরে তোল।"

সেই ফুল ফোটাতেই সুপ্রিয়া এসেছে। কৃতজ্ঞতার পালা ত তার নয়, ও কাজ দীপেনেরই ছিল। আজ তার পক্ষ থেকে উলটো চাপ দিচ্ছে গীতা। মন্দ নয়!

কিছুক্ষণ চুপ। সমুদ্রের বুক থেকে

হাওয়া। মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। ট্রেনের বিদ্যুৎ-বিন্দু। কালো সমুদ্রের উপর একটা জাহাজের বিচিত্রবর্ণ আলোর আন্দোলন।

গীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"হঠাৎ তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলে ফেললাম, কিছু মনে কর না। আমার মনকে আমি জানি। আমাকে যে ও ভালবাসে না, তুমি যে ওর সবখানি জুড়ে আছ, তার জন্যে আমি তোমাকে হিংসে করি। আর সেই সঙ্গে যখন ভাবি, তুমি ইচ্ছে করলেই ওকে বাঁচাতে পার, বাঁচাতে পার অত বড় গুণীকে, অথচ কিছুই করছ না, তোমাকে তখন আর ক্ষমা করতে পারি না।"

সুপ্রিয়া জবাব দিল না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওইটুকুর জন্যেই সার্থক হতে পারবে না দীপেন? সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সাধনা, সমস্ত প্রতীক্ষার সমাপ্তি হচ্ছে না কেবল এরই জন্যে?

গীতা একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"বারটা বাজে। এখনো ফিরল না! রাস্তায় পুলিশে ধরল না ত?"

"তা হলে ভাবনা নেই।" সুপ্রিয়া হঠাৎ হেসে ফেলল, "ভালই থাকবেন আজকের রাত।"

গীতা একটা ক্রুদ্ধ উগ্র দৃষ্টি ফেলল। আস্তে আস্তে উঠে গেল সামনে থেকে। সুপ্রিয়া বসে রইল দূরের দিকে তাকিয়ে। তার অতীতকে মনে পড়ছে।

আশ্চর্য, সবাই চেয়েছে তার কাছে। কান্তি, অমরেশ্বর, দীপেন — আরো অনেকেই। এমনকি, ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করও। মুখ ফুটে কোনো কথা কখনো বলেননি, তবু তার মনে হয়েছে, শূন্যে ব্যথিত চোখের দৃষ্টি মেলে দুর্গাশঙ্কর জানাতে চেয়েছেন, "আমি ভারী নিঃসঙ্গ—তুমি আমার কাছে থাক। যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব, তখন আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দাও আমার মাথায়।" শুধু অতীশই কিছু চায়নি তার কাছে। বরং দিতে চেয়েছে, বরং বলেছে, "আমি তোমার কাছে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি; শুধু কোনোদিন যদি তোমার প্রয়োজন হয়, আমাকে ভুলো না। আমি জানি, যখন তুমি থাকবে না, তখন আমার বাঁচবার প্রয়োজনও যাবে ফুরিয়ে। তবু আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকব। যদি কখনো পৃথিবীতে তোমার আর কিছু না থাকে, আমি আছি।"

একটা ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ল সুপ্রিয়ার। গান সে শিখছে। স্বপ্নে যাঁর পায়ের ধুলো ভিক্ষা করেছে, আজ গান শিখছে তাঁরই পায়ের কাছে বসে। তবু যখন তাঁর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসে, তখন তার চোখটা অভ্যাসবশে রাস্তার ওধারে চলে যায়। কিন্তু এ ত কলকাতা নয়, এখানে সেই বকুলগাছের তলায় নীল অন্ধকার নেই, যেখানে সাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রতীক্ষা করছে অতীশ।

ভারী ফাঁকা লাগে সুপ্রিয়ার।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র তার কী কাজে লাগবে? সে ত তার গানের সঙ্গে সংগত করতে পারবে না।

গীতা ফিরে এল।

"ফোন করেছিলাম। রাও বললে, কোনো চিন্তা নেই, একটু পরেই দীপেন আসছে।"

গীতা আবার মুখোমুখি বসল সুপ্রিয়ার। মুখে একটা বিষণ্ণ ভাবনা। কী একটা কথা বলতে এসেছে যেন। কিছুতেই বলে উঠতে পারছে না।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করল, "আজকে নাচ ছিল না তোমার?"

"ছিল।"

"কেমন হল?"

"ভালই।" হঠাৎ যেন বহুক্ষণের একটা আবরণ মনের উপর থেকে জোর করে সরিয়ে দিলে গীতা: "জান, আজ আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন সোহনলাল!"

"সোহনলাল!"

"আমি ভাবতেই পারিনি—" গীতার গলা কাঁপতে লাগল, "কল্পনাই করিনি তিনি বম্বেতে রয়েছেন।"

"তুমি ত বলেছিলে তিনি দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রোফেসারি করছেন।"

"তাই ত জানতাম।" গীতা বিহ্বল চোখে বললে, "হয়ত কোনো কারণে বম্বেতে এসেছেন। আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন, বসেছিলেন একেবারে সামনের রো-তে। আমি তাঁর চোখ দেখেছি। আমাকে চিনতে পেরেছেন তিনি।"

গীতার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

"একবারের জন্যে আমার নাচে তাল কেটে গেল ভাই। একবার মনে হল, আমি ছুটে পালিয়ে যাই এই স্টেজ থেকে। শুধু স্টেজ থেকে নয়, পৃথিবীর চোখের সামনে থেকে। গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি সমুদ্রে।"

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললে, "চিনলেই কি বিশ্বাস করবেন? তিনি ত জানেন তুমি আর বেঁচে নেই।"

ওড়নার প্রান্তে জল মুছে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকাল গীতা। "ঠিকই বিশ্বাস করেছেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম, কালো হয়ে গেছে ও'র মুখ। তারপর প্রত্যেকটা নাচের সময় কেবল একদৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলেন মূর্তির মত। মাথা নাড়লেন না, হাততালি দিলেন না, কিছুই না।"

নীরবে বসে রইল সুপ্রিয়া।

"আজ মনে পড়ছে, একবার কলেজ সোস্যাল শেষ হলে সকলের চোখের আড়ালে আমার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল। সেদিন তাঁর একটা দৃষ্টি দেখেছিলাম, আজ দেখলাম আর-এক দৃষ্টি।" গীতার চোখ বেয়ে আবার জল পড়তে লাগল।

বাইরে কালো সমুদ্র। মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। ঝড়ের মত হাওয়া।

গীতা আবার বললে, "যদি মদ পেতাম, আজকে দীপেনের মতই ড্রিঙ্ক করতাম আমি। ভোলবার জন্যে নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবার জন্যে। আজকের রাত আমার কী করে কাটবে সুপ্রিয়া?"

বাইরে মোটরের শব্দ হল। দীপেন ফিরে এসেছে।

(কান্তি বলছিল, "তুমি কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি?"

"আত্মহত্যা কেন করবে কান্তি? জীবনটা কি এক টুকরো বাজে কাগজ, যে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ইচ্ছে করলেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া চলে?"

কান্তির শান্ত মুখটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। "আমার কাছে জীবন ছেঁড়া কাগজের টুকরোর চাইতে বেশী নয়। প্রমাণ চাও? দেখাচ্ছি!"

বলতে বলতেই কান্তি নিজের একটা হাত তুলে আনল বুকের কাছে। বিস্ফারিত চোখে সুপ্রিয়া দেখল, সে-হাত মানুষের নয়! ভালুকের মত কালো কালো লোমে ভরা। আর হাতের আঙুলগুলো একরাশ সাদা ধারালো বাঘের নখ। পরক্ষণেই কান্তি সেই নখগুলো নিজের বুকের মধ্যে বসিয়ে দিলে। পুরনো কাপড় ছেঁড়বার মত শব্দ করে ছিঁড়ে গেল বুকের চামড়া, মট মট করে ভেঙে গেল পাঁজর, আর উদ্ঘাটিত বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত হৃৎপিণ্ডটা, ঝুলে পড়ল বাইরে।

একটা রক্তমাখা ভালুকের থাবা সুপ্রিয়া কপালে রেখে কান্তি বললে, "দেখছ?")

অমানুষিক ভয়ে সুপ্রিয়া ঘরফাটানো আর্তনাদ করে উঠল। স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আবছা আলো। স্বপ্নের আতঙ্ক জড়ানো চোখে সুপ্রিয়া দেখল, তার মাথার কাছে তখনো কান্তি দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মত।

যেন প্রেতলোকের পার থেকে কান্তির গলা ভেসে এল, "চেঁচিয়ো না, আমি।" তারপরেই বাঘের থাবার মত দুটো লুব্ধ বাহু বাড়িয়ে সে ঝুঁকে পড়ল সুপ্রিয়ার দিকে।

আবার একটা আর্তনাদ তুলল সুপ্রিয়া, দুটো পা তুলে প্রাণপণে লাথি মারল প্রেত-

মূর্তিকে। চাপা যন্ত্রণার একটা গোঙানি তুলেই মূর্তিটা সোজা উলটে পড়ে গেল. সেই সংগে বিকট শব্দে উলটে পড়ল একটা টিপয়, ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে গেল একটা কাচের গ্লাস।

আর সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গীতার চিৎকার উঠল, "কে-কে-কে?"

॥ ৪ ॥

মুনিয়া বাঈ নাচছিল।

নামজাদা এক শেঠ এসেছেন তাঁর ঘরে। তিনটে কোলিয়ারি, দুটো পাটের কল, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক। আরো কী কী ব্যবসা আছে তাঁর। লাখ দশেক টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন এবার, ফাঁকি দিয়েছেন তার তিনগুণ।

এসেই শেঠজী বের করেছেন একটা পেট-মোটা মস্ত বড় মনিব্যাগ। দুখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন, "নোকর লোগকো বকশিস।"

তারপর এসেছে আতরদান, সোনালী তবকমোড়া বাটাভরা পান, রুপোর থালায় কয়েক ছড়া মোটা মোটা মালা, আর এসেছে মদের বোতল।

মুনিয়া বাঈ বেশী মদ খায় না। কিন্তু এমন সম্মানিত অতিথির সে অমর্যাদা করতে পারেনি। শেঠজীর সংগে সংগে বেশ কয়েক-পাত্র চড়িয়ে নিয়েছে নিজেও। উচ্ছলতম গান শুনিয়েছে একটার পর একটা, দু চোখে ছড়িয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণ। তারপর শুরু হয়েছে নাচ।

ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাওয়া মুনিয়া বাঈ যেন পিছিয়ে গেছে দশ বছর। সমস্ত শরীর তার ফণা তোলা সাপের মত ছোবল মেরেছে শেঠজীকে। এমনকি, বুড়ো সারেঙ্গিওলার চোখ পর্যন্ত চমকে উঠেছে কয়েকবার। শেঠজী একটার পর একটা গ্লাস শেষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত আর সোডারও দরকার হয়নি।

নেশার জড়তা আর নাচের ক্লান্তিতে এক সময় কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ল মুনিয়া বাঈ। তার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন শেঠজী। প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করে আছে, নাক দিয়ে বেরুচ্ছে উৎকট আওয়াজ। সারেঙ্গি রেখে বুড়ো সারেঙ্গিওলা এগিয়ে গেল, একটা তাকিয়া টেনে সস্নেহে মুনিয়া বাঈয়ের মাথাটা তুলে দিলে তার উপর, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্তি তবলা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল আবার।

শেঠজীর গলায় চিকচিকে সোনার হার। হাতের আঙুলে সবশুদ্ধ গোটা আটেক আংটি, তার একটা থেকে কমলহীরের একটা দীর্ঘ রশ্মিরেখা কান্তির চোখে এসে আঘাত করছে। পেটমোটা মনিব্যাগটা গড়িয়ে পড়েছে কার্পেটের উপর। জামার বোতাম-গুলোতেও যা চিকচিক করছে, তা হীরে ছাড়া আর কিছুই নয়।

কান্তির হাত-পা যেন জমে পাথর হয়ে গেল।

কত টাকা হতে পারে সবশুদ্ধ? পাঁচ হাজার, সাত হাজার? ওই মনিব্যাগটাতেই যে কত আছে কে জোর করে বলতে পারে?

কান্তি চারদিকে তাকাল একবার। রাত একটা বেজে গেছে। একটা চাকরেরও সাড়া নেই। তারা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে নিজেদের জায়গায়। মুনিয়া বাঈ নেশায় অচেতন, শেঠজীর নাক ডাকছে।

কমলহীরের দীর্ঘ রশ্মিরেখাটা শয়তানের সংকেতের মত ডাকতে লাগল কান্তিকে। পেটমোটা মনিব্যাগটা সাদর আমন্ত্রণে হাত-ছানি দিতে লাগল। বোতামের উজ্জ্বল বিন্দুগুলো কতগুলো আলোর সুতোয় পরিণত হল, তারা যেন দু পায়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল কান্তির।

কান্তি একবার কপালের ঘাম মুছে ফেলল। তাকিয়ে রইল মন্ত্রবদ্ধের মত। তারপরে মনে হল, তার চোখের তারাদুটো আর চোখের ভিতরে নেই, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়েছে তারা, ওই আংটিটার উপর, ওই মনিব্যাগটার উপর জ্বলস-জ্বল ঝক-ঝক করে জ্বলছে।

আলোর সুতোগুলো সরীসৃপ হয়ে কান্তির দু পা জড়িয়ে ধরে টানতে লাগল। একটা দুর্জয় লোভ বুকের ভিতরে আঁচড়াতে লাগল ক্রমাগত। মাথার ভিতরে শুধু কমলহীরের আলোটা আগুনের ঊর্ধমুখী শিখার মত জ্বলতে লাগল।

কান্তি ফিরে গেল শেঠজীর কাছে।

পাঁচটা আংটি খুলে এল সহজেই, কমল-হীরেটা এল সব চেয়ে সহজে। গোটা তিনেক বাধা দিলে, তার দুটোও খোলা গেল কিছু-ক্ষণের মধ্যে। একটা শুধু শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইল, আঙুলের মোটা গাঁটটা কিছুতেই পেরোতে রাজী হল না।

ওটা থাক, এমন কিছু লোভনীয় নয়। বোতামটার সংগে এল বেশ মোটা সোনার চেন। আর মনিব্যাগটা ত তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ঘামে জামাটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে। কান্তির চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা ভূমিকম্পের মত দোল খাচ্ছে। শেঠজীর নাক ডাকছে সমানে। একটা ছিঁড়ে আনা পদ্মের মত লুটিয়ে আছে মুনিয়া বাঈ। কান্তি দ্রুতপদে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সেখান থেকে সোজা সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু সিঁড়িতে প্রথম পা রাখতেই কে যেন তার কাঁধে থাবা দিয়ে চেপে ধরল। লোহার মত শক্ত তার মুঠো। থরথর করে কেঁপে উঠল কান্তি।

সারেঙ্গিওলা।

কোটরে-বসা চোখ দুখো ঝিলিক দিচ্ছে ক্রোধে। বজ্রগর্জনে বুড়ো বললে, "কাঁহা যাতা? ঠহ্‌রো!"

"কেঁও?"

"তোম্ চোরি কিয়া।"

শান্তিভূষণ জ্বলে উঠল রক্তে। কান্তি পালটা গর্জন করে উঠল, "মুখ সামলাও।"

"চোপরও চোট্টা। জেব দেখলাও!"

একটা ঝটকা মেরে বুড়োকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, কিন্তু পারল না। পরক্ষণেই বুড়ো প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল কান্তির মুখে। ঠোঁট ফেটে গেল সঙ্গে সংগেই, নাক দিয়ে দরদরিয়ে নেমে এল রক্ত।

শান্তিভূষণ কান্তিভূষণকে বললে, "তুমি খুনীর ছেলে, সে-কথা ভুলো না।"

ফাটা ঠোঁট আর রক্তাক্ত নাক নিয়ে কান্তি বাঘের মত বুড়োর উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

বাড়ির চাকরবাকরগুলো এসে যখন কান্তিকে টেনে তুলল বুড়োর বুক থেকে, তখনো বুড়োর গলায় তার আঙুলগুলো অকারণে পাকের পর পাক দিচ্ছে। ফাটা ঠোঁট আর নাকের রক্ত-মাখানো মুখে ফেনা তুলে কান্তি তখনো অবরুদ্ধ স্বরে বলে চলেছে, "এবার—এবার?"

॥ ৫ ॥

"দাদা-ঘুমুচ্ছেন?"

সাড়া নেই।

"ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, ও অতীশবাবু?"

"উঁ? কী বলছেন?" অতীশ পাশ ফিরল।

শ্যামলাল নিজের তক্তপোষে ছটফট করল আরো কিছুক্ষণ। খালি মনে হচ্ছে যেন অজস্র ছারপোকা কামড়াচ্ছে বিছানায়। উঠে বসল, বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে খুঁজে দেখল। না, একটা ছার-পোকারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

নেমে গিয়ে কুঁজো থেকে জল খেল এক গ্লাস। তারপরে আবার করুণস্বরে বললে, "ও অতীশবাবু!"

"হুঁ।"

"ঘুমুচ্ছেন?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা। ঘুমোন।"

অতীশ চোখ মেলল। জড়ান গলায় বললে, "ডাকছিলেন কেন?"

"না—এমনি। আপনি ঘুমুচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

অতীশের পাতলা ঘুম সম্পূর্ণ ভেঙে

বাঘের মত বুড়োর উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল

গিয়েছিল। হেসে বললে, "মজা মন্দ নয়! আমি ঘুমুচ্ছি কিনা জানবার জন্যে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুললেন?"

শ্যামলাল কুঁকড়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে বললে, "না-ইয়ে-এমনি। আমার ঘুম আসছিল না কিনা, তাই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব। তা আপনি ঘুমোন। ডিসটার্ব করলাম, কিছু মনে করবেন না।"

অতীশ হাই তুলল। আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসল বিছানায়। ঘরে আলো নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে একফালি ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শ্যামলালের মুখে। অত্যন্ত বিপন্ন আর কাতরভাবে তাকিয়ে আছে শ্যামলাল।

অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠির চকিত আলোয় শ্যামলালের বিষণ্ণ মুখখানাকে আরো বিবর্ণ মনে হল।

"মনে করলেই বা আর করছি কী। একবার যখন জাগিয়ে দিয়েছেন, তখন সহজে আমার আর ঘুম আসবে না। কিন্তু ব্যাপার কী? পড়ছেন না অথচ জেগে রয়েছেন এমন অঘটন ত আপনার ক্ষেত্রে ঘটে না।"

শ্যামলাল বললে, "মানে—কেমন যেন মাথা ধরেছে, তাই—"

"এ-পি-সি খাবেন? দিতে পারি এক পুরিয়া।"

"ধন্যবাদ—দরকার নেই। আমি বলছিলাম, কবে এলাহাবাদে যাচ্ছেন?"

অতীশ বললে, "আমাকে জয়েন করতে হবে প্রায় একমাস পরে।"

"ও! তা বেশ ভাল চাকরি আপনার। ওসব জায়গার ইউনিভার্সিটি মাইনে দেয় ভাল, তা ছাড়া ফরেন স্কলারশিপ পাওয়ার সুবিধেও আছে।" শ্যামলাল নিশ্বাস ফেলল।

"দেখা যাক।" টোকা দিয়ে মেজেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অতীশ বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কী শ্যামবাবু? আমার কুশল আর খবরাখবর নেবার জন্যেই কি এত রাতে আমাকে ডেকে তুললেন নাকি?"

সামনের রাস্তা দিয়ে মরা গেল একটা। হরিধ্বনির দানবিক চিৎকারটা সমস্ত অঞ্চলকে মুখর করে তুলল, কয়েকটা কুকুর সাড়া দিলে তীক্ষ্ণ ভীত গলায়, একটা ঘুম-ভাঙা কাক কঁকিয়ে উঠল বাইরের শিরীষ গাছে। শ্যামলাল বিবর্ণ মুখে খানিকক্ষণ দূরে-চলে-যাওয়া হরিধ্বনির আওয়াজ শুনল, তারপর সসংকোচে বললে, "আপনি মল্লিক সাহেবদের ওখানে যান?"

শ্যামলালের অলক্ষ্যে অতীশ অল্প একটু হাসল।

"আজকাল বিশেষ যাওয়া হয় না। তবে মাসখানেক আগে গিয়েছিলাম একবার।"

"ওরা আপনার আত্মীয়?"

"দূর সম্পর্কের। কেন, বলুন ত?"

"না—এমনি।" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "মানে ও'রা একটু—"

অতীশ বললে, "সাহেবি-ঘে'ষা। তা ভদ্রলোকের অনেক টাকা। দু বার আই-সি-এস ফেল করেছেন; যদ্দুর জানি, ব্যারিস্টারি ব্যাপারটাও সহজে হয়নি। কাজেই বিলেতে অনেক দিন থেকেছেন এবং সাহেবি করবার অধিকারও ও'র আছে।"

"ও'রা সবাই তা হলে—"

অতীশ হাসল, "না—সবাই নয়। মল্লিক সাহেবের স্ত্রী এখনো বাড়িতে পায়ে জুতো পরেন না, এবং ও'দের রান্নাঘরে এখনো বাবুর্চি ঢুকতে পায় না। আর মন্দিরাকে ত আপনি দেখেইছেন।"

"তা দেখেছি।" শ্যামলালের চোখ চকচক করে উঠল, "চমৎকার মেয়ে।"

"যা বলেছেন।" অতীশ উৎসাহ দিলে, "অমন বাড়ির মেয়ে, অথচ কোন খটমটে চাল-চলন নেই। একেবারে সাদামাটা। মানে, মেয়েটা ওর মায়ের দিকটাই পেয়েছে কিনা।"

উত্তেজনায় ভাল করে নড়ে-চড়ে বসল শ্যামলাল। ঝুঁকে পড়ল অতীশের দিকে।

"ঠিক বলেছেন। মেয়েটি একেবারেই ও বাড়ির মত নয়। আর দারুণ ইণ্টেলিজেণ্ট!"

অতীশ আবার সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। "তাতে আর সন্দেহ কী! বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে ওর যা মাথা খোলে, তার আর তুলনা নেই। আমি ত মধ্যে মধ্যে ভাবি, বি-এসসি পাশ করবার আগেই কোনদিন বা ও ডি-এসসি হয়ে বসবে।"

শ্যামলাল একটু চমকে উঠল। খোঁচা লাগল গায়ে। মন্দিরার যে কেমিস্ট্রিতে

এতখানি মাথা, অতটা শ্যামলালও ভাবতে পারেনি।

"ঠাট্টা করছেন না ত?"

"ঠাট্টা করব কেন? মেয়েটা সত্যিই খুব শার্প।" অতীশ গম্ভীর হয়ে গেল।

শ্যামলাল চুপ করে রইল। নির্জন নিঃশব্দ পথের উপর সুদূরে থেকে আসা হরিধ্বনির একটা ক্ষীণ রেশ তখনো কাঁপছে। পথের কুকুরগুলো ডেকে চলেছে একটানা। শিরীষ-গাছটায় ঝোড়ো হাওয়ার দোলা লেগেছে, শনশনানির আওয়াজ উঠছে একটা। কোথায় যেন তীব্র তীক্ষ্নস্বরে পুলিশের বাঁশি বাজল।

শ্যামলাল একটু সামলে নিয়ে আবার বললে, "আচ্ছা—"

"বলে ফেলুন।"

"মানে—মনে করুন—" শ্যামলাল একটা গলা খাঁকারি দিলে, "ওই সাহেবী আবহাওয়া থেকে বাইরে যদি কোথাও—" শ্যামলাল আবার ঢোক গিলল, "বাইরে যদি কোথাও মন্দিরার বিয়ে হয়, তবে সে কি সুখী—"

"সুখী হবেই ত। সাদাসিদে গেরস্থর ঘরেই ওকে মানাবে ভাল।"

শ্যামলালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "জানেন, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কোন সাদাসিদে ঘরেই ওকে মানাবে ভাল। তাই বলে কি আর ওর রান্নাবান্না করতে হবে? চাকর-ঠাকুর সবই থাকবে। তবে হয়ত মোটরে চাপতে পারবে না, কিংবা টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হবে না—"

"কোনো দরকার নেই।" অতীশ জানালা গলিয়ে সিগারেটটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলে, "ওসব তেমন ওর পছন্দও নয়। ও পিঁড়ে পেতে গরম বেগুনভাজা দিয়ে মুসুরীর ডাল খেতে খুব ভালবাসে, গাড়ি চড়ে ঘোরাঘুরির চাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ানই ওর বেশী পছন্দ।"

"বাঃ—বাঃ!" শ্যামলালের চোখ আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "একেই বলে ভারতীয় নারী।"

"পার্ফেক্ট।" অতীশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে।

"কিন্তু ওঁর বাবা এ-সব পছন্দ করেন?"

"না করেই বা কী করবেন? তিনি ত জানেনই, শেষ পর্যন্ত ওর সাধারণ বাঙালীর ঘরেই বিয়ে হবে।"

শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। এত জোরে যে, সন্দেহ হতে লাগল অতীশ তার শব্দ শুনতে পাবে। উত্তেজনায় তার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

"আপনি ত অনেক খবর জানেন দেখতে পাচ্ছি।" কোন মতে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শ্যামলাল বললে, "আপনাকে বুঝি সব খুলে বলে মন্দিরা? আত্মীয় বলে বুঝি খুব বিশ্বাস করে?"

"শুধু আত্মীয় কেন?" একটা হাই তুলে অতীশ বিছানায় পিঠটাকে এলিয়ে দিলে। অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বললে, "আমি ছাড়া এ-সব আর কে বেশী জানবে? আমাদের ঘরের সঙ্গেই ত শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে হবে মন্দিরাকে।"

শ্যামলাল কান খাড়া করল। কেমন বেসুরো ঠেকল কোথাও।

"মানে? আপনাদের ঘরের সঙ্গে কেন?"

"বা-রে!" অতীশ তেমনি সরল নিরীহ ভঙ্গিতে আলতোভাবে ছড়িয়ে দিলে কথাটা: "আমার সঙ্গে যে বিয়ের কথা আছে মন্দিরার।"

আকাশ থেকে যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার মুগুরের ঘা শ্যামলালের মাথায় এসে পড়ল। শ্যামলাল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রায় চিৎকার তুলে বললে, "কী বললেন?"

"একটা পাকা খবর দিলাম আপনাকে।" অতীশ নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল, "আমার ডি-এসসি আর চাকরির জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন মল্লিক সাহেব। কাল আমি একটা চিঠি পেয়েছি ওঁর। আমি এলাহাবাদে চলে যাওয়ার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।"

কথাটা ঠিক। মল্লিক সাহেবের দিক থেকে অন্তত।

শ্যামলাল জবাব দিতে পারল না। কী একটা বলবার উপক্রম করেছিল, গলা দিয়ে খানিকটা গোঙানি ঠেলে বেরিয়ে এল।

"কী হল আপনার?" আবার সরল বিস্মিত প্রশ্ন অতীশের।

"মিথ্যেবাদী—লায়ার!" হঠাৎ একটা সিংহ-গর্জন বেরিয়ে এল শ্যামলালের মুখ দিয়ে।

"কে মিথ্যেবাদী কে লায়ার?"

"কেউ না, কাউকে বলছি না।" শ্যামলালের স্বর প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল, "মন্দিরার সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে এ-কথা আগে কেন বলেননি? চেপে রেখে-ছিলেন কিসের জন্যে?"

অতীশ বললে, "থামুন—আর বেশী বকাবেন না। আমার সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে নিয়ে আপনার কী মাথাব্যথা যে, আগ বাড়িয়ে বলতে যাব আপনাকে? আপনি ও-বাড়িতে প্রাইভেট টুইশন করতে গেছেন—তা-ই করবেন। আপনার ত এ-সব দুশ্চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই!"

শ্যামলাল বোবাধরা গলায় বললে, "না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তা হলে আপনি ইচ্ছে করেই—ওঃ—! মানুষ কী বিশ্বাসঘাতক!" শেষটা আর বলতে পারল না, বোধ হয় চোখের জলে থমকে গেল।

অতীশ চটে গেল। কড়াভাবে বললে, "এও ত জ্বালা কম নয় দেখছি! আপনি প্রাইভেট টিউটর, বাড়ির সব খবরাখবর আপনাকে দিতেই হবে, এমন কথা কোন্ আইনে বলে বলুন দেখি। থামুন, এ-সব আর বেশী বক্‌বক্ করবেন না। অনেক রাত হয়েছে, প্রায় দেড়টা বাজে, আমাকে ঘুমুতে দিন।"

শ্যামলাল আর কথা বললে না। ধুপ করে নেমে পড়ল তক্তোপোষ থেকে, তারপর দুম্‌দুম্ করে চলে গেল ছাদের দিকে। অতীশ চুপ করে শুয়ে শুয়ে শ্যামলালের পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। কোথায় যাবে—ছাতে? সেই ঘুঁটের ঘরে? সেইখানেই কি শুকনো গোবরের উপর বসে বসে নতুন করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে শ্যামলাল? তিন মাস ধরে ওর যে ব্রতচ্যুতি ঘটেছে, সারারাত ধরে সরস্বতীর কাছে চোখের জল ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার?

কিন্তু খামোখা শ্যামলালকে এমনভাবে আঘাত করল কেন অতীশ? একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল, শ্যামলাল বড় বেশী বকর-বকর করছিল মাঝরাতে। যেভাবে শুরু করে-ছিল, তাতে আর সহজে ঘুমুতে দিত না। অথচ আজ রাতে তার ভাল করে ঘুমোনোটা একান্ত দরকার। সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেবার শাস্তি খানিকটা দেওয়া গেল শ্যামলালকে।

শুধু কি এই? না, আরো কিছু ছিল এর ভিতরে? তার চোখের সামনে দিয়ে শ্যামলাল একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরার দিকে, সেই জন্যে কি খানিকটাও ঈর্ষাও ছিল তার মনে? আর সেই ঈর্ষা থেকেই কি এই আঘাত?

অতীশ চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার অবশ্য ভাবল: শ্যামলাল বড় বেশী আঘাত পেয়েছে—এই মাঝরাত্রে একা ছাদে গিয়ে সে কী করছে সেটা দেখে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু কী লাভ? মৃদু অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল অতীশের ঠোঁটের কোনায়। শ্যামলালের মত হিসেবী ছেলেরা অত সহজেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে না। প্রেম করে বিয়ে করতে গিয়েও যদি পণের টাকার গোলমালে তার বাপ আসর থেকে তাকে তুলে আনে, তা হলে সে চোখের জল মুছতে মুছতে বাপের পিছনে পিছনে গাড়িতে এসে উঠবে। তার বেশী আর কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু সত্যিই কি মন্দিরাকে সে বিয়ে করবে? মল্লিক সাহেব চিঠিতে ত স্পষ্ট করেই সে-কথা লিখেছেন।

ক্ষতি কী! অতীশ ভাবতে চাইল: ক্ষতি কী! কোনো ভাবনা নেই, কোনো দায়িত্ব নেই, জীবনের ঘাটে নিশ্চিন্তে নোঙর ফেলা। নির্ঝঞ্ঝাট—নিশ্চিন্ত! নিজের গৃহিণীপনায়

বাইরে এতটুকুও দাবি করবে না মন্দিরা, সুপ্রিয়ার মত অতখানি চাইবার শক্তি তার নেই।

কেবল, কেবল সুপ্রিয়াকেই যদি ভুলতে পারা যেত! মন্দিরা সম্পর্কে সাধ্যমত রোমান্টিক হতে গিয়েও সে কিছুতেই পেরে উঠছে না। সুপ্রিয়ার একটা বিষণ্ণ ছায়া এসে মন্দিরার মুখখানাকে আড়াল করে দিচ্ছে বার বার।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ১ ॥

অমিয় মজুমদার অপরিমিত খুশী হয়ে বললেন, "আরে এস, এস। কেমন আছ?"

অতীশ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বললে, "চলছে একরকম।"

"কাগজে পড়েছিলাম, তুমি ডি-এস্‌সি হয়েছ। ভারী খুশী হয়েছিলাম। আমি ত বরাবরই জানি, তোমার মত ছেলে আর হয় না।" সস্নেহ দৃষ্টিতে অতীশের সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে অমিয় মজুমদার বললেন, "কী করছ এখন? বিলেত-টিলেত যাবে ত?"

"না, বিলেতে যাওয়া এখন হবে না। আমি চাকরি পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।"

"ভাল, খুব ভাল। জএন করছ কবে?"

"আরো হপ্তা তিনেক দেরি হবে।"

"বেশ—বেশ!" অমিয় মজুমদার প্রসন্ন মনে বললেন, "রেবার বিয়েটাও দেখে যেতে পারবে।"

"ঠিক হয়ে গেছে নাকি?" হঠাৎ কোথায় একটা আঘাত লাগল অতীশের। "কোথায় ঠিক করলেন?"

"জামশেদপুরে। টাটায় চাকরি করে ছেলেটি, ইঞ্জিনীয়ার।" তৃপ্তভাবে অমিয় মজুমদার বললেন, "দেখতে শুনতেও মোটা-মুটি ভালই। তা ছাড়া বাড়িতে গানবাজনার চর্চাও আছে। ছেলের বাবা খুব ভাল পাখোয়াজ বাজান, অনেক বড় বড় ওস্তাদের সংগে সংগত করেছেন।" অমিয়বাবুর চোখে খানিকটা আবিষ্ট সুখস্মৃতি ফুটে উঠল, "আমি গেলাম কথাবার্তা পাকা করতে। তা কথাবার্তা কী আর হবে, সারা সন্ধ্যে আমায় পাখোয়াজ বাজিয়েই শোনালেন। হাত আছে বটে। যেন পাখোয়াজেই সাতটা সুর তুলে দিলেন ভদ্রলোক।"

অতীশ চুপ করে রইল। কেউ অপেক্ষা করবে না, কেউ না। সে জানত, তার উপরেও অমিয়বাবুর লোভ আছে, শুধু সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। শুধু তার দিক থেকে একটুখানি ইংগিতের অপেক্ষা ছিল মাত্র। আর মস্ত বড় একটা হৃদয় ছিল রেবার। সেই হৃদয় তাকে পাখির নীড়ের মত আশ্রয় দিতে পারত।

রেবা ত জানে, সুপ্রিয়া তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। যদি কোনোদিন ফিরেও আসে, তা হলেই বা কী আসে যায়? মহাভারতের সংগীত-তীর্থে-তীর্থে যে পূর্ণ-কুম্ভ সে ভরতে চলেছে, তা দিয়ে সে যে-বিগ্রহের অভিষেক করবে, সে আর যে-ই হক, অতীশ নয়। রেবা ত জানত, একমাত্র তার কাছেই অতীশ নিজেকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরতে পারে, সান্ত্বনা চাইতে পারে, আশ্বাস পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত রেবা ত তাকে বলতে পারত, "আমি ত রইলামই। সুপ্রিয়ার প্রয়োজন হয়ত আমাকে দিয়ে মিটবে না, তবু যেটুকু দিতে পারব, তার দামও কম নয়।"

কিন্তু রেবা অপেক্ষা করল না। কেউ অপেক্ষা করে না কারো জন্যে। শুধু একা অতীশই কি সুপ্রিয়ার পথ চেয়ে বসে থাকবে?

অমিয়বাবু বললেন, "বোসো, রেবাকে ডাকি। চা খাও।"

অন্য সময় হলে অতীশ বলত, "আজ থাক, আমি যাই।" কিন্তু এই মুহূর্তে ওই বিনয়টুকুও সে করতে পারল না। সত্যিই এখন তার এক পেয়ালা চা দরকার, কোথাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকা দরকার। রেবা আসে ত আসুক, না এলেও ক্ষতি নেই।

কারো সময় নেই। চোখের সামনে দিয়ে রূপকথার গল্পের সেই মায়া-হরিণের দল ছুটে চলেছে। সময়মত ধরতে পারলে পেলে, নইলে হারালে চিরদিনের মত। আধবোজা দৃষ্টিতে অতীশ দেখতে লাগল ছেলেবেলার একটা দিনকে। পাহাড় ধ্বসিয়ে, অরণ্যকে উপড়ে ফেলে তিস্তার বন্যা নেমেছে; গ্লেশিয়ারের বাঁধ ভেঙে ছুটেছে উথাল-পাথাল গেরুয়া রঙের জল, দু মাইল দূরে পর্যন্ত তার হাহাকার শোনা যাচ্ছে। আর সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে ঘূরপাক খেতে খেতে চলেছে উৎপাটিত শাল-শিমুল-গামার গাছের দল। সেই ভয়ংকর স্রোতের পাশে ডাঙার উপর দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুঃসাহসী মানুষেরা। সামনে দিয়ে কাঠ ছুটে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীতে, দড়ি বেঁধে কাঠকে টেনে আনবে ডাঙায়। কেউ পারবে, কেউ পারবে না। কখনো কখনো এক আধজনের সর্বাংগ সেই হিমশীতল জলে কালিয়ে যাবে, কাঠের সংগে সংগে তিস্তার স্রোত চিরদিনের মত ভাসিয়ে নেবে তাদেরও।

অতীশেরও কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজন ছিল। হয় পেত, নইলে তলিয়ে যেত। কিন্তু এ কোথায় ডাঙার উপরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল সুপ্রিয়া? নিজে এল না, কাউকে আসতে দিল না। রেবা চলে গেল, মন্দিরাও হয়ত চলে যাচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত—

অমিয়বাবু উঠে গিয়েছিলেন। রেবা এসে দাঁড়াল।

"নমস্কার। কেমন আছেন?"

"ভাল। নমস্কার।"

অতীশ তাকিয়ে দেখল। মাস দুই সে আসেনি, কিন্তু এর মধ্যেই কেমন বদলে গেছে রেবা। সামান্য একটু মোটা হয়ে গেছে যেন, গাল দুটো ভরে উঠেছে, চোখে খুশির আভাস চিকচিক করছে। রেবার কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনে সংগী নির্বাচনের দায় সে নেয়নি, কাজেই যে আসছে তার জন্যে তৃপ্ত মনে সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

রেবা বসল। "চা করতে বলেছি, এখুনি আসবে। আপনার ডক্টরেটের জন্যে অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ।"

"বাবার মুখে শুনলাম, এলাহাবাদে যাচ্ছেন।"

"কী আর করা। একটা চাকরি-বাকরি ত করতেই হবে।"

রেবা অতীশের মুখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেট্‌ল্‌ করতে যাচ্ছি, শুনেছেন বোধ হয়।"

"শুনেছি।" অতীশ হাসল, "উইশ ইউ এ হ্যাপি ম্যারেড লাইফ।"

"এবার ধন্যবাদের পালা আমার।" রেবা আবার একটু থামল, "কিন্তু আপনি?"

"আমার কথা কী বলছেন?"

রেবা খুব সহজেই আবরণটা ভেঙে দিলে। হয়ত ওরও মনের ভিতরে তীব্র জ্বালা ছিল একটা, হয়তো অতীশের যন্ত্রণা ওকে স্পর্শ করেছিল এসে।

"সুপ্রিয়ার জন্যে কেন মিথ্যে বসে থাকবেন আর? কোনোদিন যে আপনার দাম দেবে না, কেন নিজেকে নষ্ট করবেন তার জন্যে?"

অতীশ বললে, "ঠিক জানি না।"

"ক্ষতি যা সে ত আপনারই একার।"

"তাই নিয়ম। ক্ষতি চিরকাল ত একজনেরই হয়। নদীর দুটো কূল কখনো এক সংগে ভাঙে না।" অতীশ হাসতে চেষ্টা করল।

রেবার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, "তার মানে ওকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনোদিন?"

"এতবড় কথা কেমন করে বলি?" অতীশ

হাসিটাকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ঠোঁটের কোনায়, "কোনোদিন কাউকে ভুলতে পারব না, এতখানি মনের জোর আমার নেই। তবে কিছুদিন হয়ত সময় নেবে। তা ছাড়া জীবনে অনেক কাজ। এলাহাবাদে গিয়ে কিছুদিন কাজ করলে একটা বাইরের স্কলারশিপ পেয়ে যেতে পারি। নইলে নিজেই যাব। বিলেতের একটা ডিগ্রি আমার চাই। আর এত সব কাজের মধ্যে সুপ্রিয়া নিশ্চয় মুছে যাবে মন থেকে। তখন এসে দাঁড়াব আপনাদের কাছেই। বলব, আমি তৈরি হয়ে আছি, এবারে একটি ভাল পাত্রী খুঁজে দিন।"

চা এল।

রেবা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে টি-পটে চামচে নাড়ল, তারপর চা ঢেলে পেয়ালা এগিয়ে দিলে অতীশের দিকে।

"সে আশা আমরাও করি। তবে অত দেরি না হলেই আরো বেশী খুশী হব।"

অতীশ জবাব দিলে না। তুলে নিলে চায়ের কাপ। চা-টা অতিরিক্ত গরম, ঠোঁট দুটো জ্বলে উঠল।

পথে বেরিয়ে অতীশ ভাবল, সত্যিই সে কেন দেরি করবে? কার জন্যে দেরি করবে?

সুপ্রিয়ার প্রয়োজনে? যদি কখনো সুপ্রিয়া এসে তার কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পেতে দাঁড়ায়, তা হলে সেই শুভলগ্নটিতে চরিতার্থ হওয়ার আশায়?

বিয়ের মরসুম পড়েছে কলকাতায়। বসন্তের ফুল ধরেছে গাছে গাছে। হাওয়াটা নেশা-জড়ান। অতীশ তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওপারে একটা তেতলা বাড়ির ছাতের ওপর ত্রিপলের বিশাল আচ্ছাদন পড়েছে। সামনে একটা 'দশকর্ম ভাণ্ডার'। অত্যন্ত স্থূল একটা সাইনবোর্ড, তাতে আরো স্থূল চিত্রকলায় বরবধূ, মিলিত করপুটে ফুলের মালা দিয়ে জড়ান।

তিন মাসের মধ্যে আর চিঠি দেয়নি সুপ্রিয়া।

তার গান, তার ভারতবর্ষ। ত্র্যম্বক মহাকালের বন্দনা উঠছে সপ্ত সুরে; জালি-কাটা শ্বেত পাথরের বিরাট জলসাঘরের দেওয়ালে যেখানে সারি সারি মোগল আর রাজপুত শিল্পকলা, সেখানে এক ঝাঁক রঙিন পাখির মত উড়ছে ঠুংরির ঝঙ্কার; দক্ষিণী মন্দিরে যেখানে অগ্নিবলয়িত নটরাজের অষ্টধাতুমূর্তি নৃত্যোদ্যত পদ-ক্ষেপে স্তব্ধ, সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু মৃদঙ্গের সুর।

আর এই কলকাতা। সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরি। অতীশ।

বকুল গাছের তলায় রাত্রির একটুখানি নীল-কাজল ছায়া। কিন্তু সে-ছায়াটুকু একান্তভাবেই অতীশের, সুপ্রিয়ার নয়। দক্ষিণী নটরাজের তৃতীয় নেত্রে একটা জ্বলন্ত হীরা, সেই হীরার আলোয় এই ছায়াটুকু কবে মিলিয়ে গেছে সুপ্রিয়ার।

অতীশ দাঁতে দাঁত চাপল। কেন সে দেরি করবে?

এলাহাবাদ যাওয়ার আগে একবার বহরমপুরে যেতে হবে। দেখা করতে হবে মা-বাবার সঙ্গে। ভেবেছিল, দিন কয়েক পরেই যাবে বহরমপুরে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন অসহ্য লাগল কলকাতাকে। আজকেই বা চলে গেলে ক্ষতি কী? এক্ষুনি? কিসের বাধা তার?

অতীশ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। ঘণ্টাখানেক পরেই একটা ট্রেন আছে।

মেসের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরা বেরিয়ে আসছে।

অতীশ দ্রুতপায়ে ফুটপাথ পার হল। ডাকল, "মন্দিরা!"

মন্দিরা চমকে উঠল। একবারের জন্যে কালো হয়ে গেল মুখ।

"এই যে অতীশদা!" শুকনো গলায় মন্দিরা বললে, "আপনার কাছে গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি নেই।"

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে অতীশ মন্দিরার দিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোনো ভুল নেই। একটু আগেই কাঁদছিল মন্দিরা। এখনো জ্বলছে আভা তার চোখে, এখনো বাঁ দিকের ভিজে গালটা চকচক করছে।

তীব্র, তীক্ষ্ণ ঈর্ষায় অতীশ জ্বলে গেল। শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল! সেই স্থূল গ্রন্থকীট, প্রায়-নির্বোধ শ্যামলাল! সে-ও ছাড়িয়ে গেছে অতীশকে! আজ একটু আগেই রেবার বিয়ের কথা শুনে মনের মধ্যে যে ঘা লেগেছিল, সেটা আবার রক্তাক্ত হয়ে দগদগ করতে লাগল।

স্রোতে ভেসে চলেছে সব। অতীশ যাকে মনে করেছিল হাতের মুঠোয়, ভেবেছিল চাইবামাত্র যা অঘোর মত লুটিয়ে পড়বে তার পায়ের কাছে, তারা সবাই ছাড়িয়ে চলেছে তাকে। সে কাউকে পাবে না, রূপ-কথার একটা মায়া-হরিণকেও ধরতে পারবে না! সে যখন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে, তখন যে যা পারে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তার জন্যে! কিন্তু শ্যামলাল শেষ পর্যন্ত? মন্দিরার কী রুচি।

মাথার মধ্যে এক ঝলক উচ্ছ্বলিত রক্তের আঘাতে বুদ্বুদের মত ফেটে গেল বহরমপুর।

"মন্দিরা!"

অপরাধীর মত মন্দিরা দাঁড়িয়েছিল, এক দৃষ্টিতে দেখছিল দূরের বস্তির কলের সামনে কতগুলো ছোট ছোট ছেলেকে। বোধ হয় অতীশের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না।

"কী বলছিলেন?"

"তোমার সময় আছে?"

"কেন?" মন্দিরা বিব্রতভাবে হাতের ছোট ঘড়িটার উপরে চোখ বোলাল, "একটু কাজ ছিল।"

"কাজ পরে হবে। চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"যেখানে হক। যে-কোনো একটা চায়ের দোকানে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

অতীশের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল মন্দিরা। ঠোঁটটা নড়ে উঠল বার দুই।

"আজকে না হলে হয় না?"

"না।" শক্ত গলায় অতীশ বললে, "কথাটা জরুরী।"

প্রতিবাদ করতে আর সাহস পেল না মন্দিরা। একবার মুখের ঘামটা মুছে ফেলল হাতের ছোট রুমালটায়। তারপর যেমন করে মানুষে নিজেকে তুলে দেয় ভাগ্যের হাতে, তেমনিভাবেই অতীশকে অনুসরণ করলে।

চায়ের একটা মনোমত দোকান পাওয়া গেল বড় রাস্তা পেরিয়ে।

সময়টা অসময়। দোকানে লোক ছিল না। তবু পুরনো জীর্ণ নীল পর্দা সরিয়ে দুজনে একটা কেবিনে ঢুকল। মাথার উপর পাখাটা খুলে দিয়ে বয় বললে, "কী চাই?"

"কিছু খাবে মন্দিরা?"

ভয়-ধরা ফিস্ফিসে গলায় মন্দিরা বললে, "কিছু না।"

"শুধু চা?"

"শুধু চা।"

বয় চলে গেল। মন্দিরা আঁচড় কাটতে লাগল চায়ের দাগধরা ময়লা টেবিল-ক্লথটার উপর। অতীশ মন্দিরার মাথার পাশ দিয়ে পিছনের কাঠের দেওয়ালটাকে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ। তারপর, "তুমি কি আজ আমার খোঁজেই গিয়েছিলে মন্দিরা?"

তীক্ষ্ণ জড়তাহীন প্রশ্ন। মন্দিরা ত্রস্ত চোখ তুলল।

"এ-কথা কেন অতীশদা?"

"দরকার আছে বলেই বলছি। সত্যিই কি আমার খোঁজেই তুমি গিয়েছিলে?"

মন্দিরা পাংশু মুখে আর্ত গলায় বললে, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক—"

"বুঝতে পারছ না?" অতীশ একটা হিংস্র হাসি হাসল, "কার জন্যে গিয়েছিলে তুমিই জান। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমি না থাকাতেও তোমার কোনো অসুবিধে হয়নি। শ্যামলাল ছিল, কী বল?"

ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মন্দিরা হঠাৎ যেন রুখে দাঁড়াল।

"তাতে কী অন্যায় হয়েছে? তিনি আমার মাস্টারমশাই।"

বয় চা এনে দিয়ে গেল। তার চলে যাওয়া পর্যন্ত নিজের ভিতরে বন্য ক্রোধটাকে কোনোমতে সংযত করে রাখল অতীশ। তারপরে চাপা গলায় যতটা সম্ভব বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

"কিন্তু আমি বলব, শ্যামলালের সঙ্গে মেলামেশায় এখন তোমার সতর্ক হওয়া দরকার।"

মন্দিরার গাল রাঙা হয়ে উঠল, নিশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। চায়ের পেয়ালা তুলেছিল, নামিয়ে রাখল।

"আপনি আমার অভিভাবক?"

"এখনো নই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হতে পারি। বোধ হয় জান, দু বছর ধরে তোমার বাবা আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা ভাবছেন। তিনি আমায় প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। আমি আসছে আটাশ তারিখে চাকরি নিয়ে এলাহাবাদে চলে যাব, তার আগেই বিয়েটা করে নিতে চাই।"

যেটুকু জ্বলে উঠেছিল, তার দ্বিগুণ নিভে গেল মন্দিরা। যেন অতল জলে ডুবে যাচ্ছে, এমনি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অতীশের দিকে। ঠোঁট দুটো আবার থর-থর করে কাঁপল, অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, "কিন্তু—"

"আমিও অপেক্ষা করে আছি। তুমি আভাস দিয়েছিলে, আমাকে তুমি ভালবাস।"

মন্দিরা বসে রইল নিথর হয়ে। অতীশ উগ্র চোখে তাকে দেখতে লাগল। একটা অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে সে, কাউকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার আনন্দ।

মন্দিরা আবার শক্তি ফিরিয়ে আনল প্রাণপণে।

"কিন্তু আপনি ত সুপ্রিয়াকে—"

"ওটা ক্রোড়পত্র। তেমনি তুমিও ভালবেসেছিলে শ্যামলালকে। আমার জীবন থেকে সুপ্রিয়া চলে গেছে, তোমার জীবন থেকেও শ্যামলালকে চলে যেতে হবে।"

"আপনি আশ্চর্য নিষ্ঠুর!" মন্দিরার গাল বেয়ে আবার জল নেমে এল।

অতীশ হাসল, তিক্ত বিষাক্ত হাসি।

"কিন্তু আদর্শ সুপাত্র। আমাকে কন্যাদান করে মল্লিক সাহেব সুখীই হবেন। তুমিও। আজকে যে-কাঁটাটা বুকের মধ্যে বিঁধছে, দু' দিন পরে তার অস্তিত্বও খুঁজে পাবে না কোথাও।"

মন্দিরা আর সহ্য করতে পারল না। ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

"আমি আর চা খাব না। চললাম।"

"যেতে পার। কিন্তু আজই তোমার বাবার সঙ্গে আমি দেখা করব। আশা করি, দশ বার দিনের মধ্যেই তিনি রেডি হতে পারবেন।"

মন্দিরা বেরিয়ে চলে গেল। বোধ হয় চোখের জল মুছতে মুছতেই। চায়ের দোকানের ছোকরাটা একটা কিছু অনুমান করে পর্দা সরিয়ে কৌতূহলী গলা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মত গর্জে উঠল অতীশ।

"কী দেখতে এসেছিস? থিয়েটার?"

সভয়ে পালিয়ে গেল ছেলেটা।

চায়ের পেয়ালা তুলে অতীশ চুমুক দিলে। কটু বিস্বাদ চা। রেবার এগিয়ে দেওয়া চায়ের মতই অসহ্য গরম।

॥ ২ ॥

গীতা এসে বলেছিল, "এটা বাড়াবাড়ি। এত রাতে চাকরগুলোকে জাগিয়ে এভাবে সীন ক্রিয়েট না করলেও চলত।"

সুপ্রিয়া জবাব দেয়নি। খুলে বলেনি কোনো কথা। বললেও কোনো লাভ হবে না। দীপেন সম্পর্কে গীতার একটানা পক্ষপাত।

গীতা ক্রুদ্ধ কটু গলায় আরো বলেছিল, "বাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার মত নার্ভ যার আছে, তার অতটা সেণ্টিমেণ্টাল হওয়ার কোনো মানে হয় না।"

দীপেন বেরিয়ে গিয়েছিল নিঃশব্দে। মাথা নিচু করে। নেশার ঘোরটা তার কেটে এসেছে এতক্ষণে।

সুপ্রিয়া তেমনি বসে ছিল চুপ করে। আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

"ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে দেবতা আছেন বটে, কিন্তু মানুষ এখনো দেবতা হয়ে যায়নি।" রেবার গলা।

না, দেবতা যে হয়নি, সে-কথা সুপ্রিয়াও বিশ্বাস করে। দেবতা হয়ে গেলে কি মানুষকে সহ্য করা যেত? অমন দাবি নেই সুপ্রিয়ারও।

কিন্তু তবু—

খালি ঘৃণা হয় দেহটার জন্যে। সে-দেহ মাটি দিয়েই গড়া। মাটির ফুল, মাটির ফল, মাটির আনন্দ, মাটির ক্লেদ—এরাই তার উপকরণ। তবু সেই মাটির উপরে একটা আকাশ আছে, যেখানে সপ্তর্ষি ঝলমল করে, যেখানে আশ্চর্য রঙ দিয়ে আঁকা হয় মেঘের ছবি, যেখানে ছায়াপথের আকাশ-গঙ্গা ঝরনার মত নেমে আসে মানস-সরোবরে। মাটির ফুলকে ফুটিয়ে তোল সেই আকাশের রাশিবন্ধ তারায় তারায়, মাটির ফলকে সুধা-সুনিবিড় করে দাও স্নিগ্ধ শিশিরবিন্দু দিয়ে, বর্ষার বিষণ্ণ চক্ররেখাকে উজ্জ্বল কর ইন্দ্রধনুর রঙে। মাটিকে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়াই ত আর্টের কাজ। ধুলোর ঘূর্ণিকে নীহারিকায় রূপায়িত করাই ত শিল্প।

আর দেহ? তার কামনা হক প্রেম, তার আশা হক আদর্শ, মাটির দাবি চরিতার্থ হক হেমন্তের হিরণ্যে। তার দেহকে সেই শিল্পীর চোখ দিয়েই দেখুক দীপেন। নারী হক মোনালিসা, বাসনা ব্যাপ্ত হক মুন-লাইট সোনাটায়।

কিন্তু কোথায় সেই চোখ? কার আছে? কোথায় সেই শিল্পীর আঙুল, যা মাটির সেতারে বাজিয়ে তুলবে রাগ জয়-জয়ন্তী?

—অথবা তারই দোষ। হয়ত তার নিজের প্রচ্ছদপটটাই এত বেশী উজ্জ্বল, এত বেশী তার প্রলুব্ধি যে তাকে ছাড়িয়ে ভিতরে কেউ যেতে পারল না। কেউ না। দীপেনও নয়! এ লজ্জা ত তারই!

শব্দ করে দরজা বন্ধ হল একটা। দীপেনের ঘরেই। নিজের উপর অভিমানেই হয়ত শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে সে। আত্মরক্ষা করতে চায়।

অনেকদিন পরে সুপ্রিয়ার একটা প্রশ্ন জাগল নিজের কাছে। সে যদি কালো হত? অসাধারণ কুৎসিত? তা হলেও কি দীপেন এমন করে কাছে টানত তাকে? বলত, "তোমার গলায় আমার না-পাওয়া সুরগুলো ধরা দিয়েছে, তুমি আমার গীতলক্ষ্মী?" বলত, "তোমার বাইরের রূপ আমি দেখিনি, দেখেছি অন্তরের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার, যেখানে তুমি অনন্যা?"

বলতে পারত দীপেন?

প্রচ্ছদপট! হয়ত প্রচ্ছদপটটাই একমাত্র সত্যি! সুপ্রিয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বারান্দায় গানের আওয়াজ। কে যেন গেয়ে চলেছে। গীতাই খুব সম্ভব। কান পাতল সুপ্রিয়া:

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর শির নাবে'।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনকে বেদন বেদন
সুখী জনকে আনন্দ এ—"

ভজন গাইছে গীতা। তার নিজের ভাষায়, বিশেষ ধরনের সুরে। কেমন আশ্চর্য কোমল, কেমন অশ্রুসিক্ত। কোথায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এর। ঠিক এখানে এই গান যেন মানায় না। বহু দিন পার হয়ে, বহু দূর থেকে এর সুরটা ভেসে আসছে যেন।

সুপ্রিয়া জানত না, এ-গান গীতা শেষবার শুনেছিল অমৃতসরের গুরুদ্বারে।

"ক্যায়সে চাঁদিনী রাত প্যারে—"

প্লে-ব্যাক। হিন্দী ছবির গান। খুব সম্ভব উদ্গীর্ণ হবে কোনো নৃত্য-পটীয়সী নায়িকার ওষ্ঠস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে।

পিছনে সারি সারি বাদ্যযন্ত্রের উগ্র ঝংকার। সামনে মাইক্রোফোন। মিউজিক ডিরেক্টরের নির্দেশ: "মনিটার!"

"ক্যায়সে চাঁদিনী রাত—"

সাউন্ড ট্রাকের প্রতিধ্বনি : "ও-কে—ও-কে।"

"টেক।"

গান শেষ হল।

"চমৎকার হয়েছে রেকর্ডিং।" অভিনন্দন জানালেন ডিরেক্টর।

মিউজিক-ডিরেক্টরের মাথা নড়ল সংগে সংগে। দীপেনের পুরনো বন্ধু। তারই অনুরোধে সুযোগ দিয়েছেন সুপ্রিয়াকে।

শুধু হিট্ নয়—সুপার হিট্ হবে এই গান।"

সুপার হিটের অর্থ খুব সহজ। বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে। হাটে-বাজারে। পুজো-পার্বণের অ্যামপ্লিফায়ারে।

সুপ্রিয়া বসে রইল ক্লান্তভাবে। সুপার হিট্! ঠিক এই জন্যেই কি এত দূরে ছুটে আসা? এই জাপানী খেলনার বেসাতি? মন্দিরের বাইরে যেখানে মেলা বসে, সেখানে রঙিন বেলুনের পশরা সাজিয়ে বসা?

দীপেন বলেছে, "কী করা যায় বল। ভাল গান ত তুমি শিখবেই। কিন্তু টাকারও ত দরকার আছে। আরে, অনেক বড় বড় গুণীকেও বাগানবাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসতে হয়। তোমাকে একটা গল্প বলি—"

গল্পটা শুনেছে সুপ্রিয়া। একটা নয়, পর পর অনেকগুলো। বহু দিকপাল ওস্তাদকেই চুটকি গজল আর খেমটা শোনাতে হয়েছে স্বর্ণগর্দভ মাতালের জলসায়। কিছুটা মানিয়ে নিতে হবেই জীবনের সংগে। নইলে দীপেনই কি আসত এত দূরে, সিনেমার বইতে চটুল সুর দেবার জন্যে?

হয়ত তাই। কিন্তু সুপ্রিয়ার মন সাড়া দেয় না। কোথায় কী যেন অশুচি হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের বাইরে বসে রঙিন বেলুনের বেসাতি। দোকানে বসে লাভ-লোকশানের হিসেব করতে করতে সময় ফুরিয়ে যাবে কি না কে জানে! তার পরে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগও হয়ত আর ঘটবে না।

চেক আর ভাউচার নিয়ে এলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। টাকার অংকটা তুচ্ছ করবার মত নয়, একবার ভাল করে সেটা না দেখে থাকতে পারল না সুপ্রিয়া।

আয়ার এল। মিউজিক ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

"মিস্টার আয়ার এবার আমায় যেতে হবে।"

আয়ার বললে, "চলুন, রেডি। আমার গাড়িতেই পৌঁছে দেব আপনাকে।"

স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছুটল তীরবেগে।

আয়ার পাশেই বসে ছিল। একটা সিগারেট রোল করে বললে, "মিস্ মজুমদার!"

"বলুন।"

"এখনি ফিরবেন? তার চাইতে চলুন না আমার ফ্ল্যাটে। কফি খেয়ে আসবেন।"

"আপনার ফ্ল্যাটে!" সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল।

আয়ার হাসল। কালো রঙ, কোঁকড়া চুল, বুদ্ধিতে মুখ উদ্ভাসিত। সিগারেটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললে, "ভাববেন না কিছু। সেখানে আমার মা আছেন। আলাপ করিয়ে দেব তাঁর সংগে।"

"আপনার স্ত্রী?"

উইন্ডস্ক্রীণটা নামিয়ে দিতে দিতে আয়ার আবার হাসল।

"তিনি এখনো এসে জোটেননি। মানে আমিই জোটাতে পারিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নেই।" প্রসন্ন পরিতৃপ্ত গলায় আয়ার বললে, "বাড়িতে আমার মা রয়েছেন। তাঁর হাতের তৈরি কফি বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা বম্বে মার্কেটের কফি খাই না। নিয়ে আসি নিজের দেশ নীলগিরি থেকে।"

চমৎকার সাদা আয়ারের দাঁতগুলো। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবার মত।

"আসবেন আমাদের ওখানে?"

"বেশী দেরি হবে?"

"না—না—পনের মিনিট। জাস্ট।"

ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি বোম্বাইয়ের শহরতলিতে। সামনে একটুখানি লন। কিছু ফুল। গোছানো ছিমছাম। আয়ার গুণী মানুষ, বুঝতে কষ্ট হয় না।

আয়ারের মা এলেন। পঞ্চাশ পেরিয়েছে

তার চাইতে চলুন না আমার ফ্ল্যাটে

বয়েস। মাথার চুলে পাক ধরেছে। গম্ভীর শান্ত চেহারা।

"মা, ইনি আমাদের ছবির নতুন ভোকাল আর্টিস্ট। খুব ভাল গলা, দারুণ প্রমিসিং।"

মা হাসলেন। ঝরঝরে পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা বললেন।

"বেশ বেশ, ভারী খুশী হলাম।"

"কফি খাওয়াও। তোমার হাতের নীলগিরি কফি। সেই জন্যেই ডেকে এনেছি। কিন্তু দেরি করতে পারবে না, ঠিক পনের মিনিটের মধ্যে।"

"দিচ্ছি।" মা ভিতরে চলে গেলেন।

আয়ার বললে, "জানেন, মা আমার ওপর একটু খুশী নন।"

"কেন বলুন ত?"

"আমার বাবা ছিলেন আই-সি-এস। দাদা ফরেন সার্ভিসে। মা চেয়েছিলেন আমিও অমনি একটা কিছু দিকপাল হয়ে পড়ি। কিন্তু এই গানই আমার সর্বনাশ করল। আমাদের পরিবারে যা কখনো হয়নি, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ বি-এ ফেল করলাম দু-দু বার। দাদা ত আমার মুখ দেখাই বন্ধ করলেন। কিন্তু আমি গান ছাড়িনি।" আয়ার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল :

"অবশ্য তার পরিণাম এই ফিলমে। কী বলেন, ভুল করেছি নাকি?"

সুপ্রিয়া মৃদু নিশ্বাস ফেলল, "জানি না।"

এমনি করে গান ত অনেককেই ঘর ছাড়া করেছে। অনেকেই ছুটে এসেছে তীর্থ-দেবতার আহ্বানে। তারপর? কে কতখানি পেয়েছে, কতটাই বা সিদ্ধিলাভ করেছে? ব্যাগের ভিতরে চেকটা যেন খসখসিয়ে সাড়া দিয়ে উঠল, কী একটা বলতে চাইল অবোধ্য ভাষায়।

আয়ারও একটা নিশ্বাস ফেলল, "ঠিক কথা, আমিও জানি না। কিন্তু কেবল ক্ল্যাসিকাল শেখবার আশায় ছুটোছুটি করলে ত পেট চলবে না। রোজগার আপনাকে করতেই হবে।"

দীপেনও এই কথাই বলেছিল। সুপ্রিয়া যেন হঠাৎ অনুভব করল : স্বপ্নের দরজা সব সময়েই খোলা আছে, কিন্তু জীবন অত সহজেই পথ ছেড়ে দেয় না। তার দুর্গাশংকরের কথা মনে পড়তে লাগল। অনেক কষ্টেই তাঁর চলে। অথচ এখনকার বড় বড় মিউজিক ডিরেক্টর যাঁরা তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখতে পারত, তাদের বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালান্স দেখলে—

সুপ্রিয়ার কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। পায়ের তলায় যে সোজা পথটা সে দেখেছিল চলন্ত বস্বে মেলে বসে, সেটা এখনই লুপের মত বাঁক নিচ্ছে। তীর্থেও পারানি চাই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পারানিই কি একান্ত হয়ে ওঠে?

সবচেয়ে বড় কথা, আগে বাঁচা চাই। ক্ষিদেয় গলা চিঁচি করলে যা বেরিয়ে আসে, তা আর যাই হক, তাকে গান বলে না। আয়ারের দোষ নেই, দীপেনেরও না। মিথ্যে কেন খুঁতখুঁত করে সুপ্রিয়া?

আয়ারও চুপ করে কী ভাবছিল। চোখ তুলল।

"জানেন - ত একটা ছবিতে আমি ইনডিপেনডেন্ট চান্স পাচ্ছি এবার।"

"সে ত খুবই ভাল কথা।"

"আপনি আমায় সাহায্য করবেন?"

"আমি? আমি কী করতে পারি?"

"আপনাকে এরা পুরো ইউটিলাইজ করে না। কিন্তু দেখবেন, আমি করব। আমি জানি সোনার খনি আছে আপনার গলায়। এমন গান গাওয়াব আপনাকে দিয়ে যে এখানকার ঝানু প্লে-ব্যাক আর্টিস্টেরাও একেবারে ম্লান হয়ে হয়ে যাবে।"

আয়ারের চোখ দুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নতুন সৃষ্টির আনন্দে? সুপ্রিয়া কেমন সংকুচিত বোধ করল। এমনি করে তার দিকে তাকিয়ে এমনি কথা দীপেনও বলেছিল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দশা হয় পিগম্যালিয়নের?

কিন্তু সত্যিই গান? না এখানেও সেই প্রচ্ছদপট? সুপ্রিয়া ভাবল, একটা কোনো অ্যাকসিডেন্টে তার সমস্ত মুখটাই যদি পুড়ে বীভৎস কালো হয়ে যায়, তা হলেও কি আয়ার এ-কথা তাকে বলবে? দেখতে পাবে তার গলার সোনার খনি?

আয়ারের মা ফিরে এলেন।

কফির পেয়ালা। কিছু বাদাম। ইডিলি।

"আচার দিলে না মা?"

"সে ওরা খেতে পারবে না। ভয়ংকর ঝাল লাগবে।"

"তাও ত বটে।" আয়ার হেসে উঠল, "আচ্ছা, তবে খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে আসি—"

"না—না—দরকার নেই—" সুপ্রিয়া প্রতিবাদ করল। আয়ার কথা শুনল না, উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

বিস্কুট খুঁজতে দু-তিন মিনিট দেরি হল আয়ারের। তার মধ্যেই গল্প জমিয়ে ফেললেন মা।

"বিয়ে করনি, না?"

মাথা নিচু করে সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল।

আই-সি-এসের গিন্নী গম্ভীর হয়ে গেলেন, "কী যে তোমরা হয়েছ আজকালকার ছেলেমেয়ে! আমার ছেলেটাকেও রাজী করাতে পারছি না। অথচ ফিল্মে কাজ করে, ভারী খারাপ লাগে আমার। জায়গাটা ত ভাল নয়! শেষে—"

কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন তিনি।

"তোমাদের আলাপ কতদিন?"

"মাস দেড়েক।"

"ও!" একটু চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, "ছেলে বলছিল, বাঙালী মেয়েদের ওর ভারী পছন্দ। সুবিধেমত মেয়ে পেলে ও বাঙালীই বিয়ে করবে। আমরা অবশ্য একটু কনজারভেটিভ, তা হলেও ছেলে যদি চায়—"

কফিটা আটকে গেল গলায়। সুপ্রিয়া বিষম খেল।

আয়ার ফিরে এল। যেন একটা দুঃসাধ্য কিছু করে ফেলেছে, এমনি মুখের চেহারা।

"উঃ, কোথায় রেখেছিলে বিস্কুটের টিন। প্রায় রিসার্চ করে খুঁজে আনতে হল আমাকে।" এক মুখ হাসি নিয়ে আয়ার সশব্দে টিনটা টেবিলে রাখল, "নিন, আসুন—"

সুপ্রিয়া বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। বললে, "বিস্কুট থাক। পনের মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে আপনার। এবার আপনার কফিটা শেষ করে আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন।"

আয়ার নিভে গেল। ম্লান হয়ে গেল সমস্ত উৎসাহ।

"সরি, কিছু মনে করবেন না।"

॥ ৩ ॥

গান চলছিল গুরুদ্বারে।

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর শির নাবে'—"

মাথা নিচু করে বসে আছে ভক্তের দল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কে বলবে, জীবন আছে, জীবিকা আছে? কে বলবে, অনেক দুঃখ, অনেক গ্লানি, অনেক মিথ্যার মধ্য দিয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়? এই ঘরে, এই বিশাল দরবারে খেলছে সুরের ঢেউ। ভক্তের বুকে দুলছে আনন্দের তরঙ্গ। কোনো বাধা নেই, কোনো শোক নেই, কোনো পরাজয় নেই। জীবন আর জীবিকা বহু দূরের মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন।

আনন্দ—অমৃত।

গুরু সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন সেই অমৃতের সংবাদ। মানুষকে তা দান করতে চেয়েছিলেন-দু-হাতে। কিন্তু অত সহজে দিতে পারেননি। আঘাত এসেছে, দুঃখ এসেছে, রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে বুক থেকে, ঘাতকের কুঠারে ছিন্ন মুণ্ড গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

তবু গুরু শুনিয়েছেন শেষ কথা। আনন্দের বার্তা, অমৃতের মন্ত্র। মলিন মৃত্তিকা তাঁদের রক্তরেখায় কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেছে। ভক্তের কণ্ঠে সুরের ঝংকার বেজে চলেছে :

"বনা-বনামে সাঁবল সাঁবল,
গিরি-গিরিমে' উন্নিত-উন্নিত,
সরিতা-সরিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।"

সবই ত তাঁর। অরণ্যের শ্যামশ্রী, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়া, খরস্রোতা নদীর প্রবাহ, গম্ভীর সাগর, সব বয়ে আসছে একই আনন্দের উৎস থেকে। প্রাণ পাচ্ছে, গতি পাচ্ছে। পল্লবিত, বিকশিত হয়ে উঠছে।

"চন্দ্র সুরয বরে নিরমল দীপা
তেরো জগ-মন্দির উজাড় এ—
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
তেরো চরণপর শির নাবে'—"

গুরু-দরবার হয়ে যায় বিশ্বমন্দির। তার চূড়া ছাড়িয়ে পড়ে নীলকান্ত আকাশে, ত্রিভুবনব্যাপী মহাবিগ্রহের এই মহামন্দিরকে আলো করে জ্বলে অনির্বাণ চন্দ্রসূর্য। "এ হরি সুন্দর—"

ওস্তাদের তানপুরা থামে। সুর থামে না। ভক্তেরা অশ্রু-চোখে বসে থাকে ছবির মত। অনেকক্ষণ।

বাবা এগিয়ে যান, প্রণাম করেন ওস্তাদজীর পায়ে।

"এ দুটি আমার মেয়ে। এটি প্রেম, এ সুরয।"

স্নেহস্নিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ওস্তাদজী। বিশেষ করে তাঁর চোখ আটকে থাকে বড় মেয়েটির উপরে।

"এদের আশীর্বাদ করুন," বাবা বলেন।

"আমি কী আশীর্বাদ করব? গুরুই এদের আশীর্বাদ করবেন। তিনিই ত আমাদের ভরসা।"

"ভারী ভাবনা হয়। সামান্য ব্যবসা আমার। ছেলে নেই—এ দুটি মেয়েকে—"

ওস্তাদজী জবাব দেন, "ভাবনা নেই, কোনো ভাবনা নেই। গুরু আছেন মাথার ওপর। এটি প্রেম? আহা, দেখলে জুড়িয়ে যায় চোখ। আর এর নাম সুরয? বাঃ, ভারী সুলক্ষণা! তুমি কি ভাবতে পার এদের কোনো অকল্যাণ হবে কোনোদিন...?"

বিশ্রী শব্দে করোগেটেড-টিন-বোঝাই একটা লরি চলে গেল সামনে দিয়ে। গীতা চমকে উঠল। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে এই ভাবে? কতক্ষণ ধরে সে গুরু-দরবারের স্বপ্ন দেখছিল?

সামনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কালো ঘোড়া। একটা বিরাট বিশাল উদ্ধত মূর্তি। চন্দ্রসূর্যের নির্মল দীপকে যেন স্পর্ধা করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রাফিকের কর্কশ চিৎকার। সোনার মন্দির এখান থেকে বহু দূরে। ওস্তাদজীর তানপুরা এতদিনে কোথায় ধুলোর মধ্যে মিলিয়ে গেছে। আর তাঁর আশীর্বাদ? এদের কি অকল্যাণ হবে কোনোদিন।

গীতা জেগে উঠল। দুরুদুরু করে দুলে উঠল বুক।

চারটে বাজতে আরো দশ মিনিট। পালাবে? পালিয়ে যাবে সময় থাকতে থাকতে?

"চারটের সময় দেখা কর কালো ঘোড়ার সামনে। ডানদিকের ফুটপাথে। আমি আসব।"

প্রথম চিঠিটা পেয়েই বুকের স্পন্দন যেন থমকে গিয়েছিল গীতার। ভেবেছিল, চরম লজ্জা, চরম পরাজয়ের খবর বয়ে এনেছে এই চিঠি। কিছুতেই সে দেখা করবে না। তার আগে মাটিতে মুখ লুকিয়ে মরে যাবে।

তবু ঠিক তিনটে বাজতে না বাজতেই সে উঠে পড়ল। দু কান ভরে বাজতে লাগল—"চন্দ্রসূর্য নিরমলদীপা।" সেই গান যেন তাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে এল এখানে। নিয়ে এল তার প্রথম-ফোটা দিনগুলির ভিতরে।

মন শেষ চেষ্টা করেছিল। ছুটে যেতে চেয়েছিল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। ভেবেছিল, সামনে যে ট্রেনটা পাবে, তাতেই উঠে পড়বে। যে-কোনো মেল যে-কোনো লোক্যাল।

সোহনলালের চিঠি। এই চিঠির প্রতিটি লাইনে লাইনে বাজছে ঃ "এ হরি সুন্দর!" আর সেই সঙ্গে—

কলেজ সোশ্যাল শেষ হলে এক ফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোহনলাল। ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক সোহনলাল। প্রায় রুদ্ধ গলায় বলেছিলেন, "এই ফুলটা তোমায় দিলাম, প্রেম। আজকে এর চাইতে বড় তোমায় আর কিছু দিতে পারব না।"

একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া।

কিন্তু প্রেম! তার নাম! যে-নাম ছিল জন্ম-জন্মান্তরের ওপারে; যে-নাম শুনে তার মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলেন ওস্তাদজী। আর যে-নামে তাকে জানতেন প্রোফেসার সোহনলাল, যে-নামে তাকে তিনি ভালবেসেছিলেন।

"এ-ফুল শুকিয়ে যাবে, প্রেম। কিন্তু এই ফুলের সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনো দিন শুকোবে না।"

মনে হয় যেন কালকের কথা। এর মধ্যে কিছুই ঘটেনি, কিছুই না। সেই দাঙ্গা, সেই রক্ত। অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের বীভৎসতা দিয়ে ভরা সেই দেড় বছর। তার পরে আর এক পথ, বাঈজীর জীবন। গীতা কাউর। এরা কোথাও নেই, কোথাও ছিল না। শুধু সেই আঠার বছরের প্রেম প্রথম-ফোটা একটি ম্যাগনোলিয়ার মত তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ওস্তাদজীর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে মাথার উপর।

গীতা পালাতে পারেনি। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ এখানে টেনে এনেছে তাকে।

নাচের আসরে তাকে দেখে ঠিকই চিনেছিলেন সোহনলাল। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি।

আসবে না, কিছুতেই আসবে না, ভেবেছিল বার বার। তবুও তাকে আসতে হয়েছে। এত ঝড় বয়ে গেছে, এত মানুষের কলুষিত ছোঁয়া তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, তবু ত মনের ভিতর এমন একটা আসনে বসে ছিলেন সোহনলাল যেখানে এর কিছু গিয়েই পৌঁছতে পারেনি। সেখানে আঠার বছরের ভালবাসা একটা নিভৃত মন্দির গড়ে রেখে দিয়েছে। সে-মন্দির লুকিয়ে ছিল ধুলোকাদা-মাখা আবরণের অন্তরালে। আজ সে-আবরণ সরে গিয়ে আবার সেই মন্দির দেখা দিল, আর দেখা দিল শ্বেত পাথরের বেদীতে সোহনলালের বিগ্রহ-মূর্তি। তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়ে মন বলতে লাগল ঃ "তেরো চরণপর শির নাবে'—"

কালো ঘোড়াকে ঘিরে ঘিরে ট্রাফিকের কর্কশ ছন্দ। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-সাইকেল-পদাতিক। গীতা দাঁড়িয়ে রইল। এখনো তিন মিনিট। এখনো পালিয়ে যাওয়া চলে। ছুটে যাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে—উঠে পড়তে পারে যে-কোনো একটা গাড়িতে। ক্যালকাটা মেল, দিল্লী মেল, মাদ্রাজ মেল—

গীতা পালাতে চাইল, কিন্তু প্রেম তাকে ধরে রাখল কঠিন হাতে। গীতার চাইতে আজ প্রেমের শক্তি অনেক বেশী।

পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একেবারে তার গা ঘেঁষেই। গীতা চমকে সরে গেল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে সোহনলাল বললেন, "এস।"

সময় তখনো ছিল। কিন্তু গীতা কাউরকে প্রেম কাউর কিছুতেই পালাতে দিলে না। "তেরো চরণপর—"

সোহনলাল আবার বললেন, "এস।"
গীতা গাড়ির মধ্যে পা বাড়াল।

জুহুর নারকেল-বীথির মর্মর, অবিশ্রান্ত হাওয়া, সমুদ্রের কলধ্বনি, তরল অন্ধকার। আকাশের তারাগুলোর মুখের উপর মেঘের ঘোমটা থমথম করছে।

কাহিনী শেষ করে গীতা তখনও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সোহনলাল সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে চুরুট ধরালেন একটা।

"দিস্ ইজ লাইফ!" দার্শনিকের মত বললেন সোহনলাল। এর চাইতে ভাল কথা আপাতত কী বলা যায় আর।

নারকেল-পাতার মর্মর আর সমুদ্রের গর্জন চলল আরো কিছুক্ষণ। গীতা মুখ

তুমুল। কে'দে কী লাভ? কী হবে সোহন-লালের সহানুভূতি কুড়িয়ে? ভাঙা কাঁচ তাতে জোড়া লাগবে না। এখন কেবল একবার প্রণাম করেই সে ফিরে যাবে।

গীতা বললে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে?" সোহনলাল কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, "হ্যাঁ, তা আর কী করা যাবে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি মরেই গেছ—তাই শেষ পর্যন্ত—"

ঠিক কথা, সোহনলালের কোনো দোষ নেই। শারীরিক মৃত্যু যদি না-ও হয়ে থাকে, তবু ত সত্যি সত্যিই মরে গেছে প্রেম কাউর। জীবনে আসবার আগেই যে মরে

তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ প্রেম?

গেছে, তার জন্যে বসে বসে কেন কৃচ্ছ্র-সাধন করতে যাবেন সোহনলাল?

"ছেলেপুলে?"

সোহনলাল আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

"হয়েছে, এই জন তিনেক।"

"সবই ছেলে?"

"না—দুই মেয়ে, ছেলে এক।"

কিন্তু এ-সব প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করছে গীতা? জেনে তার কী হবে? এর ভেতরে সে কি নিজের কল্প-কামনা মেটাতে চায়? সোহনলালের কাছে গিয়ে সে কী পেতে পারত, তাই শুনে মনের বুভুক্ষা মেটাতে চায় খানিকটা?

সোহনলালের চুরুটের আগুন কণায় কণায় বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। কড়া তামাকের গন্ধ ঢেউয়ের মত এসে আছড়ে পড়তে লাগল গীতার মুখের উপর।

জিজ্ঞাসা করবে না মনে করেও কিছুতেই লোভ সামলাতে পারল না গীতা।

"ওদের আনেননি এখানে? বম্বেতে?"

"নাঃ।" সোহনলাল বললেন, "আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে, একটা ইন্টারভিউ দিতে। আজকেই ফিরে যেতাম। কিন্তু পরশু সন্ধ্যায় তোমার নাচ দেখবার পরে সব গোলমাল হয়ে গেল। শো শেষ হওয়ার পরে তোমার খোঁজ করলাম, পেলাম না। তখন ঠিকানা নিয়ে তোমায় চিঠি দিলাম।"

"গেলেই তো পারতেন আমার কাছে।"

"ইচ্ছে করেই গেলাম না।" সোহনলাল চুরুটে একটা টান দিলেন, "জানই ত, আমরা প্রোফেসার মানুষ, সব দিক আমাদের একটু সামলে-টামলে চলতে হয়। হয়ত বম্বেতেও আমার ছাত্র আছে এদিকে-ওদিকে। তারা যদি কেউ দেখত যে, আমি বাঈয়ের বাড়িতে যাচ্ছি—"

গীতার হাতে আগুনের মত কী একটা এসে পড়ল। চুরুটের খানিকটা মোটা ছাই। এতক্ষণের অবসন্ন কাতর শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে শক্ত আর সজাগ হয়ে উঠল।

সোহনলাল বললেন, "জান প্রেম, আমি তোমাকে আজও ভালবাসি।"

একটু আগে, মাত্র আর একটু আগেই কথাটা বললে গীতার বুকের ভেতরে সামনের সমুদ্রের মতই ঢেউ উঠত। কিন্তু কানের ভিতরে তখনো কথাটা বাজছে—'বাঈয়ের বাড়ি'! সম্মানের ভয়ে, ছাত্রদের চোখে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় সেখানে যেতে পারেননি সোহনলাল। তাই চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাই তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন কালো ঘোড়ার সামনে। হাতের যেখানে ছাইটা খসে পড়েছিল, সে-জায়গাটা যেন জ্বলে যেতে লাগল গীতার।

সোহনলাল বললেন, "তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ প্রেম?"

গীতার হাহাকার করে উঠতে ইচ্ছে হলঃ তা কি পারি? কোনোদিন ভুলতে পারি? কিন্তু গীতা কিছুই বলল না—বসে রইল দাঁতে দাঁত চেপে। হাতটা জ্বলছে, মাথার ভিতরে জ্বলছে এখন।

সোহনলাল একবার আড়চোখে গীতার দিকে তাকালেন।

"তুমি আসবে আমার সঙ্গে?"

গীতা আর থাকতে পারল না। একটু আগেকার অপমানটা তৎক্ষণাৎ একটা বন্যার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে চাইল।

"কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?"

"আমি যেখানে থাকি। আমার হোটেলে।"

"তারপর?"

তারপর? তারপর কী বলবেন সোহন-লাল? নিজের প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মুহূর্ত গণনা করতে লাগল গীতা। একটিমাত্র কথার উপরেই এখন যেন তার সব কিছু নির্ভর করছে। বন্যার শেষ উচ্ছ্বাসটা আসছে আকাশছোঁয়া একটা ঢেউ তুলে।

সোহনলালও দ্বিধা করলেন একটু। চুরুটের আগুনটা ঘন ঘন দীপ্ত হল বার কয়েক।

"চল আমার হোটেলে।"

হৃৎপিণ্ডে এবার যেন হাতুড়ি পড়তে লাগল।

"সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?"

"কোথায় আর নিয়ে যাব? সে-উপায় ত নেই।" সোহনলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, "তোমাকে একেবারে নিজের ঘরে পাব, এই স্বপ্নই ত আমার ছিল। অন্তত একটা রাতও তুমি থাক আমার কাছে।"

একটা রাত, মাত্র একটা রাত! তবু এই-টুকুই থাক গীতার। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও আবার ফিরে আসুক প্রেম কাউর।

অন্ধকারে আঁকা থাক একটি সোনার রেখা।

"কিন্তু হোটেলে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার?"

সোহনলাল হাসলেন। সামনের বাঁধানো দাঁতের একটা রিং ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বললেন, "না। ও-হোটেলে কোনো ক্ষতি হবে না। 'রাতকে রহনেওয়ালী'র ব্যবস্থা আছে। ওখানে অনেকেই ও-রকম আনে।"

'রাতকে রহনেওয়ালী!' 'অনেকেই ও-রকম আনে!'

কোথা থেকে যেন একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল গীতার কপালে। গুরুদুয়ারের প্রকাণ্ড বাড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে এলিয়ে পড়ল চারদিকে। কী ভেবেছেন তাকে সোহনলাল? তাঁর চোখে আজ তার কী মূল্য?

গীতা দাঁড়িয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ। "মাপ করবেন, এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?"

প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল গীতার। প্রাণপণ চেষ্টায় বললে, "রাতকে রহনেওয়ালী বম্বেতে আপনি অনেক পাবেন। আপনার হোটেলের লোকেই জোগাড় করে দেবে আপনাকে।"

সবিস্ময়ে সোহনলালও উঠে পড়লেন। "কী হল তোমার? আমি যে তোমাকে ভালবাসি। আর তুমিও আমাকে—"

"না।" প্রায় চিৎকার করে উঠল গীতা, "ভালবাসার পালা আমার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন আমাকে রোজগার করে খেতে হয়। আমি যাই—"

"রোজগার!" সোহনলাল শব্দ করে হেসে উঠলেন। "বুঝেছি—বুঝেছি!" তাঁর চুরুট আর চোখ দুটো এক সঙ্গেই ঝকঝক করতে লাগল, "তুমি কি ভাবছ, তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি তার অ্যাডভাণ্টেজ নেব? তুমি ভেব না প্রেম, আমি তোমায় ঠকাব না।" মৃদু হেসে সোহনলাল হাত পুরে দিলেন ট্রাউজারের পকেটে।

কী বার করবেন সোহনলাল? টাকা? এ-অপমানও কি আজ অবশিষ্ট আছে গীতার জন্যে?

"থামুন বলছি!" এমন একটা বিকৃত আর্তনাদ শুনতে পেলেন সোহনলাল যে, ট্রাউজারের পকেটের ভিতর তাঁর হাতটা থমকে গেল।

এই সোহনলালই একদিন তাকে এনে দিয়েছিলেন সেই প্রথম-ফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুলটি। বলেছিলেন, "প্রেম, এই ফুল শুকিয়ে যাবে কাল-পরশুই। কিন্তু এর সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনোদিনই—"

সেই সোহনলালই সেই হাতে আজ টাকা দিতে চাইছেন তাকে। রাতকে রহনেওয়ালীর প্রণামী!

বুকফাটা কান্না হঠাৎ বুকফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল গীতার। আগুন ঠিকরে বেরুল চোখ দিয়ে।

"পারবেন না, অত অল্প টাকা দিয়ে একটা খেলো হোটেলে আমায় নিয়ে যেতে পারবেন না। সারা হিন্দুস্থানের অনেক শেঠ তাদের পাগড়ি খুলে রাখে আমার পায়ের তলায়। আমাকে কেনা একজন প্রোফেসরের কাজ নয়, তার সারা বছরের মাইনের টাকাতেও কুলোবে না।"

বার দুই হাঁ করলেন সোহনলাল, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বোধের মত। তাঁর উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল গীতা কাউর, পিছন থেকে ফিরে ডাকবার সাহস পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি।

শুধু খানিক পরে দার্শনিকের মত স্বগতোক্তি করলেন, "স্ট্রেঞ্জ! উইমেন্ আর স্ট্রেঞ্জ!"

আর ও-দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল গীতা। হাতে যে আগুনের ছোঁয়াচটা লেগে ছিল, এখন তা ছড়িয়ে গেছে সারা গায়ে, লাক্ষার মূর্তির মত পুড়ে ছাই হচ্ছে সর্বাঙ্গ। যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ছুটে চলল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে? এয়ার পোর্টে? অ্যাপোলো বন্দরে?

না-না-না। কোথাও নয়। এ-জ্বালার হাত থেকে কোথাও তার নিস্তার নেই।

তবে একমাত্র জায়গা আছে। রাওয়ের কাছে। গোপনে সব রকম মদের ব্যবস্থা রাখে রাও। কড়া প্রহিবিশনের শহরে তারই মত দু-চারজন বিপন্নের পরিত্রাতা, অগতির গতি, দুর্দিনের বান্ধব।

সে-ই ভুলিয়ে দিতে পারবে এই সন্ধ্যাটাকে। ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই গান:

> "এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
> তেরো চরণপর শির নাবে—"

আর ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই মেয়েটিকে, একদিন যার নাম ছিল 'প্রেম', যার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল।

॥ ৪ ॥

সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল সাদা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, সেই চকচকে কোঁকড়া চুলের রাশ, তেমনি স্মার্ট ভঙ্গি। আয়ার এসে তরতর করে ঘরে ঢুকল।

"আপনার টেলিফোন পেয়ে কালকের রেকর্ডিং ক্যানসেল করতে হল। কী হয়েছে—জ্বর? মুখ টুখও কেমন লাল হয়ে উঠেছে দেখছি!" সুপ্রিয়ার বিনা নিমন্ত্রণে সে সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

"সামান্য। গায়ে আর গলাতেও ব্যথা হয়েছে।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"দরকার হবে না। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা!" বিছানার উপর বসে সুপ্রিয়া জবাব দিলে।

"তাই বলুন। অসুখ বেশী বাড়লে আমাদেরই মুশকিল।" আয়ার বললে, "ভাল হয়ে উঠুন চটপট।"

"চেষ্টা করছি।" বলেই সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল "ও কী! ওগুলো আবার কী রাখলেন টেবিলের ওপর?"

"কিছু না, গোটাকয়েক ফল। আঙুর, বেদানা, আপেল।"

"ছিঃ ছিঃ, কেন আনতে গেলেন এগুলো?"

আয়ার বললে, "আনতে নেই? রোগীর জন্যে রোগীর খাবার নিয়ে এলাম। দোষ আছে তাতে?" দীপ্ত দৃষ্টি সুপ্রিয়ার মুখের উপর ছড়িয়ে দিলে, "খাবেন কিন্তু—ফেলে দেবেন না পচিয়ে।"

"না, তা করব না।" সুপ্রিয়া ক্লান্ত হেসে বললে, "চা খাবেন একটু?"

"নাঃ—থ্যাংকস। চায়ে আমার সুবিধে হয় না।"

"কফি? তাও আছে।"

"খাঁটি নীলগিরির নেই।" আয়ার সকৌতুকে বললে, "বম্বে মার্কেটের কফি আমার ঠিক জমবে না। ও-সব আতিথেয়তার জন্যে ভাববেন না। সেরে উঠে একদিন বাঙালী রান্না খাইয়ে দেবেন—ব্যাস।"

বাঙালী রান্না! কথাটা খচ করে বিঁধল সুপ্রিয়ার কানে। মনে পড়ল আয়ারের মা-র কথা: "আমার ছেলের ভারী শখ বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবে—"

মুহূর্তের জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার মন। সামলে নিয়ে বললে, "আমাদের রান্না খেতে পারবেন? ভাল লাগবে?"

"চমৎকার লাগবে।" আয়ার এবার সশব্দে হেসে উঠল "দরকার হলে গোটা কয়েক লংকা মেখে নেব তার সঙ্গে। ন্যাশনাল মশলা। কেবল মাছটা চলবে না। ওর গন্ধ সইতে পারি না।"

"বেশ, নিরামিষই খাওয়াব।"

"হ্যাঁ—খাওয়াবেন। সেই সঙ্গে বাঙালী পায়েস। আমি একবার খেয়েছিলাম। খুব চমৎকার! কিন্তু খাওয়ার কথা পরে হবে। আগে খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন। আমার সেটা মেটিরিয়েলাইজ করেছে, জানেন ত?"

"তাই নাকি?"

উৎফুল্ল মুখে আয়ার বললে, "ইনডিপেণ্ডেণ্ট চান্স। কসটিউম ছবি, বিস্তর

গান আছে। অন্তত ছ'খানা প্লে-ব্যাক করব আপনাকে দিয়ে। সেনসেশন এনে দেব।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "আচ্ছা, এবার উঠি।"

"এত তাড়া কেন?"

"একবার অর্কেস্ট্রায় যেতে হবে। সেখান থেকে একটা রি-রেকর্ডিংএ। চলি তবে—"

আয়ার দাঁড়িয়ে পড়ল। দোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বললে, "সেরে উঠতে দেরি করবেন না কিন্তু। পারি ত কাল খবর নেব আবার।"

আয়ার চলে গেল। সুন্দর ওর চোখ দুটো। অতীশকে মনে পড়ে।

কিন্তু সবাই অতীশ নয়। আশ্রয় দিতে কেউ চায় না, সবাই আশ্রয় চায় ওর কাছে। তা ছাড়া ঠেকে শিখেছে সুপ্রিয়া। প্রচ্ছদ-পটেই চোখ ভোলে সকলের। মাটিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায় না কেউ, দেখতে জানে না আকাশকে। অত সহজেই আঁকা হয় না মোনালিসার ছবি।

আয়ারকে যাই বলুক, সুপ্রিয়া বুঝতে পারছিল জ্বর বাড়ছে। গায়ে প্রচুর ব্যথা। গলার যন্ত্রণাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে বড় বেশী। দিন কয়েক স্টুডিয়োতে স্টুডিয়োতে বেশী রিহার্সাল দেবার জন্যেই কি না কে জানে। সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দুটো জ্বালা করছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সী-গাল উড়ছে। দূরে একটা প্রকাণ্ড সাদা জাহাজ। জাহাজ দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

সুপ্রিয়া শুয়ে পড়বে ভাবছিল, এমন সময় দীপেন এল। সেদিনের পর থেকে একটু কুণ্ঠিত, একটু এড়িয়েই চলে। ক্ষমা চেয়েছিল পরদিন সকালে। বলেছিল, "নেশা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, ব্যালান্স ছিল না।"

সুপ্রিয়া সহজ করে দিতে চেয়েছিল। "মন খারাপ করবেন না দীপেনদা। আমি জানি, আপনি ইচ্ছে করে ও-ভাবে আমার ঘরে এসে পড়েননি।"

আজ কিন্তু সেই কুণ্ঠার ভাবটা দেখা গেল না। কেমন উত্তেজিত দীপেন, একটু চঞ্চল।

বিনা ভূমিকাতেই বললে, "একটু আগে আয়ার এসেছিল, না?"

"হ্যাঁ, এসেছিলেন," সুপ্রিয়ার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, গলায় কষ্ট হচ্ছিল, শরীরে যেন ছুঁচ বিঁধছিল। তবু বললে, "কয়েকটা ফলও দিয়ে গেলেন।"

"ও।" দীপেনের স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, "তবে ওর সঙ্গে অত মেলামেশা কিন্তু না করাই ভাল সুপ্রিয়া।"

সুপ্রিয়ার শরীরটা আরো জ্বালা করে উঠল: "ও'র অপরাধ?"

"অপরাধ কিছু নেই। তবে ফিল্ম লাইনের লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত।"

মুহূর্তে সব স্বচ্ছ হয়ে গেল সুপ্রিয়ার কাছে। সেই চিরদিনের ইতিহাস। আদিম পুরুষের সেই চিরন্তন ঈর্ষা। তাই দীপেনও নীতিবাক্য শোনাচ্ছে! আর তার উৎস চিরকালের দেহ—রক্তমাংসের উপর সেই পুরনো অধিকারবোধের অন্ধতা! কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাত নেই!

"গানের লাইনের লোককেও সব সময়ে সবাই ভাল বলে না দীপেনদা!" কপালটা ফেটে পড়ছে, গলায় বিশ্রী যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে লোহার বলের মত কী একটা আটকে আছে সেখানে। বিকৃত গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আপনার নিজের সম্বন্ধেই কি আপনি সুনাম দাবি করতে পারেন যথেষ্ট?"

দীপেনের মুখে যেন মস্ত বড় একটা চড় এসে পড়ল। চমকে বললে, "আমি—"

"আপনি ভাল নন, হয়ত আয়ারও নয়। আপনি আমাকে সুরের লক্ষ্মী বলেন, আয়ারও হয়ত পুজোর থালা সাজাচ্ছে আমার জন্যে।" যন্ত্রণা বেড়ে উঠছে, গলার শিরায় আগুন জ্বলছে যেন। মুখ দিয়ে যে কাতরোক্তি বেরুতে চাইছিল, একরাশ তিক্ততায় সেটাকে মুক্তি দিলে সুপ্রিয়া: "কেন এ-সব মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন আমাকে নিয়ে?"

দীপেন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জ্বরের তীব্রতা একটা অস্বাভাবিক বাঁক নিলে। যেন প্রলাপের ঘোরে কথাটা মনে এল সুপ্রিয়ার।

"আমাকে বিয়ে করবেন দীপেনদা?"

কানের কাছে যেন বোমা ফাটল দীপেনের।

"কী বলছেন? করবেন বিয়ে?" সুপ্রিয়ার গলা কাঁপতে লাগল।

একটা ভূমিকম্পের নাড়া খেয়ে দীপেন বললে, "বিয়ে!"

"তা ছাড়া উপায় কী। আপনারা সবাই ত একই জিনিস চান। চান অধিকার করতে। তা হলে আর অন্যকে আসতে দিচ্ছেন কেন? কেন সুযোগ দিচ্ছেন আয়ারদের?" সুপ্রিয়া বললে, "এখনো হিন্দু ম্যারেজ য়্যাক্ট হয়নি। পাশ হলে আর সময় পাবেন না।"

"তুমি ঠাট্টা করছ না ত?" দীপেনের গলা শীর্ণ হয়ে গেল।

"ঠাট্টা আমি করিনি। বলুন, রাজী আছেন আমাকে বিয়ে করতে?"

দীপেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। কিন্তু সুপ্রিয়া নিজে আর সহ্য করতে পারছে না, যন্ত্রণায় তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে। গলার শিরাটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

দীপেন ঝিড় ঝিড় করে বললে, "এ-সৌভাগ্য আমি আশা করতে পারিনি।"

"সৌভাগ্য আপনার নয়, আমার। এত বড় গুণীর স্ত্রী হব আমি। তাঁর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার সব কিছু আমিই পাব সকলের আগে।" বিকৃত মুখে সুপ্রিয়া বললে, "রাজী আছেন দীপেনদা?"

"তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম—" দীপেন রুদ্ধশ্বাসে বললে, "সেদিন থেকেই আমি তৈরী হয়ে আছি।"

"তা হলে সামনের সপ্তাহে?"

"সামনের সপ্তাহে!"

"ভয় পাচ্ছেন?"

"না, ভয় পাইনি।" দীপেন বিপন্ন হাসি হাসল। "বলছিলাম—মানে—এত তাড়াতাড়ি?"

"আমি ভেবে দেখলাম দীপেনদা," যন্ত্রণায় প্রলাপের মত সুপ্রিয়া বলে চলল, "আমার আর একা থাকা উচিত নয়। আমি তাতে করে আরো অনেকের দুঃখের বোঝাই বাড়াব। তার চাইতে জীবনের কোথাও নিজেকে বেঁধে ফেলাই আমার ভাল। সেই জায়গাটি আপনার কাছেই পেয়েছি। আপনি গানের রাজা। নিজের যা আছে সে ত দেবেনই। যা নেই, তাও আমাকে এনে দেবেন। তাই আপনার ঘাটেই আমি নোঙর ফেলব। আর আয়ারের মত কাউকে ভয়ও করতে হবে না আপনাকে।"

"বেশ আমি তৈরী।" দীপেন জোর করে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় সংশয় কাটল না।

"কেবল সর্ত আছে একটা।"

"বল।"

"বৌদিকে আপনার ত্যাগ করতে হবে। গীতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। ওই যে মারাঠী মেয়েটি মাঝে মাঝে আসে, যার নাম অনসূয়া, তাকে মোটরে করে রাতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসাও চলবে না আর।"—জ্বরের ঘোরে একটানা বলতে লাগল সুপ্রিয়া, "এক সময় ভাবতাম, আমার অনেক বড় প্রেম আছে, যেখানে অনেকের জায়গা দিতে পারি। আজ দেখছি ত হয় না। এক-একজন এত বড় হয়ে আসে যে, সবটুকু জায়গাতেও তার কুলোয় না আমি সইতে পারব না, কাউকে সইতে পারব না, একজনকে ছাড়া। আমি আপনারই হতে চাই সম্পূর্ণ করে

আপনিও আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাইতে পারবেন না।"

"সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে বকে চলল, "না, আমি—কাউকেই আমি সইব না। আপনি বৌদিকে ত্যাগ করুন, গীতাকে ছেড়ে দিন। দু চোখে অমন করে খিদে নিয়ে কিছুতেই আপনি চাইতে পারবেন না অনসূয়ার দিকে। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে নিয়ে ভাগাভাগি কিছুতেই সহ্য করব না। যে আমার, সে সম্পূর্ণ করেই আমার। রাজী আছেন দীপেনদা?"

"সুপ্রিয়া—শোন—"

"শোনবার কিছু নেই। স্পষ্ট জবাব দিন। বৌদিকে আপনি ত্যাগ করতে পারবেন? গীতাকে? বলুন!"

দীপেনের শরীর শিরশির করে উঠল। একবারের জন্যে মনে পড়ল স্ত্রী সুধার দুটো কালো কালো বিশ্বাসভরা চোখ। মনে পড়ে গেল সুধার গায়ের সেই শান্ত শ্যামশ্রী, তার চলার সেই বিশেষ ভঙ্গিটি। দীপেন যখন তাকে ভালবেসে বিয়ে করে, তখন নাম দিয়েছিল, "পূরিয়া ধানশ্রী"। আর গীতা? কত দুর্দিনের সঙ্গী, কত একান্ত কান্নার আশ্রয়। তারপর অনসূয়া—

"পারবেন না?"

"পারব।" দীপেন জবাব দিল। কাপুরুষ মনের একটা রেশ কেঁপে গেল গলায়।

"গীতা?"

"তাকেও ছেড়ে দেব।"

"আর অনসূয়া?"

"সে-ও আর কোনোদিন এখানে আসবে না।"

"তা হলে কথা দিচ্ছেন?" সুপ্রিয়ার চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, "কথা দিচ্ছেন আপনি? আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে আপনি মনের ভাগ দিতে পারবেন না?"

"কথা দিচ্ছি।"

"তবে কাল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করুন। আমি এক সপ্তাহও দেরি করতে পারব না। আমার বড্ড তাড়া!"

কিন্তু এতক্ষণে কেমন যেন খট্‌কা লাগল দীপেনের। না, সবটাই স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত লাল সুপ্রিয়ার মুখের চেহারা—গলার একটা শিরা কেমন ফুলে উঠেছে। সুপ্রিয়ার চোখ দুটো একটা উদগ্র আলোয় দপ দপ করছে।

মুহূর্তের কুণ্ঠার পর দীপেন সুপ্রিয়ার কপালে হাত ছোঁয়াল। অনেকখানি গরম, অল্প একটুখানি জ্বর এ নয়!

সুপ্রিয়া ততক্ষণে হাতটা চেপে ধরেছে দীপেনের।

"কথা দিয়েছেন?"

আগুনতপ্ত হাতটা সভয়ে ছাড়িয়ে নিলে দীপেন। বললে, "বলছি ত। তুমি যদি চাও, তা হলে কালই বিয়ে হবে। এখন দাঁড়াও, একটা কাজ সেরেই আসছি।"

দীপেন উঠে পড়ল। চলে এল পাশের ঘরে। ফোন করল ডাক্তারকে।

ততক্ষণে জ্বরের ঘোরে আর অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে সুপ্রিয়া। বলছে, "সইব না, আর কাউকেই আমি সইব না—! অতীশ, তোমাকেও না।"

দীপেন বাধ্য হয়ে মাথায় একটা আইস-ব্যাগ ধরল।

ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। সুপ্রিয়াকে পরীক্ষা করেই গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

বললেন, "এঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এক্ষুনি। আর এক মিনিটও দেরি করা চলবে না।"

গীতা কেবল কিছু টের পেল না। কাল অনেক রাতে মাতাল অবস্থায় তাকে থানা থেকে উদ্ধার করেছে দীপেন, এখনো সে তার বিছানা ছাড়েনি।

॥ ৫ ॥

"চল্ মুসাফির, চল্ মুসাফির, চল্ মুসাফির চল্—"

কাঠগড়ার রেলিং বাজিয়ে গান গেয়ে উঠল কান্তি।

সমস্ত আদালত চমকে উঠল। একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাওয়ালা।
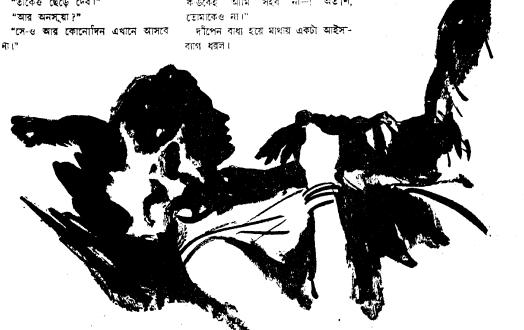
সুপ্রিয়া ততক্ষণে হাতটা চেপে ধরেছে দীপেনের

কান্তি হেসে বললে, "ও, গানে অসুবিধে হচ্ছে বুঝি? তা হলে তবলাই বাজিয়ে শোনাই—" কাঠের উপর দ্রুত তালে তার হাত চলতে লাগল।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে একবার ভিজে-ভিজে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল মুনিয়া বাঈ। করুণার রেখা ফুটে উঠল কপালে।

সরকারী উকিল বললেন, "এ শেঠজীর টাকা আর বোতাম নিয়েছিল? আর আংটি?"

মুনিয়া বাঈ একটা ঢোক গিলল।

"না, তা ঠিক নয়।"

উকিল আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "এ চুরি করেনি?"

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে মুনিয়া বাঈ বললে, "না।"

কান্তির তবলা বাজান থেমে গেল। চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

উকিল বললেন, "চুরি করেনি? তবে কী হয়েছিল?"

মুনিয়া বাঈ আর একবার সিক্ত চোখে তাকাল কান্তির দিকে। গড়গড় করে বলে গেল তারপর:

"শেঠ তো ঘুমিয়ে পড়লেন। আমারও জবর নেশা ধরেছিল। বুঝলাম, আর বেশীক্ষণ হোঁস থাকবে না। তখন আমি বললাম, 'বাবুজী, দিনকাল ভাল নয়। আপনি সাচ্চা আদমি, শেঠের আংটি—বোতাম—ব্যাগগুলো একটু দেখবেন। কাল সকালে দিবেন শেঠজীকে। এ-সব কাজ আমাদের এখানে হামেশাই হয়।' বাবুজী মালুম হচ্ছে তা-ই করেছিলেন। লেকিন বুড়া ওস্তাদ সে-কথা জানত না। সে বাবুজীকে চোট্টা বলে পাকড়াও করে—"

কিন্তু মুনিয়া বাঈ আর বলতে পারল না। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কান্তি।

"না—না—না—"

পাহারাওয়ালা ধমকে উঠল, "চুপ!"

কিন্তু কান্তি চুপ করল না। তেমনি চিৎকার করে বলে গেল "আমি ওগুলো চুরি করে পালিয়ে যেতেই চাইছিলাম। এমন সময় সারেঙ্গিওয়ালা এসে ধরল আমাকে। পালাতে চাইলাম, পারলাম না।" কান্তি উৎসাহিতভাবে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "তখন এই দু হাতে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেললাম!"

মুনিয়া বাঈ পাংশু হয়ে গেল। রেলিং চেপে ধরল শক্ত করে।

উকিল একবার তাকালেন তার দিকে।

"আচ্ছা বাঈ, আপনি যেতে পারেন। আর দরকার নেই।"

কান্তির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল মুনিয়া বাঈ।

আদালতের নিঃশ্বাস পড়ছিল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল জজের গলার স্বরে।

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আপনি এমন জঘন্য অপরাধ করলেন কান্তিবাবু!"

কান্তি প্রচণ্ড শব্দে অট্টহাসি করে উঠল। আঁতকে সরে দাঁড়াল পাহারাওয়ালাটা।

"ভদ্রলোকের ছেলে! কে ভদ্রলোকের ছেলে? আমার বাপও খুন করেছিল, খুনীর রক্ত আমার শরীরে। এমন কাজ আমি করব না ত কে করবে!"

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভরে গেল আদালত। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। কান্তির মা। তারাকুমার তর্করত্নের একমাত্র মেয়ে।

জুরীরা উঠে গেলেন। বেশী সময় লাগল না তাঁদের। আসামীর স্বীকারোক্তিতে এতটুকুও কুয়াশা নেই কোথাও।

"গিল্‌টি।"

আরো আধ ঘণ্টা মাত্র সময় নিলেন জজ।

সংক্ষিপ্ত রায়। শাস্তি একটু কম করেই দিয়েছেন। কারণ, আসামী যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়, তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

"দশ বছর।"

"দশ বছর!" কান্তি অট্টহাসি হেসে বললে, "আমার ফাঁসি হল না? ভারী আশ্চর্য ত!" এই বলে সে কাঠগড়ার রেলিঙের উপর অত্যন্ত কঠিন একটা তাল বাজাতে লাগল। পাহারাওয়ালাকে বললে, "দেখছ হাত? এমনি তৈরি হয়নি দাদা, অনেক মেহনত করতে হয়েছে এর জন্যে।"

রায়টা শুনতে পেলেন না কান্তির মা। তিনি তখন হাসপাতালে। তখনো তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছিলেন, মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে।

॥ ৬ ॥

আজকে অনেকক্ষণ ধরেই ট্রাম-স্টপের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল। উপায় নেই, কারণ ইদানীং সে মল্লিক সাহেবের বাড়িতে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যেদিন থেকেই শুনেছে অতীশের সঙ্গে মন্দিরার বিয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে, আর পড়তে বসে যেদিন জল-ভরা চোখ তুলে মন্দিরা বলেছে 'এমনি করেই কি সবকিছু ফুরিয়ে যাবে আমাদের—' সেদিন থেকেই শ্যামলাল আর বালীগঞ্জ প্লেসের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না।

আগে রবিবারে প্রায়ই মেসে থাকত না অতীশ। আর সেই ফাঁকে দুপুরবেলার দিকে মন্দিরা আসা-যাওয়া করত। কিন্তু কী যে হয়েছে আজকাল। অতীশ তার বিছানার উপর প্রায় সব সময়ই লম্বা হয়ে পড়ে থাকে সিগারেট টেনে যায় একটার পর একটা। অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে শ্যামলাল বজ্রদৃষ্টি ফেলে তার দিকে। অতীশ ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং:

"আমাদের বিয়েতে কিন্তু আপনাকে বরযাত্রী যেতেই হবে শ্যামবাবু।"

কাটাঘায়ের উপরে নুনের প্রলেপ পড়ে যেন। না-শোনবার প্রাণপণ চেষ্টায় যেন যোগাভ্যাস করতে থাকে শ্যামলাল।

"ও শ্যামবাবু, শুনছেন? আরে, ও-মশাই শ্যামবাবু!"

যোগাভ্যাসে আর কুলিয়ে ওঠে না এরপর। ক্ষিপ্ত চোখ তুলে শ্যামলাল বলে, "কী, কী বলছেন? দেখছেন না পড়ছি? কেন বিরক্ত করছেন এ সময়ে?"

"আরে পড়া ত মশাই আছেই আপনার বার মাস। একটু গল্প করুন না।"

আমার সময় নেই।" শ্যামলাল কান্না চাপতে চেষ্টা করে।

"সময় কি আর কারো থাকে মশাই, ওটা তৈরি করে নিতে হয়। শুনুন না, যা জিজ্ঞেস করছিলাম। আমাদের বিয়েতে আমি মন্দিরাকে খুব একটা ভাল জিনিস প্রেজেণ্ট করতে চাই। কী দেওয়া যায় বলুন ত?"

শ্যামলালের এইবারে ইচ্ছে হয় কেমিস্ট্রির মোটা একখানা বই তুলে ছুড়ে মারে অতীশের মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু অমন সহিংস প্রতিশোধ নিতে তার শক্তিতে কুলোয় না, সাহসেও নয়। অসহ্য হয়ে সে উঠে পড়ে তক্তপোষ থেকে, চটির ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ তুলে বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে।

"যাচ্ছেন কেন? আরে ও মশাই, ও শ্যামলালবাবু! আরে শুনুন না, ও শ্যামবাবু—"

পিছন থেকে অতীশ ডাকছে।

"আরে অত উত্তেজিতভাবে কোথায় চললেন? শুনুন না—"

আবার সেই ছাতের ঘরে। সেই ঘুঁটের স্তূপের উপর।

কিন্তু সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন আর ওই ঘুঁটের মধ্যে এসে বসলেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চারদিকের শুকনো গোবর আর কয়লার গন্ধ তার ইডা-পিঙ্গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে তোলে না। চোখের সামনে আবির্ভূত হন না সরস্বতী—তাঁর এক হাতে কেমিস্ট্রির বই, আর এক হাতে টেস্‌ট টিউব; পিছনে এসে মাথার উপর হাত রাখেন না স্বনামধন্য রাসায়নিক আচার্য, বলেন না, 'বৎস, তোমার কাজ তুমি করে যাও। সাধনায় সিদ্ধিলাভ তোমার হবেই।'

কিছুতেই কিছু হয় না শ্যামলালের। আগে মন চঞ্চল হলেই এখানে এসে ধ্যানে বসত শ্যামলাল। কিছুক্ষণের ভিতরেই সব একদম প্রশান্ত হয়ে যেত, একেবারে সমাধির

অবস্থা। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝড় বয়ে গেছে তার তপস্যার উপর দিয়ে।

এখন শ্যামলালের মনে হয়, ঘুঁটের স্তূপের মধ্যে অসংখ্য পিঁপড়ে আছে। পায়ের কাছে কী একটাকে সেদিন নড়তে দেখেছিল, কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল—তেঁতুলে বিছে। এক লাফে সে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল।

আগে কখনো এমন হয়নি। এ-সব তুচ্ছ জিনিসকে সে গ্রাহ্যও করত না।

কিন্তু তবু এর ভিতরে এসেই এখনো বসতে হয় তাকে। আত্মশুদ্ধির জন্যে নয়, অন্তর্জ্বালার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় অতীশকে খুন করা, নইলে পালিয়ে যাওয়া এখান থেকে।

প্রথমটা অসম্ভব। দ্বিতীয়টাও খুব সম্ভব নয়। মেসের আর কোনো ঘরেই জায়গা নেই; আর থাকলেও যারা আছে তাদের সঙ্গে শ্যামলালের বনিবনা হওয়া শক্ত। তাদের অনেকেই সুযোগ পেলে শ্যামলালের পিছনে ফেউের মত লাগে। তারপর, মেসে এ-ঘরটাই একেবারে দক্ষিণ-মুখী, দরজা খুললেই পুবের আকাশ। আরো বড় কথা, কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনার আবহাওয়াটা সৃষ্টি করে নিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগে।

কী করা যায় তা হলে?

একটা মাত্র উপায় ভেবে পেয়েছে শ্যামলাল। কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে এক-আধটু খোঁজ-খবর করে দেখলে মন্দ হয় না। ওখানে নাকি মধ্যে মধ্যে একজন দুজন তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। তাঁদের দ্বারস্থ হলে হয় না? হয়ত কোনো তুকমন্তরের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন যাতে করে অতীশ—

কিন্তু তখনি জিভ কেটেছে শ্যামলাল। ছি-ছি। একজনকে মেরে ফেলবে সে? এত নীচে নামবে? ছিঃ!

কী করা যায়?

কিছুই করা যায় না। শুধু যন্ত্রণা, শুধু অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। আজ পনের দিন ধরে একটা লাইনও সে পড়তে পারেনি। কলেজে গেছে, অথচ যা কিছু শুনেছে তাদের কোনোটার কোনো অর্থবোধ হয়নি তার। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অ্যাসিডে হাত-পা পুড়িয়েছে, ভেঙে ফেলেছে একরাশ কাচের অ্যাপারেটাস। গচ্চা দিতে হবে। অথচ—

কিছুই করা যায় না।

আর এর মধ্যে থেকে থেকে অতীশ জুড়ে দেয়ঃ "বসে বসে অত কী দুশ্চিন্তা করছেন ও মশাই শ্যামলালবাবু? আসুন, গল্প করি একটু।"

যখন পারে রাস্তায় চলে আসে। যখন রাস্তায় সম্ভব হয় না, তখন ঘুঁটের ঘরে। আর বেলা দশটায়, বিকেল পাঁচটায় ট্রাম-স্টপের সামনে এসে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো উদগ্র চোখ মেলে প্রতীক্ষা করে মন্দিরার।

আজও দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল।

এর ভিতরে জন চার ভিক্ষুক পয়সা চেয়ে গেল, চারজন লোক তাকে পথের কথা জিজ্ঞেস করল, তিনজন জানতে চাইল কটা বেজেছে, কোথা থেকে এক ভদ্রলোক এসে খামোকা গায়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "শীত শেষ হয়ে গেল মশাই, এখন বাঁধাকপি গোরুতে খায়!" আরো উত্তেজিত হয়ে শ্যামলালের কানের কাছে তিনি সমানে শুনিয়ে চললেন, "তবু, ব্যাটারা বলে ছ আনা সের! বলুন—এতে কারো মাথা ঠিক থাকে? না এমন চললে বাজার করা যায়? বুঝলেন—ছ্যাঁচড়া, সব ছ্যাঁচড়া!"

শ্যামলাল সরে গেল। ভদ্রলোকও সরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"মশাইয়ের মুখখানা যেন চেনা-চেনা।"

"আমি আপনাকে চিনি না।"

"দাঁড়াও—দাঁড়াও। তুমি কেদার নও? মগরা হাটের নিতাইদার ছেলে না?"

শ্যামলাল চটে গিয়ে বললে, "না। আমার নাম শ্যামলাল ঘটক।"

"অঃ—ভুল হয়েছে।" বলেই ভদ্রলোক সামনের একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

দশটা। শ্যামলাল তীর্থের কাকের মত ট্রাম-স্টপের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সমানে। বেশী কিছু আশা তার নেই—

বড় কোনো লাভের ভরসাও নয়। কলেজে যাবে মন্দিরা। সে কেবল দূর থেকে একবার তাকে যেতে দেখবে।

একদল মেয়ে এল কলরব করতে করতে। আরো কয়েকটি দাঁড়িয়ে ছিল ইতস্তত। সবই কলেজের ছাত্রী। কিন্তু ওদের মধ্যে মন্দিরা নেই।

তখন আর একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে এল। যদি মোটরে করে কলেজে চলে যায় মন্দিরা?

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর একটু অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে, এ-সম্পর্কে একটা কিছু ভেবে নেবার আগেই পিছন থেকে ডাক এলঃ "শোন?"

তীরবেগে ফিরে দাঁড়াল শ্যামলাল। মন্দিরা।

আশে পাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে চাপা গলায় মন্দির বললে, "রোজই দেখি, এখানে এসে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাক। সাহস করে কাছে আসতে পার না একবার? ভিতু কোথাকার!'

সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে শ্যামলাল দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলতে পারল না। বুকের ভিতরে তুফান চলতে লাগল।

মন্দিরা বললে, "চল।"

"কোথায়?"

"কলেজ পালাব আজ।"

"আর আমি?" নির্বোধের মত শ্যামলাল জিজ্ঞেস করলে।

"তোমার সঙ্গেই ত পালাব।" মন্দিরা ভ্রূকুটি করলে, "নইলে কি একা-একা ঘুরে বেড়াব সারা দুপুর?"

"আচ্ছা।"

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শ্যামলাল মিথ্যে কথা বললে, "হয়েছে।"

"তা হলে উঠে পড়।"

"কিসে?"

"আঃ—ওই যে ড্যালহৌসির ট্রাম আসছে, ওটাতেই।"

"কিন্তু ড্যালহৌসির ট্রামে চেপে যাব কোথায়?"

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বললে, "ওঠ না তুমি। কোথায় যাওয়া হবে, সে-ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। ওঠ চট্‌পট্। দেখছ না কলেজের মেয়েগুলো কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে?"

অগত্যা ট্রামেই উঠতে হল।

কিন্তু বেলা দশটার ট্রামে ওঠা কাজটা খুব সহজ নয়। বরাবর সে এই সমস্ত ভয়াবহ ট্রামকে এড়িয়েই চলেছে সাধ্যমত। আজ কী করে যে উঠল শ্যামলাল, তা সে নিজেই জানে না। আর ওরই ভিতরে ফাঁক দিয়ে গলে কখন উঠে পড়ল মন্দিরাও।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলাল, প্রাণপণে সামলাতে লাগল চশমা। দুজনকে আসনচ্যুত করে বসবার জায়গা পেল মন্দিরা।

কেন চলেছে শ্যামলাল? কিসের আশায়? এখনো তার খাওয়া হয়নি। অত্যন্ত জরুরী একটা ক্লাস ছিল আজকে। একজনের কাছ থেকে ভাল একটা নোট পাবার কথা ছিল। সব ছেড়েছুড়ে সে কেন চলেছে, কোথায় চলেছে? মন্দিরা কি কোনো উপায় বলে দিতে পারবে?

কিসের উপায়? যার বাবা পুরুলিয়ায় গালার ব্যবসা করেন, হাঁটুর নীচে কাপড় পরেন না, যার দশটি ভাইবোন, মল্লিক সাহেবের বাড়িতে তার এতটুকুও আশা কোথায়? "ওয়ানটেনথ অব কুরুবংশ!" কানের কাছে বাজছে এখনো।

বাপ-মা, জিলিপি দিয়ে মুড়ি খাওয়া ভাই-বোন, সব কিছুর উপরে একটা তীব্র ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল শ্যামলাল। মনে হল, সবাই ঠকিয়েছে তাকে, চক্রান্ত করে বঞ্চনা করেছে। মল্লিক সাহেবের সেদিনের চোখ দুটো মনে পড়ল। যেন একটা এক্স-রে ক্যামেরা দিয়ে তার ভিতরের সব কিছু দেখে নিচ্ছিলেন। তাঁকে কোথাও ফাঁকি দেবার জো নেই।

আর অতীশ। ছেলেবেলার পরিচয়। আত্মীয়তা। ডি-এসসি ডিগ্রী।

চাকরি পেয়েছে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।

মন্দিরা কী করতে পারে?

শ্যামলাল ভাবতে পারল না। একটা ফাঁকা মন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রামের রড ধরে। দুটো টিকেট মন্দিরাই কিনল। শ্যামলাল ভাসতে লাগল শূন্যতার উপরে। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখতে লাগল আচ্ছন্ন চোখে।

বেলা এগারটায় ইডেন গার্ডেন। ইতস্তত দু-চারজন বেকার। নানা রঙের কয়েকটা ফ্লাওয়ার-বেড। গাছের ছায়া। শ্যাওলা-জমাট কালো জল ঝিলের। তার উপর কয়েক টুকরো ভাসমান কাগজ, একটা সিগারেটের প্যাকেট।

শ্রীহীন অপরিচ্ছন্ন বর্মী প্যাগোডার পাশে, জলের দিকে মুখ রেখে একরাশ মুমূর্ষু ঘাসের উপরে বসল দুজনে।

মন্দিরা বললে, "আর সাতদিন।"

শ্যামলাল রক্তহীন মুখে জবাব দিলে, "জানি।"

"অতীশদা আমাকে জোর করে বিয়ে করছে।"

শ্যামলাল ঠোঁট কামড়াল, "তা-ও জানি।"

"কিছুই করা যাবে না?" মন্দিরার চোখে ক্ষুব্ধ নিরাশার জ্বালা জ্বলতে লাগল, "কিছুই করবার নেই?"

"তোমার বাবাকে—"

"বাবাকে?" মন্দিরা অধৈর্যভাবে থামিয়ে দিলে কথাটা, "বাবাকে বলে কী হবে? বাবা কোনো কথা শুনবেন না। তোমাকে তিনি—" একটা অত্যন্ত অপ্রিয় কথা মুখে এসেছিল, মন্দিরা সামলে নিলে।

"কেন, আমি কি মানুষ নই?" শ্যামলালের পৌরুষে খোঁচা লাগল।

"তাঁর স্ট্যান্ডার্ডে নয়। তুমি যদি কুলীন জাতের কোনো চাকরি-বাকরি করতে, বিলেতে যদি তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকত, তোমার বাবা যদি বালীগঞ্জ না হক অন্তত রিজেন্ট পার্কেও একটা বাড়ি করতেন—"

যদি। বলবার কিছু নেই। সবই শ্যামলাল জানে। খুব বেশী করেই জানে। অনেক দিন, অনেক রাতের অনেক অসহ্য জ্বালার মধ্য দিয়েই তাকে তা জানতে হয়েছে।

"কী করা যায়?"

মন্দিরা ক্ষেপে উঠল হঠাৎ।

"কী করা যায়? এ-কথা তুমি হাজার-বার বলেছ, আমিও বলেছি। কিন্তু বলে লাভ নেই আর। এবার যা হয় কিছু একটা করে ফেল। সাত দিন পরে আর সময় পাবে না।"

শ্যামলাল একটা মরা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিলে। চিবুতে লাগল হিংস্রভাবে।

"পালাবে?" মন্দিরা ফিসফিস করে বললে।

"অ্যাঁ!" দাঁতের কোনায় ঘাসের শিষটা আটকে গেল শ্যামলালের।

"চল, পালিয়ে যাই।" মন্দিরার চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল।

"পালাব!" শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্প্রীং-ছিঁড়ে-যাওয়া ঘড়ির মত থমকে গেল। জাবর কাটা গোরুর মত ঘাসের শিষটা আটকে রইল গালের পাশে।

"তা ছাড়া আর উপায় কী?" মন্দিরার মুখে রক্তের উত্তেজিত উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ল, "আমরা চলে যাই কলকাতা ছেড়ে। যেখানে খুশি যাই। গিয়ে বিয়ে করব।"

একটা ধাক্কা খেয়ে শ্যামলালের স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডটা আবার চলতে আরম্ভ করল।

"কিন্তু থানা-পুলিশ—"

"কোর্টে দাঁড়িয়ে বলব আমি সাবালিকা। সেটা প্রমাণ হতে সময় লাগবে না।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী? আমরা ঘর বাঁধব।"

শ্যামলাল ঘাসের শিষটা তুলে জলের দিকে ছুঁড়ে দিলে, "কিন্তু আমার এম-এসসি পরীক্ষা—"

"এ-বছর না হয় পরের বার দেবে।"

পরের বার দেবে! কত সহজে বলে বসল মন্দিরা। কিন্তু তার বাবা হরলাল ঘটককে তার চাইতে কে আর বেশী করে জানে! চিৎকার করে বলবেন, "পরীক্ষা দেবার মতলব যদি ছিলই না, তা হলে কলকাতায় বসে বসে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করলে কেন? টাকা কি এতই সস্তা যে রাস্তায় খুঁজলেই কুড়িয়ে পাওয়া যায়?" সে-ও না হয় এক রকম সইবে; কিন্তু নিজের এত দিনের আশা? পাশ করে রিসার্চ করবে, তার স্বপ্ন?

"নইলে চল, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করি।"

"তারপর?"

"আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব। আর এখানে থেকে তুমি পরীক্ষার পড়া করবে।"

"কিন্তু তোমার বাবা—"

গোলমাল একটা ত করবেনই। কিন্তু আইন আমাদের পক্ষে আছে। আমি সাবালিকা।"

কত সহজ সমাধান। গোলমাল হবে, কিন্তু আইন আছে পক্ষে! আর ওদিকে হরলাল ঘটক? এই সমস্ত গোলমাল দেখলে তিনি ঘরে জায়গা দেবেন ছেলের বউকে? তাঁর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করবার পরে?

"আমাকে না জানিয়ে লভ্ করা হয়েছে, বিয়ে করা হয়েছে! তবে আর আমাকেই বা কেন? এবার বউ নিয়ে নিজের পথ দেখ। অমন কুলাঙ্গার পুত্রের আমি মুখদর্শনও করতে চাইনে।"

তাতে ক্ষতি নেই হরলাল ঘটকের, পিণ্ড লোপের আশঙ্কা নেই বিন্দুমাত্রও। শ্যামলালের পরে আরো পাঁচ ভাই। পরলোকের ব্যবস্থা আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছেন হরলাল।

নিজের পথ দেখবে শ্যামলাল। তার মানে আলাদা বাসা করতে হবে তাকে। সে-বাসা জোগাড় করা কি এতই সহজ? আর জোগাড়ও যদি হয়, তার খরচ চালাবে কে? তার মানে যেমন করে হক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে শ্যামলালকে এবং সেটা বড় জোর স্কুল-মাস্টারি। পড়ে থাকবে এম-এসসি, পড়ে থাকবে ভবিষ্যৎ, চোখের সামনে এতদিন যে রামধনুর জগৎটা ভাসছিল, সেটা মিলিয়ে যাবে ছায়াবাজির মত। পুরুলিয়ার গালার ব্যবসায়ী হরলাল ঘটকের ছেলের মনের উপর দিয়ে এত গুলো সম্ভাবনা একরাশ ফুলকির মত ঝরে পড়ল।

"কী ভাবছ? কথা বলছ না?" ব্যগ্র আকুল জিজ্ঞাসা মন্দিরার।

শ্যামলাল একটা অতল অন্ধকার থেকে নিজেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। "একটা কথা বলব?"

মন্দিরা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললে, "আর কিছু বলতে হবে না। চল, এখনি যাই। যদি রেজিস্ট্রি অফিসে না হয়, তবে কালীঘাটেই। ওখান থেকেই সিঁদুর পরিয়ে দেবে আমার কপালে। তারপরে যা হবার হক।"

যা হবার হক। অত সহজেই যে জিনিসটাকে নিতে পারবে না শ্যামলাল। শুধু পা বাড়িয়ে দিলেই ত চলে না। সেটা শক্ত মাটিতে না খাদের উপর, পথে না অথই সমুদ্রে, সেটাও ত ভেবে নিতে হবে।

"আমি বলছিলাম—" শ্যামলাল গলা খাঁকারি দিলে।

"কী বলছিলে?"

"আরো দু বছর তোমার বাবাকে ঠেকানো যায় না?" সম্পূর্ণ অর্থহীন জেনেও অবান্তর দুরাশায় শ্যামলাল বলে চলল, "এর মধ্যে এম-এসসি পাশ করে আমি থীসিসটা দিয়ে ফেলি। তখন আর তোমার বাবা—"

আগুন-ধরা হাউই-এর মত সোজা দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরা।

"চেষ্টা করব।" গলা থেকে একরাশ বিষাক্ত ধিক্কার ছড়িয়ে বললে, "শুধু দু বছর কেন, সারা জীবন শবরীর প্রতীক্ষা করব তোমার আশায়!"

"মন্দিরা—"

"শুধু আমি কেন? আমার বাবাও বসে

বসে তোমারই নাম জপ করবেন। তুমি এম-এসসি হবে, ডক্টরেট পাবে, তিন বছর ইয়োরোপে গিয়ে থাকবে, বড় চাকরি নিয়ে আসবে। আর ততদিন বাবা তোমার জন্য তোরণ সাজিয়ে রাখবেন, আর সমানে নহবত বাজাতে থাকবেন!"

ভীত বিবর্ণ শ্যামলাল যেন চোরাবালির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে বললে, "আমি—"

"তুমি কাপুরুষ, তুমি এক নম্বরের অপদার্থ!" চোখের আগুনে শ্যামলালকে ছাই করে দিয়ে মন্দিরা বললে, "আমি অতীশকেই বিয়ে করব। আর কোনোদিন যদি তুমি ট্রাম-স্টপের সামনে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাক, আমি পুলিসে খবর দেব—বলে রাখলাম সে-কথা।"

হাউইয়ের মতই উড়ে গেল মন্দিরা। শ্যামলাল বসে রইল।

সামনে ঝিলের শ্যাওলা-কালো অপরিচ্ছন্ন জল। শ্যামলাল ভাবতে লাগল ওর মধ্যে ডুবে আত্মহত্যা করা যায় কি না। ঠিক এমনি সময় জলের মধ্যে থেকে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে এসে পড়ল তার পায়ের কাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো জোরে লাফ মারল শ্যামলাল। তার ভারী বিশ্রী লাগে ব্যাঙকে।

॥ ৭ ॥

আর চারদিন পরে বিয়ে।

আজ বহরমপুরে যেতে হবে, সামাজিক কর্তব্যের তাগিদেই। ওখান থেকে বাবা আসবেন, কাকা আসবেন, আরো অনেকে আসবেন। অতীশকে সেজে আসতে হবে বরবেশে।

ভারী বিশ্রী, ভারী বিরক্তিকর।

ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেন। অতীশ ঘরে ঢুকে বিছানার উপরে বসে পড়ল। সারাটা দিন এলোমেলোভাবে ঘুরেছে। কোনো লক্ষ্য ছিল না, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। একবার শুধু গিয়েছিল অমিয় মজুমদারের বাড়িতে। একই দিনে রেবারও বিয়ে।

রেবা বেশী কিছু বলেনি। খালি কিছুক্ষণ সন্ধানী চোখে তাকিয়ে ছিল অতীশের দিকে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করছেন?"

"পাত্রী হিসেবে ত মন্দ নয়।"

"হুঁ—তা ভালই। তবে—"

তবে। রেবা আর বলেনি, অতীশও জানতে চায়নি। কিন্তু এমন কী আছে, যেখানে 'তবে' নেই? সব কিছুই ত সর্ত-সাপেক্ষ। কে বলতে পারে, এখানেই সব ঠিক মিলে গেছে, কোথাও এতটুকু সংশয় অবশিষ্ট নেই আর?

রেবা বলেছিল, "সুখী হবেন আশা করি।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

বিছানার উপরে বসে পড়ল অতীশ। ভারী ক্লান্ত লাগছে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন। আজ কুড়ি দিন ধরে যেন একটা নেশার মত্ততায় তার দিন কাটছিল। সেই নেশার ঘোর কেটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, কী দরকার ছিল এ-সবের? কী লাভ হবে এমন করে মন্দিরাকে বিয়ে করে?

মন্দিরা তাকে চায় না। সেই কি মন্দিরাকে চায়? শুধু ভাবছিল, জীবনে কোথায় সে হেরে যাচ্ছে বার বার, সকলে তাকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সবাই যখন নিজের পাওনা হিসেব করে নিলে, তখন তার একার ফাঁকির পালা। কেন সে হার মানবে? আরো বিশেষ করে ওই শ্যামলালের কাছে?

মন্দিরা তাকে ঘৃণা করবে। অনেকদিন পর্যন্ত। করুক। আসে যায় না, কিছু আসে যায় না। অন্তত মন্দিরার সঙ্গে ওইটুকুই তার বন্ধন। পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুটো সম্পর্কই ত রাখতে পারে নিজেদের মধ্যে। হয় প্রেম, নইলে ঘৃণা। ওর জন্যে ক্ষোভ নেই অতীশের। না, এতটুকুও নয়।

মোট কথা, আর সে অপেক্ষা করবে না।

অতীশ বিস্বাদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোশের উপর মড়ার মত লম্বা হয়ে পড়ে আছে শ্যামলাল। একবার মনে ভাবল, সুইসাইড করেনি ত? খেয়ে বসেনি ত খানিকটা পটাশিয়াম সায়ানাইড? ল্যাবরেটরি থেকে ওটা সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ নয়।

শ্যামলাল নড়ে উঠল। বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

মরেনি তা হলে। ওর মত মানুষের কাছে অতটা রোমাণ্টিকতা আশা করা যায় না। ছ মাস পরেই হয়ত ময়ূরপঙ্খী মোটরে চড়ে টোপর মাথায় দিয়ে কন্যাদায় উদ্ধার করতে ছুটবে আর-এক জায়গায়।

ক্লান্তি, ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। সারা শরীরে, সমস্ত মনে, নেশা কেটে যাওয়ার একটা শিথিল অবসাদ। মন্দিরাকে মুক্তি দিলে হয়। কিন্তু কী হবে দিয়ে? তা হলেও শ্যামলাল ওকে পাবে না। মল্লিক সাহেব তাঁর নতুন কেনা বাঘা চেহারার কুকুরটা লেলিয়ে দেবেন শ্যামলালের দিকে।

কিন্তু দু-ঘণ্টা পরে বহরমপুরে যেতে হবে। সুটকেসটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

অতীশ উঠে পড়ল। আর তখন তার চোখ পড়ল টেবিলের উপরে। একখানা চিঠি।

চেনা হাতের লেখা। মাথার ভিতরে একরাশ রক্ত আছড়ে পড়ল অতীশের। সুপ্রিয়ার চিঠি।

খাম ছেঁড়ার অশান্ত শব্দে মুহূর্তের জন্যে মুখ বের করলে শ্যামলাল। তারপরে আবার ডুব মারল চাদরের অন্ধকারে।

খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছে সুপ্রিয়া। এলোমেলো হরফ।

"একটু আগেই এসেছি কলকাতায়। ভবানীপুরে গিয়ে জানলাম মাত্র মিনিট পনের আগে তুমি এসেছিলে। আরো জানলাম চারদিন পরে তোমার বিয়ে। তুমি বিয়ে করছ মল্লিক সাহেবের সেই গোলগাল পুতুলের মত মেয়েটিকে।

আমি ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। নীচেই তোমাদের মেসের চাকর খবর দিলে, তুমি এখনো ফেরোনি। রাস্তা থেকে খাম আর কাগজ কিনে চাকরের কাছেই চিঠি লিখে দিয়ে গেলাম। আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

বলেছিলাম, শেষ প্রয়োজনের দিন তোমার কাছেই আশ্রয় চাইব। সে-দিন বোধ হয় এসেছে। আমি দেশে যাচ্ছি একবার। প্রথম গিয়ে দাঁড়াব কান্তির কাছে। সেখানে বিমুখ হলে আছেন দুর্গাশঙ্কর। আমার মত একটি মেয়ে তাঁকে গান্ধার-আর্টের একটি সরস্বতী-মূর্তি এঁকে দিয়েছিল; আমার ভিতরে তিনি সেই মূর্তিকে দেখতেন, আমার গলায় তিনি শুনতেন বাগেশ্রীর বীণা। জানি না আজকের ছবির মত নীরব সরস্বতী তাঁর কোনো কাজে লাগবে কিনা।

নইলে তুমি আছ। সন্ধ্যা সাতটায় এস লেকের ধারে। সেইখানটিতে, যেখানে আমরা বসেছি অনেকবার। তুমি এস। আর কেউ যদি আমাকে চায়, ভাল কথা। যদি না চায়, আমার দায়িত্ব তোমার কাছেই সঁপে দেব।

নিতে পারবে কিনা তুমিই জান।"

অতীশ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট দুই। মন্দিরাকে বিয়ে করবার কথা, শ্যামলালকে আঘাত দিয়ে দিয়ে একটা জৈবিক হিংস্র আনন্দ, প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের আত্মনিগ্রহের বিলাস, সবগুলোকে মনে হল একটা অর্থহীন ক্যাপামি। সূর্যের মত দেখা দিল সুপ্রিয়া, ভোরের কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল মন্দিরাকে বিয়ে করার অবিশ্বাস্য কল্পনা।

"শ্যামবাবু!"

শ্যামলাল জবাব দিলে না। আর একবার পাশ-ফিরল। তার যে-কানটা নীচের দিকে ছিল, সেটাকে শক্ত করে চেপে ধরল বালিশে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করতে চান শ্যামবাবু?"

চাদরের মধ্যে যেন সাইক্লোন দেখা দিলে একটা। গা থেকে চাদরটা মেঝের উপর তাল পাকিয়ে ছুড়ে দিয়ে সটান বিছানার উপরে খাড়া হয়ে উঠে বসল শ্যামলাল। চোখ দুটো রক্ত-মাখানো। থাবার মত মুঠো-পাকানো হাত। উত্তেজনার বারুদে আর একটা ফুলকি লাগলেই বিস্ফোরণ। তার পরে সে মানুষ খুন করতে পারে।

"ঠাট্টা করছেন?" দানবিক মুখভঙ্গি

করে শ্যামলাল বললে, "অনেক আমি সহ্য করেছি অতীশবাবু। কিন্তু রসিকতারও সময়-অসময় আছে একটা, তা মনে রাখবেন।"

"ঠাট্টা করছি না, খুব সিরিয়াস্‌লিই বলছি। আপনিই বিয়ে করুন মন্দিরাকে। আমার দরকার নেই।"

শ্যামলাল রক্তাভ চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার দু-পাশে রগ দুটো কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। না, ঠাট্টা করছে না অতীশ। তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণ উদাস ছায়া নেমে এসেছে।

"আমাকে বিশ্বাস করুন শ্যামবাবু।"

জীবনে এই তৃতীয়বার কাঁদল শ্যামলাল। মুখ ঢেকে ফেলল দু-হাতে।

অতীশ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল।

"আপনি কিছু ভাববেন না। কেবল গোটা কয়েক চমৎকার মিথ্যে কথা বলতে হবে। ও-পাপটা আমিই করব এখন। শুধু একটা কথার জবাব দিন। মন্দিরা সত্যি সত্যিই আপনাকে ভালবাসে ত?"

"ভালবাসে মানে?" শ্যামলালের অধৈর্য উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল, "জানেন, আপনি তাকে বিয়ে করলে সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করবে? আমাকে না পেলে একদিনও সে বাঁচবে না?"

অতীশের মনের মধ্যে আবার একটুখানি কৌতুক দুলে গেল। মন্দিরা আত্মহত্যা করবে! ওই গোলগাল পুতুলের মত মেয়েটি যে এখনো রাতদিন চকোলেট খায়? তার অতখানি জোর থাকলে অনেক আগেই সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত অতীশকে, অমনভাবে বলির পশুর মত প্রতীক্ষা করত না।

কিন্তু ঠাট্টা করবার মত মনের অবস্থা অতীশের আর ছিল না। বললে, "তা হলে সব ঠিক আছে। আর একটা কথা বলি। বিয়ের পরে মল্লিক সাহেব হয়ত চটবেন, হয়ত মুখদর্শন করবেন না আর। ও-বাড়ির জামাই-আদর থেকে বঞ্চিত হলে খুব কি মন খারাপ হবে আপনার?"

"ও-বাড়ির উপর আমার কোনো লোভ নেই। আদরও চাই না। বিশেষ করে মল্লিক সাহেবের নতুন কুকুরটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। আমার শুধু মন্দিরাকে পেলেই চলবে।"

"বাপের বাড়ির জন্যে মন্দিরার মন খারাপ করবে না?"

"না। আমার কাছে থেকেই সে সব চাইতে খুশী হবে।"

অতীশ হাসল, "দ্যাট সেট্‌ল্‌স। উঠে পড়ুন তা হলে।"

কান্না-জড়ানো বিস্ময়ে শ্যামলাল বললে, "কিন্তু কী করতে চান আপনি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝবেন পরে। এখন উঠে আসুন আমার সঙ্গে।"

আকাশ থেকে পড়লেন মল্লিক সাহেব। রাগে আর আতঙ্কে লাল টকটকে হয়ে উঠল মুখ।

"আর চারদিন মাত্র সময় আছে। বিয়ে করবে না মানে? এ কি ছেলেখেলা?" হিংস্র গলায় বললেন, "তোমার নামে আমি কেস্‌ করতে পারি তা জান?"

শ্যামলাল সোফার ভিতরে লুকোবার গর্ত খুঁজতে লাগল।

অতীশ বিচলিত হল না। বললে, "কেস্‌ আপনি হয়ত করতে পারেন, আইনের খবর আমার জানা নেই। কিন্তু আমার চাইতে সুপাত্র আপনাকে আমি এনে দেব।"

প্রায় বিদীর্ণ হওয়ার সীমান্তে এসে মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার চাইতে সুপাত্র বাংলা দেশে বিস্তর আছে, সে আমি জানি। কিন্তু তারা ত বাজারের ল্যাংড়া আম নয় যে, গিয়ে কিনে আনলেই হল।"

"পাত্র আপনাকে আমি এক্ষুনি দেব। তার আগে ধৈর্য ধরে আমার একটা কথা শুনবেন আপনি?"

দাঁতে-দাঁত চেপে মল্লিক সাহেব বললেন, "বল।"

"সুপ্রিয়া বলে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম।"

"আই নো, আই নো! ও সব কাফ-লাভ সকলেরই থাকে।"

"না, কাফ-লাভ নয়। আমি ভেবে দেখলুম, তাকে ছাড়া কাউকেই আমি বিয়ে করব না।"

"দেন হোয়াই—" মল্লিক সাহেব বজ্রস্বরে বললেন, "তা হলে কেন তুমি এত দূর এগোলে? এ কি ছেলেখেলা? বেবিকে তোমারই বিয়ে করতে হবে। ইচ্ছেয় না কর আইন দিয়ে বাধ্য করব!"

"কেন মিথ্যে পণ্ডশ্রম করবেন? বলছি ত অনেক ভাল সুপাত্র আপনাকে দেব।"

"বটে!"

"বিশ্বাস করুন। আরো বিশ্বাস করুন, আপনার মেয়ে তাকে ভালবাসে।"

"ইজ ইট? ইজ ইট?" যেন বাতের যন্ত্রণা টনটনিয়ে উঠেছে এমনিভাবে মল্লিক সাহেব বললেন, "কোথায় সে সুপাত্র? আমার মেয়ের যিনি মনোহরণ করেছেন, তিনি কে?"

সোফার মধ্যে এমন গর্ত নেই, যেখানে শ্যামলাল লুকোতে পারে। পাণ্ডুর হয়ে ঠায় বসে রইল।

"এই ছেলেটি। এই শ্যামলাল ঘটক।"

"শ্যামলাল!" সোফা ছেড়ে প্রায় দু-হাত শূন্যে উঠে গেলেন মল্লিক সাহেব, "ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে অতীশ!"

"আজ্ঞে ইয়ার্কি নয়। চমৎকার ছেলে!"

"চমৎকার ছেলে! আই মাস্ট রিঙ মাই গান য়্যান্ড শুট বোথ অব ইউ!"

শ্যামলালের প্রায় চৈতন্যলোপ হল। বন্দুকের একটা নল যেন তার বুকে এসে ঠেকেছে।

অতীশ বললে, "সত্যিই ভাল ছেলে। গালার ব্যবসা ছাড়াও ও'র বাবার প্রায় দশ লাখ টাকার প্রোপার্টি সেটা ভুলবেন না।"

প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেও পেটের মধ্যে

শ্যামলালের বিবেক মোচড় খেয়ে উঠল। কিন্তু নড়তে পারল না।

"দশ লাখ!" মল্লিক সাহেব আবার ভাল করে চেপে বসলেন সোফায়। সবিস্ময়ে বললেন, "কিন্তু চেহারা দেখে ত—"

"আজ্ঞে, প্লেন লিভিং হাই থিংকিং!"

"অঃ!"

"তা ছাড়া ও'র বড়মামা লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। ডাক্তার। কুড়ি বছর রয়েছেন, বাড়ি করেছেন গোলডার্স গ্রীনে। ফ্রেঞ্চ ওয়াইফ। এম-এর্সাস দিয়েই তাঁর কাছে চলে যাচ্ছেন শ্যামবাবু। লণ্ডন ডি-এর্সাসর জন্যে।"

বড়মামা! শ্যামলালের পেটের মধ্যে বিবেকটা লাঠি-খাওয়া ঢোঁড়া সাপের মত দাপাদাপি করতে লাগল। বড়মামা! লণ্ডন! ডাক্তার! তার একজন মাত্র মামা। তিনি চাকরি করেন খড়্গপুরে রেলওয়ে ইয়ার্ডে। তার মামীমার নাম নন্দিনীবালা, তাঁর বাপের বাড়ি নোয়াখালি জেলায়!

মল্লিক সাহেব কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

"কিন্তু এ-সব কথা ত—"

"ইচ্ছে করেই বলেননি শ্যামবাবু। দেখছেন ত কি রকম বিনয়ী ছেলে!"

"সম্ভব, সবই সম্ভব।" মল্লিক সাহেব মাথা নাড়তে লাগলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

"ভাববার আর কী আছে? আপনার হাতে ত মাত্র তিন দিন আর সময়।"

"হু।"

"তা ছাড়া মন্দিরাও শ্যামবাবুকে—"

"তুমি বলছিলে বটে।" মল্লিক সাহেব একবার বিরূপ দৃষ্টিতে শ্যামলালের দিকে তাকালেন, "তা হলে এই জন্যেই বেবি পরশু থেকে বাড়িতেই মুখ গুঁজে বসে আছে, চকোলেট ও খায় না! তা যাই বল, বেবির টেস্ট ভাল নয়!"

ঘরে ম্লান আলো। জানলার কাঁচের উপর রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। মৃদু ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। দেওয়ালের গায়ে গান্ধার-রীতিতে আঁকা বরাভয়মুদ্রা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্গাশঙ্কর।

ওই ছবি যে এঁকে দিয়েছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়ার জো নেই। দুর্গাশঙ্করের হৃদয়-পদ্মের সব কটি পাঁপড়ি সে ফুটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই পদ্মাসনটিতে সে আর আসন পাতল না। কোথায় কোনখানে যে হারিয়ে গেল, আজো তার সন্ধান পাননি।

সামনে তানপুরা নিয়ে একটি মেয়ে গান গেয়ে চলেছে। মীরার ভজন।

"চাকর রহাসু", বাগ লগাসু",
নিতি উঠি দরশন পাসু",
বৃন্দাবন কি কুঞ্জ গলিমে
তেরি লীলা গাসু"—"

কিন্তু এ ত সে নয়। এর পরনে লাল শাড়ি, উগ্র রঙ। এর দেহের রেখায় কাঠিন্য। এর গানে সবই আছে, সুর-তাল-লয়—কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই। কিন্তু কোথায় সেই মাধুর্য, যা সুরের মধ্যেও নিয়ে আসে সুরের অতীতকে। কোথায় সেই ঝঙ্কার যা আলোর মত। শিখাকে ছাড়িয়ে যা জ্যোতিঃপ্রকাশ!

একজন এসেছিল। তার সঙ্গে মিল ছিল সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটির। তার মাথার উপর যেন গান্ধারী ইরার বরাভয় প্রসারিত হয়ে আসত। সে-ও দূরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এসেছে। এখন সে মাটির সরস্বতী, এখন সে ছবি হয়ে গেছে। তার বীণাটিকে সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে ত্র্যম্বক-তীর্থের নীল-সমুদ্রে।

কী করবেন তাকে দিয়ে? তাকে দিয়ে কী করবেন দুর্গাশঙ্কর?

একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ধূপের ধোঁয়া উঠছে কুয়াশার মত, ছবিটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে তার ভিতরে। সামনে মেয়েটি সমানে গান গেয়ে চলেছে:

"সাবরিয়াকে দরশন পাউ
পহির কুসুম্মি সারি—"

মিলবে না, সে-সুরে আর মিলবে না। জীবনে একবার তাকে পাওয়া যায়, বড় জোর দুবার। কিন্তু তার বেশী নয়।

জানলার কাছে রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। অনেক দূরের দুরাশার মত রঙ।

আর লেকের ধারে নতুন ধরনের আলো-গুলোয় নকল চাঁদের রঙ।

সাতটা প্রায় বাজে। অতীশ পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দিলে।

শ্যামলাল কি সহজে বশ মানবার পাত্র? রাস্তায় বেরিয়ে দস্তুরমত কেলেঙ্কারি শুরু করে দিলে। মাথার কাছে মাননীয়দের ছবি টাঙিয়ে রেখে এতদিন সে সততার সাধনা করেছে। কিছুতেই বোঝানো যায় না তাকে।

অতএব, পরম জ্ঞানের বাক্যটি তাকে শোনাতে হল।

"প্রেমে আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনো বস্তু নেই।"

"কিন্তু সবই ত উনি জানতে পারবেন।"

"বিয়ের আগে নয়।"

"যদি পুরুলিয়ায় খোঁজ করেন?"

"এই তিন দিনের মধ্যে পেরে উঠবেন না, সে-সময় ও'র নেই। তা ছাড়া ও'দের কাছে আমি অত্যন্ত সত্যবাদী ভাল ছেলে, আমার কথায় কিছুতেই অবিশ্বাস করবেন না। পরে অবশ্য আমাকে প্রচুর গালাগালি করবেন। কিন্তু সে আমি শুনতে পাব না, কারণ, তখন আমি এলাহাবাদে।" শ্যামলালের

মুখের উপর একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফেলে অতীশ বললে, "আপনার জন্যে আমি কতবড় স্যাক্রিফাইস করলাম জানেন মশায়? ওঁদের বাড়িতে চমৎকার বিরিয়ানি পোলাও হয়, ভবিষ্যতে সে-পোলাও খাওয়ার জন্যে কোনোদিন আর আমার ডাক পড়বে না।"

কিন্তু অতীশের আত্মত্যাগের ব্যাপারে কান দেবার সময় ছিল না স্বার্থপর শ্যামলালের।

"আর আমার বাবা?"

"ওই ত কাজ বাড়ালেন। আমাকে কালই ছুটতে হবে পুরুলিয়ায়, তাঁকে ম্যানেজ করতে। আশা করি, পেরে উঠব। কারণ, তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁর বড় ছেলেটি এম-এস্‌সি ফেল করে দেশান্তরী হবে, এ সেখানে পৃথিবী নেই, কেউ নেই, কিছুই নেই।

সুপ্রিয়া চলে যাবে কান্তির কাছে? দুর্গাশংকরের কাছে? যাক, তার যেখানে খুশী। কিন্তু তবু সে ফিরে এসেছে। এখন তাকে একবার দেখবার জন্যে, সেই ছোট রাস্তাটি থেকে ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে এখন অতীশ বকুলগাছের নীলচে ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

অতীশের রক্ত ছলকে উঠল।

লেকের ধারে, জলের কোল ঘেঁষে মূর্তির মত কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুপ্রিয়াই।

"সুপ্রিয়া!"

"এমন করে কী সব বলছ সুপ্রিয়া? তোমার গলার স্বর ও-রকম কেন? তুমি যে মহাভারতের তীর্থ-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলে! এত সহজেই তা হয়ে গেল?" ব্যাকুল বিস্ময়ে অতীশ বললে, "তোমার কী হয়েছে সুপ্রিয়া? আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না?"

গলায় একটা সিল্কের চাদর জড়ান ছিল সুপ্রিয়ার! সরিয়ে দিলে সেটা। তেমনি অদ্ভুত অস্বাভাবিক করে বললে, "চেয়ে দ্যাখ।"

আতঙ্কে বিস্ময়ে চমকে এক পা সরে গেল অতীশ। গলার ঠিক মাঝখানটিতে সদ্য শুকিয়ে যাওয়া একটা ক্ষত। সবে তার স্টিচ কাটা হয়েছে।

"একি! একি!"

সুপ্রিয়া বললে, "ডিপথিরিয়া।"

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। চারদিকে থমকে গেছে সব। হাওয়া বইছে না, লেকের জলে কলতান বাজছে না, মর্মরিত হচ্ছে না নারকেলের পাতা। সময় থেমে গেছে।

যেন অনন্তকাল পরে, সুপ্রিয়া বললে, "গান ফুরিয়ে গেল, দীপেন ফুরিয়ে গেল, স্বপ্ন ফুরিয়ে গেল, আমি ফুরিয়ে গেলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই ছুটে এসেছি কলকাতায়। আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে অতীশ?"

একবারের জন্যে চোখ বুজে এল অতীশের। একবারের জন্যে মনে পড়ল মন্দিরাকে মনে পড়ল তার স্বাস্থ্যে-উজ্জ্বল নির্মল শঙ্খ-গ্রীবা। এখনো হয়ত দেরি হয়ে যায়নি।

সুপ্রিয়া আর-একবার বিকৃত আর্তগলায় বললে, "আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে অতীশ, কী করবে? আমি যে ফুরিয়ে গেলাম চিরদিনের মত!"

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে অতীশ। সুপ্রিয়ার একটা প্রাণহীন, শীতল, ঘর্মাক্ত হাতকে টেনে নিলে নিজের শক্তিমান হাতের মুঠোর ভিতরে।

কিছুই কোনোদিন মিথ্যে হয়ে যায় না

তিনি চাইবেন না। ভাল কথা, ট্রেন-ভাড়াটা দেবেন মশাই। গাঁটের কড়ি খরচ করে অতটা পরোপকার আমার পোষাবে না।"

তিনখানা দশ টাকার নোট তখনই বাড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলাল: "এই নিন ভাড়া—"

অতীশ এগিয়ে চলল। নারকেল-পাতায় বাতাস বাজছে। নতুন ধরনের আলোয় নকল চাঁদের রঙ। আশ্চর্য, মন্দিরাকে বিয়ে করবার কথা সে ভেবেছিল কী করে? কেমন করে সে তলিয়ে গিয়েছিল এমন একটা অসুস্থ বিকারের মধ্যে? সুপ্রিয়া ফিরে এসেছে, এসেছে তার কাছে আশ্রয় চাইতে। তার সমস্ত মন এখন একটা ফুটন্ত সূর্যমুখীর মত উচ্চকিত হয়ে উঠেছে সুপ্রিয়ার দিকে।

আস্তে আস্তে সুপ্রিয়া মুখ ফেরালে। ইলেকট্রিক আলোর নকল জ্যোৎস্না পড়ল শীর্ণ বিবর্ণতার উপরে। কালো চোখের উপর অসীম অতলস্পর্শ বেদনা নিয়ে তাকিয়ে রইল। জবাব দিলে না।

"সুপ্রিয়া!"

অস্বাভাবিক ফিসফিসে গলায় সুপ্রিয়া বললে, "কান্তি খুনের দায়ে জেল খাটছে!"

"কী বলছ তুমি?"

"সে আশ্রম গেল। ওস্তাদজী দুর্গাশংকর অবশ্য থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সে কেবল করুণাই। তাঁর গান্ধার-আর্টের সরস্বতীর সঙ্গে এখন আমার কোথাও কোনো মিল নেই আর। বল, তুমি কী করবে?"

"জীবনে একদিক ফুরিয়ে গেলে আর-একদিক নতুন করে আরম্ভ করা চলে সুপ্রিয়া। কিছুই কোনোদিন মিথ্যে হয়ে যায় না। এতদিন তোমার কথা তুমিই ভেবেছ। এবারে আমাকে ভাবতে দাও।"

খণ্ড চাঁদের কোল ঘেঁষে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল একরাশ। দীর্ঘ বিলম্বিত মূর্ছনায় গুরুগুরু করে শব্দ উঠল তাতে। যেন চন্দ্রচূড় আকাশ-মন্দিরের কালো গ্র্যানিট চত্বরে সাড়া বেজে উঠল দক্ষিণী নটরাজের মহামৃদঙ্গে॥

—শেষ—

বীরভূমে হরপ্রসাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

লিকাতা ইণ্টালি হইতে মাসিক পত্র "গৃহস্থ" প্রকাশিত হইত। সম্পাদক শ্রীরামরাখাল ঘোষ। এই পত্রে নামকরা লেখকরাও লিখিতেন। ১৩২০ সালে বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী "গৃহস্থ"-এ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন "সুপুর"। লেখায় কিছু ভুল ছিল, আমি প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইলাম। প্রতিবাদ ছাপা হইয়াছিল। ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া লিখিয়াছিলাম, বীরভূমের ইতিহাস আসমান হইতে গজাইবে না। এ-কাজে দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারের মত পৃষ্ঠপোষক চাই, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দের মত সাধক চাই ইত্যাদি। প্রতিবাদ পড়িয়া ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে মহারাজকুমার পত্রসহ কুড়মিঠা গ্রামে আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। পত্রখানি নিজের হাতে লেখা। "সুপুর সম্বন্ধে আপনার প্রতিবাদ পড়িলাম। দুর্ভাগ্যবশত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। বীরভূমে এমন লোক আছেন জানিতাম না। অনুগ্রহপূর্বক হেতমপুরে আসিয়া দেখা করিলে আনন্দিত হইব।" লোক যখন আসে, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি সে-সময় মাঝে মাঝে কিছু পয়সা জোগাড় করিয়া সিউড়ি চলিয়া যাইতাম। তুলসী বৈষ্ণবীর হোটেলে খাইতাম, ছয় আনা পয়সায় দুই বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া হইত। চা খাই না, দুই বেলা দুই আনার জলখাবার, অথবা রাত্রে ময়রার দোকানে চারি আনায় আধ সের খাস বালুসাই নয়ত রসগোল্লা। কাজ ছিল শিবরতন মিত্রের রতন লাইব্রেরিতে দুই বেলা পুস্তক পাঠ। এক উকিলের বাসাতে রাত কাটাইতাম। উকিলের মুহুরীর সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। পয়সা ফুরাইলেই পলাইয়া আসিতাম। বাড়ি ফিরিয়া মহারাজকুমারের পত্র পড়িলাম এবং দুই-একদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া হেতমপুরে উপস্থিত হইলাম। মহারাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া আমি ত অবাক। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা অনেক বুঝাইয়া বলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, "এম এ, বি এর এখানে অভাব নাই। তুমি এখানে এস, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, কত কত বই পড়তে পাবে, তোমার লেখা কাগজে বেরুবে, বইয়ের আকারে ছাপান হবে।" ভাবিয়া দেখি, বলিয়া হেতমপুরে একদিন থাকিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। শ্রাবণ মাসে কলিকাতা হইতে মহারাজকুমারের এক চিঠি পাইলাম। টেলিগ্রাম লইয়া হেতমপুর হইতে একজন লোকও আসিল।

বই পড়িতে পাইব, লেখা ছাপার অক্ষরে বাহির হইবে, বীরভূমের কথা, চণ্ডিদাস, জয়দেবের কথা বাহিরের লোককে শুনাইব, এই প্রলোভন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি মন স্থির করিয়া বলিলাম। হেতমপুরে গিয়া দেখি পুণ্যাহ উপলক্ষে রাজবাড়িতে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। রাত্রে কর্মচারীরা এবং দুবরাজপুরের মুনসেফ, সাবরেজিস্ট্রার, স্টেশন মাস্টার আদি অনেক লোক খাইবেন। দুই দিন হেতমপুরে ছিলাম। তৃতীয় দিন

মহারাজকুমার আমাকে একেবারে কলিকাতায় আনিয়া তুলিলেন—প্রায় এক বস্ত্রে। দিন দুই পরে একদিন আমাকে লইয়া বিশ্বকোষ লেনে গিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। বীরভূমে বসু মহাশয়ের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। সেই সূত্রে হেতমপুর-রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। তিনি মাঝে মাঝে রাজবাড়িতে যাতায়াতও করিতেন। বসু মহাশয়ের রাজন্যকাণ্ড গ্রন্থখানা হেতমপুরে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিলাম, কিছু ভুল দেখাইলাম। পরে বুঝিয়াছিলাম, আমারই ভুল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রাগ করিলেন না। প্রশংসার কথাটা মনে থাকে। আমাকে যশোদানন্দন তালুকদারের সম্পাদিত "প্রেমবিলাস" কিনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিলাম—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহারাজকুমারকে বলিতেছেন, "ছোকরার বাহাদুরি আছে, রাজন্যকাণ্ড—চায়না টু পেরু মনে রেখেছে, আমার সঙ্গে আলোচনা করছে। কোথায় পেলেন একে, হাতছাড়া করবেন না।"

কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরে পড়িলাম। যত গায়ে বেদনা, তত শীত। সঙ্গে বিছানা ছিল না। তিন দিন অত্যন্ত কষ্টভোগ করিলাম। পথ্য পাওয়ার পর একদিন বসু মহাশয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপনের কথা আলোচিত হইল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির তখন খুব নাম। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের গৌড়রাজমালা বোধহয় বাহির হইয়াছে। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রকাণ্ড পাণ্ডিত্য এবং কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়ের অকাতর অর্থব্যয়ের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। পরামর্শ হইল, আমাদের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদকে গিয়া ধরিতে হইবে। আমরাই দুইজনে গিয়া দেখা করিব। পরদিন সকালের দিকে বসু মহাশয় আমাকে লইয়া পটলডাঙায় গেলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সে-সময় পটলডাঙায় থাকিতেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি, সদাহাস্য মুখ, প্রজ্ঞার মাধুর্য-বিগ্রহ। নগেনবাবুর নিকট অনুসন্ধান সমিতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আশীর্বাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়া কিন্তু দমিয়া গেলাম।

নগেনবাবুর দেখাদেখি আমিও পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি নীচের একটি ঘরেই বসিয়া ছিলেন। নগেনবাবুকে কুশল প্রশ্নের পর আমার দিকে চাহিয়া একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন "একে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে।" খাস পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি, চেহারাতেও বিদ্যাবুদ্ধির কোন পরিচয় নাই, তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগেনবাবু আমার পরিচয় দিলেন, মহারাজকুমারের কথা, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির কথা বলিলেন। কিছুদিন পূর্বে বোধ হয় বর্ধমানে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সভাপতি। সুতরাং আমরা বিশেষ আমল পাইলাম না। তবে নগেনবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমাদের সমিতির মহোপদেশকরূপে নাম দিতে তিনি সম্মত হইলেন। মহোপদেশক কথাটা কিন্তু তাঁহার পছন্দ হইল না। বৌরানীর শরীর ভাল যাইতেছে না, মহারাজকুমার বৈদ্যনাথ-ধামে চলিয়া গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইল।

দেওঘর হইতে পূজার কিছু পূর্বেই মহারাজকুমার হেতমপুরে ফিরিলেন। হেতমপুরে আসিয়া অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন প্রতি মাসে আমাকে পঁচিশটি টাকা দিবেন। থাকিবার স্থান পাইব, তবে ঐ টাকা হইতে খাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাকেই করিয়া লইতে হইবে। কলেজ-হোস্টেল এবং স্কুল-বোর্ডিং রাজবাড়ি হইতে কিছুটা দূরে। রাজকর্মচারীদের কোন মেস নাই। গ্রামেও পয়সা দিয়া কোথাও ভাত পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আমাকে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইবে। কখন আসি, কতদিন থাকি, কখন যাই, স্থিরতা নাই। দেওঘরে "চণ্ডিদাস"-জীবনী লেখক শ্রীকরালীকিংকর সিংহের মামার বাড়িতে (মামা বীরভূমের লোক, দেওঘরের মোক্তার) ইকমিক্ কুকারে রাঁধিয়া খাইয়া মহারাজকুমারের নিকট গল্প করিয়াছিলাম। তিনি একটা কুকার কলিকাতা হইতে রেল পার্সেলে আনাইয়াছিলেন। রান্নাটা শিখাইয়া দিয়াছিলাম। সেই কুকারে তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা রাঁধিয়া খাইতেন। কথা ছিল কুকারটা আমাকেই দিবেন। হেতমপুরে আসিয়া কিন্তু যোগীন্দ্র কর্মকারের দ্বারা একটা কুকার তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। বাটি চারিটা টিফিন ক্যারিয়ার হইতে লওয়া হইল। লোহার পাতে কুকারের অন্য সবটাই যোগীন্দ্র তৈয়ারী করিয়া দিল। আমি পঁচিশ টাকা বেতনেই কুকারে রাঁধিয়া খাইতে রাজী হইয়া গেলাম।

সরস্বতী পূজায় হেতমপুরে খুব ধুম হইত। মেলা বসিত, ছোটখাট কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, কবি, ঝুমুর, লেটো, যাত্রা, কলিকাতার থিয়েটার ইত্যাদি দেখিতে শুনিতে মেলায় বহু লোক আসিত। ঘটা করিয়া সাহেবদের খাওয়ান হইত, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আসিতেন। শ্রীপঞ্চমীর পরদিন মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুরের শ্রাদ্ধতিথি। পোলাও, মাছ, মিষ্টি, মন্দ খাওয়ানো হইত না। গ্রামের ব্রাহ্মণ, মেয়েছেলে ছাড়াও যাঁহারা মেলা দেখিতে আসিতেন এমন ব্রাহ্মণও অনেকে খাইতেন। ব্রাহ্মণদের জন্য চারি আনা দক্ষিণার বরাদ্দ ছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্বে চারি আনা পয়সায় আধ সের রসগোল্লা পাওয়া যাইত। সুতরাং চারিপাশের তিন-চারি ক্রোশ দূর হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ আসিতেন। পূজার পর কলিকাতায় গিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, সরস্বতী পূজার সময় হেতমপুরে অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে, সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া এথোরায় কাশিমবাজাররাজের নায়েব মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর লেখক শ্রীনিখিলনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম।

সরস্বতী পূজাটা সেবার বোধ হয় ফাল্গুনের গোড়ার দিকে পড়িয়াছিল। ষষ্ঠীর দিন কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব আসিলেন। এথোরা হইতে আসিলেন নিখিলনাথ। কলেজের অধ্যাপকগণ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছিলেন। লাভপুর হইতে নাট্যকার শ্রীনির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়াও বীরভূমের অপর কেহ আসেন নাই। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় পুরাতন রাজবাড়ির উপরে সভা বসিল। হরপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচনের পালা। সমিতি স্থাপিত হইল। উপদেষ্টা হরপ্রসাদ, সভাপতি নগেন্দ্রনাথ। সহ-সভাপতি নিখিলনাথ, সম্পাদক মহিমানিরঞ্জন, সহ-সম্পাদক আমি, সভা কলেজ-স্কুলের দুই-একজন শিক্ষক ও বীরভূমের এখান সেখান হইতে দুই-দশজন ভদ্রলোক। কর্মকর্তা নির্বাচনের পর প্রবন্ধ পাঠ, আমি "কেন্দুবিল্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। নগেনবাবু নিখিলবাবু প্রবন্ধের খুব প্রশংসা করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "জয়দেব সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, অন্যে যাহা জানে, আজ পর্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, সবই এ প্রবন্ধে আছে। যাহা জানিতাম না, অন্যেও জানে না, কেন্দুলী সম্বন্ধে স্থানীয় এমন অনেক খবর লেখক দিয়াছেন।"

এতদিনে একটু আনন্দিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। চুপি চুপি কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর লেখার এমন ধৃষ্টদ্যুম্ন ধরনের চেহারা কেন? অ্যাঃ ভারী পাণ্ডিত্য! লেখাটাকে শক্ত না করলে চলে না বুঝি? সহজ সরল করে বলতে পার না?" লেখাটা বীরভূম-বিবরণ প্রথম খণ্ডে আছে। কাঁচা হাতের লেখা, কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

পরের দিন একটা কেলেংকারি ঘটিয়া গেল। এই কয়দিন আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। যে দুইজন কর্মচারীর উপর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাঁহারা জানিতেন আমি একজন সামান্য লোক, মাহিনা খোরাকি সহ পঁচিশ টাকা। তাহাও আবার জমিদারী সেরেস্তার কাজ জানি না, কী যে করি তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই। নগেন বসু রাজবাড়িতে আসেন যান। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কর্মচারী দুইজন আমি সঙ্গে আছি বলিয়া বসু ও শাস্ত্রী মহাশয়কে একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন। আমি নানা রকমে সামলাইয়া লইতাম। সকালে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "আমি বক্রেশ্বর দেখিতে যাইব।" রাজবাড়িতে মোটর ছিল না। জুড়ি-গাড়িও পাওয়া যাইবে না। এক জোড়া খচ্চরের একটা গাড়ি ছিল। বক্রেশ্বর যাতায়াতের জন্য মহারাজকুমার সেই গাড়িটাই ঠিক করিয়া দিলেন। বক্রেশ্বরে পৌঁছিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নগেনবাবুকে লইয়া প্রথমে মূল মন্দিরটি দেখিলেন। শ্বেতগঙ্গার উত্তর তীরে বটগাছতলায় হর-গৌরীর একটি ভগ্ন মূর্তি পড়িয়া ছিল, সেটি দেখিলেন। এদিক ওদিক ঘুরিয়া পাপহরা ও গরম জলের কুণ্ডগুলি দেখিয়া বেড়াইলেন। শেষে শ্বেতগঙ্গার জলেই স্নান সারিয়া দেবদর্শন করিলেন। আমি শাস্ত্রী ও বসু মহাশয়কে দাঁইহাটের হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে লইয়া গিয়া বসাইলাম। ময়রার দোকানে ভাল রসগোল্লা ছিল, আনিয়া জলযোগ করাইলাম। হেতমপুরে ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। বিশ্রাম করিয়া খাইতে বসিলেন প্রায় আড়াইটায়। ভাত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তরকারিও তথৈবচ। গরম

পড়িয়াছিল, নগেনবাবু দই চাহিলেন। তিনি জানিতেন, সাঁওতাল পরগনার কুণ্ডহিতের দই প্রসিদ্ধ। তত্ত্বাবধায়কদের একজন দই আনিয়া দিলেন। পাত্রয় পড়িবামাত্র দুর্গন্ধ পাইয়া ছুটিয়া ভাঁড়ারে গিয়া আমি এক হাঁড়ি (ছোট হাঁড়ি, বেঠে বলে) ভাল দই আনিয়া দেখি, দুইজনেই উঠিয়া পড়িয়াছেন।

আমি তখনও খাই নাই, খাওয়া মাথায় উঠিল। ছুটিয়া পুরাতন রাজবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ইঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল হাজার দুয়ারীর (রঞ্জন প্যালেসের) উপরতলে। সেখান হইতে পুরাতন রাজবাড়ি কিছু কম আধ মাইল। মহারাজকুমারকে লইয়া আসিলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই শাস্ত্রী ও বসু মহাশয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ই মূল সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় দিন স্নানের পর দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বলিলেন, "এখানেই খাইয়া যাও।" খাওয়ার সময় নিজের পাশেই বসাইলেন। চুপি চুপি একবার হেতমপুরের দইয়ের কথাটাও তুলিয়াছিলেন। সেখানে কলিকাতার বড় বড় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের দেখিয়াছিলাম। বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলন এক এলাহী কাণ্ড। মাছ মাংস প্রচুর। মিহিদানা সীতাভোগ ও সিগারেটের ছড়াছড়ি। চৌদ্দ শত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। অনেকেই ছান্দা বাঁধিয়াছিলেন।

বীরভূমের উত্তরে পাইকোর গ্রামে চেদিরাজ কর্ণদেবের নামযুক্ত একটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। স্তম্ভে কয়েকছত্র লিপি। আমি কর্ণদেব নাম মাত্র পড়িতে পারিলাম। কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রনাথকে লইয়া আসিলাম। তিনিও সবটা পড়িতে পারিলেন না। ফিরিয়া গিয়া দুইজনেই শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণ লইলাম। কিন্তু তিনি প্রায় তাড়াইয়াই দিলেন। "কোথায় ধাপধাড়া গোবিন্দপুর পাইকোর। এই শরীর নিয়ে বর্ষায় (সময়টা বর্ষা কাল ছিল) তেপান্তরের মাঠে গিয়ে পড়ে থাকি। তোর রাজা ত থাকবে হেতমপুরে, আর তোরা ভাল ভাল দই এনে খাওয়াবি! চেদি কর্ণের লিপি পড়ে দেশোদ্ধারের জন্যে আমার বুক টন্ টন্ করছে!" সে-দিনের মত চম্পট দিলাম। বসু মহাশয় বাগবাজারে, আমি রিপন স্ট্রীটে। মহারাজকুমার কলিকাতায় ছিলেন। আমি পটলডাঙার বাড়িতে কয়েকদিন যাতায়াতের পর একদিন মহিমানিরঞ্জনকে সংগে লইয়া গেলাম। মহারাজকুমারের অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয় পাইকোর যাইতে সম্মত হইলেন।

সিউড়ি হইতে কিছু তরকারিপা[illegible] কয়েক রকমের মোরব্বা প্রভৃতি লই[illegible] পাইকোরে গিয়া বসিলাম। নগেনবাবুর জ[illegible] দুইটি দিন পালটাইয়া গেল। জিনিসপ[illegible] নষ্ট হইল। দুই দিনই পাইকোরে[illegible] ভদ্রলোকদের লইয়া কয়েক জোড়া গরু[illegible] গাড়ি মুড়ারই স্টেশন হইতে ফিরি[illegible] আসিল। বৈকালে আমি সিউড়ি গিয়া[illegible] উদ্দেশ্য টাটকা জিনিসপত্র আনিব। সন্ধ্যা[illegible] ট্রেনে শাস্ত্রী মহাশয়কে লইয়া নগেন্দ্রনা[illegible] মুড়ারইয়ে আসিয়া নামিলেন। যেখা[illegible] বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। গরু[illegible] গাড়ি ত দূরের কথা, স্টেশনে একজ[illegible] লোক পর্যন্ত নাই। মুড়ারই থানার দারো[illegible] ছিলেন সে-সময় বন্ধু শ্রীকিরীটী রা[illegible] চৌধুরী। তিনি লিপি সম্বন্ধীয় সম[illegible] সংবাদই জানিতেন, আমার সিউড়ি যাও[illegible] কথাও তাঁহার জানা ছিল। ঐ সময়ে তি[illegible] স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিরী[illegible] নগেনবাবুকে চিনিতেন। তিনি ব[illegible] সমাদরে তাঁহাদিগকে থানায় লইয়া গি[illegible] থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। [illegible] সে[illegible] রাত্রেই সংবাদ পাঠাইয়া পর[illegible] নি[illegible] গিয়া শাস্ত্রী মহাশয়দের পাইকোরে রাখি[illegible] আসেন। নগেনবাবুর প্রিয় ভৃত্য পাহা[illegible] সংগে থাকায় কোন অসুবিধা হয় নাই[illegible] দূরবর্তী স্থানের কোন এক মুসলম[illegible] ভদ্রলোক পাইকোরের জমিদার ছিলে[illegible] গ্রামের শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহ[illegible] নায়েব। হেতমপুর হইতে আনা রাঁধুনীটি[illegible] পাইকোরে রাখিয়া গিয়াছিলাম। ঘরও ঠি[illegible] করিয়া রাখিয়াছিলাম। অন্যান্য ব্যব[illegible] প্রভাসবাবু করিয়াছিলেন। বৈকালে আ[illegible] সিউড়ি হইতে পাইকোরে ফিরিলা[illegible] দেখিলাম, নারায়ণচত্বর পুকুরের ঘাট হইতে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্তম্ভটি আনাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় পাঠোদ্ধার করিতেছেন। নগেনবাবু কিন্তু আমাকে মারিতে বাকী রাখিলেন।

লিপিটি পাঠ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কর্ণদেবের সংগে বংগেশ্বর নয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল। নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের হস্তে কর্ণদেব আপনার কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ণদেব বাংলায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় আসিয়াছিলেন কেহ জানিত না। পাইকোরের স্তম্ভলিপি হইতে সেই স্থানের পরিচয় পাওয়া গেল। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণদেবের একজন সামন্ত এই লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।
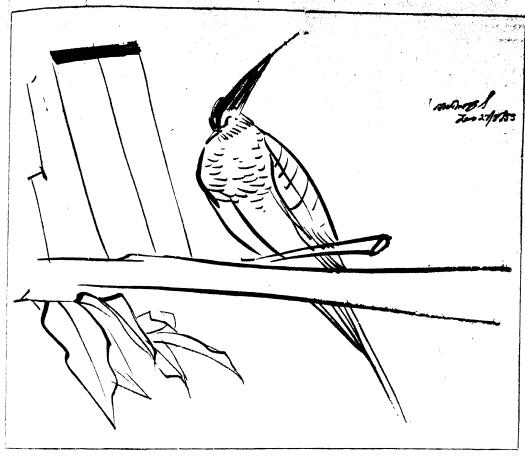
অন্যমনা   শিল্পী গোপাল ঘোষ

পাইকোর-লিপি ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে নূতন পত্রাংক যোজনা করিয়াছে।

পাইকোর বুড়াশিবতলায় অনেকগুলি পুরাতন মূর্তি আছে। 'পাহি দত্তের নামাংকিত একটি স্তম্ভ আছে। আশে পাশে ধ্বংসস্তূপের অভাব নাই। পাইকোরে শাস্ত্রী মহাশয় পাঁচদিন ছিলেন। তাঁহার আরও কয়েকদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নগেনবাবু রাজী হইলেন না। কোন একজন বড়লোককে জাতিতত্ত্বের পাঁতি দিতে হইবে, কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার থাকিবার উপায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আমার উপর এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নগেনবাবু চলিয়া গেলেও একক থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেনবাবুর জন্য তাহা হইয়া উঠিল না। নগেনবাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে পাইকোরে ফেলিয়া কলিকাতা যাইবেন না। এদিকে প্রবল বৃষ্টির জন্য মাঠ ঘাট ডুবিয়া গেল। পাগলা নদীর বন্যায় নদী নালা একাকার। দুইখানি খেয়া ডিঙিতে আমি তাঁহাদিগকে নুড়ারই স্টেশনে আনিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিলাম।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথামত এই স্তম্ভ-লিপির প্রতিলিপি এবং ফোটো আনাইয়াছিলেন। স্তম্ভটিকে আইনানুসারে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে এই স্তম্ভ-লিপির উল্লেখ এবং লিপির আবিষ্কারক বলিয়া আমার নাম করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বীরভূম-ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে আমার অকপট আগ্রহ এবং তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা নগেনবাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। পাইকোরেও কিছু দেখিয়াছিলেন। পাইকোরে কথাপ্রসঙ্গে আমার সাংসারিক অবস্থা ও হেতমপুর হইতে পঁচিশটি টাকা মাসিক পাওনার কথাও শুনিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে আমার উপর তাঁহার কেমন একটা মায়া জন্মিয়াছিল। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখন-তখন পটলডাঙার বাড়িতে যাইতাম। দুই একদিন থাকিতাম। ভারতে নানাস্থানে তাঁহার ভ্রমণের কথা, বার বার নেপালে যাওয়া, রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের কথা, এবং বাংলার ইতিহাসের নানা তথ্য আবিষ্কারের কথা শুনিতাম। গল্পের মত করিয়া ইতিহাসের কত কথাই যে বলিতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে নৈহাটিও যাইতাম। নৈহাটিতে তিনি একবার সাহিত্য সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন। খুব ধূম হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়ার

বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথও গিয়াছিলেন। এখানে বর্ধমানের মহারাজ সভাপতি, ওদিকে কাঁঠালপাড়ায় কয়েকজন সাহিত্যিক নাটোরের মহারাজাকে সভাপতি করিয়া একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মেলন বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা সফল হয় নাই। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণকে আমি নৈহাটির সভাতেও দেখিয়াছিলাম। এক প্যাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দেখিয়া পাঁচজনে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া মঞ্চে বসাইলেন। বিখ্যাত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ও বর্ধমানের শ্রীবিজয়চাঁদকে সম্মেলনের সময় একদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে জলযোগ করিতে দেখিলাম নৈহাটির গজা ও 'বিশ্বনাথ চাটুজ্যে'র আম। শাস্ত্রী মহাশয় নৈহাটির গজার বড় ভক্ত ছিলেন। এ-গজা দুই চারিটি তৈয়ারী হয় না, একটা বড় কড়াই ভর্তি পাক চড়াইতে হয়। তাঁহার নিকটেই গল্পটা শুনিয়াছিলাম। নৈহাটি সম্মেলনে গিয়া আমি প্রায় দিন দশেক ছিলাম।

একবার শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পটলডাঙার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় নারিকেলের গঙ্গাজলী নাড়ু তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এই নাড়ু আগুনে পাক করিতে হয় না। সূর্য-পক্ক গঙ্গাজলী গঙ্গাজলের মত কিছুদিন অবিকৃত থাকে। গঙ্গাজলী সেই খাইয়াছিলাম—প্রথম ও শেষ। শাস্ত্রী মহাশয় লোককে খাওয়াইতে খুব ভালবাসিতেন। পটলডাঙা হইতে হাঁটিয়া শিয়ালদহ যাইবার পথে পড়িয়া গিয়া পায়ে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে, আর চলাফেরা করিতে পারিতেন না। এই কারণেই তাঁহার সংবর্ধনা উপলক্ষে যে গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ তাঁহার হাতে দিবার জন্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ লাহা, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জন পনের ভদ্রলোক পটলডাঙার বাড়িতে গেলেন। তিনি শতাধিক লোকের জলযোগের মত প্রচুর মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পনের জন লোক দেখিয়া তাঁহার সে কী রাগ। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন নাই জানিয়া তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। সন্দেশ রসগোল্লা দোকানে কিছু ফেরত পাঠান হয়। কিছু আমাদের সদ্ব্যবহারে লাগিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নৈহাটি গিয়াছি, একদিন বৈকালে বলিলেন, "চল একটা তীর্থ দেখাইয়া আনি।" হাঁটিয়াই কাঁঠালপাড়ায় গেলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের দেবমন্দির, বৈঠকখানা, বাস্তুবাড়ি প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইলেন। বঙ্কিমের জন্মভিটা, বঙ্গদর্শন লিখিবার ঘর সব দেখিয়া ফিরিবার পথে বৃষ্টি নামিল। আমরা নৈহাটি স্টেশনে বেঞ্চির উপর গিয়া বসিলাম। স্টেশন জলে ভাসিয়া গেল, দুইজনেই জুতা খুলিয়া বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া দিলাম। দুইজন গোরা সিপাহী সামনে দিয়া জল ভাঙিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। একজনের সঙ্গে একটা বানর ছিল—দড়িতে বাঁধা। বানরটা মাঝে মাঝে গোরার কাঁধে উঠিতেছিল, জামার পিঠে কাদাসুদ্ধ হাত পায়ের দাগ আঁকিতেছিল। দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাঁদর কি আর গাছে ফলে?" শাস্ত্রী মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, বাঁদর নৈহাটি স্টেশনে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে থাকে।" রসিকতায় শাস্ত্রী মহাশয় পুরাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই উত্তরাধিকারী ছিলেন।

কত লোককে যে তাঁহার বাড়িতে দেখিয়াছি! কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল, কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত প্রভৃতির সঙ্গে পটলডাঙার বাড়িতেই পরিচিত হইয়াছিলাম। একবার এক ভদ্রলোককে দেখিলাম, বেদের বয়স জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় গম্ভীর, নিরুত্তর, আমি প্রমাদ গণিতেছি। এমন সময় সেই ভদ্রলোক বলিলেন, অবিনাশচন্দ্র দাস বলিয়াছেন, ঋক্‌বেদের বয়স এত হাজার বৎসর। আর যায় কোথায়, শাস্ত্রী মহাশয় ফাটিয়া পড়িলেন। একদিন নীচের ঘরে বসিয়া আছি। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসিলেন। এক সময় রাখালদাস তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইদানীং ইতিহাসের কথায় কিছু বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "এই যে শ্রীমৎ আর. ডি. বন্দ্য. আসুন।" রাখালদাস পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছিলেন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। অনেকে শাস্ত্রী মহাশয়কে দাম্ভিক বলিতেন। আমি দেখিয়াছি পরিহাসপ্রিয় পিতামহ, শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক, সহৃদয় আচার্য, মনীষা ও মনস্বিতায় এক প্রকাণ্ড পুরুষ।

১৩২৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয়বার হেতমপুরে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রিয় পুত্র শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। এবার মহারাজকুমার যথাযোগ্যভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় জয়দেব কেন্দুবিল্ব গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য বৌদ্ধ সহজিয়াদের অনুসন্ধান। কেন্দুবিল্বের সভায় শাস্ত্রী মহাশয় জয়দেব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। মহান্ত দামোদর ব্রজবাসী শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্যামারূপার গড় ও ইছাই ঘোষের দেউলও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বীরভূম বিবরণ ২য় খণ্ড তখন ছাপা শেষ হইয়াছে। আমরা কলেজ-প্রাঙ্গণে সভা করিয়া তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধার অভিনন্দন দিয়াছিলাম। বীরভূম বিবরণ ২য় খণ্ড তাঁহার মহিমময় নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। শ্রীঅনিলবরণ রায় তখন হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক, অধুনা পণ্ডিচেরিতে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক একটু প্রেরণা (Inspiration) দিয়া যাইবেন।" তিনি সেই সভায় আমাকে "সাহিত্যরত্ন" উপাধি দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই তো মূর্তিমান প্রেরণা আপনাদের সম্মুখেই রহিয়াছেন।" সভায় মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনকে তিনি "তত্ত্বভূষণ" উপাধি দিয়াছিলেন। ২য় খণ্ড বীরভূম বিবরণে প্রায় আশিখানা ছবিতে বীরভূমের বহু স্থানের, মন্দিরের, মূর্তির ও জলাশয় ভিটি আদির ছবি আছে। সাহিত্যিকদের পরিচয় আছে। বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ৩য় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজকুমার দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমিও দিন গণিতেছি। বীরভূমের অনেক কথাই বলা হইল না।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বসন্তঋতু আসিয়াছে। দক্ষিণ হইতে ঝিরঝিরে বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা শহরের এখানে-ওখানে যে দুই চারিটা শহুরে গাছ আছে তাহাদের অঙ্গেও আরক্তিম নব-কিশলয়ের রোমাঞ্চ ফুটিয়াছে। শুনিয়াছি এই সময় মনুষ্যদেহের গ্রন্থিগুলিতেও নূতন করিয়া রসসঞ্চার হয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের উপর কাত হইয়া শুইয়া কবিতার বই পড়িতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকাল বসন্তকালের সমাগম হইলেই মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বাড়িতেছে।

সন্ধ্যার মুখে সত্যবতী আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সে চুল বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াইয়াছে, পরনে বাসন্তী রঙের হাল্কা শাড়ি। অনেক দিন তাহাকে সাজগোজ করিতে দেখি নাই। সে তক্তপোষের পাশে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে ব্যোমকেশকে বলিল, "কী রাতদিন বই মুখে করে পড়ে আছ। চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে।"

ব্যোমকেশ সাড়া দিল না। আমি প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় বেড়াতে যাবে? গড়ের মাঠে?"

সত্যবতী বলিল, "না না, কলকাতার বাইরে। এই ধরো—কাশ্মীর—কিম্বা—"

ব্যোমকেশ বই মুড়িয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া বসিল, থিয়েটারী ভঙ্গিতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বিশুদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি করিল,

"ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ গমনে·
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লী মন উড়ুউড়ু
একি দৈবের শাস্তি।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "এটা কোত্থেকে পেলে?"

"হুঁ হুঁ—বলব কেন?" ব্যোমকেশ আবার কাত হইয়া বই খুলিল।

হাতে কাজ না থাকিলে লোকে জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করে, ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের লইয়া পড়িয়াছিল; ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কবিকে একে একে শেষ করিতেছিল। ভয় দেখাইয়াছিল, অতি-আধুনিক কবিদেরও সে ছাড়িবে না। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কোন দিন হয়তো নিজেই কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিবে। আজকাল ছন্দ ও মিলের বালাই ঘুচিয়া যাওয়ায় কবিতা লেখার আর কোনও অন্তরায় নাই। কিন্তু সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ কবিতা লিখিলে তাহা যে কিরূপ মারাত্মক বস্তু দাঁড়াইবে ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই যে খোকাকে একখানা "আবোল তাবোল" কিনিয়া দিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের কাব্যিক প্রেরণার মূল সেইখানে। তারপর বইয়ের দোকানের অংশীদার হইয়া গোদের উপর বিষফোঁড়া হইয়াছে।

একটি উচ্চা...
শুনলে কেন?

ব্যোমকেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কাশ্মীর যেতে কত খরচ জান?"

"কত?"

"অন্তত এক হাজার টাকা। অত টাকা পাব কোথায়?"

সত্যবতী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "জানি না আমি ও সব। যাবে কি না বল।"

"বললাম তো টাকা নেই।"

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল। বেশ
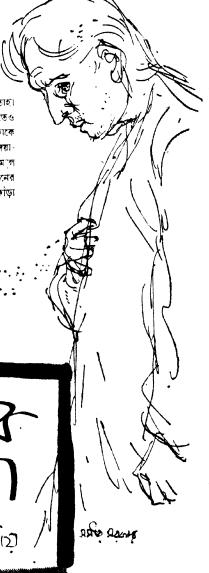
রক্তের দাগ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

...শের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্মেলনে ...ন্দ্রনাথও গিয়াছিলেন। এখানে বর্ধমান... এক... রাজ সভাপতি, ওদিকে ... ...পাত ... গেল। সত্যবতী

ব্যোমকেশকে কোপ-কটাক্ষে আধ-পোড়া করিয়া দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া দ্বার খুলিলাম। যে-লোকটি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া সহসা কিশোরবয়স্ক মনে হয়। বেশী লম্বা নয়, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে অল্প গোঁফের রেখা। বেশবাস পরিপাটি, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতা হইতে গায়ে স্বচ্ছ মলমলের পাঞ্জাবি সমস্তই অনবদ্য।

"কাকে চান?"

"সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বাবুকে।"

"আসুন।" দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। যতটা কিশোর মনে করিয়াছিলাম ততটা নয়; বর্ণচোরা আম। চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়াদারির ছাপ পড়িয়াছে, চোখের কোণে সূক্ষ্ম কালির আঁচড়; মুখের ... সৌকুমার্যের অন্তরালে হাড়ে পাক ধরিয়াছে। তবু বয়স বোধ করি পঁচিশের বেশী নয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের পাশে বসিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "বসুন। কী দরকার আমার সঙ্গে?"

লোকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, "আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে।"

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, "তাই নাকি! কাজটা কী?"

যুবক পাশের পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল, ব্যোমকেশের সম্মুখে অবহেলা ভরে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আপনি আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবেন। এই কাজ। পরে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে না, তাই আগাম দিয়ে যাচ্ছি। এক হাজার টাকা। গুনে নিন।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কুঞ্চিত চক্ষে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নোটের তাড়া গুনিয়া দেখিল। এক শত টাকার দশ কেতা নোট। নোটগুলিকে টেবিলের এক পাশে রাখিয়া ব্যোমকেশ অলসভাবে একবার আমার পানে চোখ তুলিল; তাহার চোখের মধ্যে একটু হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে যুবকের মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কাজ নেব কিনা তা নির্ভর করবে আপনার উত্তরের ওপর।"

যুবক সোনার সিগারেট-কেস খুলিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিল, ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিল। যুবক তখন নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল "প্রশ্ন করুন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারি।"

ব্যোমকেশ একটু নীরব রহিল, তারপর অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কী?"

যুবকের মুখে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। হাসিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সে বলিল, "নামটা এখনও বলা হয়নি। আমার নাম সত্যকাম দাস।"

"সত্যকাম!"

"হ্যাঁ! আপনি যেমন সত্যান্বেষী, আমি তেমনি সত্যকাম।"

"এ-নাম আগে শুনিনি। সত্যকাম ছদ্মনাম নয় তো?"

"না, আসল নাম।"

"হুঁ। আপনি কোথায় থাকেন? ঠিকানা কী?"

"কলকাতায় থাকি। ৩৩।৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রীট।"

"কী কাজ করেন?"

"কাজ? বিশেষ কিছু করি না। দাস-চৌধুরী কোম্পানির সুচিত্রা এম্পোরিয়মের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি। ধর্মতলা স্ট্রীটের বড় মনিহারী দোকান।"

"আমি সুচিত্রা এম্পোরিয়মের অংশীদার।"

"অংশীদার।—অন্য অংশীদার কে?"

সত্যকাম একবার দম লইয়া বলিল, "আমার বাবা—উমাপতি দাস।"

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যকাম তখন ক্ষণেকের জন্য ইতস্তত করিয়া অনিচ্ছাভরে বলিল, "আমার মাতামহ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের পত্তন করেছিলেন, পরে আমার বাবা তাঁর পার্টনার হন। এখন দাদামশাই মারা গেছেন, তাঁর অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার মা দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। আমিও মায়ের একমাত্র সন্তান।"

"বুঝেছি।" ব্যোমকেশ ক্ষণকাল যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মদ খান?"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া সত্যকাম বলিল, "খাই। গন্ধ পেলেন বুঝি?"

"আপনার বয়স কত?"

"একুশ চলছে। জন্ম-তারিখ জানতে চান? ৭ই জুলাই, ১৯১৭।" সত্যকাম বঙ্কিম-বঙ্কিম হাসিল।

"কতদিন মদ খাচ্ছেন?"

"চৌদ্দ বছর বয়সে মদ ধরেছি।" সত্যকাম নিঃশেষিত সিগারেটের প্রান্ত হইতে নূতন সিগারেট ধরাইল।

"সব সময় মদ খান?"

"যখন ইচ্ছে হয় তখনই খাই।" বলিয়া সে পকেট হইতে চার আউন্সের একটি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া দেখাইল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমিও নির্বাকভাবে এই একুশ বছরের ছোকরাকে দেখিতে লাগিলাম। যাহারা সর্বাংশে জগৎ পরিত্যাজ্য ত্রিভুবন বিজয়ী হইতে চায়, তাহারা বোধকরি খুব অল্প বয়স হইতেই সাধনা আরম্ভ করে।

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া পূর্ববৎ নির্বিকার স্বরে বলিল, "আপনার আনুষঙ্গিক দোষও আছে?"

সত্যকাম মুচকি হাসিল, "দোষ কেন বলছেন ব্যোমকেশবাবু? এমন সর্বজনীন কাজ কি দোষের হতে পারে।"

আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার মুখেই বলিল, "দার্শনিক আলোচনা থাক। ভদ্রঘরের মেয়েদের উপরেও আপনি নজর দিয়েছেন?"

"তা দিয়েছি।" সত্যকামের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু তৃপ্তির আভাস পাওয়া গেল।

"কত মেয়ের সর্বনাশ করেছেন?"

"হিসেব রাখিনি ব্যোমকেশবাবু।" বলিয়া সত্যকাম নির্লজ্জ হাসিল।

ব্যোমকেশ মুখের একটা অরুচিসূচক ভঙ্গি করিল, "আপনি বলেছেন হঠাৎ আপনার মৃত্যু হতে পারে। কেউ আপনাকে খুন করবে, এই কি আপনার আশঙ্কা?"

"হ্যাঁ।"

"কে খুন করতে পারে? যে-মেয়েদের অনিষ্ট করেছেন তাদেরই আত্মীয়-স্বজন? কাউকে সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ করি। কিন্তু কারুর নাম করব না?"

"প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টাও করবেন না?"

সত্যকাম মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, "চেষ্টা করে লাভ নেই ব্যোমকেশবাবু। আচ্ছা আজ উঠি, আর বোধ হয় আপনার কোনও প্রশ্ন নেই। রাত্রিরে আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।"

এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট যে ব্যবসায়ঘটিত নয় তাহা তাহার বাঁকা হাসি হইতে প্রমাণ হইল।

সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে ব্যোমকেশ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যদি কেউ খুন করে, আমি জানব কী করে?"

সত্যকাম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরের কাগজে পাবেন। তা ছাড়া আপনি নিজেও খোঁজ খবর নিতে পারেন। বেশী দিন বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে না।"

সত্যকাম প্রস্থান করিলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া তক্তপোষে আসিয়া বসিলাম। সত্যবতী হাসি-ভরা মুখে পুনঃপ্রবেশ করিল। মনে হইল সে দরজার আড়ালেই ছিল।

"এক হাজার টাকার জন্যে ভাবছিলে, পেলে তো এক হাজার টাকা!"

ব্যোমকেশ বিরস মুখে নোটগুলি সত্যবতীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "পিপীলিকা খায় চিনি, চিনি যোগান চিন্তামণি। আর কি, এবার কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দাও।" আমাকে বলিল, "কেমন দেখলে ছোকরাকে?"

বলিলাম, "এত কম বয়সে এমন দুঃকান-কাটা বেহায়া আগে দেখিনি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আমিও না। কিন্তু অদ্ভুত, নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, মরার পর অনুসন্ধান করাতে চায়!"

॥ দুই ॥

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী বলিল, "কাশ্মীর যে যাবে, কোনও বিছানা নেই।"

[illegible] বলিল, "কেন, গত বছর পাটনায় তো ছিল!"

সত্যবতী বলিল, "সে তো সব দাদার। আমাদের কি কিছু আছে! নেহাত কলকাতার শীত, তাই চলে যায়। কাশ্মীর যেতে হলে অন্তত দুটো বিলিতী কম্বল চাই। আর আমার জন্যে একটা বীভার-কোট।"

"হুঁ। চল আজই বেরুনো যাক।"

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় যাবে?"

সে বলিল, "চল, সুচিত্রা এম্পোরিয়মে যাই। রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে।"

বলিলাম, "সত্যবতীও চলুক না, নিজে পছন্দ করে কেনাকাটা করতে পারবে।"

ব্যোমকেশ সত্যবতীর পানে তাকাইল, সত্যবতী করুণ স্বরে বলিল, "যেতে তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে? খোকার ইস্কুলের গাড়ি আসবে যে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "তোমার যাবার দরকার নেই। আমি তোমার জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আসব। দেখো। অপছন্দ হবে না।"

সত্যবতী ব্যোমকেশের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, ব্যোমকেশের পছন্দের উপর তাহার যে অটল বিশ্বাস আছে তাহাই জানাইয়া গেল। সত্যবতীর শৌখিন জিনিসের কেনাকাটা অবশ্য চিরকাল আমিই করিয়া থাকি। কিন্তু এখন বসন্তকাল পড়িয়াছে, ফাল্গুন মাস চলিতেছে—

দুজনে বাহির হইলাম। সাড়ে নটার সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখিলাম এম্পোরিয়মের দ্বার খুলিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আস্ত কাচের জানালা হইতে পর্দা সরিয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল ঘর, মোজেয়িক মেঝের উপর ইতস্তত নানা শৌখিন পণ্যের শো-কেস সাজানো রহিয়াছে। দুই চারিজন গ্রাহক ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলা। কর্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইতেছে। একটি প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পাদচারণ করিতে করিতে সর্বত্র নজর রাখিয়াছেন।

আমরা প্রবেশ করিলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা করিলেন, "আসতে আজ্ঞা হক। কী চাই বলুন।"

ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক তাকাইয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "সামান্য জিনিস, গোটা দুই বিলিতী কম্বল। পাওয়া যাবে কি?"

"নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।" ভদ্রলোক আমাদের একদিকে লইয়া চলিলেন, "আর কিছু?"

"আর, একটা মেয়েদের বীভার-কোট।"

বীভার[illegible]

ঘরের কোণে [illegible] করিতেছে, আমরা তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে বলিল, "আমি এঁদের দেখছি।"

পরিচিত কণ্ঠস্বরে পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—সত্যকাম। সিল্কের সুট পরা ছিমছাম চেহারা; এতক্ষণ সে বোধহয় এই ঘরেই ছিল, বিজাতীয় পোশাকের জন্য লক্ষ্য করি নাই। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও—আচ্ছা। তুমি এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, এঁরা বিলিতী কম্বল আর বীভার-কোট কিনবেন।" বলিয়া আমাদের দিকে একটু হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যকামের দিকে একবার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ইনি আপনার—"

সত্যকাম মুখ টিপিয়া হাসিল, "পার্টনার।"

"অর্থাৎ—বাবা!"

সত্যকাম ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

এতক্ষণ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়াও লক্ষ্য করি নাই, এখন ভাল করিয়া দেখিলাম। তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া অন্য একজন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সম্বচ্ছন্দভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিলেন। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি চওড়া কাঠামোর মানুষ, চিবুকের হাড় দৃঢ়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রগের চুলে ঈষৎ পাক ধরিয়াছে। দোকানদারির লৌকিক শিষ্টতা সত্ত্বেও মুখে একটা তপঃকৃশ রুক্ষতার ভাব। দোকানদারির অবকাশে ভদ্রলোকের মেজাজ বোধ করি একটু কড়া।

এই সময় লিফ্‌ট নামিয়া আসিল, আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম।

সত্যকাম ব্যোমকেশের দিকে চটুল ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "সত্যি কিছু কিনবেন? না সরজমিন তদারকে বেরিয়েছেন?"

"সত্যি কিনব।"

উপর তলাটি নীচের মত সাজান নয়, অনেকটা গুদামের মত। তবু এখানেও দুটিকয়েক ক্রেতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যকাম আমাদের যেদিকে লইয়া গেল, সে-দিকটা গরম কাপড় চোপড়ের বিভাগ। সত্যকামের ইঙ্গিতে কর্মচারী অনেক রকম বিলাতী কম্বল বাহির করিয়া দেখাইল। এ-সব ব্যাপারে ব্যোমকেশ চিটা ও চিনির প্রভেদ বোঝে না, আমিই দুইটি কম্বল বাছিয়া লইলাম। দাম বিলক্ষণ চড়া, কিন্তু জিনিস ভাল।

এক পাশে বীভার কোট। নানা রঙের—নানা মাপের কোট—সবগুলিই অগ্নিমূল্য।

ঘাড় ফিরাইয়া তরুণীকে দেখিল

ভদ্রলোকের পাড়া, এ-পাড়ায় ও-সব চলবে না।"

এই সময় আরও কয়েকজন গদাধর্মী ছোকরা ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া কটমট চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বোঝা গেল সত্যকামকে ঠ্যাঙাইবার সংকল্প এক-জনের নয়, সমস্ত ব্যায়াম সমিতির অনুমোদন ইহার পশ্চাতে আছে। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গতিক সুবিধার নয়, সত্যকামের ঝাড়াটা আমাদের উপর দিয়া বুঝি যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু সামলাইয়া লইল। সহজস্বরে বলিল, "পাড়ার কোনও লোক যদি বজ্জাতি করে তাকে শাসন করা পাড়ার লোকেরই কাজ, এ কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হয় না। আপনারা সত্যকামকে শায়েস্তা করতে চান তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। তাকে যতটুকু জানি দু'ঘা পিঠে পড়লে তার উপকারই হবে। শুধু একটা কথা, খুনোখুনি করবেন না। আর, কাজটা সাবধানে করবেন, যাতে ধরা না পড়েন।"

নন্দ এক মুখ হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যেই তো কাজটা আমি হাতে নিয়েছি স্যার। পিছন থেকে ঘা দিয়ে কেটে পড়ব। আমি এ-পাড়ার ছেলে নই, চিনতে পারলেও সনাক্ত করতে পারবে না।"

ব্যোমকেশ হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "তবু, যদি কোনও গণ্ডগোল হয় আমাকে খবর দিতে ভুলবেন না। নমস্কার, ভুবনেশ্বরবাবু।"

বড় রাস্তায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া নন্দ আখড়ায় ফিরিয়া গেল। ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বাপ্, একেবারে বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিলাম!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সত্যকামকে মার-ধর করার উৎসাহ দেওয়া কি তোমার উচিত? তুমি ওর টাকা নিয়েছ।"

ব্যোমকেশ বলিল, "দু'চার ঘা খেয়ে যদি ওর প্রাণটা বেঁচে যায় সেটা কি ভাল নয়?"

॥ তিন ॥

যদিও আমি কোনও দিন অফিস-কাছারি করি নাই, তবু কেন জানি না রবিবার সকালে ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হয়। পূর্ব-পুরুষেরা চাকুরে ছিলেন, রক্তের মধ্যে বোধ হয় দাসত্বের দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পরদিনটা রবিবার ছিল, বেলা সাড়ে সাতটার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ দু'হাতে খবরের কাগজটা খুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। আমার আগমনে সে চক্ষু ফিরাইল না, সংবাদপত্রটাকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিল, "নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত!"

তাহার ভাবগতিক ভাল ঠেকিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী হয়েছে?"

সে কাগজ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "সত্যকাম কাল রাত্রে মারা গেছে।"

"অ্যাঁ! কিসে মারা গেল?"

"তা জানি না। তৈরি হয়ে নাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরুতে হবে।"

আমি কাগজখানা তুলিয়া লইলাম। মধ্য পৃষ্ঠার তলার দিকে পাঁচ লাইনের খবর—

—অদ্য শেষ রাত্রে ধর্মতলার প্রসিদ্ধ সুচিত্রা এম্পোরিয়ামের মালিক সত্যকাম দাসের সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। পুলিস তদন্তের ভার লইয়াছে।—

সত্যকাম তবে ঠিকই বুঝিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াছিল। কিন্তু এত শীঘ্র! প্রথমেই স্মরণ হইল, কাল সন্ধ্যার সময় মন্দ যোম চাদরের মধ্যে খোঁটে লুকাইয়া বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করিতেছিল—

বেলা সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ফটকের বাহিরে ফুটপাথের উপর একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে; একটু খুঁতখুঁত করিয়া আমাদের ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল।

ইট বাঁধানো রাস্তা দিয়া সদরে উপস্থিত হইলাম। সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে কেহ নাই। বাড়ির ভিতর হইতে কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া যাইতেছে না। ব্যোমকেশ দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নীরবে মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম দরজার ঠিক সামনে ইট-বাঁধানো রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে খানিকটা রক্তের দাগ। কাঁচা রক্ত নয়, বিঘৎপ্রমাণ স্থানে রক্ত শুকাইয়া চাপড়া বাঁধিয়া গিয়াছে।

আমরা একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। তারপর আমরা রক্ত-লিপ্ত স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একটি চওড়া বারান্দা, তাহার দুই পাশে দুইটি দরজা। একটি দরজায় তালা লাগান, অন্যটি খোলা; খোলা দরজা দিয়া মাঝারি আয়তনের অফিস-ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, টেবিলের সম্মুখে উষাপতিবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

উষাপতিবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে চিবুক আবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে দুঃস্বপ্নভরা চোখ তুলিয়া চাহিলেন, শুষ্ক নিষ্প্রাণ স্বরে বলিলেন, "কী চাই?"

ব্যোমকেশ টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "এ-সময় আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, মাফ করবেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী—"

উষাপতিবাবু ঈষৎ সজাগ হইয়া পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইলেন, তারপর বলিলেন, "আপনাদের আগে কোথায় দেখেছি। বোধহয় সুচিত্রায়।—কী নাম বললেন?"

"ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল আমরা আপনার দোকানে গিয়েছিলাম—"

উষাপতিবাবু আমাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের স্বাভাবিক শিষ্টতা বোধ হয় তাঁহার অস্থিমজ্জাগত, তাই কোনও প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "কিছু দরকার আছে কি? আমি আজ একটু—বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে—"

ব্যোমকেশ বলিল, "জানি। সেই জন্যেই এসেছি। সত্যকামবাবু—"

"আপনি সত্যকামকে চিনতেন?"

"মাত্র পরশু দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছে। তিনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন—"

"কী প্রস্তাব?"

"তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে আমি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।"

উষাপতিবাবু এবার খাড়া হইয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া যেন প্রবল হৃদয়াবেগ দমন করিয়া লইলেন, তারপর সংযত স্বরে বলিলেন, "আপনারা বসুন। —সত্যকাম তা হলে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মাফ করবেন, আপনার কাছে সত্যকাম কেন গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আপনি —আপনার পরিচয়—মানে আপনি কি পুলিসের লোক? কিন্তু পুলিস তো কাল রাত্রেই এসেছিল, তারা—"

"না, আমি পুলিসের লোক নই। আমি সত্যান্বেষী, বেসরকারী ডিটেকটিভ বলতে পারেন।'

"ও—" উষাপতিবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সত্যকাম কাকে সন্দেহ করে, আপনাকে বলেছিল কি?"

"না, কারুর নাম করেনি। —এখন আপনি যদি অনুমতি করেন আমি অনুসন্ধান করতে পারি।"

"কিন্তু—পুলিস তো অনুসন্ধানের ভার নিয়েছে, তার চেয়ে বেশী আপনি কী করতে পারবেন?"

"কিছু করতে পারব কিনা তা এখনও জানি না, তবে চেষ্টা করতে পারি।"

এত বড় শোকের মধ্যেও উষাপতিবাবু যে বিষয়বুদ্ধি হারান নাই তাহার পরিচয় এবার পাইলাম।

তিনি বলিলেন, "আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "কিছুই দিতে হবে না। আমার পারিশ্রমিক সত্যকামবাবু দিয়ে গেছেন।"

উষাপতিবাবু প্রখর চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর চোখ নামাইয়া বলিলেন, "ও। তা আপনি অনুসন্ধান করতে চান করুন। কিন্তু কোনও লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু।"

"লাভ নেই কেন?"

"সত্যকাম তো আর ফিরে আসবে না। শুধু জল ঘোলা করে লাভ কী?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে উষাপতিবাবুর পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরস্বরে বলিল, "আপনার মনের ভাব আমি বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জল ঘোলা হতে আমি দেব না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্য আবিষ্কার করা।"

উষাপতিবাবু একটি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, "বেশ। আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

ব্যোমকেশ বলিল, "কাল কখন কীভাবে সত্যকামবাবুর মৃত্যু হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। আপনি বলতে পারবেন কি?"

উষাপতিবাবুর মুখখানা যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি বুকের উপর একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি বৈ আর কে বলবে? কাল রাত্রি একটার সময় আমি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুম করে একটা আওয়াজ। মনে হল যেন সদরের দিক থেকে এল—"

"মাফ করবেন, আপনার শোবার ঘর কোথায়?"

উষাপতিবাবু ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "এর ওপরের ঘর। আমি একাই শুই, পাশের ঘরে স্ত্রী শোন।"

"আর সত্যকামবাবু কোন ঘরে শুতেন?"

"সত্যকাম নীচে শুত। ঐ যে বারান্দার ওপারে ঘরের দোরে তালা লাগান রয়েছে ওটা তার শোবার ঘর ছিল। আমার স্ত্রীর শোবার ঘর ওর ওপরে।"

"সত্যকামবাবু নীচে শুতেন কেন?"

ঊষাপতিবাবু উত্তর দিলেন না, উদাসচক্ষে বাহিরের জানালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের সুবিধার জন্যই সত্যকাম নীচের ঘরে শয়ন করিত। তাহার রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়েরও ঠিক ছিল না।

এই সময় ভিতর দিকের দরজার পর্দা সরাইয়া একটি মেয়ে হাতে সরবতের গেলাস লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের দেখিয়া থমকিয়া গেল, অনিশ্চিত স্বরে একবার "মামা—" বলিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল। মেয়েটির বয়স সতরো-আঠারো; সুন্দরী নয় কিন্তু পুরন্ত গড়ন, চটক আছে। বর্তমানে তাহার মুখে-চোখে শঙ্কার কালো ছায়া পড়িয়াছে।

ঊষাপতিবাবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "দরকার নেই।" মেয়েটি চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়িতে কে কে থাকে?"

ঊষাপতি বলিলেন, "আমরা ছাড়া আমার দুই ভাগনে ভাগনী থাকে।"

"এটি আপনার ভাগনী?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন এরা আপনার কাছে আছে?"

"বছরখানেক আগে ওদের বাপ মারা যায়। মা আগেই গিয়েছিল। সেই থেকে আমি ওদের প্রতিপালন করছি। বাড়িতে আমরা কজন ছাড়া আর কেউ নেই।"

"চাকর বাকর?"

"পুরনো চাকর সহদেব বাড়িতেই থাকে। সে ছাড়া একটা ঝি আর বামনী আছে, তারা রাত্রে থাকে না।"

"বুঝেছি। তারপর কাল রাত্রির ঘটনা বলুন।"

ঊষাপতিবাবু চোখের উপর দিয়া একবার করতল চালাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ। আওয়াজ শুনে আমি ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলাম না। তারপরই সদর দরজার কাছ থেকে সহদেব চিৎকার করে উঠল। ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এলাম; দেখি সহদেব দরজা খুলেছে, আর—সত্যকাম দরজার সামনে পড়ে আছে। প্রাণ নেই, পিঠের দিক থেকে গুলী ঢুকেছে।"

"গুলী! বন্দুকের গুলী?"

"হ্যাঁ। সত্যকাম রোজই দেরি করে বাড়ি ফিরত। সহদেব বারান্দায় শুয়ে থাকত, দরজায় টোকা পড়লে উঠে দোর খুলে দিত। কাল সে টোকা শুনে দোর খোলবার আগেই কেউ পিছন দিক থেকে সত্যকামকে গুলী করেছে।"

"গুলী। আমি ভেবেছিলাম—" ব্যোমকেশ থামিয়া বলিল, "তারপর বলুন।"

ঊষাপতিবাবু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন, "তারপর আর কী? পুলিসে টেলিফোন করলাম।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, "সত্যকামবাবুর ঘরে তালা কে লাগিয়েছে?"

ঊষাপতি বলিলেন, "সত্যকাম যখনই বাড়ি থেকে বেরুত, নিজের ঘরে তালা দিয়ে যেত। কালও বোধহয় তালা দিয়েই বেরিয়েছিল, তারপর—"

"বুঝেছি। ঘরের চাবি তা হলে পুলিসের কাছে?"

"খুব সম্ভব।"

"পুলিস ঘর খুলে দেখেনি?"

"না।"

"যাক, আপনার কাছে আর বিশেষ কিছু জানবার নেই। এবার বাড়ির অন্য সকলকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"কাকে ডাকব বলুন।"

"সহদেব বাড়িতে আছে?"

"আছে নিশ্চয়। ডাকছি।"

ঊষাপতিবাবু উঠিয়া গিয়া অন্দরের দ্বারের নিকট হইতে সহদেবকে ডাকিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সহদেব প্রবেশ করিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শরীরে কেবল হাড় কখানা আছে। মাথায় খাঁকড়া পাকা চুল, ভ্রূ পাকা, এমন কি চোখের মণি পর্যন্ত ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। তোবড়ানো শিরা-উপশিরা মুখে হাবলার মত ভাব।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম সহদেব? তুমি কদ্দিন এ-বাড়িতে কাজ করছ?"

সহদেব উত্তর দিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার আমাদের দিকে একবার ঊষাপতিবাবুর দিকে তাকাইতে লাগিল। ঊষাপতিবাবু বলিলেন, "ও আমার বাবার সময় থেকে এ-বাড়িতে আছে—প্রায় পঞ্চাশ বছর।"

ব্যোমকেশ সহদেবকে বলিল, "তুমি কাল রাত্রে—"

ব্যোমকেশ কথা শেষ করিবার আগেই সহদেব হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আমার কথাটা শুনে উত্তর দাও। কাল রাত্রে সত্যকামবাবু যখন দোরে টোকা দিয়েছিলেন তখন তুমি জেগে ছিলে?"

সহদেব পূর্ববৎ জোড়হস্তে বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।"

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, "মনে করবার চেষ্টা কর। সে-সময় দুম করে একটা আওয়াজ শুনেছিলে?"

"আমি কিছু জানিনে বাবু।"

অতঃপর ব্যোমকেশ যত প্রশ্ন করিল সহদেব তাহার একটিমাত্র উত্তর দিল—আমি কিছু জানিনে বাবু। এই সর্বাঙ্গীণ অজ্ঞতা কতখানি সত্য অনুমান করা কঠিন; মোট কথা সহদেব কিছু জানিলেও বলিবে না। ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি যেতে পার। ঊষাপতিবাবু, এবার আপনার ভাগনীকে ডেকে পাঠান।"

ঊষাপতিবাবু সহদেবকে বলিলেন, "চুমকিকে ডেকে দে।"

সহদেব চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চুমকি প্রবেশ করিল, চেষ্টাকৃত দৃঢ়তার সহিত টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া আরও গাঢ় হইয়াছে, আমাদের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নত করিল।

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, "তোমার মামার কাছে শুনলাম তুমি বছর খানেক হল এ-বাড়িতে এসেছ। আগে কোথায় থাকতে?"

চুমকি ধরা-ধরা গলায় বলিল, "মানিকতলায়।"

"লেখাপড়া কর?"

"কলেজে পড়ি।"

"আর তোমার ভাই?"

"দাদাও কলেজে পড়ে।"

"আচ্ছা, কাল রাত্তিরে তুমি কখন জানতে পারলে?"

চুমকি একটু দম লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ঘুমোচ্ছিলুম। দাদা এসে দোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, তখন ঘুম ভাঙল।"

"ও—তুমি রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোও?"

চুমকি যেন থতমত খাইয়া গেল, বলিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার শোবার ঘর নীচে না ওপরে?"

"নীচে, পিছন দিকে। আমার ঘরের পাশে দাদার ঘর।"

"তা হলে বন্দুকের আওয়াজ তুমি শুনতে পাওনি।"

"না।"

"ঘুম ভাঙার পর তুমি কী করলে?"

"দাদা আর আমি এই ঘরে এলুম। মামা পুলিসকে ফোন করছিলেন।"

"আর তোমার মামীমা?"

"তাঁকে তখন দেখিনি। এখান থেকে ওপরে গিয়ে দেখলুম তিনি নিজের ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।" চুমকির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিও।"

চুমকি ঘরের বাহিরে যাইতে না যাইতে তাহার দাদা ঘরে প্রবেশ করিল; মনে হইল সে দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল। ভাই বোনের চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরনের। প্যাঁচার চোখের মত তাহার চোখেও একটা নির্নিমেষ অচঞ্চল একাগ্রতা। সে অত্যন্ত সংযতভাবে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল।

"তোমার নাম কী?"

"শীতাংশু দত্ত।"

"বয়স কত?"

"কুড়ি।"

"কাল রাত্রে তুমি জেগে ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী করছিলে?"

"পড়ছিলাম।"

"কী পড়ছিলে? পরীক্ষার পড়া?"

"না। গোর্কির 'লোয়র ডেপ্থস' পড়ছিলাম। রাত্রে পড়া আমার অভ্যাস।"

"ও... বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে?"

"পেয়েছিলাম। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ বলে বুঝতে পারিনি।"

"তারপর?"

"সহদেবের চিৎকার শুনে গিয়ে দেখলাম।"

"তারপর ফিরে এসে তোমার বোনকে জাগালে?"

"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চিবুকের তলায় করতল রাখিয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম উষাপতিবাবুও নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছেন, প্রশ্নোত্তরের সব কথা তাঁহার কানে যাইতেছে কিনা সন্দেহ। মনের অন্ধকার অতলে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ আবার সওয়াল আরম্ভ করিল।

"তুমি রাত্রে শোবার সময় দরজা বন্ধ করে শোও?"

"না, খোলা থাকে।"

"চুমকির দোর বন্ধ থাকে?"

"হ্যাঁ। ও মেয়ে, তাই।"

"যাক।—কাল রাত্রে সকলে শুয়ে পড়বার পর তুমি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে?"

"না।"

"সদর দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবার অন্য কোনও রাস্তা আছে?"

"আছে। খিড়কির দরজা।"

"কাল রাত্রে খিড়কির দরজা দিয়ে কেউ বেরিয়েছিল?"

"না। বেরুলে আমি জানতে পারতাম। খিড়কির দরজা আমার ঘরের পাশেই। দোর খুললে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়। তা ছাড়া, রাত্রে খিড়কির দরজায় তালা লাগান থাকে।"

"তাই নাকি! তালার চাবি কার কাছে থাকে?"

"সহদেবের কাছে।"

"হুঁ। সত্যকামবাবু রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফিরতেন তুমি জান?"

"জানি।"

"রোজ জানতে পারতে কখন তিনি বাড়ি ফেরেন?"

"রোজ নয়, মাঝে মাঝে পারতাম।"

"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।"

শীতাংশু আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ উষাপতিবাবুর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ সংকুচিত স্বরে বলিল, "উষাপতিবাবু, এবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?"

উষাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন, "আমার স্ত্রী! কিন্তু তিনি—তাঁর অবস্থা—"

"তাঁর অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর ঘরে গিয়ে দু-একটা কথা—"

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইল না, একটি মহিলা অধীর হস্তে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে উষাপতিবাবুর স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, "কেন আপনি আমার স্বামীকে এমনভাবে বিরক্ত করছেন। কী চান আপনি? কেন এখানে এসেছেন?"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মহিলাটির বয়স বোধকরি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও কম বয়স মনে হয়। রঙ ফরসা, মুখে সৌন্দর্যের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমানে তাঁহার মুখে পুত্রশোক অপেক্ষা ক্রোধই অধিক ফুটিয়াছে। ব্যোমকেশ অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বলিল, "আমাকে মাফ করবেন, নেহাত কর্তব্যের দায়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি—"

মহিলাটি বলিলেন, "কে ডেকেছে আপনাকে? এখানে আপনার কোনও কর্তব্য নেই। যান আপনি, আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনি কি চান না যে, সত্যকামবাবুর মৃত্যুর একটা কিনারা হয়?"

"না, চাই না। যা হবার হয়েছে। আপনি যান, আমাদের রেহাই দিন।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

আমরা উষাপতিবাবুর পানে চাহিলাম। তিনি বিস্ময়াহতভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আছেন, যেন নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মহিলাটিও একবার স্বামীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

॥ চার ॥
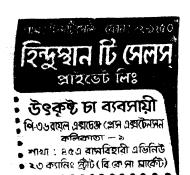
আমরা সদর দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উষাপতিবাবুও আমাদের পিছন পিছন আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের বিস্ময়াহত ভাব সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, "আমাদের মানসিক অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।"

দরজা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ বলিল, "ওটা কী?"

আসিবার সময় চোখে পড়ে নাই, কবাটের বাহিরের দিকে নীচের চৌকাট হইতে হাত খানেক উ'চুতে একটি সোনালী চাকতি চকচক করিতেছে। উষাপতিবাবু দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। চাকতিটা আয়তনে চাঁদির টাকার চেয়ে কিছু বড়। ব্যোমকেশ নত হইয়া সেটা দেখিল, আঙুল দিয়া সেটা পরীক্ষা করিল। বলিল, "রাংতার চাকতি, গ'দ দিয়ে কবাটে জোড়া রয়েছে।" সে সোজা হইয়া উষাপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কী?"

উষাপতিবাবু দ্বিধাভরে বলিলেন, "কী জানি, আগে লক্ষ্য করেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "সম্প্রতি কেউ সে'টেছে। বাড়িতে ছোট ছেলেপিলে থাকলে বোঝা যেত। কিন্তু—আপনি একবার খোঁজ নেবেন?"

উষাপতিবাবু সহদেবকে ডাকিলেন, সে যথারীতি বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।" চুমকিও কিছু বলিতে পারিল না। শীতাংশু বলিল, "আমি কাল সন্ধ্যের সময় যখন বাড়ি এসেছি তখন ওটা ছিল না।"

আমার মাথায় নানা চিন্তা আসিতে লাগিল। সত্যকামকে যে খুন করিয়াছে সে কি নিজের পরিচয়ের ইঙ্গিত এইভাবে রাখিয়া গিয়াছে? হয়তনের টেক্কা! লোমহর্ষণ উপন্যাসে এই ধরনের জিনিস দেখা যায় বটে। কিন্তু—

কোনও হদিস পাওয়া গেলনা। আমরা চলিয়া আসিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এখনও দশটা বাজেনি। চল, থানাটা ঘুরে যাওয়া যাক।"

থানার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ির লোকের এজেহার শুনলে। কী মনে হল?"

এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল। বলিলাম, "কাউকেই খুব বেশী শোকার্ত মনে হল না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, বেশী শোকে পাথর।"

বলিলাম, "প্রবাদ থাকতে পারে, কিন্তু উষাপতিবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর আচরণ খুব

বন্দুকের আওয়াজ বলে বুঝতে পারিনি

স্বাভাবিক নয়। সত্যকাম ভাল ছেলে ছিল না, নিজের উচ্ছৃংখলতায় বাপমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সবই সত্যি হতে পারে। তবু ছেলে তো। একমাত্র ছেলে। আমার বিশ্বাস এই পরিবারের মধ্যে কোথাও একটা মস্ত গলদ আছে।"

"অবশ্য। সত্যকামই তো একটা মস্ত গলদ। সে যাক, দরজায় রাংতার চাকতির অর্থ কিছু বুঝলে?"

"না। তুমি বুঝেছ?"

"সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয়—"

থানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, দারোগা ভবানীবাবু আমাদের পরিচিত লোক। বয়স্থ ব্যক্তি; ক্রস-বেল্ট টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া কাজ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছেন মনে হইল না। তবু যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া শেষে খাটো গলায় বলিলেন, "আপনি আবার এর মধ্যে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছি।"

ভবানীবাবু পূর্ববৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, "ছোঁড়া পাকা শয়তান ছিল। যে তাকে খুন করেছে সে সংসারের উপকার করেছে। এমন লোককে মেডেল দেওয়া উচিত।"

ব্যোমকেশ বলিল, "তা বটে। আপনারা যা করছেন করুন, আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই।"

ভবানীবাবু তাহাকে দৃষ্টি-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "সত্যান্বেষণ? কী জানতে চান বলুন।"

"পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও বোধহয় আসেনি?"

"না। সন্ধ্যে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।"

"সন্ধ্যের পর আমি আপনাকে ফোন করব।—বন্দুকের গুলীতেই মৃত্যু হয়েছে?"

"বড় বন্দুক নয়, পিস্তল কিম্বা রিভলভার। গুলীটা পিঠের বাঁ দিকে ঢুকেছে, সামনে কিন্তু বেরোয়নি। শরীরের ভিতরেই আছে। পিঠে যে ফুটো হয়েছে সেটা খুব ছোট, তাই মনে হয় পিস্তল কিম্বা রিভলবার।"

"পিঠের দিকে ফুটো হয়েছে, তার মানে যে গুলী করেছে সে সত্যকামের পিছনে ছিল।"

"হ্যাঁ। হয়তো ফটকের ভিতর দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল, যেই সত্যকাম সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমনি গুলী করেছে। তারপর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

"হুঁ। এ-পাড়ায় একটা গুণ্ডার আস্তানা আছে আপনি জানেন?"

"জানি। তাদের কাজ নয়। তারা দু-চার ঘা প্রহার দিতে পারে, খুন করবে না। সবাই ভদ্রলোকের ছেলে।"

ভদ্রলোকের ছেলে খুন করে না পুলিসের মুখে একথা নূতন বটে। কিন্তু ব্যোমকেশ সেদিক দিয়া গেল না, বলিল, "ভদ্রলোকের ছেলের কথায় মনে পড়ল। সত্যকামের এক পিসতুত ভাই বাড়িতে থাকে, তাকে দেখেছেন?"

ভবানীবাবু একটু হাসিলেন, "দেখেছি। পুলিসে তার নাম আছে।"

"তাই নাকি! কী করেছে সে?"

"ছোকরাটা ভালই ছিল, তারপর গত দাঙ্গার সময় ওর বাপকে মুসলমানেরা খুন করে। সেই থেকে ওর স্বভাব বদলে গেছে। আমাদের সন্দেহ ও কম-সে-কম গোটা তিনেক খুন করেছে। অবশ্য পাকা প্রমাণ কিছু নেই।"

"ওর চোখের চাউনি দেখে আমারও সেই রকম সন্দেহ হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় এ-ব্যাপারে ওর হাত আছে?"

"কিছুই বলা যায় না ব্যোমকেশবাবু। সত্যকামের মত পাঁঠা যেখানে আছে সেখানে সবই সম্ভব। তবে যতদূর জানতে পেরেছি যখন খুন হয় তখন সে বাড়ির মধ্যেই ছিল। সহদেবের চিৎকার শুনে ওর মামা আর ও একসঙ্গে সদর দরজায় পৌঁছেছিল। সত্যকামকে পিছন থেকে যে গুলী করেছে তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, "ছাতের ওপর থেকে গুলী করা কি সম্ভব?"

ভবানীবাবু বলিলেন, "ছাতের ওপর থেকে গুলী করলে গুলীটা শরীরের ওপর দিক থেকে নীচের দিকে যেত। গুলীটা গেছে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে। সুতরাং—"

এই সময় টেলিফোন বাজিল। ভবানীবাবু টেলিফোনের মধ্যে দু'চার কথা বলিয়া আমাদের কহিলেন, "আমাকে এখনি বেরুতে হবে। জোর তলব—"

"আমরাও উঠি।" ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভাল কথা, মৃত্যুকালে সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—"

"ঐ যে পাশের ঘরে রয়েছে, দেখুন না গিয়ে।" বলিয়া ভবানীবাবু কোমরে বেল্ট বাঁধিতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে একটি টেবিলের উপর কয়েকটি জিনিস রাখা রহিয়াছে। সোনার সিগারেট-কেসটি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তা ছাড়া হুইস্কির ফ্লাস্ক, চামড়ার মনিব্যাগ, একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ প্রভৃতি রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সেগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভবানীবাবু এতক্ষণে বেল্ট বাঁধা শেষ করিয়াছেন, দেরাজ হইতে পিস্তল লইয়া কোমরের খাপে পুরিতেছেন। বলিলেন, "দেখলেন? আর কিছু দেখবার নেই তো? আচ্ছা চলি।"

ভবানীবাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার তৎপরতা দেখিয়া মনে হইল, তিনি আসামীকে ধরিবার কোনও চেষ্টাই করিবেন না। শেষ পর্যন্ত সত্যকামের মৃত্যু-রহস্য অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে।

আমরাও বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "এতদূর যখন এসেছি, চল বাঘের আস্তানা দেখে যাই।"

"এখন কি বাঘের দেখা পাবে?"

"দেখাই যাক না। আর কেউ না থাক ফেলু মশাই নিশ্চয় গুহায় আছেন।"

বাঘ কিন্তু গুহায় নাই। গিয়া দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো। একজন ভৃত্য-শ্রেণীর লোক দাওয়ায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, সে বলিল, "ভুতু সর্দারকে খুঁজতেছেন? আজ্ঞে তিনি আজ সকালের গাড়িতে কাশী গেছেন।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বল কি! একেবারে কাশী!—তুমি কে?"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে আমি ভেনার নফর। ঘর ঝাঁট দি, কাপড় কাচি, কলসিতে জল ভরি। আজ সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখনু সর্দার খবরের কাগজ পড়তেছেন। কলসিতে জল ভরে নিয়ে এনু, সর্দার সেজেগুজে তৈরী। কইলেন, আমি কাশী চনু, সন্দে বেলা ছেলেরা এলে কয়ে দিও।"

বুঝিতে বাকী রহিল না, ভুবেশ্বর বাগ খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়াছেন এবং বিলম্ব না করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বাসায় ফিরিলাম প্রায় সওয়া এগারোটায়। দেখি বন্ধ সদর দরজার সামনে নন্দ ঘোষ প্রতীক্ষমাণভাবে পায়চারি করিতেছে। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখে শঙ্কিত অস্বাচ্ছন্দ্য। ব্যোমকেশ দ্বারের কড়া নাড়িয়া স্মিতমুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী খবর?"

"আজ্ঞে স্যার"—বলিয়া নন্দ ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

পুঁটিরাম আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আমরা নন্দকে লইয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম। নন্দ আরও দু-চার বার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, "সত্যকামের খবর শুনেছেন?"

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "শুনেছি। তুমি কোথায় শুনলে?"

নন্দ বলিল, "সকাল বেলায় ও-পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, খবর পেলাম কাল রাত্তিরে কেউ সত্যকামকে গুলী করে মেরেছে। আমি কিন্তু কিছু জানি না স্যার। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই যে আপনারা আখড়া থেকে চলে এলেন, তারপর আমি আর ওদিকে যাইনি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বোস, তোমাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করি। ও-পাড়ায় তোমার জানাশোনার মধ্যে কারুর পিস্তল কিম্বা রিভলভার আছে?"

"না স্যার। থাকলেও আমি জানি না।"

"তোমাদের আখড়ায় কারুর নেই?"

"জানি না। তবে একটা লোক ভুবেশ্বরের কাছে চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল।"

"চোরাই পিস্তল!"

"হ্যাঁ স্যার। শুনেছি যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত।"

"ভুবেশ্বর কিনেছিল?"

"তা জানি না। আমাদের সামনে কেনেনি।"

"আচ্ছা ও-কথা যাক। সত্যকাম ভদ্রঘরের মেয়েদের পিছনে লাগত। কীভাবে পিছনে লাগত বলতে পার?"

নন্দ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "স্যার, সত্যকাম জাদুমন্ত্র জানত, দুটো কথা বলেই মেয়েগুলোকে বশ করে ফেলত। তারপর নিজের দোকানে নিয়ে যেত, ভাল ভাল জিনিস উপহার দিত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত—" কুণ্ঠিতভাবে সে চুপ করিল।

"বুঝেছি। মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়।" গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ সিগারেট টানিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "স্ত্রী-স্বাধীনতাও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। যাক, কোন কোন ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে সত্যকামের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তুমি বলতে পার?"

নন্দ আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, "সকলের কথা জানি না স্যার, তবে ৭৩ নম্বরের অখিলবাবু আমাদের ব্যায়াম সমিতিতে নালিশ করেছিলেন, তাঁর মেয়ে শোভনা—! তারপর রামেশ্বরবাবুর নাতনী—সেও কিছুদিন সত্যকামের ফাঁদে পড়েছিল, ভীষণ কেলেঙ্কারি হবার যোগাড় হয়েছিল। যা হক, তার বিয়ে হয়ে গেছে—"

"আর কেউ?"

"আর ভবানীবাবুর মেয়ে সলিলা—"

"কোন ভবানীবাবু?"

"ও-পাড়ার থানার দারোগা ভবানীবাবু! তিনি মেয়েকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর এখন মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ব্যোমকেশের সহিত আমার একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়ামোড়া ভাঙিল, নন্দকে বলিল, "আচ্ছা নন্দ, তুমি আজ এস। অন্য সময় তোমার সঙ্গে আবার কথা হবে। ভাল কথা, তোমাদের ওস্তাদ পালিয়েছে। তুমি এখন কিছুদিন আর ওদিকে যেও না।"

নন্দ আবার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, "আচ্ছা স্যার।"

॥ পাঁচ ॥

সমস্ত দিন ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। বিকেলে সত্যবতী দু-একবার কাশ্মীর যাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যোমকেশ শুনিতে পাইল না, ইজিচেয়ারে শুইয়া কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "তাড়া কিসের? এ-ব্যাপারের আগে নিষ্পত্তি হোক।"

সত্যবতী বলিল, "নিষ্পত্তি হতে বেশী দেরি নেই। মুখ দেখে বুঝতে পারছ না!"

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কথা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, আপন মনে "রাংতার চাকতি" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সত্যবতী আমার পানে অর্থপূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিল।

সন্ধ্যার পর থানায় ফোন করিবার কথা। আমি স্মরণ করাইয়া দিলে ব্যোমকেশ বলিল, "তুমিই ফোন কর অজিত।"

থানার নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ভবানীবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, "এইমাত্র রিপোর্ট এসেছে। মৃত্যুর সময় রাত্রি বারটা থেকে দুটোর মধ্যে। গুলিটা ·৪৫ রিভলভারের, বাঁ দিকে স্ক্যাপিউলার নীচে দিয়ে ঢুকে হৃদ্‌যন্ত্র ভেদ করে ডান দিকের তৃতীয় পঞ্জরে আটকেছে। গুলীর গতি নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে।......অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।......আর কি! পেটের মধ্যে খানিকটা মদ পাওয়া গেছে।"

ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, "গুলীর গতি—কী বললে?"

"নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে। অর্থাৎ যে গুলী করেছে সে রাস্তার বাঁ দিকে ঝোপের মধ্যে বসে ছিল, বসে বসেই গুলী করেছে।"

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, "উবু হয়ে বসে গুলী করেছে! কেন?"

"তা জানি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে গুলী করেনি।"

ব্যোমকেশ আবার ইজিচেয়ারে শয়ন করিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমাদের ধারণা আততায়ী আগে থেকে ফটকের ভিতর দিকে লুকিয়ে ছিল, সত্যকাম ফটক দিয়ে ঢুকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট রাস্তা পার হয়ে সদর দরজার সামনে এসে কড়া নাড়লে, তখন আততায়ী তাকে গুলী করল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? সত্যকাম যেই ফটক দিয়ে ঢুকল আততায়ী তখনই তাকে গুলী করল না কেন। তাতেই তো তার সুবিধে, গুলী করেই চট করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয়ও থাকত না।"

"প্রশ্নের উত্তর কী—তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ বলিল, "প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, আততায়ী ওদিক থেকে গুলী করেনি। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা, রাংতার চাকতিটা কে লাগিয়েছিল, কখন লাগিয়েছিল এবং কেন লাগিয়েছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওটা তা হলে আকস্মিক নয়?"

"যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ওটা আকস্মিক নয়, ওর একটা গূঢ় অর্থ আছে। সেই অর্থ জানতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে।"

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, রাংতার চাকতির তাৎপর্য কী? যদি ধরা যায় আততায়ী ওটা লাগাইয়াছিল তবে তাহার উদ্দেশ্য কী ছিল? যদি আততায়ী না লাগাইয়া থাকে তবে কে লাগাইল? বাড়ির কেহ যদি না হয় তবে কে? সত্যকাম কি? কিন্তু কেন?

ব্যোমকেশ হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, "অজিত, সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—থানায় টেবিলের ওপর দেখেছিলে—মনে আছে?"

বলিলাম, "সিগারেট-কেস ছিল, রিস্ট-ওয়াচ ছিল, মনিব্যাগ ছিল, মদের ফ্লাস্ক ছিল আর—একটা ইলেকট্রিক টর্চ ছিল।"

ব্যোমকেশ আবার আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল, "ইলেকট্রিক টর্চ—! কলকাতায় পথ চলবার জন্যে ইলেকট্রিক টর্চ দরকার হয় না।"

"না। কিন্তু ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত যেতে হলে দরকার হয়।"

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, "তা হলে সত্যকাম টর্চের আলোয় আততায়ীকে দেখতে পায়নি কেন?"

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর যোগাইল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ব্যোমকেশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, "কাল সকালে শীতাংশুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা দরকার।"

আমি উচ্চকিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর কিছু বলিল না; বোধ করি কাউকাউ গানের শব্দ। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখের বিরস অন্যমনস্কতা আর নাই, যেন সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকাল ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখি ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। আমি চায়ের পেয়ালা লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলে সেও আসিয়া বসিল। তাহার মুখ গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাকে ফোন করছিলে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "উষাপতিবাবুকে।"

"হঠাৎ উষাপতিবাবুকে?"

"শীতাংশুকে পাঠিয়ে দিতে বললাম।"

"ও।—ওদের বাড়ির খবর কী?"

"খবর—পুলিস কাল সন্ধ্যেবেলা লাশ ফেরত দিয়েছিল...ওঁরা শেষ রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরেছেন।" ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "কাল যদি পুলিস খানাতল্লাসি করত তা হলে রিভলবারটা বোধ হয় বাড়িতেই পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যাবে না।"

"তার মানে বাড়ির লোকের কাজ!"

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আধঘণ্টা পরে শীতাংশু আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, "এস—বোস। কাল তোমার মামার সামনে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।"

শীতাংশু ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসিল এবং অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল, "কাল থানায় খবর পেলাম তুমি নাকি দাঙ্গার সময় গোটা দুত্তিন খুন করেছ। কথাটা সত্যি?"

শীতাংশু উত্তর দিল না, কিন্তু ভয় পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না; নির্ভীক একাগ্র চোখে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, "আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার, আমি পুলিসের লোক নই।"

শীতাংশুর গলাটা যেন একটু ফুলিয়া উঠিল, সে চাপা গলায় বলিল, "হ্যাঁ। ওরা আমার বাবাকে—"

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, "জানি। কী দিয়ে খুন করেছিলে?"

থানার নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম

"ছোরা দিয়ে।"

"তুমি কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছ?"

"না।"

"সত্যকামের রিভলভার ছিল?"

"জানি না। বোধহয় ছিল না।"

"বাড়িতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কিনা জান?"

"জানি না।"

"সত্যকামের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?"

"না। দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলতাম।"

"সত্যকাম লম্পট ছিল তুমি জানতে?"

"জানতাম।"

"তোমার বাবাকে তুমি ভালবাসতে। তোমার বোন চুমকিকেও নিশ্চয় ভালবাস?"

শীতাংশু উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "সত্যকামকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কোনদিন হয়েছিল?"

শীতাংশু এবারও উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নীরবতার অর্থ স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। সত্যকামকে তুমি বোধহয় শাসিয়ে দিয়েছিলে।"

শীতাংশু সহজভাবে বলিল, "হ্যাঁ। তাকে বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে বেচাল দেখলেই খুন করব।"

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তীক্ষ্ণ চক্ষে নয়, যেন একটু অন্যমনস্কভাবে। তারপর বলিল, "সে রাত্রে সহদেবের চিৎকার শুনে তুমি সদরে গিয়ে কী দেখলে?"

"দেখলাম সত্যকাম দরজার বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।"

"কী করে দেখলে? সেখানে আলো ছিল?"

"সত্যকামের হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তারই আলোতে দেখলাম। তারপর মামা এসে সদরের আলো জ্বেলে দিলেন।"

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। দুই তিনটি লম্বা টান দিয়া বলিল, "ও কথা থাক। সত্যকামকে নিয়ে তোমার মামা আর মামীর মধ্যে খুবই অশান্তি ছিল বোধহয়?"

"অশান্তি—?"

"হ্যাঁ। ঝগড়া বকাবকি—এ-রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।"

শীতাংশু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না, ঝগড়া বকাবকি হত না।"

"একেবারেই না?"

"না। মামা আর মামীমার মধ্যে কথা নেই।"

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, "কথা নেই! তার মানে?"

"মামা মামীমার সঙ্গে কথা বলেন না, মামীমাও মামার সঙ্গে কথা বলেন না।"

"সে কি, কবে থেকে?"

"আমি যবে থেকে দেখছি। আগে যখন মানিকতলায় ছিলাম প্রায়ই মামার বাড়ি আসতাম। তখনও মামা-মামীমাকে কথা বলতে শুনিনি।"

"তোমার মামীমা কেমন মানুষ? ঝগড়াটে?"

"মোটেই না। খুব ভাল মানুষ।"

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমার মনে পড়িয়া গেল, কাল সকালবেলা উষাপতিবাবুর স্ত্রী সহসা ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি বিস্ময়-ভরা চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলেন। এখন তাঁহার সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে বাকি নাই। ... স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ [illegible]।

শীতাংশু চলিয়া যাইবার পরও ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ খুলিল, [illegible]। "শীতাংশুকে কেমন মনে হল?"

"মনে হল সে সত্যি কথা বলছে।"

"ছেলেটা বুদ্ধিমান, ভারী বুদ্ধিমান।"

বলিয়া সে আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল।

আধঘণ্টা পরে তাহার ধ্যান ভাঙিল বাহিরে মোটরের হর্ন বাজার শব্দে। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম। দেখি— উষাপতিবাবু।

॥ ছয় ॥

ব্যোমকেশের আহ্বানে উষাপতিবাবু চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্ত অবসন্ন মুখ, চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ; শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। দুইজনে সিগারেট ধরাইয়া অনুসন্ধিৎসু চক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তারপর উষাপতিবাবু বলিলেন, "[illegible]। আপনার ফোন পাবার পর থানায় গিয়েছিলাম, ওরা তো কোনও খবরই রাখে না। তাই ভাবলাম দেখি যদি আপনি কোনও খবর পেয়ে থাকেন।"

উষাপতিবাবুর কথায় যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ছিল ব্যোমকেশ সরাসরি তাহার উত্তর দিল না, বলিল, "একদিনের কাজ নয়, সময় লাগবে। আপনার উপর দিয়ে খুবই ধকল যাচ্ছে, আপনি আজ বাড়ি থেকে না বেরুলেই পারতেন। আপনার স্ত্রীকেও দেখা শোনা করা দরকার।"

উষাপতিবাবুর মুখ লক্ষ্য করিলাম, স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার মুখের কোনও ভাবান্তর হইল না; স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে দীর্ঘ-

কালের বিপ্রয়োগ তাহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। বলিলেন, "আমার স্ত্রীর জন্যেই ভাবনা। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।" একটু থামিয়া বলিলেন, "ভাবছি কিছুদিনের জন্যে ওঁকে নিয়ে বাইরে ঘুরে এলে কেমন হয়। কলকাতার বাইরে গেলে হয়তো ওঁর মনটা—"

"তা ঠিক। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না। কলকাতা ছেড়ে যেখানে হক গেলেই বোধহয় কাজ হবে। কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লী—। কিন্তু পুলিস আপত্তি করবে না তো?"

"পুলিসকে বলে যাবেন। আমার বোধ হয় আপত্তি করবে না।"

"যদি আপত্তি না করে, কাল পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতা যেন বিষবৎ মনে হচ্ছে।—আচ্ছা নমস্কার।" বলিয়া উষাপতিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার দোকান কি বন্ধ রাখবেন?"

"দোকান—সুচিত্রা? না, বন্ধ রাখব কেন? দোকানের পুরনো খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবু আছেন। বিশ্বাসী লোক; তিনি চালাবেন। আমার ভাগনে শাঁটুকেও ভাবছি দোকানে ঢুকিয়ে নেব, পড়াশুনো করে আর কী হবে, দোকানটাই দেখুক। আর তো আমার কেউ নেই।" নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দ্বারের পানে চাহিলেন।

"আপনি কি এখন দোকানের দিকে যাচ্ছেন?"

"না, দোকানে এখন আর যাব না। ধনঞ্জয়-বাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।"

"আসুন তা হলে নমস্কার।"

উষাপতিবাবু প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ পর পর তিনটা সিগারেট নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি একবার বেরুচ্ছি। তুমি বাড়িতেই থাক।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"সুচিত্রা এম্পোরিয়মে। খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।"

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি স্নান সারিয়া অপেক্ষা করিতেছি, সত্যবতী অস্থিরভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে। ব্যোমকেশ পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, পাখা চালাইয়া দিয়া তক্তপোষের উপর লম্বা হইল। বসন্তকাল হইলেও দুপুরবেলার রৌদ্র বেশ কড়া।

বলিলাম, "খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠেছিল দেখছি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "হুঁ। লোকটি কে জান? পরশু সুচিত্রায় দোতলায় যে ক্যাশিয়ার আমাদের ক্যাশমেমো কেটেছিল সেই।"

"তাই নাকি? তা কী পেলে তার কাছ থেকে?"

"পেলাম—" ব্যোমকেশ ঘূর্ণত পাখার পানে চাহিয়া হাসিল, "একটা প্রীতি উপহার।"

"প্রীতি উপহার!"

"হ্যাঁ। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বিয়ের সময় প্রীতি উপহার ছাপার খুব চলন ছিল, এখন কমে গেছে। ঘুড়ির কাগজের মত পিতপিতে কাগজের রুমালে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, মাথার ওপর ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির ছবি। দেখেছ নিশ্চয়।"

"দেখেছি। খাজাঞ্চি মশায় এই প্রীতি উপহার তোমাকে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। ওই যে পাঞ্জাবির পকেটে রয়েছে, বার করে দেখ না।"

"কিন্তু—কার বিয়ের প্রীতি উপহার?"

"পড়েই দেখ না।"

পাঞ্জাবির পকেট হইতে প্রীতি উপহার বাহির করিলাম। পিতপিতে কাগজে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, উপরে মুক্তপক্ষ প্রজাপতি। এবং তাহাকে ঘিরিয়া রামধনুর আকারে লেখা আছে—কুমারী সুচিত্রার সঙ্গে উষাপতির শুভ পরিণয়। তারপর কবিতা। এ-কবিতা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এমন দিগগজ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। সর্বশেষে কাব্য-রচয়িতার নাম; **শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল ও সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ।**

বলিলাম, "এই কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে। এ ছাড়া আর কিছু পেলে না?"

"আর কিছুর দরকার নেই। ওই প্রীতি উপহারের মধ্যে সব কিছু আছে।"

"কী আছে? আমি তো কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ। ভাল করে দেখ।"

কবিতা আবার পড়িলাম। পড়িতে খুবই কষ্ট হইল, তবু পড়িলাম। তারপর বলিলাম, "এ-কবিতার মধ্যে যদি কোনও ইশারা ইঙ্গিত থাকে তার মানে বোঝা আমার কর্ম নয়। সুচিত্রা নিশ্চয় উষাপতিবাবুর স্ত্রীর নাম। তাঁর সঙ্গে উষাপতিবাবুর বিয়ে হওয়াতে ধনঞ্জয় মণ্ডল এবং সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন এইটুকুই আন্দাজ করছি।"

"কবিতা নয়, তারিখ তারিখ! বিয়ের তারিখটা দেখ।"

নীচের দিকে বাঁ কোণে লেখা ছিল:

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

বলিলাম, "তারিখ দেখলাম, কিন্তু অজ্ঞান-তমসী দূর হল না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, "সত্যকাম তার জন্মতারিখ বলেছিল, মনে আছে?"

"বলেছিল মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে নেই।"

"আমার মনে আছে।"

অধীর হইয়া উঠিলাম, "এ-সব সন-তারিখের মানে কী? সত্যকামের খুনের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী?"

"ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভেবে দেখ।"

"ভেবে দেখতে পারি না। তুমি যদি বুঝে থাক কে খুন করেছে পষ্টাপষ্টি বল।"

"তুমি বুঝতে পারছ না?"

"না। কে খুন করেছে সত্যকামকে?"

"উষাপতিবাবু।"

"বাপ ছেলেকে খুন করেছে?"

"করলেও অন্যায় হত না, কিন্তু সত্যকাম উষাপতিবাবুর ছেলে নয়।"

মাথা গুলাইয়া গেল, কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া রহিলাম। তারপর সত্যবতী ভিতরের দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁগো, আজ কি তোমাদের উপোস?"

* * * *

অপরাহ্নে চারটের সময় আবার উষাপতি-বাবু আসিলেন। এবারও অনাহূত আসিয়াছেন, সকালবেলার ক্লান্ত বিষণ্ণতা আর নাই, চক্ষে সতর্ক তীক্ষ্ণতা। তিনি আসিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলেন কিছুক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"কী জানতে গিয়েছিলেন?"

"যা জানতে গিয়েছিলাম তা জানতে পেরেছি।"

"কী জানতে পেরেছেন?"

"সবই জানতে পেরেছি উষাপতিবাবু। এমন কি দোরে আঁটা রাংতার চাকতির তত্ত্বও অজানা নেই।"

উষাপতিবাবুর প্রশ্নের তীব্রতা যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। তিনি আবার খানিকক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সংবৃত স্বরে বলিলেন, "যা জানতে পেরেছেন তা আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনার বিয়ের তারিখ আর সত্যকামের জন্মের তারিখ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইনি উষাপতিবাবু। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম। সত্যকাম আমাকে বলেছিল তার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে, আসামীকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার কোনও দায়িত্ব আমার নেই।"

উষাপতিবাবু স্থির নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইল। এতক্ষণ তিনি যেন যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া ছিলেন, এখন সহসা অস্ত্র নামাইলেন। অবিশ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "আপনি যা জানতে পেরেছেন পুলিসকে তা বলবেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল, না, "পুলিস আমার সাহায্য চায় না, আমি কেন গায়ে পড়ে ওদের সাহায্য করতে যাব?"

উষাপতিবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দুই হাতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার শরীর দুই তিন-বার অবরুদ্ধ আবেগে ঝাঁকানি দিয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন মুখ খুলিলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ-কাল রোগভোগের পর মরণাপন্ন রোগী প্রথম আরোগ্যের আশ্বাস পাইলে তাহার মুখে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে উষাপতিবাবুর মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিলেন, "ব্যোমকেশবাবু, সত্যকামের মৃত্যু কেন দরকার হয়েছিল আপনি শুনবেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "শুনব। আপনি সব কথা বলুন।"

উষাপতিবাবু একবার কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিলেন। তাঁহার চাহনির অর্থ: ব্যোমকেশের কাছে তিনি নিজের মর্মকথা বলিতে রাজি থাকিলেও আর কাহারও সম্মুখে বলিতে অনিচ্ছুক। ব্যোমকেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে বলিল, "অজিত, তুমি একবার হাওড়া স্টেশনে যাও, এনকোয়ারি অফিস থেকে জেনে এস কাশ্মীর যাওয়ার ব্যবস্থা কীরকম। কাশ্মীরে গণ্ডগোল চলছে, আগে থাকতে খবরাখবর নিয়ে রাখা ভাল।"

মনে মনে একটু নিরাশ হইলাম, তারপর জামা কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

॥ সাত ॥

হাওড়া স্টেশনের কাজ সারিয়া যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সদর দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উষাপতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন, ছায়াচ্ছন্ন ঘরের অপর প্রান্তে জানালার সামনে চেয়ার টানিয়া সত্যবতী ও ব্যোমকেশ ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে। জানালা দিয়া ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া সত্যবতী একটু সরিয়া বসিল।

আমি কাছে আসিয়া বলিলাম, "বেশ তো কপোত-কপোতীর মত বসে মলয় মারুত সেবন করছ। খোকা কোথায়?"

সত্যবতী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "পুঁটিরাম খোকাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "দেখ অজিত, কবিদের কথা মিছে নয়। তারা যে বসন্তঋতুর সমাগমে ক্ষেপে ওঠেন, তার যথেষ্ট কারণ আছে। মলয় মারুতে যুবক যুবতীরাই বেশী ঘায়েল হয় বটে কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন না। আমার বিশ্বাস, এটা যদি বসন্তকাল না হত তা হলে উষাপতিবাবু সত্যকামকে খুন করতেন কিনা সন্দেহ।"

বলিলাম, "বল কি! বসন্তকালের এমন মারাত্মক শক্তির কথা কবিরা তো কিছু লেখেননি!"

ব্যোমকেশ বলিল, "স্পষ্ট না লিখলেও ইশারায় বলেছেন। শক্তি মাত্রেই মারাত্মক; যে আগুন আলো দেয় সেই আগুনই পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে।—কিন্তু যাক, কাশ্মীরের খবর কী বল।"

বলিলাম, "কাশ্মীরে লড়াই বেধেছে, সাধারণ লোককে যেতে দিচ্ছে না। যেতে হলে ভারত সরকারের পারমিট চাই।"

আমি একটা চেয়ার আনিয়া ব্যোমকেশের অন্য পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল "পারমিট জোগাড় করা শক্ত হবে না। ভারত সরকারের সঙ্গে এখন আমার গভীর প্রণয়, অন্তত যতদিন বল্লভভাই প্যাটেল বেঁচে আছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই মিলে কাশ্মীর যাওয়া কি ঠিক হবে? খোকা সবেমাত্র স্কুলে ঢুকেছে, গরমের ছুটিরও দেরি আছে। ওকে স্কুল কামাই করিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত মনে হচ্ছে না।"

সত্যবতী বলিল, "খোকা যাবে কেন? খোকা বাড়িতেই থাকবে। ঠাকুরপো, তুমি খোকার দেখাশুনো করতে পারবে না?"

আমি কিছুক্ষণ সত্যবতীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, "ও—এই মতলব। তোমরা দুটিতে হংস-মিথুনের মত কাশ্মীর উড়ে যাবে, আর আমি খোকাকে নিয়ে বাসায় পড়ে থাকব। ভাই ব্যোমকেশ, তুমি ঠিক বলেছ, বসন্তঋতু বড় মারাত্মক ঋতু। কিন্তু কুছপরোয়া নেই। যাও তোমরা, টো টো করে বেড়াও গে, আমি খোকাকে নিয়ে মনের আনন্দে থাকব। সত্যি কথা বলতে কি, কাশ্মীর যাবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। বাংলা দেশই আমার ভূ-স্বর্গ—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

সত্যবতী ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিয়া হাসি গোপন করিল। ব্যোমকেশ মৃদু গুঞ্জনে কবিতা আবৃত্তি করিল, "যৌবন মধুর কাল, আও বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন।—একটা সিগারেট দাও।"
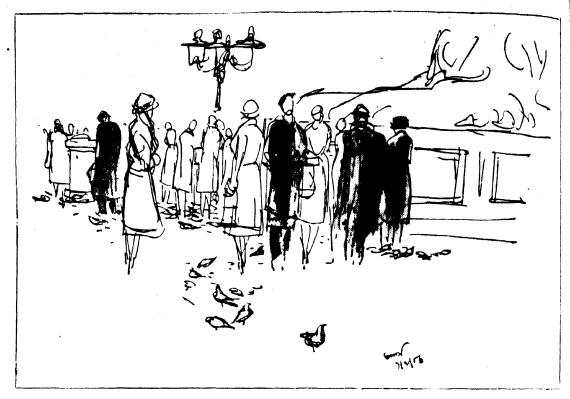
লণ্ডনের রাজপথ — শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

সিগারেট দিয়া বলিলাম, "কবিতা পড়ে পড়ে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, উষাপতি যে নিজের চরিতামৃত শুনিয়ে গেলেন তা বলতে বাধা আছে কি?"

ব্যোমকেশ বলিল, "কিছুমাত্র না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের দুজনকেই শোনাতে চাই। বড় মর্মান্তিক কাহিনী।"

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

"সত্যকাম আমার কাছে এসেছিল এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে—আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় আপনি অনুসন্ধান করবেন। সে জানত কে তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু তার নাম আমাকে বলল না। তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগল—নাম বলতে চায় না কেন? এখন জানতে পেরেছি, নাম না বলার গুরুতর কারণ ছিল, পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ত। সে যে জারজ, তার মা যে কলঙ্কিনী, এ-কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি; নিজের মুখে নিজের কলঙ্ক-কথা কটা লোক প্রকাশ করতে পারে? সবাই তো আর সত্যযুগের সত্যকাম নয়।

"তবু একটা ইঙ্গিত সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল—তার জন্ম-তারিখ। কিন্তু এমন-ভাবে দিয়েছিল যে, একবারও সন্দেহ হয়নি তার জন্ম-তারিখের মধ্যেই তার মৃত্যু রহস্যের চাবি আছে। সে জানত, আমি যদি অনুসন্ধান আরম্ভ করি তা হলে জন্ম তারিখটা আমার কাজে লাগবে। সত্যকাম বিবেকহীন লম্পট ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধির অভাব ছিল না।

"এবার গোড়া থেকে গল্পটা বলি। সত্যকামের জন্মের আগে থেকে যে-গল্পের সূত্রপাত। উষাপতিবাবুর মুখেই এ-গল্পের বেশির ভাগ শুনেছি, তবু গল্পটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেকে রেয়াত করেননি, নিজের দোষ দুর্বলতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

"বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রমাকান্ত চৌধুরী সুচিত্রা এম্পোরিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। রমাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের নাম সুচিত্রা, মেয়ের নামেই দোকানের নাম। চৌধুরী মশায় ভারী চতুর ব্যবসাদার ছিলেন, দু-চার বছরের মধ্যেই তাঁর দোকান ফেঁপে উঠল। ধর্মতলায় নতুন বাড়ি তৈরি হল, জমজমাট ব্যাপার। চৌধুরী মশায়ের সুচিত্রা এম্পোরিয়ম বিলিতী দোকানের সঙ্গে টেক্কা দিতে লাগল।

"উষাপতি দাস ১৯২৫ সনে সামান্য শপ্-অ্যাসিসট্যাণ্টের চাকরি নিয়ে সুচিত্রা এম্পোরিয়মে ঢোকেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ; গরিবের ঘরের বাপ-মা-মরা ছেলে, লেখাপড়া বেশী শেখেননি। কিন্তু চেহারা ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। দু-চার দিনের মধ্যেই তিনি দোকানের মাল বিক্রি করার কায়দা-কানুন শিখে নিলেন, খদ্দেরকে কী করে খুশী রাখতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ক্রমে স্বয়ং কর্তার সুনজর পড়ল তাঁর ওপর। দু-চার টাকা করে মাইনে বাড়তে লাগল।

"দু-বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন উষাপতিবাবুর চরম ভাগ্যোদয় হল। রমাকান্ত চৌধুরী তাঁকে নিজের অফিস-ঘরে ডেকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।' এ-প্রস্তাব উষাপতির কল্পনার অতীত, তিনি যেন চাঁদ হাতে পেলেন। সেই যে রূপকথা আছে, পথের ভিকিরির সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে, এ যেন তাই। সুচিত্রাকে উষাপতি আগে অনেকবার দেখেছেন, সুচিত্রা প্রায়ই দোকানে আসতেন। ভারী মিষ্টি নরম চেহারা। উষাপতির মন রোমান্সের গন্ধে ভরে উঠল।

"মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। খুব ধুমধাম হল। উষাপতির সহকর্মীরা প্রীতি-উপহার ছেপে বন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন। উষাপতি এতদিন তাঁর বিবাহিতা বোনের বাড়িতে থাকতেন, এখন শ্বশুর-বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। শ্বশুর-বাড়ি অর্থাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি। রমাকান্ত চৌধুরী বড়মানুষ, তায় বিপত্নীক; তিনি মেয়েকে কাছ-ছাড়া করতে চান না।

"টোপের মধ্যে বঁড়শি আছে উষাপতি তা টের পেলেন ফুলশয্যার রাত্রে। রূপকথার স্বপ্ন-ইমারত ভেঙে পড়ল; বুঝতে পারলেন সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্তা কেন দীন-দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ফুলের বিছানায় শয়ন করা হল না, উষাপতিবাবু সারা রাত্রি একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেন। সকাল বেলা শ্বশুরকে গিয়ে বললেন—আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।

"রমাকান্ত চৌধুরী ঘড়েল ব্যবসাদার, তিনি বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন; মোলায়েম সুরে জামাইকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন—সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা-মরা মেয়ে; তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে, কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়; কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে? সবাই বৌ নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নিজের মুখেই চুন-কালি পড়বে। অতএব—

"উষাপতি কিন্তু কথায় ভুললেন না, বললেন, 'আমায় মাপ করুন, আমি গরিব বটে কিন্তু সদ্বংশের ছেলে। আমি পারব না।'

"কথায় চিঁড়ে ভিজল না দেখে রমাকান্ত চৌধুরী ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। দেরাজ থেকে ইস্টাম্বরি কাগজে লেখা দলিল বার করে বললেন, 'আজ থেকে সুচিত্রা-এম্পোরিয়মের তুমি আট আনা অংশীদার। এই দেখ দলিল। আমি মরে গেলে আমার যা কিছু সব তোমরাই পাবে, আমার তো আর কেউ নেই। কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার পার্টনার হলে। দোকানে আমার হুকুম যেমন চলে তোমার হুকুমও তেমনি চলবে।'

"উষাপতির মাথা ঘুরে গেল। রাজকন্যাটি দাগী বটে, কিন্তু হাতে হাতে অর্ধেক রাজত্ব। মোট কথা উষাপতি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন, সদ্য সদ্য অত টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে রাজি হলেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রইল না। সেই যে ফুলশয্যার রাত্রে দু-চারটে কথা হয়েছিল, তারপর থেকে কথা বন্ধ; শোবার ব্যবস্থাও আলাদা। বাইরের লোকে অবশ্য কিছু জানল না, ধোঁকার টাটি বজায় রইল।

"রমাকান্ত যে বলেছিলেন সুচিত্রা ভাল মেয়ে, সে-কথা নেহাত মিথ্যে নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশী মাতামাতি করেছিলেন। অভিভাবিকার অভাবে গণ্ডীর বাইরে যে পা দিচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল। বিয়ের পর তিনি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, শান্ত সংযতভাবে বাড়িতে রইলেন। রমাকান্তের বাড়িতে লোক কম, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই; কেবল রমাকান্ত সুচিত্রা আর উষাপতি। স্থায়ী চাকরের মধ্যে সহদেব, আর বাকী ঝি-চাকর শুকো। সহদেব চাকরটার বুদ্ধিসুদ্ধি বেশী নেই, কিন্তু অটল তার প্রভু-পরিবারের প্রতি ভক্তি। তাই ঘরের কথা বাইরে চাউর হতে পেল না।

"বিয়ের মাস দেড়েক পরে রমাকান্ত মেয়েকে নিয়ে বিলেত গেলেন। ওজুহাত দেখালেন, মেয়ের শরীর খারাপ, তাই চিকিৎসার জন্যে বিলেতে নিয়ে যাচ্ছেন। উষাপতি দোকানের সর্বময় কর্তা হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

"প্রায় এক বছর পরে রমাকান্ত বিলেত থেকে ফিরলেন। সুচিত্রার কোলে ছেলে। ছেলে দেখে বোঝা যায় না তার বয়স দু-মাস কি পাঁচ মাস...

"তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে উষাপতিবাবুর নীরস প্রাণহীন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, শ্বশুরের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ। দোকানটিকে উষাপতি প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেন। তবু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? অন্তরের মধ্যে ক্ষুধিত যৌবন হাহাকার করতে লাগল। ওদিকে সুচিত্রা সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে উষাপতি তাঁকে দেখতে পান, মনে হয় সুচিত্রা যেন কঠোর তপস্বিনী। তাঁর মনটা কোমল হয়ে আসে, তিনি জোর করে নিজেকে শক্ত রাখেন।

"একটি একটি করে বছর কাটতে থাকে। সত্যকাম বড় হয়ে উঠতে লাগল। লম্পট বাপের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত তার শরীরে, তার যত বয়স বাড়তে লাগল রক্তের দাগও তত ফুটে উঠতে লাগল। সব রকম রক্তের দাগ মুছে যায়, এ-রক্তের দাগ কখনও মোছে না। সত্যকাম কারুর শাসন মানে না, নিজের যা ইচ্ছে তাই করে। কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত সে, কুটিল তার বুদ্ধি। দাদামশায়কে সে এমন বশ করেছে যে, সব জেনেশুনেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। সুচিত্রা শাসন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। উষাপতি সত্যকামের কোনও কথায় থাকেন না, সব সময় নিজেকে আলাদা রাখেন...স্ত্রীর কানীন পুত্রকে কোনও পুরুষই স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন না। সত্যকামের স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হত তা হলে উষাপতি হয়তো তাকে সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁর মন একেবারে বিষিয়ে গেল। সুচিত্রার সঙ্গে উষাপতির একটা ব্যবহারিক সংযোগের যদি বা কোনও সম্ভাবনা থাকত তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। উষাপতি আর সুচিত্রার মাঝখানে সত্যকাম ফণি-মনসার কাঁটা-বেড়ার মত দাঁড়িয়ে রইল।

"সত্যকামের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন রমাকান্ত মারা গেলেন, সত্যকামকে নিজের অংশ উইল করে দিয়ে গেলেন। এই সময় সত্যকাম নিজের জন্মরহস্য জানতে পারল। বিলেতে তার জন্ম হয়েছিল, সুতরাং বার্থ-সার্টিফিকেট ছিল। দাদা-মশায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সেই বার্থ-সার্টিফিকেট বোধহয় সে পেয়েছিল, তারপর পারিবারিক পরিস্থিতি দেখে আসল ব্যাপার বুঝে নিয়েছিল। সে বাইরে ভারী কেতা-দুরস্ত ছেলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুটিল আর হিংসুক। উষাপতি আর সুচিত্রার প্রতি তার ব্যবহার হিংস্র হয়ে উঠল। একদিন সে নিজের মাকে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমাকে শাসন করতে আস কোন লজ্জায়! আমি সব জানি।' উষাপতিকে বলল, 'আপনি আমার বাপ নন, আপনাকে খাতির করব কিসের জন্যে?'

"বাড়িতে উষাপতি আর সুচিত্রার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। ওদিকে দোকানে গিয়ে সত্যকাম আর-এক রকম খেলা দেখাতে আরম্ভ করল। সে এখন দোকানের অংশীদার, উষাপতির সঙ্গে তার অধিকার সমান। সে নিজের অধিকার পুরোদস্তুর জারি করতে শুরু করল। 'সুচিত্রা'র মত শৌখিন দোকানে পুরুষের চেয়ে মেয়ে খদ্দেরেরই ভিড় বেশী; সত্যকাম তাদের মধ্যে থেকে কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে বেছে নিত, তাদের সঙ্গে ভাব করত, দোকানের দামী জিনিস সস্তায় তাদের বিক্রি করত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াত। দোকানের তহবিল থেকে যখন যত টাকা ইচ্ছে বার করে দু-হাতে ওড়াত। মদ, ঘোড়দৌড়, বড় বড় ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলা তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যসন হয়ে উঠল।

"রমাকান্তর মৃত্যুর পর বছরখানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল দোকানের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, আর বেশী দিন এভাবে চলবে না। উষাপতিবাবু বাধা দিতে গেলে সত্যকাম বলে, 'আমার টাকা ওড়াচ্ছি, আপনার কী?' উপরন্তু দোকানের একটা

বেলাভূমি আলোকচিত্রী শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

বদনাম রটে গেল, মেয়েদের ও-দোকানে যাওয়া নিরাপদ নয়। খদ্দের কমে যেতে লাগল। বিভ্রান্ত উষাপতিবাবু কী করবেন ভেবে পেলেন না।"

"পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তখন একটি ব্যাপার ঘটল। একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা কাজে উষাপতি বাড়িতে এসেছেন, ওপরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে একটা অবরুদ্ধ কাতরানি আসছে। পাশের ঘরটা তাঁর স্ত্রীর ঘর। পা টিপে টিপে উষাপতি দোরের কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী একলা মেঝেয় মাথা কুটছেন আর বলছেন, 'এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি? আর যে আমি পারি না!'

"উষাপতি চুপি চুপি নীচে নেমে গেলেন। সহদেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সন্ধ্যের আগে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি সুচিত্রাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছেন। মহিলাটির মেয়েকে নাকি সত্যকাম সিনেমা দেখাচ্ছে আর বিলিতী হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে।

"সেই দিন উষাপতি সংকল্প করলেন, সত্যকামকে সরাতে হবে। তাকে খুন না করলে কোনও দিক দিয়েই নিস্তার নেই। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

"উষাপতি তৈরি হলেন। তাঁর একটা সুবিধে ছিল, সত্যকাম যদি খুন হয় তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। বাইরে সবাই জানে সত্যকাম তাঁর ছেলে, বাপ ছেলেকে খুন করেছে এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সত্যকামের অনেক শত্রু, সন্দেহটা তাদের ওপর পড়বে। তবু এমনভাবে কাজ করা দরকার, যাতে কোনও মতেই তাঁর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

"উষাপতি একটি চমৎকার মতলব বার করলেন। একজন চেনা গুণ্ডার কাছ থেকে একটি রিভলবার জোগাড় করলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিলেন, রিভলবার চালানোর অভ্যাস ছিল; তিনি কয়েকবার বেলঘরিয়ার একটা আম-বাগানে গিয়ে অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিলেন। তারপর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"সত্যকাম জানত ছেলে, সে উষাপতির মতলব বুঝতে পারল; কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার কোনও উপায় খুঁজে পেল না। পুলিসের কাছে গেলে নিজের জন্ম-রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। উষাপতিবাবু অবশ্য সে-খবর জানতেন না।

"যে-রাত্রে সত্যকাম খুন হয়, সে-রাত্রিটা ছিল শনিবার। শনিবারে সত্যকাম অন্য রাত্রির চেয়েও দেরি করে বাড়ি ফেরে, সুতরাং শনিবারই প্রশস্ত। উষাপতিবাবু একটি রাংতার চাকতি তৈরি করে রেখেছিলেন; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন সহদেব রান্নাঘরে খেতে গিয়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে সেটি সদর দরজার কবাটে জুড়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলেন। সদর দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ রইল, বাইরে যে রাংতার চাকতি সাঁটা হয়েছে

কেউ জানতে পারল না। শুকো ঝি র রাঁধুনী তার অনেক আগেই বাড়ি চলে ছে।

"সহদেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ড়োকির দরজায় তালা লাগাল, তারপর র বারান্দায় গিয়ে বিছানা পেতে শুলে। পরে উষাপতিবাবু নিজের ঘরে আলো ভিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন, সামনের কের বালকনির দরজা খুলে রাখলেন।

"দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফটকের ছে শব্দ হল, সত্যকাম আসছে। উষাপতি লকনিতে বেরিয়ে এসে ঘাপটি মেরে লেন। ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার, সত্যকাম টর্চ জেবলে পথ খতে দেখতে এগিয়ে আসছে। সদর জায় টোকা মেরে হঠাৎ তার নজরে পড়ল জার নীচের দিকে টাকার মত একটা কি টর্চের আলোয় চকচক করছে। সে মনের দিকে ঝুঁকে সেটা দেখতে গেল। মনি উষাপতিবাবু ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে লী করলেন। রিভলভারের গুলী ত্যকামের পিঠ ফুটো করে বুকের হাড়ে য়ে আটকাল। সত্যকাম সেইখানেই মুখ ড়ে পড়ল, হাতের জ্বলন্ত টর্চটা লেতেই রইল।

"এই হল সত্যকামের মৃত্যুর প্রকৃত তিহাস। উষাপতিবাবু এমন কৌশল রেছিলেন যে, লাশ পরীক্ষা করে মনে বে পিছন দিক থেকে কেউ তাকে গুলী রেছে, ওপর দিক থেকে গুলী করা হয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না। রাংতার চাকতিটা যদি না থাকত আমিও বুঝতে পারতাম না।"

ব্যোমকেশ চুপ করিল। আমরাও অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সত্যবতী বলিল, "তুমি প্রথম কখন উষাপতিবাবুকে সন্দেহ করলে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বাড়ির লোকের কাজ। যদি বাইরের লোকের কাজ হবে, তা হলে সত্যকাম হত্যাকারীর নাম বলবে না কেন? তখনই আমার মনে হয়েছিল এই সংকল্পিত হত্যার পিছনে এক অতি গুহ্য পারিবারিক কলঙ্ক-কাহিনী লুকিয়ে আছে।

"তারপর জানতে পারলাম, উষাপতি আর সুচিত্রার দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ, শোবার ঘরও আলাদা। মনে খটকা লাগল। খাজাঞ্চি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ জমালাম। লোকটি উষাপতিবাবুর দরদী বন্ধু; তিনিই একুশ বছর আগে বন্ধুর বিয়েতে প্রীতি-উপহার লিখেছিলেন। প্রীতি-উপহারটি খাজাঞ্চি মশাই খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, কারণ এটি তাঁর প্রথম এবং একমাত্র কবি-কীর্তি। আমি যখন প্রীতি-উপহারটি হাতে পেলাম, তখন আর কোনও সংশয় রইল না। সত্যকামের জন্ম-তারিখ মনে ছিল—৭ই জুলাই ১৯২৭। আর বিয়ের তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৭। অর্থাৎ বিয়ের পর পাঁচ মাস পূর্ণ হবার আগেই ছেলে হয়েছে। ধূর্ত রমাকান্ত কেন দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

"সত্যকাম উষাপতির ছেলে নয়, সুতরাং তাকে খুন করার পক্ষে উষাপতির কোনও বাধা নেই। কিন্তু তিনি খুন করলেন কী করে? যখন জানতে পারলাম মৃত্যুকালে সত্যকামের হাতে জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তখন এক মুহূর্তে রাংতার চাকতির উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সত্যকামের টর্চের আলো দোরের ওপর পড়েছিল, রাংতার চাকতিটা চকমক্ করে উঠেছিল, সত্যকাম সামনে ঝুঁকে দেখতে গিয়েছিল ওটা কী চকমক করছে। ব্যাস্—!"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। আমি ব্যোমকেশকে সিগারেট দিয়া নিজে একটা লইলাম, দুজনে টানিতে লাগিলাম। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দখিনা বাতাস চুপিচুপি আমাদের ঘিরিয়া খেলা করিতেছে।

হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিল, "আজ উষাপতিবাবু যাবার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি আর আমার স্ত্রী জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছি, একুশ বছর ধরে শ্মশানে বাস করেছি। আজ আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই, একটু সুখী হতে চাই। আপনি আর জল ঘোলা করবেন না।' আমি উষাপতিবাবুকে কথা দিয়েছি, জল ঘোলা করব না। কাজটা হয়তো আইনসংগত হচ্ছে না। কিন্তু আইনের চেয়েও বড় জিনিস আছে—ন্যায়ধর্ম। তোমাদের কী মনে হয়? আমি অন্যায় করেছি?"

সত্যবতী ও আমি সমস্বরে বলিলাম, "না।"

■ পারেতে সর্বসুখ

আলোকচিত্রী শ্রীনীরদ রায়

কবিতা

জীবন ভালবেসে

জীবনানন্দ দাশ

দেখা হল অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল;
চারিদিকে অধোমুখে মানুষেরা শব বহন করে:
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা, তবু
এ-সব মৃত অবশেষে ঘুমের ভিতরে
জুড়োয় গিয়ে দূরে পৃথিবীর ঘাস শিশিরে জলে;
এরা নদী সূর্য প্রেমের দিন ফুরিয়ে ফেলে
মাটি, তোমার নিজের মনের কথা হয়ে ধীরে
তোমার সাথে ঘুরেছে কেমন অজ্ঞান শরীরে।

এখানে খড়ে ভরে আছে দু-চার মাইল কামিনী-ধানের ক্ষেত;
ঘুঘুর ডাকে আদিম শান্তি আরো অনেক ক্ষণ;
মিছরি-গুঁড়ির মতন বৃষ্টি রোদ্দুরে উজ্জ্বল;
আকাশে চাতক ঃ ওর এক রাশি আত্মীয়-স্বজন;-
এ-সব সাড়া ঐ মৃতদের ফুরিয়ে গেছে সবি;
সময়ের এই কার্যকলাপ গভীর মনে হয়;
জীবন ভালবেসে হৃদয় বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

ছক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যা আছে ছাড়িয়ে যত্নে কুড়োই
মেলাতে উভয় প্রান্ত।
গাঁথব মোটা কি মিহি যে সুতোয়
তাই খোঁজা বিয়োগান্ত।

প্রাণ শুধু বুঝি ছোঁয়াচে রোগের ব্যাপ্তি।
জড়ে জ্বরভাব, ফের জড়ত্ব প্রাপ্তি।
ছাঁচ প্রায় এক, যতই কেন না তাপ দি।
কারিকুরি করে আখেরে কিস্তিমাত।
তাপটুকু শুধু অযাচিত উৎপাত।

ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে।
হুকুম কোথায় চালের বাইরে হেলতে।
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা।
রাজার, প্রজার, নিজের গরজে
যে যেমন দেয়, নাম তা।

একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে আসে সুপ্তি,
হাত-পা এলিয়ে সময়ের স্রোতে ডুব দি।

মাঝে মাঝে তবু স্খলিত উচ্চারণ।
আর্ষ প্রয়োগে লঙ্ঘিত ব্যাকরণ!
অর্থ ছড়ায় সনাতন সব ভাষ্য,
জীবন মানে না জৈব নীতির দাস্য।
ভুলে জ্বলে-ওঠা দৈব দীপ্তি, ঊর্মিল উল্লাস,
ভাঙে ভাঙে বুঝি প্রাণ-শৃঙ্খলে অন্ধ অনুপ্রাস!
সে মহাপ্রমাদ শশব্যস্ত মহাকাল শোধরায়
প্রলয়-প্লাবনে মনু নোয়াদের নায়।
আবার ছাপানো ছক
যুগান্ত ইস্তক।

সময়ের ঘরে

বিষ্ণু দে

সাবধান তুমি সাবধান
তুমি ওদের কথাতে কখনো দিও না কান।
ভেবো তুমি মাতা, চোখে চোখে হাতে হাতে
তুমিই বাছার প্রাণ।
জীবনের মেয়ে জীবনের তুমি মাত
ধরিত্রী তুমি ধাত্রী, তোমারই ভার
জীবনের এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ।

কখনো ওদিকে খুলে রেখো নাকো দ্বার,
তোমার ঘরেই রয়েছে বাছার প্রাণ,
তোমাতেই আদি-অন্ত সারাৎসার।
ও মাঠে যেও না লোভের নিলামী হাঁকে,
ভুলো না তোমার সেবিকার সম্মান।
বেঁধে নেবে জেনো অভ্যাসে শতপাকে
ঘুমভাঙানির ঘুমপাড়ানির গান।

ও হাটে যে আছে সে সবার ভাল চেনা,
সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে ওর দেনা।
সময়ের ঘরে মিথ্যা লোভের ডাকে
কী করবে বেচা কেনা?
সময়ের থলি ফুটো ওর হাত সকলের কাছে পাতা,
রোগীর পথ্য ও কোথায় পাবে বেনামদারির ফাঁকে?
মানুষের ঘরে কিছু নেই ওর দান।

দগ্ধ দিনে

অরুণ মিত্র

টগর চুঁইয়ে চুঁইয়ে রোদ ঝরছে
টকটকে রোদ জবার ঝুমকোয়
আমি ছায়া খুঁজছি
তোমার গলার স্বরে,
আমার ঘুমের স্তরে স্তরে বিছানো
তোমার কথা
কথা থমকে গেলে আচ্ছন্ন
কান্নায় ভাঙো
তখন আমার মধ্যে তুমি ছড়িয়ে যাও
দুলতে থাকো
জলের নীচে যেমন আবছা উদ্ভিদেরা দোলে
আর তোমার হাসি থেকে উদ্গত রাত্রি
যেন এক ঝরনা
আমি শ্যাওলা-ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের মত আবিষ্ট,
তোমার স্বরে আমার শান্তির আস্বাদ।

দুঃখ আর আনন্দের ঝঙ্কার
দাবদাহ জুড়িয়ে
পাখির নীড়ে ফেরার শব্দ
আশ্রয় শান্তি বেদনার দোলা
দিনের একান্তে ছায়া আরো ছায়া
আমার স্নায়ু ছেয়ে তোমার স্বর।

তোমার গলার অন্ধকারে
রহস্যের পর রহস্যের সৃষ্টি।

হুতাশন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এই খানে বস কিছুক্ষণ।
কেমনে বুঝাব আমি এ-অঞ্চল ছিল না এমন;
হেথা হতে যতদূর দৃষ্টি চলে যায়
পায়ে চলা দীর্ঘ পথ যেথা গিয়ে দিগন্তে মিলায়
সেথায় অরণ্য ছিল, আর ছিল আরণ্য জীবন
নখদন্ত বিস্তারিয়া দুর্বল শিকার অন্বেষণ
জৈব ক্ষুধা নিবৃত্তির তরে।
অরণ্য-উপান্তে শূন্য নির্জন প্রান্তরে
ছিল শুধু ঘূর্ণি হাওয়া উন্মত্ত অস্থির,
নির্ভয়ে সেথায় এসে বেঁধেছে শিবির
মুষ্টিমেয় নরনারী; ভবিষ্যৎ স্বপ্নে সমুজ্জ্বল
তাদের অভ্রান্ত দৃষ্টি; বিশ্বাসে সাহসে বক্ষঃস্থল
স্ফীত হতে স্ফীততর প্রতি পদবিক্ষেপের সাথে,—
তারাই ত নির্মল প্রভাতে
অরণ্য নিশ্চিহ্ন করি সূর্যালোক এনেছে এখানে;
সে আশ্চর্য ইতিহাস কজনই বা জানে?
সে শূন্য প্রান্তরে কারা জাগাইল পুষ্প-সমারোহ
সহস্র জীবনে সেথা অলক্ষিতে প্রাণের আরোহ
আলোকে পুলকে কারা আনিয়াছে মৃত্যুপণ করি
আজ কেহ জানেনাক; তাহাদের কেমনে বিস্মরি
এরা আজ বসিয়াছে মানের আসনে,
সৃষ্টির অমৃত ফল উদ্ধত ভাষণে
করায়ত্ত করি এরা রাজত্বের নিশান উড়ায়
শ্রমলব্ধ স্বর্ণশস্য নির্বিকারে দুহাতে কুড়ায়।
বহু দূর হতে তুমি এসেছ যখন
পথশ্রান্ত; ছায়াতলে বস কিছুক্ষণ।
আমি হেথা বসে আছি প্রজ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখে
বিদীর্ণ আমার বুকে
জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি সেই হুতাশন
মিথ্যারে যে ধ্বংস করে, অন্যায়ের ত্রাসননাশন।

শেষ ছায়া

দিনেশ দাস

আগেকার মত
শামুকের পিঠে চড়ে শরৎ এল ত?
ঘাসে-ঘাসে নীল গুনগুন,
দিগন্তের বাঁকা ঠোঁট মাখল কি রঙের আগুন?
আকাশে মাঠের 'পরে
রোদের সোনালী মধু ঝরে?

আমার হৃদয় আজ চাইল না ভাদ্রের ভরানদী হতে
পুরাতন মন আজ হল নাকো আশ্বিনের মেঘ;
আকাশের চাঁদ ওঠে পরের আলোতে—
হৃদয়-সমুদ্রে ঢেউ তোলে নাকো, তোলে না আবেগ।

আমার শাখায় যদি জীবনের কুঁড়ি না-ই ধরে—
ডাল যদি শুধু ধুধু করে,
তবে আর কেন? কতদূরে
কোন্ বনে কাঠ কাটো কালের কাঠুরে,
নিয়ে এস শাণিত কুঠার
আমার গাছের শেষ-ছায়াটুকু কেটে কেটে নাও এইবার।

মাঘের কুয়াশা-ভোরে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মাঘের কুয়াশা-ভোরে, আশ্বিনের ঝড়ে,
এ-চোখের সরোবরে কার যেন প্রতিবিম্ব পড়ে
শিমুলের শীর্ষচূড়ে বেদনার রঙ ওঠে ফুটে
ইচ্ছে করে—তুলে দিই এই মাঘে তার করপুটে,
তার ছায়া তার কথা গান—
আমার সমস্ত মনপ্রাণ।

এরোড্রোমে সারি-সারি বিদ্যুতের বাতিগুলি জ্বলে
দূর যেন কাছে আসে আকাশে-বিস্তৃত ডানা মেলে;
ক্লান্তি-ঘন দিনের সন্ধ্যায়
কত বন্ধু ফিরে আসে, কত বন্ধু জানায় বিদায়,
আমি বসে মনে-মনে আঁকি
হয়ত বিমান এক, হয়ত বা অন্য কোনো পাখি।

ফুলের কুঁড়িতে যেই হাত লাগে, কেঁপে ওঠে দেহ
মনে হয় এইমাত্র, এইমাত্র সাথে ছিল কেহ।
মনে হয় নাম তার পাতায় পাতায়
ছড়ানো জড়ানো, তবু কই সে, কোথায়?
আমি তার লাগি
শরৎ বসন্ত শীত জাগি।

দোর খুলি

হরপ্রসাদ মিত্র

কোনো খরশান বর্শাফলকে নাম লিখে
কোনো টানটান ছিলাতে আমার মন ছিল।
সেই আমি, এই জীবনের কারুকার্যে আজ
পোষমানা প্রাণ, সভ্য মানুষ,
—সওয়ারী।
ছেড়েছি আমার মুক্ত দিনের আরণ্যক।
শান্ত খাঁচায়—
ঠনঠনে কালী জপ করি।

যদি ইতিহাস বদলে হঠাৎ হয় শুরু,
ফেরে সেই সব মাভৈঃ-পেশীর বন্যতা—
তাহলে আবার সাতসমুদ্র তুলবে ঢেউ।
আলোটা জ্বালিয়ে, ঘুমটা তাড়িয়ে
দোর খুলি।
স্তব্ধ মহলে একলা দাঁড়াই
—এক তারা!
পাহারা হাঁকছে প্রহরী তখন মাঝরাতে॥

আলোটা জ্বালিয়ে, ঘুমটা তাড়িয়ে, দোর খুলি।
মস্ত ছায়ায় ধুঁকছে কুকুর আধমরা
পাহারা হাঁকছে প্রহরী তখন মাঝরাতে—
দেয়ালে-দেয়ালে উঠোনে-দালানে
পথহারা।

কোনো ঝমঝম বিষ্টি ঝরার উৎসবে
কোনো দাউদাউ আগুনমেখলা রাত্তিরে
কোনো খরশান বর্শাফলকে, খড়্গে, ভল্লে—
কোথায় সে?
স্তব্ধ মহলে দুহাতে কঠিন
দোর খুলি।

এসো অন্ধকারে

মণীন্দ্র রায়

রাস্তার রেলিঙে বাঁধা নদী-নৌকো-নারকেল-সারির
আহ্লাদিত ছবি, কিংবা খেয়ালী চিঠিতে দু লাইন
উর্ধ্বতির উত্তেজনা, শুধু এই ইচ্ছা যদি ভিড়
করে, তবে কী পাবে এখানে? কোনো বেতাল বা জিন
আমার দখলে নেই। কিছুই পাবে না অনায়াসে।
না-ফুল, না-গান, স্বপ্ন, সৃষ্টির দলিলে বকলম
চলে না; বেহুলা তাই মৃতকে ফিরাতে একা ভাসে,
ভীষণ-সুন্দর নাচে স্বর্গ টলে, পরাজিত যম।

এসো না এখানে তবে উদাসীন বিদেশীর মত
ডায়েরির আমন্ত্রণে। মন্দিরের পাথরে, গুহায়
কিন্নরী, দেবতা, নারী, মাঠে মাঠে দৃশ্য শস্য যত
দিতে পারে কত আর! জানো নাকি সময় বদলায়!
বরং গভীরতর অন্ধকারে এসো, অন্তঃশীল
দেখ কী ঐশ্বর্য, প্রেমঃ স্তব্ধ লোহা, রেডিয়ামে নীল।

উদ্বর্তন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তুমিই কখনো শান্তি কখনো বা নিবিড় যন্ত্রণা,
কখনো ভাঁটার গ্লানি কখনো বা উত্তুঙ্গ জোয়ার;
কখনো অভয়মন্ত্র কখনো বা মায়াবী মন্ত্রণা,
তোমাকেই দিই আজো জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।
উদ্বিগ্ন দুবাহু কাঁপে : শ্রান্তিহীন ক্লান্তির যাত্রায়
অদম্য অনন্যগতি সে তো শুধু তোমার প্রসাদে;
তুমিই ভরাও পথ বজ্রপাতে প্রবল মাত্রায়,
তোমারই ছোঁয়ায় কান্না পরিণত ফের স্নিগ্ধ স্বাদে।

বরাবর দুই রূপ : শুচিসৌম্য কিংবা ভয়ঙ্কর,
অথচ অঙ্কুরে কিন্তু উভয়েই একসূত্রে বাঁধা;
সতীস্কন্ধে যিনি শিব উমাপতি তিনিই শঙ্কর,
কড়ি ও কোমলে আজো যুগান্তের বাদ্যযন্ত্র সাধা।

অসুখে আনন্দে স্থৈর্যে যেখানেই থাক আজো জানি,
তুমিই সত্তার উৎস, অন্তরালে তুমি রাজধানী॥

রিক্ত

শ্রীযতীন্দ্র সেন

নিস্পন্দ চন্দন যেন আগুনের দুঃসহ দহনে
দহি দহি ঢালে তার নিরভিমান সুরভি-নির্যাস,
নীরবে নিশ্চিহ্ন করি আপনারে, রাখি ভস্মশেষ
অগ্নিসত্রে আত্মাহুতি; উদ্বেজিত নাহি দীর্ঘশ্বাস।—

অলক্ষিত অনুরাগে পরাগের মত ঝরি ঝরি;
অগুরু-ধূপের মত গন্ধ ঢালি দহি আপনায়,
তোমারে দিয়েছি প্রেম, জীবনের যত ভালবাসা,
নিজেরে নিঃশেষ করি, নিঃস্ব করি, রিক্ত করি হায়।

শারদ মেঘের মত শূন্যবক্ষ, লঘুগতি আমি,
নিরুদ্বেগ, নিস্তরঙ্গ যাত্রা মোর নিরুদ্দেশ-পানে।
তার পর মিশে যাব সীমাহীন মহাশূন্য-লোকে
বাঁশির সুরের মত অনিবার বাজি তব গানে।

বুকের কোরকে মোর একদিন লুকানো সৌরভ
তোমারে বিলায়ে দিয়ে কুসুমের পরমায়ু শেষ;
শ্লথ দল-তলে হায় ফসলের জাগেনি উৎসব,
ক্ষতি নাই—পাইনি ক তব শুভ্র বক্ষের আশ্লেষ।

এই সোনায়-সবুজে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কোন সুনীল সরোবরে
বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মত—
এক টুকরো সাদা মেঘ থমকে আছে আকাশে।
নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের মত জ্বলজ্বলে কাচের আকাশ।
আর সেই সীমাহীন নীলান্তের পটভূমিকায়—
সিন্দুর টিপের মত,
স্নিগ্ধ সূর্যটি জ্বলেছে
যেন দেবতার তৃতীয় নয়ন।

কাঁপছে নারকেল-পাতার ঝালরগুলি:
কাঁপছে আমের-জামের-নিমের শাখায়
সহস্র সবুজ আগুনের শিখা।
কী অব্যক্ত নৃত্যের মুদ্রায়
স্তব্ধ সমগ্র প্রকৃতি!

আর যেটুকু বাকি ছিল—
সেটুকুও সম্পূর্ণ করতে এল
একটি খয়েরী রঙের চিল
আর চোখের ওপর দিয়ে উড়ে গেল
একঝাঁক হলুদবরন প্রজাপতি:
এক মুঠো হলুদ স্বপ্নের মত ইথারে—হাওয়ায়!

একটি অস্পষ্ট নৃত্যচ্ছন্দের ধ্বনি উঠছে
কোথায় অন্তরালে:
কোথায় কোন্ দূরের মন্দিরে
কে বাজিয়ে চলেছে দুটি বিলম্বিত লয়ের মন্দিরা।
আর দুলছে পৃথিবী দুলছে
রূপের ঘোরে, রসের ভারে—
আধো তন্দ্রায়—আধো জাগরণে
বিমুগ্ধা নাগিনীর মত ফণা দুলিয়ে-দুলিয়ে!

এই সোনায়, সবুজে, খয়েরী, হলুদে, নীলে :
এই বিভাসে ও বর্ণবিন্যাসে :
এই নৃত্যসুষমায় ও তন্ময় স্তব্ধতায়—
মহাকাল!
এ কোন্ হিরণ্ময় সূর্য-বীজ ছড়ালে আজ
এই বন্ধ্যা, ব্যর্থ, কালো মাটিতে!
কেমন করে বইব এই দুরন্ত স্বর্ণ-বীজাণুর গুরুভার?
তেমন হৃদয় কই? তেমন রক্ত কই?
এখানে যে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না কোন কালে!

আন্তর্জাতিক

গোপাল ভৌমিক

নখদর্পণে বসুধা আমার,
চোখে ছায়া ফেলে গ্রহ তারা সব মিলে ;
আকাশ-বিহারী এ-হৃদয় তাই
দুটি পাখি এক ঢিলে
মেরে হতে চায়
পরম বিত্তবান।
এক মন চায় হনলুলু যেতে
আর মন ধরে গান
রবি ঠাকুরের। বাংলা আমার
শস্যশ্যামলা মাটিতে মধুর ঘ্রাণ—
বুঝি গৃহগত সদাচালিকু প্রাণ!

তবু অভিমান করা কি সহজে সাজে?
সদা-পরিপাটি একটি প্রেয়সী
ধূলি ধূসরিত গৃহিণী যে গৃহকাজে।
আছে ম্যালেরিয়া, আছে মশা-মাছি
তাই নিয়ে খাসা আজও বেঁচে আছি
বিত্তবিলাসী নগরে কিংবা বিত্তবিহীন গ্রামে-
স্বপ্ন-সুখের সংবাদ আসে
তাইত রঙিন খামে
ছাপমারা সুদূরের—
আমি টেনে চলি দৈনন্দিন দুঃখ-সুখের জের।

কথা থাকে তবু ঢের :
মনে ও মননে ব্যবধান স্তম্ভের
ঘুচবে কি কোনদিন?
হবে কি আমার এ-দেহে কখনও লীন
মালয় মিশর পেরু ব্রাজিল
আরব বা মহাচীন?

আশ্বিন

চিত্ত ঘোষ

শিউলি সকালে আশ্বিন অস্থির :
নীল দিগন্ত হাতছানি দিয়ে ডাকে—
মুক্তির সুখে বর্ষার বন্দীর
নিকানো উঠোন রুদ্দুরে ভরে থাকে।

দূরের নৌকা উজানের টানে ভাসে—
দুপুর ওড়ায় হাল্কা মেঘের ঘুড়ি :
অধীর জীবন খরস্রোত ভালবাসে
তীরে পড়ে থাকে স্মৃতির রঙিন নুড়ি।

প্রতীক্ষা

অরুণকুমার সরকার

প্রতিধ্বনি ঘোরে কক্ষে কক্ষে :
কে আছ? কেউ আছ? কেউ কি নেই হে?
এখানে কেউ নেই : শব্দ গন্ধ
স্পর্শ দৃশ্যের অতীতে কেউ না।
সবাই ভৌতিক॥

যদি না ঈশ্বর পাষাণ মূর্তি
অথবা মৃণ্ময়ী মানুষী মর্ত,
তা হলে নিরাকার অসীম শূন্য
হাওয়ার চিৎকার : তা ছাড়া, কিছু না।
স্বপ্ন প্রলাপীর॥

আমার ঈশ্বর শুদ্ধ শিল্প
গড়নে অপরূপ, ভাবনে মুগ্ধ ;
গৌরীহর সমভঙ্গভঙ্গী
জৈব জীবনের নৃত্য, ছন্দ।
রক্তে ঢেউ যেন॥

মানবসংসার ঈর্ষা দ্বন্দ্বে
অভাবে অবিচারে ভগ্ন কক্ষ।
কবে, হে ঈশ্বর, আমার মুক্তি
তোমার রচনায় মুখর মৌন!
বিফলে দিন যায়॥

নীল

পরিতোষ খাঁ

জীবনে সমুদ্র নেই : মেয়েটি এ-কথা ভেবেছিল।
চপল লীলায় মেতে তাই তার আয়ত চোখের
গভীরের রঙ ভুলে আকাশে তাকিয়ে নীল খুঁজে
সমুদ্র চিনবে ভেবে পাখিদের দানা ছুঁড়ে ছুঁড়ে
হয়ত খবর পাবে আশাতে সে বৃথাই কাটাল
অনেক সময়। কিন্তু পাখিরা তখন সাগরের
গন্ধ ভুলে নিস্তরঙ্গ নীড়ের আয়েসে চোখ বুজে
সাথীর সান্নিধ্যে তৃপ্ত সমুদ্রের থেকে বহু দূরে॥

আকাশের সেই নীলও অবশেষে সন্ধ্যায় ধূসর।
আলো নিভে গেছে। ছায়া দেয়ালে কাতর মাথা রেখে,
নীলের আকাঙ্ক্ষা তার মেটেনি, দু চোখে অবিরল
অশ্রুর হঠাৎ-স্বাদে খুঁজে পেয়ে সমুদ্রের জল
বুঝল সে ঘরেই তার পৃথিবীর সমস্ত খবর,
এ-শূন্য নিরাশা নীল আরো দূর আকাশের থেকে!

বুড়ো ভদ্রলোক

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দোতলা ফ্ল্যাটের বুড়ো ভদ্রলোক
রোজ দেখি বসে থাকে
খোলা বারান্দায়।
একগাল দাড়ি, অসহায় চোখ
ধুঁকছে লড়ায়ের শেষ দিকটায়।
হঠাৎ চাইলে পর
মনে হয় চিত্রার্পিত সে-মুখ নিথর।

একপাল অপোগণ্ড শিশুর চিৎকার
দিনরাত্রি ঘরের ভিতরে
ইঁদুরের উৎপাতের মত
বিশ্রী এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।
কখনো কখনো
সকাতর বামাকণ্ঠ
একটানা রোগ-যন্ত্রণায়
উৎসারিত। সে-শব্দ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে
কখন বাইরে ছিটকে যায়।

বৃষ্টিভেজা ধূসর আকাশ।
ভদ্রলোক বারোমাস
চুপচাপ টিকে আছে
ভাঙা কেদারায়
ক্লান্তি আর ক্লান্তি জেবলে দিয়ে
সারা চেহারায়।
হঠাৎ চাইলে পর
মনে হয় চিত্রার্পিত সে-মুখ নিথর।

প্রবাসের পর

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

এই দীর্ঘ দু-মাসের প্রবাসের পর
অনেক সুস্পষ্ট তুমি, আর স্পষ্টতর,
অনেক কিছুই।
এইবার যদি মুক্তি দাও
আকাশের প্রস্ফুটিত দুটি ফুল, তাও
সাধ হয়, আলগোছে ছুঁই।

দুরন্ত ধুলোর ঝড়ে ঘোলাটে রোদ্দুর
মনে হয়, পশ্চিমী দুপুর
যেন,
গ্র্যানিটের আবির ছড়ান।
দুস্তর বিরহ-গিরি হল ভস্মসাৎ
বাতাসে জড়ান তার অণু-পরমাণু।
এ-আলোকে আজকে হঠাৎ
সাধ হয়, একবার, দেখি তব মানবীয় তনু।
ধুলোর ঝড়ের এই ঘোলা কামনায়
মন যেন মিশে চলে যায়।

যত কমনীয় হক, তবু এত কামনাই।
যে নামেই ডাকা যাক,
রয়ে যায় কিছু ফাঁক
সহস্র নামের মাঝে তবু এর নাম নাই।
এমন অকালে তার এসেছে উদ্দেশ
ঝাপসা রোদ্দুরে ঢাকা
এই গ্র্যানিটের পরিবেশ।
চৈতালী প্রহরে এর মেলেনি আভাস
কী যে রঙ রেখে গেছে পশ্চিমী প্রবাস।

অরণ্যের শেষে

অমলকান্তি ঘোষ

যাত্রার আগে তুমি বলেছিলে, "এই পথে যেও
এ-পথে মাটির ছায়াময় রেখা, আর ফলদেহ
বৃক্ষ রয়েছে, সুপেয় জলের অভাব হবে না।
এই পথে যেও।"

আমি ত বলেছি, "দারুণ ক্লান্ত আমার অঙ্গ।"
"পথ সামান্য", মৃদু মৃদুঙ্গ
স্তিমিত কণ্ঠে সুর চেয়েছিল, "যাত্রা তোমার
বন্ধ করো না এত প্রান্তর হয়ে এসে পার।
তা ছাড়া এ পথ অতি মনোহর
বনবীথিময়। ফল-ফুল-পাখি তোমার প্রহর
মুগ্ধ রাখবে। আর তারপরে শ্যামল কুটির, শান্তি অমেয়।'
যাত্রার আগে তুমি বলেছিলে, "এই পথে যেও।"

আমি সারাপথ
স্থির অপলক দুটি চোখ মেলে তোমার শপথ
কুড়োতে চেয়েছি। অনুপ্রেরণা
সেই অরণ্য—আমি নিঃঝুম—আমার ক্লান্ত নয়নে ছিল না।

তারপরে সেই শ্যামল কুটির,
শ্যামলিমা যার একটুও নেই।
লাউ-লতা আর দূর্বাঘাসের
যৌবন কবে অপ্রত্যক্ষ। ...
অশীতিপরের সব মেদটুকু
সময় নিয়েছে নিঃশেষে কেড়ে।...
কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে
বিগত দিনের শ্যামলী কক্ষ।

একটি কবিতার জন্য

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

রাতের দ্বিতীয় প্রহরে জেলে-ডিঙি ভাসিয়ে
তন্ময়তার আবছা-আলোয় একা একা
চিন্তার মধ্যালয়ের স্রোতের টানে টানে
হৃদয়ের গভীর সমুদ্রে সে যখন চলে গেছে
তখন ফোঁটা ফোঁটা তারা নিয়ে বিস্মিত আকাশ
আর মৎস্যগন্ধী সজল বাতাস তাকে ঘিরে আছে।

ইচ্ছার ডিঙি ভাসছে হৃদয়ের জলে,
চিন্তার ঢেউ ছলাত ছলাত করছে,
একটি কবিতার জন্য তার কলমের যাতনা
প্রবল উৎকণ্ঠায় কখন থেকে চিন্ময় হয়ে
আবছা জলে আধখানি ডুবে আছে।
দূরের কিছু আর দেখা যায় না,
না বেলাভূমি, না তার উদ্ভিদের অলঙ্কার,
না ঘরবাড়ি, না তার ঝাড়লণ্ঠন।

কেবল তাকেই দেখা যায়,
যে জ্যোতির্ময় হয়ে গভীর নৈশসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে
অবশেষে রক্তবর্ণ ঊষাকে স্পর্শ করেছে।
এবার সে ফিরে আসছে সেই ডিঙিতে,
লোকালয়ের দিকে যতই সে এগোয় ততই
জাগর-ক্লান্ত তার চোখে হিরণ্ময় রৌদ্র পড়ে।
তার ডিঙিতে বাঁধা একটি মাছ,
ঠিক মাছ নয়, মাছের মত শোভা,
একটি মীনাক্ষী কবিতা।

তক্তাঘাটে হেমন্তসন্ধ্যা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি মুখ তারকা ধ্রুব উত্তরের
আর যা সবই কুয়াশা নিরবধি!
একটি দেহ অন্ধকারে বন্দরের
স্টীমারে জ্বলা অনেক আলো রাত্রে-বওয়া নদী!
হঠাৎ যেন দেখেছি হল আলোয় ঝলমল
দেখেছি খুঁজে বুঝেছি এর যায় না পাওয়া তল।
কী করে তবে এ-নদী হই পার?
আকাশ হাসে নীরব হাসি অমেয় বিস্তার
লক্ষ তারা প্রদীপে ঝিলমিল!
একটি তারা হারিয়ে গেল, কোথায় গেল খসে
—দীর্ঘ সোনা-আঁচড় মুছে নিথর হল নীল!
উপস্থিত রয়েছি আমি তক্তাঘাটে বসে!
হারিয়ে গেছি, তবুও দিয়ে চলেছি গোঁজামিল!

একটি মুখ তারকা ধ্রুব ছড়ায় সংকেত
সকল ধাঁধা সংশয়েই নিমেষে পড়ে ছেদ;
সে বলে, "তুমি জীবন-ভর যা কিছু মরো খুঁজে
চরম বলে এসেছ যাকে বুঝে
তোমার কাছে সে-সবই হই আমি।"
একটি ধাপ গভীর আরো আসংজ্ঞানে নামি।
একটি দেহ অন্ধকারে বন্দরের
নিশীথে হল কী ঝলোমলো দীপান্বিতা নদী!
আর যা সবই স্মৃতির নামে বিস্মৃতিই যেন
জড়িয়ে-ধরা কুয়াশা নিরবধি!

কুজ্ঝটিও স্বচ্ছ হল কিছুক্ষণ ধ্যানে
আকাশ-ভরা মিনতি যেন নিথর হাসি নীল।
জীবনটাকে যে-সন্ধানে ভরেছি দিনে-দিনে
বুঝেছি বেশ, নয় তা গোঁজামিল।

দেবযান

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গাঁয়ের মহিম আর চড়কের মেলায় যাবে না,
কিনতে চাইবে না আর খেলনায় সাজান সারা মেলা,
তোমরা কি জানো কবে দু-আনায় সব যাবে কেনা?—
বলবে না তারিণীকাকা ভারী ঝক্কি এটার ঝামেলা।

গাঁয়ের মহিম আর মেলার দু-দিন শেষ হলে
খুঁজবে না পায়ের ছাপ কংকালিতলার এই ঘাসে;
গল্প ঢের শুনেছে সে, এবার মাকেই গল্প বলে
তাক লাগিয়েছে : কবে দেখেছিল মেলার সার্কাসে

ভীমের মতন বীর, তিতু এক জড়সড় বাঘ।
আরেক তাঁবুর নীচে সকলেই ম্যাজিক-লণ্ঠন
দেখেছিল, সে দ্যাখেনি। তারিণীকাকার পরে রাগ
মার কাছে বলে ওর প্রাণে ঘুম নামল যখন,

মাকে রেখে একা ও যে কংকালিতলার অন্ধকার
পার হল হাতে নিয়ে চাঁদের হলুদ হ্যারিকেন;
আশ্চর্য দোকানী এক মাঝরাতে দোকানপশার
খুলে ওর দুই হাতে সব খেলনা সাজিয়ে দিলেন॥

হাওয়ায় উন্মুখ

আলোকচিত্রী শ্রীনেপাল মুখোপাধ্যায়

এক ঘুমের পর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে

নীলকান্ত অন্ধকারে, নিঃশ্বাসের সঙ্গী এই ঘরে
হাত দিয়ে স্পর্শ করি, তুষারের স্তূপ এক নারী,
আকুল কুন্তলপাশ মেলে দিয়ে ক্লান্তির সাগরে
তুমিও আকাশ বুঝি—অন্ধকার, বর্ষণ-সঞ্চারী।

বাইরে মাতালের মত ঘোরে দুরন্ত বাতাস
গলিত গানের মত ছিটকে ওঠে রাতপাখির ডাক
শয্যার পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ
অনুগত মার্জারের মত নীল চোখ, স্তব্ধবাক্।

তোমার শরীরে ঘুম, তুষারের স্তূপের মতন,—
জেগে যাও মূর্তিমতী, জীবনের শান্তির নির্ঝরে
সন্ধানী ভোরের হাতে সঁপে দাও সূর্যমুখী মন
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী-অন্ধকার-ঘরে।

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

রাত্রিরেখা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

নির্জন রাত্রির হাতে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কলি
তুলে দিয়ে ঘরে ফিরি, শ্রাবণের মৌন পদাবলী
অস্ফুট কান্নায় ভাঙে প্রতিদিন, এই অন্ধকার
জীবনের যন্ত্রণায় চুপি-চুপি নাম লেখে যার
মনের ঝিনুকে-আঁকা জটিলরেখার সেই মন
রাত্রির সমুদ্র হয়, ঢেউ-ভাঙা ফেনার মতন
অভ্র আকৃতি নিয়ে হৃদয়ের মলিন কোরক
আমি একা তুলে ধরি—যৌবনের আকাঙ্ক্ষার শ্লোক।

রাত্রির নির্জন হাতে হৃদয়ের যন্ত্রণার কলি
তুলে দিয়ে ঘরে ফিরি। এই অন্ধকারে যার মন
সে এক অরণ্য, তার হৃদয়ের সুচিরগোপন
বাসনার নীল পদ্মে জ্বলে ওঠে দীপ্ত দীপাবলী
অনেক রহস্যে জেনে, তাই এই নিভৃত কোরক
যন্ত্রণায় বারবার ফুটে ওঠে আকাঙ্ক্ষার শ্লোক!

সমর্পণ

অরবিন্দ গুহ

তোমার চিন্তায় আজো সমাবৃত দিনরাত্রিগুলি,
আমার শরীরে তাই সজীব অগ্নির দাহরেখা;
আমাকে বিচিত্র দীক্ষা দিয়েছিল উষা ও গোধূলি,
আমার সমস্ত ভাষা সুদূর দুঃখের কাছে শেখা।

শুনেছি প্রচ্ছন্ন তুমি ক্ষমাহীন মরুবালুতলে
প্রতীক্ষায় থাকে। শুনি অরণ্যে অলক্ষ্যে থাকে সোনা।
চিরস্থায়ী কিছু নেই, কোনো জন্ম যাবে না বিফলে;
এ-সংসারে সমমূল্য সুখদুঃখ-বাসনাবেদনা।

অর্পিতসর্বস্ব বলে আমার অস্তিত্ব লঘুভার;
আমি কল্পনার বৃন্তে ফোটাই তোমার পুষ্পস্তবক;
রাত্রি ভরে দিবালোকে, দিন জুড়ে নামে অন্ধকার,
আমার সাম্রাজ্যে আজ সবকিছু সুন্দর, সম্ভব।

আমার বাস্তবে অগ্নি দীর্ঘ, উগ্র, ক্ষুধাতুর, স্থির—
তার লক্ষ্য আমার অন্তিম লগ্ন, আমার শরীর।

অবচেতন

দুর্গাদাস সরকার

ঘুম ভাঙে শব্দ শুনে। স্বপ্নে বলা তোমার প্রলাপে
থরথর শব্দ কাঁপে। ভাবি, তুমি আশ্চর্য হেঁয়ালি।
অসংলগ্ন বর্ণে অন্য নাম শুনি তোমার সংলাপে।
মুখোমুখি আমি; তবু অন্তরের আদিগন্ত খালি।

প্রত্যহ প্রভাত আনে তোমার আনম্র কণ্ঠস্বর।
অক্ষয় কল্যাণস্পর্শে মুগ্ধ করে আমার কল্পনা।
জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যে মুক্ত অফুরন্ত আনন্দ-নির্ঝর।
আমি দিলে অর্থ কিছু, তুমি দাও অগাধ ব্যঞ্জনা।

আবার জাগাবে ভোরে। নিজ হাতে ধোয়া বাসনপত্র
সাজাবে ফুলের গুচ্ছ। এনে দেবে কাগজ-কলম।
অন্তরের অন্তরালে তবুও কে আমাকে ধাঁধায়;
অস্পষ্ট নামের তাপে অনুতাপে কাঁদে সিংহাসন।

আজ আর ভোর নেই। বন্ধ ঘরে রুদ্ধ অন্ধকার।
পাশাপাশি বাহুবন্ধন তবু শয্যা শূন্য। তুমি কার!!

পাওয়ার ও-পারে

বটকৃষ্ণ দে

ডেকেছ, এসেছি তাই। ভীরু পায়ে, মৃদুল সম্ভাষে
রজনীগন্ধার গন্ধে ছুঁয়ে যাই, পদ্মকলি চোখে
স্বপ্নের নিটোল স্পর্শ রাখি; সন্ধ্যামালতীর হাসে
হাওয়ার মধুর ছন্দে। যেন বলাবলি করে, ও কে!

চেন না আমায়? সেই কৈশোরের ভোরের মেলায়
দেখনি আমাকে? আমি পথপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেম
তোমাকে দেখার সুখ পাব বলে; ভুলে গেলে, প্রেম,
তুমি যে তোমারই সাথে বারে বারে ডেকেছ খেলায়।

ডেকেছ, এসেছি তাই। ভীরু পায়ে মৃদুল সম্ভাষে।
হাসি কান্না, দুঃখে সুখে, জীবনের পথের দু পাশে
ব্যর্থতার শীর্ণ স্মৃতি রেখে, আমি আবার এলাম;
ঈশ্বর, বলো তো তুমি এ-সংসার এসে কী পেলাম?

কী পেয়েছি, জানা নেই। কী দিয়েছি তাও ত জানি না—
শুনি শুধু আদি-অন্ত ভরে বাজে অমৃতের বীণা॥

উৎস

সুশীলকুমার গুপ্ত

চেতনার ভোর থেকে চলি আমি তোমার গভীর
উৎসের সন্ধানে। রাঙা আকাঙ্ক্ষার দিকচক্রবাল
ক্রমাগত সরে যায় দূরে, ধ্রুব নক্ষত্রের নীড়
ভেঙে পড়ে, নীল শূন্যে ঝরে ঝরে স্বপ্নের মরাল।

তোমার উৎসের পথে ফুল ফোটে ঝরে, নদী নীল
ঢেউ তুলে খেলে, মেঘ-ময়ূর আলোর ডানা মেলে
নাচে, ধান-ক্ষেতে হাওয়া ছুটে যায়, ঘাসের মিছিল
প্রান্তরের পথে, বক্ষ প্রসারিত নীলিমাকে ঠেলে।

উৎসের আশ্বাসে পাখি-মৌমাছির গুঞ্জনের তলে
অমৃত কণ্ঠের সাড়া, ছায়ালোকে মুখের রঙিন
রেখাকাব্য, আকাশে তৃতীয় নেত্র, তটিনীর জলে
নীল পদ্ম, ফুলে তৃণে জীবনের সঙ্কেত কঠিন।

সে-উৎসে কালের দ্বন্দ্ব, চিন্তা-ব্যথা-ক্লান্তি-অবসানে
স্থিতির আরতি; শেষে একদিন যাব সেইখানে।

গ্রাম-বাংলা আলোকচিত্র। শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়

॥ অমলাবালা সরকার ॥
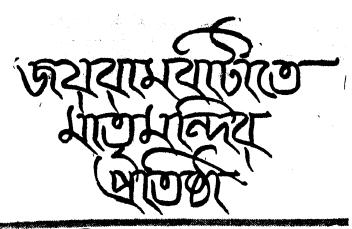
শ্রাবণ মাসের ৪ঠা, ১৩২৭ সাল (ইং ১৯২০ সন)। শ্রীশ্রীমা পীড়িতা হইয়া 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতে ছিলেন। কয়েকদিন হইতেই আশঙ্কার মধ্যে সকলের দিন কাটিতেছিল। ঐ দিন রাত্রি দেড়টার সময় মাতৃদেবী মহাপ্রয়াণ করিলেন। পরদিন বেলা দশটার সময় স্বামী সারদানন্দ মায়ের মরদেহ লইয়া কীর্তনাদি সহকারে বেলুড় মঠে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বরানগর হইয়া পরামাণিক ঘাট হইতে নৌকার গঙ্গা পার হইয়া বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন। বর্তমানে যেখানে শ্রীশ্রীমার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইখানেই জননীর মরদেহের শেষকৃত্য সম্পাদন করা হইয়াছিল। পূতদেহ হোমানলে নিশ্চিহ্ন হইবার পরই এক পশলা মাঠ-ভাসানো বারি বর্ষণে সমস্তই ধৌত হইয়া গিয়াছিল।

বেলা তিনটার সময় সমস্ত সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) সকলকে সঙ্গে করিয়া 'উদ্বোধন'-এ ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরই লাটু মহারাজও (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) দেহত্যাগ করেন। ইনি যখন বালক, তখন হইতেই মায়ের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই একসঙ্গে বেলুড় মঠে ও জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার স্মৃতিমন্দির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। বেলুড় মঠে এই মন্দির নির্মাণ কার্যের ভার স্বামী শংকরানন্দের (বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সভাপতি) উপর অর্পিত হইয়াছিল। জয়রামবাটীর মন্দির-নির্মাণ কার্যের ভার শরৎ মহারাজ স্বামী উমানন্দের উপর অর্পণ করেন।

জয়রামবাটীর পথ দুর্গম। কলিকাতা হইতে মন্দির নির্মাণের যাবতীয় উপকরণ সেখানে লইয়া যাইতে হইবে, এবং মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থও সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য মন্দির নির্মাণ কার্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং বেলুড়ে মন্দির যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হইল জয়রামবাটীতে তাহা হয় নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমার জন্মতিথিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন ভুবনেশ্বরে ছিলেন। তিনি দুর্গা পূজার সময় মাদ্রাজে দুর্গাপূজা করিয়া অসুস্থ শরীরে ভুবনেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে বেলুড়ে আসিয়া মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার লইবার জন্য বারবার লিখিতেছিলেন। মহারাজ প্রথমে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তো সকলেই ওখানে আছ, তোমরাই মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, আমি এখান থেকেই মাকে প্রণাম করব।" কিন্তু স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে না আনিয়া নিরস্ত হন নাই।

ইহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রামবাটীতে যখন মায়ের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর ছিলেন না, তাহার পূর্বেই তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সুতরাং জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার ভার স্বামী সারদানন্দই গ্রহণ করেন। ইহার আগের বৎসর চৈত্র মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাসন্তী পূজাও হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্কল্পিত এই মন্দির স্বামী শিবানন্দ প্রতিষ্ঠা করিবার ভার গ্রহণ করেন।

প্রায় একই সঙ্গে জয়রামবাটীর মন্দির ও ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। সেজন্য সাধু ও কর্মীরা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। একদল ভুবনেশ্বরে গেলেন ও অপর দল জয়রামবাটীতে গেলেন। [illegible] বেলুড় মঠের কার্যনির্বাহের জন্যও [illegible] রহিলেন। তাই যাঁহারা ভুবনেশ্বরে [illegible] উৎসবের শেষে বেলুড়ে ফিরিয়া [illegible] বেলুড়ের মঠে কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং বেলুড়ের অপর সাধুগণ তখন শ্রীশ্রীজয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত হইবার অবসর পাইলেন।

বেলুড়ের মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ (কপিল মহারাজ) পূজকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জয়রামবাটীতেও তিনিই পূজার ভার ও রাত্রে কালী পূজার ভার গ্রহণ করেন। বেলুড়ে

শ্রীশ্রীমা

মঠে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূজা ও কালী পূজার ডাক্তার কাঞ্জিলালও তাঁহার সহকারী ছিলেন, কিন্তু জয়রামবাটীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মাতৃভক্ত ডাক্তার কাঞ্জিলাল লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি। মায়ের ভাইদের মা সন্তানের ন্যায় লালন করিয়াছেন। তাঁহারা যখন পৃথক্ হইলেন, তখন মা ভাগ বাটোয়ারার ভার শরৎ মহারাজের উপরই দিয়াছিলেন। এইভাবে মা তাঁহার পিত্রালয়ের যখন যাহা প্রয়োজন হইত শরৎ মহারাজকেই তাহার ভার দিতেন এবং তিনিও সেই ভার লইতেন এবং তাহা সম্পাদন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কলিকাতায় আসিলে মায়ের বাস করিবার অসুবিধা যাহাতে দূর হয়, সেজন্য অর্থের অনটন সত্ত্বেও স্বামী সারদানন্দ ঋণ করিয়া ১নং মুখার্জি লেনে উদ্বোধনের বাড়ি করেন, এই বাড়ি অদ্যাবধি 'মায়ের বাড়ি' নামে খ্যাত। এই বাড়িতে মা বাস করিয়াছেন, বহু পুরনারী এখানে মায়ের দর্শনের জন্য আসিয়া মাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহারা শোকে রোগে ও বিপদে মায়ের নিকট সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, মায়ের বাণী শ্রবণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়াছেন। কৈলাসে যেমন মা ভবানী জয়া ও বিজয়া উভয় সঙ্গিনীর সহিত বিরাজ করিতেন, উদ্বোধনের বাড়িতেও তেমনই শ্রীশ্রীমা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা দুই সঙ্গিনীর সহিত অভয়া মূর্তিতে বিরাজ করিতেন। সেদিন উদ্বোধনের বাড়ি ছিল আনন্দ নিকেতন।

উদ্বোধনের মাতৃমন্দিরে স্বামী সারদানন্দ ছিলেন প্রহরী। তিনি নিজেকে "আমি মায়ের বাড়ির দারোয়ান" এই পরিচয় দিয়া গর্ব অনুভব করিতেন।

শরৎ মহারাজ কায়মনঃপ্রাণে মায়েরই উপাসনা করিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিয়া জননীকে প্রণাম করিতে আসিতেন, সেই প্রণাম নিবেদনই ছিল তাঁহার সকল সাধনার উৎসস্বরূপ। সুতরাং মায়ের মন্দির স্থাপন ও প্রতিষ্ঠার ভার তিনি যে অন্তরের আকুল আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কী?

নারী জাতির উপর তাঁহার ছিল একান্ত শ্রদ্ধা। অপরিসীম স্নেহ ও সহানুভূতি। যিনি তাঁহার কিছু পরিচয়ও লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই ইহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রখানি এইরূপ, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তি প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।"

শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির বেলুড়

জননীর শৈশব নিকেতন এই জয়রামবাটী গ্রাম। মা এখানে বাল্যে সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করিয়াছেন। এখানেই মায়ের পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শুভবিবাহ হয়। এখানে তাঁহার কত আত্মীয়া ও গুরুজন ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে হয়ত পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি গ্রাম সুবাদে মা ছিলেন সকলেরই আপনার জন ও স্নেহের পাত্রী। জয়রামবাটীতে তাই পদার্পণ মাত্রেই মায়ের সন্তানগণের মনে এক অপূর্ব অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনে জাগে, জগৎজননীর বালিকা-লীলার দিনগুলির কথা; মনে জাগে, মা যখন সাক্ষাৎরূপে এই জয়রামবাটীতে বাস করিয়াছেন সেইসব দিনের কথা। মায়ের সেই নিজের মাটির ঘর কয়খানি মায়ের ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মাতার একখানি ঘর, একখানি তাঁহার নিজের ও একখানি তাঁহার মাতৃহীনা আশ্রয়হীনা ভাইঝি নলিনীর ঘর। সেই ঘরে মা তাঁহার দর্শনার্থী বিদেশাগত সন্তানগণের কীভাবে সেবা করিয়াছেন, জয়রামবাটীতে যে সকল ভাগ্যবান সন্তান তখন মায়ের দর্শন ও স্নেহের সেবা পাইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে জয়রামবাটীর পবিত্র বায়ুপ্রবাহের স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে সে দিনের কথা জাগিয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই ছোট পল্লীটি আজ সমগ্র ভারতের, এমনকি সমগ্র জগতেরও এক মহাতীর্থ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শস্যসম্পদে সমৃদ্ধিশালী এই পল্লীর অধিবাসিগণ নিরক্ষর কিন্তু সরল ও উদার। 'আমোদর' নামক ছোট নদটি গ্রামের পূর্ব ও উত্তর প্রান্ত দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এইরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলা নদীপ্রবাহের বেষ্টনে একটি কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় ঢালু জমি উপদ্বীপের ন্যায় রচিত হইয়াছে। এই উপদ্বীপে অশ্বত্থ-বট-আমলকী-বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ যেন একটি কুঞ্জ রচনা করিয়াছে। সেটি যেন প্রকৃতির নিজে হাতে রচিত একটি পঞ্চবটী বা সাধকের সাধনস্থল। দুই পার্শ্বে গ্রামের শ্মশান, স্থানটি স্বভাবতই নির্জন। শরৎ মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন প্রথমবার জয়রামবাটীতে আসেন, তখন এখানে আসিয়া সকাল ও সন্ধ্যায় ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

জয়রামবাটীতে যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তখন স্বামী ভূমানন্দ ঢাকায় ছিলেন। ইঁনি স্বামী সারদানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। "স্বামী সারদানন্দ যেমন দেখিয়াছি" নামক গ্রন্থখানি ইঁহারই প্রণীত। সেই গ্রন্থে মায়ের জয়রামবাটীতে বাসকালীন যে সব কাহিনী আছে তাহা হইতে এখানে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"শরৎ মহারাজ পদব্রজে জয়রামবাটী যাইতেছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ ২৪শে মার্চ। বেলা ১১টার সময় আমোদর নদ পার হইয়া মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধাও আসিতেছিলেন। রৌদ্রে ও গরমে মহারাজকে ঘর্মাক্ত দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল, বৃদ্ধা সস্নেহে বলিলেন, 'আহা, ভোঁদা (মোটা) মানুষ! বড্ড কষ্ট হয়েছে বাবা?'

"মহারাজ স্নান করিতে আমোদর নদে নামিলেন, স্নান করিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া জয়রামবাটী গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং একেবারে ধূলাপায়ে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তিনি মাকে প্রণাম করিলেন, মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। পরে আমি প্রণাম করিলাম, মা আমারও মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন।'

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬৩।

".....শ্রীশ্রীমা দুইবেলা নিজের হাতে তাঁহার সন্তানদের জন্য কিছু কিছু রান্না করিতেন। ভক্তদের রান্না করিয়া খাওয়াইতে মা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।......সকালে বাহিরের উনুন মুক্ত করিয়া আমাদের জন্য মাছ রান্না করিতেন। পাড়াগাঁয়ে বৃষ্টি হইলে উঠানেও বিষম কাদা হয়। মা অন্দরের উঠানের সেই কাদা একখানা কাঠ দিয়া সমান করিয়া দিতেন। মা স্বেচ্ছায় কাজ করিতেন, এবং কাজ করিয়া চিরদিন আনন্দ পাইতেন।"

জয়রামবাটীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের একটি বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। "নবাবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা" নামে ১৩৩০ সালের উদ্বোধনে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মায়ের জন্মস্থল জয়রামবাটী পল্লী আবার বিশেষ করিয়া বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি,—ইহার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ২৬ মাইল পরিধির মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার অগ্রদূত রেলগাড়ি এখনও দেখা দেন নাই, গরুর গাড়িই একমাত্র বাহন। নগরবাসীর চক্ষে সুতরাং বিশেষ দুর্গম। দুর্গমস্থানে—স্থানীয় ও প্রদেশাগত প্রায় আট হাজার স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর ভক্ত, ইহার পর অভ্যাগত দরিদ্রনারায়ণমণ্ডলী,—ইহা ছাড়া কাশী, এলাহাবাদ,পাটনা, জামতাড়া, মধুপুর, দেওঘর, মিহিজাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বেলুড়, কলিকাতা এবং সুদূর রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় চারিশত সাধু, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তের সমাগমে সেই নির্জন নিস্তব্ধ ঘুমন্তপুরী যেন কোন দেবকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিল।

"মাঠের পরে দূরে আমোদরের মৃদু কল্লোলের সহিত পল্লীর নহবতের তান যেন এক মধুর ঐকাতান সৃষ্টি করিয়াছিল। চারি দিবসব্যাপী অহোরাত্র দীয়তাং ভুজ্যতাং,—কীর্তন, ভজন, যন্ত্রালাপ, লাঠিয়ালগণের লাঠি খেলার নৈপুণ্য, কুচকাওয়াজ, হাতসাফাই, দ্বন্দ্বযুদ্ধ,—স্বাধীন সমৃদ্ধ বাংলার বিস্মৃত অতীত যুগের স্মারক বাদ্য—চৌদ্দখানি ঢাক, কাড়ানাকড়া একসঙ্গে একতালে বাজিয়া উঠিল। মনে হইল যেন রণচণ্ডী মা সিংহবাহিনী সমর সজ্জায় বাহির হইয়াছেন। নদ-নদী-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সবই যেন এক পরমানন্দের হিল্লোলে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; উঠিতেছে অবিরাম অনাহত ধ্বনি,—'শুন শুন মা এসেছে ঘরে তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।' মুসলমান বাদকেরা ব্যাগপাইপে পোঁ ধরিয়াছেন,—সকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা শঙ্খকাঁসর ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত মন্দির প্রাঙ্গণ, সারি সারি পাকশালা, সূপকারগণের ভোগরন্ধনের উৎসাহ উদ্যোগ,—গ্রামের

স্বামী সারদানন্দ

শিশু, বালকবালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সেই বিরাট জনসঙ্ঘে আপনাদের হারাইয়া ফেলিয়াছেন; পরস্পর আলাপন, কর্মীদলের নিঃশব্দ সেবা,—শৃঙ্খলা, শান্তি, মিলন, জপ, ধ্যান, নামামৃত পান ও সেই সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ—সংক্ষেপে ইহাই উৎসব চিত্র।

"বৃহস্পতিবার উৎসব, কিন্তু যাঁহাদের উপর বিশেষ বিশেষ কর্মের ভার পড়িয়াছে তাঁহারা এক পক্ষ পূর্ব হইতেই বিভিন্ন স্থান হইতে জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়াছেন। সেই সকল কর্ম বৃহৎ পাকশালা নির্মাণ, পংক্তি ভোজনের জন্য ছাউনি নির্মাণ। জ্বালানি কাঠের আয়োজন, চারিটি বৃহৎ বৃক্ষ খরিদ করিয়া তাহা কাটিয়া চেলা করিয়া রাখা; ভিয়ান পাতিয়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করা, আগন্তুকদের বাসা দিবার জন্য গ্রামের ভদ্রলোকদের সকলের নিকট হইতেই তাঁহাদের বাহিরের ঘরগুলি চাহিয়া ও বাসের উপযোগী করিয়া রাখা। কলিকাতা ও ঘাটাল হইতে পাকা মাল (অর্থাৎ যাহা নষ্ট হইবে না) বাজার করিয়া আনিয়া ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করা। তরী-তরকারী প্রভৃতি প্রত্যহই সংগ্রহ করা হইবে।

"মনে হইতেছে মা যেন স্বয়ং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিবার জন্য দূর দূরান্তরে সন্তানগণের নিকট আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছেন, তাই মঙ্গলবার হইতেই অনবরত মায়ের অঙ্গন জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

"মঙ্গলবার, ৪ঠা বৈশাখ, ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। মায়ের মন্দিরে সানাই বাজিতেছে। আমাদের যেখানে রাত্রিযাপনের জন্য বাসা দেওয়া হইয়াছিল সে স্থানটি ঠিক শ্রীমন্দিরের সম্মুখে। শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট, প্রস্থে ১৯ ফুট। বাহির বারান্ডার পূর্বদিকে দশ ফুট পশ্চিমে নয় ফুট এবং উত্তরে ও দক্ষিণে ৮ ফুট করিয়া

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির

বারান্ডা। (এই বারান্ডা পরে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় ভাঙিগয়া প্রশস্ত করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে) স্বামী উমানন্দের উপর মাতৃমন্দির নির্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছিল। মন্দিরটি বেশ বড়ই হইয়াছে, সাদা ধপ্‌ধপে। সম্মুখদ্বার, ছয় গবাক্ষ এবং ভিতরকার শয়ন গৃহের দুইটি দরজা ধরিলে নবদ্বার। বৌদ্ধস্তূপ ও মুসলমান গম্বুজ এই দুয়ের সংমিশ্রণে মন্দিরের নক্সা করা হইয়াছে। গম্বুজ সমেত মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। নির্মাণকার্যের জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন অভিজ্ঞ কারিগর আনিতে হইয়াছিল। উপরের পতাকাটি যেন দূরাগত যাত্রীদের ধ্রুবতারার মত পথ নির্দেশ করিতেছে এবং পথশ্রান্তকে অভয় দিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে মায়ের আহ্বান জানাইতেছে। চারিধারের বারান্ডাগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা, লাল সিমেণ্টের মেঝে। ঠিক সম্মুখে হিন্দুস্থানের মন্দিরের ন্যায় একটি প্রকান্ড ঘণ্টা ঝুলান আছে। চারিধারের শুচিশুভ্র দেওয়ালে সপার্ষদ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছায়াচিত্র। ভিতরে কালপাথরের বেদীর উপর দেবীর আসন এবং তাহার সহিত সংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তরে একটি নিম্ন বেদিকা। ভিতরের দেওয়ালে দশাবতার যুগাবতারগণের চিত্রাবলী শোভা পাইতেছে। গম্বুজকেন্দ্র হইতে দীপ ঝুলাইবার জন্য একটি লৌহশলাকা লম্বমান রহিয়াছে। বাহিরের আলো ও বায়ু চলাচলের জন্য কয়েকটি গবাক্ষ-গোলক (স্কাই লাইট) মন্দিরগাত্রে উপরের দিকে ফুটানো হইয়াছে। ভিতরে মাথার উপরে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় গম্বুজের গায়ে একটি শতদল পদ্ম অঙ্কিত রহিয়াছে।

"পিছনের সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠা যায়। গম্বুজ ঘিরিয়া একটি বারান্ডা, সেই বারান্ডা হইতে জয়রামবাটী-গ্রামের দৃশ্য চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। শ্যামলশ্রী-মণ্ডিত গ্রাম, চারিধারে অসংখ্য তাল বাঁশ ও তেঁতুল গাছের শ্রেণী।

"জয়রামবাটীর উত্তরে দেশড়া, কোয়াল-পাড়া, পূর্বে তাজপুর, আনুড় ও কামার-পুকুর এবং আরামবাগ, দক্ষিণে জিবটা, রামজীবনপুর এবং পশ্চিমে শিওড় ও শিরোমণিপুর। এ অঞ্চলের ভূমি বিশেষ উর্বরা, তাই দারুণ-ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সত্ত্বেও অন্নাভাব নাই বলিয়া মানুষ বাঁচিয়া আছে। জয়রামবাটী গ্রাম, ছোট গ্রাম হইলেও এখানে প্রায় চারিশত লোকের বাস। এই চারিশত গ্রামবাসীর সকলেরই কিছু না কিছু জমি ও জোত আছে, মরাই ভরা ধান আছে।

"জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। জমি আবার দুই প্রকার,—মাঠের জমি ও কালা জমি। মাঠের জমিতে নানা রকমের ধান হয় এবং সেই সকল ধানের নানা রকম নাম,—যেমন রাজীবোলদেজ, পাৎসাভোগ (বাদশাভোগ), ধুলে কলমা, হেমৎধান (হৈমন্তিক ধান্য) প্রভৃতি। কালা জমিতে বর্ষার লেউঁজি, আউশ ও ঝাঁঝি প্রভৃতি মোটা ধরনের ধান হয়, ইহা ছাড়া রবিশস্যও উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রকমের কলাই,—যেমন মাষকলাই, মুগ, মটর, মসুর ও টুমুর, গম, যব, সরিষা, হলুদ ও আদা। তরকারীর ভিতর বুলি উচ্ছে, বেগুন, মুক্তকেশী বেগুন, ঝিঙে, কাঁকুড়, গোলআলু, কুমড়া (উৎসবের সময় ইহার প্রচুর তরকারী হইয়াছিল) পিঁয়াজ, রসুন ও নানা প্রকার শাক, মূলা এবং আখ,—তবে দুঃখের বিষয় এ অঞ্চলে আম কাঁঠালের গাছ ও নারিকেল গাছ খুবই কম, ঐ সকল ফলের প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাইতে হয়।

"গ্রামের ভিতর যে সকল দেব দেবী পূজিত হন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সিংহবাহিনী মাতা, বাংলা দেশের বৌদ্ধ যুগের স্মারক ধর্মঠাকুর ও যাত্রাসিদ্ধি। গ্রামে প্রতি বৎসর শ্যামাপূজা হয়; আমরা যে বাড়ীর বৈঠকখানাটি বাসের জন্য পাইয়াছিলাম, সেখানে প্রতি বৎসর প্রতিমা আনিয়া শ্যামা পূজা হয়। মায়ের বাড়ীতেও প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হয়, সেই জগদ্ধাত্রী মণ্ডপেই এই উৎসবের যিনি আচার্যদেব—স্বামী সারদানন্দের স্থান করা হইয়াছিল।

"আচার্যদেব আসিয়া পৌঁছিলেন। আজিকার এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা যজ্ঞে তিনিই হোতা, তাঁহার আগমনে সকলের কর্মের উৎসাহ যেন বিপুলভাবে বর্ধিত হইল।

"আচার্যদেব নদীপারে আছেন, সকলে সেখান হইতে তাঁহাকে বরণ করিয়া আনিবার জন্য ছুটিলেন, তখন সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, আচার্যদেব আসিয়া মায়ের মন্দিরের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। ভক্তেরা সকলে এক এক করিয়া আসিয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনি সকলেরই মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। একজন এই সময় আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদী মালা পরাইয়া বরণ করিলেন। ... ... ক্রমে ভোগের ঘণ্টা পড়িল। ... যাঁহারা আজ নূতন আসিয়াছেন তাঁহাদেরও শয়নের ব্যবস্থা করা হইল। ... ...

"৫ই বুধবার, পূজার প্রণালী গত রাত্রেই স্থির করা হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমে কার্যসিদ্ধিদাতা গণপতির পূজা করিয়া ঘট স্থাপনা, পঞ্চ দেবতার অর্চনা। আশ্রম গৃহেই নিত্যপূজা হইল। আচার্যের আদেশমত স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী বোধন-পূজা আরম্ভ করিলেন।

"নূতন মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনা,—শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ একখানি তৈল চিত্র অদ্যই স্থাপনা করা হইল। মৃগচর্মাসীনা জপরতা মা—বক্ষোপরি আলুলায়িত চাঁচর চিকুর,—পরণে শুভ্র লাল পাড় সাড়ী, সীমন্তে সিন্দুর রেখা,—করদ্বয়ে সুবর্ণ-বলয়। (গত শত বার্ষিকী উৎসবের সময় মায়ের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে) সৌম্য, শান্ত যেন জীবন্ত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। ... মাতৃমূর্তি বসানো হইলে শ্রীমন্দির অপূর্ব শোভায় ভরিয়া উঠিল।

"যে জননী একদিন শান্ত রূপে আমাদের দেখা দিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি জনেরই

ছিলেন তিনি নিজস্ব, তিনি স্নেহময়ী মা,—সেই মা অনন্ত মাতৃমূর্তিতে দেখা দিলেন; আজ এই পল্লীর পূজার অংগনে শত হাজার সন্তান একই সংগে এক কণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাক দিল। এই অপূর্ব দৃশ্যে মন যেন একেবারে বিমোহিত। চারিধারে জমায়েত বিপুল জনতা, একটু অগ্রসর হইতে হইলে লোক ঠেলিয়া পথ করিতে হয়, অথচ ইহার মধ্যে কি দেখিলাম?—দেখিলাম কি অপূর্ব প্রশান্তি, শত শত উৎসব-মুখরতার মধ্যে শান্ত সৌম্য মূর্তি মন্দির চত্বরের উপর ধ্যানমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট; মন্দির দ্বারে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমস্ত বিস্তৃত উত্তরের বারান্ডাটিতে সারীর পর শ্রেণী কৃপাপ্রার্থীগণ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন দলে দলে। দ্বাদশ বর্ষের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ, সকলেই নিস্তব্ধ, আজ এই পুণ্য দিবসে স্বাগত বরাভয়করা মায়ের দুয়ারে বর প্রার্থীর দল,—'হে আচার্য, হে দেব, উপেমাহং ভবন্তং আমরা কৃপা-প্রার্থী জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় আমাদের দৃষ্টি-দান কর, আমাদের মোহপাশ হইতে মুক্ত কর।"

এই দিনের সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আর এক অপূর্ব রূপ দেখিয়াছিলাম মহারাজের। এই বিরাট যজ্ঞ যাঁহার পরিকল্পনা, প্রেরণা ও আদেশে সম্পন্ন হইতেছিল তিনি যেন কর্মহীন দ্রষ্টা কর্তামাত্র। অথচ এই পরম নিষ্ক্রিয়াহীন কর্তার উপস্থিতিতেই সকলের প্রাণে এমন অদ্ভুত কর্মপ্রেরণা ও উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল যে কেহ কাহারও হুকুমের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের প্রাণ-মন যতটা সামর্থ্য সমস্ত ঢালিয়া দিয়া আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করিবার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেছিল। অথচ কোথাও বিন্দু-মাত্র বিশৃঙ্খলা বিরোধ বিতর্ক দেখা যায় নাই।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের আবাসগৃহ

"মায়ের বাড়ীতে আসিয়া মহারাজ যেন সকলের মায়ের মতই হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য, অভিষেক, দীক্ষা যে যাহা চাহিতেছে তাহাই পাইতেছে। একদিন সকাল হইতে দীক্ষা দিতে দিতে অনেক বেলা হইয়া গেল, খাওয়া নাই, বিশ্রাম নাই, সবে অসুখ হইতে উঠিয়াছেন, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।......বালক, বৃদ্ধ, ধনী ও গরীব সকলেই সমভাবে মহা-রাজের কৃপা পাইতেছে, মায়ের বাড়িতে তিনি যেন দানসত্র খুলিয়াছেন। কেহ কেহ দীক্ষার পর দক্ষিণার জন্য যে ফুল-ফলের প্রয়োজন তাহাও আনিতে পারে নাই, মহা-রাজ মায়ের ভাণ্ডার হইতেই সমস্ত জোগাইতেছেন।......

"মায়ের মন্দিরে পূজা আরম্ভ হইয়াছে, আচার্যদেব শৃঙ্খলার সহিত পূজার শুভ-কার্যগুলি কিভাবে সম্পাদিত হইতেছে স্থির দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছেন। তদ্-ভাবাপন্ন-তন্ময়। প্রথমে শ্রীগুরুপূজা, তাহার পর বাস্তুপুরুষের পূজা। আজ আরও একবার শ্রীগণপতির পূজা হইল। তাহার পর ক্রমে ব্রহ্মা, ষোড়শোপচারে বিদ্যা-দায়িনী বাণী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা, বসুধারা দান এবং ষোড়শোপচারে প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাহার পর শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিস্নান ও ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা। তাহার পর হোমকুণ্ডে সমিধের উপর অগ্নিদান হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া হবিঃ আহুতি চলিল। মন্দির মথিত করিয়া ক্রমাগত 'স্বাহা', 'স্বাহা' ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ধূপধূমার সৌরভ ও ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ।

গোযানে শ্রীশ্রীমা

"অন্নপূর্ণা জননীর সমক্ষে থরে থরে বিরাট ভোগের অন্নসমূহ একটির পর একটি সুসজ্জিত হইল, বিরাট অনুষ্ঠানে

বিপুল ভোগের আয়োজন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেল। ভোগের পর ভোগারাতি, সতৃষ্ণ-নয়নে মাতৃমূর্তির দিকে চাহিয়া সন্তানগণ সকলে গলবস্ত্রে দণ্ডায়মান। আরাত্রির পর জননীর জয়ধ্বনি, পরে আরাত্রিক গান ও স্তবপাঠ আরম্ভ হইল। ইহার পর বহু-কণ্ঠে একত্রে ভজন গান।

"এদিকে অজস্র তরিতরকারী কুটা চলিতেছে। পাকশালে পঁচিশ জন সূপকার কোমর বাঁধিয়া রন্ধনে ব্যাপৃত। কর্মিগণ হাতে হাতে জোগান দিতেছেন।

"রন্ধনশালার নিকটে বহুজনসমাকীর্ণ প্রাঙ্গণে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, 'এস, এস, কে কোথায় ক্ষুধিত প্রসাদপ্রার্থী আছ এস, কে আছ অভুক্ত এস, অন্নপূর্ণা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।'

"কর্মিগণ অনলসভাবে কর্ম করিয়া যাইতেছেন, বৃহৎ ছাউনির একধার হইতে অনাধার পর্যন্ত পরিমার্জিত করা হইয়াছে, দুতহস্তে কুশাসন সাজাইয়া দেওয়া হইতেছে—নুন, পাতা ও জল পরিবেশন করার পর মানাবিধ ভাজা, অন্ন, ডাল, কুমড়ার তরকারী, মাছের কালিয়া, চচ্চড়ি, অম্বল, দধি, বোঁদে ও পায়েস পরিবেশন করা হইল। এক পংক্তি উঠিতেছে, নিমেষে স্থান পরিষ্কার ও অপর পংক্তির জন্য আসন দেওয়া হইতেছে, এইভাবে বেলা ১২টা হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত সমভাবে প্রসাদ বিতরণ হইল।

"চারিধারেই কর্মপ্রচেষ্টা, কাজ হইতেছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র হৈ-চৈ নাই। নিঃশব্দে কাজ চলিতেছে। কর্মীর দল নিজেরা সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া ভক্তসেবায় প্রাণমন অর্পণ করিয়াছেন। কি সুন্দর দৃশ্য! মায়ের ভিখারী সন্তানগণ আজ মায়ের কৃপায় মায়ের সেবায় যেন কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন।......পল্লীসমাজে নানা সামাজিক আচার, মানমর্যাদার সমস্যা আছে। কিন্তু আজ যেন সকলের মনেই ভেদাভেদ ভাব দূর হইয়া গিয়াছে। কাহারও কোন সংকোচ নাই, নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা নাই। অতি দরিদ্র, অতি নিম্নশ্রেণী হইতে পল্লী-সমাজের অতি উচ্চশ্রেণীর এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই একত্রে সমবেত হইয়াছেন। সাধুরা উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলকেই সমভাবে সমাদর করিতেছেন।

"জলের জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। জলবহনকারী কর্মীদের একটি আলাদা বিভাগ করা হইয়াছিল। সকাল, দ্বিপ্রহর ও বৈকাল—তিন বেলাই ডাক বসাইয়া বাড়ুয্যে পুখুরের রক্ষিত জল আনা হইতেছে। বড় বড় কলসী জলে অত্যন্ত ভারী হইলেও লোক বাছাই করিয়া যাহার যেমন সামর্থ্য তাহার উপর সেইরূপ-ভাবে জল আনিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। যখন কর্মীদের দারুণ গরম ও রোদে অত্যন্ত পরিশ্রম হইতেছে তখন যাহাতে তাঁহারা বিশ্রাম লইতে পারেন সেজন্য পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় মাদুর পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জল বিভাগের যিনি কর্তা তিনি তাঁহার সহকর্মীদের ঠাণ্ডা সরবৎ ও বোঁদে পরিবেশন করিতেছেন।

"কত যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে কাঙ্গাল গরীব মেয়েরা ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া ও কোলে করিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রসাদ পাইবার পর রাত্রি হওয়াতে তাহারা পথের দুই ধারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শয়ন করিয়াছে। যেন তাহারা মায়ের অঞ্চলেই নির্বিঘ্নে নিদ্রামগ্ন।"

এই কাঙ্গাল-ভোজনের দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া জয়রামবাটীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের সমাপ্তি করিলাম।

উৎসবটি অবশ্য মায়ের শতবার্ষিক উৎসবের ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার উৎসবের মত সমারোহপূর্ণ হয় নাই। তথাপি যে অনাবিল ভক্তি এবং জাঁকজমকহীন আন্তরিক একাগ্রতা এই উৎসবে প্রকটিত হইয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন এই মাতৃযজ্ঞের কর্ণধার এবং তাঁহারই পরিকল্পনায় এই উৎসব সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছিল।

পুরনো দুনিয়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ড়ির মুখে দেখা হতেই রিনা বলে উঠল, "ইশ, একটুর জন্যে তুমি সুযোগটা হারালে।"

বললাম, "কী ব্যাপার ?"

রিনা বলল, "আমার এক বান্ধবী এইমাত্র চলে গেল। পাঁচ মিনিট আগে এলে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত।"

বললাম, "আমি আমার নিজের বান্ধবী ছাড়া আর কারো বান্ধবী সম্বন্ধে উৎসাহী নই।"

আমার আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রিনা ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে একটু হাসল। "দেখ, আর যাই কর, আমার কাছে মিছে কথা বল না। বলে সেরে যেতে পারবে না। আমি তোমাকে চিনি।"

প্রশস্ত ছাদের মাঝখানে নিচু গোল টেবিল পাতা। তার চারদিক ঘিরে খান তিনেক বেতের চেয়ার। আমি তার একটি টেনে নিয়ে বসতেই রিনা বলল, "একটু আগে আমার সেই বান্ধবীটি এখানে ছিল। তোমার ওই চেয়ারটাতেই বসেছিল। তোমার নাক যত বড়, ঘ্রাণশক্তি যদি তত তীব্র হত, তাহলে এখনো হাওয়ায় তার গায়ের গন্ধ পেতে।"

হেসে বললাম, "পুরোবর্তিনীর পাউডারের সৌরভ নেপথ্যবর্তিনীকে ঢেকে দিয়েছে। আমার নাকের কোন দোষ নেই।"

রিনা বলল, "দোষটা তোমার নাকের নয়, চোখের। নতুন মেয়ের মুখ দেখলে তোমার দুটি চোখ সেখান থেকে নড়তে চায় না। তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছ, তোমার দেশভ্রমণের কোন আগ্রহ নেই। একেকটি মেয়েই তোমার কাছে একেকটি দেশ, একেকটি দুনিয়া।"

বললাম, "কথাটা একটু শুধরে নাও। মেয়ে কেটে মানুষ কর। একেকটি মানুষ আমার কাছে একেকটি দুনিয়া, এ-কথা ঠিক। সেই দুনিয়া দেখবার জন্যে আমার দূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না। এমন কি, অন্য গ্রাম অন্য নগরেও নয়। আমি তাদের ঘরে বসেই দেখতে পাই। বড়জোর দু পা বাড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই হল।"

আমার কথার মধ্যে যে কোন যুক্তি নেই, সত্যতাও নেই, তা বলবার জন্যে রিনা একটু হাসল। হাসলে যে ওকে সুন্দর দেখায়, তা ও জানে। নিজের দাঁতগুলির শুভ্র চারুতা সম্বন্ধে ও সচেতন। হাসিতে যদি ক্ষণেকের জন্যে কথা ঢাকা পড়ে, ওর বন্ধুরা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ তারা যখন ওকে দিয়ে কথা বলায়, তা কান পেতে শোনার জন্যে বলায় না, চোখ পেতে ওর বাক্যময় রূপ দেখবার জন্যে তর্কের অবতারণা করে। কিন্তু রিনা সে-কথা মনে রাখে না। কথা বলায় ওর আনন্দ। কথা বলতে ও ভালবাসে। কথা বলতে ও জানেও। বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত শ্রোতা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আত্ম-প্রকাশ হয় লক্ষ্য।

আর এখন কথা বলা ছাড়া ওর কোন কাজ নেই। রিনা ধনী ব্যারিস্টারের মেয়ে। ওর নিজের নামেও হাজার কয়েক টাকা জমা আছে। সে-টাকায় ইউরোপ যাওয়া না গেলেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাওয়া যায়। কলকাতা যখনি একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে ও পা চালা দেয়। আসলে মুখ চালাই ওর উদ্দেশ্য। ওদের সমাজে পর্দার প্রচলন নেই। তাই অন্তরালের জন্যে ওর মাঝে মাঝে দেশান্তরী হবার দরকার হয়। আমাকে রিনা মাঝে মাঝে কুনো বলে খোঁটা দেয়। কারণ আমি ঘর থেকে বড় একটা বেরোই না। মানে এই শহর থেকে। আসলে আমার দুখানি পা থাকা সত্ত্বেও চলচ্ছক্তি কম। তাই বলে যে বেরোবার সাধ নেই তা নয়। নতুন দেশের স্বাদ ঘরের কোণে বসে মেলে না। সে-কথা আমি মনে মনে মানি। কিন্তু মুখে স্বীকার করিনে। বলি, মনোরথের তুল্য রথ নেই। বলি, সব চেয়ে দূর আর দুর্গম হল বন্ধুজনের অন্তরদেশ। আমার দেশান্তরে যাওয়ার দরকার কী।

রিনা আমার মত নয়। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ও অনেক জায়গা ঘুরেছে, অনেক মাটি মানুষ আর মনের স্পর্শ পেয়েছে। দু দু বার বিয়ের বাঁধন ছিঁড়েছে। আরও কয়েকবার বাঁধনে ধরা পড়তে পড়তে সরে এসেছে। বক্ত আঁটুনি আর ফস্কা গেরো যে কতবার হয়েছে তার তো ঠিক-ঠিকানাই নেই। জীবন সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা বিচিত্র, শুধু দেখা নয় শোনা নয়।

ছুটোছুটির ফাঁকে ফাঁকে জীবন সম্বন্ধে ও বসে বসে ভেবেছেও। ওর অনেক কথাই হয়ত বই পড়ে পড়ে না হয় বন্ধুদের মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করা। কিন্তু তাতে দোষ কী। আমরা কজন আর সংসারে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করছে আসি। পাঁচজনের মুখের কথাই কুড়িয়ে কাড়িয়ে পঞ্চামৃতের স্বাদ আনা যায়, যদি তাতে আত্মোপলব্ধির দু-একটি ছিটেফোঁটাও অন্তত থাকে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, রিনার তা আছে। শেখা বুলি আওড়ালেও ও নিজের গলায় আওড়ায়।

আমার সঙ্গে যখন ওর আলাপ, ও তখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কর্ম থেকে বিশ্রাম নয়, কর্ম থেকে বিশ্রাম। জীবিকার জন্যে কখনো ওকে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি।

জীবনের অভিজ্ঞতায় সেই ওর বড় রকমের ঘাটতি। রিনা অবশ্য সে-কথা স্বীকার করে না। বলে, "মাস্টারি কি কেরানীগিরি না করলে, হাসপাতালের নার্স কি অফিসের স্টেনো না হলে আধুনিক মেয়ের জীবন মাটি হয়ে যায়, এ-কথা আমি মানিনে।"

আমি বলি, "বেশ, তাহলে কোন আর্টের দিকে যাও। নাচ গান, ছবি আঁকা, সাহিত্য কি অভিনয়, রাজনীতি কি সমাজ-সংস্কার—"

রিনা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "কিছু না কিছু না। আমি কিছু না করে শুধু বেঁচে থাকব। আমার অস্তিত্বই এক উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি। সব রকমের সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ।"

বলি, "অনভ্যাসে বিদ্যা যে হ্রাস পাবে। বুদ্ধিতে মরচে পড়বে।"

রিনা হেসে বলে, "সেই বুঝি হয়েছে তোমার মহা ভাবনা। অনেকদিন আগেই বিদ্যেকে গলিয়ে চোখের সুর্মার সংগে মিশিয়েছি, আর বুদ্ধিকে লিপস্টিকে। যাতে আমার বন্ধুদের নয়ন মন দুইই রঞ্জিত হয়। দুনিয়ায় এ ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।"

রিনার সব কথাই এই ধরনের শ্লেষ, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপে শাণিত। কিন্তু এত অস্ত্র চালনা যে কার বিরুদ্ধে তা সব সময় বোঝা যায় না। অনেক সময় মনে হয়, ও হাওয়ার সংগে লড়াই করছে।

এ-গল্প রিনা চৌধুরীকে নিয়ে নয়। তবু যে তার সম্বন্ধে এত কথা বলছি তার কারণ গল্পটা রিনার মুখ থেকে শোনা। মুখবন্ধের আকারে সেই মুখশ্রীর যদি একটু বন্দনা করি, পাঠকরা অপরাধ নেবেন না।

চাকর এসে চায়ের পট রেখে গেল। রিনা একবার সেদিকে একটু তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "কিন্তু চিত্রাকে দেখলে, তার সংগে আলাপ করলে, তোমার পক্ষে লাভ হত। ওর জীবনে বেশ বড় একটা কাহিনী আছে।"

বললাম, "কাহিনী তোমার জীবনেই বা এমন কি কম। আর তুমি জীবন দিতে না চাইলেও জীবনীর দু চার অধ্যায় ত দিয়েছ।"

রিনা বলল, "দিয়েছি। কিন্তু সে-দেওয়া ধোপাকে কাপড় দেওয়ার মত। বন্ধুকে বই ধার দেওয়ার মত। তুমি আমার জীবনীর দু-এক অধ্যায় অধ্যয়ন করতে পার, কিন্তু তা মুখস্ত লিখতে পারবে না।"

বললাম, "মুখস্ত আমি কিছু লিখিনে। মেয়েদের মনের কথাই হক, আর মুখের কথাই হক, আমার কলমের মুখে পড়লে তা আপনিই সূচিমুখ হয়ে ওঠে। তার রূপ আগা-গোড়া পালটে যায়।"

রিনা বলল, "যাকগে, চিত্রার কথা তুমি শুনবে কি শুনবে না এক কথায় বলে দাও।"

ধমকের ভঙ্গিটুকু উপভোগ করে বললাম, "আচ্ছা বল।"

রিনা খুশী হয়ে বলতে শুরু করল।

"ওর পুরোনাম ছিল চিত্রাঙ্গদা চট্টোপাধ্যায়। ওর বাবা যে তোমার মতই অনুপ্রাসের ভক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্রার বাবা শ্রীপদ চাটুজ্জেকে আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। তাই হিসেবমত চিত্রার সংগে আমার বন্ধুত্ব পুরুষানুক্রমিক। কিন্তু আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ কোন মিল ছিল না। চিত্রারা জাতে বামুন, ধর্মে খৃষ্টান। শ্রীপদবাবু ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটা তেমন না মানলেও, নীতির দিকটা বিশেষ করেই মানতেন। মদ খেতেন না, পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলতেন না। লোকের সংগে অসদ্ব্যবহারের কোন সুযোগই তাঁর ছিল না। কারণ মানুষের সংগে বেশী মেলামেশা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মিশনারি কলেজে পড়াতেন। স্বার্থপর খেলোয়াড়ের মত তিনি ছিলেন স্বার্থপর অধ্যাপক। নিজের মনে পড়িয়ে যেতেন, ছাত্রদের সহযোগিতা বেশী চাইতেন না। তবু তাঁর নাম যশ ছিল। সৎ মানুষ হিসেবে আশপাশের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। শ্রদ্ধা করত, কিন্তু গ্রাহ্য করত না। রাঁচি রোডে ওঁদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে তখন আমাদের বাড়ি। হাওয়াটাও যে একটু উল্টো রকমের ছিল তা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ। হাইকোর্টে পসার আর শহরে প্রতিপত্তি, দুই-ই আমার বাবার আছে। তাঁর পেশা সুবোধ ছেলে পড়ানো নয়। যে-সব মক্কেল নিয়ে তাঁর কারবার, তাঁরা সবাই কিছু যুধিষ্ঠির ছিলেন না। কিন্তু কোর্টে গিয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাবার মত মাথার জোর ছিল বাবার, মুখের জোর ছিল। সেই জাদুকরী শক্তি খানিকটা আমি পেয়েছি। অশনে-বসনে পোশাকে-আসবাবে রীতিতে-নীতিতে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে মিল ছিল না। তবু চিত্রার সংগে আমার ভাব জমে গিয়েছিল। আমরা একই স্কুলে পরে একই কলেজে পড়েছি। এক ক্লাশে এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছি। তার ফলে কিছুটা বন্ধুত্ব আপনা থেকেই হয়ে গেছে। আমি পড়াশুনো না করে আর দিনরাত আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে বেড়িয়েও চিত্রার চেয়ে চিরকাল বেশী নম্বর পেয়েছি। তার ফলে কাকা-বাবুর কাছে আমার খানিকটা বেশী খাতির

ছিল। তা ছাড়া চিত্রা যা করতে সাহস পেত না, আমি তা পেতাম। কাকাবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতাম। ভালটা কেন ভাল, মন্দটা কেন খারাপ তা জানতে চাইতাম। চিত্রার মত বিনা বিচারে সব কথা মেনে নিতাম না। কাকাবাবু যদিও আড়ালে-আবডালে অকালপক্ক বলে আমাকে গাল দিতেন, কিন্তু সামনে গেলে অনাদর করতে পারতেন না। পরে শুনেছি, আমার অনেক কথা তাঁর মনে চিন্তার উদ্রেক করেছে। সেই চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে প্রবন্ধ।

"তোমার কাছে বিনয় করব না। কারণ বিনয় তোমার ভূষণ হতে পারে, আমার নয়। দেখতেই পাচ্ছ, হাতে কানে গলায় আমার আলাদা আলাদা গয়না আছে। আর তোমার বিনয় ছাড়া কিছুই নেই। চিত্রা আমার চেয়ে রূপে গুণে নিরেস ছিল, এ-কথা বললে শিষ্টাচারের যদি নিয়মভঙ্গ হয় হক। চিত্রার রঙ শ্যামলা, নাক-চোখ খুব চোখা নয়। ছিপছিপে একহারা গড়ন। তবু লোকে বলত ওর মুখে মিষ্টত্ব বেশী, চেহারায় হাঁটা-চলায় ও একেবারে সেন্ট পারসেন্ট মেয়ে। আমি ঈর্ষায় জ্বলতাম। তুলনাটা যে কার সঙ্গে তা কেউ উল্লেখ না করলেও আমার বুঝতে বাকী থাকত না। মনে মনে বলতাম, আমি চাইনে ওর মত হতে। ও যদি লতা হয়, আমি ধারালো তলোয়ার। আমি বীরের হাতের, বিদ্রোহীর হাতের অস্ত্র। ছেলেরা বারবার ওর দিকে তাকাত। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে উৎসাহ পেত না। চিত্রা মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু বড় ঠাণ্ডা, বড় শান্ত, বিষণ্ণ আর গম্ভীর। ও যেন ট্র্যাজেডির নায়িকা হওয়ার জন্যেই জন্মেছে।

"অবশ্য কিছুটা দুঃখের কারণ ছিল। অল্প বয়সে ওর মা মারা যায়। বাপ ত সংসারে থেকেও আধা সন্ন্যাসী ছিলেন। বউ মারা যাওয়ার পর বইয়ের মধ্যে আরো বেশী করে ডুবে গেলেন। চিত্রার এক বিধবা বুড়ী পিসিমা এসে ভার নিলেন সংসারের। ভারি শুচিবাই ছিল চিত্রার পিসিমার। দু-তিন পুরুষ ধরে ক্রিশ্চিয়ান হলেও হিন্দুয়ানির অনেক সংস্কারই তিনি ছাড়তে পারেননি। কেবল গীতার বদলে বাংলা বাইবেল পড়া আর রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বদলে একমাত্র যীশুখৃষ্টের ছবির নীচে মোমবাতি জ্বালানো ছাড়া হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ কোন তফাত তাঁর ছিল না। ভূত প্রেত তাবিচ কবচ এমন জিনিস নেই যা তিনি মানতেন না। চিত্রাকে তিনি প্রায়ই বকতেন। বাইরের কোন ছেলের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতেন না। আর আমার মত মেয়ে ত ছেলেরও বাড়া। তখন আমার বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশী নয়। কিন্তু সেই বয়সেই চিত্রার পিসি আমাকে নষ্ট আর বজ্জাত বলে গাল দিতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য আমি যে নিরীহ আশ্রমমৃগী ছিলাম তা নয়। তখন থেকেই পুরুষের চোখ আর চিত্ত আমাকে দেখে চঞ্চল হত। বিশেষ করে যাঁদের বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশের উপরে তাঁরা আমাকে কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। মুশকিল এই যে, আমি তাঁদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মানে বুঝতাম। সুবিধেমত অবশ্য না-বুঝবার ভান করতাম। তাতে যদি আবার তাঁদের সুবিধে বাড়ত, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতাম যে, আমি সব বুঝেছি। যা হক, দোষ থাকলেও আমি তা কবুল করতে রাজী ছিলাম না। অন্যের মুখে তা শুনতে আমার আরো আপত্তি ছিল। তাই চিত্রার পিসি যেমন আমাকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না, তিনিও তেমনি আমার চক্ষুশূল ছিলেন। শুধু আমি একা নই, আমার ছোট ভাইবোনদেরও ওই বুড়ীর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। তারা চিত্রার পিসিকে দেখে ভেংচি কাটত, আর ছড়া কাটত। আর তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। গালি-গালাজ শাপ-শাপান্তের আর অন্ত থাকত না।

"চিত্রাও হাসত। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর মুখে অনুযোগ দিয়ে বলত, 'আমার পিসিমার সঙ্গে অমন করে লাগিস কেন? বুড়োমানুষ, কষ্ট হয় না?'

"আমি বলতাম, 'কষ্ট না ঘোড়ার ডিম হয়। ওই বুড়ী কেন পাড়া ভরে আমার অমন নিন্দে-মন্দ করে? কেন তোর কাছ সুদ্ধু আমাকে ঘেঁষতে দেয় না? আমি কি পচা-আপেল যে কাছে এলেই তোর গায়ে দাগ লাগবে?'

"চিত্রা হেসে বলত, 'আহা বাড়ির বাইরেও ত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভিতরে না হয় নাই গেল।'

"ওর এই নির্লিপ্ততা দেখে আমার ভারী রাগ হত। মনে মনে ভাবতাম, পিসিকে ত পারব না, কিন্তু এই পিসিসোহাগী ভাইঝিকে আমি একদিন বখাবই বখাব। তার জন্যে যদি আমার সব চেয়ে সেরা ভক্তকে ছেড়ে দিতে হয়, তাতেও রাজী আছি।

"আমার মাও বারণ করতেন! বলতেন, 'ওরা যখন চায় না, যাসনে ওদের বাড়িতে। মিশিসনে ওদের সঙ্গে।'

"আমি বলতাম, 'বয়ে গেছে ওই বুড়ীর বাড়িতে যেতে।'

"বুড়ীর বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে ও-বাড়ির নাম হয়ে গেল 'দ্যাট ওল্ড অ্যাণ্ড এনসিয়েণ্ট ওয়ার্ল্ড'। নামটা আমার ছোটভাই অন্তুই মাথা থেকে বার করলে। শুধু আমাদের বাড়ির নয়, পাড়া ভরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর কুকুরছানার নতুন নতুন নাম রেখে তার যশ বেড়েছে। তার দেওয়া চিত্রাদের বাড়ির এই নামটা আমরা সবাই লুফে নিলাম। ঠিক উপযুক্ত নাম হয়েছে। ও-বাড়িতে শুধু যে একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বুড়ী আছে তাই নয়, ও-বাড়ির সবই পুরনো। দুটো ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে চুনবালিঝরা চেহারাটা যেমন প্রাচীন, ভিতরের বাসিন্দা কটিও তেমনি, এ-কালের হয়েও পুরনো আমলের মানুষ। এমন কি, চিত্রার গায়েও পুরনো গন্ধ, পুরনো পোশাক, মন ভরা পুরনো দিনের সংস্কার। ও-বাড়ির উপযুক্ত নাম পুরনো দুনিয়া। নামটা কেন যে আমাদের আগে স্ট্রাইক করেনি, এইটেই আশ্চর্য।

"তারপর পুরনো দুনিয়া থেকেও চিত্রার বুড়ী পিসিমা একদিন সরে গেলেন। মারা গেলেন তিন-চারদিনের জ্বরে। চিত্রা কেঁদে আকুল হল। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিও যে কেন চোখের জল ফেললাম, তা জানিনে। সারা পাড়াটা যেন কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারী ফাঁকা আর খালি-খালি লাগতে লাগল। শত্রুপক্ষ যদি এমন নির্মূল হয়ে যায়, লড়ব কার সঙ্গে।

"চিত্রাদের বাড়ির দোর আবার আমার কাছে নিষ্কণ্টক হল। কাকাবাবুও আমাকে মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু ও-বাড়িতে তখন আমার যাওয়ার সময় কম। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় আরো অনেক বাড়ির ড্রয়িংরুমে তখন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে। পার্টি পিকনিকের ভিড় ঠেলে কূল পাইনে।

আমাদের বাড়ির অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা বেড়েছে। তাদের মধ্যে শুধু এ-দেশী নয়, বিদেশী বন্ধুরাও আছেন। তাঁদের জন্যে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কারণ আমার জন্যেও তাঁরা কেউ কেউ ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। কিন্তু কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যালের চাইতেও আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন বেশী। তাঁর আধিপত্য শুধু কলেজের গণ্ডিটুকুর মধ্যে। কিন্তু আমার দুনিয়া না মানে মানা, না মানে সীমানা।

"এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। চিত্রার সেই বুড়ী পিসিমা মারা যাওয়ার পর আর কোন মামীমা-মাসিমাকে তার বাবা বাড়িতে আনলেন না। দিদির চালচলন আর ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় বিরক্ত আর বিব্রত হয়েছিলেন। এবার কলেজ থেকে ধরে আনলেন এক বেয়ারাকে। সে একেবারে সব্যসাচী। একাধারে ঠাকুর চাকর মালী দারোয়ান। এর আগে চিত্রার পিসিমার আমলে কোন ঝি-চাকর এসে দু-চারদিনের বেশী টিঁকতে পারত না। কিন্তু চিত্রাদের এই নতুন চাকরটি বেশ টিঁকে গেল। ওর কাছেই শুনলাম, লোকটির নাম অভয়। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বয়স। গায়ের রঙ পাথরের মত কালো। কিন্তু নাক চোখ ঠোঁট চিবুক যেন পাথর থেকেই সেকালের কোন শিল্পী কুঁদে বার করেছে। বেশ লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা। মুখশ্রীটুকু সুন্দর। হঠাৎ মনে হয় না যে, পেটে কোন বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। বরং চোখ দুটি দেখলে মনে হয়, বেশ খানিকটা দুষ্টুবুদ্ধি রাখে।

"অন্তু ওর নাম দিল বিকমূর্তি। কিন্তু নামটা চাকরের পক্ষে বেশী সম্ভ্রান্ত বলে তেমন চালু হল না। অভয় যখন প্রথম এসেছিল, ওর মাথায় ছিল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, পরনে ডোরাকাটা পাজামা। কিন্তু চিত্রা নাপিত ডেকে ওর চুল ছোট করে ছাঁটিয়ে নিল। পাজামা ছাড়িয়ে ধুতি পরাল। তেরছি-কলার জামাটা ছিঁড়ে ফেলে ছিটের হাফশার্ট, আর বাইরে বেরোবার জন্যে ভদ্রদর্শন সাদা পাঞ্জাবি করিয়ে দিল। একেকটি পোশাক বদলানো হয় আর অভয়ের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। পোশাক ত নয়, যেন ওর গায়ের চামড়া কেউ ছাড়িয়ে নিচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই চিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, "দেখুন তো ও'দের কাণ্ড। আমার খুশিমত আমি জামাজুতো পরব, তাও ও'দের সইবে না। কী অত্যাচার। চাকরি করতে এসেছি বলে কি মাথা বিকিয়ে দিয়েছি।' শুনে আমি হেসে বলি, 'কী আর করবে বল। চিত্রা যা বলে, ভালর জন্যেই বলে। তোমাকে ভদ্র আর সুন্দর দেখাবে বলেই বলে। জান ত আপরুচি খানা, পররুচি পরনা। আমরা সবাই তাই করি। পরের জন্যে পরি।'

"কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের চাকর দারোয়ানের সঙ্গে অভয় এসে তাস খেলত, আড্ডা দিত। চিত্রার তাতেও আপত্তি। বলে, 'অত সময় নষ্ট করবে কেন? বাড়িতে কি আর কোন কাজ নেই?'

"এ-কথা শুনে আমি একদিন চিত্রাকে ডেকে বললাম, 'ব্যাপার কী চিত্রা? তুই ত এ-রকম ছিলিনে। নিজের পড়াশুনো নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতি। হঠাৎ এমন সমাজ-সংস্কারক হয়ে পড়লি কেন?'

"চিত্রা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সমাজ-সংস্কার!'

"আমি বললাম, 'ওই হল, চাকর সংস্কার।'

"চিত্রা গম্ভীর হয়ে বলল, 'অভয়ের চাল-চলনটা একটু শুধরে দেওয়া দরকার।'

"বললাম, 'তা ঠিক। বাড়ির কালচারের এরাই ত বাহক। জানলার পর্দা, টেবিলের ঢাকনি, ঠাকুর-চাকর, কুকুর-বেড়াল, গৃহ-স্বামিনীর সংস্কৃতি এদের ভিতর দিয়েই ত ফুটে বেরোয়।'

"চিত্রা বিরক্ত হয়ে বলল, 'সব সময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি ভাল লাগে না রিনা।'

"আমি লক্ষ্য করলাম চিত্রার আগের সেই সহিষ্ণুতা নেই, ওর মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে রয়েছে। আমার বুঝতে কিছু বাকী রইল না। চিত্রার বাবার এক ভক্ত ছাত্র ছিল, নাম অমরেশ মুখুজ্যে। তার প্রসঙ্গ উঠলে চিত্রার মুখের রঙ বদলাত। কিন্তু মেয়েটি এত লাজুক, এত চাপা, এত সেকেলে যে, কিছুতেই ওর মুখ থেকে মনের কথা বার করে নিতে পারিনি। সেই অমরেশ হঠাৎ একদিন যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিল। বিয়েও করল এক ধনী ব্রাহ্মণ-পরিবারে। জান ত, পুরুষের নিন্দায় আমি পঞ্চমুখ। আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে বেশির ভাগই কুপুরুষ। শুধু রূপের দিক থেকে নয়, গুণের দিক থেকেও। তবু বেচারা অমরেশকে বেশী দোষ দিতে পারিনে। কারণ চিত্রার ধরন-ধারণই একটু আলাদা। কোন ছেলেকেই ও উৎসাহ দিতে জানে না। তা সে কৃত্রিমই হক, আর অকৃত্রিমই হক। কিছুটা ও যেন ওর বাবার স্বভাব পেয়েছে। তিনি যেমন নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, চিত্রাও তাই। দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে তলিয়ে যেত। কিন্তু সংসারে ডুবুরীর সংখ্যা কম, সাঁতারুর সংখ্যা বেশী। এমন কোন ডুবুরী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে? তারপর মজুরি যে পোষাবে, এমন গ্যারান্টি কই? চিত্রার দিকে আমার বাছা-বাছা বন্ধুদের চোখ আকৃষ্ট করে দেখেছি। তারা সবাই এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে এসেছে। চিত্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতার আমার বড়ই সাধ ছিল। দেখতাম কে হারে কে জেতে।

লতা না বিদ্যুৎলতা। কিন্তু বড় ভীরু মেয়ে চিত্রা। ও ব্রহ্মযুদ্ধে নামলই না। ওর একমাত্র আনন্দ অন্তর্দ্বন্দ্বে।

"ইতিমধ্যে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটল, আমি নিজেই ঘটালাম। অঘটনঘটনপটীয়সীর গৌরব আর কাউকে দিতে চাইনে। এক পাঞ্জাবী শিখকে বিয়ে করে ছেড়ে গেলাম তোমাদের বাংলা দেশ। ফিরে এলাম দু-বছর বাদে। আমি ছেলে হলে বাবা আমাকে ঘটা করে ত্যাগ করতেন। মেয়ে বলে মনে মনে ছাড়লেন। কিন্তু তাই বলে মৌখিক ভদ্রতার সম্পর্কটুকু দূর হল না। বাড়ির সকলের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাই, গল্প করি। মন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাইনে, মেজাজ ভাল রাখতে পারলেই হল।

"ফিরে এসে শুনতে পেলাম চিত্রাও এক কাণ্ড করেছে। তার কৃতিত্ব আমার চেয়ে কম নয়। বাড়ির চাকর অভয়কে নিয়ে সে পলাতকা। পৃথিবীর কিছুই আমাকে বিস্মিত করতে পারে না। কিন্তু চিত্রার এই খবরে আমিও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। চিত্রার মত মেয়ে এমন কাণ্ড করতে পারে, তা যে স্বচক্ষে দেখলেও চোখ রগড়ে ভাবতে হয়, স্বপ্ন দেখছি কিনা। আস্তে আস্তে জেনে নিলাম সব বৃত্তান্ত। বোনদের মুখে, বন্ধুদের মুখে। চিত্রার নিন্দায় একেকজনের পাঁচখানা করে মুখ বার হল। মেয়েটা যে মিটমিটে শয়তান তা নাকি সবাই আগে থেকে টের পেয়েছিল। দেখলে মনে হত, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু আসলে তা নয়। নিজেদের সমাজে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাড়ির চারকটাকে পছন্দ করল! দেহ ছাড়া আর কী আছে অভয়ের। ছি-ছি-ছি। কী রুচি মেয়েটার, কী প্রবৃত্তি।

"আমি কিন্তু খুশী হলাম। বেশ করেছে, ঠিক করেছে। এতদিনে ওদের পুরনো দুনিয়া খানখান করে ভেঙে পড়েছে। মরেছে ওদের ভূতের ভয়। আহা, এ-সময় যদি চিত্রার সেই বুড়ী পিসিমা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী মজাটাই না হত। তিনি তো নেই-ই, চিত্রার বাবাও বাড়ি ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে, শুনলাম কলকাতা শহর ছেড়েই কোথায় চলে গেছেন।

"চিত্রাদের সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটা ছিল ভাড়াটে বাড়ি। তার মালিক এসে ইঞ্জিনিয়ার মিস্ত্রি লাগিয়ে সেই পুরনো বাড়িটার নতুন চেহারা দিলেন। বাড়ির রঙ বদলাল, রূপ বদলাল। নীচে উপরে দুখানা করে ফ্ল্যাট হল। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেও এসে গেল। আর তা দেখে দেখে আমার মনের এক নির্জন কোণ গোপনে হাহাকার করে উঠল। ঠিক চিত্রার বুড়ী পিসিমা মারা যাওয়ার সময় যেমন করেছিল। এত অদল-বদল সত্ত্বেও আমার মন থেকে সেই পুরনো বাড়ির ছবিটা একেবারে মুছে গেল না। বার বার চিত্রার মুখখানা মনে পড়তে লাগল। আহা কতদিনের জানাশোনা ওর সঙ্গে, কতদিনের বন্ধুত্ব। বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কোন্ প্রণয়েই বা নেই। তবু ছেলেবেলার ভালবাসার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলে না।"

রিনা তার গল্প থামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল।

আমি বললাম, "ব্যাপার কী। চিত্রাদের সেই পুরনো দুনিয়াটা কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে এসে বাসা বাঁধল?"

রিনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, "না না, আমার মনে সহজে কোন কিছু বাসা বাঁধে না। আমার কথা ছেড়ে দাও। যা বলছি তাই শোন। চিত্রার কথা আমার মনে পড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে অভয়ের কথা। আশ্চর্য, যতই বলিনে কেন, চিত্রার পাশে অভয়কে দাঁড় করাতে আমারও যেন কেমন বাধো বাধো লাগতে লাগল। চিত্রাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির যে সম্পর্কটুকু ছিল আমি তার নাম দিয়েছিলাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অভয়ের সঙ্গে চিত্রার যে মিল, তাতে তাও নেই। একে গদ্যকবিতাও বলা চলে না। তবে ব্যাপারটা কী। ওদের সম্পর্কটা কোন জাতের। নিজের জীবনের গিঁট বাঁধা গিঁট খোলার ফাঁকে ফাঁকে আমি ওদের কথা ভাবি।

"অভয়ের কথা মনে পড়ে। আমার জানলা থেকে, কি দোতলার ব্যালকনি থেকে, যখনই চিত্রাদের ঘরদোর চোখে পড়ত, অভয়কে প্রায় সব সময় কর্মব্যস্ত দেখতে পেতাম। কখনো বাজার থেকে ফিরছে, কখনো বা কয়লা ভাঙছে, জল তুলছে, রান্না করছে। আবার চিত্রা কি তার বাবা অসুখ-বিসুখে পড়লে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করছে। পথ্যের বাটি নিয়ে চিত্রাকে সাধাসাধি করছে দেখতে পেতাম। মাঝে-মাঝে মন্দ লাগত না দেখতে। মানুষ যখন কাজ করে, তার সেই নড়া চড়া থেকে যেন এক আলাদা ছন্দ আলাদা রূপ ফুটে বেরোয়। তাই বলে এ-কথা ভেব না যে, চিন্তামগ্ন মানুষের রূপ নেই। তাও আছে। আমি একচোখা নই। দু চোখ দিয়ে দেখি। তাই সব মানুষের মধ্যেই রূপ দেখতে পাই। এমন কি, পাপে মগ্ন মানুষও আমাকে টানে। ডুবন্ত জাহাজের মত তাদের মগ্ন সৌন্দর্য।

"দরকারী কাজ ছাড়া অভয়ের খুশির কাজও ছিল। টবে সে ফুলের চারা লাগাত। আমাদের মালীর কাছ থেকে সে অর্কিড, ডালিয়া, জিনিয়া, ক্যানার চারা চেয়ে নিত। চেয়ে নিত রঙ-বেরঙের গোলাপ। চিত্রার কি তার বাবার ফুলের দিকে কোন চোখ ছিল না। তবে অভয়ের পুষ্পবিলাসকে কেউ বাধাও দেয়নি। আর ছিল ছেলে-মানুষের মত অভয়ের ঘুড়ি ওড়াবার শখ। যখন-তখন ছাদে উঠে মনের রং ও আকাশে উড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ওড়াত না, পাড়ার ছেলেদেরও ও অকাতরে নিজের তৈরী ঘুড়ি বিলাত। তার ফলে পাড়ায় ওর ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আর গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাত অভয়। কার কাছে যেন সবে শিখতে শুরু করেছিল। সব সময় যে সুর-তাল ঠিক থাকত তা নয়। তবু শুনতে নেহাত খারাপ লাগত না। আমি আমার ভাইবোনদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এই নিয়ে হাসাহাসি করতাম। এই সুর সাধা ওর কার জন্যে। আমার ছোট বোন বলত, 'দিদি, নিশ্চয়ই তোমার জন্যে। ঠাকুর চাকর ত দূরের কথা; পৃথিবীর গাছ-পাথর পর্যন্ত তোমাকে চায়। তাদের যদি কথা বলবার শক্তি থাকত, বাঁশি বাজাবার শক্তি থাকত, চাওয়ার সুর এমনি শুনতে পেতে।'

"আমি হেসে বলতাম, 'তাহলে বাঁশির সুরে এরই মধ্যে শুনতে শুরু করে দিয়েছিস তুই? বাবাকে বলতে হবে কথাটা।' কিন্তু অভয়ের রাধা যে ঘরের মধ্যেই বাঁধা ছিল এ-কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

"ওদের পালাবার কিছুদিন আগে বাড়িতে ছোটখাট এক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাকাবাবু বাড়ি ছিলেন না। উনুনে আঁচ দিয়ে অভয় যেন কাছেই কোথায় গেছে। তাকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে

চিত্রা নিজেই চায়ের জল গরম করবার জন্যে কেটলি হাতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। হঠাৎ কী করে আঁচল পড়ে গেল উনুনের মধ্যে। আর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মেয়েদের আঁচলের লোভ কোন্ দেবতাই বা সামলাতে পারেন। অগ্নিই বল আর বরুণই বল। চিত্রা যেমন নার্ভাস তেমনি বোকা মেয়ে। বি-এ পাশ করলে কী হবে, ওর মোটেই বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। আগুন-সুদ্ধ আঁচল নিয়ে ও ঘর আর বারান্দা দিয়ে কেবল ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। আর তার ফলে সে-আগুন ওকে একেবারে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। আগুনের ধর্মই ওই। ছুটোছুটি করে তাকে নেবান যায় না। তা ভিতরেরই হক, আর বাইরেরই হক।

"অভয় বেশী দূরে যায়নি। চিত্রার চেঁচামেচি শুনে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল। চিত্রাকে ধমক দিয়ে বলল, 'করছেন কী দিদিমণি? আপনার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? খুলে ফেলুন, শিগগির খুলে ফেলুন।'

"চিত্রা তবু বুঝতে পারছে না কী খুলবে।

"অভয় তখন এগিয়ে এসে টান দিয়ে ওর শাড়িটা খুলে ফেলল, টেনে ছিঁড়ে ফেলল সায়া আর ব্লাউজ। চিত্রা এক পলক বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থেকে দু হাতে চোখ ঢেকে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দোরে খিল দিল।

"কয়েক বালতি জল এনে অভয় সেই জ্বলন্ত শাড়ি-ব্লাউসের উপর ঢেলে দিল। ততক্ষণে পাড়া-পড়শীরা সব এসে পড়েছে। কেউবা দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছে। দু-একজন বলল, 'দমকল ডাকব নাকি অভয়?'

"কিন্তু ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াল না। চিত্রাদের সবই রক্ষা পেয়েছে। ঘর-দোর চেয়ার-টেবিল বই-পত্র কিছুই পুড়ল না। পুড়ল শুধু চিত্রার কপাল। আর অভয়ের হাত। সে হাত জেনেশুনেই পুড়িয়েছে।

"কলকাতায় এসে এই অগ্নিকাণ্ডের তিন-রকম ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। এক নম্বর হল ব্যাপারটা দৈব দুর্ঘটনা। দু-নম্বর হল চিত্রা সাধ করে শাড়িতে আগুন ধরিয়েছে, অভয়ের হাতে ওর বস্ত্রহরণ হবে বলে। তিন নম্বরের টীকাকাররা বলল, হরণ যা হবার হয়ে গিয়েছিল। গায়ে কেরোসিন ঢেলে চিত্রা গিয়েছিল মরতে। শেষ পর্যন্ত ভয়ের জন্যে পারেনি। বিশেষ করে অভয়ের জন্যে।

"যে-ব্যাখ্যা তোমার পছন্দ হয় তাই বিশ্বাস কোরো। আমি তো তাই করি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালমন্দ, সুনীতি-দুর্নীতি সব আমার পছন্দ-অপছন্দের উপর।

"চিত্রা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গায়ে শুধু আগুনের আঁচ লাগেনি, পুড়েও গিয়েছিল দু-এক জায়গা। ওই সঙ্গে জ্বরও হল। খানিকটা বোধ হয় আতঙ্কে। চিত্রার বাবা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শুশ্রূষার ভার অভয় নিজের হাতে নিল। ওর সেই পোড়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে আগের মত, এমনকি আগের চেয়েও বেশী, কাজ ও করতে লাগল। ওর একখানা হাত পুড়ে গিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়ে এসেছে।

"প্রথম প্রথম চিত্রা ওকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। অভয় ঘরে গেলে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলত। পাশ ফিরে শুয়ে থাকত, না হয় চোখ ঢেকে রাখত হাতের তেলোয়। কিন্তু অভয়ের আদর-যত্নে অনুনয়-অনুযোগে কখনো বা শাসনে-ধমকে চিত্রা বিমুখ হয়ে থাকতে পারল না। ওষুধ খেল, পথ্য খেল, চোখ মেলল, মুখ তুলল।

"এদিকে পাড়াপড়শীরা গা-টেপাটিপি শুরু করেছে। আশেপাশের বাড়িতে ছাদে জানালায় প্রায়ই নানাবয়সী বউ-ঝিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষের দলও যে না আসে তা নয়। আগে এই খৃস্টান বাড়িটি সম্বন্ধে পাড়ার কারো কোন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু এখন যেন পৃথিবীর যত রস যত রহস্য ওই পুরনো জীর্ণ বাড়িটির মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে।

"দিন কয়েক বাদে চিত্রা সুস্থ হয়ে উঠল। ওর বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এবার অভয়কে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

"চিত্রা বলল, 'কেন?'

"ওর বাবা বললেন, 'তোর ভালর জন্যে।'

"চিত্রা বলল, 'ভালমন্দ বোঝবার বয়স ত আমার হয়েছে বাবা।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'বয়স হলেই যে সবাই তার ভালমন্দ বুঝতে পারে এমন কোন কথা নেই।'

"চিত্রা বলল, 'এ-কথা তোমার মুখে নতুন শুনছি বাবা। এতকাল ত তুমি আমাকে সেভাবে মানুষ করনি। তুমি আমাকে নিজের মনে থাকতে দিয়েছ, নিজের মনে চলতে দিয়েছ। সব বিষয় সম্বন্ধে নিজের মতামত গড়ে তুলতে দিয়েছ। আজ কেন অন্য কথা বলছ? আজ কেন বাধা দিচ্ছ?'

"চিত্রার বাবা আবার বললেন, 'দিচ্ছি তোর ভালর জন্যে। তোর পরিণামের কথা ভেবে। একটা চাকরের সঙ্গে—। ছি ছি ছি। ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করছে। আমি তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছিনে চিত্রা।'

"লজ্জায় চিত্রা নিজেও খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর মুখ তুলে বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে অসীম জেদ আর সাহসের সঙ্গে বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয় বাবা, লোকে যা বলছে তা মিথ্যে। আমি এমন কিছু করিনি, যাতে তোমার গা ঘিনঘিন করতে পারে। কিন্তু চাকর বলে ওকে ঘৃণা করবার অধিকার তোমার নেই।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'ঘৃণা ত আমি করছিনে। কিন্তু ও যা করে তাতে ওকে সমাদরও করতে পারিনে।'

"চিত্রা একটু হাসল, 'ও যা করে—। কিন্তু ওকে দিয়ে ত এসব কাজ আমরাই করাচ্ছি বাবা, আমরাই ওকে করতে বাধ্য করছি। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে তুমি আর আমি কত আলোচনা করেছি, তুচ্ছ কাজে আজও হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে পেটের দায়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আমরা দুজনে কত দুঃখ করেছি। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টিশক্তির এমন চরম অব্যবহার আর অপচয়ের জন্যে কত আফশোষ করে মরেছি। তুমি লিখেছ, আমি পড়েছি। আর আমাদেরই চোখের সামনে ওই অভয় দিনের পর দিন বাসন মেজেছে আর জল টেনেছে।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'চিত্রা, এই জল টানা আর বাসন মাজার কাজ ত তুই শুধু আজ দেখছিসনে। অনেককাল ধরেই ত দেখছিস। কিন্তু আজই তোর এই অবিচারটা

কেন নতুন করে চোখে পড়ল। এত দরদ তোর মনের মধ্যে কেন উথলে উঠল। তার কারণ ওই লোকটাকে তুই অন্য চোখে দেখেছিস।' দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কামনার চোখে দেখেছিস, লোভের চোখে দেখেছিস। তাই তোর এই দরদের কোন দাম নেই। তোর এই ওকালতি নিঃস্বার্থ নয়।'

"চিত্রা ফের কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক বাবা। হয়ত ভিন্ন চোখেই দেখেছি। আর তা দেখেছি বলেই এমন করে আমার চোখ খুলে গেছে। সামনে থেকে সব আড়াল সরে গেছে। বাবা, যাঁরা মহাপুরুষ, মহামানব, তাঁরা এক সঙ্গে অনেককে দেখতে পান। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখ তাঁদের চোখের সামনে ভাসে। কোটি কোটি মানুষের দুঃখ সুখ তাঁদের হৃদয়কে দিনরাত তোলপাড় করে। কিন্তু আমরা যারা ছোট তারা জীবনে এমনি দুজন-একজনকেই শুধু দেখি। দুজন-একজনের ভিতর দিয়েই হঠাৎ একেক সময় আমাদের বিশ্ববোধ জাগে। শিশু কৃষ্ণের মুখে যশোদা যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, সে-রূপ ছেলের মুখে ছিল না, ছিল মায়ের চোখে।'

"হিন্দু পুরাণ, দর্শন, বাপ আর মেয়ে দুজনেরই চর্চার বিষয় ছিল। কিন্তু সেদিন মেয়ের মুখে এ-ধরনের পৌরাণিক উদাহরণ বাপের কাছে নিতান্ত হাস্যকর, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক আর পরম অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে তিনি তীব্র জ্বালাভরা স্বরে মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কিন্তু তুই কি ভেবেছিস, একটা চাকরকে বিয়ে করে তুই দুনিয়ার চাকরের দুর্দশা ঘোচাতে পারবি? নাকি ঘরে ঘরে মনিবের মেয়েরা ধরে ধরে চাকরদের বিয়ে করলেই সব শ্রেণীভেদ লোপ পাবে?'

"চিত্রা বলল, 'আমি ত পাগল হইনি বাবা যে ও কথা বলব। আমি শুধু আমার সমস্যার কথাই ভাবছি। শুধু আমার পথই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি।'

"ওর বাবা বললেন, 'ও চেষ্টা তুই ছেড়ে দে চিত্রা। অভয়ের ওপর তোর যদি অত মায়া হয়ে থাকে, আমি ওকে পাঁচশ কি হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তাই দিয়ে ও হয় লেখাপড়া শিখুক, না হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। ওকে আগে মানুষ হতে দে। যাক আরো পাঁচ সাত দশ বছর। তারপর তোর যা খুশি তাই করিস।'

"চিত্রা এবার কিছুক্ষণ ভেবে দেখল, তারপর বলল, 'এর আগে তুমিই বলেছ বাবা, শুধু লেখাপড়া শেখাটা মানুষ হবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে সিদ্ধি? তাই কি মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি? বরং উল্টোটাই ত বেশী চোখে পড়ে। ওর সাধ্য নেই একা-একা কিছু করে। বেশী টাকা-পয়সা হাতে পড়লে ও হয়ত তা দুদিনেই নষ্ট করে দেবে। ওকে তোমার কিছুই দিয়ে কাজ নেই বাবা।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'বেশ, আমি ওকে কিছু দেব না। কিন্তু তুইও ওকে কিছু দিতে পারবিনে।'

"শুধু এ-কথা বলে তিনি নিশ্চিত আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। অভয়কে সেই দিনই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলে দিলেন, তাঁর চাকরের স্বভাব ভাল নয়। পয়সা চুরির অভ্যাস আছে। ঘরের জিনিসপত্র দিয়েও তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই সে ফের যদি এমুখো হয়, ও যেন উচিত শিক্ষা পেয়ে যায়।

"এসব কথা আমি চিত্রার মুখে পরে শুনেছিলাম। তার বাবা যে এসব কাজ করতে পারেন তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু মেয়ের সুনাম আর পরিণামের চিন্তা, আর সমাজে নিজের মান সম্মান খোয়াবার ভয় তাঁকে বোধ হয় অস্থির আর অশান্ত করে তুলেছিল। অভয়কে তিনি বোধ হয় তখন নিজের হাতে খুনও করতে পারতেন। মানুষ যে কত বিচিত্র আর বিপরীত ধাতুতে গড়া তা আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা। একথা জানবার জন্যে পরের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না। নিজের দিকে নিরাসক্তভাবে তাকালেই আমরা সেই দিব্যদৃষ্টি আর দিব্যজ্ঞান পেতে পারি।

"অভয় হত না হলেও খুবই আহত হল। একদিন বেশী রাত্রে পাড়ার ছেলেরা ওকে চোরের মার মারল, যদিও জিনিসসুদ্ধ ধরতে পারলে না। পরদিন সে-জিনিস নিজে এসে ধরা দিল। চৌকিদারদের হাতে নয়, চোরের হাতে। ওরা পাড়া ছেড়ে পালাল। দিন কতক কেউ আর ওদের কোন পাত্তা পেল না।

"তুমি ত জান, পৃথিবীর রঙ্গালয়ে আমি শুধু দর্শক কি শ্রোতার সারিতে বসে থাকবার জন্যে আসিনি। নানারকম ভূমিকায় অভিনয় করেছি। হেসেছি, কেঁদেছি। সান্ত্বনা এই যে, কাঁদাতেও পেরেছি কাউকে কাউকে। আমার এই অতি-ব্যস্ত জীবনে যারা হারিয়ে যায়, তাদের পিছনে পিছনে

যাবার আমার অভ্যাসও নেই, উৎসাহও নেই। তবু চিত্রার কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ত। সামনের ওই ফ্ল্যাট-বাড়িটার ঘর-গুলিতে অপরিচিত গৃহস্থ-বউদের নড়াচড়া আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে একটি চেনা মুখ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত। আর সেই সঙ্গে ছেলেবেলার অনেক ছায়া-ছবি। ভাবতাম চিত্রা কেন আসে না এখানে? ওই বাড়িরই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে কেন বাস করে না নতুন বেশে, নতুন ধরনে? ও ত এখন নতুন জগতের বাসিন্দা। ওর ভয় কী? জানতে কৌতূহল হত, সেই লোকটি কি ওর সঙ্গে এখনো আছে, নাকি তাকে দুদিন বাদে তাড়িয়ে দিয়েছে চিত্রা? তাই ত স্বাভাবিক। তাহলে এখন কে ওর সংগী, কেমন ওদের মধ্যে সম্বন্ধ, জানতে ইচ্ছে হত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই আমি অন্য ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়তাম।

"সেবার গোয়েন্দা-বিভাগের একটি চালাক চতুর সুদর্শন ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। কথায় কথায় তাকে বললাম, 'তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করতে পারবে?' সে বলল, 'তোমার জন্যে অকাজও করতে পারি।' আমি ওকে দিলাম চিত্রার নাম-ধাম পরিচয়, রূপ-গুণের বর্ণনা। জানালাম সেই প্রণয়-কাহিনী। তারপর বললাম, 'খুঁজে বার কর এই বনহরিণীকে। আমার ত মনে হয় এই শহরেরই কোন উপবনে সে আছে।'

"দিন কয়েক বাদে সত্যিই সে সন্ধান আনল। ডালহৌসী স্কোয়ারের এক বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে চিত্রা স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করছে। থাকে ইন্টালির এক সরু কানা গলিতে। নাম অনরেইট সেকেন্ড লেন। আমার বন্ধু বলল, সেখানে আমাকে সে নিয়ে যেতে পারে। আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, তাকে সঙ্গে করে গলিঘুঁজিতে হাঁটবার আমার ইচ্ছে নেই। বেড়াই ত বড় বড় সড়ক দিয়েই বেড়াব।

"আর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম চিত্রাকে শুধু আমিই দেখিনি। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়েরই তাকে চোখে পড়েছে। যারা ট্রামে-বাসে দশটা-পাঁচটার ভিড় ঠেলে অফিসে যায়, তারা দেখেছে শুকনো শীর্ণ স্বাস্থ্যহীন একটি মেয়েকে লেডীজ সীটের এক কোণে চুপ করে বসে থাকতে। কখনো বা সে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। কখনো বা আপন ভাবনা-সমুদ্রে। চিত্রাকে এ-পাড়ার অনেকেই চেনে। জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই তারা আমাকে ওর খোঁজ এনে দিতে পারত। তার জন্যে গোয়েন্দা লাগাবার দরকার ছিল না।

"চিত্রাদের যে পুরনো বাড়িটা রূপান্তর আর জন্মান্তর নিয়েছে, সেই বাড়ির তিন নম্বর ফ্ল্যাটের অনিলেন্দু সেন ইনকাম-ট্যাক্সের অফিসার। প্রথমে সে আমার বাবার কাছে আসত দরকারী কাজে। তারপর অ-দরকারেও আসতে লাগল। আমাদের ড্রয়িং-রুমে বসে বসে গল্প করত। একদিন তার মুখেও শুনলাম চিত্রার কথা। চিত্রা নাকি আগে ওই অফিসেই কাজ করত। এমন কি, অনিলেন্দুরেই সেকসনে। অনি-লেন্দুর ঠিকানা শুনে সে নাকি বলেছিল, 'আমরা আগে ওই বাড়িতেই থাকতাম।' আমার খোঁজ-খবরও জিজ্ঞাসা করেছিল চিত্রা। এমনি করে একসঙ্গে কাজ করতে করতে আলাপ-পরিচয় এগোয়। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। ছুটির পর অনিলেন্দু সেদিন অফিস থেকে বেরিয়েছে, পাশা-পাশি চিত্রা চলছে হেঁটে। এমন সময় চোয়াড়ে চেহারার অশিক্ষিত অভদ্র-দর্শন একটি লোক কোত্থেকে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল, 'খুব যে জমিয়ে তুলেছ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অত খাতির কিসের তোমার? আমি কেবল দেখছি আর দেখছি। যেদিন ধরব, হাড় আর মাস আলাদা করে ছাড়ব।'

"চিত্রার মুখ বিবর্ণ। অনিলেন্দু অবাক। একটু বাদে সে বলল, 'মিসেস মণ্ডল, এই পাগলটি কে? একে কি আপনি সত্যিই চেনেন? নাকি পুলিস ডাকব?'

"চিত্রা বলল, 'পুলিস ডেকে দরকার নেই। ইনি আমার স্বামী। আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। অভয়কুমার মণ্ডল, আর—।'

"এতক্ষণ বিস্ময় ছিল, এবার বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল অনিলেন্দুর। আলাপের উৎসাহ তার অনেক আগেই চলে গিয়েছিল।

"চার পাশে লোক জমতে শুরু করেছিল। চিত্রা তার স্বামীকে নিয়ে কোনরকমে একটা ট্রামে উঠে পড়ল। কিন্তু ঝামেলাটা একদিনেই গেল না। অভয় প্রায়ই এসে উৎপাত করতে লাগল। অনিলেন্দু খোঁজ-খবর নিয়ে আরো জানতে পারল যে, লোকটি আগে চিত্রাদের চাকর ছিল। এই রুচি-বিকৃতির কথা শুনে গা আরো রি রি করে উঠল অনিলেন্দুর। মেয়েটির শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন মূল্যই তার কাছে আর রইল না। অফিসসুদ্ধ ছি-ছি-ছি পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চিত্রা সেখান থেকে রিজাইন করতে বাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতা নাকি ওর প্রথম নয়। তবু যে
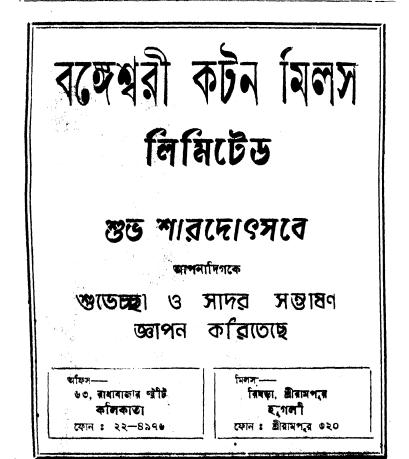
বার বার কেন চাকরী করতে আসে, তাই আশ্চর্য।

"আমিও অবাক হলাম। অমন একটা ইতরকে চিত্রা আজও কেন সহ্য করছে? পৃথিবীতে সে কি আর দ্বিতীয় পুরুষ খুঁজে পেল না।

"তারপর খুঁজে খুঁজে একদিন গেলাম চিত্রার বাসায়। না, কোন গাড়ি নিলাম না, সঙ্গী নিলাম না। মনে কর না যে, সব সময় তোমাদের সঙ্গ আমার কাম্য। অচেনা-অজানা পথে একা একা বেড়াবার আমার অভ্যাস আছে। শুধু গাড়িঘোড়ায় নয়, খালি পায়েও হেঁটেছি। তার ফলে পথ হারিয়েছি বহুবার। আবার নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছি।

"মার্কেটের সামনে ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে সেন্ট জনরেট লেনের সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তোমার ভাষায় সে এক দেশ আবিষ্কার। এ-গলিতে আমি এর আগে কোনদিন আসিনি। কলকাতায় কত অনাবিষ্কৃত গলিই যে আছে এখনো। শুধু স্ট্রীট ডাইরেক্টরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না, রহস্য বোঝা যায় না, শুধু পা দিলে টের পাওয়া যায় গা কেমন শিরশির করে উঠছে।

"পুরোনো দরিদ্রপাড়া। দু-দিকে ভাঙা জীর্ণ বাড়ি। অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন। নম্বর মিলিয়ে কড়া নাড়তেই সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এসে দোর খুলে দিল।

"আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুকু, চিত্রা বলে এখানে কেউ থাকে?'

"সে দোরের দুটি পাল্লা খুলে দিয়ে আমাকে সাদরে ভিতরে ডেকে বলল, 'ওই ত মাসী।'

"দেখি উঠোনের এক কোণে কলতলায় বসে বসে একটি মেয়ে বাসন মাজছে। পরনে লালপেড়ে আটপৌরে শাড়ি। এলো খোপাটি ঘাড়ের কাছে নোয়ানো। চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে। তবু আমি ওর বসবার ভঙ্গি দেখে পিছন থেকে চিনতে পারলাম, ও চিত্রা ছাড়া আর কেউ নয়।

"সাড়া দিতেই ও মুখ ফেরাল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তুই!'

"আমি জানি চিত্রা আমাকে পুরোপুরি ভালবাসত না, সহ্য করতে পারত না। কারণ ওর পথ আর আমার পথ এক নয়, ওর রুচি আর আমার রুচি আলাদা। তবু সেই মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় আমরা দুজনেই অনুভব করলাম, আমরা দুই বন্ধু। অনেক দিনের অনেক কালের অনেক যুগের দুই পুরোনো বন্ধু।

"চিত্রা বলল 'তুই এখানে আসবি আমি ভাবতেও পারিনি। গরিবের বাড়িতে হাতির পা।'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হাতি তোকে পিঠে করে নিয়ে যেতে এসেছে। চল আমার সঙ্গে।'

"চিত্রা হাত ধরে আমাকে সঙ্গে করে ওর ঘরে নিয়ে গেল। একতলায় তিন ঘর ভাড়াটে। দোতলায় থাকে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার। বারান্দা থেকে একটি বাঁধা কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

"চিত্রার ঘরখানা পূবদক্ষিণ কোণে। গিয়ে দেখলাম আসবাবপত্র সামান্যই। তবু ওরই মধ্যে বইয়ের র‍্যাক আছে। জানলার ধারে পাতা ছোট সস্তা দামের একটি টেবিল। চিত্রা আমার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বোস।'

"বললাম, 'তুই কোথায় বসবি?'

"ও বলল, 'আমি ত গৃহস্বামিনী।'

"হেসে বললাম, 'বটে! তা স্বামীটি কোথায়? তাকে যে দেখছিনে?'

"চিত্রা বলল, 'কোথায় যেন বেরিয়েছে। একটু বাদেই আসবে হয়ত।'

"দু-চার মিনিট পরে চিত্রা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুই বোস। আমি চা করে আনি।'

"আমি হাত ধরে ওকে টেনে বসিয়ে বললাম, 'দরকার নেই চায়ের। আমি চা বেশি খাইনে। সেবার চা করতে গিয়ে তুই নাকি যা কাণ্ড ঘটিয়েছিলি। আমি সব শুনেছি।'

"চিত্রা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজকাল আর সেসব হয় না। এখন আমি নিজের হাতে সব করি, সব পারি।'

"আমি বললাম, 'তা ত দেখতেই পেলাম। উনুন বাসন মাজা পর্যন্ত। তুই যখন অফিসে চাকরিবাকরি করিস, অভয়কে দিয়ে ওসব কাজ করালেই পারিস। ওর ত অভ্যাসই আছে।'

"চিত্রা একটু হেসে বলল, 'থাকলে কী হবে। এখন আর করতে চায় না ভাই। এ-বাড়ির অন্য কোন পুরুষে ত করে না।'

"আমি বললাম, 'অন্য কোন পুরুষ আর ও কি সমান?'

"চিত্রা সে-কথার জবাব না দিয়ে আগের মতই হেসে বলল, 'বলে কি, এতদিন ত আমি করেছি। এখন তুমি দিন কতক করে দেখ।'

"যেন কত বড় হাসির কথা। আমি রাগ করে বললাম, 'রাট। চিত্রা, তুই ওকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে আরো অমানুষ করে তুলেছিস। আমি অনিলেন্দু সেনের কাছে সব শুনেছি। এত কাণ্ডের পরেও তুই ওকে সহ্য করছিস কী করে? ওর মনুষ্যত্ব ত গেছেই। তুইও তা খোয়াতে বসেছিস।'

"চিত্রা এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'অনিলেন্দুবাবুর সঙ্গে তোর তা হলে আলাপ হয়েছে? তিনি বুঝি সব বলেছেন তোকে?'

"বললাম, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেননি।'

"চিত্রা স্বীকার করল। এক বিন্দুও বানায়নি অনিলেন্দু। তার সব কথা সত্যি। চিত্রাকে নানা জায়গায় এমন নিগ্রহ পেতে হয়েছে। যেখানেই ওর সত্য পরিচয় লোকে জানতে পেরেছে, সেখানেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অপমান-লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছে ওকে। প্রাসাদের দিকে কোনদিন ও পা বাড়ায়নি। কিন্তু কুটিরে কুটিরেও দ্বার বন্ধ হয়েছে। সে সব কুটির চিত্রার মধ্যবিত্ত স্বজন-বন্ধুদের। তাদের শ্লীলতা, শালীনতা, রুচিবোধে চিত্রা আঘাত দিয়েছে। ওর এই রুচি বিকৃতিকে কিছুতেই তারা মেনে নিতে পারেনি।

"বাইরের এই প্রতিকূল দুনিয়ার বিবরণ শেষ করে চিত্রা বলল, 'কিন্তু, রিনা, যুদ্ধ ত শুধু বাইরের সঙ্গেই নয়, যুদ্ধ ঘরের সঙ্গেও আছে। সেই যুদ্ধই সবচেয়ে বড়।'

"আমি রাগ করে বললাম, 'বড় না ছাই।

চিত্রা বলে এখানে কেউ থাকে,

আসলে তুই ওকে ভালবাসিসনি চিত্রা। ওই রকম একটা লোককে ভালবাসা যায় না। সাময়িক কৌতূহল হয়ত মেটান যায়। তুই ভালবেসেছিস একটা আইডিয়াকে। হয়ত তাও নয়। তুই ভালবেসেছিস নিজের জেদকে। তুই ভিতরে ভিতরে আমারই মত এক জেদী মেয়ে।'

"চিত্রা শান্তভাবে হেসে বলল, 'তবু ভাল, নিজের সঙ্গে আমার একটু মিল খুঁজে পেয়েছিস।'

"আমি বললাম, 'মিথ্যে কথা। তোর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আমরা দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। আমি আমার প্রেমিকদের চাকর করে রেখেছি, আর তুই তোর চাকরকে প্রেমিক বানিয়েছিস, স্বামী বানিয়েছিস।'

"চিত্রা তেমনি হেসেই জিজ্ঞাসা করল, 'কোনটা ভাল রিনা, কোনটা ভাল?'

"আমি থমকে গেলাম। ওর আত্মপ্রত্য বড় বেশী। আমি চট করে জবাব দি পারলাম না। ও প্রত্যয়বাদী, আমি সংশয়ী আমি কিছুকেই ধ্রুব বলে জানিনে, ধ্র বলে মানিনে। আমি নিত্য ভাঙি, নি গড়ি। আর সেই ভাঙাগড়ার ভিতর দি এগিয়ে যাই। তোমাদের চোখে সেটা হয় থেমে পড়া, পিছিয়ে পড়া। তবু আম ভাঙাগড়ার বিরাম নেই। আমি সব জিনি যাচাই করে করে নেব। কোন আপ বাক্য মেনে নেব না।

"চিত্রা বলতে লাগল, 'রিনা, কাম পুরুষকে দাস করে রাখা যত সহজ, দাসকে উঁচুতে তুলে আনা তত সহজ ন আমি ওকে রেজিস্ট্রি করেই বিয়ে করে কিন্তু সত্যিসত্যিই ওকে প্রেমিকের পর্য স্বামীর পর্যায়ে তুলে আনা কি দু বছরের কাজ?'

"আমি বললাম, 'কে তোকে বলে তু আনতে? তুলতে তুলতে তুই যে একে পটল তুলবি হতভাগী। রূপযৌবন খ তুই যে বুড়ী হয়ে যাবি।'

"চিত্রা হেসে বলল, 'বুড়ী কি তু হবিনে? ওকথা যাক। আমাদের সমাজে পর্যায়ের সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ একরকম। বিশ্বাসে সংস্কারে মূল্যবে লাভ-লোকসান-সুবিধা-সুযোগের ভ বাটোয়ারায় তাদের মধ্যে কত যে তক কত যে হানাহানি, তা ত তুইও দেখেছি অভয় আর আমার মধ্যে ব্যবধান থাকবেই।'

"আমি বললাম, 'থাকবেই। তাহলে বল তোদের মিলটা গোঁজামিল। তোদের মিলটা শুধু দেহগত।'

"চিত্রা লজ্জিত হয়ে একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'না শুধু তাও নয়। তুই তোর বন্ধুদের মধ্যে কতকাল থেকে মনের মিল খুঁজে বেরিয়েছিস। অল্পস্বল্প মিলে তোর তৃপ্তি নেই। যে-মিল একান্ত মৌলিক, তাই তোর চাই। কিন্তু আমার কী ধারণা জানিস রিনা? সে-মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-মিল গড়ে নিতে হয়। তুই যে মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস তাকে কোথাও পাবিনে, যদি তাকে নিজে না সৃষ্টি করে নিতে পারিস!'

"আমি হেসে উঠলাম, 'সৃষ্টি করা? মানে যা নেই, সেই আকাশকুসুমে বিশ্বাস করা? তা পারব না চিত্রা। আমি বরং ঘাসফুল তুলে খোঁপায় গুঁজব, কোন ফুল না পেলে

মাঝে মাঝে চোখে সর্ষেফুল দেখব, তবু সজ্ঞানে মাতাল হওয়ার আগে আকাশ-কুসুমের তত্ত্ব আওড়াব না। তোর সঙ্গে আমার বনল না, মিলল না। যাক ও-সব কথা। কাকাবাবুর খবর কী, তাই বল। কেমন আছেন তিনি? আছেন ত?'

"চিত্রা বলল, আছেন। তিনি ছোটনাগপুরের এক মিশনারী কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন বাইরে। চিত্রা অনেক চিঠিপত্র লিখেছিল। ক্ষমা চেয়ে দেখা করতে চেয়েছিল। তিনি সে-অনুমতি দেননি। আট দশ বছরের এক অনাথ সাঁওতালী মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলছেন। আশা, সে হয়ত ভবিষ্যতে চিত্রার মত অবাধ্য হবে না। সে পিতৃস্নেহের দাম দেবে। মনে মনে হাসলাম। একজনের মানসকন্যা, আর একজনের মানস-স্বামী। মানসপুত্রটি বোধ হয় আমার জন্যে নাকি রইল।

"বাপের কথা তোলায় চিত্রার চোখ দুটি ভিজে উঠল। কথার ভিতর থেকে ঈর্ষার সুচও ফুটে বার হল। সেই একফোঁটা নাম-না-জানা সাঁতালী মেয়েটার উপর হিংসা। চিত্রা বলল, 'সে বাবার সবখানি জুড়ে বসেছে। আমি এত করে লিখলাম, আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, না হয় আমি আপনার কাছে যাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। অথচ শুনি অসুখবিসুখে কেবলই ভোগেন। ওই মেয়েটা তাঁর কতটুকু সেবা-যত্ন করতে পারবে বলত বিনা?'

"আমি এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে নেবে অভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। 'তার ভিতর থেকে কতখানি কী সৃষ্টি করতে পেরেছিস তাই শুনি। গেল কোথায়? নমুনাটা এবার দেখতে পারলে হত। ভাল কথা। সামনাসামনি নাম ধরে ডাকলে কি তার অপমান হবে? মিঃ মণ্ডল বলব, না অভয়বাবু? নাকি জামাইবাবু বলে ডাকলে তুই খুশী হবি সত্যি করে বল।'

"চিত্রা বলল, 'তোর কেবল ঠাট্টা। কেবল খোঁচা দিয়ে কথা বলার স্বভাব। তুই তাকে নাম ধরেই ডাকিস। হুকুম করিস পান-সরবত এনে দিতে, আগে যেমন করতি। তোর কাছে ত আজও চাকর ছাড়া কিছু নয়।'

"আমি বললাম, 'তুই-ই বা এমন কোন মাথার মণি করে তুলেছিস? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস! তোর ওই কানাকড়িটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিই। নইলে আসল মণির দিকে তোর চোখ পড়বে না।'

"চিত্রা হেসে বলল, 'তা তুই পারিস বিনা। সে-শক্তি তোর আছে। কিন্তু আসল মণি হল

চোখের মণি। তার চেয়ে বড় মণি কী আছে, আমি জানিনে।'

"অভয়কে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা চিত্রা গোড়াতে করেছিল। বেশীদূর এগোয়নি, তারপর নানা কাজকর্মে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভয়ের মনে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস ঢুকে গেছে। বউয়ের চেয়ে ছোট কাজ, অল্প মাইনের কাজ সে সহজে করতে চায় না। লোকে তাতে ঠাট্টা করবে। তার চেয়ে বউয়ের রোজগারে পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া তার কাছে ঢের সম্মানের। কিন্তু চিত্রার তা মোটেই ইচ্ছা নয়। তার সম্মানবোধ স্বতন্ত্র। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়। আভাসে-ইঙ্গিতে মনে হল, অভয় মারধরও এক-আধটু করে। আবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও দেরি করে না। পুরুষের স্বভাব সবজায়গায় একই রকম। চাকর-মনিবে ভেদ নেই।

"তবু চিত্রা আশা ছাড়েনি। অভয়কে নিয়ে সে এক্সপেরিমেণ্ট করেই চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যদি চালাবে, তাহলে একটা বাঁদরকে ধরে আনলে ত আরো সুবিধে হত। ছেলে মানুষ করা আর স্বামী মানুষ করা ত এক নয়; মেয়েকে বড় করা, আর স্ত্রীকে বাড়িয়ে তোলার কাজও আলাদা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনকে গড়বে। কিন্তু অত গোড়া থেকে নয়। তারা যখন শুরু করবে, তখন শুধু রঙের কাজ বাকি। মূর্তির একমেটের কাজ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

"তর্ক করলাম চিত্রার সঙ্গে। ওকে সহজে ছেড়ে দিলাম না। কেউ কেউ ভাঙে তবু মচকায় না। আমি আরো শক্ত ধাতুতে গড়া। আমি ভাঙিনে, মচকাইওনে।

"ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি, অভয় এসে হাজির হল। ওর হাতে থলি। বিকেলের বাজার সেরে এসেছে। আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আপনি!'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তোমাদের ঘরকন্না দেখতে এলাম। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কর না। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পার। তুমি এখন আমার বন্ধুর স্বামী।'

"আমার কথায় কতটুকু ঠাট্টা, কতটুকু আন্তরিকতা তা যাচাই করবার জন্যে অভয় একটু ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর শুধু একটু হেসে থলি থেকে জিনিসগুলি বার করতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, যা যা চিত্রা খেতে ভালবাসে, তার সবই থলিতে আছে। কই-মাছ, শাক আলু, মটরশুঁটি। সেই সঙ্গে এক শিশি মিকশ্চার। আর একটা ফ্রুড।

"অভয় বলল, 'মোটে ওষুধ খেতে চায় না। আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলে যান দিদিমণি। ওষুধপথ্য না খেলে শরীর ভাল হবে কী করে?'

"বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ওর?'

"অভয় বলল, 'শোনেননি বুঝি? এইত তিন মাস আগে একটা নষ্ট হয়ে গেল। সেই থেকে শরীরের আর আছে কী। আপনার কাছে বুঝি সব গোপন রেখেছে। ওই ত রোগ। কারো কাছে কিছু খুলে বলবে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, খুলে না বললে মানুষ কি মানুষের মনের মধ্যে সব সময় ঢুকতে পারে!'

"মনে মনে ভাবলাম এরা বোধ হয় তাহলে কোন কোন সময় পেরেছে। চিত্রা লজ্জিত হয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'থাক থাক তোমাকে আর বকবক করতে হবে না।'

"ওরা আমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না। মোড় পর্যন্ত দুজনে এসে এগিয়ে দিল রাস্তা থেকে একজন অনিচ্ছুক ট্যাকসি ওয়ালাকে প্রায় ধমকেই ডেকে আনল অভয়।

"আমি ট্যাকসিতে উঠে বসলাম। ভাবতে ভাবতে চললাম ওদের কথা। সেই সঙ্গে নিজের কথাও এল। ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন একটা ঝোঁক ছিল, আমি নতুন কিছু করব। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাব। হ্যাঁকে না, আর নাকে হ্যাঁ করে তুলব। কোন মেয়ের ছবি দেখলে কলমের ডগা দিয়ে আমি তার ঠোঁটে গোঁফ এঁকে দিতাম। পুরুষের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর চোখে কাজলের রেখা এঁকে তার মুখে নারীর কমনীয়তা আনতে চেষ্টা করতাম। আমাদের বাড়িতে বাবার তুলনায় মার ব্যক্তিত্বহীনতা, দুঃখ-লাঞ্ছনা দেখে দেখে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীতে মেয়েরা বড় বেশী মাত্রায় মেয়ে। তাদের আরো শক্ত হওয়া দরকার, তাদের মধ্যে আরো শক্তি আনা দরকার। পৃথিবীটাকে যে-অবস্থায় পেয়েছি, তাতে আমার সন্তোষ ছিল না। আমি কেবলই ভাবতাম, কী করে এর চেহারা পালটে দেওয়া যায়। কী করে সম্পূর্ণ নতুন সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া যায়। আমাকে তা হতেই হবে। তার জন্য যদি বিশ্বামিত্রের মত আজব দুনিয়া গড়তে হয়, তাও স্বীকার। চলতি ব্যবস্থাকে পদে পদে অস্বীকার করতে করতে আমি আস্তে আস্তে যে-পথ নিলাম, দু দিন বাদে চেয়ে দেখি সে-পথও পুরনো। সে-পথেও হাজার হাজার মানুষের পায়ের দাগ। সেখানেও

পিছলে পড়ে হুমড়ি খাওয়ার ইতিহাস। ভেব না আমি অনুশোচনা থেকে এ-কথা বলছি। অনুতাপের অশ্রুও আমার চোখে আসেনি। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সব পথই যদি পুরনো, তাহলে নতুন কী। অথচ পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটের জিনিস, এখানে নতুন কিছু বলবার নেই, করবার নেই, এ-কথা মানতেও মন বিদ্রোহ করে। কারণ আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের এখনো কিছুই অসাড় হয়নি। আমি এখনো পৃথিবীর নতুন স্বাদ পাচ্ছি, নতুন দৃশ্য দেখছি, নতুন স্পর্শ পাচ্ছি সর্বাঙ্গে। রোজ সে নতুন করে জন্মাচ্ছে, পুরনো বাপ মায়ের ভিতর থেকে নতুন শিশু বেরিয়ে আসছে। না, দুনিয়াটা যে পুরনো আর বাসী এ-কথা মানব না কল্যাণ। বাসী দুনিয়ায় আমি বাস করব না।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাকে বাস করতে বলে কে?"

রিনা বলতে লাগল, "চিত্রার কথা ভাবতে ভাবতে এলাম। ওকে পুরনো বলে একেবারে বাতিল করে দিতে পারিনে। কারণ ও ঠিক আমার মা-মাসীদের মত নয়। আবার ওকে স্বীকার করতেও আমার মন বাধা পায়। কারণ ওই ত্যাগ, ওই দুঃখবরণ, যৌবনরসের ওই অপচয় আমার জন্যে নয়। ও দয়া করতে চায় করুক, অনুকম্পা দেখাতে চায় দেখাক। কিন্তু স্বামী কি প্রেমিকের মধ্যে আমি চাই সখাকে, বন্ধুকে। যদি একজনের মধ্যে তাকে না পাই, দশজনের ভিতর থেকে তাকে খ'ুজে নেব। যদি অখণ্ডভাবে তাকে না পাই, তিল তিল করে গড়ে তুলব সেই তিলোত্তমকে। যদি সে স্থায়ী না হয়, আমিও হব ক্ষণিকা।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রিনা। তারপর বলল, "বছর দেড়েক বাদে আজ আবার দেখা হল চিত্রার সঙ্গে। এতকাল পরে ও নিজেই সাহস করে এসেছিল আমার এখানে। তুমি যে-চেয়ারটায় বসেছ, ওই চেয়ারে বসে সুখ-দুঃখের অনেক কথা সে বলল। শরীরটা আগের চেয়ে সেরেছে। চিত্রা সেই মার্চেণ্ট অফিসের চাকরিও ছেড়ে দিয়েছে। মার্কেটের কাছে ছোট একটা ঘর নিয়ে তাতে খুলেছে এক দোকান। একদিকে দর্জিখানা, আর একদিকে লণ্ড্রি। দুজনে একসঙ্গে সেখানে বসছে। সেলাই ফোঁড়াই, আড়ং ধোলাইয়ের ব্যবসা চালাবার মত বিদ্যা চিত্রা নাকি এর মধ্যে কিছু কিছু শিখে নিয়েছে। এতে আপাতত অভয়েরও খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। চিত্রা অনেক ভেবে দেখেছে, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে, অভয়ের সহকর্মী হওয়া ছাড়া ওকে কাজে লাগাবার আর কোন পথ নেই।

"যেন সহকর্মী হলেই সহমর্মী হয়। যেন স্ত্রী-পুরুষ দুনিয়ায় একসঙ্গে এই প্রথম কাজ করছে। মানে, সভ্য শিক্ষিত জগতের সঙ্গে চিত্রার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও গেল।

"চিত্রা বসেছে বলে দোকানে কিন্তু বেশ ভিড় হচ্ছে। লোকে আড়ালে-আবডালে ঠাট্টা-তামাশা করছে, কিন্তু ভিড় করতেও ছাড়ছে না। অভয় দোকানের নাম দিয়েছে নবরূপা। কার মুখ থেকে কথাটা শুনেছে কে জানে। চিত্রা আপত্তি করেনি। কোন কিছুতে আপত্তি করতে কি ও জানে যে করবে?

"কাল নাকি ওদের সেই নবরূপার ঘটা করে উদ্বোধন, মানে জানাশোনা কয়েকজনকে বলবে। জাঁকজমক কোনকালেই চিত্রা পছন্দ করত না, আজও করে না। তেমন শক্তিই বা কই।

"গোপনে আমাকে আরো একটা কথা বলে গেল চিত্রা। কাল ওদের বিবাহ-বার্ষিকী। এতকাল কিছু করেনি। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম নাকি সেই দিনটির কথা চিত্রার আজ মনে পড়েছে।

"সেই থেকে ভাবছি ওদের কথা। নতুন আর পুরনোর কথা। ওরা যা করছে তা নতুন নিশ্চয়ই নয়। হয়ত এর মধ্যেও একদিন জোড়াতালি ধরা পড়বে। নবরূপার নবত্বও যাবে, রূপও থাকবে না। আমি দুনিয়াটাকে অত সরল সহজ বলে ভাবিনে। এক কথায় সমাধান টেনে দিতে পারিনে। আমার কাছে চিত্রার চার্ম এইজন্যে কম যে, ওর মধ্যে জটিলতা নেই। ও সব সময় কিছু পেতে চায়, পেয়েছি বলে ভাবতে চায়। আর আমার সন্ধানের মধ্যেই পাওয়া, সাধনার মধ্যেই সিদ্ধি। তবু ওর মধ্যে আজ এক নতুন উৎসাহ দেখলাম কল্যাণ। চোখেমুখে যেন এক নতুন রঙ ফুটে বেরিয়েছে। স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে বলেই হয়ত।

"রঙ। এই রঙেই কি পৃথিবীর রূপ বদলায়? সে বার বার পুরনো থেকে নতুন হয়ে ওঠে? আর শিল্পীর তুলিতে যা রঙ, নীতিবিদের মুখে তার নামই কি মূল্য?"

রিনা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, "এখন ভেবে দেখ, চিত্রার সঙ্গে আলাপ করবে কি না।"

ঔদাসীন্যের ভঙ্গি করে বললাম, "এমন কিছু তাড়া নেই। পরে কোন এক দিন যদি আলাপ করি তোমার জন্যেই করব।"

রিনা ভ্রূ কুঁচকে বললে, "তার মানে?"

বললাম, "মানে আজ যেমন তোমার চোখে তাকে দেখলাম, তেমনি আর-একদিন তার চোখে তোমাকে দেখব, তার মুখে শুনব তোমার কথা।"

রিনা হেসে উঠে বলল, "তাহলে কিন্তু তোমাকে হতাশ হতে হবে। সে বেশী কথা বলতে জানে না।"

আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার

শ্রীকালিদাস রায়
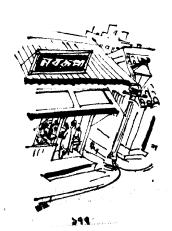
বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের যুগকে প্রধানত প্রবন্ধের যুগ বলা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের যুগ কাব্যের, শরৎচন্দ্রের যুগ কথা-সাহিত্যের। আজকালকার বাঙালী জাতির চিত্তভূমি ও বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যাঁহারা ঊনিশ শতকে গড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রবন্ধকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রামগতি ন্যায়রত্ন, সখারাম গণেশ, ইন্দ্রনাথ, শিবনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ পর্যন্ত সকলেই ছিলেন প্রবন্ধকার। এই ধারা, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, যোগেশচন্দ্র, পাঁচকড়ি পর্যন্ত চলিয়াছে। আচার্য অক্ষয়চন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে গণ্যতম না হইলেও অন্যতম। আচার্য অক্ষয়চন্দ্রকে কেবল প্রবন্ধকার না বলিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্যকার বলিতে হয়। কারণ, অক্ষয়চন্দ্র অক্ষয়কুমার বা রাজকৃষ্ণের মত কোন গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন নাই, কোন তত্ত্বমূলক বিষয়বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করেন নাই বা যুক্তি-পরম্পরার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোন প্রতিপাদ্যের সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি তাঁহার চিন্তা ও অনুভূতিকে সরস সরল ভাষায় কবিত্বময় করিয়া প্রকাশ করিতেন। এজন্য তাঁহাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যকার বলিতেছি। তিনি এক-স্থলে বলিয়াছেন—

"সৌন্দর্য হইতে রস, রসরচনাই সাহিত্য। ভাবুকে বিবিধ উপায়ে রস উপভোগ করেন। এক সৃষ্টি করিয়া আর এক দৃষ্টি করিয়া বা দেখাইয়া দিয়া। সৃষ্টির ক্ষমতা অল্প লোকেরই থাকে—দৃষ্টি সাধনা করিলে অনেকেরই হইতে পারে।"

অক্ষয়চন্দ্রের রচনা এই রসদৃষ্টি সাধনার ফল। আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের সাধারণ কথায় বলে, সরস কথায় গালি দেয় তাও সহ্য যায়, তবু কর্কশ ভাষায় প্রশংসা করিলে সহ্য যায় না। বাস্তবিক সরস কথার মাহাত্ম্য এইরূপই বটে। ইটগুলি সুপোড় হইবে, পাড়ন বেশ সোজা হইবে, তাহার পর জলে ভিজাইতে হইবে, পাটা ধরিয়া বসাইতে হইবে—তবে ত গাঁথনি ভালো হইবে। কেবল আমা ঝামা টেরা বাঁকা ইট হইলে গাঁথনিও হয় খণাবণা। উপাদানের গুণেই ত গঠন, সুতরাং পচা বা শুকা মাছের ঝোলের মত নীরস বাক্য সংযোগে রচনা পরিপাটি, সুন্দর হইবে প্রত্যাশা করাই ভুল।"

সাহিত্য রচনার রীতি সম্বন্ধে তাঁহার যে উক্তি উৎকলিত হইল অক্ষয়চন্দ্র সেই উক্তির মর্ম নিজে তাঁহার রচনায় অনুসরণ করিতেন।

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—

"বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না। বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গ-

ভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণ-পদার্থ আছে—সেইটি বাঙ্গালীর মতো হইলে তবে বাঙ্গালীর উপযোগী ভাষা হয়। ভাষা বুঝিতে হইলে প্রাণ-পদার্থ বুঝিতে হয়। ভাষা প্রাণেরই জিনিস।"

অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় কোথাও এ-সত্যের অপলাপ হয় নাই। ভাষার জিনিয়াস বা অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। তাঁহার ভাষায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না, ইংরেজীতে ভাবিয়া মনে মনে তর্জমা করিয়া তিনি বাংলা লিখিতেন না। ইহা তাঁহার অনুশীলনের ফল নয়, স্বাভাবিক উপলব্ধির ফল।

অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে এই—অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়ানিবাসী, মুনসিফ গঙ্গাচরণ সরকারের পুত্র। ১২৫৩ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। গঙ্গাচরণ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একজন সাহিত্যিক। অক্ষয়চন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে এবং পিতার শিক্ষাগুণে বাল্যকালেই সাহিত্যানুরাগী হইয়া পড়েন। বাল্যকালে অক্ষয়চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর ভক্ত পাঠক ছিলেন। প্রভাকরের প্রভাব সেকালের সকল সাহিত্যিকের মত তাঁহার সাহিত্য-জীবনেও সঞ্চারিত হয়।

অক্ষয়চন্দ্র সেকালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেকালে কলেজ-লাইব্রেরিতে যে সকল পুস্তক থাকিত, সেই সকল পুস্তকের বিষয়বস্তু ছাত্রগণ কতটা অধিগত করিয়াছে, তাহার একটা পরীক্ষা লওয়া হইত। বিশ বৎসর বয়সে গোটা লাইব্রেরি পড়িয়া অক্ষয়চন্দ্র ঐ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হন। ইহার দ্বারা তিনি কত বড় অধীতী পুরুষ ছিলেন, তাহার প্রমাণ হয়। বি-এল পাশ করিয়া তিনি ২২ বৎসর বয়সে বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান। তাঁহার পিতা তখন সেখানে মুনসিফ। এখানে আসিয়া অক্ষয়চন্দ্র ডাঃ রামদাস সেনের বিরাট লাইব্রেরিতে অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। এই সময় দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বহরমপুরের পোস্টাল ইনসপেক্টর, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর আদালতের উকিল, রামগতি ন্যায়রত্ন কলেজের অধ্যাপক, লোহারাম শিরোরত্ন নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। একেবারে অষ্টবজ্র সম্মেলন। গঙ্গাচরণবাবুর গৃহেই ইঁহাদের বৈঠক বসিত। এইরূপ দুর্লভ যোগাযোগ ক্বচিৎ কখনও ঘটে। এই আবেষ্টনীর মধ্যে তরুণ অক্ষয়চন্দ্রের ওকালতি গৌণ হইয়া পড়িল, মুখ্য হইল সাহিত্যসেবা।

এই দিগ্‌গজদের একত্র সম্মেলন নিষ্ফল হইতে পারে না। এই যোগাযোগের ফল হইল 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাব। ১২৭৯ সালে ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল, তাহাতে তরুণ অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দীপনা' নামক প্রবন্ধ স্থান পাইল।

তখন হইতে বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইলেন। এক বছর পরে অক্ষয়চন্দ্র ওকালতি ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় গিয়া 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক

পত্র প্রকাশ করিলেন। 'সাধারণী' কথাটা অর্থগর্ভ। বঙ্গদর্শন হইল বিদ্বৎসমাজের জন্য, শিক্ষিত পাঠকদের জন্য। অক্ষয়চন্দ্র ইহার পরিপূরকস্বরূপ সাধারণের জন্য বাহির করিলেন 'সাধারণী'। ইহার ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু সবই হইল জনসাধারণের অধিগম্য। স্বভাবতই ইহা হইল সাপ্তাহিক পত্র।

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের সম্বন্ধ অক্ষুন্নই থাকিল। বঙ্কিমবাবু অক্ষয়চন্দ্রের রচনার খুবই সমাদর করিতেন। বঙ্গদর্শনে প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনাও অক্ষয়চন্দ্র মাসে মাসে লিখিতেন। বঙ্গদর্শনে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অক্ষয়চন্দ্র কমলাকান্তী ঢঙে 'চন্দ্রালোকে' নামে একটি রসনিবন্ধ রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে সেই প্রবন্ধটিকে স্থান দিলেন। চন্দ্রালোকে ছাড়া অক্ষয়বাবুর 'মশক' নামে এইরূপ আর একটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে তরুণ অক্ষয়চন্দ্রের মতামত ও চিন্তার যে স্বাধীনতা ছিল না, সাধারণীতে তিনি সেই স্বাধীনতার বিনিয়োগ করিতে লাগিলেন। 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু পত্রিকা সম্পাদনে দীক্ষালাভ করেন এই সাধারণীতেই।

১২৯১ সালে অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করিলেন। উদ্দেশ্য বাংলার মৃতকল্প হিন্দুসমাজে নবজীবন সঞ্চার। 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' এই দুই পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়। বাগ্মীবর দেশনেতা বিপিনচন্দ্রও সাধারণীর কাছে নিজের রাজনৈতিক জীবনের জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন।

কিন্তু গুরু-শিষ্যে কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য ঘটিতে লাগিল। অক্ষয়চন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে ও দেশের অধঃপতিত কৃষক কারিগর ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল মনোভাবে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের চেয়ে কতকটা অগ্রসর ছিলেন, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদ বহুদূর অগ্রসর। কাজেই ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতবাদ প্রচারের জন্য বঙ্কিম 'প্রচার' পত্র প্রকাশ করিলেন।

মতবাদের জন্য এই বিচ্ছেদে দুইজনের বান্ধবতা ছিন্ন ত হয়ই নাই, কিছুমাত্র ক্ষুন্নও হয় নাই।

দেশভক্তি সম্বন্ধে দুইজনের চিন্তা ও হৃদয়াবেগ একরূপই ছিল। একই হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি দুইজনের রচনাতেই বর্তমান।

চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চমবর্ষীয় সাহিত্য-সম্মেলনে অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মূল সভাপতি হন। সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের যোগ ছিল। ১৩২৪ সালে ৭১ বৎসর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

সেকালের এই সকল সাহিত্যরথীদের জীবনের ব্রত ছিল সাহিত্য-রচনার মধ্য দিয়া লোকশিক্ষা প্রচার, জনমত গঠন, স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন ও দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের প্রয়াস। উদ্দেশ্যহীন নিরপেক্ষ সাহিত্য খুব অল্পেই রচিত হইত। ইহার ফলে কাহারও একেবারে রাজনীতি এড়াইয়া চলিবার উপায় ছিল না। যাঁহারা সরকারী চাকরি করিয়াছেন, তাঁহারাও (অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায়) কি 'সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে' কি 'দৃষ্টিমূলক সাহিত্যে' জাতি-বাৎসল্য ও দেশপ্রেমেরই প্রচার করিয়াছেন। জাতি বলিতে ইঁহারা বুঝিতেন হিন্দু বাঙালী, আর দেশ বলিতে বাংলাদেশ। অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজের দাসত্ব করিতেন না—তিনি সারাজীবনই দেশে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজ-রাজত্বের তিনি অবসান চাহেন নাই, সেকথা সেকালে কেহই স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন ইংরেজের সুমতি, আর চাহিয়াছিলেন ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার না করিয়া বাঙালী জাতিকে অবিরত ধিক্কার দিয়া আত্মসচেতন করিয়া তুলিতে।

'দেশভক্তি' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"ইংরাজের নানা গুণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অনেক গুণের মূল তাহার স্বজাতিপ্রিয়তা স্বদেশবাৎসল্য। যদি ইংরাজের কাছে আমরা এই স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারি তবেই ইহাদের রাজত্ব ও আমাদের দাসত্ব সার্থক হয়।

* * * *

আইস এই ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইংরাজের প্রকাশিত গ্রন্থপাঠ করিয়া এই অপূর্ব স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করি—উহা পরিপোষণ করি, উহাকে সতেজ এবং সবল করি।"

অক্ষয়বাবুর বক্তব্য, ইংরেজকে শত্রু মনে না করিয়া তাহাকে আপাতত গুরুপদে বরণ কর।

অক্ষয়বাবু মনে করিতেন, নিজের জাতিকে না জাগাইয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া লাভ নাই। তাই তিনি বাঙালী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

১। আমরা ক্রমেই অধিকতর ভণ্ড হইতেছি; এখন আমরা রাজনীতিতে ভণ্ড, সাহিত্যে ভণ্ড, ভাষায় ভণ্ড, লেখায় ভণ্ড।

২। বর্ষ পরে বর্ষ যাইতেছে—অশক্ত বাঙ্গালী মহাশক্তির কেবলমাত্র জড় উপাসনা করিতে করিতে দিন দিন আরো শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

৩। ইংরাজের জ্ঞানশক্তি, বিদ্যাশক্তি, নীতিশক্তি—ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার শক্তির কাছে বাঙ্গালী গললগ্নীকৃত বাসে নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। সে বাঙ্গালীর উপর মহাশক্তি প্রসন্না হইবেন কেন?

৪। যে জাতির মধ্যে জাতীয়বন্ধন আদৌ নাই, যে জাতি একতা কাহাকে বলে শিক্ষা করে নাই, যে জাতির লোকেরা প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু কিন্তু কার্যকালে নিজ নিজ পথ খোঁজেন, যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ, যাঁহারা স্বজাতীয়দের সামান্য দোষ দেখিলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, যাঁহারা তোষামোদ বা ভাগ্যবলে রাজদ্বারে উচ্চ পদবী লাভ করিয়া তাঁহাদের অধীন স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত বাক্যালাপে আপন মর্যাদা লাঘব মনে করেন তাঁহাদের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনিলে না হাসিয়া থাকা যায় না।

ইংরেজের সুমতি তিনি চাহিয়াছেন। যে জাতি সমস্ত জগৎকে নূতন যুগের শিক্ষা-সভ্যতায় দীক্ষা দিয়াছে, তাহার মনুষ্যত্বে অক্ষয়বাবু আস্থা হারান নাই। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সেকালের কোন দেশভক্তই সে-আস্থা হারান নাই। তিনি ছিলেন আশাবাদী। তিনি ভাবিতেন, একদিন এই জাতি তাহার ভুল বুঝিবে। তাই বলিয়া তিনি ইংরেজশাসনের দোষ দেখাইতে কখনও ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনিই লিখিয়াছেন—

১। ইংরাজের আদালত ধর্মাধিকরণ নয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি ও ঠকামির হাটবাজার।

ওখানকার মাটি মাড়াইলেও জন্মসন্তানের ধর্ম-হানি হয়—ইহকাল পরকাল দুইই খোওয়া যায়।

২। (ইংরাজের সংকল্প) করজালে দেশ-ব্যাপিয়া ফেলিব তৎপরে করজালের রন্ধ্র সকল ক্রমেই ক্ষুদ্রায়তন করিয়া আনিব, যাহাতে চুনো-পুঁটিটা পর্যন্ত ধরা যায়। আবার করজাল পাছে ছিঁড়িয়া যায় তজ্জন্য সেই করের টাকা হইতে বন্দুক বর্শা কিনিয়া চারিদিকে বসিয়া পাহারা দিব।

৩। শোষণবশতঃ ভারতে এত অন্নাভাব, সেই অন্নাভাব নিবন্ধন রোগের এত প্রাদুর্ভাব × × চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি অনবরত শ্রুতিগোচর হইতেছে—জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন ভগ্ন সজীব কংকাল-পুঞ্জ চতুর্দিকে দেখিতেছি—ক্রমে রেল টেলি-গ্রাফের উপকারিতা ভুলিয়া যাইতেছি। ইংরাজের শোষণে আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মত অক্ষয়চন্দ্রও বাংলার সমস্যা লইয়াই উদ্বেজিত ছিলেন, সমগ্র ভারতের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান নাই। বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারি-বারিক সমস্যা এত বেশী যে, কেবল সে-সকলের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমাধানের চিন্তার অতিরিক্ত চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তাঁহার রচনায় বাংলা দেশের কোন সমস্যাই বাদ পড়ে নাই। চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—

"এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন এবং পাতি পাতি করিয়া দেখেন।"

অক্ষয়বাবু বাংলাকে ভালবাসিতেন, বাঙালী জাতিকে ভালবাসিতেন। বাঙালী জাতির সরল, অনাড়ম্বর, স্বল্পেতুষ্ট, শান্তি-প্রিয় জীবনযাত্রাকেও ভালবাসিতেন। দুঃখ-ক্লেশকে উপেক্ষা করিয়া সেকালের শান্তিময় সদাপ্রফুল্ল শুচিসুন্দর জীবনযাত্রার চিত্রই তিনি আঁকিয়াছেন বহু প্রবন্ধে। দুঃখকষ্ট, অভাব, দারিদ্র্য ইত্যাদির সার্থকতাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এইগুলি আছে বলিয়াই সেবাধর্ম, দয়াদাক্ষিণ্য, দানধর্ম এবং অন্যান্য পুণ্যানুষ্ঠানের আবির্ভাব হয়, নতুবা মানুষ পশুস্বপ্রাপ্ত হইত।

একটি প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন—

"সুখ দৌড় ঝাঁপে নয়, রাজনীতিতেও নয়...... সুখ পারিবারিক শান্তিতে। একথা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কথা, বাঙ্গালার মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালী কিছুকাল পূর্বেও এই কথা বুঝিত বলিয়া বাঙ্গালী স্বীয় পারিবারিক অধিষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতা সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখনও পারে নাই। অতি সামান্য আয়ের বাঙ্গালী দেবতা-অতিথির সেবা করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া দেহে স্বাস্থ্য মনে স্ফূর্তি পরিপোষণ করিয়া কিছুকাল পূর্বে অতি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে, এইটিই বাঙ্গালীর গৌরব ছিল। × × আমরা সেই সন্তোষের সমাজে, সেই সুখের সমাজে সেই আনন্দের সমাজে সন্তোষেই গড়াপিটা হইয়াছিলাম। × × পিতা দেখাইতেন দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেকগুণ বেশি। × × বুঝিয়াছিলাম জগৎ সুন্দর সুশৃঙ্খল, পরে বুঝিতাম ভগবান মঙ্গলময়। ইহাই বৈষ্ণবধর্মের বীজ।"

তিনি বলিতেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসন্তোষই সকল দুঃখের মূল। ইহাই জীবনকে সংগ্রামে পরিণত করে, জীবনটা সংগ্রাম হইয়া উঠিলে জীবন কখনও উপভোগ্য হইয়া উঠে না। সংগ্রামের দান সামান্য। শান্তির দানেই সমাজের কল্যাণ হয়, সংগ্রামের দানে সমাজের শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না।

মহাভারতের—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।

এই শ্লোকটি অক্ষয়চন্দ্রের মটো ছিল এবং এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বাঙালী জাতির জীবনযাত্রার আদর্শ প্রচার করিয়া-ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র বলিতেন, 'বহুকাল পরে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।' এই শান্তির সদ্ব্যবহার করিতে তিনি জনগণকে বিশেষত বিদ্বৎসমাজকে আহ্বান করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—

"এই শান্তির সুযোগ লইয়া নিজ জাতির গুণগুলি আয়ত্ত করিয়া লও, পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিগত কর, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন কর, একতাবদ্ধ হইতে শিক্ষা কর—এখন দীর্ঘকাল স্বল্পে তুষ্ট থাকিয়া তপস্যা কর। যে অসন্তোষের বীজ জাহাজে বোঝাই হইয়া এদেশে আমদানী হইয়াছে—দেশময় তাহার চাষ করিও না। নীলের চাষের চেয়েও তাহা ভয়ানক হইবে।"

আজ স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের সমস্যার পরিবর্তন হইয়াছে, হয়ত অক্ষয়-চন্দ্রের মতবাদের মূল্যও এখন আর নাই। কিন্তু এই সন্তোষধর্মের কথায় জীবনের যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাকে কোন যুগেই কোন দেশেই বোধ হয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। এটাও একটা Philo-sophy of life, চিরন্তন সত্য। এ যুগেও বহু লোক বহু দেখিয়া এবং বহুবার ঠেকিয়া শিখিয়া এই তত্ত্বের গূঢ়মর্ম উপলব্ধি করেন। বিদেশের বহু মনীষীও এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন।

অক্ষয়চন্দ্র সেকালের আদর্শ বাঙালী জীবনযাত্রার বহু চিত্র নানা প্রবন্ধে অংকন করিয়াছেন। তিনি যে-কালে বি-এল পাশ করিয়াছিলেন সেকালে তাঁহার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি জজকোর্ট কিংবা হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া [illegible] হইতে পারিতেন। কিন্তু সে-পথে না আগাইয়া তিনি সাহিত্যসে[illegible]

অনন্যচিত্ত হইয়া সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি পরিতুষ্ট চিত্তে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবন যাপন করিয়াছিলেন। জীবনে বহু শোকতাপ পাইয়াও তিনি নিজের জীবনকে একদিনের জন্য শোচনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার জীবন-তত্ত্বই তাঁহাকে শক্তি দিয়াছে, আশা দিয়াছে, আশ্বাস দিয়াছে এবং কোন দুঃখে মুহ্যমান হইতে দেয় নাই।

সেকালের মানুষ কেমন ছিল তাহা তিনি কয়টি চরিত-চিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-কথায় সেকালের জ্ঞানগুরু লোকশিক্ষক সাহিত্যিকের, কেশবচন্দ্র সেনের জীবন-কথায় সেকালের ধর্মগুরুর, নিজের পিতার জীবনচিত্রে সেকালের হাকিমের, বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথায় সেকালের বহুজন-প্রতিপালক, বদান্য স্বধর্মনিষ্ঠ ধনীর, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথায় সেকালের সুরসিক পুরুষের এবং কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির জীবন-কথায় সেকালের আদর্শ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরিত্রের ও জীবনযাত্রার পরিচয় তিনি দিয়াছেন। এইসব গেল উচ্চশ্রেণীর লোকদের কথা।

বীরাঙ্গনা দ্রবময়ী চণ্ডালিনীর তেজস্বিতা ও অদ্ভুত লাঠিখেলার পরিচয় দিয়া তিনি সেকালের বাঙালীর বাহুবলের আভাস দিয়াছেন। ইহা হইতে বাঙালী পুরুষদের শক্তিসাহসের পরিচয় অনুমান করিতে বলিয়াছেন। মুনকে রঘুর কথাও তিনি ভুলেন নাই। একালের ভোজনাতঙ্কী বার্লি-সেবী যুবকদের কাছে রঘুকে কল্পিত পুরুষ বলিয়া মনে হইবে। একশত বৎসর আগেকার বাঙালী জাতির জীবনযাত্রার ইতিহাস অক্ষয়-বাবুর রচনায় পাওয়া যাইবে। এই ইতিহাস জাতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত।

আমি অক্ষয়চন্দ্রকে বঙ্কিমের শিষ্য বলিয়াছি। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের মতবাদের শিষ্য নহেন। অক্ষয়কুমারের মতবাদগুলি তখনকার বাংলার আকাশ-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের রচনারীতির শিষ্য।

এবিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রেরও স্বকীয়তা ছিল। ভাগীরথীর এপারে-ওপারে প্রচলিত আসল বাংলা ভাষার ইতর-বিশেষ ছিল না। অনেক-স্থলে অক্ষয়চন্দ্রের ভাষার কলাচাতুর্য বঙ্কিমের সমকক্ষ। বঙ্কিমের কমলাকান্তী ঢঙ অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় আরো যেন সরস হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধ হইবে। অনেক-স্থলে মনে হয়, বর্তমান যুগের রম্য-রচনার রচনারীতির সূত্রপাত হইয়াছিল অক্ষয়চন্দ্রের রচনায়।

অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় সূক্তি ইত্যাদি শ্রেণীর বাক্য (Aphorism, Epigram, Adage) অজস্র। কতকগুলির দৃষ্টান্ত—

১। যে লেখে সে শেখে না, যে শেখে সে লেখে না।

২। কবির কবিত্ব কীর্তনই কবির আসল জীবনী।

৩। স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বানুবর্তিতা, সহজজ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি বলিয়া যতগুলি ভাব জাহাজে আমদানী হইয়াছে—সে সকলই আত্মম্ভরিতার নামমাত্র।

৪। আপাততঃ অসম্ভবকে কালে সম্ভব করার নাম বিজ্ঞান, নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম।

৫। মস্তক বেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করাই এখনকার দিনে আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সকল তত্ত্বই এখন য়ুরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়।

৬। সাম্য বৈষম্যের একত্র মিলনে সৌন্দর্য। বৈষম্যের ভিতরে সাম্য থাকিলে তাহাকে শৃঙ্খলা বলে।

৭। (মুদ্রা)-যন্ত্র আছে বলিয়া আমরা সকলেই সুলেখক; (পড়িবার জন্য কোন) যন্ত্র নাই বলিয়া আমরা সকলেই অপাঠক। অতএব বাংলায় পুস্তক লিখিত হয়; পঠিত হয় না।

৮। অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপে চালিত হয় তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা অন্তঃ-প্রকৃতি কিরূপে চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নভেল রচয়িতার প্রধান কার্য।

৯। রাজদ্বারে এবং শ্মশানে কেবল যে বন্ধুর পরীক্ষা হয় এমন নয়, বন্ধু লাভও হইতে পারে।

স্থলে স্থলে অক্ষয়বাবুর রচনা চমৎকার ব্যঞ্জনাগর্ভ—

১। ভারতবর্ষের আনারস ইংলণ্ড দ্বীপে ভালোরূপ ফল প্রসব করে না। কাবুলের বেদানার বীজে আমাদের বাঙ্গালায় যে দাড়িম্ব বৃক্ষ জন্মে তাহার ফল বেদানার ন্যায় সুরস ও সুমিষ্ট হয় না। আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যেরা প্রায় এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না।"

(ব্যঞ্জনা এই, যে-সকল আচার ও ব্যবস্থা বিলাতের পক্ষে উপযোগী, এদেশের পক্ষে সেগুলি উপযোগী নয়। না হইবারই কথা।)

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি দুয়ানি, সিকি, আধুলি ব্যতীত আর কিছুই নয়। টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থলে রূপা ক্রয় করিয়া নিজ খাদে মিশাইয়া ব্যবসায় করিতেছেন।

(ব্যঞ্জনা এই—বিদ্যাসাগর সাহিত্য-স্রষ্টা নহেন, তিনি দেশ ও বিদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যকে বাংলায় রূপান্তরিত করেন মাত্র। সাহিত্যিকের প্রতিভাসৃষ্ট সাহিত্যই সোনা। মন্তব্য—উত্তররামচরিত ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌কে রূপা বলা চলে না—সোনাই বলিতে হয়।)

বঙ্কিমের মত অক্ষয়কুমারের রস-রচনায় শ্লেষাঢ্য ভঙ্গি (ironical), বৈষম্যসূচক ভঙ্গি (antithetical) ও স্বল্পাক্ষরী ভঙ্গি (elliptical)—এই তিন ভঙ্গিই দেখা যায়।

শ্লেষাঢ্য—

১। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে অদ্যাপি কায়েমী পত্তন করেন নাই। জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা, মহামারী, গ্রীষ্ম, মশক আমাদিগকে এতদিন এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ইহারা ভারতবর্ষে চির-বিরাজমান রহুক।

২। তুমি বর্বর, বলিতে পার ইংরাজি ইতিহাসের কথায় আমি বিশ্বাস করিনা। না কর গোল্লায় যাইবে, পরীক্ষায় ফেল করিবে, চাকরি পাইবে না। শেষে আমার মত বাংলা লিখিয়া গ্রাহকের দ্বারে দ্বারে মূল্য প্রাপ্তির জন্য কাঁদিয়া বেড়াইবে।

স্বল্পাক্ষরী ভঙ্গির দুই-একটি দৃষ্টান্ত—

১। ইংরাজের কল্যাণে (আর কল্যাণই বা কেন বলি—) ইংরাজের কৃপায় আমরা কত কি না দেখিলাম আর কত কি না দেখিব? রাজ্যে দেখিলাম ভূমিশূন্য রাজা আর জমিশূন্য প্রজা, কার্যে দেখিলাম যিনি কাপুরুষ তিনি বাহাদুর, যিনি সৎপুরুষ তিনি দুরদুরে। রাজদ্বারে দেখিলাম বিচার বিক্রয়, শাসন বিক্রয়, শান্তি বিক্রয়। দান—কেবল আধিব্যাধি উপাধি আর সমাধি। নগরে দেখিলাম শরমহীনা কুলনারী আর ধরমহীন পাদরি। দেশে দেখিলাম—জলে বাষ্পবোট, স্থলে রেল রোড, সিন্দুকে ব্যাঙ্কনোট, আর সর্বত্র অনবরত হরিরলুট। সভায় দেখিলাম—দেশভক্ত রেজোলিউশন করে, রাজভক্ত সার্টিফিকেট জারি করে। ভিতরে দেখিলাম, সধবার নিগ্রহ, বিধবার আগ্রহ ও বহুধবার শুভগ্রহ। বাহিরে দেখিলাম আলতা পায়ে জুতার চটক, বুড়ানাকে নোলক দোলক, বড়ির উপরে বড়ি ও বগীর উপর গোপধাত্রী, শহরের হাটে দেখিলাম—উশুনায় গুঁড়ি, আতপে খড়ি, দুধে জল, ঘিয়ে বাতি (চর্বি), লবণে হাড়, বসনে মাড়, সন্দেশে ময়দা।

২। বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? উত্তর—ইহা আমাদের সর্বস্ব। ইহা দুর্বলের বল, অসহায়ের সহায়। ভয়ব্যাকুলিত চিত্তের শান্তিস্থান, অশিক্ষিত জনের শিক্ষাগুরু এবং আমাদের বাঙ্গালী জীবনের একমাত্র কাঁদিবার স্থান।

৩। দেবতার পাগলামি লীলা, বালকের পাগলামি খেলা, ধনীর পাগলামি উদারতা, মধ্যবিত্তের পাগলামি লৌকিকতা, বিজ্ঞের পাগলামি জাতীয় সমিতি, অজ্ঞের পাগলামি বিজাতীয় অনুকরণ।

দুই একটি বৈষম্যমূলক রচনাভঙ্গির নিদর্শন দেখাই—

১। শিক্ষিত যুবক অশিক্ষিতের আবাসস্থান পল্লীগ্রামে পদার্পণ করে না—অশিক্ষিতের পরিধেয় ধুতি চাদর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অশিক্ষিত মুষ্টিভিক্ষা দান করে, শিক্ষিত সাবস্ক্রিপ্‌সন দেন। অশিক্ষিত অবগাহন করে, শিক্ষিতের তোলা জলে স্নান। অশিক্ষিতে তৈলমর্দন করে, 'শিক্ষিতের রুক্ষতা শ্রেয়। অশিক্ষিত গান করে,' সঙ্গীত আমাদের শিক্ষিতের পক্ষে হৃৎকর্ণশূল। যে কার্যে অশিক্ষিত নীরবে নিভৃতে রোদন করে, সেই কার্যই শিক্ষিতগণ সহস্র লোক একত্র করিয়া বাহু আস্ফালন করিয়া অভিনয় করেন। কালু, কিনু, ভনু, মধু যে ধর্মে বিশ্বাস করে ভুজেন্দ্রভূষণ এম এ, যোগেন্দ্রজীবন বি এ-দের সে ধর্মে বিশ্বাস করিলে অপমান হইবে না?

[শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে এই ব্যবধান যত বাড়িতেছে—ততই আমাদের জাতীয় সংহতি অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অক্ষয়চন্দ্র এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত।]

২। কাব্য উপন্যাসে সৃষ্টিশক্তির ইতিহাস, বিজ্ঞানে দৃষ্টিশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কাব্য উপন্যাসে সৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া কাব্যাদি সর্গে (সর্গের অর্থ সৃষ্টি) বিভক্ত। ইতিহাস বিজ্ঞানে দৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া ঐ সকল সংস্কৃতে 'দর্শন' বলিয়া অভিহিত। কবি সৃষ্টিকারক, দার্শনিক দৃষ্টিকারক। সৃষ্টি ও দৃষ্টি লইয়াই সমগ্র সাহিত্য শাস্ত্র।

৩। সেই চোখভরা চাহনি, গালভরা হাসি, প্রাণভরা স্ফূর্তি, তেমন মজলিসভরা লোক কৈ, আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। কেবল কতকগুলো হিংসেয় ভরা, রগচেপা, ক্রূরকটাক্ষ, বিষদিগ্ধ বেতালা বেসুরো বদরসিক।

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। সে যুগে সুপণ্ডিত লেখকরা এরূপ সহজ সরল ভাষায় লিখিতেন না, তাঁহাদের রচনা ছিল সংস্কৃত সন্ধি-সমাসে সমাকীর্ণ। এইরূপ ভাষারও প্রয়োজন ছিল বিষয়বস্তুর গৌরব ও মহিমা থাকিলে। অক্ষয়চন্দ্র সে-কথা বিস্মৃত হন নাই।

ভারতের বর্ণনার ভাষা—

"এই সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত সহস্র পর্বতাশয়ে তরঙ্গায়িত-দেহ সহস্র নদনদী প্রবাহে বিধৌত-মল, শস্য-শ্যামল বনরাশি-সংকুল, রত্নগর্ভ, উর্বরভূ, বিংশতি কোটি মানবের আবাসভূমি ভারতবর্ষ ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি। × ×

এমন শালতমাল-তাল-সংকুল ঘন বিজন বনচিত্র সুপের পয়োনিঃসরণকারী প্রস্রবণ, সেই বিদ্যুদ্দামদীপ্ত, ঘনঘটাপূর্ণ, মুষলধারাস্রাবী বর্ষার আকাশমণ্ডল, আর এই চূতমুকুল-সৌরভে পূর্ণ পাপিয়া কল-কোকিল-আরাবিত বসন্তকাল—এমন কি আর কোথাও আছে নাকি?"

সমালোচক অক্ষয়চন্দ্রের সামান্য পরিচয় দিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি। সমালোচক হিসাবে অক্ষয়চন্দ্র সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সেইজন্যই তিনি বঙ্গদর্শনে সমালোচনার ভার পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমারকে তিনি শুধুই ভক্তি-নিবেদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"বিশ্বাসেই যাঁহার প্রকৃতি, বিশ্বাসেই যাঁহার প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসেই যাঁহার নিবৃত্তি তিনি আজীবন অন্ধকারচারী—তিনি কপালকুণ্ডলা।

বিশ্বাসে যাঁহার আরম্ভ, সন্দেহে প্রবৃত্তি সন্দেহেই পরিণাম—তিনি চন্দ্রশেখর। আর বিশ্বাসে যাঁহার উদ্যোগ, সন্দেহে যাঁহার প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাসে যাঁহার পরিণাম—তিনি প্রতাপ রায়। এখন চাই জনকতক প্রতাপ রায়।"

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি—

"কবি গেটে শকুন্তলার সৌন্দর্য দশ পংক্তিতে প্রকাশ করেন—রবীন্দ্রনাথ সেই কয় পংক্তি বুঝাইয়া দিলে সেই সমালোচনা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইলে তবে কুমার শকুন্তলা বুঝিতে পারিলাম।"

অক্ষয়চন্দ্র হেমচন্দ্রের কবিতা সমালোচনার জন্য একখানি গ্রন্থই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-মত সেকালের হেমচন্দ্র ভক্তদের প্রীতিকর হয় নাই। হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মাইকেলের মিতাক্ষর ছন্দ অমিত্রাক্ষর হইলেও তাহা নয়। হেমচন্দ্র হয়ত মনে করিয়াছিলেন, মিতাক্ষর পয়ারের বন্ধনচ্ছেদন মাত্র। মাইকেল মিতাক্ষর এক শ্রেণীর নিগড় ছেদন করিয়া অন্য শ্রেণীর নিগড় ধারণ।

অক্ষয়চন্দ্র বলেন—

"কাব্যের জন্য নিগড় চাইই। চূড় বলয় অনন্ত—এগুলিও নিগড় বটে, বাহুলতা বাহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয় চূড় অনন্ত বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। দশরূপ নিগড়েই কবিতা—নিগড়েই সৌন্দর্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি শশী, ছন্দও ত নিগড়। নিগড় সোনা জগতে, নিগড় কাব্যজগতে।"

অক্ষয়চন্দ্র বলেন, হেমচন্দ্র এই মাইকেলী ছন্দের নূতন নিগড়ের সার্থকতা উপলব্ধি করেন নাই। মাইকেলের কাব্য পড়িয়া হেমচন্দ্র আবিষ্কার করিলেন, কাব্যের আলম্বন জাতিবৈর। সেই জাতিবৈরকে আশ্রয় করিয়া তিনি বৃত্রসংহার রচনা করিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের দোষ-গুণ বিচার করিয়াছেন। গুপ্তকবি মিত্রাক্ষরী গদ্যের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সেইরূপ মিত্রাক্ষরী গদ্যে গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা করিয়াছেন যে অংশে, সেই অংশটুকু তুলিয়া দিই—

"(গুপ্ত কবির রচনায়) অশ্লীল আছে অশ্লীল আছে, রঙ্গ আছে ব্যঙ্গ আছে, হাসি আছে, খুসি আছে, উপদেশ আছে, নির্দেশ আছে, ক্রন্দন আছে, ক্রন্দন আছে, কিন্তু তাহাতে হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই, নাকশিটকানি নাই, চোখ টাটানি নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রাগ—ভোলানাথের খোলা কথা। তুষের আগুনের মত সে রাগ গুমরে গুমরে থাকে না। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ ইয়ারের রঙ্গ—তাহাতে দ্বেষের লেশ নাই।......ঈশ্বর গুপ্তের আনন্দ-লহরী বাঁধা সুরের সাধা রাগিনী—তাহাতে অহঙ্কারের গিটকারি বা ঘৃণার টিটকারি নাই।"

পরমায়ু

টেবিলের উপর দু পা তুলে দিয়ে যিনি নাকে সার্গম তুলছিলেন, তিনি সুরপতিবাবুর পায়ের সাড়ায় চোখ মেলে তাকালেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ

হাওড়া ইস্টিশনে গাড়ি দাঁড়াতেই প্রথমে কুলি পরে হোটেলের দালালেরা ছেঁকে ধরেছিল, ঠিক দশ বছর আগেও যেমন ধরত, তেমনই পায়ে-পায়ে-ঠোক্কর ভিড়, কানে-তালা সোরগোল। একটু বেশী বই কম নয়। তবু গেটে টিকিটটি সঁপে বাইরে পা দিয়েই সুরপতি নিজেকে বড় একা বোধ করেছিলেন। ম্যামথকঙ্কাল ব্রীজটার নীচে ভাগীরথী যথাপূর্ব পুণ্যদায়িনী, পণ্য-বাহিনী; উপরের ধোঁয়াঘোলাটে আকাশটুকুও চিনতে পারছেন ঠিক। তবু সুরপতি মৃদু গলায় নিজেকে বললেন, "কিছুই আসলে তখনকার মত নেই।" মোড়ে মোড়ে এমন লালচোখ আলোর ধমক কি তখন ছিল, না দূরে দূরে এত আকাশলেহী বাড়ি। সেকালের হিলহিলে পিছল-কেঁচো গলি-ঘুঁজিও কেমন উদারহৃদয় হয়ে গেছে দেখ।

প্যাকপ্যাক ট্যাক্সিকে কেবলই ডাইনে বাঁয়ে ঘোরার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মনে মনে ভয় পেয়েছেন, সেই পীতাম্বর সাহা লেনটিকে বোধহয় খুঁজে পাবেন না। ভারী ভারী উৎসাহী শহরসংস্কারক রোলারের তলায় সে হয়ত কবে গুঁড়িয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ে সুরপতি এদিক ওদিক দেখেছেন, আর সন্দিগ্ধ, হয়রান ট্যাক্সিওয়ালাকে ভরসা দিয়েছেন, "আর একটু, আরও একটু।"

অবাক ব্যাপার, কী এক সুকৃতির জোরে পীতাম্বর সাহা লেনটি বেঁচে গেছে। আর, দশ বছর আগে জীর্ণ বাসের মত যাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই মেস-বাড়িটিও। ট্যাক্সিকে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন আগে, সামান্যই সামান, নামিয়ে নিতে অসুবিধে হল না। তার পর কড়া নাড়লেন।

ছাইমাখা হাতের পিঠ দিয়ে যে ঝি দরজা খুলে দিল, তাকে সুরপতি চেনেন না, অন্তত তাঁর আমলে দেখেননি। জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুকূলবাবুর মেস ত?" কম কথার মানুষ ঝি, আঙুল দিয়ে অফিসঘর দেখিয়ে দিল। একটা চাকর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছিল, সেও নতুন। অফিসঘরের বাঁধানো কালীর পটটা ধুলো আর ঝুলে ভরে গেছে; কাচও ভাঙা, তবু চেনা যায়। কমলেকামিনী ক্যালেণ্ডারটা অবশ্য তখন ছিল না। টেবিলের উপরে দু পা তুলে দিয়ে যিনি নাকে সর্গম তুল-ছিলেন, তিনি সুরপতিবাবুর পায়ের সাড়ায় চোখ মেলে তাকালেন। পা দুটি নামিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। "কী চান?"

নাকে যার মেঘডম্বর, তার গলার আওয়াজ এত মিহি কী করে হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে সুরপতিবাবু তখনই যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, তার কারণ তখনও এখানে

আশ্রয় পাবেন কিনা, তার নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং ক্ষীণতর কণ্ঠে বলেছেন, "অনুকূলবাবুর মেস? এখানে সীট পাওয়া যাবে? কদিন থাকতে চাই।" শ্রোতার মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হল না দেখে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিয়েছেন, "অনুকূলবাবুকে আমি চিনি। এখানে আমি অনেক দিন আগে থেকে গেছি। আমার নাম সুরপতি চৌধুরী।"

ভেবেছিলেন, নামটা শুনে লোকটা হয়ত চকিত চোখে তাকাবে, শ্রদ্ধায় সমীহে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলবে, বসুন। আশানুরূপ ভাববৈলক্ষণ্য দেখতে পেলেন না। লোকটি নিরুত্তরে শুধু একটা খাতা ঠেলে দিয়ে বলল, "সই করুন। পেশা, বর্তমান ঠিকানা, এ-সবও লিখবেন। রুলটানা ঘর আছে, দেখে নিন।"

পেশার ঘরে লিখতে পারতেন 'ব্যবসা' তবু কী ভেবে সুরপতি লিখলেন 'লেখক'। লোকটার মুখে তবু বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কতকটা ওকে শুনিয়ে, কতকটা নিজের মনে মনে বললেন, "সবই কেমন বদলে গেছে, না? পুরনো বোর্ডার কি একজনও নেই?" কথাটা নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল; সেটা ঢাকা দিতেই সুরপতি যেন আরও একটু বোকার মত হাসলেন, "কালীর পটটা কিন্তু ঠিক আছে। অনুকূলবাবু এখনও দু বেলা জপ করেন?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে লোকটা গম্ভীর গলায় বললে, "পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স।" ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডেকে হুকুম দিলে, "মাল দোতলায় ছ নম্বর ঘরে তুলে দে।"

অনুকূলবাবু চিনেছেন ঠিক। অফিস-ফেরত খাতায় নাম দেখে সোজা উঠে এসেছেন উপরে। আগেকার তুলনায় কিছু শীর্ণ, একটু বা ময়লা। হাসলেন, দেখা গেল দুটি দাঁতও খুইয়েছেন। বললেন, "তাই ত বলি, কে। ভাগনে বললে, পুরনো বোর্ডার। তা ও ত এই সবে বছর দুই হল দেশ থেকে এসেছে, আপনাদের দেখেনি। শুধু ওই 'লেখক' কথাটি লিখেই যা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলেন মশাই।"

"কেন, আমি কি লেখক নই?" ভয়ে ভয়ে, কতকটা আত্মপরিচয় দেবার কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, সুরপতি বললেন, "আপনার কিছু মনে থাকে না অনুকূলবাবু। এই মেসে বসেই তিনটে বই—।"

"মনে থাকবে না কেন, আছে। যাবার আগেও মেসের এই ঘরটিতেই ছিলেন। রেলে চাকরি পেলেন, তিন মাসের মাথায় বদলি। আমাদের সবাইকে জোর ফীস্ট দিয়েছিলেন, বলছেন মনে নেই? এ-শর্মার সব মনে থাকে সুরপতিবাবু। কত বোর্ডার এই তিরিশ বছরে এল গেল, কাউকে ভুলিনি। এখনও সবাইকে ডেকে ডেকে বলি, তোরা এক টুকরো মাছের ভাগ কম হলে চেঁচিয়ে মাথা ফাটাস, জানা আছে কে কোন্ লাটের বেটা। এই মেসেই আগে অনেক বড় বড় চাকুরে থেকে গেছে, এখানকার ঝোলভাত খেয়ে অনেকে অফিসার হয়েছে, তারা কোন দিন টুঁ শব্দটি করেনি। অনুকূল শম্মার মেসের ভাতের অনেক পয়।" অনুকূলবাবু সহসা উঁচু গ্রামে একটি হাসি ধরলেন, তার তরঙ্গ দেয়ালে দেয়ালে ঠোকর খেল। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন সুরপতি, হাসির গমকে এই কোনমতে মেরামতে খাড়া বাড়িটির চুনবালি না খসে পড়ে। সে-হাসি সংবরণও করলেন অনুকূল নিজেই। উচ্চতম শিখর থেকে খসে কণ্ঠস্বর একেবারে গুহাহিত হল: "এখনও সেই কাজই করছেন? নিশ্চয় এতদিনে গেজেটেড হয়েছেন?"

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুরপতি, প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললেন, "কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখন ব্যবসা করছি অনুকূলবাবু। রেলেরই ঠিকেদারি।"

ভুরু কপালে উঠে গিয়ে অনুকূলবাবুর চোখ দুটি আপনা থেকে যেন গোল হয়ে গেল। "ওরে বাবা, তবে ত আপনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। নইলে বলতুম আমার ভাগনেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। বলছেন সে-ক্ষমতা আপনার নেই? জানি সুরপতিবাবু, চিরকালই আপনি এমনি লাজুক, নিজেকে কিছুতেই বড় বলবেন না। এত ওপরে উঠেছেন, আপনার হ্যাট-কোটবুট দেখেই বুঝতে পারছি, তবু তেমনি রয়ে গেছেন। দেখেছেন আপনার কথা কিছুই ভুলিনি, স্বভাবটুকুও মনে করে রেখেছি?"

"বিশ্রাম করুন" বলে অনুকূল একটু পরে উঠে গেছেন, তবু সুরপতি পোশাক না ছেড়ে অনেকক্ষণ খাটে পা ঝুলিয়ে তেমনি বসে থেকেছেন। দেয়ালে পানের পিকের দাগ, বিলিতী মাটি চটে-যাওয়া মেঝে, দরজার কোণে অধ্যবসায়ী মাকড়শার সূক্ষ্ম কারুকর্ম—সব আচ্ছন্ন ক্লান্ত চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি একাকার অবয়ব হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা বুঁজে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন সুরপতি। কিছুই ভোলেননি, এ-কথা অনুকূলবাবু বারবার তারস্বরে ঘোষণা করে গেছেন, তবু একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনের নীচতলা থেকে এই ভয়টা উঠে এসেছে, সেদিনের অনেক কথাই বুঝি অনুকূলবাবুর মনে নেই। এই ঘরে বসে এক দিন তাঁর লেখা নাটকের পুরো তিনটি অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরে, সে-সব না হয় ভুলেই গেছেন, কিন্তু তাঁর একটি উপন্যাস যে অনুকূলবাবুকে উৎসর্গ করেছিলেন তাও কি মনে নেই?

কতক্ষণ চুপচাপ চোখ বুঁজে ছিলেন হুঁশ নেই, হঠাৎ টুপ করে একটা আওয়াজ হতেই সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। উপরের কড়িকাঠ আধখানা উইয়ে খেয়ে গেছে, একটা তড়বড়ে টিকটিকি সেটা টপকাতে গিয়ে খসে গিয়ে থাকবে। পড়েই তরতর দৌড়, কিন্তু লেজটা রেখে গেছে এখানেই, সুরপতির বালিশটার ঠিক পাশেই। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তিনি টিকটিকিটাকে চেপে ধরেছিলেন কিনা, ঠিক খেয়াল করতে পারলেন না সুরপতি, কিন্তু দিয়ে থাকতেও পারেন এই সন্দেহে গায়ে কেমন কাঁটা দিল, যে-হাতটা বালিশে রেখেছিলেন সেটা যেন বশে নেই। হেঁট হয়ে সুরপতি মোজা পরতে শুরু করলেন, হাঁতড়ে হাতড়ে খাটের নীচে থেকে জুতো জোড়াকেও টেনে আনলেন ঠিক। তাই ত, বড় দেরি হয়ে গেছে। এখনি অফিসারের বাড়ি দৌড়তে হবে পাঁচ নম্বর স্কীমের ঠিকেটার জন্যে, যে-তদ্বিরে এতদূর এসেছেন। ঘড়িতে সময় দেখলেন, সাড়ে ছটা। এরই মধ্যে এখানে দিন ফুরিয়ে যায়? এই ত, একটু আগে খাটের পায়ার কাছে সে বসে ছিল, শেষবেলার নরম এক টুকরো রোদ, পা গুটিয়ে ছোট মেয়েটির মত। তাকে পাহারা রেখে সুরপতি চোখ বুঁজেছিলেন। আর যেই চোখ বোঁজা অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়েছে, একছুটে, হয়ত সিঁড়ি টপকে, হয়ত জানালা গলিয়ে। এ-ঘরে

শুধু একমুঠো অন্ধকার তার পায়ের ধুলোর মত পড়ে আছে।

খুট করে ফের শব্দ হল। চাকর চা এনেছে, আলো জেবলেছে।

গায়ে কোট চড়াতে চড়াতে সুরপতি ঘর্ঘর গলায় তাকে বললেন, "ওখানে রেখে যাও।" দেয়ালের পেরেকে হাত-আয়না ঝুলিয়ে সুরপতি সোজা হয়ে সামনে দাঁড়ালেন। দশ বছর আগে এই ঘরে যে-যুবকটি কেরানীগিরির ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যসাধনা করত, আয়নার ছায়ায় তাকে দেখতে পাবেন এ-দুরাশা ছিল না; যদিও সেই পুরনো পরিচিত পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে চামচিকে গন্ধ, তবু নিজের-হাতে-কাচা পাঞ্জাবি-পরা সেই উজ্জ্বলচোখ ছেলেটি দেখা দিল না। সুরপতি যাকে দেখলেন, তার সিঁথির দুপাশে চুল বিরল, কানের উপরটা রুপোলী, গলায় ঝকঝকে মসৃণ-ভাঁজ টাই; চোখ দুটি ছাড়া বাকী সবটুকুই তার উজ্জ্বল। মামুলি ছবি, জীবনে সফল প্রৌঢ়ের।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাসটা যদি অতক্ষণ না দাঁড়াত, তবে কী হত বলা যায় না। সুরপতির হয়ত খেয়ালই হত না, একদা-অতিপরিচিত বইয়ের দোকানের সারি পিছনে ফেলে যাচ্ছেন। ফুটপাতে, রেলিঙের ধারে তখনকার মতই ভিড়, কাটা কাপড় আর পুরনো বইয়ের দোকানের সারি। বাস থেকে সেখানে নেমে একবার থমকে দাঁড়িয়েছেন সুরপতি, রকমারি বেসাতির উপর চোখ বুলিয়েছেন, কিন্তু দাঁড়াননি, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে গেছেন ওধারে, যেখানে কাচের শো-কেসের আড়ালে নয়নাভিরাম নতুন বইয়ের প্রদর্শনী। সেখানে এক মিনিট দাঁড়ালেন, কাঁচ ঘষে নিলেন চশমার, নামগুলো একবার পড়বেন। বেশির ভাগই নতুন নাম, তবু ওরই মধ্যে দু-একটা সুরপতির চেনা। ভিতরে গেলেন, সেখানেও কাউণ্টারে অজস্র বই ছড়ান, কেনাবেচার ভিড়। গলদঘর্ম কয়েকটি লোক ক্যাশমেমো কাটছে, আরও বই বয়ে আনছে। আরো, আরো।

"'প্রলয়বীণা' কী রকম টানছে দেখেছিস।"

"আর সাতটা দিন যেতে দে, দেখবি এডিসন কাবার।" কাউণ্টারের ওপাশে ওরা বলাবলি করছিল, সুরপতি শুনতে পেলেন।

এপাশ থেকেও কয়েকজন ক্রেতা আরেকটা বইয়ের নাম বারবার চেঁচিয়ে বলছিল, "মন-আগুন"।

"'মন-আগুন', 'মন-আগুন' দু কপি, কাউণ্টারের ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। বইও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল। একটি লকলকে শিখা সমগ্র বইটিকে বেষ্টন করে আছে। এক কোণে পরিপাটি হরফে লেখক আর বইয়ের নাম। এমন সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সুরপতির চোখে বেশি পড়েনি। লোভ হল হাত বাড়িয়ে বইটি স্পর্শ করেন। করলেনও। পাতা উল্টে গেলেন। আসল বইটা যেখানে শুরু, তার আগেকার কয়েকটা পৃষ্ঠাই একরকম সাদা। কোনটাতে বইয়ের নাম লেখা আছে, কোনটাতে লেখকের। একটা জায়গায় প্রথম প্রকাশের তারিখের নীচে সুরপতি দেখতে পেলেন, বড় বড় হরফে লেখা, দশম মুদ্রণ। দশম!

আর ঠিক তখনই সুরপতি ছেলেমানুষের মত একটা কাজ করে বসলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে একবার ঝেড়ে নিলেন, তারপর স্পষ্ট, একটুও নাকাঁপা স্বরে, জিজ্ঞাসা করলেন, "'জোয়ারের জল' আছে? 'জোয়ারের জল' দিতে পারেন এক কপি?"

কাউন্টারের ওপাশে ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কেটে গেল কয়েক সেকেণ্ড। আবার চাইবেন কিনা সুরপতি ভাবছেন, ওদেরই এক জনকে ঢোঁক গিলে বলতে শুনলেন, "'জোয়ারের জল', কী বললেন, 'জোয়ারের জল'?"

কপট বিনয়ে সুরপতি বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইয়ের দোকানে কাজ করছেন, অথচ এ-বইয়ের নামও শোনেননি?"

সে-লোকটি পিছিয়ে গেল কিংবা তাকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে এল আরেকজন। "'জোয়ারের জল'? লেখকের নামটা বলতে পারেন?"

দোকানে আয়না নেই, সুতরাং মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কিনা সুরপতি দেখতে পেলেন না। সামলে নিয়ে, ধীরে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, "লেখকের নাম সুরপতি চৌধুরী।" অন্য খরিদ্দার দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটি বলল, "না, ও নামে কোন বই ছাপা নেই।" অজ্ঞতার লজ্জা নয়, সুরপতি তার মুখে অবহেলার হাসি দেখলেন। "পাশের দোকানে খোঁজ করতে পারেন।" উপদেশ দিয়েই ছেলেটি হাঁক দিলে, "'প্রলয়বীণা' দু কপি, 'মন-আগুন' তিন।"

তারপর সারা বিকেল জুড়ে সুরপতি সেদিন শুধু দোকানে দোকানে ঘুরেছেন। "জোয়ারের জল" আছে, দিতে পারেন এক কপি? "ত্রিপূর্ণির ঘাট?" "রাতশেষের খেয়া?" নেই? সুরপতি চৌধুরীর কোন বই নেই? সবাই বলেছে, না। এক দোকানে কে একজন বুঝি নামটা চিনতে পেরে বলেছে, "ওসব বই এখন আর ছাপা হয় না মশাই। চাহিদা নেই। আমরাও রাখি না। নতুন কিছু চান ত বলুন, বের করে দিই,"

এক দোকানে শিক্ষিত, অন্তত দেখে সুরপতির তা-ই মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বসে ছিলেন। "রাতশেষের খেয়া" বইটির নাম শুনে হেসে হাই তুললেন। "ছিল মশাই লাস্ট কপি, শেলফের নীচের তাকে অনেক দিন ধুলোবালি মেখে পড়ে ছিল। মাস ছয়েক আগে একজন প্রবীণ অধ্যাপক খোঁজ করে কিনে নিয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর কোন থীসিস লিখে ডক্টরেট হাতাবার ফিকিরে আছেন কিনা খবর নিয়ে দেখুনগে যান।"

সেখান থেকে সুরপতি গেছেন পিছনের গলিতে। এখানে অনেক প্রকাশক, অনেকেই তাঁর চেনা; একটি দোকানের সাইনবোর্ড দেখেই চিনলেন; তাঁর "জোয়ারের জল"-এর প্রকাশক ত এরাই। একটি টেবিল ঘিরে কয়েকজন বসে। সকলেরই মোটামুটি কম বয়স, অন্তত রাতের আলোতে তাই মনে হল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মার্জিত করে সুরপতি বললেন, "অপূর্ববাবু আছেন?"

যারা বসে ছিল তাদের সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল। একজন বললে, "অপূর্ববাবু ত রিটায়ার করেছেন, বিজনেস এখন দেখছেন ইনি, তাঁর ছেলে, নিশীথবাবু। এঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

আঙুল দিয়ে যাকে দেখান হল, সিগারেট আর চায়ের ধোঁয়ায় তার মুখের আধখানা ঢাকা, তবু অপূর্ববাবুর সঙ্গে তার চেহারার মিল সুরপতি সহজেই খুঁজে পেলেন। তাঁর নিজে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। নমস্কার করে ধপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, অনুরোধ না হতেই। ঘুরে ঘুরে ঘেমেছিলেন, ঘাড়ে গলায় একবার রুমাল বুলিয়ে নিলেন। নিশীথ চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসল ওঁর মুখোমুখি। একটা সিগারেট ধরাল নিজে, একটা বাড়িয়ে দিলে ওঁর দিকে, দেশলাই নেবাতে নেবাতে বলল,

কেয়ো-কার্পিন

ফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল
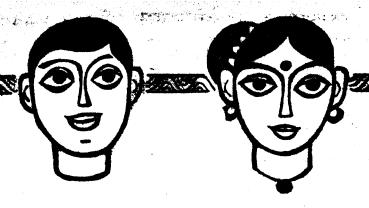
বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের নির্যাস থেকে প্রস্তুত মনোরম গন্ধযুক্ত অনন্যসাধারণ কেশ তৈল "কেয়ো কার্পিন" চুলের গোড়ার পুষ্টি সাধন ও চুলের স্বাভাবিক রং-এর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় "কেরাটো মাইন" জাতীয় পদার্থ সরবরাহ করিয়া অচিরেই চুল পড়া ও অকাল-পক্কতা বন্ধ করে এবং ঘন নূতন চুল উৎপাদন করে।
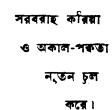
প্রস্তুতকারক

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস প্রাইভেট লিঃ

কেয়ো-কার্পিন বিভাগ

কলিকাতা-১৩ ● বোম্বাই ● দিল্লী ● মাদ্রাজ

"মফস্বলের লাইব্রেরি বুঝি? কত টাকার বই নেবেন?"

আর কথা বাড়ান বা দেরি করা চলে না, সুরপতি মরিয়ার মত গলায় বললেন, "আমি সুরপতি চৌধুরী।"

আশ্চর্য, এই প্রথমবার যেন মনে হল, নামটায় কাজ দিয়েছে। ওদের চোখে চোখে কী কথা হল সুরপতি বুঝলেন না, কিন্তু একজনকে বলতে শুনলেন, "আপনি আগে লিখতেন, না?"

"আজ্ঞে হাঁ। এখান থেকেই আমার দুখানা বই বেরিয়েছিল।" বলতে বলতে সুরপতি সীলিংয়ের দিকে চাইলেন, যেন হিসেব করলেন, "বার আর পনের বছর আগে।" নিশীথের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহ গলায় বললেন, "সে-সব বই এখন আর কেউ পড়ে না, ছাপাও নেই, না?"

"কবে ফুরিয়েছে।" হাল্কা, তাচ্ছিল্য-ভরা গলায় নিশীথকে বলতে শুনলেন, "সেই বাবার আমলেই। সব বোধ হয় বিক্রি হয়নি। কেন, আপনার অ্যাকাউণ্ট ত বাবাই ..."

"হিসেব নিতে আসিনি, বলছিলুম কি বইগুলো যদি আবার ..."

"ছাপতে বলছেন?" অসহায়ের মত মুখভঙ্গি করে নিশীথ একটার পর একটা ধোঁয়ার বলয় রচনা করে গেল। "কিন্তু এখন যে অনেক অসুবিধে। এই দেখুন না দশটা বই প্রেসে পড়ে আছে, চালু বইই বাজারে দিতে পারছি না, এখনকার কারবারে কী যে ঝামেলা ..."

"পরে ছাপবেন?" অকম্পিত, নির্লজ্জ, প্রায় প্রার্থনার সুরে সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠোঁটে সিগারেট, নিশীথের গলা তাই বুঝি কেমন ধরা-ধরা শোনাল, "কবে ছাপব ঠিক কথা দিতে পারছিনে যে। দেখুন না, এঁদের কাছেই অপরাধী হয়ে আছি, এখনকার সেরা দুজন লেখক এখানে বসে আছেন। সর্বেশ মুখুজ্যে, 'মন-আগুন'-এর লেখক। দশ হাজার বই দেড় বছরে কেটে গেছে, লোকে ওঁর নতুন বই চায়। সেটা আমরা নিয়েছি, কিন্তু দপ্তরী আজও বেঁধে এনে দিল না। কী করি বলুন। ইনি সুবীর মিত্র, সিনেমায় হিট বই 'জীবনদোলা' দেখেছেন, তার লেখক। এখন টালিগঞ্জ ছাড়ছে না, ওদিকে বোম্বাই থেকে ডাকছে। যমে-মানুষে টানাটানি লোকে বলে না? এ ঠিক তাই। 'জীবনদোলা'র বাইশ শোর এডিশন ফুরিয়ে গেছে, বাজারে নেই বলে ইনি মুখ ভার করে বসে আছেন।"

অনাসক্ত গলায় সুরপতি বলেছেন, "ও।" চশমার পুরু কাচের আড়ালে ওঁর চোখের পাতা ঘনঘন পড়েছে, ওরা দেখতে পায়নি। চেয়ারটা আরও কাছে নিয়ে এসেছে নিশীথ, আর্তবিনীত গলায় বলেছে, "এই ত অবস্থা। তার চেয়ে আমি বলি কী সুরপতিবাবু, আপনার বই তুলে নিয়ে আপনি অন্য কোন ঘরে দিন। আমরা কবে ছাপতে পারব ঠিক নেই, কেন খামোখা নিজের লোকসান করবেন।"

"লোকসান, লোকসান," মৃদুস্বরে সুরপতি যেন নিজেকে একবার শোনালেন, তারপর মূর্খের মত হঠাৎ জোর গলায় হেসে বললেন, "আমার আর লাভ কতটুকু বেঁচেছে নিশীথবাবু, যে লোকসানকে ভয় পাব।"

কোনমতে শুকনো একটা নমস্কার সেরে সুরপতি পথে নেমে এসেছেন। দু পাশে সেই বইয়ের দোকানের সারি। নতুন নাম, নতুন বই, সংখ্যা কত সুরপতি হিসেব করেও বলতে পারবেন না। পুরো তালিকা একমাত্র তাঁর কাছেই আছে, কালের কাঠের ফলকে সাদা খড়ি দিয়ে নিত্য যিনি নাম লেখেন আর মোছেন।

কিন্তু সেজন্যেই, শুধু সেজন্যেই, সুরপতি পরদিনই হাওড়া ইস্টিশনে গিয়ে টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসেননি। আঘাত পেয়েছিলেন বই কি, কিন্তু কেবল ঘা খেয়েই পালাননি। পালিয়েছিলেন অপ্রত্যাশিত পুরস্কারের ভয়ে। সুমিতার বাসায় পরদিন সকালে যদি দেখা করতে না যেতেন, তবে হয়ত অত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার কথা ভাবতেন না।

নইলে বইপাড়ার অভিজ্ঞতার পর মনের সঙ্গে তিনি ত একটা রফা করে নিয়েই ছিলেন। সেদিন মেসে ফেরবার পথে রিকশায় বসে সুরপতি স্বগত বলেছিলেন, "এরা বড় তাড়াতাড়ি ভোলে। আমি আর কোথাও নেই। মুছে গেছি।" "মুছে গেছি" কথাটাই দুবার উচ্চারণ করেছিলেন, মন্ত্রের মত। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে খেদের খাদটুকু উপে গিয়ে মনের নিকষে নতুন ভাবনার সোনার জলের দাগ পড়েছিল। "মুছে গেছি, ক্ষতি নেই", সুরপতি আবার আহত অন্তরকে বলেছেন, "মুছে গেলেই কি সব মিথ্যে হয়। পাহাড় নিত্য, চিরায়ু; মেঘে মেঘে আকাশে যে ছবি-লেখালেখি হয়, তা ক্ষণায়ু: কিন্তু দুটোই কি সুন্দর অতএব সত্য নয়! ক্ষণকালেও যা সুন্দর, সত্য, তাও শিল্প, যেমন দিনায়ু কুসুম।"

আর এই প্রবোধ মনে স্নিগ্ধ অবলেপের কাজ করেছে। মেসে ফিরে চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন নিঃশব্দে। খাবার ঢাকা ছিল, ছোঁননি। আলো জ্বালেননি। বালিশে মুখ রেখে ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন চোখ জড়িয়ে এসেছে। অনেক দিন আগে দেখা একটি গ্রামের ছেলেকে মনে পড়েছে। মেঝেতে মাদুর ছড়ান, বুকের নীচে বালিশ, সম্মুখে লণ্ঠন, কাঁপাকাঁপা শিখা। ছেলেটি কী লিখছে। পাঠশালার অঙ্ক অবশ্যই নয়, তাহলে আরেকটি মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াতেই ছেলেটি খাতাটা লুকোতে চাইত না।

"কী লিখছিলি রে?"

"কিছু না, ছড়া।"

"আমাকে পড়ে শোনাবি?"

"পালা।"

"তবে মাসিমাকে বলে দিই?"

বলেনি, মেয়েটি একটু পরে নিজে থেকেই ফিরে এসেছে। "আমাকে নিয়ে ছড়া লিখবি?"

"তোকে নিয়ে ছড়া হয় না। ভাগ।"

এবার কাঁদোকাঁদো হয়েছে মেয়েটির মুখ, পিছন থেকে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছে।

"লেখো না একটা: ইস, কী অহংকার। আমার নামে ছড়া বাঁধ। তোমার লেখায় আমি থাকব না?"

তোমার লেখায় আমি থাকব না? জীবনে বারবার নানাজনের মুখে এই আকুতির প্রতিধ্বনি শুনতে হয়েছে। সেই গ্রামের ছেলেটি বড় হয়েছে, শহরে এসেছে। অঙ্কের খাতায় লুকনো ছড়া নামকরা পত্রিকায় কবিতা, কাহিনীর পরিণত রূপ নিয়েছে। কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত ছলে কতজন তাকে জীবনের কাহিনী শুনিয়েছে। লিখবে তুমি? লেখ না। এমনি ত মরে আছি, লেখার মধ্যে তবু যদি বেঁচে থাকি। সামান্য মানুষের অমৃতসাধ। কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা। সে-প্রার্থনা যথাসাধ্য পূরণ করেছে যুবক সুরপতি। একদিন গ্রামের সহচরীকে নিয়ে যে ছড়া বেঁধেছিল, পরবর্তিকালে সে পরিচিতমাত্রের ভিতরে কাহিনীর কুশীলব খুঁজেছে। যে সর্বত্যাগী বিপ্লবী সতীশদা একদিন তার হাতে তিনটি রিভলভার গচ্ছিত রেখে জেলে গিয়েছিলেন, তাকে সুরপতি চাপাগলায়-উচ্চার্য পাড়ায় নীলিমার ঘরে শেষ নিশ্বাস ফেলতে দেখেছে। সেদিন কিন্তু মনে তাঁর কোন কামনা ছিল না এমন কি, দেশকে স্বাধীন করে যেতে পারলেন না বলে আফশোসও না। শুধু সুরপতির হাত ধরে বলেছিলেন, "আমাদের কথা তুই লিখে রাখিস ভাই। বিফলতা আর সাফল্য সাহস আর দুর্বলতা দুইই দেখাস।"

সুরপতি সে-কথা রেখেছিলেন। সেই বৃহৎ ট্র্যাজেডির কথা লেখা আছে তাঁর পুরনো আমলের বহুপ্রশংসিত একটি দীর্ঘ গল্পে। যা জানেন, যা শুনেছেন, যা দেখেছেন, তা সবই ছিল। এমন কি, শেষ অধ্যায়ের ফকিরচাঁদ লেনের নীলিমাকেও বাদ দেননি।

আজ পীতাম্বর সাহা লেনের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকলকেই মনে পড়ছে, যাদের ব্যর্থসার্থক জীবনের কথা সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন সুরপতি। কাশী মিত্তিরের ঘাটের সেই সাধু; ওর হাতে গাঁজার কলকে তুলে দিয়ে যে বলেছে "লেখ্ বাবা, লেখ্। আমাকে যে শেষ করেছে সেই শয়তানীর নামে ঢিঢি পড়িয়ে দে বাবা।" সব ছেড়ে নেংটিমাত্র যে সম্বল করেছে, গল্পে ঠাঁই পাবার লোভ তারও কিন্তু কম ছিল না। রোজ আসত লুকিয়ে, গাঁজায় দম দিত আর বলত, "জ্বলে মলাম বাবা, পুড়ে মলাম।"

"কেন, তুমি শান্তি পাওনি? ভগবানকে পাওনি?"

হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে সাধু বলেছে, "কিছু পাইনি বাবা, কিছু না। শয়তানীটাকে ভুলতে পারলে ত ভগবানকে পাব? তুই ওর সব কথা ফাঁস করে দে রে বাবা, ফাঁস করে দে।"

ময়লাটানা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে সাধু যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন কিন্তু সে সুরপতির কাছে এসেছিল। ঘামেভেজা বিশ্রী দাড়ি-ঢাকা মুখ সুরপতির কানের কাছে নামিয়ে বলেছিল, "আমি শান্তি পেয়েছি। তুই আর ওর নামে কিছু লিখিসনি বাবা।"

"লিখব না?"

"না।" সাধু ফিসফিস করে বলেছে, "তাকে আজ আমি চাঁদপাল ঘাটে গেরোনের

যোগে ভিক্ষে করতে দেখেছি। পাপিষ্ঠার কুষ্ঠ হয়েছে বাবা।"

আরও কত আছে। সকলের কথা আজ রাত পুইয়ে গেলেও ভাবা শেষ হবে না। সুধাদি। চারু। এই মেসের সদানন্দ, যে দেশবিদেশ ভ্রমণের কাহিনী সকলকে ডেকে শোনাত, শুধু একবার ঘোর অসুখের সময় সুরপতিকে চুপে চুপে বলেছিল, "আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন। বলুন, লিখবেন? সারা জীবন খালি গাইডবুক আর রেলের টাইমটেবিল মুখস্ত করে লোককে ধাপ্পা দিলাম, আসলে কিন্তু ওতোরপাড়া ছাড়িয়ে যাইনি। আমাদের মত সামান্য কেরানী যারা, তাদের অনেকেই যায় না, যেতে পায় না। এতদিন যত ভ্রমণকাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি, সব ভুয়ো, লিখে দেবেন এ-কথা, তবে সংগে সংগে এটাও লিখবেন যে, আমার নানা দেশ দেখার সাধটুকু কিন্তু খাঁটি ছিল।"

আরও যে কত লোক তাদের জীবনের গোপনতম কথাটি তাকে নিবেদন করেছে। দু দিনের জীবন নিয়ে চিরদিনের কাহিনী রচনা করুক, সুরপতির কাছে তাদের প্রার্থনা মোটে এইটুকু।

গায়ে টিকটিকি পড়েনি, কড়িকাঠ থেকে উইয়ের বাসাও পড়েনি ঝুরঝুর করে তবু সুরপতি শিউরে উঠলেন। হৃৎপিণ্ড বারবার কম্পিত প্রসারিত হয়ে কণ্ঠতালু অবধি শুকিয়ে ফেলেছে। বুকে চেপে ধরে বালিশটাকে কানে কানে বললেন, "ভুল, সব ভুল। কত অবুঝ ওরা, সাধারণ মানুষ। লেখকের কাছে অমরত্ব চায়, কিন্তু লেখকের নিজের আয়ু কদিনের, কেউ ভাবে না ত। মনে রাখে না লেখকও তুচ্ছ মানুষ, তারও মৃত্যু হতে পারে, হয়। যেমন আমি মরেছি।"

"আমি মরেছি।" সুরপতি উচ্চারণ করেছেন ধীরে ধীরে। বালিশের যেখানটায় মুখ রেখেছিলেন সেখানটা সিক্ত হয়ে গেছে, নিঃশব্দে সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন। এই টপটপ নোনতা জলের চিহ্ন কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন টের না পায়।

তবু যদি পরদিন সকালে জামাটা ছাড়তে গিয়ে খুচরো পয়সা ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ত। কিংবা, পয়সা পড়েছিল ক্ষতি নেই, চিরকুটটা যদি পকেটেই থেকে যেত। আর সেই চিরকুটে যদি সুমিতাদের বাসার ঠিকানা লেখা না থাকত। এতগুলো যদির বাধা যখন ঘুচলই, তখন সুরপতি যে ফের জামাটা ফিরিয়ে পরবেন, পথে রিকশ নেবেন একটা এবং শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেন খুঁজে বের করে তার ষোল বাই দুই বাই এফ নম্বরের বাড়ির দরজায় টোকা দেবেন, একে প্রায় নিয়তি বলা চলে।

নিয়তি বই কি। নইলে সেদিনই হয়ত সুরপতিকে কলকাতা ছাড়তে হত না।

হাওড়া ইস্টিশনের এলাকা ছাড়বার পর প্রথম শ্রেণীর একটা গাড়ির কামরায় আধ-শোয়া সুরপতি মনে মনে সেদিন সকাল-বেলাকার ঘটনা আবার রচনা করে নিজেকে শুনিয়েছিলেন।......দুয়েকটি রুপালী চুল সামান্য যা একটু বিভ্রম ঘটিয়ে থাকবে, নইলে টোকা দিতেই যে দরজা খুলে দিয়েছিল, হলুদমাখা আঁচল আর কনুয়ের কাটা দাগ থেকেই তাকে তোমার চেনার কথা। "সুমিতা?" কতকটা ভয়ে কতকটা ভরসায় জিজ্ঞাসা করেছিলে। সে জবাব দেয়নি, একটু পরে একটি ছোট মেয়ে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। বসবার ঘর নয়, এদিক ওদিক তাকালেই বোঝা যায় এটাও শোবার, তাড়াতাড়ি করে এটাকে একটা বসবার ঘরের চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ কোথা থেকে একটা টেবিল টেনে এনে রাখা হয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানে, একখানা চেয়ারও আছে, কিন্তু তুলো-ঝুরঝুরে তোশকটাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। ছেঁড়া মাদুরটায় লজ্জা নিবারণ করে, সেটাও ঘরের এক কোণে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। "এই খুকি শোনো।" মেয়েটিকে কাছে ডেকে তুমি আলাপ করতে চেয়েছ। একেবারে ছোট মেয়ে হলে পালিয়ে যেত, কিংবা কিশোরী হলেও; কিন্তু দশ এগার বছরের এই মেয়েটির সংকোচ স্বভাবত কিছু কম, সে একবার ডাকতেই কাছে এসেছে। যথারীতি তার নাম, পড়াশুনোর খবর জেনে নেবার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছ, "বলত আমি কে।" মেয়েটি একবারও না ভেবে বলেছে, "মামা।" অবাক হয়েছ বই কি, মেয়েটির সপ্রতিভতায়, না, সম্পর্কের আকস্মিকতায়, বলা যায় না। "মামা? কে বলেছে?"

"বারে, মা বলে দিল যে। তা ছাড়া তুমি ত, আপনি ত লেখেন।"

"লিখি? (তুমি যে লেখ একথা আর একজনের মুখে কত দিন পরে যে শুনলে!) "লিখি?" জিজ্ঞাসা করলে আবার। "কে বলেছে।"

"আপনার বই আছে যে আমাদের আলমারিতে। মা মাঝে মাঝে খুলে দেখে, মুছে রাখে। একটাতে মার নাম লেখা, আপনি লিখে দিয়েছেন, মা বলেছে। আর দুটোতে কিন্তু কিছু লেখা নেই। এবার আপনি নাম লিখে দিয়ে যাবেন ত?"

"যাব।" অভিভূত গলায় শুধু একটি কথা বলতে পেরেছ।

আর ঠিক তখনই সুমিতা এসেছে। হলুদমাখা শাড়িটা বদলাতে পারেনি, কনুয়ের সেই কাটা দাগটা লুকোতেও না, তবু ওরই মধ্যে যা একটু ফিটফাট। হয়ত তোমার জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে কলতলায় গিয়ে ভিজে গামছায় মুখটাই শুধু মুছে আসতে পেরেছে। বয়স হয়েছে বোঝা যায়, তবু শ্রীটুকু পুরোপুরি ঘোচেনি, বিশেষত হাসিটুকু সেই পনের বছর আগেকার।

"অনেক দিন পরে এলে।"

"হ্যাঁ, অনেক দিন।" আর কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে ওর কথাটাই তুমি ফিরিয়ে দিলে। আর আঁচলে হাত ঘষে ঘষে ও আঙুলগুলো পর্যন্ত হলদে করে ফেলল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তুমি নিজেই আবার বলেছ, "কলকাতায় থাকি না ত, তাই সব সময় খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। তোমরা ভাল আছ?" নাম ভুলে গিয়েছিলে বলে সুমিতার স্বামীর কুশল আলাদা করে জিজ্ঞাসা করা হল না।

"ভাল আছি।, তুমি যে ভাল আছ দেখতেই পাচ্ছি।, হবে না কেন," বিষন্ন একটু হাসি জুড়ে দিয়ে সুমিতা বলেছিল, "তোমার এখন অনেক টাকা, জোড়াজোড়া নাম।"

গরম লাগছিল, তুমি একবার হুকহীন সীলিঙের দিকে অসহায় চোখে তাকালে, তার পর রুমাল বার করলে পকেট থেকে। সুমিতা প্রায় সংগে সংগে একটা হাতপাখা নিয়ে এল, বোধহয় রান্নাঘর থেকে, কেননা তার ডাঁটে কয়লার গুঁড়ো লেগে ছিল বলে তুমি ধরতে পারলে না। পারলেও অবশ্য সুমিতা পাখাটা তোমার হাতে দিত না, নিজেই হাওয়া করত।

"তোমার আরও নিশ্চয় অনেক বই বেরিয়েছে, একখানাও ত দাও না। একটা তুমি সেই ষোল বছর আগে দিয়েছিলে, তোমার প্রথম বই, আর দুটো আমি কিনেছি।"

"কিনেছ!" উৎফুল্ল হয়েও আহত হবার ভান করেছ।

"কিনেছি। দেখবে? এস না এদিকে। এটা আমার বিয়ের পাওয়া আলমারি, কাচ ভেঙেছে, রঙ চটে গেছে, তবু এইটুকুই যা চিহ্ন আছে। অনেক বই পেয়েছিলাম ত, সব গেছে, লোকে পড়তে নিয়ে ফেরৎ দেয়নি, শুধু এই শরৎ-গ্রন্থাবলীটা কী ভাগ্যে টিঁকে আছে। এই দেখ।"

ওর দৃষ্টির পিছু পিছু গিয়ে তোমার চোখ দেখেছে, ভাঙা আলমারির কাপড় পুতুলের স্তূপের ধারে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাশে সযত্নে রাখা তোমার তিনখানি বই।

অপরাধী গলায় সুমিতা বলেছে, "আর কিনতে পারিনি। সংসার বড় হয়েছে, নানা অসুখ-বিসুখ। কী করব, ছেলেমেয়েদের তোমার এই তিনখানা বইই দেখাই, তোমার

মত হতে বলি।" একটু থেমে সুমিতা ফের জিজ্ঞাসা করেছে, "তোমার আর কী বই বেরিয়েছে বল ত। সিনেমা হয়েছে?"

কাচের আলমারিতে সাজান তোমার বই দেখার পরে কী নেশাই চোখে লেগেছিল, অনায়াসে তাই বলতে পারলে, "হয়নি, এবার হবে। সেই কনট্রাক্ট করতেই ত কলকাতায় আসা।"

"আমরা পাশ পাব ত।" হঠাৎ কী করে মধ্যবয়সী মেয়েটি একেবারে কিশোরী হয়ে গেছে, আবদারের সুরে বলেছে, "আমরা সবাই যেন পাশ পাই। আর, তোমার নতুন বইগুলো দেবে না?"

"দেব।" সম্মোহিতের মত বলেছ, "দেব। নতুন এডিসন সবে ছাপা হয়ে এসেছে। কাল দিয়ে যাব।"

সুমিতার মুখেচোখে ছেলেমানুষি খুশি। "কাল আবার আসবে তুমি? তা হলে কী ভাল যে হয়। কাল রবিবার, ওঁর সঙ্গেও দেখা হবে। তুমি এখন অনেক বড়, বলতে ভরসা পাইনে, এসে ওই সঙ্গে দুটি ঝোলভাত—"

অনেকক্ষণ ধরেই একটু একটু করে থামছিলে, এর পরে আর বসে থাকতে পারনি, হঠাৎ, এক রকম বিনা নোটিশে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছ, "সে হবে এখন, সে হবে। এখন চলি।"

সুমিতা দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে।

"আরও একটা কথা আছে।"

সবে চৌকাঠের ও-দিকে পা দিয়েছিলে, হঠাৎ থেমে গেছ। ঘোমটা কখন খসে গেছে, আরও একটু কাছে এসেছে সুমিতা। "আরও একটা কথা আছে। তুমি বোধহয় শুনে হাসবে, ভাববে ছেলেমানুষি। আমার মনে একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে কিন্তু। এত-জনকে নিয়ে এত কথা লিখলে, আমাদের কথা কোনটাতে আজও লেখনি।"

ভাঙা সুইচে যেন হাত ঠেকেছে এমন চমকে উঠেছ। সে-চমক কাটিয়ে উঠতে অবশ্য সময় নাওনি। কণ্ঠস্বরে একটু বা পরিহাসের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছ, "সব ক্ষোভ কি শেষে তোমার ছোট্ট এই একটুখানি দুঃখে রূপ নিয়েছে সুমিতা। কিন্তু কী লিখব বল ত?"

কিছু লেপটে-যাওয়া সিঁদুর, কিছু লজ্জায়, সুমিতার মুখখানা লালচে লাগছে। আড়ষ্ট স্বরে বলেছে, "কেন, আমাদের কথা। তোমার সাহিত্যে এই হলুদমাখা আঁচল আর কনুইয়ের কাটা দাগটার কথা লেখা রইলই বা।"

এবার আর পরিহাস নয়, কঠিন গলায় বলেছ, "ভয় করবে না?"

"কিসের ভয়।"

"কেন, কলঙ্কের।"

অনেকক্ষণ পরে সুমিতার মুখে চকিত বিদ্যুতের মত এক ঝিলিক হাসি দেখা গেছে। "সে-ভয় থাকলে তোমার-হাতে-আমার-নাম-লেখা বই কি আলমারিতে সবাইকে দেখিয়ে রাখি।"

অপলক সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারনি। মাথা নিচু করে চলে আসতে যাবে, জামার হাতায় আলগোছ টান লেগে আবার ফিরে তাকিয়েছ। দেখেছ সেই দৃষ্টি আর নেই সুমিতার চোখে, খর রৌদ্র ছায়াকোমল হয়েছে। গাঢ়, অশ্রুতপ্রায় গলায় সুমিতাকে বলতে শুনেছ, "আর শোন, যদি কিছু লেখ তবে তাতে আমার ডাকনামটাই দিও,—ঝিনুক। বাপের বাড়িতে ও-নাম ছিল। ও-নামে এখানে কেউ ডাকে না।"

কামরার বাইরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিপরীত দিকে দ্রুতসরন্ত গাছপালা, তারের খুঁটির দিকে চোখ রেখে সুরপতি আবার আপনাকে বললেন, "এর পরে এক বেলাও কলকাতায় থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বইয়ের বাজারে যা-লেবে-তা-দু-টাকার নিলামে তোমার দেউলে হবার খবর কী এক আশ্চর্য কারণে শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেনের একটি অধিবাসিনীর কাছে অজানা থেকে গেছে। সেখানে আলমারিতে শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাশেই তুমি। কিন্তু আর দুদিন থাকলে কি কিছু জানাজানি হত না। পর-দিন সকালে সুমিতার বাসায় খালি হাতেই ত যেতে হত। গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দিতে। প্রাণ গেলেও কি তাকে বলতে পারতে লেখক সুরপতি মরে গেছে, তার বই আর কোনদিন ছাপা হবে না? হয়ত মুগ্ধ একটি মেয়ের নির্জলা স্তুতি শুনতে শুনতে তোমার নিজের বিবেকই মাথা তুলে দাঁড়াত, দুর্বল কোন মুহূর্তে স্বীকার করে বসতে, নতুন বই নয়, ছায়াছবির চুক্তি নয়, শুধু রেলের ঠিকেদারির তদ্বির করতেই দূর প্রবাস থেকে এতদূরে এসেছ। কদর্য সত্যের হাত থেকে সুন্দর একটি মিথ্যাকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছ সুরপতি, ভালই করেছ।"

আরও একটা কথা আছে

পরিকল্পনা ও পশ্চিমবাংলা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

অল্প কয়েকদিন আগেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেক পার্থক্য আছে। তা নিয়ে গত এক বছর ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে, সুতরাং সেকথা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে, প্রথম পরিকল্পনার মোদ্দা কথাটা হল কৃষির উন্নতি, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোদ্দা কথাটা হল, কৃষির দিকে অবহেলা না করেও শিল্পের দিকে আরও ঝোঁক দেওয়া। যুক্তিটা হল এই যে, কৃষির বনিয়াদ আমরা মোটামুটি পাকা করতে পেরেছি, এখন সেই বনিয়াদের উপর শিল্পের ইমারত স্থাপনা করা।

এই নিয়ে দেশে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। এই ইমারত গড়বার জন্য মালমশলা কী কী দরকার, সে-মালমশলা আমাদের হাতে আছে কিনা, কিভাবে সে-ইমারত গড়লে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় হতে পারে, এ-সব কথা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটি কথা এবার খুব স্পষ্টভাবে উঠেছিল। সে-কথাটি হল এই যে, পরিকল্পনায় যদি কেবল উৎপাদনই বাড়ে অথচ লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য না বাড়ে তাহলে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। সুতরাং পরিকল্পনায় আর যাই করা হক না কেন, লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতেই হবে।

কথাটা শোনায় খুব নিরীহ, কিন্তু এর মধ্যে বহু কুটিল তর্ক ফণা উদ্যত করে আছে। সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে কী বুঝি? বিদেশ থেকে সস্তায় ভোগ্যবস্তু আমদানি করতে থাকলে ত বহু লোকেরই এখন খুব সুবিধে হয়, চড়া দাম দিয়ে স্বদেশী জিনিসপত্র কিনতে হয় না। কিন্তু যদি একাধারে আমাদের ভোগ্যবস্তু ও মূলবস্তু (ক্যাপিটাল গুড্‌স) উৎপাদন করবার মত যথেষ্ট পুঁজি হাতে না থাকে তাহলে আমরা কী করব? আমাদের যা পুঁজি, তা কি কেবল চলতি ভোগ্যবস্তু আমদানি করতেই খরচ করে দেব, দেশে ভারী ও বৃহৎ শিল্প কোনকালেই গড়ে উঠবে না? অর্থাৎ তা হলে আমরা চিরকালই কৃষিনির্ভর গরিব দেশ হয়ে থাকব, আর ল্যাংকাশিয়রের লাট্টু মার্কা ধুতির কোঁচা দুলিয়ে বেড়াতে থাকব? তাহলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে কী করে? ইংরেজ ত আমাদের এই দুরবস্থাতেই রাখতে চেয়েছিল, সে চেয়েছিল আমরা চিরকালই এমনই থাকি এবং চিরকালই বিদেশী পণ্য আমদানি করতে থাকি। এতে যে আমাদের অবস্থার কোনও উন্নতি নেই, সে-কথা, আজকের দিনে, কাউকে বোঝাবার দরকার করে না।

তার্কিকেরা বলবেন, "বেশ ত, বিদেশ থেকে ভোগ্যদ্রব্য নাই বা আমদানি করলে, এই খানেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন কর না কেন? সে-ও ত একটা পদ্ধতি আছে। তা ছাড়া আর্থিক বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই আগে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প গড়ে উঠেছে, তারপর তা হতে ক্রমশ মৌলিক বস্তুর শিল্প, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্প, গড়ে উঠেছে। বিবর্তনের ধারাই ত এই। তবে এদেশে সেটাকে উল্টে দেবার চেষ্টা হচ্ছে কেন?"

এ-কথা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু এ-দেশের পক্ষে খাটে না। বস্তুত কোনও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষেই খাটে না। যে-সময়ে পূর্বোল্লিখিত বিকাশের ধারা দেখা গিয়েছিল তখন জগতে শিল্পপ্রধান দেশ ছিল কম। যে দু-একটি দেশ ছিল তারা ছিল সারা দুনিয়ার মালিক। কি রাষ্ট্রিক, কি আর্থিক ব্যবস্থায়। কোথায়ও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কাজেই সারা দুনিয়ার সম্পদ গায়ের জোরে আহরণ করে তারা প্রথমে নিজের দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছে, তারপর গড়ে তুলেছে বৃহৎ শিল্প। তখন সেই শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চালিয়েছে জগৎময়। কিন্তু এখন সে-অবস্থা নেই। বিশেষত, যে-সব অনগ্রসর দেশ দ্রুত উন্নতিবিধান করতে চাচ্ছে তাদের পক্ষে এত ধীরে সুস্থে চলা সম্ভব নয়। তাদের দ্রুত অগ্রসর হতেই হবে এবং মোটামুটি নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হবে। বিদেশের সাহায্যের হাঙ্গামা অনেক, বণিকের মানদণ্ড রাজার রাজদণ্ড হয়ে উঠতে বেশী দেরি হয় না।

বস্তুত, আজকাল যে-সব অনগ্রসর দেশ অগ্রসর হয়ে চলেছে তাদের ইতিহাস এই নতুন ধারারই সাক্ষী। প্রসঙ্গত, রুশিয়ার উদাহরণ ধরা যেতে পারে। তারা বাইরের সাহায্য বিশেষ পায়নি, সবটাই প্রায় নিজেদের উপর নির্ভর করেছিল। সেইজন্য তারা বহু কষ্ট স্বীকার করেও নিজেদের বহু ভোগ্যপণ্য থেকে বঞ্চিত করেও দেশের বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলেছিল। বৃহৎ শিল্প না গড়ে উঠলে কোনও দেশেরই শিল্পের ভিত পাকা হতে পারে না, তাই তাদের এই প্রাণান্তকর চেষ্টা। এর অতি মনোহারী বর্ণনা ওয়েবদের (S. & B. Webb: Soviet Communism—A New Civilization?) বইয়ে আছে। স্টালিন পার্টির কাছে যে-সব হিসেব দাখিল করেছেন, তার মধ্যেও এ-কথা সুপরিস্ফুট। দু-একটা নমুনা দিচ্ছি। প্রথম পরিকল্পনা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে স্টালিন বলেছিলেন,—

Of course, out of the 1,500,000,000 rubles in foreign currency that we spent on purchasing equipment for our heavy industries we could have set apart a half for the purpose of importing raw cotton, hides, wool, rubber etc. Then we could not have a tractor industry or an automobile industry; we would not have anything like a big iron and steel industry; we would not have metal for the manufacture of machinery etc.

অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট দিতে গিয়ে স্টালিন বললেন, ১৯৩৩ সনকে ১০০ ধরলে দেখা যায় ১৯৩৮ সনে শিল্পের উৎপাদন হয়েছে ২৩৮·৮— ডবলেরও বেশী, প্রায় আড়াই গুণ। অথচ কৃষির বেলায় দেখা যায়, ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯৩৮ সনে কৃষির এলাকা মাত্র ১৩০·৪, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৩০·৪ ভাগ বেশী। ১৯৩৩ সনের সঙ্গে তুলনা করলে তা নিশ্চয়ই আরও অনেক কম। এই ধারাই এখনও অব্যাহত আছে। উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে ম্যালেনকভ যে রিপোর্ট

পেশ করেন তার পরিসংখ্যানও এই ধারারই সমর্থন করে।

মহাচীনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলেও সেই একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। চীনের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে চৌ-এন লাই বলেন,—

The guiding principle of the Plan, as is generally known, is to concentrate our main efforts on the development of heavy industry as a foundation for the industrialisation of the country and modernization of national defence (১)

সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন,

Three factors in the growth of industry deserve special mention. The first is the rapid increase, in terms of value, in the proportion of modern industrial output to total industrial and agricultural output.

বস্তুত প্রত্যেক অনগ্রসর দেশেরই এই কথা। দু'দিক সামলাবার ক্ষমতা না থাকলে একদিকে হাত টানতেই হয়। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের স্বার্থে সেখানে বর্তমানকে অধোকৃত করতেই হবে।

অন্যান্য অনেক দেশ যখন কঠিন নির্মমতার সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তখন ভারতবর্ষ তারই মধ্যে একটু নূতনত্ব করতে চেয়েছিল। সে ডিক্টেটরী দেশ নয়, শস্ত্রপাণি হয়ে কোন পরিকল্পনা চালাবার অধিকার সে গ্রহণ করেনি, কাজেই নির্মমভাবে একটা দিক উপেক্ষা করলে তার চলে না। সেইজন্য সে বৃহৎ শিল্পের দিকে ঝোঁক দিলেও অন্যদিক একেবারে উপেক্ষা করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভাবতে বাধ্য হয়েছে, এই পরিবেশেও অর্থাৎ এই মূল লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট না হয়েও কী করে বর্তমানেও জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা যায়। সেইজন্য প্ল্যানে বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে। পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা হয়েছে,—

These objectives have to be pursued in a balanced way, for excessive emphasis on any one of them may damage the economy and delay the realisation of the very objective which is being stressed. Low or static standards of living, underemployment and unemployment, and to a certain extent even the gap between the average incomes and the highest incomes are all manifestations of the basic underdevelopment which characterises an economy depending mainly on agriculture. Rapid industrialisation and diversification of the economy is thus the core of developing basic industries....Investment in basic industries creates demands for consumer goods, but it does not enlarge the supply of consumer goods in the short run.. A balanced pattern of industrialisation, therefore, requires a well-organised effort to utilise labour for increasing the supplies of much-needed consumer goods in a manner which economises the use of capital. (*Plan*, p. 25).

এই কথা শুধু যে জনসাধারণের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখাবার জন্যই প্রয়োজন তা নয়। এই কথা ভাবতেই হবে, কারণ তার পিছনে দুটি বড় অর্থনৈতিক কারণ আছে, যাদের কথা না ভাবলে পরিকল্পনার সাফল্যই ব্যাহত হবে। প্রথম কথাটির ইঙ্গিত উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্যেই আছে। দেশ বৃহৎ শিল্পের দিকে অগ্রসর হলে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বাড়ে, কিন্তু ভোগ্যবস্তুর সে-চাহিদা বৃহৎশিল্প মেটাতে পারে না। সুতরাং আমদানির চেয়ে চাহিদা অনেক বেশী হলে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য, যদি না দেশময় প্রত্যেকটি বিষয়ে খুব কড়া রেশনিং হয়। আর এই মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বৃহৎ শিল্পের ক্ষতি না করে অর্থাৎ তার জন্য সঞ্চিত পুঁজিতে হাত না দিয়ে যদি ভোগ্যবস্তুর যথেষ্ট উৎপাদন হয় তাহলে এই সমস্যার অত্যন্ত চমৎকার সমাধান হয়। বলা বাহুল্য, এর সমাধানের উপায়, সেইজন্য, হল কুটিরশিল্প।

কুটিরশিল্পের দিকে নজর দেবার আরও একটা প্রকাণ্ড অর্থনৈতিক কারণ আছে। একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে উৎপাদন যতই বেড়ে থাক তার চেয়ে ভয়াবহভাবে বেড়েছে বেকার-সমস্যা। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ পশ্চিমবাংলা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কয়েক বছর আগে নিজেই বাজেট-বক্তৃতায় এই সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় বেকার-সমস্যা শুধু যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তাই নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও চাষী সমাজেও তা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং একদিকে উৎপাদন বাড়ল, অথচ অন্যদিকে দেশের একটা খুব বড় জনসংখ্যা জীবিকার অভাবে হাহাকার করতে লাগল, এ হল ধনতান্ত্রিক সংকটের চরমতম লক্ষণ। সেইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জীবিকাবৃদ্ধির কথা খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে-পরিকল্পনা পরিকল্পনাই নয়, অন্তত সমাজতান্ত্রিক এবং কল্যাণমূলক পরিকল্পনাই নয়, যদি না তাতে জীবিকার প্রসার ঘটে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, অন্যান্য উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে জীবিকার প্রসার ঘটাতে গেলে একমাত্র উপায় হল কুটিরশিল্পের প্রসার। কুটিরশিল্পে মূলধন লাগে কম, অথচ লোক লাগে তার তুলনায় বেশী। অর্থাৎ অনেকের জীবিকা সংস্থান হয়। তাতে বড় জিনিস উৎপাদন করা যায় না বটে, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্য খুব সহজেই উৎপাদন করা যায়। সেই ভোগ্যদ্রব্য দ্বারা মূল্যবৃদ্ধিও রোধ করা যায়, অন্যদিকের পুঁজিও ভাঙতে হয় না। একাধারে সর্ববিধ সমাধান। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্ল্যান-ফ্রেমের সময় এইসব কথাই বলেছিলেন। তাঁর কথা যদি সর্বত্র গৃহীত হত, তাহলে এদিকে একটা সুষ্ঠু এবং অভিনব সমাধান হতে পারত। কিন্তু পরিকল্পনায় তাঁর কথা কিছু কিছু গৃহীত হলেও অনেক আসল কথাই বাদ পড়ে গিয়েছে। পরিকল্পনার গোড়ার বছরেই তো আমরা মুদ্রাস্ফীতির দুঃস্বপ্নে আতঙ্কিত।

॥ ২ ॥

এই সব কথা সারা ভারতবর্ষের পক্ষেই সত্য, কিন্তু পশ্চিমবাংলার পক্ষে আরও সত্য। কেননা, পশ্চিমবাংলার মত সমস্যাজর্জর রাজ্য ভারতবর্ষে বোধ হয় একটিও নেই।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে দেশের লোকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে

নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

আলোকচিত্রী শ্রীভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পাড়
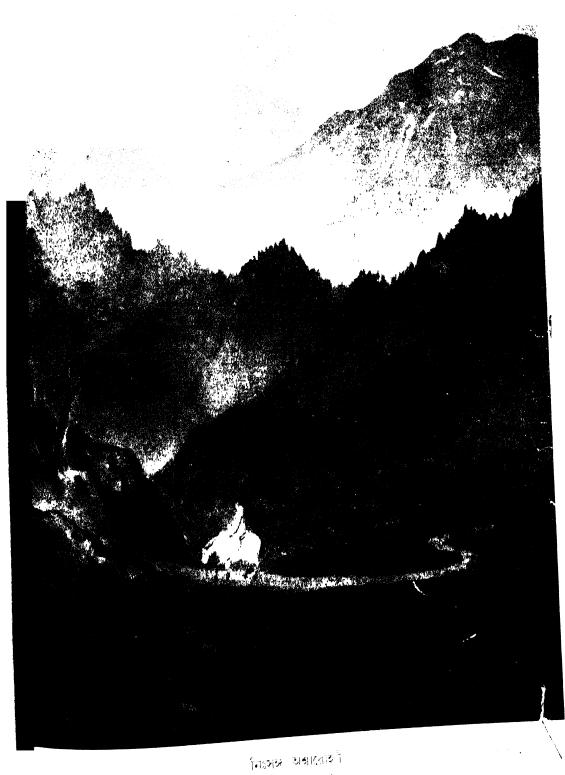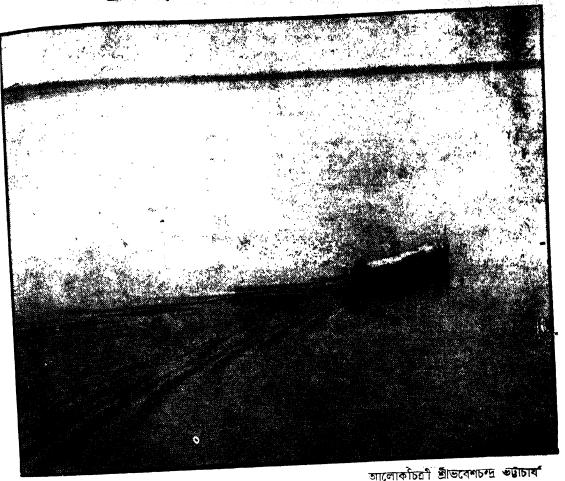
ালব্রুক সাহেব লিখেছেন, সে-যুগের রা নিছক চাষের উপর নির্ভর করে থাকত, দের অবস্থা ভাল ছিল না। যারা কৃষির ংগ আর একটা কিছু করত—যেমন াপালন—তাদের কোনরকমে চলে যেত। ছাড়া কার্পাসের চাষ ছিল খুব বিস্তৃত। াশী হতে শুরু করে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ার্পাসের চাষ কোলব্রুক দেখেছিলেন। ুতরাং দেখা যাচ্ছে সেই অতীতেও কেবল াষের উপর নির্ভর করে থাকলে সচ্ছলতা াসত না, তার সঙ্গে আরও কিছু করা রকার হত। অথচ, দুঃখের কথা, ক্রমে ্রমে যখন বাংলার সমস্যা বাড়তে লাগল খনই অপর কিছু করার উপায় ক্রমে ক্রমে ্দ হয়ে যেতে লাগল। নানা কারণে ুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। ওধারে র্নওয়ালিসী ব্যবস্থায় জমির টান াড়ল খুব বেশী। এইভাবে আমাদের অর্থনৈতিক ধ্বংসের গোড়াপত্তন হল।

এই ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস, তার পুনরাবৃত্তি করা এই পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু এই দেড়শ বছর ধরে যে বিবর্তন ঘটেছে তার মূল সূত্রটি একই থেকে গিয়েছে। বরং ক্রমে ক্রমে এই সংকট তীব্রতর ও গভীরতরই হয়ে এসেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে লোকসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, কাজেই সে-সময় কিছুদিন জীবিকার অভাব ঘটেনি। কিন্তু তার পর যখন লোকসংখ্যা আবার বেড়ে উঠল তখনই সংকট দেখা দিতে শুরু করল। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, এমন কি ১৮৭০ সন নাগাতও বাঁকুড়া থেকে আসামের চা-বাগানে কুলি চালান শুরু হয়েছিল। যাই হক, গত শতকের শেষ পাদ এ-দেশে বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা গড়ে ওঠার যুগ। তারই যে ছিটেফোঁটা অংশ বাঙালীর ভাগে পড়েছিল (যদিচ এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মালিক ছিলেন অভারতীয় এবং শ্রমিক অবাঙালী), তার ফলে কিছুটা সংকট তরণ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই মোড় গেল ঘুরে।(২) স্যাডলার কমিশন বলেছিলেন মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার নেই, উকিল ছাড়া। কিন্তু তার দু-তিন বছরের মধ্যেই কাউন্সিল হতে এ-বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রস্তাব পাশ হল এবং এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য কমিটি নিয়োগ করা হল। অবস্থার এতই দ্রুত বদল ঘটছিল। সংকোচন প্রত্যেক দিকেই প্রচণ্ড। মধ্যবিত্তদের ত কথাই নেই, সে সম্বন্ধে নতুন করে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য দিকেও এই ধারা।(৩) দেখা যাচ্ছে (ক) অন্যত্র কাজ পাক আর নাই পাক, গ্রামাঞ্চল থেকে লোক শহরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। (খ) কিন্তু কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় অবাঙালীরই প্রাধান্য। (গ) উপার্জনক্ষম লোকের উপর নির্ভরশীল লোকের অনুপাত বাড়ছে। (ঘ) যারা অপ্রধান জীবিকা হিসেবে কৃষিকে অবলম্বন করে ছিল তাদের অনুপাত বাড়ছে। অথচ কৃষকেরা অনেক সময় দ্বিতীয় জীবিকা হিসেবে কৃষিব্যতিরিক্ত কাজ কিছু কিছু করত, তাদের অনুপাত কমছে বা বাড়লেও খুব সামান্য বেড়েছে। এইজন্য পশ্চিম-

বাংলা সেন্সাস রিপোর্ট বলেছেন ঃ(৪)

While the support derived by agricultural classes from secondary non-agricultural livelihoods has increased slightly, dependence of non-agricultural classes on secondary agricultural livelihood has increased more than thirteen times..... This is 'indeed' a picture of decay.

বঙ্গবিভাগ হবার পর এবং শরণার্থীদের আগমন চলতে থাকায় এই দুরবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে গেলে আর একটি আলাদা প্রবন্ধই রচনা করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সমস্ত জমি প্রায় ব্যবহৃত হতে চলেছে, আর জমি নেই।(৫) বর্ত্তমানে যে-সব শিল্প আছে, তাতে অবাঙালীদেরই প্রাধান্য। যদিচ সেন্সাস রিপোর্ট বলেছেন, এ অনেকখানি সর্দারদের চক্রান্ত, তবুও সে-চক্রান্ত ভেঙে বাঙালীদের সেখানে নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা আপাতত মনে হচ্ছে না। নতুন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে (যথা চিত্তরঞ্জনে) বাঙালী শ্রমিক দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। বস্তুত এ-সব প্রতিষ্ঠান হল যন্ত্র-নির্ভর ক্যাপিটাল-ইনটেনসিভ স্কিম, এতে মূলধন এবং যন্ত্র বেশী লাগে, শ্রমিক তত লাগে না। এই কারণেই বেকার-সমস্যা ঘোচাবার জন্য লেবার-ইনটেনসিভ স্কীম-এর কথা উঠেছিল, সেইসঙ্গে কুটির-শিল্পের কথাও। আর বাংলায় তো ঘরে ঘরে বেকার। পশ্চিমবাংলা সরকার এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন, মোট বাঙালী পরিবার সংখ্যার ৩৮%ই বেকার সমস্যায় জর্জরিত। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও অনেক বেশী। সেখানে হিন্দুস্থানী পরিবারবর্গের অনুরূপ অনুপাত মাত্র ১৬%, ওড়িয়া ১০%। এর চেয়ে ভয়াবহ চিত্র আর কী হতে পারে?

॥ ৩ ॥

সুতরাং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার আশু উন্নতি করার যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তা সব চেয়ে বেশী দরকার হয়ে পড়েছে পশ্চিমবাংলায়, কেননা, পশ্চিমবাংলার চেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্য ভারতবর্ষে পরিসংখ্যানের হিসেবেও আর পাওয়া যায় না। পশ্চিম বাংলার কথা আমরা এত বলি, সে কেবল বাঙালীর সেণ্টিমেণ্ট নয়। নিছক হিসেব ধরলেও যে কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। সুতরাং এখানে পরিকল্পনা করতে হবে খুব সাবধানতার সঙ্গে, যাতে এই অবস্থার দ্রুত এবং স্থায়ী প্রতিকার গোড়াপত্তন হতে আর বিলম্ব না হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলার প্রথম দ্বিতীয় পরিকল্পনার সামান্য কি আলোচনা করা যেতে পারে। পশ্চিম বাংলায় প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে খরচের বরাদ্দ ছিল এই রকম ঃ

প্রথম পরিকল্পনা

	পশ্চিম বাংলার মোট খরচের শতকরা অংশ	অখিল ভারতে মোট খরচের ঐ ঐ বিষয়ে তাহার শতকরা অংশ
১। কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	১৫·২%	১৭·৫%
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	২৩·৩%	২৭·১%
৩। শিল্প	১·৭%	৮·৪%
৪। যানবাহন পথঘাট	২২·৯%	২৪·০%
৫। সমাজসেবা	৩৬·৯%	১৬·৪%
৬। পুনর্বাসন	...	৪·১%
৭। বিবিধ	...	২·৫%
	১০০%	১০০%

দেখা যাচ্ছে ভারত সরকার এক এক দিকে যতটা ঝোঁক দিয়েছেন, বাংলা সরকার

সেদিকে ততটা দেননি, অন্যদিকে দিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটার পার্থক্য স্বাভাবিক। যেমন শিল্প। শিল্প প্রধানত ভারত সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্বীকার করলে চলবে না, পশ্চিমবাংলা সরকারের সব চেয়ে বেশী ঝোঁক সমাজসেবার দিকে। উত্তরপ্রদেশেও শিল্পের জন্য প্রায় ৩% বরাদ্দ হয়েছিল, কিন্তু এখানে তা মাত্র ১·৭%। কৃষিতে এখানকার বরাদ্দ ভারত সরকারের চেয়েও অনুপাতে কম। বস্তুত, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী একটি বাজেট বক্তৃতায় নিজেই বলেছিলেন, পশ্চিম-বাংলার পরিকল্পনায় সব চেয়ে বেশী ঝোঁক সমাজসেবার দিকে।

সমাজসেবা নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতি হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য, সেটা দূর না করতে পারলে কিছুই হবে না। যার নাভিশ্বাস উঠেছে তাকে সেবা করলে তার আয়ু হয়ত একটু বাড়তে পারে, কিন্তু জীবন পাওয়া যাবে না। কাজেই আমরা সমাজসেবার দিকে যতই জোর দিই না কেন সেইসঙ্গে যদি দারিদ্র্যমোচনের দিকে তার চেয়েও বেশী দৃষ্টি না দিই তাহলে পরিণামে উন্নতি হবে না। বস্তুত হয়েছেও তাই। মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায় নিজেই বলেছেন, পশ্চিম-বাংলায় দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যাও ক্রমবর্ধমান।। একটা ছোট উদাহরণই ধরা যাক। সম্প্রতি রিলিফ বিভাগ হতে Relief of Distress in West Bengal, January-July, 1955. নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে যে হিসেব দেওয়া আছে তা হতে দেখা যায় পশ্চিমবাংলায় চালের মোট উৎপাদন এইরকম

(লক্ষ টন)

১৯৪৭	৩৫·১৯
১৯৪৮	৩৪·৫০
১৯৪৯	৩২·৭৫
১৯৫০	৩৬·২১
১৯৫১	৩৯·৩৪
১৯৫২	৩৫·৬৬
১৯৫৩	৪০·২৯
১৯৫৪	৫০·৯৬
১৯৫৫	৩৭·৫৫

এ হতে স্পষ্টই দেখা যায়, জলসেচ ও সারের ব্যবস্থা বা কৃষির উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌঁছতে এখনও ঢের দেরি, যে-ব্যবস্থায় বৃষ্টির অভাব আমাদের আর মারাত্মকভাবে আঘাত করতে পারবে না। এক বছরে ৫০ লক্ষ টন, পরের বছরেই ৩৭ লক্ষ টন। এ হতে স্পষ্টই বোঝা যায়, আমরা এখনও চাতক-বৃত্তিই অবলম্বন করে আছি। অথচ প্রথম পরিকল্পনাই ছিল কৃষিপ্রধান পরিকল্পনা। আশা ছিল, কৃষির উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হতেই আমাদের হাতে টাকা আসবে, সেই টাকা হতেই শিল্পের বনিয়াদ রচিত হতে থাকবে। এ অবশ্য সারা ভারতবর্ষের কথা, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় দূরের কথা আমাদের অন্নই জুটবে না, তার জন্যই সাহায্য দরকার হবে, আমাদের অবস্থারও অবনতি হবে।

সেইসঙ্গে আরও একটি কথা ভাববার প্রয়োজন আছে। এতদিন পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি জমির চারপাশেই আবর্তিত হচ্ছিল, কারণ কুটিরশিল্পও বিশেষ কিছু ছিল না। এখন ভূমি-সংস্কার আরম্ভ

হয়েছে। গ্রামের মধ্যবিত্তরা প্রায় সকলেই ছিলেন জমির উপস্বত্বভোগী বা প্রকারান্তরে জমির উপর নির্ভরশীল। এখন তাদের আর্থিক অবনতি ঘটেছে। সীলিঙের উপর চাষের জমি চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নিলে তাদেরও অবস্থার অবনতি ঘটবে। আসল কথা, জমির উপর চাপ যখন অত্যধিক তখন ইকনমিক ইউনিট করতে গেলে বহু লোককে জমি থেকে সরাতে হবেই, তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এই বিতাড়িত লোকগুলির অবস্থা যে অত্যন্ত সাঙিন হবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই অবস্থায় যদি শুধু সমাজসেবার ব্যবস্থাই থাকে, জীবিকা-প্রসার এবং আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে চলবে কী করে?

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় পরিকল্পনার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনায় মোট ১৫৩ কোটি টাকা খরচ হবে স্থির হয়েছে। (তার পরেও অবশ্য কিছু কমান হয়েছে)। তার মধ্যে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ এই রকম :—

	কোটি টাকা
কৃষি ও কমিউনিটি প্রোজেক্ট	৩৩·৩৬
সেচ ও বিদ্যুৎ	৩০·৪০
শিল্প	৯·৪৮
যানবাহন ও পথঘাট	১৯·০৩
সমাজসেবা	৫২·২১
বিবিধ	৯·১৭
	১৫৩·৬৬

এর মধ্যে বৃহৎ শিল্প ১·৯০ কোটি, ছোট শিল্প ও কুটিরশিল্প ৭·৫৮ কোটি।

এবার জীবিকার প্রসারের কথা খুব উঠেছিল। সেইজন্য এই পরিকল্পনায় কত লোক লাগবে তারও একটা হিসেব করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলা সরকারের অনুমান এই রকম :—

	প্রত্যক্ষ পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ
১। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ	১৪,৪৫৭
২। টেকনিক্যাল	২০,১৬৬
৩। কুশলী শ্রমিক	৫৪,২৮৭
৪। কাজে বিশেষজ্ঞ নয় এমন শ্রমিক	১,৪৬,৫১৮
মোট	২,৩৫,৪২৮

অর্থাৎ মোটামুটি সওয়া দু লাখ হতে আড়াই লাখ (বেশী ধরলেও) লোকের প্রত্যক্ষ নিয়োগ হতে পারে।

এ সব যা হচ্ছে তা ভাল কথা, কিন্তু সেইসঙ্গে এ প্রশ্ন থেকেই যায়, এতে পশ্চিমবাংলার মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যের কতটা উন্নতি হবে। বেকারদের কথাই ধরা যাক।[৫] পূর্বের হিসেবে দেখা গিয়েছে মোট বাঙালী পরিবারের অন্তত শতকরা ৩৮% বেকার-সমস্যার সম্মুখীন। তার উপরেও শরণার্থী আগমন হয়েছে, ভূমিসংস্কার হয়েছে। এমনই লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। এই সব কারণে বেকার সমস্যা আরও বেড়েছে সন্দেহ নেই। যদি খুব কমিয়েও ধরা যায় মোট বাঙালী পরিবারের শতকরা ৪০% বেকার সমস্যার সম্মুখীন তাহলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় (১৯৫১ সনের হিসেবে) ২০ লক্ষ। এখন বলা হচ্ছে সওয়া দু লাখ লোক জীবিকা পাবে। পরিবারে একজন লোক জীবিকা পেলে সেই পরিবারের সমস্যা মিটল এই অসম্ভব কথা ধরে নিলেও দেখা যাচ্ছে তাতে সওয়া দু লক্ষ পরিবার, কি আড়াই লক্ষ পরিবার উপকৃত হতে পারে। কিন্তু বেকার ২০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে আড়াই লক্ষ পরিবারের সমস্যা মিটলে বকেয়া থেকে যায় অনেক।

আসলে এরকম প্রত্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে সমস্যা মেটানো কোনও দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেখানে সমস্ত সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ত এবং সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সেখানে সব নিয়োগই রাষ্ট্রচেষ্টার মাধ্যমেই হতে হবে। কিন্তু যেখানে প্রাইভেট সেকটর আছে, লগ্নির প্রশ্ন আছে, লাভ-ক্ষতির হিসেব আছে সেই পরিবেশে কেবল প্রত্যক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত, মিশ্রিত অর্থনৈতিক গঠনের মারাত্মক গলদই এইখানে। একদিকে রাষ্ট্র লগ্নি করছে, অথচ অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের মত চলছে, এই দুই দিককে জোড় মিলিয়ে সারা দেশকে এক লক্ষ্যে চালানো বিশেষ কঠিন। পরস্পরের অভিঘাত অনেক সময়ই প্রবল হয়ে ওঠে। তার উপর আমাদের দেশ অনগ্রসর দেশ। অন্যত্র যেমন এক জায়গায় বোতাম টিপলে সব জায়গায় চাকা ঘুরতে শুরু হয় এখানে তা হয় না। বহু জায়গায় ত আর্থিক লেনদেনই নেই উৎপাদনের মধ্যে, সে-উৎপাদন কেবল নিজের জন্য। কাজেই সে-জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক কলকৌশল সাড়া তুলবে কী করে?

কাজেই এই অবস্থায় আর্থিক উন্নতি করবার একমাত্র উপায় শুধু অসাম্য দূরীকরণ নয়। যথাসম্ভব সমীকৃত সমাজের মধ্যে প্রসরণশীল আর্থিক কাঠামো স্থাপিত করতে হবে। প্রসরণশীল কাঠামো তাকেই বলা যেতে পারে যে-ব্যবস্থায় একবার ঢেউ উঠলে তার গতিবেগ প্রথম ঢেউতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, পর পর ঢেউ তুলে যেতে থাকে। যাকে অর্থশাস্ত্রীরা বলে থাকেন মাল্টিপ্লায়ার। প্রথমে যে প্রত্যক্ষ নিয়োগ করা হল, তার ফলে আবার আর কাজকর্ম বাড়বে। তা হতে আবার—এ রকম। বিভিন্ন ধরনের কারবারে বিভিন্ন গতিবেগের ঢেউ ওঠে, এ নিয়ে দেশে বিদেশে বহু অঙ্ক কষা হয়েছে। বলা বাহুল্য আমাদের দেশে গতিবেগ কিছুটা ঢিলে হবেই। কিন্তু তা বলে যদি দেখা যায়—যেমন অনেক শরণার্থীদের জন্য নির্মিত নতুন শহরে দেখা যাচ্ছে (যথা নিলোখেরি) বা পশ্চিম বাংলায় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক-গুলির প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে যে, যতদিন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তৈরির কাজ চলে ততদিনই জীবিকা থাকে, আর যখনই সে-কাজ শেষ হল তখন আর কোনও জীবিকাও নেই, তাহলে বুঝতে হবে আমরা কোনও সম্প্রসরণশীল আর্থিক কাঠামো গড়তে পারিনি, আমাদের সমস্যার মূলেও প্রবেশ করতে পারিনি। আর তা না পারলে আমরা বিষবৃত্তে পড়ে যাব। আমরা যে-পথে চলেছি তাতে সেই বিষবৃত্ত থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের খালি একটি পথ খোলা আছে, সে হল, বৃহৎ শিল্পের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্র বাদ রেখে বাকী সবটাই বিকেন্দ্রিত সমাজে বিকেন্দ্রিত শিল্প-ব্যবস্থা। পশ্চিমবাংলা, তথা ভারতবর্ষের পরিকল্পনায় এদিকে এখনও যথেষ্ট নজর পড়েছে বলে মনে হয় না।

১। Documents of tbe First Session of the First National Peoples' Congress. p 78.

২। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৫১, Part IC-তে মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। মৎসংকলিত এবং পশ্চিম বাংলা সরকার প্রকাশিত West Bengal Today দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ, ৪৭ পৃষ্ঠা।

৫। কিছুকাল পূর্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বাংলায় যথেষ্ট জমি আছে। কিন্তু তাঁরা ঈশাক রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁদের পরিসংখ্যান প্রণয়ন করেছিলেন। এ হতে ঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। ঈশাক রিপোর্ট কয়েক বছরের পুরনো, সে রিপোর্ট লেখবার পর আরও অনেক জমি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঐ রিপোর্টে অনেক জমি Cultivable but uncultivated বলে উল্লিখিত হয়েছিল যা নামেই cultivable কাজে নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বারা-পুরের কিছু জমি এইভাবে উল্লিখিত হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না সোনারপুর-আরাপাঁচ স্কীম করে তার জলনিকাশ সম্ভব হয়েছে ততক্ষণ জমি থাকা বা না থাকা দুই-ই সমান। দ্বি সব জায়গায় এত টাকা খরচ করে স্কীম ক সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও কিছু জমি পতিত রাখা অবৈজ্ঞানিক, তার উপর গো-চর বাড়া হবে, বন বাড়াতে হবে, শরণার্থীদের বসবাস জায়গা দিতে হবে, নতুন শিল্প ও শহর এলাক জন্য জমি দখল করতে হবে। এত জমি নে

সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রাণী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

ঘড়ি, না কুকার? দুটোরই দরকার। কিন্তু কোনটা আগে?

এই নিয়ে দুজনের বিতর্কের আর নিষ্পত্তি হয় না।

স্বামীর যুক্তিঃ এতকাল ঘড়ি ছাড়াও তাদের দিন যদি চলে এসেছে, তবে আরও কিছুকাল চলতে না পারার কোনও সংগত কারণ নেই। তা ছাড়া, ঘড়ি কিনতে চাওয়া মানেই কম করেও এক শ টাকা। আর, একটা সাধারণ কুকারের কী-ই বা দাম!

স্ত্রীর পাল্টা যুক্তিঃ কুকারের রান্না নাকি আবার খাদ্য! দুবেলা খালি সিদ্ধ গিলে বেঁচে থাকা আর কিছু না খেয়েও টিঁকে থাকা প্রায় একই কথা। অতএব, আগে রিস্ট-ওয়াচ—সামনের বাসার দোতলার তিমিরদি-বাবুর ঘড়ির মত, অমনি গোলগাল নধর সাইজ, ঠিক ঐ রকম খাঁজ-কাটা সোনালী ব্যান্ড।

"দাম জান ঐ ঘড়িটার?"

"কত?"

"তিন শ টাকার কম নয়।"

দাম শুনে সুরমা হতাশ হয়। প্রশ্ন করে, "শ খানেক টাকায় বাজারে কোনও ভাল ঘড়ি পাওয়া যায় না?"

মহীতোষ খানিক ইতস্তত করে জানায়, "যায় বৈকি।"

"বেশ ভাল ঘড়ি?"

"হাঁ—তা—ভালই। আমাদের কাছে ভালর চেয়েও ভাল।"

"বেশ, তারই একটা কিনতে হবে।"

"তার আগে একটা কুকার।"

"কখখনো নয়!" সুরমা জোর আপত্তি জানিয়ে বলে, "লজ্জা করে না তোমার? আজকাল রিস্টওয়াচ হাতে না পরলে কি আবার পুরুষ মানায়!"

মহীতোষের পৌরুষে তবু আঁচড় লাগে না। হেসেই বলে, "ঘড়ি নেই এমন লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়।"

"কুকার যেন বাড়ি-বাড়ি সবারই আছে!"

এই ধরনের বিসংবাদ অবশেষে আপস-মীমাংসার পথে আসে। ঠিক হল, হাত-ঘড়ি আর কুকার দুই-ই আসবে এক সংগে, একই দিনে। তার জন্যে চাই উদ্যোগ-আয়োজন, অর্থাৎ টাকার যোগাড়। হিসেব করে দেখা গেল, প্রতি মাসে দশ টাকা করে জমালে এক বছরে হবে এক শ কুড়ি টাকা। যথেষ্ট!

এমন সহজ হিসাবও কিনা গরমিল হয়ে যায়। ঐ এক বছরের মেয়াদ ফুরোবার আগেই সুরমার কোলে এল একটি পুত্র-সন্তান। ঘড়ি-কুকার তহবিলের সব টাকা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বহু দিন। প্রতি মাসে এখন ঘাটতি বাজেটের বিড়ম্বনা।

অবশেষে হাত-ঘড়ি একদিন নেমে এল একেবারে টেবিল-ঘড়িতে। মহীতোষের আপিসের সহকর্মী মণিবাবুর এক আত্মীয় ভাল চাকরি পেয়ে দিল্লী যাচ্ছেন। তিন বছর আগে পঁচিশ টাকায় কেনা তার টাইম-পিস ঘড়িটা মহীতোষকে নাকি খাতির করে দশ টাকায় বেচে দিয়ে গেলেন।

ঘড়ি পেয়ে সুরমা ভারী খুশী।

"দেখলে তো, আমার কথাই রইল। আগে এল ঘড়ি।"

একখানা ভিজে ন্যাকড়ায় খানিক সাবান ঘষে নিয়ে সুরমা তাই দিয়ে ঘটিকা-যন্ত্রের নিকেলের দেহটাকে দেখতে দেখতে ঝকঝকে করে তোলে। তারপর শাড়ির আঁচলে বেশ করে মুছে নিয়ে ঘরের টেবিলের উপর ঘড়িটাকে বসাল যেন সযত্নে বসিয়ে দেয় ঠিক মাঝখানে। ঘড়িটার ডাইনে-বাঁয়ে নতুন করে সাজিয়ে রাখে নারীজীবনের সেরা সাধের প্রসাধনের অঙ্গ—সিঁদুরের কৌটো, স্নোর ডিবে, ফেস-পাউডারের কাগজের বাক্স, তেল-আলতার শিশিবোতল, চুলের কাঁটা আর ফিতে রাখার প্ল্যাসটিকের বাটী।

মহীতোষ পরিহাস করে, "থরে থরে নৈবেদ্য সাজাচ্ছ বুঝি!"

সুরমা হাসতে থাকে। ঘরের শালগ্রাম-শিলাও এর চেয়ে কত আর বেশী আদর পায়!

"তুমি ভেবেছ এই টাইমপিস পেয়ে আমি গলে গেছি! রিস্টওয়াচ তোমায় একদিন কিনতেই হবে, বলে রাখলাম।" কথা বলতে বলতে সুরমার দৃষ্টি চলে গিয়েছে স্বামীর বাঁ হাতের সুপুষ্ট মণিবন্ধের উপর। অমন চওড়া কব্জি কটা বাঙালী পুরুষের? ঐ হাতে হাত-ঘড়ি মানাবে না তো মানাবে কার হাতে?

পরদিন থেকে মহীতোষ সকালে ঘড়ি দেখে চা খায়, দাড়ি কামায়, ঘড়ি দেখে খবরের কাগজ পড়তে বসে, ঘড়ি দেখে থলে হাতে বাজারে বার হয়। ফিরে এসেও ঘড়ি দেখেই স্নান সারে, খেতে বসে, আপিস যায়। আজকাল মহীতোষের জীবন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা।

দেখে শুনে সুরমা একদিন না বলে পারল না, "তুমি বড় আদেখলে গো! ঘড়ি যেন দ্যাখনি কোনদিন।"

মহীতোষ হাসতে থাকে। সুরমা টিপ্পনী কাটে, "তাই বলে দুধের স্বাদ এই ঘোলে!"

মহীতোষ হার মানতে নারাজ। বলে, বাসনার জোর থাকলে ঘোলের মধ্যেও রসনা দুধের আস্বাদ পেতে জানে।"

"আস্তে কথা কও। শুনতে পেলে খোকাও হেসে উঠবে!"

তক্তপোশের উপর এক বছরের ঘুমন্ত ছেলের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সুরমা মুচকে হাসে।

স্বামীর এমনধারা ঘড়ি-ঘড়ি ভাব সুরমার কিন্তু সত্যি ভাল লাগে না। কেন লাগে না তার একটা ইতিহাস আছে।

কলেজে ঢুকবার আগে থেকেই মহীতোষ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, বিয়ের সময় আর কিছু না পাক একটা ঘড়ি দাঁও মারবে নিশ্চয়। কিন্তু এক বাংলা খবরের কাগজের দেড় শ টাকা বেতনের এক জুনিয়র সাব-এডিটর ঘরে নিয়ে এল তারই মত নির্ধন পরিবারের একটি মেয়েকে। মহীতোষের নির্ঘড়ি জীবনের লজ্জা আর ঘুচল না শেষ পর্যন্ত।

ঘড়ির অভাব সুরমা অনেকখানি মিটিয়ে দিয়েছিল। সুরমা যেন ঘড়িকেও হার মানায়। মহীতোষের আপিসের কাজ কখনও সকালে, কখনও দুপুরে, কখনও বিকেলের দিকে, কখনও বা রাত দশটার নাইট-শিফ্ট। এমনতর বেতর ডিউটির লোকটা কিন্তু একদিনও লেট হয় না। হয় না সুরমারই কল্যাণে।

সুরমার ঐ নিখুঁত সময়-বোধের চাবিকাঠি তার কান আর চোখ। পাশের বাসায় রেডিও আছে। রোজ সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলার খবর বলা শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুরমাও জানায়, "এবার বাজারে যাও।" বেতারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয় ঘণ্টাধ্বনি করে। সুরমাও নোটিশ দেয়, "এবার নাইতে যাও গো, নইলে আজ লেট হতে হবে।" স্বামীর যেদিন বিকেলের দিকে ডিউটি, সুরমা কান খাড়া করে থাকে "মহিলামহল" বা "অনুরোধের আসর" শেষ হবে কতক্ষণে।

বেতারের বিরতির সময়েও সুরমা নিরুপায় নয়। পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে দশটার পর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং করে আওয়াজ হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তুলে নেবার লরি এ-পাড়ায় আসে বেলা এগারটায়। সুরমার শোবার ঘরের জানালার দৃষ্টির মধ্যেই সামনের মোড়ের মাথায় প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে চারবার করে লোক এসে লাল রঙের ডাকবাক্সটার চিঠিপত্র সব খালাস করে নিয়ে যায়। তা ছাড়া সারা দিনে কতবার ডাকপিয়ন আসে বাড়ি-বাড়ি চিঠি বিলি করতে, কিংবা হোসপাইপ নিয়ে দেখা দেয় রাস্তায় জল দেওয়ার লোক। সঠিক সময়ের দু-চার পাঁচ-দশ মিনিট এদিকে বা ওদিকে, এই যা তফাত।

কালের স্রোত নিজেকে যখন মানুষের প্রয়োজনের মাপে-মাপে জানান দেয়, নানা-ভাবে নানা দিকে, সুরমার তখন সময় নিয়ে ভাবনা কী? মহীতোষ নিশ্চিন্ত। সুরমাও গর্বিত। সে ঠিক জানে, সে না থাকলে ঐ লোকটা ঠিক সময়ে আপিস যেতে পারত না।

সুরমার উপর নির্ভরশীল সেই মহীতোষ এখন রোজ ঠিক সময়েই আপিসে যায়। ঘন ঘন রান্নাঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে তার সময় জানবার প্রয়োজন পড়ে না আর।

একদিন রান্নাঘর থেকে সুরমা ঘরে ঢুকেই বলে, "ছাই ঘড়ি নিয়ে এসেছ!"

"কেন?"

"দ্যাখ চেয়ে। কটা বাজে তোমার ঘড়িতে?"

টেবিল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মহীতোষ জানায়, "আটটা বেজে সতের মিনিট।"

"আমার চেয়ে তোমার ঘড়ি বেশী জানে?"

মহীতোষ চুপ করে চেয়ে থাকে।

"এখন সাড়ে সাত। শুনছ না, রেডিও খবর বলছে?"

মহীতোস ঘড়ির পক্ষ হয়ে ওকালতি করে, "দু-চার মিনিট ফাস্ট চলছে হয় ত।"

"দু-চার মিনিট নয়, আধ ঘণ্টারও ওপরে।" সুরমা সুযোগ পেয়ে খোঁচা দেয়, "তোমায় ভালমানুষ পেয়ে লোকটা পুরনো পচা ঘড়ি গছিয়ে দিয়ে গেছে।"
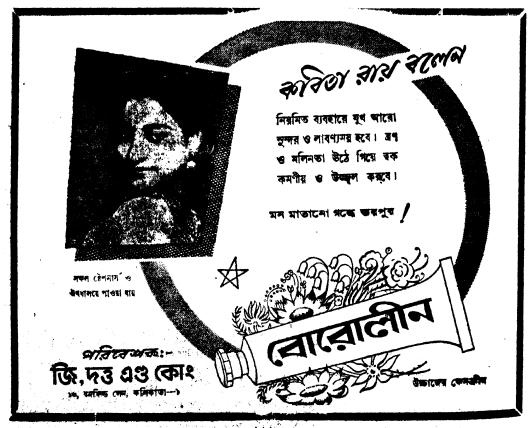
ঘড়িটা দিনের পর দিন যেন যুগের আগে এগিয়ে চলল। এই প্রগতিশীলতার দাপট এতই বেড়ে গেল যে, মাস দুয়েক মধ্যে আর-সকলের চলার সঙ্গে ঘড়িটার চলার ব্যবধান এসে দাঁড়ায় পুরো দেড় ঘণ্টা।

সুরমা ঠাট্টা করে, "কী আমার ঘড়ি রে!"

মহীতোষ তবু আশা ছাড়ে না। মাইনে পাওয়ার পরে টাইম-পিসটা এক ঘড়ি-মেরামতের হাসপাতাল ঘুরে এল চার টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

ঘড়িটা দিন কয়েক ঠিকমতই চলল। মহীতোষ খুশী। সুরমাকে এখন মানতেই হবে, ঘড়ি কিনে সে ঠকেনি।

কিন্তু চার টাকায়-কেনা প্রমাণটুকু নিঃশেষ হতে এক মাসও লাগল না। একদিন সুরমা এসে তাগাদা দেয়, "আজ বাবুর নাওয়া-খাওয়া নেই? ওঠ এবার।"

মহীতোষ খবরের কাগজখানা সরিয়ে রেখে জানতে চাইল, "বল, বাজার থেকে কী-কী আনতে হবে।"

"রক্ষে কর। বাজারে গেলে আজ আর আপিসে যেতে হবে না। কটা বাজে খেয়াল আছে?"

টেবিলের উপরে ঘড়িটায় তখন সাড়ে আট।

"নটা বেজেছে অনেকক্ষণ। আর দেরি কর না।"

মহীতোষ বুঝতে পারে, কালের যাত্রায় ঘড়িটা এবার পিছু হটতে শুরু করেছে। তবু মুখে বলে, "সকালে বুঝি চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

সঙ্গে সঙ্গেই সুরমা জানায়, "ঘুম থেকে উঠেই চাবি দিয়েছ। স্বচক্ষে দেখেছি।"

মহীতোষ চুপ করে যায়। সুরমা তবু ছাড়ে না। বলল, "ঘড়িটা আগে ছিল ঘোড়া, এখন হয়েছে খোঁড়া। দু দিন বাদে আর-এক পায়ে হবে গোদ। তখন আর চলতেই চাইবে না। দেখে নিয়ো।"

হলও তাই। টাইমপিসটার পশ্চাদপসরণের গতিবেগ একদিন মহীতোষের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াল। উপরওয়ালা শাসিয়েছেন। মহীতোষ সেদিন লেট হয়েছিল পাঁচ-দশ-পনের মিনিট নয়, এক ঘণ্টার উপরে।

বিকেলে স্বামী বাড়ি ফিরে এলে সব কথা শুনে সুরমা জানায়, "আজকাল তোমার ঐ ঘড়িটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।"

কথাটা সত্যি। ঘড়িটার এখন কী হালই না হয়েছে! নিকেলের দেহে ন্যাকড়ার স্পর্শ পড়ে না বহুকাল। আষ্টেপৃষ্ঠে এক-রাজ্যের ধুলো। দম দেওয়ার ভার ত মহীতোষই বুঝে নিয়েছে বহুদিন আগে।

ঘড়ি সম্পর্কে মহীতোষ এখন প্রায় নিস্পৃহ। তবু সকালে ঘুম থেকে উঠে দম দেয় নিয়মিত। আশা গেলেও অভ্যাস আঁকড়ে আছে ছিনে-জোঁকের মত।

ঘড়িকে ছাড়লেও ঘড়ি কিন্তু ছাড়ে না। দেখা দেয় নতুন উপসর্গ। মাঝে মাঝে হঠাৎ অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তার জন্যে আগে-ভাগে অ্যালার্মের চাবি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না।

অশিষ্ট ঘড়িটা একদিন রাত দুপুরে আর্তনাদ করে উঠল। মাথার উপরের ছোট্ট বোতামটা টিপে আওয়াজ বন্ধ করে মহীতোষ বিরক্তি চেপে আবার বিছানায় ফিরে আসে।

সুরমা রসিকতা করে, "দেখলে ত কাণ্ড! ও আমার সতীন। কাল সকালে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।"

খানিক বাদে অন্ধকারে মহীতোষ ডাকে, "সুরমা! ঘুমোলে?"

"উঁহু।"

"সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস কেনার মত আহাম্মকি আর নেই। কিনতে হয় ত আনকোরা নতুন। শুনছ?"

সুরমা সাড়া দেয় না।

"ঘড়ির পিছনে খামকা চোদ্দ টাকা বার হয়ে গেল। আর গোটা দশেক টাকা হলেই একটা কুকার হয়ে যেত।"

"দোহাই তোমার!" অন্ধকারে সশব্দে হেসে ওঠে সুরমা, "এক ঘড়িই কত রঙ্গ দেখাল, তার উপর তোমার কুকার এসে না জানি কোন পেল্লায় কাণ্ড শুরু করে দেবে!"

"না গো না! কুকারের কোনও আইডিয়াই নেই তোমার। শোন তবে।" বলেই মহীতোষ ঝাড়া দশ-বার মিনিট বক্তৃতা করে যায়: কুকারের বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যনীতিসম্মত রন্ধন, বাঙালীর হেঁসেলের জটিল কাণ্ড-কারখানার সরলীকরণ, মানবজীবনের মূল্যবান সময়ের অযথা অপচয় নিবারণ, কয়লার ধোঁয়ার স্বাস্থ্যহানিকর উৎপাতের হাত থেকে উদ্ধার-সাধন.....

"......রোজ দু-বেলা তোমাদের সাত-আট ঘণ্টা কাটে রান্নাঘরে। কুকারে সে-কাজ দু ঘণ্টায় হয়ে যাবে। তা ছাড়া কয়লার উনোনে রাঁধলে বাসনকোসন যেন্নাই লাগে। হাঁড়ি-কড়াই-খুন্তি-হাতা-ডেকচি-গামলা সব মেজে ঘষে ধুয়ে তুলতে কমাসে কম এক ঘণ্টা। ঠিক কি না বল।"

কে বলবে? সুরমা ঘুমিয়ে পড়েছে। বোধ হয় বহুক্ষণ আগেই।

সকালবেলা মহীতোষ আবার আগের রাতের প্রসঙ্গের জাবর কাটতে শুরু করে। তার মগজ থেকে ঘড়ি নেমে গিয়ে সেই শূন্য স্থান জুড়ে বসেছে এখন স্টীম-কুকার। হাত-ঘড়ির সাধ আপাতত সাধ্যের বাইরে। কুকার তা নয়। অপিচ, সুরমা আবার অন্তঃসত্ত্বা। তার রান্নাঘরের ঝামেলা মহীতোষ অনেকখানি হালকা করে দিতে চায়। স্থির সিদ্ধান্তের সুরে জানালে, "সুরমা, সামনের মাসের মাইনে পেলেই একটা কুকার কিনব।"

সুরমা এতটুকু উৎসাহ দেখায় না।

দুপুরে সামনের বাসার অলোকাদির ওখানে গিয়ে সুরমা তাদের কুকারটা দেখে এল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে কুকারের নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে বুঝে মনে-মনে কুকারের মেহনত-বাঁচানো বিশেষত্বের কথা স্বীকার না করে পারল না। তবু তার দৃঢ়-সঙ্কল্প, ঐ উৎপাত সে ঘরে আনতে দেবে না কিছুতেই।

ছুটির দিন দুপুর বেলা মহীতোষ খেতে বসেছে। থালার চারদিকে আজ গোটা কয়েক বাটি। সুরমা সামনে বসেছে একটা পাখা হাতে নিয়ে।

"শুক্তো আজ ভাল হয়নি?"

"ভালই হয়েছে।"

খানিক বাদে আবার সুরমা প্রশ্ন করে, "লাউ-চিংড়ি বুঝি ভাল রান্না হয়নি?"

"খুব ভাল লাগছে! চমৎকার হয়েছে!"

সর্বশেষে সুরমা হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করে, "কাঁচা আমের চাটনি খুব খারাপ লাগছে, না?"

আঙুল চাটতে চাটতে মহীতোষ এতক্ষণে পরিহাসের মর্মটুকু ধরতে পারে। সুরমা এবার ফিক করে হেসে ফেলে। বলে, "এ-সব তোমার কুকারে হবে?"

মহীতোষ মুশকিলেই পড়ে। এখন চেঁচে মুছে ভরপেট খাওয়ার পরে কুকারের গুণ-কীর্তন তার নিজের কানেও হাস্যকর মনে হবে। বললে, "তুমি আগে খেয়ে নাও। পরে বলছি।"

ঘণ্টাখানেক বাদে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি বসেছে। একজন শক্ত কাঠের চেয়ারে, আর একজন তক্তপোশের উপরে।

মহীতোষ বোঝাতে বসে: রুচি জিনিসটা

মানুষের অভ্যাস আর অনুশীলনের ফল। অতএব চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে আর-এক রকমের নতুন রুচি গড়ে উঠতেই বা বাধাটা কোথায়।

সুরমা মৃদু হেসে বলে, "এ ত গেল বইয়ের কথা। তোমার নিজের কথা বল।"

"আমার নিজের কথা নয়?" মহীতোষ ক্ষুন্ন হয়ে বলে, "তা হলে তুমি বিশ্বাস কর না তোমার মেহনত আমি বাঁচাতে চাই?"

"আমি তাই বললাম নাকি? কী কথার কী মানে! কুকার থাকলে চার-পাঁচ ঘণ্টার রান্নার কাজ এক ঘণ্টায় শেষ হতে পারে—এ-কথা পাগলেও বোঝে।"

"তবে?"

"না গো, অত সুখ আমার কপালে সইবে না।"

"তার মানে?"

কানের পাশ থেকে কয়েক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে সুরমা বললে, "ভাবছি এত সময় হাতে পেয়ে কী করব আমি! আমি কি ও-বাসার লীলাদি, না হিমাদ্রি-বাবুর ভাইঝি রমা যে রোজ সাড়ে নটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বার হয়ে আবার ঘরে ফিরতে হবে সেই সন্ধ্যে ছটা নাগাত? কুকার-টুকার ও-সব চাকরে মেয়েদেরই দরকার, ওদেরই পোষায়।"

"তোমারও দরকার। শেলাইর কাজে আরও বেশী সময় পাবে। বই পড়তে বললেই 'সময় কৈ' বলে আর নালিশ জানাতে পারবে না। তা ছাড়া, এই ধর, কোনও ছুটির দিনে বিকেলে নিশ্চিন্ত মনে আমার সঙ্গে বাইরে বার হতে পারবে, সিনেমায় বা বটানিক্যাল গার্ডেনে। রাত এগারটায় বাড়ি ফিরে এসেও তৈরি পেয়ে যাবে কুকারের হাতে গরম, পাতে গরম।"

হাসি লুকোবার জন্যে সুরমা শাড়ির আঁচলে নাক পর্যন্ত ঢেকে রাখল। কিন্তু চোখের হাসি লুকোবে কী দিয়ে?

মহীতোষ কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়। আবার তাকে বক্তৃতার ঝোঁকে পেয়ে বসে। কুকারের মহিমা ব্যাখ্যানে তার মুখ দিয়ে যেন খই ফোটে।

সুরমা মনে মনে হাসে। লোকটা খালি মোটা-মোটা বই পড়ে আর বড়-বড় কথা বলে। কুকারের তত্ত্বকথা বলেই সে খালাস। কুকারের আসল ব্যাপারের সে কী জানে? জানে সরমা। সে এখন সবিস্তারে মুখস্থ বলে যেতে পারে: কুকারের উনোনে কতটা করে কাঠকয়লার দরকার হয়; কতক্ষণ পরে উনোনটাকে আবার বার করে আনতে হয়; সিলিণ্ডারে জল দিতে হয় কতখানি বা কতটুকু; দেড় কাপ চাল নিলে বাটিতে জল দিতে হবে ক কাপ; মাংস রান্না করলে চল্লিশ মিনিটের পরেও অতিরিক্ত দশ মিনিট দরকার; ডিম, আলু, ঝিঙে, পটল ইত্যাদি সেদ্ধ করতে হলে উপরের বাটিতে জলের দরকার হবে না এক ফোঁটাও। ইত্যাকার।

"শুনছ ত?"

"হুঁ!" অন্যমনস্ক সরমা ঘাড় নাড়ে।

"তা হলে এসব কথা মানছ?"

"সবই মানি, সবই বুঝি। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন?"

"না গো, কাজ নেই কুকার এনে।"

ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের অংশের স্কুলমাস্টার তারিণীবাবুর স্ত্রী হাঁক দেন, "সুরমা আছিস?"

মাসীমাকে পেয়ে সুরমা অকূলে কূল পেয়ে গেল। সাড়া দেয়, "হ্যাঁ, মাসীমা! ভেতরে আসুন।"

দলে ভারী হয়ে সুরমা হেসে জানায়, "দেখুন না মাসীমা, কুকার কিনবে বলে রুখে উঠেছে।"

"অমন কাজও করিসনে সুরমা!" মাসীমা

হীতোষের দিকে ফিরে বললেন, "কুকারের ন্না আবার মানুষে খায়! একঘেয়ে সেদ্ধ ডই খেয়ে পরে ভাল জিনিসও আর ভাল াগবে না মুখে।"

মাসীমার অযাচিত উপদেশে মহীতোষ ত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সংযতকণ্ঠেই লে, "আপনি জানেন না মাসীমা! তাই -কথা বলছেন। আমাদের আপিসের খময়বাবু রোজ দুবেলা কুকারে খান। ধ বদলাবার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি মাছ-রকারি সব ভেজে নেন একটা আলাদা টাভে। গুঁড়ো মশলা দিয়ে একটুখানি তেলে রাখেন, তারপর চাপিয়ে দেন কারে। স্বাদ আর স্বাস্থ্য দুই এক সঙ্গে। া হলে দেখুন—"

মাসীমা আর সুরমা দুজনেই একসঙ্গে হা-হো করে হেসে ওঠে। শুধু হাসাই নয়, জনেই মহীতোষের বাকী বক্তব্য না শুনেই র ছেড়ে চলে গেল।

মহীতোষের রাগ হয়, দুঃখ হয়, করুণা য়—সুরমার উপর, মাসীমার উপর, মেয়ে-াতের উপর, গোটা বাঙালী জাতেরই উপর। কারের মর্যাদা লোকে বুঝেও বুঝল না! ানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার এমন এক ানকে মানুষই কিনা কাজে লাগাতে চায় না! াতকে-জাত জীবন-বিমুখ! এদের সকল খভোগের সারাংশ এসে আটকে আছে কবল জিবের ডগায়!

ঘড়িটা আজ আবার রসিকতা করল এই াসময়ে। অ্যালার্মের আওয়াজে বিছানার পরে খোকার পর্যন্ত ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

মহীতোষ তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে ায়। আজকাল বোতাম টিপলেও অনাদরের ড়ির কান্না আর থামতে চায় না। তখন া দুই ঝাঁকুনি দিয়ে চিত করে শুইয়ে দিলে বেই আওয়াজ বন্ধ হয়। এই উপসর্গও যমন অদ্ভুত, উদ্ভাবিত উপায়টাও তেমনি দ্ভট।

আজও মহীতোষ চিত করে রাখতেই াস্তে আস্তে ঘড়িটা নিস্তেজ হয়ে আসে ন্দাতুর শিশুর মত। কিন্তু ঘরের শিশু াতে খুশী হয় না। খোকা তক্তপোষ থেকে নজেই নেমে এসে আঙুল দিয়ে ঘড়িটা দখিয়ে দেয়—ইঙ্গিতে ওটাকে আবার খাড়া রে বসিয়ে দিতে বলে।

সুরমা ঘরে ফিরে এসেছে। মহীতোষ াসা নালিশ জানায়, "দ্যাখ তোমার ছেলের াবদার। ঘড়িটাকে বসিয়ে দিতে বলে।"

"তা দিলেই বা একটু বসিয়ে। ওটা তো খন খেলনা-পুতুলেরই সামিল।"

খোঁচাটা মহীতোষ গায়ে মাখে না। ঘড়ির াধ তার মিটেছে। সে আজকাল স্বপ্ন দখে: খোকা বড় হয়ে উঠেছে, কলেজে ঢাকবার আগেই তাকে সে একটা হাত-ঘড়ি কিনে দেবে—শক-প্রুফ, অ্যান্টি-ম্যাগনেটিক, রেডিয়াম ডায়াল, লাল রঙের সেকেণ্ডের কাঁটা—দস্তুরমত এক ভাল রিস্টওয়াচ!

স্বপ্ন দেখে সুরমাও। প্রতি মাসে শিশিবোতলওয়ালার কাছে পুরনো খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকাগুলো বেচে ইতিমধ্যেই সে পনের টাকার এক গোপন তহবিল খুলেছে। বছর দুই বাদে সুরমা একটা হাতঘড়ি কিনে এনে স্বামীকে অবাক করে দেবে।

"তুমি বুঝি আজকাল চাবি দিচ্ছ?" মহীতোষ প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" খানিক আগের তাচ্ছিল্যের ভাব ভুলে গিয়ে সুরমা জানায়, "আমার হাত না পড়লে ঐ ঘড়ির বাচ্চা কথা শুনত! ঠিক টাইম দিচ্ছে—রেডিওর টাইমের সঙ্গে সমান তালে। দ্যাখ, এখন সাড়ে পাঁচটা।"

সুরমার এ ডাহা মিথ্যা কথা। ভুভারতে কোথাও এখন সাড়ে পাঁচটা নয়।

সুরমা ভেবেছিল ঘড়িটার দিকে একরোখা স্বভাবের লোকটার আগ্রহ আবার উসকে তুলে কুকার আসার সম্ভাবনাকে সে ঠেকাবে। তাই রোজ সকালে সে ঘড়িটায় দম দেয়। রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ওটার চালচলন কখনও কমায়, কখনও বাড়ায়।

বৃথা চেষ্টা। মহীতোষের মগজে এখন কুকারের কেবলম্। স্থির সিদ্ধান্ত ক্রমে সংকল্প হয়ে দাঁড়ায়।

"আপত্তি কর না সুরমা! সেবার তুমি হাসপাতালে গেলে আমি কী মুশকিলেই পড়েছিলাম, মনে নেই?"

সুরমার মনে আছে বিলক্ষণ। দু দিন আধ-সিদ্ধ ভাত-ডাল গিলে তিন দিনের দিন মহীতোষ দু-বেলাই হোটেল সম্বল করেছিল।

সুরমা স্মিতহাস্যে বলে, "কত ব্যাটাছেলে ত রাঁধতেও জানে। তুমি কেন জান না?"

"ও-সব আমার আসে না। তার জন্যেই তো কুকার কিনতে চাই। এবার দেখে নিয়ো তুমি, এ-শর্মাই চালিয়ে নেবে। হোটেলে আর যেতে হবে না।"

"বটে!"

"হেস না। নিজের ভাল কাক-প্রাণীও বোঝে, বোঝে না কেবল বাঙলা দেশের মেয়েরা।"

সুরমা হাসে। হেসেই বলে, "আমায় বিয়ে করে এনেছিলে কি এ-সংসারে এক পটের বিবি করে টাঙিয়ে রাখতে?"

এ-যুগের পৌনে দু শ টাকা বেতনের স্বামীর স্পর্ধা কম নয়! পালটা জবাব দেয়, "এ-বাড়ির রাঁধুনী করে রাখবার জন্যে নয়।"

"কী যে বাজে বকো!" সুরমা গম্ভীর হবার ভান করে বলে, "রাঁধুনী হতে যাব কোন দুঃখে! নিজের রান্না নিজে রাঁধি, নিজের বাসন নিজে মাজি, নিজের ঘর নিজের হাতে ঝাঁট দিই, নিজের বিছানা নিজের হাতেই পাতি। আমিই সব করি—সবই আমার, আমার, আমার! পরের বাড়িতে খাটতে যাই, না কখনো যাব?"

"পাখি এবার সোনার খাঁচার মহিমা-কীর্তন শুরু করল।"

"ঢের লেকচার শুনিয়েছ। একবার থাম।" সুরমা রীতিমত গম্ভীর হয়েই বলতে লাগল, "আমি কি নুলো যে কাজকে ডরাই? না-খেটে কে খায়, শুনি? তুমি কাজ কর না রাতদিন? আপিসের কাজ ছাড়াও তোমার বাজার আছে, মুদীর দোকান আছে,

তোলো উঠে খাটালে গিয়ে কামানে দাঁড়িয়ে থেকে খোকার জন্যে দুধ নিয়ে আসতে হয়, ঝুড়ির পয়সা বাঁচাবার জন্যে একবারের কয়লা থলেয় করে নিয়ে আস তিন-চার বারে। এর উপর আবার কাছাকাছি টিউশনের খোঁজ পেলে তা-ও হাতছাড়া করতে চাও না।"

স্ত্রীর যুক্তিজাল-বিস্তারে মহীতোষ থতমত খেয়ে যায়। চটপট কোনো লাগসই পাল্টা বুদ্ধি মনে না আসায় সুরমার মতই গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করে, "তোমরা কী কনজারভেটিভ! মেয়েদের ভাল করতে গেলে বাধা আসে প্রথমেই মেয়েদের কাছ থেকে।"

"আমাদের ভাল করার ভার আমাদের উপরেই ছেড়ে দাও না বাপু!" বলেই সুরমা স্বামীকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গৃহকাজে চলে যায়।

মহীতোষ বসে বসে ভাবে : কী অবুঝ সুরমা! তাই না স্ত্রীর অমন সুন্দর মুখখানিও সময় সময় কী বিশ্রী মনে হয়। তার মাধুর্যের সংগে এমন এক অসংগত অনমনীয় জেদ একেবারেই বেখাপ, অসহ্য!

সুরমা আবার ঘরে আসে। স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই বলে, "না গো! ভেবে দেখলাম, কুকার একটা কিনতেই হবে।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

"হ্যাঁ, কুকার আমাদের চাই। তবে এখন নয়।"

"কবে?"

সুরমা মুচকি হেসে জানায়, "খোকা যখন বড় হবে, সে-থা করবে—তখন।"

মহীতোষ বিরক্তি গোপন করে মুখ ফেরায়। সুরমা কিন্তু বলেই চলল, "তখনই কুকারের প্রয়োজন হবে। তখন সময় হাতে পাবার কত দরকার! গীতার শ্লোক শুনতে হবে, রামায়ণ-মহাভারত পড়তে হবে। তাই বলে এখন, এত আগেই কেন সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি আর গঙ্গার ইলিশের স্বাদ ভুলতে যাব?"

মহীতোষ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

"রাগ করেছ?"

"করব না! রক্তমাংসেরই তো মানুষ আমি, আর কিছু?"

"ভুল বুঝো না। কুকারের সব গুণ স সুবিধে আমি বুঝি। তোমার চেয়ে বেশী বুঝি।"

"তবে এত আপত্তি কেন?"

এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে সুরমা আবার রান্নাঘরে ফিরে যায়।

মহীতোষের নজর পড়ে ঘড়িটার উপর। এখন, এই সন্ধ্যার পরে, ঘড়িতে বাজে বেলা একটা। আজ সকাল থেকে দেখে আসছে মিনিটের কাঁটা চলছে ঠিক, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে এক ঠাঁই। ঠিক সুরমার মনখানির মত। তারও সচল যুক্তি-বুদ্ধি তার অনড় মনকে কিছুতেই স্থান-চ্যুত করতে পারছে না।

মহীতোষ মনে মনে মানে, এত সহজে হবে না। মেয়েদের সংস্কারের শিকড় অনেক গভীরে। তাকে টেনে তুলতে হলে ধৈর্যের দরকার, প্রতীক্ষার প্রয়োজন।

আগের দিনের ঐ জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত পরদিন সন্ধ্যার আগেই মহীতোষ বিলকুল ভুলে গেল। বাড়ি এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্ত্রীকে ডাকে, "সুরমা শিগগির এস।"

বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে সুরমা বললে, "অমন চ্যাঁচাচ্ছ কেন?"

"অদ্ভুত! ওয়াণ্ডারফুল!"

"কী?"

"এ-বেলা পাঁচ মিনিট, ও-বেলা পাঁচ মিনিট। সারা দিনে মোট দশ মিনিট।"

"কী ব্যাপার?"

"প্রেশার কুকার!"

"আবার কুকার!"

"না গো, সে-সব মামুলী কুকার নয়। আগে শোনই না। আজ আপিসে প্রেশার কুকারের কথা শুনে এলাম। দাম এমন কিছু বেশী নয়। ষাট-পয়ষট্টি টাকা। কিন্তু কী আশ্চর্য জিনিস!"

শুনবার জন্য সুরমা এতটুকু আগ্রহ দেখায় না।

"আশ্চর্য নয়? চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাত-ডাল-আনাজ সব এক সংগে সেদ্ধ হয়ে যাবে। প্রেশার কুকারে মাংস সেদ্ধ হতেও সাত-আট মিনিটের বেশী সময় লাগে না।"
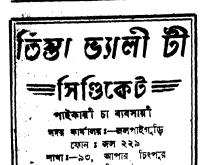
সুরমা তবু নিস্পৃহ।

মহীতোষ বিরক্ত হয়ে বলে, "তুমি অবুঝ হলেও আমি তো অবুঝ নই। এর পরের ভাবনা থাক। আর দু'দিন বাদে চলবে কী করে? তুমি হাসপাতালে গেলে এবার আর আমি অকূলে সমুদ্রে পড়ব না। আমার মত আনাড়ীও দু-চার দিন বেশ চালিয়ে নেবে সংসার, দেখ তুমি।"

সুরমা তেমনি নিরুত্তর।

"দু-চার দিন কেন, দু-চার মাসও চালিয়ে নিতে পারি ঘরে একটা কুকার থাকলে।"

সুরমা এবার মুখ খোলে, "এতই যখন সহজ, তখন বিয়ে করে ভুল করতে গেলে কেন?"

"আসল কথা চাপা দেবার জন্যে বাজে কথার প্যাঁচ খেল না সুরমা!"

"বাজে কথা নয়।" অভিমানের সুরে সুরমা বলল, "আমার প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, বিদায় করে দাও।"

মহীতোষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কেবল কথার পিঠে কথা। এক অজুহাতের পর আর এক অজুহাত। এবার আর কোনও আপত্তি সে শুনবে না। কালই কুকার কিনে নিয়ে আসবে। মহীতোষ দৃঢ় কণ্ঠে সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে দেয়, "কাল আমি কুকার কিনে তবে বাড়িতে ঢুকব।"

দৃঢ়তর কণ্ঠে স্ত্রীও জানায়, "আমি এক পয়সাও দেব না।" সুরমা জানে স্বামীর হাতে এখন কিছুই নেই। তিন দিন আগে মাইনে পেয়েছে। সেই টাকা, হাসপাতালে খালাস হতে যাবার জন্যে জমানো টাকা আর কাগজ বেচা হাত-ঘড়ি তহবিলের টাকা—সবই সুরমার বাক্সে।

মহীতোষ সুর নরম করে জানাল, "ভয় নেই। তোমার কাছে টাকা চাইব না। গেল মাসে অ্যানিভার্সারি স্পেশালে ওভার-টাইম খেটে প'চাত্তর টাকা পাওনা হয়েছিল। সে-টাকা কাল পাব। তাই দিয়েই প্রেশার কুকার কিনব।"

সুরমা শঙ্কিত হয়। প্রেশার কুকার! পাঁচ মিনিটে রান্না শেষ? সারা দিনে অঢেল অবসর? না-না, কিছুতেই নয়। সেই বাঞ্ছনীয় মুক্তির মধ্যে সুরমা আবিষ্কার করে এক প্রচণ্ড অস্বস্তি! এ-সংসারে সে আর তবে অপরিহার্য নয়?

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে সুরমা বলল, "আমি বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে কুকার আসতে পারবে না।"

"জেদ ছাড় সুরমা!"

কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে দ্বিগুণ জেদের সঙ্গে সুরমা জানায়, "ঐ উৎপাত বাড়িতে আমি কিছুতেই ঢুকতে দেব না। কখনো না।"

মহীতোষেরও জেদ বাড়ে দ্বিগুণতর। অযৌক্তিক প্রস্তাব যখন নয়, কেন সুরমা তা মানবে না? তাকে মানতেই হবে। কেন সুরমা বুঝবে না তার স্বামীর এই সামান্য ত্যাগ-স্বীকার? হাত-ঘড়ি কি সে চায় না, না কিনতে পারে না? কালই সে একটা রিস্টওয়াচ কিনে আনতে পারে। তবু সে কেন কুকার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? সেই স্পষ্ট মনোভাবের মর্যাদা কেন সুরমা দেবে না? দিতেই হবে।

গলা ছেড়ে বললে মহীতোষ, "কার সাধ্য বাধা দেয়। কুকার আনবই।"

কিছুতেই আনতে দেব না

এবার সুরমা একটা বোমার মত ফেটে পড়ে। "কিছুতেই আনতে দেব না।—মুরদ থাকে তো ঝি-চাকর রেখে দাও, রাঁধুনী রেখে দাও। সে-ক্ষমতা যখন নেই, চুপ করে থাক। বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে।"

হঠাৎ মহীতোষের মুখ যেন কে সেলাই করে দিয়েছে। সুরমার মুখে এ কী কথা! তার এতদিনের প্রকাশ্য আপত্তি আর এই সদ্য মুহূর্তের উত্তপ্ত অভিযোগের মধ্যে আসল সুরমা কোনখানে?

মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুরমার তেজ ক্রমেই বাড়ছে। কাঁপছে থর থর করে। চোখের কোণে চকচক করছে জল। সমানে বলে চলেছে, "মেয়েমানুষ বলে আমি মানুষ নই? আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম নেই? এ-সংসারের মুখে তবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বার হয়ে যাব।"

স্বামী-স্ত্রীতে কলহ এই প্রথম নয়। এই পাঁচ বছরে সুরমার ক্রোধ মহীতোষ বহুবার দেখেছে। কিন্তু এ তো শুধুই ক্রোধের মূর্তি নয়। সুরমার এ কী সৃষ্টিছাড়া রূপান্তর!

বাক্স থেকে সুরমা তখন জামা-কাপড় শাড়ি-ব্লাউজ সব টেনে টেনে বার করে ফেলে ছড়িয়ে এক তচনচ কাণ্ড শুরু করে দিয়েছে। মেঝের উপর এক এক করে ছুড়ে ফেলল কাগজে মোড়া সংসার খরচের টাকা, লেফাফায় রাখা হাসপাতালে যাবার খরচ, একটা টিনের লম্বা কৌটোয় গোপনে জমানো হাত-ঘড়ির তহবিল।

মহীতোষ ঘাবড়ে গেল। কী যে বলবে, কী যে করবে তা কিছুই ভেবে পায় না। ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। এই সঙ্কটকালে মহীতোষকে ত্রাণ করে দিল অনাদৃত ঘড়িটা। অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

ঘড়িটাকে নিয়ে মহীতোষ ছুটে যায় বারান্দায়। সামনেই এক বালতি জল। সেই বালতির মধ্যে ঘড়িটাকে ডুবিয়ে দিয়ে মহীতোষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

বারান্দার ওদিক থেকে খোকা তার খেলনা ফেলে ছুটে এল আর-এক খেলার আকর্ষণে। বালতির তলা থেকে তখন আকস্মিক নিমজ্জনের বুদ্‌বুদ উঠছে অনবরত।

সুরমাও ঘরে থেকে বারান্দায় এসেছে। বালতির কাছ থেকে ছেলেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে তার দু-হাত মোছাতে মোছাতে ধরা গলায় বলল, "যেয়ো না, দাঁড়াও।"

কণ্ঠস্বর এখন অনেকখানি স্বাভাবিক। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সজল চোখে ভারী গলায় জানালে, "এ-সংসারে, এই বাড়িতে, আমার কথার উপরে আর কারও কথা চলবে না।"

এ-উক্তি সুরমার নয়, মহীতোষের। মহীতোষ কতদিন উচ্ছ্বাসের বশে অপর পক্ষের দাবির অপেক্ষা না রেখেই ঐ অধিকার মেনে নিয়েছে। সুরমা স্বামীর সেই প্রতি-শ্রুতি আজ আর একবার কবুলে করিয়ে নিতে চায়।

"বল, এ-বাড়িতে আমার কথার উপর আর কারও কথা খাটবে না।"

মহীতোষ নির্বাক।

"মনে মনে না মানো, একটিবার মুখেই না হয় মেনে নাও।"

মহীতোষ মেনে নেয়। তার বিমূঢ় নীরবতাই তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বছর তিনেক পূর্বে অন্যত্র আমি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলাম। এই অ্যাসোসিয়েশন বা সভাটি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার অবকাশ আছে। পূর্ব প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপকরণ ব্যতিরেকেও বিস্তর নূতন তথ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব এবং অধুনাপ্রাপ্ত তথ্যসমূহ লইয়া এই সভার একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

গত শতাব্দীর নব-জাগরণ সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আজকাল স্কুল-কলেজে ক্লাবে-সংঘে কতই না বিতর্ক-সভা বা আলোচনা-সমিতির ছড়াছড়ি। এই বিতর্ক-সভাটি ঐ সকল সভা-সমিতির পথিকৃৎ সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এই সভাটি আরও বেশি কিছুর দাবি রাখে, আর এই কারণেই ইহার বিশেষত্ব। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ নব্য শিক্ষালব্ধ বিষয়বস্তুরই শুধু আলোচনা বিতর্ক করিতেন না, তাঁহারা নিজ নিজ জীবনে উহার প্রয়োগের বিষয়ও অহরহ ভাবিতেন, বলিতেন। ইহাতেও ততটা আপত্তি ছিল না, কিন্তু যখন তাঁহারা নব নব ভাবধারা কার্যে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে সমাজ-জীবনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহা কখনও আর পুরাপুরি প্রশমিত হয় নাই। সমাজের বিস্তর পরিবর্তন ঘটাইয়া তবে ইহার খানিকটা সাময়িক নিবৃত্তি হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের আবির্ভাবে এই অ্যাসোসিয়েশনটির দান এত অধিক।

এই সভার বিষয় সম্যক্ অনুধাবন করিতে হইলে তৎকালীন নব্যশিক্ষার কথাও আমাদের কতকটা জানা আবশ্যক। ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া সে যুগে বাঙালীরা কিছু কিছু ইংরেজী শব্দমালা মুখস্থ করিয়া লইত। অবশ্য কেহ কেহ যে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন না হইতেন এমন নহে। তবে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ১৮১৭, ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের কার্যারম্ভের দিবস হইতেই এই নূতন শিক্ষার সূচনা, এইরূপ আমরা ধরিয়া লইতে পারি। এই বৎসরই সুষ্ঠুরূপে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ-ব্যবস্থার নিমিত্ত স্থাপিত হইল কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি। পর বৎসর, ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হয়। সে যুগের পাঠশালা-সমূহের সংস্কার এবং নূতন আদর্শ পাঠশালা স্থাপন এই দুই-ই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। স্কুল-বুক সোসাইটির পরিপূরকরূপেই এটি প্রথম স্থাপিত হয়। উহা দ্বারা প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলি স্কুল সোসাইটির অধীন পাঠশালাগুলিতে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল। আবার এই সব স্কুলের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণই হিন্দু কলেজে গিয়া ভর্তি হইতেন। স্কুল সোসাইটি মেধাবী অথচ নিঃসম্বল ছাত্রদিগের বেতনাদির ব্যয় বহন করিতেন।

হিন্দু কলেজ প্রথমে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় মাত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানদের চেষ্টা-যত্নে ইহা ক্রমে একটি বিশিষ্ট শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। স্কুল সোসাইটি কর্তৃক প্রেরিত ছাত্রগণ কলেজের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ১৮২৩ সনে গবর্নমেণ্ট কলেজটিকে সরকারী সাহায্য-দানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের জন্য ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনকে নিযুক্ত করেন। কলেজের সহিত তাঁহার সংযোগসাধন নব্যশিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উইলসন কলেজের শিক্ষাদান-রীতির আমূল সংস্কার করিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ছাত্রেরা ধাপে ধাপে যাহাতে শিখিতে পারে তাহার আয়োজন হইল। পূর্বে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা নামমাত্র ছিল, যাহা ছিল তাহা না থাকারই সামিল। উইলসন ছাত্রদের গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নেরও সুযোগ করিয়া দিলেন। পাঠে এতাদৃশ সংস্কার সাধনের পর তিন-চারি বৎসরের মধ্যেই ইহার ফল ফলিল। ছাত্রেরা শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি করিতে লাগিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮২৮ সনের আরম্ভেই কলেজ ত্যাগ করেন; তখনই তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির পরিচয় সংবাদপত্র-পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতে লাগিল।

হিন্দু কলেজ ১৮২৬ সনের ১লা মে গোলদিঘির উত্তরে নূতন ভবনে চলিয়া আসে। এইদিনে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক, অধ্যাপনার বিষয় ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস, তাঁহার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার বয়সের ব্যবধান খুবই কম। এই বয়সেই তিনি কবি ও সাংবাদিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। একখানি ইংরেজী কবিতার বইও তিনি অবিলম্বে বাহির করেন। কলেজের পাঠপ্রণালী ইতিপূর্বে সংস্কৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল; এখন কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর যোগদান যেন সোনায় সোহাগা হইল। শিক্ষাপ্রণালী ও পাণ্ডিত্য উভয়ে মিলিয়া ডিরোজিওকে সত্বর একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী করিয়া তুলিল। তিনি যে যে শ্রেণীতে পড়াইতেন তাঁহারা তো তাঁহার অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইতেনই, উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও আসিয়া সেখানে ভিড় জমাইতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক তখন উচ্চতর শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন; রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র। ইঁহারা অনেকেই কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কলার; অর্থাৎ, স্কুল সোসাইটি এই সময়ে যে ত্রিশজন মেধাবী ছাত্রের কলেজী শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেছিলেন তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কলেজেও তাঁহারা আদর্শ ছাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহাদের দ্বারা কলেজের গৌরব যে কতখানি বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা সহজে পরিমাপ করা যায় না। ডিরোজিওকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল ছাত্র

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

কবে এই অ্যাসোসিয়েশনটি স্থাপিত হইয়াছিল? ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, ১৮২৮ কি ১৮২৯ সনে। তিনি স্মৃতি হইতে সম্ভবত সঠিক সনটির কথা বলিতে পারেন নাই। তবে এই দুই সনের মধ্যে যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ছাপা রিপোর্ট বা কার্যবিবরণী প্রকাশিত করিতেন। প্রতি বৎসর এই রিপোর্ট ছাপা হইত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, দেখিতেছি, পঞ্চম রিপোর্টে ১৮২৮ সন পর্যন্ত বৎসর তিনেকের কার্যবিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কলেজের সঙ্গে সোসাইটির ঘনিষ্ঠ যোগ। কার্যবিবরণে সোসাইটি-প্রেরিত উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষ এবং শিক্ষানুগ কার্যকলাপের সম্বন্ধেও তথ্যাদি প্রদত্ত হয়। সোসাইটি এই বিষয়ে অষ্টম রিপোর্টে লেখেন:

"Many of the young gentlemen appear very properly to appreciate the value of knowledge, and are endeavouring to improve themselves as much as possible. they have formed societies amongst their friends at some of which they debate and read essays of their own composition on literary subjects, and at others read and study English books and translate into Bengalee. They are at present employed in translating the Elements of General History, the wonders of the World and the Grammar of History."

এখানে পরিষ্কার বলা হইল যে, ছাত্রগণ ক্লাব বা সোসাইটি স্থাপন করিয়াছেন। কোন কোন সভায় নানা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইত; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রগণ মিলিয়া মিশিয়া ইংরেজী পুস্তকসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। এই প্রথম আমরা ছাত্রদের ডিবেটিং সোসাইটি বা বিতর্কসভার উল্লেখ পাইতেছি। কাজেই, ১৮২৮ সন নাগাদ যে এই ছাত্রগণই অ্যাকাডেমিক-অ্যাসোসিয়েশন বা বিতর্কসভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ধারণা অধিকতর দৃঢ়ীভূত হয় যখন প্রায় তিন বৎসরের পরবর্তী একটি বিবরণে ঐ সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৮ সন নাগাদ প্রতিষ্ঠিত বিতর্কসভার নিম্নরূপ উল্লেখ পাই:

"Not quite three years have past since an association was formed of the principal students of the Hindoo College, which met there once a fortnight for literary discussions. Notwithstanding the ability displayed by some members, and the propriety with which the proceedings were conducted, the institution was nipped in the bud, chiefly by the interference of the managers of the seminary...."
(John Bull, Dec. 11, 1830).

উদ্ধৃত অংশে বলা হইতেছে যে, তিন বৎসর তখনও পূর্ণ হয় নাই, যে সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা একটি বিতর্কসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভার অধিবেশন হইত প্রতি পক্ষে একবার। সাহিত্য বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত। সভায় সদস্যদের জ্ঞান-সামর্থ্য প্রকাশ পাইত, কার্যও যথাযোগ্যভাবে নির্বাহিত হইত; কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষগণের প্রতিবন্ধকতায় বেশি দিন না যাইতেই ইহার বিলোপ সাধন ঘটে। এই উক্তির কোন কোন অংশের যাথার্থ্য যাচাই করিয়া লইবার উপায় দেখি না। এই সময়ে ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা এবং ইহার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সভা-সমিতি সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবের কথা তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যপ্রমুখাৎ এখানে বলিব। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে, পাদরী কৃষ্ণমোহন) ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না; তথাপি তিনি ডিরোজিওর উপদেশ এবং বক্তৃতাদির দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ জানিতে পাই:

"এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন (Metaphysics) আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সহকারী শিক্ষক মিঃ এইচ এল ভি ডিরোজিও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকটে কখন পড়েন নাই, তিনি এই সময়ে কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকেও ডিরোজিও-প্রবর্তিত আলোচনার ছোঁয়া লাগে; এবং তিনি নব্য হিন্দু-সংস্কারক দলে যোগ দিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সকল যুবক আপনাদের সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত হন এবং ঘোষণা

করেন তাঁহাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল্ পৌত্তলিকতার বিলোপসাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরই জোর দিতেন।... তাঁহারা সকল প্রকার পাপকর্ম এবং মনুষ্য-প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।......"

(The India Review, Oct. 1842):

সুবিখ্যাত রাধানাথ শিকদার কলেজে ডিরোজিওর নিকট পড়িয়াছেন। তাঁহার অভিমতও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আত্মজীবনীতে রাধানাথ এই মর্মে লিখিয়াছেন:

"ডিরোজিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিবেচক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়মিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, উন্নতির নানা জল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যাহা সমাজের শিক্ষিতসাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায়—এসকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"

(আর্যদর্শন, কার্তিক, ১৮৯১)

সে যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং সমাজ-কর্মী প্যারীচাঁদ মিত্রও ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের এবং সতীর্থদের উপর ডিরোজিও-শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে তিনিও এইরূপ সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

Of all the teachers Mr. H. L. V. Derozio gave the greatest impetus to free discussions on all subjects, social, moral and religious. He was himself a free thinker, and possessed affable manners. He encouraged students to come and open their minds to him. The advanced students of the Hindu College frequently sought for his company during tiffin time, after school hours, and at his house. He encouraged everyone to speak out. This led to free exchange of thought and reading of books which otherwise would not have been read. These books were chiefly poetical, metaphysical and religious." (A Biographical Sketch of David Hare. 1877. Pp. 16-7).

সংক্ষিপ্ত হইলেও প্যারীচাঁদ ডিরোজিও-শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। ডিরোজিওর অমায়িক ব্যবহার তাঁহার দিকে ছেলেদের স্বতঃই আকর্ষণ করিত। সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে ডিরোজিও উৎসাহ দিতেন, তিনি ছিলেন একজন 'ফ্রি থিঙ্কার'। কলেজে টিফিনের সময়, ছুটির পরে এবং তাঁহার নিজের গৃহেও ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। ডিরোজিওর নির্দেশে ছাত্রদল জ্ঞানগর্ভ পুস্তকসমূহ পাঠে লিপ্ত হইতেন। কাব্য,

র্শন, ধর্ম—সব বিষয়েই পুস্তক তাহারা পাঠ করিতেন। ইহার পরেই প্যারীচাঁদ লেখেন:

"It was at last proposed t. establish, in 1828 or 1829, a debat ng club, called the academic asso ciation, at the house now occupi by the Wards' Institution."

অর্থাৎ, এইসব আলাপ-আলোচনা, অধ্যয়ন-অনুধ্যানের পরেই ১৮২৮ কি ১৮২৯ সনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামীয় বিতর্ক-সভা স্থাপিত হয়। ১৮২৮ সনেই যে এই সভা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। সভা প্রথমে প্যারীচাঁদ উক্ত ভবনে, অর্থাৎ মানিকতলায় হিন্দু কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে বসিত না। প্রথমে সভাস্থল ছিল লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত ডিরোজিওর নিজ বাসভবনে। এখন যেখানে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি স্ট্রীট লোয়ার সারকুলার রোডের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার সন্নিকট ছিল ডিরোজিওর বাড়ি। পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলাস্থ বাগানবাড়িতে উহা উঠিয়া যায়। এখন এই অঞ্চল ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন স্ট্রীটের মধ্যে পড়িয়াছে। কলেজের উচ্চশ্রেণীসমূহের ছাত্রগণ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ং ইহার সদস্য ছিলেন। আরও বিশেষ কয়েকজন সদস্যের নাম তিনি এইরূপ দিয়াছেন: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতি। ডেভিড হেয়ার নিয়মিতভাবে সভার অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হইতেন। বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বড়লাট বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল বেনসন, ডব্লিউ ডব্লিউ বার্ড (পরবর্তীকালের ডেপুটি গবর্নর) প্রমুখ বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মধ্যে মধ্যে সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে এবম্বিধ আলোচনায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি সভার কার্য নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিতেন।

সভায় কি কি বিষয় আলোচনা হইত, তাহা জানিতে আমাদের ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। ডিরোজিওর জীবনীকার এ সম্বন্ধে লেখেন:—

"No doubt, in the meetings of the Academic Associtaion and in the social circle that gathered round his hospitable table in the old house in Circular Road, subjects were broached and discussed with freedom, which could not have been approached in the class-room. Free-will, free-ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid....Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry, and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to the very depth the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta." (Henry Derozio. By Thomas Edwards, 1884. P. 32).

এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনগুলিতে মনুষ্য-জীবন ও সমাজ সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইত। সত্য, ন্যায়, প্রত্যয়, স্বাধীন চিন্তা, স্বদেশপ্রেম হইতে শুরু করিয়া হিন্দুর পৌত্তলিকতা সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি পর্যন্ত কোনটির আলোচনা ইহা হইতে বাদ যাইত না। তাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার বা জাতিবিচার কিছুই মানিতে অসম্মত হইলেন। পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া খৃষ্টান পাদরীগণ বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিতেন, শুধু পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। কলেজের ছাত্রগণ যুক্তিবাদী; তাঁহারা একদিকে যেমন পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন করিতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রচলিত খৃষ্টধর্মেরও বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণমোহনের জীবনীতে আমরা পাই:

"হিন্দুধর্মের ন্যায় খৃষ্টধর্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহন কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খৃষ্টান পাদরীদের নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা গসপেল প্রচারের ভান করিতেন, কখনও পাদরীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করিতেন, তখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও ব্যাকরণ প্রভৃতির ভুল প্রয়োগ দর্শাইয়া দিতেন।"

সভাক্ষেত্রে এবং প্রকাশ্যে শুধু ধর্মের ব্যবহারিক দিকের নিন্দাবাদ করিয়াই ছাত্রগণ নিরস্ত হইতেন না, তাঁহারা তাঁহাদের এবম্প্রকার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য শীঘ্র একখানি মুখপত্রও বাহির করিলে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০)। এই সংবাদপত্রখানির নাম 'পার্থিনন'। ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে ডাঃ উইলসন ইহা বন্ধ করিয়া দেন। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের পক্ষ হইতে কয়েক বৎসর পরে বলা হইয়াছে:

"আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির [ডিরোজিও] সাহায্যে 'পার্থিনন' নাম ইংরাজি সমাচার পত্র বাঙ্গালীদিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ১[ম] সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভারতবর্ষে বাস—এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দু ধর্ম এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শনমাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত্য তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও প্রাপকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দ মণ্ডলীস্থ অনেক লোক ভীত হইয়াছিল......।"

((Tre Bengal Spectator, 1st. September, 1843).

প্রাচীনপন্থী হিন্দু অভিভাবকগণ সত্য-সত্যই ভীত হইলেন। "তৎকালে বাংগলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি বিস্কুট আহার করা-রূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকাশিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার, কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহারদিগের প্রাণ পর্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।" কলেজকর্তৃপক্ষও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ১৮৩০ সনেই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দুইখানি সার্কুলার-পত্র জারি করিলেন। প্রথমখানিতে শিক্ষকগণের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল যেন তাঁহারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অথবা হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণ—খাদ্যাখাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্রদের সংগে আলোচনায় নিরত না হন। যাঁহারা এই নির্দেশ মানিবেন না, তাঁহাদিগকে কলেজের কার্য হইতে অপসৃত করা হইবে। ছাত্রদের প্রতি হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার নির্দেশ আরো স্পষ্ট। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের নাম উল্লেখ না করিলেও, এই সভাতেই যে ধর্ম ও রাজনীতিমূলক আলোচনা চলিত, উক্ত সার্কুলার পত্রের ভিতরে তাহার ইংগিত রহিয়াছেঃ

"The Management of the Anglo-Indian College, having heard that several of the students are in the habit of attending Societies at which political and religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice and to prohibit its continuance. Any student being present at such a society after the promulgation of this order will incur their serious displeasure."

(The Proceedings of the Hindoo College Managing Committee. Unpublished).

এই সার্কুলার-পত্রে একাধিক সভার উল্লেখ পাই। বস্তুত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে তখন আরও বহু বিতর্ক-সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সব সভায় সাহিত্য ব্যতিরেকে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা চলিত। ডেভিড হেয়ারের পটলডাংগা স্কুলে ডিরোজিও দর্শন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতাও এই সময় দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা ছিল দর্শন বিষয়ে। তবে সমাজের বাস্তব অবস্থার সমালোচনাও যে ইহাতে ছিল না তাহা নহে। এইসব বক্তৃতায় কলেজের ছাত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদলও যোগ দিতেন। প্রতিবারে প্রায় দেড় শতজন ছাত্র-শ্রোতা বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত থাকিতেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রসংগে এই বক্তৃতামালার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। বাস্তবিক এই দুইটির মাধ্যমেই ডিরোজিও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কলেজের ছাত্র-সভ্যদের পূর্বোল্লিখিত বিবরণে আছেঃ

"ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগকে সদাসর্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হেয়ার সাহেবের স্কুলে লেকচার অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউশন | এসোসিয়েশন | নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষতঃ অতি-সুখপাঠ্য অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য বোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভান্বিত হইয়া আছে।"

১৮৩০ সন নাগাদ ডিরোজিওর শিক্ষায়, তাঁহার বক্তৃতার মাধ্যমে এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও বিতর্ক মারফৎ কলেজের ছাত্রদের মনে অভূতপূর্ব কর্মপ্রেরণা জাগে, এবং তাহার জন্য তাঁহারা নানারূপ নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করিতে থাকেন। নব্যশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের মনে কর্মৈষণা উদ্রেকের আরও কিছু কিছু কারণ ঘটে এই সময়ে। বড়লাট বেণ্টিংক ১৮২৯ সনে বহুনিন্দিত সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা রহিত করেন। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা তখনই সুবিদিত ছিল। নারীর অধিকার সম্পর্কে তিনি পূর্বেই অনুকূল আলোচনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে নারীজাতির কল্যাণ নাই—এ কথাও তাঁহার রচনায় প্রকাশিত হয়। ডিরোজিও 'সতী' শীর্ষে একটি দীর্ঘ ইংরেজি কবিতায় নারীর অধিকার, শিক্ষা ও দুঃখদুর্দশা প্রভৃতি

বিষয় মর্মস্পর্শী অথচ সুললিত ভাষায় বিবৃত করেন। হিন্দু কলেজের যুব ছাত্রদল এই সকল দ্বারাও বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

তখন ইংরেজি শিক্ষা কথঞ্চিৎ প্রসারলাভের সুযোগও ঘটিয়াছে। হিন্দু কলেজ ব্যতিরেকে রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুল, সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ছাত্রদল রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা পাইতেছিলেন। ১৮৩০ সনে শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন যে, পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরে যাহা না হইয়াছে, গত দশ বৎসরে তাহার অধিকসংখ্যক লোক ইংরেজি শিক্ষালাভ করিয়া ঐ সাহিত্যে পারঙ্গম হইয়াছেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে ছাত্রদলের মধ্যে সভা-সমিতির সংখ্যাও বিস্তর বাড়িয়াছে, প্রতি সপ্তাহে বা পক্ষে ছাত্রগণ সভায় মিলিত হইয়া শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন, অথবা বক্তৃতা করেন। ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সভা-সমিতিতেও তিনি যোগ দিতেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট আদর্শে এসকল সভার কার্য সম্পাদিত হইত। ডিরোজিও তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যমণি। ছাত্রগণ সভা-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত নন, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, লিটারারি গেজেট প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও তাঁহাদের রচনা বাহির হইতে শুরু হয়। এই সকল কথা বর্ণনা করিয়া 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ এক ব্যক্তি একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর ১৮৩০ দিবসীয় 'জন বুল'-এ তাহা উদ্ধৃত হয়। এই পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বাংলা ভাষার অনুশীলনের জন্যও তখন দুই-তিনটি সভা স্থাপিত হইয়াছিলঃ

"The spirit of union has spread itself, and in the course of a short time a great number of literary societies have been formed in Calcutta, consisting principally of the former and present leading students of the Hindu College, the School Society's English school, and the seminary generally known by the name of Ram Mohun Roy's school. It has been ascertained upon enquiry that seven associations of this kind are now in existence, the proceedings of which are conducted exclusively in the English language. Most of them meet once a week, and some at longer intervals, for discussing questions in literature and science; and sometime in politics; the number of members belonging to each varies from 17 to 50. At some of the societies written essays are produced, which become the subjects of discussion; at one of them lectures on intellectual philosophy are delivered in rotation by the members, and, at another, by the president, an East Indian gentleman (Derozio) of great talents, whose name has been for some time familiar to the public ear as the author of some interesting poems. ..Not content with a conscientious discharge of his duties as a teacher of the College, he devotes his care and his talents during a very considerable part of his time out of school, to the improvement not only of those immediately placed under his tuition, but of all such native young men as come within his reach. He is connected with one society [Academic Association] only as president, but with most of the others as a member. In short he lends a very able and active hand in raising the intellectual character of the native youths....The example thus set in English has been imitated in Bengali literature, and two or three associations have been formed principally of persons not connected with the schools above mentioned, for writing upon and verbally discussing various subjects exclusively in the Bengali language."

ডিরোজিও-শিক্ষার প্রভাব এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেরণা শুধু নব্য-শিক্ষিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, এমনকি বাংলা সাহিত্য-অনুশীলনকারীদেরও এই-সকল বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা পরিমাপ করা যায় না। অনতিবিলম্বে তাঁহাদের কৃতিত্ব দর্শনে ডিরোজিও সত্যসত্যই কতকটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কৃতী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি একেবারে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, ফুলের পাপড়ির মত ছাত্রদলের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয় একে একে একদিন বিকশিত হইবে; তিনি হয়ত এসকল দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি এই আশা লইয়া যাইবেন যে, তাঁহার জীবন-

ধারণ বৃথা হয় নাই। এইসব ভাব ডিরোজিও একটি চতুর্দশপদী কবিতায় মধুর ছন্দে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ডিরোজিওর ছাত্রদল সত্যপ্রিয়, যুক্তিবাদী, কিন্তু ভাবপ্রবণ। তাঁহারা আগামী কালকে তখনই কর্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, আর এইখানেই যত বিপদ দেখা দিল। প্রাচীন-পন্থী সমাজ ইহা সহ্য করিতে পারিল না। নিজ নিজ অভিভাবকের হস্তে ছাত্রদলের অনেকে কিরূপে নির্যাতিত হইতে থাকেন, তাহার কতকটা আভাস আমরা একটু আগেই পাইয়াছি। ছাত্রদল তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি-মতে যতই কার্য করিতে অগ্রসর হইলেন, ততই তাঁহারা প্রবীণদের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার হিন্দু প্রধানেরা সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করেন। ইহার স্মারক-স্বরূপ তাঁহার একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনে উদ্যত হইলে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কলেজের মূল পরিচালক ডেভিড হেয়ারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১)। কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে অগ্রণী হইলেন। কলিকাতার সমুদয় ছাত্রসমাজই তাঁহাদের সপক্ষে ছিল এবং এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহারা যথাসাধ্য সহায়তা করে। কিন্তু ইহাতেও প্রবীণেরা চটিয়াছিলেন; পরে কলেজের ছাত্রদের কাহারও কাহারও তরফে এমন কতকগুলি গর্হিত কার্য (অবশ্য প্রাচীনদের মতে) সংঘটিত হইল যাহাতে প্রাচীন সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, এবং কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ডিরোজিওকে এইসব কার্যের জন্য দায়ী করিয়া হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা-পদ হইতে অপসারিত করিলেন (২৫শে এপ্রিল ১৮৩১)। এসময় ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন এবং ডিরোজিওর মধ্যে পত্র-বিনিময় হয়। যুবজনের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই পত্রগুলি পড়িয়া দেখিতে বলি।

ডিরোজিও তথা অ্যাকাডেমিক অ্যাসো-সিয়েশনের প্রভাবে ছাত্রদল নানাভাবে স্বদেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্প-বাণিজ্যে উদ্যোগী, রাজনৈতিক কর্মী, সত্য-সন্ধ সরকারী কর্মচারী নানা রূপেই তাঁহারা পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহাদের বাগ্মিতাশক্তিরও যথেষ্ট স্ফুরণ হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই অ্যাসো-সিয়শনকে কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র-সংসদগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে 'পেট্রিয়ট' (২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮) এই বিষয়টির পরিষ্কার উল্লেখ করেন:

"What the Oxford and Cambridge Clubs are to those universities, the Academic Association was to the old Hindu College. As the greatest senators and statesmen of England cultivate oratory in those clubs, so did the first alumni of the Hindu College, who have in after-life so eminently distinguished themselves, cultivated their debating powers in that Association."

হিন্দু কলেজ হইতে অপসারণের (২৫শে এপ্রিল ১৮৩১) কয়েক মাস পরেই ডিরোজিওর মৃত্যু (৩১শে ডিসেম্বর ১৮৩১) ঘটে। তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণও একে একে কলেজ ত্যাগ করিয়া জীবনের বৃহত্তর কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্য ইহার পরও কিছুকাল রীতিমত চলিতেছিল। ১৮৩৪ সনের মাঝামাঝি ডিরোজিওর কৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয়তারও উল্লেখ পাই। ৫ই জুন ১৮৩৪ সনের 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রে "A Friend to the College" অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন:

"The Academic Association, another extremely useful institu tion, which has attracted the attention and elicited the applause of the first gentlemen of the place, was founded and fostered during his time and by him; and despite the various efforts made to crush it at its bud, the spirit that animated its founder, continues to guide its operation to this day."

কলেজের প্রাক্তন ও তৎকালীন যুব ছাত্রগণ এই অ্যাসোসিয়েশনটিকে আরও কয়েক বৎসর পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব গৌরব আর তেমন রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, ডিরোজিও-ছাত্রগণ বিবিধ কর্মে লিপ্ত হন, এবং অনেকে কর্মব্যপদেশে বিভিন্ন স্থলে যাইতে থাকেন। যাঁহারা কলিকাতায় রহিলেন না তাঁহাদের পক্ষে ইহার সঙ্গে যোগ রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। তবে জ্ঞানানুশীলনের জন্য বয়স্ক নব্য-শিক্ষিতেরা সভা-সমিতিও নূতন করিয়া স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। সর্বতত্ত্ব-দীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা—পর পর স্থাপিত হয়। মূল কার্যবিবরণীসমূহের উপর নির্ভর করিয়া আমি শেষোক্ত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ১৮৩৯ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বজায় ছিল, ইহার প্রমাণ আছে। অ্যাসো-সিয়েশনের একজন প্রধান সদস্য রাম-গোপাল ঘোষ ইহার অন্যতম সদস্য গোবিন্দ-চন্দ্র বসাককে ১৮৩৯ সনের ৩১শে মার্চ কলিকাতা হইতে এক পত্রে লেখেন:

"The last meeting of the A-A. [Academic Association] was held yesterday night, and we fortunately had a discussion which took place after three successive meetings having failed. The attendance was thin, and the speaking very ordinary. I have little hope of the revival of the palmy days of this Association." (**A General Biography of Bengal Celebrities.**—Ramgopal Sanyal. 1889. P. 177).

ডিরোজিও তথা অ্যাকাডেমিক অ্যাসো-সিয়েশনের ভাবাদর্শ ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইহার সদস্যগণ—তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষও আছেন—পরে এইরূপ লিখিয়াছেন:

"উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম ২ রীতি-নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য প্রীতি তাবদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে, তদ্দৃষ্টে সকলেরই অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতিবর্ত্ম শীঘ্রই পরি-বর্তন হইবেক।......"

(The Bengal Spectator, 1st. September, 1843.

এই অনুমান সার্থক হইয়াছিল।

ষ্টি এখনও নামেনি। আকাশের যেরকম অবস্থা, এখন নামবে, সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবে একেবারে।

সকাল থেকে যে ইলশে-গুঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, সেই ভাবটা চলছে এখনও। চারিদিক ঝাপসা। সত্যিই মনে হয়, মেঘ যেন গুঁড়ো হয়ে আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে; খুদে খুদে জলের কণা এক-একবার হাওয়ার ঝাপটায় তোড়ের উপর এসে পড়ছে গায়ে, পুরোপুরি ভিজিয়ে না দিলেও জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে করে দিচ্ছে।

কিনারা থেকে প্রায় তের-চোদ্দ হাত ভিতর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে মাচাটা বাঁধা হয়েছে। যারা মাছ ধরে, ছাতা মাথায় দিয়েই ধরে। তবে নায়েব মশাইয়ের ছেলের শখ, মাচার শেষ দিকটায় একটা ছোট্ট চালা তুলে দেওয়া হয়েছে। নায়েব মশাইয়ের ছেলে হরিবিলাস হুইলের ছিপ পেতে মাছ ধরছে।

মনটা কিন্তু মাছের দিকে পড়ে আছে বলে বোধ হয় না। ইলশে-গুঁড়ির কুয়াশায় চারিদিক মুছে একাকার করে দিয়েছে, পিছন দিকে কাছারি-বাড়ির একটা সাদা আবছায়া, কুয়াশাটাই যেন জমাট হয়ে উঠেছে; সামনে বিলটা হাত কয়েক পরেই নিশ্চিহ্ন, তবু হরিবিলাসের চোখ দুটো যেন ঘুরে ঘুরে কাকে খুঁজছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ফাঁক হতে ছিপে এক একটা করে টান দিচ্ছে বটে, মাছ কিন্তু তখন টোপ মুখে করে বিলের একেবারে মাঝামাঝি।

অবশেষে মাচাটা একটু দুলে উঠল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দও উঠল গোড়ার দিকে; ফাতনাটা বার কতক গোত্তা দিয়ে আবার ভেসে উঠেছে। কষে টান মারবার মোকা একটা। হরিবিলাস কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে ঘুরে চাইল পিছনে, প্রশ্ন করল, "রাখাল নাকি? এত দেরি হল যে?"

মাচার উপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে রাখাল চালাটার নীচে এসে পাশটিতে বসল। বলল, "হয়ে গেল একটু দেরি। বাদুলে মেঘ, শরীরটা আবার একটু খ্যাতখ্যাত করছে বলছিল। বলে, দাদা, তুমি একটু বস কাছটিতে।"

হরিবিলাস ব্যস্ত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করল, "খ্যাতখ্যাত করছে মানে? জ্বরটর হয় নি ত?"

রাখাল বলল, "না জ্বর নয়। একটু নোনা ধাত ত, বার্ষে লাগলে কেমন যেন একটু এলিয়ে পড়ে ছেলেবেলা থেকেই।"

"এলিয়ে পড়ে, তা চিকিৎসা হয় না কিছু? তোমরা দেখছি এসব দিকে বেশ একটু গাফিল আছ।"

"চিকিৎসা আছে, করাও হয় তাই। তা সে ত ওষুধপত্র নয়। একটু গরগরে করে ঝালমশলা দিয়ে খানকতক মাছের দাগা, কিম্বা গরম গরম মাংসের সুরুয়া একটু; সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা করে দেয়; নোনা ধাত কিনা। তা মাছ ত দেখছি আপনি গাঁথতে পারেননি একটাও।"

হরিবিলাস ছিপটা টেনে তুলল। বঁড়শি তিনটেই পরিষ্কার। টোপ পরাতে পরাতে বলল, "খাচ্ছে কৈ তেমন জুত করে?"

রাখাল একটু বোকার মত হেসে বললে, "এর চেয়ে আর কত জুত করে খাবে? আসলে টের পেয়েছে শহুরে মানুষ, ওরা টানেই টের পায় কিনা। পড়ত আমার হাতে—"

হরিবিলাসও একটু হাসল। বলল, "ঠাট্টা হচ্ছে?" যেন উপভোগ করছে এই-ভাবে বলল, "বেশ, হক।" তারপরেই আবার একটু বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল; বলল, "কিন্তু কখন তোমার হাতের টান বুঝে মাছ আত্মসমর্পণ করবে তার ভরসায় থাকলে চলবে? বর্ষার ভাবটা ত এদিকে বেড়েই যাচ্ছে।...আমি বলছিলাম মাংসের ব্যবস্থাই না হয় করলে হত না একটু?"

"একটা মানুষের জন্যে? পোঁটাকও বোধ হয় টানতে পারবে না।"

"কেন, আর খাবার মানুষ নেই? এমন চমৎকার বাদুলে দিন, পাঁটা বেটারা জন্মেছে কী করতে। হারাধন পাইককে ডেকে নিয়ে এস আমার ঘরে। একটা কচি দেখে কিনে নিয়ে আসুক গাঁ থেকে।"

হুইলে সুতো গোটাতে গোটাতে উঠে পড়ল।

গোড়ার দিক থেকে না বললে সবটুকু পরিষ্কার হবে না। একটু বিশদ করেই বলা ভাল তাহলে।

এক একটা পরীক্ষা দিয়ে ওঠার পর ছেলেরা সময় নিয়ে প্রশ্নপত্র যেন একটা,

সমস্যায় পড়ে যায়। একেবারে অতটা আত্ম-নিরোধের পর অতখানি মুক্তি, যেন থৈ পেয়ে ওঠে না। তারপর আবার আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে। লক্ষ্য করলে এরও বেশ একটি পদ্ধতি বাঁধা আছে বলে মনে হয়।

ম্যাট্রিক দেওয়ার পর ঝোঁকটা যায় ঘুরে ফিরে বেড়ানোর দিকে। তার কারণ স্কুলের ঐ টানা কয়েকটা বছর ছেলেদের সবচেয়ে বেশি করে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়; সুযোগের অভাব, তার উপর বয়সটাও স্বাধীনতার পরিপন্থী, ম্যাট্রিকের দরজার বাইরে পা দিতেই দিক-চক্রটা হঠাৎ যেন বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে, টানে হাতছানি দিয়ে।

ইণ্টারমিডিয়েটের পর এ-ভাবটা কমে আসে। কলেজের খানিকটা মুক্ত জীবনে অনেকখানি দেখেছে শুনেছে ছেলে; ঠিক ওরকম অজ্ঞ, আদেখলে ভাবটা নেই। খানিকটা গাম্ভীর্যও এসেছে জীবনে, মন একটা বিশেষ দিক ধরে এগুতে শিখেছে। সময়টা যে হাতে এল, সেটাকে কতকটা সুপরিকল্পিত ভাবেই কাজে লাগাতে পারছে। কোনও কাজের মত কাজে, কিংবা কোন শখের কাজেই, এমন কি ঘুরে ফিরে বেড়ানতেও; শুধু সে-ঘোরাফেরার একটা অনির্দিষ্ট এলোমেলো ভাব নেই আর।

বি এ পরীক্ষা যখন দিয়ে উঠল, তখন একটা আমূলে পরিবর্তন এসে গেছে জীবনে। এদিককার যা দেখার তা বেশ খানিকটা দেখে শুনে নিয়েছে; খানিকটা পুরনো হয়ে গেছে, তাই জীবনের এদিকটা অনেকখানি সুনির্দিষ্ট, সুসংহত। তাই এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেরা একটা একেবারেই নূতন পথে পা বাড়াবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। বয়সটাও ততদিনে হয়ে উঠেছে অনুকূল, মনে রং ধরতে আরম্ভ করেছে; বি এ পরীক্ষা দেওয়ার পরের ঢালা অবসরটা ছেলেরা যতটা পারে রোমান্স দিয়ে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করে।

হরিবিলাসও করবে বলে ঠিক করল। বাড়িতে চারিদিকের ভিড়ের মধ্যে রোমান্স চর্চা করতে যাওয়ায় পদে পদে প্রতিবন্ধক, হরিবিলাস অন্য পরিবেশ বেছে নিল। ওর বাবা মথুরানাথ জমিদারের নায়েব। সুদূর এক পাড়াগাঁয়ে জমিদারের কাছারি-বাড়ি। সেইখানেই থাকেন; একাই। হরিবিলাস লিখে দিল, পরীক্ষার পড়ার চাপে শরীরটা একটু ভেঙে পড়েছে, দিন কতক গিয়ে থাকতে চায়। মথুরানাথ খুশীই হলেন। এর আগে একবার নিয়ে এসেছিলেন ছেলেকে, সেই স্কুলের যুগে, তারপর এত-দিন ধরে আর আতঙ্কটা কাটাতে পারেননি। চিঠি পেয়ে স্টেশনে একটা হাতি পাঠিয়ে দিলেন, হরিবিলাস এসে উপস্থিত হল।

স্কুলের যুগের মনটা যখন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত, তখন জায়গাটা যতই মন্দ মনে হক, হরিবিলাস দেখল মনের এই পরি-বর্তিত অবস্থায় বাছাইটা তার বেশ ভালই হয়েছে। শ্রীপুরের একদিক দিয়ে ইছামতী নদী। একটা বড় বাঁকের পাশে, নদী থেকে একটু সরে একটা খুব বড় বিল। নদীরই পুরনো খাত। তারই ধারে কাছারি-বাড়ি। কাছারি থেকে বেশ খানিকটা সরে শ্রীপুর গ্রাম, পাশে বিল, সামনে নদী। সুবিধামত দুটোই ব্যবহার করে গাঁয়ের লোকে, যার যেটা কাছে হয়। কেউ স্নান করে, কেউ জল ভরে নিয়ে যায়, ছেলেরা সাঁতার কাটে, রাখালেরা গোরুর পাল নামিয়ে দেয়, মাঝি জমায় খেয়ার পাড়ি। দুটি জলাশয়কে আশ্রয় করে ছোট্ট গ্রামটি সমস্ত দিন চঞ্চল হয়ে থাকে। পড়ার ভাবনা গিয়ে একটা যে নূতন চিন্তা মনে উঁকি মারছে তাতে পক্ষাবৃত করে পুষ্ট করে তুলবার বেশ চমৎকার একটি পরিবেশ।

এর উপর বিধিও হলেন অনুকূল। আসার দিন দুই পরেই এমন একটা ব্যাপার হল, যাতে হরিবিলাসের আর নিছক চিন্তা নিয়েই কাটাতে হল না, একটা নিরেট অবলম্বন পাওয়া গেল।

কাছারি-বাড়ির উত্তর দিকের অংশটায় মথুরানাথের বাসা। এই অংশটার উত্তর দিকের বারান্দায় বসলে বিল, আর পাশে গ্রাম, তার সামনে ইছামতীর বাঁক এক নজরে বেশ খানিকটা দেখা যায়। তাই দেখছিল হরিবিলাস। বিকেল বেলা, রোদটা হলদে হয়ে এসেছে, তারই আভায় বোধ হয় কাউকে গ্রামের কোথাও বসিয়ে বা চলা ফেরা করিয়ে কোন স্বপ্ন রচনা করছিল। এমন সময় দেখল, বিলের যেখানটা ঘাটের মত ব্যবহার করে গাঁয়ের লোকে, তার খানিকটা উপরে পাকুড় গাছের ভাঙা বাঁধানো চাতালটায় একটি বছর বার-তেরর মেয়ে এসে হাতের কলসীটা নীচে নামিয়ে বসল। একলাই। গাঁয়ের মেয়েরা আসেনি এখনও, একটি যুবতী যে জল নিতে নেমেছিল, ঘড়া ভরে নিয়ে কাঁকালে বসিয়ে ডাঙায় উঠল, পাকুড় গাছের সামনাসামনি এসে মেয়েটির দিকে ঘুরে কী বলল, কী একটা উত্তর হল, তারপর আবার দুলতে দুলতে উঠে গ্রামের দিকে চলে গেল। এ-মেয়েটি বসেই রইল। নীচে থেকে খড়-কুটো কী একটা খুঁটে নিয়ে অলস ভাবে দাঁতে কাটতে লাগল, আর পা দুলিয়ে দুলিয়ে চাতালে গোড়ালি দুটো ঠুকতে লাগল, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রামের দিকে চেয়ে দেখছে।

কিছুক্ষণ গেল, তারপরেই হঠাৎ মেয়েটি চাতাল থেকে পিছনে নেমে পড়ে কলসীটা দুহাতে চেপে ধরে কতকটা যেন রোখের সঙ্গেই উপরের দিকে চেয়ে রইল। কারণটা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল। একটি ছেলে তীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হনহন করে নেমে আসছে। ঢালু মুখে গতিবেগ আরও

বেড়েছে। এসেই কলসীটা চেপে ধরল। একটু কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কলসীটা নিয়ে। ছেলেটিই অবশ্য জিতল, বিলে নেমে কলসীটা ভরে নিয়ে ডান হাতে কানাটা ধরে উপরে উঠে গেল। তারপর অদৃশ্যও হয়ে গেল। বেশ খানিকটা দূরে; মনে হল পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে ভেংচে কাটল, তারপর হেলতে দুলতে ভারী চালে যেন মুখটা গোঁজ করেই উঠে গেল।

সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যার আলো একটুও আকাশে লেগে রইল, হরিবিলাস একভাবে এক জায়গায় রইল বসে। এক কলসী জলেই একটা গৃহস্থের প্রয়োজন মিটে যায় কখনও?

বিলের তীর যখন অন্ধকারে মিশে গেছে, গ্রামের শেষ কলসীটি হয়ে গেছে ভরা, তখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল হরিবিলাস।

দীর্ঘনিঃশ্বাস এই জন্য যে, এক কলসীতেই মিটে গেছে গৃহস্থের প্রয়োজন, নয়ত যার সন্ধানে এত কষ্ট করে আসা শ্রীপুরে, তাকে ও পেয়েই গেছে হরিবিলাস।

ছেলেটিকে চেনে। আলাপ নেই। তবে দুদিন সে এসেছে, দুদিনই সকালে কাছারি-বাড়িতে দেখেছে। তার পরদিনও দেখল। একটা কৌতূহল জেগেছে বলে বেশ ভাল ভাবেই দেখল লক্ষ্য করে। ছেলেটির বয়স বছর পনর-ষোল হবে। হরিবিলাসের ঠিক সমবয়সী বলা যায় না, তবে খুব বেশী ছোটও নয় ওর চেয়ে। বেশ সুশ্রী; পাড়াগেঁয়ে ছেলের একটা অবহেলার ভাব আছে দেহে—পরিচ্ছদে, তবে তার মধ্যে দিয়েও রংটা যেন আভা দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। গায়ে একটা আধময়লা মোটা তাঁতের কাপড়ের কুর্তা, তার নীচের দিকে একটা ময়লা পৈতের খানিকটা বেরিয়ে থাকতে দেখে হরিবিলাস বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ছেলেটি গাঁয়ের দিক থেকে বিলের ধারে ধারে এসে কাছারি-বাড়ির দিকে চলে গেল। হরিবিলাস উপরের বারান্দা থেকে দেখছিল। কখন আবার বেরয়, তার প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইল।

প্রায় ঘণ্টা দুই ঠায় বসে থাকতে হল, তারপর কাছারি থেকে ছেলেটিকে বেরুতে দেখে হরিবিলাস আস্তে আস্তে নেমে এল।

নেমেও এল এমন আন্দাজ করে যাতে ছেলেটি একটু এগিয়ে যায়, তারপর পিছন থেকে ডাক দিল, "এই যে, শুনুন।"

ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটি; প্রশ্ন করল, "আমায় ডাকছেন?"

হরিবিলাসের যেন ভুল ভাঙল একটা, বলল, "ও, আপনি?...না, আমি মনে করে-ছিলাম বুঝি ইয়ে—"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, "না, আমার নাম রাখাল।"

যেন অন্যমনস্কভাবেই এগিয়ে গেল হরিবিলাস। বলল, "ও, আপনার নাম রাখাল?" নতুন এসেছি কিনা, গোলমাল হয়ে যায়। নামেও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নাম, পদবী। শহরের দিকে একটু অন্যরকম ত।"

যেন অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি করতে করতেই এগোল। ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেও পা বাড়াল। বলল, "পদবী ত একই, নামগুলোই যা সেকেলে। রাখাল নামটা দেখুন না; আজকের?"

একটু বোকার মত হাসল। হরিবিলাসও নেহাত অজ্ঞের মতই প্রশ্ন করল, "পদবী সব শহরের মতনই বুঝি?...আপনি ত দেখছি ব্রাহ্মণ।"

"হ্যাঁ, আমাদের পদবী চাটুজ্যে।"

"তাই নাকি!" খুবই আশ্চর্য হয়ে ঘুরে চাইল হরিবিলাস। বলল, "ওদিককারই মতন দেখছি ত। আমরা হচ্ছি বাঁড়ুজ্যে।"

"জানি। তাই ত বলছিলাম, পদবী সব এক।...তা, আমায় 'আপনি' বলছেন কেন? কত ছোট আপনার চেয়ে..."

হরিবিলাস একটু হাসল। বলল, "তা বলতে পার। ওটা একটা শহুরে অবোল। তোমার বাড়ি এই গ্রামেই নাকি?"

"হ্যাঁ, এই ত বিলের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে গিয়ে...বিলের উপরই...ঐ যে জোড়া নারকোল গাছ দেখা যাচ্ছে—"

"ও! ঐখেনটায়?...তাহলে কালকে বিকেল বেলায় যে মনে হচ্ছিল তোমারই মতন কে একটি ছেলে..."

ছেলেটি হঠাৎ লজ্জিত হয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে চোখ তুলেই ঘাড়টা আবার নিচু করল।

আর ওকথা নিয়ে না এগুনোই উচিত; কিন্তু আর লোভ কি ছাড়া যায়? হরি-বিলাস প্রশ্ন করল, "তুমিই ছিলে তাহলে?"

তারপর সামান্য একটু বিরতি দিয়ে বলল, "আর যেন মনে হল একটি মেয়েও। অনেকখানি দূরে থেকে দেখা ত, মনে হল সাত আট বছরের একটি মেয়ে যেন।"

কলসী কাড়াকাড়ির কথাটা আর তুলল না। বলল, "আমি যখন দেখলাম—বই পড়তে পড়তে একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছি—দেখলাম তুমি কলসীটা হাতে ঝুলিয়ে ওপরে উঠছ। একটি যেন সাত-

আট বছরের মেয়ে তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।...বোন নিশ্চয়?"
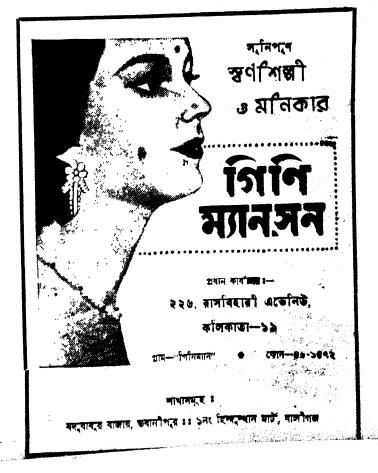
ছেলেটি যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনছিল, অপ্রতিভ ভাবটা একটু লেগে থাকলেও কলসী কাড়াকাড়ির দিকটা বাদ পড়ায় নিশ্চিন্ত হয়েই একটু হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারপর একটা যেন কী ভেবে নিয়ে বলল, "অত ছোট কোথায়?"

"তা হবে। দূর থেকে দেখা ত। তার ওপর নজরও যায় না বেশীদূর, এই দেখ না চশমা নিতে হয়েছে। ভাই বোনে বুঝি পিঠোপিঠি?"

রাখাল আবার একটু হেসে ঘাড় নাড়ল।

"তাই দেখছিলাম..."

পিঠোপিঠি ভাই-বোনের কলসী কাড়া-কাড়ির মধুর দৃশ্যটির কথা বলে ফেলতে যাচ্ছিল হরিবিলাস; হঠাৎ সংবিৎ হল, আরও লজ্জায় পড়ে যাবে। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমাদের বাবা আছেন নিশ্চয়।"

রাখাল ঘাড়টা বেঁকিয়ে জানাল, আছেন।

"কী করেন?"

"পণ্ডিত। বাড়িতেই লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা আছে।"

"বাঃ, তাহলে বিদ্যাচর্চা নিয়েই থাকেন। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে নিশ্চয় এক সঙ্গে?"

রাখাল মাথা দুলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

একটু সময় নিতে হল হরিবিলাসকে, তারপর প্রশ্ন করল, "বাড়ির ছেলেমেয়েরাও ত পড়ে?"

"আমি আর পড়ি না। পড়তাম আগে।"

হরিবিলাসের একটু ঠাট্টা করবার লোভ হল। বলল, "তুমি ত লায়েক হয়ে গেছ। ...ইয়ে...তোমার বোন পড়ে ত?"

"ও ত পড়ায়...প্রথম দ্বিতীয় ভাগের ছেলেমেয়েদের।"

বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই কথাটা বলে রাখাল দৃষ্টিটা নত করল।

ঠাট্টার মধ্যে আরও একজনকে টেনে আনবার লোভটা সংবরণ করতে পারল না হরিবিলাস; বেশ একটু শিউরে উঠেই বলল, "আরে, বিদুষী যে একেবারে!... তারপর? ঘরের কাজও ত সামলাতে হয় একটু একটু?"

"মা দেন না বেশী করতে। ছেলে-মানুষই ত? শরীরও খুব ভাল নয়, ভোগে মাঝে মাঝে।"

অনেক কথা আছে, অথচ যেন হাতে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার একটু ভাবল হরিবিলাস, তারপর মনে পড়ে গেল ভা[illegible] কথাই। একটু আমতা আমতা করে প্র[illegible] করল, "ছেলেমানুষ...হ্যাঁ, ছেলেমানু[illegible] বৈকি...তা এদিকে ত পেকে গেছে...মাষ্টা[illegible] করছে...ছেলেমানুষের মতন খেলার দি[illegible] ঝোঁক-টোক আছে, না তাও শেষ হ[illegible] গেছে?...খেলনা-টেলনার শখ? মা[illegible] একেবারে বুড়িয়ে যাওয়া ত ভাল নয় [illegible] বয়সে?"

"পুতুল-টুতুল খেলে। নিজেই গ[illegible] নেয়।"

"তাদের বিয়ে-টিয়েও দেয় ত? না[illegible] নেমন্তন্ন হয়?"

আবার হেসে একটু ঠাট্টা। রা[illegible] হাসল। হঠাৎ কেমন নিজের কাছেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল হরিবিলাস। [illegible] প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিল। প্রশ্ন করল, "তা হ্যাঁ, ইয়ে, বোন ত গুরুমশাইগিরি করে, তুমি নিজে কী কর? কাছারি-বাড়িতে রোজ

কী করতে আস? কাজ-টাজ কিছু যদি চাও ত বাবাকে না হয় বলে দেখি। বামুনের ছেলে..."

রাখাল মাথাটা একটু নিচু করে নিয়ে বলল, "কাজই শিখতে আসি।"

"বাঃ! তবে ত ভালই। কার কাছে; কেউ আত্মীয় আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কে?...কাকা?"

রাখাল মাথাটা নিচু করেই বলল, "হ্যাঁ।"

"বাঃ, বেশ! কী কাজ করেন তিনি?"

"খাজাঞ্চি।"

"ভাল কাজ। শেখ। আমি বাবাকেও বলে দোব। বেশ ত?"

রাখাল লজ্জিতভাবে ঘাড়টা নাড়ল। তারপর ঘাড়টা তুলে একটু চকিত হয়েই বলল, "এসে গেলাম বাড়ি। আসবেন না, আসবেন?"

হরিবিলাসও চকিত হয়ে উঠল। বলল, "না, না, আসব'খন। আসব না কেন? তবে আজ আর নয়, একটা হাতের কাজ ফেলে এসেছি।"

বেশ হঠাৎই ঘুরে পা বাড়াল, তারপর আবার ফিরে ডাকল, "শোন।"

রাখাল এগিয়ে আসতে বলল, "কথা হচ্ছে...ইয়ে, সেই ছেলেটি, যাকে তুমি ভেবে ভুল করছিলাম, তোমাদের পাড়াগেঁয়ে নাম আমার মনে থাকে না বাপু, তা সে ক'দিন থেকে না আসতে বড় একলা পড়ে গেছি। তুমি না হয় আসবে, যে-ক'টা দিন আছি। সঙ্গী পাই তাহলে। খাজাঞ্চিবাবুকে তাহলে বলে দেব।...আরে কাজ ত পালাচ্ছে না।"

রাখাল হেসে ঘাড় কাত করল।

খাজাঞ্চিবাবু নিজেই কথাটা পাড়লেন তার পরদিন। "রাখাল বলছিল, বড় একলা পড়ে গেছেন, চান যে একটু কাছে কাছে থাকে। তা থাকবে, তার হয়েছে কি? এমন ভাল সঙ্গ..."

নায়েবের ছেলে, বেশ কৃতার্থ হয়েই বললেন।

হরিবিলাস বলল, "না, সকাল বেলাটা কাজ শিখুক, যেমন শিখছে। বিশেষ করে আপনি যখন শেখাচ্ছেন। বিকেলের দিকটা বড় একলা বোধ হয়; সেই সময়টা যদি আসে..."

কাকাকেও একটু হাতে রাখা দরকার ত। মুখে একটু খাতির দেখালেও সকাল-বিকাল সর্বক্ষণই কাছে টেনে রাখল রাখালকে। ছেলেটি বেশ মিষ্টি। এদিকে খতকটা যেন হাঁদা গোছের, তাতে ওর বোনকে নিয়ে আলোচনা করতে বেশ যেন একটা আড়াল পাওয়া যায়, চক্ষুলজ্জাটা আসতে পায় না। আলোচনার মাত্রাটা বেশী হয়ে যাচ্ছে কিনা সেদিকে রাখালের হুঁশ নেই, নিজেই গায়ে পড়ে কখনও কখনও তোলে তার কথা। পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ওর বোন ত সে যেন দুনিয়ার সবার বোন, শহুরে ভালবাসা বলে যে একটা আলাদা জিনিস আছে তার যেন কিছুই জানে না, বোঝে না।

হরিবিলাস সুযোগ বুঝে সূত্র ধরিয়েই রেখেছিল, খেলনা দিয়েই আরম্ভ করল। একটু ঘনিষ্ঠতা করতে দিন চারেক গেল, তারপর বেড়িয়ে আসার পর সন্ধ্যায় রাখালকে বাড়ি যেতে না দিয়ে নিজের ঘরেই নিয়ে গেল এবং ঘরটা ভেজিয়ে দিয়ে বাক্স খুলে বেশ কতকগুলি নানারকমের খেলনা বের করল। সেলুলয়েডের, রবারের, কাচের, প্ল্যাসটিকের, টিনের। নানারকমের পুতুল। পাখি, জানোয়ার, চেয়ার, টেবিল, পালকি—সব মিলিয়ে গোটা পনর। রাখালের লুব্ধ, বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "কার জন্যে বল দিকিন?"

উৎসবে...
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশতৈল
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ , কলিকাতা-১

চোখ দুটো বড় বড় করে রাখাল প্রশ্ন
ল, "নবর জন্যে?"
মেয়েটির নাম নবদুর্গা।
হরিবিলাস মাথা দোলাতে সে উচ্ছ্বসিত
য় উঠল, "উঃ, কী খুশী যে হবে! পুতুল
চ ভালবাসে! এসব ত চোখেও দেখেনি,
ওয়া যায় না ত এখানে! উঃ, শুনলে
ভালবাসবে সে আপনাকে!"
হরিবিলাস একটু শিউরেই উঠল।
"আমার নাম কখনও করো। খবরদার!"
তারপর সে-ভাবটা সামলে নিয়ে একটু
সে বলল, "কী বোকা তুমি! নিজের
করবে। দাদা হচ্ছ...বাঃ!"
"হাতে পয়সা কোথায়? আর অল্প
টি নয় ত।"
একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল হরিবিলাস।
ল, "তা বটে। অবিশ্যি এর পরে আমার
া করতে পার, খেতি হবে না। তবে
ন...সাদা সদা—"
একটু সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল,
য়েছে! তুমি কাজ শিখছ, মাইনে পাও
?"
রাখাল সংকুচিতভাবে বলল, "শিখছি ত।"
হরিবিলাস একটু রেগেই উঠল। বলল,
ঃ, শিখছ, তা একটা হাতখরচ পাবে না?
বড় সব কোম্পানিতে অ্যাপ্রেন্টিস
লেই একটা করে অ্যালাউএন্স পায়।
মরা চাইতেও জান না, পাও-ও না। শিখছ
ওদের জন্যেই ত। আমি বাবাকে বলব;
তেই হবে। বাঃ!"
দৃষ্টি উৎফুল্লই হয়ে উঠল রাখালের।
ন্তু সংকুচিত হয়ে বলল, "কিন্তু সে কবে
ব..."
"শিগগিরই পাবে।"
"কিন্তু পাইনি ত এখনও..."
"তুমি একটু বোকা বাপু। হাতখরচ
ওয়ার কথা হচ্ছে, টের পেয়েছ, আহ্লাদ
য়েছে, ধার করেই বোনের জন্যে কিছু
লনা আনিয়ে দিয়েছ। তাতে বরং আমারই
া করতে পার, ধার দিয়েছি, আনিয়েও
য়েছি খেলনা। তবে হ্যাঁ, তোমার
া-মা এখন কেউ জানবেন না। লুকিয়ে
র করবে, লুকিয়ে খেলবে।"
তারপর একটু টেনে টেনে যেন কী চিন্তা
র বলল, "পরে সে তখন যদি টের পান,
তে খেতি হবে না।"
রোমান্স বেশ জমে উঠতে লাগল। এই
ড়াগাঁয়ের এত আনন্দ যে কোথায় ছিল
রিবিলাস বুঝে উঠতে পারে না। এর
থঘাট, বিল নদী; এর যেখানে লোক নেই,
খানে লোকের গাদাগাদি, সব যেন স্বপ্ন-
বলে মনে হচ্ছে! এত মধু যে কোথায়
কনো ছিল! রাখালকে আরও ভাল
গেছে। একদিন প্রসঙ্গক্রমে বললও,
তোমার নামটা পুরনো বলে তোমার

বোকার মত হেসে উঠল রাখাল

অপছন্দ, কিন্তু আমার ত ভালই লাগে
বেশ! ভাল বলেই না এত পুরনো হয়েও
আজও চলে আসছে।...তাহলে ত নব-
দুর্গাও পুরনো, তা বলে কম মিষ্টি?"

মাঠে, পথে ঘুরে বেড়ায় রাখালকে নিয়ে,
নদীর তীরে নির্জন দেখে বসে। সর্বদাই
যে নবদুর্গার কথাই হচ্ছে এমন নয়, তবে
অনেকক্ষণ ধরে বাদও থাকে না; বেশী দেরি
হলে রাখালই তুলল প্রসঙ্গটা, এমনও হচ্ছে
মাঝে মাঝে।

দেখলও বার দুই নবদুর্গাকে। দিবা-
লোকে নয়। যার রোমান্সের একটুও জ্ঞান
আছে সে দেখেও না অতি-স্পষ্ট দিবা-
লোকে। বার চারেক বেড়িয়ে ফেরার পথে
রাখালকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বার দুই দেখে
ফেলল। দেখে ফেলল সন্ধ্যা যখন গাঢ় হয়ে
এসেছে, সন্ধ্যার মতই ঘন কেশরাশি নব-
দুর্গার দেহখানিকে চারিদিক দিয়ে আচ্ছন্ন

করে আস্তে আস্তে গেছে মিলিয়ে। একটি
মুহূর্তের চকিত দেখা, কিন্তু সেই মুহূর্ত
যা সমস্ত জীবন নিয়ে থাকে ছড়িয়ে।

"শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হয়?...সে
ত ভাল কথা নয়। একটা ভাল টনিক
খাওয়াও, অবিশ্যি লুকিয়ে, পরে তখন টের
পেলে খেতি হবে না।"

"টনিকের সঙ্গে ভাল খাবারেরও ত
দরকার।" বোকার মত মুখটা একটু নিচু
করে বলেই ফেলে রাখাল।...সে-ব্যবস্থাও
হয়, অতি সহজেই। হরিবিলাসের পাড়া-
গাঁয়ে এসে স্বাস্থ্য ফিরেছে, বেশ ক্ষিধে
হচ্ছে। এখন তার তিনটে হরিবিলাসের
জলখাবার খায় সে। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের
লুচি, ছানাবড়া, সরভাজা, রসকরা, রসবড়া
যেদিন যেমন শখ হয়।

একটু চতুর হাসির সঙ্গে রাখালের সঙ্গে
কথা হয়। হরিবিলাস বলে, "কেন, তুমি

ত জলপানি পাচ্ছ এখন, বোনের জন্যে এটা-ওটা ফরমাস দিয়ে নিয়ে যেতে সাধ হয় না? যদি টের পায়ই কেউ, ত বলবার কী আছে? আমার নাম করো না ত?"

রাখাল বোকার মত হেসে বলে, "তা কখনও করি?"

একদিন ঐ প্রশ্নের ঐ উত্তর দিতে হঠাৎ একটু বেশীরকম বোকার মত হেসে উঠল রাখাল। হরিবিলাস একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল, "হঠাৎ অত হাসি যে?"

হাসতেই লাগল রাখাল। তারপর হরিবিলাস একটু ধমকের মত দিতে হেসেই বলল, "নাম না করলেও ওর কাছে লুকুনো থাকে নাকি?"

"তার মানে!" বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল হরিবিলাস।

"আমায় বোকা বলেন বলুন, কিন্তু দাদা বোকা হলে বোনকেও বোকা হতে হবে নাকি? ধরে ফেলেছে।"

"কবে থেকে গো? কী করে?"

"ভয়ানক চালাক যে। ধরে ফেলেছে অনেকদিনই। সেই যেদিন খেলনাগুলো নিয়ে যাই সেইদিনই। আপনাকে বলিনি, রাগ করবেন আপনি।"

রাগ করবার কোন লক্ষণই না দেখিয়ে হরিবিলাস বলল, "তা রাগ করব বৈকি। বলতে হয় আমাকে। তাহলে কি আর দিই কিছু? কী বলে জিনিসগুলো পেয়ে?"

"সে শুনলে আপনি আরও রাগ করবেন। ফরমাস করে কত—তা কি আপনাকে বলেছি? বলে, 'আমার দাদার বন্ধু যখন, তখন তিনি আমারও দাদা, কেন দেবেন না?'"

রাগই করল হরিবিলাস। কেন এতদিন বলেনি রাখাল? যেমন টের পাওয়ার কথা বলা উচিত ছিল রাখালের, তেমনি আবদার করে চাওয়ার কথাও বলা উচিত ছিল। ছেলেমানুষই ত বেচারি।

অনেক আবদারই করে রেখেছিল নবদুর্গা। সিল্কের রুমাল, এসেন্স, সাবান, খোঁপার শৌখিন ক্লিপ। দাদার যেমন পছন্দ। একে একে সব জোগান হতে লাগল।

তারপর লেখার খাতা, চিঠির প্যাড, ঝরনা-কলম...

রোমান্স যেন নিজের পথ করে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে চলেছে। হরিবিলাস এত সৌভাগ্য কল্পনাও করতে পারেনি কখনও। জোগায়। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে "এসব কী করবে? বিদ্যে ত দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত।"

রাখাল আরও স্মিত করে তোলে, বোকার মত চতুর হাসি হেসে বলে, "নিজে কিনে দিতে বলেছে। ...চেনেন না ত ওকে!"

একদিন নদীর তীরে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে হরিবিলাস হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "নভেল পড়ে...পদ্যটদ্য বুঝতে পারে?"

রাখাল বলল, "জিজ্ঞেস করছিল সে-কথা। 'দাদা অত বিদ্বান, পদ্যটদ্য লেখেন না?'"

লিখত না হরিবিলাস; কদিন থেকে আরম্ভ করেছে। নবদুর্গা শুনছে, ফরমাশ করে করে।

বোকা ভাই, অত বুঝছে না; বেশ একটা পর্দাও রয়েছে। বেশ কৌতুক লাগে হরিবিলাসের। মাঝখানে ভাইকে বসিয়ে দু দিক থেকে দুজনের লুকোচুরির খেলা চলছে।

ওদিকেও নজর আছে। হুইলের ছিপ নিয়ে ইলশে-গুঁড়ির মধ্যে বসে থাকে। রাখাল বলে, "নোনা ধাত ত, ঝাল-মশলা দিয়ে দুটো মাছের দাগা পেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। কিম্বা একটু গরম গরম মাংসের সুরুয়া।" তাড়াতাড়ি সুরুয়ারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

রোমান্সটাকে যতদূর সম্ভব ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি এনে রেখে একদিন আবার শহরে ফিরে গেল। রাখাল বলল, "বড় মুশড়ে পড়বে নবদুর্গা।" আরও নানারকম মন-ভোলানো জিনিসপত্র দিয়ে গেল হরিবিলাস।

নিজেও কি কম মুশড়ে পড়েছে? আর বিলম্ব করল না। বাড়িতে জানিয়ে দিল, অমুক গ্রামে, অমুক পণ্ডিতের মেয়ে, এই নাম, বিয়ে করতে হয় ত তাকেই বিয়ে করবে।

এতদিনে মত হয়েছে, তার উপর পাশটাও করেছে সদ্য সদ্য, মা, পিসী, ভাজ সবাই উৎসাহ করে লিখে দিল হরিবিলাসের বাপকে। চিঠি এল, অমুক পণ্ডিতের কোন মেয়ে নেই ত। অমুক নাম, সে তাঁর পুত্রবধূর, খাজাঞ্চি শ্রীনাথ বাড়ুজ্যের মেয়ে। হরিবিলাস বোধ হয় অন্য কারুর মেয়ের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলে থাকবে। খোঁজ নিচ্ছেন তিনি।

পাড়াগাঁ সম্বন্ধে আতঙ্কটা আবার চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এসেছে হরিবিলাসের। সেখানে ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়ে রাখালের মত নেকড়ের দল ঘুরে বেড়ায়!

কবির সঙ্গে দু দিন

মহেন্দ্রনাথ সরকার

কালিম্পং এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছিলাম। তিনি অনেকদিন মংপুতে কাটিয়ে এলেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য সহসা হয়নি। সেদিন "হোটেল হিল ভিউ"-তে তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, "আপনি আসবেন, দেখা করিয়ে দেব।" দেখা হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে সহজপ্রাপ্য বলে আমার মনে হয়নি। এজন্য তাঁর সেক্রেটারীর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। শ্রীযুক্ত চন্দের সুজনতায় ও সমধুর ব্যবহারে বড়ই তৃপ্ত হয়েছিলাম।

জ্যৈষ্ঠের এক পশলা বর্ষণের পর আমরা "গৌরীপুর হাউস"-এ চললাম কবীন্দ্র-সঙ্গ-সুখ লাভ করবার আশায়। শ্রীযুক্ত চন্দ এসে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কক্ষে নিয়ে গেলেন। কবিবর একটা ছোট ঘরে সমস্ত শরীরটা কাপড় ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। আমরা প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলাম। তাঁর স্বাস্থ্য-সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয় জানিয়ে বললেন, "শরীরটা বড় ভাল নেই। দিলীপকুমার এসে কাল বড় কথা বলিয়ে গিয়েছে।" আমি একটু চুপ করে রইলাম। তাঁর শরীর ভাল নেই শুনে কোন কথার অবতারণা করবার সাহস পেলাম না। তখন তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু লিখছেন নাকি?" আমি বললাম, "হ্যাঁ কিছু লিখছি বটে।" তখন তিনি বললেন, "আমাদের দেশে যদি কেউ উপনিষদগুলিকে বর্তমান জীবনের উপযোগী করে, অর্থাৎ যে-সব অংশ গভীর ও যাতে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে, সেগুলিকে নিয়ে বেশ একটি সুন্দর ইংরেজীতে তর্জমা করে, তবে বড় ভাল হয়। ওদেশের কেউ কেউ সেরূপ করেছেন, কিন্তু তাদের সে-যোগ্যতা নেই, যা উপনিষদ-বিদ্যাকে ঠিক বুঝতে পারে। এদেশের অনুভূতি ও বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ এ-বিদ্যার। এদেশের আবহাওয়ায় না গড়ে উঠলে শুধু পড়েই এ-বিদ্যা অধিকার করা যায় না। এ-বিদ্যা জীবনের গভীর ধ্যানে নিহিত।"

এই বলে বললেন, "আমাদের দেশে আজকাল একটা ব্যাধি হয়েছে গুরুবাদ। সবাই একটা গুরুকে মেনে চলতে চায়। সকলেই একটা মত মেনে নিতে পারলেই যেন সন্তুষ্ট হয়। একটা ধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে নবীন সৃষ্টির শক্তি হ্রাস হয়ে আসে। ওতে

মানুষকে খর্বই করে। আমাদের দেশে এই মেনে-নেওয়া ভাবটি এত যে, দার্শনিক চিন্তাতে দেখি এখনও এদেশে শঙ্করের প্রভাব।" আমি বললাম, "তাঁর চিন্তার ধারার ভিতর এমন গাম্ভীর্য আছে, যা আকৃষ্ট করে।"

এই কথা হতে না হতেই শ্রীযুক্ত চন্দ এসে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর এক বন্ধুর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করলেন। কবির আসন সরিয়ে দেওয়া হল, একটা কেন্দ্র-স্থানে। সকলে আসন গ্রহণ করলেন। তখন দেবব্রতবাবুর অনুরোধে কবি তাঁর মেঘদূত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। দেবব্রতবাবুর বড় ইচ্ছা তাঁর মুখে একটা কবিতার আবৃত্তি শোনবার। কবির এই বয়সে কণ্ঠে কত শক্তি! আবৃত্তিটি সবারই বেশ ভাল লাগল। তখন নানা রকমের কথাবার্তা চলতে লাগল। হীরেনবাবু কবিকে অনুরোধ জানিয়ে রাখলেন, মহাভারতের উপর একখানি পুস্তক লিখতে, যাতে থাকবে মহাভারতের আদর্শ ও তত্ত্ব। কবি বললেন, ইচ্ছা আছে, তবে এখন তিনি বাংলা ভাষার উপর একখানি বই লিখছেন। এর মধ্যে দিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী মিত্র এসে যোগ দিলেন।

কথা চলতে লাগল নানা রকমের। শ্রীমতী সরকারের সঙ্গে জাপানের ও চীনের কথা হল। জাপানীরা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কেমন ভালবাসে, কবি তা তাঁর অপরূপ ভাষায় বর্ণনা করলেন। বড় ছোট সকলেই প্রকৃতির সঙ্গ-সুখ ভোগ করে, কিন্তু প্রকৃতির উপর কোন প্রকার আঘাত করে না। দলে দলে যুবক-যুবতীরা, বালক-বালিকারা কোথাও গাছের তলে, কোথাও ঝোপঝাড়ের মধ্যে, কোথাও বিন্যস্ত উদ্যানবাটিকায় বসে থাকে নীরবে, প্রকৃতির অনুপম ছন্দের সঙ্গে তাদের মৌন আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু সুন্দরের উপাসক জাতির চীনের উপর এরূপ অত্যাচারে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন শ্রীমতী সরকার বললেন, "চীন ত জাপানের দ্বারা প্রায় অধিকৃত হল। চীন ত গেল।" কবি তেজোদ্দীপ্ত স্বরে বললেন, "কী বললে, 'চীন গেল'! কখনও না। কেউ কখনও এ-জাতিকে পরাজিত করতে পারবে না। কারও সে-শক্তি নেই। মাঝ থেকে জাপানের শক্তি হ্রাস হয়ে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়বে।" এই কথা বলে কবি চীনের শালীনতা, ভদ্রতা, শান্ত সমাহিত ভাবের প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন, "পৃথিবীর মধ্যে এত বড় জাতি আর নেই এদের শিক্ষা, দীক্ষা, সৌন্দর্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা, আতিথেয়তা সকলের উপরে। বিরাট সত্তার বোধ এ-জাতিকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়েছে সভ্য জগতে। চীনের সভ্যতা সব দেশের সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" আমি বললাম, "কাউন্ট কাইজারলিঙও আপনার মত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, চীনে সভ্যতার হয়েছে শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।" কবি বললেন, "যাঁরা একটু-মাত্রও দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরা একথা না বলে মোটেই পারবেন না। ভারতের উপর চীন অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত। তাদের জ্ঞান-

প্রতিষ্ঠা, ধর্ম-প্রতিষ্ঠা জাগ্রত হতে পেরেছে বলে আমাদের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কি সৌন্দর্যকলা, কি জ্ঞাননিষ্ঠা, চীনের মত জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই।"

দিলীপকুমার তখন ইউরোপের কথা তুললেন। আমি বললাম, "জার্মানিতে আপনার প্রতিষ্ঠা খুব দেখেছি। হামবুর্গে দেখেছি, জনৈক অধ্যাপক-পত্নী আপনার কবি-প্রতিভাকে বোঝবার জন্য বাংলা ভাষা শিখছেন।" কবি বললেন, "তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু শুধু ভাষা শিখলে ত আর কবিকে চেনা যায় না, কবির দেশ, তার আবহাওয়া, তার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কবির রচনামাধুর্য বোঝা যায় না। কবির দৃষ্টি অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু একটা নয়, জীবনধারার পুঞ্জীভূত ভাবের একটা বিকাশ। যা হক, আমি দেখেছি কণ্টিনেণ্ট-এ আমাদের দেশকে সম্মান করে ও আমাদের বুঝতে চেষ্টা করে। জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়াতে আমার বাংলা রেসিটেশন লোকেরা কত আনন্দ করে শুনত। এমন কি, তার তর্জমা শুনতে রাজী হত না। শুধু ভাষার লালিত্য ও ঝঙ্কার শুনেই তাদের কত আনন্দ হত। ওদের দেশে পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল, 'আমাদের দেশের কোন মনস্বী হৃদয়ে এরূপ ভাব জাগিয়ে এরূপ রসসঞ্চার করেন না।' কী সুন্দর দেশের আজ কী পরিণতি।" হীরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুসহ চলে গেলেন। তখন কথোপ-কথনের ধারা বিচ্ছিন্ন হল এবং একটা সাময়িক নিস্তব্ধতা এল। এই অবসরে আমি আমার পূর্বেকার কথার অবতারণা করলাম।

কবি বললেন, "দেখ, আমি সত্যকে জীবনের ভিতর দিয়ে বুঝতে চাইছি এবং তাকে আনন্দরূপেই বুঝেছি। এই আনন্দ কোন ভাবের উদ্বেলতা নয়, এ শান্ত আনন্দ, শান্তি প্রতিষ্ঠা হলেই এর সঞ্চার হয় হৃদয়ে। এই আনন্দকে আমরা উপভোগ করি নানা রূপে, নানা রসে জীবনের উৎসবের ভিতর, কিন্তু তাই বলে তার অপরিসীমত্ব নষ্ট হয় না। সত্য অপরিমেয়, মানুষ সত্যের সবটা পায় বলে মনে হয় না, কিন্তু যতটুকু পায়, ভিতর দিয়েও তার স্বরূপকে পায়।" বললাম, "আপনি বলতে চান সসী ভিতর দিয়ে, অসীম স্ফূর্ত হয়, বিকাশের কোন রূপের সবটা নিয়ে; বিকাশও হয় সত্যের প্রকৃত পরিচয়। সত্যের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্রের অন হওয়া দরকার।" কবি বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের দার্শনিকতার সঙ্গে আমার একটা পরিচয় নেই, আমি যা অন বুঝি তাই বলি।" এ কথাগুলি সহাস্য মুখে বললেন, "দেখ, ডাক পড়েছে, এবার যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁকে গিয়ে বলব, খুব সুখী হয়ে এসেছি যেখানে পাঠিয়েছিলে; অন্তর ভরে গেছে হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে। কিছু নালিশ করবার নেই।" কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর মুখমণ্ডল তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সকলের ভিতরই একটা আনন্দের উল্লাস হল। আবার বলতে লাগলেন, "সৃষ্টি আনন্দেরই বিকাশ, এর ভিতর তিনি নিজেকে এত ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, সেটুকুরই উপলব্ধি হলে আমাদের অন্তর
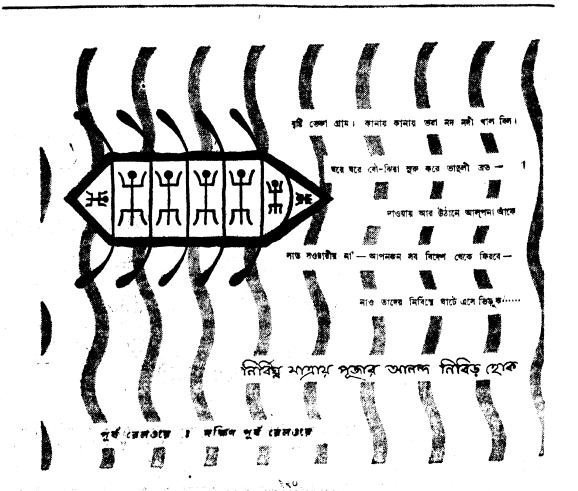
আর কোন দৈন্য থাকে না। আমরা আনন্দে নিমজ্জিত হই। এর ভিতর দিয়েই তাঁর অপরিমেয়ত্বের আস্বাদ করি। একথা ঠিক যে, একে অতিক্রম করেও তাঁর স্বরূপ আছে, কিন্তু কোন মানুষের বুদ্ধির দ্বারা তার সবটা অধিকৃত হয় না। অপরিমেয়ত্ব কিন্তু একটা নেগেটিভ কিছু নয়। পরিপূর্ণতার ব্যাপক, সেই পূর্ণতার পূর্ণ পরিচয় কেউ পায় বলে আমি জানিনে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলতে লাগলেন, "দেখ, এবার আমার অসুখের মধ্যে একটা অনুভূতি হয়েছিল।" দিলীপকুমার আগ্রহে জিজ্ঞাসা করায় কবি বললেন, "একদিন রাত্রে আমার অঙ্গে সহসা একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কাউকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। সহসা আমি যেন আমার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আমাকে দেখতে লাগলাম। মনে হল, রবিঠাকুর ও তার লেখা, গান গাওয়া সবই যেন আমার সামনে আমা হতে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আমি যেন আলাদা কিছু। যেমন এরূপ দেখা, কোথায় যেন বেদনা চলে গেল। আমি কিছুই অনুভব করলাম না। বেদনাটি যেন আমা হতে দূরে গেল; আমার সত্যিকার সত্তার ভিতর তার যেন স্থান আর থাকল না।"

আমি তখন বললাম, "এরূপ অবস্থাকে বেদান্তীরা সাক্ষী-অবস্থা বলেন।"

কবি বললেন, "ঠিক তাই, এ ত সাক্ষিত্ব।" দিলীপকুমার বললেন, "শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কোন বেদনার অনুভূতির ভিতরে আনন্দই অনুভব করেছেন।" আমি বললাম, "আমাদের সত্তার স্বরূপকে বেদনার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আনন্দ অনুভব হওয়া স্বাভাবিক। তখন বেদনাটি আপনি অপসারিত হয়ে যায়।"

কবির সঙ্গে আলাপে দেখলাম, তিনি পরিমেয়ের ভিতর অপরিমেয়কে দেখতে পেয়েছেন এবং পরিমেয়ের অতীত হয়েও তাঁর নিজের ভিতর অপরিমেয় উদাসীনতার স্বরূপ ধরা পড়েছে। এদিনকার মত আমাদের আলাপ এখানেই শেষ হল। আমার ইচ্ছা থাকল আবার এ-বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করতে।

আর একদিন গেলাম। সেদিনও কবি নিজেই আলোচনা শুরু করলেন। এদিনের কথা হল সাধনা নিয়ে। কবি বললেন, "ভাষার চেয়ে সুর সূক্ষ্ম জিনিস। ভাষার যেখানে গতি নেই, সুরের, ধ্বনির গতি সেখানে আছে। সুরের স্বরতরঙ্গ আমাদের মনকে উপরে নিয়ে গিয়ে অপরিমেয় সত্তার ভিতর আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয়। এখানে অপরিচিতের সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয়।"

আমি বললাম, "আপনার হিবার্ট লেকচার-এ আপনি এরূপ অবস্থার কথা বলেছেন যা মানস ভূমির অতীত।" এরূপ ভূমিকাতে আমরা সত্যের বিশ্বাতীত স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হই। এই নিত্য-যুক্ত অবস্থা; এর নীচের অবস্থায় সত্য আমাদের স্পর্শ করে তার সৃষ্ট জগতের বিকাশের দ্বারা; এখানে বিকাশের অতীত সত্যস্বরূপে আমরা মগ্ন হই।"

কবি বললেন, "ঠিক তাই। আমি দেখেছি সুরের এরূপ শক্তি আছে, যা আমাদের মনকে তার নিত্যকার জগৎ হতে ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে মনকে লয় করে দেয়। কথাটা আরও পরিষ্কার হবে যদি আমরা সাধারণ শব্দ ও ধ্বনির ভেদকে স্পষ্ট করে বুঝি। শব্দ অর্থকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা ধ্বনি যেমন দিতে পারে, শব্দ তা পারে না। এজন্যই শব্দ দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ যত হয়, তার চেয়ে সুর ও স্বরের দ্বারা আরও বেশী হয়। আমি দেখেছি সুর ও ধ্বনি যে উচ্চ গ্রামে আমাদের চেতনাকে নিয়ে যেতে পারে, শব্দ তা পারে না। কারণ শব্দের সেখানে কোন স্থান নেই। এজন্যেই কবিতার চেয়ে সংগীতের স্থান অনেক উচ্চে। বিশেষত সুরের।"

তখন আমি গায়ত্রী ও প্রণবের কথা তুললাম। কবি বললেন, "নিশ্চয়ই প্রণবের এরূপ শক্তি আছে; এজন্যে ঋষিরা একে ব্রহ্ম-প্রতীক বলেছিলেন। ব্রহ্মসাধনরূপে প্রণবের অসীম শক্তি। যদি মনকে এর ছন্দের সঙ্গে যোগ করিয়ে দেওয়া যায়, তবে খুব সহজেই মন অনুভূতির উচ্চগ্রামে অধিরোহণ করে। আমাদের ভিতর স্বাভাবিকই একটা প্রেরণা ও বেগ আছে, ঊর্ধ্ব চেতনার দিকে অগ্রসর হবার; প্রণব সেই ঠিক পথে চালিত করে নিয়ে যায়। মনে আছে তো শ্রুতি বলেছেন, প্রণব হল ব্রহ্মকে বিদ্ধ করবার ধনু।"

এই বলে কবি নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পরে কবি আবার বলতে শুরু করলেন। এবার তিনি রূপ-জগতের কথা তুললেন। নিজের ছবি আঁকার কথা বলে বললেন, "এ-বিশ্বের প্রত্যেকের একটা অন্তররূপ আছে, যা দেখতে পারলে সুন্দর-বিশ্বের পরিচয় আমরা পাই। আমার ছবি আঁকার impulse উঠছে ওখান থেকে। ওর বাইরের দিকে কিছু নেই, ও একটা রূপের ও ভাবের জগতের প্রকাশ। রূপ ত ভাবেরই ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। সত্যিকার সৌন্দর্য ভাবে পুষ্ট। যে সুন্দর, তার একটা ভাবের বিকাশ আছে; সে-ভাব থাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বস্তুর ভিতরে। আমি যখন বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে তাকাই, দেখি, তারা কত রূপ ও ভাব নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে।"

আমাদের মধ্যে একজনের কথার তিনি উত্তর দিলেন, "আমার ছবির পরিচয় আমি ভাষায় দিতে চাইনে; ছবির ভিতরই আছে ছবির পরিচয়।

রূপ-জগতের পরিচয় সাধারণ ভাষা দিতে পারে না। রূপকে দেখবার একটা শক্তি থাকা চাই। রূপ স্বতই অন্তর্বেদনা জাগিয়ে দিয়ে তার নিজের পরিচয় তার ভিতর দিয়েই দেয়। মানুষের বেদনা-বোধ তীব্র হলে এ-জগতের অন্তরালে রূপ, রস, শব্দের কত না প্রকাশ দেখতে পায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "শব্দের ত বিশেষ বিশেষ বিকাশ আছে। কোনটি আমাদের ভিতরে জাগায় জ্ঞানের প্রসার, কোনটি দেয় অন্তর-স্বচ্ছতা, কোনটি ক্রিয়াশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। সৃষ্টির মূলে আছে যে শব্দ, তার সঙ্গে রূপের কোন সম্বন্ধ হয় কি? অশরীরী শব্দ-সৃষ্টি ভূমিকায় শরীরী রূপ নেয় কিনা?"

কবি বললেন, "নিশ্চয়ই শব্দের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। একটি ক্রিয়া হচ্ছে, শব্দ-রূপ অরূপের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, শব্দই শব্দহীন বিশ্বের পথ দেখিয়ে দেয়। তেমনি শব্দ-বিশেষের ভিতর এমন শক্তি আছে, যা স্ফূর্ত হয় রূপ নিয়ে।" আমি বললাম, "এজন্যেই বোধ হয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে নাদ ও বিন্দুর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আছে। আমাদের দেশের তান্ত্রিকাচার্যরা বলে থাকেন, শব্দ ঘনীভূত হয়ে বিন্দুরূপ নেয়।"

কবি বললেন, "হতে পারে, আমি বিশেষ জানিনে। তবে শব্দ যে ইমেজারি সৃষ্টি করে, তাতে সন্দেহ নেই। ইমেজারি জগতে শব্দের সূক্ষ্ম গতি নেয় রূপ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি যে বললেন, প্রণব জীবচেতনাকে ব্রহ্মাভিমুখী করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, ঐ স্তরে তার স্থিতি স্বরূপ কী? এবং সেই স্থিতি হতে কি কখনও বিচ্যুতি হয়? যদি হয়, তখন আমাদের চেতনা কীভাবে অবস্থান করে?"

কবি মন দিয়ে কথাটি শুনলেন, কিন্তু বললেন "এর উত্তরটা আজ থাক।"

আমি আর কিছু বললাম না। তখন অন্য সব কথা, দেশের কথা, হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা হতে লাগল। তখন আমি নীরবেই ছিলাম। সহসা ফাঁক পেয়ে আমি সাইকিক একস্‌পিরিয়েনস সম্বন্ধে কবির মতামত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমার বিশ্বাস হয় এরূপ সব হতে পারে। মানুষের মনের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সাইকিক ওয়ার্ল্ড আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু কারও এরূপ অভিজ্ঞতা হলেই আমি তাকে বড় অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ বলব না। কারণ অভিব্যক্তি-ধারায় আমাদের অরগ্যান্‌স অব পারসেপসন কারও কারও খুবই সচেতন তাদের কাছে আরও সূক্ষ্ম জগতের বিকাশ হয়।"

আমি বললাম, "বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের অনেক যোজন হতেন। আমাদের যোগশাস্ত্রেও প্রাতিভ জগতের অধিবাসীরা তাঁর কাছে আবির্ভূত হতেন। আমাদের যোগ শাস্ত্রেও প্রাতিভ

দর্শনের কথা আছে। অলিভার লজ এরূপ অদৃশ্য সাহায্যকারীদের কথা বলেছেন।"

কবি বললেন, "ঠিকই, আমাদের অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাবস্থায় এরূপ দর্শন হতে পারে, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম দর্শন যার হয়, তিনি খাঁটি অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ না হতেও পারেন। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় মিডিয়ামেরা নীতিভ্রষ্ট হন। এসব একটি সূক্ষ্ম দর্শনের ক্ষমতা। অনেক সময় ধর্মপথে বিচরণ করতে করতে এরূপ দর্শনাদি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে ভ্রষ্ট করে।"

আমি বললাম, "এরূপ সূক্ষ্ম দর্শন অন্তরের পবিত্রতা না হলে কি হওয়া সম্ভব? হলেও কি এ-শক্তি থাকে?" কবি বললেন, "ওটা কিছু বোঝা যায় না। ও একটা স্বাভাবিক বিকাশ। তার সঙ্গে নীতির বড় যোগ নেই—এ একটা ন্যাচার্যাল গিফ্‌ট। তাতে জ্ঞানের পরিসর বাড়তে পারে, কিন্তু তা অধ্যাত্ম জ্ঞান হতে বহু দূরে। অধ্যাত্ম জীবনের স্থিতি জ্ঞান ও আনন্দে। জ্ঞান যেখানে নিরঙ্কুশ, আনন্দ যেখানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অধ্যাত্ম জীবনের সেই হচ্ছে সুষ্ঠু প্রকাশ। অপরিমেয় সত্তার বোধে অনন্বেল আনন্দ তখন আমাদের পূর্ণ করে। এরূপ স্থিতিই ব্রাহ্মী স্থিতি।"

কথায় কথায় "বলাকা"র কথা উঠল। আমি বললাম, "আপনার 'বলাকা'য় একটা নূতন সুর আপনি তুলেছেন। জীবনের অবিরাম গতির কথা।"

কবি বললেন, "দেখ, আমি 'বলাকা' লিখেছি ঐরূপ অনুভূতি পেয়ে। একদিন এলাহাবাদে ছাদের উপর বসে আছি অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে। আমার একটা অনুভূতি হল—সব গ্রহমণ্ডলী চলছে, অবিরাম গতিতে পৃথিবীও চলছে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবই চলছে। এ প্রত্যক্ষ দর্শনের ওপর 'বলাকা'র ভিত্তি।"

আমি বললাম, "'বলাকা'তে কিন্তু আপনার মাটির দেশের কথা ভোলেননি। অনন্ত আকাশের ভিতর লক্ষ্যহীন গতির বেগ মানবজীবনের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা রুদ্ধ হয়ে কবির দৃষ্টি পুনরায় পৃথিবীর অনন্ত সুষমার উপর আকৃষ্ট হয়েছে।"

কবি বললেন, "গতিটাই জীবনের সব নয়। এখানেই আমার সঙ্গে বের্গসঁর তফাত। বের্গসঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। আমি তখন শুনে গিয়েছিলাম, কিছু বলিনি। কিন্তু বের্গসঁ একটা জিনিসের উপর মোটেই দৃষ্টি দেননি। সেটা জীবনের কেন্দ্র বা গতির কেন্দ্র। গতিটা চলে একটা দিক ও লক্ষ্য নিয়ে ও একটা আশ্রয় নিয়ে। এ দুটিকে বাদ দিলে গতির থাকে কী? এ ত জীবনের নিত্যানুভূতির বিষয়। নিত্যগতির লক্ষ্য নেই, আশ্রয় নেই আমি খুব স্পষ্ট বুঝিনে। এরূপ গতির জগৎ থাকলে, মানুষের অন্তঃসত্তায় ও জীবনে এরূপ গতিতে কোন তৃপ্তিই পায় না। আমাদের জীবনের একটা মাধ্যাকর্ষণ আছেই ত। সেখানেই তার টান। শুধু গতিতে নয়।"

আমি বললাম, "বের্গসঁ এরূপ শক্তিকে জীবন (life) বলেছেন। 'জীবন'-এর স্ফূর্তি হয় প্রেমে—একথাও বলেছেন।"

তখন কবি বললেন, "ঠিক, তাই যদি হয় তবে কি জীবনকে শুধু শক্তিই বলা যায়। প্রেমকেন্দ্রীভূত শক্তি শুধু শক্তি নয়।" এই কথা বলে তিনি নীরব হলেন।

কালিম্পঙে অবস্থিতির শেষের দিকে কবির সঙ্গসুখ লাভ করে বিমল আনন্দ পেয়েছি। তাঁর শুভ্র হাসি, তাঁর নিরুপম বাক্যবিন্যাস, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সত্তার ব্যাপকতা বড়ই আকৃষ্ট করত। তাঁর কাছে কোন শঙ্কা হত না, মনে হত কত নিকট আত্মীয়ের কাছে এসেছি। যাঁরা প্রকৃত বড়, তাঁরাই পরমাত্মীয়। কালিম্পঙে তিনি দিনরাত খাটছেন, আমাকে বললেন, "তোমরা এসেছ ছুটিতে, আমার কিন্তু ছুটি নেই, আমি কাজ নিয়ে এসেছি।" শ্রীযুক্ত সরকার বললেন, "একটুখানি নিজেকে বাঁচিয়ে কাজ করলে হয় না?" তিনি উত্তর দিলেন, "আর হাতে রেখে কিছু করবার নেই। সব দিয়ে বসেছি, আমার বলে আর রাখবার কিছুই নেই। আগে যখন কাজ করতাম, কিছু হাতে রেখেই করতাম। এখন আর কিছু হাতে রাখবার ইচ্ছা নেই। ডাক এসেছে, সর্বস্ব দিয়ে রিক্ত হয়ে পথের প্রতীক্ষায় থাকব।"

আমরা প্রণাম করে ফিরে এলাম। গৌরীপুর হাউসের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা উদাসীনতা অনুভব করলাম। "ডাক এসেছে" কথাটা মনের এক কোণে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। একটা অস্ফুট বেদনায় হৃদয় ভরে গেল। বেদনাক্লিষ্ট অন্তর হতে নীরবে প্রার্থনা-বাণী উঠল "মানবের এমন পরমাত্মীয়কে, হে ভগবান, আর কিছুদিন শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে রক্ষা কর।"

লিখেছেন ঃ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীসুখলতা রাও, শ্রীকার্তিক দাশগুপ্ত, শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীসুনির্মল বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, [illegible] আলী মিয়া, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীমনোজিৎ বসু, শ্রীধীরেন বল, শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধু ভুতুম, আশরাফ সিদ্দিকী, শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরবিদাস সাহা রায়, শ্রীউৎপলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীমৃণাল আচার্য, ডাক্তার এ সি সরকার, মৌমাছি।

ছবি এঁকেছেন ঃ

শ্রীপ্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন বল, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীবিমল দাস, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

[illegible] মেলেছি মানুষ হতেই
[illegible] দীপ্ত পথেই,
[illegible] ভার আমাদের 'পরে
করব সে সবে
সুরঙিন্।

রইব সজাগ চির চলন্ত,
জীবন মনে সুবসন্ত,
[illegible] আগামী দিবা ও রাত্রি
আশা ও কাজে
সীমাহীন।

মানুষের কাজে পৃথিবীখানি
হবে সৃষ্টির অতুল্য রাণী,
বাজাও এ সুরে—তারি সন্তান—
মানুষের প্রাণের
উজল বীণ্!

এটির অর্থ সকল ভাষায় লিখে, ছড়িয়ে দেওয়া হল জগৎময়।

যে যেখানে আছে কিশোরী কিশোর পেঁছিল এ চিঠি সবার হাতে।

সাত

মাস চলেছে। বছর গেল। সব জায়গাতেই কিশোর কিশোরীরা জেনে গেছে নিজেদের আসল খবর। তাদের মনের আর হাতের ছোঁয়া পেয়ে, জগৎ চোক মেলে জেগে যাচ্ছে।

আরো বছর আসবার আগেই দশ দিক থেকে আসতে থাকল খুশির সাড়া।

ঘুমিয়ে পড়েছে কবেই তো বোমারু, টোমারুর দল, এবারে স্ফূর্তিতে হাসছে আকাশ, এরোপ্লেনে মানুষ, তার সঙ্গে পাখীর উড়ন্ত ঝাঁক! এদেশ ওদেশ সেদেশ এখন আর নেই, সব পৃথিবীটাই একটা বাড়ী। গমগম করে চলা ফেরা চলছে

পাগড়ি মাথায় কিশোরদের দল আসছে

[illegible] মেলেছে কিশোর কি[illegible]
এরি [illegible] তারা চালাচ্ছে [illegible]
কে [illegible] বুদ্ধি আর এতো [illegible]
ছিল? [illegible] তারা যা বলছে তাই [illegible]
এনে দিচ্ছে। পৃথিবীটাই হয়েছে রোজ কিশোর কিশোরী[illegible]
খেলাঘর—সে ঘরে এসে খেলছে জগতের সব মানুষ! [illegible]
খেলাগুলো হল—বড়ো কাজ, আর কাজ হল অতুল আনন্দ[illegible]
তা ছাড়া হাজার আমোদ তো আরো বাড়ছেই! লড়াইয়ে [illegible]
যে টাকা যেত উড়ে, তারাও এসে বসেছে খেলাঘরের ভাণ্ডা[illegible]
বলছে—আমাদেরও ভালো কাজে লাগাও। রইল না পৃথিবী[illegible]
কেউ গরীব, না রইল কেউ মূর্খ, না রোগী, না চোর না ডাকা[illegible]
না লাল পাগড়ি! সব শাদা আর সোনালী পাগড়ি, টুপি[illegible]
যতো কান্না পালিয়ে গেছে জগৎ থেকে। কেবল চলছে মানু[illegible]
আর 'মানুষ'—মনে আলো, হাতে কাজ, মুখে অঝোর হাসি[illegible]
বাড়ীর বাগানের যেমন ফুল তুলে আনে, তেমনি করে কিশো[illegible]
কিশোরী দল আকাশ বাতাস আগুন জল পাথর পাতা[illegible]
মানুষের বিদ্যা আর মনের চিন্তা সবখান থেকে যেন তাদে[illegible]
দেওয়া সেরা উপহার সব আনিয়ে ধরণী জননীকে প্রাণ ভ[illegible]
দিয়েছে সাজিয়ে। বিদ্বান্ আর বিজ্ঞানীরা আদরে দিচ্ছে[illegible]
তাদের সব বাহো' বাহো'।

সৃষ্টির সবাই দেখতে এসে দেখছে—এ কি! এযে এক[illegible] নতুন পৃথিবী! জীব-জন্তুরাও আশ্চর্য হচ্ছে। তারা রয়ে[illegible] বেশ এবার শান্ত, নতুন পৃথিবী এমন জিনিষ বের করেছে [illegible] কোনো কাজে আর জীবজন্তুদের মারবার দরকার নেই!

যুবকেরা অবাক হয়ে দলে দলে এসে যোগ দি[illegible] কিশোরদের পৃথিবীতে। আগের বড়দেরও কেউ কেউ।

অল্পদিনেই তখন এমন হল, চমৎকার নতুন নতুন ঐশ[illegible] নিয়ে পৃথিবী যেন লাখ বছর এগিয়ে গিয়েছে!

●

● ●

সূর্য দাঁড়ালেন এসে।

রাঙা হাসি হেসে বললেন—

—যে জন্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, তোমরা তা সাথ[illegible] করেছ। আলোর লক্ষ হাত লক্ষ আশীর্বাদের মতো সবার উপ[illegible] বুলিয়ে দিলেন—

—চলো, চলো! আরো এগিয়ে চলো!

সন্ধ্যায় চাঁদ এসেই গলা থেকে জ্যোৎস্নার মালাখানি খ[illegible] পরিয়ে দিলেন নতুন পৃথিবীর সবাইকে—

—এই মালার মতো অমর আর পবিত্র হোক তোমা[illegible] চিরশরৎ।

* * *

* * *

* * *

তারপর কোটি কোটি তারার দল সভা করে বসেছে। ব[illegible] ঝিকিমিকি সুরে—এতো করে গড়া পৃথিবী, তা নাকি ভস্ম হ[illegible] যাচ্ছিল আর কিশোর কিশোরীরা এনেছে সেখানে অপরূপ শ[illegible] ওরাও তো আমাদের চেয়ে কম নয়!!

এই মধুর শরতে তাদের কি উপহার পাঠানো হবে—অফু[illegible] আকাশে তার আলাপ চলতে থাকল।

…স্বতী নদীর তীরে মুনি-ঋষিদের যজ্ঞ চলছিল। নানা আশ্রমের সাধু-সীরা যজ্ঞ দেখতে এসেছিলেন।
…থায় কথায় সেই সাধুদের মধ্যে প্রশ্ন —ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব, এই যে …জন দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে বড়

…কদলের মতে ব্রহ্মাই বড়, কেন-না, …ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন।
…বের ভক্তেরা প্রতিবাদ করলেন—…য়ের দেবতা শিব। চোখের পলকে তিনি …র সৃষ্টি লোপ করতে পারেন, তাঁর আবার বড় কে?"
…ক্তেরা বললেন—"সৃষ্টি আর প্রলয় একমুহূর্তের ব্যাপার। সৃষ্টিকে …য়ের হাত হতে রক্ষা করে চিরদিন এই

আসন ছেড়ে একবার উঠলেও না

…শ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করে আসছেন বিষ্ণু। …লের বড় তিনিই।"
তিন দলের তর্ক থামে না, এমন সময়ে …খানে ভৃগুমুনি এসে উপস্থিত।
সকল কথা শুনে ভৃগু বললেন—…ধুমাত্র আমার মুখের কথা মানবে কে? …মাণও তো চাই। আপনাদের তিন দলের …নজন সাধু আমার সঙ্গে চলুন। আমি …করি তা দেখে শুনে নিজেরাই বিচার …রতে পারবেন বড় কে।"
ভৃগুমুনির কথামত তিন দলের তিনজন সাধু তাঁর সঙ্গে চললেন।
তাঁদের নিয়ে ভৃগু প্রথমে গেলেন ব্রহ্মলোকে। সেখানে ব্রহ্মা থাকেন। ভৃগু ব্রহ্মারই ছেলে। ব্রহ্মলোকে গিয়ে তিনি যে-আসনে বসে ছিলেন, ব্রহ্মাকে দেখে সে-আসন ছেড়ে একবার উঠলেনও না, তাঁকে প্রণামটাও করলেন না। ছেলের এই আচরণে ব্রহ্মা বড়ই বিরক্ত হলেন। তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।
ভৃগু মুচকি হেসে সঙ্গীদের বললেন—"এখানকার কাজ শেষ হয়েছে? চলুন এবার কৈলাসে।"

দেবতার পরীক্ষা

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

কৈলাসে পার্বতীর সঙ্গে শিব বসে ছিলেন। ভৃগুকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেলেন। কিন্তু শিব যতই এগোন ভৃগু ততই তাঁকে এড়িয়ে পিছনে সরে সরে যান। শিব ভৃগুকে ছোট ভাই বলেই মনে করেন। তাঁর এরকম দেখে তিনি ভারী অপমান বোধ করলেন। তাই চটে গিয়ে ভৃগুর দিকে হাতের ত্রিশূল তুলে ধরলেন। পার্বতী তাঁর হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে রাখলেন।

ভৃগু মুচকি হেসে সঙ্গীদের বললেন—"এখানকার কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার চলুন বৈকুণ্ঠে যাই।"

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু থাকেন। সেখানে কোনো জায়গারই সাধু-সন্ন্যাসীর যাওয়া-আসার বাধা নেই। বিষ্ণুকে আর কোথাও না দেখে সঙ্গীদের নিয়ে ভৃগু তাঁর শোবার ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, বিষ্ণু পালঙ্কের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি যখন দেখলেন, বিষ্ণু ঘুমে অচেতন, তখন নিজের ডান পা-খানি তুলে তাঁর বুকের উপর আঘাত করলেন। সেই আঘাতে বিষ্ণুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পালঙ্ক ছেড়ে নীচে নেমে হাত জোড় করে ভুরু কুঁচকে ভৃগুর মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন—"মহর্ষি, আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে। আমি ঘুমে বেহুঁস ছিলুম। আপনারা কখন এসেছেন টের পাইনি। তাই সময়মত আপনাদের অভ্যর্থনা করে আসন

তাঁকে এড়িয়ে পিছনে সরে যান

পর্যন্ত দিতে পারিনি।" … … জন্য … …
বিষ্ণু আদর-অভ্যর্থনা করে ভৃগু আর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে বসালেন।
ভৃগু বললেন—"নারায়ণ, আমরা আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করেছি। তার উপর, আপনি আমাকে দয়া করেন বলে আপনার ঘুম ভাঙাতে আমি আপনার উপর অত্যাচারও করেছি।"
বিষ্ণু হেসে বললেন—"আপনি আমার উপর অত্যাচার করেছেন, সে কি কথা! আপনি সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আমার কাছে এসেছেন, আর আমি কিনা অঘোরে ঘুমিয়েছিলুম! আপনি আমাকে জাগিয়ে না দিলে আপনাদের প্রতি আমার সামান্য

তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন

কর্তব্য পালনের সুযোগও পেতুম না। এজন্য আপনি আমার উপকারই করেছেন। তার ফল হয়েছে আমার এই পুরস্কার—" বলেই বিষ্ণু আঙুল দিয়ে ভৃগুকে নিজের বুক দেখিয়ে দিলেন।
ভৃগু দেখেন—বিষ্ণুর বুকে তাঁর ডান পায়ের ছাপ। সে-ছাপ তাঁর বুকের কৌস্তভমণির পাশে রক্ত-পদ্মের মত পাঁচটি দল মেলে ফুটে উঠেছে।
বিষ্ণু বললেন—"মহর্ষি, আপনার পায়ের এই ছাপ চিরদিন আমার বুকের শোভা হয়ে থাকবে। যখনই আমি আমার কর্তব্য ভুলে যাব তখনই এই চিহ্ন আমাকে মনে করিয়ে দেবে সে-কথা।"
ভৃগুমুনি এতক্ষণ শান্ত হয়েই বসেছিলেন। এরপর আর স্থির থাকতে পারলেন না। 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে আকুল হয়ে তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।
তাঁরা তখন সত্যিই বুঝতে পেরেছেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে বড় কে।

সেই সকল লোক নিয়ে কি করবেন? সরোবরের জল পান করুন—জল পান করে শান্ত হোন্।”

বিজয় বললেন, “কি রকম! জল পান করবো কি রকম!” তিনি বুঝতে পারলেন। ভয়ানক রেগে গিয়ে, স্ত্রীলোকটার চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে বললেন, “তোমায় এক্ষুনি কেটে ফেলবো। বার কর আমার লোকদের।”

স্ত্রীলোকটা বিজয়ের হাতে পড়ে ভড়কে গেল। দেখলে, এ লোকটি জল পান করলে না। তা না করলে একে বশ করা যাবে কি করে। মহা বিপদ। তাড়াতাড়ি বললে, “আমায় মেরো না তুমি। যদি না মারো, তবে তোমায় এই রাজ্যের রাজা করে দেবো।”

বিজয় বললেন, “বেশ, তোমায় মারবো না। আমার লোকেদের বার করে দাও। তোমার ছলনায় আমি ভুলছি না।”

কুবয়া হলো স্ত্রীলোকটির নাম। সে বললে, “আমি আমার কথা রাখবো। তুমি হবে এই সাম্রাজ্যের রাজা। চলো তোমার লোকেদের কাছে।” যেতে যেতে বললে, “যুদ্ধ করতে পারবে?”

“নিশ্চয় পারবো। কার সঙ্গে যুদ্ধ?”

“তা পরে বলছি।”

তারপরে, লোকেদের কাছে নিয়ে গেল। বিজয় তাঁর অনুচরদের দেখে মহাখুশি। সবাই পড়েছিল যক্ষী কুবয়ার মোহে। বীর বিজয় কিন্তু তার মোহে পড়েননি।

কুবয়া বলল, “এখানে এক রাজধানী আছে। সেখানে এক রাজা থাকে। তার রানী আছে, এক কন্যা আছে। সবাই এরা যক্ষ। আজ সেই মেয়েটির হবে বিবাহ। খুব গোলযোগ। সেই গোলযোগের মধ্যেই যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করে সবাইকে মেরে ফেল। আজ না করলে, আর পারবে না মারতে।”

“বেশ তাই হবে।” বিজয় তাঁর সাতশত অনুচর নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাতিতে আর ঘোড়ায় চড়ে চললেন যুদ্ধ করতে। সে বিরাট আয়োজন। এমন যুদ্ধ করলেন যে, তেমন যুদ্ধ সেখানে কখনো হয়নি। এক জোড়া হাতিতে চড়ে বিজয় করলেন যুদ্ধ। যক্ষরা সব হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে থাকে। কুবয়া বললে, “আমি যে দিকে পাথর ছুঁড়বো, তোমরা সেই দিকে তীর ছোঁড়। তাহলেই যক্ষরা মারা পড়বে।” তাই-ই হলো। যক্ষরাও খুব যুদ্ধ করলো। কিন্তু মারা পড়তে লাগলো দলে দলে। হলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। সবাই মারা পড়লো। লঙ্কাদ্বীপের সে অঞ্চলে একটিও যক্ষ রইলো না। বিজয় তারপর হলেন লঙ্কার রাজা। লঙ্কার নামকরণ করলেন সিংহল, তাঁর পিতা সিংহবাহুর নামে।

বিজয় এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন সিংহলে। সে দেশের কত উন্নতি করলেন। তাঁর মন্ত্রীরা বললেন, “আপনি তো এক সাম্রাজ্যের রাজা হলেন। কিন্তু আপনার অভিষেক করতে চাই আমরা।” রাজ্ঞী না হলে অভিষেক হয় না। রাজ্ঞী কই? রাজ্ঞীর উপযুক্ত কন্যা সংগ্রহের জন্য তাঁর এক মন্ত্রী গেলেন তখন ওপারে—মাদ্রাজে।

মাদ্রাজের এক রাজা বিজয়ের বিজয় কাহিনী শুনে খুব মুগ্ধ হলেন, আর নিজের কুমারী কন্যাকে রত্ন-অলঙ্কার আর মূল্যবান যৌতুক সহ পাঠালেন সিংহলে।

বিজয়ের বিবাহ হলো। অভিষেক হলো। তিনি সগৌরবে ও মহাবিক্রমে রাজত্ব করলেন আটত্রিশ বছর কাল। সিংহলে বিজয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য শাসন, এ এক বাঙালীর মহাগৌরবের বস্তু। কিন্তু সে কথা অত্যন্ত পুরাতন হয়ে গেছে। এখনকার সিংহলীরা মূলে যে হলেন বাঙালী, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

কলম-কাগজী

প্রাপ্তনির্মলি বসু

(কলম টেবিলের ধারে গালে হাত দিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে—এমন সময়ে কাগজের প্রবেশ। কলমের মুখের চেহারা দেখে কাগজ খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলো।)

কাগজ— হি-হি-হি-হি
যেমন ধারা রূপের বাহার
তেম্‌নি মুখের শ্রী।

কলম—কি গো কাগজী দিদি, অমন করে' হাসছ কেন?

কাগজ—আরে, হাসব না? আমি কেন, তোর অমন বাংলা পাঁচের মত মুখখানা যে দেখবে সেই হেসে ভিরমী যাবে।

কলম—কেন, কেন, আমার মুখের হোলো কি?

কাগজ—তোর ঠোঁট দুখানা ওরকম থেব্‌ড়ে গেল কি করে কলম-ভায়া? যেন ভেংচি কাট্‌ছিস।
ভেংচি কাটিস্ কলম-ভায়া—
তোর 'পরে তাই জাগছে মায়া।
হি-হি-হি

কলম—ও, তাই বুঝি তোমার হাসা হচ্ছে? কিন্তু কারণটা জানলে মুখ দিয়ে তোমার হাসির ঝরণা না ঝরে দুঃখে তোমার চোখ দিয়ে কান্নার নোনাজল গড়িয়ে পড়বে কাগজী-দিদি।

কাগজ—কারণটা কি, কারণটা কি,
আমার কাছে বলবি নাকি?

কলম—কাল আমাদের সেজবাবুর পরীক্ষা শেষ হয়,—
তারই জন্যে এ দশা মোর হয়েছে নিশ্চয়।
এই কয়দিন আমার উপর দিয়ে কি কম অত্যাচার গেছে। একে খাতার উপর তার নামখানা লিখতেই তো আমি প্রায় আধ-মরা। তারপর তো লেখার কাজ আছেই।

কাগজ—কি রকম, কি রকম—
লিখতে তেনার নাম,
ছুট্‌লো কি কাল-ঘাম?
এমন কি উদ্‌ভট্‌ বিট্‌কেল নাম! বাবা।

কলম—নাম? নাম হচ্ছে—বজ্রাংশু বিরাট-বক্ষ বটব্যাল।

কাগজ—এ্যাঁ, কী বললি?—লবণ্ডুষ বিস্কুটের বাক্স আর ব্যাট্‌বল? আরে হোঃ হোঃ।

কলম—তা নয় কাগ্‌জী-দিদি, বজ্রাংশু বিরাট-বক্ষ বটব্যাল্।

কাগজ—এবার বুঝেছি। সত্যি তো নামটা বড় খট্‌মটে্‌। দাঁত ভাংবার কথাই বটে।
বাঙালীর ছেলেদের নামের বাহার
তোর কাছে পেনু আজ প্রমাণ তাহার।

ঠোঁট দুখানা ও-রকম থেব্‌ড়ে গেল কি করে

গায়ে নাই তিল জোর—নামে যত জোর;
তারি গরিমায় সব করে হুল্লোড়।

কলম—শুধু বুঝি তাই?—ইতিহাস-পাতিহাস, ভূগোল-পাগল, ইংরাজী-হিজিবিজি—যত কিছু বিদ্‌ঘুটে, উদ্ভুটে খিটিমিটি শব্দে আমি জেরবার হয়ে গেছি। তার চেয়ে দিদি আমাকে দিয়ে বাগান চাষ করালে আমার এত হয়রানি হোত না।
যত কিছু হিজিবিজি
আমার মাথায় ডাকায় ঝিঁঝিঁ।
আমাকে দিয়ে বাগান চাষ করলে বাগান ফলে-ফুলে ভরে উঠত। যাই হোক, কাগজী-দিদি, আমার উপর দিয়ে এত চোট গেলেও, ঠোঁট থেব্‌ড়ে গেলেও—

সেজবাবুকে আমি বড্ড ভালোবাসি। বিশ্বাসী চাকরের মত আমি ওর কাজ করে দিয়েছি। এবার সে নিশ্চয়ই পাশ করবে।

কাগজ—তাই নাকি?

ছেলেগুলোর কথায় মাৎ
পাশ করতে কুপোকাৎ।

কলম—না কাগজী-দিদি, আমাদের সেজবাবু তেমন নয়। জানো, কত রাত জেগে পড়েছে সে। অন্য ছেলেদের মত সে কথায় জগৎ মাৎ করে না। সত্যি খেটেছে সে। পড়ার জন্যে বাড়িতে কত বে-ইজ্জৎ হয়েছে সে—কত কান-মলা, গাঁট্টা, রদ্দা, চোখ-রাঙানি আর মুখ ভ্যাঙানি খেয়েছে সে।

কাগজ— গাঁট্টা-রদ্দা খায় কারা?
নেহাৎ ফাঁকিবাজ যারা।

কলম—না কাগজী-দিদি,

সেজবাবু তেমন নয়,
সেজবাবুর হবেই জয়।

সেজবাবু আমাকে খুব ভালোবাসে।

কাগজ—হি-হি-হি, তোকে খুব ভালোবাসে সেজবাবু—

তাইতো পেলি চোট
থেবড়ে গেল ঠোঁট।

কলম—আমার এই দুরবস্থা দেখেও সে আমাকে ত্যাগ করেনি। এমনকি, শেষ পরীক্ষায় আমার এই অবস্থায় আমাকে ত্যাগ না করে—প্রশ্নপত্রের অর্ধেকের ওপর উত্তর দেওয়া ত্যাগ করে উঠে এসেছে। ধন্যি সেজবাবু, ধন্যি।

কাগজ—তাহলেই হয়েছে আর কি! এবার নিশ্চয় তোর সেজবাবু ব্যাট্‌বল মশাই পরীক্ষায় মস্ত একটা ফুট্‌বল পাবে। হিঃ-হিঃ-হিঃ।

পরীক্ষায় যে রকম লিখেছেন চোস্ত—
ব্যাট্‌বল পাবে ঠিক ফুট্‌বল মস্ত।

কলম—আমার সেজবাবুকে চেনো না তাই ঠাট্টা করছ কাগজী-দি। সে যা লেখে তাতেই গুণ চিহ্ন পায়। গুণ না থাকলে কেউ কি আর গুণচিহ্ন পায়? যাই হোক, তোমার গায়ে ওসব আঁকিড়ি-মাকিড়ি কি কাগজী-দিদি? গয়না পরেছ নাকি—?

কাগজ—নারে কলম-ভায়া, তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যে। আজ আমার দিদিমণির অঙ্কের পরীক্ষা কিনা—তাই কাল অনেক রাত জেগে সে এইসব হিজি-বিজি কেটেছে আমার গায়ে। এই দ্যাখ্ না, কোনোটা রসগোল্লার মত, কোনোটা নিম্‌কির মত, কোনোটা সিঙ্গাড়ার মত কত কি হবি। আমি দিদিমণিকে বলতে চাইলাম—ও দিদিমণি, ওসব সিঙ্গাড়া-নিম্‌কি আর আমার উপর কেন? কড়াইতে চাপিয়ে দাও আর ময়দা মেখে ভাজো। খাসা মুচ্‌মুচে নিম্‌কি আর ফুলকপির সিঙ্গাড়া হবে। তা কে শোনে কার কথা! দিদিমণি রাত বারোটা পর্যন্ত আমার বুকেই ময়রার দোকান খুলে বসলো।

কলম—তাই নাকি?

মেয়েগুলোর কাণ্ডই খাপছাড়া,
ময়রা-দোকান ফাঁদ্‌লো এমন ধারা?

কাগজ—আর এক দিদিমণি তাকে পড়াচ্ছিলেন—তিনি আবার কয়েকটি সরু সরু যন্তর এনে আমার বুকের উপর প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে ফোটাতে লাগলেন। ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম—জ্যামিতি না কি শ্রীমতীকে শেখানো হচ্ছে। তা বাপু, জ্যাম-জেলি তৈরি করতে কি আর তুরপুন লাগে! ব্যথায় বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবুও যদি মেয়েটা পাশ করে তা'হলে সব সার্থক।
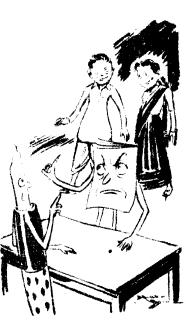
সেজবাবু ও দিদিমণি এদিকে আসছে

কলম—সত্যি কাগজী-দিদি, আমরা যে অত দুঃখ সহ্য করি তা কেবল ওদের মঙ্গলের জন্যে। এই যে তোমার বুক ফুটো হয়েছে, আমার ঠোঁট থেবড়ে গেছে, আমরা সব নীরবে সহ্য করব—যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা সত্যিকারের মানুষ হয়।

কাগজ—ঠিক বলেছিস কলম-ভায়া। দেশের ছেলেমেয়েরা মানুষ না হলে আমরা সবাই বিদ্রোহ করব।

না হলে তাদের মঙ্গল
আমরা যাব জঙ্গল।

তখন সবাই বুঝবে ঠ্যালা। আবার গাছের বাকলে লেখা শুরু করতে হবে। হুঁ-হুঁ, আর আমাদের টিকিরও সন্ধান পাবে না।

কলম—ঠিক্ বলেছ কাগজী-দিদি, আবার সেই খাগের কলম নিয়ে হোঁচট্ খেতে খেতে লেখার হুজ্জুতি করতে হবে।

কাগজ—চুপ্—চুপ্, ঐ তোর সেজবাবু—বিস্কুটের বাক্স এদিকে আসছে।

কলম—তার সঙ্গে তোমার দিদিমণি সুঁচ-সুতোও আসছে।

কাগজ—আরে আমার দিদিমণি সুঁচ-সুতো নয়; আমার দিদিমণি শুচিস্মিতা দেবী।

কলম—আমার সেজবাবুও বিস্কুটের বাক্স নয়,—বজ্রাংশু বিরাটবক্ষ বটব্যাল।

কাগজ—বাবারে বাবা, আজকাল ছেলেগুলো হোলো কি। তাদের শরীরের বহর যেমন কমছে—নামের বাহারও তেমনি বাড়ছে। বজ্রাংশু বিরাটবক্ষ বটব্যাল, কপিধ্বজ করজাক্ষ কাঞ্জিলাল, শাল-প্রাংশু অনিন্দ্যাংশু দেব-বর্মা, বাবারে-বাবা।

কলম—কেন মেয়েদের বেলাই কম কি—তারাই কি কোনো বিষয়ে পিছিয়ে আছে। শুচিস্মিতা দেবী, ঋতম্বরা পীতম্বরা, জৈগিষব্যা, ইরম্মদা, ব্রজ-নির্ঘোষা—এই সব দাঁত ভাঙা নাম আজকাল হর্দম শোনা যাচ্ছে।

নাম বলতে চট্‌পট্
দাঁত ভাঙে পট্‌পট্

যাই হোক কাগজী-দিদি—এই সব শক্ত শক্ত নামের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি তাদের শরীর আর মনও শক্ত করে তুলতে পারে, তবেই সব সার্থক। কাগজী-দিদি—আমাদের সেজবাবুর নাম বজ্রাংশু বিরাট বক্ষ, কিন্তু ঐ দ্যাখো তিনি হেলুতে-দুলতে আসছেন যেন একটা কেঠো ফড়িং। ফুঁ দিলেই বোঁ করে উড়ে যাবে।

কাগজ—আমার দিদিমণিও তাই—উড়তে উড়তে আসছে, যেন উচ্চিংড়ে। সত্যি কলম-ভায়া আমরা সব সময়েই এদের মঙ্গল কামনা করছি। এরা কি সত্যি-কারের মানুষ হবে না? তারা কি শুনবে না আমাদের এই মাত্র কয়েক মিনিটের কথা?

যবনিকা

টামড়াবে নাও? ওজনটিও নেহাত কম নয়। যেই না ও কথা ভাবা, পূর্বপুরুষ একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি শাঁখটাও কোল থেকে গড়িয়ে বালির উপর চিৎ হয়ে পড়ল। পূর্বপুরুষ অবাক হয়ে দেখলেন, ওটার ভিতর পোকা টোকা কিছু নেই, একদম ফাঁকা, এমন কি মাথায় একটা ফুটো অবধি রয়েছে। তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন, অমনি মাঝ সমুদ্রের অগাধ জলের শোঁ শোঁ শব্দ কানে এল, পূর্বপুরুষের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। শাঁখটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একবার একটু ফুঁ দিয়ে বাজাতেই আকাশ বাতাস জুড়ে গম্ গম্ শব্দ উঠল।

মনে ভাবলেন, যদি কিছু টাকা পেতাম, শাঁখটা নিয়ে দেশে ফিরে যেতাম। ধার-কর্জ শোধ করে দিয়ে, শাঁখটাকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। যেমনি ভাবা, অমনি ঠক্ করে প্যায়ের কাছে কি একটা পড়ল। তুলে দেখেন ময়লা একটা ন্যাকড়ার থলি ভরা রুপোর টাকা। পূর্বপুরুষ আর সময় নষ্ট না করে, বুকে শাঁখটাকে জাপটে ধরে, হাতে টাকার থলি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তারপর ধার-ধোর শোধ করে দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করলেন। শাঁখের জন্য আলাদা একটা ঘর হল, ভারী ধুমধাম করে রোজ তার পুজো হত। আর তার দৌলতে ও'দের আর কোনোরকম দুঃখ কষ্ট রইল না, কারণ রোজ রাত্রে পুজোর পর একবারটি বাজিয়ে ওর কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত।

বটু এতদূর বলে, একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর আরো বলল, "দিনের মধ্যে কিন্তু ঐ একবারই ওর কাছে চাওয়া হত, আর যা চাওয়া যেত ঠিক তাই পাওয়া যেত। কিন্তু খুব সাবধানে চাইতে হত, কারণ ঠিক যেমনটি বলা হত, তেমনটি ফলে যেত। কথার একটু নড়চড় হত না। তারজন্য মাঝে মাঝে খুব অসুবিধাও হত। বুড়ি ঠাকুমা শাঁখ বাজিয়ে প্রণাম করে সবেমাত্র উঠেছেন, নাতি-নাতনীরা এমনি জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে যে, ও'র পানের ডিবের সব পান কটি খেয়ে ফেলে, ও'র একেবারে হাড় ভাজা ভাজা করে তুলেছে। বিরক্ত হয়ে নাকি বলেছেন, 'চুলোয় যাক্‌গে সব!' আর যাবে কোথা। ঝুপ্ ঝুপ্ সব রান্নাঘরের উনুনে গিয়ে পড়েছে, উনুন টুনুন নিভে একাকার, এখানে ছ্যাঁকা ওখানে ছ্যাঁকা! তবে মাঝে মাঝে আবার সুবিধাও হয়ে যেত। বেয়াইবাড়ির লোকরা মহা বাড়াবাড়ি লাগিয়েছিল। কিছুতেই মেয়ে পাঠাবে না। বুড়ো ঠাকুরদা সবে পুজো সেরে শাঁখকে বাজিয়ে প্রণাম করে উঠেছেন, এমন সময় যারা মেয়েকে আনতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিল। বুড়োও রেগে বললেন, 'বেয়াই বেয়ান ফিরিয়ে দিলে বুঝি? যাক্‌গে, মরুক্‌গে!' বাস! আর যাবে কোথা। তৎক্ষণাৎ বেয়াই বেয়ান চোখ তুলে একেবারে অক্কা!"

আমি বটুকে বললাম, "তবে তুই শাঁখকে বলে একটু অঙ্কের নম্বর টম্বর বাড়িয়ে নিস না কেন?"

বটু বলল, "সে হবার জো নেই। সত্তর বছর থেকে আর ওর কাছে কিছু চাওয়া বারণ।" আমি শাঁখটার আরেকটু কাছে এগিয়ে বললাম, "কেন, চাইলে কি হয়?"

"আরে, কি হয় মানে? ঠাকুরদার ঠাকুরদা যে একেবারে কর্পূরের মত উড়ে গেলেন, সেটা বুঝি কিছু নয়?"

যদিও ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা উড়ে গেছেন বলে আমার কিচ্ছুও হয় না, তবু ওদের বাড়িতে আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, তাই আর কিছু না বলাই ভালো মনে হল।

একেবারে ছোটদাদুর পায়ের উপর

কিন্তু অমন সুন্দর একটা শাঁখ, এতকাল ঘরে রয়েছে, কাউকে কিছু বলে টলেও না, তাকেই বা অত ভয় কিসের ভেবে পেলাম না। একটু হাত দিয়ে সরালাম, কিচ্ছু হল না। দু হাতে তুলে নিয়ে একটু শুঁকলাম, বেশ গন্ধ। কানের কাছে উঠিয়ে নিয়ে শুনলাম, অগাধ সমুদ্রের জল শোঁ শোঁ করছে। কেমন যেন গায়ের লোমগুলো সর সর করে সব খাড়া হয়ে উঠল। শাঁখটাকে আবার নামিয়ে রাখলাম। বটু একটু কাষ্ঠ হেসে বলল, "দেখিস, বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেললে কিন্তু শেষে কষ্ট পেতে হবে।"

বটুদের পাড়া ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে, বটতলার মাঠে পুজোর সময় যাত্রা হয়। কিন্তু বটুদের বাড়ির লোকরা এমনি যে, কিছুতেই ছেলেদের গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেবে না। বলে নাকি, আমার বাবা শুনলে রাগ করবেন। বাবা এদিকে নিজে—যাক্‌গে সে কথা। বটু বলল, "অত সহজে ঘাবড়ালে চলবে কেন। দেখই না!" তারপর খাওয়া দাওয়া সারা হলে, ঘরে গিয়ে খানিক ঘাপ্‌টি মেরে থাকলাম। তারপর উঠে পাশ বালিশ আর মাথার বালিশ দিয়ে, দুই বিছানায় দুই মানুষ বানিয়ে তাদের গায়ে মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে, মশারি গুঁজে, আলো নিভিয়ে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল, হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। বটু বলল, "এ তো আমরা বহুবার করেছি। চল, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে।"

দূরে যাত্রার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে। আমরা বসবার ঘর পেরিয়ে যাবার সময়, তাকের উপর চোখ পড়ল, অন্ধকারেও শাঁখটা কি রকম জ্বলজ্বল করছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, পা চালিয়ে এগোলাম।

বাইরে তারার আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরের জানলা বাইরে থেকে ঠেসে দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড় দৌড়, একেবারে বটতলার মাঠের যাত্রায়।

উঃ, কি ভালোই যে লাগল! কুম্ভকর্ণ যে কি মজাটাই করল! কখন যে রাত কেটে গেল টেরই পেলাম না। ভোরের আগে যাত্রা ভাঙল, বটু আর আমি ঢুলু ঢুলু চোখে বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

এই পর্যন্ত কোনো গোলমাল হয়নি। কিন্তু রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ঢুকেই বটু একটা বালতি না কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে, একগোছা থালা ঝন্‌ঝন্ করে ফেলল। তার এমনি আওয়াজ যে, মড়া মানুষরাও উঠে বসে।

কোনো রকমে সেখান থেকে ছুটে বসবার ঘর অবধি এসেছি, আর ততক্ষণে চারদিকে হৈ-চৈ। ছোটদাদু লাঠি নিয়ে টর্চ নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ধরলে আর আস্ত রাখবেন না। একবার টর্চটা আমাদের মুখে পড়লেই, আমার ছুটিতে মজা-মারা সারা! অন্ধকারে শাঁখটা তখনো জ্বলজ্বল করছে। একদৌড়ে সেটাকে বুকে নিয়ে আস্তে একটু ফুঁ দিলাম। অমনি সারাবাড়িময় গম্ গম্ করে উঠল। মনে মনে বললাম, "এইবার দেখি তোমার কত ক্ষমতা।" ওমা! ওকথা ভাবামাত্র শাঁখটা আপনি আপনি আমার হাত থেকে সুড়ুৎ করে ছুটে গিয়ে, একেবারে ছোটদাদুর পায়ের উপর! আর কি! ওরে বাবারে, বোমা ফেলল নাকি রে, মরে গেলাম রে, জল আন রে! দেখতে দেখতে চারদিকে লোকজন গিজ গিজ করতে লাগল। সেই সুযোগে বটু আর আমি খাবার ঘর থেকে
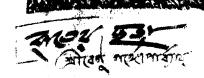
ছায়া নাচে দেয়ালে।
ডাক পাড়ে শেয়ালে।
ইঁদুরের দুপ্ দাপ,
খুকু বসে চুপ চাপ।

আরসুলা ফর্ ফর্
ঘোরে ফেরে ঘর ঘর।
খোকাবাবু কাঁপছে।
ভয়ে চোখ ঢাকছে।

মিশ কালো আঁধারে
চোখে লাগে ধাঁধারে।
একা নড়ে তাল গাছ
ভোঁদড়েরা ধরে মাছ।

আগডুম বাগডুম
ঠাকুমা পাড়ায় ঘুম।
আয় ঘুম, ঘুম আয়।
খোকা খুকু ঘুমু যায়।

জলের সোরাই এনে, ছোটদাদুর পায়ের উপর জল ঢাললাম।

ততক্ষণে আলো জ্বালা হয়েছে, সবাই ভাবছে, আমরাও বুঝি এক্ষুনি নেমে এসেছি। বামুনঠাকুর এমনি মিথ্যাবাদী যে, বলতে লাগল, "তিনটে লোক ছিল বাবু। নিজের চোকে দেখলুম, শাঁখটা তুলে আপনার গায়ে ছুঁড়ে, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল। এই গোঁফ, সারা গা তেল চুকচুকে! এত কাণ্ড হল, তা দাদাবাবুদের এমনি ঘুম, এতক্ষণে নেমে এয়েছেন! বাবুকে তো আরটু হলেই মেরে ফেলেছিল! নেহাত আমরা পাঁচজনা এসে পড়লাম! ওরা তো শিঙা বাজিয়ে দলের লোকজন ডাকতে লেগেছিল!"

আমি আস্তে আস্তে শাঁখটাকে তুলে আবার তাকের উপর রেখে দিলাম। সেখানে পাঁচটা শিং তুলে ও বসে রইল।

ছোট ঠাকুরদার পায়ে জলপটি দেওয়া হতে লাগল, বটু আর আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। হঠাৎ বটু বলল, "দেখ, আমার কি মনে হয় জানিস? ঐ যে ঠাকুরদার ঠাকুরদা, উনি বোধ হয় অদৃশ্য হয়ে যেতেই চেয়েছিলেন। ঠাকুমা নাকি নামকরা বদমেজাজী ছিলেন।"

আমি কিছু বললাম না। ওদের বাড়িতে আছি। বটু আবার বলল, "শাঁখটা কিরকম মুচকি হাসছিল দেখেছিস?"

তারপর আস্তে আস্তে মশারি তুলে, বালিশ ঠেলে, দুজনে শুয়ে পড়লাম।

ভগবানের করুণা নিত্যই নানাভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু সে জন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষ করে কোন কৃতজ্ঞতা জানাই কি? অথচ কখনও যদি সামান্য একটু অসুবিধা হয় বা দুঃখ পাই ত অমনি বলি—"ভগবান, তোমার মনে এই ছিল?" একথা কিন্তু একবারও মনে হয় না যে, যিনি এত ভাল জিনিস দিচ্ছেন তাঁর হাত থেকে না হয় দু-একটা খারাপ জিনিস নিলামই বা। কবির ভাষায়—"আমি বাছিয়া লবো না তোমার দান, যাহা দাও তাই ভালো: তুমি বেদনার পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের পাশে আলো!" এ রকম কিন্তু ক-টা লোকই বা ভাবে!

অবশ্য এই রকম একটি লোক কিন্তু সত্যিই ছিলেন পৃথিবীতে। তিনি নিজের জীবনে তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

তিনি হলেন লোকমান (বা লুকমান)। জাতে হাবসী, ক্রীতদাসরূপে আরবে এসেছিলেন। এই লোকমান সহজাত জ্ঞানের জন্য পরে খুব বিখ্যাত লোক হন। ঈশপের মত এঁরও রূপক গল্প আছে বিস্তর। এঁর উপদেশ মুসলমান সমাজ—শুধু মুসলমান সমাজ কেন, সকলেই—খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে থাকেন। কবি সতেন্দ্র দত্ত এঁর কথাই লিখেছেন তাঁর 'কালোর আলো' কবিতায়—'হাবসী কালো লোকমানেরে মানে আরব আর ইরাণী।"

ইনি তখনও ক্রীতদাস। এঁর মনিব একদিন ওঁকে একটা শরদা (খরমুজের মতন একটা জিনিস) আনতে বললেন। ওঁদেরই ক্ষেতের জিনিস। লোকমান তাড়াতাড়ি বেছে ভাল দেখে কাঁচা শরদা এনে দিলেন। মনিব এমনিই ভাল বাসেন। মনিবটি ভাল লোক ছিলেন। লোকমানকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তবে একটু তামাসাপ্রিয়ও ছিলেন।
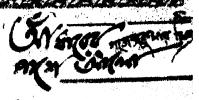
তিনি শরদাটি নিয়ে কামড়েই দেখলেন সেটি হাকুচ্ তেতো। ফেলে দিতেই যাচ্ছিলেন—একটু তামাসা করার লোভ সামলাতে পারলেন না। লোকমানকে বললেন, "বাঃ বেশ জিনিসটি, তুমি খেয়ে দ্যাখো।"

লোকমান হাত পেতে নিলেন এবং ধীরে সুস্থে চিবিয়ে—যেন বেশ তারিয়ে-তারিয়েই সবটা খেয়ে ফেললেন।

মনিব ত অবাক। বললেন, "ও কী হে, আমি তোমাকে তামাসা ক'রে দিলুম আর সত্যিই ওটা খেয়ে ফেললে?"

লোকমান বললেন, "আপনি স্নেহ করে দিলেন আর আমি কি ফেলে দেব?"

"কিন্তু তুমি খেলে কী করে হে? ওযে বিষম তেতো!"

লোকমান হেসে সবিনয়ে বললেন, "আপনি যখন-তখন কত কি ভাল ভাল জিনিস দেন—সেগুলো খাই আর দৈবাৎ একটা জিনিস তেতো হয়ে গেছে বলে খারাপ লাগবে কেন? আপনার দেওয়া জিনিস—এই ভেবেই আমি খেয়েছি—তেতো কি মিষ্টি অত ত ভাবিনি!"

ওঁর মনিব স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চাকরের কাছে শ্রদ্ধায় ওঁর মাথা নত হয়ে পড়ল।

বেশ জিনিসটি, তুমি খেয়ে দ্যাখো

সেদিন বিশ্বকর্মা পুজো। নিতুর দাদারা কত রকম সব ঘুড়ি কিনে এনেছে। লাটাই ভর্তি সুতো! রোজই নিতু দেখে দাদারা ঘুড়ির কল বাঁধে, কোনও কোনও ঘুড়িতে আবার লম্বা লেজ লাগায়। ল্যাজওলা ঘুড়িগুলো যখন ওড়ে—তখন নিতুর ভারী মজা লাগে। ঠিক যেন আকাশে কিল্‌-বিল্‌ ক'রে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাক চিলগুলো ভয়ে কা—কা ক'রে পালিয়ে যায়। নিতু হাততালি দিয়ে ওঠে। ঘুড়ি ওড়াতে ওরও ইচ্ছে যায়, কিন্তু দাদারা ওকে একটুও ওড়াতে দেয় না।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, ঘুড়ি, সুতো, মানজা এই নিয়েই দাদারা সবাই ব্যস্ত। নিতুর সঙ্গে কেউ একটা কথাও বলছে না। উল্টে চিলের ছাতে উঠে গিয়ে দাদারা দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। নিতুরও অভিমান কম নয়। দোতালার ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আকাশ আলো করে রং বেরঙের ঘুড়ি উড়ছে।

হঠাৎ নিতুর খেয়াল চাপলো—দাদারা তো ঘুড়ি ওড়ায় কিনে এনে। ও ঘুড়ি হয়ে নিজেই উড়বে আকাশে। দাদারা হাঁ করে চেয়ে থাকবে।

নিতু তার নতুন মতলবটার কথা কাউকে বললো না। বললে শুধু লোমওয়ালা কুকুর ছানা 'ভুলুয়া'কে।

ভুলুয়া সব সময়ে নিতুর সঙ্গে থাকে। নিতু যখন যা হয়ে যায়, 'ভুলুয়া'ই শুধু একলা দেখতে পায়। কাউকে তো ভুলুয়া বলে দেয় না নিতুর মনের ইচ্ছেগুলো।

নিতুর ধারণা, একমাত্র ভুলুয়াই ওর দুঃখ্যু বোঝে। আর কেউ না! মা নয়, বাবা নয়, দাদা দিদিরা তো নয়ই।'

ঘুড়ি না হওয়া পর্যন্ত, নিতুর সোয়াস্তি নেই। মাথায় যখন মতলবটা এসেছে, তখন তাকে ঘুড়ি হতেই হবে। তাই সে চুপি চুপি ছোড়দার কোটটা, গায়ে চড়ালে। খানিকটা দড়ি, কাগজ আর গঁদের আঠার শিশিটা পকেটে পুরে নিলে। মেজদার বাখারীর তৈরি বাঁকানো ধনুকটাও কোটের আড়ালে ঢেকে নিয়ে গুট গুট করে বেরিয়ে পড়লো খিড়কি দরজা দিয়ে। হাজির হলো ওদের বাড়ির পেছনের মাঠটায়। সংগে গেল শুধু 'ভুলুয়া' কুকুর ছানাটা।

মাঠে গিয়েই চট্‌পট্‌ কোটটার পেছনে বেশ লম্বা করে খানিকটা দড়ি বেঁধে নিলে। তারপর কাগজের ছোট বড় নানা মাপের টুকরো ছিঁড়ে—গঁদের আঠা লাগিয়ে দিলে। শেষটায় নিতু কোটের দুটো হাতের ভেতরে বাঁকা ধনুকের দুটো মাথা পুরে আর হাত দুটোও ঢুকিয়ে দিলে।

ঘুড়ির কাপের মত ধনুকটা কোটটাকে টান করে মেলে দিলে। নিতুকে আর পায় কে? ঠিক সেতো ঘুড়ি হয়ে গেছে।

নিতু বাঁই বাঁই করে ছুটতে লাগলো। কোটের পেছনে বাঁধা দড়িটাও ঘুড়ির লেজ হয়ে দৌড়ুচ্ছে এঁকে বেঁকে নিতুর পিছু পিছু। ভুলুয়া কুকুর ছানাটা ভাবলে নিতুকে বুঝি সাপ-টাপে তাড়া করেছে, তাই সে অমন ছুটোছুটি করছে।

ভুলুয়া ছুটে গিয়ে এক লাফে তখুনি ঘুড়ি-নিতুর দড়ির লেজটা কামড়ে ধরলে। দৌড়ের ঝোঁকে ভুলুয়ার হেঁচকা টান লেগে নিতুর পা গেল পিছলে। পড়লো একেবারে দড়াম করে চিৎ হয়ে। মাঠের একটা বড় ইঁটের টুকরোতে মাথাটা ঠুকে গেল!

নিতু ভয়ানক চটে গেল। ভাবলে ঘুড়ি হয়ে সেতো উড়তে পারতোই আর একটু হলে। 'ভুলুয়া' কিনা শেষটায় সব পণ্ড করে দিলে। উঠে পড়ে ধুলো ঝেড়ে দেখে—ভুলুয়া নেই!

নিতু আছাড় খেতেই 'ভুলুয়া' এক দৌড়ে পালিয়ে গেছে বাড়ির ভেতরে। মাথাটাতেও লেগেছে খুব চোট—নিতুর ঘুড়ি হওয়ার সাধে বাধা পড়লো। ছুটলো সোজা মায়ের কাছে। মাকে গিয়ে দেখালে মাথার পেছনের ঢিবলি হয়ে ফুলে ওঠা জায়গাটা।

ছেলের অমন দুর্দশা দেখে—মায়ের মনটাও খারাপ হয়ে গেলো। মা ওকে জিগ্যেস করলেন—"লেগেছে নাকিরে খুব।"

"না! মা।" নিতু জবাব দিলে। বললে—জানো মা আমি ঘুড়ি হয়ে উড়ে যেতুম, কিন্তু কি করে মাটি ছেড়ে ওপারে উঠবো ভুলুয়া তোমার নিতু ঘুড়ির লেজ ধরে টেনে ফেলে দিলে যে।"

মা ওর কথা শুনে বললেন—"কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুড়ি হয়ে যেতে তা হলে তো ভারি মুস্কিলই হতো। তাহলে তুমি বল খেলতে পারতে না, লাফাতে পারতে না, সিঁড়ির রেলিংটাকে ঘোড়া করে চড়তে পারতে না। পারতে না এমনি আরও কত কি, যা তুমি করতে চাও। এখনও ভেবে দেখো 'ঘুড়ি' তুমি হবে কি না!"

মা জল-পটি বেঁধে দিলেন নিতুর মাথায়। নিতু ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলে। শেষকালে ভুলুয়াকে কোলে টেনে নিয়ে ওর কানে কানে বললে—যে ও একেবারে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে ও আর কক্ষনো ঘুড়ি হবে না। ঘুড়ি হয়ে উড়ে লাভ নেই কিছু কারণ সে ভেবে দেখেছে—পাগুলোকে কাজে লাগাতে পারলেই বেশী মজা।

বাচ্ছা ভুলুয়া চুপ করে চেয়ে রইল নিতুর মুখের দিকে—বললে না যে, নিতুর চেয়ে ভুলুয়া বেশী জানে পায়ের কথা, কারণ ভুলুয়ার চার চারটে পা। ঘুড়ি হওয়ার ঝুট-ঝামেলা না করেই সে বলে দিতে পারতো ঘুড়ি হওয়ার ঠ্যাসাটা কি!

নিতু বাঁই বাঁই করে ছুটতে লাগলো

ল টিকেপাড়া বি সম্মেলন

শ্রীধীরেন বল

ষ্ঠে বললেঃ অল টিকেপাড়া কবি সম্মেলনের ত আর মোটে দুমাস । গুণেদা ত কবিতা লেখায় বিশেষ থে করে উঠতে পারছে না।

ন্তা চোখ বড় বড় করে বলে ঃ পারবে রে বল? গুণেদা ঠিকই বলে—কবিতা ত চাই পরিবেশ! কাঠখোট্টা পরিবেশে কবিতা বেরোয় না, তেমনি পরিবেশ হলে কাঠ-ঠকঠকে হেড থেকেও বেরোয় উঁচু রকমের কবিতার গঙ্গা। নাথ পর্যন্ত এই পরিবেশ তৈরি করে ন—গুণেদা বলে।

ষ্ঠ বলে ঃ পরিবেশ আবার কি?

এই ধর আবহাওয়া। বসন্তকাল। র গন্ধ, ঝির ঝিরে হাওয়া, লের কুহুতান। এসব পেলে গুণেদা গুণেদা তুইও কালিদাস হয়ে যাবি।

ষ্ঠ মহা ভাবনায় পড়ে।

এই ঘোর বর্ষায় সে পরিবেশ তুই পাবি রে? নাঃ, গুণেদার আর কবি হওয়া না। অল টিকেপাড়া কবি সম্মেলন গেল বেমালুম।

খ বড় বড় করে নন্তা বলে ঃ বলিস সেটা যে আমাদের ক্লাবের বদনাম। দের মুখে চুণকালি! সে কথা— ন ত?

খুব বুঝি! কিন্তু বুঝে কোনো লাভ প্রথমেই ধর—বর্ষাকালকে পাল্টে তুই বানাতে পারিসনে। অবিশ্যি শোনা এটম বোমার ফলে সব ঋতুই নাকি ক দিন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। ওই এটম বোমার ফলে কাল থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে। মানে, তর ব্যারাম নয়, বসন্ত ঋতু। বার ভাগো যদি সে-সিকে ছেঁড়ে, তবে গুণেদার কবি হওয়া ঠেকায় কে ?

সেই আশায় ত আর চুপ করে বসে যায় না। কবিতা লিখবে বলে গুণেদা ন্ত কাগজ আনালে, তাহলে সে গুলোরই যে শুধু বরবাদ—তা নয়। বড় একটা কবি-প্রতিভারও অপঘাত!

ষ্ঠ বলে ঃ বটেই ত!

আমি ভেবেছি কি জানিস? তোর ওই বোমার জন্যে বসে না থেকে, আর গুণেদার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করি।

কি করে?

এই ধর—ফুল গাছের বাগান সাজিয়ে —গুণেদার জানালার পাশে, দোপাটি, গন্ধা, গন্ধরাজ। আর ঝিরু ঝিরে া? আমাদের বড় তালপাতার পাখাটা রয়েছে ভাঁড়ার ঘরে। ওই দিয়ে ন না হয় পালা করে হাওয়া করে যাব।

কোকিল?

ঃ কোকিলের কি হবে? তাইতো—নন্তা বাহাদুরির হাসি হেসে বলেঃ কোকিলের জন্যে ভাবিসনে, সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। একটা কোকিলের ছানা এনে পুষবো।

ঃ ছানা? সে তো কোকিলের বাসায় থাকে। এ অঞ্চলে কোকিলের বাসা তো চোখে পড়ে না।

ঃ কেন? আমাদের সেই লম্বা আম গাছটার মগডালে!

ঃ দূর বোকা, সে যে কাকের বাসা!

ঃ আরে, ওই কাকের বাসাতেই থাকে কোকিলের ছানা। তা-ও জানিসনে বুঝি?

ষষ্ঠে মাথা চুলকে আমতা আমতা করে।

নন্তা বিজ্ঞের মত বোঝায় ঃ কোকিলরা খুব চালাক কিনা। নিজেরা বাসা বানাতে পারে না, তাই কাকের বাসায় গিয়ে তার ডিমগুলো খেয়ে, সেইখানে নিজেরা ডিম পেড়ে রেখে আসে। বোকা কাক সেই ডিমে তা দিয়ে দিয়ে ডিম ফোটায়। যখন সে ছানা উড়তে শেখে, আর মুখে বোল ফোটে, তখন কোকিলের ছানা বলে বুঝতে পারে। আর তখুনি তাকে ঠুকরে বাসা থেকে দেয় তাড়িয়ে। ঠিক এর কিছু আগেই কাকের বাসা থেকে আমাদের পেড়ে আনতে হবে কোকিলের ছানাকে।

ষষ্ঠে খুব উৎসাহ পায়। বলে ঃ তবে আর দেরী কেন? আজ দুপুরেই তোদের আমগাছটায় চড়া যাক। কি বলিস?

নন্তা বলে ঃ ঠিক!

দুপুরের পর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে হেঁসেলের দরজা বন্ধ করে মা শোবার ঘরে ঢুকলেন। বাবা খবরের কাগজ বুকে করে তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। নন্তা এই ফাঁকে সুড় সুড় করে পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ষষ্ঠে আগে ভাগেই গাছতলায় এসে জুটেছে। তারপর দুটিতে মালকোঁচা মেরে একেবারে আমগাছটার মগডালে।

কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয়। তারা হানা দিয়েছে একটা বাসায়, কিন্তু কোথা থেকে একশটা কাক এসে হল্লা শুরু করে দিয়েছে তাদের ঘিরে! একটা ডাল ভেঙে নিয়েও ষষ্ঠে সামলাতে পারে না নন্তাকে। কাকেরা একজোট হয়ে তাদের ওপর ব্লীৎসক্রীগ চালিয়ে দিয়েছে। ঠুকরে দুজনার মাথার চুল ছিঁড়ে নিয়েছে, রক্তারক্তি করে দিয়েছে দুজনার সর্বাঙ্গ। নিচে নেমেও নিস্তার নেই। ছুটে নন্তার পড়বার ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিয়ে তবে রক্ষে। সেখানেও দলে দলে ধাওয়া করেছে কাকরা। নন্তার পড়বার ঘরের চারি পাশে বসেছে কাকেদের পঞ্চায়েৎ। কা-কা রবে পাড়াটাকে নাড়া দিচ্ছে।

বাবা ঘুম থেকে জেগে বসেছেন। কি হলো ভেবে মা-ও দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন। নন্তারা ততক্ষণে আণ্ডার গ্রাউণ্ড অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে পড়বার ঘরের খাটের তলায়। সেখানে ষষ্ঠে একটা খাঁচা আগেই জোগাড় করে রেখেছিল, কোকিল ছানা একেবারে সিধে তার ভেতরে।

সন্ধ্যের দিকে বসন্তকালের সব মাল-মসলা জোগাড় করে দুই বন্ধুতে গিয়ে গুণেদার পড়বার ঘরে পা টিপে টিপে হাজির। গুণেদা তখন পরীক্ষার পড়ার বইগুলো কায়দা করে চারপাশে খুলে রেখে মাঝখানে এক দিস্তে কাগজ খুলে নিয়ে কলম বাগিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই নন্তা বলে ঃ নাও গুণেদা, আর তোমাকে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে হবে না। এবার ভাল করে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাও। এই নাও তোমার কোকিল ছানা, আর এই নাও বড় তালপাতার পাখা।

একটা ডাল ভেঙে নিয়েও সামলাতে পারে না

ষষ্ঠে বলে ঃ আর এই নাও গন্ধরাজের ডাল তোমার জানালার পাশে পুঁতে দিলেই দিব্যি একমাসের মধ্যে ফুল ফুটবে ফট্ ফট্ করে। আর এই এনেছি রজনী-গন্ধার চারা। একমাসের মধ্যে এরও ফুল ফুটে যাবে।

তারপর ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের মোড়ক খুলে জানলা দিয়ে বাইরে ছড়াতে ছড়াতে বললেঃ এই ছড়িয়ে দিলুম দোপাটির বীচি। দু-এক মাসের ভেতরেই গাছ গজিয়ে ফুল ধরবে দেখো। পরিবেশ সৃষ্টি না হয়ে উপায় নেই।

নন্তা বললেঃ এবার তোমার কবি হওয়া ঠেকায় কে গুণেদা! মোদ্দা অল টিকেপাড়া কবি সম্মেলনের আগেই দুদিস্তে কবিতা আমরা চাই। আমরা আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না। কাগজ ফুরোবার আগেই জানিও, ফের দুদিস্তে এনে দেবো।

পাশেই। [illegible]

গন্ধ পেয়েই ঠাকমা চেঁচিয়ে বলেন ঃ আবার তোরা গনুকে জ্বালাতে এসেছিস? পই পই করে তোদের বারণ করে দিইচি না—এটা ওর এগজামিনের বছর, ওকে তোরা পড়তে দে! যা—যা—যা, যে যার ঘরে গিয়ে পড়গে যা। তোদের এগজামিনের আরো দু-বছর বাকি—যা!

এর দিন কুড়ি পরে দুপুর বেলা দুজনেতে চুপি চুপি এসে গনুদার জানালার বাইরে উপুড় হয়ে কি খুঁজছে।

নন্তা বলে ঃ কি রে, গজিয়েছে তোর দোপাটি গাছ?

ঃ কি করে গজাবে বল? খোয়া বালি আর রাবিশের গাদা। অন্ধকারে কি আর টের পেয়েছি সেদিন? এ যে একেবারে সাহারা রে নন্তে!

ঃ এই শুকনো কাঠটাই বুঝি তোর সেই গন্ধরাজের চারা রে ষষ্ঠে? গনুদার কী বুদ্ধি! এই রাবিশের ওপরই তা পুঁতে দিয়েছে! আর ওই শুকনো ঘাসের চাপড়া, ওটা নিশ্চয় তোর রজনীগন্ধার ঝাড়!

ঃ হায়রে জায়গা বুঝে লাগাতে পারলে নিশ্চয় ওতে ফুল ধরে যেতো এতদিনে! গনুদার ক্যাবলামিতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।— দুহাতে মাথা চাপড়ায় ষষ্ঠে!

হঠাৎ পড়বার ঘরের জানলা খুলে যায়। বিমর্ষভাবে বাইরে মুখ বাড়ায় গনুদা।

নন্তা বলে ঃ এদিককার যাইহোক, তোমার কাগজ আর কত বাকি গনুদা?

উদাসভাবে গনুদা বলে ঃ সবটাই।

ঃ সে কী!

ঃ কেন নয়? ওইত তোর রজনীগন্ধার দশা, আর ওই গন্ধরাজের।

ষষ্ঠে ক্ষুব্ধভাবে বলে ঃ রাবিশে কিছু গজায় না গনুদা!

গনুদা বলে ঃ অতবড় তালপাতার পাখার হাওয়া কি নিজে নিজে খাওয়া যায়?

নন্তা বলে ঃ ঠাকমার ভয়ে আমরা কি আর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পেরেছি গনুদা? নইলে হাওয়া করতে ত আমরা প্রস্তুত?

ষষ্ঠে বলে ঃ আজ খবর পেলাম ঠাকমা গঙ্গায় গেছেন, সেই ফাঁকে চুপি চুপি এসে পড়েছি। তা' সেই কোকিল ছানা? সেও কি রাবিশের তলায়?

হতাশার সুরে গনুদা বলে ঃ কোকিল না ছাই! কোথা থেকে কুড়িয়ে একটা কাকের ছানা এনেছিলি। মিথ্যে এতদিন ছাতু, কলা আর গুড় খাওয়ালুম। যখন বোল ফুটলো, শুরু করে দিল কা—কা—কা। আসলে ওটা একটা কাকেরই ছানা। উড়িয়ে দিয়েছি বেটাকে!

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নন্তা আর ষষ্ঠে। হায়রে! অল টিকেপাড়া কবি সম্মেলন তবে কি পরিবেশের অভাবেই তাদের ব্যর্থ যাবে?

বাকি উপায় এখন এটম বোমা। এটম বোমা বানাবার বারুদের ফর্মুলাটা তো ওরা এখনও জানতে পারেনি। তারি আশায় বসে থাকবে দুজনায়।

সে এক ভারী মজার গল্প।

১৮৮৪ সনের কথা। ডিস্ট্রিক্ট টাউন্স এ্যাক্ট পাশ হয়েছে।
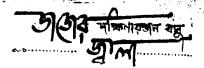
বাংলা দেশে মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাস শুরু সেই থেকে।

নতুন আইনে জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট টাউন কমিটির পত্তন হয়েছে। সোজা কথায় জেলা-শহর-পৌরসভার সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বত্রই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান। আর জজ সাহেব এবং অন্যান্য ইংরেজ-বাঙালী হাকিমরা সব কমিশনার।

তেমনি একটি শহর-পৌরসভায় বৈঠক বসেছে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়,

এবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন

প্রথমে খানিকটা গালগল্প, হাসি-তামাসা চলে, তারপরে গুরুগম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

এ বৈঠকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং গল্পে গল্পে অনেকখানি সময় কাবার হয়ে যাবার পর চেয়ারম্যান বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শেষে সবটুকু সময়ই সাবাড় হয়ে যাবে নাকি।

হাসি-ঠাট্টার মাত্রাধিক্য দেখে চেয়ারম্যান হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে উঠে কাজের কথা আরম্ভ করে দিলেন। সভার হালকা আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল!

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে?

শহরের রাস্তার এ-মাথায় সে-মাথায় এবং মাঝে মাঝে রাস্তার নাম টাঙিয়ে দিতে হবে। স্থির হয়েছে, পথিকদের যাতে পথের গোলক ধাঁধায় পড়তে না হয় সেজন্যে এক এক টুকরো টিনের উপর প্রত্যেকটি রাস্তার নাম লিখিয়ে নিয়ে তাই টাঙানো হবে দেয়ালে দেয়ালে।

কিন্তু বিনে টাকায় তো আর সে কাজ হবে না। সেই টাকার প্রশ্ন নিয়েই এসেছে মঞ্জুরী প্রস্তাব এবং তাই হলো সেদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

চেয়ারম্যান নিজেই মঞ্জুরী প্রস্তাব তুলেছেন এবং মতামত জানতে চেয়েছেন কমিশনারদের।

"না এতে চলবে না। আরো অন্তত প'চাত্তর টাকা চাই।" মাত্র তিনশ টাকার মঞ্জুরী প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন জজ সাহেব। দুজনেই ইংরেজ হলেও ভেতরে ভেতরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজের মধ্যে বনিবনা নেই তেমন। বাইরের আচরণে বা কথাবার্তায় তা অবশ্য সহজে ধরা পড়ে না। তবুও চেয়ারম্যানের প্রস্তাব যে [illegible] প্রতিবাদে কখনো পাশ হবে না, তা ভাল জানেন কমিশনাররা। আর তা জানা বলেই সেই প্রতিবাদে একটু ফোড়ন কেটে আ[illegible] পেতে চান তাঁরা।

জজ সাহেব মঞ্জুরী প্রস্তাবের প্রতি[illegible] করতেই একজন বাঙালী কমিশনার [illegible] করে বসলেন, "কেন চলবে না তি[illegible] টাকায়?"

"না বাবু, আরো কিছু টাকা ম[illegible] করিয়ে না নিলে এ কাজ কিছুতেই ভা[illegible] ভাবে করা যাবে না, এ আমি একদম [illegible] হয়েই বলছি।"

"কেন পারা যাবে না, সে কারণটাই আমরা জানতে চাইছি। আপনার [illegible] হওয়াটা এখানে বড়ো কথা নয়, আ[illegible]

ন্দিটাই আমাদের শোনা দরকার। তাই বলুম স্যার।"

যুক্তি আর কিছুই নয়। রাস্তার চলতি বাংলা নামগুলো কেউ ভালো করে বুঝতে পারবে না, তাই ওগুলোর ইংরেজী তর্জমা করাতেই হবে। তারই জন্যে আরো কিছু টাকার দরকার।

"তার মানে?" আর একজন বাঙালী কমিশনার প্রশ্ন করেন।

"মানে আবার কি?" এবারের প্রশ্নে একটু উত্তেজিতই হয়ে ওঠেন জেলা জজ। তবু রাগটাকে বেশ সামলে নিয়েই বলেন : "আরে বাবু, 'বৌমার গলি' বললে মাথা-মুণ্ডু বোঝা যায় কিছু?"

"তা হলে 'বৌমার গলিকে' কী বলতে হবে?"

"কেন, Daughter-in-law's Lane— দিব্যি রাস্তার নাম! এভাবে সমস্ত বাংলা নামগুলোর ইংরেজী তর্জমা করে নিলেই হলো, তাহলে আর কারুর কোন অসুবিধেই হবে না।"

এতোক্ষণ ধরে একজন বাঙালী কমিশনার চুপচাপ বসে শুনে যাচ্ছিলেন সব আলোচনা। এবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। গুরুগম্ভীর স্বরে বললে "ভারী চমৎকার প্রস্তাব এনেছেন আমাদের মাননীয় জজ সাহেব। তবে আমার মনে হয়, এমন একটা কাজের জন্যে তিনি বড্ড কম দাবি পেশ করেছেন। মাত্র পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না। তাই আমি বলি, চেয়ারম্যানের মূল মঞ্জুরী দাবির ওপর আরো তিনশ টাকা বেশি মঞ্জুর করা হোক।"

চেয়ারম্যান প্রথম থেকেই টুকে টুকে নিচ্ছেলেন সকলের মতামত। সব শেষে তাঁকে তো আবার উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মনে মনে তৈরিও হচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু আরো তিনশ টাকার দাবির কথা শুনে তিনি তো একেবারে অবাক্।

অন্যান্য বাঙালী কমিশনাররাও এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন এ প্রস্তাব শুনে।

জেলা জজ কিন্তু খুব খুশী। তাঁর প্রস্তাবের এমন জোরালো সমর্থন যে কোন বাঙালী কমিশনারের কাছ থেকে আসতে পারে এ আশা করা তো দূরের কথা, তিনি কখনো তা ভাবতেই পারেন নি। খুব উৎফুল্ল হয়েই তিনি জিগ্যেস করলেন, "কেন, কেন, তিনশ টাকা কেন?"

"বারে, আদালতের সমস্ত বাঙালী কর্মচারীদের নামও তো ইংরেজীতে তর্জমা করে নিতে হবে। এ একেবারে এক সঙ্গেই সেরে নেওয়া যাবে।"

"তার মানে?" এবার একটু বিস্ময়ান্বিত হয়েই প্রশ্ন করলেন জজ সাহেব।

"মানে আবার কি? মনে করুন, কালীপদ মিত্র নামে আপনার আদালতে একজন

হাসুখালির চর

খন্দেআলী মিয়া

রাখাল ছেলে গরু চরায় হাসুখালির চরে
তার পানে যে চেয়ে আমার মনটা কেমন করে।
ওই চরেতে সারাটি দিন পাখির কোলাহল
তারে ঘিরে গান গেয়ে যায় পদ্মা নদীর জল।
শ্যামল কচি দূর্বা ঢাকা চরের আঙন খানি
বিহান বেলায় জাগে সেথায় আলোর ঝলকানি।
কাশ ফুলেরা দোলায় চামর নদীর কিনারায়
সারাটি দিন ফড়িং শালিক উড়ে উড়ে যায়।

সাধ হয় যে বাঁধি হোথায় ঘর
মাটি মায়ের সঙ্গে থাকি সারা জীবন ভর
নদীর জলে পাল তুলিয়া কতই যাবে না'
কোথায় যাবে বাঁক ছাড়ায়ে নাইকো ঠিকানা।
ডিঙি বেয়ে ও-পার থেকে আসবে সকল জেলে
ধরবে ইলিশ, রুই, কাৎলা খ্যাপলা জাল ফেলে।

হাসুখালির চরে
নিশীথ রাতে জ্যোৎস্নাধারা চাঁদ হতে যায় ঝরে।
সাঁঝ বিহানে নরম রোদে জাগে রঙের খেলা
হোথায় গিয়ে আজকে আমি কাটিয়ে দেব বেলা।
গাঙের কূলে একা একা শামুক কুড়াইয়া
মালা গেঁথে নেবো আমার বুকে দোলাইয়া।
পাখির পালক কানে গুঁজে চুলে গুঁজে লবো
দুপুর বেলা ও-পার থেকে এ-পার চেয়ে রবো।

কর্মচারী আছেন। বাংলা নাম বুঝতে তো সত্যি বড্ড অসুবিধে। তাই তাঁর নামটাকে Black footed friend বলে ইংরেজীতে তর্জমা করে নিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। কী বলেন?" এই বলে গম্ভীরভাবে বসে পড়েন ঐ বাঙালী কমিশনার।

আর সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠেন সবাই। এমন কি চেয়ারম্যান সাহেবও হাসি চাপতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে ফেটে পড়েন।

এদিকে জজ সাহেব তো চটে আগুন। কোর্টের লোক হয়ে তাঁর কথা নিয়ে এমন নিদারুণ রসিকতা করতে পারেন কেউ, এ তাঁর ধারণার অতীত। বিশেষ করে এই রসিকতায় আর সকলের হাসির বহর দেখে জ্বলে যেতে লাগলো তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা দেহ। তিনি আর থাকতে পারলেন না সভায়। সভার কাজ শেষ না হতেই টুপীটা বগলদাবা করে রাগে গজ গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা হলে চেয়ারম্যান বললেন, "ব্যাপারটা খুব ভালো হলো না মিঃ

আজকে তোমার চিঠি এলো
নীল আকাশের পাতায়
চিঠি এলো সাদা মেঘের খামে,
তোমার আদর গাছের চূড়ায়
দূর বনানীর মাথায়
মধুর মত রোদ্দুরে ওই নামে।

তোমার স্নেহ দিক্-হারানো
উদাস মাঠের পরে
কেঁপে ওঠে সবুজ ঘাসে ঘাসে,
শতেক ধারায় তোমার চোখের
নরম আলো ঝরে
কোলে ফেরার আকুল ডাক আসে।

আষাঢ় মাসে রাশি রাশি
কাজল মেঘের মেলায়
এলোমেলো ওড়ে বকের সারি,
বাতায়নে আপন মনে
কাজ ভুলোনো খেলায়
আমি অমন উড়ে যেতে পারি।

হঠাৎ যেন শারদ-রোদের
মন-গলানো সোনা
ছড়িয়ে দিলে এই আঙিনা জুড়ে,
চমকে উঠে তাই তো দেখি
দূরে আকাশের কোনা
নীল রেশমে কে দিয়েছে মুড়ে।

আজকে আমার ডাক দিয়েছ
রোদ ছড়ানো দিনে
পাঠিয়ে দিয়ে নীল আকাশের চিঠি
আনন্দ তাই লুটিয়ে পড়ে
শ্যামল তৃণে তৃণে
দেখতে পেলাম মা তোর মধুর দিঠি

চাটার্জি। বাড়ি গিয়ে সাহেবকে একটু শান্ত করে দিয়ে আসা দরকার।"

ম্যাজিস্ট্রেটের কথা মতো তিন দিন ধরে চেষ্টা করেও চাটার্জি আর সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাননি জজ সাহেবের সঙ্গে। তিন দিন কার্ড পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিন দিনই দেখা করতে অস্বীকার করেছেন জজ সাহেব।

এতো রাগ!

বুলবুলি

ইন্দিরা দেবী

পাখিটা সারাদিন খিদেয় ছটফট করছে—না জল, না খাবার। টুকটুকি একেবারে ভুলে গেছে সেদিন তাকে কিছু দিতে। আশ্চর্য, নিজে খেয়ে দেয়ে খেলতে বেরিয়ে গেল আর পাখির জল বা খাবারের কথা একবারও মনে হলো না! বুলবুলি কত চেঁচালো, ডাকলো; কিন্তু টুকটুকি বন্ধুদের সংগে গল্পে এত মশগুল যে, তার কানে ঢুকলোই না।

এদিকে সারাদিন না খেয়ে, না জল পেয়ে বুলবুলির অবস্থা একবার ভাবো। সারাদিনটাই চলে গেল, রাত নামলো। টুকটুকি দিব্যি বিছানায় গিয়ে ঘুম দিল, একবার পাখির কথা তার মনেও পড়লো না। ভাবো একবার পাখিটার দশা! কতো দুঃখে ওর চোখে জল নামলো। কিন্তু কে দেখছে? টুকটুকি তো ঘুমে অচেতন।

বেশ গভীর রাত নেমেছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। আকাশ ভরা চাঁদের আলো, জাজানের ভিতর থেকে মস্ত জানলা দিয়ে বুলবুলি সেদিকে চেয়ে আছে, তার চোখের জল তখনও টলটল করছে।

"কি হয়েছে তোমার?"

মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনে বুলবুলি ফিরে দেখলো।

রোজদিনের মত রাত্রে টুকটুকির খেলাঘরের পুতুলরা উঠে এসেছে। সারাদিন ঘুমিয়ে আরামে, আমাদের যখন সন্ধ্যা হয়, ওদের তখন ভোর হলো। আমাদের যত রাত্তির হয়, ওদের তখন কাজকর্মের সাড়া পড়ে যায়। আর সবাই ঘুমুলে, নিশুতি হলে তখন শুরু হয় নাচ, গান, হল্লা; খাওয়া দাওয়া খেলাধুলো। বুলবুলি দাঁড়ে বসে সব দেখে, ওখান থেকেই মাঝে মাঝে যোগ দেয়। এরা ওর রাতের সঙ্গী।

চেনা সুরের প্রশ্ন শুনেই বুলবুলির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো।

"কাঁদছো কেন ভাই বুলবুলি," রাঙাবৌ পুতুল প্রশ্ন করলে।

দুবার ডানা ঝাপটে নিলো সে, তারপর বললে, "আমি আজ সারাদিন কিছু খাইনি। টুকটুকি খেয়ে দেয়ে ঘুমোলে—একবারও তার আমার কথা মনে হলো না। তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে। না খেয়ে বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জল না হলে বাঁচবো কী করে?"

"বল কি, সারাটা দিন এমনি গেছে?" রাঙাবৌ দুঃখিত হয়ে বললে।

ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাক টেনে বুলবুলি বললে, "তাই তো ঘটেছে।"

আজ পুতুলদের বাড়ি চায়ের মজলিস আছে, তাই সকলেই খুব ব্যস্ত। রাঙাবৌকে কথা বলতে দেখে কাফ্রি কুঞ্চিত পুতুলটা হাঁক দিয়ে বললে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হচ্ছে, একগাদা কাজ পড়ে আছে না। টেবিল সাজানো, কার্পেট পাতা, ফুল দেওয়া, ঝাড়া-মোছা।"

"খাবার দাবার ব্যবস্থা করা—" বুলবুলি বললে বাধা দিয়ে।

রাঙাবৌ বললে, "জানি, কিন্তু শোনো, ওর সারাদিন খাওয়া হয়নি, তাই শুনছি।"

"কেন? কেন?" চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো কাফ্রি।

"আর কেন—টুকটুকি ভুলে গেছে," রাঙাবৌ বললে।

"তা কোথায় তোমার খাবার থাকে, চল আমি এখনি এনে দিচ্ছি," সহানুভূতির সুরে কাফ্রি পুতুল বললে।

"তুমি কি হাত পারে? ঐ দেখ, ঐ ঘরে যে জাল-আলমারি—ওর উপর কাঁচের জারে আমার খাবার আছে। আর কোণে কুঁজোতে ঠান্ডা জল। খাবার দাও-না-দাও জল না হলে আর পারছি না।"

"সব দেবো তোমায়—" এই বলেই কাফ্রি পুতুল তার ডোরাকাটা লম্বা পায়জামাটা হাঁটু অবধি তুলে জাল-আলমারির উপর এক লাফ দিয়ে উঠে ছোলা নিয়ে এলো। কিন্তু অত বড় কুঁজো থেকে জল ঢালার শক্তি কাফ্রি পুতুলের নেই। যতই তার গায়ে জোর থাক। কিন্তু জলই তো বেশী দরকার পাখির। —'কোথায় জল? কোথায় জল অবস্থা' যখন, তখন কাঁচের চৌবাচ্চা থেকে সোনালী মাছ ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে গোলমুখটা উঁচু করে বলে উঠলো, "জল জল করে চেঁচামেচি করছো কেন? খেলাঘর থেকে একটা বালতি নিয়ে এসো; ভরে নাও আমার এখান থেকে।"

"ওহো ঠিক বলেছ তো?" সকলে মিলে বলে উঠলো।

পায়জামা হাঁটুতে তোলাই ছিল। কাফ্রি ছুটলো বালতি নিয়ে সোনালী মাছের কাছে। তারপর বালতি ভরে জল দিল—তাতে বুলবুলির স্নান ও খাওয়া বেশ হলো।

ব্যস! তখনকার মত অসুবিধে কেটে গেল।

বুলবুলি অনেক ধন্যবাদ জানালো তার রাতের সঙ্গীদের।

তারপর খেলাঘরের পুতুলরা, ভালুক, হাতি, বানর, খরগোস, বাদশা পুতুল, রাঙাবৌ পুতুল, মেমসাহেব সবাই এলো চায়ের মজলিশে। এর মধ্যে সব রেডি হয়ে গেছে। কাঁচের আর সেলুলয়েডের চারটে মেম পুতুল আজ নাচবে। তৈরি হয়ে এসেছে নাচের পোশাক পরে। ঝলমলে নেকলেস গলায়। হাতি গান করবে—সে তো আর আধুনিক গাইতে পারে না। উঁচুদরের গান—যাকে বলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, তাই গাইবে, সেইজন্য তানপুরা বাঁধতে ব্যস্ত। আর যারা যা করবে সবাই আগে একটু প্র্যাকটিশ করে নিচ্ছে। এমন সময় কাফ্রি এসে বলল, "সব পণ্ড হলো। অর্গানের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না, নাচ হবে কি করে?"

"তাহলে? কি হবে তাহলে—" সকলে বলে উঠলো।

"তাই তো! তাই তো কি হবে?" মেম-পুতুলরা আকাশ থেকে পড়লো।

এদের ব্যস্ত আর হতাশ হয়ে পড়ার ভাব দেখে দাঁড় থেকে বুলবুলি বললে, "অত ভাবছ কেন—নিতান্তই যদি অর্গানের চাবি না পাও, আমি গান করবো—তা হলে হবে না?"

"চমৎকার প্রস্তাব, চমৎকার প্রস্তাব—" ভারী গলায় ভালুক বলে উঠলো।

তখন খেলাঘরে আলো জ্বলে উঠলো—টেবিল ঘিরে সারি সারি সবাই চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো। এমনকি কাঁচের চৌবাচ্চা থেকে জলে সোনালী পাখনা মেলে মাছ বললে, "আমি এখান থেকেই যোগ দিচ্ছি, গাও বুলবুলি।"

বুলবুলি মিষ্টি সুরে গান শুরু করলো—আর মেমপুতুলরা নাচতে আরম্ভ করলো। সারা খেলাঘর ঝলমল করে উঠলো—জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে—সে কি চমৎকার দেখতে!

বুলবুলি অনেকক্ষণ ধরে গাইলে। খেলাঘরের পুতুলরা চুপ করে বসে শুনলো। কোনো গোলমাল, চেঁচামেচি, কথা বলা, উসখুস করা কিছু করলো না। ওদের দেখে মনে হলো ছোট সভা হলেও ওরা নিয়ম জানে, ডিসিপ্লিন মেনে চলে।

নাচ গানের আসর শেষ হলো। কাফ্রি পুতুল বললে, "তুমি যে এত সুন্দর গান জানো বুলবুলি তা তো আমরা জানতেও পারিনি। তুমি না থাকলে আজ আমাদের মজলিশই মাটি হয়ে যেতো, অনেক ধন্যবাদ তোমায়।"

বুলবুলি বললে, "তুমি আমাকে আজ খিদে তেষ্টার সময় কত বড় সাহায্য করেছ বল কাফ্রি, তার তুলনায় কিই বা করলাম, তবু আমাকে দিয়ে যদি একটুও কাজ হয়ে

বুলবুলি মিষ্টি সুরে গান শুরু করলো

নে রাখার কৌশল

রবিদাস সাহা রায়

লা বোকা ক্যাবলরামের মাথায় গোবর ভরা
ন কালে হলো না তার তাইতো লেখাপড়া।
রী এক খবর নিয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি
া তাকে পাঠিয়ে দিলেন
গোপাল সিংহের বাড়ি।

াবাজারের গোপাল সিংহ বেজায় নামী লোক
খিয়ে দেবে বাড়িটি তার
যে কেউ বুজে চোখ।

কানাটি লিখে নেবার দরকার যে নাই,
াপাল সিংহ নামটি শুধু মনে রাখা চাই।
লে না যায় নামটি পাছে তাইতো ক্যাবলরাম,
ক পা চলে আবার থেমে
আওড়ে সে নেয় নাম।

াপাল, গোপাল-কৃষ্ণকে তো
গোপাল সবাই কয়,
দই নামটি মনে রাখা শক্ত কিছুই নয়।
লে বেলায় গরু নিয়ে কৃষ্ণ যেতো বনে,
বুর কথা ভাবলে 'গোপাল" নামটি রবে মনে।
ার পরে তো সিংহ নামটি মনে রাখা চাই,
সংহের ডাক কী ভয়ানক তেমন কিছুই নাই।
াতি আছে তার চেয়েও অনেক বড় প্রাণী,
বু সিংহ বনের রাজা তাইতো মোরা জানি।
সংহ বড় হাতি বড়—এই কথাটি খাঁটি,
নে রাখার কায়দা ক্যাবল শিখলো পরিপাটি।
গরু, হাতি' দুটি কথা থাকলে মনে তার,
াসল নামটি রাখতে মনে পারবে পরিষ্কার।
ই না ভেবে ক্যাবলরাম বাগবাজারে এলো,
পথের মাঝে জনা কয়েক লোকের দেখা পেলো।
াদের কাছে কি শুধাবে—কি ছিল সেই নাম
মাথাটি তার গেল ঘুরে, ছুটলো গায়ের ঘাম।
তারপরে সে অনেক ভেবে শুধায়—'মহাশয়,
বাগবাজারে 'গরু-হাতির' কোন্ বাড়িটা হয়।'
কথা শুনে সবাই হেসে পড়লো ভুঁয়ে লুটে,
লেলো—'মাথায় ঘোল ঢেলে দে,
জল নিয়ে আয় ছুটে।'

থাকে সেজন্য আমি নিজেই কৃতজ্ঞ হবো।"

হাতি তার মোটা দেহ নাড়া দিয়ে বললে, "এসব কৃতজ্ঞ-টিতজ্ঞর ব্যাপার নয়। একজন যদি অপরজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, ভালবাসে—তাহলে অন্যজন করবেই, আর যে ভালো লোক হয় সে তা করেই থাকে, করা উচিত। তাই কাঙ্কি যা করেছে তা করা উচিত ছিল আর বুলবুলি যা করেছে তাও তার উপযুক্ত কাজই হয়েছে। দুনিয়ায় এমনি মিলেমিশেই থাকতে হয়।"

রাঙাবৌ বললে, "এসো সবাই, গানের আসর শেষ, এবার চায়ের আসর।"

বুলবুলি দাঁড়ে থেকে আর সোনালী মাছ জলে থেকেই চায়ের আসরের আনন্দে যোগ দিল।

সব শেষ হল, ওদিকে চাঁদ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে, ভোরের আলো ফুটে উঠছে। তাই সকলে যে যার জায়গায় চলে গেল।

বুলবুলি কাঙ্কি-পুতুলকে আবার ধন্যবাদ জানালে।

টুকটুকি আর কোনদিন বুলবুলিকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিল কিনা তা জানি না।

আশরাফ সিদ্দিকী

চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!!
সাগর দেশের চম্পাবতী!
রূপ কাহিনীর চম্পাবতী!!
নিঝুম পুরীতে শঙ্কাবতী!
চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!!

কোন সাগরের নামহীন দ্বীপে ফুলের মতন
কোন সাগরের দানব পুরেতে সোনার মতন
বন্দিনী মন
বন্দী জীবন
নাগের বাঁধনে শঙ্কাবতী!
চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!!

কতদেশ হতে কত রাজা এলো
সোনার জীবন ভেঙে ভেঙে গেলো
কত রাজত্ব মুছে মুছে গেলো
কত তরবারী ম্লান হ'য়ে গেলো
যুগ হ'তে যুগে অধুনাবধি—
চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!!

তবু সাগরের পথ তারা পেলোনাকো
তবু দানবের জাল ছেঁড়া হ'লো নাকো
চোখের বারিতে ব'য়ে ব'য়ে চলে অশ্রুনদী
বন্দিনী মন খুঁজে খুঁজে ফেরে ত্রিযাম্পতি
চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!

রুমুমণি কই? ময়ুরপঙ্খী সাজিয়ে নিয়ে
সাতশ' সেনার সপ্ত ডিংগা ভাসিয়ে দিয়ে
শম্ শম্ শম্ ঝড়ের বাদাম উড়িয়ে দিয়ে
ঢাল তরোয়াল বাগিয়ে নিয়ে
সাতটি দিবস সাতরাত পরে সাগর ঘুরে
স্বপন পুরে
পৌঁছাবে যেই
সোনার কাঠিটি ছোঁয়াবে সেই
সোনার কৌটা ভেঙে দিয়ে সেই
সোনার ভ্রমর কাটবে যেই
গাছে গাছে সব পাখিরা গাইবে অকস্মাৎ
মাটিতে মাটিতে রঙিন ফুলের বৃষ্টিপাত...

ঘুম ভেঙে গিয়ে সদ্য-ফোটা সে
ফুলের মতন
পুবের আকাশে সোনালী আলোর
ফুলের মতন
নিঝুম পুরীতে হাসবে হঠাৎ ত্রিযাম্পতি—
চম্পাবতী! চম্পাবতী! চম্পাবতী!!

প্রায় চার শ বছর আগের কথা বলছি। উত্তর ভারতে তখন মালব নামে একটি সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এই রাজ্যটিকে পদানত করে রাখবার জন্য দিল্লীর সম্রাটগণ বারবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেন নি। সাময়িকভাবে তা বিজিত হলেও, সুযোগ পেলেই মালব দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়েছে। যে সময়ের কাহিনী বলছি, তখনও মালব স্বাধীন রাজ্য। আর ঐ গিরিপর্বত ও নদ-নদী পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিমণ্ডিত রাজ্যটির নৃপতি হচ্ছেন একজন সাহসী ও বীর যোদ্ধা। নাম তাঁর বাজ বাহাদুর। তিনিই মালবের শেষ স্বাধীন রাজা।

বাজ বাহাদুর কেবল যে বীর যোদ্ধা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন গুণানুরাগী, কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি হিন্দী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। সকলেই সেই সব কবিতাকে উচ্চ প্রশংসা করেছে। নিজে গান জানতেন বলে তাঁর রাজসভায়ও বহু গুণী এসে সমবেত হয়েছিল। সঙ্গীত ছিল তাঁর রাজসভার প্রাণ।

বাজ বাহাদুরের রানীর নাম রূপমতী। তিনি ছিলেন পদ্মিনীর মত অপরূপ সুন্দরী। তাঁর সৌন্দর্য সারা দেশে রূপ-কথার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি যে কেবল সুন্দরী ছিলেন তা নয়, তাঁর অনেক গুণও ছিল। তিনি চমৎকার বীণা বাজাতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর সুমধুর কণ্ঠের সংগীত যে শুনত সেই মোহিত হত।

বাজ বাহাদুর ও রূপমতী পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু এত সুখ বোধহয় বিধাতার সইল না। দুঃখের কালো যবনিকা নেমে এল তাঁদের উপর।

আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট। রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি মালব দেশ জয়ের পরিকল্পনা করলেন। বহু সৈন্য দিয়ে তিনি পাঠালেন আদম খাঁকে। আদম খাঁ ভীমবিক্রমে আক্রমণ করল মালবের রাজধানী মাণ্ডু। বাজ বাহাদুর তাঁর রানীর সঙ্গে তখন মাণ্ডুর দুর্গ-প্রাসাদে ছিলেন। মোগল সৈন্যদের পরাজিত করার জন্য তিনি নিজের সৈন্যসামন্ত সমাবেশ করলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হল। বাজ বাহাদুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন মাণ্ডু থেকে। বিজয়ী মোগল সৈন্য আদম খাঁর আদেশে মাণ্ডুর নরনারী নির্বিশেষে হত্যা করে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে

দিল। একটা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হল।

আদম খাঁ মাণ্ডুর দুর্গে বাজ বাহাদুর-সঞ্চিত বহু কোটি টাকার ধনরত্ন পেল। কিন্তু তাতে সে খুশী হল না। রানী রূপমতীকে তার চাই, সে বিয়ে করবে তাঁকে। খবর শুনে শিউরে উঠলেন রানী। সর্বনাশ! কিন্তু বসে শোক করবার নারী তিনি নন। ফুলওয়ালীর ছদ্মবেশ ধরে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাসী অনুচর যারা ছিল তারা তাঁকে সাহায্য করল। তিনি বিনা বাধায় ফুলওয়ালীর বেশে বেরিয়ে পড়লেন রাজপ্রাসাদ থেকে। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলেন না। কি করে যেন টের পেয়ে গেল আদম খাঁ যে, রানী পালিয়ে গেছেন। খবর শুনেই সে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল রানীকে ধরে নিয়ে আসার জন্য। আদেশ পেয়েই টগবগিয়ে ছুটল মোগল সৈন্য।

সারঙ্গপুরে ছিল রানী রূপমতীর বাপের বাড়ি। সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মোগল সৈন্য ঘেরাও করে ফেলল রানীকে আর তাঁর দলবলকে। সেই দলে রানীর ভাইয়েরাও ছিল। সবাই মিলে প্রবলভাবে বাধা দিল মোগল সৈন্যদের। রানী যাতে পালিয়ে যেতে পারেন তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করল না। কিন্তু কিছুই হল না। রানীকে বন্দী করে নিয়ে এল আদম খাঁর কাছে। আদম খাঁ মহাখুশী। উৎসব শুরু করে দিল মনের আনন্দে। তারপর নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগল রানীকে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল রানী রূপমতীর জীবন। কিন্তু তবু মাথা নোয়ালেন না তিনি। আদম খাঁকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, তার সম্মুখে যেতেও তিনি সম্মত হলেন না। কিন্তু বন্দী-জীবন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। নিরুপায় রানী একদিন খবর পাঠালেন আদম খাঁকে, তিনি তার সম্মুখে কাল ভোরে দাঁড়াবেন এসে। শুনে উৎফুল্ল হলো আদম খাঁ। গোঁফ চোমরাতে লাগল মনের আনন্দে।

আর ওদিকে আদম খাঁকে সংবাদ পাঠিয়েই, শীতল জলে স্নান করলেন তিনি। তারপর পরলেন তাঁর বাসর রাতের শাড়ি গহনা। তারপর বসলেন বীণা নিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সংগীত এক সময় তাঁর প্রাণে জাগিয়ে দিল আগুন। উত্তেজনায় তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাতের বীণা। তুলে নিলেন হীরের গুঁড়োর কৌটোটা। মুখে ঢেলে দিলেন আস্তে আস্তে। তারপর ঢলে পড়লেন চিরনিদ্রার কোলে। ভোর হতে তখন আর বেশী বাকি নেই।

তুলে নিলেন হীরের গুঁড়োর কৌটো

শব্দের কত রকমফের। ঘড়ি চলে টিক্ টিক্, ঘণ্টা বাজে ঢংঢং, ট্রাম চলে ঘড়ঘড়, পটকা ফাটে দুমদাম, বাজনা বাজে ট্যংটাং, বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝুপ্, মেঘ ডাকে কড়্কড়্, পাতা কাঁপে সরসর, শিশু কাঁদে ওয়াঁ ওয়াঁ, পায়রা ডাকে বকম্ বকম্ এমনি কত হাজারো রকম। থির হয়ে কান পেতে শুনলেই আস্তে-জোরে কর্কশ-মিঠে নানা রকম শব্দ এসে বাজবে তোমার কানে। এদের কোনটা আসছে হয়ত অনেকটা দূর থেকে আর কোনটা তোমার কানের ঠিক পাশটি থেকেই। এসব তো গেল তোমার চেনা শব্দ। আজ কিন্তু এমন শব্দের কথা শোনাবো যা তোমার অচেনা। কোনদিন শোননি সে শব্দ। আর শুধু তুমি কেন, কোন মানুষই শোনেনি সে শব্দ। তার মানে, সে শব্দ শোনা যায় না। অবাক হচ্ছো! শোনা না গেলে শব্দ হলো কি করে? সেই কথাই তো বলছি।

ঢিল ফেললে জল যেমন কাঁপতে কাঁপতে ঢেউ সৃষ্টি করে, আমরা কথা বললে বা

॥ না-শোনা শব্দ ॥

শ্রীমৃণাল আচার্য

কোন কিছুতে আঘাত করলে বাতাসও তেমনি কাঁপতে থাকে আর তাতে ঢেউ ওঠে। এই বাতাসের ঢেউ আমাদের কানের পর্দায় এসে লাগলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। এই ঢেউ-এর আবার কম বেশী আছে। কোন শব্দে সেকেণ্ডে মাত্র আট-দশটা ঢেউ ওঠে আবার কোন শব্দে ওঠে লক্ষ লক্ষ ঢেউ। কিন্তু সব শব্দই আমাদের কানের পর্দায় ধরা পড়ে না। কানের পর্দার শব্দের ঢেউ ধরবার একটা সীমা আছে। সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম ঢেউ কানের পর্দায় ধরা পড়ে না। আবার যদি ১৮০০০ বারের বেশী হয়, সে-ঢেউও ধরা পড়বে না আমাদের কানে। তাহলেই বুঝতে পারছো, আমরা যে সব শব্দ শুনি তাদের প্রত্যেকেরই কাঁপুনি বা ঢেউ সেকেণ্ডে ১৬ থেকে ১৮০০০ বারের মধ্যে তা সে আস্তে বা জোর যেমন শব্দই হোক।

যে সব শব্দে সেকেণ্ডে ১৮০০০ বারের বেশী ঢেউ ওঠে বিজ্ঞানীরা সেই সব শব্দের নাম দিয়েছেন 'আলট্রাসোনিক সাউণ্ড' বা 'আলট্রাসোনিক্স্'। তুমি হয়ত ভাবছো এই শব্দ কানে যদি শোনা নাই গেল তাহলে আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভটা কি? শুনতে পেলেও না হয় বুঝতাম, শব্দগুলো কেমন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের তো জানোই। মাথা ঘামাবার মত একটা কিছু পেলেই হলো। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন-রাত্তির মেতে থাকবেন তাই নিয়ে। এই না-শোনা শব্দ নিয়েও তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন অনেক। নানারকমের পরীক্ষাও করেছেন বিস্তর। আর এই পরীক্ষার ফল যা পেয়েছেন তা যেমনি আজব তেমনি মজার।

তোমার জামা কাপড় যদি ময়লা হয়ে যায় তাতে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আর সাবান-সোডার হাঙ্গামাও করতে হবে না। ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো এক যায়গায় জড়ো করে ছেড়ে দাও সেখানে না-শোনা শব্দকে। দেখবে তোমার জামা-কাপড় পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হয়ে গেছে। খাবারের মধ্যে অনেক সময় রোগ বীজাণু থাকতে পারে, তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে এই শব্দকে ছেড়ে দাও তোমার খাবারের মধ্যে। বীজাণুদের দফারফা করে তোমার খাবারকে নির্দোষ করে দিতে এর বেশী সময় লাগবে না।

"তেলে জলে মিশ খায় না" একথা তুমি জানো। কিন্তু এই না-শোনা শব্দ তেল আর জলকে এমন মিশিয়ে দিতে পারে যে, তোমার সাধ্য কি যে তাদের আলাদা করো।

সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলে অথবা জলে ডোবা চোরা পাহাড় থাকলে এই শব্দ চারদিকে ঘুরেফিরে সঠিক জায়গাটার

॥ সিন্ধুর টিপ ॥

॥ শ্রীনিখিল মৈত্র ॥

আড়াই হাজার বছর আগেকার ঘটনা। বঙ্গাধীপ সিংহবাহু পুত্র বিজয়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন যে, অবাধ্য পুত্রকে নির্বাসনে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। পিতার এই আদেশকে মেনে নিয়ে বিজয় সাতশ সঙ্গী নিয়ে বাংলার বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগরের পরপারে অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সম্ভবত উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বাতাসের সাহায্যে সেই তরণী-যূথ এসে সিংহল দ্বীপে ভিড়ল। মহাবংশের ইতিহাসকার সে-ঘটনার সবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ঠিক এমনিভাবে ভারতবর্ষের মহাকাব্য রামায়ণে আর-এক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে জীবনযাপন করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে সিংহল দ্বীপে আসেন। আজও লংকাদ্বীপবাসী হিন্দুরা ভক্তিভরে রামায়ণের সেই কাহিনী পাঠ করে; বন্দিনী সীতাকে রাজা রাবণ যেখানে রেখেছিলেন ও যেখানে রাম-রাবণের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, তার সবই অতি পবিত্র তীর্থস্থান।

বিজয়সিংহের অভিযান কিন্তু শুধু মহাকবি বা ইতিহাসকারের বর্ণনার বিষয়বস্তু হয়েই থাকল না। উত্তর ভারতের সঙ্গে সিংহলের এক নিবিড় যোগসূত্রও স্থাপিত হল। লংকাদ্বীপের নামকরণ হল সিংহ-বংশের নামে। সিংহবংশ সিংহলের পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর ইতিহাসে দু-হাজার বছর ধরে শাসন করেছে। মহাবংশ ও শূল-বংশে সেই বিরাট কাহিনী সুললিত ছন্দে বৌদ্ধ ইতিহাসকার লিখে গিয়েছেন। সে-কাহিনীর উপর যবনিকাপাত হয়েছে, যখন স্যার বিক্রম রাজসিংহের হাত থেকে কাণ্ডি-নৃপতিদের সীমিত স্বতন্ত্রতাও বৃটিশ রাজশক্তি কেড়ে নিল।

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সিংহলের যোগ-সূত্র আরও প্রাচীন। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় সভ্যতা বিকাশের আগে দক্ষিণের মালভূমিও আদিম জাতিরই বাসভূমি ছিল। পরে সভ্য মানুষের আনাগোনায় আদিবাসীরা ধীরে ধীরে দক্ষিণের পথে সরে যেতে আরম্ভ করে। তারপর বোধ হয় এমন এক অবস্থা আসে, যখন এত বড় বিরাট দেশ ছেড়ে উপজাতিরা অপরিসর পক প্রণালী এবং মান্নার উপসাগর অতিক্রম করে সিংহলে চলে আসে। সিংহলের সব থেকে সংখ্যাধিক ও অনগ্রসর আদিবাসী ভেদ্দারা বোধ হয় এইভাবেই কোনও ধূসর অতীতে এখানে এসেছিল।

বিজয়সিংহ সিংহলের আদিবাসী রাজ-কুমারী কুবেনীকে বিবাহ করেন। এই মিলনের ফলে বহিরাগত শক্তিই লাভবান হয়, তাদের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কুবেনীকে তিনি ত্যাগ করেন। পরিত্যক্ত অবস্থায় কুবেনী দীনহীন বেশে নিজের গোত্রজদের কাছে ফিরে যান। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় মিলল না, বিশ্বাসঘাতিনী বলে কুবেনীকে তারা মেরে ফেলে। হয়ত তারই পর থেকে ভেদ্দারা সভ্য মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে বন থেকে বনান্তরে যাত্রা শুরু করেছে। বিংশ শতাব্দীতেও সিংহলে প্রস্তরযুগের মানুষ ক্ষুধা, পিপাসার আক্রমণ থেকে সেই আদিম যুগের উপকরণ নিয়েই আত্মরক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রয়েড উপজাতির আদিম মানুষদের। উভা প্রদেশের দুরধিগম্য অঞ্চলে এখনও ভেদ্দারা বসবাস করে সভ্য সমাজের সংস্পর্শ এড়িয়ে। কালে-

সিংহলী ধীবর-কন্যা

সমুদ্রবক্ষে পাল-তোলা জেলে-ডিঙি

ভয়ে কখনও মুর উপাধিধারী মুসলমান ফেরিওয়ালা সামান্য কিছু পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভেদ্দাদের কাছে যায় এবং সেইখানে বিনিময়ে বেচাকেনা হয়। কয়েকটা কুটির নিয়ে এক-একখানা ভেদ্দা গ্রাম। সে-পল্লীর সবাই এক ওয়ারুগেস বা গোত্রভুক্ত। পল্লীর চারপাশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গোষ্ঠী-ভুক্ত সবারই মাছধরার বা শিকার করার অধিকার আছে। ভেদ্দাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি সম্বন্ধে বহু বহিরাগত মানুষই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সামান্য কয়েক গজই দেখা যায়, কিন্তু ডাল-পাতার আবরণ ভেদ করে ভেদ্দা শিকারী বন্য জন্তুর সন্ধান অভ্রান্ত-ভাবেই করতে পারে। বনের মানুষ বন্য জীব-জগৎকে চেনে বড় নিবিড়ভাবে। গগনস্পর্শী বিরাট বৃক্ষ থেকে মধু সংগ্রহেও ভেদ্দারা অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গাছের বহু উপরে বা খাড়া পাহাড়ের গায়ে বড় বড় মৌমাছি চাক বানিয়েছে। সেখানে এমনি সোজা গাছ বেয়ে ওঠার কোনও উপায়ই নেই। বাঁশের লম্বা মই লাগিয়ে সব থেকে ওস্তাদ ভেদ্দা আদিবাসী সেই মৌচাক ভেঙে আনে। মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটে। উপরে ক্রুদ্ধ মক্ষিকার তীব্র আক্রমণে সামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেও মই থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু অবধারিত। কিছু কিছু ভেদ্দা অবশ্য সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আবার সিংহলী গ্রামের ঠিক বাইরে ভেদ্দা বসতিও গড়ে উঠেছে।

সিংহলের অন্য আদিবাসী রডিরা কিন্তু সভ্য সমাজের আশেপাশে আনাগোনা করছে বহুদিন ধরে, এমন কি তারা নিজদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয়। তবুও, সিংহলী সমাজ অস্পৃশ্য বলে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। রডি রমণীর সৌন্দর্য বহু সিংহলী নর-পতির কামনার ইন্ধন জুগিয়েছে। কাহিনী, কিংবদন্তীতে তার বিস্তৃত বিবরণও পাওয়া যায়। তবে, সমাজ-পতিরা সে-যুগে অনুশাসন জারি করেছিলেন যে, রডি রমণীর সঙ্গে সহবাসে কোনও বাধা নেই, কিন্তু ভোজন-পান করলেই সমাজচ্যুত হতে হবে। একদা নাকি এই অভিশপ্ত আদি-বাসীরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিল। মহাবংশের নৃপতিদের খাদ্য সরবরাহের ভার ছিল এদের উপর। একবার মৃগমাংসের পরিবর্তে নরমাংস সরবরাহ করার অপরাধে সমস্ত আদিবাসী সমাজের উপর কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয় এবং তারপর থেকে সভ্য মানুষের বসতি থেকে দূরে বনবাসী হয়েই তাদের কাটাতে হয়েছে। সম্প্রতি চেষ্টা চলেছে রডিদের উপর থেকে এই কলঙ্ক-কালিমা মুছে দেবার। রডি শিশুদের প্রাথমিক পাঠশালায় নিয়ে আসা হয়েছে। সভ্য-সমাজ যে এতদিন পরে অপমানিত আদিবাসী-গোষ্ঠীকে সাদরে নিজেদের মধ্যে নিতে পেরেছে, তা বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ করা হবে। কয়েকটা শহরের অভিভাবকেরা জোর করেই বলেছেন যে, রডিদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের একত্র বিদ্যাভ্যাস করতে দিতে তাঁরা কিছুতেই রাজি নন।

আদিবাসীদের প্রতি এই অবমাননা সত্ত্বেও পঁচিশ হাজার বর্গমাইল আয়তনের সিংহল-দ্বীপের একাশি লক্ষ মানুষ সদ্ভাব ও সম্প্রীতিতে রয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে এশিয়ার যে-সমস্ত দেশ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, তার মধ্যে সিংহল সব থেকে ছোট এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে এখানে অশান্তি, উপদ্রবও সব থেকে কম হয়েছে। আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার লাভের সংগ্রামে সিংহল তার প্রতিবেশী ভারতবর্ষ থেকে সব থেকে বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছে। সেই-জন্যেই ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্টের পর সিংহলকে ক্রাউন কলোনি হিসেবে রাখা ব্রিটিশ রাজশক্তির পক্ষে আর বেশীদিন সম্ভব হল না। ১৯৪৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহলও স্বশাসিত ডোমিনিয়ন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

ভারতবর্ষ এবং সিংহলের সম্পর্ক নিকটতর হচ্ছে, বিশেষ করে সিংহলের বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর। প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবার পরই সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, নেহরুজীর পররাষ্ট্র-নীতি সিংহল সম্পূর্ণ-ভাবে সমর্থন করবে। সিংহল এবং ভারতের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপনের পথে এখন সব থেকে বড় অন্তরায় সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা। এরা সবাই ভারতীয় পরিবারে জন্মেছে এবং সিংহলে একশো বছর ধরেও অনেকে বসবাস করছে। ব্রিটিশ শাসনের যুগে কফি ও চা-বাগান এবং পরে রবার আর নারকেল-বাগিচায় কাজ করার জন্যে তামিলনাদ ও কেরল থেকে বহু শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন এই মজুরদের মেহনতে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন-জঙ্গল কেটে চা ও রবারের বাগান গড়ে উঠেছিল। সিংহলী কৃষক দিনমজুর হিসেবে খাটতে আসেনি এবং তার নিজের কাজ থেকে ফুরসতও ছিল না। আজ, লঙ্কা-দ্বীপেরও লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের সরিয়ে দেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এখনই অবশ্য সব ভারতীয় মেহনতী মানুষ সিংহল থেকে চলে এলে সেখানকার অর্থনীতি ভেঙে পড়বে; চা, রবার এবং নারকেলের বাগান বেচাল হয়ে যাবে। তাই, সিংহলীরা এখনও

বেশ কিছু লোককে রাখতে চাচ্ছে। তবে তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তাদেরও সরে আসতে হবে। সমস্যা জটিল সন্দেহ নেই, তবুও এর একটা সমাধান নিশ্চয়ই হবে। ভ্রাতৃত্বের যে নিবিড় বন্ধন বিজয়সিংহ, ভিক্ষু মহেন্দ্র, ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা, ধর্ম-প্রচারক মনীষী স্থিরমতি এবং আরও কত অজ্ঞাত সুধী এবং সাধক রচনা করেছেন, তাঁকে ছিন্ন কেউ করতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম সিংহলে কখন কিভাবে এসেছিল, এ নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। বোধিসত্ত্ব গোতমের স্পর্শধন্য সুমনা পর্বত। লংকার নাগরাজ মহোদয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বোধিসত্ত্ব যাচ্ছিলেন আকাশপথে মগধে। হঠাৎ পর্বতগাত্রকে ধন্য করে তিনি তাঁর পদযুগল ঐ পাহাড়ের শিখরে স্থাপনা করেন। আরও বহু দিন পরে মৌর্যসম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র তথাগতের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে আসেন মিহিনতালের অম্বাত্তালে গিরিশিখরে। লংকাধীপ দেবানাম্ প্রিয় তিষ্য মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন। মায়ামৃগের অনুসরণ করে তিষ্য এলেন মহেন্দ্র সমীপে। মুক্তি-পথের যুক্তি তিষ্য মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলেন। সারা দেশময় তিনি সেই অমৃত-বাণী প্রচার করলেন। আবার মহেন্দ্রের প্রদর্শিত পথে এলেন ভগ্নী সংঘমিত্রা। নিরঞ্জনার তীর থেকে তিনি বোধিদ্রুমের শাখা বহন করে নিয়ে এলেন। অনুরাধপুরে মহামেঘবন উদ্যানে সেই পবিত্র বোধি-বৃক্ষ জয়শ্রী মহাবোধিবংশ—আজও নব নব পত্র পল্লব বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে থুপরাম দাগোবা ভগবান তথাগতের দক্ষিণ কণ্ঠাস্থির পবিত্র স্মৃতি বহন করে আজও লক্ষ লক্ষ সিংহলী পুণ্যার্থীকে আকৃষ্ট করছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কলিঙ্গ-রাজকুমারী বিধর্মী আক্রমণকারীর হাত থেকে ভগবান তথাগতের দন্তকে রক্ষা করার জন্যে নিজের কেশদামের মধ্যে সযত্নে সেই অমূল্য রত্নকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে সিংহলে আসেন। সিংহলীরা সযত্নে সেই দন্তকে অনুরাধাপুরে ডালাডা মালিগাওয়াতে স্থাপনা করেন। বিদেশী আক্রমণের সামনে পর্যুদস্ত সিংহলী শক্তিকে অনুরাধাপুর ছেড়ে দিয়ে আরও দক্ষিণে চলে যেতে হয়। নতুন রাজধানী পোলন্নারুয়াতেও দন্ত-মন্দির স্থাপিত হয় এবং তারপর সেখান থেকে কাণ্ডিতে প্রাকৃতিক প্রাচীরের অন্তরালে যখন সিংহলী রাজারা আত্ম-রক্ষার জন্যে যান, তখন দন্তসৌধ কাণ্ডিতেও নির্মিত হয়েছিল। আজও পাহাড়ের কোলে দন্তমন্দিরের পবিত্র দন্তাধার ও তথাগতের

পেরাডেনিয়া উদ্যান, কাণ্ডি

ভিক্ষাপাত্র দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়। পেরহারা উৎসবের কদিন সুসজ্জিত গজ-পৃষ্ঠে সে-দন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিহাসে অবশ্য উল্লেখ আছে যে, কাণ্ডি রাজারা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে পবিত্র দন্ত জাফনার রাজাদের হাতে দেন। উত্তর অঞ্চলের জাফনার তামিল নৃপতিও কিন্তু পর্তুগীজদের অবিশ্রান্ত আক্রমণে পরাজিত হন। নগরীর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেই দন্তও পর্তুগীজরা নিয়ে যায়। অনেকের ধারণা যে, পর্তুগীজরা আসল দন্ত হস্তগত করতে পারেনি। অনেকে আবার জম্বুদ্বীপে গুহশিবের কাহিনী উল্লেখ করেন। প্রকাশ এই যে, পরম পরাক্রমশালী নৃপতি পাণ্ডুর আদেশ অমান্য করে রাজকুমার গুহশিব দন্তের আরাধনা করতেন। এ-সংবাদ শুনে উদ্ধত পাণ্ডু আদেশ দিলেন, সেই দন্তকে রাজ-সমীপে নিয়ে আসা হোক। উন্মত্ত নৃপতি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে, হাতুড়ির তলায় এবং ক্লেদপঙ্কিল আবর্জনাস্তূপে সেই দন্তকে ফেলে দিলেন, কিন্তু প্রতিবারই ক্ষমতাগর্বী রাজার দর্পচূর্ণ করে প্রস্ফুটিত শতদলের উপরে দন্তকে দেখা গেল। নিজের নিষ্ফল দম্ভ এইভাবে ব্যর্থ হতে দেখে রাজা নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন। তেমনি, বিদেশী পর্তুগীজ ধর্মযাজকের সমস্ত প্রয়াস বিফল করে আসল দন্তও অদৃশ্য হয়ে যায়। অলৌকিক শক্তিবলে তা আবার রাজধানী কাণ্ডিনগরে ফিরে আসে।

মিহিনতালের পর্বতশিখর থেকে আট মাইল দূরে অনুরাধাপুরের দৃশ্য অতুলনীয়। আজ সেখানে বনজঙ্গলে বহু সৌধ ঢেকে গিয়েছে। কালের অপ্রতিহত গতিতে অধিকাংশ কীর্তিচিহ্নই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বিগত দিনের সে-চিত্রকে দেখতে হয়। সিংহলী রাজ-কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিহিনতাল থেকে অনুরাধাপুর পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ উৎসবের দিনে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর কলরবে মুখরিত হয়ে উঠত। স্নান ও পুজো অর্চনার পর যাত্রীদের যাতে অপরিচ্ছন্ন স্থানে পদক্ষেপ করতে না হয়, তার জন্য সমস্ত পথ পুরু গালিচা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। পথের দুধারে ছোট বড়

কত স্তূপ, কত সৌধ। তারপর, স্বাধীন সিংহলের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি দুষ্টগামিনীর নির্মিত মহাবিহার স্বর্ণকণা বা রুয়ানওয়েলি আজোবা দেখা যাবে। সিংহলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ইসুরুমুনিয়াও অনুরাধাপুরে অবস্থিত।

আদি বৌদ্ধযুগের সিংহলী ললিতকলা ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে প্রভূত প্রেরণা পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ এই শিল্প সৃজনের ধারা সিংহলের নিজস্ব সম্পদ হয়ে গেল।

মৌর্যযুগে বহু স্থপতি ও ভাস্কর মগধ থেকে সিংহলে এসেছিলেন। সে-যুগের সিংহলী মূর্তির আকৃতি অত্যন্তই সুঠাম ও মনোরম ছিল। গুপ্তযুগে সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সিংহলের শিল্পকলায় মৌর্যযুগীয় স্থাপত্যের যে সরল রেখা ও কোণাত্মক ভঙ্গির প্রাধান্য ছিল, তার পরিবর্তে গুপ্ত শিল্প-শৈলীর অনুসরণে লীলায়িত দেহভঙ্গিমা ও কমনীয় স্থাপত্যের বিকাশ আরম্ভ হল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে পিতৃহন্তা কাশ্যপ প্রাকৃতিক দুর্গ শ্রীগিরিতে কিছুদিনের জন্য তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শ্রীগিরির অর্থ সিংহগিরি। নৃপতির আদেশে পাহাড়ের অগভীর কোটর-গাত্রে অপরূপ চিত্রাবলী অংকিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সিংহলী শিল্পীরা নব নব সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

অনুরাধাপুর, পোলন্নারুয়া এবং কান্ডি—এই তিন রাজধানীই বিরাট এক কৃষি-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে বৃষ্টির যে প্রাচুর্য, তা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মধ্য অঞ্চল বঞ্চিত। প্রকৃতির সীমিত দানকে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখার জন্যে সেখানে বড় বড় জলাশয়, নালা প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে। সারা বছর ধরে জলসেচন করে সিংহলের উর্বর ভূমিতে বহু শস্য উৎপন্ন হত।

উত্তর ভারত থেকে সিংহল যেমন পেয়েছে বৌদ্ধধর্ম, তেমনি দক্ষিণ ভারত থেকেও সভ্যতার অন্য এক ধারা সিংহলী ইতিহাসের গতিপথকে প্রভাবান্বিত করেছে। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দশকে চোল রাজা এল্লাল সিংহল-নৃপতিকে হত্যা করে নিজের শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তামিল নৃপতির ন্যায়বিচারের প্রশংসা মহাবংশ উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছে। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের পথে কোনও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেননি। সেইজন্যেই বিদেশী রাজার সমাধিস্থল সিংহলীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। সে-পথ দিয়ে গেলে অবনত-মস্তকে সশ্রদ্ধ মৌন অভিবাদন করেই সবাই যায়। সিংহলী নৃপতি দুষ্টগামিনী বিদেশী শক্তিকে বিতাড়িত করে আবার স্বাধীন লংকার জয়পতাকা উড়িয়ে দেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে তামিল আক্রমণ এবং অবিশ্রান্ত সংগ্রাম-সংঘর্ষ কান্ডির সিংহলী শক্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়। তারপরেই পর্তুগীজ, পরে ওলন্দাজ এবং ইংরাজ রাজশক্তি সিংহলে রাজত্ব করে। পর্তুগালের শাসন-শোষণের ইতিহাস বড় রক্তাক্ত। বিদেশী শাসক দেশ শাসন ও ধর্ম প্রচার একই সংগে আরম্ভ করে। বেশী লোক অবশ্য ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি অবশ্য ধর্মের আলোক বিতরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ধনসম্পদ আহরণ বা লুণ্ঠনের দিকেই বিশেষ নজর দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ওলন্দাজ শক্তি ইউরোপে নিজের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে এবং সিংহলেও তখন ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রসারিত হয়। কিছুদিন সিংহলের শাসনকার্য মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

তিন বিভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তি প্রায় দেড়শ বছর করে সিংহলের উপর শাসন চালায়। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিচ্ছবি সিংহলী মধ্যবিত্ত সমাজের উপরই বিশেষভাবে পড়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম, এই নীতি প্রচলিত করা হয়। সিংহলের মধ্যবিত্ত সমাজও রাজশক্তির রীতিনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মস্থ না হক গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। দেড়শ বছর আগে এমন বহু সিংহলী মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল, যারা নিজেদের বাড়িতেও পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্তা বলত। তেমনি ইতিহাসের পট-পরিবর্তনে ওলন্দাজ ভাষা সিংহলীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, আর ইংরেজী ভাষার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এখন প্রতিটি শিক্ষিত সিংহলীই সচেতন।

ওলন্দাজ সংস্পর্শের ফলে সিংহলে বারগার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সংগে এই গোষ্ঠীর তুলনা দেওয়া চলে। কিন্তু, কর্মনিপুণতায় ও সমাজে প্রতিষ্ঠায় সিংহলের বারগাররা অনেক অগ্রসর। হল্যান্ডের সংগে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল বহুদিন আগে। ব্রিটিশ শক্তি তাদের উপর করুণার

দৃষ্টি রেখেছিল, কিন্তু নিজের লোক বলে মেনে নেয়নি। সিংহলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, অফিস আদালতে এ'রা কর্মঠ বলে সমাদৃত। বহু খৃষ্টান সিংহলীও ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ যুগে নিজেদের নাম-সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্যে সম্পূর্ণ বিদেশী নামেই নিজেকে পরিচিত করতেন। আজ অবশ্য বিদেশী ও স্বদেশী নামের সংমিশ্রণে তাঁরা আবার অভিজাত পংক্তিতে স্থান পেয়েছেন। জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতিও অনুরাগ বেড়ে যায়। অনেক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিও আবার স্বধর্মে ফিরে আসেন।

সিংহলের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সিংহলী তামিলভাষী জনতার বাস। তাঁদের অনেকেই হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং সিংহলের ইতিহাসে অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাঁরা গৌরবের স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ধর্ম ও জাতিগত উৎপত্তি এবং দক্ষিণ ভারতের সান্নিধ্য—এই সমস্ত কারণে জাফনার তামিল সমাজ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। আজও তাঁদের ভাষা তামিল এবং তামিলনাদে ব্যবহৃত ভাষার থেকে তা আরও শুদ্ধ; কারণ তা বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত। সিংহলীকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

তামিলভাষী সম্প্রদায় ছাড়া সিংহলে তথাকথিত মুরসম্প্রদায়ও বিশেষ কর্মঠ। মুর নাম অবশ্য পর্তুগীজদের দেওয়া এবং অতীতে স্বদেশে বিজয়ী আরবদের স্মরণ করেই বোধ হয় এ-নামকরণ তাঁরা করেছিলেন। যাই হক, সিংহলী মুরদের সঙ্গে গ্রানাডা ও করডোভার অবিস্মরণীয় সভ্যতার কোনও যোগই নেই। অনেকের ধারণা, সমুদ্রপথযাত্রী আরব নাবিক এবং দক্ষিণ ভারতের সিংহলপ্রবাসী মুসলমানদের মিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তাঁদের অধিকাংশই আজ কৃষক এবং কেউ কেউ ছোট ব্যবসায়ী। ডাচ ওলন্দাজ অধিকারের যুগে যে মালয়ের সৈন্যবাহিনী সিংহলে এসেছিল

কান্ডির বন-বিভাগে হাতিকে দিয়ে কাঠ বহন করান হচ্ছে.

তারা আর স্বদেশে ফিরে যায়নি এবং এখন সিংহলের মালয়ী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত।

আশি লক্ষ লোকের খাদ্যবস্তুর জন্য সিংহল অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, রবার উৎপাদনে সিংহলের স্থান মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই। সিংহলের প্রধান রপ্তানি-বস্তু রবার। তার পরই চা ও নারকেল। এই সমস্ত বাগান-বাগিচার মালিক অধিকাংশই বিদেশী এবং বিশেষ করে ইংরেজ।

সিংহল-পরিচিতি কখনও সম্পূর্ণ হবে না, যদি না সেখানকার প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যের সামান্য পরিচয় দেওয়া যায়। নারকেল ও কেতকীর কুঞ্জ সমস্ত তটরেখাকে আবৃত করে রেখেছে। মানুষও প্রকৃতির এই বরদানকে সশ্রদ্ধভাবে নিয়েছে, নিজের শ্রমে সারা দ্বীপে কত ছোট বড় উদ্যান গড়ে তুলেছে। আগেকার দিনে থুপরাম বা স্বর্ণকণা দাগোবার বিরাট পরিধির সর্বত্র পুষ্পসজ্জা রচিত হত। বুদ্ধপাদমূলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে পুণ্যার্থীরা সেদিন নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছে।
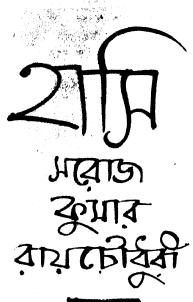
এই কাহিনীর যারা পাত্র-পাত্রী, তারা—আরও লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর মত — ইতিহাসের পাতায় বেঁচে নেই। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে, এরা মরেনি, অন্য দেহে বেঁচেই আছে সম্ভবত, যদিও তাদের ঠিকানা জানা নেই।

এদের দেখতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে একশো বছর আগের এক গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে, বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে। ইস্পাতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো রোদ। সেদিকে চাওয়া যায় না। ঝিমুচ্ছে গাছের পাতা এবং পাতার আড়ালে পাখির দল।

মেঝেয় জল-ছড়া দিয়ে শীতল পাটি পেতে দোর বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে প্রবীণের দল। ঘুমুচ্ছে গৃহিণীর দল মেঝের আঁচল পেতে। পাশে একটি দুটি শিশু নাতি-নাতনী। গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে গেছে। ঈষদুন্মুক্ত ঠোঁটে সেই অর্ধসমাপ্ত গল্পের রেশটুকু তখনও লেগে রয়েছে যেন।

ঘুম নেই বধূদের। শাশুড়ী-ননদের কঠোর শাসনে এই গ্রীষ্মে তাদের ঘুমুনো নিষেধ। তারা হয়ত কয়েকজন বসে গল্প করছে। নয়ত একা একা তেঁতুল কেটে বিচিগুলো বের করছে।

আর ঘুম নেই বালক-বালিকাদের। রৌদ্র তাদের দগ্ধ করতে পারে না। গুমোট তাদের ক্লিষ্ট করতে পারে না। আগুনের মত তেতে উঠেছে যে গ্রাম-পথ, তাও তাদের জব্দ করতে পারে না। তারা দল বেঁধে চুপি-চুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে, চুরি করে দুটো আম পাড়বার ফিকিরে, নয়ত অন্য কোনো ফলের লোভে। পাঠশালা সকালে-বিকেলে বসে। দুপুরে তারা এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন পেয়ে যায়। সেটা পুরোপুরি উপভোগ করাই তাদের বাসনা।

আর ঘুম নেই বাবুলালের। ছিপছিপে বলিষ্ঠ গঠনের একটি হিন্দুস্থানী যুবক। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স। এইটে তার পসরা নিয়ে বেরুবার সময়। রঙিন গোলাপ-ছড়ি, গুড়ের তৈরি ফাঁপা খেলনা। ছেলেদের অত্যন্ত প্রিয়। এবং এই সমস্ত লোভনীয় সুখাদ্য বিক্রির এইটেই সময়, যখন গৃহিণীরা সুখসুপ্ত, ভাঁড়ার অরক্ষিত এবং ছেলেমেয়েদের পক্ষে চাল-চুরির অবারিত সুযোগ।

জীবিকার্জনের চেষ্টায় বিহার থেকে ব্যবসায়ীর একটা ক্ষীণ স্রোত আবহমান-কাল থেকেই বাংলা মুলুকে প্রবহমান। অনেক দিন আগে এমনি কোনো একটা বণিকযূথের সংগে বাবুলালের বাবা মুঙ্গের থেকে বাংলা-মুলুকে আসে। পরিবার দেশেই থাকত। মাঝে-মাঝে, সে হয়ত বৎসরে একবার, কি আরও বিলম্বে, দেশে যেত। সম্বৎসরের উপার্জিত অর্থে দেশে যেত খামার কিনতে, বিহারের জল-হাওয়ায় শরীরটাকেও ঝালিয়ে নিত, তারপর আবার ফিরে আসত। শেষবার যখন আসে, তখন কী ভেবে বাবুলালকেও সংগে আনে। প্রথম প্রথম বাপের সংগে সংগেই ঘুরত। শীঘ্রই স্বাধীনভাবে ঘোরার বৃত্তি অবলম্বন করে। বাপের মৃত্যুর পরও তাই করছে।

আর ঘুম নেই রাসমণির।

আট বৎসর আগে যখন রাসমণির বয়স ছিল নয়, তখন তার বাবা তাকে গৌরীদান করে-পুণ্যসঞ্চয় করেছিল। পরের বছরই সে বিধবা হয়। তারপরে আর শ্বশুরবাড়ি যায়নি। সেখান থেকে কেউ তাকে নিয়ে যেতেও আসেনি।

তার ঘুম আসে না। মা-বাবা দুজনেই বেঁচে। দিবানিদ্রায় তার বাধা নেই। তবু ঘুম আসে না। চেষ্টা করলেও না। কিছুদিন থেকে কী যে তার হয়েছে, বাড়ির সবাই যখন দোর বন্ধ করে অন্ধকারের স্নিগ্ধতায় নিদ্রা-মগ্ন, সে দাওয়ার একটা নিরিবিলি কোণে বসে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে।

ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং।

ঘণ্টা বাজিয়ে মাথায় কাঠের ডালা আর বাঁ বগলে সেই ডালা বসাবার মোড়া নিয়ে এই সময়ে আসে বাবুলাল। অনেক দূর থেকেই গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। বোঝা যায়, সে কতদূরে।

রাসমণি তখনই গায়ে ভাল করে শাড়ীটা জড়িয়ে উঠে বসে। বাবুলাল কুমোরপাড়া পেরিয়ে স্যাকরাপাড়ার মোড়ে ডালাটা একবার নামায় কেষ্টপদর ঘরের ছায়ায়।

ওখানে তার পশরা কিছু বিক্রি হয়। তখন ঘণ্টা বাজে না।

রাসমণি অপেক্ষা করে। যেই আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে, রাসমণি সদর দরজা একটু ফাঁক করে দাঁড়ায়। একটি চোখ দিয়ে দেখে,—মা কি কান দিয়ে?—বাবুলাল কত-দূর এল।

মিনিট দুয়েকের পথ।

চোখে চোখ পড়তে দুজনেই মিষ্টি একটু হাসে। মাথার পশরা রাসমণির সদর-দরজার সামনে নামায় বাবুলাল। মাথার গামছা খুলে ছোট্ট দাওয়াটুকুর উপর বসে মুখের ঘাম মোছে। এই রোদে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। গামছা ঘুরিয়ে একটু হাওয়া খায় বাবুলাল।

রাসমণি নিঃশব্দে অপেক্ষা করে। তার চোখের কোণে হয়ত একটু উদ্বেগ, ঠোঁটের ফাঁকে হয়ত একটু হাসি থাকে। কিন্তু বাবুলাল হাসতে পারে না তখন। তার মাথা এবং সমস্ত দেহ দিয়ে একটা গরম বাষ্প বেরুচ্ছে তখন। মিনিট পাঁচেক গামছার হাওয়ায় দেহ কিছুটা শীতল হলে তখন রাসমণির দিকে চেয়ে হাসে।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করে, "জল আনি?"

"আন।"

ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকার কোণের জালার যে ঠাণ্ডা জল, একটি কাঁসার ঘটিতে করে তাই নিয়ে আসে। দাওয়া থেকে নেমে নর্দমার ধারে বাবুলাল অঞ্জলি পাতে। এক ঘটি জলে হয় না। প্রথম ঘটির জল তার ধূলিমলিন হাত-মুখ, উত্তপ্ত কর্ণমূল, চোখ, ললাট ধুতেই শেষ হয়। দ্বিতীয় ঘটির জলে তৃষ্ণা নিবারণ।

তারপরে সুস্থ হয়ে ঘণ্টা বাজায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল জোটে বাড়ি থেকে চুরি-করে-আনা চাল নিয়ে। একটা নারকোলের মালায় চাল মেপে থলিটায় রাখে এবং যার-যেমন চাল সেই অনুযায়ী কাউকে গোলাপ-ছড়ি কাউকে বা অন্য জিনিস দেয়।

রাসমণি আধ-কপাটী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে ওর ব্যবসা করা দেখে। এক একদিন দুষ্টু ছেলের দল পণ্যের দুর্মূল্যতা নিয়ে বাবুলালকে বেজায় নাজেহালও করে। রাসমণি তখন এগিয়ে এসে ওদের বিরোধের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে দেয়।

ওর ছোট ভাইটি শিবু পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে। তারা গরিব, রোজ রোজ চাল দিয়ে গোলাপ-ছড়ি কিনতে পারে না। কিনতে না পারলে গোলাপ-ছড়ির অভাবে জীবন বৃথা মনে হয় তার। অন্য ছেলেদের কেনা দেখে আর ছটফট করে। বাবুলাল সেদিন যাওয়ার সময় একখানা গোলাপ-ছড়ি সহাস্যে ওকে উপহার দিয়ে যায়।

"কাল পয়সা দিও।"

বলে রাসমণির দিকে চেয়ে বাবুলাল হেসে চলে যায়।

শিবুর বন্ধুরা বাবুলালের এই পক্ষপাতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়। তারা জানে, কাল পয়সা দেওয়াটা কিছুই নয়। মাঝে মাঝেই বাবুলাল এমন খয়রাতি করে। গোলা -ছড়ি ধারে বিক্রি নেই।

বলে, "লোকটা তোদের খুব ভালবাসে। না রে?"

গোলাপ-ছড়িটা মনোযোগের সঙ্গে লেহন করতে করতে শিবু প্রথমে বলে, "হাঁ।" তারপর বলে, "আমরা জল দিই যে!"

ওর নাম ছেলেরা কেউ জানে না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করে না। ওদের সম্পর্ক লোকটির সঙ্গে নয়, তার গোলাপ-ছড়ির সঙ্গে। গোলাপ-ছড়িওলা বললেই সে প্রয়োজন মেটে। কাছেই কোন একটা গ্রামে বোধ হয় ওর আস্তানা। কিন্তু সেটা যে কোথায়, সে-কথা জানবার কোন কৌতূহল তাদের জাগে না।

এ-গ্রামে ও রোজ আসে না। একই গ্রামের ছেলেরা রোজ রোজ গোলাপ-ছড়ি কেনার পয়সা পাবে কোথায়? এক একদিন এক এক গ্রামে যায়। তবে এ-গ্রামটা বড়, এই গ্রামেই বেশী আসে।

এক একদিন দু-একটা ছোট গ্রাম ঘুরেও এ-গ্রামে আসে। সেদিন খুব ক্লান্ত থাকে। সেদিন আর রাসমণির দেওয়া এক ঘটি জলেই শ্রান্তি-নিবারণ হয় না। সেদিন পশরা পাশে নামিয়ে রেখে ওদের রাস্তার দিকের চাতালে মাথায় গামছাটা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুমোয় না। ঘুমোবার উপায় নেই। যা দুষ্টু পাড়ার ছেলেরা, ঘুমিয়ে পড়লে ডালাটাই উধাও হয়ে যাবে।

বাবুলাল ঘুমোয় না। রাসমণিও সংলগ্ন ঘরের দরজা অল্প একটু খুলে তার আড়ালে বসে। দুজনে অনেক গল্প হয়:

"তুমি শ্বশুরবাড়ি যাও না রাসু?"

"সেখানে কার কাছে আর যাব?"

"মাঝে মাঝেও যাও না?"

"না।"

"ওরা নিতে আসে না?"

"না।"

বাবুলাল বিষণ্ণ মুখে কী যেন ভাবে। বলে, "তোমার যখন সাদি হয়, তখন কত উমর ছিল?"

"ন বছর।"

"কিছু ইয়াদ হয় না?"

"না।"

রাসমণির আনত মুখের দিকে বাবুলাল গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চেয়ে থাকে। ভারি কষ্ট হয় তার।

বলে, "আমাদের দেশে তোমার মত লেড়কীর আবার সাদি হয়।"

"বাবুদের মতোও ?"

"না। অন্য জাতের হয়।"

"আমাদের দেশে হয় না।"

রাসমণিও ওদের দেশের কত কথা জিজ্ঞাসা করে :

"তুমি দেশে যাবে না গোলাপ-ছড়িওলা ?"

"কী করে যাই ? রুপেয়া-পয়সা কামাই হবে তবে ত!"

"সেখানে কে আছে তোমার ?"

"মা আছে, ভাই আছে দুটো, বহিন আছে একটা, আর ভঁইস আছে দুটো।"

"বহিনের বিয়ে হয়নি ?"

"বাত্ চলছে। লেকেন রুপেয়া' না নিয়ে গেলে ত হবে না।"

"আর ভাই কী করে ?"

"ভঁইস চড়ায় ছোটটা, আর বড়টা ক্ষেতে খাটে।

"কতদিন দেশে যাওনি তুমি ?"

"দু'বরষ।"

"কী সর্বনাশ! যেতে ইচ্ছে হয় না ?"

"ইচ্ছে ত হয়, মগর একঠো মুশকিল ভি আছে।"

"কী মুশকিল ?"

মাথা নেড়ে বাবুলাল বললে, "সে কাউকে বলতে পারব না।"

"কেন ?"

"না।"

রাসমণির জেদ চড়ে গেল। বললে, "বলতেই হবে।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পরে বাবুলালকে বলতে হল, একটা লেড়কীকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তাকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না।

রাসমণি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, "আমাদের দেশের মেয়ে ?"

"হাঁ। বাংগালী।"

"তা তাকেই সাদি করে ফেল না ?"

"হামি তো রাজী। লেকেন দু'বার সাদি তাদের হয় না।"

এক মুহূর্ত কথার মানে বোঝবার জন্যে রাসমণির চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল। তক্ষুনি সেদুটো খঞ্জনের মত নেচে উঠল যেন।

দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠল, "ধোৎ!"

সেদিন একাদশী।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। তৃষ্ণায় রাসমণির ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। অথচ একটু জল খাওয়ার উপায় নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে সে বাইরের দিকের চাতালের সংলগ্ন ঘরে চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল। ইচ্ছা একটু ঘুমোয়। কিন্তু তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ঘুমও আসে না।

ঠং-ঠং-ঠং-ঠং।

কিন্তু রাসমণি উঠতে পারলে না। মনে করলে, স্যাকরা-পাড়ার গলি পার হয়ে যখন বাবুলাল আসবে, তখন হয়ত সে উঠতে পারবে। কিন্তু ওর দরজার সামনে ঘণ্টা যখন খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল, তখনও উঠতে পারলে না।

বাবুলাল উদ্বিগ্নভাবে থামলে। দীর্ঘ-কালের মধ্যে এরকমটি একদিনও ঘটেনি। রাসমণিদের সদর-দরজার গোড়ায় আসতেই ঈষদুন্মুক্ত দুয়ারের ফাঁক দিয়ে তার কৌতুক-পূর্ণ একটি চোখ বরাবর দেখা গেছে।

আবার একবার ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল। ছেলের দল অনেক এল। অনেকেই কিছু না কিছু কিনলে। কিন্তু যাকে সে খুঁজছে তার দেখা নেই!

একটু পরে হাঁফাতে হাঁফাতে শিবু এল। আম পাড়তে বাগানে গিয়েছিল সে। তাকে দেখে বাবুলাল একটু সুস্থ হল। ছেলেদের ভিড় কমতে বাবুলাল তার হাতে একটি গোলাপ-ছাড়ি দিলে। প্রীত মনে শিবু সেটি লেহন করতে শুরু করলে।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দিদি কই জল দিতে এল না ?"

"দিদির একাদশী যে!" শিবু বললে, "ওই ঘরে শুয়ে আছে। আমি তোমার জল এনে দিই দাঁড়াও।"

বাবুলাল নিষেধ করলে। তার জলের দরকার নেই।

শিবুও গোলাপ-ছাড়ি পেয়ে গেছে। সুতরাং বাগানের দিকে ছুটল।

বাবুলাল অন্য দিনের মত তার পসরা চাতালে রেখে গামছাটাকে উপাধান করে শুয়ে পড়ল। একবার কাশলেও। ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

চিন্তিতভাবে বাবুলাল এদিক-ওদিক চাইছে, এমন সময় ভিতরে কাশির শব্দ পাওয়া গেল। এটা তার কাশির উত্তর কি না, ঠিক করবার জন্যে বাবুলাল আবার একবার কাশলে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেও কাশির শব্দ হল।

বাবুলাল উঠলে। ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেললে। ভিতরে একখানা অনাবৃত তক্তা-পোষে রাসমণি শুয়ে।

বাবুলাল ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। একবার চোখ মেলে চেয়েই রাসমণি আবার চোখ বন্ধ করলে।

"খুব কষ্ট হচ্ছে ?" বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলে।

রাসমণি ঘাড় নেড়ে জানালে, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবুলাল বললে, "চল, আমরা চলে যাই।"

"তোমার দেশে ?"

"না। সেখানে জায়গা হবে না।"

"তবে ?"

"অন্য কোথাও। কলকত্তা ভারী শহর হয়েছে। সেখানে যেতে পারি। যাবে ?"

রাসমণি সাড়া দিলে না।

"এমন তকলিফ করে, জানকে তকলিফ দিয়ে লাভ কী ? সেখানে আমরা কত আনন্দে দিন কাটাতে পারি। যাবে ?"

"অতদূর কী করে যাব ?"

আনন্দে বাবুলালের রৌদ্রদগ্ধ মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে, "তুমি রাজি হলে গংগাজীতে একখানা নৌকো ঠিক করি। শুধু গংগাজী পর্যন্ত পায়দল যেতে হবে। পারবে না ?"

রাসমণি আবার দ্বিধাভরে চুপ করে রইল।

বাবুলাল উৎসাহের সংগে ভাবী জীবনের একটা রৌদ্রোজ্জ্বল ছবি আঁকতে লাগল. গংগাজীর ধারে ছোট একখানা ঘর বানাবে তারা। সেখানে কত লোক, কত কেনাবেচা। মানুষ দুদিনে লাল হয়ে যাচ্ছে। চাই কি, ওরাও একদিন বেশ দু'পয়সা কামাই করতে পারবে। তা যদি নাও পারে, সকাল-সন্ধ্যা গংগাজীমে আস্নান এবং আনন্দ ত করতে পারে। যাবে ?

রাসমণি চোখ বন্ধ করে যেন জীবনকে দেখতে লাগল। কলকাতা শহর, গংগা, তাদের ছোট্ট মাটির ঘর, উঠানের নারিকেল গাছ, সন্ধ্যার পরে ফেরি করে যখন বাবুলাল ফিরে আসবে, তখন সেইখানে বসে কত হাসি-গল্প। সব যেন সে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল, কিন্তু রক্তে যেন আগুনে জ্বলতে লাগল।

বাবুলাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে?"

"কবে?"

"নৌকো ঠিক করতে যতদিন লাগে। চার-ছ দিন।"

রাসমণি বললে, "যাব।"

বাস্তব জীবনে এই স্বপ্নের কিছু মিলেছে কিছু মেলেনি।

কলকাতা ভারী শহর তাতে আর সন্দেহ নেই। সিপাহী যুদ্ধ মিটে গেছে। ইংরেজ তার নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানীকে সাজাতে ব্যস্ত। গঙ্গাও প্রকাণ্ড বড় গঙ্গা। রাসমণিদের দেশের গঙ্গার চেয়ে অনেক বড়। তার বুকে কত সওদাগরী জাহাজ, পণ্যবাহী নৌকা! আর দিনরাত্রি কী হট্টগোল!

একখানা বেড়ার ঘর গোড়ার দিকে পেয়েছিল বটে, উঠানের নারিকেল গাছটি সমেত। তার আড়ালে যখন বড় করে চাঁদ উঠেছে, তখন কিন্তু স্যাঁতসেঁতে দাওয়ায় বসে দুজনে গল্প করেনি। অথবা করেছে, পাশাপাশি বসে, কিন্তু নিঃশব্দে। অজস্র স্বপ্ন-মদির গল্প একজনের হৃদয় থেকে অন্যজনের হৃদয়ে অদৃশ্য পথে সঞ্চারিত হয়েছে। এর চেয়ে সুখের দিন ওদের জীবনে আসেনি।

বছর খানেক পরেই এখান থেকে ওদের উঠতে হল। কী একটা কোম্পানি সমস্ত খানটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ইটখোলা বসালে।

ওরা উঠে এল একটা বস্তিতে। লম্বা টানা বস্তি। পরের পর অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেক ঘরে এক একটা পরিবার। সামনের লম্বা দাওয়ায় সারি-সারি পঁচিশ-ত্রিশটা উনান সকাল-সন্ধ্যায় বস্তিটাকে ধোঁয়ায় অন্ধকার করে তোলে। আর সামনের উঠোনে রাজ্যের জঞ্জাল। তার সামনে একটা বেড়ার পরেই কোমর-পর্যন্ত গভীর খোলা নর্দমা দিনরাত্রি দুর্গন্ধ উদ্গিরণ করছে।

বছর চারেক এখানে ওদের থাকতে হয়েছে।

রাসমণির সব চেয়ে খারাপ লেগেছে। একটা অন্তরালহীন অনাবৃত জীবন। এখানেই ওদের প্রথম ছেলেটি জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নিরিবিলি বসে এখানে কোনো দিন ওরা দুজনে হাসি-গল্প করেছে বলে মনে পড়ে না। দুজনে প্রতিদিন ছকে-বাঁধা নিজের নিজের কাজ করেছে, আর পশুর মত জীবন যাপন করেছে।

কিন্তু এইখানেই ওদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

প্রথম এসে বাবুলাল মাথায় করে তার গোলাপ-ছড়ি ফেরি করত। তারপরে ফুটপাথে বসে তেলে-ভাজা বিক্রি করতে লাগল। কিন্তু তাতে খুব সুবিধা না হওয়ায় আবার পথে-পথে ফেরি করা আরম্ভ করলে, গোলাপ-ছড়ি নয়, কাপড়-জামা। তখন বিলিতী কাপড় আমদানী হতে আরম্ভ হয়েছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ একটা দুঃসাহসী কাজ করে তার অবস্থা একেবারে ফিরে গেল। গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটা সুপুরীর নৌকা ধরে ফেললে।

তখন তার অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হলেও সুপুরীর নৌকা ধরবার মত হয়নি। কী সাহসে যে সে ধরে ফেললে তাও ভাবতে বিস্ময় লাগে ওর নিজেরই। কে যেন ওকে সেইখানে টেনে নিয়ে গেল। কে যেন ওকে

আমাদের দেশে তোমার মত লেড়কীর আবার সাদি হয়

দর-কষাকষি করালে। তার সংবিৎ ফিরে এল যখন দর পাকা হল।

যখন সে ভাবছে, টাকাটা কী ভাবে সংগ্রহ করা যায়, তখন একজন দালাল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে তার দরের চেয়ে অনেক বেশী দর দিয়ে নৌকোগুলো কিনে নিলে। বাবুলালকে কিছুই করতে হল না। ফাঁকতালে মোটা টাকা পেয়ে গেল। এই থেকে তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

বাবুলাল সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তার উপরে কাঠা-দশেক জায়গা কিনে ফেলল। সামনের সদর দরজার দুপাশে দু প্রস্থ চালাঘর তৈরি করলে। একটাতে তার নিজের কাপড়ের দোকান। অন্যটি ভাড়া দিলে। ভিতরে আর একটা মাটির ঘর তৈরি করলে নিজেদের থাকবার জন্যে।

রাসমণি বস্তি থেকে এখানে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

তাকে কিন্তু তখন আর কেশব চাটুজ্যের বিধবা কন্যা বলে চেনবার উপায় নেই। দুই বাহুতে ও বুকে উল্কি। হাতে-কানে-গলায় হিন্দুস্থানী গহনা। কথার মধ্যেও হিন্দুস্থানী টান এসেছে।

কিন্তু বাবুলালের তখন জোর-পড়তা আরম্ভ হয়েছে। যেদিকে হাত বাড়ায় সেদিক থেকেই মুঠো মুঠো টাকা আসে। বছর দশেকের মধ্যে মাটির বাড়ি, চালা-ঘর বিরাট অট্টালিকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। ফটকে তকমা-পরা দারোয়ান। জুড়িগাড়িতে ছেলেরা কলেজে যায়, রাসমণি গড়ের মাঠে হাওয়া খায়। আর বাবু বাবুলাল রায় কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চমৎকার বাঙালী হিন্দুসমাজে মিশে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় তার বাড়িতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়ে। বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।

আরও কয়েক বৎসর পরে।

সদরের দেউড়িতে পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজল। বাবুলাল অন্দরে এলেন। এ-সময় অন্দরে তিনি বড় একটা আসেন না।

চাকর এসে সুগন্ধী পান-তামাক দিয়ে গেল। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে ব্যস্তভাবে রাসমণি দেবী এলেন।

"কী ব্যাপার! এত সকালে এলে যে! শরীর ভাল আছে ত?"

বাবুলাল ওর ভয় দেখে হাসলেন। "অন্যায় হয়ে গেছে। শাস্তি দাও।"

রাসমণিও হেসে ফেললেন। "অসময়ে এসেছ, তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।"

"অসময়ে কি আসি না? আমি কি শুধুই সুসময়ে আসি? এ-অপবাদ কী করে দিলে?"

রাসমণি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "সে-অপবাদ তোমাকে দিলে অধর্ম হবে। অসময়ে একমাত্র তুমিই এসেছিলে। এসেছিলে বলেই আজ সুসময়ের দেখা পেলুম।"

বাবুলাল হেসে বললে, "সেই পুরনো কথা মনে পড়ল?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ বাবুলাল সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

"তোমার বাপ-মায়ের খবর রাখ রাসু?"

"না। কী করে রাখব? তুমি জান কিছু?"

"জানি। তোমাকে বলিনি। দুঃখ পাবে বলে ইচ্ছে করেই বলিনি। অল্প দিন হল তাঁরা মারা গেছেন। মধ্যে বড় কষ্ট পেয়েছেন।"

এ-সংবাদে রাসমণির মনটা খুব ভারী হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"তুমি চলে আসার পরে সমাজ ও'দের একঘরে করেছিল। অনেক উৎপাতও করেছে। এক সময় তোমার বাবা ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মুসলমান হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারেননি।"

"তারপরে?"

"তারপরে ও'রা গ্রাম ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অন্ধকার থাকতেই ও'রা বের হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকে কী করে টের পায়। তারা টিন বাজাতে-বাজাতে অনেক দূর পর্যন্ত ও'দের পিছু পিছু আসে। ধুলো-কাদা ছোঁড়ে।"

"তুমি কী করে খবর পেলে?"

"শিবুর কাছে।"

"শিবু! আমার ভাই শিবু!"

"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?"

"এইখানেই। রোজই দেখা হত। মাস দুয়েক আর হচ্ছে না।"

"কেন?"

"সে এখানে নেই। আমার কানপুরের মিলের ম্যানেজার হয়ে চলে গেছে।"

রাসমণি লাফিয়ে উঠল, "আমাদের শিবু! আমাদের কানপুরের মিলের ম্যানেজার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

কী বলছেন বাবুলাল পাগলের মত! রাসমণি অবাক হয়ে ও'র দিকে চেয়ে। বাবুলাল সমস্ত ব্যাপার বললেন:

অনেক দিন আগে একটি ভিখারী তাঁর গদিতে তাঁর কাছে ভিক্ষার জন্যে হাত পাতে। তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও বাবুলালের কেমন মনে হয় ছেলেটি শিবু নয় ত? মুখে পাতলা গোঁফ-দাড়ি। চুল উস্কোখুস্কো। মলিন ছেঁড়া কাপড়। কিন্তু বাঁ চোখের তারায় সেই সাদা দাগটি অবিকল আছে।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "খাবে কিছু?"

"না।"

"না কেন? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি।"

ছোকরা কেঁদে ফেললে, "ওই গাছতলায় আমার বাবা-মা বসে আছেন আমার জন্যে। ভিক্ষে করে যা পাই নিয়ে গিয়ে ও'দের খাওয়াব, তারপরে আমি খাব।"

কথাবার্তা ভদ্রসন্তানের মত। এবং চোখের তারায় সেই সাদা দাগ!

বাবুলাল বললেন, "ও'দের ব্যবস্থাও আমি করছি। তুমি ভেব না।"

বলে একজন কর্মচারীকে বললেন, "কিছু খাবার নিয়ে গিয়ে ও'দের দুজনকে খাইয়ে এস। আর একজন এর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস।"

খেয়ে-দেয়ে ছেলেটি সুস্থ হলে বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কী?"

"আজ্ঞে, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

বাবুলাল চমকে উঠলেন। নামটা মিলছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ি কোথায়?"

শিবনাথ জেলার নাম করলে। আরও প্রশ্নে গ্রামের নাম। সব মিলে গেল।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "গ্রামে কি তোমাদের চলছিল না?"

শিবু স্নেহের স্পর্শ পেয়ে অকপটে সমস্ত বিবৃত করলে। বাবুলাল তখনই তাঁর দোকানে ওকে চাকরি দিলেন। ওর বাপ-মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাংলা মোটামুটি শিবু জানত। ওর ইংরিজী লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। কাজে-কর্মেও ক্রমশ নিজের অধ্যবসায় এবং সততার জোরে উন্নতি করতে লাগল। বাবুলালের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারও শ্রীবৃদ্ধি হল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করলে, "ও কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?"

"না।"

"তুমিও পরিচয় দাওনি?"

"না। সেটা ঠিক হত না।"

রাসমণিও সেটা বুঝলে। চুপ করে রইল।

হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সেই যে তোমার দোকানের একটি কর্মচারীর খুব ধুমধাম করে, ইংরিজী বাজনা বাজিয়ে বিয়ে দিলে, সে কি আমাদের শিবুর?"

"হ্যাঁ। সমাজ ওদের টিন বাজিয়ে তাড়িয়েছিল, আমি তার শোধ নিলাম। আর একবার নোব, তোমার বড় ছেলের বিয়ের সময়।"

বাবুলাল লহরে লহরে হাসতে লাগলেন।

রাত্তিরে শুতে এসে ঘরের ভেজানো দরজাটায় হাত দিয়েই চমকে উঠল নীলা।

দরজাটা এখন আর শুধু ভেজান নেই, ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। চমকে উঠেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে নীলার। কে? কে? বাড়িতে কেউ নেই, ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করল কে? কোন দুর্বৃত্ত কী মতলবে নীলার নিভৃত নির্জন শয়ন-মন্দিরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে বসে আছে?

চিন্তা বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, সন্দেহ নেই তাতে। নিমেষে মনের মধ্যে সহস্র চিন্তার ঝড় বয়।

সন্ধানী চোর! নিশ্চয় সন্ধানী চোর! জানে আজ রাত্রে নীলা বাড়িতে একা। তাই নীলার কোন অসতর্ক মুহূর্তে টুক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং একেবারে আশ্রয় নিয়েছে শোবার ঘরে। অবিশ্যি শোবার ঘর ছাড়া ঘর আর কই? নীলা এতক্ষণ যেখানে ছিল, যাকে রান্নাঘর বলা হয়, সে ত ঘর নয়, বারান্দার কোণ মাত্র! কিন্তু এখন নীলা কী করবে? এত কথা অবিশ্যি এক লহমাতেই ভাবা হয়ে গেল। ভাবল, চেঁচামেচি করা ঠিক নয়, তার চাইতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে—

ভাবলে কী হবে?

ততক্ষণে অভ্যাসগত প্রেরণা কণ্ঠের পথ দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা আর্ত প্রশ্নঃ "কে? কে ঘরের মধ্যে?"

স্বর আর্ত কিন্তু অস্ফুট!

ঘরের মধ্যে অবস্থিত লোকটা কি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল? তাই অমন অস্ফুট প্রশ্নটাও কানে পৌঁছল তার। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ততোধিক মৃদু-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "আমি! আমি নীলা, আমি!"

আমি! আমি কে? কার কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হল এই 'আমি'?

নীলা কি জেগে আছে? না শয়তান লোকটা নীলার বিভ্রান্তি ঘটাতে এই এক সর্বনেশে ফাঁদ পেতেছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই! কিন্তু তবু নীলা ছুটে চলে যেতে পারল না কেন? ওর পা দুটো কি কেউ পেরেক দিয়ে পুঁতে রেখেছে ওই বন্ধ দরজার সামনে?

দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে!

হাওয়ার শনশনানির মত শব্দ, "দোহাই নীলা, চেঁচিয়ে উঠ না। দোহাই দিও না আমার জীবনের শপথ!"

বোধ করি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ঘরের মধ্যে পা ফেলল নীলা, নিজের অজ্ঞাতসারেই দরজাটা ফের ভেজিয়ে দিল। বাড়িতে কেউ নেই, বাইরের দরজা বন্ধ, তবু এই সাবধানতা কেন কে জানে! তা সাবধানতা মানুষ সহজে ছাড়ে না, নইলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েও দুটো পাল্লার মাঝখানে চারটে আঙুল আটকান থাকল কেন নীলার? এ-ভাবনা দরকার হলে চট করে খুলে বেরিয়ে পড়বার!

লোকটা আর একবার মিনতি করে, "সব কথার আগে মিনতি করছি নীলা, ভুল বুঝে চেঁচামেচি কর না। অনেক দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি।"

"আলো জ্বালাব আমি!"

"নিঃসংশয় হতে চাও?" মৃদু একটু

হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে; "আলোটা জেলো না, দেওয়ালেরও চোখ আছে, জানো তা আমি জানলাম।"

ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাই-কাঠি, তার থেকে জ্বলল একটা মোম-বাতি। আর এগার বছর পরে নীলা প্রথম প্রশ্ন করল—কুশল প্রশ্ন নয়, দীর্ঘ বিরহ-কালের কোনো দুরবস্থার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন: কেন, "কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ?"

হয়ত সেটাই স্বাভাবিক। ভিতরে যখন আবেগ প্রবল ঝড় বইতে থাকে, তখনই সব চেয়ে মূল্যহীন কথা মুখে আসে।

নীলার আর নিজের মাঝখানে বাতিটা উঁচু করে ধরল লোকটা। বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "চিনতে পারছ, না কি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেছ?"

বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে নীলা বাতির আলো পড়া বিষণ্ণ সেই মুখটির দিকে। মাথা থেকে খসে পড়ল ওর [illegible] মুঠির [illegible], মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার প্রান্তভাগ, সাদা [illegible] ব্লাউসপরা বুকটা কাঁপতে লাগল [illegible] থরথর করে উঠল সর্বাঙ্গ।

[illegible] মিনিট, দেড় মিনিট, সহসা [illegible] পড়ল নীলা তার বুকের উপর, "[illegible] তুমি সত্যি ফিরে এলে?"

[illegible] বাতিটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। [illegible] কী। দুটি নরনারী যেন [illegible] ফিরে পেতে চায়, [illegible] এই [illegible] নীলা এগার বছরের ব্যবধান [illegible] যায় কি না।

"[illegible] আমাকে? [illegible]"

"[illegible] কী বলছ? কিন্তু [illegible] একটিবার আলো জ্বালতে দাও [illegible] শুধু একটি বার। বিশ্বাস করতে [illegible] তুমি এসেছ!"

"[illegible] ত আমারও করছে নীলা, [illegible] বড় ভয়, বড় ভয়! জানালাগুলো ভাল করে বন্ধ করে দাও আগে। একটুকু ফাঁক থাকে না যেন, এক বিন্দু আলোর রেখা বাইরে যায় না যেন।"

[illegible] জানালাগুলো একবার টেনে টেনে [illegible] ছিটকিনির শব্দ না করে আলো জ্বালায় নীলা, তার আরো একবার আপাদমস্তক [illegible] দেখতে থাকে কতটা পরিবর্তন [illegible] বিশ্বজিতের। খাটের উপর এসে বসে [illegible]। অকারণে একবার বিছানার [illegible] চাদরটার উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে [illegible] ভাবে প্রশ্ন করে, "এখানে শোও [illegible]?"

এও এক অর্থহীন প্রশ্ন।

নীলা খাটের পাশটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে, স্খলিত আঁচলটা তুলে জড় করে নিয়েছে বুকের উপর, কালো চুলের অরণ্যের মধ্যে পদচিহ্নরেখার মত সরু সিঁথিটা বিছানার চাদরখানার মতই শুভ্র।

মৃদু হাসির রেখা দেখা দেয় ওর মুখে; বলে, "তা শুই! এগার বছর কাল বিছানা ত্যাগ দিয়ে মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছি, এ-কথা বললে হয়ত ভাল শোনাত, কিন্তু সত্যিকথা হত না। জান ত, চিরদিন আমি সব কষ্ট সইতে পারি, পারি না খারাপ বিছানায় শুতে।"

"খুকু আর তুমি শোও?"

মুহূর্তে মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে নীলার; রূঢ় কণ্ঠে বলে "তা ছাড়া আর কী শুনতে চাও?"

থতমত খেয়ে যায় বিশ্বজিৎ, তাড়াতাড়ি বলে, "আমি কিছু ভেবে বলিনি নীলা, কিছু ভেবে বলিনি। শুধু কথা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই যা হক কিছু বলে ফেলেছি!"

কঠিন রেখা কোমল হয়ে আসে, কাছে সরে পড়ে নীলা রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "কথার সমুদ্র ভেতরে নিয়ে কথা খুঁজে পাচ্ছ না? তাই বটে! তাই বটে! আমিও ত এখনো জিজ্ঞেস করিনি এতদিন কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে! আর এমন করে এলে কী করে?"

তারপর উথলে ওঠে পূর্ণিমার জোয়ার!
কথা আর কথা!
অর্থহীন অন্তহীন থইহীন কথা!

"খুকু তোমার ছবিকে রোজ নমস্কার করে জান? সকালে খাবার সময় আর ঘুম থেকে উঠে। ছবিতে মালা পরায় তোমার জন্মদিনে, আর—"

"আর কী? কী বলতে গিয়ে থামলে নীলা? জন্মদিনে আর? মৃত্যুদিনে বুঝি? বুঝতে পেরেছি, তোমার সাজ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বেচারা খুকুকে পিতৃহীন করে রেখে দিয়েছ!"

বালিশের উপর লুটিয়ে পড়ে নীলা, কাঁপতে কাঁপতে বলে, "তা ছাড়া আর কী উপায় ছিল? বল, আর কী উপায় ছিল তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার? কী জবাব দিতাম আমি তার কাছে, যদি শাড়ি চুড়ি পরে ঘুরে বেড়াতাম, আর—"

"ঠিকই করেছ নীলা," বিশ্বজিৎ সস্নেহে ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলে, "ঠিকই করেছ। আমার মৃত্যু দিয়ে তুমি ওর কাছে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ! প্রকৃত ঘটনা জানলে আর যাই হক, বাপের ছবিতে ফুলের মালা পরাবার বাসনা খুকুর জাগত না। কিন্তু এখন কী করবে?"

"এখন?" নীলা বিহ্বলভাবে বলে "তুমি কি ওকে দেখা দেবে?"

"দেখা দেব! দেখা দেব কি না জিজ্ঞেস করছ?" অনুচ্চ একটু হেসে উঠে বিশ্ব-

নীলার বৈ
বাড়ির মধ্যে
আশ্রয় নিয়েছে
শোবার ঘর ছে
এতক্ষণ যেখা
হয়, সে ত ব
কিন্তু এখন

জিৎ বলে, "ঠিক করেছি এবার তোমাদের কাছেই থেকে যাব। আর এমন করে পালিয়ে বেড়াতে পারছি না। তোমাদের কাছে তাই এসে পড়লাম! স্বাস্থ্যটাও একেবারে ভেঙে গেছে।"

নীলা ম্লান দৃষ্টিতে একবার ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, "সে-অপরাধ স্বাস্থ্যের নয়। কিন্তু কিছু মনে কর না, একটা কথা বলছি, ওয়ারেণ্ট কি তুলে নিয়েছে?"

"তুলে? এ-জীবনে নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে।"

"তবে?"

"তা জানি না, ঠিক করেছি—যা থাকে কপালে। পরিচয়টা ঠিক করে ফেল। স্বামীর বন্ধু? দূর সম্পর্কের ভাই? যা হক। কলকাতা থেকে এত দূরে, এই ছোট্ট মফস্বল শহরটুকুতে কে আমাকে চিনে রেখেছে?"

"চিনে রাখবে!" নীলা ম্লান হেসে বলে, "ছোট্ট একটু মফস্বল শহর বলেই ত ভাবনা। সবাই যে সবাইয়ের তত্ত্বতল্লাস করে। বিধবা স্কুল-মাস্টারনীর একক ঘরে স্বামীর বন্ধুকে, অথবা দূর সম্পর্কের ভাইকে বাস করতে দেখলে কে উদাসীন থাকবে?"

"ওই ছুতো করে তাড়িয়ে দিতে চাইছ? খুনী আসামীর সঙ্গে ঘর করবার সাহস হচ্ছে না?"

"তা ত বলবেই!" নীলা একটা নিশ্বাস ফেলে।

"আচ্ছা নীলা, খুব সত্যি করে একটা কথা বলবে?"

"হ্যাঁ বলব! আর তুমি যা জিজ্ঞেস করবে জানি।"

"তা হলে বল। বল, জীবনে একদিনও কি তুমি আমাকে খুনী বলে ঘৃণা করনি?"

"না।"

"কিন্তু কেন করনি?"

"জানি, তুমি খুন করলেও, অন্যায় করনি।"

"নীলা, নীলা! শুধু এই জন্যে! শুধু এই জন্যেই এই ঘৃণিত পলাতক জীবনের, ছদ্মজীবনের, বোঝা বহন করে চলেছি, মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কিন্তু আর পারছি না পালিয়ে বেড়াতে। জীবনকে আমি আবার ফিরে পেতে চাই নীলা! যে জীবন ফুলস্পীডে চলতে চলতে হঠাৎ পাথর চাপা পড়ে থেমে গিয়েছিল, তাকে পাথর খুঁড়ে আবার উদ্ধার করে বাঁচাতে চাই। ফিরে পেতে চাই আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার সংসার।"

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, "কিন্তু পুলিশ?"

"সে-ভয়কে আমি জয় করেছি নীলা। অনেক দূরে পাহাড়ের কোলঘেঁষা এক দেশে বেঁচে উঠেছি আমি, সেখানে নিয়ে যাব তোমাদের!"

"আমাদের নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ, অবাক হচ্ছ কেন? এখানে থাকলে ত ভয় নিয়ে বাস! পুলিশের ভয়, লোক-নিন্দার ভয়, অনাহারের ভয়! সেখানে নির্ভয়ে তুমি, আমি, আর খুকু নতুন করে জন্মাব। কিন্তু খুকু আমায় চিনতে পারবে ত? তার কাছে ত আমাকে মরিয়ে রেখেছ?"

নীলা মৃদু হেসে বল্লে, "বল্লেই ত—'নতুন করে জন্মাবে'!"

রাত শেষ হয়ে আসে। নীলা বলে, "খুকীটা আজ রাতে বাড়ি নেই; এ ভগবানের আশীর্বাদ! নইলে—"

"নেই, সে-খবর জেনেই এসেছি নীলা।"

"ও, তাই বুঝি?" নীলা হেসে ওঠে, "একেবারে পাকা চোর!"

হাসির হাওয়া পালে এসে লেগেছে, তবু নিশ্চিন্ত শান্তি কই? সব কথা সব হাসির অন্তরালে ঢেউ উঠছে অস্বস্তির, দুর্ভাবনার! এ-রাত যদি কোনোদিন শেষ না হত!

অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না এই রাত্রি অনন্তকালের গায়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে না এই রুদ্ধদ্বার নির্জন ঘর?

কিন্তু তা হয় না! তা হবার নয়।

রাত্রি এক সময় শেষ হয়, খুলতে হয় রুদ্ধ কপাট।

"ও মা, মা গো মণি! তুমি গেলে না, কী মজা যে হল!" হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ঢোকে খুকু। শাড়ির আঁচল স্খলিত, আলগা করে বাঁধা বেণী উস্কোখুস্কো, বিপর্যস্ত। মুখে ক্লান্তি আর স্ফূর্তির অপূর্ব সমন্বয়। তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে, তবু ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল স্বরে বলে, "জান মা, মণ্টির বরের আমি না কি শাশুড়ী হলাম। বাসরঘরে কত যে গান হল! আমায় বলছিল গান গাইতে। আমি যেন গান গাইতে জানি!"

আপন খুশিতে উচ্ছল খুকু মায়ের ভাবান্তর তার নজরে পড়ে না।

তার তের-চোদ্দ বছরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এই বিবাহ-উৎসবের বৈচিত্র্য তুলেছে এক নতুন তরঙ্গ। পাড়ার সূত্রে মাসীমা, তাঁর নাতনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল মাতা-কন্যার। নীলা যায়নি। দুর্ভাগ্যের পরিচয়-লিপি অঙ্গে এঁটে উৎসব-গৃহে যেতে ইচ্ছে তার করে না। অনুরোধে পড়ে মেয়েকে পাঠিয়েছিল ঝিয়ের সঙ্গে। এবং খুকুর পক্ষে বেশী রাতে মাঠ পার হয়ে আসার চাইতে বরং বিবাহ-বাড়িতে থেকে যাওয়াই সমীচীন ভেবে রাতে আসতে বারণ করেছিল।

খুকুর জীবনে এ এক নতুন আস্বাদ!

একে ত উৎসবের খাতিরে ফ্রক ছেড়ে পরেছে মায়ের একখানা সিল্ক-শাড়ি, যে-শাড়ি সামলাতে অস্থির হয়ে গেলেও নিজেকে ভারিক্ক ভেবে ভারী ভাল লাগছিল! এক দিনেই যেন বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠেছে খুকু।

এতগুলো কথা বলার পর মার ভাবান্তর খুকুর চোখে পড়ে! একটিও কথা বললেন না মা! খুকুর এত বড় বিজয়-অভিযানের অন্তে মার এই নীরবতা কী অদ্ভুত, কী অস্বাভাবিক! ও, খুকু রাত্রে আসেনি বলে অভিমান হয়েছে বুঝি? তা ওর কী দোষ? মা নিজেই ত বলেছিলেন। কিন্তু খুকু তবুও চলে আসবে, মাকে একা থাকতে দেবে না, এই ভেবেছিলেন বুঝি?

আপন মনে প্রশ্নোত্তর! তবু অভিমানে চোখে জল এসে পড়ে।

"মা, রাগ করেছ?"

"রাগ? রাগ করব কেন?"

"তবে কথা বলছ না কেন?"

"বলছি ত!"

"ওই ত, ওই রকম করে বলছ! নিশ্চয় রাগ করেছ! সত্যি মা, তোমার একলা থাকতে খুব খারাপ লেগেছে, না?"

নীলা এবার যেন আত্মস্থ হয়, নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসে, "একা ত থাকিনি! একা থাকতে হয়নি! রাত্রে একজন এসেছিলেন!"

"রাত্রে এসেছিলেন! কে এসেছিলেন মা?"

উৎসুক প্রশ্ন করে খুকু, "লাবণ্য পিসি বুঝি?"

"না!"

"না? তবে কে মা?"

"তুমি চেন না, আমাদের খুব নিকটজন!"

"ইস! খুব নিকটজন, আর আমি চিনি না! চালাকি করা হচ্ছে, নিশ্চয় লাবণ্য পিসি!"

খুকুর জ্ঞানে ওই একটি মানুষকেই কদাচ-কখন আসতে দেখেছে খুকু। নইলে রেলস্তাত্ম
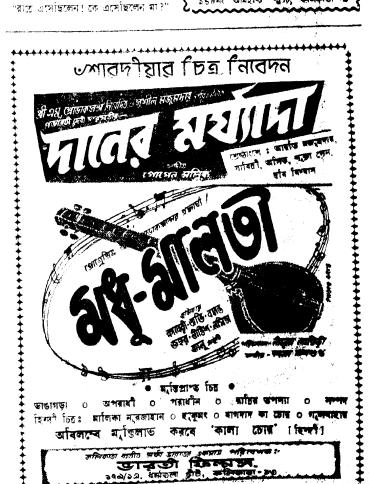
দিয়ে নীলাকে দেখতে আসবে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে নীলা এত দামী নয়। লাবণ্য পিসি সত্য করে আত্মীয় নয়, তাই। তিনিই নীলার ছিন্ন ভিন্ন ছন্নছাড়া জীবনটাকে কুড়িয়ে তুলে নিয়ে অনেক চেষ্টায় কোনো রকমে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টাতেই মফস্বলের এক সেলাই-স্কুলের এই সামান্য চাকরিটুকু নীলার। তাঁর চেষ্টাতেই এই কোয়ার্টার্সটুকু।

কখনো-সখনো তিনিই এসে দু-চারদিন থেকে যান।

নীলা মাথা নেড়ে বলে, "বললাম ত লাবণ্যদি নয়।"

"তাহলে বল কে?"

"বলব পরে; তুমি আগে মুখ হাত ধোও!"

"উঃ, একটা কথা বলতে অত ভূমিকা করছ কেন মা? যাচ্ছি আমি, দেখে আসছি—"

শোবার ঘরের দিকেই অগ্রসর হয় খুকু। আগন্তুককে অবশ্য মহিলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে।

নীলা ওর শাড়ির কোণটা ধরে ফেলে। বলে, "একখুনি যেও না, আগে শোন কে তিনি।"

খুকু হতাশ ভাবে বলে, "নাঃ, তুমি আজ একেবারে রহস্য-রোমাঞ্চ।"

ধপ্ করে বসে পড়ে সে আবার।

নীলা যেন খেই পায় না, কোন দিক থেকে শুরু করবে কথাটা! এত সহসা কেমন করে বলবে, 'জ্ঞান অবধি তুমি যাকে মৃত বলে জান, সেই ব্যক্তি সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে তোমার মায়ের শয্যার একাংশে।' তা ছাড়া তাতে আশঙ্কা ঢের।

তাই ইতস্তত করে বলে, "শোন, তুমি তাঁকে ছেলেবেলায় দেখেছ, কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, তবে আপাতত শুনে রাখ, উনি আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। তোমার বাবাকে জানতেন উনি।"

"বেটাছেলে!" অসতর্কে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায় খুকুর।

নীলার মুখটা লাল হয়ে যায়। ও শুধু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

খুকু নির্বাক!

"নাও, এখন মুখটুখ ধোও। উনি ঘুমোচ্ছেন, উঠলে প্রণাম করবে।"

"এই যে খুকু!" বিশ্বজিতের কাছে সহাস্যে পরিচয় করিয়ে দেয় নীলা, "দেখুন কত বড় হয়ে গেছে। প্রণাম কর খুকু!"

গত রাত্রেই একরকম ঠিক করে রেখেছিল ওরা, চট করে পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না খুকুর কাছে। কারণ, ছেলেমানুষের বুদ্ধি, হয়ত এখুনি কার কাছে গল্প করে বসবে, আর কোন ফাঁক দিয়ে আসবে বিপদ। তার চাইতে বিদেশে চলে গিয়ে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে তবে বলবে। তাই এই 'আপনি' সম্বোধনের ছল।

বিশ্বজিৎ সস্নেহ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "এখনো ওর নাম শুধু খুকু?"

"নাঃ তা কেন? পোশাকী নাম ত একটা আছে। মধুমিতা। ভাতের সময় যে নাম হয়েছিল।" বলেই থেমে যায় নীলা। খুকু
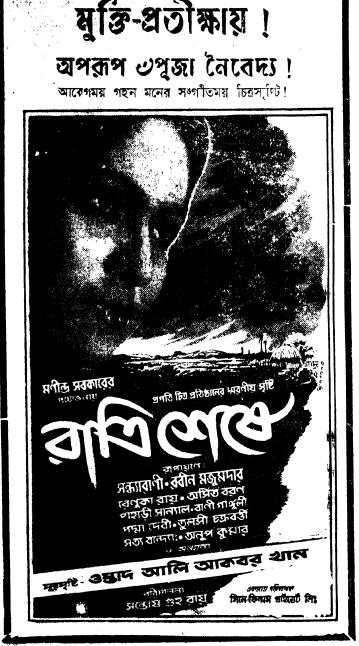
কিন্তু মায়ের নির্দেশে প্রণাম করে না, কেমন এক অনমনীয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

একন্তই তাদের মায়ে-ঝিয়ের ঘরের মধ্যে, নিতান্ত শুচিস্নিগ্ধ বিছানায়, এই লোকটাকে বসে থাকতে দেখে তার মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

"কই রে খুকু, প্রণাম কর। কী বোকা মেয়ে রে তুই?"

মেয়ের অভদ্রতার ত্রুটিটুকু সামলে নিতে চেষ্টা করে নীলা।

গজখানেক দূরে থেকে প্রণামের মত একটা ভঙ্গি করে খুকু।

মেয়ে দেখে বিশ্বজিৎ যেন হতাশ হয়ে যায়।

কিন্তু কেন? ওর কি বাস্তব বুদ্ধি ছিল না? আড়াই বছরের মেয়েকে রেখে এগার বছর পরে ঘরে এলে, সে কি সেই মূর্তি নিয়েই ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে? সে কি জানবে তোমার চিত্ত কত তৃষিত হয়ে আছে সেই কচি কোমল স্পর্শটির আশায়?

নাকখ্যাদা ভুরুবিহীন তুলোর পুতুলের মত সেই অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে বুঝে ফেলে যেন শোকাহত হয়ে গেছে বিশ্বজিৎ।

"কোন ক্লাশে পড়?"

খুকু নীরব।

নীলা তাড়াতাড়ি বলে, "কই বল? বল কোন ক্লাশে পড়িস!"

তথাপি নীরবতা অব্যাহত থাকে।

"লজ্জায় পড়ে গেছে," খুকুর মাথা ডিঙিয়ে বিশ্বজিতের চোখে চোখে একটু ইশারা করে বলে নীলা, "কোন ছেলেবেলায় দেখেছে আপনাকে, মনে ত নেই?"

কিন্তু মাথা ডিঙোতে পারলেই কি নেপথ্য ডিঙনো যায়? সামনের আর্শিটার দিকেই যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল খুকু, পিছন থেকে এ-কথা কেমন করে জানবে নীলা? আর্শিতে দেখা মায়ের হাস্যোৎফুল্ল মুখখানা যে তাকে ক্রমশই কঠিন করে তুলছিল, তা-ই বা বুঝবে কেমন করে?

মায়ের এমন মুখ কবে দেখেছে খুকু?

তার বিষণ্ণ মূর্তিটাই প্রধান। অবিশ্যি কারণে-অকারণে হাসে না কি আর? উচ্ছ্বসিত হাসিও হাসতে দেখেছে বৈ কি, কত সময় দেখেছে। কিন্তু না হেসেও এমন আলো ঠিকরে পড়া মুখে তাকাতে দেখেছে কবে?

নীরবতাটা অস্বস্তিকর।

বিশ্বজিৎ আবার বলে, "কই বললে না ত কোন ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস নাইন-এ।"

ক্লাস নাইন। রীতিমত বড় মেয়ে! আর একবার আহত হয় বিশ্বজিৎ। ওর মনে হয় কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে ওর। যেন যে-ব্যাংকে ওর আজীবনের সঞ্চয় গচ্ছিত ছিল, হঠাৎ সেই ব্যাংকটা ফেল হওয়ার খবর পেয়েছে সে!

কোন ক্লাশে পড়?

কথা এগোয় না।

"আমি যাই," বলে এক সময় চলে যায় খুকু।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয় নীলাকে।

বিলাসী বলে, "যা হক তবু নিরুদ্দিশ রাজার স্মরণ হয়েছে, ভেয়েরা মাকে নিতে পাঠিয়েছে। ইনিও কি তোমার আপন ভাই মা?"

নীলা গম্ভীরভাবে বলে, "আপন ভাই আমি কোথায় পাব বিলাসী? আপন ভাই কি আমার আছে? তাকে ত ভগবান অনেক দিনই নিয়েছেন।"

"কিছু মনে কোরোনি মা! এমনি শুধোচ্ছিলাম!" বিলাসী অপ্রস্তুত হয়ে বলে. "ক' দিনের জন্যে যাচ্ছ?"

"দেখি! দু-দশদিন হবে হয়ত!"

"দেরি কোরোনি মা!" বলে বিলাসী স্কুলের কাজে চলে যায়।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়ে নিয়ে আসা তার আসল কাজ। সকাল-সন্ধ্যা নীলার কাজ করে।

নীলা রান্না করে পরিপাটি করে, তবু হাতে পায়ে মনে যেন অভিসারিকার চাঞ্চল্য। প্রতীক্ষা করে খুকু কতক্ষণে স্কুলে যাবে। নিজে আজ আর যাবে না সে। চলে যেতে হবে এখান থেকে, কত দিনের বিরহ-নিশ্বাস-রুদ্ধ ঘরখানা একদিনের জন্য মিলনের সৌরভে প্রাণ পাক। রাত্রে ত খুকু আছে, আছে অনেক সমস্যা।

নিঃশব্দে ভাত খেয়ে নিঃশব্দেই বই-খাতা

গুছিয়ে বেরিয়ে গেল খুকু। নীলা আড়ে আড়ে ওর জলদগম্ভীর মুখখানা দেখছিল। বুঝেছে ব্যাপারটা খুকুর বিশেষ পছন্দ হয়নি। না-হবারই কথা! আহা! এই দণ্ডে যদি সত্যি কথাটা বলা যেত!

কী ভয়ানক খুশী হত খুকু!

কী ভয়ানকভাবে চমকে যেত। চমকে গিয়ে কী রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। নাকি সহজে বহন করতে পারত না সেই প্রচণ্ড আনন্দের ভার! তাহলে হয়ত এই-ই ভাল।

মেয়ে চলে গেলে পারিপাটি করে স্বামীকে খাওয়াল নীলা, বিশ্বজিতের অনেক অনুরোধেও একত্র খেতে বসল না, বসল পরে। অনুরোধ রাখল—অশনে নয়, বসনে। নরুনপাড় ধুতিখানা ছেড়ে পরল পুরনো দিনের একখানা ঢাকাই শাড়ি, চিকনের কাজ করা ব্লাউস। শেষ বিবাহ-বার্ষিকীর দিন যে-শাড়িজামা উপহার দিয়েছিল বিশ্বজিৎ। সিঁথেয় সিঁদুর দিতে ভয় করে, খুকু আসার আগেই ত ছেড়ে ফেলতে হবে এই বাসর-সজ্জা। অনেক দিনের অনভ্যস্ত হাতে কপালে আঁকল ছোট্ট একটু সিঁদুর-টিপ!

বাইরের দরজায় ভাল করে খিল এঁটে এসেও স্বস্তি হয় না, ঘরের দরজা-জানালা আঁটতে হয়।, কে কোন দিক থেকে দেখে ফেলবে, কে জানে। সাবধানের মার নেই।

কোথা দিয়ে কেটে গেল অত বড় দুপুরটা, কখন বেলা গেল গড়িয়ে। গত-কালকের সারারাত্রিব্যাপী অনিদ্রার শোধ নিতে বেলা তিনটের সময় যে নিদ্রা এসে মায়াকাজল বুলিয়ে দেবে চোখে, তা-ই বা কে ভেবেছিল?

প্রচণ্ড একটা দোর ঠেলার শব্দে তন্দ্রা-জগৎ থেকে ছিটকে এসে পড়ল নীলা, আর ধড়মড় করে ছুটে চলে গেল দরজা খুলতে।

কপালের সিঁদুর-টিপটা যে লেপে গেছে সারা কপালে, আর পরনে আছে ঢাকাই শাড়ি আর চিকন-কাজ-করা ব্লাউস, একথা ভুলেই গেল! এত অসহিষ্ণু করাঘাত কার? খুকুর? কই এরকম ত কোন দিন—?

নীলা ভুলে যায় এ-রকম দিনই বা এসেছে কবে? নীলা নিজের সেলাই-স্কুল ফেরত খুকুর স্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! খুকুর আগে হলে, সে আসে সেলাই স্কুলের দরজায়!

খিল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে ঠেলে দরজাটা হাট করে দিয়ে খুকু অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে, "কী, হয়েছিল কী?"

পরক্ষণেই মায়ের দিকে তাকিয়ে পাথর!

শাড়ির পাড়ের কথা প্রথমটা মনে পড়েনি নীলার, থতমত খেয়ে বলে, "খুব বুঝি ডেকেছিস? হঠাৎ কী রকম ঘুমিয়ে—"

পরক্ষণে সেও পাথর হয়ে যায় মেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে! এ কী সর্বনেশে ভুল করে বসল সে!

হাতের বইগুলো রান্নাঘরের দাওয়ায়

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে উঠে গেল খুকু ছাতে! একতলা এই বাড়িটুকুর যা পরম সম্পদ। হাত দেড়েক লম্বা চিলে-কোঠাও আছে কি না একটা!

ছাতটা ন্যাড়া ছাত বলে মেয়েকে একা বড় উঠতে দেয় না নীলা। তা ছাড়া এখন ত পড়ন্ত বেলার কড়া রোদ্দুর! কিন্তু নিষেধ করবার সাহস হয় না নীলার!

খুকুর মনে কি শুধুই অপছন্দের বিরক্তি?

না কি সন্দেহ জেগেছে মনে? জগতের সব চেয়ে কুটিল সন্দেহ?

নাঃ, দেরি করে দরকার নেই, আজ রাত্রেই সত্যি কথাটা ওকে বলে দিতে হবে।

চিলেকোঠা থেকে নামান গেল না খুকুকে, ওর নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে।

নীচে এসে বিপন্নমুখে বলে নীলা, "খুকুটা ত মুশকিল বাধাল।"

বিশ্বজিৎ ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, "তাই দেখছি! বেশ ছিলে তোমরা, আমিই এসে মুশকিল বাধালাম!"

"আঃ! কী যে বল! শোন, আমি ভাবছি ওকে জানিয়ে দেওয়াই হক, নইলে যাবার সময় গোলমাল বাধাতে পারে!"

"বেশ, শুধু—"

"কী শুধু?"

"নাঃ! হঠাৎ মনে হল, আকাশের স্বপ্ন মাটিতে আছড়ে ভেঙে পড়বে না ত? কেমন যেন আতংক হচ্ছে।"

"ও-কথা কেন? এখনো তুমি তেমনি কবি-কবি আছ। উঃ!"

কিন্তু সত্যি কথাটা কীভাবে জানিয়ে দেওয়া যাবে?

খুকুর মুখে চোখে, বোধ করি সর্বাঙ্গের রেখায় রেখায়, সন্দেহ আর বিদ্রোহ যেন নীলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। রাত কেটে গেল খুকুর চিলে-কোঠার ঘরে। অগত্যা নীলারও কাটল খোলা ছাতে মাদুর পেতে শুয়ে। আর রীতিমত শঙ্কিত হল নীলা, পরদিন যখন সেই ঢাকাই শাড়িখানা পাট করে তুলে রাখতে এসে দেখল সেটাকে কে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কেটে ফালিফালি করে রেখেছে!

পরিবেশ সৃষ্টি করবার অবকাশ আর নেই! অবকাশ নেই রইয়ে সইয়ে বলবার। বিশ্বজিৎ বলেছে এখানে থাকবার সাহস ওর আর নেই, আজ রাত্রেই রওনা দিতে হবে। অতএব আচমকাই বলতে হবে!

"খুকু, আজ আর স্কুলে যাসনি।"

"কী হয়েছে?" ভুরু কুঁচকে তাকাল খুকু!

"বলছি আজ আর স্কুলে যাসনি, অনেক কথা আছে, আছে অনেক কাজ।"

"আমার সঙ্গে কারুর কোন কথা নেই, কোন কাজও নেই।"

কৈশোর ছাড়িয়ে খুকু কি যৌবনে পৌঁছল সহসা?

"আছে কথা, আছে কাজ!" নীলা ধমকের ভান করে, "আজ রাত্রের গাড়িতে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে—"

খুকু সহসা মুখ ফিরিয়ে ঠিকরে ওঠে। দুই চোখে জ্বলে ওঠে সন্দেহ ব্যঙ্গ আর ঘৃণার আগুন!

"তোমার যেতে ইচ্ছে হয়, তুমি যাও গে, আমি কী করতে যাব?"

"কী? কী বললি?.. বল কী বললি?"

উদ্ধত স্বরে খুকু বলে, "আমি যাব না!"

"রাগ করছিস কেন খুকু, কান পেতে শোন না আমার কথাটা! কাছে আয়।"

"এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি, বল না কী বলবে?"

"যাকে দেখে অত রাগ করছিস, যার সঙ্গে যেতে চাইছিস না, সে কে জানিস?"

"জানি না! জানতে চাই না!" বলে খুকু জুতোর পা গলায়।

"শোন খুকু, চলে যাসনি! ও আমাদের সব চেয়ে আপনার লোক ও তোর—"

"ককখনো না!" ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত ফুঁসে ওঠে তের বছরের খুকু, "ককখনো না! ও আমাদের কেউ না! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না! তুমি মিথ্যে কথা বলবে, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে! বিলাসীর মত বোকা নই আমি "

বইখাতাগুলো উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় খুকু' আর স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে নীলা খোলা দরজার দিকে! উত্তপ্ত নিশ্বাসে কান মাথা আগুন হয়ে আসে সমস্ত শরীর থরথর করতে থাকে।

বিশ্বজিৎ এত কথার কিছুই জানে না। গা ঢাকা' দেবার পক্ষে সুবিধাজনক ভেবে চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়েছে সে সকাল বেলাটা!

সহরের পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ সর্বজনবিদিত, মফস্বলের পুলিশ চৌকিদাররা ত দারুব্রহ্ম, তব, দারুব্রহ্মেরও টনক নড়ে। বালিকা একটা মেয়ে যদি দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসে, আর সে মেয়েটা যদি ওদের চেনা জানা হয়। স্কুলে যাবার পথে থানা। যেতে আসতে দু'বেলা ওর কোল মাড়িয়ে হাঁটতে হয় খুকুকে। ছেলেবেলায় কত আদর করেছে ওই বুড়ো চৌকিদারটা! হ্যাঁ, সেই মেয়ে যদি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে বলে "আমাদের বাড়িতে একটা বদমাস লোক ঢুকে পড়েছে, আমার মা একা আছেন, শিগগির চল তোমরা—" তখন একটু নড়াচড়া করতে হয় বৈ কি! আর সত্যি, যুদ্ধ দাঙ্গা সব কিছু মিটে যাবার পর বড্ড বেশী মিইয়ে গেছে তাদের কাজকর্ম, তবু একটা খোরাক জুটল! একা একজন মহিলার বাড়িতে বদমাস লোক ঢুকে পড়ার ফয়সলা করার মত পছন্দসই খোরাক!

খুকু আর উদ্‌ভ্রান্ত নেই! আত্মস্থ হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। হ্যাঁ, মাকে রক্ষা করতে হবে তাকে। এ-দায়িত্ব খুকুরই।

কিছুতেই মাকে উচ্ছন্ন যেতে দেবে না সে।

"কে? কে?"

চমকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল নীলা, উঠোনে গোটা তিন-চার লাঠিধারী পাহারাওলা, আর রক্তমুখী খুকু!

"কোথায়! ডাকু বদমাস কোথা?"

খুকু নিঃশব্দে চিলে কোঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় শাণিত ছুরির নির্মম দৃষ্টি নিয়ে!

মফস্বলের নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদটা পাঠায় ধীরে সুস্থে সে-খবর সহরের খবরের কাগজে ছাপা হয় আরো ধীরে সুস্থে। 'অমুক জেলা'র নানা সংবাদের মধ্যে ছাপা হয় এক "চাঞ্চল্যকর সংবাদ" "দিবা দ্বিপ্রহরে জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর উপর দুর্বৃত্তের আক্রমণ। বালিকা কন্যার প্রত্যুৎপন্নমতিকে জননীর সম্ভ্রমরক্ষা। অতঃপর পুলিশের কৃতিত্বের একটি জোরালো কাহিনী বর্ণনার পর ... হয়, "জানা যায় উক্ত দুর্বৃত্ত একজন পলাতক খুনী আসামী, পুলিশ ... হইতে তাহার সন্ধান করিতেছিল।"

এর থেকে বেশী কথা সংবাদপত্রে ... না!

এর পরের ... কাহিনীকারের কিন্তু ... আছেই ... নীলা ... সাদা ... উপর ... সেলাই-স্কুলে ... এখনো ... স্কুলের ... নিয়ে পাড়ায় যে হাসাহাসি, ... সমালোচনা চলেছিল, সেও ... গেছে!

সত্যি কথাটা আজ পর্যন্ত ... বলা হয়ে ওঠেনি নীলার। কিন্তু—... লাভই বা কী? বিশ্বাস করাতে না পারলে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে মায়ের উপর ঘৃণা আরো বাড়বে খুকুর। বিশ্বাস ... পারলে বাপের উপর জন্মাবে ঘৃণা! তা হলে ও-বেচারারই বা আশ্রয় কোথা?

চির-আশ্রয়টা ত ধসেই গেছে। মায়ের ... র খুকুর মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে এক ... পরের প্রাচীর।

হয়ত এমনি করেই জগতের অনেক সত্যি কথা মিথ্যার জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে থাকে, এমনি দ্বিধার জন্যই অনেক সত্যকথা অনুক্ত থেকে যায়! মানুষের হাতে প্রতিকার নেই, তাই তারা শুধু আর-একটু রোগা হয়ে যায়, আর-একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়ে।

॥ আজব জীব টারজিয়ার ॥

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দশাবতার স্তোত্রে আমরা দেখি, শ্রীভগবান মীন, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ ইত্যাদি রূপ পরিগ্রহ করার পর পূর্ণাঙ্গ নররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। জীব-বিবর্তনের ইতিবৃত্তেও তেমনি দেখা যায়, এককোষী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে ক্রমোন্নত প্রাণীর আবির্ভাব হতে হতে শেষ পর্যায়ে বানর এবং সর্বশেষে মানুষের হয় আবির্ভাব। বিবর্তনের শেষ ধাপে বানর থেকে সরাসরি মানুষের উদ্ভব হয়েছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, তবে নর ও বানরের সম্বন্ধ যে অতি নিকট, তা অনায়াসে বলা যায়।

পৃথিবীতে মানুষ যেমন নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের দেখা যায়, বানরজাতীয় প্রাণীও তেমনি দেখা যায় নানা প্রকারের। গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, গিবন, লমুর, টারজিয়ার—সবই বানরজাতীয় প্রাণী, কিন্তু আকৃতিগত পার্থক্য তাদের প্রচুর। এদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত আকৃতি হচ্ছে টারজিয়ারের।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পাঁচ কোটি বছর বা তারও আগে টারজিয়ারের আদি পুরুষেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পৃথিবীর বুকে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু টারজিয়ারের আকৃতি আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে তার পূর্ব-পুরুষদের মত। টারজিয়ার সম্পর্কে এটাই হল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কথা।

পাঁচ কোটি বছর আগে যে প্রাণীর আবির্ভাব, তার আদিম নিবাস কোথায় ছিল তা আজ সঠিক বলা মুশকিল। বর্তমানে এদের দেখতে পাওয়া যায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিণ্ডানো অঞ্চলে। সমুদ্র-উপকূলে ও অধিত্যকায় জঙ্গলের মধ্যে এরা সচরাচর বসবাস করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের এক অদ্ভুত নামে অভিহিত করে থাকে। সে-নামটি হল 'পর্বতের প্রাচীন মানুষ' (ওল্ড ম্যান অব দি মাউণ্টেন্স)।

নামটি যেমন বিচিত্র, টারজিয়ারের চেহারাও তেমনি অতি বিচিত্র। দেহ মাত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু লেজ হচ্ছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ১০ ইঞ্চি। লেজটা দেখতে অনেকটা ইঁদুরের লেজের মত। দেহসংলগ্ন ২ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ বেশ লম্ব, বাকী অংশ নমনীয়। কান দুটো তেমন লম্বা নয়, তবে একটু অদ্ভুত ধরনের। পুরু চামড়া দিয়ে গঠিত ও খাঁজকাটা। টারজিয়ার তাই ইচ্ছা-মাফিক কান মুড়তে ও মেলতে পারে।

টারজিয়ারের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে তার চোখ দুটো। ৫ ইঞ্চি পরিমাণ দেহে এক প্রাণী তার চোখ আবার কত বড় হবে? কিন্তু দেহের তুলনায় টারজিয়ারের চোখ দুটো বেশ বড়ই। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে টারজিয়ার যখন তাকায়, তখন তার বিচিত্র [illegible] দেখে মন মজে যায়। কিন্তু আমরা যেমন মাথা না ঘুরিয়েও এদিকে-ওদিকে চোখ ফেরাতে পারি, টারজিয়ার তেমন পারে না। চক্ষু-কোটরে চোখ দুটো এত সামান্যই ঘোরানো-ফেরানো যায় যে, অল্প কয়েক ইঞ্চি ডানে বা বামে অবস্থিত কোনো কিছু দেখতে হলে টারজিয়ারকে মাথা ঘুরিয়ে তা দেখতে হয়। টারজিয়ারের হাত-পায়ের আঙুলগুলোও কম অদ্ভুত নয়। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যেন মানুষের আঙুল দেখছি। প্রত্যেক পায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙুলে লম্বা

বিচিত্র প্রাণী টারজিয়ার। চোখ দুটি লক্ষণীয়

ধারালো নখ আছে, অন্যান্য আঙুলের নখগুলো ভোঁতা, লম্বা বা ধারালো নয়। টারজিয়ারের সারা দেহ ছোট ছোট নরম লোম দিয়ে আচ্ছাদিত। গায়ের রঙ পাঁশুটে, তবে মাঝে মাঝে গেরুয়া ও লালচে বাদামী রঙের ছিট-ছিট দেখা যায়।

টারজিয়ার নিশাচর প্রাণী, দিনের বেলায় সাধারণত বার হয় না। ঝোপঝাড়ের মধ্যে লম্বা লেজ দিয়ে কোনো গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে এরা ঝুলে থাকে। রাত্রি সমাগম হলে বাসা থেকে বেরিয়ে খাদ্যের সন্ধানে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। ৬ ফুট ব্যবধানে এরা শূন্যে বিহার করতে পারে। এদের শূন্যবিহারের ভঙ্গিমাটি অপরূপ। শূন্যে বিহারের সময় এরা হাত-পা প্রথমে গুটিয়ে নেয়, কান দুটো পুরো মেলে দেয় এবং পিছন দিকে লেজটা একেবারে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দেয়। অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে লেজটা উপরের দিকে বেঁকিয়ে নেয় এবং পিছনের লম্বা পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে অবতরণ-ক্ষেত্র প্রথম স্পর্শ করে। লাফিয়ে পড়ার ধাক্কাটা এইভাবেই তারা সামলে নেয়।

টারজিয়ার আমিষভোজী প্রাণী। পোকা-মাকড়, ফড়িং, টিকটিকি, ইঁদুর ইত্যাদি তার খাদ্য। ক্ষুদে প্রাণী বটে, কিন্তু এদের ভোজনের বহর নিতান্ত কম নয়। প্রত্যহ তিনটে বড় টিকটিকি ও দশটা বড় পোকা পেটে পড়লে তবে এদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়।

টারজিয়ারের শিকার ধরার কৌশলটি অভিনব। কয়েক ফুট দূরে কোনো গাছের ডালে কোনো পোকা হয়ত ক্ষীণ আওয়াজ করে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। টারজিয়ারের কানে সে-আওয়াজ এসে পৌঁছতে বেশী দেরি লাগে না। আওয়াজ শুনে পেঁচার মত আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে সে খুঁজতে শুরু করে কোথায় তার শিকার রয়েছে। সামনে পিছনে কান দুটো দুলিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই পোকাটিকে সে আবিষ্কার করে ফেলে। বড় চোখ দুটো যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করে অন্ধকারের মধ্যেও সে পোকার সামান্য একটু নড়নচড়ন বুঝতে পারে। তারপর তাক বুঝে চোখের পলকে পোকাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পোকাটাকে ধরেই একেবারে মুখে পুরে দেয় এবং সুচের মত তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কয়েকটা কামড়ে টুকরো টুকরো করে দ্রুত উদরসাৎ করে ফেলে।

আলো ও আগুনের প্রতি টারজিয়ারের একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়। তার এই আলোকপ্রীতির সুযোগ গ্রহণ করে মিণ্ডানো অধিবাসীরা টারজিয়ার ধরে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করে (দুষ্প্রাপ্য প্রাণী বলে প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে টারজিয়ারের বিশেষ দাম আছে)। টারজিয়ার শিকারীরা করে কী, বর্ষাকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন উঁচু পাহাড়ে (যেখানে টারজিয়ারদের আবাসস্থল) আগুন জেলে কয়েক গজ দূরে লুকিয়ে বসে থাকে। অল্পক্ষণ পরে দেখা যায়, আগুনের তাপ উপভোগের জন্যে টারজিয়ারের দল ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে অগ্নিকুণ্ডের ধারে এসে জড় হয়েছে। সুযোগ বুঝে শিকারীরা তাদের ধরে খাঁচায় পুরে ফেলে।

টারজিয়ারের দেহ থেকে একটা তীব্র বোটকা গন্ধ বেরয়। বাতাসে এই উগ্র গন্ধের আভাস পেয়ে তাদের আবাসস্থল খুঁজে বার করা যায়। ভীতসন্ত্রস্ত হলে টারজিয়ার উচ্চকণ্ঠে কর্কশ আওয়াজ করে, তা না হলে শান্ত অবস্থায় তার কণ্ঠস্বর পাখির মত মিষ্টি।

টারজিয়ারের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত প্রেমময় বলে শোনা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-টারজিয়াররা কখনও এক সঙ্গে থাকতে পারে না, একসঙ্গে হলেই তাদের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেধে যায়। কিন্তু স্ত্রী-টারজিয়ারকে নিয়ে টারজিয়ার-পতি বনের মধ্যে প্রায়ই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মিন্ডানো অধিবাসীদের কাছ থেকে শোনা যায়, টারজিয়ারের দাম্পত্যপ্রেম এত গভীর যে, টারজিয়ার-যুগলের মধ্যে কোনো একটি যখন মারা যায়, অপরটি তখন মৃতের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সারাদিন বসে থাকে। এদের সম্পর্কে আর একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রচলিত আছে। সন্তান-প্রসবকালে গর্ভবতী স্ত্রীকে টারজিয়ার-পতি নাকি ওষুধ দেয় যাতে সহজে প্রসব সম্পন্ন হয়। শুধু তা-ই নয়, প্রসবের সঙ্কট মুহূর্তে উপস্থিত হলে সে নাকি স্ত্রীর জঠর নিজ হস্তে ধারণ করে তার গর্ভমোচনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে থাকে।
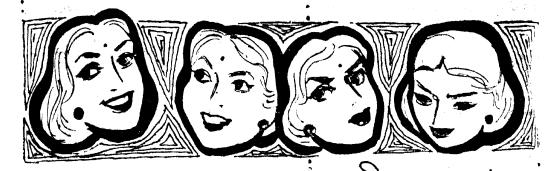
চার শিল্পী

সুশীল রায়

কেবারে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে আছি, এমন সময় চারটে চঞ্চল চড়ুইপাখির মত এসে ঢুকল ওরা চারজন।

চারজনের চোখে চার রকমের দৃষ্টি, মুখে চার রকমের কথা। সদালাপী সহজ সরল চারটি মেয়ে। খুব সপ্রতিভ, আর খুব অমায়িক। আন্তরিকভাবেই নানা রকম কথা বলতে লাগল। কিন্তু এতটা অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলাম যে, উত্তর দিতে থতমত খেয়ে যাচ্ছিলাম।

বেলা প্রায় বারটা নাগাদ ট্রেন থেকে নেমেছি। সঙ্গে দুটো মোটা বেডিং ছাড়াও টুকরি ঝুড়ি মিলিয়ে সতেরটা বোঝা। ছাব্বিশ ঘণ্টা ট্রেনের ধকল সহ্য করা আর তার সঙ্গে এতগুলো মালপত্রের হিসেব রাখায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নড়া-চড়ার আর সাধ্য ছিল না।

স্টেশনে নেমে হেনাকে বললাম, "পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়—এই নাও তোমার পাহাড়। আমার এবার ছুটি। এই হাঙ্গামার জার্নি, এ কি কোনো ভদ্রলোকের পোষায়?"

কটাক্ষে একটু হাসি নিক্ষেপ করে হেনা বলল, "তোমার ত বেশ পোষাল দেখলাম।"

বললাম, "তোমাদের হাতে পড়ে ভদ্রাভদ্র ভেদ ঘুচে গেছে একেবারে। যাক, চল, কুলী ডাক।"

কুলী ডাকতে হল না। কুলী-কামিনরা এসে ঘিরে দাঁড়াল।

আমরা যাব পাঙ্খাবাড়ি রোডে, যেখানে গিয়ে উঠব ঠিক করে এসেছি, সে-বাড়ির নাম "দি ক্লাউড।" বাড়ির মালিক আমার বন্ধুর বন্ধু, নাম হরেকৃষ্ণ চাকী। কেয়ার-টেকারের নামে তাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি। শুনে এসেছি, তাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আর-এক দল নাকি আগে এসে গেছে। কিন্তু অসুবিধে হবে না কিছু। বাড়ি বড়, অনেকগুলি ঘর। তা ছাড়া, মেন বিল্ডিঙের পাশেই পাঁচ ফুট আন্দাজ নীচে হরেকৃষ্ণবাবুরই একটা গেস্ট হাউস আছে—খুশী হলে আমরা সেখানেও উঠতে পারি।

কুলীদের ঠিকানা দিয়ে দিলাম। ওরা মালপত্র নিয়ে আগে আগে হাঁটতে লাগল, আমরা দুজন পিছনে।

বললাম, "লোকে হাসবে নিশ্চয়।"

হেনা বলে উঠল, "কেন?"

"এই মালের বহর দেখে।"

"হাসুক। বিদেশ-বিভুঁই, কোথায় কী পাব না-পাব ঠিক নেই, সব নিয়ে এসেছি, তেল-নুন থেকে আরম্ভ করে চা-চিনি পর্যন্ত। তার উপর শীতের জায়গা, বিছানা বালিশ কম্বলও ত আনতে হয়েছে।"

পাঁচটা মেয়ে-কুলী চলেছে আঠারো উনিশটা বোঝা ভাগাভাগি করে নিয়ে, কুলীদের সঙ্গে আমাদের যেন কোন সম্পর্ক নেই, এমনি নির্লিপ্তভাবে চলতে লাগলাম।

কেয়ারটেকার খড়্গ সিং আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। মালিকের কাছ থেকে সে নাকি সরাসরি আলাদা চিঠিও পেয়ে গেছে। তাই তৈরী হয়েই আছে।

ভিতরে ঢুকেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কলকাতা থেকে আরও যাত্রী নাকি এসেছেন। তাঁদের খুঁজলাম। কেউ নেই। হয়ত বেড়াতে গিয়েছেন।

হ্যাঁ। বেড়াতেই নাকি গিয়েছে। তবে, এই কার্সিয়াঙের পাহাড়ে নয়, গেছে দার্জিলিঙে, ভোরের ট্রেনে; বিকেলেই এসে পড়বে নাকি।

খড়্গ সিং লোকটাকে বড় ভাল লাগল। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়স, চিমড়ে চেহারা, মুখের আর কপালের চামড়া কুঁচকে কুঁচকে গিয়েছে। পরনে খসখসে গরম কাপড়ের কালো প্যাণ্ট, গায়ে গলাবন্ধ কালো কোট, মাথায় টুপি। যেন একটা লোহার পাত, এমনি ঝরঝরে টানা লম্বা একটা শক্ত চেহারা। মুখে হাসি।

চারটে আঙুল দেখিয়ে বলল, "চার জনানা—চার লড়কি।"

কথা বুঝতে পারলাম না, বললাম, "কই?"

"দার্জিলিং গিয়েছে, বিকেলের ট্রেনে ফিরবে।"

বললাম, "ওঃ।"

হেনাকে বললাম, "শুনলে ত? চার জেনানার ভিড়ে তবে মেন বাড়িতে থেকে কী হবে। গেস্টহাউসই ভাল, ওখানেই চল।"

খড়্গ সিংও বুঝিয়ে দিল যে, ও-বাড়িতেও বেশ থাকা যাবে। কোন অসুবিধা নেই।

অতএব খড়্গ সিংয়ের নির্দেশে কুলী-মেয়েরা মাল নিয়ে চলল। কয়েক পা গিয়েই পাথরের স্ল্যাব-বসান সিঁড়ি ফুট পাঁচেক নীচেই আমাদের ডেরা, গেস্টহাউস।

উঃ। বাঁচা গেল হাঁফ ছেড়ে। হাঁফও ছাড়লাম, সেই সঙ্গে গাও ছেড়ে দিলাম। মেঝের উপর পড়ে রইল মালপত্রের আণ্ডিল। ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লাম টান হয়ে।

হেনা বলল, "শুয়ে ত পড়লে? খাওয়া-দাওয়া?"

"খিদে নেই। তোমার যদি খিদে লেগে থাকে, খড়্গ সিংকে বল, কোন রেস্তোরাঁ থেকে কিছু এনে দিক।"

"তুমি খাবে না ত?"

"তোমার জন্যে যদি আনে, তবে তার থেকেই একটু মুখে দিয়ে নেব।"

ঘরে এসে ঠিক হয়ে বসতেই বেলা দেড়টা-দুটো বেজে গেল। এই অবেলায় রান্নার আয়োজন আর হল না। হোটেল থেকে ভাত আর ডিমের ঝোল এনে দিল খড়্গ সিং।

দুটো ভাত মুখে দিয়ে আমি টান হয়ে শুয়ে পড়লাম ক্যাম্পখাটে। আঃ, চমৎকার আরাম। টানা রাত্তিরটা গিয়েছে টানা জাগা। ঘুম আসছিল। কিন্তু ঘুমের উপায় নেই। হেনা ঘর গুছচ্ছে। অসাধ্যসাধন করার চেষ্টা করছে। মোটা-মোটা বোঝা একাই টানছে।

আড়ষ্ট গলায় বললাম, "থাক না। খড়্গ সিং আছে, তার বৌ আছে, ওদের ডেকে বিকেলের দিকে গুছিয়ে নিলেই হবে।"

কিন্তু তা নাকি হবে না। যা করার এখনই নাকি হতে হবে।

তবে হক। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। সারা রাত ঐ মাল পাহারা দিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে।

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি ঘর মালপত্রে একেবারে ছত্রাকার। পা রাখার জায়গা নেই। পেটমোটা হোল্ডঅল দুটো খোলা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে বালিশ কম্বল বেডকভার বেরিয়ে পড়ে একটা ধ্বংসস্তূপের আকার নিয়েছে।

একটা লুঙ্গি পরে, আর গায়ে কাঁধ-ছেঁড়া একটা ময়লা পাঞ্জাবি চড়িয়ে আমি ছোট-একটা দিবানিদ্রা দিয়ে এবার উঠে বসেছি। বসে বসে দেখছি ওর তামাশা। দেখছি আর শিউরে উঠছি; ভাবছি, এই ধ্বংস মেরামত করার দায়িত্ব যদি আমার উপর পড়ে তাহলে আমি নির্ঘাৎ ধ্বংস হয়ে যাব। একে এই স্বাস্থ্য আমার, একটা দমকা হাওয়ার মুখে পড়লে উড়ে যাব, তার উপর এই ধকল গিয়েছে সারাটা রাত।

বললাম, "করেছ কী? এ-যে প্রলয় করে ফেলেছ একটা।"

"কী করা যাবে? কাজের জিনিসগুলো ত বের করে নিতে হবে। কোথায় কী রেখেছি, তা মনে করতে পারছিনে। এটা পাই ত সেটা পাইনে, সেটা পাই ত এটা হারিয়ে যায়।"

থরময় ছড়ান জিনিসপত্রের উপর হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বলল হেনা।

ক্যাম্পখাটের মধ্যে আমি জড়সড় হয়ে ডুবে বসে আছি নির্বিকারভাবে।

এমন সময় বারান্দায় একসঙ্গে কতকগুলো পায়ের আওয়াজ শুনলাম, এবং সেই সঙ্গে সম্মিলিত হাসির শব্দ।

হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল যেন এক ঝাঁক চঞ্চল চড়ুই। ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

হেনার মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, "কারা?"

আমার কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেল না হেনা। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে কী যেন খুঁজছিল, হঠাৎ দু পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন।"

একসঙ্গে এসে ঢুকল ওরা চারজন। এরাই বুঝি তারা—খজা সিংয়ের চার জনানা, চার লড়কি?

কোথায় ওদের বসতে দেবে খুঁজতে লাগল হেনা। আমার অবস্থাও শোচনীয়। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া জামা। চারটি অচেনা মেয়ের হঠাৎ-আবির্ভাবে একেবারে বেকুব আর বোবা হয়ে গিয়েছি।

তিনটে চেয়ার ছিল এক কোণে জড় করা। খুব চটপটে আর ছটফটে মেয়ে ওরা, চেয়ার তিনটে টেনে নিয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে ওরা চারজন ভাগাভাগি করে বসে পড়ল।

বলল, "তারপর?"

তারপর যে কী ভেবে পেলাম না। বললাম, "এসে ত পৌঁছলাম।"

"তা ত দেখছি। কজন এসেছেন?"

হেনা বলল, "আমরা দুজন।"

ঘরের জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে ওরা এ-ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে হেসে ফেলল।

কথা না পেয়ে বললাম, "ভীষণ শীতের জায়গা শুনেছিলাম। কিন্তু তেমন শীত ত ঠেকছে না। যদি শীত পড়ে তার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছি।

ওদের মধ্যে লম্বা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি হেসে উঠল, বলল, "তৈরী মানে? লড়াই করবেন নাকি?"

মাঝারী গড়নের ফর্সা মুখ-চ্যাপ্টা মেয়েটি হেসে উঠল খিলখিল শব্দে।

বেঁটে আর মোটা গোলগাল মেয়েটি ওদের ধমক দেওয়ার মত করে চোখ পাকাল।

চতুর্থ মেয়েটি একেবারে নির্বাক, আর নির্বিকারও বটে। সে চুপচাপ বসে রইল।

প্রথম মেয়েটি বলল, "আপনারা আসছেন খবর পেয়েছিলাম খজা সিংয়ের কাছে। এক্ষুনি ফিরলাম দার্জিলিং থেকে। ফিরেই তাই ছুটে এলাম দেখা করতে।"

বললাম, "ধন্যবাদ। আপনারা কার সঙ্গে এসেছেন?"

"আমরা?" মেয়েটি বলল, "কারও সঙ্গে নয়। আমরা একাই এসেছি।"

বলে ফেললাম, "চারজনে একেবারে একা? খুব সাহস কিন্তু আপনাদের।"

মাঝারী গড়নের মেয়েটা শব্দ করে হেসে উঠল খিলখিল করে।

হেনা একটু রুষ্ট চোখে কেন-যেন আমার দিকে তাকাল।

এদের সঙ্গ যতই মধুর আর মনোহর লাগুক-না কেন, ইচ্ছে হচ্ছিল ওরা এখন চলে যাক। আমরা ঘর-টর গুছিয়ে নিই, তারপর প্রাণ ভরে গল্প করা যাবে, আলাপ-পরিচয় করা যাবে। কিন্তু ওরা ওঠে না। নানা রকমের কথা বলতে থাকে।

ওরা নাকি শিল্পী, আর্টিস্ট। কলকাতায় আর্টস্কুলের ছাত্রী। দলবেঁধে এসেছে ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে। অনেক এঁকেছে, আরও আঁকবে। এখন এখানে থাকবে কয়েক দিন। এখানে সাবজেক্টের ত আর শেষ নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিকে চেয়ে থাকলেও চোখের সামনে দশ মিনিটে মিনিটে পাল্টে যাচ্ছে, ল্যান্ডস্কেপের চেহারাই যাচ্ছে বদলে।
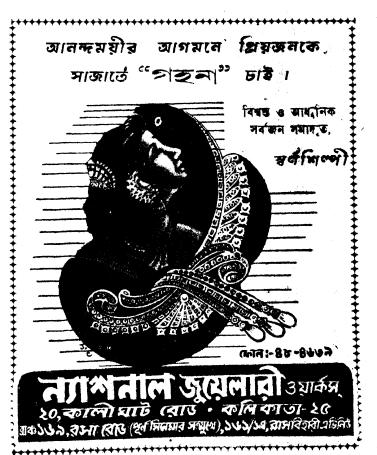
বললাম, "এই ত পাহাড়ের লাইফ। নইলে আর পাথরে রস কোথায়?"

হেনা বলল, "আপনাদের আঁকা ছবি দেখব কিন্তু।"

"নিশ্চয়। কিন্তু কী বেইমান বৃষ্টি বলুন। ঝুপ করে নামছে, টুপ করে পালিয়ে যাচ্ছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে একটু আঁকার ফুরসত দিচ্ছে না। নইলে এর মধ্যে আমরা আরও অনেক স্কেচ এঁকে ফেলতে পারতাম।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের মধ্যে হাত ভাল সব চেয়ে কার?"

ওরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর একটু বাদে মাঝারী গড়নের মেয়েটা আঙুল দিয়ে লম্বা ছিপছিপে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "সবচেয়ে পাকা হাত এর—অলকার।"

অলকা প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে তাকাল, কিন্তু জোরালো প্রতিবাদ করল না দেখে বুঝতে পারা গেল যে, এদের মধ্যে সে-ই পাকা শিল্পী বলে সে নিজেও বুঝি জানে।

নড়তে-চড়তে পারছিলাম না, জড়সড় হয়ে বসেই বললাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল, কিন্তু আপনাদের সকলের নাম জানা হল না এখনও।"

অলকা উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি অলকা। আগেই শুনে ফেলেছেন। এর নাম উৎসা—এর খিলখিল হাসিরও যেমন মানে নেই, এর নামেরও তেমনি মানে জানিনে। আর, এ হচ্ছে সীমা, আর ও অঞ্জনা। অঞ্জনা কিন্তু বাঙালী না, মারাঠী। খুব কথা বলতে পারে, কিন্তু অচেনা মানুষের মধ্যে ও একেবারে বোবা হয়ে বসে থাকতেও ওস্তাদ।"

বললাম, "বা, বেশ। বেশ নাম।"

অলকা বলল, "এবার চলি। আলাপ-পরিচয় হল। আবার দেখা হবে। কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হল না যে!"

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়লাম, বললাম, "আমার নাম রজহরি কবিরাজ। ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী হেনা।"

করজোড় নমস্কার করে ওরা চলে গেল।

ছোট ঘর। গুছিয়ে নিতে বেশী সময় লাগল না। থক্কা সিং এসে হাত লাগাল, সঙ্গে তার বৌও এল—যশোদা। থক্কা সিংয়ের চেহারা যেমন চিমড়ে, আর লোহার পাতের মত, তার স্ত্রীর চেহারা ঠিক তার বিপরীত। ননী দিয়ে যেন তৈরী ওই শরীর, বেশ নাদুশ-নুদুশ। শরীর অমন হলে হবে কী, খাটতে পারে। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর ওরা স্বামী-স্ত্রী—একসঙ্গে চার জোড়া হাত ঘর গোছাতে লেগে গেল।

পরদিন সকালে নিজেদের ঘর যেন চিনতে পারিনে, একেবারে দিব্যি ফিটফাট চেহারা হয়েছে ঘরের। আমিও দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ঘরটার মতই ঝকঝকে ফিটফাট হয়ে নিয়ে বসলাম, বললাম, "ডাক ওদের।"

হেনা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "কাদের?"

নামগুলো মুখস্ত করে ফেলেছি, বললাম, "অলকা উৎসা সীমা অঞ্জনা।"

"কেন?"

বললাম, "আজ দেখে যাক। কেমন চেহারা বানিয়েছি।"

মাথার চাঁদিতে হাতের তেলো দিয়ে তেল ঘষতে ঘষতে হেনা বলল, "কিসের চেহারা?"

"এই ঘরের, আর আমার। কী হালে দেখে গেছে কাল!"

"বয়ে গেছে ওদের।"

ওরা এল না। ক্যামেরা হাতে নিয়ে আমিই বেরিয়ে পড়লাম। তৈরী হয়েই এসেছি পাহাড়ে। পাহাড়ের সব রকমের শোভা এই ক্যামেরায় ধরে নিয়ে যাব।

পাহাড়ে পাহাড়ে তাই ঘুরে বেড়াই রোজ। মণ্টীভিয়ট রোডের ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে যাই অনেক নীচে। সেখান থেকে অগাধ গভীরে ও ধূসর সুদূরে চিকচিক করে বলসান নদীর জল। আমার ক্যামেরায় ওই নদীর চাকচিক্য যে এতটুকু ধরা পড়বে না, সে-খেয়াল থাকে না, আমি ওই অপূর্ব রজত-শোভা তাক করে ক্যামেরা টিপি।

গেস্টহাউসের ডেরা থেকে বেরবার সময় ওদের ঘরের সামনে দিয়ে যাই, দেখি, ঘর ফাঁকা; ফেরার পথেও ওই রাস্তা দিয়ে আসি, দেখি, ঘর শূন্য।

তাহলে ওরা কি চলে গেল? চঞ্চল চড়ুই পাখি ঘুলঘুলি দিয়ে যেমন ফুরফুর করে ঢুকে পড়ে ঘরে, ঠিক সেইভাবে আমাদের ডেরায় হানা দিয়েছিল ওরা। চঞ্চল চড়ুই পাখিরা যেমন শূন্যে পাখা বন্ধ করে এক
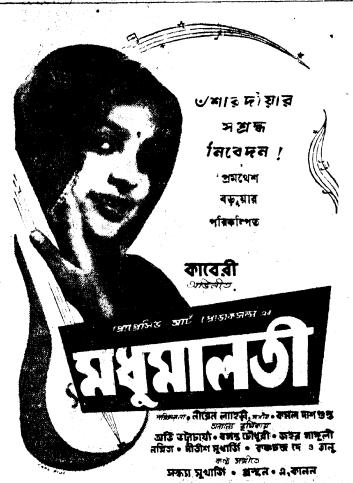
ডুব-সাঁতারে দৃষ্টির নেপথ্যে চলে যায়, ঠিক সেইভাবেই ওরাও কি উধাও হয়ে গেল?

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। আমাকে উচ্চবাচ্য করতে না দেখেই সম্ভবত হেনা কথা পাড়ল, বলল, "ওরা বোধ'য় নেই। চলে গেছে।"

আকাশ থেকে পড়ার মত করে বললাম, "কারা?"

হেনা অপাঙ্গে তাকাল আমার দিকে; কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "এত সাধ করে ঘর সাজান হল।"

বললাম, "সত্যিই। শুকিয়ে গেল সাজান বাগানটা।"

কিন্তু এ কি শুকোয়? পাহাড়ে পাহাড়ে মৌরসিপাট্টা করে বসেছে যে ফুলের সমারোহ, সে-সমারোহে এতটুকু বর্ণান্তর নেই, সে-ফুলের পাপড়িতে কড়া রোদের আঘাত লাগে না কখনো। পরমরমণীয় শোভায় তা শোভান্বিত।

নানা উপকরণ সাপ্লাই করেছে খঙ্গা সিং। ইজিচেয়ার, তেপায়া, খাবার টেবিল, বসবার চেয়ার।

ফুলবিলাসিনী পাহাড়ী কন্যা যশোদা কাঁচের গেলাশে করে ফুলের তোড়া বেঁধে গেছে জানলার উপর।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট টানছি। ধোঁয়া ছাড়ছি আর ভাবছি, বিকেলের দিকে হানা দেওয়া যায় কোন দিকে—দূরবিন-দাঁড়ায় না, তাওহীলে? এই সব ভাবছি, এবং তার সঙ্গে অন্য কথাও হয়তো ভাবছি।

অদূরে বসে হেনা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।

হঠাৎ সম্মিলিত পায়ের শব্দে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। পুরো সংবিৎ ফেরার আগেই ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওরা।

একটু সোজা হয়ে বসার মত করে বললাম, "কী ব্যাপার?"

অলকা বলল, "ব্যাপার গুরুতর।"

"কী হল?" ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল হেনা।

অলকা বলল, "এক সকালে এ'কে ফেলেছি পাঁচটা ল্যান্ডস্কেপ।"

খিলখিল করে হেসে উঠল উৎসা, বলল, "আপনার কান্ড দেখে যা হাসা আজ হেসেছি আমরা।"

"কার কান্ড বললেন? আমার?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনার।" সীমাও তার বিপুল শরীর নিয়ে একটু দুলে উঠল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ওদের সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

অলকা বলল, "অমন তাক করে খাদের ছবি নিচ্ছিলেন। খাদের ছবি কেউ নেয়? কী বিউটি আছে ওতে?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় দেখলেন আমাদের?"

"মণ্টভিয়ট রোডে। আমরাও তখন ওখানেই। রাস্তা থেকে দশ-বার ফুট উঁচুতে একটা চৌকো প্লট আছে, ওখানে বসে আমরা ছবি আঁকছিলাম।"

একটু ভেবে নিলাম, বললাম, "ওঃ। বুঝেছি। খাদের নয়। বলসান নদীর ছবি নিলাম।"

একসঙ্গে ওরা হেসে উঠল শব্দ করে, হাসি একটু থামিয়ে বলল, "তবে ত আরও ভাল। আপনার ক্যামেরায় নিশ্চয় তাহলে ওই প্রায়-অদৃশ্য নদীটার স্রোতের শব্দও ধরা পড়ে গেছে। আমরা দেখব, আমরা দেখতে চাই ওই ছবি।"

হেনাকে বললাম, "তুমিও বল না, আমরাও দেখতে চাই আপনাদের আঁকা ছবি। পাইন-বন নিশ্চয় পাইন-বনের মতই হয়েছে?"

ওরা রাজী হল। দেখাবে বলল। কিন্তু এখনও ছবিগুলোর চূড়ান্ত টাচ দেওয়া হয়নি। হলে অবশ্যই দেখাবে।

ওরা চলে গেলে হেনা বলল, "বেহায়া।"
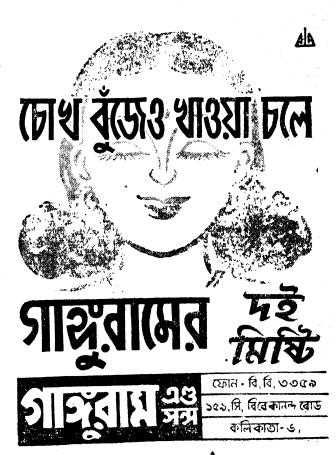
প্রতিবাদ করে উঠলাম, বললাম, "আমার বেহায়াপনা কোথায় দেখলে?"

হেনা বলল, "তোমাকে বলিনি।"

আমিও কাউকে কিছু বললাম না। মনে মনে কেবল বলতে লাগলাম, মেয়েগুলো অপ্রস্তুত করার যেন ঈশ্বরী। অগোছাল ঘরের মধ্যে ঢুকে সেদিন অমন বেকুব করে দিয়ে গেল। আজ এসে সাজান ঘরটা একটু ভাল করে দেখল তো নাইই, উপরন্তু ছবি-তোলা নিয়ে ব্যঙ্গ বিতরণ করে চলে গেল।

ওদের আঁকা ছবিও দেখতে হবে, পাকা হাতের আঁকাটা সর্বপ্রথম।

হেনাকে বললাম, "ওরা যখন বিনা নোটিশে এখানে এসে হানা দিয়ে পড়ছে, তুমিও যাও-না একবার ওদের ডেরায় হানা দিয়ে পড়।"

হেনার গা নেই।

এই অচেনা জায়গা, প্রতিবেশী বলতে আমরা ওদের ওরা আমাদের। এখানে একটু মেলামেশা ভাল। না হয় পছন্দসই নয় ওরা, না হয় একটু গায়ে-পড়া। তাতে ক্ষতি কী।

হেনার হয়ত মনে-মনে ইচ্ছে ছিল, আমার একটা মাথা যে নয়, হয়েছে বঙ্কিম কাপড় পাশে ফেলে ফেলে চলে উঠল, বলল, "যখন বলছ এত করে, যাই ঘুরেই আসি।"

হেনা গেল। আবার তখনই ঘুরে চলে এল?

"একি, চলে এলে যে?"

"ওরা নেই।"

ওরা নেই যখন, তখন আমরাই বা থাকি কেন? বেড়াতে এসে ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

ক্যামেরা হাতে নিলাম আমি। হেনাও তৈরী হয়ে নিল। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি নেব, এবং ধবলাগিরির আর গৌরীশৃঙ্গের।

"ক্যামেরায় আসবে?" হেনা জিজ্ঞেস করল।

বললাম, "ওটা ক্যামেরার ডিউটি। আমার কাজ আমি করে যাব—তুলে যাব একে একে।"

পাংখাবাড়ি রোড ধরে এগিয়ে চলেছি সোজা, রাইফল-রেঞ্জ গ্রাউণ্ডের দিকে। ডান দিকে অগাধ খাদ। সেই ছায়াচ্ছন্ন গভীরে এক পাল মেঘ এসে জটলা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে; এ ওর গায়ের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, আবার দল বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসবার চেষ্টা করছে। হড়কে যাচ্ছে হয়ত ওদের পা, আবার গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। এই মেঘের দলের ওপারে সারিবদ্ধ পাইন গাছ, মনে হচ্ছে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে একদল সান্ত্রী দাঁড়িয়ে।

হেনা বলল, "কী সাংঘাতিক, দ্যাখো।"

"কী?"

"কী অদ্ভুত সুন্দর। মনে হচ্ছে যেন কাঠকয়লায় হিজিবিজি করে আঁকা একটা মস্ত ছবি। পারবে ওই মেয়েরা আঁকতে এই ছবি?"

চেয়ে দেখলাম ওই মাস্টারপিস। সামনে ওটা বুঝি একটা দৃশ্য নয়, দক্ষ শিল্পীর তুলির সাধনা দিয়ে আঁকা একটা জীবন্ত চিত্র।

আমি ছবি তুলতে লাগলাম। এক-এক করে অনেকগুলো তুলে ফেললাম—যেটা ভাল আসে।

ছবি নেওয়া সাঙ্গ করে পিছন দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। অনেকটা দূরে উঁচু পাহাড়ী ঢিবির উপর বসে নিবিষ্ট মনে চিত্র রচনা করে চলেছে চার শিল্পী।

হাঁটু ভেঙে ভেঙে আমরা ওদের কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম কী এঁকেছে ওরা।

উল্টে নিল ওরা ছবি, বলল, "না। এখন না। এখনো ফিনিশ করিনি।"

অঞ্জনা আর সীমা আরও কয়েক ধাপ উপরে বসে ছিল, তাদের ছবিতে তাই উঁকি দেওয়া হল না।

আক্ষেপ থেকে গেল মনে। ওদের মত শিল্পীর এমন নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছি, কিন্তু ওদের শিল্পের সঙ্গে কোনও চাক্ষুষ পরিচয় হল না।

অলকা বলল, "দিলেন ত সর্বনাশ করে?"

চমকে উঠলাম। কী করলাম বুঝতে না পেরে হেনার মুখের দিকে তাকালাম।

হেনাও কিছু বোঝেনি। আলগোছে সামান্য একটু ঠোঁট ওল্টাল।

সীমা আর অঞ্জনা নেমে এসেছে, স্কেচের খাতা জড়িয়ে নিয়ে হাতের মধ্যে করে এমন-ভাবে দাঁড়াল, মনে হতে লাগল যেন এই মাত্র ট্রফেখানা নিয়ে এল।

সীমার শরীর স্থূল, বুদ্ধি সম্ভবত সূক্ষ্ম, তাই একটু রসিকতা করল, বলল, "আমার ছবিতে স্পট পড়ে গেছে—ব্ল্যাক স্পট। আমার সাবজেক্টটা আপনি এমন আড়াল করে দাঁড়ালেন যে, আমার ছবিতে দাগ পড়ে গেল।"

কিন্তু সীমার কথায় কান দিতে পারলাম না, অলকার অভিযোগটাই কানের মধ্যে তখন বাজছে, বললাম, "কী বললেন যেন আপনি?"

খিলখিল করে হেসে উঠল উৎসা, বলল, "সর্বনাশ।"

হেনা আমার হাত ধরে টেনে বলল, "চল। ওদের ডিসটার্ব করে লাভ নেই।"

অলকা বলল, "আর ডিসটার্ব! সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে, কনসেনট্রেশন চুরমার করে দিয়েছেন। চলুন। আমরাও ফিরব এখন। পেটে মশাল জ্বলছে।"

চেয়ে দেখলাম, হেনার চোখেও কৌতুক।

গল্প করতে করতে ফিরতে লাগলাম আমরা।

সীমা কথা তুলল, বলল, "অনেক ল্যান্ড-স্কেপ তো হল, এবার একটা ম্যানস্কেপ আঁকব। খাওয়া-দাওয়া করে জিরিয়ে তার পর।"

অঞ্জনাটা পিছিয়ে পড়েছিল, লাজুক লাজুক পা ফেলে এগিয়ে গেল সীমার কাছে, কী যেন জিজ্ঞাসা করল।

সীমা বলল, "ও হরি। ম্যানস্কেপ বোঝনি? একটা মানুষের স্কেচ।"

খিলখিল করে হেসে উঠল উৎসা। অলকা লম্বা লম্বা পা ফেলে বলল, "ঠিক। আমরা এক সঙ্গে ও'র ছবি আঁকব আজ।"

ওরা হৈ-হল্লা করে হাঁটতে লাগল আগে আগে। আমরা দুজন কয়েক হাত তফাতে পিছন-পিছন চললাম।

হেনা বলল, "কী পেয়েছে ওরা তোমাকে বল ত?"

কী আর বলব? বললাম, "হয়ত একটা বোকা কিংবা একটা বেকুব, কিংবা একটা গাধা।"

"তা যদি ভেবে থাকে তবে ভাল।"

বলে হেনা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি কোনও প্রতিবাদ করলাম না।

দি ক্লাউড। মেঘে ঢাকা ছিল বাড়িটা। আমরা এসে পৌঁছবামাত্র মেঘ কেটে গেল।

খড়্গ সিং তার চিমড়ে টান টান লম্বা দড়ি-পাকান চেহারাটা নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের ফিরতে বুঝি একটু দেরি হয়েছে, তাই তার মুখে একটু ব্যস্ততার ছায়া।

আমরা চলে গেলাম আমাদের ডেরায়। ওরা ওদের কামরায়।

হেনা বলল, "দরকার নেই আর স্কেচ আঁকিয়ে। খুব হয়েছে।"

বললাম, "ক্ষতি কী। বরং ভালই। দুনিয়ার কোন্ শিল্পী এত গরজ করে এই রজহরি কবিরাজের মত অর্বাচীনের ছবি আঁকতে চাইবে বল?"

"যা ইচ্ছে কর গিয়ে।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে আরামে সিগারেট ফুঁকছি। হুটপাট করে ওরা এসে ঢুকল ঘরে। কাঁচের ঘরে ঝড়ের আগমন একে আমি বলব না। কিন্তু হেনা নিশ্চয়ই এদের আবির্ভাবকে এই ধরনের উপমাই দেবে।

ওদের পিড়াপিড়িতে আমি উঠলাম। সুতীর লংকোট চাপিয়ে নিলাম গায়ে, হাতে নিলাম সঙ্গের সাথী ক্যামেরাটি।

বাগানের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। বললাম, "কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে?"

অলকা বলল, "বেশী না। ওয়ান আওয়ার। একঘণ্টা।"

অদূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে লাগল হেনা।

সিঁড়ির উপর বসে গেছে চার শিল্পী। হাত-দুই তফাতে তফাতে লাইন বেঁধে।

গর্বে বুক ফুলে উঠেছে আমার। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গেলে, বাঁ পায়ের ভর ডান পায়ে চালান করে নিচ্ছি।

একটু আবগোছে বসে নিচ্ছি রেলিংএর উপর।
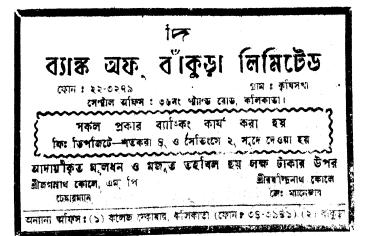
ওরা মাঝে মাঝে আমার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে ভুষো পেন্সিল ঘষছে কাগজে। নিশ্চয় এতক্ষণে একটা ফিগার দাঁড়িয়ে গেছে ওদের কাগজে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগছে। চোখে-চোখে ইশারায় কথা বলে নিচ্ছি হেনার সঙ্গে। ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি কখনো-বা।

ওরা মাথা নিচু করে আঁকছে। আমি ক্যামেরাটা তাক করে চিত্ররচনারত চার শিল্পীর ছবি নিয়ে নিলাম খুট করে।

শব্দ শুনে ওরা বলল, "ও কী?"

"কিছু না। পা ধরে গেল। আর কত দেরি?"

"হয়ে এল।" বলে দ্রুত হাত চালাতে লাগল উৎসা।

একটু পরে ওরা ছুটি দিল আমাকে। ছুটি পেয়েই হেনাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কার্ট রোডে এসে ফটোর দোকানে ঢুকলাম। বলে গেলাম, "ঘুরে আসছি, ফিরেই কিন্তু ছবি চাই—এর মধ্যে ডেভেলপ আর প্রিণ্ট করে দিতেই হবে।"

অনেক ঘুরে, সেণ্টমেরীর গির্জায় উঠে হাওয়া খেয়ে, হোর্সনেস্কোরার ধারে বসে জিরিয়ে ছবির দোকান থেকে ছবি নিয়ে পাংখাবাড়ির ডেরায় যখন ফিরলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে।

আমরা ফিরতেই ওরা তেড়ে এল। চোখের সামনে মেলে ধরল চারটি ছবি। বলল, "এই দেখুন।"

দেখলাম। দেখে দমে গেলাম। মনে হল, অবিকল চারটি খড়্গা সিং চারটি খাতার পাতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর বেলা গেটের সামনে যে-ভাবে ব্যাকুল দুটো দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইভাবে।

হেনা চুপ করে ছিল, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে বলল, "এক কাজ করুন আপনারা। যশোদাকে দিয়ে আসুন, বাঁধিয়ে রাখবে।"

"কেন, পছন্দ হল না?"

"অপছন্দ হয়নি।" হেনা বলল, "কিন্তু যশোদা নিশ্চয় লুফে নেবে।"

উৎসা এগিয়ে এসে বলল, "কেন? যশোদা কেন?"

হেসে ফেলল হেনা। বলল, "ও-যে খড়্গা সিংয়ের জেনানা।"

চারটি মেয়ের উৎসাহ যেন [illegible] দপ করে। চারজনেই যেন [illegible] অপ্রস্তুত আর অপ্রতিভ হয়ে গেছে। ওদের মুখের এ-চেহারা এতদিন চোখে পড়েনি। ওই মুখের দিকে চেয়ে বড় করুণা হল।

বললাম, "জিতে গেলাম কিন্তু আমি। এই দেখুন।" মেলে ধরলাম ছবিটা।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা চারজন। বলল, "এ-ছবি পেলেন কোথায়?"

ছবিটা বুকপকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম, "বলব না।"

অলকার গায়ে ধাক্কা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল উৎসা। বলল, "জাদু জানেন নাকি, মশায়?"

হেনার মুখের দিকে চেয়ে এ-কথার আর উত্তর দিতে পারলাম না।

যা যনা করতে নয়, আগেভাগে একটা আঁচ নিতে এসেছিল ওরা। খুব একটা ভরসা নিয়ে আসেনি। পাঁচজনের মুখে যা শোনা গিয়েছিল, তাতে ভরসা পাবার কথা নয়। এই বয়সে বউ মরলে এমনিই হয়; সব ব্যাপারেই ছাড়ো-ছাড়ো আড়াল-আড়াল ভাব। মন বসে না আর—সে সংসারেই হক কি কাজেকর্মে। নেশা, শখটখ, আমোদ-আহ্লাদ ত পরের কথা।

ফটিক আঘোরী দু দশটা কথার পর খুব সাবধানে, সসংকোচে আসল কথাটা তুললে। "বাসনা ত খুবই ছিল গ' ঠাকুরমশাই—ই বারে মায়ের থানে আসরটা দি।" ফটিক এমন একটা হতাশার সুর টানল যেন অত সাধ-বাসনার সবটাই বিফলে গেল।

ফটিক আঘোরী আর তার দলবলের দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বললে, "বাধছে কিসে তুমাদের?"

বাধছে আসল জায়গায়। মূর্তি না থাকলে যেমন পুজোয় বাধে, পিঁড়িতে বর না বসলে যেমন বিয়েতে—তেমনি। আসরটা ত ফটিক আঘোরীরা বসাবে, কিন্তু সে মরা-আসর জমাবে কে ছাই, যদি না নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য একটা যাত্রার পালা গায়। ফটিক আঘোরী বেশ গুছিয়ে কথাটা পুরোপুরি বলে ফেললে।

নীলকণ্ঠ মনে মনে অবাক হচ্ছিল। এই কথা, এর জন্যে আঘোরীর অত ইজল-বিজল কেন?

নীলকণ্ঠের গোল, ভরাট, তামাটে মুখের গোড়ায় বেশ একটু কৌতুক আর হাসির ছোঁয়া লাগল। ঈষৎ লালচে চোখ আর ধূসর মণি দুটো ফটিক আঘোরীর রোগাসোগা মুখের উপর রেখে নীলকণ্ঠ বললে, "আমি পালা গাইব না, এটা তুমি ঠাওরালে কী করে হে আঘোরী?"

"আমি কিছু ঠাওরাই নাই ঠাকুরমশায়।" ফটিক মাথা নেড়ে দু-হাত প্রায় করজোড়ের ভঙ্গিতে বুকের উপর তুলে ধরে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "ই ছোঁড়াদের বিশ্বাস আসছিল না।" সঙ্গীদের দেখিয়ে দিল ইশারায়, "দোষ নাই উদেরও, যা শোকতাপ গেল আপনার, পালাটালা ফিরে আবার গাইবেন বিশ্বাস লাগে না। হ্যাঁ, তবে কিনা—"

নীলকণ্ঠ বাধা দিল ফটিকের কথায়। বললে, "যতদিন গলা আছে, বুঝলে আঘোরী, পালা আমি গাইব; আর হাতে খাগের কলমটা যতদিন আছে, পালাও আমি লিখব, জেনে রাখ তুমি।"

ফটিক তাড়াতাড়ি আসল কথাটা শুধল, "নতুন পালা কিছু লিখলেন নাকি ঠাকুরমশায়?"

নীলকণ্ঠ মাথা নাড়লে। না, লেখেনি।

ফটিক সুযোগটা ছাড়াতে চায় না।

গোলাপের মিষ্টি গন্ধ যেমন মনকে
করে তেমনি
ও শক্তির উৎস
এনে দেয়
কুমার এজেন্সির গোলাপ ফুল মার্কা
* খাঁটি সরিষার তেল/২॥০/৫ টিনেতে পাওয়া যায়
একমাত্র পরিবেশক
ফোন: ৪৫-২১৩৪
পার্ব্বতী চরণ কুমার এণ্ড কোং

র হাসিটা আরও বিনীত করে বলল,
অন্তরের কথাটা শোনেন ঠাকুরমশায়,
বলি, আমাদের ইচ্ছাই ছিল এবার মার
একটা নতুন পালা জমাই, তাই ত
ম আপনার কাছে।" অল্প একটু
ল ফটিক, নীলকণ্ঠর মনোভাবটা
বোর চেষ্টা করল; তারপর বলল, "তা
নাটা আমাদের পুণ্য করেই দেন
হয়!"

নীলকণ্ঠ আধ-শোওয়া ভঙ্গিতে বসে
। ফটিক আঘোরীর দেওয়া সিগারেটে
দিতে দিতে চোখ দুটি একটুক্ষণের
য় বুজল। চোখ খুলে বলল, "হবে গ'
ধারী, তোমাদের আসরের জন্যে নতুন
া একটা লিখব। কাজকর্ম ত আজকাল
ড়ই দিচ্ছি। বেটার ঘাড়ে চাপাইছি সব।
। আছে হাতে। হবেখন।"

"তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই?" ফটিক
র জন্যে নীলকণ্ঠের মুখের দিকে
করে থাকল।

মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, ফটিক
শ্চিন্ত হতে পারে।

সঙ্গের দলবলের দিকে কৃতিত্বের একটা
ক্ষ ছুড়ে দিয়ে ফটিক উঠে দাঁড়াল,
রনাটা তবে চটপট করেই যাব
রমশায়।"

নীলকণ্ঠ ঘাড় নাড়ল। "করে যেও
না; যবে খুশি, যখন খুশি।"

ফটিকরা চলে যাওয়ার পর নীলকণ্ঠ
নকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, তেমনি
ধশোওয়ার ভঙ্গিতেই। পশ্চিমের
নলাটা খোলা। ঢেঁড়স আর কলাগাছের
পটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।
ও ডোবাটা দেখতে পাচ্ছিল না
লকণ্ঠ, তবু ডোবার ও-পারে ধুন্দুল
ছের একটু যেন চোখে পড়ছিল।
কেলে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজে লতাপাতার
কটা গন্ধ ঢুকছিল ঘরে। আর ময়না,
ড়ুই, কাকের কিচিরমিচির।

নতুন একটা পালা লিখতে হবে। এবার
ী পালা লেখা যায়, নীলকণ্ঠ শূন্যচোখে
াকিয়ে সেটা যেন ভাবছিল। এর আগে
ন্তত আট-দশটা পালা লিখেছে। রাম
ক্মণের পালা থেকে শুরু করে সিংহল
জয়ের পালা পর্যন্ত। দু-চারটে বেশ
লই উতরে গেছে। সেইসব পালা শুধু
নুরি গ্রামে নীলকণ্ঠর কালী অপেরাই
য়, আশেপাশের অনেক গাঁয়ে অন্য দলও
রেছে। যেগুলো উৎরায়নি, নীলকণ্ঠ
জেও আর সেগুলোর নামোচ্চারণ করে
। করতে লজ্জা পায় যত না, তারচেয়ে
শী বিরক্ত হয়। কেমন একটা আক্রোশে
রগর করে। নিজের উপরেই। নিজের
অক্ষমতা এবং ব্যর্থতার উপরেই যেন এই
বিরক্তি, ঘৃণা।

নীলকণ্ঠ ভাবছিল, নতুন পালা কী
নিয়ে লেখা যায়। একবার আচমকাই মনে
হল, দক্ষযজ্ঞর ঘটনা নিয়ে লেখা যেতে
পারে। সতীর দেহত্যাগ। বিষয়টা ভাল।
নীলকণ্ঠ নিজেই মহাদেবের পার্টটা করতে
পারবে। আর এই সময়—সদ্য সদ্য
নারায়ণীর মৃত্যুর পর—নীলকণ্ঠ বোধ হয়
দু-চারটে জায়গায় বেশ লিখতে পারবে,
ফুটিয়ে পার্ট করতেও হটবে না। সতীর
দেহত্যাগের পর মহাদেবের অবস্থাটা মনে-

কুসুম সরে গেল না

মনে কিছুক্ষণ কল্পনা করে নিল নীলকণ্ঠ।
একটা দৃশ্যই যেন ছকে ফেলল। সতীর
মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহাদেবের বিচলিত
অবস্থা; শোকের স্বগতোক্তি আর রোষ।
দুটি ছত্র মুখেই এসে গিয়েছিল।

নীলকণ্ঠর মনের সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে
গেল। অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যে দেবার শাঁখ
বেজে উঠেছে। বেজে বেজে থামল। নীলকণ্ঠ
খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকল।
দাওয়ার অন্ধকারে এখুনি একটু আলোর
ছিটে পড়বে।

কুসুম তবে এসে গেছে। না হলে শাঁখ
বাজাবে কে? ললিত বাইরে। গাঁয়ে দু-ঘর
আর ক্যাশিয়ারবাবুর বাসা, তিন ঘরে
সত্যনারায়ণ পুজো সারতে হবে তাকে।
বিকেল থাকতেই বেরিয়ে গেছে, বৃষ্টিতেই।
মাধু শ্বশুরবাড়ি। সেই যে তার মার শ্রাদ্ধর
পর গেছে, দেড়মাসের মধ্যে আর এ-বাড়ি
আসেনি। বলাইটা বাচ্চা, বছর আটেক
বয়েস; এখনো হয়ত চটুরাজের বাসায়
খেলছে। তা ছাড়া সে ত আর শাঁখ বাজাতে
পারে না। কুসুমই এসেছে তা হলে।
মাসখানেক ধরে ঘরে সন্ধ্যে দেওয়ার কাজটা
সে-ই সেরে দিচ্ছে।

নীলকণ্ঠ দাওয়ার অন্ধকারের দিকে
তাকিয়ে ছিল। আলোর ছিটের আশায়।
একটু পরে সত্যিই একটু আলো পড়ল।
দাওয়া দিয়ে কুসুম হাত আড়াল দিয়ে
প্রদীপ ধরে সদরে গেল, সদর থেকে
রান্নাঘরে, এদিক-ওদিক। আবার অন্ধকার
অল্পক্ষণ পরে টিমটিমে একটা কুপি এনে
কোথায় বুঝি ঝুলিয়ে দিল। দাওয়ার
একটা এবড়ো-খেবড়ো জায়গা এক খাবলা
ম্লান আলোয় টিমটিম করতে লাগল।
নীলকণ্ঠর মনে হচ্ছিল, পিঠের কুঁজের মত
দাওয়ার ওখানটায় যেন কুঁজ গজিয়েছে।

গলায় কাশির শব্দ তুলে সাড়া দিল
নীলকণ্ঠ। সাড়া না দিয়ে পারছিল না।
ছোট লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে কুসুম এল।
চৌকাঠের ও-পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে
লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ শুধল, "বলাইটা ফিরেছে
নাকি?"

মৃদু-গলায় জবাব দিল কুসুম, "হ্যাঁ
ফিরেছে।" সরে যাবার মতন একটু নড়ে
চড়ে উঠলেও কুসুম সরে গেল না।

মুখের হাসিটা আরও বিনীত করে বলল, "যদি অন্তরের কথাটা শোনেন ঠাকুরমশায়, তবে বলি, আমাদের ইচ্ছাই ছিল এবার মার থানে একটা নতুন পালা জমাই, তাই ত এলাম আপনার কাছে।" অল্প একটু থামল ফটিক, নীলকণ্ঠর মনোভাবটা বোঝবার চেষ্টা করল; তারপর বলল, "তা বাসনাটা আমাদের পূর্ণ করেই দেন না হয়!"

নীলকণ্ঠ আধ-শোওয়া ভঙ্গিতে বসে ছিল। ফটিক আঘোরীর দেওয়া সিগারেটে টান দিতে দিতে চোখ দুটি একটুক্ষণের জন্যে বুজল। চোখ খুলে বলল, "হবে গ' আঘোরী, তোমাদের আসরের জন্যে নতুন পালা একটা লিখব। কাজকর্ম ত আজকাল ছেড়েই দিছি। বেটার ঘাড়ে চাপাইছি সব। সময় আছে হাতে। হবেখন।"

"তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই?" ফটিক কথার জন্যে নীলকণ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, ফটিক নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সঙ্গের দলবলের দিকে কৃতিত্বের একটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক উঠে দাঁড়াল, "বায়নাটা তবে চটপট করেই যাব ঠাকুরমশায়।"

নীলকণ্ঠ ঘাড় নাড়ল। "করে যেও বায়না; যবে খুশি, যখন খুশি।"

ফটিকরা চলে যাওয়ার পর নীলকণ্ঠ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, তেমনি আধশোওয়ার ভঙ্গিতেই। পশ্চিমের জানলাটা খোলা। ঢেঁড়স আর কলাগাছের ঝোপটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও ডোবাটা দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ, তবু ডোবার ও-পারে ধুঁধুল গাছের একটু যেন চোখে পড়ছিল। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজে লতাপাতার একটা গন্ধ ঢুকছিল ঘরে। আর ময়না, চড়ুই, কাকের কিচিরমিচির।

নতুন একটা পালা লিখতে হবে। এবার কী পালা লেখা যায়, নীলকণ্ঠ শূন্যচোখে তাকিয়ে সেটা যেন ভাবছিল। এর আগে অন্তত আট-দশটা পালা লিখেছে। রাম লক্ষ্মণের পালা থেকে শুরু করে সিংহল বিজয়ের পালা পর্যন্ত। দু-চারটে বেশ ভালই উতরে গেছে। সেইসব পালা শুধু শুনুরি গ্রামে নীলকণ্ঠর কালী অপেরাই নয়, আশেপাশের অনেক গাঁয়ে অন্য দলও গেয়েছে। যেগুলো উৎরায়নি, নীলকণ্ঠ নিজেও আর সেগুলোর নামোচ্চারণ করে না। করতে লজ্জা পায় যত না, তারচেয়ে বেশী বিরক্ত হয়। কেমন একটা আক্রোশে গরগর করে। নিজের উপরেই। নিজের অক্ষমতা এবং ব্যর্থতার উপরেই যেন এই বিরক্তি, ঘৃণা।

নীলকণ্ঠ ভাবছিল, নতুন পালা কী নিয়ে লেখা যায়। একবার আচমকাই মনে হল, দক্ষযজ্ঞর ঘটনা নিয়ে লেখা যেতে পারে। সতীর দেহত্যাগ। বিষয়টা ভাল। নীলকণ্ঠ নিজেই মহাদেবের পার্টটা করতে পারবে। আর এই সময়—সদ্য সদ্য নারায়ণীর মৃত্যুর পর—নীলকণ্ঠ বোধ হয় দু-চারটে জায়গায় বেশ লিখতে পারবে, চুটিয়ে পার্ট করতেও হটবে না। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের অবস্থাটা মনে-

কুসুম সরে গেল না

মনে কিছুক্ষণ কল্পনা করে নিল নীলকণ্ঠ। একটা দৃশ্যই যেন ছকে ফেলল। সতীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহাদেবের বিচলিত অবস্থা; শোকের স্বগতোক্তি আর রোষ। দুটি ছত্র মুখেই এসে গিয়েছিল।

নীলকণ্ঠর মনের সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যে দেবার শাঁখ বেজে উঠেছে। বেজে বেজে থামলে। নীলকণ্ঠ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকল। দাওয়ার অন্ধকারে এখুনি একটু আলোর ছিটে পড়বে।

কুসুম তবে এসে গেছে। না হলে শাঁখ বাজাবে কে? ললিত বাইরে। গাঁয়ে দু-ঘর আর ক্যাশিয়ারবাবুর বাসা, তিন ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো সারতে হবে তাকে। বিকেল থাকতেই বেরিয়ে গেছে, বৃষ্টিতেই। মাধু শ্বশুরবাড়ি। সেই যে তার মার শ্রাদ্ধর পর গেছে, দেড়মাসের মধ্যে আর এ-বাড়ি আসেনি। বলাইটা বাচ্চা, বছর আষ্টেক বয়েস; এখনো হয়ত চাটুয্যেদের বাগানে খেলছে। তা ছাড়া সে ত আর শাঁখ বাজাতে পারে না। কুসুমই এসেছে তা হলে। মাসখানেক ধরে ঘরে সন্ধ্যে দেওয়ার কাজটা সে-ই সেরে দিচ্ছে।

নীলকণ্ঠ দাওয়ার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। আলোর ছিটের আশায়। একটু পরে সত্যিই একটু আলো পড়ল। দাওয়া দিয়ে কুসুম হাত আড়াল দিয়ে প্রদীপ ধরে সদরে গেল, সদর থেকে রান্নাঘরে, এদিক-ওদিক। আবার অন্ধকার অল্পক্ষণ পরে টিমটিমে একটা কুপি এনে কোথায় বুঝি ঝুলিয়ে দিল। দাওয়ার একটা এবড়ো-খেবড়ো জায়গা এক খাবলা ম্লান আলোয় টিমটিম করতে লাগল। নীলকণ্ঠর মনে হচ্ছিল, পিঠের কুঁজের মত দাওয়ার ওখানটায় যেন কুঁজ গজিয়েছে।

গলায় কাশির শব্দ তুলে সাড়া দিল নীলকণ্ঠ। সাড়া না দিয়ে পারছিল না। ছোট লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে কুসুম এল। চৌকাঠের ও-পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ শুধল, "বলাইটা ফিরেছে নাকি?"

মৃদু-গলায় জবাব দিল কুসুম, "হ্যা ফিরেছে।" সরে যাবার মতন একটু নড়ে চড়ে উঠলেও কুসুম সরে গেল না।

নীলকণ্ঠ আর কী বলে, যেন তা শোনায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

নীলকণ্ঠ বললে, "পাকঘরে আগুনটাগুন আছে নাকি? টুকুন চা খেতাম।"

কুসুম মাথা-ঘাড় আস্তে একটু নোয়াল। আগুন থাক না থাক, চা সে তৈরি করে দিচ্ছে।

কুসুম চলে গেল। নীলকণ্ঠ জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে থাকল কপলক। কুসুমের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছিল। বেশ ডাগর-ডোগর মেয়েটা। সুশ্রী। খুঁত আছে একটা, অন্ধকারে ধরা পড়ে না। চিবুকের নীচ থেকে গলা বেয়ে কণ্ঠার কাছাকাছি পর্যন্ত মস্তবড় একটা দাগ। ডান দিকে। গলার মধ্যে ঘা হয়ে নাকি বিষিয়ে গিয়েছিল, কাটাকুটি সেলাই-ফোঁড়াই করতে হয়েছিল। তারই দাগ। কুসুম গায়ের কাপড়টা সবসময়ে গলার উপর দিয়ে টেনে দাগটা চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। পারে না। এই খুঁতের জন্যে বিয়েও হচ্ছে না মেয়েটার।

নীলকণ্ঠ বেশ ঠাওর করে দাগটা দেখবার চেষ্টা করেছিল আজ, একটু আগেই; দেখতে পায়নি। অতটা দূরে আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই ভাল করে দেখা যায় না।

নীলকণ্ঠ খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে একটা বিড়ি ধরাল। বলাইটা ফিরেছে খানিক আগেই, তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কুসুমের কাছে দাপাদাপি করছে ছোঁড়াটা।

পালা লেখার কথাটা আবার মনে এল। কী যে লেখা যায়! দক্ষযজ্ঞের পালাটাই কি লিখবে নাকি?

চা নিয়ে এল কুসুম। নীলকণ্ঠ আঠার বছরের এই সুগড়ন মেয়েটাকে আরও একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে।

"বলাকে কুসুম, কাড়িগা থেকে ফটিক অধিকারী এসেছিল।" কুসুম চলে যেতে যেতে দাঁড়াল নীলকণ্ঠের কথায়। ফিরে তাকাল। নীলকণ্ঠ হাসি হাসি মুখে বললে, "পালা গাইতে চায়। বলে, একটা নূতন পালা লেখেন ঠাকুরমশায়।" নীলকণ্ঠ কথাটা যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল। ঈষৎ গর্বভরে।

কুসুম চৌকাঠের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এই দিকেই তাকিয়ে ছিল, নিচু মুখে। চুপচাপ। গালের আর গলার একটা পাশে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল।

নীলকণ্ঠ আর কোনো কথা বলছে না দেখে কুসুম আস্তে আস্তে চলে গেল।

চা খেতে খেতে নীলকণ্ঠ কুসুমের সঙ্গে যাওয়া চুপচাপ লক্ষ্য করলে। পালা লেখার কথাটাও ভাবতে লাগল। দক্ষযজ্ঞের বিষয়টা

একবার মনে হয়েছিল মাত্র, কিন্তু বিষয়টায় তেমন কোনো আকর্ষণ পাচ্ছিল না। বড় পুরনো, আর সেই এক সতী, সতী। কোনো রস নেই। বউ মরল তো খ্যাপামি। না, নীলকণ্ঠর এ-সব ভাল লাগে না। মরণ—মরণ; তার জন্যে এত হৈ হৈ করার কী আছে! ধুলোয় গড়াগাড়ি দেবার, লুটোপুটি খাবার কী মানে!

না, নীলকণ্ঠর এ-সব পছন্দ নয়। এ-পৃথিবীতে যে-কদিন আছ, আনন্দ করে থাক। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনি। সুখ পাওয়াটাই বড় কথা, শোকতাপ পাওয়াটা নয়। তা যদি পেতে চাও, তবে ভিখিরি হও, ভদ্রলোক হওয়া কেন? কেন এই জমিজমা আগলানো, সংসার পাতা, বাড়ি-বাড়ি চাল-কলা গামছার জন্যে হাঁটাহাঁটি!

নীলকণ্ঠ বোধ হয় ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেসুঝে সব ছেড়ে দিয়েছে। বৃত্তিটা পর্যন্ত। এই গাঁয়ের একমাত্র যাজক বলতে গেলে, পুজো-পার্বণ তো লেগেই ছিল। আজ শনি, কাল সত্যনারায়ণ, পরশু দুর্গা, তরশু কালী, বার মাসে তেরো কেন, তেইশ পার্বণ। উপবাসের পর উপবাস কর, দিন নেই রাত্রি নেই, বর্ষা-বাদল নেই। আজ এর উপনয়ন ত কাল ওর শ্রাদ্ধ, শুভ দিনের নির্ঘণ্ট খুঁজতে খুঁজতে চোখে ছানি পড়ার যোগাড়, পুজোর মন্ত্র পড়তে পড়তে ফুসফুসটা ফুটো হয়ে যাবার অবস্থা। ভাল লাগেনি আর। ভাল লাগতে না মোটেই নীলকণ্ঠর। ছেলেটাকে সংগে সংগে নিয়ে ঘুরত। এখন তার হাতেই আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দিয়েছে। তা বছর বাইশ বয়েস হতে চলল ললিতের। বেশ কাজের ছেলে। ধর্মেকর্মে মতি আছে, হিসেব-পত্তরেও। যজমানদের বাড়ি যায় যেমন, তেমনি জমি-জায়গা ফলন-টলনের সবটাই দেখাশোনা করে। নীলকণ্ঠ এ-সব ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই।

বয়সটা যে যথেষ্ট, নীলকণ্ঠ নিজের দিকে তাকিয়ে তা কোনোদিনই মেনে নেয় না। বেঁচে থাকতে নারায়ণী যদি কখনো বয়সের কথা তুলে খোঁটা দিয়েছে, নীলকণ্ঠ ভীষণ চটে উঠত। বলত, "বয়স আবার কী? যতদিন শরীরে ক্ষুধা আছে, কাম আছে, ভোগের ক্ষমতা আছে, ততদিন মানুষ জোয়ান। যখন থাকবে না, তখন সে জরাগ্রস্ত, অধম, অচল। আমার আবার বয়স কী! নেহাত বামুনের ছেলে, গাঁয়েগ্রামে মানুষ, তাই ফচকে বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে ত বেটার বাপ। শহর টহরে আজকাল তিরিশ পঁয়ত্রিশের আগে বিয়ের কথাই কেউ ভাবে না। তবু ত ওই খড়কে-কাঠি স্বাস্থ্য! আর আমার— ?"

নীলকণ্ঠ স্ত্রীকে তার স্বাস্থ্যটা দেখাত। তা স্বাস্থ্যটা ওর বেশ ভালই। না বেঁটে, না লম্বা। মাঝারী। জলফুলো চেহারা নয়; গড়ন-পেটন মজবুত। মুখটা গোল, ছোট কপাল, লম্বা নাক, পাটি-সাজান দাঁত। শরীরের কোথাও এখনো টোল পড়েনি।

শরীরকে নীলকণ্ঠ ভালবাসত, শরীরকে সে রাখবার চেষ্টা করত। কলা-আতপ-চালের ভক্ত ছিল না নীলকণ্ঠ; মাংস-মদটাও খেত, দিশী মদ। ধর্মপুজোর মাঠটার এক কোণে যে ইঁট-বারকরা ভাঙা নাটমন্দিরটা রয়েছে, সেখানে কালী অপেরার মহড়া হত বছরে তিন কি চার মাস, কিন্তু বারমাসই নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য, মদন চট্টরাজ, কেষ্ট চক্রবর্তী আর দু-একজন মিলে আসরটা জমাত। ইঁটের ঠেকা দেওয়া তক্তপোশের উপর ধুলো-ভর্তি সতরঞ্চি বিছিয়ে দাবার সংগে দিশী টিশী চলত।

নীলকণ্ঠ পঁয়তাল্লিশে পৌঁছেও পরিশ্রান্ত হয়নি কেন, এর জবাব সে দিতে পারত। বলত, "আমি ত গঙ্গাজল ঠেকানো বামুন নই, সোমরস পান করা বামুন। বুঝলে হে চট্টরাজ, এখনো বসলে একসের চালের ভাত খেতে পারি—একটা ছোটখাটো পাঁঠা। আর যদি বল বিয়ে থা, কিরে কেটে বলছি রে চট্টরাজ, দুটো বউ ত হেসেখেলে সামলাতে পারি।"

নীলকণ্ঠ পারলেও নারায়ণী পারেনি। পনর বছর বয়স থেকে ছেলে বিয়োতে

শুদ্ধ করেছিল। প্রথমটা বেঁচে গিয়েছিল কী ভাগ্যে! তারপর ত বছরে বছরে বিয়োয় আর সেগুলো মরে। এরই মধ্যে মাধুটা মরে গেল, এবং শেষ বলতে বলাইটা। বলাইয়ের পর নারায়ণীর আরও তিনটে মরেছে। নিজেও সে মরল বাচ্চা বিয়োতে গিয়েই। সেপ্‌টিক, তারপর ধনুষ্টংকার।

নীলকণ্ঠ চা-টুকু অনেকক্ষণ আগেই শেষ করে কখন যেন বিড়ি ধরিয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল।

বলাইয়ের বিশ্রী একটা চিৎকারে চমকে উঠে নিজেকে ফিরে পেল। আ—ছাই, বাইরে যে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখন মুখ হাত ধুয়ে জামাটা চড়িয়ে ধর্মপুজোর মাঠে গিয়ে পৌঁছতে ত রাতই হয়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যেতে তাকে হবেই। চট্টরাজদের কাছে আজ ফটিক আঘোরীদের কথাটা বলতে হবে। নতুন পালা লেখার কথা।

নীলকণ্ঠ এলোমেলোভাবে ভাবছিল, কী পালা লেখা যায়, কোন্ পালা। ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে এল। গামছাটা তুলে নিল দড়ি থেকে। দাওয়ায় নেমে যাচ্ছিল হাত মুখ ধুতে। হঠাৎ রান্নাঘরের কাছাকাছি আসতেই থমকে দাঁড়াল। উনুনটা কাঠ দিয়ে দিয়ে গনগনে করে জ্বালিয়ে নিয়েছে কুসুম। সেই আঁচের মুখোমুখি পিঁড়ি পেতে বসে রয়েছে। গায়ের কাপড়টা একটু আলগা। ওই তাপ যেন সহ্য করতে না পেরে শাড়ি-জামা সামান্য ঢিলেঢালা করেছে।

গামছাটা বুকের কাছে অন্যমনস্কভাবে চেপে ধরে নীলকণ্ঠ তাকিয়ে থাকল।

এমনি হয় মাঝে মাঝে। সব থাকে, তবু হয় না। নীলকণ্ঠর তেমনই হচ্ছিল। পালা লেখার জন্যে গল্পের কি অভাব আছে! কাশীরাম আর কৃত্তিবাসের বড় ভক্ত নীলকণ্ঠ। উপাখ্যানের পর উপাখ্যান তার মুখস্থ। ঋতুপর্ণ, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, যে-কোনো একটা আখ্যান নিলেই হয়। শুধু কাঠামোটা। প্রাণটা ত নীলকণ্ঠর হাতে। লাল খেরো বাঁধানো খাতায় শরের অথবা পালকের কলমের টানে টানে নীলকণ্ঠ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। সে-ক্ষমতা তার আছে।

কিন্তু আশ্চর্য, কোনোটাই নীলকণ্ঠর মনোমত হয় না। কোনো উপাখ্যানই নয়। আজ হয়ত মনে মনে একটা পছন্দ করে, কাল ভাবতে বসে সেটা বাতিল করে দেয়। বিদুরকে নিয়ে একটা পালা প্রায় ছকে ফেলেছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু কী মনে করে আর লিখল না। না, অত ধর্মটর্ম-করা মানুষ নিয়ে তার চলবে না। মানুষটার কোনো তেজ নেই, বীর্য নেই, ক্রোধ নেই। যেন গাছ কিংবা পাথর। নীলকণ্ঠর আবার এ-সব পছন্দ হয় না। কটা পালা লিখেছে আগে, এদের মতন মানুষ নিয়ে, কিন্তু সেগুলোই গেছে, ভাল জমাতে পারেনি। তেমন প্রাণের টানই পায় না নীলকণ্ঠ এইসব সরল সাদামাটা মানুষের কথা লিখতে বসে।

নীলকণ্ঠর পছন্দর ধরনটা অন্যরকম। "মন্দ যদি না থাকল তবে মানুষ কী হল।" চট্টরাজ, রায়—এদের বোঝাতে নীলকণ্ঠ, "আমরা স্বর্গে থাকি না হে, মর্তে থাকি। এখানে মায়ে-বেটায় সতীন-মতন হয়, বাপে-ছেলেতে লাঠালাঠি করে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা লড়ে—বুঝলে! ও সব যুধিষ্ঠির টুধিষ্ঠির নয়, উরা কি মানুষ নাকি—! হ্যাঁ লেখ দিকি একটা পালা দুর্যোধনকে নিয়ে, কি দুঃশাসনকে—জমে যাবে। কেনে, আমি যে কৈকেয়ী পালাটা লিখেছিলাম গ, দেখলে ত কতবার গাইলাম পালাটা।"

মুশকিল এই যে, নীলকণ্ঠর পছন্দমতন চরিত্র কি আখ্যান যা ছিল আগেই ফুরিয়েছে। এখন আর নতুন করে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ ফটিক আঘোরীরা সময়মতন বায়না করে গেছে। নীলকণ্ঠ টাকাটা নিয়েছে, কাগজে সইও দিয়েছে। ফটিক আঘোরীকে এ-কথাটা বলতে পারেনি নীলকণ্ঠ যে, তার মাথায় আর নতুন পালা আসছে না। বলা মানে ত নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া। আঘোরীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, নীলকণ্ঠের ক্ষমতা সত্যিই গেছে।

নীলকণ্ঠ তা পারে না। ভাবতেও তার আপত্তি। এটা নিছকই ভাগ্য যে, বামুনের ঘরে জন্ম নিয়েছিল নীলকণ্ঠ, তার সাত

মুখুজ্যেদের বুদ্ধিটাই ছিল যাজকের, দরকারের দালানটায় বেঁধে ঘরে ঘরে ঘণ্টা নাড়তে আর চাল কলার সিধে আনতে যাওয়া। নরেন্ত আসল ও অন্য মানুষ। স্বভাবে খানিকটা নাস্তিক, খানিকটা অবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, সুখ আর ভোগের প্রত্যাশী। আর মনে মনে মানুষটা শিল্পী। শিল্পী ছাড়া কীই বা হতে পারে। কৈশোর থেকে যাত্রাগানে তার মন মজে গিয়েছিল। তখন থেকেই গাঁয়ের যাত্রায় পার্টটার্ট করত। তারপর দিনে দিনে এটা তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। সাংঘাতিক নেশা। নিজের একটা দলই গড়ে ফেলল নীলকণ্ঠ—"কালী অপেরা।" এ কালী মা-কালী নয়, কালিপদ বসাক। টাকা দিয়েছিল প্রথমটায় যাত্রার দল গড়তে, তাই তার নামে নাম।

নীলকণ্ঠ দল গড়েছে, দল বজায় রেখেছে ; কাছাকাছি শুধু নয়, দূরে দূরে গ্রামে পালা গেয়ে এসেছে, কলকাতার দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুনাম লুটে নিয়ে এসেছে। পালাও লিখেছে নতুন নতুন। একটা পালা ত চিৎপুরের তরুণ অপেরারা কিনে নিল। সেটার ছাপা বই পাওয়া যায় কলকাতায়। পাঁজিতে তার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

এ-হেন নীলকণ্ঠ আজ আর নতুন পালা লেখার বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। মনে যাকে যাও বা একটা বাছে, কিছুক্ষণ পরেই সেটা মনে হয় পুরনো, অচল। খুঁতখুঁত করে মন। নীলকণ্ঠ বাতিল করে দেয়।

ফটিক আচার্যির কাছ থেকে বায়না নেবার পর বিশটা দিন কেটে গেল, নীলকণ্ঠ কিছু ঠিক করতে পারল না, একটা লাইনও লিখতে পারল না।

ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। মনে মনে ভীষণ একটা অস্বস্তি আর অক্ষমতার মোহে পড়েছিল। সময় তো আর বেশী নেই। পালা লিখতে হবে, মহড়া বসাতে হবে, দরকার হলে নাচের মাস্টারকে দিয়ে ছোঁড়াগুলোকে আরও নতুন নতুন নাচ শেখাতে হবে। নীলকণ্ঠ তার ঘরে সারাদিন বসে বসে কাশীরাম দাসের মহাভারতটার পাতা উল্টে যায়। মাঝে মাঝে কোনো একটা পাতায় চোখ রেখে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। তারপর বইটা বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, জানলা দিয়ে ঢেঁকশাল আর কলাগাছের ঝোপটার দিকে চেয়ে থাকে।

চাটুরাজ সেদিন শুধল, "কী হে, ভট্চাযি লিখছ নাকি কিছু?"

"না।" আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠের মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চাটুরাজ বললে, "হল কী তুমার, অ্যাঁ—!" একটু থেমে আবার, "পরিবারটা মরে তুমার মাথাটাই গণ্ডগোল হয়ে গেল যে হে! এটা ছাড়লে, সেটা ছাড়লে—পালা লেখাটাও ছাড়লে তুমি!"

নীলকণ্ঠ কোনো জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বন্ধুর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থেকে শেষে অবশিষ্ট তাড়িটুকু একচুমুকে গলায় ঢেলে দিল।

পরের দিন নীলকণ্ঠ ভীষণ একটা জেদ নিয়ে সকাল থেকেই নতুন একটা খাতা খুলে বসেছিল। সস্তা একটা কাঠের চেয়ার। শরের আর পালকের কলম। এক দোয়াত কালি। কাশীরাম দাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণটা পাশে। এক বাণ্ডিল বিড়ি। দেশলাই।

সকালটা কেটে গেল। একটা অক্ষরও

লিখতে পারল না নীলকণ্ঠ। দুপুরে স্নান-খাওয়া করে আবার বসল। নতুন এক বাণ্ডিল বিড়ি আর এক কৌটো পান নিয়ে। পানের সংগে বিড়ির ধোঁয়া এমন একটা আচ্ছন্ন তন্দ্রা আনল যে, নীলকণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। ডোবার ও-পারের ধুধুল-ঝোপে ফুরনো বিকেলের ম্লান একটু আলো। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে নীলকণ্ঠ ডেস্কের দিকে তাকাল। খেরোয় বাঁধানো খাতাটা তেমনি পড়ে আছে। রামায়ণ মহাভারতটাও পাশাপাশি সাজানো।

মুখেচোখে জল দেবার জন্যে খড়মটা পায়ে গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নীলকণ্ঠ। পুবদিকের দাওয়ায় দড়ির খাটিয়াটায় ললিত বসে আছে। খুব অন্যমনস্ক। খেয়াল নেই কিছু। নয়ত নীলকণ্ঠর খড়মের শব্দে চোখ ফিরিয়ে তাকাত অন্তত একবার। বলাইটা এক বাটি মুড়ি নিয়ে সদরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনমনে ছড়া কাটছে।

নীলকণ্ঠ খড়মের শব্দ তুলে মুখ-হাত ধোবার জায়গাটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। মুখ-চোখে জল দিতে গিয়ে যেন চোখে পড়ল হঠাৎ। তাকাল নীলকণ্ঠ। গোয়ালঘরের পাশটায় দোপাটি আর মোরগ ফুলের ঝোপটার কাছে কুসুম। এই অসময়ে কেন? মুখটা দেখা যাচ্ছিল না কুসুমের। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে শশাগাছের মাচাটা যেন ঠিক করছে। অথচ ও-মাচা ঠিক করার কিছু নেই।

নীলকণ্ঠ উঠে পড়ল। ঘরের দিকে এগুতে গিয়ে একবার একটু দাঁড়িয়ে ললিতের দিকে তাকাল। না, এখন আর বেঘোরে নেই ছেলেটা। বাপের দিকেই তাকিয়ে আছে।

কী ভেবে নীলকণ্ঠ ছেলেকে কাছে ডাকল। সামনে এসে দাঁড়াল ললিত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের মুখটা দেখল নীলকণ্ঠ। কেমন যেন বোকা-বোকা নিরীহ ভাল মানুষ গোছের মুখ। গোলগাল। নীলকণ্ঠর হাসি পায়। পুরুত-বংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর মুখই বটে। অর্থহীন, দুর্বোধ্য কতকগুলো মন্ত্র আউড়ে যেতে এর কোথাও বাধবে না। ছেলের সংগে বন্ধুর মতন একটু যেন ঠাকুর রসিকতা করে বসল নীলকণ্ঠ, "কী হে বাপ, আজ ঘণ্টা নাড়তে যাবে নাই কুথাও?"

মাথা নাড়ল ললিত। হ্যাঁ, যাবে। লক্ষ্মীপুজো আছে সিংহীদের বাড়িতে।

ঠিক, ঠিক। আজ লক্ষ্মীবার। নীলকণ্ঠ ভুলেই গিয়েছিল।

"আর উটার কী হল? জমির আলটার? হারু গোমস্তার কাছে গিয়েছিলে নাকি?"

ললিত এবারও মাথা নাড়ল। গিয়েছিল গোমস্তার কাছে। মিটমাট হয়ে গেছে সব।

"বেশ, বেশ।" ছেলেকে বাহবা দেবার মত করে শব্দটা উচ্চারণ করলে নীলকণ্ঠ। একটু থেমে বললে, "রাতে একবার আমার কাছে এস হে, কথা আছে কটা।"

নীলকণ্ঠ আর দাঁড়াল না। খড়মের শব্দ তুলে নিজের ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে আবার চুপচাপ। কটা বিড়ি পর পর শেষ করল নীলকণ্ঠ। খেরোয় বাঁধান খাতার সাদা পাতাগুলো অনর্থক উলটে গেল। নামল তক্তপোশ থেকে। পায়চারি করল ক'বার। জানলায় এসে দাঁড়াল। ডোবার কালো জলের একপাশে একটা হাঁস এখনো খাবার খুঁটছে। ডাবগাছের লম্বা ছায়া ডোবা ডিঙিয়ে কোথায় যেন অন্ধকারে মিশে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীলকণ্ঠ নিজের অস্থিরতা নিজেই বুঝতে পারছিল। মনের মধ্যে অনেককাল পরে সেই বিশ্রী চাঞ্চল্য আবার এসেছে। আবার সেই তুষের জ্বলন। একটা কথা যেন ভয়ংকর অন্ধকার থেকে খানিকটা মুখ বার করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছে।

ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। কপালে একটু একটু ঘাম জমছিল। নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিল মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যা দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে রোজকার মতন আজও লণ্ঠন রাখতে কুসুম ঘরে এল।

নীলকণ্ঠ বললে, "একটু জল খাওয়াও ত!"

জল দিয়ে গেল কুসুম। নীলকণ্ঠ যে কী ভীষণ তৃষ্ণার্ত ছিল, জলের ঘটিটা শেষ করে তা যেন বুঝতে পারল।

লণ্ঠনটা ডেস্কের উপর চাপিয়ে হঠাৎ খেরোয়-বাঁধানো খাতাটা খুলে ফেলল নীলকণ্ঠ। সাদা পাতাগুলো যদিও সাদা—তেমনি নীরব ছিল, তবু নীলকণ্ঠ এখন যেন ওই সাদা পাতার মধ্যে অনেক অনেক কালো রেখা দেখতে পাচ্ছিল। অজস্র কথা।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। হাতটা সরিয়ে নিল খাতা থেকে। ঘরের চারপাশে তাকাল। না, কেউ নেই। লণ্ঠনের শিখাটা আরও খানিক বাড়িয়ে দিল।

নীলকণ্ঠ মনে মনে সত্যিই ভেবে নতুন একটা পালা তৈরি করে ফেলেছে, এতদিন চুপচাপ থাকেনি। অবশ্য পালাটা শেষ হয়নি, হয়ত অর্ধেকও নয়, তবু অনেকটাই হয়েছে।

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ। কিন্তু অনুভব করতে পারছিল, পঁয়তাল্লিশ বছরের কঠিন তামাটে মুখটা এখন আঁচে ঝলসে যাচ্ছে। নিশ্বাস তপ্ত। চোখের মধ্যে সাংঘাতিক একটা জ্বালা, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। অসহ্য। নীলকণ্ঠ ঘামছিল দরদর করে।

সাড়াশব্দ নয়, কিন্তু নীলকণ্ঠ বুঝতে পারল। পাথরের গেলাসে চা নিয়ে কুসুম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দৃষ্টিটা স্বচ্ছ নয়, একটু ঘোলাটে, খানিকটা হয়ত বিকারের রোগীর মতন। লণ্ঠনের শিখাটা আচমকা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ কুসুমকে দেখতে লাগল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কুসুম। ভয় না, শুধু অবাক চোখেই সে তাকিয়ে ছিল। চায়ের গেলাসটা হাতে ধরেই।

লণ্ঠনের বাড়ান পলতেয় শিস উঠে কাঁচটা কালো হয়ে এল। ঝাপসা আর অন্ধকার দেখাচ্ছিল কুসুমের গোটা শরীরটাই। নীলকণ্ঠ চোখের দৃষ্টিকে হয়ত আরও তীক্ষ্ণ, আরও উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করল। পারল না। তার আগেই শিসের কালোয়-কালোয় লণ্ঠনের সমস্ত কাঁচটা ভরে গেছে। চিড় খাওয়ার শব্দ করে কাঁচটা ফেটে গেল।

এতক্ষণ যেন নিজেকে ফিরে পেল নীলকণ্ঠ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের শিখটা কমাতে গেল। বেকায়দায় হাত লেগে লণ্ঠন ডেক্স থেকে উলটে তক্তপোশে পড়ল। নিভে গেল কয়েকটা লিকলিকে আঁকাবাঁকা ফণা তুলে।

অন্ধকার। কুসুমকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

গেছে। ললিত এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে, বাবার মুখোমুখি। নীলকণ্ঠ তন্ময়। কিছু দেখেনি, কাউকে নয়। দীর্ঘ একটা অংশ লিখে মুখ তুলল। সেই তন্ময়তার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে পড়ে যেতে লাগল সদ্য-লেখা অংশটা।

নীলকণ্ঠর স্বরে অদ্ভুত এক বেদনা এবং বিষণ্ণতা আর ব্যাকুলতা। কী কাতর কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল না, এটা নাটকের অভিনয়। বুক থেকে প্রত্যেকটি কথা যেন স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসছিল। শাপ-গ্রস্ত জরাভীত, ভোগী এক পুরুষ কাতর-কণ্ঠে যৌবন ভিক্ষা করছে। আমি সুখের অভিলাষী, আমি ভোগের ভিক্ষুক, আমি বিলাসে ক্লান্ত হইনি, আমার দেহ এই অকালে শ্লথচর্ম, লোল হয়ে যাবে—; না, না—এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখনো যে আমার ভোগ্য ধেনু আছে, সুরা আছে, ফল আছে, পুষ্প আছে, নারী আছে, শত-সহস্র সুখ আছে এই বসুন্ধরায়। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করো না। "তৃপ্ত নাহি, ক্লান্ত নাহি—; আসঙ্গ জ্বালায় জ্বলে এ-দেহ নিয়ত। প্রার্থনা আমার পুত্র পূর্ণ কর তুমি। আমি যে তোমার পিতা, নৃপতি যযাতি—!"

নীলকণ্ঠ নয়, রাজা যযাতি যেন পুত্র পুরুর কাছে করজোড়ে ভিক্ষুকের মতন অশ্রুসজল কণ্ঠে ক্ষীণ একটা আবেদন জানিয়ে কাতর প্রত্যাশী চোখে চেয়ে থাকল।

ললিত কথা বলতে পারছিল না। বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল তার। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় যযাতিকে সে চিনতে পারল সহজেই।

"বাবা—।" ললিত আচমকা ডাকল।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। ললিত সামনে দাঁড়িয়ে। একেবারে মুখের কাছটিতে। আর কেউ নেই। লণ্ঠনের একটু আলো—আর পিতা-পুত্র।

নীলকণ্ঠ যেন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল। পারছিল না।

ললিত খুব মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললে, "মেয়েছেলে বাসায় না থাকায় বড় অসুবিধা ঘটছে। একটা বিয়ে করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।"

ললিত আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীলকণ্ঠ চুপ। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে ললিতকে একবার ডাকে। ডাকতে পারছিল না। লণ্ঠনের শিখাটা যযাতির চোখের মতন জ্বলছে।

নতুন করে বাতি জ্বালিয়ে সত্যি সত্যি নীলকণ্ঠ এতদিন পরে আজ পালা লিখতে বসে গেল। কী সহজে এবং অক্লেশে এখন কথাগুলো আসছে। এতদিন কোথায় ছিল এই কথা, কোন্ অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল!

দু-চক্ষু ছত্র করে লেখে নীলকণ্ঠ আর থেমে গিয়ে আবেগ-কাঁপা গলায় জোরে জোরে পড়ে। যেন অভিনয় করছে। গলার পর্দা কোথাও চড়িয়ে, কোথাও আস্তে করে; কোথাও ব্যাকুলতা, কোথাও মিনতির সুর ফুটিয়ে পড়ে যায়।

খেয়াল ছিল না নীলকণ্ঠর, রাত হয়ে

সারাটি
বছর
অম্লান আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক
আপনাদের গৃহ; মুছে যাক অতীত কর্মের
যতো বেদনার স্মৃতি ।
স্মরণে রাখবেন, বেদনা, মাথাব্যথা, সর্দি
এবং জ্বরের উপশমে এনাসিন দ্রুত, নিরাপদ
ও অব্যর্থ ফলপ্রদ ।
'এনাসিন'
ট্যাবলেট
বেদনার উপশমের জন্য
ভারতে প্রস্তুতকারক:
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
ম্যাগনেট হাউস, ডুগাল রোড, বোম্বাই-১ ।
ট্রেডমার্ক স্বত্বাধিকারী: হোয়াইটহল ফার্মাকল কোং, নিউইয়র্ক, ইউ, এস, এ,

শিল্পী-জীবনের সার্থকতা

শ্রীদেবকীকুমার বসু

মানুষ স্বভাবতই স্বপ্নবিলাসী। যা তার নাগালের বাইরে, তাকেই কেন্দ্র করে কত দিবা-স্বপ্ন রচনা করে মানুষের মন। কিন্তু জাগ্রত প্রতিদিনের জীবনে সত্যকে তুচ্ছ করে যে দিবাস্বপ্ন রচিত হয়, এ ক্ষণিক তৃপ্তি দিলেও, সাবানের ফেনা দিয়ে গড়া রঙিন ফানুসের মতই সেই স্বপ্ন রূপে-রঙে বিচিত্র হয়ে যত স্ফীত হতে থাকে ততই মুহূর্তে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে তা এগিয়ে যায়। ক্ষণিকের নেশায় অনেক সময়ে এই নিশ্চিত পরিণতির কথা আমাদের মনে

ডি-লুক্স নিবেদিত "অঞ্জনা" চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে গ্রামবধূর ভূমিকায় দেখা যাবে

থাকে না। আমরা ভুলে যাই যে, বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে এই ফেনায়িত বুদ্বুদের ঘরে বাস করলে জীবনের সত্যিকার রূপ-রঙ-রসের বোধও নষ্ট হয়ে যায়।

আর্টের ক্ষেত্রে—বিশেষ করে সংগীত, নৃত্য, নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে—মানুষের এই স্বপ্নরচনা খুব গভীরভাবে ফুটে ওঠে। আর্ট যেন কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখা। বাস্তবের রূদ্র কঠিন খরতেজ নেই তার মধ্যে, অথচ অবাস্তবের অন্ধকার বিভীষিকাও তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে না। জাগরণ ও নিদ্রার মাঝখানে আর্ট যেন রঙিন গোধূলির আলোকমায়া। অথচ আর্ট অলীক নয়; আর্ট বাস্তবকেই দেখে, মাধুর্যের আবরণের মধ্য দিয়ে।

আমি মনে করি, ধর্মসাধনার মতই আর্ট সত্যধর্ম। যদিও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আর্ট ধর্মের মত সর্বাদিকে সূর্যসম জ্বলন্ত সত্যের স্পষ্ট রূপ দেখতে পায় না। আর্টের সাধনায় এ-ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয়; তবু আর্ট যেন সেই সত্যকেই দেখে তটস্থ লক্ষণে। রুদ্রের আনন্দ-স্বরূপকে শুধু তাঁর স্বরূপে না দেখে আর্ট তাঁকে দেখাবার চেষ্টা করে ছন্দের আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে নটরাজরূপে।

কিন্তু এ-রূপও শুধুমাত্র বিলাস নয়, এ শুধু নৃত্য, গান, অভিনয় নয়। শুধু সংগীত আর্ট নয়, সংগীত যাকে সম্যকরূপে উদ্গীত করে তাই-ই আর্ট। নৃত্যের মুদ্রা আর্ট নয়। মুদ্রার অন্তরালে যোগীর মত যে-শিল্পী হাতের মুদ্রাকে, দেহের বিক্ষোভকে দেহাতীতের শান্তবোধে সমাহিত করতে পারেন, তিনিই সত্যিকার শিল্পী। এমনি চিত্রাঙ্কন, অভিনয় প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রেও সকল আর্টের সার্থকতা।

শিল্পসৃষ্টির আঙ্গিকটাই সব নয়। রূপের মধ্য দিয়ে যিনি অরূপকে, দেহের মধ্য দিয়ে যিনি দেহাতীতকে ধরবার চেষ্টা করেন, তিনিই আর্টিস্ট নামের যোগ্য।

শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেমন পরম আনন্দ আছে, তেমনি ছন্দঃপতনের মত এর বিচ্যুতি ঘটলে ধ্বংসও আছে। যে-আর্টিস্ট জীবন-সত্য থেকে স্খলিত হয়ে ছুটে চলে, সে মরুভূমির প্রখর সূর্যতাপকে এড়াতে গিয়ে স্নিগ্ধ মরূদ্যানে যাবার চেষ্টা না করে কেবলি ছুটতে থাকে এক মৃগতৃষ্ণিকা থেকে অন্য মৃগতৃষ্ণিকার উদ্দেশে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরালে ও ঊর্ধ্বে যে মহাসত্য, শিব ও সুন্দর সদাবিরাজিত, তার সঙ্গে সেই শিল্পীরই জীবনের যোগ সিদ্ধ হবে যিনি শিল্পকে মূর্ত করেন নিজের ধ্যান দিয়ে, তিলে তিলে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

শিল্পের এই সার্থকতার সন্ধান যিনি না পান, তাঁর জীবনে তথাকথিত আর্ট দুঃখই আনে, মোহ আনে। অজস্র অর্থ ও অপরিমিত খ্যাতির মধ্যে বাস করেও কোন

সানরাইজের নূতন ছবি "পুত্রবধূ"র একটি দৃশ্যে চন্দ্রাবতী ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়.

হারজিৎ

আর. আর. পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের চিত্র

ভূমিকায়

উত্তম ★ অনিতা ★ বসন্ত ★ মলিনা ★ পাহাড়ী ★ কমল ★

পরিচালনা— মানু সেন

সঙ্গীত— রবীন চ্যাটার্জী

গীত— প্রণব রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র

আর্টিস্টের মনে হতে পারে, এই বহু জীবনব্যাপী সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, নাটক, চলচ্চিত্র, এই রঙিন স্বপ্ন সবই বৃথা; এ শুধু স্বপ্ন, শুধু নেশা। অভিনেতার নাট্য-প্রতিভার সার্থকতা সেইখানে যেখানে তিনি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনয়কে অতিক্রম করে প্রাচীন বাঙালী কবির মত বলতে পারেন, "এ ভব রঙ্গমাঝে রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সে তা সাজে।"

বহু বিচিত্র চরিত্রের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জীবনকে বোঝবার অতুলনীয় সুযোগ অভিনেতার জীবনেই আছে। বহু জীবনের সত্যকে যে-অভিনেতা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি অভিনয়কে অতিক্রম করে জীবনের সত্য পথে এগিয়ে গেছেন। এইখানেই শিল্পী-জীবনের সার্থকতা।

তাই অভিনেতার জীবনকে আমি সাধনার জীবন বলে মনে করি। অপরের জীবন অভিনয় করে যদি আমরা বুঝতে পারি যে, অনেক কষ্টের মধ্যেও মানুষের জীবনে বহু সুখ, অপরিসীম আনন্দ আসতে পারে, যদি কোন-একটি বিশেষ ভূমিকাকে আমরা আঁকড়ে না থাকি, যদি কোন একটি বিশেষ ভাবধারা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে না গিয়ে থাকে, অভিনেতৃ-জীবনের বিস্তার তাহলে ঘটবে। কোথাও আটকে গেলেই আর্টিস্ট নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেইটাই হয় তার জীবনমৃত্যু।

মানুষ মৃত্যুকে যত না ভয় করে, তার চেয়ে বেশী ভয় করে এই জীবনমৃত্যুকে। আমি ধনী, আমি বড়, আমি আর্টিস্ট, আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমি শিক্ষক—এ সব সম্পূর্ণ কথা নয়। সম্পূর্ণ সত্য এই যে আমি মানুষ—সব রঙে, সব রূপে, সব ভাবে। সংসার গোলক-ধাঁধায় সবাই ঘোরে যে ঘোরে, যার বুদ্ধি কোন বিশেষ ঘরে আটকে না যায়, সে-ই এই সংসারের গোলক-ধাঁধাকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে ওঠে গোলোকের আনন্দলোকে।

গত বছর এক ভারতীয় প্রতিনিধিদল রাশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সেদলের এক সভ্য জানান যে, সারা রাশিয়ায় তিনি রাজ কাপুরের যে জনপ্রিয়তা দেখে এসেছেন, তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। শুধু রাজ কাপুরই বা কেন, ভারতের যে-সকল সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল রাশিয়া ও চীনে গিয়েছেন সেসব দলের শিল্পী প্রতিনিধিবৃন্দ ওদের দেশে প্রত্যেক স্থানে যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন তা সংবাদ-চিত্রে না দেখলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হত।

বিদেশের কথা কেন, আমাদের দেশেই বা কম কিসের? কোথাও কোন আসরে শিল্পীদের সমাবেশ ঘটলে ভিড়ে ভিড়ে ভরে যায় আশপাশের অনেকখানি স্থান। লাঠি এবং অনেক সময় কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে পুলিসকে ভিড় সামলাতে হয়। কত অপ্রিয়-ঘটনা ঘটে যায়। কেন এমন হয় তার অনেক কারণ। তবে মূলে এও সেই আদিকালের মানুষের রূপকথার রাজপুত্রের রাজকন্যাকে দেখবারই ঝোঁক। শিল্পীদের, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের শিল্পীদের লোকে ঠিক ঐ চোখেই দেখে। যেন রূপকথার রাজ্যের লোক ওরা। সাধারণ মানুষ স্বপ্নে যে জীবনকে দেখে, বর্ণে বর্ণে ও রূপশোভায় ঝলমল যে জীবন সাধারণের মনে একটা মায়াময় জগৎ প্রভাসিত করে দেয়, শিল্পীরা যেন সেই জীবন ও সেই জগতেরই অধিবাসী। চিত্রনির্মাতারাও মানুষের এই স্বভাবজ দুর্বলতাকে আশকারা দেবার ব্যবস্থা করে যান অবিরাম। অভিনয়শিল্পীদের তাঁরা একেবারে আকাশে তুলে ধরেন। তাঁদের পরিচিত শিল্পী বলে নয়, তাঁদের অভিহিত করা হয় তারকা বলে। সাধারণ মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের স্বপ্নাকাশে মোহজাল বিস্তার করার যত রকমের পন্থা চিন্তায় আনা সম্ভব তা সবই খাটিয়ে নেওয়া হয় তারকাদের জনপ্রিয় করে রাখার জন্যে। নাম যদি কারও হয়

অগ্রগামী প্রোডাকসনের 'শিল্পী'র নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

"জনার্দন" ত তাকে বদলে হয়ত করা হয় "অরূপকুমার", "মন্দাকিনী" হয়ে দাঁড়ান হয়ত "সুছন্দা"। এমনিই এনে দেওয়া হয় নামের বাহার। আর, নামের বাহারকে আরও অলঙ্কৃত করে তোলার জন্য বাছা বাছা বিশেষণ যোগ করাও আছে। তারপর আছে সাজপোশাকের ফ্যাশান। আছে কাগজে কাগজে ছবি ছাপাম যাতে কোন জনপ্রিয় শিল্পী তথা তারকা সর্বক্ষণই লোকচক্ষুর সামনের সবটুকু দৃশ্য জুড়ে দেদীপ্যমান থাকে। এছাড়া সময় সময়ে তারকার নামে শাড়ি বা অলঙ্কারের নামকরণ; কোন তারকার নামে প্রসাধন-সামগ্রীর সার্টিফিকেট; ক্যালেণ্ডারে ক্যালেণ্ডারে তারকাদের ছবি,—এইভাবে সজ্জা ও শয্যায়, দৃষ্টির মনে ও মনের দৃষ্টিতে সব সময়েই তারকাদের ঘিরে একটা রূপকের প্রতীতি সাধারণের গোচরে ধরিয়ে

"মধুমালতী"র নায়িকা কাবেরী বসু

রেখে দেবার চেষ্টা থাকে। তারকাদের জন্য রকমারি উপায়ে মানুষের কৌতূহলকে উদ্বেগে চড়িয়ে রাখার বহুবিধ উপায়ের অন্ত নেই। এইভাবে তারকাপ্রিয়তা লোকের মনে এমন একটা পরিবেশ রচনা করে দেয়, এমন একটা দুরন্ত, দুর্বার কৌতূহল যে, পর্দা বা মঞ্চের বাইরে কোন তারকাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া তাদের কাছে একটা যেন বিরাট বিস্ময়। তারকাদের জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে পারা, তাও যেন পরম বিস্ময়। আর পাঁচজন মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে তারকারাও ঠিক তেমনি পরিশ্রমী মানুষ, সেভাবেই খায়, ঘুমোয়, বিয়ে-থা করে, সন্তান-সন্ততীর জনক-জননী হয়, শোকসন্তাপে ভোগে, তাদের বিলাসবাসন আর সবারই মত।, কিন্তু তারকাদের এই বাস্তবিক জীবন লোকের যেন মনঃপুত নয়। তাই রূপকের অস্বাভাবিকতা জড়ানো জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি ওদের সম্পর্কে রঙ চড়িয়ে বানিয়ে বানিয়েও প্রকাশ করা হয়। গৃহস্থ সংসার

"হারজিত" ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে অনীতা [illegible]
নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে

মানুষ তারকাদের জীবনের এ পরিচয়টা লোকের সম্মুখে চাপাই রেখে দেওয়া হয়। নায়িকার চরিত্রে যিনি অবতরণ করেন যদি জানা যায় যে, তিনি বিবাহিতা, জননী এবং গৃহিণীও, তাহলে তার জনপ্রিয়তা কমে যায়। স্বাভাবিক জীবন যেন তারকাদের নয়, লোকেরও ধারণা এবং বিশ্বাস তাই, আর সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে রাখারই চেষ্টা হয় ব্যবসায়িক স্বার্থের দিক থেকে।

আজ এমন হয়েছে যে, বেশ সুস্থবুদ্ধি লোকও মনে ধরে নিয়ে বসেছেন যে, তারকারা সত্যিই কল্পলোকের মানুষ। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তারকাদের নিজেদের জীবনে সামনাসামনি আবির্ভূত হওয়াটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর সকলের মত তারা স্বচ্ছন্দে পথেঘাটে বার হতে পারেন না। অনেক তারকার হয়ত একটা এই আত্মপ্রসাদ থাকে যে, তাঁকে অবাক-চোখে দেখবার জন্য এত ভিড় হয় যা আর কোন ক্ষেত্রের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে হয় না। কিন্তু তাঁদের নাকালেরও অন্ত থাকে না। তারকাদের দেখবার জন্য হুজুগে অনুরাগীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অভিনয়-শিল্পীকে "তারকা" পদবাচ্য করে জনপ্রিয় হওয়ার পথে এগিয়ে দেন চিত্র-ব্যবসায়ী এবং জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ালে সেই জনপ্রিয়তাকেই ব্যবসার সাফল্যের জন্য তাঁরা খাটিয়ে নিতে থাকেন। জনপ্রিয়তা কিন্তু বড় ভঙ্গুর। কে যে কখন সাধারণের চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়াবে তার কোন স্থিরতা নেই। জনসাধারণের শিল্পী-প্রীতি বড় সাময়িক, বড় চঞ্চল। আজ যাকে নিয়ে লোকে হৈ চৈ করছে, কাল দেখা গেল তার আর কেউ নামও করে না। সেই তারকার তখন যে কী সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়ায়, তা চাপা থাকতে থাকতে প্রকাশ হয়ে পড়ে অতি দুঃস্থ অবস্থার রোগের তাড়নায় একদিন তাঁর মৃত্যুর পর। সকলেরই যে এমন চরম গতি হয় তা অবশ্য নয়, অনেক ভাগ্যবান আছেন যাঁরা শেষ জীবন পর্যন্ত অভাব বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন। কেউ হয়ত ভালভাবে, কেউ হয়ত মন্দমন্দভাবে। তবে জনসাধারণের প্রীতি থেকে বঞ্চিত বেশির ভাগ শিল্পীকেই বড় দুঃস্থ অবস্থার মধ্যেই বাকী জীবন অতিবাহিত করে জীবননাট্যে যবনিকাপাত করে যেতে হয়। এক এক করে কতজনের কথাই ত মনে পড়ে। জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, রবি রায়, নরেশ বসু—আরো অনেক নামই করা যায়, যাঁরা জীবনে খ্যাতি পেয়েছেন কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। অথচ একদিন সকলেই ভাল চাকরে ছিলেন, এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকেই অবসর করে নিয়ে তাঁরা তাঁদের নাট্য-প্রতিভা দেখিয়ে চমৎকৃত করেছেন, যশ অর্জন করেছেন, জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের কাজে তাঁরা দক্ষতাও দেখিয়ে এসেছেন। একদিন তাঁরা

উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের "নীলাচলে মহাপ্রভু"র একটি দৃশ্যে
অহীন্দ্র চৌধুরী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্চ ও পর্দার সেবায় তাঁদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার তাগাদায় হাতের বাঁধা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। মঞ্চ ও পর্দার কাজ করে জীবনধারণের অনিশ্চয়তার কথা জনপ্রিয়তার শিখরে বসে কেইবা ভাবতে পারে! তাঁরাও তা ভাবতে পারেননি। কিন্তু একদিন যখন দেখতে পেলেন যে, জনপ্রিয়তার গদি তাদের খালি করে দিতে হচ্ছে তখন ধ্যানেজ্ঞানে, চিন্তায়-স্বপ্নে অভিনয়জগতের সঙ্গে নিবিড় হয়ে জড়িয়ে থাকার পর আর তাঁদের অবস্থা থাকে না অন্য রকমের কোন কাজ হাতে নেবার। লজ্জা আসে, সংকোচ আসে, নিজেকে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র পৌঁছে দিতে দ্বিধা আসে, আর তার উপর মনে জমা হয়ে যায় আশার উপরে আশা। যদি কখনো আবার দিন ফিরে আসে! কিন্তু সে-রকম ঘটনা বড় কচিৎ। শিল্পকে ব্যবসার সামগ্রী করে তোলার এই হল স্বাভাবিক পরিণতি। জনপ্রিয়তা অর্জন করা কার না জীবনের স্বপ্ন ও কামনা?—কিন্তু পরিণামের অনিশ্চয়তার কথা একরকম স্থির জেনেও প্রতিভার দল ব্যবসার চাহিদা পরিপূর্ণ করার জন্য সর্বদাই হাজির রয়েছেন এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-বিসর্জন দেবার জন্য।

ছবি বা নাটকের ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরা ত ওঁত পেতেই আছেন। কেউ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে দেখলেই শুধু তাঁদের দিয়েই ছবি বা নাটক করে ব্যবসা করার দিকেই তাঁদের তৎপরতা। তৈরী জনপ্রিয় শিল্পী হাতে না জোটে, কাউকে অন্য ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে প্রচারে প্রচারে জনপ্রিয়তার গদিতে বসিয়ে তাঁকে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রচারের মর্যাদা কেউ রাখতে পারে ত ভাল, নয়ত নতুন কাউকে ধরা হবে। ব্যবসাদার বলবেন, তিনি ত অর্থনীতির রীতি মেনেই চলছেন। যার যখন চাহিদা তাকেই তিনি বাজারে পেশ করছেন বা বাজারে নতুনের চাহিদাই তিনি মেটাচ্ছেন। কিন্তু এতে শিল্পী মরেন, আর সেইসঙ্গে শিল্পও মরে।

পৃথিবীর যে-দেশেই ছবি ও নাটক ব্যবসার ধাপে রয়েছে, সে-দেশেই এই একই অবস্থা। কারণ, ব্যবসা চালাতে গেলে নতুন উপাদানের জোগাড় সব সময়েই রাখতে হয়। নতুন কাহিনী, নতুনভাবে বর্ণনা, নতুন ভাবসঞ্চার, নতুন আঙ্গিক, আর তার জন্য নতুন নতুন শিল্পী, এইটেই হল লোকের চাহিদা। যে-প্রতিভাবান শিল্পী নিজেকে সর্বসময়েই নতুনের মত করেই উপস্থাপিত করতে পারেন, তিনি নিজেকে অনেককাল চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু অমন প্রতিভাবান এবং সেইসঙ্গে দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পী কজনই বা সৃষ্ট হয় যাঁরা চিরকালই দর্শকদের তাঁদের ব্যক্তিত্বের ও শিল্পদক্ষতার প্রভাবে আচ্ছন্ন করে রেখে যেতে পারেন? কজন হতে পারেন শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস? আর কজনই বা অশোককুমারের মত ভাগ্য নিয়ে আসেন যিনি পঁচিশ বৎসর ধরে জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অধিরোহণ করে থাকতে পারেন অম্লান হয়ে। ব্যবসাদাররা তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, শিল্প চুলোয় যাক, জনপ্রিয় শিল্পীকে আঁকড়ে থাকলে ব্যবসার সাফল্য বিষয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই হল শিল্পপ্রথা উদ্ভবের মূল সূত্র। যা থেকে হয়েছে শিল্পী ধরে ছবির বা নাটকের পরিকল্পনা। শিল্পের মূলে এই হল সব-

প্রভাত প্রোডাকসনের বহু-আলোচিত "মা" ছবির একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও অসিতবরণ

চেয়ে সাংঘাতিক কুঠারাঘাত। এইটেই সবচেয়ে বড় অনর্থ।

এখন সাধারণত যা হয় তা হচ্ছে, নাটক বা ছবির জন্য কোন কাহিনী নির্বাচনকালে প্রথমেই যাচিয়ে নেওয়া হয় বাজারে যেসব শিল্পী আছেন তাঁদেরই নিয়ে ভূমিকালিপি পূর্ণ করা যাবে কি না। যদি দেখা যায়—না, তা হয় না, তা হলে, হয় সে-গল্পই বাতিল, আর নয়ত সে-গল্পের চরিত্রগুলিকেই বাজারে যা পাওয়া যায় এমন শিল্পীদের মত করে গড়ে নেওয়া হয়। খুব জনপ্রিয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে ত দেখা যায় তাঁদের নিয়োগ করবার জন্য পুরো গল্পই তাঁদেরই খাপ খাওয়াবার মত করে নেওয়া হয়। এতে ভাবীর ক্ষেত্রে নতুনের সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র যে-কোন যুগান্তরকারী নাটক বা ছবির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে নতুনদের সমাবেশ। শিল্পের অধিকাংশ দিকেই নতুন ধরনের বা নতুন লোকের গল্প, নতুন ধরনের আঙ্গিক এবং নতুন নতুন শিল্পী। বেশী দূরে যাবার কী দরকার, আমাদেরই "পথের পাঁচালী"র উদাহরণ ত রয়েছে। দু একজন ছাড়া, যেমন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তী, আর সব শিল্পীই নতুন। তাই আমরা দেখেছি যেন সত্যিকারের সর্বজয়াকেই, ইন্দির ঠাকরুনকে (চুনীবালা দেবী এত প্রাচীন অভিনেত্রী যে, এখন তাঁকে চেনেই না কেউ), অপুকে, দুর্গাকে। কিন্তু হরিহর কি পণ্ডিত মশাই যখনই আবির্ভূত হয়েছেন তখন দেখেছি কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়কে। অভিনয়-কৃতিত্বে দর্শকের মনের উপরে চরিত্রানুগ ছাপ অবশ্য দিয়েছেন, সেটা তাঁদের শিল্প-সৌকর্যের পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু অপর চরিত্রগুলির অনুরূপে ওরা সটান হরিহর কি পণ্ডিত মশাই হয়েই দৃষ্টিতে এসে দাঁড়াননি। দৃষ্টিতে প্রথম বিকিরণে তারা প্রথমত কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তী, তারপর হরিহর ও পণ্ডিত মশাই। কিন্তু অপরদিকে আমরা চোখ ফেলতেই পাই সর্বজয়া, কি ইন্দির ঠাকরুন, কি অপু দুর্গাকে এবং তারপর দেখি করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীবালা, সুবীর আর উমাকে। এই যে চরিত্র রূপায়ণের তারতম্য, এর ফলে চরিত্রগুলি সম্পর্কে দর্শকের অনুভূতিতেও তারতম্য ঘটেই। আরো উদাহরণ, যেমন গিরিশচন্দ্ররূপে পাহাড়ী সান্যাল। একটা অসাধারণ অভিনয়-কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষণই সামনে সামনে থেকেছেন পাহাড়ী সান্যাল। বহু বৎসর অভিনয়ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে সাধারণের অতিপরিচিত শিল্পীদের একজন পাহাড়ী সান্যাল। তার ফলে তিনি যে-কোন চরিত্রে অবতরণ করলেই সর্বাগ্রে তাঁরই আঙ্গিক রূপটা আর সেই সঙ্গে অভিনয়-প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে উঠবেই। ফলে দর্শকমন গিরিশচন্দ্র চরিত্রটির চেয়ে বেশী নিবিষ্ট হয়ে ওঠে এই পরিচিত শিল্পীর অভিনয়-দীপ্তির প্রভাবে।

হাতে মনে প্রাণে গিরিশচন্দ্রকে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে। "শিল্পকীর্তি", "বিন্দুর ছেলে", "জেঠবৌ" কি "মামলার ফল"য়ে যে একটি একটি করে বড়বৌ চরিত্র আছে, তার প্রতিটিই আলাদা আলাদা চরিত্র। চরিত্রগুলিতে পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃতিগত মিল কিছু কিছু অবশ্য আছে, কিন্তু একই চরিত্র তারা নয়। অথচ প্রতি চরিত্রেই মলিনা দেবী অভিনয় করায় একেবারেই যেন কাহিনীতে-কাহিনীতে একই চরিত্রের পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হয়। অভিনয়-দোষে কিন্তু এমন হয়নি, বরং মলিনা দেবী প্রতিবারই গভীরভাবে এঁকে নেবার মত করেই চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন, কিন্তু শুধু সেই একই মলিনা দেবী থাকায় এবং একই প্রকৃতির চরিত্র হওয়ায় একটি চরিত্রকেই যেন বার বার করে আসতে দেখা যায়।

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন যুগ্মভাবে জনপ্রিয়তার প্রায় একটা রেকর্ড সৃষ্টি করায় বহু চিত্রনির্মাতাই ও'দের একত্রে রাখতে চাইছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কি "সাগরিকা", কি "একটি রাত" আর কি "সবার উপর"-এ আলাদা আলাদা গল্প হয়েও ওদের দুজনকে রাখতে একই প্যাটার্নের যেন, সবই যেন একই গল্প একই চরিত্র, তফাত কেবল নামের আর ঘটনাস্থলের। গল্প যেমন আলাদা আলাদাই, তেমনি বক্তব্যও থাকে বিভিন্নই, কিন্তু ওরা দুজনে থাকায় সব কখানিরই চেহারা ও প্রকৃতি যেন এক হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ, অমন পরিচিত শিল্পী থাকলে মানুষের দৃষ্টি ওদেরই উপরে নিবদ্ধ হয়ে থাকে, কাহিনীর চরিত্রটিকে আর ধরতেই দেয় না। আবার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, কি শ্যাম লাহা প্রভৃতি রয়েছেন। যাঁদের লোকে কমিক চরিত্রে দেখতেই

"অপরাজিত" চিত্রের ছোট অপু
পিনাকী সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল ফিল্মসের "তাসের ঘর" ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় উত্তমকুমার ও দেবযানী

অভ্যস্ত। হঠাৎ ও'দের কেউ যদি একটু ভিন্ন প্রকারের চরিত্রে নেমে পড়েন ও সেটাকেও লোকে কমিক চরিত্র বলেই ধরে নেয়। ফলে এরা নতুন কিছু কাজ দেখাতে গেলেও অভিনীত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটা আর ধরিয়ে দিতে পারেন না। এটাও দেখা যায় যে, কোন শিল্পী কোন এক চরিত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করে তারপর অন্য ধরনের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করতেই জনপ্রিয়তার ধাপ থেকে তাকে নেমে পড়তে হয়েছে। "রাইকমল" ছবিখানিতে কাবেরী বসু প্রথম অবতরণ করেই সাধারণের হৃদয়ে আসন লাভ করে নেন। কিন্তু তারপর একে একে "দেবী মালিনী", "দৃষ্টি", "শ্যামলী" প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চরিত্রে অবতরণ করতেই তাঁর উপর লোকের গোড়ার সেই মন যেন আর রইল না।

শিল্পী-প্রথার এই হল পরিণাম। শিল্প সৃষ্টিতে পদে পদেই তার দ্বারা ব্যাঘাত ঘটে। কাহিনীতে যে-প্রকৃতির ও আকৃতির চরিত্র, সেটা না রক্ষা করে শিল্পীর যা চেহারা ও অভিনয়ধারা সেই মতই চরিত্র সৃষ্ট হয়ে পড়ে। মঞ্চে বা পর্দায় নতুন নতুন চরিত্র পাবার এ মহা বিঘ্ন। পরিচিত শিল্পী হলেই দর্শকের অভ্যস্ত চোখে আগে ধরা দেয় তার সেই চেনা চেহারাটি এবং পরে সেই চেহারায় আড়াল করে নেওয়া কাহিনী-কল্পিত চরিত্রটি। চেনা শিল্পীর চেহারা গোপন করার জন্যই হয়েছে রূপসজ্জার উদ্ভব। তবে একেবারে অচেনা শিল্পী হলে দর্শকের মনের প্রত্যয়ে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্রটি ঐ রকমেরই আকৃতি ও প্রকৃতির বলেই গ্রাহ্য হয়ে যায়। তার উপর যদি সে-শিল্পী অভিনয় নৈপুণ্যও দেখাতে পারেন বা পরিচালক তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন, তাহলে ও চরিত্রটি একটি নতুন সৃষ্টিরই পর্যায়ে পরিগণিত হয়ে দাঁড়ায়। তাই নতুন সৃষ্টির নতুনত্বকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে গেলে কাহিনী-ভুক্ত চরিত্র মিলিয়ে শিল্পী নির্বাচনটাই প্রকৃষ্ট হয়। কাহিনীভুক্ত চরিত্রের সঙ্গে অবয়ব মিলিয়ে পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে থেকে কাউকে নির্বাচন, অথবা কাহিনীভুক্ত চরিত্র যেমনই হক জনপ্রিয় শিল্পীদের নির্বিচারে নিয়োগ দুইই সাধারণত শিল্প-সৃজনের প্রতিবন্ধক। এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন শুধু অতীব প্রতিভাবান শিল্পী যিনি চরিত্র অনুযায়ী নিজের আকৃতি-প্রকৃতিকে সেই মত সৃষ্টি করে নিতে পারেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তেমন সৃজনী প্রতিভা যুগে একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন সবই একঘেয়ে লাগে, যে-একঘেয়েমি একশ একজন জনপ্রিয় তারকাকে একই ছবিতে দেখেও ঘোচে না, যখন মনে হয় সৃষ্টি যেন চলার পথই হারিয়ে ফেলেছে। তার অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে ছবিতে বা নাটকে নতুন অবয়ব-যুক্ত চরিত্রের অভাব। অর্থাৎ প্রস্তাব দাঁড়ায় এই যে, নতুন কোন নাটক বা ছবি ঠিক করলে কাহিনীতে যেমন চরিত্র আছে

তার সঙ্গে চেহারা ও প্রকৃতির সঙ্গে মেলে বা মিলিয়ে নেওয়া যায়, সমাজের যেক্ষেত্র থেকেই হক তেমন নতুন লোক খুঁজে তারই উপরে সেই চরিত্র চিত্রণের ভার দেওয়াই হবে আর্ট সৃষ্টির সহায়ক।

এই সূত্রে আর একটা ভাবনার কথাও উল্লেখ করতে হয়। শিল্পী-প্রথার অবসান ত চাইই, সেই সঙ্গে শিল্পী-শ্রেণীও যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে কখনও নিজেদের অভিনয়-প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনে, কখনও ব্যবসায়ীর প্রয়োজনে লোক অভিনয়-জগতের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। এ-সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই সর্বক্ষণ সকল অভিনয়-শিল্পীকেই কাজে নিয়োগ করে রাখা সম্ভব হতে পারে না—নাটক বা ছবি সংখ্যায় যতই অগণিত হক না কেন। সব গল্পে সকলের চরিত্র মিলতে পারে না বলেই সব সময়েই কতক লোক বেকার থাকতে বাধ্য। অভিনয়-জগতের লোক, তারা যেন একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী। সাধারণ মানুষের কাছে তারা স্বপ্নলোকের অধিবাসী, যাদের নিয়ে মায়াজাল বোনা যায়; কিন্তু তাদের করুণা-মমতার প্রকোষ্ঠে আশ্রয় দেওয়ার কথা যেন ভাবাই যায় না। তাই সমাজের আর আর ক্ষেত্রের দুঃস্থদের মত শিল্পীর উপরে দৃষ্টি পড়ে না। বেকার শিল্পীকে তাঁর দুঃস্থতাকে নিজের অন্তরের একান্তে আটক রেখে দেওয়া ছাড়া উপায়ই থাকে না। অথচ শিল্পীর বেকার হওয়াটা তাঁর নিজের দোষও নয় বা তার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রকেও ঠিক দোষী করা যায় না। কারণ আইন করেও সব ছবি, কি সব নাটকেই সকল শিল্পীকে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না, অবশ্য তেমন আইনও করা যায় না।

আজকে এটা সমগ্র পৃথিবীরই সমস্যা। ইওরোপ ও আমেরিকার নানা রাজ্যে মঞ্চ ও পর্দার শিল্পীদের জন্য ইউনিয়ন, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু তাও ত সকল শিল্পীকে সব সময়ে কাজে নিয়োজিত রাখার কোন গ্যারাণ্টি নয়। শিল্পী বলে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী না থাকলে, অর্থাৎ যখন যেমন চিত্র বা নাট্য-প্রযোজকদের কাছ থেকে ডাক এসেছে সেই মত অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের লোক নাটকে বা ছবিতে অভিনয় শেষ করে আবার তাঁর মূল কর্মক্ষেত্রে এসে যোগদান করলে, অর্থাৎ অভিনয়টা শিল্পীর জীবনায়নের একমাত্র মাধ্যম যদি না হয়, তাহলে যেমন শিল্পী-প্রথার কুফল থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে, তেমনি সমাজের অঙ্গাঙ্গী হয়ে থেকেও একটা ভিন্ন শ্রেণীর মত বিবেচিত হয়ে সমাজ-উপেক্ষিত হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকেও শিল্পীরা রেহাই পেয়ে যান।

"রিজিয়া" নাটকে বক্তিয়ারের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী

বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়

শ্রীপ্রভাতাংশু গুপ্ত

১৮৭২ সন। তারিখ ৭ই ডিসেম্বর। বাংলার প্রথম ও আদি পেশাদার রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কলকাতায় মহাসমারোহে ঐ শুভদিনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। নাট্যরস পরিবেশনে থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'।

ঐ বছরে ১১ই ডিসেম্বর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন এই ভাবে, "শহরে থিয়েটার ও অপেরা সংখ্যায় বড় কম নেই। বর্তমানে সংখ্যা খুব বেশী না হলেও এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই রকম শখের থিয়েটার ছিল বহু। প্রতি অলি-গলিতে একটা না একটা থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল। এর ভিতর কতকগুলিকে নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর বলা যেতে পারে। তবে এই সব থিয়েটার ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হওয়াতে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়া এই প্রকার থিয়েটারে সাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল না। জনসাধারণের জন্য প্রথম পাবলিক থিয়েটার,—ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল। এ কারণে এই থিয়েটারের পরিচালক-বর্গ সত্যই ধন্যবাদের পাত্র।"

বাংলার এই প্রথম পেশাদার থিয়েটারের জন্ম কিন্তু হঠাৎ হয়নি। এর পিছনেও ক্রমবিবর্তনের ধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার বিশেষ উন্নতি সাধন হয়েছিল। তার প্রমাণ ভারতের নাট্যশাস্ত্র। ভারতের সেই অতি প্রাচীন যুগ ছেড়ে দিলেও কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, প্রভৃতি সংস্কৃত-নাট্যকারের যুগেও ভারতীয় নাট্যশালা ও সংস্কৃত নাটক সব দিক দিয়েই যে এগিয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নাটক ও নাট্যশালার এই ক্রমোন্নতির ধারায় প্রথম ছেদ পড়ল মুসলমান রাজত্বের সময়। ইতিপূর্বে হিন্দু-নৃপতিরা নাট্যশালার উন্নতি বিধানে অর্থ ও সহানুভূতি প্রদানে মোটেই কার্পণ্য করেননি, কিন্তু মুসলমান-বাদশাহদের শাসনাধীনে অবস্থা হল একেবারে বিপরীত। সহানুভূতি দূরের কথা, প্রত্যক্ষ বিরোধিতার ফলে নির্বাপিত হল নাট্যশালার দীপ, নাট্য-সাহিত্যের হল অকালমৃত্যু।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই ইত্যাদিরই প্রাচুর্য দেখা যায়।

ইংরেজের শাসনাধীনে রঙ্গালয়ের আবার জন্ম হল। ইংরেজরা নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কলকাতা শহরে একটার পর একটা থিয়েটার খুলতে লাগলেন। প্রথম থিয়েটার 'প্লে হাউস' ১৭৫৬ সনে লাল-বাজার অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয়, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছরখানেক আগে। তারপর ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৫), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩) ও সাঁ সুসি (১৮৩৯)। এই সব রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়ারের নাটক মঞ্চস্থ করা হত।

ঐ সময়ে যে-সব সম্ভ্রান্ত বাঙালী ইংরেজী লেখাপড়া শিখতে লাগলেন, তাঁরাও ঐ সব থিয়েটারে ভিড় করতেন। ক্রমে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য টেকনিকে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলতে লাগল।

এই প্রচেষ্টার প্রথম অবদান 'হিন্দু থিয়েটার'। ১৮৩১ সনে ২৯শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর জোড়াসাঁকোতে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা নাটক বলতে

সন্ধ্যারাণী ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়কে "[illegible]" ছবিতে বেশ একটি ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে দেখা যাবে
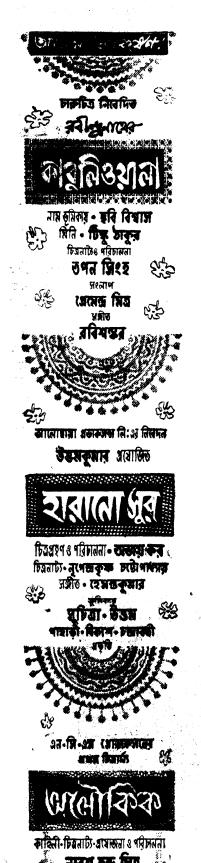
তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' থেকে অংশবিশেষ ও ভবভূতির সংস্কৃত নাটক 'উত্তর রামচরিত' ঐ থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

বাংলা নাটকের অভাব তখন সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগলেন।

১৮৩৩ সনে শোভাবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর আবাসে প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, তবে নাটকখানির নাম কোন বিবরণীতে পাওয়া যায় না। নবীনবাবুর থিয়েটারে ১৮৩৫ সনে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অভিনীত হয়।

ঐ সময়ে কলকাতা শহরে নানা শখের থিয়েটার-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।

প্রথম ছাপা বাংলানাটক, নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। ১৮৩৭ সনে সেকালের কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক আশুতোষ দেবের গৃহে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে এই নাটকখানিকে মঞ্চোপযোগী রূপ দেওয়া হয়।

১৮৩৭ সন থেকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী-পরিচালিত শখের থিয়েটারে কোনও ইংরেজী নাটক মঞ্চস্থ হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাট্যকলার উন্নতির প্রচেষ্টা প্রথম সার্থক হল ১৮৫৯ সনে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্ত-প্রচেষ্টায় বিরাট শখের রঙ্গালয় 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'। দ্বিতীয় নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'। এই নাটকের অভিনয়-তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর।

একটার পর একটা আরও অনেক শখের থিয়েটারের জন্ম হল। যেমন পাথুরেঘাটা থিয়েটার, শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বউবাজার থিয়েটার প্রভৃতি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি সাধনে এই সব থিয়েটারের দান বড় কম নয়।

১৮৬৮ সনে স্থাপিত হল বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েট্রিকাল ক্লাব। পরে নাম পরিবর্তন করে এই ক্লাব শ্যামবাজার নাট্য-সমাজে রূপান্তরিত হল। এই নাট্যসমাজের প্রধান সভ্যদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার প্রথম পেশাদার রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে চার শ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল। টিকিটের মূল্য ছিল ১, ৳ ৷৷৹।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের বিরাট অট্টালিকার বহির্বাটীর উঠানটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

অনেকের মতে ১৭৯৫ সনে রুশ-পর্যটক ... বিক্রয় করে বাংলা নাটক দেখান হয়। কাজেই এই থিয়েটারটিকে বাংলার আদি পেশাদার রঙ্গালয় বলা কর্তব্য। কিন্তু প্রথম কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ নাট্যশালার যে উন্নতি হয়েছিল, তার সঙ্গে লেবেডেফের প্রচেষ্টার কোনও যোগসূত্র নেই। দ্বিতীয় কথা, নিছক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশীর এই প্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। লেবেডেফের থিয়েটারে প্রবেশমূল্য ছিল এক-আধ টাকা নয়, এক মোহর। তারপর ঐ থিয়েটারে দুবার মাত্র অভিনয় হয়, তাও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ বাংলা-নাট্যাকারে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।

যাই হক, ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হবার পর থেকে বাংলার পেশাদার থিয়েটার দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল। এই উন্নতির মূলে সবচেয়ে বেশী দান নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের। নাটক রচনা, অভিনয় শিক্ষা ও প্রযোজনা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের উন্নতি বিধানে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

১৯১২ সনে গিরিশচন্দ্রের তিরোধানের পর রঙ্গালয়ের নেতৃত্ব গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবু) উপর পড়ল। দানীবাবু তাঁর পিতার আদর্শ অনুসরণ করে রঙ্গালয়ের পুষ্টিসাধন করতে লাগলেন।

পেশাদার রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় যুগ শুরু হল পাদপ্রদীপে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবের সঙ্গে। শিশিরকুমার তাঁর বিরাট প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিনয়ের ধারা ও রূপ একেবারে বদলে দিলেন। তারপর আত্মপ্রকাশ করল স্টারে আর্ট থিয়েটার। নতুন একদল প্রতিভাবান অভিনেতা পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগদান করলেন। যেমন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি।

বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়ের উন্নতি-সাধনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায়ের দান অমূল্য।

সেই নতুন যুগের প্রারম্ভে দুখানি নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রথম, আর্ট থিয়েটার পরিচালিত ও স্টারে অভিনীত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন'। দ্বিতীয়, শিশিরকুমার পরিচালিত ও নাট্য-মন্দিরে অভিনীত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা'।

বাংলার নাট্যশালার বর্তমান ইতিহাসে আজও 'শিশির যুগ' চলছে বটে, কিন্তু অভিনয়ে ও প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের প্রভাব কিছুটা এসে পড়েছে। ফলে, নতুন যুগের প্রারম্ভে অভিনয়-রীতি ও অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে যে সাবলীল ও বলিষ্ঠ ভাব প্রকাশের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বর্তমানে তার অভাব নাট্য-রসপিপাসু ব্যক্তির মনকে যদি পীড়া দেয়, তাতে বিস্মিত হবার

জগতের প্রথম কথা টাকা, শেষের কথা টাকা, মধ্যেরও তাই। অনেকটা ভক্তের হরিনামের মত, আদ্যন্তে চ মধ্যে চ। রূপালী চক্রের এই চক্রান্তকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। হয়ত মুষ্টিমেয় কিছু লোক কদাচ এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। কিন্তু গাছ যেমন মূল থেকে সঞ্জীবতা আহরণ করে, তেমনি এঁদের অদৃশ্য প্রেরণাকে সক্রিয় রাখতে পারে একমাত্র অর্থ।

এক আদর্শবাদী আইন-ব্যবসায়ীর গল্প মনে পড়ছে। ভদ্রলোক সবেমাত্র ল কলেজের অধ্যায় শেষ করে এক নামজাদা উকিলের জুনিয়র হয়েছেন। শিক্ষানবিশির প্রথম দিনে একটি বিপন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে আসেন। সব শুনে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে তিনি মক্কেলকে বলেন, "এ-কেস আইনে টিকবে না; আপনি মিটিয়ে ফেলুন, নয়ত পরাজয় অবধারিত।" এ-অবস্থায় সিনিয়রের পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব। কালবিলম্ব না করে তিনি চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা আঁটেন; তারপর স্বভাবসুলভ গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, "দেখি কাগজগুলো।" দশ মিনিট নীরবে কাটে, মোটা চুরুটের সিকিখানা ধিকিধিকি পোড়ে। ঘরের অবস্থা যখন ঘোর থমথমে, এমন যে আলপিন মেঝেয় পড়লে তার শব্দ শোনা যায়, তখন আবার দুটি শব্দের উচ্চারণ। এবার কণ্ঠ আরো দৃপ্ত। কথা দুটি দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত হয়: "কেস টিঁকবে।" বিপন্ন ব্যক্তি অকূলে কূল দেখেন। যথারীতি প্রাথমিক আলোচনার পর চরম কথাবার্তার দিন ঠিক হয়। মক্কেল চলে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যুবক বলেন; "স্যার, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন, কিন্তু এই অসম্ভব কেস নিয়ে কী হবে?" চোখ থেকে চশমা খুলে প্রবীণ আইনজ্ঞ আদর্শবাদীর পিঠ চাপড়ে দেন, তারপর একটু থেমে বলেন, "হবে বৈকি, নিশ্চয় হবে, তোমারও কিছু হবে, আমারও। না-ই বা হল ঐ মোটা লোকটির, যেহেতু টাকা যাকে কামড়াচ্ছে।"
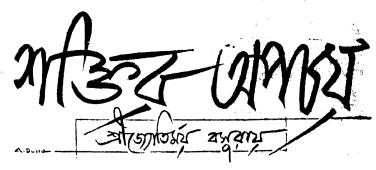
মক্কেলের সঙ্গে দর্শকের প্রভেদ সামান্যই, তবু আছে। তা হল এই: মক্কেল

অতুলনীয় আনন্দলগ্নের
অভিজ্ঞান
দি
হুমায়ুন
থিয়েটার্স
সেরা ছবি দেখার একমাত্র স্থান
লাইট হাউস
নিউ এম্পায়ার
টাইগার

চিত্তবিনোদনের কয়েকটি বাঁধা ব্যবস্থা, যেমন গান ও হাস্যকৌতুক। যে-পরিচালক এই সবগুলি সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, তাঁর ছবি [illegible] অর্থাৎ অর্থে তহবিল [illegible]

এই [illegible] কখনও কখনও ঘটেছে, [illegible]। এমন ছবি দেখা গেছে, [illegible] পরিচালকের চেষ্টায় চিত্রনাট্য [illegible] হয়েছে, তার আবেদন দেশ-[illegible] করেছে। কখনও কোন ছবি [illegible] ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে দেশের [illegible] সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করেছে, দর্শক বেদনামিশ্রিত হাসি হেসে উপলব্ধি করেছেন : "এ আমার এ তোমার পাপ"। কিন্তু এ-রকম চিত্র মাত্র বিরল বললে কিছুই বলা হয় না। এ-সব ক্ষেত্রে প্রযোজক নিশ্চয় চেয়েছেন, ছবি সুখ্যাতির সঙ্গে সোনাও আনুক। কিন্তু সব সময়ে তা হয়নি। হয়ত তার জনাই তাঁরা ফরমুলার আশ্রয় নিতে চান।

উপরে যেটুকু বলেছি তা বিশেষ করে বাংলা ছবি সম্পর্কে প্রযোজ্য। বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ স্টুডিয়োতে তোলা হিন্দী চিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার নেই। পৌরাণিক, আধা-ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র যা ঐ দুটি শহরের স্টুডিয়োতে তোলা হয় তার মধ্যে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। অবান্তর কাহিনী, রূপকথাসুলভ প্রণয়, অবাধ নৃত্য-গীত, দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ, ইত্যাদি প্রভৃতি জিনিস প্রায় সব ছবিতে একই কায়দায় সাজান থাকে। তা ছাড়া কুরুচিপূর্ণ কথা ও ইঙ্গিত মাঝে মাঝে এ-সব ছবিকে আকীর্ণ করে রাখে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-শিল্পে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। চিত্রোৎপাদনের পরিমাণ বিচারে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই বিপুল প্রচেষ্টা সার্থকতার পথ খোঁজে না। সিনেমার মত শক্তিমান বাহনের মাধ্যমে দেশবাসী অনায়াসে দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীতের সত্যকার রূপ দেখতে পারে, দেশের ঐতিহ্য কী তা জানতে পারে, সংস্কৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে পারে। একদা বাংলার রঙ্গমঞ্চ দেশের ঐতিহ্যকে জাগিয়ে রেখেছে। জাতীয় জীবনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার তরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এসে লেগেছে : তখনই সেখানে তা রূপায়িত হয়েছে এবং দেশবাসী নতুন আশার সন্ধান পেয়েছে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে মঞ্চে যা সহজ ছিল, পর্দায় কেন তা আজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, [illegible]। যতদিন [illegible] তাঁদের [illegible] না করবেন, যতদিন তাঁদের [illegible] সম্পর্কে সচেতন না হবেন, ততদিন সিনেমার মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের চেয়ে মহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, আজ সবারই এই আশঙ্কা। রাষ্ট্র এ-দিকে নজর দিলে "পথের পাঁচালী"র মত দু-একটি ভাল ছবি পাওয়া যাবে সত্যি কথা, কিন্তু রাষ্ট্রের কথাও এ-ব্যাপারে শেষ কথা হওয়া বিপদ। কারণ, এই দারুণ শক্তিকে রাষ্ট্র যদি নিজের কাজে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে শুধু গণতান্ত্রিক আলোচনা দিয়ে তাকে সুপথে পরিচালিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আজ সিনেমার কথা নিয়ে নতুন করে ভাববার দিন এসেছে। দেশের চিন্তানায়করা এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে পথ দেখাবেন, তাঁদের কাছে এইটুকু আশা অসংগত নয়।

সহকারী প্রধান শিক্ষক অপরেশের স্ত্রী সুরমা স্বামীর মুখ থেকেই খবরটা শুনল এবং শুনেই বলে উঠল, "সে কী কথা গো! না, ছিঃ, সেটা ভারী বিচ্ছিরি হবে।"

দেশবন্ধু উপনিবেশের উদীয়মান নেতা অভিজিতের নিমন্ত্রণে বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য কলকাতা থেকে আসছেন প্রজাদলের অন্যতম নেতা এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিশ্চিত মন্ত্রী হৃষীকেশ চাকলাদার। অথচ তাঁর থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে ঐ বিদ্যালয়-ভবনেই শিক্ষকদের বসবার ঘরটির আংশিক রূপান্তর সাধন করে। যুক্তি এই যে, সর্বজনের অতিথির সংকার সর্বজনীনতার ছোপ লেগে সহজ ও সার্থক হবে। আসল কারণ, সর্বজনের অতিথিকে কোন একজন নিজের ঘরে নিয়ে তুলতে রাজী হয়নি।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই সুরমার প্রতিবাদ। "ছিঃ ছিঃ! নিমন্ত্রণ করে আনছ তোমরা, তাঁকে থাকতে দেবে স্কুল বাড়িতে। অমন একজন মানী লোক!"

"তুমি জানলে কেমন করে? চেন না কি তুমি? দেখেছ কখনও?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে অপরেশ।

সুরমা দেখে নাই। কিন্তু না দেখলে, সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেই কি মানুষের সম্বন্ধে মানুষে জানতে পারে না? আর যেমন-তেমন মানুষ ত নন তিনি! খবরের কাগজে প্রায়ই তো তাঁর নাম ছাপা হয় এবং ছবিও। গুণীর গুণ আর ফুলের গন্ধ দূরে থেকেও জানতে পারা যায় না কি!

অনেকক্ষণ খুঁত খুঁত করবার পর সুরমা প্রস্তাব করলে যে, চাকলাদারমশায়কে তাদের কুটিরেই রাখতে হবে। শুধু প্রস্তাব করা নয়, রীতিমত জিদ। অপরেশ বিস্মিত হয়ে বললে, "ব্যাপার কী? এত আগ্রহ কেন তোমার?"

"রিফিউজি হয়েছি বলে কি আচার-আচরণ সব বিসর্জন দিতে হবে? অতিথি নারায়ণ। তাঁকে ঘরে স্থান না দিলে মহাপাপ হবে যে!"

"শুধুই কি নারায়ণসেবা আর কিছু নেই?"

স্বামীর চোখে কেবল কৌতুক নয়, কৌতুকের চাপা হাসিও চিক চিক করে জ্বলে উঠেছে। দেখে অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে সুরমা। লজ্জিতস্বরে বললে, "তোমার অজানা নূতন কিছু নাকি? নিজের ভাগ্যে ত কিছুই হল না। যাঁরা দেশের কাজ করছেন তাঁদের একটু সেবাভক্তিও করতে পাব না!"

"ও, সেই চিরকেলে ক্ষোভ তোমার!" বললে অপরেশ, "সেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা!"

"তা না করে কী করব! দুধের ভাঁড় নিজেই কেড়ে নিয়ে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!"

রাজি হতে হল অপরেশকে এবং নির্দিষ্ট দিনে হৃষীকেশ চাকলাদার অতিথি হিসাবে তার দীনহীন কুটিরেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

এসেই কাজের কথা শুরু করেছিলেন তিনি। তিন দিনের ঠাসবুনুনি প্রোগ্রাম চাই তাঁর, এই কংগ্রেসী ঘাটিকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে যাবেন। অভিজিতের সঙ্গে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা চলছিল তাঁর। কিন্তু বাধা পড়ল। বাধা দিলে স্বয়ং সুরমা। পরনে সস্তা দামের মোটা মিলের শাড়ি,

উৎসবমুখর দিনগুলি
উৎসবমুখর এই দিনগুলি আমাদের মনে নতুন করে এই প্রেরণা জাগাক, যাতে আমরা আরও কর্মশক্তির উৎসাহ পাই, যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি সুসমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল
সোনার বাংলা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মাথায় ঘোমটা কপাল পর্যন্ত টানা, টকটকে সিঁদুরের ফোঁটার কোন অংশই ঢাকা পড়েনি। সম্পূর্ণ মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়। গম্ভীর কিন্তু মধুরও। কোথাও সংকোচের জড়িমা নেই। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, অচঞ্চল। পানের রসে রাঙা পাতলা ওষ্ঠপ্রান্তে ভারী মিষ্টি একটু হাসি যেন লেগেই রয়েছে।

সোজাসুজি হৃষীকেশের মুখের দিকে চেয়ে সুরমা বললে, "হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমার চা তৈরি হয়ে গিয়েছে।"
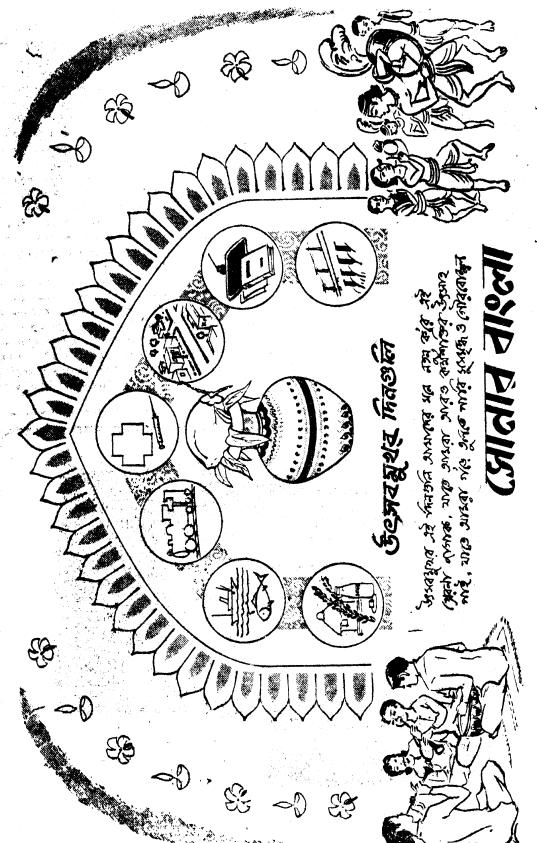
"ও", অপ্রস্তুতের মত বললেন হৃষীকেশ। "ভুলেই গিয়েছিলাম। আর ভিতরের তাগিদও তেমন নেই। হাওয়াই জাহাজে খাওয়ায় বেশ।"

"তা হলেও", সুরমা বললে, "একটু কিছু মুখে দেবেন তো! উঠুন, হাতমুখ ধুয়ে নিন।"

সুটকেশটা খুলতে যাচ্ছিলেন হৃষীকেশ। সুরমা বাধা দিয়ে বললে, "ওটা আর কী হবে?"

"চটি তোয়ালে বের করতে হবে না?"

"কী দরকার! বাইরে আসুন ত আপনি। সব রাখা আছে।"

"চটিও?"

"আসুন ত আপনি", সুরমা মুখ টিপে হাসল।

পরিপাটী ব্যবস্থা। খুশী হলেন হৃষীকেশ। অভিজিৎকে একটু ভর্ৎসনাও করলেন, "মিছামিছি ভাড়া দিয়ে আনলাম এসব জিনিস! আগে আমাকে জানাওনি কেন?"

"আমি নিজে জানলে তবে ত আপনাকে জানাব!" উত্তর দিলে অভিজিৎ, "বাড়ির কর্তাও বোধ হয় সব খবর জানতেন না।"

অপরেশ হেসে বললে, "সত্যি জানতাম না। কিন্তু দোষ আমার নয়, ওঁর। উনি আমাকে কিছু করতেও দেন না, জানতেও দেন না। ওঁর রাজ্যে আমি অনাবশ্যক, হয়ত অবাঞ্ছিতও।"

"তাই নাকি!" হৃষীকেশ সকৌতুকে মন্তব্য করলেন।

সুরমাও হাসল। স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, "যে মানুষ অনাবশ্যক তিনি শেষেরটাও হবেনই। বাড়ির কোন কাজে লাগ তুমি যে, অত উঁচু গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করছ!"

অভিজিৎ সশব্দে হেসে উঠে বললে, "হল ত, অপরেশবাবু? কেমন, আর লাগতে যাবেন বৌদির সঙ্গে!"

হৃষীকেশও হাসছিলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অপরেশ বললে, 'দেখুন, অভিজিৎ পর্যন্ত আমার পিছু লাগছে। কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, অপদার্থ আমি ছিলাম না। সংসারের কোন কাজে লাগতে না দিয়ে উনিই আমার সর্বনাশ করেছেন।'

এবার হৃষীকেশও শব্দ করেই হেসে উঠলেন। গৃহস্বামীর মুখের উপর থেকে সুরমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "কথাটা পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছিনে।" বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। জিভের ডগায় যে সম্বোধনটা এসেছিল সেটা সেখানেই আটকে গেল যেন।

না, চিরাচরিত প্রথায় 'বৌদি' বলে একে ডাকা যায় না। বয়সে অনেক ছোট সে। শ্যামবর্ণ মুখখানি কাঁচ ও কাঁচা মনে হয়। কিন্তু 'বৌমা' ডাকতেও মুখে বাধে। ঠোঁটে পানের রস এবং চোখের কোণে হাসি নিয়েও সে মুখ যেন বড় বেশী গম্ভীর। সংযম ও শালীনতার পাষাণ বন্ধনের মধ্যে তরঙ্গোচ্ছল হ্রদের পরিপূর্ণতার মহিমায় বিচিত্র সে-মুখ।

এর সংগে পরিহাস চলে না, অতি শ্রদ্ধার উপেক্ষায় ওকে দূরে রাখাও দুষ্কর।

সেই জন্যই খানিকটা এগিয়ে থেমে গেলেন হৃষীকেশ।

কিন্তু তাঁর ঐ অসম্পূর্ণ মন্তব্যের প্রত্যুত্তরেই সুরমা পরিহাস-তরলকণ্ঠে বললে, "তা ত পারবেনই না। পুরুষের জোট পুরুষের সংগে ত হবেই!"

"না, দিদি!"

হৃষীকেশের মুখ থেকে হঠাৎ সম্বোধনটা বেরিয়ে এল এবং সেটা নিজের কানে যেতেই অকস্মাৎ তার মুখখানি যেন আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক উপযুক্ত সম্বোধনটি পাওয়া গিয়েছে। হৃষ্টচিত্তে বাক্যটি সম্পূর্ণ করলেন তিনি, "সেজন্য নয়। আমি নিজেও ত দেখছি আপনাকে। এই এক ঘণ্টায় তদারকেই আমিও ত প্রায় পংগু হয়ে উঠলাম!"

গর্বে হক, আনন্দে হক, লজ্জায় হক, হয়ত বা তিনেরই সংমিশ্রণে সুরমার প্রসন্ন গম্ভীর মুখ আরও বিচিত্র হয়ে উঠল যেন। হৃষীকেশ 'দিদি' বলতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ মুখখানাই যেন নত হয়ে পড়ল। একটু সরে দাঁড়িয়ে জলখাবারের থালার উপর চায়ের বাটিগুলি গুছাতে আরম্ভ করল। তারপর প্রসংগটাকেই বদলে দিয়ে স্বামীকে উদ্দেশ করে সে বললে, "ওঁর স্নানের ব্যবস্থাটা করে দাও তুমি। আমার রান্নার খুব বেশী দেরি নেই। শুধু ত শাক ভাত।"

যথাসময়ে হৃষীকেশ যা পেলেন তা ঠিক শাকান্ন অবশ্য নয়, তবে তাতে বাহুল্যও ছিল না। প্রাঙ্গণের সামান্য শাকসবজিকে রন্ধন-নৈপুণ্যে অসামান্য করে পরিবেশন করছিল সুরমা। খেতে খেতে হৃষীকেশ আরও ভাল করে দেখলেন তাকে। না, তেমন কাঁচ নয় সে মুখ। কপালে, চোখের নীচে, গলার কুঞ্চন রেখায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে। দূর থেকে যাকে কমনীয়তা মনে হয় সেটা বাহ্য লাবণ্য নয়, ভিতরের কি যেন একটা ভাবের প্রতি-বিম্ব মাত্র। সবচেয়ে ওর বেশী প্রকাশ লুটি আছে সাধারণ চোখের অসাধারণ দৃষ্টিতে। দিঘির জলে মধ্যাহ্নসূর্যের প্রতিবিম্বের মত প্রখর উৎকণ্ঠা গভীর মমতার স্নিগ্ধতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে যেন।

খাওয়ার পরে রেকাবিতে সাজিয়ে সাজা-পান হৃষীকেশের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সুরমা বললে, "এখন বিশ্রাম করুন আপনি। কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমার খোকন-মিঠন সময়মত এসে আপনাকে সভায় নিয়ে যাবে।"

কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সুরমা। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "রাতে কী খান আপনি?"

হৃষীকেশের চোখেমুখে কৌতুকের হাসি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। "সর্বনাশ", বললেন তিনি, "আপনি এখনই রাতের খাবার তৈরি করতে লেগে যাবেন নাকি?"

"তা কেন?" উত্তর দিলে সুরমা, "অমনি জিজ্ঞেস করছি। পরে যদি ভুলে যাই। কী খান আপনি, ভাত না রুটি?"

"যা দেবেন তাই। আমি খাওয়ার বিষয়ে গোপালের মত সুবোধ বালক। তবে আমার নিজের অভ্যাস বা রুচির কথা যদি জানতে চান ত বলব যে, আমি রাতে খাই একটু দুধ।"

বিশ্বাস করতে একটু যেন সময় লাগল সুরমার। কিন্তু তার পরে সে সুরুক্ষ ভাবেই বললে, "বেশ ত, তাই খাবেন।"

"বাঁচালেন আপনি", হৃষীকেশ সত্যই একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,